"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 24th August, 1962
40 Naya Paise.

কয়েক বৎসর পূর্বে, উপর্যুপরি কয়েকটি ভয়ানক রেল-দুর্ঘটনা হওয়ার পর তৎকালীন রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পদত্যাগ করেন। তারপর রেল-দুর্ঘটনা হইলেই লোকসভায় বিরোধী পক্ষ হইতে দাবী আসে যে, রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করুন। সম্প্রতি কয়েকটি রেল-দুর্ঘটনা ঘটিবার পর ঐরূপ দাবী আসায় রেলমন্ত্রী শ্রীশরণ সিং সেই দাবী মানিতে সরাসরি অসম্মতি জানাইয়াছেন। তিনি সেই সঙ্গে বলেন যে, রেলের পরিচালনা ইত্যাদির সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং তাহার প্রতিকার করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আমাদের মনে হয় ঐ দাবীর পিছনে কোনও সারবস্তু ছিল না এবং "দায়িত্ব" গ্রহণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিরও কোনও বিশেষ মূল্য নাই।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পদত্যাগ করার পর রেল-দপ্তর নূতন মন্ত্রীর আয়ত্তে যায়। কিন্তু তাহাতে কি উন্নতির কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা দিয়াছিল? লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দায়িত্বজ্ঞান ছিল এবং সেই কারণে তাঁহার বিভাগের দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে অতগুলি জীবন নষ্ট হইতে দেখায় তিনি মনের ধিক্কারের বশে পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের ফলে যে রেলদপ্তরের কোনও বিভাগের বা পরিচালন-ব্যবস্থার কোনও উন্নতি বা সংস্কৃতি হয় তাহা নহে। বরঞ্চ যাহাদের কর্তব্যজ্ঞানের অভাবে দায়িত্বপালনে গাফিলির কারণে রেলের এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে তাহারা বাঁচিয়া গেল। পরবর্তী মন্ত্রীর আমলে রেলবিভাগের অবনতি আরও দ্রুততর হইল। সুতরাং মন্ত্রীর পদত্যাগে কোন কিছুরই প্রতিকার হয় নাই—এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না।

আমরা বলিয়াছি যে, বর্তমান রেলমন্ত্রী রেলওয়ের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে "চেষ্টা করিবেন", এই প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নাই। আমাদের এই মন্তব্যের হয়ত আরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একথা তো আমরা সকলেই জানি যে, প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তাঁহার বিভাগ-সম্পর্কিত দায়িত্বের সীমা কতদূর এবং সে দায়িত্ব-সম্পর্কিত জবাবদিহি কিভাবে লোকসভায় করা হয়, সুতরাং সে দায়িত্বজ্ঞানের যে কোনও রূপান্তর এই এক প্রতিশ্রুতির ফলে হওয়া সম্ভব, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে অক্ষম।

ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টার কথাতেও আমরা আশান্বিত হইতে পারি নাই। রেলমন্ত্রীর সহকারী মন্ত্রী, শ্রীএস ডি রামস্বামী, ঐদিনই লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, এই বৎসরে, জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে, ভারতীয় রেলওয়েগুলিতে ১১০০ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩২টি দুর্ঘটনা যাত্রীবাহী ট্রেনে ঘটে লাইনচ্যুতি ও সংঘর্ষের ফলে, এবং অন্যান্য ট্রেনে ৬৯৩টি ঘটে। ট্রেনের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডে ১৫১টি এবং লেভেল ক্রসিংয়ে রেলযান ও সাধারণ পথের পরিবহণের সংঘর্ষে ১২৪টি দুর্ঘটনা ঘটে। এই সকল দুর্ঘটনায় ১৮০ জন প্রাণ হারায়, ১৩৬ জন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং অল্পবিস্তর চোট লাগে ৫৭৪ জনের।

আমরা জানি না অন্য দেশে রেল-দুর্ঘটনার অনুপাত ইহাপেক্ষা অধিক বা কম। তবে ত্রিশ সপ্তাহে এগারশত দুর্ঘটনা—অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ছত্রিশটির উপর যে রেল-পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে একথা বলা বাহুল্য।

সহকারী মন্ত্রী বলেন যে, এই দুর্ঘটনার মধ্যে ৮২৫টির তদন্ত শেষ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে ৪৩৬টিতে রেল-কর্মচারীর কর্তব্যপালনে ত্রুটিই কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

রেল-পরিচালন বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে উপরের তালিকা যে চিত্র উপস্থিত করে তাহা আশাপ্রদ ত নহেই বরঞ্চ তাহার বিপরীত। আমাদের মুখপাত্রেরা যদি এবিষয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে প্রশ্ন করিতেন তবে এই অব্যবস্থা ও নিয়মশৃঙ্খলার অভাবজনিত দুর্ঘটনাগুলির মূল কারণ ধরা যাইত।

রেলবিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন যে আজকার দিনে রেলের পরিচালনায় কর্তব্যজ্ঞানযুক্ত বা নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ কর্মচারী খুঁজিলেও পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার কারণ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উচ্চ অধিকারিবর্গ তাঁহাদের অকর্মণ্য জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের যখন অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মচারীদিগের উপরে বসাইয়া দিতে ইতঃস্তত করেন না তখন কর্তব্যজ্ঞান বা দায়িত্বজ্ঞানের মূল্যই বা কি আর প্রয়োজনই বা কি?

কবিতা

সেখানে আশ্চর্য জাদু

দক্ষিণারঞ্জন বসু

অজগর লোভের উদরস্থ আজ মনুষ্য সত্তা,
বাউল মুহূর্তগুলো অতি দ্রুত অদৃশ্য অতীতে;
নির্মম নাস্তিকতায় প্রতিটি বায়ুকণা বিষাক্ত,
দিগন্তের কোল জুড়ে অন্ধকার পাথার বিস্তার;
লুটোপুটি ধুলোবালি উশৃংখল, উদ্দাম বাতাস।
নিঃশ্বাসে মাতাল গন্ধ, এ আষাঢ়ে প্রগাঢ় পিপাসা;
কিন্তু এও জানা সুস্থ নিদ্রা নিশ্চয়ই দুরাশা
মর্টগেজ- বিরাট প্রাসাদে। অদৃষ্টের পেন্ডুলামে
আস্থা রাখে শুধু বাতুলেরা। নিসর্গের সঙ্গে সুখ;
সেখানে আশ্চর্য জাদু, আত্মীয়তা পরম সুস্বাদু!
যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে পূত আমি মুক্ত আমি
বারংবার তোমাতেই জীবনের অর্থ খুঁজে পাই—
তোমাতেই, একমাত্র তোমাতেই!

মিডিয়া

সিদ্ধেশ্বর সেন

গঠিত সে ব্যক্তিস্বরূপ জগৎ
আলোআধাঁরিতে সন্ধি-প্রহর

গঠিত সে, বিঘূর্ণিত হলে
চারপাশচূর্ণ মনোরথ
একটি ত্রিকোণরীতি ঘোরে
আর, দন্ড-ধ্বজা ধূলিম্লান।

দুইটি শৈশব-শব দোলে
গর্ভের ঔরস, সংহার
রক্তে ভাসে জীবিতপ্রমাণ
প্রাথমিক, অদ্বিতীয় ভোরে

জেসনের স্মৃতির প্রহরে
আর্গোর বীরেরা, ভাসমান
দর্পিতা বিভক্ত-মুখ তোলে

প্রেমপাপহিংসার শহরে।।

প্রিয় রচয়িতাকে

কবিতা সিংহ

নিজের আত্মারে তুমি ধূলিতে শোয়ালে একি ভুল
ভস্ম অপমান নয়, নিহত নহে সে ব্যবচ্ছেদে,
শোণিত তরল আজো, এখনো রক্ত দিয়ে ফুল।

দুই বাহু উত্তোলিত, দেহে ঝরো নিজে ঝর্নাধারা
হে মোর একাকী হংস, আন্দোলিত, আন্দোলিত পাখা
আপন গন্ধে একা যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত-আত্মহারা।

—হে দাহ, হে শুদ্ধদাহ অপরূপ কেন্দ্রে ডাকো আরো
যেই জয়ে চক্রব্যূহে, অনঘ, অরণ্যে গূঢ় জ্ঞানে
প্রাণ চলে; সে জ্বালার তীব্র কশায় কেন মারো?

সৃষ্টিমূলে প্রাণধারা, প্রেম ক্ষুধা তৃষ্ণা পাপ ব্যথা
তোমার প্রথম দুই দ্বিতীয় হাজার কোটি আমি
প্রদর্শিত দেহ পায়, মিশে যায় মর্ত্যের জনতা।

এতবার ব্যবহৃত সময়ের দাগ গাদ কাদা
তবু সে জন্মের দ্বার ভেদ করে আজো প্রাণে নামো
নগ্ন শুদ্ধ সুবিমল, পৃথিবীতে নবজাত কাঁদা।

আমারে বিশুদ্ধ করো এ আমার একমাত্র পূজা
অমলিন উপচারে নহে ক্লেদ আবিলতা কোনো
তোমারে ঘিরিয়া থাক আত্মার দ্বিতীয়-অনুজা।

পূর্বপক্ষ

জৈর্মান

সাহিত্য নিয়ে আবার লিখতে হচ্ছে বলে আমি লজ্জিত। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সাহিত্য কিনা সে বিষয়ে আমার খটকা আছে। অন্তত যে দৃষ্টান্ত আমি এখনই হাজির করব তাকে যদি সাহিত্য বলে মানতে হয় তাহলে বাংলা সাহিত্য যে এতদিন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। অর্থাৎ গত এক হাজার বছরের ইতিহাস, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য সবই একটা স্বপ্নময় প্রহেলিকা ছাড়া আর কিছু নয়।

মুখবন্ধ এই পর্যন্ত। এবার সরাসরি বিষয়বস্তুর মধ্যে আসা যাক।

একখানি কবিতার বই হাতে এসেছে, নাম তার 'ঘুংগু'। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমি একেবারে শিহরিত, বিচলিত, অর্ধমৃত। বহুশ্রুত কোনো টনিকের বিজ্ঞাপনে যেমন লেখা থাকে—এর প্রতি বিন্দুই জীবন, তেমনি এ বই সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায়—এর প্রতি লাইনেই শক্তিশেল। তবে সুখের বিষয় এই যে, পাঠক নিজের গুণে সেই প্রাণঘাতী ব্যাপারটাকে হাসিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের সত্য যেমন দুরন্ত হাসির উচ্ছ্বাসকে কান্নায় রূপান্তরিত করেছিল তারই বিপরীত প্রক্রিয়া আর কি! তাহলে এ বই হবে আপনার শয়নে-স্বপনে নিত্যসহচর।

বাস্তবিক শোকতাপময় এ সংসারে এত অল্প খরচে (কবিতার বইয়ের আর কতই বা দাম!) এমন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার হাতের নাগালে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়! দাঁতের ব্যথা সারাতে যে পরিমাণ আক্কেল সেলামী দিতে হয়, তার চেয়ে কম খরচে আঁতের ব্যথা সারানো যাবে এমন প্রলোভন সম্বরণ করা মনুষ্যলোকে দুঃসাধ্য।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

নিরিবিলি নিরভিত নীড়
কল কল কূজনিত ঝিমি

..নীলে নীলে চারিদিক নীলাভ
মহুয়া সুরেলা তুমংতুমি।

কিংবা ধরুন—

বেড়ালটা ভালুক খায়
ইঁদুরটা বেড়াল খায়
মাছটা ইঁদুর খায়
মরমর্ জরজর্ জরায়।

সফিস্টিফরাস্ খরাস্
লনডিত ধরাস্
ঘুনডিত ফরাস্
পোড়্পোড়্ ছড়্ছড়্ ভাস।

আর দরকার নেই। মনে করবেন না এই উদ্ধৃতিগুলিতে কোনো মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। মাঝে মাঝে লাইনো মেশিনের ছাপায় যেমন দেখা যায় 'ঙঙঙক্তক্ত৫৫ ক্তএএক্তক্তক্ত' সে রকম কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের ব্যাপার নয়। আমরা অত্যন্ত সাবধানে এগুলির প্রুফ মিলিয়ে দিয়েছি। এবং কবিও খুবই সচেতনভাবে লিখেছেন লাইনগুলি।

কারণ? কারণ তিনি মনে করেন—

"Reaction-এর ভিতর দিয়ে কবির মনে গড়ে উঠে এক বিশেষ জগৎ ও জীবনচেতনা। সেই বিশেষ জগৎ ও জীবন-চেতনাকে কাব্যরূপে দিতে গিয়েই কবিকে নিজের মনের মতো করে ভাষাকে ঢালাই করে সাজিয়ে নিতে হয়।...... জীবন-চেতনা নূতন তাই ভাষাও নূতন।......" (প্রথম কথা।)

কাজেই একে পাগলামি বা ইয়ার্কি মনে করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এতে যাঁদের 'আত্মারাম ফুসকলিয়ে যাবে' তাঁদের 'পরমপিত শয়নে সমুপস্থাপিত' হতে দেরি নেই বেশি। (কোটেশান-মার্কা ব্যাক্যাংশ দুটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' থেকে গৃহীত।)

আলোচ্য লেখক অবশ্যই তাঁর আদিগুরু হিসাবে গ্রহণ করবেন রবীন্দ্রনাথ-উদ্ভাবিত বাচস্পতি নামক চরিত্রটিকে। তাহলে তাঁর দাবি এমন একটা প্রামাণ্যতা পাবে যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। কিংবা নজির হিসাবে উপস্থিত করতে পারেন তিনি জয়েসকে। তাহলে তো আর কথাই নেই। হালআমলে তরুণ কবিরা আক্ষরিক অর্থেই নীরব হ'তে বাধ্য হবেন। বিলিতি গন্ধ পেলে এঁদের তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না!

এই তো কিছুদিন আগে বীট কবিতা নিয়ে এঁরা কী রকম নাচানাচিই না করলেন? বিলেতের 'অ্যাংরি জেনারেশানে'র নকল করে এঁরা নিজেদের বলছেন 'হাংরি জেনারেশান'। কিন্তু সত্যি বলতে কি এঁরা এখনো শিশু। 'ঘংগু' পড়লে দেখতে পাবেন—What they think today, Ghangu thought yesterday!

আলোচ্য কবি তাঁর 'প্রথম কথা' অর্থাৎ ভূমিকায় বলেছেন—

'ঘংগু একজন লোকের নাম। এই বিশেষ নামটিই এ যুগে মানুষের অর্থহীন অস্তিত্বের শূন্যতা ও ব্যর্থতা সূচিত করে। এই হিসাবে ঘংগু একটি symbol।'

তারপর আছে আট পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ একটি থিসিস বা ম্যানিফেস্টো। কবিতা এ যুগে কীভাবে লিখতে হবে তা বেদান্ত গীতা, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি ঘেঁটে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। সঙ্গে আছেন এলিয়ট এবং মাইকেল রবার্টস। একে অবহেলা করা চাট্টিখানি কথা নয়!

মাঝে মাঝে এমন সব স্তবক দেখা যাবে যা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন। কিন্তু অর্থ তো এখানে বড় কথা নয়। স্তবকগুলি শিশুর কাকলী কিংবা 'প্রাথমিক তবলা শিক্ষা' ধরনের কোনো পুস্তকের বোল মনে হলেও পাঠক 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে পড়লে সরস ইক্ষুদণ্ডের চেয়েও রসালো বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন কবি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"সুতথা সুকলিত্ সাকি
মিস্ যবন অবন লাক
আকুথার আকুথার মনর মাকি
অবন চিয়রে বজ বাক।......

"এখানে বুঝতে হবে শুতশকেনা তার প্রেম-ঘটিত দুর্বোধ্য মানসিক অবস্থাকে ব্যক্ত করবার জন্য আদিম মানুষের আদিম ভাষার আশ্রয় নিয়েছে। কবির পক্ষ থেকে বলা যায় এখানে ভাষার গঠন এবং শব্দ সংকলন কাল্পনিক—শব্দের ধ্বনির ভিতর দিয়েই অর্থ বুঝে নিতে হবে।" (প্রথম কথা!)

তা তো হবেই। ভূত ছাড়ানোর মন্ত্রও এই রকম অর্থহীন, কিন্তু ভূতেরা বিলক্ষণ তার অর্থ বুঝতে পারে। অতএব এ দুর্দিনে কবিতা-প্রীতি নামক ভূত এখনো যাঁদের স্কন্ধে চেপে আছে, 'ঘংগু'র দৈব চিকিৎসায় তাঁদেরও নির্ঘাৎ ফলোদয় ঘটবে। সে পরিণতির সাহায্যকল্পে এই শেষ ফুৎকার গ্রহণ করুন—

স্বপ্ন
বিদ্যুত—
"que Dieu n'est-il a refaire?"

....

দরবারী কানাড়া
মূর্ছনা
ধা ণি পা মা পা জ্ঞা মা রে সা
মধুর মৃদঙ্গ মন্দ মন্দ বোল।

....

তবুও
মিঃ × ছিল
আছে
মিঃ y ছিল
আছে
মিঃ X y
ইতিহাস
গ্রীক, বাইজেনটাইন, রোমান, গথিক

....

Kant হাসে
শাদা দাঁতে লাল হাসি।......

পাঠক, আর পারছি না, হাসি বড় ছোঁয়াচে রোগ, হাসতে হাসতে আমার হেঁচকি উঠতে শুরু করেছে!

আধুনিক কবিতার এই 'Rock N'roll' যুগে উদ্ভবণ উপলক্ষে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

মার্কিনী জীবন

বুদ্ধদেব বসু

।। চার ।।

'আমেরিকায় সুবিধে আছে অনেক, কিন্তু আরাম নেই,' এই সূত্রটি আরো কিছুদূর অনুধাবনযোগ্য।

ধরা যাক আমাদের চেলসী হোটেলের সংসারযাত্রা। চমৎকার ফ্ল্যাট, অসুবিধের নামগন্ধ নেই; যদি যন্ত্রের দ্বারা সত্যিই সব প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা যেতো, তাহ'লে আর ভাবনা ছিলো না। কিন্তু আহার ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম সনাতনভাবেই সমাধা করতে হয়, এবং মানুষের প্রয়োজনও অনেক, তাই প্রচেষ্টা ও শ্রম অবিরলভাবে অপরিহার্য। যে-মুদিখানা আমাদের পছন্দ সেটা খুব কাছে নয়, তারা একটা ঠেলাগাড়ি ধার দিয়েছে আমাদের—সেটা যাবার সময় মসৃণভাবে চলে, কিন্তু ফেরার পথে তার ওজন হ'য়ে যায় দ্বিগুণ। কসাইখানা আলাদা, মাছ কিনতে হ'লে যেতে হয় সাত ছেড়ে আট এভিনিউতে; অমুক দোকানের আইসক্রীম ভালো, কাঁচা পাতিলেবুর জন্য হিস্পানি দোকান—এমনি সাত রাজ্যি ঘুরে, শীতে বাতাসে দগ্ধ হ'তে-হ'তে দু-জনে মিলে গাড়ি ঠেলছি; স্ট্রীটগুলো পেরোবার সময় সাবধান, ফুটপাত থেকে নামাতে বা তুলতে গিয়ে গাড়ি যেন উল্টে না যায়; মাঝে-মাঝে একটু ক'রে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নিচ্ছি;—অবশেষে বাড়ি ফেরা গেলো। বলা বাহুল্য, কাচের দরজা ঠেলে গাড়িটাকে হোটেলে ঢোকানো, তারপর লিফটে তোলা, তারপর ফ্ল্যাটের দরজা একহাতে খুলে রেখে অন্য হাতে সেটাকে ভিতরে ঢোকানো—আমরা দু-জন আছি ব'লেই এগুলো টায়ে-টুয়ে সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে কোনোটাই সুসাধ্য নয়। আর তারপর যদি ধরা পড়ে যে বাসন-মাজা সাবান আনতে ভুলেছি, বা রেফ্রিজারেটরে রাঁধুনি-চর্বি শূন্য, তাহ'লে পুনর্বার পদচালনা ভিন্ন উপায় নেই। অবশ্য এ-রকম বৃহৎ অভিযানে সপ্তাহে একবারের বেশি না-বেরোলেও চলে, তবু প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু গজিয়ে ওঠে: লণ্ড্রি, জুতো পালিশ, খুচরো খাবার, সিগারেট, ব্যাংক, পোস্টাপিশ: শার্টের হাতা ছোটো করতে দিয়েছিলাম সেটা আনতে হবে, একটা আলপিনের দরকার হ'লেও নিজেদেরই তা সংগ্রহ করা চাই। ঋতু তীক্ষ্ণ হ'লে উদাম বাড়ে তা মানছি, স্বাস্থ্যের শত্রুরাও এখানে নির্জীব, কিন্তু দিনরাত্রির আয়তন সর্বত্র সেই চব্বিশ ঘণ্টাতেই সীমিত, আর যিনি নির্বিকারভাবে নিদ্রাহীন থাকতে পারেন, ভূভারতে এমন নেপোলিয়নও বিরল। অতএব প্রতিটি দিন সম্ভ্রম ও রুদ্ধশ্বাসভাবে কেটে যায়।

যে-কর্ম নিয়ে আমি এখানে এসেছি তার দাবি অগুরু, সপ্তাহে তিনটের বেশি ক্লাশ নিতে হয় না; তবু দেখছি অপরিহার্য কালেজি বইয়ের পাতা ওল্টানো এবং বিবিধ চিঠি লেখা ছাড়া, রোজ রাত্তির দুটো পর্যন্ত জেগেও, আর কোনোরকম লেখাপড়ার সময় পাচ্ছি না, অনেক দ্রষ্টব্যও অ-দৃষ্ট থেকে যাচ্ছে। কেননা শুধু গার্হস্থ্য নয়, সামাজিক জীবনও আছে—আতিথেয়তার বিনিময়, বিবর্ধমান-বন্ধুসংখ্যা, কখনো কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। গৃহস্থালি বাদ দিলে বাঁচা যায় না, আর মেলামেশা যদি না-করা গেলো তবে তো দেশান্তরে আসা অর্থহীন। দুই দিকের দাবি মিটিয়েও আক্ষরিক অর্থে অবকাশ থাকে না তা নয়, কিন্তু আমি পারি না সেটাকে অবকাশ ব'লে অনুভব করতে, কেননা আমার অসংখ্য স্বাভাবিক ত্রুটির মধ্যে যে-দুটি সবচেয়ে গভীর, তা হ'লো—উদ্বেগপ্রবণতা ও বিস্তারের প্রতি আসক্তি। কাজ যদি একটায়, দশটা থেকে আমার অস্বস্তি শুরু; তিনটি পরম্পর নিয়োগের মধ্যে যে এক-আধ ঘণ্টা ফাঁক থাকে তা কোনোরকম কাজে লাগাতে আমি সীমাহীনরূপে অক্ষম। কূটোক্তি ক'রে বলা যায়, আমার মন ছড়িয়ে বসার জায়গা না-পেলে চলতে পারে না; অর্থাৎ, সময়ের অনেক ফেলাছড়া ক'রে তবে আমাকে ধরা দেয় উদ্যোগ: আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজগুলির জন্য এ-রকম একটা মোহ আমার প্রয়োজন যেন আমার সময় অফুরান। এই যে আমি লিখছি—যেটুকু কলম চলছে তার চেয়ে অনেক বেশি চোখ যাচ্ছে জানলায়, রমণী চাটুয্যে স্ট্রীট পেরিয়ে সিঙ্গি পার্কের লম্বা গাছগুলির দিকে, ভাবছি, ট্র্যামে ভিড়, স্মৃতি ও সম্ভাবনার বুদ্বুদ উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, শেষ বাক্যটি কেটে দিলাম, হলদে শাড়ি-পরা মহিলাটিকে মেঘলা বেলায় দেখাচ্ছে ভালো, হঠাৎ একটা নতুন ভাবনার স্ফুরণ, অনেক-কিছু মনে পড়ছে এ-মুহূর্তে যার প্রয়োজন নেই, শালকরের দোকান বন্ধ হ'লো——এই ভাবে নিজের মনের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে আছি, আর এটাই—কণ্টকিত ও কষ্টকর হ'লেও—আমার মতে এরই নাম অবকাশ। অর্থাৎ, এই চেষ্টা যেন আমাকে ধীরে-ধীরে বদলে দিচ্ছে, আর, যেহেতু পঙ্গুতাও এক প্রকার গতি, তাই সাপ্তাহিনের চোখে দু-দুটো

মতো তৈরিও যে হ'য়ে যাচ্ছে না তা নয়। ফলাফল খুব উৎসাহজনক বলা যায় না, কিন্তু ধৈর্য ও সরল গণিত আমাকে পরামর্শ দেয় যে এমনি ক'রেই পঞ্চাশ দিনে একশো পৃষ্ঠা রচিত হ'য়ে যাবে, এবং যার আরম্ভ আছে, লেগে থাকলে তার শেষও অনিবার্য।—কিন্তু এই ধরনের অবকাশ কি আমেরিকায় কেউ পায় কখনো?

একজন তরুণ মার্কিনী সাহিত্যিক, যিনি আমাকে সৌহার্দে বেঁধেছেন, তাঁকে একদিন এই কথাটা জিগেস করেছিলুম। 'কি করে আপনারা বই লেখেন, বলুন তো? অর্ধেক সময় কি ঘরকন্নার কাজেই চ'লে যায় না?' 'জানেন না বুঝি?' হেসে জবাব দিলেন আমার বন্ধু, 'সম্প্রতি কয়েকটা "হোম" হয়েছে লেখকদের জন্য।' '"হোম" মানে?' 'মানে—নির্জন পল্লীগৃহ, ঘর, শয্যা, খাদ্য, সব পাওয়া যায়; কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না, সময়মতো ঘরেই খাবার দিয়ে যাবে, আপনি নিবিষ্ট হ'য়ে লিখতে পারবেন।' 'সত্যি? আছে নাকি এ-রকম?' 'আপনারা তো দু-জনেই লেখক, কিছুদিন কাটিয়ে আসুন না ও-রকম কোথাও, কোনো খরচ নেই, কিছু টাকাও বাঁচবে আপনাদের।' এই অভিনব আশ্রম চেখে দেখার সময় আমি পাইনি—হয়তো সেটা ভালোই হয়েছে, কেননা লেখাটা যেখানে নৈতিক দায়িত্বে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আর সেই উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান আমাকে পোষণ করছেন, সেখানে হয়তো—পাছে কিছু লেখা না হয়, সেই উদ্বেগের পীড়নেই আমি বিকল হ'য়ে যেতুম।

আমি জানি, আরো বেশি অভ্যস্ত হ'লে আমিও অনেক রন্ধ্র খুঁজে পেতুম, কেননা মানুষের অভিযোজনশক্তির তুলনা নেই, আর এই মার্কিনদেশে, শুধু একশো তলা বাড়ি নয়, কিছু মানসকীর্তিও রচিত হয়েছে। তবু, মার্কিনী সাহিত্যিকদের প্রবাসপ্রীতিও স্পষ্ট, এবং তা এজরা পাউন্ড ও হেমিংওয়ের সঙ্গেই অবসিত হয়নি; এর একটি কারণ কি এ-রকম হ'তে পারে না যে অন্যান্য দেশে—এমন কি ফ্রান্স বা ইটালিতে—অবকাশ এত দুর্লভ নয়? আমার এই অনুমান যদি ভুল হয়, তবু এ-কথা বোধহয় সত্য যে মার্কিনী ব্যবস্থা একদিকে যেমন অতুলনীয়রূপে দক্ষ ও মসৃণ, তেমনি অন্য দিকে উৎকণ্ঠাজনক; অর্থাৎ যদিও সময় বাঁচাবার জন্যই যন্ত্র, তবু যন্ত্রসমবায়ে আখেরে কতটুকু সময় বাঁচে, বা সময় বাঁচলেও সুখের অংশ ক'মে যায় কিনা, তা বলতে হ'লে সূক্ষ্ম হিশেবের প্রয়োজন হবে। ধরা যাক আমরা যদি ঘরকন্নার ঝামেলা বাঁচাতে চাই, তার উপায় নেই তা নয়; কিন্তু শুধু রেস্তোরাঁয় ও কাফেটেরিয়ায় খেয়ে কালাতিপাত করা ব্যয়সাপেক্ষ, বা সময়সাপেক্ষ, বা দুটোই; আর দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা হ্যাম্বার্গার খেয়ে নিলে যথোচিত ক্যালরিলাভ ঘটলেও, তা আমাদের ক্ষুদ্র বাঙালি-সাধ্যে অন্য কারণে কুলোয় না। বোতাম টিপেও কফি-স্যান্ডুইচ পাওয়া যায়, তার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সময়সংক্ষেপ দুটোই সম্ভব, কিন্তু তৃপ্তি হয় কিনা সেই প্রশ্ন বাকি থেকে যায়। হাজার হোক, মানুষের একটা রসনা আছে, এবং তা বিচিত্র স্বাদগ্রহণে সক্ষম ও উৎসুক।

বিপুল লোকসংখ্যায় প্রপীড়িত আমরা, আর এ-দেশে সর্বত্রই লোকাভাব।* দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে হ'লে এদের অবস্থাই বরণীয় তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু যেহেতু এরা সংখ্যায় স্বল্প, এবং কতগুলো মৌল বিষয়ে সকলেরই অধিকার সমান, তাই মানুষের অন্য দু-একটা অধিকার সংকুচিত করার প্রয়োজন ঘটে। বিছানায় শুয়ে চা, ঘরে ব'সে বা একতলায় নেমে ব্রেকফাস্ট,—যা য়োরোপে মাঝারি হোটেলেও প্রাপ্য, এখানে তা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে, হোটেলগুলো অধিকাংশই নিরন্ন। এবার ন্যু ইয়র্কে এসে প্রথম যে-হোটেলে উঠেছিলুম, তার সংলগ্ন একটি পানশালা ভিন্ন কিছুই ছিলো না; যে-ঈষৎরঞ্জিত উষ্ণ জল ড্রাগস্টোরে চায়ের নামে চলে, তারই উদ্দেশে, আবহাওয়া যখন মেরুপ্রতিম, সকালে উঠে আমাকে বেরোতে হ'তো। কিন্তু একদিন দেখলুম পর-পর ড্রাগস্টোর বন্ধ; বরফ উজিয়ে মাইলখানেক হাঁটার পর অবশেষে একটা খোলা দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হলুম, কিন্তু সেখানে চা ব'লে যা দিলে তাকে পেয় ব'লে মানতে হ'লে অনেকখানি কল্পনাশক্তি খাটাতে হয়। ফিরে এসে, একটু বেলায়, দু-জনে মিলে আবার বেরোলাম; কিন্তু ফিফথ এভিনিউ ধ'রে মিনিট পনেরো হাঁটার পরেও সান্ত্বনার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না; দোকানগুলো, তাদের চিত্তহারী ফলকচিহ্ন ও স্ফটিক-পেটিকার সাজসজ্জা নিয়ে, হৃদয়হীনভাবে অবরুদ্ধ। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, আজ রবিবার। কয়েক-সপ্তাহ পরে এক বন্ধু ডাকলেন লাঞ্চে—সেদিন শনিবার ছিলো; ঘরে ব'সে কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি আমাকে নিয়ে এলেন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর নিচের তলায় এক নামজাদা রেস্তোরাঁয়; সেখানে আমরা শুধু বচনের দ্বারা আপ্যায়িত হলুম, কেননা একটু আগে সেটি বন্ধ হ'য়ে গেছে। বিকল্পের খোঁজে হাঁটতে-হাঁটতে নিমন্ত্রণ-কর্তা আমাকে জানালেন যে কর্মিকদের সাপ্তাহান্তিক ছুটি দিতে হ'লে রেস্তোরাঁ সেদিন বন্ধ রাখতে হয়, কেননা, বদলি লোক দুষ্প্রাপ্য। ছুটির দিন সকলেরই কাম্য, তা দিতে আপত্তি হওয়া যেমন অনুচিত, তেমনি সকালে উঠে এক পাত্র চায়ের প্রার্থনাও অবৈধ নয়, আর প্রকৃতিতেও এমন কোনো বিধান নেই যে মানুষ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হবে শুধু সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। অবশেষে, আত্মরক্ষার তাগিদে, আমরাও শিখে নিয়েছিলুম পাড়ার কোন দোকান শনিবারে কখন বন্ধ হয়, কোনগুলো খোলে রবিবার বিকেলে, আর কোন-কোন ইহুদির দোকান রবিবার সকালবেলাতেও প্রবেশ্য। কিন্তু এই নিখিলপৌর ন্যু ইয়র্ক, যেখানে জীবনের স্রোত প্রখর, আর অসংখ্য মানুষ অসংখ্য প্রকার কর্মে ও ব্যসনে লিপ্ত, সেখানে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো কারণে তৎক্ষীভাব আশা করা যায় না; রবিবারের মৃতবৎ পূর্বাহ্ণটাকে তাই মনে হয় যেন মহাকাব্যে ছন্দপতন, এক অসমঞ্জস মুদ্রাকরপ্রমাদ। এবং এদের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে-অদ্ভুত অদক্ষতা দেখা যায়, তারও কারণ যন্ত্রের প্রসার ও লোকস্বল্পতা; আমরা যাকে 'হস্তশিল্প' বলি তা অবশ্য প্রতীচীতে বহুদিন লুপ্ত, কিন্তু আরো সাধারণ অর্থে যা হাতের কাজ, যেমন বেশবাসে ছোটোখাটো সংস্কারসাধন, তার জন্যে উপযুক্ত কার্মিক খুঁজে বের করা—ন্যু ইয়র্কে না হোক, মফস্বল শহরে অতিশয় প্রয়াসসাপেক্ষ। এমনকি ন্যু ইয়র্কেও কোনো মহিলা তাঁর কোটের ছাঁট বদলে নিতে চাইলে খুব সম্ভব প্রতিহত হবেন; সেই কাজে ইচ্ছুক ও সক্ষম কোনো দোকান যদি বা খুঁজে পাওয়া গেলো, দেখা যাবে প্রায় সেই

* পিটসবার্গে আবাসিক পল্লীতে পনেরো-কুড়ি মিনিট ধ'রে হেঁটেও আমি কোনো জনপ্রাণীর দেখা পাইনি; গাড়ি চলছে অনেক, কিন্তু ফুটপাত নিতান্ত নির্জন, প্রয়োজন হ'লে পথের নিশানা জেনে নেবার উপায় নেই।

ব্যয়েই নববস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব। এই হ'লো একটা দিক;—আর একদিকে, লোকাভাবের জন্যই, বিনিয়োগকর্তারা অনেক সময় বাধ্য হন আনাড়ি দিয়ে কাজ চালাতে; এবং কর্মিকমহলে ঘন-ঘন পরিবর্তনও হয়; ফলত, প্রায় অবিশ্বাস্য ভুল হয় মাঝে-মাঝে, পঞ্চাশটি কবিতার বই যিনি অর্ডার দিয়েছেন তাঁকে পাঠানো হ'লো একাত্তরখানা বিজ্ঞানো-পন্যাস, এ-রকম ঘটনা আমারই অভিজ্ঞতায় আছে। একই কারণে মার্কিনী রেস্তোরাঁয় পরিবেশণ অনেক সময় তৃপ্তিকর হয় না।

মার্কিনী জীবনের দ্রুতি সর্বজন-বিদিত, কিন্তু তারও ব্যতিক্রম আছে। ভাবতে ঈষৎ কৌতুক বোধ হয়, যে-নগরে ভূতলযান সারারাত্রি সচল, আর রবিবারের বিপুল সংবাদপত্র শনিবার রাত্রে বেরিয়ে যায়, সেখানে দিনে একবারের বেশি চিঠি বিলি হয় না, ডাকবিভাগের গতিও মন্থর। কলকাতার চিঠি তিন দিনেও পাওয়া গেছে, কিন্তু এয়ার-মেলে শিকাগোর চিঠি অনেক সময় দু-দিনের ব্যাপার; আর ট্রেনে-আসা বা এমনকি স্থানীয় পার্সেলগুলো, এক্সপ্রেস-চিহ্নিত না-হ'লে, পৌঁছবার জন্য কিছুমাত্র তাড়া করে না। কর্মকেন্দ্র বিরাট, সে-তুলনায় কর্মিক অল্প: এ ছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ডাকঘরগুলি, নগরের আয়তন হিশেবে, সংখ্যাতেও প্রচুর নয়, বেশ কিছুটা দূরে-দূরে ছড়ানো। ডাক-টিকিটের যন্ত্র অবশ্য যেখানে-সেখানে বসানো আছে, আছে সব হোটেলে ও ফ্ল্যাটবাড়িতে ডাকবাক্স—কোথাও-কোথাও সেগুলো নেমে গেছে সোজা পঞ্চাশ থেকে একতলা পর্যন্ত—অর্থাৎ, সাধারণ লোকের সাধারণ প্রয়োজনগুলি পোস্টা-পিশে না-গিয়েও মিটে যায়; নিকটতম ডাকঘর কোথায়, সে-বিষয়ে অনেকের ধারণাও অস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ডাকবিভাগের যা সম্বন্ধ, তাতে তার কার্যালয়গুলিতে মাঝে-মাঝে না-গেলে চলে না, আর তখন নতুন ক'রে বুঝি যে সময় ও শ্রমের ব্যয়, যন্ত্রের বেগ ও বাহুল্য সত্ত্বেও, এ-দেশে কী-রকম অনিবার্য ও দৈনন্দিন।

যে-কোনো মুদিখানায় আপনাকে ঠেলাগাড়ি নিয়ে নিজে খুঁজে নিতে হবে জিনিশপত্র; এটা ন্যু ইয়র্কে তেমন চেষ্টাসাপেক্ষ নয়, কেননা দোকানগুলি সাধারণত ছোটো, আর সাহায্যকারীও থাকে দু-একজন। কিন্তু লস এঞ্জেলস-এ একবার দেখেছিলাম এক 'সুপার-মার্ট', বা বৃহদায়তন মুদিখানা; থরে-থরে সাজানো আছে পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্য ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী—কর্মিক ছাড়া কিছুরই অভাব নেই। একটিমাত্র লোক কাউন্টারে ব'সে আছে, সে এক হাতে যন্ত্রের দ্বারা হিশেব মিলোয়, অন্য হাতে সওদাগুলো ঠোঙায় ভ'রে ফ্যালে, আর মূল্য অবশ্য তারই কাছে দেয়। সমস্ত ব্যাবসা একটি লোক চালাচ্ছে। মানহাটানের বিভাগীয় বিপণীগুলিকে এই মহাদেশের দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধরা হয়—সেগুলো যে কত বড়ো তা চোখে দেখেও ধারণা করা শক্ত—কিন্তু সেখানে কিছু কিনতে গিয়ে কর্মি-কার কটাক্ষলাভ সাধনসাপেক্ষ হ'তে পারে। নামজাদা রেস্তোরাঁগুলোতেও একই ব্যাপার। সময়ের টানাটানি থাকলে সে-সব দোকানই শ্রেয়, যেগুলো ক্ষুদ্র ও অনামী।

আমি বলতে চাচ্ছি যে সময় জিনিশটা এমন সূক্ষ্ম ও রহস্যময় যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ শুধু আপাতভাবে জয়ী হ'তে পারে; নানাভাবে তাকে প্যাঁচে ফেলা সম্ভব হ'লেও, অবশেষে তার কুটিল প্রতিশোধ এড়ানো যায় না। মার্কিন দেশের গতিবেগ দেখে প্রথমে খুব চমক লাগে, কিন্তু কিছুদিন বসবাস করলে এই আদিসত্য উপলব্ধ হয় যে, মানুষের সঙ্গে সময়ের দূরত্ব অনতিক্রম্য; আমরা একদিকে যা অর্জন করি অন্য দিকে তার মূল্য আমাদের দিতেই হবে। দেশটা অত্যন্ত গতিশীল ব'লেই কোনো-কোনো কাজ এখানে মন্থর; ন্যু ইয়র্কের ভূপৃষ্ঠ-গামী যানগুলোকে অনবরত লোহিত-সংকেত থামিয়ে দিচ্ছে; নগরের সঙ্গে উপনগর মিশে আয়তন এমন স্ফীত হচ্ছে যে আবাস ও কর্মস্থলের ব্যবধান ঘোচানো অনেকের পক্ষে দ্রুত ট্রেনেও কালক্ষয়ী। পূর্বেই বলেছি, দু-একটি শিশু-সন্তান থাকলে মানহাটানে ফ্ল্যাট পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু পিতামাতাদের সমস্যা ওখানেই শেষ হয় না, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনও সন্তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার এক সহকর্মীকে সস্ত্রীক আপ্যায়ন করার জন্য আগ্রহ ছিলো আমাদের, কিন্তু তাঁরা প্রথমে রাজি হ'য়ে শেষ পর্যন্ত আসতে পারলেন না, তার কারণটা উল্লেখযোগ্য। দিনটা ছিলো শনি-বার, আগে জানতেন না সেদিন তাঁদের তরুণী কন্যার 'ডেইট' আছে; এদিকে তাঁদের দুটি সন্তান এখনো শিশু, বয়ঃ-প্রাপ্তরা একযোগে বেরিয়ে গেলে তাদের দেখাশোনা কে করে? শহর থেকে দূরে যে-পল্লীতে তাঁরা থাকেন, সেখানে শিশু-রক্ষক সহজে মেলে না, আর পুত্রকন্যার 'তারিখে' বিঘ্ন ঘটানো মার্কিনী তন্ত্রে অসম্ভব। এমনি সমস্যা এখানে সন্তান,

আর এমনি অধীন এখানে পিতামাতা। সন্তানলালনের সময় এলে অনেক মেয়ে কর্ম ছেড়ে দেন, তাঁদের গতিবিধিও হয় সীমিত, আর দম্পতিকে দু-ঘণ্টার জন্য সিনেমায় যেতে হ'লেও, হয় চাই করুণাময়ী প্রতিবেশিনী, আর নয়তো শিশুরক্ষকের জন্য ঘণ্টাপিছু ডলার গোনা আবশ্যক। শুনেছি, মাঝে-মাঝে তরুণ দম্পতিরা শিশুকে আহারাদি করিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে বেরিয়ে যান;—তুলনা করলে আমাদের সমাজে দুটো-একটা ক্ষুদ্র সুবিধে এখনো হয়তো ধরা পড়ে।

উপরোক্ত 'তারিখ' কথাটার ভাষ্য প্রয়োজন হ'তে পারে। 'তারিখ' মানে—কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি যাকে 'প্রেমিক' ও 'প্রেমিকা' বলছে, তা-ই (যদিও ঐ বাংলা কথাটার ইংরেজি প্রতিশব্দ ভাবলে যে-অর্থ দাঁড়ায়, সেটা এখানে অপ্রয়োজ্য)। আর যুগলবিহারের সন্ধ্যাটিরও ঐ নাম। তরুণ-তরুণীর পূর্বরাগলীলা তিনটি পরিভাষার উপর নির্ভর করছে : 'বয়-ফ্রেন্ড', 'গার্ল-ফ্রেন্ড' ও 'ডেইট'। ডিক্ যখন মার্থাকে কোনো-এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে বেড়াবার আমন্ত্রণ জানালে, আর মার্থা তা গ্রহণ করলে, তখন তারা পরস্পরের 'ডেইট' হ'লো। ডিক্-এর কর্তব্য নানাভাবে মার্থাকে আপ্যায়ন করা: বয়স ও আর্থিক অবস্থা বুঝে চকোলেট, পদচারণা, সিনেমা, ডিনার, ডিনারের পরে থিয়েটার বা নৃত্য, মোটরে ভ্রমণ, উপহারপ্রদান, ইত্যাদি, আর মার্থার কর্তব্য হ'লো ডিক্-এর চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার ও সংরক্ষণ। কিছুদিন পরে সম্বন্ধ হয়তো ভেঙে গেলো: ডিক্-এর পছন্দ হ'লো শার্লটকে, আর মার্থার সঙ্গী হ'লো ফ্রেড;—এমনি ক'রে, হার্ট্য বেগে বাঁক নিতে-নিতে, কোনো-একদিন ভাগ্যবতীরা হন অঙ্গুরীয়ধারিণী। এই প্রথা এতদূর পর্যন্ত ব্যাপক যে—আবেগ অথবা পরিণামচিন্তা না-থাকলেও—বিনোদ হিশেবেই সমাজে এটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ: নবাগত বিদেশী ছাত্রের সম্ভবপর বায়ের মধ্যে মাসে দুটো 'তারিখে'র উল্লেখ করতে সব অধ্যাপক ভুলে যান না, এবং যে-কন্যা চোদ্দ পেরিয়েও প্রথম 'তারিখে' বেরোতে পারেনি, তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে জনক-জননী উদ্বিগ্ন হন। পিটসবার্গের মহিলা-কলেজের ছাত্রীরা, অবশ্য অনুমতি নিয়ে, মাঝে-মাঝে ক্লাশে আসতো 'সবান্ধবে', আর সন্ধ্যাবেলা অপেক্ষমাণ যুবকদের দেখেই বোঝা যেতো যে আর-এক সপ্তাহ শেষ হ'লো। একবার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনেছিলুম দুই ছাত্রের মধ্যে কিছুটা কৌতুকজনক সংলাপ : শৌচাগারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভারতীয় যুবক জিগেস করছে তার মার্কিন বন্ধুকে—'তার সঙ্গে "ডেইট" পেয়েছিলে তুমি? বলো না—কোন রেস্তোরাঁ তার পছন্দ? কী খেতে ভালোবাসে? কী-রকম কথাবার্তা ও আচরণ তার মনোমতো? আমিও চাই তার সঙ্গে একটা "ডেইট"—যে ক'রে হোক, যত খরচ হয়—আমার কি কোনো আশা আছে মনে হয় তোমার?' এই আগ্রহের ফলাফল আমি অবশ্য জানতে পারিনি, কিন্তু মনে হয়েছিলো যুবকটি ভারতীয় ব'লেই এতটা উচ্ছ্বাসী। মার্কিনী সমাজে মেয়েরাই বেশি আগ্রহশীল, আর 'মিস'-পদবিযুক্ত প্রৌঢ়াদের সংখ্যা চিন্তা করলে তার কারণ বুঝতেও দেরি হয় না। একবার ন্যু ইয়র্কে এক ইহুদি কবির আতিথ্যে আমি অর্ধেক দিন কাটিয়েছিলুম; বিকেলের দিকে, নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে যখন ডিলান টমাস-এর রেকর্ড শোনাচ্ছেন, তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজলো। উঠে গেলো তাঁদের তরুণী কন্যা, দু-মিনিট পরে উদ্ভাসিত মুখে ফিরে এসে মা-কে কী যেন বললে, আর মা তাকে চুমু খেয়ে, জড়িয়ে ধ'রে, কোলে নিয়ে এমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করলেন যেন কোনো অসামান্য সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে। এক ফাঁকে মুখ ফিরিয়ে তিনি সুখবরটি জানিয়ে দিলেন আমাকে : কন্যার 'বয়-ফ্রেন্ড' মাঝে অনেকদিন উদাসীন ছিলো, তাঁরা ধ'রে নিয়েছিলেন তার ভাবান্তর ঘটেছে—কিন্তু না, আজ আবার সে 'তারিখ' নিয়েছে ওর সঙ্গে। মাতৃস্নেহের এই উদ্বেলতা সেইজন্যেই।

পাছে এই বিবরণ প'ড়ে কোনো বাঙালি পাঠক বা পাঠিকার অধর কুঞ্চিত হয়, সেইজন্যে দু-একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি। প্রত্যেক সমাজ অচেতনভাবে যে-সব ব্যবস্থা সৃষ্টি ক'রে তোলে, তার পক্ষে সেগুলোই উপযোগী ও যথোচিত; কালক্রমে তার মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তারই নাম বিবর্তন, এবং তার সমালোচনার অধিকার শুধু তাদেরই আছে যারা সেই সমাজের অন্তর্ভূত। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'ভিতর থেকে দেখা', তারই চেষ্টা বিদেশীর কর্তব্য, এবং সেটুকু সাধিত হ'লেই তাঁর ভ্রমণ সার্থক। পর্যবেক্ষণ ও যথাসম্ভব সহানুভূতি—এর বাইরে, আমার বিশ্বাস, বিদেশীর অধিকার নেই। শেতাঙ্গরা, নেহাৎই বাইরে থেকে দেখে, ভারত বিষয়ে যে-সব গ্রহসনোচিত উক্তি মাঝে-মাঝে করেছেন—বা এখনো ক'রে থাকেন—সেই দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা হ'তে পারি সতর্ক, এড়াতে পারি এমন অনেক ভ্রান্তি, যা কিঞ্চিৎ চিন্তার দ্বারাই অপসারণীয়। এ-কথা কারো অজানা নেই যে প্রতীচীতে এখন নিখিলনিয়ম স্বনির্বাচিত বিবাহ; কয়েকটি অবশিষ্ট রাজবংশে ছাড়া পাতানো বিয়ে কল্পনাতীত, এবং পিতামাতা কর্তৃক আয়োজিত কোর্টশিপের যুগও বহুকাল অপগত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ তার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বেছে নেবে—এই ধারণা, যা আমার মতে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয়, এবং যা ভারতেও অচলিত ছিলো না এবং নেই—মার্কিনী 'তারিখে'র প্রথা তারই একটি সাম্প্রতিক পরিণতি। এই-ভাবেই—যদি হবার হয়—এরা বিবাহিত হবে, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এর ফলে মাঝে-মাঝে অনর্থ ঘটে না তা নয়, কিন্তু সে-সম্ভাবনা তো সর্বত্র ও সর্বদাই উপস্থিত, সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা আছে শুধু জেলখানার অন্দরমহলে। যদি বিশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অপনোদনই লক্ষ্য হয়, তাহ'লে স্বাধীনতা নিঃসার হ'য়ে পড়ে, আর স্বাধীনতা ভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব। স্বাধীনতার অর্থ কী, এবং তা কতদূর পর্যন্ত কল্যাণকর, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, তবে অন্ততপক্ষে বৈবাহিক প্রথা আলোচ্য হ'লে আমাদের নিজেদের উদ্দেশে দু-একটি প্রশ্ন করা বিধেয়। প্রশ্ন এই : এ-বিষয়ে আমরা কি জগতের সামনে কোনো উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করছি? এখনো কি—দক্ষিণ ভারতের কথা ছেড়েই দিই—কলকাতার কাগজগুলিতেও 'সুন্দরী, এম. এ, ডিগ্রিপ্রাপ্তা, রবীন্দ্রসংগীত ও গৃহকর্মে নিপুণা' পাত্রীর জন্য প্রচারিত হচ্ছে না বিজ্ঞাপন, উক্ত মহিলাদের সজ্জিত ক'রে 'দেখানো' হচ্ছে না জনে-জনে—যেন তাঁরা নিষ্প্রাণ পুতুল বই কিছু নন, এখনো কি আমাদের 'শিক্ষিত উপার্জনক্ষম' যুবকেরা দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা শুষে নেবার পরেও সন্ত্রস্ত শ্বশুরালয়ের দ্বারা অনবরত তৈলাক্ত হচ্ছেন না? না কি এমন সম্বিবেচক পিতা দেশে আর নেই, যিনি অসাধুতা নিবারণের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, পাঁচশো জোড়া চোখের সামনে বিবাহসভায় স্বর্ণালংকার ওজন ক'রে নেন, না কি সেই সব সুপুত্রেই নির্বংশ হয়েছে, যারা পিতার আদেশে সর্বশেষ মুহূর্তে পরিত্যাগ করে পরিণীতপ্রায় কন্যাকে?

সমাজজীবনে যে-ঘটনা সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে বেশি প্রণয়োন্মুখ, তাতে এই রকম হল্লাহলসঞ্চার আর-কোন দেশের বৈশিষ্ট্য? আমার অনুরোধ : এই তথ্য-গুলি তাঁরা যেন স্মরণে রাখেন, যাঁদের মনে মার্কিনী 'তারিখ' বিষয়ে অপক্ষ-পাতী মন্তব্যের উদ্রেক হচ্ছে। এবং এও যেন তাঁরা না ভোলেন যে আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে, যেখানে স্বপ্রণোদিত বিবাহের সংখ্যা বর্ধমান, সেখানেও সম্প্রতি দেখা দিয়েছে অস্থি-রতা, অব্যবস্থা, সঙ্গ-পরিবর্তন, বিবাহের ধ্রুবতাও আর অবধারিত নেই। এটাই যুগধর্ম, এটাই আধুনিক রীতি;—মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও উপার্জনক্ষমতা যত বাড়বে, যতই তাঁরা ব্যক্তিত্বে ও আত্ম-বিশ্বাসে সম্পন্ন হবেন, ততই এর প্রসার অনিবার্য। বর্তমান জগতে স্থান পেতে হ'লে তার অশান্তিও মেনে নিতে হবে—কিন্তু আসলে সেটাই হয়তো প্রাণস্পন্দন।

মূল বক্তব্য থেকে দূরে স'রে এসেছি। বলছিলুম, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মার্কিনী দ্রুতি ও দক্ষতা কেমন নিজের কাছেই মেনে নিয়েছে পরাভব। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথা না-বললে অন্যায় হবে যে এদের কর্মশক্তি যেমন বিপুল, যেমন বহুমুখী, তেমনি প্রয়োগনিপুণ ও অনা-ড়ম্বর। পূর্ণ উদ্যম ও অভিনিবেশ ব্যব-হৃত হ'লে, কত স্বল্পসংখ্যক কর্মিকের দ্বারা কত বড়ো ব্যাপার চালিত হ'তে পারে, এই দেশ তার উদাহরণস্থল। কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদন অন্যান্য দেশেও দেখা যায়, কিন্তু যা আবশ্যিক ছিলো না, এবং যাতে অন্যে লাভবান হবে, অধিকাংশ সময় সে-রকম কাজেও এদের তৎপরতা লক্ষ করেছি। আর-এক কথা : এখানে লাল ফিতের অত্যাচার নেই; বিভাগীয় অধ্যক্ষেরা শুধু নন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে করণিকেরাও স্বাধীন-ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; শিকাগোর রেল-স্টেশনে অব্যবহৃত টিকিট জমা দিয়ে, তখনই তার মূল্য ফেরৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। এর ফলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ যে কতখানি বেড়ে যায়, আমার স্বদেশবাসীকে তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। এবং যা আমাদের চিত্তে সভয় সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, সেই সরকারি কার্যালয়গুলি এর ব্যতিক্রম নয়; আয়-করের ছাড়পত্র নিতে গিয়েও প্রসন্নতা ও সহযোগ ভিন্ন আর-কিছু অনুভব করিনি; যদিও আমার মতো অনেক আবেদক উপস্থিত, তবু এক ঘণ্টারও অনেকখানি কম সময়ে কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমাকে সন্দিগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করা দূরে থাক, অধিকারীরা বরং চেষ্টা করেছেন যাতে আমি অনভিজ্ঞতাবশত ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

এই সহজ ভঙ্গি ও সাবলীলতার দ্বারা মার্কিনী ভাষাও অনুপ্রাণিত। প্রথমে অবশ্য, ঔপনিবেশিক অভ্যাসের ফলে, মাঝে-মাঝে ঈষৎ বিব্রত হ'তে হয় আমাদের; 'hot' শব্দটি আমাদের কানে 'হাঁ-ট্'-এর মতো শোনাতে পারে, আর 'স্কেজ্যুল' শব্দটি যে 'শিডিউল'-এর একাত্ম, তা বুঝে নিতে আমার বেশ কিছু সময় লেগেছিলো। কিন্তু এই বাধা-গুলি ক্ষুদ্র ও সহজে অতিক্রম্য; এদের উচ্চারণে ও বাগ্‌ধারায় অভ্যস্ত হ'তে দেরি হয় না; আর তখন বোঝা যায় যে মার্কিনী ভাষা, অন্য সব ভাষারই মতো, স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলছে; যেমন এদের জীবনের লক্ষণ চাঞ্চল্য ও উচ্চ-নীচে ভেদবিলোপ, তেমনি এদের ভাষাও ক্ষিপ্র, ঋজু ও সরল, এবং ঐ সব গুণের মিশ্রণে সতেজ ও বাড়ন্ত। এখানে অনবরত এমন য়োরোপীয় এসে বাসা বাঁধছে, যাদের ইংরেজির জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সাধারণ কাজ-চালানো ভাষা তারা যে সহজে শিখে নিতে পারে, তার প্রধান কারণ একমাত্রিক ও সামান্য শব্দের প্রতি এ-দেশের আসক্তি। ঘর গোছানো, শার্টে বোতাম লাগানো, কোনো যন্ত্রের বা বস্তুর সংস্কারসাধন, যে-কোনো প্রকার নিয়োগের বা কর্মের ব্যবস্থা—এই সব-কিছুই একটিমাত্র ক্রিয়া-পদের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব : তা হ'লো 'fix'। তেমনি, 'make' শব্দটিও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত; আপনি দু-ঘণ্টার মধ্যে টেক্সাসের প্লেন ধরতে পারবেন কিনা, এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর দিতে চাইলে 'I can make it' বলাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। খবর-কাগজ, রেডিও, ব্যবসায়িক চিঠিপত্র, এমনকি রাজনৈতিকদের ঘোষণাতেও এই প্রাকৃতপন্থা লক্ষণীয়—এবং এর উপর নির্ভর ক'রেই ফ্রস্ট তাঁর কবিতার শৈলী গঠন করেছেন। অবশ্য এর উল্টো পিঠে আছেন এমন কোনো-কোনো মার্কিনী পণ্ডিত, যাঁদের রচনায় সর্বাঙ্গ গ্রীক,

লাতিন, বৈজ্ঞানিক ও প্যারিভাষিক শব্দের লোহবর্মে নীরন্ধ্র; কিন্তু প্রকৃতিতে এতখানি করুণা আছে যে তাঁদের অস্তিত্ববিষয়ে অজ্ঞতা হয় না অবিদ্যার নামান্তর, এবং জগতে ও মার্কিন দেশে এমন রচনাও কিছু-কিছু বিদ্যমান যা একাধারে সারগর্ভ ও রমণীয়। মোটের উপর নির্ভরতাই এদের চরিত্রলক্ষণ ঃ উপর নির্ভরতাই এদের চরিত্রলক্ষণ ঃ পাঁচ মিনিটে বিশ্ববার্তার সারাংশ আহরণ করার পরে, লণ্ডনে এসে 'টাইমস' পত্রিকাকে—তার নব বেশ সত্ত্বেও—মনে হয় কিছুটা শ্লথগামী ও গুরুগম্ভীর।

যে-সব শব্দের ব্যবহার এখানে অত্যন্ত ব্যাপক, তার একটি হ'লো 'know-how'। এই শব্দবন্ধে সুবাস নেই; এর পুনরাবৃত্তি শুনতে-শুনতে ধারণা জন্মে যে নির্ভুলভাবে চাটনির শিশি খুলতে না-পারলে মানবজীবন কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ হ'লো। পক্ষান্তরে, এদের প্রয়োগবিদ্যার ফলাফল দেখেও বিস্ময়বোধ স্বাভাবিক ঃ নগরোপম অট্টালিকা, নদীর তলা দিয়ে ট্রেন অথবা গাড়ি চলার বিরাট সুড়ঙ্গ, সেতুবেষ্টিত সামুদ্রিক সান ফ্রান্সিস্কো, প্রান্তরের মতো প্রশস্ত হাইওয়ে—এগুলো যাদের নিত্যব্যবহার্য তারাও এগুলোকে কীর্তি ব'লে অনুভব করে। কখনো বা মনে হয় এদের উপায়নৈপুণ্যে এরা নিজেরাই মুগ্ধ হ'য়ে আছে; মার্কিন দেশে ভ্রমণকালে 'তম' কথাটি বার-বার শুনতে হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম নগর, হোটেল, রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিমানবন্দর, বিভাগীয় বিপণি, সবচেয়ে বড়ো ফ্ল্যাটবাড়ি, গ্রোসারি (অর্থাৎ মুদিখানা) ও ফাইভ-অ্যান্ড-টেন স্টোর (আমরা যাকে বলি মনোহারি দোকান)—সব নাকি এই দেশেই প্রাপ্তব্য। এ-সব দাবির চাক্ষুষ সমর্থনের অভাব নেই; তবু দেখতে-দেখতে বৃহত্তেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই, কম-বড়ো ও বেশি-বড়োর পার্থক্য আর ধরা পড়ে না। আর তাছাড়া, মন যখন বলে, 'এটা প্রকাণ্ড,' তখন ইন্দ্রিয় খুব সহজে সেটা মেনে নেয়, প্রত্যাশার ফলে মৃদু হ'য়ে আসে অভিঘাত। কিন্তু একবার আমার অবস্থা হয়েছিলো ময়নির্মিত পাণ্ডব-সভায় দুর্যোধনের মতো; সেটা লিপিবদ্ধ না-করলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গিয়েছিলাম হলিউডে ফিল্ম-স্টুডিও দেখতে। আমার সঙ্গী এক মার্কিন যুবক, যিনি কিছুকাল ঢাকায় কাটিয়ে বাঙালি-প্রীতি অর্জন করেছেন। স্টুডিওর গাইড গাড়ি নিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখালে আমাদের। আমার মনে ছিলো টালিগঞ্জের ছবি—গাছপালা, পুকুর, পোষা হরিণ, আর কয়েকটা মঞ্চ, যেখানে প্রয়োজনমতো সিঁড়ি, কুটির, কুয়ো অথবা পল্লীপথ নির্মাণ ক'রে তীব্র আলোয় ছবি তোলা হয়। তারই একটা অতিকৃতির জন্য প্রস্তুত ছিলুম, কিন্তু যা দেখা গেলো তা শুধু অতিকায় নয়, জিনিশই অন্য। একটা 'জায়গা' মাত্র নয় এই স্টুডিও, আস্ত শহর, বা দেশ, বা অনেক দেশ ও যুগের এক অলীক ও বাস্তব প্রতিরূপ। গাড়ি চলছে এঁকে-বেঁকে অলিগলির মধ্য দিয়ে; বস্তুতই গলি—কিন্তু শুধু ছবি তোলার জন্যই রচিত। সারি-সারি চিমনি-ওলা বাড়ি, দোকানে ঝুলছে ফলকচিহ্ন, দরজায় বাড়ির নম্বর ঃ আঠারো শতকের ন্যু ইয়র্ক এটা। এটা ষোলো শতকের ফ্রান্সের গ্রাম। এটা মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের পল্লী। পুরোনো স্পেন, সীজারদের রোম, ফারায়োর মিশর—সব আছে। আছে লাইন-বসানো রেলগাড়ি-সুদ্ধ স্টেশন; ট্যাঙ্ক, কামান, ভাঙা প্লেন সমেত যুদ্ধ-ক্ষেত্র; এয়ারপোর্টও আছে। কুঞ্জ, বীথিকা, পুষ্পোদ্যান, ফলদ কানন—কিছুরই অভাব নেই। এলাম এক পুরোনো ধরনের গ্রামে; গোল চত্বর ঘিরে কয়েকটি বাড়ি; বারান্দায় ব'সে আছে লোকেরা—অলসভাবে, রেলিঙে পা তুলে, শূন্য চোখে তাকিয়ে। ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে অপেক্ষা করছে একটি তরুণী ও তার—'স্বামী' না 'প্রেমিক' না 'বন্ধু' তা জানি না। মানুষগুলোর সেকেলে বেশবাস ও কপোলের অতিরঞ্জন ঃ মাত্র এই দুটি লক্ষণে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা 'জীবন' নয়, অভিনয়। ভানে ও প্রকৃতে প্রভেদ এখানে নামমাত্র।

কিন্তু চলতে-চলতে হঠাৎ চোখে পড়লো প্রকৃতি। এক খণ্ড আকাশ—নীল, উজ্জ্বল নীল। এত উজ্জ্বল হয় আকাশ এই উত্তরদেশে? কে জানে—এখন এপ্রিল মাস, আর আছি তো ক্যালিফর্নিয়ায়। কিন্তু কাছে আসামাত্র ভুল ভাঙলো। সেই নীলের পাশেই দেখতে পেলাম ক্যানিয়া—পাংশু ও প্রাকৃত আকাশ—দুয়ের মধ্যে মাত্রাভেদ আমার সঙ্গে আমার মার্কিনী বন্ধুর গাত্রবর্ণের পার্থক্যের চেয়েও স্পষ্ট। যে-দীপ্তি আমাকে ভুলিয়েছিলো, তা একটি প্রকাণ্ড পট ছাড়া কিছু নয়, আকাশের তলায় অন্য এক আকাশ চিত্রার্পিত। তার ঠিক তলাতেই লম্বা বাঁধানো জলাশয়। জল আর 'আকাশ' যেখানে মিশেছে, সেই রেখাটি মহাসমুদ্রে দিগন্ত। চলেছে ভেসে শাদা মেঘের দল অনবরত, আমার চোখের সামনে দিয়ে স'রে-স'রে যাচ্ছে, অথচ পটের সীমা কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। সবই মায়া, সবই প্রতিভাস—এই সমুদ্র, আর চঞ্চল মেঘ, আর দিগন্তরেখা; কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে-তাকিয়েও আমি ধরতে পারলুম না ফাঁকিটা কোথায়; যদিও চার-দিকে শক্ত মাটির উপর বড়ো-বড়ো বাড়ি আছে দাঁড়িয়ে, তবু আমার ইন্দ্রিয় আমাকে মুহূর্তের জন্যও জানতে দিলে না যে এই আকাশ ও সমুদ্র অবাস্তব। জলাশয়ে ভাসছে অনেকগুলো খেলনা জাহাজ, ধারে-ধারে বৈদ্যুতিক পাখা বসানো—সেগুলো সঞ্চালিত হ'য়ে ঢেউ তুলবে, বইয়ে দেবে ঝড়, ডুবিয়ে দেবে জাহাজ। চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে জুল ভের্ন-এর 'সাগর-তলে হাজার লীগ'; তারই জন্য এই আয়োজন।

আবার অনেক 'বাড়ি', 'দোকান', 'গ্রাম', 'শহর' পেরিয়ে এই মায়াপুরীর অন্য প্রান্তে চ'লে এলাম। ফলকে 'Post Office' লেখা দেখে আমার মনে প'ড়ে গেলো, সকাল থেকে দুটো ডাকে দেবার চিঠি পকেটে নিয়ে ঘুরছি। 'সত্যিকার ডাকঘর আছে কি এখানে?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে গাইড বললে, 'এটাই।' বিদায়ের সময় তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'তোমাদের এখানে সবই খুব আশ্চর্য।' 'সবাই তা-ই বলে,' ম্লান হেসে জবাব দিলে লোকটি। 'সব দেশ থেকে দর্শক আসে এখানে, দেখে বলে—"এ-রকম তো কিছুই নেই আমাদের।" কিন্তু তারা যে কেমন ক'রে আমাদের চেয়ে ভালো ছবি তৈরি করে তা ভেবে পাই না। গুড-বাই।'

(ক্রমশ)

শ্রীঅরবিন্দঃ এক অধ্যায়

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু একদিন মনের স্তব্ধ আবেগে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছিলেন—'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে, সেই রুদ্র দূতে বলো কোন রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে।' শ্রীঅরবিন্দের জীবনের নানা জানা-অজানা অধ্যায়ের মাঝে . খর রাজনীতির স্মৃতি মনে এলেই এই কথাগুলিই বারে বারে• স্মরণে আসে। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক মূলকেন্দ্র থেকে রাজনীতিক শ্রীঅরবিন্দকে যাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে সম্পূর্ণভাবে পেতে পারেন না। বিপ্লবী বিদ্রোহী অরবিন্দও তাই অনাসক্ত অপ্রমত্ত যোগী, ধ্যানী, কবি মনীষী। স্বদেশ তাঁর কাছে জড়পদার্থ নয়, কতকগুলো মাঠ, বন, পর্বত, নদী নয়—স্বদেশ তাঁর কাছে মা, মার বুকের উপর বসে যদি কোন রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করে না—সে মাকে উদ্ধার করতে দৌড়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মনের অকুণ্ঠ প্রণাম জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মবান্ধব নামকরণ করেছিলেন 'মানস সরোবরের অরবিন্দ'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শুধু ভাবসাধনাতেই এককালে মিলন ছিল তা নয়, কাব্যজগতেও তাঁরা সমধর্মী। জীবনদর্শনেও তাঁরা a wayfarer towards the same goal । আমরা জানি যে, ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ চলেছেন জোড়াসাঁকোয় কবির নিমন্ত্রণে—জাপানী ওকাকুরা, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশ এবং আরো কয়েকজন আমন্ত্রিত ডিনারে। কবিকেও দেখি বহুবার চলেছেন সঞ্জীবনীর আফিসে। 'বন্দেমাতরমের' মকদ্দমায় ছাড়া পাওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দকে মুক্তিলাভের জন্য অভিনন্দন জানাতে কবি উপস্থিত। গিয়ে বলেন—আপনি আমাদের বড্ড ফাঁকি দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজীতে জবাব দিলেন—'নট ফর লঙ'—বেশীদিনের জন্য নয়, একটু ধৈর্য ধরুন। এই সাক্ষাতের একটা সুন্দর ছবি পাই আমরা চারু দত্তের কাছে—"অরবিন্দ ছাড়া পাওয়ার দিন দুই বাদে একদিন দুপুরবেলা আমরা—অরবিন্দ, ও'র মেজদা, সুবোধ, নীরদ ও আমি—খুব হৈ হৈ করছি এমন সময় দরোয়ান এসে বললে—রবিবাবু এসেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি সামনের হলে বেরিয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ দুই বাহু প্রসারিত করে অরবিন্দকে বুকে টেনে নিলেন, কবির চোখ দুটি ছলছল করছিল।"

বিশ বছর পরেও যখন শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতি থেকে এস্‌কেপিস্ট বলছে কেউ কেউ তখনও কবি লিখছেন—প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। কবি আরও বললেন, ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত করে। এই সাক্ষাৎ কবিকে যে কিরকম অভিভূত করেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীমতী মহলানবীশ।

জাতীয়তার অন্যতম পুরোহিত হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের উত্থান ও তিরোধান এক বিস্ময়কর ঘটনা। শ্রীঅরবিন্দের বাল্যজীবনের কথা আমরা সকলেই জানি। যে কয়দিন তিনি এদেশে কাটিয়েছিলেন সে কয়দিন তাঁকে আই. সি. এস-এর মহামহিমময় ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করবার উদ্যোগে উঠেপড়ে লেগেছিলেন তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। তাঁকে পড়ানো হয়েছিল ইংরাজী স্কুলে, দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেন্টে, তারপর সাত বছর বয়সে তিনি গেলেন 'হোমে' বা বিলাতে যাতে তিনি উপযুক্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বছর ধরে তিনি বিলাতে রইলেন—ম্যাঞ্চেস্টারের গ্রামার স্কুল থেকে লণ্ডনের সেণ্ট পলস থেকে কেমব্রিজের কিংস কলেজে—সেখান থেকে আই. সি. এস পরীক্ষা দিলেন, পাস করলেন, লোভনীয় চাকরীর আশ্বাস পেলেন, কিন্তু রঙীন হাতিয়ার হাতে নকল ঘোড়সওয়ার হওয়া হলো না তাঁর, কারণ তিনি দিলেন না ঐ ঘোড়াচড়ার পরীক্ষা। কেন তিনি পরীক্ষা দেননি বা দিতে চাননি বা পারেননি সে কথায় নানা ভাষ্য আছে—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণসম্বলিত ভাষ্য পুরোণীর লেখাতে পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক যে তাঁর কেম্ব্রিজে থাকার সময় তিনি ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁরই সহপাঠী বিচক্রফ্‌ট্‌ সাহেব আলিপুরে বোমার মামলায় তাঁরই বিচার করেছিলেন। আর একজন সতীর্থ (পার্শী মিড) লিখেছিলেন চারু দত্তকে "—আমার সময়ে কেম্ব্রিজে এক আশ্চর্য ইণ্ডিয়ান ছাত্র ছিল, নাম 'অরবিন্দ এক্রয়েড ঘোষ......ভারী চমৎকার লোক—পড়াশুনাতে অনেক সাহায্য পেতাম তাঁর কাছে......।"

শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বরোদায় চাকরী নিয়ে। তারও পূর্বে তিনি 'লোটাস অ্যান্ড ড্যাগার'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কেম্ব্রিজের ভারতীয় মজলিসে গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর পিতার প্রেরিত 'বেঙ্গলী' কাগজ পড়েই তাঁর মনে এগারো বছর বয়সেই দেশের জন্য কিছু করা উচিত এই প্রেরণা জাগে। এমন কি বিলাতে থাকতেই ম্যাক্সমুলারের 'স্যাকরেড বুকস অব্ দি ইস্ট' পড়ে তাঁর মনে 'আত্মন' ও বেদান্তের কথা জাগে। তখনও বিবেকানন্দের 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত'-এর কথা তাঁর কানে যায়নি। বঙ্কিমের মহাপ্রয়াণ হলো ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে। সবে বিলাত থেকে ফিরেছেন বাইশ বছরের যুবক—বরোদায় বাণীর সাধনায় বসেছেন অন্তরের নির্দেশে—এক তরুণ তাপস নিজেকে প্রস্তুত করছেন বৃহত্তম পরিণতির জন্য, গভীরতম অনুভূতির জন্য। তিনি তখনই তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে বঙ্কিমের মন্ত্রকে চিনে নিয়েছেন। তাই কবি শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—হে বঙ্গজননী, কাঁদো কাঁদো। তাঁর বঙ্কিম-প্রশস্তি শুধু মুগ্ধ তরুণের রোমাণ্টিক ভাবগদগদ বাক্যবিলাস নয়—তিনি লিখলেন—হে আমার মধুর বাংলার শ্যাম বনানী নদীগিরি কন্দর ফুলের দেশ, প্রেমের দেশ, জাগ্রত বসন্তের বার্তাবহের দেশ, তোমার অন্তরের গূঢ় কথাটি বঙ্কিম আহরণ করেছিলেন, তিনি জেনেছিলেন তোমার সৌন্দর্য ও দেবত্বের বিভূতি। দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলিয়ে যে মাতৃকল্পনা তারই মন্ত্র ছিল 'বন্দেমাতরম'। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, ত্বং হি দুর্গা। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব দুর্গাস্তোত্রে আমরা পড়ি—বীরমার্গ প্রদর্শিনী এসো, আর বিসর্জন

করিব না, আমাদের অখিল জীবনে অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব-কর্ম অধিরত পবিত্র প্রেমময় মাতৃসেবাব্রত হউক, কারণ এখানেঃ

Every image made divine
In our temple is but thine

সবই যে মায়ের মন্দির, ভবানীর মন্দির। বঙ্কিম দিলেন পবিত্র মন্ত্র, বিবেকানন্দ দেখলেন 'কালী দি মাদার', শ্রীঅরবিন্দও দেখলেন সেই আলুলায়িত কুন্তলা, মেঘাঙ্গীঃ

Dark as a thundering cloud, with streaming hair . . . obscuring heaven and in her sovereign grasp . . . the sword, the flower.

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও ভেসেছিল—বাম হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শংকাহরণ। বাংলার বাইরেও বাংলার ভাবধারায় পুষ্ট মহাকালীর সাধক শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতীকে মনে পড়ে—

তুমি বাক্ অপরূপবাদিণী
অরাতি দমনে কলুষ নাশনে চলেছ
ত্রিশূলধারিণী

ভিদুথলাই, ভিদুথলাই, ভিদুথলাই
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

আর একজন মহাকবি (কবি ভল্লথোল) গাইলেন—।

ভবানী......এই আমার খড়্গ, খড়্গ,
তো নয় সে যে
কত যুগের কত হোমের শিখা,
এই যে, আমার জন্মভূমি, এই যে
আমার বুকে
ভারতবর্ষ—রাজর্ষিদের প্রোষিতভর্তৃকা।
(অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ)

১৮৯৪ সালে "বঙ্কিম" সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ আর তার পূর্বে কংগ্রেসকে নিয়ে বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশে সাতটি প্রবন্ধ "নিউ ল্যাম্পস্ ফর দি ওল্ড" পুরাতন প্রদীপের বদলে জ্বেলে দাও নবদীপালিমালা তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলে এমনভাবে যে স্বয়ং রানাডেকে এগিয়ে আসতে হলো প্রতিবাদ করতে। তার পরের কয়েক বছর তাঁকে প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনীতিতে যোগ দিতে বা এমন কি প্রবন্ধ লিখতেও দেখা যায় না। তিনি শুধু পড়ছেন, লিখছেন বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র, কিছুই বাদ যাচ্ছে না—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে শুনেছি আমরা যে প্যাকিং-কেস ভর্তি হয়ে তাঁর কাছে বই যেতো। জ্ঞান-তপস্বী সাধক—কবি নাট্যকার বাণীর তপস্যায় বসেছেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে অগ্নিকে তিনি লালন করতেন অগ্নিমীলে পুরোহিতের মত, তারই কর্মসূচী হিসাবে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দিষ্ট কার্যভার দিয়ে তিনি বাংলাদেশে পাঠান—উদ্দেশ্য দেশকে প্রস্তুত করা এক বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য। কিন্তু তখনও তাঁর ধারণা যে এই কাজে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর লাগবে। শুধু ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা নিছক বিপ্লবাদর্শ প্রচার করা নয়, সাংস্কৃতিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতিবিধান ও তদ্ভাবভাবিত-কর্মী সংগ্রহও ছিল এই কার্যসূচীর অন্যতম পন্থা। স্বদেশী আন্দোলনের আবির্ভাব এই আন্দোলনকে আরো সক্রিয় করে তুলেছিল, কারণ শুধু বিদ্রোহপ্রচারে লোকের মন তেমন সাড়া দেয়নি। জনসাধারণকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, জনসংঘ গঠন করা প্রথমে দরকার তার পরের কাজ হলো প্রকাশ্যে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। ব্যারিস্টার পি মিত্রের পরিচালনায় একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ, ডন সোসাইটি, পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, নিবেদিতার Band of despair—(অগ্রগামী মরিয়া দল), স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনা, সবই সেই যুগের চিন্তাধারার বহিরঙ্গ ফল, যার ভাবরাজ্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম! তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ শুধু ভাবের রাজ্যেই এঁদের সাথী ছিলেন না—'অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজমে'র পুরোধা হলেন তিনি। অবশ্য এ ঘটনা ঘটলো ১৯০৬-১৯০৭, ১৯০৮-১৯০৯। এই চার বছরেই শ্রীঅরবিন্দের তথাকথিত 'পলিটিকাল লাইফে'র চরম সৃষ্টি। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, কর্মযোগিন, ধর্ম প্রভৃতি কাগজের পাতায় পাতায় সে আগুন, সে তীব্রতা, সে তেজ, সে বীর্য ছড়ানো। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শিখাময়ী লোকমাতা নিবেদিতা, অশ্বিনী দত্ত ওদিকে তিলক, খাপর্দে, লাজপত প্রভৃতি নেতারা তখন শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধের কর্মধারা নিয়েছেন। বাংলাদেশে সে এক অপূর্ব উন্মাদনার যুগ।

এর পূর্বে আর একটি জিনিস বলে রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে 'ভবানী মন্দির' নামে একটি পরিকল্পনার লিপি যত্নে ঘরে ঘরে কর্মীদের হাতে হাতে। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সেদিনকার বিপ্লববাদের ইতিহাসে বা দেশাত্মবোধী গণচেতনার অধ্যায়ে এবং অরবিন্দ-চিন্তার বিবর্তনে এই দলিলটির মূল্য অপরিসীম। শ্রীঅরবিন্দের স্বাদেশিকতার মূল উৎস এতে পরিস্ফুট। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ বলে এই প্রবন্ধের আরম্ভ। মায়ের নামে মন্দির গড়বেন মায়ের ভক্তরা সন্তানরা। তাঁরা পেয়েছেন আদেশ—ভগবান রামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন মন্দির গড়ো। একদিকে ধ্বংসের চিতাচুল্লী, নরকরোটিপূর্ণ মহাশ্মশান, অন্যদিকে নবজীবন—একদিকে সংহারের খড়্গ, আর একদিকে বরাভয়। সেই মহাশক্তির নামকরণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ, বললেন—ইনিই মাতা, ইনিই দেশ, ইনিই স্বর্গ, ইনিই ভবানী—আজ জীবনের সর্বপর্যায়ে এই শক্তির অবতরণই দরকার—সাধনাও আজ হবে শক্তির। কিন্তু সাধক শ্রীঅরবিন্দের এই জ্ঞানও আছে যে, সেই শক্তি যেন বলদর্পিত না হয়, ভোগজও না হয়, লোভী লালসাতুর না হয়, প্রজ্ঞাহীন, শ্রদ্ধাহীন আনন্দহীন না হয়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—চেয়ে দেখ সর্বভূমে শক্তিরূপেই তিনি অবস্থিতা......আজ যদি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করো—দেখতে পাবে দিকে দিকে শক্তির স্তম্ভ—যুদ্ধের শক্তি, অর্থের শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি, এরই মধ্যে আছে বিস্ফোরণের দাহিকা, চূর্ণবিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে এই বিশ্ব। পশ্চিম তার সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে জেগেছে, জাপানে হয়েছে জাগরণ। এই ম্লেচ্ছ শক্তির মধ্যে বিকশিত হয়েছে মায়ের তামসিক ও রাজসিক শক্তি কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকার সাত্ত্বিক শক্তিও জাগবে, যেখানে থাকবে ত্যাগের পূত অগ্নিশিখা, আত্মদানের পর্ব। কিন্তু ভারতবর্ষে এই কাজ হচ্ছে ধীরে—ভারতমাতা উঠতে চাইছেন—কিন্তু বৃথাই সে ক্রন্দন—কাজ হচ্ছে না—দুর্বলতা আমাদের অন্তর্নিহিত—আমরা শক্তিকে ত্যাগ করেছি, শক্তিও আমাদের ত্যাগ করেছেন। বলা হয় যে, আজকে বিজ্ঞানকেই শিক্ষার বাহন করে নিতে হবে। সে কথা সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তি রাক্ষসের হাতে ভীমসেনের গদার মত। দুর্বল তা তুলতে পারে না, তার চাপে নিজেই মারা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের কথায়— Bhakti is the leaping flame, Shakti is the fuel, ভক্তি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা, শক্তি হচ্ছে তার ইন্ধন। তাই "ভবানী মন্দিরের" আবেদনে বলা হলো ভারতবর্ষের মূল অভাব—শক্তির অভাব, শক্তিপূজাই কাম্য।

এই বৃদ্ধ ক্লান্ত ভ্রমবিমুখ পরপদলেহী ভারতবর্ষকে নব-যৌবন দান করতে হবে। ভারতবর্ষ হবে শক্তিমান, বীর্যবান, নির্লোভী, তপস্বী, জ্ঞানী—মহাসমুদ্রের মত কখনও শান্ত ধীর কখনও বা শক্তির লীলাতে চঞ্চল, তার এক হাতে থাকবে শংকাহরণ মন্ত্র আর এক হাতে খড়্গ, এক-দিকে বরাভয় আর একদিকে অসিখর্পর।

ভারতবর্ষের নবজন্ম চাই, এই পুনর্জাগৃতি সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন।

It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race that Bhagawan Ramkrishna came and Vivekananda preached.

এই বিরাট বিচিত্র কর্মযজ্ঞের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান রামকৃষ্ণ, এরই জন্য প্রচারে বেরিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এর পরেই এলো স্বদেশী যুগের মন-ভোলানো প্রাণ-মাতানো সেই আন্দোলন—কিভাবে শুধু সেকালের শিক্ষিত মনকে নয় জনসাধারণকেও, হাটে-মাঠে বাজারে এই স্বদেশী যুগ পরি-প্লাবিত করেছিল তার ইতিহাস আজ রূপকথার সামিল। রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর পরিচয়, অরবিন্দের ভাব-সাধনায় তাঁর রূপায়ণ। তারপরে আস্তে আস্তে সেই গণসংযোগের মোড় ফিরলো—গুপ্ত সমিতির কথা ও কাহিনী আজকের বক্তব্য নয়—বোমা রিভলবার চুরি ডাকাতির ইতিহাস ঠিক স্বাদেশিকতার ইতিহাস কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু তার পিছনে যে বিশাল প্রাণ জন্ম নিয়েছিল তার গভীরতায়, তার বেদনায়, তার আত্মোৎসর্গের পরিমাপ করবে কে। শ্রীঅরবিন্দকেও সেখানে আমরা দেখেছি —স্তব্ধ শান্ত সমাহিত, অচঞ্চল। চারু দত্ত তাঁর নামকরণ করেছিলেন গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের 'কর্তা'। অনেক দিন পরে তাঁরই এক ভক্ত শ্রদ্ধেয় নীরদবরণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন কিনা। তিনি বললেন, "আমি সে দলের প্রতিষ্ঠাতাও নই, নেতাও নই। পি মিত্র এবং মিস্ ঘোষাল ওকাকুবার মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় তা আরম্ভ করে। আমি বাংলায় গিয়ে তাদের এই কাজ সম্বন্ধে জানতে পাই। তখন থেকে আমি শুধু খবর রাখতাম। ...আর এরা যা করত, তা নিতান্ত ছেলেমানুষী, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে মার-ধোর করা। ... ওগুলো মোটেই আমার মতানুযায়ী নয়, উদ্দেশ্যও ছিল না।" (শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা পৃঃ ৫১) তারপরে এলো আলিপুর বোমা মামলায় শ্রীঅরবিন্দের বিচার ও মুক্তি। আলিপুর জেলেই তাঁর চিন্তাধারার ও কর্মপ্রণালীর পরিবর্তন ঘটে এ বিষয়ে সকলেই জানেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মামলার কাহিনীও সবাই পড়েছেন। স্বদেশাত্মার এই মূর্ত প্রতীককেই রবীন্দ্রনাথ নমস্কার জানিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে নূতন রাষ্ট্র গঠনের সময় এই কথাই তিনি বললেন :

"August 15th is the birth day of free India. It marks for her the end of an old era, the beginning of a new age.

তার আছে অপরিসীম সম্ভাবনা— যা সমগ্র মানবজাতিকে রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি আরও বললেন যে, আমার জন্মদিনে যে এই শুভলগ্নটি এল, আমার কাছে তার অর্থ হচ্ছে যে, ভাগবতী শক্তি আমার কাজের সমর্থন করেছেন এবং শেষে বললেন :

Such is the content which I put into this date of India's liberation; whether or how far or how soon this connection will be fulfilled, depends upon the new and free India. এই তাঁর শেষ কথা—জগৎ-সভায় ভারতের এই দান যেন সার্থক হয়।

মতামত

॥ কাজলের সংলাপ ॥

সবিনয় নিবেদন,

১৭ই আগস্টের ১৫শ সংখ্যা অমৃত পত্রিকায় আপনার প্রখ্যাত বিভাগে সদ্য-মুক্ত 'কাজল' চিত্রটির সমালোচনা পড়ে, চিত্রটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পর্কে বাংলার চিত্রামোদীদের কাছে আমার কিছু বলা উচিত, এই কথা মনে হ'ল। অনুগ্রহ ক'রে আমার বক্তব্যটুকু প্রকাশ করবেন।

আপনার সমালোচনার এক জায়গায় দেখলাম যে কাজল ছবিখানির সংলাপ (পর্দায় চিত্রনাট্য ও সংলাপ) আমার লেখা। এই প্রসঙ্গে আমি অমৃতের পাঠকপাঠিকাদের পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিতে চাই যে, কাজলের চিত্রনাট্য সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নেই। পরিচালক সুনীলবাবু দৃশ্যাক্রমিক কিছু কিছু সংলাপ আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে আমি তাঁর এক সহকারীর কাছে শুনেছিলাম—সবই আগাগোড়া বদলে গেছে। চিত্রনাট্য, আমি যতদূর জানি—সুনীলবাবু ও তাঁর এক শিল্পী বন্ধু মিলে করেছিলেন। কাজলের বিজ্ঞাপনে আমার নাম নেই দেখে মনে হ'য়েছিল যে আমার সংলাপগুলি নেই বলেই নামটা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে না। সুনীলবাবু নিজে আমাকে একদিন বলেছিলেন যে গল্পটারও অনেক বদল করা হ'য়েছে। অথচ চিত্রনাট্য ও সংলাপে আমার নাম তিনি কেন দিলেন বুঝতে পারছি না।

ছবিতে থাক্—না থাক্, কাজলের কিছু সংলাপ আমি তো লিখেছি। কিন্তু ইতিপূর্বে এমন ঘটনাও হয়েছে যে পরিচালক একদিন এসে তিনটি দৃশ্যের সংলাপ সংশোধন করিয়ে নিয়ে চিত্রনাট্য ও সংলাপে আমার নাম দিয়ে দর্শক-দর্শিকা তথা আপনাদের গালাগালি খাবার মহৎ অধিকারটুকু আমাকে দান করেছেন।

সুনীলবাবু নিজে রসিক ও পণ্ডিত মানুষ। যদি তিনি আমার লেখা দৃশ্যক্রমিক সংলাপ হুবহু চিত্রায়িত করে থাকেন, তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি জানি তা হয়নি। বাইরে কোন নাম নেই, যোগাযোগ নেই, নিমন্ত্রণ নেই, অথচ আমি কাজলের চিত্রনাট্যকার—এটা ক'রে সুনীলবাবু আমার প্রতি সুবিচার করেননি।

নমস্কারান্তে—বিনীত
বিধায়ক ভট্টাচার্য
কলকাতা—৬

মহাশয়,

অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসাবে শ্রীরূপদ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত ও সুচিন্তিত রচনাগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর প্রতিটি রচনাতেই পাঠক-সমাজের মতামতের অবকাশ থাকায় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় অমৃতে তিনি হ্যারিয়েট বীচার স্টো সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা' নিঃসন্দেহে অমৃতে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তবুও এতে পাঠকের আলোচনার অবকাশ থাকায় আমি দু'একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

আমেরিকা চিরকালই স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ। আমেরিকার সৃষ্টিই হয় স্বাধীনচেতা কিছু ইউরোপীয়ের প্রচেষ্টায়। একথা অনেকে বলে থাকেন যে আমেরিকানরা প্রাণের থেকেও স্বাধীনতাকে ভালবাসেন। কথাটা নিছক মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার বুকেই যুদ্ধ করেছেন এমন উদাহরণ ইতিহাসে খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। জর্জ ওয়াশিংটন-এর যুদ্ধের সঙ্গে লিংকন-এর যুদ্ধের পার্থক্য অনেক; ওয়াশিংটন বিদেশী শাসন মেনে নেননি, লিংকন মানেননি স্বদেশী অন্যায়। দাসত্ব-প্রথার আকার নিয়ে যে অন্যায় ও অবিচার আমেরিকার মাটিতে শক্ত বাসা বেঁধেছিল তার বিরুদ্ধে লিংকন-এর যুদ্ধ পৃথিবীর যে কোনও দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতোই মহৎ ও উজ্জ্বল। লিংকন-এর পাশাপাশি যিনি দাঁড়াতে পেরেছিলেন তিনিই "আংকল টম্‌স কেবিন"-এর রচয়িতা। ১৮৬২ সনে লিংকন মিসেস স্টো-কে বলেছিলেন, "Are you the little woman that made this great war"? একটিমাত্র বই যে দেশের শাসনযন্ত্রকে বিকল ক'রে দিতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ "আংকল টম্‌স্ কেবিন"।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, যিনি দাসত্বপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করলেন তিনি জীবনের প্রথম থেকেই দাসদের জন্য ভাবনা শুরু করেননি। বহু বছর ধ'রে তিনি দাসত্বপ্রথার প্রবাহ দেখেছেন ও মেনে নিয়েছেন। তবুও তিনি দাসত্বের মর্মবেদনা যে কখনও উপলব্ধি করেননি এমন মন্তব্যও অযৌক্তিক। যখন তিনি সিনসিনাটি-তে থাকতেন তখন তাঁদের বাড়ীতে এক দাসী কাজ করতো। দাসী বলতে অবশ্য মহিলা-দাস বোঝাচ্ছি। হঠাৎ একদিন সেই দাসীর খোঁজ পড়ে। মিস্টার স্টো ও মিসেস স্টো-র ভাই সেদিন দাসীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। তাঁরা স্ত্রীলোকটিকে কানাডা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু মিসেস্ স্টো-কে "আংকল টম্‌স্ কেবিন" লিখতে অনুপ্রেরিত করেন তাঁর ভাই এডওয়ার্ডের স্ত্রী। তিনি বোস্টনে থাকাকালীন দাসদের উপরে অত্যাচার দেখে আর সহ্য করতে পারেননি। একটি চিঠিতে তিনি মিসেস স্টো-কে লিখতে অনুরোধ করেন—

"to write something that would make this whole nation feel what an accursed thing seavery is".

চিঠির ফল হয় অপূর্ব। মিসেস্ স্টো সমস্ত দেহ সোজা ও শক্ত করে হাতের মুঠোয় চিঠিটি নিষ্পেষিত ক'রে বলেন, "I will write something. I will, if I live."

সমস্ত দিন ঘরকন্নার পর তিনি গভীর রাত্রিতে লিখতে বসতেন। রচনার গঠনের থেকে মনের সংবেদনের মূল্য ছিল বেশী। তিনি সমবেদনার মনোভাব নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে চলেন। দেখা দেয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বই। এই বই যে কেবলমাত্র দাসদের মুক্তি দিয়েছিল তা নয়—মুক্ত করেছিল মিসেস্ স্টো-র দেহের মাঝখানে লুকিয়ে-থাকা অমানুষে-ভরা পৃথিবীতে মানুষটিকে। পরবর্তী জীবনে তিনি ছিলেন মুক্ত—বইটির জন্য দারিদ্র্যের কাঠিন্য তাঁর দুয়ারে হানা দিলেও তিনি পরাজিত মনোভাব নিয়ে চলতে পারেননি—জীবনযাত্রার শেষে তাই তিনিই বিজয়িনী হয়েছিলেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মাঝপথে এসেছিল "আংকল টম্‌স্ কেবিন"। প্রথম জীবনের উদাসীনতা শেষজীবনে দেখা দিয়েছিল স্বচ্ছন্দ সহানুভূতিতে। "অমৃত"-তে প্রকাশিত মিসেস স্টো-র ছবিটি শেষজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকেই ফুটিয়ে তুলেছে; তাঁর যৌবনের ছবি (যা অন্যান্য কয়েকটি বই-য়ে দেখতে পাওয়া যায়) ঘোষণা করেছে উদাসীনতা। "আংকল টম্‌স্ কেবিন"-এর মতোই বইটির রচয়িতার জীবনের পরিবর্তন মূল্যবান। মিসেস স্টো আরও কয়েকটি বই লেখেন; তার মধ্যে Dred (1856), The Minister's wooing 3 Old Town Folks উল্লেখযোগ্য।

"আংকল টম্‌স্ কেবিন" শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তার মূল্য আজও অনেকটা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় সেক্সপীয়র-এর "ওথেলো"-র উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। কারণ অবশ্য গায়ের রং। ঊনিশ শতকের আমেরিকান অন্যায় বিংশ শতকের আফ্রিকার মাটিতে দেখা দিয়েছে। "আংকল টম্‌স্ কেবিন" সেদিনই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবে যেদিন পৃথিবীর বুকে গায়ের রং নিয়ে জুয়াখেলার অবসাদ ঘটবে। সেদিন কত দূরে তা' কে বলবে?

বিনীত
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩১

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

দ্বিতীয় দাগ

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

আমার ইচ্ছে ছিল, "অ্যাবিগ্রেন্জ-এর অ্যাডভেঞ্চার"-ই হবে আমার শেষ রচনা। এরপর, আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোম্‌সের আশ্চর্য কীর্তিকলাপের আর কিছুই উপস্থাপিত করব না জনসাধারণের সামনে। উপাদানের অভাব হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। কেননা, এমন বহুশত কেসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা রয়েছে আমার কাছে যে সম্পর্কে কোনদিনই কোনরকম উল্লেখ করিনি আমার পূর্বোপর রচনায়। অথবা, এই অসাধারণ মানুষটির অতুলনীয় কার্যপদ্ধতি আর অতি আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পাঠক-মহলের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসার ফলেই যে এমন সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, তা-ও নয়। আসল কারণ হোম্‌সের অনিচ্ছা। সে চায় না তার অভিজ্ঞতা-উপাখ্যান এমনিভাবে ক্রমাগত প্রকাশ পাক। সত্যিকারের অর্থকরী প্র্যাকটিস নিয়ে যতদিন মেতে ছিল ও, তখন ওর সফলতার রেকর্ড প্রকাশ পেলে তার একটা ব্যবহারিক মূল্য ছিল তার কাছে। কিন্তু লন্ডন থেকে নিশ্চিতভাবে অবসর গ্রহণ করার পর থেকে সাসেক্স ডাউন্‌স-এ মধুমক্ষিকা উৎপাদন এবং সেই সংক্রান্ত পড়াশুনো নিয়ে অবসর জীবন যাপন করা শুরু করেছে সে। এ সময়ে সর্বজনবিদিত হওয়াটা পরম ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। কোনরকম বাগবিতণ্ডার অবকাশ না রেখে অন্যথা করা যায় না এমনি একরোখা অনুরোধ জানিয়ে দিয়েছে আমাকে—এ সম্পর্কে তার ইচ্ছে যেন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি আমি। কিন্তু ওকে আমি একদিন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম যে, উপযুক্ত সময়ে "দ্বিতীয় দাগের অ্যাডভেঞ্চার" প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি আমি যে আগেই দিয়ে ফেলেছি। অন্তত

বললাম, উপাখ্যানগুলোর এই দীর্ঘ সিরিজটাকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া দরকার। তা করতে গেলে, এ সিরিজ শেষ করতে হয় তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কেস দিয়ে—যে ধরনের কেস নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ ইতিপূর্বে সে কোনদিনই পায়নি। এত কয়ে বোঝানোর পর শেষ পর্যন্ত ওর সম্মতি আদায় করা গেল। ঠিক হ'ল, খুব সন্তর্পণে রেখে-ঢেকে ঘটনাটার চাঞ্চল্যকর বিবরণ হাজির করতে হবে জনগণের সামনে। গল্প বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ কোন খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে যদি কিছুটা অস্পষ্ট থেকে যায়ই, জনসাধারণ তাহলে তখুনি বুঝে নেবেন যে, অতি জবরদস্ত যুক্তি আছে আমার এ হেন বাগ্‌সংযমের মূলে।

কোন্ বছর, তা বলব না। এমন কি সে যুগটারও কোন নামকরণ করব না। শরৎকালে এক মঙ্গলবারের সকালে বেকার স্ট্রীটে আমাদের দীনহীন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবির্ভূত হলেন ইউরোপবিখ্যাত দুজন পুরুষ। একজনের তপঃকৃশ চেহারা, উন্নত নাক, ঈগল পাখীর মত চোখ এবং সব মিলিয়ে ক্ষমতাবান পুরুষের মত প্রভুত্বময় মূর্তি। দু' দুবার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যিনি, ইনিই সেই স্বনামধন্য লর্ড বেলিঙ্গার। আর একজনের বর্ণ মলিন; মুখের গঠন নিখুঁত; সুষ্ঠু, সুন্দর, পরিপাটি চেহারা। টেনেটুনে তাঁকে মধ্য-বয়েসীও বলা যায় না। দেহ এবং মনের স্বভাব-দত্ত সর্ববিধ গুণসম্পন্ন এই পুরুষটিই রাইট অনারেবল ট্রেলয়ানি হোপ—যিনি ইউরোপসংক্রান্ত দপ্তরের সেক্রেটারী এবং দেশের উদীয়মান রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁর স্থান সবার আগে। কাগজপত্র ছড়ানো সেটির উপর পাশাপাশি বসলেন দুজনে। ওঁদের ক্লান্ত, শুকনো আর উদ্বেগ-আঁকা মুখ দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, রীতিমত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে দুজনকে সশরীরে আসতে হয়েছে আমাদের আস্তানায়। নীল-নীল শিরা-বার-করা পাতলা হাতে ছাতার হাতীর দাঁতের বাঁটটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীমশায়। আর বিষাদ-মাখা তপঃকৃশ কঠোর মুখে ক্রমান্বয়ে তাকাচ্ছিলেন আমার আর হোমসের পানে। নার্ভাস হয়ে গিয়ে নিজের গোঁফ ধরে টানাটানি করছিলেন ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী আর চঞ্চল আঙুলে নাড়াচাড়া করছিলেন ঘড়ির চেনের সীলমোহরগুলো।

"মিঃ হোমস্, আজ সকালে আটটার সময়ে চুরিটা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীমশায়কে খবর দিই আমি। তাঁরই প্রস্তাবমত দুজনে এসেছি আপনার কাছে।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"না, মশায়।" চট করে জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনভাবে বললেন, যেন তাঁর কথাই চূড়ান্ত, তারপর আর কিছু বলার নেই। কথা বলার এই দুটি বিশেষ ভঙ্গিমার জন্যে সুনাম আছে তাঁর। "আমরা জানাইনি এবং জানানোও সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। পুলিশকে জানানো মানেই, দুদিন বাদে জনসাধারণকে জানানো। ঠিক এই জিনিসটাই আমরা এড়িয়ে যেতে চাই।"

"কিন্তু কেন, স্যার?"

"কেননা যে দলিল সম্পর্কে আমরা এসেছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনই বিরাট তার গুরুত্ব যে, একবার যদি তা প্রকাশ পায়, তাহলে অতি সহজে চরমতম মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে পড়বে সারা ইউরোপ এবং আরও জটিল হয়ে উঠবে তার বর্তমান পরিস্থিতি। আমি আবার বলছি, এ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা খুবই বেশী। বেশী কি, এ ব্যাপারের ওপর শান্তি অথবা যুদ্ধ নির্ভর করছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। রীতিমত গোপনতার সাথে এ দলিল উদ্ধারের চেষ্টা না করলে, কোনদিনই তা উদ্ধার করা যাবে না। কেননা, এ জিনিস যারা নিয়েছে, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণে প্রকাশ করে দেওয়া।"

"বুঝলাম। মিঃ ট্রেলয়ানি হোপ, কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে এ দলিলটি অদৃশ্য হয়েছে, তা যদি হুবহু বলেন আমার তো বাস্তবিকই উপকার হয় আমার।"

"অল্প কয়েকটি কথা দিয়েই তা বলা যায়, মিঃ হোমস্। চিঠিটা—দলিলটা আসলে এক বিদেশী রাজার একটা চিঠি—পেয়েছিলাম ছদিন আগে। চিঠিটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনদিনই আমার আয়রন-সেফে তা রেখে যাওয়া নিরাপদ মনে করিনি। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে সঙ্গে করে এনেছি হোয়াইট হল টেরেসে আমার বাড়ীতে। চিঠিপত্র দলিল, দস্তাবেজ বয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ডিসপ্যাচ-বক্স আছে আমার, শোবার ঘরে। এই ডিসপ্যাচ-বক্সেই চাবি দিয়ে রেখে দিতাম চিঠিটাকে। গত রাতে এই বাক্সতেই ছিল চিঠিটা। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ডিনারের পোশাক পরার সময়ে বাক্সটা খুলেছিলাম, চিঠিটাকেও ভেতরে দেখেছিলাম। আজ সকালে দেখি তা উধাও হয়েছে। আমার ড্রেসিং-টেবিলে আয়নার পাশেই সারারাত ছিল ডিসপ্যাচ-বাক্সটা। আমার ঘুম পাতলা, আমার স্ত্রীর-ও তাই। আমরা দুজনেই শপথ করে বলতে রাজী আছি, সারারাত ঘরের মধ্যে তৃতীয় কোন প্রাণী ঢোকেনি। তা সত্ত্বেও আবার আমি বলছি, চিঠিটা উধাও হয়েছে বাক্সের ভেতর থেকে।"

"ডিনার খেয়েছিলেন কখন?"

"সাড়ে সাতটায়।"

"শুতে গেছিলেন কখন?"

"থিয়েটারে গেছিলেন আমার স্ত্রী। তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলাম কিছুক্ষণ। সাড়ে এগারোটায় আমরা শুতে গেছিলাম।"

"তাহলে পুরো চার ঘণ্টা অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল ডিসপ্যাচ-বাক্সটা?"

"সকালে বাড়ীর পরিচারিকা, আর সারাদিনে আমার খিদমৎগার অথবা আমার স্ত্রীর পরিচারিকা ছাড়া আর কাউকে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না। এরা প্রত্যেকেই খুব বিশ্বাসী এবং বেশ কিছুদিন ধরে রয়েছে আমাদের কাছে। তা ছাড়া, ওদের মধ্যে কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে, দপ্তরের সাধারণ কাগজপত্র ছাড়া আরও বেশী মূল্যবান দলিল থাকতে পারে আমার ডিসপ্যাচ-বাক্সে।"

"চিঠিটার অস্তিত্ব কে কে জেনেছিল?"

"বাড়ীর মধ্যে কেউ নয়।"

"আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জেনেছিলেন?"

"না, মশায়। আজ সকালে কাগজটা

খোয়া যাওয়ার আগে পর্যন্ত স্ত্রীকে কিছুই বলিনি আমি।"

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন প্রধান-মন্ত্রী।

বললেন, "জনসাধারণের কাজে তোমার কর্তব্যবোধ যে কতখানি প্রখর, অনেকদিন ধরেই আমি তা জানি, হোপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন যতই নিবিড় আর মধুর হোক না কেন, সব কিছুর ওপরে স্থান দেওয়া উচিত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য-সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা।"

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী।

বললেন, "আমার ন্যায্য পাওনাটুকুই শুধু আমায় দেবেন, স্যার। মিঃ হোম্‌স্‌, আজ সকালের আগে এ ব্যাপাব সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি আমার স্ত্রীর কাছে।"

"উনি অনুমান করতে পেরেছিলেন কি?"

"না, মিঃ হোম্‌স্‌। উনি তো পারেনই নি,—আর কারও পক্ষেও সম্ভব ছিল না অনুমান করার।"

"এর আগে আপনার কোন দলিল খোয়া গেছিল?"

"না, মশায়।"

"এ চিঠির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কে কে খবর রাখেন সারা ইংল্যাণ্ডে?"

"ক্যাবিনেটের প্রত্যেক মেম্বাররা জানেন। গতকালই এ খবর দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। ক্যাবিনেট-মিটিংয়ে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের প্রত্যেককেই গুহ্যতত্ত্ব গোপন রাখার আনুষ্ঠানিক অংগীকার করতে হয়। এ অঙ্গীকারের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রধান-মন্ত্রীমশায়ের দেওয়া গুরুগম্ভীর হুঁশিয়ারীতে। হায়রে! তখন কি ভাবতেও পেরেছিলাম এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি নিজেই খুইয়ে বসব এ জিনিস!" প্রবল নিরাশায় দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত হয়ে ওঠে তাঁর সুশ্রী মুখ। দু'হাতে চুল ধরে টানতে লাগলেন উনি। মুহূর্তের জন্যে এক ঝলকে দেখে নিলাম আমরা আসল মানুষটিকে— উদগ্র আবেগ, আন্তরিক আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি দিয়ে ঘেরা একটি স্বাভাবিক মানুষকে। পরের মুহূর্তেই ফিরে এল তাঁর আভিজাত্য-আঁকা মুখোস আর ধীর-গম্ভীর স্বর। "ক্যাবিনেটের মেম্বাররা ছাড়া এ চিঠি সম্বন্ধে জানেন দপ্তরের দু'জন, কি খুব সম্ভব তিন জন, অফিসার। ইংল্যাণ্ডে আর কেউই জানে না, মিঃ হোম্‌স্‌। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি।"

"কিন্তু সাগরের ওপারে?"

"আমার বিশ্বাস, এ চিঠি যিনি লিখেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউই এটা দেখেননি। আমার দৃঢ় ধারণা, মিনিষ্টার-দের মানে, অফিসের কাউকেই এ কাজের ভার তিনি দেননি।"

অল্পক্ষণের জন্যে কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করে নিলে হোম্‌স্‌।

তারপর বললে, "এবার, স্যার, আরও বিশদভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। এ দলিলটা কিসের এবং এর অন্তর্ধানের পরিণামই বা এত গুরুতর হ'বে কেন, তা আমার জানা দরকার।"

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন দুই রাজনীতিবিদ্‌। তারপর, ঝাঁকড়া ভুরু কুঁচকে ভ্রূকুটি করলেন প্রধানমন্ত্রী।

"মিঃ হোম্‌স্‌, লেফাপাটা লম্বা আর পাতলা। ম্যাড়মেড়ে নীল রঙ, গুঁড়ি-মারা একটা সিংহের ছাপ আছে লাল গালার সীলমোহরের ওপর। ঠিকানাটা লেখা হয়েছে গোটা গোটা, বলিষ্ঠ অক্ষরে—"

হোম্‌স্‌ বাধা দিয়ে বললে, "এ সব খুঁটিনাটি যতই চিত্তাকর্ষক আর প্রয়োজনীয় হোক না কেন, সব কিছুরই একদম গোড়ায় পৌঁছোতে চায় আমার তদন্তধারা। চিঠিটা কিসের?"

"সেটা একটা রাষ্ট্রিক গুহ্যতত্ত্ব এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিতে পারব না এবং এ তথ্যের প্রয়োজন আছে বলেও মনে হচ্ছে না আমার। যে সব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় আপনার এত সুনাম, তার সাহায্যে আমার বর্ণনামত লেফাপা এবং তার মধ্যেকার কাগজপত্র যদি উদ্ধার করে আনতে পারেন, তাহলেই জানবেন, আপনার স্বদেশের একটা যথার্থ উপকার আপনি করলেন। আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয়, এমনি একটা পুরস্কারও অর্জন করবেন আপনি।"

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোম্‌স্‌।

বললে, "এ দেশের সবচেয়ে কর্ম-ব্যস্ত পুরুষদের মধ্যে আপনারা দুজনেও আছেন। আর, দীনহীন হ'লেও, বহু জনেই দেখা করতে আসে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব না। এ সাক্ষাৎকার আর টেনে নিয়ে গেলেও শুধু সময় নষ্টই সার হবে।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন প্রধান-মন্ত্রী। কোটরে-বসা দুই চোখে দপ্‌ করে জ্বলে উঠল চকিত, ভয়ংকর দীপ্তি। এ চোখের সামনে কতবার কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে গোটা ক্যাবিনেটটা। "এ সব আমি বরদাস্ত করি না" বলেই, প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন তাঁর ক্রোধ। আবার বসে পড়লেন সেটির ওপর। মিনিটখানেক কি তারও বেশী হ'বে, চুপচাপ বসে রইলাম সবাই। তারপর দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ, "আপনার সর্তই মেনে নেওয়া উচিত, মিঃ হোম্‌স্‌। নিঃসন্দেহে খাঁটি কথাই বলেছেন আপনি। আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আওতায় আপনাকে না আনা পর্যন্ত আপনার পক্ষে তৎপর হওয়াটাও যুক্তি-যুক্ত নয়।"

"আমি আপনার সাথে একমত, স্যার", বললেন কনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

"আপনার এবং আপনার সহকর্মী, ডঃ ওয়াটসনের সততার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সবই আমি বলব। আপনাদের স্বদেশপ্রেমের ওপরও আস্থা রাখছি আমি। এ ব্যাপার একবার প্রকাশ পেলে যে চরমতম দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে এ দেশের শিরে, তার চেয়ে বেশী আর কিছু আমি কল্পনাতেও আনতে পারছি না।"

"নিশ্চিন্ত মনে আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন আপনি।"

"চিঠিটা এসেছে একজন বিদেশী রাজার কাছ থেকে। সম্প্রতি এ দেশের

উপনিবেশ-সংক্রান্ত কয়েকটি পরিস্থিতিতে বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন উনি। চিঠিটা লেখা হয়েছে তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের দায়িত্বে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এ ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর মিনিষ্টাররাও কিছু জানেন না। চিঠিটা কিন্তু লেখা হয়েছে এমন ভঙ্গিমায়, বিশেষ করে এর কয়েকটি কথা এমনই আক্রমণাত্মক যে, এ চিঠি একবার কাগজে ছাপা হয়ে গেলেই অত্যন্ত বিপজ্জনক মনোভাবের সৃষ্টি হবে এদেশে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই আমার। ফলাফলটা এমনই গেঁজে উঠবে যে, কোন রকম দ্বিধা না করেই বলছি, এ চিঠি প্রকাশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে আমাদের দেশ।"

একটুকরো কাগজে একটা নাম লিখে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলে হোমস্।

"এগ্জ্যাক্টলি। ইনিই বটে। এবং এইটাই সেই চিঠি, যার পরিণাম হয়ত কোটি কোটি মুদ্রার ব্যয় আর লক্ষ লক্ষ জীবনের হানি। এই চিঠিটাই হারিয়েছি এরকম অবর্ণনীয়ভাবে।"

"চিঠি যিনি পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জানিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, জানিয়েছি। গোপন হরফে লেখা একটা সংকেত-টেলিগ্রাম চলে গেছে তাঁর কাছে।"

'উনি হয়ত চান চিঠিটা ছাপা হোক।'

"না, মশায়, না। কাজটা যে মাথা গরম হয়ে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় অত্যন্ত অবিবেচকের মত করে ফেলেছেন, তা যে এর মধ্যেই উনি বুঝতে পেরেছেন, তা বিশ্বাস করার মত জোরালো কারণ আমাদের আছে। এ চিঠি প্রকাশ পেলে আমরা যে চোট পাব, তার চাইতেও প্রচন্ড আঘাত গিয়ে পড়বে ও'র নিজের দেশের ওপর।"

"তাই যদি হয়, তাহলে বলুন তো এ চিঠি সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাক, এ রকম আগ্রহ কার থাকতে পারে? এ জিনিস লোপাট করা বা ছাপানো অভিসন্ধিই যদি কারো মনে জেগে থাকে, তবে তার মূল কারণটাই বা কি?"

"মিঃ হোমস্, তাহলেই তো আমাকে বেজায় উঁচুদরের আন্তর্জাতিক কূটনীতির এখতিয়ারে এনে ফেললেন। ইউরোপীয় পরিস্থিতি যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন, তাহলেই কিন্তু মোটিভ অনুমান করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না আপনাকে। সারা ইউরোপটা এখন একটা সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে দুই জাতির একটা জোট আছে—সামরিক শক্তির মোটামুটি সমতা রক্ষা করছে এরাই। পাল্লা ধরে বসে রয়েছে গ্রেট বৃটেন। এই দুই রাষ্ট্রের একটির সঙ্গে যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় বৃটেন, তাহলেই জোটের অপর রাষ্ট্রটির পরম প্রাধান্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তারা যুদ্ধে যোগদান করলেই বা কি, না করলেই বা কি। বুঝেছেন তো?"

"জলের মত। তাহলে এই রাজার শত্রুরাই চাইছে চিঠিটা সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিতে—যাতে করে তাঁর দেশ আর আমাদের দেশের মধ্যে ফাটল ধরে! এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"শত্রুপক্ষের হাতে এ দলিল গিয়ে পড়ার পর, সেখান থেকে কার কাছে তা পাঠানো হবে বলুন তো?"

"ইউরোপের যে-কোন বড় চ্যান্সেলারীতে অর্থাৎ এমব্যাসী-সংলগ্ন অফিসে পাঠিয়ে দিলেই হ'ল। এই মুহূর্তে চিঠিটা খুব সম্ভব এই রকম কোন চ্যান্সেলারীর দিকে ধেয়ে চলেছে তীরবেগে—মানে যতটা বেগে ষ্টীমের জাহাজ তাকে নিয়ে যেতে পারে।"

মিঃ ট্রেলয়ানি হোপের মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। সজোরে গুঙিয়ে উঠলেন উনি। আলতো করে সান্ত্বনার ছলে তাঁর কাঁধের ওপর হাত রাখলেন প্রধানমন্ত্রী।

"মাই ডিয়ার, এ তোমার নিছক দুর্ভাগ্য। এ জন্যে কেউই অপরাধী করতে পারে না তোমাকে। এমন কোন সাবধানতা বাকী ছিল না যা তুমি অবহেলা করেছ। মিঃ হোমস্, সব তথ্যই তো পেলেন। এবার বলুন তো, আমাদের করণীয় কি?"

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে লাগল হোমস্।

বলল, "স্যার, আপনি তাহলে মনে করেন, এ চিঠির পুনরুদ্ধার না হলে যুদ্ধ হবেই?"

"আমার মনে হয়, সে সম্ভাবনা খুবই বেশী।"

"তাহলে, স্যার, যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুত হোন।"

"কথাটা খুবই শক্ত, মিঃ হোমস্।"

"ঘটনাগুলো ভেবে দেখুন, স্যার। চিঠিটা যে রাত সাড়ে এগারটার পর নেওয়া হয়নি তা সহজেই অনুমেয় এই কারণে যে, এইমাত্র শুনলাম মিঃ হোপ আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই সেই সময় থেকে চুরি ধরা পড়ার সময় পর্যন্ত ঘরের মধ্যেই ছিলেন। তাহলে এ জিনিস উধাও হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে, খুব সম্ভব সাড়ে সাতটার পরেই কোন সময়ে। এ কথা বললাম এই কারণে যে, চিঠিটা যেই নিক না কেন, সে নিশ্চয় জানত ডিসপ্যাচ-বাক্সেই আছে দলিলটা। কাজে কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তগত করে ফেলাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আচ্ছা, স্যার, এ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল যদি ঐ সময়ে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলুন তো এখন তা কোথায় থাকতে পারে? চিঠিখানা কাছে রেখে দেওয়ার কোন কারণ নেই কারোরই। এ জিনিস যারা চায়, তাদের কাছেই চটপট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দলিলটা। এখন বলুন তো এদের পিছু নেওয়ার বা পিছু নিয়ে তাদের পেরিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ কি আমাদের আছে? না, নেই। চিঠি চলে গেছে আমাদের নাগালের বাইরে।"

সেটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

"মিঃ হোমস্। যা বললেন, তা খুবই যৌক্তিক। বেশ বুঝতে পারছি, বাস্তবিকই এ ব্যাপার আমাদের হাতের বাইরে।"

"নিছক তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, দলিলটা সরিয়েছে পরিচারিকা অথবা খিদমৎগার—"

"দুজনেরই বয়স হয়েছে এবং বহুভাবে যাচাই হয়ে গেছে তাদের সততা।"

"আপনার মুখেই শুনলাম, আপনার ঘরটা তিনতলায়। বাইরে থেকে সে ঘরে ঢোকার কোন পথ নেই এবং ভেতর থেকেও অলক্ষিতভাবে কারোর পক্ষে উঠে আসা সম্ভব নয়। তাহলে, নিশ্চয় বাড়ীর কেউ নিয়েছে চিঠিটা। চোর মহাপ্রভু চিঠিটা নিয়ে যাবে কার কাছে? আন্তর্জাতিক গুপ্তচর আর সিক্রেট এজেন্টদের একজনের কাছে। এদের সংখ্যা বেশী নয় এবং তাদের প্রত্যেকের নামের সাথে মোটামুটি পরিচয় আছে আমার। এ পেশার মাথা বলতে আছে তিনজন। আমার

তদন্ত শুরু হবে এদেরকে দিয়েই। প্রত্যেকের ঘাঁটিতে গিয়ে আমায় দেখতে হবে তারা হাজির আছে কিনা। একজন যদি নিপাত্তা হয়—বিশেষ করে কাল রাত থেকে যদি সে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলেই দলিলটা যে কোন্ দিকে গেছে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।"

ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী শুধোলেন, —"কিন্তু সে নিপাত্তাই বা হবে কেন? চিঠিটা নিয়ে লণ্ডনেরই কোন এমব্যাসীতে পৌঁছে দিলেই কাজ শেষ হয় তার। অবশ্য এমনটা হতেও পারে, নাও হ'তে পারে।"

"আমার তা মনে হয় না। এই ধরনের এজেন্টরা স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং এমব্যাসীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ মোলায়েম হয় না।"

ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানালেন প্রধানমন্ত্রী।

"আমার তো বিশ্বাস, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, মিঃ হোমস্। এ রকম একটা মূল্যবান দলিল সে নিজের হাতেই পৌঁছে দেবে হেড কোয়ার্টারে। আপনার কাজের গতি-পদ্ধতি খুব চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে আমার। হোপ, ইতিমধ্যে এই একটা দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা সাজে না। সারাদিনে নতুন কোন পরিস্থিতি উদ্ভব হ'লে আপনাকে খবর দেব। আর আপনিও আপনার তদন্তের ফলাফল জানাবেন নিশ্চয়।"

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে গম্ভীরমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই রাজনীতিবিদ্।

এ হেন যশস্বী সাক্ষাৎকারীরা বিদায় হ'লে পর, নীরবে পাইপটা ধরিয়ে নিলে হোমস্। তারপর, অতলস্পর্শী চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। সকালের কাগজটা খুলে একটা চাঞ্চল্যকর খুনের সংবাদে ডুবে গেছিলাম আমি। খুনটা হয়েছে গতরাতে লণ্ডন শহরেই। ঠিক এমনি সময়ে বিস্ময়চকিত দারুণ চীৎকার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আমার বন্ধুটি। তারপর পাইপটা নামিয়ে রাখল ম্যান্টেলপিসের ওপর।

বললে, "ঠিক এ রহস্যের মর্মে পৌঁছোনোর এর চাইতে আর ভাল পথ নেই। পরিস্থিতি বেপরোয়া হলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এমন কি এখনও যদি জানতে পারি এদের মধ্যে কোন মূর্তিমান এ জিনিসটাকে চক্ষুদান করেছেন, তাহলেও এমনও হতে পারে যে চিঠিটা এখনও তার বেহাত হয়নি। একটা কথা কি জানো, এ ধরনের লোকেদের কাছে অর্থই হচ্ছে পরমার্থ আর বৃটিশ কোষাগার তো আমার পেছনেই রইল। এ চিঠি যদি বাজারে গিয়ে পৌঁছোয়, কিনে নিতে পেছপা হব না আমি—তাতে যদি ইনক্যাম ট্যাক্সে আর একটা পেনি বৃদ্ধি পায়, পরোয়া করি না। যতদূর মনে হয় আমার, লোকটা হয়তো মওকা বুঝে দাঁও মারবার আশায় এখনও চিঠিটা রেখে
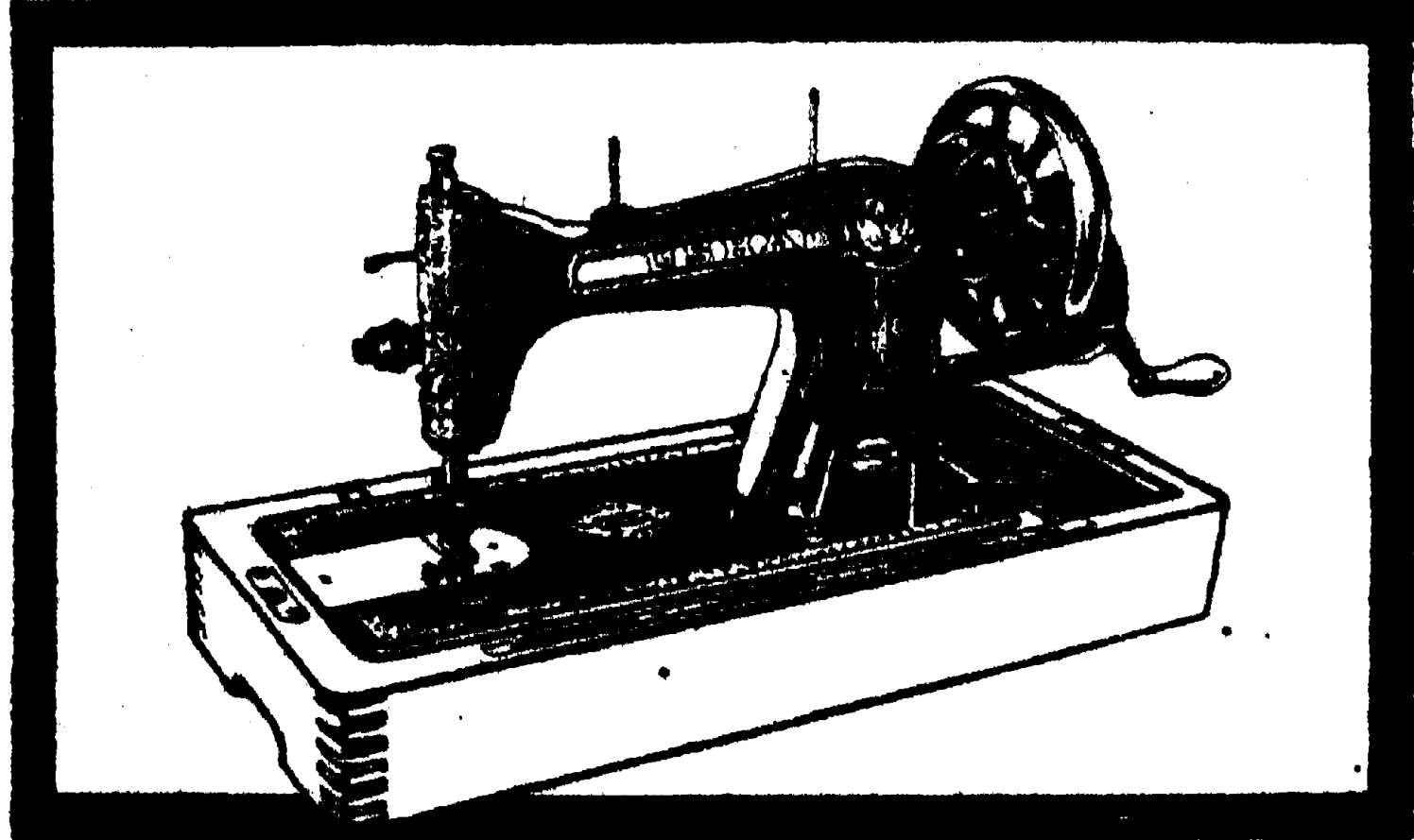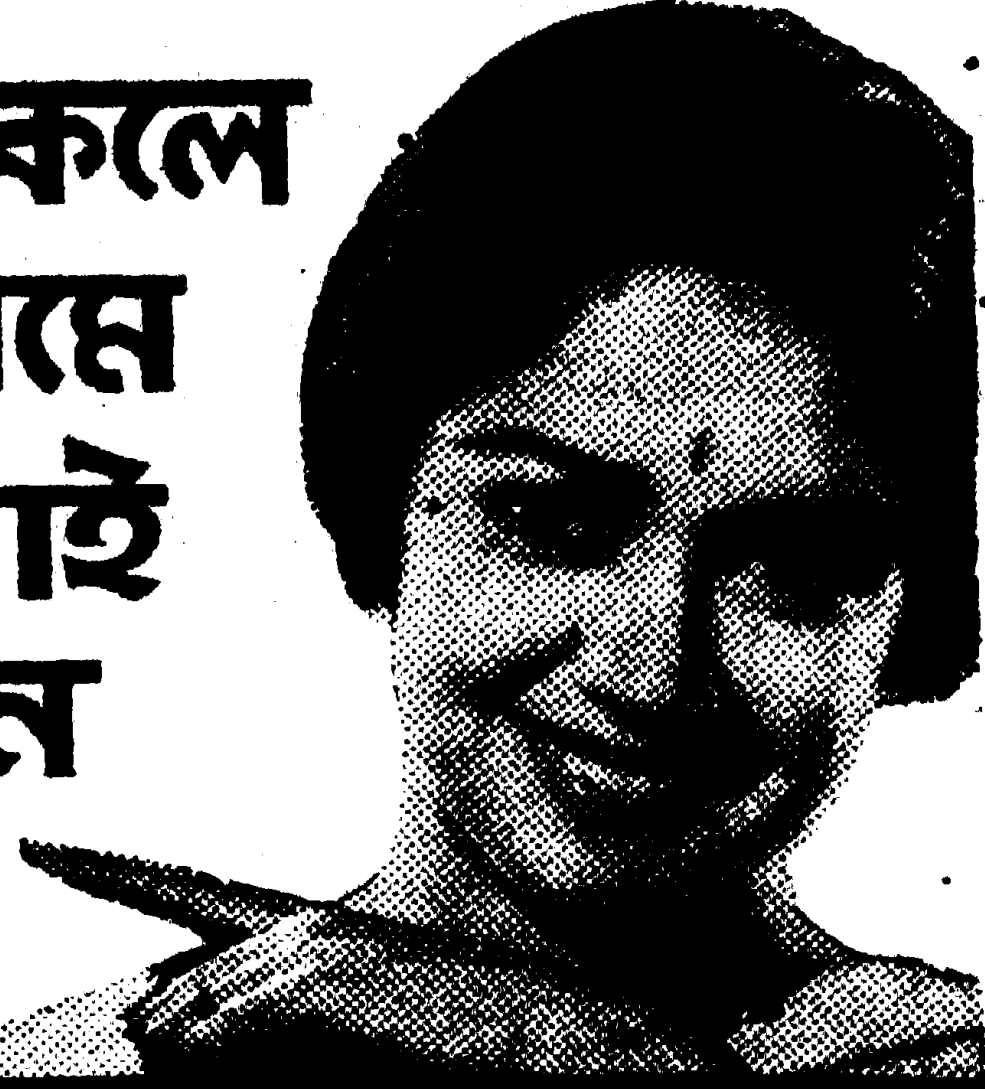
দিয়েছে নিজের জিম্মায়। ওদিকে কপাল ঠুকে দেখার আগে দেখে নিতে চায় এদিক থেকে কি রকম দরটা আসে। এ ধরনের বিরাট খেলা খেলতে পারে শুধু তিনজন। ওবারস্টাইন, লা রোথিয়েরা, আর এডুয়ারডো লুকাস। এদের প্রত্যেকের সাথে দেখা করব আমি।"

আমি সকালের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম।

"গোডোলফিন স্ট্রীটের এডুয়ারডো লুকাস তো?"

"হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

"কেন হ'বে না?"

"গতরাতে সে খুন হয়েছে তার বাড়ীতে।"

বিগত বহু য়্যাডভেঞ্চারে আমাকে বহুভাবে তাক লাগিয়েছে আমার বন্ধুটি। কাজেই, যখন উপলব্ধি করলাম এক্ষেত্রে তাকেও আমি বিলকুল তাজ্জব বানিয়ে দিতে পেরেছি, তখন বাস্তবিকই পরম সন্তোষলাভ করলাম আমি। বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ও, তারপর কাগজটা ছিনিয়ে নিলে আমার হাত থেকে। হোমস্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর পর থেকে যে প্যারাগ্রাফটা তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম, তা নীচে দিলাম:

ওয়েস্টমিনস্টারে হত্যা

গতরাত্রে ১৬নং গোডোলফিন স্ট্রীটে একটি রহস্যজনক অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। হাউস অফ পার্লামেন্টের সুবিশাল টাওয়ারগুলির ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে, নদী এবং মঠের মধ্যবর্তী স্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সারি সারি কতকগুলি সেকেলে নির্জন বাড়ী আছে। ১৬ নম্বর বাড়ীটি ইহাদেরই অন্যতম। ক্ষুদ্র কিন্তু রুচিসুন্দর এই আয়তনটিতে মিঃ এডুয়ারডো লুকাস কয়েক বছর ধরিয়া বাস করিতেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন মহলে তিনি দুই কারণে সমধিক পরিচিত। প্রথমতঃ তাঁহার মনোহর ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয়তঃ এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌখীন গায়ক হিসাবেও তাঁহার বিলক্ষণ সুনাম আছে। মিঃ লুকাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বছর। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করার জন্য বর্ষীয়সী মিসেস্ প্রিঙ্গল এবং খিদমৎগার মিটনকে লইয়াই তাঁহার সংসার। মিসেস্ প্রিঙ্গল সকাল সকাল ঘুমাইতে যায় এবং তাহার শয়নকক্ষ বাড়ীর সর্বোচ্চ তলায়। হ্যামারস্মিথে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিবার জন্য সন্ধ্যানাগাদ বাড়ীর বাহিরে গিয়াছিল খিদমৎগার। এই সময়ে কি ঘটিয়াছে, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু রাত সওয়া বারোটা নাগাদ পুলিশ কনস্টেবল ব্যারেট গোডোলফিন স্ট্রীট দিয়া যাইতে যাইতে লক্ষ্য করে যে ১৬ নম্বর বাড়ীর দরজাটি দুহাট করিয়া খোলা। টোকা মারিয়াও সে কোনও উত্তর পায় না। সামনের ঘরে আলোর আভাস পাইয়া সে প্যাসেজ বরাবর আগাইয়া যায় এবং আবার টোকা মারে, কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ আসে না। তখন সে দরজা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ঘরের সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। যাবতীয় আসবাবপত্র টানিয়া একধারে জড়ো করা হইয়াছিল এবং একটি চেয়ার উলটা হইয়া পড়িয়াছিল ঘরের কেন্দ্রে। চেয়ারের পাশেই, তখনও চেয়ারের একটি পায়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া, পড়িয়াছিলেন বাড়ীর হতভাগ্য ভাড়াটিয়া। তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল এবং প্রাণবায়ু নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। যে ছুরিকা দিয়া অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা একটি বেঁকানো ভারতীয় ভোজালি। নির্জিত শত্রুর দেশ হইতে সংগৃহীত প্রাচ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি টাঙানো ছিল একটি দেওয়ালে। ভোজালিটি এইস্থান হইতেই টানিয়া নামানো হয়। হত্যার মোটিভ চুরি বলিয়া মনে হইতেছে না। কেননা, ঘরের মূল্যবান সামগ্রীসমূহের একটিও সরানোর প্রচেষ্টা করা হয় নাই। মিঃ এডুয়ারডো লুকাস এত সুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁহার এই নিষ্ঠুর এবং রহস্যাবৃত পরিণতি তাঁহার সুদূরপ্রসারী বন্ধুমহলে সুগভীর সহানুভূতি এবং বেদনাময় আগ্রহের সঞ্চার করিবে।

"ওয়াটসন, এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় শুনি?" দীর্ঘ বিরতির পর শুধালো হোমস্।

"একটি আশ্চর্য কাকতালীয়।"

"কাকতালীয়! এ নাটকে যে তিনজন সম্ভাব্য অভিনেতার নাম বলেছি, এ লোকটা তাদেরই একজন। যে সময়ে এ নাটক অভিনীত হয়েছে বলে আমরা জানি, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছে সে। কাকতালীয় না হওয়ার সম্ভাবনাই দেখছি বিস্তর। কোন সংখ্যা দিয়েও এসবের প্রকাশ চলে না। না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ দুটো ঘটনার মধ্যেই যোগসূত্র আছে—আছেই আছে। এবং সে যোগসূত্র কি, তা আমাদেরই বার করতে হ'বে।

"কিন্তু এখন তো সরকারী পুলিশ সবই জেনে ফেলেছে?"

"মোটেই নয়। গোডোলফিন স্ট্রীটে যেটুকু দেখছে, ওরা শুধু সেইটুকুই জানে। হোয়াইট হল টেরেস সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না বা জানবে না। আমরাই শুধু দুটি ঘটনাই জানি এবং আমরাই পারি এই দুইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করতে। তবে একটা জবরদস্ত পয়েন্ট আছে এবং যে কোন পরিস্থিতিতেই শুধু এই পয়েন্টের জোরেই আমার সন্দেহ এসে পড়ত লুকাসের ওপর। ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রীট থেকে হোয়াইট হল টেরেস মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। আর যে ক'জন সিক্রেট এজেন্টের নাম করলাম, ওরা থাকে ওয়েস্ট এণ্ডের এক প্রান্তে। কাজেই ইউরোপীয়ান সেক্রেটারীর গেরস্থালীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বা সেখান থেকে কোন বার্তা গ্রহণ করা অন্যান্যের চেয়ে লুকাসের পক্ষেই সহজতর। জিনিসটা খুবই সামান্য, কিন্তু যেখানে সমস্ত ঘটনাকে চেপেচুপে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মেয়াদে আনা হচ্ছে, সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও থাকতে পারে। আরে! আরে! আবার কি এলো?"

রেকাবীতে এক ভদ্রমহিলার কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস হাডসন। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভুরু তুলল হোমস্। তারপর, কার্ডটা তুলে দিলে আমার হাতে।

বললে—"লেডী হিলডা ট্রেলয়ানি হোপকে দয়া করে ওপরে আসতে বল।"

এক মুহূর্ত পরেই আমাদের দীনহীন ঘরে প্রবেশ করলেন লণ্ডনের সবচেয়ে লাবণ্যময়ী রমণী। সকালবেলাই এই সামান্য প্রকোষ্ঠ একবার ধন্য হয়েছিল দুই রাজনীতিবিদের আগমনে এবং তা আর একবার সম্মানিত হ'ল লেডী হোপের আবির্ভাবে। ডিউক অফ বেলমিনস্টারের কনিষ্ঠতম কন্যার রূপের খ্যাতি আমি প্রায় শুনতাম। কিন্তু বর্ণনা শুনে বা রঙিন ফটোগ্রাফ দেখে অনেক কল্পনা করেও তাঁর এহেন সুগঠিত চারু করোটির অপরূপ বর্ণসমারোহ আর নিখুঁত মনোহর, নয়ন-সুন্দর কান্তির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরতের সেই সকালে তাঁর সৌন্দর্যই কিন্তু সবার আগে আমাদের মনে গভীর ছাপ এঁকে দেয়নি। গালদুটি কমনীয় বটে, কিন্তু আবেগের ছোঁয়া লেগে তা ফ্যাকাশে। চোখদুটি প্রদীপ্ত

বটে, কিন্তু সে দীপ্তি জয়ের উত্তাপ-জনিত। অনুভূতি-সচেতন মুখটি দৃঢ়-সম্বদ্ধ, এবং চাপা অধরোষ্ঠে আত্মসংযমের প্রয়াস। মুহূর্তেকের জন্যে খোলা দরজার ফ্রেমে আমাদের রূপসী দর্শনপ্রার্থী যখন এসে দাঁড়ালেন চিত্রার্পিতের মত, তখন সৌন্দর্য নয়—আতঙ্কই সবার আগে থির থির করে কেঁপে উঠল তাঁর দীঘল দুই চোখে।

"আমার স্বামী কি এখানে ছিলেন, মিঃ হোম্‌স্ ?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম, এখানে ছিলেন তিনি।"

"মিঃ হোম্‌স্, আপনাকে মিনতি করছি, আমি যে এখানে এসেছি, তা তাঁকে বলবেন না।" ভাবলেশহীন নিস্পৃহ মুখে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল হোম্‌স্। তারপর হাতের সংকেতে লেডীকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

বললে, "ইওর লেডীশিপ আমাকে বড় সংকটে ফেললেন। আমার অনুরোধ, আগে বসুন, তারপর বলুন কি আপনার অভিপ্রায়। কিন্তু আগেই জানিয়ে রাখছি, কোন রকম সর্তবিহীন প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।"

দ্রুত পদক্ষেপে আড়াআড়িভাবে ঘর পেরিয়ে গিয়ে জানলার দিকে পিঠ করে বসে পড়লেন লেডী হোপ। রানীর মতই হাবভাব চেহারা তাঁর—তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, আভিজাত্যময় এবং রেখায় রেখায় বরবর্ণিনী।

"মিঃ হোম্‌স্", কথা বলতে বলতে সাদা দস্তানাপরা হাতের মুঠি বন্ধ করতে এবং খুলতে লাগলেন ঘন ঘন, "অকপটে আপনাকে সব খুলে বলব আমি। বলব এই আশায় যে হয়ত সব শোনার পর আপনিও প্রাণখোলা হবেন আমার কাছে। শুধু একটি বিষয় ছাড়া আমি এবং আমার স্বামী পরস্পরের কাছে কোন প্রসঙ্গই গোপন করি না। সমস্ত ব্যাপারে আমার ওপর ও'র পরিপূর্ণ আস্থা আছে—শুধু একটি ছাড়া। এবং তা রাজনীতি। এ ব্যাপারে যেন গালামোহর করা তাঁর ঠোঁট। কিছুই বলেন না আমাকে। কিন্তু আমি জানি, গতরাত্রে অত্যন্ত শোচনীয় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে আমাদের বাড়ীতে। আমি জানি, একটা কাগজ অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টা রাজনীতি-সম্পর্কিত, সুতরাং আমার স্বামী পুরো-পুরিভাবে আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারছেন না। অথচ এ ঘটনার সবকিছু বিস্তারিতভাবে আমাকে জানতেই হবে। এবং জানাটা একান্তই দরকার—একান্তই দরকার আবার বলছি আমি। এই রাজ-নীতিবিদ্‌রা ছাড়া আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সত্য ঘটনাটা জানেন। সেই-জন্যেই আমার অনুরোধ, আমার মিনতি মিঃ হোম্‌স্, দয়া করে বলুন, ঠিক ঠিক বলুন কি হয়েছে এবং এর পরিণাম কি। সমস্ত খুলে বলুন, মিঃ হোম্‌স্। মক্কেলের স্বার্থের কথা চিন্তা করে নির্বাক হয়ে থাকবেন না। কেননা, তাঁর স্বার্থ সম্যক রক্ষা পাবে যদি আমাকে আপনারা সব কথা বলেন এবং আমার ওপর আস্থা রাখেন। যে কাগজটা চুরি গেছে, সেটা কি ?"

"ম্যাডাম, যা জিজ্ঞেস করছেন তা সত্যিই অসম্ভব।"

গুঙিয়ে উঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন লেডী।

"জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করুন, ম্যাডাম। আপনার স্বামী যদি এ ব্যাপারে আপনাকে অন্ধকারে রাখাই সঙ্গত মনে করে থাকেন, তখন, সদ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যে সব সত্য তথ্যগুলো আমি জেনেছি এবং যা উনি আপনার কাছে গোপন রেখেছেন, তা কি আপনাকে বলা আমার উচিত ? এ কথা জিজ্ঞেস করাটাও অন্যায়। আপনার উচিত তাঁকেই জিজ্ঞেস করা, আর কাউকে নয়।"

"আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে। শেষ উপায় হিসেবে আপনার কাছে আমি এসেছি। মিঃ হোম্‌স্, নিশ্চিত কিছু না বলেও একটি পয়েন্ট সম্পর্কে আপনি যদি আমায় আলোকিত করেন তো বড় উপকার হয়।"

"পয়েন্টটা কি, ম্যাডাম ?"

"এ ঘটনার ফলে আমার স্বামীর রাজনৈতিক কর্মজীবন কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ?"

"ম্যাডাম, এ ব্যাপারের একটা সুরাহা না হলে ফলাফল খুবই খারাপ হতে পারে।"

"আ!" এমনভাবে চকিতে নিঃশ্বাস টানলেন লেডী যেন আরও দৃঢ়মূল হ'ল তাঁর সন্দেহের রাশি।

"আর একটা প্রশ্ন, মিঃ হোম্‌স্। এ বিপর্যয়ের প্রথম শক পেয়েই আমার স্বামী তাঁর চোখেমুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা থেকে আমি বুঝেছিলাম, এ দলিল খোয়া যাওয়ার ফলে ভয়ানক রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে জনগণের মধ্যে।"

"উনি যদি তা বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় তা উড়িয়ে দিতে পারি না।"

"প্রতিক্রিয়াগুলো কি প্রকৃতির বলুন তো ?"

"উঁহু, ম্যাডাম, আবার আপনি এমন কথা জিজ্ঞেস করছেন যাঁর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তাহলে আপনার সময় নষ্ট করব না। তারও একটু খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চাইলেন না, সেজন্যে আপনাকে আমি দোষ দিই না, মিঃ হোম্‌স্। আপনিও যে আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা নিশ্চয় পোষণ করবেন না—সে বিশ্বাস আমার রইল। আমার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি চাই তাঁর উদ্বেগ উত্তেজনার কিছুটা অংশ নিজের মনে নিতে। আর একবার অনুরোধ জানিয়ে যাই, আমি যে এখানে এসে-ছিলাম, তা দয়া করে ওঁকে বলবেন না।" দরজার কাছ থেকে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন উনি। শেষবারের মত দেখলাম তাঁর সুন্দর কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত মুখ, চমকিত চোখ আর চাপা অধরোষ্ঠ। তারপরেই অদৃশ্য হলেন উনি।

স্কার্টের বিলীয়মান খস্ খস্ শব্দের পরিসমাপ্তি ঘটল দরজা বন্ধ করার শব্দে। হাসিমুখে হোমস তখন বললে, "ওহে, ওয়াটসন, মেয়েদের বিভাগটা তো তোমার। সুন্দরী মহিলাটি কি খেলায় মেতেছেন বলো তো ? ওঁর আসল অভিপ্রায়টা কি ?"

"ভদ্রমহিলার বক্তব্যই তো জলের মত পরিষ্কার এবং ওঁর উদ্বেগও খুবই স্বাভাবিক।"

"হুম্ ! ওঁর চেহারাটা একবার ভেবে দ্যাখ, ওয়াটসন। আরও ভাব ওঁর হাব-ভাব, অবরুদ্ধ উত্তেজনা, অশান্ত প্রকৃতি এবং নাছোড়বান্দার মত প্রশ্ন করার ধরন। মনে রেখ, উনি যে সম্প্রদায়ের মানুষ, সেখানে কেউ লঘু কারণে আবেগ প্রকাশ করে না।"

"বাস্তবিকই, বেজায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রমহিলা।"

"আরও মনে রেখ, কি রকম অদ্ভুত ঐকান্তিকতার সঙ্গে উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর স্বামীর সম্যক স্বার্থরক্ষার জন্যেই তাঁর সব জানা উচিত। ও কথা বলার অর্থ কি ? আরও একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, ওয়াটসন। আলোর দিকে পেছন ফিরে কেমন কৌশলে বসে পড়লেন, তা তো দেখলে। আমরা যে তাঁর মুখের ভাব দেখে মন বুঝে ফেলি, তা উনি চাননি।"

"হ্যাঁ, ঘরের একটা চেয়ারই বেছে নিয়েছিলেন উনি।"

"জানোই তো, মেয়েদের মোটিভ সদাই অবোধ্য। মার্গারেটের সেই স্ত্রীলোকটার কথা তোমার মনে থাকতে পারে। তাকেও ঠিক এই কারণে সন্দেহ করেছিলাম আমি। নাকের ওপর কোন

'ম্যাডাম, যা জিজ্ঞেস করছেন তা সত্যিই অসম্ভব'

'পাউডার ছিল না—আর এই সন্দেহই কিনা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল নির্ভুল সমাধান। এ রকম চোরাবালির ওপর কি করে তোমার সিদ্ধান্তের প্রাসাদ তৈরী করবে বল তো? ওদের অতি তুচ্ছ 'কার্য-কলাপ' নিয়েই মোট মোটা গ্রন্থখণ্ড রচনা করা যায় অথবা ওদের অতি অসাধারণ আচরণের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে পাওয়া যায় হয়ত একটা চুলের কাঁটা বা চুল কোঁচকানোর প্রসাধন-সামগ্রী। গুড মর্নিং, ওয়াটসন।"

"বেরোচ্ছ নাকি?"

হ্যাঁ। যাব গোডোলফিনে স্ট্রীটে। পুলিশ অফিসের দোস্তদের সঙ্গে সকালটা কাটাব ঐখানেই। আমাদের সমস্যার সমাধান জড়িয়ে আছে এডুয়ার্ডো লুকাসের মৃত্যু-রহস্যের সাথে—যদিও স্বীকার করছি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়ে কিছুই আন্দাজ করে উঠতে পারছি না আমি। ইঙ্গিত, ইসারা—কিছুই আমি পাইনি এ সম্পর্কে। ঘটনা ঘটার আগেই থিওরী তৈরী করাটা বিরাট ভুল। ভায়া ওয়াটসন, একটু সামলে থেকো। নতুন কেউ দেখা করতে এলে কথা বলো আমার হয়ে। যদি সম্ভব হয় তো লাঞ্চের আগেই দেখা হবে তোমার সাথে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত
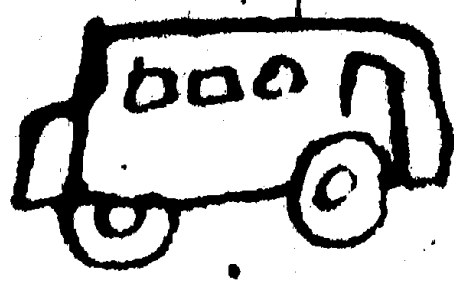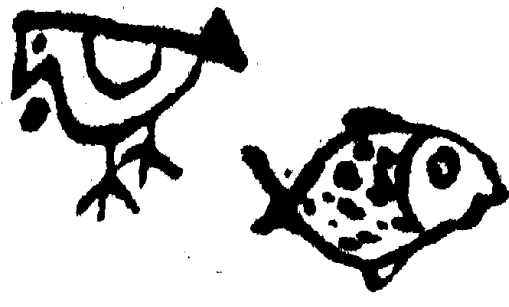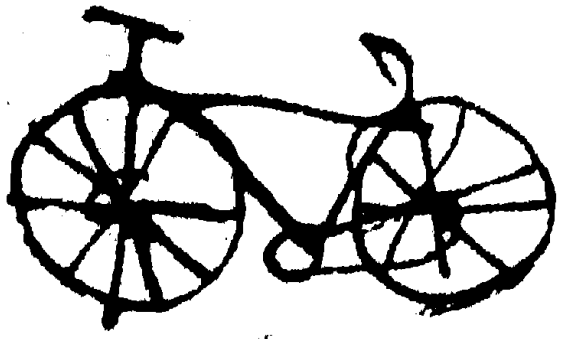
॥ একজন সাধারণ মানুষের গল্প ॥

এই পাড়ায় এলেই আমি এই দোকানে চা খেয়ে যাই। আর যখনই আসি তাকিয়ে দেখার মতো কোনো না কোনো দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে আমার সবচেয়ে বেশি কৌতূহল কাউন্টারের পেছনের সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকটি সম্পর্কে। মুখখানি ছোট, চামড়ায় বয়েসের ভাঁজ, মাথার সামনের দিকে অনেকখানি অংশ জুড়ে টাক পড়েছে—তবুও মনে হয় ভদ্রলোক যেন এখনো শিশুর মতো সজীব। মনে হয় এই জটিল জগতের কোনো দুশ্চিন্তা বা দুর্বিপাক ভদ্রলোককে স্পর্শ করতে পারেনি।

শেষকালে কৌতূহল চাপতে না পেরে একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি। অবশ্য ইতিমধ্যে ভদ্রলোক সম্পর্কে আমি আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা 'কল্লোল যুগ' বইটি পড়ে। কল্লোলের সাহিত্যিকরা তাঁদের উদ্দাম সাহিত্য-জীবনের অনেকগুলো অবসর-মুহূর্ত কাটিয়ে গিয়েছেন এই দোকানের চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে। আমার ধারণা হয়েছিল, ভদ্রলোকের স্মৃতিকে নাড়া দিতে পারলে হয়তো বিগত অতীতের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোক আমাকে নিরাশ করেননি।

• • •

পুরনো রাস্তাটির নাম ছিল মীর্জাপুর স্ট্রীট। রাস্তাটি তেমনি পুরনোই আছে, শুধু নতুন নাম হয়েছে সূর্য সেন স্ট্রীট। আশেপাশের হোটেল ও বোর্ডিং-হাউসগুলোও অধিকাংশই নতুন। কিন্তু এই চায়ের দোকানটির সেই ১৯২৩ সাল থেকে একই চেহারা। শ্বেতপাথরে বাঁধানো টেবিল আর কাঠের চেয়ার। এমন পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে সাজানো যে যে-কোনো চেয়ার থেকে অন্য কারও অসুবিধে না ঘটিয়ে উঠে আসা চলে। কোনো টেবিলেই নুন বা গোলমরিচের পাত্র নেই। দেওয়ালে নেই সারি সারি ক্যালেণ্ডার বা একটি কালো বোর্ডের ওপরে চকখড়িতে লেখা খাদ্যতালিকা। গত চল্লিশ বছর ধরে এই দোকানে শুধু চা-টোস্ট-বিস্কট-কেক বিক্রি হয়ে আসছে। আমিষবর্জনের কৌলিন্যে এই চা-খানাটি কলকাতায় সম্ভবত অদ্বিতীয়। কল্লোলের সাহিত্যিকরা নিরামিষকে এতখানি প্রশ্রয় দিয়েছেন ভাবতেও অবাক লাগে।

নাম অবশ্যই একটি আছে। ফেভারিট কেবিন। অচিন্ত্যকুমার এই নামটিকেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু যে-মানুষটি এই ইতিহাসের অবলম্বন তাঁর নামেও নূতনত্ব কম নয়। তিনি স্বয়ং নূতনচন্দ্র বড়ুয়া। ১৮৯৪ সালে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও নামের মধ্যে এতখানি নূতনত্ব লাভ করা কম ভাগ্যের কথা নয়।

কথায় এখনো চট্টগ্রামের টান। তবে সেজন্যে তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত নন। জন্ম হয়েছিল, তাঁর ভাষায়, "জে-এম সেনগুপ্তর পাশের গ্রামে।" নাম জিজ্ঞেস করলে বলেন পটিয়া থানার বৈলতলী গ্রাম। ১৯১৮ সালে পটিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পরে দাদার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন জীবিকার সন্ধানে এবং চট্টগ্রামের আরো অনেকের মতোই সাংগুভ্যালির চা বিক্রির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তারপরে যথারীতি বিয়ে করেছেন। যথারীতি তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ের জনক হয়েছেন। যথারীতি যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে [illegible] হয়েছেন। নিতান্ত ছকবাঁধা মামুলী একটি জীবন।

উল্লেখ করবার মতো যদি কিছু থাকে তো তাঁর নিষ্ঠা আন্তরিকতা ও সততা। মধ্যযুগের রাজারা অস্ত্রের জোরে রাজ্য জয় করতেন কিন্তু বিশ শতকের এই নিতান্ত সাধারণ মানুষটি বাংলাদেশের ইতিহাস-সৃষ্টিকারী বহু বিশিষ্ট-জনের হৃদয় জয় করেছিলেন নিতান্তই নিরীহ একপেয়ালা গরম পানীয়ের সদাপ্রস্তুত আপ্যায়নে।

• • •

শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি-সি নামে যিনি খ্যাত) ও ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসকে প্রায়ই দেখতাম এককোণের দুটি চেয়ার দখল করে বসে থাকতে। কী তাঁরা আলাপ করতেন বা আদৌ কোনো আলাপ করতেন কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রের দুই যশস্বী পুরুষকে এমনি একটি নগণ্য স্থানে বসে থাকতে দেখে আমার খুব অবাক লাগত। পরে আমি শুনেছি যে এই দুটি চেয়ারেই প্রায় এমনিভাবেই

সারাদিনের অনেকখানি সময় কাটিয়ে যেতেন স্বনামখ্যাত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্বেতপাথরের টেবিলে যদি ম্যাগনেটিক টেপের মতো মানুষের মুখের কথা বিদ্যুতের ভাষায় রেখায়িত হতে পারত তাহলে বাংলাদেশের সংবাদপত্র-জগতের অলিখিত কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যেত নিশ্চয়ই।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সংবাদপত্র-জগতের সবচেয়ে বীর্যবান যুগটিকেই অনুভব করা যেত এখানে কান পাতলে।

ছ'নম্বর বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটে সঞ্জীবনী প্রেস ও সঞ্জীবনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই পত্রিকার সঙ্গে স্বয়ং অরবিন্দর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। প্রধানত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়ে কুমুদিনীও (কুমুদিনী বসু) ছিলেন এই স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। পরে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে সঞ্জীবনী পত্রিকাটিকে ঘিরে যে চক্রটি গড়ে উঠেছিল তার নিয়মিত অধিবেশন বসত বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের দোতলা বাড়িটিতে। এবং নিয়মিতভাবেই তাঁরা এসে বসতেন ও দীর্ঘ সময় ধরে উত্তেজিত আলাপ-আলোচনা করতেন মীর্জাপুর স্ট্রীটের এই চা-খানাটিতেও। সঞ্জীবনী প্রেসের অধিকাংশ দলিলপত্র ব্রিটিশ পুলিশের দাপটে খোয়া গিয়েছে। কিন্তু শ্বেতপাথরের যদি ভাষা থাকত তবে তার অনেকখানিই আবার উদ্ধার করা যেত হয়তো।

যুগান্তরের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অমৃতবাজার পত্রিকার কালিপদ বিশ্বাসও নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন, দু পয়সার চা ও দু পয়সার টোস্ট সামনে নিয়ে তাঁরা যা-কিছু আলোচনা করেছেন তার ফলশ্রুতি বাংলার সংবাদপত্র-জগতকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চলমান জগতের পুরো বিবরণটি আমরা এখনো পাইনি। তিনিও নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন তাঁর চলমান জগতটি কোন্ ঘাটিতে এসে বারবার এক পেয়ালা চায়ের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠত।

আর সাক্ষ্য দিতে পারতেন আরো একজন যিনি বাংলাদেশের স্বদেশী দাদাদের কাছে ছিলেন ঘৃণার পাত্র আর গুণ্ডাদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। তিনি টেগার্ট। তাঁরই সবুট লাথি খেয়ে স্বনামখ্যাত কিরণদা দোতলার সিঁড়ি গড়াতে গড়াতে এই দোকানের সামনের ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। তারপরে যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ভাঙা হাত ও স্থানচ্যুত অস্ত্র কিরণদার জীবনে অপরিসীম ক্লেশের কারণ হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য পুলিশের নজর পড়ার অন্য কারণও ছিল। স্বনামখ্যাত সৌম্যেন ঠাকুর সদলে আসর জমাতেন এখানে। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক পরিকল্পনারই জন্মস্থান এটি। তেমনি আসর জমাতেন বিপ্লবী কামাখ্যা চক্রবর্তী, ছাত্র সুভাষচন্দ্র এবং চট্টগ্রামের একদল স্বদেশী যুবক। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি সবসময়ে সজাগ থাকত। মাঝে মাঝে শিকারী কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এক-একটি চায়ের পেয়ালার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত এক-একটি মানুষকে।

তা সত্ত্বেও এখানেই এসে বসতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রবোধ সেন ও যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাম অধিকারী কি বর্তমানের কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে অতিব্যস্ত জীবনের কোনো এক আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে সেদিনকার সেই রঙীন কল্পনার দিনগুলোর জন্যে একবারও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন না? কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-অধিকর্তা ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়াও কি সেই দিনগুলোকে ভুলতে পেরেছেন?

• • •

কিন্তু সেদিনকার সেই মানুষটি কিন্তু এখনো একইভাবে কাউন্টারে এসে বসেন। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে মানুষটি এখন বৃদ্ধ। কিন্তু দেখে মনে হয় এখনো যেন শিশুর মতো সজীব। চল্লিশ বছরে দোকানের পরিসরের সম্প্রসারণ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তনই আসেনি।

কিন্তু কল্লোলের সেই সাহিত্যিক-গোষ্ঠী এখন এই কাউন্টারের দৃষ্টিসীমা থেকে বহুদূরে অপসৃত। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জয়ন্তী-উৎসবের কোনো কলরবই এখন আর এখানে শুনতে পাওয়া যাবে না। অচিন্ত্যকুমারের পরম-পুরুষ ও জগদগুরুর উচ্চমার্গ এই চায়ের দোকানের প্রগল্ভ পরিবেশের সঙ্গে নিতান্তই সম্পর্কহীন। প্রবোধ সান্যালের কাছে সম্ভবত এখন চায়ের আসরের চেয়ে রুশ খানাপিনার আসরের আকর্ষণ বেশি। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাগর থেকে ফেরার পরেও রাস্তার দিকেই পা বাড়িয়েছেন; চায়ের দোকানের স্থবির পরিবেশ সম্ভবত তাঁর কাছে এখন অস্বস্তিকর। তারাশঙ্করের বিচরণক্ষেত্র বহুকাল আগেই চায়ের দোকানের পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আর নজরুল ইসলাম বিস্মৃতি দিয়ে গড়া নিজস্ব জগতে আত্ম-অচেতন। কল্লোলের এই সাহিত্যিকদের এই চায়ের দোকানে আবিষ্কার করা যেতে পারে বড়ো জোর অন্য আরেকটি স্মৃতিকথার পৃষ্ঠায়।

কিন্তু তাঁদের আসন শূন্য থাকেনি। নতুন যুগের নতুন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা নতুন করে আসর জমিয়েছেন এখন। কান পাতলে ঠিক আগের মতোই শোনা যেতে পারে নাটকের চুলচেরা বিশ্লেষণ। মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপরে প্রচণ্ড ঘুষি।

তবে আটষট্টি বছরের অভিজ্ঞতায় একটি পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। আজকালকার তর্কবিতর্কে ঝাঁঝ ও উত্তাপ অনেক বেশি। উত্তেজনা কখনো কখনো বিদ্বেষ হয়ে ফেটে পড়ে। কারণ, দেখা যাচ্ছে, আজকালকার একমাসে কাপডিশ ভাঙে আগেকারকালের এক বছরের মাপে। তবে শ্বেতপাথরগুলো কিন্তু চল্লিশ বছরেও অটুট।

ফেভারিট কেবিন অবশ্যই [illegible] নয়। তবুও স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির রূপায়ণে এই চা-খানাটির ভূমিকা নিতান্তই অনুল্লেখ্য নয়।

যে রূপকথায় রাজপুত্র নেই

রাজলক্ষ্মী দেবী

ভাঙা হোক্, হোক্ না চুনবালি-খসা, তবু রাজপ্রাসাদের মতোই তো বাড়িখানা। নির্জন, পরিত্যক্ত এক রাজপ্রসাদ। লোনা-ধরা দেয়ালগুলো দাঁত খিঁচিয়ে আছে, ঝাউ আর পপলারের সুষম ছায়ার নিচে ওদের বেখাপ্পা লাগে বইকি। ভেতরে ঢুকলেই একটানা লম্বা বারান্দা; তার দুপাশের দেয়ালে ছাত-ছোঁয়া প্রকাণ্ড তেলরঙ ছবিগুলোর ওপরে মাকড়সার বহু বছরের জাল বুনে রেখেছে।

শুধু একবার-ই ঢুকেছিলাম। প্রথম এ-পাড়ায় এসে প্রতিবেশি কৌতূহল বা সৌহার্দ্য যাই হোক্, দেখাবার জন্যে সেই একবার যাওয়া। দ্বিতীয়বার ও-মুখো হবার দুঃসাহস হয়নি তারপর। এমন কি, জোনাকি হবার আগটাতে যখন ছটফট করছি, উনি যখন বললেন,—'তাহলে হেমা-র ঠাকুরমাকেই একবার ডাকি—' তখন সভয়ে আঁৎকে উঠেছিলাম,— 'না না না, —ওর ওই মুখ দেখ্‌লে এখন আমার ভয় লাগবে আরও।'

মাদী গরিলা-র মতো নুব্জ শরীর আর পৃথুল মুখে একটা অমানুষিক আক্রোশ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। হাস্‌বার প্রচেষ্টায় বাঁকা বাঁকা শ্বা-দন্ত দুটো বেরিয়ে এসে আরও ভয়ানক দেখায় সেই মুখ। ছানি-পড়া চোখ দুটোয় যেন একটু বুড়ী-পেঁচার ভয়-দেখানো চাউনি। হেমা-র ঠাকুমাকে রোদের মধ্যে কখনও সোজাসুজি তাকাতে দেখিনি। বাঁকা হাত দুটো আড়াআড়ি ক'রে চোখের ওপর রেখে বাইরে আস্‌তো বড়ির থালা কি লেপ তোষক রোদ্দুর থেকে ওঠাতে।

জোনাকি হাত-পা ছুঁড়তে শেখারও আগে হেমা-কে রাতদিনের জন্যে অধিকার ক'রে ফেল্‌লো। সেই যে একদিন এসে জানালার বাইরে থেকে লুব্ধ দুটো চোখ মেলে তাকিয়েছিলে—যেদিন দরজা খুলে ওকে ডাক্‌লাম, বললাম—'কোলে নেবে বাচ্চা-কে? সেই-দিন থেকে আমার বাড়ির সর্বত্র অবাধ গতি হয়ে গেছে হেমা-র।

দুই পায়ের ওপর ফেলে জোনাকিকে তেল মাখাতে কি ঘুম পাড়াতে ওইটুকু মেয়ের পটুত্ব দেখে অবাক্ হয়ে যাই। উনি বলেন,—'হবে না কেন? ভাই দুটোকে তো ও-ই ক'রছে। এতটুকু বয়স থেকেই তো মা-মরা শিশুগুলো।' কিন্তু ভাই দুটো আজকাল কী করলো, কোথায় গেলো,—পাড়াতে কার সংগে মারামারি ক'রে রক্তাক্ত হয়ে এলো, সেদিকে হেমার বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। বরং বুড়ী ঠাকুরমা-কেই দেখি দুপুর বারোটা পেরোলে আড়াআড়ি হাতে চোখ ঢেকে পেছনের প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে ওদের খুঁজতে যাচ্ছে, ডাকছে নাম ধরে ধরে। সেটাই হেমা-র পক্ষে সিগ্‌ন্যাল। জোনাকি-কে আমার কোলে দিয়ে বোঁ ক'রে দৌড়ে বাড়ি যায় হেমা। কখনো কখনো শুনতে পাই—'কোথায় ছিলি এতোক্ষণ? গিলতে যে এলি, লজ্জা করে না? কুটোটি নেড়ে উপকার ক'রেছিস সকাল থেকে? আবাগী, হতচ্ছাড়ী।'

হেমা-র সরল বিস্ময়,—'আমি তো এইখানেই ছিলাম গো। তুমি না দেখ্‌তে পেলে কী করবো?'

ভোরের আলো স্পষ্ট হবার আগেই দরজায় তিনবার টোকা পড়ে। 'হেমা, এখন না—'ফিসফিসিয়ে জানালাকে বলি আমি,— 'জোনাকি ঘুমুচ্ছে। আমরাও—'

'তাহলে আমি তোমার জন্যে ফুল দুব্বো তুলছি। আচ্ছা?—' জবাবের অপেক্ষা না ক'রে সরে যায় হেমা।

সত্যি, সারাদিনে টুকিটাকি অনেক কাজ ক'রে দেয় মেয়েটা। দুপুরের রোদ পড়বার আগেই শুকনো কাপড় ঘরে এনে আলনা গোছায়। রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে কেটলি চাপিয়ে দেয়। উনি কিন্তু এ সব পছন্দ করেন না, খুব রাগ করেন মাঝে মাঝে,—'কেন ওকে এ সব করতে দাও? পরের মেয়ে। ওর ঠাকুমা ভাববে আমরা ওকে খাটিয়ে নিচ্ছি।'

'মানা তো করি—' সত্যি কথাই বলি আমি,— 'কিন্তু ও যে কথা শোনে না। কী করবো?'

'সারাদিন বাচ্চাটাকে ওর কাছেই না দাও কেন?' উনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন,— 'এ সব ঠিক নয়।'

'ভালোবাসে—'

'থাক্‌। গরীব, নোংরা। ওদের সঙ্গে এতো ঘেঁসাঘেঁসি-র দরকার কী? এখন তোমার ভয়, ঘেন্না গেলো কোথায়?'

ভাঙা রাজপ্রাসাদের মেয়ে হেমা-র জামা-কাপড় ময়লা, চুলে জট, তা ঠিক। চেহারাটাও মোটেই রাজকন্যার মতো নয়। টেরা-কোটায় তৈরি মূর্তির মতো কালো। আর চ্যাটালো মুখে ঠাকুমা-র সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্য। কিন্তু তার হাসিটুকু যেন হঠাৎ এক মুঠো ধপধপে শাদা শিউলিফুল। ওই হাসি-র জন্যেই হেমা-কে ভাঙা প্রাসাদের রাজকন্যা ভাবা যেতে পারতো।

ও'র বিতৃষ্ণা দূর করতে আমার বেশিদিন লাগলো না। চুলে একটু তেল আর চিরুণী দিয়ে, দু-একটা পুরনো ব্লাউজ সায়া কেটে ফ্রক বানিয়ে, হেমা-কে দস্তুরমতো পরিচ্ছন্ন ক'রে ফেললাম আমি। সাবান দিয়ে মুখ হাত ধুতে আর বলতে হতো না, বাড়িতে ঢুকেই হেমা এক দৌড়ে বাথরুমে। তবুও উনি থেকে থেকে বলতেন,—'ভালো করছো না। একটু সীমা রেখে চলা উচিত।'

জোনাকি হামা দিলো, হাঁটতে শিখলো। সঙ্গে সঙ্গে হেমা-রও যে শরীর পুরন্ত হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ওকে আমি ফ্রকের বদলে ব্লাউজ, সায়া আর শাড়ি পরাতে শুরু করেছি। কিন্তু ওর অস্ফুট শিশু মনকে দু একটা সতর্ক উপদেশের তীর ছুঁড়ে একটা রঙিন বেলুন ফাটাবার নিষ্ঠুরতা কিছুতেই করতে পারছি না। এখনও, 'দাদা-র চা আমিই দিয়ে আসি—' বলে বাইরের ঘরে লোকজন, রোগীপত্রের মধ্যে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয় হেমা, নানা অছিলায় কখনো কখনো তাকে থামাই—কিন্তু কখনো কখনো মানা না মেনেই চলে যায়। উনি পরে আমাকে বলেন,—'ভালো করছো না। ও বড়ো হচ্ছে যে! লোকে এর পরে নানান কথা বলবে।'

অথচ হেমা'যে এখনও একটা উজ্জ্বল শিশু-মন নিয়ে আমাদের কাছে আসে। যখন মোড়া পেতে জোনাকি-কে বসিয়ে মনের সুখে স্নো, ক্রীম, পাউডার ছড়িয়ে ওকে সাজায়, তখন একদিন বলেছিলাম,—'তুইও একটু সাজবি না কি? আর না তোকেও পাউডার লাগিয়ে দিই।'

হেসে গড়িয়ে পড়েছিলো হেমা,—'মা গো মা, বউদি-র সখ কী! জানো, ঠাকুমা আমাকে কী বলে? ডাইনী, পেত্নী, শাঁকচুন্নী। আমার রূপ দেখলে নাকি ভূত পালায়। ঠাকুমা তাহলে কী জানো? —বুড়ী রাক্ষুসী। ঠিক না বউদি?'

'ছি, হেমা—ও রকম বলতে নেই—' আমি সস্নেহ ধমক দিয়েছিলাম,—'আচ্ছা হেমা, তুই এখানে তো কতো কাজ করিস্। তার চেয়ে বাড়িতেই আরেকটু সময় থেকে ঠাকুরমার কিছু কাজ তো করে দিলে পারিস্। ও'রও কষ্ট কমে,—তোকেও বকুনি শুনতে হয় না।'

'দূ—র,' হেমা হাত ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো, —'ওর কাজ করবে না কচু। তাহলেই তো খোনা রাক্ষুসীর মতো তোঁর বাঁবাঁ তোঁর মাঁ বলে ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করবে। আচ্ছা বউদি, মা মরেছে, বাবা সন্ন্যিসি হয়ে গেছে, সে কি আমার দোষ না বিলু-ভুলুর দোষ? তুমি খাওয়াতে না পারো তো আঁশগাদায় ফেলে দিলেই পারতে?'

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো আওয়াজ পাই—'হেমি, হেমি—ও ডাইনী, ও পোড়ারমুখি।'

সন্তর্পণে ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল ছোঁয়ায় হেমা। পেছনের উঠোন পেরোয় এক ছুটে, তারপর খিড়কি দরজার শেকলটা খুলে পেছনের মাঠ পেরিয়ে উধাও হয়। সামনের দরজা দিয়ে দেখি বুড়ী ঠাকুমা ঢুকছেন, হাতে একটা বাঁকারি।

'হেমি এসেছিল না কি?' —খনখনে আওয়াজ বেজে ওঠে।

'একটু আগেই তো চলে গেল,—' অশ্বত্থামা গজ-র ঐতিহ্যে মিথ্যাচরণ করি আমি।

'বসুন না ঠাকুমা।'

'না, বসবো না।' —বুড়ী ইতি উতি তাকান; স্বল্পতেজ চোখ দুটো পেছনের খোলা দরজা পর্যন্ত পৌঁছে তার নিহিত অর্থ খুঁজে পাবে না জেনে নিশ্চিন্ত থাকি আমি —'আজ ছুঁড়ীর পিঠে এই বাঁকারি ভাঙবো। সকাল থেকে ওর কাপড় সেদ্ধ করছে এই কোমরভাঙা বুড়ি—এতো বড়ো বেহায়া মেয়ে।'

বক বক করতে করতে চলে যান বুড়ী ঠাকুরমা। একটুক্ষণ বাদেই দেখি পেছন দিয়ে হেমা ঢুকছে—

'গেছে গো বউদি?'

'তোমার অন্যায় কিন্তু, হেমা—' আমি মুখ গম্ভীর করি,— 'নিজের কাপড় তুমি কেন কাচবে না শুনি?'

'কচবো না বলেছি না কি?'—হেমা কাঁদোকাঁদো হয়, —'আমি ভুলে গেছিলাম, তা ডেকে দিলেই তো হতো। তা নয়, নিজে কেচে এখন পিঠে বাঁকারি ভাঙবে। যাই বাবা, বাঁকারির বাড়িই খাই গিয়ে—নয়তো আবার তুমি রাগ করছো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্—' এর বেশি আর এগোতে পারে না আমার শাসন। জোনাকি-কে ওর কোলে এগিয়ে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে যাই আমি।

চূড়ান্ত ব্যাপার হলো কিন্তু আরেকদিন। পেছনের দরজাটার শেকল নামিয়ে দরজার পাল্লা দুটো খুলেই হুড়মুড়িয়ে আবার ফিরে এলো হেমা, —'ওই দিক্ দিয়েই আজ এসেছে গো রাক্ষুসি—' টগ্‌বগে হরিণের মতো লাফে লাফে এবার সামনের দরজা দিয়েই পালায় হেমা। কিন্তু এক টুকরো লাক্‌ড়ি শূন্যে এসে পরিচ্ছন্নভাবে আমার কোমরেই লাগ্‌লো। 'উঃ'—বলেই বসে পড়ি আমি। যতোক্ষণে উঠতে পেরেছি, ততোক্ষণে হেমার ঠাকুমা-ও নিশ্চিহ্ন উধাও হয়েছেন।

উনি তো হাসপাতাল থেকে ফিরে সব শুনে রেগে আগুন। পেছনের দরজার শেকল তুলে নিজের হাতে কুলুপ লাগালেন তক্ষুণি। 'আজ থেকে—' আমাকে বল্‌লেন,—'হেমা-কে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিয়েছো তো ভালো হবে না।'

যতোই উনি বলুন, সকালে হেমা-র তিনটে টোকা শুনতে পেলে দরজা না খুলে দিয়ে পারতাম-ই না আমি। কিন্তু, আশ্চর্য, বেলা হলো—জোনাকি ঘুম থেকে উঠে 'হেমা, হেমা—' বলে চেঁচামেচি শুরু করলো, আমাদের মুখ-টুখ ধোয়া, চা খাওয়া সব শেষ। তবুও হেমার দেখা নেই। অবশেষে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম ওকে,— ঘাড়টা খুব নিচু ক'রে উঠোনে বসে এক ডালা গম বাছছে। ডাক্‌লাম,—'হেমা—', তবু মুখ ওঠালো না।

'লজ্জা পেয়েছে ভারী—' আমি বল্‌লাম ও'কে,— 'ও নিজে থেকেই আর আসবে না।'

'ভালো হয়েছে।' —একটা তৃপ্ত উত্তর দিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হতে থাকেন উনি,— 'আপদ বাড়ি থেকে বিদায় হওয়া ভালো। ওর-ও একটু ভদ্রস্থ হবার আশা আছে কাজকর্ম শিখে। তুমি তো আহ্লাদ দিয়ে ওর মাথাটি খাচ্ছিলে।'

আমি সত্যি মনে ঘা খেয়েছিলাম ও'র কথায়। বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম পাশের বাড়ির দিকের জানালাটা। হেমাও দেখি চুপচাপ বাড়ির কাজই করছে, যেন ভুলেই গেছে তার অতো আদরের জোনাকী-কে!

বিকেলে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন একটু তাড়াতাড়ি। চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন,—'হেমা আসে নি সারাদিনেও?'

'না।' —বলে জোনাকি-কে দুধ খাওয়ানোর দিকে বেশি বেশি মনোযোগ দিলাম আমি।

দুটো দিন এইরকম ক'রেই কাটলো। তারপর দেখি, জোনাকি-কে কোলে ক'রে পাশের বাড়ি-র দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন উনি। জোনাকি ডাকছে.—'হেমা, হেমা, হেমা—'

কোথা থেকে ছুটে বাইরে এলো হেমা, ভেবেছিলো একলা জোনাকি বুঝি ওখানে। হঠাৎ ও'র সামনে পড়ে যেন অপরাধীর মতো নিচু মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে গেলো।

'হেমা, জোনাকি তোমাকে ডাকছে।' উনি বললেন, আর হেমা হাসলো, উজ্জ্বল হলো তার মুখ। পাঁচ মিনিট বাদেই হেমা আবার আমার বাড়িতে, জোনাকিকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে দোলা দিচ্ছে।

'আমি যে তোকে সেদিন ডাকলাম,' আমি বললাম,—'সাড়া দিস্ নি কেন? আসিস্ নি কেন?'

'দাদা না ডাকলে কী ক'রে আর আসি বলো? দাদা যে সেদিন খুব রাগ ক'রেছিলেন—জোরে জোরে তোমায় বক্-ছিলেন।' হেমার করুণ চেহারা কিন্তু হঠাৎ হাসিতে উজ্জ্বল হলো,—'ঠাকুমা রাক্কুসি খুব জব্দ হয়েছে। আর লাকড়ি ছুঁড়বে না।'

রাজপ্রাসাদের সামনের ভাঙা গ্যারেজটাতে একদিন দেখি কারা পলেস্তারা লাগাচ্ছে। চুনকাম হলো। কৌতূহলী হয়ে হেমা-কে প্রশ্ন করলাম, 'তোদের গ্যারেজ-ঘরটা কেউ ভাড়া নিচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ গো—' আবার হেসে কুটিকুটি হেমা, —'মুদীর দোকান খুলবে এক মাড়োয়ারী। কী পেটমোটা, বউদি! আর চালকে বলে চাবল, চিনিকে বলে চীনহী। সেদিন ঠাকুমাকে বলেছে,— ভাড়া দেবে না, আমাদের যা চাল চিনি লাগে, দেবে ওর দোকান থেকে।'

কয়েকদিন বাদেই দেখি বস্তা, পুরিয়া, টিন সাজিয়ে কালো আর মোটা এক দোকানদার বসে গেছেন জিনিস ওজন করতে। অমায়িক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের—'রাম রাম বাবুজী। হামার দোকান থেকে সামানপত্র লিবেন এখুন থেকে। হাপনাদের ভরোসাতেই তো দুকান দিলম।' শুধু হাসিটা নয়, জিনিসগুলোও দেখলাম অকৃত্রিম। অতএব মনে মনে খুশিই হলাম পাড়ায় একটা ভালো মুদীর দোকান হওয়াতে।

চিন্তিত করলো হেমা। —'বউদি, পেটমোটা দোকানীটা ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে রোজ আসবে, আর দেখবে শুধু আমাকে। কী বোকা বোকা চাউনি, ইস্! গা জ্বালা করে।'

'সেদিন বলছে কি জানো—' হেমা অনর্গল বকে যায়,— 'ওর নাকি বউ মরে গেছে তিনটে বাচ্ছা রেখে। তাই আবার বিয়ে করবে। বলছে আর খালি খালি আমাকে দেখছে।'

—আমাদের চিন্তিত ক'রে রেখে হেমা কিন্তু পরনের আঁচল কোমরে জড়িয়ে চলে গেছে সেই মুদীর দোকান-টাতেই। 'লবঞ্চুস দাও না জোনাকির জন্যে—'

'পয়সা দাও—' হাত পাতে দোকানী।

'ঈস্—পয়সা কীসের?' ফোঁস ক'রে ওঠে হেমা,— 'আমাদের যা জিনিস লাগে তুমি অমনি দেবে বলোছো না?' শর্তের মধ্যে যে জোনাকির লজঞ্চুস কোনোমতেই আসে না, এ কথাটা হেমাকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা। হেসে একমুঠি লজেঞ্চুস বিনা বাক্যে তুলে দেয় দোকানী।

হেমা আবার হয় তো পরের দিন এসে নতুন খবর দেয়,— 'ঠাকুমা-টাকে রাক্কুসী কি আর সাধে-বলি বউদি! ওই দোকানীটাকে বলছিলো, আমার নাকি বিয়ে দেওয়া দরকার। আমি বুঝি না নাকি ওর মতলব? আমাকে দোকানীটার ঘাড়েই চাপাতে চায়। ওই কুচ্ছিত পেট-মোটা বুড়োকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।'

'তুই ওর সঙ্গে গিয়ে হাসিগল্প করিস কেন তাহলে?' আমি হেমা-কে শাসন করি—'ও যদি ভাবে ওকে তোরও পছন্দ, তাহলে আমি অন্ততঃ ওকে দোষ দেবো না।'

সত্যিই মুদীর দোকানে হেমা-র গতিবিধি বেড়েই চলেছে দিনদিন।

'তা ওর কথা শুনলে যদি আমার হাসি পায়—' এইখানটায় মুখে আঁচল গুঁজে খানিকক্ষণ হেসে নিলে হেমা,— 'তো হাসবো না? আর কথা বলতে কী দোষ? আমি তো খালি ওর মজার কথা-গুলো শুনতে চাই বলে ওর সঙ্গে গল্প করি।'

তার বেশি আর হেমা আমাকে কী বলবে? কিন্তু একটা মঞ্জরিত যৌবন,— সে যতো রুক্ষ মরুভূমির মতো শরীরেই আসুক,—তার আরতি চায়। পেটমোটা দোকানীর দুই চোখে নির্বোধ আরতি দেখবার লোভেই নিশ্চয় যেতো হেমা,— যৌবনের নিষ্ঠুর নিয়মে এই একটা সহজলভ্য হৃদয়কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা-র চপল নেশা হেমা-কে পেয়েছিলো। তার পরে একদিন পেট-মোটা দোকানী আর বুড়ী ঠাকুমা-র মিলিত ষড়যন্ত্রকে এক হাসি-র ঘায়ে ধূলিসাৎ ক'রে প্রাণচঞ্চলা হেমা সহজেই পালাতে পারতো জীবন নামক মাঠ পেরিয়ে। সেই বিশ্বাসে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। ভাঙা প্রাসাদের রাক্ষসদের কাছে কাছে থেকেও রাজকন্যা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতো, আমরাও নির্ভয় ছিলাম।

কিন্তু হেমা একদিন এসে আমার খুব কাছে বসলো, নখ খুঁটলো খানিকক্ষণ,—হাসি নিভে গেছিলো তার মুখ থেকে। ভয় পেলাম আমি, খুব ভয় পেলাম—'কী হয়েছে, হেমা?'

'কালকে—' হেমা-র গলায় একটু জড়তা ছিলো না, মনে হলো না একটুও চোখের জল ওর গলার স্বরের মধ্যে আর্দ্র হয়ে আছে,—'দোকানীটাকে আমার ঘরে ঢুকিয়ে ঠাকুমা বাইরে থেকে শেকল লাগিয়ে দিয়েছিলো বউদি।'

'বলিস কী রে—' আমি পাথর হয়ে গেলাম,—'তারপর?'

'তারপর কিন্তু কিছুই নেই—' হেমা তার উজ্জ্বল হাসিটা হাসলো,—' পেট-মোটা-টা দু হাত কচলিয়ে বলছে,

লাগলো, আমি তার বালবাচ্ছা-র মা হলে ভলো হয়।'

'তুই ভয় পাস্‌নি—?'

'ভয় পেলো তো পেটমোটা। দরজা বন্ধ দেখে সে প্রায় কাঁদে আর কী। এদিকে বাইরে থেকে ঠাকুমা বলছে, যেভাবে পারে আমাকে রাজি করাতে। আমার বিয়ে না হলে নাকি ঠাক্‌মার আর শান্তি নেই।'

'হেমা, তুই কী করবি এখন?'

'আমি ভাব্‌ছি—' হেমা শিশিরে ভেজা শিউলিফুলের মতন হাসলো,—'পেটমোটাটাকেই বিয়ে করি।'

'পাগল না কি? ওই একটা বিদ্‌ঘুটে রাক্ষস—'

'কিন্তু বউদি, সেদিন ও আমাকে এমন হাতে পেয়েও কিচ্ছুটি করলো না। কত ভালো মানুষ বলো তো। ওকে রাক্ষস কেন বল্‌বে? বেচারী।'

বুঝলাম, রাজকন্যার কাহিনী প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবং এ কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র আস্‌বেন রাক্ষসের ছদ্মবেশ ধরে।

কিন্তু, সহসা সবাইকে অবাক্ ক'রে দিয়ে একদিন এলো একখানা তিন পয়সার পোস্টকার্ড হেমা-র ঠাকুমার নামে। আর পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে বুড়ী সোজা আমার কাছেই এলেন।

'পড় তো গো বউমা পোসটোকাড খানা—' বুড়ী চিঠি এগিয়ে দেন,—'হেমা বলে ওর বাপ লিখেছে। বলে, বাপে খোঁজ নিলো না আজ তেরো বচ্ছর, আজ নেবে! কী পড়তে কী পড়ে যে।'

'না, হেমা সত্যিই বলেছে—' আমি পড়তে শুরু করি,—'শ্রীচরণকমলেষু—মা, আমি চাকরী ছাড়ার পর বিলাত ও জাপান গিয়াছিলাম। ফিরিয়া ব্যবসা শুরু করি। বহু কারণে আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি জানেন। সংসারের জন্য কোনও মমতাই ছিল না বলিয়া এতদিন পত্রাদি দিই নাই। কিন্তু এখন ভাবিতেছি, শিশু তিনটি যদি বাঁচিয়া থাকে তবে তাহাদের প্রতি যথাকর্তব্য করা উচিত। আমি আগামী বৃহস্পতিবার সকালে পৌঁছিব। উহাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়াছি। হেমা বোধহয় বড় হইয়াছে, তাহাকে অচিরেই সৎপাত্রস্থ করিতে হইবে। প্রণাম নিবেন। ইতি সেবক শ্রীনিরঞ্জন।'

বৃহস্পতিবার সকালে পাশের বাড়ির ঝাউ পপলারের ছায়ায় একটা মিলনান্তক দৃশ্য আমরা কৌতূহলী চোখ নিয়ে দেখ্‌লাম;—যদিও নিভাঁজ দামী স্যুট ও চশমা-পরা ভদ্রলোককে হেমার বাবা বলে ভেবে নিতে ভারী অসুবিধা হচ্ছিলো।

'...ওকে রাক্ষস কেন বল্‌বে? বেচারী'

হেমা এক ফাঁকে এসে হাজির।—'কী হেমা, বাবা এসেছে বলে খুব খুশি, না?'

'খুশিই তো।' —হেমা জোনাকি-র চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।—'আমরা সব্বাই বাবার সঙ্গে কোলকাতায় যাচ্ছি, বউদি। বাবা বলেছে এই বাড়িটা বিক্রি করে দেবে।'

'খুব ভালো থাক্‌বি—' আমি ওর করুণ চেহারা-র দিকে তাকাচ্ছিলাম না—'তোর এখন কতো ভালো বিয়ে হবে। ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন।'

'খুব একটা হাসির কথা শুনবে, বউদি—? হেমা হাসতেই চেষ্টা করলো, কিন্তু তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ছিলো,—'ঠাকুমা গিয়ে ঐ দোকানীটা-কে ক্যাটক্যাট ক'রে অনেক কথা শুনিয়ে এসেছে। সে নাকি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিচ্ছিলো, তাকে নাকি জুতোপেটা ক'রে ভদ্রলোকের পাড়া থেকে বার ক'রে দেওয়া উচিত।'

তারপর হেমা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো,—'বউদি, সকালে সে এসেছিলো, —ঠাকুমা তাকে বাবার সামনে যেতে দেয়নি, ঘরেই ঢুকতে দেয়নি।'

পরের দিনই ভাঙা রাজপ্রাসাদের রাজা মহা সমারোহে তিনটে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে মাল আর জিনিসপত্র শুদ্ধ রাজপুরী-র সকলকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে চলে গেলেন। বাড়ীটা বিক্রি হয়ে যাবার পরে মুদীর দোকানটাও উঠে গেলো। পাড়াতে মুদীর দোকান আরও আছে সত্যিই, কিন্তু ঠিক দরে খাঁটি জিনিসটি ওখানে যেমন পেতাম, তেমন আর পাই না। হেমা-র কথাও মনে পড়ে, যখন জোনাকী বেশি বেশি বিরক্ত করে। তা না হলে এখন আমরা ওর বিষয়ে ভারী নিশ্চিন্ত হয়েছি।

বিচিত্র দেশ : বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদার

।। ছাগল দিয়ে সাধা—
রা নাহি দেয় রাধা ।।

ব্যাপারটা শুনতে সামান্য হলেও আইনের বিচারে অত্যন্ত গুরুতর।

ছোটবেলায়, যেমন হয়ে থাকে, মেয়ের বাপ-মা কোন সৎ সুপরিচিত প্রতিবেশী স্বজাতির ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। ছেলে উপযুক্ত হোক, বৌ-পুষবার সামর্থ্য হোক, মেয়েটিও এদিকে ডাগর-ডোগর হয়ে উঠুক—তারপর দুজনের বিয়ে-থা হবে, সুখে ঘর-সংসার করবে। এই সব ভেবে মেয়ের ঘরের আর ছেলের ঘরের বাপ-মা আপন আপন ছেলেমেয়ের ছোটবেলাতেই ঝামেলা চুকিয়ে রেখেছেন। ছেলের ঘর থেকে, নিয়ম অনুযায়ী পাঁঠাটা, ফলটা-মুলোটা মেয়ের বাপ-মা ভাই-দাদারা এতকাল খেয়ে এসেছেন; নিশ্চিন্ত আছেন, মেয়ে বড় হলেই এসব বাধ্যবাধকতা চুকে যাবে। মেয়ে বড়ও হয়েছে, এবার পাকাপাকি বিয়েটা চুকে গেলেই হয়।

কিন্তু কি ছিল দুহিতার মনে!

তিনি এদিকে স্বয়ম্বরা হয়ে বসে আছেন অন্য এক নায়কের সঙ্গে। শুধু মন দেওয়া-নেওয়াই নয়, মনের মানুষকে বিয়ে করবেন বলে তিনি কোমর বেঁধে বসেছেন। বাপ-মা যার সঙ্গে এতকাল মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে পুরুষ্টু পুরুষ্টু পাঁঠাগুলি গোগ্রাসে উদরস্থ করেছেন—সেই পাত্রকে মেয়ের পছন্দ নয়!

তা না হয় না হ'ল। নিজের পছন্দমত স্বামী বেছে নিল—কষ্ট-দুঃখ যদি পেতে হয় নিজেই পেল, সুখ পেলেও নিজেই সুখী হল। বাপ-মার এতে বলার কিছু নেই।

কিন্তু পাঁঠাগুলো! সেগুলি তো এতকাল হজম হয়ে গেছে। স্বামী বদলানো সোজা—কিন্তু হজম হয়ে-যাওয়া পাঁঠা তো মেয়ের ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুযায়ী জ্যান্ত হয়ে পেট থেকে বেরিয়ে আসবে না! ইল্বল আর বাতাপীর মত হজম হয়ে-যাওয়া পাঁঠা বাঁচাবার মন্ত্র তো এরা জানে না, এরা সবাই অগস্ত্য মুনির মত পাঁঠা হজম করতেই জানে।

এদিকে মুশকিল! ছেলে কোথা থেকে জানতে পেরেছে, যে-মেয়েকে বৌ করবার আশায় সে এতকাল মেয়ের বাপকে, মানে তার হবু শ্বশুরকে, গত চার-পাঁচ বছর যাবৎ মাসে মাসে একটি করে পাঁঠা দিয়ে এসেছে শ্বশুর-ষষ্ঠীর মত উপঢৌকন হিসাবে; শ্বশুরের, বিশেষ করে, শ্বশুর-দমন শাশুড়ীর পাঁঠা পছন্দ না হলে পড়ি কি মরি করে আবার নতুন পাঁঠা (অবশ্যই শাশুড়ীর পছন্দ-মত) এনে দিয়েছে বেচারা বশম্বদ হবু-জামাই—সে কিনা আজ শুনেছে তার ভাবী স্ত্রী সটান তার বাপ-মাকে বলেছে, যে-পাত্র তোমরা আমার জন্য স্থির করেছ, সেই বেঁটে, মোটা, বুড়ো, পায়ে গোদ, চোখে-ছানি ইত্যাদি ইত্যাদি ঘাটের মড়ার সঙ্গে আমি ঘর করতে পারব না। আমি স্বাধীন জেনানা—আমি আমার পাত্র বেছে নিয়েছি, আমি তার ঘর করতেই চললাম। এই না বলে সটান তার মনের মানুষের ঘরে গিয়ে উঠে সেই নতুন পাত্রকে 'সংসারের জন্যে তেল নুন লকড়ী আনতে হাটে পাঠিয়েছে!

পাঠকদের মধ্যে বিয়ের-যুগ্যি মেয়ের বাপ যদি কেউ থাকেন তবে একমাত্র তিনিই এ অবস্থাটা বুঝবেন, বিশেষ করে তিনি যদি মেয়ের বিয়ে দেব বলে হবু জামাইয়ের কাছ থেকে গোটা পঞ্চাশ-ষাট লম্বকর্ণের মত 'দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠা' পেটের অন্ধকার গুহায় চালিয়ে দিয়ে থাকেন! নিরুপায় হয়ে তিনি তো ছুটলেন, মেয়ের পিছু পিছু—'ওরে, ইত্যাদি থাকি! আমি যে তোর তার সঙ্গে বিয়ে দেব বলে গুষ্টিসুদ্ধ পাঁঠা খেলুম—সেগুলের কি হবে?'

—মেয়েও তেমনি। সে সোজা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—'সে আমি কি জানি! কথা দিয়েছ তোমরা, পাঁঠা খেয়েছ তোমরা—তোমরাই তার ব্যবস্থা করবে। কথা দেবার আগে তোমরা আমার মত নিয়েছিলে—যে, এখন তোমাদের পাঁঠার ব্যাপারে আমি মত দেব?' বলে, সে যেমন স্বামীর ঘরের মাকড়সার ঝুল ঝাড়ছিল, তেমনি আবার ঝুল ঝাড়তে লাগল।

এদিকে প্রতিশ্রুত পাত্রও গোল বাধিয়েছে। —'হ্যাঁ, মশাই, আমার সঙ্গে যদি মেয়ের বিয়েই না দেবেন, তবে আমার পাঠাগুলি অমন নির্বিবাদে খেলেন কেন? আমাকেই না হয় পছন্দ

হাটে এসেছে পাগান রমণী

হয়নি, কিন্তু মা-ষষ্ঠীর জীব ঐ পাঁঠাগুলো তো কোন দোষ করেনি—তাদের এ হাল করলেন কেন? —দিন, আমার পাঁঠা ফিরিয়ে!'

আইনতঃ মেয়ের বাপ তা ফেরৎ দিতে বাধ্য। কিন্তু চট্ করে অতগুলি পাঁঠা ফেরৎ দেওয়াও তো সহজ নয়! মেয়ের বাপ গাঁই-গুঁই করে, সময় চায়, রিজেক্টেড পাত্রকে বাবা-বাছা করে! কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—দাও আমার পাঁঠা ফেরৎ, নয়তো পাঠাও মেয়েকে আমার ঘর-সংসার করতে। এর মধ্যে কোন 'শান্তিপূর্ণ আপোস-আলোচনা' নাই। এখানে কারও 'ভেটো' চলবে না।

তাই বিচার-সভা বসেছে। এসেছে মেয়ের বাপ-মা, পাত্রের বাপ-মা, মেয়ে, মেয়ের পছন্দকরা স্বামী। গাঁয়ের মোড়লরা বসেছেন বিচার করতে। ব্যাপার যা বোঝা যাচ্ছে, মেয়ে তার পছন্দকরা স্বামী ছাড়বে না, বাপেরও একজোড়া পাঁঠা-পাঁঠী কিনে বংশবৃদ্ধি করিয়ে গোটা পঞ্চাশ-ষাট পাঁঠা 'রেইজ' করিয়ে দায়মুক্ত হওয়া লং-টার্মের ব্যাপার। অতদিন অপেক্ষা করবার সময় অভিযোগকারীর নেই—আর সেও তো বিয়ে করবে, তখন তাকে মেয়ের বাপকে পাঁঠা নজর দিতে হবে—তখন সে পাঁঠা পাবে কোথায়! এতকাল পাঁঠা জুগিয়ে সে যে নিজেই এখন পাঁঠা বনে গেছে।

অতএব ধর মেয়ের পছন্দকরা স্বামীকে। গাঁয়ের মোড়লরা তখন তাকে বললেন, 'দেখ বাপু, মেয়ে নেবে অথচ মেয়ের মূল্য দেবে না—তা তো হবে না। শ্বশুরের দেনা শোধ কর।'

নতুন স্বামী যদি চালাক হয় সে স্রেফ্ বলে দেবে—'মেয়ে তো শ্বশুরের ঘর থেকে আমি আনিনি, মেয়ে নিজে আমার ঘরে এসেছে—আমি গোঠে-মাঠে খাই, বৌ পেলে ঘরে সাদরে দি ঠাঁই, শ্বশুরের পাঁঠার আমি কি জানি!' —এই বলে সে কেত্তন গেয়ে দিতে পারে। কোন কোন চালাক পাত্র বৌয়ের উস্কানিতে তা করেও, কিন্তু বেশির ভাগই তা করে না। অবশ্য দর কষাকষি হয়, ষাটটার জায়গায় পঞ্চাশটায় হয়তো রফা হয়, কিন্তু দেয়। না দিলে শ্বশুরকেই যেমন করে হোক দেনা শোধ করতে হয়। 'একটা খড়ের গুচ্ছিতে ভক্ষিত পাঁঠার হিসাব থাকে। —সেই খড় গুনে গুনে মেয়ের বাপকে পাঁঠা ফেরৎ দিতে হয়।

বস্তুত নাইজেরিয়ার সত্যিকার আদিবাসী 'পাগান্'দের এই হচ্ছে বিবাহপ্রথা। মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাপ হয় আগে থেকেই এ্যাডভান্স পাঁঠা পেয়ে আসে, অথবা বিয়ের সময় পাত্রকে কন্যাপণ হিসাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঁঠা 'ক্যাশ ডাউন' করতে হয়। বিয়ের উৎসবের অন্যান্য খাদ্যপানীয়ের খরচ অবশ্য দুপক্ষই চালায়।

নাইজেরিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে তিনটে প্রধান শাখা—হ্যাসা, ফুলানী এবং পাগান্। হ্যাসারা ধর্মে মুসলমান, পোষাকে আচারে ব্যবহারে খৃষ্টান এবং গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির দিক দিয়ে আফ্রিকান। ফুলানীরাও অনেকটা এদেরই মত। একমাত্র পাগান্রাই 'সভ্য' হতে চায়নি—তারা নাইজেরিয়ার পার্বত্য এলাকায় নিজেদের গোষ্ঠীগত সমস্ত বিশেষত্ব নিয়ে পাগান্ হয়েই রইল। পাহাড়ের ওপরেই তারা থাকতে ভালোবাসে—কারণ Hills to the Pagan, meant safety; plains meant risk. কিসের রিস্ক স্পষ্ট করে না বললেও, নীচের প্রচুর উর্বর জমিতে নিশ্চিত ফসলের প্রতিশ্রুতি থাকলেও, পাগানরা কিছুতেই নীচের অনধিকৃত জমিতে চাষ করতে আসবে না। পাহাড়ের রুক্ষ্ম শক্ত পাথুরে মাটির প্রেমেই তারা মত্ত। এর কারণ তাদের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। সমতলে তাদের চেয়ে শক্তিমান কোন গোষ্ঠী যতটা সহজে তাদের কাবু করতে পারবে, পাহাড়ের ওপরে উঠে ততখানি সহজে পারবে না—ওপর থেকে নীচের শত্রুকে ঘায়েল করা ত পাগানদের পক্ষে সোজা। সেজন্যেই পাহাড়ের পাথুরে জমিতে তাদের বসতি, ঝড়ে কিম্বা পাহাড়ী ছাগলে পাথর সরিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর যে খালি জায়গাটুকু পাওয়া গেল সেখানেই তারা কাদামাটির দেওয়াল তুলে ওপরে ছনের ছাউনি দিয়ে গোল গোল কুঁড়েঘর বানিয়ে নেয় নুবা উপজাতিদের মত। পাহাড়ের নীচ থেকে আপনি যদি ওপরে তাকান, দেখবেন মুখ-বের-করা পাখীর বাসার মত উপরে নীচে পাশে সারি-সারি কুঁড়েঘর। প্রচুর পাথরের টুকরো এপাশে-ওপাশে জড়ো করে রাখা। এখন অবশ্য দিনে দিনে উপজাতি উপজাতিতে মারামারি কমে এসেছে কিন্তু পাগান্দের চিরাচরিত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এখনও কমেনি।

পাহাড়ের নীচে ঘন সবুজ কলাগাছের অরণ্য। সেখানে অতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রাগৈতিহাসিক একটি গর্তের মধ্যে জমানো বৃষ্টির জল—সেটাই পাগান্দের সারা বছরের জলাধার। সেখানে দাঁড়ালে দেখবেন সিল্কের মত নরম সবুজ কলাপাতার নীচ দিয়ে বেঁকে গেছে একটি পায়ে-চলা রাস্তা, পাশে একটি ছোট আঙিনা, সেখানে উৎসবের দিন হয় নাচের আসর। তার বাঁ দিকে একটা পাথরের বড় চাত্তর, সেখানে ছাগল বলি দেওয়া হয় পরবের দিন। সেখান থেকে এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে পাগান্দের বসতির দিকে যাওয়ার রাস্তা। কোন রকমে পায়ের পাতা দুমড়ে-মুচড়ে যদি ওপরে উঠে আসেন শুনবেন নিস্তব্ধ পাহাড়ের ঘুমপাড়ানী গান এদিকে-সেদিকে গাইছে গুটি কয়েক পার্বত্য পাখী, গোলপাতার কুঁড়েগুলি দুপুরের রোদের মদ পান করে বেহুঁশের মত ঝিমোচ্ছে। সুস্থ সবল কর্মক্ষম পুরুষ-মেয়েরা গেছে মাঠে, কেবল বৃদ্ধারা আদিম কালের দিদিমা-ঠাকুমাদের মত ছোট ছোট নাতি-নাতনি কোলে, মুখে তামাকের লম্বা পাইপ গুঁজে নিয়ে আধ-ঘুমো চোখে নিজেদের অতীত যৌবনের মধুময় বলয় পরিক্রমা করছে প্রগাঢ় শান্তিতে। এই মোহময় নিস্তব্ধতা ভাঙতে আপনার মত নির্বিকার নৃতত্ত্ববিদের মনেও সাময়িক দ্বিধা আসবে।

তাই হাঁক-ডাক করবেন না। পাহাড়ের এক প্রান্তে চলে আসুন—পাগান্দের এই পাহাড়ী গ্রামের এলাকার বাইরে। শেষরাত্রির অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে আসবে—তখন দেখবেন গাঁও-বুড়া নিজের কুঁড়েঘর থেকে গোল-চত্বরে এসেছে, তখনও বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, পাহাড়ের নীচে ঘন নীল অরণ্যে পাতলা মেঘের চাদর জড়ানো। কুঁড়েঘরগুলির সামনে রাত্রির জ্বালানো আগুন ছাইচাপা পড়ে তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে, ঠাণ্ডা হাত-পা সেই নরম আগুনে একটু সেঁকে নিয়ে পাগান্ গাঁও-বুড়া শুকনো ঘাসের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে তার বৃদ্ধা স্ত্রীর কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রতিটি পাগান্ গোষ্ঠীতে একজন সর্বজন-মান্য গাঁও-বুড়া, একজন সর্দার এবং বাড়ির বড়কর্তা থাকে—মেয়েদের মহলেও তেমনি সব চেয়ে বড় গাঁও-বুড়ার স্ত্রী, তারপর সর্দারের স্ত্রী, তারপর পরিবারের গৃহকর্ত্রী। নারী-পুরুষ দুয়েরই মর্যাদা সমান সমান। গোষ্ঠীর বসতির সামনের চত্বরে দিনান্তে কাঠের টুকরো

দিয়ে রাত্রির আগুন জ্বালানোর দায়িত্ব গাঁও-বুড়োর স্ত্রীর। স্বামীর শয্যাত্যাগের সংগে সংগে সেও উঠে আসবে সামনের চত্বরে। সস্ত্রীক গাঁও-বুড়ো এসে ঘাসের মশাল জ্বালানোর পর—নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন এই মশাল জ্বালানো পাগান্‌দের প্রভাত ঘোষণার প্রতীক—একে একে সবাই এসে জোটে সর্বজনীন চত্বরে। সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে এই ভাবে—

—'রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

—'নিশ্চয়! তোমার?'

'—'হ্যাঁ, আমারও!'

লম্বা পাইপে দেশজ কুড়া তামাক ঠাসতে ঠাসতে এই তাদের প্রত্যেক দিনের প্রাথমিক কথোপকথন। তারপর সমর্থ মেয়ে-পুরুষরা কাজের জন্য তৈরী হয়, গাঁও-বুড়োর নির্দেশে সবাই নিজের নিজের লাঙ্গল নিয়ে মাঠের দিকে রওনা দেয়ার ব্যবস্থা করে। তখনও নীচের পাহাড়ে অন্ধকারের শেষ অস্তিত্ব মিলিয়ে যায়নি. 'সারা' পার্বত্য এলাকাগুলি তখন সবে মাত্র প্রভাতের সূর্যালোকে স্নানের উদ্‌-যোগ করছে। লাল বেনারসী পরা নব-বধূর মত তার চূড়াগুলি আস্তে আস্তে রক্তিম হয়ে উঠছে।

মাঠে যাবার সময় হল। সকালের প্রাতরাশের নাম 'কুনু'—গরম জলে সিদ্ধ কাঁচা ময়দার সংগে এক রকম গাছের ছালের রস অথবা কলা মেশানো। এই প্রাতরাশ গ্রহণেরও একটা প্রথা আছে। গাঁও-বুড়োর স্ত্রী আগে দাঁড়াবে তার নিজের হাতে তৈরী 'কুনু' নিয়ে। তারপর সারি দিয়ে সর্দারের স্ত্রী এবং অন্যান্য কুলবধূরা। গাঁও-বুড়ো সব আগে নিজের স্ত্রীর হাত থেকে 'কুনু' খেয়ে পরপর সমস্ত গৃহবধূর পাত্র থেকে একটু করে কুনু চেখে দেখে। কুনু খাওয়া হলে গাঁও-বুড়ো উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবে—'যে খেতে আমি ফসল বুনেছি, সেখানে আমি খাটতে চললাম, তোমরা সবাই আমার পিছনে পিছনে এস।' এই বলে সে নিজের কুটিরে ঢুকবে তার লাঙল নেবার জন্যে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই লাঙল পাগান্‌দের কাছে অতি মূল্যবান জিনিস। আগে ছাগলের বদলে লাঙলের সংখ্যা দিয়ে বৌয়ের পণ ঠিক হত, আন্ত গোষ্ঠী বাণিজ্যের বিনিময় মূল্যও নির্ধারিত হত লাঙলের সাহায্যে। এই লাঙল দেখতে দুমুখো খুরপীর মত, অবশ্য আকারে বেলচার সমান। মাটি কোপানো বা গোঁড়ার কোন ব্যাপার এই লাঙল দিয়ে করা যাবে না, মাটি ওলট-পালট করাই এদের কাজ। এই লাঙল-গুলিতে লোহার ব্যবহার নেই বল্লেই চলে কারণ এদের গোষ্ঠীতে লোহা অত সহজে পাওয়া যায় না, কামারের কাজও এরা জানে না। কাঠ জোড়া দেবার জন্যে কাঁটা বা গোঁজ হিসাবেই লোহার ব্যবহার, তা তারা পাহাড়ের নীচের সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক হাটে গিয়ে হুসা বা ফুলানী গোষ্ঠীর মিস্ত্রিদের কাছ থেকে কিনে আনে। কাঠের তৈরী হলেও এই লাঙলগুলি খুব ভারি, দুহাতে তুলে মাটিতে গেঁথে মোচড় দিয়ে এরা জমি তৈরী করে—তাতে রীতিমত শক্তির প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, তাদের জমি নরম নয়, শক্ত পাথুরে জমিতে তারা চাষ করে—সেই মাটির উপযোগী করেই এই লাঙলগুলি তৈরী। পুরুষরা যে ভারী লাঙল ব্যবহার করে, কোন কোন পাগান্‌ গোষ্ঠীর মেয়েরাও সেই একই লাঙল অবলীলাক্রমে চাষের মাঠে ব্যবহার করতে পারে— কোন কোন গোষ্ঠীর মেয়েরা তার চেয়ে একটু হাল্‌কা আগাগোড়া কাঠের তৈরী লাঙল ব্যবহার করে—কোথাও তার একটুও লোহা নেই। সেই লাঙলগুলির নাম 'কেনুতি'। লোহ-যুক্ত লাঙল সেই মেয়েদের ব্যবহার করা নিষেধ, ব্যবহার করলে মাঠে সেবার কিছুতেই ফসল ফলবে না,—পাগান্‌দের এরকম বিশ্বাস।
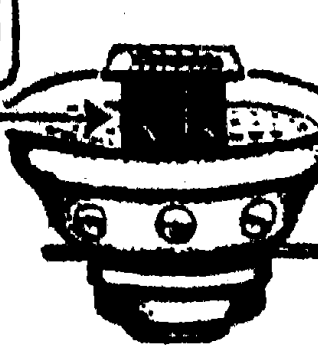
কোমরে তীরধনুক এবং কাঁধে লাঙল নিয়ে গাঁও-বুড়োর পিছন পিছন সবাই মাঠে আসে। বৃদ্ধারা বাচ্ছা আগ-লায়, খাবার তৈরী করে, কাঠকুটো সংগ্রহ করে রাত্রির ধুনি জ্বালাবার জন্যে। গাঁও-বুড়োর একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের নিজের নিজের আলাদা জমি থাকবে, নিজের জমিতে তারা নিজেরাই কাজ করবে— কেবল প্রধানা স্ত্রী স্বামীর জমির ফসলের হকদার, তাকে মাঠ চষতে হবে না। মাঠ চাষ, বীজ বোনা, ফসল কাটা—সমস্ত কৃষিকাজ শুরু হয় কোন-না-কোন অনুষ্ঠান দিয়ে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে যেমন তেমনি পাগান্‌দের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। চাষের আগে একজন গিয়ে মাঠ 'পবিত্র' করে দিয়ে আসে, প্রথাটি খুব শ্লীল নয়, সেজন্য তার বিস্তৃত বিবরণ ছাপার অক্ষরে দেওয়া যাবে না। পবিত্র করার কাজটি সচরাচর একজন স্বাস্থ্যবান অবিবাহিত যুবক করে থাকে। তার পবিত্রকরণ শেষ হলে, গাঁয়ের অন্য সবাই গিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করে। এর অঙ্গ নাচ গান এবং কলা পচিয়ে তৈরী মদ্যপান তো আছেই। অনুষ্ঠানে পাঁঠাবাজটা দিতেই হবে। মাংসের মধ্যে পার্বত্য ছাগলের মাংস এদের সবচেয়ে প্রিয়।

এদের চাষের ক্ষেতগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট—সেজন্য চাষের কাজে কোন জন্তুর ব্যবহার এরা করে না। দুটো ফসল একসংগে রোপণ বা চাষ এরা করে না— গম এবং আরেকটা ফসল, ধরা যাক ভুট্টা, এরা একসংগে মিশিয়ে খায় না। গম খাবে তো শুধু গম, ভুট্টা খাবে তো শুধু ভুট্টা—দুটো মিশিয়ে খাওয়া এদের

ট্যাবু। একটা ফসল চাষ হয়ে গেলে, ফসল কেটে ঘরে তুলে আনা হলে তবে অন্য ফসল বুনতে পাবে, তার আগে নয়। এক ফসলের পর আরেক ফসল বোনার মঝখানের দিনটা তারা উপবাস পালন করে।

ফসল চাষ গোষ্ঠীগত ব্যাপার হলেও ফসল কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তবে দুর্ভিক্ষের সময় সকলের ফসল একত্র করে সবার মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হয়। গাঁও-বুড়ো তার গোলা থেকে অবশ্য স্ত্রীদের ইচ্ছা করলে ফসল দান করতে পারে, স্ত্রীরাও নিজেদের সঞ্চয় ভেঙে স্বামীকে ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারে। পরিবারের কর্তা এবং গিন্নিরও আলাদা আলাদা ফসলের গোলা আছে. নিজের গোলা থেকে নিজের খাদ্যের ব্যবস্থাই সাধারণ নিয়ম, তবে সেখানেও স্ত্রীরা ইচ্ছা করলে স্বামীকে নিজের ভাগের ফসল ভালোবেসে রেঁধে খাওয়াতে পারে, স্বামীরাও পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের ফসল দান করতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকারের এমন উদাহরণ অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে দুর্লভ।

শুকনো ঘাসের মশাল জ্বালছে গাঁওবুড়োর স্ত্রী। মুখে লম্বা পাইপ।

স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে খাওয়ার নিয়মও পাগানুদের মধ্যে নেই। স্বামী নিজের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য ছেলের হাতে দিয়ে বলে কোন ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে, পাছে তার বৌ খেয়ে ফেলে এবং স্বামীর পরদিন হরিমটর গুনতে হয়! স্বামী তার খাওয়া হয়ে গেলে দেওয়ালে বা পাথরে হাত ঘষে নিয়ে পুরুষদের তামাকের আসরে জোটে। মেয়েরা একত্র খায় গাঁও-বুড়োর বৌয়ের সঙ্গে। নিজের নিজের খাদ্য তারা হাতে করে বয়ে নিয়ে যায়। নতুন বৌ এলে তাকে গাঁও-বুড়োর বৌ বলে দেয়—'তোমার নিজের খাদ্য আমার কাছে নিয়ে এসে খাবে। আমরা আজ থেকে বন্ধু। যেদিন তোমার খাবার থাকবে না সেদিন আমি তোমাকে খেতে দেব, আর যেদিন আমার ভাঁড়ে মা ভবানী সেদিন তুমি আমার খাবার নিয়ে আসবে।' এই ভাবে প্রথম থেকেই পাগানু মেয়েরা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে মহিলা-মহলে যোগ দেয়। তবে নিজের নাবালক ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মায়েরা একত্র খেতে পারে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে নৈব নৈব চ।

ছেলেমেয়ের ব্যাপারে পাগানু পিতা-মাতা দারুণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ছেলেমেয়ের নামকরণ তাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা। কারণ নামের সঙ্গে ছেলেমেয়ের আত্মার সম্পর্ক। সেজন্য পাগানুদের প্রত্যেকের দুটি নাম—একটি কেবল তার মা এবং সে নিজে জানে এবং সারাজীবন গোপন থাকে, অন্যটি পোষাকী নাম বাইরের লোক এবং তার বাবা ব্যবহার করে। এই পোষাকী নামটা সচরাচর বর্ণনাত্মক. যেখানে তার জন্ম সেই জন্ম-স্থানের নাম, যে ঋতুতে তার জন্ম সেই ঋতু অনুযায়ী নাম, জন্মের সময় মার অসুখ হয়ে থাকলে সেই অসুখের নাম—যে-কোন নাম তার হতে পারে। 'পাহাড়ের পাশে ঝরণা', 'বেজায় বর্ষা', 'কালাজ্বর', 'ঘরের চালে আগুন', 'পেটে ঘা'—ইত্যাদি নাম পাগানু বাচ্চাদের মধ্যে দুর্লভ নয়। অনেকগুলি বাচ্চা মারা যাওয়ার পর বাচ্চা হলে মায়েরা নাম দেয় 'ভাঙা কলসী', 'দাস', 'ঝাঁটা' ইত্যাদি—যাতে শয়তান বুঝতে পারে সে

পিতামাতার অনভিপ্রেত। শয়তান তখন তাকে ছেড়ে যায়, এবং সে তারপর যশোদার ঘরে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে। ছেলে মরে যাওয়া মানেই পাগানদের বিশ্বাস ভূতের কৃপা। শয়তান তাড়াবার জন্যে তখন তারা এই ফন্দী নেয়।

পাগান গোষ্ঠীতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কদর বেশি। সম্পত্তির ব্যাপারে ছেলেদের সমানই মেয়েদের অধিকার। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের গুমোর আরও বেশি। ছাগল দিয়ে সাধলে তবে রাধা সেখানে রা কাড়বে তার আগে নয়। মেয়ের স্বাস্থ্য কর্মক্ষমতা এবং সৌন্দর্য অনুযায়ী ছাগলের সংখ্যাও বাড়ে কমে। বাল্যকালেই পাত্রপক্ষ পাত্রী ঠিক করে এবং ছাগল ভেট দেয়। এই ছাগল দিতে দিতে পাত্র যে নিজেই কোন কোন সময় পাঁঠা বনে যায় সে গল্প তো আগেই বলেছি।

বিয়ের আগে মেয়েদের মাথায় চুল থাকতে পারে কিন্তু বিবাহিতা নারীকে বিয়ের পর মাথা ন্যাড়া করতেই হবে—হিন্দু সধবা মেয়েদের মাথায় সিঁদুর দেওয়ার মত! মুখে আঁচড় কেটে সৌন্দর্য-চর্চা ত পাগান মেয়েদের মধ্যে বহুপ্রচলিত ফ্যাসান। গাছের কাঁটা দিয়ে মুখের চামড়ার জায়গায় জায়গায় তারা ক্ষত সৃষ্টি করে। সেই ক্ষত শুকিয়ে গেলে যে দাগ হয় সেটাই তাদের মেক-আপ। অবশ্য পৃথিবীর সব দেশের মত যুবতীদের মধ্যেই এই রূপচর্চা নিবদ্ধ—মায়েদের এসবের প্রয়োজন বহু আগেই ফুরিয়েছে।
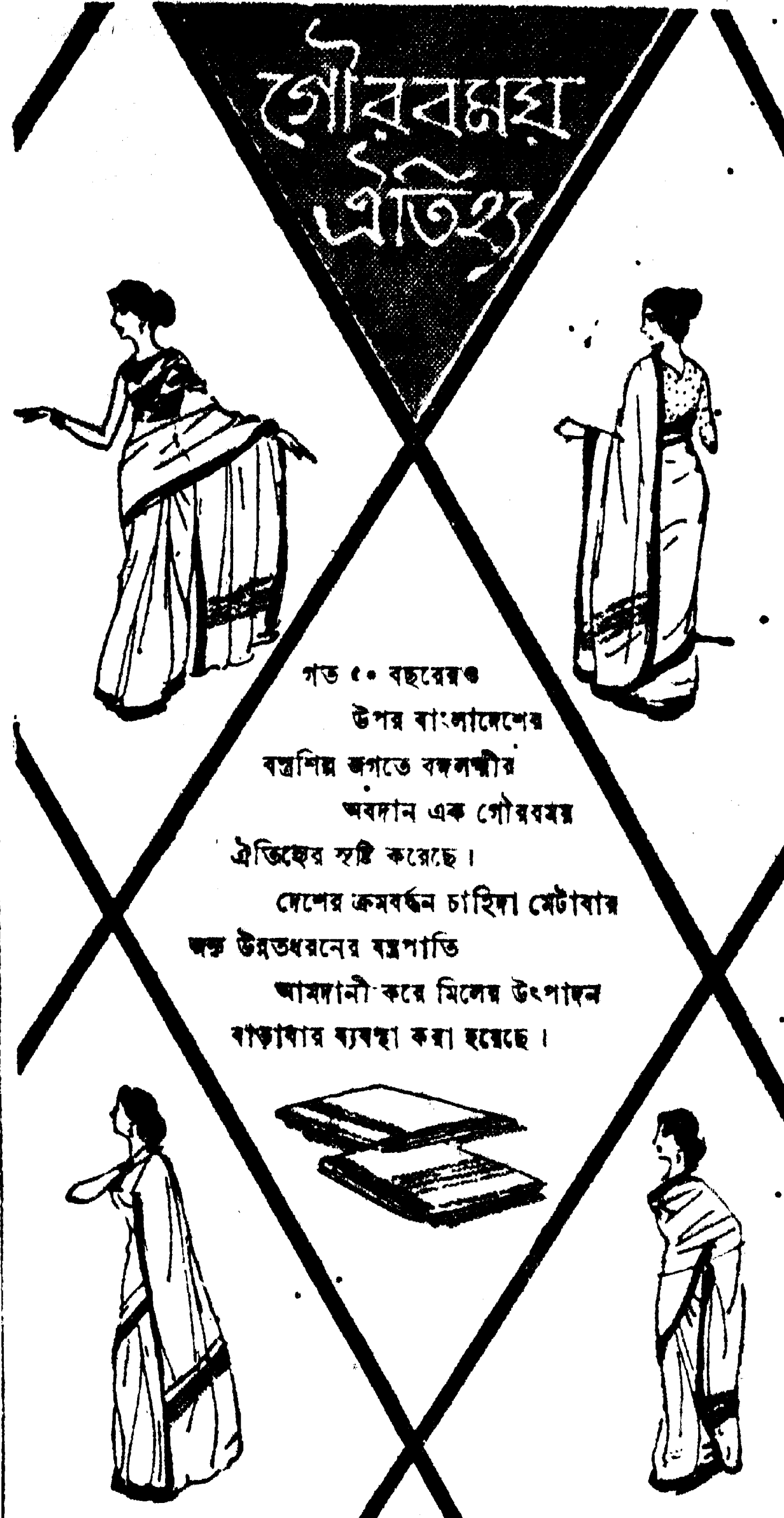
পাগান পুরুষেরা সম্পূর্ণ নগ্ন। কোমরে একফালি কাপড় বা গাছের ছাল কেউ কেউ ব্যবহার করে। মেয়েদেরকেও তারা এর চেয়ে বেশি পোষাক ব্যবহার করতে দেয় না—খুব জোর পিঠের সঙ্গে এক ফালি ন্যাকড়া তারা বাঁধতে পারে। গাছের পাতার ঘাগরা নিষিদ্ধ নয়, তবে সব গাছ চলবে না। পাংকুসিন পাগান মেয়েরা পাতা-সমেত আস্ত গাছের ডাল একটি সামনে এবং একটি পিছনে কোমরের সঙ্গে ঝুলিয়ে নেয়। সেখানেও আবার গাছ বাছাবাছির ব্যাপার আছে। গমের পাতা, যবের পাতা কোমরে ঝুলানো চলবে না।

প্রতি সন্ধ্যায় যে নাচের আসর হয় যুবক-যুবতীর সেটাই প্রেম-নিবেদনের সবচেয়ে প্রশস্ত এবং আইনসম্মত ক্ষেত্র। বাগদত্তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে নেবার সেই সবচেয়ে বড় সুযোগ। নাচের আনুষঙ্গিক পানীয় হিসাবে চলে ঘরের বীয়ার। কিন্তু ছেলে দুলে যতই প্রেমিক পুরুষ তার হৃদয় নিবেদন করুক না কেন—মেয়ে এবং মেয়ের বাপ মনে মনে পাঁঠার হিসাবটা ঠিকই রাখে। বুকের পাটা চিতিয়ে আর ঈগলের মত দুই বাহু বিস্তৃত করে যতই সে প্রেমিক-পায়রার মত মাথা নীচু করে এগিয়ে আসুক না কেন তার প্রিয়তমার দিকে, প্রেয়সী তার বুকের পাটার চেয়ে প্রতিশ্রুত পাঁঠার দিকেই নজর রাখে বেশি।

।। এই বর্ণভেদ কেন ? ।।

(প্রশ্ন)

সম্পাদক মহাশয়,

আমি গত বছর জুলাই মাসে কলিকাতা থেকে নবদ্বীপ বেড়াতে গিয়েছিলাম। নবদ্বীপের দর্শনীয় স্থান হ'ল অনেকগুলি ছোট ও বড় মন্দির। তাহার মধ্যে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির প্রসিদ্ধ। আমি, আমার ভাই ও এক বন্ধু সকালের কাজ সেরে মন্দির-দর্শনের জন্য রিক্‌শা করে বের হ'লাম। মন্দির দেখা আরম্ভ করলাম সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির দিয়ে। সেখানকার ব্যবস্থাপক শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের আগে প্রত্যেকজনের কাছ থেকে পাঁচ আনা করে ভেট চাইতে লাগলেন। যতক্ষণ না তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে ভেট পাবেন ততক্ষণ আমাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তবে, হোটেল মালিকের কাছ থেকে আমাদের এই খবর জানা ছিল যে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে এই রকম ভেট ব্যবস্থাপক বা অন্য কারও প্রাপ্য নয়। সেজন্য তিনি আমাদের তিন ব্রাহ্মণের নাম খাতায় লেখবার পরও যখন আমাদের কাছ থেকে ভেট পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন তখন আমাদের সেখানকার প্রচলিত তথাকথিত নিয়ম বাধ্য হয়ে জানাতে হ'ল। তিনি শেষে নিরুপায় হলেন।

এরপর ২।৩টি মন্দির দেখার পর আর এক মন্দিরে পূজারী-ঠাকুর আমাদের ছেড়ে রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া বাধালেন। মন্দির থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রথমে এই কোলাহলের কারণ বুঝতে পারিনি, পরে বুঝলাম যে রিক্‌শাওয়ালা ব্রাহ্মণ যাত্রী নিয়ে এসেছে বলে পূজারী তাকে দোষারোপ করছেন। দুইপক্ষের গলার আওয়াজ চড়ানোর জন্য আমাদের চারদিকে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল।

হোটেলে পৌঁছোবার কিছুক্ষণ আগে রিক্‌শাওয়ালাকে প্রশ্ন করে জানলাম যে সে এককালে যাত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করে রিক্‌শায় বসতে দিত। তখন, অবশ্য, সে পূজারীর পাওয়া ভেটের ভিতর থেকে শতকরা হিসেবে যাত্রী নিয়ে যাবার দরুণ কমিশন পেত। এখন সে আর পায় না এবং পূজারীরা তাদের কিছুভাগ না দিয়ে পুরোটাই আত্মসাৎ করছেন। বাধ্য হয়ে রিক্‌শাওয়ালারাও যাত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করে না ও ব্রাহ্মণ বলে অবজ্ঞা করে না।

এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে নাগপুর শহরের তিরিশ মাইল উত্তর-পূর্বে রামটেক নামক টাউনের মধ্যে রামটেক মন্দির দর্শন করতে গেলে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি মাথা-পিছু দশ নয়া পয়সা ভেট নেয় কিন্তু বর্ণভেদ করে না।

অমৃতের পাঠকদের মধ্যে কেউ কি জানাতে পারেন যে নবদ্বীপের মন্দির দর্শনাভিলাষীদের মধ্যে এই বর্ণভেদ কেন করা হয় ও এই নিয়ম কোনকাল থেকে চলে আসছে? এর অস্তিত্বের কারণই বা কি?

—শঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়,

এমপ্রেস মিল্‌স নং ১ রোড, নাগপুর—২।
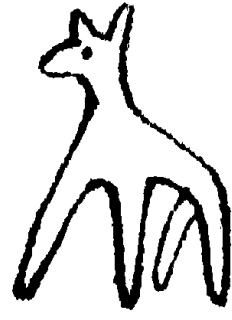
জানাতে পারেন

(উত্তর)

।। কিরিচ ও বল্লম ।।

বিগত ২৭শে জুলাই তারিখের অমৃত পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় কিরিচ ও বল্লমের প্রভেদ জানিতে চাহিয়াছেন। চলন্তিকা অভিধানে দেখিতেছি, কিরিচ পর্তুগীজ "Cris" শব্দ হইতে আসিয়াছে। অর্থ—বক্র তরবারি বা ছোরা বিশেষ। বল্লম এক ফলাযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র। বল্লম শব্দে শূল, ভল্ল, বর্শা ইত্যাদিকে বুঝায়।

।। দীঘি-পুষ্করিণী ।।

৮ই জুন তারিখের অমৃতে দত্ত মহাশয় (৫ম প্রশ্নে) জানিতে চাহিয়াছেন হিন্দুর খনিত দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয় কেন। ইহার সঠিক কারণ জানি না। তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে গাছপালা থাকিলে সকালের ও বিকালের দিকে সূর্যের কিরণ সরাসরি জলে পড়িয়া জল উত্তপ্ত হয় না। এজন্যই সম্ভবতঃ দীঘি-পুষ্করিণী উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়।

পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দীঘি-পুষ্করিণী ত্রিপুরা জেলায় (অধুনা পূর্ব-পাকিস্তান) দেখিয়াছি। সেগুলিকে "মগের পুকুর বা দীঘি" বা মগুয়া পুকুর ইত্যাদি বলা হয়। কোন মুসলমানের খনিত দীঘি সুদূরে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দেখি নাই। আরাকানের বৌদ্ধগণকে সাধারণতঃ মগ বলা হয়। দত্ত মহাশয় একটু খোঁজখবর লইয়া হয়ত জানিতে পারেন যে তাঁহার দৃষ্ট দীঘি পুকুরগুলি আদিতে মগ বা আরাকানী বৌদ্ধদের দ্বারা খনিত কিনা।

।। কুলুপ বা তালা ।।

ঐ তারিখেরই ৬ষ্ঠ প্রশ্ন—কুলুপ ও তালার প্রভেদ কি? চলন্তিকা অভিধান মতে কুলুপ আরবী শব্দ কুফ্‌ল্‌ হইতে আসিয়াছে। কুলুপ অর্থে তালা (Padlock) বুঝায়। সুতরাং কুলুপ ও তালায় কোন প্রভেদ নাই।

।। নবদ্বীপ প্রসঙ্গ ।।

বিগত ২০শে জুলাই তারিখের পত্রিকায় শ্রীবৈদ্যনাথ হেম মহাশয় নবদ্বীপ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছেন। সাধ্যমত তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম।

(১) নবদ্বীপ পুরাকালে প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট ৯টি চর বা ছোট দ্বীপের সমষ্টিও হইতে পারে, আবার নূতন দ্বীপ বলিয়াও ঐ নামে অভিহিত হইতে পারে। এগুলি সবই গঙ্গা নদীর চর বা গঙ্গার পতিত কোন ছোট স্রোতস্বতী বা শাখা-নদী বা খাল দ্বারা কর্তিত ভূমিখণ্ডের সমষ্টি মাত্র হওয়া সম্ভব। নবদ্বীপে সমুদ্রের অবস্থিতির কল্পনা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অন্ততঃ ঐতিহাসিক যুগে তাহা ছিল না। কারণ, তাহা হইলে গঙ্গার সাগরে পতন, এবং তাহা হইতে গঙ্গা-সাগর সঙ্গম তীর্থের উদ্ভবও মিথ্যা হইয়া যায়। আদিগঙ্গার তীরস্থ পীঠ-স্থান কালীঘাটও আধুনিক যুগের তীর্থে পরিণত হয়। বৈদিক যুগে বড় জলস্রোতকেও সমুদ্র বলা হইত, এবং তাহা হইতেও সমুদ্রগড় নামের উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। যতদূর জানা যায়, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ই নবদ্বীপ বা নদীয়া প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এখানেই বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণে বাংলার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। গঙ্গাতীর-বর্তী সুন্দর স্থান বলিয়াই সম্ভবতঃ

বৃদ্ধ বয়সে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ধর্মকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে এখানে বাস করিতেন এবং তখনই নবদ্বীপ গৌড়-বাংলার দ্বিতীয় রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। আদি নবদ্বীপ বা নদীয়া নগরের শ্রীবৃদ্ধির মূলে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

(২) নবদ্বীপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ও আদি লীলাস্থল। সুতরাং ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, শৈব বা শাক্ত ধর্মের সঙ্গে মূলতঃ তাহার কোন বিরোধ ছিল না, এখনও নাই। মহাপ্রভু নিজে অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার দাক্ষিণাপথ বা উত্তরখণ্ডে তীর্থ-ভ্রমণকালে রাস্তায় যেখানে যে দেব বা দেবীমন্দির দেখিতেন, নিঃসঙ্কোচে তথায় পূজারতি সমাধা করিতেন বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত উভয় গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণকালে এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন-কালেও কাশীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তথায় মণিকর্ণিকা ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা মন্দিরে পূজারতি করিতেন বলিয়া জানা যায়। নীলাচলে দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ও প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তথায় নবরাত্রি উৎসব-পালন ও বিমলাদেবীর মন্দিরে পূজারতি করিতেন। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ বলিয়া কীর্তিত শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুও তান্ত্রিক অবধূত ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের সঙ্গী নীলকণ্ঠ শিব ও তারা-যন্ত্র অদ্যাপি তদীয় বংশধরগণ কর্তৃক খড়দহে পূজিত হইতেছেন। মহাপ্রভুর অন্যতম অতিপ্রধান পরিষদ্ অদ্বৈত প্রভুও (অদ্বৈতাচার্য) আগমশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় ত বটেই, তাহার পূর্ব হইতেই নবদ্বীপ শিব-শক্তি আরাধনার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। মহাপ্রভুর নীলা-চলে প্রস্থানের কিছুকাল পরেই নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের আবির্ভাব ঘটে। এই দুই ধর্মই নবদ্বীপে নির্বিরোধে এবং প্রায় অভিন্নভাবেই পাশাপাশি চলিতেছিল। এবং আজ পর্যন্তও সেই ভাবই বর্তমান আছে বলিয়া জানি। এমন কি, স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নির্মিত যে নিম্ব কাষ্ঠের বিশ্বম্ভর মূর্তি আদিকাল হইতে নবদ্বীপে পূজিত হইয়া আসিতেছে, তাহারও পূজারীরা পূর্বাপর শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত (তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুজ বংশজাত)।

মহাপ্রভু ও তদীয় পরিষদ্‌বর্গ সকলেই সত্যকার জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব ধর্মে ও শাক্ত ধর্মে কোন প্রভেদ দেখিতেন না। বস্তুতঃ সকল দেব-দেবীকেই সেই এক ও অদ্বিতীয় পুরুষেরই নানাভাবের ও নানারূপের বিকাশ হিসাবে মান্য করিতেন। মন যেখানে উদার, সেখানে কখনও বিরোধ দেখা দেয় না। বলা বাহুল্য, মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু উভয়েই আচার্য শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, এবং উভয়েই চরম অদ্বৈতবাদী হইয়াও প্রেম ও ভক্তিমার্গকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইদানীংকালেও আর এক মহাপুরুষ (শ্রীরামকৃষ্ণ) অদ্বৈতবাদী হইয়াও প্রেম ও ভক্তিমার্গকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্মোৎসবেই সানন্দে যোগদান করিতেন। একের মধ্যে বহুকে এবং বহুর মধ্যে একককে দর্শন করাই প্রকৃত জ্ঞানীর ধর্ম। নবদ্বীপে হরিহরকে অভেদ জ্ঞানেই মান্য করা হয়।

(৩) রাস-পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে রাধাকৃষ্ণের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শাক্ত দেবদেবীর জাঁকজমক সহকারে পূজারতির তাৎপর্যও এইখানেই। অচ্যুত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাস শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অচ্যুতের সঙ্গে মূলতঃ অভেদ সমগ্র দেবতাকুলেরই রাস বিলাস।

—অমরকুমার চক্রবর্তী,
১৬, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯।

॥ এ রকম হয় কেন ? ॥

(প্রশ্ন)

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমি বিশেষ উৎসাহ নিয়ে পড়ি। এক কথায় আমার ভাল লাগে এই বিভাগটি। আজ কয়েকদিন ধরেই একটা বিষয়ের কারণ ঠিক মতো জানতে পারছি না। যেটুকু জেনেছি তা আমার মনে ধরছে না। তাই আমার সত্যিকার কারণ জানতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে বিকট চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেদিন। প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম, আওয়াজটা সত্যিকার কোথা থেকে আসছে জানতে না পেরে। পরে আমার ঘুমের ঘোর কাটলে বুঝতে পারলাম আমার পাশেই দাদা ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছেন। আমি বার দুই-তিন ডাকার পরও দাদার কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। একইভাবে গোঙাচ্ছেন। দাদা যখন মুখ দিয়ে বিকট আওয়াজ বার করছিলেন তখন লক্ষ্য করলাম তিনি চিৎ হয়ে, বুকের ওপর হাত দিয়ে শুয়ে আছেন আর নিশ্বাস ফেলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাদার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম। দাদা সাড়া দিলেন এবং পাশ-ফিরে শুলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছিল। দাদা বললেন, "কৈ, কিছু না তো"।

আমি এর আগেও শুনেছি চিৎ হয়ে বুকের ওপর হাত রেখে ঘুমুলে নাকি এরকম হয়। কিন্তু এর সঠিক কারণটা কি আমার জানতে ইচ্ছা করে। যদি কেউ অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন আমি বাধিত হবো।

—মিন্টু মৈত্র,
"রেলওয়ে কলোনী" রাঁচী।

॥ য-ফলা প্রসঙ্গে ॥

(উত্তর)

মহাশয়,

গত শুক্রবার (২০শে জুলাই) "অমৃত" পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীমদনচন্দ্র মান্না 'য'-ফলার উচ্চারণ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলতে পারি 'য'-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ যেমন আমরা করি না সে রকম অনেক ক্ষেত্রে 'য'-ফলা না থাকা সত্ত্বেও আমরা য-ফলার উচ্চারণ করি। যেমন 'খেলা', 'মেলা' শব্দগুলি উচ্চারণ করি 'খ্যালা', 'ম্যালা', 'ব্যালা' রূপে। এবং এইরূপেই এগুলি সুবিধা হয়।

সুতরাং উচ্চারণের সুবিধার্থে যেমন 'য'-ফলা না থাকলেও 'য'-ফলার উচ্চারণ করি অনুরূপভাবে 'য'-ফলা থাকলেও তা পরিত্যাগ করে উচ্চারণ করি। আর এ ভুল উচ্চারণের সুবিধার্থেই হয়ে থাকে।

—শ্রীমনোমোহন বিশ্বাস,
সিমলা, হুগলী।

মূর্ত-সেবিকা মাদার তেরেসা

আনন্দকুমার সেন

১৯২৮ সালের কথা। লরেটো কমিউনিটির শিক্ষাব্রত গ্রহণ করে ভারতবর্ষে এলেন তেরেসা। জন্মভূমি যুগোশ্লাভিয়া। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অগণিত দরিদ্র মানুষের সংস্পর্শ তাঁর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এল। বিধাতার অক্ষম সৃষ্টি দুঃস্থ দুর্বল মানুষের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠা করলেন মিশনারি অব্ চ্যারিটিস। তখন ১৯৪৮ সাল। দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। চারদিকে ভাঙনের মাঝখানে নতুনভাবে গড়ে ওঠবার চেষ্টা চলেছে। মাদার পেছিয়ে পড়লেন না তাঁর কর্তব্য থেকে। ধর্ম-প্রেমিক হয়েও ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সেবার জন্য দয়া প্রেম ভালবাসার এই নিকেতন গড়ে তুললেন। তখন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। আপন দুর্লভ মনের দুর্বার তাগিদে সকলের মাঝখানে মিশে যেতে পেরেছিলেন।

কলকাতায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা অনেক কিছুই জানেন। কলকাতার পথে পথে পরিত্যক্ত সন্তানদের দল শহরকে কুৎসিত করে তুলেছে দিনের পর দিন। তাদের দারিদ্র স্রষ্টা কারও ওপর দেননি। বৃদ্ধ যুবক শিশুনির্বিশেষে বহু মানুষকে রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। আজকের দিনে এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। শহরের আবহাওয়া সুস্থতাহীন পঙ্কিলতার মাঝখানে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই যখন কোন মানব-প্রেমিককে আমরা দেখি তখনই স্বাভাবিকভাবে আনন্দিতই হই। নিজের ক্ষমতা নেই স্বীকার করি। কিন্তু অপরের প্রেমিক মনটিকে প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি।

মাদার তেরেসার পনের বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই সেবা নিকেতন। আজকের এই বৃহৎ রূপ সেদিন ছিল অজ্ঞাত। বহু পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতি—আজ দেশের মানুষের কাছে দয়া প্রেম ভালবাসার কল্যাণময় মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কলকাতার সেবা-নিকেতনের পনেরটি শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া দিল্লী, আগ্রা, আসানসোল, রাঁচী, ঝাঁসী এবং আম্বালায় স্থাপিত হয়েছে আরও সাতটি।

মাদার একদিন ছিলেন একা। আজ তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ১৫০ জন সন্ন্যাসিনী। ৩০০ জন কর্মী রয়েছে নানা কাজে সহায়তার জন্য। তাঁরা প্রত্যেকেই নানাবিধ কাজে জড়িত। যে তেত্রিশটি স্কুল স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে তেরটি রয়েছে বস্তী অঞ্চলে,

মাদার তেরেসা

তিনটি কমার্সিয়াল স্কুল এবং ১৭টি রবিবাসরীয় স্কুল। কমার্সিয়াল স্কুল থেকে টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড শেখান হয়। তেরটি বস্তী এলাকার স্কুল এবং সতেরটি রবিবাসরীয় স্কুল থেকে ইতোমধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করেছে।

তাছাড়া মাদার তেরেসা গড়ে তুলেছেন একটি চেস্ট ক্লিনিকসহ সাতটি ডিসপেনসারী। পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য একটি 'শিশুভবন' এবং কালীবাড়ির কাছে অসহায় দরিদ্রদের জন্য 'নির্মল-হৃদয়' নামক একটি আশ্রম। প্রতি বৎসর কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত এবং নানাবিধ রোগের জন্য প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে আসছে।

সবথেকে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে 'শিশুভবন' ও 'নির্মলহৃদয়ে'র। শহরের নানাস্থান থেকে দাবিদারহীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে 'শিশুভবনে' স্থান দেওয়া হয়। তাছাড়া অসহায় সাহায্যবঞ্চিত নারীদেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫২ সালে 'নির্মলহৃদয়ে'র প্রতিষ্ঠা হয়। এ পর্যন্ত বারো হাজারের ওপর অসহায় ও দুর্বল মানুষকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত মানুষ হয়ত খেতে না পেয়ে অবহেলিতভাবে রাস্তায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হত। তাদের সেবাযত্নের মাধ্যমে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করা হয়েছে। যাদের বাঁচার সম্ভাবনা নেই তাদের মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা-স্পর্শে পৃথিবীর শেষতম আশীর্বাদে ঘিরে রাখা হয়। তারপর একদিন হারিয়ে যাওয়ার পর তাদের নশ্বর দেহ তুলে নিয়ে যায় নানা ধর্মের নানা সেবাকর্মীরা। হয়ত সমস্ত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর হার থেকে বেঁচে ওঠার সংখ্যা অনেক বেশি।

মাদারের পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন তাঁরা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন সেবাব্রতকে। তাদের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য থেকে কাজ করতে হয়। একদিকে রয়েছে পীড়িত মানুষদের সেবা করার দায়িত্ব অপর দিকে রয়েছে অসহায় শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। এক কঠোর বাধ্যবাধকতার মাঝখানে সেবাব্রতীদের জীবন কাটে চরম দায়িত্ব পালনের জন্য। তাদের নানা কাজের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। সমস্ত শিক্ষার মাঝখান দিয়ে একথা তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় মানুষের দুঃখে 'তোমাদের দায়িত্ব অপরিসীম'। তাঁরা কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান, আর নানাভাবে লোকের সংস্পর্শে এসে অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। প্রত্যেকটি অসহায় নরনারী শিশুকে নানাভাবে সেবা করবার সুযোগ লাভ করেন।

মঙ্গল কামনাই মহৎ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আদিম পৃথিবীর অমঙ্গলের মধ্য থেকে কলুষিত বেদনাময় জীবনকে সুস্থতার মাঝখানে মুক্তি দেওয়ার জন্য শুভার্থী মানুষের অভাব ঘটেনি। ব্যক্তিস্বার্থ, ধর্মচেতনা, রাজ-নৈতিক সিদ্ধি নানা কারণ হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মানুষের অভাব ঘটেনি যাদের জন্মসূত্র গাঁথা রয়েছে সেবাব্রতের মধ্যে। একালের মূর্তিমতী সেবিকা মাদার তেরেসা তাদেরই একজন। তাই এই মাতৃসুলভ স্নেহলাবণ্যের গুণে অনন্যা রমণী বহু মানুষের আশীর্বাদ লাভে ধন্যা। এবছর ভারত রাষ্ট্রের সরকারী সম্মান 'পদ্মশ্রী' লাভ করেছেন। অতি সম্প্রতি তিনি ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ করেছেন।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। কুড়ি ।।

চমকটা সামলে নিয়েই ব্যবস্থা করে ফেলেছিল চন্দন সিং। এক মিনিটও অপেক্ষা করেনি আর। চাইতে না চাইতেই যা মুঠোয় এসে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই তার সদ্গতি করা ভালো। পরে অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচা যায় তা হলে।

শুধু শেষবার অভয় জিজ্ঞেস করেছিল, অমিয় ছিল এখানে?

—ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত।

—কোথায় গেছে?

—বলেছিল বাড়ী যাবে।

—বাড়ীতে সে যায়নি।

—তা হলে আমি জানি না।

—তৃপ্তি আসেনি?

—না, আর কেউ আসেনি।

পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল অমল, এইবারে সামনে এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, আমি দেখেছি।

—তুম ভুল দেখা থা। জেয়াদা বাত মৎ করো।—চন্দন সিং রুখে উঠল।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অভয় তাকিয়ে দেখল, এর মধ্যেই বাড়ীর সামনে ছোটখাটো ভিড় জমেছে একটা। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল, এখানে কোনো গণ্ডগোল বাধলে তিনজনকে আর মাথা নিয়ে ফিরতে হবে না। এর মধ্যেই কয়েক জোড়া চোখে হিংস্র পিঙ্গল আলো জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে।

তিনজনে নিঃশব্দে ট্যাক্সিতে ফিরে এল।

ট্যাক্সিওলা বাঙালী। ব্যাপারটার কিছু আঁচ সে পেয়েছিল, খানিকটা এগিয়ে সে আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। বললে, কী হয়েছে স্যার? মেয়েছেলে পালিয়েছে বুঝি? এ তো আকছারই হচ্ছে আজকাল। সেদিন আমার ট্যাক্সিতেই তো বালীগঞ্জের এক জোড়া রাত একটার সময়—

সরস কাহিনীটা আর শেষ হল না, এইবারে ফেটে পড়ল অভয়।

—চুপ করুন, বাজে বকবেন না। অত কথায় কী দরকার আপনার। ট্যাক্সি চালাচ্ছেন, তাই চালান।

কিন্তু ট্যাক্সিওলাকে ধমক দিলেই মনের আগুন নেবে না। নিজের হাত পা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে এমনি অভয়ের অবস্থা। তাদের কারখানার একজন মজুর পাগল হয়ে গিয়ে দাঁতে করে হাতের একটা বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছিল—অভয়ের মনে হল, ওই রকম একটা ভয়ংকর কিছু করতে পারলে ঠাণ্ডা হয় সে।

অমল ড্রাইভারের পাশে কাঁচুমাচু হয়ে বসেছিল। বাজে খবর দিয়ে মিথ্যে ঘোড়-দৌড় করিয়েছে, এ জন্যে অভয় আবার তার টুঁটিটা খপ করে চেপে না ধরে—এইটেই সে ভাবছিল।

অমল বললে, মাইরি বলছি, আমি মিথ্যে বলিনি অভয়বাবু। ওঁকে চোরের মতো বাড়ী থেকে বেরুতে দেখে ফলো করলুম। দেখলুম, জিজ্ঞেস করে করে বাসে উঠলেন, ভবানীপুরে নেমে খুঁজে খুঁজে ও বাড়ীর কাছে গেলেন, তারপর—

—কে অবিশ্বাস করছে তোমায়?—অভয় খেঁকিয়ে উঠল।

—তা হলেই হল স্যার।—অমল নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালো একটা।

প্রভাত গুম হয়ে বসেছিল। একটা কথাও বলতে পারছে না। তৃপ্তি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে, এইটেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না এখনো। কিংবা মেয়েদের কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না। প্রত্যেক দিনই তো সে রিনি কাঞ্জিলালকে দেখতে পাচ্ছে।

অভয়ের গলাটা বুজে এসেছিল, খাঁকারি দিয়ে সাফ করে নিলে। ডাকল: প্রভাতদা!

—হুঁ।

—ও ব্যাটা স্রেফ মিথ্যে কথা বলল মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে রাস্কেল অমিয়টা আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিল মনে হচ্ছে।

প্রভাত চুপ করে রইল। অভয় দার্শনিক মুখে বলে চলল: পাঞ্জাবীর কী দোষ? অমিয়ই তো প্রশ্রয় দিয়েছে। দিদিকে দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার নাম করে পাঞ্জাবীর মোটরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চায়ের দোকানে ঢুকে আড্ডা মেরেছে।

সারা শরীরে যেন তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে বসল প্রভাত। এসব খবর সে জানত না।

—সে কি!

পেছনে মুখ ফিরিয়ে অমল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

—ওইখানেই তো গণ্ডগোলের গোড়া। ব্যাপারটা অভয়বাবুকে আমিই তো জানিয়েছিলুম মশাই। আমরা বদ ছেলে হতে পারি, কিন্তু তাই বলে স্যার বাইরে থেকে একটা উটকো লোক এসে আমাদের ঘরের মেয়েদের নিয়ে—

অভয় গর্জন করে বললে, থামো, তোমার আর বাহাদুরী নিতে হবে না। সত্যি বলছি প্রভাতদা, পাঞ্জাবীর ওপরে কোনো রাগ নেই আমার। কিন্তু শুয়োরের বাচ্চা অমিয়টা যে এতদূর জাহান্নমে গেছে, এটা আগে বুঝতে পারলে আমিই ওর মাথাটা ভেঙে ফেলতুম। যদি একবার হাতের কাছে ওকে কখনো পাই, তা হলে আগে গলা টিপে খুন করব, তারপর ওকে টুকরো টুকরো করে ওর মাংসগুলো রাস্তার কুকুরকে খাওয়াব আমি।

প্রভাত নিজের কপালটা চেপে ধরল দু হাতে। ক'দিন ধরে খেয়াল ছিল না। কিন্তু আজ আবার সেই তীব্র যন্ত্রণাটা দেখা দিয়েছে। ঘাড়ের তলা থেকে উঠে বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো ঠিকরে পড়ছে কপালে, দাঁতে দাঁত চেপেও ভোঁতা ছুরির টানের মতো সেই নিষ্ঠুর বেদনাটা সহ্য করা যাচ্ছে না কিছুতেই, চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। ডাক্তারকে দেখিয়েছিল একবার, ডাক্তার বলেছেন—আই সাইটের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই—নার্ভের ব্যাপার। কিন্তু কতখানি যন্ত্রণা সইতে পারে নার্ভ?

কপাল ছেড়ে হাত দুটোকে চোখের ওপর আনল প্রভাত, ছুটে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চোখ দুটোকে ঠেলে ধরল ভেতর দিকে। অস্পষ্ট গলায় বললে, হয়তো অমিয় কিছুই জানে না।

অভয়ের বীভৎস মুখে একটা বিষাক্ত হাসি দেখা দিল।

—দুয়ে আর দুয়ে চার হয় প্রভাতদা, পাঁচ হয় না।

কী হবে—কে জানে। চোখ দুটোকে একভাবে ঠেলে ধরে, নিজের যন্ত্রণাটাকে আস্বাদন করতে করতে প্রভাত ভাবল: দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে সব হিসেব এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন বাঁচতে হলে মনুষ্যত্বকে বলি দিতে হয়, আর মনুষ্যত্ব বাঁচাতে হলে আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকে না। এখন দীপ্তির রোজগারের কথা ভাবতে গেলে চোখ বুজে থাকতে হয়, এখন তৃপ্তির মতো মেয়েকে ঘরে রাখা যায় না—এখন মায়ের পেটের ভাই হয়ে অমিয় তার হাত ধরে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এখন কলকাতার পথে পথে একদল ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়ায়—যারা রাস্তার কুকুরের চাইতেও করুণার পাত্র; এখন চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যা একটু রঙিন হয়ে এলে দালালকে ফিস-ফিসিয়ে বলতে শোনা যায় (হঠাৎ একদিন প্রভাতের কাছে এসেছিল): আইয়ে সাব্ —বেঙ্গলী রিফিউজি গার্ল—ভেরি ফ্রেশ! এখন রিফিউজী কলোনীগুলোর অভাবের অন্ধকার থেকে সার বেঁধে বেরিয়ে আসে খুনী, গুণ্ডা, জুয়াচোরের দল—যারা মেঘনা-পদ্মা-মধুমতীর তীরে মানুষ হলে বেঁচে থাকবার আলাদা মানে খুঁজে পেত।

তবু কৃষক হয়তো আন্দামানে গিয়ে জমি পায়—হয়তো দণ্ডকারণ্যের বনে গিয়ে ফসল ফলায়। কিন্তু মূলে ছেঁড়া মধ্যবিত্তের দল? চুরমার হচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—গলে পচে একাকার হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওর মধ্যেই জনকয়েক মরতে মরতেও বেঁচে যায়—ছাইগাদার ভেতরে সূর্যমুখী ফুলের মতো ফুটে ওঠে। তারপর? দীপ্তি—তৃপ্তি—অমিয়—

অভয়ের কনুইয়ের একটা ধাক্কায় প্রভাত হাত থেকে চোখ সরিয়ে নিলে। কপালের ভেতরে যন্ত্রণাটা এখন একটা শক্ত সীসের পাতের মতো আটকে বসেছে। অনুভূতিটা তার মধ্যেই স্থির হয়ে আছে এখন।

গাড়ী পার্ক সার্কাস ছাড়িয়ে এগিয়েছে খানিক দূর। অভয় বললে, ঘুমুচ্ছ নাকি প্রভাতদা?

—না।

—কী করা যায় বলতো?

—থানায় একটা খবর দেওয়া দরকার।

—থানা!—অভয় প্রতিধ্বনি করল।

—তা ছাড়া উপায় কী আর? এ তো পুলিশেরই কাজ।

সঙ্গে সঙ্গেই আঁতকে উঠল অমল।

—দোহাই স্যার—থানা পুলিশ করুন আর যা-ই করুন, আমাকে কিন্তু জড়াবেন না এর মধ্যে। সেই বোমার ব্যাপার নিয়ে জেরবার হয়ে আছি, এখনো মাঝে মাঝে ডেকে পাঠায়—এবার হাতে পেলে বলবে, ব্যাটা—এ তোমারি কাজ। তুমিই মেয়েটাকে ইলোপ করেছ। আসামী ধরবার মুরোদ নেই, খামাকা ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে—

অভয় বললে, আঃ।

—আমাকে কিন্তু সাক্ষী মানবেন না স্যার। কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—

—দেখা যাবে পরে, এখন চুপ করে থাকো।

চুপ করে রইল অভয় নিজেও। থানার অভিজ্ঞতা সে এখনো ভোলেনি। সেই কাগজপত্র আর ধুলোর গন্ধেভরা দমচাপা ঘরটা, দেওয়ালে সেই দু জোড়া ঝুলন্ত হাতকড়ি, হল্লায় ধরে আনা কতগুলো বিপন্ন ফিরিওলা। দারোগার চোখে সেই কঠিন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, একটার পর একটা জেরা, দীপ্তির চাল-চলন সম্পর্কে সেই ইঙ্গিত। দীপ্তি—দিদি! সারা শরীরে ঘৃণা আর আতঙ্ক কিলবিল করে উঠল অভয়ের। এতক্ষণের অসহ্য ক্রোধটা থানার ঠাণ্ডা ঘরটার ছোঁয়াতেই একেবারে নিবে গেল, মনে পড়ল দারোগার প্রত্যেকটা কথা যেন বিষের তীরের মতো এসে বিঁধছে বাবার গায়ে—চেয়ারের পেছন দিকে মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার—বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সেই থানা।

অভয়ের গলাটা শুকিয়ে উঠল।

—থানায় যেতেই হবে প্রভাতদা?

—তাই তো উচিত। আমরা কোথায় খুঁজে পাবো ওদের?

একটা ঢোক গিলে অভয় বললে, চলো তবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী এসে থানায় থামল।

অমল পালাতে চেষ্টা করছিল, প্রভাত হাত চেপে ধরল তার।

—তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমরা তো আছিই।

—স্যার, সেই মামলাটা—

—তুমি আমাদের সাহায্য করলে পুলিশে ভাববে, ও ব্যাপারটায় তোমার কোনো হাত ছিল না। ভালোই হবে তোমার—এসো।

অমল হতাশ হয়ে বললে, দেখবেন স্যার, ডোবাবেন না শেষ পর্যন্ত।

—না না।

তিনজনেই ভেতরে ঢুকল। আর অভয়ের মনে হতে লাগল একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকূপে ঢুকতে যাচ্ছে সে—সেখান থেকে আর বেরুতে পারবে না কোনোদিন। পৃথিবীতে গরীব হয়ে জন্মানোর মতো অভিশাপ আর নেই।

ডাক্তার মজুমদার চেঁচিয়ে উঠলেন : একি করেছ করুণাময়, বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেলো তোমার?

ওষুধ-বিক্রীর হিসেবে আগাগোড়া ভুল। বারো টাকার জায়গায় আঠারো টাকা নেমেছে, ছ' আনার জায়গায় ছ' পাই।

রোজ রাত ন'টা নাগাদ ডাক্তার একবার হিসেব মিলিয়ে রেখে যান। আজ পর্যন্ত করুণাময়ের একটি পয়সাও গোলমাল হয়নি কখনো।

—হঠাৎ হয়ে গেছে স্যার।

—হঠাৎ? যোগ-বিয়োগও ভুলে গেলে নাকি?—ডাক্তার এবার ভালো করে করুণাময়ের দিকে তাকালেন : কী হয়েছে তোমার বলো দেখি? চোখ মুখের চেহারা ও-রকম কেন? অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

বুকের ভেতর থেকে যে কান্নাটা ঠেলে উঠছিল, প্রাণপণ শক্তিতে করুণাময় সেটাকে ঠেকালো। ডাক্তারের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, কি-কিছু হয়নি স্যার। ভা-ভালোই আছি।

—তা হলে এগুলো সব ঠিক করে রাখো। আমি আর বসতে পারছি না—একটা জরুরি কেস আছে বেলেঘাটায়।

স্টেথিসকোপ গলায় ঝুলিয়ে, কালো ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পুরোনো ঝরঝরে অস্টিন গাড়ীটা গ্যাস ছড়িয়ে আর নানা রকম আওয়াজ করতে করতে পুব দিকে এগিয়ে গেল।

করুণাময় হিসেবের খাতাটা নিয়ে বসল, কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারল না। বুকের ভেতরে তার ঝড় চলছে—ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে সমস্ত মাথাটা। টপ করে একটা ঘামের ফোঁটা কপাল বেয়ে খাতাটার ওপরে পড়ল।

খাতাটা সরিয়ে রাখল করুণাময়।

কিছুই জানতে বাকী নেই আর। অমলের বন্ধু-বান্ধবেরাই খবর দিয়ে গেছে।

—দাদা, ফসকে গেল!

—কী ফসকে গেল?—গোড়াতে কিছু বুঝতে পারেনি করুণাময়।

—মুখের গ্রাস। কাকে নিয়ে গেছে।

—কা'র মু-মু-মুখের গ্রাস? আর কা-কা-কাক-টাকই বা কী বলছ?—তখনো করুণাময় অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাদের দিকে।

—ওই আইডিন আর পেনিসিলিন নিয়েই থাকো!—আর একজন ঠাট্টা করে বলেছিল : ওদিকে তোমার টাকের ওপর টেক্কা দিয়ে তোমার পাত্রী তো হাওয়া! সোজা ভাগলপুর!

—মু-মা-মানে? —চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল করুণাময়। হাতের ধাক্কায় দুটো ইনজেকশনের অ্যাম্পুল ছিটকে পড়েছিল টেবিল থেকে : কী বলছ এসব?

—বলছি পাকা কথা। এই তো অভয়বাবুরা অমলদাকে নিয়ে খুঁজতে গেল। কিন্তু আর কি পাবে? অমন চাঁদপানা মেয়ে— তোমার টাক আর তোৎলামো দেখেই ভেবড়ে গেছে। হয়তো ভেবেছে এর চাইতে গঙ্গায় ডুবে মরাও ভালো। এখন আর কী করবে? এক ডোজ আইডীন কিংবা বেনজিন খেয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকো।

হাসতে হাসতে হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে গেল দলটা। শুধু স্বপ্নের মতো শুনল : কে একজন বলছে : মাইরি, খাসা মেয়েটা রে! ওকি আর করুণাদার মতো বুড়ো শেয়ালের ভোগে লাগে? কিন্তু কার সঙ্গে ভাগল বল্ দিকি? সে লোকটাকে দস্তুর মতন হিংসে হচ্ছে রে!

বাজে-পোড়া মানুষের মতো একই জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে বসে রইল করুণাময়। তারপর কে একজন ঘরে ঢুকে বললে, কম্পাউণ্ডারবাবু, এই ওষুধটা—

প্রেসক্রীপশনের দিকে না তাকিয়েই করুণাময় বললে, নেই। হ-হবে না।

ম—মা—মানে? চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল করুণাময়

লোকটা বেরিয়ে যেতেই সে ডিসপেনসারী ছেড়ে উঠে পড়ল। দোকান খোলা রেখেই ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

বাড়ুজ্জে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। করুণাময়কে দেখে ভুরু কোঁচকালেন তিনি।

করুণাময় বারান্দার রেলিংটা চেপে ধরে টাল সামলাতে চাইল। রাস্তাটুকু প্রায় ছুটে এসে তার বুকের ভেতরে প্রায়

হাতুড়ির ঘা পড়ছিল তখন, সারা শরীরটা টলছিল।

—এ সব ক্‌-কী শ্‌নছি?

বাঁড়ুজ্জে কিছুক্ষণ তামাক টানলেন নিঃশব্দে। হ্‌ঁকোটায় জল কমে গেছে, একটা অদ্ভুত আওয়াজ উঠছিল তা থেকে। তারপর :

—কী শ্‌নছ?

—গো-গো-ব্রাং বাবুর ছোট মেয়েটা নাকি প্‌-পালিয়েছে?

বাঁড়ুজ্জে হ্‌ঁকোটা নামিয়ে রাখলেন।

—ঠিকই শ্‌নেছ। —বিরক্ত গলায় বাঁড়ুজ্জে বললেন, তোমার বরাতটাই খারাপ। দেখলে তো, চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তোমার বিদ্যে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত, বলেছি ম্যাট্রিক পাশ। আধকাঠা

বিপুলা এ পৃথিবী!

আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরা তোর ব্যবসা...!

কন্যাটা একটু বোঝেন!

আর বুঝবার কাজ নেই!

ভেড়ও খাচ্ছি তামাক ও খাই!

কমন ওয়েল্থ

ইউরোপীয় কমন মার্কেট

জমিতে দু'খানা খোড়ো চালা তুলেছ, বলেছি নিজের বাড়ী। তোমার জন্যে কাল থেকে বকে বকে আমার মুখে ফেনা উঠে গেছে—আর কী চাও?

করুণাময় ঢ্যালা ঢ্যালা নির্বোধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাঁপা গলায় বললেন, কিন্তু ক্যা-ক্যা-ক্যা—

—কেন পালালো?—বাঁড়ুজ্জে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, কেন পালালো? এম্‌নিতেই ওই তোমার চেহারার শ্রী—তার ওপর অত ক্যাবলামি করলে ভালো লাগে? মেয়েকে দেখেই সব ক'টা দাঁত আর মাড়ি বের করে হাঁ করে গাধার মতো চেয়ে রইলে, বলে বসলে: খাখ-খাসা! খুব প-প-পছন্দ হয়েছে।—করুণাময়ের কথার ভঙ্গি বিকৃতভাবে নকল করে বাঁড়ুজ্জে বললেন: এর আগে আরো তিন্‌বার চেষ্টা করেছি—ভদ্রলোকেরা তোমাকে দেখেই বিগড়ে যায়। এখানে ভাই আর বাপকে ভিজিয়ে ছিলুম—কিন্তু মেয়ে তোমাকে দেখে পালিয়ে বাঁচল।

করুণাময় কথা বলতে পারল না। রেলিংটা ধরে তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

বাঁড়ুজ্জে বললেন, তুমি কি হে? রিফিউজিদের কল্যাণে কলকাতা শহরে মেয়েরা মড়ার খইয়ের মতো ছড়িয়ে রয়েছে, কানা-খোঁড়া-কুষ্ঠরোগী পর্যন্ত ড্যাং ড্যাং করে গিয়ে বরাসনে বসে, আর তোমার বরাতেই একটা জোটে না? গলায় দড়ি দিয়ে মরো গে যাও—কাউকে আর মুখ দেখিয়ো না।

করুণাময়ের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আর একটা কথাও বলতে না পারার দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় তার কপাল বেয়ে ঘামের এক একটা করে ফোঁটার স্রোত গড়িয়ে চলল।

বাঁড়ুজ্জে বললেন, যাক, আমি বেঁচে গেলুম। এক রাশ মিথ্যে কথা বলে বাঁদরের গলায় সোনার হার পরাতে যাচ্ছিলুম, সে পাপ থেকে ভগবান আমায় রক্ষা করলেন। এখন আর কী করবে? যাও, তোমার সেই সাধের খোড়ো আট-চালাতে বসে বেশ গলা খুলে হাপু গাও গে।

করুণাময় চলে এল। মার-খাওয়া একটা জানোয়ারের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে এসে ঢুকল ডিসপেনসারিতে। প্রত্যেক-বার যা হয়, এবারও তাই হয়েছে। কিন্তু আঘাতটা এবারে যেন বড় নিষ্ঠুর হয়ে বাজছে। অনেকখানি আশা জেগেছিল মনে—সুন্দরী মেয়েটার রূপ যেন বুকের ভেতরে বিঁধে রয়েছে তার।

হিসেবের খাতা নিয়ে বসল করুণাময়। বারোর জায়গায় আঠারো নামল, ছ' আনার জায়গায় ছ' পাই। তারপরে ডাক্তার এলেন।

করুণাময় বসে রইল। রাত বাড়ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে একজন পাহারাওলা চলেছে, পেছনে পেছনে তিন-চারটে কুকুর তারস্বরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাকে। একটা বাস চলে গেল—তার জানলায় একটি রূপসী কিশোরীর হাসিভরা মুখ। হৃৎপিণ্ডটা সজোরে ধাক্কা খেলো একটা। তৃপ্তি? না— তৃপ্তি নয়।

নিজের জীবনটা ছায়ার মতো ভেসে উঠল চোখের সামনে। খুলনায় কিছু জমিজমা ছিল তা ঠিক। লেখাপড়া শেখেনি, ওই সবই অল্পস্বল্প দেখত। বড়ো ভাইয়েরা কলকাতায় চাকরি করত—করুণাময় কোনোদিন দেশ ছেড়ে আসবার কথাও ভাবেনি।

কিন্তু আসতে হল। তখন দেখা গেল, ভাইয়েদের তিন ঘরের ফ্ল্যাটে তার জায়গা হয় না।

গ্রামের এক ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিলেন, কম্পাউণ্ডারীও শেখালেন। কিন্তু বেশিদিন তা-ও সইল না। বিপত্নীক নিঃসন্তান ডাক্তারের মাথায় ছিট্ ছিল, হঠাৎ একদিন ডিস্পেন্সারিতে তালা দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে আলমোড়া না পণ্ডিচেরী কোথায় চলে গেলেন। মজুমদারের যাওয়া-আসা ছিল সেখানে। তিনিই ওকে তাঁর নারকেলডাঙার দোকানে নিয়ে আসেন।

দেশের জমি-জমা নামমাত্র দামে বিক্রী হয়েছিল, তা থেকে কিছু অংশ পেয়েছিল করুণাময়। তাই দিয়েই বারাসতে একফালি জমিতে দুখানা ঘর। ঠিক খোড়ো নয়—টিন আছে। ভাইয়েদের কাছেই থাকেন মা, তবু ছোট ছেলেটাকে একেবারে ভুলতে পারেন না—দু-চার দিনের জন্যে এসে দেখে যান।

এতদিনে হাতে শ' চারেক টাকা জমেছে। ভেবেছিল তাই দিয়ে বারাসতেই একটা ছোট ডাক্তারখানা খুলবে। তার আগে একটি স্ত্রী। যেমন করে হোক চলে যাবেই। ছোট একটি সংসার—সারাদিনের খাটুনির পর একটুখানি শান্তি, কিছু স্নেহ। কিন্তু আজ পাঁচ বছর চেষ্টা করেও তার পাত্রী জোটেনি। ওদিকে বয়েস বাড়ছে, টাক বাড়ছে। অচল করুণাময় দেউলে হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

মনে পড়ল, বিয়ে-পাগলা বলে এখন তাকে সামনা-সামনিই সবাই খ্যাপায়। পাত্রী ঠিক করে দেবে বলে এই পাড়ার ছেলেরাই বিস্তর চপ-কাটলেট খেয়েছে তার পয়সায়, তারপর একটা দাড়িওলা ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে কনে দেখিয়েছে। দাড়িওলা ছেলেটা তার থুৎনিতে হাত দিয়ে আদর করে বলেছে, 'প্রাণনাথ, পছন্দ হল না আমায়? বেশ, তা হলে এক আনা পয়সা দাও—রাস্তা থেকে দাড়িটা কামিয়ে আসি।'

সব মনে পড়ল, আর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল ঝরে যেতে লাগল করুণাময়ের।

কে ও রাস্তায়? অভয় নয়?

অভয়ই বটে। বাড়ীতে রান্না-বান্না নেই—সব অন্ধকার, বাবা-মা কিভাবে পড়ে আছেন কেউ জানে না। তার মধ্যেই 'বড্ড মাথা ধরেছে' বলে প্রভাত গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজেছে। শুধু অভয়ই ঘুমুতে পারেনি—পথে পথে ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

করুণাময় এগিয়ে গেল: অভয়বাবু!

দুটো রক্তবর্ণ চোখ মেলে অভয় বললে, কী চাই?

—আ-আ-আপনার বোন—

বিষাক্ত স্বরে অভয় বললে, পাওয়া যায়নি তাকে। আর কিছু বলবার আছে?

করুণাময়ের জিভটাকে যেন কেউ ভেতর দিকে টেনে ধরছিল, তবু ক্ষীণভাবে বললে, শ' চারেক টাকা আছে আমার। যদি দু-দরকার হয়—মানে—আপনার বো-বো-বোনকে খোঁজবার জন্যে—

অভয় ফিরে দাঁড়াল।

—কী বললেন?

তার গলার আওয়াজে করুণাময় পিছিয়ে গেল: বলছিলুম চা-চা-চারশো টাকা আছে আমার—

—ভিক্ষে চেয়েছি আপনার কাছে?—অভয়ের নাক দিয়ে একটা বন্য আওয়াজের মতো বেরিয়ে এল: ইডিয়ট—উজবুক কোথাকার!

—তারপর সমস্ত তিক্ততা; নিরুপায় বিদ্বেষ আর মনের যত জ্বালা এই বোকা লোকটার ওপর বর্ষণ করে অভয় বললে, কী ভেবেছেন আপনি? বোন ফিরে এলে আপনার সঙ্গে বিয়ে দেব? ওই চেহারা দেখে সে পালিয়েছে—ফিরে এলে আপনার হাতে দেব আত্মহত্যা করাবার জন্যে?

—দেখুন—আবার প্রায় নিঃশব্দ একটা আর্তি ভেসে উঠল করুণাময়ের গলায়।

—গেট্ আউট!—বিকট চিৎকার করল অভয়। সে যে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলছে, সে-কথাও তার খেয়াল রইল না। রক্তাক্ত দু-চোখ দিয়ে যেন পুড়িয়ে দিতে চাইল করুণাময়কে: গেট্ আউট!

তারপর নিজেই ঝড়ের মতো চলে গেল বাড়ীর দিকে।

একটা ল্যাম্প পোস্টে ঠেসান দিয়ে নির্বোধ করুণাময় আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। রাত আরো বাড়ল, বাস চলা বন্ধ হয়ে গেল, নারকেলডাঙার দু চোখ ভরে ঘুম নামল। শুধু করুণাময় ঘুমুতে পারল না। তার কাছে জীবনের সব অর্থ হারিয়ে গেছে। সে কখনো ঘর বাঁধতে পারবে না—কোনো মেয়ে তাকে জীবনে বরণ করে নেবে না, সন্তান-সংসার চিরদিন তার কাছে স্বপ্নের চাইতেও অসম্ভব হয়ে থাকবে!

আর যত বয়েস বাড়বে, লোকে তত তাকে ঠাট্টা করবে: তার পয়সায় মাংস-পরোটা খেয়ে তাকে নিয়ে রসিকতা করবে।

চারদিকের আলোগুলো চোখ টিপে তাকে ঠাট্টা করতে লাগল; মনে হল মাথার ওপর তারাগুলো যেন তাকে ভেংচি কাটছে; ওই যে কুকুরগুলো সমানে ডেকে চলেছে, ওরা যেন ইয়ার্কি দিচ্ছে তাকে নিয়ে।

তখন করুণাময়ের মন শান্ত আর শক্ত হয়ে এল। বাড়ুজ্জেই তাকে ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

হয়তো আরো কিছুদিন এমনিভাবে কেটে যেত; হয়তো আরো কয়েক বছর এমনিভাবে লোকে বাঁদর নাচাত তাকে নিয়ে—সে বুঝতেও পারত না। কিন্তু তৃপ্তির চেহারাটা বুকের মধ্যে বিঁধে আছে—সেই সুন্দর মিষ্টি মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারা যাচ্ছে না! অসম্ভব প্রায় হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছিল বলেই তাকে হারিয়ে করুণাময়ের ভুলটা একেবারে ভেঙে গেছে।

যদি সব মিটিয়ে দিতে হয়, তা হলে ওই মুখখানাই থাকুক চোখের সামনে।

করুণাময় ধীর পায়ে ফিরে এল। ডিস্পেন্সারির দরজা বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে। আলমারি খুলে ধারালো নতুন ক্ষুরখানা বের করল—ড্রেস করতে দরকার হয়। তারপর আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে রোগীদের বসবার বেঞ্চটার ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

চোখের সামনে অন্ধকারটা আলো হয়ে গেল। তৃপ্তি এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে লাল শাড়ী। পদ্মের মতো মুখখানা লজ্জা আর ভয়ে রাঙানো। কী সুন্দর! মানুষ যে এত সুন্দর হয়, এর আগে করুণাময় তা কোনোদিন জানত না!

আর ঠিক তখনি বাঁ হাতে ক্ষুরখানা শ্বাসনালীর উপরে ধরে ডান হাতে শক্ত করে একটা চাপ দিলে সে।

তার হাতের যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা করল না—তার শেষটুকু পর্যন্ত মাংসের মধ্যে বসে গেল।

কখন সে বেঞ্চ থেকে নীচে আছড়ে পড়ল, কখন ছুটল রক্তের ধারা—করুণাময় টেরও পেল না। শুধু তখনও তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল আর সেই জল মিশে যাচ্ছিল ফিনকি দিয়ে বেরুনো রক্তের সঙ্গে। (ক্রমশঃ)

কলকাতার ফুটপাতের আত্মকাহিনী

অমরেন্দ্র দাস

ট্রাম-বাস-মোটরের মিছিল চলে পথ দিয়ে. আর লোক চলে সেই পথের দুপাশের ধার ঘেঁসে। লোক চলে পথের দুপাশের বড় বড় বাড়ীর কোল দিয়ে, অতি সাবধানে, সন্তর্পণে। যদি এই সীমানা একবার ফস্‌কায় তাহলে সরকারের বপুমান ডবলডেকার সর্বদাই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, আপনাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে তার এতটুকু কষ্ট হবে না। এমন তো কত কাহিনী প্রত্যহ খবরের কাগজের পাতার বুকে ঝুলছে। ঝুলছে আরও অনেক কাহিনী। আপনি আরও কত ঘটনা প্রত্যহ লক্ষ্য করেন। এও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, মাঝে মাঝে পথচারীদের জন্যে এই নির্দিষ্ট পথচলা স্থানটুকুতে কোন ডবল-ডেকার বা কোন মোটরগাড়ী উঠে পড়েছে! তখন নিশ্চয় আপনি দারুণভাবে বিরক্ত হয়ে এইসব গাড়ীর চালকদের কান্ড-জ্ঞানহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক মদ্যপায়ী বলে সম্ভাষণ করেছেন।

কিন্তু কেন করেছেন? আপনার অধিকারের ওপর অপরের হস্তক্ষেপই কি আপনার বিরক্তির কারণ নয়? হয়ত না, হয়ত ঠিক। কিন্তু আপনার এই পায়ে-চলা পথটুকু অন্য যে কোন অজুহাতেই হস্তান্তরিত হলে আপনি আর কারুরই খাতির রাখবেন না, সে আপনার চলার ভঙ্গিতেই প্রতীয়মান। তাই আপনার ঐ ফুটপাতটুকুর সম্বন্ধে আপনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

ট্রাম থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ফুটপাতে ওঠেন। কেন একবার রাস্তার মাঝখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিন না? ছোটবেলা থেকেই মাতাপিতার নিষেধ বাক্য শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন—ওরে খোকা, কখনও ফুটপাথ ছাড়া পথে নামিস্ না? এখন আপনি খোকার পিতৃদেব হয়েও সে কথা ভোলেননি। এখন আপনি কচি-কিশোর নাগরিকদের ঐ নিষেধবাক্য শুনিয়ে সাবধান করে দেন।

অথচ ঐ ফুটপাতের কোথাও কোন অংশ করপোরেশনের জলকলের লোকেরা এসে খুঁড়লে, তারা যাবার সময় ভাল করে পূর্বাবস্থায় বজায় না রেখে গেলে আপনি চলতে চলতে খোঁড়া জায়গার মুখে এসে খুঁড়িয়ে যান। ওমনি আপনার মুখের ফুলঝুরি আকাশ স্পর্শ করে। করপোরেশনের চোদ্দ দুগুণে আটাশ চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে আপনি বাড়ী ফেরেন। ফিরে গৃহিণীর সামনেও আর এক দফা আস্ফালন করেন। ফুটপাতের কোন অংশ একবার ভাঙাচোরা হলে হয়, তারপরেই যে ভুরি ভুরি আবেদন আসল জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, তার অনেক নজীর আছে। এ তো গেল ফুটপাতের আর এক অবস্থা।
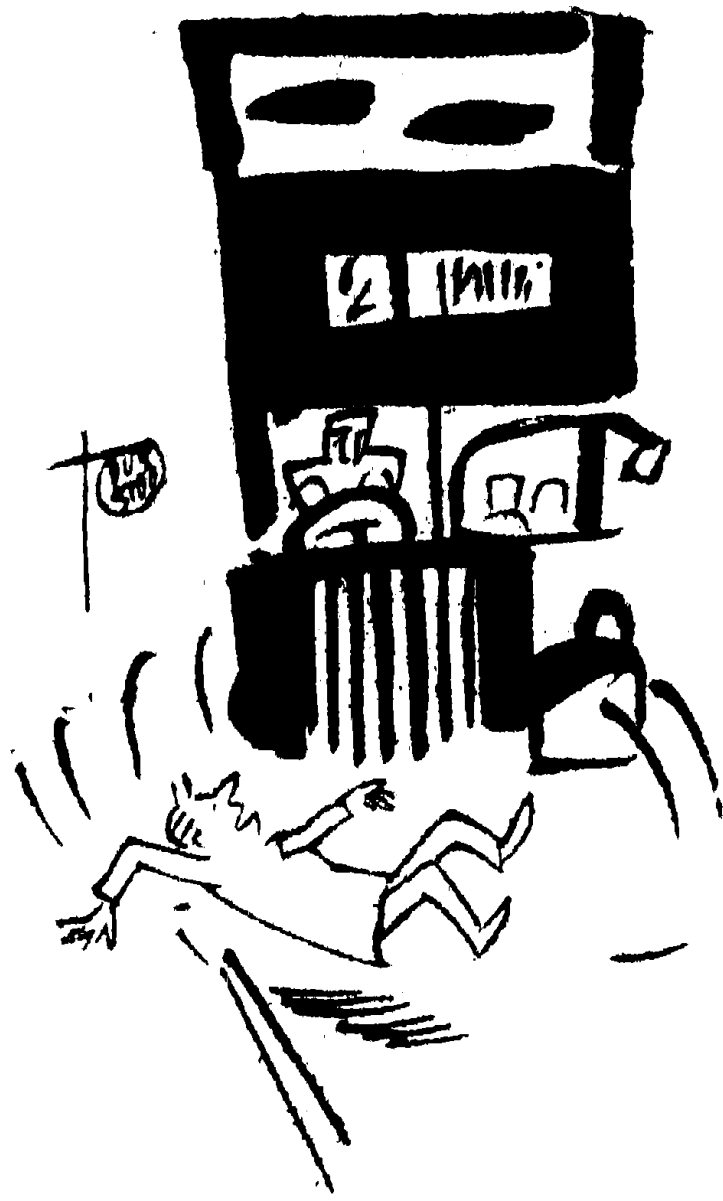
আপনি নিশ্চয় চিৎপুরের দিকে গেছেন! এ শহরে থেকে উত্তরের ঐ পথে যাননি এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেখেছেন নিশ্চয় সেখানের পথগুলির অবস্থা? ফুটপাত আছে সেখানে। কিন্তু একেবারে টানা, লম্বা, বরাবর, দীর্ঘ ফুটপাত নেই। ওখানে আপনাকে পথ দিয়েই চলতে হয়। মাঝে মাঝে যেটুকু ফুটপাত জেগে আছে সেটুকু দিয়ে আপনার একার দুপা দিয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে, কিন্তু অন্য আর কারুর নয়। তাই ওসব ঝামেলায় না থেকে পথকেই পথ-চলার সম্বল করে আপনি চলেন। তাতে ক্ষতি কিছু হয় না। তবে ফুটপাতের গুরুত্ব এখানে ম্লান।

ফুটপাতের গুরুত্ব আছে চৌরঙ্গীতে। তামাম কলকাতার যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে শহরের যা কিছু রূপ, সেই চৌরঙ্গীতে আছে ফুটপাত। একপাশে ফুটপাত। হোক্ একপাশে। কিন্তু পথ-চলার সময় আরামের ঘুম আসে। প্রাণে আসে হিল্লোল। চোখে স্বপ্ন। মান্ডোলীনের মৃদুমূর্ছনা শুনতে শুনতে যখন আপনার কণ্ঠে গান এসে আকুলি-বিকুলি করে, তখন কি আপনি এই ফুটপাতেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন না?

গ্রান্ড, • ফিরপো, ' ব্রিস্টল, মেট্রোর সামনের ফুটপাতে একটু অন্য জগতের নেশা। সেই নেশা কি আপনার চোখেও লাগে না? তখন কি মনে হয় না—দূরে তোমার বাসা। এইত "আমার স্বপ্নের পাওয়া স্বপ্নেরই বাসা।

এবার আসতে হল এই ফুটপাতের প্রথম আবিষ্কারের দিনটিতে। আজ এই ফুটপাত আছে বলে মাঝে মাঝে ফুটপাতের গুরুত্ব বুঝি। যেখানে ফুটপাত থাকে না, সেখানে ফুটপাতের প্রয়োজন আছে বলেই গুরুত্ব আরোপ করি। স্লোগান ছড়াই। নতুন পথ ও স্থান গড়ে ওঠার সময় ফুটপাত অবশ্যই থাকবে বলে প্ল্যান তৈরী হয়। করপোরেশনকে ফুটপাতের জন্য আলাদা করে জমি ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু যখন প্রথম ফুটপাত এল? মানে জন্ম হল। কেন তার জন্ম? আজ যে উপকারে ফুটপাতের প্রয়োজন, সেদিন এই উপকারের জন্য ফুটপাত লাগবে—এ কথা কার মাথায় প্রথম এসেছিল? মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্লার্ক পথের ওপর খানা বুজিয়ে ড্রেন তৈরীর সময় এই ফুটপাতের কথা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন। পথের দুপাশে ড্রেনের ওপর দিয়ে লোক চলাচলের পথ করে দিলে লোকেরও উপকার হবে, আর ড্রেন সুরক্ষিত রাখারও সুব্যবস্থা হবে।

একথা যখন বাইরে প্রচারিত হল, তখন সাধারণ মানুষদের মাঝে ক্লার্কের প্রস্তাব খুব একটা শোরগোল তুলল। পথের পাশে বাড়ীর নীচের দোকানদারেরাও ক্লার্কের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে অভিনন্দন জানাল। খরিদ্দারদের পথে দাঁড়িয়ে জিনিস কেনা যে বিপদজনক; যে কোন সময় গাড়ী এসে তাদের ভবলীলা সাংগ করতে পারে—সেখানে ফুটপাত যে ব্যবসায়ীদের পরমবন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ক্লার্কের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে ব্যবসায়ীরা ফুটপাতের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠল। শেষে প্রশ্ন এল, খরচের কথা। এই বাড়তি খরচের জন্য দায়ী থাকবে কে?

তখন গ্যাসলাইট পথে ঝোলানর ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ী থেকে কুড়ি ফুট দূরে গ্যাসলাইট বসাতে হবে। অতএব এই কুড়ি ফুট স্থানটিকে নিয়ে লোক-চলাচলের জন্য ফুটপাত হোক। প্রথম ফুটপাত হল চৌরঙ্গীতে। পরীক্ষার জন্যে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই-সূত্রে কমিশনারদেরও সমর্থন করপোরেশনের ঠিকুজিতে দেখা যায়। (By Section 9 of Act XIV of 1856).
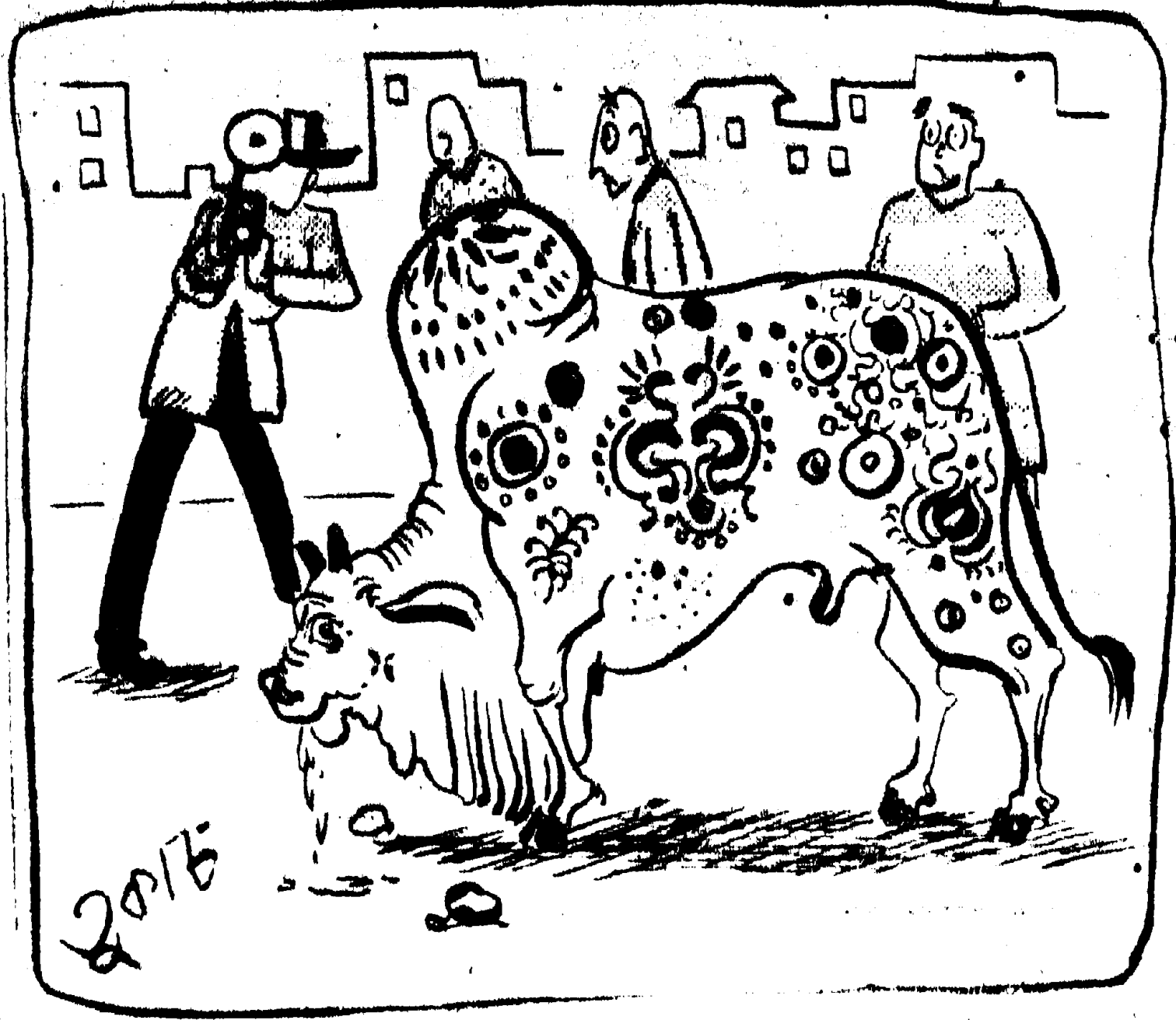
সর্বপ্রথম চৌরঙ্গীর সুরম্য পথের ওপর ফুটপাতের সৃষ্টি শুধু এক্সপেরিমেন্টের জন্য। কথাটা আজকের আধুনিক কলকাতার অধিবাসীদের ভাববার বিষয়। আজকের এই ফুটপাতকে ভুলে গিয়ে সেদিনের সেই ফুটপাতহীন পথের কথা ভাবুন। আর তারপর ভাবুন হঠাৎ ফুটপাত তৈরীর জন্য আলকাতরা, সিমেণ্ট, টালিপাথর, কাঁকর, সুরকী প্রভৃতি দ্রব্যাদি এসে পড়ল। কয়েকদিনের মধ্যে পথের দুপাশে ঢালাও ফুটপাত বিছানো হল। তার ওপর দিয়ে পথবাসীরা চলতে শুরু করল। সেদিন এমনি করেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। সেদিন ঐ পরীক্ষামূলক ফুটপাত করতে চার হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তারপর ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা যথাক্রমে ৬০০০ টাকা, ১৬,৭১১ টাকা ও ১৩,৩১৮ টাকা শুধু ফুটপাতের জন্য ব্যয় হয়েছিল। শহরের চারিদিকে যত ড্রেন তৈরী হতে শুরু হয়, ফুটপাতও তত বেশী শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৭০ মাইল বিস্তৃত পথ ফুটপাতের উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে।

ষণ্ড বিদায় উৎসবের একটি দৃশ্য

এর পর শহরের চারিদিকে বহু উন্নতি হতে থাকে। পথের দুপাশের বাড়ীগুলিও নতুনরূপে আবার সেজেগুজে দাঁড়ায়। রাস্তাও সাজে। রাস্তার পাশে অনেক অলিগলিরও সৃষ্টি হয়। সেইজন্যে ফুটপাতেরও আরও উন্নতি হতে থাকে। আগে বাড়ী-ভাঙ্গার রাবিশ, খোয়া-ইঁট প্রভৃতি পিটে ফুটপাতের সাময়িক শোভা বাড়ান হত। ১৯০২ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ফুটপাতকে পাকা করার তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়, এবং দেখা যায় ১৯১৩ থেকে ১৯১৪র মধ্যে ৬½ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখুন—শহরের এই ফুটপাত। আপনার পায়ের চাপে তার বক্ষ দমিত হলেও আবার তাকে সংস্কার করে পূর্বাবস্থায় ফেরানো হচ্ছে।

আরও একটি কথা এই ফুটপাত প্রসংগে এসে গেল—দেশবিভাগের পর থেকে উদ্বাস্তুদের স্বপ্ন এই ফুটপাত। এতটুকু বাসা যদি উদ্বাস্তু কখনও ভাবে—সে ঐ ফুটপাতের একটি কোণ। যেন সেখানে যুগ যুগ বাস করে বংশবৃদ্ধি করে সংসারের বাহাদুরী দেখিয়ে একদিন চোখ বুজতে পারে। না থাক ফুটপাতের মাথায় কোন আচ্ছাদন। রাত্রের নির্মল আকাশ যখন নক্ষত্রের বর্ণাঢ্যে মুগ্ধ হয়ে ওঠে তখন যে সমস্ত দিনের অনাহারও ভুলিয়ে দেয় ঐ আকাশপানে চেয়ে। তাই, কি দরকার মাথার ওপর আচ্ছাদন?

আর মনে পড়ে প্রত্যহ রাত্রে কলকাতার ফুটপাতের আর একটি ভূমিকা। হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে আপনাকে। এই ফুটপাত যদি সেদিন তৈরী না হত তাহলে যারা আজ এই ফুটপাতের ওপর শুয়ে রাত কাটায় তারা নির্ঘুম যন্ত্রণা নিয়ে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করত। রিক্সাওয়ালা, কুলি, ঠেলাওয়ালা, দোকানী, পথবাসী এই রকম কলকাতার বহু গৃহহারাদের রাতের আস্তানা এই ফুটপাত। বিশ্রামের তীর্থক্ষেত্র এই ফুটপাত এদের চিরকালের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১॥

মহাশ্বেতার নিজের কথাতেই, তার দুঃখের ভরা পরিপূর্ণ হ'লে তবে সে মায়ের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু শ্যামার আর ভাল লাগে না এ সব, তাঁর নিজেরই যথেষ্ট জ্বালা, যথেষ্ট দুর্ভাবনা। সে তুলনায় মহাশ্বেতা তো রাজরাণী। শুধু শুধু বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া বৈ তো নয়। এক এক দিন নিতান্ত অসহ্য হ'লে বলেই ফেলতেন মুখের ওপর, 'নে বাপু, তোর ঐ একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি আর নাকে কান্না থামা দিকি। সেই বলে না— মারবার না লোক থাকলে চালতাতলায় বাস। তা তোর হয়েছে তাই। নিজের ভাতার, নিজের ছেলেমেয়ে—তাদের তুই সামলাতে পারিস না—পরকে দোষ দিস কেন? হাতে পেলে আর কে কবে ছেড়ে দেয়! সবাই চায় নিজের দিন কিনে নিতে। তোর বুদ্ধি নেই তুই পারিস না—ওদের আছে ওরা পারে। তোর ভাগ্যের দোষ দে ওদের কি অপরাধ!'

এর পর—বলাবাহুল্য এক অবর্ণনীয় কাণ্ড হ'ত। মহাশ্বেতা রেগে কেঁদে মাথা খুঁড়ে চিৎকার করে বুক চাপড়ে পাড়ার লোক জড়ো করাত। আগে সত্যিই এদিক ওদিক থেকে লোক ছুটে আসত—এখন সবাই জেনে গেছে 'নতুন বামুনদের বড় মেয়ের মাথাটায় বাপু বেশ ছিট আছে। বদ্ধ পাগল।' এখন আর বড় একটা কেউ আসে না।

এই সব দিনে যাবার সময় বারবার প্রতিজ্ঞা করে যেত মহাশ্বেতা যে, সে আর কখনও বাপের বাড়ি আসবে না। বাপের বাড়ি তার ঘুচে গেছে, সপুরী এক গাড়ে গেছে তা সে জানে। তাই সে ধরে নেবে। আর কখনও এ-মুখো হবে না! ফের যদি কখনও এ-মুখো হয় তো তার নামে সবাই যেন কুকুর পোষে, গুয়ের জল গায়ে ছেটায়...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আবারও আসতে হয় তাকে ঠিকই। অন্য কোনও খবর থাকলে, মজাদার বা চটকদার কোন ঘটনা ঘটলে তার পরের দিন ছুটে আসতেও তার বাধা নেই। শ্যামা তা জানেন তাই তিনি ওর চেঁচামেচি কান্নাকাটিতেও বিচলিত হন না, শাপমন্যি দিব্যি দিলেসাতেও না! শ্যামার পুত্রবধূ কনকেরই অসহ্য লাগত প্রথম প্রথম, সে মৃদু অনুযোগ ক'রে বলত, 'কেন মা জেনে-শুনে ও পাগলকে ঘাঁটান! চুপ ক'রে শুনে গেলেই হয়!'

'আমার আর সহ্যি হয় না মা। একে আমার জ্বালাতনের শরীর, নিজের ভাবনা-চিন্তেয় বলে আমার নিজের ঘুম হয় না, তার ওপর কানের কাছে যদি নিত্যি ঐ সব মিথ্যে নাকেকান্না কাঁদে আর হা হুতাশ করে তো কার ভাল লাগে বলতো! হ্যাঁ, মা যদ্দিন ছিলেন আমিও মার কাছে গিয়ে পড়তুম কিন্তু সে যে কত দুঃখু কত কষ্ট বুকে চেপে চেপে রেখে, সে কেউ জানে না। বুক যখন ফাটবার মতো হ'ত তখন প্রাণ আসত ঠোঁটের ডগায়, তখনই ছুটে যেতুম। তাই কী সব কথা তাঁকে ব'লেছি? নিজের ভাতার-পুতের কেচ্ছা নিজের শ্বশুরবাড়ির খিটকেল কখনও বাপ-মায়ের কাছেও করতে নেই। আকাশের গায়ে থুতু দিলে সে থুতু নিজের গায়েই এসে পড়ে। বলে আহাম্মক নম্বর চার, ঘরের কথা করে বার। ঐ তো ওরই ছোট জা, দাঁতে দাঁত চেপে কী দুঃখুটাই না সহ্য করলে, কৈ একদিন ওকে কেউ বাপের বাড়িতে এমনিও খাওয়াতে ডেকে-ছিল! ছেলে পেটে [illegible] সাধ খেতে প্রথম বাপের বাড়ি গেল—মাথা উঁচু ক'রে!'

আবার কোন দিন বলতেন, 'ওর ঐ মিথ্যে কথাগুলো আমার সহ্য হয় না বাপু, তা তুমি যতই বল। কোনদিনই অসৈরণ কথা আমার ভাল লাগে না। এতটিতো সাত বাড়ি নিন্দে করে শ্বশুর-বাড়ির—তুমি একটা কথা বল দিকি, তখনই ফোঁস করে উঠবে। মায় ঐ মেজ-কর্তা মেজগিন্নি নিজেরা যাকে খাওয়া না দিয়ে জল খায় না, তারাও দেখবে তখন কত জ্ঞানবান বিচক্ষণ কত বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। তখন ওদের বিবেচনাই ধন্যি ধন্যি হবে। ওর ও রোগ মধ্যে মধ্যে খানিকটা কান্নাকাটি চেঁচামেচি না করে থাকতে পারে না। বাপ রে ওটা।...ছেলেগুলোকে নিজে [illegible] কলছে। কী সদাচার না ওর বাপ-কাকারা কে কত লেখাপড়া শিখেছে, তারা করে খাচ্ছে না? [illegible] বেড়াচ্ছে না। নিজেরা যখন [illegible] তাকে গাল দেবার দরকার [illegible] ছেলেদের পড়াশুনোর কথাটা মনে পড়ে! ওসব নাকে-কান্না আমার ভাল লাগে না।'

কিন্তু সেদিন বলাতে গেলে একটা অঘটনই ঘটল। মহাশ্বেতা এসে পড়ল লাফাতে লাফাতে, খুশিতে ডগোমগো।

হয়ে আহ্লাদে ফেটে পড়তে পড়তে। দূর থেকেই তার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন শ্যামা, মেয়ে এসে বাড়ি ঢুকতে তাই অন্য দিনের মতো নিরাসক্ত ভাব বজায় রাখতে পারলেন না, একটু উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই মুখ তুলে চাইলেন।

'নাঃ, তা যাই বলো বাপু ছেলেটার পয় আছে! মাওড়া অনাথ হ'লে কি হবে, আমার সংসারে এসে পয় ফলিয়েছে তা মানতেই হবে।'

'কে ঠাকুরঝি, কার কথা বলছেন?' কনক জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্নটা মায়ের কাছ থেকে এলে মহাশ্বেতা আরও খুশী হত। ঈষৎ একটু ভ্রূটা কুঞ্চিত হ'ল কনকের বাস্ততায়। তবু হাসি হাসি মুখেই হাত-পা নেড়ে বললে, 'ঐ মেজবৌয়ের বোমপোটার কথা বলছি। ঐ অরুণটার কথা। যাই হোক, ও আসবার পরই তো তোমার নন্দায়ের সুবুদ্ধি হ'ল তবু, দিদিরের কথা কইতে এল আমার সঙ্গে। কোনদিন তো এর আগে আমাকে মানুষের মধ্যেই গণ্যি করেনি, টাকা-পয়সার কথা আমার সঙ্গে যে কইতে হয় এ কখনও জানত না।...আর এ শুধু বলাই নয়, আমার একটা আয়ের পথও তো হ'ল। ছেলেটার পয় ছাড়া কি বলব বল, নইলে এমন অকালে সকাল, আমার হঠাৎ এমন বরাত খুলবেই বা কেন?'

এবার শ্যামাও আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। 'আয়' এবং 'বরাত খোলা' শব্দ দুটো তাঁর কাছে কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। আজকাল মেয়েকে দূর থেকে দেখলেই কপালে যে বিরক্তির রেখাটা পড়ে সেটা মুছে গিয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, 'কী রকম, কী রকম। হঠাৎ বরাতটা কী খুলে গেল শুনি? জামাই তোর নামে সম্পত্তি কিনেছে?'

'তবেই হয়েছে! সেদিন পুবের সূয্যু পশ্চিমে উঠবে। তা নয়—অত আশা আমার নেইও। আমার কাছে দু পয়সা আয়ের পথ হলেই ঢের। দাঁড়াও আগে বসি একটু, দম নিই। বলছি তারপর!'

অর্থাৎ বেশ ঘটা ক'রেই বলবার মতো কথাটা।

শ্যামা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নারকেল পাতা চেঁচে খ্যাংরা কাঠি বার করছিলেন, তিনি পাতাগুলো এক দিকে সরিয়ে একটু জায়গা করে দিলেন। কনক তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একটা পিঁড়ি পেতে দিলে। চোপচাপ বসে কিছুক্ষণ স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল মুখে মা আর বৌদির দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। যেন খুব মজার কোন কথা বলে তার ফলাফলটা দেখছে এখন।

শ্যামা ওর ভাবগতিক দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বললেন, 'নাও, তোমারি দম নেওয়া হ'ল? এখন কী মৎলবে এসেছ কথাটা খুলে বল দিকি, অমন থিয়েটারের য়্যাক্টো করতে হবে না!'

মনের পাত্রে তৃপ্তি আর বিজয়-গর্ব তখন উছলে উঠেছে মহাশ্বেতার তাই এসব তুচ্ছ খোঁচা গায়ে মাখলে না। হাসি হাসি মুখে বললে, 'বলি মাথার ওপর ভগবান আছেন তো গা! দিনকে রাত বলে কতকাল চালানো যায়? এক-দিন না একদিন ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন না?......চিরকাল মোট মোট টাকা এনে ঐ দুই রাজারাণীর শ্রীপাদপদ্মে ঢেলেছেন, যত কিছু উপার্জন গোদাপদে সমর্পন! কী না আমার ভাই-ভাজ খুব ভাল। লক্ষ্মণ ভাই। ও-ই সবাইকে দেখবে।...তা এবার চোখটা একটু খুলল তো? মানুষটা বেঁচে থাকতেই এই, চোখ বুজলে কী মূর্তি ধরবে তা বুঝছে না এবার? হাড়ে হাড়েই বুঝছে। তবে ঐ, ভাগ্যে তো মচকায় না ওরা! তেমন ঝাড়ের বাঁশ নয় কেউ। ওরা মরে তবু মর্যাদা হারায় মা। সব সব, বুঝলে ও সব সমান। ছেলেগুলো পঞ্চজন্ত দ্যাখো না—লেখাপড়া করে না কিছু না, কথা কইতে যাও দিকি, মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে দেবে একেবারে। কত এম-এ বি-এ পাস লোক থ হয়ে যায় ওদের মুখের সামনে!'

এবার শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বঁটিখানা দেওয়ালের খাঁজে উপুড় ক'রে রেখে পাতারই একটা ফালি বার ক'রে নিয়ে ঝাঁটার কাঠিগুলো বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'তুমি দেওয়ালের সামনে বসে বক্তিমে করো মা, আমি উঠলুম, আমার কাজ আছে!'

'রোস রোস। আমার আসল কাজটাই যে বাকী গো। বাবা তুমি যে একেবারে সব্বক্ষণ ঘোড়ায় জীন কষে আছ দেখতে পাই।...তবে কাজের কথাই সেরে নিই। অ বৌদি তুই একটু ওধারে যা ভাই, মার সঙ্গে দুটো পেরাইভেট কথা আছে!'

তারপর গলাটা নামিয়ে—ও ঘর থেকে কনকের শুনতে কোন রকম বাধা না হয় এমন পর্দাতেই ফ্যাস ফ্যাস ক'রে বললে, 'দুশোটা টাকা দিতে হবে আমাকে এখুনি—তোমার জামাইয়ের দরকার!'

এইবার শ্যামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। অন্ধকারও হয়ে উঠল বলা যায়। আর যাই হোক, ঠিক এ আক্রমণটা আশঙ্কা করেন নি তিনি। মেয়ের খুশির তালটা যে তাঁর ওপর এসে পড়বে তা একবারও ভাবেন নি।

প্রায় মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'হঠাৎ? জামাইয়ের কী দরকার পড়ল? আমার কাছে তোর টাকা থাকে জামাই জানলেই বা কি করে?'

'না, মানে তোমার জামাইয়ের দরকারও বলতে পার, আমার দরকারও বলতে পার!'

'ঘোরপ্যাঁচ ছেড়ে একটু খোলসা করেই বল না কথাটা বাছা!'

'ঘোরপ্যাঁচের আর আছে কি। আমিই বলেছি তাকে টাকাটা দেব।

এখানে টাকা আছে তাও আমিই বলেছি।'

মেয়ের কণ্ঠে তাপের আভাস পেতেই শ্যামার কণ্ঠের তাপটা কমে আসে। এ তাপ মালিকানার তাপ, এর চেহারাটা শ্যামার চেনা আছে। যার টাকা সে চাইছে, এর মধ্যে কোন অনুরোধ কি অনুনয় নেই। এর ওপর কোন কথাও চলবে না।

বেশ একটু নরম গলায় প্রশ্ন করেন তিনি, 'তা হঠাৎ? জামাই-এর হঠাৎ টাকার দরকার হল যে! সম্পত্তি কিনবেন নাকি কোথাও?'

'তবে বাপু খোলসা করেই বলি কথাটা। কাউকে যেন বোল নি। শোন্। ওদের আপিসে নাকি দু-তিনটে নতুন সায়েব এসেছে—তাদের খুব জুয়োর বাই। শনিবারে শনিবারে রসার মাঠে কী ঘোড়দৌড় না কি হয়, সেখানে গিয়ে মড়-মড় টাকা ঢেলে আসে। এর জন্যে নাকি দুচোকোর ব্রত দেনা করে যেখানে পায়। আর মোটা মোটা টাকা সুদ গোনে। একশ' টাকায় এক মাসে পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা সুদ। অফিসের বেয়ারা দারোয়ানগুলো সব লাল হয়ে গেল সুদ খেয়ে খেয়ে। তাই দেখে ওর মাথায় ঢুকেছে কথাটা যে খোট্টা দারোয়ানগুলো এত পয়সা কামাচ্ছে—তবু ওদের কিছু নেই—আর আমরা এত টাকা নিয়ে বসে আছি আমরা কামাতে পারব না! তা পেরথম পেরথম কাউকে বলে নি, নিজেই দু-চার টাকা যা নিজের হাতে ছিল দিয়েছে। মাস কাবারে পেয়েওছে সুদে আসলে সব টাকা। বলি টাকা তো হাতের মুঠোয় গো. মাইনে তো নিতে হবে, ঐখেনে তো টিকি বাঁধা সব!'

এই পর্যন্ত বলে, বোধ করি দম নেবার জন্যেই একটু থামে মহাশ্বেতা। কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বুদ্ধিমানের মতো বলতে পেরেছে এর জন্য একটু আত্মপ্রসাদের হাসিও হাসে।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। কথাটা এত সহজ নয়, এর মধ্যে কোথাও একটা বড় রকম গোলমাল আছে। সেই গোলমালটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মনে মনে।

মহাশ্বেতাই আবার শুরু করলে। পূর্ব প্রসঙ্গের খেই ধরে বললে, 'তা কথাটা তাই কাল হাটি-পাটি পেড়ে লক্ষ্মণ ভাইকে বলতে গেছল! আমি তো আজকাল সেয়না হয়ে গেছি কিনা. যখনই দেখি আপিস থেকে ফিরে বড় ভাই গিয়ে মেজ ভায়ের ঘরে সেঁদিয়ে দোর দিলে, তখনই জানি যে এবার বিষয়-কম্মের ব্যাপার কিছু হবে। আমিও আজকাল সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আড়ি পাতি। তাতেই তো সব শুনলুম, নইলে কি আর আমাকে এ সব কথা ও নিজে থেকে বলবে? তবেই হয়েছে! সেই লোকই কিনা!'

কথাটা আবারও সোজা রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে দেখে অসহিষ্ণু শ্যামা প্রশ্ন করলেন, 'তা মেজকর্তা কি বললে?'

'সব বিত্তান্ত বলে বড়কত্তা বললেন, আমাকে তুমি বেশী না শ-তিনচার টাকা দাও, ছ মাসে আমি ডবল ক'রে দিচ্ছি। তা মেজকত্তার মত হ'ল না। তিনি বললেন, না দাদা এসব কাজ ভাল না। এইভাবে ধার করতে করতে একদিন এমন হবে যখন আর মাইনের টাকায় কুলোবে না। তাছাড়া এর কোন লেখাপড়া নেই। সুদ নিচ্ছ তুমি কাবুলিওলার বাড়া, কোম্পানীকে বলতে গেলে কোম্পানীও শুনবে না। লেখাপড়া যদি করেও দেয় তবু কোম্পানী তার টাকা কেটে তোমাকে দেবে না। বলবে যেমন লোভ করতে গেছলে তেমনি তার ফল ভোগ করো গে।...তোমার জামাই কত বুঝিয়ে বললে, বললে, আমি তো দিনরাত ঐখেনে পড়ে আছি, আর এতো মোটা কিছু টাকা নয়, আমি যদি অল্প দিনে আসলটাকে ডবল করে নিতে পারি শেষ পজ্জন্ত না হয় কিছু টাকা ডুবলই। তাতে তো আর লোকসান নেই। তা মেজ-কত্তার বুদ্ধি বেশী—বললেন, না, লোভ মানুষের বেড়েই যায়, দেখো তুমি ও সুদের টাকাও সরিয়ে রাখতে পারবে না সবসুদ্দ খাটাবে, যাবে যখন সবসুদ্দুই যাবে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, বেশী লোভ ভাল না! তার চেয়ে যেমন আছি তেমনি থাকি!'

'অম্বিক ঠিকই বলেছে। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—এ সবও জুয়া খেলা। তাছাড়া ওরা সায়েব জাত, হঠাৎ রাতা-রাতি সরে পড়লে আর কোথায় তাদের পাত্তা পাবি যে টাকা আদায় করবি? না বাপু দরকার নেই তোরও ওসবে গিয়ে। ঐ তো কটা টাকা! গেলে আর দুঃসময়ের সম্বল বলতে কিছু থাকবে না!'

'দ্যাখো' অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার কণ্ঠ, 'তোমার জামাইয়ের চেয়ে টাকাটা বেশী বোঝে—এমন মানুষ তো আমি কই আর দেখলুম না। বলি আজ যে মেজকত্তা সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা দিয়ে বসে আছেন সে টাকাটা আনলে কে? সে কি ও'র রোজ-গারের টাকা? আজ যদি আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গি? যুদ্ধের সময় চোরাই লোহা চালান করে শয়ে শয়ে টাকাটা কে রোজগার করেছিল? তাতে ঝুঁকি ছিল না? ধরা পড়লে যে একেবার পুলি-পোলাও দেখিয়ে দিত। তখন এসব ধম্মের বুলি কোথায় ছিল! তা তো নয়, এখন টাকাটা গুদোমজাত করে বসে আছি, নাড়ছি চাড়ছি হাত বুলোচ্ছি সোনার বাটে—এখন বার করতে বড় মায়া লাগছে আর কি! হাড্ডোল বেইমানের জাত রে! যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে দই!'

এর পর আর টাকাটা না দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ লোককে বোঝাতে যাওয়াও বৃথা। হিতে বিপরীত হবে। হয়ত এর চেয়েও কটু কথা শুনতে হবে নিজেকেই। শ্যামা আর কথা বাড়ালেন না। পাতা চাঁচবার জন্যে একটা খাটো কাপড় পরে ছিলেন, সেটা ছেড়ে ভিজে গামছা পরে গিয়ে ঘরের দোর দিয়ে কোথা থেকে হাতড়ে হাতড়ে দুশোটি টাকা বার করে এনে নিঃশব্দেই মেয়ের সামনে ফেলে দিলেন।

মহাশ্বেতা টাকাগুলো নিয়ে পেট-কাপড়ে বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'আমিও তেমন বাপের বেটি নই বাপু! যেমন মেজকত্তার ঘর থেকে বেরোল অমনি আমি ইসারা ক'রে ডেকে নে এসে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিলুম। তা মানুষ তো নয় পাথর—ওকে শোনানোও যা দ্যাল-টাকে শোনানোও তা। তবু মনের ঝালটা তো মিটিয়ে নিলুম। আর মুখে না মানুক. ভেতরে ভেতরে তো বুঝেছে!... ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়ে বললুম,

আমাকেংতো কোনদিন বিশ্বাস কর না, আমার হাতে ভরসা করে কখনও টাকাও দিলে না। তবু আমিই তোমার মান রাখব। আমি তোমাকে এনে দেব দুশো টাকা' তখন একটু অবাক হ'ল, মুখটা একটু ওজ্জ্বলও হ'ল। বললে, তুমি কোথায় পাবে? আমি তা বলে অত বোকা নই যে সব টাকার সন্ধান দেব। আমি বললুম সে আমি এনে দেব যেখান থেকে পাই। মোদ্দা সুদটা ঠিক ঠিক আমাকে এনে বুঝে ক'রে দিও, সেটা আবার যেন নিয়ে গিয়ে 'ঐ শ্রীপাদপদ্মে ঢেলোনি। তা বলে, না না—পাগল। তোমার টাকায় সুদ তুমিই পাবে। ......তাই এই ছুটে এলুম।'

এতক্ষণে আনুপূর্বিক ইতিহাস শেষ করে উঠে পড়ল সে।

'যাই, আবার এতটা পথ এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে যাওয়া তো, ভয় করে। ভেবেছিলুম দুপুরবেলা আসব, তা ও বিনিমাইনেরী চাকরির কি ছুটি আছে! খোকাটা কোথায় গেল, এগিয়ে দিয়ে আসত একটু!'

'ঐ বাগানে কী করছে বোধ হয়। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যা। সাবধানে যাস একটু। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।'

শুষ্ক বিরস কণ্ঠে কর্তব্য পালন করেন শ্যামা। তাঁর মুখের অপ্রসন্নতাও ঢাকা থাকে না। কিন্তু মহাশ্বেতার তা লক্ষ্য করবার কথা নয়, করলও না—খুশী মনেই বৌদিকে ডেকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

এ গাঁ ও গাঁ বটে, এপাড়া ওপাড়াও বলা যায়। সবসুদ্ধ তিন-পোয় বেশী নয়, এটুকু পথ হাঁটতে এখানে কারুরই গায়ে লাগে না।

॥ ২ ॥

শ্যামার এ বিরসতার কারণ আছে বৈকি। টাকাটা যদিও মহাশ্বেতার, এবং সে জমাই রাখতে দিয়েছে মাকে, তবু এইটেই এখন শ্যামার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সব টাকাই অভয়পদ এনে ভাইকে ধরে দিত—এখনও দেয়। মাইনের টাকাই শুধু নয়—উপরির টাকাও, সৎ অসৎ সর্ববিধ উপার্জ্জনের টাকাই। এই নিয়ে মহাশ্বেতার অশান্তির অন্ত ছিল না। সে অশান্তি অবশ্য মুখ ফুটে অভয়পদকে জানাবার বা এই নিয়ে তার সঙ্গে কলহ-কাজিয়া করার সাহস কোনদিনই তার হ'ত না, যদি না পিছন থেকে শ্যামা তাকে নিরন্তর উত্তেজিত করত। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই নিজের দাবি জানিয়েছিল মহাশ্বেতা এবং তার ফলে অভয়পদও দু-চার টাকা মধ্যে মধ্যে দিতে শুরু করেছিল। চেয়ে নেওয়া ছাড়াও ইদানীং সাহস বেড়ে যেতে পকেট থেকেও দু-এক টাকা করে সরাতে শুরু করেছিল। অভয়পদ তা টের পেত—আর টের যে পেত সে কথাটাও সে মহাশ্বেতাকে জানিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু তা নিয়ে রাগারাগি করেনি। মহাশ্বেতা তাতেও কতকটা প্রশ্রয় পেয়েছিল।

তবু সে কতই বা! বেশী টাকা না বলে নেবার সাহস মহাশ্বেতার আজও হয়নি। সুযোগও কম। তেমন বাড়তি টাকা ওর পকেটে পড়ে থাকে কদাচিত। সুতরাং সব জড়িয়ে মহাশ্বেতার জমানো টাকার পরিমাণ ছ-সাতশ'র বেশী ওঠেনি এখনও পর্যন্ত।

টাকাটা যতই হোক—শ্যামার কাছে অনেক। জামাইয়ের কাছে তাঁর কিছু ঋণ আছে, এই বাড়িখানা করার দরুণ, সে টাকাটা আজও শোধ দিতে পারেন নি। কিছু কিছু যে দিতে পারতেন না তা নয়—কিন্তু ইতিমধ্যে উপার্জ্জনের একটা নতুন এবং অভিনব পথ আবিষ্কার করেছেন, তা হচ্ছে সুদে টাকা খাটানো। এ পাড়ার থালা বাটি গেলাস রুপোর বাসন—দৈবাৎ কখনও সোনার গহনা রেখেও টাকা ধার করতে আসে অনেকে। বেশী টাকায় শ্যামার উৎসাহ কম। চার আট আনা ধার দেওয়াতে সুদ বেশী আদায় হয়। টাকায় এক পয়সা সুদ, আট আনা চার আনাতেও এক পয়সা। কারণ, পয়সা ভেঙ্গে সুদ দেওয়ার নিয়ম নেই।

এ পথটা একদিন অকস্মাৎ আপনিই খুলে গিয়েছিল। শ্যামাও সুযোগটা বুঝতে ও তার সদ্ব্যবহার করতে ইতস্তত করেন নি কিছু মাত্র! সেই থেকে জামাইকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন। জামাইও তাগাদা দেয় না অবশ্য, হয়ত সে ফেরৎ পাবার আশাতে ঠিক দেয়ও নি, তবে শ্যামা দেবেন ঠিকই। আপাতত যা হাতে আসে সুদে খাটান, এই সুদ বা সুদের সুদ থেকেই একদিন এ ঋণটা শোধ হয়ে যাবে এ ভরসা তাঁর আছে।

তোমার জামাইয়ের চেয়ে টাকাটা বেশী......

মেয়ের টাকাও এই কারবারে খাটে তাঁর। অবশ্য মেয়েকেও তিনি এই লাভ বা সুদের কিছু অংশ দেবেন, অন্তত মনে মনে এ রকম শুভ ইচ্ছা এখনও আছে। মেয়েকেও সে কথা শুনিয়ে রেখেছেন। তবে সে হিসেব ক'রে চুলচেরা রকমের কিছু নয়, সেভাবে হিসেব নেইও তাঁর। মেয়েকে যখন টাকাটা বুঝে দেবার সময় হবে তখন একটা আন্দাজী আয় ধরে ঠাওকো থোক কিছু ধরে দিলেই চলবে। সে পরের কথা। এখন যদি আসলই বেরিয়ে যায় এইভাবে হাত থেকে—।

ভাবতেই খারাপ লাগছে শ্যামার। একদিন এমনিই, বলতে গেলে খেলাচ্ছলে এ কারবার আরম্ভ করেছিলেন, সেটা যে এমনভাবে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা আজকের আগে তিনিও বুঝি এমনভাবে অনুভব করেননি। অবশ্য সব টাকাটা খাটছে না এটা ঠিক—নইলে চাইবা-মাত্র বার ক'রেই বা দিলেন কি ক'রে—তবু মহাজনের হাতে টাকাটা সব সময় থাকা দরকার। নইলে এ কারবারের ইজ্জৎ থাকে না। মক্কেলও হাত-ছাড়া হয়ে যায়। 'নেই নেই' শোনাতে হয়, খুব অনিচ্ছাতে দিচ্ছেন এমন ভাবও দেখাতে হয়—তবু শ্যামা ফেরান না প্রায় কাউকেই। কারণ তিনি জানেন যার এমন ঠেকা, বাসন কি গয়না রেখে ধার নিতে এসেছে, সে নেবেই—তিনি ফেরৎ দিলে অপর জায়গা থেকে নেবে—মাঝখান থেকে তিনি সুদটা ক্ষোয়াবেন কেন? তা ছাড়া নতুন পথ পেলে পরেও হয়ত সেই পথেই চেষ্টা দেখবে, অর্থাৎ ঘরটাই নষ্ট হয়ে যাবে চিরকালের মতো।

অথচ এখন কীই বা করা যায়?

এ টাকাটা গেছে যাক, কিন্তু এখানেই যে ওরা থামতে পারবে না তা শ্যামা বুঝতে পারছেন। এ বড় সাংঘাতিক লোভ, প্রায় জুয়ার নেশার মতোই। আবারও আসবে, আবারও চাইবে। এক উপায়—হাতে নেই, সুদে খাটছে বলা কিন্তু তা হ'লেই অনুমানের ঘরে সুদের অংকটা বাড়তে থাকবে মেয়ের মনে—আশাটা বেড়ে যাবে। তখন আয়ের হিসাব চাইবে সে।

নাঃ, সেও কোন কাজের কথা নয়।

তবে?

এই তবেটাই ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বহুক্ষণ স্বব্ধভাবে বসে রইলেন শ্যামা। তাঁর ভাবগতিক দেখে কনকেরও বিস্ময়ের সীমা রইল না। এখনও আকাশে আলোর আভাস আছে, এখনও পুরোপুরি অন্ধকার নামেনি ওদের উঠোনের কাঁঠালগাছ কলাগাছের ছায়ায়—এখনই এমনভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা স্থির হয়ে—এ শ্যামার পক্ষে একেবারেই অভিনব। কনকের অভিজ্ঞতায় অন্তত এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।

কারণটা শুনলেও অবশ্য কনক বুঝত না। বরং আরও হাস্যকর মনে হ'ত। পরের টাকা ও'র কাছে খাটত, না হয় আর খাটবে না। এটা তো একটা বাড়তি আয়, এর ওপর ভরসা ক'রে কিছু ও'র সংসার চলছে না, তাছাড়া মেয়ের টাকাটা সব বেরিয়ে গেলেও ও'র কারবার একেবারে অচল হবে না—তবে?

কনক বুঝতে পারত না কারণ সে অনেক পরে এ বাড়িতে এসেছে। আভাসে ইঙ্গিতে, মেজোঠাকুরঝির কথা থেকে, মহাশ্বেতার কদাচিত কোন বেফাঁশ কথাতে—সে কিছু কিছু পূর্ব ইতিহাসের আঁচ পেয়েছে; কিছু বুঝেছে সে তার শ্বশুরের মৃত্যুর সময়—তাঁকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে—কিন্তু তবু সবটা সে জানে না, সে ইতিহাস তার কল্পনার অতীত।

শ্যামার শ্বশুররা ছিলেন খুব নাম-করা গুরু বংশ। বাড়িঘর শিষ্য-যজমান বিষয়-সম্পত্তি সব দিকেই প্রাচুর্য দেখে শ্যামার মা রাসমণি মূর্খ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন। ঠিক অত সহজে, অত অল্পদিনে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে সত্যি-সত্যিই তাঁর মেয়েকে পথের ভিখিরী করবে সে ছেলে, তা তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি। যা ছিল বসে খেলেও তাতে দু'পুরুষ কেটে যেতে পারত। আর রাসমণিও অসহায় বিধবা মেয়েছেলে—অভিভাবকহীন, সহায়-সম্পত্তিহীন—তিনিই বা করবেন কি? ঘটক ঘটকীর ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁর তো উপায় ছিল না। ছেলে মূর্খ এটা জেনেছিলেন কিন্তু সে যে অমানুষ এটা জানতে পারেন নি।

শ্যামার স্বামী নরেন আর ভাশুর দেবেন—সেদিক দিয়ে দুজনের কেউই কম কৃতী নন। ও'দের বাড়ি বাগান প্রভৃতি সব যখন খিদিরপুর ডকে পড়ল তখন নতুন বাড়ি খোঁজার অছিলায় ও'দের গুপ্তিপাড়ায় এক শিষ্যের খালি বাড়িতে রেখে এসে দুই ভাই-ই প্রাণখুলে উড়তে শুরু করলেন। বাড়ির টাকা, সরকার থেকে পাওয়া, সে আর কদিন, তারপর অন্য বিষয়ও ভাগ করে নিয়ে দুজনেই জলের দামে বেচে দিলেন, ওড়ার ব্যবস্থাটা রইল অব্যাহত। তারপর একদিন অবশ্য আবার মাটিতে পা দিতে হ'ল কিন্তু তখন সে সমস্ত টাকাই উড়ে চলে গেছে—রেখে গেছে দুজনের শরীরে কিছু কুৎসিত ব্যাধি। দেবেন তবু নিজেকে সামলে নিলেন, সামান্য কিছু ওষুধ

সংগ্রহ করে আরাম্ভে গিয়ে 'ডাগদারি' শুরু করলেন (ওদেশে ডাক্তারি করার জন্য নাকি চিকিৎসা শাস্ত্র জানবার দরকার ছিল না!) এবং স্ত্রীপুত্রকে ভরণপোষণ করার মতো আর্থিক অবস্থাও করে নিলেন। কিন্তু স্বভাবকে বা অভ্যাসকে কিছুতেই সংযত করতে পারলেন না নরেন। তার ফলে বহু দুর্গতির মধ্যদিয়ে এসে অবশেষে আশ্রয় যোগাড় করলেন পদ্মগ্রামের সরকারদের বাড়ি পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে। তবু সেটুকু আশ্রয়ই সেদিন শ্যামার কাছে স্বর্গের চেয়ে দুর্লভ ছিল, কারণ তার আগে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল অবস্থায় একটি শিশু এবং বৃদ্ধা শাশুড়িকে নিয়ে যেভাবে দিন কেটেছে তা একমাত্র তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।

এই পূজারীর কাজটাও যদি মন দিয়ে করতেন নরেন তো হয়ত সংসারটা দাঁড়াতে পারত। কিন্তু একেবারেই ভবঘুরে স্বভাব হয়ে গিয়েছিল—তাঁর মন কিছুতেই এক জায়গায় বাসা বাঁধতে পারত না। তাছাড়া কুসংসর্গটা অভ্যাস থেকে স্বভাবের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল—সে লোভেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ত তাঁকে। দু'মাস, ছ'মাস কখনও বা এক বছর দেড় বছর অন্তর হুতাশনের মতো এসে পড়তেন কোথা থেকে, কখনও কিছু—চাল ডাল ময়দা বা পুরোপুরি একটা সিধা—সঙ্গে আনতেন, কখনও বা দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের মতো এসে এদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসিয়ে কিছুদিন পরে শ্যামার হতদরিদ্র সংসার থেকেই কিছু চুরি করে আবার সরে পড়তেন নিজের অজ্ঞাতবাসে। এ প্রায়ই হ'ত। কী করে যে এই একেবারে অচল অবস্থা সচল রেখেছিলেন শ্যামা, এমন একান্ত প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন আর করে—টিকেছিলেন শুধু নয়—দাঁড়িয়েও ছিলেন শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে—মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ি করে ভবঘুরে স্বামীকে শেষ-নিঃশ্বাস ফেলবার, নিজস্ব আশ্রয়টুকু দিতে পেরেছিলেন—সে ইতিহাস, কনক তার চিন্তাশক্তিকে যত উচ্চপ্রসারী পাখা মেলে কল্পনার সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনুক—সেই সত্য ইতিহাসকে কোনদিন স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।

হ্যাঁ, বড়জামাই অভয়পদ অবশ্য অনেক সাহায্য করেছেন—যদিচ ঠিক কতটা করেছেন তা শ্যামা ছাড়া কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানেন না; এমন কি মহাশ্বেতাও নয়। ('মুখপোড়া মিনসে কি কোনকালে কোনকথা খুলে বললে ওকে! ওরই বাপের বাড়ির কথা চিরকাল ওর কাছে ঢেকে ঢেকে ম'ল। মরে আগুন বুদ্ধির!) —তবু এ দাঁড়ানো যে কী দাঁড়ানো, কী অমানুষিক চেষ্টা, কী অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি এবং কী উত্তুঙ্গ উচ্চাশা থাকলে যে এই পুনরুত্থান সম্ভব—তা কনক কেন আর কেউই কোনদিন ধারণা করতে পারবে না। আর তা না থাকলে সহস্র অভয়পদ পাশে এসে দাঁড়ালেও এভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হ'ত না। হয়ত বড়-জামাইও সেটা বুঝেছিল, নইলে সে-ও এমন ক'রে পাশে এসে দাঁড়াত না। তাকেও প্রায় বাল্যকাল থেকেই জীবনের সঙ্গে লড়াই ক'রে একটি পয়সা বাঁচাবার জন্যও একান্ত সাধনা ও প্রাণপাত পরিশ্রম করে একদা শিশু ভাইবোনদের মানুষ করতে হয়েছিল। সেই দুর্লভ অথবা দুর্লভতর শক্তি শাশুড়ির মধ্যে প্রত্যক্ষ ক'রেই সে সম্ভবত নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল।

সুতরাং আজ যদি পয়সা সম্বন্ধে একটা মোহই পেয়ে বসে থাকে তাঁকে, উপার্জন করাটা যদি নেশায় পর্যবসিত হয়ে থাকে তো শ্যামাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজ তাঁকে সারা দিন-রাত পাতা কুড়িয়ে জড়ো করতে বা নারকেল পাতা চে'চে ঝাঁটার কাঠি সঞ্চয় করতে দেখে যারা হাসে তারা এ ইতিহাস জানে না বলেই হাসে, আর হাসবেও চিরকাল, কারণ আর কেউই জানবে না। কোনদিনই না। সেদিনের যারা প্রধান সাক্ষী—হেম আর মহাশ্বেতা—তাদের স্মৃতিতেও কি বর্তমানের সূক্ষ্ম সাদা পর্দা পড়ে যাচ্ছে না? অতীতের কথা আর বুঝি তাদেরও তেমন করে স্মরণ করা বা অনুভব করা সম্ভব নয়। হয়ত তারাও এখনই হাসে মনে মনে, অথবা বিরক্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য সমাচার

।। হেরমান হেস ।।

হেরমান হেস মারা গেছেন। এদেশের সংবাদপত্রে চরম ঔদাসীন্যের মধ্য দিয়ে সংবাদ প্রচারিত হল। ভাবতে অস্বাভাবিক লাগে মানুষ মানুষকে কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। শ্রেষ্ঠ রচনাশৈলী, ভাষা বৈদগ্ধ্য, মহান শিল্প প্রতিভা নিয়ে যে মানুষটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই সহমর্মী মানুষরা তাঁকে দূরে ঠেলে দিল। তাই মনে হয় চিরকালের স্তব্ধ আঁধারে হয়ত বিলীন হয়ে যাবেন অনাগত ভবিষ্যতের দু-এক পাতার মধ্যে! কিন্তু হেস কোনদিন মানুষকে ভুলতে চাননি। তাঁর রচনায় শিল্প গুণের ঊর্ধ্বে যে মহান দরদী মানুষটিকে দেখা গিয়েছিল আজকের মানুষ সে কথা ভুলে গেলেও আগামীকালের মানুষ এতটা ভুল করবে কি!

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান ঔপন্যাসিক ও কবি হেরমান হেস গত ৯ই আগষ্ট সুইজার-ল্যান্ডের মনট্যাগনোলাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। ১৮৭৭ সালে জার্মানীর স্বাবিয়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে এসেছিলেন ভারত পরিভ্রমনে। পিতা এবং পিতামহ ছিলেন ভারতে মিশনারীদের ধর্মমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। হেস ভারত পরিভ্রমনে এসে ভারতীয় চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু তিনি ধর্ম সাধনাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে কোনদিনই স্বীকার করে নিতে পারেননি। যুক্তিবাদী মন তাঁকে বাস্তব জীবনের চিন্তাধারায় জাগ্রত রেখেছিল। যুদ্ধবিরোধী চিন্তাধারা হেসের এই যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিৎপ্রকর্ষেরই লক্ষণ। যুদ্ধের প্রতি যে তীব্র অনীহাবোধ গড়ে উঠেছিল তৎকালীন জঙ্গীবাদী শাসনতন্ত্র তাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তাঁর জার্মানীতে বসবাস করা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে ওঠে। এমন কি জার্মানী তখন তার পক্ষে নিরাপদ ছিল না। প্রাণসংশয় দেখা দিতে পারে যে কোন সময়। বাধ্য হয়ে তিনি সুইস নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডই ছিল তাঁর একমাত্র শান্তিনিকেতন।

টমাসমানের সমপর্যায়ী খ্যাতিবান লেখক হিসাবে হেস প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৯০৪ সালে 'পিটার কামেন-জিন্ড' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরই সমগ্র জার্মানীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৯ সালে হেসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনও সুলেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি।

হেসের রচনায় ভারত ভ্রমন যে কত গভীর ছাপ ফেলেছিল তার পরিচয় কয়েকটি গ্রন্থে সুস্পষ্ট। বিশেষকরে সিদ্ধার্থ, দ্যমিয়ান এবং দ্যর স্টিফেন-উলফ-এর নাম করা যায়।

হেসের কবিতা প্রবন্ধ এবং উপন্যাস নিয়ে চারদিকে যখন প্রশংসার ঝড় বয়ে চলেছে তখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হলেন। অর্থাৎ তাঁকে ১৯৪৬ সালে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল। কিন্তু একটি আশ্চর্যের বিষয় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক হিসাবে হেস দেশ-বিদেশে খুব বেশী সমাদৃত অথচ আলোচিত নন। বহুদেশের বহু ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সমালোচকের গভীর দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েনি। বিশেষ করে ইদানিংকালে হেস একজন হারিয়ে যাওয়া লেখক, যদিও তাঁর নাম অনেকের মুখেই শোনা যায়। কিন্তু তাঁর পাঠকের সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে অল্প। কিন্তু ক্রম-উত্থান পর্যায়ে হেস জার্মানীতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিলেন গোটে পুরস্কার। 'পশ্চিম জার্মান বুক ট্রেডে'র শান্তি পুরস্কার পান ১৯৫৫-তে। এই দুর্লভ সম্মানটি লাভের অধিকারী প্রত্যেক জার্মান মাত্রেই গর্বিত। জুরিখ থেকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি হিসাবে 'গট ফ্রায়েড-কিলার' নামে যে পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। হেস সে দুর্লভ সামগ্রীটিও সংগ্রহ করেছিলেন। এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয় ১৯৩৬ সালে।

হেস যুদ্ধপরবর্তীকালের জার্মান সাহিত্য ধারায় এক ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেন। তরুণ জার্মান সাহিত্যিকগণ হেসের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। গভীর মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী সৃষ্টিতে যুদ্ধোত্তরকালে জার্মান সাহিত্য ক্ষেত্রে যে স্মরণীয় প্লাবন আসে হেসের অবদান সেখানে অসামান্য। বিশেষকরে হেসের উপন্যাসগুলির কথাই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথম উপন্যাস থেকে শেষতম রচনার মধ্যে মানব চরিত্রের দ্বৈতরূপের সমন্বয় সাধনের এক অসীম প্রয়াস পরিদৃশ্যমান। সাহিত্য চিন্তায় যে স্বতন্ত্র মেজাজ নিয়ে এসেছিলেন তার গতি পরবর্তীকালের রচনায় ভিন্ন পথে প্রবাহিত হলেও ঐ একটি বস্তুর সাদৃশ্য যেন সকল জায়গায়ই মেলে। তাই যুদ্ধোত্তরকালের জার্মান কথা-সাহিত্যিকরা হেসকে অনুসরণ ও অনুকরণ উভয়ভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন, একালের জার্মান সাহিত্যে হেস যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

প্রথম উপন্যাস রচনার পরবর্তী সময়ে হেস অপর যে দুখানি উপন্যাস রচনা করেন তা সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে। এ সমস্ত রচনায় জার্মান রোমান্টিসিজমের এক চরমোৎকর্ষ রূপ ফুটে উঠেছে।

পরবর্তীকালে হেস বহু উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনা। হেসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাম করা যায়,— Knulp; Kurgast; Gedichte: Gertrud; Rosshalde; Spaete Prosa; Briefe; Goldmund; Fabulierbuch; Betrachtungen; Beschwoerungen.

দেশে বিদেশে

॥ নগরীর সমস্যা ॥

সম্প্রতি চার নগরীর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে ক'লকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিকে। ক'লকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ—ভারতের এই • চার প্রধান নগরীর নগর-জীবনের সমস্যা-বলীর সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন এক ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক। তাতে ক'লকাতার যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তা শুধু নৈরাশ্যজনকই নয়, রীতিমত ভয়াবহও। কারণ যে সব সমস্যাভারে ক'লকাতার জীবন আজ দুর্বিষহ তা থেকে অনতি-বিলম্বে তার মুক্তির কোনই সম্ভাবনা নেই, অতি-বিলম্বেও না। ক'লকাতার আবর্জনাস্তূপ এখন সারা ভারতে এমন কি ভারতের বাইরে সুপ্রতিষ্ঠিত কুখ্যাতি অর্জন করেছে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর এক সহস্র যুবকের অক্লান্ত প্রয়াসে কিছুদিনের জন্যে ক'লকাতা কিছুটা আবর্জনামুক্ত হয়েছে, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রত্যাহৃত হওয়া মাত্রই আবার সেই স্তূপীকৃত আবর্জনার গ্রাসে ক'লকাতা হারিয়ে যাবে। কারণ এই পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত রাখার মত অর্থবল বা জনবল ক'লকাতা পৌর-সভার নেই। সহরে পানীয় জল সরবরাহের পাইপ অধিকাংশ জায়গাতেই জীর্ণ ও ছিদ্র হয়ে গেছে। তাই বাড়ীতে বাড়ীতে কলের মুখ দিয়ে এখন সাপ, কে'চো, মাছ প্রভৃতি বেরিয়ে আসে। আগে এনিয়ে হৈ-চৈ হ'ত কিন্তু এখন এটিকেও সহরবাসীরা একটি স্থায়ী সমস্যা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও একথা কারও অজানা নেই যে এ জলপান মানে বিষপান। তারপর বিষক্ষতের মত সারা সহর-জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বস্তী, মানুষ যেখানে পশুর মত জীবনযাপন করে। বছরে বছরে মহামারীর রূপ নিয়ে আসে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ংকর সংক্রামক ব্যাধি। দলে দলে মানুষ অসহায়ের মত প্রাণ দেয়, তা নিয়ে হৈ-চৈ হয় কিছু দিন, তারপর সব চুপচাপ হয়ে যায়। কারণ সকলেই ধরে নেয় যে, এর কোন প্রতিকার নেই। এ ক'লকাতার নগর-জীবনের অনিবার্য অভিশাপ।

ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক-সহযোগী এর কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ক'লকাতা পৌরসভার আয় অত্যন্ত কম, বোম্বাই পৌরসভার আয়ের অর্ধেকও তার চেয়ে বেশী। ক'লকাতার নাগরিকদের স্থায়ী অভিযোগ আছে কর্পোরেশনের ক্রমবর্ধমান ট্যাক্সের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, বোম্বাইর নাগরিকেরা যেখানে মাথাপিছু বছরে পৌর-ট্যাক্স দেন ৪৪ টাকা, কলকাতার নাগরিকদের সে জায়গায় দিতে হয় মাত্র ২০ টাকা। সুতরাং বোম্বাইর নাগরিকেরা যে ক'লকাতার তুলনায় একটু বেশী পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য-কর পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পাবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ কথাও ভুল নয় যে, ক'লকাতার নাগরিকরা যে মাথা-পিছু ২০ টাকা ট্যাক্স দেন তার বিনিময়ে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য তাঁরা পান না। কারণ মাত্র ৯·৮৮ টাকা ট্যাক্স দিয়ে মাদ্রাজ নগরীর অধিবাসীরা যে পরিচ্ছন্ন পরি-বেশে বসবাসের সুযোগ পান তা ক'লকাতার পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে কল্পনাতীত বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। রাজধানী দিল্লীর নাগরিকেরা মাথা-পিছু বছরে পৌর-কর দেন আরও কম, মাত্র ৭·৯৫ টাকা। কিন্তু তার জন্যে দিল্লীবাসীদের ক'লকাতা মহানগরীর হতভাগ্যদের মত নিত্য মহামারীর আতঙ্কে দিনাতিপাত করতে হয় না।

এই বিশ্লেষণ হতেই বোঝা যায় যে, আর্থিক অনটনই ক'লকাতা পৌরসভার দুষ্কৃতি ও ব্যর্থতার প্রধান কারণ নয়। যাঁদের হাতে পৌরসভার পরিচালন-দায়িত্ব ন্যস্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই আজ ঐ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাটির প্রধান সমস্যা। দুর্নীতি, অসাধুতা ও উদ্যমহীনতা আজ ক'লকাতা পৌরসভার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার সহজ জীবন অসম্ভব করে দিয়েছে। সুতরাং ক'লকাতাকে যদি বাঁচাতে হয় তবে সমূলে উৎপাটন ভিন্ন আর অন্য কোন প্রতিকার নেই।

॥ সহকারী ভাষা ॥

স্বাধীনতা অর্জনের পর পনের বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় অতি-উৎসাহী-দের প্রথমদিকের ভাবাতিশয্যের কিছুটা অবসান হয়েছে বলে মনে হয়। সংবিধান রচনাকালে প্রায় গায়ের জোরেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করা হয় এবং হিন্দী-প্রেমিকদের সিদ্ধান্তক্রমে স্থির হয় ১৯৬০ সালের মধ্যে ইংরেজির সম্পূর্ণ নির্বাসন ঘটিয়ে ভারতের একমাত্র 'জাতীয়' ভাষা হিন্দীকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে ১৯৬০ সাল এসে যায় এবং দেখা যায় যে, জাতীয় ভাষার মর্যাদালাভের প্রাথমিক উপযুক্ততাও হিন্দীর পক্ষে তখনো পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাই আবার পাঁচ বছর পেরিয়ে ১৯৬৫ সালকে হিন্দীর রাজ্যাভিষেকের তারিখ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অহিন্দীভাষী ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীর প্রবল বাধা প্রবলতর হয়ে ওঠায় এবং হিন্দী ভাষার সীমাবদ্ধ সামর্থ্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিরা অধিকতর সচেতন হওয়ায় হিন্দী সম্পর্কিত এত দিনের 'জাতীয়' সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ও সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে সাব্যস্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছেন, ইংরেজির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমাদেরই স্বার্থে ছেদ করা চলবে না। প্রথমত, আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্যে আমাদের একটি আন্তর্জাতিক ভাষা অবশ্যই শিখতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজিই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ও সহজবোধ্য। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি ভাষা একটি বিরাট সমৃদ্ধ ভাষা। তার সংস্পর্শে প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষারই উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে। অর্থাৎ হিন্দীকে যদি বড় হতে হয় তবে ইংরেজির সহায়তাতেই তার পক্ষে তা সম্ভব হবে। সুতরাং ইংরেজি বরাবরই ভারতের সহায়ক সরকারী ভাষা হিসাবে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত এই যুক্তিগুলির মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, শুধু যথাযথ স্বীকৃতিরই অভাব ছিল এতদিন। তবুও এই স্বীকৃতির ফল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে অহিন্দী-ভাষী ভারতের প্রায় ত্রিশ কোটি নরনারী এত দিনে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে যে, সংখ্যালঘু হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে কোনদিনই তাদের কোন অবাঞ্ছিত ও অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'তে হবে না।

ইংরেজির প্রতি অহিন্দী-ভাষীদের কোন অকারণ মোহ নেই; প্রধানত প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত যুক্তিগুলিতেই তারা ইংরেজির বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের বিরোধী। ইংরেজিকে কেউই জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে চায় না, চায় সরকারী ভাষারূপে তার ব্যবহার অব্যাহত রাখতে। সারা দেশের মানুষ নিশ্চয়ই হরিনাথ দে'র প্রতিভা নিয়ে জন্মায় নি সব, তারা প্রাদেশিক প্রয়োজনে

শিখবে মাতৃভাষা, জাতীয় প্রয়োজনে শিখবে হিন্দী ভাষা ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে শিখবে ইংরেজি ভাষা। তার ওপরেও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে আছে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা। শুধুমাত্র এতগুলি ভাষা-শিক্ষার মধ্যেই যদি এদেশের অবোধ শিশু-শিক্ষার্থীদের অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত করা হয় তবে তাদের পক্ষে শুধু যে কোন ভাষাটিই ভালভাবে শেখা সম্ভব হবে না তাই নয়, ভাষার-অরণ্যে হারিয়ে ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতির জ্ঞানবীথিকা চিরকালই তাদের অজ্ঞাত থেকে যাবে। প্রধানত এই কারণেই অনাবশ্যক ভাষার বোঝা আজ শিক্ষার্থীদের স্কন্ধ হতে যতখানি সম্ভব নামাতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজির প্রয়োজনকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং এ কারণে শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্যে আজ যেমন সারা দেশের শিক্ষার্থীকে নিরুপায়ের মত ইংরেজির দ্বারস্থ হতে হয়, অবিলম্বে সে লজ্জাকর অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পনের বছর বাদেও ভারতীয় ভাষাগুলির কোনটিরই এমন উন্নতি হওয়া সম্ভব হ'ল না যার জোরে সেই ভাষাভাষীদের পক্ষে সামান্যতম উচ্চশিক্ষাও মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব হতে পারে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার দাবীতে হিন্দীভাষীদের সোচ্চার দাবীর অন্ত নেই, কিন্তু উত্তর ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই আজ পর্যন্ত হিন্দীকে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীকে বিকল্প ভাষার মর্যাদাটুকু হয়ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার ফলে উল্লেখযোগ্য ফললাভ কিছু ঘটেছে বলে জানা যায়নি। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত ভাষাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে সকলেরই এখন উচিত হবে মাতৃভাষাকে প্রকৃত সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত করার কাজে আত্মনিয়োগ করা।—সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক কাজে ইংরেজি ভাষা, এই হওয়া উচিত ভারতের ভাষানীতি।

॥ অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ॥

নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে—সনাতনকাল হ'তে সগৌরবে প্রচারিত এই কথাটির সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ পুরুষ-শাসিত সমাজে খুব কমই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বের যে সকল দেশে সনাতনী সমাজ ভেঙে পড়ায় নারীর আপনভাগ্য জয়ের সুযোগ এসেছে সেখানে সন্তানের মা হওয়ার ব্যাপারে নারী-সমাজের যে অনিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে তা প্রায়-অবিশ্বাস্য।

ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র দেশ হাঙ্গেরী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম হয়েছে সে দেশে এবং সে কারণে নারীর পূর্ণ স্বাধিকারও। সরকারী অনুমতিসাপেক্ষে গর্ভপাত সে দেশে আইনসিদ্ধ। সম্প্রতি হাঙ্গেরীর ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা 'নেপজাডা' এ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, এই বছরের প্রথম তিন মাসে সরকারী অনুমতি অনুসারে গর্ভপাত হয়েছে ৫০ হাজার, আর ঐ সময়ে স্বাভাবিকভাবে শিশু ভূমিষ্ট হয়েছে মাত্র ৩০ হাজার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রূণনাশের অনুমতিপ্রার্থিণীরা তাঁদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন কারণ দেখাননি। অথবা শুধু বলেছেন, একটি সন্তানের চেয়ে একটি ফ্ল্যাট বা একটি গাড়ীই বর্তমানে তাঁদের বেশী কাম্য। সংশ্লিষ্ট সরকারী কমিশনও প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনার প্রতি আবেদন জানিয়ে ভ্রূণনাশের অনুমতি দিয়েছেন।

সাফল্যজনকভাবে মহাশূন্য পরিক্রমান্তে প্রত্যাবর্তনের পর সোভিয়েট মহাকাশচারী-দ্বয় মেজর নিকোলায়েভ ও লেঃ কর্ণেল পোপোভিচের মুখে বিজয়ের হাসি।

॥ অভিনন্দন ॥

সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই মহাকাশচারী মেজর নিকলায়েভ ও লেঃ কর্ণেল পপোভিচ পনেরই আগস্ট, ভারতীয় সময় ১২-২৫ মিনিটে মহাকাশ পরিক্রমা সাঙ্গ করে নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করেছেন। রুদ্ধশ্বাসে পৃথিবীর সকল মানুষ এই দ্বৈত পরিক্রমার সফল সমাপ্তির মুহূর্ত গণনা করছিল, তাদের সে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। ভারশূন্য অবস্থায় দীর্ঘকাল মহাশূন্যে অবস্থানের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণই ছিল এই মহাকাশ পরিক্রমার প্রধান উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিকরা এবার সেই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং বহু অজ্ঞাত তথ্যের কথা হয়ত অনতিবিলম্বেই বিশ্ববাসী জানতে পারবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে যে সংবাদটি সবচেয়ে বেশী আনন্দদায়ক বলে মনে হবে তা হ'ল সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতি-মণ্ডলীর একটি ঘোষণা—'সেদিন খুব নিকটে যেদিন সুবিশাল মহাশূন্যযানসমূহ সৌরজগতের অন্তর্বর্তী গ্রহগুলির উদ্দেশে ধাবমান হবে।'

নতুন জগতের বার্তা বহন করে এনেছেন দুই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশূন্যচারী। আমরা তাঁদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাই।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৯ই আগষ্ট—২৪শে শ্রাবণ : ইংরাজীকে দেশের সহকারী সরকারী ভাষা করার উদ্যমের প্রকাশ্য বিরোধিতা—দিল্লীতে সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলনে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত।

বিহারের মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও চম্পারণ জেলায় নদীসমূহে বন্যা—শতাধিক গ্রাম প্লাবিত, সম্পত্তি বিনষ্ট ও ফসল ধ্বংস।

দিল্লীতে বিদ্যুৎ সরবরাহে অচলাবস্থা—লোকসভায় দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক।

১০ই আগষ্ট—২৫শে শ্রাবণ : দমদম জংশনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা—ব্রীজ ভাঙ্গিয়া মালগাড়ীর ইঞ্জিন নিম্নে রাজপথে পতিত।

'কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অপরাধ করিয়াছে'—পাক্ সরকারের নিকট ভারতের কড়া নোট প্রেরণ।

কলিকাতাস্থ পাক্ হাই কমিশনের সম্মুখে স্থানীয় ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভ—পূর্ব পাক্ সরকার কর্তৃক ছাত্রদলনের তীব্র প্রতিবাদ।

১১ই আগষ্ট—২৬শে শ্রাবণ : ডাঃ বিধানচন্দ্র স্মৃতি-তহবিলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ষাট লক্ষ টাকা সংগ্রহের নূতন সিদ্ধান্ত—তিন সপ্তাহে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা—মুখ্যমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গ ভেষজ শিল্প সম্মেলনে (কলিকাতা) বিবিধ সমস্যা আলোচনা—ভেষজ আইন সংশোধনের দাবী জ্ঞাপন।

১২ই আগষ্ট—২৭শে শ্রাবণ : কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রস্তুতি ও অভিযান এক বৎসরের মধ্যেই শুরু—আগামী জুনের (১৯৬৩) মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রার্থী মনোনয়ন—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব।
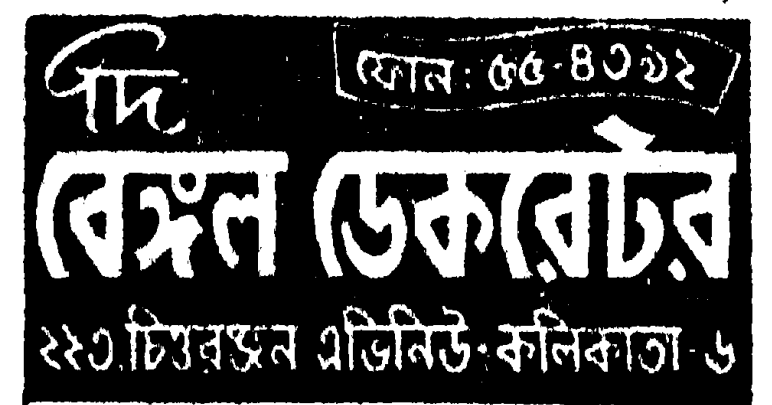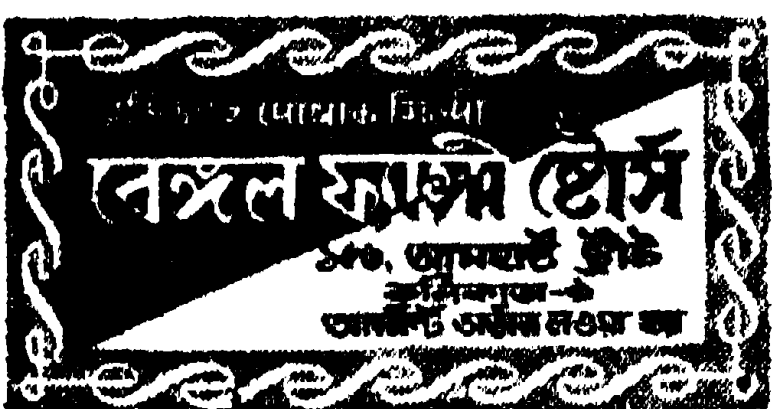
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়নে সর্বপ্রথম 'প্যাকেজ প্রোগ্রামে'র উদ্বোধন—বর্ধমানে কৃষি ফার্মে অনুষ্ঠান—উদ্বোধক : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

বিধানচন্দ্র সপ্তাহের (৫ই—১২ই আগষ্ট) সমাপ্তিদিবসে প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ।

১৩ই আগষ্ট—২৮শে শ্রাবণ : 'সীমান্তে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত চীন-ভারত আলোচনা অসম্ভব'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা—সীমান্তের অবস্থা গুরুতর বলিয়া উল্লেখ।

ত্রিপুরা সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশের সংবাদ।

কয়লাখনি শিল্পের জন্য নূতন বেতন বোর্ড গঠিত— চেয়ারম্যান : শ্রীসেলিম মার্চেণ্ট।

১৪ই আগষ্ট—২৯শে শ্রাবণ : গণজীবনের মান উন্নয়নে সুসংবদ্ধ সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট্রপতির (ডঃ রাধাকৃষ্ণণ) আহ্বান—স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে বাণী।

'১৯৬৫ সালের পরও ইংরাজী সহযোগী সহকারী ভাষা থাকিবে'—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—চৌ এন্ লাই'র (চীনা প্রধানমন্ত্রী) সহিত সাক্ষাৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া মন্তব্য।

১৫ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ : দেশসেবা ও দেশরক্ষার পবিত্র সংকল্প গ্রহণের জন্য শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) দৃপ্ত আহ্বান—স্বাধীনতার পঞ্চদশ বার্ষিকী উপলক্ষে লালকেল্লার প্রাকার হইতে ভাষণ—ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত—ময়দানের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক দেশের অগ্রগতিতে সকল দলের সহযোগিতা কামনা।

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তসহ ২৫ জন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিলাভ—হাজরা পার্কে সম্বর্ধনা-সভায় অনুষ্ঠান।

॥ বাইরে ॥

৯ই আগষ্ট—২৪শে শ্রাবণ : পশ্চিম নেপালের পর্বতশীর্ষে ১লা আগষ্ট তারিখের নিখোঁজ নেপালী বিমানের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট—নয়টি মৃতদেহেরও সন্ধান প্রাপ্তি।

১০ই আগষ্ট—২৫শে শ্রাবণ : কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতার জন্য পাকিস্তানের নয়া চেষ্টা—পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ্ আলির ইঙ্গিত।

বায়ুমণ্ডলে সোভিয়েট ইউনিয়নের আর একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের (পরীক্ষামূলক) সংবাদ।

১১ই আগষ্ট—২৬শে শ্রাবণ : সোভিয়েটের তৃতীয় মহাশূন্যচারীর (মেজর নিকোলিয়েভ) মহাকাশ পরিক্রমা—ভোস্তক-৩ যোগে প্রতি সাড়ে ৮৮ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ—সর্বত্র গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার।

মোজাম্বিকে (পূর্ব আফ্রিকান অঞ্চল) আশু স্বাধীনতা দানে পর্তুগালকে বাধ্য করার দাবী—রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ কমিটিতে প্রস্তাব গ্রহণ।

বার্লিন সীমান্তে পূর্ব জার্মান বাহিনীর সমাবেশ ও সারারাত্রি টহল—সোভিয়েটের প্রেরিত শান্তি আলোচনার দাবী পশ্চিমী শক্তিত্রয় (আমেরিকাসহ) কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার জের।

১২ই আগষ্ট—২৭শে শ্রাবণ : চতুর্থ ভোস্তকযোগে আরও একজন সোভিয়েট মহাশূন্যচারীর (কর্ণেল পোপোভিচ) কক্ষপথে আবর্তন—অসীম শূন্যে নিকোলিয়েভ ও পোপোভিচের ঐতিহাসিক সংলাপ—পরস্পর অতি নিকটে থাকিয়া পৃথিবী পরিক্রমা।

১৩ই আগষ্ট—২৮শে শ্রাবণ : দুই-জন মহাকাশচারীর নিশ্চিন্ত রজনী যাপন—উভয়েরই পৃথিবী প্রদক্ষিণ অব্যাহত।

চীনা ঘাঁটির উপর ভারতীয় ফৌজের গুলীবর্ষণের অভিযোগ। (নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর সংবাদ)

১৪ই আগষ্ট—২৯শে শ্রাবণ : রাশিয়ার দুই মহাশূন্যচারীরই যুগপৎ অব্যাহত পৃথিবী পরিক্রমা।

১৫ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ : সোভিয়েট মহাশূন্যচারীদ্বয়ের সুস্থ দেহে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ—গ্রহান্তরে অভিযানের দিন আসন্ন বলিয়া রুশ সরকারের দাবী—বৃটিশ বিজ্ঞানীর অভিমত 'রাশিয়া মহাশূন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী'।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রচেতনা ॥

মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-চেতনা সম্পর্কিত গ্রন্থাদির তেমন অভাব নেই, অন্যান্য চিন্তানায়কদের সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পাওয়া যায় না। সম্প্রতি ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ বর্মা THE POLITICAL PHILOSOPHY OF SRI AUROBINDO নামক যে মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন তা দুটি কারণে অভিনন্দনযোগ্য।

প্রথম কারণ, আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা হিসাবে এই গ্রন্থ এক উল্লেখনীয় সংযোজন। দ্বিতীয়ত, আমাদের পূর্বসূরীরা ঠিক যেখানে থেমেছেন উত্তরকালে সেই সূত্র ধরেই অনুগামীরা চিন্তা করেছেন, মূল চিন্তাতরঙ্গের উন্নয়নে সহায়তা করেছেন। এই চিন্তার সঙ্গে যোগসূত্র অব্যাহত রেখে ধারাবাহিকত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর।

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয়দর্শন বিভিন্ন নীতি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। আমাদের সামগ্রিক দর্শনের একটা অংশ হিসাবেই ছিল রাষ্ট্রীয় দর্শন। য়ুরোপের পক্ষেও এ কথা প্রযোজ্য, সেখানে আগষ্টিন বা একাইনাস সামগ্রিকভাবেই দর্শনের ক্রম-বিকাশ সম্ভব করেছেন। 'রিফর্মেশন' কালের পর য়ুরোপের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয়. সেই কাল থেকে রাজনীতি এক বিশিষ্ট শাখা হিসাবে প্রসারলাভ করে, রাষ্ট্রীয় দর্শনের অর্থ ছিল রাষ্ট্রের একটি নীতিমাত্র, তার বেশী কিছু নয়।

প্রাচ্য ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রচেতনা তাঁর দর্শনের একটি শাখামাত্র। তাঁর সামগ্রিক দর্শনের এক সামান্য অংশ। শ্রীঅরবিন্দের সম-সাময়িক মহাত্মা গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এক পার্থক্য বর্তমান। কারণ যদিচ এঁদের দার্শনিক হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারে, তবু একথা বলা যায় যে, তাঁদের চিন্তা-ধারার মধ্যে একটা ধারাবাহিকত্ব ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কালে তাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন, তবে সব সময়ে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি ও ধারা-বাহিকত্বের অভাব ছিল। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু একটা ধারার প্রতিষ্ঠাতা, এবং তাঁর দর্শনে আছে স্থপতির কলানৈপুণ্য।

ডঃ বর্মা তাঁর এই গবেষণায় শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের এই সব বৈশিষ্ট্যই যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন। মানসিক প্রকৃতি, জাগতিক প্রকৃতি, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রকৃতি, রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ই রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকের মুখ্য উপজীব্য। সেই বিষয়-গুলির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ডঃ বর্মা।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের বুনিয়াদী গুণ এই যে, বৈদান্তিক মতবাদের বিভিন্নতার সঙ্গে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক জড়তত্ত্বের সংমিশ্রণ সাধন করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ইতিহাসের মধ্যে যে মৌল-উপাদান আছে সে তাঁর দিব্য-জীবনের ছায়ায় প্রভাবিত। বিশ্বজীব—"Fulfils itself in the world and the individual and the group with an impartial regard for all as equal powers of its self-manifestation" এই উক্তি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দার্শনিক মতবাদ থেকে বিভিন্ন, গীতার মধ্যে যা নিহিত আছে তা থেকেও বিভিন্ন। ডঃ বর্মার বিশ্বাস যে, শ্রীঅরবিন্দের এই ধারণার ভিত্তিতে আছে হেগেলীয় মতবাদ।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত "God Sent Leader" এর ঠিক পরবর্তী ধাপ, এবং যুক্তিসঙ্গত। 'Divine Determinism'—দ্বারা নেতা দৈবী ইচ্ছার যন্ত্ররূপে পরিণত হন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"This is the greatness of the great men, not that by their own strength they can determine great events but that they are serviceable and specially forged instruments of the Power which determines them".

যে সব মহৎ নেতার মধ্যে উদাসীনতা আছে তাঁরা মানবিক ইতিহাসের বাহ্যিক ক্রিয়া বা ঘটনায় কোনো ভাবে প্রভাবিত হন না। এইখানে শ্রীঅরবিন্দের গান্ধীজীর মতবাদের সঙ্গে পার্থক্য, বিশেষতঃ অহিংস এবং 'স-হিংস নীতির' প্রশ্নে।

ডঃ বর্মার ধারণা যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রীঅরবিন্দের সূক্ষ্ম দর্শন এক হিসাবে 'মাকিয়াভেলীজম'-এর প্রচ্ছন্ন সমর্থক। তবে এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা।

ডঃ বর্মার বক্তব্য কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস-বহুল, কারণ তিনি রাজনীতির মধ্যে নীতির দাবী করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মত খাঁটি দার্শনিক কিন্তু তাঁর বক্তব্যর এবং ধারণার সমর্থনে সর্বত্র বিচরণ করেছেন। সংস্কারমুক্ত মন নিয়েই তাঁর চিন্তা, বাঁধা ধরা পথে তিনি পরিভ্রমণ করেননি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন না বলতে চেয়েছেন হত্যা করাটা নীতির দিক দিয়ে প্রয়োজন হতে পারে। তাই বলে হত্যা করা যে নীতিসঙ্গত তা নয়। এই পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম সন্দেহ নেই, তবে এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে একটা বিভিন্নতা।

সমসাময়িক ভারতীয় রাজনৈতিক আকাশের সঙ্গে পরিচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সমাজবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতবাদ বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করবে। শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রচেতনা প্রাচীন চিন্তানায়কদের ধ্যান-ধারণানুসারী। শ্রীঅরবিন্দের মতে আধুনিক রাষ্ট্র এক ভীতিপ্রদর্শক যন্ত্র মাত্র, তার না আছে আত্মা না আছে প্রজ্ঞা। শ্রীঅরবিন্দ তাই অধ্যাত্ম নৈরাজ্যবাদের সারটুকু গ্রহণ করার উপদেশ দান করেছেন। প্রতিষ্ঠিত যে সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী আছে তার বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ করার নির্দেশ তিনি দেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে, ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনের মধ্যে দিব্যপ্রেরণা থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক গণতন্ত্রের চতুর্বিধ ত্রুটির প্রতি শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমতঃ সমানাধিকারের প্রচারিত ধারণা সত্ত্বেও একটি প্রতাপশালী দলই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় শাসন চালনা করেন, দ্বিতীয়তঃ বুর্জোয়া-শ্রেণী এই কাঠামোর পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে আইনগতভাবে শোষণ করে যান, তৃতীয়তঃ গণতন্ত্র ধনিক সংস্কৃতির (Money Culture) অপর নাম, এবং সর্বশেষে এই জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণের সুযোগ দানের ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচারের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বিপদ আছে তিনি তার ইঙ্গিত করেছেন। এর ফলে আত্ম-সম্মোহিত জনগণের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রসার হয় মধ্যম শ্রেণীর এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হয়।

শ্রীঅরবিন্দ সমাজনীতিকেই রাষ্ট্রের সকল প্রচেষ্টার সার্থকতম পরিণতি মনে করেন। সমতা, নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্র-সভ্যতার বিস্তার এবং উৎপাদন তার ফলে বৃদ্ধি পায়। যদিচ সমাজবাদের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের শ্রদ্ধা বর্তমান তথাপি তিনি সমাজতান্ত্রিক নিয়ামক প্রথার মধ্যে যে সর্বনাশা ভয়ংকরত্ব আছে তা প্রকাশ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :

"Nothing great or small escapes its purview. Birth and marriage, labour and amusement and rest, education, culture, training of physique and character, the Socialist State leaves nothing outside its scope and its busy intolerent control." কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের অতি-উৎসাহী সমর্থকের কাছে শ্রীঅরবিন্দের এই সতর্কবাণী বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, ভারতীয় স্বাধীনতার অর্থ আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য কিন্তু পশ্চিমের স্বাতন্ত্র্য বহিরঙ্গ। এই উক্তি বিপরীতধর্মী নয়, পরস্পরের পরিপূরক।

ডঃ বর্মার গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। *

---

* THE POLITICAL PHILOSOPHY OF SRI AUROBINDO: By: Dr. Vishwanath Prosad Varma, Asia Publishing House Bombay ;

* * *

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিদেশে ক্রমশঃ যে অনুসন্ধিৎসা বাড়ছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল আরসং মালৎজেব-এর একটি প্রবন্ধে। মালৎজেব রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক। কিছুদিন তাসখন্দ লেখক সম্মেলনের বিষয়ে লিখতে গিয়ে আধুনিক জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছেন তিনি। অবশ্য সোভিয়েট দেশে বাংলা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থই অনূদিত হয়েছে এবং এমন কি হাল আমলের ভবানী ভট্টাচার্যের পুস্তকও রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে শোনা গেছে। তবে মালৎজেব জনৈক প্রথিতযশা বাঙালী ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের রচনা প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালী পাঠকরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তবু বিদেশী কোনো লেখকের জবানীতে নিজেদের লেখকের কথা জানতে ভালই লাগে। প্রবোধ সান্যাল সম্বন্ধে মালৎজেব তাঁর প্রবন্ধে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। প্রবোধবাবুর সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করেছেন লেখক সম্মেলনের অবকাশে। প্রবোধ সান্যালের হিমালয়-প্রীতির সংবাদে মালৎজেব উৎসাহিত হয়ে লিখেছেন :

হিমালয় দুর্জয় গিরিশৃঙ্গ, দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষকে ধারণ করে আসছে। একদিকে মধ্য-এশীয় বায়ুরাশি এবং তিব্বতের তুষার-ঝঞ্ঝার হাত থেকে তাকে রক্ষা করছে, আর অন্যদিকে দক্ষিণ মৌসুমী বায়ুর গতিরোধ করে সমগ্র দেশকে শস্য-শ্যামল করে তুলছে। বেদে এবং ভারতবর্ষের বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থে নতশিরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে।

সেই দুর্গম শৈলচূড়ায়, ভৌগোলিক দৃশ্যপটে কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটেছে, কত সংস্কৃতির জন্ম ও বিনাশ হয়েছে। বহু সাহসী বীরের হৃদয়াবেগের কাহিনী সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে সেখানে। অগম্য পাহাড়ের বুকে কত ঐতিহাসিক আলেখ্য রয়েছে যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া আছে হাজার হাজার মন্দির ও তীর্থস্থান।

শ্রীপ্রবোধ সান্যালের মত প্রথিতযশা লেখকরা যত বেশী বিদেশ ভ্রমণে যাবেন ভারতবর্ষ ততই বহির্বিশ্বের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে এবং একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত সান্যাল ভারতবাসী এবং লেখক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব যথোচিত পালন করেছেন।

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা—

(আলোচনা)—ধীরানন্দ ঠাকুর। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড—১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম বারো টাকা।

ধীরানন্দ ঠাকুর এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'পরিশেষে'র দুটি ও তার পর রচিত আরো দুটি গদ্যকবিতার আলোচনা করেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে প্রস্তাবনায় লেখক গদ্যকাব্য ও গদ্যকবিতা, গদ্যকবিতা এবং মুক্তপদ্যের (মুক্ত ছন্দ ?), রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার উষাকাল এবং তাঁর গদ্যকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছেন। এই খণ্ডটি বেশী মাত্রায় 'একাডেমিক' হলেও সুলিখিত, ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা অংশে 'লিপিকা', 'পুনশ্চ' সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। এই অংশটিতে লেখক মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দান করেছেন, তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গি প্রাঞ্জল। তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' এবং 'শ্যামলী'—এই পর্যায়ে 'শেষ সপ্তক' সংক্রান্ত আলোচনাটি অপূর্ব। বাংলা সাহিত্যে 'শেষ সপ্তকে'র এইজাতীয় আলোচনা আর দেখেছি মনে হয় না। শেষ সপ্তকে কবির জীবন-দর্শন, মরণতত্ত্ব, প্রকৃতি, প্রেম, সহজবাদ সম্পর্কিত আলোচনা অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত—এই অংশে শেষের চারটি গদ্যকবিতা আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের রচনা-শৈলী সর্বত্র সমান নয়, তার কারণ হয়ত বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রয়োজনে সেগুলি লিখিত, তবে লেখক 'শেষ সপ্তক' সংক্রান্ত আলোচনার জন্য সমালোচনা-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ছাপা বাঁধাই উত্তম।

অনেক দিনের অনেক কথা

(স্মৃতিচারণ)—সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ, সুরভি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম চার টাকা।

বস্তুত অনেক দিনের অনেক কথা নয়। কালের পরিসীমায় অর্ধশতকও পেরোয়নি। একেবারে একালের কথা এবং এ-কালের মানুষেরই। সাধারণ মানুষ নয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককুলের কথা। তবে দূরত্ব বুঝি আছে, সেটা দৃষ্টিভঙ্গির, হালের সাহিত্যিকগণ স্মৃতির দূরাভাস থেকে প্রবীণ অগ্রজদের চিত্ররূপ দিয়েছেন। দূরত্ব সৃষ্টি না করলে স্মৃতিচর্চা স্বাভাবিক হয় না। হালের লেখকেরা তাই দূরত্বের সমুদ্রের অবগাহনে যে কয়েক গুচ্ছ ঝিনুক কুড়িয়ে পেয়েছেন তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই শিল্পকলা। পূর্বসূরীদের ঋণ স্বীকার নয়, সশ্রদ্ধ অঞ্জলি। তথাকথিত অর্থে এই রচনাগুলির ঐতিহাসিকতা যাঁরা আবিষ্কার করতে চাইবেন তাঁরা নিরাশ হবেন। কিন্তু ইতিহাসের অন্তরঙ্গ তাৎপর্য যাঁদের কাছে পরিস্ফুট তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ আদরণীয় হবে। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাগুলি ব্যক্তিক, অনুভূতিশীল লেখা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইমপ্রেসানিস্ট। অর্থাৎ অনুজ সাহিত্যিক-মনে অগ্রজ সাহিত্যিকদের ধারণারই ফলশ্রুতি। এই দিক থেকে এই গ্রন্থের সাহিত্যিক-কৌতূহল অনস্বীকার্য।

আলোচ্য গ্রন্থে অগ্রজদের মধ্যে আছেন পরশুরাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ ও আশাপূর্ণা দেবী এবং এঁদের সম্বন্ধেই যথাক্রমে অনুজ সাহিত্যিকরা লিখেছেন : সুশীল রায়, বিমল মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রঞ্জন, সন্তোষকুমার ঘোষ, গজেন্দ্র মিত্র, প্রফুল্ল রায়, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও আশা দেবী। শ্রীসাগরময় ঘোষের সম্পাদকীয়টি স্বল্পায়তন হলেও আন্তরিক-গুণসম্পন্ন। অনুজ সাহিত্যিকদের অগ্রজ সাহিত্যিকদের প্রতি কর্তব্যের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 'সাহিত্য-সংসারে এই রীতি যদি অব্যাহত রাখা যায় তাহলে সেটা সাহিত্যের পক্ষেও কল্যাণ,

সাহিত্যিক-সমাজের পক্ষেও মঙ্গল।' আমরাও এ-কথা বিশ্বাস করি।

কুয়োতলা (উপন্যাস)—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জনী, ৬৭এ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা—৩৭। দাম তিন টাকা।

"আধুনিকতার কাছে প্রথম আশাই ইচ্ছে এই যে পুরানোকে তা অস্বীকার করবে। এই অস্বীকার অত্যন্ত গৌরবজনক। পূর্ববর্তী সাহিত্যের অকৃতার্থতা এই যে, তার মধ্যে ঐক্য আছে, জীবন আছে, আছে স্টাইল। কিন্তু সত্য কথা এই যে, জীবনের কোনো ঐক্য নেই, স্টাইল নেই, জীবনের কোনো নির্দিষ্ট মানে নেই"—উপস্থিত-বর্তমানের জনৈক তরুণ গল্পকারের এই উক্তি থেকে এই দশকের লেখকদের সাহিত্য-ভাবনা স্পষ্ট। এরা সাহিত্যের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নন, জীবনের কোনো মানে তাঁদের কাছে ধরা পড়েনি, এ'রা স্বয়ম্ভু এক আন্দোলনের পক্ষপাতী। জোরালো ভাবে পুরাতনকে অস্বীকার করতে গিয়ে এ'রা নতুন সাহিত্য-ভাষা এবং বিষয়-বস্তু আহরণ করে আনছেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কুয়োতলা' এমনি একটি উদাহরণ। ভাষা ও বক্তব্যে এই গ্রন্থ অবশ্যই বৈপ্লবিক। উপন্যাসের নায়ক নয় দশ বছরের বালক নিরুপম, যে তার পরিবেশ থেকে তিলে তিলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হচ্ছে। ছেলেটি সত্যই বড় ভাবুক বড় স্পর্শপ্রবণ। এবং যা দেখে বিশদ করেই দেখে, অনুভূতির মধ্যেও ফাঁক নেই। যেমন ঃ "টাকুমাসিকে নিরুপমের বেশ লাগে। গায়ে কি অদ্ভুত গন্ধ টাকুমাসির! বগলের কাছটা কেবল পচা পেঁয়াজের মতো গন্ধে থিতোনো।'' ইত্যাদি এবম্বিধ নিখুঁত পর্যবেক্ষণে বইটি আধুনিকতার জয়গানে সোচ্চার। ভাষাও অপূর্ব। বিশ্বাস করতে অবাক লাগে ১৯৫৬-৫৭ সালে দাঁড়িয়ে একজন লেখক শতবর্ষ-জীর্ণ আলালী ভাষায় এই উপন্যাস রচনা করেছেন।

তুলাদন্ড— মণি গঙ্গোপাধ্যায়। অভিজিৎ প্রকাশনী সমবায় লিমিটেড ৭২-১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২-৫০ নঃ পঃ।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস। পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

কেন এমন হয়—অজিত মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যিক, ৮, নীলমণি দত্ত লেন, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

একটি উপন্যাস। লেখকের ভাষা সুন্দর হওয়ায় কাহিনী পাঠকমনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

গন্ধর্ব (চতুর্থ বর্ষ ।। চতুর্থ সংখ্যা ।। ১৯৬২)—সম্পাদক ঃ নৃপেন্দ্রনাথ সাহা। ১৮ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম এক টাকা কুড়ি নয়া পয়সা।

নাটক ও নাটক-সংক্রান্ত আলোচনায় সমৃদ্ধ 'গন্ধর্ব' পত্রিকাটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেকথা স্মরণে রেখেই 'অমৃতে' পূর্ববর্তী সংখ্যায় সমালোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটির অমূল্য উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, কালিপ্রসাদ ঘোষ, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিলীপকুমার সেন, শিশিরকুমার দাস। মার্টিন ব্রাউনের 'কবি ও নাট্যমঞ্চ' অনুবাদ করেছেন বিনয় মজুমদার। সম্প্রতি পরলোকগত জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী ছবি বিশ্বাসের ওপর আলোচনা করেছেন দিলীপ রায়। কয়েকটি নাটক ও নাটক-সংক্রান্ত গ্রন্থের আলোচনা আছে। পত্রিকাটির সু-সমাদর কামনা করি।

কালপুরুষ (প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৬৯)—সম্পাদক ঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। ১৯বি বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ইতোমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ পত্রিকাটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধে এই সংখ্যা সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে আছেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও বিনয় সেনগুপ্ত। দুটি বড় গল্প লিখেছেন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিতা সিংহ। তাছাড়া আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের রচনা আছে।

মনরো ডকট্রিন

কন্দ্র চৌধুরী

শনিবারে ফোন করার কথা ছিল মিসেস এলিজাবেথ কোর্টনীর। ষোলো শ' ডলারের পোষাকটা গায়ে ঠিক হয়েছে কিনা দেখতে যাবেন বলেছিলেন তাকে। কিন্তু কি একটা কাজে আটকা পড়ে শনিবার যেতে পারেন নি। শুধু শনিবারই না, পোষাকের মাপ দেখতে যাওয়া সেখানে আর কোনোদিনই হবে না তাঁর। রবিবারে কোনো পোষাকের তোয়াক্কা না করেই সে নিঃশব্দে চলে গেছে। সে যখন যায়, তার শরীরে একটা সুতোও ছিল না, নগ্ন নির্জন হাতে শুধু টেলিফোন রিসিভারটি ধরা ছিল।

কিন্তু পোষাক যে ভাল বাসত, সময় সময় বাসতও না, সেই কিন্নরীর ছেড়ে রাখা পোষাকগুলো নিয়ে কি করবে এখন হলিউড! এমনি পোষাক পরবার জন্যে, না পরবার জন্যে, আবার কখন আসবে আরেকজন? মেয়েটি প্রথম যেদিন স্কুলে যায়, পরনে ছিল সাদা আঁটো সোয়েটার। সতীর্থদের চোখে ঘোর লেগেছিল। অথচ প্রতিদিন চার মাইল হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করে বাসের ভাড়া বাঁচানো পয়সায় রূপ-চর্চার কতটুকুই বা আয়োজন করা সম্ভব ছিল তার পক্ষে। আবার আয়োজন যখন জমে জমে পাহাড় হয়েছে, তখনও তার পোষাক নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছে হলিউডে। নিন্দে হয়েছে অনেক। এমন কি তার স্বামীও তাকে নিয়ে অনেকবার কোনো অনুষ্ঠানে যেতে চান নি তার পোষাকের জন্যে। একবার এক ভোজ-সভায় যখন একটা সোনালী পোষাকের অভিনয় পরে এলো মেয়েটি, হাস্যাভিনেতা জেরী লুইস উত্তেজনায় ভোজ-টেবিলটার ওপরেই শিস দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়েছিলেন। এবং অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত অভিনেত্রী জোয়ান ক্রাফোর্ড পত্রিকায় মেয়েটির বিরুদ্ধে বিবৃতিই দিয়ে ফেললেন একটা। মেয়েটির তরফ থেকে জানানো হল যে, তার সৌন্দর্য, যৌন-আবেদন, কখনই পোষাক-নির্ভর নয়—আলুর বস্তা পরলেও তাকে সমান মোহময়ী মনে হবে। প্রমাণস্বরূপ একটা বেঢপ আলুর বস্তা পরা সর্বাংগ আবৃত তার একটা প্রতিকৃতি বিরুদ্ধপক্ষের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হল। বিরুদ্ধবাদীরা লজ্জায় নিরুত্তর হলেন।

মেয়েটি কি তবে সত্যিই অনিন্দ্য-সুন্দরী? তার ত ডান দিকের মুখ-রেখা খারাপই ছিল! ঠোঁট দুটো ত কখনো বুজতো না। এমন কি হলিউডে এমন গুজবও রটেছিল যে, তার মুখ-বোজা একটা ছবিও যদি কেউ স্টুডিও কর্তৃপক্ষকে দেখাতে পারে, ছবি-প্রতি একশো ডলার পুরস্কার দেয়া হবে তাকে। চুলের খ্যাতি ছিল তার। কিন্তু চুলের রঙেও ত তার নিরন্তর অভিনয় ছিল। "দি অ্যাসফল্ট জাংগল" ছবিতে তার চুল ছিল ছাই, "অল অ্যাবাউট ইভ"-এ সোনালী, "ইফ এ্যাজ ইউ ফিল"-এ রুপোলী, "ডোন্ট বদার টু নক"-এ 'ভ্রমরকৃষ্ণ' এবং তার সর্বশেষ কেশবর্ণ ছিল প্লাটিনাম।

তবে কি শরীরের উত্তুংগ আঙ্গিক তার যৌবনের একমাত্র সম্পদ? তার প্রতিভা কি তাহলে ৩৮'-২৬'-৩৮'-এর অক্ষরেখায় আবর্তিত হয়ে এসেছে এতকাল? কিন্তু তাই যদি হবে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর ঈশ্বর জ্যানুক্ জেন ম্যান্সফিল্ড, ডায়না ডরস, শীরি নর্থ, এবং ম্যামী ভ্যান ডোরেন প্রভৃতি যুবতীদের জনপ্রিয়তার মঞ্চে তুলতে পারলেন না কেন। পারেন নি কারণ সেই মেয়েটির মত হাঁটতে পারে নি তারা কেউ। অনির্বচনীয় এক বসন্তের কানন থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে সে মানুষের হৃদয়ের অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে সোজা ঢুকে যেতে পারত।

এমনি একটা হাঁটা হাঁটতে হয়েছিল তাকে তার স্ক্রীন টেস্টের সেই স্মরণীয় দিনে। স্টুডিওর মেঝেতে সাপের মত পড়ে থাকা তারগুলো পায়ে জড়িয়ে কোনোরকমে হুমড়ী খেতে খেতে আলোর নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। সাজঘরে সে ছিল নর্মা জীন ডগহার্টি—ওই সামান্য পথটুকু পেরিয়েই সে তার নতুন নামে পৌঁছে গেল : মেরিলীন মনরো।

মেরিলীন মনরোর সেই স্ক্রীন টেস্টের বারো মিনিটব্যাপী নির্বাক রঙীন ছবিটি তুলেছিলেন হলিউডের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান লিও শ্যামরয়। ছবিটির প্রিন্ট দেখে শ্যামরয় প্রায় বাকশক্তিরহিত ছিলেন অনেকক্ষণ। এই প্রসংগে তার স্বীকারোক্তি :

মনে হল বিস্ময়ে হিম হয়ে গেছি। নির্বাক যুগের পর এই ধরণের শরীর আমার চোখে পড়ে নি। গ্লোরিয়া সোয়ানসনের মতই মেয়েটির সৌন্দর্য অবিশ্বাস্য, এবং যৌন-আবেদনে মেয়েটির তুলনা একমাত্র জীন হারলো। টেস্টের প্রতিটি দৃশ্যই যেন বসন্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিকীরণ। মনে হয়েছিল এই মেয়েটির কাহিনী সবাক চিত্র ছাড়াই দর্শক-মনে পৌঁছে দেয়া যায়।

অথচ এমন কিছু অভিনয় করেন নি মেরিলীন সেদিন। "মাদার ওর টাইটস"-এর সেটে তিনি ক্যামেরার সামনে দিয়ে এসে ঢুকেছিলেন শুধু প্রথমে। তারপর একটা কৌচে বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা, নিবিয়ে ফেললেন, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, নেমে এলেন একতলায়, এবং অবশেষে ক্যামেরার বাইরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে

গলেন। "মনরো মনুমেন্ট" নামক একটি বিশেষ ধরণের হাঁটার জন্ম হল সেদিন। 'নায়েগ্রা" ছবির ক্যামেরাম্যান শ্রীযুক্ত মাথাওয়ে এই হাঁটার দৃশ্যটি তুলেছিলেন। নিকটতম দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা এই দৃশ্যটিই ছিল হলিউড চিত্রের দীর্ঘতম হাঁটার দৃশ্য।

কিন্তু একটি বিশেষ ক্রিয়ার মধ্যেই কি মেরিলীনের জনপ্রিয়তা, অভিনয়-প্রতিভা সীমিত ছিল শুধু? "হাউ টু ম্যারি এ মিলিওনিয়ার" ছবির পরিচালক জীন নেগুলেস্কো তাঁর ছবির নায়িকা সম্বন্ধে এককথায় বলেছিলেন : Monroe represents to man something we all want in our unfulfilled dreams.... মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসে দেখা গেছে, হাস্যাভিনেত্রীরা অসাধারণ রূপের অধিকারিণী হলেও, তাঁদের যৌন-আবেদন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে না। তবু হলিউড চারজন মোহময়ী 'কমেডিনের' সন্ধান পেয়েছিলেন গ্লোরিয়া সোয়ানসন, জিঞ্জার রজার্স, ক্যারল লম্বার্ট এবং ক্লদেৎ কোলবার্ট-এর মধ্যে। মেরিলীনকে এই চারজনেরই উত্তরসূরী বলা যেতে পারত, যদি না সারল্যের এক অলৌকিক সুষমায় তিনি বিশিষ্ট হতেন। বিভিন্ন চিত্রে নানা ধরণের চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, কিন্তু সেই সুমধুর সরলতাকে কখনো ত্যাগ করতে পারেন নি। "নায়েগ্রা" চিত্রে মেরিলীনের ভূমিকা ছিল "খারাপ মেয়ের" (অবিশ্বস্ত স্ত্রীর)। তাঁর এই ছবির ভূমিকার সারল্য সম্বন্ধে হেরাল্ড ট্রিবিউনের সমালোচক সবিস্ময়ে লিখেছিলেন :

She gives the kind of serpentine performance that makes the audience hate her while admiring her.

তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে স্যার লরেন্স অলিভিয়ারের বক্তব্য :

আমার মতে মিস মনরো এমন এক অভিনয়-প্রতিভার অধিকারিণী যার ফলে একেকবার তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে 'খারাপ মেয়ে' মনে হয়, আবার পরমুহূর্তেই তিনি যেন সারল্যের মূর্তিমতী প্রতীক। তাঁর ছবি দেখার পর দর্শকরা উপভোগ্য দোলাচলের মধ্যে দুলতে দুলতে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন।

অবশ্যই শুধু অভিনয়-প্রতিভা নয়, শরীরের ভূমিকাও নিশ্চয়ই গৌণ ছিল না তাঁর ষোলো বছরের অভিনেত্রী জীবনে।

মেরিলীন মনরো শরীরিণী ছিলেন নিঃসন্দেহে। নিজের শরীরটাকে চেনবার চেষ্টাও তিনি কম করেন নি। ফটোগ্রাফার আর্ল থীসেন একবার মনরোকে একটা অস্থিবিদ্যার বই মনোযোগ দিয়ে পড়তে দেখেন। বইটির পাতায় পাতায় দাগ দেয়া। হঠাৎ অস্থিবিদ্যায় আগ্রহের কারণ জিজ্ঞেস করলে মেরিলীন বল্লেন :

শরীরের অস্থি-সংস্থানগুলো জেনে নিচ্ছি। হাড়ের ঠিকানা না জানলে শরীরকে বশে রাখা যায় না।

শরীরকে যথার্থই বশে রাখতে পেরেছিলেন মেরিলীন। তাঁর কাছে যৌনতা ছিল যেন এক আজ্ঞাবহ যন্ত্রের মত। ইচ্ছে-মত চাবি ঘুরিয়ে যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন যখন-তখন। থীসেন স্পষ্টই বলেছেন যে, মনরোর যৌন-আবেদন তাঁর শরীরের কোনো বিশেষ স্থানের অথবা বিশেষ অঙ্গভঙ্গির উৎপাদক ছিল না কোনো দিন, যৌনতা তাঁর মস্তিষ্কেই সুপ্ত থাকত, চরিত্রানুযায়ী যৌনতাকে তিনি ফুলের মতই বিকশিত করতে পারতেন। প্রখ্যাত প্রযোজক পরলোকগত জেরী ওয়াল্ড মেরিলীনের যৌনতার ব্যাখ্যা করেছিলেন একটি উপমায় :

মাদকতাকে তিনি একটা ছিপি দেয়া শিশিতে ভরে রাখতেন। একেকটা দৃশ্যের জন্যে ছিপি খুলে খানিকটা প্রয়োজনমত মাদকতা মেখে আবার ভরে ছিপি দিয়ে রেখে দিতেন ভবিষ্যতের জন্যে।

তার ফল হত ব্যাপক। দর্শকরা ত মুগ্ধ হতেনই এমন কি মেরিলীনের সহভূমিকায় অভিনেতারাও অভিনয় ভুলে যেতেন। একবার টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী স্টুডিওর এক সেটে "লাভ নেস্ট" নামে একটি ছবির সুটিং চলছিল। দৃশ্যটি ছিল একটি ঘরে একটি বিবাহিত যুবক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মেরিলীনের ঘরে ঢুকে বাইরের পোষাক ছেড়ে বাথরুমে ঢোকার কথা। যুবকটির ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন ল্যাণ্ডিগ্যান। আলো ইত্যাদি ঠিক করবার পর পরিচালক "এ্যাক্শান" বলে চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ করতে বল্লেন। মেরিলীন যথানিয়মে ঘরে ঢুকলেন, জুতো খুলে, মোজা খুলছেন, পরিচালক চেঁচিয়ে উঠলেন "কাট্" বলে।

—কি হলো কোনো ভুল কিছু করে ফেল্লাম? সভয়ে প্রশ্ন করলেন মনরো পরিচালক জোসেফ নিউম্যানকে!

—না, আপনি ঠিকই করেছেন, কিন্তু ল্যাণ্ডিগ্যান মিট-মিট করে আপনার মোজা ছাড়া দেখছিল।

এই 'লাভ নেস্ট' ছবিটি তোলার সময়ে স্টুডিও অফিসের কেরানীরাও অফিসের কাজ ফেলে সেটে এসে ভিড় করত, যার ফলে শেষ পর্যন্ত নিউম্যানকে কঠোরভাবে স্টুডিওর কর্মচারীদের

প্রথমবার বধূবেশে মনরো

প্রথম স্বামী জেমস ডগহার্টি

প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হয়েছিল। সেদিন মেরিলীন সামান্য মাইনের অভিনেত্রী ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত একটা নায়িকার ভূমিকা ত দূরের কথা সহ-নায়িকার ভূমিকাও খুব বেশী পাননি।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ একদা বলেছিলেন :

জীবনী তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষের সহস্রের মধ্যে সে অন্ততঃ পাঁচ ছয়টি অস্তিত্বেরও যথাযথ বিবরণ দেয়।

মেরিলীনের জীবনী সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখতে গেলেও তাঁর দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তার উল্লেখ করতেই হবে। একবার তাঁর মনে হয়েছে পৃথিবীর দিকে শরীরের নগ্নতা ছুঁড়ে তাকে অন্ধ করে দেবেন, আবার সত্যিকারের শিল্পী হবার প্রেরণায় পরিশ্রমও উদয়াস্ত কম করেন নি। খ্যাতির মধ্যাহ্নে পৌঁছেও "এ্যাকটার্স ল্যাব" নামে স্ট্যানিসলাভস্কি রীতির অভিনয় শিক্ষার স্কুলে নিয়মিত গিয়ে অভিনয় শিক্ষা করতেন। এই স্কুলের শিক্ষকরা হলেন মঞ্চ এবং চিত্র-জগতের বুদ্ধিজীবী পরিচালক সম্প্রদায়। লী স্টাসবার্গ, এলিয়া কাজান, স্টেলা এাডলার, আর্থার পেন প্রমুখ ব্যক্তিরা এই স্কুলে অভিনয় শিক্ষা দিতেন নিয়মিত। এবং আমেরিকার টেলিভিসান, মঞ্চ এবং চিত্রজগৎ-এর ওপরে এই স্কুলের স্টানিসলাভস্কি ধারার যথেষ্টই প্রভাব ছিল। "ডেথ অফ এ সেলসম্যান" "মার্টি", "এ স্ট্রীট কার নেমড
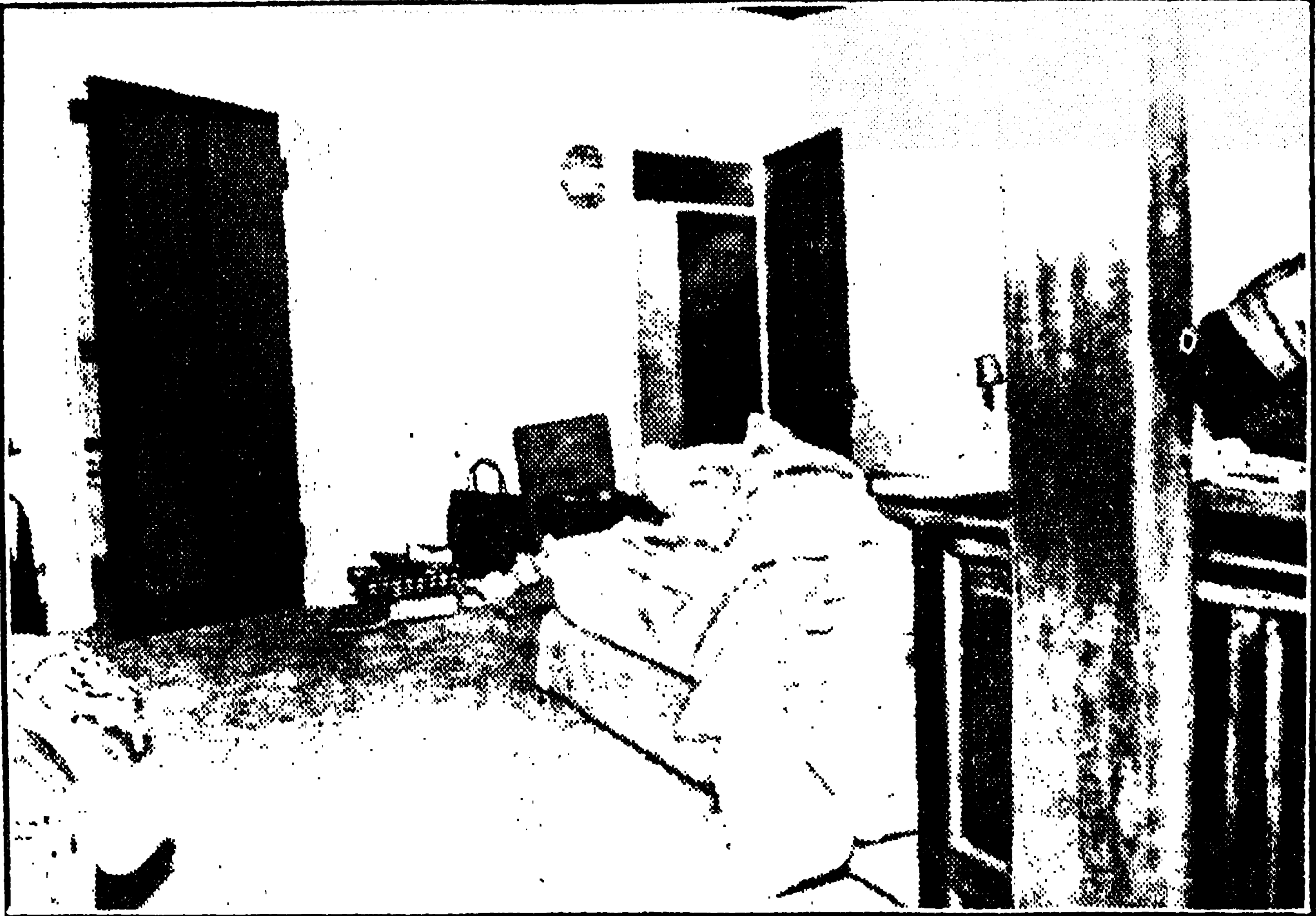
মেরিলীন মনরোর শেষ শয্যা

ডিজায়ার", "ইস্ট অফ ইডেন" 'অন দি ওয়াটার ফ্রন্ট', "বেবী ডল" প্রভৃতি ছবি এই ধারাতেই স্নাত। "মিসফিটস" ছবিতে স্ট্যানিসলাভস্কিক অভিনয়-রীতিকে উজ্জ্বল করেছিলেন মেরিলীন। মেরিলীনের সহকর্মিদের মধ্যে অনেকেই এই স্কুলের ছাত্রছাত্রী ছিলেন যেমন, মার্লন ব্রান্ডো, পল নিউম্যান, মণ্টোগোমারী ক্লিফট, ইভা মারী সেন্ট, শেলী উইন্টার, ডিভেকা লিন্ডফোর্ডস প্রভৃতি।

অভিনয়ের জন্যে কোনো পরিশ্রমেই কখনো বিমুখ হননি মনরো। স্যাটিং-এ একেকটা টেক্-এ কুড়িবার ত্রিশবার অভিনয় করার পর তবেই 'ফাইনাল' নিতে দিতেন। অথচ হলিউডের সাধারণ নিয়মে দু-তিনটের বেশী একই দৃশ্যের টেক্ করা হত না। তার ফলে অনেক সময়েই মেরিলীনের ছবির অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে, সংলাপ ভুলে, পরিচালকদের সমস্যায় ফেলতেন। মেরিলীন যতবার একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় করতেন তাঁর সঙ্গের অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় ততই খারাপ হতে থাকত। ফলে মেরিলীনের সঙ্গে অভিনয় করাটা হলিউডের অভিনেত্রী মহলে শেষ পর্যন্ত একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "সাম লাইক ইট হট"এ মনরোর বিপরীতে ছিলেন টনি কার্টিস। একটি বজরায় চুম্বনের দৃশ্যের টেক্ নেয়া হচ্ছিল। মেরিলীন দৃশ্যটিকে নিখুঁত করবার জন্যে বারবার কার্টিসকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে চুম্বন করছিলেন। কার্টিস যথারীতি দু-তিনবারের পর ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে উঠছিলেন। অন্ধকার সেট থেকে এমন সময় কৌতুককণ্ঠে কে যেন বলে উঠেছিলেন :

—স্বর্গ রাজ্যে বিচরণ করছেন নাকি মিঃ কার্টিস?

প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলেন কার্টিস,

—হায় ঈশ্বর! মনে হচ্ছে আমি স্বয়ং হিটলারকেই চুমু খাচ্ছি।

শুধু সহঅভিনেতারাই নয়, পরিচালকরাও তাঁর দীর্ঘসূত্রী অধ্যবসায়ের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। 'সাম লাইক ইট হট'এর পরিচালক বিলি ওয়াইল্ডার ছবিটি শেষ করে সখেদে বলেছিলেন :

আমি আজকাল বেশ খেতে পারছি। মেরুদণ্ডের সেই ব্যথাটা আর নেই। দীর্ঘ কয়েক মাস পর ঘুম হচ্ছে আমার। আমার স্ত্রী একজন মহিলা শুধুমাত্র এই কারণেই তাকে প্রহার করবার সেই দুর্দমনীয় বাসনাটাও আর নেই।

—আপনি কি মনরোর আর কোনো ছবি পরিচালনা করবেন?

—এই বিষয়ে আমি আমার ডাক্তার মনোসমীক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করেছি।

ইংলণ্ডে তৃতীয় স্বামী আর্থার মিলারের সঙ্গে মনরো (১৯৫৬)

তাঁদের উপদেশ হল মনরোর আরেকটি ছবি পরিচালনা করার পক্ষে আমার বয়েসটা কিঞ্চিৎ বেশী।

এবং অন্যো প্রেমিঙ্গার তাঁর টেলিভিশনে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে স্পষ্ট বললেন যে মেরিলীনের সঙ্গে ছবি? নৈব, নৈব চ—না, দশলক্ষ আয়কর-রহিত ডলারের বিনিময়েও না!

সবচেয়ে বিরক্তির কারণ ছিল মেরিলীনের দীর্ঘসূত্রতা। কখনো তিনি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকেননি। কতদিন যে তিনি প্লেন, ট্রেন ধরতে পারেননি তার কোনো হিসেব নেই। এমন কি স্টুডিওতেও তিনি কোনোদিন যথানির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হন নি। সেট সাজিয়ে পরিচালক, অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীরা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছেন। হয় সেদিন এলেনই না মনরো, যদিবা এলেন, কলাকুশলীদের কাজের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হতে আর হয়ত বেশী বাকি নেই তখন। তার ফলে প্রযোজক পক্ষের আর্থিক ক্ষতি হত নিদারুণ। মনরোর অর্ধসমাপ্ত ছবি "সামথিং'স গট টু গিভ" ছবিটি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী মনরোর অনিয়মিত উপস্থিতির জন্যেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। মেরিলীনকে এবিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি সরলকণ্ঠে বলেছিলেন :

সত্যি করে বলতে কি আমি ঠিক দেরী করি না। আসলে পৃথিবীটাই অত্যধিক তাড়াতাড়ি চলে। তবে আসল স্বীকারোক্তি পরে করেছিলেন মনরো :

যারা আমাকে চায় তাদের অপেক্ষা করিয়ে শাস্তি দিতে আমি এক অদ্ভুত

বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও দ্বিতীয় স্বামী ডি ম্যাগিও-র সঙ্গে মনরো

আনন্দ পাই। আসলে আমি কিন্তু ঠিক তাদেরই শাস্তি দিতে চাই না, বিগত দিনের নর্মা জীনকে যারা অবজ্ঞা করেছিল তাদের ওপরের আক্রোশটাই আমি এই-ভাবে মেটাতে চাই।

বাস্তবিক, শৈশবের নর্মা জীনকে কখনো ভুলতে পারেননি মেরিলীন মনরো। একটু ভালো জলে স্নান করাটাও তাঁর শৈশবে বিলাসিতা ছিল। তাই ভোজসভার অতিথিদের ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর করে, সেটের তীব্র আলোগুলোকে নির্বিচারে পুড়তে দিয়ে, অভ্যর্থনা সভার ফুলগুলোকে ঝরিয়ে, স্নানঘরে টবের মহার্ঘ গন্ধ-জলে ঘন্টার পর ঘন্টা স্নান করাতেন কবেকার সেই কিশোরী নর্মা জীনকে। শুধু কৈশোরই বা কেন, তাঁর প্রথম যৌবনের হলিউডও তাঁকে নিয়ে নির্মমভাবে খেলতে চেয়েছিল।

সিমোন ডি বোভায়ার তাঁর "দি সেকেন্ড সেক্স" গ্রন্থে আধুনিক হলি-উডের এক নিপুণ বিবরণ দিয়েছেন :

The subjection of Holywood stars is well known. Their bodies are not their own; the producer decides on the colour of their hair, their weight, their figure, their type, to change the curve of a cheek, their teeth may be pulled. Dieting, gymnastics, fittings, constitute a daily burden. Going out to parties and flirting are expected under the head of "personal appearances"; private life is no more than an aspect of public life .... a shrewd and clever woman knows what her "publicity" demands of her. The star who refuses to be pliant to these requirements will experience a brutal or a slow but inevitable dethronement.

কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে হাঁটলেও মেরিলীন কখনো হলিউডের নকল নাগরিকসমাজের একজন হননি। হলিউডের নৈতিক শৃঙ্খলনেরো কখনও সারিক হননি তিনি—এটাই আশ্চর্য। লস-এঞ্জেলসে নবাগত অভিনেত্রীদের প্রথম যৌবনের ইতিহাস প্রায়শঃই গ্লানিকর, কিন্তু মেরিলীন কখনো কোনো সুবিধের বিনিময়ে নিজের শরীরকে কাদা হতে দেন নি।

অনেক সময় অর্থাভাবের জন্যে বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে বেরোতেন মনরো। স্বভাবতঃই বাইরে খাওয়ার খরচটা তারাই দিতেন, তার নিজের একবেলার খাওয়ার খরচটা বেঁচে যেত। এমনি একবার এক বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রতীরে 'খাওয়া বাঁচানো' ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন মেরিলীন। বন্ধুটি প্রায়ই তাঁর শরীরে হাত দিয়ে টিপে হাড় অনুভব করার চেষ্টা করছিল। কথায় কথায় জানায় সে,

—তোমার হাড়গুলো খুব ভালই। যেসব মেয়েদের হাড় খুব ভাল আমি তাদের খুবই—।

ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন মেরিলীন।

—আমার হাড় যদি আপনার খুব পছন্দের হয়, বেশ, তাহলে একটা এক্সরে তুলিয়ে পাঠিয়ে দেবো আপনাকে।

আর দাঁড়াননি তিনি।

যখন তাঁর অবস্থা নিতান্তই খারাপ ছিল তখনই লক্ষ লক্ষ ডলারপতিদের মধ্যে অনেকে তাঁকে বিয়ে করে সম্পত্তিদান করতে চেয়েছিলেন। রাজী হননি মেরিলীন। অথচ মাত্র পঞ্চাশ ডলার বাড়ি ভাড়া যোগাড় করবার জন্যে এক ফোটো-গ্রাফার দম্পতির কাছে ক্যালেণ্ডারের জন্যে স্বচ্ছন্দেই নগ্নগাত্রে ছবি তুলেছিলেন। "মনরো ডেসনুডো"র দুটী ক্যালেন্ডারের ছবি "গোল্ডেন ড্রিমস" এবং "এ নিউ উইকংল" হাজার হাজার ডলারে দিয়েছিল ছবির সত্ত্বাধিকারীকে। কিন্তু এই ছবি দুটির জন্যে কখনো লজ্জা বোধ করেন নি তিনি। গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটবার পর শরীরসর্বস্ব চরিত্রে কখনো অভিনয় করতেও চাননি। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী, ফ্রাংক সিনাত্রার বিপরীতে "দি গার্ল ইন পিংক টাইটস" ছবিতে অভিনয়ের জন্যে তাঁর নাম ঘোষণা করে। মেরিলীন প্রবল আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন :

আমি সত্যিকারের অভিনেত্রী হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমাকে খাটো গোলাপী জামা পরিয়ে দর্শকদের স্থূলে ছবি উপহার দিয়ে ষ্টুডিও অর্থ উপার্জন করতে চাইলেও, আমি চাই না।

টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করবার ভয় দেখান। কিন্তু মনরো বরখাস্তকে মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি।

মেরিলীন মনরোকে হলিউডের অনেক সমালোচক প্রায় কিংবদন্তীর অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গার্বো প্রচারবিমুখ ছিলেন এবং জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন নিঃসঙ্গভাবে। হলিউডের দাসত্ব মেরিলীন এবং গার্বো কেউই করেন নি। তবে গার্বোর অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁর উত্তরসূরীর ছিল না। মেরিলীন সর্বদাই দ্বৈত সত্তায় পৃথিবীর পথে ছিলেন। তাঁর ছবির মুক্তি অনুষ্ঠানে যেতে চাইতেন না, ভোজসভার নেমন্তন্ন এড়িয়ে চলতেন। আবার অন্যদিকে হলি-উডের প্রচার যন্ত্রটিকেও নিজের কাজে ষোলো আনা ব্যবহার করেছেন।

মনরো সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্য খবর হল হলিউডের বিশ্ববিখ্যাত অভি-নেত্রীদের মধ্যে মেরিলীন মনরোই সম্ভবতঃ একমাত্র কবি। ম্যানহাটন শহর সম্বন্ধে একবার একটি কবিতায় লিখেছিলেন :
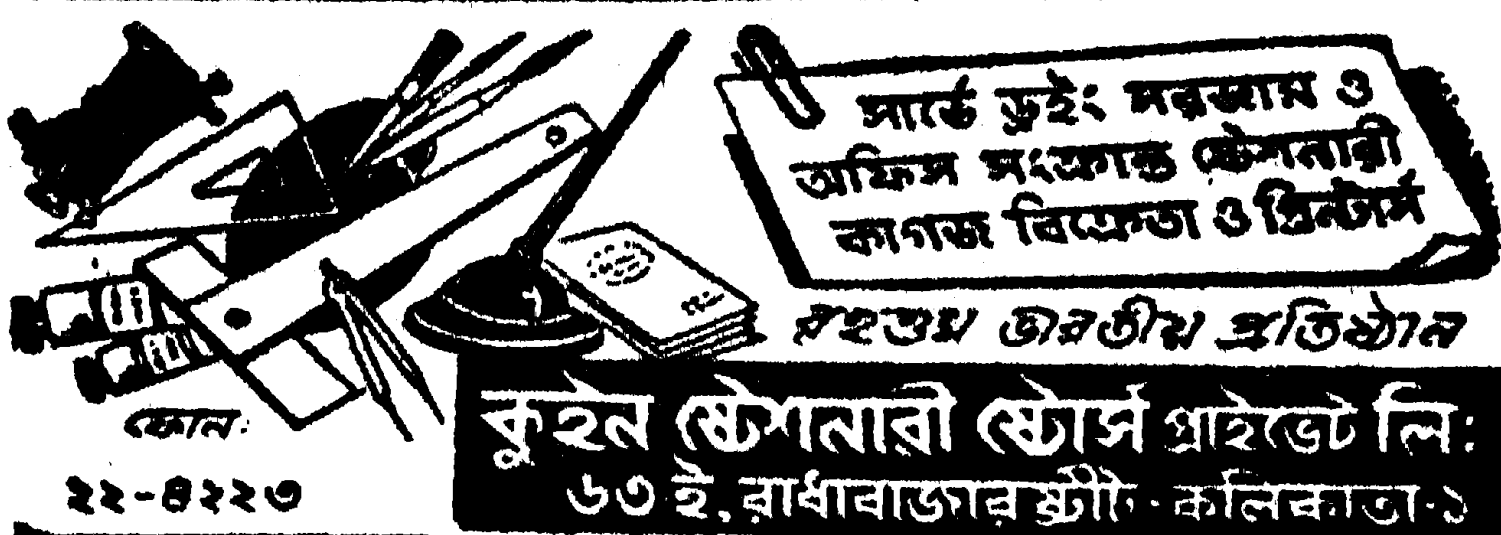
So many lights in the darkness
making skeletons of the
buildings ....
(The Towers)

ষ্টুডিওতে প্রায়ই তাঁর হাতে মার্সেল প্রুস্তএর রচনাবলী দেখা যেত। ১৯৫১ সালে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মনরো চারজন প্রিয় লেখকের নাম করেছিলেনঃ আর্থার মিলার (পরে স্বামী), টলস্টয়, টমাস উলফ এবং জঁ পেরী। মনরোর প্রিয় লোকের তালিকাটি আরো চিত্তাকর্ষক। জওহরলাল নেহেরু, মার্লন ব্রান্ডো, মাইকেল চেকভ, জন হাস্টন এবং জেরী লুইস!

কিন্তু মেরিলীন মনরো কবি ছিলেন শুধু এই কারণেই না যে তিনি কবিতা লিখতেন। তিনি তাঁর জীবনের মালাটিকেও মুক্ত ছন্দের কাব্যে গাঁথতে চেয়েছিলেন। তাই সারল্য, যৌনতা, সাহিত্য, শিল্প, অধ্যবসায়, উচ্ছৃংখলতা ইত্যাদি বিচিত্র শব্দগুলি তাঁর জীবনের কবিতায় পাশাপাশি বসেছিল স্বচ্ছন্দে। মনরো সম্বন্ধে জনৈক পত্রিকা-সমালোচক একবার লিখেছিলেন :

Her appearance is more felt in her exit.

কবি শ্রীমতি মেরিলীন মনরো নিজের আবির্ভাবকে চিরকালের অনুভূতি করবার জন্যেই কি মঞ্চ থেকে মহাপ্রস্থান কর-লেন? নাকি এই অকাল প্রস্থান জনৈকা দীর্ঘসূত্রীর পরম প্রায়শ্চিত্ত?

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

আশার বাণী :

ইংরেজ-কবি শেলী যে-কথা বলেছেন, তারই বাঙলা তর্জমা ক'রে বলতে ইচ্ছে করছে, "শীত যদি আসিল ঘনায়ে, বসন্ত কি রবে বহু দূরে!" অন্ততঃ গেল শনিবার, ১৯ই আগস্ট বৈকালে ক্যাথিড্রাল রোডস্থ ফাইন আর্টস্ অ্যাকাডেমী হলে উপস্থিত থেকে এই কথাই মনে হয়েছিল। আরও মনে হয়েছিল, বাঙলার মুমূর্ষু চলচ্চিত্র-শিল্পকে দৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড় করিয়ে তাকে সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে দিয়ে তার উন্নতির পথকে প্রসারিত করবার জন্যে আমরা এই "অমৃত"-এর প্রেক্ষাগৃহ-স্তম্ভে বারংবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যে-দরবার করেছি, এতদিনে যেন তার সুফল ফলতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পের জয়েণ্ট ওয়েলফেয়ার কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে-তিনজন মন্ত্রী—একজন কেন্দ্রীয় এবং দু'জন পশ্চিমবঙ্গের—এই রাজ্যের চলচ্চিত্র-শিল্পের বর্তমান সংকট ও সমস্যাবলী-সংক্রান্ত আলোচনা-সভায় যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা তিনজনই বাঙলার এই গৌরবময় শিল্পের বর্তমান দুরবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই অবস্থা থেকে শিল্পটিকে বাঁচাবার জন্যে সকল রকম প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করবার আশ্বাস দেন। কিন্তু ওরই মধ্যে তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিচিত্র এবং উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল।

সভাপতি হিসেবে পশ্চিম বাঙলার শিল্পবাণিজ্য এবং সমবায়মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যার প্রতি শুধু বাঙলা দেশ নয়, সারা ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য ব'লে মনে করছি। তিনি বলেছেন, আজকের জগতে চলচ্চিত্র-শিল্প এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে যে, যাঁরা দেশের কাজ করতে চান, তাঁরা কোনো মতেই এই শিল্পটিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। বাঙলা ছবির জগতে বর্তমান সংকটের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন, যে-বাঙলা দেশ চলচিত্রের ক্ষেত্রে একদিন সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তার আজ এই দুরবস্থা কেন? পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে বাঙলা ছবির বাজার নিশ্চয়ই ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু এইটেই কি একমাত্র কথা? একদিন নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি সারা ভারতে আদর পেয়েছিল; আজ কি আবার হিন্দী ছবি তৈরী ক'রে ভারতের সব জায়গায় দেখানো যায় না? বাঙলার বাইরেও বাঙলা ছবি দেখবার লোক আছে যথেষ্ট; কিন্তু দেখাবার ব্যবস্থা যথেষ্ট নেই।—এই কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙলা ছবি এবং বাঙলা দেশে তোলা ছবি দেখাবার জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত ছবিঘর তৈরী করা যায় কিনা, তাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলে বলেন, বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্প যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তার থেকে কি ক'রে একে উদ্ধার করা যায়, সেই প্রশ্নটিই আজ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখা যায়, ছবি যিনি টাকা খরচ ক'রে তৈরী করলেন, তাঁর খরচ উঠুক না উঠুক, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে চিত্রগৃহের মালিকরা তাঁদের নিজেদের গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে, তারজন্যে সাপ্তাহিক 'হাউস প্রোটেক্শন'-এর ব্যবস্থা রেখেছেন। একটি হপ্তায় যদি কোনো ছবির বিক্রি থেকে সাত হাজার টাকা পাওয়া যায়, তাহ'লে ছবিঘরের মালিক তাঁর 'হাউস প্রোটেকশন' বাবদ ছ'হাজার টাকা কেটে রেখে মাত্র এক হাজার টাকা দেন ছবির পরিবেশকের হাতে।—ছবি দেখিয়ে যে-টাকা আমদানি হয়, তার এই রকম অসমবণ্টনের ফলেই ছবির প্রযোজকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন,—এই কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ-রকম অসাম্য দূর করা যায় কিনা, তা চিন্তা করা দরকার।

শ্রীঘোষ এবং শ্রীকোলে দু'জনেই ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে রাজ্যসরকার অতি শীঘ্রই শিল্প-সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি গোপাল রেড্ডী তাঁর ভাষণ দিতে উঠে বলেন, সারা ভারত যখন চলচ্চিত্রশিল্পের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক তখনই যদি ভারতে চলচ্চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ এবং বিশ্বের স্বীকৃতিধন্য বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্প দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়, তাহ'লে সেটা হবে একটি জাতীয় ট্রাজিডি। এবং এই ট্রাজিডি যাতে কিছুতেই ঘটতে না পায়, সে-সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করতে সব সময়েই প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু যেহেতু জনসাধারণ খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু সমস্যা থাকতে চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্যাকে অগ্রাধিকার (প্রায়রিটি)

ফাইন আর্টস একাডেমী হলে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রযোজক, পরিবেশক, শিল্পী ও কুশলীদের সভায় বক্তৃতা করছেন শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। পার্শ্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ রেড্ডী।

দিতে চাইবেন না, সেই হেতু কেন্দ্রীয় বা কোনো রাজ্যসরকারের পক্ষে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সরাসরি অর্থবিনিয়োগকে তাঁরা সম্ভবতঃ অনুমোদন করবেন না। তিনি প্রস্তাব করেন, অধিকতর চিত্রগৃহ নির্মাণের কাজে পশ্চিমবঙ্গের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অগ্রণী হ'তে আহ্বান করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন চিত্র-নির্মাণে ঋণদানের ব্যাপারে তাঁদের শর্তাবলীকে কিছুটা শিথিল করবার কথা চিন্তা করছেন। পশ্চিম বাঙলার কলা-কুশলীদের যাতে ফিল্মস্ ডিভিসনের কাজের জন্যে নিয়োগ করা যায়, তাও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ঘোষণা করেন, ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্যে শীঘ্রই একটি জাতীয় চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে এবং এই পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা যথাযোগ্য আসন লাভ করবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পের বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই একটি প্রতিনিধিমূলক অনুসন্ধান সমিতি গঠনের পরামর্শ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পের জয়েন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফ থেকে যে-তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, এই শিল্পটির সঙ্গে প্রায় ১১,০০০ কর্মীর জীবন জড়িত; পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ ৪০০টি প্রেক্ষাগৃহ আছে এবং মাত্র প্রমোদকর বাবদ আমাদের রাজ্য সরকার বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। জয়েন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি যে ১৪ দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করেছেন, তারমধ্যে প্রধানতমগুলি হচ্ছে:—

১। পশ্চিম বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য সরকারী রক্ষাকবজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহে বাধ্যতামূলকভাবে বাঙলা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যে প্রেক্ষাগৃহে বাঙলা ছবি মোটেই চালানো হয় না, সেখানে বছরে অন্ততঃ ৮ সপ্তাহ বাঙলা ছবি দেখাইতে হইবে।

৩। স্টুডিও এবং ল্যাবরেটারীতেও চিত্রনির্মাণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে হইবে অথবা প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিতে হইবে।

৪। চিত্রনির্মাতাদের যৌথ সমবায়-গুলিকে সরকারী সাহায্য দিতে হইবে।

৫। সরকার কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই কাজে বেকার ও অর্ধ-বেকার কলাকুশলীদের কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যের বড় শহরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অন্ততঃ একটি করিয়া প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করিয়া বাঙলা ছবি প্রদর্শনের ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। বাঙলাদেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং সরকারের পরিচালনাধীনে কতকগুলি বিশেষ ধরণের প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করিতে হইবে।

মানুষ স্বভাবতঃই সংরক্ষণশীল। তাই চিরাচরিত প্রথাকে পরিবর্তন করা কোনো ক্ষেত্রেই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি নিয়ে যদি অগ্রসর হওয়া যায়, তাহ'লে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনই সমাজ ও শিল্পের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। ব্যবহারিক অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে, যিনি অর্থ-বিনিয়োগ করে কোনো কিছু প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন, সেই জিনিসের বিক্রয়লব্ধ অর্থের বেশীরভাগ অংশই—এবং গড়পড়তা হিসেবে দেখা গেছে এই অংশ কোনো ক্ষেত্রেই শতকরা ৬৬⅔ ভাগের কম নয়—তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু বাঙলাদেশের চিত্র-প্রযোজকদের ভাগ্যে কখনই এই অংশ শতকরা ২০।২১ ভাগের বেশী হয় না। এই অন্যায় দূর করতে হবে। এবং এর জন্যে প্রয়োজন হ'লে সরকারীভাবে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে। বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে একটি সুস্থ অর্থনৈতিক কাঠামো খাড়া করা অত্যাবশ্যক। আমরা আশা করি, আজ যখন আমরা তরুণকান্তি ঘোষের মত একজন চলচ্চিত্রভক্তকে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ও সমবায়মন্ত্রীরূপে পেয়েছি, তখন চলচ্চিত্রশিল্পকে সুস্থ জীবনদানের জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা' করতে আদৌ কালবিলম্ব করবেন না।

চিত্র সমালোচনা

মায়ার সংসার (বাঙলা) ঃ শিবানী ফিল্মস্-এর নিবেদন ঃ ১২,০৩০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; রচনা, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা ঃ কনক মুখোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীত-রচনা ঃ প্রণব রায়; চিত্রগ্রহণ ঃ দেওজীভাই; শব্দধারণ ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শব্দ-পুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা ঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা ঃ কার্তিক বসু; রূপায়ণ ঃ সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি রায়, সুলতা চৌধুরী, শিখা বাগ, মালা বাগ, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মাস্টার তিলক প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১৭ই আগস্ট থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বহু দিন আগে দেখেছিলুম, এমিল জেনিংস-অভিনীত "ওয়ে অব অল ফ্লেশ" বলে একখানি অবিস্মরণীয় চিত্র। সংসার-প্রিয়, বেহালাবাদনে পারদর্শী, সময় এবং কর্তব্যনিষ্ঠ এক ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার নিজের সাময়িক দুর্বলতার জন্যে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে ব্যাঙ্কের টাকা হারিয়ে ফেলে কিভাবে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে সারা জীবন ধ'রে নিজের প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল, তারই জাজ্বল্যমান চিত্র বিধৃত হয়েছিল "ওয়ে অব অল ফ্লেশ"-এ।

"মায়ার সংসার"-এর অমরেশকেও দেখি, এক সঙ্গীতপ্রিয়, বেহালাবাদক, স্নেহপরায়ণ, কর্তব্য ও সময়নিষ্ঠ অফিস-সেক্রেটারী রূপে। কিন্তু রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানীর যে-পঞ্চাশ হাজার টাকা খোয়া যায় তার হাত দিয়ে, তার জন্যে তার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই; একজন ঈর্ষাপরায়ণ, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির লোভ এবং প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির চক্রান্তে প'ড়েই সে টাকাটা হারাতে বাধ্য হয়। "ওয়ে অব অল ফ্লেশ"-এর ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের মত ট্রেনলাইনের ওপর ধস্তাধস্তি ক'রে শেষ পর্যন্ত তার বদলে তার আততায়ীই ট্রেন চাপা পড়ে; যদিও পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, অমরেশই ট্রেন চাপা প'ড়ে মারা গেছে। যদিও দেখানো হয়েছে, ট্রেন-লাইনে বেঁচে যাবার পর সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ বিভাসের দ্বারা বন্দী অবস্থায় কিছুদিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে এবং পরে তার স্ত্রী নমিতা দ্বারা মুক্ত হয়, তবু সমস্ত ছবিটা দেখবার পর প্রশ্ন থেকেই যায়, মুক্তিলাভের পর সে সরাসরি পুলিশ-স্টেশনে গিয়ে সমস্ত ঘটনা না জানিয়ে দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধ'রে আত্মপরিচয় গোপন ক'রে গাঢাকা দিয়ে রইল কেন? অতদিন ধ'রে কোন্ পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করল? এবং গাঢাকা দিয়ে থাকবার সময় বেহালাই বা সে পেল কোথা থেকে এবং আত্ম-গোপনই যদি সে করতে চায়, তাহ'লে বেহালা বাজাবেই বা কেন?—

"মায়ার সংসার"-এর গল্প সম্পর্কে এমন সব প্রশ্ন কিন্তু ছবিটি দেখবার সময় মনে না আসাই সম্ভব। কারণ, অনুভূতি-আকর্ষণকারী চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা-সংস্থাপন, উপভোগ্য সংলাপ প্রভৃতির সহায়তায় চিত্রনাট্যটি এমন একটি গতিশীলতা লাভ করেছে, যা হয়েছে অতিমাত্রায় চিত্রধর্মী এবং সেই কারণে সার্থক।

"মায়ার সংসার"-এ জনপ্রিয়তার উপাদান আছে প্রচুর। প্রথমেই এর অভিনয়াংশ দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। কবিতা-লেখায় বাতিকগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ সর্বেশ্বরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের প্রাণ-ঢালা আন্তরিক অভিনয়, রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানীর মালিক দীনদয়াল রায়ের ভূমিকায় কমল মিত্রের অভিনব রূপসজ্জা এবং প্রত্যয়শীল অভিনয়, মায়ার ভূমিকায়
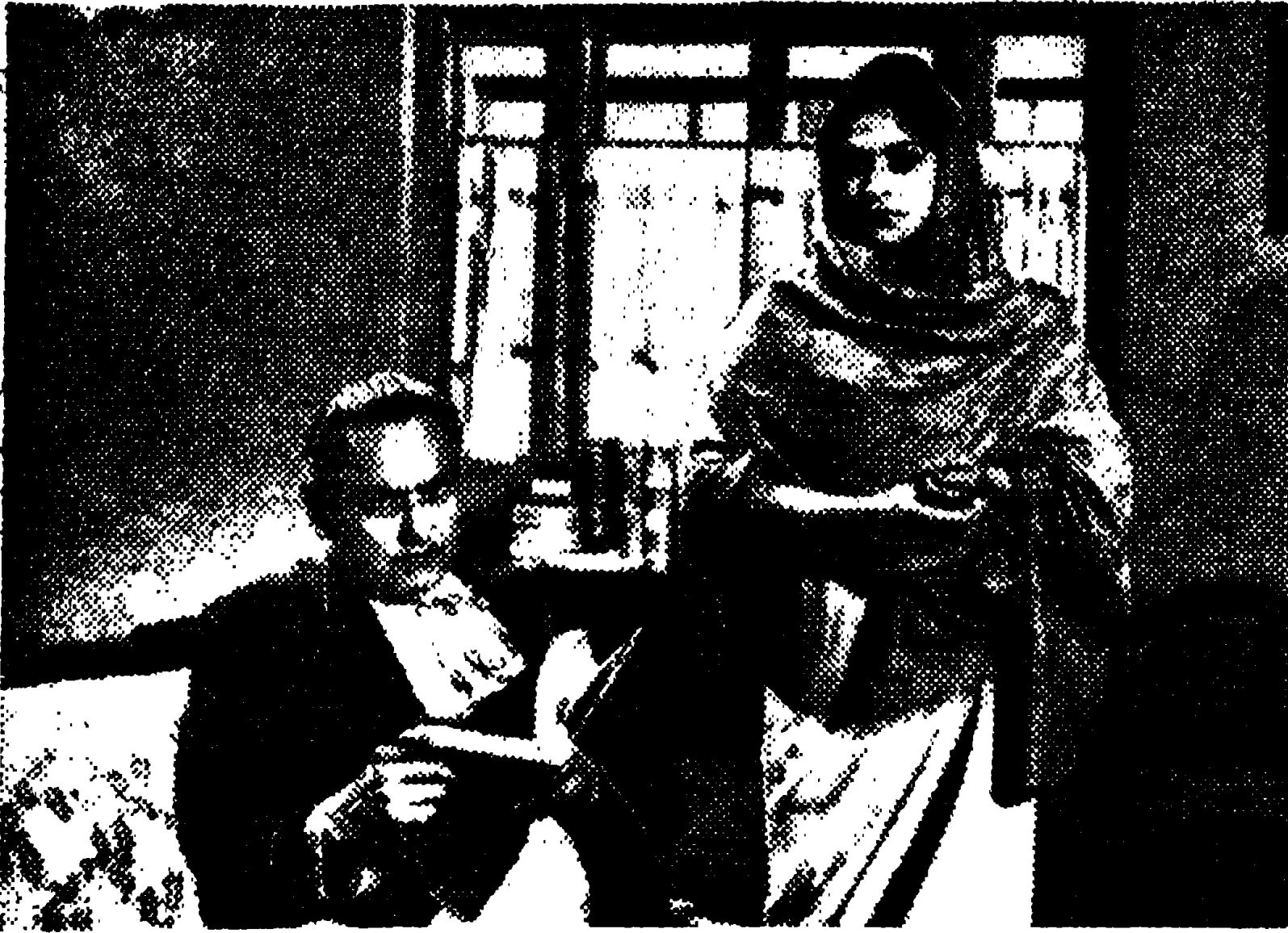
সদ্যমুক্ত 'মায়ার সংসার' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও পরলোকগত শিল্পী ছবি বিশ্বাস

সন্ধ্যারাণীর আনন্দ-বেদনা, আকস্মিক আঘাতের দুঃখ এবং নিষ্ঠুর নিয়তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামশীলতার প্রকাশক চিত্তহারী অভিনয় এবং অমরেশ চরিত্রে নিষ্ঠা, সততা, স্নেহ-মমতা, নিয়তির চক্রান্তে পরাভবস্বীকার প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবকে প্রকাশ ক'রে অসিতবরণের স্মরণীয় অভিনয়—এই ছবির অন্যতম সম্পদ। এই চারজন ছাড়াও যাঁরা তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয়ের গুণে ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে বিকাশ রায় (বিভাস), দীপ্তি রায় (নমিতা), বিশ্বজিৎ (তপন), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বটাদা), মাস্টার তিলক (ছোট তপন), সুলতা চৌধুরী (উৎপলা) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"মায়ার সংসার"-এর দ্বিতীয় সম্পদ হচ্ছে এর গানগুলি। সাতখানি গানের প্রতিটিই সুলিখিত, সু-সুরবন্ধ, সুগীত, সুগৃহীত এবং সুপ্রযুক্ত। বহুদিন বাঙলা ছবির মাধ্যমে এমন সুন্দর গানের পরিবেশন দেখতে পাইনি। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। চিত্রগ্রহণের ব্যাপারে, বিশেষ ক'রে রাত্রের দৃশ্যে দেওজীভাই অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির শব্দ-ধারণের কাজেও সমান মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর ঘোষ। এবং সম্পাদক ছবিটিকে যে-ভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন করবার জন্যে মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নিয়েছেন, তা' উচ্চ প্রশংসারযোগ্য। শিল্প-নির্দেশনা সাধারণভাবে উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

শিবানী ফিল্মস-এর "মায়ার সংসার" জনপ্রিয়তা লাভ করবে, এ-ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করা যায়।

মঞ্চাভিনয়

(১) চক্রবৈঠক-এর "উদ্বার্ষিকী": 'চক্রবৈঠক"-এর সভ্যসভ্যারা গেল মঙ্গলবার, ১৪ই আগস্ট স্টার রঙ্গমঞ্চে অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত "উদ্বার্ষিকী" রঙ্গনাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

"উদ্বার্ষিকী" নামকরণের মধ্যে নিশ্চয়ই নতুনত্ব আছে; কিন্তু কথাটা একটু কষ্টকল্পিত নয় কি? উদ্বাহ+বার্ষিকী= উদ্বার্ষিকী; সন্ধিটা একটু বড়ো রকম নিপাতনে সিদ্ধ। এর চেয়ে ম্যারেজ+অ্যানিভার্সারি=ম্যারিভার্সারি ঢের সহজ। এবং অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "উদ্বার্ষিকী"-তে একটি ছোট গল্প আছে বটে, কিন্তু নাটক নেই। গুরুভক্তি-প্রবণা স্বর্ণময়ী ইটখোলার মালিক জগৎ-হরিবাবুর সঙ্গে প্রায় আদায়-কাঁচকলায়—ঝগড়া তাঁদের লেগেই আছে। তাই জগৎবাবুর ভাগ্নে প্ল্যান করল, মামা-মামীর বিবাহিত জীবনের পঁচিশ বচ্ছর উদ্যাপন উপলক্ষ্যে একটা রজত জয়ন্তী উৎসব ক'রে মামা-মামীর মধ্যে একটা বরাবরের মিল ঘটিয়ে দেবে। গুরু প্রেমঘনাচ্ছন্ন মহারাজের কৃপায় মিল ত' ঘটলই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মেয়ে শান্তিও তার পিসতুতো ভাই ভোম্বলের বন্ধু বিশ্বরূপকে পেল জীবনসঙ্গীরূপে এবং "উদ্বার্ষিকী"র মধ্যে যেটি সত্যিই নাটকীয় ব্যাপার, গুরু প্রেমঘনাচ্ছন্ন মহারাজ নিজে ফিরে পেলেন তাঁর বহুদিন আগে ছেড়ে-আসা স্ত্রীকে।

"উদ্বার্ষিকী"তে হাসির উপাদান আছে প্রচুর, যদিও সে-হাসি ঘটনাশ্রয়ী না হয়ে প্রধানতঃ সংলাপাশ্রয়ী। "মাল্টি-পার্পাস কালচারাল ব্যুরো" নিঃসন্দেহে অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের একটি মৌলিক সৃষ্টি এবং সমগ্র রচনার মধ্যে প্রায় প্রক্ষিপ্তভাবে স্থান পেলেও দৃশ্য হিসেবে সামান্য একটু রসবিকারকে বাদ দিলে পরম উপভোগ্য।

এবং সমগ্রভাবেই "উদ্বার্ষিকী" অসামান্যরূপে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল চক্রবৈঠক-এর সভ্যসভ্যাদের অভিনয় গুণে। তবে ওরই মধ্যে দু'জনের অভিনয় সেদিনের দর্শকসাধারণের বহু দিন মনে থাকবে। ইটখোলার মালিক জগৎবাবুর ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষ রূপসজ্জা থেকে শুরু ক'রে বাচনে, অঙ্গভঙ্গীতে, বিশেষ ক'রে আঁখিতারকার কুঞ্চন এবং ঘূর্ণনে যে-নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা' একমাত্র তাঁরই মত প্রথম শ্রেণীর চরিত্রাভিনেতার পক্ষেই সম্ভব। তাঁর পরেই "মাল্টি-পার্পাস কালচারাল ব্যুরো"র ম্যানেজার নেপালের চরিত্রে ঝানু অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে 'এঁহে'— এঁহে'— এঁহে'— উচ্চারণের সাহায্যে চরিত্রটিকে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। গুরুদেবের ভূমিকায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়কে মানিয়েছিল চমৎকার এবং তিনি সংযত অভিনয়ের সাহায্যে চরিত্রটিকে মর্যাদা-মন্ডিত ক'রে তুলেছেন। অভিনয়ের গুণে আর যেসব চরিত্র দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল, সেগুলি হচ্ছে ভোম্বল (অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়), ঝঙ্কার (বিমান গুপ্ত), সদানন্দ (অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়), আনন্দ (কালী সরকার), সুকান্ত (ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল), ভজহরি (কালিপদ দে), স্বর্ণময়ী (সুভদ্রা ঘোষ), শান্তি (দেবী মুখোপাধ্যায়), মণিকা (কুমকুম দত্ত), মিসেস চাকলাদার (অনিমা দাশগুপ্ত) এবং সুহাসিনী (পরী বন্দ্যোপাধ্যায়)। গীতশ্রী ইভা দত্তর কীর্তন

গান দু'খানি অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর হয়েছিল।

"উল্টাবার্ষিকী"র মঞ্চস্থাপনা এবং পরিচালনা হয়েছিল যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের।

(২) সারম্-এর "মেক-আপ্" :

"সারম্"-সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় গেল রবিবার, ১২ই আগস্ট ভবানীপুরের ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ হলে অমল বসু রচিত এবং পরিচালিত "মেক-আপ" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

"মেক-আপ" প্রধানতঃ রহস্যমূলক এবং সাস্পেন্সধর্মী নাটক। একটি অভিনয়-মঞ্চ এবং একটি মেক-আপ রুম নাটকটির অকুস্থল। সমীরণ নামে একজন পটশিল্পীর স্ত্রী অঞ্জনা অভিনেত্রী-জীবনে নায়ক-অভিনেতা নীলাদ্রিকে ভালোবেসে ফেলেছেন। কিন্তু সংস্থার ভূতপূর্ব অভিনেতা দেবাংশু এবং সংস্থার মালিক নিজেও অঞ্জনার প্রেমের কাঙাল। এই অবস্থায় মঞ্চের ওপর অঞ্জনা যখন রানীর বেশে অভিনয় করছে, তখন সে নীলাদ্রির অভিনেয় চরিত্র "দিবাকর"-রূপধারী কারুর দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নিহত হয়। হত্যাকারী কে, এই নিয়ে চলে তদন্ত এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পায়, সমীরণ নিজেই অঞ্জনার উপেক্ষায় অশান্ত হয়ে নিজ স্ত্রীকে হত্যা করেছে। নিঃসন্দেহে "মেক-আপ"-এর উপাখ্যানভাগ কোনো বিদেশী গল্প থেকে সংগৃহীত।

অভিনয় মোটামুটি সাধারণ পর্যায়ের। এবং ওরই মধ্যে উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন নীতীশ বাগচী (নীলাদ্রি), নারায়ণ কুন্ডু (দেবাংশু) এবং গীতা বসু (অঞ্জনা)। মঞ্চপরিচালনা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ: দৃশ্যান্তরে যেতে অনাবশ্যক কালক্ষেপ সময় সময় অসহনীয় মনে হয়েছে। আলোকসম্পাতেও বহু ভুলত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না বলেই মনে হয়।

বিবিধ সংবাদ

প্রযোজক আর, ডি, বানশাল :

প্রায় আড়াই মাস ধ'রে বিদেশ ভ্রমণের পর গেল ৫ই আগস্ট প্রযোজক আর, ডি, বানশাল কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ইয়োরোপ এবং আমেরিকা পরিভ্রমণের সময় তিনি পাশ্চাত্য দেশের চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে পর্যালোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কয়েকদিন তিনি হলিউডেও কাটিয়ে এসেছেন।

"এক টুকরো আগুন", "সাত পাকে বাঁধা" এবং "ছায়াসূর্য" :

বিনু বর্ধনের পরিচালনায় "এক টুকরো আগুন" প্রায় সমাপ্তির পথে এসে পৌঁছেছে। সুচিত্রা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে "সাতপাকে বাঁধা" ছবিখানি অজয় করের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। আর, ডি, বানশালের পরবর্তী চিত্র "ছায়াসূর্য"-র কাজও পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরিচালনায় শীঘ্রই শুরু হবে।

চিত্রসংসার-এর "শেষচিহ্ন" :

মূলচাঁদ জৈন নিবেদিত এবং এস, ব্যানার্জি প্রযোজিত চিত্রসংসার-এর নবতম নিবেদন "শেষচিহ্ন" আজ শুক্রবার, ২৪-এ আগস্ট থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা, আলোছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। বিভূতি চক্রবর্তীর পরিচালনায় তোলা এই ছবিখানিতে সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, লিলি চক্রবর্তী, রেণুকা রায় প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীদের দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ।

শেষাগ্নির ১০০তম অভিনয় :

কাল ২৫-এ আগস্ট, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে "শেষাগ্নি" নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে। এই অনুষ্ঠানে স্টার রঙ্গমঞ্চের সত্ত্বাধিকারী শ্রীসলিল মিত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে ১০০১্ টাকা প্রদান করবেন এবং শেষাগ্নি নাটকের কাহিনীকার, নাট্যরূপদাতা-পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক, সুরকার, গীতিকার, শিল্পীবৃন্দ এবং নেপথ্য কর্মিবৃন্দকে পুরস্কৃত করা হবে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব :

আসছে ১লা থেকে ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা পশ্চিমবাঙলায় "শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ"-আয়োজিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উৎসবের উদ্বোধন করবার জন্যে এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবার জন্যে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ এবং বি গোপাল রেড্ডীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এ বছর লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবে। এবারের উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হবে শিশু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে তিন দিনব্যাপী আলোচনাচক্র, সর্বভারতীয় শিশু সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের বিশেষ সংবর্ধনা সভা এবং আন্তর্জাতিক শিশুমেলা।

'অবাক পৃথিবী' চিত্র-প্রদর্শনী

গত বৎসরের মত এই বৎসরও 'ইউনাইটেড নিউ অর্গানাইজেসন'-এর উদ্যোগে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সাহায্যকল্পে আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় "উত্তরা" প্রেক্ষাগৃহে 'অবাক পৃথিবী' চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি উপ-সমিতি গঠিত হয়েছে : সভাপতি—শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

সহসভাপতি—শ্রীশৈলরাজ ঘোষ, সদস্য-বৃন্দ—শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ, শ্রীরমণীমোহন কর, শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ, শ্রীঅরুণ বোস, শ্রীরামেশ্বর বসাক।

মাস থিয়েটার্স

গত ১২ই আগষ্ট '৬২ শ্রীরসরাজ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে মাস থিয়েটার্সের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া ১৯৬২-৬৩ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়ঃ সভাপতি—শ্রীহেমন্তকুমার মুখার্জি, সহ-সভাপতিদ্বয়—শ্রীরসরাজ চক্রবর্তী ও শ্রীপ্রদীপকুমার গুহ; সাধারণ-সম্পাদক—শ্রীশীতাংশু চক্রবর্তী; সংগঠন-সম্পাদক—শ্রীনিরঞ্জন রায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য; প্রচার-সম্পাদক—শ্রীসুকৃতিমোহন ভৌমিক; প্রযোজনা-সচিব—শ্রীজ্ঞানেশ মুখার্জি; সদস্যগণ—শ্রীগোপাল গাঙ্গুলী, শ্রীঅরুণ ব্যানার্জি ও শ্রীআইভি ব্যানার্জি।

ত্রুটি স্বীকার ঃ

উত্তর কলকাতার রবীন্দ্র উদ্যানে আয়োজিত আসন্ন যাত্রা উৎসব সম্পর্কে গেল ৩রা আগষ্ট যে-আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে "সাঁঝের আসর"-কে একটি পেশাদারী সংস্থা ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সংস্থা-সচিবের পত্র থেকে জানা গেল, ওটি একটি সৌখীন সম্প্রদায়। আমরা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে দুঃখিত।

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলিকাতা

সম্প্রতি নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'বন্ধ কারো না পাখা' চিত্রের শুভ মুহরৎ সুসম্পন্ন হল টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। মহরৎ অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার, অসিতবরণ ও তরুণকুমার। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রণব রায়।

'দুইভাই' সাফল্যের পর ফিল্ম এন্টারপ্রাইজের দ্বিতীয় চিত্রের মিলিত প্রযোজনায় রয়েছেন আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল ভট্টাচার্য ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করছেন কানাই দে। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় 'কাঁচা পাকা' চিত্রের সংগীত গ্রহণ করলেন সংগীত-পরিচালক পবিত্র দে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও অনিল দত্তের কণ্ঠে কয়েকটি গান গৃহীত হল।

'বৈশাখী' গোষ্ঠীর অন্যতম অরুণকুমার চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে অভিনয় করবেন অনুপকুমার, জহর গাঙ্গুলী, নৃপতি চ্যাটার্জি, শীতল ব্যানার্জি, জহর রায়, হরিধন, শ্যাম লাহা, অজিত চ্যাটার্জি, অনু দত্ত, মণি শ্রীমানী, রঞ্জনা ব্যানার্জি, তপতী ঘোষ, অনুভা গুপ্ত, আরতি দাস, গীতা দে ও রাজলক্ষ্মী দেবী। কে. এল. পাল প্রযোজিত স্টার পিকচার্স এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

শ্রীলেখা মুভিটনের প্রথম ছবি 'দুটি ফুল একটি পাতা'। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জ্যোতির্ময় রায় ও বিনতা রায়। নায়ক নায়িকার চরিত্রে আশীসকুমার ও তন্দ্রা বর্মণ। পার্শ্ব চরিত্রে ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, অনুপকুমার ও গীতা দে। চিত্র ও সংগীত পরিচালনা করছেন শচীন অধিকারী ও ভি বালসারা।

'দাঠাকুর' ছবির পরিচালক সুধীর মুখার্জি তাঁর পরবর্তী ছবি করছেন 'ত্রিধারা'। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, কালী ব্যানার্জী, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্ত, ভারতী দেবী ও রেণুকা রায়। এ ছবির পরিবেশক প্রভা পিকচার্স।

বোম্বাই

রাজশ্রী পিকচার্সের 'মা বেটা' ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষিত। শীলা রমনি এ ছবির নায়িকা। প্রধান চরিত্রে নিরুপা রায়, অমিতা, মনোজকুমার, তরুণ বোস, মনমোহন কৃষ্ণ, ললিতা পাওয়ার, লীলা মিশ্র, জীবন জলিল ও আই এস জহোর। ছবির পরিচালক লেখরাজ বখরী। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অভিনেতা ও সংগীত-শিল্পী সুরেন্দ্র একটি নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান—সুরেন্দ্র ফিল্ম প্রোডাকসন্স করেছেন। প্রথমে তথ্যমূলক চিত্রের কাজ আরম্ভ করবেন এই সংস্থা।

'সাঁজ আউর সবেরা' চিত্রের পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। কারদার ও ফিল্মস্থান স্টুডিওর চিত্রগ্রহণের কাজ চলেছে। মীনাকুমারী ও গুরু দত্ত এ ছবির নায়ক-নায়িকা।

এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রীতিবালা, শুভা খোটে, মনমোহন কৃষ্ণ ও প্রভীন পল। সুরসৃষ্টি করেছেন শংকর-জয়কিশন।

রঞ্জিত স্টুডিওর উত্তম চিত্রের 'বীন বাদল বরষৎ' ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছবির পরিচালক জ্যোতি স্বরূপ মামুদ ও পদ্মা অভিনীত একটি নাটকীয় হাসির দৃশ্য সম্প্রতি গ্রহণ করলেন। কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন দেবকিষাণ। আশা পারেখ ও বিশ্বজিৎ এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্র। অন্যান্য ভূমিকায় রূপদান করছেন নিশি, এস এন ব্যানার্জি, দেবকিষাণ, মণি চ্যাটার্জি, লীলা মিশ্র ও রাম মারথি। সংগীত-পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সায়রা বাণু ও রাজকাপুর অভিনীত অনুপম চিত্রের 'দিওয়ানা'-র চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে রূপতারা স্টুডিওয়। সম্প্রতি একটি দৃশ্যে অভিনয় করলেন সায়রা বাণু, হীরালাল, কমল কাপুর, রবীন্দ্র কাপুর ও সেলিম।

মাদ্রাজ

জেমিনীর একটি হিন্দী ছবি, প্রোডাকসন্স নম্বর ৩৩০ চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। চরিত্রশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অশোককুমার, নিরুপা রায়, রাজশ্রী, মনোজকুমার, ইন্দ্রাণী

মুখার্জি, সুদেশকুমার, ললিতা পাওয়ার, শুভা খোটে, মামুদ ও বন্দনা। ছবিটির পরিচালক কিশোর সাহু। সংগীত পরিচালক রবি।

অভিনেতা ও সাহিত্যিক পি এল দেশপান্ডে সম্প্রতি একটি মারাঠী নাটক পরিচালনা ও পরিবেশনার জন্য ব্যস্ত আছেন। সম্ভবতঃ প্রথম প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে বোম্বাই শহরে।

প্রসাদ প্রোডাকসন্সের 'বেটি বেটে'-এর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন রি সরোজদেবী। তেলেগু 'শান্তানাম' ছবি অবলম্বনে এই হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করছেন এল ভি প্রসাদ। যমুনা, মামুদ, শুভা খোটে, সুদেশকুমার ও রাজেন্দ্রনাথ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। সংগীত পরিচালনা করছেন শঙ্কর-জয়কিশন।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম। কিন্তু জীবনের সবটাই পুতুল খেলার অপমান নিয়ে যাচ্ছি। একদিন সব রং মুছে যাবে, সব খেলা ফুরোবে, তবু মানুষের কাছে এই পুতুল খেলার কথা থেকে যাবে। মার্জনা করবে না, খিক্কার দেবে—

এ আমার কথা নয়। সমরেশ বসু রচিত 'পুতুলের খেলা' অবলম্বনে 'দুইনারী' কথাচিত্রের নায়ক নিখিলেশ গাঙ্গুলীর [illegible]। এ কাহিনী তার জীবনের আদর্শ থেকে হেরে যাবার একটা করুণ বিবৃতি। মুক্তির জন্য এ সত্যভাষণ।

মধ্যবিত্ত ঘরের এম-এ পাশ করা এক আদর্শবাদী ছেলে নিখিলেশ। কলেজ জীবনের সহপাঠিনী সুপ্রীতির গৃহস্বামী। ভালবাসা থেকে এদের পরিণয়। অভিভাবকদের অমতেই এ সংসার। সুপ্রীতি মাষ্টারি করতো। নিখিলেশের তখনও কোন চাকরি ছিল না। অভাবের মধ্যেও এদের ছোট্ট ছেলে মিঠুকে নিয়ে সংসারে প্রাচুর্য ছিল। একদিন এক শিক্ষয়িত্রীর ওপর অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সুপ্রীতির মাষ্টারিটা গেল চলে। অচলপ্রায় সংসারে সকাল-সন্ধ্যের ছাত্রী পড়িয়েও দিন চলছিল। তবে সুপ্রীতির শরীর ভেঙে পড়ল কঠিন অসুখে। এরই নাম ভাগ্য। জীবন সাধনার কোন দাম নেই। এত বড় শহরে শিক্ষার বিনিময়ে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষিত যুবকের চাকরি নেই কোথাও। প্রাত্যহিকতার জীবনযুদ্ধে দুটি ভালবাসার এখানেই পরাজয়।
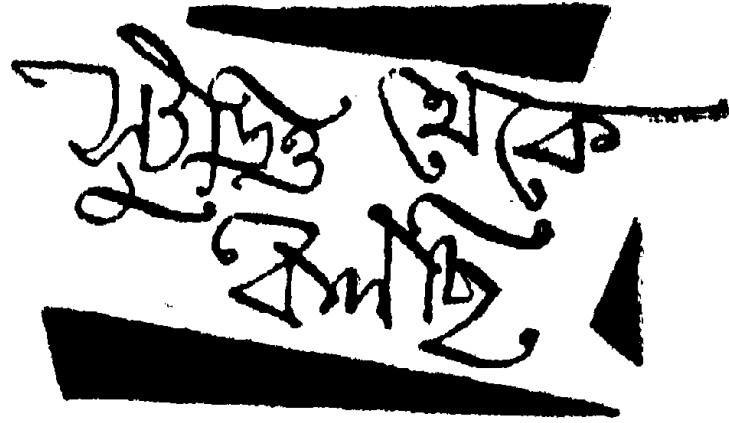
ডালহৌসি স্কোয়ারের প্রতিটি জায়গায় ঘুরে ঘুরে নিখিলেশের সকাল-সন্ধ্যে শেষ হয়। এই আসা-যাওয়ার মাঝে কলেজ জীবনের সহপাঠী হরিদাসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। বোধ হয় হরিদাসকে সংসারের সব কথা খুলে না বললে হয়তো নিখিলেশ এমনভাবে সুপ্রীতির ওপর অবিচার করতে পারতো না। নিবারণের চায়ের দোকানে জুয়াড়ী হরিদাস অর্থ উপার্জনের একটা পথ বলে দেয়। নিবারণদের মীরগাঁয়ের মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র অন্ধ মেয়ে মালতীর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করলে নিখিলেশ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। শুধু মন্ত্র পড়ে বিয়ের একটু অভিনয় করা। 'এ পাপ নয়, একটা ট্যাকটিস মাত্র'—হরিদাস বেশ গর্বের সঙ্গে নিখিলেশকে বোঝায়। এদিকে সুপ্রীতির চিকিৎসার কোন আয়োজন নেই অর্থাভাবে। এই সুযোগে হরিদাস অর্থ জুগিয়ে নিখিলেশকে রাজী করিয়ে নিল।

মীরগাঁয়ে মাধববাবুর বাড়ীতেই মালতীর সঙ্গে নিখিলেশের শুভকাজ সুসম্পন্ন হল। মিথ্যে অভিনয়ে সুপ্রীতি আর মালতীর মন রক্ষা করতে নিখিলেশের জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় নেই। হাজার হাজার টাকা ভয় দেখিয়ে হরিদাস নিতে লাগলো নিখিলেশের কাছ থেকে। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অত টাকা নিখিলেশের কি প্রয়োজন থাকতে পারে সে বিষয়ে নায়েবের সন্দেহ হল এবং শেষপর্যন্ত এক সঙ্গে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন না। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে এই টাকা পৌঁছে দিতে না পারায় হরিদাস নিখিলেশের সমস্ত কথা সুপ্রীতিকে জানিয়ে দেয়। সুপ্রীতি কোন উপায় না দেখে নিজেই মীরগাঁয়ে ছুটে এসে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল।

তাই স্টেশনে শেষ বিদায়ের সময় সুপ্রীতি বলে—

'তুমি যাও, আমি ফিরি।'

নিখিলেশ—আমি যেতে পারবো না।

সুপ্রীতি—ছিঃ! মালতী মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ হয়ে তার এতবড় সর্বনাশ আমি করতে পারি নে। তাছাড়া সে অন্ধ। তুমি তার ভরসা।

নিখিলেশ—এভাবে আমায় শাস্তি দিও না।

সুপ্রীতি—শাস্তি নয়। আমার জীবনে সবটুকুই তুমি অক্ষয় হয়ে রইলে। এরপরে তোমার জন্যে যে সম্মান আর শ্রদ্ধা থাকবে, তুমি আমার সঙ্গে এলে তা যে ধুলোয় লুটোবে।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

এরপর ঘটনা অনেক। কথা সংক্ষিপ্ত। কলকাতায় নিখিলেশ নতুন বাড়ীতে মালতী আর মিঠুকে নিয়ে আছে।

কিন্তু সুপ্রীতি! সে মারা গেছে।

এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী। টালিগঞ্জের শেষপ্রান্তে ক্যালকাটা মুভিটোনে দৃশ্যগ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। চিত্রগ্রহণের দৃশ্যটি ছিল নিখিলেশের মেস। কলেজ ফেরৎ বিকেলে সুপ্রীতি এসেছে এখানে। নিখিলেশ মেসে ফিরে

'দুই নারী' চিত্র গ্রহণের পূর্বমহূর্তে চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত, শিল্পী নির্মলকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী।

সুপ্রীতিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—

নিখিলেশ—তুমি?

সুপ্রীতি—হ্যাঁ তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছি। কলেজে তোমাকে না দেখতে পেয়ে এখানেই চলে এলাম। তোমার সঙ্গে কথার দরকার আছে।

নিখিলেশ—কি বল?

সুপ্রীতি—তোমার সঙ্গে হয়তো আর আমার দেখা হবে না। কাল থেকে আর আমি কলেজে যাবো না।

নিখিলেশ—কেন?

সুপ্রীতি—জানোই তো দাদা অনেকদিন থেকেই আমার বিয়ের চেষ্টা করছে। এক জায়গায় প্রায় ঠিকই হয়ে গেছে। কালই আশীর্বাদ।

নিখিলেশ উত্তেজিত হলে সুপ্রীতি বোঝায়—

সুপ্রীতি—তুমি আমার জন্যে বিপদে পড়বে সে আমি সইতে পারবো না।

নিখিলেশ—না না সুপ্রীতি তুমি বিপদ ভাবছো কেন। তোমাকে পাওয়ার যদি কিছু মূল্য দিতে হয় সে তো আমার ঐশ্বর্য।

সুপ্রীতি—বেশ তোমার মনের জোর আছে এই আমার যথেষ্ট।

দৃশ্যটি এখানেই শেষ হল। জীবন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় দৃশ্যগ্রহণ করলেন আলোকচিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। নিখিলেশ ও সুপ্রীতির ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করলেন নির্মলকুমার এবং সুপ্রিয়া চৌধুরী। পার্শ্বচরিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন হরিদাস-এর চরিত্রে বিকাশ রায়, মাধববাবু—পাহাড়ী সান্যাল, মালতী—কাজল গুপ্ত, নিবারণ—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও নায়েবের চরিত্রে কালী সরকার।

কলাকুশলীদের মধ্যে পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন সত্য রায় ও রঞ্জিত গুহ। চিত্রগ্রহণে সুনীল চক্রবর্তী। শব্দ-প্রধানে অতুল চট্টোপাধ্যায়। সহকারী রথীন ঘোষ। সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী। সহকারী প্রতুল রায়চৌধুরী। শিল্পনির্দেশনায় প্রসাদ মিত্র। রূপকার শৈলেন গাঙ্গুলী। ব্যবস্থাপনায় শিব-প্রসাদ মিত্র। জাওয়াল প্রোডাকসন্সের প্রযোজনায় 'দুইনারী' চিত্রের চলচ্চিত্র সংবাদ এখানেই শেষ হল। —চিত্রদূত

ভিনদেশী ছবি

।। রাজকুমার এবং সেই দরিদ্র বালক ।।

মার্ক টোয়েনের "দি প্রিন্স এ্যান্ড দি পপার" জনপ্রিয় কাহিনী। ওয়াল্ট ডিজনে এই কাহিনীর একটি ঐতিহাসিক চিত্ররূপ দিয়েছেন। এই চিত্রের কাহিনীকাল হল অষ্টম হেনরীর আমল। লণ্ডনের হ্যামটন কোর্টের রাজপ্রাসাদ হল চিত্রের ঘটনাস্থল। অষ্টম হেনরীর ছেলে রাজকুমার এডওয়ার্ড যে কোনো সাধারণ ছেলের মতই বিশ্বাস করে "লেখা পড়া করে যে, গাড়ি চাপা পড়ে সে।" শুধু কি লেখাপড়া, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত দরবারের সহবৎ শিক্ষার অনুসঙ্গটিও রাজকুমারের কাছে কম বিরক্তিকর ছিল না। মনে মনে দারুণ ইচ্ছে রাজকুমারের, যদি একদিন, অন্ততঃ একদিনের জন্যেও সাধারণ ছেলে হয়ে যেতে পারত সে! ভগবান বোধ হয় তার বাসনা বুঝতে পেরেই, ঠিক তারই মত দেখতে একটি ভিখিরী বালকের দেখা করিয়ে দিলেন। প্রাসাদের জানালা দিয়ে রোজ ছেলেটিকে দেখত এডওয়ার্থ। রাজকুমার তাকে একদিন কাছে ডাকলেন। দরিদ্র বালকটির কাছে সবিস্ময়ে শুনলেন তার একমাত্র বাসনা অন্ততঃ একদিনের জন্যেও যদি সে রাজকুমার হতে পারে। এডওয়ার্থ দেখল ছেলেটি ল্যাটিন কিছু কিছু জানে এবং তারা যদি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে কেউই সহজে বুঝতে পারবে না। তারা যথারীতি চরিত্র পরিবর্তন করল। কাহিনীর মোড়ও যথারীতি উত্তেজনার রাজপথে এসে দ্রুতগতি হল এরপর থেকে। কিন্তু রাজা অষ্টম হেনরী হঠাৎ মারা গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ওলোট-পালট হয়ে গেল। রাজার মৃত্যুর পর ভিখিরী রাজকুমারকেই সত্যিকার রাজকুমার ভেবে রাজা ঘোষণা করা হল।

রাজকুমার এবং ভিখিরী বালকের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত সীন স্কুলি। অন্য দুটি ভূমিকায় আছেন হেন্রে মিলস এবং জেন আসায়। জেন লেডী জেন গ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি "দি গ্রীন এজ সামার" ছবিতে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ছবিটি বৃটেনে তোলা হয়েছে, পরিচালনা করেছেন ডন সেকে। ডনের তোলা অন্যান্য ছবির নাম "গ্রেফ্রায়ারস ববি", "নিয়ারলি এ ন্যাষ্টি এ্যাকসিডেন্ট" এবং রোমহর্ষক ছবি "দি ম্যান আপস্টেয়ারস"।

।। আরেকটি টুইস্ট নাচের ছবি ।।

টুইস্ট নাচের সাম্রাজ্য আজ পৃথিবী-ব্যাপী। আটলান্টিকের দুই তীরেই "মোচড়" নাচের (টুইস্টের বাংলা কি হবে?) প্রকোপ। বৃটেনে টুইস্ট-নাচের উপরে একটি ছবি তুলছেন জুলিয়ান-উইন্টল-লেসলি পারকিন সংস্থা। "প্লে ইট কুল" চিত্রে ইংলণ্ডের অনেক প্রখ্যাত গায়কগায়িকাকে দেখা যাবে। মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন বিল ফিউরী এবং অ্যাসা পল্ক। অতিথি শিল্পী হিসেবে আছেন হেলেন শ্যাপিরো। গানগুলি লিখেছেন নরমী পারামর। —চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড-পাকিস্তানের পঞ্চম টেস্ট

ইংল্যান্ড : ৪৮০ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কাউড্রে ১৮২, টেড ডেক্সটার ১৭২, শেফার্ড ৫৭ এবং ব্যারিংটন ৫০। ফজল ১১২ রানে ২ এবং ডি'সুজা ১১৬ রানে ২ উইকেট)

ও **২৭ রাণ** (কোন উইকেট না পড়ে)।

পাকিস্তান : ১৮৩ রান (ইমতিয়াজ আমেদ ৪৯, হানিফ মহম্মদ ৪৬ এবং মুস্তাক মহম্মদ ৪৩। লারটার ৫৭ রানে ৫ এবং কোল্ডওয়েল ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩২৩ **রান** (ইমতিয়াজ আমেদ ৯৮, মুস্তাক মহম্মদ ৭২, ওয়ালিস ম্যাথিয়াজ ৪৮। লারটার ৮৮ রানে ৪ উইকেট)।

প্রথম দিন (১৬ই আগষ্ট) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ২টো উইকেট পড়ে ৪০৬ রান। টেড ডেক্সটার ১৪৪ এবং কেন ব্যারিংটন ১৩ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১৭ই আগষ্ট) : ইংল্যাণ্ড ৪৮০ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৬টা উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রান করে।

তৃতীয় দিন (১৮ই আগষ্ট) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৮৩ রানে সমাপ্ত। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পাকিস্তান ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৮৯ রান করে।

চতুর্থদিনের খেলা (২০শে আগষ্ট) : পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৩ রানে শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৭ রান উঠে যায়।

ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ১০ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। পাঁচদিনের টেস্ট খেলা চতুর্থদিনে ৭৫ মিনিট খেলার পর শেষ হয়। ফলে ১৯৬২ সালের ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের আলোচ্য টেস্ট সিরিজের খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ইংল্যাণ্ডের জয় ৪ এবং খেলা ড্র ১।

এ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে তিনটি সিরিজে ১২টি টেস্ট খেলা হয়েছে। টেস্ট সিরিজ এবং টেস্ট খেলার ফলাফল : টেস্ট সিরিজ : ইংল্যাণ্ড ২ বার (১৯৬১-৬২ ও১৯৬২) 'রাবার' পেয়েছে এবং ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র যায়। ১২টি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের জয় ৬, পাকিস্তানের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৫।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টসে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কলিন কাউড্রে এবং রেভারেণ্ড ডেভিড শেফার্ডের জুটি ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সূচনা করেন। প্রথমে ধীর গতিতে রান উঠতে থাকে—প্রথম এক ঘন্টার খেলায় মাত্র ২৭ রান। পরে বেশ রান উঠতে থাকে এবং দলের ৫০ রান পূর্ণ হয় ৮৫ মিনিটের খেলায়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় কোন উইকেট না পড়ে ইংল্যাণ্ডের ৭৬ রান দাঁড়ায়। দলের ১১৭ রানের মাথায় শেফার্ড এবং ৩৬৫ রানের মাথায় কাউড্রে আউট হ'ন। কাউড্রে এবং ডেক্সটারের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ২৪৮ রান ওঠে। কাউড্রের আউট হওয়ার সময়ে ডেক্সটারের রান ছিল ১১৬। কাউড্রে ১৮২ রান ক'রে আউট হ'ন। কাউড্রে তাঁর শতরানের মধ্যে শেষ ৫০ রান করেন ৫৫ মিনিটে। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে কাউড্রের এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের দুটো উইকেট পড়ে ৪০৬ রান দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ৪৮০ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ৪র্থ এবং ৫ম উইকেট খুব অল্প রানের ব্যবধানে পড়ে যায়—দলের ৪৪১ রানে ৩য়, ৪৪৪ রানে ৪র্থ এবং ৪৫২ রানে ৫ম উইকেট পড়ে। এইদিনে পাকিস্তানের ৬টা উইকেট পড়ে ১৭৫ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৮৩ রানে শেষ হয়। শেষ ৪টি উইকেটে মাত্র ৮ রান উঠেছিল। পাকিস্তান ২৯৭ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে 'ফলো-অন' করে। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তানের ২৮৯ রান দাঁড়ায়, ৬টা উইকেট পড়ে। ইমতিয়াজ এবং মুস্তাক মহম্মদের যথাক্রমে ৯৮ এবং ৭২ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমতিয়াজ এবং মুস্তাক মহম্মদের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের মূল্যবান ১৩৭ রান ওঠে আড়াই ঘন্টার খেলায়। মুস্তাক তাঁর নিজস্ব ৭২ রানের মধ্যে ৫২ রান তুলেন বাউণ্ডারী মেরে।

খেলার চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৩ রানে শেষ হয়। তৃতীয় দিনের ২৮৯ রানের (৬ উইকেটে) সংগে বাকি ৪ উইকেটে মাত্র ৩৪ রান যোগ হয় ৪৫ মিনিটের খেলায়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৭ রান তুলতে ইংল্যাণ্ডের ২৫ মিনিট সময় লাগে। ইংল্যাণ্ড ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

॥ গুণীজন সম্বর্ধনা ॥

স্বাধীনতার পঞ্চদশ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত গুণীজন সম্বর্ধনার দ্বিতীয় দিনে প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ডাঃ শ্রীসন্মথনাথ দত্তকে অভিনন্দিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত।
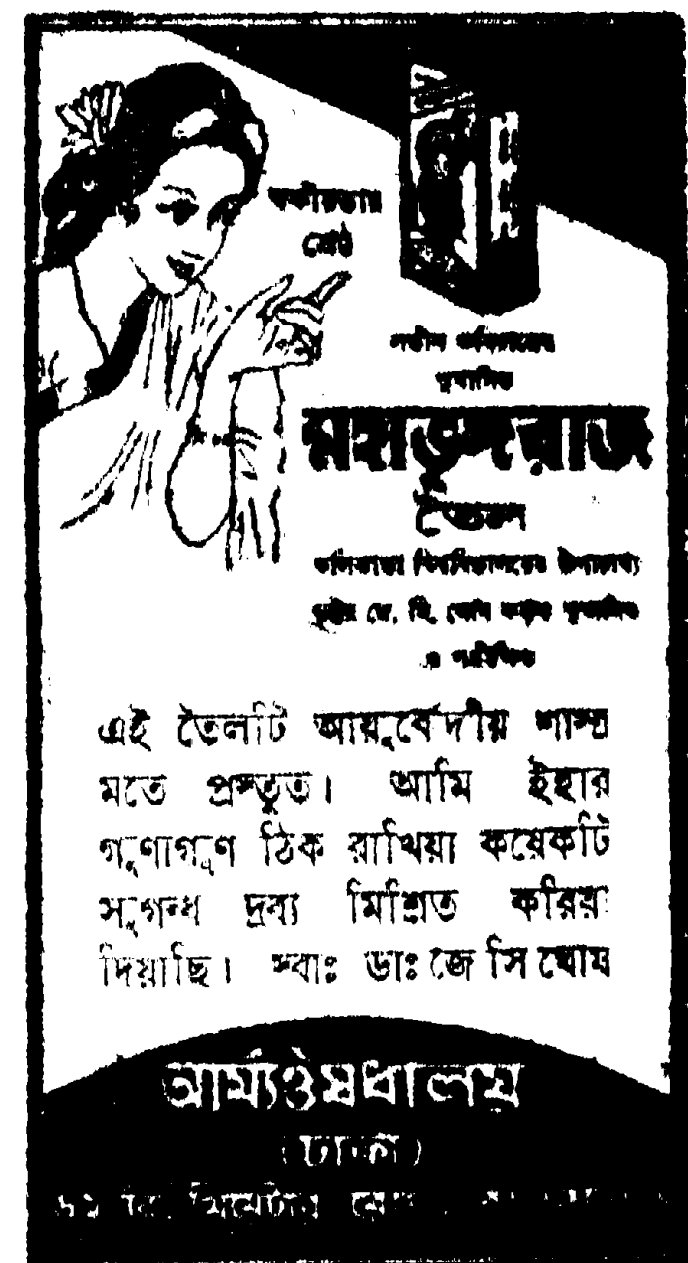
এশিয়ান গেমস্‌

প্রথম এশিয়ান গেমস—১৯৫১

১৯৫১ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ দিল্লীর নবনির্মিত জাতীয় স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে গ্রীসের সুমহান প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান রীতি প্রতিপালিত হয়। গ্রীসের অলিম্পিক গেমসের প্রথামত এই উপলক্ষে দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল-কেল্লায় সূর্যরশ্মির সাহায্যে অগ্নিশিখা উৎপাদন করা হয় এবং সেই অগ্নিশিখা চল্লিশজন মশালধারীর সাহায্যে ১১ই মাইল পথ অতিক্রম ক'রে জাতীয় স্টেডিয়ামে বহন ক'রে আনা হয়। এই চল্লিশজনের সর্বশেষ মশালধারী ছিলেন প্রবীণ ক্রীড়াবিদ বিগ্রেডিয়ার দলীপ সিং। দলীপ সিংয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় দল ১৯২৪ সালে প্যারিসের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে যোগদান করে। দলীপ সিং মশাল হস্তে একবার স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ ক'রে মশালের অগ্নি-শিখার সাহায্যে জাতীয় স্টেডিয়ামের বিশেষ অগ্নিকুণ্ডটি প্রজ্বলিত করেন। এই অগ্নিকুণ্ডটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের শেষদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল। ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী দেশগুলির প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা বহন ক'রে স্টেডিয়াম পরিক্রমা করেন। হাজার হাজার পারাবত এই উদ্বোধন উপলক্ষে স্টেডিয়াম থেকে উন্মুক্ত করা হয়। খেলা-ধূলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ৫ই মার্চ এবং সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ১১ই মার্চ।

ব্যক্তিগত ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাপান প্রথম স্থান লাভ করে; অপর দিকে দলগত ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায় ভারত-বর্ষ। এই সময়ে আন্তর্জাতিক সন্তরণে জাপানের খুবই নাম-ডাক ছিল, কিন্তু জাপান প্রথম এশিয়ান গেমসের সন্তরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেনি। এ্যাথ-লেটিকসে লেভী পিণ্টোর (ভারতবর্ষ) সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

প্রথম এশিয়ান গেমসে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ১১। ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান যোগদান করেনি।

ভারতবর্ষের সাফল্য

ভারতবর্ষ নিম্নলিখিত ১৫টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ করে :

এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠান : ১০০ মিটার দৌড়—লেভী পিণ্টো (সময় ১০·৮ সেঃ); ২০০ মিটার দৌড়—লেভী পিণ্টো (সময় ২২ সেঃ); ৮০০ মিটার দৌড়—রঞ্জিৎ সিং (সময় ১ মিঃ ৫৯·৩ সেঃ); ১,৫০০ মিটার দৌড়—নিক্কা সিং (সময় ৪ মিঃ ৪১·১ সেঃ); ১০,০০০ মিটার ভ্রমণ—মহাবীর সিং (৫২ মিঃ ৩১·৪ সেঃ); ৫০,০০০ মিটার ভ্রমণ—ভগতোয়ার সিং (সময় ৫ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ৭·৪ সেঃ); ম্যারাথন—ছোটা সিং (সময় ২ ঘঃ ৪২ মিঃ ৫৮·৬ সেঃ); ১,৬০০ মিটার রীলে—ভারতবর্ষ (সময় ৩ মিঃ ২৪·২ সেঃ); ডিসকাস থ্রো—মাখন সিং (দূরত্ব ১৩০' ১০ই"); লৌহ বল নিক্ষেপ—মদন লাল (দূরত্ব ৪৫' ২ই")।

সন্তরণ অনুষ্ঠান : ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল—শচীন নাগ (সময় ১ মিঃ ৪·৭ সেঃ); ডাইভিং (স্প্রিং বোর্ড)—কে পি থাক্কার (৩৭১·২৫ পয়েণ্ট); ফিক্সড বোর্ড—কে পি থাক্কার (৩৬২·০৫ পয়েণ্ট)।

ফুটবল : ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে ইরানকে পরাজিত করে।

ওয়াটার পোলো : ফাইনালে ভারতবর্ষ ৬—৪ গোলে সিঙ্গাপুরকে পরাজিত করে।

যোগদানকারী দেশ (সংখ্যা ১১) : জাপান, ভারতবর্ষ, ইরাণ, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, থাইল্যাণ্ড, আফগানিস্থান এবং নেপাল।

দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস—১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ১লা মে ফিলি-পাইনের অন্তর্গত ম্যানিলার রিজ্যাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট। প্রতিযোগিতা শেষ হয় ৯ই মে। যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ১৮। প্রথম এশিয়ান গেমসে সভ্য সংখ্যা ছিল ১১। দ্বিতীয় এশিয়ান গেমসে এই সাতটি নতুন দেশ যোগদান করে—কম্বোডিয়া, জাতীয়তাবাদী চীন (ফর্মোসা), হংকং, কোরিয়া, উত্তর বোর্ণিও, পাকিস্তান এবং ভিয়েৎনাম।

জাপান সর্বাধিক পদক পেয়ে পদক-প্রাপ্তির তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করে। স্বর্ণপদক প্রাপ্তির তালিকায় প্রথম চারটি দেশ : ১ম জাপান (৩৮), ২য় ফিলিপাইন (১৪), ৩য় কোরিয়া (৮) এবং ৪র্থ ভারতবর্ষ (৫টি স্বর্ণপদক)।

ভারতবর্ষ নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ করে :

পুরুষ বিভাগ

১১০ মিটার হার্ডলস : সরণ সিং (সময় ১৪·৭ সেঃ)—এশিয়ান রেকর্ড; হাই-জাম্প : অজিত সিং (উচ্চতা ৬' ৪ ৪-৭/৮"; ডিসকাস থ্রো : পর্দুমন সিং (দূরত্ব ১৪২' ৩ই")—নতুন এশিয়ান রেকর্ড; সটপুট : পর্দুমন সিং (৪৬' ৪ই")—নতুন এশিয়ান রেকর্ড।

মহিলা বিভাগ

৪×১০০ মিটার রীলে : ভারতবর্ষ (৪৯·৫ সেঃ)।

চূড়ান্ত ফলাফল

এ্যাথলেটিকস : ১ম জাপান, ২য় ভারতবর্ষ এবং ৩য় পাকিস্তান

কুস্তি : ১ম জাপান, ২য় পাকিস্তান এবং ৩য় ফিলিপাইন

সন্তরণ : ১ম জাপান, ২য় ফিলিপাইন এবং ৩য় সিঙ্গাপুর

স্যুটিং : ১ম ফিলিপাইন, ২য় জাপান এবং ৩য় ইসরাইল

বাস্কেটবল : ১ম ফিলিপাইন, ২য় চীন (জাতীয়তাবাদী) এবং ৩য় জাপান

বক্সিং : ১ম ফিলিপাইন, ২য় জাপান এবং ৩য় কোরিয়া

ভারোত্তোলন : ১ম দক্ষিণ কোরিয়া ২য় ব্রহ্মদেশ এবং ৩য় জাতীয়তাবাদী চীন

ফুটবল : ১ম জাতীয়তাবাদী চীন, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া এবং ৩য় ইন্দো-নেশিয়া

ওয়াটারপোলো : ১ম সিঙ্গাপুর, ২য় জাপান এবং ৩য় ইন্দোনেশিয়া

তৃতীয় এশিয়ান গেমস—১৯৫৮

জাপানের সম্রাট হিরোহিতো টোকিওর মেইজি স্রাইন পার্কস্থ নব-নির্মিত জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৯৫৮ সালের ২৪শে মে তৃতীয় এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজার শ্বেত পারাবতকে স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ থেকে উন্মুক্ত করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ২১ বার তোপধ্বনি ক'রে উদ্বোধন অনুষ্ঠান গৌরবান্বিত করা হয়।

তৃতীয় এশিয়ান গেমসে যোগদান-কারী দেশের সংখ্যা ছিল ২০। ১৯২৮ সালের অলিম্পিকের হপ-স্টেপ-জাম্প বিজয়ী জাপানের মিকিও ওডা মশাল-বাহী দলের শেষ মশালধারী হিসাবে একবার স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করেন এবং ৮৬টি সোপান অতিক্রম ক'রে স্টেডিয়ামের শীর্ষদেশে রক্ষিত বৃহদাকার অগ্নিকুণ্ডে ম্যানিলা থেকে প্রেরিত প্রজ্বলিত মশাল সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করেন। এই

অগ্নিকুণ্ডটি প্রতিযোগিতার শেষ দিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত রাখা হয়েছিল। জাপানী দলের অধিনায়ক সুসুমো তাকাহাসি তৃতীয় এশিয়ান গেমসে যোগদানকারী সকল দেশের পক্ষ থেকে শপথ বাণী উচ্চারণ করেন। যে ১৫·৪৬ মিটার দণ্ডে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের পতাকাটি উত্তোলন করা হয়েছিল সেই দণ্ডের উচ্চতা সম্পর্কে এই তাৎপর্য ছিল যে, ১৯২৮ সালের অলিম্পিকে জাপানের মিকিও ওডা হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানে ১৫·৪৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম ক'রে স্বর্ণপদক পান। এবং তাঁরই সম্মানার্থে পতাকাদণ্ডের উচ্চতা ১৫·৪৬ মিটার রাখা হয়।

তৃতীয় এশিয়ান গেমসে জাপান প্রথম স্থান লাভ ক'রে উপর্যুপরি তিনটি এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে শীর্ষস্থান লাভ করার গৌরব লাভ করে। তৃতীয় এশিয়ান গেমসে জাপান মোট ১৩৮টি পদক লাভ করে—স্বর্ণ ৬৭, রৌপ্য ৪১ এবং ব্রোঞ্জ ৩০। অপর দিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ফিলিপাইনের মোট পদক সংখ্যা ছিল ৪৮—স্বর্ণ ৮, রৌপ্য ১৯ এবং ব্রোঞ্জ ২১। বেসরকারী পয়েন্টের হিসাবে জাপান পেয়েছিল ৮৩৭ পয়েন্ট এবং ফিলিপাইন ৩২৬ পয়েন্ট।

তৃতীয় এশিয়ান গেমসে নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপিত হয়েছিল—এ্যাথলেটিক্সে ২৬টি, ভারোত্তোলনে ২২টি, সন্তরণে ১৭টি, সাইক্লিংয়ে ৪টি এবং সুটিংয়ে ১টি।

সন্তরণে জাপানের বিরাট সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৬টি অনুষ্ঠানের মধ্যে জাপান ২৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। মেয়েদের ৪০০ মিটার রীলেতেও জাপান প্রথম স্থান অধিকার করেছিল; কিন্তু আইনগত ত্রুটিতে জাপানের এই সাফল্য স্বীকৃতি লাভ করেনি, বাতিল হয়। টেবল টেনিসে জাপান তার আন্তর্জাতিক সুনাম অনুযায়ী সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ১৯৫৭ সালের মধ্যে জাপান উপর্যুপরি চার বার (১৯৫৪—৫৭) বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ২ বার (১৯৫৪ ও ১৯৫৭)। তাছাড়া এই কয়েক বছরের বিশ্ব টেবল টেনিস খেলার ব্যক্তিগত বিভাগেও জাপান একাধিক খেতাব পেয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় এশিয়ান গেমসের টেবল টেনিসে পুরুষদের দলগত খেতাব পায় ভিয়েৎনাম। জাপান মহিলাদের দলগত বিভাগে প্রথম স্থান পায়। ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের সাফল্য—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পায় ফর্মোসা এবং পুরুষদের ডাবলস খেতাব পায় ভিয়েৎনাম। পুরুষদের দলগত এবং ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের এই অসাফল্য আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস মহলকে বিস্মিত করেছিল।

লন টেনিসের মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ফিলিপাইন পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেতাব পায়। টেবল টেনিসের মতই জাপান বাকি তিনটি খেতাব—মহিলাদের সিঙ্গলস ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব পায়।

মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠানের মোট দশটি স্বর্ণপদকের মধ্যে জাপান ৬টি, কোরিয়া ২টি, ব্রহ্মদেশ এবং ফর্মোসা প্রত্যেকে ১টি ক'রে স্বর্ণপদক পায়।

ভলিবল প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগেই (৬ জনের লীগ এবং ৯ জনের লীগ খেলা) জাপান অপরাজেয় অবস্থায় শীর্ষস্থান পায়। জাপান প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভ করে।

হকি : ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সমান ৪টে খেলায় ৭ পয়েন্ট লাভ করে। কিন্তু গোল দেওয়া-খাওয়ার গড়পড়তার ভিত্তিতে পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়।

ভারতবর্ষ ৮—০ গোলে জাপানকে, ৬—০ গোলে মালয়কে এবং ২—১ গোলে কোরিয়াকে পরাজিত করে।

পাকিস্তান ৮—০ গোলে কোরিয়াকে, ৫—০ গোলে জাপানকে এবং ৬—০ গোলে মালয়কে পরাজিত করে।

হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, কোরিয়া, মালয় এবং জাপান এই পাঁচটি দেশ যোগদান করেছিল। লীগ তালিকায় কোরিয়া ৪ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান পায়।

ভারোত্তোলন : ১ম ইরান, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া এবং ৩য় জাপান

ফুটবল : ১ম ফর্মোসা, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া এবং ৩য় ইন্দোনেশিয়া

বাস্কেটবল : ১ম ফিলিপাইন, ২য় ফর্মোসা এবং ৩য় জাপান

ওয়াটার পোলো : ১ম জাপান, ২য় সিঙ্গাপুর এবং ৩য় ইন্দোনেশিয়া

ভলিবল (৬ জনের খেলা) : ১ম জাপান, ২য় ইরান এবং ৩য় ভারতবর্ষ

ভলিবল (৯ জনের খেলা) : ১ম জাপান, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া এবং ৩য় ফর্মোসা

ভারতবর্ষ এই বিভাগে যোগদান করেনি।

ভারতবর্ষের সাফল্য

ভারতবর্ষ মোট ১৩টি পদক লাভ করে—স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ৪। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণপদক লাভ করেন :

শটপুট : পরদ্যুমন সিং (দূরত্ব ৪৯' ৪")—নতুন এশিয়ান রেকর্ড।

৪০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং (সময় ৪৭·০ সেঃ)।

২০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং (সময় ২১·৬ সেঃ)—নতুন এশিয়ান রেকর্ড।

ডিসকাস্ থ্রো : বলকার সিং (দূরত্ব ১৫৬' ৪·৩৮")—নতুন এশিয়ান রেকর্ড।

হপ্-স্টেপ-জাম্প : মাহিন্দর সিং (দূরত্ব ৫১' ২৩·৪")—নতুন এশিয়ান রেকর্ড।

ভারতবর্ষ তৃতীয় এশিয়ান গেমসের সুটিং, সাইক্লিং, ভারোত্তোলন, মল্লক্রীড়া, ওয়াটারপোলো, সন্তরণ, টেনিস এবং টেবল-টেনিস অনুষ্ঠানে যোগদান করেনি।

চতুর্থ এশিয়ান গেমস

আগামী ২৪শে আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সোয়েকর্ণ জাকার্তায় নবনির্মিত পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হবে ৫ই সেপ্টেম্বর।

ইন্দোনেশিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়া—এই দুই দেশের সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসাবে জাকার্তার বুকে পৃথিবীর এই বৃহত্তম এবং সুরম্য স্টেডিয়ামটি আজ স্বগৌরবে মাথা তুলে অপেক্ষা করছে। চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ১৯টি দেশের প্রতিনিধিদের পদধূলিতে তার জীবন ধন্য হবে। এই স্টেডিয়াম নির্মাণের সমস্ত গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল সোভিয়েট রাশিয়া। সোভিয়েট রাশিয়া ৯,৫০০,০০০ ডলার মূল্যের মাল-মশলা এবং যন্ত্রপাতি নিঃস্বার্থভাবে ইন্দোনেশিয়াকে সরবরাহ করেছিল; এবং সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার দলের পরিকল্পনায় এবং তদারকিতে মাত্র দু' বছর সময়ের মধ্যে এই বৃহদাকায় স্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

প্রধান স্টেডিয়ামে আছে এ্যাথলেটিক্স এবং ফুটবল মাঠ এবং এখানে এক লক্ষ আসনের ব্যবস্থা আছে। প্রধান স্টেডিয়াম থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে সুইমিং পুল, অতিরিক্ত এ্যাথলেটিক্সের ব্যবস্থা এবং হকি স্টেডিয়াম; তাছাড়া আছে ব্যাডমিন্টন এবং টেনিস খেলার পৃথক স্টেডিয়াম, ভলিবল এবং বাস্কেটবল খেলার উন্মুক্ত কোর্ট। প্রধান স্টেডিয়াম ছাড়াও এই সব স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শকের বসবার সুব্যবস্থা আছে। স্টেডিয়ামের ভেতরে কোথাও কোন থাম না থাকায় যে কোন স্থান থেকে বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দে খেলা দেখা যায় এবং স্টেডিয়ামের উপরিভাগ আচ্ছাদিত থাকায় রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে দর্শকেরা রক্ষা পাবেন।

চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই ১৯টি দেশ যোগদান করবে—ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, সিংহল, হংকং, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইস্রায়েল, জাপান, দক্ষিণ
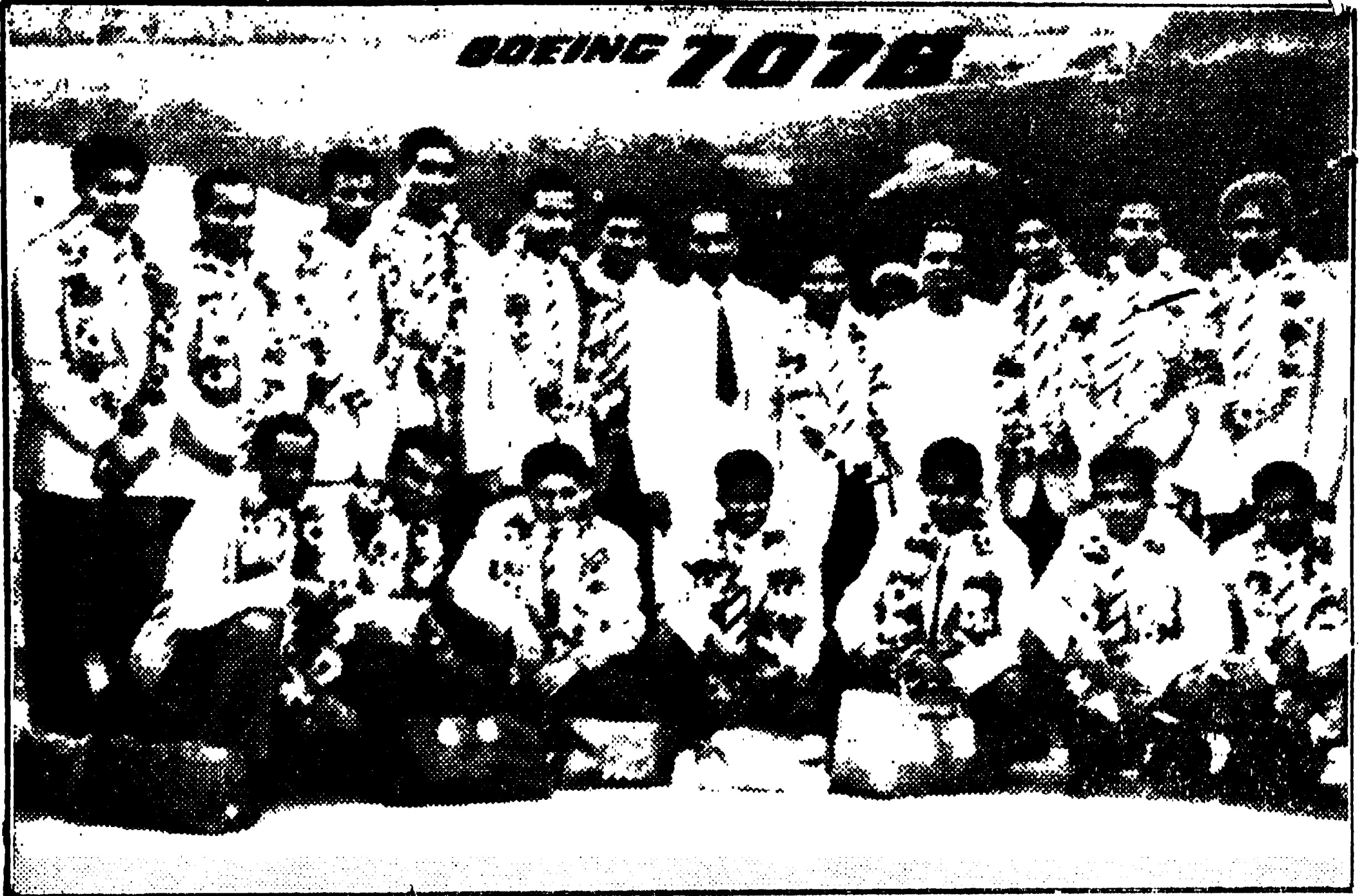
জাকার্তা যাত্রার প্রাক্কালে দমদম বিমান বন্দরে ভারতীয় ফুটবল দল

কোরিয়া, মালয়, উত্তর বোর্ণিও, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সারাওয়াক, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান (ফর্মোজা), থাইল্যান্ড, আফগানিস্থান এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। তবে তাইওয়ান এবং ইস্রায়েলের যোগদান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত ১৫টি খেলা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ঃ

এ্যাথলেটিকস, সন্তরণ এবং ডাইভিং, ওয়াটারপোলো, হকি, বাস্কেটবল, ফুটবল, ভলিবল, লন্ টেনিস, টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, সাইক্লিং, ভারোত্তোলন এবং স্যুটিং।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

ফুটবল প্রতিযোগিতায় বারটি দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলা এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

ক বিভাগ ঃ তাইওয়ান, ব্রহ্মদেশ এবং থাইল্যান্ড।

খ বিভাগ ঃ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ফিলিপাইন এবং জাপান।

গ বিভাগ ঃ সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়।

ঘ বিভাগ ঃ ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং ইস্রায়েল।

লীগ খেলার তালিকা

২৫শে আগষ্ট ঃ ভারতবর্ষ ঃ ইন্দোনেশিয়া; তাইওয়ান ঃ থাইল্যান্ড।

২৬শে আগষ্ট ঃ সিঙ্গাপুর ঃ মালয়; দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ জাপান।

২৭শে আগষ্ট ঃ ব্রহ্মদেশ ঃ থাইল্যান্ড; ভারতবর্ষ ঃ ইস্রায়েল।

২৮শে আগষ্ট ঃ দক্ষিণ কোরিয়া ঃ মালয়; ফিলিপাইন ঃ জাপান।

২৯শে আগষ্ট ঃ তাইওয়ান ঃ ব্রহ্মদেশ; ইন্দোনেশিয়া ঃ ইস্রায়েল।

৩০শে আগষ্ট ঃ সিঙ্গাপুর ঃ দক্ষিণ কোরিয়া; দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ ফিলিপাইন।

কোয়ার্টার ফাইনাল (নক আউট)

১লা সেপ্টেম্বর ঃ (১) ক বিভাগের বিজয়ী দল বনাম খ বিভাগের রাণার্স-আপ দল; (২) খ বিভাগের বিজয়ী দল বনাম ক বিভাগের রাণার্স-আপ দল; (৩) গ বিভাগের বিজয়ী দল বনাম ঘ বিভাগের রাণার্স-আপ দল; (৪) ঘ বিভাগের বিজয়ী দল বনাম গ বিভাগের রাণার্স-আপ দল।

সেমি ফাইনাল

২রা সেপ্টেম্বর ঃ উপরের ১নং খেলার বিজয়ী দল বনাম ২নং খেলার বিজয়ী দল; ৩নং খেলার বিজয়ী দল বনাম ৪নং খেলার বিজয়ী দল।

৩রা সেপ্টেম্বর ঃ তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্যে সেমি ফাইনালে পরাজিত দুই দলের মধ্যে খেলা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ঃ ফাইনাল খেলা।

হকি প্রতিযোগিতা

হকি প্রতিযোগিতায় ৯টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে। এই ৯টি দেশ দু'ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। ক বিভাগে খেলবে ৪টি দেশ এবং খ বিভাগে ৫টি দেশ।

ক বিভাগ ঃ ভারতবর্ষ, মালয়, দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকং।

খ বিভাগ ঃ পাকিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল এবং সিঙ্গাপুর।

সেমি ফাইনাল

২রা সেপ্টেম্বর ঃ ক বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল বনাম খ বিভাগের রাণার্স-আপ দল; খ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল বনাম ক বিভাগের রাণার্স-আপ দল।

৩রা সেপ্টেম্বর ঃ ফাইনাল খেলা এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্যে সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুই দলের মধ্যে খেলা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 31st August, 1962.
40 Naya Paise.

মানুষের অগ্রগতির মাপকাঠি কি? যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা নূতন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ আজ অসাধ্যসাধন করিতেছে—সেগুলি কি তাহার প্রগতিরই পূর্ণ পরিচয় বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের কারণ শুধু এইটুকু যে মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে যে মানুষের জীবন-পথ এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পূর্বেকার চাইতে সহজ, সরল ও সুগম হইয়াছে, না আরও দুর্গম ও বিপদসংকুল হইয়াছে, এবং সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে না।

আজ মানুষ পরমাণুর মধ্যে নিহিত যে দানবীয় শক্তি তাহার পরিচয় পাইয়াছে বটে কিন্তু সেই পরিচয় কি পূর্ণ এবং সে পরিচয় মানুষের জীবন সহজ করিতে কি বিশেষ সাহায্য করিতে পারিয়াছে। এতদিন ঐ পারমাণবিক শক্তির সংহাররূপেই আমাদের সম্মুখে বীভৎস ও ভয়ানক ভাবে দেখা দিয়াছে। মানুষ ঐ শক্তির ব্যবহারে সংসার ও সমাজকে ধ্বংসের পথে লইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজ আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছে কি? এই যে পরীক্ষা-সমীক্ষা সাইবেরিয়ার তুষারময় অঞ্চলে বা প্রশান্ত মহাসাগরের জনহীন দ্বীপে চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য তো মানুষ বা মানবসমাজের রক্ষণ বা উন্নয়ন নয়, বরঞ্চ সভ্য জগতের বিনাশের চেষ্টারই রূপান্তর মাত্র, একথা তো কতশত মুখে কত সহস্রবার বলা হইয়াছে ও হইতেছে। তবে এই পারমাণবিক বিস্ফোরণকে মানুষের অগ্রগতির পরিচায়ক বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় কি?

বিজ্ঞানের অন্য এক বিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে মানুষের ক্ষেপণ-শক্তির অসম্ভব বর্দ্ধিতে। আজ মানুষ গগন-পথে অনেক দূর ও অনেকক্ষণ বিহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আগেকার দিনে শুধু কবির কল্পনায় যাহা সম্ভব ছিল এখন দিনে দিনে তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার দিকে চলিয়াছে। যে মানুষ আজ ভূতল হইতে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম সীমা ছাড়াইয়া আকাশপথে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে, কাল সে যে অন্য গ্রহ-উপগ্রহের পথে ছুটিয়া যাইয়া চন্দ্রলোক দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইবে—তাহা অসম্ভব নয় আশ্চর্যও নয়। কিন্তু তাহাতে সাধারণ জনের জীবনে কি নূতন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কি নূতন সম্পদ আসিবে? মানুষের জ্ঞানের প্রসার ইহাতে বিকাশিত ও বর্ধিত হইবে সন্দেহ নাই, এবং মানুষের উদ্যম-উৎসাহ ও অদম্য সাহস, নূতন ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে চালিত হইবে ইহা দ্বারা, সে কথাও নিশ্চিত। কিন্তু ক্ষুদ্র শক্তি জনসাধারণের ব্যক্তিগত উপকার ইহাতে কতটা হইতে পারে তাহাই প্রশ্ন।

একদিকে দেখি এই নূতন শক্তির ও নূতন জগতের চিত্র, অন্যদিকে দেখি যে, সাধারণ মানুষের জীবন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় পূর্বেকারই মত বিপদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝা বা প্লাবন যখন কোনও দেশের বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত করে তখন সেই দুর্যোগ-পীড়িত লোকের দুরবস্থার প্রতিকার হয়ত আজ পূর্বাপেক্ষা দ্রুততর হয় কিন্তু এই ঝড়-প্লাবন ইত্যাদির বিপদ হইতে কোনও দেশ বা কোনও জাতি কি নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারিয়াছে?

অনাবৃষ্টির ফলে এত বড় শক্তির অধিকারী যে উদ্ধত যুযুৎসু চীন সেও আজ অন্নের চেষ্টায় কানাডা অষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরিতেছে। তাহারা যে দাম যে সর্ত্ত চাহে তাহাতেই চীন রাজি। অতিবৃষ্টির ফলে আসাম দারুণ বিপন্ন। কোথায় গেল আসাম সরকারের সে পূর্বেকার রাষ্ট্র-অধিকারপ্রমত্ত সদম্ভ মূর্তি? এখন বন্যার্তের জন্য সারা ভারতের জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন প্রচারিত হইতেছে তাহাদেরই তরফ হইতে!! নির্ভর একমাত্র সেই পুরাকালপ্রথিত মানবত্ব ও মানবপ্রেমেরই উপর, একথা আজ যেন এই প্রগতির যুগে নূতন করিয়া আমাদের শুনিতে হইতেছে, বুঝিতে হইতেছে।

সেই মানবত্বের ও দুর্গত মানবের প্রতি সমবেদনার কথাই যেন আজ আমাদের মনে থাকে। বন্যার্তের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে অতীত স্মৃতির অনুভূতি যেন কোনও দ্বন্দ্ব না জাগায় আমাদের মনে। আজিকার জগতে, প্রগতির আত্মপ্রকাশ যেরূপ হিংসাদ্বেষজড়িত, আমাদের অনগ্রসর মন যেন তাহা হইতে মুক্ত থাকে।

কবিতা

দিনরাত্রির কবিতা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

১।
উজ্জ্বল দিনের মতো অঙ্গীকারে
স্বর্গের তর্পণ; নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বাধা নেইকো, বাধা;
রৌদ্রের শাণিত ফলা-য় দ্বিধা নেইকো, দ্বিধা;
অন্ধকার-ও তিরোহিত। এখন উজ্জ্বল দিন ঘরে বাইরে
অঙ্গীকারে অঙ্গে অঙ্গে আয়ু।

২।
নিরুপমা অন্ধকার বিস্তারিত, ছায়াহীন দৃশ্যের দর্পণ।
পাশাপাশি আন্তরিক,
মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ উত্তাপ;
মনের অন্য চোখ সেতু গড়ছে,, স্থপতি প্রেমিক,
পরিচিত অস্থি-মজ্জা অনুষঙ্গ তৎসহ প্রাণ;

যন্ত্রণার সব রঙ এক হলে
অন্ধকার আলোর প্রতিমা॥

অনিকেত

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

আঠারোমুড়ার রাস্তা আঁকাবাঁকা, খাড়া,
পাহাড়ের উচ্চাবচ ঢাল
ঈশ্বরের বিধানের মতন জটিল।

দু' পাশের সারি সারি গামাল, গর্জন,
কদাচিৎ শাল,
ছায়া পায় লাল ধুলো, ভাঙা ডাল, শেয়ালের শব।

ডম্বুরের গোমতীর মতন সলীল
রিয়াঙ-যুবতী আসে রাইমাশর্মা থেকে—
দাঁতালো হাতির সঙ্গে ঘর করে টিলায় টিলায়
এখন দু' চোখে তার অনির্ণেয় ত্রাস।

তা' হোলে কি দু' পাশের যুবক পাদপ
তাকে ছায়া দেয় নি, দেবে না?

প্রশস্তি

দিলীপকুমার সেন

পুষ্পহার হ'য়ে গেছে অলক্ষ্যে দেহের রূপাবলী!
সায়াহ্ন মেঘের রাজ্যে রশ্মিপাত তারার নিখিলে
পুষ্পহার হ'য়ে দোলো—শরগুলি রেখেছো বিন্যাসে,
দৃষ্টির অতলগর্ভে সর্বস্ব আশ্রয় বুঝি নিলে?
অফুরান রূপরাশি, জ্যোৎস্না যার যাত্রা-নিয়ামক
চোখের চুলের পুঞ্জে নীহারিকা গভীর নিখাদে
যেখানে ছোঁয়াও পক্ষ সচঞ্চল রাত্রি প্রহারক
অনুপম সর্বনাশে ভূয়োদর্শী অন্ধ হ'য়ে কাঁদে।

যেন বা দক্ষিণ মেঘ সূর্যাস্তের বরুণ আভাসে
ধীরে ধীরে নগ্ন করে নির্জনতা, জঙ্গম, প্রবাল
কায়া-অকায়ার স্পর্শে ম্লান কোনো মৃত ভাস্করের
সত্তার চূড়ান্ত ধ্বংস, যেন তার স্মৃতিরে নেভায়;
বৈদূর্য প্রহারে ক্ষমা, ধূম্র মেঘে-মায়াছত্রজাল
ও-মুখমণ্ডলে নেমে—পুষ্প হ'য়ে—রিক্ত হ'য়ে যায়।...

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

মৃত্যুভয় মানুষের মজ্জাগত। একবার জন্মগ্রহণ করলে কোনো-না-কোনো সময়ে এ সংসার থেকে বিদায়গ্রহণ করতে হবে এ সত্য অবধারিত, তবু মৃত্যুকে মানুষ যমের মতো ভয় করে। কথাটার মধ্যে একটু পুনরুক্তি থেকে গেল, পাঠক লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? যমই তো মৃত্যুর ঈশ্বর! মৃত্যুকে মানুষ যমের মত ভয় করবে, এ আর বেশি কথা কী? কিন্তু ঐ মহিষারূঢ় কালান্তক দেবতা ছাড়া ভয়াবহতার যে অন্য কোনো তুলনা চলে না এ কথাও সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

একটা ব্যাপার তবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে। কিন্তু ঐ অবাঞ্ছিত নিদারুণতার সঙ্গেই তো মানুষ সৃষ্টির আদিতম যুগ থেকে সহাবস্থান করে এসেছে! ফলে মোটামুটি এক ধরণের বোঝাপড়াও যেন হয়ে গেছে ঘটনাটির সঙ্গে। মরতে আমরা ভয় পাই নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ভয়ের বিষয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতেও লজ্জা পাই।

কিন্তু মৃত্যু যখন নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়, এ লজ্জা তখন জীর্ণ বস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করি আমরা। কাকের বাসায় বিপদ-সংকেত এলে নিমেষের মধ্যে যেমন হাজার হাজার কাক তাই নিয়ে আর্তনাদ শুরু করে, আমাদেরও অবস্থা ঘটে প্রায় সেই রকম। ঘরোয়া আড্ডা থেকে জনসভার মঞ্চ পর্যন্ত মুখর হয়ে ওঠে কলকোলাহলে।

এইটেই স্বাভাবিক। মৃত্যু ভয়াবহ, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর নতুনভাবে মরা। এ নিয়ে শোরগোল হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মনে পড়ল একজন ফাঁসির আসামীর গল্প। একই সময়ে আরো একজন অপরাধীর ফাঁসি হওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেই মঞ্চে। গল্পটা গল্পই, কাজেই ফাঁসিকাঠের নিচে একটি প্রবাহমান নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন নয়। দ্বিতীয় অপরাধীর গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হল আগে। তারপর যেই তার পায়ের নিচের তক্তাটা সরে গেল অমনি সে ঝুলে পড়ল পদতলের গহ্বরে, এবং সেই মুহূর্তেই তার ফাঁসির দড়িটাও গেল ছিঁড়ে। নিচে বলাবাহুল্য খরস্রোতা নদী। শুনেছি, ফাঁসির আসামীকে নাকি তার শেষ ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা

আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ দশা ঘটার পর গল্পের নায়ক আমাদের প্রথম আসামীকে যখন তার শেষ ইচ্ছা জানাতে বলা হয় তখন সে নাকি করজোড়ে নিবেদন করেছিল, 'হুজুর আর কিছু নয়, শুধু দড়িটা বদলে একটা নতুন দড়ির ব্যবস্থা করুন। ফাঁসিকাঠে মরব, সেটা নতুন নয়, কিন্তু গলায় দড়িবাঁধা অবস্থায় জলে খাবি খেয়ে মরব এটা আমি ভাবতেই পারিনে!'

বাস্তবিক তাই। মৃত্যু নয়, মৃত্যুর নতুনতম মাধ্যমটাই মানুষের সব থেকে বড় আতঙ্কের বিষয়।

হবে, না-ই বা কেন? সংক্রামক রোগে এ দেশের মানুষ কবে থেকে মরতে শুরু করেছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। ব্যাপারটা স্মরণাতীত কাল থেকে ঘটছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। আর সেই জন্যেই এভাবে মরা আমাদের গা-সওয়া হ'য়ে এসেছে। কিন্তু রাস্তার অ্যাক্সিডেন্টে মরা একেবারেই হাল-আমলের আমদানী। এখনো তার শতবার্ষিকী করা চলে কিনা সন্দেহ! ফলে সে বিষয়ে কৌতূহল এবং কোলাহল এখনো আনকোরা।

ধরুন পুলিশের সূত্রে থেকে প্রচারিত এই সংবাদটি—গত জুন মাসে যে ছয় মাস শেষ হ'য়েছে বছরের সেই ১৮২ দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়িতে-গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে ৬০১৪ বার, অর্থাৎ মোটামুটি দিনে প্রায় ৩৪টি দুর্ঘটনা।। কিংবা, আরো একটু সূক্ষ্ম হিসাবে এলে বলা যায়, ২৪ ঘন্টায় বিশ্রামের ৬ ঘন্টা বাদ দিলে অন্য সময়ে প্রতি ঘন্টায় দুর্ঘটনা ঘটে অন্তত দু'বার করে। আপনি যেখানেই থাকুন, বাড়িতে কি বাজারে কিংবা আপিসে, জেনে রাখবেন ঠিক আধঘন্টা পর পর একটা করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাচ্ছে শহরে। এই সব ঠোকাঠুকিতে, পুলিশের পরিসংখ্যানে প্রকাশ, জুন পর্যন্ত ছয় মাসে আহত হ'য়েছে ২১৫০ জন মানুষ, আর মারা গেছে ১৩৫ জন। অর্থাৎ মোটামুটি দিনে প্রায় একজন ক'রে। কাজেই প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় এ কথাও এক রকম সত্য বলেই মেনে নিতে পারেন, সেদিনের ১৬।১৭ ঘন্টায় শহরের কোথাও না কোথাও অন্তত একজন মানুষ ইহধাম ত্যাগ করেছে গাড়ির আক্রমণে।

তর্ক উঠতে পারে, সংখ্যাটা এমন আর বেশি কি? নিশ্চয়ই নয়। অসুখ-বিসুখে এর চেয়ে বেশি লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিনই। কিন্তু সেগুলো যে পরিচিত মৃত্যু! পেট্রোল বা ডিজেল-চালিত শকটের ধাক্কায় শমনসদনে যাওয়া একেবারেই এক-জেনারেশনের ব্যাপার। আমাদের রক্তের মধ্যে সে ভয়ের কোনো প্রতিষেধকই তৈরি হয়নি এখনো!

জানি না, কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। পুলিশ জানাচ্ছেন, তাঁরা উন্নততর ট্রাফিক আইন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। তা করুন, নিশ্চয়ই করবেন তাঁরা। কিন্তু ততোদিনে গাড়ির সংখ্যাও তো আরো বেড়ে যাবে? এবং বেড়ে যাবে মানুষের সংখ্যা। কাজেই বিপদের মূল কারণ তবু থেকেই যাবে।

এই সব ভেবেচিন্তে একটা মৌলিক উপায় বার করেছি আমি সম্প্রতি। ভ্যাকসিন! কলেরা বসন্ত টাইফয়েড জয় করে এখন আমরা ক্যান্সারও ভ্যাকসিন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলে আশা করছি। ক্যান্সারের চেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট কি কম বিপজ্জনক? আমার বিনীত প্রস্তাব, অচিরাৎ একটা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হোক, যেখানে পথ-দুর্ঘটনার ইঞ্জেকশন তৈরি হবে।

তারপর? তারপর আর ভাবনা নেই, বছরে একবার করে বসন্তের টীকে এবং টি-এ-বি-সি ইঞ্জেকশন নেওয়ার মত শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা গ্রহণ করবে অ্যাক্সিডেন্ট প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন, বাঘ-মার্কা স্টেট বাস পর্যন্ত হার মেনে যাবে আমাদের জীবনীশক্তির কাছে!

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

হীরেন মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী শিল্প-সাধনায় আমাদের জন্য যা রেখে গেছেন তার মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁর জীবন ও কর্মকে ভিত্তি করে কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি, তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবির নিখুঁত প্রতিলিপি সমন্বিত কোন অ্যালবাম অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি, তাঁর বিপুল চিত্র-সম্ভার সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য কোন স্থায়ী আর্ট গ্যালারী তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেও গড়ে ওঠেনি*। আমরা পিকাসো সম্বন্ধে যতটা আগ্রহ দেখাই, তার শতাংশের একাংশও দেখাই না আমাদের শিল্পীগুরুর সম্বন্ধে। উপরন্তু তাঁর কৃতিত্বকে খর্ব করার অপচেষ্টায় দু'-একজন বিদেশীর সঙ্গে আমরাও হাত মিলিয়েছি। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ভাগ্যবান যিনি জীবিত কালে এবং মৃত্যুর পরও সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে গেলেন। এই সেদিন মহা ধূমধামে আমরা তাঁর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত করলুম, কিন্তু সন্দেহ আছে তার কতটা আন্তরিক এবং কতটা লোক-দেখানো। এই বিদেশী মুদ্রা-বিনিময় সংকটের দিনেও আমরা তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিদেশ থেকে তাঁর ছবির নিখুঁত প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে আনলুম—এটা খুবই আনন্দের কথা—কিন্তু অনুরূপ আগ্রহ যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সম্বন্ধে দেখাতুম তাহলে বুঝতুম আমাদের শিল্প-রুচিতে কোন ফাঁকি নেই। রবীন্দ্রনাথের এতটুকু অসম্মান হ'লে আমরা তার প্রতিবাদ করি—করা উচিত—কিন্তু শিল্প-সমালোচনার নামে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রবর্তিত শিল্পসাধনার বিরুদ্ধে হীন আক্রমণ দেখেও যখন চুপ করে থাকি, তখন সন্দেহ হয়, আমাদের সাহিত্য-প্রীতিও হয়তো একেবারে খাঁটি নয়। অবনীন্দ্র-সমালোচনার নামে কত অসম্মানজনক উক্তি উচ্চারিত হয় নীচে তার কিছু পরিচয় দিলাম :

"As it (the style) developed over a period of thirty years it became identified with certain qualities—hesitant, indecisive line, misty vagueness of form, sombre murkiness of colour, likings for wistful girlish stances, dainty wanness, anaemic sentimentality. Some of these qualities spring directly from technical weakness—his inadequate training in British technique and imperfect mastery of Mughal idiom, the force of Japanese example. They are also due, in part, to mystical nature of Havell's teaching . . . . They are the qualities which go with tepid shrinkage from reality, faltering distrust, a failure in courage." (Archer, Modern Art in India)

"The Modern Art movement in India was born in the first years of this century in a haze of nostalgia for the past. The nostalgia only produced a sickly sweet art without bone or nerve. The 'Back to Ajanta' and 'Back to Rajput Painting' cries with which the new movement was launched were no more than sentimental slogans. Abanindranath Tagore, the pioneer of the new movement, himself did not go to Ajanta for his inspiration as much as to Persian miniatures, Chinese Scrolls and Japanese Wood cuts. In fact, neither he nor his students understood the logic of line and colour which gave the Ajanta murals and Rajput painting their power. For the sensitive line of the old works they substituted a lacrymose line. In place of the bright and lively colours of the older works they used dull and often indistinct colours.... Its (Bengal School's) members fail to see that even the best of foods is of no use if the body is allergic to it. The anaemic body of the Bengal school was not made to take in the rich diet of Ajanta and Rajput art." (one Mr. Sityamial, Times of India Annual, 1961).

অবশ্য এসব ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ অতি অল্প। 'কালচার' বলতে আমরা বুঝি নাচ আর গান। শিল্প তাই কোন রকমে বড়লোকের বৈঠকখানা আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। কিন্তু সেখানেও তার সম্মান নেই। সেখানে

ভারতমাতা (১৯০২)

[illegible] (১৯০৬)

---

* কিছুদিন National Gallery of Modern Art এ তাঁর সংরক্ষিত ছবির সংখ্যা [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... শ্রেষ্ঠ ছবি সবই আছে। [illegible] যায়, [illegible] করে সংগ্রহ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে অমৃতা শেরগিলের সমস্ত ছবি সংগ্রহ [illegible] তার ১০০টি ছবি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে প্রায় লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনে দু'টি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে রাখা হয়েছে

শিল্প হচ্ছে একটা ফ্যাশন, রুজ-লিপ-স্টিকের মতই আধুনিকতার একটা অঙ্গ মাত্র। শিল্পপ্রদর্শনীর কক্ষ হচ্ছে সমাজের উপরতলার লোকের সামাজিক মিলনক্ষেত্র। শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিনে এমন সব বিসদৃশ ঘটনা চোখে পড়ে যা উল্লেখ করা এ প্রসঙ্গে অবান্তর কিন্তু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শিল্প ও শিল্পীর ভবিষ্যৎ এ'দের হাতে নিরাপদ নয়।

॥ ২ ॥

এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বেশী। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য রচনা শুরু করেন তখন তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যখন শিল্প-রচনা শুরু করেন তখন তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। মধ্যযুগে (ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) ভারতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি (miniature) চিত্রকলার মান খুবই উঁচুতে উঠেছিল নিঃসন্দেহে, যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল কাঙড়া ছবিতে। কিন্তু ১৯ শতকের প্রথম পাদে কাঙড়া শৈলীর অবসান ঘটে শিখ ও গুর্খা আক্রমণের ফলে। তারপর থেকে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অবধি ভারতীয় চিত্রকলার শুধু অধোগতির ইতিহাস। শিখ ছবির মধ্যে যদিবা কিছুটা ভারতীয় ধারা বজায় ছিল, দিল্লী ও পাটনা কলমে বিলিতী ছবির সংস্পর্শ এসে ভারতীয় ছবির চরম বিকৃতি ঘটেছিল। একমাত্র দেশের লোক-শিল্প কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছিল সমাজের সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে। কিন্তু বেশীদিন তাও পারল না। তার কারণ দেশের লোকের রুচির মান ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছিল। সমাজের সেই অবক্ষয়ের রূপ ধরা পড়েছে কালীঘাটের ছবিতে।

ইতিমধ্যে দেশে বিলাতী আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পীরা বিলিতী প্রথায় মডেল বসিয়ে বাস্তবানুগ ছবি আঁকতে শিখেছে। দেশে তখন অয়েল পেন্টিংএর চাহিদা প্রচুর, বিশেষ করে প্রতিকৃতির। একটু অবস্থাপন্ন লোকেরাই নিজেদের বা পরিবারবর্গের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখতেন। এই পরিবেশেই রবি বর্মার জন্ম। তখনকার দিনে প্রতিকৃতি আঁকিয়েদের মধ্যে তাঁর নামডাক ছিল প্রচুর। প্রথম প্রথম তিনি শুধু রাজা-মহারাজাদের প্রতিকৃতি আঁকতেন, পরে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার অনুরোধে হিন্দু দেব-দেবী এবং রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিতে উৎসাহী হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সেই সব ছবি বিলিতী ওলিয়গ্রাফ পদ্ধতিতে ছাপা হয়ে দেশ ছেয়ে ফেলল এবং রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদ থেকে পানের দোকান অবধি অলংকৃত করতে লাগল। ভারতীয় চিত্রকলার অধঃপতনের যেটুকু বাকী ছিল তাও এতদিনে সম্পূর্ণ হ'ল। এই সব ছবি সম্বন্ধে বিখ্যাত শিল্প-রসিক কুমারস্বামী মন্তব্য করেছেন—

"Theatrical conceptions, want of imagination and lack of Indian feeling in the treatment of epic Indian subjects are Ravi Varma's fatal faults......His pictures are such as any European student could have paint after perusal of the necessary literature and a superficial study of Indian life".

স্বাভাবিক অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথ হয়তো রবি বর্মাকেই অনুসরণ করতেন। তিনি শিল্পী-জীবন শুরু করেছিলেনও সেইভাবে। প্রথমে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের Vice Principal, O. Gillhard, ও পরে Charles Palmer নামে একজন ইংরেজ আর্টিস্টের কাছে কিছুদিন তেল-রঙের কাজ শিখলেন। তারপর রীতিমত Studio খুলে বিলিতী কায়দায় মডেল বসিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। তিনি যে এই সময় তেলরঙের কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের দুটি প্রতিকৃতিতে * (১৮৯৩-৯৪)। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যের চিত্ররূপও এই সময়েই দেন। কিন্তু এ সবে তাঁর মন ভরল না। এমন সময় দৈবাৎ ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রর দেওয়া একখানা পাটনা কলমের ছবির বই তাঁর হস্তগত হয়। ছবিগুলির অলংকরণ তাঁকে মুগ্ধ করল। তার কিছুদিন আগেই তাঁর স্বর্গতঃ ছোট দাদা-মশায়ের (নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এক বান্ধবী Mrs. Martindale নামে এক বুড়ি মেম তাঁকে কতকগুলি কবিতা সোনার জলে অলংকৃত (illuminate) করে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের প্রাচীন শিল্প-ধারার অনুসরণে। একদিকে প্রাচীন দেশী আর্টের নিদর্শন ও অপর দিকে প্রাচীন বিদেশী আর্টের নিদর্শন তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। তিনি ঠিক করলেন দেশী প্রথায় ছবি আঁকবেন। কিন্তু কি আঁকবেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বৈষ্ণব কাব্যের চিত্ররূপ দাও'। অবনীন্দ্রনাথ একমনে বৈষ্ণব কাব্য পড়তে শুরু করলেন, তার পর দিলেন গোবিন্দ দাসের সেই দুটি লাইনের চিত্ররূপ।

'পৌষলী রজনী পবন বহে মন্দ
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্দ।'

ছবির নাম দিলেন 'শুক্লাভিসার'। কিন্তু তাঁর নিজের ভাষায় 'দেশী রাধিকা হ'ল না, সে হ'ল যেন মেমসাহেবকে শাড়ী পরিয়ে শীতের রাত্রে ছেড়ে দিয়েছি'। প্রথমটায় খুব মুষড়ে পড়লেন, তারপর ঠিক করলেন দেশী টেকনিক শিখতে হবে। তাই শিখলেন কিছুদিন। তারপর এক ফ্রেমের মিস্ত্রীর কাছ থেকে ছবিতে সোনা ধরানোর কাজও শিখে নিলেন। তখন আর তাঁকে পায় কে, আঁকতে শুরু করলেন বৈষ্ণব পদাবলীর সেট। তারপর একে একে শেষ করলেন 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'বুদ্ধ-চরিত্র', 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' ইত্যাদির চিত্রায়ণ (১৮৯৬-৯৭)। তিনি রাধা-কৃষ্ণের ছবি আঁকছেন শুনে একদিন বিখ্যাত বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ মশায় এলেন তাঁর ছবি দেখতে। রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে বললেন, 'এ কি রাধাকৃষ্ণের ছবি? লম্বা লম্বা সরু সরু হাত-পা যেন কাঠ-খোট্টাই—এই কি গড়ন? রাধার হাত হ'বে নিটোল, নধর তাঁর শরীর, জান না তাঁর রূপ বর্ণনা?'

---

* তিনি এর আগেও কিছু কিছু ছবি এঁকেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের চিত্ররূপ। ছবিগুলিতে বিলিতী ছাপ সুস্পষ্ট।

অবনীন্দ্রনাথ একটু হতভম্ব হলেন কিন্তু দমলেন না। যেমন ছবি আঁকছিলেন সেই রকম ছবি আঁকতে লাগলেন।

অবনীন্দ্রনাথের সেই সময়ের কিছু ছবি রবীন্দ্র-ভারতী ও ইণ্ডিয়ান মিউ-জিয়মের সংগ্রহে আছে। ছবিগুলি দেখলে এইটেই মনে হয় বিলিতি প্রথায় শিক্ষার প্রভাব শিল্পী কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। তাঁর রাধাকৃষ্ণ ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া ছবিগুলিতে একটা আড়ষ্টতা বর্তমান, পাত্র-পাত্রী কলের পুতুলের মত আচরণ করছে। রেখা স্বচ্ছন্দ নয় এবং সর্বোপরি শিল্পী পরি-বেশ (atmosphere) সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবু এটুকু বোঝা যায় শিল্পীর রঙের ব্যবহারে চোখ আছে এবং তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য।

ঠিক এই সময়েই হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ভারতীয় শিল্পের নব-জাগরণে এই হ্যাভেল সাহেবের দান কত-খানি তার বিচার এখনও হয়নি এবং কোনদিন হবে কিনাও সন্দেহ। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, হ্যাভেল ও কুমারস্বামী না থাকলে ভারতীয় শিল্প আজ স্ব-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারত না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হ্যাভেল সাহেব কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এসেই আর্ট স্কুলের সংগ্রহে যে-সব তৃতীয় শ্রেণীর বিলিতী ছবি ছিল তাদের নিলামে চড়িয়ে দিয়ে সেই অর্থে কিনলেন কিছু প্রাচীন মোগল ও পারসিক ছবি। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা যাতে অযথা বিলিতী প্রথার নকল করে নিজেদের শক্তি-ক্ষয় না করে, সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় অবনীন্দ্র-নাথের, অবনীন্দ্রনাথের কাকা সত্যেন্দ্র-নাথের বাড়ীতে। হ্যাভেল ধরে বসলেন অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমটায় গড়রাজী হয়ে শেষে রাজী হলেন। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই পরে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে সম্পর্ক হ্যাভেলের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কাজে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনেই হ্যাভেল সাহেব তাঁকে নিয়ে গেলেন আর্ট গ্যালারী দেখাতে। দু' তিনখানা মোগল ছবি আর খান দুই পার্শিয়ান ছবি—এই নিয়ে তখন আর্ট গ্যালারী। পর্দা তুলতেই প্রথম যে ছবিটি শিল্পীর নজরে পড়ল সেটি হচ্ছে বকপাখীর ছবি। শিল্পী সেটিকে মনযোগ দিয়ে দেখছেন এমন সময় হ্যাভেল সাহেব বুক-পকেট থেকে একখানা আতসী কাঁচ বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—'এই নাও এটি দিয়ে দেখ।' সেটির ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর কি মনের অবস্থা হয়েছিল তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন—

"ওমা কি দেখি, এ তো সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি, তার গায়ে ছোট্ট ছোট্ট পালক—কি দেখি—আমি অবাক হয়ে গেলুম, মুখে কথাটি নেই। পিছনে সাহেব তেমনিভাবে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, আমার অবস্থা দেখে মুচকি হাসছেন, যেন উনি জানতেন যে আমি এমনি হয়ে যাব এ ছবি দেখে। তারপর আর দু'চার খানা ছবি যা ছিল দেখলুম। সবই ওই একই ব্যাপার। মাথা ঘুরে গেল। তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে, ঢেলে দিয়েছে সোনা-রুপো সব। কিন্তু একটি জায়গা ফাঁকা তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্যে ভরে, কোথাও কোনো কার্পণ্য নেই কিন্তু ভাব দিতে পারেনি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এইবার আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম। কি ক'রে তার ব্যবহার তা জানলুম। এবার ছবিতে ভাব দিতে হবে।

"বাড়ী এসে বসে গেলুম ছবি আঁকতে। আঁকলুম 'শাজাহানের মৃত্যু'।"

এই 'শাজাহানের মৃত্যু' ছবিখানি (১৯০০?) পরে দিল্লীর প্রদর্শনীতে গিয়ে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। মূল ছবিটি তেলরঙে আঁকা (পরে শিল্পী এর একটি জলরঙে কপি করেন Lord Montegue কে দেবার জন্য) এখন রবীন্দ্র-ভারতীর সংগ্রহে আছে। ছবিটিতে মোগল প্রভাব সুস্পষ্ট। আগ্রা দুর্গের যে চত্বরটুকুতে শাজাহান জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়েছিলেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এঁকেছেন তা শিল্পী, এমনকি শ্বেত পাথরের মধ্যে বহুবর্ণের পাথর বসানো কাজ (inlaid, works) পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু মোগল ছবির স উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ তার ছবিতে নেই। তাছাড়া স্থাপত্য (architecture) বড় বেশী প্রকট, আসল ছবি তার পিছনে ঢাকা পড়ে গেছে। পরে কোন ছবিতে তিনি স্থাপত্যকে এত বেশী প্রাধান্য দেননি।

এর পরের ছবিগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পুরোনো 'wash' পদ্ধতিকেই পূর্ণতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চললেন। 'ঋতু-সংহার' (১৯০১-২) 'ভারতমাতা' (১৯০২) মেঘদূত (১৯০৫) হয়ে যখন 'ওমর-খৈয়ামে' (১৯০৬-৮) এসে পৌঁছুলেন তখন দেখি তাঁর ছবির আড়ষ্টভাব কেটে গেছে, রেখা সাবলীল হয়ে উঠেছে এবং সর্বোপরি কাব্যের আত্মা ছবির মধ্যে ধরা দিয়েছে। ছবির রঙ ফিকে বটে কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত—'ওমর-খৈয়ামের' রস মৃদু, গাঢ়, স্নিগ্ধ, তাঁর ছবির রঙও তাই।

১৮৯৪ থেকে ১৯১০ মোটামুটি এই ষোল বছরকে বলা যায় শিল্পীর প্রস্তুতি-কাল। এর পর তিনি যাতেই হাত দিয়ে-ছেন তাই তাঁর প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল

হয়ে উঠেছে। শিল্পের ভাষা তখন তাঁর আয়ত্ত, প্রকরণেও সিদ্ধি লাভ করেছেন, বিষয়বস্তুরও অভাব নেই—তাঁর নিজের ভাষায় 'বিষয়বস্তু তো চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে, দেখতে জানলেই হল'—সেই সংগে মিশেছে তাঁর অফুরন্ত কল্পনা-শক্তি। ছবি তাঁর হাতে তখন খেলার সামগ্রী। ১৯১৯ সালে গেলেন পুরী বেড়াতে, ফিরে এসে আঁকলেন সমুদ্র তীরের ছবি। আগেকার 'ওমর খৈয়ামের'র ছবি থেকে এ ছবি কত ভিন্ন! এখানে রঙ কত উজ্জ্বল! রৌদ্র-উদ্ভাসিত ধূসর বেলাভূমির গায়ে আছড়ে পড়ছে নীল সমুদ্র। প্রকৃতির মুক্ত অংগনে রঙের ছড়াছড়ি, এখানে রঙ ব্যবহার না করে পারেন শিল্পী? ছবিগুলি আকারে ছোট কিন্তু তারই মধ্যে সমুদ্রের ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে 'পুরী সিরিজের' পর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কতকগুলো ছবি আঁকেন শিল্পী, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বোধিবৃক্ষতলে ভিক্ষারক্ষিতা' (১৯১৯), 'কাজরী' (১৯১৩) ও 'পথচলার শেষ' (১৯১৩)। শেষের ছবিখানি একটি উটের ছবি। মরুভূমিতে চলতে চলতে বোঝার ভারে ক্লান্ত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—তার সব পথচলা শেষ হয়ে গেছে। তারই প্রতিধ্বনি উঠেছে অস্তগামী সূর্যের শেষ আভায়। মরুভূমির বুক, আকাশ, দিগন্তের সব রাঙা হয়ে উঠেছে বেদনার রঙে! যে সহানুভূতি ও দক্ষতার সংগে ছবিটি এঁকেছেন শিল্পী তার তুলনা বিরল।

এর পরে পশুপাখী নিয়ে অনেকগুলি ছবি আঁকেন শিল্পী। পশুপাখীর উপর চিরদিনই তাঁর প্রীতি ছিল। তাঁর নিজের পোষা কুকুর 'ভাকু'র ছবিই কতবার এঁকেছেন। ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় শিল্পী এই সব মূক প্রাণীদের মনের ভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'মুক্তির স্বপ্ন' ছবিখানিতে একটি হরিণের খাঁচায় থাকাকে চিত্রিত করছেন। একটি খোলা জানালা পথে হরিণটি তীর বেগে বেরিয়ে আসছে—তার চোখে মুক্তির স্বপ্ন। ছবিটি দ্বিমাত্রিক, কিন্তু ছবিটির সামনে দাঁড়ালে মনে হয় হরিণটি ছবি ভেদ করে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। তার বাঁকানো দেহে যে বেগের ইংগিত আছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

১৯০৬ সালে অবনীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকাভিনয়ের অনেকগুলি ছবি আঁকেন। এই অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নামেন। তাঁর আবক্ষ

ঝুলন-পূর্ণিমা

শ্মশ্রু, আগুল্ফলম্বিত আলখেল্লা অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে গিয়েছিল, শুধু হাতে নিতে হয়েছিল একটা একতারা। যাঁরা সে অভিনয় দেখেছিলেন তাঁরা অনেকদিন অবধি সে-দৃশ্য ভোলেননি। আর আমরা যারা দেখিনি তারাও দেখতে পাই অবনীন্দ্রনাথের ছবির ভেতর দিয়ে। একটি ছবিতে আছে রবীন্দ্রনাথ মাথার উপর একতারাটি তুলে নাচছেন, নাচের তালে তালে তাঁর আলখেল্লাটি দুলছে। অবনীন্দ্রনাথের দ্রুত তুলির টানে সে নৃত্যছন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে। রঙ বিশেষ ব্যবহার করেননি শিল্পী, শুধু কালির ওয়াশ, মাঝে মাঝে অল্প একটু হলদে বা বাদামী রঙের ছোপ।

পরবর্তী 'হিমালয়-সিরিজের' ছবিতে (১৯১৯-২০) শিল্পী প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছেন চীনা-শিল্পীর মত। তফাত শুধু চীনা-ছবি বেশীর ভাগই আকারে বড় আর তাঁর ছবি আকারে ছোট। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পরিসরে দেবতাত্মা হিমালয়ের যে মহিমময় রূপ ধরা পড়েছে তা অতুলনীয়। 'ওয়াশ' এবার তাঁর হাতে রহস্যময়তা লাভ করেছে—সে রহস্য হিমালয়ের রহস্যের মতই দুর্ভেদ্য কিন্তু তার আকর্ষণ দুর্নিবার। রঙের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে সীমিত, তার কারণ বর্ণবহুল হিমালয়ের রূপ কোন রঙই প্রকাশ করতে পারে না। শিল্পী তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কালি-ওয়াশই ব্যবহার করেছেন। মাঝে মাঝে অল্প একটু-আধটু হলদে বা সবুজের ছোঁয়া আছে।

এর পরে (১৯২০-২৫) মোগল বংশের অনেকগুলি বিখ্যাত চরিত্রের রূপ দেন শিল্পী। ছবিগুলি ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিকৃতি নয়, তাঁদের চরিত্রের প্রকাশ। এই সত্যটি বুঝতে পারেননি বলেই অনেক পণ্ডিত সমালোচক ছবিগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।

"The intimate union of subject and artist which had underlain the greatest achievement of Mughal painting was lacking and the result was an art devoid both of strong conviction and real enthusiasm." (Archer, Modern Art in India).

আসলে অবনীন্দ্রনাথের 'জাহাঙ্গীর' একজন ভোগী, বিলাসী, শান্তিরুচি মানুষ—যাঁর কাছে সীমান্ত প্রদেশের

একখণ্ড রাজ্য অপেক্ষা একটুকরো ফুলের বাগানের মূল্য বেশী। তাঁর 'শাজাহান' একাধারে কবি, শিল্পী ও ভাবুক, তিনি সব সময় স্বপ্নের জাল বুনছেন। তাঁর 'ঔরঙ্গজেব' ধর্মান্ধতা, কৃচ্ছ্রসাধনা, এবং অবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। তাঁর ছবিগুলির এই প্রতীক ধর্মের সঙ্গে পরিচিত না হলে শিল্পীর প্রতি অবিচার করা অসম্ভব নয়।

এর পর ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকগুলি ছবি আঁকেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু ১৯২৬-২৭ সালে শাহজাদপুর অঞ্চলের পল্লীদৃশ্য নিয়ে যে ছবিগুলি আঁকেন তা তাঁর শিল্পী-জীবনের এক স্মরণীয় সৃষ্টি। ছবিগুলিতে 'ওয়াশ' এবং রঙের যে প্রয়োগ দেখিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ তা একমাত্র তাঁর তুলিতেই সম্ভব। রেখার কাজ নেই বললেই হয়, তার স্থান দখল করেছে রঙের সূক্ষ্ম স্তর ভেদ। সে রঙ কোথাও উগ্র নয়, চাপা গাঢ় স্নিগ্ধ—বাংলার পল্লী-প্রকৃতির মতই কোমল। অবনীন্দ্রনাথের মোহন তুলির স্পর্শে পল্লী বাংলার যে মায়াময় রূপ ফুটে উঠেছে তার তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু অবনীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তাঁর 'আরব্য উপন্যাসে'র (১৯৩০) ছবিতে। প্রথমে শিল্পীর ইচ্ছে ছিল একাধিক সহস্র রজনীর সব ক'টিরই চিত্ররূপ দেবেন, পরে খেয়ালী শিল্পী সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তবু যা রেখে গেছেন (সংখ্যায় ৩৭টি) তাই যথেষ্ট। ছবিগুলির মধ্যে যে গল্প, নাটকীয়তা ও কৌতুকরসের সমন্বয় ঘটেছে তার তুলনা বিরল। তাছাড়া রেখার সূক্ষ্মতায়, বর্ণের প্রয়োগে ও কল্পনার ব্যাপ্তিতে ছবিগুলি অনন্য। তাঁর অন্যান্য ছবির মত এ ছবিগুলিও দ্বিমাত্রিক, পিছনের জিনিসকে দেখিয়েছে উঁচুতে তুলে। স্থানগত কালগত ঐক্যও (Unity of Space and unity of time) সব সময় রক্ষা করেননি শিল্পী। তাঁর যখন যেমন ইচ্ছা সেই রকম ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন, হয়তো সেই সব ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছিল কিংবা হয়তো আদৌ ঘটেনি। সম্ভব অসম্ভবের বেড়া ডিঙিয়ে এমন অনেক জিনিস ঢুকে পড়েছে তাঁর ছবিতে যা অন্য কারও হাতে পড়লে হয়তো উদ্ভট পাগলামীতে রূপান্তরিত হ'তো কিন্তু তাঁর হাতে পড়ে গল্পের পরিবেশের সঙ্গে তা আশ্চর্য খাপ খেয়ে গেছে।

এর পরে পাঁচ-ছ বছর আর তুলি ছোঁননি শিল্পী। যাত্রা লেখা নিয়ে মেতেছিলেন। তারপর দৈবাৎ একদিন শিল্পী মুকুল দের কৌশলে* (সেজন্য আমরা মুকুলবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ) আবার তুলিতে হাত দিলেন। আবার আমরা পেলাম 'কবিকঙ্কন', 'কৃষ্ণ-মঙ্গল' ও 'পারাবত' সিরিজের অপরূপ চিত্রাবলী (১৯৩৬-৩৮)। স্পষ্টই বোঝা যায় এবার অবনীন্দ্রনাথকে খেলায় পেয়ে বসেছে, তাঁর সরস কৌতুকী মন ছবির মধ্যে খেলার সামগ্রী খুঁজছে। 'ওয়াশ' ও বর্ণ-প্রয়োগের জটিলতা পরিহার ক'রে শিল্পী তাই ছবিতে পটের ঢঙ আমদানী করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতিরও (distortion) আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন কৃষ্ণ-বলরামের দেহের তুলনায় মাথাটাকে করেছেন, বড়, কিন্তু তাতে ছবির রস ক্ষুণ্ণ হয়নি। কৌতুকরসে, কাব্য-সুষমায় ও গাল্পিক আবেদনে ছবিগুলি ভরপুর।

এর পর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে'র ছবি ক'খানি (১৯৪১)। ছবিগুলি গভীর বেদনা থেকে উৎসারিত, তাই রূপের সীমা পেরিয়ে অরূপের দুয়ারে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে। সারা জাতির শোকের রূপ দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ মোটা তুলির টানে অশ্রু-সমুদ্রের ইঙ্গিত দিয়ে। ছবিগুলি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের বিবর্তনের চরম নিদর্শন। যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পী-জীবন শুরু করেছিলেন বিলিতী প্রথায় মডেল বসিয়ে ছবি এঁকে তিনিই তা শেষ করলেন প্রায় বিমূর্ত শিল্পে পৌঁছে। একটা জীবন শুধু এগিয়ে চলারই ইতিহাস।

পরবর্তী জীবনে রঙ তুলি আর ছোঁননি অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সৃষ্টি-ক্রিয়া বন্ধ হয়নি। এখান থেকে ওখান থেকে কাঠ-কুটো, নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে বানাতেন নানা রকম রকম খেলনা—এরাই হোল তাঁর 'কুটুম-কাটাম'। শেষ জীবনে এই 'কুটুম-কাটামের' খেলা নিয়েই মেতেছিলেন বৃদ্ধ-শিশু—অবনীন্দ্রনাথ। তারপর একদিন ক্ষমতাও লোপ পেল, তখন সে খেলাও তাঁকে ছেড়ে দিতে হ'ল। কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি-ক্রিয়া কি স্তব্ধ হয়ে গেল? নিশ্চয় নয়। তার কারণ শিল্পী নিজেই বলেছেন—
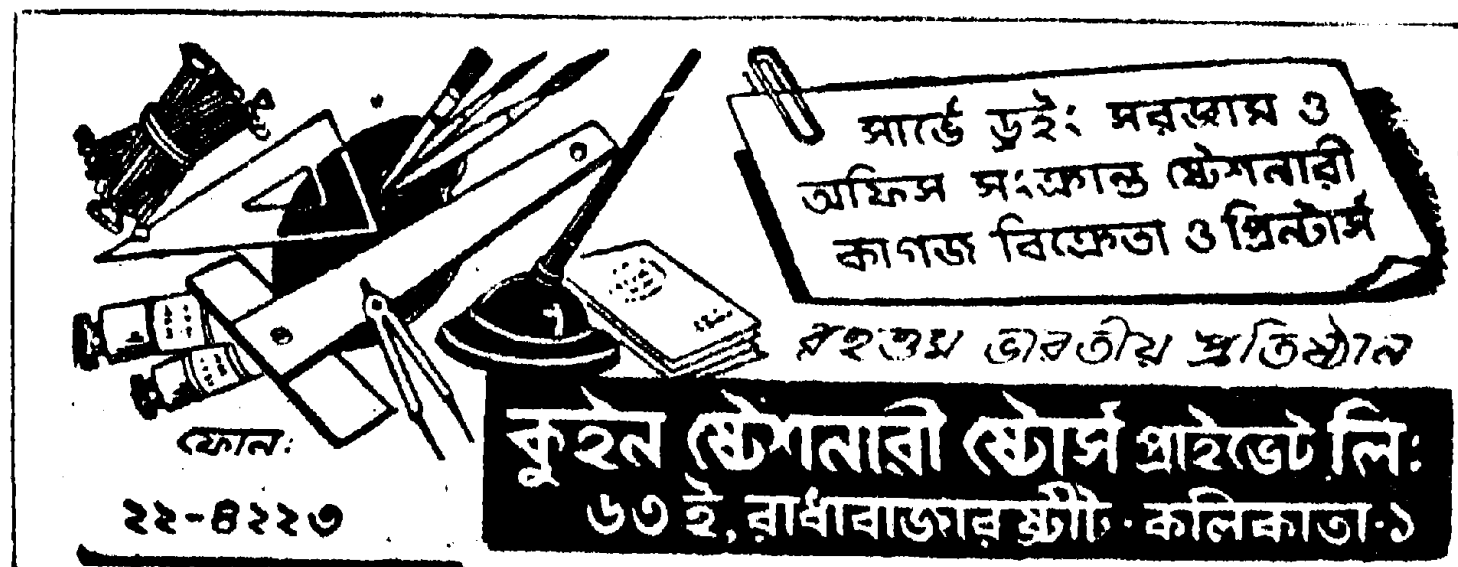
"তুলি না থাকলে হাত দিয়ে আঁকবো, হাত না থাকলে কনুই দিয়ে আঁকবো.........আর কিছু না থাকলে মন দিয়ে আঁকবো।"

জীবনের শেষ কটা দিন রোগ-জর্জরিত নিঃসংগ শিল্পী মন দিয়েই আঁকতেন।

॥ ৩ ॥

অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল ও টেকনিক নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। প্রথম প্রথম তাঁর সমালোচকরা বলতেন তাঁর ছবিতে অঙ্গসংস্থান (anatomy) নেই, পরিপ্রেক্ষণ-বোধ (perspective) নেই; আলোছায়ার খেলা (play of light and shade) নেই—অতএব তাঁর ছবি ছবি নয়। এখন অবশ্য শিল্প-তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আর উত্থাপিত হয় না, এখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নিজে কিছু সৃষ্টি করেননি, শুধু প্রাচীনেরই নকল করেছেন, অতএব তিনি revivalist. অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। Tradition-এ শ্রদ্ধাবান হলেও অবনীন্দ্রনাথ নিজে কোনদিন Tradition মেনে চলেননি। তাঁর শিষ্যদের অনেকেই অজন্তার নবাবিষ্কৃত চিত্রকলার সংস্পর্শে এসে স্বকীয়তা হারালেও তিনি নিজে তার প্রভাব থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর ঝোঁকটা ছিল মধ্যযুগের ক্ষুদ্রাকার (miniature) ছবির প্রতি। মোগল ছবির সূক্ষ্মরেখা ও অলঙ্করণ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল—এ আমরা আগেই দেখেছি। অত্যন্ত যত্নে তিনি মোগল ছবির রেখা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর আরব্য উপন্যাসের যে কোন

* দ্রষ্টব্য 'দক্ষিণের বারান্দা'—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ঝুলন (১৮৯৬)

ছবিই তার প্রমাণ) এবং ফার্সী calligraphy-র অনুকরণে বাংলা অক্ষরে তাঁর ছবিতে নানা সরস মন্তব্য জুড়ে দিতেন। মোগল ছবির সংগে তাঁর সম্পর্ক এখানেই শেষ। মোগল ছবির রাজারাজড়াদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা তাঁর ভাল লাগেনি। ছবিতে তিনি চাইতেন গল্প, নাটকীয়তা। এদিক দিয়ে বরং পারসিক শিল্পীদের সংগে ছিল তাঁর মনের মিল। ছোটবেলা থেকেই যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছেন সেখানে সংস্কৃত নাটক, বৈষ্ণব কাব্য ও ইসলামিক কাহিনীর চর্চা চলেছে পুরোদমে। কাজেই তাঁর মধ্যে যে একটা গল্পপ্রবণ মন গড়ে উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি? এ ছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল একটা চিরন্তন শিশু, দুনিয়ার সব কিছুতেই যার অসীম কৌতূহল। সেই সংগে মিশেছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজাত রুচি ও আমিরী মেজাজ। এই সবকিছুর প্রতিফলন তাঁর ছবিতে। সেখানে কোন স্থূলতা, কুশ্রীতার স্থান নেই। অনেকে অভিযোগ করেন তাঁর ছবিতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেনি কেন? এ অভিযোগও সম্পূর্ণ অবাস্তব তার কারণ তৎকালীন সাধারণ মানুষের গতানুগতিক নিরুত্তাপ জীবনযাত্রায় শিল্পীর ক্ষুধা মেটাবার মত উপকরণ ছিল না।

অবনীন্দ্রনাথের 'স্টাইলে'র মত তাঁর 'টেকনিক'ও নিজস্ব। বেশির ভাগ প্রাচ্য ছবির মত তাঁর ছবি রেখা-নির্ভর নয় (দু' এক ক্ষেত্র ছাড়া) অথচ পাশ্চাত্য ছবির বাস্তবতাকেও তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেননি। তাঁর ছবিতে রূপের আভাস আছে, ব্যঞ্জনা আছে। সেইজন্য তাঁর ছবিতে রঙের ভূমিকা এত বেশি। রঙের ব্যবহারে তাঁর জুড়িদার আজও মিলল না। তাঁর যে 'ওয়াশ' পদ্ধতি সেও তাঁর আবিষ্কার, চীনা বা জাপানী পদ্ধতি থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। চীনা বা জাপানী পদ্ধতিতে সিল্ক বা ছবির কাগজটিকে একবার বা দু'বার জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর দ্রুত তুলির টানে ছবিটিকে শেষ করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর ছবিতে এক এক পর্দা করে রঙ চাপাতেন আর ছবির কাগজটিকে জলে ডোবাতেন। এইভাবে বার বার জলে চুবিয়ে চুবিয়ে যখন দেখতেন রঙ বেশ মিলে মিশে গেছে তখন ছবির কাগজটিকে জল থেকে বার করে এনে final touch দিয়ে শুকিয়ে নিতেন। বার বার ধোয়ার ফলে রঙের উগ্রতা হ্রাস পেত, ছবিতে স্নিগ্ধতা আসতো। এছাড়া এতে রঙ ছবিতে একেবারে পাকা হয়ে বসত।

সম্প্রতি একটা ধুয়ো উঠেছে যে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতির মূলে আছে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ। এর পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাজনীতির আবর্ত অবনীন্দ্রনাথকে কোনদিন টেনে নিয়ে যেতে পারেনি এবং তাঁর 'ভারতমাতা' তাঁর শিল্পীজীবনের এক ক্ষণস্থায়ী পর্ব মাত্র। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন নিঃসন্দেহে কিন্তু সে অন্য অর্থে। তিনি মুমূর্ষু ভারতীয় চিত্রকলার দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, তাকে বাঁচবার উপযোগী খাদ্য দিয়েছিলেন এবং তার মুখে নতুন ভাষা দিয়েছিলেন, সেজন্য প্রয়োজনবোধে প্রাচ্য প্রতীচ্য কোন জায়গা থেকেই উপকরণ আহরণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এইখানেই তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব।

এই শতকের প্রথম পাদে যখন হ্যাভেল ও কুমারস্বামী প্রমুখ শিল্পরসিকেরা তাঁর ছবি বাইরে প্রচার করেন তখন তাঁরা তাঁর ছবির আধ্যাত্মিকতার উপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন। তখন হয়তো তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এখন একথা স্বীকার করার সময় এসেছে যে আধ্যাত্মিকতা অবনীন্দ্রনাথের উপর কোনদিনই খুব বড় একটা ছাপ ফেলতে পারেনি। দেবদেবীর ছবি তিনি খুব কমই এঁকেছেন এবং যাও এঁকেছেন তাও ঘরের মানুষের মত ক'রে এঁকেছেন। নিজেই বলেছেন—'দেবদেবীর ছবি আমার ভাল আসে না'।

অবনীন্দ্রনাথের 'স্টাইল' অবনীন্দ্রনাথেই শেষ। নন্দলাল তাঁর শিষ্য হলেও ভিন্ন পথগামী। নব্য-বঙ্গীয় ছবি বললেই আমাদের চোখের সামনে যেসব জোলো সেন্টিমেন্টাল ছবির চেহারা ভেসে উঠে সে সবের সংগে অবনীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্ক নেই। সে সব তাঁর অক্ষম অনুকারকদের সৃষ্টি।

মার্কিনী জীবন

বুদ্ধদেব বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঁচ

প্রত্যেক মানুষের দুটি দেশ আছে ঃ একটি তার জন্মভূমি, অন্যটি পৃথিবীর যে-কোনো মহানগর। একমাত্র মহানগরেই অতিথি হ'তে পারে অপ্রবাসী, অচিরস্থায়ী বিদেশীও জীবনস্রোতে গা ভাসাতে পারে। বৃহৎ হ'লেই মহানগর হয় না, সর্বমানবতা তার চরিত্রলক্ষণ, তাকে বলতে পারি নানা দেশের ও নানা ধরনের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বাসভূমি। প্যারিস, আকারে ছোটো হ'লেও, জগৎবাসীর এক মিলনস্থল, আর নিন্দুকেরও না-মেনে উপায় নেই যে কলকাতা শুধু বাঙালির রাজধানী নয়, সূচনা থেকেই ছাত্রিশ জাতির শ্রীক্ষেত্র। এই মিশ্রণ যেখানে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না, সেগুলোই পৃথিবীর মফস্বল। তফাৎটা স্পষ্ট বুঝেছিলুম সেবার পিটসবার্গ থেকে ন্যু ইয়র্কে আসামাত্র। পূর্বোক্ত স্থলে পাঁচ মাস কাটিয়েও আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি যে আমি 'এখানকার কেউ নই', কিন্তু মানহাটান আমাকে কয়েক দিনের মধ্যেই আত্মীয় ক'রে নিলে। বাতাস যেন হাল্কা সেখানে, অনেক সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়; রাস্তায় পা চলে দ্রুত; নিজেকে মনে হয় স্বাধীন ও ক্ষমতাপন্ন, পরিবেশের স্বীকরণে দেরি হয় না। সাব-ওয়ে স্টেশনে পথ হারিয়ে, গাড়ি ভুল ক'রে, রকিফেলার-ভবন থেকে বেরোবার চেষ্টায় বিভ্রান্ত হ'য়ে, নগরের নানা অংশে নানা সময়ে নানা জাতীয় রেস্তোরাঁয় আহার ক'রে, সবুজ সংকেতে অসংখ্যের সঙ্গে রাস্তা পার হ'য়ে—এমনি করে মানহাটানকে আমি ভালোবাসতে শিখেছিলুম। কয়েকটি বিম্ব আমার স্মরণে মুদ্রিত হ'য়ে আছেঃ এক প'য়ষট্টি তলার জানলা থেকে হঠাৎ দেখা অস্পষ্ট আটলাণ্টিক, ট্যাক্সিতে অচেনা পাড়ায় যেতে-যেতে একসঙ্গে হাজার জানলায় হীরকতুল্য বৈদ্যুৎদীপ্তি, ফিফথ এভিনিউর বিপণিশ্রেণীতে বাতায়নিক ঐশ্বর্য, আর ফিফথ এভিনিউর ভিড়—ভিড়—ভিড়। আমি ভালোবেসেছিলুম ন্যু ইয়র্কের স্রোত, তীব্রতা, তার নিদ্রাহীন প্রাণস্পন্দন; অনুভব করেছিলুম যে এখানে কেউ 'বাইরে প'ড়ে' থাকে না, যে-কোনো মানুষ অপ্রয়াসে আপন স্থান খুঁজে পায়। মনে হয়েছিলো, একা থাকতে হলে এমন স্থান আর নেই; বোদলেয়ার যাকে বলেছিলেন 'জনতাস্নানের উন্মাদনা', সেই বিলাসিতা পাত্র ছাপিয়ে উচ্ছল। মধ্য-মানহাটানে, যেখানে ভুবনবহ আটলাসের মূর্তি স্থাপিত আছে, আর সর্বজাতির পতাকা উড্ডীন, সেখানে দাঁড়ালে ভিড়ে যেন নেশা ধ'রে যায়, মানুষগুলোকে দেখায় এক জীবন্ত, চলমান ও অন্তহীন শৃঙ্খলের মতো। আর তাদের মধ্যে অনেকেই কোনো কাজে বেরোয়নি, শুধু 'শহর দেখছে'। অনেক বিদেশীর সঙ্গে, চোখে-মুখে একই রকম কৌতূহল বা বিস্ময় নিয়ে অসংখ্য জাত-মার্কিনী উপস্থিত, কেননা ক্যানসাসের কৃষক বা ওক্লাহোমার দোকানির পক্ষে ন্যু ইয়র্ক প্রায় ততটাই লোমহর্ষক, যতটা ছিলো মৈমনসিংহের মহাজনের পক্ষে কলকাতা, বা উনিশ-শতকী 'কালেজে'-পড়া বাঙালির পক্ষে 'বিলেত'। আগন্তুক ও দৈশিকের মধ্যে প্রভেদ এই নগরে নানা কারণে অস্পষ্ট।

ন্যু ইয়র্কের আর-এক রূপ দেখেছিলাম সেবার যখন চ'লে আসি। ঘাটে পৌঁছতে দেরি হয়েছিলো আমার: আমি তক্তা পেরোবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই জাহাজ ছেড়ে দিলে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো বন্দর ও তীরবর্তী মানুষ: এগিয়ে এলেন দীপধারিণী স্বাধীনতা, উল্টো দিকে ধাবমান হ'লো তুঙ্গ ও অসমান সৌধশ্রেণী। অর্ণবপোতের দ্রুতি ছিলো অসামান্য, তবু সেই দৃশ্য রইলো বহুক্ষণ ধ'রে চোখের সামনে— মানহাটান যে কত বিপুল, আর তার স্থাপত্য যে কী-রকম গরীয়ান, তা যেন আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলুম। বিপুল কিন্তু সমুদ্র থেকে দেখায় যেন নির্ভার, এক ঋজু, কঠিন ও সুমিত ছন্দে উঠেছে এই উচ্চাবচ আকাশ-রেখা কৃশ, উচ্ছ্বাসহীন, সংহত ও জ্যামিতিক। 'নগরী, আমার প্রেয়সী, আমার শুভ্রা! তন্বী তুমি, শোনো আমার কথা...শোনো!...কুমারী তুমি স্তনহীনা, রজতকান্তি বেণুর মতো ক্ষীণাঙ্গী তুমি শোনো!...' কবিকল্পনা নয়, পাউণ্ডের এই পংক্তি ক-টিতে ন্যু ইয়র্কের বাস্তব রূপই ধরা পড়েছে।

যাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তা নির্বিশেষ ও বৈচিত্র্যহীন। আকাশ সর্বত্রই এক, সব দেশেই প্রান্তর, পাহাড়, উপত্যকা একই ভাবে গঠিত। যা মানুষের সৃষ্টি, শুধু তারই সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন 'দেশ' ব'লে চেনা যায়—যেমন ভাষা, স্থাপত্য, লোকাচার। যদি যোজনের পর যোজনব্যাপী প'ড়ে থাকে শুধু ভূমি ও দিগন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রকৃতি, যদি মানুষের কোনো রচনা কোথাও দেখা না যায়,

তাহ'লে চীনে ও পেরুতে কোনো পার্থক্য নাও অনুভূত হ'তে পারে, কিংবা, যেমন মধ্যসমুদ্রে আটলান্টিক ও প্যাসিফিকের তফাৎ, তেমনি তা গোচর হবে শুধু বৈজ্ঞানিক উপায়ে। কিন্তু কোনো নগরে চব্বিশ ঘণ্টা কাটালেও তা বিঁধিয়ে দেয় মনের মধ্যে কিছু চরিত্র-চিহ্ন : অমুক ব্যাঙ্ক থেকে বাঁয়ের মোড়ে হোটেল; উল্টো দিকে মিনিট দশেক হাঁটলে চিত্রশালা পাওয়া যাবে; স্থানীয় ভাষায় 'সসেজ'কে বলে 'হুর্স্ট'—এই চিহ্নগুলি মনের উপর এমনভাবে কাজ করে যে দিনের শেষে হোটেলে ফিরে মনে হয় যেন 'বাড়ি এলাম', আর স্বগৃহে ফিরেও মনে হয় না সেই দূর নগরে কিছুই কুড়িয়ে পাইনি। এবং যেগুলোকে মহানগর বলছি তাদের আছে রীতিমতো এক-একটি ব্যক্তিত্ব; তাদের স্পন্দমান প্রাণ নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আগন্তুকের উপর; যে স্বল্পকাল পরে বিদায় নেবে তাকেও কিছু দেবার আছে তাদের; ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদনে প্রবল ব'লেই তারা স্মৃতির কাছে বিশেষভাবে স্বীকার্য।
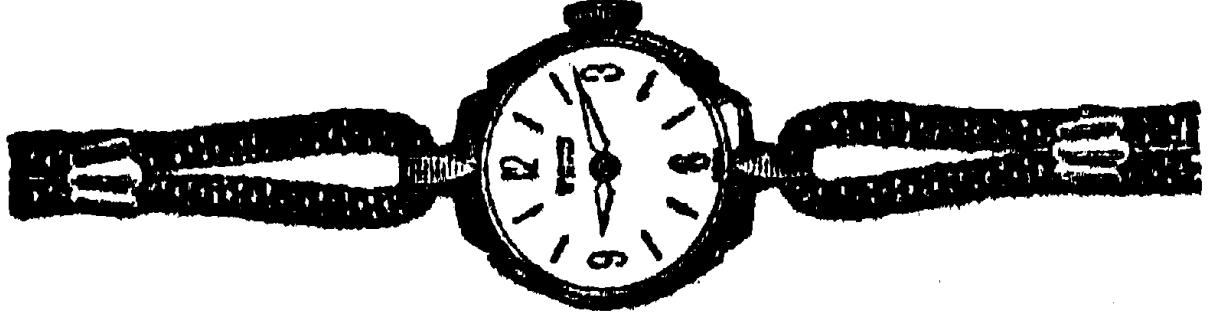
সেবারে ঋতু ছিলো মৃদু, এবার শীত দুর্জয়। বৃষ্টি, কাদা, বরফ-গলা জল—এই সব এলো তথাকথিত বসন্তের দান। মে মাসের আগে সত্যিকার রোদালো দিন পাওয়া গেলো না। তবু ন্যু ইয়র্ক পৌঁছিয়ে দিলে আমাদের কাছে তার আন্তরিক বার্তা, নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিলে তার চরিত্র। আমাদের এই আজকের পৃথিবীতে যে-ক'টি বিশ্বপুরী গ'ড়ে উঠেছে তার মধ্যে এই নগর অন্যতম বা অগ্রণী। চলতে-ফিরতে নিরন্তর এর প্রমাণ মেলে। যে-নাপিতের কাছে আমি চুল ছাঁটতে যাই, সে গ্রীক; যে-রাস্তায় আমরা বস্ত্রাদি কিনি সেখানে সব দোকানে হিস্পানি ভাষার প্রাধান্য; শৌখিন রুটি-বিস্কুটের জন্য যেতে হয় পটুর্কেশিনী দিনেমার মেয়ের দোকানে; মাঝে-মাঝে যে-সব রেস্তোরাঁয় আহার করি সেগুলো ইটালিয়ান বা চৈনিক। আমার ছাত্রছাত্রী সহকর্মী ও বন্ধুদের মধ্যে আছেন গ্রীক, ইটালিয়ান, ওলন্দাজ, জর্মান, চেক, ইত্যাদি; যে-কোনো পার্টিতে গিয়ে দেখি, অতিথিরা এই রকমই বিমিশ্র। তাঁরা অনেকে এই দেশেরই নাগরিক বটে, এবং সর্বতোভাবে তা-ই, কিন্তু জন্মভূমির কিছু-কিছু লক্ষণ তাঁরা রোপণ করেছেন এখানে, আর এমনি ক'রে মার্কিনী জীবন শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে চলেছে। সাব-ওয়ের যাত্রীদের হাতে প্রায়ই দেখা যায় ঈডিশ বা হিস্পানি ভাষার দৈনিকপত্র; রাস্তায় শোনা যায় হিস্পানি অবিরল, অন্যান্য ভাষা মাঝে-মাঝে। একটি তথ্যপুস্তিকায় লেখা দেখছি যে ন্যু-ইয়র্কবাসী মার্কিনীরা প'চাত্তর ভাষায় কথা বলে, আর এখান থেকে যে-সব ভাষায় দৈনিক বেরোয় তার মধ্যে আছে চৈনিক, গ্রীক, জর্মান, ইটালিয়ান, পোলিশ ও রুশীয়। এবং সাপ্তাহিক ইত্যাদি প্রকাশিত হয় য়োরোপের প্রায় সব ক-টা ভাষায়, তা ছাড়া আরবি, হিব্রু ও জাপানিতে।

সব মার্কিনী এই নগরের প্রেমিক নন। বিভিন্ন রাজ্যের ছোটো শহরে গিয়ে অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছি : 'ন্যু ইয়র্ক আমেরিকা নয়, ন্যু ইয়র্ক দিয়ে আমেরিকাকে বিচার করবেন না।' যেন ন্যু ইয়র্ক যথোচিত নয়, যেন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবার কারণ আছে, তাঁদের মনের ভাবটি এই রকম; আমার সেখানে খুব ভালো লাগছে শুনে তাঁরা একটু অবাক না-হ'য়ে পারেননি। ন্যু-ইয়র্কবাসীর হৃদ্যতা নেই, নেই কোনো পারিবারিক জীবন, তাদের আসক্তি শুধু অর্থে ও প্রমোদে, তাদের ব্যবহার ক্ষিপ্র ও অশালীন— পাঁচশো অথবা বারো শো মাইল দূরে ব'সে এই ধরনের উক্তিও অনেকে ক'রে থাকেন। তেমনি, আমার ছেলেবেলার পূর্ববঙ্গেও অনবরত শুনতুম যে কলকাতা এক ভয়ংকর স্থান, সেখানে রাস্তায় বেরোনোমাত্র পকেট কাটা যায়, আর লোকেদের মুখে মধু থাকলেও হৃদয় শুধু গরলে ভরা। রূপসী নারী ও কৃতী পুরুষের মতো, পৃথিবীর নগরগুলিও অলীক রটনার উপলক্ষ না-হ'য়ে পারে না—সেটা তাদের গৌরবেরই এক প্রমাণপত্র। কিন্তু ন্যু ইয়র্কের প্রতি যাঁরা বিমুখ, তাঁরা হয়তো এও জানাতে চান যে এক 'খাঁটি' আমেরিকার অস্তিত্ব আছে; যাকে বলে সত্যিকার মার্কিনী জীবন, ঐ বিশ্বধামে তা পরিস্ফুট নয়। শতকরা-একশো-পরিমাণে মার্কিনী কি পেনসিলভেনিয়া না মধ্য-পশ্চিম না টেক্সাস, তা বিচার করার সাধ্য অবশ্য আমার নেই; আর শতকরা-একশো-পরিমাণে কিছু-একটা যে হ'তেই হবে, বা হ'লেও সেটা প্রশংসনীয়, তা মেনে নেবার অক্ষমতাও আমার অপার। স্বভাবদোষে, ও কুশিক্ষার ফলে, আমি নিজেকে এখনো বিশ্বাস করাতে পারিনি যে কলকাতার চেয়ে বীরভূমের গ্রাম বেশি বাংলাদেশ; এবং ধরা যাক, পি, জি, উডহাউস বা রাডিয়ার্ড কিপলিঙের রচনায় যে-ধরনের 'খাঁটি' ইংরেজিয়ানার আলেখ্য আছে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়েও আমি অনুৎসুক। আমি ভুলে যাচ্ছি না যে মার্কিনীর পক্ষে ন্যু ইয়র্ক ঠিক তা নয়, যা বাঙালির পক্ষে কলকাতা বা ফরাশির পক্ষে প্যারিস; এই বিশাল দেশ বহু স্থলে ছড়িয়ে দিয়েছে তার স্নায়ুকেন্দ্র; মান-হাটানের মাটি না-মাড়িয়েও, অন্তত তাত্ত্বিক হিশেবে, বিবিধ প্রকার উচ্চাশা-পূরণ সম্ভব। কিন্তু এ-কথাও তর্কাতীত যে—সর্বস্ব না হোক—আমেরিকার সর্বোত্তম হ'লো ন্যু ইয়র্ক; একমাত্র এই নগরই মৌলিক অর্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি; যা ছিলো হুইট-ম্যানের 'মার্কিনী স্বপ্ন' তার প্রতিচ্ছবি দেখতে হ'লে এখানে আসা ভিন্ন উপায় নেই। কোনো-এক প্রাদেশিক বা পারি-ভাষিক অর্থে ন্যু ইয়র্ক নাও হ'তে পারে

আমেরিকা, কিন্তু এই দেশের যা-কিছু বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রলক্ষণ—তার বহুমিশ্র প্রজাবৃন্দ, তার গতিবেগ, তার তারুণ্য, তার সর্বজনীনতার আদর্শ—ব্যক্তির মুক্তি, মানুষের স্বাধীনতা ও নিঃসংকোচতা —এমনকি তার কুবেরসিদ্ধি—এই সবকিছুর এক অবিকল চিত্রকল্প এই ন্যু ইয়র্ক। এবং অন্য দিক থেকেও তাকে বলতে পারি আমেরিকার এক [illegible] ঃ কেননা এদের সংস্কৃতির পীঠস্থান যদিও অনেকগুলো, তবু আর কোথাও নেই এত চিত্রশালা, চিত্রশালায় এত ঐশ্বর্য,* এত রঙ্গমঞ্চ ও গীতিমঞ্চ, এত বইয়ের দোকান, গ্রন্থাগার, ও মুাজিয়ম, আর কোথাও নেই দেশজ, বৈদেশিক ও সদা-দৈশিকতাপ্রাপ্ত এত রসজ্ঞ ও গুণীজন। যে-আদর্শ নিয়ে এই দেশ স্থাপিত হয়েছিলো তা মনে রেখে বলা যায় যে ন্যু ইয়র্ক, সবচেয়ে আন্তর্জাতিক ব'লেই, সবচেয়ে মার্কিনী।

এখন ভেবে দেখছি যে ন্যু ইয়র্কে প্রবাসকালে আমরা যতটা মার্কিনী উচ্চারণ শুনেছি, প্রায় ততটাই শুনেছি য়োরোপীয় ইংরেজি ; সদয় বন্ধুরা যে-সব গুণীদের আহ্বান করেছেন আমাদের সঙ্গে দেখাশোনার জন্য, তাঁরা অনেকে য়োরোপ ছেড়েছেন এই শতকেরই প্রথমার্ধের কোনো সময়ে, এবং অনিবার্যভাবে বাসা বেঁধেছেন ন্যু ইয়র্কে। মনে পড়ে একটি বৃহৎ ভোজের সভা, সেখানে অতিথির সংখ্যা এত বেশি যে আমার কাছে অধিকাংশ নাম অস্পষ্ট থেকে গেলো। আমি আসন পেলুম এক সস্ত্রীক যুবকের পাশে, তিনি সফোক্লেস অনুবাদ করেছেন। এই নগরে যা অপ্রত্যাশিত, তাঁর মুখে সেই ইংরেজ উচ্চারণ শুনে আমি না-ব'লে পারলুম না, 'একটা কথা জিগেস করি, আপনি কি ইংলণ্ডে পড়াশুনো করেছিলেন?' 'হ্যাঁ, তা-ই।' 'আপনার উচ্চারণ দেখছি একেবারে ইংরেজ হ'য়ে গেছে।' এর উত্তরে যুবকটি বললেন, 'আমি ইংলণ্ডেই জন্মেছিলুম।' আমাদের কাছাকাছি ছিলেন একটি মার্কিনী তরুণী—আমরা, বোধহয় বয়সের সামীপ্যের জন্য, তাঁকে ইংরেজ যুবকটির স্ত্রী ভেবেছিলুম, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে তরুণীটি আমাদের ভুল ভাঙিয়ে দিলেন। 'ঐ যে প্রৌঢ় পুরুষটিকে দেখছেন—উনি আমার স্বামী।' যাঁকে 'প্রৌঢ়' বলা হলো, তাঁর বয়স অন্তত সত্তর, কিন্তু দেহ যেমন বলিষ্ঠ তেমনি মেধাবী তাঁর মুখশ্রী। ক্রমশ জানতে পারলুম, তিনি আর্চিবল্ড আর্চিপেঙ্কো, কীর্তিমান ভাস্কর; জন্মেছিলেন রাশিয়ার উক্রাইন প্রদেশে, যৌবনকাল প্যারিসে ও য়োরোপের নানা দেশে কাটিয়ে, প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে আমেরিকায় আছেন। প্রথম স্ত্রী ছিলেন জর্মান; তাঁর মৃত্যুর পরে সম্প্রতি বিবাহ করেছেন এক তরুণী ছাত্রীকে; ছাত্রীটিও ভাস্কর্যবিদ্যায় নিপুণ। আর্চিপেঙ্কোকে 'খাঁটি' মার্কিনী বলা যাবে না, কিন্তু মার্কিন দেশের ঋদ্ধির একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে তিনি—ও তাঁর মতো আরো অনেকে—এখানে পেয়েছেন গৃহ, স্বীকৃতি ও সম্মান।

সেই সন্ধ্যার আর-একটি স্মৃতি উপস্থিত করি। ডিনারের পরে, গৃহস্বামীর অনুরোধে, আমাকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দু-চার কথা বলতে হ'লো। আমার বলা হ'য়ে যাবার পর কিছু প্রশ্ন করলেন—আর্চিপেঙ্ক নন, অন্য এক প্রাচীন পুরুষ। অত্যন্ত ভঙ্গুর ইংরেজিতে, সম্ভ্রমভাবে, মিনিট পাঁচেক কথা বললেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টলস্টয়ের কিছু সাদৃশ্য আছে—এই ধারণা কি সার্থক? আমি যথাসাধ্য তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলুম। পরে, দুই মার্কিনী বন্ধুর সঙ্গে যখন বাড়ি ফিরছি, আমি জিগেস করলুম—'উনি কে, জানেন? যিনি টলস্টয়ের কথা তুললেন?' 'উনি কেরেনস্কি।' 'কেরেনস্কি? নামটা চেনা মনে হচ্ছে।' 'তা হ'তেই পারে—উনি তো রুশ বিপ্লবে—' 'বলেন কী! রুশ বিপ্লবের কেরেনস্কি উনি?' আমার ভাবতে খুব অদ্ভুত লাগলো যে, আমি কিছুক্ষণ আগে কেরেনস্কির সঙ্গে কথা বলছিলুম, কেননা—তিনি এখন কোথায় আছেন তা জানা দূরে থাক, তিনি যে এখন পর্যন্ত জীবিত তা সুদ্ধ আমার ধারণায় ছিলো না। কেরেনস্কি—তা আমার কাছে ইতিহাসের একটি নাম মাত্র; তাঁর বিষয়ে পুস্তকে পড়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্পনীয় নয়। কোনো পার্টিতে কেউ যদি বলে, 'ইনি হিণ্ডেনবুর্গ' বা 'ইনি ক্লেমেসোঁ'—তাহ'লে যেমন হ'তো, সেই রকমের ব্যাপার এটা। এমনি সব ছোটো-বড়ো বিস্ময় ন্যু ইয়র্ক সাজিয়ে রাখে তার অতিথির জন্য।

(সমাপ্ত)

* আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমার কাছে ন্যু ইয়র্কের একটি বড়ো আকর্ষণ তার চিত্রশালাসমূহ; সবগুলো দেখা আমার সময়ে ও সাধ্যে কুলোয়নি, কিন্তু প্রধান চারটিতে একাধিকবার সঞ্চরণ ক'রে যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে আমার অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ব্যাপ্ত থাকবে। প্রাচীন থেকে অত্যাধুনিক পর্যন্ত প্রতীচ্য শিল্পকলার প্রতিটি পর্যায়ের এতগুলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে হ'লে য়োরোপে অন্তত তিনটি দেশে ভ্রমণ করার প্রয়োজন ঘটে। ন্যু ইয়র্কে ও য়োরোপে প্রবাসকালে আমার বার-বার মনে হয়েছে যে শুধুমাত্র ছবি দেখার জন্যই আমাদের পক্ষে প্রতীচ্য ভ্রমণ সার্থক।

মতামত

॥ 'ভারত ও চীন : অশান্ত অঞ্চল'—প্রসঙ্গে ॥

'অমৃত' সম্পাদক সমীপে—
সবিনয় নিবেদন,

স্বাধীনতা সংখ্যা (২য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যা) 'অমৃত' পত্রিকায় দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'ভারত ও চীন—অশান্ত অঞ্চল' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে লেখককে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। ইতিপূর্বে একাধিকবার এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে।

প্রবন্ধকার তাঁর আলোচনার এক স্থানে বেশ যুক্তিসহকারেই বলেছেন : 'চীনের হামলা প্রতিরোধের জন্য সীমান্তে ভারতের শক্তিবৃদ্ধি নিতান্তই প্রয়োজন।' কেননা চৈনিক সরকার ভারতের সামরিক শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয়েরা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বলে অভিযোগ তুলেছেন যে চীন ভারতের বুকে বারবার ছুরিকাঘাত করে চলেছে।

আশার কথা শ্রীনেহরু বলেছেন সীমান্তে ভারতের যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ভারত এতদিন পরে চীন সরকারের ভূমিক্ষুধার পেছনে যে অধ্যবসায় ক্রিয়াশীল তার সন্ধান পেয়েছে। নেপালকে চীন বাগে এনেছে, আর ছোবল মেরেছে ব্রহ্মদেশের কোমল বুকে, পাকিস্তানের সঙ্গে সাময়িকভাবে দোস্তী করেছে, ভুটান ও সিকিমকে দলে টানবার চেষ্টা করে আংশিক সফল হয়েছে, ভারতকে আঘাত করবার জন্যে চীন সরকার একযোগে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিচিত্রভঙ্গীতে হাত মিলিয়েছে।

কম্যুনিষ্ট চীন কাশ্মীরের ওপর ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না। কাশ্মীর-প্রসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে চীন সরকার হাত মিলিয়েছে। গত ৩১শে মে তারিখের চিঠিতে চীন সরকার ভারতের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেছে। গত ২৫শে মে ৬২-র অমৃত পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল : 'কাশ্মীরের ব্যাপারে ত' আমাদের এখনও পন্ডিত নেহরুর অবিমৃশ্যকারীতার ফল ভোগ করিতে হইতেছে।'—আপনাদের সেই মন্তব্য যদিও যুক্তিপূর্ণ তবুও একথা বলা হয়ত ভুল হবে না যে, নেহরুর শান্তিকামী নীতিই এর জন্যে দায়ী, নেহরু নয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ওপর ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন (বিশ্বের কারও) প্রশ্ন থাকতে পারে না, তেমনি কাশ্মীর সম্পর্কেও থাকতে পারে না।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা যায়। মিলিটারী বাজেট পাশ হওয়ার আগে অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে চীন যে কোন মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করতে পারে। শ্রীনেহরু তখন সদস্যদের কথায় সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু গত ২০শে জুন তিনি উল্টো গেয়ে বললেন : 'চীন কর্তৃক নতুন কোন আক্রমণাত্মক কাজ হয়নি, পক্ষান্তরে বরং আমাদের অবস্থাই সেখানে সুবিধাজনক।'—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ভারতের সীমান্ত-অঞ্চল যে আজ ক্রমশঃ জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পাকিস্তান ও চীন সরকার আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ভারতের মাটিতে অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট। সুতরাং ভারতকেও উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। ভারত সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে কাশ্মীর-সমস্যাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতালিপ্সু পশ্চিমী মহল আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে তার ওপর! আর তা না করে কেবল প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে এবং হুঙ্কার জানিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলে সেই জাতীয় আস্ফালন বা সিংহনাদ একান্তই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হবে।

বিনীত নমস্কারান্তে,
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া।

॥ যাত্রা থিয়েটার প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতে'র ৩রা আগষ্টের ১৩শ সংখ্যায় প্রেক্ষাগৃহ শীর্ষক নিয়মিত বিভাগে যাত্রা-থিয়েটার সম্বন্ধে নান্দীকার মহাশয়ের আলোচনা পড়ে অবাক হয়ে গেছি। উনি মন্তব্য করেছেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত, বিদেশী জাহাজে চেপে রঙ্গালয় আমাদের দেশে এসেছে, আমাদের দেশের মাটীর সোঁদা গন্ধ তার মধ্যে আমরা পেতে পারি না। রঙ্গমঞ্চকে যতক্ষণ না আমরা আমাদের আসরের মাঝখানে মাটীর উপর বসাতে পারি, ততক্ষণ তার সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়, ইত্যাদি।"

দেশী জিনিস ফেলে বিদেশী জিনিস নিয়ে মাতামাতি করছি—এই কটাক্ষ করলে সদ্যপরাধীনতামুক্ত জাতির Sentiment- এ প্রবল ঘা লাগে। অতএব এইপথে লোক ক্ষ্যাপানো যায়। কিন্তু তা যুক্তির পথ নয়। মোটকথা, আমরা থিয়েটার ভালবাসি। বিদেশী জাহাজে চড়ে এলেও আমরা দুশো বছরে একে আত্মস্থ করে ফেলেছি।

যাত্রা—তার কাহিনী, মোটাদাগের অভিনয়-পদ্ধতি, কথার ফাঁকে গান গেয়ে ওঠা ইত্যাদি অর্থাৎ melodrama intellectuals দের খুশী করতে পারে না। তাছাড়া, দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসজ্জার কৌশলে থিয়েটারের মঞ্চে এমন একটা আবহ সৃষ্টি সম্ভব যা যাত্রার আসরে অসম্ভব। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'মনিহারা' গল্পের একজায়গায় আছে ফণীভূষণ যথাসাধ্য টাকাপয়সা সংগ্রহ করে বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। তার ধারণা ছিল, তার স্ত্রী মনিমালিকা নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিশ্চয় বাপের বাড়ী থেকে এতদিনে ঘরে ফিরে এসেছে। এবং আজ স্বামীর উপস্থিতিতে তার কৃতকর্মের জন্য তার লজ্জা ও অনুতাপের সীমা থাকবে না। এরূপ ভাবতে ভাবতে ফণীভূষণ শয়নঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলো, দরজা বন্ধ। তালা ভাঙ্গা হল। দেখা গেল, ঘর শূন্য। ঘরের এককোণে লোহার সিন্দুক পড়ে আছে, তাতে গয়নাপত্র কিছুই নেই।

এ রকম Situation যাত্রায় সম্ভব নয়। সিনেমায় সম্ভব। থিয়েটারেও সম্ভব।

আজ থিয়েটারে কয়লাখনির খাদ পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে। কয়লাখনিতে যারা কাজ করে, নদীতে যারা মাছ ধরে তারাও মানুষ। তাদের জীবনে সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, ব্যথা-বেদনা, সমস্যা যখন বাস্তব সত্য, তখন এসব প্রকাশেরও নিশ্চয় পথ আছে। থিয়েটারে তা সম্ভব।

অবশ্য, নান্দীকার মহাশয় যাত্রাভিনয়কে কালোপযোগী (বিদেশী থিয়েটারের বিকল্প দেশী সংস্করণ?) করবার জন্য কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন। উনি বলেছেন, "যাত্রাভিনয়ে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রক্ষেপন দ্বারা দৃশ্যগুলিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও সজীব করে তোলার কৌশল উদ্ভাবনের জন্যে তাপস সেনের মত মস্তিষ্কের প্রয়োজন আছে। বহুবিধ আনুষঙ্গিক কৃত্রিম শব্দসৃষ্টির জন্য উচিতমত টেপরেকর্ডারের ব্যবহারও যাত্রাভিনয়ের রসসৃষ্টি করতে সক্ষম। রণক্ষেত্রের কোলাহল, অসির ঝনৎকার, অশ্বাদির গমনাগমন, নৌকাযাত্রা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টিতে টেপরেকর্ডারের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।" আমার বক্তব্য হল যাত্রা এবং উপরোক্ত কারিগরির ফলশ্রুতি যাত্রা নয়, থিয়েটার। এ জিনিসটা নান্দীকার মহাশয় একটু ভেবে দেখবেন।

সবশেষে আমি বলতে চাই, থিয়েটার যাত্রার প্রতিপক্ষ নয়। যাত্রা না থিয়েটার—এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো, দুই-ই। যাত্রা যাত্রাই, থিয়েটার থিয়েটারই। এ দুয়ের ক্ষেত্র আলাদা। Technique ও আলাদা। দুটোই আমাদের। দুটো কই আমরা ভালবাসি। নমস্কারান্তে ইতি—

শম্ভু চৌধুরী,
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দাগ

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

সেদিন, তার পরের দিন এবং তারও পরের দিন বিশেষ একটা 'মুডে' রইল হোমস্। ওর বন্ধুবান্ধবরা এ সময়ে ওকে বলে স্বল্পভাষী, আর সবাই বলে বিষণ্ণ। এ ক'দিন ও ঝড়ের মত এল, ঝড়ের মত গেল, ধূমপান করলে অবিরাম, মাঝে মাঝে বেহালা নামিয়ে টুকটাক দু' একটা গৎ বাজালে, কখনও বা ডুবে রইল দিবাস্বপ্নে, স্যান্ডউইচ গিললে যখন তখন অসময়ে, এবং আমার ছাড়া ছাড়া প্রশ্নগুলোর উত্তর যা দিলে তা না দেওয়ারই সামিল। বেশ বুঝলাম, তদন্ত সম্পর্কে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না ও। নিজের অবস্থাও তেমন ভাল নয়। কেসটা সম্বন্ধে কিছুই বলত না ও। তদন্তের খুঁটিনাটি এবং নিহত ব্যক্তির খিদমৎগার জন মিট্টনের গ্রেপ্তার এবং পরে খালাস পাওয়ার খবর জানলাম আমি কাগজ পড়ে। করোনারের জুরীরা জানালে যে খুনটা নিশ্চয় "উদ্দেশ্যমূলক এবং সুপরিকল্পিত হত্যা"। কিন্তু খুনী অথবা খুনীরা আগের মতই রইল অজ্ঞাত। মোটিভ কি, সে রকম আঁচও কেউ দিতে পারলে না। বহু মূল্যবান সামগ্রীতে ঘর বোঝাই থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিসও সরেনি। নিহত ব্যক্তির কাগজপত্রও কেউ নাড়াচাড়া করেনি। কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল ভদ্রলোক ছিলেন একাধারে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরম উৎসাহী এবং উৎসুক ছাত্র, অবিশ্রান্ত গল্পবাজ, অসাধারণ ভাষাবিদ, এবং ক্লান্তিহীন পত্র-লেখক। অনেকগুলো দেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর ড্রয়ার-বোঝাই দলিলপত্র

থেকে চাঞ্চল্যকর কোন তথ্যই আবিষ্কার করা গেল না। স্ত্রীলোকদের সাথে আলাপের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বাছ-বিচাররহিত। ব্যক্তিনির্বিশেষে সবার সংগেই মিশতেন, কিন্তু ওপরে ওপরে, মাখামাখি ছিল না কারোর সাথেই। এ রকম মেয়েদের মধ্যে তাঁর পরিচিতের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু বান্ধবী ছিল মাত্র কয়েকজন, আর এমন একজনও ছিল না যাকে তিনি ভালবাসতেন। স্বভাব-চরিত্র পরিমিত এবং নিয়মিত। আর, তাঁর আচরণে কেউ রুষ্ট হতেন না। আগাগোড়া একটা বিরাট রহস্য তাঁর মৃত্যু এবং এ রহস্য সম্ভবতঃ শেষ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে।

সীমাহীন নিষ্ক্রিয়তার অনুকল্প হিসাবে মরিয়া হয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল খিদমৎগার জন মিটুনকে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন মামলাই টেনে নিয়ে যাওয়া গেল না। সেই রাতেই হ্যামারস্মিথে বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিল সে। কোন ফাঁক নেই তার অ্যালিবিতে। একটা পয়েণ্ট অবশ্য সত্যি, যে সময়ে বাড়ীমুখো রওনা হয়েছিল সে, খুনটা ধরা পড়ার আগেই ওয়েস্ট-মিনস্টারে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল তার। কিন্তু দেরী হওয়ার যে কারণ সে দর্শালে তা খুবই সম্ভব। সে-রাতে খানিকটা পথ হেঁটে এসেছিল সে এবং তা আশ্চর্য নয় এই কারণে যে বড় সুন্দর ছিল বিশেষ রাতটি। কাজেই, বারটার সময়ে বাড়ীতে পৌঁছোয় সে। পৌঁছেই ঐ অপ্রত্যাশিত শোচনীয় কাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। মনিবের সংগে তার সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভাল। মৃত ব্যক্তির কয়েকটি জিনিস, বিশেষ করে ক্ষুর রাখবার একটা ছোট্ট কেস, খিদমৎগারের বাক্সে পাওয়া গেছিল। কিন্তু জন মিটুন জানালে যে জিনিস-গুলো তার মনিবের দেওয়া বখশিস। মিসেস প্রিঙ্গলও তা সমর্থন করলে। বছর তিনেক হ'ল লুকাসের কাজে বহাল আছে মিটুন। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষণীয়। ইউরোপ সফরের সময়ে লুকাস মিটুনকে সংগে নিতেন না। মাঝে মাঝে মাস তিনেকের জন্যে প্যারিসে থাকতেন উনি। সে সময়ে মিটুন থাকত গোডোলফিন স্ট্রীটের বাড়ীর তত্ত্বাবধানে। খুনের রাতে মিসেস প্রিঙ্গলও কিছু শুনতে পায়নি। তার মনিবের সাথে কেউ যদি দেখা করতে এসে থাকে তো তিনি নিজেই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

কাজে কাজেই তিনটে দিন কেটে গেল, কিন্তু রহস্যতিমিরের একটা অংশেরও সমাধান করা গেল না। অন্ততঃ কাগজে আমি তাই পড়লাম। হোমস্ এর থেকে বেশী খবর যদিও বা রাখত, তা আর কাউকে জানায়নি। ওর মুখেই শুনেছিলাম, এ কেসে লেসট্রেড তাকে দলে টেনেছে। সে যে প্রত্যেকটা নতুন পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রয়েছে, তা জানতাম। চতুর্থ দিন প্যারিস থেকে একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোনোর পর মনে হল এ বিরাট প্রশ্নের সবকিছুরই সমাধান হয়ে গেল।

প্যারিসের পুলিশ সদ্য একটা আবিষ্কার করিয়াছে (লিখেছে 'ডেলী টেলিগ্রাফ')। ফলে, যে অবগুণ্ঠন মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাসের শোচনীয় অদৃষ্টকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা উত্থিত হইল। গত সোমবার রাত্রে ওয়েস্টমিনস্টারের গোডোলফিন স্ট্রীটে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস। আমাদের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, নিহত ভদ্রলোককে ছুরিকাহত অবস্থায় তাঁহার ঘরেই পাওয়া গিয়াছিল। কয়েকটি কারণে তাঁহার খিদমৎগারকে সন্দেহ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু একটি য়্যালিবির জন্যে সে কেস ভাঙিয়া যায়। ম্যাডামজেল হেনরী ফোরনেয়ি নামে পরিচিত এক ভদ্রমহিলা রু অসটারলিট'তে একটি ছোট্ট ভিলা লইয়া বাস করিতেন। গতকাল তাঁহার চাকর-বাকরেরা কর্তৃপক্ষকে খবর দেয় যে তিনি নাকি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। পরীক্ষার পর দেখা যায় যে বাস্তবিকই তিনি বিপদজনক এবং স্থায়ী প্রকৃতির একটা বাতিকে আক্রান্ত। তদন্তের ফলে পুলিশ আবিষ্কার করিয়াছে যে লণ্ডন পরিভ্রমণ সমাপনান্তে গত মঙ্গলবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন ম্যাডামজেল হেনরী ফোরনেয়ি এবং প্রমাণ যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, ওয়েস্টমিনস্টারের অপরাধের সংগে তাঁহার সংযোগ আছে। ফটোগ্রাফ মিলাইয়া দেখার পর সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মঁসিয়ে হেনরী ফোরনেয়ি এবং এডুয়ার্ডো লুকাস এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং নিহত ব্যক্তি কোন কারণে লণ্ডন এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। ম্যাডামজেল ফোরনেয়ি বর্ণসংকর। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তাঁহার জন্ম এবং তাঁহার ধমনীতে ইউরোপীয় ও নিগ্রো উভয় রক্তই প্রবাহিত। অল্পতেই নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া ওঠা তাঁহার স্বভাব এবং অতীতে ঈর্ষার প্রকোপে কয়েকবার তাঁহার চিত্তবিকার ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। অনুমান, উত্তেজনা বা ঈর্ষাবিশতঃই তিনি ঐ ভয়ানক খুনটা করিয়া ফেলিয়াছেন যাহার ফলে এই প্রকার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে লণ্ডনে। সোমবার রাত্রে তাঁহার গতিবিধির কোন হদিশ এখনও পাওয়া যায় নাই বটে, তবে পুলিশের সন্দেহ, তাঁহার বর্ণনার সংগে মিলিয়া যায় এমন একজন স্ত্রীলোক মঙ্গলবার সকালে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনে তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা এবং মারমুখো অঙ্গভঙ্গির জন্যে। অতএব, খুনটা সম্ভবতঃ উন্মত্ত থাকাকালীনই হইয়াছে অথবা খুনের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় চেতনা লোপ পায় এই অসুখী মহিলার এবং পাগল হইয়া যান তিনি। বর্তমানে অতীতের কোন সুসংবদ্ধ বর্ণনা দিতে তিনি অপারগ এবং চিকিৎসকেরাও তাঁহার চেতনার পুনরুদ্ধারের কোন আশা রাখিতেছেন না। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, একজন স্ত্রীলোককে, তিনি ম্যাডামজেল ফোরনেয়িও হইতে পারেন, সোমবার রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে গোডোলফিন স্ট্রীটের একটা বাড়ীকে লক্ষ্য করিতে দেখা গিয়াছে।

"এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়, হোমস্?" খবরটা আমিই জোরে জোরে পড়ে শোনালাম ওকে। শুনতে শুনতে প্রাতরাশ খাওয়া শেষ করল বন্ধুবর।

"মাইডিয়ার ওয়াটসন," টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে বলল ও, "বুঝতে পারছি নিদারুণ ভোগান্তি চলছে তোমার কৌতূহলের টুঁটি টিপে বসে থাকার জন্যে। কিন্তু গত তিনদিনে যদি তোমায় কিছু না বলে থাকি তো বুঝতে হ'বে বলার মত কিছুই ছিল না। এমন কি এখনও প্যারিস থেকে আসা এই রিপোর্টও আমায় বিশেষ সাহায্য করতে পারছে না।"

"লোকটার মৃত্যুই যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে এই রিপোর্টই তো চূড়ান্ত, তাই নয় কি?"

"ভদ্রলোকের মৃত্যুটা তো একটা নিছক ঘটনা—আমাদের আসল কাজের

তুলনায় তুচ্ছ একটা উপসংহার। আমাদের মুখ্য কর্তব্য হ'ল দলিলটার হদিশ খ'ুজে বার করা আর একটা ইউরোপীয় বিপর্যয়কে নিরোধ করা। গত তিনদিনে একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঘটেছে, এবং তা হচ্ছে কিছুই ঘটেনি। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি আমি এবং ইউরোপের কোথাও যে কোন রকম অশান্তির সূচনা দেখা যায়নি, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখন, এ চিঠিটা যদি দেশছাড়া হ'ত—না, কখনই তা হয়নি, হ'তে পারে না—কিন্তু যদি দেশ ছাড়া না-ই হয়ে থাকে, তবে এখন তা কোথায়? কার কাছে? কেনই বা একে চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নটাই তো হাতুড়ির মত দমাদম পড়ছে আমার মস্তিষ্কে। চিঠিটা যে রাতে অদৃশ্য হ'ল, ঠিক সেই রাতেই লুকাসও ওপারের পথে যাত্রা করলেন—এ কি বাস্তবিকই নিছক কাকতালীয়? চিঠিটা কি আদৌ পৌঁছেছিল ও'র কাছে? তাই যদি হয় তো তাঁর কাগজ-পত্রের মাঝে চিঠির সন্ধান মিলছে না কেন? ও'র বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রী কি যাওয়ার সময়ে চিঠিটাও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? তাই যদি হয়, তাহলে তা কি তাঁর প্যারিসের বাড়ীতে আছে? ফরাসী পুলিশের সন্দেহ জাগ্রত না করে কিভাবে আমি এখন এর সন্ধান করি বলো তো? মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এ কেসটা এমনই যে এখানে আইন আমাদের কাছে যতখানি বিপদজনক, ঠিক ততখানি বিপদজনক ক্রিমিন্যালরা। প্রত্যেকটি পুরুষের হাত রয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, তা সত্ত্বেও স্বার্থের ঝু'কি কিন্তু অতি বিপুল। এ রহস্যের সাফল্যময় পরিসমাপ্তিতে যদি পৌঁছোতে পারি, তাহলে আমার গৌরবময় কর্মজীবনের মুকুটমণি হয়ে থাকবে এ ঘটনা। এই তো দেখছি রণাঙ্গন থেকে এসে পৌঁচেছে আমার সর্বশেষ রিপোর্ট!" নোটটা হাতে পেয়েই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে ও। "হুররে! লেসট্রেড কৌতূহলোদ্দীপক কিছুর খোঁজ পেয়েছে আমার মনে হচ্ছে। ওয়াটসন, টুপীটা মাথায় দিয়ে নাও। চল, বেড়াতে বেড়াতে ওয়েস্ট-মিনস্টারের দিকে যাই দু'জনে"

অকুস্থলে সেই আমার প্রথম আগমন। যে শতাব্দীতে এ বাড়ীর জন্ম—হুবহু তারই মত তার আকৃতি। উ'চু, মলিন, আর সংকীর্ণ খুপরিতে বহুধা

বিভক্ত আয়তন। ফিটফাট, কেতাদুরস্ত আর নিরেট। সামনের জানলা থেকে লেসট্রেডের বুলডগ-আকৃতিকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। বিশাল বপু একজন কনস্টেবল দরজাটা খুলে ধরতেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালে লেসট্রেড। যে ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল, খুনটা হয়েছে সেইখানেই। তখন কিন্তু কার্পেটের ওপর একটা কুৎসিত এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়া দাগ ছাড়া খুনের আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না ঘরের মধ্যে। কার্পেটটা ছোট্ট আর চৌকোণা, পুরু কাপড়ে আবৃত এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা। চারপাশে ঘিরে ছিল চওড়া কিন্তু ভারী সুন্দর সেকেলে কায়দায় খুব চকচকে পালিশ করা চৌকো ব্লকের কাঠের মেঝে। আগুনের চুল্লীর ওপরে ঝুলছিল বিজিত শত্রুদেশের অতি চমৎকার অস্ত্রের সারি। এই অস্ত্রেরই একটিকে কাজে লাগানো হয়েছে সেই শোচনীয় রাতে। জানলার সামনে একটা বহুমূল্য জমকাল লেখবার টেবিল। ঘরের প্রতিটি তুচ্ছ বস্তু, ছবি, মেঝের আবরণ, দরজা জানলার পর্দা—সবকিছুর মধ্যে একটা সুখাবহ বিলাসপ্রবণ রুচির নিদর্শন।

"প্যারিসের খবরটা দেখেছেন," শুধালো লেসট্রেড।

মাথা নেড়ে সায় দিল হোমস্।

"মনে হচ্ছে, আমাদের ফরাসী বন্ধুরা এ বার আসল জায়গায় হাত দিতে পেরেছে। ওরা যা বলেছে, নিঃসন্দেহে ঘটেছেও তাই। দরজায় টোকা দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। আমার অনুমান, আচমকা এসে চমকে দিয়েছিলেন লুকাসকে। কেননা, জলনিরোধক নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে জীবনধারণ করতেন উনি। দরজা খুলে ভদ্রমহিলাকে ভেতরে আনলেন লুকাস—বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না। কিভাবে লুকাসের ডেরা খুঁজে বার করেছেন, তা বললেন ভদ্রমহিলা। ভর্ৎসনা করলেন। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়লেন অচিরে। আর তারপরেই ছোটখাট ঐ ভোজালীর ঘায়ে যবনিকা পড়ল লুকাসের জীবনে। এত কাণ্ড কিন্তু এক মুহূর্তে হয়নি। কেননা, জানেন তো চেয়ারগুলো গিয়ে জড়ো হয়েছিল দূরে ঐখানে। আর, একটা চেয়ার বাগিয়ে ধরেছিলেন এমনভাবে, যেন ঐ দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলেন উনি।

প্রমাণাদি সবই পেলাম এবং তা এমনই জলের মত পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে আমরা যেন নিজের চোখেই দেখেছি সে দৃশ্য।"

ভুরু তুললে হোমস্।

"আর তবুও কিনা আমায় ডেকে পাঠালে তুমি?"

"আ, হ্যাঁ, সেটা আর একটা বিষয়। নিছক একটা নগণ্য ব্যাপার, কিন্তু এই সবেতেই তো আপনার আগ্রহ জেগে ওঠে। অদ্ভুত নেহাতই খামখেয়াল। মূল ঘটনার সঙ্গে এ প্রসঙ্গের কোন সংযোগ নেই—থাকতে পারে না, অন্ততঃ ওপর ওপর দেখে যা মনে হচ্ছে।"

"জিনিসটা কি শুনি?"

"আপনারা জানেন তো এ ধরনের অপরাধের পর যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা বেজায় সতর্ক হয়ে থাকি। দিনরাত একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মোতায়েন ছিল এখানে। আজ সকালে মিঃ লুকাসকে কবর দেওয়ার পর খতম হ'ল তদন্ত পর্ব—অন্ততঃ এই ঘর সম্পর্কিত তদন্ত। তারপর আমরা ভাবলাম একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যাক জিনিসপত্র। এই কার্পেটটা। দেখছেন তো মেঝের সঙ্গে এটা আঁটা নেই—শুধু পেতে রাখা হয়েছে। কার্পেটটা তোলার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। তুলতে গিয়ে দেখলাম—"

"হ্যাঁ? তুলতে গিয়ে দেখলে—"

উদ্বেগে টানটান হয়ে ওঠে হোমসের মুখ।

"যা দেখলাম তা আপনি একশো বছরেও অনুমান করে উঠতে পারবেন না। কার্পেটের ওপর এই দাগটা দেখছেন তো? বেশ খানিকটা রক্ত ভেতরেও নিশ্চয় শুষে নিয়েছে—নেয়নি কি?"

"নিঃসন্দেহে নিয়েছে।"

"বেশ, বেশ, শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সাদা কাঠের কাজের ওপর এই দাগটার সঙ্গে মিলে যাওয়ার মত অনুরূপ দাগটি কিন্তু নেই।"

"দাগ নেই! কিন্তু তা থাকতেই হবে—"

"ঠিক। আপনিও তাই বলছেন। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে দাগটা নেই।"

কার্পেটের কোণটা তুলে নিয়ে উলটে ফেলে লেসট্রেড দেখাল, বাস্তবিকই সে যা বললে তা সত্যি।

"কিন্তু গালিচার তলার দিকে দাগটা যতখানি, ওপরও ততখানি। কাঠের ওপর নিশ্চয় পড়েছে রক্তের চিহ্ন।"

সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে হতবুদ্ধি বানিয়ে দেওয়ার উল্লাসে মুখ টিপে নিঃশব্দে হেসে উঠল লেসট্রেড।

"এবার আপনাকে দেখাচ্ছি এর ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দাগ একটা আছে, কিন্তু তা প্রথমটার সঙ্গে মিলছে না। নিজেই দেখুন।" বলতে বলতে কার্পেটের আর একটা অংশ উলটে ফেললে ও। আর, সত্যি সত্যিই দেখলাম বেশ খানিকটা টকটকে লাল রঙ গড়িয়ে পড়েছে পুরোনো কায়দার মেঝের চৌকোণা সাদা জমির ওপর। "কি মনে হয় আপনার, মিঃ হোমস্?"

"আরে, এ তো ভারী সোজা। দুটো দাগই ওপর ওপর ছিল, কিন্তু কার্পেটটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে পরে। চৌকোণা কার্পেট, মোটেই বেগ পেতে হয়নি।"

"মিঃ হোমস্, কার্পেটটা যে ঘোরানো হয়েছে, একথা বলার জন্যে আপনাকে সরকারী পুলিশের প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কার্পেটটা এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই মিলে যাচ্ছে দাগ দুটো। একটার ওপরেই এসে পড়ছে আর একটা। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, কার্পেটটা ঘুরিয়েছে কে এবং কেনই বা ঘুরিয়েছে?"

হোমসের শক্ত মুখ দেখে বুঝলাম অবরুদ্ধ আভ্যন্তরিক উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ও।

বললে, "লেসট্রেড। প্যাসেজের ঐ কনস্টেবলটি কি সর্বক্ষণ এখানে পাহারা দিয়েছিল?"

"নিশ্চয়।"

"আমার উপদেশ নাও। খুব সাবধানে পরীক্ষা কর ওকে। আমাদের সামনে কর না। আমরা বরং এখানে অপেক্ষা করছি। পেছনকার ঘরে নিয়ে যাও ওকে। একলা থাকলে অনায়াসেই ওর কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারবে তুমি। ওকে জিজ্ঞেস কর, কোন সাহসে বাইরের লোককে ভেতরে ঢুকিয়ে একলা রেখে

গেছিল সে এ ঘরের মধ্যে। এ কাজ সে করেছিল কিনা, তা জিজ্ঞেস কর না! ধরে নাও সে করেছে। ওকে বল এখানে যে কেউ ছিল তা তুমি জান। চাপ দাও। বল, আগাগোড়া সব স্বীকার করলেই এ যাত্রা ক্ষমা পেতে পারে সে। যা বললাম, অবিকল তাই কর।"

"সর্বনাশ। ও যদি এ খবর জানে তো ওর পেট থেকে এখুনি আমি তা টেনে-হিঁচড়ে বার করে নিচ্ছি!" চীৎকার করে উঠে হলের ভেতরে ছিটকে এগিয়ে যায় লেসট্রেড। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওর গমগমে কণ্ঠের তর্জন-গর্জন শোনা যায় পেছনের ঘরে।

"এবার, ওয়াটসন, এবার!" চীৎকার করে ওঠে হোমস্—বিকারগ্রস্ত ব্যাকুলতা রণরণিয়ে ওঠে ওর স্বরে। নিরুদ্যম, নির্বিকার আচরণের ছদ্মমুখোস পরা মানুষটির সমস্ত দানবিক শক্তি, তেজ যেন নিমেষে ফেটে পড়ে উৎপঞ্জর-উৎসাহ প্রকম্পিত সাময়িক কিন্তু উদ্দাম উদ্দীপনের মধ্যে। একটানে মেঝে থেকে কার্পেটটা তুলে ফেলে পলকের মধ্যে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে-দিতে চৌকোণা কাঠের ব্লকের প্রতিটা জোড় আঁকড়ে আঁকড়ে পরখ করতে লাগল ও। একটা ব্লকের কিনারায় নখ বসে গেল হোমসের এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ঘুরে গেল পাশের দিকে। বাক্সের ডালার মত পেছনের কব্জায় ঘুরে গেল কাঠের ব্লকটা। নীচে বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট অন্ধকারময় গহ্বর। ক্ষিপ্তের মত সাগ্রহে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে হোমস্। পরক্ষণেই রাগে হতাশায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এক তিক্ত গর্জন ছেড়ে হাত টেনে নিলে সে। গহ্বর শূন্য।

"তাড়াতাড়ি, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি! যেমন ছিল, তেমনি রেখে দাও!" কাঠের ডালা ফিরে এল যথাস্থানে। কার্পেটটা সবে সোজা করে রাখা হয়েছে, এমনি সময়ে প্যাসেজে লেসট্রেডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে এসে দেখলে অলসভাবে ম্যান্টেলপিসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হোমস্। যেন চিন্তায় ইস্তফা দিয়ে মূর্তিমান সহিষ্ণুতার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদম্য হাইগুলো চাপবার চেষ্টা করছে সে।

"আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত, মিঃ হোমস্। বেশ দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছেন আপনি। যাক, সব স্বীকার করেছে ও। এদিকে এস, ম্যাকফারসন। তোমার এই অত্যন্ত অক্ষমার্হ আচরণের ইতিবৃত্ত শুনিয়ে দাও এই ভদ্রলোকদের।"

সুট ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিশাল-বপু কনস্টেবলটি। চোখমুখ বেজায় লাল হয়ে উঠেছিল তার। হাবভাব দেখে বেশ অনুতপ্ত মনে হল তাকে।

"কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার ছিল না, স্যার, সত্যিই ছিল না। যুবতী মেয়েটি গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন এ দরজায়—বাড়ী ভুল করেছিলেন—উনি তাই বললেন। আমরা কথাবার্তা কইলাম কিছুক্ষণ। সারাদিন এখানে ডিউটিতে মোতায়েন থাকলে বড় একলা-একলা লাগে।"

"বেশ, তারপর কি হ'ল শুনি?"

"খুনটা কোথায় হয়েছে, তা তিনি দেখতে চাইলেন। বললেন, কাগজে নাকি এ সম্বন্ধে খবর পড়েছেন। দেখলে খুব সম্ভ্রান্তঘরের মেয়ে বলে মনে হয় তাঁকে, অল্প বয়স, কথাবার্তাও চমৎকার বলেন। তাই, স্যার, ভাবলাম ওঁকে একবারটি উঁকি মারতে দিলে এমন কি আর ক্ষতি হবে। কার্পেটের ওপর ঐ চিহ্নটা দেখেই ধপ করে উনি পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। এমনভাবে পড়ে রইলেন যে দেখে মনে হ'ল বুঝি বা মারাই গেলেন। পেছনে দৌড়ে গিয়ে খানিকটা জল নিয়ে এলাম, কিন্তু জ্ঞান ফেরাতে পারলাম না। তখন দৌড়ে গেলাম মোড়ের 'আইভি প্ল্যান্টে' কিছু ব্র্যান্ডি আনতে। ফিরে এসে দেখি, মেয়েটি আর নেই। নিশ্চয় জ্ঞান ফিরে পেয়ে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে আর মুখ দেখাতে সাহস করেন নি।"

"কার্পেটটা নড়ল কেমন করে?"

"স্যার, ফিরে এসে কার্পেটটাকে বাস্তবিকই একটু কুঁচকে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু শুনলেন তো, মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন কার্পেটের ওপর। পালিশকরা মেঝের ওপর পাতা কার্পেটটাকে মেঝের সঙ্গে আটকে রাখারও কোন বন্দোবস্ত নেই, আমিই পরে তা সিধে করে দিই।"

ভারিক্কে চালে লেসট্রেড বললে, "কনস্টেবল ম্যাকফারসন, আজকে এই শিক্ষাই পেলে যে, আমার চোখে ধুলো দিতে তুমি পারবে না। ভেবেছিলে, তোমার কর্তব্যের গাফিলতি কোনদিনই ধরা পড়বে না। কিন্তু কার্পেটটার দিকে এক লহমা তাকিয়েই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে এ ঘরে একজনকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। তোমার কপাল ভাল হে, কিছুই খোয়া যায় নি। তা না হ'লে এতক্ষণে কোয়ার্স স্ট্রীটে চালান হয়ে যেতে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি দুঃখিত, মিঃ হোমস্। ভেবেছিলাম, দ্বিতীয় দাগের সঙ্গে প্রথম দাগের না মিল হওয়ার পয়েন্ট শুনলে নিশ্চয় আগ্রহ বোধ করবেন আপনি।"

"আরে, পয়েন্টটা তো দারুণ ইন্টারেস্টিং বটেই। কনস্টেবল, এই ভদ্রমহিলাটি কি এ ঘরে শুধু একবারই এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, স্যার, মাত্র একবার।"

"কে তিনি?"

"নাম জানি না, স্যার। টাইপরাইটিং সংক্রান্ত একটা বিজ্ঞাপন পড়ে খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলেন। এসে পড়েন ভুল ঠিকানায়। ভারী মিষ্টি, আর ভদ্র মেয়ে, স্যার।"

"ছিপছিপে লম্বা? সুন্দরী?"

"হ্যাঁ, স্যার। পুরুস্ত চেহারার অল্প বয়েসী যুবতী। সুন্দরীও বলতে পারেন। কেউ কেউ হয়ত বলবেন বেজায় সুন্দরী। 'ও, অফিসার, একবারটি আমায় উঁকি মারতে দিন' বললেন মেয়েটি। এমন মধুরভাবে জেদাজেদি করতে লাগলেন যে আমি ভাবলাম, দরজা দিয়ে একবারটি ওঁকে মাথা গলাতে দিলে কোন ক্ষতিই হবে না।"

"কি রকম পোষাক পরেছিলেন তিনি?"

"সাদাসিদে, স্যার—পা পর্যন্ত লম্বা একটা আলখাল্লা।"

"কোন সময়ে?"

"সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছিল তখন। ব্র্যান্ডি নিয়ে ফিরে আসার পর দেখলাম ওরা ল্যাম্পগুলো জ্বালাচ্ছে।"

"বেশ, বেশ", বললে হোমস্। "এস ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় অন্যত্র

এর চাইতেও দরকারী কাজ আমাদের আছে।"

লেসট্রেডকে সামনের ঘরে রেখে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। অনুতপ্ত কনস্টেবলটি এসে দরজা খুলে দিলে। সিঁড়ির ধাপের ওপর ঝোঁ করে ঘুরে গেল হোমস্। হাতের মধ্যে কি একটা জিনিস নিয়ে তুলে ধরলে ম্যাকফারসনের সামনে। নিবিষ্ট চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কনস্টেবল ম্যাকফারসন।

তারপরই চেঁচিয়ে উঠল, "জয় ভগবান, স্যার!" বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার মুখে। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখল হোমস্। হাতের জিনিসটা রেখে দিল বুক পকেটে। তারপর যখন রাস্তায় নেমে এলাম, শুরু হল তার অট্টহাস্য। বললে, "চমৎকার! বন্ধু ওয়াটসন, শেষ দৃশ্যের ড্রপসিন এবার উঠছে। শুনে তুমি আশ্বস্ত হবে যে যুদ্ধ আর হবে না, রাইট অনারেবল্ ট্রেলয়ানি হোপের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও মসীলিপ্ত হবে না, অবিবেচক নৃপতি মহোদয়কেও তাঁর অবিবেচনার কোন শাস্তি পেতে হবে না, প্রধানমন্ত্রীমশায়কে ইউরোপীয় জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, এবং আমরা যদি সামান্য বুদ্ধি খরচ করে সমস্ত ব্যাপারটাকে সুকৌশলে পরিচালনা করতে পারি, তা'হলে কারোরই আর একটা পেনিও লোকসান হবে না—নতুবা জানোই তো কি বিশ্রী দুর্ঘটনা সৃষ্টি হতে পারে।"

এই অসাধারণ পুরুষটির প্রতি প্রশংসার প্লাবনে টলমল করে ওঠে আমার মনের দুকূল।

"সমস্যার সমাধান করেছ তা'হলে!" চেঁচিয়ে উঠি আমি।

"একেবারে নয় ওয়াটসন। এখনও কতকগুলো পয়েন্ট রয়েছে যা আগের মতই তিমিরাবৃত। কিন্তু এত বেশী জেনে ফেলেছি যে, এখন যদি বাকীটুকু না জানতে পারি তো দোষ হবে আমাদের নিজেদেরই। এখন আমরা সিধে যাব হোয়াইটহল টেরেসে। এ ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতির সৃষ্টি হবে সেখানেই।

ইউরোপীয়ান সেক্রেটারীর বাসভবনে পৌঁছে হোমস্ যাঁর খোঁজ করল তিনি লেডী হিল্ডা ট্রেলয়ানি হোপ। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল মর্ণিংরুমে।

"মিঃ হোমস্!" ঘৃণা মিশানো রোষে অরুণ হয়ে ওঠে লেডীর মুখ, "এ কিন্তু আপনার অত্যন্ত অন্যায় এবং অনুদার আচরণ। আমার অভিপ্রায় আপনার সামনেই প্রকাশ করে এসেছি—আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার গোপনে রাখবেন শুধু এই কারণে যে আমার স্বামী যেন মনে না করেন যে আমি তাঁর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। আর তবুও কিনা এখানে এসে আপনি আমায় সবার সন্দেহভাজন করে তুলছেন এবং দেখাচ্ছেন যে, আপনার আমার মধ্যে আছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক।"

"ম্যাডাম, দুর্ভাগ্যক্রমে এ ছাড়া আর কোন সম্ভাব্য বিকল্প পথ আমার ছিল না। নিদারুণ গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটা পুনরুদ্ধারের কাজে বহাল করা হয়েছে আমাকে। সুতরাং, ম্যাডাম, বলতে বাধ্য হলাম, দয়া করে দলিলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিন।"

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন লেডি—নিমেষ মধ্যে উধাও হল তাঁর সুন্দর মুখের সমস্ত রঙ। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর দুই চোখ—এমনভাবে টলমল করে উঠলেন যে আমি ভাবলাম এবার বুঝি জ্ঞান হারাবেন তিনি। তারপরেই প্রবল প্রচেষ্টায় আঘাতের বিপর্যয় থেকে নিজেকে সামলে নিলেন। আতীব্র বিস্ময় আর ঘৃণা মিশানো ক্রোধ মুখের প্রতিটি রেখা থেকে বিতাড়িত করলে আর সব ভাবকে।

"আপনি—আপনি আমায় অপমান করলেন, মিঃ হোমস্।"

"ধীরে, ধীরে, ম্যাডাম, এ সবে কোন লাভ হবে না। চিঠিটা বার করে দিন।"

ঘণ্টার দিকে ছিটকে গেলেন লেডী।

"বাটলার এসে আপনাদের বাইরের পথ দেখিয়ে দেবে।"

"ঘণ্টা বাজাবেন না, লেডী হিল্ডা। যদি বাজান তো একটা কেলেংকারী এড়োনোর জন্যে আমার যাবতীয় আন্তরিক প্রচেষ্টা বিফলে যাবে। চিঠিটা দিয়ে দিন—তা'হলেই সব কিছুই দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আমার হাতে হাত মিলিয়ে চলুন, সব বন্দোবস্ত আমি করে দেব। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে গেলেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে দ্বিধা করব না আমি।"

অপরূপ উদ্ধত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন লেডী হিল্ডা। রাণীর মতই দর্পিত চেহারা তাঁর। নিষ্পলক দুই চোখ দিয়ে হোমস্‌কে গেঁথে ফেলে যেন ওর অন্তরাত্মা শুদ্ধ পড়ে নিলেন উনি। ঘণ্টার দড়িতে হাত রেখেছিলেন বটে, দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজানো থেকে নিবৃত্ত করে নিলেন নিজেকে।

বললেন, "আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন আপনি। এখানে আসা, তারপর ভ্রূ-ভঙ্গি করে একজন স্ত্রীলোককে ভড়কে দেওয়ার চেষ্টা করাটা খুব পুরুষোচিত কাজ নয়, মিঃ হোমস্। আপনি কিছু জানেন বলছেন। কি জানেন আপনি?"

"দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, ম্যাডাম। পড়ে গেলে নিজেই চোট পাবেন। আপনি না বসা পর্যন্ত আমি কথা বলব না। ধন্যবাদ।"

"আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, মিঃ হোমস্।"

"এক মিনিটই যথেষ্ট, লেডী হিল্ডা। আমি জানি আপনি এডুয়ার্ডো লুকাসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এই দলিলটা তাঁকে দিয়েছিলেন, অতি দক্ষতার সঙ্গে গত রাতে সেই ঘরেই আবার গেছিলেন এবং সুকৌশলে চিঠিটাকে বার করে এনেছেন কার্পেটের তলায় লুকোনো জায়গা থেকে।"

ছাই-ছাই মুখে বিস্ফারিত চোখে হোমসের পানে তাকিয়েছিলেন লেডী হিল্ডা। কথা বলার আগে বার দুয়েক ঢোক গিললেন।

তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—"আপনি উন্মাদ, মিঃ হোমস্—আপনি উন্মাদ!"

পকেট থেকে ছোট্ট একটুকরো কার্ডবোর্ড বার করল হোমস্। জিনিসটা ফটোগ্রাফ থেকে কেটে নেওয়া একটি স্ত্রীলোকের মুখের ছবি।

বললে, "ভেবেছিলাম কাজে লাগতে পারে, তাই সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলাম এই ছবিটি। পুলিশম্যান ছবি দেখে চিনতে পেরেছে।"

যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল লেডী হিল্ডার—মাথা এলিয়ে পড়ল চেয়ারের পেছনে।

"স্বীকার করুন লেডী হিল্ডা। চিঠিটা আপনার কাছেই আছে। ব্যাপারটাকে এখনও সামলে নেওয়া যায়। আপনাকে ঝামেলায় জড়ানোর কোন অভিপ্রায় আমার নেই। হারানো চিঠিটা আপনার স্বামীর কাছে পেঁছে

দিলেই শেষ হয় আমার কর্তব্য। আমার উপদেশ নিন—সরলভাবে সব খুলে বলুন আমাকে। এ ছাড়া রেহাই পাওয়ার আর কোন পথ আপনার নেই।"

প্রশংসনীয় তাঁর সাহস। এত কাণ্ডের পরেও হার মানবার পাত্রী তিনি নন।

"আবার আপনাকে বলছি, মিঃ হোমস্, উদ্ভট কতকগুলো কল্পনার জাল বুনে চলেছেন আপনি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস্।

"আপনার জন্যে আমি দুঃখিত, লেডী হিলডা। আমার যথাসাধ্য করলাম আপনার জন্যে। সবই দেখছি বৃথা।"

ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ও। ঘরে ঢুকল বাটলার।

"মিঃ ট্রেলয়ান হোপ বাড়ীতে আছেন?"

"পৌনে একটার সময়ে উনি বাড়ীতে পৌঁছোবেন, স্যার।"

ঘড়ির দিকে তাকাল হোমস্।

বললে, "আরও মিনিট পনেরো। বেশ, আমি অপেক্ষা করব।"

বাটলার বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে না করতেই লেডী হিলডা জানু পেতে বসে পড়লেন হোমসের পায়ের কাছে। দুই হাত সামনে প্রসারিত করে সুন্দর মুখটি তুলে ধরলেন ওপর পানে। দরদর অশ্রুধারে সিক্ত সে মুখ।

"মিঃ হোমস্, আমাকে এ যাত্রা ছেড়ে দিন! আমাকে বাঁচান!" অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতির উদ্দামতায় যেন সাময়িক চিত্তবিকার ঘটে ওঁর।

"ঈশ্বরের দোহাই, ওঁর কাছে একথা বলবেন না! ওঁকে যে আমি বড় ভালবাসি। ওঁর জীবনে এতটুকু ছায়াও আমি ফেলতে চাই না। আমি তো জানি, সে আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ওঁর মহান অন্তর।"

লেডী হিলডাকে ধরে তুললে হোমস্। বললে, "ধন্যবাদ, ম্যাডাম, আপনি যে এই শেষ মুহূর্তেও আপনার বিচারবুদ্ধি ফিরে পেয়েছেন, এজন্যে ধন্যবাদ! আর একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যায় না। চিঠিটা কোথায়?"

তীরবেগে একটা লেখবার টেবিলের কাছে গিয়ে চাবী ঘুরিয়ে ডেস্কটা খুলে ফেললেন লেডী হিলডা। ভেতর থেকে বার করে আনলেন নীল রঙের একটা দীর্ঘ লেফাপা।

"এই যে মিঃ হোমস্। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ভেতরে কি আছে, তা আমি কোনদিনই খুলে দেখিনি!"

"কি করে ফেরৎ দিই খামটা?" বিড় বিড় করতে থাকে হোমস্। "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, যা হয় একটা

মুহূর্ত পরেই লালরঙের একটা চ্যাটালো বাক্স হাতে ফিরে এলেন লেডী হিলডা।

"এর আগে কি করে খুলেছিলেন বাক্সটা? নকল চাবী আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। খুলুন!"

বুকের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা চাবী বার করলেন লেডী হিলডা। ওপর দিকে ছিটকে গিয়ে খুলে গেল বাক্সের ডালা। কাগজপত্রে ঠাসা ভেতরটা।

বার করে আনলেন নীল রঙের একটা দীর্ঘ লেফাপা

উপায় ভেবে বার করতেই হবে আমাদের! ডিসপ্যাচ বাক্সটা কোথায়?"

"এখনও ওঁর শোবার ঘরে।"

"ওঃ, কি সৌভাগ্য! তাড়াতাড়ি, ম্যাডাম, বাক্সটাকে নিয়ে আসুন এখানে।"

নীল লেফাপাটা একরকম ভিতরে ঠেসে দিলে হোমস্। অন্যান্য দলিলের পাতার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখে দিলে বাক্সের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। বন্ধ হয়ে গেল বাক্স, চাবী ঘুরল এবং ফিরে গেল তা শোবার ঘরে।

হোমস্ বললে, "এবার আমরা তৈরী। এখনও দশ মিনিট হাতে আছে। আপনাকে আড়াল করতে গিয়ে অনেক দূর গড়িয়েছি, লেডী হিল্ডা। তার প্রতিদানে আপনি শুধু এই সময়টুকুর মধ্যে বলুন, অকপটে বলুন, এই অসাধারণ ব্যাপারের আসল অর্থটা কী।"

"মিঃ হোমস্, সবই বলব আপনাকে", চীৎকার করে বললেন লেডী। "ওঃ মিঃ হোমস্, ওঁকে একমুহূর্তের জন্যও দুঃখ দেওয়ার আগে যেন আমার ডান হাতটা আমি কেটে ফেলি! সারা লণ্ডনে আপনি এমন একজন মেয়েকে খুঁজে পাবেন না যে তার স্বামীকে আমার মত এতখানি ভালবাসে। আর, তবুও, আমি যা করেছি—যা করতে আমি বাধ্য হয়েছি—তা যদি শুনতে পান তো জীবনে আর আমায় ক্ষমা করে উঠতে পারবেন না উনি! ওঁর মানসম্মান এতই সুমহান, সুউচ্চ যে কোনরকম পদস্খলন ভুলত্রুটিকে উনি বিস্মৃত হ'তে পারেন না বা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন না। আমাকে সাহায্য করুন, মিঃ হোমস্! আমার সুখই তাঁর সুখ, আর, একি মহা-সংকটের মাঝে এসে পড়ল আমাদের দু'জনের জীবন!"

"তাড়াতাড়ি, ম্যাডাম, সময় কমে আসছে!"

"মিঃ হোমস্, সব কিছুর মূলে আছে আমার লেখা একটা চিঠি, বিয়ের আগে অবিবেচকের মত, মহামূর্খের মত লেখা একটা চিঠি, আবেগবিহ্বল, প্রেমান্ধ এক বালিকার লেখা একটা চিঠি। কারও ক্ষতি করার কোন ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জানি, উনি এ চিঠিকে গুরু অপরাধ বলেই গণ্য করতেন। এ চিঠি উনি পড়লে আমার ওপর ওঁর অটুট আস্থা চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যেত। এ চিঠি লেখার পর অনেক বছর কেটে গেছে। ভেবেছিলম, সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে গেছে সবাই। আর, তারপরেই, এই লুকাস লোকটা'র কাছে শুনলাম যে চিঠিটা তার হাতে এসে পৌঁচেছে এবং শীগগিরই আমার স্বামীর সামনে সে তা হাজির করবে। আমি অনুনয় করে দয়াভিক্ষা করলাম ওর। সে বললে, চিঠিটা সে আমায় ফিরিয়ে দিতে পারে একটি সর্তে। আমার স্বামীর ডিসপ্যাচ বাক্স থেকে বিশেষ একটা দলিল এনে দিতে হ'বে তার হাতে। অফিসে ওর কয়েকজন গুপ্তচর আছে। তারাই এসে ওকে দলিলটার অস্তিত্ব জানিয়েছিল। আমাকে আশ্বাস দিলে যে এর ফলে আমার স্বামীর কোন ক্ষতিই হ'বে না। আমার স্থানে নিজেকে কল্পনা করুন, মিঃ হোমস্! এ অবস্থায় কি করা উচিত আমার?"
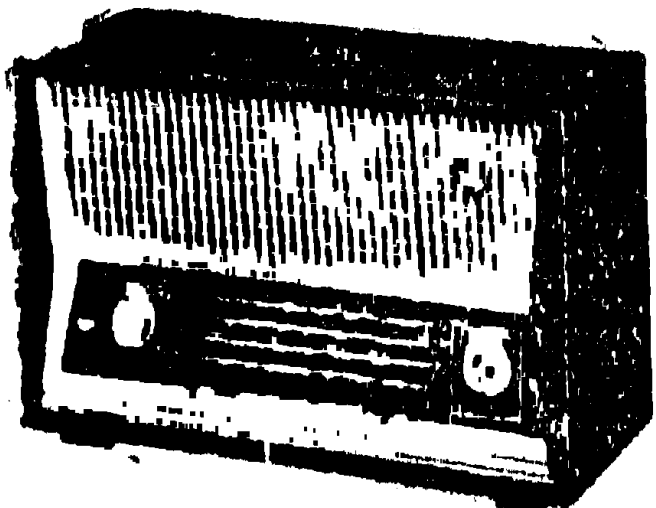
"স্বামীকে বিশ্বাস করে অকপটে সব খুলে বলা।"

"আমি তা পারিনি, মিঃ হোমস্, আমি তা পারিনি! একদিকে নিশ্চিত ধ্বংস। অপরদিকে, স্বামীর কাগজপত্র অপহরণ করা ভয়ংকর কাজ মনে করলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে এর ফলাফল আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। তার চেয়ে বরং স্নেহভালবাসা আর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর পরিণাম কি, তা জলের মত স্বচ্ছ মনে হয়েছিল আমার কাছে। আমি তাই করলাম, মিঃ হোমস্! চাবীটার একটা ছাপ নিলাম আমি। এই লুকাস লোকটা একটা নকল চাবী আনিয়ে দিলে আমায়। ডিসপ্যাচ বাক্স খুলে কাগজটা নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলাম গোডোলফিন স্ট্রীটে।"

"সেখানে কি ঘটল, ম্যাডাম?"

"পূর্ব ব্যবস্থামত দরজায় টোকা দিলাম আমি। দরজা খুলে দিলে লুকাস। ওর পাছু পাছু এসে পৌঁছোলাম তার ঘরে। হল-ঘরের দরজা দু'হাট করে খুলে রেখে এলাম এই কারণে যে লোকটার সঙ্গে একলা থাকতে ভয় ভয় করছিল আমার। ভেতরে ঢোকার সময়ে মনে আছে একজন স্ত্রীলোককে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমাদের কাজ শেষ হ'ল অচিরে। আমার চিঠিটা ও টেবিলের ওপর রেখেছিল। আমি দলিলটা তুলে দিলাম ওর হাতে। চিঠিটা আমাকে দিয়ে দিল ও। ঠিক এই মুহূর্তে, দরজার কাছে কিসের শব্দ শুনলাম। প্যাসেজে সিঁড়ির ধাপ ছিল। লুকাস চট করে কার্পেটটা তুলে ফেলে একটা চোরা গর্তের মধ্যে দলিলটা ঠেসে গুঁজে দিয়ে আবার কার্পেটটা পেতে দিলে সমান করে।

"এরপরে যা ঘটল তা যেন এক-টুকরো ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। পলকের মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখলাম একটা মলিন, উন্মত্ত মুখ। কানে শুনলাম ফরাসী ভাষায় একজন স্ত্রীলোকের চিলের মত তারস্বরে চীৎকার, 'প্রতীক্ষা আমার বিফলে যায়নি। শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি তোমায় ঐ মেয়েটার সাথে!' শুরু হ'ল বর্বরের মত দারুণ ধস্তাধস্তি। লুকাসের হাতে দেখলাম একটা চেয়ার। আর, স্ত্রীলোকটার হাতে ঝলসে উঠল একটা ছোরা। তীরবেগে আমি বেরিয়ে পড়লাম এই ভয়াবহ দৃশ্য ছেড়ে—এক দৌড়ে এসে পড়লাম বাইরে, রাস্তায় পড়েও দৌড় থামালাম না। খণ্ডযুদ্ধের বীভৎস ফলাফল জানতে পারলাম পরের দিন সকালে—কাগজ পড়ে। চিঠিটা ফিরে পেয়ে সে রাতটা কিন্তু বড় সুখে কাটালাম আমি। তখনও অবশ্য বুঝিনি ভবিষ্যতের গর্ভে লুকোনো এর বিষময় পরিণতি।

"পরের দিন সকালে বুঝলাম, এক উৎপাত নিরোধ করতে গিয়ে আর এক উৎপাতের সৃষ্টি করেছি আমি। দলিল খোয়া যাওয়ায় আমার স্বামীর আতীব্র মানসিক যাতনা তীরের মত গিয়ে আমার বুকে বিঁধল। তখনই আর কালবিলম্ব না করে ভাবলাম তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলি আমার কীর্তি। কিন্তু অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। কেননা, তা করার মানেই তো অতীতের অন্যায় স্বীকার করা। সেদিনই সকালে আপনার কাছে গেলাম আমার এই উৎকট অপরাধের পুরো গুরুত্বটা জানতে। যে মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম আমার কাজের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, সেই মুহূর্ত থেকে শুধু একটি চিন্তাই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল আমার মনের কোণে কোণে এবং সে চিন্তা হ'ল যেমন করেই হোক আমার

স্বামীর দলিলটাকে ফিরিয়ে আনা। এমনও হ'তে পারে যে, লুকাস দলিলটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, এখনও তা সেইখানেই আছে। ভয়ংকর ঐ স্ত্রীলোকটা ঘরে ঢোকার আগেই কাগজটা ও লুকিয়ে ফেলেছিল এবং সে না এসে পড়লে আমি বোধহয় জানতেই পারতাম না তার গোপন স্থানের হদিশ! কি করে যাওয়া যায় তার ঘরে? দু'দিন চোখে চোখে রাখলাম জায়গাটাকে। কিন্তু একবারও দরজাটাকে খোলা অবস্থায় দেখলাম না। গত রাতে শেষ চেষ্টা করলাম। কি করেছিলাম এবং কি ভাবে আমি কার্যোদ্ধার করি, তা তো আপনি আগেই জেনেছেন। কাগজটা নিয়ে এলাম বাড়ীতে। অপরাধ স্বীকার না করে স্বামীর কাছে এ দলিল ফিরিয়ে দেওয়ার কোন পথ না পেয়ে ভাবলাম নষ্ট করে ফেলব কাগজটাকে। হে. ভগবান, ও'র পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি সিঁড়ির ওপর!"

উত্তেজিতভাবে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন ইউরোপীয়ান সেক্রেটারী।

"খবর আছে, মিঃ হোমস্, কোন খবর আছে?" চেঁচিয়ে ওঠেন উনি।

"কিছু আশা আছে।"

"আ, জয় ভগবান!" প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। "প্রধানমন্ত্রী মশায় আমার সাথে আজ লাঞ্চ খাবেন। আপনার আশার অংশ কি তিনিও নিতে পারেন? ইস্পাত-কঠিন নার্ভ থাকা সত্ত্বেও আমি জানি, এই ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে ঘুম উড়ে গেছে ও'র চোখের পাতা থেকে। জেকব্স্, প্রধানমন্ত্রী মশায়কে ওপরে আসতে বলবে কি? হিল্ডা ডিয়ার, এটা একটা রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাইনিং রুমে তোমার সংগে আমাদের দেখা হবে 'খন।"

প্রধানমন্ত্রীর অচঞ্চল হাবভাবে সংযমের প্রকাশ দেখলাম। কিন্তু তবুও ও'র চোখের দীপ্তি আর অস্থিসার হাতের মৃদু মৃদু কম্পন থেকে বুঝলাম তরুণ সহকর্মীর উত্তেজনার কবল থেকে তিনিও নিস্তার পাননি।

"শুনলাম, রিপোর্ট দেওয়ার মত খবর এনেছেন, মিঃ হোমস্?"

বন্ধুবর উত্তর দিলে, "এখনও কিন্তু তা পুরোপুরিই না-বাচক। যেখানে যেখানে এ দলিলের হদিশ পাওয়া সম্ভব, সব জায়গায় খোঁজ খবর নিয়েছি আমি। কোনরকম বিপদের আশংকা যে নেই, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কিন্তু তা তো যথেষ্ট নয়, মিঃ হোমস্। এরকম একটা আগ্নেয়গিরির ওপর আমরা তো আর চিরকাল বসে থাকতে পারি না। নিশ্চিত কিছু আমাদের পেতেই হবে।"

"আশা আছে, তা পাবো। সেই কারণেই এখানে আমি এসেছি। এ ব্যাপার নিয়ে আমি যতই ভাবছি, ততই একটা বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে যাচ্ছে আমার মনে। বিশ্বাসটা এই—চিঠিটা কস্মিনকালেও এ বাড়ীর বাইরে যায়নি।"

"মিঃ হোমস্!"

"যদি যেত, তাহলে তা এতক্ষণে জনসাধারণের সামনেই উপস্থাপিত হ'ত।"

"কিন্তু এ বাড়ীর মধ্যেই রেখে দেওয়ার জন্যে চিঠিটা কে-ই বা সরাতে যাবে বলুন? আর, কেনই বা নেবে সে?"

"আমি বিশ্বাস করি না যে চিঠিটা কেউ নিয়েছে।"

"তাহলে ডিসপ্যাচ-বাক্স থেকে উধাও হ'ল কেমন করে শুনি?"

"আমি বিশ্বাস করি না যে চিঠিটা আদৌ ডিসপ্যাচ-বাক্সের বাইরে গেছে।"

"মিঃ হোমস্, বড় অসময়ে এসব রঙ্গ-পরিহাস শুরু করেছেন। আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চিঠিটা বাক্স থেকে উধাও হয়েছে।"

"মঙ্গলবার সকালের পর থেকে বাক্সটা আর পরীক্ষা করেছিলেন?"

"না। তার আর দরকার ছিল না।"

"আমার অনুমান, আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে চিঠিটা।"

"অসম্ভব। আমি বলছি, অসম্ভব!"

"কিন্তু আমি তো পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হ'তে পারছি না, বিশ্বাসও করে উঠতে পারছি না। এরকম ব্যাপার ঘটতে তো এর আগেও আমি দেখেছি। ধরে নিচ্ছি, নিশ্চয় আরও কাগজপত্র ছিল বাক্সের মধ্যে। সেই সবের মধ্যেই মিশে থাকতে পারে দলিলটা।"

"দলিলটা ছিল সবার ওপরে।"

"কেউ হয়ত নেড়েছিল বাক্সটাকে। তাতেই তা স্থানভ্রষ্ট হয়েছে।"

"না, না। আমি সব কিছু বার করে দেখেছিলাম।"

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "হোপ, অনায়াসেই তো সমাধান করা যায় এ সমস্যার। ডিসপ্যাচ-বাক্সটা এখুনে আনাও দিকি।"

ঘণ্টা বাজালেন সেক্রেটারী।

"জেকব্স্, আমার ডিসপ্যাচ-বাক্সটা নামিয়ে আন। সময়ের হাস্যকর অপচয় ছাড়া আর কোন লাভই হবে না। এই করলেই যদি সন্তুষ্ট হ'ন তো, তবে তাই হোক। ধন্যবাদ, জেকব্স্, এখানে রাখ। চাবীটা সবসময়ে আমার ঘড়ির চেনে লাগানো থাকে। এই দেখুন, এই কাগজগুলো। লর্ড মেররো'র চিঠি, স্যার সার্লস হার্ডির রিপোর্ট, বেলগ্রেড থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণী, রাশিয়া-জার্মান ফসল-কর সংক্রান্ত টীকা-টিপ্পনী, মাদ্রিদ-এর চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ার্সের চিরকুট—হে ভগবান! এটা কি? লর্ড বেলিনগার! লর্ড বেলিনগার!"

ও'র হাত থেকে নীল লেফাপাটা ছিনিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী।

"হ্যাঁ, এইটাই—চিঠিটাও আছে। হোপ, আমার অভিনন্দন নাও!"

"ধন্যবাদ! ওঃ, একি গুরুভার পাথর নেমে গেল আমার বুক থেকে! কিন্তু এ যে অকল্পনীয়—অসম্ভব! মিঃ হোমস্, আপনি ভেল্কি জানেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক! কি করে জানলেন আপনি যে এ চিঠি এখানেই রয়েছে?"

"কেননা, আমি জানতাম এ চিঠি আর কোথাও নেই।"

"আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি!" ক্ষিপ্তের মত দরজার কাছে ছুটে গেলেন সেক্রেটারী। "আমার স্ত্রী কোথায়? ওকে বলে আসি, সব ঠিক হয়ে গেছে। হিল্ডা! হিল্ডা!" সিঁড়ির ওপর থেকে ভেসে এল ও'র কণ্ঠস্বর।

চকচকে চোখে মিট মিট করে হোমসের পানে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী।

বললেন, "এবার বলুন তো, মশায়! এ ব্যাপারে চোখের দেখার চেয়ে অদেখা জিনিসই আছে বেশী। চিঠিটা কি করে ফিরে এল বাক্সের মধ্যে?"

আশ্চর্য ঐ দুটি চোখের তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে থেকে মুচকি হেসে সরে গেল হোমস্।

"আমাদেরও তো কিছু কিছু কূটনৈতিক মন্ত্রগুপ্তি আছে," বলে, টুপিটা তুলে নিয়ে ও এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

অনুবাদ : **অদ্রীশ বর্ধন**

আলোচনা

॥ স্বাধীনতা ও সাহিত্য ॥

(এক)

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

এবারের স্বাধীনতা সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জৈমিনি সাহিত্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা সময়োপযোগী ও যথার্থ। তাঁর ক্ষুদ্র পরিসর এই আলোচনায় তিনি যতোটা বলেছেন ততোধিক যেন ইচ্ছাকৃত-ভাবেই অনুক্ত রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ যেন সাহিত্য ক্ষেত্রে চরম দুর্ভিক্ষ চলেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের সমস্যা প্রাক্-স্বাধীন যুগে থেকে জটিলতর হয়েছে। আজ সমাজ-জীবনে দেখছি অনাচার, অবিচার, স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, প্রতারণা, অসাম্য ও ভেদনীতি। স্বাধীনতার পূর্বে এইগুলি থাকলেও মানুষ আশা করেছিল স্বাধীনতালাভের পর এই অকল্যাণ নাগপাশ থেকে তারা মুক্তি পাবে। আশা করেছিল, স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মতোই সাহিত্যিকরা বিড়ম্বিত মানুষকে সত্যের পথ দেখাবেন তাঁদের সৎসাহিত্যের মারফৎ। আজ তা' ব্যর্থ হয়েছে। অনেক সাহিত্যিকই এই পনেরো বছরে সৎসাহিত্য যতোটা উপহার দিয়েছেন ততোধিক সিনেমাধর্মী অবাস্তব কাহিনী কর্ষণে ব্যস্ত রয়েছেন দেখছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎপাঠকের সংখ্যাও যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ছে। এক সমালোচক ছদ্মনামধারী যে লেখকের উপন্যাসকে যাচ্ছেতাই বলে নিন্দা করলেন, সেই লেখকই তাঁর নাতনীর প্রণয়ী। বিষয়টা জেনে ভদ্রলোক ব্যথিত হোলেন। বল্লেন তিনি জানলে বইটির উচ্চ প্রশংসা করতেন। কিন্তু লেখক বল্লেন—খারাপ বলে সমালোচিত হওয়ায় তাঁর উপন্যাসের কদর বেড়েছে। সমালোচনায় বলা হয়েছে—রুচিহীন, সমাজবিরোধী, পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে পড়ার অযোগ্য। তাই পরিবারের প্রত্যেকে একখানা কিনে গোপনে পড়ছে (অনেকটা 'A' মার্কা সিনেমায় গোপনে অনধিকারীদের ভিড় করার মতো)। এই ধরণের সংখ্যাধিক পাঠক ও লেখক-এর বিকৃত রুচিসমন্বয় রুচিশীলদের হতাশ করেছে। আর একদল হেঁয়ালীভরা প্যানপেনানি সংলাপকার অবাস্তব রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মাঠে ময়দানে, রাস্তায় ঘাটে, আপিসে সমস্ত সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে তুলছেন। এজন্য একটা কথাই বলতে ইচ্ছা করে—সাহিত্যই দেশের অসংগতিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়; আজ যেন তার উল্টোটাই করার দিন এসেছে। কিন্তু ঘন্টা বাঁধবে কে? কারণ যশের শিখরে সেই বিকৃত সাহিত্যই ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে সৎসাহিত্য উপোসী হয়ে আছে। তবু বলি, যুগে যুগে যে আদর্শপথ সাহিত্যিকরা দেখিয়েছেন সেই পথের কঠিন অনুসরণ ছাড়া রসপিপাসু বাঙালী পাঠকসমাজ তৃপ্ত হবে না। সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয় থেকে সাহিত্য কি তাকে মুক্তির পথ দেখাবে না? সত্য একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই, এবং মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ—এই অবস্থায় বুক বেঁধে সুদিনের অপেক্ষায় আছি। নমস্কারান্তে ইতি—

বিশ্বম্ভর দাস,
শ্রীধর রায় রোড, তিলজলা,
কলিকাতা-৩৯।

> 'অমৃতের' স্বাধীনতা সংখ্যায় শ্রীজৈমিনি পূর্বপক্ষে 'স্বাধীনতা ও সাহিত্য' প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে পাঠকদের পক্ষ থেকে কয়েকটি চিঠি আমরা পেয়েছি। বিষয়টি জটিল হওয়াতে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা চালাবার পক্ষপাতী। পাঠকদের পক্ষ থেকে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পাঠালে আমরা যথাযথভাবে ছাপবার চেষ্টা করব।
>
> সম্পাদক : অমৃত

(দুই)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের 'অমৃত-স্বাধীনতা সংখ্যার' পূর্বপক্ষ বিভাগে শ্রীজৈমিনির 'স্বাধীনতা ও সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনাটি সাহিত্যের প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর সাম্প্রতিক যুগের বাংলা সাহিত্যের সত্যিই এ-আলোচনা একটি সুন্দর বিশ্লেষণ।

এ বিশ্লেষণে শ্রীজৈমিনি লিখেছেন : 'আমার মনে হয়, স্বাধীনতা ব্যাপারটা যে কী জিনিষ তাই আমরা হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারি নি। বিপত্তি ঘটেছে সেইখানে।' আমার মনে হয় 'হৃদয়ঙ্গম' আমরা হয়তো করেছি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তার প্রকাশ আজও তেমনটি কই! আর তার প্রকাশ যদিও বা দেখা যায়, তবু বঙ্কিমচন্দ্রের "লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারা অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি" করার সুপ্রয়াস যেন আজও প্রায় অনুপস্থিত।

একথা বললে এতটুকু অত্যুক্তি করা হবে না যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য যেন প্রজ্ঞা (erudition) ও অনভিপ্রেত উপদেশ (edification)-এর নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার কথা বলা যায়। এলিয়ট বলেছেন, 'We distrust verse in which the author is deliberately aiming to instruct or to persuade.' (T. S. Eliot—"On Poetry and Poets" Faber. P. 184) সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গেও এই ধরণের সন্দেহবাদ জেগেছে জনমানসে। অথচ প্রাক-স্বাধীনতার যুগে এরূপ সন্দেহের সম্মুখীন হতে হয়নি বাংলা কবিতাকে। সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণের জন্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শে সাহিত্যসৃষ্টিতে যেদিন আমরা অনুপ্রাণিত হবো, সেদিন আমরা স্বাধীনতার সামগ্রিক মূল্যায়নেও সক্ষম হবো।

বলা বাহুল্য, স্বাধীনোত্তর যুগের কয়েকজন তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যিক সে পথে অগ্রসর হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু জনমতের ও জনজীবনের স্রোতে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা এতটুকু অসম্ভব নয়। শ্রীজৈমিনি তাঁর 'স্বাধীনতা ও সাহিত্যের আনুসঙ্গিক হিসেবে স্বাধীনোত্তর বাংলা সাহিত্য ও জনমত বিষয়ে ভবিষ্যতে পূর্বপক্ষ বিভাগে আলোচনা করলে সুখী হবো।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী,
নরেন্দ্রপুর,
২৪-পরগণা।

তোমাকে নিয়ে যে গল্প লিখতে হবে, এ-দুরাশা কোনদিনই ছিল না আমার। তবু কেন যে সেই দুরাশাটাই বার বার মাথানাড়া দিয়ে উঠল তাই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি আজ। অথবা এ-ই বুঝি জীবনের ধর্ম। সময়ের পরিবর্তনে হৃদয়ের স্পর্শকাতর অনুভূতিগুলিও বিস্মৃতির পলিমাটিতে ভরে যায়। আর যায় বলেই বন্ধ্যা মাটির বুকেও একদিন নতুন ফসলের সম্ভাবনা জেগে ওঠে।

সময়-ও কি নদী?

তাই যদি না হবে, তাহলে তুমি আজ আমার গল্পের খোরাক হলে কেমন? কোনদিন তো তোমাকে ঠিক এমনভাবে দেখিনি। দেখা তো দূরের কথা, চিন্তাও করতে পারিনি কোনদিন। তোমার কাছ থেকে শেষবিদায় নেওয়ার দিনে

অহল্যা

সুনীলকুমার ঘোষ

ব্রহ্মপুত্রের অশ্রান্ত জলকল্লোলের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যের শেষ দীপ্তিকে সাক্ষী রেখে একদিন যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে আজ রক্ষা করতে পারলাম না বলে ক্ষমা ক'রো আমাকে। তখন ভাবিনি যে প্রতিজ্ঞা করলেই সব সময়ে তাকে রক্ষা করে চলার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। চলাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত লাভাকে এ-পৃথিবী যদি পথ করে না দিত, তাহলে কী হ'ত বল ত?

এ-তো গেল যুক্তির কথা। এ-ছাড়াও একটা কৈফিয়ত থেকে যায় আমার দিক থেকে। সেটি হ'ল মুক্তির কথা। আমি কি তখন জানতাম, সেই পাঁচ বছর আগে যে ধিক্কার আর ক্লীবত্বের পসরা মাথায় নিয়ে ফিরে এসেছিলাম, সেই জ্বালা আমার সমস্ত জীবন একটানা ছিছি-তে ভরিয়ে দেবে? অপরের কাছে যুৎসই সাফাই গাওয়াটা এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয়; কিন্তু যেখানে কোন রকম কারসাজি চলে না, সে-ই নিজের কাছে আমার জবাবটা কী?

তোমাকে কোনদিনই আমার মনের কথা খুলে বলতে পারিনি। তুমিও তো পারনি। কিছু কুয়াশার আস্তরণ আমাদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রেছিল। কিছু গন্ধ, কিছু স্পর্শ, ইঙ্গিত আর ধ্বনিই ছিল আমাদের মন দেওয়া-নেওয়ার শ্বেত পারাবত। আজ এই দীর্ঘ ব্যবধানের ভাস্বরতায় সেই কুয়াশা কেটেছে, সেই স্পর্শে অনুভূতির আবেগ শুনতে পেয়েছি। সেই আবেদন মুখর হয়ে বার বার আমার কাছে অভিযোগ করছে: তুমি কিছু বল, তুমি কিছু বল। বিস্মৃতির ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় যে-মেয়েটি অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে কিছু অন্তত বল। হোক মিথ্যা, তবু চুপ করে থেক না।

আমার আত্মচেতনার সিংহদ্বারে এতদিন যারা আত্মম্ভরিতার সঙগীন উঁচিয়ে হাবসী সেনার ভয়াল মূর্তিতে পাহারা দিচ্ছিল, তারা কখন পরম নির্ভয়ে ঘুমোতে শুরু করেছিল, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার সুরক্ষিত দুর্গ আজ অরক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে। সচকিত হয়ে দেখলাম, আমার অচলায়তনের গবাক্ষ আজ উন্মুক্ত। এবং তারই ভিতর দিয়ে পাঁচশ মাইল দূরের একটি কুটিল রাত্রি তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে আমার ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছে, আর পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাস আমার ক্লীবত্বকে ধিক্কার দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে-ফেটে পড়ছে।

নিশ্চয়ই কিছু বলতে হবে আজ। এবং এ-ও জানি, সত্যের অপলাপ করা চলবে না এতটুকু।

যেদিন হোটেল প্যালেতে হঠাৎ কুমারসাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেদিন আমি সত্যাই বিস্মিত হয়েছিলাম। অরণ্যের অন্ধকার কাটিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে ছোট হোটেলটি। সামনে দিয়ে ঢালাও সোজা পিচের রাস্তা চা-বাগান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারই দুপাশে গভীর অরণ্যের মাতামাতি। চা-বাগানের পথে যাওয়া-আসার সময় সাহেবরা প্যালেতে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, দু'চার পেগ শ্যাম্পেন-হুইস্কি ওড়ায়, বিলিয়ার্ড খেলে, স্টেকে তাস পেটায়। প্রয়োজন হলে দু'চারদিন আত্মগোপন করে থাকারও বিশেষ অসুবিধা ছিল না সেখানে।

তবু ঠিক ঐ সময়ে, আর ঐ স্থানটিতে কুমারসাহেবকে আশা করিনি আমি। জায়গাটি পাহাড়ী, এবং সময়টি শীতের। সুতরাং বায়ু-পরিবর্তনের স্থান ও-টি নয়। কুমারসাহেবের যে আর্থিক আর সৌখীন মানসিক অবস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাতে ঠিক ঐ রকম একটি বুনো জায়গায় তাঁর আবির্ভাব কেবল যে অস্বাভাবিক তাই নয়, যথেষ্ট বেমানানও বটে।

তা ছাড়াও একটা কথা রয়েছে। আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম, সেই সময়েই তিনি মিলিটারিতে কমিশন নিয়ে ফিলিপাইনসের দিকে চলে যান। তারপর প্রাচ্যে অনেক ঘটনার সঙ্গে দুর্ঘটনাও ঘটেছে যথেষ্ট। অনেক স্মৃতি ভারত আর প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবেছে:

পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক নূতন দাগ দেখা দিয়েছে, কত পুরনো নাম যে ভুলে গিয়েছি তার আর শেষ নেই। দীর্ঘ অদর্শনের বিস্মৃতি-গহ্বরে যাদের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কুমারসাহেব অবিসংবাদিতভাবে তাদেরই একজন। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মিত্রশক্তি যাদের নিখোঁজের মধ্যে ফেলেছিলেন তাদের মধ্যে কুমারসাহেবকে স্পষ্ট দেখেছিলাম আমরা।

যাঁর সম্বন্ধে পনেরটি বছর কোন আশা রাখতে পারিনি, হঠাৎ এতদিন পরে আসামের ঐ পার্বত্য অঞ্চলের একটি অতি গোপন হোটেলে তাঁকে বসে হুইস্কি খেতে দেখে তাই সেদিন অতটা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটার পরেই কিন্তু ভেবেছিলাম, ও জিনিসটি কুমারসাহেবের পক্ষেই সম্ভব। ওঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন জমিদার। বাবা ছিলেন ব্যবসাদার। কিন্তু পূর্বপুরুষের অর্জিত আভিজাত্য, আর পিতৃদেব-প্রচারিত ইংরাজ মহিমাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি খদ্দর চাপিয়ে মহাত্মার ভক্ত সেজে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। আর সেই মুহূর্তে আমরা কুমারসাহেবের ছত্রতলে কিশোর বাহিনী গড়ে তুলে ইংরাজদের সাগরপারে খেদিয়ে দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই সময়ে একদিন অকস্মাৎ শুনতে পেলাম তিনি কমিশন নিয়ে ভারত মহাসাগর থেকে জাপানীদের হটিয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রিন্স-অফ-ওয়েলসের ডেকে উঠেছেন। যে সমাজ পরস্পর-বিরোধী জটিলতার পীঠস্থান সেই সমাজে কুমারসাহেব আর একটি জটিলতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বসলেন।

প্রথমে চিনতে পারিনি আমি। রূপান্তর নামে বাংলা অভিধানে যে একটি শব্দ রয়েছে সেটির এমন সার্থক প্রকাশ বোধ হয় আর কোথাও নজরে পড়েনি। যৌবনের সেই প্রথম যুগটিতে তিনি ছিলেন একজন সত্যকারের সুন্দর পুরুষ। লম্বায় প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি, ঋজু গৌরবর্ণ তনু, পরিমিত ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট, টিকালো নাক, প্রশস্ত কপাল, জোড়া ভ্রূ, সরু প্রজাপতি ঢং-এর গোঁফ, মুক্তোর মত চকচকে কচি-কচি দাঁত। আমাদের কিশোর কল্পনায় তিনি তো একজন রীতিমত রোমাণ্টিক হিরো।

কিন্তু সেদিন যাকে দেখলাম? রোমান্সের নাম-গন্ধ সেখানে নেই। বরং একটি অকৃত্রিম আরণ্য ভাব তার শিরায় শিরায়। কাঁচায়-পাকায় এক মুখ দাড়ি, গায়ের ওপর ভেড়ার চামড়ার মোটা কোট। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ কুটিল। অথচ সমস্ত জড়িয়ে কিছুটা ক্লান্তির অবসাদ।

একই টেবিলে মুখোমুখী বসেছিলাম আমরা। প্রথমে কেউ কারও দিকে নজর দিইনি। তারপর হঠাৎ কখন দুজনেই মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম দুজনেই দুজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হতভম্ব হয়ে বসে রয়েছি।

কুমারসাহেব নয়?

আগন্তুকের মুখেও ভাবান্তর দেখা গেল। প্রথমে কৌতূহল, পরে বিস্ময়। সেই বিস্ময় কেটে গিয়ে দ্বিধা আর স্পন্দন।

অ-নি-ল?

হেসে বললাম : অবিকল।

কুমারসাহেব চারপাশে একবার চেয়ে ফিস-ফিস করার ভঙ্গিতে বললেন : চুপ। ও-নামটা অনেক দিন পিছনে ফেলে এসেছি। আমি এখন ডি মেলো। আমার বাবা পর্তুগীজ আলবুকর্ক। মা আরাকানীজ।

আর একবার চেয়ে দেখলাম কুমারসাহেবের দিকে। পর্তুগীজ জলদস্যুই বটে।

হেসে বললাম : আমিও ডকটর মুখার্জি।

ডাক্তার বুঝি? তা এখানে কী করছ?

চা-বাগানে চাকরি করি।

কুমারসাহেব চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কিছুটা আত্মগত হয়েই যেন বললেন : ভালই হ'ল। আমি একজন ডাক্তারেরই খোঁজ করছিলাম। তুমি কি খুব ব্যস্ত এখন?

না।

তাহলে চল না আমার সঙ্গে।

কোথায়?

বেড়াতে।

শ্যাম্পেন শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। তারপর বনের মধ্যে কাঠুরিয়ারা যে পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করে সেই পথ ধরে দুজনে এগিয়ে চললাম। দুটি বছর ঐ অঞ্চলে কেটেছে আমার। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়েই ঘুরে বেড়িয়েছি এতদিন। কিন্তু যে পথ দিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা এগিয়ে চলেছিলাম অরণ্যের সে-অংশটি আমার কাছে তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই ছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অরণ্য ঘন থেকে ঘনায়িত হচ্ছে, পাহাড়ের উপলে-উপলে পথ দুর্গম হচ্ছে; জায়গায়-জায়গায় অন্ধকার পাথরের মত জমাট বেঁধে গিয়েছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা কনকনে শীত। অস্বস্তিতে ভরে উঠল আমার শরীর। মনে হ'ল, যেন এক অদৃশ্য নিয়তি আমার হাত ধরে একটি অজানা কুটিল অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে।

অনেকক্ষণ অভিভূতের মত চলার পর কুমারসাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন; বললেন : এই আমার ডেরা।

প্রথমটায় লক্ষ্য পড়েনি; কারণ পথের দিশা তখন হারিয়ে ফেলেছি; মনের দুর্গম অরণ্যে তখন অনুভূতির শিশুগুলি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কুমারসাহেবের স্বরে চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখলাম, একটি প্রাসাদই বটে।

দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ভিতর থেকে একটি সচল আলোর রেখা চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কপাট খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একটি পাহাড়ী মেয়ে।

কুমারসাহেব কোন কথা না বলে আমাকে সঙ্গে করে একটি ঘরে নিয়ে এলেন; বললেন, বস, ভয় নেই। আসছি এখনই।

আলো একটি নিশ্চয়ই ছিল সেখানে। না থাকলে সমস্ত দেখলাম কেমন করে? কিন্তু কী দেখলাম? জায়গাটির চারপাশে দেওয়াল; মাথার ওপরেও ছাদ রয়েছে
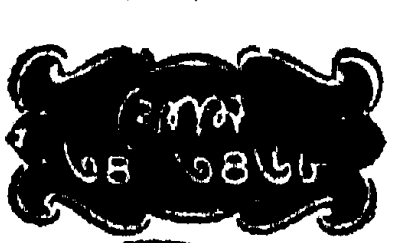
একটি। দেওয়ালগুলির কোনটিই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। বার্ধক্যে জীর্ণ। চারপাশে অজস্র ক্র্যাক। সেই ক্র্যাকের ফাঁকে-ফোকরে অসংখ্য লতাগুল্ম মনের আনন্দে বেড়ে উঠেছে। সেই স্তিমিত আলোতে পর্যবেক্ষণ করার মত শক্তি আমার ছিল না। তবু ওপর দিকে চেয়ে দেখলুম, ছাদের একাংশ ঝরে পড়েছে। আর তারই ভিতর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে নীল আকাশের একটি অংশ অসীম বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটি বিশ্রী সোঁদা গন্ধে নাক ভরে উঠল। জোরে নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল বোধ হয়। মনে হচ্ছিল, ওঘরের ভিতরে অনেক অপমৃত্যু ঘটেছে আর তাদেরই প্রেতাত্মা দেওয়ালে-দেওয়ালে কবরস্থ হয়েছে। সেই সব মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

কুমারসাহেবের পিছু-পিছু পাহাড়ী মেয়েটি হাজির হল। তার হাতে কিছু খাবার। টেবিলের ওপর রেখে সে চলে গেল।

কুমারসাহেব দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এখানে শ্যাম্পেন নেই। এই চালাও।

র-হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : অস্বস্তি লাগছে?

অস্বস্তির চেয়ে বরং উদ্বেগ বললেই ভাল হ'ত। কিছুটা কৌতূহলও যে ছিল না তা নয়। তবু সেদিন বলতে হয়েছিল : না; তেমন কিছু নয়।

হুইস্কির গুণে, না, কুমারসাহেবের সান্নিধ্যের জন্য, ঠিক মনে নেই আজ; তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাজমেজে ভাবটা কেটেছিল আমার। পুরানো দিনের অর্ধ-বিস্মৃত কাহিনী নিয়ে গল্পও জমেছিল কিছুটা। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটলো। মনে হল, কোথা থেকে যেন একটি কাতর গোঙানি সেই অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারে ধীরে ধীরে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি চিনচিনে যন্ত্রণার সৃষ্টি হলে যেমন সমস্ত শরীরটাকে অবসন্ন করে ফেলে, এও যেন অনেকটা সেই রকম। রাত্রির সীমাহীন নির্জনতা, আর প্রাচীন প্রাসাদের স্থবিরতা আমার চেতনার ওপর হয়ত কোন দুঃস্বপ্নের সঞ্চার করেছিল। মাঝে-মাঝে তাই বুঝি আমি চমকে উঠছিলাম।

অথচ কিছু জিজ্ঞাসা করতেও বড় সঙ্কোচ লাগছিল। আমি জানি, রাত্রির অরণ্য শব্দময়। তার নিজস্ব একটি শব্দ রয়েছে, আবেদন রয়েছে। তাকে বুঝতে পার, ভালই। না পার, চুপ করে বসে থাক। প্রশ্ন করে, উত্যক্ত করো না তাকে।

কুমারসাহেব সহজভাবে বললেন : আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার।

কী হয়েছে?

ঠিক জানি নে। তবে মাঝে-মাঝে ওর ভিতর থেকে এই রকম গোঙানি শুনতে পাওয়া যায়। সমস্ত রাত ধরেই চলে; ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও আবার নিজের জগতে ফিরে আসে। চল না, একটু দেখবে।

কুমারসাহেবের পিছু-পিছু দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকলাম। একখানি খাট; একখানি ছোট টেবিল। এ-ছাড়া তৃতীয় কোন আসবাব নেই। টেবিলের ওপর একটি আলো। সেই আলোতেই দেখলাম, খাটের ওপর একটি মহিলা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছেন। মহিলার দেহের ওপর একটি নীল চাদর বিছানো। মুখটি কেবল খোলা।

চমকে উঠলাম। এমন করুণ মূর্তি জীবনে বোধ হয় আর কোনদিন দেখিনি আমি। মনে হ'ল, এ কিছুতেই জীবন্ত মানুষ হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ভাস্করের নিপুণ হাতে গড়া শ্বেত-প্রস্তরের কারুকার্য।

ডাক্তারের দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। তোমার চেতনা ফিরে আসেনি। তোমার অন্তরের নিভৃত তল থেকে একটা অস্ফুট গোঙানি কেঁপে-কেঁপে অসহায় কান্নার মত মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসছিল কেবল।

কত দিন এমন হয়েছে?

বছর খানেক হবে।

কোন চিকিৎসা হয়নি?

না।

আমি একটু চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলাম : চিকিৎসা করাবেন না?

কুমারসাহেব অবাক হয়ে বললেন : তা না হলে তোমাকে নিয়ে এলাম কেন?

বললাম : ওষুধপত্র কাছে নেই আমার।

কুমারসাহেব বললেন : তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। তোমার সময়মত চিকিৎসা করলেই খুশী হ'ব।

ফেরার পথে আমাকে বললেন : তুমি যদি মাঝে-মাঝে আস তো ভালই হয়। আমি তো থাকতে পারি নে।

কেন?

অভ্যাস নেই, ডাক্তার। তাছাড়া, অন্য কাজও রয়েছে। তাদের অবহেলা করতে পারি নে।

হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে বিয়ে করলেন কেন?

সেদিন সোজাসুজি কোন উত্তর দিতে পারেননি কুমারসাহেব। প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন : আমার অনুপস্থিতিটা তোমাদের মেলামেশায় যেন বাধার সৃষ্টি না করে, ডাক্তার।

তারপরেই একেবারে পনের দিনের ব্যবধান। কয়েকটি জরুরী কাজে দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। কিন্তু সে-টা খুব বড় কথা ছিল না আমার কাছে। আজ আর বঞ্চনা করে লাভ নেই, সেদিনকার সবচেয়ে বড় কথাটা ছিল তোমার আকর্ষণ। মাত্র কয়েকটি কথা, আর কয়েক মিনিটের জন্যে অর্ধ-অচেতন তোমার সান্নিধ্য। এ দুটি তুচ্ছ ঘটনাই যে আমার কাছে একটা তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেবে তা কি আগে ভেবেছিলাম কোন দিন?

কুমারসাহেব, তুমি আর তোমাদের ঘিরে ঐ বর্বর অরণ্য। তিনটির কোনটি-কেই পৃথক করে দেখতে পারিনি আমি। তিনটিই মিলেমিশে আমার চোখে একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিনই তোমার সেই স্তিমিত চোখের পাণ্ডুরতা আমাকে আমার সহস্র কাজের মধ্যে ডাক দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এগিয়ে যেতে পারিনি। পা বাড়িয়েও অনেক বার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছি। যতবারই পা বাড়াবার চেষ্টা করেছি ততবারই আমার আত্ম-

সংযমিতা সাবধান করে বলেছে : কুমারসাহেব নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন সত্য; কিন্তু তাই বলে সে-নিমন্ত্রণ রাখার বাধ্যবাধকতা যে নেই, তা তুমিও যেমন জান কুমারসাহেবও তেমনি জানেন।

হয়ত সত্য। কিন্তু তুমি? তোমার ডাককে অবহেলা করি কেমন করে? আর অবহেলা করতে পারিনি বলেই সেদিন অপরাহ্নের শেষবেলাতে বেরিয়ে পড়লাম তোমাকে দেখতে নয়, তোমাকে আবিষ্কার করতে।

ভাগ্যের পরিহাসও বলতে পার। তোমাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে নিজেই কখন হারিয়ে গেলাম সেই দুর্গম অরণ্যে। একদিন রাত্রির অন্ধকারেও যে-অরণ্যে পথ হারাইনি, সেদিন অপরাহ্ণ বেলাতেই সেই পথ হারিয়ে ফেললাম আমি। অনেক ঝোপ-ঝাড়-খানা-খোঁদল-উপত্যকা পেরিয়ে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল, দিনান্তের শেষসূর্য ডুবে গিয়েছে। সমস্ত অরণ্য আচ্ছন্ন করে পঙ্গপালের মত অন্ধকার-শিশুরা চারপাশে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। নিথর, নিস্তব্ধ বনভূমি। কিসের প্রতীক্ষায় যেন উদগ্রীব হয়ে বসে রয়েছে। হঠাৎ ভয় পেলাম। মনে হ'ল, আমাকে কেন্দ্র করে এখনই হয়ত কোন নাটকের অভিনয় শুরু হবে; আর তারই জন্যে প্রস্তুতি চলেছে দিকে দিকে।

সেদিন সন্ধ্যায় কেমন করে যে তোমাদের ডেরায় গিয়ে পৌঁছলাম সেকথা আজ আর মনে নেই আমার। তবে এটুকু মনে রয়েছে যে, সেদিনকার সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তোমার ডেরার মশালের আলো দেখতে না পেলে কী হ'ত বলা যায় না। সেই প্রচণ্ড শীতেও আমার শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরেছিল। চেঁচাতে গিয়ে নিজের স্বর শুনে নিজেই আঁৎকে উঠেছিলাম। সে-স্বর তো স্বর নয়; শুষ্ককণ্ঠের বিকৃত আর্তনাদ মাত্র।

কু-মা-র-সা-হে-ব, কু........

একবার, দু'বার, তিনবার। উত্তর নেই কোন।

দরজায় ধাক্কা দিলাম; একবার নয়, বার বার।

ডি মেলো, মিস্টার ডি.........

দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখলাম, সেদিনের সেই পাহাড়ী মেয়েটি।

মেয়েটিকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভিতরে ঢুকে এলাম। বাধা দেয়নি মেয়েটি। তার হাব-ভাবেও কেমন আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছু দেখলাম না।

মেয়েটির ঘাড় নড়ে উঠল। অর্থাৎ নেই।

পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা আমার। একটু দাঁড়িয়ে বললাম : এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?

মেয়েটি আমাকে সঙ্গে করে সেই পুরানো বসার ঘরটিতে নিয়ে গেল। জল ঢেলে দিলে। এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললাম জলটা। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম সেই বিকৃত দেওয়ালগুলির দিকে। তারা যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেছে। কুটিল দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসছে। কতদিনকার কত ভ্রূকুটি যেন ওদের পাঁজরায় পাঁজরায় রুদ্ধ হয়ে বসে ছিল। সেদিন তারাই যেন সুযোগ পেয়ে আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরল। ভয় পেলাম; ভাবলাম দৌড়ে পালিয়ে আসি। সেই রুদ্ধ কবরের প্রেত-দৃষ্টির বাইরে অরণ্যের মৃত্যু-কুহকও বুঝি অনেক কম ভয়ঙ্কর।

মিঃ ডি মেলো বাইরে গিয়েছেন।

আচ্ছন্ন ছিলাম বলেই বোধ হয় তোমার পদধ্বনি কানে আসেনি। আমি কেবল মুখ তুলে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। মনে হ'ল, এত যুগ ধরে যে ভাষা নীরব হয়ে ঐ জীর্ণ দেওয়ালের শ্যাওলা-ঢাকা কফিনের তলায় লুকিয়ে ছিল, আজ সেই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্বেত-মর্মরের মত স্বচ্ছ তোমার চোখের দুটি তারা। ঐ চোখ দুটি দিয়ে সেদিন কি অতলজলেরই ডাক দিয়েছিলে তুমি?

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল। তোমার উত্তাপহীন, অকর্কশ, মৃদু কথার সুরে নিজের মধ্যেই ফিরে এলাম এক সময়। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, আটটা বাজে।

উঠে পড়লাম : তা হলে আজ আর বিরক্ত করে লাভ নেই।

এত রাত্রে এখান থেকে একা যেতে পারবেন না আপনি। সঙ্গে দেওয়ার মত লোকও নেই। আজ রাতটা এখানে কাটাতেই হবে আপনাকে।

কথার মধ্যে তোমার না ছিল আবেগ, আর না ছিল আসক্তি। যে-কোন মানুষ এই নিমন্ত্রণকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারত। নীতি অথবা শালীনতার দিক থেকে কিছুমাত্র অপরাধী হতে হ'ত না তাকে। আমি কিন্তু পারলাম না। সে কি কেবল বাইরের সেই নিস্তব্ধ অরণ্যানীর মায়াবী অনিশ্চয়তার ভয়ে? না, আর কিছু ছিল তার পিছনে?

মিঃ ডি মেলো আমাকে আসতে বলেছিলেন তাই......

তবুও একটা কৈফিয়ত, আত্মপক্ষ সমর্থনের অকারণ চেষ্টা। যদিও জানি, ও-কৈফিয়তটি অপ্রাসঙ্গিক এবং জলো।

তুমি বোধ হয় আমার অস্বস্তিটুকু লক্ষ্য করেছিলে; তাই বললে : মিঃ ডি মেলো আপনার সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন। এবং আপনি যে পথ ভুল করতে পারেন সে-সন্দেহও আমাদের ছিল। তাই সন্ধ্যার পরেই দরজার বাইরে মশাল জেলে রাখতাম। এত রাত্রে আপনি যদি একা ফিরে যান, তাহলে কিন্তু আমি নিজেই লজ্জায় মরে যাব।

তুমি বড় ভীরু ছিলে মা-থীন। আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে সময় নিয়েছিলে তুমি। দীর্ঘ দিনের আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যে হঠাৎ কখন কুয়াশা কেটে আলোর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'ল তা আমি বুঝতে পারিনি। অরণ্য যেমন তার গোপন রহস্য লোকচক্ষুরে অন্তরালে লুকিয়ে রাখে, তুমি কি তেমনি তোমার হৃদয়ের গোপন বারতাটুকু আমার কাছ থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলে?

তুমিও কি অরণ্য ছাড়া আর কিছু ছিলে না?

আমি ডাক্তার। তোমাকে নীরোগ করার ভারই ছিল আমার ওপর। কিন্তু কখন আর কেমন করে যে প্রত্নতাত্ত্বিক মনটা আমার সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দিল তা কি ছাই আমিই বুঝতে পেরেছি? হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, তোমাদের বাড়ীটার মতই তুমিও একটি পুরাতত্ত্বের খনি। তোমাকে অস্বীকার করবো কেমন করে?

বিচিত্রময়ী তুমি।

ওপরে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ক্রমোন্নত অরণ্যানীর নিবিড় শ্যামলীমা, আর অনেক, অনেক নীচে টেরাই-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গল; এদেরই মাঝামাঝি একটি উপত্যকায় তোমার শৈশব আর কৈশোর কেটেছিল। সুদূর বাংলা থেকে তোমার বাবা এসেছিলেন এখানে কাঠের ব্যবসা করতে। ছোট পাহাড়ী জনপদ; হাজার দুই মানুষের বাস। তাদের অনেকের মত তুমিও পাহাড়ের একান্ত নিজস্ব মানুষ ছিলে। হরিণশিশুর দ্রুত-তার সঙ্গে তাল দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জল-ধারার উজান বেয়ে, দেওদার-শালবীথির ব্যূহ ভেদ করে মনের মত্ত আবেগে তুমি ছুটে বেড়িয়েছ; বাধা দেওয়ার প্রয়োজনও কেউ কোনদিন অনুভব করেনি।

নিরুপদ্রব জীবনযাত্রায় বাহুল্য হয়ত ছিল না তোমাদের, কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার আয়াস ছিল।

অকস্মাৎ সব তছনছ হয়ে গেল। একদিন অসংখ্য প্লেনের গর্জন শুনে তোমরা পুলকিত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। তারই কয়েকটা দিন পরে পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একদল সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে কদমে-কদমে এগিয়ে এল। মানুষগুলির চেহারা অদ্ভুত। অদ্ভুত তাদের পোষাক। মুখের চেহারা ভীষণ, চোখের দৃষ্টি কুটিল।

তোমাদের ঐ হাজার মানুষের জনতা হাঁ করে চেয়ে রইল তাদের দিকে। না বুঝলো ওদের ভাষা, না বুঝলো ওদের প্রয়োজন।

লোকগুলি হাত-পা নেড়ে, পাথরের ওপর বুটের গুঁতো মেরে, হায়নার মত চীৎকার করে কী যেন বললো। তারপরেই বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করলো। প্রতিরোধ এল না কিছুই। আকস্মিক হত্যার দাপটে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো সবাই। রক্তের নদীতে পাহাড়ের উপত্যকায় ঢল নামলো।

তুমিও লুকিয়ে ছিলে একটি পাহাড়ের ঢালুতে। সমস্ত দিন আর বেরোওনি। সারাদিন ধরেই মাঝে-মাঝে পাহাড় আর অরণ্য সেই শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ থেমেছে; কিন্তু রাত্রির আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। তোমাদের জনপদের কাঠের বাড়ীগুলি আগুনের লেলিহান শিখা দগ্ধ করেছে।

সমস্ত রাত্রি ধরেই সেই ধ্বংসলীলা তুমি দেখেছ। আর ভয়ে আঁৎকে উঠেছ। সকালে দেখেছ অন্য দৃশ্য। তোমাদের জনপদের কয়েক শ মানুষকে ওরা ধরে নিয়ে চলেছে। তাদের কোমরে-কোমরে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাথা নিচু করে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে তারা। তাদের পিছনে অসংখ্য গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া। তাদের পিঠে তোমাদের সমস্ত বছরের খোরাক। দস্যুর দল আগের পথে ফিরে চলেছে।

তুমি চুপ করে থাকতে পারনি। চীৎকার করে উঠেছিলে। ফলে তুমিও বন্দী হয়েছিলে।

পুরো দুটি মাস তোমার ওপর অত্যাচার করেছে জাপানীরা। এই অকারণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারনি তুমি। তারপর একদিন রাতে ঘুমন্ত গার্ডের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে তারই রিভলবারটি কেড়ে নিয়েছিলে। তারপর তারই পোষাক জড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলে।

যুদ্ধের কোন বিষয়েই উৎসুক ছিলে না তুমি। কিন্তু জাপানীদের ওপর তোমার একটি জাতক্রোধ ছিল। ফলে সুযোগ পেলেই তুমি তোমার রিভলবারের গুলির সদ্ব্যবহার করতে ভুলতে না।

তারই কিছু পরে হিরোসীমায় জাপানীদের ধ্বংস করলো অ্যামেরিকা। জাপানীরা তখন আত্মগোপন করায় ব্যস্ত। ইংরাজরাও জাপানীদের পিছু নিয়েছে। যেখানে দেখতে পাচ্ছে সেখানেই গুলি করে মারছে। তাদের চাপে পড়ে তুমিও ছড়িয়ে পড়লে। কোথায়, তা তুমিও জানতে না। সেই থেকে তোমারও বারমাস্যা শুরু। তোমার সেই বহুবিচিত্র জীবনধারায় যখন যেটুকু প্রয়োজন বলে মনে করেছ তা করতে পিছপাও হওনি তুমি। অথচ জীবনের দুর্দান্ত স্রোতকে ফেরাতে পারনি; কোন ঘাটে ভিড়েনি তোমার তরী।

এমনিভাবে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন একটি দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে গেলে। একটি পাহাড়ের পাশে জাপানী পোষাকপরা একটি লোক শুয়ে রয়েছে। গায়ে তার শতছিন্ন পোষাক। প্রতিহিংসার আগুন তখনও তোমার বুকে নেভেনি। তুমি রিভলবারটি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে। একভাবে দেখলে। তারপর কী জানি একটা সন্দেহে চুপি-চুপি এগিয়ে গেলে।

লোকটির মধ্যে প্রাণের কোন সাড়া নেই। মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। কৌতূহলে লোকটির পাশে গিয়ে নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়নি তার। মুখটাকে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুরিয়ে দিতেই লোকটি অসীম ক্লান্তিতে চোখ খুলে বললে : জল।

না, জাপানী নয়। বাঙালী। পাশের ঝরনা থেকে দৌড়ে গিয়ে জল এনে মুখের কাছে ধরলে তার; ঝোলা থেকে কিছু শুকনো খাবার দিলে তাকে। লোকটি গোগ্রাসে সব শেষ করল।

কুমারসাহেবের সঙ্গে সেই তোমার প্রথম দেখা। দুজনেই ভাগ্যের হাতে চাবুক খেয়ে জর্জরিত। তোমরা কেউ কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারনি।

ঝড়ের রাতে নীড় বাঁধলে দুজনে। ভেবেছিলে, অনেক ঝড়ের পর আর বুঝি আকাশে মেঘ জমবে না। কিন্তু ঝড় আবার উঠলো। তবে এবার আর বাইরের জগতে নয়, তোমার মনের জগতে।

সীমান্তে অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের ফলে বর্মা পুলিশ কুমারসাহেবের পিছনে তাড়া করলো। তোমরা পালিয়ে এলে এই দুর্ভেদ্য অরণ্যে। কিন্তু কুমারসাহেবকে ধরে রাখতে পারলে না।

আবার তুমি একা। বিপদ, শারীরিক ক্লেশ আর অনিশ্চয়তার চেয়ে যে নিঃসঙ্গতা মানুষের বড় শত্রু একথাটা বোধহয় এখনই তুমি বেশী করে বুঝেছ। একদিন জাপানী বর্বরতার বিরুদ্ধে তুমি পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরেছিলে, আজ অনাবিল নিঃসঙ্গতা তোমাকে কারারুদ্ধ করেছে।

আর ঠিক সেই সময়েই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম : তোমার নাম মা-থীন রাখলো কে?

আমার দিকে বড়-বড় দুটি চোখ মেলে একটু হেসে তুমি বলেছিলে : ইচ্ছে হলে অহল্যা বলেও ডাকতে পার।

কিন্তু তোমায় মুক্তি দেবে কে?

আমার হাতের ওপর তোমার হাতটি রেখে বলেছিলে : কেন, তুমি?

বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না মা-থীন, সেদিন তোমার কথা শুনে আমার শরীরে রোমাঞ্চ জেগেছিল। আমার ওপর এতখানি গুরুদায়িত্ব আর কেউ কোনদিন দেয়নি। আমি কি সত্যিই তোমার বিশ্বাসের যোগ্য?

তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে?

হ্যাঁ।

যদি না পার?

সে দোষ আমার; তোমার নয়।

আর কুমারসাহেব?

আমার জন্যে কোনদিনই তাঁর কোন অভাব হয়নি।

যদি হয়?

তুমি একটু হেসে বলেছিলে : বড় সন্দেহপ্রবণ তোমার মন।

আমিও সেদিন হেসে উত্তর দিয়েছিলাম : প্রেম চিরকালই পাপশঙ্কী, মা-থীন।

সেদিন বাংলোতে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার মনের এমন একটি নিবিড় আত্মীয়তা জন্মালো কেমন করে? মনের ভিতর দুজনেই হয়ত একই নিঃসঙ্গতার জ্বালা অনুভব করছিলাম। অথচ আমি জানি, আমাদের চিন্তাধারা বিপরীতমুখী। তুমি চেয়েছিলে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করতে, আমি চেয়েছিলাম তোমার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। তুমি চেয়েছিলে মুক্তি, বন্ধনের অবলুপ্তির দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম আমি।

কুমারসাহেবকে ভালবাসতে পারনি তুমি। কুমারসাহেবের নিটোল উদাসীনতা তোমাকে ব্যথা দিয়েছিল, তোমার বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল ব্যর্থতার পাষাণ ফলক। তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে তুমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে-মানুষ তোমাকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের সুযোগ দেয় না, সে বোধ হয় সমুদ্রের জল ছাড়া আর কিছু নয়। কোন দাগই কাটে না তার বুকে। তুমিই বুঝেছিলে কুমারসাহেবের নিত্যপ্রয়োজনের তালিকায় তোমার নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে।

তবুও একটা "কিন্তু" থেকে যায়। যদি কোনদিন তাঁর ডাক আসে, তাকে 'না' বলে ফিরিয়ে দেবে কেমন করে?

এ বিষয়ে তুমি কোন চিন্তাই করনি। অথবা করলেও, ঠিক করতে পারনি কিছু। সত্যিই তো, মানুষ কি কেবল ভবিষ্যতের প্রত্যাশাতেই দিন গনে যাবে?

তবে তাই হ'ক আজ। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিও যদি আজ মত্ত হাহারবে আমাদের মিলনের পথে দাঁড়ায়, আমরা তাকে প্রতিরোধ করব। তোমাকে আমি মুক্তি দেব অহল্যা।

তার পরের ক'টা দিনই আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। জীবনের সেই ত্রিশটা বছর অন্ধকার কারাগারে বাস করে হঠাৎ যেন একটি ভাস্বর দিনের মধ্যাহ্নে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মনে-মনে অস্থির হয়ে বেড়ালাম। যেন অনেক কিছু করার রয়েছে, করা হয়নি কিছু। এখনই, এই মুহূর্তে সব কিছু করে ফেলা উচিত। কাল সকালেই আমরা এই পার্বত্য উপ-ত্যকা ছাড়বো। আজ সমস্ত রাতই আমার প্রতীক্ষায় তোমার প্রাসাদের ওপর মশাল জ্বলবে। আজ আর পথ হারালে চলবে না আমার।

বকেয়া কাজ মিটিয়ে ফেলতে একটু সময়ই লেগেছিল। সব সেরে সন্ধ্যার অনেক আগেই জিপ নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লাম তখন আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। মনে হ'ল, একটা উদা-সীন হালকা হাওয়ায় আমার আমিটিকে ভাসিয়ে দিয়েছি, ছড়িয়ে দিয়েছি চার-পাশে। আজ আর কৃপণের মত কোন কিছু সঞ্চয় করা নয়; কেবল বিলিয়ে দেওয়া। মনে হ'ল, আমার হৃদয় আজ অক্ষয়; অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার। আর সেই তুলনায় পৃথিবীতে বড় বেশী দারিদ্র্য, বড় বেশী শূন্যতা।

বনপ্রান্তে জিপটিকে দাঁড় করিয়ে, কীট ব্যাগটি নিয়ে বনের পথ ধরলাম। হঠাৎ দেখি, কুমারসাহেব বসে রয়েছেন একটি পাথরের শিলার ওপর। ক্লান্ত, অবসন্ন তিনি।

পুরো দুটি মাস পরে ফিরে এসেছেন কুমারসাহেব। তাঁকে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে রূঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম: কী হয়েছে আপনার পায়ে?

কুমারসাহেব আমার মুখের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বললেন: ও কিছু নয়।

কিছু নয়? কী বলছেন? পা দিয়ে অত রক্ত পড়ছে কেন?

রক্ত!

একটু যেন বিব্রত হলেন কুমার, সাহেব। তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করে দেখলেন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সত্ত্বেও রক্তকে আটকানো যায়নি। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা ফুলে উঠেছে।

ইচ্ছে হলে অহল্যা বলেও ডাকতে পার

বন্দুকের গুলি লেগেছে,

কোথায়?

বর্মা সীমান্তে।

কেন?

হত্যা করা মানুষের নেশা, ডাক্তার। ওর পিছনে কোনদিনই কোন কারণ থাকতে পারে না।

সঠিক বুঝতে না পারলেও, অনুমান করলাম। বর্মা সীমান্তের মোহ তিনি এখনও ছাড়তে পারেননি।

আপনার মোহ ফুরিয়েছে।

কুমারসাহেব একটু হেসে বললেন: মোহ নয়; প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

হঠাৎ মনে হ'ল, লোকটি কেবল নিষ্ঠুরই নয়, যথেষ্ট দাম্ভিকও বটে। এ জগতে কারও যেন কোন প্রয়োজন রয়েছে? সভ্যতা, ভব্যতা, সংস্কৃতি সবই তো অপ্রয়োজনের বোঝা, আলস্যের নিষ্ফল সঞ্চয়। কেবল নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একাকার করার অপচেষ্টা মাত্র।

কী করবেন এখন?

বাড়ী যাব, তারপর, বেঁচে যদি থাকি, মা-থীনকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। ও একদিন আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। ওরই হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম এবার।

একটি দেহাতি লোক হাজির হ'ল। তারই কাঁধে ভর দিয়ে কুমারসাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

তুমিও এস, ডাক্তার। তোমার ওপর যে ভার দিয়েছিলাম তা তুমি পালন করেছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

হঠাৎ কে যেন একটা চাবুক কষিয়ে দিল আমার মুখের ওপর। ভাবলাম, সেই নির্জন বনপ্রদেশে একটা রিভলবারের গুলি খরচ করাটা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়; কিন্তু করতে পারলে হয়ত......

এস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আপনি এগোন। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

লোকটির কাঁধে ভর দিয়ে কুমার-সাহেব ধীরে ধীরে বনপথে অদৃশ্য হলেন। আমিই কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম একা। প্রাক সন্ধ্যায় গাছে-গাছে পাখিদের অশ্রান্ত গুঞ্জন জেগে উঠেছে। কিছু দূরে ব্রহ্মপুত্রের কলনাদ শুনতে পাচ্ছি। কোথা থেকে যেন একটি পিপাসার্ত পাখির করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে। আকাশের শেষসূর্য ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

জীপের মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

আশা করি, তোমার মুক্তি হয়েছে মা-থীন। তোমার পাষাণভার সেদিন আমি নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছিলাম। আমার কি মুক্তি হবে না কোনদিন?

অথ লন্ডন-কথা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

লণ্ডন, ১লা আগস্ট ঃ

১৯৫৯ সালে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র দিবসে লণ্ডনের ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের বিখ্যাত ভোজসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হেরল্ড ম্যাকমিলন। বিরোধীদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন পার্লামেণ্টারী শ্রমিকদলের উপনেতা জেমস্ গ্রিফিথ।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন সাধারণ নির্বাচনের আসন্ন তারিখ ঘোষণা-সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত। অথচ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের উপনেতা উভয়েই সেদিন সন্ধ্যায় পার্লামেণ্টের বৈঠক কামাই করে এসেছেন। বিষয়টা পরিহাসচ্ছলে উল্লেখ করে গ্রিফিথসাহেব বল্লেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্কট ও তিনি ওয়েলসম্যান। বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁরা উভয়েই পার্লামেণ্টে অনুপস্থিত বলে তাঁর মনে শান্তি নেই। কারণ তাঁর আশংকা হচ্ছে যে তাঁদের এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সদস্যরা হয়তো সাধারণ নির্বাচনের তারিখটাই ঠিক করে ফেলবে।—বলা বাহুল্য মিঃ ম্যাকমিলান কিম্বা মিঃ গ্রিফিথ ব্যক্তিগত কিম্বা দলগত, কোনভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রান্তিকতাবাদে বিশ্বাস করেন না। তাই উপরোক্ত মন্তব্য একটি আনন্দমুখর ভোজসভার একটি নির্দোষ পরিহাস মাত্র।

কিন্তু এই নাতিবিশাল দ্বীপপুঞ্জে প্রান্তিকতাবাদ অনেক সময়েই একটা গুরুতর বিষয়। গত মাসে আমরা যখন স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করছিলাম, তখন আমাদের ভাগ্যগুণে এক প্রগলভ ড্রাইভার জুটেছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে এখনো দুটি শ্বেত জাতি পরাধীনতার জোয়ালে পিষ্ট হচ্ছে। সেই দুটি অভিশপ্ত জাতি হচ্ছে স্কট ও ওয়েলস। —এই 'পরাধীনতার' শোষণ ও শাস্তি যে কতই ভয়াবহ তার সব তথ্য তাঁর জিহ্বাগ্রে। নিঃসন্দেহে সেই সব তথ্যাবলী উক্ত বাচস্পতির অনর্গল বাক্যস্রোতে ফেনস্ফীত। তবুও অনস্বীকার্য যে, ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডে প্রান্তিক 'জাতীয়তাবাদ' রীতিমত লক্ষণীয় একটি শক্তি।

প্রান্তিক স্বাতন্ত্র্যবাদের ইতিকথা

ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয় যথাক্রমে ১৫৩৬ ও ১৬০৩ সালে। কিন্তু 'এ্যাক্ট অব ইউনিয়নের' দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আইনগত মিলন হয় তার অনেক পরে, ১৭০৭ সালে।

ওয়েলস যদিও স্কটল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি বিভক্ত ছিল তবু অংশত নিজের ভাষাটিকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া অন্য সব বিষয় অধিকতর ইংগভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে।

ওয়েলসের ২৬৪০০০০ লোকের এক-চতুর্থাংশ এখনো ওয়েলস্ ভাষা ব্যবহার করে এবং শতকরা একজন সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না।

ওয়েলস জাতীয়তাবাদী দল প্লাইড সিমরু (Plaid Cymru) গঠিত হয় ১৯২৫ সালে।

স্কটল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী দল 'স্কটিশ ন্যাশন্যাল পার্টি' গঠিত হয় ১৯২৮ সালে।

উভয় দলই স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের জন্যে কমনওয়েলথোচিত স্বাধীনতা চায়। অর্থাৎ কানাডা কিম্বা অস্ট্রেলিয়ার মত তারা শুধু রাজানুগত্যের দ্বারা ইংলাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কিন্তু তাদের নিজস্ব লোকসভা থাকবে এবং প্রশাসনিক বিষয় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি থাকবে।

উভয় দলেরই অভিযোগ বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত সুযোগ-সুবিধার ননীটুকু ভোগে লাগে ইংরেজদের আর তাদের ভাগ্যে জোটে শুধু ঘোল। সংযুক্তির ফলে তাদের অর্থনীতি, রাষ্ট্র-

কল্যাণ ও সংযোগ-ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিঘ্নিত হচ্ছে। নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধ্বংস ও লুপ্ত হচ্ছে ইত্যাদি।
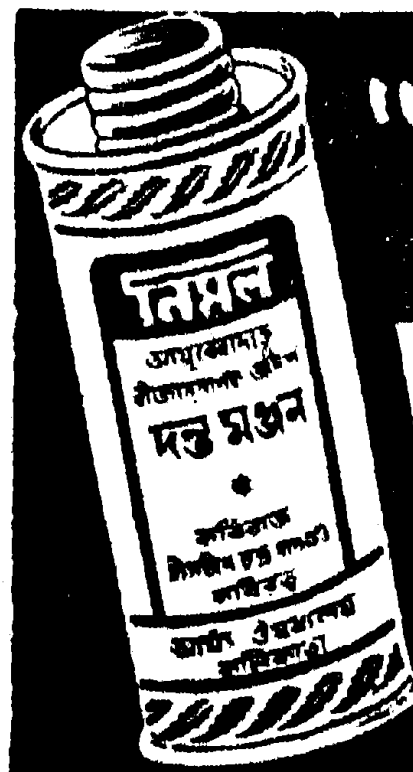
অবশ্য ওয়েলসের ও স্কটল্যাণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর খনি ও কারখানাগুলি ক্রমশ সাবেকী, অকেজো ও লোকশান-জনক হয়ে পড়ায় উভয় স্থানেই যে বেকার-সমস্যা ও বিবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা জটিলতর হয়ে পড়ছে তাও ঠিক। স্কটল্যাণ্ডে বেকার-সমস্যা জাতীয় হারের চেয়ে শতকরা ৭৫ ভাগ বেশি।

কিন্তু স্বকীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অবলুপ্ত হবার অভিযোগ কতটা বাস্তব তা সন্দেহসাপেক্ষ। কারণ ওয়েলস ভাষা কিম্বা ওয়েলস ও স্কটিশ পরিচ্ছদকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হচ্ছে তা তো মনে হয় না। কারণ, যে সময়ে ইংরেজি ভাষার প্রভাব ও ব্যাপকতা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত তখন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই একটি মুমূর্ষু ও সীমিতপ্রসার ভাষাকে পুনর্জীবনদানের চেষ্টার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে করার কারণ নেই।

পরিচ্ছদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। বস্তুত, বিশেষ কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিলে লণ্ডনের রাস্তায় যত স্কটিশ ঘাঘরা দেখা যায় এডিনবরার পথ চলতে তত চোখে পড়ে না।

কিন্তু স্কটিশ লোকনৃত্য কিম্বা ওয়েলস্ লোক-সঙ্গীতের কদর কমে যাচ্ছে না। বরং টেলিভিশনের কল্যাণে বর্ধিষ্ণু।

বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা

বর্তমান অবস্থায় স্কটল্যাণ্ড ওয়েলসের চেয়ে অনেক পরিমাণে বেশি স্বতন্ত্রতা ভোগ করে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভায় অর্থাৎ ক্যাবিনেটে একজন 'সেক্রেটারী অব স্টেট ফর স্কটল্যাণ্ড' আছেন। তার দপ্তরের ওপরই স্কটল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্কট পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব। 'ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যাণ্ড' স্বতন্ত্র নোটও বিলি করে।

ওয়েলসের উপরোক্ত বিষয়গুলি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। কেবল স্বায়ত্ত-শাসন ও বাসবিভাগের মন্ত্রী তার সমস্যাবলীর জন্য সাধারণভাবে দায়ী।

বৃটেনের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র উদারনৈতিক দল ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের দাবীকে সমর্থন করে।
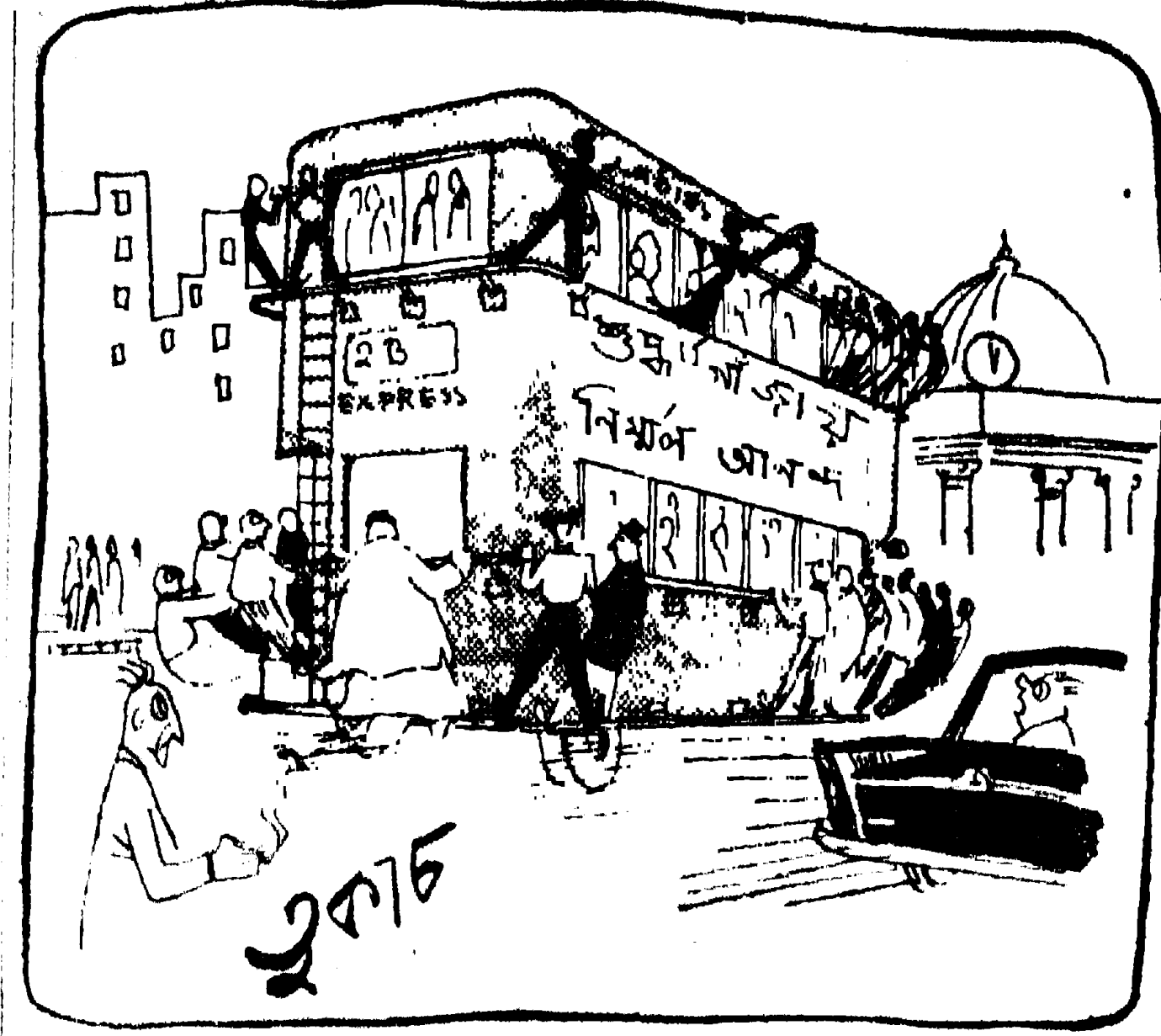
যানবাহন সমস্যার সমাধান

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, আইল অব ম্যান ও চ্যানাল আইল্যাণ্ডসের স্বতন্ত্র লোকসভা আছে।

এদের মধ্যে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অবস্থাটা অনেকটা একটি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের মত। অন্তর্রাজ্য বিষয়ে স্থানীয় সরকার স্বাধীন কিন্তু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে হোয়াইট হলের অধীন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে তার সদস্য-সংখ্যা নির্দিষ্ট।

আইল অব ম্যান ও চ্যানাল আইল্যাণ্ডস্ বৃটিশ রাজতন্ত্রের অধীন। আইনত তাদের দায়িত্ব প্রিভি কাউন্সিলের ওপর। বৃটিশ সরকার যদি তাদের জন্যে কোন আইন প্রণয়ন করতে চায় তা হলে তা করতে হবে 'অর্ডার ইন্ কাউন্সিলের' দ্বারা।

কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উভয়েই স্বাধীন। তাদের নিজস্ব কর-নীতি আছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি নিজেরাই পরিচালনা করে।

চ্যানাল আইল্যাণ্ডস্-এর মধ্যে জার্সি, গর্নসে ও এলডার্নের পার্লামেণ্ট স্বতন্ত্র ও গণ-নির্বাচিত। কিন্তু সার্ক দ্বীপে তা সামন্ততন্ত্র ও গণতন্ত্রের জোড়াতালি।

ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-বাদীরা যদি সত্যি একদিন বিপুল জন-সমর্থন সংগ্রহ করতে পারেন তা হলে তাঁদের পক্ষেও নিজস্ব পার্লামেণ্ট লাভ অসম্ভব না-ও হতে পারে।

বর্তমানের গণ-সমর্থন

১৯৫৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্কটল্যাণ্ডের ৭১টি পার্লামেণ্টারী আসনের প্রায় সবগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শতকরা ১১·৪ ভাগ ভোট পান। তিনজন প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়। তবে ১৯৪৫ সালের একটি উপ-নির্বাচনে ডাঃ রবার্ট ম্যাকইনটায়ার নামক এক ব্যক্তি ঐ দলের হয়ে প্রথম ও শেষবারের মত জয়-লাভ করেন। তিন মাস পরে সাধারণ নির্বাচনে তিনি পরাস্ত হন। ডাঃ ম্যাক-ইনটায়ারই এখন দলের সভাপতি। দলের সদস্য-সংখ্যা অনুমান দশ হাজার।

কিন্তু ১৯৫০ সালে এই দল স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের দাবীতে স্কটল্যাণ্ডের ৫২২৩০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২০ লক্ষের অধিক লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহে সমর্থ হয়।

প্লাইড সিমরু (ওয়েলস পার্টি) সদস্য-সংখ্যা ১৫০০০ জন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা কোন নির্বাচনে জয়লাভ করেননি। ১৯৫৯ সালে ওয়েলসের ৩৬টি পার্লামেণ্টারী আসনের মধ্যে তাঁরা ২০টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শতকরা ১০·৪টি ভোট পান, ১৪ জন প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়।

চিত্র-পরিচয় ঃ

(১) মিঃ গয়েন প্লাইড সিমরুর নেতা
(২) ডাঃ রবার্ট ম্যাকইনটায়ার, স্কটিশ ন্যাশন্যাল পার্টির নেতা।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। একুশ ।।

গাড়ীটা সোজা রাস্তায় এল না। হরিশ মুখুজ্জে রোড দিয়ে রেড্ রোডে এসে পড়ল, সেখান থেকে ময়দান পাশে রেখে গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ড রোড ধরল। তখন গঙ্গার হাওয়ায় গাছের সারিগুলি বাতাসে মর্মরিত, জেটিতে, বেঞ্চিতে রেললাইনের ওপাশের পথটিতে মানুষের ভিড়; কোথাও একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো খুলেছে কেউ—কোথাও বা পোর্ট কমিশনারের কর্মীরা একটা পুরোনো গ্রামোফোনে উর্দু রেকর্ড জুড়ে দিয়েছে।

দু'ধারের ইলেকট্রিকের সারিতে, বাতাসে, জাহাজের নানা রঙের আলোয়, চলন্তি মোটরে, মানুষের গলার আওয়াজে একটা উৎসবের আমেজ চারদিকে। কিন্তু তৃপ্তি একবার চোখ মেলে তাকালো না পর্যন্ত। আর নেশাটা কেটে যাওয়ার পর একটা ঠাণ্ডা ভয়ের হাত উঠে বার বার অমিয়র হৃৎপিণ্ডটা চেপে চেপে ধরতে লাগল। অমিয় একটা সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করল কিন্তু উদ্দাম বাতাসে ছ'টা কাঠি পুড়িয়েও ধরানো গেল না। মুখ-পোড়া সিগারেটটাকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অমিয় একবার চেয়ে দেখল তৃপ্তির দিকে।

চোখ বুজে সীটের গায়ে এলিয়ে পড়ে আছে তৃপ্তি। কয়েকটা রুক্ষ চুল খেলে বেড়াচ্ছে মুখের ওপর। নিজের ছোট বোনটাকে এই মুহূর্তে কী করুণ আর অসহায় দেখাল।

গাড়ীটা চালাচ্ছে চাচা। তার বিরাট শরীর আর প্রকাণ্ড পাগড়ি সামনেটা প্রায় জুড়ে আছে। মোটা একটা রোমশ হাত রয়েছে স্টিয়ারিঙের ওপর, আর এক হাতে মাঝে মাঝে গীয়ার বদলাচ্ছে। ড্যাশ বোর্ডের আলো, ঘড়ির কাঁটা, স্পীডোমিটার সবগুলো থেকে একটা অদ্ভুত দীপ্তি পড়েছে চাচার কঠিন মুখের ওপর—চিকচিক করছে শাদা-কালো দাড়ি সামনের ছোট আয়নায় সেই মুখটা দেখে শরীর শিউরে উঠল অমিয়র। এই লোকটাকে একেবারে ভালো লাগে না তার—না চেহারা, না চাউনি, না কথার ধরণ। কানের মধ্যে এখনো তার সেই বিশ্রী গর্জনটা ভেসে বেড়াচ্ছে : 'ভাগ্ যা বুদ্ধু, ভাগ্ হিয়াসে। আশমানসে মঞ্জীল নেহি বন্তা—'

এই লোকটার সঙ্গেই তাদের কেন পাঠালো চন্দন সিং?

গাড়ী ইডেন গার্ডেন পেরিয়ে এসে সশব্দে ব্রেক কষল। পুলিশের হুইসেল। দারুণ ভয়ে চমকে উঠল অমিয়—রক্ত শুকিয়ে গেল বুকের ভেতর।

একটা ছোট পুলিশের দল এগিয়ে এল গাড়ীর দিকে। সামনে একজন অফিসার।

অমিয়র মনে হল, বাঁচতে হলে এই বেলা নেমে ছুটে পালানো দরকার। নিশ্চয় বাড়ীর থেকে থানায় খবর দিয়েছে, আর তাই—

কিন্তু এত বড়ো স্ট্র্যান্ড রোড্ পেরিয়ে পালাবার কোনো পথ নেই। অমিয়র সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠল।

পুলিশ অফিসার বললেন, টোকেন?

চাচা স্টিয়ারিঙের ওপর অলসভাবে হাতটা নামিয়ে রেখে বললে, দেখিয়ে।

—লাইসেন্স, বু বুক, ইন্সিওরেন্স?

ড্যাশ বোর্ড থেকে সেগুলো বের করে এগিয়ে দিলে চাচা।

পুলিশ অফিসার একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, তারপর চাচার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, ঠিক হ্যায়—যাইয়ে।

গাড়ী আবার ছুটল। কয়েক সেকেণ্ডেই ফাঁকা রাস্তায় স্পীডো-মিটারের কাঁটা পৌঁছে গেল ত্রিশের কোঠায়।

কিছুই নয়—পুলিশের কাজের একটা অঙ্গ—চেকিং। অমিয় তবু কিছুক্ষণ যেন নড়তে পারল না। কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছিল, কাঁপা হাতে ট্রাউজারের পকেট খুঁজে রুমালটা খুঁজে পেল না, হাতের পিঠ দিয়েই ঘামটা মুছে ফেলল।

সেই একভাবেই চোখ বুজে আছে তৃপ্তি। আবার অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—তিপু ?

—উঁ ?

—ভয় করছে ?

—না।

ওর ভয় করছে না, কিন্তু থেকে থেকে অমিয়র হাত-পাগুলো কাঁপিয়ে আসছে। গাড়ীর কাঁটা ত্রিশ থেকে চল্লিশে চলেছে, উল্কার বেগে পেরিয়ে যাচ্ছে সামনের গাড়ীগুলো—ট্রাম, বাস, লরী। হাওড়া ব্রীজ অ্যাপ্রোচের কাছে এসে মিনিট দুই দাঁড়ালো, তারপর আবার স্ট্র্যান্ড রোডের অপরিচ্ছন্ন পথ দিয়ে, পুরোনো টাঁকশালের পাশ দিয়ে ছোট-বড়ো গর্তে ঝাঁকুনি খেতে খেতে, চাকার তলায় ময়লা জল চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে বাঁয়ে জগন্নাথঘাট রোডে বাঁক নিলে।

গাড়ীতে ওঠবার আগে চন্দন সিং বলেছিল, কোনো ভাবনা নেই। চাচা তোমাদের সোজা রাণীগঞ্জে নিয়ে যাবে। সেখানে আমার এক দোস্তের কোঠি আছে—তিন-চারদিন থাকবে সেখানে। তারপর আমি চলে আসব। তখন যা হয় করা যাবে।

কী করবে চন্দন সিং? অমিয় জানে না। কিন্তু আপাতত তিনশো টাকা চন্দন সিং পকেটে গুঁজে দিয়েছে তার। বলেছে, এগুলো রেখে দাও এখন—যদি দরকার হয়।

বুশ শার্টের বুকপকেটে নোটের তাড়াটা হাত দিয়ে একবার অনুভব করল। তিনশো টাকা! একসঙ্গে এতগুলো টাকা কেউ তার হাতে এমন করে তুলে দিতে পারে—অমিয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু পকেটের এই একরাশ নোট—যা দিয়ে যা-খুশি করতে পারে সে—সেগুলোকে বার বার ছুঁয়েও সে উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছে না এখন। দু পাশে ছিটকে সরে যাচ্ছে কলকাতা—পিছলে যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের বড়ো বড়ো প্রাসাদ, আর অমিয়র মনটা ততই ভারী হয়ে উঠছে, ততই একটা অন্ধকার দুলে উঠছে চোখের সামনে। এখনো সময় আছে, এখনো নেমে পড়তে পারে—এখান থেকে নারকেলডাঙায় ফিরে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

একবার প্রায় মুখের সামনে এগিয়ে এল : চাচা—রোখকে - রোখকে—! আমরা রাণীগঞ্জ যেতে চাই না, বাড়ী ফিরে যাব।

কিন্তু চাচার কঠিন মুখ সেই ছোট আয়নাটার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, একটা হিংস্র আলোয় যেন জ্বলছে সে মুখটা। মোটা মোটা কতগুলো কর্কশ আঙুল আঁকড়ে রয়েছে স্টিয়ারিংটাকে, রোমশ বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটা মস্ত গোল ঘড়ি যেন চাচার হয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অমিয়র দিকে।

না—চাচাকে বলবার কোনো অর্থ নেই। ওই যমদূতের মতো লোকটা ফিরেও তাকাবে না একবার।

তা ছাড়া ফিরে যাওয়ার কি উপায় আছে আর? বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন বাবা? দাদা এসে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর। মারধোর, অকথ্য অজস্র গালাগাল। সে দুঃস্বপ্ন কল্পনা করা যায় না। তার চেয়ে যা ঘটছে তাই ঘটুক, যা হওয়ার তাই হোক। যদি কোনোদিন মানুষ হয়ে ফিরতে পারে অমিয়, যদি অনেক টাকা হয় তার, যদি কখনো একখানা বিরাট গাড়ী হাঁকিয়ে তাদের নারকেলডাঙার বাসার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হলে—

তা হলে সেদিন হয়তো সব অন্য রকম হয়ে যাবে।

কিন্তু তিপু?

অমিয়র গলা শুকিয়ে এল আবার। আবার সেই ঠাণ্ডা ভয়টা কুঁকড়ে আসছে হৃৎপিণ্ডের ওপর।

চন্দন সিং বিয়ে করবে তিপুকে?

ভাবাই যায় না। তার দোস্ত, তার প্রাণের বন্ধু, সব ঠিক। কিন্তু তিপুকে কি ওর সঙ্গে মানায়? এমন সুন্দর—এত ছোট-খাটো শান্ত মেয়েটাকে চন্দন সিংয়ের পাশে কিছুতেই দাঁড় করানো যাচ্ছে না। তা ছাড়া ওদের আলাদা সমাজ, আলাদা চাল-চলন, আলাদা রেওয়াজ। তিপু মানিয়ে নিতে পারবে তার সঙ্গে। চন্দন সিং বলেছে, 'জমানা বদল হো গয়া—আর আজাদী হোনেকা বা দ—বা ঙা.লী-পা ঞ্জা বী-মা রা ঠী-ম্যাড্রাসি সব এক দিল। আভি তো আইসাই হো না চাহিয়ে।' তারপর এ রকম বিয়ের একটা লম্বা ফিরিস্তিও শুনিয়েছে তাকে। অমিয়রও কিছু আপত্তি নেই, কিন্তু—

কিন্তু যদি পুলিশ কেস্ হয়—

চন্দন সিং হেসেছিল, সে ভার আমার। এমন ব্যবস্থা করব যে কোনো পুলিশ কখনো আমাদের নাগাল পাবে না।

চন্দন সিংয়ের ক্ষমতার ওপর অমিয়র বিশ্বাস আছে—কিন্তু মনের থেকে ভয় কাটে না। থানা-পুলিশ-আদালত। নিজের বোনকে বাড়ী থেকে চুরি করার দায়ে তাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়। উকিলে তাকে জেরা করবে—আদালত-সুদ্ধ লোক চেয়ে থাকবে তার দিকে—জজ হয়তো তাকে—ক'বছরের জন্যে কে জানে—জেলেই চালান করে দেবেন।

অমিয়র মাথাটা ঘুরে উঠল এক-বারের জন্য। কিছুক্ষণ সমস্ত অনু-ভূতিগুলো অসাড় হয়ে গেল—চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে এল সমস্ত। এর চাইতে বাবার গালাগালি ভালো—দাদার কিলচড়ও ভুলতে সময় লাগবে না।

নিজের মনে মনেই অমিয় বললে, গাড়ী থামাও চাচা, আমরা নেমে যাব। —কিন্তু ঠোঁট নড়ল না, কথা বেরুল না মুখ দিয়ে। চাচা তার মনের কথা শুনতে পেলো না। গাড়ী ট্রাফিকের সংকেত পেয়ে ধীরে ধীরে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা পেরুল, ছাড়িয়ে গেল টালার পুল—তারপর ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—তিপু ?

—উঁ ?

নিজের ভয়ের তাড়াতেই অমিয় আবার জিজ্ঞেস করলে, তোর ভয় করছে না তো?

—না।

—বাড়ীর জন্যে মন খারাপ করছে?

—না।

—কিছু ভাবিসনি আমি তো আছিই সঙ্গে—কথাটা বলে অমিয় যেন নিজের ওপরেই জোর আনতে চাইল। বাস্তবিক, এত ভাবনাই বা কিসের? পুরো তিনশো টাকা পকেটে আছে তার। এই টাকা দিয়ে কী না করতে পারে সে। পাঁচ টাকা মূলধন নিয়েও পরে কোটি-পতি হয়েছে, এমন অনেক লোকের গল্প শুনেছে। সে, অমিয় দে—স্পোর্টসম্যান—গায়ে জোর আছে, মনে সাহস আছে তার। তা ছাড়া এই তো শেষ নয়। চন্দন সিংয়ের ব্যবসায় পার্টনার হবে সে, নিজের ট্যাক্সি চালাবে,

লরী কিনবে তারপর—বড়ো বড়ো মার্সেডিজ - বেডফোর্ড—

চিন্তাটা হোঁচট খেলো। চন্দন সিং তৃপ্তিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তৃপ্তি? সে যদি রাজী না হয়? সে যে আর ছেলেমানুষটি নেই, তারও যে নিজের একটা জোরালো মত আছে আজই তো তার প্রমাণ পেয়েছে অমিয়। আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ভয়ে যে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে—চন্দন সিংকেও যদি তার পছন্দ না হয়—

গলাটা আবার শুকিয়ে এল, একটা অনিশ্চিত দুর্ভাবনা অমিয়কে আবার নিবিয়ে দিতে লাগল। হাতের সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে দেখল সেটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। পকেটের প্যাকেটটা হাতড়ে দেখল, সেটা খালি।

তা হলে এখন আর কিছুই করবার নেই অমিয়র। চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকা। যা হওয়ার হোক, গাড়ী ছুটতে থাকুক। ভাবনাটা তোলা থাক রাণীগঞ্জে পৌঁছোনো পর্যন্ত।

তৃপ্তির যেন ঘোর ভাঙল। সোজা হয়ে উঠে বসল এবার। গাড়ীটা বালী ব্রীজ পার হচ্ছে এখন।

নীচে গঙ্গার জল। দূরে আলোর সার। ঝম-ঝম করে একটা অন্ধকার মালগাড়ী পেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কী ভয়ংকর দেখাচ্ছে গাড়ীটাকে—একটা লোহার ঝড় যেন। মনে হচ্ছে এই পুলটাকে ভেঙে নিয়ে গঙ্গার জলে আছড়ে পড়বে ট্রেনটা।

কী আসে যায় তৃপ্তির? তার কাছে প্রায় সব সমান।

যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন মাথার ঠিক ছিল না তার। শুধু সেই কম্পাউণ্ডারটার বিশ্রী চেহারাই ভাসছিল চোখের সামনে। একবার মাত্র তাকিয়েছিল সেদিকে, আর তাতেই দেখেছিল একটা টেকো আধবুড়ো লোক হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে—অথচ চাউনির আধখানা গিয়ে পড়েছে দরজার ওপর। একে ওই রূপ—তায় ট্যারা!

—'খা - খা - খাসা মেয়ে। আমার খুব প - পছন্দ' —আবার তোৎলাও! চমৎকার! দাদা খুঁজে খুঁজে পাত্র জোগাড় করে এনেছে বটে! তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে লোকটার সামনে—আর খালি মনে হয়েছে ওই ট্যারা টেকো বুড়োটা দু'চোখ দিয়ে তাকে যেন গিলতে চাইছে রাক্ষসের মতো। আর বাঁড়ুজ্জে বুড়ো সমানে ঘরঘড়ে গলায় বলে চলেছে : ছেলে ভালো, স্বভাব ভালো, বংশ ভালো। আপনি ভাববেন না দে মশাই—মেয়েটি সুখেই থাকবে আপনার।

সুখই বটে! সবাই মিলে তাকে বলি দেবার ব্যবস্থা।

ভেবেছিল, বাবার পছন্দ হবে না। কিন্তু বাবা পরিষ্কার গলাতেই বললেন, 'আমাদের আর আপত্তি কী, তবে দেওয়া-নেওয়া—'

—'কিছু না, কিছু না। শাঁখা-সিঁদুরে সম্প্রদান করবেন। বুঝলেন—ছেলে হীরের টুকরো। কোনো দাবি নেই—মেয়েটি পছন্দ হয়েছে, ব্যাস্!''

তৃপ্তি যখন ছুটি পেলো, তখন তার মাথার ভেতরে আগুন ছুটছে। দৌড়ে চলে এল দিদির ঘরে, ছুঁড়ে ফেলল লাল শাড়ীটা, উবুড় হয়ে পড়ল বিছানায়। তার কেউ নেই। দাদা নয়, বাবা নয়, মা তো নয়ই—বাবাদাদার মুখের ওপর একটা কথা বলবারও সাহস নেই মা-র। শুধু দিদি থাকলে হয়তো একটা উপায় হতে পারত, কিন্তু—

প্রভাতদাকে মনে পড়ল। ভালো লোক প্রভাতদা, মনে দয়া-মায়া আছে, তৃপ্তির দুঃখের কথা কান দিয়ে শোনে। অথচ প্রভাতদাকে দিয়েও তো কিছু হল না। সবাই একদলের—সবাই তাকে বিদেয় করতে চায়; গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিতে পারে না বলেই তুলে দিতে চায় ওই টেকো কম্পাউণ্ডারের হাতে। তার চেয়ে তৃপ্তিই সারা সংসারটাকে নিষ্কৃতি দিক, শাঁখা-সিঁদুরের খরচটাও বেঁচে যাবে বড়দার।

সেদিন পুলের ওপর বড়দার হাতে মার খেয়ে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ী এসেছিল অমিয়। পরদিন সকালেই বলেছিল, 'আমি হাজারীবাগে খেলতে যাচ্ছি মা, ফিরতে দু-তিন দিন দেরী হবে।'

মা বলেছিলেন, 'ওই খেলা নিয়েই থাক হতভাগা। বাড়ীসুদ্ধু লোক মরতে বসলেও তুই কাউকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দিবিনে কোনোদিন।'

অমিয় উত্তর দেয়নি, মা-র কথার কোনো উত্তর না দিলেও চলে। বাবা প্রায় বিছানাই ছাড়েন না এখন—তাঁর কাছে কোনো কৈফিয়তের দায় নেই। দাদাও কারখানায়, অতএব—

অতএব কিট্‌ব্যাগ আর বুট হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেছে অমিয়, আর যাওয়ার আগে একবার রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় ডেকেছে : 'তিপু!'

'কী ছোড়দা?'

'আমি খেলতে যাচ্ছি না—বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি একেবারে!'
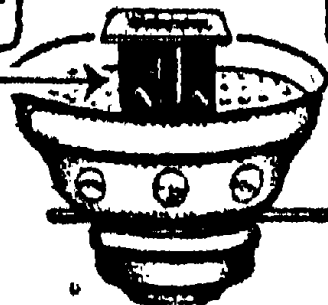
'সে কি!'

'আস্তে!' —অমিয় ঠোঁটে আঙ্বল দিয়েছে : 'দাদা যে ভাবে রাস্তার মধ্যে আমায় অপমান করলে, সে আমি সইব বলে মনে করিস তুই? আমি চলল্বম চন্দন সিংয়ের ওখানে।'

'ছোড়দা!'

'কাউকে কিছ্ব বলিসনি—যাওয়ার আগে তোকেই জানিয়ে গেল্বম কেবল। তুই দেখিস তিপ্ব, কি রকম দাঁড়িয়ে যাই আমি। আরে গায়ে জোর থাকলে, খাটতে পারলে আর মনে ইচ্ছে থাকলে—এই কলকাতা শহরে পড়ে পড়ে মার খায় কেউ, এমনি করে দিন কাটায় নারকেলডাঙার এই বাড়ীতে। আমি তোকে বলে যাচ্ছি, দ্ব বছরের ভেতরে তোদের এ বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাব আমি—বালীগঞ্জে কিংবা—'

এমন সময় ঘর থেকে বাবার ডাক এসেছে—'তিপ্ব!' অমিয়ও আর দাঁড়ায়নি, তৎক্ষণাৎ বড়ো বড়ো পা ফেলে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে।

ছোড়দার কথা ভেবে অস্বস্তির সীমা ছিল না তৃপ্তির—দ্ব'দিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল মা-কে ব্যাপারটা জানানো দরকার। কিন্তু তারপরেই এসে পড়ল কর্বণাময়। আর প্রভাতের ঘর থেকে অভয়ের অগ্নিদ্বষ্টিতে জবলতে জবলতে বেরিয়ে আসবার সময় বিদ্যুতের চমকের মতো মনে হল—এ বিপদে একমাত্র ছোড়দাই বাঁচাতে পারে তাকে। হাঁ—ছোড়দাই।

পরের ব্যাপারটা নিজের কাছেও আবছা। কোনোদিন সে একা কলকাতার পথে চলেনি, অথচ ঠিক চলে এল ছোড়দার কাছে—ভবানীপ্বরে। একটু খ্বঁজতে হল না—একটু হাঁটতে হল না।

বের্বতে পারলেই ভাবনা থাকে না। চলতে শ্বর্ব করলেই পথ চেনা হয়ে যায়।

কিন্তু এখন—এখন?

সেই কম্পাউন্ডারের হাত থেকে বেঁচেছে, এইটুকুই যথেষ্ট তার পক্ষে। এরপরে যে-কোনো দ্বর্ঘটনা ঘটুক, গাড়ীটা প্বল ভেঙে গঙ্গার জলে পড়ুক, কিছ্বতেই তার কিছ্ব আসে-যায় না।

প্বল অবশ্য এখন অনেক দ্বরে। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে গাড়ী ছ্বটেছে। কখনো দ্ব'পাশে ঝাঁপ বন্ধ হওয়া বাজার, কখনো কারখানা, কখনো গাছ-পালা, কখনো ডান দিকে গঙ্গার এক-আধটা ঝলক। গাড়ীটা যেন উড়ে চলেছে এখন। ছোড়দা বোধ হয় ঘ্বমিয়ে পড়েছে এখন, দেখে তাই মনে হচ্ছে তার।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? কী হবে জেনে। তৃপ্তির ভয় নেই—ভাবনাও না। ছোড়দা সঙ্গে আছে, ওইটুকুই যথেষ্ট।

তব্ব মা-র কথাটা ভোলা যাচ্ছে না, তব্ব ব্বক ফেটে কান্না আসতে চাইছে তার। ব্বকের ভেতর দ্বরন্ত অভি-মানের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। একটু চেষ্টা করলে স্কুলে ফ্রী হয়ে যেত, রিফিউজি গ্র্যান্ট দিত বই কেনবার জন্যে। অথচ সে চেষ্টা কেউ করল না, পড়া ছাড়িয়ে এনে রান্নাঘরে পেঁছে দিলে। সেখানেও শান্তি নেই—দিন-রাত বাড়ীর চারপাশে ঘ্বরে বেড়ায় অমল। শেষে সেই চিঠিটা! লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল তার—মনে হল, তারই জন্যে এত কান্ড, তাকে নিয়েই এত অশান্তি!

অথচ, অন্যভাবেও তো সব হতে পারত। স্কুলে পড়া না-ই হল, হাতের কাজ যে সব জায়গাতে শেখায়, সেখানেও তো ভর্তি করতে পারত তাকে। চামড়ার জিনিস, মাটির খেলনা, বেতের কাজ, তাঁত বোনা—যে-কোনো একটা তাকে শেখালেও তো সংসারের বোঝা হয়ে থাকত না, বরং দ্ব'পয়সা ঘরে আনতে পারত। কিন্তু তার জন্যে কেউ ভাবল না। শেষ পর্যন্ত ওই বিশ্রী লোকটাকে—

বেশ করেছে—পালিয়েছে বাড়ী থেকে। লোকে নিন্দে করবে—কর্বক। তৃপ্তিও আর ফিরবে না। ছোড়দাকে বলে কলকাতা থেকে অনেক দ্বরে কোনো একটা আশ্রমে ভর্তি হয়ে যাবে, নিজের ভার নিজেই নেবে সে। এত মেয়ে এত-ভাবে বাঁচতে চেষ্টা করছে, তার পক্ষেও কি একেবারেই অসম্ভব? কর্বণাময়ের হাতে পড়া ছাড়া আর কিছ্বই কি করবার নেই?

মা-র ম্বখখানা ভুলতে পারা যাচ্ছে না কিছ্বতেই। যেখানেই যাক, গিয়ে প্রথমেই একটা চিঠি দেবে মা-কে। চিঠিতে ঠিকানা দেবে না। বড়দাকে বিশ্বাস নেই, ঠিক এসে ধরে নিয়ে যাবে, তারপর ওই ব্বড়োর সঙ্গেই বসিয়ে দেবে বিয়ের পিঁড়িতে। বড়দা অসম্ভব গোঁয়ার—সব পারে।

চাচা মোটরটাকে ছ্বটিয়ে চলেছে তীরবেগে। সামনে দিয়ে এক-একটা দৈত্যের মতো লরী যেন পথের ওপর দিয়ে আগ্বনের স্রোত বইয়ে ছ্বটে আসছে—মনে হচ্ছে এখ্বনি ধাক্কা লেগে গ্বঁড়িয়ে যাবে তার। কিন্তু ধাক্কা লাগছে না—গাড়ী ছ্বটছে, কল-কারখানা, ঘর-বাড়ী, বন-বাগান-গঙ্গা ছিটকে সরে যাচ্ছে পেছনে।

একটা মস্ত বাজার। এত রাতেও লোক চলছে, রিক্স চলেছে, দোকান-পাট সব বন্ধ হয়নি। তৃপ্তি রাস্তার একটা সাইনবোর্ড পড়ল : 'শ্রীরামপ্বর'।

শ্রীরামপ্বর! ট্রেনে যেতে যেতে তৃপ্তি দেখেছে কলকাতা থেকে অনেক রেলস্টেশন পেরিয়ে শ্রীরামপ্বরে আসতে হয়। এর মধ্যেই গাড়ী পেঁছে গেল সেখানে। আর মনে পড়ল, এই শ্রীরাম-প্বরেই কোথায় যেন ছোট মেসোমশাই দোকান করেছেন।

তৃপ্তি সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা গ্বঁজে নিলে গাড়ীর ভেতর। পথ-চল্বতি মান্বষগ্বলোর মধ্যে যদি মেসোমশাই থাকেন! যদি দেখতে পান ওকে! যদি প্বলিশ ডেকে গাড়ীটা থামিয়ে—

শ্রীরামপ্বর পেরিয়ে গেল, পার হল লেভেল ক্রসিং। আবার অন্ধকার রাস্তা। কতদ্বরে ওরা চলে এল কে জানে! ছোড়দা সত্যিই ঘ্বমুচ্ছে এখন, আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, ম্বখটা ফাঁক হয়ে রয়েছে একটু, নাক ডাকছে। তৃপ্তিরও চোখ জড়িয়ে আসছে। সারা দিন, সারা সন্ধ্যা শরীর আর মনের ওপর দিয়ে ঝড়ের ঝাপটা বয়ে গেছে যেন। সে-ও আর পারছে না।

শ্বধ্ব একবার দেখলে সামনে পাথরের ম্বর্তির মতো বসে গাড়ী চালাচ্ছে লোকটা। একভাবে বসে আছে যন্ত্রের মতো। এতক্ষণ পার হয়ে গেছে, একটা কথা বলেনি, একবার পেছনে তাকায়নি।

স্টিয়ারিংয়ের ওপর তার মোটা মোটা আঙুলগুলোকে দেখতে দেখতে তৃপ্তির ঘুম এল।

ঘুম ভাঙল লোকটার ডাকে। একটা কালি-ঢালা মাঠের পাশে দাঁড়িয়েছে, গাড়ীটা। চারদিক থমথমে নির্জন, পাশের জলা থেকে সোনা ব্যাঙের ডাক উঠছে। খানিক দূরে একসার আলো দেখা যাচ্ছে।

চাচা নেমে পড়েছে গাড়ী থেকে। দরজা খুলে দিয়ে ডাকছে ঃ অমিয়—এ অমিয়—

ধড়মড় করে দারুণ চমকে জেগে উঠল অমিয়। বিস্ফারিত চোখে তাকালো তৃপ্তি।

—কা হুয়া চাচাজী?

—উতারো।

—কাঁহে?

—গাড়ী থোড়া বিগড় গিয়া। দোনো উতারো।

একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করে অমিয় নামল। তৃপ্তিও নেমে এল গাড়ী থেকে। তখনো চোখ থেকে ঘোর কাটেনি—কী যে ঘটছে ভালো করে বুঝতে পারছে না।

চাচা গাড়ীর ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলল, টেনে বের করলে অমিয়র ব্যাগটা। সেটা অমিয়র গায়ে ছুড়ে দিয়ে বললে, লো!

অমিয় হতভম্ব হয়ে বললে, মানে?

হঠাৎ বজ্রমুঠিতে চাচা অমিয়র ঘাড়টা চেপে ধরলে। কটু বিকৃত গলায় বললে, সমঝতা নেহি? তু আদমি ইয়া কুত্তা হো? চন্দন সিংকো সাথ্ আপনা বহিন্ কি সাদী দেনা চাহ্‌তা? রুপেয়াকো লিয়ে জানবর বন্ গেয়া?

—চাচা!

—চুপ রহো! —সেই বিরাট হাতের এক বিশাল চড় অমিয়র গালে পড়ল—যেন হাঁড়িফাটার মতো আওয়াজ হল একটা ঃ জান্‌তা নেহি, উস্‌কো খারাব বিমারী হ্যায়? পয়লা নম্বর বদমাস হ্যায় উ? অভি আপনা ইজ্জৎ লে কর্ ভাগ যাও। আগে টিশন হ্যায়। রাত উঁহা ঠহর যাও—সবেরে মে কলকাত্তা-জানেবালী বহুৎ গাড়ী মিল জায়গী!

চড় খেয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়েছিল অমিয়—তৃপ্তি কাঁপছিল থর থর করে।

কিন্তু চাচা আর অপেক্ষা করল না। অভ্যস্ত হাতের ছোঁয়ায় এঞ্জিন গুঞ্জন করে উঠল—তারপরে পঞ্চাশ মাইল বেগে যেন উড়ে চলে গেল সামনের দিকে। শেষবার আর একটা কর্কশ চিৎকার কানে এল ঃ আগে টিশন হ্যায়—

অমিয় অন্ধকার মাঠের ধারে বসে রইল নিথর হয়ে—তৃপ্তি বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল দূরের আলোগুলোর দিকে—সেগুলো তখন তার চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছিল।

'জান্‌তা নেহি, উসকো খারাব বিমারী হ্যায়?'

আর পাশের জলার ভেতর থেকে চাচার কর্কশ গলায় প্রতিধ্বনি বাজাছিল সমানে—সোনা ব্যাং ডাকছিল।—(ক্রমশঃ)

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে

কন্দর্প চৌধুরী

লাখ টাকার স্বপ্ন, বাস্তবিক ছেঁড়া কাঁথায় না শুয়ে দেখা সম্ভব কিনা বলা শক্ত। তবে বাংলা প্রবাদটিতে কাঁথাই একমাত্র শয্যাসঙ্গী। লেপের আরাম অবশ্যই কাঁথায় নেই, কিন্তু শয্যাসঙ্গী হিসেবে কাঁথা প্রিয়তর। কাঁথার একটা ঐতিহ্য আছে, সূচীশিল্পকৃতি ত আছেই। তাই দেখবেন কাঁথার গন্ধ আলাদা, কেমন নিজের পুরোনো বইটার মতই। এবং অতিচেনা একটা পুরুষানুক্রমিক ঘুমবহ গন্ধের ভিতরে ডুবতে ডুবতে মা ঠাকুমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোনো একমাত্র কাঁথার সঙ্গেই সম্ভব। অভিজ্ঞতাসুলভ একটি বাড়তি গুণও কাঁথার আছে। ঠিক অভিজ্ঞতার মতই, পুরোনো হলেও কাঁথার মর্যাদা এতটুকু কমে না। অন্য কোনো শয্যাউপাদানের এই আভিজাত্য নেই। সত্যি করে বলতে গেলে নতুন কাঁথারও কিছুই নতুন না। সাধারণতঃ নতুন কাপড় দিয়ে কেউই কাঁথা তৈরী করেন না, এমন কি সেলাই করার সুতোটাও পুরোনো শাড়ির পাড় থেকে নেয়া। গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে প্রস্তুত হলেও কাঁথাকে কুটীরশিল্পজাত পণ্যের মধ্যে ফেলা যাবে না। কারণ কাঁথাকে বাঙ্গালী পণ্য হিসেবে কখনো ব্যবহার করতে চায়নি। পারিবারিক প্রয়োজনের বাইরে কাঁথা রপ্তানীর উদাহরণ আগে খুঁজলে পাওয়া যেত না। তবে আজকাল লোকশিল্পের পেশাদার পৃষ্ঠপোষকদের জন্যে ঘরের জিনিস বাইরেও আসছে। কিন্তু ঠিক বিকৃত হবার জন্যেই কাঁথা বাজারে আসে, কারণ কেবলমাত্র আপন প্রিয়জনের জন্যেই, নির্মিত মমতার এক আশ্চর্য আচ্ছাদনের নাম ঃ কাঁথা। তাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা মানেই তাকে ঐতিহ্যচ্যুত করা।
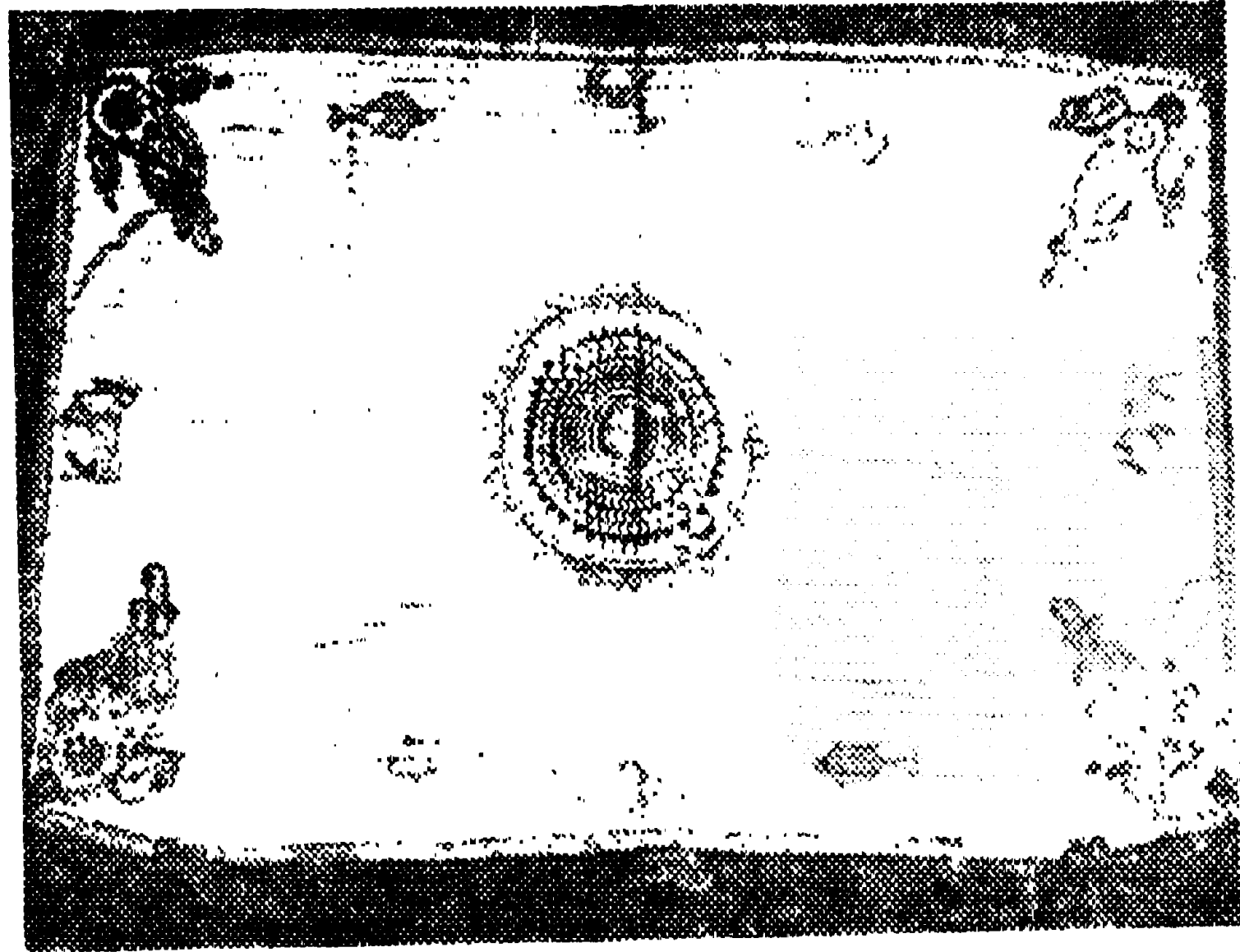
যদিও এই আচ্ছাদনটি নেহাৎই ঘরের বৌ-ঝিদের অতীব যত্নের প্রমাণ, তবুও এর জন্যে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন হয়নি। বাংলাদেশের প্রাচীন আমল থেকে পাশাপাশি দুটো সংস্কৃতি চলে এসেছে, গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতি এবং রাজসভা-কেন্দ্রিক নগর-সংস্কৃতি। বুদ্ধিজীবি শিল্পকলার প্রভাবে বাংলার লোক-শিল্পকলা কখনই বিশেষ প্রভাবিত হয়নি। এমন কি দুই ভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। কিন্তু কাঁথা, এবং সেই সঙ্গে আলপনাও সরল গ্রাম্য বধূর কল্পনার ফসল হলেও বুদ্ধিজীবী চারুকলার চেনা আত্মীয়। কাঁথার সৌন্দর্য তার সূচীকর্মের সুচারু নক্সায়। এই নক্সাটি কিন্তু কলাকৈবল্যের মানসিকতা সঞ্জাত না। কিংবা শুধু নক্সাই না গোটা কাঁথাটাই যেন নানা রঙের রূপকের সুতোয় আবদ্ধ। জীবন অনিত্য, পার্থিব সব কিছুই একদিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে কোন অন্ধকারে চলে যাবে—তাই কাঁথার উপাদানও অকিঞ্চিৎকর ছেঁড়া কাপড়, পুরোনো শাড়ির পাড়। সেলাইয়ের জন্যে যে মোট তিনটি রঙের সুতো ব্যবহার করা হয়, লাল, হলদে এবং কালো, এরা স্বতঃই সত্ত্ব, রজঃ এবং তম গুণের
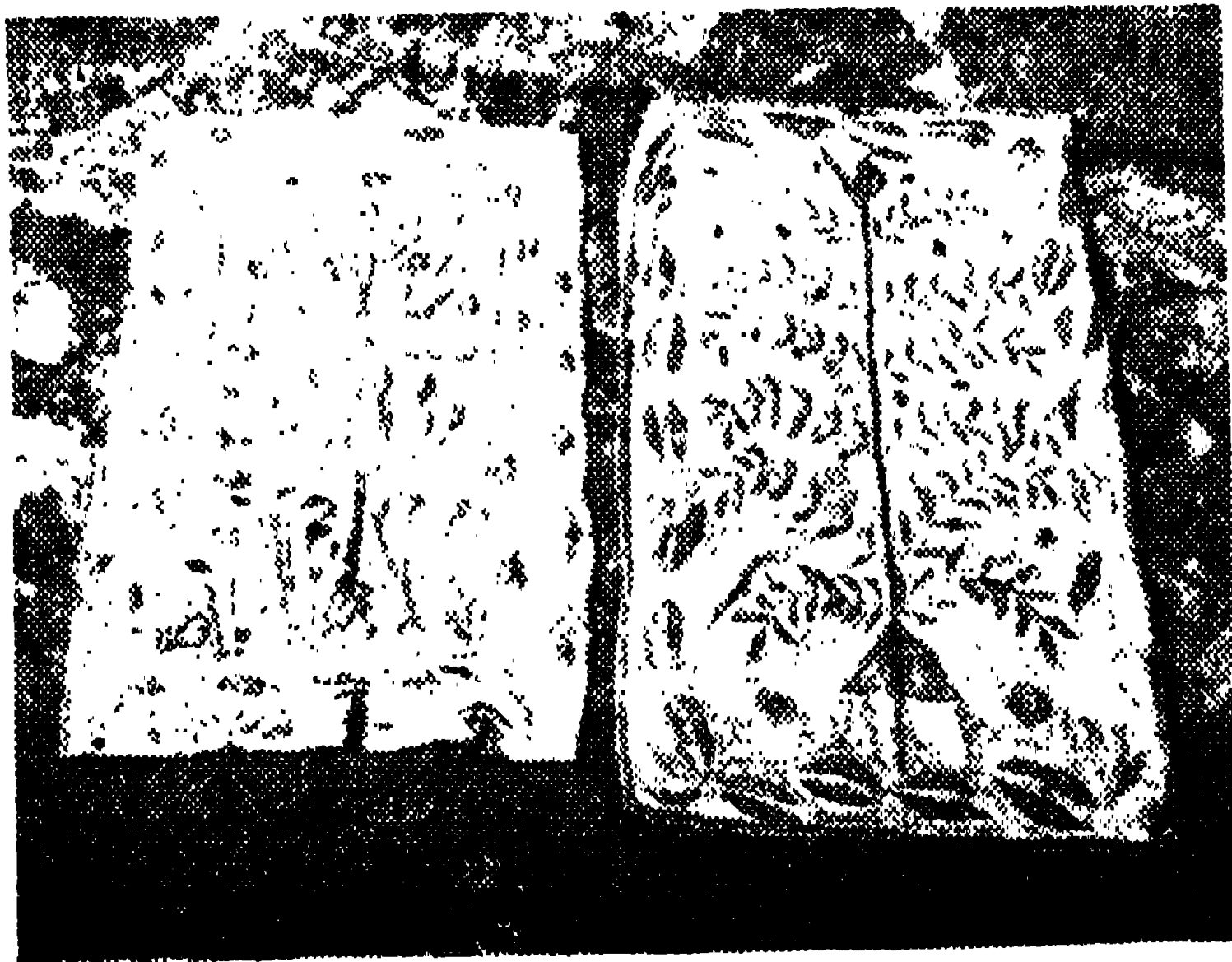
প্রতীক রেখা। কাঁথায় প্রায়ই পদ্মের নক্সা দেখতে পাওয়া যায়। কাঁথার পদ্ম কেন্দ্র-বিন্দুর চারধারে পাঁপড়ি মেলে দেয়। শতদল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, বিন্দুকে ঘিরেই তার আবর্তন। কারণ অনুপম ঋষি বাক্যটি হল সিন্ধুর স্বাদ বিন্দুতেই লভ্য। আবার এই পদ্মটিকে ঘিরে সাধারণতঃ গাছ, ঘোড়া, স্বস্তিকা প্রভৃতির নক্সা তোলা হয়। এই সব প্রতিটি নক্সাই কিছু না কিছুর প্রতীক, যেমন গাছ—জীবনের প্রতীক, অশ্ব—সূর্যের প্রতীক এবং স্বস্তিকা—চলমান জীবনের প্রতীক।

কাঁথার জন্মলগ্ন সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কোনো সময়ে নিহিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে কাঁথার একটা নিকট সম্বন্ধ ছিল। আচার্য কাটালিপার বৌদ্ধেয় কাহিনীর নীতি কথাটি কাঁথাকেন্দ্রিক। গল্পে আছে জনৈক ঝাড়ুদার একদা একটি ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে হাতে সূঁচ বিঁধে যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিল। তখন এক ডাকিনী এসে তাকে প্রশ্ন করল সামান্য একটা সূচাঘাতের ব্যথাই যদি তার অসহ্য হয় তার, তাহলে অন্যান্য পার্থিব যন্ত্রণার শরাঘাত সে কি কোরে সহ্য করবে। উক্ত কাহিনী অনুসারে শূন্যতাই হচ্ছে একমাত্র শাশ্বত অসীম। এবং এই অসীম শূন্যতায় শায়িত তিন ভুবনকে ঠিক কাঁথার মতই জ্ঞানের সুতো দিয়ে সেলাই করে অখণ্ড করে নিতে হয়।

কিন্তু এত সব চমৎকার ঐতিহাসিক সমাচার কাঁথা গায়ে দেবার সময়ে নিশ্চয়ই মনে আসে না, আর যদিই বা আসে ঘুমের হাত ধরেই আসে। কিন্তু শুধু ঘুমই না, আমার এক ডয়ে বিন্দু 'ড়' নিয়ে গবেষণাকারী বন্ধুর মতে, বৃষ্টি নাকি কাঁথারও সহচর। উক্ত বন্ধুটির গবেষণায় বৃষ্টি হলে আমরা বেশী মুড়ি খাই। বৃষ্টির দিনে কাপের চেয়ে খুরিতেই চা খেতে বেশী ভালো লাগে, খিচুড়ির স্বাদটিও বৃষ্টিবিধৌত। বৃষ্টির বিশেষণেও এমন কি, 'ড়' এর বর্ণাধিকার অনস্বীকার্য। উদাহরণ স্বরূপ সে 'ইলশেগুঁড়ি'র নাম করল। কিন্তু তার কথা এই নিবন্ধে উল্লেখ করতে হল তার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের জন্যেই। সম্প্রতি সে আবিষ্কার করেছে, একধরনের বৃষ্টি হলে গোয়েন্দা বইও পড়তে ভালো লাগে না, সিনেমা ভালো লাগে না, বান্ধবী-সঙ্গও বিষবৎ মনে হয়। সেই সব শ্রাবণ দিনে কাঁথা গায়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না করার। তেমন বৃষ্টির নতুন নাম ঃ কাঁথা-মুড়ি-বৃষ্টি!

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

তৃতীয় ও চতুর্থ ভোস্তকের পৃথিবী-প্রদক্ষিণ

তারিখ ও নামগুলো আরেক বার স্মরণ করা যাক। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে এক-নম্বর ভোস্তক ও য়ুরি গাগারিন। ১৯৬১ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে দু-নম্বর ভোস্তক ও ঘেরমান তিতোভ। ১৯৬২ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে তিন-নম্বর ভোস্তক ও আন্দ্রিয়ান গ্রিগোরিয়েভিচ নিকোলায়েভ। ১৯৬২ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে চার-নম্বর ভোস্তক ও পাভেল রোমানোভিচ পোপোভিচ। অর্থাৎ মাত্র ষোল মাসের মধ্যে চারজন সোভিয়েত নভোচারী নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছেন। অবশ্য শুধু এইটুকু বললে কৃতিত্বের পরিমাপ বোঝা যায় না। গাগারিন ও তিতোভের মহাকাশ-পরিক্রমা ছিল সম্পূর্ণ একক। নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের পরিক্রমা যুগল। গাগারিন মহাকাশে ছিলেন প্রায় দেড় ঘণ্টা, তিতোভ প্রায় পঁচিশ ঘণ্টা, নিকোলায়েভ পঁচানব্বই ঘণ্টা, পোপোভিচ একাত্তর ঘণ্টা। মাত্র ষোল মাসের মধ্যে মহাকাশ-পরিক্রমার এই আশ্চর্য সাফল্য ঘোর অবিশ্বাসীদেরও সন্দেহ-মুক্ত করেছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে অদূর ভবিষ্যতেই মানুষের গ্রহান্তর-যাত্রা শুরু হবে। সকলেই জানেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বাগাড়ম্বর বা প্রচার বিশেষ পছন্দ করেন না। কাজেই এই সংক্ষিপ্ত উক্তিকে একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে কয়েকটি লাইন এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"তৃতীয় ও চতুর্থ ভস্তক যান দুইটিকে একই কক্ষপথে একযোগে পরিক্রমার ব্যবস্থা এবং একযোগে একই স্থানে তাহাদের প্রত্যাবর্তন রুশ বিজ্ঞানীদের অতুলনীয় অগ্রগতির জ্বলন্ত উদাহরণ। গাগারিণ ও তিতোভের যানের তুলনায় এবারে নিকোলায়েভ এবং পপোভিচ আরও আরামে, আরও নিশ্চিন্তে তিন দিন তিন রাত্রি মহাকাশে বিচরণ করিয়াছেন, পরস্পরের সহিত বার্তা বিনিময় করিয়াছেন এবং মাটির পৃথিবীর সহিতও সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এই মহাকাশচারীদ্বয় যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই দুইজনের দুঃসাহসিকতা সমস্ত রূপকথাকেও হার মানাইয়াছে। চন্দ্র-অভিযানের পথে এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরেকটি নিশ্চিত পদক্ষেপ এবং মানবজাতি আশা করিতে পারে যে, সোভিয়েট বিজ্ঞান শতাব্দীর বৃহত্তম রোমাঞ্চকর অভিযানের সংবাদ তাহাদিগকে সর্বাগ্রে উপহার দিতে পারিবে। বস্তুত মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ে আমরা বাস করিতেছি। এ যুগের মানুষের ইহা একটি পরম সৌভাগ্য যে, মানুষের প্রতিভা দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করিবার এই অকল্পনীয় ঘটনা তাঁহারা জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।"

॥ যুগল পরিক্রমার উদ্দেশ্য ॥

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির উপ-সভাপতি আলেকজান্দার তোপচিয়েভ একটি বিবৃতিতে যুগল-পরিক্রমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। প্রায় একই কক্ষপথে দুটি ব্যোমযান স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিনটি: কক্ষ-পরিক্রমাকালে দুটি পৃথক ব্যোমযানের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব কিনা তা পরখ করে দেখা, মহাকাশচারী কর্তৃক যৌথভাবে বিশেষ একটি কর্মসূচী সম্পাদন; বিভিন্ন মনুষ্য-শরীরে একই ধরনের মহাকাশ-প্রক্রিয়ার ফলাফল পরীক্ষা। দুই ভোস্তোকের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পরে অবশ্যই বলা চলে যে এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেতারবার্তা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন দিগন্ত প্রসারিত হল। মহাকাশের দুই অবস্থানে দুজন মানুষের মধ্যে বেতার-যোগাযোগ এই প্রথম। স্পুৎনিকের যুগ শুরু হবার পর এতদিন পর্যন্ত বেতার-বার্তা পাঠানো হয়ে এসেছে পৃথিবী থেকে মহাকাশে বা মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে। মহাকাশ থেকে মহাকাশে বেতার-বার্তা পাঠাবার কোনো সুযোগ এতদিন পর্যন্ত ছিল না। ভবিষ্যতের মানুষে নক্ষত্রলোক থেকে নক্ষত্রলোকে এই-

ভারশূন্য প্রকোষ্ঠে অনুশীলনরত নিকোলায়েভ
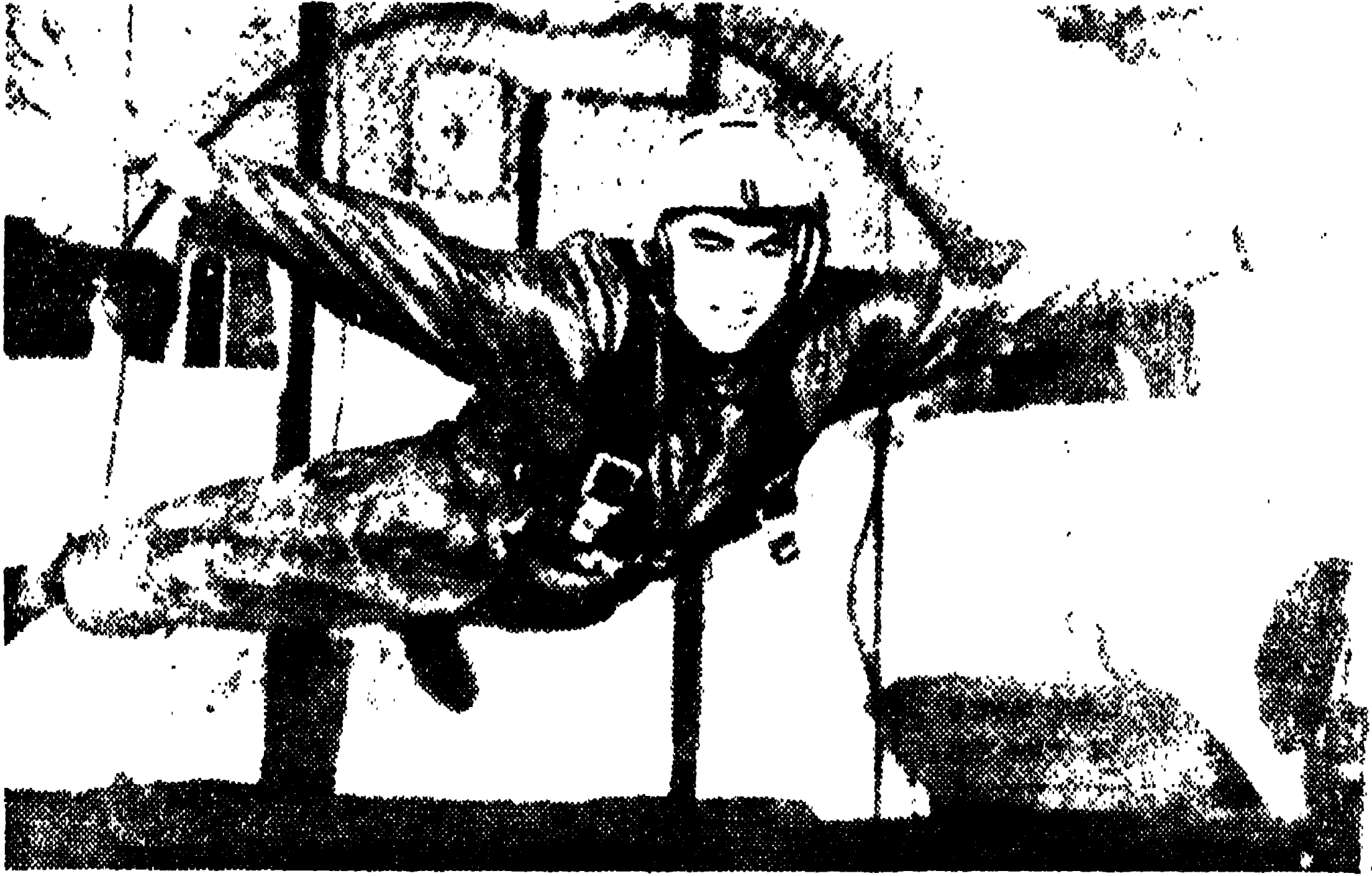
ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করবে কিনা, তা এখনো নিতান্তই অনুমানের ব্যাপার। কিন্তু সামান্যভাবে সূত্রপাত হলেও (কারণ তিন ও চার নম্বর ভোস্তোকের মধ্যে দূরত্ব ছিল দশ কিলোমিটারের চেয়েও কম) এই ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে কী আশ্চর্য সম্ভাবনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে তা এখনো হয়তো আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই ঘটনার একটি ফল হবে এই যে পৃথিবীর যে-কোনো স্টেশনের বেতার বা টেলিভিশন-বার্তা পৃথিবীব্যাপী সম্প্রচারিত হতে কোনো বাধা থাকবে না। মার্কিন বিজ্ঞানীদের টেলস্টার-এ এই ভবিষ্যতেরই সূত্রপাত প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

কয়েকটি তথ্য

তিন-নম্বর ভোস্তোকের মহাকাশ-যাত্রা শুরু ১৯৬২ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে মস্কো সময় সকাল ১১-৩০ মিনিটে। আর পৃথিবীর মাটিতে প্রত্যাবর্তন ১৫ই আগস্ট তারিখে সকাল ৯-৫৫ মিনিটে। প্রায় ৯৫ ঘণ্টাব্যাপী কক্ষ-পরিক্রমায় তিন-নম্বর ভোস্তোক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে ৬৪ বার, দূরত্ব অতিক্রম করেছে ২৬,০০,০০০ কিলোমিটার।

চার-নম্বর ভোস্তোকের মহাকাশ-যাত্রা শুরু ১৯৬২ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে মস্কো সময় সকাল ১১-০২ মিনিটে। আর মাটিতে প্রত্যাবর্তন ১৫ই আগস্ট তারিখে সকাল ১০-০১ মিনিটে। ৭১ ঘণ্টাব্যাপী কক্ষ-পরিক্রমায় চার নম্বর ভোস্তোক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে ৪৮ বার আর দূরত্ব অতিক্রম করেছে ২০,০০,০০০ কিলোমিটার।

তিন-নম্বর ভোস্তোকের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সময় ছিল ৮৮·২ মিনিট, চার-নম্বরের ৮৮·৩ মিনিট।

কক্ষপথে তিন-নম্বরের পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব ছিল ২২৭·৬ কিলোমিটার, চার-নম্বরের ২৩৪·৮ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কম দূরত্ব ছিল তিন-নম্বরের ১৭৬·৬ কিলোমিটার, চার-নম্বরের ১৭৭·৯ কিলোমিটার।

তিন-নম্বরের কক্ষ রচিত হয়েছিল পৃথিবীর বিষুব-সমতলের ৬৪·৫৯° কোণাকুণি, চার-নম্বরের ৬৪·৫৭° কোণাকুণি।

দুই ভোস্তোকের কক্ষ-পরিক্রমার সময়ে দুই মহাকাশচারীর ছবি একাধিক বার সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় টেলিভিশন-ব্যবস্থায় প্রচারিত হয়েছে। ব্যোমযানের কক্ষে ভারশূন্য অবস্থায় মহাকাশচারীরা কি-ভাবে কাজকর্ম করেছেন তা টেলিভিশনের পর্দায় সারা দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন।

মহাকাশে অবস্থানকালে দুজনেই পৃথিবীর স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেছেন, স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়েছেন, যথানিয়মে ব্যায়াম ও নিত্যকর্ম সমাধা করেছেন এবং এমন কি প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্যোমযানের কক্ষে চলাফেরা করেছেন। ব্যোমযানের প্রত্যেকটি যন্ত্র নিখুঁতভাবে কাজ করেছে এবং ব্যোমযানের কক্ষের তাপমাত্রা ও চাপ কোনো সময়েই নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকায় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দুটি ভোস্তোকেরই যাত্রা-শুরুর সময়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এই বিবরণী থেকে কিছু-কিছু অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি।

"ভোর হল। আজই শেষ দিন। একটু পরেই যাত্রা শুরু হবে। মহাকাশ-চারীরা ঘুম থেকে ওঠেন সবার আগে। তাঁদের দিনযাপন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা—তার একচুল এদিক-ওদিক হয় না। অনেকেরই এখনো প্রাতরাশ শেষ হয়নি। কিন্তু মহাকাশচারীরা ইতিমধ্যেই প্রাত্যহিক অনুশীলন সমাধা করে এসেছেন। নিকোলায়েভের পরনে হালকা ছিটের শার্ট ও স্ল্যাক। তাঁকে দেখে মনে হতে পারে তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন, তাঁর চোখেমুখে কঠোরতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা নয়। তাঁর ভুরু দুটি এত ঘন ও কালো যে মনে হয় তিনি সব সময়ে ভুরু কুঁচকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টিটাই এমন যে মনে হয় তা অন্তর্ভেদী। আসলে মানুষটি কিন্তু খুবই দিলখোলা ও মিশুকে। রকেট-ঘাঁটির দিকে যাত্রার সময় হল। সবাই প্রস্তুত।"

যাত্রা শুরু করার আগের চব্বিশটি ঘণ্টা নিকোলায়েভ কাটিয়েছেন বিশেষ একটি কুটিরে। রকেট-ঘাঁটিতে যাবার পথে এই কুটিরটিকে বলা চলে মহাকাশ-যাত্রীর সরাইখানা। ইতিপূর্বে এই একই কুটিরে পুরো এক-একটি দিন কাটিয়ে গিয়েছেন গাগারিন ও তিতোভ। সেই একই ঘর। তফাৎ শুধু এই যে নিকোলায়েভের বিছানার পাশে রয়েছে আরো দুটি বিছানা। একটিতে গাগারিনের ছবি। অপরটিতে তিতোভের। ঘরের দেওয়াল নীল কাগজে মোড়া। ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল—টেবিলের ওপরে ফুল, একটি কবিতার বই, দাবাখেলার সরঞ্জাম ও কয়েক বাক্স টেপ-রেকর্ডিং।

পরদিন এই একই ঘরে মহাকাশ-যাত্রার আগের চব্বিশটি ঘণ্টা কাটাতে এলেন পাভেল পোপোভিচ। একটু আগে নিকোলায়েভ এই ঘরটি ছেড়ে গিয়েছেন। গাগারিন ও তিতোভের পাশে এবারে তাঁরও একটি প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে। মনের খুশিতে পাভেল পোপোভিচ গান গেয়ে উঠলেন। আর চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাঁরও একটি প্রতিকৃতি এই ঘরটিতে শোভা পাবে। ভবিষ্যতের একটি ছবিও তাঁর চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। যেদিন মহাকাশ-যাত্রীদের প্রতিকৃতিতে ভরে উঠবে এই ঘরটি।

বিবরণীটি শেষ হয়েছে এইভাবে ঃ "হঠাৎ রকেটঘাঁটিতে প্রচণ্ড একটা উল্লাস শোনা গেল। এইমাত্র খবর পাওয়া গিয়েছে যে ভোস্তোক-৩ ও ভোস্তোক-৪ একে অপরের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। নিকোলায়েভ পোপোভিচের উদ্দেশে বার্তা প্রেরণ করেছেন এবং পোপোভিচ তার জবাব দিয়েছেন।"

এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকদের বললেন, "পৃথিবীর আকাশে এখন দুটি সোভিয়েত ব্যোমযানের পরিক্রমা শুরু হয়েছে। দুটি ব্যোমযানের মধ্যে যোগা-যোগ স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েত যন্ত্রবিদ্যার এই সাফল্য খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে এই সাফল্যের বড়ো রকমের ভূমিকা থাকবে এবং বিশেষ করে আন্তঃ-গ্রহ ঘাঁটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যাপারটি অতঃপর আর সমস্যা বলে গণ্য হবে না।"

শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র—মহাকাশ

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে ভোস্তোক-৩ ও ভোস্তোক-৪ থেকে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপন রাখা হবে না। অন্যদিকে, এই দুটি ভোস্তোকের মহাকাশ-পরিক্রমা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে স্বতোৎসারিত অভি-নন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কেনেডিও এই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন। এমন কি ধর্মগুরু পোপের বাণীতেও মহাকাশ-চারীরা অনুল্লিখিত থাকেননি। বিখ্যাত

ইতালীয় বিজ্ঞানী এবং প্যারিসের আন্তর্জাতিক নভোচারণবিদ্যা আকাদেমির সদস্য অধ্যাপক মার্গারিয়া বলেছেন যে বিপুল মহাবিশ্ব হয়ে উঠুক শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান শিবিরগুলির আপোস-মীমাংসার পটভূমি। তিনি আরো বলেছেন, নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের মহাকাশ-পরিক্রমা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে দীর্ঘকালীন মহাকাশ-যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এই মুহূর্তেই হতে পারে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রেখেই মানুষের পক্ষে দীর্ঘকাল মহাকাশে অবস্থান করা সম্ভব।

সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও জনসাধারণের উদ্দেশে শান্তির প্রতি অঙ্গীকার ঘোষণা করার আবেদন জানিয়েছেন। আমরাও আশা করব, বিজ্ঞান ও টেকনোলজির এই সর্বশেষ সাফল্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি গড়ে তুলবে এবং পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠবে প্রকৃতিকে জয় করার "অকল্পনীয় ঘটনার" নায়ক। ভোস্তোক এই আশ্চর্য ভবিষ্যতেরই সূচনা।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

এরই মধ্যে একদিন—একেবারে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মতো তরু এসে হাজির।

ভোরবেলা, সবে শ্যামা কাপড় কেচে এসে পাতার জ্বালে ছেলের ভাত চড়িয়েছেন, কনক উঠে ছড়া-ঝাঁট দিচ্ছে, অশ্রুমুখী মেয়ে এক কাপড়ে এসে দাঁড়াল।

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল শ্যামার।

জন্মের পর মোট নটি বছর নিশ্চিন্ত ছিলেন শ্যামা, যতদিন না বিবাহ হয়েছিল। তারপর দশ বছর বয়সে সেই বিবাহের পর থেকে—সারা জীবনই তাঁকে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে। দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ শুনতে হয়েছে শুধু। এইতেই অভ্যস্ত তিনি। আকস্মিক, অভাবনীয় কোন ঘটনা ঘটলেই তিনি জানেন একটা বড়রকম দুর্ঘটনার সামনে দাঁড়াতে হবে এবার।

আজও সেই রকমেরই একটা বড় কিছু শোনবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখনও খুব বেশীদিন হয়নি, এমনি ভোরবেলা, এমনি কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে এসে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, স্বামীর কাল-ব্যাধির সংবাদ নিয়ে। এও সেই ভোর-বেলা। এরও চোখে জল।

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন শ্যামা। কোন প্রশ্ন পর্যন্ত মুখ দিয়ে বেরোল না।

কনকই গোবরজলের বালতি নামিয়ে ছুটে এসে ওর হাত ধরলে। 'একী ঠাকুরঝি। এ কী অলক্ষণ। ভোরবেলা এমনভাবে—। কী হবে মা। এসো এসো, বসো এসে! কী হয়েছে কি?'

হাতধরে নিয়ে এসে বসাল সে রান্নাঘরের দাওয়াতেই।

'কী হয়েছে রে? জামাই, জামাই ভাল আছেন তো?'

এতক্ষণে স্বর বেরোয় শ্যামার কণ্ঠ দিয়ে। স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ও বিকৃত একটা স্বরই বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে।

'সে ভাল আছে।' কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে তরু।

'তবে? তুই একা, এ ভাবে?'

হেম রান্নাঘরেই শোয়, সে এতক্ষণ আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে একটু আলস্য করছিল, ভাতের ফ্যান উথলে উঠলেই মা ডাকবেন, তখন উঠে স্নান প্রাতঃকৃত্য সারতে যাবে। মায়ের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সেও ছুটে বেরিয়ে এল। সেও আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রথমটা।

এভাবে প্রশ্ন করলে তরুর পক্ষে কিছুতেই সব কথা খুলে বলা সহজ হবে না তা বুঝে কনক একেবারে ওর পাশে বসে ওর হাত দুটি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে রাগারাগি করে চলে এসেছ বুঝি?'

মাথা হেঁট ক'রে আরও অস্পষ্ট অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে তরু, 'সে জানে না। আমি যখন এসেছি তখনও ঘুমোচ্ছে!'

যাক্। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল এতক্ষণে শ্যামার। তবু ভাল। জামাইয়ের কিছু হয়নি। চরম বিপদ অন্তত নয়।

হেমই এবার তাড়া দিয়ে উঠল, 'সে জানে না, তবে তুই এমনভাবে এলি কেন? কী হয়েছে কি?'

'আমি—আমি আর ওখানে ঘর করতে পারব না। আমি তা হ'লে মরে যাব। ও বুড়ি আমাকে মেরে ফেলবে!'

কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় কথা কটা বলে ডুকরে কেঁদে উঠল তরু।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল সকলে, বেশ কিছুক্ষণ। ওকে সান্ত্বনা দেবার কি আশ্বাস দেবার চেষ্টামাত্র কেউ করতে পারলে না। এমন কি কনকও না। কিছু-ক্ষণের জন্য যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেল সকলের চেতনা। ঠিক কি শুনছে, ঠিকমতো শুনছে কি না, এ থেকে কতটা খারাপ অনুমান করতে হবে—তা বোঝবার মত শক্তি রইল না কারুর।

সম্বিৎ শ্যামারই ফিরে এল সকলের আগে। কিন্তু তিনিও কথা কইতে পারলেন না, শুধু পাগলের মতো সজোরে নিজের ললাটে করাঘাত করতে লাগলেন। যেন এই কপালটা সত্যিই ভেঙে ফেলতে পারলে তিনি বাঁচেন, অব্যাহতি পান।

সেই কোন সুদূর অতীতে শুরু হয়েছে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আজও কি শেষ হল না? আজও কি ক্লান্ত হলেন না সেই অদৃশ্য দণ্ডদাতা! কী এত পাপ করেছিলেন আগের জন্মে যা

জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিভৃতে বসে—কেউ কি বাধা দেবার ছিল, না, কেউ ছিল না নিষেধ করবার।

তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়েরাও?

তারাও কি বসে বসে তাঁর সঙ্গে শুধু পাপই ক'রে এসেছে আগের জন্ম-ভোর?

না, এ তাঁরই পাপ। তাঁরই অন্যায় হয়েছে ওদের পৃথিবীতে আনা। তাঁরই বোঝা উচিত ছিল যে তাঁর রক্ত যেখানে এক ফোঁটাও আছে, কেউ সুখী হবে না। কেউ না।

একমাত্র অন্যথা হচ্ছে তাঁর বড় মেয়ে—অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত। তাও তার অদৃষ্টে কী আছে এর পরে তা কে বলতে পারে?

তাও, বড় মেয়ের বিয়েটাও দিয়েছিলেন শ্যামা অত্যন্ত ভয়েভয়ে; বিয়ে দেবার সময় আর তার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নানা উদ্বেগ আর আশঙ্কায় কন্টকিত ছিলেন। তাঁর জীবনে এমনিতেই বিবাহ সম্বন্ধে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁর আর তাঁর যমজ বোন উমার বিবাহ নিয়ে—তাতে বিবাহ সম্বন্ধে আতঙ্কের ভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহাশ্বেতার বিয়েটাই সবচেয়ে ভাল দাঁড়িয়ে গেছে; জামাইয়ের তো কথাই নেই, অমন জামাই লোকে তপস্যা ক'রেও পায় না—শাশুড়ি জা শ্বশুরবাড়ির অপরাপর লোকজন সম্বন্ধেও শ্যামার অন্তত কোন নালিশ নেই। এমন নির্বিবাদী ও নির্ঝঞ্ঝাট কুটুম-বাড়ি লোকে কদাচিত পায়। মহাশ্বেতা যাই বলুক, শ্যামা তাঁর জীবনে অনেক দেখলেন, তিনি জানেন বহু ভাগ্যেই এমন শ্বশুরবাড়ি পেয়েছে তাঁর বড় মেয়ে।

মেজমেয়ে ঐন্দ্রিলার বিয়ে দিয়েই সবচেয়ে সুখী আর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামা। মাধব ঘোষাল দৈবাৎ মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেচে সেধে নিয়ে গিয়েছিলেন পুত্রবধূ করে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন কোন রকম অযত্নও হতে দেন নি সে বধূর। আর জামাই হরিনাথ তো ছিল স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা পাড়া-ঘরে একটা গল্পের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এমন মিল কখনও সখনও চোখে পড়ে। কদাচ কখনও শোনা যায়। অন্তত শ্যামা তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে কখনও শোনেন নি এটা ঠিক।

কিন্তু মেয়ের কপাল। বোধহয় ওর জন্মলগ্নে সবগুলি কুগ্রহ একসঙ্গে বাসা বেঁধে ছিল নইলে এমন হবে কেন? দুর্দিনের জ্বরে বলতে গেলে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল শ্বশুর, স্বামীর ধরল রাজযক্ষ্মা। যেন গ্রামসুদ্ধ দুর্ভাগিনীর ঈর্ষার নিঃশ্বাসেই স্বামী-সৌভাগ্য জলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। সদ্যজাত শিশু সন্তান নিয়ে এসে উঠল তাঁর বাড়ি—শুধু বিধবা হয়েই নয়, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে। জামাইয়ের ঐ সাংঘাতিক অসুখের সময় দিশাহারা মেয়ে চিকিৎসার খরচের জন্য যথাসর্বস্ব লিখিয়ে দিয়েছে ওদের নামে—অর্থাৎ দেওরদের নামে। চিরদিনের গর্বিতা মেয়ে তার, রূপসী স্বামী-সৌভাগ্যবতী—আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। ওর যে কী জ্বালা তা শ্যামা বোঝেন, অহর্নিশ সেই জ্বালায় নিজে জ্বলছে আর ওর চারিদিকে যারা আছে তাদের জ্বালাচ্ছে। সে জ্বালায় শ্যামাও দগ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি!

তবু, ছোট মেয়ে তরুর বিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামা। অবশ্য সতীনের ওপর বিয়ে দেওয়া—কিন্তু তরুর বুড়ি দিদিশাশুড়ি অনেক জমি-জায়গা দিয়ে সে বৌয়ের কাছ থেকে না-দাবিনামা লিখিয়ে রেজেষ্ট্রি করিয়ে একেবারে পাকা ক'রে নিয়েছেন। সে দলিল শ্যামা দেখেছেন, অক্ষয় সরকার উকীল দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছেন সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই। বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট, ছেলেও চাকরী করে। যাকে বলে আল-সোল নেই তাই। এক বুড়ি ঠাকুমা, সে যেকোন দিন চোখ বুজবে। তারপর একেবারেই নিষ্কন্টক। মেয়ে-জামাইয়ের ভাবও হয়েছে বেশ, তাও তিনি টের পেয়েছেন ওদের কথাবার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে।

কিন্তু সে সব আশাভরসা ধূলিসাৎ করে দিয়ে এ কী হ'ল!

অকস্মাৎ কী এমন ঘটল যে তরুকে পালিয়ে চলে আসতে হল?

শ্যামা ওকে কোন প্রশ্নও করতে পারলেন না। ললাটে আঘাত করে করে অবসন্ন হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিলেন।

প্রশ্ন করল কনকই, আস্তে আস্তে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন ক'রে ক'রে—কিছুটা বা ওকেই বলবার অবকাশ দিয়ে আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা বার ক'রে নিল।

বুড়ি যে পরিমাণ ভালবাসে হারাণকে, সেই পরিমাণই তার সম্বন্ধে ওর আশঙ্কা। বৌ এসে পর করে নেবে—বাংলাদেশের চিরকালীন আশঙ্কা শাশুড়িদের, কিন্তু এ আরও উগ্র, আরও ভয়ঙ্কর। যদিও এ দিদিশাশুড়ি—তবু সাধারণ শাশুড়ির চেয়েও যেন বেশী। কারণ সব হারিয়ে ওর এই হারাণ। হারাণও যদি পর হয়ে যায় তো তাকে দেখবে কে? এই কারণে এদিকটা সম্বন্ধে সে সদা-সতর্ক, সদা-জাগ্রত।

শুধু হারাণকে হারাবারই ভয় নয়—আরও একটা অদ্ভুত ভয় ইদানীং পেয়ে বসেছে বুড়িকে। বিষয়-সম্পত্তি হারাণের পৈত্রিক নয়, বুড়ির নিজস্ব। বুড়ি হারাণের বাবার জেঠাইমা। সম্পত্তি সেই পিতামহের স্বক্রীত। একটা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা পরের মেয়ে তাঁর এই সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক হয়ে বসবে—হয়ত বা উড়িয়ে দেবে নষ্ট করবে—এই ভেবে ভেবেই বুড়ি প্রায় পাগল হ'তে বসেছে। সম্পত্তি এমন কিছু নয়, ন'বিঘে বাগান ভদ্রাসন এবং বারো বিঘে আন্দাজ ধান-জমি। আরও কিছু ছিল, সে বৌকে দিয়ে হাতছাড়া হয়েছে। এছাড়া আছে বুড়ির কিছু গহনা, এবং সম্ভবতঃ কিছু নগদ টাকা। তবে সেটা আছে কি না এবং থাকলেও ঠিক কত তা হারাণও জানে না। পোষ্ট অফিসে শ'পাঁচেক টাকা পড়ে আছে—কিন্তু সে টাকা বুড়িকে কখনও তুলতে হয় না, অথচ কিছু কিছু খরচ সে নিজেও করে—তাইতেই হারাণের ধারণা যে বেশ কিছু আছে।

তবু এই সম্পত্তির ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তার এমন মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত হাওড়ার কাছ থেকে কোন এক তান্ত্রিককে আনিয়েছিল 'যক' দেবে বলে। সে সম্পত্তির পরিমাণ এবং বিবরণ শুনে হেসে চলে গেছে, তিরস্কারও করে গেছে খুব—তার সময় নষ্ট করাবার জন্য, বলে গেছে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ না করলে এ ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়া হয় না। একটি ব্রাহ্মণ বালক চাই, তাকে খুনের দায়—এ কি সোজা কথা নাকি?

তারপর থেকেই বুড়ি নাকি আরও ক্ষেপে গেছে।

অবশ্য তার আগেও, সে বৌয়ের ওপরও অত্যাচার নাকি কম করেনি। সে বাপমায়ের আদুরে মেয়ে সহ্য করতে না পেরেই নাকি বাপের বাড়ি চিঠি লিখে পালিয়ে যায়। এসব কথা পুকুরে স্নান

করতে বা বাসন মাজতে গিয়ে পাড়ার অন্য মেয়েদের কাছে শুনেছে তরু। অনেকেই বলেছে—এক কথা। সুতরাং খানিকটা সত্য আছেই।

আর, তা-ছাড়া, সে সম্বন্ধে হারাণও সচেতন। এর আগে এ ধরণের ঘটনা না ঘটলে সে-ই বা এত সতর্ক হবে কেন? সে যতদিন সতর্ক ছিল ততদিন এতটা বাড়াবাড়ি তো হতে পারেনি।

কী সতর্কতা? কনকের প্রশ্নের উত্তরে লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা নামিয়ে সেকথাও বললে তরু। সেও যেমন বিচিত্র তেমনি হাস্যকর।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম হারাণ বৌ সম্বন্ধে খুব উদাসীন নিরাসক্তভাব দেখিয়েছিল। তরুকে ঠাকুমার কাছে শোওয়াবার প্রস্তাব করেছিল। অন্যথায় তিনজনাই একসঙ্গে শোবে এমন প্রস্তাবও করেছিল। বুড়ি ভারী খুশী, সে-ই তখন জোর করে বৌকে হারাণের ঘরে পাঠিয়ে দিত প্রতিরাত্রে। তবু এখনও হারাণ বৌয়ের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা কইত না। তরু প্রথমটা ওর ব্যবহারে একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল। ছোটমাসীর কাহিনী সে মার মুখে, মেজদির মুখে অনেকবার শুনেছে। বিয়ে করেছিল মেসোমশাই নাকি শুধু তার মার সংসারে খাটবার জন্য, নিজে এক-বারের জন্যও গ্রহণ করেনি স্ত্রীকে। সুন্দরী উমা অনাঘ্রাতা থেকেই ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেল। স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করা আর হ'ল না। অথচ এমনিতে সে মেসোমশাই নাকি খুব ভদ্র, ওদের বাবার মতো নয়।

সে যাই হোক—হারাণ শিগ্গিরই তার ভয় ভেঙে দিলে। একদিন একটা চিঠি লিখে ওকে জানিয়ে দিলে যে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু এখন কয়েকটা দিন ওদের প্রেম এবং প্রেমালাপটা একটু সংযত হয়ে যতটা সম্ভব সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে করতে হবে এই মাত্র। বুড়ির ভিমরতি হয়ে মাথাটা একটু খারাপ-মতো হয়েছে; সুতরাং সাবধান থাকাই ভাল। বুড়ি আর কদিন? এই কটা দিন তরু যেন মানিয়ে নেয়, আর কিছু মনে না করে!

তবু তখনও হারাণের আচরণের পুরো অর্থটা ওর বোধগম্য হয়নি। হারাণও পরিষ্কার করে বলেনি যে বুড়ির ভিমরতির সঙ্গে ওদের নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে প্রেমালাপ করার কী সম্পর্ক। বোধ হয় লজ্জায় বেধেছিল, কেলেঙ্কারিটা পুরোপুরি নববধূকে খুলে বলতে। কিন্তু পরে তরুই আবিষ্কার করেছিল। বুড়ি প্রত্যহ ওদের ঘরে আড়ি পাতত। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কতদূর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হচ্ছে সেটার খবর রাখত।

সবই জানত হারাণ কিন্তু মানুষের সহ্যেরও সীমা আছে। স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতাটা সম্পূর্ণ ঢাকা সম্ভব নয়। ইদানীং ওরা একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। একটু চালাকিও করতে গিয়েছিল। প্রথমরাত্রে দু'একটা শুষ্ক প্রয়োজনীয় কথা বলে দুজনেই কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে হারাণ নাক-ডাকাবারও চেষ্টা করত, তারপর একবার ঘাটে যাবার অছিলায় দেখে আসত বুড়ি জেগে আছে কি না—বুড়ি ঘুমিয়েই পড়ত ততক্ষণে—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে গল্প করত।

কিন্তু বুড়ি আরও চালাক। সে তরুর চোখের দিকে চেয়েই সন্দেহ করত ব্যাপারটা। তার বয়স হয়েছে ঢের। মনের খুশী যে চোখের চাহনিতে অকারণেই উপচে পড়ে এটা সে জানে। তাছাড়া রাত্রি-জাগরণের কালিও চোখের কোণে ঢাকা কঠিন। বুড়ীও তাই ইদানীং প্রথম রাতটা মটকা মেরে পড়ে থেকে গভীর-রাত্রে উঠে এসে আড়ি পাতত। তারপরই অত্যাচার চরমে উঠল। এবং সর্বশেষ—শ্যামারাও খবরটা এই প্রথম জানল—তরু গর্ভবতী হয়েছে টের পেয়ে যেন পুরো-পুরি পাগল হয়ে গেল। হারাণ ভেবেছিল বুড়ি বংশরক্ষা হচ্ছে ভেবে, খুশী না হোক—একটু চেপে থাকবে, কারণ তারও জলপিণ্ডির ব্যবস্থা আর নেই। সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল পরোক্ষভাবে—তাতে হিতে বিপরীত হ'ল। তাহলে সবাই তার মরণের কথাই চিন্তা করছে, 'মরণ টাকছে' ভেবে ক্ষেপে উঠল। আগে গায়ে হাত তুলত না, এই-বার মারধোর শুরু করল। আর গালাগাল তো অষ্টপ্রহর। এমন অকথা, কুকথা নেই যা বলে না। দিনেরাতে সদাসর্বদা তরুর পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করছে।

এও সয়েছিল তরু কিন্তু গত সাত-আটদিন খাওয়ায় হাত দিয়েছে বুড়ি। ভাত বেড়ে খেতে বসেছে দেখলেই হয় ভাতের থালা টানমেরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নয়ত পুকুরে দিয়ে আসে। হাঁড়িসুদ্ধ ভাত গোরুর ডাবায় ঢেলে দেয়। একদিন ভাতের থালা জোর করে চেপে ধরে ছিল—নড়াতে পারে নি—ছাই এনে পাতে ফেলে দিয়েছে। কদিনই বলতে গেলে ওর খাওয়া নেই।

'তা ঠাকুরজামাই কি এসব টের পান না?' কনক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকার পর অতিকষ্টে প্রশ্ন করে। তার চোখেও তখন জল এসে গিয়েছে এইসব শুনতে শুনতে। আরও, নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রেই হয়তো।

'কেন পাবে না। আমি তাকে কাগজে লিখে লিখে সব জানিয়েছি। সে শুধু বলে—আর একটু! দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাকো। এবার পুরো ভীমরতি ধরেছে, শিগ্গিরই মরবে বুড়ি।......আসলে সেও বুড়িকে ভয় করে। তারও ঐ বিষয়ের ভয়। এতদিন এত কষ্ট সহ্য করল, দুদিনের জন্যে যদি সুবসুদ্ধু যায়। বুড়ি যদি ছন্নমতি হয়ে আর কাউকে লিখে দিয়ে যায়! এই ভয়েই গেল। আমি তাও বলেছি, চল আমরা চলে যাই, কোথাও একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকব, তুমি যা আনবে তাইতেই চালাব। তা শিউরে ওঠে, বলে, বাপ্রে, এতটা সম্পত্তি দুটোদিনের জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাবে!'

'তারপর? আজ কী হ'ল তাই বলু না!' অসহিষ্ণু হেম প্রশ্ন করে।

ওদিকে মুখ ফিরিয়ে তরু বলে, 'পর পর দু'দিন খাওয়া হয়নি শুনে পরশু রাত্তিরে পকেটে করে দুটো সন্দেশ এনেছিল। রাতে সেই সন্দেশ খেয়ে দালানে জল খেতে বেরিয়েছি—বুড়ি নিজের ঘর অন্ধকার করে জানলায় বসে ছিল, সব দেখেছে। কাল ভোরবেলা যে-ই আমি ঘাটে গিয়েছি বুড়ি ঘরে ঢুকেই ওর পকেটে হাত দিয়েছে। এসব দিকে আশ্চর্য মাথা এখনও বুড়ির। সকালে বাজার করার সময় বেরিয়ে পাঁদাড়ে ফেলে দেবে বলে শালপাতার ঠোঙাটা পকেটেই রেখেছিল—বুড়ি টেনে বার করল। তখন সটেপটে চেপে ধরতে ওকেও মানতে হ'ল কথাটা। তখন তো ছড়া বেঁধে গালাগাল দিলেই—তারপর ও বেরিয়ে যেতে একটা ছুতো করে বললে, আমি পুলিশে যাব, তোরা আমাকে বিষ দিয়ে মারছিস। এর মধ্যে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেছল—সেই থেকে মধ্যে মধ্যে ধুয়ো তোলে তোরা আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছিস। তা আমি পুলিশে যাবার কথায় আর থাকতে পারিনি, বলেছিলাম যান না পুলিশে, কত ধানে কত চাল একবার দেখুন না। যা নির্যাতন করছেন আমায় তা পাড়াঘরের সবাই জানে, দেখবেন আপনার হাতেই [illegible]

পড়বে।......এই বলে কি—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোর ঐ জিভ আমি আজ টেনে বার করব। এই বলে সাঁড়াশি টকটকে করে পুড়িয়ে এনেছিল জিভ টানবে বলে, আমি কোনমতে হাত এড়িয়ে ছুটে বাইরে চলে এসেছিলুম কিন্তু সেই সাঁড়াশি আমার বুকে লেগে কী কাণ্ড হয়েছে দ্যাখো—'

বলতে বলতে আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তরু। তারপর দাদার দিকে পেছন ফিরে বুকের জামা সরিয়ে বৌদিকে দেখাল—এতবড় একখানি ফোস্কা পড়ে আছে তখনও, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

দেখেছিলেন শ্যামাও, তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন আর একবার। শুধু কনকই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'তারপর? তা তখনই চলে এলে না কেন?'

সে কথাও বলল তরু, কোনমতে থেমে থেমে, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে, একটু একটু করে।

সে সময় আর তার কোন জ্ঞান ছিল না। ভয়ে যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে পাশের দত্তদের বাড়ি আছড়ে পড়েছিল সে। দত্তগিন্নী নারকেল তেল লাগিয়ে বাতাস ক'রে একটু সুস্থ করে তুলেছিলেন। তৃষ্ণায় তখন সমস্ত ভেতরটা ওর শুকিয়ে গেছে বুঝে একঘটি বাতাসার সরবতও করে দিয়েছিলেন। তাঁকেই বলেছিল তরু এখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে কিন্তু দত্তগিন্নী তা শোনেননি। ওকেও ছাড়েননি। আশ্বাস দিয়েছিলেন 'তোমার সোয়ামী আসুক, এমন কেলেঙ্কারী শুনলে কি আর একটা বিহিত করবে না? ফট্ করে অমন এক কথায় শ্বশুরঘর ছেড়ে যেতে নেই মা!'

তরুও তাই আশা করেছিল। ভেবেছিল এবার অবস্থা চরমে উঠেছে জানলে—এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে—নিশ্চয়ই তার চৈতন্য হবে। হারাণ অফিস থেকে ফিরছে দেখে দত্তগিন্নীই সঙ্গে ক'রে এনে সব বলে দিয়ে গেলেন তরুকে। সে কিন্তু সব কথা শুনে মন্তব্য করল 'তা তুমিই বা জেনেশুনে ও পাগলকে ঘাঁটাতে গেলে কেন? সত্যিই কি আর কিছু ও পুলিশে যেত।'

এই পর্যন্ত।

একটা সান্ত্বনার কথাও উচ্চারণ করেনি হারাণ কিম্বা পোড়া জায়গাটাও একবার দেখতে চায়নি। বুড়ি ভাত বেড়ে খেতে ডাকলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে খেতে বসেছে, খেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বুড়িকেই রাঁধতে হয়েছিল, কারণ তরু তো ছিল না—নইলে না খেয়েও তরুই রান্না করেছে ক'দিন, আর যতই বিষ দেবার কথা বলুক মুখে, বুড়ি খেয়েছেও এতটি—যেমন খায়। বুড়ি কাল কী মনে করে তরুর মতোও রান্না করেছিল, হয়ত

তরু খেতে যায়নি, ঘরে ঢুকে মেঝেতে পড়েছিল, সেখান থেকেও ওঠেনি। হারাণ কিন্তু নির্বিকার, ওকে খেতে অনুরোধ করা কিম্বা ডেকে বিছানায় শোয়ানো, কিছুই করেনি। তরুর বিশ্বাস, একটু পরে সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বরং।

তাই সারারাত জেগে পড়ে থেকে

বৌদিকে দেখালো এতবড় একখানি ফোস্কা পড়ে আছে তখনও...

সকালের অতটা বাড়াবাড়িতে নিজেই ভয় পেয়ে থাকবে—হারাণের পাতেই ভাত বেড়ে দিয়ে হেঁকে বলেছিল, 'ও ডাইনীকে দয়া ক'রে খেয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে বল্ হারাণ, আমার শরীর খারাপ, বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারব না!'

মনের ঘেন্নায় শেষরাত্রে উঠে চলে এসেছে ও।......

এখন যদি এরা আশ্রয় না দেয় তো—সামনেই পুকুর আছে, কিম্বা স্টেশনে গিয়ে রেলেও গলা দিতে পারে। মোট কথা, ওকে যদি যেতেই হয়—

পিতৃকুল শ্বশুরকুল সকলের মুখে কালি দিয়ে সে যাবে। এই তার স্পষ্ট কথা।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে রইল। যেন নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে সবাই।

হেমের অফিসের বেলা পার হয়ে গেল। এরপর আর স্নানাহার ক'রে গিয়ে ছটা চল্লিশের ট্রেণ ধরা সম্ভব নয়। সেদিকে খেয়ালও নেই হেমের। কোলের বোন তরু—বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আর শান্ত বলেই বোধ হয় ওর প্রতি তার স্নেহ একটু বেশী চিরদিনই।

শ্যামা যেন আরও কাঠ হয়ে গেছেন। উনুনে ভাত ফুটে গলে গেছে। আঁচ ঠেলে দেওয়া বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণই কিন্তু ভেতরের তাপে তা এখনও ফুটছে। একটু পরেই হয়ত অখাদ্য পাঁক হয়ে যাবে, এতখানি খাদ্য-বস্তু নষ্ট হবে। তবু সেদিকেও শ্যামার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ভাবছিলেন তাঁদের রক্তের কথা। তাঁর মার রক্ত যেখানে এক ফোঁটাও আছে, কেউ সুখী হবে না। মনের মধ্যে এই আঘাতের মধ্যেও বিচিত্র একটা হাসি পাচ্ছিল তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন যে মেজমেয়ের বৈধব্য এবং তাঁর স্বামী নরেনের মৃত্যুতেই বুঝি এ প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে গেল। হায় রে! এতই সহজে ভাগ্যকে ফাঁকি দেবেন তিনি!

সম্বিৎ ফিরল বুঝি কনকেরই প্রথম।

সে উঠে দাঁড়িয়ে তরুর হাত ধরে টেনে বললে, 'তুমি ঘাটে চল ঠাকুরঝি, মুখহাত ধুয়ে কাপড়টা কেচে নাও, আমার একটা শাড়ি আছে আনলায় ঐটেই পরো। মুখে একটু জল দাও। অমন করে বসে থেকে তো লাভ নেই!'

এইটুকু সহানুভূতির স্পর্শেই এত-দিনের নিরুদ্ধ বেদনা আবার প্রবল হয়ে ওঠে তরুর। সে হু-হু করে কেঁদে বৌদির কাঁধে মুখ গুঁজে বলে, 'আমার কি হবে বৌদি, আমি কোথায় দাঁড়াব!'

এইবার হেমও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়।

তার কণ্ঠস্বরও সম্ভবত খানিকটা বাষ্পার্দ্র হয়ে এসেছিল। জোর ক'রে সে কণ্ঠকে সহজ করতে গিয়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের কঠোর শোনায়।

সে বলে ওঠে, 'হবে আবার কি? আমরা তোকে দুটো ভাত দিতে পারব না? একটা বোন পুষছি, না হয় আর একটাকেও মনে করব তেমনি হয়ে এসে উঠেছে!'

শিউরে উঠল কনক।

'ও মা ছি ছি! ও কী অলুক্ষণে কথা!' অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে কনক, 'দুদিনের ব্যাপার দুদিনেই মিটে যাবে ঠাকুরঝি, তোমার ঘর বর তুমি ঠিকই পাবে। নাও এখন ঘাটের দিকে চল দিকি!'

শিউরে ওঠেন শ্যামাও। অস্ফুট কণ্ঠে 'ষাট! ষাট!' ক'রে ওঠেন।

তেমন ক'রে আর কাউকে না এসে উঠতে হয়।

ছেলেটা যেন কি!

সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি তাড়া-তাড়ি ভাতের হাঁড়িতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে ফ্যান গালতে বসেন। যদি কিছুটাও আদায় হয়। হয়ত সবটা এখনও পাঁক হয়ে যায়নি।

কনক একরকম জোর করেই তরুকে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অনুচ্চ-কণ্ঠে বলে, 'মা, ও'র তো অফিসে যাওয়া হ'লই না আজ যা দেখতে পাচ্ছি—তা ও'কে একবার বলুন না নিবড়েয় যেতে!'

হেম কথাগুলো বলে উঠোন পেরিয়ে ওধারের সিঁড়িতে গিয়ে বসে ছিল। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে মন্তব্য করে উঠল, 'কিসের জন্যে ঐ ছোটলোকদের কাছে যাব শুনি!......এই ব্যবহারের পর পায়ে ধরে বোনকে ফিরিয়ে দিতে যাব? ওরা তো আরও পেয়ে বসবে। এবার তো সোজা-সুজি খুন করে ফেলবে তাহলে। না সে আমি পারব না। ও থাক এখানেই—নিজেরা যদি খেতে পাই তো বোন ভাগ্নেও একমুঠো খেতে পাবে!'

অগত্যা চুপ ক'রে যায় কনক। কিন্তু কথাটা তার ভাল লাগে না আদৌ। অথচ তার আর কীই বা বলবার আছে, স্বামীর ওপরই বা তার কতটুকু অধিকার!

সে শুধু নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় শাশুড়ির মুখের দিকে।

কিন্তু শ্যামা কিছুই বলতে পারেন না। কিছুই ভেবে পান না যেন। বহু আঘাত সহ্য করেছেন জীবনে কিন্তু তখন নিশ্চিন্ত ভাবটা ছিল না, আঘাতের জন্যেই যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন তিনি। এখন, এই বছর-কতকের নিশ্চিন্ততার পর, আকস্মিক এই আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনিও। তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও যেন আজ আর কোন কাজ করছে না।

—(ক্রমশ)

(উত্তর)

বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখের অমৃত পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় ১১টি প্রশ্ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিলাম:—

(১) অতি-প্রচলনের ফলে ব্যাকরণ-গত অশুদ্ধ শব্দকে শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া লিখিতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না। "ইতিমধ্যে ও ইতিপূর্বে" শব্দ দুইটির প্রয়োগ সাহিত্যে ও রচনায় এত বেশী দেখা যায় যে এখন শুদ্ধ প্রয়োগ "ইতোমধ্যে ও ইতঃপূর্বে" কদাচিৎ চোখে পড়ে। অবশ্য, পরীক্ষার্থীদের বেলায় বাংলাভাষার উত্তরপত্রে ব্যাকরণগত শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগই নিরাপদ। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাকরণ চালু বা চলতি ভাষাকেই অনুসরণ করে। হয়ত, কিছুকাল পরে "ইতিমধ্যে ও ইতিপূর্বে" শব্দ দুইটি বহুল প্রয়োগের প্রসাদে ব্যাকরণের ছাড়পত্র পাইবে।

(২) আস্পদ শব্দের অর্থ পাত্র, আধার, ইত্যাদি। সেই হেতু শ্রদ্ধাস্পদ এই পাঠ পত্রের আরম্ভে বা শিরোনামায় পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই লেখা চলিতে পারে। কোন ভুল হইবে না। চলন্তিকা অভিধান মতে এই পাঠ শুদ্ধ।

(৩) সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষেপিত শব্দ দুইটির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভাষাবিদ্গণ ভাল বলিতে পারেন।

(৪) Editorial Column-এর প্রতিশব্দ হিসাবে সম্পাদকীয় স্তম্ভ বা সম্পাদকীয় কলম উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। শব্দ দুইটির প্রয়োগ এত বেশী চালু হইয়াছে যে এখন অন্য কোন ভাল প্রতিশব্দ কেহ বাহির করিলেও তাহা গৃহীত হওয়ার পক্ষে সন্দেহ আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের মত দিকপাল যদি নিজে কোন সুন্দরতর প্রতিশব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে অবশ্য ব্যাপার কিছুটা স্বতন্ত্র হইত, সন্দেহ নাই।

জানাতে পারেন

(৮) পৃথিবীর সর্বদেশেরই প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহ পদ্যে লেখা। কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আদিকাল হইতেই মানুষ কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া মুগ্ধ বা অভিভূত হইলে মনে মনে তাহা প্রধানতঃ কবিতার মাধ্যমেই প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্য কথ্য-ভাষা গদ্য হইলেও লেখ্যভাষা আদিতে পদ্যই। Aristotle-কৃত Poetics নামক গ্রন্থে ইহার কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। প্রশ্নকর্তা ইচ্ছা করিলে ইহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

(৯) চলন্তিকা অভিধান মতে সাহিত্যিক শব্দের অর্থ সাহিত্য সম্বন্ধীয় (Literary)— সাহিত্য-চর্চাকারী। চিত্তাকর্ষক রচনা দ্বারা—তাহা কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদি যাহাই হউক না কেন,—সাহিত্যে যাঁহারা স্থায়ী আসন লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সাহিত্যিক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। নতুবা লেখক (রচনাকারী) শুধুমাত্র লেখকই থাকিয়া যান, সাহিত্যিক হইতে পারেন না।

(১০) "না" বুঝাইতে কেবল বাংলা দেশেই নহে, পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই দক্ষিণে ও বামে মাথা হেলান হয়। দ্রাবিড়ীরা "হাঁ" বুঝাইতে ঠিক এইরকমভাবেই মাথা নাড়িয়া থাকে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ জাতিগত ও অভ্যাসগত। এরকম বৈপরীত্য বাঙালী ও হিন্দুস্থানীদের বাক্ধারায় দেখা যায়। আমরা ২ মাস পূর্বে বুঝাইতে দুই মাস আগে বলিয়া থাকি। সেই অর্থে হিন্দুস্থানীরা বলিবে দুই মাস "পহেলে", আর আমাদের দুই মাস পরে বুঝাইতে তাহারা বলিবে দুই মাস "আগে"। কাহাকেও রাস্তা বা বাড়ি দেখাইতে গিয়া আমরা বলি এর পরের রাস্তা বা এর পরের বাড়ি। হিন্দুস্থানীরা বলিবে, আগের রাস্তা বা আগের বাড়ি। ইহা বাক্ধারার বৈপরীত্য, সন্দেহ নাই।

(১১) পত্রশেষে "নমস্কারান্তে ইতি" লেখা ভুল প্রয়োগ। "ইতি" শব্দ প্রথমে লিখিয়া, একটি দাঁড়ি বা ছেদ টানিয়া লইয়া, পরে "নমস্কারান্তে" কথাটি লিখিলে, দোষ অনেকটা কাটিয়া যায়। তবে "নমস্কারান্তে" শব্দের প্রয়োগ চিঠিপত্রের আদিতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যেমন নমস্কারান্তে নিবেদন, প্রণামান্তে নিবেদন, ইত্যাদি। সাবেকী আমলের চিঠিপত্রের শেষে "অলমতি বিস্তরেণ", "কিমধিকমিতি" ইত্যাদি সংস্কৃত পাঠ দেখা যাইত। চালু আমলের চিঠিপত্রের শেষে "নমস্কারান্তে ইতি" প্রভৃতির আমদানী সম্ভবত ইংরেজীর "with thanks, with kind regards" প্রভৃতি পাঠ হইতেই হইয়াছে।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯,
১৮-৮-৬২ ইং

(প্রশ্ন)

আগরপাড়া
২২-৮-৬২

মহাশয়,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ছাপা হলে বাধিত হইব।

(ক) পৃথিবীর মধ্যে (১) সবচেয়ে সুন্দর, (২) দীর্ঘতম, (৩) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ "রাস্তা" কোনটি।

(খ) পৃথিবী ও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ির নাম কি, ও কত তলা।

(গ) সৌন্দর্য অনুসারে পর পর সাজিয়ে দিন। কলকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, নিউদিল্লী, মস্কো, টোকিও, পিকিং, বার্লিন, মেলবোর্ণ।

ইতি—
সুব্রত চক্রবর্তী.
পূর্ব আগরপাড়া.
২৪ পরগণা।

কিংবদন্তীর নায়ক

মিহির সেন

সুনীল গুহ

নামটা মিষ্টি। এবং মাদকতা আছে। অনেকেই তাই মোহ নিয়ে আসে মান্দার হিলে।

এ মোহ মানসীরও ছিল। শুধু আবছা আভাস নয়, কল্পনায় গোটা পরিবেশেরই একটা স্পষ্ট ছবি এ'কে নিয়ে এসেছিল ও। যেদিকে দৃষ্টি ছোট-বড় পাহাড়ের ঢেউ। টিলায় টিলায় ছবির মত সৌখিন বাংলো। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কটি স্ফটিক তন্বী ঝর্ণা। কিছু শাল তমাল থাকলে মন্দ হয় না। অথবা মহুয়া বন।

কিন্তু দেওঘর থেকে মাইলের পর মাইল রুক্ষ রিক্ত প্রান্তর পাড়ি দিতে দিতে ক্লান্ত, স্বপ্ন-ভঙ্গের সন্দেহে দুরুদুরু মানসী, অবশেষে বাস থেকে এখানে, এই অতি সাধারণ শুকনো বিহারী সমতলে নেমে, বিমূঢ় বোধ করল। নিরাশায় অসহিষ্ণু হল। বিপন্ন বিস্ময়ে ভাবল, শিলং দার্জিলিং না হোক, অন্তত রাঁচি-টাঁচির মত হবে ভেবেছিলাম। এ কোথায় এলাম!

আর এই শরীরী বিস্ময় ও বিরক্তিকে উস্কে দিতেই যেন, ঠিক তখন, পশ্চিমী শুকনো হাওয়া ধুলো নিয়ে হু-হু করে ছুটে এল। রুমালে মুখ ঢাকল মানসী।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল অসীমও। ইম্পিরিয়াল টোবাকোর অফিসার অসীম চৌধুরী। কুলি নেই, গাড়ি নেই, সেই লোকটাই বা কোথায়? অশোক কি চিঠি দেয়নি তাহলে? কিন্তু চিঠি না পেলেও, লোকটা সম্বন্ধে যা শুনে এসেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে, প্রকৃতির নিখুঁত নিয়মের মত, লোকটার এখন এখানে হাজির থাকার কথা। ঝাপসা অতীত, নিস্পৃহ বর্তমান আর নিষ্কাম ভবিষ্যতের বোঝায় বিনত মান্দার হিলের মুস্কিল-আসানটি নাকি প্রতিটি বাসের সময়ই উপকারের প্রার্থনা নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে এখানে। অশোক সাহিত্যিক। চরিত্রটাও বানানো নয়-তো?

—আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?

অসীম ফিরে তাকাল। রুমাল থেকে মুখরুণ তুলল মানসী। সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল দাড়ি-গোঁফ আড়াল রুক্ষ দেহাতী মুখটার দিকে। একটু অবাক হল পরুষ-পশ্চিমের মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে।

—চণ্ডী ভিজায় তো আপনাদেরই ওঠার কথা?

সাময়িক স্বস্তিতে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হল মানসী। —আপনিই কি মন্মথবাবু?

হঠাৎ, মুখের সঙ্গে বেমানান একটা দৃষ্টি তুলে তাকাল মন্মথ মানসীর দিকে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মানসী ওর এই দৃষ্টির সামনে প্রথমে সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিল। তারপর তৃপ্তি। মানসী জানে, ও সুন্দরী।

অসীমও সকৌতুকে লক্ষ্য করছিল এই গেঁয়ো লোকটার মুহূর্তের বিমোহিতি।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল মন্মথ। নির্লোভ খোলসের ভেতর আবার গুটিয়ে নিল নিজেকে। আস্তে বলল, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি দুটো লোক ডেকে আনছি।

অসীম নিশ্চিন্ত হল। ও জেনেই এসেছে মন্মথের সাহচর্যের এই শুরু। তারপর কি নয়? রান্নার লোক চাই, বাসন কম পড়েছে, কয়লা প্রয়োজন, হাট-বাজারের হদিশ, ডাক্তার, থানা, পোস্ট-অফিস, এমনকি রসিক পুরুষদের জন্য বিশেষ দোকান-পাটের সন্ধান—সব কিছুর জন্য নির্ভয় নির্ভাবনায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য লোক মন্মথ দত্ত।

লোকটার প্রসঙ্গে মানসীরও কিছুটা কৌতূহল ছিল। দুষ্টবাস্থানহীন মান্দার হিলে লোকটা নাকি রীতিমত একটি চরিত্র। এবং রহস্য।

একটু বাদেই মন্মথ লোক সংগ্রহ করে আনল। মালগুলো দেখেশুনে ওদের মাথায় তুলে দিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে শুরু করল।

বড় রাস্তাটা ঘিরেই যেটুকু গঞ্জের চাঞ্চল্য। কিন্তু কিছুটা এগোলেই ভিন্ন-রূপ। আধ মাইলের ভেতর ঘন-বসতি শেষ। রাস্তা নির্জন। অনেকটা জমি নিয়ে এক-একটা চেঞ্জারের বাড়ী। স্বভাবতই ব্যবধান দ্বৈপায়ন। বাড়ীগুলো প্রায় সবই খালি। দু'চারটা নবাগত চেঞ্জারদের খুশীতে গমগম। নির্জন মেটে পথের দুধারে আমগাছের সারি। শান্ত ছায়া। দূরে দূরে দু'চারটা গ্রামের আভাস। দিগন্ত-ছোঁয়া ধানের সবুজ বিস্তার। গোটা পরিবেশ জুড়ে একটা স্নিগ্ধ উদাস স্বপ্ন। মানসীর ভাল লাগতে শুরু করল।

বাড়ীটা দেখে আরো খুশী মানসী। অসীমও। এরকম অজ পাড়াগাঁয় এরকম একটা সুন্দর সৌখিন আশ্রয় ওরা কল্পনা করতে পারেনি। বাড়ীটা পৌরাণিক নয়। আধুনিকতা ও বনেদি আভিজাত্যের একটি সুসম সমন্বয় বাড়ীটার সর্বাঙ্গে।

অসীম কলকাতা থেকে চাবি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বন্ধ ঘরগুলো খুলে ওদের সব বুঝিয়ে-শুনিয়ে দিল মন্মথ। বাড়ীর মালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ও কিছু প্রয়োজনের তালিকা নিয়ে বেলা বারটা নাগাদ বিদায় নিল মন্মথ। বলে গেল, হঠাৎ কোন দরকার পড়'ল মালীকে দিয়ে খবর পাঠাবেন, আমি চলে আসব।

রোজই আসত মন্মথ। খবর দিলেও, না দিলেও। ওদের খোঁজ-খবর নিয়ে যেত। ওর নিরাসক্ত মুখ দেখে মাঝে মাঝে মনে মনে হাসত অসীম, মিটার ইন্সপেক্টারের কর্তব্য পালন করতে আসে যেন লোকটা। আর, ওর এই কর্তব্য-নিষ্ঠার উৎস খুঁজতে গিয়ে প্রথম প্রথম অনেক জটিল কিছু অনুমান করবার চেষ্টা করল মানসী। কিন্তু দু-চার জনের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বুঝতে পারল, ওর এই কর্তব্যনিষ্ঠা কোন বিশেষ বাড়ীর পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সব চেঞ্জারের ক্ষেত্রেই সম-ব্যাপ্ত।

সন্দেহ কাটল, কিন্তু কৌতূহল মিটল না মানসীর। বরং নিকাজ অবসরের প্রশ্রয়ে বাড়তে লাগল। সত্যিই লোকটা যেন কেমন অদ্ভুত। নিঃশব্দে সবার প্রয়োজন মিটিয়ে যাবে কিন্তু নিঃস্বার্থ নিষ্ঠায়। নিমন্ত্রণ করলে এড়িয়ে যাবে। তাসের আমন্ত্রণ জানালে সময়াভাবের অজুহাত দেবে। আড্ডায় জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে প্রায় নীরব শ্রোতার ভূমিকা নেবে। ওর নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে তো নিতান্ত নিশ্চুপ। বড় জোর মিটি মিটি হাসবে। যে হাসি চেঞ্জারদের আরো কৌতূহলী করে তোলে। একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের মুখোমুখি করে সন্দেহে তীক্ষ্ণ করে তোলে। লোকটা এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে এমন স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কেন? পুরো অতীতটা মুছে দিয়ে, প্রচ্ছন্ন বর্তমানের আড়াল নিয়ে এমন গোপন থাকতে চায় কেন লোকটা?

মাঝে মাঝে এই কৌতূহলটা মেটানর জন্য একটু ঘুর পথেও যেত মানসী। ওর সঙ্গে সহজ হয়ে মিশে যেতে চাইত। হাসি-ঠাট্টা করত। এক রাশ প্রশ্নের মাঝখানে ওকে দাঁড় করিয়ে ওকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলত। এসব সময় মন্মথ পালিয়ে যেতে চাইত। যন্ত্রণা বোধ করত। কি যেন বলতে চাইত, কিন্তু পারত না।

কিছুদিন পর থেকে এই কৌতুকের সীমানায় ছোট ছোট অন্য কিছুর অনু-অস্তিত্ব টের পেতে শুরু করল যেন মানসী। কেন যেন মনে হত, নিরিবিলি ওর সামনে পড়লে, ক্বচিৎ কখনও দৃষ্টি বিনিময়ে, নিরাসক্ত মন্মথ ওর অস্তিত্বের অতলে কেমন যেন নড়ে চড়ে ওঠে। ওর নির্মোহ দৃষ্টিতে কিসের একটা আবছা ছায়া পড়ে। নিজেকে সেসব মুহূর্তে আরো বেশী নিরাসক্ত করে তোলার চেষ্টা করে মন্মথ। মানসী বোঝে না, চল্লিশ ছুঁয়েও কি এখনও সেই রূপের উত্তাপ আছে ওর, যাতে আজো কেউ সিক্ত হাত সেঁকে তপ্ত হতে পারে!

অসীমের অবশ্য মন্মথ প্রসঙ্গে কোন কৌতূহলের বালাই ছিল না। জীবনে বিচিত্র চরিত্র ও অনেক দেখেছে। মাঝে-মাঝে গোটা পৃথিবীটা কেই ওর বেড়া তুলে নেওয়া চিড়িয়াখানা বলে মনে হয়। সুযোগ পেলেই পড়ে পড়ে ঘুমাত অসীম। জেগে থাকলে খোলা ছাদে চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে ইংরাজী নভেলের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। মানসীর মত স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসেনি ও, এসেছে নিছক বিশ্রামের লোভে।

মানসী অসীমের এই অনড় প্রকৃতির কথা জানত বলেই পারতপক্ষে বিরক্ত করত না ওকে। দেখার ভেতর সামান্য যা দু-চারটা মন্দির তা নিজেই দেখে এসে-ছিল। কিন্তু পাহাড়টা দূরে বলেই পাহারা দরকার। অথচ কিছুতেই নড়াতে পারছিল না অসীমকে। সমানে দিন সরাচ্ছিল ও। তারপর, একদিন বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই বসল, আমি ঠিক মেজাজ পাচ্ছি না, যাও না, মন্মথ-বাবুকে নিয়ে দেখে এস। ওর সব নখ-দর্পণে। মানসী বিরক্ত হল। অভিমানে ভুরু কোঁচকাল। তারপর তীর্যক ভঙ্গীতে বলল, নির্ভয়ে বলছ?

হো-হো করে হেসে উঠল অসীম। তোমার রুচির ওপর এতটা সন্দিহান

হয়েছি বলে তোমার ধারণা? ওতো একটা রক্ত-মাংসের যন্ত্র!

তা অবশ্য মানসীও জানে। জানে বলেই বোধহয় ওর সামনে কপট দাম্পত্য কলহে খুন-সুটি করতে সঙ্কোচ বোধ করে না। অসাবধানে তরল বা বেফাঁস হয়ে পড়লেও বিব্রত হয় না। মন্মথর নিরাসক্ত উপস্থিতি যেন পোষা বেড়ালের নীরব উপস্থিতি মাত্র। মানসী তাই আপত্তির কিছু খুঁজে পেল না।

নির্ধারিত কাকডাকা ভোরে এসে হাজির হল মন্মথ। শান্ত প্রসাধন সেরে মানসীর বেরুতে ভোর স্পষ্ট হল। অসীম তখনও বিছানায়।

মন্মথর সামনে এসে মানসী নির্দ্বিধায় হাতের টিফিন ক্যারিয়ারটা মন্মথের দিকে এগিয়ে দিল। মন্মথও তর্কাতীত কর্তব্যের মত সেটার বাহক হয়ে চলতে শুরু করল।

গরুর গাড়ীর যন্ত্রণাদায়ক যাত্রাটা এড়ানর জন্যই ধানক্ষেত ধরে পায়ে হাঁটা পথে যাওয়াই পছন্দ করেছিল মানসী। পথও খুব দূর নয়, মাত্র মাইল তিনেক। অনেকটা দূরত্ব রক্ষা করে হাঁটছিল মন্মথ। মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল মানসী। এতটা পথ এভাবে মুখ বুজে পাড়ী দেওয়া রীতিমত বিরক্তিকর। অসীমের ওপর মনে মনে রাগ হল।

অবশ্য লোকালয় আর ষ্টেশন ছাড়িয়ে নিরিবিলি ধানক্ষেতে নেমে এই নীরবতা খুব খারাপ লাগছিল না আর। সবে-ওঠা মিষ্টি রোদের আমেজ, ধানক্ষেতের অপরিচিত গন্ধ, বৃষ্টির জমা জল, চিকচিক খুশী মাছ, দূরের মান্দার—সব মিলে অন্যমনস্কতা এল মানসীর। একটা ভারভার ঔদাসীন্য। ঐ রক্ত-মাংসের যন্ত্রটা ছোঁক ছোঁক করে কাছে নেই বলে এবার বরং তৃপ্তি বোধ করল। আর, এই উদাস নির্জনতার, মাদক নিঃসঙ্গতার স্বাদ সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে করতে কখন যে তিন মাইল পাড়ি দিয়ে পাহাড়ে পৌঁছে গেল টেরই পেল না মানসী।

পাহাড়ের শুরুতে মন্মথ একবার দাঁড়াল। তারপর মানসী এসে পৌঁছলে জিজ্ঞেস করল, বিশ্রাম করে নেবেন?

—দরকার নেই।

পাহাড়ে উঠতে শুরু করল মন্মথ। সামনে এবং চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মানসী। আদিগন্ত সমতলের মাঝে ছোট্ট পাহাড়টাকে মনে হল কারো আরোপিত ইচ্ছে, খেয়ালী প্রক্ষেপ। সামনে সামান্য ঝোঁক দিয়ে দিয়ে মন্মথকে অনুসরণ করে উঠতে শুরু করল মানসী।

কিছুটা উঠে থামল মন্মথ। থেমে পেছন ফিরে দাঁড়াল। মনে হল, মানসীর অপেক্ষায়।

দাঁড়িয়ে অবাক হল। অপূর্ব সুন্দর একটা শান্ত দিঘি।

—এটার নাম পাপহারিণী দিঘি।

মানসী ফিরে তাকাল।—নিশ্চয়ই কোন কিংবদন্তী আছে?

—হ্যাঁ। এবং কিছু সংস্কার।

—যথা?

তোমার রুচির ওপর এতটা সন্দি হান হয়েছি বলে তোমার ধারণা?

মানসী বলল, এগোন, আমি ঠিকই আসছি।

—এখানে একটা দেখবার জিনিস আছে।

মানসী বুঝল না, এই ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে এমন কি দেখবার জিনিস থাকতে পারে। কিছু উঠে, মন্মথর পাশে এসে

মানসীর চোখের দিকে তাকাল মন্মথ। —এখানে স্নান করলে নাকি জীবনের সমস্ত পাপমুক্ত হওয়া যায়।

কথাটা শেষ হলেও মানসীর চোখ থেকে চোখ নামাল না মন্মথ। এটা ব্যতিক্রম। সামান্য অবাক হল মানসী। তারপর হেসে বলল, তাই নাকি? ধন্বন্তরী তো?

চোখ নামাল মন্মথ। আবার চলতে শুরু করল। কিছু দূর এগিয়ে কৌতূহলে জিজ্ঞেস করল মানসী, সেই সাপের দাগটা কোথায়?

নিরাসক্ত স্বরে জবাব দিল মন্মথ, চলুন, পথে পড়বে।

প্রচলিত পথ ছেড়ে ছোট্ট একটা আঁকা-বাঁকা পথ ধরল এবার মন্মথ। দুপাশে নাম-না-জানা পাহাড়ী গাছের ঝোপ-ঝাড়। মানসী এতক্ষণে সামান্য ক্লান্তি বোধ করতে লাগল।

—এটা কিসের দাগ?

হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল মানসী।

ফিরে তাকিয়ে লজ্জা পেল মন্মথ। আসল আকর্ষণই ও অন্যমনস্কে পার করিয়ে আনছিল মানসীকে। একটু এগিয়ে এসে সংকোচের সঙ্গে বলল, ঠিক খেয়াল করিনি, এটাই সেই দাগ।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মানসী দাগটা। গোটা পাহাড়টার কোমর বেষ্টন করে পাথর ঘষে বসে যাওয়া এই দাগটাই নাকি সমুদ্র-মন্থনে রজ্জু হিসেবে ব্যবহৃত সাপের স্বাক্ষর। সমুদ্র মন্থনে আকাঙ্ক্ষিত সুধা উঠেছিল। শ্রমের অংশীদার হিসেবে যে সুধা দাবীর অপরাধে মধুকৈটভের ওপর দেবতাদের রোষ। বিষ্ণুর আবির্ভাব। মধুর মাথায় পা দিয়ে তাকে দাবিয়ে দিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এ-পাতো তুলতে হবে। গড়ুরের ওপর আদেশ হল ভারী কিছু আনার জন্য। গড়ুর উড়ে গিয়ে নখে করে তুলে আনল সমুদ্র মন্থন-দন্ড মান্দার পাহাড়ের দুটো টুকরো। তারই একটা, এই মান্দার পাহাড় দিয়ে বিষ্ণু চাপা দিলেন মধু দৈত্যকে। এই মান্দারের তলেই যুগ যুগ ধরে চাপা পড়ে থাকল সুধাকাঙ্ক্ষী মধু।

রোমাঞ্চকর পৌরাণিক ইতিবৃত্তটার সামনে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকল মানসী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ডাকল মন্মথ।—চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মানসী সজাগ হল। মন্মথর নিরাসক্তি সামান্য অবাক করল ওকে। তারপর, হাঁটতে শুরু করে হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করে বসল মানসী, আচ্ছা, আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

না ফিরেই কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল মন্মথ, কোনদিন ভেবে দেখিনি।

মানসী চোখ তুলে ওকে লক্ষ্য করল একবার।—আপনার কোন কিছুতেই আকর্ষণ নেই, না?

আচমকা প্রশ্নটায় একটু বিব্রত হল মন্মথ। তারপর হেসে বলল, এত বেশীবার এসেছি যে, কৌতূহল মরে গেছে।

বলে একটু থামল মন্মথ। তারপর, যা ওর স্বভাববিরুদ্ধ তাই করল। জিজ্ঞাসা না থাকলেও নিজে থেকেই বলল, অবশ্য আকর্ষণ না থাকলেও একটা উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা আছে।

মানসী একটু অবাক হল। বলল, সেটা আবার কি?

—মাঝে মাঝে আমার মান্দার পাহাড়টা তুলে মধু দৈত্যের মুখটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে। এতদিনে বোধহয় বিকৃত, পঙ্গু হয়ে গেছে ওর মুখটা। অথচ বেচারার একমাত্র অপরাধ সামান্য একটু সুধার আকাঙ্ক্ষা। তাও হকের সুধা।

মনে মনে চমকাল মানসী। মন্মথর পাথরের চোখে ঘন আবেগ। চেনা পরিবেশের অনেক ওপরে, এই অসহায় নির্জনতায় মন্মথর অপ্রত্যাশিত মুখরতা একটা গোপন ভয়ের মুখোমুখি করল মানসীকে।

ভয়টা বোধহয় টের পেল মন্মথ। তাই, ওকে নির্ভয় করতেই বোধহয়, গতি বাড়িয়ে আগের ব্যবধান দৈর্ঘ্যে আরো বাড়াল। —একটু পা চালিয়ে আসুন। নাহলে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

নিঃশব্দে আবার উপরে উঠতে লাগল ওরা। পথ দুর্গম নয়, কিন্তু ঋজু চড়াই। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল মানসীর। কিন্তু থামতে লজ্জা পাচ্ছিল। পাহাড়ের একেবারে শীর্ষে মহাবীরজীর মন্দিরে যখন পৌঁছাল ওরা, মানসীর তখন দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। মন্দিরের বারান্দায় দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল মানসী। ওকে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামের সুযোগ দেবার জন্যই মন্মথ বাইরে গেল।

অদ্ভুত প্রশান্তি জায়গাটার। নৈস্তব্ধ যে এমন ভাবগম্ভীর হতে পারে এর আগে ধারণা ছিল না মানসীর। আকাশটা যেন ওর ছোঁয়ার সীমায় চলে এসেছে।

এই নির্জনতা, এই বিশালতা, উদাস আকাশ অনুভব করতে করতে হঠাৎ ওর চেতনায় একটা নতুন উপলব্ধি এল। ওরা ছাড়া এই মন্দিরে, গোটা পাহাড়ে আজ অন্য কোন যাত্রী নেই। কোন মানুষ নেই ওরা ছাড়া।

মন্মথ মন্দিরের বাইরে একটা পাথরের উপর আকাশমুখী ধ্যানমগ্ন। ওর দিকে তাকিয়ে, ওকে লক্ষ্য করতে করতে মানসী কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। আবছা জটিল কতগুলো নাম-না-জানা অনুভূতি শতাব্দীর কুন্ডলীর ভেতর নড়ে-চড়ে উঠতে লাগল। মানসী হঠাৎ যেন নিজেকেও ভয় পেতে শুরু করল এই নির্জনতার শীর্ষে। ও উঠে দাঁড়াল। বাইরে এল।

—ভীষণ চায়ের পিপাসা পেয়েছে।

মন্মথ একটু চমকাল। বোঝা গেল গভীর অন্যমনস্কতার জন্যই। উঠে বসল।

নিজেকে সহজ করার চেষ্টায় টিফিন ক্যারিয়ারটা নিতে নিতে হালকা সুরে বলল মানসী, অবশ্য আপনার পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা অবান্তর। আপনি-তো মুক্ত পুরুষ।

আবার সেই গভীর দৃষ্টি নিয়ে মানসীর দিকে তাকাল মন্মথ। আস্তে বলল, মানুষ বলেই পিপাসা আমারও আছে। আর সেজন্যই প্রতিনিবৃত্ত করার শক্তিও আছে।

আবার সেই ভয় ভয় অনুভূতিটা টের পেল মানসী। মেয়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অধিকারে বুঝল, মূল্য না দেওয়া লোকটার মৌন কি এক অভিমান যেন অভিযানমুখী। সজাগ হল মানসী। ক্যারিয়ারটা নিয়ে সামনের একটা বড় পাথরের ছায়ায় গিয়ে বসল। দুটো পাত্রে খাবার ভাগ করল। চায়ের ফ্লাস্কটা খুলতে খুলতে আড় চোখে দেখল, মন্মথ একটু দূরে হাঁটুতে থুতনি রেখে কি যেন ভাবছে।

ভয় পাচ্ছে না, অস্বস্তি বোধ করছে না, এটা প্রমাণের জন্যই যেন আবার সামান্য তরল হল মানসী।

—কই, চা খাবেন না? নাকি সুধায় আকাঙ্ক্ষা নেই?

মন্মথ এগিয়ে এল। একটু দূরত্ব রক্ষা করে নিজেকে গুটিয়ে বসল। বলল, আছে। একই পরিশ্রম পেরিয়ে আসায় হয়তো অধিকারও আছে। কিন্তু মধু দৈত্যের কথাটা ভেবে মাঝে মাঝে ভয় হয়।

মানসী কোন উত্তর দিল না। অন্যমনস্কতার ভানের আড়ালে চা ঢালতে লাগল।

চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে আড়চোখে মন্মথকে দেখছিল মানসী। নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি এ মুহূর্তে সামান্য

তীক্ষ্ন। পিঙ্গল দাড়ি-গোঁফ আড়াল মুখের রেখায় ঈষৎ রুক্ষতা। হঠাৎ, এই প্রথম, মন্মথর পেশীগুলো নজরে পড়ল মানসীর। লোকটা নিরাসক্ত, কিন্তু শক্তিধর। মানসী ভেবে পেল না, মানসী দুঃসাহসী নয়, তাহলে কোন্ সাহসে একা এভাবে চলে এল। ওর পৌরুষকে তাচ্ছিল্য করে বলেই তো। ও যদি হঠাৎ সেই অপমানে, পৌরুষের দম্ভে মাথা তুলে দাঁড়ায়? কি করবে মানসী? কী করতে পারে? মানসীর আবছা ভয়টা এবার শরীর পেল।

মন্মথর নীরব চিন্তাকেও ভয় পেতে শুরু করল মানসী। ওকে চিন্তার সিঁড়ি বেয়ে কোন চরম সিদ্ধান্তের শীর্ষে পৌঁছাতে দেওয়া উচিৎ নয়। কথা দিয়ে ওর চিন্তার পথে প্রাচীর তুলতে হবে।

—আপনি তো বেশ কথা বলতে পারেন, তাহলে অমন মূকাভিনয় করে বেড়ান কেন?

হঠাৎ, কিছু না ভেবেই করে ফেলা, প্রশ্নটার জন্য একটু লজ্জা পেল মানসী।

সামান্য চাপা হাসল মন্মথ।—কেন, এর চেয়ে কোন বড় অভিনয় কোনদিন চোখে পড়েনি আপনার?

ওর সাহসে বিস্মিত হল মানসী। এ সাহসের উৎস খুঁজে পেল না। ভয় থেকে খুব বেশী উদারতা দেখিয়ে ফেলেছিল বোধহয়।

টিফিন ক্যারিয়ারটা গুছিয়ে নিতে নিতে বলল মানসী, চলুন এবার উঠা যাক। রোদ চড়ছে।

উঠে দাঁড়াল মন্মথ। ক্যারিয়ারটার জন্য হাত বাড়াল। মানসী চলতে শুরু করে বলল, থাক না।

এবার আর আগের দূরত্ব নেই মন্মথ। গভীর চিন্তার অন্যমনস্ক পদক্ষেপে প্রায় পাশে পাশে হাটছিল। ওর রুক্ষ রেখাঙ্কিত মুখ আরো জটিল। মানসী লক্ষ্য করে আবার সেই ভয়টার সাড়া পেল।

—কি ভাবছেন?

সজাগ হল মন্মথ—কিছু বলছিলেন?

প্রশ্নটা পুনশ্চারণ করল মানসী।

একটু হাসল মন্মথ।—এখানে এলেই আমার কেন যেন বারে বারে সেই মধু দৈত্যের কথাটা মনে পড়ে। আর গত বছর এখানে বেড়াতে আসা এক ভদ্রলোকের কথা।

মানসী দুটোর যোগসূত্র ঠিক খুঁজে পেল না। হেসে বলল, ভদ্রলোকেরও ঐ একই কৌতূহল ছিল বুঝি?

—না, ভদ্রলোক কল্পনায় আমার চেয়েও কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে নাকি নিজেকেই পাথর-চাপা মধু বলে মনে হত।

মেয়েদের কৌতুহল, মানসী জানে, পুরুষদের কাছে একটা বিদ্রূপের বস্তু। তাই নিজেকে বোঝাল ও, গল্পে গল্পে এগিয়ে গেলে সময়টাও কাটত। আর ওকে ওর চিন্তার ঘূর্ণি থেকে সরিয়েও রাখা যেত। যতটা সম্ভব নিরাসক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তাই, এমন উদ্ভট কল্পনার হেতু?

খুব সহজ সুরেই বলল মন্মথ, হেতুটার সঙ্গে ওর নিজের জীবনের একটা গল্প জড়িয়ে আছে। অবশ্য অসাধারণ কোন গল্প নয় হয়তো, তবু জানেন তো, মানুষ নিজের জীবনের গল্প সম্বন্ধে ভীষণ দুর্বল। না হলে খুঁজলে হয়তো সেই একই কাহিনী বহু লোকের ক্ষেত্রেই মিলে গেছে দেখা যাবে। কেননা, আত্মকেন্দ্রিক, হীনমন্যতাবোধে ভুগছে এমন লোকের সংখ্যা সমাজে কোনদিনই বোধহয় কম নয়।

মানসীর কৌতূহল সামান্য সচেতন হল।—ভদ্রলোক কম্‌প্লেক্সে ভুগতেন বুঝি?

—আমারও তাই সন্দেহ।, ভদ্রলোক খুব গরীব ছিলেন। অবশ্য কম্‌প্লেক্সটা সব সময় অবস্থার উপর নির্ভর করে না। আর ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। নিজের এবং পরিবারের জীবনে ছেলেবেলা থেকে চরম কিছু লাঞ্ছনার ঘটনা দেখে দেখে কেমন যেন মানুষ সম্বন্ধেই একটা ভীতি জন্মে গিয়েছিল ওঁর। ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। ফলে ভিড় এড়িয়ে নিজের খোলসের ভেতর থাকতেই পছন্দ করতেন।

মন্মথ একটু থামল। মানসীর দিকে তাকাল। তারপর, ওর নীরবতা সম্মতি বহন করছে বুঝে আবার শুরু করল বলতে। এবং থেমে থেমে, মনে করে করে ভদ্রলোকের যে কাহিনী পরিবেশন করল মন্মথ, সেটার সংক্ষেপ রূপ কিছুটা এরকম :

ভদ্রলোক চাকরি খুঁজতেন; আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটের তাগাদায় দু'-তিনটে টিউসনি করতেন। তার ভেতর একটি ছিল ছাত্রী। মেয়েটির বাড়ীর অবস্থাও ভাল ছিল না।

কিছুদিন পড়ানর পর ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন, মেয়েটির ভেতর এমন কিছু সম্ভাবনা চাপা পড়ে আছে, চেষ্টা করলে যাকে বিকশিত করে তোলা যায়। ভদ্রলোক, এই প্রথম, একজন মানুষের জন্য আন্তরিক হলেন। নিঃশব্দে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন এ প্রচেষ্টায়। এবং সাফল্য লক্ষ্য করতে লাগলেন।

কিন্তু নিঃশব্দে ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। একদিন ভদ্রলোক সভয়ে অনুভব করলেন, মেয়েটি ওর প্রতি কবে থেকে যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। কৃতজ্ঞতা অনেক সময় আকর্ষণের হেতু হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও সেটাই কারণ বলে মনে হল ভদ্রলোকের। নিজের হীনমন্যতাবোধ ভদ্রলোককে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফল হল বিপরীত। মেয়েটির ক্ষেত্রে যা ছিল প্রচ্ছন্ন আভাস, সেটা এতে উচ্চারিত, প্রকাশিত হল। ভদ্রলোক এই নতুন অনুভূতির কাছে অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্তার গভীরে প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প অনুভব করলেন। ভালবাসার মন্ত্রোচ্চারণে মেয়েটি ওঁর গুহায়িত সত্তাটাকে উজ্জীবিত করে তুলল। নিজের অজান্তেই পুনর্জন্ম শুরু হল ভদ্রলোকের। হীনমন্যতাবোধের খোলস ভেঙ্গে এক ঋজু পৌরুষ বেরিয়ে এল। বলিষ্ঠ দাবীতে মুক্ত পৃথিবীর মাঝখানে এসে দাঁড়াল এক ত্রাতা পুরুষ।

মেয়েটিও কৃতী হল। খ্যাত হল। নিজের পরিচয়ে ব্যাপ্ত হল। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই সভয়ে লক্ষ্য করলেন ভদ্রলোক, মেয়েটির আন্তরিকতা ক্রমেই নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানে এসে দাঁড়াচ্ছে। বুঝলেন, মেয়েটির খ্যাতির পরিধি-বিস্তার ওকে কেন্দ্রাতিগ করে তুলছে। নিজের কৃতিত্বের দাবীতে ওর তখন বড়

আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। বোধহয় আশ্বাসও পাচ্ছে।

অথচ ইতিমধ্যে এই মেয়েটিকে উপলক্ষ করেই ভদ্রলোককে পরিবেশের বিরূপতা আর পরিবারের বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এবং হাসিমুখে সমস্ত বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছিলেন তিনি নিষ্ঠার তৃপ্তিতে। ভদ্রলোক অভিমানী ছিলেন। নিঃশব্দে উপলব্ধি করলেন, মেয়েটির জীবনে ওর প্রয়োজন শেষ হয়েছে। নিজের এতদিনের ঐকান্তিকতা, আত্মত্যাগ আর আত্মবঞ্চনার কথা ভেবে একবার ভেবেছিলেন নিজের দাবী নিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হল তাতে। পৃথিবীর কোথায়ও, কারো জীবনে নিজেকে আরোপ করতে চাওয়াটা লজ্জার। ঘৃণার। তাই নিঃশব্দে একদিন মেয়েটির জীবন থেকে সরে গেলেন তিনি। নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, যন্ত্রণার সমুদ্র মন্থন করে আমি তো সুধা তুলে দিয়েছি, সেটুকুই আমার তৃপ্তি।

মন্মথ যখন গল্প শেষ করল, ওরা তখন পাপহারিণী দিঘির সামনে পৌঁছে গেছে। শান্ত স্নিগ্ধ পাহাড়-ঘেরা দিঘিটায় কেমন এক বিরহী বিষণ্ণতা। মন্মথর কথা শেষ হলেও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মানসী। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। চাপা অস্থির।

দিঘিটার দিকে মুখ রেখে পথ-প্রদর্শকের কর্তব্যনিষ্ঠ কণ্ঠে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মন্মথ, আপনি কি স্নান করে যেতে চান এখানে?

এ প্রশ্নে মানসী হঠাৎ সজাগ হল। ওর লোকালয়ের সীমায় পৌঁছে যাওয়া সত্তার অভিমানে আঘাত লাগল বোধ হয়। কিছুটা দম্ভের সঙ্গেই বলল, আমি সজ্ঞানে কোনদিন কোন পাপ করিনি।

মন্মথ নিরুত্তেজ স্বরে বলল, তাহলে আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক।

আবার হাঁটতে শুরু করে বলল মানসী, হয়তো তাই।

লোকালয়ে পৌঁছে গেছে মানসী। ও এখন অনেক নির্ভয়। এই মৌন-মুখোস-আড়াল ভণ্ড লোকটাকে আবার ও অনুকম্পার পাত্র হিসেবেই দেখতে শুরু করেছে।

বাড়ী ফিরে মানসী অবাক। একরাশ কাঁকড়া রেঁধে সগর্বে অপেক্ষা করছে অসীম। ওরা বেরিয়ে গেলে একা ভাল লাগছিল না বলে বাড়ীর পেছনের ধান-ক্ষেতে বেড়াতে বেরিয়েছিল নাকি। হঠাৎ চোখে পড়ল আলের পাশ দিয়ে অসংখ্য কাঁকড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুশীতে হঠাৎ কৈশোরে পৌঁছে গেল অসীম। কাপড় গুটিয়ে নেমে পড়ল ক্ষেতে। প্রথমে ভয়ে ভয়ে তারপর উজ্জ্বল হাতে কাঁকড়া ধরতে শুরু করল। আর, বাড়ী ফিরে, মানসীকে অবাক করে দেবার জন্য স্রেফ সহজিয়া বুদ্ধির উপর নির্ভর করে রেঁধে ফেলল কাঁকড়াগুলো। খেতে বসেও নিজের কৃতিত্বের গর্বেই বোধহয়, পরম তৃপ্তির সঙ্গে একরাশ কাঁকড়া খেয়ে ফেলল অসীম।

কিন্তু কাজটা খুব ভাল হয়নি সেটা টের পেতে শুরু করল বিকেলের দিকে। অসুস্থ বোধ করতে শুরু করল। এবং শেষ পর্যন্ত, সকালের স্মৃতিতে মন থেকে সাড়া না পেলেও, আতঙ্কিত অসহায় বোধ-করা মানসীর রাত্রে খবর পাঠাতে হল মন্মথকে।

খবর পেয়েই মন্মথ এল! ডাক্তার ডাকল। ওষুধ আনল। আর, ডাক্তার অভয় দেওয়া সত্ত্বেও আতঙ্কিত মানসীর বার বার অনুরোধে সে রাত্রে এ বাড়ীতে থেকে যেতে হল মন্মথর। এত আতঙ্কের ভিতরও মানসী অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল, সেই আগের খোলসে ঢুকে কত সহজে আবার সেই নিখুঁত রক্ত-মাংসের যন্ত্র হয়ে গেছে লোকটা।

কিন্তু মানসী জানল না, এই রক্ত-মাংসের যন্ত্রটাকে কি দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে আমন্ত্রণ করে আনল ও।

সারারাত ভাল করে ঘুম এল না মন্মথর। জানলার বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। নিশুতি নৈস্তব্ধ। চাপ চাপ মৌন-অন্ধকারের অতলে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে যেন চেতনা। শ্বাস রোধ করে আনছে। পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে চুড়ির টুং-টাং, নড়াচড়ার খস্ খস্ ভেসে আসছে। কেউ কি জেগে আছে? মানসী, না অসীম? নাকি দুজনেই? অন্ধকারের সুখে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নিয়ে গভীর নৈস্তব্ধের সুধাপান করছে। আচমকা সমস্ত চেতনা ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিল কল্পনাটা। অদৃশ্য এক শূন্যতার বিষাক্ত হুলে ওকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলল। একটা জ্বলন্ত পিপাসাকে কে যেন নির্মম পাথর চাপা দিয়ে রোধ করতে চাচ্ছে। সমস্ত শক্তি সংহত করে নিজেকে তুলে ধরল মন্মথ। তারপর প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল ছাদে। খোলা আকাশের নিচে।

—কে?

ভূত দেখার মত থমকে দাঁড়াল মন্মথ। প্রেতের মত টানটান অন্ধকার ছাদ ঘেঁষে উঠে আসা ঝাউ-গুলোর ছায়া থেকে যেন প্রশ্নটা ভেসে এল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল মন্মথ।

অন্ধকারের পটভূমিতে প্রশ্নের সুরটা আতঙ্কে নড়ে চড়ে উঠল। প্রায় চীৎকার করে উঠতে চাইল, কে?

মুহূর্তে প্রশ্নের অস্তিত্বটা শরীরী হয়ে উঠল মন্মথর কাছে-একটা নাম-না-জানা প্রকট অনুভূতির প্রচণ্ড ধাক্কায় যেন মন্মথ ছিটকে পড়ল সেই শরীরের উপর। দৃঢ় বন্ধনে সেই অন্ধকার অস্তিত্বটাকে জড়িয়ে ধরল এক হাতে। অন্য হাতে ওর মুখ চেপে ধরল।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আবার সামলে নিল মন্মথ। ছিটকে সরে এল। একটা কাতর অপ্রকৃতিস্থ স্বরে বলল, আমাকে ক্ষমা কর।

তারপর উচ্চারিত প্রার্থনাটা দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেল। নিদ্রিত নিস্তব্ধ সিঁড়িতে অবতরণের শব্দ তুলে তুলে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। আর সেই শব্দের উদ্দেশ্যে খোলা ছাদ থেকে একটা বিমূঢ় বিস্ময়ের কাতর প্রশ্ন শোনা গেল, কে! শোন!

পরদিন বরাহাটের সদ্য খোলা একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টের বাইরের বেঞ্চে বসে মন্মথ তন্ময় হয়ে কি যেন সব ভাবছিল। হাতের চা হাতেই ঠান্ডা হচ্ছিল। পায়ের কাছে একটা ছোট্ট টিনের সুটকেস। বংশী থেকে এ পর্যন্ত একটা লরি ধরে এসেছে। এখান থেকে প্রথম বাসটা ধরতে হবে। বরাহাট থেকে ভাগলপুর। তারপর?

মানসী কি এখন রোজের মত সামনের মাঠটায় প্রাতঃভ্রমণ করছে? না কি মন্মথর বাড়ীটার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়াপরশীরাও দরজায় তালা দেখে অবাক হয়ে আলোচনা করছে, মন্মথ ভাইয়া তো মোকাম ছেড়ে কোনদিন কোথায়ও যায় না! মানসী কি আর একদিন পাপহারিণী দিঘিতে যাবে? স্নান করতে?

শেকলের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মন্মথ। পাশের পানের দোকানটা ঝাপ তুলছে। হঠাৎ ঝাপের ফাঁক দিয়ে ভেতরের বাঁকাচোরা আয়নায় নিজের ভাঙ্গা-চোরা মুখটার প্রতিবিম্বের দিকে চোখ পড়ল ওর। সতৃষ্ণ কৌতূহলে অপলকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মন্মথ। আর দেখতে দেখতে এক সময় হঠাৎ মনে হল, মন্দার পাহাড়টা একবার তুলে ধরতে পারলে মধুদৈত্যের এই মুখটাই বোধ হয় দেখতে পেত সেখানে।

সংবাদ বিচিত্রা

।। ভাষা শিক্ষার ল্যাবরেটরি ।।

লণ্ডনের ইলিং টেকনিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরিতে ৪,০০০ পাউণ্ড (৫৩,৩৩০ টাকা) ব্যয়ে স্থাপিত একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র সাহায্যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ শতকের বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সম্প্রতি অডিও-ভিস্যুয়াল কোর্সেও এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কোর্সে যোগদানকারী সাধারণ বয়স্ক ছাত্ররাও ২৫০ ঘণ্টা পড়াশোনা করে ফরাসী ভাষায় দৈনন্দিন কাজ চালাবার উপযোগী কথাবার্তা বলতে পারে। অন্যান্য ভাষা শিক্ষাদানের জন্যও অনুরূপ কোর্স প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে।

উক্ত কলেজের জেনারেল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষা মিস মেবেল স্কালথর্প বলেন, “বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মত কথ্য ভাষা শিক্ষাদানের জন্যও শীঘ্রই ল্যাবরেটরি অত্যাবশ্যক বলে পরিগণিত হবে।”

ইলিং-এর ল্যাবরেটরিতে ১৬টি শব্দনিরোধক ক্ষুদ্র কক্ষে মাইক্রোফোন ও ইয়ারফোনসহ দুই ট্র্যাকবিশিষ্ট একটি করে টেপ রেকর্ডার আছে। একটি কণ্ট্রোল রুমে রয়েছে সমস্ত শিক্ষাদান কার্যটি তদারক করার ব্যবস্থা। এক-একটি কক্ষে এক একটি ছাত্র বসে শিক্ষকের নির্দেশানুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়ের অনুশীলন করতে পারে। কণ্ট্রোল রুমে বসে একজন শিক্ষক কয়েকটি সুইচের সাহায্যে ১৬ জন ছাত্রের কাজ তদারক করতে পারেন এবং সকলকে একই সঙ্গে নির্দেশ দিতে পারেন। আবার এক একজনের কথা আলাদাভাবে শুনে, যন্ত্রটি থামিয়ে অন্যদের বিরক্ত না করে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে লেখা বা গ্রামার ও বাক্যরচনা ইত্যাদি শেখানো হয় না। ছাত্ররা প্রথমেই স্বাভাবিক ভাবে ও সঠিক উচ্চারণে এক একটি বাক্য বলতে শেখে। কথাবার্তা শোনা, বোঝা ও বারবার বলে আয়ত্ত করার পর ছাত্রদের লিখতে পড়তে শেখানো হয়। নিজের কাঁচনির্মিত কক্ষে বসে একজন ছাত্র পর্দার ওপর প্রতিফলিত কতগুলি চিত্র দেখতে পায়, যেগুলি তার কথাবর্তার বিষয়গুলিকে রূপদান করে। ইয়ারফোনের সাহায্যে যে চিত্রগুলির বর্ণনামূলক কথাবার্তা শুনতে পায়। এক একটি শব্দ শুনে সে তা নিজে মাইক্রোফোনের সামনে উচ্চারণ করে। শিক্ষকের কথা এবং তার কথা দুটিই পাশাপাশি টেপ মেশিনে রেকর্ড হয়ে যায়। এইভাবে কতগুলি বাক্য বলার অভ্যাস করার পর ছাত্রটি রেকর্ড চালিয়ে শিক্ষকের কথাগুলি এবং তার পাশাপাশি নিজের কথাগুলি শোনে। শুনতে শুনতে নিজের উচ্চারণের ত্রুটিগুলি সে নিজেই ধরতে পারে এবং আবার সে কথাগুলি আরও ভালভাবে উচ্চারণ করার চেণ্টা করে। এইভাবে সে যতবার নতুনভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করে ততবার সেগুলি পুরাতন কথাগুলির জায়গায় নতুন করে রেকর্ড হয়ে যায়। এইভাবে শিক্ষকের কথাগুলি শুনতে শুনতে এবং বারবার সেগুলি বলতে বলতে তার সঠিক উচ্চারণটি রপ্ত হয়ে যায়। এই অভ্যাসের সময় শিক্ষক তার অজ্ঞাতসারে তার চেণ্টার ওপর কান রাখেন এবং প্রয়োজনমত তাকে থামিয়ে সংশোধন করান।

ইলিং কলেজের ফরাসী ভাষা শিক্ষার কোর্সে ছাত্রদের ১৫০০টি সুনির্বাচিত শব্দ এবং কতগুলি বিশেষভাবে রচিত বাক্য শেখানো হয়। ছাত্ররা ফ্রান্সে গিয়ে যে সকল অবস্থার মধ্যে পড়তে পারে সেরকম ৩২টি অবস্থা চিত্র-সহযোগে দেখানো হয়। এবং সে সম্পর্কিত কথাবার্তা তাদের শেখানো হয়।

।। সর্বাধিক দ্রুতগামী বাণিজ্য-জাহাজ ।।

ডেনিসন নামে আমেরিকায় একটি অভিনব বাণিজ্য-পোত নির্মিত হয়েছে, বর্তমানে একে জাহাজ নির্মাণ ঘাঁটিতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ১০৪ ফুট এবং ওজন মাত্র ৮০ টন। ঘণ্টার গতি হবে ৬০ নট। চলবার সময় জল থেকে এর কাঠামো কিছুটা ওপরে থাকবে এবং ডানাতে ভর করে অগ্রসর হবে। এটিই হবে আমেরিকার সর্বাধিক দ্রুতগামী বাণিজ্যপোত।

।। হৃদস্পন্দন বন্ধ— কিন্তু রোগীর প্রাণ লাভ ।।

হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে। যান্ত্রিক উপায়ে বুকের বাইরের দিকে, নিয়মিতভাবে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধ হৃদস্পন্দন পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। মেরিল্যাণ্ডের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। এই যন্ত্র সাহায্যে প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর পরিমাণে রক্ত যাতে পাম্প করা যেতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরও এই পদ্ধতিতে ফুসফুসে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় রোগীকে মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করা যেতে পারে।

।। ইলেকট্রোনিক কম্পিউটার কেন্দ্র ।।

দিনের যে কোন সময় দেখা যায় বার্লিনের একটি দোকানের বড় জানালার সামনে বহু লোক জড় হয়ে কি যেন দেখছে, অথচ ঐ দোকানে কিছু বিক্রী হয় না। দিনের বেলায় স্কুলের ছেলে মেয়েরা দোকানের মোটা কাঁচে নাক ঠেকিয়ে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রয়েছে ভেতরের অদ্ভুত আকৃতির ধূসর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দিকে, ভেতরে সাদা লম্বা জামা পরা মেয়েরা হাতে পাকানো কাগজের কাটিম নিয়ে আসছে, যাচ্ছে। রাতেও পথচারীরা এদিকে তাকালে দেখে নানা রঙের রঙীন আলো ও ডায়াল জ্বলছে, নিবছে, কোন আলো জোরে জ্বলে উঠছে, কোন আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলছে, আবার নিবে যাচ্ছে। বার্লিনের এই কৌতূহল জাগরূক যন্ত্রটি একটি ইলেকট্রোনিক কম্পিউটার কেন্দ্র।

এই হিসাবকারী রোবট অসাধ্য সাধন করতে পারে। জটিল অঙ্ক এতে নিমেষে করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের ছশো কর্মচারীর মাইনে কত দিতে হবে, তা এই যন্ত্রে পাঁচ মিনিটে জানা যায়। কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামে তথ্যে ভরা ফুটো করা কার্ড যন্ত্রের একদিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে প্রত্যেকের মাইনের কাগজ বেরিয়ে আসে। একই সঙ্গে যন্ত্রে হিসেব হয়ে যায় মালিককে মাইনে বাবদ মোট কত দিতে হবে, আয়কর কত পড়বে, স্বাস্থ্যবীমার দরুন কত যাবে এবং সমাজবীমার অঙ্কই বা কত। ফুটবোর্ড দিয়ে হিসেব করলে যন্ত্রটি ৬৪,০০০ সংখ্যা সেকেণ্ডে হিসেব করে, কিন্তু ম্যাগনেটিক টেপের সাহায্যে হিসেব করলে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় সেকেণ্ডে এক লক্ষ। অবিশ্বাস্য নয় কি? একঘণ্টা এই কম্পিউটার চালাতে খরচ পড়ে ৪০০ থেকে ৭০০ জার্মান মার্ক অথবা ১০০ থেকে ১৭৫ ডলার। এর দাম হচ্ছে ১·৬ মিলিয়ন জার্মান মার্ক অথবা ৪,০০,০০ ডলার। যন্ত্রটি চালানর অঙ্কশাস্ত্রে পারঙ্গম এগারোজনের একটি দল। এতে শুধু বেতন হিসেব করা হবে না; নানারকম হিসেব এতে সারা যাবে যা আগে করতে বার্লিনের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচুর সময় যেত।

॥ আম দরবার ॥

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের অন্যতম বড় কারণটিকে তিনি সঠিক উপলব্ধি করেছেন। পাঁচ বছর অন্তর শুধু ভোটের সময় একবার মাত্র দেখতে পাওয়া যায় বাবুদের, তার মধ্যে শত প্রয়োজনেও কারো টিকিটি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না—শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশবাসীর এই প্রধান অভিযোগের প্রতিকারের এক আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যবস্থা করেছেন তিনি। রক্তকরবীর রাজার মত জালের আড়ালে নিজেকে বন্দী না রেখে তিনি ঘোষণা করেছেন, দেশের সাধারণ মানুষের অভিযোগ তিনি সপ্তাহে একদিন স্বকর্ণে শ্রবণ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধু যে শাসক-শাসিতের দুরতিক্রম্য ব্যবধানই অপসৃত হবে তাই নয়—এই সম্পর্কের নিবিড়তা দুর্নীতি দূরীকরণেও বিশেষ সহায়ক হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সোজা-সুজি অভিযোগ পৌঁছে যাওয়ার ভয়ে অনেক রাজকর্মচারীকেই এবার দুর্নীতির পথে পা বাড়ানোর আগে দুবার চিন্তা করতে হবে। ক্ষুদে আমলাদের অসহনীয় অত্যাচারও এর ফলে অনেকখানি কমবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাতে পারলে অভিযোগের প্রতিকার হবে—এ বিশ্বাস যদি সত্যিই দেশবাসীর মনে সুদৃঢ় হওয়ার সুযোগ পায় তবে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তা এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাবে। একই কারণে তাঁর গ্রামে গ্রামে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসানোর সিদ্ধান্তও দেশবাসীর অভিনন্দনলাভ করবে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ মথুরার সিংহাসনলাভ করে যুগে যুগেই ব্রজের রাখালদের ভুলে আসছেন—শ্রীপ্রফুল্ল সেন যদি তার স্বাগত ব্যতিক্রম হন, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

॥ জাল ও ভেজাল ॥

জাল ও ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে সারা দেশের ক্ষোভ সংসদেও প্রতিধ্বনি তুলেছে। সব দলের সদস্যই এক কণ্ঠে দাবী তুলেছেন, অবিলম্বে এই কলঙ্ক-জনক অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে এবং ভেষজ-শিল্পকে জাতীয় শিল্পে পরিণত করতে হবে। জনৈক সদস্য বলেছেন, দুষ্কৃতিকারীরা অবাধে ওষুধ জাল করার সুযোগ পাওয়ায় ভারতে নির্মিত ওষুধের ওপরেই এদেশের লোকের আস্থা চলে গেছে। তাঁর নিজের ডাক্তারই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভারতে নির্মিত পেনিসিলিন স্পর্শ পর্যন্ত না করতে। অপর এক সদস্য বলেছেন, কতকগুলি সমাজ-বিরোধী মানুষকে ওষুধের নামে বিষ-বিক্রয়ের সুযোগ দিয়ে সরকার প্রকৃত-পক্ষে নিজেকেই এক ব্যাপক গণহত্যার অংশীতে পরিণত করেছেন। যতদিন না

দেশে বিদেশে

ভেষজ-শিল্পকে জাতীয় শিল্পে পরিণত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের অতি কঠিন শাস্তিতে দণ্ডিত না করা হবে ততদিন এ অবস্থার কোন প্রতিকার নেই। ওষুধের মাননির্ধারণকল্পে সারা ভারতে গবেষণাগার আছে মাত্র একটি, সেটি আছে কলকাতায়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লীর মত বড় শহরেও ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধ পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই; এ ভাবলেও অবাক হতে হয়। তাছাড়া আইনে ওষুধের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা এমনই অস্পষ্ট ও ব্যাপক যে এদেশের যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই 'ওষুধ' নাম দিয়ে যে কোন বস্তু চালানো সম্ভব। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে যদি সরকারের দৃষ্টি না পড়ে, তবে অবস্থার কোন প্রকৃত প্রতিকার কোনদিনই হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

॥ আলজিরিয়া ॥

বেনখেদা-বেনবেলা বিরোধের অবসানের পর আলজিরিয়া শান্ত হয়েছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সংখ্যাতীত সমস্যা আজ নতুন করে বিপর্যস্ত করার উপক্রম করেছে আলজিরিয়ার জন-জীবনকে। শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের ব্যাপক হারে দেশত্যাগের ফলে আলজিরিয়ায় আজ সবচেয়ে অভাব ঘটেছে শিক্ষক ও চিকিৎসকের। আলজিরিয়া স্বাধীন হওয়ার পর পঁচিশ হাজার ফরাসী শিক্ষকদের মধ্য হতে প্রায় চব্বিশ হাজার স্বদেশে ফিরে গেছেন। ফলে সমগ্র আলজিরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাই আজ অচল হয়ে পড়েছে। আলজিরিয়ার পক্ষ হতে ঐ শিক্ষকদের আবার ফিরে আসার জন্যে সবিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং কেউ কেউ ফিরে আসছেনও। কিন্তু অধিকাংশের কাছেই এখন কঙ্গোর অধিকতর বেতনের আকর্ষণ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়াও আছে আফ্রিকায় সদ্য-স্বাধীন আরও সতেরটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ, যেসব জায়গাতে গেলেই উচ্চতর বেতনে শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া যাবে। সমগ্র দেশের তুলনায় আফ্রিকার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু সে ব্যবস্থাটুকু বজায় রাখার জন্যেও আলজিরিয়ার এখনই পঁচিশ হাজার ফরাসী-জানা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়েছে। এ অবস্থায় ভারত সরকার আলজিরিয়া ও ভারতের ফরাসী-জানা শিক্ষিত-সমাজের প্রভূত উপকার করতে পারেন বলে মনে হয়। উচ্চতর বেতনের সুযোগ পেলে এ দেশের বহু ফরাসী-জানা শিক্ষিত যুবকই আলজিরিয়ায় শিক্ষকতার কাজ নিয়ে যেতে সম্মত হবেন।

ফরাসীরা চলে যাওয়ায় ডাক্তারের অভাবও গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করেছে আলজিরিয়ায়। কিন্তু এ সমস্যা খোদ এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর সকল দেশের ভীষণ সমস্যা।

॥ আরব রাজনীতি ॥

সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ-বিচারের উদ্দেশ্যে লেবাননে আরব লীগের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। ঐ অধিবেশনের আলোচনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা সামান্যই আছে, তবে অকারণ উত্তেজনা হ্রাসের উদ্দেশ্যে এই ধরণের আন্তঃরাষ্ট্র অধিবেশনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। আরব লীগের অধিবেশন আহ্বান খুব সহজে সম্ভব হয়নি। কারণ পরস্পর বিবদমান ঈজিপ্ট, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েৎ, জর্ডন ও সৌদি আরবের অবাঞ্ছিত কলহের মধ্যে সুদান, ইয়েমেন, টিউনিসিয়া, লেবানন, মরক্কো ও লিবিয়া—এই কটি নিরপেক্ষ আরবরাষ্ট্র নিজেদের জড়িত করতে চায়নি। শেষপর্যন্ত লেবাননে যে সম্মেলন ডাকা সম্ভব হয়েছে তা লেবাননের বহু সর্ত স্বীকৃত হওয়ার পর। সম্মেলন লেবাননের রাজধানী বেইরুটে হবে না, কারণ তাতে রাজধানীর নাসেরপন্থী ও নাসের-বিরোধীদের মধ্যে রাজধানীতে যে অকারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত তা বন্ধ হবে।

সব কটি আরবরাষ্ট্রেই এখন নাসেরের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভি-যোগের বিচারের ঝুঁকি কোন আরব-রাষ্ট্রের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আরব-জগতে বিরোধ কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু আজকের বিরোধের রূপ ও চরিত্র ভিন্নতর হয়েছে বলে মনে হয়। এখন আর শুধু সিংহাসনের দখল ও উত্তরাধিকার নিয়ে আরব দেশগুলির মধ্যে বিরোধ হয় না। আজ অধিকাংশ আরবরাষ্ট্রেই বিরোধের বিষয় রাজতন্ত্র অথবা প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্র, সংযুক্ত বিশাল আরব অথবা খণ্ড বিচ্ছিন্ন সার্বভৌমত্ব, ধর্মতন্ত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষ, এবং কোন বিরোধই আজ আর কোন রাষ্ট্র-সীমানার ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নাসের-বাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বোধহয় এইখানেই।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৬ই আগস্ট—৩১শে শ্রাবণ ঃ 'সকলের সহযোগিতা পাইলে কংগ্রেস ও সরকারের যুক্ত নেতৃত্বে গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তোলা সম্ভব হইবে'—শিল্পপতিদের সম্বর্ধনার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের উক্তি। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের মন্তব্য ঃ ডাঃ রায়ের স্থলাভিষিক্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ইতিমধ্যেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

'প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের কারণ'—রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

১৭ই আগস্ট—৩২শে শ্রাবণ ঃ 'ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা-সীমান্ত রক্ষার ভার গ্রহণ'—লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের ঘোষণা।

যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করিয়া পুঞ্চ অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের সপ্তাহকাল যাবৎ গুলীবর্ষণ—আধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করার সংবাদ।

১৮ই আগস্ট—১লা ভাদ্র ঃ মাস্টার তারা সিং (অকালী নেতা) ও সন্ত ফতে সিং (বিরুদ্ধবাদী নেতা) সহ শতাধিক অকালী গ্রেপ্তার— সংঘর্ষ এড়াইতে পাঞ্জাব সরকারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার-সীমান্তে অতিরিক্ত পাক্ সৈন্য সমাবেশ এবং কয়েকটি গ্রামে পরিখা খনন—পাকিস্তানের নিকট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিবাদ।

১৯শে আগস্ট—২রা ভাদ্র ঃ 'স্বার্থান্বেষী পশ্চিমী শক্তির চক্রান্তেই কাশ্মীর সমস্যা জীয়াইয়া রাখিয়াছে।'—প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীমেননের কঠোর মন্তব্য।

ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় সমগ্র ডিব্রুগড় শহর প্লাবিত—জলস্ফীতির দিক হইতে পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ—লখিমপুর, শিবসাগর, দারাং, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় বন্যার প্রকোপ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের (পশ্চিমবঙ্গ) নূতন প্রস্তাব ঃ গ্রামাঞ্চলে মন্ত্রিসভার বৈঠক (বছরে অন্ততঃ চারবার) আহ্বান করা হইবে।

চীন-ভারত বিরোধে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) নীতি সমর্থন—ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে (হায়দ্রাবাদ) প্রস্তাব।

২০শে আগস্ট—৩রা ভাদ্র ঃ 'বিভিন্ন রাজ্যের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন সম্ভব'—পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সম্মেলনের (কলিকাতা) উদ্বোধন-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের ভাষণ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের গণসংযোগ ব্যবস্থা—নিজ বাসভবনে প্রথম দিনেই তিন শত লোকের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ।

মাস্টার তারা সিং ও সন্ত ফতে সিং (পাঞ্জাব) সহ সমস্ত আটক অকালীদের মুক্তিলাভ।

২১শে আগস্ট—৪ঠা ভাদ্র ঃ অবিরাম ধারাবর্ষণের ফলে উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত—কয়েক সহস্র বিপন্ন নর-নারীর আশ্রয় গ্রহণ—বিহারের বিভিন্ন নদীতেও জলস্ফীতির সংবাদ।

'সমবায় আন্দোলনের সাফল্যকল্পে সাহেবিয়ানা বর্জনীয়'—কলিকাতায় সর্বভারতীয় সমবায় সংগঠন ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ভাষণ।

২২শে আগস্ট—৫ই ভাদ্র ঃ আসামে বন্যার্তদের উদ্ধারকার্যে সামরিক বাহিনী তলব—বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিমান হইতে খাদ্য নিক্ষেপের ব্যবস্থা—যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি পি চালিহার আবেদন।

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের চীন-ভারত সীমান্ত নীতি অনুমোদিত—লাডাক অঞ্চলের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত বলিয়া শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১৬ই আগস্ট—৩১শে শ্রাবণ ঃ সমগ্র কুষ্টিয়া (পূর্ব পাকিস্তান) সীমান্ত বরাবর পাক্ রাইফেল বাহিনীর ফৌজদের বিপুল সংখ্যায় সমাবেশ—স্থায়ী সামরিক শিবির স্থাপনে পূর্ব পাক্ সরকারের তৎপরতা।

১৭ই আগস্ট—৩২শে শ্রাবণ ঃ ১লা অক্টোবর (১৯৬২) হইতে পশ্চিম ইরিয়ানে রাষ্ট্রসংঘের শাসন বলবৎ—ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার রিকেয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ টীমের সুপারভাইসার নিযুক্ত।

১৮ই আগস্ট—১লা ভাদ্র ঃ মস্কোতে সর্বশেষ দুই মহাকাশচারীদ্বয়ের (নিকোলায়েভ ও পোপোভিচ) অপূর্ব সম্বর্ধনা—অভিনন্দন-জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) মন্তব্য ঃ যুগল মহাশূন্যচারীদ্বয় মহাকাশের রহস্য-উদ্ঘাটনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছেন।

ঊর্ধ্বাকাশে রাশিয়ার আর একখানা মহাকাশ যান (মানব-আরোহী বিহীন) প্রেরণ।

চুক্তি-অনুযায়ী পশ্চিম ইরিয়ানে ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় বাহিনীর যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা।

১৯শে আগস্ট—২রা ভাদ্র ঃ দীর্ঘদিন আটক থাকার পর প্রাক্তন পাক্ প্রধানমন্ত্রী শ্রী এইচ এস সুরাবর্দীর করাচীতে মুক্তিলাভ।

২০শে আগস্ট—৩রা ভাদ্র ঃ 'পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই'—সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীসুরাবর্দীর দাবী।

ইস্রায়েল কর্তৃক আরব প্রজাতন্ত্রের আকাশ-সীমা লংঘন।

২১শে আগস্ট—৪ঠা ভাদ্র ঃ মস্কো-এ সাংবাদিকদের নিকট সোভিয়েট নভশ্চর নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের অভিজ্ঞতা বর্ণনা—মহাকাশের ভারহীন অবস্থায় কোনই অসুবিধা হয় নাই বলিয়া মন্তব্য—প্যারাসুটযোগে পৃথিবীতে অবতরণের তথ্যপ্রকাশ।

পূর্ব-পশ্চিম বার্লিন - সীমান্তে উত্তেজনা—সোভিয়েট বাসের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ।

জাকার্তায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া গ্রামের উদ্বোধন—ভারত সমেত পনেরোটি রাষ্ট্রের প্রায় ১৬ শত প্রতিনিধির যোগদান।

২২শে আগস্ট—৫ই ভাদ্র ঃ দক্ষিণ ইটালীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দশজন নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত।

বার্লিনে সোভিয়েট সেনাধ্যক্ষের কার্যালয় বন্ধ—পশ্চিমী শক্তিবর্গকে রুশ সরকারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

প্যারিসের নিকট প্রেসিডেন্ট দ্য গলের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ ভিক্‌টোরীয় যুগের ভারত ॥

জন বীমস ছিলেন বিলাতী সিভিলিয়ান, কিন্তু বাঘ-ভাল্লুক টাইপ ছিলেন না, তিনি অবসরকালে একটা ডিভিসনের কমিশনার হিসাবে প্রমোশন পেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি তাঁর হয়নি বটে, আর তার কারণ হয়ত তিনি রুটিনের বাঁধাধরা রাস্তায় বিচরণ করেননি, কিন্তু যে দেশে তিনি কাজ করেছেন সেই দেশের উন্নয়ন তাঁর লক্ষ্য ছিল।

জন বীমস ছিলেন প্রতিভাধর পুরুষ। অনেকগুলি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল, হেইলবেরী কলেজে গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন, পারসির জন্য পেয়েছিলেন পদক। বাবরের আত্মকথা তুর্কী ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। গ্রীক, লাতিন, জর্মান, ফরাসী, স্প্যানিস, ইতালিয়ান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষা ব্যতীত সংস্কৃত, বাংলা, পারসিক, তুর্কী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় রীতিমত ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন বীমস, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, এককালে সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশদের এই বাংলা ব্যাকরণ পড়তে হত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আর্যভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনায় নিযুক্ত হন, তার প্রথম খন্ড ১৮৭২, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৭৫ ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বীমস তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন—"আমার এই প্রচেষ্টা উত্তম কি অধম জানি না, আমার গ্রন্থ তুলনামূলক ব্যাকরণ হিসাবে রচিত, আর সেই ভাবেই নামকরণ করেছি।"

বীমস তাঁর কর্ম উপলক্ষ্যে পাঞ্জাব, বিহার, ও উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশে সুদীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন। কর্মজীবনের সূত্রপাত বঙ্গদেশে এবং অবসান ঘটে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনার হিসাবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই পাঞ্জাবের গুজরাট প্রদেশে (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান) জন বীমস নিযুক্ত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একজন শিখ্ শিক্ষক নিযুক্ত করে আদালতের পল্লীবাসী মামলাদারদের মুখের ভাষা শিখে নিলেন।

নির্বোধ মানুষকে বীমস সহ্য করতে পারতেন, তাঁর প্রকৃতি ছিল কিঞ্চিৎ ক্ষেপাটে ধরনের। তাঁর ওপরওলাদের মধ্যে যাঁরা বেশী চালিয়াৎ তাঁদেরই তিনি ততোধিক ঘৃণা করতেন এবং সেই মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখতে পারতেন না। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল একবার কটকে গিয়েছিলেন, সেই সময় স্যার রিচার্ডের বাচনভঙ্গীর নকল এবং বক্তব্যের অনুকৃতি (Parody) করায় চাকুরী-জীবনে তাঁর উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। বীমসের রচনার মধ্যে যে স্বচ্ছতা, যে বলিষ্ঠতা এবং উজ্জ্বল রঙ লক্ষ্য করা যায় তার দ্বারাই বিচার করা সম্ভব যে জন বীমস একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। অনেক মানুষের ভিড়ে তিনি মাথা উঁচু রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

জন বীমস নিজের খেয়ালে যে আত্মকথা রচনা করেছিলেন, তা অসম্পূর্ণ। পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িষ্যা এবং চট্টগ্রাম সম্পর্কে অনেক তথ্য এই গ্রন্থে আছে, তবে বাংলাদেশ সম্পর্কিত অংশ তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাঁর এই মূল্যবান স্মৃতি-চরিত হয়ত কোনোদিন প্রকাশিত হত না, যদি না ফিলিপ ম্যাসন—যিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন, তিনিই বীমসের মৃত্যুর প্রায় ষাট বছর পরে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করতেন। ফিলিপ ম্যাসন লিখিত ভূমিকায় সমৃদ্ধ হয়ে এই স্মৃতিচারণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালের পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িষ্যার মানুষের যে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, লোভ, উঞ্ছবৃত্তি, নোঙরামি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা তিনি দিনলিপিতে লিখে গেছেন, অনেক চিঠিপত্রও আছে। তরুণ ইংরাজের পক্ষে নতুন দেশের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। আদালতকক্ষে সুদীর্ঘ সময়পাত, কিংবা 'ইনসপেকসন' উপলক্ষ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দীর্ঘপথ অতিক্রমণ সবই ক্লান্তিকর। অনেক সময় কোনও বাঁধাধরা নিয়ম বা নীতি না থাকায় 'রেডিমেড' বিচার-ব্যবস্থা নিজের খেয়াল-খুশীমত করতে হত, সবচেয়ে অসুবিধা ছিল তখনকার কালের ওপরওলা মহাপ্রভুরা অধঃস্তনদের ত্রুটী ক্ষমা করতেন না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় সেকালের পাঞ্জাবের ছোটলাট জন লরেন্স সাহেবের কথা, তিনি তরুণ সিভিলিয়ানদের কেবল এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় বদলী করতেন—"to wean them from their weak, effiminate liking for clean shirts, a decent house and a settled life. Elmslie, one of my Haileybury comrades, imprudently brought a Piano to the Punjab with him. His refinement was unpardonable, and poor Elmslie was moved five times from one end of Punjab to the other in the course of two years 'I'll smash his Piano for him', John Lawrence is reported to have said, when he heard of such a degradation as a Punjab officer having a Piano." বীমস নিজে কলকাতা থেকে ডিনার-খাওয়ার জন্য সুন্দর বাসনপত্র কিনে এনেছিলেন, তাঁকে সবাই উপদেশ দিল একথা যেন প্রকাশ না পায়, তাহলে কেবল এক ঠাঁই থেকে অপরাঞ্চলে বদলী করে সবগুলি ভেঙে দেওয়া হবে।

জন বীমস ভ্রষ্টচরিত্র রাজা এবং তাঁদের ম্যানেজার সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমার বরাবর লক্ষ্য ছিল রুই কাৎলার দিকে, আমি জানতাম চুনোপুঁটি ধরে লাভ নেই, তারা যদি নিপাত যায় তাহলে কাৎলা শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে সহজেই তাদের জায়গায় অন্য লোক বসানো সহজ হয়। উইঢিবি খুঁড়তে গিয়ে, মজুর উইপোকাকে মারা ঠিক নয়, যদি রাণী উইপোকাকে ধরা যায়, তাহলেই ফল পাওয়া যায়, সমগ্র পিঁপড়ের বাসা ধ্বংস হয়।" দুঃখের বিষয় ১৯৬২-র ভারতেও মজুর উইপোকাকেই ধরার চেষ্টা, রাণী উইপোকার কাছে কেউ ঘেঁষে না।

জন বীমস ভাবাবেগ-প্রধান মানুষ নন, মৃত্যু দেখে তিনি কাতর হন না, মড়ক মন্বন্তর তাঁর কাছে যেন কিছু নয়। রথযাত্রার হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পথের পাশে মরে পড়ে আছে। কিন্তু এই তীর্থযাত্রীদের মৃতদেহ তাঁকে এতটুকু বিচলিত করেনি। তিনি লিখেছেন—"Often journeying about the district and riding late along the road we passed scores of white figures of Bengali women lying asleep on the damp ground muffled in their thin cotton saris,

their only garment. We never knew how many of them were alive and how many were dead. Only every morning a band of 'Sweepers of the dead' (murdah-farash), as they were called marched along with a cart to carry off and bury as many of the white robed figures as had finished their mortal journey during the night." প্রচুর মুর্দাফরাস নিযুক্ত হয়েছিল এই সাফাই-কর্মের জন্য। এই অংশের পরই বীমস বাড়িতে কি রকম আহারাদি করতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন. রাত সাড়ে আটটার ডিনারে থাকত সুপ, রোস্ট-ফাউল কিংবা ডাক, মাঝে মাঝে মাটন, শীতকালে বীফ এবং মিষ্টান্নাদি। পান করতেন বীয়র কিংবা ক্লারেট মদ্য। মোটামুটি এই উত্তম আহার, তবে অতিথিরা স্যাম্পেনটাই পছন্দ করতেন তার সঙ্গে টিন-সংরক্ষিত খাদ্যাদি।

সর্বদাই অবশ্য তিনি ডিনার বা লাঞ্চের বিবরণ দেননি। খাদ্য-আগ্রহ তাদৃশ প্রবল ছিল না, বরং কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন। যে কোনও প্রকার আবহাওয়া তাঁর সইত। কোনও অসুবিধা ছিল না. শুধু চট্টগ্রামের বৃষ্টি তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। তিনি লিখেছেন— "You up-country fellows never see rain like we have here. It begins early in the morning before daybreak on the first of the month and when you go to bed at ten o'clock on 31st it is still drizzling on the same remorseless way." মাসের পয়লা তারিখের প্রাতঃকালে শুরু হয়ে ৩১শে রাত্রিতেও টিপ টিপ করে পড়ছে। বুট জুতো ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে প্রিয়দ্রব্য গ্রন্থ-সংগ্রহ, এই বৃষ্টিজনিত ড্যাম্পে বই-এর মলাট খসে যাচ্ছে। ভেতরের পাতাগুলি একেবারে মণ্ডে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর মৃতদেহের ওপর যেন শব-প্রাবরণীর মত নিঃসাড়ে ঝরে পড়ছে বর্ষাধারা।

এই বর্ণনার সবটুকু উধৃত করতে পারলে ভালো হত, কারণ এমন বিচিত্র বিবরণ কদাচিৎ দেখা যায়। একজন বিলাতী সিভিলিয়ানের পক্ষে রীতিমত উত্তম রম্যরচনা। অথচ তিনি বৈয়াকরণিক, এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং তার স্থায়ীত্বকাল প্রায় কুড়ি বছর। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কারের পর তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি জর্নালে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

নানা কারণে জন বীমসের স্মৃতি-কথার প্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভিকটোরীয় যুগের ভারতের ছবি এই স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে একজন ভাষাবিদ-গবেষকের জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়। *

* MEMOIRS OF A BENGALI CIVILIAN: By John Beames (Chatto & Windus—30 sh.)

✱

কল্লোল-গোষ্ঠীর পুনর্মিলন

বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'কল্লোল' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। প্রগতিমূলক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য কল্লোলের লেখকবৃন্দ প্রখ্যাত। তিরিশের দশকে কয়েকজন লেখক একত্রিত হয়ে বাংলা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। তারপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত, সেদিনের তরুণ-বৃন্দ আজ অনেকেই প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত, তথাপি আজো তাঁদের লেখনী সচল, আজো বাংলা সাহিত্য তাঁদের অপর্যাপ্ত দানে সমৃদ্ধ। এই কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধুগণ দীর্ঘকাল পরে প্রবীণ সাহিত্যসেবী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি মহানির্বাণ রোডে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাসভবনে এক মনোজ্ঞ প্রীতি-সম্মেলনে মিলিত হন। এই সভায় কল্লোল যুগের নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, মনীশ ঘটক, সোমনাথ সাহা, নির্মলচন্দ্র সিংহ, মনীন্দ্র চক্রী, ভূপতি চৌধুরী, বিকাশচন্দ্র চৌধুরী, ক্ষিতীন্দ্র সাহা, আশুতোষ ঘোষ ও অমিয়কুমার সেন প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পুরাতন বন্ধুদের সমাগমে সভাস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে, এবং কার্যক্রমের অনেকখানি অংশ টেপ রেকর্ড করা হয়। কয়েকখানি সম্মিলিত আলোকচিত্রও গ্রহণ করা হয়। শ্রীমতী নীলিমা সেন কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

ক'ল্লোল যুগের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এই সমাবেশে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর স্কেচ অঙ্কন করেন। সাম্প্রতিককালে এতগুলি প্রখ্যাত সাহিত্যিকের এত দীর্ঘ সময়-ব্যাপী প্রীতি-সম্মেলন এক স্মরণীয় ঘটনা। গৃহস্বামী সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সমাগত বন্ধুদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

নতুন বই

রবীন্দ্র অভিধান— (২য় খণ্ড)— সোমেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড— ১নং শংকর ঘোষ লেন—কলিকাতা —৬। দাম ছ' টাকা।

সোমেন্দ্রনাথ বসু অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে 'রবীন্দ্র অভিধান' রচনা করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থের সংকলন-কর্ম অতিশয় দুরূহ। অভিধানকার কৃতিত্বের সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড আলোচনাকালে এই কথা 'অমৃতে' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় এবং ১৬৬ পৃষ্ঠায় হুইটম্যানের একই কবিতার আগাগোড়া মুদ্রণ করার অর্থ বোধগম্য হল না। ৫৩-৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'আত্ম-পরিচয়' সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেই রকম 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' ২১৭ পৃষ্ঠায় আরম্ভ এবং ২২৯ পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে। এই জাতীয় আরো উদাহরণ দেওয়া যায়, ফলে ২য় খণ্ডে 'অ' এবং 'আ' সম্পূর্ণ হয়েছে। অভিধানের মন্তব্য সংক্ষিপ্ত করাই রীতি, বিস্তারিত আলোচনা Encyclopaedia জাতীয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। অভিধান এবং কোষ-গ্রন্থের সমন্বয় যদি রবীন্দ্র অভিধান হয় তাহলে অবশ্য আপত্তির কারণ নেই। এই কয়েকটি ত্রুটি ব্যতীত 'রবীন্দ্র অভিধান' একটি মূল্যবান সম্পদ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

টক-মিষ্টি রান্না (প্রবন্ধ)—সুলেখা সরকার। এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম—১-৫০ নয়া পয়সা।

স্বর্গতা লেখিকার রান্নার বই নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশেষ জন-সমাদর লাভ করেছিল। দীর্ঘকাল পরে তাঁর এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল। নিত্যব্যবহার্য যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে টক ও মিষ্টি পর্যায়ের চাটনি, অম্বল জেলি, জ্যাম, আচার কাসুন্দি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় তার সহজ ও বিজ্ঞান-সমস্ত প্রস্তুত-প্রণালীই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাজারে প্রাপ্য দ্রব্যাদিকে গৃহে কত সহজ ও সুন্দর উপায়ে ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত করা যায় এবং তা সংরক্ষণ করবার নিয়মাদিও গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বিবিধ ধরণের মোরব্বা প্রস্তুত-প্রণালী, আমসী, আমচুর পিকল, টমাটো সস, টমাটো জুস প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালীও দেওয়া হয়েছে। সস্তায় এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তুত-প্রণালী তুলে ধরা হয়েছে, তা বাঙলা দেশের গৃহিণী-দের যেমন অন্যতম সাহায্যকারীরূপে দেখা দেবে তেমনি শ্রদ্ধেয় লেখিকার আন্তরিক প্রচেষ্টা তাদের দ্বারা সমাদৃত হবে আশা করি।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সীমান্ত (নবপর্যায় : দ্বাদশ সংকলন) সম্পাদক : তরুণ সান্যাল। ১২৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। দাম এক টাকা।

'সীমান্ত' এক সময়ে বাঙলা সাহিত্যে কবিতা-সংকলনরূপে জনসমাদর লাভ করে। তারপর দীর্ঘকাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়নি। ইদানিং বিশুদ্ধ কবিতা-সংকলনরূপে সৎসাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন পত্রিকার আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে না। ঐতিহ্যময় পত্রিকাগুলি একে একে বিদায় নিচ্ছে। এ অবস্থায় সীমান্তের আত্মপ্রকাশকে দুঃসাহসিক বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান সংকলনে খ্যাতিমান প্রবীণ কবিদের পাশে বহু তরুণ কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব সযত্নে ও সচেতনার সঙ্গেই পালন করেছেন। এ সংখ্যায় যাঁদের কবিতা আছে তাঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, গোপাল ভৌমিক মনীন্দ্র রায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃগাঙ্ক রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, কিরণশংকর সেনগুপ্ত চিত্ত ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, বীরেন্দ্র রক্ষিত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শিবশম্ভু পাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, চিত্ত ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ সিংহ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাস, করুণাসিন্ধু দে, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গোপেশচন্দ্র দত্ত, পুষ্কর দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পিনাকরঞ্জন সাহা, শঙ্কর দে, উত্তমকুমার দাস ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। এসথেটিক্সের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন অমর ভট্টাচার্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্য-গ্রন্থের বিষয়ে আলোচনা করেছেন মনীন্দ্র রায়।

চতুরঙ্গ—(মাঘ—চৈত্র ১৩৬৮) সম্পাদক : হুমায়ুন কবির। ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ। কলিকাতা—১৩। দাম একটাকা কুড়ি নয়া পয়সা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে চতুরঙ্গের স্থান কিছুটা স্বতন্ত্র। সুসম্পাদিত এই পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যাই উচ্চশ্রেণীর মূল্যবান ও উল্লেখ-যোগ্য রচনাসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে চতুরঙ্গের সমালোচনা বিভাগটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। এখনও বাঙলাদেশে নিরপেক্ষ ও জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক সমালোচনার অভাব ঘটেনি—তা সহজেই এখান থেকে উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান সংখ্যায় আলডুস হাক্সলির মূল্যবান প্রবন্ধ 'সাহিত্য ও আধুনিক জীবন' অনুবাদ করেছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সুধাংশু ঘোষের "ফানুষের উপমা" উপন্যাসটি লেখকের সাবলীল ভাষা-ভঙ্গীমায় ও চরিত্রচিত্রণের মুন্সীয়ানায় উল্লেখযোগ্য পরিণতি লাভ করেছে। বর্তমান সংখ্যায় কবিতা আছে আনন্দ বাগচী, চিত্ত ঘোষ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শামসুর রহমান ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার শিক্ষাচিন্তা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন ভবতোষ দত্ত। আধুনিক সাহিত্য পর্যায়ে "সৈয়দ মুজতবা আলির শ্রেষ্ঠ গল্প" বইখানির আলোচনা করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রথালোচনাও এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

ম্যাজিকের কথা

ভোজবাজী :

আমাদের এই বাঙলা দেশ নাকি ভানুমতীর দেশ! বছর চল্লিশ আগেও এই কলকাতা শহরের পথে ঘাটে ঝোলা কাঁধে মেয়ে এবং পুরুষ বাজিকরেরা হেঁকে বেড়াত "ভানুমতীর খেলা, "ভানুমতীর খেলা"। মাত্র চার আনা পয়সা কবুল করলেই পথের উপরেই কাঁথা বিছিয়ে হরেক রকমের ছোট বড় জিনিস বার করত তাদের সেই ঝোলা থেকে এবং সেইসঙ্গে ছোট একটি খঞ্জনী বাজিয়ে নানান্ রকম ভোজবাজি—একটা কাঠের শূন্য গেলাস থেকে এক এক করে অনেকগুলো কাঠের বল, এবং শেষ পর্যন্ত একটা আস্ত পায়রা বার করা গোছের—ভেল্কি দেখিয়ে পথচারী ছেলে বুড়ো সকলেরই তাক লাগিয়ে দিত। আর এক শ্রেণীর লোকেরাও মাঝে মাঝে খেলা দেখাত: তারা ঠিক কোন্ দেশের লোক তা বলা শক্ত। আমরা তাদের বলতুম—বেদে। তাদের মাথায় থাকত মোটা মোটা বেত-জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরী বড় বড় ঢাকাওয়ালা গোল পেটিকা। ওদের অনেক খেলার মধ্যে একটা আশ্চর্য খেলা ছিল—ওদের মধ্যে একজন সঙ্গীকে ওরা হাত-পা বেঁধে একটা জালের মধ্যে ভরে সেই জালটাকেও কষে বেঁধে ফেলত। তারপর সেই জালশুদ্ধ লোকটাকে বহু চেষ্টা চরিত্র করে সেই ঢাকনিওয়ালা গোল পেটিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। তারপর বন্ধ করে দিয়ে একজন একটা চকচকে তলোয়ার গোছের জিনিস দিয়ে সেই পেটিকার ভেতর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চালিয়ে দিত সবেগে। চার দিকের লোক ভয়ে শিউরে উঠত! কিন্তু পরে বাজিকর যখন খঞ্জনী বাজিয়ে সেই পেটিকার ঢাকনি খুলত, তখন দেখা যেত তার মধ্যে খালি জালটা এবং বাঁধনের দড়ি পড়ে রয়েছে এবং লোকটি পরক্ষণেই আমাদের ভিড়ের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

এ ছাড়া দুর্গোৎসব, রাসযাত্রা প্রভৃতি পালপার্বণ উপলক্ষে মেলায় আগত তাঁবু খাটানো ম্যাজিক দল ছিল। দু'আনা চার পয়সার টিকিট কেটে ভেতরে গেলেই তাসের খেলা থেকে শুরু করে চোখ বেঁধে আঁকাবাঁকা খড়ির দাগের উপর দিয়ে নির্ভুলভাবে হেঁটে যাওয়া পর্যন্ত বহু তাক-লাগানো খেলা দেখতে পাওয়া যেত। ওর মধ্যে একটা খেলার কথা এখনও ভুলতে পারিনি। বাজিকর একটি কাঁচের গেলাসের মধ্যে বিড়ির (সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেও সিগারেট না খেয়ে লোকেরা বিড়িই খেত!) ধোঁয়া সমেত গেলাসটাকে হাতের তালু দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করত জনৈক দর্শককে। পরে অন্য একজন দর্শককে প্রথম ব্যক্তি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে আর একটি কাঁচের গেলাস হাতে নিয়ে উপুড় করিয়ে দিত। এরপর প্রথম দর্শককে ধোঁয়া সমেত গেলাসের ওপর হাতটি সরিয়ে নিতে বলত। তখন আমরা সবিস্ময়ে দেখতুম, প্রথম থেকে ধোঁয়া যেমন আস্তে আস্তে উড়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনই আস্তে আস্তে দ্বিতীয় দর্শকের হাতের খালি গেলাসটি ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে!

আরও ম্যাজিক দেখতুম আমরা স্কুল-কলেজে, ক্লাবে, পার্টির আনন্দানুষ্ঠানে। বাজিকর স্কুলের ছেলের চোখ বেঁধে দিয়ে প্রকাণ্ড এক যোগের উত্তর বলাতেন, দর্শকের কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া আংটিকে উড়িয়ে দিয়ে আস্ত মুরগীর ডিমের ভিতর থেকে বার করতেন, কোনো দর্শকের হাতঘড়িকে হামানদিস্তাতে গুঁড়ো করে গুঁড়িয়ে ফেলে পরে তাঁরই পকেট থেকে তাকে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করতেন, হেড মাস্টার মশাইকে সকল ছাত্রের সামনে

আর ডি বনশলের নতুন চিত্রার্ঘ্য 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে সুচিত্রা সেন

দশটি টাকা গুণে দিয়ে পরমুহূর্তেই ফেরত চাইতেন এবং তিনি তাঁর হাতের টাকা ফেরত দিতে গিয়ে যখন দেখতেন তাঁর হাতে মাত্র ন'টি টাকা রয়েছে, তখন তাঁর অপদস্থ হবার ভাব ছাত্রদের মধ্যে হাসির রোল তুলত।

যোদ্দা কথা, সেযুগে পথে-ঘাটে সভাসমিতিতে ম্যাজিক দেখাবারও লোক যেমন বহু ছিল, ঠিক তেমনই ছিল ম্যাজিক দেখে আনন্দ পাবার লোকও। তাই সেকালে বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে বহু জগদ্বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান বা বাজিকরের শুভাগমন ঘটত এই শহর-কলকাতায়। বিডন স্ট্রীটের ম্যেসনিক টেম্পল-এ (বর্তমানে যেখানে বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিস) দেখেছি 'কার্টার দি গ্রেট'কে, কোহিনুর থিয়েটারে (বিডন স্ট্রীট এবং চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ-এর সংযোগস্থলের উত্তরাংশে, যেখানে ছিল মনোমোহন থিয়েটার এবং পরে শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত মনোমোহন নাট্য-মন্দির) দেখেছি থার্সটন দম্পতিকে। স্টারে এসেছিলেন বিখ্যাত চৈনিক জাদুকর চ্যাং। একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে কামানের চোঙের মধ্যে পুরে তাতে আগুন লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলার প্রেক্ষাগৃহের সর্বোচ্চতলে আবির্ভাব কার্টারের প্রসিদ্ধ খেলা। থার্সটন-দম্পতির ভল্লুক ও বানর বেশে নৃত্য করতে করতে উভয়ের মধ্যে বেশ-পরিবর্তন এবং একটি বন্ধ বাক্স থেকে থার্সটন-জায়ার অন্তর্ধানের পর লম্বা, গোলাকার চোঙের মত বন্ধ বাক্স খুলে তার ভিতরে দ্বিতীয় বাক্স, পরে আবার তার ভিতর থেকে তৃতীয় বাক্স; এমনই ভাবে পঞ্চম ষষ্ঠ, সপ্তম অষ্টম, নবম দশম বাক্সের ভিতর থেকে তার পুনরুদ্ধার—এই দুইটি খেলা দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঞ্চার করত। সেই যুগে যে-বাঙালী জাদুকর তাঁর ম্যাজিক দেখিয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম হচ্ছে গণপতি চক্রবর্তী। সে-যুগে বড়দিনের সময় ময়দানে (তখন নাম ছিল গড়ের মাঠ) তাঁবু ফেলে বহু সার্কাস দেখানো হ'ত। ওরই মধ্যে বেশ নামকরা ছিল 'বোসের সার্কাস'; এই সার্কাসে জাদুকর গণপতি তাঁর খেলা দেখিয়ে অগণিত জনতাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করতেন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এই গণপতিই হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর পি, সি, সরকারের গুরু।

বর্তমানের কলকাতা থেকে পথচারী, ভবঘুরে বাজিকরের দল তো অন্তর্হিত হয়েছেই, এমন কি শহরের কোনো আনন্দানুষ্ঠানে, জলসায় বা প্রীতি সম্মেলনে কেউ ম্যাজিক দেখিয়ে সমবেত দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করছেন, এমন ঘটনাও নজরে পড়ে না। আমরা হয় অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান হয়ে গিয়েছি, নয় বৈজ্ঞানিক যুগে হাত সাফাইয়ের খেলা দেখে বা দেখিয়ে আনন্দ পাই না। অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন পি, সি, সরকার। তিনি বছর দু'বছর অন্তর যখন পৃথিবী-পরিক্রমা শেষ করে বা তার আগে সাড়ম্বরে তাঁর 'ইন্দ্রজাল'-এর আসর বসান নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে, তখন সেখানে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ে; তিনিও প্রতিবারই কিছু-না-কিছু নতুন খেলা দেখিয়ে তাঁর দর্শকদের খুশী রাখবার চেষ্টা করেন।

'ভানুমতীর খেলা'র সঙ্গে বাঙলা দেশের নামটা জড়িয়ে পড়ল কেন, সেটা বিশেষ অনুসন্ধানসাপেক্ষ। কারণ ভোজরাজের মেয়ে ভানুমতী ছিলেন বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব যে কস্মিনকালে বাঙলা দেশে ছিল না, এই কথাই তো এতদিন ঐতিহাসিকেরা ব'লে এসেছেন। রাজা ভোজ কি বাঙলা দেশের আশেপাশে কোথাও ছিলেন? "ভোজবিদ্যা" কথাটা তো তাঁর থেকেই এসেছে, যদিও এ-বিদ্যায় তাঁর মেয়ের নামই বেশী।

শোনা যায়, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই জাদুবিদ্যা দেখানো হ'ত এবং সেই জন্যেই এর আর এক নাম 'ইন্দ্রজাল'। অবশ্য কারুর কারুর মতে সকল ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ 'চক্ষু'র ওপর এই বিদ্যা মায়াজাল বিস্তার করে ব'লেই এর নাম 'ইন্দ্রজাল'। এও শোনা যায় যে, ভারতবর্ষই জাদুবিদ্যার জন্মভূমি। পৃথিবীখ্যাত 'দড়ির খেলা' (রোপ-ট্রিক) এখানেই হ'ত। এখান থেকেই ক্রমে এই বিদ্যা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এর প্রচুর অনুশীলনও হয়েছে। জগতের পেশাদারী এবং সৌখীন—সকল সম্প্রদায়ের জাদুকরদের সম্মেলন ক্ষেত্র 'ম্যাজিক সার্কেল' ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয়েছে। এর বিরাট লাইব্রেরীতে জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত অন্ততঃ ২,৬০০ বই আছে। পৃথিবীর জাদুকররা মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় সম্মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ, আলোচনা এবং ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন।

ইংরিজী ম্যাজিক কথাটা অবশ্য এসেছে পৌরোহিত্য সংক্রান্ত কথা থেকে। 'মেজাই'-এর কাজ ছিল ধর্মতত্ত্ব আলোচনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা। পরে অবশ্যই পারশ্যরাজদের আমলে এদের কাজ হয়েছিল মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা গ্রহ ভবিষ্যৎ বা নিয়তির বিধানকে নিয়ন্ত্রিত করা। নানা রকম যোগ-যাগ, কবচ-ধারণ ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের ভবিতব্যকে পরিবর্তিত করা যায়, এই ধারণা থেকেই 'ম্যাজিক্যাল চার্ম' বা ইজিপ্টের 'ব্লাক আর্ট' প্রভৃতির উৎপত্তি ও চলন হয়েছিল। পরে যখন ভারতের ভোজবাজি বা জাদুবিদ্যা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন এই বহু মানুষের চোখে ধাঁধা লাগানো বিদ্যার পাশ্চাত্য নাম হ'ল—ম্যাজিক।

বহুজনের মনোরঞ্জনের একটি অঙ্গ হিসেবে এই বিদ্যা আবার আমাদের মধ্যে নিজের যোগ্য স্থান ক'রে নিতে পারবে এই আশাই আমরা করব।

চিত্র সমালোচনা

শেষ চিহ্ন (বাঙলা) : চিত্র-সংসারের নিবেদন; ১১,৪৮৯ ফুট দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : মূলচাঁদ জৈন; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নীনা দেবী; চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : বিভূতি চক্রবর্তী; সঙ্গীত-পরিচালনা : রথীন ঘোষ; গীত-রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; শব্দধারণ : জে, ডি, ইরাণী; শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ণ : সন্ধ্যা রায়, দিলীপ চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, স্বাতী, কৃষ্ণা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কমলা মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মাঃ বাবলু, মাঃ অমিয় প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স (প্রাঃ) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২৪এ আগস্ট উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়েছে।

নিষ্ঠাবান পুরোহিত ব্রাহ্মণের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র মেধাবী ছেলে শিবনাথকে নিজের বাড়ীতে রেখে লেখাপড়া শেখাবার ভার নেন তাঁরই সঙ্গতিপন্ন যজমান, ডাক্তার সঞ্জীব। কিন্তু ডাক্তারপত্নী মমতা শিবনাথকে দু'চক্ষে

চিত্র সংসার-এর "শেষচিহ্ন" চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

দেখতে পারেন না, তাঁর নিজের ছেলে জয়ের চেয়ে সে লেখাপড়ায় ভালো ব'লে। জয়ও প্রথম প্রথম শিবনাথকে হিংসা করত; কিন্তু যেদিন শিবনাথ একা অপর ছেলেদের সমবেত আক্রমণ থেকে জয়কে রক্ষা করে, সেদিন থেকে জয় শিবনাথের ভক্ত হয়ে পড়ে; শিবনাথ হয় জয়ের দাদা। জয়ের ছোট বোন লতা কিন্তু প্রথম থেকেই শিবনাথকে পছন্দ করে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পছন্দ যে নীরব ভালোবাসার রূপান্তরিত হয়েছে, এ-খবর শিবনাথ পেল সেই দিন, যেদিন সে ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত যাবার জন্যে প্রস্তুত। এবং এ-খবর পেয়ে শিবনাথ বিব্রত বোধ করল; কারণ, ছেলেবেলার সাথী মিনতি ওরফে মিনুকে সে কোনোমতেই ভুলতে পারে না। স্টেশনে পৌঁছুতে গিয়ে লতা যখন মিনতিকে আবিষ্কার করল, তখন মনে মনে সে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারল না। কিন্তু বিদেশের উচ্চতর লেখাপড়া শেষ করে শিবনাথ যেদিন দেশে ফিরল, তখন দেখল, তার আদরের মিনু ইতিমধ্যেই বিবাহিতা। শিবনাথের ফিরে আসা পর্যন্ত মিনুর গরীব বাপ অপেক্ষা করতে পারেননি। এদিকে ডাক্তারপত্নীও তাঁর মেয়ে লতার বিবাহের ব্যবস্থা করছেন অনেক ধনীর হোমিওপ্যাথ পুত্রের সঙ্গে। শিবনাথ সঞ্জীব ডাক্তারের আশ্রয় ছেড়ে নিজের একটি চেম্বার খুলল এবং সেখানেই থাকবার ব্যবস্থাও করল। লতা-শিবনাথের মিলনের পথে যিনি একমাত্র বাধা ছিলেন, সেই ডাক্তারপত্নী মমতা শিবনাথের চিকিৎসায় তাঁর কানের ব্যথা উপশম হওয়ার দরুণ তার পরম ভক্ত হয়ে পড়লেন এবং উভয়ের বিবাহ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একটি পুত্র-সন্তান নিয়ে মিনতি বিধবা হয়েছে এবং লতা-শিবনাথের ফুলশয্যার রাত্রে সে তার সন্তানটিকে শিবনাথের হাতে দিয়ে নিজেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। মিনতির শেষ চিহ্নটিকে লতা নিজের কোলে তুলে নিল।

এই হচ্ছে 'শেষ চিহ্ন'-ছবির কাহিনী। এবং কাহিনীরচয়িত্রী নিজেই ছবির সংলাপ এবং চিত্রনাট্যরচনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন। সাদা-মাঠা কাহিনী সাদা-সিধে ভাবেই বলা হয়েছে—কোনও গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় পরিস্থিতি একে ভারাক্রান্ত করেনি। কিছু উপভোগ্য হাসির পরিস্থিতিও আছে এখানে সেখানে।

অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ কেনো শিল্পীই পাননি। অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি কৃতী শিল্পী তাঁদের ভূমিকাগুলিকে যথাযথভাবেই চিত্রিত করেছেন। রেণুকা রায় ডাক্তার-পত্নীর ভূমিকায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় ক'রে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন লিলি চক্রবর্তী, তুলসী চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং মাস্টার বাবলু।

কলাকুশলীদের কাজ হয়েছে সাধারণ পর্যায়ের। রথীন ঘোষের আবহ-সঙ্গীত-রচনার কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মঞ্চাভিনয়

হাওড়ায় দুটি নাট্যানুষ্ঠান

রূপরূপ এবং অগ্রণী নামক দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগে গত ১২ই আগস্ট হাওড়ার ই আর রঙ্গমঞ্চে রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'তিলতর্পণ' এবং সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আগন্তুক' নামক নাটক-দুটি মঞ্চস্থ হয়। অগ্রণীর পরিচালনার 'আগন্তুক' নাটকটি বিষয়বস্তুগুণে দর্শকদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রাংশে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সুশান্ত পাঠক, কালোচরণ কুমার, সাকন্যা রায়, কুমারনাথ পাল, কমল ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব ভট্টাচার্য, কানাই দত্ত, অমর ভক্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতাংশে ছিলেন অমৃতলাল রায় এবং যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডে। পরিচালনা করেন দ্বারকানন্দ কুমার।

পুরানো নাট্যকারদের নাটক ইদানীংকালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। দু'একটি নাটক পরিচালনার গুণে, সর্বোপরি শিল্পীদের অভিনয়-দক্ষতায় উচ্চরসের সন্ধান দিতে পেরেছে। রূপরূপের প্রযোজনায় 'তিলতর্পণ' নাটকটি ত্রুটিহীন, না-হলেও মূলরস আমাদের বিতরণ করতে সমর্থ হয়েছে। অমৃতলাল বসুর প্রহসনজাতীয় নাটকগুলির মধ্যে কিছু 'অবিশুদ্ধ' সোসাল স্যাটায়ার (কি হেঁয়ালিতে কি ব্যঞ্জনায়) 'তিলতর্পণ' বোধকরি অন্যতম। নাট্যকার এবং নাটকের এত রসমিশ্রিত সমালোচনা বাংলা নাট্য সাহিত্যে দুর্লভ। বর্তমান নাটকটি বিষয়মাহাত্ম্যে এবং পরিচালনার গুণে দর্শকদের পরি-

দ্রুসস্থলে যথেষ্ট ভাবনার খোরাক দিতে পেরেছে। শিল্পীরা কমবেশি সকলেই ভালো অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় দৃশ্যটি বহুকাল স্মরণযোগ্য। শিল্পী ভূমেন্দু চট্টোপাধ্যায় বাপ্পারাও-এর চরিত্র-ব্যাখ্যায় যে সজ্ঞান 'এ্যাবসার্ড'টি সৃষ্টি করেছেন তা' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মূল দুটি নারীচরিত্রের মধ্যে শ্রীমতী রাণু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী আশা বেরা উল্লেখযোগ্য। মহিষীর চরিত্রদান করেছেন রুণু বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর বাচনভঙ্গি সংগীতধর্মী হওয়ায় রস-পরিবেশনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। শ্রীমতী আশা বেরা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। অন্যান্য চরিত্রাংশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনিল মিত্র, রমেন রায়, গৌরমোহন কুন্ডু, দেবব্রত সেনগুপ্ত, অজয় চট্টোপাধ্যায়, মাণিক ভট্টাচার্য, বামনদাস ব্যানার্জি, সত্যেন্দ্রনাথ দে, দেবনাথ সেনগুপ্ত, বলাই মিত্র, শঙ্কর হাজরা, রমেন মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুখার্জি, শিশির পাল, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, কল্পনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংগীতাংশে ছিলেন পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এবং নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন অনিল মিত্র।

বিবিধ সংবাদ

"থিয়েটার সেন্টার"এর নব-পরিকল্পনা ঃ

নট, নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালক তরুণ রায় যখন তাঁর সহযোগীদের নিয়ে "থিয়েটার সেন্টার"-এর পত্তন করেন, তখন তাঁর বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল, সৌন্দর্যসঞ্জাত প্রেরণা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও শান্তির বিস্তার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার জীবনের যে সত্য এবং অপরূপত্বকে হারিয়ে ফেলেছে, মঞ্চে তাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

থিয়েটার সেন্টার তার প্রযোজনা-সংস্থা 'মুখোশ'-এর মাধ্যমে 'রুপোলী চাঁদ' থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেছে, বেশ ভালো ক'রে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তার কোনোটিতেই প্রতিষ্ঠানটি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং 'সত্য-শিবসুন্দরের' সন্ধান দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে প্রতিটি নাট্যাভিনয়েই।

সম্প্রতি থিয়েটার সেন্টার তার কর্ম-প্রচেষ্টা এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন নাট্যরসিক ব্যক্তিদের জন্যে একটি নব-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাৎসরিক ১০ টাকা চাঁদা দিয়ে যে-কোনও নাট্যোৎসাহী সুধী 'মুখোশ-বন্ধু' ব'লে পরিগণিত হ'তে পারেন। তিনি সদস্যপদ গ্রহণের এক বছরের মধ্যে মুখোশ প্রযোজিত ছ'খানি নাটক ত' দেখতে পাবেনই, তার ওপর তাঁর নিজের যদি অভিনয়ক্ষমতা বা সঙ্গীত কিংবা অঙ্কন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকে, তিনি নিজের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেবারও সুযোগ পাবেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের জন্যে বিশেষ সুবিধায় টিকিটও কিনতে পারেন। এতগুলি সুযোগ-সুবিধা দেবার পরিবর্তে থিয়েটার সেন্টার তাঁর কাছ থেকে মাত্র একটি জিনিস আশা করে; থিয়েটারের কথা উঠলেই তিনি তাঁর পরিচিত-অপরিচিতদের কাছে বলবেন, "আমাদের থিয়েটারে চলুন।" থিয়েটার সেন্টার ইতিমধ্যেই প্রায় একশো 'মুখোশবন্ধু' লাভ করেছে। কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন, তাঁরা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে, টাস ফিল্মসের 'অভিসারিকা' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন কমল মজুমদার।

মোট পাঁচশো 'মুখোশবন্ধু' গ্রহণ করবেন।

থিয়েটার সেন্টার-এর পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে—প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কৌতুকনাট্য "ওরা থাকে ওধারে।" এবং এর পরে এঁরা যে দুখানি নাটককে মঞ্চস্থ করবেন বলে প্রকাশ, সেগুলি হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান।"

ষ্টারে 'শেষাগ্নি'র শততম রজনীর স্মারক উৎসব

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সভাপতিত্বে গেল শনিবার ২৫-এ আগস্ট ষ্টার থিয়েটারে শক্তিপদ রাজগুরু লিখিত এবং দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত 'শেষাগ্নি' নাটকের শততম অভিনয়-রজনীর স্মারক-উৎসব সুসম্পন্ন হ'ল। এই উপলক্ষে ষ্টারের পক্ষ থেকে মুখ্য-মন্ত্রীর হাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের জন্য ১০০১৲ টাকা দেওয়া হয় এবং প্রতিষ্ঠানের শিল্পী, নেপথ্যকর্মী, লেখক, পরিচালক, সুরকার, শিল্পনির্দেশক প্রভৃতিকে পুরস্কৃত করা হয়। মাননীয় অভ্যাগতদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী প্রভৃতি এই নাটকের সাফল্যে শুভকামনা জানিয়ে যে বক্তৃতা দেন, তা নিয়ে বারান্তরে আমরা কিছু আলোচনা করব।

কে, লাল-এর "মায়াজাল" ঃ

গেল শুক্রবার, ২৪-এ আগস্ট থেকে সৌরাষ্ট্রের বাজিকর কে লাল নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে তাঁর মায়াজাল-এর আসর বসিয়েছেন। আরোহীসমেত মোটরগাড়ী নিমেষে উড়িয়ে দেওয়া, চাবিবন্ধ হুডিনির ম্যাজিক বাক্সের মধ্যে একটি কাপড়ের থলের ভিতর পোরা একটি মেয়ের পরিবর্তে মুহূর্তের মধ্যে নিজে প্রবেশ করা, গাছে ধীরে ধীরে ফুল ফোটানো, জ্যান্ত মেয়েকে ইলেক্‌ট্রিক করাত দিয়ে কাটা, প্রথমে তিনটি তলোয়ারের অগ্রভাগে একটি মেয়েকে শুইয়ে পরে মাত্র মাথার নীচেরটি রেখে বাকী দুখানাকে সরিয়ে দেওয়া (চাইনিজ পানিশমেন্ট), ইজিপ্সিয়ান ব্ল্যাক আর্টে নিজেকে মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া এবং পর-ক্ষণেই ওপরের ব্যালকনিতে আবির্ভূত হওয়া প্রভৃতি রোমহর্ষক খেলা দেখিয়ে তিনি দর্শকদের অজস্র হাততালি কুড়িয়েছেন। কিন্তু যেখানে তাঁর বিশেষত্ব দেখা গেল, সেটি হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রদর্শনীতে গুরুগম্ভীর আবহ তৈরী করতে নারাজ, তাই দর্শকেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর খেলাগুলিকে যেমন দেখেছে, তেমনই পরক্ষণেই বাজিকর ভাঁড়েদের কীর্তিকলাপ দেখে অফুরন্ত হেসেছে। তার ওপর তাঁর প্রদর্শনীর গোড়া থেকে শেষ 'জাতীয় সংগীত' পর্যন্ত আবহাওয়া-সৃষ্টিকারী যন্ত্রসঙ্গীত দর্শকদের কানকে করেছে পরিতৃপ্ত; বিশেষ করে কৌতুকের জায়গাগুলিতে এফেক্ট মিউজিক যেন কথা কয়েছে। খেলাগুলিকে আর একটু চাতুর্যের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে সাজাতে পারলে কে লাল অদূর-ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ জাদুকর হিসেবে পরিগণিত হবেন।

ভি, বালসারা ঃ

হেলসিংকিতে অষ্টম আন্তর্জাতিক যুবউৎসবে যোগদানের পর ভি, বালসারা সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছেন। যাওয়া আসার পথে তিনি দিন সাতেকের জন্যে তাসকন্দ এবং এক দিনের জন্যে মস্কোতেও গিয়েছিলেন। তাসকন্দে তিনি টেলিভিশনে গান গেয়েছিলেন এবং রেডিওতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত উজবেগী সুরকার আই-সামড় খৈরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে তিনি মনে করেন। এঁরা দুজনে স্বর-লিপির সাহায্যে ভারতীয় এবং উজবেগী সংগীতের আদান প্রদান করেন। বাগেশ্রী রাগকে আশ্রয় ক'রে বালসারা "তাসখন্দ প্রেরণা" নাম দিয়ে একটি সংগীত রচনা ক'রে তার স্বরলিপি আইসামড়কে উপহার দেন। কথা আছে, উভয় সুর-কারই মাঝে মাঝে তাঁদের সংগীত-স্বরলিপি ডাকযোগে বিনিময় ক'রে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্রকে বর্ধিত করবেন।

হেলসিংকিতে ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত সুরকার ও পরিচালক কারী রাইডম্যানের সঙ্গে বালসারার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটে। ইনি এমন একটি নূতন পদ্ধতির স্বরলিপি উদ্ভাবন করেছেন, যা অনু-ধাবন করা ঢের সহজ। বালসারার মতে এই নূতন পদ্ধতি আসছে দশ বছরের মধ্যে সংগীত-জগতে এক বিপ্লব

বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'বর্ণচোরা' চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও সন্ধ্যা রায়

আনবে। ভারতীয় সংগীতকলা নিয়ে এই সুরকারের সঙ্গে বালসারার পুরো ছ' ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠক বসে। রবীন্দ্রনাথের "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে" এবং একটি লোকসংগীতের স্বরলিপি বালসারা রাইডম্যানকে উপহার দিয়েছেন এবং বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন তাঁর নব উদ্ভাবিত স্বরলিপি পদ্ধতি।

আইসামড খৈরী এবং কারী রাইডম্যানের সহযোগিতা ও উৎসাহ লাভ ক'রে বালসারা "বিদেশীদের জন্য ভারতীয় সংগীত" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করবেন এবং রুশ, উজবেগী ও ফিনিশ ভাষাতে এর তর্জমা হবে।

হেলোসিংকির উৎসবে পৃথিবীর ১৩৯টি দেশের সংগীত শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে বালসারার সংগীত সম্পর্কীয় জ্ঞানের পরিধি যথেষ্টই বিস্তৃত হয়েছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। এই উৎসবে তিনি এ্যাকর্ডিয়ান এবং পিয়ানো সহযোগে কণ্ঠ এবং যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। পিয়ানো সহযোগে তাঁর পরিবেশিত ভারতীয় মার্গসংগীত উচ্ছ্বসিত প্রশংসালাভ করেছিল।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত "যাত্রা উৎসব" :

রবীন্দ্রকাননে (বিডন উদ্যানে) গেলকাল বৃহস্পতিবার, ৩০এ আগস্ট থেকে শুরু ক'রে ২০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইশ দিন ধ'রে যে বৃহৎ যাত্রাআসর বসছে, তাতে যোগ দিয়েছেন পেশাদারী এবং সৌখীন—বহু সুখ্যাত সম্প্রদায়। উৎসবলিপি পড়ে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি শনিবার তিন বার অভিনয়, প্রতি রবিবার দু'বার এবং অন্যান্য দিন একবার ক'রে অভিনয় হবে। তবে ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবারও তিনবার অভিনয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিষদ কর্তৃপক্ষ যাত্রাভিনয়ের আসরকে যত দূর সম্ভব আরামপ্রদ এবং আধুনিক পরিবেশবিশিষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছেন।

যাত্রাভিনয়ের প্রথম দিনে যাত্রাজগতের বিখ্যাত নট ফণী বিদ্যাবিনোদ এবং নাট্যকার ব্রজেন্দ্রনাথ দেকে পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মাননা জানাবার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া "যাত্রার আধুনিকীকরণ" নিয়ে ২রা, ৯ই এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন সকাল ৯॥টা থেকে ১২॥টা পর্যন্ত একটি তিন দিনব্যাপী বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে।

টাস ফিল্মস্-এর "অভিসারিকা" :

আজ শুক্রবার, ৩১এ আগস্ট তারা বর্মণ প্রযোজিত এবং টাস পিকচার্স পরিবেশিত টাস ফিল্মস্-এর নবতম চিত্রনিবেদন "অভিসারিকা" মুক্তি পাচ্ছে রূপবাণী, ভারতী এবং অরুণা চিত্রগৃহে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন 'লুকোচুরি'খ্যাত কমল মজুমদার। সংগীত পরিচালনা এবং চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায় ও দীনেন গুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে সুপ্রিয়া চৌধুরী, ভারতী দেবী, তপতী ঘোষ, রাজলক্ষ্মী, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীদের।

পরলোকে চিত্রাভিনেত্রী মায়া বসু :

আমরা শুনে মর্মাহত হলুম, বিগত দিনের চিত্রাভিনেত্রী মায়া বসু গেল ৪ঠা আগস্ট রক্তচাপজনিত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে পরলোকগমন করেছেন। মায়া বসুর অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল, তিনি নিজেকে চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতেন। নিজের একমাত্র পুত্রসন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে তিনি অভিনেত্রীর জীবন ত্যাগ ক'রে সাহিত্য ও জ্যোতিষচর্চায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র যে আট ন' বছর তিনি চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারই মধ্যে তিনি বাঙলা, হিন্দী এবং তামিল ছবি মিলিয়ে অন্ততঃ ৪০ খানি ছবিতে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অমায়িক, মধুর স্বভাববিশিষ্ট এবং নিরহংকার ছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কারের জন্য নাটকের সুপারিশ :

বাঙলা নাটকের ভাগ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ কোনো দিনই ঘটেনি। বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে জানতে পারেন, অ্যাকাডেমীর তরফ থেকে এ-ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ নেই। তাই পরিকল্পনা পরিষদ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ রথীন রায় ও শৈলেজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সদস্য ক'রে একটি সাব-কমিটি গঠন করেছেন, কোনও বাঙলা নাটককে অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভের যোগ্য ব'লে সুপারিশ করা যায় কিনা, সে-সম্পর্কে মতামত গঠন করবার অধিকার দিয়ে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা—

ফিল্ম ক্র্যাফ্‌ট প্রযোজিত ও বিমল রচিত 'বেনারসী' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। তরুণ ও নবাগত অরূপ গুহঠাকুরতা এ-ছবির পরিচালক। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন রুমা গুহঠাকুরতা। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ও সুরুচি সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। একটি পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তির নাটকীয় দৃশ্যরচনায় শ্রীগুহঠাকুরতার বলিষ্ঠতম প্রয়াস—বেনারসী।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত শিশুভারতী প্রোডাকসন্সের 'বর্ণচোরা' ছবিটির সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স এক নম্বরে দুটি গানের দৃশ্যগ্রহণ শেষ হল এক জলসার অনুষ্ঠানে শিল্পী সন্ধ্যা রায় ও অনিল চ্যাটার্জিকে নিয়ে। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পিদ্বয় হলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দুটি গানই সুগীত এবং পরিচিতি পাবে। এ ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রণয়মধুর হাস্যরসাত্মক এ ছবির কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, অনুপকুমার, হরিধন মুখার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, অবিনাশ মুখার্জি, রাজলক্ষ্মী, গীতা দে, রেণুকা রায়, সুরুচি সেনগুপ্তা ও অনিল মুখোপাধ্যায়। শিশুভারতী প্রোডাকসন্স-এর তরফ থেকে ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন গৌর দে।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর 'নবদিগন্ত' ছবিটি পরিচালনা করছেন রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় অগ্রদূত গোষ্ঠী। দুই পুরুষের কাহিনী অবলম্বনে এই প্রণয়মধুর প্রধান চরিত্রের শিল্পী হলেন বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। বিপরীত নায়ক চরিত্রে বিশ্বজিৎ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সংগীত পরিচালনা করবেন।
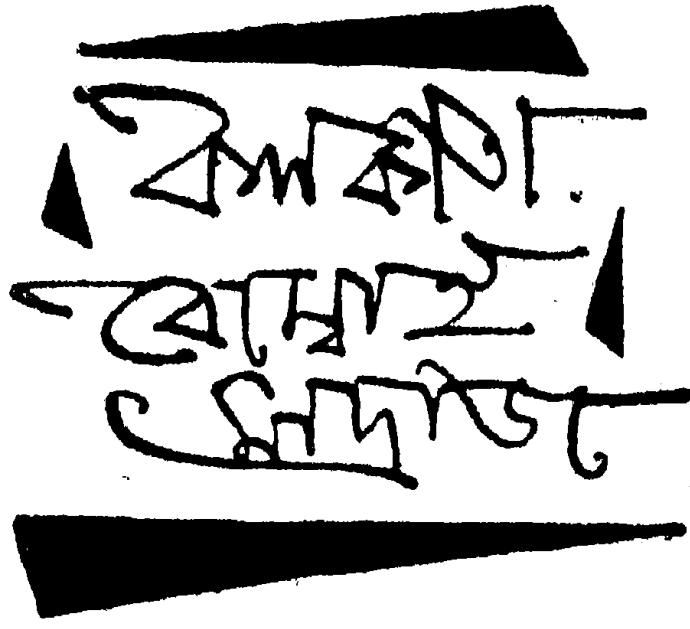
ক্যালকাটা মুভিটোনে পরিচালক চিত্ত বসু 'ধূপছায়া'র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ করেছেন। চরিত্রাভিনয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, দীপ্তি রায়, ছবি বিশ্বাস, বিশ্বনাথন, তরুণকুমার ও অমর মল্লিক। ছবিটি প্রযোজনা করছেন অনন্ত সিংহ। সংগীত পরিচালক অমল মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই—

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের দ্বিতীয় অর্ঘ 'শার্মিলা'। 'বিশ সাল বাদ' চিত্রের সাফল্যের প্রযোজক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হিন্দী চিত্রজগতে আর এক নতুন নাম ঘোষণা করেছেন। বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বহুজনবন্দিত নায়ক উত্তমকুমার এই প্রথম হিন্দী ছবিতে অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান-র বিপরীত চরিত্রে। বিভিন্ন কলাকুশলীদের মধ্যে রয়েছেন পরিচালনায় বীরেন নাগ, চিত্রনাট্যে ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, গীতিকার শাকিল বাদুনি, সংলাপ রচনা দেশাকিশন, চিত্রগ্রহণে মার্শাল ব্রাগাঞ্জা ও সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এ আর কারদার পরিচালিত নতুন রঙিন ছবিটির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার জন্য মনোনীত হয়েছেন দিলীপকুমার ও ওয়াহিদা রেহমান। পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে শ্যামা, রেহমান, জনি ওয়াকর এবং প্রাণ অন্যতম। সুরসৃষ্টি করবেন প্রবীণ সংগীত পরিচালক নৌশাদ আলি।

গত সপ্তাহে মেহেবুব স্টুডিওয় 'শাগুন'-এর শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন কমলজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন নীনা, রাজদিপ, মুরাদ, প্রতিমা দেবী, অচলাসহদেব ও নানা পালশিকর। ছবির পরিচালক মেহেবুব খাঁর সহকারী নাজার। সংগীত পরিচালক খৈয়াম।

প্রযোজক পরিচালক ভি শান্তারাম তাঁর রঙিন ছবি 'শেহরা'-র দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন রাজকমল স্টুডিওতে। নবাগত প্রশান্ত এ ছবির নায়ক এবং নায়িকা সন্ধ্যা। এছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন মনমোহন কৃষ্ণ, ললিতা পাওয়ার, উল্লাস ও আর এক নবাগত মমতাজ। এ ছবির সুর সৃষ্টি করবেন এস পি রামলাল।

রাজকাপুর প্রোডাকসন্সের 'সংগম' ছবিটির বহির্দৃশ্য গৃহীত হল বিলেতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় দু মাস ধরে। সম্প্রতি এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্র রাজেন্দ্রকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা বোম্বে ফিরেছেন।

প্রযোজক-পরিচালক বি আর চোপরার 'গুমরা'-এর সংগীত গ্রহণ করলেন সুরকার রবি। অশোককুমার, মালা সিনহা ও সুনীল দত্ত চরিত্রয়ের কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্যগ্রহণ করেন পরিচালক আলোকচিত্র শিল্পী এস এন মালহোত্রা।

মাদ্রাজ—

সম্প্রতি অভিনেতা শিবাজী গণেশন একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতালের জন্য বোম্বের কলাকুশলীদের সাহায্যে বাহান্ন হাজার টাকা দান করেছেন।

প্রায় এক মাসকালীন [illegible] বাহিনী স্টুডিও বন্ধ থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় সম্ভবত পুনরায় কাজ শুরু হবে। সাময়িক ধর্মঘটের পর এই স্টুডিওর কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ভারতের কাঁচা ফিল্ম উৎপাদনের জন্য নতুন কারখানা নির্মিত হয়েছে উটকামণ্ডে। ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্যে বর্তমানে কারখানা চালু হয়েছে। আগামী বছর থেকে কাঁচা ফিল্ম সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায়।

তিনটি তামিল ছবি এ সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। আর আর পিকচার্সের 'পাশাম'। চরিত্রলিপিতে রয়েছেন রামচন্দ্র, সরোজা দেবী, রাধা, অশোকন, কল্যাণকুমার ও শীলা। এ ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হলেন টি আর রমান্না। সংগীতে বিশ্বনাথন ও রামমূর্তি।

দ্বিতীয়টি বসুমতী পিকচার্সের 'কাথিরুন্থা কণ্ডাল।'

বিভিন্ন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী, জেমিনী গণেশন, রাধা ও শোভা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন টি প্রকাশরাও।

অঞ্জলি পিকচার্সের 'মাঙ্গার উল্লম মাঙ্গাথা সেলভাম।' নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন শিবাজী গণেশন ও অঞ্জলি দেবী। প্রযোজক আদিনারায়ণ রাও এ ছবির সংগীত পরিচালক চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বেদান্দম।

চিত্রদূত
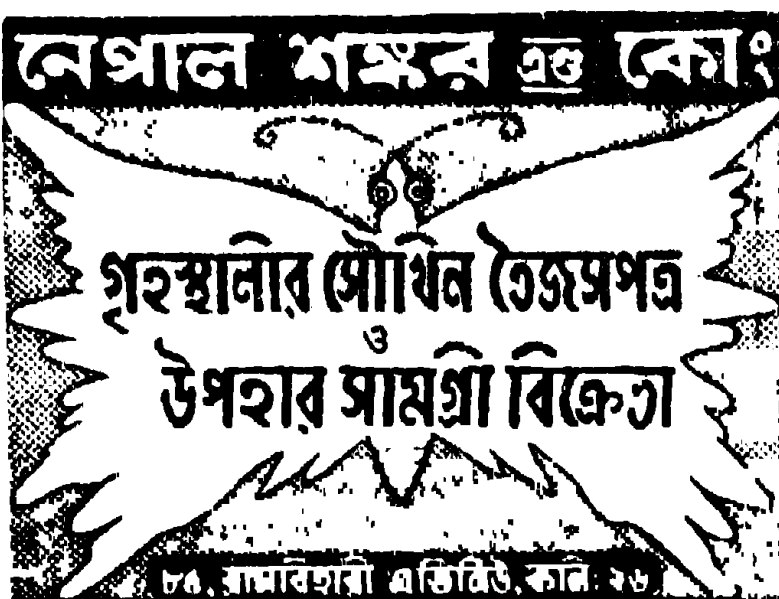
'I had a dream —
which was not all a dream
The bright sun was
extenguished
And the stars did wonder
darking
in the eternal space.
rayless and pathless'

স্বপ্ন......
সে শুধু স্বপ্নই নয় বুঝি।
জলন্ত সূর্য-পিণ্ডটা আঁধারে ডুবেছিল,
অনন্তের তিমির গহ্বরে তারার দল
দিশাহারা জ্যোতিহারা পথহারা।

মনোরমা—বাঃ, এক্ষুণি মুখে মুখে তর্জমা করলেন? আমি কিন্তু কম-পক্ষে পাঁচবার না পড়লে মানেই বুঝতে পারি না। নিন, খেয়ে নিন।

দক্ষিণাচরণ—আমি কিন্তু খুব ভোজন-রসিক নই। আপনি বরং বসুন দুটো কথা বলা যাক।

মনোরমা—আমার কথা যে খুব গদ্য কথা, শুনবেন বলবো। এগুলো সব আমার নিজের হাতের তৈরী, না খেলে রাগ করবো।

দক্ষিণাচরণ—আপনার এ বইটা নিয়ে যেতে পারি। তাড়াহুড়োতে এখানে কিছু আনা হয়নি। দিন কাটতে চায় না।

মনোরমা—হ্যাঁ হ্যাঁ নিননা। যখন যে বই ইচ্ছে নিয়ে যাবেন। আপনার বুঝি কলকাতায় খুব বড় লাইব্রেরী আছে?

দক্ষিণাচরণ—ও লাইব্রেরীটাই যা বড়।

মনোরমা হঠাৎ ঘর থেকে উঠে যায়। দক্ষিণাচরণের ভাল লাগে। চলচ্চিত্র-ভাষ্যের এই চিত্রনাট্যের একটি অংশে অভিনয় করলেন দক্ষিণাচরণ—উত্তমকুমার এবং মনোরমা—নন্দিতা বসু। ছবির নাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিশীথে'। এই দুরূহ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন অগ্রগামী গোষ্ঠী। সম্প্রতি শেষ কয়েকটি দিনের চিত্র-গ্রহণ গৃহীত হল রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওয়।

বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের যে পরীক্ষা চলেছে তা নিঃসন্দেহে আশাবহ। 'নিশীথে'র চলচ্চিত্রায়ণের সংবাদ দর্শকদের কাছে কৌতূহল সঞ্চার করবে। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকের মনে তাঁর ছোটগল্পের বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের এই গল্পটি অনেক ভাবনা অনেক প্রশ্নের অনুরণন তুলেছে। আমাদের জীবন যে কোন একটি সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা নয়, এমন বহু সত্য আছে যা বিস্মৃত। এই বিস্মরণই এনেছিল 'নিশীথে'-র নায়ক দক্ষিণাচরণের জীবনে। তাঁর মনের দ্বৈত স্বরূপের অস্তিত্ব ছিল তাঁর কাছে লুপ্ত। তাই জীবনের একটি মুহূর্তকেই তাঁর মনে হয়েছিল চিরন্তন। কিন্তু

স্টুডিও থেকে বলছি
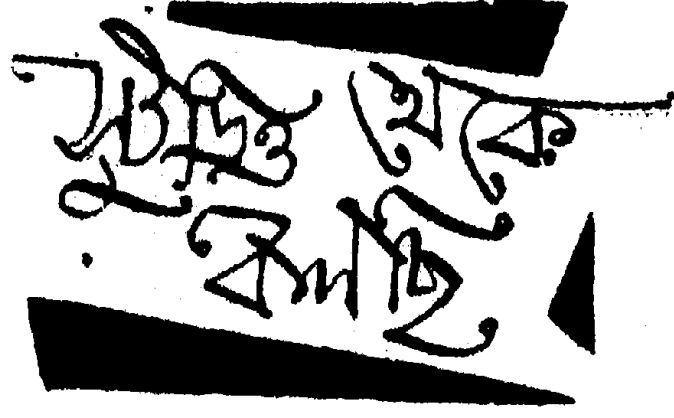
আর একটি অজানা স্বরূপ তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে উত্তর স্বরূপকে সংঘাতের আহ্বান জানায়। এই দুই স্বরূপের জটিল সংঘাতে আবর্তিত মুহূর্তগুলি এ কাহিনীর বিষয়বস্তু।

জমিদার দক্ষিণাচরণের প্রথম স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু প্রণয়-সম্ভাষণ তাঁর কাছে সহজে রসাধিক্য ছিল না। এমনকি অসুস্থকালে তাঁর সেবায় দক্ষিণাচরণ ব্যস্ত হলে তিনি বলতেন—'আঃ করো কী', লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না। পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'

বহু চিকিৎসার পরেও যখন স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দক্ষিণাচরণ তাকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে এলেন। সেখানে ডাক্তার চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এ রোগ নিরাময় হবার নয়। স্ত্রী বোঝালেন—'যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।'

হারান ডাক্তার স্বজাতীয় ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে দক্ষিণাচরণের প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকতো। হারান ডাক্তারের অবিবাহিত মেয়ে মনোরমার সঙ্গে যাতায়াতের
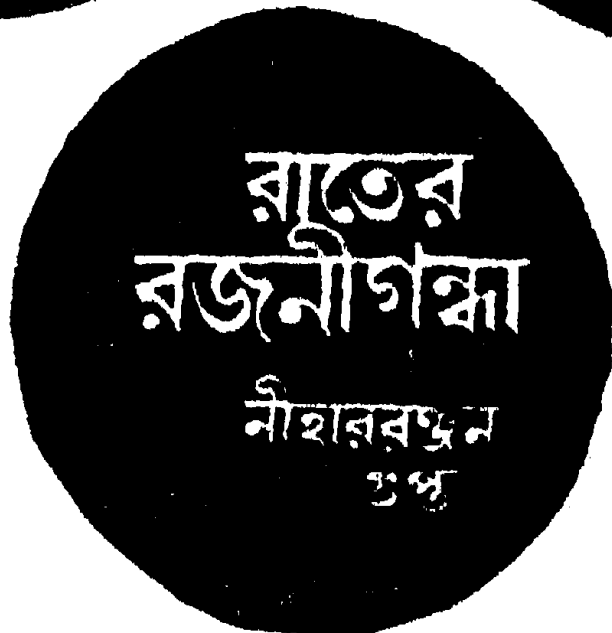
অগ্রগামী পরিচালিত 'নিশীথে' ছবির চিত্রগ্রহণের সময় পরিচালক সরোজকুমার দে, আলোকচিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত, সহকারী পরিচালক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সহকারী চিত্রশিল্পী কেষ্ট চক্রবর্তী ও শিল্পী নন্দিতা বসু

সূত্র ধরে পরিচয় নিগূঢ় হল। যেমন স্বরূপ তেমনি সুশিক্ষা। ডাক্তার বলেন—'তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই।' দক্ষিণাচরণের ভালো লাগে মনোরমাকে। মরুভূমির মধ্যে এ যেন আর এক মরীচিকা। মনোরমা রুগ্ন স্ত্রীকে দেখতে আসে। দক্ষিণাচরণের অভাব স্ত্রী বুঝতে পারে। তাই একদিন ডাক্তারের দেওয়া মালিসের বিষ ওষুধটা খেয়ে স্ত্রী নিরুপমা শেষ কথা বলে গেলেন—'শোক করিও না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।'

দক্ষিণাচরণ মনোরমাকে বিবাহ করে দেশে ফিরলেন। বরানগরের বাড়ীতে মধুসন্ধ্যা বাহিত হলেও দক্ষিণাচরণের বিগত স্ত্রীর অশরীরী আত্মার ছায়ায় তার ভয় দূরীভূত হল না। রজনী অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যহ শুনতে পেতেন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কণ্ঠস্বর—'ও কে, ও কে, ও কে গো।'

জমিদার দক্ষিণাচরণ মনোবিকারে ভুগতে শুরু করলেন। প্রতিদিন অর্ধরাত্রে ডাক্তারের দ্বারে দক্ষিণাচরণের শেষ মিনতি এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

অগ্রগামী গোষ্ঠী 'নিশীথে' কাহিনীর নিখুঁত পরিবেশ রচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন চিত্রগ্রহণে। দক্ষিণাচরণের জটিল নায়ক-চরিত্রে উত্তমকুমার শিল্পী-জীবনের সুদক্ষ অভিনয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলি দর্শনীয় করেছেন। এ দুরূহ চরিত্রে তিনি সার্থক হবেন সুঅভিনয়ে এ কথা দৃশ্য-গ্রহণের সময় সহজেই প্রমাণিত হয়। গল্পের দুই প্রধান নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নন্দিতা বসু। হারাণ ডাক্তারের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ছায়া দেবী, গঙ্গাপদ বসু, শৈলেন গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, জীবন কর্মকার ও সঞ্জীব দে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্র শিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত এই ছবিতে দৃশ্যগ্রহণের নতুন মান প্রতিষ্ঠা করবেন এমন কথা বলা চলে। শিল্প নির্দেশক সুধীর খাঁন ছবিটির পুরোনো আভিজাত্য পরিবেশ রচনায় ও রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সঙ্গীত-পরিচালনায় বিশেষ করে আবহ-সঙ্গীতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই ছবিতে এবং সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস তিনি নতুন কিছু পরিবেশনে সঙ্গীতের মান উন্নত করবেন। প্রবীণ সুখ্যাত চিত্র-সম্পাদক কালী রাহা এ ছবির সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। শব্দ-গ্রহণে রয়েছেন সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ ও সুনীল। সহকারী কলাকুশলীদের মধ্যে পরিচালনা ও চিত্র-গ্রহণে রয়েছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য, তরুণ দে ও কেষ্ট চক্রবর্তী। অগ্রগামী গোষ্ঠীর অন্যতম সরোজকুমার দে ও নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবির পরিচালক। —চিত্রদূত

ভিনদেশী ছবি

শ্রেষ্ঠাংশে জেনিফার জোন্স-এর পুত্র :

প্রখ্যাত অভিনেত্রী জেনিফার জোন্স-এর পুত্র তেইশ বছরের বরাট ওয়াকার "দি হুক" ছবিতে প্রথম অভিনয় করছেন। তাঁর সহ-ভূমিকার অভিনয় করছেন ক্লার্ক ডগলাস, নিক, এ্যাডামস, এনরিয়ণ্ মাগালোনা এবং নিমিয়া পারসক প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। "দি হুক"-এর পটভূমি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ। ওই চিত্র যুদ্ধের নৃশংসতার ওপর নতুন করে আলোকপাত করা হয়েছে। ছবিটি তোলা হচ্ছে গত মে মাস থেকে জর্জ সীটনের পরিচালনায়।

গান! গান!

ডরিস ডে-এর ছবি মানেই গান আর গান। "বিলি রোজেজ জাম্বো" এমনি এক ডরিস অভিনীত গানের ছবি। এই চিত্রের সাতটি গানের যুগ্ম-সুরকার হলেন রিচার্ড রোজার্স-লোরেঞ্জ হার্ট। যাঁরা ইংরেজী গানের ভক্ত তাঁরা নিশ্চয়ই এই সুরকারদ্বয়ের 'দি মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দি ওয়ার্ল্ড', 'মাই রোমান্স' এবং 'লিটল গার্ল ব্লু' গানগুলি শুনেছেন। আগামী বড়দিনে ছবিটি মুক্তি পাবে।

সোফিয়া লোরেন—কার্লো পন্টির নতুন ছবি :

এম-জি-এম, "টু উইম্যান" ছবির সাফল্যের পর সোফিয়ার সঙ্গে ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত দুটো ছবির জন্যে চুক্তি করেছেন। এই দুটো চিত্রেরই প্রযোজনা করবেন "টু উইম্যান", "ইউলিসিস", "দ্যাট কাইন্ড অফ উয়োম্যান" এবং "ওয়ার এ্যান্ড পীস"-এর প্রযোজক কার্লো পন্টি। অবশ্য এখনো ছবি তোলার কাজ শুরু হয়নি। পন্টি তাঁর নতুন ছবি দুটোর জন্যে উপযুক্ত কাহিনীর সন্ধান করেছেন। —চিত্রকূট

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খন্ড, ১৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 7th September 1962
40 Naya Paise.

কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইয়ের সংবাদে জানা যায় যে ভেজাল ও জাল ঔষধ বিক্রি লইয়া সেখানে খুবই সোরগোল চলিতেছে। এই ভেজাল ও জাল ঔষধের ব্যবহারে চিকিৎসা-বিভ্রাট ও রোগীর প্রাণসংশয় ক্রমাগত হইতেছে—এই কারণ দর্শাইয়া কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বোম্বাইয়ের জনসাধারণের নামে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করেন যে এই ভেজাল ও জাল ঔষধ প্রস্তুতকারকদিগের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ও উহাদের এই দুর্নীতিমূলক কাজ নিবারণের জন্য ব্যাপক নিরোধ ব্যবস্থা করা হউক। একথাও বলা হয় যে এই জাল ও ভেজাল ঔষধ পশ্চিমবঙ্গ হইতে চালান যাইতেছে।

বলা বাহুল্য এই সোরগোলের পিছনে নিছক জনসাধারণের মঙ্গলচিন্তাই ছিল না। অবশ্য জাল ও ভেজাল এবং দূষিত ঔষধের ব্যবহারে রোগীর জীবন বিপন্ন এমন কি প্রাণহানি—অনেক ক্ষেত্রেই হইতেছে, এবং যে সকল দুষ্কৃতকারী এই নীচ ও নির্দয় কাজ চালাইয়া অর্থাগমের পথ দেখিতেছে তাহাদের শাস্তি ও দমন আমরা সকলেই চাই। কিন্তু সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ঔষধ ব্যবসায়কে ঘায়েল করার নীচ অপচেষ্টাও যে এই দাবীদাওয়ার পিছনে রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ঔষধ প্রস্তুতকারক ছোটবড় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই তিনটি প্রদেশেই আছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ইহাদের মধ্যে সর্বোচ্চে আছে, সুতরাং সে সকলের সম্পর্কে অপযশ রটাইলে তাহাদের বিক্রয়ে বাধা পড়িবে এবং এই বাধার পূর্ণ সুযোগ লইবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটস্থিত ঔষধ প্রস্তুতির প্রতিষ্ঠান-সকল। এ-কথাও শোনা যায় যে ঐ সকল পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ঔষধের খালি শিশিতে নকল ও জাল ঔষধ বিক্রয়ের উদ্যোগ মহারাষ্ট্রে চলিতেছে।

যাহা হউক সারাভারতে জাল, ভেজাল ও হীনগুণ ঔষধ এখন ব্যাপকভাবে চলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তাহার কারণ একদিকে খাঁটি ঔষধের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মহার্ঘতা ও অন্যদিকে বিশুদ্ধ বিদেশী ঔষধের আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহার চোরাবাজারে প্রবেশ।

আরো সূক্ষ্মভাবে অবস্থার বিচার করিলে দেখা যায় যে আমাদের শাসনতন্ত্রের চালনায় শৈথিল্য ও অবহেলাই ইহার প্রধান কারণ। এবং এই শৈথিল্য ও অবহেলার মূলে আছে আমাদের রাষ্ট্রচালনায় অভিজ্ঞতার অভাব এবং বিকৃত নীতি। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ সেদিন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র-চালনার মূল নীতি, যাহা আমাদের স্মৃতি শ্রুতি ও গীতায় গ্রথিত, তাহার উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রচালকগণ দুষ্টকেও শিষ্টের ন্যায় সমানে পালন ও পোষণ করিতেছেন।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ দেশের সর্বোচ্চ আসন অলংকৃত করিতেছেন সুতরাং তাঁহাকে দুদিক বাঁচাইয়া বলিতে হইয়াছে। কিন্তু দেশের সাধারণজন দেখিতেছে ও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে যে এই সকল আমদানী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ও বিষম উচ্চহারে টেক্স ও শুল্কাদি গ্রহণের কঠোর ব্যবস্থায় দেশের শাসনতন্ত্রে এক বিকার আসিয়াছে, যাহার ফলে শিষ্টের দমন ও শোষণ এবং দুষ্টের পালন ও পোষণই চলিতেছে। একে তো আমাদের সংবিধানে দুষ্কৃতকারির পলায়নের শতদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। অন্যদিকে চোরাবাজারের টাকা শাসনতন্ত্রের উচ্চতমসীমাও কলুষগ্রস্ত করিতেছে।

সম্প্রতি লোকসভায় শ্রীমহাবীর ত্যাগীর মত প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী সভ্যও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস সরকারের এই দুর্নীতি দমনে অক্ষমতা প্রদর্শনই তাহার চরম অপযশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ তীব্র সমালোচনার ফলে আমাদের বড়কর্তারা বলিতেছেন যে তাঁহারা জাল-ভেজাল বন্ধ করিবার ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সক্রীয়ভাবে অবলম্বন করিবেন। দেখা যাউক কথা ও কাজে কি সামঞ্জস্য থাকে।

কবিতা

স্বাদ

মৃগাঙ্ক রায়

হাত বাড়ালে যেন তোমার হাত পাই।
এ কথার লবণাক্ত স্বাদ জিহ্বামূলে, স্বাদ
নিতে নিতে আমাদের চারিদিকে
ছায়া তুলে নিল পাঁচটি পাম গাছ।

তারপর আর সূর্য ওঠে নি। নক্ষত্রনিচয়
রয়ে গেছে পৃথিবীর নিম্নভাগে। ক্ষয়
নশ্বরতা, প্রেত, বিকলাঙ্গ-যন্ত্রণায়
ধূমল, নীল।

সাপ সাপ অথবা ফাটলে ফাটলে জ্বলা
বিদ্যুৎ। সে কথার পরিণত দাহ, স্বাদ
নিতে নিতে আমাদের আয়ু নিঃশেষিত হল।

অথচ আমার হাত আর সে খোঁজে নি কখনো॥

সফলতা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সফল ভাবনা ফুলে আনমনে যে ফোটে একাকী;
প্রফুল্লতা গায় শুধু মনেমনে রোদ্দুরে ছায়ায়,
অপরাহ্ন এলে পরে খোঁজে নাকো কোনো কিছু বাকী,
স্রোতের আগেই ভাসে বার্তাবহ পালের হাওয়ায়।

কিন্তু ফুল মাটি-ঘেঁষা, কেবা দেয় নদীর খবর।
হাওয়ার উন্মুক্ত প্রাণে মনে হলে তবে কাছে আসে,
ভালোবেসে গন্ধ বয় মাঠেঘাটে অজ্ঞাত প্রান্তরে,
হয়তো ভরিয়ে তোলে ছড়ায় সে সুদূর আকাশে।

সফলতা অর্ধসত্য, ফুলহীন ফুলের সৌরভ ঃ
মুছে যদি যাই আমি কেন নিই আমার এ-ভার!
সারাটা জীবন ধরে শুনে গিয়ে সমুদ্রের রব
দূর থেকে, আড়ালেই রেখে যাব এ-ঢেউ আমার!

সফলতা বুঝি সে-ই আনমনে যে ফোটে একাকী,
ভাবেনাকো ঘড়িধরে কিছু, কবে সূচনা বা বাকী!

রণক্ষেত্রে কবি

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বর নড়েছে যেই সিংহাসনে, বহেছে বাতাস......
আমাদের স্তব্ধতায় এরকম বাতাস কচিৎ
দেখা দেয়: সুচিক্কণ পাতাগুলি শোণিতে হৃদয়ে
কেঁপে ওঠে, কেহ কেহ কবিতার দৈববাণী শোনে।
মনে হ'ল খুব শান্ত এই জন্ম এই আবির্ভাব;
আসলে গভীর যুদ্ধ, আলিঙ্গন, বিপুল মন্থন
হ'তে থাকে। বাতাসের মধ্য থেকে এই যে উত্থান
এর দীর্ঘ ভারে অশ্ব হ্রেষা করে নিখিল প্রান্তরে!

কেবল সঙ্গীত এর সমগোত্র তাই কবিকুল
বেঁচে যায়; এত বড় যুদ্ধ তবু সঙ্গীতের সাথে
যুদ্ধ ব'লে শরীরের কোন অংশে আঘাত লাগে না।
কবির প্রশান্ত মুখ দেখা দেয়; কতবার এই
রণক্ষেত্রে তার প্রাণ সুবৃহৎ হস্তীপদতলে
পিষ্ট হয়ে সেখানেই পুষ্প হ'য়ে জন্মেছে আবার।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

পুজো এসে গেছে।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কী করে আমি টের পেলাম ব্যাপারটা, তাহলে আমি পাঁজি মিলিয়ে হিসেব দিতে পারব না। কিন্তু আরো একটি অকাট্য প্রমাণ আমার নজরে এসেছে। সেইজন্যেই আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারছি, পুজো এসে গেছে।

না, রোদে এখনো সেই কাঁসার রং ধরেনি। (পরশুরামের গল্প দ্রষ্টব্য।) কিংবা বাজারে গিয়ে পটল-আলু-কপির পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তন ঘটেছে বলেও লক্ষ্য করা যায় না। আজকের এই কোল্ড স্টোরেজের যুগে প্রকৃতির সময়োচিত নিবেদন গ্রহণ ক'রে খুশি থাকতে হয় না—সারা বছরই সকল ঋতুর তরকারি সুলভ।

কিন্তু আমি সে সব লক্ষণ দেখে বলছি না। তার চেয়েও জোরালো প্রমাণ হাতে আছে আমার। অবশ্য সকলেই জানেন, খাদ্য ছাড়াও পুজো, অর্থাৎ শরৎকালের আবির্ভাব অনুভব করার অন্য উপায় আছে। যেমন কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা, কিংবা কাপড়-জামা-জুতো ইত্যাদির দোকানে নতুন সাইন বোর্ডের আবির্ভাব। তবে এগুলো নেহাতই বাইরের পরিচয়। এর চেয়েও গভীরতর প্রস্তুতির ভূমিকা তৈরি হতে থাকে অন্যত্র। আমি সেই অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করব আজ আপনাদের কাছে।

লেখা। হ্যাঁ, চমকে উঠবেন না. লেখকেরা যা লেখেন, সেই বস্তুই আমার আলোচ্য বিষয়। পুজোর সময় রংবেরঙের কতো সব শারদীয় সংকলন প্রকাশিত হয়, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? এগুলোর মালমশলা যে মহালয়ার বহু আগে থেকেই সযত্নে সংগৃহীত হ'তে থাকে তা কি অনুমান করেছেন কখনো? হয়তো করেন নি। কিন্তু লজ্জিত বোধ করার কারণ নেই তাতে। আমিও অনুমান করিনি। অন্তত মাসখানেক আগেও আমি এ বিষয়ে অচেতন ছিলাম। তারপর এক বিচিত্র কার্যকারণে মোহনিদ্রা ভেঙে গেল আমার। আর এখন, বললে বিশ্বাস করবেন না, জাগ্রত অবস্থাতেই জ্ঞান লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম।

বন্ধুমহলে আমার আড্ডাবাজ বলে খ্যাতি ছিল। আড্ডার প্রাণ হল হাসি-

ঠাট্টা। বন্ধুরা বলত, আমি নাকি খুব হাসাতে পারি। আমি যাকিছু বলি তাইতেই নাকি তাদের হাসি পায়। তারপর কালক্রমে এমন সময় উপস্থিত হল যখন রগুড়ে মানুষ বলে আমার সুনাম (?) রটে গেল, এবং যারা কখনো আমার সঙ্গে আড্ডা দেয়নি তারাও আমাকে দেখে হাসতে লাগল।

আমার কাছে, বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা খুবই শোকাবহ হ'য়ে উঠল। আমি এতে লজ্জিত বোধ করতাম। কিন্তু বন্ধুরা বলত, এই লজ্জার ভাবটা নাকি আমার হাস্যকরতাকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে তোলে। শুনে আমি স্তম্ভিত হতাম।

কিন্তু এসব ছিল ঘরোয়া ব্যাপার। দুঃখ বোধ করলেও ভেঙে পড়বার মতো কিছু নয়। তারপর, হঠাৎ কি দুর্মতি হল, মাসখানেক আগে পাড়ার ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে একটি ছোটো মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় লিখে ফেললাম, 'হাসির চেয়ে হে'চকি ভালো।' ব্যস সেই হল আমার কাল। তৎক্ষণাৎ দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ল, যে আমি লিখেছি। এবং সভাস্থলের প্রত্যেকে ঐ একটি মাত্র লাইন পড়ে এত বেশি হাসতে লাগল যে সকলেরই প্রায় হে'চকি ওঠার মতো অবস্থা।
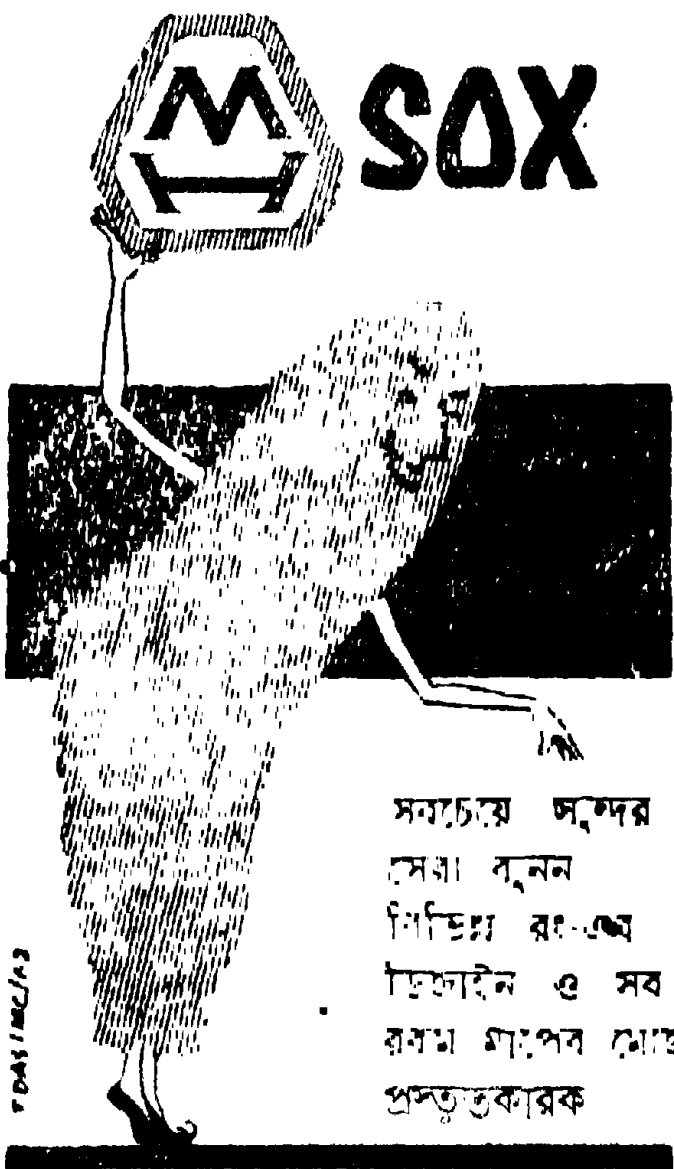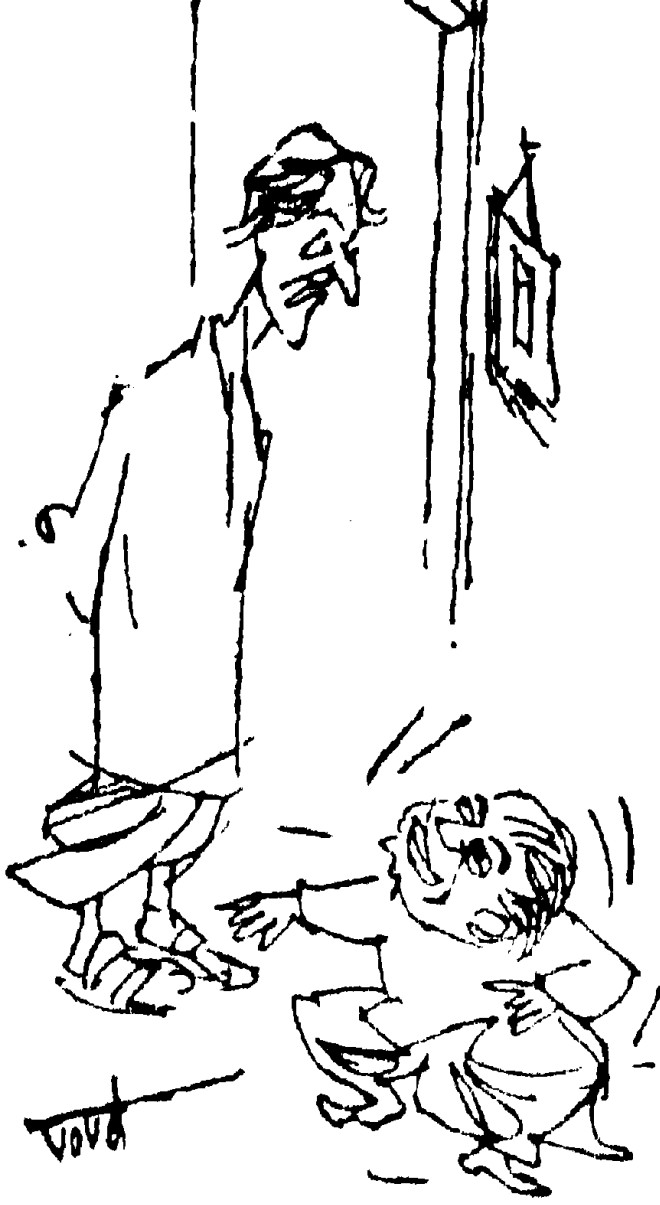
পাড়ায় একটি পত্রিকা ছিল, নেহাতই পাড়াটে ব্যাপার, তার সম্পাদক এসে বলল, 'দাদা আপনাকে লিখতে হবে।'

'কী? প্রেসক্রিপশান?'

'আঁ!' হকচকিয়ে গেল সে।

'বলি মাথার ব্যামো হ'য়ে থাকে তো ডাক্তার দেখাও না। আমার কাছে কেন?' বলে আমি স্থানত্যাগের উদ্যোগ করলাম।

সে বেচারা, বাড়িয়ে বলছি না, একেবারে বসে পড়ল মাটিতে। দুঃখে নয়, হাসিতে। বলতে লাগল, 'এই-এইটুকুই দেব তাহলে ছেপে। ওঃ হো হো, কী সাংঘাতিক! বাপস্, একেবারে পাগল বানিয়ে ছাড়লেন। ওঃ হো হো—!'

পালিয়ে বাঁচলাম সেই সুযোগে।

পরদিন সকালবেলায় সবে ঘুম থেকে উঠেছি, কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি সেই ছেলেটি। একগাল হেসে সে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন লেখাটা।'

'তার মানে?' চমকে উঠে বললাম, 'লেখা দেব বলেছি কখন?'

'বলেন নি, কোনো লেখকই বলেন না, আমাদের জোগাড় করে নিতে হয়।'

'আরে আমি যে লেখক, সে কথা বলল কে?'

'ছিলেন না, হতে আপত্তি কী? জানেন, রাজশেখরবাবু লেখা শুরু করেছিলেন চল্লিশে? আর আপনি তো এখনো—!'

'থামো, থামো' চটে উঠে বললাম, 'কার সঙ্গে কার নাম তুলছ! আমি পারব না।'

'বেশ, তবে আমিও বসলাম।'

কাজেই কিছুক্ষণ পর আবার আমাকে বলতে হল, 'কোনো বড় লেখককে ধরো না? বেশ নাম হবে তাহলে কাগজের।'

'তাতো বটেই। কিন্তু কেউ রাজি হচ্ছেন না। অনেক লেখা লিখতে হবে, ওঁদের আর উপায় নেই।'

'বেশ তো। তোমাদের তো দরকার পুজোর সময়। হাতের কাজ শেষ করেই না হয় দেবেন!'

আমার অজ্ঞতায় ছেলেটির বোধহয় করুণা হল। সে বলল, 'দাদা, পুজোর লেখাই তো লিখছেন ওঁরা। পুজো আসতে বাকী আছে নাকি? আর তো মোটে দু মাস!'

'এত আগে থেকে?'

'এরও আগে থেকে!' ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল আসব।'

অবশেষে, পরদিন নয়, পঞ্চমদিনে সারারাত্রি কলম চিবিয়ে একটি লেখা আমাকে তৈরি করে দিতেই হল। লেখার পর সে লেখা আর নিজে পড়িনি। সময় হয়তো ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। প্রাণের দায়ে দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঘটেছিল বোধহয়, কী লিখেছি নিজেই হয়তো তা বুঝতে পারব না। সম্পাদক ছেলেটি কিন্তু লেখাটা দেখে ঘোষণা করে গেল, এবার পুজোয় সেইটেই হবে তার কাগজের সব থেকে বড় সারপ্রাইজ।

পাঁচদিন ঘুম ছিল না। পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল। শুনলাম একটি ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকৃত হলাম। লেখা চান। পাড়ার কাগজ যে-প্রেসে ছাপা হয়, সেখানেই ছাপা হয় এঁদেরও শারদীয় সংকলন। একটি উপন্যাস আমাকে দিতেই হবে।

'উপন্যাস?' আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি! 'গল্পই লিখিনি কোনোদিন তো উপন্যাস!'

'গল্প না লিখলেও উপন্যাস লেখা যায়।' ভদ্রলোক বললেন, 'বেশি বড় নয়, পাঁচ ফর্মা। দিন পনের পরে এসে নিয়ে যাব।'

'অসম্ভব।' আর্তনাদ করে উঠলাম, 'মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না।'

'হবে, হবে,' ভদ্রলোক বললেন, 'দিনে পাঁচ ছ' স্লিপ করে লিখবেন, দেখবেন তিল কুড়িয়ে তাল হ'য়ে গেছে। আর এই যে, সামান্য কিছু দক্ষিণা।'

জোর করে হাতের মধ্যে কয়েকখানি নোট গুঁজে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সেই থেকে আমি অশ্রুপাত শুরু করেছি। প্রতিদিন কাঁদতে কাঁদতে হাসির উপন্যাস লিখি।

এবং লিখতে লিখতে হাসি।

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস (মারাঠা)

ভারতের জাতীয় সংহতির অন্যতম উপায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ভিতর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। সেই উদ্দেশ্যে এ-সংখ্যা থেকে প্রতি মাসে একটি করে সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কাহিনীগুলি মূল ভাষা থেকে অনূদিত। এ-বিষয়ে শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথমের দক্ষতা 'অমৃত'-পাঠকগণের কাছে সুবিদিত।

—সম্পাদক, অমৃত

*

সংঘাত

শ্রীপদনারায়ণ পেণ্ডসে

—উনি হলেন গাঁয়ের মোড়ল। তুই কোন্ সাহসে ও'র মুখের উপর কথা বলিস্। তোর যে কবে বিবেকবুদ্ধি হবে তাই ভাবি। এতবড় হয়েছিস তবু গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা করতে শিখিসনি। বাপুর মা এশীর কথায় ঝাঁজের চেয়েও ক্ষোভ বেশি।

বাপু ভেবে পায় না কি দোষ করেছে সে। মা যে হঠাৎ তার উপর কেন এতখানি চটে গেছে জানে না সে। মোড়লকে কী-ই বা এমন সে বলেছে! অন্য লোকে বকুনি দিলে সহ্য হত। কিন্তু মা-ও তাকে ভুল বুঝল! সে বলল, তুমি যে অত কথা বলছ, কি এমন দোষটা করেছি আমি! আমি তো তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। গররাজি তো ছিলাম না তার সঙ্গে যেতে। আমার সঙ্গে সে ও-ধরনের বাজে কথা বলল কেন? আমি কি তার চাকর না তার রোজগারে খাই। বলতে বলতে বাপুর গলা ভার হয়ে গেল।

—তুই জানিস্ না ও'র সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। তোর বাবা আর আমি দুজনেই তো তাঁদের বাড়িতে চাকরি করি। চাকরের ছেলে-মেয়েদের কেউ আদরযত্ন করে? কিন্তু উনি তোকে কত স্নেহ করেন, যেখানে-সেখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চান। তোকে মানুষ করে তুলতে চান।

মার এই উপদেশ বাপুর মনে ধরে নি। সে গর্জে উঠে বলল, থাক, আর বক্-বক্ করতে হবে না। ঢের হয়েছে! মেনে নিচ্ছি আমিই দোষী। বাপু মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে। তার চোখে জল।

বাপ্পুর চোখে জল দেখে মায়ের মন ভিজল। এশী তাঁর আগের কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, যাক, আমার কথা তোর যখন ভাল লাগছে না, আর বলব না, চুপ কর। তুই বরং কিছু খা, তোকে খাইয়ে এক্ষুনি আবার কাজ করতে আমার বাড়ি যেতে হবে।

—আমি খাব না।

—তোকে নিয়ে আর পারি না বাপ্পু। জ্বালিয়ে মারলি!

—কানের কাছে ঘেনর-ঘেনর কর না। খাব না বলছি খাব না।

—তুই কি কোনদিন ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখবি না? এত মেজাজ কিসের!

—চুপ কর। কোথায় যাবে বলছিলে যাও। আমি খারাপ হই, ভাল হই, তোমার তাতে কি!

—তাতো বটেই বাপ্পু, এই তো আজকালকার জগতের রীতি। যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর।...এ-জগতে দেখছি আমার সবচেয়ে বড় শত্রু তুমি।

—তাহলে আর অত কথা বলছ কেন? আমি যখন তোমার শত্রু, তাহলে এই বাড়িতে আমি থাকব কেন? আমি চললাম তোমার ঘর থেকে।

বাপ্পু উঠে দাঁড়াল। এশী হতবাক্। তার এই আচরণে স্তম্ভিত হয়ে হাত ধরে বলল, না খেয়ে যাবি কোথায়? আমি না মরলে কি তুই শান্তি পাবি না? এভাবে আমাকে মারবি?

—আমি কাউকে মারতে চাই না। আমি তো তোমার শত্রু। আমার সঙ্গে তোমার দরকার কিসের। আমি চললাম মাসীর বাড়ি। বাপ্পু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাসীর বাড়ি ভূতওয়াড়ির দিকে রওনা হল।

এশী থ বনে গেল। কিছুটা অনুতপ্তও হল। এত সকালে ছেলেকে বকুনি না দিলেই হত। বেচারা কাল রাতে কিছু খায়নি। এতটা খিদে নিয়ে পারবে কি করে তিন মাইল হাঁটতে। অনেকক্ষণ নানান কথা চিন্তা করে সে-ও রওনা হল বোনের বাড়ির দিকে।

এশীর গোটা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে এশী বোনকে ডাক দিল।

—আরে বা! এশী তুই এসে গেছিস? আয় বস।

বাপ্পু চটাইয়ের উপর বসে ছিল। মাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব-নিস্তব্ধ ভাব।

এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল বাপ্পুর মাসী, কিরে এশী, তুই বাপ্পুকে অহেতুক অত বকেছিস্ কেন?

—তাতো বটেই। সব দোষ আমার। এমনিতেই ও বিগড়েছে। তোর আগের বাপ্পু আর নেই। মুখের উপর চটাং চটাং কথা বলতে শিখেছে। তার উপর তোর আস্কারা পেয়ে আজকাল ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। কী এমন বলেছি ওকে। গাঁয়ের মাথা আমরা ওকে কত আদরযত্ন করেই নিয়ে গিয়েছিলো। কি-না-কি বলেছে তাতেই বাবু ও'র সঙ্গে ঝগড়া করে মাঝপথ থেকেই চলে এসেছেন। ওখানে গেলে ওর ভবিষ্যৎটাই ভাল হত, আমার নয়।

—না মাসীমা, মার কথা বিশ্বাস কর না। মা চিরকাল আমার পক্ষেই কথা বলে।

মাসী এশীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল আর কথা বাড়াতে বারণ করে। বাপ্পুকে বলল, বাপ্পু, দেখে আয় তো উনোনের উপর চায়ের কেটলি বসিয়েছি, জল গরম হয়েছে কিনা?

বাপ্পু চলে যাওয়ার পর মাসী আস্তে আস্তে এশীকে বোঝাতে লাগল, দেখ এশী, বাপ্পুর একটু বয়স হয়েছে। ছোট্ট খোকাটি আর নেই। একটু-আধটু সব-কিছু বুঝতে পারে। ভালমন্দ বিচার করতে পারে। তুই ভালভাবে জানিস যে আমার উপর তার একটা রাগ দানা বাঁধছে। আমার সঙ্গে তোকে জড়িয়ে যে রটনা বাজারে চালু আছে, তা ওর কানে কিছু কিছু এসেছে বৈকি! আমার মতে তোর উচিত নিজের এবং বাপ্পুর ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে ওকে না চটানো। ওকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই।

অনেকক্ষণ মাসীর বাড়িতে থেকে এশী এবং বাপ্পু নিজেদের গ্রাম গারম্বীর দিকে রওনা হল। বাপ্পু কিছুতেই বাড়ি ফিরতে চাইছিল না। কিন্তু মাসীর কথা আর বাবার কথা ভেবে বাড়ি ফিরল। সারা রাস্তায় মা-ছেলেতে কোন কথা হয়নি। বাড়ি ফিরে বাপ্পু বাবাকে বলল, বাবা, আমি কিন্তু মাসীর বাড়িতেই থেকে যেতাম। শুধু তোমার কথা ভেবে চলে এসেছি। আর এক মুহূর্ত মার কাছে থাক'তে পারছি না। বাপ্পুর বাবা মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেলের সব কথা বুঝল, কিন্তু নিজে কোন মন্তব্য করল না।

।। দুই ।।

গারম্বী গ্রামের মানুষের সঙ্গে বাপ্পুর বিরোধ যেন সব সময় লেগেই রয়েছে। কোনদিন এ-দুটো জীবনের ধারা যেন এক খাতে বইবে না। গারম্বীর লোক বাপ্পুকে সুনজরে দেখে না। ছেলেবেলা থেকেই সে ওদের উপেক্ষা আর তিরস্কারই পেয়েছে। গ্রামের মানুষ তো দূরের কথা, নিজের বাড়িতেই তার কোন খাতির নেই, আদরযত্ন নেই। বাপ্পুর বাবা অদ্ভুত রকমের এক নির্বিকার নির্লিপ্ত পুরুষ। আমরা খোতের কাছে অনুগত। বউয়ের কাছে অবনত। ভীরু কাপুরুষের জীবন্ত প্রতীক যেন সে। আর এশী, সে যেন ভাদ্র মাসের এক বন্ধনহীন নদী। খেয়াল-খুশিমত ছুটে চলে তার প্রবাহ। কাউকে তোয়াক্কা করে না। দুই কূলে ধ্বস ধরিয়ে প্রবল বেগে সে ছুটে চলেছে। বাবা এবং মায়ের এই পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের সংঘর্ষের চাপে পড়ে বাপ্পু চরিত্র-গঠনের কোন পথ খুঁজে পায়নি। বাইরের জগতের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। পরিবারের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। স্কুলে ভর্তি হয়ে বেশিদূর পড়তেও পারেনি। মরাঠী ইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়ে দিতে হল। চারদিকের চাপে সে ক্রমশঃ নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন সে হয় গ্রামের সীমানায় নদীর সেতুর উপর বসে কাটায়, অথবা অন্য কোন নির্জন জায়গায় বসে বসে বিড়ি টানে। গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের কেউ তাকে দুচোখে দেখতে পারে না। কথা বলে না। মেয়েমহলেও তার সম্পর্কে কানাঘুষা চলে। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে একমাত্র দিনকর ভট্টই কালেভদ্রে লুকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। দু-একটি মেয়েও বাপ্পুর সঙ্গে ঠাট্টা করত। সুযোগ পেলেই ওর সঙ্গে ঠাট্টা করে রামী। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে সে। এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। নদীতে জল তুলতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিন সুযোগ পেলেই ঐ নিরীহ ভবঘুরেকে দু-চার কথা শোনাতে পারলে ছাড়ে না। বাপ্পুও ছেড়ে কথা বলে না। সমাজ বা গ্রামের উপর তার যত আক্রোশ, যত রাগ, সব ঝাল রামীর উপর ঝাড়ে। রামীও পাল্টা দু'কথা ওকে শুনিয়ে দেয়।

একদিন সকালে দিনকর গোপনে বাপ্পুর সঙ্গে দেখা করে বলল, বাপ্পু

স্বামী এবং তোমার সম্পর্কে গ্রামে যা-তা রটছে। ওর নাকি ছেলে হবে। লোকে কিন্তু তোকেই সন্দেহ করছে। বাপুর চোখ ফেটে জল এল। চোখে অন্ধকার দেখছে সে। একি অবিচার তাঁর উপর! প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে। দীনু, লোকের মনে এইভাবে অদ্ভুত একটা ধারণা জন্মাল কি করে!

—গাঁয়ের লোক বলছে, প্রত্যেক দিন তোমার সঙ্গে নাকি পুকুরের উপর ওর দেখা হয়। অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়।

—আচ্ছা, লোকে কি ভুলে গেছে আমার বয়সের কথা? বয়সে আমি ওর চেয়ে কত ছোট!

—বাপু, তোমার উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি আর কি করতে পারি? সকালে বাবার মুখে এ-কথা শুনেই তোমাকে তাড়াতাড়ি জানানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।

—বাবা-মার কানেও কি এ-কথা গেছে?

—তোমার বাবা জানে কিনা জানি না। তবে মার কানে গেছে মনে হয়। কারণ, এই রটনার সূত্রপাত তো হয়েছে আমা খোতের বাড়িতেই।

বাপু 'ও' বলে করাঘাত করল মাথায়।

—এখন বুঝেছি, এ-সব কার কারসাজি। যাক দীনু, তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো। কাজেই তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, লোকের কাছে বুঝিয়ে বল—বাপু কক্ষনো এই কাজ করতে পারে না। বাপু নির্দোষ।

দীনু বড় বড় চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে। পরক্ষণে বলল, আচ্ছা বাপু, এখন যাই আমি। আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করেছি, এ-কথা কেউ বাবার কানে তুললে আর রক্ষে নেই।

বাপু অনেকক্ষণ মাথা গুঁজে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বাড়ি ফিরল। বাবা সস্নেহে বলল, সারাদিন তুই কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল? সারাদিন খাসনি কিছু। আয় আমি তোর জন্যেই বসে আছি। তুই এখানে বস, আমি চা বানিয়ে আনছি। তোর জন্য ভাতের ডেকচিটাও বসিয়ে আসব।

—আমার ক্ষিদে নেই, বাবা। মা কোথায় গেছে?

—আমার বাড়িতে। ওদের বাড়িতে নাকি অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছে।

—আচ্ছা বাবা, তুমি আমার সম্পর্কে কিছু শুনেছ?

—না তো, কি ব্যাপার?

—কিছু নয়। সবই আমার দুর্ভাগ্য। কই চা বানাবে বললে—বানাও। তাড়াতাড়ি এস, অনেক কথা আছে।

বাপু মাথা গুঁজে বসে রইল।

—আজ তোর কি হয়েছে রে বাপু? অমন মুখ-ভারি করে বসে আছিস কেন?

—কি বলব বাবা, আমার সম্পর্কে যা নয় তাই রটছে।

চমকে উঠে বাপুর বাবা বলল, কি হয়েছে; কিসের রটনা?

বাপুর চোখের কোণ বেয়ে টপ্-টপ্ করে জল পড়ছে। দিনকরের কাছে সে যা শুনেছে, সব বলল বাবাকে। ওর বাবা বলল, আমার বাড়িতে এই ধরনের কি একটা কথা কানে এসেছিল বটে, তবে তুই তো জানিস্, বাজে কথায় কান দিতে আমার ইচ্ছে করে না। এ-সব কথা কানে তুলে লাভ কি আমার।

—আমার সম্পর্কে নানারকম কুৎসা শুনেও তুমি ব্যাপারটা ভালভাবে জানার চেষ্টা করনি?

—তুই তো জানিস আমার—

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আচ্ছা বাবা, তুমি এত ভীতু কেন? এত ভয়ে-ভয়ে তুমি বাঁচবে কি করে?

এই সময় [illegible] এল। বাপুর বাবা [illegible] না। ঘরে পা রেখেই [illegible] ঘায়ের উপর নুন ছিটিয়ে দিল, লেবুর রস ঢালল। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

—ছি-ছি-ছি-ছি, ঘেন্নায়, লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তোর মত কুলাঙ্গারকে আমার পেটে ধরতে হয়েছে। অমন জানলে আঁতুড়ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে ফেলতাম। হ্যাঁরে, তোর কি একটুও ঘেন্না-লজ্জা-ভয় নেই?

বাপুও যেন ঠিক এই ধরনের একটা অবস্থার অপেক্ষায় ছিল। সে ফুঁসে উঠল, ঠিক উল্টো বললে, মা। আমার তো মনে হয় তোমার পেটে জন্মেছি বলেই আমার উপর লোকে এত সহজে এই জঘন্য অপবাদ দিচ্ছে। কুৎসা রটাচ্ছে।

—চুপ কর। কিছু জানে না। ধোয়া তুলসীপাতা। শাস্ত্রে বলে—যা রটে তা বটে। এমনি-এমনি কথা ওঠে না। আমি আড়ি পেতে সব শুনেছিলাম তোদের কথা। আমা তোর সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করতে যাবে কেন শুনি?

—ঐ জানোয়ারটার নাম আমার সামনে তুমি নিও না মা বলে দিচ্ছি। তবে যা কিছু রটছে, সবকিছুর মূলে যে সে-ই, এ-ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এ-সব তারই কারসাজি।

—দেখ বাপু, কথায়-কথায় আমাকে গাল দিবি না। উনি তোর পাকা ধানে মই দিতে যাননি। নিজে পথেঘাটে পাপ কাজ করে বেড়াবে, লোকে তা বলবে

না! অত দেমাক কিসের? অমন কাজ করলে লোকের কথা সইতে হয় বইকি। এখন বড় গলা করলে শুনবে-কে? বেহায়া কোথাকার!

—ব্যাস্, চুপ কর, চুপ কর বলছি।

বাপুকে অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করল ওর বাবা! এই ঘটনার পর দীর্ঘ এক মাস বাপু ঘরের বাইরে পা রাখেনি। ঘরেই চব্বিশ ঘণ্টা মাথা গুঁজে বসে থাকত। স্নান-খাওয়া-ঘুম সময়মত করত না। এত বড় অপবাদের বোঝা সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। ওর হঠাৎ এই ঘরকুনো জীবন অনেকের মনে সন্দেহ বাড়াল। পথেঘাটে লোকে যা নয় তাই বলতে লাগল। বাপুর বাবার কানেও যে দু-চার কথা আসত না, তা নয়; কান খাড়া করে সে শুনত কিন্তু কিছুই বলত না। দু-চারজন বাপুর বাবাকে জিজ্ঞেস করত, বাপুকে তো আজকাল ঘরের বাইরে পা রাখতে দেখি না, কি হয়েছে ওর? আর তোমারও তো খাটনির শেষ নেই দেখছি! ছেলে তো বড় হয়েছে, আর ওকে ঘরে বসিয়ে-বসিয়ে খাইয়ে লাভ কি! বের করে দাও না ঘর থেকে।

এ-সব কথা বাপুর বাবা এক কানে শুনত আর এক কান দিয়েই বের করে দিত। ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া তো দূরের কথা, বাপু নিজেই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, ওর বাবা পথ আগলে দাঁড়ায়, ওকে যেতে দেয় না। কাতরভাবে অনুরোধ করে যাতে না যায়।

—অতই যখন আমার ওপর তোমার টান, তবে গারম্বী গাঁয়ের প্রত্যেক ঘরে-ঘরে গিয়ে লোককে বোঝাও না, কেন ওরা আমার নামে এই অপবাদ দিচ্ছে।

দীর্ঘ এক মাস ঘরে বসে বুঝল যে, বাবা ওর জন্য জীবন দিতে পারে, কিন্তু গাঁয়ের লোকের কাছে নিজের ছেলের পক্ষে ওকালতি করতে পারে না। সে সংসাহস তার নেই। ভাবল, এ-সম্পর্কে দিনকর এবং তার মা কিছু করে থাকতে পারে। ভুতওয়াড়ির মাসীর কথাও মনে পড়ল। আজ এক মাস সে তার বাড়ি যায়নি। মাসীও আসেনি এ-বাড়িতে। বাপুর সংশয় হল, তাহলে কি মাসীও আমার সম্পর্কে যা রটছে, তা বিশ্বাস করল! অথচ মাসী তো প্রত্যেক দিন এই গ্রামের সীমানায় এসে ব্যাঘ্রেশ্বরের মন্দিরে পুজো দেয়। একদিনও কি আমাকে দেখার ইচ্ছে হয়নি তার? বাপু যেদিন এই সব কথা ভাবছিল, সেই দিন সন্ধ্যায় মাসী এল। মাসীর সঙ্গে কথা বলে বাপু কিছুটা স্বস্তি পেল। হঠাৎ এক সময় মাসীর পা ধরে বলল, বিশ্বাস কর মাসী এ-ব্যাপারের আমি কিছু জানি না। ঘরে বসে-বসে আমার এত বিশ্রী লাগছে যে, কি বলব! বাবাকে কত করে বলেছি কিন্তু উনি এ-ব্যাপারে কিছুই করতে সাহস পাচ্ছেন না। মা তো ধরেই বসে আছে আমারই সব দোষ। তুমি বিশ্বাস কর মাসী। তোমার পা ছুঁয়ে আমি বলছি।

—বাপু, ওঠ। তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমি সব ঠান্ডা করে দিচ্ছি। কার এত-বড় বুকের পাটা যে, তোর নামে এরকম অপবাদ রটায়? তুই আগের মতন যে-রকম বেরোতিস, সেরকমই বেরো বা। কোন ভয় নেই। আর দেখ, এশী তোকে পরিষ্কার বলে রাখছি, আমার বাপু সম্পর্কে আর কেউ যদি কোনরকম কুৎসা রটায়, আমি তার জিভ ছিঁড়ে ফেলব।

পরের দিন পঞ্চায়েতের রায় বেরোনোর আগেই এশী তাড়াতাড়ি ঘরে এসে বলল, আন্না নিজের গাঁটের তিনশো টাকা ঢেলে সব ঠিক করে দিয়েছে।

বাপু আর্তনাদ করে উঠল, কে বলল তাকে এ-সব করতে! এ-ব্যাপারে দোষ কার তা খুঁজে বের করা উচিত ছিল।

পরক্ষণে মাসী এসে বোঝাল, বাপু, যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। ওসব ঝামেলায় আমাদের নাক না গলানোই উচিত। ওরা নিজেরাই বেশী ঘাঁটাতে চায় না। ওদেরই বেশি ভয়, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। ওরা ঘোষণা করেছে তুই নিরপরাধ। এই যথেষ্ট। আর ঘাঁটাসনি বাবা, চেপে যা।

।। তিন ।।

ওখানাদে নদীর সেতু যেন একটি মিলনক্ষেত্র। ইর্গে বন্দর, সাখরপোঁড়, গারম্বী, ভুতওয়াড়ি এবং আরও বহুস্থানের যাতায়াতের ওটাই ছিল সাধারণ পথ। ঐ সেতুকে ঘিরে বসেছে বাজার। পাঁচ-সাতটা হোটেল-রেস্টুরেন্টও আছে। তার মধ্যে একটি হোটেল চালায় আন্না খোতের জামাই সপাটবাপু এবং অন্য একটি দোকানের মালিক রাওজী গুরবের। সপাটবাপুর হোটেলটাই সবচেয়ে বেশি সাজানো-গোছানো। তাই তার হোটেলে ভিড়ও বেশি।

দীর্ঘ এক মাস পর বাপু এল সেই সেতুর কাছে। দিনের বেশির ভাগ সময় ওখানেই ঘোরাঘুরি করত। এতদিন নীরব-নির্বাক জীবনযাপনের ফলে তার মনে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এখন তার বিচারশক্তি অনেক বেড়ে গেছে এবং আর একটি নতুন অভ্যেস তার হয়েছে—সেটা হল লোকের সঙ্গে গায়ে-পড়ে আলাপ করা। ফলে, অনেকের সঙ্গেই বাপুর পরিচয় হতে লাগল। অনেকেই এখন তার বন্ধু। দূরদূরান্ত গ্রামের ব্যবসায়ী, ড্রাইভার প্রভৃতি নানা ধরনের লোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হতে লাগল। সপাটবাপুর হোটেলে সব সময় ভিড় জমে রয়েছে। বাপু দু-একদিন গেল ঐ হোটেলে। কিন্তু আন্না খোতের জামাই তার দিকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকাল। ওর এই ব্যবহারে বাপুর মন বিগড়ে গেল, ঠিক করল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন রাওজী গুরবেরের হোটেলে বসতে লাগল। ওর ওখানে বসার ফলে তার পরিচিত অনেকেই এই হোটেলে বসল, খেল। দেখতে দেখতে রাওজীর হোটেলে বিক্রি অনেক গুণ বেড়ে গেল। বাপুর উপদেশে সে নতুন নতুন ফার্ণিচার দিয়ে দোকান সাজাল। নতুন বাসনপত্র আনাল। খরিদ্দারের সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয়, রাওজীকে তা-ও শেখাল বাপু। দোকানে বাপু বসলেই হোটেলে ভিড় হয়, তাই রাওজী তাকে খুব খাতির করতে লাগল। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীরতর হল। দু-চার মাসের মধ্যেই রাওজীর হোটেল ওখানাদে সেতুর অন্যতম আকর্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত হল।

বিক্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাওজীর কর্মতৎপরতা বাড়ার পরিবর্তে আলস্যেমী বাড়ল। রাওজী বাপুর উপর হোটেলের সমস্ত ভার দিয়ে নিজে গাঁজা টানত আর পড়ে পড়ে ঘুমোত এবং তার তরুণী সুন্দরী বউকে দিয়ে সেবা করাত। এদিকে বাপু সারাদিন হোটেলে থাকে। গাঁয়ে যাওয়ার তার সময় হয় না। রাওজী তাকে ছাড়তে চায় না। কালেভদ্রে যেতে চাইলে রাওজী বলত, ভাই বাপু, তাড়াতাড়ি ফিরে এস। এ-হোটেল চালানোর ক্ষমতা আমার নেই। তুমি না আসলে আমি একা এইখানে মারা পড়ব।

গাঁয়ের মানুষের কাছে বাপু হয়ে উঠল ডুমুরের ফুল। আজকাল বাড়িতেও

বাবা যেন একটু বেশি রকমের আদর করে। প্রত্যেক দিন বাড়ি ফেরে না বলে অনুযোগ করে। কিন্তু গারম্বীর বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাপু থাকতে চায় না। গাঁয়ে পা রাখলেই হাঁপিয়ে ওঠে যেন, দম বন্ধ হয়ে আসে। গারম্বী তাকে বুঝল না। তাকে পুছল না।

এইভাবে তিন বছর কেটে গেল। এই তিন বছরের মধ্যে বাপুর জীবনে এল একটা বিরাট পরিবর্তন। সে ঐ ওয়ানাদে সেতু অঞ্চলে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠল।

একদিন সন্ধ্যায় বাপু কাউণ্টারে বসে আয়-ব্যয়ের হিসেব করছে, এমন সময় এক বিবাহিতা তরুণী তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা তোমারি নাম বাপু—না?

—হ্যাঁ, বাপু সসম্ভ্রমে বলল।

—আমার নাম রাধা।

—রাধা! রাওজীর স্ত্রী রাধা? বস, বস। কি করে এলে? অসুবিধে হয়নি তো? বাপু দাঁড়িয়ে রাধাকে বসার জন্য অনুরোধ করল।

—রাওজী কোথায় গেছে, এক্ষুনি আসবে। বসো।

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সারাদিন একা ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না। ভাল কথা, আমার জন্য তোমার কাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে না তো?

—ক্ষতি আর কি! রাওজী এখনও আসেনি, তাই হিসেবনিকেশের কাজটা একটু সেরে নিচ্ছি। বস।...ওরে ভাল করে একটা চা বানিয়ে দে।

বাপু কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে রাধার সঙ্গে কথা বলতে। ওর সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে এর আগে। শুনেছে সে সুন্দরী। কিন্তু সে যে এতটা সুন্দরী, তা কল্পনা করতে পারেনি। চেহারায় একটা আভিজাত্যের ভাব সুস্পষ্ট। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা জমে উঠল। রাধা সস্নেহে বলল, হোটেলের রান্না খেয়ে নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। অন্তত দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। হোটেলের রান্না খেয়ে কি আর স্বাস্থ্য টেঁকে? ঠিক করেছি, কাল থেকে বাড়িতে রান্না করে তোমার জন্য পাঠাব।

এত গভীর স্নেহভরা কথা এর আগে বাপু কোনদিন শোনেনি। সে অবাক দৃষ্টি মেলে রাধার শান্তস্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি আমাদের হাতের রান্না খেলে আবার জাত যাবে না তো! সে ব্যাপারে আপত্তি থাকলে জানিয়ে দাও এক্ষুনি।

—আপত্তি? আমার? আমি কিন্তু মুসলমান ক্রীশ্চান—সকলের সঙ্গেই খাই। আর তুমি তো—

—বল না, তুমি তো গুরুবিন।

—না, আমি বলছিলাম...মানে আমার বলার উদ্দেশ্য হল...আমার দৃষ্টিতে তুমি হলে দেবী।

—থাক, অত ভার বইতে পারব না। দেবী হতে চাই না। মানবী হয়েই বাঁচতে দাও। অন্তত আমি যে মানুষ তা যেন দু-চারজন মনে করে।

বাপু রাধার এই অনুযোগের তাৎপর্য ঠিক ততখানি বুঝতে পারল না। যেটুকু বুঝল, তার কোন জবাব খুঁজে পেল না। রাধার সম্পর্কে রাওজীর মুখে বাপু যা শুনেছিল, তাতেই তার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল। রাধার বিয়ের আগে নাকি তাকে নিয়ে কিছু রটেছে। কিন্তু রাধার আজকের এ-কথা যে মনের কোন্ রিক্ত কোণের অপূর্ণতা পূর্ণ করার অভিলাষে রাধা আজ বলল তা তার বোধগম্য হল না। শুনেছে রাধা লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তাই বাপু বলল, তুমি অনেক লেখাপড়া-জানা মেয়ে আর আমি হলাম গণ্ডমূর্খ। বিদ্যের দৌড় আমার ক্লাস ফোরের বেশি নয়।

বাপু সহজ-সরলভাবে বলে ফেলল।

রাধা মুচকে হেসে বলল, ঢের হয়েছে, আর বলতে হবে না। আমার হাতের রান্না খাবে কিনা শুনতে চাই। বলো, আমার অনুরোধ রাখবে?

—রাখব না বলিনি তো।

—তাহলে কাল থেকে তোমার খাবার পাঠিয়ে দেবো। আমার রান্না ভাল লাগবে না জানি তবু চোখ বুজে গিলে নিও। হোটেলের রান্নার চেয়ে কিছুটা বোধহয় ভাল হবে। ......একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবে না তো? দিনে কত ছিলিম গাঁজা খাও?

বাপু থতমত খেয়ে বলল, এই কালেভদ্রে রাওজীর সঙ্গে একটু-আধটু—।

—আমি কোথায় ভেবেছিলাম ও'র গাঁজা খাওয়া তুমি ছাড়াবে, এখন দেখছি তুমি নিজেই তা ধরে আছ। আচ্ছা, আমার আর একটা অনুরোধ রাখবে? জোড়হাত করে অনুরোধ করছি, তুমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দাও। চোখের সামনে তো দেখছো তোমার বন্ধুর অবস্থা। ও'র খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য আমি কত যত্ন নিই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গাঁজা খায় বলে দিনের পর দিন শরীর ভেঙে পড়ছে। আর তোমার তো খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক নেই। গাঁজা ছেড়ে দাও। ঐ ছিলিমের আগুনে তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নেবে।

রাধার প্রত্যেকটি কথা যেন মা এবং বোনের নিঃস্বার্থ স্নেহজাতক। সেদিন থেকে বাপুর একটা দিকের দায়িত্ব যেন রাধা নিল। রাওজীও এতে খুশী, কারণ যেকোনভাবে বাপুকে বেঁধে রাখতে পারলে তার লাভ। বাপুও স্নেহের নতুন স্বাদ পেল। কিন্তু গারম্বী গাঁয়ের মানুষ তার ভাগ্যে এতখানি স্নেহপ্রাপ্তিযোগ ঘটুক এটা চায় না। দিনকয়েকের মধ্যেই রাধাকে জড়িয়ে বাপুর নামে আবার অপবাদ ছড়াল। দিনকরের কাছে এই খবর জানতে পারল বাপু। এবারে কিন্তু বাপু ওসব অপবাদে গুরুত্ব দেয়নি। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আচ্ছা দিনকর, গারম্বীর লোকের কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই? খালি যা নয় রটিয়ে বেড়াবে। যাক, এবার ওদের জানিয়ে দিও, আমি ওদের তোয়াক্কা করি না। ওসব দিন আমার গেছে। তবে হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে তোমার মনেও যদি কোন সন্দেহ ঢুকে থাকে তবে বলি, যমীর ব্যাপারে যা রটেছিল তাতে আমার কোন দোষ ছিল না, রাধার ব্যাপারেও তাই। আমার চোখে রাধা মানবী নয়, দেবী—আমার শ্রদ্ধার পাত্রী। ......এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই।

দিনকর নীরব রইল। দিনকর, রাধা, রাওজী সবাই এ-ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলেও রটনা কিন্তু কমেনি। ফলে রাধা এবং বাপুর সম্পর্ক আরও নিবিড়তর হল। বাপুর প্রতি রাধার স্নেহ, সমবেদনা এবং আন্তরিকতা আরো গভীর হল।

।। চার ।।

আজ ক'দিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সমগ্র অঞ্চল যেন তোলপাড় না

করলে প্রকৃতি স্বস্তি পাচ্ছে না। বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রচন্ড ঝড়। যত-দূর দৃষ্টি যায় থৈ-থৈ জল।

বৃষ্টি থামার পরের দিন রাধা আর বাপ্‌দু ঐ সেতুর কাছে এল। হঠাৎ বাপ্‌দু চিৎকার করে উঠল, রাধা ঐ দেখ, কার শবদেহ ভাসছে। তীরবেগে ছুটে গিয়ে বাপ্‌দু একহাটু জলে দাঁড়িয়ে দেখে তার বাবার শবদেহ ভাসছে। আর্তনাদ করে উঠল বাপ্‌দু। ঝাঁপ দিল জলে।

...রাধা অনেক করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাপুর শোকার্ত-হৃদয়কে কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। বাপ্‌দু পাগলের মত ছুটে গিয়ে দিন-করকে বলল, দিনু, এতবড় সর্বনাশ কী করে হল! এখন আমি কি করি বল ত?

দিনকর সব জানত। কিন্তু সে তখন কিছু বলেনি। শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর সুযোগমত একদিন দিনকর বলল, জানো বাপ্‌দু, ঝড়বৃষ্টির দিনে তোমার বাবা কিন্তু তোমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। একদিকে তোমার জন্য ভাবনা, অন্যদিকে ঐ দুর্বল শরীরেও কাজ করতে না গেলে ছাঁটাই হবে। ঝড়ের দিনেও তাকে যেতে হল আমার বাড়িতে কাজ করতে। সেই প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমার বৌ খালের ধারে পাতকুয়োর জল আনতে বলল। তোমার বাবা প্রথমে একটু

গররাজি হয়েছিল। কিন্তু আন্নার বউ যখন বলল, আর যাই হোক মরে যাবে না, জল নিয়ে এসো। তোমার বাবা আর কোন কথা না বলে জল আনতে চলে গেল। ঐ কাঠের সাঁকো দিয়ে খালের মাঝখানে পৌঁছোতেই সাঁকো ভেঙে গেল। তোমার বাবা পড়ে গেল সেই প্রচণ্ড জলস্রোতে।

বাপু পাগলের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা তুমি এত ভীতু কেন ছিলে! ভয়ে ভয়ে গোটা জীবনটাই তুমি নষ্ট করলে!

বাপু মার কাছে গেল। সারা জীবনের রোজগার থেকে কিছু জমিয়ে বাবা তার জন্যে যে আংটিটা গড়িয়েছিল সেই আংটিটা চাইল মার কাছে। ওটা নিজে পরে বাবার কাছেই রেখে দিয়েছিল বাপু। আজ সেই স্মৃতিবিজড়িত আংটি চাইল।

—ঐ আংটি ছাড়া তোর বাবা কিই-বা রেখে গেছে। ওটা আবার তোকে দেবো কেন? এতেও ভাগ বসাবি!

—মা, তোমার জন্যে ওটার পরিবর্তে আর একটা আংটি গড়িয়ে দেবো। তুমি আমাকে ওটা দিয়ে দাও।

—থাক যথেষ্ট হয়েছে। বলি, এতদিন তো রোজগার করেছিস, ক'টাকা মার হাতে দিয়েছিস শুনি? এখন এসেছে আংটি গড়াতে! ওসব যদি গড়াতেই হয় তবে যা গড়িয়ে তোর রাধাকে দে-গে। মনে কর তোর মা নেই মরে গেছে।

—মা, আর যাই হোক, রাধা সম্পর্কে যা নয় তাই বল না। রাধা আমার কাছে দেবী। বাবার স্মৃতি এমনিতেই আমার মনে জাগরূক থাকবে। ও আংটি না দাও তোমার কাছেই থাক।

বাবার মৃত্যুর পর বাপুর কথায়-বার্তায় চালচলনে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। রাধা বাপুর এই মানসিক অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ওঠে। বার বার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। রাওজীও খুব ঘাবড়ে গেল। একদিন রাধা বাপুকে নিয়ে গেল ব্যাঘ্রেশ্বরের মন্দিরে। মন্দিরের কাছেই সেই পাতকুয়ো, যেখানকার জল আনতে গিয়ে বাপুর বাবা মারা গেছে। বাপু ছুটে গিয়ে সেই পাতকুয়োর কাছে বসে রইল। রাধাও সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বাপু চিৎকার করে উঠল, বাবা, বাবা—এই যে আমি এখানে। এই তো তোমার সামনে, তুমি দেখতে পারছো না?

—বাপু, এ কি করছো। এখানে তোমার বাবা থাকবেন কেন? চল ওদিকে যাই।

—আমাকে ছেড়ে দাও, রাধা। তুমি দেখতে পারছো না, ঐ তো আমার বাবা। বাবা, আমি তোমাকেই দেখতে এসেছি। রাধা, এইমাত্র বাবা বলল, আমি তোমাকেই দেখতে এসেছি। এতে রোগা হয়েছিস কেন? তোমার নাম জানতে চাইলেন। আমাকে আশীর্বাদ করলেন। বাবা শেষে কি বললেন জান? বাপু, আমি সারাজীবন ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। আন্না খোতকে ভয় করেছি, তোর মাকে ভয় করেছি। গারম্বী গাঁয়ের সবাইকে ভয় করেছি। কিন্তু তুই কাউকে ভয় করিস না। আমার অপমান আর অকাল-মৃত্যুর প্রতিশোধ নিস বাবা।

রাধা বাপুর মানসিক অবস্থা বুঝে তখনি কিছু করল না। হঠাৎ বাপু রাধার কোলে মুখ লুকিয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে বলল, ঐ কথাগুলো বলেই বাবা চলে গেলেন। কত ডাকলাম এলেন না।

রাধা গভীর স্নেহের সঙ্গে বাপুর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, বাপু, তোমার বাবা তোমাকে খুব স্নেহ করতেন, সেই জন্যেই দেখা করতে এসেছিলেন। তা না হলে কি আর অত কথা বলতেন। উনি চান তুমি বড় হও, সমাজের মাথা হও। গাঁয়ের মোড়ল ঐ আন্না খোতের বিষদাঁত ভেঙে দাও।

—তুমি ঠিক বলেছ, রাধা। সত্যি আমাকে অনেক বড় হতে হবে। ঐ আন্না খোতকে ঠাণ্ডা করতে হবে। আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। আন্না খোতকে ঠাণ্ডা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গারম্বী গাঁয়ে মোড়ল হওয়া। রাধা আমি এই ব্যাঘ্রেশ্বরের কাছে শপথ করছি, বাবার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবই। ওঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলবই। তার জন্য যদি আমার জীবন যায় যাক।

রাধা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তুমি নিশ্চয়ই পারবে, বাপু।

।। পাঁচ ।।

বাবার স্মৃতি আচ্ছন্ন করে রইল বাপুর জীবনকে। আজীবনের অপমান আর লাঞ্ছনার জ্বালার ফলে বাপুর কর্মতৎপরতা অনেক গুণ বেড়ে গেল। তার নিঃসঙ্গ একক জীবনের একমাত্র সম্বল রাধার স্নেহময় ব্যবহার। সেই স্নেহের টানে মাঝে মাঝে সে রাধার কাছে আসত।

কিন্তু ইদানীং বাপু অত্যন্ত ব্যস্ত। বাপু চলে গেল সাথরপেড়ি। এক মুসলমানের দোকানে সাধারণ কর্মচারীর মত ঢুকে দিনকয়েকের মধ্যেই সুপারী-ব্যবসার আটঘাট বুঝে নিল। তারপর মুসা শেঠের অধীনে কাজ করল। দিনে আঠারো ঘণ্টা সে কাজ করে। মাস ছয়েকের মধ্যেই বাপুর বিরাট পসার হয়ে গেল এবং টাকাও হল তার অজস্র। পরিশেষে সে হল মুসা শেঠের ব্যবসার কার্যকরী অংশীদার।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। বাপু বোম্বাই বাজারের জন্য বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সুপুরী কিনতে প্রচুর টাকাপয়সা জমিয়ে বেরোবে এমন সময় সে রাধার চিঠি পেল। রাওজীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। এ চিঠি পাওয়ার পর ব্যবসার লাভলোকসানের কথা না ভেবে বাপু সোজা ওয়ানাদে সেতুর কাছে পৌঁছল। দেখল শুধু রাওজীর শারীরিক অবস্থাই নয়, পরিবারের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। রাধার চোখ বসে গেছে, চেহারা ভেঙে পড়েছে। দেখেই বোঝা যায় অনেক দিন খাওয়া, ঘুম তার বন্ধ। চোখের পাতা না ফেলে দিনের পর দিন সে রাওজীর মাথার কাছে বসে সেবা-শুশ্রূষা করছে। প্রতিদানে পাচ্ছে রাওজীর গালাগালি এবং বিরক্তি। বাপুর হৃদয় গভীরভাবে আর্দ্র হল এ-দৃশ্য দেখে। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের মত টাকা ঢালল ওষুধ-পথ্যের জন্যে। কিন্তু বাপুর শতচেষ্টা সত্ত্বেও রাওজীর প্রাণবায়ু তার অতটা দুর্বল শরীরকে আশ্রয় করে বেশিদিন থাকতে পারেনি। ফলে, রাধার পুরো দায়িত্ব স্বভাবতই এসে পড়ল বাপুর ঘাড়ে। রাধা চলে যেতে বলল বাপুকে। অনুরোধ করে বলল, বাপু,

আমার জন্য তুমি এভাবে জীবন নষ্ট কর না। আমাকে ছেড়ে চলে যাও। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। গোটা জীবনে যে সুখ পাইনি, এখন আর তার পাওয়ার কোন আশা নেই। আমার প্রতি তোমার অগাধ শ্রদ্ধা, কিন্তু আমি চাই না নিজের স্বার্থে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে। তুমি তো জান অল্প বয়সেই একবার আমার নামে কুৎসা রটেছিল। উনি বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে ঘোরা-ঘুরি করলেও কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু এখন তোমার উচিত দূরে থাকা, তা নাহলে বুঝতেই তো পারছ সুযোগ পেলেই সত্য-মিথ্যার বিচার না করে সমাজ কাদা ছিটোবে।

—রাধা, সমাজকে আমি ভয় করি না। আজকাল আমি আর কোন-কিছুকেই ভয় করি না। নিজের ভবিষ্যৎ আমি নিজের হাতেই গড়ব নিজের খেয়াল-খুশিমত। তার জন্য যদি সমাজকে ছাড়তে হয় ছাড়ব। বলতে পার রাধা, সমাজ আমাকে আজ পর্যন্ত কী দিয়েছে? রাধা, শুধু তোমার স্বার্থেই নয় নিজের স্বার্থেও তোমার কাছে থাকা আমার প্রয়োজন।

রাধার চোখ জলে ভরে গেছে। জীবনে সে এতখানি দরদ এবং সহানুভূতির ছোঁয়া বাপু ছাড়া আর কারো কাছে পায়নি। বোম্বাইয়ে পড়ার সময় কোন এক ছাত্র তার নামে একটা প্রেমপত্র পাঠিয়েছিল ডাকযোগে। সে চিঠি শিক্ষকের হাতে পড়ে। কানাঘুষো শুরু হয়। বাড়ির লোকের কানে এল। ফলে পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হল। এই ঘটনার ফলে অনেক বয়েস পর্যন্ত রাধাকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয়নি। এমতাবস্থায়, স্বীকার করতে হবে, রাওজী ওকে বিয়ে করে দয়াই করেছিলো। কিন্তু বিয়ের পর সেই দয়ার মূল্য তাকে কম দিতে হয়নি। রাওজী কোনো দিন রাধাকে ঠিক ভালবাসতে পারেনি। নিজের জৈবিক কামনা চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে তাকে ব্যবহার করেছে। ......বাপুর মনে কোন পাপ নেই। সব কাজের পেছনেই সে রাধার প্রেরণা চায়। চায় হৃদয়ের সহানুভূতি। রাধা পারেনি বাপুর আকর্ষণ অস্বীকার করতে, পারেনি নিজেকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। বাপু, তার মা, মাসী, আম্রা খোত এবং গারম্বী গ্রামের সকলের মতের বিরুদ্ধে রাধার সঙ্গেই থাকতে লাগল।

রাধার প্রেরণায় ব্যবসায়ে বাপুর অদ্ভুত রকমের পসার আরও বেড়ে গেল। আশপাশের প্রত্যেকটি গ্রামে তার নামডাক। এখন সে অঢেল টাকার মালিক। শুধু নিজের গ্রামেরই নয়, আরও দশ-বিশটা গ্রামের মানুষ তাকে এখন একডাকে চেনে। সমাজসেবা-মূলক কাজেও বাপু টাকা ঢালল। নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করল, রাস্তা-ঘাটের সংস্কার করল, কয়েকটা পাত-কুয়ো তৈরী করল। যে কাদের সাঁকো ভেঙে যাওয়ার ফলে তার বাবার জীবন দিতে হয়েছিল সেটা পাকা করল। এবং সবশেষে নিজের থাকার জন্য গারম্বী গ্রামের সীমায় এক বিরাট মনোরম বাড়ি করল।

কিন্তু বাপুর যত নামডাকই হোক না কেন, গারম্বীর ব্রাহ্মণ-সমাজ বাপুকে গ্রহণ করেনি। দিনকর অবশ্য মাঝে-মাঝে গোপনে এসে বাপুর সঙ্গে দেখা করে। বাপু আজও দিনকরের সঙ্গে সেই বন্ধুত্বমূলক ব্যবহার করে, কিন্তু দিনকরের ভীরুতা বাপুর অসহ্য লাগত। মাসীকে সে ভোলেনি। বিভিন্ন সময়ে তাকে আর্থিক সাহায্য করে। এক-দিন মাসীকে বলল, মা আমাকে দুই চোখে দেখতে পারে না। আমি তাঁর দুচোখের বিষ, কিন্তু তবুও মায়ের ওপর আমার একটা কর্তব্য আছে। এই টাকা ক'টা মাকে দিয়ে দাও—এমনভাবে দাও যেন সে টের না পায় আমি দিয়েছি। বাপুর মার কঠিন রোগ হয়েছে। আমার বাড়িতে এখন তার স্থান নেই। গ্রামের মানুষও তাকে এখন পোছে না।

বাপুর গৃহপ্রবেশের দিন ঘটা করে পুজো হল। বহু ব্যবসায়ী এবং বড়-লোক তার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল। পুজো করতে গারম্বীর ব্রাহ্মণ রাজী হয়নি, কিন্তু বাইরের ব্রাহ্মণরা এসে পুজো করে প্রচুর টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের ব্রাহ্মণদের গা জ্বলে গেল। পরের দিন সন্ধ্যার সময় গোপনে দিনকর, বাপুর সঙ্গে দেখা করে বলল, বাপু, কাল তোমার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের খবর দূর থেকে নিচ্ছিলাম। আমি যে কত খুশী হয়েছি তা তোমাকে কি করে বলবো। আর থাকতে না পেরে শেষে ব্যাঘ্রেশ্বরের কাছে ডালি দিয়ে প্রার্থনা করেছি তুমি যাতে সুখী হও, তোমার ব্যবসায় যাতে পসার হয়। সরল-স্বভাব বাপু দিনকরের এই ভীরুতায় হোহো করে হেসে ওঠে।

।। ছয় ।।

বাপুর টাকা বাড়ি গাড়ি, সবই হয়েছে, কিন্তু একটি ইচ্ছা এখনও অপূর্ণ রয়ে গেল। তা হোল গারম্বীর মোড়ল হওয়া। তার জন্য এখন আর তার বেশি চেষ্টা করার প্রয়োজন ছিল না। একমাত্র ব্রাহ্মণরা বাদে গাঁয়ের আর সবাই বাপুর পক্ষে।

মাসী মৃত্যুশয্যায়। বাপুকে ডেকে পাঠাল। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে মাসী বলল, বাবা এ-যাত্রায় আমি আর বাঁচব না। তবে মরার আগে তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। তুমি রাধাকে বউ হিসেবে গ্রহণ করো। এতে তোমার মঙ্গল হবে। যা শুনেছি, তাতে এটুকু বুঝেছি যে রাধার মত মেয়েকে বউ হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের বিষয়, গর্বের বিষয়। আর একটি কথা। আমাকে যতখানি তুমি শ্রদ্ধা কর তোমার মাকেও ততখানিই শ্রদ্ধা করবে। ছোট-বেলা থেকে ও ওইরকম খিটখিটে। এই দেখ না কথায়-কথায় কি একটা বলেছি বলে রাগ করে চলে গেছে। আর একটা কথা বলার ছিল। গারম্বীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঝগড়া করে মোড়ল হওয়ার চেষ্টা কর না। ওরা করতে পারে না এমন কাজ নেই। তুমি আজ অনেক বড় হয়েছ। গারম্বীর লোক মনে মনে তোমাকে ঈর্ষা করে। কোন দিন যদি ওরা স্বেচ্ছায় তোমাকে মোড়ল করতে চায় সেদিন তুমি হবে।

বাপু বলল, আমি কথা দিচ্ছি মাসী, তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

বাপু উদ্যোগ না নিলেও ব্রাহ্মণ বাদে গারম্বী গ্রামের আর সবাই উঠে-পড়ে লাগল বাপুকে মোড়ল করার জন্য। ফলে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একদিন অন্যান্যদের ভীষণ মারামারি হল। এই মারামারির সময় বাপু ছিল না, ব্যবসার কাজে অন্য কোথাও গিয়েছিল। ফিরে এসে সব ঘটনা শুনে উদ্যোক্তাদের দৃঢ়-কণ্ঠে বলল, ভাইসব, এভাবে আমি মোড়ল হতে চাই না। মার খাওয়ার ভয়ে হয়তো আজ ব্রাহ্মণরা আমাকে মোড়ল করবে, কিন্তু ওদের মন আমাকে কিছুতেই পঞ্চ-প্রধান হিসেবে গ্রহণ করবে না। ওরা নিজেরা যেদিন স্বেচ্ছায় আমাকে পঞ্চ-প্রধান হিসেবে

গ্রহণ করবে সেদিনই বুঝবো তোমাদের চেষ্টা সফল হয়েছে। মারামারি আর ঝগড়াঝাটি করে আমি এই পদ আর নিতে চাই না।

বাপুর এই ধরনের ভূমিকার ফলে তার বিরোধীদের মনে একটা ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। আন্নার দলের লোক আদাজল খেয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে প্রচার করতে লাগল বাপু ধর্মচ্যুত। ওকে গাঁয়ের মাথা হিসেবে কিছুতেই মানা হবে না। বাপুকে যারা পঞ্চ-প্রধান করতে চায় তাদের মধ্যে গরুজাতের লোকই বেশি। আন্নার দলের লোক ওদের কাছে গিয়ে বলল, অব্রাহ্মণদেরই যদি পঞ্চ-প্রধান করতে হয় তাহলে তোমাদের মধ্যেই কেউ হও না কেন। আর একেবারে যারা অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাদের কাছে বলল, ব্যাম্বেশ্বরের

আদেশ গারুচর্চা গ্রামের পঞ্চ-প্রধান একমাত্র ব্রাহ্মণই হতে পারে।
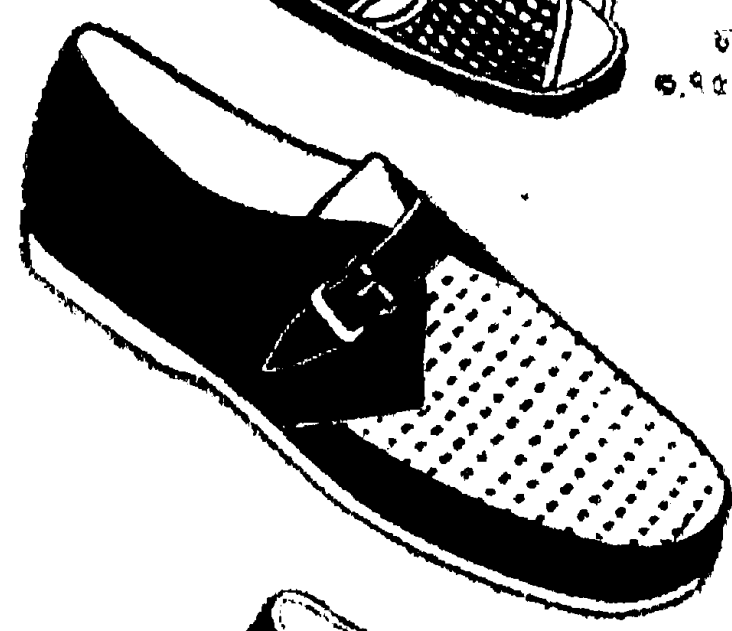
কিন্তু বাপুর এই নৈতিক বিজয়ের ফলে স্বয়ং আম্মা খোতকেও তা স্বীকার করতে হল। সেদিন গ্রামবাসীরা সীমাহীন আশ্চর্যবোধ করল যেদিন দেখল আম্মা খোত স্বয়ং সানন্দে বাপুকেই পঞ্চ-প্রধান হওয়ার স্বপক্ষে মত দিল।

এদিকে বাপুর মা তার বোনের সংগে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল অন্য এক ছেলের কাছে। কিন্তু সে-বাড়িতে বেশিদিন টিকতে পারল না। ঘুরে-ফিরে আবার এল সেই ওয়ানাদ সেতুর কাছে। আজ সে খোলা চোখে, পায়ে-হাঁটা পথে দেখছে গ্রাম। গ্রামের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন রাস্তা হয়েছে। যেখানে-সেখানে পাতকুয়ো। অনেকগুলো স্কুল। ছেলেবুড়ো সকলের মুখে বাপুর নাম। এসব দেখেশুনে পা গুটিয়ে মাথা গুঁজে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল সে। কোন মুখে এখন সে বাপুর কাছে যাবে। কিন্তু আর কোথাও তো যাওয়ার উপায় নেই। বসে থাকতেও ভাল লাগছে না। পা টানতে-টানতে ব্যাঘ্রেশ্বরের মন্দিরের কাছে পৌঁছল। সেখানে দেখে, দিনকরের বাবা দান্ত ভট্ট পুজো করতে এসেছে।

—এশী নাকি? আরে তোমাকে তো চেনাই যায় না। কি হাল হয়েছে তোমার!

—ভট্ট মশায়, এ বয়সে কি কেউ আমাকে আর পোঁছে। যাক, তোমার কাছে একটা আশ্রয় চাই—একটু মাথা গুঁজে থাকার।

—যা দিনকাল পড়েছে, নিজেরই হয় না আবার শংকরাকে ডাকে। দেখ এশী, খুব জোর তোমার শোয়ার জায়গা দিতে পারি।

—শোয়ার জায়গা দিয়ে এখন আর কি পাবে?

—আ — আস্তে কথা বল, কেউ শুনলে কি মনে করবে!

—না! আজ আমি চিৎকার করব, গলা ফাটিয়ে চেঁচাব। আজ আমার কোন কিছুর ভয় নেই। সবাইকে জানিয়ে দেবো।

—এশী, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি এখান থেকে চলে যাও। তুমি দেখছি আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

ভট্ট মশায় ভীষণ ঘাবড়ে গেল! তাড়াহুড়ো করে পুজো সেরে হন্-হন্ করে চলে গেল। এশী সেখানেই পা-ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে ছিল। কিছুক্ষণ পরে এল দিনকর। বলল, আরে বাপুর মা যে! কী ব্যাপার, এখানে! এভাবে?

—কি করি বাবা—কোন্ মুখে বাপুর কাছে যাই।

—একবার গিয়েই দেখ না মা, রাধা-বৌদি তোমাকে নিশ্চয়ই ঘরে ডেকে নেবে। কত সেবাযত্ন করবে।

—না দিনকর, আমি আর এখানে থাকব না, অন্য কোথাও চলে যাব। এ গ্রামে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ব্যাভিচার আর অনাচার। ......না কিছুতেই না, বাপুর ঐ পবিত্র বাড়িতে আমি কিছুতেই যাব না।

—ব্যাভিচার আর অনাচার!

—হ্যাঁ বাবা, লজ্জার মাথা খেয়ে আমি তোমার কাছে সব বলব। শোন : তখন আমার কৈশোর পেরোয়নি। কিন্তু ঐ পাপী আম্মা খোতের দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। ওর ঐ চোখ দেখলেই গেলে দিতে ইচ্ছে করে। শুধু আমার উপরেই নয়, গাঁয়ের অনেক মেয়ের ওপরেই তার চোখ পড়েছে। জন্মেই বাবাকে খুইয়েছি। কাকার কাছে মানুষ। কাকা অন্ধ। মা শয্যাশায়ী। আমার বড় দুটো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ঐ আম্মা খোত সুযোগ বুঝে নানা রকমের লোভ দেখিয়ে আমাকে খারাপ করে দিল। আমি গর্ভবতী হলাম। আম্মার ভয়ে আমার অন্ধ কাকা মুখ খুলল না। ক্ষোভে দুঃখে মা মরে গেল। ফলে পাছে আমি হাঁড়ি ভেঙ্গে দিই সেই ভয়ে আম্মা খোত নিজেই কোত্থেকে একটা পাত্র খুঁজে এনে আমার সংগে বিয়ে দিলেন। উনি যে কতখানি ভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন তাতো তোমার অজানা নয়। তোমার কাছে কি বলবো বাবা, পতন যখন একবার শুরু হয় তাকে আর ঠেকানো যায় না। একটা কথা তোমাকে বলে রাখি দিনকর, এ-গাঁয়ে তোমার বাবার বয়সী এমন একজনও সচ্চরিত্র ব্যক্তি নেই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চরিত্রের প্রশংসা করতে পারে। এমন কি তোমার বাবাও পারবে না। ......কিন্তু আমার সে জৌলুস এখন আর নেই। মোমের মত সব গলে গেছে। এখন আমি দুধে পড়া মাছির মত ফেলে দেওয়ার জিনিস। আমি এখন আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা।........

দিনকর কানে আঙুল দিয়ে আর্ত-নাদ করে উঠল, মা, আর নয়। চুপ করো মা। এ-কাহিনী আর কাউকে বলো না। এতে বাপুর সম্মান নষ্ট হবে। যতই হোক এখন সে গাঁয়ের মাথা—পঞ্চ-প্রধান। গাঁয়ের মানুষ তার কথায় ওঠে-বসে।

মুহূর্তে এশীর ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দিনকর, সত্যি কি বাপু আমার এ-গাঁয়ের মাথা? ঐ হতচ্ছাড়া আম্মা কি মরে গেছে? ও বেঁচে থাকতে আমার বাপু কি করে মোড়ল হল!

—বাপুর কাছে শেষ পর্যন্ত আম্মাকে হার মানতে হয়েছে, মা আম্মা নিজেই বাপুকে পঞ্চ-প্রধান করার মত দিয়েছে।

—যাক, এতদিনে ঐ পাপী নিজের ছেলের ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে।......

দিনকর বাপুর মায়ের হাত ধরে আবার অনুরোধ করল, চলো মা, ওঠ, চলো বাপুর বাড়িতে যাই।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব বাবা। ...আজ আমি ওর হাত ধরে ক্ষমা চাইব। ......দিনকর, সে কি আমাকে ক্ষমা করবো না? মাকে কি ছেলেরা ক্ষমা করতে পারে?

এশীর কোঠরস্থ ঘোলাটে চোখের কোণ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছে। দিন-কর তার হাত ধরে বাপুর বাড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

অনুবাদ : ঘোষ্মানা বিশ্বনাথম্

লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রভাষ্য

সুধীর করণ
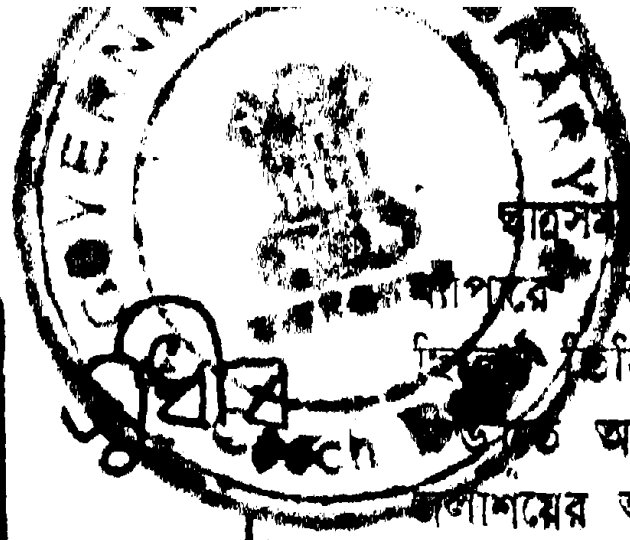
বাঙলাদেশের লোকসাহিত্য মূলতঃ সংগীত, কিন্তু এর বৃহৎ পরিসরের মধ্যে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, রূপকথা-উপকথার স্থানও উপেক্ষণীয় নয়। লোকসাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবেই মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটা হচ্ছে, লোকসাহিত্যের আঞ্চলিকতা।

পশ্চিম সীমান্ত-বাঙলার টুসু, ভাদু ও বহুবিধ ঝুমুর-সংগীতের মধ্যে যে আদিম অকৃত্রিমতার পরিচয়, তা' সমতল বাঙলার লোকসংগীতের মধ্যে অবলুপ্ত। বাঙলাদেশের পরিবেশ প্রতিবেশ এমনকি জীবনধারণের রীতি-নীতি সর্বত্র এক নয়, তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নদী-বিধৃত সমতল পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের সঙ্গে অরণ্যপাহাড়-অধ্যুষিত মানভূমের লোকসংগীতের পার্থক্য অনেক। ভাবে-ভাষায়-সুরে একটি স্পষ্ট বিশিষ্টতা উভয় অঞ্চলের লোকসংগীতকে পরিস্ফুট করেছে।

বলা বাহুল্য পশ্চিম সীমান্ত-বাঙলার এই লোকসংগীতের সঙ্গে নানাকারণেই রবীন্দ্রনাথের কোন পরিচয় ছিল না। এই অঞ্চলের লোকসংগীতের প্রায়-সাহিত্যগুণহীনতা এবং সুরের অবৈচিত্র্য গবেষকের উৎসাহ সৃষ্টি করলে-ও লোকসংগীত-রসিকের কাছে ততো বেশী গ্রাহ্য হবে না। শুধু বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভাবিত ঝুমুর ছাড়া অন্য সব কিছুর মধ্যে নিখুঁত লোক-চারিত্র বর্তমান বলে তা'র সংগীত-মূল্যও অল্প।

বাঙলাদেশের লোকসাহিত্য এবং এবং লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথই প্রথম, লোকসাহিত্য সংগ্রহের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইভাবেই তিনি গ্রামের মানস-সম্পদ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও এ বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষের অস্তিত্ব অনজ্ঞাত নয়, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার মূলে গ্রামের প্রতি ভালোবাসার কোন অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। রেভারেণ্ড উইলিয়াম মার্টিন আঠারো শো বত্রিশ খৃষ্টাব্দে একটি প্রবাদ-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তা'তে কিছু কিছু ছড়াও ছিল। পরবর্তীকালে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-ও পল্লীবাঙলার রূপকথা-উপকথা সংগ্রহের কাজে ব্রতী ছিলেন।

আঠারো শো পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'ছেলে-ভুলানো ছড়া।' এর পূর্বে এতো বেশী ছড়া একত্রে আর কেউ প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এই ছড়াগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তা'তে তাঁর গ্রাম-প্রীতি, রসবোধ এবং শিশুমন একত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। সহৃদয় হৃদয়ের সংবাদে তিনি ছড়াগুলিকে পরিস্ফুট করেছেন। কোনরূপ বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে ছড়াগুলির কাব্যসত্তাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। তা'র কারণ তিনি নিরাসক্ত গবেষক ছিলেন না। গ্রামের মানস-সম্পদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মধ্যে দেশপ্রেম নিহিত ছিল। ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে, বিদেশী শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য দেশ যে ক্রমশঃ শিক্ষিত মানুষের কাছে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে একথা তিনি বুঝেছিলেন। গ্রামকে অবহেলা ক'রে যে দেশসেবা হয় না, একথাও তিনি গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গ্রাম-বাঙলার সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষা, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ও জ্ঞান-লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথই এবিষয়ে প্রথম আমাদের সচেতন করেন। এমনকি সমগ্র ভারতের সমাজ ও ধর্মের যে লৌকিক অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করার আবেদনও তিনি জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ, লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব আমাদের উচ্চমার্গের মানস-বিকাশকে জানার পক্ষে বাধা-স্বরূপ হতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল।

ছাত্রসমাজকেই বিশেষভাবে এ ব্যাপারে আগ্রহশীল করতে চেয়েছিলেন তিনি। নিছক পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে মন যে বদ্ধ জলাশয়ের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, একথা তিনি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতেন, তাই জ্ঞানের পরিধিকে স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপকতার মধ্যেই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। পুঁথিকে মনের রাজা না করে মনকে পুঁথির রাজা করতে চেয়েছিলেন। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' তিনি একথা অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছিলেন। সেই ভাষণেই বলেছিলেন :

> "সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত পার্বণগুলি বাঙলার এক অংশে যে-রূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থান ভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।"

বাঙলাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে যে বৈচিত্র্য, সে বৈচিত্র্যকে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। তার মানস-সম্পদের উপর তাঁর সহৃদয় দৃষ্টি ছিল, কিন্তু গ্রাম-দেশে ধর্মচর্চার নামে যে ভণ্ডামী, তাকে তিনি গ্রাম থেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছেন। কোন-কোন ক্ষেত্রে সেখানে যে রুচিহীনতা ও ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রা, তাকে তিনি ধিক্কৃত করেছেন এবং এ সমস্ত কিছুর মূলেই যে দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা এ বিশ্বাসে তিনি অবিচল ছিলেন।

লোকসাহিত্যের যে সহজ এবং

নির্মল আবেদন, তাকেই রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত করেছেন। লোকসাহিত্যের কতোটুকু ভালো, কতোটুকু মন্দ তা তিনি জানতেন। লোকমানসের সৃষ্ট সাহিত্য, যে-কোন সাহিত্যের মতোই ভালো-মন্দ-মাঝারীতে পূর্ণ। গ্রাম-প্রীতির অহংকারে এবং লোকহিতের অত্যুৎসাহে করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপে লোক-সাহিত্যকে জানা যায় না। কোন সজ্ঞান শিল্পীচেতনা অনুগ্রহ করে লোকসাহিত্য রচনা করতে পারে না, এই সহজ সত্য-টুকু রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্বেই আমাদের গোচরীভূত করেছিলেন। তেরোশো এগার বঙ্গাব্দে লিখিত লোকহিত প্রবন্ধের একাংশে তিনি বলেছেন :

"পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশী করিয়া ঝোঁকে।"

"সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতর অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব, তবে এমন জিনিষের আমদানী করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন, এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা, অর্থাৎ ইহাতে ভালো-মন্দ-মাঝারী সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহা ভালো—তাহা অপরূপ ভালো,—জগতের কোন রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব, দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোন ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না।"

কবিগানকে, রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেছেন। বলা বাহুল্য, বণিকসভ্যতাপুষ্ট নগরসঞ্জাত এই গান সত্যিকারের লোক-চরিত্র বর্জিত। কবিওয়ালাদের মুখে মুখে গান রচনা করার ক্ষমতা ছিল বটে কিন্তু আসলে এ সব জ্ঞান স্বল্প শিক্ষিত কাব্যরচয়িতাদের কাব্যরচনার নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। অলঙ্কারের সৌষ্ঠব নির্মাণের দিকে এদের ঝোঁক ছিল বেশী, স্বভাবজাত কবিত্বের অত্যল্প ছাপই এতে ছিল। কবিগানের মধ্যে লোকসংগীতের অকৃত্রিমতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি অলভ্য। রাজসভাপুষ্ট কবিগান শেষ পর্যন্ত রাজসভা থেকে নির্বাসিত হ'য়ে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় লাভ ক'রে লোক-সংগীতের গোষ্ঠীবন্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু তা' জনমানস থেকে উদ্ভবের কথা ঘোষণা করতে পারে নি। এই নষ্ট-পরমায়ু কবিগানের আলঙ্কারিক আতি-শয্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিগানের সাহিত্যিক ইতরতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

"অনুপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয়, তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ক'রে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ় লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়। যথা :—

"একে নবীন রস, তাতে সুসজ্জা,
কাব্যরসে সে রসিকে,—
মাধুর্য গাম্ভীর্য তাতে দাম্ভীর্য
নাই
তার আর বোঁ যেমন ধারা ব্যাপিকে
অধৈর্য হেরে তোরে সজনী
ধৈর্য ধরা নাহি যায়।
যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য,
করব সাধ্যমা
বলি তাই বলো যা আমায়।"

বলা বাহুল্য, এতে লোকসাহিত্য কেন কোন সাহিত্যেরই লক্ষণ নেই। হরুঠাকুর, ভোলা ময়রা বা এন্টুনী ফিরিঙ্গিদের যে সাধারণ 'উইটযুক্ত বুদ্ধি-দীপ্ত কবিসংগীত তা'ও যে সাধারণ লোকমানসের সৃষ্টি নয়, তা' সহজেই বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, এ-ও সত্য যে, লোকসাহিত্য কেন, কোন সাহিত্যকেই লক্ষণের গন্ডীর মধ্যে আবন্ধ রেখে তার ভৌগোলিক পরি-সীমার নির্দেশ করা যায় না, তবু বিশেষ বিশেষ রূপের সাহিত্যের সাধারণভাবে

নির্দিষ্ট একটি সীমাকে মেনে নিয়েই অগ্রসর হ'তে হয়। এভাবে বিচার ক'রে পল্লী-জাত কবিগানকে গ্রাম্যসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু 'লোক-সাহিত্য' শব্দটি অধুনা এমন একটি লোক-পরিমণ্ডলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে এর মূলে বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতেই হবে।

গ্রাম্যসাহিত্যের যে অকৃত্রিমতা তাই রবীন্দ্রনাথকে আনন্দ দান করেছিল। তার মধ্যে যে স্বভাবজাত সৃষ্টিকলা-কৌশল বর্জিত একটি সহজ ভাব—তাই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই "যোবতী ক্যান বা কর মন ভারী, পাবনা থেক্যে আন্যে দেব টাহা দামের মোটরী" —গানটিও তাঁর কানে মধুরে মনে হয়েছিল। পূর্বেই বলেছি যে লোকসংগীতের রাজ্যেও আঞ্চলিকতা বর্তমান এবং অঞ্চল ভেদে তার বৈশিষ্ট্যও অনস্বীকার্য। এই সব বিভিন্ন ধরণের লোকসংগীতের কোন কোন সহজ সুর রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। শুধু তাই নয় আমাদের ছাপ-মারা সাহিত্য যে মূলতঃ লোকসাহিত্যের ভিত্তিভূমি অবলম্বন করেই বর্ধিত হয়েছে, বিকশিত হয়েছে, এই সব অবহেলিত সাহিত্যই যে একটি আনন্দ রসের যোগান দিতে সমর্থ, তা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন:—

"গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে, সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।"

"গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষ রূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রদেশের নিম্ন স্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপে উচ্চ সাহিত্য ও নিম্ন সাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল ও ডালপালার সঙ্গে মাটীর নীচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"

রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যকে তাঁর স্নেহদৃষ্টিদানে অভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা-সাহিত্যের মধ্যে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার দিকটি অপুষ্ট। লোকসাহিত্য সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ আলোচনা তাঁর কাছ থেকে আমরা পাইনি, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাঙলাদেশের লোকসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আলোচনায় সূত্রপাত করেন।

বর্তমানকালের, লোকসাহিত্য আলোচনা পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য আলোচনার পদ্ধতি পৃথক। রবীন্দ্রনাথ নিছক শিল্পদৃষ্টিতে লোক-সাহিত্যের,—বিশেষ ক'রে ছড়ার, স্বরূপকে পরিস্ফুট করেছেন। কোনক্রমেই তিনি সামগ্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। লোকসাহিত্যের আলোচনাতে অধুনা জটিল পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সমালোচনার ক্ষেত্রে সমাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, ঐতিহাসিকতা এবং নৃতত্ত্ব প্রভৃতি অনিবার্যভাবেই লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অগ্রসর হয়। শুদ্ধ শিল্পবোধ বরং কিছুটা গৌণভাবেই তার সংকুচিত

উপস্থিতির ঘোষণা করে। লোক-সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য সমগ্রভাবে প্রকট নয় বলেই নিছক সাহিত্য হিসাবে এর বিচার অল্প। কিন্তু লোকসাহিত্যকে যদি সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়, তাহলে তার শিল্পমূল্য সম্পর্কেও আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ছড়াগুলি সাধারণতঃ প্রাচীন স্মৃতিবাহী হলেও, তার প্রাচীনত্বকে রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে আলোচনা করেছেন। তার ভেতর থেকে ইতিহাস খোঁজার অপপ্রয়াস করেন নি বা প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কোন বিস্ময়কর আবিষ্কারও করেন নি। ছেলে-ভুলানো ছড়া-র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিকেই প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু একথা আমরা কোন-ক্রমেই বলতে পারি না যে, ছড়াগুলির আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অন্যান্য দিক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। শিশু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি নিপুণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং ছড়া-গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। একটি স্বচ্ছ শৈশব সরলতায় তিনি ছড়ার রস উপলব্ধি করেছিলেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়, রসোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই তিনি ছড়ার স্বরূপ আবিষ্কার করেছিলেন ঃ

"সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে-একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।"

লোকসাহিত্যের মৌলিক স্বরূপ সম্পর্কে সহজ দৃষ্টি তাঁর ছিল। ছড়ার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ছড়াগুলিকে তিনি স্বতঃজ্ঞ, সজ্ঞান-অকৃত, সহজ, অকৃতবেশ, অসংস্কৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থহীন বলেই মনে করেছেন। লোক-সাহিত্যের মধ্যে উপরিউক্ত বিশেষণ-গুলির অধিকাংশই প্রযোজ্য।

ছেলেভুলানো ছড়ার অসামান্য চিত্রধর্ম রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দিয়ে এই চিত্রধর্মকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন আমাদের সামনে। রসিকের প্রতীতি যেন শিশুর সারল্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে ছড়ার রস উপলব্ধি করেছে। রসিকমনে ছড়ার আবেদন কেন অধিক, তা' প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ছড়ার চিরত্ব, ছড়ার ধ্বনিমাধুর্য, ছড়ার চিত্রধর্ম, তার অসংবদ্ধ প্রবহমানতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের বহুবিধ সমালোচনা প্রবৃত্তির অন্তঃস্থলে যে রসবোধের ক্ষমতা আছে, তা' এক্ষেত্রে একটি অকারণ আবেগে সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আসে।

শিশুমনের কাছে ছড়ার আবেদন ঘনিষ্ঠরূপে বর্তমান। তার কারণ শিশুমন ছড়ার অসংলগ্ন চিত্রের মাধ্যমে যথেচ্ছ কল্পনা-লোকে উপস্থিত হ'তে পারে। শুধু তাই নয়, ছড়া অতি তুচ্ছ কথাকেও সজীব করে উপস্থাপিত ক'রে তুলতে পারে। "প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাঙলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে ছড়ার গ্রাম্যতাও ধরা পড়েছে। আধুনিক রীতিতে ছড়া বিচারের ক্ষেত্রে, ছড়ার অপরিবর্তিত রূপটিকেই যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের আস্বাদ পেতে চেয়েছিলেন বলে, ছড়ার সব কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি। এমন কি একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার একটি গ্রাম্য শব্দ তাঁকে ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল। মূল শব্দটি উচ্চারণ করতেও তিনি সংকোচ বোধ করেছেন। কিন্তু এ সংকোচের কারণ শব্দটির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ নয়। রবীন্দ্রমানসের পরিশুদ্ধ শুভ্রতাই তাঁকে একটু সলজ্জ করেছে মাত্র। সেই শব্দটিকে বাদ দিলে ছড়াটির করুণ রস যে ক্ষুণ্ণ হয় তা' স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি শব্দটিকে সংস্কৃত করেই বলেছেনঃ

"তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে 'ভর্তৃখাদিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

"বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন
খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন
স্বামী খাকী বলে॥"

বলা বাহুল্য, এর ফলে ছড়াটির শুচিতা রক্ষা করা হয়েছে বটে, কিন্তু ছড়াটির মৌলিকত্বের অংগহানি হয়েছে, একথা রবীন্দ্রনাথই স্বীকার করেছেন।

এ কথা সত্যি, পশ্চিম সীমান্ত-বাঙলার লোকসাহিত্য ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব বেশী আদরণীয় হতো না। এর ভাষার মধ্যে যে অকৃত্রিম গ্রাম্যতা আছে, তা' লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবেশ-গ্রাহ্য হলেও রবীন্দ্র-নাথের মনে তা' হয়তো অন্যরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতো।
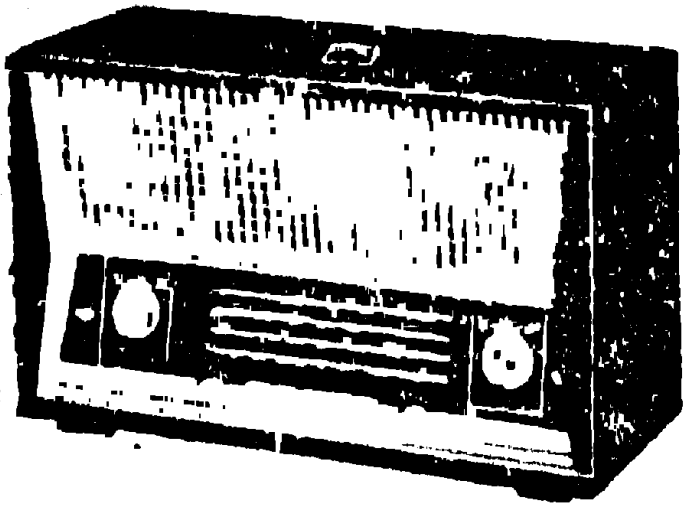
মানুষ হওয়ার গল্প

আরতি দাস

প্রেমের পথ আছে। অজস্র ভাটফুল আর নীলচে ধুতরো কলির মাঝখান দিয়ে সে পথটা এঁকেবেঁকে নদীর ধারে চলে গেছে। নদীর ঢালু পাড়ের সবুজ ঘাসে পাশাপাশি বসে আছি আমরা দুজন। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আগুন লেগেছে পলাশের বনে।

ধলচিতায় পাহাড় নেই। কিন্তু ওই বয়সে মনে মনে ভালবাসার পথের যে নকশা আমি এঁকেছিলুম তাতে ঐ সবই ছিল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পলাশের রংমশাল না জ্বললে ছবিটা পুরো আঁকা হয়েছে বলে মনে হত না আমার।

আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছে যেতুম আমরা দুজন। আমি আর আমার সংগী ছেলেটি। ঢালু পাড়ের সবুজ ঘাসে বসে থাকতুম পাশাপাশি। কোথাও কেউ নেই। গেরুয়া পাল তুলে দু একটা নৌকো ভেসে যেত। দাঁড়ের শব্দ, জল চিরে চলে যাওয়া নৌকোর ছলছল আওয়াজে চমক ভাঙত আমাদের। চেয়ে দেখতুম সন্ধ্যার আকাশ যেন রংয়ের নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছে। ছেলেটি চুপিচুপি আলতো হাত রাখল আমার হাতে আর আমি সর্বাংগে শিউরে উঠেছি।

এর পর আর ভাবতে পারতুম না। কল্পনার ছবিটায় হাত চাপা দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দম বন্ধ করে পড়ে থাকতুম কিছুক্ষণ। মুখ তুললে নজরে পড়ত দুপুরের গরম হাওয়ায় কেবলই সজনে পাতা ঝরে পড়ছে সামনের গাছটা থেকে। ঝরে পড়া পাতায় ছেয়ে গেছে উঠোনের এদিকটা।

বালবিধবা দিদির কাছে আমি মানুষ। তের বছর পেরোতেই তোতা-পাখীর মত ভাল ভাল কথা শেখাত দিদি। বলত, জানিস রমা, ভালবাসায় মনটাই সব। দেহটা কিছু নয়। যারা অত্যন্ত নীচ, ইতর স্বভাবের তারাই শুধু দৈহিক কামনা বাসনায় জ্বলে মরে। দিদিকে মায়ের মত ভালবাসতুম। ভক্তি করেছি দেবী প্রতিমার মত। তাই নদীর ঢালু পাড়ের যে ছবি আমি আঁকতুম তার কোথাও কোন মলিন ছাপ পড়তে দিইনি। সবটাই পলাশ ফুলের রংয়ে রাঙা। একটু হাতের স্পর্শেই ঘাসফুল আর নদীর জল ভয়ে শিউরে উঠত। এমনি ছবি এঁকে এঁকেই আমি তের থেকে উনিশে পৌঁছে গেলুম।

(২)

এক শিবচতুর্দশীর ভোর বেলা সাপের কামড়ে দিদি মারা গেল। উনুনের ছাই-এর মধ্যে যে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে কে জানত! ভোরবেলা ছাই তুলতে গিয়ে বিষের আগুনে জ্বলে গেল দিদির শরীর। কতক্ষণই বা সময়। চীৎকার করে ওখানেই ঢলে পড়ে গেল দিদি। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠতেই দেখি সাপটা এঁকেবেঁকে চলে যেতে যেতে আড়চোখে চেয়ে দেখল আমাকে। সাপের সেই চাহনি দেখে কান্না ভুলে গেলুম আমি।

দিদির সংগেই স্নেহ ভালবাসায় চোখ চাওয়া শেষ হয়ে গেল আমার। এর পর থেকে শুধুই একজোড়া বিষাক্ত সাপের চোখ পিছু তাড়া করে ফিরতে লাগল আমাকে।

ফাল্গুনের এক কোকিল ডাকা দুপুরে আম বাগানের মধ্যে দিয়ে গরুর গাড়ীর ছইয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে ধলচিতা স্টেশনের দিকে চললুম আমি। আমার সংগে এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা খুড়ীমা। কলকাতায় ধাত্রীর কাজ করে দিন চালান তিনি।

স্টেশনে পৌঁছনর সংগে সংগেই বিশাল লৌহদানবটা তীব্র চীৎকারে মাঠ কাঁপিয়ে এসে পড়ল। আমাকে তুলে নিয়েই রেলের লাইন ধরে ছুটতে লাগল প্রাণপণ। তাকিয়ে দেখি দৈত্যের ভয়ে দুধারের গাছপালা উর্ধ্বশ্বাস ছুটে পালাচ্ছে। বেশীক্ষণ দেখতে পারিনি। কয়লার কুচি এসে বিঁধলো চোখে। সেই আমার প্রথম ট্রেনে চড়া।

কত স্টেশন এল, গেল, কিন্তু কোথাও থামল না দৈত্যটা। সন্ধ্যে গড়িয়ে যখন রাত হল তখন কি খেয়ালে আমাকে ছুঁড়ে দিল একরাশ আলোর মধ্যে। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নীচে শুধুই আলো। একসংগে এত আলো দেখে কেমন দিশেহারা লাগছিল আমার।

বৃদ্ধা খুড়ীমার পিছনে হেঁটে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌঁছলুম। আচ্ছন্ন কাক-

ভোরে ছুটন্ত ট্রামের জ্বলন্ত চোখ দেখে অস্ফুটে বলে ফেলেছিলুম, এ আমি কোথায় এলুম!

(৩)

এর নাম হ্যারিসন রোড। মুখের অজস্র রেখায় হাসি ফুটিয়ে বললেন খুড়ীমা। ও'র সেই হাসি দেখে মনে হল দৈত্যের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এ কোন ডাইনীর কবলে এসে পড়েছি।

দর কষাকষি নাকি আগেই হয়ে গেছে। খুড়ীমাই গরগর করে বলে গেলেন সব কথা। বললেন, পড়ে থাকবার জিনিস তো তুমি নও বাছা। সোনায় ঢেকে, রুপোর পাতে মুড়ে তুলে নিয়ে যাবে তোমায়। এমন রং, এমন চোখ ভুরু নাক। এমন সরু কোমর। দুহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে আমার কোমরের মাপ নিয়ে এক গাল হাসলেন খুড়ী। আর ঠিক তখনই কড়কড় কড়ানাড়ার আওয়াজ পেয়ে ছুটে গেলেন সদরে। বলতে বলতে গেলেন, ঐ বুঝি সুবল এসে গেল।

ধলচিতার নদীর ধারে এক শিকারী সাহেবকে দেখেছিলুম। খুড়ীমার সংগে যে লোকটি এল সে লোকটিও দেখতে অনেকটা তার মতই। পরনে সাহেবের পোশাক। তবে গায়ের রংটা তামাটে। আমাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। মনে হল কুঁচকে যাওয়া চামড়ার মধ্যে বসানো চোখ দুটোয় নুন ছিটোনো উনানের আভা জ্বলছে। খুড়ীর নির্দেশ মেনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। লোকটা অনেকক্ষণ ছিল। খুড়ীমার সংগে ওর এত কী কথা হল আমি জানি না।

ও লোকটা চলে যেতেই সব লজ্জা-সংকোচ কাটিয়ে আমি খুড়ীকে বলে ফেললুম, ওর সংগে বিয়ে দেবেন আমার? খুড়ী ঢোক গিলে, কেসে বললেন, না, ঠিক বিয়ে নয়।

বিয়ে নয় তবে কি?

বিয়ের মতই আর কি!

বিয়ে নয় অথচ বিয়ের মত এ আবার কি কথা? অকারণ ভয় করতে লাগল আমার। মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। তক্তাপোশে শুয়ে পড়ে মাথাটা দুহাতে চেপে ভাবতে লাগলুম, আমি এখন কি করি? কতক্ষণ চোখ বুজে পড়ে ছিলুম মনে নেই, এক সময় মনে হল ঘর বাড়ী তক্তাপোশ সব দুলতে শুরু করেছে। লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

খুড়ী কলঘর থেকে ছুটে এলেন, কোথায় ভূমিকম্প?

না, সত্যিই মাটি কাঁপেনি ত! বোধ হয় স্বপ্নই। ভাল করে তাকিয়ে দেখি আশপাশের বাড়ী থেকে অনেকেই আমার কান্ড দেখে হাসছে। তখনই বুঝলুম কলকাতা শহর। এখানে কেউ মনের কথা বোঝে না। শুধু বাইরে থেকে দেখে, আর হাসে।

খুড়ীমা আমায় অনেক করে বোঝালেন। অনেক সুখ হবে তোর। কি চমৎকার সাজানো ঘর দোর! দামী আসবাব, কত টাকা, কত সোনাদানা। একেবারে ভরাহাট।
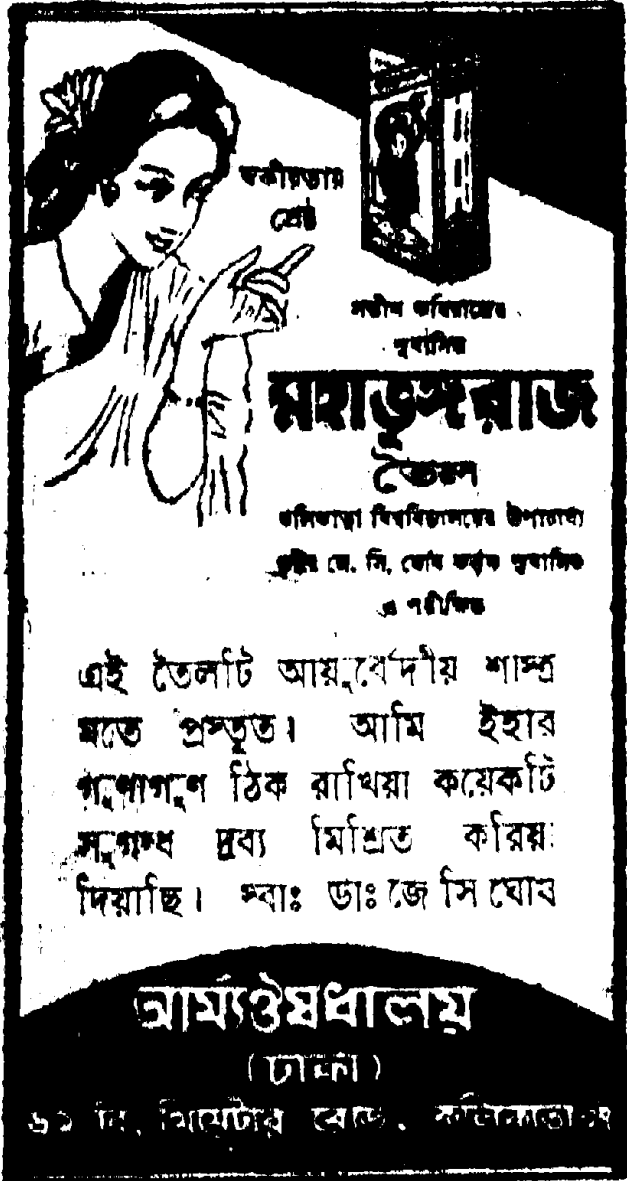
রাত্রে ভাল ঘুম হল না। শেষের দিকে স্বপ্ন দেখলুম, ধলচিতার হাটে আমায় বেচতে নিয়ে বসেছে এক বুড়ি। আমিই বটে। তবে আমার শরীর থেকে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে খুলে আলাদা করে নিয়েছে। নাক চোখ মুখ ভুরু চুল হাত পা সব পৃথক পৃথক চুবড়িতে সাজানো। আমার কোমরের দামই হয়েছে সব থেকে বেশী। বুড়িটা হেঁকে বলছে, সরু কোমর, দামী কোমর, এমন আর কোথাও পাবে না। নিয়ে যাও বাবু, সাড়ে তেইশ টাকা দাম।

ঘুম ভেঙে গেল। সকালের আলোয় নিজের শরীরের দিকে চেয়ে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে গেলুম আমি। হপ্তা-খানেক না যেতেই হ্যারিসন রোড থেকে পার্ক সার্কাসের তিনতলার চমৎকার সাজানো ফ্ল্যাটে চলে এলাম।

(৪)

প্রথম রাত্রেই আমার প্রথম প্রশ্ন করেছিলুম ভদ্রলোককে, আমায় বিয়ে করলেন না কেন?

উত্তরে ঠোঁটের ফাঁকে ধোঁয়া ছড়িয়ে সুবল সরকার বললো, আরে বাবা, সে সব অনেক ঝামেলা। তাছাড়া কে কিরকম মক্কেল জানা নেই তো! তোমারই হয়ত একদিন পাখনা গজাবে তখন ধুত্তোর বলে দেব হুট্ আউট্ করে। বিয়ে করা বউ-এর বেলায় তা পারব? আইন আছে, আদালত আছে,

ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবে না? কই এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

মখমলের কৌটো খুলে নেকলেশ বার করে এগিয়ে এল সুবল। মনে হল ফাঁস পরিয়ে দিল গলায়। দম বন্ধ হয়ে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে মরীয়ার মত বললুম, আপনি আমার সময় দিন।

সময়? কিসের সময়? হো হো করে হেসে উঠল সুবল। বলল, আমার বয়সের হিসেব রাখ? একচল্লিশ হল।

একচল্লিশ? আমার এই সবে সাড়ে উনিশ—হিসেব শেষ হবার আগেই টুক্ করে বাতিটা নিভিয়ে দিল সুবল। অসহিষ্ণু হাত বাড়াল, কই এসো।

দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল ভাঁটফুল আর ধুতরো কলির বনে। আলোজ্বলা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি আমি। আমার মনে হয় লাখো বাতি জেলে দেওয়া ঘরে কোনো মুমূর্ষু লোককে শুইয়ে দিলে তার কেমন লাগে! চতুর্দিকে আলো, অথচ তার দুচোখের সামনে ধীরে ধীরে একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে আসছে। অত আলোর মধ্যেও কেমন আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীটা নিকষ কালো আঁধারে ঢেকে যায় তার চোখে।

আমিও এই অজস্র আলোর মধ্যে অন্ধকার দেখি। ওই ল্যাম্প পোস্ট-গুলির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। ওদের অত তীব্র হয়ে জ্বলার কোনো মানে নেই। আমি তো বিন্দুমাত্রও উৎসাহ পাইনে। এর চেয়ে অমাবস্যার রাতের ধলচিতার নদীর পাড়ের শ্মশানও ভাল। সেই ছেঁড়া মাদুর বালিশ আর মড়ার খুলি ছড়ানো শ্মশানের পথে যে নিরাপত্তা আছে এই তিনতলার ফ্ল্যাটে তা নেই। সেখানে শ্মশানকালীর ভূত-প্রেতের দল হয়ত আমার প্রাণটাই নিয়ে নেবে, তাবলে আমার দেহ নিয়ে এমন টানাহেঁচড়া করবে না। অবশ্য শেয়াল শকুনে মানুষের দেহ টেনে ছিঁড়ে খায় কিন্তু সে তো মরে যাবার পর।

মনে মনে ভাবি সুবল সরকার যদি ধলচিতার শেয়াল শকুনও হত। আর ভাবি আমি যদি মেয়েমানুষ হয়ে না জন্মাতুম!

(৬)

দিনের পর দিন পার হয়ে আবার ফাল্গুন মাস ঘুরে এল। আমের বোল ফুটল না। কাঞ্চন গাছের ডাল সাদা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল না। জোড়া কোকিলের ডাক নেই কোথাও। তবু ক্যালেণ্ডারের পাতায় লাল অক্ষরে জ্বলজ্বল করছিল ফাল্গুন মাসের নামটা। ভূতে পাওয়া লোকের মত আমি চেয়ে থাকতুম ঐ নামটার দিকে।

হঠাৎ দরজার সামনে অদ্ভুত একটা-আওয়াজ শুনে চমকে তাকালুম। হামা দিয়ে এসে চৌকাঠের কাছে থমকে তাকিয়ে আছে বাচ্চাটি। কাদের ছেলে? কোত্থেকে এল এ? দোতলায় এক পার্শী-দম্পতি থাকে শুনেছি। মাঝে মাঝে শিশুর চীৎকার কান্নাও ভেসে আসে বটে কিন্তু আমার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই কেমন দূরে দূরে, অস্পষ্ট। আমি হতবাক, চেয়ে আছি বাচ্চাটির দিকে।

ও কি বুঝল জানিনে, হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আর ওর কান্নাটা ছুরির ফলা হয়ে বিঁধল আমার বুকে। আমি ছুটে এসে ওকে তুলে নিলুম কোলে।
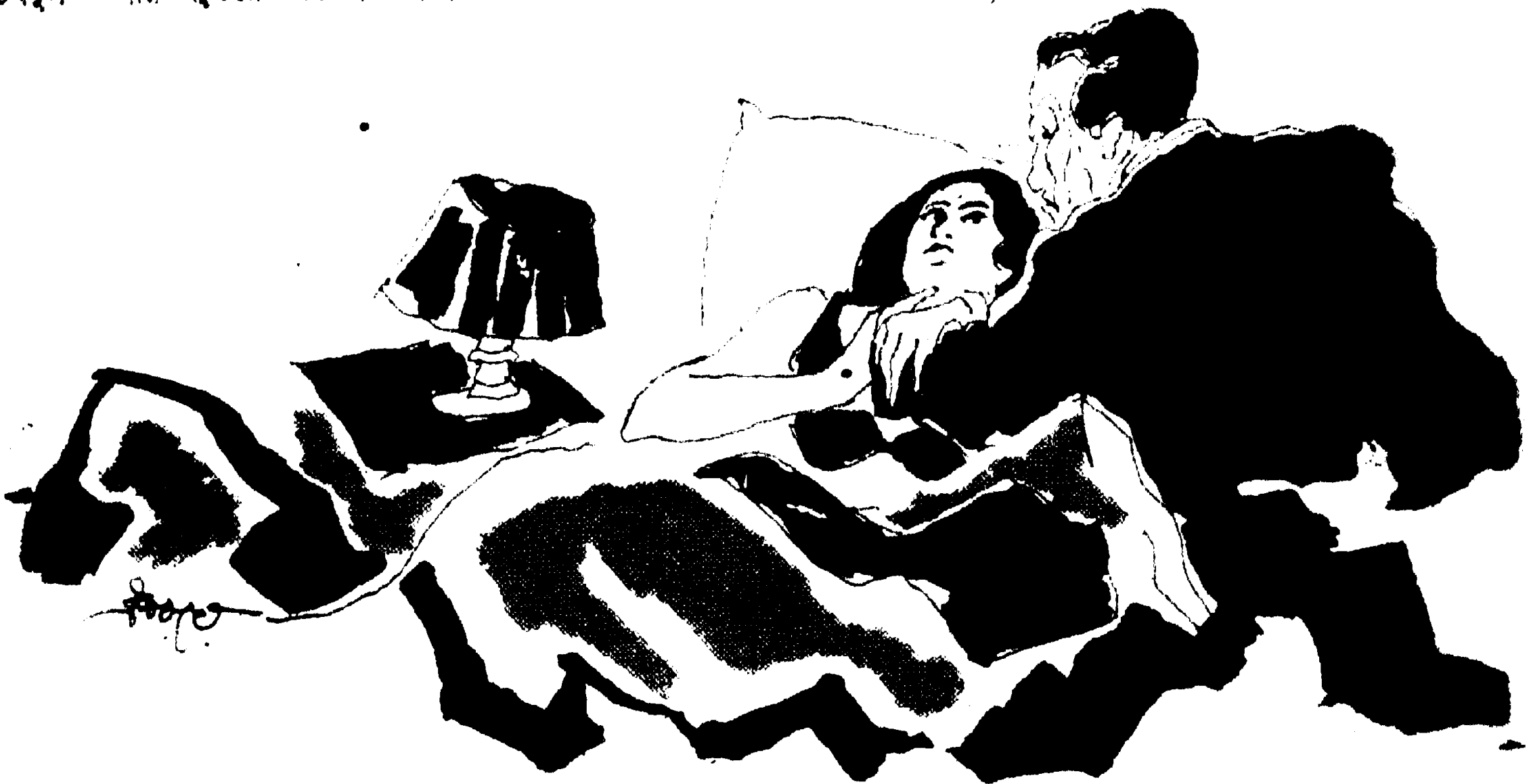
......টুক্ করে বাতিটা নিভিয়ে দিল সুবল। অসহিষ্ণু হাত বাড়াল, কই এসো।

অজস্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী সাপের মত জড়াতে লাগল আমাকে। সারারাত ধরে আগুনটা জ্বলেছিল। ভোরবেলা চেয়ে দেখি পায়ের কাছে পথ নেই। শুধু ছাই আর পোড়াকাঠের টুকরো এলো-মেলো ছড়ানো।

একটা কাক ডেকে উঠল কার্নিসে। এর পরে ধীরে ধীরে জেনেছি এখানে কোকিলের মাস নেই, বারোমাসই কাকের।

(৫)

কত আলো জ্বলে পার্ক সার্কাসে! রাত একটু বেশী হলেই মস্ত বড় পার্কটার দিকে চেয়ে আশ্চর্য লাগে আমার। শুধু আলো দিয়েই পার্কের চারপাশ ঘিরে দিয়েছে। রাস্তার দুপাশেও আলো। নির্জন রাতে অজস্র

ছেলের কান্না শুনে মা ছুটে এসেছিল নীচ থেকে। মা কোলে ছেলেকে ফিরিয়ে দিলুম ঠিকই কিন্তু আমার অসাড় দেহ মনে যেন সাড়া জাগল বহুদিন পর। মনে হল আমি যদি মা হই।

সুবল সরকারকে সেই মুহূর্তে আমার খুব খারাপ লাগল না। একদিন

হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে। একটি শিশুর মুখ দেখলে হয়ত মতিগতি বদলে যাবে লোকটার। ভয় ভয় আশা জাগল আমার মনে। আমি চোখ মেলে ভাল করে বাইরে তাকালুম।

একদিন যখন আমার মনের এই ইচ্ছেটার আভাস দিলুম কথায়, সুবল সরকার হেসে ঘর ফাটিয়ে দিল। কি বলছ? আমার হাতে তর্জনী ঠেকিয়ে বলতে লাগল, তোমার ছেলের বাপ হব আমি? অ্যাঁ! পাগল না কি? বলে, আমার বাপ মায়েরই ঠিক নেই তার আবার—। খু-ব একটা মজার কথা শুনেছে এমনি ভাবে দুলে দুলে হেসেই চলল সুবল।

যেন হাসতে হাসতেই একটা শুকনো অন্ধকার কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আমায়। যে দড়িটা ধরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছিলুম সেটাও কেড়ে নিল সুমুখ থেকে।

এই ক'দিন মনে মনে যে শিশুর ছবি এঁকেছি সে ভারি সুন্দর, ঠিক ওই পাশীদের বাচ্চাটির মত। ভেবেছি আমার ছেলে ঠিক অমনই হবে দেখতে। সুবল সরকারের মনের পাঁকে পদ্মফুল ফোটাবে সে। এমনি আবোল তাবোল কথা ভেবেছি আর চমৎকার রং ফলিয়েছি ছবিতে। হঠাৎ এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল সুবল তার ওপরে।

মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে উঠে গেল আলমারীর কাছে। দেরাজের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি বার করে দেখাল আমাকে। বলল, আমাকে তুমি একটা বুদ্ধু পেয়েছো নাকি? এই দেখ। প্রথম মাসেই এর দু ফোঁটা খাইয়ে দেব। বাস্, আর ঝামেলা নেই।

শিশিটা তুলে রাখতেই অফিসঘর থেকে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সুবল চলে গেল। তা যাক্। এতদিনে পুরো সম্বিত ফিরে এসেছে আমার। আর নয়। এই লোকটার হাত থেকে পালাতে হবে। বাঁচতে হবে। এতদিন ধন্দ পাগলের মতই দিন কেটেছে। আর নয়। আর কিছুতেই নয়।

(৭)

ধলচিতা মহামায়া বিদ্যাপীঠের শেষ ক্লাস অবধি পড়া ছিল আমার। আশ্বিনের এক হলুদগুঁড়ো ছড়ানো রোদের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম। হালকা পায়ে সুবলের অফিস-ঘরে ঢুকে পড়ে বললুম, আমি পড়তে চাই।

কান থেকে টেলিফোনটা নামিয়ে কোঁচকানো চামড়ার মধ্যে বসানো জ্বলজ্বলে চোখ দুটি দিয়ে খানিকক্ষণ আমাকে দেখল সুবল। তারপর বলল, আচ্ছা সে হবে।

পরক্ষণেই টেলিফোন মুখের কাছে তুলে নিয়ে প্রাণপণ চেঁচাতে লাগল, হংকং, হংকং, হ্যালো—।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আবার চেঁচানি শুনলুম, হ্যালো খিদিরপুর, হ্যালো।

হংকং-এর জাহাজঘাটা থেকে খিদিরপুর অবধি ছোটাছুটি করতে লাগল সুবল সরকার, আর আমি খাবার ঘরে চায়ের কাপে চামচে নেড়ে নেড়ে অকারণ ঠান্ডা করে ফেললুম চা-টা।

হপ্তাখানেকের মধ্যেই পড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল আমার। সকালে আসেন সুজাতাদি। ইংরিজী ছাড়া আর সব বিষয়ই পড়ান উনি। সন্ধ্যাবেলা ইংরিজী পড়ান মিস্ উড্‌বার্ণ।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা মিস্ উড্‌বার্ণকে দেখলেই আমার ধলচিতার শ্মশানকালীর কথা মনে পড়ে যায়। তেমনই কালো রং গায়ের আর তেমনই রক্তরাঙা ঠোঁট। হপ্তা দুই পড়িয়েই মিস্ উড্‌বার্ণ বললেন আমার উন্নতি খুব দ্রুতগতি।

ব্যাকরণের সন্ধিবিচ্ছেদ শেখাতে বসে সুজাতাদিও ঐ শব্দটিই ব্যবহার করলেন। বললেন উৎ + নতি, উন্নতি। আমিও বুঝলুম, উঁচুর দিকে নেমে যাওয়াই উন্নতি। হ্যাঁ একেবারে খুব দ্রুতগতি যে উঁচুর দিকে নেমে চলেছি এতে আর আমার কোন সন্দেহ নেই।

সুজাতাদি ভারি কড়া স্বভাবের মানুষ। পড়াশোনায় এতটুকু ফাঁকি দেওয়া সইতে পারেন না। সেদিন জোর বৃষ্টিতে রাস্তায় একহাঁটু জল দেখে ভাবলুম আজ আর এলেন না, দেখি জলে ডোবা রাস্তায় রিক্‌শা ভাসিয়ে এসে উপস্থিত। পাটিগণিত আর বীজগণিতের পাঠ চুকিয়ে রুশোর ওপরে একটা নিবন্ধ পড়তে শুরু করলেন। বললেন, তোমার এসব জানা দরকার।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। সুজাতাদি জোরগলায় শব্দ কয়টি প্রায় ঘোষণা করে তাৎপর্য বোঝাতে লাগলেন মহোৎসাহে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কথাগুলো আমার কানের পর্দায় ঠিকই আঘাত করছিল, কিন্তু খুব চতুর মেয়ের মতই আমি বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ রেখে অন্য কথা ভাবছিলুম। ভাল ভাষা শেখবার জন্য সুজাতাদি প্রায়ই আমাকে গল্প উপন্যাস পড়তে দেন। আজ সকালে ও'র দেওয়া দুর্গেশনন্দিনী পড়ছিলুম। দিন বসিয়া থাকে না। সকলেরই দিন যায়। দ্রুততাল সেতারের বাজনার মত ঐ কথা কয়টি আমার কানে কেবলই বেজে চলেছে। সকলেরই দিন যায়। তবু তিলোত্তমার দিন, আয়েষার দিন, জগৎ সিংহের দিনাতিপাতের ধারাটা

এক নয়। আমারও দিন কেটে যায় কিন্তু—।

মৈত্রী মানে কি? সুজাতাদি হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন আমাকে। মৈত্রী মানে—ঠিক তখনই অর্থটা বলতে পারলুম না।

চলন্তিকা দেখ। সুজাতাদি বোধহয় আমার অন্যমনস্কতা ধরে ফেলেছেন। মুখ নীচু করে চলন্তিকার পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলুম। মানেটা বলে দিয়ে উনি সাম্য মৈত্রীর ব্যাখ্যায় ডুবে গেলেন। আর আমিও এই সুযোগে আর এক প্রসঙ্গে চলে এলুম।

কথার কোন মানে হয়? পৃথিবীতে সব ভাষাতেই কতকগুলি শব্দ আছে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মন মেজাজ রুচিমাফিক তার অর্থ করে নেয়। কাজেই এই সব অভিধান লিখে সময় নষ্ট করে কি লাভ? সব কথার মানে সকলের কাছেই তো আর এক নয়।

রুশো পড়াতে পড়াতে সুজাতাদি তন্ময় হয়ে গেছেন এমন সময় একটা কাশির শব্দে তাকিয়ে দেখি সুবল সরকার পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে।

ওঃ দশটা বাজে। সুজাতাদি উঠে পড়লেন। আমারও মনে পড়ে গেল আজ শনিবার। শনিবারের দিনটা অন্যদিনের মত নয়। এ দিনটা তেজী ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ছুটে আসে আমার দিকে। আমি ভয়ে আতঙ্কে যতই এর থেকে পিছিয়ে সরে যেতে চাই ততই পশুটা যেন উল্লাসে উৎসাহে মেতে ওঠে। আজ সুবল সরকার স্ট্র্যান্ড রোডের অফিসে যাবে না। সকাল থেকে একখানা চটি বই নিয়ে ঘোড়ার ঠিকুজী কোষ্ঠী মুখস্ত করবে। খেয়ে দেয়ে ছুটবে রেসকোর্সে। তারপর হেরে গিয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফিরে আসবে। নয়তো ঘোড়া জিতে টগ্‌বগিয়ে ছুটে আসবে ঐ ঘোড়ার মতই। মৃত্যুর যন্ত্রণা আমার জানা নেই। তবে শনিবার এলে আমি মৃত্যুই কামনা করি।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। সুজাতাদি চলে যেতে, সুবল সরকার ঘরে ঢুকে রুশোর প্রচারিত মতবাদকে দাঁতে চিবিয়ে হাসল। আমাকে বাঁ হাতে কাছে টেনে নিয়ে বলল, দেখ, আমার এ বাড়ীতে এ সবই রয়েছে।

বুঝিয়ে বলুন। দুঃসহ বিরক্তি কোনমতে চেপে প্রশ্ন করলুম, আপনার এখানে সাম্য কোথায়?

সাম্য নয়? আমি তোমার জন্য সারাক্ষণ ছটফটিয়ে মরে যাচ্ছি আর তুমি আমার জন্য! আমি অফিসে বসে ভাবি কখন বাসায় ফিরব আর তুমি ভাব কখন ফিরে আসব।

বাঃ বেশ মিলছে ত! আমি উৎসাহে প্রায় কণ্ঠলগ্ন হয়ে বললুম, আর মৈত্রী?

মৈত্রী মানে ভালবাসা। তা হ্যারিসন রোডে তোমায় প্রথম দিন দেখেই তো বেহেড্ হয়ে গেছি।

দুটোই মিলেছে ঠিক। এবারে স্বাধীনতা? স্বাধীনতা কোথায় বলুন।

টাকা মানেই স্বাধীনতা। টাকা থাকলে যা খুশি তাই করতে পার। তোমার হ্যারিসন রোডের খুড়ীর ওখানে পুঁই ডাঁটা আর কুচো চিংড়ীর ওপরে উঠতে পারতে কি? আর এখানে? অখণ্ড অবাধ স্বাধীনতা। কলকাতা শহরের যে কোন বাজারের যে কোন দোকানে যা খুশি সওদা করতে পার তুমি। শুধু একবার মুখ ফুটে বলার অপেক্ষা। তুমি বললেই হুজুরে হাজির—বলে থিয়েটারি কায়দায় কার্পেটের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সুবল। ওর ঐ ভঙ্গী দেখে কেমন গা গুলিয়ে উঠল আমার। যাই স্নানটা সেরে নিই, বলে চট্ করে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। মহামতি রুশোর মতবাদটা তখনকার মত অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

(৮)
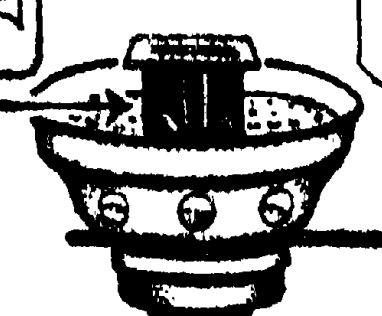
দুপুর বেলা। কেউ কোথাও নেই। ঝি চাকররা ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। অশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। এ বাড়ীর পেছনেই একটা বস্তি আছে। এই বৃষ্টিতে বস্তির লোকদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। আমি ওদের কথা ভাবছিলুম আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলুম। একটা ডাষ্টবিনের সামনে ক'টা কুকুর খেয়োখেয়ি করছে। পাঁচিলের ওপর ভিজছে একটা কাক। আর ছাতিম গাছটার তলায় জবুথবু হয়ে বসে আছে কটা বেড়াল।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। আজ ঐ কথা কয়টিই ঘুরে ফিরে আমার মনে আসবে। বেড়াল কুকুর কাকের মধ্যে কতটা সাম্য আর কি ধরনের মৈত্রী আছে আমার ভাল জানা নেই। কিন্তু ওরা স্বাধীন। কথাটা মনে হতেই আমার সমস্ত শরীর চমকে উঠল। হ্যাঁ ওরা সবাই স্বাধীন। সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কি যে হয়ে গেল আমি বলতে পারব না। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আলোড়ন তুলে যেন একটা ঝড় বইতে লাগল। চোখের সম্মুখে সব কেমন অস্পষ্ট, এলোমেলো। আমার মনে হল আমি একটা কাক হয়ে গেছি। খোলা আকাশের নীচে পাঁচিলের ওপরে বসে ভিজে যাচ্ছি। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ছে আমার ডানা থেকে।

নিজের দিকে চাইলুম ভাল করে। কাক কি? পরক্ষণেই দেখতে পেলুম একটা কুকুর হয়ে খেয়োখেয়ি করছি ডাষ্টবিনটার সামনে। ঝিম ধরে বসে রইলুম। আর বসে থাকতে থাকতেই টের পেলুম আমি ঐ ছাতিমতলার

নীচের জবুথবু ভেজা বেড়াল হয়ে গেছি।

আঃ কি আনন্দ। এতদিনে মানুষ হয়ে জন্মাবার সব কষ্ট আমি এড়াতে পেরেছি। আমি স্বাধীন। সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ছিপি খোলা বোতলের থেকে বেরিয়ে এসে রূপকথার সেই দৈত্য কত আনন্দ পেয়েছিল আমি তা আঁচ করতে পারছি। এ আনন্দের তুলনা নেই। দেহে, মনে এমন আশ্চর্য আরাম আর কখনো অনুভব করিনি আমি। যেন হালকা মেঘের ভেলায় ভেসে সারা বিকেল সন্ধ্যে কেটে গেল আমার।

রমলা, রমা, রিমঝিম্। ঘোড়া জিতে খুশিতে একসঙ্গে দুতিনটে সিঁড়ি টপকে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল সুবল সরকার। ডাকছিল, রমলা, রমা, রিমঝিম্। আমি স্পষ্ট দেখলুম দুহাতে একটা ভিজে বেড়ালকে জড়িয়ে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসল সুবল। একটা খেঁকি কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে কত আদর করল রাত দশটা অবধি। তারপর নেশার ঝোঁকে এক বোতল হুইস্কিই ঢেলে দিল কাকটার মাথায়। রাত যখন সাড়ে এগারটা তখন খাবারের থালা থেকে সন্দেশ তুলে জোর করে গুঁজে দিতে লাগল কাকের ঠোঁটের ফাঁকে।

সুবল সরকারের ধরাছোঁয়ার বাইরে, এ সবই দেখলুম আমি, আর মনে মনে হেসে সারা হয়ে যাচ্ছিলুম। এমন তামাশা জন্মে অবধি আর কখনো দেখিনি। কোথাও না। বেচারা সুবল। ও কি এক পলকের তরেও বুঝতে পারছে যে একটা কুকুর, একটা বেড়াল, একটা কাক নিয়ে মত্ত হয়ে আছে ও!

নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লুম এবারে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি কে জানে, খুট্ খুট্ আওয়াজ হল দোরের কাছে। স্বপ্ন দেখছি নাকি? না স্বপ্ন কেন হবে? ঐ তো ছোট্ট টাইমপিস্ চলছে টিক্‌টিক্ আওয়াজ তুলে। সবুজ শেডের নীচে গোল আলোর ঘের। পাশে সুবল সরকার নেশায়, ঘুমে, অচৈতন্য।

রাত বারোটা। টাইমপীসটার দিকে চেয়ে দেখলুম আবার। ঘড়ির দুটো কাঁটা একত্রিত হয়ে সময়ের দেবতাকে নমস্কার জানাচ্ছে। তাহলে স্বপ্ন নয়।

দরজার পরদাটা অল্প দুলে উঠেছে। ওখানে কে? আস্তে পরদা সরিয়ে ভেতরে এল মেয়েটি। আমার দিকে মুখ ফেরাতেই চমকে গেলাম আমি।

এ কি? এ তো আমি। নাক মুখ চোখ অবিকল আমার মত। এবারে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম ওকে। আমার মত হলেও ওর চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের কোণে কালি তো পড়েছেই, তাছাড়া কপালে অজস্র দুশ্চিন্তার রেখা। যেন সুবল সরকারের চেহারার ছাপ পড়তে শুরু করেছে ওর শরীরে।

আমার হাসি পেল। মানুষ হয়ে জন্মাবার এই শাস্তি। মানুষের প্রাপ্য দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করে এ দশা যে ঘটবেই আমি তা জানি। জানি বলেই কাক কুকুর বেড়ালের অনুভূতি জেগেছে আমার মনে আর এই দ্বিতীয় সত্তা আমাকে মানুষিক সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি দিয়েছে। বেঁচে গেছি আমি।

আহ্লাদী বেড়ালের মত লেজ ফুলিয়ে আমার দুঃখিত ছায়াশরীর বয়ে বেড়ানো মেয়েটিকে দেখতে লাগলুম। বললুম, কি ব্যাপার? তুমি কি মনে করে?

মেয়েটি একটি তেপায়ার ওপরে বসে পড়ে মুখ ঢাকলো, আমার কি হবে?

আমি ওর অবসন্ন ক্লান্ত মুখ দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। রুক্ষ তেতো গলায় বললুম, কেন, কি হতে চাও তুমি?

আমি মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই। মেয়েটি স্থির চোখ রাখল আমার মুখে। বলল, ভালবাসায় মানুষে মানুষ হয়। তা নইলে পশুর মত বাঁচতে হয় লোকে।

বুঝলুম আমায় ঠেস্ দিয়ে কথা বলছে ও। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বাঁকা হেসে জবাব দিলুম, ও, তাই বল! তাহলে ভালবাসার অভাবেই এমন ঝাঁঝরা হয়ে গেছ তুমি! পাঁজরার হাড় কখানাও বেশ গুনে দেখা যায়।

হাঁড়ির কালি পড়েছে দুচোখের কোণে। বড় ভালবাসার শরীর তোমার। আহা!

মেয়েটি খুব দমে গেল আমার ঠাট্টায়। তবু কোনমতে ঢোক গিলে বলল, আমি তোমার কথাই বলছিলুম। এই যে তুমি—মানে—এই যে কাক কুকুর বেড়াল সেজে আছ এ কি ভাল? ভাল লাগছে তোমার?

ভাল লাগা না লাগার প্রশ্ন নয়। এটা প্রয়োজনের কথা। তারপর খুব রেগে গিয়ে ওকে তেড়ে গেলুম এবারে। তুমিতো আজকাল রোজই রাতদুপুরে বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। সারারাত ঘুরে বেড়াও শহরের রাস্তায়। তা জুটলো কিছু? ভালবাসার ভিক্ষের ঝুলির কতটা ভরল? কত মুনাফা হল?

ও অবাক চোখে আমার কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। আমিও দেখছিলুম ওকে। আহা, কি হয়ে গেছে ওর শরীর। যেন শুধু একখানা কংকাল। মেয়েও নয়, মানুষও নয়।

বড় মায়া হল। গলাটা খাটো করে ভেজা বেড়ালের মত মিয়োনো সুরে বললুম, তুমি তো এই কবছর অনেক খুঁজে-পেতে দেখলে এমন কাউকে পেলে যে শুধু হাতে তোমায় ডেকে নেবে কাছে?

ও মাথা নাড়ল।

তাহলে? তবে? তাহলেই তো দেখতে পাচ্ছ লোকে ভালবাসে হয় রূপ নয় রূপো।

ও কি বুঝল জানি না। দরজার দিকে তাকাল। তারপর উঠে বেরিয়ে গেল।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে সুবল সরকার। আমি বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে সোজা চলে গেলুম ছাতে। কি করে দুপুর রাত পায়ে পায়ে শেষ প্রহরে পৌঁছয় তা সেদিন প্রথম দেখলুম। আমার মনে হচ্ছিল একটা ডানা-ভাঙা মস্ত কালো পাখি কষ্টে সাঁতরে দিনের আলোর কিনারার দিকে চলেছে। আর সেই রাতপাখিটা বার বার মুখ থুবড়ে ঠোক্কর খাচ্ছে শহরের ল্যাম্পপোস্ট-গুলোর গায়ে।

আকাশে তাকালুম। তারাগুলো ম্লান হয়ে এসেছে। অনেক চেনা তারা ডুবে গেছে।

সেদিন অন্যমনস্ক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কী ভেবেছিলুম আজ মনে নেই। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুচ্চমকের মত খেলে গিয়েছিল আমার মনে।

আমরা মানুষ হয়ে জন্মাই একথা ঠিকই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে পারি কি? প্রাণান্ত লড়াই করে করে আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় সত্তার জন্ম হয়। হয় আমরা নেমে আসি বেড়াল কুকুরের পর্যায়ে। নয়তো মানুষ হই।

আমি মানুষ হতে চাই।

।। দি টকিং প্লাউ ।।

বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যচর্চার টুকরো টুকরো খবর আমরা মাঝে মাঝে জানতে পারি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ভাষা না জানার অজ্ঞতা অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যের অসুবিধার জন্য সব বই হয়ত আমাদের হাতেও এসে পৌঁছায় না। অর্থাৎ একালের আমাদের জ্ঞানপিপাসার মধ্যে একটা অচরিতার্থতা বা অপূর্ণতার ভাব থেকে যাচ্ছে।

সম্প্রতি জার্মানীতে 'দি টকিং প্লাউ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট কবিদের লিখিত প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাস গ্রন্থে সন্নিবেশিত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কাশ্মীরের তরুণ কবি মাহিউদ্দিনের রচনায় পুস্তকটি সমৃদ্ধ। জার্মান পাঠকগোষ্ঠী ভারতীয় জীবন-ধারার বহুমুখী পরিচয় লাভ করবেন বর্তমান ভারতীয় দর্শন ও কাব্যসংক্রান্ত বিভিন্ন রচনাসমৃদ্ধ রসঘন এই গ্রন্থটি থেকে। বৈদেশিক সম্পর্ক-সংস্থার তরফে পশ্চিম জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরের ইস্ট এর্ডম্যান নামে প্রকাশনালয় 'দি টকিং প্লাউ'এর প্রকাশক। পুস্তকটি সংকলন করেছেন সাংবাদিক ডবলিউ এ ওয়েরলী। পুস্তকটির সমালোচনায় জার্মানীর একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র লিখেছে যে, ব্যক্তিগতভাবে রচনাগুলি বিরাট দেশের বিভিন্ন অংশের মত বিভিন্নমুখী হলেও আধ্যাত্মিক ও মননক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলিই এক।

।। একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ ।।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক সমাবেশ ঘটেছিল বেশ কিছুদিন আগে সম্প্রতি সে সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য হাতে এসেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

সমাবেশে সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবির রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্যময়তা উল্লেখ করে বলেন যে, শিশু-সাহিত্য থেকে শুরু করে কবি-গুরুর শিল্পভাবনা যে এক রোমান্টিক জগতের ক্রমপ্রসারণ ঘটিয়েছিল তার দ্বারা সামগ্রিক সৃষ্টির মধ্যে ক্লাসিকধর্মী এক বিরাটত্বের সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে ভারতীয় সভ্যতার দুই সুপ্রাচীন ধারার অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্য ও লোক-

সাহিত্য সমাচার

সাহিত্যের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু এই মহান প্রতিভা দীর্ঘকাল পাশ্চাত্য মানুষের কাছে অজ্ঞানা থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া কবিরের বক্তব্যে কবি সংগীতজ্ঞ, শিক্ষক, দার্শনিক, চিত্রকর এবং রাজনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বর্ণনানুলেপনে প্রতিনিয়ত যে নতুন নতুন ফসলে ভরে উঠেছে সভ্যতার আলোক, কবির সশ্রদ্ধ বিনয়ের সংগে তা উল্লেখ করেন।

বিদেশী অতিথিদের মধ্যে অলডাস হাক্সলের নাম করতে হয় সর্বপ্রথমে। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে রবীন্দ্রনাথের অবদানকে তিনি কবি-গুরুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলে মনে করেন। স্যার ইসয়া বার্লিন রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-বোধের উল্লেখ করে বলেন যে এই চেতনাপ্রভাবে গ্রেট বৃটেনের বহু ছাত্র প্রভাবিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক জীবনধারার এক জটিল অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ।

খ্যাতনামা মার্কিন কবি মিঃ লুইস আন্টারমেয়ার বলেন যে, আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সমাদৃত। হুইটম্যান, থোরো এবং এমার্সনের নামের সংগে সংগে আমেরিকাবাসী এই মহান মানবতাবাদী কবির নামও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে থাকে।

ফরাসী লেখক গুয়েনো ব্যক্তিগত যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রবীন্দ্রনাথ যে মানবমৈত্রীর জয়গান গেয়েছিলেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে হলে সমস্ত পৃথিবীতে সেই সমন্বয়ী চেতনার মধ্যে আত্মোৎসর্গ করতে হবে— এই তাঁর বিশ্বাস।

মিশরীয় অধ্যাপক কামাল হুসেন রবীন্দ্রনাথের সংগে মধ্যযুগের আরব কবিদের মিস্টিক চেতনার এক সাযুর্যের উল্লেখ করেন। ডঃ জাকি নাগুইব মহম্মদ (মিশর) বলেন যে কবির শিক্ষা-চিন্তা শান্তিনিকেতনে যে রূপলাভ করেছে তা সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

অধ্যাপক সুরোতগর (ইরান) রবীন্দ্রনাথের পারস্য-ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে আধুনিক পারসীক কবিতায় ও গদ্যে যে নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র-নাথ একদিন এ চেতনা সমগ্র ভারতীয় লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারিত করে-ছিলেন।

থাইল্যান্ডের প্রিন্স প্রেম পুরাচত্র, লেবাননের ডঃ ক্লভিস মাসুদ, জাপানী প্রতিনিধি টোমিকো কোরা এবং মাৎসুকা এবং সিংহলের মার্টিন য়ুইকরেমেসিনজি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গুণাবলীর ওপর মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করে তাঁদের দেশের সংগে রবীন্দ্রনাথের গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

প্রবীণ সোবিয়েৎ লেখক ভেসেভলভ ইভনভ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এতদিনে তাঁর ভারত-দর্শনের স্বপ্ন সার্থক হোল। অধ্যাপক চেলিশেভ সোবিয়েৎ দেশে রবীন্দ্রনাথের জন-প্রিয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন যে সোবিয়েৎ দেশের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-নাথের গ্রন্থগুলির অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বিহারের হিন্দী কবি আর ডি দিনাকর, কেরলের থাকেজীশংকর পিল্লাই, কাশ্মীরের অধ্যক্ষ কাউল, আসামের হেম বড়ুয়া, গুজরাটের উমা-শংকর যোশী, খ্যাতনামা ভারতীয় ইংরাজি ঔপন্যাসিক আর কে নারায়ণ ও ভবানী ভট্টাচার্য, মহারাষ্ট্রের কুসুমাবতী দেশপান্ডে এবং বলবন্ত গার্গী বিভিন্ন-ভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন।

পরিশেষে সম্মেলনের অন্যতম বক্তা মুলুকরাজ আনন্দের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

"...... We have to understand and imbibe the spirit of the renaissance of India over which he looms as a giant figure, giving fresh inspiration to the unprecedented flood of writing which is in India today."

মতামত

॥ যাত্রা-থিয়েটার প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

যাত্রা-থিয়েটার প্রসঙ্গে নান্দীকরের সমালোচক শ্রীশম্ভু চৌধুরীর (অমৃত—৩১শে আগষ্ট, '৬২ সন) মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও অন্ততঃ দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলানো আমার পক্ষে অসম্ভব। শ্রীচৌধুরী (এবং নান্দীকর স্বয়ং) যেন বর্তমান যুগের সমালোচনার অসম্পূর্ণ রীতিই অবলম্বন করেছেন; অর্থাৎ আসল জিনিসের বিচার থেকে দূরে সরে গিয়ে কতগুলি পুঁথিগত নামের দিকেই বেশী নজর দিয়েছেন এবং কোনও নামের স্বপক্ষে মন্তব্য করতে গিয়ে অন্য কোনও নামের বিরোধিতা করেছেন। যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমা যে একই জিনিস এমন কথা কেউ কখনও বলবেন না। কিন্তু তাঁরা সে সম্পর্কবিহীন তিন ধরনের আর্ট এমন কথা আজকাল যাঁরা বলে থাকেন তাঁরা যেন এই তিনের কোনও একের নামের মোহে মুগ্ধ হয়ে অন্য দুইয়ের দোষটুকু ধরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। এতে আর যাই হোক না কেন, আর্টের সৃষ্টিমূলক অবদানের যথাযোগ্য বিচার হয় না এবং সমালোচকদের নানাবিধ craziness-এর কাছে জবরদস্তি করে আর্টের বলি দেওয়া হয়।

যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমার মধ্যে পার্থক্য অনেক; কিন্তু আরও কারণ আছে। যাত্রা প্রথম যুগের মানুষের সৃষ্টি, থিয়েটার তারই উপর কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং সিনেমা নিঃসন্দেহে থিয়েটারের ভিত্তিতেই আশ্রিত। আজকে technique নিয়ে যে কথা উঠেছে তা' যেন এই সত্যটুকু বানের জলে ভাসিয়ে দিতে ব্যস্ত। ফলে আর্ট যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

থিয়েটারের উন্নতির ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা কখনও যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। ইংরিজি নাটকের কথাই ধরা যাক্ না কেন। অন্যান্য দেশের মতো ইংল্যান্ডের গির্জার মাঝখানে নাটকের জন্ম। তারপরে যুগ যুগ ধরে নাটকের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। কিন্তু প্রথম আমলের নাটকের সঙ্গে যাত্রার পার্থক্য কই? সেক্স্‌পীয়র-এর নাটকগুলির কথাই ধরি। তখন না ছিল আজকের রিভলভিং থিয়েটার স্টেজ না ছিল পর্দা না ছিল তাপস সেনের আলোকসজ্জা। নাটক হ'তো দুপুরবেলায়। রোমিও-জুলিয়েটের রাত্রির কাব্য, ম্যাকবেথের রাত্রির বিভীষিকা, হ্যাম্‌লেটের নৈশ অভিযান—সব দেখানো হ'তো ভর-দুপুরবেলায়। আজকের নাটকের technique-এর কোনটিই তখন ছিল না। তবে কি সেক্স্‌পীয়রের নাটক-গুলি নাটকের পর্যায়ে পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে। কারণ দেখিয়েছেন Coleridge, তিনি বলেছিলেন নাটকের ক্ষেত্রে "Suspension of disbelief"ই মূল কথা; অর্থাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাসের দুনিয়ায় মনের প্রবেশ ঘটানো চলবে না। তাই রিয়ালিজম্ বা ন্যাচারালিজম্-এর প্রশ্ন প্রথম থেকেই বাতিল করা সম্ভব, যদি দর্শকদের মনে কাব্যের কোনও স্থান থাকে। এ যুক্তি সেক্স্‌পীয়র-এর নাটকের স্বপক্ষে; একই কথা যাত্রার পক্ষেও বলা চলে। সেক্স্‌পীয়র-কে যদি আমরা নাট্যকার বলতে পারি ও হ্যামলেট বা কিং লীয়র-কে যদি নাটক হিসাবে নিতে পারি তো যাত্রাকে বর্তমান নাটক বা থিয়েটারের পূর্বসূরী বলতে পারবো না কেন? কিছুকাল আগে এলীজাবেথীয় ঢংয়ে পর্দাবিহীন মঞ্চে সেক্‌সপীয়র অভিনয়ের জন্য এক মুভমেণ্ট হয়ে গিয়েছে। একে আমরা কি বলবো? যাত্রার পক্ষে যুদ্ধ না থিয়েটারের ন্যাচারালিজমের পক্ষে?

যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমা সবই একই দলের আর্ট। যিনি এই তিনের এক-কে মনেপ্রাণে ভালবাসেন, তিনি অন্য দুইকে কখনও হেয় করতে পারেন না।"

বিনীত

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কলিকাতা-৩১।

ভবঘুরের খাতা
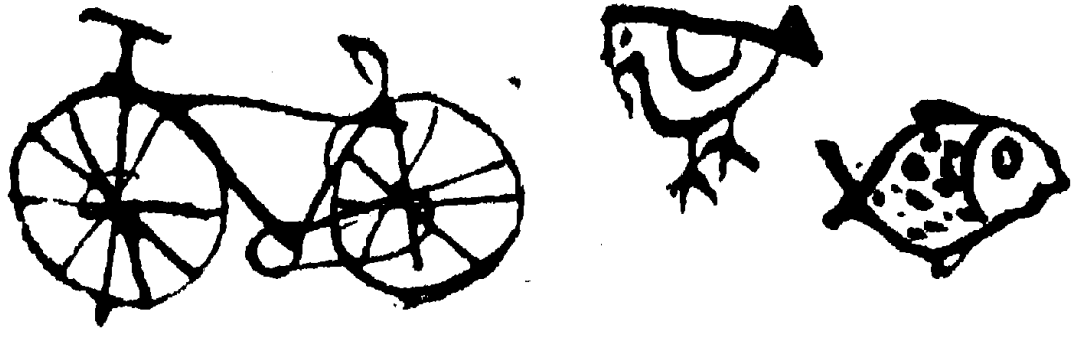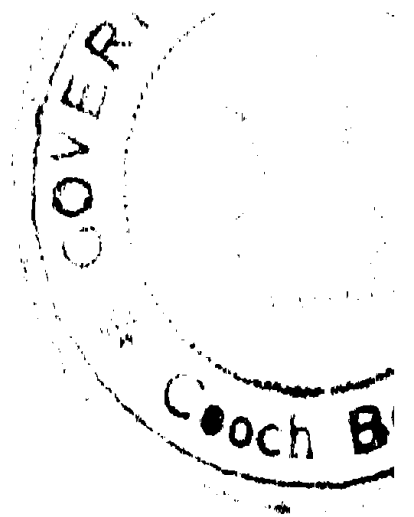
অয়স্কান্ত

॥ যক্ষ্মারোগী ও ফুটপাথ ॥

কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে একটি ছবি দেখেছিলাম। মোটামুটি সুবেশ একটি যুবক ফুটপাথে শুয়ে আছে। যুবকটির নাম নিমাই পাত্র। বিপিন গাঙ্গুলি স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে পূবদিকের ফুটপাথে একটি গাড়িবারান্দার নিচে সে আশ্রয় নিয়েছে। ছবির নিচে দু-কলম হেডিং-এ সংবাদঃ ঘরভাড়া বাকি পড়ায় বিতাড়িত যক্ষ্মারোগীর ফুটপাথে আশ্রয় গ্রহণ। সে নাকি শৌখিন বেতের আসবাব তৈরির কাজে নামকরা কারিগর ছিল; সার্পেন্টাইন লেনে সপরিবারে থাকত। বছরখানেক আগে সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। ফলে শেষপর্যন্ত তার এই পরিণতি। বৌ-ছেলে রয়েছে শ্বশুর-বাড়িতে। দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয় দিনান্তে দুটি ভাত দিয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও কোনো হাসপাতালে আশ্রয় পায়নি। আশ্রয়ের বোধহয় আর বিশেষ প্রয়োজনও নেই।

বত্রিশ বছর বয়সের নিমাইয়ের তবু ভাগ্য ভালো যে খবরের কাগজের সাংবাদিকদের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করতে পেরেছে। হয়তো এই ছবি ও সংবাদের কল্যাণে তার একটা হিল্লে হয়েও যেতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার আট লক্ষ যক্ষ্মারোগীর জন্যে বেড আছে মাত্র চার হাজার। বাকি সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার যক্ষ্মারোগীর সংবাদ আলাদা আলাদা ভাবে ছাপা হতে পারে—পশ্চিম-বাংলার সমস্ত পত্রিকাতেও এতখানি স্থান-সঙকুলান হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজারকে লোক-চক্ষুর আড়ালেই একটি একটি করে অব-ধারিত মৃত্যুর দিন গুণতে হচ্ছে।

আমি একটি পরিবারকে চিনি যে-পরিবারের চারজনের মধ্যে তিনজনকেই এই কালরোগের কবলে পড়তে হয়েছে। অথচ যদি আমাদের দেশে এই রোগের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার সামান্যতম ব্যবস্থাও থাকত তাহলে অন্তত দুটি তাজা প্রাণকে অনায়াসে বাঁচানো যেত। পরিবারটির সামান্য একটু পরিচয় দিই।

ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশ। লম্বা দোহারা চেহারা। গান খুব ভালোবাসেন এবং নিজেও একসময়ে পালাগান বেঁধে-ছেন। শখের থিয়েটারের দিকেও ঝোঁক আছে। পাকিস্তানে ভদ্রলোকের দরজির দোকান ছিল। নিজেই সেলাই করতেন; সেলাইয়ের কল ছিল নিজের। দুটি ছেলেমেয়ে—দাদা আর তার ছোট বোন। ছেলেটি একটু রোগা, একটু লম্বাটে, মুখেচোখে বুদ্ধির ছাপ। মেয়েটি গোল-গাল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বড়ো বড়ো চোখ, ফুলো ফুলো গাল—সব মিলিয়ে প্রায় ডল-পুতুলের মতো। আর এই ছেলেটির ও মেয়েটির যিনি মা তিনি নাকি বিয়ের পরেও মাঝে মাঝে মস্ত নদী সাঁতরে পার হয়েছেন।

তারপরে পাকিস্তান ছেড়ে আসবার সময়ে ভদ্রলোককে সেলাইয়ের কলটিকেও ছেড়ে আসতে হয়েছে। কলকাতায় এসে একটি জবরদখল কলোনীতে তিনি অনেক কষ্টে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও একটি সেলাইয়ের কল যোগাড় করতে পারেন নি। কয়েকটি বছর কি-ভাবে এই পরিবারটির দিন চলেছিল আমি জানি না।

আমি যখন থেকে এই পরিবারটির খবর রাখি তখন ভদ্রমহিলা একেবারেই শয্যাশায়ী। যক্ষ্মার জীবাণু তাঁর দুটি ফুসফুসকে নাকি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ভদ্র-মহিলার নিজস্ব একটি রিফিউজি সার্টিফিকেট থাকলে কোনো একটি সর-কারী হাসপাতালের বেড নাকি তাঁর কপালে জুটতে পারত। স্বামীর রিফ-উজি সার্টিফিকেটের জোরে স্ত্রীর রিফিউজি হিসেবে গণ্য হবার পথে কোনো বাধা আছে কিনা আমি জানি না। ভদ্রমহিলা কিন্তু রিফিউজির জীবনের দুঃখটুকুই ভোগ করলেন, অথচ সুবিধেটুকু পেলেন না।

যাই হোক, ভদ্রমহিলার কথা বলার জন্যে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। ভদ্র-মহিলার অবধারিত ভবিষ্যৎকে আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কাজেই তাঁর সম্পর্কে আমি অনেক আগেই মনকে শক্ত করেছি।

কিন্তু কিছুদিন আগে আমি খবর পেলাম যে ছেলেটি রক্তবমি করছে আর মেয়েটির ঘুষঘুষে জ্বর। ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ডল-পুতুলের মতো সেই মেয়েটির মুখখানিও। এক্ষেত্রেও, বলা বাহুল্য, হাসপাতালের বেড পাওয়া যায়নি। কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিকিৎসার বন্দোবস্ত সামান্য কিছু করা

গিয়েছে। কিন্তু আমি ভালো করেই জানি, যতো জনে মিলেই চেষ্টা করুন না কেন, শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ছেলেটির ও এই মেয়েটির ভবিষ্যৎকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

অথচ দোষ দেব, কাকে? রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে? ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু জীবনকে? মানুষের জীবন সম্পর্কে আমাদের অপরিসীম অবজ্ঞাকে?

কারণ, প্রশ্ন শুধু এই একটি পরিবারকে নিয়ে নয়। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কয়েকটি তথ্য ও সংখ্যা উদ্ধৃত করতে চাই।

খবরের কাগজে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে একমাস থেকে দশ-বছর বয়সের রোগীর সংখ্যা ছিল মোট রোগীর শতকরা দু-ভাগ। ১৯৬১ সালে এই বিশেষ বয়সের রোগীদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা পাঁচভাগ।

কলকাতার টি-বি ক্লিনিকগুলোতে ১৯৬১ সালে নতুন ও পুরাতন মিলে মোট সাড়ে-পাঁচ লক্ষেরও বেশি যক্ষ্মা-রোগী চিকিৎসার জন্যে এসেছিল। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কিছু বেশি।

এখানেই শেষ নয়। আরো শুনুনঃ

"১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল এই দশ বছরের এমন কি অসম্পূর্ণ হিসাবের ভিত্তিতেও দেখা যায় নতুন যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ষাট হাজার। আরো যা তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, মহিলা, বিশেষ-ভাবে বিবাহিতা প্রৌঢ়াদের মধ্যে এ-রোগ বেশি বিস্তারলাভ করছে। বয়সের বিচারে যক্ষ্মার দাপট সম্পর্কে জানা যায় যে, গত কয়েক বছর যাবৎ একেবারে তাজা এবং উঠতি জোয়ানরাই এ-রোগের কবলে বেশি পড়ছে। কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স এমন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশজন। ত্রিশ এবং চল্লিশের মধ্যবর্তী-দের সংখ্যা শতকরা কুড়িজন।"

শুধু কলকাতাতেই যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা চৌদ্দ হাজারেরও বেশি। চব্বিশ পরগণায় প্রায় দু-হাজার।

১৯৫৮ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিসিন রিসার্চ কর্তৃক গৃহীত সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, সারা ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ।

এই সঙ্গে সারা ভারতে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থার যে সরকারী হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তা এইঃ

হাসপাতাল, স্যানাটোরিয়াম ও ক্লিনিকের সংখ্যা

	১৯৫০ সালে	১৯৬০ সালে
স্যানাটোরিয়াম	৪১	৬৮
হাসপাতাল	৩৫	৭০
ক্লিনিক	১১০	২২৩
ওয়ার্ড	১১৪	১৫২
বেড	১০,৩৭১	২৬,৪৪৫

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে আরো সাড়ে-তিন হাজার বেড ও দুশোটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে ১৯৬৬ সালে। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতেও সাকুল্যে মোট ত্রিশ হাজার বেডের বন্দোবস্ত থাকবে। বাস্তবে না হোক, অন্তত কাগজে-কলমে।

তবে কোনো সরকারী বা বেসরকারী হিসেব থেকে জানার উপায় নেই যে পশ্চিমবাংলার আট লক্ষ যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা তখন কততে দাঁড়াবে। যে হারে খাদ্যে ভেজাল চলছে এবং যে হারে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে (সরকারী হিসেব থেকেই প্রমাণ করা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আরো বাড়বে) তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হারে যে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা বাড়বে—এই ভবিষ্যদ্বাণী যক্ষ্মারোগ-বিশেষজ্ঞ না হয়েও নিশ্চিন্তভাবে করা চলে।

অবশ্য, খাদ্যে ভেজাল না থাকলেও বা বেকারের সংখ্যা না বাড়লেও যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে পারে। যে-দেশে পঞ্চাশ লক্ষ রোগীর (১৯৫৮ সালের হিসেবে) জন্যে মাত্র ত্রিশ হাজার বেড (১৯৬৬ সালে হবার কথা), সেখানে প্রায় সবকটি রোগীকেই সুস্থ মানুষদের মধ্যেই জীবন কাটাতে হচ্ছে। স্বয়ং ধন্বন্তরীর দেশ হলেও এক্ষেত্রে রোগের বিস্তৃতিকে ঠেকানো যেত না।

যে-পরিবারটিকে উপলক্ষ করে এত-গুলো কথা বললাম তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা করি আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

• • •

মেয়েটি কিন্তু এখনো জানে না তার নিজের অসুখটা কী। জানলেও হয়তো বোঝে না। কিন্তু দাদার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। চোখদুটো সবসময়ে ছল-ছল। মুখখানা সবসময়ে ভার-ভার। অতটুকু মেয়েও বুঝতে পেরেছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়াটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। ভদ্র-লোক কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিরোগ আছেন। তবে একটি রোগাক্রান্ত পরিবারে একজন সামর্থ্যহীন মানুষের নিরোগ থাকাটাও যন্ত্রণা বিশেষ। গান-পাগল মানুষটির গলায় এখন আর কোনো সময়েই সামান্যতম সুরের আভাসও পাওয়া যায় না।

তবে এই পরিবারটিকে এখনো পর্যন্ত ফুটপাথে আশ্রয় নিতে হয়নি, এই যা রক্ষে। খুব সম্ভবত এই মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু বজায় থাকবে। উদ্বাস্তু পরিবাররা পরস্পরের প্রতি এত বেশি সহানুভূতিশীল যে নিজেরা রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি নিয়েও প্রতি-বেশীকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

তবুও মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যে-দেশে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এতই কম যে না-থাকার মতো, যে-দেশে যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার সামান্যতম আয়োজনও নেই, অথচ যে-দেশে কয়েক লক্ষ মানুষ যক্ষ্মায় ভুগছে সে-দেশে যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ফুটপাথই বোধহয় সবচেয়ে ভালো আশ্রয়।

ভদ্রমহিলা যদি রোগের শুরুতেই ফুটপাথে গিয়ে আশ্রয় নিতেন তাহলে দুটি কচি ও তাজা প্রাণ হয়তো বেঁচে যেতে পারত। 'হয়তো' বললাম এই কারণে যে যক্ষ্মা থেকে বাঁচলেও এই দুটি প্রাণকে পিষ্ট করবার অন্যবিধ আয়োজনের কোনো অভাব আমাদের দেশে নেই।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
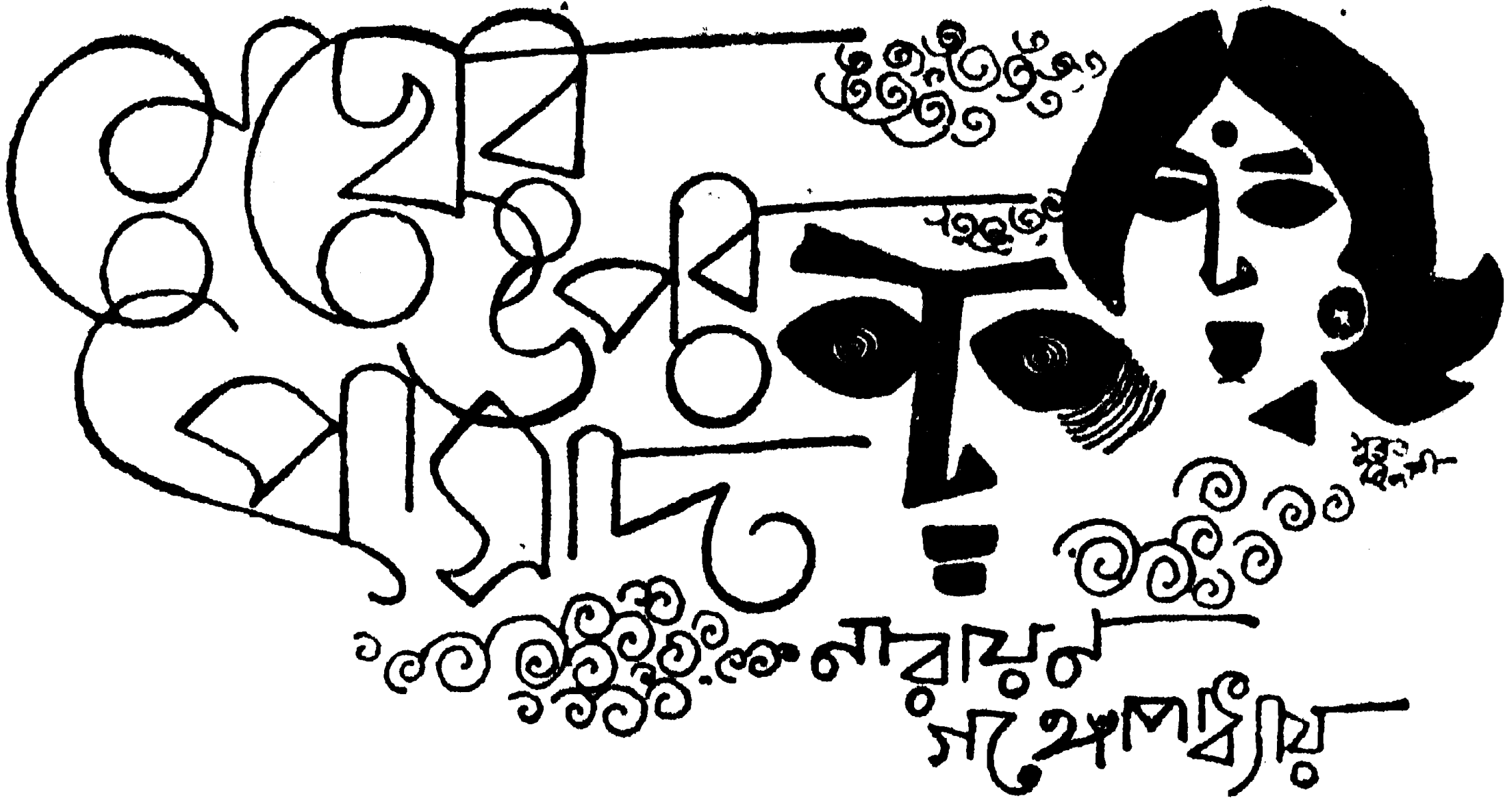
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। বাইশ ।।

সেই নার্সটি—হাসি — দীপ্তির বেডের পাশে এসে দাঁড়ালো। বালিশের ভেতরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে দীপ্তি। ঘুমুচ্ছে না জেগে আছে বোঝা গেল না।

নার্স আস্তে আস্তে ডাকল : শুনছেন?

দীপ্তি বালিশ থেকে মাথা তুলে নার্সের দিকে তাকালো। লাল টকটক করছে চোখদুটো। মুখের সদ্য শুকিয়ে-যাওয়া ক্ষতচিহ্নটাও যেন আর একটা আরক্তিম চোখের মতো দেখাচ্ছে।

নার্স আবার মৃদু গলায় বললে, শুনুন—বাড়ীতে একটা খবর দেবেন না?

দীপ্তি বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়ল বিছানায় : কিসের খবর?

সারাদিন দাপাদাপি করে পাশের বেডের ঠাকুরমা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দীপ্তির তীক্ষ্ম স্বরে নড়ে উঠলেন একবার। বিড়বিড় করে যেন বললেন, 'মরণ!' তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

নার্স বললে, কাল আপনাকে রিলিজ করে দেওয়া হবে। ও'রা যেন এসে নিয়ে যান আপনাকে।

দীপ্তির মুখ শাদা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

—বাড়ী ফিরব? কেমন করে ফিরব? মা-বাবা—

কথাটা শেষ হল না। শাড়ীর আঁচল চোখে তুলল দীপ্তি, কান্নার সমুদ্র দুলতে লাগল সারা শরীরে।

জানলার বাইরে পশ্চিমের আকাশটা অনেকখানি দেখা যায়। কতগুলো ধোঁয়াটে মেঘ ভেসে যাচ্ছে সার দিয়ে—হয়তো বৃষ্টি আসবে দু-একদিনের মধ্যেই। দুটো নারকেল গাছের মাথা দুলে দুলে জটলা করছে, কাকেরা বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে তাদের ওপর। এক ঝাঁক পায়রার খুশির আর শেষ নেই, রোদে স্নান করছে, মেঘের ছায়া মেখে নিচ্ছে ডানায়। একটা রুপালি বিন্দু মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে—এরোপ্লেন।

এই জানলা দিয়ে তাকালে বাইরের কলকাতা হারিয়ে যায়, মনে হয় আকাশটার যেন শেষ নেই; ওই মেঘেরা যেখান থেকে আসে সেখানে যায়—সেই পাহাড় আর সাগরের ছবি মেঘেদেরই খেয়ালের তুলিতে বার বার আঁকা পড়ে; নারকেল গাছের মাথায় কোন্ দূর বনের খবর আসে। এরোপ্লেনটা কত-দূরে চলে গেল কে জানে। মেঘের ছায়ায়—রোদের আলোতে পায়রাদের খেলা আর শেষ হয় না।

অথচ, আকাশ-সাগর-মেঘের এত বড়ো পৃথিবীতে দীপ্তির আজ এত-টুকুও জায়গা নেই।

হাসি নীরবে দাঁড়িয়ে তার কান্নার উচ্ছ্বাস দেখতে লাগল। হাসপাতালে আসবার পর অনেক মৃত্যু, অনেক যন্ত্রণা, অনেক শোকের উচ্ছ্বাস সে দেখেছে, দেখতে হয় দিনের পর দিন। নববধূকে বিয়ের এক মাসের মধ্যে দুর্ঘটনায় বিধবা হতে দেখেছে, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশয্যায় মা-র আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না দেখেছে, পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধার শেষনিঃশ্বাস পড়বার পর পঞ্চাশ বছরের সঙ্গিনীকে হারিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধের নিরুপায়, উদ্‌ভ্রান্ত, অন্ধকার চোখ তাকে দেখতে হয়েছে। কত নিষ্ঠুর মৃত্যু—কত রোগের যন্ত্রণা, কত বিকৃত শোকের প্রলাপ : 'আমার অমন জোয়ান ছেলে—সে কি মরতে পারে? ডাক্তারবাবু, তোমরাই তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছ!'

তবু মনে এখনো দোলা লাগে। মৃত্যু কিংবা ব্যাধির চাইতেও এক-একটা বড়ো আতঙ্ক কখনো চেপে ধরে বুকের ভেতর। আজ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সেই আতঙ্কটা তাকে স্পর্শ করতে লাগল। বাড়ী ফিরব? কেমন করে ফিরব?

হাসি কেস-হিস্ট্রিটা জানে। পুলিশের ব্যাপার জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। একটা বোমা ছোড়ার ইতিহাস। মেয়েটির ভেতরে একটা সঙ্কোচের আড়াল—সব সময় তাকে বোঝা যায় না। তারপর এই—

গরীবের মেয়ে, অথচ সুন্দরী। কল-কাতার পথে পথে মানুষের দৃষ্টি বাঘের চোখ হয়ে জ্বলে। সান্ত্বনা কাকে দেবে? নার্স-জীবনের অভিজ্ঞতা

তারও সব সময়ে সুখের নয়। তারই এক সুস্ত্রী বান্ধবী ঘর বাঁধবার আশায় দু বছর আগে যে ভুলের মাশুলে দিয়েছিল—সেটা এখনো দুঃস্বপ্ন হয়ে ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে। অবাঞ্ছিত সন্তানকে বিদায় করতে গিয়ে অপারেশনের নামে সেই বীভৎস আত্মহত্যা।

সেই কান্না : 'আমি বাঁচব না হাসি, আমি বাঁচব না?'

হাসি স্পর্শ করল দীপ্তিকে।

'আপনি ভাববেন না। মা বাবা বুঝবেন আপনার অবস্থা।'

'কেউ বুঝবে না। নিজের হাতে বিষ খেয়েছি আমি।'

'তাঁরা যাতে বোঝেন, সে আমি দেখব। আজ বিকেলে আমার ডিউটি নেই—আমিই আপনাকে নিয়ে যাব সংগে করে।'

'আমি যাব না—আমি যেতে পারব না।'

'বলেছি তো, সব ভার আমার।'

'না—না, যাবেন না আপনি।' —ভয়ে কেঁপে উঠল দীপ্তি : 'বাবা আপনাকে সুদ্ধ অপমান করে—'

'কিচ্ছু বলবেন না আমাকে।' —হাসি ম্লানভাবে হাসল : 'তাঁরা তো অবুঝ নন। আমি তাঁদের—'

'না—না।'

তবু সেই নারকেলডাঙার বাড়ীতেই ফিরতে হল। যে-বিকেলে কলকাতায় নেশা ধরে, চৌরংগীর হোটেলে যখন উচ্ছল রাত্রির আয়োজন শুরু হয়ে যায়, যে-বিকেলে দিনের পর দিন দীপ্তি ডাকিনী সন্ধ্যার ডাক শুনতে শুনতে ঠোঁটে গালে রঙ বুলিয়েছে, সেই বিকেলেই হাসির সংগে বাড়ী ফিরে চলল সে। নৌকো ডুবে গেলে ঝড়ের নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে ক্লান্তি, নিরাশা আর অর্ধচেতনায় মানুষ যেমন করে অতলের টানে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তেমনিভাবেই দীপ্তি রিক্‌শাতে এসে বসল।

দীপ্তির ঠাণ্ডা আড়ষ্ট একখানা হাতকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে হাসি বললে, 'ভাববেন না—আমি আছি।'

তখন তলিয়েই চলেছে দীপ্তি। ভাবল না, ভাবতেও পারল না। শুধু একবার বললে, 'রিক্‌শার পর্দাটা ফেলে দিতে বলুন না ভাই, বাইরের আলো আমি সইতে পারছি না।'

হাসি কথা রেখেছিল। গৌরাংগবাবু আর মা-কে সে কী বলেছিল, দীপ্তি জানে না। নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়ে, চাদরের তলায় পাতালের অন্ধকার খুঁজতে খুঁজতে শুধু একবার কানে এসেছিল, মা ডুকরে কেঁদে উঠেছে। আর বাবার একটা চাপা পৈশাচিক ধমক কানে এসেছিল : 'হয়েছে, থামো। কেলেংকারীর ঢাক চারদিক থেকেই তো বাজছে—তুমি আর লোক হাসিয়ো না।'

চলে যাওয়ার আগে হাসি দীপ্তির কাছে এসেছিল আর একবার।

—শুনুন, আমি।

দীপ্তি জবাব দেয়নি।

—শুধু একটা কথা বলে যাই। বিপদ কাটাবার জন্যে কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন না—কোনো যা-তা ওষুধপত্র খাবেন না। আমি আবার আসব। আপনার জন্যে যা দরকার আমিই করব।

চাদর ফেলে উঠে বসেছিল দীপ্তি। অস্বাভাবিক চোখে তাকিয়ে, অস্বাভাবিক গলায় ফিসফিস করে বলেছিল : বাবা কী বললেন?

—কী আর বলবেন? —বিষণ্ণ ম্লান মুখে হাসি বলেছিল, শকটা ওঁদের পক্ষে কতখানি যে সাংঘাতিক, সে তো বুঝতেই পারেন। তবু কথা দিয়েছেন, কেউ আপনাকে কোনো কথা বলবেন না। আমিও বলেছি—যা হবার তো হয়েই গেছে, আপনাদের মেয়ে এমনিতেই যথেষ্ট শাস্তি পাচ্ছেন—আপনারা ও'র ওপর আর দণ্ড না চাপিয়ে ও'কে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। সময় এলে আমিই ও'র লজ্জা দূর করতে চেষ্টা করব।

—আমি আত্মহত্যা করব।

—কেন করবেন? জীবনটা কি এত খেলো যে বেলোয়াড়ী কাচের চুড়ির মতো ভেঙে ফেলা যায়? ভুল হয়—ভুল শোধরাতে হয়, বাঁচবার অর্থ নতুন করে খুঁজে নিতে হয়। আমার কথা যদি সব শোনেন—হাসি থেমে গিয়ে মণিবন্ধের ছোট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল : এই যা—ছটা বাজে! সাতটা থেকে আবার ডিউটি, আর আমার দাঁড়াবার জো নেই। কিন্তু যে-কথাটা
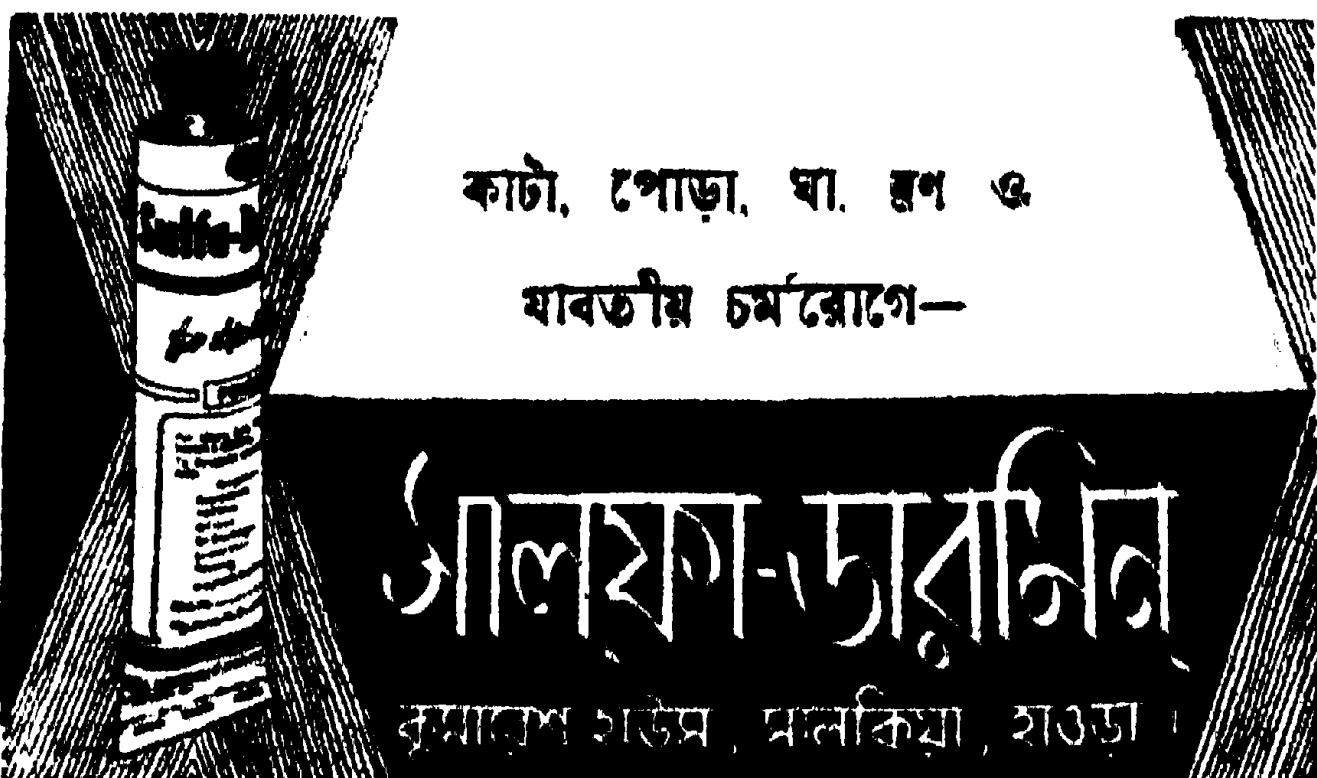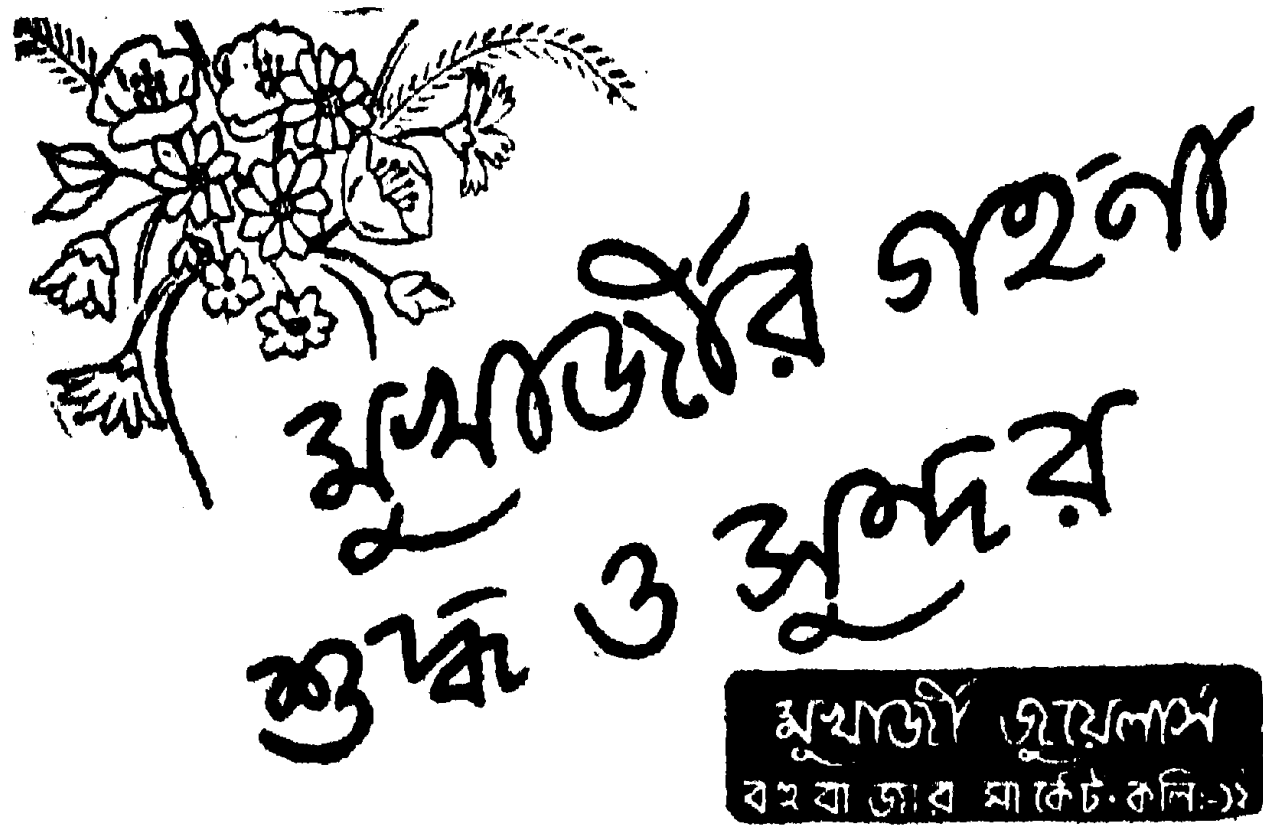
বলেছি, মনে রাখবেন। বিপদ কাটাতে গিয়ে কোনো আনাড়ীর অপারেশন কিংবা বাজে ওষুধ-বিষুধের ঝুঁকি নেবেন না। দুটো মৃত্যু একসঙ্গে ঘটাবার কোনো অধিকার নেই আপনার। আচ্ছা ভাই—চলি আজকে।

দুটো মৃত্যু! দীপ্তি চমকে উঠেছিল। তারপরেই মনে হল আর এক-জনের কথা—যার কোনো পরিচয় নেই, যাকে কেউ চায়নি, অথচ পিশাচের মতো দীপ্তির রক্ত শুষে শুষে যে তারই ভেতরে বড়ো হয়ে উঠছে।

তার হাত থেকে বাঁচতে হলে, লজ্জার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন্ পথ আছে আর?

পাগলের মতো বাঁ হাত দিয়ে কপালে একটা ঘা মারল দীপ্তি। হাতের কাচের চুড়িগুলোর দু-তিনটে ভেঙে খান-খান হয়ে গেল, একটা টুকরো কপালে বিঁধে গিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল, দীপ্তি টেরও পেল না।

কিন্তু আত্মহত্যা দীপ্তি করতে পারল না। সেদিন নয়, তার পরের দিন নয়, তার পরের দিনও নয়। মরবার জন্যে যেটুকু উদ্যোগ আয়োজন করা দরকার, সেটুকুর জন্যেও কোথাও কোনো উৎসাহ সে খুঁজে পেল না। ঝড়ের নদীতে ডুবে গিয়ে একটা কালো শীতল বিশ্রামের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল সে।

তারপর এ-ও সহজ হয়ে এল—একেও মেনে নিলে সবাই। শুধু বাবার কথা জানা গেল না, দীপ্তির মতোই তিনি অন্ধকূপে ডুব দিয়েছেন, সেখান থেকে নিতান্ত দরকার না পড়লে বেরিয়ে আসেন না। মা চোখের জল মুছতে মুছতে খাবার নিয়ে আসেন, এক-আধ-দিন অভয় পর্যন্ত ঘরে আসে, গল্প করতে চেষ্টা করে, তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। প্রভাতদা ইচ্ছে করেই আসে না, সে বাইরের লোক বলেই হয়তো দীপ্তির লজ্জাকে নিজের ভেতরে আরো বেশি করে অনুভব করে সে। বাড়ীতে তার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, চটির শব্দ আসে কিন্তু দীপ্তির ঘরে কখনো পা দেয় না সে।

দীপ্তি নিজের শূন্যতা নিয়ে অপেক্ষা করে। আর এর ভেতরেও তৃপ্তি আর অমিয়র ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগে তার। যা বলেছে,

অমিয় মাদ্রাজ না কোথায় খেলতে গেছে, সেখান থেকে ফিরতে দেরী হবে তার। অমিয়র অমন দেরী মাঝে মাঝে হয়েই থাকে। কিন্তু যে বহরমপুরের বড়োলোক মাসিমা তাদের কখনো খবর নেন

আমি আত্মহত্যা করব'

না—চিঠি লিখলে জবাব পর্যন্ত দিতে চান না, তিনি হঠাৎ এসে তৃপ্তিকে নিয়ে চলে গেলেন—বোনঝির জন্যে এত দরদ উথলে উঠল তাঁর? আর বাবা-মা এক কথায় ছেড়ে দিলেন তৃপ্তিকে—যতদিন খুশি থেকে আসুক?

আশ্চর্য!

দীপ্তির হাসপাতালে থাকায় এই দেড় মাসের মধ্যেই অনেকখানি বদলে গেছে পৃথিবীটা!

কিন্তু নিজের সব ভাবনাই যার বোবা যন্ত্রণার মধ্যে থমকে আছে, পরের ভাবনা সে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। তার নিজের ভেতরেই যে রক্তচোষা জন্তুটা দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে—সেইটেই তার সামনে এসে দাঁড়ায়ঃ বড়ো হয়, আরো বাড়ে, আরো বাড়তে থাকে, তারপর আকাশ-ছোঁয়া একটা দৈত্যের মূর্তি নিয়ে সারা পৃথিবীকে আড়াল করে দেয়।

পার্ক সার্কাসের সেই বারের সামনে কাঞ্জিলালসাহেবের গাড়ী অপেক্ষা করছে। রাত আটটার কাছাকাছি। প্রভাত গাড়ীর পেছনে ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সেই ব্যাক-লাইট চোর ছেলেটার কথা সে ভোলেনি। এই সব বড়োলোকের পাড়াতেই ওদের উপদ্রব বেশি। পুরোনো মডেলের ঝর্‌ঝরে গাড়ীর পাড়া শ্যামবাজার-বাগবাজার-ভবানীপুরে ওদের উৎসাহ নেই।

কারনানি এস্টেটের অতিকায় বাড়ীটার জানলাগুলো জ্বলছে। কতগুলো জানলা আছে ওখানে? এক হাজার—দু হাজার? কত মানুষ থাকে ওখানে—কত দেশের? বাড়ীটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন একটা আতঙ্ক জাগে যেন তার। মনে হয় অতবড়ো বাড়ী আর অত মানুষের ভিড় নীচের মাটিটা একদিন আর সইতে পারবে না। তখন—

পথের দুধারে গাছের ছায়া লেগে ভাঙা ভাঙা আলোগুলো দুলছে। কোথা থেকে একটা মিষ্টি বাজনার সুর আসছে একটানা—প্রভাত এক সময় সামান্য গান-বাজনার চর্চা করেছিল, সুরটা সে চেনে। মল্লারে ঝালা চলেছে এখন। বৃষ্টি নেই, ঝকঝক করছে তারা, এমন আকুল হয়ে মল্লার বাজাচ্ছে কেন?

কিন্তু সেতারের সুর চাপা পড়ল ব্যাণ্ডের আওয়াজে। বাজনার দল চলেছে হিন্দি ছবির গান বাজাতে বাজাতে। পেছনে বড়ো বড়ো ঝাড়ে থাস গেলাসের আলো জ্বলছে, কয়েকজনের মাথায় উঁচুকরা কারবাইড ল্যাম্প। পেছনে থান পাঁচেক ঘোড়ার-গাড়ী, মুখে অভ্রের ঝালর ঝুলিয়ে একটি গাড়ীতে বসেছে কিশোর বর, কাগজের অসংখ্য ফুলের ওপর আলো ঝকমক করছে। এর মধ্যেই কয়েকটা চীনে পটকা ফাটল, দুটো হাউই উড়ল শোঁ-শোঁ করে। কোনো অবস্থাপন্ন মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীর বিয়ে।

বিয়ের শোভাযাত্রা খানিক দূরে এগিয়ে গেলে আবার সেতারের বাজনা

শোনবার জন্যে প্রভাত কান পাতল। কিন্তু সেতার থেমে গেছে তখন। পল্লী-গীতি শুরু হয়েছে ঃ "কালো মেয়ে দোলেরে ভাই মেঘবতীর কেশ—"

শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ হয়ে এল। চোখের সামনে দেখা দিল ছেলেবেলার মেঘনা, সেই রাত্রির নদীর ওপর দিয়ে ভাটিয়ালী গান গাইতে গাইতে চলেছে নৌকো, সামনের কারনানি ম্যানসন একটা প্রকাণ্ড স্টিমারের মতো এগিয়ে আসছে।

কিন্তু পার্ক সার্কাসের এ অঞ্চলে এই গান কোথা থেকে এল? রেডিয়ো নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় বাজছে?

তখন খেয়াল হল। তারই গাড়ীর রেডিয়োটা খোলা রয়েছে। কাঞ্জিলাল-সাহেব খিদিরপুর থেকে ফেরবার সময় খুলতে বলেছিলেন। সেই থেকে বেজে চলেছে। সাহেব নেমে যখন 'বারে' গিয়ে ঢুকলেন, তখন ওটা আর বন্ধ করবার কথা প্রভাতের মনে ছিল না।

"সে তো দেয় না ধরা পাগলকরা
বিজলী হাসি হাসে,
আমি দূরে সাগরে দিলাম পাড়ি,
তাহারি নৈরাশে রে—"

প্রভাত গাড়ীতে ফিরে এসে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলে। গানটা ভালো লাগছিল, কিন্তু একা বসে কার-রেডিয়ো শোনা তার এক্তিয়ারের বাইরে। তবু মনের ভেতরে গানটা গুন গুন করে চলল। সেও তো একবার নয়—দুবার মেঘবতীর স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তার একজন রাণী, সে সকালের শিউলির মতো ঝরে পড়েছে; আর একজন তৃপ্তি —মেঘবতী কন্যা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

কোথায় গেল? কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কোন্‌খানে মিলিয়ে গেল সে? সেই চন্দন সিংই কি তাকে গ্রাস করল? কেউ জানে না। এক অমিয়রই হয়তো জানা আছে, কিন্তু সেও তো মেঘবতীর কালো কেশের ভেতরে ডুবে গেছে।

"সে তো দেয় না ধরা, পাগলকরা
বিজলী হাসি হাসে—"

কিন্তু বিজলী হাসি কি তৃপ্তির সঙ্গে মানায়? সে আর একজন। রিনি। বিদ্যুতের মতোই হঠাৎ, বিদ্যুতের মতো ধারালো। মানুষকে জ্বালিয়ে রাখাই তার একমাত্র কাজ।

"আমায় দে মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শংকরী—"

জড়ানো বেসুরো গলায় রাম-প্রসাদী, মৃদু মন্দ পায়ে বেরিয়ে আসছেন কাঞ্জিলালসাহেব। পোশাকে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে তিনি ইংরেজ; কিন্তু নেশা একটু চড়লে তখন সব অন্য রকম। বিশ্বপ্রেম জাগে, দেশের দুঃখে কাঁদতে থাকেন এবং নিজে যে গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন—পরে স্কলার-শিপের জোরে বিলেতে গিয়ে সেল্‌ফ্‌ মেড হয়েছেন, সে-সবও তাঁর মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় বাপের মুখে শোনা কালীকীর্তনও গুনগুনিয়ে ওঠে গলায়।

"আমি নিমকহারাম নই শংকরী
—হুঁ - হুঁ - হুঁ—"

আর মনে পড়ছে না, তাই হুঁ - হুঁ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গাড়ীতে উঠলেন। প্রভাত এঞ্জিনে স্টার্ট দিলে।

হুঁ-হুঁ বেশিক্ষণ চলল না, নতুন করে শুরু করলেন, "এবার কালী তোমায় খাব।" কিছুক্ষণ খেতেও চেষ্টা করলেন, এবারও হুঁ-হুঁ করে থেমে যেতে হল। তারপর ঃ

—ইয়ং প্রভাত!

—হ্যাঁ, স্যার।

—কেমন আছো হে?

সকাল থেকেই দেখছেন, গাড়ীতে করে ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত ঘুরিয়েছেন। এতক্ষণে প্রভাতের কুশল সংবাদ অবগত হওয়ার কৌতূহলটা তাঁর জাগল।

—ভালোই আছি স্যার।

—ভেরি গুড্। —প্রভাতকে উৎসাহিত করে বললেন, গুড্ বয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ —বলেই প্রভাত লজ্জা পেলো। তার সম্পর্কে সাহেবের মতা-মতটা সমর্থন না করাই উচিত ছিল, ওতে বিনয়ের অপমান হয়। কিন্তু অভ্যাসটা ঠেকানো মুশকিল।

কিন্তু কাঞ্জিলালসাহেব সেটা লক্ষ্য করলেন না। তাঁর মন তখন অন্যদিকে।

—ইয়ং আর ভেরি হ্যাপি। বাট লুক অ্যাট মী। কী আছে আমার? কেন এত খেটে মরি? কিসের জন্যে?

এবার প্রভাত আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকালো। সুরটা নতুন রকমের ঠেকছে।

সীটে হেলান দিয়েছেন কাঞ্জিলাল-সাহেব। বলে চলেছেন স্বগতোক্তির মতো।

—আফ্‌টার অল — লোকে কী

চায়—একটা ভদ্র জীবনযাত্রা—একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ইন্‌কাম। ওয়েল, আমার তা আছে। —কাঞ্জিলালসাহেব একটার পর একটা চিন্তা গুছিয়ে আনতে লাগলেন : কিন্তু কার জন্যে? আই হ্যাভ্‌ নো সান।· একটা মাত্র মেয়ে —ভেবেছিলুম মনের মতো করে মানুষ করব। কিন্তু কী হল? গন্‌ অ্যাস্‌ট্রে।

একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় রাস্তা জুড়ে জাবর কাটছিল, গাড়ীকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। প্রভাত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

—আচ্ছা, হোয়াট্‌ ডু য়ু থিংক? মানে, তোমার কী মনে হয়? —প্রশ্নটা প্রভাতের উদ্দেশে।

—আমাকে বলছেন স্যর?

—ইজ্‌ দেয়ার এ থার্ড পার্সন? —কাঞ্জিলালসাহেব বিরক্ত হলেন : তোমাকে ছাড়া আর কাকে? ওয়েল, তোমার কী ধারণা? মানে, আমার মেয়ের সম্পর্কে?

—এ সব কথা স্যার, আমাকে জিজ্ঞেস করা—

—শাই? —আরে না - না! তুমি আমার ড্রাইভার হতে পারো, বাট য়ু আর এ ম্যান। সেইটেই বড়ো কথা—অ্যাজ্‌ এ ম্যান—রিনিকে তোমার কী মনে হয়?

—ক্ষমা করবেন স্যার, কিছু মনে হয় না।

—মনে হয় না? —কাঞ্জিলালসাহেব ভ্রূকুটি করলেন : দ্যাট্‌স ভেরি স্ট্রেঞ্জ! অথচ গাড়ীতে ওকে নিয়ে তুমি প্রায়ই বেরোও। কখনো ফর আওয়ার্স টুগেদার!

কী বলতে চান কাঞ্জিলালসাহেব? অকারণেই প্রভাতের গলা শুকিয়ে এল। সেই গড়ের মাঠের সন্ধ্যা—সেই ডায়মণ্ড হারবার রোডের ধারে নির্জন মাঠে? রিনি কি কিছু বলেছে ও'কে? কী বলতে পারে?

—তুমি কিছুই লক্ষ্য করোনি?

—আজ্ঞে না।

একটু চুপ করে রইলেন কাঞ্জিলাল-সাহেব। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

—শী ইজ এ প্রোব্লেম চাইল্‌ড্‌। মানে, ছেলেবেলা থেকেই ওকে নিয়ে আমার ঝঞ্ঝাট। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে আমরাই ওর মাথা খেয়েছি। সব সময় নিজের মর্জি মতো চলবে। হিস্ট্রিতে এম-এ পড়ছিল, ফার্স্ট ক্লাস পেত—ছেড়ে দিলে। বললুম, 'য়ুরোপে পাঠাচ্ছি, পড়ে আয়।' উত্তরে বললে, 'যাব না।' 'কেন?' জবাব হল : 'তোমার ক্লাবের বেয়ারাগুলো পর্যন্ত আজকাল কন্টিনেন্ট ঘুরে আসে, আমি না গিয়েই ডিস্‌টিংটিভ্‌ থাকব।' এমন অদ্ভুত কথা শুনেছ কখনো?

প্রভাত সংক্ষেপে সারল দিলে : আজ্ঞে না।

—কী যে ওকে নিয়ে করব জানি না। এক ছোকরার দিকে মনটা একটু ঝুঁকেছিল, কিন্তু খবর এসেছে সে কাউন্ড্রেল্‌টা লণ্ডনে ওখানকার একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছে। সেই থেকে আরো অ্যাব্‌নর্ম্যাল। এখন বলে, 'আমি একজন কোনো প্রিমিটিভ্‌—কোনো বার্বেরিয়ানকে বিয়ে করব। যে ন্যাকা ন্যাকা কথা শোনাবে না, বীরের মতো এসে আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে।' বললুম, 'মাই ডিয়ার গার্ল, দিস্‌ ইজ টোয়েন্টিয়েথ্‌ সেঞ্চুরি এবং তুমিও আফ্রিকার কোনো জংগলে বসে নেই। তা ছাড়া মধ্যযুগে হলে স্বয়ংবর সভা থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত তোমায়—বাট্‌ য়ু আর এ বিট্‌ লেট!' উত্তরে বললে, 'দু-দিন অপেক্ষা করো ড্যাডী, সভ্যতার চাকা আবার পেছনে ঘুরে যাচ্ছে, মানুষ প্রিমিটিভ্‌ অবস্থায় পৌঁছুল বলে।' ওয়েল প্রভাত, এ সব শুনে তোমার কী মনে হয়?

কাঞ্জিলালসাহেবের অর্ধেক কথা প্রভাত বুঝতে পারল না। কিন্তু এই রকম কিছু কিছু আলোচনা ছাড়া-ছাড়া-ভাবে রিনির মুখ থেকে শুনেছে বলে মনে পড়ল।

—কথা বলছ না যে?

—কিছু বুঝতে পারছি না স্যর।

—এগ্‌জাক্‌ট্‌লি। আমিও বুঝতে পারি না। একদিন আমাকে বললে, 'ড্যাডি, তোমার রিভলবারটা আমায় দেবে?' জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন?' বললে, 'তোমার শোয়ার ঘরে যে ইতা-লীয়ান ব্রোঞ্জের মূর্তিটা আছে—ওর মুখে গুলী করব। ওটা অসহ্য রকম সুন্দর—ভাল্‌গার! একটু বিকৃত করে না দিলে ওর ক্যারাক্‌টার আসবে না!' ভাবতে পারো?

—আজ্ঞে না।

—আই নো, হোয়াট ইজ হোয়াট! রাত-দিন কতগুলো কন্টিনেন্টাল নভেল পড়ছে। তাদের দু-একটার পাতা উল্‌টেছিলুম। কোনো কোনোটা এত আগ্‌লি যে পড়াই যায় না। সেইগুলোই গিলছে ক্রমাগত আর মাথার মধ্যে যত সব পাগলামো জট পাকাচ্ছে। শী ইজ এ হোপলেস্‌ কেস্‌!

শেষ কথাটায় প্রভাতের সম্পূর্ণ মত আছে। জবাব দিল না।

—রিনির জন্যে একটি পাত্র দেখে দিতে পারো, প্রভাত?

গাড়ীটা অকারণে দ্রুত বাঁক নিলে একটা। প্রভাতের হাত থেকে পিছলে গিয়েছিল স্টিয়ারিং।

—আমাকে বলছেন?

—নইলে ওই ট্র্যাফিক সিগন্যালটাকে বলছি নাকি?

—কিন্তু স্যার, আমি—

—হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। প্রিমি-টিভ্‌ দরকার নেই, একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে জোগাড় করে দাও। যদি টোল থাকে, যদি স্যান্‌স্ক্রীট্‌ ছাড়া কিছুই না জানে, ইভ্‌ন যদি মাথায় একটা টিকিও থাকে, আই ডোণ্ট মাইন্ড্‌! ডু য়ু নো—আমরা করাপ্‌টেড হয়ে গেছি, টু দ্য কোর! এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।—কাঞ্জিলালসাহেবের গলা ভারী হয়ে আসছিল, এবার কেঁদেই ফেললেন : আহা, আমাদের ভারতীয় সভ্যতা! দি ব্রাহ্‌মনিক্যাল্‌ গোল্ডেন এজ! সেই 'ভেদাজ্‌' —দ্যাট্‌ 'উপানিষাড্‌' আর 'হোলি লাইফ্‌' —সে কি আর ফিরে আসবে! সেই দিন যদি থাকত, তাহলে রিনিকে নিয়ে কি কোনো প্রব্‌লেম্‌ থাকত আজকে! ন'বছর বয়সেই—কোনো এক বটবৃক্ষের ছায়ায়—

বটবৃক্ষের ছায়ায় কী ঘটতে পারত, সেটা অনুচ্চারিতই রইল আপাতত। গাড়ী কাঞ্জিলালসাহেবের গেটে ঢুকল আর দোতলা থেকে রিনির প্রকাণ্ড হাউন্ড্‌টা হাঁড়ির মতো গম্‌গমে গলায় গৃহস্বামীকে অভ্যর্থনা জানালো।

—(ক্রমশঃ)

আলোচনা

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের স্বাধীনতা সংখ্যার পূর্বপক্ষ পর্যায়ে 'স্বাধীনতা ও সাহিত্য' বিষয়ে ব্যক্তব্যনিষ্ঠ মতপ্রকাশের জন্য সংখ্যাহীন ধন্যবাদ।

সত্যিই স্বাধীনতা-পূর্ব সাহিত্যের সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী আমাদের সাহিত্যের মধ্যে কি দুস্তর ধনী-দরিদ্র ফারাক! জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের স্থলে শুধু ফাঁকা আঙ্গিকসর্বস্ব প্রসাধনী প্রকরণাদির জোরপূর্বক আসর অধিকার। প্রকৃত প্রতিভাবানের বদলে সাহিত্যিক-যশাকাঙ্ক্ষী 'নতুন কিছু করবো'দের অক্ষম অপপ্রয়াস।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বের ও পরের বাংলার সাহিত্য মনোযোগ-পাঠান্তে যেকোনো বিবেকবান পাঠকের পক্ষে উপরোক্ত 'মন্তব্য টীকা-টিপ্পনী'তে পৌঁছানো মোটেই অমূলক নয়।

অথচ পরাধীন-পর্বে মনে মনে আমরা কতো আশা-ভরসাই না পোষণ করেছিলাম। জাতীয় জীবনে অন্যান্য বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা আনয়নের সমতালে সাহিত্যের দিগন্তও দূরবিস্তৃত হবে এবং তা দেখে প্রত্যেকে গর্ববোধ করতে পারবো, এই ছিল আমাদের একান্ত কামনা।

কিন্তু পরিণামে—বলা বাহুল্য পনেরো বছরে সেসব কিছু তো হোলোই না, উপরন্তু বিচিত্র খেয়াল-খুশির খেলাতে তার আঙিনা আগাছা-আচ্ছাদিত হয়ে উঠলো। কতদিনে এসব আগাছা-পরগাছার উচ্ছেদ সাধন শুরু হবে? এই এখন একমাত্র চিন্তা।

অবশ্যই অল্প-স্বল্প ব্যতিক্রম বর্তমান। তবে তুলনায় সেগুলি এমনি অকিঞ্চিৎকর যে গণনায় আনার যোগ্য নয়।

তাছাড়া অনেক কথাই লেখার ছিল। তথাপি নির্লিপ্ত থাকলাম একারণে যে, এ-সব উক্ত আলোচনায় মোটামুটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে একটি গুরুতর অনবধানতার জন্যে অভিযুক্ত না করে পারছি না। যেরূপ বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনায় অবতরণ করা হ'য়েছিল, সে তুলনায় অতি সামান্যই ধরা-ছোঁয়ায় এনেছেন তিনি। আরো এক কথা, প্রাথমিক পদচারণাতেই তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ভাশুর-ভাদর-বউয়ের মতো। একথা শুনে বিস্মিত হ'তে হয়। ওখানে যদি 'আমাদের' কথাটার উল্লেখ থাকতো, তাহলে আমার মনে হয়, এমতাবস্থা ঘটবার অবকাশ থাকতো না। এবং একথা আশা করি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের ও আরো কয়েকটি দেশে স্বাধীনতার পরে সাহিত্যের অমনতর অবস্থা ঘটলেও সকল দেশেই অনুরূপ অবস্থার আগমন ঘটেনি। নমস্কার গ্রহণ করুন। নিবেদন ইতি—

বিনীত,
কাশীনাথ চিন্যা,
মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭

মাননীয় 'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

গত অমৃতের 'স্বাধীনতা সংখ্যায়' (১৫শ সংখ্যা) শ্রীজৈমিনি তাঁর স্ব-বিভাগে 'স্বাধীনতা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে যে নাতিদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি করেছেন, তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে, এবং সেইজন্যই তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর এই সময়োপযোগী আলোচনাটির ফলে উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে সাহিত্য-প্রেমিক ব্যক্তিমাত্রই নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ পাবেন। উক্ত আলোচনা সম্পর্কে একজন সাহিত্যপ্রেমিক হিসাবে আমিও আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করছি।

শ্রীজৈমিনি বাংলা সাহিত্যকে প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর যুগের সাহিত্য নামে দুটি পর্বে বিভাগ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে রচিত সাহিত্য, স্বাধীনোত্তর যুগে রচিত সাহিত্যের চেয়ে অনেক উচ্চমানের। এবং এই যে পার্থক্য এর একমাত্র কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন 'স্বাধীনতার প্রভাব'।

তাঁর এই উক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেকাংশে আমিও একমত। একটা প্রশ্ন আজকাল প্রায় শুনতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে, বর্তমান বাংলা সাহিত্য আজ কোথায় চলেছে? আজকের বাংলা সাহিত্য দুর্বোধ্যতায় ভরপুর। সাহিত্য পাঠ করে পাঠকেরা আগের মত ভাবাবেগে মগ্ন থাকে না। নায়ক-নায়িকাদের সুখ-দুঃখে পাঠকদের হাসতে বা কাঁদতে দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত অথবা রবীন্দ্রনাথের গোরা আমাদের মনকে যেভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছেন, স্বাধীনোত্তর যুগের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সেভাবে আমাদের মনকে প্রভাবিত করতে পারেন না কেন? এর একমাত্র কারণ স্বাধীনতা নয়। বর্তমান সমাজ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সুতরাং হিংসা, দ্বেষ, ব্যভিচার, প্রতারণায় মগ্ন সমাজ। সেখানে গোরা বা শ্রীকান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। এর আরেকটি কারণ আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা (সকলে নয়) চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে নতুন আঙ্গিকে দুর্বোধ্যতার ফাঁদ পেতে সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন। সুতরাং সেখানে সৎ-সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে অর্থোপার্জনই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের মূল লক্ষ্য।

সমাজে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের মন রূপকথার রাজকুমারের দেশ ছেড়ে চাঁদের দেশকে পিছনে ফেলে কারখানা, বস্তির নায়ক-নায়িকাদের খোঁজ করবার চেষ্টা করছে। বাংলা সাহিত্যের পটভূমি আজ দেশ থেকে বিদেশের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এবং সাহিত্যও ক্রমশঃ কল্পনালোক ছেড়ে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং শ্রীজৈমিনির 'হাল আমলের বাংলা সাহিত্য রূপকথার চেয়েও অবাস্তব' কথাটি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু একটা কথা। বাংলার বর্তমান সাহিত্যিকরা নতুন দিগন্তের খোঁজে মগ্ন, না পূর্বসূরীদের চলার পথ অনুসরণ করেই চলছেন? এ প্রশ্নের উত্তর গভীর আলোচনাসাপেক্ষ। শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যকেও পুরানো পথ পরিত্যাগ করে নতুন পথ অনুসরণ করতে দেখা গিয়েছে। সেই প্রভাবে বাংলা সাহিত্যও প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলা সাহিত্য যতটা না প্রভাবিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছে স্বাধীনতার দ্বারা। শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ স্বাধীন ভারতে পৌঁছানোর পর কলকারখানায় নিম্ন-শিক্ষিত শ্রমিকদের মনোরঞ্জনের জন্যই আজ বেশীর ভাগ সাহিত্যিক সস্তা সিনেমাধর্মী বক্তব্যে ভরপুর গল্প লিখে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায় মগ্ন। সুতরাং সৎসাহিত্যের চেয়ে অসৎ সাহিত্যের সংখ্যাই বাংলার সাহিত্যাকাশকে ছেয়ে ফেলেছে। ঠিক এই কারণে স্বাধীনোত্তর সাহিত্য যতখানি সমৃদ্ধ হওয়ার কথা, ততখানি হতে পারেনি। বিপরীত ফলই লাভ হয়েছে।

সুতরাং শ্রীজৈমিনি যে বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, সাহিত্য রচিত হয়, তখনই যখন দেশে স্বাধীনতার অভাব ঘটে। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এলে সাহিত্যের স্রোতে চড়া দেখা দিতে শুরু করে।" কথাটি অনেকাংশে সত্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো মহাপাপ! সেই জন্যে আমরা বাংলার সাহিত্যিকদের ওপরও বিশ্বাস হারাইনি। আমরা আজও আশা রাখি, বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ থেকে অনাচার, ব্যভিচার, কদর্যতাকে দূরীভূত করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করবেন সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে।

আন্তরিক নমস্কার গ্রহণ করবেন।

শ্যামলেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী,
সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৩২

(উত্তর)

'অমৃত'
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"'অমৃত' পত্রিকায় ১০-৮-৬২ প্রকাশিত 'জানাতে, পারেন' পৃষ্ঠায় প্রশ্ন কয়টির অধিকাংশের" উত্তর পাঠাইলাম।

(১) অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহারঃ—যদিও 'ইতিমধ্যে' ও 'ইতিপূর্বে' 'ইতোমধ্যে ও 'ইতঃপূর্বে' হওয়াই সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ অনুযায়ী উচিত, তথাপি 'সক্ষম', 'সিঞ্চন' (শুদ্ধরূপঃ—'ক্ষম', সেচন) প্রভৃতির ন্যায় বাঙ্গলায় অতি-প্রচলনের ফলে ওগুলি ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে। ইহা communis error facit jus অর্থাৎ common error makes the law নীতি অনুসারে ঐরূপ হইয়াছে।

(২) পাঠনির্ণয়ঃ—যেহেতু 'পাত্র' 'ভাজন', 'আস্পদ' শব্দগুলি সংস্কৃত অজহল্লিঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ্য পদের লিঙ্গানুযায়ী তাহাদের লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না, তাহারা সর্বদা ক্লীব লিঙ্গই থাকে এবং অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে পাত্রেষু, ভাজনেষু, আস্পদেষু হয়, অতএব মহিলাদের ক্ষেত্রেও 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' হইবে, 'শ্রদ্ধাস্পদাসু' নহে।

(৪) editorial column-এর ভাল প্রতিশব্দ = সম্পাদকীয় বক্তব্য।

(৩) সংক্ষিপ্ত = সম্+ক্ষিপ্+ক্ত;
সংক্ষেপিত = সম্+ক্ষিপ্+নিচ্+ক্ত।
যদিও summarised এই ইংরাজী শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'সংক্ষেপিত' হওয়াই অধিকতর সঙ্গত, তথাপি ঐ অর্থে 'সংক্ষিপ্ত' শব্দটি চলিতে পারে। ইহার প্রাচীন দৃষ্টান্ত—ক্রমদীশ্বরের 'সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণ'।

(৬) 'শ্রী' শব্দ Mr. এর অনুরূপ। ইংরাজীতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার সময় কেহ Mr. নামের পূর্বে লেখে না কিন্তু অপরকে পত্র দিবার সময় বা তাহার নাম উল্লেখের সময় তাহার নামের পূর্বে ব্যবহার করে। তাই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৯) লেখক ও সাহিত্যিকঃ—সাহিত্যস্রষ্টা কবিধর্মী লেখককে আমরা সাহিত্যিক বলি। কারণ, 'সাহিত্য' শব্দটি 'সহিত' শব্দের ভাববাচক বিশেষ্য পদ এবং সহিত শব্দটির ভিতর 'শব্দ' ও 'অর্থ' মিশ্রিত আছে। তাই 'কাব্যপ্রকাশ'কার মম্মট ভট্ট বলিয়াছেন ঃ—তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি। ইহাই তাঁহার মতে সাহিত্য বা কাব্যের সংজ্ঞা। এইজন্য ইতিহাস, দর্শন বা বিজ্ঞানের গ্রন্থকারগণ লেখক, সাহিত্যিক নহেন।

জানাতে পারেন

(১০) বাঙালী ও মাদ্রাজীঃ—যেমন ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা বাম দিক হইতে ডানদিকে লেখা হয়, অথচ আরবী, পার্শী, উর্দু প্রভৃতি ভাষা ডানদিক হইতে বামদিকে লেখা হয়, তেমনি উত্তর ভারতীয় বাঙালী ও দক্ষিণ ভারতীয় মাদ্রাজীর দুই-তিনবার ঘাড় নাড়ার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

(১১) নমস্কারান্তে ইতিঃ—সংস্কৃত ভাষায় একটি দাঁড়ি ও দুইটি দাঁড়ি ছাড়া আর যতিচিহ্ন ছিল না বলিয়া, কাহারও কথা উদ্ধৃত করিতে হইলে quotation marks এর পরিবর্তে শেষে 'ইতি' লিখিলেই বুঝিতে পারা যাইত কতটুকু পরের বক্তব্য। বাংলা পত্রের শেষে সংস্কৃত হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে সেই 'ইতি' আসিয়াছে। এখন আবার 'নমস্কার' ('আমার নমস্কার জানিবেন' বাক্যটির সংক্ষিপ্তরূপ) এবং 'অন্তে' শব্দদ্বয়ের অবৈধ সমাস ও তজ্জনিত সন্ধির ফলে 'নমস্কারান্তে' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আমরা 'নমস্কারান্তে ইতি' এই অদ্ভুত ক্রিয়াহীন বাক্যটি লিখিতেছি। ইহা ব্যাকরণসম্মত নহে।

আপনি আমার নমস্কার জানিবেন।
ইতি

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য (এম-এ, ডি-লিট),
(কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃতর
অধ্যাপক)

॥ এরকম হয় কেন? ॥

(প্রশ্ন)

ঐ ২৪শে আগষ্ট তারিখের পত্রিকায়ই শ্রীমিন্টু মৈত্র মহাশয়ের প্রশ্ন। চিৎ হইয়া, বুকে হাত রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, কিছুক্ষণ পরে হাতের চাপ বুকে বসিয়া যায়, এবং তাহাতে আস্তে আস্তে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলের কাজ ব্যাহত হয়। ফলে নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট হয় এবং সে যন্ত্রণায় গোঙাইতে থাকে বা চীৎকার করিয়া উঠে। এই গোঙানীর বা চীৎকারের শব্দ কানে যাওয়া মাত্রই পাশে কেহ থাকিলে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জোরে ঠেলা মারিতে হয়। তাহাতে সে জাগরিত হয়, আর বুক হইতে হাত সরাইয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বাসকষ্টজনিত সমস্ত যন্ত্রণারও উপশম হয়। ইহাকে কেহ কেহ "বোবা-ধরা" রোগও বলে। যাহাদের এই অভ্যাস আছে, তাহাদের পক্ষে চিৎ হইয়া না শোয়াই ভাল।

এই শ্বাসকষ্ট চলার সময় কেহ কেহ আবার বিভীষিকাময় স্বপ্নও দেখিয়া থাকে বলিয়া শুনিয়াছি। তাহারা দেখে কোন বিকটদর্শন লোক যেন গলা টিপিয়া ধরিয়াছে বা মারিবার উপক্রম করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সব বিভীষিকাময় দৃশ্য নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাস-কষ্টেরই প্রতীক মাত্র।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা-৯।

॥ 'য' ফলা সম্পর্কে ॥

(উত্তর)

সম্পাদক মহাশয়,

গত শুক্রবারের 'অমৃত'তে (৭ই ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) শ্রীমনোমোহন বিশ্বাস মহাশয় 'জানাতে পারেন' বিভাগে 'য' ফলার অনুপস্থিতিতে যে 'য' ফলার উচ্চারণ-এর উদাহরণ দেখিয়েছেন সেগুলো শুধু উচ্চারণের সুবিধার জন্য বলে অনেক কিছুই শ্রীবিশ্বাস বলেন নি। অর্থাৎ পলায়ন-বৃত্তি অবলম্বন করে-ছেন।

'খেলা', 'মেলা' প্রভৃতি উচ্চারণ করতে যে 'খ্যালা' 'ম্যালা' বলে তা যে 'এ' কারের বিকৃত উচ্চারণ তা বলা বাহুল্য। ইংরাজী 'Cat' শব্দের 'a' এর ন্যায় এখানে খ্যালা, ম্যালা উচ্চারিত হয়েছে এ কথাটি জানালে বাধিত হতাম।

আলোচনা কালে সম্পূর্ণভাবে আলোচ্য বিষয় আলোচিত হওয়াই কাম্য।

শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়,
১০৫, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-৯

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
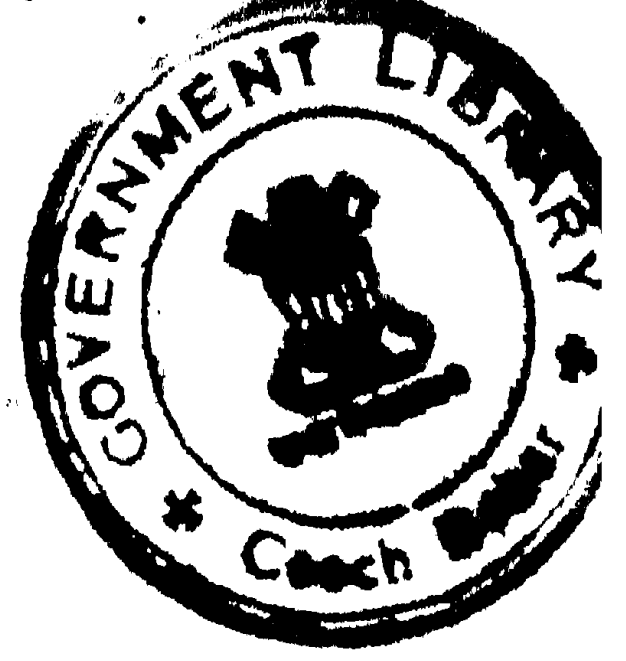
[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শাশুড়ী যতই চুপ করে থাকুন এবং হেম যতই ভাত-কাপড়ের ভরসা দিক, কনকের বুকের মধ্যে যেন ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে থাকে তরুর অবস্থাটা চিন্তা করে। কিছুতেই সে স্বস্তি পায় না; তরুর দিকে চোখ পড়লেই চোখে জল এসে যায় তার।

হয়ত এতটা উদ্বেগ অকারণ, কিছুই হয়ত হবে না শেষ পর্যন্ত, হয়ত ওবেলাই মিটে যাবে সব—তবু একটা আকারহীন অজ্ঞাত আশংকায় কণ্টকিত হয়ে থাকে সে। মনে হয়, এ ঠিক হচ্ছে না; তাদের তরফ থেকে কিছু একটা করা দরকার, যেমন করেই হোক এটা মিটিয়ে নেওয়া দরকার। যদি—যদি শেষ পর্যন্ত হারানেরও বিষ-নজরে পড়ে যায় তরু এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে?

দোষ তরুর নেই সত্যি কথা—কিন্তু পুরুষের মন কি সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার ধরে চলে!

তা যদি চলত তবে কনকেরই বা এ অবস্থা হবে কেন?

কনকের এতটা উদ্বেগের কারণ যে ঐখানেই।

তার নিজের কথা ভেবেই তরুর জন্য এত দুশ্চিন্তা।

আহা যে পেয়েছে, যে সুখী হয়েছে সে আর না হারায়, সে সুখ থেকে না বঞ্চিত হয়।

পোড়া ঘায়ের ক্ষতটা তরুর বুকের ওপর আর কনকের বুকের মধ্যে—আজও সমান দগদগ করছে।

অথচ তার এ কথা কাউকে বলবার নয়—জানাবার নয়। কাউকে খুলে বলতে পারলেও হয়ত একটু শান্তি পেত সে। কিন্তু কী বলবে? তার এ অদ্ভুত অবস্থা—ত্রিশঙ্কুর মতো স্বামীর হৃদয়াকাশে ঝুলে থাকা কে বুঝবে? হয়ত বলবে বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা! সহানুভূতির পরিবর্তে উপহাসই করবে তারা। কিংবা শেষ পর্যন্ত তারই দোষ দেবে—বলবে তারই অক্ষমতা, স্বামীর মন সে দখল করতে পারেনি। মেয়েমানুষের পক্ষে চরম অপমানের কথা এটা। আরও সেই কারণেই সে কাউকে বলে না, নিজের বাবা-মার কাছেও না। তাঁরা জানেন, বোধহয় সবাই জানে [illegible] সুখী, স্বামী-সোভাগ্যবতী।

আর বাস্তবিকই—সে যে কী—সৌভাগ্যবতী না দুর্ভাগ্যবতী—তা সে

যে নিজেই বুঝতে পারে না এক এক সময়। কারণ ঠিক স্বামী-পরিত্যক্তা বলতে যা বোঝায়—এদেশে মেয়েরা যাকে বলে 'বর নেয় না'—সে অবস্থাও তো তার নয়। সে স্বামীর ঘরে থাকে, স্বামীর পাশে শোয়, স্বামী তাঁর সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা দাবী করেন, হাতে হাতে পান জল কাপড় জামা যুগিয়ে দেয় সে—প্রয়োজন মতো কথাও বলেন সহজেই—রাত্রে শোবার পর পা টিপে দেয় সে, সে সেবাটা তিনি অত্যন্ত আরামের সঙ্গেই উপভোগ করেন।

কোন অসদ্ব্যবহারও করে না হেম। এমনিতেই তার মেজাজটি ইদানীং একটু রুক্ষ হয়েছে—সেটা মা বোন সকলের সঙ্গে ব্যবহারেই সমান প্রকাশ পায়—হয়ত কনকের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। তেমনি, অতিরিক্ত রূঢ়তা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি, এমন নালিশও কনক করতে পারবে না। এমন কি—এমন কি বহুদিনের ব্যবধানে মধ্যে মধ্যে তাদের দৈহিক মিলনও ঘটে—তবু কনক জানে যে হেম তাকে আজও পর্যন্ত ঠিক স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রয়োজনের আসবাব এই পর্যন্ত, তার প্রতি সপ্রেম তো দূরের কথা—সকাম কোন আসক্তিও বোধ করে না। আর তা জানে বলেই ঐ দৈহিক মিলনের দিনগুলো তার পক্ষে আরও বেদনাদায়ক আরও অপমানকর হয়ে ওঠে। কে জানে কেন, তার কেবলই মনে হয় হেম তাকে মূক পশুর মতো মনে করে, আর সেইভাবেই আচরণ করে। সে দিনগুলোর অপমান ভুলতে তাই কনকের বহুদিন সময় লাগে। অথচ তার দোষ কি সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

মোটামুটি তার চেহারা খারাপ নয়—লোকে বলে ভালই। অন্তত তাই সে শুনে এসেছে চিরকাল। বয়স বরং হেমের তুলনায়, মানান-সই যা, তার চেয়ে অনেকটাই কম। তার বিয়ের সময় এ নিয়ে আত্মীয়মহলে অনেক কথা উঠেছিল। কিন্তু অত বিচার করা সম্ভব ছিল না তার বাবার, অনেকগুলি বোনের একটি সে। তার দিদির বিয়েতেই তার বাবা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, এই যা পাত্র পেয়েছেন তিনি, ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তা হোক, কনকের অন্তত সেজন্য কোন নালিশ ছিল না। বয়স যাই হোক—সে বয়সের ছাপ হেমের মুখে আজও পড়েনি। যথেষ্ট রূপবান সে, বিয়ের পরের দিন দিনের আলোয় বরকে দেখে কনকের মন তৃপ্তিতেই ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। বর রান্নাঘরে শুতে চেয়েছিল—সম্ভবত ফুলশয্যা সম্বন্ধে কোন মোহ বা ভুল ধারণা না কনকের হয় সেই জন্যই। সেদিনটা মা বোন বকাবকি ক'রে ঠেকালেও পরের দিন থেকে আজও সে রান্নাঘরেই শুচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে সে কথাও বলেনি দীর্ঘকাল, খুব প্রয়োজন ছাড়া, কোন প্রণয়-সম্ভাষণ তো দূরের কথা। ওর বাপের বাড়িতে শিখিয়ে দিয়েছিল স্বামীর পা টিপতে হয়—সেই মতো সব লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সে নিজে থেকেই পা টিপতে শুরু করেছিল। কোন বাধা দেয়নি হেম। কোন সেবাতেই তার অরুচি নেই—সবই তার প্রাপ্য বলে গ্রহণ করে। অথচ কনকেরও যে কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে, তাকেও যে কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত সেইটে তার মাথাতে ঢোকে না। ও শুনেছে ওর মেজ ননদের মুখে ওদের মাসশাশুড়ির কথা, মেসোমশাই ফুল-শয্যার দিন মধ্যে বালিশ রেখে শুয়েছিলেন, জীবনে কখনও গ্রহণ করেন নি স্ত্রীকে। সেই মেসোমশাই নাকি বুড়ো বয়সে রক্ষিতা হারিয়ে সেবা নেবার জন্য স্ত্রীর কাছে এসে উঠেছেন।

এই রকমই এদের ধারা নাকি? কনক ভাবে মধ্যে মধ্যে—আর সে সম্ভাবনার কথা মনে হলে শিউরে ওঠে।

অবশ্য আগের অত কঠোরতা আর নেই। কথাবার্তা অনেকই হয় আজকাল। এমন কি সাংসারিক পরামর্শও কোন কোন সময় নিজে থেকেই যেচে নেয় তার কাছে। এর মধ্যে একদিন কনকের শরীর খুব খারাপ হতে মৌড়ির হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দিয়েছিল শাশুড়ীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। মেয়েদের অসুখ হ'লে ডাক্তার দেখাতে হবে কি ওষুধ খাওয়াতে হবে—এটা শ্যামার মতে বাড়াবাড়ি। বৌদের জন্যে আবার এত। একটা যাবে আর একটা হবে। 'বেঁচে থাক আমার মোহনবাঁশী কত শত মিলবে দাসী!' ঠিক ওর সম্বন্ধে এসব কথা না বললেও অপর বৌদের সম্বন্ধে এসব মন্তব্য করতে শুনেছে কনক—সুতরাং তাঁর মনোভাব জানতে বাকি নেই।

কিন্তু এতেও তৃপ্ত নয় কনক। সে জানে যে এটা নিতান্তই মায়া, স্নেহ। পাখী পুষলেও মায়া হয়—এ তো মানুষ। সে যে দিয়েছে অনেক। এ সংসারে ঢুকে পর্যন্ত দিনরাত পরিশ্রম করছে, নীরবে প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে যাচ্ছে, ওর জন্য একটুখানি অন্তত করতে বাধ্য হেম।

আসলে হয়ত তার বিধবা মেজ ননদ

ঐন্দ্রিলাই বিষিয়ে দিয়ে গেছে তার মন। তা নইলে হয়ত এতটা মাথা ঘামাত না। ঐন্দ্রিলা তাকে গোপনে সব কথাই বলে গেছে। এই রেল অফিসে ঢোকবার আগে নাকি হেম থিয়েটারে চাকরি করেছিল কিছুদিন। সেইখানে নলিনী ব'লে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে খুব প্রেম হয় ওর। পাগল হ'তে বসেছিল। সেইটে হাতে-নাতে ধরা পড়েই নাকি সে চাকরি যায়। কিন্তু তবু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যায়নি —তাও জানে ঐন্দ্রিলা। কনকের বৌ-ভাতের দিনও তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং সেও এসেছিল। 'গরদের শাড়ি পরে এসে সোনার জিনিস দিয়ে মুখ দেখে গেল—মনে নেই তোমার?' প্রশ্ন করেছিল ঐন্দ্রিলা।

খুবেই মনে আছে কনকের। কারণ সে মহিলার চালচলন বেশভূষা সবই ছিল উপস্থিত সমস্ত অভ্যাগতা থেকে স্বতন্ত্র। তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ও বিব্রত ছিল হেম—তাও লক্ষ্য করেছে কনক, ঘাড় হে'ট ক'রে বসে থাকা সত্ত্বেও। আরও মনে আছে এই জন্যে যে তাকে নিয়ে বড় ননদের শ্বশুরবাড়ির মধ্যে বেশ একটা চাপা গুঞ্জরণ উঠেছিল। মহাশ্বেতার মেজ জার হাসি আর মন্তব্যটা কনকের আদৌ ভাল লাগেনি। তখনই কেমন খটকা লেগেছিল।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা ঐখানেই থামেনি।

আরও কিছু বলেছিল কনককে।

ঐন্দ্রিলা অদ্ভুত, তাকে দেখলে ভয় করে ওর, সাক্ষাত হুতাশনের মতো জ্বলে ও জ্বালিয়ে বেড়ায় সর্বদা। ওর সম্বন্ধেও যে তার কোন প্রীতি নেই তাও কনক জানে। আসলে কেউ সুখে আছে এটা সুদূর কল্পনাতে অনুমান করলেও জ্বলে ওঠে সে। সে সুখের মূলসুদ্ধ উৎপাটিত না করা পর্যন্ত যেন তার শান্তি থাকে না।

সেইজন্যই এত কথা বলেছিল ওকে ঐন্দ্রিলা—প্রীতিবশত নয়।

স্বামী যে তাকে ভালবাসে এমন অসম্ভব দুরাশা যেন কনক কখনও না পোষণ করে। এইটেই বার বার বোঝাতে চেয়েছিল সে।

হেমের মন পড়ে আছে বহু দূরে।

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে চেয়ে চোখ ধেঁধে আছে তার। পতঙ্গের মতো সেইদিকেই শুধু লক্ষ্য—সামান্য মাটির প্রদীপ কনকের সাধ্য নেই যে সে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

ওর মাসতুতো দাদা গোবিন্দর দ্বিতীয়পক্ষের • বৌ রাণীই সেই জ্যোতিষ্ক।

ইদানীং দীর্ঘকাল ধরে তার জন্যেই নাকি ঐন্দ্রিলার দাদা পাগল। সে নাকি মহা খেলোয়াড় মেয়ে, ধরাও দেয় না ছেড়েও দেয় না, শুধু অবিরাম খেলায়। হেমও নাকি বেশী কিছু চায় না—তাকে দেখে তার কথা শুনেই সে মুগ্ধ। সেইটুকু পেলেই খুশী সে। আর সেটুকু পাবার কোন বাধাও নেই। তাই সে মোহ খুব তাড়াতাড়ি ঘুচবে হেমের এমন অসম্ভব আশা যেন কনক না করে।

রাণীদিদিকে দেখেছে কনক। মুগ্ধ হবার মতোই মেয়ে।

শুধু রূপেই নয়—রূপসী মেয়ে কনক আরও দু একজন দেখেছে, কিন্তু তারা যেন পুতুলের মতো, আলতো সন্তর্পণে রেখে রূপ বাঁচাতেই তারা ব্যস্ত, প্রাণহীন অহংকারের পুতুল

এক একটি। কিন্তু রাণীদি তেমন নয়— কারুর মতোই নয়, সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অত উজ্জ্বল প্রাণশক্তি আর কারুর মধ্যে দেখেছে বলে কনকের মনে পড়ে না। হাসিতে-খুশীতে, কথায়-বার্তায় কাজে-কর্মে অনন্যা সে।

যদি সত্যিই সে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে থাকে হেমের, তার মন যদি সেখানে বাঁধা পড়ে থাকে, তাহলে কনকের বিশেষ কোন আশা নেই তা সেও বোঝে।

তাই তার আরও হতাশা, আরও অতৃপ্তি। যেটুকু পায় তাতে মন ওঠে না—ঐন্দ্রিলার দেওয়া বিষ তার ক্রিয়া করেছে মনে, সে কেবলই দেখে স্বামী তার সম্বন্ধে বিশিষ্ট না হোন—উদাসীন।

তাই অন্তর তার তৃষ্ণার্ত হয়েই থাকে। আর কেবলই মনে হয় বিবাহিতা মেয়েদের সব সুখ-সৌভাগ্যের বড় কথা হ'ল স্বামী-সোহাগ, তা থেকে যেন কোন দুর্ভাগিনী কখনও বঞ্চিত না হয়।

যে কখনও পায়নি তার কথা তবু আলাদা, যে একবার পেয়েছে সে তা হারিয়ে বাঁচে কি করে!

ঐন্দ্রিলা ওর মহাসর্বনাশ করেছে জেনেও তাই কনক তাকে মার্জনা করে। বোঝে যে এই জ্বালাই তার স্বাভাবিক। বিশেষ দোষ নেই, বেচারী!

আজ তাই তরুর জন্যও ওর এত দুশ্চিন্তা।

বেলা বারোটা নাগাদ হারানের গলা পাওয়া গেল বাইরে।

'দাদা আছেন নাকি, দাদা?'

হেম ঘরেই ছিল, অফিস যাওয়া তার হয়নি, সে-বেলা উৎরে গিয়েছিল, আর বোধহয় যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও ছিল না। সেই সময় কনক তরুকে ঠেলে ঘাটে পাঠাবার পর সেই যা কটা কথা বলেছিল হেম, তারপরই আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আর ওঠেওনি কথাও বলেনি কারুর সঙ্গে। স্নানাহারের তো প্রশ্নই ওঠে না। শ্যামা অবশ্য বসে নেই, তাঁর অভ্যস্ত কাজ ঠিকই ক'রে যাচ্ছেন কিন্তু সে কতকটা কলের পুতুলের মতো, তাঁরও যে বেলার দিকে নজর আছে তা মনে হয় না।

ভোরের রান্না বাদে সাধারণ গৃহস্থের যা রান্না কনকই করে। আজ যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সে-পর্ব শেষ ক'রে তরুকে ধরে এক রকম জোর করেই এক গাল ভাত খাইয়ে দিয়েছে—তারপর থেকে সে-ও চুপ ক'রে বসে আছে দাওয়ায়। হেমের এই অবস্থায় স্নান করতে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত হবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না সে। হয়ত মারই একসময় খেয়াল হবে, তিনিই বলবেন। অথবা শেষ পর্যন্ত হেমই উঠবে। কনকেরও সমস্ত মনটা ভারী হয়ে আছে, এদিকে বিশেষ তাগিদ নেই। তাই চুপ ক'রে অপেক্ষাই করছে সে ঘটনার গতি স্বাভাবিক ভাবে আবর্তিত হবার।

হারানের গলা পেয়ে সে-ই ছুটে বাইরে এল, 'ঠাকুরজামাই যে, কী ভাগ্যি! আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। অমন পরের মতন বাইরে থেকে ডাকছেন কেন?'

কনকই যে আগে বেরিয়ে আসবে তা বোধহয় ভাবেনি হারান, সে একটু থত-মত খেয়ে গেল। কোনমতে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'আর বৌদি, ব্যাপার গতিকে পরই হ'তে বসেছি!'

তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি আর এখন ভেতরে যাব না, আপনি দয়া করে আপনার ছোট ননদকে বলুন যে, কেলেঙ্কারী যা হবার তা তো চরম হ'ল, বাকী তো কিছু রইল না। এখন তার যদি সে ঘর করবার ইচ্ছে থাকে তাহলে এখুনি এই দণ্ডে আমার সঙ্গে যেতে হবে। তা নইলে সে-মুখো যেন আর কখনও না হয়।'

'ছি ছি! কী সব বলছেন ঠাকুর-জামাই। বেশ তো, তাই না হয় হ'ল—তা একটু ভেতরে আসতে দোষ কি! জামাই মানুষ, বাইরে দাঁড়িয়ে এমন করে ভরদুপুরবেলা—! চলুন চলুন। যা বলবার আপনিই বলুন না তাকে, আমরা কেন আর নিমিত্তের ভাগী হই!'

'না না, ওসব আদর-আপ্যায়ন এখন থাক। ওসব আমার এখন ভাল লাগছে না। আপিস কামাই হ'ল মিছিমিছি—। আবার এই ঠেকা রোদ্দুরে এতটা পথ যেতে হবে!'

'তাই তো বলছিলুম, নেয়ে খেয়ে বেলা পড়লেই না হয় যাবেন। আপিস তো গেলই, শুধু শুধু এখনই ছুটে লাভ কি! আসুন আসুন, একটা কথা রাখুন, আমি আপনার গুরুজন হই—তায় কুটুম, আমার কথা রাখতে হয়।'

বোধহয় চক্ষুলজ্জা এড়াবার জনাই, একেবারে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল

হারান। তারপর একটু চেষ্টাকৃত কর্কশ কণ্ঠেই বললেন, 'মাপ করবেন বৌদি, যদি ছোটবড় কথা বলে ফেলি। কুটুম্ব কিসের, বোয়ের সম্পর্কেই তো। এ কুটুম্বিতেয় আমার আর রুচি নেই। আপনি দয়া ক'রে ওকে গিয়ে বলুন—আমি ঠিক ঘড়িধরা আর-পাঁচ মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। এর মধ্যে যদি আসতে পারে—আর থাকতে চায় তো আসবে, নইলে এই শেষ!'

ওর ভাবভঙ্গি দেখে এই উদ্বেগের মধ্যেই হাসি পেয়ে গেল কনকের। যেন যাত্রার দলের সেনাপতি। মনে পড়ল হারানের থিয়েটার করার খুব সখ, পাড়ার ক্লাবে খুব নাকি নামও ওর।

হাসি পেল বলেই বোধহয় অপমানটা গায়ে লাগল না। সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হয়ত হাতটাই ধরত শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার আগেই হেম বেরিয়ে এল। একটা দুসুতির থান-ছেঁড়া জড়িয়ে শোয় সে রাত্রে (অফিস থেকে নিয়ে আসা), সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়াল ভগ্নিপতির সামনে।

'পাঁচ মিনিটও তোমার থাকবার দরকার নেই, তুমি এখনই পথ দেখতে পার। কী করতে যাবে আমার বোন সেখানে আবার শুনি—খুন হ'তে? শেষ ক'রেই তো এনেছিলে দুজনে মিলে, এখনও যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করছে কণ্ঠার কাছে, সেটুকুও না নিঃশেষ করতে পারলে বুঝি তোমাদের দিদি-নাতির মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে না? রাস্কেল কমুনেকার! আবার মেজাজ দেখানো হচ্ছে। তোমাদের পুলিশে দিতে পারি জান? তোমাকে আর তোমার ঐ ডাইনী ঠাকুমাকে! আর তাই দেওয়াই উচিত। নইলে আরও কার কি সর্বনাশ করবে তার ঠিক কি!...তুমিও যেমন, ঐ রাস্কেলকে আবার মিষ্ট কথায় ঘরে ডাকছ!'

হারান হেমের এই উগ্রমূর্তিতে কেমন যেন একটু নরম হয়ে এসেছিল গোড়ার দিকটায়, কিন্তু দু-দুবার 'রাস্কেল' শুনে তার মুখও অগ্নিবর্ণ ধারণ করল। সে বলল, 'বেশ তো তাই দিন না, পুলিশেই দিন না, দেখি কত মুরোদ! থানাপুলিশ আমরাও করতে জানি। সে কোমরের জোর আমাদের আছে...যা ঢ্যাটা আপনার বোন! বাড়িতে ঠাকুমা দিদিমা থাকলে অমন একটু-আধটু শাসন করেই। তার জন্যে কোন ভদ্দরলোকের মেয়ে ভাতের ওপর ঠ্যাকার করে না খেয়ে পড়ে থেকে এমন হুট্‌ ক'রে একা একা চলে আসে তাই শুনি। এ তো কুলত্যাগ করা। আর কেউ হ'লে ঘরে নেবার নাম করত না। পাড়াঘরে শুনলে বলবে কি? আর শুনতেই কি বাকী আছে! কেলেঙ্কারে যে মুখ দেখাতে পারব না আমরা।—তবু তো ঠাকুমার অনেক সহ্য—বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, এবারের মতো মাপ কর, ওকে নিয়ে আয়। ঠাকুমা এখনও এ বাড়িকে চেনেনি তো!...বেশ, থাক না আপনার বোন এখানে। চিরদিনই পুষুন। হয়ত কাজেও লাগাতে পারবেন। কিন্তু মনে থাকে যেন সে দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হ'ল। এই শ্বশুরবাড়িতে লাথি মেরে আমি চলে যাচ্ছি।'

সে হন হন ক'রে বেরিয়ে গেল।

......তুমি এখনই পথ দেখতে পার

হেম প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধরে ছুটে যাচ্ছিল। বোধকরি গিয়ে গলা টিপেই ধরত। কনক সব লাজলজ্জা ভুলে পেছন থেকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল, 'করছ কি! হাজার হোক ও জামাই! একদিন হাটু ধরে ওর হাতে বোনকে তুলে দিয়েছ। ও শত অপমান করলেও আমাদের সয়ে যেতে হয়। বোনের কথাটাও ভাব, ওর যে সারা জীবন এখনও সামনে পড়ে।'

অগত্যা হেম নিরস্ত হ'ল। ততক্ষণে হারানও ওদের বাগান পেরিয়ে একেবারে বাইরে রাস্তাতে গিয়ে পড়েছে—ছুটে যাওয়াও আর সম্ভব নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ততক্ষণে অগ্রুমুখী তরু বেরিয়ে এসেছে।

'আমি যাই বৌদি, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। যদি আর দেখা না হয়, দোষঘাট যা করেছি, মাপ করো—

কিন্তু সে আর এগোবার আগেই হেম ওর একখানা হাত চেপে ধরলে, 'খবরদার! এক পা বাড়ালে পা কেটে দু টুকরো করে ঐ পগারে ফেলে দেব। তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। ...কতবড় ছোটলোক! শ্বশুরবাড়ি লাথি মেরে চলে গেল, আর তুই এ বাড়ির মেয়ে হয়ে সেখানে বাঁদি শেষে ঘর করতে।...আবার বলে কিনা—কাজেও লাগাতে পারেন! আমি ওদের মতো বোনকে দিয়ে রোজগার করাই কিনা!—হাতোর ছোটলোকের ঝাড়!...... থাক তুই, মনে করব তুইও খেঁদির মতো বিধবা হয়ে এসেছিস!'

(ক্রমশঃ)

বন্ধুর এ পৃথিবী

৩০-৮-৬২ ইং

কে জাগে ?

ভারতের ষোড়শ রাষ্ট্র । নাগা ভূমি

ছেড়ে দিলাম পথটা ! --- তাই ওদের--বদলে গেল মতটা !

বেল্লা

খেদা

আলজিরিয়া

এশিয়ান গেমস জাকার্তা

কীজানি কী হোলো আজি · জাগিয়া উঠিল প্রাণ --- দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান !

বিচিত্র দেশ: বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদার

॥ একের বদলে ছয় ॥

গ্রাম-পঞ্চায়েতের সামনের গাছতলায় একটু দূরে বসে আছে কজন লোক. লম্বা পাইপে করছে ধূমপান দেশজ দা-কাটা কড়া তামাক ঠেসে নিয়ে। নিজেদের মধ্যে তারা গল্পগুজব করছে, তামাক পাতা চিবোচ্ছে মেজাজের মাথায়. কেউ বা আপন মনে মাটিতে আঁচড় কাটছে অন্য সবার থেকে আলাদা হয়ে। এরা সবাই এসেছে পঞ্চায়েতের বিচারের রায় শুনতে। কেউ বা নিজে আসামী. কারও ভাই-বেরাদর পড়েছে বে-কায়দায়. কেউ বা নিছক দর্শক।

একজন কেবল এদের থেকে দূরে একলা একটা গাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে। সকলের নজর পঞ্চায়েতের দিকে, এর নজর পঞ্চায়েতের সামনে বিচার-প্রার্থিনী একটি যুবতীর দিকে।

যুবতীটি বসে আছে তার সমবয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে, আশে পাশে তাদের মা-মাসিরা। তারাও তামাক টানছে লম্বা পাইপে, তামাক পাতা চিবোচ্ছে থেকে থেকে, হঠাৎ হেসে উঠে ঢলে পড়ছে এ-ওর গায়ে। শুধু বিচারপ্রার্থিনী মেয়েটিই এদের মধ্যে থেকেও আনমনা, চোখ চলে যাচ্ছে থেকে থেকে সেই দূরের গাছটির ছায়াশীতল অন্ধকারে উপবিষ্ট যুবকটির দিকে। তারা দুজনেই দলে থেকেও একাকী, আবার একাকী হয়েও দুজন।

গাঁওবুড়োর নেতৃত্বে পঞ্চায়েতের বিচারকরা বসেছেন এবার দৃঢ় হয়ে, মুখে নির্বিকার এবং নিরপেক্ষ গাম্ভীর্য —পৃথিবীর সব দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বপ্রধান বিচারকদের চেহারা যেমন হয়—এদের সঙ্গে সেইসব দেশের বিচারকদের কারোও সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।

গাঁওবুড়ো গলাটা ঝেড়ে নিয়ে যুবতীর নাম ধরে ডাকলেন। মেয়ে-পুরুষ দু-দলেই ভিড়টা একটু নড়ে চড়ে আলগা হয়ে নিয়ে আবার শক্ত হল, দৃঢ় হল। সকলের চোখের সামনে দিয়ে হংসগমনা রমণীটি হেঁটে গিয়ে সোজা হয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়ালো। বিচারক একটু বিব্রত হলেন। বছর তিনেক আগে এই মেয়েটিই না পঞ্চায়েতের সামনে বিবাহের অনুমতি নিতে এসেছিল? গাঁওবুড়োকে না

পাত্রীর দাদা, সম্প্রদানের পোশাকে

নেমন্তন্ন খাইয়েছিল মাংস এবং মদ দিয়ে এর বাবা-মা, কাকা-দাদারা? এর স্বামীকেও তো মনে পড়ছে—সুস্থ সবল কর্মঠ জোয়ান যুবক। কী হল এর? এ বিচার চাইতে এসেছে কেন?

—কী হয়েছে তোমার বল দেখি? কি তোমার নালিশ?

—'আমি বিবাহ বিচ্ছেদ চাই।' শান্ত গলায় উত্তর দিল মেয়েটি।

—তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বনছে না? সে কি অন্য কাউকে বিয়ে করেছে? কেন তাকে ছাড়তে চাও।

—সে বড় নিষ্ঠুর, বড় দায়িত্বজ্ঞান-হীন।

—কি সে করেছে, যার জন্যে আর তুমি স্বামীর ঘর করবে না?

—সে ছেড়ে চলে গেছে আমাকে আজ দু'বছর হল, এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে সাদা চামড়ার দেশে খালাসী হয়ে —আর সে আসবে না আমি জানি। আমাকে খাওয়াবে কে? আমাদের নিয়ম তো আপনি জানেন, বিয়ে করলে স্ত্রীকে **খেতে পরতে দিতে হবে, তাকে ভরণ-**

পোষণ করতে হবে আজীবন। সে তো তা করছে না, আর করবে না। আমি কেন তবে তার স্ত্রী হয়ে থাকব?

লোকটিকে এবার বিচারকের মনে পড়ল। সে ছিল একজন ব্যবসায়ী, শহরে লেখাপড়া শিখেছিল সামান্য, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ানো এবং সওদা ফেরি করা ছিল তার জীবিকা। হয়ত অন্য গাঁয়ে অন্য কোন গ্রামবালিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণিগ্রহণ করেছে। হয়ত সত্যি সত্যি জাহাজের—

—তোমার স্বামী যখন গ্রাম ছেড়ে গেল তুমি তার সংগে গেলে না কেন?

—আমার—আমার সন্তান তখনও জন্ম নেয়নি—সে তখন—। সেজন্যে আমি তার সংগে যাইনি, আমার বাপের বাড়ির লোকের সংগে আমি থাকতে চেয়েছিলাম। সেরকমই নিয়ম।

বিচারক জানেন প্রথম সন্তান জন্মের সময় মেয়েদের বাপের বাড়িতে থাকাই এদেশের নিয়ম। তাছাড়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দূরে দেশে যাওয়ার পথের কষ্ট হয়তো মেয়েটি সহ্য করতে পারতো না।

—তুমি যে এসব কথা বলছ, তোমার কোন সাক্ষী আছে?

—না। আমি যা বললাম তা সত্যি। আপনি বিচারক, বিচার করুন। আপনি তো জানেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা!

বিচারক আবার প্রশ্ন করলেন—সে কি তোমাকে টাকা কড়ি কিছু পাঠায় না?

—আজ্ঞে না। আমি একটা ছোট্ট খোড়োঘরে থাকি, পথের ধারে ছেলে নিয়ে বসে হাড়ের মালা বিক্রি করি। আমাকে দেখাশোনার কেউ নেই। আমি বিবাহবিচ্ছেদ না পেলে কেউ আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে না।

বিচারক একটু ভাবলেন। তিনি জানেন মেয়েটির অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষী-সাবুদ যেমন নেই, মেয়েটির স্বামীর পক্ষেও প্রতিবাদ করার কেউ নেই। মেয়েটি মিথ্যা বলছে না, এই মেয়েরা মিথ্যা বলে না। বিচারক রায় দিলেন। "যাও। তুমি পূর্বের বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত। তোমার পূর্ব স্বামীরও তোমার ভরণপোষণের কোন দায় থাকলো না। তুমি এখন স্বাধীন।"

সঙ্গিনীরা সবাই বিদায় নিল। গাছের তলে বসে থাকা দর্শকের দলও চলে গেল অরণ্যের গভীরে। মেয়েটি তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেই একলা গাছের নীচে ছায়ার গভীরে দণ্ডায়মান যুবকটির দিকে। যুবকটি এগিয়ে এল স্মিত হাস্যে, হাত ধরলো মেয়েটির, চোখে চোখ রেখে নরম গভীর গলায় ডাকলো—"মিমা!"

ধরা গলায় মেয়েটি ছেলেটির বুকে মাথা রেখে ডাকলো—"আমাডু!" আস্তে আস্তে মেয়েটি বলে—"সব ঠিক হয়ে গেছে। বিচারক আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।"

ছেলেটি আশ্বস্ত হল। 'এখন তুমি তবে বাড়ি যাও। তোমার সেই কুঁড়ে ঘরে। তিনদিনের মধ্যে আমি তোমার কাছে সরকারীভাবে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। এর মধ্যেই আমাদের আস্তানা ঠিক করে নিতে হবে, সংসার নিতে হবে সাজিয়ে।'

আস্তে আস্তে আলিঙ্গন শিথিল হল। মেয়েটি ধীরে ধীরে চলে গেল বাওবাব গাছের অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ছোট পায়ে-চলা পথে ছেলেটি অন্য দিকে।

না, এ-কাহিনী হলিউডের নয়। য়ুরোপের কোন প্রগতিবাদী দেশেরও নয়। এ ঘটনা হ্যসাল্যাণ্ডের—পাগানদের প্রতিবেশী হ্যসারা। সেই পাগানরা—যাদের ঘরে রাধা আনতে ছাগল দিয়ে সাধাসাধি করতে হয়। তাদেরই এক প্রশাখা এই হ্যসারা!

আফ্রিকার নাইজেরিয়ায় তিন শাখায় বিভক্ত তিন দল আদিবাসী—পাগান, ফুলানী এবং হ্যসা। খাঁটি হ্যসারা—অর্থাৎ যাদের ঘরে পাগান বা ফুলানী মা-বউ নেই—তারা অত্যন্ত কালো, অবশ্য তীরবাসী নিগ্রোদের চেয়ে কম বলিষ্ঠ, কিন্তু পাগুলি খুব লম্বা আর হ্যসারা হাঁটতেও পারে খুব। মুখ সাধারণভাবে লম্বাটে ধরণের, চিবুক সরু, পাগানদের মাথার মত গোলাকৃতি মাথা নয় অনেকটা নারকোলের মত লম্বা গড়নের। পায়ের মত হাতও দেহের তুলনায় লম্বা এবং পেশীবহুল। হ্যসাদের খাঁটি প্রশাখার সংখ্যা এখন কয়েকটি গ্রামেই সামান্য কয়েকটি পরিবারেই সীমাবদ্ধ। এরা স্বভাব-ব্যবসায়ী এবং নাইজেরিয়ার নানা অঞ্চলে সওদা ফেরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেই সূত্রে এরা আশ পাশের ঘোর কালো অথবা বাদামী নিগ্রোদের গৃহকন্যাকে বিবাহ করেছে, রক্তেও মিশ্রণ হয়েছে। তবুও এদের হাল্কা বাদামী ফুলানী বা ঘোর কালো পাগানদের থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়—তার কারণ এদের শরীরের গড়ন আর স্বভাব। পাশের তুয়ারেগ-কন্যাদের সংগেও এরা বিবাহবন্ধনে

পাগড়ী মাথায় হ্যাসা পুত্র

আবদ্ধ হয়; —এই তুয়ারেগরা কিন্তু আদৌ নিগ্রোবর্টুর অন্তর্গত নয়।

হ্যাসারা ধর্মে মুসলমান এবং পাগান বা ফুলানীদের তুলনায় অনেক শিক্ষিত। লেখাপড়া শেখাটা গত পাঁচের কুড়ি বছর ধরে এদের মধ্যে একটা নেশার মত ছড়িয়ে গেছে, সেজন্য এখন বৃদ্ধ পিতামহরাও চান তার পৌত্র যেন লেখাপড়া শিখে 'মানুষ' হয়। তাই মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে পিতারা অধিক মনোযোগী। দু'-তিন বছর বয়স হতে না হতেই হ্যাসা হরিহর-রা তাদের ঘরের জাদুদের গ্রাম্য পাঠশালায় মৌলভীর কাছে পাঠিয়ে দেন অথবা নিজেই খেজুর পাতার চাটাইয়ে বেত হাতে বসে যান ছেলেকে মানুষ করতে। সেই বয়সেই তারা অক্ষর চিনে যায় এবং দশ বারো বছরের বয়স্ক হ্যাসা বালককে পাওয়া যাবে যারা সমগ্র পবিত্র কোরাণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আউড়ে যেতে পারে।

এই হচ্ছে হ্যাসা বালকদের প্রাইমারী পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বাপ তাকে দেন রিগা, পাগড়ী এবং একজোড়া পায়জামা। বাজার থেকে এসব কিনে আনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন একটা গরু কিম্বা মদ্দা ভেড়া নিয়ে। তারপর পাড়া প্রতিবেশী ভাই-বেরাদরদের ডেকে বাপ বলেন, 'আজ আমার ছেলেকে তোমাদের সকলের সামনে লায়েক ঘোষণা করব।' লায়েক ঘোষণার পর পুত্র পিতার হাত থেকে পায় পবিত্র কোরাণের একটি খণ্ড—একটি বড় থলির মধ্যে সেই গ্রন্থ থাকে মহাসমাদরে। পুত্রকে তারপর সকলের সামনে উচ্চৈস্বরে কোরাণের শ্লোকগুলি শোনাতে হয়।—সবাই তারিফ করলে সে তখন ব্যাখ্যা-টীকা বোঝার জন্য যায় গাঁও-বুড়োর কাছে তার পরদিন থেকে। সেদিনের অনুষ্ঠান সেখানেই শেষ—অবশ্য অনুষ্ঠানের শেষে সেদিন বাজার থেকে কিনে-আনা বৃক্ষের জীবটির সদ্ব্যবহার করা হয় মহোৎসাহে।

বিবাহ-বাসরে পাত্রের মা

হ্যাসা বালকদের কেন জানি না, সবচেয়ে আগ্রহ দর্জির কাজ শেখার ব্যাপারে। সেজন্য গাঁওবুড়োর কাছে কোরাণের টীকা-ব্যাখ্যা শোনার পর বছর বারো যখন তার বয়স হয় তখন থেকে সে দর্জির কাজ শিখতে শহরে যেতে-আসতে থাকে তার বাপের সঙ্গে। বাপ শহরের রাস্তায় সওদা বিছিয়ে বসে আর ছেলে যায় সামনের দর্জির দোকানে সেলাই ফোঁড়াই রপ্ত করতে। এই সেলাই শিখতে শিখতে ফোঁড়ের হিসাব রাখবার জন্য সে মোটামুটি যোগ-বিয়োগ শিখে যায়। নাইজেরিয়ার আদিবাসীদের সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণারত তাঁরা বলেছেন, দর্জির বৃত্তি নেবার জন্যে হ্যাসারা কিন্তু দর্জির কাজ শেখে না, আসলে তারা অংক শেখার জন্যেই যায় দর্জির কাছে—কারণ হ্যাসাদের ধারণা, সেলাই-এর ফোঁড়ের গোলমেলে ব্যাপার যে জানে সে নিশ্চয় অংকও ভালো জানে।

বছর দুয়েক পরে সেলাইয়ের কাজ শেখা অর্থাৎ দর্জির কাজ করতে করতে ফাঁকতালে সটকে শেখা হয়ে যাবার পর, ছেলের বয়স যখন চোদ্দ তখন সে আসে ক্ষেতের কাজ করতে। পরবর্তী এক বছর সে সর্দার-কৃষকের অধীনে তার নির্দেশ মত দিনে রাতে যখন যেমন প্রয়োজন চাষের কাজ করবে। চাষের পদ্ধতি পাগানদের মতই। রাত শেষ হলেই সে যাবে চাষীর দলের সঙ্গে, মা সঙ্গে দিয়ে দেবে ময়দাগোলা তরল, সেই খেয়ে সে কাজ করবে সারাদিন। তারপর দিনান্তে ঘরে ফিরে আবার ময়দাগোলা, নুন আর মাংস খাবে রাতের আহার হিসাবে।

এইভাবে পনের বছর পর্যন্ত ছেলের ট্রেনিং হল তিনটি বিষয়ে—বাপের

Perhaps many of the races were originally related and then disintregated, but the white man has seen them only in the process of welding together under the combined effect of common speech, common religion and common interests: You cannot oversell the Haussa; for he is oriental, as well as Negro; he knows values and is shrewdly conscious of his own needs. The trait and the uniform religion are what form the backbone of the Haussa race with a marked code which is simple but direct, kindly but unyielding."

হাসা বলতে সেজন্য কোন নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক নরগোষ্ঠী না বুঝে একটি মিশ্রজাতি অথচ ভাষা এক—এরকম একটি নরসমাজকে বুঝলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। কিন্তু মিশ্রজাতি হলেও এদের মর্যাদাজ্ঞান অথবা নিজ গোষ্ঠীর প্রতি আত্মীয়তাবোধ অন্য কোন সভ্যজাতি থেকে কম নয়। আমেরিকায় যাঁরা আদি বসতি স্থাপন করেন—পাশ্চাত্য দেশের সেই ইয়র্কশায়ারের লোক, স্পেনের ক্যাভেলিয়ার, আয়ারল্যাণ্ডের কৃষক বা ইতালীর ব্যবসায়ী—আজ তাঁদের আলাদা করে চিনবার উপায় নাই। সবাই মিলে মিশে গিয়ে আজ তাঁরা অখণ্ড আমেরিকাবাসী হয়ে গেছেন—তাঁদের ভাষা এক সংস্কৃতিও এক, ধর্মও এক। য়ুরোপ থেকে তাঁরা প্রাণধর্মে আলাদা এক বিপুল নরসমাজ। তেমনি আদিবাসী হলেও হাসারা তাদের আশেপাশের আদিবাসী সমাজের থেকে প্রাণধর্মেও যেমন পৃথক, সংস্কৃতি এবং জীবনবোধেও তেমনি

বিয়ের সাজে পাত্রী

সওদাগিরির কাজে, দর্জির কাজে এবং চাষের কাজে। ছেলে তখন সাবালক। বাপ তাকে নিজের পছন্দমত জীবিকা বেছে নিতে বলে—সে সওদাগর, চাষী কিম্বা দর্জি—যা খুশি হতে পারে। ছেলে নিজের পছন্দ মত জীবিকা বেছে নেবার পর বাপ তার বিয়ে দেন। বিয়ের পর ছেলে বৌ নিয়ে বাপের বাড়ির আঙিনাতেই একটা আলাদা ঘর বানিয়ে থাকে, খায়-দায় নিজের টাকাতেই—নিজের বৌ পোষার খরচ তার একার। শুধু রোগ ব্যাধি হলে বাপ তাকে দেখবে। উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই ব্যবস্থা। ছেলে উনিশ বছর পার হলে বাপের বাড়ির সীমানা ছেড়ে দিয়ে তাকে আলাদা সংসার পাততে হবে অন্য জায়গায়। বাপের যেটুকু সামান্য দায়িত্ব ছিল সামাজিক নিয়ম অনুসারে তা শেষ হয়ে গেল বলা চলে। ছেলে তখন ইচ্ছা করলে একাধিক বিবাহ করতে পারে—অবশ্য ক্ষমতায় কুলালে। বাপ তাতে বাধা দেবেন না, তবে বাপ প্রথম যে বিয়ে দিয়েছেন সে বউ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন সে থাকবে ছেলের সংসারে পাটরাণী। ছেলের ত্রিশ বছর বয়সে সে একেবারে আলাদা—বাপ মা মরে গেলেও সে আর দেখতে আসবে না, বাপ লক্ষপতি হলেও সম্পত্তির ভাগ নিতে আসবে না।

হাসাদের সংখ্যা নাইজেরিয়ায় এখন লক্ষাধিক কিন্তু এদের হাসা নাম থেকে এদের একটা অখণ্ড জাতি হিসাবে মনে করলে ঠিক হবে না। এ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী বলেছেন— এদের 'হাসা' নাম : "covers a language-group of varying tribes now far along the path of amalgamation into one race.

শিক্ষিতা হাসা যুবতী

বিশিষ্ট। হ্যাসাদের সঙ্গে মিশ্রণ হয়েছে পাগান্, বেয়্বেয়্, ফুলানী, খাঁটি নিগ্রো—ইত্যাদির। তবুও এরা এমন এক বিশেষত্ব নিয়ে আজও নাইজেরিয়ায় রয়েছে যাদেরকে বলা যায় আদিবাসী হলেও as human as we are।

বিচ্ছেদ দিয়ে এদের কাহিনী শুরু হয়েছিল এবার মিলন দিয়ে ছেদ টানা যাক।

হ্যাসাদের বিবাহ উৎসব পাগানদের মত নিরলংকার নয়। ধরা যাক, ফারসামাতুর সুন্দরী কন্যা মুসার সংগে উসমানের পুত্র সেনুসিসির বিয়ে,—ছাদনাতলার টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে হবে মেয়ের বাড়িতে—কম্বল দিয়ে মাটির ঘরের মেঝে সাজানো হবে—সেখানেই বিয়ের আসর।

বিয়ের আসরে প্রথমে কন্যা আসবেন না, আসবেন তার প্রতিনিধি বড় ভাই, বা বড় ভাইয়ের অবর্তমানে বংশের অন্য কেউ। প্রতিনিধির মাথায় থাকবে এক ফুটের চেয়েও উঁচু পাগড়ি, সামনে পিছনে ঝুলবে সবুজ সিল্কের টুকরো। খালি গা, কোমরে চোঙার মত পাজামা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

পাত্রও নিজের পক্ষে প্রতিনিধি পাঠাবে—সেনুসিসির সবচেয়ে ছোট ভাই আদু। মা তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবেন সাদা 'ভারবুস', সবুজ পাগড়ি এবং কালো চাদর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে। পাত্রের মা থাকবেন বিয়ের বাসরে, তাকে পরতে হবে কালো পাগড়ি, সাদা বা হলুদ কাপড় বুক থেকে কোমর পর্যন্ত। সভায় আরও থাকবে পাত্রের পাঠশালার বন্ধুরা এবং মেয়ের সখীরা।

পাত্রের বয়স ষোল, পাত্রীর তেরো।

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম? ভেড়ার মাংস, রুটি এবং কলা থেকে তৈরী এক রকম দেশজ মদ। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই এই খাদ্যে অধিকার সেই বিবাহ-দিবসে।

তারপর পাত্রী আসবে সভায়, পাত্রও। পাত্রী একটা মুরগীর ডিম ভেঙে ছড়িয়ে দেবে এক থালা ময়দার ওপর। তার সংগে মেশানো হবে ঘাসের বীজ এবং এক রকম সুগন্ধি তেল।

পাত্রীর পোশাকও লক্ষণীয়। কোমর থেকে ঘাগরার মত হলুদ এক টুকরো কাপড়, বুকে সবুজ জামা। গয়নার মধ্যে তাকে রাজহাঁস এবং রুপোর মুদ্রা দিয়ে গাঁথা মালা ঝোলানো থাকবে গলায়।

পাত্রী, ফারসামাতুর সুন্দরী কন্যা মুসা ময়দা, ঘাসের বীজ, ডিম এবং সুগন্ধি তেল মিশিয়ে একটি করে পিণ্ড পাকাবে স্বহস্তে। তারপর দাঁড়াবে ঘরের এক কোণে নিজের খমদার কাছে।

পাত্র আসবে তারপর। একা এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে রাখা সেই পিণ্ড গ্রহণ করবে একটি এবং সকলের সামনে খাবে। স্ত্রী তখন পিছন ফিরে থাকবে, স্বামীর খাওয়া দেখবে না। স্বামীর খাওয়া হয়ে গেলে এসে দাঁড়াবে ঘরের পাশে। তখন স্ত্রী এসে আরেকটি পিণ্ড খাবে, এবং স্বামীও তখন পিছন ফিরে থাকবে, স্ত্রীর খাওয়া দেখবে না।

তারপর দুজনের দুটি পিণ্ড খাওয়ার পর সেগুলি বিলানো হবে নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে। আত্মীয়রা কেউ তা খাবেন না।

শেষে বাড়ির আঙিনায় শুরু হবে নাচ-গান।

হ্যাসাদের বিয়ে হয় দুপুরে, শেষ হয় সন্ধ্যায়। সন্ধ্যা হলে পাত্র পাত্রী আলাদা হয়ে যায়। তিনদিনের মধ্যে বাপের বাড়ির আঙিনায় আলাদা ঘর বেঁধে পাত্র এসে পাত্রীকে নিয়ে যায়। তখন থেকে তারা সংসারধর্ম পালন করবে।

হ্যাসা এবং পাগান—দুই গোষ্ঠীতেই মেয়েদের খুব দাম। কারণ বিয়ে করার সময় দুজনকেই পাত্রীপণ দিতে হয়। পাগানরা দেয় ছাগল আর হ্যাসারা দেয় কম্বল, মাদুর, জলপাইয়ের তেল, ভেড়া এবং কোলাবাদাম। চলনসই গোছের পাত্রীর জন্য পাত্রকে দিতে হবে তিনটে কম্বল (হাতে বোনা), দুটি মাদুর বা চাটাই (খেজুর পাতার), ১০ পাউণ্ড মত জলপাইয়ের তেল, দুটি ভেড়া এবং দু'ঝুড়ি কোলাবাদাম। এসবই হবে মেয়ের বাবার সম্পত্তি।

সেজন্যেই বোধ হয় হ্যাসাদের ঘরে মেয়ে জন্ম নিলে তারা ভেড়া জবাই করে ভোজ দেয়, কারণ তারা জানে একটা ভেড়া গেলেও তার অন্তত দুগুণ মেয়ে ফিরিয়ে দেবে তার বয়সকালে। *

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি শ্রীমতী এরিক্ বেরী কর্তৃক অঙ্কিত।

সাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ রসবোধ ॥

ইংরেজী হিউমার কথাটার সঠিক ভাষান্তর কি হবে এ নিয়ে অনুবাদকেরা মাথা ঘামান, আমি সেদিক দিয়ে যাচ্ছি না। এটা ঠিক হিউমার এই ইংরেজী কথাটার অর্থের সঙ্গে যে কৌতুকী মেজাজ জড়ানো, তাতে এই শব্দটা যেন মজার কথাই কিছু বলতে চায়; কিন্তু যখনই দুঃসাহস করে একজন একজনকে বলে, "দূর! তোমার দেখছি হিউমার করার বা বোঝার ক্ষমতা নেই," তখন এই মজার ব্যাপারটাই রীতিমত অকৌতুকের ব্যাপার হয়ে ওঠে। হিউমারের সার্থকতা তার নিজস্ব নয়, তার সার্থকতা অপরের গ্রহণ করার ক্ষমতায়। আমরা জানি এ ক্ষমতা না থাকাটা আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান তাই আমরা সব কিছু 'অপবাদ' সহ্য করতে পারি, কিন্তু নিজেদের এই রসবোধহীন কোন কিছু ভাবতে সত্যিই আমাদের কষ্ট হয়। এবং নিঃসন্দেহে এই খোঁটা আমাদের কাছে মারাত্মক গালাগাল বিশেষ। বিভূতি মুখুজ্যে বা তাঁর গুরু পরশুরামের লেখা পড়ে কোন পাঠকের হাসি নাও আসতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁকে যদি বলা হয় যে আসলে কৌতুক উপলব্ধি করবার অক্ষমতাই তাঁর না হেসে থাকতে পারার একমাত্র কারণ, তাহলে তিনি তা মোটেই স্বীকার করবেন না।

সত্যি কথা বলতে গেলে কেন কোন কৌতুক কথায় আমরা হাসি, কোনটাতে কিছুতেই হাসি না এ একটা রহস্য। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেনই বা হাসলাম একটি বিশেষ কথায়, তারও সহজ উত্তর নেই। যে কথাটায় অনেকেই হেসে গড়িয়ে পড়তে দেখি, মন ভালো থাকলেও, মাঝে মাঝে তার মধ্যে হাসির কিছু পাই না। নিজেকে রসবোধহীন ভাবতে আমরা সব মানুষের মতই নারাজ।

প্রশ্ন এই, মানুষের এই যে কৌতুক করার মানসিক উচ্ছ্বাটুকু, এটা কি মানুষের জীবনের বা সমাজের অসংগতিকে কটাক্ষ করে গড়ে ওঠে। যদিও মনে হয় এটাই প্রধান কারণ, তবু এ ছাড়া অন্য কারণও আছে। মানুষের স্বভাবে, রীতি-আচরণে, সমাজে প্রচলিত আইনকানুনের ব্যতিক্রম কিছু দেখলেই মানুষের রসবোধ সুড়সুড়ি দিয়ে ওঠে, এটাই কি কারণ? যা সচরাচর ঘটে না, তাই যদি ঘটে তবে সেটাই শুধু কৌতুককর ঠেকবে আমাদের কাছে?

কিন্তু সবক্ষেত্রে ঘটনার চেয়ে ঘটনার নায়কই আমাদের এই কৌতুকরসের জোগান দেয়। ধরুন, লেখক "ক" খুবই অন্যমনস্ক এক মানুষ। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়ে খেয়েদেয়ে নববধূকে উপহার না দিয়েই তিনি চলে এসেছেন। অথচ কত কষ্টেই না ছুটির দিনে তাঁকে গয়নার দোকানে গিয়ে গয়না বাছাই করে কিনে আনতে হয়েছে। এঁকে ঘিরে বা বলতে গেলে সমগ্র লেখককুলের অন্যমনস্কতা সম্পর্কে আমাদের মনে একটা প্রশ্রয়ের ভাব থাকার জন্যেই, এ ঘটনা আমাদের হাসায়। কিন্তু আপনার আমার মত সাধারণ লোকের অন্যমনস্কতায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কৌতুককর বলে কেউ ত' মনেই করবে না বরং একটা উদ্দেশ্যই আরোপ করে বসবে।

অ্যারিস্টটলের নাকি মতবাদ ছিল, অন্য মানুষের দুর্ভোগই আমাদের কৌতুকের উপাদান। বলতে গেলে, অ্যারিস্টটলের এ কথাটা মোটেই ফেলনা নয়। এই সেদিন পর্যন্ত কোন মোটা লোক কলার খোসায় পা হড়কে মাটিতে চিৎপাত হত, তাহলে কি সেই ঘটনা উচ্ছ্বসিত কৌতুকের ব্যাপার হত না? অবিশ্যি এখন কিছু কিছু লোক মুখে হাসি এলেও হাসি থামিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা বরং জানতে চান কলাটা এলো কোথা থেকে, কোন সভ্য (!) বাঁদরের কীর্তি এটা!

কিন্তু বলতে গেলে এই মোটা মানুষের ভূমিশয্যার ঘটনায় কৌতুকের সন্ধান পাওয়া কোন কুরুচির পরিচয় বলে মনে করা ঠিক নয়, কারণ অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এটাই চলে আসছে। গুহাবাসী আদিম কোন মোটাসোটা মানুষ যখন কোন ম্যামথের তাড়া খেয়ে গুহার সামনে এসে চিৎপটাং হয়ে প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্যে চিৎকার জুড়েছিল সেদিন সেটাও যেমন ছিল মারাত্মক হাসির কিছু, তেমনি যজ্ঞদত্ত যখন বলেছিল, 'শুয়ে ত পড়তে বলছে যে, আমাকে আবার তোমার মত যন্ত্রণা আছে ত' তোমার?' সেটাও ছিল কৌতুকের।

বা একেবারে আধুনিক কালে প্রহসনকারী স্টেটবাস থেকে নামবার সময় যখন কোন মোটাসোটা ভদ্রলোক 'জেনানা বাধকের' সমপর্যায়ের ঘোষণা মত কন্ডাকটারকে উদ্দেশ্য করে কাতর অনুরোধ করেন, 'একটু ভাল করে বেঁধে দাদা, অনেকে নামবে' আর অনেকের বদলে একটি মানুষকেই পথে নামতে স্টেটবাসের অনেক সময় নিয়ে নেন, তখন হাসিটাই স্বাভাবিক।

অর্থাৎ মোটা লোকদের এ পৃথিবী থেকে চাঁদে পাঠিয়ে দেখুন, দেখবেন একটু হাসার জন্যে মানুষ তখন চাঁদের উদ্দেশ্যে টিকিট কাটতে ছুটবেন।

এবং তারপরই আসে বিয়ের কথা। শোলার টোপর আছার টোপরে রূপান্তরিত হবার দীর্ঘ পরিক্রমাটিও কম কৌতুকের নয়। বাসরঘর থেকে যে কৌতুকের শুরু, বুড়ো বয়সে গৃহিণীর প্রবল দাপটে তার পূর্ণ পরিণতি। বলতে গেলে, পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের এই স্ত্রী-শাসিত দুরবস্থা মানুষের চির কৌতুকের বস্তু। কথা আছে, বিবাহিত লোকেরা নাকি অবিবাহিত মানুষদের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে আর তারই উত্তরে স্ত্রী-উৎপীড়িত পুরুষেরা বলে, 'উহু' বাঁচে কে বললে, মনে হয় বাঁচাটা যেন অনেকদিন ধরে হয়ে যাচ্ছে।' এটাই হল বিয়ের স্যাটায়ারিক্যাল সত্য। এবং অতএব শত সুখেও এ যন্ত্রণা চির কৌতুকের সৃষ্টি করে চলেছে।

কুমারী মেয়েদের নিয়েও মানুষের কৌতুকবোধ কম নয়। আধুনিক ছেলেরা যেমন ইলা শীলা রেবার নানা ব্যাপার নিয়ে হেসে সারা হয়, তেমনি প্রাচীন কালেও এর ব্যতিক্রম ছিল কি? রূপকথার সেই গল্পটাই ধরুন না। এক রাজার দুই মেয়ে, ছোটটি সুন্দরী, বড়টি অসুন্দরী। রাজা তার সভায় ঘোষণা করলেন, 'যে ড্রাগনকে মারতে পারবে তাকে দেব আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে।' সব চুপচাপ। অবশেষে সভার দূরপ্রান্ত থেকে একজন বলে উঠল, 'কোনটি?'

—'কেন বড়টি?' রাজা বললেন। এ ঘোষণার পর সবাই আরও মারাত্মক চুপচাপ হয়ে গেল!

দুঃখের বিষয়, অসুন্দর মেয়ে যখন সুন্দরী হবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে, তখনই তা মজা কৌতুকের বিষয় হয়ে ওঠে এবং এটা চিরদিনই হয়ে আসছে। এ কৌতুক বিদ্রূপসঞ্জাত।

তার সবচেয়ে হাড়বিচ্ছু বাচ্চাদের কথাই বা বাদ দেওয়া কেন? বাচ্চা সবাই ভালবাসে, আর সেই ভালবাসার বাচ্চারা যা করে বা যা বলে তাতেই আমাদের খুশী, তাই আমাদের কাছে কৌতুককর। আমার ভাইঝি তার দ্বিতীয় পুত্রের গরিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, 'জানো কাকা, শয়তানটা কি শিখেছে, এই বল ত'?' এবং তখনই সেই অবোধ মানবটি আমার উদ্দেশে যখন তার অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে বলে, 'চামচা' তখন আমিও মহাকৌতুকে হাসি। অথচ হাসাটা আমার মোটেই উচিত নয় জানি।

আসলে হিউমার জিনিসটা আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সন্দেহ এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। যে মানুষ আমাদের হাসায়, তারই যে রসবোধ আসছে, তার পরিশীলিত রুচির অসামান্য কৌতুকমনের যখন আমরা সান্নিধ্য পাই, তখনই হিউমার জিনিসটা যে আসলে কি, তা বুঝতে পারি। ভাঁড়ামি আর হিউমারের পার্থক্য স্থূলতা আর সূক্ষ্মতার।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে গেছেন, তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু হলেও, একজন শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্ট। দুঃখের কথা সন্দেহ নেই, হিউমারের যে অর্থে বাংলা ভাষান্তর রসবোধ, আপনার আমার অনেকের মধ্যেই তার বিস্তর অভাব।

মানুষের মন

সুহাস রায়

গল্প
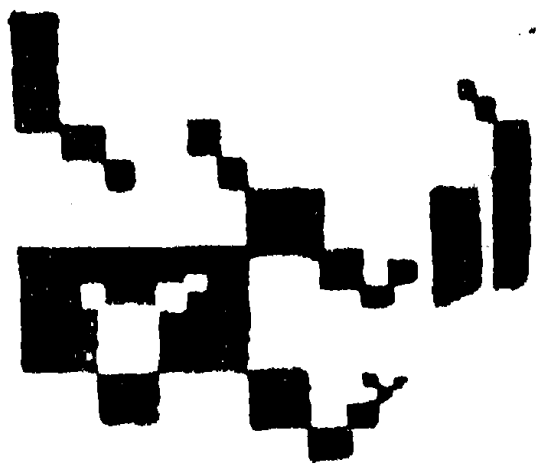
ধীরে ধীরে চোখ খুললো সুব্রত। জানলার কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাবার চেষ্টা করলো। ভোর হ'য়ে আসছে। আধো-অন্ধকারে দূরের কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়গুলো অস্পষ্ট হ'য়ে আছে। প্রতিদিনের মতই এই সুন্দর ক্ষণটি, একটি নতুন দিনের জন্মলগ্নটি খুব ভাল লাগলো সুব্রতর কাছে। পাশের বেডের দিকে তাকাল একবার। ওপাশে মুখ ফেরানো, বোধহয় জাগ্রত মানুষটিকে উদ্দেশ ক'রে বললো—'মেহের, গেট্ আপ, দিস্ ইজ মর্নিং।' 'ইয়েস মর্নিং'—সদ্য ঘুমভাঙা চোখদুটো খুলে মুখ ঘুরিয়ে হাসবার চেষ্টা করলো সে। তারপর গায়ের চাদরটা একটু নামিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

দার্জিলিং-এর মনোরম পরিবেশে এই টি. বি. স্যানিটোরিয়াম। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানো দিগন্ত পটভূমিকায় পাহাড়ের শ্রেণী। এপাশে ওপাশে অতলস্পর্শী খাদে সুবিশাল বৃক্ষের গহন সবুজ অরণ্য। মৃত্যুর স্তব্ধতা নিয়ে এই নির্জন শান্ত পৃথিবী যেন এক কিসের প্রতীক্ষায় নিমগ্ন।

মেহের সিং—একটি উদ্ধত পাঞ্জাবী দেহ। মুখের অনেক ক্ষতচিহ্নের মাঝখানে টানা ভাসা ভাসা দু'টো গভীর চোখ। দু'টি বেডের এই ছোট কামরাটিতে আজ প্রায় একমাস হ'লো সে এসেছে সুব্রতর পাশের পরিত্যক্ত বেডটিতে। কিন্তু এই মৃত্যুর পৃথিবীতে অতি অল্পসময়েই মন তাদের পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাঁধা পড়েছে বন্ধুত্বের বন্ধনে। লক্ষ্য করেছে সুব্রত—বাঁচবার কি এক অদম্য উৎসাহ মাঝে মাঝে মেহের-এর চোখেমুখে ঝিকমিক করে ওঠে। এই গভীর স্পৃহা তাকেও যে একদিন পাগল ক'রে তুলেছিল, সে কথা মনে পড়লে আজ যেন কেমন তার আশ্চর্য মনে হয়। আর এই বেডে শুয়ে শুয়ে কখনও বা সুব্রতর মুখের উপর, কখনও বা দূর-দিগন্তের গায়ে দৃষ্টিটাকে ভাসিয়ে দিয়ে কত গল্প তাকে শুনিয়েছে মেহের। সে সব কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণালী। সৈনজীবনের কত করুণ মর্মান্তিক বিস্ময়।

"ডু ইউ নো মিস্টার, আমার এই তেত্রিশ বছরের জীবনটা কত বিচিত্র, কত অদ্ভুত। কত কি দেখেছি আমি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমাদের গ্রামটা কি রকম জানো; ছোট—খুবই ছোট, চাষীদের যে রকম হয়। চারদিকে শুধু সবুজ ফসলের ক্ষেত। কি জানি কেন—হাল, লাঙল আর জমি নিয়ে বাপ-ঠাকুর্দার মত সেই একঘেয়ে শান্ত পারিবারিক জীবন আমি কোনদিন সহ্য করতে পারিনি। লেখাপড়া করতেও ভাল লাগত না। তাই অল্প বয়সে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। আর পালিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েছিলাম 'আর্মি'তে।"

হয়তো নার্সের আগমনে থেমে গেছে মেহের। সে এসে ওষুধ খাইয়েছে; টেম্পারেচার নিয়েছে। প্রথমে তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটু হেসেছে মেহের; তারপর সুব্রতর চোখে চোখ রেখে আবার বলতে শুরু করেছে।

"জানো, এই হাত দু'খানা দিয়ে স্টেনগান ছুড়ে কত সৈন্যকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছি চিরদিনের মত। কত অন্ধকার রাত্রে একমুহূর্তের জন্য আমি নিজে প্রাণে বেঁচে গেছি। একজন, দু'জন—দশজনকে আমি নিঃশেষে, মুহূর্তের মধ্যে ফুরিয়ে যেতে দেখেছি। জানো, একবার আমি একজনকে গলাটিপে মেরেছিলাম—ঠিক পুরো দশ মিনিট সময় লেগেছিল আমার। বোধহয় কোন খবর সংগ্রহ করবার জন্যেই অন্ধকার রাত্রে আমাদের সীমানায় এসেছিল। কিন্তু আমার চোখ এড়াতে পারেনি। হঠাৎ আক্রমণে সে কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার গলাটা আমি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলাম। ধরেই ছিলাম—যতক্ষণ না তার দেহটা ছটফট করতে করতে নিস্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। কাগজ-পত্র আর রিভলবার দু'টো কেড়ে নিয়ে,

জয়ের আনন্দে আমি যখন লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়েছিলাম —তখন হাতঘড়িতে দেখেছিলাম, একটা জীবনকে শেষ করে দিতে আমার মাত্র দশ মিনিট সময় লেগেছে।

"মৃত্যুকে আমি চোখের সামনে দেখেছি—অনুভব করেছি। তাই মৃত্যুভয় আমার ছিল না। ভেবেছিলাম, এই তো জীবন। কোন একদিন, কোন অসতর্ক মুহূর্তে একটা বুলেট চলে যাবে আমার বুকের মধ্যে দিয়ে। আর সেইদিনই সবশেষ। ব্যারাকে এসে বোতলের পর বোতল মদ গিলতাম। সৈনাজীবনের যে কুৎসিত ব্যভিচার আমি করেছি, তা শুনলে তুমি শিউরে উঠবে মিস্টার। আর আজ—আজ আমি বাঁচতে চাই। মরতে আজ আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।"

ডাক্তারের কঠিন পদশব্দে মেহের চুপ ক'রে গেছে। ডাঃ বসাক ঘরে ঢুকে সুব্রতর বেডের কাছে এগিয়ে এসেছেন। —"ওয়েল্ সুব্রত, আজ কেমন আছ?" "ভালই"—সুব্রত হাসতে চেষ্টা করে। —"তারপর মিস্টার সিং, রাত্রে ঘুম হ'য়েছে তো!" সুব্রতকে পরীক্ষা করেন ডাক্তার। "তোমার আর বিশেষ কোন ডিফিকাল্টি নেই। তবে বুঝতেই তো পারছো, আরও মাসখানেক তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।" তারপর মেহেরকে পরীক্ষা করেছেন—আশা দিয়েছেন—বেশি কথা বলতে বারণ করে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন।

এ'কদিনে মেহেরের গভীর জীবন-সত্তার অনেক কিছুই আশ্চর্য হ'য়ে দেখেছে সুব্রত। মনে আছে একদিন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তার একটি হাত সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরেছিল মেহের। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল—"মাই ফ্রেন্ড, আমি কি বাঁচবো না? তোমার কি মনে হয়, আমার বাঁচা খুবই অসম্ভব?"

হাত ছাড়িয়ে সুব্রত হেসে উঠেছিল। জোর দিয়ে দু'বার উচ্চারণ করেছিল—"সিওর! সিওর!" তারপর বলেছিল—"এই তো, তোমার বেডেই ছিলেন একজন বাঙালী—অলকেশ ঘোষ। আমার মাত্র সপ্তাহ কয়েক আগে এসেছিলেন; তোমার চেয়েও খারাপ অবস্থায়। অথচ দেখ, আমার আগেই সুস্থ হয়ে ফিরে গেলেন।" তারপর সেই অন্ধকারে একটু অদ্ভুত হেসে সুব্রত বলেছিল—"বিশ্বাস না কর, আমাকে দেখ। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর মুখ থেকে তিলে তিলে আমি আবার আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। আর মাত্র একমাস পরে আমি বাড়ি ফিরে যাব।"

নিশ্চুপ হ'য়ে গিয়েছিল মেহের। শান্ত কণ্ঠে বলেছিল—"হোম! ইয়েস্, তুমি হোমে ফিরে যাবে। আমিও ফিরে যাব আমার হোমে। ফিরে আমাকে যেতেই হবে। জানো, যুদ্ধের পর আমার চাকরী চলে গেল। কেন গেল তা বুঝতেই পারছো। একদিন মেডিকেল এগ্‌জামিনেশানের রিপোর্টে আমি জানতে পারলাম—আমার টি, বি, হ'য়েছে। আমি টি, বি, রোগী। ভাবলাম, কোথায় যাব—আমার মত অসহায়কে আশ্রয়ই বা দেবে কে! হঠাৎ আমার মনে পড়লো বাড়ির কথা। দীর্ঘ চোদ্দ বছরে যে বাড়ির কথা, যাদের কথা মনে করবার কোন প্রয়োজনই আমার হয়নি। মনে পড়লো আমার বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে; আর আছে সাকিনা—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছিল ছোটবেলায়। কিন্তু আমাকে কেন তারা গ্রহণ করবে—আশ্রয় দেবে। দীর্ঘ চোদ্দ বছরে আমি যে তাদের কোন খবরই রাখিনি। তবু গেলাম। ভাবলাম মরবারও তো একটা জায়গা দরকার। না হয়, সেখানেই মরবো।

—"কিন্তু মাই ফ্রেন্ড, সেখানে গিয়ে সমস্ত ধারণাই আমার পাল্টে গেল। আর পাল্টালো জীবনের এই বিচিত্র ছকটা। বুড়ো বাবা চোখে মুখে হাত বোলাতে লাগলো, আর দু'টো অন্ধ চোখ দিয়ে নিঃশব্দে বেয়ে পড়তে লাগলো জলের ধারা। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। পাড়ার সবাই ছুটে এলো। তাদের হর্ষোৎফুল্ল উচ্ছ্বাসে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। ভাবলাম, জীবনে এত অদ্ভুত আনন্দও আছে!

"সবচেয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম তাকে দেখে। চব্বিশ বছরের সাকিনাকে দেখে। দেহে তার উদ্দাম যৌবনের পূর্ণতা, সুডৌল দু'টি গৌরবর্ণ হাত, স্বপ্নময় দু'টো কাল কাল চোখ। শেষ দেখা দশ বছরের সেই অপুষ্ট মেয়েটির সঙ্গে এ মেয়েটির কোন মিলই যে নেই। সেই মুহূর্তে মনে হ'লো এ আমি কি করেছি। জীবনের তেত্রিশটা বছর কেন আমি পুড়িয়ে ছারখার করেছি; আর আমার সামনের দিনগুলোও যে নিঃশব্দ ধূসরতায় ঢাকা। বুঝলে ফ্রেন্ড, সেই মুহূর্তে—ঠিক সেই মুহূর্তে আমি মরতে ভয় পেলাম। অনুভব করলাম মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর, কত নিষ্ঠুর, কত শীতল!" দুর্বার আবেগে মেহেরের কণ্ঠস্বর সাপের মত হিস্ হিস্ ক'রে ওঠে—"আমি আজ বাঁচতে চাই—বাঁচতে আমাকে হবেই; আই মাস্ট লিভ্।"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে যেন একটা জ্বলন্ত আগুনের স্রোত সুব্রতর মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে—সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে পায়ের দিকে নেমে গিয়েছিল।

—"সাকিনার চিঠি আমি দেখায়

তোমাকে। আমার কাছে আছে—অনেকগুলো। চার পাঁচদিন বাদেই তো আসে। ভাল গুছিয়ে লিখতে পারে না সাকিনা; তবু সে চিঠির অক্ষরে অক্ষরে কত রঙীন জীবনের খসড়া, কত আশা, কত আকাংক্ষা। তাই নতুন ক'রে বাঁচতে আমাকে হবেই। আমি নতুন জিনিস সৃষ্টি করবো, গড়বো। আই স্যাল ক্রিয়েট এ নিউ ফ্যামিলি।" পাশ ফিরে বোধহয় সেই অনাগত ভবিষ্যতেরই স্বপ্ন দেখে মেহের।

আর সেই জ্বলন্ত অগ্নিস্রোতটা সুব্রতের সত্তাটাকে পাকে পাকে বেষ্টন করে—পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সেই তীব্র দহনে অনুভূতির শেষ শক্তিটুকু অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুব দেয়। রাশ রাশ অন্ধকার ছেয়ে আসে চোখে।

মনে পড়ে মার কথা, দাদার কথা। স্পষ্ট ভেসে ওঠে চোখের সামনে ঘরের পেছনে ডোবা পুকুরটা আর কুয়োতলার সেই চাঁপা গাছটা যার তীব্র সুবাস ছড়িয়ে পড়তো সন্ধ্যাবেলায়। আর মনে পড়ে নীলিমার কথা, ম্লান প্রদীপের আলোয় মায়ের সেই ছোট ব্যথাভরা মুখখানার কথা। আর দাদা—শিবনাথ সরকার। অর্ধশিক্ষিত মানুষ। পরণে আটহাতি কাপড়, গায়ে সাদা ফতুয়া। শিবনাথ উঠতেন সেই ভোরবেলায়। গাছে গাছে আধো অন্ধকারে পাখীরা যখন ঘুম-ভেঙে ডানা ঝাপটাত। মা বলতো—'এবারে সুবুকে ডেকে দে, পড়তে বসুক।' শিবনাথ বলতেন—'থাক না আর একটু ঘুমোক্। এখনও তো ভাল করে সকাল হয়নি।' সেই সকাল না হওয়া দিনের শুরুতে শিবনাথ তার পুরনো ছাতাটি বগলে চেপে বেরিয়ে পড়তেন ছয় মাইল দূরে নটীপুরের কাছারির উদ্দেশে।

পড়াশোনায় খারাপ ছিল না সুব্রত। দরিদ্র সংসারে তাই সুব্রতকে ঘিরে একটি স্বপ্নের চারাগাছ বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার মার মনে, দাদার মনে। সুব্রতকে কেন্দ্র করে তারা স্বপ্ন দেখতো স্বচ্ছল জীবনযাত্রার, স্বপ্ন দেখতো নতুন ক'রে বাঁচবার। বিয়ে করেননি শিবনাথ। বলতেন—'সুবু মানুষ হবে, বড় হবে—আমাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচবে—এই-ই আমার একমাত্র চিন্তা। এর বেশি আমি আর কিছু চাই না।' আর মা চোখের জল ফেলে সে কথার নীরব সমর্থন জানাতো।

কত কথাই মনে পড়ে সুব্রতর। এই গভীর নিস্তব্ধ স্যানিটোরিয়ামের অন্ধকার আকাশে বাতাসে যেন মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। আর সেইখানে ফেলে-আসা জীবনের মধ্যে ছিল কি অপরূপ জীবনের গতি! পাশের বাড়ির নিকুঞ্জ-কাকার অতি শান্ত আর শ্যামলা' রঙের মেয়ে নীলিমাকে ঘিরে কত উজ্জ্বল স্মৃতির আবর্তন।

অনেক ফাই-ফরমাস খেটে দিত এবং আরও অনেক কিছু করতো, যার জন্য নীলিমাকে খুব ভাল লাগতো সুব্রতর। কিন্তু নীলিমার ভাল লাগাটা যে অন্য একটা কিছুর গভীর রূপ নিয়েছে সে কথা একদিন বুঝেছিল সুব্রত। সুব্রত কোলকাতার কলেজে ভর্তি হ'য়েছিল—থাকতো মেসে। মনে আছে কোলকাতায় আসার আগের দিন রাত্রে চাঁপা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে পনেরো বছরের নীলিমা কেঁদেছিল। কেঁদে বলেছিল—'তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো সুবুদা!' কোন উত্তর দিতে পারেনি সুব্রত। শুধু কি এক বিচিত্র উত্তেজনায় তার সতেরো বছরের শিরা-উপশিরা দগ্ধ হ'য়েছিল।

কিন্তু না—সুব্রত বড়ো হ'তে পারেনি; সুব্রত কিছুই হ'তে পারেনি। বিধাতার নির্মম বিচারে সে বাতিল হ'য়ে

গিয়েছে। শেষপর্যন্ত হ'য়েছে সে এক অসহায় মেরুদণ্ডহীন ভঙ্গুর মানুষ।

কোলকাতায় এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে। এই কোলকাতার বিচিত্র জীবনধারা তার সুকুমার মনকে করেছিল গ্রাস—তার সরল বুদ্ধিকে করেছিল বিভ্রান্ত। অভিভাবকহীন সুব্রত ভেসে গেল সিনেমা, থিয়েটার, খেলায়। মেসে দাদার দু'খানা চিঠি আসতো মাসে। যার সারাংশ—"তুমি মানুষ হইবে, ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তা। সুতরাং পড়াশোনায় অবহেলা করিও না।" উত্তরে সুব্রত লিখতো—"পড়ার চাপ থাকায় সামনের ছুটিতে বাড়ি যাইব না। এখানকার খরচ চালাইতে পারিতেছি না; কিছু টাকা পাঠাইলে ভাল হয়।" সে সব কথা মনে পড়লে সুব্রত আজও হিমশীতল হ'য়ে যায়। সেই নির্মম প্রবঞ্চনা—দাদাকে, মাকে, নিজেকে। অতি সাধারণ একটি ছেলে হ'য়ে গেল সুব্রত। বি-এ ফেল করে দীর্ঘ চার বছর পরে গ্রামে ফিরে এলো সে।

আর দারিদ্র্যের নির্মম প্রকট রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পড়ার খরচ যোগাতে শিবনাথ আজ নিঃসহায়, রিক্ত— সম্বলহীন। লজ্জায়, ঘৃণায় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে বিভ্রান্ত হ'য়ে গেল সে। দাদা আর মাকে দেখে তার অন্তর গুমরে গুমরে ওঠে; আর কোলকাতার দিনগুলোর স্মৃতি অহরহ মর্মান্তিক দহনে তাকে ক্লান্ত ক'রে তোলে।

নীলিমার চোখের দিকে তাকাতে পারে না সে। সে চোখে এক প্রতীক্ষার স্বপ্ন—প্রতিষ্ঠার জিজ্ঞাসা। পাত্রপক্ষের সামনে সেজেগুজে নীলিমাকে বসতে হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু তাদের অপছন্দ আর অপমানকে ভুলতে পেরেছে সে কিসের জোরে? সুব্রত জানে—ভাল ভাবেই জানে—সে শক্তির কেন্দ্রবিন্দু সে নিজে। এ অপমান থেকে কি মুক্তি দিতে পারবে না নীলিমাকে?

সেইদিন থেকে ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেরিয়েছে সুব্রত। একটা চাকরী চাই—চাই টাকা। সকালের গাড়ী চেপে কোলকাতায় এসেছে। অফিসপাড়ার বাড়িগুলোতে ক্লান্তিহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে সারাটা দিন। কিন্তু কে দেবে চাকরী এক সাধারণ নগণ্য ছেলেকে। খোঁজখবর নিয়ে যেখানেই গেছে, সেখানেই চোখের সামনে ঝুলেছে "নো ভ্যাকেন্সির" বোর্ড। অফিসাররা মুখ বেঁকিয়ে সুব্রতকে একপলক দেখে মৃদু হেসে বিদায় জানিয়েছেন। অনেকে মুখের ওপর স্পষ্ট বলেছেন—"আপনি এই কোয়ালিফিকেশান আর অনভিজ্ঞতার ছাপ নিয়ে কি করে চাকরী পাবার আশা করেন? আপনার চেয়ে অনেক উঁচু ডিগ্রীওলা লোকের এপ্লিকেশান ঐ ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে পড়ে আছে।"

এখানে শুয়ে শুয়ে সেই দিনগুলো মনে পড়ে—কোলকাতার সেই দিনগুলো। জীবনসংগ্রামের ইতিহাসের সেই ব্যর্থ দিনগুলো। সেই শহরের ইঁট, কাঠ, পাথর আর জনসমুদ্র কোন খোঁজ রাখে না সুব্রতর স্বপ্নের। সেই যান্ত্রিক সভ্যতার সামনে তার মূল্য কত তুচ্ছ তার দাবী কত সামান্য। রাতের অন্ধকারে সে আবার বাড়ি ফিরে যেত—একবোঝা ব্যর্থতা, তিক্ততা আর গ্লানি নিয়ে।

তারপর এসেছিল সেই দিনটি। সেই দিনটির কোন এক অশুভ মুহূর্তে সুব্রত জানতে পারলো তার এই সুবিশাল বুকে বাসা বেঁধেছে কতকগুলো সুদক্ষ কীট। যারা তার দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে; তারপর কোন একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবে পরিত্যক্ত জিনিসের মত। অনড় অচল হ'য়ে গিয়েছিল সুব্রত। কিছু ভাবতে পারেনি, যেন কিছু বুঝতে পারেনি। শুধু দু'চোখে এক গভীর অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছিল।

শিবনাথ বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। তারপর তার কুঞ্চিত মুখখানা কিসের এক কঠিন সিদ্ধান্তে সোজা হ'য়ে গিয়েছিল। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন—"সুব্রর উপযুক্ত চিকিৎসা আমি করাবোই, যে করেই হোক—আমার সামর্থ্যের শেষটুকু পর্যন্ত দিয়ে।"

তারপর সেই দিনগুলির এক ক্লান্তিকর অথচ বিচিত্র ইতিহাস। কোন এক ডাক্তার-বন্ধুর সুপারিশে সুব্রত ভর্তি হ'য়ে এলো দার্জিলিং-এর এই মনোরম টি বি স্যানিটোরিয়ামে।

আর নীলিমা! ঠিক, সেই দিনটির মতই, চাঁপা গাছটার নীচে একরাশ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল সে। চোখের জলও মুছিয়ে দিতে পারেনি সুব্রত। সান্ত্বনা দেওয়ার কোন কথাও যে তার ছিল না। চলে

গিয়েছিল নীলিমা আর যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল—"আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবো, সুবুদা!"

বিচিত্র মানুষের মন। উদার আকাশের মত তার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। কখনও সে উজ্জ্বল মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত; কখনও বা থমথমে নিস্তব্ধ। আবার কখনও বা জল ঝড় আর মেঘগর্জনে সে ক্রুদ্ধ। বিদ্যুতের ভয়াল চমক তার এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তরে গম্ভীর আক্রোশে ছড়িয়ে পড়ে।

ছট্‌ফট করে উঠে সুব্রতর মন। সেই তীব্র আগুনের স্রোত তার কোষে কোষে দাপিয়ে বেড়ায়। সমস্ত মাথাটা জ্বালা করে। কি প্রতিদান দিয়েছে সুব্রত তার দাদাকে, মাকে, নীলিমাকে। দিনের পর দিন—বছরের পর বছর দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছেন শিবনাথ। তাঁর যৌবনের সব স্বপ্ন বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেছে সুব্রতর জন্যে। কি করে সেই স্নেহান্ধ মানুষটি মাসের পর মাস জুগিয়ে চলেছেন স্যানিটোরিয়ামের এই রাজকীয় খরচ—তা কি সুব্রত কল্পনা করতে পারে! সুব্রত কি শুধু নিয়েই চলবে? যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের এত ত্যাগ, এত দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা—তাও তো সফল করতে পারেনি সুব্রত।

তিনদিন আগে পাওয়া মার চিঠিতে জানতে পেরেছে সুব্রত এক নতুন এবং অপ্রত্যাশিত খবর। নীলিমার বিয়ে হ'য়ে গেছে। নিজে সে মত দিয়েছে এ বিয়েতে। অন্ধকারে একটা মৃদু হাসি খেলে যায় সুব্রতর ঠোঁটে। কেনইবা অপেক্ষা করবে নীলিমা? কোন বিশ্বাসে সে নির্ভর করতে পারে; কি বা পেতে পারে সে সুব্রতর কাছ থেকে। মনে মনে যেন বললো সুব্রত—'নীলিমা, তুমি ভাল করেছ—খুব ভাল করেছ। একটি কঠিন দায়িত্ব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ।'

মুখটাকে বালিশে গুঁজে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে দুর্বার আবেগটাকে রোধ করতে। কি করে মুখ তুলে দাঁড়াবে সে মার সামনে, দাদার সামনে? নীলিমা কি তার পৌরুষকে বিদ্রূপ করবে? দিনের পর দিন যে পৃথিবী তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে—অসুস্থ, ভঙ্গুর সুব্রত আবার কি করে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা? এ রোগ সেরে গেলেও তার লুকনো অস্তিত্বকে প্রতিহত করতে যে ওষুধের জের টেনে নিয়ে যেতে হবে—তা আসবে কোত্থেকে?

সেই আগুনের শিখাটা সুব্রতর সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে দেয়। মস্তিকের তীব্র জ্বালায় বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করে। গুমরে গুমরে সুব্রত যেন বলতে চায়—"ভগবান, আমি বাঁচতে চাই না; আমি বাঁচতে পারবো না! আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম ভগবান; কিন্তু তার-জন্যে নতুন করে যে মাশুল আমাকে দিতে হ'বে, তা দেবার শক্তি আমার নেই নেই!"

রাত এখন ক'টা? ভোর হ'তে আর কত দেরী? এপাশে ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে সুব্রত আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো; কিন্তু কিছু বুঝতে পারলো না। ঘরের চারপাশে জমাট অন্ধকারের গভীর আস্তরণ। সুব্রতর মনে হ'লো তার যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে, ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। এই জমাট গভীর অন্ধকার সে যেন কোনদিন অতি-ক্রম করতে পারবে না। চুপচাপ খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে পড়ে রইলো সুব্রত। আস্তে আস্তে অন্ধকার সহজ হ'য়ে এল তার চোখে; দম-আটকানো ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। ঘরের জানলা দরজা একটা আবছা, অস্পষ্ট রূপ নিয়ে ভাসতে লাগলো। দূর থেকে কোন ডাক্তার কিংবা

নার্সের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। এদিক ওদিক চাইলো আর অভ্যস্ত চোখে কিছু খুঁজতে গিয়ে ওপাশের খালি বেডটির দিকে চোখ পড়লো সুব্রতর। মেহের ওখানে নেই।

না, মরেনি মেহের। চারদিন আগে কাশতে কাশতে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে যায় সে। ডাক্তার আর নার্সরা ছুটে আসে—মেহেরের অবস্থা খারাপের দিকে। হাসপাতালে রোগীদের অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। তাই নিয়মানুযায়ী তাকে বদলী করা হ'য়েছে অন্য ওয়ার্ডে। সুব্রতর চোখের সামনেই স্ট্রেচারে করে ওরা নিয়ে গেল মেহেরকে।

বেঁচে আছে কি না মেহের—কে জানে! কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয়। মরবেই বা কেন সে—অতবড় স্বপ্নটা কি নিঃশেষে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে। সহজ ভঙ্গিতে প্রার্থনার মত করে সুব্রত ভাবলো—মেহের বেঁচে উঠুক। সুস্থ হয়ে ফিরে যাক সেখানে, যেখানে সবাই আছে, সাকিনা আছে—যার চারপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত।

দিন কেটে যায়। রাত্রি আসে। সময় এগিয়ে চলে। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ পরে একদিন এক উজ্জ্বল সকালে মেহের শুয়ে ছিল তার বেডে। ডাঃ বসাক ঘরে ঢুকে এগিয়ে এলেন।

"আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবো সুব্রত!"

একদিকে অসহায়ভাবে মেহেরের মাথাটা ঝুলেছিল। ঠোঁটটা নড়ছিল অল্প অল্প—হয়তো বা কোন প্রলাপে। হয়তো স্বপ্ন দেখছিল তার অতি পরিচিত মানুষদের।

স্বপ্ন! মানুষ তার জীবনে কত স্বপ্নই তো দেখে। সবই কি তার সফল হয়! মেহেরের সব আশাই কি সার্থক হবে? হয়তো হবে—হয়তো নয়। তার আর কিছু না থাক, স্বপ্নটুকু তো আছে। সেটাই তার জীবন-মন্ত্র—তাতেই সে বেঁচে উঠবে। কিন্তু সুব্রতর যে তাও নেই। তার যে শুধু আছে স্বপ্নভঙ্গের তিক্ততা।

—"ওয়েল মিস্টার সিং, আশা করি ভাল আছেন।"

প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দ হাসিতে মেহেরের মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিলেন ডাক্তার।

—"আপনাকে আর এই ওয়ার্ডে থাকতে হবে না। কালকেই আপনার সেই পুরনো ওয়ার্ডেই আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। ওয়েট্ করুন— যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠেন। আর, আর আপনার নতুন জীবন সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিন্ত।"

বিছানায় উঠে বসলো মেহের।

—"একটা রিকোয়েস্ট।" সামান্য কুণ্ঠিত হ'লো যেন সে।

—"ইয়েস্, ইয়েস্"। ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার—'বলুন'।

আস্তে আস্তে, যেন একটা প্রত্যাশা-পূর্ণ কণ্ঠে বললো মেহের—"যদি রুম নাম্বার 'টেনে'র সেই বেডটা এখনও পর্যন্ত খালি থাকে—তবে, তবে আমাকে যেন সেইখানে পাঠাবেন।" তারপর যেন কৈফিয়ৎ দিল সে—"আমার এক বন্ধু, মোস্ট ডিয়ারেস্ট ফ্রেণ্ড— সে থাকে ঐ রুমে। তারও ফিরে যাবার সময় হয়েছে—হয়তো তিন চারদিনের মধ্যেই চলে যাবে। কিন্তু তার—মানে সুব্রতর সঙ্গে অনেক কথা আমার এখনও বাকী আছে। তাকে আমি বলেছিলাম"—ঘুরে দাঁড়িয়ে মেহেরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তার। মেহের থেমে যায় তার দিকে তাকিয়ে; পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নেন তিনি।

—"তাকে তো আপনি পাবেন না মিস্টার সিং।"

—"তা'হলে চলে গেছে।" কণ্ঠ তার হতাশায় ভরা।

—"না!"

—"তবে!!" বিস্ময়ে যেন চীৎকার ক'রে উঠতে চায় মেহের।

—"হি ইজ নাউ ডেড্। চারদিন আগে একটা বিষাক্ত মেডিসিন খেয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি।"

পুরু লেন্সের চশমার গন্ডী ছাড়িয়ে ডাক্তারের বিষণ্ণ, ধূসর দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে দূর পাহাড়ের আনাচে কানাচে।—"আমি বুঝতে পারছি না, কেন সে এরকম একটা অদ্ভুত কাজ করলো। আমার বহু পরিশ্রমের একটা সফল এক্সপেরিমেন্টকে সে নষ্ট করে দিল।"

বোবা বিস্ময়ে এক অস্ফুট আর্তনাদ বের হ'য়ে আসে মেহেরের মুখ থেকে। অসহায় চোখ দু'টো মেলে পাথরের মত স্থির, অনড় হ'য়ে যায় সে। যেন কিছু বুঝতে পারে না; কিছু বলতে পারে না। চোখদুটো জ্বালা করে। আর চেতনার অতল গহ্বরে সে যেন অনুভব করে এক অসীম শূন্যতা।

দেশে বিদেশে

॥ অবিশ্বাস্য নিষ্ক্রিয়তা ॥

বাঙলাদেশে মাছের আকাল চরমে পেৌঁচেছে। তার জন্যে সময় সময় রাজ্য-সরকারকেও যথেষ্ট উৎকন্ঠা প্রকাশ করতে দেখা যায়। কিন্তু সে যে নেহাতই কাগজী উৎকন্ঠা তা সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি হিসাব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে এই রাজ্যে মাছের চাষ বাড়ানোর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু রাজ্যসরকার তা থেকে ২৭ লক্ষ টাকাও ব্যয় করতে পারেননি। সুতরাং বাকি টাকা দ্বিতীয় যোজনার শেষে কেন্দ্রীয় সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হয়।

তৃতীয় যোজনাকালেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। যেটুকু হয়েছে সেটা অবনতির দিকে। তৃতীয় যোজনার প্রথম বছরে পশ্চিমবঙ্গে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পশুপালনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১·৪০ কোটি টাকা, কিন্তু রাজ্যসরকার এক বছরে তা থেকে ব্যয় করতে পেরেছেন মাত্র ৫৪ লক্ষ টাকা। কলকাতায় মাছের সরবরাহ নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে হিমঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৯৫ হাজার টাকা। কিন্তু একাজে সরকার এখনও পর্যন্ত এক হাজার টাকাও ব্যয় করতে পারেননি। মাছের চাষ বৃদ্ধির জন্য ১৮৮৬ একর পতিত জলাজমি উদ্ধারের একটি বিশ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা যোজনাকর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম বছরে ব্যয় করতে পেরেছেন মাত্র দুই লক্ষ টাকা। সুতরাং এহারে কাজ চললে পাঁচ বছর বাদে এই পরিকল্পনার জন্য মঞ্জুরে টাকারও প্রায় অর্ধেক অব্যয়িত থেকে যাবে। সমবায় প্রথায় মাছের চাষের জন্যেও ১·৫৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়. কিন্তু রাজ্যসরকার তা থেকে এক বছরে ব্যয় করেছেন মাত্র চার হাজার।

এই কটি হিসাব থেকেই বোঝা যাবে যে, মাছের আকালে রাজ্যসরকারের প্রকৃত দুশ্চিন্তা কতটুকু।

॥ অপরাধ ॥

কলকাতার পুলিশ কমিশনার গত ছ'মাসের অপরাধ অনাচারের হিসাব দেওয়ার সময় বলেছেন, ঐ সময়ে যে বত্রিশটি অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে অপহৃত হয় তার আটাশটিকে পরে বিভিন্ন পতিতালয় থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিষাক্তক্ষতের মত শহর কলকাতার বুকে ছড়িয়ে থাকা পতিতালয়গুলি সমাজ-জীবনকে যে প্রতিনিয়ত কতখানি পচিয়ে দিচ্ছে তার কিছুটা পরিচয় এই ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে। আইনত পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান পতিতাদের পুনর্বাসনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভব না হওয়ার অজুহাতে আজও শহরের প্রকাশ্য স্থানে এই জঘন্য পাপবৃত্তি বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হচ্ছে। আর সেকারণে হত্যা, জালিয়াতি, চুরি, নারী-অপহরণ প্রভৃতি গুরুতর রকমের জঘন্য অপরাধগুলিরও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। কারণ ঐ সব অপরাধগুলির মূল উৎসই হ'ল পতিতালয়। সুতরাং পতিতালয়গুলি বজায় রেখে কলকাতাকে অপরাধ-মুক্ত করার প্রয়াস নোঙর না তুলে নৌকা চালানোর মতই অর্থহীন। কিন্তু অদূরে ভবিষ্যতে এ জাতীয় কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করার ইচ্ছা সরকারের আছে বলে আমাদের জানা নেই।

॥ আত্মহত্যা ॥

উড়িষ্যার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরকালে জানিয়েছেন, ১৯৬১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত এক বছরে উড়িষ্যায় আত্মহত্যা করেছে ৮৭৫ জন নরনারী।

॥ পেশা বদল ॥

জংগী শাসন কায়েম হয়েছে বর্মায়, তাই রাজনীতি যাঁদের পেশা ছিল এতদিন তাঁদের অনেককেই এখন নিরুপায় হয়ে পেশা বদলের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেকে এব্যাপারে বেশ কিছুটা এগিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও ফ্যাসী-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা লীগের সহ-সভাপতি উ কিয়াউ নিয়েন নতুন করে আইন ব্যবসায় শুরু করেছেন। প্রাক্তন পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী ও বর্তমানে পিদাউংজু দলের নেতা বো মিন গাউঙ স্থির করেছেন. চলচ্চিত্রের সংলাপ লিখে তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন। বর্মার কমিউনিস্ট-পন্থী ওয়ার্কার্স পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল থাকিন চিট মাউঙ পোল্ট্রি ফার্মিংকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পেশারূপে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু প্রাক্তন সংসদীয় সচিব থাকিন আউং সুইন্ট ঘোষণা করেছেন, তাঁর এরপর থেকে কাজ হবে- হস্তরেখা বিচার। দুর্ভাগ্য তাঁর, নিজের হাতখানা গোড়াতেই ভাল করে দেখে তিনি যদি আগেই একাজে নামতেন তবে হয়ত এতদিনে রীতিমত পসার জমে যেত তাঁর।

॥ বিচার ॥

নেপালের বিশেষ আদালতের বিচারে হত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আদালতে গরহাজির অবস্থাতেই শ্রীসুবর্ণ সমশের, শ্রীভরত সমশের প্রমুখ নেপালের নেতৃবৃন্দ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। রাজ-নির্দেশে গঠিত এক বিশেষ আদালত এইভাবে মোট ৬২ জন নেপালের আত্মগোপনকারী অথবা দেশত্যাগী নেতাকে বিভিন্ন মেয়াদে 'দণ্ডিত' করেছেন। এরপর নেপাল সরকার হয়ত ভারতে অবস্থানকারী নেপালী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে নেপালে প্রেরণের জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ করবেন। বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ভারত সরকার দালাইলামাকে ভারতে আশ্রয় দিয়েছেন, সুতরাং নেপালী নেতৃ-

বৃন্দের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম না হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় নেপাল সরকারের অন্ধ ঔদ্ধত্যে। আলজিরিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস তাঁদের অজানা থাকার কথা নয়, কিন্তু তা থেকে তাঁরা কোন শিক্ষালাভ করেছেন বলে মনে হয় না। ফরাসী সরকারও একদিন এমনি করেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন বেন বেলা, বেন খেদা প্রমুখ আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রামের নেতৃবৃন্দকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের অমোঘ বিধানে তাঁদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড মেনে নিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। নেপালেও সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে খুব বেশী সময় লাগবে না।
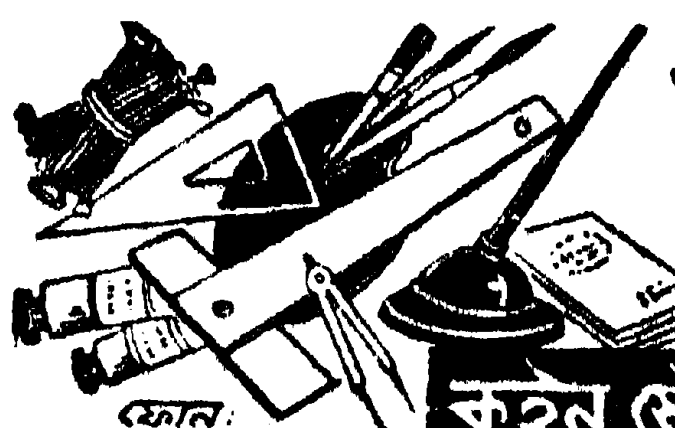
॥ আলজিরিয়া ॥

হিংসার মাঝে যার উদ্ভব হিংসাতেই তার পরিণতি—সত্যদ্রষ্টা গান্ধীজীর এই উক্তির সত্যতা একটু কঠিন মূল্য দিয়ে বেন বেলাকে উপলব্ধি করতে হ'ল। ফরাসীরা দেশত্যাগের সময় আলজিরিয়ার শাসনদায়িত্ব অর্পণ করেছিল অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী নেতা বেন খেদার হাতে। কিন্তু সে ক্ষমতা বেন খেদা একমাসও করায়ত্ত রাখতে পারেননি, সৈন্যবলে বলীয়ান বেন বেলার কাছে নতিস্বীকার করে আলজিরিয়ার রাজনীতির ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ হতে সরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। মাত্র একমাসের জাতীয় সরকারকে পঙ্গু করে আলজিরিয়ার শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করেছিল বেন বেলার রাজনৈতিক ব্যুরো। বেন বেলার লক্ষ্য ছিল একনায়কতন্ত্র এবং সেইভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। এভিয়ান চুক্তির সর্তমত ২রা সেপ্টেম্বর যে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল আলজিরিয়ায় তাতে 'সর্বসম্মত তালিকা' প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি এই কদিন। কিন্তু তার সময় তিনি পেলেন না, যে সৈন্যদলের সহায়তায় আলজিরিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন তিনি, সেই সৈন্যদলেরই একাংশ আবার বিতাড়িত করল তাঁকে সদ্যলব্ধ শাসনাধিকার হ'তে। আলজিরিয়ার শাসনক্ষমতা এখন চতুর্থ সামরিক কমান্ডের হাতে। এই সৈন্য-শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন বেন বেলা, কিন্তু তা তিনি পারেননি। তাই ২৩শে আগষ্ট সদলবলে রাজধানী ত্যাগ করে তিনি ওরানে আশ্রয় নিয়েছেন। সম্পূর্ণ আলজিরিয়ার শাসন এখন চতুর্থ সামরিক কমান্ডের হাতে আছে মনে করলে ভুল করা হবে। শুধু রাজধানী আলজিয়ার্সই বর্তমানে তাদের শক্ত ঘাঁটি। ওরান এখনও বেন বেলার অনুগত। অন্যান্য নেতাদেরও এক একটি শক্ত ঘাঁটি আছে আলজিরিয়ার এক এক অঞ্চলে। এ অবস্থায় অবিলম্বে যদি না আলজিরিয়ার নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে একটা আপোসে আসতে পারেন তবে কঙ্গোর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা সেখানে একেবারেই অসম্ভব হবে না।

চতুর্থ কমাণ্ড আলজিরিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করেই বেন বেলা ও তাঁর রাজনৈতিক ব্যুরোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন এবং বিপ্লবী-পার্লামেণ্টের এক জরুরী অধিবেশনের আহ্বান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দের কলহে সদ্যস্বাধীন আলজিরিয়া আজ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। বাকি আছে শুধু আর একদফা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

॥ আংশিক নিষিদ্ধকরণ ॥

পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রস্তাব ইতিপূর্বে ব্যর্থ হয় পর্যবেক্ষণের প্রশ্নে। যুক্তরাষ্ট্র জল স্থল অন্তরীক্ষে সকল প্রকার পরীক্ষা বন্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিল পর্যবেক্ষণের শর্তে। অর্থাৎ পরীক্ষা নিষিদ্ধ হলে এবং নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে সকল পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রে থাকবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদিন ঐ প্রস্তাবকে গুপ্তচরবৃত্তির নতুন কৌশল বলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। সেই পর্যায়ের আলোচনার ব্যর্থতার পর যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েই নতুন করে পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করে এবং এবিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে কোন সুমীমাংসার সম্ভাবনা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু তাবলে নিরস্ত্রীকরণ বা নিষিদ্ধকরণের আলোচনা বন্ধ হয় না। ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তি চীনের জঙ্গী শাসকদের করায়ত্ত হওয়ার সম্ভাবনা উভয় পক্ষকেই ভবিষ্যতের বে-পরোয়া পরীক্ষার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। তাই গত ২৭শে আগষ্ট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হতে জেনিভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে একটি আংশিক পরীক্ষা-নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ঐ প্রস্তাবে জলে, স্থলে ও উর্ধ্বাকাশে বিনা পর্যবেক্ষণেই পরীক্ষা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়। শুধু ভূনিম্নে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণাধীনতার শর্তে বন্ধ রাখার কথা বলা হয়।

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ঐ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এ সম্বন্ধে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ কুজনেৎসোভ বলেন, জলে বা জলের নীচে, স্থলে বা উর্ধ্বাকাশে পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূনিম্নেও পর্যবেক্ষণব্যবস্থাহীন অবস্থাতে পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ভূনিম্নে পরীক্ষা আইনসঙ্গত থেকে যাবে।

এ সম্বন্ধে আপাততঃ শুধু এইটুকুই বলা যায় যে পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাবে এবার পশ্চিমী শক্তিবর্গ যতটা আপোসের মনোভাব দেখিয়েছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে তা দেখানো হয়নি। পরীক্ষা যেখানে নীতি হিসাবে অন্যায় সেখানে বিশেষ কোন ধরণের পরীক্ষা কোন যুক্তিতেই আইনসঙ্গত হতে পারে না। সুতরাং ভূনিম্নে পরীক্ষা এখনই বন্ধ না হলে তা আপনা হতেই আইনসিদ্ধ হয়ে যাবে এরূপ ভাবার কোন যুক্তি নেই। এখনই যুদ্ধের কোন আশংকা নেই, এই মুহূর্তের প্রধান সমস্যা হল পরীক্ষা বিশেষ করে জলে বা জলের নীচে বা উর্ধ্বাকাশে পরীক্ষা। যার ফলে সারা পৃথিবীর জল বাতাস আজ দূষিত হতে চলেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভূনিম্নে পরীক্ষা বন্ধের কোন সুসমাধান হল না বলে অন্যান্য মুক্তস্থানেও যদি পরীক্ষা বন্ধ না হয় তবে সেটা এই গ্রহেরই দুর্ভাগ্য বলে মনে করতে হবে।

॥ সকলি বিফল ভেল ॥

মধ্য-সিংহলের নওয়ালাপিটিয়া স্কুলের এক শিক্ষিকা ভালবেসেছিলেন প্রায় দেড়শত মাইল দূরবর্তী অনুরাধাপুরমের এক শিক্ষককে। ব্যবধান ক্রমে অসহনীয় হওয়ায় শিক্ষিকা শিক্ষাদপ্তরের কাছে আবেদন জানালেন অনুরাধাপুরমের শিক্ষালয়ে বদলী হওয়ার। কিন্তু সে আবেদনে কোন সাড়া না পাওয়ায় ভাগ্যপরীক্ষার্থে প্রেমিক শিক্ষকই তখন আবেদন জানালেন নওয়ালাপিটিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার।

এইবার শিক্ষা দপ্তরের ঘুম ভাঙল। তাঁরা দুজনের আবেদনেই সাড়া দিলেন। শিক্ষক স্থানান্তরিত হলেন নওয়ালাপিটিয়ায় আর শিক্ষিকা অনুরাধাপুরমে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৩শে আগষ্ট—৬ই ভাদ্রঃ ব্রহ্মপুত্রের জলস্ফীতিতে আসাম রাজ্যের ছয়টি সমতল জেলায় যানবাহন চলাচল বন্ধ—প্রতিদিন নূতন নূতন অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যার প্রসার—শত শত গ্রাম বিপন্ন ও লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত।

বন্যার ফলে জলপাইগুড়ি ও কোচ-বিহার জেলায় ৬৫ খানি গ্রাম জলমগ্ন—৭৫ হাজার নর-নারী আশ্রয়হীন।

মোহনবাগানের দশমবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ (ফুটবল) লাভ—চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারক খেলায় ইষ্ট-বেঙ্গল দল ২—০ গোলে পরাজিত।

২৪শে আগষ্ট—৭ই ভাদ্রঃ বর্ধমানে ছাত্রদলের উপর পুলিশের লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—সংঘর্ষে পুলিশ সমেত ১২ জন আহত—বাস কণ্ডাক্টারের সহিত ছাত্রবিরোধের গুরুতর পরিণতি।

ধ্বংসাত্মক কার্যে শিক্ষাদানের জন্য পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীরের পাক্ অধিকৃত এলাকায় শিবির পরিচালনা—বিষয়টি গুরুতর বলিয়া রাজ্যসভায় শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) ঘোষণা—পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত-অঞ্চলে বহু পরিখা খননের সংবাদ।

২৫শে আগষ্ট—৮ই ভাদ্রঃ 'তৃতীয় পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক) রূপায়িত হইবেই'—লোকসভায় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের দৃঢ় ঘোষণা—আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ সম্পর্কে আশার মনোভাব প্রকাশ।

২৬শে আগষ্ট—৯ই ভাদ্রঃ কলিকাতার উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছরে পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যসরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) সম্মতি—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র উপস্থিতিতে মহানগরীর বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা। শ্রীমোরারজীর আশ্বাসঃ কলিকাতার উন্নয়নকল্পে অর্থ অন্তরায় হইবে না।

'প্রতি বৎসর গান্ধীজীর জন্মদিবস (২রা অক্টোবর) হইতে জাতীয় সংহতি সপ্তাহ পালন'—জাতীয় সংহতি-সংক্রান্ত আঞ্চলিক পরিষদ কমিটির সিদ্ধান্ত।

২৭শে আগষ্ট—১০ই ভাদ্রঃ 'দেশের বিভিন্ন অংশে বিধ্বংসী বন্যায় এযাবৎ ৯০ জনের প্রাণহানি—প্রায় দুই সহস্র গবাদি পশুর মৃত্যু ও হাজার হাজার গৃহ বিধ্বস্ত—পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীও ভি আলগেসানের বিবৃতি।

স্বতন্ত্র দলের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীএন জি রঙ্গ চিত্তুর কেন্দ্র হইতে লোকসভায় নির্বাচিত—প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীটি এন বিশ্বনাথ রেড্ডীর পরাজয় বরণ।

২৮শে আগষ্ট—১১ই ভাদ্রঃ ভারতীয় ইউনিয়নের ষোড়শ রাজ্যরূপে নাগাভূমি গঠনের উদ্যোগ—লোকসভায় সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত।

বিদ্রোহী নাগা ও জাতীয়তা-বিরোধী মিজোদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যালোচনা—শিলং-এ রাজভবনে রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক।

২৯শে আগষ্ট—১২ই ভাদ্রঃ লোকসভায় নাগাভূমি রাজ্য বিল পাশ—নূতন রাজ্য গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

ভেষজ-শিল্প নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন—কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ারের ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

২৩শে আগষ্ট—৬ই ভাদ্রঃ সীমান্তের প্রশ্নে পাক্-চীন আলোচনা সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ পাকিস্তান কর্তৃক অগ্রাহ্য—পাকিস্তানের সদম্ভ জবাবঃ জম্মু ও কাশ্মীরের উপর ভারতের দাবী মানি না।

২৪শে আগষ্ট—৭ই ভাদ্রঃ বার্লিন সম্বন্ধে চতুঃশক্তি বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় আহবান—সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট পশ্চিমী গোষ্ঠীর লিপি।

পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া জেলায় অভূতপূর্ব বন্যা—বন্যার্ত উদ্ধারকার্যে সৈন্যবাহিনী তলব—রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলাতেও প্রবল জলোচ্ছ্বাস।

জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান গেমস্-এর উদ্বোধন—লক্ষাধিক দর্শকের সমাবেশে উদ্দীপনাময় অনুষ্ঠান—প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া) কর্তৃক ক্রীড়ারম্ভ ঘোষিত।

২৫শে আগষ্ট—৮ই ভাদ্রঃ কাশ্মীর লইয়া আমেরিকার কূটনৈতিক দাবাখেলা—পাক্-ভারত বিরোধ জীয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা—রাষ্ট্রসংঘস্থ সিংহলী প্রতিনিধির গোপন রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্যপ্রকাশ।

সিকিমে বন্যাস্ফীত তিস্তার গ্রাস—একসঙ্গে কর্মরত শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যু।

অনির্দিষ্টকালের জন্য আলজিরিয়ায় নির্বাচন স্থগিত—আলজিরীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঘোষণা—চতুর্থ সামরিক কমান্ডের প্রকাশ্য বিদ্রোহে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি।

হাভানার উপকূলে সশস্ত্র জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ—আমেরিকার বিরুদ্ধে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রোর অভিযোগ।

২৬শে আগষ্ট—৯ই ভাদ্রঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিউবার আকাশ ও সমুদ্র-সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ—মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক সরাসরি অস্বীকার।

'বিপ্লবী ছাত্রদল হাভানায় গুলীবর্ষণ করিয়াছে'—ফ্লোরিডায় সাংবাদিক বৈঠকে কিউবার ছাত্র বিপ্লবীদলের নেতা শ্রীজুয়ান ম্যানুয়াল স্যালভান্টের ঘোষণা।

২৭শে আগষ্ট—১০ই ভাদ্রঃ শুক্র গ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন মহাকাশ-যান প্রেরিত।

ঢাকায় স্ফীতকায়া বুড়ীগঙ্গার বিধ্বংসী রূপ—শহরতলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত—পূর্ব পাকিস্তানের বন্যায় এ পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু।

আণবিক পরীক্ষা সম্পর্কে নূতন পশ্চিমী প্রস্তাব—রাশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য—শুধু বায়ুমন্ডল, মহাশূন্য ও জলে পরীক্ষা বন্ধ করিতে নারাজ—ভূগর্ভেও আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার দাবী।

২৮শে আগষ্ট—১১ই ভাদ্রঃ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক আরব লীগ বর্জনের হুমকী—আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিনিধিদলের লীগের কাউন্সিলের অধিবেশন (লেবানন) ত্যাগ।

ইয়াল্টায় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সহিত রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের বৈঠক—রাষ্ট্রসংঘ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

২৯শে আগষ্ট—১২ই ভাদ্রঃ জানুয়ারী মাসের মধ্যে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার দাবী—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধির প্রস্তাব।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বন্যায় ১৩৮ জন নিহত।

নেপালে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক রেলওয়ে সেতু বিধ্বস্ত—একই দিনে একটি থানা দখল।

॥ সার্লক হোমসের ব্যক্তিজীবন ॥

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যখন সার্লক হোমস্ চরিত্রটি সৃষ্টি করেন তখন তিনি হয়ত স্বপ্নেও ভাবেননি যে এই চরিত্রটি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এতখানি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। সাহিত্যের ইতিহাসে সার্লক হোমস্‌কে ঘিরে যে উপকথা গড়ে উঠেছে তার আর তুলনা নেই। এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের বিখ্যাত Strand Magazine-এর বিলুপ্তির বছরে প্রকাশিত সার্লক হোমসের মৃত্যু-সংবাদ যেভাবে পরিবেশিত হয়েছিল তা মনে পড়ে।

স্বর্গীয় মঁসিয়ে রেনল্ড নকস্ সার্লক হোমসের কাহিনীগুলিকে বলতেন 'The Sacred Writings' এবং "Studies in the Literature of Sherlock Holmes" নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যকর্ম হিসাবে গ্রন্থটি অতুলনীয়। এরপর অনেকেই সার্লক হোমস্‌কে নিয়ে প্রবন্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে ভিনসেন্ট ষ্টারেট রচিত "The Private Life of Sherlock Holmes" গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিখ্যাত গ্রন্থটির একটি পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন লণ্ডনের প্রকাশক এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন। সার্লক হোমসের অসংখ্য ভক্তবৃন্দের কাছে এ এক সুসংবাদ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

সাউথ সীর জনৈক নগণ্য ডাক্তার, রোগীর সংখ্যা যখন অনেক কম সার্লক হোমসের প্রথমতম কাহিনী "A Study in Scarlet" নিয়ে যখন প্রকাশকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেদিনে আর এ-দিনে অনেক তফাৎ। সেদিন অতিকষ্টে সেই পাণ্ডুলিপি মাত্র দশ'পঞ্চাশ পাউণ্ডে বিক্রী হয়েছিল। লেখকের অবস্থা তখন ডাঃ ওয়াটসনের চাইতেও খারাপ, অর্থের বড় প্রয়োজন।

সার আর্থার কোনান ডয়েলের কিন্তু সেদিন কিংবা কোনোদিন নিজের হাতে গড়া এই চরিত্রটির প্রতি তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না। একেবারে শুরুতে নেহাৎ-ই হাঁড়ি চড়ানোর প্রয়োজনে তার জন্ম, যাঁরা সার্লক ভক্ত তাঁরা হয়ত শুনে শিউরে উঠবেন যে কোনান ডয়েল একবার এই চরিত্রের নামকরণ করতে চেয়েছিলেন —"Sherringford Holmes", আর ডাঃ ওয়াটসন যার নামটিও পৃথিবীতে কম পরিচিত নয় তাঁর নামকরণ হচ্ছিল "Ormond Sacker"

ধীরে ধীরে সার্লকের প্রতিষ্ঠা যত বেড়ে ওঠে, যতই তার সমাদর ততই তার প্রতি স্রষ্টার একটা বিতৃষ্ণা বেড়ে চলে। যেন ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন তার স্রষ্টাকে হত্যা করছে এমনই মনোভাব লেখক এবং চরিত্রের মধ্যে। তাই সার্লক হোমসের নিখুত চরিত্র বিশ্লেষণ এবং তার খুঁটিনাটি আলোচনা কোনান ডয়েলের কাছে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তিনি ছিলেন অতিশয় সরল মানুষ, এমন এক সার্লকতন্ত্রে দীক্ষিত গোষ্ঠী গড়ে উঠবে তিনি কখনও কল্পনা করেননি। হয়ত স্রষ্টা স্বহস্তে তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হতেন না কিন্তু সার্লক হোমসের অসম্ভব জনপ্রিয়তা তাঁকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। লণ্ডনের দশ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীটের বাড়িটির ইতিহাস অনেকেই হয়ত বলতে পারবে না কিন্তু বেকার ষ্ট্রীট কার না পরিচিত।

সার্লক হোমসের চাইতেও মহত্তর চরিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনা কোনান ডয়েলের ছিল, এমন অসংখ্য চরিত্র মাথায় ভীড় করে এসেছে কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন অন্যান্য চরিত্রের দীপ্তি সার্লক হোমসের প্রবল প্রভাবে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। বোতলের ভিতর থেকে যে দৈত্য আবির্ভূত হয়েছে তাকে আবার বোতলে ভরা কঠিন হয়ে উঠল। তাই রাইখেন বাখ্ প্রপাতে তাকে নিক্ষেপ করে কোনান ডয়েল যে শেষ পর্যন্ত শান্তি লাভ করেছিলেন একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়।

একথা বলা বাহুল্য যে, প্রকাশকদের 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' সার আর্থার কোনান ডয়েলকে সুবর্ণ-শৃঙ্খলে বেঁধেছিল। সমগ্র পৃথিবী কেন সার্লক হোমসের দেউল-সোপানে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেছে? আজো কেন সার্লক হোমস্ কলোসাসের মত বিরাট পুরুষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রহস্য-কাহিনীর রাজ্যে? র‍্যামন, সাণ্ডল্যার প্রভৃতি একালের রহস্য-কাহিনীর লেখকবৃন্দ সার্লক হোমস্‌কে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, তবু হোমসের অমরত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। তার কারণ লেখক হিসাবে কোনান ডয়েল অনেক সার্থক শিল্পী, তাঁর মূল্যায়ন যথাযথভাবে হয়নি, তাঁর সার্লক হোমস্ তাই একটা আশ্চর্য যুগ সৃষ্টি করতে পেরেছে।

দৃশ্যপট বিস্তারকালে লেখক কোনান ডয়েলের মনে ছিল যাদুকরের পরিমিতি বোধ এবং কুশলতা। বৎসরের যে কোনও কালের বর্ণনাই লেখক করুন পাঠকের মনে হবে সার্লক হোমসের কক্ষে বসে আছি, তিনি তাঁর কেস্-এলবাম গোছ-গাছ করছেন। কিংবা

বেহালা বাজাচ্ছেন, বা অস্থির চিত্তে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের প্রতি মনোনিবেশ করছেন।

হয়ত সেপটেম্বর মাসের ঝড় বাড়িঘর কাঁপিয়ে তুলেছে, কিংবা গ্রীষ্মের দিনে যখন বেকার ষ্ট্রীটের ফুটপাথ জল-দেওয়া গাড়ি ধৌত করছে, কিংবা ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান গাড়িতে বসে ঢুলছে, কিংবা শীতের কুয়াশায় যখন গ্যাসবাতির আলো হরিদ্রাভ ঠেকে, ঘোড়ার গাড়ি কাদায় ছুটে যায়, তখনঃ

"All the day the wind had screamed and the rain had beaten against the windows, so that even here in the heart of great hand-made London we were forced to raise our minds for the instant from the routine of life, and to recognise the presence of those great elemental forces which shriek at mankind through the bars of civilization, like untamed beasts in a cage."

হাওয়ার বেগ যত বেড়ে চলে, চিমনীর ভিতর থেকে যেন শিশুর চাপা কান্নার মত শোনায়, সার্লক হোমস্ চিন্তাকুল হয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে অপরাধের ইতিহাস পাঠ করছেন, তারপর—?

মিঃ ষ্টারেট লিখেছেন—And then the bell, inevitably, the bell," সেই ঘণ্টাধ্বনি।

সার্লক হোমসের কাহিনীগুলিতে কোনান ডয়েল বিস্তারিত খুঁটিনাটি সম্পর্কে বেশ অস্পষ্টতা রেখেছেন, অনেকটা 'Sapper'-এর মত। স্যাপারের কাহিনীর নায়ক অতিশয় পূত চরিত্রের মানুষ, সেইভাবে তাকে আঁকা হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে ব্যাভিচারে মত্ত। অর্থাৎ লেখক আগেকার কাহিনী আর উলটে দেখেননি।

হাসাকর ভুল, ত্রুটি ইত্যাদি প্রদর্শন করে সমালোচনা হয়েছে, সময়, কাল ইত্যাদি তথ্যের ভুল অতিশয় মারাত্মক রকমের। কোনান ডয়েলের কাছে তা নিরর্থক—

"In short stories it has always seemed to me that so long as you produce your dramatic effect, accuracy of detail matters little. I have never striven for it and have made some bad mistakes in consequence. What matters, if I can hold my readers?"

সমালোচকদের মুখের মতন জবাব! এরপর আর কি বলা যাবে? সার্লক হোমসের ইতিহাসে তাই অনেক ফাঁক অনেক বিপরীত উক্তি। তাঁর বাপ-মা সম্পর্কে তিনি নীরব। কোনো কোনো সমালোচক বলতে চান যে তিনি গোত্রহীন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাও নিশ্চয়ভাবে বলা শক্ত। রোনালড্ নক্সের মত ভক্ত লিখেছেন—"হোমস্ ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁর অবসর যাপনের ব্যবস্থা ছিল মুষ্টিযুদ্ধ এবং অসিচালনায়। আর তাঁর বন্ধুসংখ্যা ছিল স্বল্প।"

কল্পনা-কুশল লেখক হিসাবে কোনান ডয়েলের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ করে তার চরিত্র সৃষ্টি করেননি, তার মধ্যে তাই যৌবন-আবেগ বা অনুভূতির অভাব। তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্র কাঠের পুতুল মাত্র। সার্লক ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মচারী। এক হিসাবে ভালো, যে-মানুষ কল্যাণব্রত গ্রহণ করেছেন পার্থিব আকর্ষণ তাঁর যত কম থাকে ততই মঙ্গল। একমাত্র হিটলারের মত আধুনিককালে হোমস্ই একমাত্র চরিত্র যার কাছে দৈহিক আনন্দের আবেদন নেই। হোমসের মন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী বিচার করবেন। কারণ আজীবনের বন্ধু ওয়াটসনও তাকে ক্রীশ্চান নামে ডাকতে পারেননি, অথচ

"Three Garibaldis" নমক গল্পে বন্ধুর প্রতি একটা গভীর অনুরাগের ছবি আছে।

'Sherlockismus' নামক তন্ত্রের পূজারী অসংখ্য, তার মধ্যে মিঃ ষ্টারেট বিশেষ চমকপ্রদ, কারণ তিনি ব্যক্তি-চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। তার গ্রন্থটি সরস এবং চমকপ্রদ। শেষ পর্যন্ত মানুষ হোমস্ পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন, ডিটেকটিভ হোমস্ নয়। এ অবস্থা বিচিত্র। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার একদা জর্জ স্যান্ডকে যেমন বলেছিলেন—*—L'hommie C'est rien. l'oeuvre C'est tout"* —(মানুষ কিছু নয়, কাজটাই প্রধান)—সেইকথা স্বয়ং হোমস্‌ও পুনরাবৃত্তি করেছেন।

অমৃত' পাঠকবৃন্দ সম্প্রতি সার্লক হোমসের অনেকগুলি বিখ্যাত গল্পের সুন্দর অনুবাদ পাঠ করার সুযোগ পেয়েছেন. হোমসের এই ব্যক্তি-জীবনের আলোচনা হয়ত তাঁদের আকৃষ্ট করবে।

নতুন বই

অনিদ্র গোলাপ (কবিতা)—মানস রায়চৌধুরী। মানস প্রকাশনী। ...৩ ম্যাংগো লেন, কলকাতা—১। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কয়েকটি কণ্ঠস্বর (কবিতা)—মণিভূষণ ভট্টাচার্য। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। ১সি, রাণীশংকরী লেন, কলকাতা—২৬। দাম আড়াই টাকা।

নির্বাসন (কবিতা)—পরিমল চক্রবর্তী। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। ১সি, রাণীশংকরী লেন, কলিকাতা—২৬। দাম দু টাকা।

ঝর্ণামন (কবিতা)—পরিমল চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ানা। কলকাতা—১২। দাম দু'টাকা।

বর্তমান তিনজন কবিই বয়সে প্রবীণ নন। আবার একেবারে তরুণও নন। কিছুকাল ধরে তাঁরা কবিতা লিখছেন। সব থেকে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল এখনও তাঁরা এক একটি পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন।

'অনিদ্র গোলাপ' মানস রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১। কবি উচ্চকণ্ঠ নন। প্রায়শঃই তাঁর উচ্চারণ অনুচ্চ নিবিড়তায় মগ্ন। তাঁর সন্ধান গোপন গভীরতা অভিমুখী।

সংসার পেরোলে বন্ধ পাথরের দরজা
খুলে যাবে এই চির প্রত্যাশার
ঘুমহারা রাত্রি ছিলো আমার দুপাশে,
আমি শরীরের সব অধিকার
সরিয়ে নিয়েছি এই তারকা-অঙ্কিত
পথে অনাবৃত নিশ্চল সুন্দরে
মৌরীর জঙ্গল ঘুরে অমর্ত
ফোয়ারা পাই
নিঃস্ব বুকে, গন্ধভারাতুর।

• • •

হঠাৎ ঘুমের নীচে শুনতে পাই
বসন্ত পাখির উচ্চারণ......

'স্মৃতির সৌরভে আমোদিত'। নিরালা পথে যাত্রার ইতিহাস-এর গভীরতার অন্তরাল হতে উচ্ছ্বাত এ কবিতাগুচ্ছ। কবি হৃদয়-বৃত্তিতে অবিশ্বাসী নন। তাই প্রণয় তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়। কবিতাগুলি আবেগময়। কিন্তু সে আবেগ শীলিত, সংহত এবং গোপন, অন্তর্লীন স্রোতের মত প্রবাহিত। কবিতার প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রেই সাংকেতিক—অপ্রত্যক্ষ। অবশ্য কবি স্ব-চরিত্রের বিরোধী কয়েকটি চতুর কবিতা রচনা করেছেন। এবং এসব কবিতা গ্রন্থের মূল আবহকে নষ্ট করেছে বলেই আমার বোধ হয়েছে। 'সিদ্ধপুরুষ' 'কয়েকজন' এজাতীয় কবিতার অন্তর্গত।

কবিতার ছন্দ, অবয়ব গঠন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই পয়ার আশ্রিত হলেও মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তে রচিত কবিতাও রয়েছে। এই বৈচিত্র পাঠকের কানকে একঘেয়েমির অবসাদ থেকে রক্ষা করে। শব্দচয়নে কবির সক্রিয় চেতনার নিদর্শন মেলে। গ্রন্থের সার্থক কবিতাগুলির শব্দযোজনা সংগীতময়ব্যঞ্জনা সঞ্চারণে সক্ষম। পাঠ-শেষে বলা প্রয়োজন যে, এই কবিতা-পুস্তকে এমন এক তরুণ কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যিনি এখনো একটি বিশেষ দর্শনভূমিতে পৌছতে পারেননি ; কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে সৎ, ক্ষমতাবান এবং পরিণতিমুখী। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যরচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' কবিতাগুলি ১৩৬২-৬৮ সালের মধ্যে রচিত। গ্রন্থটি 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' 'অন্ধকারের গল্প' এবং 'বিনিদ্র সংলাপ' এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। কয়েক বছরের কবিতার মধ্য দিয়ে তরুণ কবির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় স্বচ্ছন্দে। কবিতার বহিরঙ্গ প্রসাধনে কবি অত্যন্ত সচেতন। বক্তব্য বিষয়কে সুন্দরভাবে উপস্থিত করবার জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রয়াস অভিনব চিত্রকল্পের মধ্যে ব্যঞ্জনা লাভ করে। তিনি যখন বলেন 'যৌবন নামক এক পরম্পরা-বিরোধী স্বভাবে' 'যে-নদীর গতিপথে আমরা আজ স্বতন্ত্র, একাকী' তখন মনে হয় তিনি অনেক স্বাভাবিক এবং মৌলিক। কোথাও কোথাও তাঁর চিন্তা এক অতি সুন্দর ভাবময়তায় আপ্লুত।

যে সুন্দরতর চৈতন্য কাব্যময় জগতে প্রয়ান করে স্বকীয় শিল্পস্বভাব গুনে।—

পল্লবিত ঐশ্বর্যের অতিথিরা একে একে
ফিরে গেলো কাল,
তারা সব অর্ধমৃত, পরতন্ত্রী,,
তৃপ্ত,পলাতক :"
কেউ তারা দেখলো না শোণিতাক্ত
চাঁদের মশাল,
স্নান সেরে নিতে গেলো আত্মহত্যা
প্রবণ স্নাতক।

স্ব-ভাবনাময় এই তরুণ কবির মধ্যে যে স্বতন্ত্র মেজাজটি লক্ষ্য করা গেল তা সমস্ত কবিতায় সমান ভাবে ফুটে ওঠেনি। পরিণত শিল্পবোধ গড়ে তোলবার জন্য তাঁর এখনও কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে 'সদ্যোজাত অন্ধকার গোধূলির বিবর্ণ শিশুকে' হারিয়ে ফেলতে হবে 'অন্ধকারের পদতলে ঐ শান্তি নদীর জলে'।

স্বল্পকালের ব্যবধানে পরিমল চক্রবর্তীর 'নির্বাসন' ও 'ঋণীমন' কাব্য-গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৬৪-৬৮ সালের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে দুটি গ্রন্থে সংকলিত। মোট কবিতার সংখ্যা অষ্টআশি। আবেগ-নির্ভর কবিতা রচনাতেই কবির প্রবণতা। উপস্থাপনার সারল্য এবং গীতিময়তা তাঁর কবি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রেম, বিস্ময়, যন্ত্রনা, বিধুরতা—এসব উপাদানে রচিত এক রোমান্টিক পরিবেশে কবির ভ্রমণ।

অনুভবে আবেগের ঊর্ণনাভ বোনে
স্বপ্নজাল
প্রতিদিন প্রতিরাত; অমবস্যা কিংবা
পূর্ণিমার
অকূল রহস্য ভাসে চেতনার
থই থই হ্রদে।

এই আবেগ-মগ্নতাই তাঁর কবিতায় সমুজ্জ্বল।

আমার দুচোখে জেলে
বৈশাখের দীপ্ত মধ্যাহ্ন
তুমি তো করেছো বন্দী
নিরক্ত প্রণয়ে এ-যৌবন
যন্ত্রনার ভাববৃত্তে; বাসন্তিক
শোক, দুঃখ, ক্ষয়ে
তুমি তো দিয়েছো হাতে
অপরূপ রূপের খঞ্জনী,
স্পর্শে তার জেগে ওঠে
অন্ধকার মৃতকল্প মন।

হৃদয়ধার্মিক গীতিময় রোমান্টিকতার একটি ধারা বাঙলা কবিতায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কখনো আধুনিকতার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনো বা কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। পরিমল চক্রবর্তী এই ধারারই কবি। স্বভাবতই মাঝে মাঝে তাঁর কাব্যোক্তিকে যেন বা পুরনো মনে হয়।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে
পৃথিবীর সেই সব দিন
....
হে আকাশ, হে আমার
নীলকান্তমণির আকাশ,
একমাত্র তুমি পারো
এই তীক্ষ্ন যন্ত্রণার মাঝে
শান্তির আশ্বাস দিতে;
আহত হৃদয়ে আজো বাজে
তোমারই স্বপ্নের সুর,
দাও তুমি স্নেহের আভাস।

কোথাও কোথাও কবিকল্পনা সার্থক ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারেনি। মাত্রাতিরিক্ত-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যেই ব্যর্থতা আসে। তবুও একথা স্বীকার্য তাঁর কবি-অনুভূতি সৎ বলেই রোমান্টিক গীতিকবিতার চিরন্তন হার্দ্য আবেদন তাঁর কবিতায় বর্তমান।

পরিচিতা (উপন্যাস)—**অজিত মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।**

উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে লেখক যে গভীর সত্য তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তা সার্থক শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাষামাধুর্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চলতি বাজারী উপন্যাস থেকে এর পার্থক্য রয়েছে অনেক। বইটি সমাদৃত হবে আশা করি।

আমেরিকার আলেখ্য— ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলকাতা হতে প্রকাশিত।

আলোচ্য পুস্তিকায় আমেরিকার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিবেশ স্থাপনের কাল থেকে শুরু করে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংস্কৃতিবান জাতি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্পর্কে জানবার পক্ষে গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। ভূগোল ও বহিরাগত উপনিবেশ, অর্থনীতি বিষয়ে মার্কিন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য: রাজনীতি বিষয়ে মার্কিন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম', যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন জাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে ব্যবস্থা', 'সাহিত্য ও শিল্পকলা' 'পারিবারিক গোষ্ঠী', 'যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থা' ও 'বিশ্বের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র' এইভাবে গ্রন্থটির আলোচনা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

লেনিন— অনুবাদ : ইলা মিত্র। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২। দাম ১-৬০ নঃ পঃ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক, সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তাঁর জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যাবে এ গ্রন্থ থেকে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

উত্তরকাল—(শ্রাবণ ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও প্রসূন বসু। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

উত্তরকালের বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক আত্মপ্রকাশকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছিলাম পূর্বেই। যথাসময়ে পত্রিকাটি মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে পাঠক-সাধারণকে নতুন চিন্তার প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। বর্তমান সংখ্যায় শীতাংশু মৈত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটি মূল্যবান। অপূর্ব নিয়োগীর আলোচনাটিতে যুক্তি ও তথ্যের অভাব অনুভূত হল। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। চিত্ত ঘোষাল বর্তমান সংখ্যায় একটি গল্প লিখেছেন। কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, প্রসূন বসু ও সুশীল গুপ্ত। আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে।

এষণা (দ্বিতীয় বর্ষ ।। বৈশাখ-আষাঢ়)—সম্পাদক : বিশ্বনাথ ঘোষ। ১৬।১এ ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। বিশেষ কোন মূল্যবান রচনা চোখে পড়ল না। মুদ্রণপ্রমাদ অতিরিক্ত মাত্রায় বেশী।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও নাটক :

"শেষাগ্নি" নাটকের শততম রজনীর স্মারক উৎসবে বক্তৃতাচ্ছলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : ১৯০৫ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছে, সেগুলিতে আমাদের মনের প্রতিফলন ছিল। প্রতাপ-আদিত্য, মেবার-পতন, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম প্রভৃতি নাটক দেখে বোঝা যেত, বাঙলাদেশের লোক কি চায়। বেশ বোঝা যেত, একটি পরাধীন জাতি মুক্তি-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এ ছাড়া সে-যুগের সামাজিক সমস্যাগুলিকেও নাটকের ভিতর দিয়ে তুলে ধরা হ'ত। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর আজ পনেরো বছর অতীত হয়েছে; এই পনেরো বছরের ভিতর আমাদের রঙ্গালয়ে যে-সব নাটক অভিনীত হ'তে দেখা গেছে, তা থেকে জাতি কি চায়, তা বোঝা যায় না, আমরা আমাদের দেখতে পাই না। আজ বাঙলার বিভিন্ন জেলায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, আমরা আমাদের আড়াই হাজার বছরের সমাজকে নিজে হাতে ভাঙছি—এই ভাঙবার জন্যে আইনের পর আইন তৈরী হচ্ছে। জমিদারী চ'লে গেছে; তার বদলে এসেছে শিল্প, কারখানা। কালকের সমাজের সঙ্গে আজকের মিল নেই; কালকের জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে আজকের জীবনজিজ্ঞাসার অনেক তফাৎ। আমাদের নাটকে এই পরিবর্তন রূপায়িত হচ্ছে না; সাধারণতঃ যে-সব সমস্যা নিয়ে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটকগুলি গ'ড়ে ওঠে, ওগুলো অত্যন্ত ব্যক্তিগত, ছোট সমস্যা। ওগুলোর সঙ্গে মাটির কোনো যোগ নেই; তাই জন-মানসের সঙ্গেও ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। নতুন কালের নতুন নাটক এখনও লেখা হয়নি।

তারাশঙ্করের মত চিন্তাশীল সাহিত্যিকের মুখের কথা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁর কথা শোনবার পর স্বাধীনতালাভের পরবর্তী যুগে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির বিষয়বস্তুর দিকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন অনুভব করলুম। গেল পনেরো বছর আমাদের রঙ্গমঞ্চগুলি অন্ততঃ একশো সওয়াশো নাটককে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করেছে। এর মধ্যে আছে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য এবং জীবনী-নাটক; আছে ভক্তিমূলক দেশাত্মবোধক, কৌতুক এবং গীতিনাট্য; এমন কি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা নাটকও দু' একখানা খুঁজলে পাওয়া যাবে: যেমন স্বাধীনতালাভের প্রথম বছরেই দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ওপর জলধর চট্টোপাধ্যায় লিখিত "থামাও রক্তপাত"। ঐ ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে-আটখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়, তার মধ্যে সাতখানিই হচ্ছে দেশাত্মবোধক; ওরই মধ্যে একখানি আবার ভারতের স্বাধীনতা লাভের যুগ-ব্যাপী প্রচেষ্টার ওপর লিখিত—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত "স্বাধীনতার সাধনা।" কিন্তু ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে-সাতাশখানি নাটক অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে জাতীয়তামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বীর চরিত্র-সংবলিত ন'খানি নাটক থাকলেও সেগুলি দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারেনি; কারণ স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসনের সমাপ্তির পর ওই নাটকগুলির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল। এবং স্বাধীনতা লাভের ফলে দেশবাসীর মনে যে-আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে চরিতার্থ না হওয়ার জন্যে যে-ব্যর্থতা ও নিরুৎসাহের ভাব জন-চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করবার উপযোগী ঘটনা বা সংঘর্ষ সৃষ্টির ক্ষমতা বা চেষ্টা কোনো নাট্যকারের ছিল না। ওরই মধ্যে সুধীন্দ্র রাহার "দিল্লী চলো", শচীন সেন-গুপ্তের 'এই স্বাধীনতা' এবং অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতির মন্ত্র' নাটকে (১৯৪৯-৫১) সেই সময়ের জনমানসের কিছুটা প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ নাটকের মধ্যেই না ছিল সামাজিক সমস্যা, না ছিল রাষ্ট্রীয় সমস্যার কথা। মৌলিক গার্হস্থ্য নাটকগুলির মধ্যে এমন কোনো বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়নি, যা দর্শকমনে সাড়া জাগাতে পারে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে-দু'খানি নাটক অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে-ছিল, তাদের ভিতর প্রথমখানি হচ্ছে কালিকা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এবং তারক মুখোপাধ্যায় রচিত 'যুগদেবতা' (পরম-

হংসদেবের জীবনীচিত্র—১৯৪৮) এবং দ্বিতীয়খানি হচ্ছে রঙমহলে অভিনীত এবং দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি"। এই যুগে রচিত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কেরানীর জীবন"-এ মধ্যবিত্ত সমাজের কিছুটা চিত্র ধরা পড়েছিল।

শ্রীসলিল মিত্র স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর যখন ১৯৫৩ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত নিরুপমা দেবীর "শ্যামলী"কে মঞ্চস্থ করলেন, তখন থেকেই আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলিতে একখানি নাটকের দীর্ঘকাল-ব্যাপী একটানা অভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হল। "শ্যামলী" একটানা অভিনীত হয়েছিল ৪৮৪ রাত্রি। রঙমহল চালালেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "উল্কা" ৫০৭ রজনী ধ'রে। মিনার্ভাতেও "এই সত্যি' নাটক চলেছিল একশত রাত্রির ওপর। ১৯৫৬ সালের ৭ই জুন বিশ্বরূপা তাঁদের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন তারাশঙ্কর রচিত "আরোগ্য নিকেতন"-এর নাট্যরূপ নিয়ে। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর থেকে আজ পর্যন্ত যে প'য়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ-খানা নাটক মঞ্চস্থ হয়, তার মধ্যে সন্তোষ সেন রচিত এবং কমল মিত্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত "মধ্যবিত্ত", বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত "ক্ষুধা", সলিল সেন রচিত "ডাউন ট্রেণ", উৎপল দত্ত রচিত "অঙ্গার", ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত "আর হবেনা দেরী" এবং শক্তিপদ রাজগুরু রচিত ও দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত "শেষাগ্নি"—নাটকে কিছু কিছু সমাজ-চিত্র আছে। ধনী দ্বারা দরিদ্রকে শোষণ এবং স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানোর চিত্রের মধ্যে আজকের প্রবঞ্চিত, ক্ষুধার্ত ও উৎপীড়িত সমাজের রূপ নিশ্চয়ই ফুটে ওঠে, কিন্তু মাত্র এই রূপটাই জাতির একমাত্র রূপ নয়। বাঙালীর সমাজ-জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন সংসাধিত হচ্ছে, সমাজ এবং পারিবারিক সম্পর্কে যে নবমূল্যায়ন প্রবর্তিত হচ্ছে, রুচি, রীতি এবং নীতির ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তার সঙ্গে আজকের নাট্যকারের হয় নিবিড় পরিচয় ঘটেনি, নয় বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক চাপে তার স্বাভাবিক দৃষ্টি আজ স্তিমিত হয়ে রয়েছে। মাত্র "শেষাগ্নি" নাটকে জমিদারী-প্রথা লোপের পর শিল্প-ভারত গ'ড়ে ওঠার মধ্যে যে সমাজগত বিপ্লব রয়েছে, তার আঘাতে গেল সামন্ততান্ত্রিক যুগের মানুষের ভেঙে পড়ার ট্রাজিডি বিধৃত হয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনো নাটকে—অবশ্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকে—জাতির নবরূপায়নের কোনো চিত্র দেখতে পাওয়া যায়নি। নতুন দিনের নতুন নাটক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে। আশা আছে, যে-ভাবে সারা বাঙলাদেশময় নাট্য-আন্দোলন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, তাতে সৃষ্টিধর্মী নাট্যকারের সন্ধান অদূর ভবিষ্যতেই আমরা পেতে পারব।

চিত্র সমালোচনা

অভি...রকা (বাঙলা) ঃ টাস ফিল্মস-এর নিবেদন; ১১,৯৯৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; **প্রযোজনা ঃ** তারা বর্মণ; **কাহিনী ঃ** হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; **চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ** কমল মজুমদার; **সংগীত-পরিচালনা ঃ** রবীন চট্টোপাধ্যায়; **গীত-রচনা ঃ** শ্যামল গুপ্ত; **চিত্র-গ্রহণ ঃ** দীনেন গুপ্ত; **শব্দধারণ ঃ** অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য) ও শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য); **সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ** শ্যামসুন্দর ঘোষ; **সম্পাদনা ঃ** কমল গাঙ্গুলী; **শিল্পনির্দেশনা ঃ** সুনীতি মিত্র; **রূপায়ন ঃ** সুপ্রিয়া চৌধুরী, ভারতী, রাজলক্ষ্মী, তপতী ঘোষ, নিভাননী, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, মণি শ্রীমানী, হরিমোহন বসু প্রভৃতি। টাস পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৩১-এ আগস্ট থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

মুক্তিপ্রাপ্ত 'অভিসারিকা' চিত্রে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

বন্ধুর সঙ্গে বাজী রেখে বিয়ে-বাড়ীতে অনাহূত নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে পাত পেড়ে পাঁচ রকম ভালোমন্দ খাওয়ার সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে উত্তম-মধ্যম প্রহার খাওয়ার কাহিনী সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি আছে; কিন্তু তারই সঙ্গে অযাচিতভাবে বধূলাভের চমকপ্রদ বৃত্তান্ত সচরাচর কানে আসে না। অবশ্য "অভিসারিকা"-চিত্রের নায়ক রতীন চৌধুরীর ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন ছিল না যে, আসন্ন বিবাহকে এড়িয়ে প্রেমাস্পদ গৃহ-শিক্ষকের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে অভিসারিকা শুভাকে সে বিনা আয়াসেই বধূরূপে লাভ করতে পেরেছিল। ঘটনা-ক্রমে সঙ্গী হয়ে সে প্রথমে অপরিচিতা শুভাকে তার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে সাহায্য করতেই চেয়েছিল; কিন্তু নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে যখন শেষ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করল, শুভার দয়িত কল্যাণদা শুধু বিবাহিতই নয়, একটি পুত্রের জনকও বটে, তখন তার মনের সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধ স্বভাবতঃই প্রেমে রূপান্তরিত হ'ল এবং সামান্য ভুল বোঝাবুঝির পর সেই প্রেম সার্থকতাও লাভ করল—শুভা ও রতীন ছবির শেষ মুহূর্তে হ'ল মিলিত।

চিত্রনাট্যের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত কৌশল লক্ষ্য করা গেল। যে-কল্যাণদাকে উপলক্ষ ক'রে ছবিতে বিস্তারিত ঘটনার জাল বোনা হয়েছে, সেই কল্যাণদাই ছবিতে অনুপস্থিত, মাত্র একটি চিঠি পড়ার মাধ্যমে তার নেপথ্যকণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায়। এমন কি, কল্যাণদা' শুভাকে পড়াতে এসেছেন, দেরীতে আসার জন্যে শুভা তাঁর কাছে অনুযোগ করছে, শুভার বৌদি তাঁর জন্যে চা-জলখাবার দিয়ে গেল, কিন্তু দর্শকের কাছে কল্যাণদা' নেপথ্যেই থেকে গেলেন; সেই খল ভিলেন মানুষটিকে মুহূর্তের জন্যেও ছবিতে দেখা গেল না। বাঙলা চিত্রনাট্য রচনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব। সদ্য রোগমুক্ত শুভার কল্পনার চক্ষে নিজেকে নববধূ বেশে ব্যর্থতার গান গাইতে দেখবার দৃশ্যটি একটি অতি-পরিচিত ক্যামেরা কৌশলের সাহায্যে সাধারণ দর্শকের চোখে কিছুটা চমক লাগায় হয়ত'। কল্যাণের প্রবঞ্চনা ধরা পড়বার পর নিজের ব্যর্থ জীবনের সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টাকে যথেষ্ট ট্রাজিক করবার জন্যে যে-প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তার অভাব থেকে গেছে চিত্রনাট্যে। কিন্তু এর চেয়েও ত্রুটি দেখা গেছে ছবির একেবারে শেষ মুহূর্তে, যেখানে খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দু'হাজার টাকার লোভে রতীন শুভার দাদা জয়ন্তকে খবর দেয়নি জানতে পেরে শুভা অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেণ থামিয়ে প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান রতীনের কাছে ছুটে আসে নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে তার হাত ধ'রে জীবনের পথে পা বাড়াবার জন্যে। অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেণ থামানোর ভিতরে কেন জানি না একটি হাসির উপাদান জড়িয়ে আছে বহু দিন ধ'রেই; ওকে হৃৎস্পন্দনবন্ধকারী গুরুগম্ভীর নাটকীয় করে তোলা রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

অভিনয়াংশে নির্মলকুমার নায়ক রতীনের চরিত্রটি জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। প্রেসের সহকর্মী বরদার সঙ্গে বাজী রেখে নিমন্ত্রণ খেতে আসা এবং খাওয়ার মাঝে প্রায় ধরা পড়ার প্রাক্কালেই সবেগে প্রস্থান করার মধ্যে যে হাল্কা ভাব, তাও তিনি যেমন অনায়াসেই প্রকাশ করেছেন, তেমনই আকস্মিকভাবে নববধূ বেশে সজ্জিতা তরুণী শুভার সহযাত্রী হয়ে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবার ভাবও তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে চমৎকার। নিরাসক্তভাবে সঙ্গিণীকে সাহায্য ও সেবা করতে করতে ধীরে ধীরে রতীনের মনে শুভার প্রতি দুর্বলতার সঞ্চার এবং পরে অনন্ত প্রেমকে মনের গভীরে রেখে তাকে অনায়াসে বিদায় দেওয়া, আবার শেষ মুহূর্তে তাকে সহজেই গ্রহণ করা প্রভৃতির মাধ্যমে রতীন চরিত্রের মহত্ব অতি সহজেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। নায়িকা শুভার চরিত্রের ব্যাকুলতা, হতাশা, সাহায্যকারী সঙ্গীর প্রতি ক্ষণে শ্রদ্ধা, ক্ষণে অবিশ্বাস ও ঘৃণা এবং শেষে প্রগাঢ় প্রেম প্রভৃতি সমস্তই স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়ের মাধ্যমে। এ ছাড়া চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল (সদাশিব), অসিতবরণ (জয়ন্ত), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (পান্থনিবাসের মালিক-ম্যানেজার), ভারতী (জয়ন্তের স্ত্রী), তপতী ঘোষ (কল্যাণের স্ত্রী কমলা), জহর রায় (নবদ্বীপের হোটেলওয়ালা), রাজলক্ষ্মী (পান্থনিবাসের মালিকের স্ত্রী), অনুপকুমার (বরদা), মণি শ্রীমানী (কাঞ্জিলাল) প্রভৃতি।

ছবির কলাকুশলীদের কাজ, বিশেষ ক'রে দীনেন গুপ্তের চিত্রগ্রহণ এবং সুনীতি মিত্রের শিল্প নির্দেশনা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ছবির দু'খানি গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া হ'লেও সুরের মধ্যে বিশেষ কোনো নতুনত্ব না থাকায় ও দুর্বলভাবে ছবির মধ্যে প্রযুক্ত হওয়ায় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি। আবহসঙ্গীত এবং আবহশব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগ কয়েক জায়গায় আকস্মিকভাবে হ'লেও মোটের ওপর হয়েছে সুষ্ঠু। ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে শুভার বিবাহপূর্ব জীবন এবং কল্যাণদা'র জন্যে তার মনের দুর্বলতাকে চিত্রায়িত ক'রে সম্পাদক কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিবিধ সংবাদ

এস, সি, প্রোডাকসন্স-এর "শুভদৃষ্টি" :

এস, সি, প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের "কাঁটা ও কেয়া" উপন্যাস অবলম্বনে গঠিত "শুভদৃষ্টি" চিত্রখানি এই মাসের শেষের দিকে মুক্তি পাচ্ছে। সুকুমার কুমারের প্রযোজনায় চিত্ত বসু পরিচালিত এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন কাঞ্চনজঙ্ঘাখ্যাত অরুণ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যারাণী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, গীতা দে, নিভাননী, দীপিকা দাস, পার্থপ্রতিম, মমতাজ আহমেদ এবং ছবি বিশ্বাস। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবিখানিতে সুরযোজনা করেছেন। জনতা পিকচার্স এ্যান্ড থিয়েটার্স লিঃ ছবিখানির পরিবেশক।

প্রয়োগাচার্য সেবক শ্রীকালিদাসের "পরিত্রাণ" :

গেল বুধবার, ৫ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার কালিকা রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগাচার্য সেবক শ্রীকালিদাসের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের "পরিত্রাণ" অভিনীত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়।

গীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর "বিশ সাল বাদ" :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত গীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর "বিশ সাল বাদ" নামে রহস্যমূলক হিন্দী ছবিখানি খুব শিগগিরই মুক্তি পাচ্ছে। প্রখ্যাতনামা শিল্পনির্দেশক বীরেন নাগ পরিচালিত এই ছবিখানির শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণ হয়েছেন বাঙলার জনপ্রিয় নট বিশ্বজিৎ এবং হিন্দী চিত্রজগতের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমন। সুরযোজনা করেছেন প্রযোজক হেমন্তকুমার নিজে। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড ছবিখানির পরিবেশক।

একটি যাত্রাভিনয় :

গেল ১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতাদিবসে নিউ গণেশ অপেরা পার্টি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটস্থ কমলকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে যশস্বী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীমান বিনায়ক ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক "আগুন"-এর যাত্রাভিনয় করেন। নারী ও সুরাসক্ত দ্বিতীয় মহীপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে, তখন উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত সম্প্রদায় তাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে-বিদ্রোহ করেছিল, তাকে উপজীব্য ক'রে এই "আগুন" নাটকটি লিখিত। গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা, সুরশিল্পী অমিয় ভট্টাচার্যের সঙ্গীত-পরিচালনা এবং নাট্য-উপদেষ্টা বিধায়ক ভট্টাচার্যের উপদেশগুণে 'আগুন' যাত্রাভিনয় মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছিল। বিশেষ ক'রে মহীপাল, রামপাল ময়না, সপ্ততীর্থ, ন্যায়রত্ন এবং অঙ্গনার ভূমিকায় যথাক্রমে গোপাল চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী, ছবিরাণী, রাধারমণ পাল, অনাদি চক্রবর্তী এবং অনীতার অভিনয় দর্শকদের অতিমাত্রায় মুগ্ধ করেছিল।

যাত্রা উৎসব :

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত সুবৃহৎ যাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে গেল বৃহস্পতিবার, ৩০-এ আগস্ট তারিখে রবীন্দ্রকাননে (বিডন উদ্যানে)। অন্যূন চার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এখানে কোন রকম বক্তৃতা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমি আসিনি। কিন্তু যাত্রাভিনয় দেখবার জন্যে এই বিপুল জনসমাগম দেখে এবং যাত্রাজগতের বিখ্যাত নট ও নাট্যকার দু'জনের প্রতি উদ্যোক্তারা যে-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন, তা' শুনে আমার
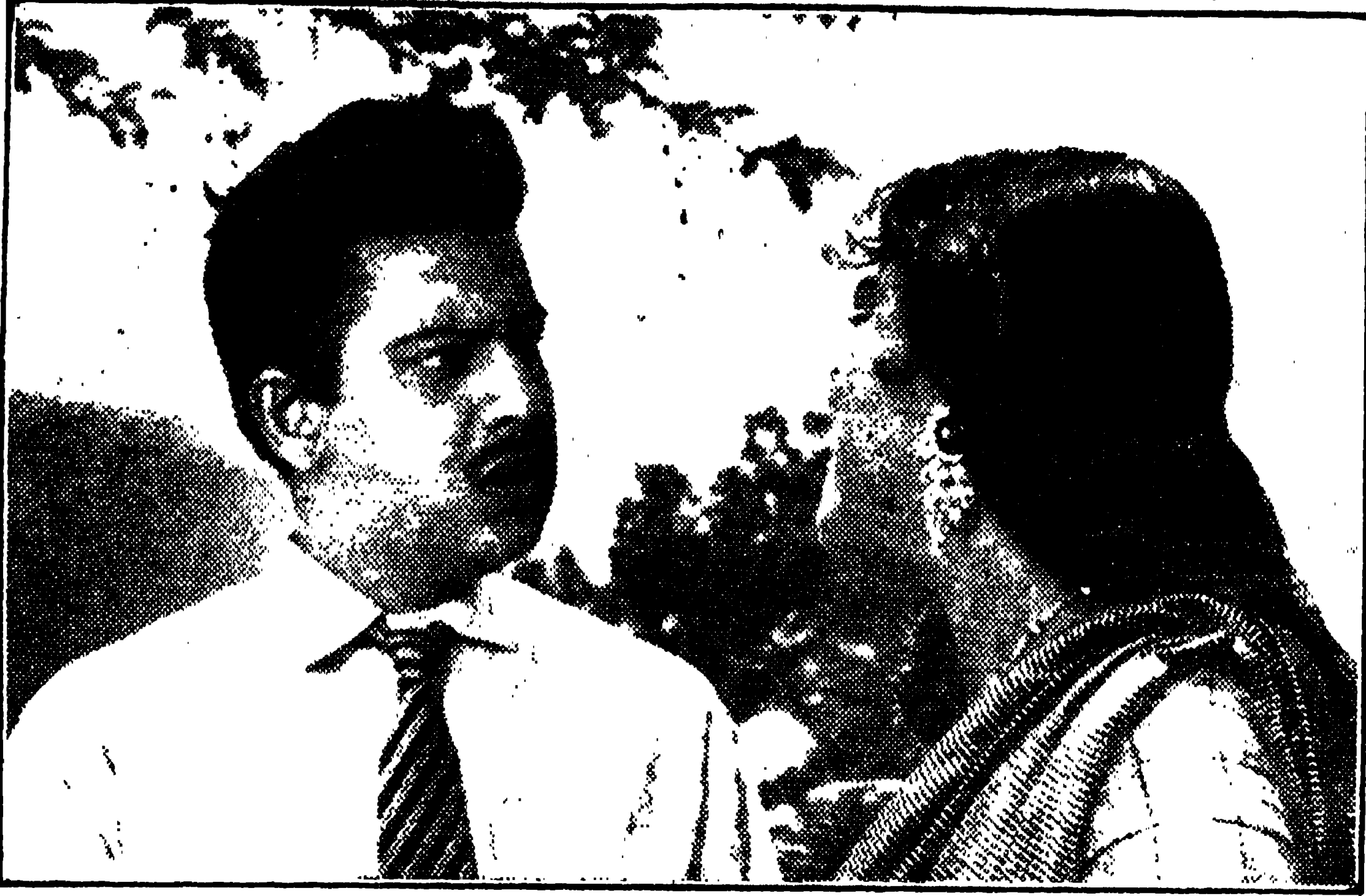
বিশ্বভারতীর নির্মীয়মান কৌতুকচিত্র 'স্বর্ণচোরা'র একটি দৃশ্যে অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়।

কয়েকটি কথা বলবার ইচ্ছে করছে। আমি দেখছি যে, বাঙলা তথা ভারতের লোকসংস্কৃতির বিনাশ নেই; কতকাল ধ'রে আমাদের দেশে যাত্রা, পালাগান চলে আসছে—আজও এদের জনপ্রিয়তা কমেনি; এদের সাহায্যে আমাদের দেশের সাধারণ লোক যেমন আনন্দ পেয়েছে, তেমনই শিক্ষাও পেয়েছে। লোকশিক্ষার জন্যে যাত্রাগানের প্রয়োজনীয়তা বরাবরের মত আজও আছে। তাই থিয়েটার সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আজ তা বেঁচে রয়েছে। কতবার ভারতের—বাঙলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে-চেষ্টা বিফল ক'রে আমাদের সংস্কৃতি আজও অক্ষতভাবে বেঁচে রয়েছে। আমি যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। বাঙলার যাত্রাগান ব্রজেন্দ্র দে, ফণী বিদ্যাবিনোদ, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি শক্তিমানদের সহায়তায় উন্নতির পথে অগ্রসর হোক, এই কামনাই আমি করি।" বলা বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের আগে যাত্রাজগতের ধুরন্ধর নট-নাট্যকার ফণী বিদ্যাবিনোদ এবং জনপ্রিয় নাট্যকার ব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয়দের বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষে শ্রীরাসবিহারী সরকার সম্মানিত করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ছলে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী বাঙলা যাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। পরে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীরাসবিহারী সরকার সানন্দে ঘোষণা করেন যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাঙলাদেশের যাত্রা ও মঞ্চাভিনয়ের উন্নতিকল্পে এই দুইটি লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহনকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে আশা করব যে, লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন এই যাত্রা উৎসবকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন প্রমোদ-করের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অভিব্যক্ত মতের গৌরব রক্ষা করেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হবার পর প্রথম দিনের নির্ধারিত যাত্রাভিনয়—সুখ্যাত নাট্য কোম্পানীর "লোহার জাল"-এর অভিনয় শুরু হয়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আয়োজিত ব্রিটিশ চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী:

গেল মঙ্গলবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা ইনফরমেশান সেন্টারে হামফ্রে জেনিংস পরিচালিত দুটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র—"আই ওয়াজ এ ফায়ারম্যান" এবং "ফ্যামিলি পোর্ট্রেট"—প্রদর্শিত হয় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে।

সমকালীন মঞ্চ প্রয়াস-এর "অন্য আকাশ":

গেল ১৮ই আগস্ট প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ সমকালীন মঞ্চপ্রয়াস-সংস্থা শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত "অন্য আকাশ" অভিনয় করেছিলেন।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা ।৫

সম্পূর্ণ অন্তঃ ও বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের পর অভিযাত্রিক-প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান' পরিচালক সত্যজিৎ রায় গত সপ্তাহে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে আবহ-সঙ্গীত গ্রহণ করলেন। এ ছবির চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনা শ্রীযুক্ত রায়ের। এই মাসের শেষ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ওয়াহিদা রেহমান, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রেবা দেবী, চারুপ্রকাশ ঘোষ, বীরেশ্বর সেন, অবনী মুখোপাধ্যায় ও অরুণ রায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় যথাক্রমে সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত। ছায়ালোক-পরিবেশিত 'অভিযান' মুক্তিপ্রতীক্ষিত।

'যাত্রিক' গোষ্ঠী তাঁদের পরবর্তী ছবি ভি. শান্তারাম প্রযোজিত 'পলাতক'-র চিত্র গ্রহণ শুরু করছেন আগামী সপ্তাহে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। মনোজ বসুর 'আংটী চ্যাটার্জীর ভাই' গল্প অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন যাত্রিক গোষ্ঠীর অন্যতম তরুণ মজুমদার, শচীন মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, রবি ঘোষ, হরিধন, তরুণ বসু, নবেন্দু ঘোষ, এস এন ব্যানার্জী, মণি চ্যাটার্জী ও অসিত সেন। যাত্রিক-গোষ্ঠীর বিভিন্ন কলাকুশলী বিভাগে কাজ করছেন আলোকচিত্রে সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত, শিল্প নির্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত, শব্দগ্রহণে পারমার এবং সঙ্গীত পরিচালনায় হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।
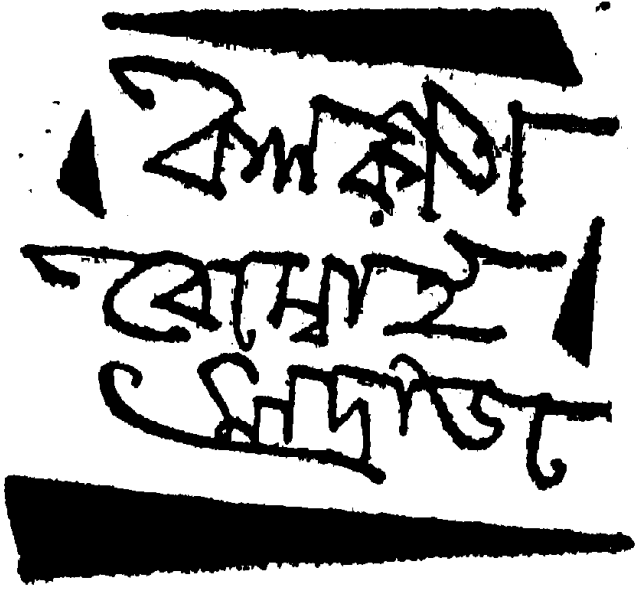
ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় জরাসন্ধ রচিত 'ন্যায়দন্ড' ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রম প্রযোজিত এ 'ছবির বিভিন্ন অংশে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, আশীষকুমার, তন্দ্রা বর্মন, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, সবিতা চ্যাটার্জী, মঞ্জুলা সরকার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ।

চিত্র-গ্রাহক কানাই দে। সঙ্গীত পরিচালক আলী আকবর খাঁ।

চিত্রালয় প্রযোজিত ও আলোকচিত্রম পরিবেশিত শৈলেশ দে-র 'মহাকালীন মামলা' কাহিনী অবলম্বনে 'দুই বাড়ী' ছবির দৃশ্যগ্রহণ করছেন রাধা ফিল্ম স্টুডিওয় পরিচালক অসীম পাল। এ ছবির আলোকচিত্রশিল্পী মনীষ দাশগুপ্ত ও কানাই দে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অনিল চ্যাটার্জী ও তন্দ্রা বর্মন। পার্শ্ব-প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, গীতা দে, রেণুকা রায়, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, মিতা চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমানি ও তুলসী চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন।

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওয় সম্প্রতি একটানা 'শেষ অঙ্ক' ছবির কাজ করলেন পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য। কাহিনীর সম্পূর্ণ নাটকীয় ও সাসপেন্স মুহূর্তগুলির সংযত অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, পাহাড়ী সান্যাল, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, দীপক মুখার্জী, কমল মিত্র, রেণুকা রায় ও শিশির বটব্যাল। এইসঙ্গে সম্পা-

অমরবাণী নিবেদিত মুক্তিপ্রতীক্ষিত "ভুল" চিত্রের দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী।

দনার কাজ চলেছে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে। সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলী।

বোম্বাই :

অভিনেতা - পরিচালক - প্রযোজক ভি শান্তারাম 'কন্যা রাজশ্রী শান্তারাম স্ত্রী' ছবির পর বর্তমানে কয়েকটি চিত্রে নায়িকার জন্য মনোনীত হয়েছেন। প্রথমটি, হরদীপ প্রযোজিত ও বাপ্পি সোনি পরিচালিত 'জিন্দা দিল।' নায়ক শাম্মিকাপুর। রঙিন ছবির সংগীত পরিচালক শংকর-জয়কিষন। দ্বিতীয়টি, শান্তি সামন্তের 'কাশ্মীর কি কলি।' এ ছবিরও নায়ক শাম্মিকাপুর। সুর ও পি নায়ার। এছাড়া মাদ্রাজের জেমিনী প্রযোজিত একটি ছবি। নায়ক মনোজ। সুরকার রবি। পরিচালক রাজ খোসলাও রাজশ্রীকে নিয়ে ছবি করবেন। অর্থাৎ এর মধ্যেই চারখানা ছবির নায়িকা চরিত্রে স্বাক্ষর করেছেন রাজশ্রী।

গোল্ডেন ফিল্মস-এর 'কোন অপনা কোন প্যায়ারে' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ গত সপ্তাহে শেষ হল মোহন স্টুডিওয়। বহির্দৃশ্যের জন্য স্থান মনোনীত হয়েছে নৈনিতাল। আগামী অক্টবর মাসে পরিচালক নিরঞ্জন সদলবলে রওয়ানা হবেন। এই ছবির প্রধান চরিত্রলিপি হল ওয়াহিদা রেহমান, বিজয়কুমার, অমর, নিরুপা রায় ও জনিওয়াকর। ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছেন রবি।

সম্প্রতি পরিচালক সদাশিব জে রাও 'বেগানা' ছবির আবার চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন প্রকাশ স্টুডিওয়। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন বাংলার অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরী, ধর্মিন্দার, শৈলেশ কুমার, তরুণ বসু, মাষ্টার বাবলু, মাধবী ও আগা। স্বপন ও জগমোহন এ ছবির সংগীত পরিচালক।

ফিল্ম ভারতী-র ছবি 'নর্তকী'। একসঙ্গে রঞ্জিত ও রূপতারা স্টুডিওয় পরিচালক নিতীন বসু চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করছেন। ধ্রুব চ্যাটার্জি রচিত এই চিত্রনাট্যের মুখ্য শিল্পীদের নাম হল, নন্দা, ওমপ্রকাশ, আগা, নানা পালশিকর, প্রীতিবালা এবং চন্দ্রিমা ভাদুড়ী। সংগীত পরিচালক রূপে যিনি আছেন তাঁর নাম রবি।

প্রযোজক ও পরিচালক বিমল রায় তাঁর আগামী মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি 'প্রেমপত্র'-এর সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করেছেন। মুখ্য চরিত্রে শশিকাপুর, সাধনা, সীমা, সুধীর ও চাঁদ-ওসমানী-র অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী। এই মাসেই 'প্রেমপত্র' মুক্তি পাবে।

মাদ্রাজ :

সম্প্রতি বোম্বাই মহালক্ষ্মী স্টুডিওয় মারাঠী ছবি 'নন্দিনী'-র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য যে সব শিল্পী মনোনীত হয়েছেন তাদের মধ্যে সীমা, রমেশদেব, শ্রীকান্ত মোঘী, ইন্দিরা চিটনীস ও সরদ তলোয়াকর অন্যতম। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মধুকের পাঠক। সংগীত পরিচালক বিশ্বনাথ।

তামিল ছবি 'পথা কানিক্যাই' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শান্তি, প্রভাত ও সরস্বতী চিত্রগৃহে। সামাজিক চিত্র তবে অতিনাটকীয়। অভিনীত চরিত্র-শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অশোকান, জেমিনী গণেশ, এম আর রাধা, বিজয়া-কুমারী ও পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনী। পার্শ্ব-চরিত্রে নতুন চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন জেমিনী গণেশ ও জি সাবিত্রী।

মালায়লম ভাষার একটি ছবি 'কল্পদুকাই'-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হল গোল্ডেন স্টুডিওয়। কেরালার সাধু নারায়ণ গুরু-র জীবন অবলম্বনে এই চিত্রটি এই মাসের শেষেই মুক্তি পাবে। কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রেমনাজির, আরানমুলা ও পদ্মিনী। একটি বিশেষ নৃত্যের দৃশ্যে রাগিনীকে দেখা যাবে। এ ছবির পরিচালক ও সংগীত পরিচালক হলেন শ্রীনিবাসন ও কে এস এন্টনী।

—চিত্রদূত

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। প্রাচীর ঘেরা চার দেওয়ালের মাঝখানে এক একটি জীবন এখানে ছড়ানো। পাশাপাশি চারটি স্টুডিও-ফ্লোরে দুটি ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ চলেছে। উপন্যাস বা গল্পের চরিত্র নিয়ে ছোট ছোট জীবনের এক-একটি রূপ এখানে দানা বাঁধে চলচ্চিত্রায়নের চিত্রনাট্য। সবভুলে একসঙ্গে পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীদের বহু দিনের বহু পরিশ্রম এই সকাল-সন্ধ্যের তীর্থভূমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। এ আর এক অনুভূতি। শিল্পসৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণে এখানে প্রত্যহের দৈন্যতা থেকে মুক্তি আনে।

সাহিত্যের এ আর এক সৃষ্টি চলচ্চিত্রে যার নাম দৃশ্যকাব্য। অভিনীত সেই সব কাহিনীর কথাই বলছি। ইন্দ্রানী প্রোডাকসন্সের 'হাসি শুধু হাসি নয়' চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন আলোকচিত্রশিল্পী ও পরিচালক সন্তোষ গুহরায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। আজকের শহরজীবনের যে সমাজ তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ কাহিনী। গল্প পরে বলবো। প্রথমে অভিনীত একটি দৃশ্যের কথা বলছি। কলকাতার আউট্রাম ঘাটের পার্শ্ববর্তী ফোর্ট উইলিয়ম মাঠের ভ্রমণ উদ্যানের বহির্দৃশ্যের হুবহু কাঠামোটি এখানে তৈরী হয়েছে। মনে হবে আপনার স্টুডিওতে এসে আপনি বেড়াতে এসেছেন আউট্রাম ঘাটে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সবই সম্ভব। শিল্পনির্দেশক এ দায়িত্ব পালন করেন। কাহিনীর দুটি মধুর চরিত্র—সুজিত আর রিতা-র চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও সাধনা ঘোষ। একটি মধুর পরিবেশ। গঙ্গার তীরবর্তী একাসনে পাশাপাশি দুটি জীবনের ছায়া পড়েছে। প্রশ্ন তাদের জীবন মিলনে। বিয়ের কথা পাকা করতে সুজিত এসেছে রিতার কাছে এই নিভৃতে। কয়েকটি কথা। আকাশ-গঙ্গার এক পাশে বসে এমনি অনেক কথা। টুকরো টুকরো ভাবে দৃশ্য গৃহীত হল। চিত্রগ্রহণের অবসরে আজকের জনপ্রিয় নায়ক বিশ্বজিতের সঙ্গে কিছু কথা হল। বিশ্বজিৎ অভিনীত প্রথম হিন্দী ছবি 'বিশ সাল বাদ' সাফল্যের পর বর্তমানে বম্বেতে কয়েকটি নতুন ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন। ছবিগুলির নাম—'বীনবাদল বরসাৎ।' জ্যোতিস্বরূপ পরিচালিত নায়িকা আশা পারেখের বিপরীতে। মোহন সায়গলের 'শেয়সী।' নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান। সুবোধ মুখার্জির রঙিন ছবি 'এপ্রিল ফুল'—নায়িকা সাধনা। ত্রিপাঠী পরিচালিত 'বিজয়গড়'—নায়িকা অনিতা গুহ। সম্প্রতি ইনি 'বীনবাদল বরসাৎ' ছবির অভিনয় করে বম্বে থেকে ফিরেছেন। এখানে এ'র

স্টুডিও থেকে বলছি
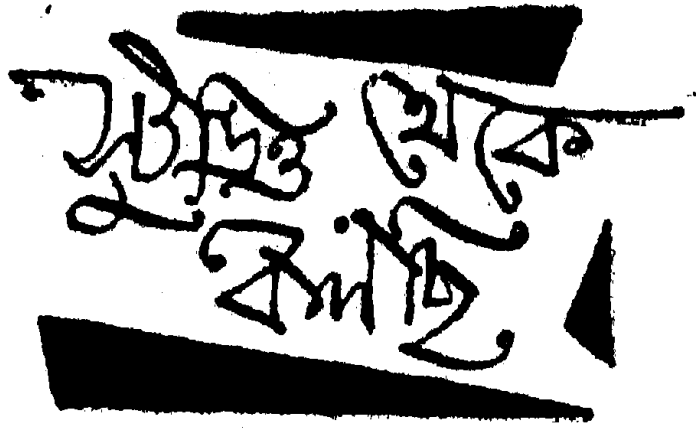
অভিনীত ছবিগুলির নাম—'দাদাঠাকুর' 'ধূপছায়া' ও 'একটুকরো আগুন', যার চিত্রগ্রহণ বর্তমানে চলেছে। কলিকাতা আর বোম্বাই একসঙ্গে দু'জায়গায় বাংলা ও হিন্দী ছবির অভিনয় করে খুব অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বজিৎ জনপ্রিয় হয়েছেন।

'হাসি শুধু হাসি নয়'-র সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রযোজক জগন্নাথ চক্রবর্তী জানালেন। গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ শান্তিরাম। অর্থ উপার্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কলকাতার গ্রাম ছেড়ে চলে আসে একা। কিন্তু যা মনে মনে ভেবেছিল শান্তিরাম কলকাতা তা নয়। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের অনেক তফাৎ। ফুটপাতেও ঠাঁই মেলা ভার। তা' নাহলে ওরাই বা বলবে কেন —এখানে কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশপত্র আছে? শান্তিরাম ভয়ে ভয়ে মাথা দোলায়।

—তাহলে এখানে তো পুনঃবাসনের স্থান মিলবো না। কারণ 'নব বঙ্গ রিফুজি পুনর্বসতি কেন্দ্র'-এ রিফুজি কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

আর একজন বলে—ও কে?

—একজন নন-রিফুজি হতভাগ্য!

পথে পথে এ চলার শেষ নেই। ট্রেন থেকে নেমে এখনও একটুকরো জায়গা পেল না শান্তিরাম মাথা গোঁজার জন্য। এত বড় শহর। কেউ কারো জন্য ভাবে না। যে যার নিজের জন্য ভাবছে। পরিচিতি না থাকলে পরিচয় কেউ রাখে না।

হোঁচট খেতে খেতে দিন চলে যেতে লাগলো শান্তিরামের। আজ এখানে কাল সেখানে। বাসনওয়ালার দোকানে চাকরী ছেড়ে 'হস্তশিল্প পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে' পা বাড়াতে বাধ্য হয়। এখানে মানুষকে ঠকিয়ে উপার্জনের ব্যবসা চালান সমাজের উচ্চপদস্থ দলপতি। যার নাম মিঃ চৌধুরী। এই সংস্থার সভ্যরা কেউ চোর, কেউ ডাকাত আর কেউবা পকেটমার। শিক্ষায়তনের এই বিশেষ শিক্ষার জন্য শিক্ষকও রয়েছেন নিযুক্ত। একদিন শান্তিরামের ওপর নির্দেশ হল এই শহরের ধনশালী বাঈজী রাণীমার বাড়ীতে হানা দেবার। রাতের আঁধারে রাণীমার বাড়ীতে অনভিজ্ঞতার জন্য শান্তিরাম ধরা পড়ে। তবে এ অপরাধে সাজার বদলে ভাগ্যই ফিরলো শান্তিরামের। রাণীমার একমাত্র ছেলে বুদ্ধিমান সামন্ত নিরুদ্দেশ হয়েছিল। একই চেহারা, রাণীমা ভুল করে শান্তিরামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শান্তিরামের নতুন পরিচয় হল—বুদ্ধিমান সামন্ত।
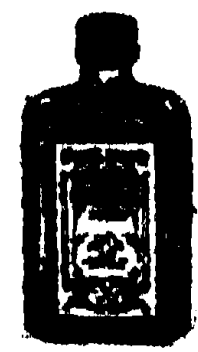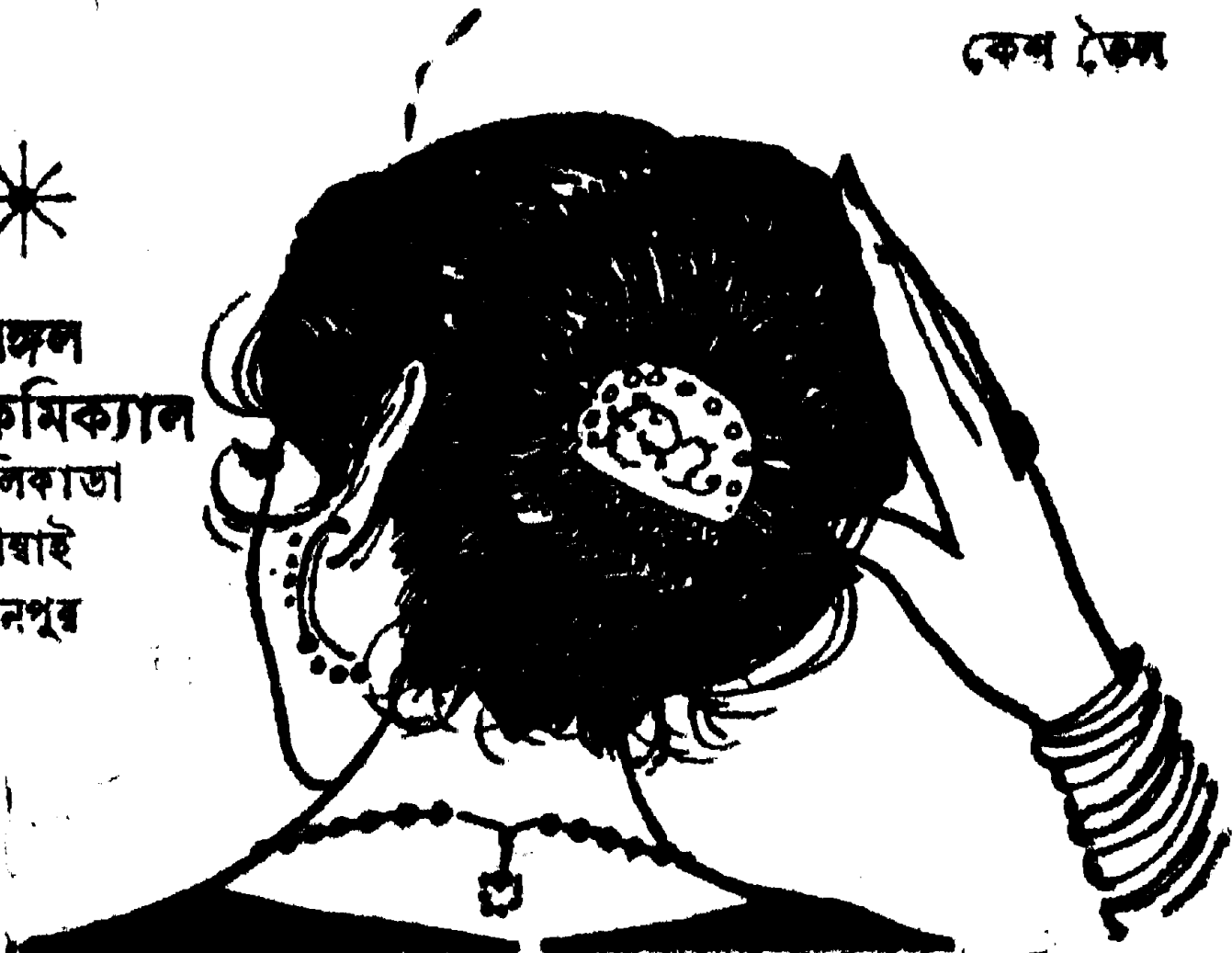
ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্সের 'হাসি শুধু হাসি নয়' চিত্রগ্রহণের অবসরে পরিচালক সন্তোষ গুহ রায়, বিশ্বজিৎ ও সাধনা ঘোষ।

রাণীমা মারা যাবার পর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল সামন্ত। দলপতি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ঐ সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বুদ্ধিমান দেশের সেবায় সমস্ত টাকা দান করতে শুরু করলেন। এই সময়ে সুজিতকে নিজের সহযোগী রাখলেন। সমস্ত বুদ্ধি এখন সুজিতের ওপর। মিঃ চৌধুরীর মেয়ে রিতাকে সে ভালবাসে। বুদ্ধিমান এ খবর জানতে পেরে সুজিতের সংগে রিতার বিবাহের যোগসূত্র পাকা করে দিলেন। কিন্তু সেই সময় নিরুদ্দেশী বুদ্ধিমান সামন্ত সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে এসেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা প্রমাণিত হলে বুদ্ধিমান সামন্ত শান্তিরামকে মুক্তিই দিলেন কারণ সে থাকলেও সমস্ত সম্পত্তি দেশের সেবায় ব্যয় করতো।

শান্তিরাম শহর ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরলো। শহর জীবনের এ অভিজ্ঞতা তার জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলো।

এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে শান্তিরামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন জহর রায়। সুজিতের চরিত্রে বিশ্বজিৎ। রিতা—সাধনা ঘোষ। মিঃ চৌধুরী—নিতীশ মুখোপাধ্যায়। রাণীমা—পদ্মাদেবী। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, গঙ্গাপদ বসু, জয়শ্রী সেন ও রাজলক্ষ্মী দেবী। কলাকুশলীদের মধ্যে সম্পাদনায় সুবোধ রায়, শব্দগ্রহণে জি ডি ইরাণী ও শিশির চ্যাটার্জি, শিল্প নির্দেশনায় গৌর পোদ্দার ও সংগীত পরিচালনায় শ্যামলকুমার মিত্র।

—চিত্রদূত

ভিন্‌দেশী ছবি

টেনেসী উইলিয়ামস-এর নবতম চিত্র-কাহিনী ঃ

টেনেসী উইলিয়ামস-এর "পীরিয়ড অফ এ্যাডজাস্টমেন্ট" নাটক অবলম্বনে ছবি তুলছেন এম-জি-এম। চিত্রটি সংগীতসমৃদ্ধ হবে। লীন মারে সংগীত পরিচালনা করবেন। ইতিপূর্বে "টম থাম্ব", "বেলস আর রিঙ্গিং", "টু ক্যাচ এ থীফ", "দি ব্রিজেস অফ টোকেরী" প্রভৃতি চিত্রে সংগীত এবং কণ্ঠ-সংগীত পরিচালনা করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন মারে। "দি পীরিয়ড অফ এ্যাডজাস্টমেন্ট" পরিচালনা ক'রবেন জর্জ রয় হিল এবং প্রযোজনা করবেন লরেন্স ভাইংগারটেন। ভূমিকালিপিতে আছেন জেন ফণ্ডা, টনি ফ্রান্সিওসা, জিম হার্টন এবং এই নেটলটন। শ্রীমতী নেটলটন আরেকটি এম-জি-এম ছবি "শাম্পেন ফ্লাইট"এ অভিনয়ের জন্যেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

দি পট ক্যারিয়ারস ঃ

'দি পট ক্যারিয়ারস' একটি নতুন ধরনের ছবি। জেমস রেইনবো ঈর্ষায় উত্তেজিত হয়ে ছুরি নিয়ে একটি লোককে মারতে গিয়েছিল। লোকটির দোষ সে জেমস-এর প্রণয়িনীর সংগে ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়েছিল। বিচারে জেমস-এর এক বছরের কারাদণ্ড হয়। জেলে প্রথম প্রথম সে তার সহবন্দীদের এবং জেলের সমস্ত পরিবেশকে ঘৃণা করে হতাশায় নিঃসংগ হয়ে কাটাচ্ছিল। তার সহকর্মীদের সহানুভূতি তাকে ক্রমশঃ সুস্থ, স্বাভাবিক করে তোলে। তাকে জেলে কাজ দেয়া হয়েছিল রান্নাঘরে। সেখানে কাজ করতে করতে সহৃদয় রেডব্যান্ড এবং সিঁধেল চোর 'মাউস'-এর সঙ্গে এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

'দি পট ক্যারিয়ারস'-এর কাহিনীকার হলেন জনৈক দুগ্ধ ব্যবসায়ী মাইক ওয়াট। পরিচালক পিটার গ্রাহাম স্কট নিখুঁত তথ্যচিত্রের মতই ইংলণ্ডের কারাগারের অন্তর্দৃশ্যগুলি তুলেছেন। কারাগারের জীবনকে তার সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত এই চিত্রে পাওয়া যা'ব। প্রখ্যাত অভিনেতা পলম্যাসী রেইনবোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। রেড ব্যান্ডের ভূমিকায় রোনাল্ড ফ্রেজার এবং সিঁধেলচোর 'মাউস'-এর ভূমিকায় হাস্যাভিনেতা ডেভিড কে অভিনয় করেছেন।

চিত্রটি তোলা হচ্ছে এ্যাসোসিয়েটেড বৃটিশ স্টুডিওতে।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

॥ এ্যাথলেটিকস ॥

এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় জাপান অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে অনুষ্ঠানের মোট সংখ্যা ছিল ৩২—পুরুষ বিভাগে ২২ এবং মহিলা বিভাগে ১০। জাপান মোট ১৮টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পেয়ে স্বর্ণ-পদক লাভ করে (পুরুষ বিভাগে ১১টি এবং মহিলা বিভাগে ৭টি)। এবার মোট ২৪টি অনুষ্ঠানে (পুরুষদের ১৭ এবং মহিলাদের ৭টি অনুষ্ঠান) নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপিত হয়। জাপানই ১২টি অনুষ্ঠানে এই রেকর্ড স্থাপন করে।

পদক প্রাপ্তির হিসাব তালিকায় জাপান সর্বাধিক রৌপ্য পদক (১১টি) এবং সর্বাধিক ব্রোঞ্জ পদকও (৬টি) পেয়েছে। জাপানের পরই ভারতবর্ষের স্থান—স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ২।

পুরুষ বিভাগে দুটি ক'রে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন মাত্র দু'জন—ইন্দোনেশিয়ার মহম্মদ সারেংগাং এবং পাকিস্তানের মুবারক সাহ। মহম্মদ সারেংগাং ১০০ মিটার দৌড় এবং ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান পেয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। অপর দিকে মুবারক সাহ ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ এবং ৫০০০ মিটার দৌড়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করে স্বর্ণ পদক পান।

মহিলা বিভাগে ফিলিপাইনের মোন সুলেমান ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পেয়ে 'ডাবলস' খেতাব লাভ করেন। তাছাড়া এই দুটি অনুষ্ঠানে তিনি নতুন এশিয়াম রেকর্ড স্থাপন করেন।

এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণ পদক পান ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং, ১,৫০০ মিটার দৌড়ে মহীন্দর সিং, ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ত্রায়লোক সিং এবং ডেকাথলনে গুরবচন সিং। তাছাড়া ১,৬০০ মিটার রীলেতেও ভারতবর্ষ স্বর্ণ পদক পায়। ডেকাথলন ছাড়া অপর চারটি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেন। ২০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং দুর্ভাগ্যক্রমে ফাইনালে উঠতে পারেননি। সেমি-ফাইনালে তিনি চতুর্থ স্থান পান। কিন্তু তিনি তাঁর গ্রুপের প্রথম তিনজনের মত ২১·৫ সেকেন্ড সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। ভারতবর্ষের অপর প্রতিনিধি মাখন সিং দৌড়েছিলেন ৩নং গ্রুপের সেমি-ফাইনালে। তিনি ২১·৮ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় স্থান পান এবং ফাইনালে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। মাত্র তিনজন—মিলখা সিং ৪০০ মিটারে, মুবারিক সাহ ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজে এবং এস ওবোনী মহিলা বিভাগের সটপুটে তৃতীয় এশিয়ান গেমসের মতই এবারও প্রথম স্থান পেয়েছেন। পুরুষ বিভাগের ৪০০ মিটার রীলে রেসে গত বারের মত ফিলিপাইন এবারও স্বর্ণ পদক পায়।

জাতীয় পতাকা হাতে ৪০০ মিটার দৌড় বিজয়ী মিলখা সিং
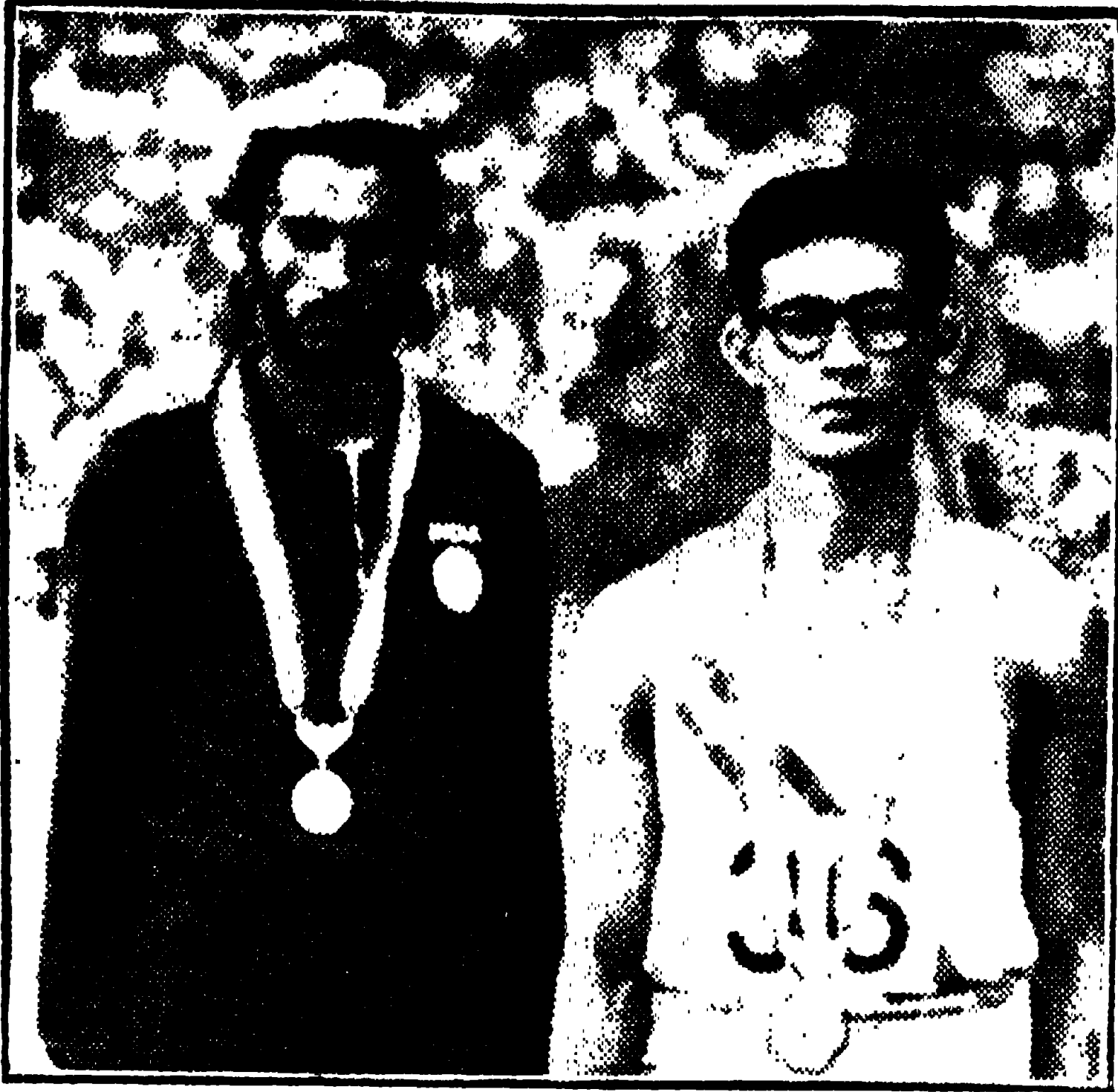
ডেকাথলন : বিজয়ী গুরবচন সিং (বাঁ দিকে) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী এস সুজুকী (জাপান)

॥ ফাইনাল ফলাফল ॥

(ফাইনালে যাঁরা প্রথম স্থান পেয়েছেন)

পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার : মহম্মদ সারেঙ্গাং (ইন্দোনেশিয়া) সময় : ১০·৫ সেঃ (নতুন রেকর্ড)।

২০০ মিটার : এম জগথেসন (মালয়) সময় : ২১·৩ সেঃ (নতুন রেকর্ড)।

৪০০ মিটার : মিলখা সিং (ভারতবর্ষ) সময় : ৪৬·৯ সেঃ (নতুন রেকর্ড)।

৮০০ মিটার : মামোরু মোরিমতো (জাপান) সময় : ১ মিঃ ৫২·৬ সেঃ।

১,৫০০ মিটার : মহীন্দর সিং (ভারতবর্ষ) সময় : ৩ মিঃ ৪৮·৬ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ : মুবোরক সাহ (পাকিস্তান) সময় : ৮ মিঃ ৫৭·৮ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৫,০০০ মিটার : মুবারক সাহ (পাকিস্তান) সময় : ১৪ মিঃ ২৭·২ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

১০,০০০ মিটার : তারলোক সিং (ভারতবর্ষ) সময় ৩০ মিঃ ২১·৪ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

১১০ মিটার হার্ডলস : মহম্মদ সারেঙ্গাং (ইন্দোনেশিয়া) সময় : ১৪·৩ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৪০০ মিটার হার্ডলস : কে ওগোসি (জাপান) সময় : ৫২·২ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৪০০ মিটার রীলে : ফিলিপাইন সময় : ৪১·১ সেঃ (হিট)

১,৬০০ মিটার রীলে : ভারতবর্ষ সময় : ৩ মিঃ ১০·২ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

হাই জাম্প : কুনিয়োসী সুগিওকা (জাপান) উচ্চতা : ২·০৮ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ব্রড জাম্প : তাকুয়াকি ওকাজাকি (জাপান) দূরত্ব : ৭·৪১ মিটার

হপ-স্টেপ এ্যাণ্ড জাম্প : কোজি-সাকুরাই (জাপান) দূরত্ব : ১৫·৫৭ মিটার

পোলভল্ট : হিসাও মোরিতা (জাপান) উচ্চতা : ৪·৪০ মিটার (নতুন রেকর্ড)

জাভেলিন থ্রো : তাকাসি মিকি (জাপান) দূরত্ব : ৭৪·৫৬ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ডিসকাস থ্রো : সোজো ইয়ানাগাওয়া (জাপান) দূরত্ব : ৪৭·৭১ মিটার (নতুন রেকর্ড)

সটপুট : তেরু ইতোকাওয়া (জাপান) দূরত্ব : ১৫·৫৭ মিটার (নতুন রেকর্ড)

হ্যামার থ্রো : নোবোরু ওকামোতো (জাপান) দূরত্ব : ৬৩·৮৮ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ডেকাথলন : গুরবচন সিং (ভারতবর্ষ) পয়েন্ট : ৬,৭৩৫

ম্যারাথন : মাসায়ুকি নাগাতা (জাপান) সময় : ২ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৫৪·২ সেঃ

॥ ফাইনাল ফলাফল ॥

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার : মোন সুলেমান (ফিলিপাইন) সময় : ১১·৮ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

২০০ মিটার : মোন সুলেমান (ফিলিপাইন) সময় : ২৪·৪ (নতুন রেকর্ড)

৮০০ মিটার : আকি সি তানাকা (জাপান) সময় : ২ মিঃ ১৮·২ সেঃ

পরদুম্মন সিং

মহীন্দর সিং

পদম বাহাদুর মল

তারলোক সিং

৮০ মিটার হার্ডলস ঃ ইকুকো জোডা (জাপান) সময় ১১·৪ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

৪০০ মিটার রীলে ঃ ফিলিপাইন। সময় ঃ ৪৮·৬ সেঃ (পূর্ব রেকর্ডের সমান)

হাই জাম্প ঃ কিনু সুটসুমি (জাপান) দূরত্ব ঃ ১·৬০ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ব্রড জাম্প ঃ সাচিকো কিসিমাতো (জাপান) দূরত্ব ঃ ৫·৭৫ মিটার

জাভেলিন থ্রো ঃ হিরোকো সাতো (জাপান) দূরত্ব ঃ ৪৮·১৫ মিটার (নতুন রেকর্ড)

ডিসকাস থ্রো ঃ কিকো নুরাসি (জাপান) দূরত্ব ঃ ৪৫·৯০ মিটার

সটপুট ঃ সিকো ওবোনাই (জাপান) দূরত্ব ঃ ১৪·০৪ মিটার (নতুন রেকর্ড)

॥ ফুটবল ॥

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষ ২—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করেছে।

ফুটবল প্রতিযোগিতায় আটটি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই আটটি দেশকে প্রথমে সমান দু'ভাগ হয়ে লীগ প্রথায় খেলতে হয়। এ গ্রুপে যোগদান করেছিল ভিয়েৎনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন। বি গ্রুপে ছিল দক্ষিণ কোরিয়া, ভারতবর্ষ, জাপান এবং থাইল্যান্ড। লীগের খেলায় এ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং বি গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়া। রানার্স-আপ হয়েছিল 'এ' গ্রুপে মালয় এবং 'বি' গ্রুপে ভারতবর্ষ। 'এ' গ্রুপে মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার পয়েন্ট এবং গোল এভারেজ সমান দাঁড়ায়; ফলে লটারী করা হয় এবং মালয় সেমি-ফাইনালে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'বি' গ্রুপে ভারতবর্ষ প্রথম খেলায় ০—২ গোলে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পরাজিত হয়। দ্বিতীয় খেলায় ৪—১ গোলে থাইল্যান্ডকে এবং তৃতীয় খেলায় ২—০ গোলে জাপানকে পরাজিত ক'রে লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পায়।

সেমি-ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ ৩—২ গোলে 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

অপর দিকের সেমি-ফাইনাল খেলার অতিরিক্ত সময়ে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং গত বছরের রানার্স-আপ দক্ষিণ কোরিয়া ২—১ গোলে 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ মালয়কে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

॥ হকি ॥

এশিয়ান গেমস হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ২—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। বিশ্রাম সময়ের তিন মিনিট আগে পাকিস্তান প্রথম গোল দেয়; দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় দ্বিতীয় গোলটি হয়। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, খেলার প্রথম ছয় মিনিট বাদে বাকি সমস্ত সময় ভারতবর্ষকে দশজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হয়েছিল। প্রথমার্ধের খেলার ষষ্ঠ মিনিটে মাটি-উ'চু একটা বল হাত দিয়ে থামাতে গিয়ে ভারতীয় দলের সেন্টার-হাফ চরঞ্জিৎ সিং নাকে গুরুতরভাবে আঘাত পান এবং তাঁর পক্ষে আর খেলায় যোগদান করা সম্ভব হয়নি। দলের আউট-সাইড লেফট্ দর্শন সিংকে দিয়ে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। ফলে ভারতবর্ষকে চারজন ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর ক'রে খেলতে হয়। দর্শন সিংয়ের পক্ষে এই অনভ্যস্ত স্থানে যথাযথ দায়িত্ব পালন ক'রে খেলা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান দলের খেলায় মার্জিত ক্রীড়াপদ্ধতির যথেষ্ট অভাব ছিল এবং একাধিক সময়ে তাদের খেলা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বে-আইনী খেলার দরুণ পাকিস্তান দলের অধিনায়ককে শাস্তি হিসাবে পাঁচ মিনিটের জন্যে মাঠ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

এই রকম গুরুত্বপূর্ণ খেলার উপযুক্ত মনোবল ভারতীয় দলের এইদিন ছিল না। সারা জাকার্তা জুড়ে 'জি ডি সোন্ধী বিরোধী আন্দোলন,' বিক্ষোভকারীদের আক্রমণে ভারতীয় দূতাবাসের ক্ষয়ক্ষতি, আসবাবপত্র লুণ্ঠন ইত্যাকার ঘটনাবলী ভারতীয় দলের দুশ্চিন্তা এবং মনোবল ভঙ্গের যথেষ্ট কারণ বলা যায়।

হকি প্রতিযোগিতায় ৯টি দেশ যোগদান করে। প্রথমে লীগ প্রথায় খেলা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ নক-আউট পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ১নং গ্রুপে এই চারটি দেশ খেলেছিল—ভারতবর্ষ, মালয়, হংকং এবং কোরিয়া; ২নং গ্রুপে ছিল পাঁচটি দেশ—পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, জাপান, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া।

লীগের খেলায় চূড়ান্ত ফলাফল

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পঃ
প্রথম পুল							
ভারত	৩	৩	০	০	১২	০	৬
মালয়	৩	২	০	১	৯	৪	৪
হংকং	৩	১	০	২	২	৮	২
কোরিয়া	৩	০	০	৩	১	১২	০
দ্বিতীয় পুল							
পাকিস্থান	৪	৪	০	০	২৬	১	৮
জাপান	৪	২	১	১	৮	৬	৫
সিঙ্গাপুর	৪	২	১	১	৬	৬	৫
সিংহল	৪	১	০	৩	৪	১৫	২
ইন্দোনেশিয়া	৪	০	০	৪	২	১৮	০

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান নিজ নিজ গ্রুপ থেকে অপরাজেয় অবস্থায় প্রথম স্থান লাভ করে।

এক নম্বর গ্রুপের লীগের খেলায় ভারতবর্ষ ৩—০ গোলে মালয়কে, ৪—০ গোলে হংকংকে এবং ৫—০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে লীগ তালিকায় প্রথম স্থান পায়।

অপর দিকে দু' নম্বর গ্রুপের লীগের খেলায় পাকিস্তান ৫—০ গোলে জাপানকে, ৯—১ গোলে সিংহলকে, ৩—০ গোলে সিঙ্গাপুরকে এবং ৮—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত ক'রে নিজ গ্রুপে প্রথম স্থান পায়।

লীগের খেলায় দ্বিতীয় স্থান পায় এক নম্বর গ্রুপে মালয় এবং দু' নম্বর গ্রুপে জাপান। জাপান এবং সিঙ্গাপুর সমান পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছিল; কিন্তু জাপান গোল এভারেজে সিঙ্গাপুরকে মেরে দিয়ে সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৭—০ গোলে জাপানকে এবং পাকিস্তান ৫—০ গোলে মালয়কে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

॥ ভলিবল ॥
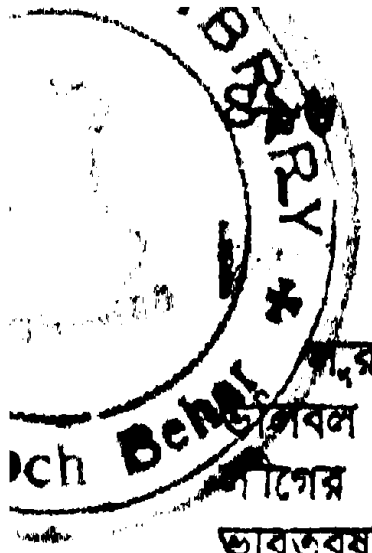
পুরুষদের ছয়জন খেলোয়াড়ের ভলিবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের লীগের খেলায় জাপান প্রথম স্থান, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান এবং পাকিস্তান তৃতীয় স্থান লাভ করে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী দেশগুলিকে প্রথমে তিনটি গ্রুপে ভাগ ক'রে লীগ প্রথায় খেলানো হয়। ভারতবর্ষ 'বি' গ্রুপ থেকে প্রথম স্থান লাভ করে। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা লাভ করে। শেষ পর্যায়ে খেলেছিল জাপান, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া এবং ব্রহ্মদেশ। শেষ পর্যন্ত জাপান অপরাজেয় অবস্থায় স্বর্ণপদক লাভ করে। ভারতবর্ষ পাঁচটি খেলার মধ্যে কেবল জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে রৌপ্য পদক লাভ করে। ব্রোঞ্জ পদক পায় পাকিস্তান। পাকিস্তান তিনটে খেলায় পরাজিত হয়।

॥ সন্তরণ ॥

জাপানের শ্রেষ্ঠ সাঁতারুরা আমেরিকার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় চতুর্থ এশিয়ান গেমসে জাপানকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাঁতারুদের নিয়ে দল গঠন করতে হয়েছিল। কিন্তু জাপানকে তার জন্যে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। মাত্র পুরুষদের ৪০০ মিটার এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল অনুষ্ঠান ছাড়া জাপান পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের আর সকল অনুষ্ঠানেই প্রথম স্থান লাভ করে এবং পুরুষ ও মহিলা বিভাগের মোট ১৪টি অনুষ্ঠানে (পুরুষ বিভাগে ৮ এবং মহিলা বিভাগে ৬) নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করে। সাঁতার এবং ডাইভিং অনুষ্ঠান নিয়ে জাপানের পদক পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬—স্বর্ণ ২২, রৌপ্য ২০ এবং ব্রোঞ্জ ৪। ওয়াটার পোলোতেও জাপান স্বর্ণ পদক লাভ করেছে।

॥ মুষ্টিযুদ্ধ ॥

মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় কোরিয়া ৩টি, জাপান ২টি, ভারতবর্ষ এবং তাইল্যাণ্ড ১টি ক'রে স্বর্ণ পদক লাভ করে। ভারতবর্ষের পক্ষে পদম বাহাদুর মল লাইট-হেভী ওয়েট বিভাগে স্বর্ণ পদক পান। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তিনি আরও একটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ভারতবর্ষের পক্ষে ডি' সুজা লাইট-মিডল ওয়েট এবং সুরেন্দ্রনাথ সরকার মিডল ওয়েট বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পান।

॥ কুস্তি ॥

এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মল্লবীরদের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কুস্তি দলে ছিলেন মোট সাতজন মল্লবীর এবং তাঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন পদক লাভ করেছেন। এই পদকের সংখ্যা ১২। গ্রীকো-রোম্যান বিভাগে

মারুতি মানে

মালওয়া

ভারতবর্ষ পেয়েছে মোট ৬টি পদক : স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ১। ফ্রি-স্টাইল বিভাগেও পদক লাভের সংখ্যা ৬ : স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ২।

ফ্রি স্টাইল বিভাগে মোট ২৪টি পদকের হিসাব :

স্বর্ণ পদক : জাপান ৫; পাকিস্তান ২; ভারতবর্ষ ১

রৌপ্য পদক : ভারতবর্ষ ৩; পাকিস্তান ৩; জাপান ১; দক্ষিণ কোরিয়া ১

গণপৎ আন্দালকার

উদয়চাঁদ

ব্রোঞ্জ পদক : জাপান ২; ভারতবর্ষ ২; পাকিস্তান ২; দক্ষিণ কোরিয়া ১; আফগানিস্থান ১

ভারতবর্ষের পক্ষে পদক লাভ করেন :

স্বর্ণ : মারুতি মানে (লাইট হেভী ওয়েট)

রৌপ্য : উদয়চাঁদ (লাইট ওয়েট); সজ্জন সিং (মিডল ওয়েট); গনপৎ আন্দালকার (হেভী ওয়েট)

নারায়ণ ঘুমে

সজ্জন সিং

ব্রোঞ্জ : মালওয়া (ফ্লাই ওয়েট); লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে (ওয়েল্টার ওয়েট)

গ্রিকো-রোম্যান বিভাগের আটটি স্বর্ণ পদকের মধ্যে জাপান পাঁচটি স্বর্ণ পদক লাভ করে। ভারতবর্ষ ২টি স্বর্ণ পদক, ৩টি রৌপ্য পদক এবং ১টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

ভারতবর্ষের পক্ষে পদক লাভ করেন :

স্বর্ণ : মালওয়া (ফ্লাই ওয়েট); গণপৎ আন্দালকার (হেভী ওয়েট)

রৌপ্য : উদয়চাঁদ (লাইট ওয়েট); সজ্জন সিং (মিডল ওয়েট); মারুতি মানে (লাইট-হেভী ওয়েট)

ব্রোঞ্জ : নারায়ণ ঘুমে (বাণ্টামওয়েট)

॥ সুটিং ॥

মোট পনেরটি পদকের হিসাব :

স্বর্ণ : জাপান ৩; কোরিয়া ১; সিঙ্গাপুর ১

রৌপ্য : জাপান ১; ইন্দোনেশিয়া ২; তাইল্যাণ্ড ১; ফিলিপাইন ১

ব্রোঞ্জ : কোরিয়া ২; ইন্দোনেশিয়া ১; তাইল্যাণ্ড ১; ভারতবর্ষ ১
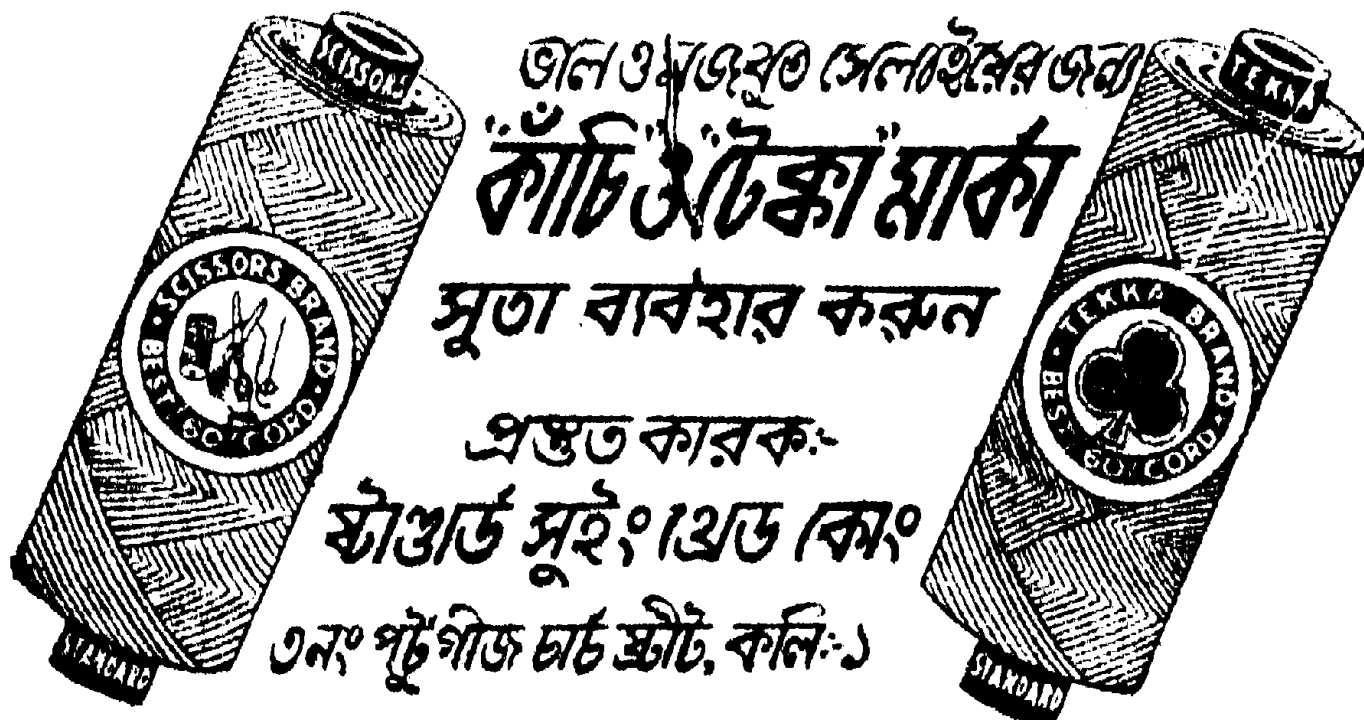
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ই আষাঢ়ের বই

'বনফুল'-এর

বনফুল-এর গল্প-সংগ্রহ (প্রথম শতক)   ৮·৫০

[একশতটি গল্পের সংকলন]

৭ই শ্রাবণের বই

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

হি মা চ ল ম   ৩·৫০

সম্প্রতি প্রকাশিত

'বনফুল'-এর
সর্বাধুনিক উপন্যাস

কন্যাসু   ২·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আধুনিক গল্পগ্রন্থ

ব্যোমকেশের ছ'টি   ৪·৫০

বিমল মিত্রের
নূতন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস

নফর সংকীর্তন   ২·৫০

কাজী আবদুল ওদুদের
গবেষণামূলক বিরাট প্রবন্ধ গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

ডীন অফ্ দি ফ্যাকালটি অব ড্রামা—রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়;
মেম্বার, বোর্ড অফ্ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়;
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরীশ লেকচারার
নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি   ১৫,

সেকালের নট ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্র ও
তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ ঃ

"......নাট্যমঞ্চ বা ছায়াছবির কর্মশালায় বা নাট্য আকাদমির দেব-দেউলেই সব অঞ্জলি আমার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এলাম, সেদিনও ভাবিনি, আমার শিল্পী-জীবনের শেষ যবনিকাখানি পড়ে যেতে এখনো অনেক বাকি আছে। শিল্পী-জীবনের যবনিকা টেনে দিয়ে মর-জীবনের যবনিকা পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো পঠন-পাঠন নিয়ে, এই তো অভিলাষ ছিলো! কিন্তু, দেখা গেল, আমার শিল্পী-জীবনের নিয়ন্তা আমি নই, সেখানে আরও এক অমোঘ শক্তির প্রচণ্ড অভিলাষ অনুক্ষণ তার লীলা-সঞ্চালন করে চলেছে !

পাদ-প্রদীপের আলো থেকে আত্মগোপনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে গিয়েও দেখতে পেলাম, আরেক আলো এখানে জ্বলে উঠেছে। পাদ-প্রদীপ এখানে এসে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। দিনের পর দিন সেই কম্পমান স্মৃতি-শিখার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হলো,—আমিও যে মিশে আছি স্মৃতির রাজ্যে—স্মৃতির মানুষগুলির সঙ্গে! মনে হলো,—আমি নিজেও তো এক স্মৃতি! এবং সেই স্মৃতির ছায়াছবিরা আর ত কোনদিন ফিরে আসবে না।......"

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

কয়েকখানি
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

সুধীরচন্দ্র সরকারের

বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০

[বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের অভিধান। প্রায় পানেরো হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত ঃ ইহাতে আছে ঃ—প্রবচন ঃ দেবদেবী, নাম, স্থান ইত্যাদি ঃ বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ ঃ বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ ঃ বৃহৎ-বাচক ও ক্ষুদ্র-বাচক শব্দ ঃ সমষ্টি-গত জিনিষের নাম ঃ সহচর শব্দ প্রতিচর শব্দ উপচর বা বিকার শব্দ, আপ্তবাক্য ও ডাক ঃ পরিভাষা ইত্যাদি]

শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮·০০

[দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, গান ও কাব্যনাট্যের নানা দৃশ্য]

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

স্মৃতিচারণ (১ম খণ্ড) ১২·০০

স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড) ৬·৫০

[প্রথম খণ্ডে আছে ঃ দ্বিজেন্দ্র-লাল, গিরিশচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রেম, বারট্রাণ্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ঃ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণের বৃত্তান্ত]

আমাদের বই
পেয়ে ও দিয়ে
সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম : 'কালচার'

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 14th September, 1962
40 Naye Paise.

আলজিরিয়া উত্তর আফ্রিকার একটি নূতন স্বাধীন দেশ। ফ্রান্সের উপনিবেশ হিসাবে দীর্ঘদিন (১৮৪২ হইতে) থাকিবার পর ঐ দেশে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে। ফ্রান্সে তখন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং যে সামরিক শক্তি জার্মানীর আক্রমণে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয় সেই শক্তি পুনর্গঠিত ও নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল, উপরন্তু মার্কিন অস্ত্রবল ও ধনবল পরোক্ষভাবে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদকে তখন সমর্থন করিতেছিল। সুতরাং স্বাধীনতাকামী আলজিরিয় আরব ও বের্বেরদিগের বিরুদ্ধে ফ্রান্স প্রচণ্ড ও নৃশংস দমননীতি চালিত করে। সেই চণ্ড-নীতির প্রতিক্রিয়ায় আলজিরিয় মুসলমানদিগের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের অভ্যুদয় হয়। উহাকে দমন করার জন্য ফ্রান্স শেষে ৩ লক্ষের অধিক সৈনিক ও সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগ করে এবং শেষের ৪।৫ বৎসর প্রায় বাৎসরিক ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে।

ফ্রান্স বুঝিতে পারে নাই যে, কালের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধারা আগেকার মত সম্পূর্ণ অসহায় ও বন্ধুহীন নয় এবং বিশ্বজগতে সাম্রাজ্যবাদের স্থান এখন অত্যন্ত সংকুচিত। আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদিগের মরণজয়ী শৌর্য ও দৃঢ়সংকল্প বহির্জগতের সহায়তা ও সমর্থনের ফলে ফ্রান্সের বিরাট সৈন্য ও শস্ত্রবলকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল। এই সাড়ে সাত বৎসরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যখন তাহা হইবে তখন জগৎ বুঝিবে যে ঐ নিরস্ত্র, অসহায় ও দরিদ্র জাতি স্বাধীনতার মূল্যদান কি অসীম সাহস, বীরত্ব ও ধৈর্যের সহিত করিয়াছিল।

ফরাসী সৈন্যের পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে শেষে ফ্রান্সের জনমতও টলিতে আরম্ভ করে। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব ফরাসী সাধারণ নাগরিকও শেষে বুঝিতে পারে যে, আলজিরিয়ার ১০ লক্ষ ফরাসী ঔপনিবেশিক—যাহারা ঐ দেশের ৯০ লক্ষ মুসলমানকে শোষণ ও দমন করিয়া ভারবাহী পশুর অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল—সমস্ত ফরাসী জাতিকে জগতের চক্ষে হেয় ও নিন্দার্হ করিতেছে, অন্যদিকে আলজিরিয়দিগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সক্রিয় সমর্থনও ক্রমেই বাড়িতেছে। এই অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট দ্য গল যখন আলজিরিয়ার সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইবার পূর্বে ফ্রান্সের জনগণের নিকট একনায়কত্বের অধিকার চাহিলেন, তখন তাহারা বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁহার উপর বিশ্বাস জানাইয়া সেই দাবীর সমর্থন করে। সেই সমর্থনের বলে, দ্য গল যে ব্যবস্থা করেন, তাহার ফলে, দীর্ঘদিন কথাবার্তা চালাইবার পর, আলজিরিয়ায় জনমত গ্রহণ করিলে পরে বিগত ১লা জুলাই আলজিরিয়া স্বাধীন হইয়াছে।

আলজিরিয়ার প্রকৃত জনপদের—অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের কূলবর্তী অঞ্চল হইতে দুইভাগে বিভক্ত এট্‌লাস পর্বতমালা পর্যন্ত, যাহার ওপারে সাহারা মরু-প্রদেশ—বিস্তৃতি ১১৩৮৮৩ বর্গমাইল মাত্র এবং উহার লোকসংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। যাহার মধ্যে ফরাসী ঔপনিবেশিক ১০ লক্ষ এবং বাকি ৯০ লক্ষাধিক আরব ও বের্বের জাতীয় মুসলমান। এই ৯০ লক্ষ নিরস্ত্র, দরিদ্র ও অসহায় আবালবৃদ্ধবনিতা জনগণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রচণ্ড অস্ত্রবল ও সৈন্যবল নির্মম ও পশুবৎ নির্দয়ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ফরাসী সৈন্য ও ঔপনিবেশিকের অত্যাচারে সওয়া লক্ষেরও উপর স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ হারায় এবং প্রায় আট-নয় লক্ষ আহত বা গৃহহীন ও নিঃস্ব হয়। অসংখ্য নারী ধর্ষিতা ও পিতা-পুত্র-স্বামীহারা হয়। সুতরাং তাহারা সকলেই স্বাধীনতার মূল্য ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সমর্থ। সেই কারণে যখন স্বাধীনতার পর দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকার লইয়া গৃহযুদ্ধের আরম্ভ হয় তখন নিরস্ত্র নাগরিক, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ভ্রাতৃহন্তা সশস্ত্র সৈন্যদলের মাঝে পড়িয়া তাহাদের ক্ষান্ত করে।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী, শোষণ ও দলননীতির সমর্থক যে ফরাসীয় দল, যাহারা এতদিন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল তাহারা এখন বোমা ছুঁড়িয়া, অগ্নিকাণ্ড করিয়া, গুলী চালাইয়া নিরীহ লোকের ও দেশের স্বস্তি-শান্তির বিরুদ্ধে "বিক্ষোভ"মূলক কার্যক্রম চালাইতেছে। দ্য গলের প্রাণনাশ তো তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কে স্বাধীনতার ধ্যানমূর্তিও বিকৃত।

আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহার মূল্য যাহারা দিয়াছিল তাহারা তো অবহেলিত বা বিস্মৃতির অতলে অবলুপ্ত। সেই জন্যই বোধহয় আমাদের অপরিণত-মস্তিষ্ক সন্তানগণের "বিক্ষোভ"জনিত অগ্নিকাণ্ডে এবং তাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের মধ্যে ঐ সাম্রাজ্যবাদী, স্বাধীনতা-বিরোধী ফরাসী সন্ত্রাসবাদেরই প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিতা

চিরদিন

আলোক সরকার

এইমাত্র দুইটি বকুল ঝরে গেলো। তামসী দুপুরে
নিস্পৃহ আকাশ মৌন রাজপথ
যেন অভিমান যেন প্রান্তরের দীর্ঘ অস্বীকার। অলৌকিক দূরে
বড়ো-বড়ো বাড়ি নিঃস্ব জানালার সুস্থিত শপথ—
এইমাত্র দুইটি বকুল ঝরে গেলো।

কোনো প্রতিবাদ নয়, চীৎকার, চৈত্র ডালপালা
সুদূর হাওয়ার মধ্যে ক্লান্ত সংগোপনে।
মলিন নদীর নাম জেগে ওঠে, হেমন্তের অর্পিত নিরালা
ছড়ায় শিশির রিক্ত ঘাসে-ঘাসে। স্বাভাবিক লীন উচ্চারণে
মাঠের পথের শেষে সাদা বাড়ি, দরজা খোলার শব্দ।

এইমাত্র দুইটি বকুল ঝরে গেলো। সমস্ত আকাশ ভ'রে
একটি পাখির জ্যোৎস্না, চিরদিন, নীরক্ত আভাস।
প্রাচীন মন্দির রুগ্ন হলুদ ফুলের বন মৌমাছি ওড়ে
আর ছায়া, আনত শ্রাবণ দিন মূক অনিঃশেষ—
এইমাত্র দুইটি বকুল ঝরে গেলো।

ঝুলন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সকলি আশ্চর্য আজ বন্ধু, প্রেম, প্রেমিকার বাড়ি।
কোথাও বাতাসে যেন লেগে আছে দীর্ঘ, বাঁকা.........
বিনষ্ট বিকেল,
মনে হয় রৌদ্র.........ক্ষত, উজ্জ্বল চিৎকার——
কুটকুয়াশার বেলোয়ারি;
কলকাতায় সন্ধ্যাগুলি বড়ো বেশি অন্ধকার,
অনন্ত নিস্তেল।

কিংবা যদি ইচ্ছা করো, অন্তহীন কম্র কণ্ঠে বলি—
তুমিও প্রপঞ্চে দুষ্ট, নগরীর অশ্লীল আঁধারে;
দৈনিক ট্রাফিকে ট্রামে আত্মঘাতী আজ আশ্চর্য সকলি,
কম্পিত কেরানীকুল স্বপ্ন দেখে মূল্যমান মাছের বাজারে।

একা-ও যাব না ঘরে

করুণাসিন্ধু দে

পথে যেতে দেখা হলে অচেনার ভান করে চেনা-
আর্শি, প্রতিবিম্ব, অক্ষিগোলক তির্যক বেঁকে যায়,
অপাঙ্গে বুলায় ছুরি ক্ষুরধার; মাটির খেলেনা
যেন ভাঙা-হাত-মুখ, অনাদৃত, বিবর্ণ, দাওয়ায়।
কিংবা অন্যমনে কৃপা-পূর্বক গ্রীবায় ঢেউ তুলে
মৃদু-হাস্য বিতরণে চকিত চপলা ফিরে যান,
স্ব-ঘরে কৃতার্থ করে, যেন অভাজন, পথ ভুলে
যখন এসেছে উঞ্ছ, অগত্যা তণ্ডুল করো দান।

স্বীয় অধিকার আমি গ'ড়ে তুলি বক্ষের সোপানে
হাড়ে হাড়ে, পটভূমি স্থির লক্ষ্যে প্রাপ্য বুঝে নেবো;
প্রেমিক, অন্ধের মতো না-হেঁটে, বধির কানে, গানে
অশ্রুত শব্দের ঝড়ে অচেনা বিভ্রম ভেঙে দেবো।
একা-ও যাব না ঘরে, দুঃখলোকে, বিক্ষুব্ধ প্রস্থানে;
রক্তজ জন্মের লব্ধ দৃঢ় হাতে ফলাবো বাগানে।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

আবার, আবার কামান-গর্জন!

থিয়েটারের ফাঁকা পটকা নয়, সত্যিকার তোপধ্বনির মতোই গুরুতর ব্যাপার। মাছি এবং ষাঁড়-পর্বের পর এবার নজর পড়েছে কুকুরের দিকে। স্থির হ'য়েছে ঐ অবাঞ্ছিত চতুষ্পদ জীবগুলিকেও লোপাট করে দেওয়া হবে শহর থেকে।

বলা বাহুল্য, সব কুকুরই অবাঞ্ছিত নয়। যে-সব কুকুর বাড়িতে থাকে এবং গৃহস্থের পুত্রকন্যার সঙ্গে অপত্য-নির্বিশেষে প্রতিপালিত হয়, তারা বাঞ্ছিত। বিশেষ করে আজকের এই নব্য সাহেবীআনার যুগে কুকুর তো এক অপরিহার্য গৃহোপকরণ। কুকুর না থাকলে যেন আভিজাত্যই খোলে না অনেক বাড়ির। সত্যি বলতে কি, আমি এমন অনেক পরিবার দেখেছি, যাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কুকুর নিয়েই পাগল। এবং কুকুরের কামড়ে পাগল হওয়ার চেয়ে এই সব কুকুরের আদরে পাগল ব্যক্তিরা যে কম মারাত্মক হ'য়ে ওঠেন না, তাও লক্ষ্য করেছি স্বচক্ষে।

মনে পড়ল, আমার এক পরলোকগত বন্ধুর কথা। কুকুরকে তিনি যমের মতো ভয় করতেন। একদিন আমরা দুজনে জনৈক বি-এন-জি-এস'এর (অর্থাৎ 'বিলেত না যাওয়া সাহেবের') সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মস্ত বড় বাড়ি, সদর দরজা উন্মুক্ত। যেন আতিথেয়তার মূর্তিমান প্রতিভূ! কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিতে না দিতেই প্রায় মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মতো এক ভীমদর্শন অ্যালসেশিয়ান।

বন্ধুটির হাতে ছিল সিগারেটের টিন। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা টুপ ক'রে খসে পড়ল মেঝেতে। তাকিয়ে দেখি, তিনি কাঁপছেন—কবিরা যাকে বলেন ছিন্ন কদলী-পত্রের মতো ঠিক সেই রকম।

কুকুরটি সৌভাগ্যবশত টিন শোঁকায় ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ল তাই রক্ষা, নাহলে কী হত বলা যায় না। তবে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা দিলেন গৃহস্বামী।

'এই য, কী খবর?' স্বাগত জানালেন তিনি।

বন্ধুবর টলতে টলতে সামনের চেয়ারে গিয়ে এক বস্তা বালির মতো 'দেহরক্ষা' ক'রে বললেন, 'এক গেলাস জল—!'

গৃহস্বামীর চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। আমি তখন সংক্ষেপে আনু-

পুর্ব্বিক ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম তাঁকে। তিনি হো হো হেসে উঠে বললেন, 'কী কাণ্ড! কিছু বলে না ও, জানেন, জিম বড় ভালো কুকুর।'

বন্ধুটি ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছিলেন। চাপা অসন্তোষের সঙ্গে তিনি বললেন, 'কুকুরের ভালোত্বে বিশ্বাস রাখাটা একটু বেশি চাহিদা নয় কি?'

'মোটেই নয়!' গৃহস্বামী আনন্দের সঙ্গেই ঘোষণা করলেন, 'ওরা মানুষ চেনে। ভালো লোকদের ওরা কিছু ক'রে না!'

বন্ধুবর কাষ্ঠহাসি টেনে বললেন, 'বলেন কি? এমন জানলে আমি কখখনো এখানে আসতাম না। প্রথমত একটা জানোয়ারের ভালোত্বে অটুট আস্থা, তার ওপর দেখুন, জন্তুটা যদি কামড়ে বসত তাহলে সেই মুহূর্তেই প্রমাণিত হত, লোকটা আমি তেমন সুবিধের নই। আর যাই হোক, কুকুরের কাছ থেকে আমি কিছুতেই ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে যাব না!'

এ কথার পর আমরা তিনজনেই বলা বাহুল্য হেসে উঠলাম, কিন্তু গৃহস্বামী যে খুব খুশি হলেন না সেটাও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

বাস্তবিক, কুকুর-প্রীতি মানুষকে এমন অন্ধ করে তোলে যে অন্যে কী ভাবছে না ভাবছে সে বিষয়ে একরত্তিও খেয়াল থাকে না। আমি এমন অনেক ভদ্রলোককে দেখেছি, যাঁরা এমনিতে বেশ বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, কিন্তু কুকুরের কথা উঠলে যাঁদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়।

একজন ভদ্রলোককে জানি, তিনি মস্ত বড় একজন অধ্যাপক এবং শিল্প-সমালোচক। তাঁর বাড়িতে একটি কুকুর ছিল। মোটাসোটা গোবেচারার মতো চেহারা, তেতলার ড্রইং-রুমে না দেখলে তাকে অক্লেশে নেড়ী কুকুর মনে করা যেত। অধ্যাপক গৃহিণী, অর্থাৎ আমাদের বৌদি বলতেন, ভঙ্গ কুলীন—ওর প্রপিতামহের আদি নিবাস ছিল নাকি স্পেন দেশে।

কুকুরটার নাম ছিল সোনা।

প্রায় যখনি যেতাম দেখতে পেয়েছি, সোনা ড্রইংরুমের একটি সোফা দখল করে ঝিমুচ্ছে। কিন্তু বৌদি বলতেন, ওর মতো দুষ্টু কুকুর নাকি তিনি একটাও দেখেন নি। আর এই 'দুষ্টু' কথাটা বলার সময় তাঁর চোখেমুখে এমন একটা সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটে উঠত যা তাঁর ছেলেমেয়েরাও আদায় করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

সোনার দুষ্টুমির প্রশস্তি শুনে শুনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, সেদিন হঠাৎ চ্যালেঞ্জ ক'রে বসলাম, বৌদি, প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুনো যদি দুষ্টুমীর নমুনা হয় তো আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, সোনার চেয়ে আমি বেশি বুদ্ধিমান।'

অধ্যাপক বন্ধুটি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমার কণ্ঠস্বরে ঝড়ের আভাস পেয়ে তিনি বললেন, 'আমার আবার একটা মিটিং আছে। এক পেয়ালা চা পেলে ভালো হত।'

'বলে এসেছি, দিচ্ছে।' বৌদি স্থান-ত্যাগের সুযোগটি প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, 'ঠাকুরপো, সোনা যে কী ভয়ানক ইনটেলিজেণ্ট, নিজে উনি তা দেখেছেন। ওঁকে জিগ্যেস করুন।'

'সত্যিই ভায়া, ভারি বুদ্ধিমান!' অধ্যাপক-প্রবর সমর্থন জানালেন তৎক্ষণাৎ।

ভাবলাম, স্ত্রীর ভয়ে বুঝি তিনি সায় দিচ্ছেন। বললাম, 'আপনার ছাত্রদের চেয়ে তো বটেই, তাই না?'

কিন্তু এ রহস্যকে তিনি হাল্কাভাবে গ্রহণ করলেন না। খবরের কাগজ পাশে নামিয়ে রেখে তিনি সোজা হ'য়ে বসলেন। তারপর ডাকলেন, 'সোনা—।'

কুকুরটা যেমন ছিল তেমনি রইল, শুধু চোখ মেলে তাকাল।

'সোনালা!' অধ্যাপকের কণ্ঠে যেন মধু ঝ'রে পড়ছে।

কুকুরটা একটু ওঠার চেষ্টা ক'রে আবার ভালো ক'রে শুলো।

'সোনিল্লা!' বন্ধুর কণ্ঠে যেন বেহাগের মূর্ত বিষাদ।

কুকুরটা মাথা উঁচু করে তাকাল।

'সু---!' হাততালি দিয়ে বন্ধুবর যেন কচি ছেলে ভোলাচ্ছেন, 'সু আসে, সু আসে—!'

অতি অনিচ্ছায় কুকুরটা এবার মন্থর-গতিতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

বিজয়ীর মতো সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে অধ্যাপক-বন্ধু বললেন, 'দেখলে তো, কেমন ইনটেলিজেণ্ট?'

'কিংবা ইনসোলেণ্ট! ডাকলে নড়তে চায় না।' আমি চাপা বিরক্তিতে বললাম।

'হুঃ, ব্যাপারটাই তুমি বুঝতে পারলে না! আদর চায়, বুঝলে, আদর চায়। আচ্ছা এই দেখ,' বলে তিনি গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি একটু কথা বল তো?'

অধ্যাপক-গৃহিণী বললেন তখন, 'সোনামণি, ঘুম হয়েছে?'

কুকুরটা কুঁই কুঁই করে কী বলল বুঝতে পারা গেল না।

আমাদের বৌদি বললেন, 'ও? জল-তেষ্টা পেয়েছে? মোহন, অ মোহন, সোনাকে জল দে।'

পরিচারক একটি কলাইয়ের বাটিতে জল আনল। কুকুরটা সেটা শুঁকেও দেখল না।

'ও? রাগ করেছ?' ব'লে, কি বলব, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুকুরটাকে জল খাওয়ানোর জন্যে এমন তোষামোদ শুরু করলেন যে, দেখে আমার ব্লাড প্রেসার ধাই ক'রে দুশো ছাড়িয়ে বিপদাঙ্কে উঠে গেল। আমি অদম্য বিরক্তিতে ফেটে পড়লাম এবার, 'কুকুর পুষতে পুষতে শেষে যে মানুষই কুকুরের পোষা জানোয়ারে পরিণত হয় তা জানতাম না। নমস্কার!' উঠে পড়লাম তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু এতক্ষণ যা বললাম সে হল অন্য কাহিনী। রাস্তার কুকুরের বরাতে এমন সৌভাগ্য স্বপ্নেরও অগোচর। তারা সংখ্যাহীনভাবে জন্মাবে, আস্তাকুড় ঘেঁটে বেঁচে থাকবে, এবং তাদের বেওয়ারিশ অস্তিত্ব মানুষের অসহ্য হলে স্থির-মস্তিষ্ক জিঘাংসার হাতে প্রাণ দেবে।

এমন কি, বাড়িতে যাঁরা কুকুর পোষেন, আদুরে কুকুরটি একবার হাঁচি দিলে যাঁরা ডাক্তার ডাকেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে কম উৎসাহ দেখান না।

অথচ আমার কিন্তু মনে হয়, কামড়ানোর ঘটনা রাস্তার চেয়ে বাড়ির কুকুরের খামখেয়ালিতেই ঘটে বেশি। তবে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো সে-সব ঘটনা পরি-সংখ্যানে স্থান পায় না। ইংরেজী প্রবচনের তত্ত্বকথা অনুযায়ী ফাঁসি যাওয়ার আগে দুর্নাম ভোগ করে শুধু রাস্তার কুকুরগুলি।

আয়নোস্ফিয়ারের কথা: ভারতীয় বিজ্ঞানী

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

সম্প্রতি প্রায় একাত্তর ঘণ্টা ধরে মহাকাশচারী নিকলায়েভ ও পপোভিচ মহাকাশে পরস্পরের সংগে কথা বলেছেন। মান-মন্দির থেকে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিকলায়েভের কথা শোনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শুনলেন, নিকলায়েভ ও পপোভিচের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা। শুনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা জানতেন না,—ইতিমধ্যেই পপোভিচও তাঁর মহাকাশযান চার নম্বর ভস্তক নিয়ে তিন নম্বর ভস্তকের যাত্রী নিকলায়েভের সহযাত্রী হয়েছেন। এইভাবে মহাকাশ-বিজ্ঞান গবেষণায় আরও একটি নতুন দিকের সূত্রপাত হল।

মহাকাশচারী গ্যাগারিন, তিতোভ, নিকলায়েভ, পপোভিচ, গ্লেন ও কার্পেণ্টার এঁদের কৃতিত্ব বিজ্ঞান জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বিপ্লবের সূচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যেও মহাকাশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানবার অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানে 'আয়নোস্ফিয়ার' (Ionosphere)-এর গবেষণা একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই, 'আয়নোস্ফিয়ার' সম্বন্ধেও মানুষের কৌতূহল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ। 'আয়নো-স্ফিয়ার'-এর গবেষণায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কোন অবদান আছে কিনা, আমাদের মধ্যেও এ-প্রশ্ন দেখা দেওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়।

'আয়নোস্ফিয়ার'-এর প্রকৃতি কি, তার বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে কোন্‌টা কত উঁচুতে, ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্তরগুলির উচ্চতার কি রকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, স্তরের উৎপত্তির কারণ কি, এ-সম্বন্ধে বিশেষ করে বিলাতের রয়েল সোসাইটির ফেলো ও জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা 'আয়নোস্ফিয়ার' সম্পর্কিত গবেষণার নতুন একটা দিকে পথ নির্দেশ করেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত উচ্চতা বাদ দিয়ে, তার ঊর্ধ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কয়েকশত মাইলব্যাপী 'আয়নো-স্ফিয়ার' বা আয়নমণ্ডল (আয়নায়িত বায়বীয় স্তর) পরিব্যাপ্ত। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রভা, চুম্বক-ঝটিকা, বেতার-তরঙ্গ-প্রতিফলন প্রভৃতি ঘটনাবলীর উদ্ভবও এই আয়নমণ্ডলে।

আয়নমণ্ডল চারটি বায়বীয় স্তরে স্তরীভূত। বিজ্ঞানীরা চারটি স্তরের-ই সন্ধান পেয়েছেন। D, E, F1 ও F2 নামে এই স্তরগুলি বিজ্ঞানে পরিচিতি লাভ করেছে।

আয়নমণ্ডলের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অঞ্চলের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী কেন?

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলিতে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা 'ইলেকট্রন' এবং একই সঙ্গে ধন-তড়িৎ আর ঋণ-তড়িৎ

শিশিরকুমার মিত্র

বিশিষ্ট 'আয়ন' (তড়িতাবিষ্ট অণু বা পরমাণুকে বলা হয় 'আয়ন') রয়েছে বলেই আয়নমণ্ডলের বাতাস বিদ্যুত-পরিবাহী। তাই, স্তরগুলি বিদ্যুত-পরিবাহকরূপে কাজ করে। তড়িৎ নিরপেক্ষ অণু বা পরমাণু থেকে 'ইলেকট্রন' বেরিয়ে আসার পদ্ধতিকে বিজ্ঞানে আয়নক্রিয়া (আয়নাইজেশন) বলা হয়। সূর্যের বিকিরণ ক্রিয়ার (রেডিয়েশন) ফলেই 'ইলেকট্রন' অণু বা পরমাণুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও ছিটকে বেরিয়ে আসে। আয়ন-মণ্ডলের স্তরগুলির উপর যখন-ই সূর্যের অতি-বেগুনি রশ্মি (আলট্রা-ভায়োলেট রে) পড়ে, তখনই রেডিয়েশন সম্ভব হয়।

আয়নমণ্ডলের বিদ্যুত-পরিবাহক স্তরগুলি কি ধরনের কাজ করে?

এই স্তরগুলি বেতার-তরঙ্গ-গুচ্ছকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বেতার-তরঙ্গগুলিই দেশ-বিদেশের বার্তা রেডিও সেটের মাধ্যমে আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। তাহ'লে বেতার-তরঙ্গগুলি এক জায়গা থেকে দূর-দূরান্তে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে?

বেতারের মূলতত্ত্বের আবিষ্কারক মহাবিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুত ও চুম্বক বল-ক্ষেত্রের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা করতে গিয়ে 'তড়িৎ-চুম্বকীয় ঢেউ' (ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভস্) আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, এই গতিবেগ, আলো ও তাপ-বিকিরণের গতিবেগের সমান,—প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ১৮৮৭ সালে জর্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ (Hertz) এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে 'ম্যাক্সওয়েলের ঢেউ',—যা এখন বেতার-তরঙ্গ নামে সুপরিচিত, ল্যাবরেটারীতে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। হের্ৎজের (Hertz) তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংথ্) ছিল কয়েক গজ। কিন্তু কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর তৈরী যন্ত্র থেকে যে বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন তার দৈর্ঘ্য ছিল খুবই ছোট, এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। আচার্য বসু-ই বিজ্ঞানী হের্ৎজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন।

হের্ৎজের বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর কুব্জ-পৃষ্ঠ অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশে পৌঁছিতে পারে কিনা, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংশয় দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তার সমাধান পেয়েছেন।

১৯০২ সালে বিজ্ঞানী কেনেলি ও হেভিসাইড যে তথ্য পরিবেশন করেন, তা থেকেই প্রথম জানা গেল, আয়ন-মণ্ডলের বিদ্যুত-পরিবাহক স্তরগুলিই বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অ্যাপল-টন্‌ও ক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ তরঙ্গ পাঠিয়ে দেখলেন 'হেভিসাইড-স্তর'-এ (বিজ্ঞানী হেভিসাইডের নামানুসারে) তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো। এজন্য স্তরগুলিকে প্রতিফলক-স্তর নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রতি সেকেণ্ডে বেতার-তরঙ্গমালা ১,৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ ৩,০০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে ছড়িয়ে পড়ে। মহা-বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের হিসাব অনুযায়ীই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। ৩,০০,০০০ কিলোমিটারকে তরঙ্গের সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি) দিয়ে ভাগ করলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের (ওয়েভ্-লেংথ্) মাপটা পাওয়া যায়। কিন্তু সবকয়টি বেতার-তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের হয় না। যেমন,—জার্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ কর্তৃক সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গ ও ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। দূরপাল্লার যোগাযোগে হ্রস্ব-তরঙ্গের কার্যকারিতা অনেক বেশী।

আয়নমণ্ডলের স্তরে যখন বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এ'লো, তখন প্রশ্ন উঠ্‌লো, এই 'হেভিসাইড-স্তর' ভূ-পৃষ্ঠের কত উঁচুতে? অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিজ্ঞানীরা অবশেষে দু'টো স্তরের সন্ধান পেলেন। একটি প্রায় নব্বুই কিলোমিটার, আর একটি প্রায় দু'শো কিলোমিটার উঁচুতে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই স্তর দু'টোকে E ও FI নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই দু'টো স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বিজ্ঞানী অ্যাপলটন আরও গবেষণা চালিয়ে গেলেন। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর সন্দেহ হ'লো, E স্তরের নীচে (ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ষাট কিলোমিটার উঁচুতে) হয়তো অন্য একটি স্তর আছে। কিন্তু অ্যাপলটন এই স্তরের অস্তিত্বের কোন পরীক্ষা-মূলক প্রমাণ দিতে পারলেন না। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও এই স্তরের কোন প্রমাণ পেলেন না।

১৯৩৫ সালে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা ভূ-পৃষ্ঠের পঞ্চাশ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে আয়নমণ্ডলের একটি স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে যান (অ্যাপলটন এই স্তরেরই অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ করেছিলেন) ও সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করেন। অ্যাপলটন D-স্তর নামে ইহার নামকরণ করেছেন। ডঃ মিত্রের সহকারী

ডঃ হৃষীকেশ রক্ষিতও প্রতিফলক স্তর নিয়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। D-স্তরটির অস্তিত্ব শুধু দিনের বেলাতেই থাকে।

অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর ছাত্র ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড় (বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপক) ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর চল্লিশ কিলোমিটার উঁচুতে আরও একটি বিদ্যুত-প্রতিফলক স্তর আবিষ্কার করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কলওয়েলও এই স্তরের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেন ও বিলাতের বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল 'নেচার'-এ এ-সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। অধ্যাপক কলওয়েল তখন জানতেন না,—অধ্যাপক মিত্র ও অধ্যাপক ভড় অনেকদিন আগেই এই স্তরটিও আবিষ্কার করে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন।

এই আবিষ্কারের পর প্রায় পঁচিশ বছর চলে গেছে। আজও এই নতুন প্রতিফলক-স্তর সম্পর্কে আর কোন তথ্য হাজির হয়নি। ডঃ মিত্রের ধারণা, যে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন পাওয়া গিয়েছিলো, তা সম্ভবতঃ কোনও চলমান এরোপ্লেন থেকে, রেডার প্রতিফলন জাতীয়। অবশ্য তখনও রেডার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। অধ্যাপক মিত্র ও অধ্যাপক ভড় যে প্রতিফলন-সূত্রে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন, একই প্রতিফলন-সূত্র অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালিয়ে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্তে রেডার যন্ত্র তৈরী করা হয়।

অধ্যাপক মিত্রের বিখ্যাত বই 'দি আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণায় আর একটি বিরাট অবদান। এই বইয়ে উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের যে সব তথ্য আলোচিত হয়েছে, সবই কৃত্রিম উপগ্রহ ডিজাইনের সময় অনেক কাজে লেগেছে। এজন্যই সোভিয়েট দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বইটির এত চাহিদা। বইটি ১৯৪৭ সালে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন মুলুকে হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে ইহা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুবাদ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যাপক ডঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন্ অব্ দি ফেকাল্টী অব্ সায়েন্স ও বিশুদ্ধ পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক) গবেষণাও বিজ্ঞান-জগতে সাড়া তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর মৌলিক অবদান আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণায় অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজনা হিসেবে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জগতে সমাদৃত।

বেতার-বিজ্ঞান, আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের সংক্রমণ, বিশেষ করে কণ্ট্যাক্ট-রেক্টিফিকেশন ও কৃত্রিম আয়নমণ্ডল সম্পর্কে অধ্যাপক খাস্তগীরের গবেষণা আবহ-বিজ্ঞান গবেষণার কয়েকটি দিকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে।

আয়নমণ্ডল থেকে যে বেতার-তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে, তার বৈদ্যুতিক স্পন্দনগত (পোলারাইজেসন্) বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক খাস্তগীরের ল্যাবরেটরীতেই ভারতবর্ষে সবচেয়ে আগে গবেষণা আরম্ভ হয়।

ভারতে এখনও জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের ল্যাবরেটরীতে 'আয়নমণ্ডল' (আয়নোস্ফিয়ার) নিয়ে গবেষণা চালানো হচ্ছে।

মতামত

মাননীয় 'অমৃত' সম্পাদক,

গত 'স্বাধীনতা সংখ্যা ১৩৬৯'-এ প্রকাশিত এন কে জি'র লেখা 'চলচ্চিত্র-স্খলিত শিল্প' প্রবন্ধটি পড়ে বড়োই আনন্দিত হয়েছি। এ ধরণের লেখা, বিশেষ কোরে চলচ্চিত্রের তত্ত্বগত ও শিল্পগত দিক নিয়ে আলোচনামূলক প্রবন্ধ, আমাদের দেশের তথাকথিত সাহিত্য পত্রপত্রিকায় খুবই কম প্রকাশিত হয়ে থাকে। ফলে এই বিষয়ে যাঁরা আগ্রহশীল, তাঁরা তাঁদের আগ্রহ মেটাতে বাধ্য হন ছবি-ভর্তি তথাকথিত ফিলম্-ম্যাগাজিনগুলোর পাতা উল্টে। আপনার পত্রিকা মারফৎ এ-বিষয়ের উপর ভবিষ্যতে আরো প্রবন্ধ বা আলোচনা প্রকাশিত হোলে একশ্রেণীর পাঠকপাঠিকা তাঁদের অনেকদিনের অভাবকে পূর্ণ করতে সমর্থ হবে বলে যথেষ্ট আশা রাখি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে চলচ্চিত্রে প্রচলিত প্রয়োগরীতি ও ধ্যান-ধারণা আজ বাতিল হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি-ভঙ্গীও বদলে গেছে। আজকের চলচ্চিত্র আগেকার মতো নিছক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গই নয়, আধুনিক যুগের চলচ্চিত্র ললিতকলা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে স্বীকৃত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এবং এই স্বীকৃতির ক্ষেত্র পাশ্চাত্ত্য চলচ্চিত্র জগৎকে অতিক্রম করে বর্তমান ভারতবর্ষেও প্রসারিত হয়েছে। সরকারের ক্রমবর্ধমান পৃষ্ঠ-পোষকতায় অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ রচিত হবে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। গত দশকে ভারতীয় চলচ্চিত্র যান্ত্রিক দিক দিয়ে যেমন উন্নতিলাভ করেছে, তেমনি উন্নতিলাভ করেছে শিল্পগত দিক দিয়েও। 'পথের পাঁচালির' মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের চলচ্চিত্রে প্রগতিমূলক চিন্তা-ধারার সূত্রপাত হয়েছে—চলচ্চিত্রে এসেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্রধারা। ইতালি, ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের যুদ্ধোত্তর চলচ্চিত্রে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'নিও-রিয়ালিজম', চলচ্চিত্রে এসেছে 'নিউ ওয়েভ' আর 'ডি-ড্রামাটাইজেশন'এর 'নতুন দিগদর্শন'। এন কে জি মহাশয় চলচ্চিত্রের এই নতুন শিল্পরীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে এবং এই 'তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত' যে প্রমাদ-পূর্ণ সে কথা সোচ্চার ঘোষণা করে যথেষ্ট ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। একজন বিদগ্ধ চিত্র-সমালোচকের বক্তব্যে 'প্রকৃত রূপকারের' দৃষ্টিভঙ্গিই যে ফুটে উঠবে, 'ব্যাকরণ ও তত্ত্বের বাঁধাধরা অনুশীলনে' সীমিত ও 'কোন নির্দিষ্ট রূপ-রীতির শৃঙ্খলে' আবদ্ধ চলচ্চিত্রকে তিনি যে প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা দিতে পারবেন না, এন কে জি'র আলোচ্য প্রবন্ধ সে কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছে আমাদের। কিন্তু 'ডি-ড্রামাটাইজেশনের'র যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেটা সেই বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ আলোকপাত কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাস্তবভিত্তিক চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন চিন্তা আর দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিকা রচিত হয়েছে, 'ডি-ড্রামাটাইজেশনে'র উদ্ভা-বনকে সেই পটভূমিকাতেই বিচার করতে হবে। 'ডি-ড্রামাটাইজেশন'এর তত্ত্ব চলচ্চিত্র-জগতে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্ত্য জগতে 'নিও-রিয়ালিজম'কে ভিত্তি করে চল-চ্চিত্র-ক্ষেত্রে চিন্তা-পরিবর্তনের যে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হয়েছিল, 'ডি-ড্রামাটাইজেশন' তো তারই ফলশ্রুতি। এবং আনুক্রমিক ধারায় বিচার করলেই বোধ হয় 'ডি-ড্রামাটাইজেশনে'র সার্থকতা বা তাৎপর্য বোঝা যাবে। কিন্তু এন কে জি মহাশয় কেন জানি না 'চলচ্চিত্র-তত্ত্বজ্ঞদের' এই 'নতুন দিগ্‌দর্শন' বা 'অভিনব সিদ্ধান্তকে' এই আলোকে বিচার করে দেখেননি, ফলে তিনি 'ডি-ড্রামাটাই-জেশন'-এর একপাক্ষিক চিত্রটিকেই উপ-স্থাপিত করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন—'এই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত প্রমাদপূর্ণ', কারণ তাঁর মতে 'ছায়াছবি থেকে নাটকের নির্বাসনেরই নাম 'ডি-ড্রামাটাইজেশন'। এখানে নাটককেও তিনি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে গণ্য করেছেন, কারণ 'নাটক নাকি অলীক। জীবনানুগ নয়'। 'ডি-ড্রামাটাই-জেশনে'র প্রচারকারীরা নাটককে এরূপ চিত্রে চিত্রিত করেছেন বলে আমার জানা নেই: তাঁরা বাস্তবিকই চান জীবনের নগ্ন সত্যরূপই শুধু ফুটিয়ে তুলতে হবে ছবিতে। এতোটুকু মিথ্যা আবেগে জীবন যেন বিকৃত না হয়ে ওঠে। জীবনের নগ্ন সত্যরূপকে ফুটিয়ে তোলার অর্থ এই 'মিথ্যা আবেগকে' ছায়াছবি থেকে বিসর্জন দেয়া, নাটককে নয়, আর এই 'আবেগ' যেখানে সাহিত্য-কারের মূল্যে প্রতিষ্ঠিত, আবেগের নিশ্চিদ্র আবরণের তলায় যেখানে জীবনের নগ্নসত্যরূপ ঢাকা পড়ে না, সেরকম আবেগকে বিসর্জন দিয়ে চল-চ্চিত্র-সৃষ্টির কথা চিন্তা করা নিছক বাতুলতা এবং 'ডি-ড্রামাটাইজেশন'এর প্রচারকারীরা নিছক বাতুল না বলেই হয়তো তাঁরাও এই কথা বিশ্বাস করেন। বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক জর্জ সেডুলের ভাষায়...... 'Pictorial and theatrical' — two basic impurities ছায়াছবি থেকে এদের বিসর্জন দেয়াই হচ্ছে 'ডি-ড্রামাটাইজেশন' আন্দোলনের লক্ষ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে জর্জ সেডুল 'theatrical' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং 'dramatical' কথাটি নয়। ('ডি-ড্রামাটাইজেশন' আক্ষরিক অর্থে যাই বোঝাক না কেন, প্রয়োগগত অর্থেই নামটি সার্থক এবং শেষোক্ত অর্থেই এর সার্থকতা বিচার্য)। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' ও জর্জ সেডুল্ উল্লিখিত 'basic impurities' থেকে মুক্ত ছিল না; পরবর্তী চিত্রগুলো যতো বেশি এই দোষ দুটি থেকে মুক্ত হয়েছে, ততো বেশি তারা 'ডি-ড্রামাটিক' চিত্রসৃষ্টি হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই 'ডি-ড্রামাটাইজেশনে'র প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব বলে আমার ধারণা। নমস্কারান্তে ইতি—

বিনীত

গোপেন দত্ত

১।৩।৪-এইচ দমদম রোড,

কলিকাতা—২

মাননীয়েষু,

সম্প্রতি দেবানন্দের 'হাম দোনো' ছবিটি দেখলাম। এই ছবির সঙ্গে বহু দিন আগে বাংলায় তোলা একটি ছবির কাহিনীর অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করলাম। সেটি হচ্ছে ১৯৩৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সতু সেন পরিচালিত 'ইম্পস্টার' বা 'ধূমকেতু'—যাতে 'রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বৈত ভূমিকায় ছিলেন। নায়িকা ছিলেন শান্তি গুপ্তা, অন্যান্য ভূমিকায় মনো-রঞ্জন ভট্টাচার্য, রঞ্জিৎ রায় প্রভৃতি ছিলেন। ছবিটি আপনি যদি দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন উভয় গল্পের মধ্যে কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে, উভয় গল্পের কাহিনীই মূল কোন বিদেশী ভাষা থেকে গৃহীত। 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ মারফৎ যদি এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহলে বিশেষ বাধিত তথা আনন্দিত হব। নমস্কারান্তে, ইতি—

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

বোখারো, হাজারিবাগ

হাম-দোনো সম্পর্কে

পত্রলেখকের অনুমান মিথ্যা নয়। সম্ভবতঃ 'ইম্পস্টার' বা 'ধূমকেতু' এবং 'হাম-দোনো'—এই দু'খানি ছবির কাহিনীই কোনো বিদেশী গল্প অব-লম্বনে রচিত। —নান্দীকর

শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন

তিনজন ছাত্র

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

১৮৯৫ সাল। একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনার চাপে পড়ে মিঃ শার্লক হোমস্ এবং আমাকে কয়েক হপ্তা একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে থাকতে হয়েছিল। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ঘিরে যে বিপুল শহরগুলি গড়ে উঠেছে, এটিও তাদের অন্যতম। কি কি ঘটনার চাপে তাদের এ-হেন শহরে যেতে হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ আর নাই বা দিলাম। এই সময়ের মধ্যেই ছোট্ট কিন্তু বেজায় শিক্ষামূলক একটা অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে গিয়ে পড়ি আমরা। সেই কাহিনীই লিখতে বসেছি আজ। একটা জিনিস অবশ্য স্বীকার্য। এমন কোন খুঁটিনাটি আমার দেওয়া উচিত নয়, যা পাঠক-সাধারণকে কলেজটা অথবা অপরাধীকে শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এ-ধরনেব তথ্য পরিবেশন করাটা অশোভন, অন্যায় এবং অপমানকর। বেদনাবিধুর কেলেঙ্কারীকে ধামাচাপা দেওয়াই উচিত। সেই কারণেই আখ্যানবস্তুর স্থান-বিশেষ বেমালুম চেপে যাওয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে এ-কাহিনী বলব আমি। বলব শুধু এই কারণে যে, যে সব বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যে আমার বন্ধুটির এত নামডাক, তারই কিছু কিছু সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে এ ঘটনার মধ্যে। কাহিনী-আলেখ্য রচনা করতে বসে কয়েকটি নামধাম শব্দ আমি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করব। যে সব তথ্য ঘটনাপ্রবাহকে কোন বিশেষ স্থানে সীমিত করবে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে সূত্র সরবরাহ করবে, সেগুলোর ধারকাছ দিয়েও যাব না আমি।

লাইব্রেরীর পাশে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একটা আস্তানায় ডেরা নিয়েছিলাম আমরা। সুপ্রাচীন ইংলিশ সনন্দ-সম্পর্কিত কতকগুলো পরিশ্রম-সাধ্য গবেষণা নিয়ে লাইব্রেরীতে অহর্নিশ ডুবে থাকত শার্লক হোমস্। এ-গবেষণার শেষে এমনই সব চাঞ্চল্যকর ফলাফল প্রকাশ পায় যে, যা নিয়ে হুলুস্থুলে পড়ে গেছিল। ইচ্ছে আছে, এ-নিয়ে ভবিষ্যতে একটা ইতিবৃত্ত রচনা করব। এইখানেই এক সন্ধ্যায় এক পরিচিত ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন আমাদের সঙ্গে। ভদ্রলোকের নাম মিঃ হিলটন সোমস্, কলেজ অফ সেন্ট লিউকস্-এর শিক্ষক এবং লেকচারার। মানুষটি রোগাটে লম্বা। নার্ভাস-প্রকৃতি এবং একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। চিরকালই ও'র হাবভাব অশান্ত ছটফটে বলেই জানি আমি। কিন্তু সেদিন তাঁর মধ্যে এমনই অদম্য উত্তেজনার লক্ষণ দেখলাম যে, বুঝতে দেরী হ'ল না বেজায় অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে।

“মিঃ হোমস্, আমার বিশ্বাস আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েকটি ঘণ্টা আমার জন্যে ব্যয় করবেন। সেন্ট লিউকস্‌য়ে একটা বড় বিশ্রী কাণ্ড ঘটেছে। সৌভাগ্যক্রমে এ-শহরে আপনি এখন উপস্থিত রয়েছেন। তা নাহলে আমি তো ভেবেই পেতাম না যে, এ-পরিস্থিতিতে কি করা উচিত আমার।”

উত্তরে বন্ধুবর বললে, “ঠিক এই সময়টাতেই দারুণ ব্যস্ত আমি এবং আমি চাই না এখন বিক্ষিপ্ত হোক আমার মন। আমার মতে, আপনি বরং পুলিশের সাহায্য নিন।”

“না, না, মাই ডিয়ার স্যার। তা একেবারেই অসম্ভব। আইনের শরণ একবার নিলে আর তো তাকে ঠেকা দিয়ে রাখা যাবে না, তা'র মুখ বন্ধও করা যাবে না। কিন্তু এ কেসটা এমনই যে কলেজের সুনাম নির্ভর করছে এর ওপর। এবং কেলেঙ্কারী এড়োনোর জন্যেই পাঁচকান না হওয়াটা একান্তই দরকার। আপনার ক্ষমতার কথা যেমন সবাই জানে, ঠিক তেমনি জানে আপনার পরিপূর্ণ আত্মনির্ভর স্বাধীনতা।

দুনিয়ার আপনি ছাড়া এ বিপদে আর কেউ আমাদের সাহায্য করতে পারবে না, মিঃ হোম্‌স্। আমার মিনতি, আপনি যা পারেন করুন এ-ব্যাপারে।"

বেকার ষ্ট্রীটের মনোমত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর থেকে আমার বন্ধুটির তিরিক্ষে মেজাজে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়নি। স্ক্র্যাপবই, কেমিক্যাল্‌স্ আর অপরিচ্ছন্নতা—এ-সবের মধ্যে না থাকলে স্বচ্ছন্দ বোধ করত না বন্ধুবর। আরাম পেত না আর কিছুতেই। মিঃ সোম্‌সের কথা শুনে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৌন সম্মতি দিলে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি সে। তড়বড় করে কথা বলতে শুরু করলেন মিঃ সোম্‌স্। উত্তেজিতভাবে বিস্তর অঙ্গভঙ্গি করে উগরে দিলেন তাঁর কাহিনী।

"মিঃ হোম্‌স্, আগেই একটা জিনিস খোলসা করে রাখি আপনার কাছে। আগামীকালই ফর্টেস্ক্যু স্কলারশিপ পরীক্ষার প্রথম দিন। পরীক্ষকদের মধ্যে আমিও আছি। আমার বিষয় গ্রীক। ফার্ষ্ট পেপারে ছাত্রদের অদেখা একটা মস্তবড় প্যাসেজ থাকে গ্রীক থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্যে। পরীক্ষার খাতাতেই ছাপা থাকে এই প্যাসেজটা। কাজেই কোন পরীক্ষার্থী যদি আগে থেকেই প্যাসেজটা তৈরী করে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে স্বভাবতঃই বিলক্ষণ সুবিধে হয় তার। এই কারণেই কাগজটাকে গোপনে রাখার জন্যে দারুণ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

"আজকে প্রায় তিনটের সময়ে কাগজটার প্রুফ এসে পৌঁছোয় ছাপাখানা থেকে। থিউসিডআইডিজ্-য়ের আধখানা পরিচ্ছদ তুলে দেওয়া হয়েছে তর্জমার জন্যে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্যাসেজটা পড়তে হয় আমায়, কেননা তা অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল থাকা দরকার। সাড়ে চারটার সময়েও শেষ হ'ল না আমার কাজ। এক বন্ধুর বাড়ীতে চা-পানের কথা ছিল। তাই প্রুফটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেলাম আমি। ঘন্টাখানেকেরও বেশী হবে বাইরে ছিলাম। আপনি তো জানেন, মিঃ হোম্‌স্, আমাদের কলেজের দরজাগুলো ভেতর বাইরে দু'রকম হয়। ভেতর দিকে থাকে সবুজ রঙের পুরুপশমী কাপড়ের আবরণ। আর, বাইরের দিকে ভারী ওক কাঠের পাল্লা। বাইরের দরজার দিকে এগুতেই অবাক হয়ে গেলাম চাবীর গর্ত থেকে একটা চাবী ঝুলতে দেখে। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়ত বা আমারই চাবী ভুলে ফেলে গেছি আমি। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখি, তা তো নয়। যতদূর আমি জানি, ঘরের দোসরা চাবী থাকে শুধু একজনের কাছেই এবং সে আমার পরিচারক ব্যানিস্টার। আজ দশ বছর হ'ল ব্যানিস্টার আমার ঘরের সব-কিছু দেখাশুনো করে আসছে এবং তার সততা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার জাগে না। দেখলাম, চাবীটা তারই বটে। আমি চা-পান করব কিনা, তা জিজ্ঞেস করার জন্যেই ঘরে ঢুকেছিল ও। তারপর বেরিয়ে আসার সময়ে ভুল করে চাবীটা রেখে এসেছে দরজায়। অত্যন্ত অসাবধানীর মত কাজ। আমি বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চয় এসেছিল ও ঘরের মধ্যে। চাবী সম্বন্ধে ওর এতটা ভুল হওয়াটা অন্য সময়ে হ'লে কোনরকম ক্ষতিকর ছিল না এবং তাতে এমন কিছু যেত আসত না। কিন্তু আজকের দিনে এই সামান্য ভুলের পরিণাম যে কি নিদারুণ শোচনীয়, তা কহতব্য নয়।

"টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই বুঝলাম কে যেন আমার কাগজপত্র হাতড়ে গেছে তাড়াহুড়ো করে। লম্বা লম্বা তিনটে স্লিপ কাগজে প্রুফটা এসেছিল। তিনটে কাগজই একসঙ্গে রেখে গেছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখলাম, একটা কাগজ পড়ে মেঝের ওপর, একটা জানালার পাশে রাখা সাইড-টেবিলের ওপর, আর তৃতীয়টা আমি যেখানে রেখে গেছিলাম ঠিক সেইখানেই।"

এই প্রথম নড়েচড়ে বসল হোম্‌স্।

"প্রথম পাতাটা মেঝের ওপর, দ্বিতীয়টা জানালার কাছে, আর তৃতীয়টা যেখানে রেখে গেছিলেন সেইখানে?" বললে সে।

"এগ্‌জ্যাক্টলি, মিঃ হোম্‌স্। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি কি করে জানলেন?"

"দয়া করে আপনার রীতিমত ইন্টারেষ্টিং কাহিনীর বাকীটুকু বলে ফেলুন।"

"ক্ষণেকের জন্যে ভেবেছিলাম, বুঝি বা ব্যানিস্টারই এই ক্ষমাহীন অপরাধটি করেছে। আমার অবর্তমানে খুশিমত নাড়াচাড়া করে দেখেছে আমার কাগজপত্র কিন্তু সে তা অস্বীকার করলে। তার সুগভীর ঐকান্তিকতা দেখে বুঝলাম, সত্য বই মিথ্যে বলেনি সে। তাহলে বিকল্প অনুমান দাঁড়াচ্ছে এই—এ দিক দিয়ে কেউ যেতে যেতে দরজায় চাবী ঝুলতে দেখেছিল। সে জানত, আমি

ঘরে নেই। তাই ভেতরে ঢুকেছিল আমার কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিতে। বিপুল অংকের অর্থ জলে যেতে বসেছে, মিঃ হোম্‌স্। স্কলারশিপটা বাস্তবিকই ভারী মূল্যবান। কাজে কাজেই, ন্যায় অন্যায় যে বোঝে না, অধর্ম-ভয়ে যে ঘাবড়ায় না, সে যদি অন্যান্য ছাত্রের ওপর টেক্কা মারার বদ মতলবে এ ঝুঁকি নেয় তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

"এ ঘটনায় দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছে ব্যানিষ্টার। যখন দেখলাম, সত্যি সত্যিই আমার কাগজপত্র কে ঘাঁটা-ঘাঁটি করে গেছে এবং এ সম্বন্ধে যখন কোন সন্দেহই আর রইল না, তখন তো ব্যানিষ্টার প্রায় অজ্ঞান হয় হয় এমনি অবস্থা। খানিকটা ব্র্যান্ডি দিলাম ওকে। আধমরার মত ও জবুথবু হয়ে বসে রইল একটা চেয়ারে। আর, আমি আবার বেশ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলাম ঘরটাকে। তখনই দেখলাম, এদিকে সেদিকে ছড়ানো কাগজ ছাড়াও আগন্তুক তার অনধিকার প্রবেশের আরও কিছু চিহ্ন রেখে গেছে ঘরের মধ্যে। জানলার কাছে টেবিলের ওপর পেন্সিল কাটা কাঠের কুচো দেখে বুঝলাম একটা পেন্সিল ছুঁচোলো করা হয়েছিল সেখানে। একটা ভাঙা শিষও পড়েছিল টেবিলের ওপর। অর্থাৎ, রাস্কেলটা বেজায় তাড়াহুড়ো করে কাগজটার নকল করতে গিয়ে পেন্সিলের শিষ ভেঙে ফেলে। কাজেই বাধ্য হয়ে পেন্সিল ছুলে আবার নতুন শিষ বার করে নিতে হয় তাকে।"

"এক্সেলেন্ট!" বলে ওঠে হোম্‌স্। কেসটার বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে যতই তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল ও, ততই শরীফ হয়ে উঠছিল বিগড়োনো মেজাজ। "ভাগ্য আপনার সহায়।"

"এই সব নয়, মিঃ হোম্‌স্, আরও আছে। আমার লেখার টেবিলটা নতুন। পাতলা মসৃণ লাল চামড়া দিয়ে ঢাকা ওপরটা। শুধু আমি নয়, ব্যানিষ্টারও আমার সুরে সুর মিলিয়ে শপথ করে বলতে রাজী আছে যে মোলায়েম চামড়ার ওপরে এতটুকু আঁচড় বা দাগ কোনদিনই ছিল না। কিন্তু এখন দেখলাম, প্রায় ইঞ্চি তিনেকের মত লম্বা একটা পরিষ্কার কাটা নিছক আঁচড়ের দাগ নয়, সত্যিকারের কাটা। শুধু তাই নয়। টেবিলের ওপর কাদা-মাটি, খমীর বা অন্য কোন নরম পদার্থের একটা ছোট্ট বলও পেলাম। বলটার গায়ে ফুটকি ফুটকি দাগ দেখে করাতচেরা কাঠের গুঁড়ো বলে মনে হ'ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে লোকটা আমার কাগজপত্র ঘেঁটে গেছে, এ-সব চিহ্ন তারই। পায়ের ছাপ বা লোকটাকে শনাক্তকরণের অন্য কোন প্রমাণাদি পেলাম না ঘরে। দেখেশুনে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি তো বেবাক গুলিয়ে গেল। কিন্তু আপনি যে এই শহরেই এখন রয়েছেন, তা আচমকা মনে পড়তেই আশার আলো দেখলাম। তাই, সিধে চলে এসেছি এ কেস আপনার হাতে তুলে দিতে। আমাকে সাহায্য করুন, মিঃ হোম্‌স্! আমার শাঁখের করাতের মত উভয় সঙ্কট বুঝতে পারছেন তো। হয় লোকটাকে আমায় খুঁজে বার করতে হবে, আর, তা না হলে, পরীক্ষা স্থগিত রাখতে হবে নতুন পেপার তৈরী না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু কোনরকম কারণ না দর্শে তা তো আর করা সম্ভব নয়। তাহলেই যে জঘন্য কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হবে, তার কালো মেঘ শুধু যে কলেজের ওপরেই এসে পড়বে তা নয়, ইউনি-ভার্সিটিও রেহাই পাবে না। তাই আমি চাই পাঁচকান না হয়ে নিজেদের মধ্যেই চুপচাপ নিষ্পত্তি হয়ে যাক এ ব্যাপারের।"

দাঁড়িয়ে উঠে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে হোম্‌স্ বললে, "এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলে সত্যিই খুশী হ'ব আমি। আমার সাধ্য-মত পরামর্শও আমি দেব আপনাকে।

কেসটা একেবারেই নিরেস নয়, ইন্টা-রেস্টিং পয়েন্ট কিছু কিছু আছে। পেপারগুলো আপনার হাতে আসার পর আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আপনার ঘরে কেউ এসেছিল কি?"

"হ্যাঁ, এসেছিল। ঐ একই তলায় তরুণ ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম থাকে। পরীক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি খুঁটিনাটি খবরাখবর জানতে এসেছিল ও।"

"পরীক্ষায় সে-ও বসছে?"

"হ্যাঁ।"

"পেপারগুলো টেবিলের ওপরেই ছিল, তাই না?"

"আমার যতদূর বিশ্বাস, গোল করে পাকানো ছিল কাগজগুলো।"

"কিন্তু প্রুফ বলে চেনা তো যেত?"

"খুব সম্ভব।"

"আর কেউ আসেনি?"

"না।"

"আর কেউ জানত কি যে আপনার ঘরে প্রুফগুলো আসবে?"

"ছাপাখানার লোক ছাড়া আর কেউ না।"

"ব্যানিষ্টার জানতো কি?"

"না, না, নিশ্চয় না। কেউই জানত না।"

"ব্যানিষ্টার এখন কোথায়?"

"বেচারী! খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল! চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ার পর ঐ অবস্থাতেই তাকে রেখে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এসেছি আপনার কাছে।"

"দরজা খোলা রেখে এসেছেন?"

"পেপারগুলো আগে তালাচাবী দিয়ে রেখেছি ভেতরে।"

"তাহলে মিঃ সোমস্, ব্যাপারটা মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এই—ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম যদি পাকানো কাগজগুলোকে প্রুফ বলে চিনে না থাকে, তাহলে যে লোকটা কাগজগুলো ঘেঁটেছে, সে কিন্তু কাগজগুলো যে ওখানে আছে, তা না জেনেই দৈবাৎ ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

প্রহেলিকা-আবিল দুর্বোধ্য হাসি হাসল হোমস্।

বলল, "চলুন, ঘরে আসা যাক এক চক্কর। এ কিন্তু তোমার কেস নয়, ওয়াটসন—মানসিক ব্যাপার, শরীরঘটিত নয়। বেশ, বেশ, ইচ্ছে হ'লে চলে এস। মিঃ সোমস্—আমরা প্রস্তুত!"

আমাদের মক্কেল ভদ্রলোকের বসবার ঘরের লম্বা, কিন্তু নীচু জাফরিকাটা জানলার পরেই প্রবীণ কলেজের গাছ-শ্যাওলার ছোপ ছোপ দাগ কলঙ্কিত সুপ্রাচীন প্রাঙ্গণটা। গথিক প্যাটার্নের খিলানওলা দরজার পরেই ক্ষয়ে আসা পাথরের সিঁড়ির সারি। একতলায় মিঃ সোমসের ঘর। আর ওপরের তিন-তলায় এক এক তলায় এক একজন ছাত্রের ঘর। এ হেন হেঁয়ালী-দৃশ্যে যখন পৌঁছোলাম, তখন গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধরিত্রীর বুকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল হোমস্।

কাঁচের শার্সিতে একটিমাত্র কাঁচ, তাছাড়া আর প্রবেশপথ নেই।"

"কি বিপদ!" বলে ওঠে হোমস্। তারপর মিঃ সোমসের পানে তাকিয়ে কি রকম যেন আশ্চর্যভাবে হেসে ওঠে। "বেশ বেশ, এখানে যদি কিছু না পাওয়া যায় তো চলুন, আমরা বরং ভেতরেই যাই।"

চাবী ঘুরিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে ফেললেন লেকচারার, তারপর সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ভেতরে। প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা। আর, কার্পেটটা পরীক্ষা করতে শুরু করলে হোমস্।

বললে, "উঁহু, এখানেও কোন চিহ্ন দেখছি না। এরকম শুকনো খট-খটে দিনে আশা করাও অন্যায়। আপনার পরিচারক মনে হচ্ছে বেশ

...গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধরিত্রীর বুকে

সামলে নিয়েছে। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বললেন। কোন্ চেয়ারটা বলুন তো?"

"জানলার পাশেরটা।"

"বটে। ছোট্ট এই টেবিলটার কাছে। এখন ভেতরে আসতে পারেন আপনারা। কার্পেট দেখা সাঙ্গ হয়েছে আমার। এবার সবার আগে এই ছোট টেবিলটা

জানলার দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ চোখে। তারপর আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সারস পাখীর মত গলা লম্বা করে তাকাল ঘরের ভেতরে।

আমাদের পণ্ডিত পথ-প্রদর্শক ভদ্রলোক বললেন, "নিশ্চয় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল লোকটা। কেননা,

নিয়ে পড়া যাব। ঘটনা-পরম্পরাগুলো কিন্তু জলের মতই দিব্যি পরিষ্কার। লোকটা ঘরে ঢুকে মাঝখানের টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নেয়। একেবারেই সবগুলো নয়—প্রতিবারে একটি তা। কাগজগুলো নিয়ে যায় সে জানলার ধারে টেবিলের কাছে এই উদ্দেশ্যে যে উঠোনের মাঝ দিয়ে আপনাকে আসতে দেখলেই সে সংকেত দিতে পারবে অনায়াসে।"

সোমস্ বললেন, "প্রকৃতপক্ষে, সে পারত না। কেননা, আমি পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলাম।"

"অ্যা, তা বেশ! সে যাই হোক, এই অভিসন্ধিই ছিল তার মনে। এবার দেখা যাক স্লিপ কাগজগুলো। আঙুলের ছাপ নেই—নাঃ! আচ্ছা, এইটাই সে প্রথমে নিয়ে যায় জানলার কাছে, নকলও করে ফেলে। সব রকমের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি কাজে লাগিয়েও এটা কপি করতে তার কতক্ষণ লাগা উচিত? মিনিট পনেরো তো বটেই, তার কম নয় কিছুতেই। প্রথমটা হয়ে যেতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুলে নিলো পরেরটা। এই নিয়েই যখন সে ব্যস্ত ঠিক তখনই এসে পড়লেন আপনি। বেজায় ত্বরিতগতিতে বিদ্যুতের মত পা চালাতে হল তাকে। মনে রাখবেন, খুব তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুতবেগে তাকে অন্তর্হিত হতে হয়েছে। কেননা, কাগজগুলো ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকা মানেই যে তার উপস্থিতি আপনাকে জানিয়ে দেওয়া—তা জানা সত্ত্বেও সে পেপারগুলো টেবিলের ওপর যথাস্থানে রেখে যেতে পারেনি, রাখার সময় পায়নি। দরজার সামনে পৌঁছে সিঁড়ির ওপর খুব দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?"

"না! এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলাম না আমি।"

"যাই হোক, ঝড়ের মত লিখতে গিয়ে পেন্সিলের শিষ ভেঙে ফেলে সে। আপনি তো লক্ষ্য করেছেন, আবার পেন্সিল ছুঁচোলো করতে হয়েছে তাকে। পয়েন্টটা কিন্তু ভারী চিত্তাকর্ষক, ওয়াটসন। পেন্সিলটা সাধারণ পেন্সিল নয়। আর পাঁচটা পেন্সিলের মতই এর সাইজ। নরম শিষ। বাইরের রঙটা গাঢ় নীল। রুপোলী অক্ষরে লেখা নির্মাতার নাম। অনেক ব্যবহারের পর তার এখনকার দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে দেড় ইঞ্চি! মিঃ সোমস্, এই রকম একটা পেন্সিলের সন্ধানে থাকুন, তাহলেই যাকে খুঁজছেন তার হদিস আপনি পেয়ে যাবেন। এই সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিই—বড় সাইজের বেজায় ভোঁতা একটা ছুরীও পাবেন লোকটার কাছে। আপনার আরও সুবিধে হয়ে গেল, মিঃ সোমস্।"

মিঃ সোমস্ তখন তথ্যের এ হেন বন্যায় বেশ খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছেন। "অন্যান্য পয়েন্টগুলো না হয় বুঝলাম। কিন্তু দৈর্ঘ্য সম্পর্কে যা বললেন—"

ছোট্ট একটা কুচো তুলে নিলো হোম্‌স্। কুচোটার ওপর N N অক্ষর দুটি লেখা এবং তারপরে খানিকটা কাঠ একদম ফাঁকা।

"দেখছেন তো?"

"না, দেখছি না, এখনও আমি বুঝতে পারছি না—"

"ওয়াটসন, চিরকালই তোমার ওপর অবিচার করে এসেছি আমি। এদিক দিয়ে তুমি একলা নও, আরও অনেকে আছেন। এই NN অক্ষর দুটো কি হ'তে পারে বলো তো? একটা শব্দের শেষের দুটো অক্ষর। তুমি তো জান Johann Faber হচ্ছে সবচেয়ে নামকরা পেন্সিল-নির্মাতার নাম। Johann শব্দটার পর সাধারণতঃ পেন্সিলের কতখানি অংশ অবশিষ্ট থাকে, তা অনুমান করা কি খুব কঠিন?" ছোট টেবিলটাকে কাৎ করে বৈদ্যুতিক বাতির দিকে ফিরিয়ে ধরলে হোম্‌স্। "ভেবেছিলাম, যে কাগজে সে লিখেছে, তা যদি পাতলা হয়, তা পেন্সিলের চাপে কিছু কিছু চিহ্ন ফুটে উঠত পালিশকরা চকচকে টেবিলের ওপর। নাঃ, তেমন কিছুই দেখছি না। এখানে আর কিছু জানা যাবে বলে তো মনে হয় না আমার। এবারে মাঝখানের টেবিলটা। কাদামাটি বা নরম পদার্থের এই ছিটে গুলির মত বলটার কথাই আপনি বলছিলেন, তাই না? আকারে মোটামুটি পিরামিডের মত। হুঁ, ভেতরটা প্রায় ফাঁপা। ঠিকই বলেছেন, মিঃ সোমস্, করাত চেরা কাঠের গুঁড়োর মতই কয়েকটা কণা দেখা যাচ্ছে বটে। সর্বনাশ, এ তো দেখছি দারুণ ইন্টারেস্টিং জিনিস। আর এই কাটাটা—বটে, দেখছি সত্যি সত্যিই ছিঁড়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে চামড়াটা। শুরু হয়েছে পাতলা আঁচড় দিয়ে, শেষ হয়েছে খাঁজকাটা গর্তে। এ কেসে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে আপনার কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ, মিঃ সোমস্। এ দরজা দিয়ে যাওয়া যায় কোথায়?"

"আমার শোবার ঘরে।"

"আপনার অ্যাডভেঞ্চারের পর ও ঘরে আর গেছিলেন?"

"না। সিধে চলে গেছি আপনার কাছে।"

"ভেতরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। বাঃ, ভারী সুন্দর ঘর তো! দিব্যি সেকেলে কায়দায় সাজানো! মেঝে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিনিটখানেকের জন্যে সবুর করবেন নিশ্চয়। এ পর্দাটা কিসের? পেছনে পোশাক-পোশাক রাখেন বুঝি? এ ঘরে যদি কেউ লুকোতে চায়, তাহলে তার আদর্শ স্থান হল এইখানটা। কেননা বিছানাটা দারুণ নীচু, পোশাক রাখার আলমারীটাও বেজায় পাতলা। কেউ নেই বলেই তো মনে হয়, তাই না?"

পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিলে হোম্‌স্। আমি কিন্তু ওর সামান্য শক্ত হয়ে ওঠা আর ভাবভঙ্গির সজাগ সতর্কতা দেখেই বুঝেছিলাম আচমকা কারও বেরিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হয়েই তবে পর্দায় হাত দিয়েছে ও। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, পর্দা সরানোর পর আলনা থেকে ঝোলানো তিন চারটে স্যুট ছাড়া আর কারও টিকিটিও দেখা গেল না ঐ স্বল্প পরিসরের মধ্যে। ঘুরে দাঁড়াল হোম্‌স্। তার পরেই হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর।

"আরে! আরে! এটা কি?" বলে ওঠে ও।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পিরামিড। কালো রঙের পুটিন জাতীয় উপাদানে তৈরী। পড়াশুনো করার ঘরে টেবিলের ওপর যে পিরামিডটি পাওয়া গেছে, হুবহু সেই রকম। হাতের তালুর ওপর জিনিসটা রেখে প্রখর বিদ্যুৎ-বাতির নীচে ধরল হোম্‌স্।

"আগন্তুক শুধু আপনার বসবার ঘরেই নয়, মিঃ সোমস্, শোবার ঘরেও তার আগমনের চিহ্ন রেখে গেছে দেখছি।"

"কিন্তু এখানে তার কি দরকার?"

"আমার তো মনে হয় তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। অপ্রত্যাশিত পথে দুম করে ফিরে এলেন আপনি। কাজে কাজেই আপনি একেবারে দোরগোড়ায় না এসে পৌঁছোনো পর্যন্ত হুঁশিয়ার হওয়ার মত কোন নিশানাই পেল না সে। এক্ষেত্রে কি করা উচিত তার? যে যে জিনিসগুলো তাকে ধরিয়ে দেবে, সেইগুলোই দু'হাতে তুলে নিয়ে তীরবেগে ঢুকে পড়ল সে আপনার শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকার অভিপ্রায়ে।"

"হে ভগবান! মিঃ হোম্‌স্, আপনি কি তাহলে বলেন, যতক্ষণ ব্যানিস্টারের সঙ্গে ওঘরে আমি কথা বলছিলাম, ততক্ষণ আসল লোকটা ঘাপটি মেরে ছিল এঘরে, আর আমি তার কিছুই জানতে পারিনি?"

"তাই তো দেখছি।"

"নিশ্চয় আর একটা বিকল্প আছে, মিঃ হোম্‌স্? আমার শোওয়ার ঘরের জানলাটা লক্ষ্য করেছেন কি?"

"জাফরি-কাটা, কাঠের শার্সিওলা, সিসের ফ্রেম, তিনটে আলাদা আলাদা জানলা, একটায় কব্জা লাগানো এবং এতবড়ো যে অনায়াসেই একজন মানুষ ঢুকতে পারে।"

"এগজ্যাক্টলি। উঠোনটার দিকে কোণ করে থাকায় জানলার খানিকটা প্রায় অদৃশ্য থাকে বললেই চলে। ঐ দিক দিয়েই লোকটা ঢুকেছিল, ভেতরে! শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে যায় ঘরের মধ্যে। সবশেষে, দরজাটা খোলা পেয়ে লম্বা দেয় সেই পথেই।"

অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়তে লাগল হোমস্।

বললে, "এবার একটু প্র্যাকটিক্যাল হওয়া যাক। আপনি তো বললেন না, তিনজন ছাত্রই এ সিঁড়ি ব্যবহার করে বলে প্রায় তাদের যাতায়াত করতে হয় আপনার দরজার সামনে দিয়ে, তাই তো?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"তিনজনেই পরীক্ষায় বসছে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাউকে সন্দেহ করার কোন কারণ আপনার আছে কি?"

ইতস্ততঃ করতে লাগল সোমস্।

তারপর বললে, "এ বড় জবর প্রশ্ন করলেন, মিঃ হোমস্, মহা ফাঁপরে ফেললেন আমায়। প্রমাণাদির বালাই যেখানে নাই, সেখানে চট করে কেউ কি কাউকে সন্দেহ করতে চায়?"

"সন্দেহই শোনা যাক। প্রমাণ খোঁজার ভার আমার।"

"তাই যদি হয় তো সংক্ষেপে, অল্প কয়েকটি কথায় তিন ঘরের তিন বাসিন্দার চরিত্র বর্ণনা করছি। নীচের তলায় থাকে গিলক্রাইস্ট। ছাত্র হিসেবে ভাল। খেলোয়াড় হিসেবেও সুনাম আছে। কলেজের রাগবি টিম আর ক্রিকেট টিমে খেলে। হার্ডলস্ আর লঙ জাম্পে ব্লু হয়েছে। চমৎকার ছেলে সে, সব দিক দিয়ে পুরুষের মত। রেসকোর্সে যিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, সেই কুখ্যাত স্যার জাবেজ গিলক্রাইস্ট ওর বাবা। ছেলে কিন্তু খুবই গরীব। তাহলেও সে কঠোর পরিশ্রমী আর অধ্যবসায়ী। পরীক্ষায় ওর ফলাফল ভালই হবে।

"দোতলায় থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলতরাম। ছেলেটি শান্তশিষ্ট, দুর্বোধ্য এবং আগাগোড়া রহস্যময়। সব ভারতীয়ই যা হয়, তাই আর কি। পড়াশুনোয় সে ভালই, যদিও সব সাবজেক্টের মধ্যে গ্রীকেই সে একটু কাঁচা। অটল তার চরিত্র এবং কাজকর্মও বেশ পদ্ধতি-মাফিক।

"ওপরের তলাটা মাইলস্ ম্যাক-লারেনের। কোন কাজ যদি করব বলে মনে করে তো ধীশক্তির দিক দিয়ে তার জুড়ি মেলা ভার। এই ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বলতম প্রতিভাদের অন্যতম সে। কিন্তু সে চঞ্চলচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল আর নীতিহীন। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে তাস খেলা নিয়ে একটি কেলেঙ্কারী হওয়ায় কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এবারের পুরো পাঠক্রমটা সে ফাঁকি দিয়েছে। কাজেই, নিশ্চয় এ পরীক্ষা একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।"

"তাহলে একেই আপনি সন্দেহ করেন বলুন?"

"অতদূর যাওয়ার সাহস আমার নেই। তবে তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কম সন্দেহ যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে সে হয়ত মাইলস্ ম্যাকলারেন নয়।"

"এগজ্যাক্টলি। মিঃ সোমস্, এবার আপনার পরিচারক ব্যানিস্টারকে একটু দেখতে চাই।"

লোকটা আকারে ছোটখাট। সাদাটে, পরিষ্কার কামানো মুখ। ধোঁয়াটে রঙের কাঁচাপাকা চুল। বছর পঞ্চাশ বয়স। রোজকার অচঞ্চল জীবনধারায় এই আকস্মিক উৎপাতের যন্ত্রণায় তখনও কষ্ট পাচ্ছিল সে। স্নায়বীয় দুর্বলতার জন্যে থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার গোলগাল মুখ। হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত স্থির রাখতে পারছিল না বেচারী।

মিঃ সোমস্ বললেন, "এই যাচ্ছে-তাই ব্যাপারটার একটা বিহিত করা দরকার, তাই আমরা তদন্ত শুরু করেছি, ব্যানিস্টার।"

"ইয়েস, স্যার।"

হোমস্ বললে, "শুনলাম, দরজায় চাবী ফেলে গেছিলে তুমি?"

"ইয়েস, স্যার।...

"যেদিন পেপারগুলো ঘরের মধ্যে এল, ঠিক সেইদিনই চাবী খুলে নিতে ভুলে গেলে তুমি—যোগাযোগটা কি খুব অসাধারণ ঠেকছে না?"

"আমার কপাল মন্দ, স্যার। কিন্তু এর আগেও মাঝে মাঝে এমন ভুল আমার হয়েছে।"

"ঘরে ঢুকেছিলে কখন?"

"সাড়ে চারটা নাগাদ! মিঃ সোমসের চা-পানের সময় তখন।"

"কতক্ষণ ছিলে ঘরের ভেতর?"

"উনি ঘরে নেই দেখে তখুনি বেরিয়ে যাই আমি।"

"টেবিলের ওপর রাখা পেপারগুলো লক্ষ্য করেছিলে?"

"না, স্যার, মোটেই করিনি।"

"দরজা থেকে চাবী খুলে নিতে ভুলে গেলে কেমন করে?"

"আমার হাতে চায়ের ট্রে ছিল। ভাবলাম, ফিরে এসে নিয়ে যাব চাবীটা। তারপর ভুলে গেছি।"

"বাইরের দরজায় কি স্প্রিংয়ের তালা লাগানো আছে?"

"না, স্যার!"

"তাহলে সর্বক্ষণই খোলা ছিল দরজাটা?"

"ইয়েস, স্যার।"

"ঘরের মধ্যে যদি কেউ থাকত, তাহলে তার পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি?"

"ইয়েস, স্যার।"

"মিঃ সোমস্ ফিরে এসে তোমাকে যখন ডেকে পাঠান, তখন তুমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলে?"

"ইয়েস, স্যার। এত বছর এখানে আছি। কিন্তু এ রকম ঘটনা তো কোনদিন ঘটেনি। প্রায় জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা হয়েছিল আমার।"

"তা তো বটেই। যখন বুঝলে শরীর খারাপ লাগছে, তখন কোনখানটায় ছিলে তুমি?"

"কোনখানে ছিলাম, স্যার? কেন, এইখানে, দরজার পাশেই।"

"ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! এতটা পথ গিয়ে দূরের কোণে ঐ চেয়ারটায় বসেছিলে কিনা, তাই বললাম। মাঝের এ চেয়ারগুলোয় বসলে না কেন শুনি?"

"জানি না, স্যার। বসার জায়গা নিয়ে তখন আমি অত ভাবিনি।"

"এ ব্যাপারে ও যে বিশেষ কিছু জানে, তা আমার সত্যি সত্যিই মনে হয় না। মিঃ হোমস্। খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল ওকে—ছাইয়ের মত একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল।"

"মিঃ সোমস্ চলে যাওয়ার পর এ ঘরে ছিলে তুমি?"

"মিনিটখানেকের জন্যে ছিলাম। তারপর দরজার তালা দিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই আমি।"

"কাকে সন্দেহ হয় তোমার?"

"কারও নাম করার আমার সাহস হয় না, স্যার। এ ধরনের নোংরা কাজ করে লাভবান হওয়ার মত প্রবৃত্তি এ ইউ-নিভার্সিটিতে কোনও ভদ্রলোকের আছে বলে মনে হয় না আমার। না, স্যার, আমার তা বিশ্বাস হয় না।"

"ধন্যবাদ। ওতেই হবে।" বললে হোমস্। "ওহো, আরও একটা কথা। এই যে তিনজন ভদ্রলোকের দেখাশুনো কর তুমি, এদের কাউকে বলোনি তো এখান থেকে কিছু খোয়া গেছে?"

"না, স্যার, একটা অক্ষরও বলিনি।"

"ওঁদের কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"না, স্যার।"

"বেশ, বেশ। এবার অনুমতি করেন তো চত্বরটায় এক পাক ঘুরে আসা যাক।" (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

শারদীয় অমৃত ১৩৬৯

সম্পাদক * শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এবার পূজায় উপন্যাস লিখছেন

একমাত্র শারদীয় 'অমৃতে'

অনিমিত্তা

●

একটি অসামান্য পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

বসুন্ধরা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

●

অবিস্মরণীয় গল্পসম্ভার

অন্নদাশঙ্কর রায়
আশাপূর্ণা দেবী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
দক্ষিণারঞ্জন বসু
দীপক চৌধুরী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিমল গোস্বামী
প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রাণতোষ ঘটক
বনফুল
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিমল মিত্র
মনোজ বসু
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
লীলা মজুমদার
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমথনাথ ঘোষ
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
এবং
আরো কয়েকজন

●

কৌতূহলোদ্দীপক বড় গল্প

ব্যর্থ তপস্যা

সতীনাথ ভাদুড়ী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপ্রকাশিত কবিতা

ভ্রমণ কাহিনী

নিঃসঙ্গ মার্কিন

বুদ্ধদেব বসু

স্মৃতি কথা

ওষুধের গুণ

তুষারকান্তি ঘোষ

সেকালের সাহিত্য ক্ষেত্রে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রবন্ধ ও আলোচনা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
নির্মলকুমার ঘোষ
সন্তোষকুমার দে
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

●

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সমস্যা
এবং
অভিনয়ের বিষয়ে
এক সুচিন্তিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ
করেছেন :

উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়
অনিল চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ও
সুপ্রিয়া চৌধুরী

●

ঘরোয়া

কণাদ চৌধুরী

সাজসজ্জার ওপর কয়েকটি অভিনব
সচিত্র প্রবন্ধ সংকলন
সকল অলংকার হে আমার
সুখ ও সাড়ী
পাতায় পাতায় রে
এবং
নানাবিধ ঘরোয়া কথা।

●

সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

বিস্তৃত সূচী ক্রমশ প্রকাশিতব্য
দাম ২·৫০ নয়া পয়সা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১ডি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

সাহিত্য সমাচার

।।সাহিত্যের পাঠশালায়।।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। একজন তরুণ লেখক জানতে চেয়েছিলেন,—কেমন করে সংলেখক, ভাল লেখক হওয়া যায় বলতে পারেন। আমি সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী কোনো গোত্রেরই মানুষ না হওয়ায়, তাকে কোনো সদুত্তর দিতে পারিনি। দুঃখিতই হয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশে তরুণ সাহিত্যিক বা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছুক ব্যক্তি উপযুক্ত শিক্ষা অনেক সময়ই পান না। এ আমাদের দেশেরই দুর্ভাগ্য। এ প্রসঙ্গে একটি শোনা কাহিনী মনে পড়ল। সত্য মিথ্যা কতদূর জানিনা। প্রাসঙ্গিক বলেই উল্লেখ করছি। একজন অখ্যাতনামা তরুণ লেখক খ্যাতিযুক্ত একজন যশস্বী সাহিত্যিককে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দানের জন্য। বেশ কিছুকাল বাদে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হল। তরুণ লেখক সেখানে অনুপস্থিত। খ্যাতনামা লেখকের নামযুক্ত উপন্যাসখানি বাজারে যথেষ্ট কাটতি হল। কিন্তু একটি ভবিষ্যৎ সাহিত্যসেবী চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল। এমনই সাহিত্যের চোরা কারবার।

বর্তমান বিশ্বে মানুষের জ্ঞান-জগতের সীমা বহুদূর বিস্তৃত। অর্থাৎ আমরা সহজেই অনেককিছু জানতে পারি। কিন্তু উপযুক্ত উত্তরসাধক তৈরীর দিকে আমাদের নজর নেই খুব বেশী। নিজের জ্ঞানগত ব্যক্তিত্বকে সকলের সামনে বিস্ময়কর চোখধাঁধানো বস্তুর মত তুলে ধরতে সচেষ্ট। আমার আলোচ্য বিষয় সাহিত্য। অর্থাৎ তরুণ সাহিত্যিকদের আমরা কোন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শন না করতে পারলেও জার্মাণীর একটি সাহিত্য বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করব।

১৯৫৫ সালে লাইপজিগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই 'ইনস্টিটিউট অব লিটারেচার'। এই শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয়তা কি? এর ভূমিকাই বা কি? কি এখানে শেখানো হয়? একমাত্র কি সাহিত্যের ইতিহাসই এখানে তুলে ধরা হয়? তা নয়। এর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আরও বৃহৎ। একথা সত্যি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কোন সাহিত্যিক সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অবশ্য এখানেও কোন সাহিত্যিক সৃষ্টি করা হয় না। যারা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে সামান্য মাত্র ক্ষমতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, নিজেদের প্রতিভার সামান্যতম পরিচয়টুকুও তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের এ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। যার ক্ষমতা আছে, প্রতিভা আছে সে যদি ঐ ক্ষমতার বা প্রতিভার ব্যবহার না করে তাহলে ঐ গুণে বিকশিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কোন দামও নেই। আবার যার কোন গুণই নেই তার মগজে হাতুড়ি পিটিয়েও তাকে শেক্সপীয়র বা টলস্টয় বা কোন মহান শিল্পী তৈরী করে তোলা অসম্ভব। যে বিশ্বের চিরন্তন সুন্দর ও মহৎ আনন্দের ঐতিহ্যকে জাগ্রত রাখতে আপন প্রতিভার দুয়ার খুলে দেয় না তার সকল প্রতিভাই মূল্যহীন।

সরকারী আনুকূল্যে স্থাপিত বিদ্যালয়টি সমগ্র পূর্ব জার্মানীর প্রতিভাবান তরুণ লেখকরা নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। আপন প্রতিভার উন্মেষে স্বীয় ক্ষমতাকে বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সমন্বিত রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। পৃথিবীর মহৎ সুন্দরকে সাহিত্যের মাধ্যমে কেমন করে তুলে ধরা যায় সার্থকরূপে তা সাহিত্যের চিরকালের প্রশ্ন। উপযুক্ত প্রতিভাই একমাত্র পারে পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দরকে সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রূপ দিতে। তাই প্রতিভাধরদের অনেকেরই 'হাতে কলমে' শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রথম পরিচালক উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠানের 'পিতা' আলফ্রেড কোরেলার লাইপজিগে বিদ্যালয়টির উদ্বোধনকালে বলেছিলেন যে লেখার শিল্পই এখানে সম্ভাব্যরূপে শেখানোর চেষ্টা করা হবে। বিদ্যালয়টির প্রচেষ্টা একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিস্ময়ের সূচনা করে। প্রকৃত বা স্বাভাবিক প্রতিভা এখানে তৈরী করা হয় না। একমাত্র সেই প্রতিভার উন্মেষ চেষ্টা এবং তাকে বিকশিত করার দায়িত্ব বহন করা হয়। যে কোন মৌলিক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় সামান্যতম ও উপযুক্ত স্বভাব দক্ষতার। তা না হলেও তাকে কোন কিছুই তৈরী করা সম্ভব হবে না। শিক্ষা দেওয়া হয় কেমন করে গড়ে তুলতে হয় কাহিনীর বা কথা বিষয়ের মানদণ্ড। সকল বস্তুর সার—সত্য ও সুন্দরকে কেমন করে উপলব্ধি করা যায়। তাই বলে এ মনে করা ভুল হবে যে কেমন করে একটি গল্প লিখতে হয়, উপন্যাসের 'কাহিনী' কাকে বলে, গল্পে আর নতুন দৃষ্টিকোণের মধ্যে পার্থক্য কি—এইটি একমাত্র শিক্ষাদান করা হয়। জার্মান সাহিত্য, রুশ সাহিত্য, সোভিয়েৎ সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্য, সাহিত্যালোচনা, সমালোচনা, সাহিত্যের রূপকল্প, শিল্পতত্ত্ব, শিল্পের ইতিহাস, সংগীত, সুবিশাল দর্শনজগৎ, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ছাত্রদের বুদ্ধির জগতে। তাছাড়া গদ্য, গীতিকাব্য আর নাট্যতত্ত্ব নিয়ে নানান পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সচেতনও করে তোলা হয়।

প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল তিরিশজন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদালাভ করেছে। এক বছর-দু বছর—এখন তিন বছরের কোর্সে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটি পরিচালিত। মন্ত্রী সংসদের সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ১৯৫৮ সালে ঘোষণা করা হয় যে যারা এখান থেকে কৃতকার্য হয়ে তার পাঠক্রম শেষ করবে তাদের উপযুক্ত প্রমাণপত্র দেওয়া হবে। আর সেই প্রমাণপত্র হবে যে কোন কলেজের স্নাতক পর্যায়ের সমতুল্য। প্রথমে যারা এখানে এসেছিল নতুনত্বের মোহে তাদের কাছে সব সময়েই বিদ্যালয়ের পরিবেশ বা শিক্ষাপ্রণালী সুখকর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যখন তারা এখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন একটি পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানময় মন নিয়ে, তখন তারা বলতে বাধ্য হয়েছেন তাদের সময় বা পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি। উপযুক্তভাবে শিক্ষা গ্রহণের ফলে মৌলিক সৃষ্টি ক্ষমতার স্বাদ উন্মোচিত হয় আরও গভীরভাবে পরিণতি লাভ করে। সত্য বিচার মনন বা নানান প্রশ্ন পরে। আগে সব কিছুকে দেখে বুঝে নেওয়াটাই বড়। বিচারের প্রশ্ন পরে। তা না হলে জ্ঞানলাভ যেমন সার্থক হবে না তেমনি মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতাও লঘু হালকা বিষয়ের মধ্যে সস্তা মনোহারীত্বের জগতেই ঘুরে বেড়াবে। সঠিক উপদেশ জ্ঞানলাভ এবং সুযোগ না পেলে কোন প্রতিভাই বিকশিত হতে পারে না। তাই জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই মহান প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

সাহিত্যের এই পাঠশালা থেকে বেরিয়ে যে সমস্ত ছাত্র সাহিত্যের দরবারে প্রবেশপত্র পেয়েছেন সম্মানের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। রেকহার্ড কেইরেল, ফ্রেড বিওয়াল্ড, মানফ্রেড রিচার, রেকহার্ড প্রেইসলার, ওয়ারনার লিণ্ডেমান, ওয়ার্নার ওয়ারনার, কুর্ট স্টেইনজার। এঁরা বিদ্যালয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে এই শিক্ষালাভের অপরিসীম উপযোগীতার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তেমনি অধ্যাপক আলফ্রেড কোরেলার ও অধ্যাপক গান জেনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মৃত জনে দেহ প্রাণ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
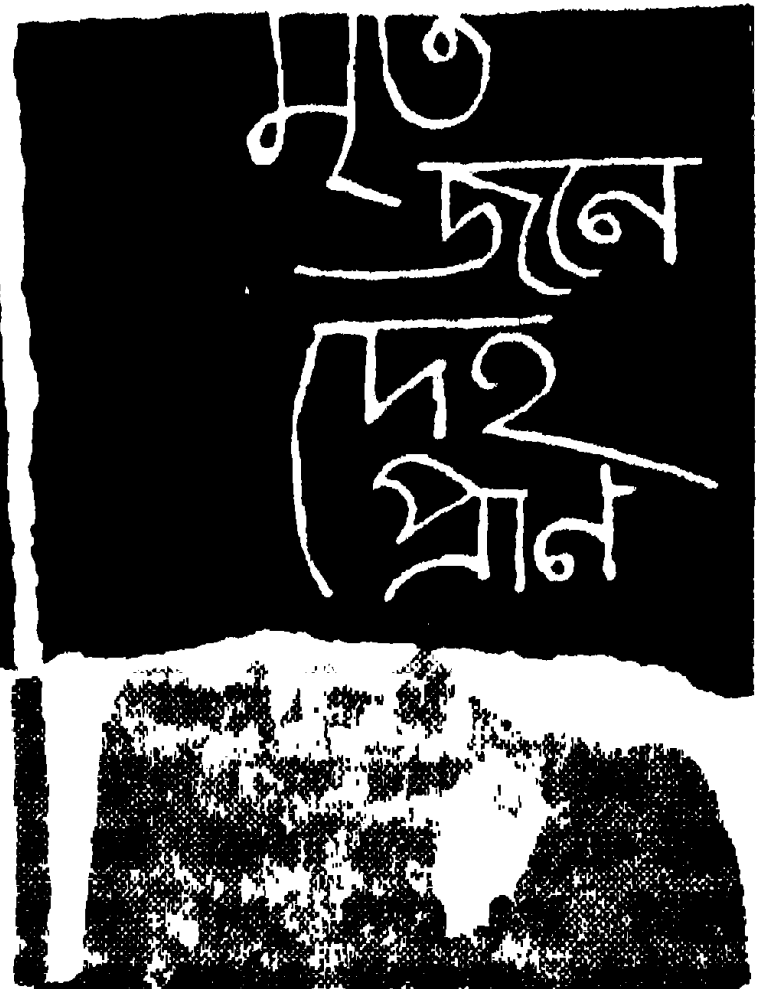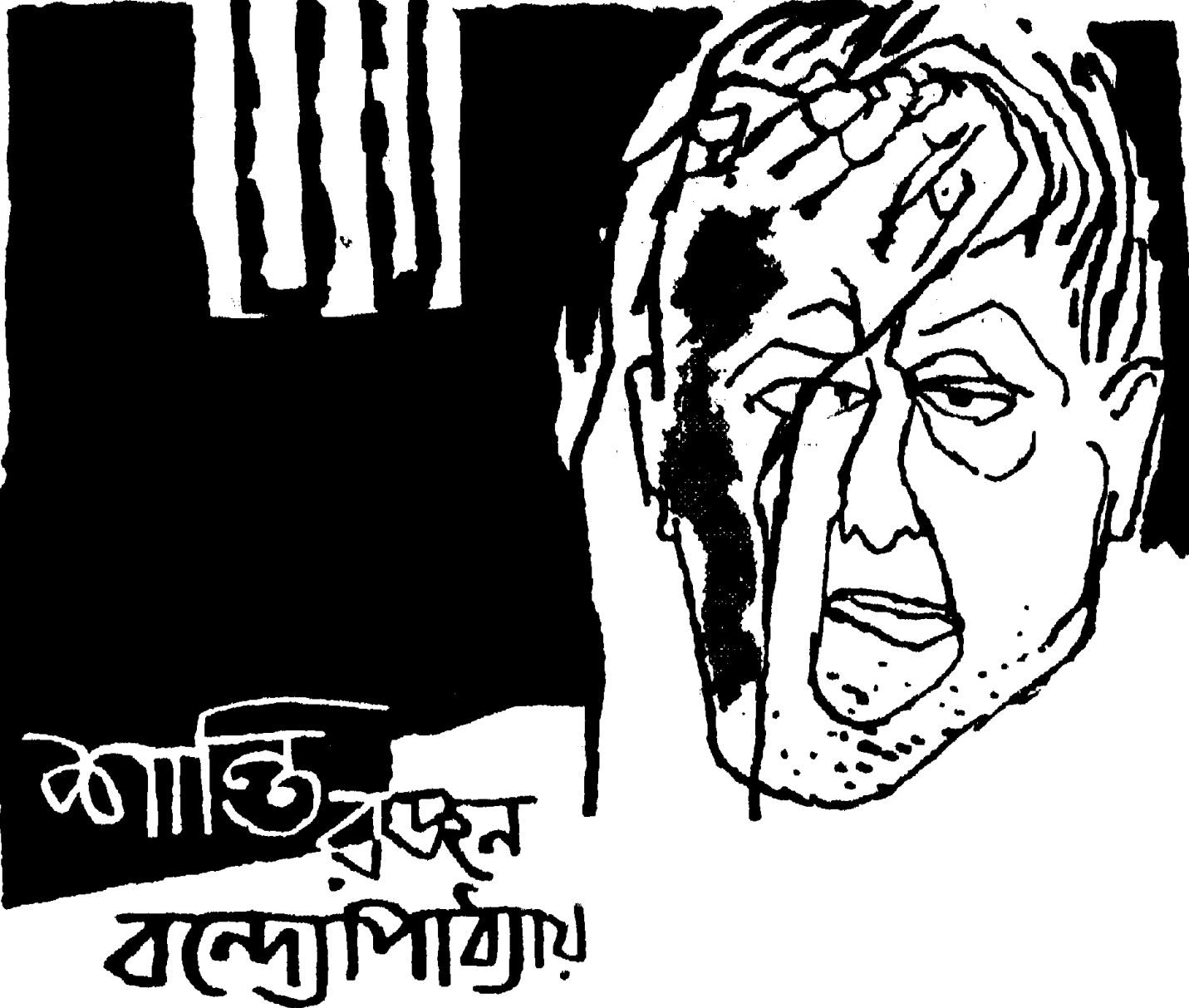
বউয়ের আচমকা কান্ডে শশধর এমনই ঘাবড়ে যায় যে, পড়ন্ত তার তার দেহটাকে আর সামলানো হয়ে ওঠে না। বাড়ানো হাত দুটো শশধরের হাওয়ায় শুধু ঘাই মারে, পা দুটো খানেক নড়বড়িয়ে কাঠ।

অগত্যা হর্দম হাওয়া গিলতে গিলতে বাপ যেমন দেখছিল মেয়েকে দেখতে থাকে। টানা-টানা চোখ জোড়া যদিও মার্বেল হয়ে গিয়ে কোটর থেকে উপচে উঠেছে, দাঁতের কামড় না মেনে জিভটা বিঘৎখানেক বেরিয়ে এসেছে, গলা লিকলিকে হয়ে দ্বিগুণ, দুই চোখে রক্ত জমাট—তবু তো মেয়ে! শশধরের বড় আদরের বড় মেয়ে।

এই মেয়েকে দেখাবার জন্যেই না ঘুম থেকে আমোদিনী তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে।

অনন্তকালের ইজারা নিয়ে চুপচাপ শশধর মেয়েকে দেখতে থাকলেও তার সংসারের পোষ্যগুলি—অর্থাৎ বিধবা বোন মানদা, মানদার এক মেয়ে, তার নিজের তিন ছেলে দুই মেয়ে—কিন্তু গারিত্রাহী হাঁকডাক শুরু করে দেয়। গলা ছেড়ে কান্না যাকে বলে।

মানদার আড়াই বছরের নাবালিকাটা 'অ বড়দি ঝুলছ কেন!' বলে মীনারাণীর পায়ে ঠেলা দেওয়ায় সে দোল খাওয়া শুরু করলে মানদা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেও দু পা পিছিয়ে আসে।

মেয়ের দোল খাওয়া তবু থামে না।

মেঝেয় সবাই গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে, মেঝে থেকে হাত দুয়েক ওপরে একজন। সবার ওপর টেক্কা মেরে সে দুলছে, দুলতে দুলতে পাক খাচ্ছে, নিজের মুখখানা চারদিককে দেখিয়ে নিচ্ছে।

শশধর ঘর থেকে বেরোয়। মেয়েকে দেখার সাধ আর নেই।

সকাল হচ্ছে, সূর্য ওঠার নোটীশ এসে গেছে। দোতলার ঠিকে ঝি আসার সময় হয়ে এল। কিন্তু আজ কি অতক্ষণ সদর দরজা, দোতলার সিঁড়ির দরজা বন্ধ থাকবে?

কোরাসের যে-কান্নাটাকে ঘরের মধ্যে বিতিকিচ্ছি রকমের একটা হল্লোড় বলে মনে হচ্ছিল বারান্দা থেকে সেই কান্নাকেই এখন অবিকল মড়াকান্না বলে মনে হচ্ছে নাকি? পাড়াজানানি মড়াকান্না।

আমার যদি সাতটা হাত থাকত! একরাশ আপসোসের ঘামাচি শশধরের বুকের মধ্যে চিড়বিড় করে। ছোট-বড় ওই সাতটি কাঁদুনে মানুষের জন্যে সাতটা হাত! এক সাথে ঘেঁটি পাকড়ে মেঝেয়-কি-দেওয়ালে মুখগুলি সবার ঠেসে ধরে কান্না বুজিয়ে দেবার জন্যে সাতখানা হাত!

কর্তব্যের প্ল্যানটা ছকে নেওয়ার প্রয়োজনে কান্না বুজিয়ে দেওয়ার জন্যে।

কর্তব্যের প্ল্যান অবিশ্যি শশধর কাল রাতে একটা করেছিল। সারাটা সন্ধ্যা গুম খেয়ে বসে থেকে মা-মেয়ের কথায় টুঁ শব্দটি না করে মনে মনে প্ল্যানটা পাকাপাকি করে নিয়ে শুয়েছিল।

আজই প্ল্যানমাফিক কাজ করত।

মেয়ে সে-প্ল্যান ভেস্তে দিল।

কিন্তু তাই বলে কি নার্ভাস হয়ে গিয়ে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে? হাজার হলেও শশধর এ-সংসারের কর্তা তো বটে, এ-সংসারের ভালোমন্দ না তারই ওপর?

সশব্দে সিঁড়ির দরজা খুলে যেতে, সদরের দরজা ধাক্কানোর শব্দ হতে শশধর বোঝে যে, আপসোসের চোটে এখন নিজের বুকের লোম ছেঁড়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

প্রতিবেশীকে সহানুভূতি জানাবার এমন মওকা লাখে একটা মেলে। হামদরদীদের ভিড়ে তাই ঘর-বারান্দা-উঠোন গিজগিজ।

জালে-আটক জানোয়ারের মত শশধর শুধু ছটফটায়। আর মনে মনে বউয়ের পিন্ডি চটকায়।

সকলের আগে ঘুম থেকে তাকে তুলে এনে ভালোই করেছিল, কিন্তু তার পর ওই চিল-চিৎকার কেন? চুপচাপ ফিট হয়ে যেতে পারত না? বয়সকালে তাই হত না?

ফিট হয়ে যাওয়ারই বা যুক্তি কী? আগের দিন মেয়েকে যে পরামর্শ দেয় 'মর মর কালামুখী, গলায় দড়ি দিয়ে মর!'—লক্ষ্মী মেয়ের মত মেয়ে সেই পরামর্শ মানলে ফিট হয় কোন্ মুখে?

বউয়ের কথার প্রতিবাদ তখন না করলেও মেয়ে গলায় দড়ি দিক শশধর

চায়নি। মেয়ের মৃত্যু বাপ চাইতে পারে? মীনার মত মেয়ের মৃত্যু শশধরের মত বাপ।

তাই বলে মেয়ের ফোঁপানিতে সান্ত্বনাও দেয়নি।

বস্তুত মেয়ের ওপর সে ক্ষুব্ধই হয়েছিল। অমন বুঝসুঝ মেয়ে হয়ে এমন কাঁচা কাজ করে বসল! শামুকে পা কাটল!'

তা শামুকে কি পা মানুষের কাটে না? কাটে। আকছার কাটে। কিন্তু তা নিয়ে নাটুকে কান্নার দরকার? দরকার নিজের আহাম্মুকির কথা পরকে জানাবার? ডেটলফেটল লাগিয়ে নিলেই চলে যায় যখন।

সামান্য একটা ব্যাপারে মীনার মত মেয়েকে ওভাবে ভেঙে পড়তে দেখে শশধর মনে মনে হেসেছে। হেসেছে নিজের প্ল্যান পাকা হয়ে যাওয়ার পর। হাসিটাও মামুলী নয়।

চোখ বুজে পথ চললে হোঁচট খেতে হবে। পথ যখন চলতে হবে দেখেশুনে চলো। —বউয়ের মারফত উপদেশটা মেয়েকে গছিয়ে দিয়ে আজ সকালেই তাকে নিয়ে যেত রাম ডাক্তারের কাছে। সাফ বলত—রোগ ধরলেই তো শুধু চলবে না ডাক্তার, চিকিচ্ছে করো। এই রোগের নিদানে না তোমার হাতযশ আছে। রামের জিম্মায় মেয়েকে সঁপে দিয়ে আসত। সবাই জানত, মেয়ে তার মামার বাড়ি গেছে।

মাঝে মাঝে অমন মামা-টামার বাড়ি কত মেয়েই যায় আজকাল। যেতে হয়। শশধরের মত বাপেদের কত মেয়েকে!

দীর্ঘশ্বাসটা কোঁৎ করে গিলে ফেলে শশধর দাঁতে দাঁতে শান্ দেয়। মেয়ে হয়েও যে ছেলের বাড়া ছিল, বাপ মা পিসি ভাইবোনে বোঝাই পেল্লাই সংসারের ভার বইছিল, শশধরকে শুয়ে-বসে থেকেও সংসারের কর্তালি করার ঢালাও সুযোগ দিচ্ছিল—শেষ অবধি সে এভাবে ফাঁসিয়ে গেল!

বিষ্ণুপদ বলে, 'কেঁদো না, শশধরদা, কেঁদো না।'

শশধর হু হু করে কেঁদে ওঠে। ফাঁসিয়েছে শুধু মেয়ে নয়, মেয়ের মা-ও। ফাঁসানোর ষোলকলা আমোদিনী পূর্ণ করেছে।

অশ্বিনী কবুল করে মীনার মত সংসারের জন্যে এমন টানওলা মেয়ে আর একটিও সে দেখেনি, বিষ্ণুপদ দেখে ভগবানের বিচিত্র লীলা, লালমোহনের অভিযোগ ভগবান নেহাতই একচোখো তাই ঝড়তিপড়তি এত লোক থাকতে মীনাকে গলায় দড়ি দেওয়াল, অশোকের আপসোস মীনাকে সে জলসার একটা টিকিট দেবে বলেছিল কিন্তু দিতে পারেনি, কেশবের কেবলি মনে পড়ে মীনা তাকে একদিন ট্রামে পাশে বসতে দিয়েছিল, শুধু তাই নয়, ভাড়াটাও দিয়ে দিয়েছিল।

জমায়েত সকলেরই এখন মীনার সম্বন্ধে কিছু না কিছু মনে পড়ছে। দরদে সবাই খাবি খাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ? কতক্ষণ টিকে থাকবে এই দরদের ফানুস?

দরদের ফানুসটা ফুটো হয়ে গেলে কী হাল হবে শশধরের?

নতুন করে ফুঁপিয়ে ওঠে শশধর।

যত নষ্টের গোড়া ওই মাগী। ফিট হওয়াটা মুলতুবি রেখে চেয়ারে উঠে দড়ি কেটে লাশ নামিয়ে বিছানায় কাৎ করে শুইয়ে গলা পর্যন্ত চাদর-চাপা দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করা কি সহধর্মিণীর উচিত ছিল না? এখন যে-কান্নাটা কাঁদছে রাম ডাক্তার এসে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেটা জমিয়ে রাখা? রামের কাছে যাওয়ার আগে স্বামীর সঙ্গে ননদকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার হারছড়া আদায় করে দেওয়া? নিজের চুড়ি চারগাছা খুলে দেওয়া?

চারগাছা চুড়িরই প্রয়োজন হয়ত হত না, তবু তৈরি থাকা ভালো। জলজ্যান্ত যুবতীর হঠাৎ হার্টফেল করে মরে যাওয়ার সার্টিফিকেট আদায় চাট্টিখানি কথা।

স্রেফ একটা ডাক্তারি চিরকুটের দৌলতে দুপুরের মধ্যে পোড়ানোর ঝামেলা চুকিয়ে আসতে হলে উপযুক্ত রসদ সঙ্গে রাখতে হবে বই কি!

'পুলিশ তো এখনও এল না অশ্বিনীদা?'

শশধর কানাইয়ের দিকে তাকায়।

'আসবে আসবে।'

শশধর অশ্বিনীকে দেখে।

'খোকন গেছে বুঝি?'

শশধর ভবতোষের দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ। আমার সাইকেল নিয়ে গেছে।'

'পুলিশ না এলে—'

'হাতও দেওয়া চলবে না। একবার হয়েছিল কি—'

শশধরের প্রাণ চায় ঠাঁ করে এক চড় কষিয়ে দেয় কেষ্ট দত্তর চোপসানো গালে। কিন্তু বড়ই বেমানান বলে সে আরেক কিস্তি ফোঁপানো শুরু করে।

'শশধরবাবু! কেঁদে আর কী লাভ বলুন! আহা!'

'চ্-চ্-চ্-চ-চু!'

'! ! ! !'

'ব্যাটাছেলে হয়ে আপনিই যদি—'

'এভাবে—'

'ভেঙে পড়েন—!'
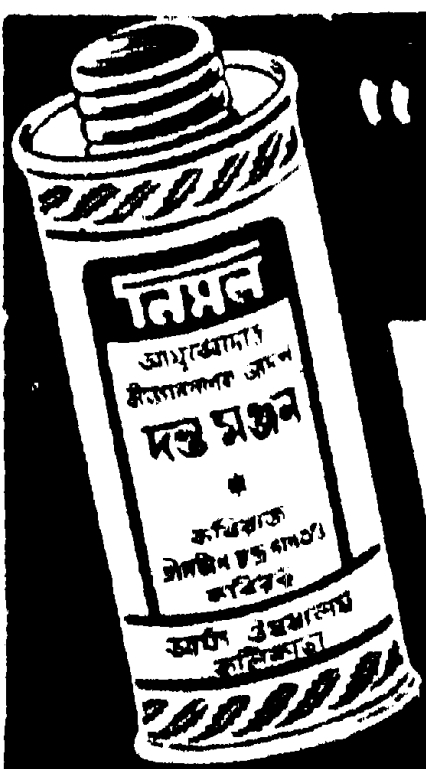
'সবই ভগবানের—'

'হাত!'

'ভ-গ-বা-ন!'

ভগবান? শশধরের পেটে পাক দিয়ে ওঠে। ভগবানের ভরসায় শশধর ইস্তফা ঠুকেছিল। বহুকাল ভগবানের ভরসায় থেকে কচুপোড়া হয়েছে বলে। ভগবানের কাছে নালিশ জানিয়ে আর্জি পেশ করে কাঁচকলা মিলেছে বলে।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছর-বছর ভগবানের শিষ্যসামন্তদের নাজেহাল অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছে বলে।

বিষ্টুপদর ভগবানে ভক্তি প্রচণ্ড। মাসের পনের দিন তাকে ধার করে সংসার চালাতে হয়।

লালমোহনের ভগবানে ভক্তি দুর্দান্ত। তের বছরের চাকরি থেকে বেকসুর খারিজ হয়ে বউ ছেলেমেয়ে সমেত দাদার সংসারে চোর হয়ে আছে।

কেশব অশোক কানাই ভবতোষ নিমাই কেষ্ট দত্ত—ভগবানের ওপর ভক্তি সকলেরই প্রচণ্ড বা দুর্দান্ত। কিন্তু ওদের হালহকিকতের কথা জানতে কিছু বাকি নেই শশধরের।

অশ্বিনী দুবেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করে না। ওর তেতলার ঠাকুরঘরে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ছবি টাঙানো। কিন্তু হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়েও উচ্ছেদ করতে পেরেছে শশধরকে?

ভগবানকে চোখকান বুজে ছাঁটাই করতে পেরেছিল বলেই না শশধর অশ্বিনীর উপর টেক্কা দিয়েছে। বিয়াল্লিশ টাকায় দেড়শো টাকার ফ্ল্যাটে বহাল তবিয়তে বজায় আছে।

শশধরের স্কুল ফাইনাল পাশ মাস্টারনী মেয়ের মাসিক আয় যে কমসে কম শ পাঁচেক—ভগবানের ভরসায় থাকলে হত?

ভগবানের হাত ধরে চললে দুটো বাচ্চা সমেত বিধবা বোনকে পুষে দাদার বাহাদুরি দেখাতে পারত? পারত ছেলেমেয়েদের মাইনে দিয়ে ইশকুলে পাঠাতে? নিয়মিত হাটবাজার করতে? তার বুকের ব্যথায় বউয়ের কোমরের ব্যথায় ওষুধ আসত?

ভগবানকে বাতিল করে বুক চিতিয়ে দিল।

……শশধরের বড় আদরের মেয়ে।

হায়, কে জানত ভগবান এমন ঝানু ওস্তাদ! মার তার শেষ রাত্রে!

এতদিন সে বিষ্টুপদদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে ছিল, একই বাড়ির বাসিন্দা হলেও ডাঁটের চোটে অশ্বিনীর সাথে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল—এবার ওই বিষ্টুপদরাই তাকে টিটকিরি দেবে, বিয়াল্লিশ টাকা বাকির দায়েই ঘাড় ধরে অশ্বিনী বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! একগুষ্টির হাত ধরে শশধর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, পেছনে বিষ্টুপদরা কেউ লেগেছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

দগদগে ঘায়ের মত ভবিষ্যৎটা শশধরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাজার গলা এক সাথে সুর মিলিয়ে হাঁকছে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কানে তার তালা লাগে।

ফুটপাথে মরুক, ডাস্টবিনে মুখ থুবড়ে মরুক, দল বেঁধে হাওড়ার পুল থেকে ঝাঁপ দিয়ে কি রেললাইনে শুয়ে থেকে মরুক—শান্তিতে তবু মরতে পারবে না।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! মরার আগে হরিনামের মত শুনতে হবে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

মেয়ে মীনারাণী গলায় দড়ি দেওয়ায় বাপ শশধর মুখুজ্জে যে ভয়ানক ফ্যাসাদে পড়ে গেছে আশা করি পাঠকরা তার আভাস পেলেন।

মোদ্দা কথা, মেয়ের মৃত্যুর জন্যে শোকদুঃখ তার রগে উঠেছে, কী করে এখন লোকসমাজে মুখ দেখাবে সেই চিন্তায় সে খ্যাপা কুকুর।

থানা থেকে বেরিয়ে খ্যাপা কুকুরের মতই শশধর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। জন্ম বা বিয়ের সুবাদে আপন হলেও আসলে যে বউ, বোন ছেলেমেয়েরা কেউই তার আপন জন নয়—সারাটা সকাল সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা একা বইতে বইতে (সবাই কেমন দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদেছে!), ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এক গলা তেষ্টা নিয়ে টো টো করে ঘুরতে ঘুরতে (যতই আপত্তি করুক অশ্বিনীর বউ কি ওদের কিছু না খাইয়ে ছেড়েছে!) শশধর সেটা হাড়ে হাড়ে বোঝে।

ওরা যখন আপন নয়, সুতরাং, ওদের কথা ভাবারও কোন দায় শশধরের নেই।

বয়সটা শশধরের যদি কুড়ি-বাইশ হত হয়ত মতলবটা সে অন্য রকম ভাঁজত। কিন্তু এখন কিনা সে প্রায় ছাপ্পান্ন এবং শরীরটা বাতে নিতান্তই বেজুত, তাই দূরে দেশে অজানা দেশে গিয়ে কেতাবী মতে—নতুন করে ফের জীবন শুরু করার মতলবটাকে আমল না দিয়ে শশধর করে কি প্রথমেই যায় গঙ্গার ঘাটে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বেখেয়ালে পা বাড়াবে, গাঁক গাঁক করে একটা জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠা মাত্র তড়বড় করে গিয়ে ঘাটে ওঠে।

ভাগ্যিস বাঁশিটা সময়মত হুঁশিয়ারি দিয়েছিল! সাঁতার-জানা মানুষ স্নানের ঘাটে ডুবে মরতে যায়!

এর থেকে স্টেট বাসের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া বরং কাজের কাজ।

কিন্তু বাসের বাদুড়-ঝোলা মানুষ-গুলির দিকে তাকিয়েই শশধর দোটানায় পড়ে যায়। পুরোপুরি মরা

যদি না হয়? আধখানা পা বা হাত দুটি হারিয়ে যদি আধমরা হয়ে বেঁচে থাকতে হয় নিবারণের মত?

হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহ স্টেশন।

ট্রাংকের ওপর পিছন ফিরে বসে একটি বউ ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মত। যদিও শশধরের মেয়ে মীনারাণী অত রোগা নয়, অমন কালোও নয়—তবু নিজের ছেলেকে দুধ খাওয়ালে সে-ও ওইভাবেই খাওয়াত। দুহাত দূরে বেডিংয়ের ওপর বসে-থাকা বুড়োটা বাপ হতে পারে, শ্বশুর হওয়াও বিচিত্র না—দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে সযত্নে ছেলের মুখ মুছিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে গাল টিপে দিয়ে যেভাবে ওই বুড়োর কোলে তুলে দিল মীনারাণীও তার ছেলেকে ওইভাবে তুলে দিত।

বাপের কোলে তুলে দিলে বাবা ওইভাবেই নাতিকে বুকে চেপে ধরে আদর করত।

মাথাটা শশধরের ঝিমঝিম করে ওঠে। বুক খাঁ খাঁ।

'আরে, শশধরদা না।'

শশধর চটপট ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

'ও শশধরদা!'

শশধর হন হন পা চালায়। কে বলল সে শশধর? সে শশধর নয়। শশধর হলে তাকে মীনারাণীর বাপ হতে হয়। কোন্ মীনারাণী? না, কাল শেষ রাতে গলায় দড়ি দিয়েছে যে মীনারাণী। যে-মীনারাণীর খবরের জন্যে শকুনের মত কাগজওয়ালারা থানায় গিয়ে হামলে পড়েছে। যে-মীনারাণীর আত্মহত্যার কারণটা কাল তারা ফলাও করে ছাপবে।

পিছন থেকে বলাই এসে পাকড়াও করে। রাম ডাক্তারের কম্পাউন্ডার বলাই। লোকে বলে ডান হাত।

'বলাই!' চার যুগ পরে যেন শশধর তার ঘনিষ্ঠ সমবয়সের বন্ধুর দেখা পেল।

'আপনি এখানে', বলাই হড়বড়িয়ে কথা বলে, 'আর সারা তল্লাট আপনাকে খুঁজে খুঁজে সবাই সারা।'

'কেন?' মুখ থেকে শশধর ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ শুধু বের করে।

'ভাগ্যিশ আমি মেজদাকে তুলে দিতে এসেছিলুম। আশ্চর্য মানুষ! এতক্ষণ হয়ত ওরা শ্মশানে চলে গেছে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে করে—যান যান শিগগীর যান।'

'শ্মশান!'

'দুটোর মধ্যে পোষ্টমর্টেম হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুও গিয়েছিলেন, অন্য কাজে অবিশ্যি—একটা যা ভুল হয়ে গেছে শশধরদা!'

'ভুল!'

'ডাক্তারবাবুর কী আপসোস!'

'আপসোস!'

'হবে না! যা ভেবেছিলেন তা নয়। এমনি গোলমাল হয়েছিল। আজকাল কোন মেয়েরই ঠিক ঠিক হয় বলুন; মীনাদির কথা শুনে ডাক্তারবাবু ভুল বোঝেন। ভুল ডায়গনসিসের জন্যে কি মীনাদি— ?'

দেহটা খাড়া থাকলেও হাত দুটি শশধরের দুপাশে নেতিয়ে পড়ে, ধড়ের ওপর মাথাটা নড়বড় করে।

ভুল, সব ভুল। স্বামী হিসেবে বাপ হিসেবে মানুষ হিসেবে শশধরের অস্তিত্বটাই ভুল। জগৎ-সংসারের সব-কিছু ধাপ্পাবাজি। সাধস্বপ্ন স্নেহ-ভালোবাসা মায়া-মমতা বিলকুল বুজ-রুকি।

অভাগী মেয়েটার জন্যে বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে চৌচির হয়ে যেতে চায়, কিন্তু কে বলতে পারে বুকের ওই ভেঙে-গুঁড়িয়ে চৌচির হয়ে যেতে চাওয়ার মধ্যেও হয়ত ঘাপটি মেরে নেই আরও মারাত্মক কোন ভুল।

ভুলের মুখোশ-পরা ভণ্ডামি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিছুকাল আগে কয়েকজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি কমিশন ফুসফুসের ক্যানসার রোগের কারণ হিসেবে সিগারেটের ধোঁয়াকে নির্দ্বিধায় দায়ী করেছেন এবং সুপারিশ করেছেন যে পনেরো বছরের কমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কাছে সিগারেট বিক্রি আইন করে নিষিদ্ধ করা হোক এবং খবরের কাগজে সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হোক। আমাদের দেশে যদিও এখনো মেয়েদের মধ্যে সিগারেটের চল হয়নি, কিন্তু শিশুতুল্য বালকদের মুখে প্রকাশ্যেই সিগারেট দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। আর সিগারেটের বিজ্ঞাপনের কথা যদি ওঠে তো ট্রেনের টিকিট থেকে দেশলাইয়ের খোল পর্যন্ত সর্বত্র তা পরিব্যাপ্ত। বড়োরা সিগারেট বর্জন করে ছোটদের কাছে আদর্শ স্থাপন করতে পারেন কিনা তা বোধহয় ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ক্যানসারের চিকিৎসা

সোভিয়েট ইউনিয়নের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য অধ্যাপক এল, শাবাদ সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছেন তা নানাদিক থেকে উল্লেখ-যোগ্য। অধ্যাপক শাবাদ অষ্টম আন্ত-র্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেসের সেক্রেটারি-জেনারেল।

ক্যানসারের বিরুদ্ধে দু-ধরনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক, ক্যানসার হতে না দেওয়া। দুই, ক্যানসারের ছড়িয়ে পড়া রোধ করা।

নিচের ঠোঁট বা চামড়ার ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে, রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় একটু একটু করে অনেক-দিন সময় নিয়ে। এই পূর্বলক্ষণের সময়ে যদি রোগ ধরা পড়ে তাহলে রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক পর্য-বেক্ষণের ব্যবস্থা থাকার দরুন পূর্ব-লক্ষণের অবস্থাতেই হাজার হাজার সম্ভাব্য রোগীর রোগ ধরা পড়েছে এবং তাঁরা সকলেই চিকিৎসার পরে স্বাভাবিক মানুষের মতোই জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছেন।

ক্যানসার হতে না দেওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে পরিবেশকে নির্মল করে তোলা। যেমন, কারখানায় যদি ধোঁয়া নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ক্যানসার হবার পক্ষে তা একটি অনুকূল পরিবেশ। তেমনি, সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা ছাড়া এক্স্-রে যন্ত্র নিয়ে যাঁরা দিনের পর দিন কাজ করেন তাঁরাও ক্যানসার রোগের শিকার হতে পারেন।

হালে নানা রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হচ্ছে যা কৃষিতে বা খাদ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে ক্যানসারের কারণ থাকাটা অসম্ভব নয়। কাজেই কৃষিতে বা খাদ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা দরকার।

আলকাতরা, ঝুল, কয়লার ধোঁয়া ইত্যাদি কয়েক ধরনের হাইড্রোকার্বনের মধ্যে ক্যানসার হবার কারণ থাকতে পারে। বিশেষ করে জ্বালানী পুড়বার সময়ে বেন্‌জোপাইরিন নামে যে পদার্থটি নিষ্কাশিত হয় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর এবং ক্যানসারের অন্যতম কারণ। বাতাস যদি বেন্‌জো-পাইরিনে কলুষিত হয় তাহলে ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব অনিবার্য। এই কারণেই গ্রামের চেয়ে ছোট শহরে, ছোট শহরের চেয়ে বড়ো শহরে ক্যানসার রোগের আক্রমণের তীব্রতা বেশি। মোটরের নিষ্কাশন-নল থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে তা শহরের বাতাসকে কলুষিত করে তোলে এবং ক্যানসার রোগের উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই কলুষকে দূর করবার উপায় কী হতে পারে তা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার।

আজকাল নানা ধরনের কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শাক-সবজির সঙ্গে এই কীটনাশক পদার্থের কিছুটা আমাদের শরীরের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়। এই অলক্ষ্য পথে ক্যানসারের আমন্ত্রণ থাকাটাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ক্যানসার নিরাময়ে পরমাণুর ভূমিকা

কংগ্রেসের বিভিন্ন রিপোর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল রেডিও-লজি। তার কারণও আছে। পরমাণু-বিজ্ঞানের আশ্চর্য অগ্রগতির ফলে সাম্প্রতিক কালে কৃত্রিম উপায়ে নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত আইসোটোপ থেকে যে তেজ ও রশ্মি বিকীরিত হয় তার প্রয়োগ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ক্রমেই ব্যাপকতর ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছে। এমনি একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ক্যানসারের চিকিৎসা। শল্য-চিকিৎসার মতো রেডিওথেরাপিও আধুনিক চিকিৎসকের কাছে ক্যানসারের চিকিৎসার অন্যতম প্রধান উপায়।

এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট, যা গামা-রশ্মির উৎস। বিশেষ করে ক্যানসারের আক্রমণ-স্থল যদি হয় শরীরের আভ্যন্তরিক কোনো প্রত্যঙ্গ তাহলে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রয়োজনবোধে অন্যান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহারও অবশ্যই হয়ে থাকে। যেমন, তেজস্ক্রিয় সীজিয়াম বা ফস্‌ফরাস বা আয়োডিন। গত পাঁচ-ছ' বছরে আরো কতকগুলো যন্ত্র ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার শক্তিশালী সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য হয়েছে। যেমন লিনিয়ার অ্যাক্সিলেটর, বিটাট্রন, সাইক্লোট্রন, ইত্যাদি।

কেমোথেরাপি

তবে খুব সম্ভবত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নয়, রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ওষুধ প্রয়োগ করেই নিকট ভবিষ্যতে ক্যানসার রোগকে সবচেয়ে সুনিশ্চিত ভাবে আরোগ্য করা যাবে। বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে এ-বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চলেছে এবং সুনির্দিষ্ট ওষুধের পরীক্ষাকার্যও শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যানসারের চিকিৎসায় ওষুধের ব্যাপক প্রচলন শুরু হবে। এমন কি ক্যানসারের প্রতিষেধকও আবিষ্কৃত হবে।

অষ্টম আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেস সমাপ্ত হয়েছে এই বলিষ্ঠ আশার বাণী ঘোষণা করে। আশা করা চলে, আরো চার বছর পরে যখন নবম আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেস শুরু হবে ততোদিনে ক্যানসারের সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে।

অধ্যাপক জে, বি, এস হলডেনের একটি প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের এই আলোচনা শেষ করছি।

ক্যানসার প্রসঙ্গে জে, বি, এস হলডেন

মানুষের শরীরে কতকগুলো কোষ কোনো সময়েই বিভক্ত হয় না। মস্তিষ্কের কোষ সম্পর্কে সম্ভবত এই

উক্তি করা চলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোষ তখনই বিভক্ত হয় যখন তাজা কোষের প্রয়োজনীয়তা থাকে। একটি নিরোগ যকৃৎ যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই ক্ষতি এইভাবে পূরণ হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য কোষরা অনবরতই বিভক্ত হচ্ছে। তবে অবশ্যই শরীরের যতোখানি প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি হারে নয়। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক গায়ের চামড়ার কোষ। এই কোষ-গুলো অনবরত বিভক্ত হচ্ছে। প্রত্যেকবার বিভক্ত হবার পরে দুটি করে "কন্যা" কোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটি "কন্যা" শক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত মারা যায় এবং তার খসখসে অবশেষটুকু ঘষা খেয়ে গা থেকে খসে পড়ে। অন্য "কন্যাটির" অবস্থান আরো গভীরে। সেই "কন্যাটি" তখন আবার বিভক্ত হয়। এখন, চামড়ার কোনো একটি অংশে যদি বেশি ক্ষয় হতে থাকে—যেমন হতে পারে পায়ের গোড়ালিতে—তাহলে সেই বিশেষ অংশে কোষ-বিভক্তির হারও খুব বেড়ে যায়।

যে-সব কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় বিভক্ত হয় না, তারা যদি বিভক্ত হতে শুরু করে, কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় যারা বিভক্ত হয় তাদের বিভক্তির হার যদি অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে যায়—তাহলে যে অবস্থাটি সৃষ্টি হয় তারই নাম টিউমার। টিউমারের সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে আঁচিল। এই দৃষ্টান্তটি পরিচিত কারণ আঁচিল আমরা চোখে দেখতে পাই ও হাত দিয়ে ছুঁতে পারি।

টিউমার যদি ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে তাকে বলা হয় "বিনাইন"। কিন্তু এই টিউমারও পীড়াদায়ক হতে পারে, বা এমন কি মৃত্যুর কারণও—যদি টিউমারের অবস্থান হয় কোনো গুরুত্ব-পূর্ণ প্রত্যঙ্গে। তবে সাধারণত এ-ধরনের টিউমার শল্য-চিকিৎসায় অপসারিত হতে পারে। যে-সব টিউমার ছড়িয়ে পড়ে তাকে বলা হয় "ম্যালিগ-ন্যান্ট" বা ক্যানসার। লিউকিমিয়া এমনি একটি ম্যালিগন্যান্ট পীড়া হিসেবে গণ্য। অস্থির মজ্জায় ও অন্যান্য তন্ত্রীতে এমন কতকগুলি কোষ আছে যা চামড়ার কোষের মতো অনবরত বিভক্ত হচ্ছে। একটি কন্যা-কোষ নিঃসৃত হয় রক্তের মধ্যে এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে বেঁচে থাকে। একেই বলা হয় রক্তের শ্বেতকণিকা বা "লিউকো-সাইট"। এই শ্বেতকণিকা জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে। লিউকিমিয়া হলে এই শ্বেতকণিকাই প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হতে থাকে এবং বলা বাহুল্য সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে। রোগটিকে বোঝবার জন্যে খুব মোটা রকমের একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী থাকে অন্য রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণকে ঠেকাবার জন্যে। রাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাই সৈন্যবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব। কিন্তু এমন রাষ্ট্র যদি থাকে যেখানে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সর্বত্র এই সৈন্যরাই জাঁকিয়ে বসেছে তাহলে এই অবস্থাটিকে তুলনা করা যেতে পারে লিউকিমিয়ার সঙ্গে।

ক্যানসারের গবেষণায় প্রচুর তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের ধারণা, এই গবেষণার বেশির ভাগটাই নিরর্থক, কারণ ভুল প্রশ্নটি তোলা হয়েছে। গবেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, "ক্যানসারগ্রস্ত কোষকে ধ্বংস করার উপায় কী?" বরং অনেক বেশি ফল পাওয়া যেত যদি প্রশ্নটা হত এই : "অধিকাংশ কোষই কেন বিভক্ত হয় না, কিংবা, তখনই শুধু বিভক্ত হয় যখন আরো অধিকসংখ্যক সমজাতীয় কোষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়?" একটি উপমার সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যাক। আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি—"কোনো কোনো লোক কেন চুরি করে?" কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুলতে হবে—"অধিকাংশ লোকই কেন চুরি করে না?" জবাবে নিশ্চয়ই একথা বলতে হবে যে এই শেষোক্তদের মা-বাবারা তাদের এমনভাবে মানুষ করেছেন যে, তারা চুরিকে ঘৃণা করতে শিখেছে। কখনো কখনো চোরকেও শোধরানো যেতে পারে।

সুইডেনের একটি গবেষণা থেকে এ-সম্পর্কে একটি সূত্র পাওয়া গিয়েছে। এই গবেষণায় জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে লিউকিমিয়াগ্রস্ত কোষের নিউক্লিয়সস্থিত ক্রোমোসোমের একটি বিশেষ অংশ খোয়া যায়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে একটি নিউক্লিয়সের মধ্যে তেইশটি বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোসোম থাকতে পারে। উল্লিখিত গবেষণায় দেখা যায়, লিউকিমিয়াগ্রস্ত অধিকাংশ কোষের ক্ষেত্রে এই তেইশটি ক্রোমোসোমের মধ্যে একটির একই অংশ খোয়া গিয়েছে। খুব সম্ভবত এই বিশেষ অংশের মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে যা মজ্জাস্থিত কোষের বৃদ্ধির মাত্রা—অর্থাৎ শ্বেতকণিকার সৃষ্টির মাত্রা কমিয়ে দেয়। যাই হোক না কেন, লিউকিমিয়া রোগীর ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় যে, এই বিশেষ অংশটি খসে পড়েছে। এ থেকে নিরাময়ের একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। ক্রোমোসোমের যে বিশেষ অংশটি খোয়া গিয়েছে সেটিকে যদি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলেই বিপথগামী কোষগুলোকে আবার স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব হতে পারে।

হয়েও তিনি জীবনের প্রতিকূলতাকে আহ্বান করলেন। পরের পর তাঁর প্রতিভার প্রমূর্ত সত্তাকে প্রকটিত করে চলে তিনি স্বল্পায়ু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শক্তিভৃৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন। জগতের কাছে সেদিন তাঁর জয়লাভ সম্ভাবিত হয়নি। অদূরদর্শী সমালোচকরা তাঁকে 'Clever, but concentrating on ugliness and the sordid', 'typifies the cult of vulgarity' ইত্যাদি বিষ-বাণে জর্জরিত করে অন্যায় যুদ্ধে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ কি আঁরি দ্য তুল্যুস্ লোত্রেকের পৃথিবী জেগে ওঠেনি স্বীকৃতির মহাঘোষে? অথবা দারিদ্র্যাক্লিষ্ট ভ্যান্ গগের জীবন-ব্যাখ্যা কি আজ সংকীর্তিত হয়ে ওঠেনি? পৃথিবীতে এই সংগ্রামশীলেরা নিরতীত। এঁরা সময়কে তুচ্ছ করে এগিয়ে নির্বিশেষের, নৈর্ব্যক্তিকতার শায়কে বিদ্ধ করে জীবনের, জগতের এবং সর্বোপরি মানবের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। কোল্‌ভিৎস্ কিন্তু সময়কে অবজ্ঞা করেননি। সময়ের দর্পণেই বলে গেলেন মেহনতী জনতার জীবনদর্শন। এমন এক চিত্রধারার প্রবর্তন করে গেলেন যা কেবল মানুষকেই সর্বোত্তর সত্য বলে উচ্চারিত করল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মূলোৎপাটনে অগ্রবর্তিনী হলেন। দিনের পর দিন যখন দেখলেন ক্ষয়িষ্ণু মানবসভ্যতার নিপীড়িত, নিগৃহীত বিকৃতি, তখন তাঁর সেন্টিমেন্ট বেদনার্ত হয়ে উঠল, তিনি সেই বয়সেই ধরলেন এমন ছবি আঁকা। প্রতিবেশীরা ক্যাথেকে বলল, 'এখন তো আনন্দের দিন। এখন তুমি কাঠিন্য, কঠোরতাকে নিয়ে চললে বাঁচবে কি করে?' স্মিতাধিনী ক্যাথে বললেন, 'যাদের নিয়ে আমার আনন্দ তাদের ধূসর পাণ্ডুরিমা যখন দেখি মুখের ওপর নির্বাক রেখার মত ফুটে উঠেছে, তখন এই আনন্দকে ভুলে সকলের দুঃখে দুঃখিনী হওয়ার আনন্দকেই বেশী আপন মনে হয়।' এ না হলে কি আর প্রোলেতারিয়েতের রূপদক্ষ হওয়া যায়।

যখন ক্যাথের ছাব্বিশ বছর বয়স তখন তিনি অকস্মাৎ জোলার অবিস্মরণীয় উপন্যাস 'জার্মিনাল' পড়ে অনুপ্রেরণা পেলেন। উত্তর ফ্রান্সের কয়লাখনি এলাকার শ্রমিকদের অনশনক্লিষ্ট, সংগ্রামশীল জীবনযাত্রার মর্মান্তিক চিত্র দেখে অভিভূত হয়ে যান ক্যাথে। জোলাকেও এর জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে হয়েছিল (এমনকি ধর্মঘটকালীন কোন নয়াপন্থী শ্রমিক-নেতার সচিবের কাজও করেছিলেন)। সেই বিষয়ের ওপর একাধিক 'এচিং' করলেন, যেমন 'প্রার্থনা-রতা বালিকা' একটি। এরপরই তিনি পড়লেন তাঁরই স্বদেশী নাট্যকার হাউপ্ট-মান-এর 'দি উইভেরস্'। তাঁকে মূলতঃ বিচলিত করল এই নাটকটি। ১৮৪০ সালে সাইলেশিয়ার তন্তুবায়দের লাঞ্ছিত মেহনতী মানুষের সংগ্রাম এই নাটকের পটভূমিকা। প্রায় পঞ্চাশটি চরিত্র এই নাটকের মুখ্য চরিত্রলিপি। 'exploited weavers' -এর মর্মন্তুদ বর্ণনা নাটকটির প্রতি ছত্রে স্ফুট। তিনি তখন 'তন্তুবায়দের উত্থান' শীর্ষক দুটি ছবি আঁকলেন। এরকম পাঁচ বছর ধরে তিনি তাঁর সহানুভূতিশীল মানবতাকে আপন মাধুরী দিয়ে বিধৃত করলেন। ১৮৯৮ সালে গ্রেট বার্লিন চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবিগুলি স্বীকৃতিলাভ করল।

ক্যাথে কোল্‌ভিৎসের ১৮৬৭ সালে জন্ম। উনবিংশ শতকের এই শেষার্ধে জর্মনীতে শিল্পবিপ্লব বর্তমান। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল। তাঁর পিতামহ জর্মনীতে প্রথম স্বাধীন ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠিত করেন। ১৮৪৮ সালের অভ্যুত্থানেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা আইনজীবী হয়েও রাজমিস্ত্রীর জীবিকা নিয়েছিলেন, কেননা সরকারী চাকুরী গ্রহণে তাঁর আদর্শগত বিরোধ ছিল। ক্যাথের স্বামী বার্লিন্-এর শল্যচিকিৎসক ছিলেন। তাঁর রোগীরা বেশীর ভাগই শ্রমিক শ্রেণীর ও স্বল্প-বেতনভোগী মানুষের দল। গরীবের চিকিৎসক ডাঃ কার্ল কোল্‌ভিৎস্, তাঁর স্ত্রী-ও দারিদ্র্যের স্বার্থে উৎসর্গীকৃতা। কার্ল এমনকি বিনা পারিশ্রমিকেও সেবা করেছেন, ঔষধ-পথ্যও দিয়েছেন বিনা-মূল্যে। প্রথমে কিন্তু এই অসহায় মানুষের দল জানত না তাদের চিকিৎসক-পত্নীর নিভৃত সাধনার কথা, যিনি আত্মদানকারী নিপীড়িত নর-নারীর নীরব দুঃখের ঘোষণার মত তখন ভাস্বর এক সাধিকা।

বার্লিন-এ খ্যাতিলাভের পরই তিনি ষোড়শ শতাব্দীর 'কৃষক-বিদ্রোহ'-স্টাডি করলেন। সম-কালীন চিত্র সমালোচকদের মতেঃ "They were exceptionally good studies, etching and lithographies ever made by herself and were of intense devotional livingness that sprung to the level of uniqueness and superiority......"
ক্যাথে মূলতঃ গ্রাফিককলার সাধিকা। তাঁর রচনার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 'লিথো-গ্রাফ' এক-চতুর্থাংশ কাঠ-খোদাই ও বাকি সব 'এচিং', কম্বিনেশন প্রিন্ট প্রভৃতি। তাঁর বিষয়-নির্বাচন মোটামুটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত : মাতৃত্ব, শৈশব, বিপ্লব ও মৃত্যু। চিত্রকরী বিদ্যায় তিনি নিয়ুক্তা ছিলেন যুবতী অবস্থাতে, পরে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাফিককলায় আত্ম-নিয়োজিতারূপে আমরা দেখি। জীবনের রুক্ষরূপকে দেখার তিনি অনন্যসুযোগ পেয়েছিলেন। জীবনে দেখেছেন অগুণতি মৃতপ্রায় মানুষের রক্তক্ষয়ী সমর, আদর্শগত সংঘাত, লাঞ্ছিত মানবতাকে দেখেছেন ছিন্নভিন্ন হতে; জীবনে হিংসিত মানুষের নির্বুদ্ধিতাজনিত দুটি নৃশংস মহাযুদ্ধ ঘটে যেতে দেখেছেন। তাই তিনি কাব্যধর্মী, মানুষকে বাঁচার নতুন সূত্র নির্দেশিত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস রূপ দেখে তিনি সমাহিত হলেন, শুরু করলেন যন্ত্রণার্ত শিশু, মাতার মরণশীল অস্বীকার, কায়মনবাক্যে তিনি চেতনার রঙে রূপ দিলেন সেই অগ্নিস্বরূপা-অস্বীকৃতিকে। এই মর্মবোধ করুণতর হয়েছিল তাঁর ঐকান্তিক শোকে। তাঁর পুত্র পিটার এই যুদ্ধের বলি। যুগান্তকারী লিথোগ্রাফ 'আর কখনো যুদ্ধ নয়' রচনা করলেন। আজও এই ছবিটি শান্তিকামী জনতার প্রতীকধর্মিতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে আছে।

দুঃখবাদই যেন বেশী সত্য হয়ে উঠেছে, তাঁর রচনার মধ্যে। তবু তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও বাঙময় তাঁর চিত্রকলায়। জীবনের অধিকাংশ রচনাই তাঁদের নিয়ে যারা আমাদের আড়ালে রোদসী মুহূর্তের তিলে তিলে সঞ্চয়করা গ্লানি ও ব্যর্থ-তায় দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয়িষ্ণু। অথচ বিচারের সময় বিষয়-বিভিন্নতার অভাব বিন্দুমাত্র ক্লান্তি সৃষ্টি করে না, বরং মনে হয় যেন বৈচিত্র্যের সমুদ্রে বসে নীল-অসীমকে পরখ করছি। কলকাতায় গণতান্ত্রিক জর্মনীর দূতাবাস আকাদমী অফ ফাইন আর্টসের সহায়তায় কোল্‌-ভিৎসের একটি একক প্রদর্শনী করে-ছিলেন। এজন্য উভয় সংস্থাই আমাদের ধন্যবাদার্হ। সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে 'কার্ল লিবনেখত্-এর মৃত্যুশয্যা' শীর্ষক লিথোগ্রাফটি ছিল না। কলারসিকমাত্রেই

একটি অনবদ্য চিত্র

আত্মতৃপ্তিবোধ করেছিলেন। কেননা এটি বহু বিদগ্ধজনের মতে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৯২৭ সালে রচিত এই মহৎ সৃষ্টির মূলে লিবনেখ্‌তে-এর মর্মান্তিক মৃত্যু। লিবনেখ্‌তের প্রাণহীন দেহের সম্মুখে কয়েকটি শোকাহত মুখ। সকলেই আনত-আনন। মৃত্যু যে কি তা' এখানে ঐ চারটি সপ্রাণ আননেই প্রতিবিম্বিত এবং ছবিটির মৌল ঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে ঘোষণামত্ত শ্রমিক-দলের চেতনা এবং যুদ্ধ হতে বীরোচিত বিদায়। কোল্‌ভিৎস্‌ নিজেই বলছেন, 'একজন রূপদক্ষ হিসেবে সব কিছুর অনুভূতিকে তুলে ধরা এবং তার দ্বারা নিজেকে আকৃষ্ট করে তার পরিণতি দর্শানো আমার স্বাধিকার।''

তাঁর চিত্রকলার বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কেননা মুহূর্তে সিন্ধুর বিরাটত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে না, কেবল 'বিরাট' এই বিশেষণেই অকস্মাৎ সমস্ত বিস্ময়কে সংযত করতে পারা যায়। উপরন্তু, খণ্ড খণ্ড ক র দেখানোর নাম সমালোচনা নয়, কলার মৌল-বিকৃতিকার। কিন্তু সেই জ্ঞানবিলাসকে অভিভাবিত করা যদি দোষনীয় না হয়, তার প্রেরণাতেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কোল্‌ভিৎস্‌ প্রথম দিকে বড় ঘটনাকেন্দ্রিক ছিলেন তাই সেই সব রচনাসমূহ হঠাৎ আকর্ষিত করে, তেমনিই হঠাৎ আবার বিকর্ষিত করে। তাই কলার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপ্তিবোধ এবং পারস্পরিক সহনশীলতার সঙ্গতি সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু উত্তরকালের রচনায় তার পরিপূরক এক উদার বিস্তৃতি-প্রবণতা যুক্ত হল। একথা যদিও তখনও সত্য যে তারা চিরকালের গুণ কিন্তু কোনদিনই পাইনি। অবশ্য রচয়িত্রীর আত্মবাসনাও ছিল তাই ঃ 'আই ওয়ান্ট মাই উয়র্ক টু বি এফেক্টিভ্ ইন্ মাই টাইম্‌'। তবু কোথাও যেন শাশ্বতধ্বনি-ধ্রুবকতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে, যা তাঁর অজান্তেই সর্বকালের স্তরে উঠে গেছে। বিশেষ করে লিবনেখ্‌তের লিথো-র পরই যেসব লিথো রচনা করেন সেগুলোতে এই ধর্মপ্রাবল্য সুপ্রতীয়মান। এই সময় তাঁর যুগান্তকারী ক্রম-পর্যায়ের রচনা 'যুদ্ধ' সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষকরে 'স্বেচ্ছাসেবকেরা' 'উৎসর্গ' 'মা-মায়ী, শিশু' প্রভৃতি অতি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। সম্ভবতঃ তাঁর সাধনার শিখর 'ফ্লান্ডার্স' সমাধি-স্মৃতিফলক' রচনা। এই কাজে তিনি বহুদিন নিমগ্ন ছিলেন। এর মূলে তাঁর মৃতপুত্রের স্মৃতি এবং তার প্রতিই উদ্দেশিত। কিন্তু পরে এটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদন বলে পরিগণিত হয়েছিল। বার্লিন-এ যখন জাতীয় আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়, তখন দর্শনরত জনতার বাকস্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। সবশেষে ঐ জীবন্তমূর্তি সকলকে নীরব সমাধিতে আত্মস্থ করেছিল। ১৯৪৫ সালে তিনি পার্থিব মায়া ত্যাগ করে চলে যান।

ক্যাথে কোল্‌ভিৎস্‌ আমাদের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতিশীল সত্তার আকাশে একটি স্থির নক্ষত্রের মত দীপ্ত। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রাফিককলার রচয়িত্রী। তাঁর আগেকার রূপদক্ষদের রচনায় গ্রাফিক চিত্রকলার দিকে প্রবণতা বড় কম ছিল, রচনা করতেনই না অনেকে। এযুগে মাতিস্, পিকাসো, মানে, ব্রাক প্রভৃতি রূপদক্ষের কিছু কিছু গ্রাফিকস্ আছে। কিন্তু এমন নিবিড় আত্মলীনতা বোধহয় অদ্বিতীয়। তাঁর প্রতিভার সামগ্রিকতা অনস্বীকার্য, তবে তাঁর অভিব্যক্তির পরিপূর্ণতা মানতে অনেকে যুক্তিসঙ্গত কারণেই নারাজ। দেশ-কাল অবশ্যই উপস্থিত থাকবে, কেন তারজন্যে দেশকালের অধীন হতে হবে? দেশকাল মানুষের চেয়ে বেশী সত্য নয়। তার ওপর মানুষই যখন তাঁর বিশ্লেষিত লক্ষ্য। সেই সময়কে, সেই স্থানকে বড়

করতে গিয়ে তিনি মানুষকে ছোট করেছেন অনেকাংশে। এজন্যেই তাঁর বিষয় টিকবে না, তাঁর আঙ্গিকই টিকবে। তাছাড়া আরো একটি মতের অবকাশ আছে। অস্কার ওয়াইল্ডের কথায় আসি : 'It is the spectator, and not life, that art really mirrors' জীবন তো বহমান, তাকে প্রতিধ্বনিত করে কি হবে। জীবনের পথসন্ধানই কলার নির্দেশ। কেননা কলা অনেকাংশে 'indicative abstraction'। তবু তাঁর গুণগান করতেই হবে। আঁধারও দেখতে হবে। কেননা প্রদীপের আলো এবং অন্ধকার দুই সত্তাই অভিন্নরূপে প্রতিভাত। তাঁর রচিত লিথোর মধ্যে 'রিফ্লেক্টিং উয়োম্যান্ (১৯২০), মাদার উয়িথ্ চাইল্ড (১৯১৬), উয়োম্যান জয়েনিং হ্যান্ডস্ উয়িথ্ ডেথ্ (১৯২৭) ও 'সিড্ মাস্ট নট বি মিল্ড্ (১৯৪৩), এচিং-এর মধ্যে 'মার্চিং উইভারস্' (১৮৯৭) ও দি ক্যাপটিভস্ (১৯০৮), 'উডকাট'এর মধ্যে ক্ষুধা (১৯২৫) ও মহামারী (১৯২৩) এবং আত্মপ্রতিকৃতির কয়েকটি আঙ্গিক, সুসামঞ্জস্য পরিসজ্জায় অভিনব। সাম্প্রতিকের ধনতান্ত্রিক ইউরোপীয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোল্‌ভিৎসকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর, তখন সেইসব বুদ্ধিহীন পাষণ্ডদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'। রোমাঁ রোলাঁ তা না হলে বলতেন না :

'The work of Kaethe Kollwitz is the greatest poem that came from Germany in those days. It reflects the toil and trouble of the simple people.

This woman with a bold heart has perceived this with her eyes and with her deep and tender love has taken the people into her motherly arms. She is the voice of the silent sorrow of the sacrificed people'.

কোল্‌ভিৎসের বেদনার্ত প্রতিকৃতির সামনে বসে আছি। হয়ত হাহাকারধ্বনি অত্যাচারিত বঞ্চিত মানুষের মিছিলে বার বার তাঁর একটি মৃত মুখই নির্মম সত্য হয়ে উঠেছে। সেটি তাঁর প্রিয়তম পুত্র পিটারের বিজয়ী মুখ। তাঁর দেখা পৃথিবীতে অমৃত-পিটার বেঁচে আছে। তাদের দিকে শ্রীমতী ক্যাথে কোল্‌ভিৎস্ তাকিয়ে আছেন নির্নিমেষে অনন্তকাল ধরে। তাঁর সমালোচনা হয়ত বেশী করে ফেলেছি। হয়ত এও শ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য।

অথ প্যারিস-কথা

দিলীপ মালাকার

প্যারিস, 'জুন'—শুধু একটি মাত্র শিল্পীর শিল্পকলার মিউজিয়ম কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। আর্ট গ্যালারি আর আর্ট মিউজিয়মের ছড়াছড়ি সব দেশেই। কিন্তু একটি মাত্র শিল্পীর শিল্পসংগ্রহ একটি বিশেষ

জর্জ ব্রাক

ভবনে সংরক্ষিত আছে তার নিদর্শন মেলা ভার। প্যারিসে মিউজিয়মের সংখ্যা একশর ওপর। তাছাড়া বিশেষ কোনো ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ-শালার কথা বাদই দিতে হয়। তাদের সংখ্যা গুনে বলা মুশকিল।

বিদেশী ট্যুরিস্টদের কাছে 'ল্যুভ্র' মিউজিয়ম বা আর্ট সংগ্রহশালা পরি-চিত। পরিচিত আরও অনেক কিছু। কিন্তু বিদেশী ট্যুরিস্টদের ক'জন রদাঁ মিউজিয়ম দেখেছেন? ভাস্কর রদাঁর ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা প্যারিসের রুদ্য ভারেন রাস্তার ৭৭নং বাড়ীতে। প্যারিসে ভিক্তর উগো ও বালজাকের মিউজিয়ম আছে কিন্তু কোনো আর্টিস্ট বা ভাস্করের নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে ভাস্কর রদাঁর বেলায়। রদাঁ মিউ-জিয়মে রদাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কার্য-কলাপ থেকে তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে প্রতিদিন। ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর এর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। রদাঁ ভাস্কর্যের কয়েক শত নিদর্শন এখানে রক্ষিত আছে। রদাঁ মিউজিয়মে কোনো ছোট বাড়ীর একতলায় কয়েকখানা ঘরে আবদ্ধ নয়। ৭৭ নং রুদ্য ভারেনের বাড়ীটাকে ছোটখাট প্রাসাদ বলা চলে। প্রাসাদটি বাগানে ঘেরা। এই ছোট প্রাসাদের লাগাও রয়েছে রদাঁর স্টুডিও। যেখানে রদাঁ কাজ করতেন। বাগানে রয়েছে ঝিল, ফোয়ারা, ফোয়ারার ধারে

পাখি — ব্রাক

রদাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে। আর প্রাসাদের ভেতরে এত ভাস্কর্য যে এক-বেলায় সব দেখে ফেরা মুশকিল। একটি শিল্পী তাঁর জীবন ধরে যত শিল্প সৃষ্টি

টেবিল — ব্রাক

করেছেন তারই ইতিবৃত্ত। বড় বড় ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলো ফ্রান্সে কেন জগতের নানান শহরে ছড়ানো রয়েছে। সবগুলো যদি একটি মিউজিয়মে দেখান হত তাহলে ওই ছোট প্রাসাদে আঁটত না।

রদাঁ সৃষ্ট ভাস্কর্যের মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ আমি তো তা বাছতে পারি নি। মিউজিয়মে ঢুকলে রদাঁ শিল্পের সম্মোহনে অভিভূত হতে হয়। 'সৃষ্টিকর্তার হাত' নামে যে কটি ভাস্কর্য রয়েছে তার সব কটাই দার্শনিক তত্ত্বে ভরপুর। শুধু হাতের কত রকম নক্সা হতে পারে তার মডেল গড়েছেন রদাঁ। তারপর মানুষের সৃষ্টি থেকে নর-নারীর মিলনকে তিনি অতিন্দ্রিয় মিলন বলে ঘোষণা করেছেন যেমন তেমনি অসংখ্য মূর্তি গড়েছেন তাকে কেন্দ্র করে। রদাঁর কোনটা ছেড়ে কোনটা নিয়ে আলোচনা করব?

ভাস্কর অগুস্ত রদাঁর জন্ম হয় প্যারিসে ১২ই নভেম্বর ১৮৪০। ১৮৫৪ সালে তাঁর বাপ-মা তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন বটে কিন্তু দুবার ফেল করে। ১৮৬৪ সালে প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে তাঁর লোম্ ও নে কাশে (নাকভাঙগা মানুষ) মূর্তিটি প্রত্যাখান হয়ে ফিরে আসে। ১৮৭১ হতে ১৮৭৭ পর্যন্ত দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। জগদ্বিখ্যাত 'ল্য পন্সয়র' (দি থিংকার) মূর্তিটি গড়েন ১৮৭৯ সালে। এর পরে বলজাকের উপন্যাস 'লা পোর্ত দ্য লঅ্যাফ্যার (নরকের দরজা) অবলম্বনে অসংখ্য মূর্তি গড়তে থাকেন ১৮৮০ সালে, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে রেখা-পাত করে। ১৮৯৪ সালে প্যারিসের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে বালজাকের ভাস্কর্য যেমন প্রদর্শিত হয় তেমনি 'চুম্বন' নামে মূর্তিটি কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করে। প্যারিসের লেখক-সভা এই মূর্তিটির অর্ডার দেয় বটে কিন্তু তারা যখন সত্যকারের শিল্প-নিদর্শন গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে লেখক ও শিল্পী-মহলে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এখন যেটা রদাঁ মিউজিয়ম সেখানে রদাঁ এসে বসবাস করতে শুরু করেন ১৯০৮ সালে। ১৯০৮ সালে তাঁর অপরূপ ভাস্কর্য ভিক্তর উগো মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত

সৃষ্টিকর্তার হাত : রদাঁ

হয় প্যালে রইয়াল বাগানে। তারপর ১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৭ই নভেম্বর হয় তাঁর মৃত্যু প্যারিসের কাছেই মেদোঁ শহরে। কখনো প্যারিসে এলে রদাঁ মিউজিয়ম দেখতে ভুলবেন না। দেখে তৃপ্তি পাবেন।

* * *

পিকাসোকে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তেমন হয়নি ফরাসী আর্টিস্ট জর্জ ব্রাককে নিয়ে। কিন্তু শিল্পরসিক মাত্রেই জানেন যে, ব্রাক্ পিকাসো থেকে কম যান না। পিকাসো ও ব্রাক্ দুজনেই অতি-আধুনিক কিউবিইজমের চিত্রশিল্পী। নিন্দুকেরা বলবেন, তাঁদের আর্ট বোঝা যায় না। কিন্তু তাঁদের আঁকার পদ্ধতি ও রং-এর ব্যবহার সমজদার মাত্রেই তারিফ করতে বাধ্য। ব্রাক্ প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী। তাঁর অশীতিতম জন্মদিবস পালিত হয়েছে বিগত ১৩ই মে। ওই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ব্রাক্ সম্বন্ধে প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে।

কোনো শিল্পীর জীবিতকালে তাঁর সৃষ্টি চিত্রকলার প্রদর্শনী প্যারিসের 'লুভ্র' মিউজিয়মে হয়েছে বলে কারুর স্মরণে নেই। এই প্রথম ব্যতিক্রম হল চিত্রশিল্পী জর্জ ব্রাকের বেলায়। গত বছরের শেষের দিকে ও এ বছরের গোড়ায় লুভ্র মিউজিয়মের একাংশ 'ম্যুজে দার দেকোরাতিফ' ভবনে ব্রাকের আঁকা চিত্রপট-সংগ্রহের প্রদর্শনী হয়েছে। এতবড় সম্মান আর কোনো জীবিত চিত্রশিল্পীর ভাগ্যে ঘটেনি আগে। ফরাসী সরকার ব্রাককে রাজকীয় সম্মান দিয়েছেন।

পিকাসোর মতন ব্রাকের জীবন রোমাঞ্চময় নয়। ব্রাক্ একবারই বিয়ে করেছেন। বাস করেছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পঞ্চাশ বছর ধরে। কিন্তু ব্রাকের জীবন অন্যদিকে তেমন শান্তিময় নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯০৮ সালে সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করে সাধারণ সৈনিকের জীবন যাপন করেন প্রথম মহাযুদ্ধের ১৯১৫ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধে আহত সৈনিক ব্রাক্ পঙ্গু হয়ে বসে থাকেন অনেককাল। তারপর মনের জোরে ও নিরলস চেষ্টায় ধাপে ধাপে তিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীর সম্মান পান গত পঞ্চাশ বছর ধরে। যদি তিনি পঙ্গু হয়ে হাসপাতালের বিছানায় নিরাশ হয়ে ছটফট করতেন তাহলে আজ আর আমরা ব্রাককে পেতাম না। নিদারুণ অন্ধকারময় নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে বলেই তিনি অমন রং ফোটাতে পেরেছেন। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তিনি নিজের চক্ষে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 'শান্তির পারাবত' অত সুন্দর করে আঁকতে পেরেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ফ্রান্সে চলছিল 'আধুনিক' আর্টের আন্দোলন, তখন সেই পরিবেশে তাঁর জন্ম হয় ১৮৮২ সালে ১৩ই মে, প্যারিসের কাছে আর্জেন্তই-সুর-সেইন শহরে। ব্রাকের পিতাও ছিলেন শিল্পী। চিত্রশিল্পের হাতেখড়ি হয় ১৮৯৯-১৯০১ সালে প্যারিসে ও ল্যহাব্র শহরে। ১৯০৭ সালে প্যারিসের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখান হয়। ১৯০৮ সালে তিনি 'কিউব্‌ইজম' পদ্ধতি অবলম্বন করতে থাকেন। ১৯১২ সালে বিবাহ হয়। ১৯১৫ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে মাথায় আঘাত পেয়ে দু' বছরের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯১৭ সাল থেকে আবার আঁকা শুরু করেন। ১৯২৩ সালে বিশ্ববিখ্যাত ব্যালে নাচিয়ের জন্যে দৃশ্যসজ্জা আঁকেন আর ১৯৩৩ সালে সুইৎজারল্যাণ্ডের বাসেল শহরে আয়োজিত হয় তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনী। ১৯৩৭ সালে তিনি কার্ণেগি ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান পিট্‌সবুর্গ শহরে। ১৯৪০ সালে প্যারিসে ফিরে আসেন। তখন চলছিল জার্মানীর সঙ্গে লড়াই। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রোগে ভোগেন। ১৯৪৮ সালে ভেনিসের বিয়েনাল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬১-৬২ সালে ল্যুভ্‌র মিউজিয়মে খোলা হয় ব্রাক্ চিত্রকলা প্রদর্শনী। কিছুদিন আগে ব্রাক্ এক সমালোচককে বলেছিলেন, "মানুষকে বাঁচতেই হবে। আমার কাছে বেঁচে থাকা মানে প্রতিদিন একটু করে পরিবর্তিত হওয়া। জীবন একঘেয়ে নয়।"

চুম্বন ঃ রদাঁ

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তেইশ ।।

দোকান বন্ধ হল ৯টায়। সারাটা দিন এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে, স্তূপাকার শাড়ী-কাপড়ের ভেতরে এতক্ষণ একটানা কাটিয়ে স্পোর্টসম্যান অমিয়রও মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে একবার আড়ামোড়া ভাঙল, একটা বিড়ি ধরালো, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল গঙ্গার দিকে।

মন্দিরগুলোতে আরতি শেষ হয়েছে—এখন ঘাটে ঘাটে মানুষের ভিড়। কোথাও কথকতা, কোথাও রামায়ণ, কোথাও বা ভজন। তারই ভেতরে কয়েকজন আবার গলা চাড়িয়ে হিন্দী ফিলমের গান ধরেছে। একটু খালি জায়গা দেখে চুপচাপ বসল অমিয়।

বাঁয়ে মণিকর্ণিকায় চিতা জ্বলছে—একটা দুটো তিনটে চারটে। গঙ্গার জলে চিতার আগুন থেকে লাল আভা কাঁপছে—ধোঁয়ার রেখাগুলোকেও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আলো জ্বলছে ওপারের রামনগরে, আলো কাঁপছে চলন্ত দুটো একটা নৌকো থেকে। দূরের রাজঘাটের পুলের ওপর দিয়ে একটা অন্ধকার মালগাড়ী চলেছে—রাত্রির হাওয়ায় গুম গুম করে আওয়াজ আসছে তার।

দরাজ মিঠে গলায় ভজনের সুর ভেসে এল। হিন্দী এখনো সে ভালো বুঝতে পারে না, তবু কিছুক্ষণের জন্যে অমিয়র কান আকৃষ্ট হল সেদিকে। একটা আধ-পাগলা চেহারার লোক, মুখে দাড়ি, মাথায় একরাশ জটবাঁধা চুল। নিজের মনেই হাতে তাল দিয়ে দিয়ে গেয়ে চলেছে :

> হো বলি কব দেখোগী তোহি,
> অহর্নিস আতুর দরসন কারনি
> অ্যায়সি ব্যাপী মোহি।
> নৈন হমারে তুমকো চাহেঁ, রতী
> ন মানে হারি,
> বিরহ অগিনি তন অধিক জরাবে
> এইসি লেহু বিচারি—"

চোখ যেন কাকে চাইছে, বিরহ আগুনে শরীর জ্বলছে, কান পেতে এই টুকুই বুঝতে পারল অমিয়। কিন্তু তার পরেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হাতের বিড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা ছুঁড়ে দিল গঙ্গার দিকে।

একটা মাস। না—আরো বেশি। এক মাস তিন দিন হল আজকে।

সেই স্টেশনটা মনে পড়ছে। কয়েকজন কুলি ঘুমুচ্ছে, স্টেশন মাস্টারের ঘরে আলো জেলে দুজন মানুষ যেন কী সব কাজকর্ম করছেন—প্ল্যাটফর্মের নীচে রেল লাইনের উপর দুটো কুকুর মারামারি করছে আর দূধার থেকে সিগন্যালের লাল-সবুজ-হলদে আলো যেন কতগুলো ঠাট্টাভরা চোখের মতো চেয়ে আছে ওদের দিকে।

চাচার প্রচণ্ড চড়টা তখনো গালের ওপর জ্বলছিল। থেকে থেকে হাত বুলোচ্ছিল অমিয়—বুঝতে পারছিল পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে সেখানে। স্টেশনে পা দিয়ে সে প্রথম কথা বলতে পেরেছিল তৃপ্তির সঙ্গে।

—ওয়েটিং রুমে যাবি?

তৃপ্তি বলেছিল, না—চল, প্ল্যাটফর্মে কোথাও বসি।

সারি সারি সিমেন্টের বেঞ্চ খালি পড়ে আছে। কোনো-কোনোটা ইলেকট্রিকের আলোয় চক চক করছে, কোনো-কোনোটায় ওপর কাঁপছে কৃষ্ণচূড়া আর কাঠ বাদামের ছায়া। একটা ছায়া-দোলানো বেঞ্চের ওপরে এসে বসল দুজন।

কিছুক্ষণ কাটল। হাওয়া এল রেল লাইন পেরিয়ে, একটা শুকনো শাল-পাতার ঠোঙা প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে খসখস করে উড়তে উড়তে চলে গেল। পেছনের কৃষ্ণচূড়া গাছটায় প্যাঁচা ডাকল একটা।

তারপর তৃপ্তিই জিজ্ঞাসা করল।

—এখন কী করবি ছোড়দা?

চাচার সেই একটা চড়েই যেন নেশা কেটে গিয়েছিল অমিয়র। মাথার ভেতরে যে সব অসম্ভব স্বপ্নগুলো কুয়াশার মতো ঘনিয়ে ছিল, এক মুহূর্তে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল সব। জীবনটা যে ফুটবলের মাঠ নয়—নিজের ভাগ্যটাকে বলের মতো ড্রিবল করতে করতে যে তাকে ইচ্ছে মতো লাথ টাকার গোলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না—মাঝরাতের নির্জন পথ দিয়ে স্টেশনের দিকে আসতে আসতে সে সত্যটা স্পষ্ট হল।

গিয়েছিল অমিয়র কাছে। চাচা যে কেবল ঘাড় ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েছে, এইটুকুই বাঁচোয়া। ইচ্ছে করলে পকেটের টাকাগুলোও তো কেড়ে নিতে পারত।

চন্দন সিং কি চাচাকে বলে দিয়েছিল এইভাবে ওদের নামিয়ে দিতে। না—কখনো নয়, তা হতেই পারে না। অমিয়র দুই কানে চাচার ধমক বাজের মতো ফেটে পড়তে লাগল : 'ভাগ্ যা বুদ্ধু—ভাগ্ হিঁয়াসে।' 'আসমান মে মঞ্জীল নেহি বন্‌তা'। 'মালুম নেহি—খারাব বিমারী হ্যায় উস্‌কো?'

সব কথাগুলো একসঙ্গে মিশে যাচ্ছিল তখন। স্পষ্ট অর্থ নিচ্ছিল একটা।

তৃপ্তিই আবার জিজ্ঞেস করল : কী করবি ছোড়দা?

পকেটে সিগারেট খুঁজল অমিয়—পেল না। সব ভাবনাগুলোই ঘোলাটে হয়ে গেছে। হয়তো প্যাকেটটা ফুরিয়ে গেছে আগেই, হয়তো ট্যাক্‌সির ভেতরে বা নামবার সময় পড়ে গেছে কোথাও—অমিয়র মনে পড়ল না। শুকনো ঠোঁট দুটো শুধু চাটল একবার। এই ঘুমন্ত ষ্টেশন, এই রাত, দুধারে সিগন্যালের নানা রঙের চোখ, মাথার ওপর তারাভরা একটা প্রকাণ্ড আকাশ—সব মিলিয়ে পৃথিবীটা এক বিরাট শূন্যে। যেন সমুদ্রের মধ্যে ভেসে পড়েছে, যার কূল-কিনারা কোথাও দেখা যায় না।

"শুনহু হমারী দাদি গোসাইঁ,
অব জনি করহু অধীর,
তুম ধীরজ, মাঁয় আতুর—"

আধ-পাগলা লোকটার গলার দরাজ আওয়াজে গঙ্গার ঘাটে ফিরে এল অমিয়। মিনিটখানেক শুনল, আর একটা বিড়ি ধরালো, তারপর আবার চলে গেল সেই রাত্রির নির্জন ষ্টেশনে।

—সকাল হলে আমরা কলকাতায় চলে যাব।

—কলকাতায়?

—আর কী করা যাবে? হতাশ গলায় জবাব দিলে অমিয়।

—কলকাতায় গিয়ে বাড়ী ঢুকতে পারবি?

অমিয় আবার ঠোঁট চাটল।

—দাদা-বাবার পা ধরে ক্ষমা চাইব।

—তারপর?

—স্কুলে ভর্তি হবো আবার। লেখা-পড়া করব। যদি স্কুলে না নেয় তা হলে প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দেব।

—চন্দন সিংয়ের টাকাগুলো কী করবি?

বুক পকেটে একবার হাত ঠেকালো অমিয়। মোটা নোটের তাড়াটা খসখস করে উঠল সেখানে।

—ফিরিয়ে দেব ওকে। বলব, আমি গরিবের ছেলে, গরিবের মতোই থাকব। রাতারাতি বড়োলোক হয়ে আমার দরকার নেই। দুঃখে ক্ষোভে অমিয়র গলা

ধরে এল : জানিস, আমি গোল্লায় যাচ্ছিলাম—টাকার জন্যে বিক্রী করতে যাচ্ছিলাম তোকে।

তৃপ্তি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

—বেশ, তুমি ফিরে যাও। কিন্তু আমি যাব না।

—যাবি না?

—না। —তৃপ্তি চোখে আঁচল তুলল : তুই জানিস না ছোড়দা, আমি ফিরে গেলে—

—কিছু বলবে না তোকে। মারধোর যা করবে আমাকেই।

—আমাকেও যদি মারধোর করত, তা হলে তো কথা ছিল না। —তৃপ্তি কাঁদতে লাগল : যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা আমাকে জোর করে সেই টেকো আর বোকা কম্পাউন্ডারটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে।

—দাদাকে বলব—

—দাদা শোনে কারুর কথা? —কান্নার মধ্যেও তৃপ্তি মাথা তুলল, দুটো তারার মতো জ্বলে উঠল চোখ : ঠিক বিয়ে দিয়ে দেবে ওই বিশ্রী লোকটার সঙ্গে। তারপর গলায় দড়ি দিতে আমাকে।

অমিয় চটিটা দিয়ে পায়ের তলার কাঁকরগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ।

—কী করবি তবে?

—তুমি ফিরে যাও।

—আর তুই?

—কলকাতার দিক থেকে যে গাড়ী আসবে তাতেই উঠে পড়ব। তারপরে যা হওয়ার হোক।

কিন্তু তৃপ্তির কাছে ব্যাপারটা যত সহজ—অমিয় সে ভাবে নিতে পারে না সব কিছু। ফুটবল খেলে, আড্ডা দিয়ে, পাঁচ রকম লোকের সঙ্গে মিশে এই আঠারো-উনিশ বছর বয়েসেই অনেক বেশি দুনিয়াটাকে বুঝেছে অমিয়। তার ছোট বোন যে সুন্দরী এ কথা সে জানে, জানে অমলের চিঠি থেকে দিদির ওপর বোমা পড়া পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটেছে তৃপ্তিকে নিয়ে। যা হওয়ার হোক—ছেলেমানুষ তৃপ্তি বলতে পারে, কিন্তু কী যে হওয়া সম্ভব তা ভাবতে গিয়ে পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল অমিয়র। মনে হল, বোনকে এই অবস্থায় এনে ফেলবার জন্যে সে-ই যখন দায়ী, তখন আজ থেকে তাকে বাঁচাবার ভারও নিতে হবে তাকেই।

একটু চুপ করে থেকে অমিয় বললে, সে হয় না।

—আমি যাব না কলকাতায়, কিছুতেই না।

অমিয় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বললে, যেতে হবে না তোকে। তার চাইতে ভাইবোনে মিলে বেরিয়ে পড়ি যেখানে হোক। সঙ্গে চন্দন সিংয়ের টাকাগুলো আছে, ভাবতে হবে না কিছু-দিন। এর মধ্যে কোনো জায়গায় একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেব।

—সেই ভালো দাদা। তোমার গায়ে জোর আছে, মনে সাহস আছে। তুমি চাকরি করবে, আমি সেলাই-টেলাই করব। ওই তো রমা বৌদি কেমন বালিশের ওয়াড়, রুমাল এই সব তৈরী করে, ফুল তুলে দেয়,—দোকানদারেরা নিয়ে যায়, বেশ রোজগার হয়। দুজনে চালাতে পারব না?

অতটা আত্মবিশ্বাস নিজের মধ্যে টের পাচ্ছে না অমিয়। ম্লান হয়ে বললে, চলবে এক রকম।

—সে বেশ হবে। —কল্পনায় তৃপ্তি এরই মধ্যে বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলতে লাগল : তারপর কিছু টাকা হাতে জমলে বাবাকে পাঠিয়ে দেব। চিঠি লিখব, 'আমাদের জন্যে ভেবো না, আমরা বেশ আছি।' কোথায় যাবি ছোড়দা? দিল্লী না বোম্বাই?

—ভেবে দেখি।

—বেশ অনেক দূরে —কেমন? —তৃপ্তি খুশি হয়ে উঠতে লাগল : চেষ্টা করলে সবাই দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে—কেউ পড়ে থাকে না। কিন্তু অনেক দূরে যাবি তো ছোড়দা? অনেক পাহাড় - বনজঙ্গল - অনেক নদী পেরিয়ে? তা হলে দাদা আর কিছুতেই খুঁজে পাবে না আমাদের—সেই বোকা বুড়োটার সঙ্গে বিয়েও দিতে পারবে না আমার। তা ছাড়া রেলগাড়ী চেপে আমার খুব দূরে-দূরে চলে যেতে ভীষণ ভালো লাগে। —তৃপ্তি নিজের ছোট ঝোলাটা বেঞ্চির ওপর পেতে সেইটে মাথায় দিয়েই শুয়ে পড়ল : ট্রেনে যেতে যেতে আমায় গরম পুরী কিনে খাওয়াবি না ছোড়দা? আর আলুর তরকারী?

—খাওয়াব।

—ভারী মজা হবে ছোড়দা। সত্যি, বাড়ী থেকে পালিয়ে এলে যে এমন অদ্ভুত লাগে সে আমি ভাবতেই পারিনি। —তৃপ্তির গলা আনন্দে আর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল : তুই বিশ্বাস কর ছোড়দা —আমার এখন আর একটুও ভয় করছে না—ভীষণ ভালো লাগছে। উঃ আকাশটা কত বড়ো দেখাচ্ছে এখন—আর কত তারা!

সেই মস্ত বড়ো আকাশে, অনেক তারা দেখতে দেখতে তৃপ্তি যেন দূর-দূরান্তের ডাক শুনতে পাচ্ছিল। তার চকচকে কালো চোখ দুটোর ওপর সপ্তর্ষির ছায়া পড়ল, কাঁপতে লাগল কালপুরুষের আলো, যে তারা সমুদ্রের জলে খুশিতে কাঁপতে থাকে, যে তারা জেগে থাকে সঙ্গীহীন পাহাড়ের চূড়োয় —দিগন্ত-ছড়ানো গমের ক্ষেতের ওপর যে-তারা সমস্ত রাত ধরে ফসলের গান শোনে, তারা সবাই মিলে তৃপ্তিকে এখন স্বপ্নের জগতে নিয়ে চলল।

তৃপ্তি ঘুমিয়ে পড়ল। একবার জড়ানো গলায় কেবল শোনা গেল : ট্রেন এসে গেলে আমাকে কিন্তু জাগিয়ে দিস ছোড়দা, ফেলে রেখে কলকাতায় চলে যাসনি।

আর, আকাশ-সিগন্যাল-রাত —সব কিছুর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বসে রইল অমিয়। সব দেখছে, অথচ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে বার বার। তারই জন্যে ছেলেমানুষ তিপু এমন করে পালিয়ে এসেছে, তিপুকে বাঁচাবার ভারও তাকেই নিতে হবে।

"বহুত দিনন কে বিছুরে মাধো,
মন নাহি বাঁধে ধীর
দেহ ছতা তুম মিলহু,
কৃপা করি আতরিবন্ত কবীর—"

দুলে দুলে গানটা শেষ করে আনল আধ-পাগল লোকটা। অমিয়র ঘোর ভাঙল আবার। রাত্রির স্টেশন নয়—কাশী। সেই প্ল্যাটফর্ম নয়—গঙ্গার ঘাট।

প্রথমে লোকাল ট্রেণে চেপে বর্ধমান। দুজনে সেখানে গিয়ে একটা হোটেলে খেয়ে নিলে, সারা রাত কিছুই খাওয়া হয়নি। তারপর ফিরে এল স্টেশনে।

লোকের ভিড়। মানুষের ব্যস্ততা। এক্সপ্রেস্ আসছে।

কী এক্সপ্রেস্? কোথায় যাবে?

—বনারস—বনারস—কুলিটা ছুটে চলে গেল উর্ধশ্বাসে।

—বনারস তো কাশী—না ছোড়দা? —তৃপ্তির জিজ্ঞাসা।

—হুঁ।

—তা হলে কাশীরই টিকিট কর। —তৃপ্তি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল : সবাই বলে খুব ভালো জায়গা। বিশ্বনাথের মন্দির দেখব সেখানে, অন্নকূট দেখব।

—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির দেখলে তো হবে না। কাজকর্ম খুঁজতে হবে।

—সে পরে দেখা যাবে। —তৃপ্তি ব্যস্ত হয়ে ধাক্কা দিলে অমিয়কে : তুই টিকিট কর ছোড়দা—ওই তো গাড়ী এসে গেল। এখনি ছেড়ে দেবে হয়তো।

গানটা শেষ করে আধ-পাগলা লোকটা জোড়াসনে বসেছে। যেন ধ্যান করছে আপন মনে। অমিয়র চোখে পড়ল : মণিকর্ণিকায় চিতা নিবেছে একটা, কারা যেন কলসী করে জল ঢালছে তার ওপর।

প্রথমে ধর্মশালা। দিন তিনেক দুজনে থাকল সেখানে। মনের আনন্দে তৃপ্তি বিশ্বনাথ দেখল, নৌকায় চড়ে গঙ্গায় বেড়াল, টাঙ্গায় চড়ে গেল সারনাথ দেখতে। ভয় নেই, ভাবনা নেই—নারকেলডাঙ্গার সেই পুরোনো দমচাপা ভাড়াটে বাসা থেকে সে যেন ছুটির খুশিতে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু অমিয়র মনে ছায়া ঘনিয়ে রইল। চন্দন সিংয়ের টাকাগুলো দিয়ে চিরদিন চলবে না—তারপর?

চতুর্থ দিন যখন সে ভাবছিল, এইবার আর কোথাও বেরিয়ে যেতে হবে, তখন বিশ্বনাথের গলিতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল তার।

বেনারসী শাড়ী-কাপড়ের দোকান। হিন্দীতে ইংরেজিতে বাঙালী মালিকের নাম। একটি লোক বেরিয়ে এসে একটা পেস্ট বোর্ড অমিয়ের সামনেই দোকানের গায়ে ঝুলিয়ে দিলে। তাতে লেখা, কর্মখালি। অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন।

লেখাটা বাংলায়।

সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ের সারা শরীরে বিদ্যুৎ চমকালো। সে-ই প্রথম দেখেছে লেখাটা। এখনো উমেদারের ভিড় জমেনি। এ সুযোগ ছাড়তে পারা যায় না।

অমিয় দোকানের সিঁড়িতে গিয়ে উঠল। ডাকল : স্যার!

যে লোকটি পেস্ট বোর্ডটা টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সে ফিরে তাকালো। দোকানের ভেতরে পাকা গোঁফ এক বুড়ো ভদ্রলোক সবে কুলুঙ্গির সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করে ক্যাশ বাক্স খুলেছিলেন, তিনি চোখ তুললেন।

—কী চাই?

—আমি সেলসম্যানের কাজটার জন্যে—

যে লোকটি বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিল, সে হেসে উঠল।

—কর্তা, বিজ্ঞাপনের ফলটা দেখুন একবার। টাঙিয়ে দেবার পরে আধ মিনিটও তর সইল না।

—তাই দেখছি। —বুড়ো ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে অমিয়কে লক্ষ্য করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, তুমি কাজ চাও?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওতে কী লেখা আছে দেখেছ ভালো করে? অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। তুমি তো একেবারে বাচ্চা।

—আজ্ঞে উনিশ বছর বয়েস আমার।

—হুঁ। এর আগে কাজ করেছ কোথাও?

—আজ্ঞে না।

কর্মচারীটি বললে, তা হলে তো চলবে না। আর কোথাও দেখো তুমি।

তখন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল অমিয়। সোজা উঠে গেল দোকানে। তারপর বুড়ো আর তার কর্মচারীটি হাঁ হাঁ করে ওঠবার আগেই সোজা গিয়ে ভদ্রলোকের পা চেপে ধরল দু-হাতে।

—আমাদের কেউ নেই স্যার। চাকরিটা না পেলে আমি আর আমার ছোট বোন না খেয়ে মরে যাব।

—আরে—আরে, কী করছ হে ছোকরা? এই সকালবেলাতেই মহা ঝামেলায় পড়া গেল তো! পা ছাড়ো—পা ছাড়ো—কর্মচারীটি অমিয়কে টেনে বের করে দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল, বুড়োই বাধা দিলেন।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, কথাটা শুনে নিই আগে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন এমন করে এসেই পড়েছে—নিশ্চয় ব্যাপার আছে কিছু। ওহে ছোকরা, সব খুলে বলো দিকি।

একটু বানাতে হল অমিয়কে। বাবা-মা কেউ নেই। সে আর তার ছোট বোন কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকত। তারা তাড়িয়ে দিয়েছে—আর খেতে দিতে চায় না। দু ভাইবোন ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে কাশীতে।

বুড়োর ভ্রূর ওপর তবু সন্দেহের মেঘ থমকে রইল খানিকক্ষণ।

—কলকাতা থেকে কাশীতে?

—এখানে এক বিধবা মাসিমা আছেন, তাঁর কাছে এসেছিলুম। এসে দেখি, মারা গেছেন।

—অ। —বুড়ো আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছেলেটাকে বেশ চালাক আর চটপটে বলে মনে হচ্ছে। সত্যি বলছে বলেই মনে হল তাঁর।

—এখন আছো কোথায়?

পাঁড়ের ধর্মশালায়। চাকরিটা যদি দেন, তা হলে ঘর-টর খুঁজে নেব কোথাও।

—কিন্তু পড়েছো তো বলছ এইট অবধি। কাজকর্মও কিছু জানো না। তোমাকে দিয়ে কী হবে?

—আজ্ঞে শিখে নেব। কাজ পেলেই তো লোকে কাজ শেখে।

—হুঁ, তা ঠিক বলেছ। —বুড়ো একটু চুপ করে রইলেন : মাইনে কী চাও?

—যা দেবেন।

—চল্লিশের বেশি পারব না। দুজনে হবে কী?

—আধপেটা খেয়েও তো বাঁচতে পারব।

—আর যদি চুরি করে পালাও?

অমিয় বললে, হাত দুটো কেটে নেবেন আমার। আর কোনটাকে ফেলে পালাবই বা কোথায়? বিশ্বাস না হয়,

আমি এখানে বসে রয়েছি—কাউকে ধর্মশালায় পাঠিয়ে—

বুড়ো বিরক্ত হয়ে বললেন, থামো, অত বকতে হবে না তোমায়। গোয়েন্দাগিরি করানোর মতো আমার সময়ও নেই—উৎসাহও নেই। আচ্ছা—লেগে যাও আজ থেকেই। দু দিন দেখব। যদি না পারো, তোমার কথায় আমি ভুলব না—সোজা ঘাড় ধরে বের ক'রে দেব দোকান থেকে।

অমিয় তখনই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বুড়োকে।

—থাক বাপু, ভক্তিতে দরকার নেই। এখন যাও—চট্‌পট খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে এসো। আজ থেকেই লেগে যেতে হবে। এখন বিক্রীর মরশুম—দোকানে বড্ড কাজের চাপ। যাও—যাও

কর্মচারীটি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। একবার বললে, কর্তা, একদম আনাড়ীকে নিয়ে—

—সকালবেলায় ভদ্রলোকের ছেলে এসে পা ধরে পড়ল—কী করব। দেখি দু-একদিন। না পারলে তখন—

বাকীটা শোনবার সময় ছিল না অমিয়র। ঊর্ধ্বশ্বাসে তখন ছুটেছে সে। এতবড় সুখবরটা এখুনি তৃপ্তিকে জানানো দরকার।

অমিয় গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে দাঁড়ালো। আজ চাকরির এক মাস পুরো হয়েছে। বুড়ো জগত্তারণ খুশিই আছেন। স্পোর্টসম্যান অমিয় বিদ্যুৎ গতিতে বস্তার পর বস্তা নামায়—একখানা শাড়ী দেখতে চাইলে পনেরোখানা মেলে দেয়, 'যত ইচ্ছে দেখুন মা—আপনাদের দেখাবার জন্যেই তো আমরা আছি।'

পকেটে মাইনের টাকা—অমিয়র জীবনের প্রথম রোজগার। এ থেকে বাবাকে কিছু পাঠালে কেমন হয়? কিন্তু এখন নয়। চন্দন সিংয়ের টাকা কিছু খরচ হয়েছে, কিন্তু বাকীটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। সময় বুঝে শোধ করে দেবে। আপাতত এই টাকাতেই সংসার চালাতে হবে তার। চল্লিশ নয়—পঞ্চাশই দিয়েছেন জগত্তারণ।

অমিয় বাক্সর দিকে এগোল। কেদারের গলিতে ইলেকট্রিকহীন পুরোনো বাড়ীতে এক তলার অন্ধকার ঘর একখানা—ছোট বারান্দা তার সামনে। বাঙালী, মাদ্রাজী আর যুক্তপ্রদেশের মানুষ মিলে এক তলাতেই পাঁচ ঘর ভাড়াটে। এক কল, এক চানের চৌবাচ্চা। তাদের নারকেলডাঙার বাসার চাইতে অনেক খারাপ। কিন্তু দশ টাকা ভাড়ায় এর চাইতে ভালো ঘর আর পাওয়া যায় না।

মাইনে পাওয়ার খুশি নিয়ে, অন্ধকারে দরজা পেরিয়ে ঘরের সামনে পা দিলে অমিয়। আর দিয়েই তার কপাল কুঁচকে এল। দরজাটা ধরে তৃপ্তি দাঁড়িয়ে—আর বারান্দায় এক জলচৌকি পেতে বসে আছে নন্দলাল।

দরজাটা ধরে তৃপ্তি দাঁড়িয়ে

পচ্ করে খানিকটা পানের পীচ্ ফেলে এক গাল হাসল নন্দলাল।

—আরে, এসো এসো অমিয়। তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ।

অমিয় সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—তিপুকে বলছিলুম, গার্লস স্কুলে জানা শোনা আছে আমার। ও তো পড়তে চায়, ফ্রী করে দিতে পারি আমি।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব—তৃপ্তির পাশ কাটিয়ে সোজা ঘরের ভেতর চলে গেল অমিয়। সেখান থেকে হাঁক ছাড়ল : এই তিপু, এক গ্লাস জল দিয়ে যা আমাকে।

নন্দলাল চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, তবে উঠি এখন। অমিয় খেটে খুটে এসেছে, খুব ক্লান্ত আছে এখন। কাল-পরশুর মধ্যেই আবার আসব।

ঘরের ভেতর গায়ের ঘামে ভেজা জামাটা মেজেতে ছুঁড়ে ফেলল অমিয়।

(ক্রমশঃ)

কতটুকু জানি ?

চিড়াকুটি চিড়াকুটি
ও দিদিগো
ভারত এসেচে ঝোলিতে !

ভারত

সমাজ বিরোধী দল

বিদ্যাস্থানে
ভয়ে
বচ

বসুধৈব
কুটুম্বকম

তা মিঞা
কাণ্ডটা
কও দেখি

রংপুর

তরুণ শিল্পীদের সম্মিলিত প্রদর্শনী

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে 'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি'র দ্বিতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই প্রদর্শনী দিয়েই বোধহয় এবার কলকাতায় শরৎকালীন প্রদর্শনী শুরু হল।

'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি' কলকাতার ছাত্র ও তরুণ শিল্পীদের সংগঠন। এদের প্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষে আমরা এই সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম এবং ঘোষিত আদর্শের উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলাম অকুণ্ঠ সমর্থন। এদের ঘোষিত আদর্শের মধ্যে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীকে সাহায্য ও পুরস্কৃত করার কথা ছিল। দ্বিতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে এঁরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। গত বারের প্রদর্শনীর প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে এবার স্বর্ণপদক প্রদত্ত হয়েছে যথাক্রমে শ্রীমতী অনীতা রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বড়ুয়া ও তরুণকুমার পালকে। রৌপ্যপদক পেয়েছেন প্রদীপকুমার বসু ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। তা ছাড়া এই সংগঠন নিজেদের স্টুডিও গঠনের কাজেও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে এই সংগঠনের প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এবারকার প্রদর্শনীতে ১৬ জন শিল্পীর ৪৮ খানি চিত্রকর্মের নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। তেল-রঙ, জল-রঙ, প্যাস্টেল, কালি-কলম—নানা মাধ্যমেই এগুলি অংকিত। তরুণ শিল্পীরা বিষয়-বস্তু হিসাবেও নির্বাচন করেছেন বহুবিধ বিষয়। কিন্তু দুঃখের কথা, এত সব থাকা সত্ত্বেও কোন চিত্র-কর্মেই কোন শিল্পী নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারেন নি। কি আঙ্গিক, কি বিষয়বস্তু নির্বাচন—সর্বত্রই প্রায় বহু ব্যবহৃত রূপ-রীতি প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যেই কয়েকজন কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ, শিল্প-চর্চায় এবং শিল্প-কলার উন্নততর মান প্রদর্শনে সামগ্রিক ভাবে 'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি'-র সভ্যেরা এখনো কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এখানেই এদের ব্যর্থতা।

তবু এই প্রদর্শনীর কিছু চিত্র আমাদের ভাল লেগেছে এবং এইসব চিত্রের শিল্পীরা যদি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকেন তবে হয়তো

প্রদর্শনী

কলারসিক

কিছু ভাল কাজ এদের হাত থেকে আমরা পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারি। শিল্পী অচিন্ত্যদেব মিত্রের প্যাস্টেলে অংকিত একটি স্কেচ 'তিন মূর্তি' (১২)-র মধ্যে ধরা পড়েছে অসহায় দুই নারী ও একটি শিশুর চমৎকার অভিব্যক্তি। এই শিল্পীর তেল-রঙের মাধ্যমে অংকিত 'নির্মাতা' (১৩) চিত্রখানিও আমাদের মন্দ লাগেনি। অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে অনিমেষ নন্দীর 'কম্পোজিশান' (১৯), ধ্রুব মজুমদারের 'নৌকা' (২২), কনককান্তি ভট্টাচার্যের জলরঙের কাজে (৩১) আলো-ছায়ার সুন্দর বর্ণ-সম্পাত, মানবেন্দ্র বড়ুয়ার তেল-রঙের মাধ্যমে অংকিত বাস্তবতাময় চিত্র 'এক যুবতীর আত্মোপলব্ধি' (৩২) এবং টুকু নন্দীর একখানি 'নিঃসর্গ দৃশ্যের চিত্র' (৪৬) আমাদের ভাল লেগেছে।
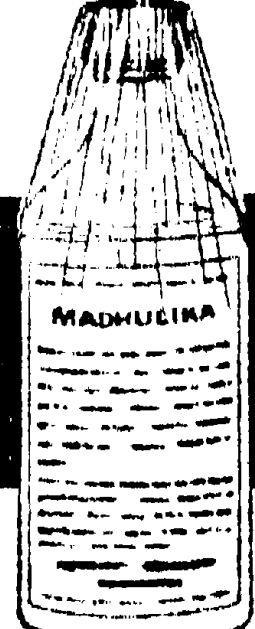
আলোচ্য প্রদর্শনীতে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০ খানি নগ্ন-দেহের স্কেচ প্রদর্শিত হয়েছে। নগ্ন-দেহে আমাদের কোন আপত্তি নেই, যদি তা শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়। কিন্তু এখানে প্রদর্শিত নগ্ন নারী-দেহের নানা ভঙ্গির স্কেচের মধ্যে আমরা সেই শৈল্পিক দক্ষতা খুঁজতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। অথচ প্রদর্শনীর প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে ছিল এই ছবিগুলি। যতদূর মনে পড়ছে কিছুকাল আগে এই নগ্ন চিত্রগুলি যেন অন্য এক প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম। তাই যদি হয় তবে কি দরকার ছিল এগুলি পুনঃ প্রদর্শনের? আশা করি তরুণ শিল্পীরা ভবিষ্যৎ প্রদর্শনী করার সময় চিত্র-নির্বাচনে আরো একটু সতর্কতার পরিচয় দেবেন। আমরা তরুণ শিল্পীদের উপর বিশ্বাস রাখি। এই ব্যর্থতার থেকে অতঃপর তারা শিক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমাদের অনুরোধ।

শিল্পীঃ অপূর্ব পাল

॥ এই বর্ণভেদ কেন? ॥

(উত্তর)

বিগত ২৪শে আগষ্ট তারিখের অমৃত পত্রিকায় শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন, নবদ্বীপের বিভিন্ন মন্দিরে অব্রাহ্মণ দর্শনার্থীদের নিকট হইতে ভেট বাবদ পয়সা নেওয়া হয় কেন এবং এই নিয়ম কতদিন হইতে চলিত আছে।

শাস্ত্রে আছে, গৃহস্থলোকের পক্ষে দেবতা, তীর্থ, সাধু ও গুরুদর্শন খালি হাতে করা অনুচিত। সেবা বা ভোগের জন্য ফুল-ফল বা ভেট বা নগদ পয়সা, একটা কিছু সঙ্গে নিতে হয়। ইহাতে দর্শনার্থীরই পুণ্য হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও একথা বলিতেন বলিয়া কথামৃতে উল্লেখ আছে। কেবলমাত্র সাধু-সন্ন্যাসী বা "সমর্থ" লোকেরাই এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা, তাঁহারা মানসিক পূজার অধিকারী।

মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলে ভেট দাবী করার পিছনে আরও একটি বাস্তব সত্য আছে। তাহা মন্দির সংরক্ষণ, পূজারতি, ভোগরাগাদির ব্যবস্থা এবং পুরোহিত-পাণ্ডা প্রভৃতির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কবে কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ হয়ত পুণ্যলাভার্থে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে তদীয় বংশধরগণের আর মন্দির রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে না। তখনই পূজক, পুরোহিত বা মহান্ত বা অধিকারী প্রভৃতিকে মন্দিরের পরিচালনা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হয়। আর তখন হইতেই সম্ভবতঃ এই ভেট প্রথারও উদ্ভব হয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ংই হয়ত দর্শনার্থীদের নিকট হইতে প্রণামী দাবী করিতেছেন। মন্দির যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়, তবে দর্শনার্থীদের মধ্যে কাহাকেও ভেট বা প্রণামী হইতে রেহাই দেওয়া-না-দেওয়া কর্তৃপক্ষেরই বিবেচ্য বিষয়, সন্দেহ নাই। আর যদি মন্দির সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়, তবে সেখানে কাহাকেও রেহাই দেওয়ার প্রশ্ন না উঠাই স্বাভাবিক, যেমন প্রশ্নকর্তা নিজেই রামটেকের মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত মন্দিরে দেখিয়াছেন।

তবে নবদ্বীপের মন্দিরগুলি সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা আছে। আজিকার নবদ্বীপ আর পূর্বেকার নবদ্বীপে আকাশ-পাতাল তফাৎ বর্তমান। আদিকাল হইতেই নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের আবাসস্থল ছিল। কিছুকাল পূর্বেও নবদ্বীপে অনেক বড় বড় টোল বর্তমান ছিল। দ্বিতীয় কাশী বলিয়া পরিচিত তৎকালীন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজের অনেকেই কোন বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলে স্বরচিত স্তোত্র বা শাস্ত্রীয় স্তোত্র পাঠ করিয়া দেবতার

জানাতে পারেন

পূজারতি করিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়াই হয়ত ব্রাহ্মণদিগকে ভেট দান হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই প্রাচীন প্রথা আজও সেখানে বলবৎ আছে। আর ব্রাহ্মণ-সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হইলেও আর্থিক বিষয়ে চিরকালই হীন বলিয়াও হয়ত হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতেই তাহাদিগকে এই সুবিধাটুকু দেওয়া হইয়া থাকিবে। ইহা বর্ণভেদ নহে, গুণীজনের সমাদর, বা আর্থিক অবস্থার স্বীকৃতি হিসাবেই দেখিতে হইবে।

কেবল মাত্র নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজই নহে, অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অনেকেই আজিকার মত নাম বা উপাধিসর্বস্ব ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'ই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃত নাম

(উত্তর)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামকরণ নিয়ে চিরায়তিক প্রশ্ন-সমস্যা আবার দেখা দিয়েছে গত ১০ই আগষ্ট অমৃতের জনপ্রিয় 'জানাতে পারেন' বিভাগে। উত্থাপিত কৌতূহলী প্রশ্নটি করেছেন শ্রীঅমিতসূদন ভট্টাচার্য। প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ও তথ্যকৌতূহলী পাঠকবর্গের কাছে এ প্রশ্ন অবশ্যই কৌতূহলজনক। এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনার পথ সৃষ্টি করলেন। সুতরাং শ্রীভট্টাচার্য এইদিক থেকে ধন্যবাদার্হ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের নামালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক গ্রন্থ-আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে পুঁথির বিষয়বস্তুর বশবর্তী হয়েই গ্রন্থের নামকরণ করতে হয়েছিল। তার কারণ প্রাপ্ত পুঁথির প্রথম ও শেষ কয়েকটি পাতা না থাকায় গ্রন্থের মূল নামটি কি ছিল তা জানা যায় নি।

পুঁথির মধ্যে একখানি ছোট তুলোট কাগজের রসিদ পাওয়া গিয়েছে। তাতে পুরণো অক্ষরে লেখা আছে :—

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানবই পত্র হইতে এক শত দশ পত্র পর্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীমহারাজার হুজুরেকে লইয়া গেলেন। পুনশ্চ আনিয়া দিবেন— সন ১০৮৯
২৬ আসীন

সন ১০৮৯
তাং ২১ অগ্রহায়ণ
শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্বা॥
১৬ পত্র দাখিল হইল—

এই মূল্যবান চিরকুটটি যে বসন্তরঞ্জনের মত সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদকের দৃষ্টি কি করে এড়িয়ে গেছে, তা বিস্ময়ের বিষয়।

রসিদে লেখা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'ই আধুনিককালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম পরিবর্তিত করে তার প্রকৃত নামটি গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। 'অমৃত'র কোনো কৌতূহলী পাঠক যদি এই প্রাচীন রসিদটি দেখতে চান তবে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পুঁথিটি রক্ষিত আছে।

আশা করি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামকরণ প্রসঙ্গে আর কোনো মতান্তর ঘটবে না।

সন্তোষ আচার্য, এম-এ
ঝাড়গ্রাম সেবায়তন বি টি কলেজ
সেবায়তন, মেদিনীপুর।

॥ কেন? ॥

।। প্রশ্ন ।।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগটি সত্যই অভিনব। এতে সুন্দরভাবে জ্ঞানলাভ ও বৈচিত্র্যের স্বাদ উপভোগের অবকাশ আছে। তাই কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। আশা করি প্রশ্নগুলির জবাব পাঠকবৃন্দ মধ্যে থেকেই অমৃত মারফৎ জানতে পারবো।

(১) আমি আজ চার বছর এখানে (ভুবনেশ্বর) আছি। এখানে অনেক উড়িয়া ভদ্রলোকের ধারণা (তার মধ্যে শিক্ষিত লোকও আছেন) যে 'সর্দিকাশি' রোগের একটি কারণ পেটগরম। এ ধারণা কতখানি চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত?

(২) 'চোখে শর্ষেফুল দেখা' কথাটি বাংলাতে প্রচলিত। বিপদে বা বিপাকে পড়ে মানুষ যখন দিশেহারা বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, তখন কথাটিকে প্রয়োগ করা হয়। যেমন—সকালবেলা পাওনাদারকে উপস্থিত হতে দেখে অমুকবাবু চোখে শর্ষেফুল দেখলেন। এখন এই শর্ষেফুল কথাটা এলো কোথা থেকে? আর বিপদ বা বিপাকের ক্ষেত্রকে বোঝাতে এই ফুলটাকে প্রচলন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য,
স্টেশন রোড, ভুবনেশ্বর,
উড়িষ্যা।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।২।।

এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন ঐন্দ্রিলা এখানে ছিল না এমন প্রায়ই থাকে না সে আজকাল। বিধবা হবার পর সর্বস্বান্ত হয়ে যখন চলে আসে তখন আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ি সে যাবে না—এই প্রতিজ্ঞা ক'রেই এসেছিল। আর যাবার কথাও নয়, কারণ তার শাশুড়ী সে সময় যে চরম দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা ক্ষমার অযোগ্য। অবশ্য তাঁর তরফ থেকে সে দুর্ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ ছিল। তাঁর বিশ্বাস তাঁর স্বামী এবং পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য ঐন্দ্রিলাই দায়ী। তারই বিষনিঃশ্বাসে তার সোনার সংসার শুকিয়ে গেল। এ বিশ্বাস তিনি চেপে রাখারও চেষ্টা করেননি। হেমকেও সে-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতিজ্ঞা যা-ই করুক, কিছুদিন এখানে থাকার পর এখানটাও অসহ্য হয়ে উঠল যখন—তখন চরম একটা রাগারাগি ক'রে সেই শ্বশুরবাড়িতেই আবার গিয়ে উঠল ঐন্দ্রিলা। ভাগ্যক্রমে তাদেরও সেটা খুব দুঃসময় চলছে। ওর শাশুড়ী শয্যাগত, জা পোয়াতি, ননদের অসুখ—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। সুতরাং তারাও বেঁচে গেল ওকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে। সাদর অভ্যর্থনা ও সস্নেহ আচরণের কোন অভাব ঘটেনি তখন, এমন কি ওর শাশুড়ীর মুখ থেকেও অভাবনীয় মিষ্টবাক্য বেরিয়েছিল।

কিন্তু যে মেয়ে বাপের বাড়িতে বনিয়ে চলতে পারেনি সে শ্বশুরবাড়িতে বনিয়ে চলবে—এটা সম্ভব নয়। একদা সেখানেও অশান্তি চরমে উঠল। তাছাড়া তাদেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে তখন, তাদের মনের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। অগত্যা আবারও এখানে এসে উঠতে হ'ল। সে সময় উপলক্ষ্যও জুটে গিয়েছিল একটা—ফিরে আসাটা খুব বেমানান হয়নি।

তারপর থেকেই এই চলেছে। যখন আসে তখন ভালমানুষ—তার পরও দু-তিন মাস বেশ থাকে। মেজাজ ভাল থাকলে রান্নাবান্নাও করে, তাও না থাকলে কাপড় জামা বিছানার চাদর যেখানে যা আছে একরাশ ক্ষার ফুটিয়ে দমাদম কাচতে বসে কিম্বা বাগানের তদ্বির ক'রে বেড়ায়। মুখের উগ্রতা তখনও প্রকাশ পায় তবে সেটা মারাত্মক নয়। কিন্তু কোনমতে মাস তিনেক কাটলেই আবার অসহ্য হয়ে ওঠে, ওরও—এদেরও। আবার একদিন কোন একটা তুচ্ছ ও হাস্যকর রকমের উপলক্ষ ধরে প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি করে—এবং সে কলহ চরমে উঠলে—চরমই ওঠে—আবারও মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যায়।

এখান থেকে শ্বশুরবাড়িতেই যায় সে সাধারণত। সোজা গিয়ে উঠলে তারাও ঠিক বাধা দিতে পারে না। এক সময় ও'কে বড়ই প্রয়োজনে লেগেছিল, আবারও হয়ত লাগতে পারে ভেবে—অথবা চক্ষুলজ্জায়, তারাও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। সম্পত্তিতে অধিকার থাক বা না থাক, বাড়ির বৌ এবং নাতনী—দু'চার দিনের জন্যও আশ্রয় না দিলে পাড়াঘরে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেখানেও সেই মাস দুই তিন বড় জোর। তারপরই আবার একটা বড় রকমের ঝগড়া—শাপশাপান্ত গালি-গালাজ—কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসা। সেই পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়। এই-ই চলছে দীর্ঘকাল।

ঈষৎ পরিবর্তন হয় মধ্যে মধ্যে অবশ্য। যখন কোন এক আকস্মিক কারণে অল্পকালের মধ্যেই কোথাও প্রবল ঝগড়া হয়ে যায় তখন মধ্যে মধ্যে কল-কাতাতে বড়মাসিমার কাছেও ওঠে। তবে সেখানে স্থান কম, অসুবিধাও ঢের। সুতরাং খুব বিপাকে না পড়লে সেখানে যায় না।

তবু যেদিন আসে সেদিন ঐন্দ্রিলা শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। সংবাদটা পেতে তার একদিনের বেশী দেরি হয়নি। এসব সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে কখনই খুব দেরি হয় না, এ ক্ষেত্রে হারানদের পাড়ার লোকেরা বহুদিন পরে পরিবেশন করার মতো এমন মুখরোচক সংবাদ পেয়ে—(দু দুবার বৌ পালানোর খবরটা মুখ-রোচক তো বটেই) তা উপযুক্ত উৎসাহের সঙ্গেই প্রচার করেছে। ঐন্দ্রিলাও খবর পেয়েই চলে এল এখানে। বিধবা হবার পর এই প্রথম বোধহয়, রাগারাগি না করে এল সেখান থেকে।

সেটা বিকেলবেলা, তরু বিষণ্ণভাবে বড়ঘরের সামনের সিঁড়িতে বসে ছিল চুপ ক'রে। ঐন্দ্রিলাকে দেখে তার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে গেল। সম্ভবত দাদার কথাটা মনে করেই। দু-দুবার ইঙ্গিত করেছে হেম। ইঙ্গিত কেন স্পষ্টই

বলেছে কথাটা। বিশ্রী তুলনা। দারুণ মর্মঘাতী শব্দ। হে ঈশ্বর, তেমন সর্বনাশ যেন কখনও না হয়। যা করেছে করেছে—তবু, সে বেঁচে থাক, সুস্থ থাক।... কাল থেকে অন্ততঃ হাজার বার এই প্রার্থনা করেছে সে মনে মনে। মনে মনেই সিদ্ধেশ্বরীতলায় মাথা খুঁড়েছে।

আজ এখন ঐন্দ্রিলাকে দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ল আবার। শিউরে উঠল সে সঙ্গে সঙ্গেই। হে ঈশ্বর! এই হুতাশন হয়ে বেঁচে থাকা! অতি বড় শত্রুরও যেন এমন অবস্থা না হয়! ঐ বাড়িও বোধ হয় এই অবস্থারই পরিণতি। হে ভগবান! আবারও শিউরে উঠল সে।

ঐন্দ্রিলা এত জানত না। জানলেও অত সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাত কিনা সন্দেহ। এ অবস্থা এ দুঃখ অনুমান করার মতো— উপলব্ধি করার মতো সহজ সহানুভূতি আর তার কারুর ওপর নেই এ পৃথিবীতে। হয়ত এক নিজের মেয়ে ছাড়া। সেই জন্যই তাকে অমন দমকা বাতাসের মতো বাড়ি ঢুকতে দেখে শুধু তরু নয়, কনকও কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

ঐন্দ্রিলা কোন দিকে না তাকিয়ে একেবারে সিঁড়ির সামনে এসেই দাঁড়াল, 'ওমা, যা শুনলুম তা তাহলে সত্যি? আমি বলি কথার কথা।... তাহলে সবই সত্যি বল্। তোকে নাকি ওরা দুজনে মিলে খুন করতে গিয়েছিল? গরম লোহা পুড়িয়ে নাকি সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা দিয়েছে?... কী হবে মা!'

তারপর একটু থেমে, যেন কতকটা বিজয়গর্বের সঙ্গে চারদিকে চোখ বুলিয়ে—'একটু বসি বাবা, এতটা হেঁটে এসে কোমর ধরে গেছে'—বলে সেই সিঁড়িতেই তরুর পাশে বসে পড়ল।

'এই শুনেছিলাম এত ভাল বে হয়েছে অত ভাল বে হয়েছে—কত কথাই শুনেছি! জিনিসপত্তর ঢেলে দিলে মায়ে বেটায়, সোহাগী ছোট মেয়ের ঘটা ক'রে বিয়ে হ'ল—তা এই বিয়ের ছিরি! বলি সেই তো আমার মতোই সব ঘুচিয়ে পুছিয়ে এসে উঠতে হ'ল বাপের বাড়ি!'

তরু আর বসতে পারল না, ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে গেল খিড়কীর বাগানের দিকে। কনকও প্রতিবাদ না করে পারল না। যদিও সে তার এই মেজ ননদটিকে যথেষ্ট ভয় করত, তবু মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললে, 'ও কি কথার ছিরি, মেজঠাকুরঝি!...ষাট ষাট! ওদের ও দুদিনের মন কষাকষি—দুদিন পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। ঘুচিয়ে পুঁচিয়ে চলে আসতে হবে কেন!... অমন কথা কেউ বলে! একে কাল থেকে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল মেয়েটা!'

ঈষৎ যেন একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়ে ঐন্দ্রিলা, 'না আমি অত ভেবে বলিনি। সত্যিই তো, আমার মতো জন্ম জন্ম ধরে এত পাপ তো আর কেউ করেনি—কেনই বা অমন হবে। যা হবার এই আমার কপালের ওপর দিয়েই হয়ে গেল, আর তাই যাক। আর কারুর এমন হয়েও কাজ নেই।... আর হবেই বা কী জন্যে বল, ওদের কপাল যে ঢের ঢের ভাল, আজ বলে নয় চিরদিনই ভাল। মা ভাই ভাজ সকলেরই আদরের নিধি ও—বরেরও নয়নের মণি হয়ে থাকবে বৈকি।... তা তাহ'লে এমনটা হ'লই বা কেন? তবু ঠিক এল কবে? কাল তো? তা তারপর আর কোন খোঁজখবর করেনি ওরা?' খাপছাড়াভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে সে।

অর্থাৎ বিষ আর কৌতূহলের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হয়। কনকের এই সস্নেহ সহানুভূতি যথারীতিই ঐন্দ্রিলার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, দৃষ্টিও কঠিন হতে শুরু করেছিল, কিন্তু সে ঝগড়া এখন শুরু করলে ইতিহাসটা পুরোপুরি শোনা হয় না বলেই সেটা এখন মুলতুবি রাখল।

'তা করবে না কেন? কালই তো ঠাকুরজামাই নিতে এসেছিলেন দুপুরবেলা।'

'তারপর? তা হ'লে গেল না কেন?' তীক্ষ্ণ বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঐন্দ্রিলা।

এ নাটকের এমন দ্রুত পরিসমাপ্তি নৈরাশ্যজনক বৈকি!

'তোমার দাদা মত করলেন না।'

'দাদা মত করলেন না? কেন? বোন পোষবার খুব সখ বুঝি দাদার? একটা বোন ভাগ্নীকেই পুষতে পারে না আবার আর একটার দায় ঘাড়ে নিতে যায় কোন আক্কেলে! ভীমরতি ধরেছে নাকি দাদার!'

ঝড় যে কখন কোন্ দিকে থেকে উঠবে ঐন্দ্রিলার রসনায়—তা আজও কোন হদিস পায় না কনক।

অগত্যা তাকে সংক্ষেপে কালকের ঘটনাটা খুলে বলতে হয়।

'বেশ করেছে দাদা! ঠিক করেছে! কেন, কিসের জন্যে এত অপমান সয়ে সেখানে মেয়ে পাঠাব আমরা! ইস! ভাত দেবার ভাতার নয়, নাক কাটবার গোঁসাই! না খেয়ে সেখানে শুধু মার খাবার জন্যে পড়ে থাকবে, না? কেন, মেয়ে-জন্ম কি এতই ফ্যালনা একেবারে। তরি কোথায় গেল, ও যেন না কোন দুঃখু রাখে মনে! কী হয়েছে, একটা পেট তো! চলেই যাবে। দুবোনে বসে যদি ঠোঙা তৈরী করি তাহলেই দুটো পেট চলে যাবে আমাদের। আজকাল রোজগারের কত রাস্তা হয়েছে। বলি এই তো মা পাঁচ বেচে কত পয়সা কামায়!'

আবারও সেই তুলনা।

কনক বিব্রত বোধ করে কিন্তু কেমন ক'রে ওকে সামলাবে ভেবে পায় না। তাকে বাঁচিয়ে দেন শ্যামা। তিনি এতক্ষণ বাগানে শশাগাছের মাচা ঠিক করছিলেন, তরুকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতে দেখে এবং ঐন্দ্রিলার গলার আওয়াজ পেয়েই ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি উঠোনে ঢুকে বললেন, 'ওর ভাবনা অত এমন থেকে তোমাকে ভাবতে হবে না মা, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে!'

যেন ঠিক এইটেরই অপেক্ষা করছিল ঐন্দ্রিলা। সে এবার নিজমূর্তি ধারণ করলে। কনকের সহানুভূতির আয়নাতে নিজের অবস্থাটা প্রত্যক্ষ ক'রে যেই থেকেই জ্বলছিল সে, এখন কৌতূহল অবসান!—সে বিষ উদ্গার করতে কোন অসুবিধাও নেই।

'সে তো জানিই, আমার কপালই যে এমনি, ভাল বলতে গেলেও মন্দ হয়ে যায়! আমার যা খুশি হোক গে, তোমাদের সোয়াগী মেয়ের পায়ে কাঁটাটিও না ফোটে। আমার সঙ্গে তুলনা করলেও বুক ফেটে যায় তোমাদের। কৈ, আমার জন্যে তো এত প্রাণ কাঁদতে দেখি না তোমাদের! আমিও তো মেয়ে। আমিও তো সইছি এই দুঃখ! আমি কিছু ফেল্না নই। রূপেগুণে আমার পাশে দাঁড়াতে পারে ও? চিরকাল তোমাদের এই এক-চোকোমি দেখে এলুম! ভাল হবে না বুঝলে? তোমাদের কখনও ভাল হবে না। এত অশ্দিশ্য ভাল নয়, এত একচোকো যারা তাদের কখনও ভাল হয় না!' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কনক বেগতিক দেখে অনেক আগেই চলে গিয়েছিল বেরিয়ে—তরুর কাছে

গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাগানের শেষ প্রান্তে পুকুরেরও ওধারে—অর্থাৎ শ্রুতিসীমার বাইরে।

শ্যামার এ সবই শা-সওয়া। তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, তো আমরা যদি এতই মন্দ আর একচোকো—তো আমাদের কাছে আসো কেন মা—আমাদের হাড় ভাজা ভাজা করতে! আমরা তো কোনদিন এরেবেরে আনতে যাই না! আজও তো কে আসতে বলিনি। সেখানে সুখে থাকো, যারা ভাল—তাদের কাছে সেখানে থাকলেই তো পারো।"

'বাব্‌বা! এত বিষ তোমাদের মনে মনে! এত বিষ হয়েছি যে আর এক দণ্ডও সহ্য হচ্ছে না আমাকে! না, তোমার ঐ আতুরেরাণী রাঙের বাধা মেয়ের অসুবিধে হবে আমি থাকলে? আমার মুখ দেখলে, আমার হাওয়া লাগলেও ওর মন্দ হবে বোধ হয়?... তাই ওর বিয়ের সময় একটা ছুতো ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে আমায়? মনে করো আমি কিছু বুঝি না!... কেন, কিসের জন্য আমি যাব। আলবৎ থাকব। যদিন খুশি যদ্দিন খুশি থাকব। কে তাড়াও দিকি, কেমন তাড়াতে পার। অমন বিয়ে দিয়েছিলে কেন আমার যে দুদিন না যেতে যেতে সব ঘুচে যায়। এখন যাও বললে আমি শুনব কেন। আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও—মাসোয়ারা বন্দোবস্ত কর, বাড়ি কিনে দাও—আমি চলে যাচ্ছি। অমনি অমনি তোমাদের সুবিধে ক'রে দিতে চলে যাব—তা স্বপ্নেও ভেবো না!'

এ রকম কতক্ষণ চলত তা বলা কঠিন। কোন যুক্তি-তর্কে বোঝানোর চেষ্টাও বাতুলতা। তরুর বিয়ের সময় তুচ্ছ ছুতো ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে ঐন্দ্রিলাই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলেও লাভ নেই। এখন প্রথম প্রশ্ন ওকে থামানো। কিন্তু কেমন ক'রে থামাবেন তা শ্যামাও ভেবে পান না। যতটা অপ্রীতি আরও ঘটাতে পারলে ও আবার রাগ ক'রে ঝগড়া ক'রে চলে যায়, ঠিক ততটা এই সন্ধ্যাবেলা করতে ইচ্ছাও করে না। বিশেষত কাল থেকে তাঁর মনটা অত্যধিক দ'মে গেছে। এমন কখনও হয়নি এর আগে। হয়ত এটা বয়স বাড়বারই লক্ষণ। তা ছাড়া ভরসন্ধ্যাবেলা কিচকিচি ঝগড়া ঘোর অলক্ষণ, ভদ্রলোকের বাড়ির পক্ষে বেমানান তো বটেই। অনেক হয়েছেও তাঁর জীবনে, আর কোন অলক্ষণ ঘটতে দিতে সাহস হয় না তাঁর কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, এখন মিষ্টি কথা বলতে গেলেও ও শান্ত হবে না, তার মধ্যে কোন মতলব খুঁজে বার ক'রে আরও চেঁচাতে থাকবে। পেয়েও বসবে খানিকটা।

প্রমাদ গুনছেন শ্যামা—এমন সময় এক অঘটন ঘটল। সহসা হেম এসে পড়ল। অঘটনই বলতে হবে, কারণ কোনদিনই এত সকাল সকাল সে বাড়ি ফেরে না। সম্ভবত কালকের ঘটনার জের তার মনকেও ভারী ক'রে রেখেছিল তাই অফিসের ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে এসেছে।

হেমকে দেখেই ঐন্দ্রিলা একেবারে চুপ ক'রে গেল। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। হঠাৎ যেন শামুকের খোলায় আঘাত লাগার মতো গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে ঘাটে গিয়ে কাপড় কেচে এসে সহজভাবেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।
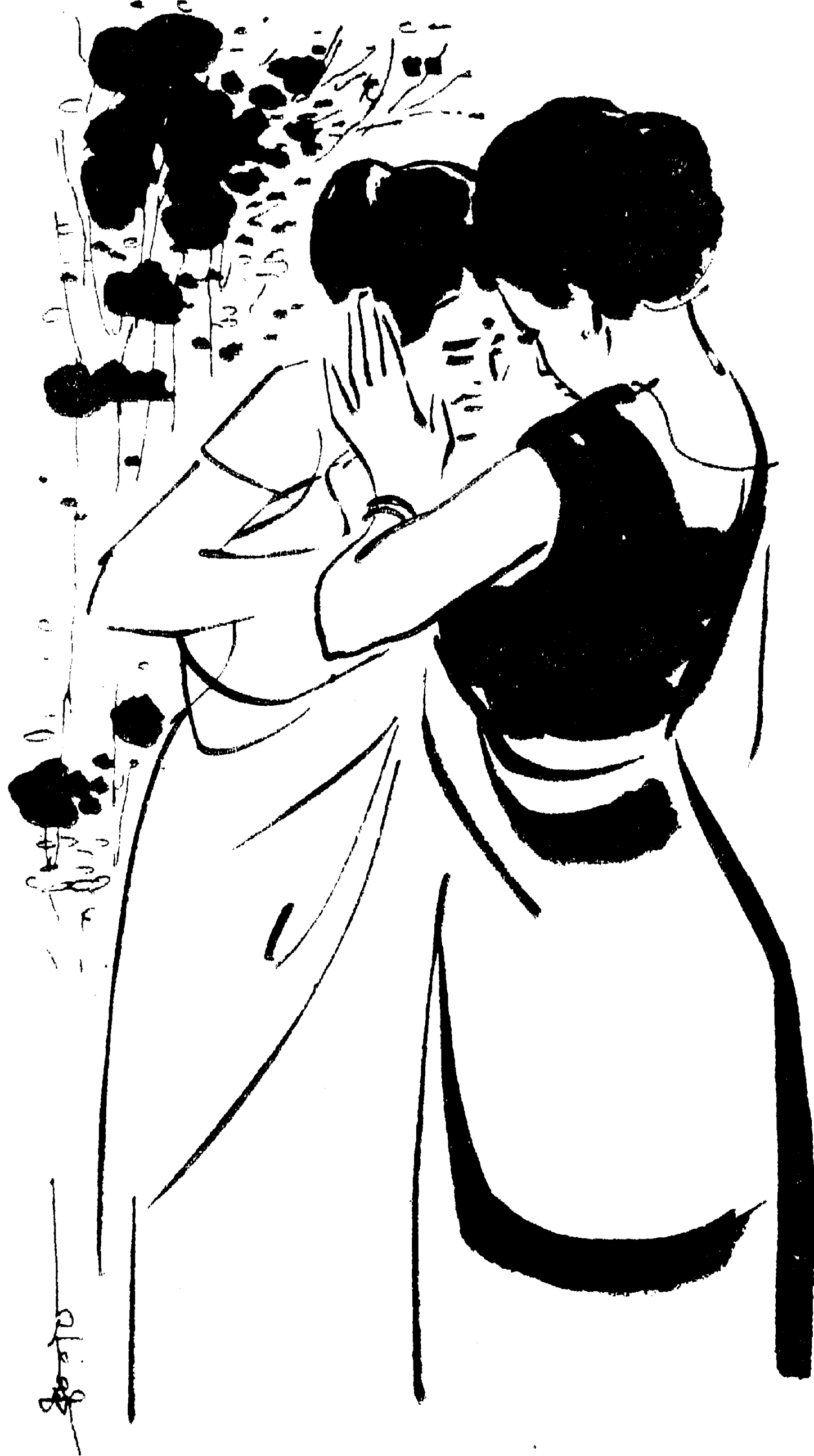
তার এ ভাবান্তরের কারণ ছিল। আসার সময় মেয়ে সীতাকে আনতে পারেনি। সে মেজকাকীর সঙ্গে তার বাপের বাড়ি গেছে, আজ বিকেলে ফেরবার কথা। ঐন্দ্রিলা বার বার বলে এসেছে যখনই ফিরুক, এমন কি রাত হয়ে গেলেও যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে কথার অন্যথা করতে তাদের সাহস হবে না। পাঠাবে তারা নিশ্চয়ই। হয়ত ছোটকাকার সঙ্গেই পাঠাবে। যে-

তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল বাগানের শেষপ্রান্তে।

কোন মুহূর্তেই তারা এসে পড়তে পারে। সে সময় যদি বড় রকমের একটা ঝগড়া—'হাড়াইডোমাই' গোছ বলতে থাকে তো ওদের কাছে বড্ড খেলো হয়ে যাবে। তার ওপর দাদা যা মেঘের মতো মুখ ক'রে এসে ঢুকল—এখন কোন কথা বললে সে হয়ত এমন রুদ্রমূর্তি ধরবে সে তখন বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না। আজই এসে আবার আজই ঝগড়া ক'রে বেরিয়ে যাওয়া- সেটা এমন কি ঐন্দ্রিলার পক্ষেও বড় লজ্জার কথা। দাদার ব্যাপার সব সময় বুঝতেও পারে না সে—এক এক সময় যতই ওদের রাগা-রাগি চেঁচামেচি হোক, নির্বিকারভাবে বসে থাকে সে পাথরের মতো, আবার এক এক সময় একটুতেই ক্ষেপে ওঠে। এই সব ভেবেই তাড়াতাড়ি চুপ ক'রে গেল ঐন্দ্রিলা।

হেম অত লক্ষ্য করেনি। কিছুক্ষণ পূর্বে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল এখানে তার কোন আভাসও পায়নি। সেকরাদের বাড়ির কাছ থেকে ঐন্দ্রিলার গলার আওয়াজ পেয়েছিল সে কিন্তু ঝগড়া ক'রে ক'রে ওর স্বাভাবিক গলাই চড়া হয়ে গেছে, দূরে থেকে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সামনে ঐন্দ্রিলাকে দেখেও কিছু বলল না তাই। কখন এল কেন এল—মেয়ে কোথায়, এসব প্রশ্নও করল না। যথানিয়মে কাপড় জামা ছেড়ে ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসে একেবারে শুয়ে পড়ল।

চা বা জলখাবারের পাট নেই এ বাড়িতে। হেমও কোন দিন কিছু খায় না। শনিবার সকাল ক'রে ফিরলেও কিছু খেতে চায় না। একেবারে রাত্রে ভাত খায় সে— এই তার চিরদিনের অভ্যাস।

সুতরাং তার আচরণে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেন না শ্যামা। করল কনকই।

প্রথমত অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসা এইটেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। মন খারাপ বলেই আরও বেরিয়ে কোথাও আড্ডা দিতে যাবার কথা। মন-মেজাজ খারাপ থাকলে সাধারণত সে সিমলেয় যায় বড়মাসিমার বাড়ি—সেদিনগুলো টের পায় কনক। প্রথমত ফিরতে অতিরিক্ত রাত হয়, এখানে খায় কম, ভাত নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করে—তাছাড়া মেজাজও প্রসন্ন থাকে। সুতরাং আজ ছুটির পরই বাড়ি চলে আসা- প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। তার ওপর মুখের ভাবটা সন্ধ্যার ঝাপসা আলোতে শ্যামা লক্ষ্য না করলেও বাগানে ঢোকবার মুখে কনক লক্ষ্য করেছিল। অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়, হয়ত আরও কোন দুঃসংবাদ আছে কোন দিকে।

তখনই কিছু বলল না সে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোরে চৌকাঠে জল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসল। শাশুড়ী ঘাটে গেছেন স্নান করতে—তিনি এসে একটি ডিবে জেলে ভাত চড়াবেন। পাতার জ্বালটা এবেলা আর বৌকে লাগাতে দেন না। তরকারী রাঁধাই থাকে, শুধু দুটি ভাত ফুটিয়ে দেওয়া। তাঁর বা ঐন্দ্রিলার জন্য খাবার করার পাট নেই—চাটটি ক্ষুদভাজা বা চালভাজা তেলহাত বুলিয়ে নিয়ে খাবেন যখন হয়—অন্ধকারে বসেই।

শ্যামা কাপড় কেচে ঝাপসা আলোতেই ঘাট থেকে চাল ধুয়ে এনে রাখলেন। কাপড় ছাড়লেন অন্ধকারেই। এইবার তুলসীতলার প্রদীপ থেকে 'লম্প' বা ডিবেটা জেলে এনে বসবেন উনুনের কাছে। ঐ থেকেই পাতা জেলে উনুন ধরাবেন। দেশলাইয়ের কাটির অনর্থক খরচা শ্যামা পছন্দ করেন না। 'একোটা দেশলাই প্রায় একপয়সা পড়ে, কটাই বা কাঠি থাকে—একমাসও যেতে চায় না একটা দেশলাই।' হ্যারিকেন একটা আছে বাড়িতে, সেটা কদাচিত জ্বালা হয়। বর্ষাকাল ঝড় জল না হ'লে সেটা তোলাই থাকে। এই 'লম্প'টিই জ্বলে, বাড়ির মধ্যে একমাত্র

আলো হিসেবে। যেদিন হেমের আসতে অনেক রাত হয়, সাতটার গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ হয় জগাছার পুলের ওপর সেদিন আবার এরই আলোতে নতুন করে পাতা চাঁচতে বসেন শ্যামা কিম্বা তেঁতুলের বিচি ছাড়াতে কিম্বা এই ধরনের কিছু। অর্থাৎ আলোটা বৃথা খরচা না হয়। কনক নিদ্রালু চোখে বসে বসে শুধু দেখে, হয়ত একটু-আধটু গল্প করে। এ সময়টায় তার কোন কাজ থাকে না। সকাল করে খাওয়ার পাট চুকলো ঘাট থেকে বাসন মেজে এনে রাখে রাতেই। ওবেলাও ঐ লম্ফটাই নিয়ে যেতে হয়। নইলে বসেই থাকা। কাজের সময় লম্প বলেটা শ্যামা ভালবাসেন না, কাচ খারাপ হয়, হাত কাটার ভয় থাকে। তাই গল্পও তেমন জমে না। শুধু কষ্ট হচ্ছে দেখলে এবং শ্যামার মেজাজ ভাল থাকলে বলেন 'তুমি শুয়ে পড়োগে বৌমা, হেম এলে আমি ডেকে দেব তখন।'

প্রীতিনা যখন এখানে থাকে তখন সীতাকে বসিয়ে ঐ আলোতেই অল্পস্বল্প পড়াবার চেষ্টা করে কনক। তার লেখাপড়ার পুঁজিও অবশ্য সামান্য—তবু যা পারে একটু পড়ায়। আসলে একটা কাজ নিয়ে থাকা। নইলে শুধু শুধু বসে থাকলেই রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ভোক—বাজে চিন্তা। নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তাকেই বেশী ভয় ওর, তাই সব রকম চিন্তাকে এড়াতে চায় সে।

সুতরাং শ্যামার পর পর বার [illegible] ওর ভাল আছে। ওর ছোট দেওর বলে [illegible] থাকলে কাজের একটু সুবিধা হয় কিন্তু [illegible] চেষ্টা করে তাকে কলকাতাতে [illegible] শাশুড়ির কাছে পাঠিয়েছে হেম, এখানে থাকলে নাকি তার পড়াশুনো কিছুই হবে না। মাসিমার শরীর খারাপ একটু, আধটু বাজার হাট করে দেয়, ইস্কুলে পড়ে। হেম গোপনে পাঁচ টাকা করে দেয় সেখানে—সেটা শ্যামা জানে না, জানলে প্রলয় কাণ্ড হবে। নগদ টাকা দিয়ে ছেলে পড়ানোর পক্ষপাতী তিনি নন।

শ্যামা লম্ফটা নিয়ে তুলসীতলায় আসতেই কনক কাছে এগিয়ে গেল। আস্তে ডাকল, 'মা।'

'কেন গা বৌমা?' উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন শ্যামা। প্রদীপের সেই সামান্য আলোতেই ওর মুখখানা ঠাওর করার চেষ্টা করেন। ডাকবার ধরনেই বুঝতে পারেন যে কোন জরুরী বক্তব্য আছে তার।

'না, তেমন কিছু নয়।' তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে সে, 'বলছিলুম যে—আপ—মানে ওঁর মুখের চেহারাটা আমার তত ভাল লাগছে না। কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। একবার জিজ্ঞাসা করুন না। ঠাকুরজামাইদের কোন খবরটবর আছে কিনা—'

শ্যামা চুপ করে যান। তাঁর ছেলের খবর বৌয়ের কাছ থেকে শোনাটা খুব রুচিকর নয়। হয়ত একটা কড়া কথাই বলতেন, কিন্তু 'ঠাকুরজামাই' সংক্রান্ত প্রশ্নটা মধ্যে থাকাতেই সামলে নিলেন।

একটুখানি চুপ করে থেকে শুধু বললেন, 'তা তুমিই জিজ্ঞেস কর না বৌমা!'

'না না—। তা ছাড়া আমাকে উনি বলবেনও না তেমন কোন কথা হলে।'

এবার একটু খুশী হন শ্যামা। আশ্বস্তও হন। তাড়াতাড়ি লম্ফটা জ্বালিয়ে এনে ঘরে ঢোকেন, 'হ্যাঁরে অমন করে এসে শুয়ে পড়লি কেন রে? শরীরটা খারাপ করছে নাকি?'

'না।' সংক্ষেপে জবাব দেয় হেম।
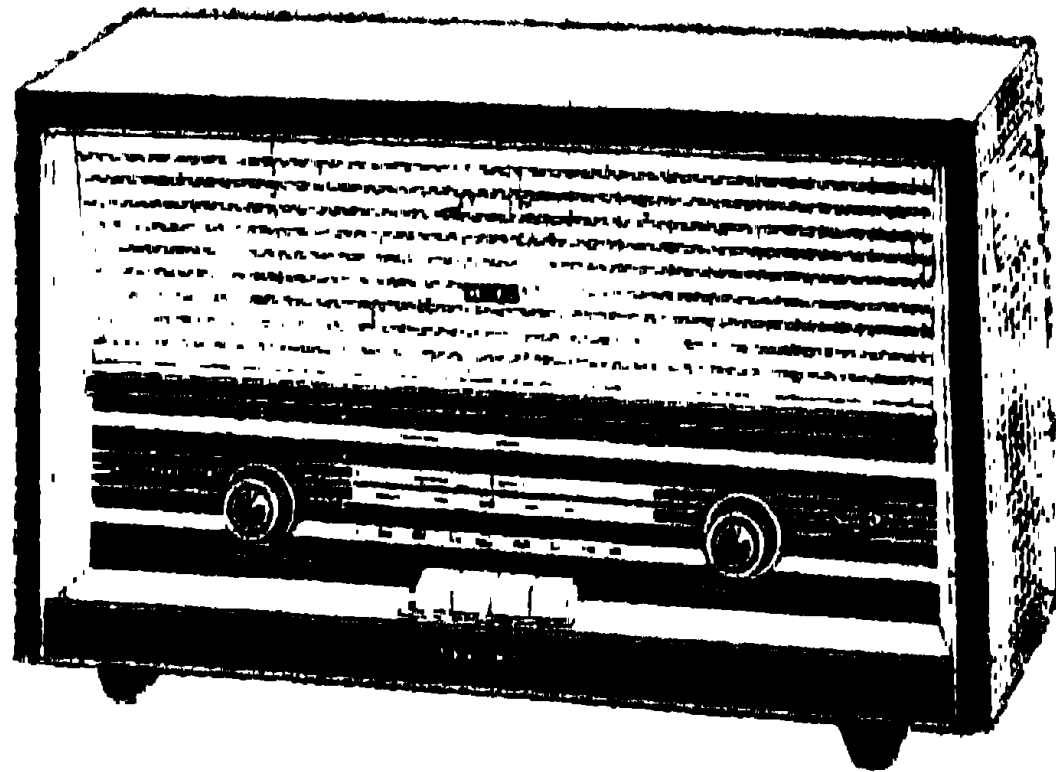
দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে ছিল, তেমনিই রইল। এপাশও ফিরল না।

এরপর আর কথা বাড়ানো উচিত নয়। ছেলের আজকাল বড় মেজাজ হয়েছে। কী বলতে কি বলে বসবে হয়ত।

তবুও ইতস্তত করেন শ্যামা। এবার তিনিও বুঝতে পারেন যে ছেলের মন খারাপ হবার কোন বিশেষ কারণ ঘটেছে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সামান্য একটু কেশে গলার আওয়াজ ক'রে বলেন, 'তা হ্যাঁ রে—ওদের কোন খবরটবর পাসনি, মানে নিবড়ের?'
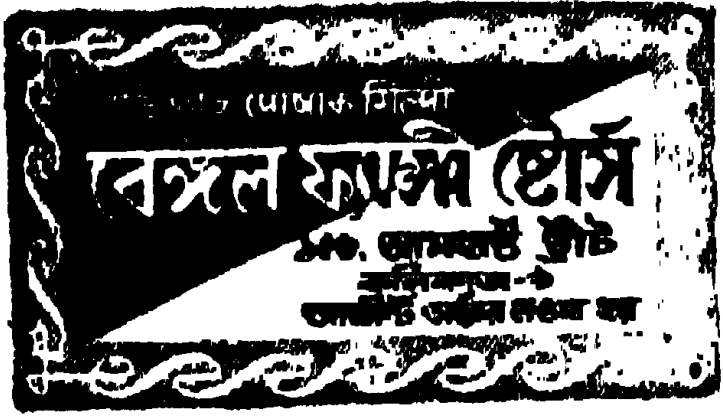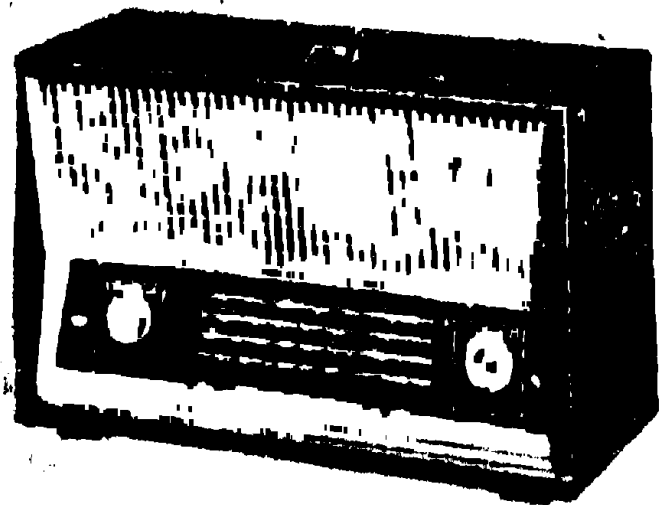
ছিলেকাটা ধনুকের মতো লাফিয়ে সোজা হয়ে বসে হেম, 'খবরদার বলছি, এ বাড়ির কেউ যেন। সে ছোটলোকদের নাম না নেয়। ওর নাম যে করবে তার সংগে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে দিলুম।'

এখনই আর কোন কথা বলা সম্ভব নয়। শ্যামাও চুপ করে থাকেন।

চুপ করে থাকে সকলেই। শ্যামার পিছু পিছু কনকও এসে দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের বাইরে, সে যেন নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ ক'রে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় যেন ঘরের আবহাওয়াটাও। শুধু শ্যামার হাতে ধরা 'লম্ফ'র শিখাটি অল্প অল্প কাঁপতে থাকে তাঁর নিঃশ্বাসের সংগে সংগে, আর তাতেই হেমের ছায়াটাও একটু একটু কাঁপে পিছনের দেওয়ালে।

কিন্তু হেমই চুপ করে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। সে নিজেই ওদের প্রসংগ তোলে এবার, 'ছোটলোকটা কি করেছে জান? এখান থেকে গিয়ে সোজা সেই প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ি উঠেছে। তাদের হাতে-পায়ে ধরে সেই বৌকে নিয়ে এসেছে আবার।'

'কী সর্বনাশ!' শ্যামা ও কনক দুজনের কণ্ঠ থেকেই একসংগে বেরিয়ে আসে কথাটা—চাপা, অস্ফুট—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো।

'হ্যাঁ। সকালে উঠে ওর ঠাকুমা নাকি খুব চেঁচামেচি করেছিল, আমি আবার হারানের বিয়ে দেব, সাত দিনের মধ্যে যদি আর একটা বৌ না আনতে পারি তো আমার নাম নেই—এইসব। তাতে নাকি ওর পাড়ায় কেউ কেউ এসে ছোটলোকটাকে ডেকে বলেছে যে ওসব মতলব করলে আমরাই এবার পুলিশে গিয়ে খবর দেব যে তোমাদের এই ব্যবসা, দুজনে মিলে বৌ খুন ক'রে নতুন বৌ চাও তার গয়নাগাঁটি মারবে বলে! তাতেই নাকি ভয় পেয়ে ও এখানে এসেছিল। দিদি-নাতিতে কিছু মতলব এঁটেই এসেছিল বোধ হয়—এখান থেকে তাড়া খেয়ে সটান সেখানে চলে গেছে!'

'তা তারা আবার পাঠালে?' শ্যামার আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন ফোটে।

'পাঠাবে না কেন! তারা কড়ার করিয়ে হারানকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে ওর সংগে দিদিশাশুড়ীর কোন সম্পর্ক থাকবে না—রান্না-খাওয়া পর্যন্ত আলাদা করতে হবে। জেদ বই তো নয় —জেদ বজায় রাখতে সবেতেই রাজী হয়েছে। তাদেরই তো ভাল হ'ল!'

'তা তোকে কে বললে?'

এখনও যেন আড়ষ্টতা কাটেনি শ্যামার! বিহ্বলভাবে কতকটা কাঠের পুতুলের মতোই প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছেন শুধু।

'ওদের পাড়ার নাড়ু চক্কোত্তি আছে না, ওদেরই কী রকম হয় সম্পর্কে, তার ছেলে আমাদের অফিসে ঢুকেছে আজ মাস কতক হ'ল। তার মুখেই শুনলুম। ...আবার বলেছে কি না—'

কথাটা শেষ হ'ল না। তার আগেই কী একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ হ'ল বাইরে! কে যেন পড়ে গেল।

তরু কখন নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা কনকও টের পায়নি।

এখন চমকে পিছন ফিরে অন্ধকারেই বুঝতে পারল।

'মা শিগগির একবার আলোটা আনুন তো। ছোটঠাকুরঝির ফিট হয়েছে বোধহয়!'

চেঁচিয়ে উঠল কনক।

ওধার থেকে অন্ধকারেই ঐন্দ্রিলার কণ্ঠ ভেসে এল। সে অর্ধ-স্বগতোক্তি করছে, 'এখনই মুচ্ছো গেলি—এর পর কী করবি? এই তো কলির সন্ধ্যে লো। কত মুচ্ছো যাবি এরপর?...কত কল্লাই জানে বাবা আজকালকার মেয়েরা।'

(ক্রমশঃ)

দুইয়ের পরে তিন

রমানাথ রায়

সমস্ত আকাশ জুড়ে কৃষ্ণকায় মেঘ নিবিড় হয়ে এল। মুহূর্তে স্থির হল অশান্ত বাতাস। আন্দোলিত বৃক্ষশাখা নিশ্চল হয়ে বৃষ্টির জন্যে উন্মুখ হয়ে রইল। নভোমণ্ডল থেকে অসংখ্য চিল ডানা মেলে নিচের দিকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে আসতে লাগল।

ঠিক এ সময় অসীম হঠাৎ দেখতে পেল, বহুদূর থেকে জ্যামুক্ত শরের মত একটা ময়ূর ভেসে এসে প্রাসাদ-প্রতিম এক বাড়ির ছাদের পাঁচিলে বসে তার নক্ষত্রখচিত রূপময় কলাপ বিস্তার করে দিল। তারপর এক অসীম উল্লাস তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল। আর সেই মুহুর্মুহুঃ জলদগম্ভীর ধ্বনিপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

অসীম তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর করে শুনল সেই উল্লাস। তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে উন্মুখ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ চকিতে দল বেঁধে বৃষ্টি নেমে এল। আর সেই সময় অসীম দেখল, ময়ূরটি তার ডানা মেলে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ বারের মত সে শুনতে পেল সেই সমুদ্রমথিত উল্লাস। কিন্তু বৃষ্টির প্রবল শব্দে সেই উল্লাস অনেকখানি চাপা পড়ে গেল।

অসীম জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। তারপর হঠাৎ খুব বিস্মিত হল। ময়ূরের কথা ভেবে তার মনে হল, এখনও মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেনি। ভেবে আনন্দিত হল, যে সে এখনও সম্পূর্ণ বোধহীন হয়ে যায়নি। মনে পড়ল, আজ অফিসে এক তুচ্ছ কারণে তাকে অপমান করা হয়েছে। অথচ কি আশ্চর্য, সে নিজেকে অপমানিত বোধ করেনি। প্রথম প্রথম কেউ অপমান করলে আঘাত পেত, উত্তেজিত হত। সেই বোধ তার ছিল। কিন্তু নিয়ত আহত হতে হতে নিজেকে অপমানিত বোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, সে এমনভাবে বোধহীন হয়ে গেছে যে, কেউ তাকে শারীরিক আঘাত করলেও হয়ত উত্তেজিত হতে পারবে না।

এ সময় পুনরায় ময়ূরের কথা ভেবে নিজেকে অসীমের পোকার মত মনে হল। বাস্তবিক কি অদ্ভুতভাবে অবিকল পোকার মত এক বোধহীন স্বভাব নিয়ে বেঁচে আছে। সমস্ত অপমান সহ্য করে বেঁচে আছে এবং এভাবে আজীবন বেঁচে থাকবে। কেননা, এ ছাড়া অন্যভাবে বেঁচে থাকার অভ্যাস তার নেই। অবশ্য, শুধু সে নয়, তার বাবাও ঠিক পোকার মতই এভাবে বেঁচেছিলেন। হয়ত ঠাকুর্দা এ ছাড়া অন্যভাবে বাঁচেননি। আসলে তার রক্তের মধ্যে পূর্বপুরুষের এই অভ্যাস তিল তিল করে গোপনে তৈরী হয়ে গেছে। সে কোনদিন জানতেও পারেনি।

এখনও বাবার প্রতিদিনের ইতিহাস ছবির মত অসীমের স্পষ্ট মনে আছে। তার স্পষ্ট মনে পড়ে, ঠিক সকাল আটটায় বাবার ঘুম ভেঙে যেত। পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হত না। ঘড়িতে আটটা বাজলেই বাবা বিছানার ওপর উঠে বসতেন। এতে অসীমের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। ভেবে পেত না, ঘড়ির সঙ্গে বাবার এরকম গোপন সম্বন্ধ কি করে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। আজ আর সে বিস্মিত হয় না। এখন সে নিজেই নিয়মিত এবং নির্ভুলভাবে ঠিক আটটায় ওঠে। এর নড়চড় হয়-না। চেষ্টা করেও আটটা বাজতে পাঁচে, কিংবা আটটা বেজে পাঁচে উঠতে পারেনি।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বাবা চোখ মুখ ধুয়ে খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরতেন। এই সময় মা চা করে আনত। চা খেতে খেতে আট পৃষ্ঠার খবরের কাগজে দ্রুত চোখ বোলাতেন।

চা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর হাতে কাগজ ধরা থাকত। শেষ হলেই উঠে পড়তেন। চা খেতে খেতে যতটুকু দেখা যায় দেখতেন। চা খাওয়ার পর আর দেখতেন না। দেখার অভ্যাস ছিল না। তারপর কাগজ ছেড়ে থলে হাতে বাজারে বেরিয়ে পড়তেন। বাজারে এসে দোকানদারের সঙ্গে বেশী দরদস্তুর করতেন না। করতে পারতেন না। অনেক সময় দোকানদাররা তাঁকে ঠকাত। অসীম এ নিয়ে বাবাকে অনেকদিন বলেছে। উত্তরে বাবা শুধু হাসতেন আর এখন অসীম নিজেই ঠকে। ঠকতে দেয়। অসীমের প্রথম প্রথম দরদস্তুর করতে ভাল লাগে তারপর আর লাগে না। কেমন এক বিরক্তি আসে। আর সেই বিরক্তি থেকেই ঠকতে থাকা অভ্যাস হয়ে যায়। এখন বাবার সেই নীরব ঔদাসীন্যের কারণ অসীম বুঝতে পারে।

বাজার থেকে ফিরে বাবা সোজা বাড়ি চলে আসতেন। রান্নাঘরের সামনে থলেটা নামিয়ে বাড়ির সামনে একটা ছোট চায়ের দোকানে এসে বসতেন। তারপর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতেন। ঠিক সেই সময় বাবারই মত অনেকে আসতেন। বাবা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। মাঝে মাঝে সদ্য পড়া খবরের কাগজের সংবাদ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধত। বাবা এক একদিন তর্কে যোগ দিতেন। কিন্তু তর্ক করা তাঁর ধাতে সহ্য হত না। একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কোন কোনদিন তাঁদের মধ্যে সংসার, অফিস নিয়ে আলোচনা হত। সে সময় প্রত্যেকের মুখে চোখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠত। বাবা সে সময় প্রায়ই একটা কথা বলতেন, অনেক বয়স হয়ে গেছে। আর ভাল লাগে না।

বাবার বয়স হয়ত তখন পঞ্চান্ন। তবু সেই বয়সেই তিনি যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অসীমের বয়স এখনও পঁয়ত্রিশ হয়নি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে সে গোপনে গোপনে সকল বিষয়ে বাবাকেই অনুসরণ করে চলেছে। সেও বাজার থেকে ফিরে ঠিক ঐ চায়ের দোকানটায় বসে গল্প করে। কিন্তু তর্ক করে না। তর্ক করতে ভাল লাগে না। আর মাঝে মাঝে ঠিক বাবার মতই আচমকা বলে ওঠে, অনেক বয়স হয়ে গেছে। আর ভাল লাগে না।

ঠিক ন'টার সময় বাবা চায়ের দোকান ছেড়ে উঠে আসতেন। তারপর বাড়িতে এসেই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। স্নান-টান সেরে ভাত খেতে বসতেন। তরকারী, ঝোল গরম হলে মাকে বকাবকি করতেন। কেননা, এতে খেতে বড় দেরী হয়।

ভাত খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে জামা পরে নিতেন। মা গলার বোতাম লাগিয়ে দিত। হাতের বোতাম নিজেই লাগাতেন। তারপর চুল আঁচড়ে রাস্তায় নেমে পড়তেন। নেমে পড়ার আগে একবার বলতেন, আসি।

বাবা চলে গেলে, মা জানালায় দাঁড়িয়ে বাবার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। অদৃশ্য হওয়ার আগে বাবা একবার পিছন ফিরে তাকাতেন। তাকিয়ে হাসতেন। অসীম নিজেও এখন ঠিক ঐভাবে পিছন ফিরে হাসে। অবিকল বাবার মত। কেন হাসে তা জানে না। হয়ত অভ্যাসের বশেই হাসে।

এর পর বাবা কি করতেন, তা সে দেখেনি। কিন্তু অসীম নিজেকে দিয়ে অনুমান করে নিতে পারে। বাবাও ঠিক তার মত নিশ্চয় ট্রাম রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতেন। ট্রাম আসতে দেরী হলে নিশ্চয় বিরক্ত হতেন। অবশেষে ট্রাম এলে এক লাফে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা করে রড ধরে ঝুলতেন। নিয়ত ধাক্কা, ঠেলাঠেলি এবং প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে করতে অফিসের সামনে এসে লাফ দিয়ে নেমে পড়তেন। চটকানো জামাটা ঠিক করতে করতে অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। খাতায় সই করে নিজের চেয়ারে এসে বসতেন। পটপট করে বুকের বোতাম খুলে পাখার হাওয়া খেতেন। এবং সে সময় নিশ্চয় বেয়ারাকে ডেকে এক গ্লাস জল আনাতেন। তারপর জল খেয়েই বোধ হয় গাদা করা ফাইলের মধ্যে মাথা নিচু করে কাজ শুরু করতেন। হয়ত মাঝে মাঝে মাথা তুলে কোন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতেন। কথা শেষ করে আবার কাজ শুরু করতেন। এমনি করে দুপুর গড়িয়ে যেত। টিফিনের সময় হলে চেয়ার ছেড়ে ক্যান্টিনে যেতেন। খাওয়া শেষ করে আবার ফিরে আসতেন। আবার কাজ শুরু করতেন।

ঠিক পাঁচটার সময় নিশ্চয় উঠে পড়তেন। সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়াতেন। আবার ঝুলতে ঝুলতে বাড়ির কাছে নেমে পড়তেন। তারপর সোজা বাড়িতে এসে জামা খুলে এই ইজিচেয়ারটায় ঠিক এভাবে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকতেন। মা কিছুক্ষণের মধ্যে এক কাপ চা তৈরী করে দিয়ে যেত। বাবা চা শেষ করে কিছুক্ষণ জিরিয়ে পুনরায় জামা পরে পাশের বাড়ি তাস খেলতে যেতেন। খেলা শেষ করে আসতে আসতে এক একদিন রাত হয়ে যেত। মার ঘুম পেত। তবু দরজা খুলে দেওয়ার জন্য জেগে থাকতে হত। বসে বসে সেলাই করত আর মাঝে মাঝে হাই তুলত। বিরক্ত হয়ে গজ গজ করত। বাবা বাড়ি ফিরে মার বকুনি শুনতেন। বাবা কোন কথা বলতেন না। খেয়ে দেয়ে

শুয়ে পড়তেন। আবার পরদিন ঠিক সকাল আটটায় বিছানা ছাড়তেন। প্রতিদিন বাবা ঠিক এইভাবেই বেঁচে ছিলেন। অসীম নিজেও ঠিক এইভাবে প্রত্যহের ভার নিয়ে বেঁচে আছে। তার ছেলেও ঠিক এইভাবেই বেঁচে থাকবে। কেননা, এ ছাড়া কেমন করে বাঁচতে হয় তার বাবা জানতেন না। অসীম নিজেও জানে না। তার ছেলেও জানবে না।

অসীম ভাবল, আসলে ঠাকুর্দা এইভাবে বাবাকে বাঁচতে শিখিয়েছেন। বাবা শিখিয়েছেন আমাকে। আমি শেখাব আমার ছেলেকে। আমরা সবাই কি অদ্ভুতভাবে আবহমানকাল ধরে বংশপরম্পরায় পরস্পরকে অনুসরণ করে বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবও।

অসীম এ সময় একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর নিজের ওপর, পিতৃ-পিতামহের ওপর একটা ভয়ংকর আক্রোশ জন্মাল, এবং একটা প্রবল বিতৃষ্ণা বোধ করল।

ঠিক এমন সময় সুমিত্রা চায়ের কাপ নিয়ে অসীমের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুমিত্রা অসীমের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বলল, জানালাটা বন্ধ করে দেব?

অসীম একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

—বৃষ্টির ছাঁট লাগছে না?

—লাগুক।

—জ্বর হলে ঠেকাবে কে?

—ভয় নেই, জ্বর আমার হবে না।

—একবার হলে, সামলানো দায় হবে।

অসীম এই মুহূর্তে একটা ভীষণ কঠিন অসুখের জন্য প্রবল প্রার্থনা করল। কেননা, তাহলে প্রত্যহের বোধহীন অভ্যাসের ভার থেকে সে অন্তত কয়েকদিনের জন্য মুক্তি পাবে।

সুমিত্রা অসীমের কথা শুনল না। জানালা বন্ধ করতে এগিয়ে গেল।

অসীম বলে উঠল, ওকি, বন্ধ করছ কেন?

সুমিত্রা কথার উত্তর না দিয়ে জানালার একটা পাল্লার গায়ে হাত রাখল।

অসীম এতে খুব বিরক্ত হয়ে বলল, আমি যা বললাম, তাই শোন। জানালা বন্ধ করতে হবে না।

সুমিত্রা অসীমের গলার তীব্র ঝাঁঝে চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল। দেখতে পেল, বিরক্তিতে অসীমের গোটা মুখ কুঁচকে গেছে।

সুমিত্রা কিছু বুঝতে পারল না। একটু ক্ষুব্ধ হল। তারপর অসীমের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার কিছু হয়েছে নাকি?

অসীম গভীর গলায় বলল, না।

সুমিত্রা ভ্রূ বাঁকিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অসীমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর প্রবল অভিমান নিয়ে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

সুমিত্রা চলে যেতেই, অসীম নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হল। ভাবল, ওর সঙ্গে রূঢ় আচরণ না করলেও পারত। কেন যে করল, সে ভেবে পেল না। মনে মনে দুঃখিত হল। আর সেই সঙ্গে সুমিত্রার ওপর কেমন যেন এক গভীর মমতা বোধ করল। তার মনে হল, তারই মত সুমিত্রার জীবন কি ভয়াবহভাবে করুণ এবং অর্থহীন। সুমিত্রাও ঠিক মায়ের মতই বেঁচে আছে। মাকে অনুসরণ করেই বেঁচে আছে। সেও প্রতিদিন মার মত ভোরে ওঠে। কয়লা ভাঙে। উনুনে আঁচ দেয়। স্নান করে। তার জন্যে সকাল সকাল উনুনে হাঁড়ি চড়ায়। তারপর তরকারি কোটে। বাটনা বাটে। প্রতিদিন একইভাবে বেলা বারটা পর্যন্ত রান্নাঘরে গরমে অনর্গল ঘামতে থাকে। শেষে খেয়ে দেয়ে রান্নাঘর ধুয়ে পান চিবুতে চিবুতে শুয়ে পড়ে। ঘুমোয়। পুনরায় বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বাসন মাজে। গা ধোয়। চুল বাঁধে। তারপর জানালায় দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে। সে এলে চা করে দেয়। চা খেয়ে সে চলে গেলে সেলাই করতে বসে। রাত্রি হলে হাই তোলে। সে ফিরে এলে এক সঙ্গে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে। আবার ভোরে ওঠে। কয়লা ভাঙে। উনুনে আঁচ দেয়।
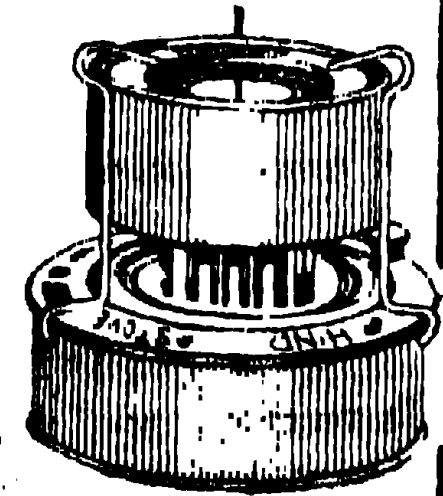
অসীম ভাবল, সে, সুমিত্রা দুজনেই ঠিক বাবা মা'র মতই প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে যেন নিয়তির এক অমোঘ নিয়মে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। এ ছাড়া অন্যভাবে তারা কোনদিন বাঁচেনি। হয়ত বাঁচতে জানে না বলেই বাঁচেনি।

এ সময় অতর্কিতে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বহুদূর থেকে ময়ূরের ক্লান্তি-হীন উল্লাস ভেসে এল। শুনে অসীমের খুব কষ্ট হল। তারপর ধীরে ধীরে তার চেতনার অতল গহ্বরে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার দুই চোয়াল নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠল। স্থির করল, এইভাবে সে আর বাঁচবে না। কোনদিন না। হ্যাঁ, কালকেই সে অফিস ছেড়ে দেবে। আর যাবে না। তারপর সে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে। সঙ্গে থাকবে সুমিত্রা। কিন্তু কোথায় যাবে তা সে ঠিক করবে না। কেননা, ঠিক করলেই তারা হয়ত পুনরায় একটা বাঁধা অভ্যাসের মধ্যে পড়ে যাবে। উদ্দেশ্যহীন হয়েই ঘুরে বেড়াবে। এখানে এইভাবে আর বেঁচে থাকার ভান করে পড়ে থাকবে না। শতাব্দীকাল ধরে এই প্রচলিত ধরণে বোধহীন হয়ে বেঁচে থাকার ওপর তার বড় ঘৃণা জন্মে গেছে।

অসীম ভাবল, সুমিত্রাকে ডেকে এই মুহূর্তে কথাটা বলা দরকার। সে প্রায় চীৎকার করে ডেকে উঠল, মিত্রা।

সুমিত্রা হঠাৎ এরকম ডাক শুনে ভয় পেয়ে ছুটে এসে বলল, কি হল? ডাকছ কেন?

অসীম ইজিচেয়ার ছেড়ে সুমিত্রার সামনে এসে দাঁড়াল।

সুমিত্রা কিছু বুঝতে পারল না। বিস্মিত হয়ে অসীমের দিকে তাকিয়ে রইল।

অসীম সুমিত্রার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, একটা কথা বলব?

সুমিত্রার চোখের কোণ, যেখানে অনেক ক্লান্তি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

সুমিত্রা অসীমকে থেমে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি ঠিক করেছ?

কথাটা মনে পড়ে যেতেই অসীম সুমিত্রার চোখের কোণ থেকে দৃষ্টি

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, একটা কথা বলব?

সুমিত্রার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। বলল, কি?

আমি ঠিক করেছি—বলেই অসীম থেমে গেল। তার হঠাৎ চোখে পড়ল

সরিয়ে বলল, আমি ঠিক করেছি, এখানে আর থাকব না।

কিছু বুঝতে না পেরে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, কেন, কি হল?

—ভাল লাগছে না।

—কোথায় যাবে?

—ঠিক করিনি।

—কিন্তু অফিসের কি হবে?

—ভাবছি, কাল থেকে ছেড়ে দেব।

সুমিত্রা কথাটা শুনে যেন ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কিছু হয়েছে নাকি?

অসীম সুমিত্রাকে ভীত হতে দেখে বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

—আমার মনে হচ্ছে, কিছু একটা বিপদ হয়েছে।

অসীম হেসে বলল, না, কিছু হয়নি।

—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ।

—তবে অফিস ছেড়ে দেবে কেন?

অসীম কোন উত্তর না দিয়ে সুমিত্রার আশঙ্কিত মুখ এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন সে কোন প্রতিমার মুখ আরতি করছে। অবশেষে সুমিত্রার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে মনে মনে বলল, মিত্রা, তোমার কি এইভাবে বর্ণহীন বেদনা বহন করতে ক্লান্তি আসে না? কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যও কি ইচ্ছে হয়নি, এই বোধহীন বিবর্ণ জীবন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই? তোমার কি কোন-দিন এই অতিপরিচিত সংসারের ওপর ঘৃণা জন্মায়নি? ক্লান্তি আসেনি?

সুমিত্রা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, অমন করে কি দেখছ?

—কিছুনা—বলে অসীম চোখ সরিয়ে নিল।

—কিন্তু যা জিজ্ঞেস করলাম তার জবাব দিলে না ত?

সুমিত্রার প্রশ্ন মনে পড়ায় অসীম বলল, এই জীবনের ওপর আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। আমি তাই আর অফিস করব না। অন্য কোথাও চলে যাব।

সুমিত্রা অসীমের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই মানুষটাকে, বড় দীর্ঘসময় ধরে যার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে আসছে, তাকে যেন সে এই-মুহূর্তে চিনতে পারল না। মনে হল, বড় অপরিচিত এই মুখ। কোথাও কোনদিন একে দেখেছে বলে মনে হল না। ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল সুমিত্রা।

বাইরে তখনও অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। সুমিত্রা আর অসীম দুজনে অবসন্ন বিকেলের অস্পষ্ট আলোয় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। উপস্থিত, তারা কোন কথা খুঁজে পেল না। এক অন্তহীন স্তব্ধতা তাদের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করল।

এভাবে কিছুক্ষণ অচল স্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হলে, অসীম হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে প্রবল আবেগে সুমিত্রাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

সুমিত্রা বাধা দিল না। দিতে পারল না।

অসীম তাকে আদর করতে করতে বলল, মিত্রা, তুমি ভয় পেয়ো না। ভাবছ, আমার বয়স হয়েছে। চাকরী ছেড়ে কিভাবে বাঁচব ভাবতে পারছ না। কিন্তু, আজকে মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার ফেলে আসা বয়স ফিরে পেয়েছি। এখন আর কাউকে ভয় করি না।

সুমিত্রা অসীমের বুকে মাথা রেখে বলল, কিন্তু কি করবে তা ত ঠিক করনি।

—নাই বা করলাম। কি যায় আসে তাতে?

—কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার কেমন ভয় করছে।

—কোন ভয় নেই মিত্রা, যে করেই হোক আমাদের চলে যাবেই।

সুমিত্রা এর পর আর কিছু বলল না। বুকে মাথা রেখে কান পেতে এক অপরিচিত শব্দ শুনতে লাগল, যা সে কোনদিন শোনেনি।

সারারাত সুমিত্রার ভয়ে ভয়ে কাটল। কাল কি যে হবে তা সে ভাবতে পারছিল না। প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছিল, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটবে।

কিন্তু দেখা গেল, পরের দিন ঠিক সকাল আটটায় অসীমের ঘুম ভাঙল। চা খেল। খবরের কাগজ পড়ল। বাজার করল। অফিসে গেল। ছ'টায় বাড়ি ফিরে তাসের আড্ডায় গেল। এবং রাত্রি দশটায় খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল।

সুমিত্রা কিছু বুঝতে পারল না। ভাবল, কিছু জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সাহস হল না।

অবশেষে অসীম নিজেই একসময় বলল, শেষ পর্যন্ত পারলাম না।

সুমিত্রা চুপ করে রইল।

অসীম একটু থেমে পুনরায় বলল, ভেবেছিলাম কাজটা ছেড়ে দেব। কিন্তু ছেড়ে দিলে, অবস্থাটা কিরকম হবে ভাবতে গিয়ে সমস্ত কিছু মুহূর্তের মধ্যে কিরকম যেন হয়ে গেল। আর, কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিসের ভয় তা ঠিক বলতে পারব না। তাই, শেষ পর্যন্ত পারলাম না। কাজটা ছেড়ে দিতে পারলাম না।

সুমিত্রা কথাগুলো শুনে খুব আশ্বস্ত হল। এতক্ষণে যেন কালকের সেই অপরিচিত মানুষটাকে বড় আপনার মনে হল।

হঠাৎ এই সময় বহুদূরে একটা ময়ূর ডেকে উঠল। অন্ধকারে অসীমের গোটা শরীর কেঁপে উঠল। তারপর খুব ভীত গলায় বলল, মিত্রা, ঐ জানালাটা বন্ধ করে দাও ত।

॥ কলকাতায় বাঙালী ॥

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, কলকাতা বাঙলার গর্ব। কিন্তু কলকাতা কি বাঙালীর শহর? শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশোক মিত্রের সযত্ন-সংকলিত সংখ্যাতত্ত্বগুলি হতে হয়ত তার উত্তর পাওয়া যাবে।

১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে বৃহত্তর কলকাতার ৪৬ লক্ষ লোকের ৬৯ শতাংশ জন ও শহর কলকাতার সাড়ে পঁচিশ লক্ষ লোকের ৬৫ শতাংশ জন ছিল বাঙালী। সেদিনের হিসাবে হিন্দী ও উর্দুভাষীর সংখ্যা ছিল ২৫ শতাংশ জন এবং বাকি লোক ছিল অন্য ভাষাভাষী। তারপর গত দশ বছরে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বাঙালীর প্রতিকূলে গেছে তা নিম্নলিখিত হিসাবগুলি হতেই উপলব্ধি করা যাবে।

১৯৬০ সালে কলকাতা ও তার চার পাশের কাপড় কলগুলির শতকরা ৫৮ জন, চটকলগুলির শতকরা ৭৬জন, যন্ত্রশিল্পগুলির শতকরা ৪৭জন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পগুলির শতকরা ৬৪জন, কাগজকলের শতকরা ৭৩জন ও মুদ্রণ শিল্পের শতকরা ২১জন শ্রমিক ছিল অবাঙালী। গড় হিসাবে যাবতীয় কারখানার ৬১জন শ্রমিক ও অন্যান্য কারখানা বহির্ভূত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা ৫০জন কর্মী ছিল অবাঙালী। ১৯৬০ সালে সারা রাজ্যে কারখানার সংখ্যা ছিল ৪,২৮৮ এবং তাতে কমরত শ্রমিকের সংখ্যা কিছু বেশী সাত লক্ষ।

১৯৬০-৬১ সালে কলকাতা থেকে মণিঅর্ডার যোগে বাইরে টাকা গেছে ২৭ কোটি ৬০ লক্ষ। যে জায়গায় বোম্বাই থেকে গেছে ২৩ কোটি ১০ লক্ষ, দিল্লী থেকে গেছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও মাদ্রাজ থেকে মাত্র ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা।

॥ কলকাতার বন্দর ॥

সারা ভারতের ছয়টি বড় বন্দরের মধ্যে একমাত্র কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানি হয়েছে সমগ্র রাষ্ট্রের রপ্তানিকৃত পণ্যের শতকরা ২৫ ও আমদানি হয়েছে সমগ্র রাষ্ট্রের আমদানিকৃত পণ্যের শতকরা ৪২ ভাগ। এটা ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব।

১৯৬১-৬২ সালে কলকাতার বাণিজ্য-শুল্ক এলাকা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব তহবিলে আমদানি-শুল্ক বাবদ দান করেছে ৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্ক বাবদ ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় আবগারী-শুল্ক বাবদ ৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও সেন্ট্রাল একসাইজ-ডিউটি বাবদ ২২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

১৯৬১ সালে কলকাতা বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে ৫৫ লক্ষ টন পণ্য ও রপ্তানি হয়েছে ৪০ লক্ষ টন পণ্য। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য রপ্তানি হল ১০০ কোটি টাকা মূল্যের চা, প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের পাট ও ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের পাটজাত বস্তু। কলকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি হল উত্তরে কানপুর হতে দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত ও সমগ্র পূর্ব ভারত। তৃতীয় যোজনাকালে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে যে ৩৭টি কলকারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা প্রধানত কলকাতা বন্দরের আমদানির উপর ভরসা করে। আসাম ও উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরা ও মণিপুর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরশীল কলকাতা বন্দরের উপরে।

কলকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমির সমৃদ্ধি ও কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের দক্ষতার কথা স্মরণ করেই বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, উন্নয়ন ঋণ ভাণ্ডার প্রমুখ বিভিন্ন আন্তজাতিক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ১৯৪৯ সাল হতে এপর্যন্ত ২৫০ কোটি টাকা ঋণ কলকাতা বন্দরের উন্নয়নকল্পে বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে কলকাতা বন্দরের এই গুরুত্ব কি যথাযথ স্বীকৃতিলাভ করেছে? কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতা ও কলকাতা বন্দরের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে তা কিন্তু আদবেই মনে হয় না।

দেশে বিদেশে

॥ ষোড়শী ॥

সংসদের উভয় সভার অনুমোদন লাভের পর ভারতীয় যুক্তরাজ্যের ষোড়শ রাজ্যরূপে নাগাভূমির প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি আরও একধাপ এগিয়ে গেল। এ ব্যাপারে এখন বাকি রইল শুধু রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর ও স্বয়ংশাসিত রাজ্যরূপে নাগাভূমির প্রতিষ্ঠার দিন ঘোষণা, যা সাভাবিক নিয়ম মতই পর পর ঘটে যাবে।

ভারতের বহু জেলার চেয়েও আকৃতিতে ছোট ক্ষুদ্রতম অংগরাজ্য নাগাভূমির আয়তন ছয় হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা পাঁচ থেকে ছয় লক্ষের মধ্যে। আসামের প্রাক্তন নাগা পার্বত্য জেলা ও 'নেফা'র তুয়েনসাং এলাকা নিয়ে গঠিত নাগাভূমি নূতন ব্যবস্থানুসারে কোহিমা, মোকোকচুং ও তুয়েনসাং এই তিন জেলায় বিভক্ত হবে। আপাতত কতকগুলি বিষয়ে নাগাভূমির শাসনব্যবস্থা আসামের শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকলেও অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাগাভূমিকে অন্যান্য অংগরাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। তবে নাগাভূমির রাজস্ব যা সামান্য তাতে কেন্দ্রের উপর অত্যধিক নির্ভর হয়ে ঐ রাজ্যটিকে বরাবরই থাকতে হবে। নাগাভূমির বাৎসরিক রাজস্ব মাত্র পাঁচ লক্ষ, কিন্তু এখনই নাগাভূমির উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারকে বছরে চার কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

॥ ইরাণের দুর্ভাগ্য ॥

গত ১লা সেপ্টেম্বর ইরানের প্রায় আট হাজার বর্গমাইল এলাকায় যে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প হয়ে গেল তাতে প্রায় বিশ হাজার নরনারী প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। ইরানের প্রধানমন্ত্রী ডঃ আসাদোল্লা আলম ঐ শোচনীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনাকালে বলেছেন—ইহা কল্পনাতীত, ইহা অবিশ্বাস্য, ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, এমন ব্যাপক ধ্বংসের দৃশ্য তারা কখনও দেখেন নি।

ইরানের এই ভূমিকম্প নিঃসন্দেহে শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ ভূমিকম্প। ১৯৬০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী মরক্কোর আগাদির বন্দরে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তাতেও প্রাণ হারিয়েছিল দশ থেকে বারো হাজার লোক।

এই শতকের সব চেয়ে বড় ভূমিকম্প হয় চীনের কানসু নামক স্থানে ১৯২০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এবং তাতে প্রাণ হারায় প্রায় এক লক্ষ আশী হাজার মানুষ। এর প্রায় তিন বছর পরে জাপানে ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর (ইরানের ভূমিকম্পও এই একই তারিখে) যে ভূমিকম্প হয় তাতেও প্রাণ হারায় এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার মানুষ।

১৯৩২ সালে চীনের কানসুতে আবার যে ভূমিকম্প হয় তাতেও মারা যায় ৭০ হাজার মানুষ।

১৯৩৫ সালের ৩১শে মে কোয়েটার ভূমিকম্পে প্রাণ হারায় প্রায় ৬০ হাজার লোক এবং ১৯৩৯ সালে তুরস্কের

এরজিঙ্গান ভূমিকম্পে মৃত্যু হয় ২৩ হাজার মানুষের।

১৯৬০ সালের ২১শে মে থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে পর পর কটি ভূমিকম্পের ফলে মৃত্যু হয় সাতান্ন শত লোকের।

মানুষের জ্ঞাতসারে সর্বাধিক ভয়ংকর ও সর্বনাশা ভূমিকম্প হয় চীনের শানসি নামক স্থানে ১৫৫৬ সালে যাতে মৃত্যু হয় ৮ লক্ষ ৩০ হাজার লোকের।

বহু নৈসর্গিক শক্তি আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণের কথা এখনও পর্যন্ত মানুষের কল্পনারও অতীত। কারণ ঊর্ধ্বাকাশে মানুষ আজ কয়েক শত মাইল উড্ডয়নে সমর্থ হলেও মাটির নিচে মাত্র চল্লিশ মাইল গভীরেও তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আর ভূমিকম্পের উৎস তারও কয়েক শত বা সহস্র মাইল নিচে। তাই এ বিপর্যয়ের কোন প্রতিকার নেই। তবুও আমরা আশা করব ইরানের দুর্ভাগ্য-তাড়িত মানুষ সাহসিকতার সঙ্গে এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন এবং বিশ্বের সকল জাতির শুভেচ্ছা ও সহায়তায় আবার নতুন করে নিজের বাস্তুভিটে গড়ে তুলবেন।

॥ ত্রিনিদাদ ॥

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আরও দুটি দ্বীপ ত্রিনিদাদ ও তোবাগো ৩১শে আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করল। এই সম্মিলিত দ্বীপপুঞ্জটি শুধু ত্রিনিদাদ নামেই পরিচিত হবে।

ত্রিনিদাদ ও তোবাগোর মিলিত আয়তন মাত্র ১৯৮০ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার আয়তন ২,০৯৪ বর্গমাইল। এই থেকেই এই সদ্য-স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্রটির ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করা যাবে। ১৮৬৪ বর্গমাইল আয়তনের ত্রিনিদাদ দ্বীপটির সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল ও প্রস্থ ৩৭ মাইল। আর ১১৬ বর্গমাইল আয়তনের তোবাগো দ্বীপটির সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ২৬ মাইল আর প্রস্থ মাত্র ৭½ মাইল।

১৪৯৮ সালে কলম্বাস ত্রিনিদাদ দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ১৫৩২ সালে স্পেনীয়রা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ১৭৯৭ সালে ইংরেজরা স্পেনীয়দের কাছ হতে দ্বীপটি ছিনিয়ে নেয়। সুতরাং ১৬৫ বছর বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার পর ত্রিনিদাদ পুনরায় স্বাধীন হল।

ত্রিনিদাদ ও তোবাগোর মোট লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব ৪১৮। রাজধানী পোর্ট অফ স্পেনের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ত্রিনিদাদ ও তোবাগোর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই বহিরাগত। তাদের মধ্যে শতকরা ৪৭ নিগ্রো বংশোদ্ভূত, শতকরা ৩৫ পূর্ব-ভারতীয়, মিশ্র-সংকর শতকরা ১৪, ইউরোপীয় শতকরা ৩ ও চীনা শতকরা ১।

ক্ষুদ্র হলেও ত্রিনিদাদ সমৃদ্ধ, উন্নত ও আত্মনির্ভর ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ। যদিও বর্তমানে ত্রিনিদাদের কর্মক্ষম লোকসংখ্যার শতকরা ১০ জন বেকার তবুও প্রধানমন্ত্রী ডঃ এরিক উইলিয়মস আশা করেন যে, অনতিবিলম্বেই ত্রিনিদাদের বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে। ইতিমধ্যেই ত্রিনিদাদের খনিজ তেল ও শোধনাগার যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে আনছে। তার উৎপন্ন সার ও অন্যান্য রাসায়নিকের বাজার পাকিস্থান ও কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিনিদাদের চিনি, গুড়, রাম, কোকোয়া, নারকেল, কফি প্রভৃতির চাহিদাও তার বর্তমান উৎপাদনের চেয়ে বেশী।

দুই দল বিশিষ্ট সংসদীয় শাসন রয়েছে ত্রিনিদাদে, যা যে কোন গণতন্ত্রী দেশেরই একান্ত কাম্য। দুই দলের নেতারাই যথেষ্ট কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ও দেশ শাসনের যোগ্যতা বিশিষ্ট। এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক দল দুটি প্রধানত জাতি-ভিত্তিক। কৃষ্ণাঙ্গদের দল 'পিপলস ন্যাশনাল মুভমেণ্ট', বর্তমানে সরকারী দল। প্রধানমন্ত্রী ডঃ উইলিয়মস তাদের নেতা। আর পূর্ব-ভারতীয়দের দল ডিমক্রাটিক লেবর পার্টি, ডঃ রুদ্রনাথ কপিলদেও তার নেতা। তবে জাতি-বিরোধের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে উভয় নেতাই সচেতন, এবং একারণে বহু জাতির ভিত্তিতে দল গঠনের জন্য তাঁরা উভয়েই যত্নশীল।

বণিক স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে দেশের মানুষ একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশান্তরে। তাই ভারত হতে দশ হাজার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ত্রিনিদাদের রাষ্ট্রনায়ক আজ ডঃ রুদ্রনাথ কপিলদেও, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত বৃটিশ গায়েনার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ছেদি জগন। ভারতে যাঁদের পিতৃভিটা আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ত্রিনিদাদ, জামাইকা, বৃঃ গায়েনা, হাইতি প্রকৃতপক্ষে আফ্রো-এশিয়ারই বিস্তৃতি। তাদের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির সংবাদ তাই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দের।

॥ কমনওয়েলথ সম্মেলন ॥

কমনওয়েলথ সম্মেলন শুরু হয়েছে লণ্ডনে। কমনওয়েলথভুক্ত পনেরটি দেশের প্রধান শাসক বা তাঁদের প্রতিনিধিরা এই উপলক্ষে সমবেত হয়েছেন লণ্ডনে। বৃটেনের ইউরোপের খোলা বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়ার যে আশংকা দেখা দিয়েছে তারই সমাধানের চেষ্টা হবে এবারের কমনওয়েলথ সম্মেলনে। একারণে এবারের সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের খোলা বাজারে বৃটেনের যোগদানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মনোভাব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

বৃটেনের যোগদান যারা সমর্থন করে তাদের মধ্যে আছে সাইপ্রাস, সিয়েরা লিওন, মালয়, মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশন।

বিশেষ কতকগুলি সর্তে যারা যোগদানের সমর্থক তাদের মধ্যে আছে নিউজিল্যাণ্ড, নাইজেরিয়া, সিলোন, পাকিস্থান, জামাইকা, ত্রিনিদাদ।

বর্তমান সর্তে যারা যোগদানের বিরোধী তাদের মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, ভারত। এ সম্বন্ধে কানাডা ও টাংগানিকার মনোভাব স্পষ্ট জানা যায়নি।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৩০শে আগষ্ট—১৩ই ভাদ্র : ত্রিপুরায় পুনঃ পুনঃ পাকিস্তানী হানার ব্যাপারে লোকসভায় প্রবল উত্তেজনা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কণ্ঠে দৃঢ় উক্তি : প্রয়োজন হইলে গুলী চালাইয়াও পাক্ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে।

ত্রিপুরা-মণিপুরে প্রভৃতি কেন্দ্র-শাসিত এলাকার জন্য আইনসভা গঠন—লোকসভায় সংবিধান সংশোধন বিল পেশ—প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলিকে 'পণ্ডিচেরী' নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত।

৩১শে আগষ্ট—১৪ই ভাদ্র : স্পীকারের (লোকসভা) নির্দেশ লঙ্ঘন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে সোস্যালিষ্ট সদস্য শ্রীরামসেবক যাদব এক সপ্তাহের জন্য সভা হইতে বহিষ্কৃত—লোকসভার ইতিহাসে অভাবনীয় ঘটনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ীর পদত্যাগ।

১লা সেপ্টেম্বর—১৫ই ভাদ্র : 'শিল্পের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির জন্য শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন'—কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের মন্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামে নূতন অধ্যাপক পদ সৃষ্টি—বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সিদ্ধান্ত।

২রা সেপ্টেম্বর—১৬ই ভাদ্র : বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত—কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র দলাদলি ও ভুয়া সদস্য সংগ্রহের অভিযোগ—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস শৃংখলা কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাব।

৩রা সেপ্টেম্বর—১৭ই ভাদ্র : জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত হওয়ার সংবাদে দিল্লীতে গভীর উদ্বেগ—ইন্দোনেশীয়দের উচ্ছৃংখল আচরণে ভারত সরকারের ক্ষোভ।

গত চার মাসে লাডাকে ৩০টি নয়া চীনা ঘাঁটি স্থাপন—ভারতের রসদ প্রেরণে বাধা : লোকসভায় সরকার পক্ষ হইতে তথ্য প্রকাশ।

রাজ্যসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের ষোড়শ রাজ্য গঠনে নাগাভূমি বিল গৃহীত।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৮ই ভাদ্র : শিয়ালদহ অঞ্চলে ছাত্র-পুলিশে খণ্ড-যুদ্ধ—ষ্টেশন ও সন্নিহিত অঞ্চলে ১৩ খানি ট্রাম গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ—সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত, দুই শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার—টিকিটের ব্যাপারে ছাত্র-রেল পুলিশ বিরোধের অপ্রত্যাশিত পরিণতি। শান্ত থাকিবার জন্য ছাত্রদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আবেদন।

ত্রিপুরা সীমান্তে প্রচুর পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ—রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিবৃতি।

ত্রিপুরা-মণিপুরে প্রভৃতি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে বিধানসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা—লোকসভায় বিল অনুমোদন।

৫ই সেপ্টেম্বর—১৯শে ভাদ্র : শিয়ালদহ এলাকার হাঙ্গামা সম্পর্কে কলিকাতায় ছাত্র-ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা—মুখ্যমন্ত্রী (শ্রীসেন) কর্তৃক ন্যায্য দাবী পূরণের আশ্বাস—শহরতলীতে কয়েকটি ছোট-খাট ঘটনা—নিবর্তনমূলক আটক-আইনে দুই দিনে তিন শত জন আটক।

সাড়ম্বরে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের ৭৪তম জন্মদিবস পালন—দিবসটি কলিকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক দিবসরূপে উদ্‌যাপিত।

॥ বাইরে ॥

৩০শে আগষ্ট—১৩ই ভাদ্র : ১লা জানুয়ারী (১৯৬৩) হইতে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি—কার্যকরী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সহ চুক্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তাব—সোভিয়েট প্রস্তাবের জবাবে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিবৃতি।

৩১শে আগষ্ট—১৪ই ভাদ্র : দীর্ঘ অধীনতার পর ত্রিনিদাদ ও টোবাগো দ্বীপের (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বৃটিশ উপনিবেশ) স্বাধীনতা লাভ।

ভারতের সহিত ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য-চুক্তি স্থগিত—এশিয়ান গেমস (জাকার্তা) ফেডারেশন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী জি ডি সোন্ধীর (ভারতীয়) ইস্রায়েল ও চিয়াং চীন-প্রীতির প্রতিক্রিয়া—খেলাধূলাকে কেন্দ্র করিয়া গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব।

১লা সেপ্টেম্বর—১৫ই ভাদ্র : পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় শতাধিক লোকের মৃত্যু—পাবনা ও রাজসাহীতে হাজার হাজার গৃহ ভূমিসাৎ—৮ হাজার বর্গমাইল জলমগ্ন—ক্ষতির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা।

ইরাণে ভয়াবহ ভূমিকম্পের (এক মিনিট স্থায়ী) ফলে ২০ সহস্র নর-নারী হতাহত—দারেশফাপান নামে একটি গ্রামেই তিন হাজার লোকের মৃত্যু—পশ্চিম ইরাণের ৮ হাজার বর্গমাইল-ব্যাপী অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড।

২রা সেপ্টেম্বর—১৬ই ভাদ্র : পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের প্রতি পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের হুঁশিয়ারী—এককভাবে (পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত বিচ্ছিন্ন অবস্থায়) দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

আলজিয়ার্সের একটি অঞ্চলে প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ—গেরিলাদের সহিত বেন বেল্লাপন্থী সৈনিকদের তুমুল লড়াই।

'চতুর্থ এশীয় ক্রীড়ার নাম পরিবর্তন হইবে না'—জাকার্তায় এশিয়ান গেমস ফেডারেশন সদস্যদের বৈঠকে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ।

৩রা সেপ্টেম্বর—১৭ই ভাদ্র : জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাসের উপর উচ্ছৃংখল জনতার আক্রমণ—সোন্ধীর (এশিয়ান গেমস্-এর নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবক) বিরুদ্ধে ২০ হাজার ইন্দোনেশীয় নর-নারীর বিক্ষোভ—মূল্যবান শিল্প-সামগ্রী, আসবাব, বাগান ধ্বংস—রাষ্ট্রদূত (ভারত) শ্রীপন্থ মর্মাহত।

এশীয় ক্রীড়ায় হকি ফাইন্যালে (জাকার্তা) পাকিস্তান দল চ্যাম্পিয়ান—ভারত ২—০ গোলে পরাজিত।

৫ই সেপ্টেম্বর—১৮ই ভাদ্র : এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত চ্যাম্পিয়ান—ফাইন্যালে দক্ষিণ কোরিয়াকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া স্বর্ণপদক লাভ।

৬ই সেপ্টেম্বর—১৯শে ভাদ্র : সর্বোদয় নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের আসাম হইতে পূর্ব পাকিস্তানে পদার্পণ—সীমান্তবর্তী গ্রাম সোনার-হাটে পৌঁছিলে পদস্থ পাকিস্তানী অফিসার কর্তৃক সম্বর্ধনা।

নেপালে বিদ্রোহী গেরিলা দল কর্তৃক থানা (ভগবানপুর থানা) ভস্মীভূত—মাদিতে সৈন্যদের সহিত ৮ ঘণ্টা খণ্ডযুদ্ধ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ সেক্‌সপীয়র বনাম বার্ণার্ডশ ॥

১৯৪৯-এ বার্নার্ড শ Farfetched Tales নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন, সেই বছরই প্রকাশিত হয় Sixteen Self Sketches. এই আত্ম-চিত্রণের মধ্যে অনেকের জীবনেতিহাস সংক্রান্ত তথ্য ছিল। আর ছিল প্রচুর জ্ঞানের কথা। তাঁর মতে তখনও ধর্মই পৃথিবীর পরিত্রাণের পথ। এর পর তিনি একটি পুতুলনাচের আঙ্গিকে নাটক রচনা করেন, তার নাম Shakes versus Shaw. শ বলেছেন সময় কাটানোর উদ্দেশ্যেই এই নাটক রচিত হয়। তারপর তিনি লেখেন সর্বশেষ নাটক Why She Would Not, সেটি একটি অসমাপ্ত চিত্রনাট্য। অসমাপ্ত ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষ কথা—"The World will fall to pieces about your ears."

Sixteen Self Sketches গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে How Frank ought to have done it অর্থাৎ তাঁর বন্ধু এবং জীবনীকার ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের কিভাবে তাঁর জীবনকথা লেখা উচিত ছিল এই প্রসঙ্গ শ লিখেছেন পরলোক-গত ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের জবানীতে। এই পরিচ্ছেদটিকে যদি বার্নার্ড শ'র মনের কথা বলে ধরা যায় তাহ'লে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। তবে বার্নার্ড শ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের উক্তি করতেন বলে তাঁর কোন্ কথা যে ঠিক আর কোন্ কথা রসিকতা তা বিচার করা কঠিন। তিনি এই প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—'Shaw plays the part of modest man only in his relations with the arts which are the great rivals ot literature. He has never claimed to be "better than Shakespears' though he does claim to be his successor." একটি ভূমিকায় তিনি প্রশ্ন-চিহ্ন দিয়ে একটি শিরোনাম দিয়েছিলেন এবং সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে নাটকে যেমন সেকস্‌পীয়র, ওপেরায় যেমন মোৎসার্ট আর ফ্রেস্কো অঙ্কনে মাইকেল এঞ্জেলো, তেমনই সেকস্‌-পীয়রকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। সেকস্‌পীয়র যা বলেননি তাও যদি কেউ এখন বলে তথাপি নয়।

১৮৯৫-এ শ যখন সর্বপ্রথম The Saturday Review পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন, সেইকালের নাট্যসমালোচনা শ'র আবির্ভাবে পেল এক নতুন আঘাত আর সেই সঙ্গে এক নতুন প্রেরণা। তাঁর সবচেয়ে সাহসিক সমালোচনা হল সেকসপীয়রের নবমূল্যায়ন। তিনি Othello-কে বললেন যে এক খেলো মেলো-ড্রামা, Cymbeline সম্পর্কে বল্লেন—"for the most part stagey trash of the lowest melo-dramatic order." বলা বাহুল্য এই সব উক্তি ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে ভীষণ পীড়া-দায়ক। এরপর বার্নার্ড শ' বল্লেন যে "Shakespeare never thought a noble life worth living or a noble work worth doing." তাঁর মতে সেকস্‌পীয়র নিয়ে একটি অপরাহ্ণ অতিবাহিত করা যায় কিন্তু তা সর্বকালিক নয়।

সম্প্রতি মিঃ এডুইন উইলসন সেকসপীয়র সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ'র সকল রকমের উক্তির একটা সংকলন সম্পাদনা করেছেন, দুশো ষাট পৃষ্ঠায় ভরা এই জাতীয় চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। মিঃ এডুইন উইলসন যে ভূমিকাটি লিখেছেন তা মূল্যবান। এই ভূমিকায় বার্নার্ড শ'র সেই বিখ্যাত উক্তি "every jest is an earnest in the womb of time" উধৃত করে বলেছেন যে বার্নার্ড শ' সেকসপীয়র সম্পর্কে যা বলেছেন তার সবটাই Jest নয়—তার মধ্যে কিছু পরিমাণে সারবত্তা বর্তমান। সেকসপীয়রীয় সমালোচক হিসাবে বার্নার্ড শ অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, প্রথমতঃ সেকসপীয়র সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানই তাঁকে সমালোচক হিসাবে সমৃদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর নাট্য-রচনায় অসাধারণ শক্তিমত্তা, আর তৃতীয়তঃ তাঁর অসামান্য গদ্য রচনা-রীতি, যার ফলে যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি এবং ভীষণ বিরোধী তাঁদেরও পড়তে হয়েছে বার্নার্ড শ'র এই শাণিত যুক্তি ও বক্তব্য।

বার্নার্ড শ'র অবশ্য বিশেষ ধরণের পক্ষপাত ছিল নব্যরীতির নাটকের প্রতি। ইবসেন এবং সেই সঙ্গে

তাঁর স্বরচিত নাটকের তিনি ঘোরতর স্বপক্ষে। সেক্সপীয়র সেই পথে বাধা, (যেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই বিখ্যাত লাইন—"সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর"), একেবারে নবীন নাট্যকারদের রাস্তার ওপর সারা পথ জুড়ে চেপে বসে আছেন। তা ছাড়া প্রাচীন রীতি এবং সংস্কারের একটা প্রতীক হলেন সেক্সপীয়র। শ বলেছিলেন—"He is to me one of the towers of the Bastille and down he must come." ডন কুইকসটের মতো শ হিরোকে নন্দিত করে সেক্সপীয়রকে নিন্দিত করেছেন, অথচ বার্নার্ড শ'র মনে হয়নি যে সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্ব কখনও অস্বীকার করতে নেই, অস্বীকৃতি তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করে, অতিভক্তি সর্বনাশ করে। শ তাঁর একটি উপন্যাসের ভূমিকায় লিখলেন—উপন্যাসটি প্রথম শ্রেণীর হয়নি বটে তবে তাঁর উপন্যাস প্রথম সারিতে এবং সেক্সপীয়রের আসন দ্বিতীয় সারিতে। শুধু বার্নার্ড শ কেন, আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলেছিলেন 'Othello'-র চাইতে "Uncle Toms Cabine" শ্রেষ্ঠ। Dramatic Opinions নামক গ্রন্থে এবং অন্যত্র বার্নার্ড শ বলেছেন সেক্সপীয়র সংগীতবিদ্ হিসাবেই মূলতঃ শ্রেষ্ঠ। শ'র কাছে 'Music' এবং 'message' যে পৃথক আর্ট তা নয়, তারা সাহিত্য-শিল্পের দুটি দিক। মহৎ কবিরা তাই সংগীতবিদ্ আর প্রয়োজনীয় কবিরা খৃষ্টীয় সুসমাচারজ্ঞাপক প্রচারক মাত্র। সেক্সপীয়রের কোনো বাণী নেই, তিনি দার্শনিক নন, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অপূর্ণ। তাহলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উৎস? শ'র সেক্সপীয়র জ্ঞান অসীম, ভিক্টোরীয় যুগের 'Bradolatry' র প্রতি তাঁর ঘৃণা, "The bradolatry I snook up was simple ignorance; the bradoleters never read him." যে সব লোক সেক্সপীয়রকে বুঝতেন তাঁদের বার্নার্ড শ সমর্থন করেছেন, যেমন ফরবেস রবার্টসন, যাঁরা বুঝতেন না, অথচ সেক্সপীয়র ভাঙিয়ে খেয়েছেন তাদের তিনি আঘাত করতেন, যথা, হেনরী আর্ভিং। সেক্সপীয়রের নাটকের যথেচ্ছ কর্তন তিনি সমর্থন করতেন না। সেক্সপীয়রের অপেক্ষাকৃত নীরস নাটক 'All's Well' এবং 'Troilus' তিনি প্রশংসা করতেন। বার্নার্ড শ'র ত্রুটী অন্যত্র, তিনি সেক্সপীয়রকে প্রথম যুগের নাটক তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেননি। তিনি ইবসেনের মাপকাঠিতে সেক্সপীয়র বিচার করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—"Shakespeare survives by what has in common with Ibsen, not by what he has in common with Webster and the rest."

বার্নার্ড শ যখন যা মনে হয়েছে তাই বলেছেন, একবার বল্লেন, "একমাত্র হোমার ছাড়া, এমন কি স্যার ওয়াল্টার স্কটও নয়, এমন কোনও প্রতিষ্ঠাবান লোক নেই যে তাঁকে আমি সেক্সপীয়রের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি।" এই উক্তির সমর্থনে আরো অনেক অবান্তর এবং অবিশ্বাস্য উক্তি তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি এইটুকু বুঝতে চাননি যে যেহেতু সেক্সপীয়রের নাটক তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয় সেই হেতু আর সব পাঠকেরও তাই মনে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যা সেক্সপীয়র অনুমান করতে পারেননি বলে একবার তিনি অনুযোগ করেছেন। বার্নার্ড শ'র মতে নাটকের উদ্দেশ্য জনশিক্ষা, কিন্তু সেই মত ভিত্তি করে সেক্সপীয়রের সমালোচনা করা কর্তব্য নয়, তা মনে হয়নি। [illegible] সম্পর্কে সেক্সপীয়রের [illegible] ধারণা [illegible] বার্নার্ড শ [illegible] করেছেন, সেক্সপীয়র ট্রাজেডি রচনা করেছেন, বার্নার্ড শ ট্রাজেডি-বিরোধী। ডঃ জনসনও King Lear-এর শেষ অংশ পড়তে পারেননি। আসলে বার্নার্ড শ ছিলেন নীতিবাগীশ, সেই মন নিয়ে গৌরব, সমর আর দৈহিক প্রেমের কোনো রকম রোমান্টিক রূপায়ন তাঁর মনে লাগত না, তিনি তার বিরোধী ছিলেন।

পূর্বেও বলেছি, বার্নার্ড শ'র প্রকৃতি ছিল দুষ্টামিতে ভরা। তিনি রঙ্গ এবং ব্যঙ্গ করেছেন সুনিপুণ ভঙ্গিতে, বলেছেন—"It is always necessary to over-state a case startingly to make people sit up and listen to it, and to frighten them into acting on it." এ কর্ম তাই তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং অভ্যাসবশে করতেন।

বার্নার্ড শ গর্বভরে বলেছেন যে তিনি সাংবাদিক। তাঁর খড়্গ তাই নাপিতের নয়, সে হল পরিত্রাণের কুঠার। বিদগ্ধ পণ্ডিতদের গোঁড়া রীতির সেক্সপীয়র সমালোচনার সঙ্গে তাঁর মিল নেই, তবে ভিক্টোরীয় যুগের মতবাদ এবং লাইসিয়ম রঙ্গমঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে (তাঁর সাপ্তাহিক মন্তব্যের পাঠকরা এইখানে সেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনয় দেখতেন।) এই সেক্সপীয়রীয় সমালোচনা ভালোই দেখায়। বার্নার্ড শ 'পণ্ডিত' বা Scholar ছিলেন না, —ঐতিহাসিক তথ্যবিচার করে তিনি অভিমত রচনা করেননি। অতিশয় বুদ্ধিমান এবং সংবেদন-

শীল মনের স্বতোৎসারিত বিচার বিশেলষণ। তিনি একবার বলেছেন, "I deal with all periods, but I never study any period but the present, which I have not yet mastered and never shall."

তবে সেক্সপীয়র সমালোচক হিসাবে বার্নার্ড শ'র রচনায় একটা সত্যের সংস্পর্শ পাওয়া যায়। ডঃ জনসনের মত বার্নার্ড শ'কে মহৎ সাহিত্য-সমালোচক বলা যায় না তার কারণ সৃজনশীল সাহিত্য নিয়ে চেতন বা অবচেতন ভাবে তাঁকে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়েছে।

এডুইন উইলসন সম্পাদিত 'Shaw on Shakespeare গ্রন্থটি বার্নার্ড শ' এবং সেক্সপীয়র-রসিক পাঠকের কাছে প্রচুর আনন্দের পসরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। *

* SHAW ON SHAKESPEARE—Edited by Edwin Wilson—(Cassel—30 Shillings).

নতুন বই

মহাকাশের পথে—(বিজ্ঞান)—ডেভিড হেনরি উড। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম চার টাকা।

বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার ইতিহাস এক বিস্ময়ের অধ্যায়। অসম্ভবকে সম্ভব করে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে দম্ভভরে। আত্মঘাতী সংগ্রামের মারণাস্ত্র আত্মজিজ্ঞাসা আর সৃজনকলার ইতিহাসকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। প্রতিটি মুহূর্তে কল্পনার বাস্তব রূপাভিব্যক্তি অতীতের স্বপ্নকে লজ্জা দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

'মহাকাশের পথে' গ্রন্থে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার দীর্ঘ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা কয়েক বৎসরে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যার যে অভাবিত উন্নতি ঘটেছে তা গত শতাব্দীর মানুষের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অভাবিত। মহাকাশে মানুষ প্রেরণের জন্য দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় মানুষ প্রধান হাতিয়ার নয়। নানাবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্র এবং কলকব্জার ওপরই নির্ভর করতে হয় অধিক মাত্রায়। টেকনিক্যাল বিষয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে মহাকাশে মানুষের ভ্রমণকে কতদূর সুখকর করে তোলা যায়। সমগ্র গ্রন্থটিতে এ সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি মোট ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে মহাশূন্যে মানুষের উপস্থিতি, অন্ধকার সীমান্ত, মাধ্যাকর্ষণজয়ী এঞ্জিন, উৎক্ষেপ অনুসরণ ও পরিচালনা, মানুষ কি মহাশূন্যে বাঁচতে পারে? পৃথিবী ছেড়ে মানুষের মহাকাশে পদার্পণ, ভবিষ্যতের প্রস্তুতি, চাঁদ এবং মহাকাশচারণ, মহতী জয়যাত্রা, মহাশূন্যের অতল গভীরে—এই অধ্যায় কয়েকটি সর্বাপেক্ষা তথ্যভারাক্রান্ত। প্রজেক্ট ফারসাইড, এক্সপ্লোরার (১-৫) পাইওনীয়ার (১—৪), এ্যাটলাস, পোলারিস প্রভৃতি রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রাদির সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক সার্থকতার পর কিভাবে মহাকাশের সীমান্তরেখা আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তার সূক্ষ্ম বিবরণও পাওয়া যাবে।

এই সমস্ত গবেষণাকালে গবেষক ও পরীক্ষকদের বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুবার স্বীকার করে নিতে হয়েছে ব্যর্থতাকে। মহাকাশের চরম শূন্যে মারাত্মক রঞ্জনরশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, আয়নিত পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রতিঘন সেণ্টিমিটারে আছে প্রায় সমভাবে বণ্টিত ১০০ আয়নিত হাইড্রোজেন পরমাণু, ইলেকট্রন, কার্বন, নানাবিধ ভারী পদার্থের আকস্মিক আয়নিত পরমাণু প্রভৃতি মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে মানুষে আজ সে বাধা কেমন করে দূর করেছে তার বিবরণও পাওয়া যাবে গ্রন্থটি থেকে।

সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি ইতিবৃত্তে পূর্ণ। সে পথে অগ্রসর হতে গিয়ে মানুষের জ্ঞানের সীমা যে কতদূর প্রসারিত হয়েছে তা গ্রন্থটি পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত এই সহজবোধ্য গ্রন্থটি আমাদের দেশের ন্যায় প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসর দেশে যে কোন পাঠকের পক্ষেই যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

শত সহস্র জিজ্ঞাসা—এম, ইলিন। অনুবাদ : প্রতিভা গাঙ্গুলী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। দাম ২·২৫ নয়া পয়সা।

আমাদের অশেপাশে নিত্যই অনেক কিছু ঘটে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা সর্বদা সচেতন থাকি না। ছোট ছেলেরা সর্বদাই অনেক ছোট-খাট প্রশ্ন করে যার কোন উত্তর আমরা সর্বদা সন্তোষজনকভাবে দিতে পারি না। যেমন সাবান দিলে কাপড় পরিষ্কার হয় কেন, দেশলাই জ্বলে কেন, কেন স্ক্রু আর কবেই বা তার আবিষ্কার হয়, উনুন জ্বালালে শব্দ হয় কেন, পাউরুটি কিভাবে তৈরী হয়, দুধ টক হয়ে যায় কেন ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন যা বড়দের মনেও অনেক সময় জাগে তার সুন্দর জবাব এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল বইয়ের গোড়ায় মানুষ মাত্র তিনশ বছর আগে চান করতে শিখেছে এই তথ্যটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের কাছে হাস্যকর। মানুষ বলতে কেবল উত্তর ইউরোপের মানুষ এই অন্ধ ধারণাই এর মূলে। বইটির ছাপা বাঁধাই ভাল।

বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ফার্মা, কে, এল, মুখোপাধ্যায়। ৬।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন। কলিকাতা—১২। দাম ৬·০০ টাকা।

ভারতবর্ষ দীর্ঘ দু'শ বছরের পরাধীনতার পর স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবাসীকে এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ সংগ্রাম ভারতের অভ্যন্তরে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লাভ করে, তেমনি বিদেশে ভারতীয়গণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশে সেই সমস্ত মুক্তিকামী ভারতীয়দের কথাই বর্তমান গ্রন্থের আলোচিত বিষয়।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় দীর্ঘকাল ভারতের বাইরে ছিলেন। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে তিনি জড়িত হন। সে সময়কার বহু স্মৃতিকথা বর্তমান গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন। মোট বারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে— আমেরিকায় সদর পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপান্ডুরঙ্গ খানখোজে, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সিং, ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্র ইন্ডিয়া হাউস, হেগ আদালতে 'সাভারকার ব্যাপার', দাদা চানজী কেরসাস্প, সুইজারল্যান্ডে ভারত-মুক্তির মন্ত্রণা, আমেরিকায় জার্মান-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র, পঞ্চনদের দ্বিতীয় শহীদ, ভারতবন্ধু জার্মান সমিতির প্রধান জার্মান অধিনায়ক, পোলান্ডের বিপ্লবী সংঘ ইউরোপে যুদ্ধের সূচনা। এই সমস্ত অধ্যায়ে ভারতের মুক্তিসাধনের যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় মূল্যবান তথ্যরূপে ব্যবহৃত হবে।

পথ চলতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় —গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। দাম ৪·৭৫ নয়া পয়সা।

আলোচ্য বইটি লেখকের স্মৃতিচিত্রমূলক কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। লেখাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিল। এগুলির মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বা কোন পারম্পর্য নেই। ছেলেবেলার কথাগুলি পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগে। এখন কলকাতায় পাঠশালা নেই। তখনকার দিনের পাঠশালার বর্ণনা আজকের পাঠকের মনে কৌতূহল জাগায় বৈকি। লেখকের বিদেশ ভ্রমণের টুকরো টুকরো কয়েকটি নকশা মনোগ্রাহী।

The Permanent Frontier: An illustrated history of the U.S. economy.

আধুনিক পৃথিবীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। ১৪৯২ সালে কৃস্টোফার কলম্বাস কর্তৃক নতুন গোলার্ধ আবিষ্কারের পর, গত সাড়ে চারশো বছরের নতুন মহাদেশের ইতিহাস নানা উত্থান পতনে, কলঙ্কে, গৌরবে সমাজবিজ্ঞানীর কৌতূহলের বিষয়। নানা জাতি, প্রজাতির, সংস্কৃতি, অধ্যবসায়, মনীষা প্রভৃতির সমন্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস বৈরিতার মধ্যে সমন্বয়ের এক আশ্চর্য উদাহরণ। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স The Permanent Frontier নামক চিত্রিত ও মনোরম গ্রন্থখানির মধ্য দিয়ে সেই বিশাল কর্ম-কাণ্ডের দীর্ঘ ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। বইখানিতে চারিটি অংশ আছে : আবিষ্কারের পর থেকে জনপ্রিয় গণতন্ত্র, পরিণতির অগ্নিপরীক্ষা এবং ক্ষমতা ও দায়িত্ব। বইখানিতে বহু মানচিত্র, তথ্যচিত্র ও চিত্র আছে। প্রচারমূলক বইও যে কত চমৎকার হতে পারে, The Permanent Frontier তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

মানুষের মত মানুষ (যুদ্ধ কাহিনী) —বরিস পলেভয়। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো। প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম ২·৫০ নয়া পয়সা।

বরিস পলেভয় একজন খ্যাতনামা সোভিয়েত কথাশিল্পী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর অধিকাংশ

গল্প বা উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সাংবাদিক হিসাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিভ্রমণকালে যে সমস্ত নোট গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে সে সমস্ত নোট অবলম্বনে তিনি গল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন। ফলে তাঁর রচনা-গুলিতে যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই সত্যকার মানুষ। রিপোর্টাজ-ধর্মী রচনা বলে এগুলিকে বিশ্লেষিত করা সম্ভব নয়। কারণ উপ-ন্যাস-এর সর্ববিধ শিল্পগুণকে এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

'মানুষের মত মানুষ' গ্রন্থখানি পলেভয়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। নায়ক বা প্রধান চরিত্র লেফটেনান্ট আলেক্সেই মারেসিয়েভকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ-জীবনের যে ভয়াবহ রূপকে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর প্রতিভারই অবদান। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সোবি-য়েত নাগরিকদের দুর্ধর্ষ সংগ্রামের কাহিনীতে গ্রন্থটি জীবন্ত। যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে যে নিদারুণ সত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তা প্রতিটি শান্তিকামী মানুষকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলবে। মহান সোবিয়েত বীর মারেসিয়েভের প্রতি আমাদের মন এক অপরিসীম শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

॥ সংকলন ও পত্রপত্রিকা ॥

দিগন্ত (আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা)—সম্পাদক : চিত্ররথ দত্ত ও পৃথ্বীশ গঙ্গো-পাধ্যায়। ২০২ রাসবিহারী এভি-নিউ, কলকাতা-২৯। দাম এক টাকা।

নবপর্যায়ে দ্বিমাসিক সাহিত্য সংকলন হিসাবে 'দিগন্তে'র আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমান সংকলনে সম্পাদকগণ পূর্বঐতিহ্য মনে রেখেই রচনাগুলি সম্পাদিত করেছেন। এই সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন সত্যজিৎ দত্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হিমেনেতের 'আমার প্লাতেরো আর আমি' অনুবাদে কল্যাণ চৌধুরী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুবীর রায়চৌধুরীর 'মুদ্রা-রাক্ষস' নামক আলোচনাটি একটি মনোজ্ঞ রচনা। একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন মিহির সিংহ। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্রের মুদ্রণ-প্রয়োজনীয়তা কোথায় বোঝা গেল না।

ছোটগল্প (চতুর্থ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক : লালমোহন দাস ও সুভাষ বসু। ১৯।৪ নয়ন-চাঁদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

একমাত্র গল্প এবং গল্প-সংক্রান্ত আলোচনা নিয়েই 'ছোটগল্প' প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় গল্প লিখেছেন অমলেন্দু চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, ভানু চট্টোপাধ্যায় ও মিহির পাল। 'কল্লোল'-পূর্ব ছোটগল্পের ধারা ও উত্তরাধিকার' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন বুদ্ধজীবন চক্রবর্তী। সাম্প্রতিক কালের তিনখানি উপন্যাস নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন সুবন্ধু ভট্টাচার্য। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

পরিচয় (ভাদ্র সংখ্যা)—সম্পাদক : গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যাটি পরমাণু ও শান্তি সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন 'তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা' সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা রয়েছে—'তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত ও মানবজাতির বিপদ', 'পরমাণু ও পারমাণবিক শক্তি' 'শান্তির সংগ্রামে ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্য', 'সোভিয়েত রাশিয়া এবং নিরস্ত্রীকরণ', 'নিরস্ত্রী-করণের সমস্যা', 'নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থ-নৈতিক পুনর্বিন্যাস', 'যুদ্ধবিরোধী চলচ্চিত্র', 'আবার বিশ্বমনীষী-সংগমে'। প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন পাবলো পিকাসো। তাছাড়া তাঁর একটি আর্টপ্লেটও রয়েছে।

ব্যালে

আমাদের সামনে মস্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে 'হংস সরোবরের' নৃত্য। ইংরেজীতে একে বলা হয় 'সোয়ান্ লেক ডান্স'। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া এটি নাকি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। মঞ্চের উপর চতুর্দিক অরণ্য সমাকীর্ণ, প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ। সেখানকার নির্জন একটি সরোবরের সলিলে একটি কিংবা দুটী হংস এবং প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি বন-হংসী, রমণীয় নৃত্যে আত্মহারা। এটি পরিকল্পনা করেছেন রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার চেকভস্কি। এর মধ্যে একটি কাহিনী লুক্কায়িত, সেটি ক্বচিৎ কলকাকলীর মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

চোখের সামনে যেটি দেখছি, সেটি দৃশ্যতঃ পরম রমণীয় এবং উপাদেয়, কিন্তু কার্যতঃ সেটি কলাকৌশলপূর্ণ দুরন্ত ব্যায়াম-ক্রীড়া বা জিমনাষ্টিক। প্রত্যেকটি হংসীর পাখা উঁচু হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে, সে পাখা বন্ধ হয় না। হংসীদলের অধোমাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন কিনা এটি দূরের থেকে নিরীক্ষণ করার জন্য অনেকে তিন রুবল ভাড়া দিয়ে কাউণ্টার থেকে এক-একটি বায়নোক্যুলর সঙ্গে এসেছেন। সেই সকল হংসীর এক একটিকে উঁচিয়ে এবং ঘুরপাক খাইয়ে

উল্লানভা

ব্যালে

রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী

কোলে, পিঠে, পায়ে, মাথায় এবং দেহের নানা আঁকে-বাঁকে যেভাবে মোচড়ানো, দোলানো, মচকানো এবং ঘোরানো হচ্ছে সেটা দ্রষ্টব্য। এই সকল কর্ম যিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছেন, তিনি পুরুষ-হংস। 'হংসীগণের' লজ্জাঙ্গ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা আমার দেখতে বাকি ছিল।

(প্রবোধকুমার সান্যাল : রাশিয়া'র ডায়েরী)

কালাপানি যাঁরা পার হবেন না ব্যালে তাঁদের প্রত্যেকেরই দেখতে বাকী থাকবে। হোটেল, ক্যাবারে এবং পশ্চিম-ঘেঁষা ক্লাবগুলির কল্যাণে সিন্ধুপারের নৃত্যকলা কিছু কিছু আমরা দেখেছি বটে, কিন্তু খাঁটি ব্যালে নাচ আমাদের দেশে বিশেষ অনুষ্ঠিত হয় না। ইয়োরোপীয় নৃত্য-কলায় ব্যালের মর্যাদা একেবারে শীর্ষে। ব্যালে নর্তকীর সম্মানও রাজকীয়। প্রাইমা ব্যালেরিনার সম্মান এপর্যন্ত পাঁচজন পেয়েছেন। ব্যালে শুধু নৃত্য-কলাই নয়, নৃত্য-নাট্যও। সংগীত, নৃত্য এবং আবৃত্তির মাধ্যমে ব্যালে নাচের নায়ক-নায়িকারা একটি কাহিনীকে মঞ্চে রূপায়িত করেন। এবং তাঁদের সহভূমিকায় থকেন 'সোলোইস্ট', 'ক্লপস ডি ব্যালে' শ্রেণীর নর্তকীরা। ব্যালে নাচের অনুষ্ঠানে আয়োজন করতে হয় অনেক। বলশই (কথাটার অর্থ বিরাট) থিয়েটার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যালে-মঞ্চ। বলশই ব্যালে-সম্প্রদায়ে শিল্পীসংখ্যা দুশো, শিক্ষার্থী তিনশো জন। যন্ত্রশিল্পী এবং সংগীত-শিল্পীর সংখ্যাও প্রায় নৃত্য-শিল্পীদের অনুরূপ। তা-ছাড়াও মঞ্চসজ্জা এবং আলোক-সম্পাতের জন্যে নেপথ্যের জনসংখ্যাও কম

নয়। আমাদের দেশে ব্যালে নাচের প্রচার এবং প্রসার না হওয়ার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ ব্যালে অনুষ্ঠানের ব্যয়-বাহুল্য। অবশ্য ইংল্যান্ড যদি ব্যালে নৃত্যের ধাত্রীভূমি হত আমরা ব্যালেতে আসক্ত হলেও হতে পারতাম হয়ত, কারণ পশ্চিমী নৃত্যগীতের মঞ্চ-প্রদীপ ইংরেজরাই এদেশে প্রথম জেবলেছিল। ইংল্যান্ডে ব্যালের আবির্ভাব হয় অপেরারো পরে, অষ্টাদশ শতকে। ব্যালের জন্মভূমি ইতালী। ফ্রান্সের কয়েকজন সম্রাটও পরে ব্যালে নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ লুই নিজেরাও ব্যালে নাচে অংশ গ্রহণ করতেন। ফরাসী রাজ-দরবারে ব্যালের আদর পরে কমে গিয়েছিল চতুর্দশ লুই মোটা হয়ে যাওয়ার ফলে। মেদবহুল শরীরে আর ব্যালে নাচে অভিনয় করতে পারতেন না তিনি। ফলে পারিষদবর্গও রাজাকে তুষ্ট করবার জন্যে

'নোয়ে ভড়োস' ব্যালের একটি দৃশ্যের নৃত্যাভিনয়। অংশ গ্রহণ করেছেন হ্যাকেস ভোরার এবং গাঁসিলা অ্যাম্ব্রোস

হেনরিখ হাইনের বিখ্যাত কবিতা 'ডের ডকটর ফউস্ট' অবলম্বনে পশ্চিম জার্মানীর ভেরসার এখ্ 'এরাক্সাশ' নামে ব্যালে তৈরী করেছেন। বর্তমান ব্যালে দৃশ্যটিতে উরসেলা কেইন, 'আর্চপোসা' এবং নরবার্ট থীল, 'ডঃ ফউস্টের' ভূমিকায় অভিনয় করছেন

ব্যালে নাচের চর্চা ছেড়ে দিলেন। তখন ফরাসী দেশে কেবলমাত্র স্কুল-কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় ব্যালে নাচের অনুষ্ঠান হত। এই নৃত্যে মহিলা শিল্পীর ভূমিকা প্রধান হলেও প্রারম্ভকালে মহিলারা এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। পুরুষরাই তখন ছিলেন ব্যালে নাচের নায়ক। সুরকার লালীই ফ্রান্সের ব্যালে-মঞ্চে মহিলা শিল্পীর পদপাত ঘটান। ১৬৮১ সালে শ্রীমতি লাফন্টেন ব্যালে নৃত্য-শিল্পী হিসেবে ফরাসী দেশে স্বীকৃতি পান। ব্যালে নাচের বর্তমান আঁটো পোশাকটিও ক্রমবিবর্তনের ফল। আগে পোশাকটির দৈর্ঘ ছিল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। পাতলা ওড়নাও থাকত। প্যারিস অপেরার জনৈক সজ্জাকর ব্যালে নর্তকীদের পোশাক হাঁটুর ওপর তুলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন দেশে। বর্তমানে ব্যালে নৃত্য ত্রিধারায় তরঙ্গে : ইটালীয়ান, রাশিয়ান এবং বৃটিশ। রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যধারার জননী কিন্তু বিশ্বখ্যাতা নর্তকী ইসাডোরা ডানকান। ১৯০৭ সালে ইসাডোরা সেন্ট পীটার্সবার্গে নৃত্য প্রদর্শন করেন প্রথম। সুরকার মাইকেল ফকীন এবং সেরগি ডায়াঘিলেভ ডানকানের প্রভাবে রাশিয়াতে নব-নৃত্য-ধারার সূত্রপাত করেন। 'ফকীন ব্যালে' নামটি রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যে মাইকেল ফকীন-এর অসামান্য অবদানের শ্রেষ্ঠ স্মারক। 'দি সোয়ান' ব্যালে নৃত্যনাট্যটি ফকীনের সৃষ্টি। উর্ধ্বতিবর্ণিত 'সোয়ান লেক ডান্স' ব্যালে সম্ভবতঃ ফকীনেরই ছায়া অবলম্বনে।

দি প্রিন্সেস অ্যান্ড দি সেভেন নাইটস

অনেক দিন আগে। এক দেশে এক রাজকন্যে ছিল। রাজকন্যের রূপ যেন শরৎকালের শিশির ধোয়া সকাল। কিন্তু হিংসুটে জারিনার রাজকন্যের রূপ আর সহ্য হয় না। রাজকন্যেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ফন্দী আঁটতে থাকেন তিনি। জার জানতে পারেন সে খবর। তখনই রাজকন্যেকে রাজ্য থেকে নিরুদ্দেশের পথে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। রাজকুমার কি আর স্থির থাকতে পারেন। রাজকন্যের জন্যে মন তার আকুল হয়ে ওঠে। রাজকুমারও বেরিয়ে পড়েন রাজকন্যের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে শ্রান্ত রাজকুমার হতাশ হন না। এক সময় হাজির হলেন সাত 'নাইটস' মধ্যে। পেলেন সেখানে হারিয়ে যাওয়া রাজকন্যাকে। আর তারপর! তারপরের কথা তো আপনিও জানেন। আমিও জানি। সকলেই জানে.....................

পূর্ব জার্মানীর স্টেট ব্যালের ছাত্ররা "দি প্রিন্সেস এ্যান্ড দি সেভেন নাইটস" রূপকটি জার্মান স্টেট অপেরায় অভিনয় করেন। স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত ব্যালে নৃত্য এই প্রথম স্টেট অপেরায় অভিনয়ের সম্মান অর্জন করল। আবহ-সংগীত পরিচালনা করেছেন বের্লিন স্টেট অর্কেস্ট্রা। রাজকুমারীর ভূমিকায় রিটা-বেলায়, শুধু সাত নাইটকেই মোহিত করেন নি, দর্শকদেরো।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

পদকের অপর পিঠ ঃ

যথার্থ শিল্পসৃষ্টি তাকেই বলি, যা সত্যকে ঘোষিত করে, মঙ্গলের সূচনা করে, সৌন্দর্যকে রূপায়িত করে। বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের বহু শিল্প-সৃষ্টিকেই 'সত্য, শিব, সুন্দর'-এর পূজো করতে দেখা গেছে ব'লেই বাঙলাদেশে তোলা ছবি এমন একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যা ভারতের অপরাপর রাজ্যে প্রস্তুত ছবির পক্ষে সুদূর-পরাহত। বিশ্বের দরবারে বারংবার জয়মাল্য লাভের সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে বাঙলাদেশে তোলা ছবিই। এ সবই জানা কথা। শুধু এই কথাটাই খুব কম লোকই জানেন এবং কোনোক্রমে জানলেও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, এ হেন গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের অস্তিত্ব আজ যথার্থই বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে অন্ততঃ দু'জন মন্ত্রী—বাণিজ্য, শিল্প ও সমবায় মন্ত্রী তরুণ-কান্তি ঘোষ এবং প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলে এই শিল্পের সংকট নিয়ে সম্প্রতি তাঁদের মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত করতে শুরু করেছেন দেখেও কাউকে কাউকে—এবং তাঁরা রাস্তার রাম-শ্যাম-মধু-যদু নয়, রীতিমত গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তি—বলতে শুনেছি, সঙ্কট-ফঙ্কট বাজে কথা, আসলে এটা হচ্ছে ঐ মন্ত্রিদ্বয়ের জনপ্রিয়তা অর্জনের কৌশলপূর্ণ প্রয়াস। গেল শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটাণ্ডায় বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ঘোষিত হয়েছে,

গীতাঞ্জলি পিকচার্সের 'বিশ সাল বাদ' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রহমান

বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকট-পূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে দ্রুত অনুসন্ধান-কার্য চালানোর জন্যে একটি তিন সদস্য-বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্যানির্ণয় সমিতি গঠিত হবে। এবং এই সমিতি যাতে ছ' মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতে পারেন, সেই মত নির্দেশ দেওয়া হবে। যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্ত্রী মহোদয়রা তাঁদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন এবং বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁদের সাহায্যহস্ত প্রসারিত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা' শোনবার পর এ-ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। মাত্র আশা করব, তাঁদের এই শুভ প্রচেষ্টা যেন জয়যুক্ত হয় এবং বলব, তাঁদের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করবার জন্যে আমরা সব সময়েই প্রস্তুত থাকব।

বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের সংকট সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা অমৃত'-এর প্রেক্ষাগৃহ স্তম্ভে বহুবার আলোচনা করেছি (১ম বর্ষ—৬ষ্ঠ, ৮ম, ১৬শ, ৪৯শ সংখ্যা এবং ২য় বর্ষ—৩য়, ১৪শ, ১৬শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতেও আমরা চলচ্চিত্র-শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা করেছি—১ম বর্ষ—৩৮শ এবং ৪৮শ সংখ্যায়। ১৯৬১ সালের ১৬ই জুন প্রকাশিত ১ম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যায় আমরা সব শেষ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলুম, "একটুও কালবিলম্ব না ক'রে এই শিল্পটিকে কি উপায়ে সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করতে অনুরোধ করি।" আর ১৯৬২ সালের ২৫এ মে তারিখে প্রকাশিত ২য় বর্ষ—৩য় সংখ্যায় লিখেছিলুম, কোনো ছবি প্রস্তুতের জন্যে কাঁচা ফিল্ম ক্রয়ের অনুমতি দেবার সুপারিশ করবার সময়ে "পরামর্শ-সমিতির কি দেখা প্রয়োজন নয়, (কাঁচা ফিল্মের জন্যে) আবেদনকারীর এমন আর্থিক ব্যবস্থা আছে কিনা, যার দ্বারা তিনি ছবিটির সম্ভাব্য ব্যয়ের সম্মুখীন হ'তে পারবেন? গল্প নির্বাচন ইত্যাদির যোগ্যতার কথা না হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার অজুহাতে নাই তোলা হ'ল, কিন্তু আর্থিক যোগ্যতার প্রমাণ দেবার জন্যে প্রত্যেক হবু-প্রযোজককেই আহ্বান

করা অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই প্রয়োজনীয়। চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদের সমূহ অপব্যয় রোধ করতে হ'লে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।"

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীএস কে পাতিলের নেতৃত্বে যে চলচ্চিত্র-অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়েছিল, তার প্রথম সুপারিশ ছিল, একটি ফিল্ম কাউন্সিল গঠন করা। কি ধরনের ছবি তৈরী হবে, তা থেকে শুরু ক'রে সেই ছবিতে কত খরচ হওয়া উচিত, সারা ভারতে কতগুলি স্টুডিও চালু থাকা দরকার, দর্শক অনুপাতে ভারতের বিভিন্ন শহর বা গ্রামে কতগুলি এবং কি ধরনের চিত্রগৃহ থাকবে, দেশে এবং বিদেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা বাড়াবার জন্যে কি করা দরকার ছবির আয় প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শকের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা সঙ্গত প্রভৃতি সব রকম খুঁটিনাটিই দেখতে হবে ঐ ফিল্ম-কাউন্সিলকে।

পশ্চিমবঙ্গেও এই রকম একটি ফিল্ম-কাউন্সিল গঠনের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। যে-কোনও লোক মাত্র নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে চলচ্চিত্র-প্রযোজক সেজে বসবেন, এই প্রথাকে বন্ধ করতেই হবে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকখানি বাঙলা ছবি দেখবার পর আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের বর্তমান দুর্দশার জন্যে আমাদের তথাকথিত প্রযোজকদের দায়িত্বও কম নয়। শুনেছি, বিগত যুগের জমিদাররা নৌকো ক'রে নদীপথে যেতে যেতে জলের মধ্যে একটি একটি ক'রে রৌপ্যমুদ্রা ফেলে (একে বলে, 'টুবুক' খেলা) তার জল-পড়ার আওয়াজ উপভোগ করতেন।
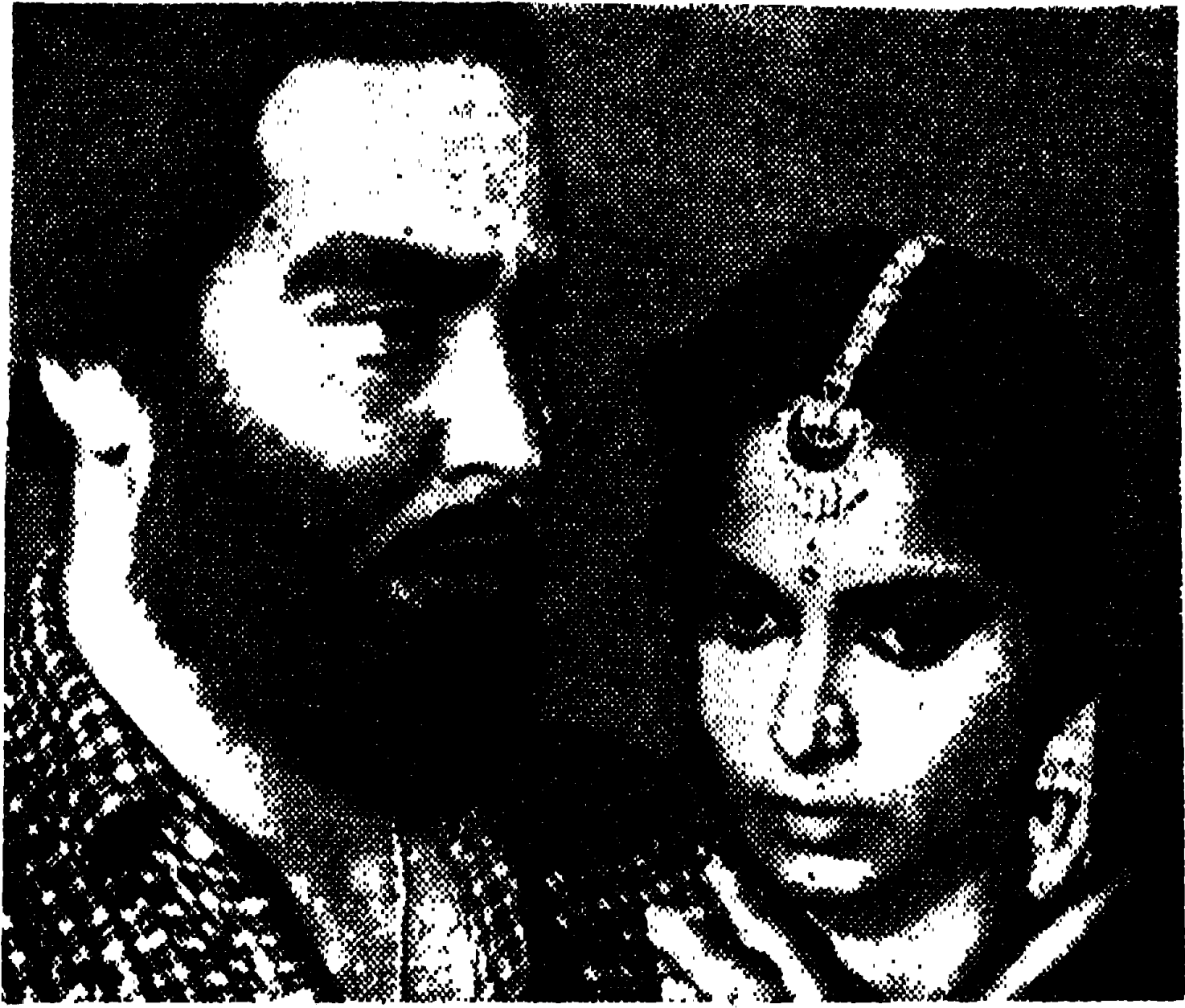
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অভিযান" চিত্রের দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ওয়াহিদা রেহমান

আজও বহু লোক বহু রকমে টাকা উড়িয়ে থাকেন। ঠিক সেই রকম ভাবেই কোনও লোক যদি নিজের টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে একখানি বাঙলা ছবি তৈরী ক'রে সেখানিকে নিজের বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে নিজের বাড়ীর হলঘরে বারংবার পর্দায় প্রতিফলিত দেখেন, কিংবা তা দিয়ে বহ্ন্যুৎসব করেন, তাহলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে যে, তাতে আমাদের বিশেষ কিছু আপত্তি করবার নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ফাঁকিটা ধরা পড়ে যাবে। যে-সময়ে একখানি ভালো ছবি তৈরী হ'তে পারত, আমাদের স্টুডিও, শিল্পী, কলাকুশলীদের সেই মূল্যবান সময়টা তো তিনি নষ্ট করেইছেন, তার ওপর বিদেশী মুদ্রার টানাটানির সময় তিনি অযথা কাঁচা ফিল্ম, রসায়ন দ্রব্য ইত্যাদিও খরচ করেছেন। এবং এই যথেচ্ছ অধিকার তাঁর থাকা উচিত নয়। এর ওপর যদি তাঁর খেয়ালখুশী মত তোলা ছবিখানি সাধারণ চিত্রগৃহে মারফত মুক্তি পায়, তা হ'লে যে-ক'জন লোকই নতুন ছবি দেখবার মোহে বা বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলে সেই ছবি দেখতে যাবে, তাদের পয়সা, সময় এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করার দায়িত্ব থেকে তিনি কোনোক্রমেই মুক্তি পেতে পারেন না। মনে রাখতে হবে, খেয়ালখুশী মতো চিত্র-প্রযোজনা আজকের দিনে একটি পুরোপুরি অসামাজিক কাজ। সকলেই স্বীকার করেন যে, জনমানসের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অসামান্য। তার ওপর চলচ্চিত্র হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহক। আজ একটি দেশের চলচ্চিত্র দেখে সেই দেশের সভ্যতার বিচার হয়। এবং আমরা বিশ্বাস করি, চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব, যার ফলে ব্যবসায়িক সাফল্যপূর্ণ জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব না হ'লেও শিল্পের দিক দিয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর মানের চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকবে। গোড়াতেই বলেছি যথার্থ শিল্পসৃষ্টি সত্যকে ঘোষিত করবে, মঙ্গলকে সূচিত করবে, সৌন্দর্যকে রূপায়িত করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় বাঙলা চলচ্চিত্র-জগত যেন এই রকম শিল্পসম্মত চিত্রই সাধারণকে উপহার দিতে পারে।

মঞ্চাভিনয়

প্রয়োগাচার্য শ্রীকালিদাসের "পরিত্রাণ" :

গেল ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার দক্ষিণ কলকাতার কালিকা রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগাচার্য সেবক শ্রীকালিদাস নিবেদিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' নাট্যাভিনয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ থেকে এই ইঙ্গিতই যেন পাওয়া গেল যে, শ্রীকালিদাস আবার বহুদিন পরে কালিকা রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়-আসর বসাবার আয়োজন করছেন। অত্যন্ত সুসংবাদ! আজ যখন নাট্যানুশীলন করবার এবং নাট্যাভিনয় দেখবার আগ্রহ বহুগুণে বেড়ে গেছে, তখন দক্ষিণ কলকাতায় একটি নিয়মিত পূর্ণাবয়ব রঙ্গালয়ের অভাব নাট্যামোদী মাত্রেই অনুভব করছিলেন। কালিকাতে নিয়মিত অভিনয় ব্যবস্থা চালু করলে সেবক শ্রীকালিদাস সকলেরই ধন্যবাদার্হ হবেন। মনে পড়ে, ও'রই ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে এই কালিকা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং এই কালিকা রঙ্গমঞ্চেই সাফল্যের সঙ্গে 'যুগদেবতা', 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। পরে কি কারণে জানিনা, কালিকা থিয়েটার কালিকা সিনেমায় রূপান্তরিত হয় এবং দক্ষিণ কলকাতায় নিয়মিত অভিনয়ের আসর হয় বন্ধ। তাই কালিকার পুনরুদ্বোধনের কথা শুনে আমাদের আনন্দের অবধি নেই।

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'পরিত্রাণ'-এর মঞ্চাভিনয় আমরা আংশিকভাবে দেখেছি; তাই অভিনয় সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা অসমীচীন হবে। শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই অপরিচিত ও নবাগত। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম মঞ্চাবতরণের পক্ষে ভালই অভিনয় করেছেন বলতে হবে; বিশেষ ক'রে উদয়াদিত্য ও সুরমার ভূমিকায় যথাক্রমে প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপ্তি ভট্টাচার্যের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ ব'লেই মনে হ'ল। বসন্ত রায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাম চৌধুরী; এককালে দক্ষ অভিনেতা হিসেবে তাঁর যে চাতুর্য প্রদর্শনী করতেন, বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সেও তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেল। ধনঞ্জয় বৈরাগীরূপে সৌমেন মুখোপাধ্যায় বহু রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন; কিন্তু মঞ্চোপযোগী উচ্চ দরদী কণ্ঠের অভাবে তাঁর সঙ্গীতগুলি আশানুরূপ আবহের সৃষ্টি করতে পারেনি।

মঞ্চসজ্জায় কোনো নতুন এবং অভিনব উপস্থাপনার প্রয়াস দেখলুম না। বর্তমানের রুচি অনুযায়ী প্রয়োগপদ্ধতি অবলম্বন ক'রে নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের আনন্দবিধান করুন, প্রয়োগাচার্য সেবক শ্রীকালিদাসকে এই অনুরোধই করব।

বিবিধ সংবাদ

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সভা :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জীবনে এই প্রথম দেখা গেল যে, বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের দুরবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটাণ্ডায় একটি সভা আহ্বান করলেন প্রচার ও আবগারী মন্ত্রী মহোদয়। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে গেল শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভাটিতে বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বহু প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সাংবাদিক এবং সরকারী তরফে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে ঐ সভা আহ্বান করবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করবার পর সভাপতির অনুরোধে সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, কানন ভট্টাচার্য, শ্যামলাল জালান, দেবকীকুমার বসু, অসিত মুখোপাধ্যায় এবং শিশির মুখোপাধ্যায় সভাস্থলে বক্তৃতা করেন। বাঙলা ছবিকে বাঁচাবার দায়িত্ব অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে, এই কথা জোরের সঙ্গে প্রকাশ ক'রে প্রবীণ পরিচালক-প্রযোজক দেবকীকুমার বসু বলেন, "ছবির কথা বড়, না মানুষের কথা বড়? সরকার যদি মানুষের কল্যাণ চান, তাহ'লে বাঙলা ছবিকে বাঁচাবার দায় তাঁদের। বাঙলার মত সাহিত্য কোথায়, সংগীত কোথায়? বাঙলার সব আছে, তবু বাঙলা ছবি মরবে কেন? যেমন খাদ্যের বা স্বাস্থ্যের জন্যে করছেন, ঠিক সেই রকমভাবেই তাঁরা বাঙলা ছবির জন্যে করবেন; তার জন্যে যে-অর্থের, যে-সাহায্যের প্রয়োজন, তা তাঁদের দিতেই হবে—মানুষ এবং জাতির কল্যাণের জন্যে এ দায়িত্ব তাঁদের নিতেই হবে।"

সব শেষে মাননীয় মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ সভাপতিরূপে বলেন, "বাঙলা ছবি এবং বাঙলা দেশে তোলা হিন্দী ছবি একদিন সারা ভারতে আদর পেয়ে এসেছে। আজ আর বাঙলাদেশে হিন্দী ছবি তোলা হয়না—বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এ-ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে; কাজেই কলা ও শিল্পের দিক দিয়ে বাঙলাদেশের ওপর বেশ খানিকটা আঘাত লাগছে। শুধু তাই নয়, বাঙলায় তোলা ছবি বাঙলাদেশেই কম দেখানো হচ্ছে—এমন কি, খোদ কলকাতা শহরেই ঐ অবস্থা। এর প্রতিকার করতেই হবে। চলচ্চিত্রের আয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টন-ব্যবস্থাও কতদূর সম্ভব, তাও দেখা দরকার। ভালো স্টুডিও ভালো সাজ-সরঞ্জামের জন্যে সরকারী সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার কথাও আমরা চিন্তা করব। বাঙলাদেশে আবার হিন্দী ছবি করবার জন্যে কোনো যৌথ ধন-ভাণ্ডার সৃষ্টি করা যায় কিনা, তাও চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। মোটকথা, ঐতিহ্যময় বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে শুধু বর্তমান সংকটের হাত থেকেই বাঁচানো নয়, তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কি উপায়ে সম্ভব, তা হবে সরকারের লক্ষ্য।" এবং এই উদ্দেশ্যে কালবিলম্ব না ক'রে সরকারের তরফ থেকে একটি তিন

অগ্রগামী পরিচালিত মুক্তি প্রতীক্ষিত "নিশীথে" চিত্রের একটি আবেগ-স্পন্দিত মুহূর্তে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু

সদস্যাবিশিষ্ট উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য-নির্ণয়-সমিতি গঠিত হতে চলেছে, এই ঘোষণা করা হয় সভার শেষে।

৪র্থ বার্ষিক আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব :

গেল সোমবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্ট প্রেক্ষাগৃহে চতুর্থ বার্ষিক আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডঃ বি, গোপাল রেড্ডী। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শিশুমনকে কাঁচা ফিল্মের সঙ্গে তুলনা করেন—যা-কিছু তারা দেখে, তাই তাদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। তাই তাদের আনন্দবিধানের জন্যে যে-চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়, তাতে যেন এমন কোনো জিনিস স্থান না পায়, যা তাদের পক্ষে ক্ষতি-কর।

এই উৎসব চলবে ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায়। অন্ততঃ ৪৪টি দেশ থেকে ২৫০টিরও বেশী চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে আমাদের দেশের ৬০০টি স্কুলের ১,২৫,০০০ বালক-বালিকাদের দেখাবার জন্যে। এ ছাড়া আসছে ২৩এ সেপ্টেম্বর এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়মে একটি আন্তর্জাতিক শিশুমেলার আয়োজন করা হয়েছে।

"শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ"-এর এই বিরাট উৎসবসূচী যথার্থই অভূতপূর্ব।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর ... . 'বিশ্বরূপা পুরস্কার' লাভ :

গেল শনিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাত থেকে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ১৯৬২ সনের 'বিশ্বরূপা পুরস্কার' লাভ করলেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর বাঙলা রঙ্গমঞ্চে বিশিষ্ট দানের স্বীকৃতি স্বরূপ কোনো বরেণ্য ব্যক্তিকে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী 'বিশ্বরূপা পুরস্কার' দানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই অনুযায়ী এই প্রথম বছর এই পুরস্কার দেওয়া হ'ল। ১,১০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি সুদৃশ্য স্বর্ণপদক হচ্ছে ১৯৬২ সালের 'বিশ্বরূপা পুরস্কার'।

সুরঙ্গমার অনুষ্ঠান

রবিবার ১৯শে আগষ্ট শ্রীশিক্ষায়তন হলে 'সুরঙ্গমা'র শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্র-নাথের 'শ্রাবণ গাথার' অভিনয় করেন। প্রধান অতিথি শ্রীঅপূর্বচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন যে, শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনার গুণে কলকাতায় শুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে চর্চা 'সুরঙ্গমা'র মত প্রতিষ্ঠান করে যাচ্ছেন, তা হারমোনিয়মসহযোগে অশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চার যুগে সত্যিই বিস্ময়কর।

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার 'সুরঙ্গমা'য় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে বিশেষ শিক্ষাদান করেন, তাতে পাঠ্যক্রম অনুসরণ না করেও অগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সঙ্গীতের বিশেষ সাধনা করতে পারেন।

অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শৈলজাবাবু। সুঅভিনয়ে, নৃত্যে ও সমবেত গানে অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। একক সঙ্গীতে নীলিমা সেন, নমিতা চৌধুরী, প্রসাদ ভট্টাচার্য-এর গান সবিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

কুমারী পূর্ণিমা সিংহ, শিখা গুহ, জয়শ্রী চৌধুরীর নৃত্য মনোজ্ঞ হয়।

বিভিন্ন ভূমিকায় প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, অনীশ ঘটক ও সুপ্রিয়া রায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে সর্বশ্রী ব্রজবাসী সিং, অজিত রায় ও ধ্রুব পাণ্ডা প্রভৃতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন।

কালীঘাট কমার্শিয়াল কলেজ ছাত্র সংস্থা কর্তৃক 'পুরাতন ভৃত্য' :

গেল মঙ্গলবার, ১১ই সেপ্টেম্বর মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে কালীঘাট কমার্শিয়াল কলেজ ছাত্র সংস্থা রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'-এর অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত নাট্যরূপটি মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন যথাক্রমে ডঃ হেমেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত ও সুসাহিত্যিক শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

শনিবার ২৫শে আগষ্ট আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস রঙ্গমঞ্চে জিওলজি-ক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাব কর্তৃক অমিত মৈত্র ও শম্ভু মিত্র রচিত কাঞ্চনরঙ্গ নাটকটি অভিনীত হয়।

পঞ্চুর ভূমিকায় শক্তি ব্যানার্জি সুন্দর অভিনয় করেন। তরলার ভূমিকায় স্বপ্না মুখার্জির বাচন-ভঙ্গীতে জড়তা থাকার দরুণ অভিনয়ে কিছুটা আড়ষ্টতা চোখে পড়েছে। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী যথাক্রমে ক্ষিতীন রায়চৌধুরী ও পুষ্প ব্যানার্জি এবং সীমারূপী নমিতা চক্রবর্তী যথোপযুক্ত অভিনয় করেন। বটুর ভূমি-কায় প্রণব ঘোষাল যথেষ্ট হাস্যরসের উদ্রেক করেছেন। অন্যান্য ভূমিকা চলন-সই।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা :

প্রভা পিকচার্সের পরবর্তী ছবি 'ত্রিধারা'। 'দাদাঠাকুর' চিত্রগ্রহণ শেষ করে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় তাঁর নতুন ছবি—ত্রিধারা-র কাজ আরম্ভ করেছেন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী। কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন অসিতবরণ, কালী ব্যানার্জি, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী, অনুভা গুপ্তা, ভারতী দেবী ও রেণুকা রায়। এ ছবির সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বনফুলের রচনা আর একটি কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে। 'নবদিগন্ত'—কাহিনী অবলম্বনে 'দেখা হল' চিত্রটি পরিচালনা করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী, তরুণ পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এ ছবিরও সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এ মাসের শেষেই প্রথমে তিনি সংগীত গ্রহণ করবেন। তারপর পুজোবকাশের পরেই ছবির দৃশ্য-গ্রহণ আরম্ভ করবেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। চিত্র-গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার জন্য মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, সুবোধ রায় ও প্রসাদ মিত্র। এ ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পার্শ্ব চরিত্রের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সুলতা চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জি, অনুভা গুপ্তা, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, অনুপকুমার, ভানু ব্যানার্জি, ছবিধন, অজিত চ্যাটার্জি, গীতা দে, অপর্ণা দেবী, সন্তোষ ঘোষাল ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রাম্য জীবনের সাধারণ মানুষের প্রত্যহের জীবন নিয়ে 'মেঘলা আকাশ' কাহিনী-চিত্রটি রচিত হয়েছে। ছবির চিত্রায়নে ব্রতী হয়েছে নবগঠিত চিত্র-প্রযোজন সংস্থা অমল দত্ত ইউনিট। এ সংস্থার অন্যতম পরিচালক শ্রীদত্ত সোনারপুর, বারুইপুর ও মেদিনীপুর অঞ্চলে বহির্দৃশ্যের চিত্র-গ্রহণ শুরু করেছেন। মুখ্য ভূমিকাগুলিতে রূপদান করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, নীতিশ মুখার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, দ্বিজু ভাওয়াল, সোমা, তপতী ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, শম্পা ও নিভাননী। এছাড়া নেপথ্যের কলাকুশলীদের মধ্যে দায়িত্ব নিয়েছেন সংগীতে ননী মুখার্জি, আলোক-চিত্রে বিজয় দে ও শান্তি দত্ত ও সম্পাদনায় শিব ভট্টাচার্য।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সম্প্রতি মেলোডি ইণ্টারন্যাশনাল প্রযোজিত 'বনানী কন্যা'-র চিত্র-গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ভার

গ্রহণ করেছেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী। অরণ্য-জীবনের এ কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন ভারতী রায়, অসীমকুমার, অনিল চ্যাটার্জি, মঞ্জুলা সরকার, ধীরাজ দাস, অপর্ণা চক্রবর্তী ও কবিতা সরকার। এ ছবির সংগীত একটি অন্যতম আকর্ষণ, সংগীত পরিচালনা করেছেন চিন্ময় লাহিড়ী।

বোম্বাই :

বদরিনাথ দর্শনে নয় প্রযোজক ও পরিচালক এন এ আনসারী 'মুলজিম' চিত্রের জন্য হৃষিকেশ-বদরিনাথের দর্শনীয় যাত্রা-দৃশ্যটি গ্রহণ করে সম্প্রতি বম্বে ফিরেছেন। দীর্ঘ দু'মাস ধরে ক্যামেরা আর শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে মহাতীর্থ এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দুরূহ দৃশ্য তুলে পরিচালক মনোরঞ্জনের একটি নতুন প্রয়াসের সন্ধান দিয়েছেন এই ছবিতে। গংগার সমতল থেকে দশ হাজার ফিট ওপরের যে দৃশ্য তার সার্থক চিত্র-গ্রহণে পরিচালক নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী বজায় রাখবেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার, শাকিলা, জনি ওয়াকার, মমতাজ বেগম ও টুনি ওয়াকার।

রাজকাপুর প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'সংগম' বহু অর্থ ব্যয়ে বহির্দৃশ্যের একটি অন্যতম ছবি। সম্প্রতি এই সংস্থার কলাকুশলী দীর্ঘ দু'মাস ধরে পাশ্চাত্যের রোম, ভেনিস, প্যারিস, লন্ডন, কোপেনহেগেন, ফ্রাংকফার্ট ও জেনিভায় চিত্র-গ্রহণ শেষ করে বম্বে ফিরেছেন। বহির্দৃশ্যের শিল্পীরা ছিলেন বৈজয়ন্তীমালা, রাজকাপুর ও রাজেন্দ্রকুমার। আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন রাধু কর্মকার। এরপর কাহিনী অনুযায়ী এয়ারফোর্সের একটি দুর্ঘটনার দৃশ্য চিত্রায়িত করার জন্য কঙ্গো যাত্রা করবেন প্রযোজক-পরিচালক ও অভিনেতা রাজকাপুর। এই স্থান নির্বাচনে কৃষ্ণমেনন সহযোগিতা করেন। বহির্দৃশ্যের এই বিরাট পরিবেশে চিত্র গ্রহণের জন্য রাজকাপুর প্রোডাকসন্সের প্রায় দশ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এই সব সংযোগে 'সংগম' আর কে ফিল্মস-এর একটি অন্যতম ছবি হিসেবে সাফল্যমণ্ডিত হবে, এ আশা করা যায়।

জনপ্রিয় নায়ক সুনীল দত্ত এই প্রথম 'এ রাস্তে হ্যায় প্যায়রকে' ছবিতে নিজেই কণ্ঠদান করলেন। সম্প্রতি সংগীত-পরিচালক রবি-র নির্দেশে সংগীত গ্রহণ শেষ হল। সুনীল দত্তের বিপরীতে নায়িকা-চরিত্রে লীলা নাইডু অভিনয় করছেন।

যুগল-দম্পতি শাম্মি কাপুর ও গীতাবালি-র সপ্তম বিবাহ বার্ষিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল। এই শুভানুষ্ঠানে দম্পতিদ্বয় পুনরায় একসংগে অভিনয় করার পরিকল্পনার কথা জানান। গীতাবালি ও শাম্মিকাপুর অভিনীত আগের ছবি হল 'কফি হাউস,' ও 'রঙ্গিন রাতে'।

চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক শিশু চিত্র 'হামনে খেলনে দো'-র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানের পর দৃশ্য-গ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই চিত্রের শিশুনায়ক রাজা। এছাড়া রাজার ভ্রাতৃদ্বয় সন্দিপ ও রন্দিপ এ ছবিতে অভিনয় করছে। কাহিনী ও সংগীত রচনা করেছেন আখতার মিরজা ও অনিল বিশ্বাস।

মাদ্রাজ :

কে শংকর পরিচালিত ভাসু ফিল্মস-এর একটি হিন্দী ললিতা পাওয়ার সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন। গত সপ্তাহে সঙ্গীত-পরিচালক রবি এ ছবির সংগীত-গ্রহণ করেছেন। গুরু দত্ত ও আশা পারেখ দুটি প্রধান চরিত্র।

ফিল্ম ফ্যানস এসোসিয়েশন-এর বাৎসরিক অধিবেশনে নির্বাচিত সভ্যগণ মনোনীত হয়েছেন বিভিন্ন বিভাগে। সভাপতি—এ অরুণাচলম্। সহ-সভাপতি—ডাঃ এম এস গিরি, পি অার গকুলাকৃষ্ণ, আর কে মণ্ডলাল, ওবালাপাথি ও রাজাম ভারথি। সম্পাদক—পি কোথান্দ্রাম।

বীণ চিত্রের মারাঠী ছবি 'নন্দিনী'র মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। ছবিটি পরিচালনা করছেন মধুকর পাঠক।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
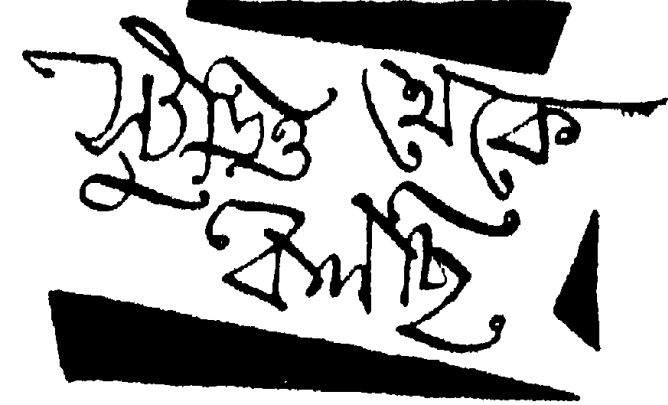
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরটারী-র সংগীত-গ্রহণ স্টুডিও থেকে একটা করুণ সুর ভেসে আসতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই সুরে দুপুরে-আকাশের ঐ থমথমে কালো মেঘের মত আমার মনটা হঠাৎ থমকে গেল। সারি সারি বেহালার ঐ করুণ সুর হৃদয়কে এতখানি শূন্য করে দিতে পারে এর আগে কোনদিন এমনভাবে অনুভব করিনি।

পায়ে-পায়ে কাঁচ ঘরের সামনে আসতেই দেখি সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবি 'অভিযান'-এর সংগীত গ্রহণ করছেন। কাহিনীর বিভিন্ন পরিবেশের নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলিকে কেন্দ্র করে টুকরো টুকরো অংশের আবহ-সংগীত গ্রহণ করলেন শ্রী রায়। দৃশ্যানু-

স্থায়ী এই বিভক্ত অংশের সংগীতের সুরগুলি সম্পাদক ছবির সংগে পরে জুড়ে দেবেন। অভিযাত্রিক-প্রযোজিত এ ছবির চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সংগীত পরিচালক সত্যজিৎ রায়।
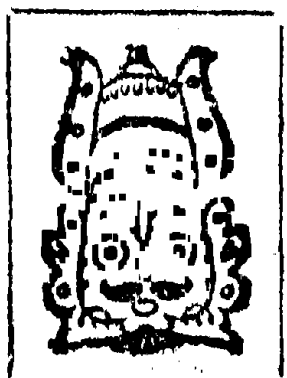
সংগীত-গ্রহণের সময় শ্রী রায় অন্যপুরুষ। দেখে মনে হয় শৈল্পিক জগতের তিনি কোন এক বিশেষ প্রতিনিধি। সৃষ্টির এই মাহেন্দ্রক্ষণে আত্মভোলা মন নিয়ে সুর ছাড়া আর কিছু অবলম্বন নেই বলে এ'কে মনে হয়েছে। স্বরলিপি, যন্ত্র আর যন্ত্রী—সব মিলিয়ে যে সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মনকে কখনো দোলা দেয় কখনো শূন্য করে। শেষকথা—'অভিযান'-এর আবহসংগীত মনের চার-দেওয়ালে এখনও ছড়িয়ে আছে। বহু যন্ত্র-শিল্পীর ঐক্যতানে সুর, ছন্দ ও তালে বৈচিত্র্য এনেছিল সেদিনের লাফিয়ে চলা সময়গুলির হাত থেকে।

'অভিযান'-এর কাহিনী নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা চলে। সামান্য এক মোটর-গাড়ী-চালকের জীবন নিয়ে এ কাহিনী দানা বেঁধেছে। সংক্ষেপে কাহিনী পরে বলছি। তার আগে চলচ্চিত্র রূপায়ণের শিল্পী ও কলাকুশলীদের পরিচয়টুকু জানিয়ে রাখি। চরিত্র কাহিনীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে নর সিং—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গুলাবী—ওয়াহিদা রেহমান, রামা—রবি ঘোষ, সুখন রাম—চারুপ্রকাশ ঘোষ, মেরী নীলিমা—রুমা গুহঠাকুরতা, যোসেফ—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রামেশ্বর—শেখর চট্টোপাধ্যায়, যোসেফের মা—রেবা দেবী, ইমামবাজারের প্রথম এস, ডি, ও—বীরেশ্বর সেন, শ্যামনগরের এস, ডি, ও—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও উকীল—অবনী মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজিতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, শৈলেন ঘোষ, ভানু ঘোষ ও ননী গাঙ্গুলী।

কলাকুশলীদের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন আলোকচিত্রে—সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনা—দুলাল দত্ত, শিল্প-নির্দেশনা—বংশী চন্দ্রগুপ্ত, শব্দগ্রহণ—দুর্গাদাস মিত্র, নৃপেন পাল ও সুজিত সরকার, রূপসজ্জা—অনন্ত দাস। সহকারী পরিচালনায়—নিতাই দত্ত, নৃপেন গাঙ্গুলী ও স্বদেশ সরকার। ব্যবস্থাপনায়—মুকুল চৌধুরী, ভানু ঘোষ ও দুলাল দাস। প্রধান কর্মসচিব—অনিল চৌধুরী। প্রযোজনায়—বিজয় চট্টোপাধ্যায়। ছায়ালোক-পরিবেশিত এ ছবির হয়তো আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন শ্রী — ইন্দিরা — প্রাচী চিত্রগৃহে মুক্তির শুভ-সূচনা ঘোষিত হবে।

ইন্দিরা ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে অভিযাত্রিক প্রযোজিত 'অভিযান'-এর সংগীত গ্রহণের সময় সংগীত-পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও সহকারী অলোক দে

অভিযান-এর নায়ক নর সিং। রাজপুত হলেও বাংলাদেশের একটি ছোট্ট মহকুমা শহরে পুরনো আমলের ঝরঝরে ক্রাইসলারে যাত্রী চাপিয়ে ভাড়ায় নর সিং রুজি-রোজগার শুরু করে। দূর-পাল্লার রেলগাড়ী আর মোটর-গাড়ীর সংগে পাল্লা দিয়েও তার জীবনে একদিন এক নারীর ভালবাসা জন্ম নেয়। কিন্তু যেদিন সেই নারী অন্য এক পর-পুরুষের সংগে গৃহত্যাগী হল সেদিন থেকেই নর সিং-এর জীবনে ঘূণ ধরে। জীবন-গতি বেড়ে যায়। এমন কি এস, ডি, ও-র গাড়ীকে অমান্য করে তার গাড়ীর পারমিট শেষ পর্যন্ত বাতিল হল। অগত্যা নর সিং গাড়ী নিয়ে নিজের দেশে ফিরে চলে। সংগে তার সহকারী একমাত্র রামা। চলারপথে

জুয়ারী সুখনরাম আর এক সুন্দরী মেয়েকে টাকার বিনিময়ে শ্যামনগরে পৌঁছে দেবার লোভ সামলাতে না পেরে নর সিং রাজী হয়। তারপর সে সুখনরামের পরামর্শে শ্যামনগরে ট্যাক্সি-সার্ভিস চালু করে। দেশে আর ফেরা হল না তার।

এখানে স্থানীয় মিশনারী স্কুলের শিক্ষিকা মেরি নীলিমা ও তার ভাই যোসেফের সঙ্গে পরিচয় হয়ে নর সিং আবার প্রাণ পেল। কিন্তু আবার সেই রাস্তার সুন্দরী মেয়েটি হঠাৎ তার কাছে আশ্রয় আর ঐ লম্পট সুখনরামের হাত থেকে বাঁচতে চেয়ে করুণা ভিক্ষা করে। নর সিং তাই কিছুটা উতলা। মেয়েটির নাম গুলাবী। এমনিভাবে দিন যেতে থাকে। ট্যাক্সি ব্যবসায়ে নর সিং-এর প্রচুর লাভ হতে লাগল। নীলিমাকে তার ভাল লাগে। কিন্তু পরে সে জানলো নীলিমা এক খোঁড়া ছেলে ব্যানার্জীকে ভালবাসে। চরম প্রতিশোধে গুলাবীর কাছে নর সিং ফিরে আসে। গুলাবীর অতীত জীবনের কিছু করুণ ইতিহাস শুনে নর সিংয়ের অন্তর ব্যথিত হয়। কিন্তু পালাবার উপায় নেই। এখানে অনেক অর্থ। নর সিং তাই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর অংশীদারের জন্য দলিলে সই করে। কিন্তু তার বিনিময়ে সুখনরামের ব্যবসার শুল্ক ফাঁকি দেওয়া আফিং গাড়ীতে পাচার করতে হয় নর সিংয়ের। এই অসৎ কাজের জন্য রামা অবশ্য প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু নর সিং তাতে কান দেয়নি। গুলাবীরও কোন কথা সে শোনেনি। শেষে যোসেফ যখন সাবধান করতে নর সিংয়ের কাছে বন্ধু হিসেবে ছুটে আসে তখন সে মাথা ঠিক না রাখতে পেরে যোসেফকেই মেরে বসে এবং সারা মুখ রক্তে ভেসে যায়। কিন্তু যোসেফ এর কোন প্রতিবাদই করেনি। এই পরিস্থিতির পর নর সিং অনুতপ্ত হয়ে যখন সুখনের কাছে আপত্তি জানাতে যায় তখন খবর পেল যে সুখন কোন মক্কেলের কাছে উপহার স্বরূপ রাত্রি উপভোগের জন্য গুলাবীকে নিয়ে গেছে।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসনের 'নবদিগন্ত' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি

নর সিং ক্ষেপে উঠলো। ক্রাইসলারের গতির সঙ্গে সেও গর্জে ওঠে। ঘটনাস্থলে গুলাবীকে সুখনের হাত থেকে উদ্ধার করে সেই মুহূর্তে শ্যামনগর থেকে নর সিং বিদায় নেয়। এরপর শ্যামনগরে কেউ আর কোনদিনই নর সিং আর গুলাবীকে দেখতে পায়নি। জানেনা তারা আজ কোন সুদূরে।
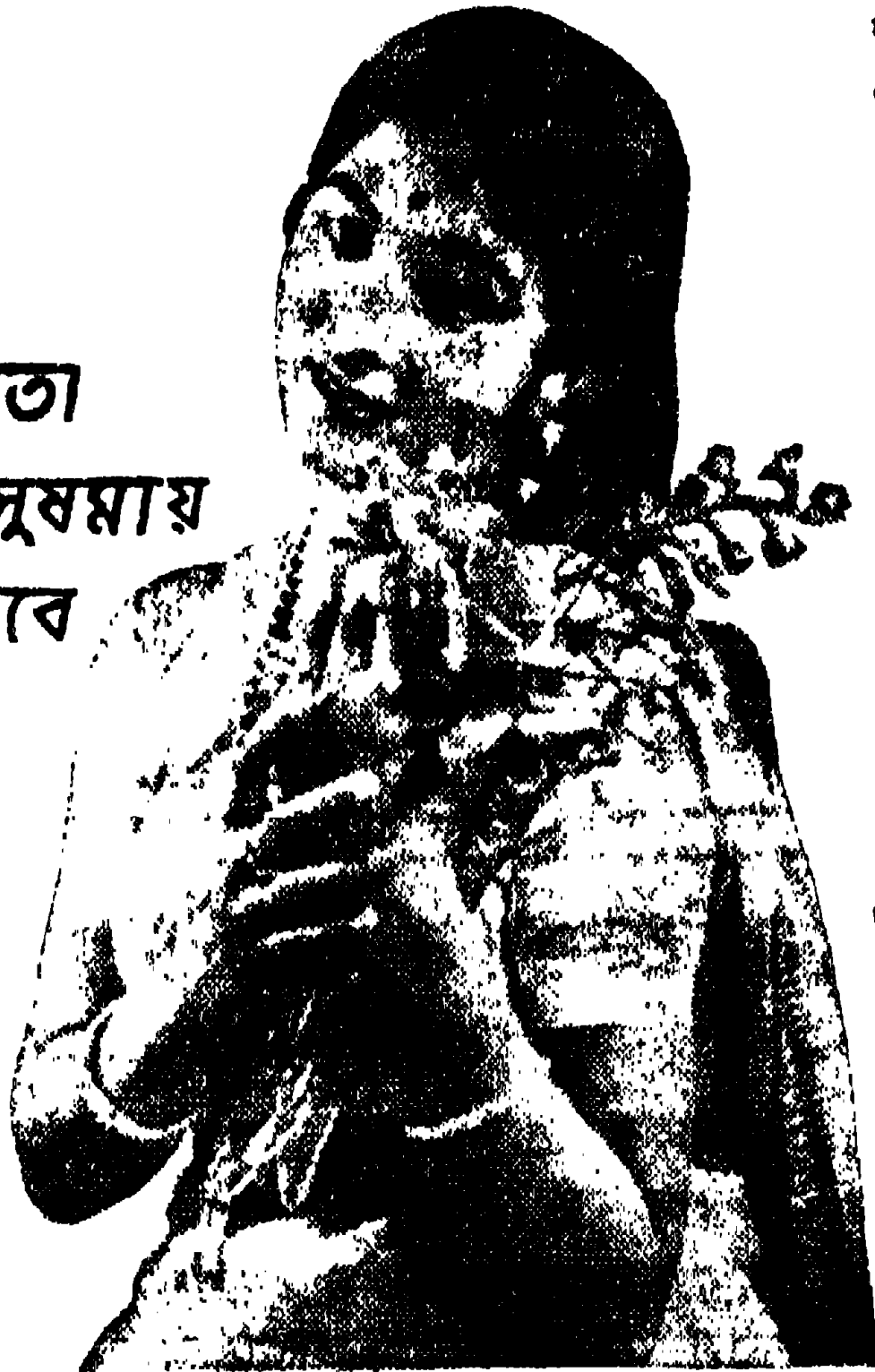
—চিত্রদূত

খেলাধূলা

দর্শক

।। চতুর্থ এশিয়ান গেমস ।।

জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাপান সর্বাধিক পদক লাভ ক'রে এশীয় মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। চতুর্থ এশিয়ান গেমসে জাপানের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২—স্বর্ণ ৭৩, রৌপ্য ৫৬ এবং ব্রোঞ্জ ২৩। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ইন্দোনেশিয়া—মোট পদক সংখ্যা ৫০ (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ১২ এবং ব্রোঞ্জ ২৭)। অর্থাৎ দেখা যায়, জাপান ইন্দোনেশিয়ার থেকে তিন গুণ বেশী পদক পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এই ব্যবধানই খেলাধূলায় জাপানের শ্রেষ্ঠত্বের মান নির্ণয় করে। ১৯৫১ সালে এশিয়ান গেমসের সূচনা থেকেই জাপান প্রতিবারই পদক এবং পয়েন্টের তালিকায় বিরাট ব্যবধানে প্রথম স্থান লাভ করেছে এবং প্রতিবারই পদক লাভের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ১৯৫৮ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশিয়ান গেমসে জাপান ১৪১টি পদক পেয়েছিল। আর চতুর্থ এশিয়ান গেমসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২। তৃতীয় এশিয়ান গেমসে জাপানের স্বর্ণ পদক লাভের সংখ্যা ছিল ৬৭ এবং চতুর্থ গেমসে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩। এশীয় মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে একমাত্র জাপানই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামানের কাছাকাছি পেঁৗছতে পেরেছে। বিশেষ করে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় গত দশ বছরে জাপান অসাধারণ সাফল্য লাভ ক'রে ইউরোপীয় দেশগুলির একছত্র প্রাধান্য খর্ব করেছে। জাপানের সাফল্যে আজ তারা কোণ ঠাসা। খেলাধূলায় জাপানের এই প্রভূত সাফল্য লাভের প্রধান কারণ সে দেশের জলবায়ু, প্রগতিশীল সামাজিক জীবনযাত্রা, উন্নত শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা এবং শিল্প বাণিজ্যে জাপানের বিরাট সাফল্য। সর্বোপরি জাপানের জনসাধারণের সর্ব কাজের মতই খেলাধূলায় আছে একনিষ্ঠতা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং খেলাধূলায় সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি।

চতুর্থ এশিয়ান গেমসে পদক লাভের তালিকায় ভারতবর্ষ মোট ৩৩টি পদক লাভ ক'রে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। ভারতবর্ষের পদক সংখ্যা—স্বর্ণ ১০, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ১০। ১৯৫৮ সালের তৃতীয় এশিয়ান গেমসে ভারতবর্ষ মোট ১৩টি পদক (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ৪) পেয়ে তালিকায় সপ্তম স্থান পেয়েছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান পেয়েছিল ষষ্ঠ স্থান ২৬টি পদক পেয়ে। এবার পাকিস্থানের পদক সংখ্যা ২৮। সুতরাং গতবারের তুলনায় ভারতবর্ষের সাফল্য এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যায়। চতুর্থ এশিয়ান গেমসে ভারতবর্ষ স্বর্ণ পদক পেয়েছে এ্যাথলেটিকসে ৫টি, কুস্তিতে ৩টি, বক্সিংয়ে ১টি ও ফুটবলে ১টি, মোট ১০টি। খবরে ছিল, লাইট ওয়েট বিভাগে ভারতবর্ষের পদম বাহাদুর মল প্রথম স্থান লাভ ক'রে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন; তাছাড়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তাঁকে একটি অতিরিক্ত স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, তিনি এই অতিরিক্ত পদকটি পাননি।

ভারতবর্ষ মোট এই ৭টি অনুষ্ঠানে যোগদান করে—এ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, কুস্তি, বক্সিং, হকি, ভলিবল এবং রাইফেল সুটিং। ভারোত্তোলন অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ নাম দিয়েছিল; কিন্তু শেষ সময়ে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিযোগিতার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ রৌপ্য পদক পায় মোট ১৩টি—এ্যাথলেটিকসে ৫টি, কুস্তিতে ৬টি, ভলিবল এবং হকিতে ১টি ক'রে। ভারতবর্ষের ব্রোঞ্জ পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০টি—এ্যাথলেটিকসে ৪টি, কুস্তিতে ৩টি, মুষ্টিযুদ্ধে ২টি এবং রাইফেল সুটিংয়ে ১টি। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভারতবর্ষের এই সাফল্যের মূলে সামরিক ক্রীড়াবিদদের অবদান বেশী ছিল। এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে পদক লাভের তালিকায় বে-সামরিক ক্রীড়াবিদ ছিলেন মাত্র ৪ জন—মিলখা সিং (পাঞ্জাব), গুরবচন সিং (দিল্লী), দিনশ ইরাণী (মহারাষ্ট্র) এবং ভারতীয় দলের একমাত্র মহিলা এ্যাথলিট এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান)। ১,৬০০ মিটার রীলেতে যে ভারতীয় দল স্বর্ণ পদক লাভ করে সেই দলের চার জনের মধ্যে বে-সামরিক ক্রীড়াবিদ ছিলেন মাত্র একজন—মিলখা সিং।

কুস্তিতে ভারতীয় দলের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ এই অনুষ্ঠানে ১২টি পদক লাভ করেছে—স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৬ এবং ব্রোঞ্জ ৩। এখানে সামরিক বিভাগের ক্রীড়াবিদরা একাধিপত্য লাভ করতে পারেনি। কুস্তিতে সর্বাধিক পদক লাভ করেছে মহারাষ্ট্র ৫ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ২, ব্রোঞ্জ ১); সার্ভিসেস ৪ (রৌপ্য ৪); পাঞ্জাব ২ (স্বর্ণ ১ ও রৌপ্য ১) এবং ইউ পি ১ (ব্রোঞ্জ ১)।

মুষ্টি যুদ্ধ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের পদক লাভের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ (স্বর্ণ ১ ও ব্রোঞ্জ ২)। এই বিভাগে সার্ভিসেস দলের ক্রীড়াবিদ পায় ২টি পদক (স্বর্ণ ১ ও ব্রোঞ্জ১)। তৃতীয় ব্রোঞ্জ পদকটি পায় রেলওয়ে প্রতিনিধি। সুটিংয়ের ব্রোঞ্জ পদকটি যায় বাংলার হরিচরণ সাহার হাতে।

চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে ভারতবর্ষের ০—২ গোলে পরাজয় খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। ভারতবর্ষের পরাজয়ের প্রধান কারণ, খেলার পুরো সময়ের প্রথম দিকের ছয় মিনিট বাদে বাকি সময় ভারতবর্ষকে দশ জন খেলোয়াড় নিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তান দলের সঙ্গে খেলতে হয়েছিল। প্রথমার্ধের খেলার ষষ্ঠ মিনিটে ভারতবর্ষের সেণ্টার-হাফ চিরঞ্জিৎ সিং নাকে গুরুতর আঘাত পেয়ে সেদিনের মত খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। তাঁর শূন্যস্থানে রাইট-আউট দর্শন সিংকে টেনে আনা হয়। ফলে আক্রমণভাগে একজন খেলোয়াড় কমে যায়। এদিকে দর্শন সিং সেণ্টার-হাফ খেলোয়াড়ের গুরু দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারেননি। চিরঞ্জিৎ সিং আহত হয়ে বিদায় নেওয়াতে দর্শক মণ্ডলীর একাংশের উল্লাসধ্বনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল যথেষ্ট ভেঙ্গে দেয়। তাছাড়া পাকিস্তান দল গায়ের জোর দিয়ে যে রকম দাপটের সঙ্গে খেলেছিল ভারতীয় দলের দশজন খেলোয়াড়ের পক্ষে তার পাল্টা জবাব দেওয়া বা দাপট প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। অন্য পাঁচটা দেশের থেকে ভারতীয় হকি খেলার বৈশিষ্ট্য—তার হকি স্টিক চালনায় মনোহারিত্ব এবং পরিচ্ছন্ন খেলা। এই ধরণের খেলা নিঃসন্দেহে নয়নাভিরাম এবং খেলায় জয়লাভের পক্ষেও সহায়ক যদি বিপক্ষ দল গায়ের জোরের উপর বেশী রকম প্রাধান্য না দেয়। সুতরাং ভারতবর্ষকে আজ নতুন ক'রে চিন্তা করতে হবে যেখানে প্রতিপক্ষ চিত্তাকর্ষক ক্রীড়া-শৈলী বিসর্জন দিয়ে দৈহিক শক্তি প্রয়োগে খেলায় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করবে সেক্ষেত্রে ভারতীয় হকি দলের ইতিকর্তব্য কি হবে। ভারতীয় হকি খেলায় বর্তমানে পুরুষোচিত বলিষ্ঠভার যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। এর পর মাঠের কথা। জাকার্তার মাটিতে পা দিয়ে ভারতীয় হকি দলের মুখপাত্র সেখানের হকি মাঠের মাটি পরীক্ষা ক'রে প্রায়

দয়েছিলেন, ভারতীয় হকি খেলার পক্ষে মাঠের গঠন-প্রকৃতি অনুকূল নয়। সুতরাং বিভিন্ন ধরণের মাঠে খেলবার অভ্যাস আমাদের বিদেশ যাত্রার পূর্বেই করতে হবে।

এবার ভারতীয় দল গঠনে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল এবং কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে সে সময়ে সমালোচনাও করা হয়েছিল। পাকিস্তান ছাড়া জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও নিজেদের দেশের হকি খেলার মান-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আজ উঠে-পড়ে লেগেছে। ভারতবর্ষ যদি হকি স্টিকের যাদুমন্ত্রের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে দৈহিক শক্তি এবং শারীরিক যোগ্যতাকে এভাবে উপেক্ষা করে চলে তাহলে অন্তর্জাতিক হকি খেলা থেকে ভারতবর্ষের নাম শুধু অতীতকালের রেকর্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

দলগত প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ফুটবলে স্বর্ণ পদক লাভ। ১৯৫১ সালের প্রথম এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে ইরাণকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দুটি এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান পর্যন্ত নিতে পারেনি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ-পদক পেয়েছিল ফর্মোজা এবং রৌপ্য পদক কোরিয়া। তৃতীয় স্থান পেয়েছিল যথাক্রমে ব্রহ্মদেশ (১৯৫৪) এবং ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৮)। গত বছর মালয়ের মারদেকা আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় সর্বনিম্ন স্থান পাওয়াতে প্রতিযোগিতা থেকে বাদই পড়ে যায়। সুতরাং চতুর্থ এশিয়ান গেমসে ভারতবর্ষের সাফল্য আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গত দুবারের এশিয়ান ফুটবল বিজয়ী ফর্মোজাকে রাজনৈতিক কারণে চতুর্থ এশিয়ান গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। ফলে ভারতীয় দলের এই সাফল্য সম্পর্কে কোন কোন মহলে জিজ্ঞাসা থেকে যায়। তবে একথা ঠিক যে, যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। গত দুবারের রাণার্স-আপ কোরিয়াকে ফাইনালে পরাজিত করে ভারতবর্ষ স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। ভারতবর্ষের আয়তন, লোকসংখ্যা এবং ভারতীয় ফুটবল খেলার বয়ঃক্রম অনুপাতে ভারতীয় ফুটবল খেলার মান যথেষ্ট উন্নত নয়। কয়েক ব্যক্তির কায়েমী স্বার্থই ভারতীয় ফুটবল খেলার মান-উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফুটবল ফাইনাল খেলার দৃশ্য : জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের গোলরক্ষক থঙ্গরাজ কোরিয়ার গোল দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। ভারতবর্ষ ২-১ গোলে কোরিয়াকে পরাজিত করে।

চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে বাংলার অবদান সম্পর্কে বলা যায়, বাংলার

খেলোয়াড় চুণী গোস্বামীর নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল স্বর্ণ পদক লাভ করেছে এবং ভারতীয় ফুটবল দলে ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলার দশজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এই দশজনের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন বাঙ্গালী। ফাইনালে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলেছিলেন এই চারজন বাঙ্গালী —চুণী গোস্বামী (অধিনায়ক), প্রদীপ ব্যানার্জি, অরুণ ঘোষ এবং প্রশান্ত সিংহ। ভারতীয় এ্যাথলেটিকস, কুস্তি, ভলিবল এবং হকি দলে কোন বাঙ্গালী স্থান পাননি। মুষ্টিযুদ্ধ এবং রাইফেল স্যুটিংয়ে যথাক্রমে বাঙ্গালী-ক্রীড়াবিদ সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং হরিচরণ সাহা ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন। সর্বভারতীয় ক্রীড়া-মানে বাংলা দেশ অনেক বিষয়ে পিছিয়ে আছে।

জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান নানা সংশয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। এক সময়ে এই অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার দাখিল হয়েছিল। সাম্প্রতিক কোন আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান এ রকম সংকট অবস্থায় পড়েনি। এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা হয়েছে চতুর্থ ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরিচালকদের এবং ইন্দোনেশিয়ান সরকারকে। ইস্রায়েল এবং তাইওয়ান রাষ্ট্র (কুওমিনটাং চীন) এশিয়ান ক্রীড়া সংস্থার সভ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগদানের প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র এবং ভিসা পায়নি। ফলে এই দুই রাষ্ট্রের পক্ষে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাফ কথায় ঘোষণা করেন, কোন রকমেই তাইওয়ানকে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। প্রথমে সরকারীভাবে বলা হয়েছিল দুই দেশকেই আমন্ত্রণপত্র এবং ভিসা পাঠানো হয়েছে। সুতরাং এই পরস্পর বিরোধী বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হয়। ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে তাঁদের সংস্থার পতাকা উত্তোলনের অনুমতি প্রত্যাহার করেন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন সংস্থা এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁদের পূর্ব স্বীকৃতি বাতিল করেন। ফলে ভারোত্তোলন অনুষ্ঠানে প্রতিযোগী দশটি দেশের মধ্যে নয়টি দেশ (ইন্দোনেশিয়া বাদে) তাদের নাম প্রত্যাহার করায় শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সংস্থার সহসভাপতি অধ্যাপক জি ডি সোন্ধি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পর্যবেক্ষক হিসাবে জাকার্তায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২৩শে আগষ্ট তারিখে এশিয়ান গেমস ফেডারেশন কাউন্সিলের সভায় 'চতুর্থ এশিয়ান গেমস' নাম থেকে 'চতুর্থ' কথাটি বাদ দেওয়ার এক প্রস্তাব আনেন এবং তাঁর এই প্রস্তাব জাপানের সমর্থন লাভ করে। প্রফেসার সোন্ধির বিবৃতিতে প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব মেনে নেয়। কিন্তু এই দিনের সভায় এবং পরবর্তী ২৮শে আগষ্ট তারিখের সভায় এই প্রস্তাবের উপর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ এশিয়ান গেমস থেকে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ান রাষ্ট্রকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়াতে অধ্যাপক সোন্ধি চতুর্থ এশিয়ান গেমসের উদ্যোক্তা ইন্দোনেশিয়ার ক্রীড়া সংস্থার সমালোচনা করেন; ফলে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ফ্রন্টের জাকার্তা শাখার সদস্যরা সারা জাকার্তা সহর জুড়ে সোন্ধি-বিরোধী বিভিন্ন ধরণের প্রচারপত্র বিলি করেন। এই সব প্রচারপত্রে অধ্যাপক সোন্ধির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়। এইখানেই এই রাজনৈতিক সংস্থার বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ ছিল না। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে এই সংস্থার নেতৃত্বে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জনতা ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণ করে দূতাবাসের আসবাবপত্র, জানালা-দরজা ভেঙ্গে তছনছ করে। এই ঘটনায় কয়েকটি মূল্যবান সামগ্রী দূতাবাস থেকে অপহৃত হয়। একদল বিক্ষোভকারী অধ্যাপক সোন্ধি যে হোটেলে অবস্থান ক'রছিলেন সেই হোটেলে গিয়ে

[illegible] পতাকা খুলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অধ্যাপক [illegible] সেই দিনই জাকার্তা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তী ঘটনা, [illegible]নেও ভারত-বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের মাঠের নানা দিক থেকে ধিক্কার ধ্বনিতে লাঞ্ছিত করা হয়। এমন কি ভারতের জাতীয় পতাকা এবং সংগীত বিক্ষোভকারীদের ধিক্কার ধ্বনি থেকে রেহাই পায়নি।

জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণ এবং ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীর ভারত-বিরোধী বিবৃতি প্রচারের অনেক আগে ভারত সরকার পরিষ্কার ভাষায় ইন্দোনেশীয় সরকারকে জানিয়েছিলেন, শ্রীসোন্ধির বিবৃতির সঙ্গে ভারত সরকারের কোন রকম সম্পর্ক নেই এবং এ ব্যাপারে সরকারের কোন দায়িত্বও নেই। তাছাড়া ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীসোন্ধিকে বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে যে প্রস্তাব দেওয়া হয় তার প্রতিও ইন্দোনেশীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের এই মনোভাব ইন্দোনেশীয় সরকারী মহলে স্বীকৃতি লাভের পরও জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণ, ভারত-বিরোধী বিবৃতি [illegible] ক্ষোভ খুবই বেদনাদায়ক। এই সব ঘটনার জন্যে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের সকল সদস্যও বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রীসোন্ধিকে উপলক্ষ্য করে চীন কিন্তু সমানে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনীতি এবং ভাবাবেগ খেলাধূলোর আদর্শকে কিভাবে কলুষিত করতে পারে তারই নজির হয়ে রইলো জাকার্তার এই বহু বিতর্কীত এবং রাজনৈতিক সমস্যায় কন্টকিত চতুর্থ এশিয়ান গেমস। খেলাধূলোর আদর্শের স্বপক্ষে অটল থাকা কতখানি বিপদজনক তা আমরা সোন্ধির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করলাম।

।। ভারতবর্ষের সাফল্য ।।

।। স্বর্ণপদক ।।

এ্যাথলেটিকস (স্বর্ণ-পদক ৫) :

৪০০ মিটার দৌড়
মিলখা সিং (পাঞ্জাব)। সময় ৪৬-৯ সেঃ।

১,৫০০ মিটার দৌড়
মহীন্দর সিং (সার্ভিসেস)। সময় ৩মিঃ ৪৮-৬ সেঃ।

১০,০০০ মিটার দৌড়
তারলোক সিং (সার্ভিসেস) সময় ৩০মিঃ ২১-৪ সেঃ।

১,৬০০ মিটার রিলে
ভারতবর্ষ। সময় ৩মিঃ ১০-২ সেঃ।

ডেকাথেলন
গুরবচন সিং (দিল্লী)। পয়েন্ট ৬৭৩৫।

কুস্তি (স্বর্ণ পদক ৩)

ফ্রি স্টাইল : লাইট হেভীওয়েট—মারুতি মানে (মহারাষ্ট্র)।

গ্রিসো-রোম্যান : ফ্লাইওয়েট—মালওয়া (পাঞ্জাব); হেভী ওয়েট—গণপৎ আন্দালকার (মহারাষ্ট্র)।

মুষ্টিযুদ্ধ (স্বর্ণ পদক ১)

লাইট ওয়েট—পদম বাহাদুর মল (সার্ভিসেস)

ফুটবল : ফাইনালে ভারতবর্ষ ২—১ গোলে গত বছরের রাণার্স-আপ দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে স্বর্ণ-পদক লাভ করে।

।। রৌপ্যপদক ।।

এ্যাথলেটিকস (রৌপ্য পদক ৫) :

৪০০ **মিটার দৌড় :**
মাখন সিং (সার্ভিসেস)

৮০০ **মিটার দৌড় :**
দলজিৎ সিং (সার্ভিসেস)

১,৫০০ **মিটার দৌড় :**
অমৃত পাল (সার্ভিসেস)

ডিসকাস থ্রো :
পরদুমন সিং (সার্ভিসেস)

সটপুট :
দিনসা ইরাণী (মহারাষ্ট্র)

কুস্তি (রৌপ্যপদক ৬) :

ফ্রি স্টাইল : লাইট ওয়েট—উদয় চাঁদ (সার্ভিসেস); মিডল ওয়েট—সজ্জন সিং (সার্ভিসেস); হেভীওয়েট—গণপৎ আন্দালকার

গ্রিসো-রোম্যান : মিডল ওয়েট—সজ্জন সিং; লাইট ওয়েট—উদয় চাঁদ; লাইট হেভী—মারুতি মানে

ভলিবল (পুরুষ বিভাগ : ৬ জন খেলোয়াড়) : ভারতবর্ষ ২য় স্থান পায়।

হকি : ফাইনালে ভারতবর্ষ ০—২ গোলে পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়ে রৌপ্য-পদক লাভ করে।

।। ব্রোঞ্জপাদক ।।

এ্যাথলেটিকস :

৮০০ মিটার দৌড়
অমৃত পাল (সার্ভিসেস)

৫০০০ মিটার দৌড়
তারলোক সিং (সার্ভিসেস)

সটপুট
যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস)

জাভেলিন (মহিলা বিভাগ)
এলিজাবেথ ডেভনপোর্ট (রাজস্থান)

কুস্তি :

ফ্রি-স্টাইল : ফ্লাইওয়েট—মালওয়া; ওয়েল্টার ওয়েট—লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে (ইউ পি)

গ্রীসো-রোম্যান পদ্ধতি :
নারায়ণ ঘুমে (মহারাষ্ট্র)

মুষ্টিযুদ্ধ :

লাইট মিডলওয়েট—বাডি ডিসুজা (রেলওয়ে); মিডল ওয়েট—সুরেন্দ্রনাথ সরকার (সার্ভিসেস)

সুটিং : হরিচরণ সা

মেডেলের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৩	৫৬	২৩
ইন্দোনেশিয়া	১১	১২	২৭
ভারতবর্ষ	১০	১৩	১০
পাকিস্তান	৮	১১	৯
ফিলিপাইন	৭	৭	২৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৪	৭	১০
মালয়	২	৪	৯
তাইল্যাণ্ড	২	৫	৫
ব্রহ্মদেশ	২	১	৫
সিঙ্গাপুর	১	০	২
সিংহল	০	২	৩
হংকং	০	২	০
কম্বোডিয়া	০	০	১
দক্ষিণ ভিয়েৎনাম	০	০	১
আফগানিস্থান	০	০	১
উত্তর বোর্ণিয়ো	০	০	০
সারাওয়াকা	০	০	০

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 21st September 1962
40 Naya Paise

সম্প্রতি ফারসী উপসর্গ "বে" যুক্ত একটি বাংলায় চলিত শব্দের পূর্ণ অর্থ জানিবার জন্য একটি বিখ্যাত চলিত বাংলায় অভিধান দেখিতে হয়। অভিধানে দেখিলাম যে, ঐ ফারসী-আরবী মিশ্র শব্দ "বে-ইখ্তিয়ার" বাংলায় "বে-এক্তিয়ার" রূপান্তরে চলিত হইয়াছে এবং ইহার বাংলায় অর্থ "অধিকার, ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত।"

এখন বলি বিশুদ্ধ বাংলায় এতো শব্দ থাকা সত্ত্বেও এই শব্দটির অর্থ খুঁজিতেছিলাম কেন। খুঁজিতেছিলাম এই কারণে যে, হিমালয়স্থিত ভারত সীমান্ত সম্পর্কে আমাদের বড়কর্তাদিগের অবস্থার বর্ণনা ঐ শব্দে যেমনটি হয় কোনও সহজ বাংলা শব্দে—দেশজ বা তৎসম, তেমন হয় না কিছুতেই। চীনারা বিনা বাক্যব্যয়ে ১২৫০০ বর্গমাইল ভারতীয় এলাকা জবর-দখল করিল, সে বিষয়ে দেশের লোককে জানানও প্রয়োজন মনে করিলেন না কেহ, কি পণ্ডিত নেহরু, কি শ্রীকৃষ্ণ মেনন। দীর্ঘ দিন চিঠি চাপাটি চলিল পণ্ডিত নেহরু ও চু-এন লাইয়ের মধ্যে অতি নিভৃতে। তারপর চীনা সৈনিকেরা গুলি চালাইয়া ভারতীয় রক্ষী কয়েকজনকে হতাহত করিবার পর সমস্ত ব্যাপারটি প্রকাশিত হইল—তাও অতি ধীরে এবং অল্পে অল্পে। তবে দেশের লোকের মধ্যে এই সংবাদ প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করায় পণ্ডিত নেহরু ও তৎসারথি শ্রীকৃষ্ণ মেনন ভিন্ন পথে ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন।

কিছুদিন দুই পক্ষের সৈন্যদল স্থাণুভাব অবলম্বন করিবার পর হঠাৎ চীনারা আগাইয়া আসিয়া লাদাখ অঞ্চলের গালওয়ান উপত্যকাস্থিত ভারতীয় ঘাঁটি অবরোধ করিল। দুই পক্ষের অধিকারিবর্গের মধ্যে বাক্যের ফোয়ারা খুলিল। চীন তাহার অভ্যাসমত মিথ্যার জালে সব কিছুই অন্ধকার করার চেষ্টা চালাইল, আমাদের কর্তারাও কিছু মিঠে-কড়া বুলি ছাড়িলেন। তবে ভারতীয় সৈনিক তাহার প্রাচীন শৌর্য এখনও হারায় নাই সুতরাং চীনারা ক্রমে হটিতে বাধ্য হয়।

আবার সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনারা ভারতের হিমালয় সীমান্তের অন্য প্রান্তেও ঠিক ঐ মত অভিযান চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত ভূটান ও তিব্বত সীমান্তের মধ্যবর্তী নেফা অঞ্চলের কামেং এলাকায় অবস্থিত থাগলা ঘাঁটি চীনা সেনায় ঘিরিয়াছে এই সংবাদ আসে এবং পণ্ডিত নেহরুর নিকট (লণ্ডনে) সেই সংবাদ পাঠাইলে পরে তিনি পিকিং সরকারের নিকট "তীব্র প্রতিবাদ" জানাইবার "অনুমতি" দিয়াছেন। চীনারা অবশ্য এই "অনুমতিগত" পত্রের অপেক্ষা রাখে নাই, তাহারা অভ্যাসমত পাল্টা ও মিথ্যা অভিযোগ পূর্বাহ্ণেই পাঠাইয়াছে। আমাদের সীমান্তরক্ষীদল দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে এ সংবাদও আসে।

এই সকল সংবাদে নতুন বা বিচিত্র কিছুই নাই। তবে প্রশ্ন একটা আসে যে, চীনারা এইরূপ যথেচ্ছ দস্যুবৃত্তির কুচকাওয়াজ চালায় কি করিয়া? তাহারা ম্যাকমোহন লাইন ইচ্ছামত অতিক্রম করিবে, পরে বলিবে যে, ভারতীয়েরা চীনা-তিব্বতের এলাকার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে আর আমরা বড়কর্তার অনুমতি অনুযায়ী হাম্বারব ছাড়িব বা গর্জন করিব। তবে কি ভারতের উত্তর সীমান্ত বিষয়ে আমাদের বে-এক্তিয়ার—অর্থাৎ অধিকার, ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত—অবস্থা?

এই প্রশ্ন লইয়া যে সকল কংগ্রেসী সভ্য বড়-হুজুরদের নির্দেশ অমান্য করিয়া লোকসভার ভিতরে ও বাহিরে আন্দোলন চালাইয়া আমাদের কর্ণধারদের কিঞ্চিত মনুষ্যত্ব প্রদর্শনে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে তো নির্বাচনীতে দাঁড়াইবার অধিকারচ্যুত করিয়া হুজুরগণ সেই "বেয়াদবি"র সাজা দিয়াছেন।

তারপর? তারপর যাহা হইতেছে তাহার বর্ণনে আরও ফারসী-আরবী মিশ্র শব্দের ব্যবহার প্রয়োজন। পূর্বভারতে পাকিস্থানীদিগের ব্যাপক 'বেআইনী' প্রবেশ, ইন্দোনেশিয়ায় অর্থাৎ ওরাং উটাঙ্গদের আদিবাসভূমিতে—ভারতীয়েরা এশিয়াটিক খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার সময় অতি অকথ্যভাবে "বেইজ্জত" হইয়াছেন, আমাদের রাষ্ট্রদূতও বাদ পড়েন নাই। এ সকলই ঘটিয়াছে আমাদের উচ্চতম অধিকারিবর্গের এই "বে-আন্দাজ" কার্যকলাপে, যাহার ফলে ভারতভূমি দাঁড়াইতেছে "বে-ওয়ারিশ" সম্পত্তির পর্যায়ে এবং ভারতমাতাও উত্তরোত্তর "বে-আবরু" হইতেছেন। দেখা যাউক শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায়।

কবিতা

রাত্রি

দিলীপ রায়

ধীরে, অতি ধীরে শব্দ না ক'রে লাজুক চন্দ্র
ওঠে কিশোরীর নম্র মুখের মতো; রজতশুভ্রতায়
চারিদিকে আলো ঠিকরে পড়লো; হ্রদে ছায়া, আলো
হীরা জ্বলে যেন! এখানে এসে কি মিশে যাব কালো
অন্ধকারে? দুলব কি ঐ নৌকায়, জ্বলে হীরা শত শত
যেখানে? না, ছায়া হয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াব?
ছায়া নিঃশব্দ; বিষণ্ণ মেয়ে চুপ করে থাকে,
কালো মেয়ে বোবা কান্না গলায় হার করে রাখে;
কালো মেয়ে শুধু চুপ ক'রে থাকে। আমি ছায়া হয়ে
মিশে যাব তার সঙ্গে, শান্ত, ছায়ার মতো?

চারণ, চিরায়ত

পরেশ মন্ডল

ললিত সুঠাম দেহে আঁকা সুস্থ চন্দনের ফোঁটা
অঙ্গে অঙ্গে অকরুণ মাঙ্গল্যের বিনীত বেহাগ;
নিভৃতে পরম শান্তি, অসংখ্য প্রগাঢ় বহ্নিজ্বালা,
বুকে বুকে সচঞ্চল বেদনার কুঞ্চকী অসুখ,
যেন রুদ্র নটরাজ আষাঢ়ের সৌরভিত মেঘে

অন্ধকারে নৃত্য করে। ময়ূরে ডাহুক ডাকে, হাওয়া
একাকার ক'রে দেয় অকম্পিত নির্মেঘ আকাশে—
তখন মানসীমন পূর্বমেঘে দূত হয়ে ছোটে
উত্তরমেঘের সঙ্গে মিলনের লালসা সম্ভোগে।
কী অগাধ শান্তি! কি যে তৃপ্তি স্থির একান্ত গোমুখী:
তারই নীড়ে স্থিত ধীর আনন্দিত জীবনের নাম,
ভোলা তো যায় না সেই ক্রমাগত চূড়ান্ত গভীর!

নন্দিত সকাল তবু বিরহের আশ্বাস জানায়
সে কি প্রেম! বহমান চারণের চিরায়ত গান!

সিঞ্চিত অপ্রেমে

ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার

পরিণামী রক্তজবা কে ছড়াবে নদীর শিয়রে।
বিপুলে মেঘের মন্দ্র, কারা সব চতুর প্রাচীন
অহল্যার বুকে বীজ ব্যাপ্ত করে এখন গভীরে
রক্তের তরঙ্গে নীল তীর হানে। আমি সেই নিশ্চিত বিমিথ
বিক্ষত বুকের ক্ষতে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে কেঁদে
মুখ ঢাকতে গেলে পর মা তুমি কেন যে সরে গেলে;
সান্ত্বনার ছলে রাত্রি ঘুমের গভীরে গান করে।

সুঢৌল গোড়ালি তার স্পন্দমান রক্তে অনুভব
দেয় না কখনো। স্থির সিঞ্চিত অপ্রেমে,
তারা হেঁটে গেলে পর এক ঝাঁক মরশুমী ফুল
সাজানো বাগানে কাঁপে, স্থিতিহীন আয়ুর শিকড়ে।

সমস্ত সীমিত শান্তি অপগত, সংক্রামক বোধ
ব্যাপ্ত হয়ে জেবলে দেয় দু-চোখের আরণ্যক সীমা,
তথাপি, দ্বিতীয় সত্তা কেঁদে ফেরে বিস্মৃতির উপলে উপলে।
ম্লান সব দৃশ্যপট, শৈশব যৌবন দেখো
পরিণামী গল্পকথা শুনে
অথচ আকাশ হব কথা ছিল; আর তুমি দ্বিতীয়ার চাঁদ।

পূর্বপক্ষ

জৌর্মান

সকালে কি সন্ধ্যের দিকে, ছুটির দিন হ'লে প্রায় সারাদিনই, একটা অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজকাল। একবার সময় করে কলেজ-স্ট্রীটে কি ভবানীপুরে বা গড়িয়াহাটার মোড়ে যাবেন, দেখতে পাবেন শুধু মানুষ আর মানুষ।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পুজোর বাজার। পাঁচশো টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত যাই থাক না কেন আপনার পকেটে, পুজোর বাজার থেকে আপনার অব্যাহতি নেই।

আমার কিন্তু কেনাকাটার জন্যে বাজারে ঘুরে বেড়াতে একটুও ভালো লাগে না। নতুন ডিজাইনের কাপড়-জামা-জুতোর সমাবেশ, সুসজ্জিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনাগোনা, সেল্‌স্‌ম্যানদের কন্যাকর্তাসুলভ বিনয়, এগুলো আমারও ভালো লাগে বইকি! তবে অজস্র ভালো জিনিসের ভিড়ের মধ্যে ঠিক কোনটি যে আমার পছন্দ তাকে আবিষ্কার করতে যে আন্দাজ নাজেহাল হতে হয় তাইতেই আমি সংকুচিত হয়ে উঠি।

ধরুন আমি একখানি শাড়ী কিনব। টাকার হিসেবে মোটামুটি একটা বাজেটও ঠিক করা আছে। দোকানে ঢুকেই আমাকে প্রথমে যে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হবে সেটা হ'ল শাড়ীখানা মিলের, তাঁতের, সিল্কের না নাইলনের। যা হোক, এ সম্ভাবনাটা হয়ত আমার আগেই ভাবা ছিল, কাজেই সম্মতি জানানো গেল তাঁতের সপক্ষে। তখন আমাকে কোণার দিকে জনৈক সেল্‌স্‌-ম্যানের হেপাজতে হাজির করা হ'ল। বলা বাহুল্য আমিই তাঁর একমাত্র ক্রেতা নই, আমার আগেও যেমন সেখানে একটি নাতিবৃহৎ ভীড়ের অস্তিত্ব ছিল, আমার পরেও তেমনি সেখানে বেশ কয়েকজন নতুন ক্রেতার সমাগম ঘটতে থাকল। সেল্‌স্‌ম্যান ভদ্রলোক ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো এই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত ক্রেতারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তৎপর হয়ে আছেন। নিপুণ রাঁধুনি যেমন কড়াই-এ ছাড়া প্রত্যেকটি মৎস্য-খণ্ডকেই ভালো করে উল্টে-পাল্টে ভেজে নেন, তেমনি তিনি আমাদের সকলের প্রতিই সমান-ভাবে মনোযোগ দিচ্ছেন।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, দোকানের উজ্জ্বল নিওনের অস্বাভাবিক

আলো এবং মাঝারি ধরণের শাড়ী দেখে ঈষৎ দোমনা হতে না হতেই সেল্‌স্‌-ম্যানটির ত্বরিৎ-গতিতে শাড়ীর আঁচল খুলে নিজের অংগে দুলিয়ে মনোহর ভংগীতে দাঁড়ানো, ভালো-মন্দের ভেদ-রেখা গুলিয়ে দেয় অতি সহজেই। আমার এক বন্ধু একবার বলেছিলেন, ভাঙা নড়বড়ে ছাতাকেও মেলে ধরলে বেশ টই-টুম্বুর দেখায়। ঠিক সেই রকমই বলা যায় পাঁচ-পাঁচি শাড়ীকেও অপরূপ ভংগীর হঠাৎ-আলোয় ঝল্‌কানিতে দেখলে মনোলোভা লাগে। বাস্তবিক পরীক্ষাটা তখন ঠিক শাড়ীর হয় না, হয় ঘরোয়া আলোয় ঘরনীর দেহে সেটি কেমন মানাবে সেই কল্পনা-শক্তির।

তাছাড়া আরো এক বিপদ আছে, সেটা বলা যায় সমস্ত পুরুষ জাতিরই সাধারণ নিয়তি। শাড়ীটির যে বিশেষ রং, পাড়ের কারুকার্য, বা আঁচলের নক্সা আপনার কাছে অত্যন্ত প্রীতিকর মনে হবে, অনিবার্য রকমেই সেটা গৃহ-সীমান্তে এক অপ্রীতিকর মন্তব্যের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে আজকাল প্রায় রেওয়াজই হয়ে দাঁড়িয়েছে, মেয়েদের কাপড় তাঁরা নিজেরা কিনবেন। পুরুষকে যদি নেহাতই থাকতে হয় তবে সে নিতান্ত তল্পি-বাহক হিসেবে।

সত্যি বলতে কী, কেনাকাটার নামে এই বাজার-সরকারী করা আমার আরও খারাপ লাগে।

কয়েক বছর আগে একটি ঘটনা দেখেছিলাম যা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। পুজোর আগে তখন এখনকার মতোই কেনাবেচা শুরু হয়েছে। দোকানে দোকানে দারুণ ভীড়। ওরই একটিতে এককোণে দাঁড়িয়ে সামান্য কিছু কেনা-কাটার চেষ্টায় ছিলাম। দোকানে ঢুকলেন একজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা এবং একজন প্রবীণ ভদ্রলোক।

এঁরা স্বামী-স্ত্রী তা আমি কিছু-কালের মধ্যেই অনুভব করতে পেরে-ছিলাম। তবে কর্তৃত্বের রাশটি ছিল সুনিশ্চিতভাবেই গৃহিণীর হাতে।

ভদ্রমহিলা নানা রঙের থান-পনেরো শাড়ী কাউন্টারের ওপর জমা করালেন একে একে। তারপর শুরু হ'ল তাঁর পছন্দের কাজ। পাড়, জমি আর আঁচল, সমান জাতের হয় না আর কিছুতেই। একটা মেলে তো আরেকটা মেলে না। যার সবগুলোই সমান ভালো তার দামের অংক আকাশ-ছোঁয়া। এর মধ্যেই বাছাইয়ের কাজ চলছিল কিছু কিছু এবং সন্দেহস্থলে চলছিল স্বামী-ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরামর্শ। নাটকের এই অংশগুলোই ফ্ল্যাশ-লাইটের নীচে ফেলবার মতো। ভদ্রলোকের বয়স হবে প্রায় ষাট, সামনের দিকে চুল উঠে গেছে, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। হয়তো বয়সকালে ইনি ছিলেন একজন ডাকসাইটে অফিসার, এখন দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। তাঁর গৃহিণী যখন রোল্ড-গোল্ডের চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে তাম্বুল-পূরিত-অধরে এক একবার করে অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিচ্ছিলেন, 'হ্যাঁগা', তখন স্পষ্টতই তিনি চমকে উঠছিলেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসারই সম্মতিসূচক উত্তর দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছুই করণীয় ছিল না। আর, শেষপর্বে কিছু টাকা বার করে দেওয়া। ওইটুকুর জন্যে একজন বর্ষীয়ান পদস্থ ব্যক্তিকে দারওয়ানের মতো মোতায়েন থাকতে দেখে আমার করুণাই হচ্ছিল।

আমাকে দেখেও কারো মনে এই রকম অনুকম্পা জাগে তা আমি একটুকুও চাইনে।

কিন্তু, সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, না চাইলেই সব কাজ থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। তাছাড়া নিতান্ত দরকারী বহু কেনাকাটাও যে পুজোর নাম করেই ঠেকিয়ে রাখা হয়ে-ছিল গত কয়েক মাস ধরে, তাও মনে রাখতে হয় বইকি! কাজেই একলাই হোক আর দোকলাই হোক, বাজারে একদিন বেরোতেই হয়।

আর এমনি মহিমা এই পুজোর বাজারের যে বেরোলেই মুখের চেহারা যায় বদলে। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছি, যাঁকে অন্য সময় দেখলে একজন রাগী মাষ্টারমশাই ছাড়া কিছুই মনে করা যায় না, পুজোর বাজারের জন্যে বেরোলে তাঁরই মুখে নব-বিবাহিতের গোপন উত্তেজনা ফুটে ওঠে।

আমারও নিশ্চয়ই এই রকমই হয়। আর এই সব লক্ষণ দেখেই দোকান-দারেরা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, এবং আরো কয়েকজন পায়েপায়ে ঘোরে।

পুজোর বাজার শুধু আমাদেরই নয় সকলেরই। পুজোর আগে বোনাস আর অগ্রিম মাইনের টাকা পকেটে আসে। দোকানে দোকানে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাতিল হয়ে যায়, সারা বছরে যা ব্যবসা হয় তার চতুর্গুণ কর্ম-ব্যস্ততা দেখা দেয় এই কয়টা দিনে। যারা প্রকাশ্যভাবে রোজগার করতে পারে না, তারাও যদি এই সময় ব্যস্ত হয়ে ওঠে তাহলে দোষ দেওয়া যায় কী করে? পায়েপায়ে ঘোরে তারাই।

তারপর আপনার আমার অন্য-মনস্কতার সুযোগে কখন যে ঠিক কি ঘটে যায় ঠাহর করা যায় না, পয়লা দোকানে ঢুকেই কিছু একটার দাম দেবার সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখা যায় যাকে খুঁজছেন সে ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য!

দুঃখ করার কিছু নেই। ছিল তো কয়েকখানা কারেন্সি নোট! হাত-সাফাইয়ের আণ্ডার-কারেন্টে এক কূল ভেঙে তা আরেক কূলে জেগে উঠেছে।

অন্যের বাজারের মাশুল জুগিয়ে পাছে আমাকে বেজার হয়ে ঘরে ফিরতে হয় এই ভয়ে পুজোর আগের কয়েকটা দিন আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি। আপনাদেরও মনে যদি এই উদ্বেগের ছিটেফোঁটা পৌঁছোয় আমি খুশী হব।

বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু গদ্য

মিনু মিত্র

॥ ১ ॥

প্রবন্ধের মাঝে যে গুরুগাম্ভীর্য লঘুগদ্যে তার প্রকাশ নেই। লঘুগদ্য লঘুপক্ষ মেঘের মতই স্বচ্ছন্দগতি, সকল দিকে তার চলা। কিন্তু প্রবন্ধের প্রতিটি পদক্ষেপই হিসেবী যুক্তি ও মননসিদ্ধ। আগের সঙ্গে পরেরটার একটা নিশ্চিত যোগ থাকতেই হবে। আর এ যোগ আবশ্যক। অসংবদ্ধ বল্গাহীন চিন্তা এ রাজ্যে ঠাঁই পাবে না। কিন্তু লঘুগদ্য নামেই তার পরিচয়। কোন বিষয় বলতে শুরু করলে তার সম্বন্ধে যাবতীয় চিন্তাকে জড় করা যাবে, যদি তাদের মাঝে পারস্পরিক যোগসূত্র না থাকে তথাপি মোটের ওপর সবদিক হতেই তার আলোচনা করা যাবে। আর এই আলোচনার ধারায় চিন্তাগুলি সারি সারি ধাপে ধাপে নাও আসতে পারে। চারদিক হতে এসে একটা ভাবনাকে পূর্ণ করে তুলতে পারে।

প্রবন্ধের চাইতে লঘুগদ্যের সীমা অনেক বিস্তৃত। লঘুগদ্য হাল্কাচালের বলে যে কোন বিষয়বস্তুকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে। এ পাঠের জন্য মনকে খুব নিবদ্ধ ও সিরিয়াস করে তুলতে হয় না। যখন খুশি যেমন খুশি পড়া যায় এবং খুব সহজেই মনে রাখা যায়। লঘুগদ্য প্রবন্ধের চাইতে অনেক হাল্কা আকারের যেমন তার প্রকৃতিতে। প্রবন্ধের মত যুক্তি-নির্ভর দৃঢ়োপিনদ্ধ চিন্তা না হলেও লঘুগদ্য আপন খেয়াল-খুশিমত চলে না। একটি মাত্র কথাই তার বক্তব্য। আর এই বক্তব্যের জন্য সে বিষয়বস্তুর পরে অনেক নূতন আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন কথাই সে বলে না। লঘুগদ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে সমালোচক বললেন—এ হ'ল একটি বস্তুর পরে নানা রঙের আলোক ফেলে তার রূপ দর্শন। লঘুগদ্যকে যে কারণে লঘু বলা হ'ল তার প্রধান কথাই হ'ল লঘুগদ্য মনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে। চিন্তার 'পরে তার কোন দাবি নেই। তার সৌভ্রাত্র হৃদয়ের সঙ্গে। যুক্তির ধার তাকে ধারতে হয় না বলে কোন আয়াসসাধ্য পথে তাকে হৃদয়ে স্থান করে নিতে হয় না। তার লঘুভঙ্গি, সহজ সরল চলা, এ হ'তেই বিষয়টি অন্তরে সঞ্চারিত হ'বে। অন্তরের সঙ্গে এর আদান-প্রদান বেশী বলেই নিত্যকার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হাস্যরসের উপাদানে ভরা হ'তে হয়। কিন্তু প্রথাগত হাস্যরস এখানে প্রাধান্য পাবে এমন বলা চলে না। উইট এবং স্যাটায়ার-এর চাইতে হিউমার এবং ফান্-এরই আধিপত্য এখানে বেশী। অন্তরের সহজাত সৌন্দর্যপ্রীতি ও শিল্প সৃষ্টির ইচ্ছা লঘুগদ্যের বিষয়কে চালিত হ'তে সাহায্য করবে। এর স্বচ্ছন্দ গতির ফলেই মনে হয় যে যখন খুশি শুরু হ'ল আবার যেখানে খুশি থেমে গেল। এ সম্বন্ধে উব্লু, ই, উইলিয়ামস্ বললেন—(essayist's usual role is that of the Social Philosopher, the critic the annotator).

ইংরাজী 'এসে' শব্দটির সঙ্গে একাত্ম করা যেতে পারে লঘুগদ্যকে। অবশ্য 'এসে'-র অর্থ রচনা। কিন্তু রচনার সঙ্গে সৃষ্টির আত্মিক যোগ তাকে প্রবন্ধর প্রতিষ্ঠা হ'তে বিচ্ছিন্ন করেছে। সৃষ্টিকে মার্জিত সুসংস্কৃত করে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রবন্ধের। কিন্তু সৃষ্টির ভূমিকায় রচনাই প্রধান। লঘুগদ্যের মাঝে যে সঞ্চার করার ধর্ম তা তাকে বর্ণনার সীমায় এনে দিয়েছে। তবে বর্ণনার চাইতে 'এসে' পৃথক। কারণ তাকে সোসাল ফিলোসফি আলোচনা করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় ক্রিটিকাল দৃষ্টি-ভঙ্গি। 'এসে' লঘু ব্যঙ্গ করতে পারে সমাজকে, আপন মনে আত্মসমীক্ষণ করতে পারে, করতে পারে নির্মল হাস্য-রসের অবতারণা। আর এ সবই লঘু-গদ্যের অন্তর্ভুক্ত। বলা যেতে পারে যে লঘুগদ্যের ক্ষেত্র 'এসে'র চাইতে বিস্তৃততর।

॥ ২ ॥

লঘুগদ্যের অবতারণা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের অনেক পূর্ব হ'তে। কিন্তু সার্থকতর ও পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের লঘুগদ্য বলতে প্রধানতঃ তিনখানা গ্রন্থকেই গ্রহণ করা যেতে পারে। সে তিনখানি হ'ল মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, লোক-রহস্য ও কমলাকান্তের দপ্তর। হাস্যরসের প্রকারভেদ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের হাস্যরসের উৎসার ঘটেছে বর্তমান গ্রন্থগুলিতে। এসেইস্ট এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে সোসাল ফিলোসফি এবং ক্রিটিক সত্তা তার প্রকাশ গ্রন্থ তিনখানিতে প্রচুর। রচনার মাঝে আত্ম-সংযোগে যে রস গড়ে ওঠে, তা মুচিরাম গুড়ের আত্মচরিতে তেমন পূর্ণতর হয়নি যেমন হয়েছে কমলা-কান্তের দপ্তরে। মুচিরাম গুড়ের আত্ম-

চরিত ও লোক-রহস্যের মধ্যে তিনি প্রধানত তৎকালীন সমাজ পর্যবেক্ষক ও সমালোচক।

এই গ্রন্থ দুটিতে তিনি সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্ধতা এবং পতনোন্মুখিতা সকল কিছুকেই ব্যঙ্গ করেছেন। অবশ্য এ ব্যঙ্গ শুধুই স্যাটায়ার নয়, অনাবিল হাস্যরসের উৎসার ঘটেছে কোথাও কোথাও। দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্যের বেদনা তাঁর মনকে মাঝে মাঝেই ক্ষত-বিক্ষত করেছে, যার ফলশ্রুতি হাসির পেছনে তীব্র শ্লেষে প্রকাশিত হয়েছে। হাস্যরসের যে উৎস অসংগতির রূপে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকল কিছু আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার ও বাঙালীর যে সঙ্গতি-হীন ও দুর্ভাগ্যের রূপটি প্রকটিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ তাকেই আঘাত করেছে বেশী। তবে হাসির অপ্রতুলতা ছিলনা সেখানে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ ও শ্লেষই মুখ্য লক্ষ্য। মুচিরাম দরিদ্র অবস্থা হ'তে ক্রমে রাজা উপাধি লাভ করলো, এই গৌরবময় ব্যাপারের অন্তরালে নীচ অসৎচরিত্র অক্ষম মুচিরামের চিত্র রচনা করেছেন। এইভাবে তিনি এই গ্রন্থে সমাজের নানা-স্তরের লোকের জীবন স্বভাব আচার-ব্যবহার ইত্যাদির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ও কঠোর সমালোচনা করেছেন। মুচিরামের জীবন-চরিত তখনকার সমাজের এক তথ্যপূর্ণ চিত্র। এদেশের হাকিমেরা শাসন-কর্তৃপক্ষের সাহেবরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ, অথচ তাদেরই হাতে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। মুচিরামের সাফল্য এসেছে গৌরবের ঋজু পথে নয়, তার মূর্খতা এবং অপমানসহিষ্ণুতার পথে। আত্মমর্যাদাবোধকে যারা মন হ'তে দূরে সরাতে পেরেছে, ইংরাজ বণিকদের সেলাম করেছে সর্বদা, তারাই এদেশে আর্থিক তথা বস্তুগত জীবনের মর্যাদা লাভ করেছে। তখন দেশে এমনতর আত্ম-মর্যাদার বিনিময় চলেছে সমাজের সর্বত্র। মুচিরাম গুড়ের জীবনে নানা উত্থান-পতন তার সামাজিক অস্তিত্ব ও সমাজের 'পরে তার প্রভাব আমাদের জীবনের নিত্যকার ঘটনা। তার এই সাফল্য আমরা গ্রহণ করতে পারি না স্বচ্ছন্দমনে কিন্তু সমর্থন করতে বাধ্যও হই। আমাদের জীবনে এমনতর অসঙ্গতির বোঝা বহন করেই চলতে হয়। কিন্তু এই অসাম্যকে আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে সহজ করে নিতে হয়েছে। মুচিরামের মূর্তিতে মানুষের পদলেহী মনোবৃত্তি এবং নিজেকে হীন করায় সহেতুক বাসনাও প্রকাশিত। এখানে বঙ্কিম সমালোচক। দেশ ও কাল নিয়ে সমাজের অস্তিত্ব। সেকালের সমাজের ভিত্তিতে ছিল মূঢ়তা এবং অপমানকর অর্থও বাহ্যমর্যাদা-লিপ্সা। আর সকল কিছুর 'পরেই ছিল বঙ্কিমের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তাই লঘু করে বললেও তার পেছনে বঙ্কিমের দেশ-প্রেমিক মনটি বেদনার্ত হয়ে উঠেছে।

॥ ৩ ॥

লোক-রহস্যের মধ্যেও রহস্যই প্রধান। কিন্তু এখানেও মাঝে মাঝে সমাজ-সচেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে। লঘু কৌতুক ও তীব্র ব্যঙ্গের সমন্বয়ে বঙ্কিমের রসিকতা বিশিষ্ট। এখানে তাঁর ব্যঙ্গ আরও তীব্রতর হয়েছে অদ্ভুত ও অসঙ্গতির স্পর্শে। অসঙ্গতির সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়। তাকে সার্থক করতে হলে গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণভাবে সেই অসঙ্গতিকে বজায় রাখতে হ'বে। মূর্খতার ও অজ্ঞতার দৃষ্টিকেই তখন সার্থক করে তুলতে হয়। মূর্খ সমালোচক যখন সমালোচনা করে তারও একটা ন্যায় শাস্ত্র থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সম্পূর্ণরূপে সেই মূর্খতার অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মূর্খের উদ্ভাবনী শক্তি অনন্যসাধারণ। তার কাজে তার নিষ্ঠাও সমালোচনাসুলভ। তাই কোনও প্রকার মন্তব্য করতে তার অসুবিধা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ এখানে 'উইট'-এর অনুপন্থী।

খুব নিকট হতে যে দোষ-ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায় না, তাকে অতি সহজেই দূরে হ'তে অনুধাবন করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এক নূতনতর রহস্য-পন্থা গ্রহণ করেছেন। মানুষের দোষ-ত্রুটিকে প্রাণীর চোখে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই বাঘেরা মানুষের সমাজ সম্পর্কে নূতন-তর অভিমত প্রকাশ করেছে। মানুষের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতির শোভনতার মুখোস উন্মুক্ত করে তার প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্লেষ ও বিদ্রূপ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়েছে। তাদের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের আদিম সত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রহস্য করার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন নানা রচনায়। গুরুগম্ভীর ভাবে মহাভারতের ভাষার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বাবুদের চরিত্র-কীর্তন করেছেন এবং এই প্রচণ্ড অসঙ্গতিতেই বঙ্কিম-চন্দ্রের হাস্যরসের শিল্প শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ছোট কথাকে বড় সহজে জটিল আবরণ দান করে, প্রত্যক্ষকে বিশদ ও অসম্ভবকে সম্ভব রূপে প্রতিপন্ন করে হাস্যরসকে সার্থক করে তুলেছেন।

যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়েছে বর্তমান গ্রন্থে তার পেছনে সমালোচক বঙ্কিম একেবারে অনুপস্থিত নন। তাই সমাজ ও সাহিত্য সকল কিছুর সম্পর্কে কোন দোষ-ত্রুটিই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। আর এই জন্য আঘাত করার প্রবণতা এবং লঘু ব্যঙ্গ এখানেও বর্তমান। তবে আঘাতের পেছনে কোন নির্মমতা নেই। তাই স্যাটায়ার-এর ঝাঁজ কমে এখানে এসেছে উইট। ইংরাজী সাহিত্যের বেকনের কথা এখানে বলা যেতে পারে। বেকন যখন সমাজ-প্রথা, রীতি-নীতি নিয়ে বলেছেন তখন শুধু লেজারলি বলে যাননি, তার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মতামতও ব্যক্ত করেছেন এবং বিশিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত করেছেন। এমনতর স্পষ্ট মত প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের লোক-রহস্য গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্ট। আরও একটা কথা যে, উপমার ব্যবহারে কোন সত্যকে খুব সহজ রূপকল্প দিয়ে বিশিষ্ট করে তোলার ব্যাপারেও বঙ্কিম-চন্দ্র বেকনের সমস্থানীয়।

॥ ৪ ॥

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত এবং লোক-রহস্য উভয় গ্রন্থেই বঙ্কিমের ব্যঙ্গ ও শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে। তবে শিল্পের দিক হ'তে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে তিনি সোজাসুজি ব্যঙ্গ করেছেন, সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আঘাতও করেছেন তাকে। কিন্তু লোক-রহস্যের মধ্যে তাঁর রহস্যপ্রিয়তা বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেখানে ব্যঙ্গ-কৌতুক আছে, শ্লেষও প্রচুর, কিন্তু তাই একমাত্র নয়, হাস্যরসের উৎসারও এখানে প্রচুর। এর পরই আসে কমলাকান্তের কথা। কমলাকান্তের দপ্তর ও পূর্বের গ্রন্থ দুখানির পার্থক্য এই যে, পূর্বের গ্রন্থ দুখানির তুলনায় বর্তমান গ্রন্থে কৌতুক ও রহস্যপ্রিয়তা নিবিড়। হাস্যরস এখানে সহস্রধার। তবে ব্যঙ্গ ও আঘাত করার প্রবণতা এখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। লোক-রহস্যের মত এখানেও দেখার বস্তুকে দ্রষ্টা হ'তে দূরে স্থাপন করেছেন, তাই দেখাটা এখানে অত্যন্ত

কৌতুকপূর্ণ ও স্বচ্ছ। অহিফেনের রঙে কমলাকান্তের চোখে মানব-সমাজ ও জীবনযাত্রার নূতনতর অর্থ দ্যোতিত হয়েছে। গ্রন্থ তিনখানিকে পর পর সাজালে দেখা যাবে যে, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ ক্রমশ কমছে এবং অনাবিল হাস্যরস তার পরিপূরক হয়েছে। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে ব্যঙ্গ কশাঘাতই উপজীব্য। লোক-রহস্যে তা কিছু কম আর হাস্য-রসের উৎসার বেশী। কমলাকান্তের দপ্তরে হাস্যরসই প্রধান কথা, ব্যঙ্গ ও আঘাত দেশপ্রেমিক তথা মানব-প্রেমিক মনের বেদনাজাত।

কমলাকান্ত অহিফেনসেবী, জগতে তার দুটি বন্ধন। আফিং আর প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ—এ দুটি ছাড়া আর কোন বন্ধন নেই। তাই তার পক্ষেই সাদা-চোখে সমাজকে দেখতে পাওয়া খুব সোজা। দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপের 'পরে তার কোন শ্রদ্ধা নেই। মানুষের মোহাচ্ছন্ন সংকীর্ণতা নিয়ে তাই কমলা-কান্ত কৌতুক করে। দূর হ'তে দেখার যে সত্যদৃষ্টি তা কমলাকান্তের ছিল। তাই আত্মসমালোচনায় তার কৌতুক মুখর হয়েছে। দেশের শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা সমসাময়িক পত্রিকা, অক্ষম লেখক ইত্যাদির প্রতি তাঁর কৌতুক বর্ষিত হয়েছে। এমনকি সাহিত্য ও দর্শনও তাঁর কৌতুকের লক্ষ্য হ'তে বাদ পড়েনি। পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন হ'ল কমলা-কান্তের ভাষায় উদার দর্শন। সকল মানুষকে কমলাকান্তের মনে হয়েছে পতঙ্গ, তারা প্রত্যেকেই কামনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। যদিও কমলাকান্তের কথা-গুলিতে আছে অদ্ভুত কৌতুক তথাপি তার সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। কমলাকান্ত শুধু যে মানুষ সমাজ এবং তার নানাবিধ আচার-ব্যবহারের সমা-লোচনা করেছে তা নয়, মাঝে মাঝে আত্ম-সমীক্ষণেরও প্রয়াস পেয়েছে। আর এই সূত্রেই রচনা করেছে অপূর্ব গীতি-কবিতা। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা তুষার ঢাকা শৃঙ্গার মত। দূর হ'তে তার যত সৌন্দর্যই প্রতীত হোক না কেন, তার একটা দুঃসহ নিঃসঙ্গতা থাকে। এই একাকীত্বের বেদনায় হয় সৃষ্টি। কমলা-কান্তের মধ্যেও জাগে নিঃসঙ্গতার বেদনা। কিন্তু নিঃসঙ্গতার মধ্য হ'তে যে স্বার্থক্ষুব্ধতার হাহাকার জাগতে পারে, কমলাকান্তকে তা পেসিমিস্ট করে তুলতে পারেনি। মানব-প্রীতি কমলাকান্তকে পরম কাম্য দান করেছে। মানব-প্রীতির বন্ধন ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে এটি কমলাকান্তের কাছে মুক্তির সমান। কমলাকান্ত তাই বলে, 'মনুষ্য জাতির' প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।' এটিই কমলাকান্তের ধ্রুবপদ। কমলাকান্তের সর্বপ্রকার অসংগত উক্তির মধ্যে মানবের প্রতি সুগভীর প্রীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। কখনও বা কবিকল্পনায় এটি উচ্ছ্বসিত, কখনও বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সরস। কমলাকান্তের মনের অভীপ্সা ও দেশ সম্বন্ধে 'যা কিছু' বলতে চেয়েছে তার মধ্যেই রচিত হয়েছে পরম গীতি-কাব্য।

কমলাকান্তর সঙ্গে দ্য কোয়েন্সি-র (confessions of an English opium eater)
এর একটা মিল আছে। অনেকে একটিকে অন্যটির প্রেরণাজাত বলে মনে করেন। কিন্তু কমলাকান্তের সঙ্গে দ্য কোয়েন্সি-র যে মিল তা শুধু আফিং সেবনে। দুজনেই আফিং সেবন করে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া এক নয়। কোয়েন্সি-র আফিং-এর প্রতিক্রিয়া বিশুদ্ধ ফ্যানটাসি। কমলাকান্তে এমনতর বিশুদ্ধ ফ্যানটাসি দেখা যাবে না। কমলাকান্তের স্বপ্ন-চারিতার মাঝে একটা রূপক আছে, আছে দেশ-সমাজের পরে একটি সচেতন দ্রষ্টা-মানস। কমলাকান্তের ভাবনা আফিং-এর প্রভাবে আরও বেশী দার্শনিক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত। ল্যাম্ব-এর ইলিয়ার সঙ্গে কমলাকান্তের মিল আছে। কমলাকান্তও ইলিয়ার মত অকৃত-দার। ইলিয়ার মত কমলাকান্তও সকল কথা বলার মধ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বহন করে চলেছে। তবু পারিপার্শ্বিক মানুষের জন্য উভয়েরই আছে অসীম প্রীতি ও মমতা। তবে একথাও সত্য,
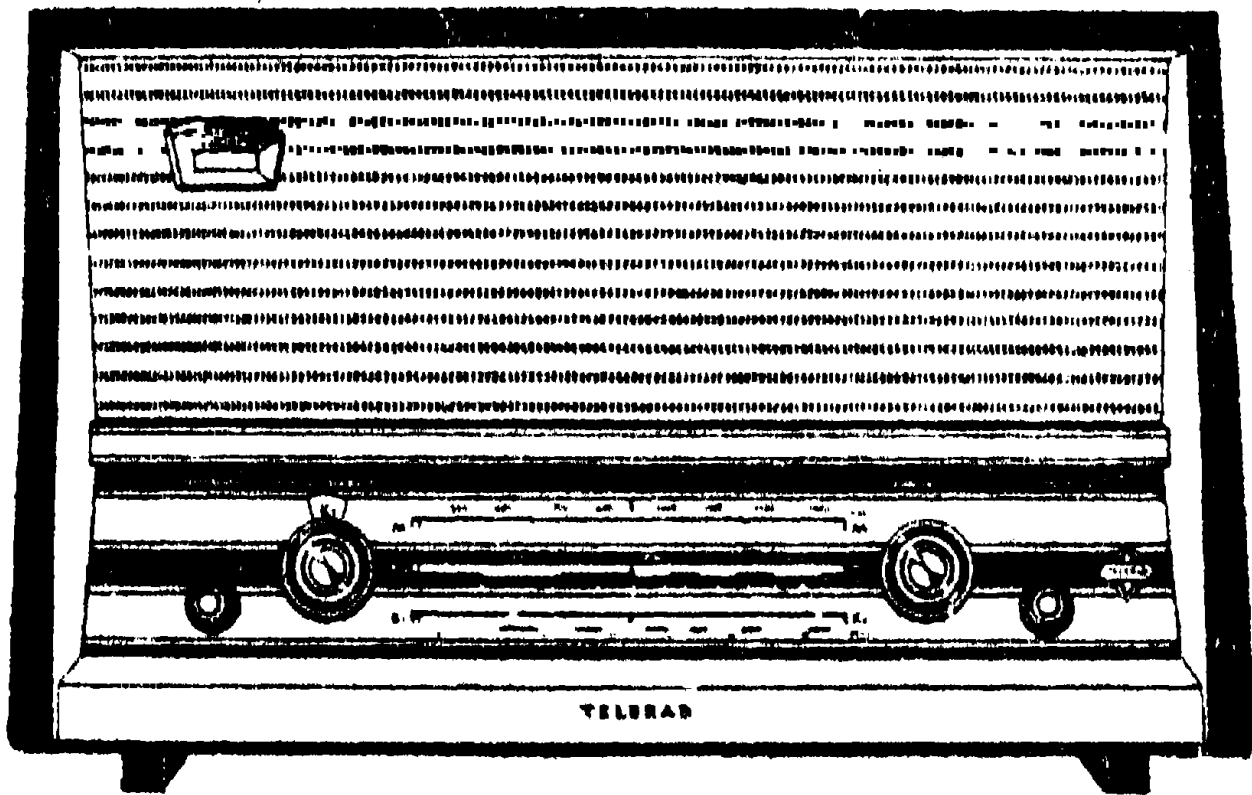
ল্যাম্ব-কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করতে হয়নি। ইলিয়া-তে কমলাকান্তের গভীর মনন ও দার্শনিকতার প্রকাশ নেই।

সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জনশিক্ষক। সেখানে সর্বদাই তাঁকে রচনা করতে হ'ত 'বহুজন হিতায়'। মনের ব্যক্তিপুরুষটি আত্মপ্রকাশের কোন অবসরই পেতো না। কিন্তু কমলাকান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম আপনার মনটিকে প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সহজে ও স্বাধীনভাবে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তকে এত বেশী পছন্দ করতেন। এ গ্রন্থকে তিনি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন। একদা বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনে যে কবিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারও প্রকাশ আছে বর্তমান গ্রন্থে। এই গ্রন্থ শুধু রোমান্টিকতা বা লঘু কৌতুক নয়, সমাজচিন্তা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাস, গীতিভাবনা সকল কিছুই মিলিত হয়ে এ গ্রন্থকে অপূর্বতা দান করেছে।

কমলাকান্তের মানব-প্রীতির ধুয়া অবশেষে দেশপ্রেমে মিলিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কমলাকান্তের কৌতুকে জেগেছে বিষাদ। এ বিষাদের পেছনে ব্যক্তিগত বেদনা যেমন আছে, দেশের ও জাতির দুর্গতির জন্য বেদনাও কম নয়। আপাত-দৃষ্টিতে কৌতুকের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেলেও এর অন্তরালে আছে চোখের জল। ইলিয়া-তেও এমনতর কৌতুক ও অশ্রু মিশেছে, কিন্তু সেখানে তার উৎস ব্যক্তিগত। বঙ্কিমের বেদনা দেশের ও সর্বমানুষের জন্যই প্রধান। কমলাকান্তের দার্শনিকতা ও মননক্ষমতা পরে আর পাওয়া যায়নি কোন সৃষ্টির মাঝে, কারণ জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে সহমর্মিতা অত্যন্ত দুর্লভ।

বঙ্কিম সারা জীবন যা বলতে চেয়েছেন তা এখানে অতি সহজেই রূপ লাভ করেছে। তাঁর দেশপ্রেম, জীবন-দর্শন, আত্মসমালোচনা—জাতি ও ব্যক্তি হিসাবে আত্মগৌরব, সর্বোপরি একটি আশা-রঙীন মনোভাব আর সকল কিছুর মূল-সূত্র হ'ল মানবপ্রেম তথা দেশপ্রেম। লঘু কৌতুক-পরিহাসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম বারে বারে একথাই বলতে চেয়েছেন, সর্বজীবে সর্বজনের জন্য আপনাকে বিকশিত করাই জীবনের লক্ষ্য।

লঘু গদ্যের অন্যতম হয় 'এসে'। 'এসে'র প্রধান গুণ এই যে, পড়লে মনে হয় হাল্কাভাবে লিখে যাওয়া। কিন্তু কমলাকান্তের ভাবনায় স্থান পেয়েছে বহু জটিল তত্ত্ব দার্শনিকতা, সকল কিছুকে সুন্দর ও আপনার ভাবনামণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস। 'এসে'র দুটি প্রকারের মধ্যে পার্সোনাল এসেতেই প্রধানত লেখকের আত্মসমীক্ষণ প্রকাশ লাভ করে।

কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যেও তাই বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছেন। শিল্প-কৃতি হিসেবেও এর একটা মহিমা আছে। বঙ্কিমের ঘটনাবহুল জীবনটিকে এখানে পাওয়া যাবে না। বারে ধারে বঞ্চনাক্ষুব্ধ অপমানিত অবহেলিত দেশকে তথা জাতিকে দেখেছে বঙ্কিম যেমনটি, তা এখানে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। এই মনটি সাধারণভাবে তাঁর গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করেনি, বিভিন্ন রূপে চিত্রিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পসত্তা ও অন্তর-সত্তা মিশ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

।। ৫ ।।

বর্তমান কালের সংজ্ঞানুসারে 'এসে' লঘুগদ্যের সঙ্গে সমার্থক নয়। 'এসে' ও লঘুগদ্যের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। লঘু-গদ্যের মধ্যে ইমপার্সোনাল 'এসে'-ও থাকতে পারে, থাকতে পারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা। বর্তমান ভাবনায় 'এসে' হ'ল লঘুসঞ্চারী রম্য রচনা এবং প্রধানত পার্সোনাল লঘুগদ্যে ব্যক্তিগতকতা ও বস্তু-প্রাধান্য দুয়েরই মিলন ঘটতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোক-রহস্য ও মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত গ্রন্থ দুখানি লঘু-গদ্য সীমাভুক্ত হ'লেও 'এসে' নয়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাদী ও সমাজ শাসনে উদ্যত। কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমের আত্মগত রূপের প্রকাশ। এখানে বঙ্কিম-চন্দ্র পুরোপুরি নিরাসক্তরূপে রস দান করতে পারেননি। বিশুদ্ধ আত্মভাবনার ক্ষেত্র অধিকার করেছে দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর সীমাহীন প্রীতি। দূরে হতে আঘাত করে করে মানুষকে জাগিয়ে তোলার অনেক বৈশিষ্ট্যে সচেতন করার প্রয়াস তিনি ত্যাগ করেছেন। কমলা-কান্তরূপে তিনি একেবারে সকলের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, বলার ভঙ্গিও পরি-বর্তিত হয়েছে। রচনা-সাহিত্যের যে স্বচ্ছন্দ গতি ও লঘুপক্ষ রূপটি তা এখানে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কমলাকান্তকে বলা যেতে পারে বাংলা-সাহিত্যের প্রথম সার্থক রচনা-সাহিত্য। বুদ্ধির দীপ্তি আর দৃষ্টির সূক্ষ্মতা এই গ্রন্থের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবু আত্মপ্রকাশের ওপর একটা হাল্কা আবরণ আছে যার ফলে মনে হয় এর সৃষ্টির উৎস লেখকের কৌতুকপ্রিয় মন।

বেকনের যুগের রচনা-সাহিত্যের যে সংজ্ঞা, তার আওতায় পড়ে না কমলা-কান্ত। কারণ এই ভাবনায় আত্মভাবনার স্থান ছিল খানিকটা সংকীর্ণ। তাই রচনাকারের দার্শনিক ও সমাজ-সমালোচক সত্তাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞাতে আত্মভাবনা স্থান পেলো জার্নালিজম-এর যুগে ল্যাম্ব এবং দ্য কোয়েনসি-র হাতে। রচনা কথাটার প্রকৃত ইমপ্লিকেশন এই যুগেই শুরু হ'ল বলা যায়। আমাদের দেশের সাহিত্যেও ঠিক এমনি দৃষ্টান্ত মিলবে। লঘুগদ্য শুরু হয়েছে বহু আগে, কিন্তু রচনা পর্যায়ের কোন সৃষ্টি তখনও গড়ে ওঠেনি। বাংলাসাহিত্যের জার্নালিজমের যুগ কবিওয়ালা থেকে শুরু করে ঈশ্বর গুপ্তের হাতে ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে আর তারই পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য শুরু। আর আত্মভাবনা-শুদ্ধ সৃষ্টি বঙ্কিমের হাতেই মূর্ত হয়েছে প্রথম। বলা যেতে পারে কমলাকান্তের দপ্তরই বাংলা-সাহিত্যে রচনার প্রথম নিদর্শনরূপে অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য। বঙ্কিমের যে লঘুগদ্য, তার পূর্বসূরী বাংলা সাহিত্যে আছে কিন্তু তার রচনা-সাহিত্যের অর্থাৎ কমলাকান্তের যথার্থ পূর্বসূরী নেই, যথাযথ উত্তরসূরী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের লঘুগদ্যের সর্বত্রই পরিহাস-রসিক বঙ্কিমকে পাওয়া যাবে। হাস্যরসের অনাবিলতা সর্বত্র রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। লঘুভাবে সঞ্চার করার কৌশল কোথাও কোথাও ব্যর্থ হয়েছে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের বেদনার প্রতি-ক্রিয়ায়। তাই হাসির অন্তরালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষ স্থান পেয়েছে। এমন কি কমলাকান্তের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র লঘুতা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর অজ্ঞাতেই এসেছে তাঁর কবিচিত্ত আর বেদনা ও জ্বালা যার ফলশ্রুতি আত্মসমালোচনা পরোক্ষে জনশিক্ষার প্রয়াস।

এই জন্যেই বলা যেতে পারে যে, লঘুগদ্যের বর্তমান সংজ্ঞানুসারে বঙ্কিম-চন্দ্রের কোন রচনাকেই তার গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে না। কিন্তু 'এসে'র যে 'দেশ' এবং স্যাটায়ারইস্ট-এর যে ভূমিকা নির্বাচন করেছেন উইলিয়ামস তা হ'তে বঙ্কিমচন্দ্রের লঘুগদ্যকে এ নামাঙ্কিত করা কঠিন নয়। বেকনের যুগের রচনার সীমায় যেমন বঙ্কিমের লোক-রহস্য ও মুচিরাম গুড়ের আত্মচরিত পড়ে তেমনি আত্মগত ভাবনার প্রকাশ বলে কমলা-কান্তকে ল্যাম্ব-এর রচনার সমপর্যায় বলে গণ্য করা যায়। লঘুগদ্যের সংজ্ঞা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিস্তৃত হয়েছে তার পরিধি। রচনার সীমা এত বিস্তৃত যে, লঘুগদ্যকে প্রায় রচনা সমার্থক করে বর্তমানে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আজকের দিনের রচনার মানদণ্ডে বঙ্কিমের লঘুগদ্যকে বিচার করা চলে না। কারণ কমলাকান্তের মধ্যেই একমাত্র রচনার উপাদান থাকলেও তা বিশুদ্ধ রচনা নয়। আরও একটা কথা, প্রতিটি লেখকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখায় প্রকাশিত। বঙ্কিমের লঘুগদ্যও এদিক হ'তে নিজপন্থানুসারী এবং নিঃসঙ্গ একক।

শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন

তিনজন ছাত্র

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার বিষণ্ণ আঁধার গাঢ় হয়ে আসছিল। তারই মাঝে তিনটে হলুদ রঙের চৌকোনা আলো ঝক-মক করছিল আমাদের মাথার ওপরে।

ওপরে তাকিয়ে হোমস্ বললে, "আপনার তিনটে পাখীই দেখছি নিজের নিজের বাসায় রয়েছে। আরে! আরে! ও কি! ওদের একজন তো দারুণ অশান্তিতে ছটফট করছে মনে হচ্ছে!"

পর্দার ওপর আচমকা ভেসে উঠল ভারতীয় ছাত্রের কুচকুচে কালো ছায়া। দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারী জুড়েছিল সে।

হোমস্ বললে, "ওদের প্রত্যেকের ঘরে একবার ঝাঁকি দর্শন দিয়ে আসতে চাই। সম্ভব হবে কি?"

সোমস্ জবাব দিলেন, "কোনও অসুবিধে নেই। এ ঘর তিনটে কলেজের সবচেয়ে পুরোনো ঘর বলে দর্শনেচ্ছুর আগমনটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আসুন, আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের।"

গিলক্রাইস্টের দরজায় টোকামারার সঙ্গে সঙ্গে হোমস্ বলে উঠল, "নাম বলবেন না, প্লিজ!" ছিপছিপে চেহারার দীর্ঘতনু একটি যুবাপুরুষ দরজা খুলে দিলে। সোনালী রেশমের মত একমাথা হাল্কা চুল। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে ভেতরে। মধ্যযুগীয় গার্হস্থ্য স্থাপত্যের কতকগুলি বিচিত্র নিদর্শন ছিল ঘরের মধ্যে সত্যি সত্যি দেখবার মত। একটা নিদর্শন দেখে হোমস্ তো এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গেল যে তা আঁকতে সুরু করে দিলে নিজের নোটবইয়ের পাতায়। পেন্সিলের শিষ ভেঙে যাওয়ায় গিলক্রাইস্টের কাছ থেকে একটা পেন্সিল ধার চেয়ে নিলে। সবশেষে, একটা ছুরী চেয়ে নিয়ে শানিয়ে নিলে নিজের পেন্সিলটা। এই আশ্চর্য দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ভারতীয়ের ঘরেও। ছেলেটি স্বল্পভাষী, খর্বকায়। বকের মতো বেঁকানো নাক। আড়চোখে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল সে। হোমসের স্থাপত্য সম্পর্কিত অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেশ বুঝলাম, আমাদের বিদায় দিয়ে খুশী হল সে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই হোমস্ যে তার অভীপ্সিত সূত্রের সন্ধান পায়নি, তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ওর মুখ দেখে। তৃতীয়বারে নিষ্ফল হ'ল আমাদের অভিযান। টোকা মারা সত্ত্বেও দরজা খোলা দূরে থাকুক ভেতর থেকে এমন এক পশলা কদর্য ভাষার বর্ষণ ভেসে এল যে কহতব্য নয়। "তুমি যেই হও না কেন, পরোয়া করি না। গোল্লায় যাও!" গর্জে ওঠে ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। "কাল আমার পরীক্ষা। আজকে কারও ক্ষমতা নেই আমায় বাইরে বার করে।"

"অত্যন্ত রুক্ষ ছোকরা," সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাগের চোটে লাল হয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন আমাদের পথপ্রদর্শক। ও অবশ্য জানত না যে আমিই টোকা মেরেছি দরজায়। তাহলেও ওর স্বভাবটাই ঐ রকম অভব্য, অভদ্র। আর এরকম অবস্থায় তো বাস্তবিকই সন্দেহজনক।"

প্রত্যুত্তরে হোমস্ যা শুধোলে, তা সত্যই বিচিত্র।

"ওর সঠিক উচ্চতাটা বলতে পারেন?"

"মিঃ হোমস্, তা তো বলা মুস্কিল। ভারতীয় ছাত্রের চেয়ে ও লম্বা বটে, তবে গিলক্রাইস্টের মত অতটা নয়। আমার তো মনে হয় পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির ধারে কাছে হ'বে।"

"দারুণ দরকারী পয়েন্ট," বললে হোমস্। "গুড নাইট, মিঃ সোমস্।"

বিস্ময়ে হতাশায় সজোরে চেঁচিয়ে ওঠেন আমাদের পদপ্রদর্শক।

"হায় ভগবান, মিঃ হোমস্, এভাবে আমাকে অকূল পাথারে ফেলে সত্যি সত্যিই কি আপনি দমন করে চললেন।

পরিস্থিতিটা এখনও উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। আগামীকাল পরীক্ষা। আজ রাতেই পাকা-পাকি কিছু ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরে তো পরীক্ষা বসতে দিতে পারি না। যে-ভাবেই হোক এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আমায়।"

"যেমন আছে, তেমনি চলুক। কিছু রদবদল করবেন না। কাল ভোরের দিকে এখানে আসছি। তখনই এ প্রসঙ্গে কথা বলব'খন। আমার তো মনে হয়, তখনই কি ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে কিছু শলাপরামর্শ দিতে পারব। ইতিমধ্যে কোন কিছুরই পরিবর্তন করবেন না—সামান্য পরিবর্তনও নয়।

"বেশ, তাই হবে, মিঃ হোম্‌স্।"

"আপনি নিরংকুশ নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন। এ উটকো উৎপাত থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা না একটা পথ নিশ্চয় আবিষ্কার করতে পারব আমরা। কালো কাদামাটির পিরামিড আর পেন্সিলের কুচোগুলো নিয়ে চললাম। গুড-বাই।"

চত্বরের অন্ধকারে বেরিয়ে এসে আবার ওপর দিকে তাকালাম জানলাগুলোর পানে। ভারতীয় ছাত্রটি তখনও পায়চারী করছিল ঘরময়। বাকী দু'জনে ছিল দৃষ্টির অন্তরালে।

বড় রাস্তায় এসে পড়ার পর হোম্‌স্ শুধোলে, "কিহে ওয়াটসন, কি মনে হয় তোমার? এ যেন একটু ছোট-খাট টেবিলে-বসা খেলা—অনেকটা তিন তাসের হাত সাফাইয়ের মত—তাই নয় কি? তিনজন লোক রয়েছে এ হেঁয়ালীতে। এদের মধ্যেই একজন করেছে এ কাজ। তোমার পছন্দসই লোকটি কে শুনি?"

"ওপরের তলার আঁস্তাকুড়-মুখো ছোকরাটা। ওরই রেকর্ড সবচাইতে খারাপ। ইণ্ডিয়ান ছোকরাও কিন্তু ভারী ধড়িবাজ। সারাক্ষণ ঘরময় পায়-চারী করার মানেটা কি শুনি?"

"তাতে কোন দোষ নেই। প্রাণপণে কিছু মুখস্ত করার চেষ্টা করলে অনেকেই এ রকম করে থাকে।"

"কি রকম অদ্ভুতভাবে বাঁকাচোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, তা দেখেছ তো?"

"তুমিও এমনিভাবে তাকাতে যদি পরীক্ষার আগের রাতের প্রস্তুতির মাঝে অনাহূত এক দঙ্গল লোক এসে ঢুকত তোমার ঘরে। না, না, ওতে কোন গলতি দেখি না আমি। পেন্সিল, ছুরী—সবই সন্তোষজনক। কিন্তু তবুও ঐ লোকটাই যে গোলমাল করে দিচ্ছে সব।"

"কে?"

"কেন, ব্যানিষ্টার, সোম্‌সের পরি-চারক? এ ব্যাপারে তার ভূমিকাটা কি বলো তো?"

"রকম সকম দেখে তাকে বিলকুল খাঁটি মানুষ বলেই বিশ্বাস হয় আমার।"

"আমারও তাই বিশ্বাস। গোল-মাল করে দিচ্ছে এই জায়গাটাই। কিসের জন্যে একজন বিলকুল খাঁটি মানুষ—বেশ, বেশ, এই তো দেখছি একটা বড়-সড় মনোহারী দোকান। এস, আমাদের গবেষণা শুরু হোক এখান থেকেই।"

মাত্র চারটে মনোহারী দোকান ছিল শহরে। বৃথাই সব ক'টায় ঢুঁ মারলাম। প্রতিবারই পেন্সিলের কুচোগুলো বার করে চড়া দাম দিতে চাইলে হোম্‌স্। কিন্তু সবাই একবাক্যে জানালে যে সাধারণ আকারের পেন্সিল নয় বলে এ জিনিস স্টকে রাখা হয় না বললেই চলে, তবে অর্ডার দিলে আনিয়ে দেওয়া যাবে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও বন্ধুবর খুব দমে গেছে বলে মনে হল না। কৌতুক-ছলে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিলে সে। তবে সে কৌতুক পুরোপুরি নয়, আধাআধি।

"লাভ নেই, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। সবচেয়ে জোরালো আর চূড়ান্ত সূত্র ছিল এইটাই—কিন্তু ফলাফল তো দেখছি ফক্কা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এ সূত্র ছাড়াই যে কেসটা খাড়া করতে পারি আমি, সে সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। সর্বনাশ! আরে ভায়া, ন'টা বাজতে চললো যে। আসবার সময়ে আধো-আধো গলায় ল্যাণ্ড-লেডী বলে দিয়েছিল কড়াইশুঁটি তৈরী থাকবে সাড়ে সাতটায়। আরে ভাই ওয়াটসন, তোমার এই বারমেসে তামাক আর অসময়ে খাওয়াদাওয়ার জন্যে আশা করছি শীগ্‌গিরই বাড়ী ছাড়ার নোটিশ পাবে। আর, তোমার অধঃপতনের অংশ আমাকেও নিতে হবে। কিন্তু নার্ভাস শিক্ষক, অসাবধানী পরিচারক আর তিনজন সমুৎসাহী ছাত্রের রহস্যভেদ করার আগে তো তা করা যাবে না।"

সেদিন আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করল না হোম্‌স্। যদিও দেরী করে ডিনার খাওয়ার পর বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইল ও। সকাল আটটায় সবে প্রাতঃকৃত্য শেষ করেছি, এমন সময়ে আমার ঘরে ঢুকল ও।

বললে, "ওহে ওয়াটসন, সেন্ট লিউক্‌স্-য়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। প্রাতরাশ না সেরে আসতে পারবে?"

"নিশ্চয়।"

"আমরা গিয়ে নিশ্চিত কিছু না বলা পর্যন্ত তো হাঁকপাঁক করে মরবেন সোম্‌স্। আর, ভয়ঙ্কর সে ছটফটানি, নাকি বল?"

"ওঁকে নিশ্চিত কিছু বলার মত উপাদান কি পেয়েছ?"

"মনে তো হয় পেয়েছি।"

"সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছ?"

"পেরেছি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। এ রহস্যের সমাধান আমি করেছি।"

"কিন্তু টাটকা সাক্ষ্য প্রমাণ তুমি পেলে কি করে শুনি? আর পেলেই বা কি?"

"আহা! ভোর ছ'টার মত অসময়ে তো আর স্রেফ হাওয়া খাওয়ার জন্যে শয্যাত্যাগ করিনি আমি। ঝাড়া দু'টো ঘণ্টা বেদম খাটতে হয়েছে আমায়। আর, কম করে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়েছে। তবেই না কিছু দেখাতে পারছি। এই দ্যাখ!"

হাত বাড়িয়ে ধরল ও। হাতের তালুতে দেখলাম কালো রঙের মণ্ডের মত কাদামাটির তৈরী ছোট ছোট তিনটে পিরামিড।

"আরে, হোম্‌স্, কাল তো মোটে দু'টো পেয়েছিলে!"

"আর একটা পেয়েছি আজ সকালে। খুবই সাদাসিদে বিতর্কের ব্যাপার হে। তিন নম্বরটার আগমন যে-অঞ্চল থেকে, এক নম্বর আর দু'নম্বরের উৎপত্তিও সেইখানে। তাই না, ওয়াটসন? বেশ, বেশ, চলে এস চটপট। বন্ধুবর সোম্‌সের যন্ত্রণা লাঘব করে আসা যাক এবার।"

বাস্তবিকই রীতিমত উত্তেজিত অবস্থায় দেখলাম দুর্ভাগা শিক্ষক বেচারীকে তাঁর চেম্বারে পৌঁছোনোর পর। সে উত্তেজনা দেখলে সত্যিই বড় করুণা হয়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হবে পরীক্ষা। অথচ তখনও তাঁর উভয়-সংকটের যন্ত্রণা ঘোচে নি। তখনও

ভাবছেন, এ কাণ্ড সর্বসমক্ষে হাজির করবেন, না, বদমাস্ নচ্ছারটাকেও মূল্যবান স্কলারশিপের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে দেবেন। এমনই উদগ্র তাঁর মানসিক উদ্বেগ যে চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলেন না উনি। হোম্‌স্‌কে দেখেই দু'হাত সামনে প্রসারিত করে ব্যাকুলভাবে ছুটে গেলেন তার পানে।

"জয় ভগবান, আপনি তাহলে এসেছেন! আমার ভয় হয়েছিল হয়ত নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনি। কি করি বলুন তো? পরীক্ষা শুরু করব?"

"হ্যাঁ। শুরু করুন—কোন বাধা দেবেন না পরীক্ষায়।"

"কিন্তু বদমাস্‌টা—"

"সে পরীক্ষা দেবে না।"

"তার নাম জানতে পেরেছেন?"

"মনে হয় পেরেছি। এ ব্যাপার যদি পাঁচকান না করতে চান তো আমাদের নিজের নিজের কিছু ক্ষমতা লাভ করা দরকার। সামরিক বিচারালয়ের মত ছোটখাট একটা কোর্ট মার্শালের আয়োজন করে আমরাই নিষ্পত্তি করে ফেলব এ ব্যাপারের। সোম্‌স্, আপনি থাকুন ঐখানে—যদি কিছু মনে না করেন! ওয়াটসন, তুমি এখানে! আর্মচেয়ার নিয়ে মাঝখানে বসব আমি। অপরাধবোধ দুরু দুরু যার হৃৎপিণ্ড, তার বুকে আতঙ্কের শেল হানবার মত পোজ আমরা নিতে পেরেছি বলেই তো মনে হয় আমার। দয়া করে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিন!"

ব্যানিস্টার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। বেশ বুঝলাম, আমাদের ধর্মাবতারসুলভ ভাবভঙ্গিমা আর ধর্মাধিকরণ-দৃশ্য দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছে ওর বুক।

হোম্‌স্ বললে, "দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। ব্যানিস্টার, গতকালের ঘটনায় যে সত্যটুকু লুকোনো আছে, তা কি এবার বলবে?"

লোকটার চুলের গোড়া পর্যন্ত বোধহয় ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেল।

"আমি তো আপনাকে সবই বলেছি, স্যার।"

"আর কিছু বলার নেই?"

"আর কিছুই নেই, স্যার।"

......সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রাগের চোটে লাল হয়ে......

"বেশ, তাহলে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা শোনাই তোমায়। গতকাল ঐ চেয়ারটায় গিয়ে যখন বসেছিলে, তখন কি তুমি কোন জিনিস গোপন করার অভিপ্রায় নিয়েই গেছিলে ওখানে? যে জিনিসটা দেখামাত্র বোঝা যেত যে ঘরের মধ্যে কারও আবির্ভাব ঘটেছিল?"

পাঁশুটেপানা বীভৎস হয়ে ওঠে ব্যানিস্টারের মুখ।

"না, স্যার, নিশ্চয় না।"

"এটা কিন্তু একটা নিছক সম্ভাবনা", মোলায়েম মিষ্টি গলায় বললে হোম্‌স্। "আমি অকপটে স্বীকার করছি, এ সম্ভাবনা প্রমাণ করতে আমি অপারগ। তবে আর একটা জিনিস খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে আমার। মিঃ সোম্‌স্ পিছু ফেরামাত্র সেই মুহূর্তে শোবার ঘরে যে লোকটা লুকিয়ে ছিল তাকে তুমিই ছেড়ে দিয়েছিলে।"

শুকনো ঠোঁটে জিব বুলিয়ে নিলে ব্যানিস্টার।

"ওখানে কেউ ছিল না, স্যার।"

"আহা, সেইটাই তো পরিতাপের বিষয়, ব্যানিস্টার। এতক্ষণ পর্যন্ত সত্য বললেও বলে থাকতে পার। কিন্তু এবার তো আমি জানি যে তাহা মিথ্যে বলছ তুমি।"

"ওখানে কেউ ছিল না, স্যার।"

"ধীরে, ধীরে, ব্যানিষ্টার।"

"না, স্যার, কেউ ছিল না।"

"তাই যদি হয় তো আর কোন খবরাখবর তুমি আমাদের দিতে পারবে না। দয়া করে এ ঘরেই থাকবে কি তুমি? শোবার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। সোম্‌স্, একটা অনুরোধ আছে। অনুগ্রহ করে তরুণ গিলক্রাইষ্টের ঘরে গিয়ে তাকে একবার এখানে আসতে বলবেন কি?"

ক্ষণেক পরেই গিলক্রাইষ্টকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন সোম্‌স্। ভারি চমৎকার চেহারা ছেলেটির। ছিপছিপে লম্বা নমনীয় তনু। লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরার ধরন দেখলেই বোঝা যায় কতখানি বিদ্যুৎশক্তি লুকিয়ে আছে তার প্রতি পদক্ষেপের মধ্যে। চটপটে আর ক্ষিপ্র তার মজবুত দেহখানি। মুখশ্রী সুন্দর আর অকপট। উদ্বেগঘন নীল নীল দুই চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে সে আমাদের প্রত্যেকের ওপর। তারপর তা স্থির হয়ে গেল দূরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যানিষ্টারের মুখের ওপর। এবার তার চোখের তারায় তারায় দেখলাম নিরবয়ব নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি।

হোম্‌স্ বললে, "দরজাটা বন্ধ করে দিন। মিঃ গিলক্রাইষ্ট, এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমাদের কথোপকথনের একটি অক্ষরও বাইরের কেউ কোনদিনই জানতে পারবে না। কাজে কাজেই, অনায়াসেই মনের অর্গল খুলে দিয়ে অকপটে কথা কইতে পারি আমরা। মিঃ গিলক্রাইষ্ট, আমরা জানতে চাই আপনার মত এ রকম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ গতকালের এই গর্হিত কাজটা করলেন কি করে?"

টলমলিয়ে উঠে পিছু হটে গেল দুর্ভাগা তরুণ গিলক্রাইষ্ট। তারপরেই বড় বড় চোখে তাকালে ব্যানিষ্টারের পানে। সে চোখে পাশাপাশি ফুটে উঠল আতংক আর তিরস্কার।

" না, না, মিঃ গিলক্রাইষ্ট। একটা কথাও আমি বলিনি—একটা কথাও না!" আকুল কণ্ঠে চীৎকার করে ব্যানিষ্টার।

হোম্‌স্ বললে, "না, বলো নি। কিন্তু এবার তা বললে। মিঃ গিলক্রাইষ্ট, এবার বুঝতে পারছেন তো ব্যানিষ্টারের এ ক'টি কথার পর আর কোন আশা নেই আপনার। এখন আপনার একমাত্র পথ হচ্ছে অকপটে সব কিছু স্বীকার করা।"
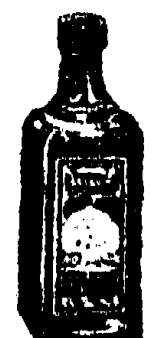
মুহূর্তের জন্যে দু'হাত তুলে দারুণ আক্ষেপে থর থর করে কেঁপে ওঠা দেহটাকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেলে গিলক্রাইষ্ট। পরের মুহূর্তেই ধপ করে সে জানু পেতে বসে পড়ল টেবিলের পাশে এবং দুই করতলে মুখ ঢেকে নিঃশেষে ভেঙে পড়ল আবেগনন কান্নায়। ওঃ, সে কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

নরম গলায় হোম্‌স্ বললে, "আস্তে, আস্তে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আর, তাছাড়া আপনাকে দাগী ক্রিমিন্যাল হওয়ার অপবাদ তো কেউ দিচ্ছে না। আপনার বদলে আমিই যদি সমস্ত ঘটনাটা বলি মিঃ সোম্‌স্‌কে, তাহলে হয়ত আমার ভুলচুক হলে শুধরে দেওয়াটাই সহজতর হবে আপনার পক্ষে। তাই করব নাকি? বেশ, বেশ, কষ্ট করে আর উত্তর দিতে হবে না। শুধু শুনে যান। লক্ষ্য রাখুন যাতে আপনার ওপর কোন রকম অবিচার না করে বসি।"

"মিঃ সোম্‌স্, যে মুহূর্তে আপনি আমায় বললেন যে আর কেউ তো নয়ই, এমন কি ব্যানিষ্টারের পক্ষেও জানা সম্ভব ছিল না আপনার ঘরে পেপারগুলোর আবির্ভাব-তত্ত্ব, ঠিক তখন থেকেই কেসটা একটা স্পষ্ট রূপ নিতে সুরু করলে আমার মনের মধ্যে। অবশ্য ছাপাখানার লোকে জানত—কিন্তু সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিলাম। কেননা, সে তো অফিসেই পরীক্ষা করতে পারত কাগজগুলো। ভারতীয় ছাত্রের সম্বন্ধেও কিছু ভাবিনি আমি। প্রুফগুলো পাকানো অবস্থায় থাকলে কাগজগুলো আসলে কিসের। তা তো আর তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, কেউ যে সাহসে বুক বেঁধে ঘরে ঢুকে পড়ার পরেই দৈবাৎ সেই দিনই কাগজগুলো দেখতে পেয়ে যাবে টেবিলের ওপর—এমন ধরনের কাকতালীয় ভাবাও যায় না। সুতরাং তা-ও বাদ দিলাম। ঘরে যে ঢুকেছিল সে জানত পেপারগুলো টেবিলের ওপর আছে। কিন্তু কি করে জানল সে?

"আপনার ঘরে আসার সময়ে জানলাটা পরীক্ষা করেছিলাম। তখন

আপনার একটা মজাদার ধারণা শুনে হাসি পেয়েছিল আমার। খটখটে দিনের আলোর বিপরীত দিকের ঘরগুলোর বাসিন্দাদের চোখের ওপর দিয়ে আগন্তুক মহাপ্রভু টেংরেচুলে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে—এমনি একটা সম্ভাবনা আমি নাকি চিন্তা করছিলাম। বাতিকগ্রস্ত উদ্ভট এই ধারণা। আসলে আমি মেপে দেখছিলাম, কতখানি লম্বা হলে পরে একজনের পক্ষে জানলার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মাঝখানের টেবিলের ওপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে মাঝখানের টেবিলটা। ঐ উচ্চতার কমে কারও পক্ষেই [illegible] পাওয়া সম্ভব নয়। আপনি [illegible] জানেন, তিনজন ছাত্রের মধ্যে যে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা, তারই সম্বন্ধে ওপরেই নজর রাখলে লাভ হবে সবচেয়ে বেশী,—এমন কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

"[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনি আমায় না বলা পর্যন্ত মাঝখানের টেবিল সম্বন্ধে কিছু-

বিসর্গ বুঝতে পারিনি আমি। তখনই সমস্ত জিনিষটা চকিতের মধ্যে ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। বাকী রইল শুধু থিওরীকে বলবৎ করার জন্যে কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহের। এবং তা-ও আমি পেলাম অচিরেই।

"যা ঘটেছিল, তা শুনুন। সারা বিকেলটা খেলার মাঠে লং-জাম্প প্র্যাকটিস করে কাটিয়েছে এই তরুণটি। লাফাবার জুতো কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে আসে সে। জানেন তো, এ ধরনের জুতোর তলায় প্রচুর কাঁটা লাগানো থাকে। জানলার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বেজায় লম্বা হওয়ার দরুণ টেবিলের ওপর রাখা প্রুফগুলো সে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয় জিনিসগুলো কি। কোন ক্ষতিই হ'ত না যদি না দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে আপনার অসাবধানী পরিচারকের ফেলে যাওয়া চাবিটি দেখতে পেত সে। আচম্বিতে একটা ঝোঁক চেপে বসে ওর মনে। ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে কাগজগুলো সত্যিই প্রুফ কিনা। কাজটা দুঃসাহসের। কিন্তু বিপদজনক নয়। কেননা, ধরা পড়ে গেলেই সাফাই গেয়ে দিত সে যে নিছক একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্যেই তার এহেন প্রবেশ।

"কিন্তু যখনই দেখলে যে কাগজগুলো বাস্তবিকই প্রশ্নপত্রের প্রুফ, তখন আর প্রলোভনের খপ্পর থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলে না সে। জুতো দুটো নামিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর। জানলার কাছে ঐ চেয়ারটায় কি রেখেছিলেন বলুন তো?"

"দস্তানা।" বললে তরুণ গিল-ক্রাইস্ট।

বিজয়গৌরবে ব্যানিস্টারের পানে তাকাল হোমস্।

"দস্তানাগুলো চেয়ারের ওপর রেখে প্রুফগুলো তুলে নিলে সে। একসঙ্গে সবগুলো নয়। একটা একটা করে নিলে নকল করার জন্যে। ও ভেবেছিল, মাষ্টারমশাই নিশ্চয় প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকবেন এবং জানলা থেকেই আপনাকে দেখতে পাবে সে। কিন্তু আমরা তো জানি, মাষ্টারমশাই ফিরে এলেন পাশের ফটক দিয়ে। হঠাৎ তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল দরজার সামনেই। পালানোর সম্ভাব্য পথ আর নেই। দস্তানার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে তীরবেগে সে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, টেবিলের ওপর ঐ আঁচড়টা একদিকে খুব ক্ষীণ,

কিন্তু শোবার ঘরের দরজার দিকে যতই গেছে দাগটা, ততই তা গভীরভাবে কেটে বসে গিয়ে দু'ভাগ করে দিয়েছে চামড়া। শুধু এই দেখলেই তো বোঝা যায় জুতোগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঐ দিকেই এবং আসামী আশ্রয় নিয়েছে ঐ ঘরে। কাঁটার চারপাশে লেগে থাকা মাটি পড়ে রইল টেবিলের ওপর। দ্বিতীয় নমুনা আলগা হয়ে খসে পড়ল শোবার ঘরে। আরও বলি, আজ সকালেই হাঁটতে হাঁটতে খেলার মাঠে গিয়েছিলাম আমি। গিয়ে দেখতে পেলাম এই কালো রঙের আঠালো কাদা-মাটির উৎস। লাফাবার গর্তে এ ধরণের মাটির ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়াও করাত চেরা কাঠের গুঁড়ো বা গাছের সূক্ষ্ম ছালচূর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওপরে যাতে করে লাফাবার পর অ্যাথলীট পিছলে না যায়। গুঁড়ো সমেত কাদামাটির খানিকটা নমুনা নিয়ে এসেছি সাথে। যা বললাম, তা সত্য, মিঃ গিলক্রাইস্ট?"

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তরুণ ছাত্র গিলক্রাইস্ট।

এখন বললে, "হ্যাঁ, স্যার, সত্য।"
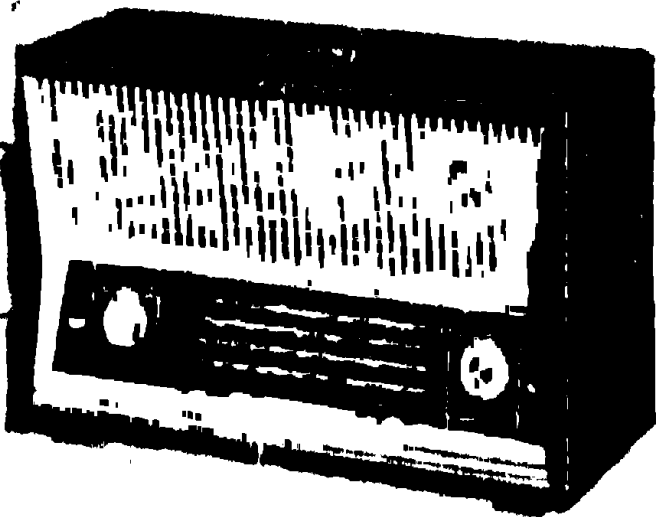
"হায় ভগবান, এ ছাড়া আর কিছুই কি তোমার বলার নেই?" চেঁচিয়ে ওঠেন সোমস্।

"আছে, স্যার। কিন্তু এই লজ্জা-কর ব্যাপার প্রকাশ পাওয়ার আঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি আমি। মিঃ সোমস্, এই চিঠিখানা নিন। সারা-রাত ছটফটিয়ে কাটানোর পর ভোরের দিকে এ চিঠি লিখেছিলাম আপনার কাছে। আমার পাপকাজ যে আর অনু-দ্ঘাটিত নেই, এ খবর জানার আগেই লিখেছিলাম চিঠিটা। নিন, স্যার। চিঠিখানা খুললেই দেখবেন আমি লিখেছি, 'আমি মনস্থ করেছি এ পরীক্ষা দেব না এবং এ বিষয়ে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'রোডেশিয়ান পুলিশ' একটি অফিসারের পদ অফার করেছে আমায় এবং আমি অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হচ্ছি।"

সোমস্ বললেন, "বাস্তবিকই খুব খুশী হলাম যে শেষ পর্যন্ত তুমি অসৎ পথে পাওয়া সুযোগ নিয়ে লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছ। কিন্তু মত পরিবর্তন করলে কেন শুনি?"

আঙুল তুলে ব্যানিস্টারকে দেখালে গিলক্রাইস্ট।

বলল, "ঐ সেই মানুষটি যে আমায় সঠিক পথে চালনা করেছে।"

হোমস্ বললে, "এবার পথে এস, ব্যানিস্টার। আমি যা বললাম, তা থেকে নিশ্চয় এটুকু অন্ততঃ পরিষ্কার বুঝেছ যে একমাত্র তুমিই এই তরুণ ছাত্রটিকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে পারতে। কেননা, ঘরে ছিলে তুমিই এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে নিশ্চয় তালা দিয়ে গেছিলে দরজায়। জানলা দিয়ে পালানোর সম্ভাবনা একে-বারেই অবিশ্বাস্য। আচ্ছা, এ রহস্যের শেষ পয়েণ্টটা খোলসা করে বলবে কি? তোমার এ রকম আচরণের অর্থটা কি, তা তো বুঝলাম না?"

"আপনি যদি আগাগোড়া সব জানতেন, স্যার, তাহলে দেখতেন জলের মতই পরিষ্কার আমার আচরণের অর্থ-টুকু। কিন্তু আপনি যতই চতুর হোন না কেন, শত চেষ্টা করলেও এ তথ্য জানা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক সময়ে আমি এই তরুণ ভদ্রলোকটির বাবা বুড়ো স্যার জ্যাবেজ গিলক্রাইস্টের বাটলার ছিলাম। উনি সর্বস্বান্ত হলে পর এ কলেজের পরিচারক হিসেবে এলাম এখানে। কিন্তু ভুলতে পারলাম না আমার পুরোনো মনিবকে—ভুলতে পারলাম না দুনিয়ার চোখে তাঁর এ হেন পতনের জন্যে, তাঁর দুর্দৈবের জন্যে। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে তাঁর ছেলেকে যতখানি পারলাম চোখে চোখে রাখলাম আমি। গতকাল, স্যার, চেঁচামেচি শুনে এ ঘরে আসামাত্র প্রথমেই যে জিনিসগুলি দেখলাম, তা হল ওদিককার চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা মিঃ গিলক্রাইস্টের চামড়ার দস্তানা দুটি। এ দস্তানা আমি ভালভাবেই চিনি এবং তাই চকিতে বুঝলাম এখানে তাদের আগমনের রহস্যটুকু। মিঃ সোমসের চোখে পড়লেই ফাঁস হয়ে পড়বে সব কিছু। তাই ঝপ করে বসে পড়লাম চেয়ারটায়। আপনাকে ডেকে আনার জন্যে মিঃ সোমস্ ঘরের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত আর চেয়ার ছেড়ে একচুলও নড়লাম না। তারপরেই আমার তরুণ মনিব, যাকে আমি হাঁটুতে শুইয়ে দোলন দিয়েছি, বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে এবং তখুনি সব স্বীকার করলে আমার কাছে। স্যার, এরপর কি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করাটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়? স্বাভাবিক নয় কি তার মৃত বাবা যা করতেন ঠিক সেইভাবে ওকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যে এ পথে তার কোন লাভই হবে না? এ জন্যে কি আমায় আপনি দোষ দেন, স্যার?"

"নিশ্চয় না।" জ্যামুক্ত ধনুকের মত টক করে দাঁড়িয়ে উঠে আন্তরিক সুরে বলল হোমস্। "সোমস্, আপনার ছোট্ট সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি বলেই তো মনে হচ্ছে। এদিকে বাড়ীতে কখন থেকে ঠাণ্ডা হচ্ছে আমাদের প্রাতরাশ। এস হে, ওয়াটসন। মিঃ গিলক্রাইস্ট, আমার বিশ্বাস, রোডেশিয়ায় আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। জীবনে শুধু একবারই আপনি নীচে নামলেন। এবার দেখা যাক, ভবিষ্যতে কত উঁচুতে আপনি উঠতে পারেন।"

—সমাপ্ত—

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

ডেকচুরের খাতা

অয়স্কান্ত
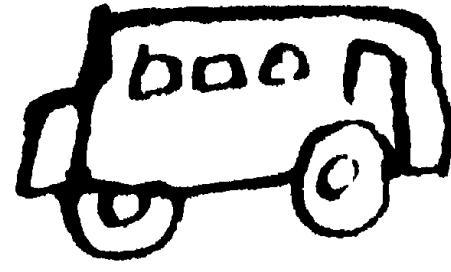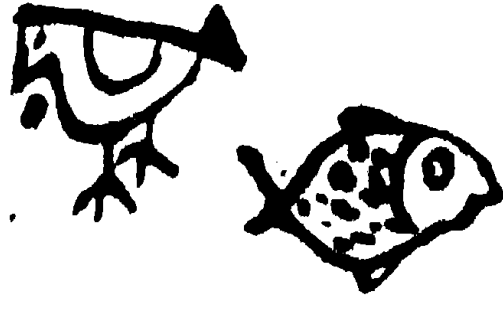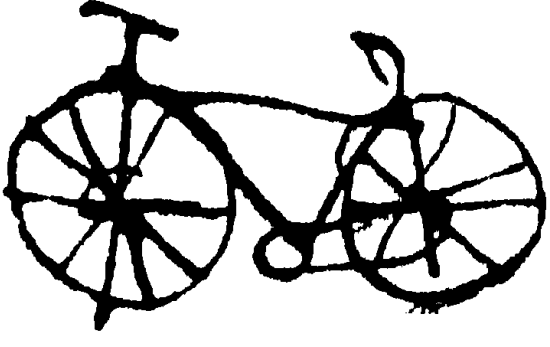
॥ মহানগর কলকাতা ॥

স্বনামধন্য অশোক মিত্র মহাশয় একটি ইংরেজি দৈনিকে মহানগর কলকাতার যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন, তা শুধু প্রত্যেক কলকাতাবাসীর নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীরও একান্ত মনোযোগ দাবি করতে পারে। খবরের কাগজের প্রচারে এবং দেশনেতাদের বিবৃতিতে কলকাতার নামের সঙ্গে সাধারণতঃ যে-সব বিশেষণ যুক্ত করা হয়ে থাকে, তার ফলে মহানগর কলকাতার গৌরব ও মর্যাদা বর্তমানে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ। ঠিক এই সময়ে অশোক মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধটি সময়োচিত তো বটেই, উপরন্তু অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

॥ বিশ্বের বাতায়ন ॥

মিত্র মহাশয় ভারতের তিনটি শহরকে বিশ্বের বাতায়ন আখ্যা দিয়েছেন। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। এই তিনটি শহর বিশেষ কোনো একটি অঞ্চলের নয়, সারা দেশের। তবে আশঙ্কার কথা এই যে সাম্প্রতিককালে ভারতের রাষ্ট্রগুলি নতুন করে গঠিত হবার পরে এই শহর তিনটির সার্বজনীন চরিত্র যেন লোপ পেতে বসেছে। এখন কলকাতা বলতে বোঝায় পশ্চিম বাংলা, বোম্বাই বলতে মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ বলতে তামিল দেশ। দেশের মঙ্গলের জন্যই এই মনোভাবে পরিবর্তন আসা দরকার। কারণ এই তিনটি শহর হচ্ছে ভারতের পক্ষে বিশ্বের বাতায়ন। আমাদের অস্তিত্বের জন্যেই এই বাতায়ন তিনটিকে যথাসম্ভব উন্মুক্ত রাখা দরকার। এই তিনটি শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য, আমাদের উদ্যোগ ও দক্ষতা, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। আমাদের সমৃদ্ধির পরিমাপকে পাঠ করা যাবে এই তিনটি শহরের দিকে তাকিয়ে।

॥ শতদুয়ারী ॥

বাংলাদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বার্ণিয়ার বলেছিলেন, এই রাজ্যে প্রবেশের জন্য একশোটি দুয়ার খোলা রয়েছে, কিন্তু এই রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাবার দুয়ার একটিও নেই। হালের কলকাতা সম্পর্কেও এই উক্তি খাটে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গিয়েছিল, কলকাতার শিল্পাঞ্চলের ৪৬ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬৯ জনের এবং শহর-অঞ্চলের ২৫·৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬৫ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। হিন্দী ও উর্দুভাষীদের সংখ্যা ছিল শতকরা পঁচিশ জনের কিছু বেশী। বাদবাকি ছিল অন্যান্য ভাষাভাষী। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে অবস্থার আরো উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায়, বাংলাভাষা যেন প্লাজমা আর অন্যান্য ভাষাগুলি করপাসল্। ফলে, অনিবার্যভাবেই, বাংলাভাষার পরিসরের মধ্যে অন্যান্য ভাষাগুলিও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, কোথাও কোথাও বেশ লক্ষণীয়ভাবেই। লোয়ার চিৎপুর রোডে এমন বাঙালীর সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে যার মুখের কথায় অন্তত পাঁচটি ভাষায় ছোঁয়াচ, যদিও তার নিজের ধারণা যে সে বিশুদ্ধ একটি ভাষাতেই কথা বলছে। অবশ্য, ফল শুভই হয়েছে বলতে হবে। মহানগর কলকাতা মানসিকতার দিক থেকে পুরোপুরি কসমোপলিটান চরিত্র অর্জন করেছে। এই উক্তির সপক্ষে আদমসুমারীর হিসেব উপস্থিত করা চলে। শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর প্রবন্ধে কলকাতার বাঙালী অবাঙালী শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাগত অনুপাত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন, সর্বভারতীয় নগর হিসেবে কলকাতা অদ্বিতীয়। কলকাতার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে একমাত্র কলকাতারই।

॥ স্বর্ণ প্রস্রাবিনী ॥

শুনলে অবাক হতে হবে যে কলকাতার অল্প মাইনের শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতি বছরে মনিঅর্ডারযোগে আঠাশ কোটি টাকা কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে থাকে। অল্প অল্প করে জমিয়ে এই টাকাটা যারা বাইরে পাঠায়, তারা বছরের ছুটির সময়ে সশরীরে বাইরে যাবার সময়ে আরো কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যায় তার কোনো হিসেব নেই। কারণ এরা কখনো কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলে না।

১৯৬০-৬১ সালে কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ডাকঘরের সেভিংস-ব্যাঙ্কে জমা পড়েছিল ১৮ কোটি টাকা। একই বছরে বোম্বাইতে জমা পড়েছিল ৭·৭ কোটি, দিল্লীতে ৯·৪ কোটি, মাদ্রাজে ৩·৪ কোটি। এই একই বছরে সেভিংস-ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নেবার পরিমাণ কলকাতায় ১৫·৩ কোটি, বোম্বেতে ৭·৬ কোটি, মাদ্রাজে ২·৭ কোটি। ১৯৬০-৬১ সালে সারা ভারতে মোট যতো সংখ্যক খাম ও পোস্টকার্ড ডাকে ফেলা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ১৩·৫ ভাগ অর্থাৎ মোট সংখ্যার প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ গিয়েছে কলকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে।

এর পরে বেশি টাকার কারবারীদের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে, কলকাতার সর্বভারতীয় চরিত্রটি এ ক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট। ১৯৬১ সালে ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্কের দপ্তর ছিল মোট ৭১টি। তার মধ্যে অন্তত ২১টি ছিল কলকাতায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মিত্র নানা তথ্য ও হিসেব উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ১৯৬০-৬১ সালে বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্কের মারফৎ সারা ভারতে যে কাজকারবার হয়েছে তার বেশির ভাগটাই হয়েছে কলকাতায়, যদিও কলকাতায় ব্যাঙ্কের দপ্তর সংখ্যার দিক থেকে সারা ভারতের তুলনায় শতকরা মাত্র ছ-ভাগ।

অন্য একটি দিকে তাকালেও কলকাতার গুরুত্বকে উপলব্ধি করা যাবে। মৌল শিল্পের উৎপাদন যেমন লোহা বা ইস্পাত ইত্যাদি—রেলওয়ের মারফৎ সারা ভারতের তুলনায় কলকাতা থেকে চলাচল করেছে শতকরা প্রায় আশি ভাগ।

॥ কলকাতার আশ্চর্য বন্দর ॥

কলকাতার বন্দরটি সবদিক থেকেই আশ্চর্য। খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়বে ভারতের অন্য সমস্ত বন্দর সম্পর্কে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা করা হচ্ছে ও মোটা মোটা টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। তারই পাশে কলকাতা-বন্দরের নিষ্ক্রমণ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে কিন্তু তা কারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না। অথচ ভারতের ছ'টি বৃহৎ বন্দরের মধ্যে একমাত্র কলকাতা-বন্দরের মাধ্যমেই ১৯৫৯-৬০ সালের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ২৫ ভাগ ও রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৪২ ভাগ পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে সারা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য থেকে আদায়ীকৃত শুল্কের শতকরা ৪৫ ভাগ ও আমদানী বাণিজ্য থেকে আদায়ীকৃত শুল্কের শতকরা ৩৮ ভাগ জমা পড়েছিল কলকাতার শুল্ক-বিভাগেই। অর্থাৎ সারা ভারতের পক্ষে কলকাতার বন্দরটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ও বাণিজ্যিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অবলম্বন। তা সত্ত্বেও এই বন্দরটি সবদিক থেকে অবহেলিত। গঙ্গা বাঁধ এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে অনিশ্চিত, হলদিয়ার উন্নয়ন কোনো কালে হবে কিনা স্থিরতা নেই; তার ওপরে আছে বিপজ্জনক মাত্রায় পলি জমা, ভারী ক্রেনের অভাব, বিক্ষোভ ইত্যাদি। এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কলকাতার বন্দর এখনো ভারতের মধ্যে সেরা। অগ্রজ বন্দর এই কলকাতা।

॥ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান ॥

সারা ভারতে যদি ঘুরে বেড়ানো যায় তাহলে আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। ভারতের সর্বত্র এমন মানুষ প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, কোনো না কোনো সময়ে যাঁদের জীবিকার ক্ষেত্র ছিল কলকাতা। কিন্তু তার চেয়েও আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ভারতের প্রখ্যাত পন্ডিত ও জন-নেতাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখেছেন বা কর্মক্ষেত্রের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন এই কলকাতাতেই। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা চলে: রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গ্রিয়ারসন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ, রমন, কৃষ্ণণ, ভান্ডার-কর, যদুনাথ সরকার, স্টেলা ক্রামরিশ, দীনেশচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সি এফ আন্ডরুজ, আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, বোস ইনস্টিটিউট ইত্যাদি শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ভারতব্যাপী এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু কলকাতার নয় বা শুধু পশ্চিম বাংলার নয়—সারা ভারতের। কলকাতাকে 'মৃত নগর' বলা যেতে পারে, 'বিক্ষোভ-নগর' বলা যেতে পারে, কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও কলকাতা এখনো পর্যন্ত সারা ভারতের অদ্বিতীয় মহানগর। এমন কি, সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র।

॥ ক্ষয়ের লক্ষণ ॥

কিন্তু তবুও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে এই অদ্বিতীয় মহানগরেও ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মজবুত দেওয়াল খাড়া করলেই একটি শহর মজবুত হয় না। সৌধমালা বা পুষ্পোদ্যান তৈরি করলেই শহরের জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

শহরের আসল পরিচয় মানুষের কর্মক্ষমতায়, পুঁজি-নিয়োগে, শিল্প-উৎপাদনে, যানবাহন ব্যবস্থায়, বাসস্থান ও কর্মস্থানের আয়তনে। ইটকাঠের শহরেরও মন বলে একটি পদার্থ আছে। এই মনের হদিশটাই আগে নেওয়া দরকার।

অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি যে গত একদশকে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৩ ভাগ, কিন্তু সে-তুলনায় কলকাতার জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা মাত্র ৮ ভাগ। এমন কি কলকাতার শিল্পাঞ্চলের প্রসারও আশানুরূপ নয়। প্রসারের মাত্রা ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে যেখানে হওয়া উচিত ছিল শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ, সেখানে হয়েছে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। চোখের দেখার সাক্ষ্যের সঙ্গে এই তথ্যের মিল নেই। এমনিতে মনে হতে পারে, কলকাতায় ঠাসাঠাসি মানুষ, কলকাতায় পা ফেলার জায়গা নেই, কলকাতায় শুধু বস্তি বস্তি—তবুও সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকালে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, কলকাতার যথেষ্ট প্রসার হচ্ছে না। কলকাতার চেয়ে বোম্বাইয়ের প্রসারের মাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বেশি। পৃথিবীর যে-কোনো জীবন্ত শহরই দ্রুত মাত্রায় প্রসারিত হয়ে চলে। পৃথিবীর যে-কোনো জীবন্ত শহরের সঙ্গে কলকাতাকে তুলনা করলে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে কলকাতা যেন ক্রমেই অসাড় ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত মিত্রের প্রবন্ধটি দীর্ঘ। তিনটি কিস্তিতে স্টেটসম্যান পত্রিকায় (৩রা, ৪ঠা, ৫ই সেপ্টেম্বর) প্রবন্ধটি প্রকাশিত। প্রবন্ধটির বুনুনি এমনই ঠাসা যে সংক্ষেপিত করার চেষ্টা করলে বক্তব্যের হানি ঘটবার সম্ভাবনা আছে। ওপরে যতোটুকু বলা হয়েছে তা প্রবন্ধের প্রথমাংশ থেকে তুলে নেওয়া কয়েকটি মোটা মোটা কথা মাত্র। ইংরেজি-জানা পাঠকরা মূল প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়ে নেবেন।

প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীযুক্ত মিত্র নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। যেমন, কলকাতার শ্রমিকদের শ্রমদক্ষতা, কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ময়লা নিষ্কাশন ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, জমির মূল্য ইত্যাদি। বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ২২৪·৩ কোটি ইউনিট, সারা ভারতে ১৫০৩·৩ কোটি ইউনিট, বোম্বাইতে ৪০১·১ কোটি ইউনিট, মাদ্রাজে ১৮৯·৮ কোটি ইউনিট। অথচ ১৯৫০ সালে বোম্বাইয়ে উৎপাদন হয়েছিল মাত্র ১৬১·২ কোটি ইউনিট আর পশ্চিমবাংলায় ১০৪·৭ কোটি ইউনিট। বিদ্যুৎ উৎপাদনে দশ বছরে বোম্বাইয়ের অগ্রগতির সঙ্গে পশ্চিমবাংলার অগ্রগতি এক্ষেত্রে তুলনীয়।

১৮৮৯ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায়, বোম্বাই সবদিক থেকেই একটি দুর্দশাগ্রস্ত নগর আর কলকাতার সমৃদ্ধি অতুলনীয়। তারপরে একশো বছরও পার হয়নি। এখনকার ছবি ঠিক উল্টো।

এই অবস্থার একটি কারণ এই যে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী-সমাজ বোম্বাইকে নিজেদের শহর বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং বোম্বাইয়ের উন্নতির জন্যে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক। কিন্তু কলকাতার ব্যবসায়ী-সমাজ একমাত্র চূড়ান্ত রকমের নির্বিকার, ফাটকা-বাজারের 'ভাও' ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি, শহরের উন্নতি সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

অবশ্যই এটি একমাত্র কারণ নয়; অন্যান্য কারণও বহুবিধ। শ্রীযুক্ত মিত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কেন কলকাতা শহরে ঘরবাড়ির এমন দুর্দশা, কেন কলকাতার পৌরব্যবস্থা এমন শিথিল এবং কি করলে পরে এই সকল অবস্থার প্রতিকার হতে পারে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত মিত্র বলেছেন: কলকাতাকে যদি আমরা হারাই তবে তা শুধু পশ্চিমবাংলারই একটা ক্ষতি—এই বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। এ ক্ষতি সারা জাতির, সারা দেশের।

গ্রহনক্ষত্র

অজিত মুখোপাধ্যায়

সবাইকেই মরতে হবে। মরা কোনোই বিস্ময়ের নয়। তবু মৃত্যু নিয়ে চূড়ান্ত নাড়াচাড়া করা হয়েছে। একটা লোকের এক বিশেষ চোখে এই পৃথিবীটাকে দেখা, এর আনন্দ-বেদনার ফলাফল ভোগ করা শেষ হবে। একটি লোক মরে যাবে। পৃথিবীর কোলাহল যথাপূর্বং। পৃথিবীটার দিক দিয়ে ভাবলে, এ কিছুই নয়, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মত নিঃশব্দ ক্রিয়াকলাপ। লোকটির দিক থেকে ভাবলে, এই সব। আমি যদি মরেই গেলাম, এই জগতে সুখের ছড়াছড়ি হচ্ছে, কি পশুত্বের ছেঁড়াছিঁড়ি হচ্ছে, আমার কি যাবে আসবে। অতএব ভেবে দেখলে মৃত্যু এক মারাত্মক কান্ড।

বিশেষ করে প্রশান্তর।

সুশান্ত ভেবে চলে। প্রশান্তর অমোঘ ভবিতব্যের একটা ছবি মনে মনে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করে। পারে না। কী করে পারবে। প্রশান্ত, আজ শনিবার, যদি আগামী শনিবার রাত্রি দুটো বেজে তেত্রিশ মিনিটের মধ্যেই...উঃ...ভাবতেই পারছে না সুশান্ত।

কী করে ভাববে। বলতে গেলে প্রশান্তর জন্যই তাদের বাড়িটার এমন ফাঁপা অবস্থা। দাদাকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াতে বাবার মাস্টারি তহবিলে কুলোয় না। বাবা, যে বাবা চিরকাল শিক্ষার পক্ষে বিদ্যার পক্ষে অকাতর ওকালতি করে এসেছেন, ভালো হোক মন্দ হোক—ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করে এসেছেন, অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রয় করাকে কসাইয়ের কাজের পাশে বসিয়ে নিন্দে করেছেন—সেই ভদ্রলোক যদি একদিন সুশান্তকে বলেন, তুমি পড়াশুনো বন্ধ করে চলে এস। আমি কয়েক মাস যাবত বিনিদ্র রজনীতে চিন্তা করেও আলোর ফুটকিও দেখতে পাচ্ছি না। হয় তোমার, নয় প্রশান্তর—দুজনের কারুর কলেজ ত্যাগ করা অবশ্যই প্রয়োজন। বাবা, আমি ভেবে দেখলাম, তোমার কমার্স পড়ে যা ভবিষ্যত তার চেয়ে প্রশান্তর ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে অনেক প্রশস্ত সম্ভাবনা, অতএব তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তুমিই লেখাপড়া ত্যাগ কর, স্যাক্রিফায়েস কর।

সুশান্ত পরের দিন হস্টেল ছেড়ে চলে এসেছিল।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। প্রশান্ত বেশ সুনামের সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে। বাবা অথর্ব হয়ে গেছেন। স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন। প্রশান্ত কংসাবতী প্রজেক্টে চাকরি করছে। যাকে বলে দারুণ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বৌদি এম-এ পাশ, ঝাড়গ্রামের মেয়ে। মোটামুটি সবই প্রশংসনীয়। শুধুমাত্র একটু কুঁড়ে।

সুশান্ত বৌদিকে বলেও, রূপের রক্ষণাবেক্ষণ করছ বৌদি।

বৌদি হাসে। মানে, হ্যাঁ।

মা সেকেলে মানুষ। বৌদির কুঁড়েমিতে গম্ভীর হয়ে যান। বলেন : কেমনধারা বৌ আনলি যে তোরা। মায়ের সব দোষ সুশান্তর ওপর। কারণ সুশান্তই খোঁজ খবর নিয়ে পছন্দ করে বৌদি এনেছে।

সুশান্ত মাকে বোঝায় : দেখবে না দুদিন বাদে দাদার কোয়ার্টারে গেলে সব শিখে যাবে। কাজের হবে। নিজের হাতে সংসার না করলে তার ওপর তো আর মায়া হয় না, হাত লাগাতেই মন চায় না।

বুঝিনে বাবা। মা বলেন : কাজও করব না, রোজগারও করব না, এ কেমন ফ্যাশান।

সুশান্ত কোন জবাব দিতে পারে না। রোজগার না করে ঘরসংসারের কাজে নিষ্ক্রিয় থাকার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খাড়া করতে পারে না। সুশান্ত পালিয়ে এড়িয়ে যায়।

সে না হয় এড়িয়ে গেল। কিন্তু বৌদি আগামী শনিবারের পর কী করে এড়াবে। মায়ের অভিযোগের সদুত্তর দিতে কি শিখা ছুটবে সার্টিফিকেটগুলো জাহির করতে। অফিসে অফিসে দরবার করতে ?

প্রশান্ত শিখাকে কংসাবতীর কোয়ার্টারে নিয়ে যাবে সব ঠিকঠাক। প্রশান্ত শিখাকে ঘর সাজানোর বিস্তারিত বর্ণনা জানিয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি দিয়েছিল। এমন সময় শিখা সব দিল ভন্ডুল করে। কংসাবতী কোয়ার্টারে না গিয়ে মধ্যপথে তাকে মেটার্নিটি হোমে অবতরণ করতে হবে। তাই শিখা এখানেই আছে এখনো।

এই বুধবার সুশান্ত গোদাপিয়াশাল থেকে ফিরেছে। ফিরেই তার মাথায় এল

দাদার ছেলের ভাগ্যগণনা করলে হয়। মাকে জিগ্যেস করল বৌদির ঠিকুজিটা আছে কিনা। মা তো মুখ বেঁকিয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে চলে গেলেন ঃ ঠিকুজি দেখে কী হবে। ওসব বুজরুকিতে আর আমার বিশ্বাস নেই। আচার্যিদের তো ব্যবসা। পয়সা পেলেই লিখে রাখবে রাজা হবে, রাজরাণী হবে। আমি জানি না। তোর বৌদিকে ডাক।

জলো হাওয়ার দিকে ফিরে মুখ ভেজাচ্ছিল তাতে। ঘরে আলো না জ্বালা থাকলেও নগরীর ছটায় অন্ধকার পাঁশুটে রঙের। শিখা চুলে চিরুনি চালাচ্ছিল।

বলল, তোমার কি ব্যবসা ডকে উঠল।

সুশান্ত সুইচে হাত রেখে বললে, কেন।
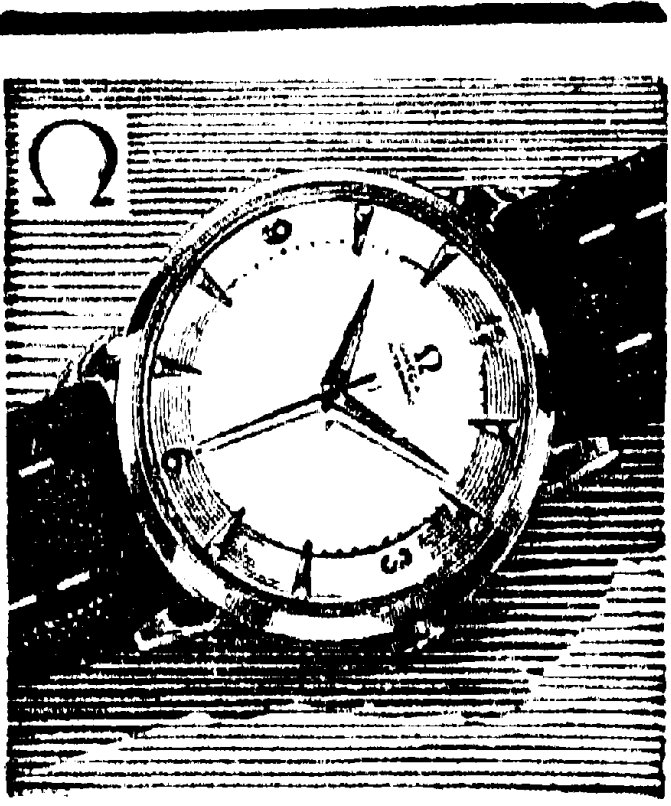
আমি তো দেখছি, তোমার লোকসান গেলেই জ্যোতিষী নিয়ে পড়।

সুশান্ত আলো জেবলে হাসল, না বৌদি, আমি বরং ভালো সময়েই চর্চা বাড়াই। তুমি হয়তো জানো না, এই আমার দশ বছর ব্যবসার জীবনে কন্ট্রাক্টরি করে কাকে রাজা বলে আর কাকে ফকির বলে জেনে নিয়েছি। লাভ লোকসান দুটোই আমার কাছে সমান।

ব্যবসা কেমন চলছে। গা এলানো ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল শিখা।

খুব খারাপ। চলবে কী করে। বিনা মূলধনে ব্যবসা। বর্বরদের কাছ থেকে ধার করে কাজ তুলতে হয়। যেটা লাভ হয়, সুদ গুনতেই সেটা চলে যায়। গোদাপিয়াশালে দেড় লাখ টাকার কাজ করলাম তিরিশ হাজার টাকা লাভ হবে। আমার থাকবে কত জানো।

কত।

এই এক বছরে তেরশ টাকার মত। বাকী তো আলুওয়ালার, ওর সুদের দরুণ।

ওই জন্যেই জ্যোতিষী নিয়ে পড়েছ। স্থায়িত্বের অভাব তোমাকে ভাগ্যবাদী করেছে।

হো হো করে হাসল সুশান্ত। খাটের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ায় সুশান্তর ডান হাতে তিনটে আঙুলের রঙ বাদামী হয়ে গেছে। সিগারেটটা গাঁজার-টান কায়দায় সাঁ সাঁ করে জ্বলতে লাগল। কথার পায়ে পায়ে হালকা চাল এসে গিয়েছিল সুশান্তর। এটাই তার বর্তমান স্বভাব। লোকে যখন দুর্ভাবনায় মাথার চুল উপড়োবে তখনো সুশান্ত টলটলে চোখে হাসির চিকমিকি ছিটিয়ে ফুকফুক করে সিগারেট ফুঁকবে। কিংবা রাত্তিরে অনুদ্বেল পদবিক্ষেপে বার থেকে ফিরবে।

কিন্তু এই সব ব্যাপার অন্য লোকের বেলা।

যেহেতু সুশান্ত অতিমানব কিছু নয়, সেই হেতু নিজের এবং পরিচিতদের ভাগ্যচর্চা করে সে উত্তেজনার খোরাক পায়। একে নেশাও বলতে পারা যায়। যে লোকটা অর্থাৎ সুশান্ত (যখন রাজা বনে গিয়েছিল তখন) শত শত মেয়ে আর গ্যালন গ্যালন মদ চেখে আজ আর নেশাতুর হয় না, সেই লোকটা হয়ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের খনি চিরে ফেলায় মাদকতার আস্বাদ পাচ্ছে।

না বৌদি, আমি হাতেনাতে ফল পেয়েছি।

অমুকে বলেছে, মিলে গেছে। শিখা কৌতুকময়ী।

অমুকে বলেছে নয়। দুতিনটি কেস আমি বলছি। বলে সুশান্ত চেঁচাল, ঝুনু দু কাপ চা পাঠিয়ে দে। ঝুনু ওদের একমাত্র বোন। আবার একটা সিগারেট ধরাল। ভাগীরথী থেকে স্টীমারের গম্ভীর ভোঁ শব্দ আবহ-সংগীতের মত বেজে মিলিয়ে গেল। শিখা আলমারী থেকে একটা ইংরেজি ডিটেকটিভ নভেল বার করতে যাচ্ছিল।

সুশান্ত বলল তখন, শোন শোন। এখানে বস। বলছি। ছোট ছোট ঘটনা। কিন্তু সত্যি। কেষ্ট ড্রাইভারকে তুমি দেখনি। পাশেই বোসসাহেবের ড্রাইভার ছিল।

মেয়েলী কৌতুহলে মাঝপথেই বাধা দিল, ছিল মানে? নেই?

আছে। তবে না থাকার মত। একদিন রাত্রে কিরণের মনোহারী দোকানে আড্ডা দিচ্ছি, বোসসাহেবের সিপিয়া রঙের গাড়িটা এসে থামল। বোসসাহেবের চারটি মেয়ে দেখবার লোভে আমাদের জটলা সুচীমুখ হয়ে গেল প্রায়। একসঙ্গে তাকালাম, ধুস্ খালি গাড়ি। কেষ্টা বাটা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এদিকেই আসছে। সোজা আমার কাছে আমার দিকে ডান করতল প্রসারিত করে বললে, দেখুন তো বাবু, ভাগ্যে আমার কী আছে। রোজই ভাবি, হাতটা একবার দেখাব, কিন্তু কাজের চাপে আর হয়ে ওঠে না।

আমি বললাম, রাত্তিরে তো ভালো দেখতে পাওয়া যাবে না। রেখাগুলো দিনেই স্পষ্ট দেখা যায় রে।

কেষ্টার ধৈর্য আর থাকছে না, ওকে দেখেই বুঝতে পারি।

হাত টেনে নিলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল, ওর মস্তিষ্ক রেখায়। উন্মাদের অকাট্য লক্ষণ দেখে সাতপাঁচ এটা সেটা বলে আসল কথাটাই চেপে গেলাম। বলে দিলাম, ওর ভালো দিনই আসছে, দুঃখের কাল কেটে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কেষ্ট চলে যেতেই আড্ডা-বাসরে বন্ধুদের জানালাম ওর উন্মাদের

সম্ভাবনা। কেউ কেউ হাসল, কেউ জোর ঠাট্টা করল। কেউ শুনলই না।

সত্যিই, কয়েক মাস বাদে কিরণের দোকানে পিয়ারডোবা থেকে ফিরে ঢুকেছি, কিরণ চেঁচিয়ে উঠল, সুশান্ত তুই যা বলেছিলি, ফলে গেছে।

জানি না কার সম্বন্ধে কী নিয়ে বলছে, আমি সিগারেট ফুঁকে বললাম, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবীণ বিজ্ঞান কি ভুল বলতে পারে। কার রে? উৎসুক হলাম। পাতা বেঞ্চিতে বসে বিমানদের দোকানে চায়ের অর্ডার গলা বাড়িয়ে ছুঁড়ে দিলাম।

কেষ্ট ড্রাইভার। পাগল হয়ে গেছে।

সিগারেটে দম দিচ্ছিলাম, চমকে উঠতেই গলায় কাশির দমকে ধাক্কা খেলাম। মাথাটায় হাজার হাজার ফানুস ঘুরতে লাগল, উড়তে লাগল বিশৃংখল, ছন্দহীন। আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সাথর্কতায় পরাজিত হলাম নিজেই, কারণ ভীষণ কষ্ট পেলাম যে। মানুষে কষ্ট পায় পরাজয়েই।

ফোরকাস্ট মিলে গিয়ে এর চাইতে ভয়াবহ অবস্থা আমার জ্যোতিষীতে হয়নি। আমি ছুটে গেলাম কেষ্টর বাসায়। শুনলাম কেষ্টকে বহুগীয় উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে গেছে।

ইংরেজি ডিটেকটিভ নভেলটি অবহেলিত এবং শায়িত, শিখার স্তব্ধ কোলে। শিখা এতক্ষণ থমথমে ছিল, এবার একটু নড়েচড়ে বসল। দীর্ঘ অন্ধকার টানেল থেকে বেরিয়ে এল যেন।

অনায়ত্ত কণ্ঠস্বরে বলল, কেষ্ট ড্রাইভার এখন কোথায়।

আর খবর রাখিনি।

পুনরায় একটি সিগারেট জ্বলল। ঝুনু চা নিয়ে এল। মায়ের কর্কশ গলা শোনা গেল, হরেনকে কোন অকাজে বকছেন।

ঝুনু স্কার্টের কোণে হাত মুছে বলল, ছোড়দা, অনিলের কথাটা বৌদিকে বল না।

শিখার চোখে কৌতূহল ঘনীভূত, কে অনিল।

ছোড়দাকে জিগ্যেস করুন না।

চার পাঁচ বছর আমি জ্যোতিষী চর্চা করছি। জার্মান এবং ভারতীয় দুটোই পড়ি, যদিও দু দেশের গরমিল প্রচুর। কিন্তু এতেই যা ফল পেয়েছি, কহতব্য নয়। সুশান্ত বলল।

অনিলের কী হয়েছিল, তাই বল না। শিখাকে যেন গল্পে পেয়েছে।

বলছি। অনিল কেন, বর্মণ উকিলের কোষ্ঠী দেখে বলেছিলাম। সাংঘাতিক আশ্চর্যের। তখন সবেমাত্র নতুন শিং গজিয়েছে কাজের সাইটে আমাদের সময় কাটাবার সুস্থ রসদ নেই কিছু। বাজে জিনিসে, পাঁকে কাদায় ডুবে থাকতে হয়। বর্মণ আমাদের ক্লাস ফ্রেণ্ড। খুব সচ্চরিত্র ছেলে। ও আমাকে ওর কোষ্ঠীটা একদিন এনে দিল। নিয়ে গেলাম বাসুদেবপুরে, রাস্তা হচ্ছে, মাটি কাটার বিরাট কাজ ধরেছি। কুলি-কামিনদের মতই থাকি। রাত্রে, খড়ের ঘরের বাসা করেছিলাম, সেখানেই ফিরি। সন্ধ্যে হলেই মনে হত কে যেন ভীষণ ভারী মোটা কম্বল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল, এমন ঝাঁঝা অন্ধকার। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, লাইব্রেরী নেই, শিক্ষিত লোক নেই, যে দুটো কথা বলে

ব্যবসা কেমন চলছে। গা টলানো ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল শিখা...

সময় কাটাই। অগত্যা নিয়ে পড়লাম বর্মণ উকিলের ভবিষ্যতলিপি। উদ্ধার করতে। যা খরোষ্ঠীর চাইতে হাজারো গুণ অবোধ্য দুরূহ।

মাস দুয়েক কত যে খড়ি পেতে আঁক কষেছি, তার নেই ঠিক। কিন্তু ভয়টাকে কিছুতেই কাটাতে পারছি না। কয়েকটি ছেলেপুলের মা, বর্ষীয়সী অথচ সুন্দরী মেয়ের সংগে বর্মণের প্রেম হবে, এবং সেই প্রেম ওদের দুজনকে এক অসামাজিক অথচ দীর্ঘ-স্থায়ী দাম্পত্যজীবন যাপনে ঠেলে নিয়ে যাবে। কোন ভুল নেই।

ফিরে এসে বর্মণকে নতুন কোষ্ঠী তুলে দিলাম। বর্মণ বিশ্বাসই করল না।

এখন আমরাই বিশ্বাস করতে পারি না, বর্মণ এমন হল কী করে। কোথাও কিছু নেই, ফাঁকা পরিষ্কার আকাশ। কোথায় যেন বিদ্যুত চমকাচ্ছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে। বর্মণদের সামনের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল, ভদ্রলোক কোন নামী বণিক অফিসে ভালো চাকরি করেন, তাঁর স্ত্রী, ও চারটি ছেলেপিলে। সেই স্ত্রী বর্তমানে বর্মণেরও অলিখিত স্ত্রী।

একটানা স্তব্ধতা বয়ে চলে কিছু-ক্ষণের জন্য। উপকণ্ঠের গলি, তাই ধোঁয়ার পায়ে পায়ে শহরের রাত্রি নিথর হয়ে এল সন্ধ্যের অনতি পরেই, অফিস ফেরতা কর্মীদের ঘরে কড়া নাড়ার আওয়াজ।

মেলেনি একেবারেই, এমনটি কি হয়নি কখনো? শিখার তেরছা নিবিড় চাউনিতে বুদ্ধির কৌতুক।

ততক্ষণে আবার একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়েছে সুশান্ত।

হয়েছে। জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কিন্তু মিলে গেছে। মাথা ধরা, বুক ধড়ফড় করা কিংবা কুঁড়েমিতে পাওয়া—এ সব মেলেনি, তাতে কিছু যায় আসে না।

তিরিশ বছরের সুশান্তকে তিরাশী বছরের প্রাজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ মনে হল। চার পাঁচ বছরের অধ্যয়নেই যদি এমন পাকা

জ্যোতিষী বনে যেতে পারে, পরে না জানি কী-ই না হবে সে।

যাকগে, আমার সময় তো কেটে যায়, নির্দোষ আনন্দে, তাহলেই হল। মিলল কি মিলল না, সেটা বড় কথা নয়।

একটা আন্দোজে বলে দেবে, আর লোকটা তো খারাপ হবার চিন্তাতেই মরে যাবে! না বাবা, আমি দিচ্ছি না আমার ঠিকুজি।

সুশান্ত হাসল, বলল, ভালোগুলোই বলব, হবে তো? দাও, দাদারটাও যদি তোমার কাছেই থাকে, ওটাও দেবে।

নতুন চকচকে বার্মাটিকের আলমারি খুলল শিখা, তলার ড্রয়ার ঘাঁটতে লাগল। তেইশ বছরের পরিণতি শিখার চেহারায় নিখুঁত, নাক চোখে সূক্ষ্মতা না থাকলেও সুদর্শনা। নীলাভ কালো চোখের তারা, একমাথা চুল, আর গায়ের রঙ বাঙালীদের এমন দেখতেই পাওয়া যায় না। সুশান্ত ভাবে, দাদার বিদ্যে এবং বৌদির রূপ, এ দুটি মিলে যাকে পাওয়া যাবে সে ছেলে নিশ্চয় হবে এক বিরল পুরুষ।

দুটি ঠিকুজিই এনে দিল শিখা। দেবার সময় বলল, ঝুনু বলছিল অনিলের কী হয়েছে।

সুশান্ত ঠিকুজি দুটো নাড়াচাড়া করতে করতে শুরু করল, কাগজে খবর দেখেছ নিশ্চয়, এক বাঙালী যুবক মহাধিকরণ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, তখনো তোমার বিয়ে হয়নি। সে ছেলেটিকে আমি চিনতাম। সে আমাকে হাত দেখিয়েছিল হাওড়ার রেলওয়ে অফিসে। টেন্ডার ফর্ম কিনতে গিয়ে অফিসে গুলতানি করছিলাম, কেউ কেউ হাত দেখাচ্ছিল। যাদের হাত গত হপ্তায় দেখেছি, তারাও ভাবছে এ হপ্তায় যদি কিছু নতুন রেখা বেরিয়ে থাকে। বিশেষ করে একসিকিউটিভের হাত আমাকে অফিসে পা দিলেই দেখতে হত একবার। ঐ ছেলেটি চাকরির খোঁজে অনাহূতই এসেছিল, এর আগেও নাকি ছেলেটি অফিসে হানা দিয়ে গেছে বার কয়। আমার কোলে তার হাত কখন বাড়িয়ে দিয়েছিল, খরায় ফাটা জমির মত সে হাতের রেখাগুলি। যেন জটপাকানো সুতো। আমার মনের বিস্ময় মুখে আনিনি, চাপা দিয়েছিলাম। একবার ভাবলাম বলব না, আরেকবার ভাবলাম, বলেই দি। পুরুষকারের চেতনায় ওর ফাঁড়া কাটতেও তো পারে।

বললাম, আপনার মনে আত্মহত্যার কুটিল ইচ্ছা অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, নিজেকে সংবরণ করতে পারছেন না। চাকরি বাকরি করেন? ছেলেটি উত্তর দিল না। ছেলেটির বয়স খুব জোর উনিশ কুড়ি। আমি বললাম, আপনার উচিত ওসব বাজে চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলা। ছেলেটি চটে গেল, কে বললে আমি বাজে চিন্তা করি, বাড়িতে বাইরে সবাই আমাকে 'বাজে চিন্তা করি' 'বাজে চিন্তা করি' বলেই পাগল করে দেবেন।

পাগল আপনি হবেন না ভাই। তবে আপনার জন্য বাড়ির লোকে পাগলের মত হয়ে যেতে পারে।

তার পাঁচ মাস বাদেই কাগজে দেখলাম। পরে জেনেছিলাম, আমি যার হাত দেখেছিলাম, সে-ই ছেলেটি।

সাংঘাতিক লোক তো তুমি, দাও, ঠিকুজিগুলো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি না। শিখা ঠিকুজিগুলি টানাটানি করতে লাগল।

সুশান্ত বলল, ধ্যুত যত সব বাজে গল্প, বিশ্বাস করলে বুঝি।

বাজে? তাই বল। স্বস্তির নিশ্বাস নেমে গেল শিখার বুক থেকে। মুঠো ঢিলে হয়ে গেল। সুশান্ত ঠিকুজি দুটো নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি তোমাদের ভাগ্য দেখব না, দেখব তোমাদের হবু পুত্রের।

ফাজিলের শিরোমণি। লজ্জিত হল শিখা।

ঝুনু দাদাকে চলে যেতে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বৌদির কাছে সরে গিয়ে বলল, বৌদি, বাজে গল্প নয়, সব একেবারে খাঁটি সত্যি।

তাই নাকি! শিখার মুখে আর কথা সরল না।

বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনদিন তিন রাতে অন্ততপক্ষে তের চোদ্দ প্যাকেট সিগারেট আর অজস্র কাপ চা চলল। কেঁচো খুঁড়তে বেরোল সাপ। দাদার প্রথমে সন্তান হবে, ছেলেটি নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবং বহুলোকের উপকার করবে। ছেলে-ভাগ্য দাদার দারুণ। কিন্তু সাতকড়ি মাস্টারমশায় অর্থাৎ সুশান্তদের বাবার ছেলে-ভাগ্য? সে যে নিদারুণ। যে লোকটির ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা তার আদর্শকেও হত্যা করেছে, তার বুদ্ধিমান, বলতে গেলে অসাধারণ মেধাবী ছেলে সুশান্তর ভবিষ্যত অনিবার্য অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, সে লোকটির কী হবে। যা অঙ্ক কষল সুশান্ত, যেমনভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের বক্তোদল, আকর্ষণ দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করল, কোনোমতেই দ্বিতীয় উত্তর পেল না। এক অভ্রান্ত এবং অদ্বিতীয়। আগামী শনিবার রাত্রি দুটো বেজে তেত্রিশ মিনিট পর্যন্তই। তার এক পলকও অধিক সময় প্রশান্তর পরমায়ুতে বিশ্বের গ্রহ-তারা-সূর্য-চন্দ্র বিরাজ করবে না। একটি আয়ুর অণুতে কালো ফুটকি। পরমাণু মাত্র হলে কী হবে। একটিমাত্র পরমাণুর নিষ্ক্রিয়তা যে কী পরিমাণ বিস্ফোরণ আনতে পারে এই পরিবারে তার অঙ্ক কষতে কে বসবে।

বাবার এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠে মাথা ঠুকে বেরিয়ে এল

মা বৌদি ঝনু ও আরেকটির, তাদের! তাদের যে প্রশান্ত সৌরতেজ।

যদিও সুশান্ত কখনো কখনো ঢেলে দিয়েছে, যখন কাজের কপাল খুলেছে। অবশ্য তেমন ঘটনা আজকাল আর দেখা যায় না। সুশান্তর কণ্ট্রাক্টরি যে প্রশান্তর পাশের সঙ্গেই পাশ কাটিয়ে গেল।

তার ওপর বিনা মূলধনে ব্যবসা। লোকে যাই বলুক না কেন, লোকের ধারণা ব্যবসা সম্বন্ধে যাই থাকুক না কেন, বিনা মূলধনে ব্যবসা আদতে হতেই পারে না।

তাছাড়া দাদা কি কেবলই পরিবারের অর্থচালক। আর কিছু নয়? আরও কিছু। দাদার শিক্ষা পদমর্যাদাও যে আজ বাড়ির অহংকার। অহংকার মুছে গেলে একটা মানুষের যেমন ক্লীবত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না, একটা বাড়ির বেলাতেও তাই।

সুশান্ত এবার দাদার দিক থেকে ভাবল। বাড়ির জন্যে যেমন প্রশান্ত, প্রশান্তর জন্যেও তো বৃহত্তর দিগন্ত থাকতে পারে। সবে মাত্র জীবন শুরু করেছে, এবং বেশ ভালো ভাবেই। দশটা লোকের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বলতে গেলে শুধুমাত্র মহরতটাই সম্পন্ন করেছে, পর্দায় প্রতিফলিত হবার আগে অনেক অনেক চড়াই উৎরাই বাকী, এবং অনেক অট্টহাসি আর চোখের জল। তবু সবাই বিশ্বাস করে, বলে, কেউ দাঁড়াতে পারে এ তল্লাটে, তবে সে প্রশান্তই।

বড় হবার অংকুর সে ছোটবেলাতেই দেখিয়েছে। ফুলপ্যান্ট পরা, রেস্টুরেন্টে হাত না লাগিয়ে কাঁটা চামচেয় খাওয়া, ইস্কুলেই অবিচ্ছিন্ন ইংরেজিতে কথা বলে যাওয়া, স্মার্ট হওয়া, এ সব প্রশান্তকে কেউ শেখায়নি। জন্মগত বড় হবার পিপাসায় প্রশান্ত ছটফটে, কিন্তু চঞ্চল নয়। সব সামান্য জিনিস নিয়েই সে ভাবিত, কিন্তু বিচলিত নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তির ভূমিকায় মহড়া দিয়েছে ছোটবেলা থেকেই। তার কাজ-কর্ম, চলাফেরা সুন্দর সিঁড়ির ধাপের মত, একটা পেরোনোর পরে, পরেরটাও তার কাছে সহজগম্য।

কিন্তু বড় হবার মুখেই এ কী আঘাতের আভাস দেখল সুশান্ত। ভবিষ্যদ্বাণীটা তার শরীরে ক্লেদাক্ত পোকার মত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু যেন ফেলতে পারছে না।

বাহির বারান্দায় ইজিচেয়ারে সাতকড়িবাবু বসে বসে রাস্তা ও সামনের পুকুর নামধারী বিরাট ডোবাটার দিকে দেখছেন। রাস্তায় ছিটছাট যাতায়াতেই নির্দিষ্ট কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

ঝনু, ঝনু।

সাড়া এল না।

ঝনু। এবার জোরে ডাকলেন।

আসছে এখুনি। সুশান্ত বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ঘোর। চুল উস্কোখুস্কো।

কখন থেকে চেঁচাচ্ছি। তোর মাকে চা দিতে বল তো। সুশান্ত চলে যাচ্ছিল, তোর কি শরীর ভালো নেই।

আ-আমার? ক-কই না তো। সুশান্ত তোতলাল। চলে গেল।

মাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ঘরে গিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করল, বৌদির সঙ্গে দেখা হলেও চিন্তার ভানে এড়িয়ে গেল। ঝনু যদি সবার সামনে রসিদসুদ্ধ পড়ে যায়, তাহলে বাবা একচোট নেবেন সবাইকে। একজনের দোষ হলে বাড়িসুদ্ধ কাউকে বাদ দেন না।

সুনু। মা ডাকল, চা দিয়ে আয়।

চা নিয়ে বাইরে যেতেই সুশান্ত শুনতে পেল ঝনুকে বাবা জেরা করছেন। অপেক্ষা করে কী হবে। বলে দেওয়াই ভালো।

আমি ঝনুকে পাঠিয়েছিলাম বাবা। বলতে বলতে বারান্দায় গেল সুশান্ত।

প্রশান্তকে টেলিগ্রাম করলি কেন? বাবা জেনে ফেলছেন, বেফাঁস করে দিয়েছে ঝনু। চায়ে চুমুক মারলেন বাবা, কিন্তু চোখে বিরক্তিমেশা প্রশ্নটা আটকে থাকল।

দরকার আছে। ভাঙতে চাইল না।

কী এমন দরকার যে টেলিগ্রাম করে ডাকতে হল। প্রশান্তকে জ্বালাতন করা শুধু। ও কাজকর্ম করবে, না করবে না। তোমাদের দলে টানতে চাও? বাবার কথার প্রতিটি স্তব্ধতায় গরম বাষ্পের খোঁচ। সারা জীবন ধরে একটা কিছু ফুটে চলেছে, মাঝে মাঝে অসহ্যতার বাড়তিটা ঠেলে বেরিয়ে আসে ধক ধক করে।

সুশান্ত ঝনুর হাত থেকে টেলি-গ্রামের রসিদটা নিয়ে আসন্ন অন্ধকারের দিকে মুখ ফেরাল। একেবারে চুপ।

শনিবার দিনই টেলিগ্রাম পেয়ে প্রশান্ত চলে এল রবিবার বিকেল নাগাদ।

কীরে, কী হয়েছে। প্রশান্ত জুতোর ফিতে না খুলেই জিজ্ঞেস করল। বিশিষ্ট কারুর কুশলতা উল্লেখ করতেও ভয় পেয়েছে।

হাত মুখ ধোও, চা খাও, বলছি। ঝনু, দাদার গামছাটামছাগুলো ঠিক করে বাথরুমে দে। সুশান্ত গায়ে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

আমার জন্যে মিষ্টি আনতে যাচ্ছিস নাকি। হো হো করে হাসল প্রশান্ত শিখা দেখেছো কী রকম খাতির করছে সুনু, নতুন অতিথির মতো? তার ওপর ইঞ্জিনীয়র সাহেব, কী বলিস সুনু!

শিখার চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে হাসি।

সুশান্ত বেরিয়ে হাসল। যাচ্ছে ডাক্তার ডাকতে আর দাদা ভাবল কিনা মিষ্টি আনতে। পকেটে হাত দিল। কয়েকটি টাকা ভাগ্যিস অবশিষ্ট রয়েছে। ফেরার সময় কিছু মিষ্টি, বিশেষ করে যেগুলো দাদা ভালোবাসে, কিনে নেবে।

শিখা মা বাবা এমন কি ঝনুও এসে একে একে জড়ো হল প্রশান্তর খাটের কাছে। প্রশান্ত গা এলিয়ে এককালে তার হাতের স্পর্শ পাওয়া লাগাও জমিটুকুর মাটিতে দৃষ্টি ছড়িয়ে শুঁকে শুঁকে দেখছিল যেন।

সবাই একে একে প্রশ্ন করে ফিরে গেল, বাবাও ফিরে গেলেন। প্রশান্ত নিজেই জানে না, কেন টেলিগ্রাম করে তাকে আনানো হয়েছে।

রবিবার রাতে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখতে এসেছিল। প্রথমে প্রশান্ত হেসেই খুন। কী পাগলামিতে পেয়েছে সুনুকে। ডাক্তার বোস পুরোনো লোক। বললেন, যখন আসাই গেছে, দেখে যাই। আপত্তি কীসের। না, প্রশান্তর কোন আপত্তি নেই। ডাক্তার বোস কিন্তু বেশ হকচকিয়ে গেলেন। সুনুর দিকে মুখ তুলে তাকালেন, মানে, আপনি জানলেন কী করে, যে লোক থাকেন কংসাবতীতে, যাঁকে মাস কয়েক দেখেননি, তাঁর অসুখ করতে পারে। তার পূর্বাভাস আঁচ করলেন, কী করে। —নার্ভের ব্যাপার। নার্ভে বেশ স্ট্রেন পড়েছে।

প্রশান্তর হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছিল।

সুশান্ত তখনো নীরব।

আড়ালে শিখাকে সাবধান ও সহনীয় করতে সুশান্ত বলেছিল, দাদার ফাঁড়া আছে।

সত্যি সত্যিই রবি সোম মঙ্গল বাদেই বুধবার বিকেলে প্রশান্ত বন্ধুদের আড্ডাস্থল থেকে ফিরে বিছানা নিল। দিন সাতেকের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল সোমবার দিনই। বুধবার বিকেলের দিকে শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি যেন কিল-চড়-ঘুষি মারতে শুরু করল। বৃহস্পতি শুক্র এবং শনিবার এই তিনদিনেই বাড়িতে এবং পাড়ায় বেশ সোরগোল পড়ে গেল। শোকের ছায়া ক্রমশই চেপে বসতে লাগল। শিখা বারবার সুশান্তর দিকে প্রশ্নার্ত চোখে কাকুতি জানাতে লাগল। অভিযোগও কি ছিল শিখার চোখে। যদি জানতেই পেরেছিল সুশান্ত যে, কোন এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা তাদের জীবনে অবধার্য, যদি জানতেই পেরেছিল আগে থেকে, তবে সেই

কুৎসিত বস্তুটিকে দু চোখ ভরে দেখবার জন্য সামনে ডেকে আনল কেন।

ভাগ্যের খেলায় এমন উদাসী দর্শক তাকে কী করে ভাবল সুশান্ত।

তুমি না বলেছিলে দাদাভাই, ভাগ্যের চেয়েও শক্তিশালী হচ্ছে পুরুষকার। যাকে বলে 'Free will, এ ক্ষেত্রে কি তার কোনো হাত, তর কোনো ক্ষমতা নেই? সে কি এমন ক্ষেত্রে অসহায়, আমার মতন?

সুশান্ত তবুও নীরব। তার নিজের কৃতিত্ব যে এত বড় দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনিতে সাড়া দেবে, তা কি সে নিজে থেকেই আগে বুঝতে পেরেছিল।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা থেকে হাজার-বার লক্ষবার বোধহয় কোটিবার হাত হাতঘড়িটা দেখল সুশান্ত। হাতঘড়ির তিলাংশটুকু চেনা হয়ে গিয়ে পচা পচা ঠেকল। মনে হল ঘড়িটাকে হাতে না বেঁধে রেখে চোখের সামনে ধরে রাখে। চোখ যেন শুধু সময় দেখে, সময়ের যাওয়া দেখে, সময়ের পায়ে পায়ে চলা দেখে। প্রতিটি মুহূর্তের সীমারেখায় কত যে অগুন্তি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সবগুলির তো স্থায়িত্ব থাকে না মানুষের স্মৃতির পাতায়। তাদের ভিতর যেগুলি প্রচণ্ডাকার ভীষণ উত্তেজক সেগুলি রূপে বীভৎসতায় মাথা চাড়া দিয়ে মরে বেঁচে থাকে।

যেমন সুশান্তর জীবনে আজকের রাত।

নতুন কলোনি, খড়ের মেশিন, রেফ্রিজারেটার কোম্পানীর দারওয়ান, পানের দোকানের হল্লা, সব ঘুমিয়ে পড়েছে, দূরে হাওড়া ব্রীজের আকাশ-যামী সংকেতের লাল চোখগুলি ঘুমোবে না। ভোর পর্যন্ত ওরা ঘুমোয় না।

সুশান্তর চোখ দুটিও হাওড়া ব্রীজের চোখের মত, উঁচুতে অলক্ষ্যে নজর এবং লাল।

না, হাওড়া ব্রীজের আগেই চোখ বুজল সুশান্ত। ইজিচেয়ারে ডোবার হাওয়া এসে সুশান্তর মস্তিষ্কের উত্তেজনা শীতল করতে পারল। দুটো বেজে সতের মিনিটে সুশান্ত চোখের পাতা জোড়া লাগল।

তার পর মড়ার মত ঘুম। ঘুমের ভিতরেও চিন্তা অতন্দ্র। এলোমেলো। কতকগুলি ভূতের মত ধস্তাধস্তি করল। তার কাছ দিয়ে এসেছে কে গেছেই বা কে, তাদের পদশব্দ বুঝতে পারল না, কেবল আলতো ধাক্কায় অনুভব বুলোতে লাগল তার ঘুমের গায়ে।

ঘুম : গ্রহনক্ষত্রের রশ্মি যতই ক্ষীণ হোক তার ক্রিয়া কত অমোঘ। রঞ্জন-রশ্মিকে কি কেউ অবহেলা করতে পারে আজ। পারে না। তেমনি। পাথর মাটি জল লোকালয় সভ্যতা এদের হয়তো অমনি রশ্মি বিকীর্ণ হয়ে চলেছে অহোরাত্র, যার ফলে একেকটা মানুষের চুলচেরা সময়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একদিন হয়তো আর মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রের দিকেই তাকিয়ে ভাগ্যের ছক কাটতে বসবে না, বসবে মানচিত্র, ইতিহাস আর সমাজদর্পণ নিয়ে।

কেউ বোধহয় হোঁচট খেল। তার শব্দ হল। ভোরের আকাশে রোদের আধো আধো সংলাপ। আলোর ঝুপসি নজর।

সুশান্ত চোখ খুলল।

কে।

কাউকে দেখতে পেল না।

দুটো তেত্রিশ অনেক আগে পার হয়ে গেছে। ঝট করে ঘড়িতে চোখ গেল, চারটে চল্লিশ। একঘণ্টারও বেশি কেটে গেছে।

বারান্দা, অন্দর, রাস্তা সব স্তব্ধ থমথমে।

কার পায়ের সন্তর্পণী চলাফেরার আওয়াজ।

দাদার ঘরের জানলা গলিয়ে তাকাল। বিছানা শূন্য। ধড়াস করে উঠল সুশান্তর বুকটা। রাগ হল সবাইয়ের ওপর। কেউ যদি কাছে থাকে, কাউকেও যদি দেখতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য এমন সময়েও সবাই কিনা চুপচাপ।

ঝুনু ঝুনু, ডাকতে বাধ্য হল এবার।

সুনু ঘরে আয়। প্রশান্তর গলা যে, সুশান্ত হাওয়ায় যেন উড়ে গেল। —ইজিচেয়ারে বসে কী করছিলি। ঝুনুকে ডাকছিস কেন।

তোমার কাছে কেউ নেই! সুশান্ত রেগে উঠল।

এই তো গেল ওরা।

মতামত

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু —

আশা করি আমার এ চিঠি প্রকাশিত হবে।

আমি কনক মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'মায়ার সংসার' দেখেছি এবং আপনাদের (২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা) প্রকাশিত সমালোচনা যত্নের সহিত পড়ে দেখেছি। সমালোচক কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন এবং আমি একজন দর্শক হিসাবে তার কয়েকটি জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

১। সমালোচক লিখছেন, "...... সমস্ত ছবিটা দেখবার পর প্রশ্ন থেকেই যায় মুক্তিলাভের পর যে সরাসরি পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সমস্ত ঘটনা না জানিয়ে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে আত্মপরিচয় গোপন করে গাঢাকা দিয়ে রইল কেন ?" — এই প্রশ্নের জবাব বইটির মধ্যে আছে। অমরেশ বিভাসের ফাঁস থেকে পালাবার সময় নমিতাকে কথা দিয়েছিল, সে নমিতার সিঁদুর যাতে না মুছে যায়, তার জন্য যথাসাধ্য করবে। সেই কারণেই, [illegible] পরোক্ষে নমিতার অশুভ আশংকায় সে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি। তাতে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হতো। একটা কথা কি সমালোচক ভেবে দেখেছেন, শেষের দিকে বিভাস নমিতার মৃত্যুসংবাদ জানাতে সে অমরেশের হাতে চড় খেয়েছিল কেন ?

২। এবারে "...গাঢাকা দিয়ে থাকবার সময় সে বেহালা পেলো কোথায় ?" — সহজেই বোঝা যায় যে মুক্তি পাওয়ার পর অমরেশকে "ভিক্ষাবৃত্তি" অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং ১৪ বছরও নেহাৎ কম নয়।

৩। এবারে "......আত্মগোপনই যদি সে করতে চায় তবে বেহালা বাজাবে কেন ?" অমরেশ কেবলমাত্র নমিতার দুশ্চিন্তায় সংসারে ফিরতে পারে না। এখানে মুখ্য "আত্ম-গোপন" এবং "বেহালা বাজান" গৌণ। সে নিজেও সংসারে ফিরতে চায় না, তাই হলে তার বেহালা বাজানোতে আটকাবে কেন ? সহজেই বোঝা যায়—সে সময় কাটাবার এবং নিজেকে ভুলে থাকবার জন্যই বেহালা বাজায়।

বর্তমানকাল 'প্রগ্রেসিভ মাইণ্ড-এর' যুগ। কাজেই এইটুকুও যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়, তবে বাংলা ফিল্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

বাংলা ফিল্মের এই অন্ধকার-ঘনায়মান সময়েই যদি বাংলা সিনেমাকে এইভাবে অনাবশ্যকভাবে অপদস্থ করবার চেষ্টা করা হয় তবে সে "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাঁচ দফার" সত্যিই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না কি ? আমি আশা করি আমার বক্তব্য প্রাধান্য পাবে সম্পাদকের দপ্তরে। নমস্কার জানিবেন।

বিনীত—কৃপানিধান ঘোষ,
৮ উমা সিঁথি রোড, কলিকাতা : ৩০

মতামত প্রসঙ্গে 'মায়ার সংসার'

আমার সমালোচনাটি যত্নের সঙ্গে পাঠ করবার জন্যে পত্রলেখককে অজস্র ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ, অমরেশ নমিতাকে যে-কথা দিয়েছিল, সেটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। অমরেশ পুলিশ-স্টেশনে গিয়ে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করলে নমিতার সিঁথির সিঁদুর মুছে যেত কি ? হত্যার চেষ্টার অপরাধে কি প্রাণদণ্ড হয় ? বিভাসের অসামাজিক কার্যকলাপ প্রকাশ পেলে বিভাসের বড় জোর দুটি বছরের কারাদণ্ড হত, তার বেশী নয়। কাজেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অমরেশকে পড়তে হত না।

এ ছাড়াও কথা আছে। রয় অ্যাণ্ড রয় কোম্পানীর সেক্রেটারী অমরেশ ব্যাংক থেকে ৫০,০০০ টাকা তোলবার পর [illegible] গেছে। এ সম্পর্কে রয় অ্যাণ্ড রয় কোম্পানী বা পুলিশের কর্তব্য কি কিছুই ছিল না ?

পত্রলেখক প্রশ্ন করেছেন, "শেষের দিকে বিভাস নমিতার মৃত্যু-সংবাদ জানাতে সে অমরেশের হাতে চড় খেয়েছিল কেন ?" স্বীকার করতে আপত্তি নেই, এই চড় মারা ব্যাপারটা বিশেষ নজরে পড়েনি এবং নজরে পড়বার মতো করে ছবি তোলা হয়নি বলেই নজরে পড়েনি। তাছাড়া যদি নজরে পড়তই তাহলেই তার নিহিত অর্থ প্রকাশিত হত কি ? আমার কাছে [illegible]।

বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পকে অপ-[illegible]দের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে কি করা উচিত বা না উচিত, এ-সম্পর্কে পত্রলেখকের কাছ থেকে মতামত জেনে শুধু খুশিই হলাম। —বাল্মীকির

রয়েল অ্যাকাডেমির সেই ছবি

প্রভাত কুমার দত্ত

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বিশ্বের এক সেরা চিত্রসংগ্রহশালা ইংলণ্ডের রয়েল অ্যাকাডেমি সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। কোনরকম সরকারী সাহায্য না পেয়েই এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি এতদিন তার অস্তিত্ব মর্যাদার সঙ্গে বজায় রেখে এসেছ। রয়েল অ্যাকাডেমি নিশ্চয়ই একটা জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং একে নিয়ে গর্ববোধ করাটা ইংরাজদের পক্ষে স্বাভাবিক। সরকারী পরিচালনাধীনে গড়ে উঠলে প্রতিষ্ঠানটি আজকের প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জন করতে পারত কিনা সে নিয়ে অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে। ইংলণ্ডে শুধু রয়েল অ্যাকাডেমি কেন এ রকম আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান আছে যা সরকারী আয়ত্তাধীনে নয়। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের একক চেষ্টা, এককালীন দান, সভ্য-চাঁদা ইত্যাদির সাহায্যেই প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে। জগৎজোড়া সাম্রাজ্য আর অবাধ বাণিজ্যের যখন চল ছিল তখন ইংলণ্ডে বিনা সরকারী সাহায্যে এই জাতীয় অ্যাকাডেমির মোটেই অর্থাভাব হোত না। কিন্তু সেদিন আর নেই। ব্রিটেনের ভাঁড়ার আজ শূন্য। যেটুকু ধনদৌলত আজও রয়েছে তা জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে কোন রকমে খাড়া রাখার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। জাতি বাঁচলে তো তবে সংস্কৃতি। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে রয়েল অ্যাকাডেমির মত প্রতিষ্ঠানের অর্থের টানাটানি হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত এর পেছনে যখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নেই। বর্তমানে ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনের যে সংকট তা অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে রয়েল অ্যাকাডেমির সাম্প্রতিক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে।

একটি ভাল চিত্রসংগ্রহশালা ঠিকমত চালাতে হলে তার পেছনে বহু অর্থব্যয় করতে হয়। রয়েল অ্যাকাডেমি এতদিন তাই করে এসেছেন। কিন্তু এখন দেখছেন জাতীয় অর্থসংকটের দিনে সংগ্রহশালাকে আগের মত চালানো খুবই কঠিন। সরকারী সাহায্যের আশা তো নেইই, সহৃদয় ব্যক্তির এককালীন দানেরও সম্ভাবনা ক্ষীণ। অথচ সংগ্রহশালার কাজকর্ম স্থগিত হতে দেওয়া যায় না। অনেক ভেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটি কার্টুন ড্রয়িং বিক্রি করবেন। আমেরিকায় এই ছবিটির জন্য ন্যূনপক্ষে দুই মিলিয়ন পাউণ্ড দাম পাওয়া যাবে। আজকাল আমেরিকায় এ রকম উচ্চদামেই ছবি বিক্রি হয়। এই মূল্য পেলে অ্যাকাডেমি তাদের সংকট সাময়িকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এতদিন ব্রিটিশেরা রয়েল অ্যাকাডেমির দুর্দশা সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব পোষণ করছিলেন। কিন্তু ছবি বিক্রির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আত্মমর্যাদাজ্ঞান যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। চারিদিকে হৈ হৈ উঠলো ইংলণ্ডের সংগ্রহশালা থেকে আমেরিকায় ছবি চলে যাওয়াটা জাতীয় অপমানস্বরূপ। এ অপমান ঘটতে দেওয়া চলবে না। অথচ সবচেয়ে হাস্যকর কথা হোল ইংলণ্ডের এমন কোন অর্থশালী শিল্পসংগ্রাহক নেই যিনি আমেরিকার দামে এ ছবি কিনতে পারেন। অর্থও দিতে পারব না অথচ ছবি বাইরে বিক্রির কথা উঠলে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন তুলব—আত্মপ্রবঞ্চনার এ এক চরম দৃষ্টান্ত। এ ঘটনার আগে লিওনার্দোর কার্টুনটির অস্তিত্বের কথা ইংলণ্ডবাসী কেউই জানতেন না। ছবিটি গ্যালারিতে প্রদর্শিত ছিল না স্থানাভাবে, সংরক্ষণাগারে গুদামজাত ছিল। কিন্তু যেই কার্টুনটির হস্তান্তরের প্রশ্ন উঠল অমনি ইংরেজ আত্মমর্যাদার কথা তুলে সরব।

যাই হোক রয়েল অ্যাকাডেমির সভাপতি ঘোষণা করলেন যে ছবিটি তাঁরা মোটেই বাইরে বিক্রি করবেন না যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডবাসী প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দেন। কারণ ব্যাপারটা তো আসলে টাকা নিয়ে। ইংলণ্ডে বর্তমানে কোটীপতির সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১০৬ জন। তাঁদের কাছে

নিজ নিজ টাকার থলি আলগা করার অনুরোধ জানানো হোল। যাতে ছবিটি সকলে দেখতে পান সেজন্য ছবিটিকে গুদাম থেকে ঝেড়ে-ঝুড়ে অ্যাকাডেমির বার্লিংটন হাউসের গৃহ থেকে ট্রাফালগার স্কোয়ারের একটি গৃহে আনা হোল। দর্শনী নির্ধারিত হোল ছয় পেনী। ছয় পেনী করে দিয়ে ইংলণ্ডবাসীর এই শেষ সুযোগ ছবিটিকে রক্ষা করার। ছবিটি প্রকাশ্য স্থানে টাঙাবার পর এ পর্যন্ত প্রায় দু' লক্ষাধিক লোক এটি দেখে গেছেন। প্রত্যেকেই যে মাত্র ছ' পেনী দর্শনী দিয়েছেন তা নয়, সংগ্রহ-বাক্সে এক পাউণ্ড কি পাঁচ পাউণ্ড নোটের কাগজও পড়তে দেখা গেছে। রাণী এলিজাবেথ, স্যার উইনস্টন চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিরাও এসেছেন, মোটা দর্শনীও দিয়েছেন, কিন্তু ছবিটিকে বাঁচাতে হলে আরো ৮ লক্ষ পাউণ্ড তোলা দরকার। জুলাই মাসের মধ্যে যদি এ টাকা না আসে তবে ছবিটি নীলামে যাবে এবং তখন পৃথিবীর যে কোন দেশে এ ছবি চলে যেতে পারে। মাসিক আদায়ের পরিমাণ হচ্ছে ৭৬০০ পাউণ্ড। এভাবে চলতে থাকলে জুলাই মাসের মধ্যে তো প্রয়োজনীয় অর্থ ওঠা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডবাসীরা পড়েছেন মহাফাঁপরে। বহু ঢক্কানিনাদ করে তাঁরা আত্মমর্যাদার প্রশ্নটা তুলেছেন, এখন যদি তাঁরা ছবিটি না রক্ষা করতে পারেন তবে মুখ লুকোবেন কোথায়? অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে ইংলণ্ড সাম্প্রতিককালে এত আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে যে তাঁদের লজ্জা-সরমের কোন বালাই নেই। তাহলে তাঁরা আত্ম-মর্যাদার কথা তুললেন কেন?

অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষরা বলছেন ইংলণ্ডে যে ১০৬ জন কোটীপতি আছেন তাঁরা এ পর্যন্ত অর্থসাহায্যে তেমন এগিয়ে আসেননি। তাঁদের কাছ থেকে মোটা দান না পেলে তহবিল পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা হোল এই কোটীপতিরা লিওনার্ডোর একটি ছবি ইংলণ্ডে থাকলো কি থাকলো না এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। আসলে তাঁদের দৃষ্টি অন্যদিকে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোটীপতিদের একজন হচ্ছেন মিঃ ডরমার। ছোটবেলায় খুব দুঃখদারিদ্র্যে মানুষ হতে হয়েছে। থাকতেন ইস্ট এণ্ডের বস্তিতে। পিতা-মাতার নবম সন্তান। কয়লা-শ্রমিক হিসাবে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। পরে নিজের বুদ্ধির জোরে লণ্ডনের নানা স্থানে অনেকগুলি গ্যারাজ ও মালবাহী যানের মালিক হন। এর থেকেই তিনি কোটীপতি। সম্প্রতি এই মিঃ ডরমার একটি ফুটবল পুলে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড পেয়েছেন। রয়েল অ্যাকাডেমি এই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে অর্থ প্রত্যাশা করতে পারেন না। অর্থপিশাচ ইনি নন। টাকা প্রচুর খরচ করেন কিন্তু অন্য ব্যাপারে। এ পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের নানাস্থানে বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের থাকার জন্য বহু ঘরবাড়ী তৈরী করে দিয়েছেন। ছোটবেলায় যে তাঁকে কষ্টে মানুষ হতে হয়েছে একথাটা তিনি ভুলতে পারেননি। লিওনার্ডোর ছবি বাঁচানোর কথাটা তাঁর মনের ধারে দিয়েও ঘেঁষে না। এরকম অন্যান্য কোটিপতিদের সম্পর্কেও বলা যায়।

লিওনার্ডোর কার্টুন ড্রয়িংটি ষোড়শ শতাব্দীতে অঙ্কিত। গত দু'শ বছর ধরে ছবিটি ইংলণ্ডে রয়েছে। সত্যই তো যে বস্তুটি ইংলণ্ডে এতদিন ঘর করলো তার পক্ষে পরের ঘরে যেতে ইচ্ছা করবে কেন? ইংলণ্ড একটা হৃদয়হীন হবেন না নিশ্চয়ই? তবে লিওনার্ডোর ছবিটি নিয়ে ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা সত্যই বিচিত্র ও অভিনব। বড় বড় ব্যাপারে সাম্প্রতিক-কালে ইংলণ্ড আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছে বলেই একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে তাঁদের এত মাথাব্যথা। লিওনার্ডোর ছবিকে বাঁচিয়ে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের সংকট যে বন্ধ হবে তা আশা করা বাতুলতামাত্র। আমার মনে হয় লিওনার্ডোর ছবি নিয়ে চেঁচামেচি করে ইংরেজরা শুধু চায়ের কাপেই ঝড় তুলছেন এবং নিজেদেরকে বিদেশের কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলছেন।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। চব্বিশ ।।

হোটেল আলোয় ঝলমল। কালো ডিনার জ্যাকেট পরা নিগ্রোটির গায়ের রঙ আর পোশাকের রঙ এক হয়ে গেছে, শাদা শার্টের সঙ্গে মিশেছে তার দাঁতের দীপ্তি—তাতে আবার সোনার বিন্দু ঝিকমিক করছে—নেচে নেচে একটা অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে সে। ওপাশে আর একজন পিয়ানোতে সুর তুলছে, একজন বেঁটে চেহারার চীনা একটি গোলগাল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে তাণ্ডব নাচ নাচছে। এক হাত ট্রাউজারের পকেটে পুরে, ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট লাগিয়ে, থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো একটা লোক, হাতকাটা গেঞ্জীর ভেতর দিয়ে সর্বাঙ্গের উল্কিগুলো দেখা যাচ্ছে তার—যেন সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছে সে। টেবিলে টেবিলে সদ্য জাহাজ থেকে নামা নাবিকেরা এক একটি করে সঙ্গিনী নিয়ে বসেছে, থেকে থেকে পেত্নীর মতো তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠছে তারা। —হে জো, ইউ আর এ নাইস গাই! —কে যেন সম্ভাষণ করছে কাকে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে চীনাটির কপাল থেকে গড়াচ্ছে ঘামের বিন্দু। ঝনঝন করে একটা ডিশ চুরমার হল কোথাও। দীপ্তি চোখ মেলল।

চৌরঙ্গীর হোটেল অনেক দূরে। তার ছেলেবেলায় দেখা কালো নদী মেঘনার মতো সাতটা নদী পেরিয়েও সেখানে পৌঁছোনো যায় না এখন। যে ঘরের জানলা দিয়ে আকাশের দুটো তারা পর্যন্ত দেখা যায় না, যে ছোট ঘরটিতে আবছা অন্ধকারে মনে হয় দু পাশের বালি-খসা দেওয়াল দুটো নড়তে নড়তে যেন ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে, মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ কখনো কখনো অনুভব করে কার যেন একটা চাপা-কান্না তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে—সেই ঘরে শুয়ে শুয়ে এখন মা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

তার এক পিসতুতো বোনের 'সাধ দেওয়া'র ছবিটা আবছাভাবে মনে আসে। লজ্জায় মুখ রাঙা করে বসেছে, কপালে জ্বলছে সিঁদুরের টিপটি আর তার এক বৌদি জোর করে তাকে নতুন গুড়ের পায়েস খাইয়ে দিচ্ছেন। সে-ও প্রথম মা হতে চলেছে, কিন্তু কত আনন্দ তাকে নিয়ে—কত উৎসবের আয়োজন!

আর দীপ্তি?

তিলে তিলে সন্তান বাড়ছে তার—একটু একটু করে ছায়া ঘনাচ্ছে এখানে। অভয় এসে চুপ করে বসে থাকে—মা-র চোখের জল পড়ে নিঃশব্দে, তার ঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে চলে যায় প্রভাতদা। বাবা এতদিন তাঁর বাতের যন্ত্রণা দাঁতে দাঁতে টিপে সহ্য করেছেন, অথচ কাল রাতে শিশুর মতো একটানা কান্না কানে এসেছে তাঁর।

তৃপ্তি আর অমিয়কে এই লজ্জার মধ্য থেকে কি ইচ্ছে করেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দূরে? দীপ্তি জানে না।

সব বেশ চলছিল। বাবা তাঁর যন্ত্রণাকে নিঃশব্দে বয়ে চলেছিলেন, মা মুখ বুজে টেনে চলেছিলেন সংসারের ভার, তিপু ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াত বাড়ীময়, ফুটবল খেলে বাড়ী ফিরে চেঁচিয়ে একটা সিনেমার গান গেয়ে উঠেই অমিয় বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে, অভয় কালিঝুলি মেখে গরগর করতে করতে ফিরেছে কারখানা থেকে: 'ব্যাটারা কী ভেবেছে আমাদের—মানুষ, না জানোয়ার?' এরই ভেতর দিয়ে পরিবারটা বাঁচতে চেষ্টা করছিল—হয়তো বেঁচেও যেত একরকম করে।

কিন্তু দীপ্তি এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। এই নারকেলডাঙার গলিতে তার মন বসেনি, চৌরঙ্গীর হোটেলে গিয়ে সে অনেক বড়ো হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। কতদিন তো ভেবেছে—এই যে বড়োলোকের ছেলেটি—যার পকেট থেকে নোটের তাড়া বেরিয়ে আসছে একটার পর একটা, এই মাতাল সন্ধ্যায় আদরে সোহাগে দীপ্তিকে যে আকুল করে দিচ্ছে, একদিন সে হয়তো বলে বসবে: 'ডিয়ার, কেন এই কুৎসিত জীবন কাটাচ্ছ? এসো, তোমাকে বিয়ে করে ফেলি।' যেমন করে তার চেনা মেয়ে হেনা উড়িষ্যার কোন এক রাজকুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তেমনি করে তারও—

কিছুই হয়নি। আজ সে পাঁকের মধ্যে ডুবছে—সমস্ত সংসারটাকে ডোবাচ্ছে।

তবু সহ্য করতে হবে। এই দায় মিটে গেলে আবার তাকে বেরুতে হবে পথে। আর সব পথ মুছে গেছে এখন। ওই চৌরঙ্গী ছাড়া তার আর পরিত্রাণ নেই।

অন্যায়? কিসের অন্যায়? সে তো চাকরি করতেই চেয়েছিল—লোকে যাকে ভালো মেয়ে বলে জানে, তা ছাড়া আর কিছু যে হওয়া যায়, সে তো দীপ্তি কল্পনাও করেনি। তবু চৌরঙ্গীই তাকে টেনে নিলে।

গ্লানি? কখনো কখনো জেগেছে। কিন্তু সেই রাত্রিগুলোর নেশাই কি কম? সেই মুঠো মুঠো টাকাই কি তুচ্ছ করবার মতো? সেই এক-একটা প্রকাণ্ড মোটরে হু হু করতে করতে ছুটে যাওয়া, সেই সব ঝলমলে হোটেলে রাশি রাশি দামী খাবার—তার কোনো দাম নেই? জীবনে যা সে কোনোদিন পেতো না—তা যখন শুধু রূপের কল্যাণে তার পায়ে এসে প'ড়ছে—দীপ্তির সাধ্য কি সে তা উপেক্ষা করতে পারে?

হেনার মতো যদি ভাগ্য খুলে যায়—

কেউ বলতে পারে না। তা যদি না হয়, শেষ পর্যন্ত রাস্তা তো খোলাই আছে। যখন রূপ থাকবে না, যখন কেউ ফিরে চাইবে না তার দিকে, তখন সেই মেয়েটির মতো ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে পারবে সে। আত্মহত্যা।

কী ক্ষতি আছে তাতে? মৃত্যু তো চারদিকে। তা হলে অনেক আলোর ভেতরে জ্বলতে জ্বলতে মরাই তো সব-চেয়ে ভালো।

ঘরে আবার ঝনঝন করে শব্দ হল।

না—চৌরঙ্গীর হোটেলে কোনো প্লেট আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যায়নি। তার দুধ-রুটি খাওয়া বাটিটা পড়েছিল মেজেতে, জানলা বেয়ে শাদা রঙের অস্থিসার একটা বেড়াল এসেছে ঘরে, সে-ই সেটা একমনে চাটছে। মধ্যে মধ্যে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছে দীপ্তির দিকে, আবছা অন্ধকারে হলদে হলদে চোখ দুটো জ্বলছে তার।

দরজায় কার পায়ের শব্দ—ছোট-খাটো চেহারার একটি মেয়ে এল ঘরে, জানলা দিয়ে এক লাফে অদৃশ্য হল বেড়ালটা।

দীপ্তি চমকে বললে, তিপু? কখন এলি?

—কার কথা বলছেন? আমি হাসি।

হাসপাতালের সেই নার্সটি।

—আসুন—আসুন—দীপ্তি বিছানার ওপর উঠে বসতে চাইল।

—উঠতে হবে না, শুয়েই থাকুন না আপনি—

হাসি এগিয়ে এসে বিছানার পাশে বসল দীপ্তির। আর ঠিক হাসপাতালে যেমন করে ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিত, তেমনি করে একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে।

—কেমন আছেন এখন?

—আর থাকা। মধ্যে মধ্যে এমন কষ্ট হয় কী বলব।

—ও জন্যে ভাববেন না। এগুলো মেয়েদের ন্যাচারাল।

—ন্যাচারাল!—দীপ্তি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল : আমার জন্যেও?

একটু চুপ করে রইল হাসি, ঠিক কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায় বুঝতে পারল না।

জানলায় বেড়ালটার লুব্ধ হলদে চোখ দুটো একবার ফুটে উঠেই, হাসিকে দেখে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। হাসি বললে, সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন।

সব ঠিক হয়ে যাবে? কি ভাবে? হাসি তার উত্তর জানে না, আর দীপ্তিই কি সে উত্তরের আশা করে? সব ঠিক হয়ে যাওয়াই দরকার—নইলে দীপ্তির কী গতি হবে—সে দাঁড়াবে কেমন করে? 'সব ঠিক হয়ে যাবে'—এই বিশ্বাসটাকে সে-ও তো প্রাণপণে আঁকড়ে রাখতে চাইছে।

দীপ্তি আস্তে আস্তে বললে, আপনাকে কিন্তু আমি আগেই আশা করেছিলুম।

—ইচ্ছে করে ভাই, কিন্তু আসতে পারি না। কাজের প্রেশার অসম্ভব বেশি, অথচ লোক কম। এমন খাটুনি পড়ে যে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়। তখন কোয়ার্টারে ফিরে আর বেরুনো যায় না—সোজা শুয়ে পড়ি বিছানায়।

নার্সের পোশাক আর টুপি না থাকলে কী যে ছোট আর ছেলেমানুষ দেখায় হাসিকে। বিশ্বাস করা যায় না—অপারেশনের সময় ডাক্তারের পাশে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে এই মেয়েটি সেই বীভৎস কাণ্ডগুলো দেখে, রোগীদের উৎকট চিৎকারেও তার কাজে এতটুকু মনোযোগ নষ্ট হয় না, মরা মানুষের মুখের ওপর একটা চাদর টেনে দিয়ে ধীরে ধীরে বেডের পাশ থেকে সরে যায়।

আচ্ছা, দীপ্তি কি হাসির মতো নার্স হতে পারে না?

ভাবতেই মনের ভেতরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। ওই হাসপাতাল—ওই সারি সারি রোগী—চোখের সামনে মৃত্যু—রাশি রাশি আলোর ভেতরেও আতঙ্কের থমথমে মধ্যরাত—নাঃ, অসম্ভব। তার আগেই দীপ্তি পাগল হয়ে যাবে। যা হওয়ার হোক, তার চৌরঙ্গীই ভালো।

হাসি ব্যাগ খুলে একটুকরো কাগজ বের করল : এইটে আপনাকে দিতে এসেছিলুম।

—কী এ?

—একটা ঠিকানা।

—কী করব এই ঠিকানা দিয়ে?

হাসি হাসল : আপনার দরকার হবে। যে বিপদে পড়েছেন, তার শেষের দিককার দায়টা ওরাই নেবে। জায়গাটা কলকাতায় নয়—কলকাতার থেকে দূরেও নয়। নবদ্বীপে।

দীপ্তি চেয়ে রইল হাসির দিকে। কোনো কথা স্পষ্ট করে ভাবতে পারল না।

হাসি বলে চলল : একটি মেয়ে আছে ওখানে—সুস্মিতা বসু। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয় যখন একসঙ্গেই দুজনে নার্সিং পড়ছিলুম। সে প্রায় তিন বছরের কথা। আশ্চর্য আনফর-চুনেট মেয়ে ভাই। বিয়ের পরের দিনই মোটর অ্যাকসিডেন্টে বিধবা হয়। স্বামীর কিছু টাকা পেয়েছিল, সেই টাকা দিয়ে একটা মেটার্নিটি হোম খুলেছে ওখানে—শুনেছি, ভালো ডাক্তারও অ্যাটাচড্ রয়েছেন। আমার সঙ্গে সুস্মিতার অবশ্য যোগাযোগ নেই আজ-কাল, তবে শুনেছি ব্যবস্থা ভালো, চার্জও বেশি নয়। মানে—খানিকটা মিশনারী ওয়ার্ক আর কি!

—নবদ্বীপ! —খানিকটা স্বগতো-ক্তির মতো বেরিয়ে এল দীপ্তির গলা দিয়ে।

—হ্যাঁ, বেশি দূরে নয়। এ-রকম দু-চারটে ব্যবস্থা কলকাতাতেও আছে, কিন্তু সুস্মিতা বোসকে জানি বলেই রেকমেন্ড করছি আপনাকে। তা ছাড়া কলকাতার চাইতে একটু দূরে হলে মনের দিক থেকেও আপনি খানিকটা স্বস্তি পাবেন খুব সম্ভব। যাবার আগে হাসপাতালের ঠিকানায় আমাকে একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করতে পারেন, আমিও বরং একটা চিঠি দেব ওকে।

—আচ্ছা সিস্টার—

হাসি কোমল গলায় বললে, আবার সিস্টার কেন ভাই? ওটা হাসপাতালের জন্যেই থাক। হাসি বলেই ডাকবেন আমাকে।

দীপ্তি বার বার মৃত্যুর কথা ভেবেছে—যেদিন প্রথম হাসপাতালে বুড়ী ঠাকুরমা এক মুহূর্তে তার সামনে অন্ধকারের পর্দা তুলে ধরেছিল, তারপর থেকে প্রত্যেকদিন আত্মহত্যার চিন্তা করেছে সে। কিন্তু হঠাৎ সে হাসির একখানা দুর্বল হাত শক্ত করে নিজের মুঠোর চেপে ধরল।

একটা আর্ত জিজ্ঞাসা যেন দীপ্তির বুকের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হয়ে এল : আমি বাঁচব তো ভাই?

—বাঁচবেন বইকি।—এবার হাসি আর নার্স একসঙ্গে কথা কইল : চমৎকার স্বাস্থ্য আপনার কিছু ভাবতে হবে না। নিন—ঠিকানাটা রেখে দিন—নিজেই সে দীপ্তির বালিশের তলায় কাগজটা গুঁজে দিলে।

—কিন্তু বাচ্চাটা?

হাসি উঠে দাঁড়ালো। ছায়া পড়ল মুখে। এতক্ষণে যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে।

—সেইজন্যেই তো আরো বেশি করে যেতে বলছি ওখানে। ওরা যাই করুক—ডাস্টবিনে বিসর্জন দিতে দেবে না, আন-ওয়ান্টেড বেবিকে একটা অর্ফানেজে পৌঁছে দেবে অন্তত। আচ্ছা ভাই, আসি আজ—

কিছুদিনের জন্যে ছুটি মিলল প্রভাতের। লম্বা—তিন সপ্তাহের ছুটি।
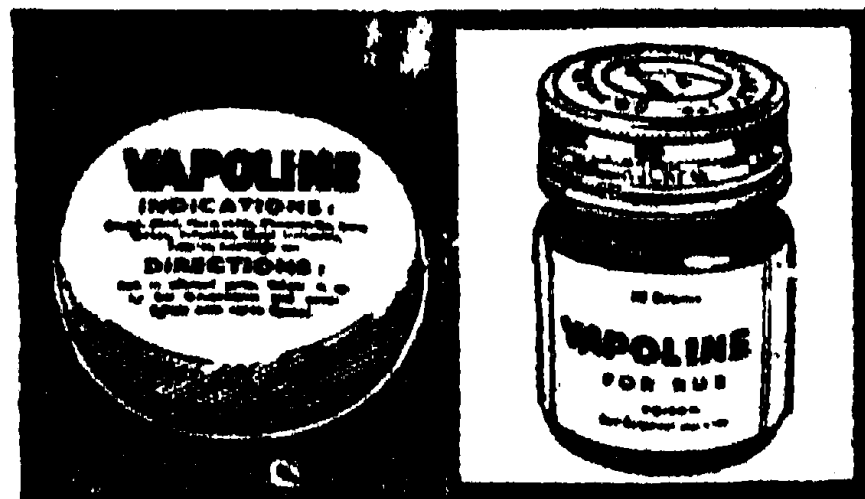
ওঃ—দিস্ ক্যালকাটা ইজ্ টু হট্! জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় মাঝামাঝি, তবু কলকাতার আকাশে এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই। এর মধ্যে যে দু-এক পশলা ঝরেছে, তারা সাহারার ওপর কয়েক বিন্দু জলের মধ্যে গরম পীচে পড়তে না পড়তে শুষে গেছে। চারিদিকে যেন আগুন জ্বলছে—আলিপুর খবর দিচ্ছে একশো নয় ডিগ্রি।

অ্যান্ড্ ডু ইয়ু থিংক্—কোনো রিজনেব্‌ল মানুষ থাকতে পারে এখানে—অ্যামিড্‌স্ট্ দিস্ ভেরিটেব্‌ল হেল-ফায়ার? অমন কর্মবীর কাঞ্জিলাল সাহেবও তাই 'কুকুর-ক্লান্ত' হয়ে পড়েছেন। সুতরাং শিলংয়ে ট্রিপ দিচ্ছেন একটা—অবশ্য তিন সপ্তাহের জন্যে।

তার বেশি থাকতে পারবেন না, কারণ তাঁর মতো রেস্‌পন্‌সিব্‌ল লোকের পক্ষে বেশিদিন আইড্‌লিং করা সম্ভব নয়।

দমদম এয়ারপোর্টে কাঞ্জিলাল পরিবারকে পৌঁছে দিয়ে প্রভাত গাড়ীতে বসে অপেক্ষা করছিল। এখন ওজন নেওয়া হচ্ছে ওঁদের—লাগেজের হিসেব-নিকেশ চলছে। প্লেন ছেড়ে গেলে তারপর সে গাড়ী নিয়ে ফিরে যাবে।

মাথার ওপর কর্কশ শব্দে বিমানের যাওয়া-আসা, উঠছে নামছে। যাত্রীদের বসবার জায়গায় নানা চেহারায় আর নানা পোশাকে পৃথিবীর সব জাতের মানুষের ভিড়। দামী স্যুটপরা একটি মারোয়াড়ী ছোকরা হাতের ট্রান্‌জিস্টার রেডিয়োতে কী একটা হিন্দি গান খুলে দিয়ে তার তালে তালে অদ্ভুতভাবে নাচছে—দুটি এয়ার হোস্টেস (প্রভাত চেনে—কারণ কাঞ্জিলাল সাহেবের দিল্লী-মাদ্রাজ-বোম্বাই যাওয়া নিয়ে এর মধ্যে কয়েকবারই তাকে আসতে হয়েছে এয়ারপোর্টে) সে দৃশ্য দেখে হাসিতে উছলে উঠছে। ধুতি আর কোটের সঙ্গে মোজা-পরা একজন মোটাসোটা মাঝারি বয়েসের ভদ্রলোক তাঁর একটি রোগা সঙ্গীকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'ওহে, অ্যাভোমিন ট্যাবলেটগুলো ব্যাগে দিয়েছ তো? আমার আবার ডাঙা ছাড়লেই বমি হয়।'

মাইক্রোফোনে ইংরেজিতে কী যেন বলছে, একদল যাত্রী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল, মারোয়াড়ী ট্রান্‌জিস্টার রেডিয়ো পকেটে পুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রান-ওয়ের দিকে—বোধ হয় তার প্লেন রেডি হয়ে গেছে। কাঞ্জিলাল সাহেবেরই প্লেন কিনা, এবং তা হলে তাকে এয়ার পোর্টের বেড়া পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দিয়ে আসতে হবে কিনা, ভাবতে ভাবতেই প্রভাত দেখল, রিনি আসছে।

পরনে লাল টকটকে শাড়ী—রিনির মনের মতো রঙ। কানে দুটো লাল টকটকে পাথর জ্বলছে—কে জানে চুনী কিনা। পায়ের জুতোটা পর্যন্ত লাল। সব মিলে রিনি এমন হিংস্র রক্তিম হয়ে আছে যে তার দিকে ভালো করে তাকানো যায় না পর্যন্ত।

প্রভাত গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল।

রিনি বললে, ড্যাডিকে বলেছি, কারে রুমালটা ফেলে এসেছি। তা নয়। আপনাকে সাবধান করতে এলুম।

—কী অন্যায় করেছি, বুঝতে পারছি না তো!—রিনির প্রশ্রয় পেয়ে প্রভাত আজকাল খানিকটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে।

—অন্যায় আপনার অনেক, সেগুলো আপনি জানেন না।—রিনি ভ্রূকুটি করল : কিন্তু সেগুলো আমি ক্ষমা করেছি আপনার। কিন্তু মনে রাখবেন, সব জিনিসের লিমিট আছে।

—আপনার কথা ঠিক—

—বলছি।—রিনি হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো : আমাদের প্লেন ছাড়তেও বেশি দেরী নেই আর। কাজেই কথাটা সংক্ষেপে সেরে নিতে চাই। তিন সপ্তাহ ছুটি পাচ্ছেন আপনি—জানেন তো?

—জানি।

—এ সময়ে আপনি কী করবেন?

—রোজ একবার এসে গাড়ীর ব্যাটারী চালু রাখব।

—ও তো পাঁচ মিনিটের কাজ। তারপর?

বিরত হয়ে প্রভাত বললে, জানি না।

—আমি জানি।—রিনির স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল : আপনাদের টাইপের লোক যারা—যাদের কোনো কাল্‌চারাল অ্যাসোসিয়েশন নেই—যারা ভালো বই পড়তে পারে না, তাদের আইড্‌ল ব্রেনে তখন একটি মাত্র ব্যাপার থাকে। তখন পাঁচী-খেঁদী-মোক্ষদা টাইপের মেয়েদের সঙ্গে আপনারা প্রেম করতে চেষ্টা করেন।

প্রভাতের মনে সেই অসহ্য ক্রোধটা জেগে উঠল আবার। ইচ্ছে করল রিনির পাতলা ঠোঁটদুটোর ওপর একটা আঘাত করে বসে, তার রাঙানো ঠোঁট আর

রঙিন শাড়ী সত্যি সত্যিই রক্তে মাখা-মাখি হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সব ইচ্ছাকেই সব সময় প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আরো বিশেষ করে রিনি কাঞ্জিলাল তার মনিব।

নিজের জ্বলন্ত চোখ দুটোকে নীচের কাঁকরগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে প্রভাত বললে, আমাদেরও আত্ম-সম্মান আছে, দয়া করে সে কথা মনে রাখবেন।

—আত্মসম্মান! —রিনি প্রখরভাবে হেসে উঠল, রাঙানো ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলোকে উৎকট রকমের জান্তব দেখালো তার : কথাগুলো বলতেই শিখেছেন, কিন্তু ওগুলোর মানে জানেন না। শুনুন, তিন হপ্তার জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি বলে আপনি যা খুশি তাই করে যাবেন—ভুলেও ভাববেন না।

আবার মাইক্রোফোনে গলা বেজে উঠল : প্যাসেঞ্জারস্ ফর গৌহাটি প্লীজ—

—দেন—আরক্তিম শরীর থেকে যেন একটা আগুনের ছোবল বেরিয়ে এল : দেন আই উইল কিল ইউ!

তারপরেই দ্রুত এগিয়ে গেল রিনি। প্রভাত দাঁড়িয়ে রইল থ হয়ে।

প্লেন ছাড়ল. কাচের জানলার ভেতর দিয়ে একবার হাত তুললেন কাঞ্জিলাল সাহেব, রিনিকে আর দেখা গেল না। গাড়ীটাকে কাঞ্জিলাল সাহেবের গ্যারেজে পৌঁছে দিয়ে সেই আগুনেই জ্বলতে জ্বলতে নারকেলডাঙায় ফিরে এল প্রভাত। আর নয়—আর এখানে চাকরি করা চলে না। মদের ঝোঁকে কাঞ্জিলাল সাহেবের বক্তৃতা তার এক-রকম সহ্য হয়ে গেছে—কিন্তু রিনির পাগলামি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একদিন কোনো দুর্বল মুহূর্তে নিজের ওপর হয়তো আর শাসন থাকবে না—একটা বিশ্রী কেলেংকারী ঘটে যাবে শেষ পর্যন্ত। তার আগেই এখান থেকে তার পালানো দরকার।

বাড়ীতে ফিরে, নিজের তক্তপোশে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রভাত ভাবছিল, চাকরির জন্যে তার ভাবনা নেই। পরশু চেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে-ছিল তার—লোকটি মুরারিবাবু। কল-কাতায় এসে মাস কয়েক যখন সে বেকার হয়ে কাটাচ্ছিল, তখন লোকটির সঙ্গে তার আলাপ—মোটর লাইনে তার ব্যবসা আছে।

মুরারিবাবু কথায় কথায় প্রভাতকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'তোমার তো হেভি ভেহিক্‌লস চালানোর লাইসেন্সও আছে —তাই না?'

'তা আছে। বাস চালিয়েছি এক সময়।'

'কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবে? মানে—বাঁকুড়ায়? ওখানে 'মুখার্জি অটোমোবাইলস্' আমারই। দুখানা নতুন বাসের পারমিট পেয়েছি। আসছে মাসেই চালু করব। যদি ইচ্ছে করো, আসতে পারো—আমরা একজন ডিপেন্ডেব্‌ল লোক চাই। মাইনেও বেশি দেব।'

'আচ্ছা, দেখি ভেবে।'

তখন ভাবেনি, কিন্তু এইবারে ভাবনাটা পেয়ে বসল প্রভাতকে। সত্যিই তো—কী হবে এখানে পড়ে থেকে? কী তার আকর্ষণ? তার পক্ষে কলকাতা-বাঁকুড়া-বারাসত-কাবুল-কান্দাহার সব সমান। গৌরাঙ্গবাবুর সংসারে হঠাৎ একদিন এসে পড়েছিল—হঠাৎ একদিন নোঙর তুলে বিদায় নিলে পৃথিবীতে কার কতটুকু ক্ষতি হবে? আজ তো নিজের কাছে এ কথা গোপন নেই যে, রাণীর ফাঁকা জায়গাটা একটু একটু করে জুড়ে বসেছিল সে তৃপ্তি ছাড়া আর কেউ নয়। রাণী আজ অনেক দূরের তারা—নিজের জগতে সে সুখী হয়েছে—অপরাধের ভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে প্রভাতকে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে কিশোরী মেয়ে তৃপ্তি কোথায় হারিয়ে গেছে—কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।

করুণাময় কম্পাউন্ডার আত্মহত্যা করেছে, পাড়ার ছেলেরা বলে, তৃপ্তিকে বিয়ে না করতে পেরে মনের দুঃখে গলায় ক্ষুর বসিয়েছে সেই বোকা লোকটা। কিন্তু ও-সব বিলাস প্রভাতের নয়। তাকে কাজ করতে হবে—বেঁচে থাকতে হবে। কার জন্যে? নিজের জন্যেই। তবে এখান থেকে চলে গেলেও গৌরাঙ্গবাবুকে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হবে তার; সে জানে, পেয়িং-গেস্ট হিসেবে এ সংসারে সে যতটুকু দেয়, তা-ই এদের পক্ষে অনেকখানি।

বাঁকুড়া। ক্ষতি কী?

বাইরে দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, অভয় কারখানায়। কাকাবাবুর গোঙানি শোনা যাচ্ছে তাঁর ঘর থেকে। প্রভাতের চিন্তাটা থমকে গেল—গৌরাঙ্গবাবুর কাতরানি অসহ্য মনে হতে লাগল তার। না—এবার তাকে যেতেই হবে।

ঠিক এমনি সময় দোরগোড়ায় কাকিমা এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, প্রভাত?

—কী হয়েছে কাকিমা? কিছু বলবেন?

কাকিমার শুকনো মুখটা আরো শুকনো দেখালো—চোখ দুটো ফুলো-ফুলো, যেন একটু কেঁদেছেন। ভারী গলায় বললেন, দীপা তোমায় একবার ডাকছে বাবা।

—আমাকে?

—হাঁ বাবা।

কাকিমা আর দাঁড়ালেন না, তখনই সরে গেলেন।

আজ দেড় মাস হতে চলল, হাসপাতাল থেকে ফিরেছে দীপ্তি। এর মধ্যে কালে-ভদ্রে ঘর থেকে বেরিয়েছে সে, প্রভাতের সঙ্গে দেখা হলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিয়েছে চোখ। আজ হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠানোর অর্থ বোঝা গেল না।

চটিটা পায়ে গলিয়ে দীপ্তির ছোট ঘরখানায় এসে ঢুকল সে।

দীপ্তি প্রভাতের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বললে, এসো।

ঘরে লোহার চেয়ার ছিল একটা—তাতেই আসন নিলে প্রভাত. একবার সঙ্কুচিতভাবে চেয়ে দেখল দীপ্তির দিকে। মেয়েটাকে যেন আর চেনাই যায় না—এই সময়টুকুর মধ্যেই যেন তার ত্রিশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে। যে দীপ্তি সকালে উঠেই প্রসাধন করত দিনে শাড়ী বদলাতো চার বার, কালিপড়া চোখ, শ্রীহীন মুখ আর শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সে কী করুণ আর অসহায় ভঙ্গিতেই বসে আছে!

'কেমন আছো?'—প্রশ্নটা গলায় এসেও থমকে গেল। কোনো অর্থ হয় না জিজ্ঞেস করবার। দীপ্তি যে কেমন আছে, তার সারা শরীরে তার রক্ত চলে, তার বিবর্ণ মুখেই তা ফুটে উঠেছে।

দীপ্তি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কথাটা বলবার আগে তার শুকনো মুখে বার কয়েক নিদারুণ লজ্জার ছাপ পড়ল। কয়েকবারই মনে হল, দিনের বেলা প্রভাতদাকে না ডেকে রাত্রের অন্ধকারে কথাগুলো বললেই ভালো হত। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সামনে থেকেই যার লজ্জার আবরণ উড়ে গেছে, তার দ্বিধা করলে চলে না।

—আমাকে একবার কলকাতার বাইরে নিয়ে যাবে প্রভাতদা?

—কোথায়?

—এখানে।

সেই ছোট কাগজের টুকরোটা প্রভাতের দিকে এগিয়ে দিতে হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল দীপ্তির।

নবদ্বীপের এক মাতৃ-সদনের ঠিকানা। সুস্মিতা বসু।

দীপ্তিকে নিয়ে রাণীর কাছেই যেতে হবে তাকে!

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে প্রভাত বসে রইল। একটা কথাও সে ভাবতে পারছে না।

—নিয়ে যাবে না প্রভাতদা?—

আমাকে একবার কলকাতার বাইরে নিয়ে যাবে প্রভাতদা?

সুস্মিতা! নবদ্বীপ! দুটো নাম একসঙ্গে মিলে প্রভাতের স্মৃতিতে বিদ্যুৎ চমকালো। হলদে রঙের সেই বিয়ের চিঠিটা: 'আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুস্মিতার সহিত—

সুস্মিতা—রাণী। নিউ মার্কেটের সামনেই সেই হঠাৎ দেখা: একটা মাতৃ-সদন খুলেছি ওখানে। সময় পেলে যেয়ো একবার ওদিকে—

রাণীর পরনে শাদা থান, পায়ে শাদা চটি।

আশ্চর্য এই জীবন! শেষ পর্যন্ত যেন অনেক দূর থেকে দীপ্তির অস্পষ্ট স্বর ভেসে এল: অভয়ের সঙ্গে যেতে—একবার থামল: তা ছাড়া ওর তো পায়ই রবিবারেও কাজ পারো যদি তুমি একটু—

প্রভাত উঠে দাঁড়ালো: কবে যেতে হবে?

—তোমার সময় মতো যে-কোনো দিন—

—আমার এখন তিন সপ্তাহ ছুটি। যেদিন যেতে হবে—বোলো।

প্রভাত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আবার এসে বসল নিজের তক্তপোশটায়।

সুস্মিতা— রাণী— নবদ্বীপ। দীপ্তিকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যেতে হবে প্রভাতকেই। একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু তাকে যে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরতে পারা যায়, সে কথা কে ভেবেছিল!

যেতে হল আরো দিন-চারেক পরে।

বাড়ী থেকে দীপ্তির বিদায়ের দৃশ্যটা দেখবার প্রবৃত্তি ছিল না প্রভাতের। ট্যাক্সিতে উঠে সে আগে থেকেই বসে রইল চুপ করে। দীপ্তি এসে যখন গাড়ীতে বসল, তখন সে অন্যদিকে চোখ মেলে রেখেছিল। পাড়ার কয়েকটি কৌতূহলী ছেলেকে যেন দেখা গেল এক জায়গায়, কী নিয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করছে। কিছু কি টের পেয়েছে ওরা? হয়তো পেয়েছে—বাড়ীর কাকেরা জানবার আগেই হয়তো এরা খবর পায়। শুধু ট্যাক্সি ছাড়বার আগে মনে হল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ যেন কানে আসছে কাকিমার, আর ঘরের ভেতর থেকে বন্দী জানোয়ারের মতো বিষাক্ত গর্জন উঠছে গৌরাঙ্গবাবুর।

স্টেশন পর্যন্ত একটা কথা হল না দুজনের মধ্যে, এমন কি ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত নয়। শুধু টিকেট করবার সময় দীপ্তি একটা ছোট মণিব্যাগ বের করে দিয়েছিল প্রভাতকে।

প্রভাত বলেছিল, এখন থাক, পরে দরকার হবে।

হোক ক্ষমতার বাইরে, তবু দুখানা ফার্স্ট ক্লাসেরই টিকেট করল প্রভাত। পৃথিবীর নিষ্ঠুর কৌতূহলী চোখকে যতটা সম্ভব আড়াল করেই নিয়ে যেতে হবে দীপ্তিকে। বিশেষ করে মেয়েদের দৃষ্টিতে তার মাতৃত্বের লক্ষণ হয়তো কোনো মতেই এড়াবে না—আবার এড়াবে না—তার কপালে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই।

যেমন আশা করেছিল, তাই হল। একটিমাত্র মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন সহযাত্রী—তিনি চোখ তুলেও চাইলেন না, নিজের মনেই কী একখানা উর্দু বই পড়ে চললেন। নেমেও গেলেন পাঁচ-ছটা স্টেশন পরেই।

তখন প্রভাত দীপ্তির দিকে তাকালো। বাইরের ঘরবাড়ী, মাঠ-বন-জঙ্গলের দিকে চেয়ে বসে আছে সে। হাওয়ায় রুক্ষ চুল উড়ে পড়ছে মুখের ওপর। কিন্তু দু'চোখে তার অতলান্ত শূন্যতা। প্রভাত জানে, দীপ্তি কিছুই দেখছে না—দেখতে পাচ্ছে না—শুধু একটা ভয়ংকর আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ তার মনের সামনে দুলছে।

কাল রাত থেকে শুধু প্রভাত ভেবেছিল, রাণীর কাছে কিছুতেই ছোট হওয়া যায় না, কিছুতেই অপমান করা যায় না দীপ্তিকে। নিজের মান বাঁচাতে হবে, লঘু করে দিতে হবে দীপ্তির লজ্জার ভার। আর সেজন্যে একটি—একটিই মাত্র উপায় আছে হাতে। আরো কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থেকে প্রভাত উঠে দাঁড়ালো। দীপ্তি গাড়ীর যে কোণাটায় বসেছিল, এগিয়ে গেল সেখানে।

—দীপ্তি!

দীপ্তি প্রভাতের দিকে তাকালো।

তখন হাতের ছোট শিশিটা থেকে অনভ্যস্ত আঙুলে দীপ্তির কপালে একটা সিঁদুরের টীপ পরিয়ে দিলে প্রভাত, একটা এলোমেলো রেখা টেনে দিলে তার শুভ্র কুমারী সীমান্তের উপর।

প্রতিবাদ করল না দীপ্তি, আশ্চর্য হল না, কেঁদে উঠল না, এক বিন্দু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। শুধু সেই শূন্য দৃষ্টি নিয়ে একভাবেই চেয়ে রইল।

তার কাছে বাইরের মাঠ-ঘাট—ট্রেন নয় কামরার ঝুলন্ত অ্যালার্ম চেন, জানলা দিয়ে উড়ে আসা এক রাশ কয়লার গুঁড়ো আর প্রভাত সরকার—সব সমান।

(ক্রমশঃ)

(উত্তর)

বিগত ১০ই আগস্ট তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন।

সাধ্যমত উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

।। **সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষেপিত** ।।

সংক্ষিপ্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—আকারে ছোট। কিন্তু সংক্ষেপিত হল—যে কোন রচনা বা ঐ জাতীয় কিছু, যার পরিসর বিস্তৃত কিন্তু প্রয়োজনে বা যে কোন কারণে স্বল্প-পরিসরের মধ্যে তাকে সীমিত করা হয়েছে।

॥ রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের পোষাক-পরিচ্ছদ ॥

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রাত্যহিক জীবনে কি ধরনের পোষাক পরতেন? এ তথ্যটি আজও প্রকাশিত হয়নি—প্রশ্নকারীর এ তথ্যটি ভুল। কারণ কবিগুরু তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তেই এ বিষয়ে লিখেছেন......

"আমাদের শিশুকালে ভোগ-বিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবন-যাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদা-সিধা ছিল। আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখন-কার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশংকা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।

......আমাদের চটিজুতো একজোড়া থাকিত..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়—বাল্যকালে কবিগুরু প্রাত্যহিক জীবনে কি ধরনের পোষাক পরতেন।

।। **শ্রী পরিহারের কারণ** ।।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্রী' পরিহারের কারণ সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারব না। তবে এ বিষয়ে আমার নিজের যা ধারণা——তাই বলি।

'রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়স এবং তার কিছু পর পর্যন্ত' অর্থাৎ সময়টা বর্ত-মান শতকের প্রায় দ্বিতীয় দশক। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ও সারা হয়ে গিয়েছে। সেই যুদ্ধেরই প্রলয়ংকরী বিধ্বংসী রূপে সমগ্র মানবজাতি হতভম্ভিত। (এবং তৃতীয় দশক হলে) সেই সময় থেকেই ঋষিকল্প জ্যোতির্ময় পুরুষ রবীন্দ্রনাথ অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। তখন পৃথিবী ভাগ হয়ে গিয়ে-ছিল—দুভাগে। **শো ষ ক-শো ষি ত,**

জানাতে পারেন

উৎপীড়ক-উৎপীড়িত, যুদ্ধবাদী ও শান্তিবাদী।

সেই শোষিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানবাত্মার সকরুণ হাহাকার কবিগুরুর চিত্তকে দীর্ণ করেছিল। ক্ষমতালোভী মানুষের বর্বর উল্লাসের পাশবিকতায় কবি স্তব্ধ হয়ে গিয়ে-ছিলেন। জগৎজোড়া এই 'শ্রী'-হীনতার মাঝে—যেখানে সাধারণ মানব সমাজের সমগ্র 'শ্রী' অবক্ষয়ের পথে—তখন নিজের নামের আগে এই একটি বিরাট 'শ্রী' তার ব্যঙ্গস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাই সেটুকুও মুছে ফেলে—সমগ্র পৃথিবীর 'শ্রী'-হীনতার প্রতিবাদস্বরূপ, নিজের 'শ্রী'টুকুও পরিহার করে কবি-গুরু সম্ভবতঃ আত্ম-অবমাননার দায় থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন।

।। **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের আসল নাম** ।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের আসল নাম—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ কি না—এ প্রশ্নের জবাব গবেষণাসাপেক্ষ। তবে এখনও পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামেই গ্রন্থটি সর্বাধিক পরিচিত। ওই নামেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যদিও দ্বিতীয় নামটি নিয়ে আলো-চনা ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

পন্ডিতেরা এখনও এ বিষয়ে একমত নন।

।। **পদ্যের পরে গদ্য** ।।

"প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যে দেখা গেছে আগে পদ্যের উদ্ভব পরে গদ্যের। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। অথচ মানুষ গদ্যেই কথা বলে, পদ্যে নয়। এ রকম হবার কারণ কি?"

এ রকম হবার কারণ এই যে—সাহিত্য যখন প্রথম রচিত হতে থাকে তখন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এমন কি লিখবার কৌশলই ছিল অনা-বিষ্কৃত। কাজেই স্মৃতির মাধ্যমে মানুষ ধরে রাখত তার রচিত সাহিত্য। গদ্যে সেটা সম্ভব নয়। পদ্যে যতটা। সেটা শ্রুতি-সাহিত্যের যুগ। তারপর সাহিত্যের কালান্তর ঘটে। সৃষ্টি হয় পুঁথি-সাহিত্যের।

পদ্য ছন্দোবদ্ধ কাজেই তা সহজেই কণ্ঠস্থ হতে পারে। এবং কণ্ঠ হতে কণ্ঠান্তরে গিয়ে স্মৃতির মধ্যে নিজের স্থায়ী স্থান অনায়াসেই করে নিতেও পারে। গদ্যে সেটা সম্ভবপর ছিল না বলেই মুখের ভাষা গদ্য হলেও সাহিত্যে 'আগে পদ্যের উদ্ভব পরে গদ্যের।'

॥ লেখক ও সাহিত্যিক ॥

'লেখক'—যিনি লেখেন তিনিই লেখক। তিনি মুদির দোকানের জমা-খরচের খাতাই লিখুন আর নকল-নবীশই হন। যদৃচ্ছং তদুল্লিখিতম অর্থে এরা লেখক হতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যিক এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে. তিনিও লেখেন কিন্তু শুধু লেখেনই না তিনি সৃষ্টি করেন রচনা-কৌশলের মাধ্যমে।

যে যে কারণ থাকলে একজন লেখককে আমরা সাহিত্যিক আখ্যা দিতে পারি—(ক) অন্তর থেকে সৃষ্টির তাগিদ বা প্রকাশ বেদনা।

(খ) সৃষ্টিশীল রচনার দক্ষতা।

(গ) দূরদৃষ্টির এবং দিব্যদৃষ্টির সুপ্রকাশ।

(ঘ) নীতি ও রুচিবাগীশতা।

(ঙ) অনায়াস ব্যঞ্জনা (মহত্তর) সৃষ্টির নিপুণতা।

(চ) এবং তিনি যা লিখবেন তা সার্থক, সুন্দর, শোভন ও শালীন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ছ) তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যুগোত্তীর্ণ হবে—অন্ততঃ আজকের লেখা কালই যেন বাসী না ঠেকে।

(জ) মানবিকতা, সহানুভূতি ও সমবেদনা। সমাজ-জীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয়।

(ঝ) জাতি, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অখন্ড ঐক্যচেতনার অন্বিত রূপ যেন তাঁর লেখায় স্ফুটতর হয়।

(ঞ) মঙ্গল ও কল্যাণবোধের আদর্শ।

(ট) এবং সর্বোপরি সাহিত্যিককে হতে হবে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী।

সাহিত্যিকের সংজ্ঞা নির্ণয়কল্পেও এ কথা বলা যায় যে তিনি হবেন—সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধক।

ইতি
শ্রী কুমকুম দে
৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড।

(**প্রশ্ন**)

মহাশয়,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' এক অপূর্ব সংযোজন। কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই জাগে, সুচিন্তিত উত্তর পাইবার আশায় আপনার কাছে জানাইলাম।

(১) বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রং-এর ব্যবহার হয় কেন? কতদিন হইতে ইহার শুরু হইয়াছে?

(২) ছেলেবেলায় পাঠশালায় শেখানো হইত : ১এ চন্দ্র, ২এ পক্ষ ইত্যাদি। ইহার তিন "নেত্র" ও "পঞ্চবান" কি কি?

ভবদীয়,
শ্রীঃ ভুবণ মিত্র, পুরুলিয়া।

সারমাদ একজন কবি

রাম বসু

কবিতার অন্য এক নাম বোধহয় স্পর্ধা। সমাজ সংসার, রাজ্য, সাম্রাজ্য, নিন্দা প্রশংসা সব কিছুকে উড়িয়ে দিয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করে। বিশ্বের ওপর সে বিধান দেয়। বলা বাহুল্য বিশ্ব অবশ্য বিনা দ্বিধায় সেই বিধান অগ্রাহ্য করে। কেননা ওরা অসম্ভবের কথা বলে। সমাজ সংসারের ব্যবহারিক প্রয়োজনটা ওরা বোঝে না। ওদের দিয়ে কোন কাজ হয় না। বৈষয়িক উন্নতি ত হয়ই না। আর আত্মিক? না, তাও না। প্লেটোর মতন দার্শনিক ত ওই সব লোকদের রিপাবলিক থেকে তাড়িয়ে দিতে এক পায় খাড়া। কিন্তু তাড়ানো যায় না। কবিরা থাকে। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করে দিতে নিয়ে আসে অবাক-করা ভাবনা। ঢেউ লাগে, তুফান ওঠে, তরী টলমল করে, যায়-যায়। সৈন্য-সামন্ত, লোকজন, গুলীবারুদ, এই সব নিয়ে যে বিদ্রোহ; সে বরং ভাল। তাকে ঠেকানো যায়। তার সামনা-সামনি দাঁড়ানো যায়। মোকাবিলা করা যায়। হার হয়ত হয়। তবু জেতার আশা একেবারে লোপ পায় না।

কিন্তু যে বিদ্রোহ আসে গোপনে, অগোচরে, চেতনায়, মানসিকতায়, ধারণায় তার চেয়ে মারাত্মক আর কিছু নেই। সে ছড়ায় আগুনের মত। অথচ সে আগুন নেভাবার মত দমকল নেই। সে আগুন চোখে দেখা যায় না; অথচ আঁচ পেতে হয়। সে মানুষকে মানুষ রেখে আবার তাকে আমূলে পরিবর্তন করে। নোতুন মানুষ করে।

জীবন, তার কাছে অন্য অর্থে ধরা দেয়। তার কাছে পৃথিবীর রঙ পাল্টে যায়। তার কাছে তখন সার্থকতার অর্থ স্বতন্ত্র। বাঁচার নোতুন সম্ভাবনায় সে দীপ্ত।

আর এই দীপ্তিটাই প্রথা ও সনাতন রীতির কাছে অসহ্য। মেনে-নেওয়া বিশ্বাসের কাছে সে তুমুল প্রতিবাদ। সে নিঃশব্দে সংগ্রাম করে। পরাজিত হয়েও জিতে যায়। তারা শেলীর কথায় কবিরা এই দুনিয়ার অস্বীকৃত বিধান-দাতা।

তাই প্রতি যুগেই দেখা যায় কবিদের ওপর নেমে এসেছে রাষ্ট্রের দন্ড, সমাজের তিরস্কার। প্রথার শাসন তাদের ওপর উগ্রতম। উপেক্ষা তাদের ওপর তীব্রতম। বঞ্চনা তাদের ভাগ্য। প্রাপ্য তাদের মৃত্যু। পুরাকালে এই মৃত্যু হত তলোয়ারের কোপে; আধুনিক যুগে হয় সংগঠনের যাঁতায়।

আর এই তলোয়ারের কোপেই প্রাণ দিয়েছিলেন সারমাদ। বেশি দিনের কথা নয়। সে ১৬৬১ সালের কথা। কবিতার চরণ বলতে বলতে জুম্মা মসজিদের ধারে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন হয়ে গেল কবির। শান্ত হলেন বাদশা আলমগীর, অর্থাৎ আরঙ্গজেব।

কবি হিসাবে সারমাদের নাম আজও মুছে যায় নি, যেমন মোছে নি হাফেজ কিম্বা ওমর। পারস্যের কবিদের আলোচনায় বারবার উচ্চারিত হয় সারমাদের নাম। ওরিয়েন্টাল বায়োগ্রাফিক্যাল ডিক্সনারীতে কবি হিসাবেই তিনি আলোচিত।

সারমাদ জাতিতে কিন্তু আরমানী। পারস্য থেকে আরও দশ-পাঁচজন আরমানীদের মত সারমাদও এসেছিলেন ভারতে। তখন শাজাহান ভারতের সম্রাট।

সিন্ধু নদীর ধারে তাতা শহরে ব্যবসা আরম্ভ করলেন সারমাদ। আরমানীদের ব্যবসার হাত খুব ভাল। বিচক্ষণ বলে সুনাম। শঠ বলেও দুর্নাম আছে। কিন্তু তা ব্যবসার ধর্ম। সুনাম আর দুর্নাম হাত ধরাধরি করে যায়। একজনের কাছে প্রশংসা পাওয়ার মানে আরও পাঁচজনের কাছে বদনামের ভাগী হওয়া। অজাতশত্রু হয়ে ব্যবসা করা অসম্ভব। তাই ব্যবসাদার সারমাদের নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই ছিল।

ব্যবসা করে আর পাঁচজন আরমানীদের মত বড়লোক হবার জন্য সারমাদ পৃথিবীতে আসেন নি। তাই অকস্মাৎ ভাগ্য তার ঘুরে গেল।

ওই শহরেই বাস করত অভয়চাঁদ। নাসরাবাদীর মতে অভয়চাঁদের বাবা ছিলেন বিখ্যাত হিন্দুরাজা। অবশ্য বায়োগ্রাফিক্যাল ডিক্সনারীতে অভয়চাঁদের নাম উল্লেখ নেই। সেই মতে ". . . he fell so passionately in love with a Hindoo girl that he
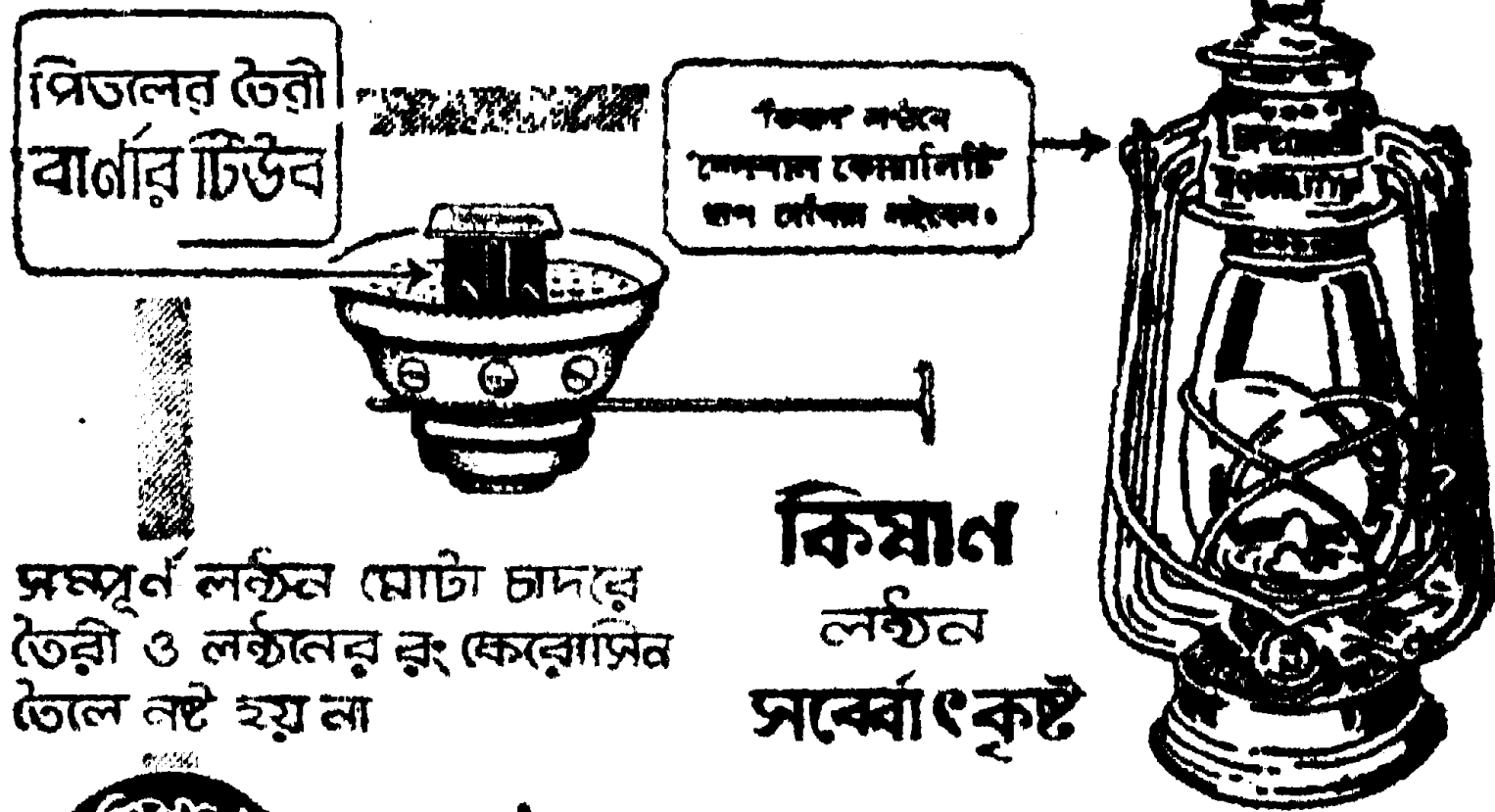
became distracted and would go about the streets naked".

কিন্তু সারমাদের কবিতায় অভয়-চাঁদের নাম সুস্পষ্টভাবেই ঘোষিত। চার-চরণের একটি কবিতায় সারমাদ বলছেন:

জানি না তাই এই দুনিয়ার মন্দিরে কি
দেবতা আমার অভয়চাঁদ,
না অন্য কেউ?

অল্প দিনের মধ্যে নিজের ভিতর উত্তর খুঁজে পেলেন সারমাদ। সে উত্তর স্পষ্ট। তাই তাঁর হল ভিতরের আলোড়ন। স্বাভাবিক চেতনা লুপ্ত হল কবির। অভয়চাঁদের বন্ধুত্বের জন্য পাগল হয়ে উঠলেন সারমাদ। ব্যবসা-বাণিজ্য গেল। হিসেবপত্র গেল। লাভ-লোকসানের দিকে নজর নেই। তাই তিনি নিজের প্রতি বলে উঠলেন:

তোমার ধর্মকে তুমি আহত করেছ
সারমাদ
উন্মত্ত আঁখিতে বিদ্ধ প্রাচীন বিশ্বাস।
অপবাদ
গায় মেখে বিত্তরাশি ত্যাগ করে
পূজো অর্চনায়
চার দিকে ছুটে গেলে, হে অবুঝ,
সে কার আশায়?

সারমাদ প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে হলেন সুফী। ব্যবসা-বাণিজ্য গেল। এখন নগ্ন ফকির। বসে থাকতেন অভয়চাঁদের বাড়ির দরজায়। কিন্তু সারমাদের এই আকুলতায় বীত-স্পৃহ হল অনেকে। শত্রু হল সবাই। তাই সারমাদ বললে:

অধুনা বন্ধুরা শত্রু শুধু এক বন্ধুর
কারণে
চিত্ত তবু পরিতৃপ্ত মুগ্ধ আমি
অম্লান বচনে
বহুধা বিভক্ত নই আমি ঐক্যে শান্ত
সুগঠিত
অবশেষে আমি তাঁর যে আমার
আজন্ম অন্বিত।

অভয়চাঁদের প্রতি সারমাদের বন্ধুত্বের পবিত্রতায় বিশ্বাস করলেন অভয়চাঁদের বাবা। তিনি বুঝলেন এই ফকিরের উদ্দেশ্য সৎ। অভয়চাঁদের বাড়ির দরজা মুক্ত হল সারমাদের জন্য। অভয়চাঁদও সারমাদের প্রতি অনুরক্ত। অবশেষে তাঁরা তাতা শহর ছেড়ে এলেন দিল্লীতে। সম্রাট শাজাহান তখন বাদশা।

দিল্লীতে ফকির হিসাবে সারমাদের নাম ছড়িয়ে পড়ল অচিরে। তাঁকে দেখতে তার সঙ্গে আলাপ করতে ভিড় লেগে থাকত সর্বদা। শাজাহানের বড় ছেলে দারাশিকো হলেন সারমাদের বড় ভক্ত।

ধর্মমতের দিক থেকে দারাশিকো বড় উদার। বিশেষ কোন ধর্মমতের, আচার-অনুষ্ঠানের সংকীর্ণতার ভেতর আবদ্ধ থাকতে তিনি নারাজ। বরং বলা যায় দারাশিকো চেয়েছিলেন সর্বধর্মের সমন্বয়। তিনি প্রমাণ করতে চেয়ে-ছিলেন যে ধর্মের এই যে, বিরোধ তা আদপে বাইরের। ভিতরের দিক থেকে সবই এক। মানুষের উচিত সেই পরম একের স্মরণ করা। এই মতকে প্রতি-ষ্ঠিত করতে দারাশিকো 'সমুদ্র সংগম' নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে দারাশিকো পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন যে, গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের জন্য এই বই লেখা হয় নি। যাই হোক এই দারা-শিকোই হয়ে উঠলেন সারমাদের প্রধান ভক্ত এবং এই দারাশিকোকে কেন্দ্র করেই বাদশার সঙ্গে বিবাদে নামলেন কবি।

দারাশিকোর কাছ থেকে এই ফকিরের খবর পেলেন শাজাহান। সম্রাটের উৎসাহ বাড়ল। কিন্তু শাজাহান ছেলের ধর্ম-প্রীতিকে ভাল চোখে দেখতেন না। যদিও শেষ জীবনে সম্রাট এ'র কাছে কৃতজ্ঞ। সম্রাট জানতেন যা কিছু গতানুগতিক নয় তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই দারাশিকোর স্বভাব। সুতরাং সম্রাট ওমরাহ এনায়েৎ খাঁকে পাঠালেন এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য। একই কথা বলল এনায়েৎ। সম্রাট সারমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। সারমাদ ভবিষ্যত বাণী করলেন দারা-শিকোই হবে ভারতের ভবিষ্যৎ বাদশা।

কথাটা কানে গেল আরঙ্গজেবের। আরঙ্গজেব দারাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। সবচেয়ে অসহ্য ছিল দারার ধর্মমত। কিন্তু চুপ করে থাকলেন আরঙ্গজেব। উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকলেন তিনি।

দারাশিকো সারমাদকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সারমাদের প্রতি দারার ভক্তি একটা চিঠিতেই বোঝা যাবে। দারা লিখছেন:

"আমার পীর, আমার গুরু,
প্রতিদিন আমি আপনাকে সম্মান জানানোর জন্য বাসনা পোষণ করি। কিন্তু প্রতিদিনই তা অপূর্ণ থাকে। আমি যদি হই আমার মালিক, তবে কেন

আমার বাসনা অপূর্ণ থাকবে? আর আমি যদি আমার মালিক না হই তবে কেনই বা এই বাসনা আমার হৃদয়ে জাগবে? এ দোষ কার?........" দীর্ঘ চিঠিতে দারা ব্যক্তির সংগে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন সারমাদকে।

জবাবে সারমাদ চার চরণের একটা কবিত পাঠালেন। সারমাদ বললেন:

"প্রিয় দারা
যা কিছু পড়েছি ভুলে বেঁচে গেছি
আজ শুধু মনে বাজে
বন্ধুরই সাথে নিত্য আলাপ
ধ্বনিত তা পাখোয়াজে।"

অনেক রক্ত আর হত্যার চোরাগলি ভিতর দিয়ে ময়ূর সিংহাসনে বসলে বাদশা আলামগীর আরঙ্গজেব। ১৬৫: সালে আরঙ্গজেবের হাতে প্রাণ দিলে দারাশিকো। ব্যর্থ হল সারমাদে ভবিষ্যৎ বাণী। খুশি হলে আরঙ্গজেব। এবার সারমাদের পালা

সিংহাসনে বসে বাদশা বিদ্রূপ করলেন সারমাদকে। শান্তভাবে উত্তর দিলেন সারমাদ; "না, আমার কথা ব্যর্থ হয় নি। তোমার ওই মর্তের সিংহাসনের বদলে ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন অপরূপ চিরস্থায়ী আসন।" ক্রুদ্ধ বাদশা সারমাদের নগ্নতা নিয়ে আবার বিদ্রূপ করলেন। এবারও জবাব দিল সারমাদ :

যে তোমাকে দিল এই পৃথিবীর
সাম্রাজ্যের ভার
সে আমাকে দিয়ে গেল উদ্বেগের
সমূহ কারণ
যাদের বিকৃত অঙ্গ সাজসজ্জা তাদের
দরকার
আমার নির্মল দেহ তাই নগ্ন,
এই আভরণ।

শব্দের যাদুকর আরঙ্গজেব কাব্যের এই নিষ্পাপ সরলতাকে সহ্য করতে অপারগ। আরঙ্গজেব স্থির করলেন পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হবে সারমাদের নাম।

ওদিকে দিল্লীতে ক্রমাগত বাড়তে থাকে সারমাদের জনপ্রীতি। কেউ আসে বয়াৎ শুনতে, কেউ আসে ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে। অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দেখতে আসে কেউ কেউ।

সারমাদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা-বিধ অলৌকিক কাহিনী।

বাদশা আরঙ্গজেব ভাঙ-খাওয়া নিষিদ্ধ করে আইন জারী করেছিলেন। ভাঙ খেলে প্রজাদের দৈহিক ও মানসিক অধঃপতন হয়। বাদশার গুপ্তচরের অভাব নেই। একদিন গুপ্তচর বাদশাকে জানালো যে ধুনি জ্বালিয়ে রাস্তার ওপর নগ্ন ফকির যেখানে বসে ঠিক তার পাশে থাকে একটা মাটির হাঁড়ি। ওই মাটির হাঁড়ির ভিতর ভাঙ রাখেন সারমাদ।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ছুতো খুঁজছিলেন বাদশা। সুযোগ সামনে। অন্য কারো ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন পারেন না বাদশা। বিশেষ করে সারমাদ যখন একেবারে হাতের মুঠোর ভিতর এসে গেছে। রাজদ্রোহিতার অপরাধে সারমাদকে সরিয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে এখন।

বাদশা নিজেই হাজির হলেন। সারমাদ তখন ভক্তদের কাছে কবিতা শোনাচ্ছেন। তারা মাটির ওপর গোল হয়ে বসে কবিতা শুনছে। সেই সময় এলেন বাদশা।

আরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করলেন 'মাটির পাত্রে কি আছে?'

প্রশ্ন শুনে মুখ চুন হয়ে গেল সকলের। সকলেই জানে কি আছে। সর্বনাশ। আরঙ্গজেব বুঝলেন সন্দেহ তবে ঠিক। আবার প্রশ্ন করলেন, "মাটির পাত্রে কি আছে দেখাও।"

অবিচলিতভাবে মাটির পাত্রের মুখটা খুলে দিলেন সারমাদ। অবাক হল সবাই। অবাক হলেন বাদশা নিজে। ক্রুদ্ধ হলেন আরও। মাটির পাত্রে ভাঙ নেই; আছে দুধ। অপমানিত বাদশা ফিরে গেলেন।

আরও একটা গল্প আছে।

সেদিন শুক্রবার। দিল্লীর জুম্মা মসজিদে প্রার্থনা করছিল এক মোল্লা। মসজিদে এলেন সারমাদ। মোল্লার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন সারমাদ, "মোল্লার ঈশ্বর আমার পায়ের তলায়।"

গুপ্তচর কথাটা বাদশার কানে তুলে দিল। ধর্মের প্রতি এই আঘাতে অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন বাদশা। তলব পড়ল সারমাদের। সারমাদ নির্বি-কারভাবে জবাব দিল যে সে মোল্লাকে ওই কথাই বলেছে। কিন্তু ধর্মে সে আঘাত করেনি। কারণ মোল্লা ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করছিল তা সম্পূর্ণ-ভাবে ঐহিক বস্তু। আর মোল্লা যা চাইছিল তা আছে ঠিক ওই জায়গায়। সারমাদ বললেন, ডেকে পাঠান হোক মোল্লাকে।

মোল্লা এল। আরঙ্গজেব আর সারমাদের সামনে মোল্লাকে সব কথা স্বীকার করার জন্য আদেশ দেওয়া হল। ভয়ে ভয়ে মোল্লা বললে যে তার মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। অথচ হাতে টাকা নেই। তাই সে ঈশ্বরের কাছে কিছু অর্থের জন্য প্রার্থনা জানা-ছিল।

সারমাদ বললে, যাও। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে ওই কথা বলেছি ঠিক সেই জায়গাটা খুঁড়লে সোনা পাবে। নিয়ে যাও। মেয়ের বিয়ে দাও। আর বাদশাকে বললেন সারমাদ, আমি বলেছি মোল্লার ঈশ্বর আমার পায়ের তলায়। সকলের নয়। মোল্লার ঈশ্বর সোনা।

মসজিদের সেই জায়গাটা খুঁড়ে নাকি সোনা পাওয়া গিয়েছিল।

আরঙ্গজেব আরও সতর্ক হলেন। অজুহাত খুঁজতে থাকেন। কারণ সার-মাদ বড় বেয়াড়া। সে প্রচলিত রীতি-নীতির ধার ধারে না। আনুষ্ঠানিক ধর্মকে সে করে বিদ্রূপ। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়। অথচ সে একটা কিছু বলতে চায় যা সব প্রথার বিরোধী। বিশৃঙ্খলা আনে চরিত্রে। তিনি বলেন,

বাদশাজাদা শোনরে আমি নগ্ন ক্ষ্যাপা
আনন্দিত
নই দরবেশ তোর মত রে ভক্ত গোঁড়া
বিষণ্ণ
মূর্তি পুজো করছি তবু অবিশ্বাসী
ফের কথিত
মসজিদে যাই মোল্লারে নই নিত্য
আমি প্রসন্ন।

তাই সারমাদকে কোন বিশেষ আধারে ধরা যায় না। কোন নিরিখে তাঁকে বিচার করা অসাধ্য। সারমাদ ব্যাপ্ত হতে চায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তুলতে চায় নিবিড় ঐক্য। বিশ্ব-চরাচরে দেখতে পায় সেই ব্যাপ্ত পরম সত্তা। তাই সারমাদ বলে ওঠেন :

কখন তুমি যে দেবদারু হও কখনও
বা জুঁই ফুল
কখনও পাহাড় ঘন অরণ্য গর্জিত
সমাকুল
কখনও বা হও প্রদীপের শিখা
গোলাপ, গন্ধ
কখনও বাগানে তোমাকে দেখেছি
করেছি আলাপ শব্দ।

কিন্তু আবার এই দৃশ্যমান জগতে আবদ্ধ থাকতে রাজী নন কবি। তিনি ছাড়িয়ে যেতে চান। এই বস্তুর প্রাচীর ভেঙে মুক্তি পেতে চান। আর একটা অদৃশ্য জগত তাঁকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে। সেই জগতের টান জাগে রক্তে। কারণ আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে। অন্য কোনখানে। আমরা তার সঠিক ঠিকানা যদি নাও জানি, ক্ষতি নেই। কারণ সব ঠিকানাই ত গর-ঠিকানা আর সব গর-ঠিকানাই ত ঠিকানা। কিন্তু কি করে যাবো? তারও নির্দেশ দেন সারমাদ :

দূর কর সব মোহ চিন্তা ভয়,—যা
শুধু জ্বালায়
সকালে হাওয়ার মত বয়ে যাও
বিশ্বের ওপর
পাগল হয়ো না রঙে, গন্ধে কিম্বা
গাঢ় সুষমায়
প্রাজ্ঞ হয়ে পার হও সেই সব
অভিভূত স্তর।

সম্মোহনের এই স্তরগুলি পার হওয়া কঠিন। তার জন্য চাই নিরবচ্ছিন্ন

সাধনা, চাই পবিত্র প্রেমের দীপশিখা। সে তীব্র দহন না হলে সোনা কখনও খাঁটি ত হবে না।

আর ভালবাসার দহন সকলের জন্য নয়। যারা আত্মমগ্ন তারা একে সহ্য করতে পারে না। তারা নিজেকেই খুঁজে মরে। নিজেকে না হারাতে পারলে তাকে পাওয়া যায় না। তাই অনেকটা নিজেকে আশ্বাস দিয়েই বললেন :

সকলের জন্যে নয় প্রেমের দহন
সারমাদ
অগ্নি থাকে জোনাকির মাছি তার
পায় না আস্বাদ
সাধনা আজন্ম হলে বঁধু বুকে বাঁধে
আলিঙ্গনে
অমলিন প্রেমরত্ন সকলে কি পায় রে
নয়নে।

সারমাদ সাধক ও কবি। সারমাদকে বোঝা বাদশার অসাধ্য। সারমাদ মাথা নিচু করেন না। মাথা তাঁর উঁচু। তিনি কুর্নিশ করেন না। বিত্তের দম্ভ তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না। অধৈর্য হন বাদশা।

অবশেষে কারণ পাওয়া গেল। বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ এল বাদশার সামনে। হিংস্র হয়ে উঠলেন আরঙ্গজেব।

সারমাদ একটি কবিতায় বলেছিলেন :

মোল্লারা বলে আহম্মদ স্বর্গে গিয়েছিল। কিন্তু আমি সারমাদ বলি স্বর্গ এসেছিল আহম্মদের কাছে।

এই উক্তি আরঙ্গজেবের কাছে গর্হিত বলে মনে হল। মনে হল সারমাদ এই উক্তি দ্বারা মুসলমানদের ধর্মের উপর করেছে তীব্র আঘাত। এই আঘাত সহ্য করা অনুচিত। ধর্মদ্বেষী কাফেরকে তাই হত্যা করার আদেশ দিলেন বাদশা। বাদশা তার সঙ্গীদের কাছে বলেছিলেন, সারমাদ নগ্ন হয়ে থাকে। শুধু এই তার অপরাধ নয়। তার অপরাধ মুসলমান ধর্মের ওপর আঘাত সৃষ্টি। কলমা সম্পূর্ণভাবে পড়ে না। মাত্র প্রথম অংশ উচ্চারণ করে।

এই অভিযোগেরও জবাব দিয়েছিলেন সারমাদ। বলেছিলেন, আমি যে এখনও 'না-সূচক' দিকটাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি। আমি বুঝতে চাইছি তার অর্থ। দ্বিতীয় অংশ আমি কি করে উচ্চারণ করব? আমি যে মিথ্যাবাদী হব। আমি তা পারব না।

যুক্তির দিকে যেতে চায় না আরঙ্গজেব। আরঙ্গজেব চায় পৃথিবী থেকে সারমাদের নাম মুছে দিতে। ধর্মের প্রশ্ন একটা ছুতো। তাই তর্কের দিকে না গিয়ে সারমাদকে হত্যার আদেশ দিলেন বাদশা।

যখন সারমাদকে বধ্য ভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন দিল্লীর রাজপথ লোকে লোকারণ্য। পথে যেতে যেতে চব্বিশটি চার-চরণের কবিতা মুখে মুখে রচনা করেছিলেন সারমাদ।

খড়্গ হাতে করে এগিয়ে এল জল্লাদ। প্রথা অনুসারে বললে, "মাথাটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।" অবাধ্য হলেন সারমাদ। অগ্রাহ্য করলেন আদেশ। এগিয়ে এল সারমাদের সঙ্গী শাহ আসাদুল্লা। বললে, "কাপড় পর। কলমা পড়। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

অবাধ্য কবি সারমাদ উত্তর দিলেন :

বহুদিন হল লোকে ভুলে গেছে
মনসুর তার গৌরব
ওই ফাঁসিকাঠ ওই ঝোলা দড়ি
রেখে দিক তার সৌরভ।

অধৈর্য হচ্ছে জল্লাদ। মৃত্যুভয়হীন শান্ত মুখশ্রীর দিকে তাকাতে পারছিল না হয়ত। অল্প হেসে সারমাদ তাকে বললেন.

অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে নিদ্রা থেকে দেখি
চোখ মেলে
শঠতার চিররাত্রি, নিদ্রা তুমি
অবশেষে এলে।

আরঙ্গজেবের সভা-ঐতিহাসিক আলি খাঁ রাজি অবশ্য অন্য কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন শেষ আঘাত এসে পড়ার আগে সারমাদ বললেন,

আমার নগ্নতা, বন্ধু এ ত ধুলো;
আমার নগ্নতা!
তাও কি অবাক দ্যাখো তলোয়ারে
তুহিন স্তব্ধতা;

দেহ থেকে মাথাটা ছিটকে পড়ল। শান্ত হল কবি-কণ্ঠ। অশান্ত হল আরঙ্গজেব। অন্তর্দাহে বিষন্ন বাদশা মৃত্যুর আগে একটা চিঠিতে লিখলেন, "আমি চলে যাচ্ছি। আমি আমার পাপের ফলগুলি তুলে নিয়ে যাই। একা। আমি একা। আমি অনেক পাপ করেছি। আমি জানি না আমার পাপের জন্য কি শাস্তি আমাকে পেতে হবে।"

ডক্টর রিউ-এর মতে সারমাদ নাকি চারশ' চার-চরণের কবিতা রচনা করেছেন এবং তার অনেকগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংগৃহীত আছে। রামপুর স্টেট লাইব্রেরীতে সারমাদের পান্ডুলিপি এবং কবি ও কবি-শিষ্য অভয়চাঁদের ছবি ছিল। লাহোর, দিল্লী ও বোম্বাইতে কবির রচনা উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তা সমগ্র রচনা নয়।

কবিকর্মের দিক থেকে সারমাদ ছিলেন হাফেজ আর ওমরের ভক্ত। গজল রচনায় তাঁর গুরু হাফেজ আর রূবাইতে ওমর। সারমাদের নিজের কথায় এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তফাৎ শুধু এই যে "আমি ওমরের মত সুরা ভক্ত নই।"

বার্ণিয়েরের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্তে সারমাদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বোঝা যায় যে, বার্ণিয়ের সাহেব সারমাদের নগ্নতাকে বিশেষ পছন্দ করতে পারেন নি। এই মতে সারমাদের মৃত্যুর কারণ তার নগ্নতা।

সে যাই হোক সম্রাটের আক্রোশে স্তব্ধ হয়ে গেল একটি নির্মল কবিকণ্ঠ পরবর্তী যুগে বারবার উচ্চারিত হবার জন্য। কারণ মানুষ সম্পর্কে কবির এই চিন্তা আজও আমাদের হানে :

সারমাদ তুমি দেহ আত্মা আছে অন্য
কারো হাতে
ধনুকের তীর শুধু; এই হল
একমাত্র মানে
জাল মুক্ত হলে নর শুদ্ধ হয় কিরণ
সম্পাতে
তবু সে গরুর মত অন্য কেউ দড়ি
দিয়ে টানে।

পৌষ-ফাগুনের পালা
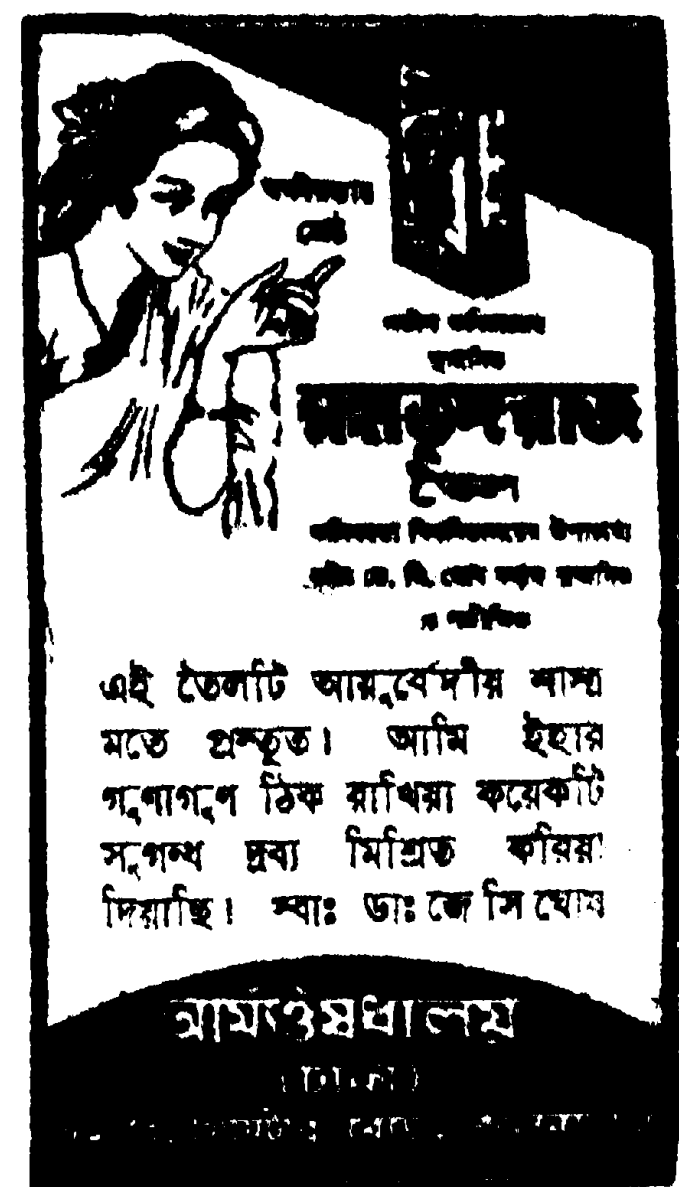
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

এই ঘটনার পর থেকে তরু যেন কেমন হয়ে গেল। কথা সে চিরদিনই কম বলে, সেদিক দিয়ে তার স্বভাব মহাশ্বেতা ও ঐন্দ্রিলার বিপরীতই বলা যায়—কিন্তু এখন যেন একেবারেই কথা ছেড়ে দিলে সে। কেউ কথা কইলেও উত্তর দেয় না, দু-তিনবার পর পর কোন প্রশ্ন করলে কিম্বা বকাবকি করলে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না'—এর বেশী নয়। তাও ঘাড় নেড়ে কাজ সারা সম্ভব হ'লে তাই নাড়ে। চুপচাপ বসে থাকে অধিকাংশ সময় ঘরের জানলায়। বাইরের দিকে বা বাগানের দিকের জানলায় নয়—উঠোনের দিকের জানলায় বসে একদৃষ্টে কাঁঠাল চারাটার দিকে চেয়ে থাকে। দিনে রাতে, সব সময়। কেউ এসে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলে স্নান করে খায়—তা নাহ'লে তাও করতে চায় না। সারাদিন খেতে না দিলেও কোন কথা বলে না বা খেতে চায় না।

কনকই এসবগুলো করে। সে-ই জোর ক'রে নিজের সঙ্গে ঘাটে নিয়ে যায়, জোর ক'রে গিয়ে ভাতের সামনে বসিয়ে দেয়। তাও প্রথম প্রথম ঠিক গোনা দু'গ্রাস খেয়েই উঠে পড়ত, কনক ছেলের কথাটা স্মরণ করাতে, 'পেটে যেটা আছে তার কথাটা ভাব ঠাকুরঝি। ওটাকে বাঁচাতে হবে তো। ওটা তো তোমার নিজস্ব—তাতে তো কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। তার কথাটা ভাবছ না কেন?' বলাতে এখন খায় কিছু। ভাও যা প্রথম দেওয়া হয় তা-ই খায়, আর চায়ও না, দিতে এলেও নেয় না। হাসিখুশী তো দূরের কথা—যদি একটু কাঁদতও, তাহ'লেও শ্যামা কতকটা স্বস্তি পেতেন।

'পোড়ামেয়ের চোখে কি জলও থাকতে নেই একফোঁটা?...কী হবে বৌমা, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে নাকি? কোন মতে ওকে একটু কাঁদাতে পার না মা?'

সে চেষ্টা অনেক করেছে কনক; কোন ফল হয়নি। ওর ভেতর-বার সবটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে বোধ হয়—কোন কিছুরই বোধশক্তি আর নেই। চোখের জলের উৎসও বুঝি গেছে শুকিয়ে। দুঃখের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে আছে শুধু মূর্চ্ছা রোগটা। সেদিনের পর থেকে ওটা থেকেই গেছে। দুদিন তিনদিন অন্তরই মধ্যে মধ্যে ফীট হয়।

মহাশ্বেতা বলে, 'ওর ওপর বাপু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, কোন অন্যি-দেবতার ভর হয়েছে। এ একেবারে পষ্ট লক্ষণ। এ আমি ভাল বুঝছি না। ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করাও তোমরা। বলেতো মাকড়দায় একজন ভাল গুণীন আছে শুনেছি, তার খবর করি। খুব বেশী নেয়ও না শুনেছি। সেবার আমার বড় ননদের ভাসুরঝির অমনি হয়েছিল—'

বিরক্ত হয়ে শ্যামা থামিয়ে দেন ওকে, 'তুই চুপ কর তো। তোর সবতাইতে বাক্তমে আমার ভাল লাগে না। অন্যি-দেবতার ভর হয়েছে! সে হয়ে থাকলে তোরই মাথাতে হয়েছে। গুণীন তুই দেখাগে যা।'

মহাশ্বেতা ঐন্দ্রিলা নয়। সে ঝগড়া করতে পারে না, ম্লানমুখে চুপ করে থাকে। তবে সে তখনকার মতোই। একটু পরেই হয়ত গিয়ে ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে কনকের কাছে গিয়ে বলে, 'আমি বলছি বৌদি, তুমি দাদাকে বলে একটা ঝাড়-ফুঁকের ব্যবস্থা করাও। যে রোগের যা। এ মন্তর-তন্তর ছাড়া ভাল হবে না। মা তো এদান্তের কথা জানে না, এখন খুব ভর হচ্ছে অন্যিদেবতাদের।'

কনক অবশ্যই চুপ ক'রে থাকে। ইদানীং 'অন্যিদেবতা'দের খুব বেশী ভর হচ্ছে এ কথা শোনবার পর হাসি চাপা কঠিন। সেই জন্যে আরও প্রাণপণে চুপ করে থাকতে হয়। তার বড় ননদটিকে সে চিনেও নিয়েছে এর মধ্যেই—জানে যে ওকে এসব কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

তার উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করে না মহাশ্বেতা। হয়ত তখনই আবার তরুর সামনে গিয়ে বলে, 'কী লো, কী খেতে-টেতে ইচ্ছে হয় খুলে বল। যা মন চায় বল, আমি পাঠিয়ে দেব। এখানে তো ভাল-মন্দ কিছু হবার যো নেই। ভাত হাড়ির ভাত খাও, তাতে মা গররাজী নয়, তার ওপর কিছু চেয়োনি বাপু। হি হি। ...... তা আমাকেই বলিস যখন যা ইচ্ছে হবে। পেটে-পোয়ে খাবার সাধ চেপে রাখতে নেই। ছেলের মুখ দিয়ে নাল পড়ে। কচুরি খাবি দু'খানা? হিংয়ের কচুরি? বল তো তোর দাদাবাবুকে বলে দিই, বড়বাজার থেকে এনে দেবে। আ মর, মুখপোড়া মেয়ে হা-ও

করে না হুঁ-ও করে না। বাকা হয়ে গেছে যেন।'

তার পরই আবার হয়ত—কিছুক্ষণ পূর্বের ধমক সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে—মার কাছে গিয়েই উপদেশ দেয়, 'তুমি ওকে দিয়ে খুব কাজকম্ম করাও। অমন ক'রে বসিয়ে রেখো নি। পোয়াতী মেয়ে, শেষে যে গুম পাগল হয়ে যাবে। খাটলে-খুটলে অত ভাববার সময় পাবে না, মনটাও ভাল থাকবে তখন।'

এ যে সৎ পরামর্শ তা শ্যামাও জানেন। কথাটা তাঁর মাথাতেও গিয়েছিল বহু পূর্বেই। কিন্তু কাজটা করাবেন কাকে দিয়ে? একশবার কি টেনে টেনে নিয়ে জোর করে কাজ করানো যায়? কীই বা কাজ তাঁর সংসারে? তাঁর যা নিজস্ব কাজ—পাতা কুড়োনো, পাতা চাঁচা, তাও পারবে না। বাগানের তদারক ও কখনও করে নি—কিছু জানে না। এক যেটা পাবে কনকের কাজ কিছু কিছু ভাগ করে নিতে। তা-ও এখন ঐন্দ্রিলা রয়েছে—সে যেন আরও, তরু এসেছে বলেই, বেশী ক'রে ক'রে কাজ করছে। রান্না, বাসন মাজা, ঘর-দোরের পাট—কনকের কাছ থেকে টেনে নিয়ে নিয়ে করছে।

সবচেয়ে বড় কথা—অনিচ্ছায় কোন কাজই করানো যায় না। জোর ক'রে বসিয়ে দিয়েও দেখেছেন, টেনে নিয়ে গিয়ে উনুনের ধারে বসিয়ে পাতাপু জ্বাল দেওয়াতে শুরু ক'রে চলে এসেছেন। খানিক পরে গিয়ে দেখেছেন সে তেমনি চুপ করে বসে আছে। উনুন নিভে ধুস। ভাতও খানিকটা কাঁচা, খানিকটা সেদ্ধ—চিকবেলো হয়ে আছে। দুপুরে বাসন দিয়ে ঘাটে বসিয়ে দিয়ে এসেছেন, বেশ খানিকটা গড়িয়ে উঠে গিয়ে দেখেছেন যে, সে তেমনি বসে আছে, বাসন একখানাও মাজা হয় নি।

আবার কনক অনুযোগ করে, অমন ক'রে ঘাটে-টাটে একা বসিয়ে রেখে আসবেন না মা, ফীটের ব্যারাম হয়েছে, যদি হঠাৎ জলের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়? আমরা তো জানতেও পারব না।'

কথাটা ঠিকই, শ্যামাও তা বোঝেন। সুতরাং সে চেষ্টা ছেড়ে দেন।

ওর ওপর বাপু......অগ্নিদেবতার ভর হয়েছে

অর্থাৎ কিছুই করা যায় না—সমস্যা শুধু দিন-দিন উগ্রতর হয়ে ওঠে।

আরও বেশী সমস্যা হয়েছে ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে।

বাক্যবাণ অহরহ তার বর্ষিত হয়ে চলেছে তরুকে উপলক্ষ ক'রে। অথচ এমন কিছু ঝগড়া-ঝাঁটিও করে না যে বাড়াবাড়ি হয়ে চলে যাবে আবার। এবার যেন সে একটু বেশী সতর্ক হয়েছে। যাকে অন্ত-টিপ্পনী বলে শুধু সেইটুকু দিয়েই সরে যায় অন্যত্র, ঝগড়া পেকে ওঠবার অবকাশ দেয় না।

হয়ত তরুর কাছে গিয়েই হাত-পা নেড়ে চাপা গলায় মুখের বিকৃতি ভঙ্গি ক'রে বলে, 'রাখালী লো রাখালী—কত যে খেলাই দেখালি!...... মাইরি আদর নিতে তুই জানিস বটে। তোকে বলত সবাই ভালমানুষ। আমি জানি চিরকাল—মিচকে পড়া শয়তান তুমি! কেমন কল্লা করলে—কোন কাজকম্ম কিছু করতে হচ্ছে না, অথচ সকলে হা-হুতাশ করছে, কী হল, কী হ'ল—মেয়েটার কী হ'ল!'

আবার হয়ত কিছুক্ষণ জানলার বাইরে উঠোন থেকে ওর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, 'নমস্কার। নমস্কার। তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার। এক বছর ধরে নিত্যি তোমার পাদোকজল খেলে তবে যদি তোমার বুদ্ধির ধার দিয়ে যেতে পারি!'

এক এক সময় অন্তরের বিষও চাপতে পারে না। হিংস্র গলায় তর্জন ক'রে ওঠে, 'হবে না! এত দেমাক ভাল নয়। বড্ড অহঙ্কার হয়েছিল তোর, ভেবেছিলি বর একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে,—তুই এখানে রাগ দেখিয়ে চলে এলেই চোখে শর্ষে ফুল দেখে ছুটে এসে হত্যে দিয়ে পড়বে। ওরে, হাজার হোক ওরা পুরুষ জাত, ওদের চার দোর খোলা।......আমার বর সত্যি-সত্যিই আমার হাত-ধরা ছিল, আমার কথায় উঠত বসত, তবু কখনও এরকম ঘাঁটাতে যাইনি আমি। তুই ভাবিস তোর খুব বুদ্ধি! ঐ বুদ্ধিই তোর কাল হ'ল!' ইত্যাদি—

এ ছাড়া ওকে উপলক্ষ ক'রে এবং শুনিয়ে মাকে বৌদিকে বলা তো আছেই।

মাঝে মাঝে উদ্বেগে কনকের চোখে জল এসে যায়।

'কী হবে মা! মেজ ঠাকুরঝি দেখছি মেয়েটার একটা ভালমন্দ কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না। নিত্যি শুনতে শুনতে শেষে যদি মনের ঘেন্নায় একটা কিছু করে বসে!'

'সবই তো বুঝি মা। কী করব সেইটেই যে শুধু বুঝতে পারি না। দুই-ই যে আমার পেটের কাঁটা। কোনটাই যে ফেলবার নয়। কাকে কি বলি বল! ওকে তো দুবেলা টাইল করছি—দেখছই তো। কিন্তু ও কি কথা শোনবার পাত্তর। ওকে তো চেনো। এর পর করতে গেলে গলা-

ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে হয়। মা হয়ে সেটাই বা করি কি করে বল?'

এক এক সময় আর থাকতে না পেরে চরম সাহসে ভর করে হেমের কাছে গিয়েই বলে, 'কী করলে বলতো মেয়েটার? সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেলে কি করবে?'

হেম গোড়ার দিকে অত গ্রাহ্য করে নি। শ্যামা কি কনক উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু বলতে গেলে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'প্রথম প্রথম শকটা পেলে অমন হয়ই। দুটো চারটে দিন যেতে দাও না—একটু সামলে নিক, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ দুঃখে হাউ-হাউ করে কাঁদে, কেউ গুম খেয়ে থাকে—দ্যাখো না? সব দুঃখই জুড়িয়ে যায়, ওরও যাবে।'

হেম বাড়িতে থাকেই কম, রবিবারেও পুরো দিনটা বাড়ি থাকে না—খাওয়া-দাওয়ার পরই বারোটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। শনিবার সকাল ক'রে এসে কাপড়-জামায় সাবান দিয়ে হয় বিকেলেই আবার বেরিয়ে পড়ে, নয়ত বাগানে মন দেয়। তবুও অবস্থাটা তত চোখে পড়ে না ওর। কাজেই প্রথম প্রথম অতটা উদ্বেগের কারণও বুঝতে পারেনি।

কিন্তু ক্রমশ সেও চিন্তিত হয়ে উঠল।

অথচ এখন যে কী করা উচিত তাও ভেবে পায় না সে।

কনকের অনুযোগে এক এক সময় চটে ওঠে, 'তা কী করতে হবে কি—এখন আবার পায়ে ধরে সতীনের ঘরে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে? সে আমি অন্তত পারব না। দিতে হয় তোমরা দাও গে।... আর দিলেই বা সে সতীন ঢুকতে দেবে কেন?'

আবার কখনও ঠাণ্ডা মেজাজেই জবাব দেয়, 'তা আমিই বা কি করছি বল। তখন ঐ অবস্থায় খুন হ'তে মেয়েটাকে পাঠানোই কি ঠিক হ'ত? দেখলে তো কি মেজাজ। ও রকম কথা শুনলে মরা মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তা আমি তো জ্যান্ত মানুষ। এ ওর বরাত। বরাত ছাড়া কিছু নয়।'

এ কথার পর চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কনক বা শ্যামা কারুরই কোন উত্তর যোগাত না।

॥ ৪ ॥

হঠাৎ একদিন কথাটা উঠল।

সেটা শনিবার না হলেও কী কারণে সকাল ক'রে ছুটি হয়েছিল—সিমলেয় বড় মাসিমার কাছে হয়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছে হেম। শ্যামা যথারীতি বসে তেতুল কাটছেন, সীতা বই খুলে বসে ঢুলছে এবং মধ্যে মধ্যে শ্যামা বা কনকের কাছে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে। ঐন্দ্রিলার জ্বর—সে শুয়ে পড়েছে। কনক বাইরের অন্ধকার বাগানটার দিকে চেয়ে বসে আছে স্থির হয়ে—অন্ধকারে জোনাকিগুলো জ্বলছে আর নিভছে। অসংখ্য জোনাকি। এক এক সময় ভয় হয় ওদের দিকে দেখলে—কত, বোধহয় হাজার হাজার হবে। এরা দিনের বেলা থাকে কোথায়, কই তখন তো মোটে দেখা যায় না।

এই সন্ধেটা এমনি এলোমেলো চিন্তাতেই কাটাতে হয়। কনকের লেখাপড়া খুব বেশী জানা নেই তবু হয়তো চেষ্টা করলে একটু আধটু পড়তে পারত, কিন্তু বইয়ের পাটই নেই বাড়িতে। শ্যামা নাকি সেকালের মতে লেখাপড়া ভালই জানতেন, এখনও তাঁর হাতের লেখা মুক্তোর মতো—অনভ্যাসে সব ভুলে গেছেন। সীতারই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ধাঁধায় পড়েন, দ্বিতীয় ভাগের বানান বলতে পারেন না সব শব্দের। ছোট দেওর এখানে এলে তার পড়ার বইগুলো নিয়ে মধ্যে মধ্যে পাতা ওলটায়, তাও শ্যামার সামনে নয়। মেয়েদের 'আয়না মুখে ক'রে বসা' তার ভাল লাগে না। ওতে সংসার বয়ে যায়, সাত হাল হয় মানুষের। মেয়েরা সংসারের কাজ নিয়ে না থাকলে লক্ষ্মী-শ্রী থাকে না।

সুতরাং—আরও অন্তত দুটো ঘণ্টা কী করে কাটবে এই ভেবে যখন অস্থির হচ্ছে কনক মনে মনে, তখন হঠাৎ সদরে পরিচিত জুতোর আওয়াজ উঠতে যেন বেঁচে গেল সে। প্রথমটা একটু চিন্তাও হয়েছিল—আবার কোন দুঃসংবাদ নয় তো? কিন্তু 'লম্প'র কাছাকাছি আসতে দেখলে যে মুখের ভাব প্রসন্ন, চোখের কোণে তখনও একটা কৌতুকহাস্যের আভাস লেগে আছে—উচ্ছল হাস্য পরিহাসের স্মৃতি সেটা।

ঘাট থেকে মুখহাত ধুয়ে আসতে কনক মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, 'ভাত দেব এখন?'

'ভাত?' উদার প্রসন্নতার সঙ্গে বলল হেম, 'তা দাও। কতক্ষণ আর বসে থাকবে। আটটা বেজে গেছে।... আজ বড়মাসিমার ওখানে গেছলুম মা (শ্যামা মনে মনে বললেন, 'তা জানি, সে তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি!'), হঠাৎ সকালকরে ছুটি হয়ে গেল আজ—কে এক সাহেব মরেছে, তাই চলে গেলুম। বৌদির আবার ছেলে হবে!'

'তাই নাকি?' এবার শ্যামা আর চুপ ক'রে থাকতে পারেন না।

'বাবা, এবার একটা ছেলে হ'লে দিদির একটু শান্তি হয়।' তিনি একটু থেমে বলেন।

'ছোটমাসিও আজ এসে পড়েছিল। দুবাড়িতে বুঝি মেয়েরা পড়েনি—তাই একটু সময় পেয়ে এসেছিল। মেসো-মশাইয়ের শরীর খুব খারাপ, হাঁপানির টানে সারারাত ঘুমোতে পারেন না, মাসিকেও বসে বসে তেলমালিস করতে হয় বুকে অর্ধেক দিন।'

'তা হ্যাঁরে—খোকা কেমন আছে?'

'ভাল আছে। বলছিল যে চ দেখে যাবি। কিন্তু তখন গেলে বড্ড রাত হ'ত।'

'উমা কি আর ওকে একটু দেখছে-শুনছে? কে জানে। পয়সা নিয়ে পরের বাড়ি পড়িয়ে পড়িয়ে ঘরে এসে আর কি ও গাধার খাটুনি খাটতে ইচ্ছে করে।...তা হ্যাঁরে শরৎ জামাই তো কিছু কিছু পান ছাপাখানা থেকে উমা তো এবার একটু বিশ্রাম নিলে পারে।'

স্বামী-পরিত্যক্ত উমা একদা অবলম্বন হিসেবে এই মেয়েপড়ানোর কাজই নিয়েছিল—নিজের স্বল্পবিদ্যা সম্বল ক'রেই। দুটাকা একটাকা মাইনের টিউশ্যানীই বেশী, তাই দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি পড়িয়ে বেড়াতে হয়, নইলে ঘরভাড়া খাওয়াপরা একটা লোকের খরচ ওঠে না। শ্যামার মনে হয়—ঘরে থাকলে তার কোলের ছেলেটাকে একটু দেখতে পারত। একটা ছেলে পড়ে আছে মহার মামাতো ননদের বাড়ি—জায়গাটা ভাল নয়—তবু আদরযত্নেই আছে। যখন আসে তার বেশভূষার মহার্ঘ্যতাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখাপড়াতেও ভাল সে। তার জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা এই ছেলেটার জন্যেই।

ভাবতে ভাবতে একনিমেষে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন শ্যামা। হঠাৎ কানে গেল হেম বলছে, 'সে তো মেসো-মশাই নিজে কতবার বলেন। তা কে শোনে বল! মাসি বলে যে, না, যতদিন পারব নিজের রোজগারে খাব। যে স্বামী কখনও ফিরে চাইলে না তার পয়সায় বসে খাব কিসের জন্যে।... আর খোকার পড়ার কথা বলছিলে? খোকা এখন সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ছে—ইংরাজি বই সব তার, সে কি মাসি পড়াতে পারে?'

'কেন—উমা তো ইংরিজী শিখেছিল গোবিন্দর কাছে।'

'হ্যাঁ সে কী শিখেছিল—ফার্স্টবুক পর্যন্ত। নেহাৎ আজকালকার দিনে কোন মেয়েই শুধু বাংলা শিখতে চায় না—কাজচলা গোছের একটু শেখাতে হয়—তাই!'

ইতিমধ্যে কনক ঠাঁই করে ভাত বেড়ে দিয়েছে। হেম গিয়ে খেতে বসে। শ্যামাও কাছে এসে বসেন। 'লম্প' এখানে, সুতরাং তাঁর কাজ বন্ধ। তাছাড়া জেগে থাকলে ছেলের খাওয়ার সময় এসে বসেন প্রত্যহই। ভাতটা আর বেড়ে দিতে পারেন না—একশবার ওঠা-বসা করতে কোমর-ব্যথা করে তাঁর।

দুএক গ্রাস খাবার পর হেম বলল, 'বড় বৌদি কি বলছিল জান মা খুকীর কথায়?'

গলাটা অকারণেই একটু বড় করে হেম। খাওয়ার ব্যবস্থাটা রান্নাঘরের দাওয়ায়। ভাত বেড়ে দিয়ে কনক ঘরের মধ্যে চৌকাঠের অপর পারে দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ী যখন সামনে বসে থাকেন তখন এখানে থাকার প্রয়োজন নেই, শোভনও নয় সেটা। যা দরকার শ্যামাই বলতে পারবেন, ও শুধু এসে দিয়ে যাবে।

সেই অন্তরালবর্তিনীও যাতে শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই গলাটা চড়ানো। খুশী হবারই কথা কনকের কিন্তু বড়বৌদির নামটা সেই উথলে-ওঠা খুশীর ফেনায় যেন জল ঢেলে দেয়। তার প্রসঙ্গ শোনামাত্র মনের ধনুকে কে যেন টং করে টঙ্কার দিয়ে ওঠে। বিদ্বেষের আগুনে কান মাথা গরম হয়ে

লেখে—

'ঠাকুরজামাই,

ছোটঠাকুরঝি আপনার জন্য দিন-রাত কাঁদিতেছে এবং পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন অবস্থায় সে বেশীদিন বাঁচিবে বলিয়া মনে হয় না। একবার আসিয়া অন্ততঃ শেষ দেখা দিয়া যান। তাহার গর্ভে আপনার প্রথম সন্তান, সে গেলে সন্তানও যাইবে। দয়া করিয়া সামনের শনিবার একবার আসুন, মিনতি করিতেছি। আপনি আমার আশীর্বাদ লইবেন। গুরুজনদের প্রণাম দিবেন। ইতি—

আপনার বৌদি।'

বানান ভুল যে অনেক হ'ল তা কনকও জানে।' তবু এইটে লিখে ওর মনে হ'ল মন্দ দাঁড়ায়নি। হাতের লেখাও, চেষ্টা করলে পড়া যাবে। তবে খামে কি আর দিতে দেবে হেম, মিছিমিছি ছ' পয়সা যে খরচ করবে তা মনে হয় না। আবার হয়ত পোস্টকার্ড এনে দেবে, আবার নকল করতে হবে। সেটা কেমন দাঁড়াবে কে জানে।

শ্যামা গড়িয়ে ওঠবার আগেই দোয়াত-কলম যথাস্থানে রেখে এল সে। আঙুলে একটু কালি লেগেছিল, ঘষে ঘষে তুলে এল ঘাট থেকে।

হেমকে জিজ্ঞাসা না ক'রে এ চিঠির কথা সে কাউকে বলবে না।

হেম প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল, খুশীও হ'ল।

বড়বৌদির কথাটা উড়িয়ে দেয়নি কনক বরং সেই মতো কাজ করেছে, খুশীটা এই জন্যেই বেশী।

তারপর প্রদীপের আলোতে (হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে বলে ঘরে একটা প্রদীপ দিয়াশলাই রেখে দিতেন শ্যামা—রান্নাঘরেও) চিঠিটা পড়ে বলল, বাঃ, এই তো বেশ হয়েছে। দিব্যি গুছিয়ে লিখেছ তো! বাবা, তোমার পেটে পেটে এত। আমি সাত জন্ম ব'সে ভাবলেও এর একটা লাইন আমার মাথাতে যেত না। খুব লোককে লিখতে বলেছিল বড়বৌদি!'

বড়বৌদির নামেতে আজও তেমনি মনের মধ্যে একটা টং করে শব্দ উঠলেও, খুশীও হ'ল কনক। স্বামীর মুখে তার এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এই প্রথম শুনল সে। খুশীর জোয়ার মনের কানায় কানায় উপচে উঠে অপ্রীতিকর নামটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার গৌরাভ মুখ-বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে রক্তোচ্ছ্বাস হ'তে লাগল। আর সেদিকে চেয়ে সেই ক্ষীণ আলোতেই মনে হ'ল হেমের যে অনেক-দিন পরে সে নতুন ক'রে দেখল কনককে। রাণীবৌদির দীপ্তি নেই বটে —সে কটা মেয়েরই বা আছে বাংলাদেশে? —তবু কনকেরও যে কিছু নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে সেটা আজ লক্ষ্য করল সে। প্রদীপের ম্লান আলো হ'লেও— আলোর কাছে ঝুঁকে পড়া মুখের ফরসা রঙের ওপর ঢেউ খেলে-যাওয়া আবীর গোলার মতো রক্তোচ্ছ্বাসটাও তার চোখ এড়াল না। লজ্জারক্ত এটাকে লজ্জার লালিমা বলেই ধরে নিল হেম—একটা শোভা আছে তা মানতেই হবে। এটা কিন্তু সকলের থাকে না। অতি সপ্রতিভ রাণীবৌদির এই শোভাটি তেমন চোখে পড়ে না। নলিনীরও এমন মধুর লজ্জা দেখার অবকাশ হয়নি তার।......

সুতরাং সে তাকিয়েই রইল সেদিকে— কয়েক মুহূর্ত। সুশ্রী মসৃণ ললাটে পটে আঁকার মতো সুন্দর ভ্রূ—তারই মধ্যে কালো টিপ একটি; বার বার ঘোমটা টানবার ফলে ঈষৎ বিপর্যস্ত কেশের কোলে কোলে সূক্ষ্ম একটি স্বেদরেখা বরাবরই ছিল, এখন সম্ভবত প্রদীপের তাপেই তার বিন্দুগুলি বৃহত্তর হয়ে ঐ টিপটির চারপাশে নামছে, ভ্রূর উপরে উপরে জমা হচ্ছে—সবটা জড়িয়ে ভালই লাগল হেমের।

হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়াটা লক্ষ্য করতে কনকেরও একটু সময় লাগল। সেও তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিল এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটা। যখন খেয়াল হ'ল, তখন বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ল স্বামীর সেই ঈষৎ-মুগ্ধ দৃষ্টি—ফলে সে আরও সুখী আরও লজ্জিত আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। এই-ই প্রথম, তবু এ দৃষ্টি বুঝতে বোধ করি কোন মেয়েরই ভুল হয় না।

আবারও প্রবল খুশীর জোয়ার বিচিত্র বর্ণাভায় সৃষ্টি করল তার মুখে

—তবু কনক সেটা উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করল না। সে যেন বড় বেশী দৈন্য প্রকাশ করা হয়, ছি!

সে বরং এই মোহটা ভাঙ্গবার জন্যই জোর করে বাস্তবে নেমে এল, 'তা এটা তো আবার পোস্টকার্ডে নকল ক'র দিতে হবে? পোস্টকার্ড আছে তোমার কাছে?'

'দূর পাগল! পোস্টকার্ড কি? অফিসে চিঠি দিতে হবে—এসব চিঠি কখনও পোস্টকার্ডে দেওয়া চলে। তুমি এমনি আমার জামার প'কেটে রেখে দাও, কাল আমি খাম কিনে ঠিকানা লিখে ফেলে দেব।...মাকে বলনি তো? এখন বলো না—দেখাই যা'ক না কী ফল হয়।'

পাগল শব্দটাও স্নেহ ও প্রশ্রয়-সূচক।

এই ধরনের সাদর সম্ভাষণের জন্যই তো কতকাল অপেক্ষা করেছে সে!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা; কিন্তু তখনই ঘুম এল না।

তবুও যা হয় হবে কিন্তু এই উপলক্ষে কনক তার পথ দেখতে পেয়েছে।

রাণীদিকে বৈরীভাবে দূরে রেখে কোন লাভ নেই। এই প্রসঙ্গ ধরেই, এই পথ দিয়েই স্বামীর অন্তরঙ্গ হ'তে হবে। অন্তরঙ্গতা না জন্মালে কোন দিনই সে তার মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং এই পথটাই সোজা—এতদিন বোকার মতো এড়িয়ে যেত সে। বড়ই বোকামি করেছে, আর না।

সে হেমের পা টিপতে টিপতে যেন কতকটা আপন মনেই বলল, 'রাণীদির খুব বুদ্ধি, না?'

একেবারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল হেম।

'বুদ্ধি ব'লে বুদ্ধি—আমি কোন ব্যাটাছেলের অমন বুদ্ধি দেখিনি। আঁচে বুঝে নেয় কথা। এই তো আমাদের সব অফিসের সায়েবদেরও দেখি একটা কথা বোঝাতে ঝিক্কুড়ে নড়ে যায়। অথচ দ্যাখো হাজার হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। তাই তো বলি আমি এক একদিন যে লেখাপড়া শিখলে তুমি জজ ব্যারিস্টার হ'তে পারতে।...তা হাসে, বলে ভাগ্যিস শিখিনি তাহলে তো এমন ক'রে আমার দেখা পেতে না, দারোয়ানকে কার্ড দিয়ে সেলাম ক'রে ঢুকতে হ'ত।'

এমনিই চলে দীর্ঘক্ষণ। শেষে এক সময় রাতই শেষ হয়ে আসে। ফরসা না হোক—ভোরাই বাতাসে তা টের পায় কনক। তবু সে-ই প্রসঙ্গটা থামতে দেয় না। হেমের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলেই সে নতুন প্রশ্নের ইন্ধন যোগায় নতুন প্রসঙ্গ তোলে রাণীদি সম্পর্কে। নতুন করে আবার উদ্দীপিত হয়ে ওঠে হেম।

এ খেলা সুখের নয়। এক নারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বক্ষেত্রেই অপর নারীর অন্তরে বিষদাহের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে সে দাহের তো কারণই আছে যথেষ্ট। তবু সে থামতে দেয় না। স্বামীর সঙ্গে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে এমন ভাবে প্রাণখোলা গল্প করতে পারবে সে—এও যে তার কাছে কল্পনাতীত। তাই তিক্ততায় যতই অন্তরের পাত্র পূর্ণ হয়ে যাক, বেদনার ভারে মনটা যতই পিষে গুঁড়ো হয়ে যাক—সে যেন আর নিজেও থামতে পারে না। শুনেছে উচ্ছে ফুলেও মধু থাকে, মৌমাছি তাতে গিয়েও বসে, লেবুর তেতো খোসা দিয়েও নাকি মোরব্বা হয়—তেমনি সেও এই তিক্ততার মধ্যে থেকে স্বামীর অন্তরঙ্গ সাহচর্যের যে মধুটুকু আস্বাদ করতে পায়—সেইটেই পরম লাভ বলে মনে হয় তার।

এই প্রথম তাদের বিবাহিত জীবনে গল্প করতে করতে সারা রাত কেটে গেল। ওঘরে শ্যামার দোরখোলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি কনক বেরিয়ে এসে যখন অবসন্নভাবে দাওয়ায় বসে পড়ল—তখন তার সমস্ত শরীর যেন অল্প অল্প কাঁপছে। সে কম্পন সুখের কি বিষাদের, আনন্দের কি ঈর্ষার তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না! (ক্রমশঃ)

আগুনখাকীর কুঞ্জ

অশোক মুখোপাধ্যায়

কাঁসাই নদীর পাড় থেকে সোজা যে রাস্তাটা বেরিয়ে বনপাটনা হয়ে ভবানীপুর নাড়াজোলের দিকে চলে গেছে, সেটা আপনি অনায়াসেই ছেড়ে দিয়ে বাঁকাকুলের মোড় থেকে ডানদিকের পথটা ধরতে পারেন। এ পথ আপনাকে নিয়ে যাবে আকালপৌষের ওপর দিয়ে আড়ারহাটের দিকে। যদি আপনি মালিঘাটি যেতে চান।

কিন্তু আপনি পথ হারাবেন, যদি না হুঁশিয়ার পথিক হন। এ পথে যদি চলা অভ্যেস না থাকে। আকালপৌষের মাইতিদের কলটা পেরিয়েই পথ একেবারে মিশে গেছে। মেশামিশি হয়ে যায় চোতবোশেখের ফাটিফাটা মাঠের সঙ্গে, বর্ষা-শরতের সবুজ শ্যামলের সঙ্গে আর অঘ্রানপৌষের পাকা রূপশালি ধানের সঙ্গে। তবু এটা পথই, কারণ এ পথে পথিকের অভাব হয় যেমন কালেভদ্রে তেমনি পথ-চলতি লোকের ভিড়ও হয় কালেকস্মিনে। সেই মালিঘাটির মেলার সময়।

কিন্তু একবার খাল পাড়ে পৌঁছে গেলেই হোল। তারপর হরিনারায়ণপুর হয়ে সোজা মালিঘাটি। লোকে বলে হুড়হুড়ের খাল। হুহু শব্দে দুপাশের মাঠের ভাঙে এই খাল-পথে। আজো যখন কোনো বর্ষণমুখর বর্ষারাতে ডাঙাডহর সব একাকার হয়ে যায় ধারাবাদলে, খালপাড়ের দূরবর্তী জনবসতিবিরল গেরস্ত চাষীর উঠানে জল জমে থৈ-থৈ করতে থাকে কিংবা কোন দিনমজুরের মাচানের তলার একহাটু জলে কৈ-মাছ খাই দেয় কুবকাব—তখন হয়তো আকাশের বুকচেরা বিজলীর সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের দধিচী-অস্থির বজ্রভীতা পল্লীজননী ছেলেকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে স্মরণ করে খালপাড়ের সেই একমাত্র পীঠস্থান আগুনখাকীর কুঞ্জকে।

কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে সাড়ে তিনডাকের মাঠ পেরিয়ে এসে হরিনারায়ণপুরের হিজলতলায় এক বুক দম নিতে গিয়ে সাত হাত দূরে থেকে দুহাত কপালে ঠেকায় শ্রান্ত হাটুরে। তারপর গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খায়।

হঠাৎ যদি আপনি এসে পড়েন এ গাঁয়ে, এই জনমানিষ্যিহীন হুড়হুড়ে খালের পাড়ে তাহলে আর সকলের মত আপনারও নজরে পড়বে বহু-বিস্মৃত অতীতের এক টুকরো স্থাপত্য, গোড়াটা যার স্রোতের জলে সযত্নে কুরে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যে এখনো পাঠশালার একগাঁয়ে দুষ্টু পড়োর মত একঠেঙে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরও অনেকদিন দাঁড়িয়ে থাকবার দুর্মরতম প্রতিজ্ঞা নিয়ে। গায়ে তার বহু যুগ অতীতের ছাপ। খসে পড়া পলস্তারায় পুরাতন জমিদার বাড়ীর গতায়ু আভিজাত্য। মাথার ওপরে অন্ধকার করে ছেয়ে থাকা হিজলের ডাল। অবিরাম ফুল ঝরে-ঝরে পড়ে টুপটাপ করে।

তবে আপনি যদি বস্তুর কারবারী না হন, খসে পড়া পলস্তারায় অথবা দাঁত বের করা সেকেলে ইঁটের খাঁজে যদি না প্রত্নতত্ত্বের গন্ধ পান, যদি এসে বসেন ওর সাতহাত দূরের হিজল গাছটার শিকড়ের উপর আর তখনই যদি দেখা পান গাঁয়ের কোনো রাখাল ছেলের যে তার মনিবের মারের ভয়ে হারানো গরুর খোঁজ পাওয়ার মানত করতে এসেছে, তাকে শুধোন, সে বলবে আগুনখাকীর কুঞ্জ। যাকে মানত মানলে মনের কথা শোনে।

দুপুর পালির মজুর ছুটি করে, গরু দুটোকে তৃণশূন্য মাঠের মধ্যে চরে খাওয়ার দুর্বোধ্য বিশ্বাসে ছেড়ে দিয়ে, হাল-লাঙল কাঁধে করে গাঁয়ের কোন

অতিবৃদ্ধ কৃষাণ যদি আসে এ পথে, তাকে জিগগেস করুন, সে বলবে। হিজল গাছের ছায়ায় দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে নিতে সে শোনাবে এর কাহিনী। তার ঘোল হয়ে খেটে খাওয়া ঘোলাটে চোখ দুটো তখন বহুবিস্মৃত অতীতের এক অনুধ্যানে লিপ্ত হবে, হয়তো শ্রুত-পরম্পরায় কাহিনীর ঠাহর খুঁজবে দিন-দুপুরের রঙে।

আপনি স্পষ্টই দেখতে পাবেন চোখের চালশে কেটে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় যে ছবিটি তার প্রতিফলিত হচ্ছে তা হোল অনেকদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের এক অতিপুরাতন বিবর্ণ আলেখ্য। যদি বলেন কত পুরাতন, তা অবশ্য বলতে পারবো না, সন-তারিখ দিয়ে লিখেও রাখেনি কোনো ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের আশঙ্কায়। তবে বাংলাদেশে তখনও সতীদাহ প্রথা লোপ পায়নি আর রামমোহন তখনও মহাত্মা হননি, নিতান্তই গোকুলের বাড়ন্ত বালক।

হরিনারায়ণপুরের মালাকারপাড়াটা ছিলো বামুনপাড়ার পুরো এক হাঁকের পথ। ঘরে ঘরে বারোমাসে তেরোপার্বণে, দেশে-গাঁয়ের শিবশিতলা পুজোয়, বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধ বাড়ীর উৎসব আয়োজনে শোলার সাজ বিক্রী করে আর অবসর সময়ে হাতে আঁকা পট দেখিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই পেট চলে যেতো মালাকার-পাড়ার।

তুলোট কাগজের ওপর হাতে আঁকা পটগুলিকে ছোটো ছোটো বেতের ছড়িতে জড়িয়ে ঝোলায় পুরে নিয়ে সকাল সকাল পট দেখাতে বেরিয়েছিলো বচনহরি।

কেশব মালাকারের ছেলে বচনহরি। একরাত্রির ওলাউঠায় যার বাপ-মা দুজনেই অক্কা পেয়েছিলো কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে, তাদের একমাত্র ছেলের জন্যে গঁড়াকাঁথের এক খুপরির ঘর ছাড়া আর কিছুই না রেখে। তারপর থেকেই বচন-হরি নিঃসঙ্গ, নিতান্ত নিরুপায়। জ্ঞাত-কুটুমের বাড়ী বেড়িয়ে দু-দশদিন পেটটা চলে গেলেও সে বুঝলে এটা চিরদিনের নয়। অথচ চোদ্দ বছরের ছেলে বচন-হরি জাতব্যবসার কাজ এখন কিছুই শেখেনি যা দিয়ে পেট চালাতে পারে। তাই সে শেষ উপায় হিসেবে তার কাঁচা-হাতের আঁকা পট দেখানোর পন্থাটিই গ্রহণ করলে পরিশেষে।

চাষীপাড়ায় পট দেখানো শেষ করে বামুনপাড়ায় সে যখন পা বাড়ালো তখন আকাশের সূর্যদেবতা মাথার ওপরে আসতে আর অতি অল্পই বাকি।

কিন্তু পট দেখিয়ে মন ভরলো বচন-হরির।

বামুনপাড়ার সাকুল্যে চার ঘর বামুনের তিন ঘরেই যে উন্নাসিকতার কাঠিন্য আর স্পর্শকাতরতার সংকোচ তার ভিজেমাটির মত নরম মনটাকে কুমোরের হাঁড়ি পোড়ানো পণের মত মৃদু উত্তাপে ধীরে ধীরে শক্ত করে তুলছিলো সে যেন এক টুকরো পিপারমেণ্টের আস্বাদ পেলো রাখাল ভটচার্যের বাড়ীতে এসে। রাখাল ভট্টাচার্যের মা-মরা একাদশী মেয়ে বুঁচকি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে পটগুলি। এত মনোযোগ দিয়ে তার পট আগে কেউ দেখেনি। তারপর পট দেখানো শেষ হলে যখন জিগগেস করলে, "এগুলি কে এঁকেচে? তুমি নাকি?" তখন যেন বচনহরির চোদ্দ বছরের জীবনটা একা-দশীর কাছে ধন্য হয়ে গেলো এক লহ-মায়। বুঁচকি তাকে সদর দরজা থেকে বিদায় করে দিলে না, খাতির করে নিয়ে গেলো ভিতর বাকুলে। যেখানে শণ-নুড়ি চুল নিয়ে চোখে চালশে-ধরা ঠাক্‌মা আর উদ্ভিন্নযৌবনা অল্প বয়েসী সৎমা দিনরাত্তির ঘরকন্না করে হাঁড়িকলসী ঠোকাঠুকি করে, আর এগারো বছরের এই ধিঙ্গি মেয়েটা যেখান থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে ঘুরে বেড়ায় হালে-ডালে পাড়াপড়শীর ঘরে ঘরে।

সেই ভিতর বাকুলে আর একদফা পট দেখালে বচনহরি। সারাক্ষণ মুগ্ধ হয়ে যৌবন জোয়ারের তীর সংলগ্ন চোদ্দ বছরের এই স্বাস্থ্যবান তরুণটিকেই দেখলে বুঁচকির অসূর্যম্পশ্যা সৎমা, চালশে-পড়া চোখ নিয়ে পটের পালার গান শুনলে ঠাক্‌মা আর বুঁচকি তার এগারো বছরের চোখ নিয়ে কি প্রশংসাই না করলে পটগুলির। এ বাড়ীতে পটুয়া বিদায়টা ভালোই পেলে বচনহরি। বিদায়কালে বুঁচকির সৎমা বললে, "আবার আসবে পট নিয়ে।" যাবার বেলায় এক মিশ্র অনুভূতির বর্ণালী রঙে রঙীন হয়ে উঠলো বচনহরির মনের আকাশ। সে ভাবতে ভাবতে বাড়ীর পথ ধরলে তার আঙুলগুলো রঙের খুরীর কোন্ রঙে ঠিকমত সাড়া দেবে এগারো বছরের ডাসাডাসা দুটি কিশোরী চোখের সঙ্গে যৌবনবতী ঐ তরুণী নারীর গভীর দুটি চোখের ছায়া।

কিন্তু চোখ ফেটে জল আসে বুঁচকির।

বলতে গেলে বচনহরি তো তারই আবিষ্কার। সেই তাকে ডেকে এনেচে বাড়ীর ভেতরে। কিন্তু দিনে দিনে মায়ের ব্যবহার যেন পাল্টে যাচ্চে। পট দেখাতে এলেই মা যেন তাঁর আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় এই পটুয়া ছেলেটিকে। সারাক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলা যেন আর ফুরোতেই চায় না। এমন কি বচনহরির সামনে মা তাকে বকেচেও কয়েকবার। যেন এতটুকু কৃতজ্ঞ নয় বুঁচকির কাছে, বচনহরির সঙ্গে এই অনধিকার আলাপ-আলোচনার সুযোগের জন্যে। অথচ বুঁচকি যদি বাবাকে একবার বলে দেয়......তবু সেই অদৃশ্য হাতের ঘেরাটোপের বাইরে
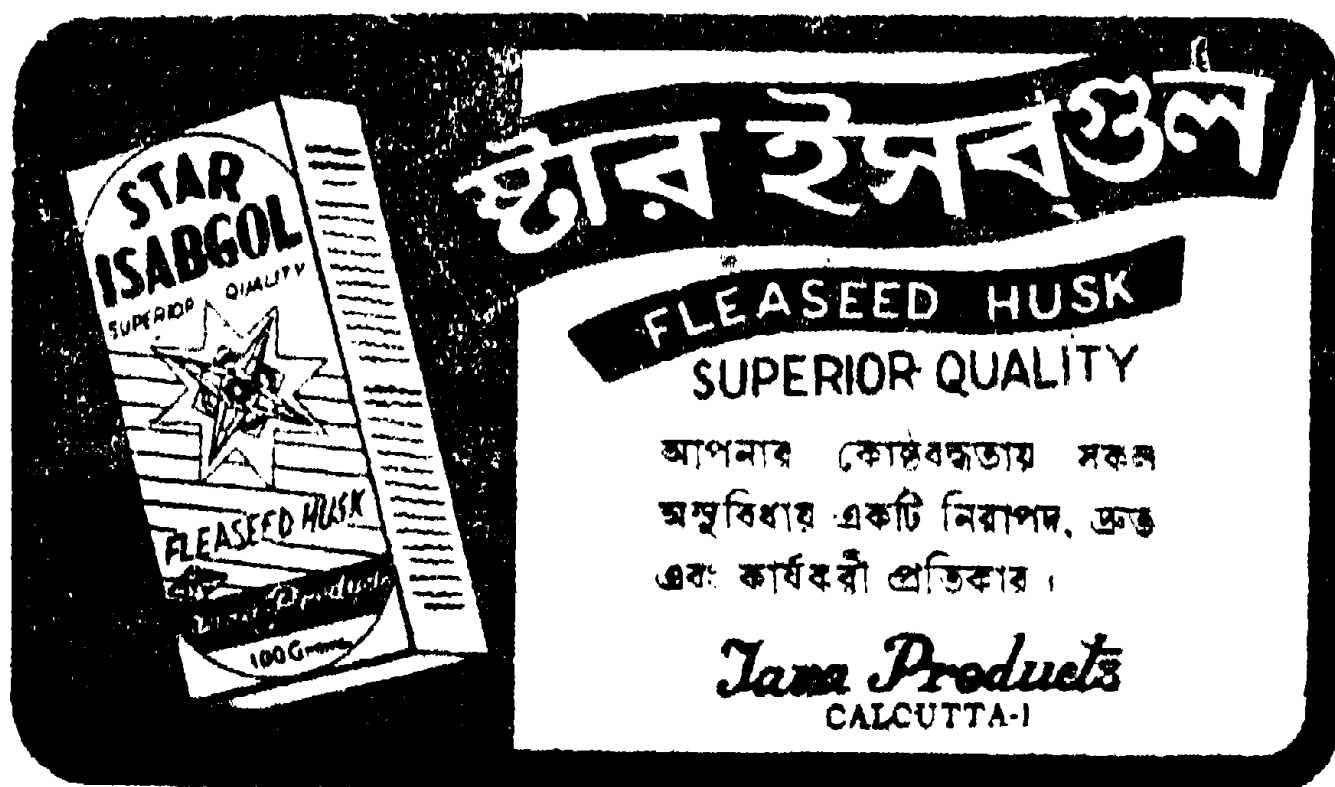
দাঁড়িয়ে শুধু একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়েই ক্ষান্ত হতে হয় বুঁচকিকে। কোন এক ফাঁকে বচনহরির সংগে কথা বলবার জন্যে মনটা তার ফস্‌ ফস্‌ করতে থাকে কেবলই।

সেদিন সে সোজা এসে দাঁড়িয়ে রইলো খালপাড়ের এই হিজল গাছের তলায়। বচনহরির যাওয়ার পথে পাকড়াও করলো তাকে।

—"আমাকে পট দেখিয়ে যাও।"

—"তোমাদের ঘরেই তো পট দেখিয়ে এলাম।"

—"বাঃ রে, সেতো মাকে। আমাকে নাকি?"

ছলছলিয়ে জল ভরে উঠলো বুঁচকির ভাসাভাসা দুটি চোখে। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বচনহরি। তার হাড়-চামড়া ঢাকা বুকের তলাটা গুর গুর করে উঠলো কয়েকবার। তারপর সে যথারীতি হাঁটু গেড়ে পট দেখাতে লাগলো বুঁচকির সামনে। ঠিক তখনি এবার একমাথা চুল ঝাঁকিয়ে বলে উঠলো বুঁচকি।

—"তোমার ঐ একশোবারই কীর্তন আর ভালো লাগে না বাবু। তুমি শুধু পট দেখাও।"

—"সে কি করে হবে?"

—"খুব হবে।"

বলেই বুঁচকি তার ঝুলি থেকে একটা পট টেনে নিয়ে নিজেই দেখতে লাগলো খুলে খুলে। আর অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো বচনহরি। বোধ করি পট দেখানোর নতুন রকম কৌশলটা হৃদয়ংগম করতে লাগলো ইত্যবসরে।

মায়ের ওপরে এমনি করেই টেক্কা দিতে দিতে এগারো বছরের এক কিশোরী অবলীলাক্রমে পা বাড়িয়ে দিলো বারো থেকে তেরো, তেরো থেকে চোদ্দ বছর বয়েসের প্রান্তসীমায়।

গৌরীদানের মহৎ পুণ্য অর্জনের লোভ থাকলেও যথাসময়ে সে ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি রাখাল ভট্টাচার্য। কিন্তু বুঁচকির সংসার নিপুণ হাতের বোনা ষড়যন্ত্রের জালটি সে ব্যবস্থাকে বিলম্বেই পাকা করে তুললো একদিন। মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তার বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, নাহলে বড় মেয়ে ঘরে রেখে কোথায় কি হয়ে যায় বলা তো যায় না। দিনের পর দিন কর্তব্য-বুদ্ধির এ হুলটুকু ফুটিয়ে ফুটিয়ে মহাস্থবির র'খাল ভটচার্যকে সে করিৎকর্মা করে তুললো অচিরেই।

সিতারগড়ের মধ্যম শ্রেণীর বামুন-বসতি হাতড়ে বুঁচকির বাবা যে পাত্রটিকে হাতের মুঠোয় তুলেছিলেন, বুঁচকির সংগে তার বয়েসের ফারাকটা ছিলো আকাশ আর পাতাল। তিনটে অপোগণ্ড ছেলেকে দাদন রেখে প্রথমা স্ত্রী পটল তুলেচে মাসখানিক আগে। শয্যার সেই শূন্য অংশটা জমজমিয়ে ভরাট করার ডাক পড়েচে বুঁচকির ওপর। চেহারাটা তার প্রথম শ্রেণীর ঘাটের মড়া হলেও ভটচার্যমশাই জামাই ঠিক করেচেন বড়লোক দেখেই। তা বড়লোক বলতে হবে বৈকি। পঁয়ষট্টি ঘর বাঁধা যজমানের মালিক ষষ্ঠীপদ চক্রবর্তী যদি বড়লোক না হয় তাহলে আর বড়লোকটা কে? বরপণ তিনি নেবেন না, বরং বুঁচকির বাবাকে কিছু কনেপণ দিয়েই তিনি নিতে রাজি হয়েচেন বুঁচকিকে। সুতরাং এ 'সুবর্ণ' সুযোগ।

বুঁচকি কিন্তু চেয়েছিলো পালাতে।

তার কল্পনার রাজকন্যে জীবনে যে রাজপুত্তুরটি জীয়ন কাঠির পরশ দিয়ে প্রথম যৌবনের রক্ত-রাগদীপ্ত ঘুম ভাঙিয়েছিলো তাকে নিয়ে তেপান্তরের মাঠ না হোক হরিনারায়ণপুরের মাঠ পেরিয়ে পালাতে চেয়েছিলো।

তাই সে রাতদুপুরে গিয়ে হাজির হয়েছিলো বচনহরির ঘরে। ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের ওপর শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে বুঝি বুঁচকির মায়ের মুখের আদলটাই আনতে চাইছিলো বচনহরি কিন্তু অনেক যত্নেও মোটা তুলির থ্যাবড়া টানে সেটা ফুটিয়ে তুলতে পারছিলো না সে। বুঁচকি গিয়ে ঘুমন্ত মানুষটাকে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতেই ঘুম ছুটে গেলো বচনহরির। ধড়মড় করে উঠে বসতেই বুঁচকিকে সামনে দেখে সে যেন বিশ্বাস করতে পারলো না নিজের চোখকে।

ওদিকে বুঁচকি ভীষণ ব্যস্ত।

এই রাতদুপুরেও তার বিশ্বাস নেই। যেন তার কল্পনার ষড়যন্ত্র-গুলোকে কে কোথায় দেখে ফেলবে, শুনে ফেলবে, সেই ভয়। সে ফিস ফিস করে বললে, "দেখছো কি? তাড়াতাড়ি ভেতরে চল, কথা আছে।" দুহাতে বার বার চোখ রগড়েও যেন স্বপন দেখচে বচনহরি নির্বাক, বিস্মিত, হত-ভম্ব। দিনেদুপুরে অনেকবার এসেচে বুঁচকি এক হাঁকের পথ ভেঙে, হিজল

গাছের তলা দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে। সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এটা যে রাত-দুপুর একথা ভুলে যাওয়ার মত এতবড় স্মৃতিবিভ্রম ঘটেনি বচনহরির।

ঘরের ভেতরে তাকে ঢুকতেই হোল, বাঁচোকির তাড়ায়। এতদিন ধরে নামমাত্র বাধার যে স্বচ্ছতম দেওয়ালের আবরণ-টুকু খাড়া রেখেছিলো বাঁচোকি আজকের এই বিপদের মুহূর্তে সেটুকুও শেষ করে দিলো সে। কিন্তু এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে সম্মত হতে পারলো না বচনহরি। আস্ত একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এই রাত্রে, সে যত বড় পুরুষমানুষই হোক না কেন, এতবড় দুঃসাহসিকতা দেখানোর সাহস ছিলো না তার। সে বরং ঘরের কোণে পাটের তুলি দিয়ে বার বার বুলিয়ে বুলিয়ে তুলোট কাগজের ওপরে হুবহু একখানা বাঁচোকির পট দুশো-পাঁচশো বার এঁকে দিতে পারে, তার সঙ্গে তার না হয় ভাবই হয়েচে, কিন্তু তাই বলে তাকে নিয়ে পালানো?

বিপ্রলব্ধা নায়িকা যেদিন ইহজন্মে প্রিয় মিলনের শেষ আশাটুকু বিসর্জন দিয়েই ফিরে এসেছিলো নিবাত নিষ্কম্প আকাশের তলা দিয়ে এক হাঁকের মাঠটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হিজলের মৃদু গন্ধভরা বনপথের সীমান্তরেখা ধরে। অন্তরে তার খণ্ডিতা নায়িকার দুরন্ত অভিমান। ছোবল উদ্যত ফণিনীর মতই সে সেদিন বচনহরির বাহু-বন্ধন থেকে ছিটকে পড়ে বলেছিলো, "এ আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে কেন, আমার মাকে নিয়ে তাহ'লে চলাবে কে "

প্রত্যুত্তরে কি একটা বলতে গিয়ে-ছিলো বচনহরি, এক ঝঙ্কারে থামিয়ে দিয়েছিলো বাঁচোকি।

—"ই সুখ কপালে সইবেনি, সইবেনি। মুই যদি সতী নারী হই"......

মুখের কথাটা আর শেষ করেনি বাঁচোকি, ছিটকে পড়েছিলো জ্যামুক্ত ধনুকের মত।

বিয়েটা বাঁচোকির আটকাতে পারেনি কেউ। গরীব মালাকারের চুলোয়-চন্ডী ছেলে বচনহরির তো সে ক্ষমতাই ছিলো না, এমন কি বাঁচোকির সঙ্গে পুনর্বার দেখা করবার মত সাহসটুকুও হারিয়ে-ছিলো। বাঁচোকির নিজের তরফ থেকেও কোনো ক্ষীণ প্রচেষ্টা প্রকাশ পায়নি কোনদিন।

তবু বাঁচোকি পালিয়ে এসেছিলো মধ্যরাত্রে বিয়ের লগ্ন আকাশ ছোঁওয়ার আগেই, সে পালিয়ে এসেছিলো বহু পুণ্যে কনে-পিঁড়িটি ছেড়ে এক হাঁকের সেই অভিসারলিপ্ত পথটা অন্ধকারে মাড়িয়ে মাড়িয়ে। একটা ঘাটের কাঠ' মড়ার চিমসে হাতের আলিঙ্গন তার অংশমূলে বেষ্টনের আগেই সে কলা দেখিয়েছিলো সিঙারগড়ের সেই পাঁয়ষাটি রাত্রে সে তার উঠানে দেখতে পাবে, এ আশা করেনি। তাই প্রথম দর্শনেই চীৎকার করে উঠেছিলো বচনহরি। তার সে চীৎকারে পাড়া-পড়শীর ঘুম ভেঙে তারা ছুটে আসে। তারপর কেমন মাথা খারাপ হয়ে গেলো বাঁচোকির। তাকে কলঙ্কী করেই কি বচনহরি বাঁচতে চায়?

এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে সম্মত হ'লো না

ঘর যজমানওয়ালা মানুষটাকে। ছুটে এসেছিলো বচনহরির কাছে সতীনারীর পরিচয় দিতে। বুকভরা তার ঈর্ষা, আক্রোশ—ঘন নিঃশ্বাসে তার দুরন্ত নাগলতার হিস্‌হিসানি। বুকের তলে তলে জমে ওঠা বিষের সবটুকুই সে ঢেলে দিয়েছিলো হাঁসুয়ার একটি আঘাতে।

বচনহরিও যে সে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছিলো তা নয়। তারও বুকের তলাটা উথাল-পাথাল করে উঠলেও বিয়ের সাজপরা কনেকে অতো কোন মর্যাদা দেবে না তার প্রেমের? প্রেমাস্পদের সঙ্গেই হয়তো বিদায় নিতো বাঁচোকি কিন্তু তার আগেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। পড়শীরা হাঁসুয়াটা কেড়ে নেয় তার হাত থেকে।

কিন্তু তখনও সতীনারীর সবটুকু পরিচয় পায়নি বচনহরি। তার দ্বিখণ্ডিত ধড় আর মুণ্ডুটা যখন চিতায় জ্বলে উঠেচে, হুড়হুড়ের এই খালপাড়ে —ঠিক তখনই দেখা গেলো বাঁচোকিকে। এতক্ষণ কেউ খোঁজ নেয়নি তার, নেওয়ার

দরকারও ছিলো না। তাছাড়া সে হোল ভিন্নজাতের মেয়ে, বামুনের মেয়ে। ওর দায়িত্ব ওর সমাজ বইবে। কোন জন্মেই কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সংগে। [illegible] মেয়ে বাঁচকি।

তবু বাঁচকির কি রূপ! চোখ তুলে একবার চাইলেই হয় তার দিকে। পরনে লাল আগুনের মত চেলী, গায়ে একগা গয়না, চওড়া সিঁথির পরে আগুনের শিখার মতই টকটকে সিঁদুর! আগুনে যারা জ্বলছিলো তারাও ক্ষণকালের মত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলো বাঁচকির মুখের দিকে। মড়াপোড়ানোর লম্বা-লম্বা বাঁশগুলো হাতে নিয়ে সরে দাঁড়ালো সব। চিতার কাঠ জোড়া। [illegible] হয়েছে। হরি হরি [illegible] চিতার আগুন। সবাই দেখছে, [illegible] কেবল চেয়ে [illegible] বাঁচকি কিন্তু [illegible] চিতাকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে [illegible] নিয়েছে। [illegible] বাইরে দাঁড়িয়ে [illegible] অতিবৃদ্ধের নজরে [illegible] পড়লো, সে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলো [illegible]—এই মাগো কি করছেন, ও মাগো কি করছেন"......কিন্তু তার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্বলন্ত চিতায়। [illegible] যৌবনপুষ্ট বুকের [illegible] সে যেন সোহাগে নিবিড় হয়ে [illegible] আঁকড়ে ধরেছে বচনহরির চিতার কাঠগুলোকে।

চারিদিকের উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে বচনহরির চিতা জ্বলতে লাগলো দাউ-দাউ করে। সে আগুনে পুড়তে লাগলো কেবল বচনহরির মৃতদেহই নয়, মালাকারপাড়ার সেই অতিবৃদ্ধের ভাষায় স্বর্গের পিতিমের মত মা-লক্ষ্মীর সোনার দেহখানি।

সেদিন লোক এসেছে কাতারে কাতারে।

চাষীপাড়া, মালাকার পাড়া ঝেঁটিয়ে। লোকের মুখে মুখে শুনে শুনে আস্তা-মালিঘাটির হাট ফেলে সবাই পালিয়ে এসেছে ছুটতে ছুটতে, হুড়হুড়ের খাল-পাড়ে। সেদিন দিনদুপুরের রোদে মাঠ পুড়েছে, বচনহরির চিতার কাঠ পুড়েছে, বাঁশ ফেটেছে ফট্‌ফট্ করে, উৎক্ষিপ্ত অগ্নিকণা ছুটে গেছে আকাশের বুক লক্ষ্য করে। আর থেকে থেকে সেই অতিবৃদ্ধের কান্না শোনা গেছে বুকফাটা হাহাকারে, "এ আপনি কি কল্লেন মা"।

বাঁচকি কিন্তু সতী হোল, সহমৃতা হোল।

অনেক মানুষের সংখ্যাতীত প্রণাম কুড়িয়ে কুড়িয়ে ভক্তির অর্ঘ্যে সে দেবী হোল। তিলে তিলে পুড়ে মরলো সর্বভুক হুতাশনকেই ভক্ষণ করে। প্রজ্জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই প্রত্যক্ষ করলো সেই আগুনখাকীকে।

লোকে বলে, আজো তারা আসে।

সেই আগুনখাকীটা বচনহরিকে নিয়ে আসে বহু বিস্মৃত যুগের অতীত ঠেলে, ঝিমধরা দুপুরে দূরের রাখাল ছেলের ক্লান্ত বাঁশীর সুরে, পা টিপে টিপে গন্ধ-ভরা হিজল ফুলের ছায়ান্ধকার পথটি ছেড়ে দেয় মৃদু ব্যস্ততায়।

প্রদর্শনী

।। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা ।।

কলারসিক

বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে ঠাকুরবাড়ীর অবদানের কথা সুবিদিত। শুধু রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ নন, গগনেন্দ্রনাথও নিঃসন্দেহে ঠাকুরবাড়ী তথা বাঙলাদেশের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অথচ দুঃখের কথা, অন্য সব প্রতিভাবান ব্যক্তিদের নিয়ে যত আলোচনা হয় গগনেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তেমন কোনো আলোচনা-পর্যালোচনার কথা আমার অন্ততঃ জানা নেই। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে চলে যে'তে বসেছেন। অথচ ভারতীয় নব্য শিল্পধারা যখন অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে পুনরুজ্জীবনবাদের আন্দোলন শুরু করেছে, সেই প্রবল জোয়ারের মুখে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের হাতেই গড়ে উঠলো ভারতীয় চিত্রশিল্পের আধুনিক ধারা। প্রকৃতপক্ষে গগনেন্দ্রনাথই শিল্পে আধুনিক রীতির জন্মদাতা। এই অবদান আমরা এত সহজেই বিস্মৃত হয়েছি যে, গগনেন্দ্রনাথের নাম নিয়ে আর আমরা বিশেষ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করিনে।

রবীন্দ্র-ভারতী কর্তৃক আয়োজিত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে দেখতে সেদিন আমার মন সত্যি অনুশোচনায় ভরে গিয়েছে। এত বড় একজন শিল্পী এবং আধুনিক শিল্পধারার পথিকৃত সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দূর করতে হলে এমনি আরো অনেক প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রের প্রয়োজন। আশা করি রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি এদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে গগনেন্দ্রনাথের ৭৯ খানি চিত্র স্থান পেয়েছে। প্রদর্শিত ছবিগুলিকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করে এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। প্রথমভাগে আছে নিঃসর্গ চিত্র, দ্বিতীয় ভাগে আছে শ্রীচৈতন্য সিরিজের ১৩ খানি চিত্র, তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে আজব দেশে আলাদীন সিরিজের ১৮ খানি চিত্র, চতুর্থ ভাগে আছে প্রতিকৃতি ও স্টাডির কাজ, পঞ্চম ভাগে আছে ব্যঙ্গ চিত্র ও ষষ্ঠ ভাগে স্থান পেয়েছে গগনেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কার্টুন চিত্রের ৫ খানি। মোটামুটি এই চিত্রগুলি দর্শনের পর যে কোনো দর্শক গগনেন্দ্রনাথের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের হাতে জলরঙের কাজ যে কী অপূর্ব শিল্পসুষমায় উদ্ভাসিত তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই প্রদর্শনীর প্রায় সব চিত্রেরই মাধ্যম জলরঙ। মাত্র খানকয়েক ছবি কালি-কলম, পেন্সিল কিংবা প্যাস্টেলে অঙ্কিত।

গগনেন্দ্রনাথের নিঃসর্গ চিত্রের রঙ প্রয়োগ সত্যি মনোমুগ্ধকর। প্রকৃতির রাজ্যে আলো-ছায়ার খেলা নিখুঁতভাবে তাঁর চিত্রে বিধৃত। অনেকগুলির সংস্থাপন এত চমৎকার যে স্পষ্টভাবে দূরত্ব ও ঘনত্ব উপলব্ধি করা যায়। হিমালয়ের নিঃসর্গ দৃশ্য যেমন তাঁর রঙে মূর্ত হয়েছে, তেমনি বাঙলার গ্রাম্য-নিঃসর্গও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর তুলিতে।

শ্রীচৈতন্য সিরিজের চিত্রগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও রেখায় বিন্যাস কিংবা জমিনে হাল্কা কোমল রঙে চমৎকার টোন সৃষ্টি করে গগনেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

'আজব দেশে আলাদীন' সিরিজে গগনেন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ঘরের ভিতর আলো প্রবেশ করলে কি রকম আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয় কিংবা সামান্য গতির ফলে আলো-ছায়া পড়ে কিভাবে নানা পরিবর্তনশীল রঙ ও রহস্যময় জগতের সৃষ্টি করে, গগনেন্দ্রনাথের কাছে তা ছিল অসীম কৌতূহলের বিষয়। এই কৌতূহলেরই মানস-ফসল তাঁর রহস্যময় চিত্র-জগৎ। এ-ছাড়া গগনেন্দ্রনাথই বোধ হয় নগর-সভ্যতাকে সর্বপ্রথম তাঁর চিত্রে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। ফলে, তাঁর অনেক ছবিতে ইট-কাঠের ইমারত কিংবা স্থাপত্য শিল্প জ্যামিতিক প্যাটার্ণে বিধৃত। মানুষের আকৃতিও বেশ গোটা গোটা। ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের 'কিউবিজম' নামক রীতি-পদ্ধতিও গগনেন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভায় নতুনভাবে ভারতীয় চিত্রে প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে। গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজমসুলভ প্রিজমের বিন্যাস ছবির অন্তঃস্থলস্থিত রূপ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এলেও অন্তত বাহ্যরূপের এমন এক নতুন বিন্যাস সৃষ্টি করেছে যা ভুলবার নয়। আর বিশেষ ধরনের রচনার ফলে গগনেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর ছবির চারিদিকে এমন এক অদৃশ্য গন্ডীর সৃষ্টি করলেন যা ভারতীয় চিত্রের 'ফ্রেম' সম্পর্কে আমাদের তথাকথিত ধারনাকে বদলে দিল। স্পেসের বিশ্লেষণ ও ব্যবহারেও গগনেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি পরিণত মনের পরিচয় দিয়েছেন। এরি ফলে তাঁর চিত্রে জ্যামিতিক সংহতি, বাঁধন, কাঠিন্য এবং ঋজুতা পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, এইভাবেই গগনেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রধারাকে সার্থকভাবে আমাদের দেশে প্রয়োগ করেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রদর্শিত চিত্র থেকে অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যায়।

তাঁর প্রতিকৃতি চিত্র এবং স্টাডিগুলিও জীবন্ত। সামান্য কয়েকটি রেখায় কিংবা ব্রাশের হাল্কা টানে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্যঙ্গ চিত্র এবং কার্টুন চিত্রেও গগনেন্দ্রনাথ যে কতখানি উন্নত রুচি ও শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, এই প্রদর্শনীর ৭২, ৭৬ ও ৭৭ নং চিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের সামাজিক ব্যাধিকে এইভাবে শেলের বিদ্ধ করা সে যুগে কল্পনাতীত ব্যাপার। অথচ গগনেন্দ্রনাথ যেন শল্য-

চিকিৎসকের মত সামাজিক ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচার করেছেন। আর এই শল্য চিকিৎসা পুঁজ বের করে দিলেও ক্ষতের দাগকে মিলিয়ে দিতে পারেনি। অর্থাৎ গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ এবং কার্টুন চিত্রের আবেদন সত্যিই সুদূরপ্রসারী।

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-ভারতীর সৌজন্যে আমরা গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা দর্শন করে খুশি হয়েছি। গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। উদ্যোক্তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

।। পাঁচজন তরুণ শিল্পীর প্রদর্শনী ।।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর আলিয়াস ক্লাসে চারজন চিত্রশিল্পী এবং একজন ভাস্কর্য-শিল্পীর মনোরম এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। প্রদর্শনীটি ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহু দর্শকের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে।

চারজন চিত্র-শিল্পীই কলকাতার সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র। এ'রা বর্তমানে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর 'স্টুডিও গ্রুপের' সভ্য। এ'দের নাম অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, সজল রায় ও যোগেন চৌধুরী। সুবলচন্দ্র সাহাও কৃতি ছাত্র এবং বর্তমানে ভাস্কর্য-শিল্প সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত।

পাঁচজন শিল্পীই প্রতিভাবান। প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখে অনায়াসে বলা যায় এ'রা অচিরেই বাঙলার আধুনিক শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রাফিক চিত্রকলার কাজ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। এবার তিনি তেল-রঙের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন আমাদের নিত্যদেখা বাস্তব জগতের মনোরম চিত্র। ইনি নীল আর হলুদ রঙের প্রতি আকৃষ্ট। এবং এই নীল আর হলুদ জমিনে মোটা রেখার 'ধোপী-খানা' (১) 'ঘড়ি প্রস্তুতকারক' (৪) কিংবা 'স্কিপিং' (৩)—এর যে সুন্দর চিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাতে মনে হয় তেল-রঙেও অরুণবাবু যথেষ্ট দক্ষ শিল্পী।

শিল্পী সুবীর সেন এ'দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিমূর্ত রীতির প্রতি আকৃষ্ট। এবং তাঁর চিত্রের সুন্দর জমিন এবং রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রশংসা করলেও আমরা তাঁর এই অতি আধুনিকতারূপ বিমূর্ত সৃষ্টিকে খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারিনি। কারণ, মনে হয়েছে তিনি বিমূর্ততার নামে অনেক সময় স্টাণ্টও দিয়েছেন। তবু তাঁর 'টেন্স মোমেন্ট' (৬) কিংবা 'নো প্লেস টু হাইড' (৫) প্রশংসার দাবী করতে পারে।

শিল্পী সজল রায় বিশেষ কোনো শিল্পরীতি কিংবা আঙ্গিকের মধ্যে তাঁর শিল্পীমনকে বেঁধে ফেলেননি। তিনি জীবনের বাস্তবতাকে কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতকে তাঁর শিল্পের জগতে স্থান দিতে সর্বদা প্রস্তুত বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। এই উদারতা বোধ হয় ভাল। কারণ মুক্ত স্বচ্ছ জীবন-দৃষ্টির অধিকারী না হলে কোনদিন শিল্পী বড় স্রষ্টা হতে পারেন না। সজল রায় 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' (১) 'আমি মরতে পারি না' (৩) কিংবা 'চাঁদ ও বিধবা'র (৫) মধ্যে তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে আরো ভাল ছবি আমাদের উপহার দেবেন।

এই প্রদর্শনীতে যোগেন চৌধুরীই একমাত্র প্যাস্টেল ও জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র উপস্থিত করেছেন। যোগেনবাবুর ড্রয়িং সত্যি ভাল। তাঁর ১ নং ও ৪ নং চিত্র আমাদের মুগ্ধ করেছে।

সুবলচন্দ্র সাহার ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির মধ্যে পরিণত শিল্পীর স্বাক্ষর বিদ্যমান। পোড়া মাটির এই কাজে তিনি দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। আমরা এই পঞ্চ শিল্পীকেই আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

করে বেড়ে যাচ্ছে। এই হারে যদি লোক বৃদ্ধি হয় তবে এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৪০০ কোটি অতিক্রম করে যাবে।

তিনি আরও বলেছেন যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১ শতাংশ, অথচ ঐ সময়ের মধ্যে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ। সুতরাং অনতিবিলম্বেই যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি-রোধের কোন ব্যবস্থা না হয় বা বর্ধিত জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য যদি খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কোন উপায় না হয় তবে এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে অনশনের সম্মুখীন হতে হবে।

পাঁচশ' বছর আগে দারুণ প্রয়োজনের মুহূর্তে আবিষ্কৃত হয়েছিল পৃথিবীর অপর গোলার্ধ আমেরিকা। আজও বিশ্বের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে শুরু হয়েছে গ্রহান্তর গমনের অভিযান। হয়ত বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই মঙ্গল বা শুক্র পৃথিবীর অধিকারে এসে যাবে। যদি তা সম্ভব হয় তবেই হয়ত পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষকে গ্রহান্তরে প্রেরণ করে বর্তমান লোক-সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। অন্যথায় পৃথিবীকে যে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হতে হবে তা বর্তমানে কল্পনাতীত।

॥ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ॥

উপকূলবর্তী দ্বীপগুলি ও রাজধানী দিল্লী ছাড়া ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সংসদীয় শাসন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অনতিবিলম্বেই ত্রিপুরা, মণি-পুর, হিমাচল প্রদেশ, পণ্ডিচেরী ও গোয়ায় বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার উপর শাসনদায়িত্ব অর্পিত হবে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি গণতন্ত্র-সম্মত ও সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হলেও এর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত নয়। তিন লক্ষ হতে তের লক্ষ পর্যন্ত নরনারী-অধ্যুষিত এই ক্ষুদ্র এলাকাগুলির স্বতন্ত্র শাসন-এলাকারূপে বজায় থাকার কোনই যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারেনা। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অদ্ভুত মনো-ভাবের জনাই তা সম্ভব হচ্ছে না। ত্রিপুরা বঙ্গভাষী অঞ্চল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা অনেক দূরে বলে প্রশাসনিক কারণে তার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসুবিধাজনক। কিন্তু আসাম ত্রিপুরাকে চায় না, কারণ তার ফলে আসামে অসমীয়াদের তুলনায় বাঙালীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, যা আসাম কোনমতেই হতে দেবে না। এ কারণে ত্রিপুরা একটি স্বতন্ত্র এলাকা হয়েই রইল এবং বহু অর্থব্যয়ে সেখানে একটি স্বতন্ত্র সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হল। মণিপুরের উপর নাগাভূমি ও আসামের সমান দাবী, অতএব মণিপুরকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে হল। হিমাচল প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় চোদ্দ লক্ষ, এবং সকলেই প্রায় হিন্দু। এই কারণেই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও আজো হিমাচল প্রদেশকে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না। পাঞ্জাবের রাজনীতি বর্তমানে শিখনিয়ন্ত্রিত, তাই হিন্দুর অকস্মাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি তাদের কাম্য নয়। এইভাবে ক্ষুদ্র ও খণ্ড স্বার্থের প্রতীক হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। বিপুল অর্থব্যয়ে এই কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে যে সংসদীয় শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে তা সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না।

॥ কমনওয়েলথ সম্মেলন ॥

লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কমনওয়েল-থের মধ্যমণি বৃটেনের রক্ষণশীল সরকার ইউরোপের খোলা বাজারে যোগদানের প্রশ্নে ঘরে বাইরে অভাবিতপূর্ব বাধার সম্মুখীন হয়েছে। উপযুক্ত মুহূর্তে বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা গেটস্কেল জাতির উদ্দেশ্যে এক ঘোষণায় জানিয়ে-ছেন, প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান খোলা বাজারে যোগদানের সব সর্ত দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করেননি। বৃটেনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বৃটেনের যোগদানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু স্পষ্টভাষায় বলেছেন, বৃটেন যদি ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দেয় তবে কমনওয়েলথের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, নতুনভাবে উপ-নিবেশবাদ প্রশ্রয় পাবে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, বৃটেন খোলা বাজারে যোগ দিলে পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তিজোটের বিরোধ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে। ম্যাকমিলানের ভরসা ছিল কানাডার সমর্থন, কিন্তু কানাডার প্রধান ডিফেনবেকারও তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন। নাইজেরিয়া, ঘানা, টাঙ্গানিকা প্রভৃতি আফ্রিকাস্থ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র-গুলিও বৃটিশ সরকারের বর্তমান মনোভাব ও কার্যকলাপে অসমর্থন প্রকাশ করেছে। এ অবস্থায় বৃটেনকে ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দিতে হলে কমন-ওয়েলথের অবলুপ্তি ও বিরাট বৈষয়িক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েই তা করতে হবে। বৃটেনের জনমত বর্তমানে রক্ষণশীল শাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে তাতে অবিলম্বেই হয়ত বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা হতে পারে।

॥ আলজিরিয়ার শান্তি ॥

চতুর্থ সামরিক কমান্ডের অকস্মাৎ ও অর্থহীন অভ্যুত্থানে আলজিরিয়ায় গৃহ-যুদ্ধের যে ভয়াবহ আশংকা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, মুখ্যত আলজিরিয়াবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ফলে আপাতত তার সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে। বেন বেলার রাজধানী ত্যাগ ও ওরানে সশস্ত্র প্রস্তুতির পরেই মনে হয়েছিল, অন্তর্বিপ্লবে আবার আলজিরিয়া রক্তাক্ত হবে। কিন্তু তার পূর্বেই আলজিরিয়ার, বিশেষ করে রাজধানী আলজিয়ার্সের হাজার হাজার নরনারী শোভাযাত্রা করে' দাবী জানায়, আর যুদ্ধ নয়, আর রক্তপাত নয়। আল-জিরিয়ার মানুষ শান্তি চায়। সেই আবেদনের কাছে চতুর্থ সামরিক কমান্ডের নেতৃবৃন্দের নতি স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া বেন বেলা যে বিরাট সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন রাজধানীর দিকে তা প্রতি-রোধের শক্তিও জনসমর্থনহীন ও সীমিত-শক্তি চতুর্থ সামরিক কম্যান্ডের ছিল না।

তাই আবার রাজধানীতে ফিরে এসেছেন বেন বেলা, এবার আরও সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা নিয়ে। পূর্ব ঘোষণা-মত আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর আল-জিরিয়ায় জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে। নির্বাচিত ১৯৬ জন সদস্য গঠন করবেন প্রথম জাতীয় সরকার এবং তখনই আলজিরিয়ার প্রকৃত স্বাধীন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

॥ কুর্দ বিদ্রোহ ॥

ইরানে কুর্দ বিদ্রোহ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। উত্তর ইরাকের প্রায় পঞ্চাশলক্ষ কুর্দের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ইরাকের শাসনকর্তারা চিরকালই উপেক্ষা করে এসেছেন এবং বর্তমান একনায়ক জেনারেল কাশেমও তার ব্যতিক্রম নন। প্রয়োজনবোধে অস্ত্রের সাহায্য নিতেও কাশেম দ্বিধাবোধ করেননি। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। উত্তর ইরাকের কুর্দ-অধ্যুষিত এলাকাতেই রয়েছে ইরাকের প্রধান জাতীয় সম্পদ কিরকার্কের তৈলক্ষেত্র। কিরকার্কের তৈলক্ষেত্র হতে ইরাকের বছরে আয় হয় নয় কোটি পাউন্ড, যা তার জাতীয় রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ। দেশের এই প্রাণকেন্দ্রটি সম্বন্ধে ইরাকের শাসনকর্তারা কোন ঝুঁকিই নিতে রাজী নন। তাই বারবার করে জেনারেল কাশেম বলেন, তথাকথিত কুর্দ আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই নেই ইরাকে।

কিন্তু তা যে ঠিক কথা নয় এবং দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ যে বর্তমানে কার্যত তাদের অধিকারে তাই বোঝানোর উদ্দেশ্যে কুর্দরা সম্প্রতি তাদের এলাকা দিয়ে চালিত ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তেলের পাইপ লাইন চারদিনের জন্যে কেটে দেয়। উত্তর ইরাকে কুর্দরা যে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি গড়ে তুলেছে খুব বড় রকমের সংঘর্ষের ঝুঁকি না নিয়ে জেনারেল কাশেম তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবেন না। একারণে মনে হয়, ইরাকে কুর্দ ও ইরাকী-দের মধ্যে একটি বড় রকমের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছে।

॥ ঘরে ॥

৬ই সেপ্টেম্বর—২০শে ভাদ্রঃ ডাঃ বি সি রায় স্মৃতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক সর্বত্র কমিটি গঠনের আবেদন—বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট লিপি প্রেরিত।

৭ই সেপ্টেম্বর—২১শে ভাদ্র ঃ কলিকাতা উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ঘোষণা। রাজধানীতে সংসদীয় কংগ্রেসী সদস্যগণ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী সম্বর্ধিত।

লোকসভায় বার্তাজীবী সাংবাদিক (সংশোধন) বিল পেশ।

৮ই সেপ্টেম্বর—২২শে ভাদ্রঃ কাঁকিনাড়া রেল ষ্টেশনে দিবালোকে দুঃসাহসিক ডাকাতি—নগদে ও ক্রেডিট নোটে ২৫ হাজার লুণ্ঠন বোমা ফাটাইয়া জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম হইতে দুর্বৃত্তদল উধাও।

আমদানী কমাও ঃ রপ্তানী আরও বাড়াও—দিল্লীতে রপ্তানী-আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের যুক্ত-বৈঠকে শ্রী কে সি রেড্ডির (কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী) আহ্বান—১০৭টি রপ্তানী পণ্যের উপর হইতে নিষেধ প্রত্যাহার।

কলিকাতা তথ্য-কেন্দ্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী) জীবন সম্পর্কে অভিনব আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন—উদ্বোধক ঃ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন।

৯ই সেপ্টেম্বর—২৩শে ভাদ্র ঃ পাটনায় ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের (প্রথম রাষ্ট্রপতি) পত্নী শ্রীমতী রাজবংশী দেবীর (৭৬) জীবনাবসান।

বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে কলিকাতা ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের গণসম্বর্ধনা—নাগরিক কমিটির সভাপতিরূপে নগরীর মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক মানপত্র অর্পণ।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ও পরিবহনমন্ত্রীরূপে শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে (পাঞ্জাব ও রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ) লইয়া বৃহত্তর প্রশাসনিক অঞ্চল গঠনে সর্দার প্রতাপসিং কাইরণের (পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী) প্রস্তাব—বকসী

ঘটনা প্রবাহ

গোলাম মহম্মদ (কাশ্মীর মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক প্রত্যাখ্যান।

১০ই সেপ্টেম্বর—২৪শে ভাদ্র ঃ জনসংখ্যার বিচারে ভারতের স্থান এখনও দ্বিতীয় (প্রথম স্থান চীনের)—১৯৬১ সালের আদমসুমারির চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ—ভারতের লোকসংখ্যা ঃ ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮২ (পুরুষ ২২,৬২,৯৩,৬২০ ও নারী ২১,২৯,৪১,-৪৬২)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্যপদে শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক (এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) নির্বাচিত।

১১ই সেপ্টেম্বর—২৫শে ভাদ্রঃ পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের সন্নিহিত পেট্রাপোলে ভারতীয় শুল্ক কর্মী দল কর্তৃক ধাবমান মোটরগাড়ীতে লুক্কায়িত ২০ লক্ষ টাকার বে-আইনী সোনা (১৮৫টি বাট) উদ্ধার—'আমেরিকান টুরিস্ট' বলিয়া পরিচিত গাড়ীর মালিক গ্রেপ্তার।

বনগাঁ অঞ্চলে (২৪ পরগণা) বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী তিনশত পাকিস্তানী গ্রেপ্তার।

১২ই সেপ্টেম্বর—২৬শে ভাদ্র ঃ নেফার কামেং সীমান্তে চীনা ফৌজের প্রবেশ—রাইফেলস-এর একটি দল চীনা সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের সরকারী (কেন্দ্রীয় সরকার) ব্যবস্থা—বিপুল পরিমিত গম ও চিনি বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত।

॥ বাইরে ॥

৬ই সেপ্টেম্বর—২০শে ভাদ্র ঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে কঙ্গো হইতে রাষ্ট্রসংঘ ফৌজ প্রত্যাহারের দাবী—কঙ্গোর ব্যাপারে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হস্তক্ষেপ করিতেছে বলিয়া অভিযোগ।

৭ই সেপ্টেম্বর—২১শে ভাদ্র ঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক দেড় লক্ষ সৈন্যের রিজার্ভ বাহিনী গঠনের উদ্যোগ।

৮ই সেপ্টেম্বর—২২শে ভাদ্র ঃ 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেন যোগদান করিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ও কমনওয়েলথ দুর্বল হইয়া পড়িবে'—লন্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর (ভারত) সতর্কবাণী।

২০শে সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ায় নির্বাচনের অনুষ্ঠান—সরকারী ঘোষণাপত্র প্রচার—আলজিরিয়ায় পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ।

৯ই সেপ্টেম্বর—২৩শে ভাদ্র ঃ 'পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণে সহস্র বৎসর পর্যন্ত মানব জাতির সমূহ ক্ষতির আশংকা'—রাষ্ট্রসংঘ নিযুক্ত বিজ্ঞানী দলের রিপোর্টে হুঁসিয়ারী।

চীনের আকাশে কুওমিন্টাং চীনের একখানি ইউ-২ বিমান (আমেরিকায় প্রস্তুত) গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত।

১০ই সেপ্টেম্বর—২৪শে ভাদ্র ঃ লন্ডনে গুরুত্বপূর্ণ কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন (দশ-দিনব্যাপী) আরম্ভ—ম্যাকমিলান (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক বৃটেনের সাধারণ বাজারের জোটভুক্ত হওয়ার অনুকূলে প্রদর্শন—সম্মেলনের বাহিরে জোটে বৃটেনের যোগদানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

'চীন ভারত সীমান্ত বিরোধ গুরুতর ঃ সহসা সংঘর্ষ বাধিতে পারে'—লন্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরুর উক্তি।

আক্রায় ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমার বাসভবনের নিকট বিস্ফোরণ—৫ জন নিহত।

১১ই সেপ্টেম্বর—২৫শে ভাদ্র ঃ 'কিউবার উপর আক্রমণ চালানো হইলে পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে'—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি রাশিয়ার হুমকী।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে (লন্ডন) শ্রীনেহরুর হুঁসিয়ারী—সাধারণ বাজারে (ইউরোপীয়) বৃটেনের প্রবেশে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিরোধ বাধিবে, নূতন উপনিবেশবাদ দেখা দিবে।

লন্ডনের হাসপাতালে পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত সোভিয়েট গুপ্তচর ডঃ রবার্ট সোবলেনের (আমেরিকান) প্রাণত্যাগ।

১২ই সেপ্টেম্বর—২৬শে ভাদ্র ঃ বৃটেনের সাধারণ বাজারে প্রবেশ প্রস্তাবে রোডেসিয়া ভিন্ন সকল রাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতা—কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের সমালোচনায় বিচলিত ম্যাকমিলান (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক আহ্বান।

এ পর্যন্ত পশ্চিম ইরাণের প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে নিহত দশ সহস্রাধিক নরনারীর মৃতদেহ উদ্ধার।

॥ অনু-পত্র ॥

ইদানীং বাংলা-সাহিত্যে একটি শুভ-সূচনা দেখা দিয়েছে যা তোরণ-শীর্ষ থেকে ঘোষিত হওয়ার দাবী রাখে, সেই বিশিষ্ট সংবাদটি পাঠকদের অবগতির জন্য কিঞ্চিৎ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা গেল।

সচেতন সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় অনেকগুলি মাসিক, ত্রৈমাসিক, চতুর্মাসিক, ষান্মাষিক পত্রিকা বাংলা ভাষায় বেশ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার লক্ষণ আছে এবং বৈশ্যসন্ধির প্রয়োজনে সস্তা, চটুল, চমকপ্রদ এবং তরল বিষয়বস্তু বর্জনের প্রচেষ্টা আছে। এই-সব পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা সীমিত, পৃষ্ঠাসংখ্যা সাধারণতঃ দু-চার ফর্মার বেশী নয়, কিন্তু তার মধ্যে যে বিষয়-বস্তু পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তা প্রশংসনীয়।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, সমালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের একটি মাত্রকে অবলম্বন করেই অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আবার দু-একটিতে সবকটি বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সুন্দর গল্প, অথচ তা ডাকসাইটে লেখকের লেখনী-নিঃসৃত নয়। আধুনিক এবং উগ্র-আধুনিক রীতির কবিতার উজ্জ্বল নমুনা। সেই সঙ্গে বিদেশী কবিতার মনোজ্ঞ অনুবাদ। বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ, সেই সব প্রবন্ধে সাহিত্য, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট আলোচনা পাওয়া যায়। পুস্তক-সমালোচনার মধ্যেও থাকে চিন্তার খোরাক। নিঃসন্দেহে সৎ-পাঠকের কাছে এই সাহসিক প্রচেষ্টা সমাদৃত হয়।

সাম্প্রতিককালে নিম্নরুচির সাহিত্য-প্রচারের একটা ঢেউ এসেছে, হালকা, স্থূলরুচির এই সব স্ফীতোদর পত্রিকার পাঠক অর্ধ-শিক্ষিত এক 'হঠাৎ-ধনী' সম্প্রদায়, জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী এই যোদ্ধাদের দলে আছেন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ। সদ্য তারুণ্যে উন্নীত যুবক-যুবতী বা মধ্য-বয়সী এবং প্রায়-প্রবীণরাও এই বিরাট গোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেশের বৃহত্তর কল্যাণে বা সমাজের উন্নয়নের জন্য এ'দের চিন্তার অবসর নেই। 'শুধু ধাও, উদ্দাম বেগে ধাও'—এই সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ'রা জীবনের লক্ষ্য রেখেছেন দুটি জিনিসে, তার নাম 'Gold and Speed'। সেই কর্মবহুল বিরল-অবসর জীবনে সংবাদপত্রে চোখ বুলানো যায়, কাজের ফাঁকে সিনেমার শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে দু'ঘণ্টা কাটান যায়, কিন্তু গুরু বিষয়ের প্রতি মনো-নিবেশ করার মত অখণ্ড অবসর এবং অবকাশ কই? তারপর পারিপার্শ্বিক

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনই রুক্ষ এবং রূঢ় যে চটুল এবং মুখরোচক চুটকি রচনা ছাড়া অন্য কিছুতে সময় নষ্ট করতে মন বিদ্রোহ করে। জীবনে যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধার অভাব সেইখানে যদি কোনও অঘটন-ঘটন-পটিয়সী অশেষ ছলাকলাধিকারিণীর নয়নমনোহর চিত্র এবং ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী জানা যায় তাহলে মনে হয় স্বর্গরাজ্য যেন করায়ত্ত।

চায়ের পেয়ালায় ক চামচ চিনি লাগে, কিংবা নিমন্ত্রণের আসরে কি পরে খেতে তাঁর ভালো লাগে, অথবা কিভাবে শৈশব থেকেই তাঁর অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, তারপর পরীক্ষার কঙ্কর-কঠিন সোপান অতিক্রম করে কিভাবে তিনি আজ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চশিখরে পৌঁচেছেন এই মূল্যবান তথ্য পাঠ করতে ভালো লাগাই স্বাভাবিক, তার সঙ্গে আবার যদি খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের নামাঙ্কিত দু-চারখানি উপন্যাসোপম বড়গল্প ফাউ হিসাবে পাওয়া যায় তাহলে কার প্রয়োজন হর্ষবর্ধন কি ছিলেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথের মানসীর মর্মবাণী কি, অথবা বাংলা সাহিত্যে পারসিক প্রভাব সম্পর্কিত নীরস প্রবন্ধ পাঠে? গল্প যদি পড়তে হয় তাহলে সেই 'এক যে ছিল রাজা দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তারা সুখে এবং স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল—' এই গল্প পড়াই ভালো। কেমন সাস্-পেন্স, কেমন রোমাঞ্চকর রোমান্স-ঘন অবদান, কেমন স্বচ্ছন্দে নায়ক এবং নায়িকার মিলন ঘটে, যেন শানবাঁধানো রাজপথে আরবী ঘোড়া উদ্দাম ছুটে চলেছে, বাধাবন্ধহীন। আর নতুন রীতির গল্প, যত সব দুঃখ-কষ্টের উদ্ভট গল্প, মানেই বোঝা যায় না। পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, কার দায় পড়েছে অত কষ্ট করে সেই সব কাহিনী পাঠ করতে এবং তার অর্থ বুঝতে!

'আয়লো অলি কুসুম কলিতে' অভ্যস্ত কবিতা-পাঠকের 'তন্নিষ্ঠ', 'অনীহা' মার্কা নতুন জাতের মুক্তছন্দের কবিতা পড়ে ক্লান্তি আসে তাই কবিতা বর্জন করাই শ্রেয়।

উপরে যে অবস্থার কথা বলা হল বাংলাদেশের প্রায় আশীজন সাহিত্য-পাঠকের এই অবস্থা। ফলে তথা-কথিত জনপ্রিয় পত্রিকাগুলি প্রকাশ হওয়ার পরই বাজার থেকে উধাও হয়, সাহিত্যের পাঠকের রুচি যদি সাহিত্য-

বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত হয় তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে সাহিত্যের মান আজ নিম্নগামী। প্রচুর অর্থ এবং প্রচারসংখ্যার আধিক্য আজ সাহিত্যের মান-নিয়ন্ত্রণের একমাত্র যন্ত্র। শোনা যায় যে, কি লিখতে হবে, কতখানি লিখতে হবে তা অনেক সাহিত্যসম্পর্কশূন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ স্থির করে দেন। এই অবস্থায় কিভাবে সাহিত্যের মান বৃদ্ধি পেতে পারে তা চিন্তাশীল পাঠকরা অনুমান করুন।

নতুন লেখক সৃষ্টি করার আগ্রহ নেই, শক্তি নেই নতুন আবিষ্কারের, সাহস নেই নতুনরীতির সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় অথচ নতুন আঙ্গিক, নতুন ভঙ্গীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই জন্য প্রয়োজন 'অনুপত্র' বা Little Magazine-এর। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন তাঁর 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'তে যে 'সবুজপত্র' বাংলা-ভাষার প্রথম 'লিটল ম্যাগাজিন'। কারো কারো মনে হতে পারে 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনা' বিষয়ে ও-কথাটা প্রযোজ্য। কিন্তু যখন অন্য কিছুর প্রায় অস্তিত্বই নেই, প্রতি তুলনার যোগ্য কিছুই নেই, তখন শ্রেণী-বিভাগে সার্থকতা কোথায়। বাংলা পত্রিকার সেই আদি যুগে, যখন পাঠক ছিল স্বল্প এবং আজকের তুলনায় অনেক বেশী সমভাবসম্পন্ন, তখন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকা দুটিকে তাঁদের একান্ত সাহিত্যসাধনার মধ্যেই নিবিষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন, প্রতিবাদের প্রয়োজন তখনো প্রবল হয়ে ওঠেনি। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন নামেই যখন প্রতিবাদ তখন অন্তরে নিশ্চয়ই তা থাকা চাই আর সেটা শুধু একজন অধিনায়কেরই নয়, একটি সাহিত্য-গোষ্ঠীর। 'সবুজপত্রে' এই লক্ষণ পুরো মাত্রায় বর্তেছিল। "তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ ঘোষণা ছিলো, ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষমা।"...

বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র' একটি অবিস্মরণীয় পথচিহ্ন। তার প্রচার-সংখ্যা পাঁচশো থেকে সাতশো ছিল, গ্রাহক ছিল অল্প, বিতরণ হত অনেক বেশী। অথচ আজ পর্যন্ত সবুজপত্রের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিহত। 'সবুজপত্র' প্রায় স্তিমিত এমন সময় প্রকাশিত হয় 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'ধূপছায়া' প্রভৃতি। একই চিন্তাধারার বিভিন্ন রূপ। সমালোচকদের মত যাই হোক না কেন, 'কল্লোল-যুগের' লেখকবৃন্দ আজো বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁদের রচনা ভিন্ন কোনো পত্রিকা, কোনো প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানই সফলতা লাভ করতে পারেন না।

এর পরেই যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটে তার নাম 'পূর্বাশা', 'পূর্বাশা'র পৃষ্ঠায় অনেক শক্তিমান তরুণ লেখকের বিস্ময়কর গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, বর্তমানকালের অনেক তরুণ ও মধ্য-বয়সী প্রতিষ্ঠাবান লেখক 'পূর্বাশা'র আবিষ্কার। বাংলা কবিতার মান উন্নয়নে এবং নতুনরীতির প্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা আছে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার। অল্প কয়েকদিনের জন্য 'নিরুক্ত' নামে আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'পরিচয়ের' উগ্র উন্নাসিকতা পাঠক এবং লেখকদের মধ্যে একটা চীনের প্রাচীর রচনা করেছিল, ফলে 'পরিচয়' শুধু অভিজাত পত্রিকা হিসাবেই স্মর্তব্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভিন্ন আর কোনও উল্লেখযোগ্য লেখক 'পরিচয়'-চিহ্নিত নন।

যাই হোক, নিম্নমানের মসৃণ পথের সংকট থেকে ত্রাণ করতে পারে 'লিটল ম্যাগাজিন'। Liberal Imagination-এ বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্য-সমালোচক Lionel Thrilling বলেছেন—

"To the general lowering of the status of literature and of the interest in it, the innumerable "little magazines" have been a natural and heroic response."

এই সব পত্রিকার সম্পাদকরা Mr Thrilling-এর মতে 'have kept out culture from being cautious and settled.'

এই কারণেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যে অল্পসংখ্যক মাসিক, দ্বি-মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক 'অনুপত্র' প্রকাশিত হচ্ছে তার ভূমিকা অতি মূল্যবান এবং সম্ভাবনা সুদূর-প্রসারী।

নতুন বই

অস্তগামী সূর্য (উপন্যাস)—ওসামু দাজাই। অনুবাদ : কল্পনা রায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

যুদ্ধোত্তরকালের এক জাপানী ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। সমস্ত কাহিনীটি বলেছে ঐ পরিবারেরই স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যা কাজুকো। পিতা মৃত। ক্ষয়রোগগ্রস্তা মাতাকে নিয়ে সে ব্যস্ত। এর মধ্যেই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে তার মাদক-জর্জরিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাওজী। জীবনের কোন অর্থই নাওজীর কাছে ধরা পড়ে না। তাদের মা মারা গেলেন। নাওজীর অর্থহীন জীবন ব্যাভিচারে ভরে ওঠে। একদিন সে আত্মহত্যা করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কাজুকো ভ্রাতৃবন্ধু পানাসক্ত এক ঔপন্যাসিকের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হচ্ছে। কাজুকোর সন্তানকামনা বার-বার তীব্র হয়ে ওঠে। মা এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে আবিষ্কার করে যে সে সন্তানসম্ভবা। এই বিষাদময় পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে অভিজাত সমাজের ধ্বংসোন্মুখ রূপটি।

'অস্তগামী সূর্যের' এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন আধুনিক জাপানী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ওসামু দাজাই। দাজাই-এর জন্ম এক অভিজাত পরিবারে। ভাল ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করলেও পড়াশুনা বেশী দূর এগোয়নি। কুড়ি বৎসর বয়স হবার আগেই দুবার এবং ১৯৩৫ সালে এক-বার, ১৯৩৬ সালে আরেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। দাজাই-এর সমস্ত জীবনই ছিল উচ্ছৃংখলতায় পূর্ণ। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় 'ভিলোনের স্ত্রী' এবং 'অস্তগামী সূর্য'। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় 'বাতিল' উপন্যাস। 'গুডবাই' নামে একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে টোকিওর তামাগাওয়া জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন এবং ১৯শে জুন তাঁর উনচল্লিশতম জন্মদিনে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়।

অনেক সময়ই দাজাই-এর রচনার সংগে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু সাযুজ্য চোখে পড়ে। বিশেষ করে 'অস্তগামী সূর্যে' দাজাই স্বীয় সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রই এঁকেছেন। বিশেষ করে নাওজি, উয়েহারা এবং কাজুকোর চরিত্রে দাজাই-এর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। নাওজির আত্মহত্যা এবং দাজাই-এর আত্মহত্যার চেষ্টার মধ্যে উদ্দেশ্যহীন জীবন-পরিসমাপ্তির কথা ফুটে ওঠে। দাজাই যে নৈরাশ্যবোধের দ্বারা চিরকাল পীড়িত ছিলেন—তার দ্বারা তাঁর অধিকাংশ রচনাই প্রভাবিত। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে কাজুকো চরিত্রের দৃঢ়তাই একমাত্র ব্যতিক্রম। এ কারণে বর্তমান উপন্যাস কাহিনীর বক্তব্য অভিব্যক্তিতে সার্থক হয়ে উঠেছে। আধুনিক য়োরোপীয় সভ্যতার দ্বারা জাপান বিশেষ প্রভাবিত। আর সে প্রভাবই জাপানের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান জাপানী জাতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় বর্তমান উপন্যাসটি পাঠের দ্বারা। দাজাই নিপুণ হাতে প্রাচীন ও নবীন জাপানের ছবি এঁকেছেন। দীর্ঘজীবন লাভ না করলেও দাজাই যে সমসাময়িক জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তা সাহিত্য-সমালোচকের বিচারের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়ে গেছে। একমাত্র জাপানে নয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই দাজাই আজ এক অপরিসীম শ্রদ্ধার অধিকারী।

অনুবাদে কল্পনা রায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরিজি অনুবাদকারের মূল ভূমিকাটিও অনূদিত হয়েছে। বর্তমান উপন্যাসটি বাঙলা ভাষায় পরিবেশন করার জন্য রূপা অ্যান্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

দর্শক ও সমালোচক :

প্রায়ই দেখা যায়, বেশ গোটাকতক অ্যাকাডেমী পুরস্কার পাওয়া কোনো আমেরিকান ছবি দেখে আমাদের দেশের দর্শকরা বলাবলি করছেন, 'এর নাম অ্যাকাডেমী-অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ছবি!—কি গুণে যে অ্যাওয়ার্ড পেল, সে শুধু যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরাই জানেন।' আবার কেউ বলছেন, 'ওসব স্রেফ ধাপ্পা—প্রোডিউসার-কে হয়ত বাঁচাতে হবে, তাই—'ইত্যাদি। আমাদের দেশের ছবির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দর্শকরা এবং সমালোচকদের রায় এক নয়। কোনো ছবি দেখে সমালোচকরা হয়ত' উচ্ছ্বসিত হয়ে এক বাক্যে বললেন, 'এই চিত্রের সংযোজনে জগতের চলচ্চিত্র জগৎ নূতনতর মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।' কিন্তু দর্শকদের বিপরীত রায়ের ফলে ছবিখানি দু'সপ্তাহ ধরে প্রায় দর্শকশূন্য ছবিঘরে প্রদর্শিত হবার পর বাক্সবন্দী হতে বাধ্য হ'ল। আবার বিপরীত ঘটনাও বিরল নয়। সমালোচক-সমাজ যে-ছবিকে অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের বলেছেন, সেই ছবিই দর্শক অভিনন্দন লাভে ধন্য হবার ফলে 'সুবর্ণ-জয়ন্তী' উৎসব পালন করছে।

একটি ছবি কেন জনপ্রিয়তা লাভ করল, এই প্রশ্ন সময়ে সময়ে সমালোচককে ভাবিত ক'রে তোলে। ছবিটিতে গল্প বলার ভংগীটি লোকের মনে ধরেছে, না ছোট ছেলেদের অংশটি খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, কিম্বা সঙ্গীতাংশ জন-সাধারণকে মুগ্ধ করেছে, তা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। সমালোচক নিজের মনেই প্রশ্ন করেন, 'যা আমাকে বিন্দুমাত্র খুশী করতে পারেনি, সেই ছবি হিট্ করে কি ক'রে?' একই ছবি সম্বন্ধে দর্শক ও সমালোচকের মধ্যে এমন বিপরীতধর্মী মত পোষণের কারণ কি?

দর্শক ছবি দেখতে যান, যতক্ষণ ছবিটি চলবে, ততক্ষণের জন্যে দৈনন্দিন জীবনকে ভুলে থাকবার জন্যে। ছবির গল্পটি যদি তাঁর কাছে গতানুগতিক না হয়ে কিছু অভিনবত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, ছবির মধ্যে যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তা যদি তাঁর নিজের মতের সংগে মিলে গিয়ে তাঁকে খুশী করতে পারে, ছবির সংলাপ, গান, সুর সুখশ্রাব্য হয়, তাঁর পছন্দ-মাফিক শিল্পী যদি তাতে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে কিম্বা ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ শিল্পীদের তিনি সুনির্বাচিত ব'লে মেনে নিতে পারেন, ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ তাঁর চক্ষুপীড়া-দায়ক না হয়ে উল্টে মনোরম ব'লে মনে হয়, ছবি দেখতে দেখতে তিনি ক্লান্তি অনুভব না করেন এবং অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর না পান এবং গতির সঙ্গে এগোতে এগোতে ক্রমে তিনি তাঁর সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে ছবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন এবং ছবি শেষ হবার পরেও অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাঁর তন্ময়তা না কাটে, তাহলে বুঝতে হবে, ছবিটি তাঁর ভালো লেগেছে এবং এই 'তিনি' যদি মাত্র একক ব্যতিক্রম না হয়ে চলচ্চিত্রের অগণিত দর্শকসাধারণেরই একজন হন, তাহ'লে বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে, ছবিটি জনপ্রিয় হয়েছে বা সাদা কথায় 'হিট' করেছে।

কিন্তু সমালোচক ছবিটি দেখতে যান, নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে রাখতে নয়, নিজেকে বেশ জাগ্রৎ রেখে ছবিটির দোষগুণ বিচারের জন্যে। প্রথমেই তিনি খুঁজবেন, ছবির গল্পটি মৌলিক কিম্বা কোনো জানা বা অজানা গল্পের ছায়া অবলম্বনে? যদি তিনি ধ'রে ফেলতে পারেন, অমুক বিদেশী গল্পের এটি হচ্ছে একটি দেশী সংস্করণ, তখন তিনি বিচার করতে বসবেন, মূল থেকে অনুকরণটির মধ্যে কি কি এবং কতখানি পার্থক্য, মূল কাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুকরণেও বজায় আছে কিনা কিম্বা ব্যর্থ অণুকরণের মধ্যে মূলের সব কিছুই হারিয়ে গেছে? এরপর তিনি দেখবেন, কাহিনীটি শুধু মাত্র কাহিনীই, না, তার মধ্যে সমাজ বা জাতির কল্যাণমূলক কোনো বক্তব্য আছে? আরও দেখবেন, পর্দার ওপর কাহিনীটিকে বিবৃত করতে গিয়ে গতানুগতিক কিম্বা চিত্রনাট্য রচনায় কোনো নতুন শৈলীর প্রবর্তন করা হয়েছে? পরিচালক, সংগীত পরিচালক থেকে শুরু করে কলাকুশলীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতখানি বাহাদুরী দেখাতে সক্ষম হয়েছেন? শিল্পীদের অভিনয়ের মধ্যে প্রাণের সাড়াই বা কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে এবং নূতনত্বের ছোঁয়াচই বা কতখানি? গানের ভাষা এবং সুর ভালো হ'লেও গানগুলি কি ছবির পক্ষে অপরিহার্য? গান এবং দৃশ্যাবলীর মধ্যে অবান্তরতা আছে কিনা এবং যদি থাকে, তা কতখানি? ছবি দেখতে দেখতে এই রকম বহু প্রশ্ন সম্বন্ধেই তাঁকে সজাগ থাকতে হয় এবং তিনি তাই সব ভুলে ছবি দেখতে পারেন না। দর্শকের কাছে ছবি দেখাটা নেশা, কিন্তু সমালোচকের পক্ষে সেটি একান্তভাবেই পেশা। এ অবস্থায় দর্শক ও সমালোচক কোনো ছবির সম্বন্ধে রায় দেবার সময় একমত হবেন কি ক'রে?

তবুও যদি দেখা যায়, কোনো একটি ছবিকে ভালো লাগা ব্যাপারে দর্শক ও সমালোচক একই মত পোষণ করছেন, তখন সেটাকে আকস্মিক ঘটনা ব'লে গণ্য করাই ভালো।

চিত্র সমালোচনা

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'বর্ণচোরা' চিত্রে জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি এবং অন্য দু'জন অভিনেতা

বিশ সাল বাদ (হিন্দী) **:** গীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর নিবেদন; ১৩,৭৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা **:** হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা **:** বীরেন নাগ; গীত-রচনা **:** শকীল বাদাউনী; চিত্র-গ্রহণ **:** মার্শাল ব্রাগাঞ্জা; সম্পাদনা **:** কে নন্দা; শিল্প-নির্দেশনা **:** যাদব রাও; রূপায়ণ **:** ওয়াহিদা রেহমান, লতা সিংহ, মীরা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, মনোমোহন কৃষ্ণ, সজ্জন, মদনপুরী, অসিত সেন, দেবকিষণ প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রাঃ) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে প্যারাডাইস, বীণা, বসুশ্রী কৃষ্ণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

একদা চন্দনগড় রাজ্যের কোনো জাগীরদারের লালসার যূপকাষ্ঠে বলি হতে অসম্মত হওয়ায় কোনো পল্লী-সুন্দরীকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়। এরই ফলে কুমার বিজয় সিংহের বাপ এবং কাকা কোনো অজ্ঞাত হস্ত দ্বারা নৃশংস-ভাবে নিহত হন তাঁদের বিশাল প্রাসাদের নিকটবর্তী বনভূমিতে। এই হত্যার কোনো কিনারা না হওয়ায় পল্লীবাসীর ধারণা জন্মায়, নিগৃহীতা পল্লীসুন্দরীর প্রেতাত্মাই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী।

এই পরিস্থিতিতে বিদেশ প্রত্যাগত কুমার বিজয় সিংহ তাঁদের চন্দনগড় রাজ্যের হাবেলী বা প্রাসাদে এলেন একাকী বাস করতে। সেখানে থাকে খাস চাকর লছমন, একজন ক্রাচ-ব্যবহারকারী খোঁড়া লোক এবং আরও এক আধজন লোক। এরা প্রত্যেকেই যেন কেমন ধরণের—কেউই সহজ, স্বাভাবিক মানুষ নয়। তবু, তবু বিজয় সিংহ সাহসে ভর করে প্রাসাদেই রইলেন; মৃত্যুবিভীষিকায় ভয় পেলে চলবে না; রহস্যের কিনারা তাঁকে করতেই হবে।

দিনের বেলা বেশ আনন্দেই কাটে বিজয় সিংহের। পাখী শিকার করতে গিয়ে পল্লীবালা রাধার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে নানা ছলে, নানা কৌতুকের ভিতর দিয়ে দু'জনের মধ্যে ধীরে ধীরে যে প্রেমের সঞ্চার হয়, তা প্রকাশিত হয় সীমাহীন প্রাকৃতিক শোভার পটভূমিকায় স্বতোৎসারিত গানের মাধ্যমে। কিন্তু গভীর প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি-রূপে বিজয় এবং রাধা যখন পরস্পরকে বিবাহ করবার কথা চিন্তা করে, তখন প্রতিবন্ধকতা আসে রাধার জেঠা গ্রাম্য কবিরাজ মশায়ের কাছ থেকে—তিনি রাধাকে গুরুতর দিব্য দিয়ে এ-বিবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চান। রাধার মৃত্যুঞ্জয় প্রেম যখন শেষ পর্যন্ত তার পিতৃব্যের মনকে দ্রবীভূত করতে সমর্থ হয়, তখনই অপর দিকে বিজয়ের জীবনে বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে।

কারণ রাত্রির রহস্যাচ্ছাদিত অন্ধকারের মধ্যে নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত "ক'হী দীপ জ্বলে ক'হী দিল" গান, বনপথে মঞ্জীরধ্বনি, হাবেলীর মধ্যে নারীর চাপা কান্না, বনপথে এবং প্রাসাদশীর্ষে আলোকইঙ্গিত প্রভৃতির অর্থ খুঁজে বের করবার জন্যে বিজয় বদ্ধপরিকর। সে একক বনপথে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে যে সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পায়, সেখানে নানা অপরিচিত পদচারণার কারণ সে আবিষ্কার করতে চায়। পরে যখন এক বিভীষিকাময় রাত্রে তারই পোশাক-পরিহিত একজন অপরিচিত লোককে আততায়ীর হস্তে নিহত হয়ে বনপথে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তখন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং বহু লোমহর্ষক ঘটনার পর গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় প্রতিহিংসাপরায়ণ আততায়ী যখন ধরা পড়ে, তখন আর

বিজয়-রাধার মিলনে কোনো বাধা থাকে না।

"বিশ সাল বাদ" মূলতঃ প্রেমের ছবি এবং প্রথম সন্দর্শনে প্রেমের জন্ম থেকে শুরু করে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ, গভীর থেকে গভীরতম রূপ ধারণ, সাময়িক বাধা ও বাধাজনিত বিচ্ছেদব্যথা এবং সর্বশেষ দুঃখের মধ্যে প্রেমের সার্থক পরিণতি—সমস্তই আছে এই "বিশ সাল বাদ" ছবিতে। শুধু আছে নয়, খুব ভালোভাবেই আছে, পরম উপভোগ্যভাবে আছে। এমন সুন্দর সুন্দর পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে, এমন চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই প্রেমের দৃশ্যগুলি চিত্রিত হয়েছে, এমন মধুর সংলাপ এবং তার চেয়ে মধুর গান দিয়ে এই দৃশ্যগুলিকে ভরাট করা হয়েছে, যা বহুদিন কোনো হিন্দী ছবিতে দেখা যায় নি এবং এই প্রেমের দৃশ্যগুলির মাঝে চমৎকার চাতুর্যের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রাত্রির অন্ধকারের রহস্যাবৃত দৃশ্যগুলি ও অসিত সেন অভিনীত কৌতুকরসাশ্রিত

বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত 'বেনারসী' চিত্রের একটি নাটকীয় মুহূর্তে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও রুমা গুহঠাকুরতা

'জাদু' চরিত্রটি—এরা যেন আলোর পাশে ছায়ার কাজ করেছে। এই ভাবে দৃশ্য-স্থাপনা "বিশ সাল বাদ"কে একটি বিশিষ্ট অভিনবত্ব দান করেছে এবং চিত্ত-জয়ী সঙ্গীতের সঙ্গে এই অভিনবত্ব মিশে ছবিখানিকে অভূতপূর্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ মাল্য নিঃসংশয়ে ওয়াহিদা রেহমানের প্রাপ্য। রাধা চরিত্রের সারল্য এবং কাপট্য, তার আনন্দ এবং বেদনা—সমস্তই তিনি অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বচ্ছন্দ সহজ অভিনয়ের মাধ্যমে।

গানগুলিকে তিনি এমন আশ্চর্য দরদ দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন যে, মনে হয়েছে ও-গুলি তাঁরই কণ্ঠনিঃসৃত। তিনি এতখানি সার্থক অভিনয় আজ পর্যন্ত আর কোনো ছবিতে করেননি। আমাদের বাঙলাদেশের বিশ্বজিৎ তাঁর প্রথম হিন্দী ছবিতেই এমন বিস্ময়কর-ভাবে তাঁর গৃহীত নায়ক চরিত্রটিকে চিত্রিত করেছেন যে, হিন্দী চিত্রজগতে তাঁর আসন সুদৃঢ় হয়ে রইল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ 'জাদু'র ভূমিকায় অসিত সেন কৌতুকরসের প্রস্রবণ বইয়েছেন। এ ছাড়া দেবীকিষণ (লছমন), সজ্জন (পুলিশ সি-আই-ডি), মদনপুরী (ডাক্তার), লতা সিংহ (নিগৃহীতা গ্রাম্য সুন্দরী), মনো-মোহন কৃষ্ণ (কবিরাজ) প্রভৃতি নিজ নিজ ভূমিকায় যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন।

"বিশ সাল বাদ" ছবির অন্যতম আকর্ষণ যে এর সঙ্গীতাংশ, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। হেমন্তকুমার ও লতা মুঙ্গেশকরের গাওয়া অন্ততঃ চারখানি গান যে-কোনো শ্রোতাকে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে। এবং ঐ সঙ্গে রহস্য, আনন্দ এবং বেদনা—এই সকল ভাব-প্রকাশক আবহসঙ্গীত চিত্রটিকে অলংকৃত করেছে অপর্যাপ্তভাবে।

কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজই উচ্চপ্রশংসালাভের যোগ্য।

হেমন্তকুমারের সম্বর্ধনা :

"বিশ সাল বাদ"—ছবির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রযোজক হেমন্তকুমার মুখো-পাধ্যায় পরিচালক বীরেন নাগকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ছবিখানির পূর্বাঞ্চলীয় পরিবেশক দি ফিল্ম ডিস্ট্রি-বিউটার্স প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীডি. এ. পি. আয়ার গেল শনিবার, ১৫ই সেপ্টে-ম্বর "বিশ সাল বাদ"-এর অভাবিত সাফল্যের জন্যে হেমন্তকুমার এবং বীরেন নাগকে সংবর্ধিত করবার জন্যে একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছিলেন গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। এই ভোজসভায় বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট অন্ততঃ শ'তিনেক লোকের উপস্থিতিতে অমৃতবাজার পত্রিকার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিত্রসমালোচক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন. কে. জি.) উপস্থিত সাংবাদিকদের হয়ে হেমন্তকুমারের প্রযোজক হিসেবে সাফল্য কামনা করবার পর ভোজের আগে হেমন্তকুমারেরই বলা-কথার সূত্র ধ'রে সকলকে জানান যে হেমন্তকুমার যদি আরও কয়েকখানি

হিন্দী ছবির প্রযোজকরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তাহ'লে তিনি বোম্বাইয়ের সংগে তাঁর আপনভূমি বাংলাদেশেও হিন্দী ছবি তৈরী করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন; বাংগালীরাও যে ভালো অথচ জনপ্রিয় হিন্দী ছবি তৈরী করতে পারে, এই কথা তিনি নতুন ক'রে সবাইকে জানাতে চান। বলা বাহুল্য, হেমন্তকুমারের এই আশা ফলবতী হ'লে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প আবার তার পরিধিকে বিস্তৃততর করবার সুযোগ পাবে। আমরা চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে হেমন্তকুমারের সর্বাংগীন সাফল্য কামনা করি।

বিবিধ সংবাদ

নবরঞ্জন অপেরার "বর্গী এল দেশে" ঃ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত বিরাট যাত্রাউৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল নবরঞ্জন অপেরা অভিনীত এবং ব্রজেন দে লিখিত "বর্গী এল দেশে"। এই "বর্গী এল দেশে" যাত্রাভিনয়ই সম্প্রতি দিল্লীতে সরকারী সম্মানে ভূষিত হয়েছিল বলে আমাদের আগ্রহ ছিল অভিনয়টিকে প্রত্যক্ষ করতে। এবং প্রত্যক্ষ করবার পর সানন্দে স্বীকার করছি, নবরঞ্জন সম্প্রদায়ের অভিনয় সমগ্রভাবে আমাদের অতিমাত্রায় মুগ্ধ করেছে। বাঙলার নবাব আলিবর্দীর আমলে এই দেশ মারাঠা-সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করে নাট্যকার ব্রজেন দে "বর্গী এল দেশে" বলে যে-পালাখানি লিখেছেন, তাতে ইতিহাস যৎসামান্যই আছে; কিন্তু যাত্রাভিনয়ের নিয়মিত দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করবার মত ঘটনার ঠাসবুনোনি যে আছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। ব্রজেনবাবুর ভাষার বাঁধুনি আছে; তাতে যেমন আছে মাধুর্য, তেমনই আছে ওজস্বিতা এবং এই সংগে আছে তাঁর কল্পনাশক্তি। ইতিহাস এবং সমসাময়িক সমাজকে মিশিয়ে নাটক রচনা করবার সময়ে সস্তা হাততালি পাবার লোভকে সম্বরণ করে তিনি যদি চরিত্র এবং ঘটনা সৃষ্টির সময়ে সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করে না যান, তাহলে তিনি যাত্রা-নাটক রচনার মানকে উন্নীত করে কালজয়ী শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন। "বর্গী এল দেশে"-তে বিশেষ করে যাঁদের অভিনয় আমাদের অজস্র প্রশংসালাভের অধিকারী তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করব আলিবর্দীর ভূমিকাভিনেতা পঞ্চু সেনের; নাট্যকার চিত্রিত বৃদ্ধ আলিবর্দীর চরিত্রকে চলনে, বলনে চাহনিতে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এ'র পরেই ভাস্করের ভ্রাতা দিবাকর এবং গ্রাম্য যুবতী মেহেরার ভূমিকাভিনেতৃদ্বয়ের নাম করতে হয়। রণক্ষেত্রে শত্রুরূপে এ'দের সংঘাতের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। বহুদিন পরে এমন একজন যুবককে নারী চরিত্রে অপরূপ অভিনয় করতে দেখলুম, যাঁর মুখ, চোখ এবং অংগসৌষ্ঠব বহু নারীকেই লজ্জা দেবে। কবি গংগাদাসের ভূমিকাভিনেতার সুরেলা উচ্চকণ্ঠ-নির্গত সংগীতলহরী আসরের সকলেরই কর্ণকে পরিতৃপ্ত করেছিল। এ ছাড়া ভাস্কর, আলিবর্দীর বেগম, সিরাজদৌলা, গংগাদাসের স্ত্রী প্রভৃতি বহু ভূমিকাভিনেতাই উচ্চ পর্যায়ের অভিনয় করেছেন। নবরঞ্জন অপেরার শক্তিমান অভিনেতৃসংঘ আরও নতুন নতুন পালাভিনয়ে নিজেদের সুনাম বর্ধিত করুন, এই কামনাই আমরা করব।

অভিযাত্রিক-এর "শরিক" ঃ

গেল রবিবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ার রংগমঞ্চে অভিযাত্রিক সম্প্রদায় তাঁদের নতুন নাটক "শরিক" মঞ্চস্থ করেন। সাইকোলজিস্টরা হয়ত খবর রাখেন, কোনো পরিবারে ছ'সাত পুরুষ ধরে একই ধরণের আত্মহত্যার ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্ভব কিনা। স্নায়বিক

দৌর্বল্য থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হওয়াও সম্ভব। তার ওপর জমিদারবাড়ীর একটি বিশেষ কক্ষ—এখানে তালাবন্ধ জলসাঘর—নিয়ে যদি একটি কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, তাহ'লে সেই সম্পর্কে ক্রমাগত চিন্তার ফলে প্রথমে স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অবশেষে দুর্বল মস্তিষ্ক থেকে উন্মাদ হয়ে যাওয়াও বিন্দু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ঠিক তিরিশ বছর বয়েস পূর্ণ হওয়ার দিনটিতেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হওয়ার কাহিনী—ঠিক স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্য মনে হওয়া কঠিন নয় কি? কথাটা মনস্তত্ত্বের দিক বাদ দিয়ে আর্টের ক্ষেত্রের সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বিচারের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু ছেলেকে অভিশপ্ত উন্মাদ রোগাক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে

আর ডি বনশালের 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে তন্দ্রা বর্মণ ও বিশ্বজিৎ
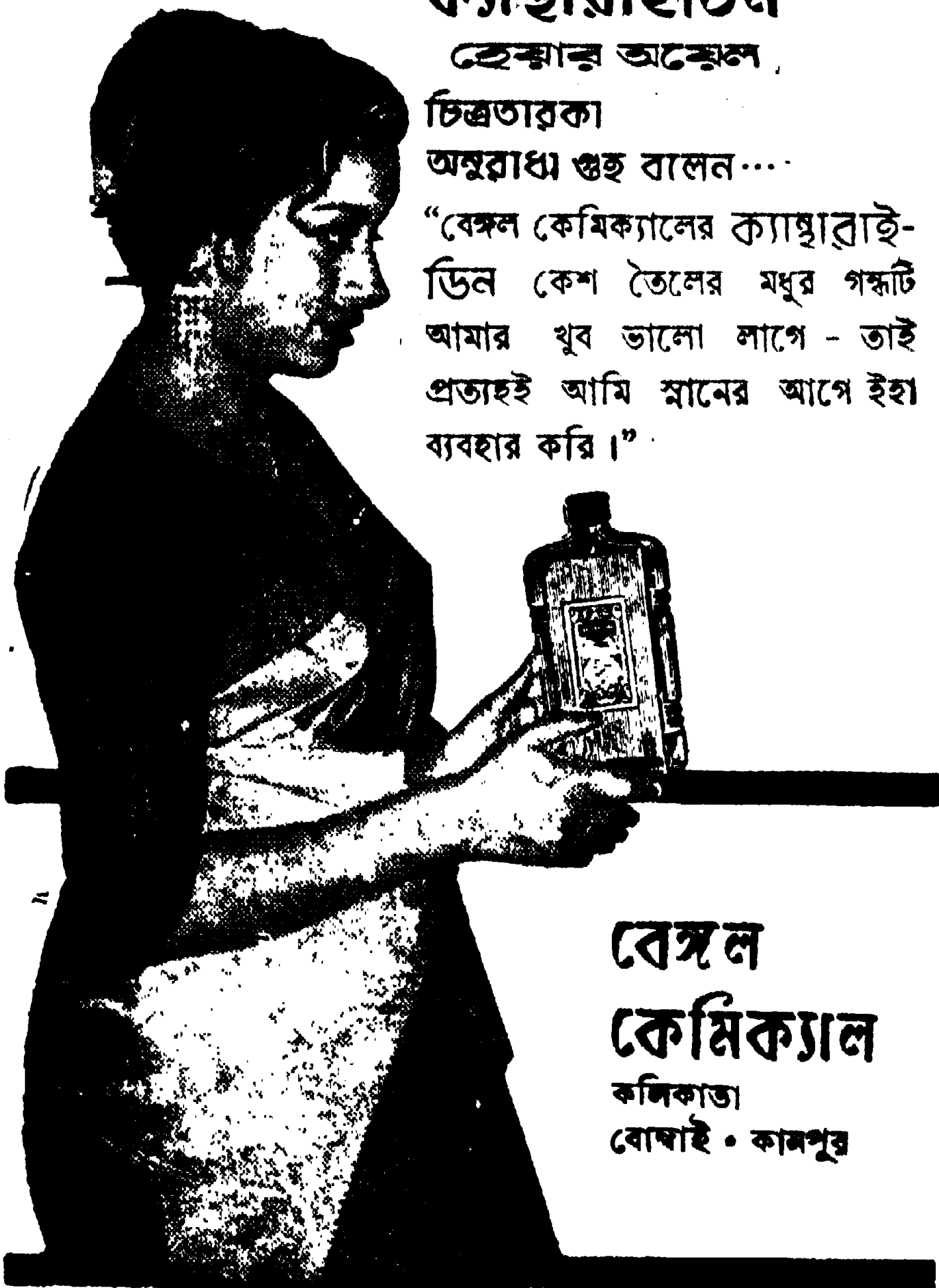
মায়ের নিজের চারিত্রিক কলঙ্কবরণ নিশ্চয়ই নাট্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং ছেলের মনের প্রতিক্রিয়া সেই পরিস্থিতিকে জটিলও করে তুলেছে। কিন্তু মাতা কর্তৃক পুত্রের হাতে জলসাঘরের চাবি দেওয়ার ব্যাপারটা যথেষ্ট নাটকীয় করবার সুযোগ ছিল, যার ফলে দর্শক-মন পরিণতি সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠত।

দলগত অভিনয় হিসেবে অভিযাত্রিক-গোষ্ঠী মোটামুটি নৈপুণ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে ওরই মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রেণু দাশগুপ্ত (মা), অরুণ দাশগুপ্ত (ছেলে—শেখর। ইনিই গ্রন্থকার এবং নাট্য-নির্দেশক), ছন্দা দেবী (আলো—শেখরের ভাবী বধূ), নবকুমার (সূর্য—শেখরের মাস্তুতো ভাই), সমর রায় (বাণীবাবু—কৌতুক চরিত্র), মনি দে (বিল্টু চাকর—আর একটি কৌতুক চরিত্র) এবং ছোট্ট মেয়ে রুনকী দাশগুপ্ত (মালা—একটি বেওয়ারিশ মেয়ে)।

মঞ্চসজ্জা এবং সঙ্গীতাংশ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়।

ভারত নাট্য পরিষদ-এর "বিসর্জন" :

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকস্মিক তিরোধানের জন্যে ভারত নাট্য পরিষদ-এর প্রস্তাবিত "বিসর্জন" অভিনয় গেল ৩রা জুলাই স্থগিত থাকবার পর আসচে ৫ই অক্টোবর স্টার রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে।

থিয়েটার লাইবার-এর "জন্মদিন" :

গেল বুধবার, ১২ই সেপ্টেম্বর রাজা-বাজারের প্রফুল্ল মেমোরিয়াল হলে

থিয়েতর লাইবার-সম্প্রদায় অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "জন্মদিন" নাটকখানি মঞ্চস্থ করেছিলেন। ক্ষমতামত্ত মানুষ আজ বিজ্ঞানকে তথা বৈজ্ঞানিককে নরমেধ যজ্ঞের হোতা রূপে ব্যবহার করছে। নিষ্পেষিত জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একদিন হয়ত' তারা বিদ্রোহী হয়ে ক্রূরতাকে করবে স্তব্ধ এবং আনবে বিশ্বজোড়া শান্তি। —এই বক্তব্যকেই প্রায় প্রতীকধর্মী নাটক "জন্মদিন"-এর মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যে পরিবেশন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সংগ্রামের মৃত্যুগুহায় ছিদে এবং কেনোর মত চরিত্রের আগমন নাটকীয় সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করে গেছে।

মঞ্চোপস্থাপনা প্রশংসনীয় হলেও কয়েকটি চরিত্রের দুর্বল অভিনয় নাটকটির উপভোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিশেষ করে বাউল যদি মতমাতানো গান গাইতে না জানে এবং ক্ষীণকণ্ঠী শান্তির সংলাপ যদি শ্রুতিগ্রাহ্য না হওয়ার ফলে দর্শকমহলে অশান্তিরই সৃষ্টি করে, তাহলে একা আচার্যদেবের ছন্দোহীন চীৎকার সমগ্র নাটকটির উপভোগে কতটুকু আর সহায়তা করতে পারে? যোগ্য শিল্পী দ্বারা যথেষ্ট মহলা দিয়ে অভিনয় করলে এই "জন্মদিন"ই নাট্যরসিক দর্শকের অজস্র প্রশংসালাভে সমর্থ হ'ত।

অগ্রদূত সংঘের বাৎসরিক উৎসব :

গেল ২৫শে আগস্ট, শনিবার, গড়ফা সাপুই ময়দানে (যাদবপুরে) অগ্রদূত সংঘের একাদশ বাৎসরিক উৎসব হয়ে গেল।

উৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার।

এই উৎসবে সংঘের সভ্য-সভ্যাগণ পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণদাস ঘোষাল, মিলন বিশ্বাস, অজিত চক্রবর্তী, সুশীল সরকার, তুষার ভট্টাচার্য, আবু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল রায়চৌধুরী, শ্রীজিৎ দত্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপবাণী মজুমদার এবং কুমকুম চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সংগীত, দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত রুচিসম্মত।

জওলা প্রোডাকসন্স-এর 'দুই নারী' :

জওলা প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় অর্ঘ 'দুই নারী'র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুখ্যাত লেখক সমরেশ বসু রচিত 'পুতুলের খেলা' কাহিনীটি 'দুই নারী' চিত্রের অবলম্বন। পরিচালক জীবন গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এই কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুপ্রিয়া, নির্মল, কাজল, বিকাশ, পাহাড়ী, জহর, অনুপ, গীতা দে, হরিধন ইত্যাদি বহু শিল্পী-সমন্বয়ে এই কাহিনীটি রূপায়িত হচ্ছে।

দুটি নারীর ক্ষমাসুন্দর রূপ একটি পুরুষের জীবনে চিরন্তন হয়ে দর্শক সাধারণের মনকে আলোকিত করবে।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুর সংযোজিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন সুরকার স্বয়ং এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

ইস্টার্ন ফিল্ম ক্র্যাফটস্ ছবিখানির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা ঃ

টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয় এই. জি, প্রোডাকসন্সের 'ত্রিধারা' ছবিটি আরম্ভ হয়েছে। "দাদাঠাকুর'-এর চিত্রগ্রহণ শেষ করে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় এ ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, কালী ব্যানার্জি, জীবেন বসু, তরুণকুমার, অজিত চ্যাটার্জী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, রেণুকা দেবী, ভারতী দেবী ও অনুভা গুপ্তা। কলাকুশলীতে রয়েছেন আলোকচিত্রে বিভূতি চক্রবর্তী, সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পনির্দেশে সত্যেন রায়চৌধুরী। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অগ্রদূত গোষ্ঠীর 'নবদিগন্ত'-র চিত্রগ্রহণ শেষ হল রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয়। কাহিনীকার বিশ্বনাথ রায়। এই সংস্থার অন্যতম বিভূতি লাহা এ ছবির চিত্রগ্রাহক ও পরিচালক। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী ও অপর্ণা দেবী। ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি প্রযোজনা করছেন শিশির মল্লিক।

এন, বি, ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনাল-এর একটি ছবি 'অকাল বসন্ত'। সম্প্রতি চিত্রপ্রযোজক সুমনা ভট্টাচার্য ও চিনু মুখোপাধ্যায় বম্বের উষাকিরণ ও অসীমকুমারকে এ ছবিতে অভিনয় করার জন্য কথা পাকাপাকি করেছেন।

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত গীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর "বিশ সাল বাদ" চিত্রের নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান

সমরেশ বসুর এ কাহিনী পরিচালনা করবেন বম্বের পরিচালক দুলাল গুহ। সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী। উষা-কিরণের বিপরীতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

চিত্ররথ গোষ্ঠীর পরিচালনায় শক্তিপদ রাজগুরুর 'কুমারীমন' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সংগীত পরিচালনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। চরিত্রভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, বিকাশ রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবী নিয়োগী, নির্মল ঘোষ ও সন্ধ্যা রায়।

শ্রীলেখা মুভিটোনের প্রথম ছবি, "দুটি ফুল একটি পাতা"র কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তরুণ পরিচালক শচীন অধিকারীর পরিচালনায় শুরু হ'য়েছে। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনতা রায় ও জ্যোতির্ময় রায় ("উদয়ের পথে", "টাকা আনা পাই" খ্যাত)। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন ঃ—জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, অমর মল্লিক ও নবাগতা সুনীতা দেবী। সংগীত পরিচালনা, গীত-রচনা, আলোকচিত্র গ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় রয়েছেন যথাক্রমে—ডি, বালসারা, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, নিমাই রায়, গৌর পোদ্দার ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাই :

প্রযোজক-পরিচালক এম. ভি রমণ তাঁর রঙিন ছবি 'জওলা'-র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন মধুবালা। সম্প্রতি সপ্তাহকালীন চিত্রগ্রহণে অংশ গ্রহণ করলেন সুনীল দত্ত, রাজ মেহরা, চন্দ্রশ্রী ও সাধনা। শঙ্কর-জয়কিষণের সুরে এ ছবির কয়েকটি কাওয়ালি গান গৃহীত হয়েছে।

জন্মদিনের একটি দৃশ্য গুরুদত্ত স্টুডিওয় গ্রহণ করলেন পরিচালক শক্তিসামন্ত 'এক রাজ' ছবির জন্য। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিশোরকুমার, যমুনা, প্রাণ ও ললিতা পাওয়ার। এ ছবির অন্যান্য চরিত্র-শিল্পীরা হলেন আগা, মদনপুরী, সুজাতা এবং জীবনকলা। সংগীত পরিচালনা করছেন চিত্রগুপ্ত।

শ্রীসাউন্ড স্টুডিওর 'ভূতনাথ' ছবির দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন নানাভাই ভট্ট। অভিনীত চরিত্রলিপির মধ্যে রয়েছেন রঞ্জন, বিজয়া চৌধুরী, মোহন চটি ও জীবনকলা। ছবির সুরসৃষ্টি করছেন ভেদপাল।

অভিনেতা-প্রযোজক ভারতভূষণ তাঁর ছবি 'দুজ কা চাঁদ'-র সংগীত গ্রহণ করলেন মেহেবুব স্টুডিওয় সংগীত পরিচালক রোসান-এর পরিচালনায়। শিল্পী ছিলেন মহম্মদ রফি। ছবিটি পরিচালনা করলেন নীতিন বসু। বিভিন্ন চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অশোককুমার, ভারতভূষণ, বি সরোজা দেবী, চন্দ্রশেখর, আগা, চমনপুরী, সুলচনা ও রত্না।

ভেনাস পিকচার্সের একটি রঙিন ছবিতে নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন রাজেন্দ্রকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। ছবির সংগীত গ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল শঙ্কর-জয়কিষণের তত্ত্বাবধানে। ছবিটি পরিচালনা করছেন টি প্রকাশরাও। প্রযোজক কৃষ্ণমূর্তি। চিত্রনাট্য লিখেছেন ইন্দ্ররাজ আনন্দ।

প্রযোজক জি পি শিপ্পি দুটি ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রথমটি রঙিন ছবি। নায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন শাম্মি কাপুর। দ্বিতীয়টির নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর এ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। পরিচালনা করছেন অমরকুমার।

মাদ্রাজ :

বিজয়া বহিনী স্টুডিও প্রায় দেড় মাস বন্ধের পর আবার চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বিদেশে বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ করে রাজেন্দ্রকুমার স্টুডিওয় এসে একটু অবাক হয়েছিলেন। কারণ 'দিল তেরে দিওয়ানা'-র নাম পরিবর্তনে হয়েছে 'সাবাস মীনা'। এই বিদেশ সফরের জন্য রাজেন্দ্রকুমারকে অভিনন্দন জানালেন সকলে। এ ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনয় করছেন শাম্মি কাপুর, মালা সিনহা, মামুদ ও শোভা খোটে। পরিচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন বি আর পান্থালু।

—চিত্রদূত

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে "বিশ্বরূপা পুরস্কারে" ভূষিত করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। ছবিতে (ডান দিক থেকে) দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন, মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরাসবিহারী সরকার, মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকারকে।

স্টুডিও থেকে বলছি
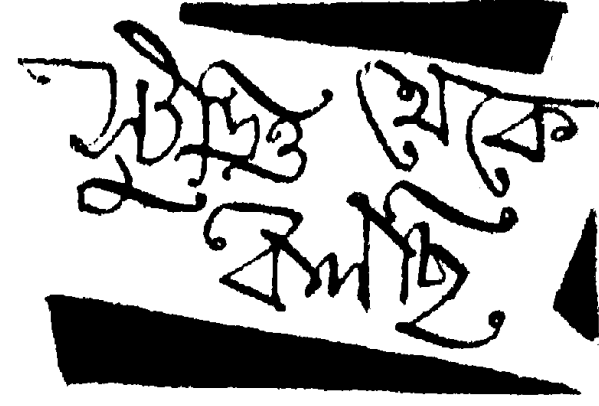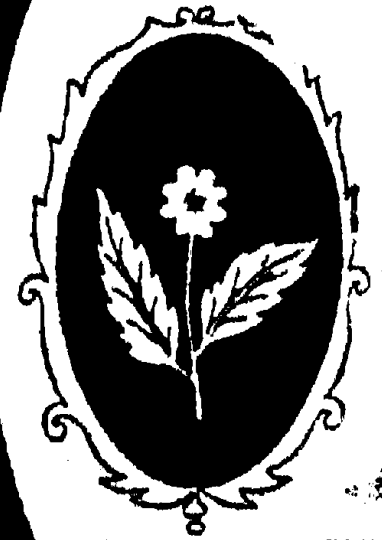
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত না হলেও টালিগঞ্জের শেষ সীমানায় ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিও। ৪ নম্বর বাসের লাস্ট স্টপ। 'একটুকরো আগুন' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ ছিল। কাহিনীর মিলি আর শেখরের সংগে দেখা হল। একজন তন্দ্রা বর্মণ আর অন্যজন বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ সম্প্রতি বম্বে থেকে ফিরেছেন। তন্দ্রা বর্মণ তার আগামী কয়েকটি ছবির নাম বললেন। পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তীর 'ন্যায়দণ্ড', অসীম পাল-এর 'দুইবাড়ী' এবং বম্বের গুরু দত্তের বাংলা ছবি 'এতটুকু ছোঁয়া'। ছবিটির চিত্রগ্রহণ হচ্ছে বম্বে। এরমধ্যে শ্রীমতী বর্মণ ওখানে এ ছবির জন্য অভিনয় করে এসেছেন। পুজোর পর আবার বম্বে যাবার কথা আছে। নতুন কয়েকটি ছবিতে এঁর অভিনয় করার কথা আছে। পরে সেই খবর আপনারা জানতে পারবেন।

'একটুকরো আগুন'-এর চরিত্রলিপি নিশ্চয়ই জানেন। কাহিনী পরে বলছি। আর. ডি. বনশল প্রযোজিত এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

বিনু বর্ধন ছবিটি পরিচালনা করছেন। সংগীত পরিচালক হেমন্ত-
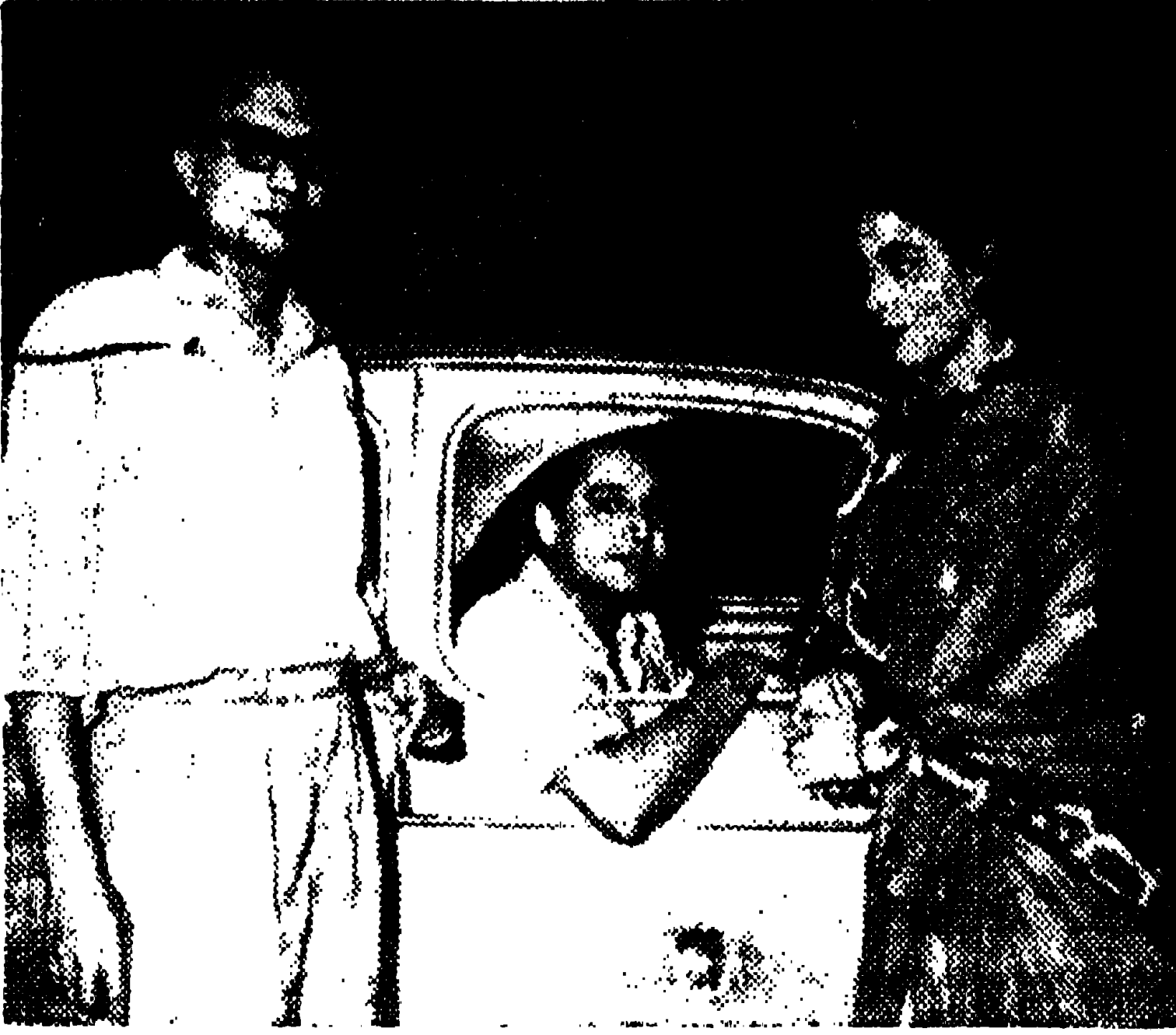
'এক টুকরো আগুন' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ পূর্বে পরিচালক বিনু বর্ধন, বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মণ

কুমার চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সুকান্ত—কালী ব্যানার্জী, শেখর—বিশ্বজিৎ, নিশিকান্ত পাহাড়ী সান্যাল, মালতী—অনুভা গুপ্তা, মিলি—তন্দ্রা বর্মণ, ললিতা—মিতা চট্টোপাধ্যায়, করুণা—আভা মণ্ডল, শীতল—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাসির চরিত্রে মিসেস ঘোষাল। এ-ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অপর্ণা দেবী, সন্তোষ সিংহ, সুব্রতা সেন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, খগেন পাঠক ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

কলাকুশলীদের মধ্যে আলোকচিত্রে দেওজীভাই। কর্মাধ্যক্ষ বিমল দে। চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হল বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মণকে নিয়ে। কাহিনীটুকু সংক্ষেপে জেনে নিলাম একজন সহকারীর কাছ থেকে। কাহিনী বলি শুনুন—

বিচিত্র মানুষ সুকান্ত দত্ত। ব্যবসায়ী জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজের প্রতিপত্তি ঘরেও বজায় রাখেন। বাইরে অহঙ্কারী ও একগুঁয়ে প্রকৃতির। শুধু অর্থ আর ব্যবসা। এমন কি এর স্ত্রী মালতী পর্যন্ত এই বিচিত্র মানুষের অন্তরের পরিচয় আজও জানতে পারেনি। সুকান্তর এই ব্যক্তিসত্তার আড়ালে মালতীর জমে ওঠা অভিমান ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হতে থাকে। একদিন সে গৃহস্বামীকে স্পষ্ট জানায় যে নারী প্রগতির এই যুগে সে সম্পূর্ণ পরাধীন নয়। ব্যক্তিসত্তা তারও আছে। এমনিভাবে তার নিজস্ব শিল্পমনকে নষ্ট হতে সে দেবে না। অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অভিমানের একটুকরো আগুনে সে ভালবাসা জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়।

মালতীর—শিক্ষা, সঙ্গীত, নৃত্য সবই লুপ্ত হতে চলেছে। এই প্রতিভার প্রেরণা কোনদিনই সুকান্ত যোগায়নি। বরং দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তবে একমাত্র ভাগ্নি মিলির মাঝে সুকান্তর ভালবাসা ছিল অটুট। তার শিক্ষা এবং সঙ্গীতের জন্য অনেক অর্থ খরচ করেছেন। এমন কি অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সাহায্য তিনি করেছেন। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ার সময় মিলির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শেখর ঘোষ। আন্তঃ কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শেখরের কাছে মিলি পরাজিত হলে সুকান্তই তখন মিলিকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—এবার কিন্তু এম, এ, পরীক্ষায় শেখরকে হারানো চাই। নিঃসন্তান সুকান্ত সেদিন বেদনায় ভেঙে পড়েছিলেন।

অসহায়া-অসুস্থ শকুন্তলার জন্য তার অন্তর কেঁদেছিল। কিন্তু মালতীর কোন খবরই সুকান্ত রাখেনি। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছুদিন অনুপস্থিতির পর সুকান্ত ফিরে এসে দেখে মালতী নীচের তলায় সিঁড়ির ধারে পার্টিশন দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন আরম্ভ করেছে। এই ব্যাপারে সুকান্ত স্তম্ভিত হল। আত্মাভিমানে লাগে। উত্তেজিতভাবে বলে—এতবড় সাহস তুমি কবে পেলে?

সুকান্ত আরও কঠোর হয়ে ওঠে। মালতী চাকরী নেয়, স্বাধীনভাবে উপার্জন শুরু করে। প্রতিসন্ধ্যায় ঘরে সঙ্গীতের আসর জমায়। উপরতলায় সুকান্ত সবই শোনে। সুকান্তও প্রস্তুত হয়। নিশিকান্ত ভাইকে বোঝায়। আর আমেরিকা ফিরৎ মাসি মালতীকে বোঝায়। কিন্তু কোন সুরাহা হল না। বরং সুকান্তের ভৃত্য শীতলের সঙ্গে মালতীর পরিচারিকা করুণার নিভৃতে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মালতীকে দেখাবার জন্যই সুকান্ত রূপসী ললিতাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানায়। ফূর্তি করে তাকে নিয়ে। এমনিভাবে প্রতিযোগিতার রূপ বেড়ে চলে। মালতীর সঙ্গীত আসরে খ্যাতনাম কণ্ঠশিল্পী শেখর ঘোষকে দেখা যায়।

সুকান্ত অলক্ষে মালতীকে অনুসরণ করে একদিন। ব্যবসার জন্য অনেকদিন বাইরে কাটাতে হল। এই অনুপস্থিতিতে মালতীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। করুণ সুরে করুণা বলে—চলনা দিদিমণি, আমরা আবার উপরতলায় যাই।

মালতীর ব্যক্তিসত্তায় বিদ্রোহ মন অন্তরকে স্পর্শ করে। অব্যক্ত হাহাকারে ভেঙে পড়ে। তারপর জীবন-যন্ত্রণার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বহু প্রতীক্ষার অবসানে শেষ পরিণতিটুকু মিলনান্তই হল।

—চিত্রদূত

রবীন্দ্র-কাননে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

নতুন দেশী ছবি

অভিনেত্রী আনে ক্যাথরীন ব্যুরগার

পূর্ব জার্মানীর প্রতিভাময়ী তরুণী অভিনেত্রী আনে ক্যাথরীন প্রথম ছবি "বার্লিন রোমান্সে" নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে একটি নাটকের স্কুলে শিক্ষালাভের জন্যে তিনি একবার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু অভিনয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে না পেরে নাটকের স্কুলে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি। এর কিছুদিন পরেই বাল্টিক সমুদ্রতীরে বেড়াতে যান তিনি। দৈবাৎ এখানে তাঁকে আবিষ্কার করেন পরিচালক গেরহার্ট ক্লাইন। তিনি তাঁর নতুন ছবি "বার্লিন রোমান্স"-এর জন্যে নতুন মুখ খুঁজছিলেন। প্রায় ১৪০০০ নায়িকার ভূমিকাপ্রার্থিনীদের মধ্যে নির্বাচিত হন আনে ক্যাথরীন। বার্লিন রোমান্স'-এর সাফল্যের পর চারটি বক্স-অফিসধন্য চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন : "টিমুস্ট অফ লাভ" "ফাইভ ডেজ ফাইভ নাইটস" (এই চিত্রের খবর এই বিভাগে আগেই দেয়া হয়েছে) এবং "রয়েল চিল্ড্রেন"। চলচ্চিত্র ছাড়াও মঞ্চে এবং টেলিভিশনেরও ক্যাথরীন জনপ্রিয়া অভিনেত্রী।

।। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার ।।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। এবারের গোল্ডেন লায়ন মূর্তিটি একটি সোভিয়েট এবং একটি ইটালীয় ছবি যুগ্মভাবে অর্জন করেছে। সোভিয়েট চিত্রটির নাম "দি ইনফ্যানসি অফ আইভান"। পরিচালনা করেছেন আন্দ্রেই টারকোভস্কি। টারকোভস্কির এই চিত্রটিই প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র। ভ্লাডিমির বোগোমোলভ-এর একটি ছোট গল্প অবলম্বনে চিত্রটি গৃহীত হয়েছে।

ইটালীয় ছবি "দি ফ্যামিলী ডায়েরী"র পরিচালক হলেন ভ্যালেরিও জুরলিনী।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চিত্র হিসেবে যোগদান করেছিল "ভগ্নী নিবেদিতা"।

।। কয়েক চিত্র-পরিচয় ।।

বার্লিনে রোমান্স

উর্শি চরিত্রটি একটি লাস্যময়ী তরুণীর চরিত্র। এই ছবিতেই প্রথম জনচক্ষুর সমক্ষে আসেন আনে ক্যাথরীন।

টিমাস্ট অফ লাভ

সেজা আর্ট স্কুলের ছাত্রী, জীবনকে চেনবার জন্যে স্কুলের বন্ধে কারখানায় কাজ করে। তার ইচ্ছে খাঁটি জীবনকে সে রঙ-তুলিতে ধরে রাখবে।

ফাইভ ডেজ—ফাইভ নাইটস্

ক্যাথরীন কনসানট্রেশান ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফিরে দেখল যুদ্ধোত্তর জীবনের জটিল সমস্যাকে। এই ছবিটি রুশ-জার্মান প্রযোজনায় নির্মিত।

রয়েল চিল্ড্রেন

ম্যাগডালেনার চরিত্র-চিত্রণ অ্যানে ক্যাথরীনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ম্যাগডালেনা ভালবাসত মাইকেলকে। কিন্তু নাৎসী উত্থানের মেঘে তাদের প্রেম মলিন হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রেমকে তারা ফিরে পেয়েছিল স্বাধীন মুক্ত জার্মানীতে।

খেলাধূলা

দর্শক

আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

এ বছরের আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের সিঙ্গলস খেলার ফলাফল সম্পর্কে আমেরিকার এবং অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সব থেকে বেশী ছিল। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার রড-লেভারের জয়লাভের অর্থ ছিল—একই বছরে পৃথিবীর চারটি প্রধান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় দুর্লভ খেতাব লাভ যা একমাত্র করেছেন আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে। মহিলাদের সিঙ্গলসে আমেরিকার ডার্লিন হার্ডের কাছে এ বছরের আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ—উপর্যুপরি তিন বছর খেতাব লাভ ক'রে রেকর্ড করার বছর। অন্য দিকে মহিলাদের সিঙ্গলসে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মার্গারেট স্মিথের জয়লাভের গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল—এই বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম খেতাব লাভ। টেনিস খেলার বিশেষজ্ঞরা প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের পারদর্শিতা বিচার ক'রে পুরুষ বিভাগে রড লেভার এবং মহিলা বিভাগে মার্গারেট স্মিথকে শীর্ষস্থান দেন। দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। কিন্তু বাছাই তালিকার উপর খুব বেশী নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। প্রতিযোগিতায় অসংখ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফলে সমর্থকদের বহুবারই হতাশ হ'তে হয়েছে। দৃষ্টান্তের জন্যে বেশী দূরে যেতে হবে না; লেভার এবং মার্গারেট স্মিথের কথাই ধরা যাক।

গত বছর রড লেভার উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় প্রথম স্থান পেয়ে সিঙ্গলসের ফাইনালে জয়লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি আমেরিকান জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়েও ফাইনালে তিন নম্বর খেলোয়াড় এবং স্বদেশবাসী রয় এমারসনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। গত বছর তিনি অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালেও এমারসনের কাছে বাধা পেয়েছিলেন। এ বছরের গত জুন মাসের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশেষজ্ঞরা এক বাক্যে মহিলাদের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। মিস স্মিথের মাথায় তখনও অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের বিজয় মুকুট জ্বল-জ্বল করছে। মিস স্মিথের ক্রীড়া-চাতুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে দর্শক-সাধারণ তাঁরই সাফল্য কামনা করছেন। এমন সময় তাঁরা নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়লেন—মিস স্মিথ প্রথম খেলাতেই (যদিও দ্বিতীয় রাউণ্ড) পরাজিত হলেন আমেরিকার এক নগণ্য খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিটের কাছে। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড়ের প্রথম খেলাতেই বিদায়, প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম নজির হয়ে রইলো।

আলোচ্য আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস বিভাগের এক নম্বর খেলোয়াড় রড লেভার এবং মহিলাদের সিঙ্গলস বিভাগের এক নম্বর খেলোয়াড় মিস মার্গারেট স্মিথ কিন্তু বিচারকমণ্ডলীকে অপদস্থ করেননি এবং তাঁদের সমর্থকদেরও হতাশ করেননি। গত বছরের ফাইনালে যাঁদের কাছে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন তাঁদের বিপক্ষেই এবার ফাইনাল খেলে জয়লাভ করেছেন। তবে ১৯৬২ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা অপ্রত্যাশিত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। এ বছরের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী কারেন সুসম্যান খেতাব লাভ করেছিলেন। শ্রীমতী সুসম্যান আলোচ্য প্রতিযোগিতায় তৃতীয় রাউণ্ডে আমেরিকার নগণ্য খেলোয়াড় স্কুল-ছাত্রী ভিকি পামারের কাছে পরাজিত হন। মিস পামারের বয়স মাত্র ১৭ বছর। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেরা সুকোভা এ বছরের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় বাছাই তালিকায় কোন স্থান না পেয়েও তালিকাভুক্ত নামকরা খেলোয়াড়দের পরাজিত করে ফাইনালে উঠে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীমতী সুকোভা আলোচ্য প্রতিযোগিতার চতুর্থ রাউণ্ডে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ডার্লিন হার্ডের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায় নেন।

১৯৬২ সালের আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত খেলোয়াড় রড লেভারের বিরাট সাফল্য লন্ টেনিস খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি রড লেভার আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ফাইনালে জয়ী হয়ে একই বছরে পৃথিবীর চারটি প্রখ্যাত লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় (অস্ট্রেলিয়া, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। এই দুর্লভ সম্মান প্রথম লাভ করেন ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা), ১৯৩৮ সালের উপরিল্লিখিত চারটি প্রতিযোগিতায়। সুদীর্ঘ ২৩ বছর পর ডোনাল্ড বাজের রেকর্ডের সমান অংশীদার হলেন অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য কিছু কিছু আছে। দুজনেরই মাথার চুল রক্তাভ এবং মুখমণ্ডল ফুট-ফুট দাগযুক্ত। লেভার ন্যাটা খেলোয়াড়। খেলার দিক থেকে এখানেই বাজের সঙ্গে তাঁর বড় পার্থক্য। লেভারের বয়স ২৩। বাজ তাঁর থেকে এক বছর আগে

রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)

ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা)

অর্থাৎ ২২ বছর বয়সে এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। আমেরিকার ফরেস্ট হিলের টেনিস কোর্ট লেভারের সাফল্য লাভের পথে এবার আর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; গত দু' বছর লেভার এইখানেই পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালের ফাইনালে তিনি তাঁর স্বদেশবাসী রয় এমারসনের কাছে স্ট্রেট সেটে অপ্রত্যাশিত-ভাবে পরাজিত হন। লেভার ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতি-যোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব যেভাবে লাভ করেছিলেন তাতে সকলেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব তিনিই পাবেন। এবার সেই এমারসনকেই তিনি ফাইনালে পরাজিত করে গত বছরের পরাজয়ের শোধ তুলে নেন। এই নিয়ে লেভার এবং এমারসনের মধ্যে ৮ বার খেলা হল। লেভারের জয় ৬ বার। লেভারের জয়লাভে আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার একটানা প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রইলো। এই নিয়ে উপর্যুপরি সাত বছর অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করলেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে এই নিয়ে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে উপর্যুপরি তিন বছর অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন।

তাছাড়া এবার ফরেস্ট হিলে অনুষ্ঠিত অপর দুটি অনুষ্ঠান—মহিলা-দের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালেও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা জয়-লাভ করেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কুড়ি বছর বয়সের কুমারী মার্গারেট স্মিথ গত দু' বছরের চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার কুমারী ডার্লিন হার্ডকে পরাজিত ক'রে আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজনা করলেন। তিনিই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান হিসাবে আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতি-যোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। আমেরিকার ডার্লিন হার্ড এবার জয়লাভ করলে 'হ্যাট-ট্রিক' করতেন। এবারের ফাইনালে পরাজিত হয়ে মিস হার্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথকে নিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন বাইরের খেলোয়াড় আমেরিকার জাতীয় লন্ টেনিস প্রতি-যোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। মার্গারেট স্মিথের আগে ১৯৩০ সালে বৃটেনের বেটী নুথল এবং ১৯৫৯ সালে ব্রেজিলের মিস মারিয়া বুইনো সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জির খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চতুর্থ রাউণ্ডে উঠে মেক্সিকোর রাফেল ওসুনার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলা থেকে আমেরিকা বড় তাড়াতাড়ি হটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমে-রিকা আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস খেলায় একাদিক্রমে যে কয়েক বছর প্রাধান্য লাভ করেছিল অস্ট্রেলিয়া সেই সময়ে ছিল তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বর্তমানে আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—দলগত এবং ব্যক্তিগত উভয় খেলাতেই।

পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে ১নং বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৪নং বাছাই খেলোয়াড় আর ওসুনাকে (মেক্সিকো) পরাজিত করেন। অপরদিকে ২নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৩নং বাছাই খেলোয়াড় সি ম্যাকিনলেকে (আমেরিকা) পরাজিত ক'রে ফাইনালে স্বদেশবাসী রড লেভারের সঙ্গে মিলিত হ'ন।

মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে ১নং বাছাই খেলোয়াড় মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ভূতপূর্ব আমে-রিকান চ্যাম্পিয়ান এবং এবারের ৩নং খেলোয়াড় মারিয়া বুইনোকে পরাজিত করেন। অপরদিকে গত দু' বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ২নং বাছাই খেলোয়াড় মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) পরাজিত করেন মিস ভিকি পামারকে (আমেরিকা)।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে রয় এমারসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৯-৭ ও ৬-৪ গেমে মিস ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: ফ্রেড স্টোলী এবং মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫ ও ৬-২ গেমে ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোহিলিং (ফ্লোরিডা) এবং লেসলী টার্ণারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

।। ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট ।।

১৯৬২ সালের ইংলিস কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় ইয়র্কসায়ার দল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। এই নিয়ে ইয়র্কসায়ার দল ২৬ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হ'ল। এর মধ্যে ১৯৪৯ সালে তারা মিডলসেক্সের সঙ্গে যুগ্মভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ইয়র্ক-সায়ার প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় ১৮৯৩ সালে। উপর্যুপরি তিন বা ততোধিক বার ইয়র্কসায়ার দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে: ১৯০০-১৯০২; ১৯২২-১৯২৫; ১৯৩১-১৯৩৩; ১৯৩৭-১৯৩৯ এবং ১৯৪৬ সালে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দল উপর্যুপরি ৭ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে একটানা প্রাধান্য বজায় রাখে ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে ইয়র্কসায়ার দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সারে দলের একটানা প্রাধান্য খর্ব করে। ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের লীগ চ্যাম্পি-য়ন ইয়র্কসায়ার দল ১৯৬১ সালে রানার্স-আপ খেতাব লাভ করেছিল।

।। কাউণ্টি রেকর্ড ।।

এক ইনিংসে সর্বাধিক রান:

ইয়র্কসায়ারের পক্ষে: ৮৮৭ রান (ওয়ারউইকসায়ার দলের বিপক্ষে)

ইয়র্কসায়ার দলের বিপক্ষে: ৬৩০ রান—সামারসেট

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান:

ইয়র্কসায়ারের পক্ষে: ২৬ রান (সারে দলের বিপক্ষে)

ইয়র্কসায়ারের বিপক্ষে: ১৩ রান (নটিংহ্যামসায়ার)

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান:

ইয়র্কসায়ারের পক্ষে: ৩৪১ রান জি হার্স্ট (লিস্টারসায়ার দলের বিপক্ষে)

ইয়র্কসায়ারের বিপক্ষে: ৩১৮ নট আউট—ডব্লউ জি গ্রেস (প্লস্টার-সায়ার)

।। আই এফ এ শীল্ড ।।

১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হতে চলেছে। কেবল সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা বাকি। চতুর্থ রাউণ্ডে আটটি দলের মধ্যে স্থানীয় দল ছিল ৬টি—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, উয়াড়ী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং বাটা স্পোর্টস ক্লাব। চতুর্থ রাউণ্ডে বহিরাগত দল ছিল মাত্র দুটি—হায়দরাবাদ একাদশ এবং ইস্টার্ণ কমান্ড। ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে ইস্টার্ণ কম্যাণ্ড দলকে, হায়দরাবাদ একাদশ ২—০ গোলে উয়াড়ীকে, বি এন আর ২—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে এবং মোহনবাগান ২—১ গোলে বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা: ইস্টবেঙ্গল বনাম হায়দরাবাদ এবং মোহনবাগান বনাম বি এন আর।

চতুর্থ এশিয়ান গেমসের জের

জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমস শেষ হয়েছে। কিন্তু এই চতুর্থ এশিয়ান গেমস নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সভা হওয়া সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার অন্যায় হস্তক্ষেপে ইস্রায়েল এবং ফর্মোজা শেষ পর্যন্ত জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগ-

বাণীপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর শিক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রখ্যাত এ্যাথলীট মিঃ কালব্রেথ সটপুটের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন। রাজকুমারী স্পোর্টস কোচিং স্কিম অনুযায়ী মিঃ কালব্রেথ নয় মাসের চুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অবস্থান করবেন।

দান করতে পারেনি। এই অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এবং এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের আদর্শের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রবীণ শিক্ষা-বিদ্ শ্রী জি ডি সোন্ধি (এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং জাকার্তায় আন্তর্জাতিক অপেশাদার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের পর্যবেক্ষক) জাকার্তার একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের বিষ-নজরে পড়ে যান। শ্রীসোন্ধির প্রতি অশোভন বিক্ষোভ এবং ইস্রায়েল ও ফর্মোজাকে চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগ-দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা—এই দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের কাউন্সিল এবং কংগ্রেস সভা সম্প্রতি তাদের রায় দিয়েছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের কাউন্সিল সভায় ইন্দোনেশিয়ার ট্র্যাক ফেডারেশনকে ৬ মাসের জন্য বরখাস্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৭ই তারিখের কংগ্রেসের সভায় এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়াকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা ক'রে কেবল সতর্ক করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাকার্তায় শ্রী জি ডি সোন্ধির প্রতি অশোভন আচরণের জন্য শ্রীসোন্ধির কাছে ইন্দোনেশিয়াকে সর-কারীভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যে-সব এ্যাথলীট যোগদান করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কংগ্রেসের সভায় চতুর্থ এশিয়ান গেমস কেবলমাত্র একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এই অনুষ্ঠানকে এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমান মর্যাদায় তালিকা-ভুক্ত করা হয়নি।

পরলোকে কানু রায়

বাংলার প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীজে এন রায় (কানু রায়) ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান দলের পক্ষে তিনি রাইট আউটে খেলেছিলেন। ১৯১১ সালে মোহনবাগান দলের পক্ষে যে এগারজন খেলোয়াড় প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের গৌরব লাভ ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে আজ মাত্র এই দু'জন জীবিত আছেন—রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জি এবং হীরালাল মুখার্জি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬৬৩	সম্পাদকীয়		
৬৬৪	সোনালী সৈকত	(কবিতা)	— শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৬৪	অন্তরালে	(কবিতা)	— শ্রীঅনন্ত দাশ
৬৬৪	কালরাত্রে	(কবিতা)	— শ্রীশিশিরকুমার দাশ
৬৬৫	পূর্বপক্ষ		— শ্রীজৈমিনি
৬৬৭	বাংলা বইয়ের ভূমিকা		— শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
৬৭৫	অপরাজিতা	(গল্প)	— শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
৬৮২	বিজ্ঞানের কথা		— শ্রীঅয়স্কান্ত
৬৮৫	মেঘের উপর প্রাসাদ	(উপন্যাস)	— শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৬৯১	অথ লণ্ডন কথা		— শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬৯৩	জানাতে পারেন		— শ্রীঅশোককুমার সাহা, শ্রীসুচিত দাস ও শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬৯৪	তাইতো এ যে বড়ই দুঃসংবাদ দারা	(ব্যঙ্গচিত্র)	— শ্রীকাফী খাঁ — শ্রীসমরজিৎ কর
৬৯৯	পৌষ-ফাগুনের পালা	(উপন্যাস)	— শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
৭০৩	সাহিত্য সমাচার		
৭০৪	প্রদর্শনী		— শ্রীকলারসিক
৭০৫	পিঞ্জরে ভাল্লুক, সিংহ, ময়ূর	(গল্প)	— শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়
৭০৯	কোম্পানীর আমলের ডাকাত		— শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়
৭১২	সুরের সুরধুনী		— শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৭১৪	সাত-পাঁচ : ঘুম, ঘুম!		— শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
৭১৫	দেশেবিদেশে		
৭১৭	ঘটনাপ্রবাহ		
৭১৮	সমকালীন সাহিত্য		— শ্রীঅভয়ঙ্কর
৭২২	টেলিভিশন অপেরা		— শ্রীরূপদ চৌধুরী
৭২৪	প্রেক্ষাগৃহ		— শ্রীনান্দীকর
৭৩৩	খেলাধুলা		— শ্রীদর্শক

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১১ই আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 28th September, 1962
40 Naya Paise

পশ্চিমবঙ্গকে সমস্যামুক্ত করিতে হইলে প্রথমেই স্থির করা প্রয়োজন যে কোন্‌টির গুরুত্ব অধিক, সমস্যাপূরণের না ভুয়া নীতিবাক্যের। এ বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়, কেননা এই ভুয়া নীতিবাদই তাহাদের প্রধান অস্ত্র যাহারা বাঙালীর স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান অন্তরায়। এই অস্ত্রের ব্যবহার বাঙালীর বিরুদ্ধে যতটা হইয়াছে এবং বাঙালী তাহা যেরূপে নীরবে সহ্য করিয়াছে অতটা বা সেইভাবে ভূ-ভারতে আর কোথায়ও হয় নাই। এবং গৈবী মন্ত্রঃপূত অস্ত্রের ব্যবহারের ফলেই বাঙালীর দুর্দশা এরূপে বাংলামায়ের অভিশপ্ত সন্তানদের অতলে নিমজ্জিত করিতেছে।

আমরা আদর্শবাদ বা নীতিবাদের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু সেই সকল আদর্শ অবলম্বন করার বা সেই নীতিবাদের অনুসরণ করার রীতি ও মাত্রা স্থানকালপাত্র ও অবস্থা বিচারের উপর নির্ভর করে। সশস্ত্র দস্যুর দল যখন গৃহস্থের উপর অস্ত্র চালাইয়া তাহাকে আহত ও নিরুপায় করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনে ও তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগে উদ্যত, বা দুর্বৃত্তের দল যখন অসহায় নারীর উপর বলপ্রয়োগে অথবা ধর্ষণে উদ্যত, তখন রক্ষীরা সেই অত্যাচারিদিগের দমনে অস্ত্রপ্রয়োগ করার সময় যদি দুরাচারগণ চীৎকার করিয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম" উচ্চারণ করে তখন সেই রক্ষীদের কর্তব্য কোন্‌ নীতি বা আদর্শ অনুযায়ী পালন করা উচিত? রক্ষীদের পক্ষে কর্তব্য হিসাবে কোন্‌টার অধিক গুরুত্ব, অসহায়ের রক্ষণ ও দুষ্টের দমন না বল ও অস্ত্রপ্রয়োগ রূপ "হিংসাত্মক" কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া লুণ্ঠনকারী ও ধর্ষণকারীদিগের কার্যসিদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া?

এই উদাহরণ হয়ত অনেকের কাছে অতিরঞ্জিত বা অপ্রয়োজন মনে হইবে। কিন্তু ইহা একেবারেই অতিরঞ্জিত বা অসম্ভব নয়। আসামে দুর্বৃত্তের দল ব্যাপকভাবে অসহায় ও স্থানীয়ভাবে সংখ্যালঘু বাঙালীর উপর লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও নারীধর্ষণ রূপ পাশবিক অত্যাচার চালাইবার পরে যখন বাঙালীর পক্ষ হইতে এই দুর্বৃত্তগণের দমন ও শাস্তিদানের দাবী আসে তখন নয়াদিল্লীর এক মহারাষ্ট্রীয় গান্ধীবাদী "অতি-ব্রাহ্মণ" অহিংসানীতির নজীর দিয়া দুর্বৃত্তগণের বিচার ও শাস্তিদানের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন। এবং সেই নীতিবাদের অপূর্ব সমর্থনপূর্ণ হিন্দী ও ইংরাজীতে লেখা ও ছাপা, হাজার দুই প্রচারপত্রও নয়াদিল্লীর লোকসভা, সংবাদপত্রের কার্যালয় ইত্যাদিতে বিলি করেন। তাঁহার এই মেকী গান্ধীবাদের যুক্তির প্রতিবাদ বাংলার কোনও মুখপাত্র বা সংবাদপত্র করেন নাই সুতরাং ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। এইরূপে উদাহরণ আরও অসংখ্য দেওয়া যায় যেখানে ঐ ভাবে ন্যায়-নীতি ও আদর্শের মেকী চালাইয়া অসহায় ও মূক বাংলামায়ের সন্তানদিগকে ভিন্ন রাজ্যের চতুর ব্যক্তিগণ শোষিত, প্রবঞ্চিত ও সম্বিৎহারা করিয়াছে ও করিতেছে। প্রবাদে বলে, "বোবার শত্রু নাই" কিন্তু বাঙালীর এই জাতীয় অসংখ্য প্রচ্ছন্ন শত্রু নীতিবাদ ও আদর্শবাদের ভেক ধরিয়া নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতেছে।

আমরা নীতিবাদ ও আদর্শবাদের বিরোধী একেবারেই নই। কিন্তু যেখানে ঐভাবে খল ও প্রতারকগণ মেকী ন্যায়-নীতি আশ্রয় করিয়া নিজেদের স্বার্থ-পূরণের জন্য বা নীচ হিংসাদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য চেষ্টিত হয়, সেখানে আমাদের মতে "শঠে শাঠ্যম্‌ সমাচরেৎ" নীতিই একান্তভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের এই প্রসঙ্গ অবতারণা করার কারণ রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠিত "কর্মসংস্থান উপদেষ্টা কমিটির" প্রথম বৈঠকের সংবাদের মধ্যে। সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদিগকে অধিক সংখ্যায় নিয়োগের পথপ্রদর্শনের অনুরোধ জানাইবার কালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, "রাজ্যের বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একদিকে যেমন অনেক ক্ষুদ্র কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সংস্থায় রাজ্যের সন্তানদিগকে আরও কাজ দিতে হইবে।" ইহা অতি উত্তম কথা, কিন্তু ইহার পর তিনি নাকি বলেন "ইহা প্রাদেশিকতার কথা নয় এবং বাংলাদেশ শুধু বাঙালীদের জন্য এই দাবীও তিনি করিতেছেন না। কিন্তু এই রাজ্যের বিশেষ অবস্থার বিচার করিলে স্থানীয় লোকদের নিয়োগের গুরুত্ব সকলেই নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।"

আমরা জানিতে চাই যে পশ্চিমবাংলার অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় পশ্চিম বাংলার সন্তানদের নিয়োগ করার প্রশ্নের মধ্যে প্রাদেশিকতা বা অন্যের ন্যায়বিচার ও স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে কেমনে? বিহারের মুখ্যমন্ত্রী যখন (প্রায় আট-দশ বৎসর পূর্বে) বলেন যে, বিহারে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি শিল্প-সংস্থায় বিহারের সন্তানদিগকে গরিষ্ঠ অনুপাতে (পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় নয়) নিয়োগ করিতে হইবে, তখন তিনি প্রাদেশিকতা বা অন্যের ন্যায়বিচারের কোনও প্রসঙ্গই তুলেন নাই—এবং তাঁহার দাবী সফল হইয়াছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সুবিধা সকল অধিকার অন্য সকলের—শুধু পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের নহে। এই অবস্থার প্রতিকার করিবে কে?

কবিতা

সোনালি সৈকত

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নিজেকে সহস্র প্রশ্নে প্রত্যহই বিদ্ধ করি,—উক্তি-পুনরুক্তি ঃ
বালিতেই নাম লিখে, অনুতাপে পা-দিয়ে মাড়াই সেই বালি ;
দুর্যোগসমুদ্রে খুঁজি বাতিঘর,—অন্ধকারে আলো
একফালি ;
গোধূলির আভা দেখে প্রতারিত মন ভাবে,—মুক্তি।

ইচ্ছার জারুল ঊর্ধ্ব আকাশকে ফুঁড়ে চায় অশ্বত্থ-বিস্তার ;
কোথাও আড়ালে আছে আকাঙ্ক্ষিত প্রাংশুলভ্য ফল ;
পাবেকি, কী পাবে মন? দিকে দিকে জিগীষা ও ভয় উচ্ছল ;
নিষ্ফল ডুবুরী, তবু ডুব দেবে মৃত্যুমুখ সমুদ্রে আবার!

অন্ধকার প্রান্তরেই প্রাণময় আলো ছিলো,
আলো আসবে ফের!
খরা মাঠ, শুকনো জলা, চিন্তাদীর্ণ আমাদের মন
ভালোবাসে সুদিনের কথা, আর প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ;
রক্তাক্ত হৃদয়, চোরাবালি নয় সোনালি সৈকত হৃদয়ের।

অন্তরালে

অনন্ত দাশ

আমায় ফেরাবে বলে বক্ষমূলে এখনও অম্লান
সংবৃত সূর্যের রেখা খেলা করে চক্ষে, পদদ্বয়ে
চিরায়ত প্রতীক্ষায় তুমি যেন প্রেমে ঘূর্ণমান
আমার ব্যাকুল তৃষ্ণা অন্তরিত দুঃখের তন্ময়ে;
তবু কে অবাধ হাতে ঐ ফুলে রাত্রির সম্ভার
যন্ত্রণায় ভরে দেয় আরক্তিম, মদির, বিহ্বল;
কত অশ্রু বুকে আজ, তবে কেন, তোমার বিস্তার
এই বাতায়ন থেকে অন্তরীক্ষে ছোটে অবিরল।

বিকল্প পাইনা কিছু, স্থলকুঞ্জে, ঐ দ্যুতিমত
হৃদয়ের অঙ্গীকারে যে হবে নির্ভুল অধিকার
মুকুর, জানি সে মায়া, জ্যোৎস্নার হীরকে প্রতিহত
তবু দুঃখ প্রতিভাসে, তুমি হ'লে প্রিয় গন্ধভার।

ঐ গৃহে ফিরে যাব, অন্ধকার প্রদোষ ফুরালে
যে অশ্রু আমার প্রেম, তুমি তার স্থির অন্তরালে।

কালরাত্রে

শিশিরকুমার দাশ

কালরাত্রে হঠাৎ ঝড় কেটে যাবার পরে
আকাশ দেখি অবিশ্বাস্য নীল
ভগবানের নিজের আঁকা ছবি
সাদা মেঘে সোনার তারায় করছিল ঝিলমিল
কালরাত্রে হঠাৎ ঝড় কেটে যাবার পরে।

পাতাহারানো গাছের কঙ্কালে
কোথা থেকে এল যে এক হাওয়া
লাগাম ছেঁড়া বুনো ঘোড়ার মত
চোখ যেন তার নেশার আগুন পাওয়া
শীতের রাত্রি উড়িয়ে নিতে চায়
অর্ঘ্য দেবে বাসন্তিকার পায়
পাতায় ভরা গাছের ডালে ডালে।

কালরাত্রে হঠাৎ ঝড় কেটে যাবার পরে
চেয়ে দেখি চাঁদের চাঁদ-মুখ
সে যেন কোন অতিথি দূর দেশের
বহু দেশের বহু দুঃখসুখ
দুচোখে যে তার, যাবে সে ফিরে ঘরে
কালরাত্রে হঠাৎ ঝড় কেটে যাবার পরে।

পায়ের নীচে বরফভেজা ঘাস
ফেলছিল এক নরম সুখশ্বাস
ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ফুলের গন্ধ ঘাসে
একটি দুটি কাতর পাখি নিভৃত বিশ্বাসে,
চেয়ে দেখি তার ওপরে স্বয়ং ভগবান
সপ্তস্বরা বীণার তারে বেঁধেছিলেন তান।
মেঘের মত গভীর স্তরে স্তরে।
কালরাত্রে হঠাৎ ঝড় কেটে যাবার পরে।

পূর্বপক্ষ

জ্যোর্মান

কয়েকদিন আগে সকালবেলার কাগজে একটা ছোট্ট খবর দেখে অনেকেই হয়ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। খবরটা কী তা অবশ্য আমি এক্ষুণি বলছি না। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, অনেকেই ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত মনে করেছিলেন, এবং এমন-যে হতে পারে সে বিষয়ে হয়তো সন্দেহও প্রকাশ করেছিলেন।

ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন আপনাদের অনেকের মতোই আমিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই, যাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, তা আমি আপনাদের দিতে পারব না। কিন্তু আরো কতগুলি ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি যার ফলে কী করে এই ঘটনাটি ঘটল তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

ধরা যাক একজন ভদ্রলোক, তাঁর নাম রামবাবু, তিনি পুজোর ছুটিতে বাইরে যাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। রামবাবু খুব ধনী ব্যক্তি নন, বাইরে বেরোলে যে বিলক্ষণ অর্থব্যয় হয় তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তবু তাঁর ইচ্ছে হল তিনি দিনকতক ঘুরেই আসবেন।

এই ইচ্ছেটার পিছনে এমন অনেকগুলি কার্যকারণের পটভূমি ছিল যে-বিষয়ে রামবাবু নিজেও হয়ত সচেতন ছিলেন না।

রামবাবু সকালে উঠে প্রতিদিন বাজারে যেতেন। মাছ ও তরিতরকারীর দোকানে যেখানে যতটুকু দর-দস্তুর করা দরকার তা তিনি করতেন। বাড়ি এসে স্নান করে খেয়ে ট্রামে বা বাসে করে অফিসে যেতেন। পথে ডানদিক বা বাঁদিক, রাস্তার যেদিকটাই নজরে আসুক, নিঃস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। বলা বাহুল্য, এইভাবে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি তাঁর প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল। তবু চোখ থাকলে দেখতে হয়, অতএব রামবাবুকেও দেখতে হত, এবং দেখে তিনি মোটেই খুশী হতেন না।

পরিবর্তন যে কিছু কিছু না হত এমন নয়। যেমন, যদুবাবুর বাজারের মোড়ে একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে কলাপাতা চিবোচ্ছে, এই দৃশ্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে প্রতিদিন ওই একই জায়গায় ষাঁড়টি একই পোজে দাঁড়িয়ে কলাপাতা চিবোয়। কিন্তু রামবাবুর মনে হয় যেন অনন্তকাল ধরে ষাঁড়টি শুধু কলাপাতাই চিবিয়ে চলেছে। কিংবা, ওদিকে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে যে লোকটি রুমাল দিয়ে ঘনঘন

তাঁর টাক মুছেন, তিনিও যেন প্রতিদিন ঠিক ওই সময় ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে টাক মুছে থাকেন।

যা হোক, এইভাবে একসময় রামবাবু অফিসে গিয়ে পৌঁছন। তারপর একই চেহারার কতগুলো ফাইল-পত্তর খুলে প্রতিদিন একই কাজ করে চলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়, তাও প্রায় একই জাতের। অবশ্য এমন নয় যে শ্যামবাবুর ছেলের প্রতিদিনই জ্বর থাকে, কিংবা যদুবাবুর মেয়ের বিয়ে হয় প্রতিদিন। কিন্তু, ছেলের অসুখ আর মেয়ের বিয়ের কথা ঠিক শ্যামবাবু বা যদুবাবুর মুখে না শুনলেও প্রায় প্রতিদিনই কারো না কারো মুখে শুনেছেন বলে মনে হয় রামবাবুর, এবং তাতে আর তিনি দুঃখ বা আনন্দ অনুভব করেন না।

ইতিমধ্যে হয়ত একবার কোনো একটি চিঠির উপরের দিকে নজর পড়ায় হঠাৎ তাঁর চোখে আটকে যায় দেওঘর, পুরী কি বেনারসের নাম। আর সহসাই হয়তো তাঁর কাজের মধ্যে ছন্দোপাত ঘটে যায়। যেন অন্তহীন দুঃখের সমুদ্রে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কতকগুলি আলোক-স্তম্ভ, নিছক বাঁচার জন্যেই ওর একটিতে আশ্রয় নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক। এ শুধু মুহূর্তের জন্যে। তারপরই তাঁকে ফিরে আসতে হয় রূঢ় বাস্তবের উপস্থিত প্রয়োজনে। কিন্তু মনের মধ্যে সেই হঠাৎ-স্বপ্নের রেশটা তবু থেকেই যায়।

এইভাবে এক সময় পাঁচটা বাজে। কাজের জগৎ থেকে ক্লান্তভাবে বেরিয়ে এসে রামবাবু ট্রাম বা বাস ধরেন। তারপর রাস্তার ডানদিক বা বাঁদিক যে দিকই নজরে আসুক প্রতিদিন বিকেলে ফেরবার সময় যা যা দেখেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

এমন কি বাড়িতে এসেও চা-খাওয়া, বিশ্রাম করা, ভাত-খাওয়া এবং ঘুমনো, এর মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য পান না তিনি। কাজেই চিঠির কাগজে দেখা দেওঘর-পুরী-বেনারস ইত্যাদির একটি নামকে যে তিনি পরমার্থের মতোই মনে মনে লালন করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

বাইরে বেরোনোর এই চিন্তা প্রথম প্রথম হয়ত তিনি আমল দিতে চান নি, খরচের কথা ভেবে সংকুচিত হয়েছেন। কিন্তু বহুদিন ধরে একটি চিন্তা মনের মধ্যে আনাগোনা করতে থাকলে ক্রমে কেমন একটা মরীয়া ভাব দেখা দেয়। তখন কায়মনোবাক্যে এই ইচ্ছাটির দাসত্ব করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু কর্তব্য থাকে না। রামবাবুরও এ অবস্থা ঘটল। পুজোর বাজনা বেজে উঠবার আগেই তাঁর মনের মধ্যে বেজে উঠল রেল-গাড়ীর বাঁশী।

অতএব অনেক কষ্টে অপিস থেকে একদিন তিনি আগে বেরোলেন। তারপর রেলের অপিসে পরিচিত যে যেখানে আছেন সকলের টেবিলে টেবিলে ঘুরে বেড়ালেন—পুরী যাওয়ার জন্যে কয়েকখানি তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপিং অ্যাকোমোডেশনের আশায়। তাঁরা হাসলেন, চা খাওয়ালেন, কিন্তু টিকিট দিতে পারলেন না।

একটা দিন এইভাবে নষ্ট হওয়াতে রামবাবু নিরাশ তো হলেনই না, বরং তাঁর জেদ যেন চ্যানেল-সাঁতারুর মতো অদম্য হয়ে উঠল। পরদিন তিনি রাত থাকতে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ালেন হাওয়া স্টেশনে। তারপর যথাসময়ে টিকিটের কাউন্টার খুলল এবং তার আগে যে ১৭৭ কিংবা ২৩৩ অথবা ৩৪৫ জন মানুষ (সঠিক সংখ্যাটি রামবাবু দিতে পারবেন না, তবে এই রকমই কিছু একটা হবে) সেই লাইনে অপেক্ষা করছিল তারা টিকিট কিনতে লাগল। অবশ্য তারা সকলেই টিকিট কিনছিল কিনা রামবাবু বলতে পারেন না। নানা রকম সরস আলোচনা, বিরূপ মন্তব্য ইত্যাদি নিয়ে তারা বেশ আরামেই ছিল বলে মনে হচ্ছিল। এদিকে পাঁচটি ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু রামবাবু কাউন্টারের দিকে পাঁচহাতও এগোতে পারলেন কিনা সন্দেহ। অবশেষে কাউন্টার বন্ধ হতে যখন প্রায় মিনিট তিনেক বাকী এবং রামবাবুর সামনে ১৭ কিংবা ২৩ অথবা ৪৫ জন মানুষ অপেক্ষা করছে, সেই সময় লক্ষ্য করা গেল টিকিট কিননেওয়ালারা সকলেই ঠিক যানেওয়ালা নয়। কিঞ্চিৎ বর্ধিত মূল্যে অন্যের হাতে টিকিট তুলে দেওয়াই তাদের অনেকের কষ্টসহিষ্ণুতার একমাত্র প্রেরণা।

এরপর লাইন রাখা ছ'মাস মিলিটারী ট্রেনিং থাকলেও কারো পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু রামবাবু তবু চেষ্টা করেছিলেন। ঢ্যাঙা মতো একটা লোক তাঁর পেছন থেকে সামনে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাতে তিনি আর তাল সামলাতে পারলেন না। ফস্ করে তার জামার খুঁট চেপে ধরলেন। লোকটিরও মেজাজ তখন বোধ করি সপ্তম ছেড়ে অষ্টম কি নবমে চড়ে গিয়েছিল, ঈষৎ খর্বকায় রামবাবু দেখলেন সিংহের মতো একটা রক্ত-লোলুপ ঘুষি দ্রুত নেমে আসছে তাঁর নাকের দিকে। ভয়, রাগ, ঈর্ষা রামবাবুর মনের মধ্যে ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে দিল। তখন, যা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, যা কেউ ভাবতে পারে বলেও তিনি কল্পনা করেন নি, সেই পরম হিংস্র ছেলেমানুষিটাই করে ফেললেন তিনি এক নিমিষে—কচ্ করে কামড়ে দিলেন তিনি ঢ্যাঙা লোকটির কড়ে আঙুলটা।

তারপরের ঘটনা আমি জানিনে, জানবার দরকারও নেই। আমি শুধু দেখাবার চেষ্টা করছিলাম কেন দিনের পর দিন বন্ধ খাঁচার মধ্যে পাখা ঝাপটানোর পর একটা নিরীহ টিয়াপাখীও ঠোঁটের কাছে আঙুল নিয়ে গেলে কামড়ে দিতে বাধ্য হয়।
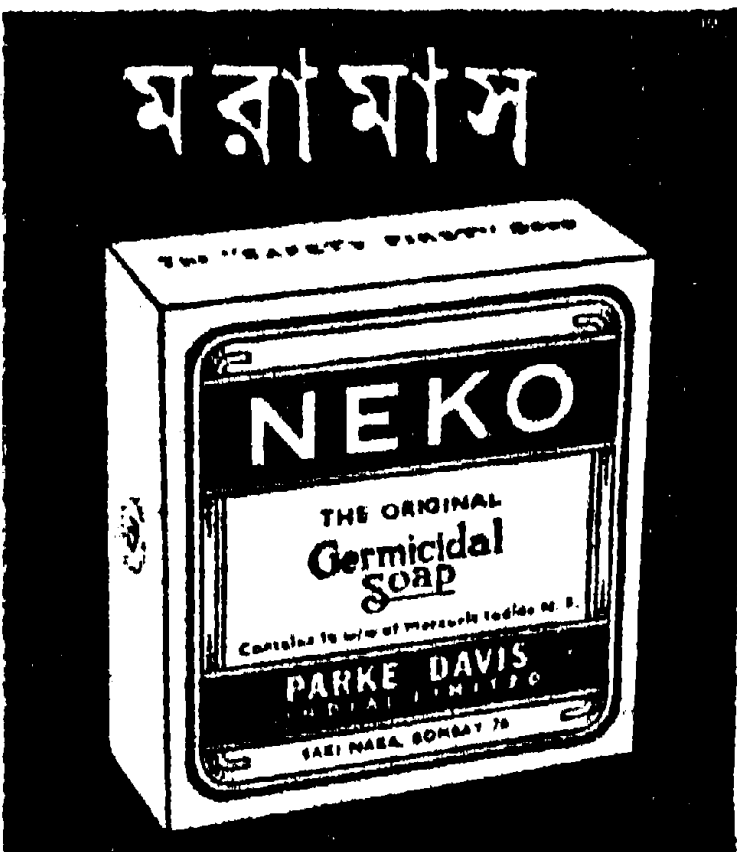
বাংলা বইয়ের ভূমিকা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

ভূমিকাও এখন গ্রন্থমাত্রেরই একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কি কাব্য কি উপন্যাস কি রম্যরচনা বই আকারে যাহাই ছাপা হউক না কেন কপালে একটা ভূমিকার ফোঁটা না পরিয়া বাহির হইবে না। শিক্ষক সমিতির টেস্ট পেপার হইতে বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস পর্যন্ত যে বইই খুলিবেন দেখিবেন একটা—একটাই বা বলি কেন একাধিকও হইতে পারে—ভূমিকা আছেই। নাটকে সূত্রধারের প্রয়োজন আছে, নাট্যকার নিজের গরজে তাহাকে ডাকিয়া আনেন। সে কাহিনীর সূত্র ধরাইয়া দেয়, তবে সে কাহিনী চলিতে আরম্ভ করে। সেকালকার নাটকে সূত্রধার তাই কুশীলবের একজন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তাহার প্রয়োজন হয় নাই। যেখানে হইয়াছে সেখানে লেখক নিজেই সূত্রধারের কাজ সারিয়াছেন। একালে সেই কাজের নাম দেওয়া হইয়াছে ভূমিকা। ভূমিকার 'মুখবন্ধ' 'অবতরণিকা' 'প্রস্তাবনা' 'নিবেদন' প্রভৃতি অনেক নাম। কেহ কেহ আবার 'দুটি কথা' 'একটি কথা' বা ঐ ধরণের আধুনিকতাগন্ধী নাম ব্যবহার করেন।

অধিকাংশ নামই যে ইংরেজী introduction, preface, foreword প্রভৃতির দেখাদেখি আসিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের কোনো কোনো রচনার প্রারম্ভে 'বিজ্ঞাপন' আছে; ইহা ইংরাজী নোটিশের অনুবাদ তাহাও সুস্পষ্ট।

ভূমিকাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের ভূমিকা এবং স্বনামধন্য বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক বা সাহিত্যিক কর্তৃক গ্রন্থপরিচিতিমূলক ভূমিকা।

কোন কোন বইয়ে এই তিন শ্রেণীর ভূমিকাই দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বাংলা বইয়ে প্রথম শ্রেণীর ভূমিকাটিই সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়, অর্থাৎ গ্রন্থকারের ভূমিকা এবং তাহার পরই পরিচিতিমূলক ভূমিকা। বাংলা গ্রন্থজগতে প্রকাশকের ভূমিকা এই দুই ভূমিকার সংখ্যার তুলনায় কম।

কোন শ্রেণীর ভূমিকার কি উদ্দেশ্য তাহা এখন আলোচনা করা যাইতে পারে।

।। গ্রন্থকারের ভূমিকা ।।

এই শ্রেণীর ভূমিকায় লেখক পাঠকের নিকট গ্রন্থের পূর্বাভাষটি জানাইয়া দিতে চান। এই গ্রন্থ লিখিবার সার্থকতা কোথায় সেটা জানাইয়া দেওয়াও গ্রন্থকারের ভূমিকার একটি উদ্দেশ্য হইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দশজন দশখানি লিখিয়াছেন। একাদশ লেখক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একাদশ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। কেন করিলেন সে কথা তাঁহার জানানো উচিত। ভূমিকায় তাহাই বলিতে হইবে।

নূতন কথা যদি তিনি কিছু বলিয়া থাকেন পাঠকের তাহা জানা আবশ্যক। নূতন কথা না থাকিলেই যে নূতন বই লেখা চলিবে না এমন নয়। কেহ যদি বড় বইয়ের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন, অথবা বহুমূল্য বা দুর্লভ গ্রন্থের সুলভ অল্পমূল্যে সংস্করণ বাহির করেন তাহাও অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সে কথা পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে। গ্রন্থকারের ভূমিকা সে কাজ করে। এ ভূমিকা শুধু বিজ্ঞাপন মাত্র নহে ইহা ক্ষেত্র বিশেষে কৈফিয়তের কাজও করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি রচনার বই হইতে জনৈক বিশিষ্ট লেখকের ভূমিকার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি—
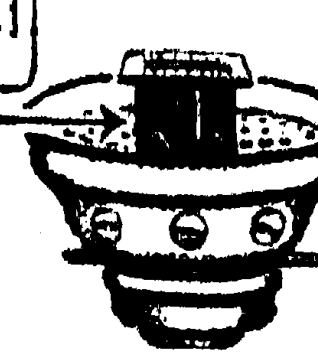
"বই লিখিয়া অর্থলাভ হইবে এই আশায় লেখকগণ যে বয়সে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, সে বয়স কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর যে কারণেই হউক না কেন, উপার্জনের আশায় যে এ পুস্তক লিখি নাই শিক্ষক মহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটি বিশ্বাস করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চক্রবর্তীর কথা স্মরণ করুন। কমলাকান্ত বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া যৌবনের দিকে হঠাৎ একদিন ফিরিয়া তাকায়। সেদিন বুঝিতে পারে, 'আশা সেই রঙিন কাচ', যে কাচ যৌবনে মনশ্চক্ষুকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকসমাজ জানেন, বর্তমান গ্রন্থকার কমলাকান্তের সমবয়সী না হইলেও 'আশার ছলনে' ভুলিবার বয়স অতিক্রম করিয়াছেন।

তবে বই লিখিলাম কেন? রচনার বই কি আর নাই? আছে, কিছু বেশীই আছে।... রচনার বই অনেক থাকিলেও ভাব ভাষা ও ভঙ্গীর দিক দিয়া তেমন বৈচিত্র্য কমই মিলে যেমন মিলে মলাটের সুদৃশ্য পরিকল্পনার এবং সমুজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসে। এই কারণেই আর একটি বই বাজারে বাহির করার প্রয়োজন বোধ
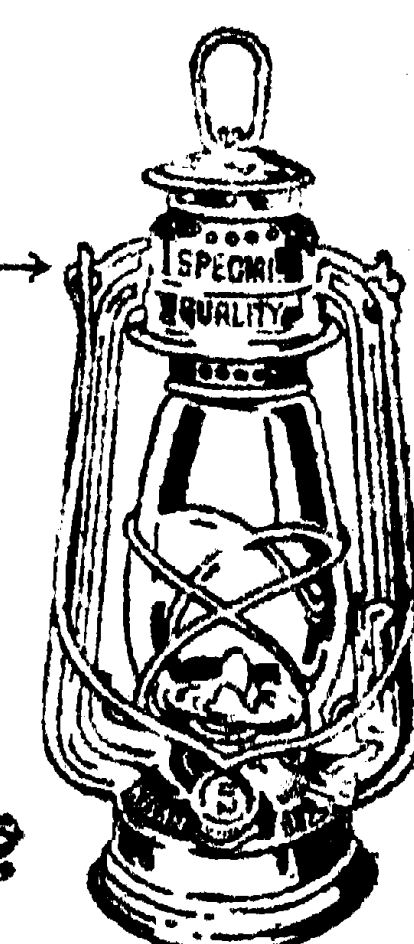
করিলাম। এটি একটি স্বতন্ত্র বই, পাঁচটি বইয়ের একটি বই নয়।"

রাজশেখর বসু তাঁহার 'চলন্তিকা'র ভূমিকায় অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকার প্রথম কয়েক ছত্র এইরূপ—

"বাংলা ভাষার একটি ছোট অভিধানের দরকার আছে যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়, অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে। যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁহারা প্রধানতঃ যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।..."

এইভাবেই গ্রন্থকার তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থের উদ্দেশ্য উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলেন। ভূমিকা পাঠ করিয়া পাঠক গ্রন্থের পূর্বাভাষ পান এবং তাহার পর মূল গ্রন্থ পাঠ করেন। এই আভাসের প্রয়োজনীয়তাই লেখকের ভূমিকা রচনার প্রধানতম কারণ।

।। প্রকাশকের ভূমিকা বা নিবেদন ।।

কোনো কোনো বইয়ের মধ্যে দেখা যায় প্রকাশকও বইয়ের খানিকটা অংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার ভূমিকা বা নিবেদনটি আকারে খুব একটা বড় হয় না। প্রকাশক ভূমিকা লিখেন তখনই যখন তিনি কোন বহুমূল্যের দুঃসাহসিকতার সহিত নিজের লভ্যাংশের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এক বৃহদায়তনের বহু সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশ করেন, কিম্বা কোনো নূতন লেখকের গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধের বই ছাপাইলেন—সেই লেখকের সহিত পাঠক-সমাজের কোনো পরিচয় নাই, তখন তিনি নবীন লেখকের প্রতিভার উল্লেখ করিয়া পাঠকের সহিত লেখকের পরিচয় করাইয়া দেন। এই দিক দিয়া গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকারও প্রয়োজন আছে। বিখ্যাত সাহিত্যিকের গল্পগ্রন্থেও প্রকাশকের নিবেদন দেখা যায়। কারণ গল্পগ্রন্থের সংকলক হয়তো প্রকাশক নিজেই। প্রকাশকের নিবেদন, বক্তব্য বা কথা বইয়ের কভারের পিছনে, জ্যাকেটের সামনের এবং পিছনের ভাঁজে ইত্যাদি স্থানে থাকে। প্রকাশকের ভূমিকার স্বরূপটি এখন দু'একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করা যাক।

সুস্পষ্ট কারণে গ্রন্থ গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রকাশক ও ভূমিকা-লেখকের নাম অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা উহ্য রাখিতে হইয়াছে।

রসাল গল্প—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ রসাল গল্পের লেখক হিসাবেই বাঙালী পাঠক সমাজে পরিচিত। যদিচ করুণ রসের কাহিনীতেও তাঁর লেখনী সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তবু শ্রীপতিবাবুর নাম করলেই পথে ঘাটে যে গল্পগুলির উল্লেখ শুনি—তা হচ্ছে তাঁর মধুর রসের গল্প।...ওঁর রসাল গল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তা নিতান্তই মধুর রসের রচনা—তাতে যেমন থাকে না অকারণ বিদ্বেষের বিষ—থাকে না কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার কোন ব্যর্থ প্রয়াস। শ্রীপতিবাবুর শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলেও তাতে নানা রসের সমাবেশ করতে গিয়ে রসাল গল্পের অনেক সেরা নমুনাই বাদ পড়েছিল। এ জন্য অনেকের মনে অনেক ক্ষোভ জমে ছিল। সেই জন্যই আমরা বিশেষ ক'রে তাঁর রসাল গল্পের সেরা নমুনাগুলি একত্রিত ক'রে এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করলুম—বাঙালী রসিক পাঠক সমাজ যদি খুশী হন, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

উপরি উদ্ধৃত অংশটি গ্রন্থ-প্রকাশকের ভূমিকা। বাজারে গল্পের বইয়ের চাহিদা কম সে কথা সকলেই জানেন। ছোটগল্প-লেখকদের প্রতিভা পাঠকের সমাদর পায়, মাসিক পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশকরা সাগ্রহে গল্প ছাপাইয়া থাকেন। অনেকে সে জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেন। কিন্তু গল্পের সংকলন গ্রন্থহিসাবে প্রকাশ করিবার উৎসাহ বেশী দেখা যায় না। নামী লেখকের দুই একখানা বাহির হয়। এক সংস্করণ কোনো রকমে উঠিয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের বেলা দুঃসাহসিক প্রকাশককেও একটু ভাবিতে হয়। বুদ্ধিমান প্রকাশকরা পুরাতন গল্পগুলিকে নানাভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া নূতন নামে নূতনরূপে প্রকাশ করেন। নাম হয়, অমুকের শ্রেষ্ঠ গল্প, অমুকের প্রেমের গল্প, অমুকের হাসির গল্প, অমুকের নির্বাচিত গল্প, অমুকের স্বনির্বাচিত গল্প ইত্যাদি। প্রকাশকের ভূমিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় এ বইটি কতকটা ঐ ধরণেরই সংকলন।

স্মৃতিকথা—শ্রীমুক্তা দেবী।

এ-যুগের যে সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত নিয়ে আমরা গৌরব করি, তার যেদিন গোড়াপত্তন হয়েছিল—সেই অনতি অতীত অথচ ইতিমধ্যেই কাহিনীতে পরিণত বিগত যুগের এক আশ্চর্য খণ্ডাংশের উপর যবনিকা তুলল এই গ্রন্থ। লেখিকা...সেই অসামান্য পরিবারের ভিতর মহল থেকে...গুণী পুরুষদের গড়ে উঠতে দেখেছেন।...বিশ্বের গুণীজনেরা মৌমাছির মতো আকৃষ্ট হয়ে বাস ক'রে গেছেন এই পরিবারের পরিবেশে। এমন এই পরিবারের স্বরূপ চিত্রণে উজ্জ্বল হয়ে রইল স্মৃতিকথা।

রসাল গল্পের ভূমিকাটি একটু আদল-বদল করিয়া লেখকই স্বচ্ছন্দে স্বনামে ছাপিতে পারিতেন। অর্থাৎ ছাপিলে তেমন কোনো বাধা হইত না। কিন্তু এই স্মৃতি-কাহিনীর ভূমিকাটি প্রকাশক ছাড়া আর কাহারো হাত দিয়া বাহির হইতে পারে না। গ্রন্থের পক্ষে এই ভূমিকার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। বইটি মূল্যবান, বিষয়ের গৌরবই তাহার প্রধান গৌরব। কিন্তু লেখিকা যে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ এবং অন্তরঙ্গ—এই তথ্যটি পাঠককে জানাইতে পারিলে গ্রন্থ-গৌরব আরও অনেকখানি বাড়িয়া যায়। সে কাজ প্রকাশকের। এই ভূমিকায় প্রকাশক সে কাজ সুচারু ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়তো অসঙ্গত হইবে না যে, বাংলা বইয়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশকের নিবেদন প্রকৃত পক্ষে লেখক বা পুস্তকের বিজ্ঞাপন হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল বিজ্ঞাপন প্রায়ই—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভাবনীয় সংযোজন', 'গ্রন্থটি চিন্তাপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ', 'নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীর বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইল' 'চিন্তাশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত বই' ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আবার একটু লক্ষ্য করিলে এমনও দেখা যাইতে পারে যে, প্রকাশকের নিবেদনটি হয়তো বা লেখকেরই লিখিত। ভাষা ও রচনাভঙ্গী (ষ্টাইল) লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যায়। এ ক্ষেত্রে তো মনে হয় লেখকের কর্তব্য সচেতন হইয়া তাঁহার রচনাভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা।

আবার মনে করুন গ্রন্থের লেখক জনৈক অধ্যাপক 'ডক্টর' এম-এ, পি-এইচ-

ক্তি ইত্যাদি। তিনি বইয়ের নামপত্রে নিজের নামের দক্ষিণে বা বামে কোন বিশেষণই ব্যবহার করেন নাই। কাহারো কাহারো মতে না ব্যবহার করাটাই আভিজাত্যের নিদর্শন। কিন্তু প্রকাশক হয়তো ইহাতে খুশী নন। তিনি যে এত বড় নামজাদা পণ্ডিতের বই প্রকাশ করিলেন তাহা তিনি সাড়ম্বরেই ঘোষণা করিতে চান। ফলে প্রকাশক তাঁহার ভূমিকায় লেখক কর্তৃক না বলা বাণীটি ব্যক্ত করিলেন।

।। **পরিচিতি** (Foreword) ।।

গ্রন্থের পরিচিতিমূলক ভূমিকা গ্রন্থকার নিজেও লেখেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য কোনো খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণী লোকের দ্বারা লেখাইয়া লন। যেখানে নিজের পরিচয়টাও প্রকাশ করা দরকার সেখানে একজন বিশিষ্ট পরিচায়কের আশ্রয় তো লইতেই হইবে। বর্তমানে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বাংলা বই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও পঠিত হইতেছে। পুস্তক প্রকাশের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিতি ভূমিকার সংখ্যাও তালিকায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

পরিচিতিমূলক ভূমিকার ভূমিকা-লেখক গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে কখনো কখনো বিস্তৃত, বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করিয়া থাকেন; গ্রন্থের গুণগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং ত্রুটি যদি কোথাও থাকে তাহাও উল্লেখ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন না। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকার এবিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবেন—ভূমিকার উপসংহারে এরূপ আশাও প্রকাশ করেন। আবার এই শ্রেণীর ভূমিকা কখনো বা কেবলমাত্র সাধুবাদ ও প্রশংসাপত্রেই সীমিত থাকে, তা সে প্রশংসা পাইবার যোগ্য হউক, আর নাই হউক। প্রবন্ধ, সমালোচনা, গবেষণামূলক গ্রন্থাদিতে পরিচিতি-ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু আজকাল দেখা যায় গল্প উপন্যাস কবিতার বইতেও এই শ্রেণীর ভূমিকা ছাপা হইতেছে। গল্প-উপন্যাসে এ ভূমিকার কি প্রয়োজন তাহা জানি না, তবে নবীন লেখক গল্পের বইটি লিখিয়া পাঠক-মহলে পরিচিত ও সমাদৃত হইবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে একটি প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শুধু গল্প-উপন্যাসের বইতেই নয়, কখনো কখনো শিশুদের অ আ ক খ, ছড়া ছবির বইতেও এ জাতীয় ভূমিকা বর্তমানে চোখে পড়িতেছে। নিছক প্রশংসাসূচক ভূমিকাগুলি কিরূপ হইয়া থাকে তাহার কয়েকটি নমুনা দেখা যাক।

।। **একটি কবিতার বইয়ের ভূমিকা** ।।

আপন মনের খুশীতে কবিতা পড়া এক কথা। তাতে কোনো দায় থাকে না। ভালো লাগে তো ভালোই, মন্দ লাগলেও ভয় করবার কারণ নাই। চুপ করে থাকলেই হল।

বর্তমান গ্রন্থের কবি নবীন, তাঁর কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি কিন্তু পড়তে হবে বলে পড়েছি। তাই ভয় হচ্ছিল। সৌভাগ্যের কথা ভয়টা অমূলক প্রমাণ হয়েছে। কবি তরুণ বয়স্ক কিন্তু তাঁর হাত পাকা, তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং সর্বত্র-বিহারী।...কবি আজও উদীয়মান কিন্তু অদূরভবিষ্যতে তাঁকে মধ্যাহ্ন গগনে দেখতে পাব এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নাই।

।। **নবীন ছোটগল্প লেখকের গ্রন্থ** ।।

সাময়িক পত্রিকায় ছোটগল্প লিখে লেখক পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর দু-একটি লেখা আমিও পড়েছি। তাই যখন শুনলাম যে তাঁর ছোটগল্পের একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তখন আনন্দিত না হয়ে পারিনি। সাহিত্যের অধ্যাপকের কাছে সাহিত্যিক-ছাত্র চিরদিনই বিশেষ আদরের।

প্রাঞ্জল ভাষায় রচনাকে হৃদয়গ্রাহী করবার ক্ষমতা লেখকের আছে।...লেখক যদি নিষ্ঠার সঙ্গে এই পথে সাধনা করে যান তা হলে একদিন আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধতম এই দিকটি তাঁর ভাণ্ডার থেকেও কিছু গ্রহণ করে

গৌরবান্বিত হতে পারবে। তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সুন্দর হোক্।

।। সমালোচনা গ্রন্থ ।।

লেখকের প্রতিভার স্বাক্ষর পাতায় পাতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধরণের গ্রন্থ যতদূর মনে হয় অভিনব। আশা করি পাঠক সমাজে ইহা সমাদৃত হইবে।

।। ছড়া সংকলন ।।

ছড়াগুলি নির্বাচনে সম্পাদিকার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা দেশের যুগল জাগ্রত দেবতা খোকা খুকু ইহা পাইলে যে আর কিছুই চাহিবে না এ কথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি।

এই শ্রেণীর ভূমিকা সবাই যে খুশী হইয়া লিখেন তাহা ঠিক নহে। কেহ বাধ্য হইয়া লিখেন কেহ বা বাধ্যবাধকতার জন্য লিখেন। অনুরোধ এমনভাবে আসিয়া পড়িল যে, তাহা আর এড়াইবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এ যেন সার্টিফিকেটের মত।—'স্যার, একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে, অমুক জায়গায় দরখাস্ত করেছি।' এ অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ।—'আমার একটা বই বেরোচ্ছে, আপনার একটা ভূমিকা চাই।' সার্টিফিকেট দিব না বলাও যেমন কঠিন, ভূমিকা লিখিয়া দিতে পারিব না বলাও তেমনি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আর লিখিতে যখন হইবেই তখন প্রশংসা করা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু পাঠক-সমাজকে এই শ্রেণীর ভূমিকা বড়ই বিড়ম্বিত করে। অনেকে নামকরা লোকের প্রশংসাপত্র দেখিয়া বই কিনেন। তবে সুখের বিষয় বর্তমানে পাঠক-সমাজ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়াছেন।

এতক্ষণ আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ভূমিকার উদ্দেশ্য পৃথকভাবে আলোচনা করিলাম। এইবার প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা বইয়ের ভূমিকার গতিপ্রকৃতি কিরূপ তাহা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুদ্রাযন্ত্রের দান অপরিসীম। মুদ্রাযন্ত্রের পরবর্তী কাল হইতেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব। ভূমিকা গদ্যেই রচিত হয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে ভূমিকার উদ্ভব মুদ্রাযন্ত্রের পরবর্তী কাল হইতে। মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ববর্তী কালে অধিকাংশ—প্রায় সকল—গ্রন্থই লেখা হইত কবিতায়। সেই যুগে 'ভূমিকা' শিরোনামায় কোন রচনা সম্ভবতঃ ছিল না। তবে কবিরা গ্রন্থের মধ্যে একটি অধ্যায়ে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেন। প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গ্রন্থকার দৈব নির্দেশের বশবর্তী হইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অথবা দেব-দেবীই তাঁহাকে দিয়া গ্রন্থটি রচনা করাইয়া লইয়াছেন; যেমন আধুনিক কালে গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায়—শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীঅমুক চন্দ্র অমুক এম্, এ কেবলমাত্র উদ্যোগী হইয়াই যে আমাকে দিয়া বইখানি লিখাইয়া লইয়াছেন, তাহাই নহে—অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াও তিনি আমার কার্যের সহায়তা করিয়াছেন। দৈবাদেশে কাব্য রচনা করা শুধু বাংলা দেশেই নয়, প্রাচীন কালের প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। যদি কোন কাব্য রচনার মূলে দৈবাদেশ নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হয়। কবির প্রতি অনুরাগ না হউক দেবতার প্রতি ভক্তি-বশতও লোকে তাঁহার কাব্য পড়িবে; তাঁহার রচিত কাব্য পঠিত বা গীত হইলে সাদরে শুনিবে। তাহার পর যদি কবির প্রতিভাগুণে সে কাব্য ভাল লাগিয়া যায় তাহা হইলে কবি অমর হইয়া যান। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের জন্য দেবতার দোহাই না দিলে চলে না।

প্রাচীন মঙ্গল কাব্যের প্রায় সকল কবিই গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-প্রসঙ্গে দৈবাদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যদিও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ আদেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া কবি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন, যেমন—

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা;

তথাপি এই রাজাদেশের পরও একটা স্বপ্নাদেশের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ বাক্যের পরই কবি বলিতেছেন,

স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে.
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উৎপত্তির কারণ এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

শুন ভায়্যা সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডী দেখা দিল আচম্বিতে॥...

গ্রন্থোৎপত্তির কারণকে আমরা যদি ভূমিকার শ্রেণীভুক্ত করিয়া লই, তাহা হইলে বলিতে হয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভূমিকার আদিরূপ ইহাই। ভূমিকার ইতিহাসের দুইটি পর্ব—মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত পদ্য পর্ব এবং মুদ্রাযন্ত্রের পরবর্তী কাল হইতে গদ্য পর্ব। গদ্যে লিখিত ভূমিকার আদিরূপ আমরা সাধারণভাবে দেখিতে পাইব 'গদ্যের জনক' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তৎসমসাময়িক লেখকদিগের ভূমিকা রচনায়।

কেহ কেহ নাটকের কথোপকথনকে নাট্যকারেরই গদ্য রীতি বলিয়া ধরিয়া লন। কিন্তু নাটকের মধ্যে কথোপকথনের ভাষাকে কি সকল ক্ষেত্রে নাট্যকারের গদ্যরীতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত? নাটকের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র আছে; বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন রকম ভাষার ব্যবহার। আর নাটকের একটি প্রধান ধর্মই হইতেছে—নাট্যকার নাটকের আড়ালে থাকিবেন। তাহা হইলে আমরা নাট্যকারের গদ্য রীতির নমুনা কোথা হইতে পাইব? বাংলা গদ্যের ইতিহাসে নাট্যকারদের দান অনেকখানি। ফলে গদ্য-রচয়িতা হিসাবে তাঁহাদের গদ্যরীতি কিরূপ ছিল এ কৌতূহল স্বভাবতই মনে জাগে। নাট্যকার যে শ্রেণী বা সমাজের মানুষ তাঁহার নাটকের মধ্যে যদি অনুরূপ কোন চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার ব্যবহৃত ভাষাকে নাট্যকারের ভাষা বলিয়া খানিকটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে ইহা অপেক্ষাও সহজ উপায় হইতেছে, যদি নাট্যকারের লিখিত নাটকের ভূমিকা বা মুখবন্ধের দিকে আমরা দৃষ্টি দিই। ভূমিকার পরিমাণ নিশ্চয় খুব বেশী হইবে না। তবে সেই অল্পের মধ্য হইতেই আমাদের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করা যাইবে বলিয়া মনে হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকে তোরাপ বা রাইয়তদিগের ভাষাকে দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য রীতির নমুনা বলিতে পারি না। সে নমুনার জন্য প্রয়োজন নাটকের ভূমিকা। ভূমিকার মধ্যে লেখক আপন ভাষাতেই আপন কথা ব্যক্ত করেন। সে ভাষা তোরাপেরও ভাষা নয় রাইয়তেরও নহে। দীনবন্ধুর গদ্য-রীতির নমুনাস্বরূপ নীলদর্পণের ভূমিকাটি হইতে দু-ছত্র তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে :—

"হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত

ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জিত বিমল যশস্তামরসে কীট স্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে।..."

নাটকের সংলাপের মধ্যে যেমন নাট্যকারের গদ্যরীতির পরিচয় সঠিক-ভাবে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অনূদিত রচনাকে সকল ক্ষেত্রে অনুবাদকের গদ্য-রীতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও যুক্তি-সঙ্গত নয়। অনুবাদ-গ্রন্থে লেখকের সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও মূল ভাষার প্রভাব অনেকটা থাকিয়া যায়। এই কারণেই অনূদিত গ্রন্থের ভাষাকে লেখকের গদ্যরীতি বলিয়া সমালোচনা করা সকল ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অনুবাদক বিদেশী ভাষার প্রভাবাধীন না হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আপন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থের ভাষাকেই লেখকের গদ্যরীতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। তবুও বলা যায় গ্রন্থের ভূমিকার মধ্যে লেখকের গদ্যরীতির স্বাভাবিক প্রবণতাটুকু সহজে ধরা পড়ে। বাংলা গদ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেকগুলি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অনুবাদগুলির মধ্যেও যেমন বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির নমুনা আছে, তদ্রূপ ঐ গ্রন্থগুলির ভূমিকার মধ্য দিয়াও আমরা তাঁহার গদ্য রচনার আর একটি ভঙ্গি লক্ষ্য করিতে পারি। বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদাহরণ দেওয়া যাক। উদাহরণই বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

(১) "ভ্রান্তি প্রহসন, কাব্যাংশে, শেক্সপীর প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যারপর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠ-কালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে শেক্সপীরের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই; সুতরাং ইহা দ্বারা লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।..."

[ভ্রান্তিবিলাস]

(২) "এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূল গ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।......"

[শকুন্তলা]

সাহিত্যের ইতিহাসে ভূমিকার যে কতখানি ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে তাঁহারই লিখিত একটি ক্ষুদ্র 'বিজ্ঞাপন' (ভূমিকা) তাহা প্রমাণ করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ—'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস (১৮৬৫)। ইহার পূর্বে তিনি বাংলায় কোন গদ্য রচনা করেন নাই; তবে বাল্যবয়স হইতে কিছু কিছু কবিতা রচনা করিয়াছেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্য পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচিত হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 'ললিতা'। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামে কলিকাতার 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত' হইয়া প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪১। ইহাই বঙ্কিমের প্রথম গ্রন্থ! এই কাব্যগ্রন্থে তাঁহার লিখিত একটি 'বিজ্ঞাপন' আছে। তাহারই মধ্য দিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কিশোর বয়সের গদ্য রচনার নমুনা পাই। নিম্নে 'বিজ্ঞাপন'টি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরি-বর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্বে এই রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।"

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত কয়েকটি দীর্ঘ পরিচিতিমূলক ভূমিকা রহিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে ও দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীতে তিনি যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা লেখকদ্বয়কে

জানিবার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। লেখকদ্বয়ের কবিত্ব ও জীবন সম্পর্কিত প্রামাণিক আলোচনা।

ভূমিকাও একশ্রেণীর সাহিত্য। তাহার মধ্যেও সাহিত্যরস থাকিতে পারে এবং তাহা পাঠ করিয়া পাঠক আনন্দ পাইতে পারেন। আমরা এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে যে পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোনো লেখক সে দিক দিয়া তাঁহার সমতুল্য নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেরই একটি করিয়া 'ভূমিকা' 'সূচনা' বা 'অবতরণিকা' রচনা করিয়াছেন। একদিন অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য (ছান্দসিক) মহাশয়ের সহিত আলোচনা হইতেছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম,—রবীন্দ্রনাথ কোনও এক স্থানে নাকি কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি এ পর্যন্ত যত ভূমিকা রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে 'ভৌমিক' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় বাংলা সাহিত্যে ইহাও এক সম্পদ। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলিকে সংকলন করিয়া পত্র-সাহিত্য নামে সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। স্বাক্ষর সংগ্রহ-কারীদের তাগিদে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-কণিকাগুলিকেও সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে স্বাক্ষর-সাহিত্য নামে। এখন রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাগুলিকেও একত্রে সংকলিত করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহা ভূমিকা-সাহিত্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকাগুলির কথাই বিশেষভাবে বলিতেছি। অপরের গ্রন্থের উপর তাঁহার লিখিত ভূমিকাও নিতান্ত বিরল নহে। যেমন দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের ভূমিকাটি। তাহা রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে' অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলিকে সমালোচনা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু লেখকের নিজের বইয়ের যে ভূমিকা তাহা প্রবন্ধ-সাহিত্যও নহে, সমালোচনা-সাহিত্যও নহে, তাহা সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর সাহিত্য। সে সাহিত্য শ্রেণীকেই 'ভূমিকা-সাহিত্য' বলিয়া উল্লেখ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা কখনো গদ্যে লিখিয়াছেন, কখনো ছন্দে আবার কখনো বা গদ্য-কবিতাতেও লিখিয়া ছন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ভূমিকা-সাহিত্যের আলোচনা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এ নয়। তাহা প্রবন্ধান্তরে করা যাইতে পারে। আমরা এখানে তাঁহার ভূমিকাবলী হইতে কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি। ভূমিকা যে কেন সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত বলিতেছি তাহা এই নমুনাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

(১) ...ওই গাছগুলো বিশ্ব-বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।...

[বনবাণী, ২৩ অক্টোবর, ১৯২৬]

(২) ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।...

[খাপছাড়া, ১৬ পৌষ, ১৩৪৩]

(৩) মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয় বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।...

[মানুষের ধর্ম, ১৮ মাঘ, ১৩৩৯]

(৪) জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণদূত উড়িয়া চলে;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা'।।

[শিশু]

(৫) প্রভাতের আদিম আভাস
অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে
লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে
সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম
সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণবৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে
করে অভিভূত।...

[চিত্রাঙ্গদা]

নমুনা অনেক দেওয়া গেল। দেখিতেছি, নমুনা যতই দিই, দিবার লোভ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে আমরা তাহা সবলে সংবরণ করিলাম।

বর্তমান কালে ভূমিকা কিছুটা আঙ্গিক-প্রধান হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভূমিকার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের উপস্থাপনা করা এখন একটা রীতিতে দাঁড়াইয়াছে। সেই রীতিগুলি কি সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে।

রীতিগুলির মধ্যে যেটির কথা সর্বাগ্রে আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহাকে রীতি না বলিয়া একটি 'অলিখিত নিয়ম' বলিয়াও উল্লেখ করা চলিতে পারে। সেটি হইল ভূমিকায় গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশককে ধন্যবাদ প্রদান। আজ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সকল গ্রন্থের ভূমিকায় এই রীতিটি দেখা যাইতেছে। গ্রন্থের মধ্যে লেখকের ভূমিকা আছে, অথচ প্রকাশককে ধন্যবাদ জানানো হয় নাই, প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা তাঁহার সাহিত্যানুরাগের উল্লেখ নাই—এরকম দৃষ্টান্ত আজকাল বেশি দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে স্বীয় প্রকাশককে ভূমিকায় ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। সেই ধন্যবাদের কিছু নমুনা দেখুন।

(১) সাহিত্যানুরাগী প্রকাশক শ্রী ...' মহাশয়ের উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

(২) প্রকাশক 'শ্রী...' মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে।

(৩) আমার প্রকাশক আমার স্নেহ-ভাজন তরুণ বন্ধু, ধন্যবাদ জানিয়ে এর সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্বন্ধের আধ্যাত্মিকতাকে ক্ষুণ্ণ করতে বা বিড়ম্বিত করতে চাই নে।

(৪) আমার বন্ধু প্রকাশক গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার সাগ্রহে ও সযত্নে
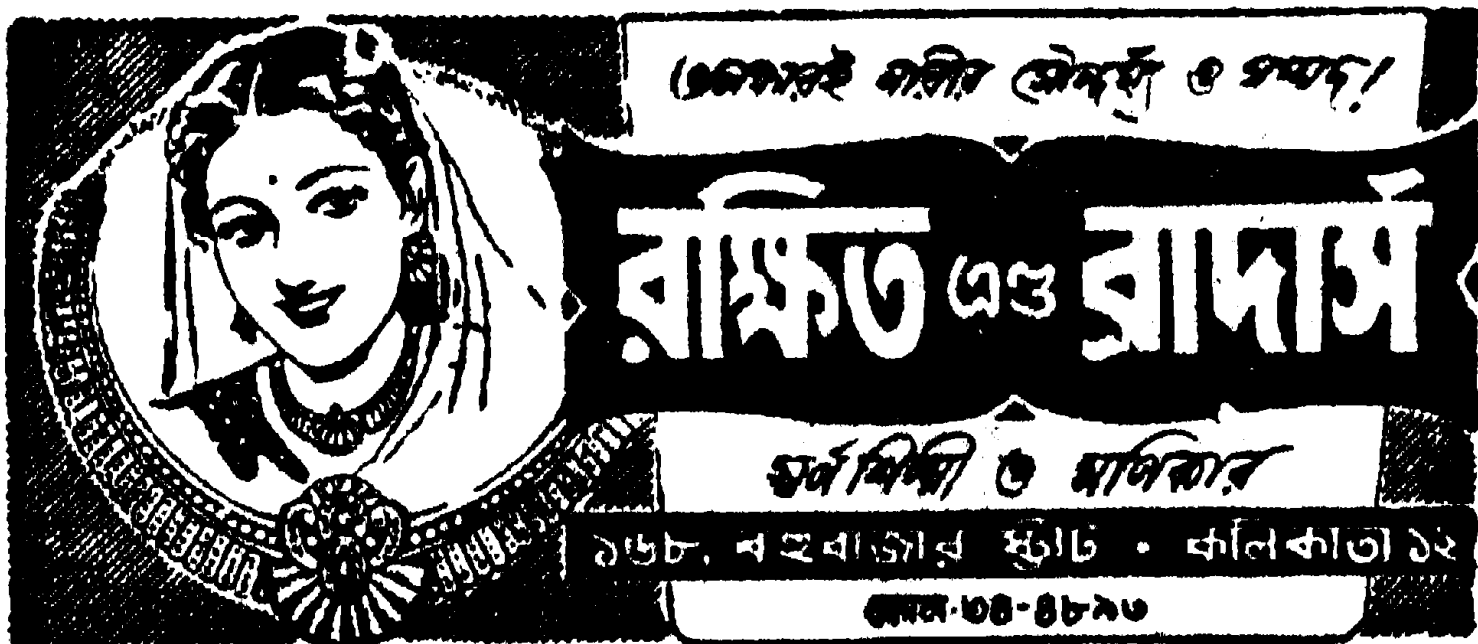
গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করিয়াছেন।

(৫) প্রকাশক প্রীতিভাজন 'শ্রী...' এম. এ'র উৎসাহ ও চেষ্টা ব্যতীত এই গ্রন্থ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না—একথা সস্নেহে স্মরণ করিতেছি।

(৬) শোভন মনোহর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশনায় এদেশে নূতন যুগের প্রবর্তন করেছেন '...'। বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তাঁরা যে যত্ন নিয়েছেন, আর কোন প্রকাশকের পক্ষে তা সম্ভব হত না, আর কারুর পক্ষে তা আশা করাও অনুচিত হত। সারা বাংলার শিশুসমাজের হাসিমুখ তাঁদের পুরস্কৃত করবে।

(৭) অগ্রজকল্প 'শ্রী...' এই গ্রন্থের প্রকাশ ভার লইয়াছেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ইহার মূলে, আমি মনে করি, আমার প্রতি প্রীতি।

(৮) বাংলা সাহিত্যের পরম বান্ধব

সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক 'শ্রীযুত...' মহোদয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

(৯) গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক কল্যাণীয় 'শ্রীমান......' অতি দ্রুত গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য সমাপ্ত করিয়া লেখকের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

(১০) এইবার প্রকাশককে ধন্যবাদ দিবার পালা। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ভূমিকা এখানে শেষ করছি।

উপরের কয়েকটি উদাহরণের মধ্য হইতে একটি কথা সহজে বুঝা যায় যে, বর্তমানে প্রকাশকদের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। প্রকাশক শুধু বই প্রকাশ করেন না, তাঁহারা আজ সাহিত্য-সেবীদিগেরই একজন। লেখকের সহিত প্রকাশকের সম্পর্ক আজ ঘনিষ্ঠতর মধুরতর।

প্রকাশককে ধন্যবাদ দিবার ন্যায় ভূমিকার মধ্যে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং পাঠকের নিকট তাহার জন্য মার্জনা ভিক্ষা ও ক্ষমা প্রার্থনা বর্তমানে প্রায় সব বইতেই দেখা যায়। ত্রুটি যেখানে হইয়াছে সেক্ষেত্রে ত্রুটি স্বীকার এবং পাঠকের নিকট মার্জনা ভিক্ষা নিশ্চয় সদ্‌গুণ ও সরীতি। কিন্তু আজ বাংলা বইয়ের ভূমিকায় যে পরিমাণে ত্রুটি স্বীকারের পালা চলিতেছে তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। এখন আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন কি করিয়া বইয়ের মুদ্রণ-ত্রুটি দূর করা যায়। গ্রন্থকারেরা ভূমিকায় কিভাবে বইয়ের মুদ্রণ ত্রুটি উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহারও কিছু নমুনা নীচে দেওয়া গেল।

(১) দুঃখের বিষয় গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে, আশা করি পাঠকগণ মার্জনা করিবেন।

(২) সতর্ক প্রয়াস সত্ত্বেও দু-একটি মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেল।

(৩) আমার অনবধানে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। যেমন, 'এলিজাবেথান' এর বানান কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ই এল আই' এর বদলে 'ই এল ই' হ'য়ে গেছে এবং ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় 'নিমচাঁদ' 'নিমাই-চাঁদ' হ'য়ে বসেছেন।

(৪) দ্রুত মুদ্রণ ব্যবস্থার ফলে গ্রন্থে কতিপয় মুদ্রণ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে দেখিয়া যথার্থই দুঃখিত।

(৫) কয়েকটি ছাপার ভুলের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :—৬১ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদের সাতের লাইনে 'অনুবাদও করেছেন'-এর জায়গায় 'অনুবাদও প্রকাশ করেছেন' হবে। ...তা ছাড়া আর যে সব ভুল আছে নিষ্প্রয়োজন বোধেই সেগুলির তালিকা দেওয়া গেল না। ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করি।

(৬) গ্রন্থখানির মুদ্রণ 'যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিয়াছি; সংস্কৃত উদ্ধৃতির বাহুল্যের জন্যই বিশেষ করিয়া সাবধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু সাবধান হওয়া সত্ত্বেও দু'একটি ভুল থাকিয়া যে যায় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না,— কিছু কিছু ভুল ত্রুটি পাঠকের চোখে পড়িলে তাহার জন্য মার্জনা চাহিতেছি।

(৭) যথাসম্ভব সতর্কতা সত্ত্বেও দু'একটি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। ৩৭ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে 'নিষ্ফল' যে 'নিষ্কল' হবে এটা বলে দেওয়া দরকার। অন্যগুলির ব্যাপারে পাঠকদের সহৃদয়তার সুযোগ নিলাম।

(৮) বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু ছাপার ভুল থেকে গেল এবং তা থাকা স্বাভাবিক। আমি নিজে খুঁটিয়ে দেখলাম না। যে পাঠকের সময় আছে তিনি খুঁজে নেবেন।

(৯) প্রুফ দেখা এত কঠিন তাহা পূর্বে জানিতাম না।

(১০) প্রুফ দেখার অপটুতা হেতু কিছু বর্ণশুদ্ধি থেকে গেছে এ জন্য মার্জনা চাইছি।

কিন্তু বর্তমান কালে পাঠকেরা গ্রন্থকার বা প্রকাশকের এই ত্রুটি মার্জনাকে মার্জনীয় বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং এখন লেখক প্রকাশকের কর্তব্য গ্রন্থমধ্যে যাহাতে এজাতীয় ভুলভ্রান্তি না থাকে তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তাহা হইলে ভূমিকায় পাঠকের নিকট মার্জনা চাহিবার প্রয়োজন হইবে না।

প্রকাশককে ধন্যবাদ দিবার ন্যায় ভূমিকার মধ্যে নিজের স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানানোর রেওয়াজ বর্তমানে অল্পস্বল্প দেখা যাইতেছে। সে ধন্যবাদের ভঙ্গী স্বভাবতঃ একটু স্বতন্ত্র।—আমার স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ প্রেরণাতেই এ গ্রন্থ এত শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সে দিক হইতে তিনি এই বইয়ের জননী। কিংবা, আমার স্ত্রী শ্রীমতী.........দেবী এই গ্রন্থ রচনায় বরাবর প্রেরণা দান করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের সম্পর্ক। কৃত্রিম ধন্যবাদ জানাইব না, তাঁহাকে আশীর্বাদ করি।—এই রকম। সমগ্র পাঠকমণ্ডলীর নিকট ছাপার অক্ষরে স্ত্রীকে আশীর্বাদ করিবার প্রয়োজন মনে হয় পারিবারিক অশান্তি হইতে রক্ষা পাওয়া। লেখকের দাম্পত্য জীবন যদি এই ভাবে শান্তিময় ও সুখময় হইয়া উঠে তাহা হইলে পাঠকের আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

ভূমিকার নীচে লেখক তাঁহার নিজের পুরো নামটি লিখিয়া দেন। কেহ কেহ নাম না লিখিয়া 'ইতি বিনীত গ্রন্থকার' বা 'লেখক' ব্যবহার করেন। আবার কেহ কেহ আছেন যাঁহারা নাম ও পদবীর আদ্য অক্ষরগুলি ব্যবহার করাই পছন্দ করেন। মনে করা যাক্ লেখকের নাম শক্তিকুমার নিয়োগী। ভূমিকার নীচে তিনি নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিলেন শ. কু. নি। এই সংক্ষেপিত 'শ. কু. নি' নামের কি সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে জানি না। কিন্তু এই 'শকুনি'র প্রতি লেখকের অসীম অনুরাগ। আবার বইয়ের টাইটেল পেজে দেখা যাইবে লেখক শ. কু. নি. লেখেন নাই, তাঁহার পুরো নামই লিখিয়াছেন— শ্রীশক্তিকুমার নিয়োগী। এ ক্ষেত্রে মনে হইতে পারে লেখক বুঝি তাঁহার মূল ও সংক্ষেপিত দুই নামই একটি বইয়ের মধ্য দিয়া সাহিত্যের বাজারে প্রচার করিতে ইচ্ছুক।

এ তো গেল ভূমিকার নীচে নামের পালা। এবার আসিবে তারিখের পালা। নাম সাধারণতঃ ডানদিকে লেখা হয় এবং তারিখটি থাকে ভূমিকার নীচে বাম-দিকে। অধিকাংশ লেখকের ভূমিকার নীচে একটি বিশেষ তারিখ বসাইবার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, রাসপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, রথযাত্রা, শ্রীপঞ্চমী, মহালয়া ইত্যাদি।

ভূমিকার সর্বাধিক সার্থকতা সমালোচনার ক্ষেত্রে। বিনা পারিশ্রমিকে কেবলমাত্র একটি বইয়ের লোভে—সে বইও হয়তো যথেষ্ট মূল্যবান নয়, না আক্ষরিক অর্থে না আলঙ্কারিক অর্থে—সমালোচনা লিখিয়া দিতে হয়। সংবাদ-পত্রে সমালোচনার জন্য দুই খণ্ড করিয়া বই দিবার রীতি। একটি থাকে পত্রিকার কার্যালয়ে আর একটি যায় সমালোচকের কাছে। তিনি যে সমালোচনা লিখিয়া দেন ঐ বইখানিই তাহার একমাত্র পারি-শ্রমিক, (অবশ্য দুই-একটি বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ হইতে সমালোচনা জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হইতেছে) তাহার জন্য বেশী পরিশ্রম করিবেন কেন? দায়ে পড়িয়া পড়িতে হইলে পাঠের ইচ্ছা আপনা হইতেই চলিয়া যায়; তাহার উপর বই যদি অতি বৃহৎ হয় তাহা হইলে তো কথাই নাই। তখন ভূমিকাই বিপদ হইতে রক্ষা করে। ঐ ভূমিকা পড়িয়াই কাজ সারিয়া দেওয়া যায়। কেবল ছাপা বাঁধাই এবং মূল্য সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীন মত-টুকু জুড়িয়া দিয়া সমালোচক ভূমিকার খণ্ডাংশকেই পূর্ণাঙ্গ সমালোচনায় রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং অনুকূল সমালোচনার পক্ষে ভূমিকা যে ক্ষেত্রবিশেষে সহায়ক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপরাজিতা

প্রাণতোষ ঘটক

ডোবা-পুকুর নয়, দীঘি এক দীঘি বললেই হয়।

তবুও লোকে বলে চড়ক-পুকুর। বর্ষার দিনে টইটম্বুর থাকে। পারাপারে দৃষ্টি চলে না সহজে, এমনই এক বিশাল রূপ চড়ক-পুকুরের। এক তীরে দাঁড়িয়ে অন্য পারের মানুষকে তাকালে মনে হয় দেখায় যেন ঠিক খেলার পুতুলের মত। গরু আর মোষ বিচরণ করে জলের ধারে ধারে। দূরে থেকে মনে হবে বুঝি পিপীলিকা। জলে পাঁক-পানা থিক থিক করছে এখানে সেখানে। কোথাও বা তীর-বরাবর শালুক ফুটে আছে রাশি রাশি। যেন চাপ চাপ জমাট-বাঁধা রক্ত। বিগত-কালের স্বাক্ষীস্বরূপ আজও কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে বাবুদের অনেক সখের বহু সাধের মাছ-ধরা মাচান। জরাজীর্ণ এখন। ঘুণ ধ'রে গেছে বাঁশে আর কাঠের তক্তায়। জোরালো বাতাস বইলে নড়বড় করতে থাকে। মাছ-রাঙা পাখী এসে বসে ভাঙা মাচায়। মাছের লোভে তাকিয়ে থাকে। জলের দিকে চোখ। অব্যর্থ লক্ষ্য।

আজ আর কোথাও বাবুদের পাত্তা মেলে না।

এককালে বাবুরা সানন্দে মাছ ধরতে বসতেন, দলবল সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত। চড়ক-পুকুরে তখন যেন বান ডাকতো। ভয়ার্ত মাছের প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় হুইল-ছিপের সুতো ছাড়তে থাকেন বাবুরা। মাছকে খেলার সুযোগ দেন খানিক। বাবুদের কিঞ্চিৎ হাসির খোরাক পাওয়া যায় যেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে পান আর অনুপান। বোতল বোতল বীয়ার। মাছের কচুরি। মাংসের সিঙাড়া। হাঁসের ডিমের ঘুগনী।

বঁড়শিবিদ্ধ বিশ-সেরী কাৎলা অ-ধরা থাকতে চায় যেন। বাবুদের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলতে চায়। বাবুদের হয়তো আনন্দ দিতে চায়। এদিক থেকে সেদিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ জলের অতল গহন-গর্ভে স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—এই নাকি কাৎলা মাছের স্বভাব। কোথায় তলিয়ে গিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে। টানা-টানির হাজারো চেষ্টাতেও নট্ নড়ন-চড়ন। শেষ পর্যন্ত ছিপের সুতো ছিঁড়ে যায়। মাছের হদিশ মেলে না আর। মোটা-সোটা কাৎলার কাছে সূক্ষ্মবুদ্ধির বাবুরা কতদিন ঠকতেন। বোকা বনতেন।

জলের নীচে বাসা থাকে কাৎলা-মাছের।

দৌড়-ঝাঁপে ক্লান্ত হলে তখনই নীচুপানে ছুট দেয় সে। একেবারে যাকে বলে ডুব। বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় অবশ্য মৃত্যুর ভয়ে। হুইল তখন আর ঘুরতে চায় না। তারপর কখন ছিপধর হাতের অনুভূতিতে টের পাওয়া যায়—সুতো আলগা হয়েছে। বঁড়শি কেটে পালিয়ে গেছে কাৎলা মাছ। সামান্য নগণ্য মীনের কাছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাবু-দের পরাজয় দেখে সোল্লাসে হেসে উঠতে।

আশপাশের দর্শকরা। হাততালি দেওয়ার শব্দ শুনে বাবুরা অপরিসীম লজ্জা পেতেন। মাছের জয় সহ্য করতে পারতেন না যেন।

আর আজ টানাজালেও মাছ ওঠে না তেমন। ওঠে কিছু কিছু জলজ-উদ্ভিদ। কিছু পুঁটি আর মহুরলা। ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যাংরার বাচ্চা। আজকাল বছর বছর কেউ নায় হাঁড়ি হাঁড়ি পোনা ছাড়ে না পুকুরে। ঝাঁঝি সাফ করে না দিন-মজুর লাগিয়ে। ছিপ ফেললে বঁড়শি নামতে চায় না জলে। অবরে সবরে ধরা পড়ে এক আধটা কাঁকড়া।

ঐ চড়ক-পুকুরের মধ্যভাগ কত যে গভীর, আজও কেউ মেপে দেখতে সাহস পায় না। কতটা যে বিস্তার, জরীপ করে না কেউ। শোনা যায়, দীঘির জঠরে গেছে অসংখ্য গরু মোষ আর ছাগল। ডুবে মরেছে কত যে নারী আর পুরুষ তার সংখ্যা কারও জানা নেই। ডুবে মরেছে শোকে-তাপে, বিরহ-বেদনায়, মনের দুঃখ-কষ্টে। কোথাও যার ঠাঁই মেলেনি তাকে সাদরে বুকে নিয়েছে সর্ব-জ্বালাহর চড়ক-পুকুর।

শাশুড়ী আর ননদ কষ্ট দেয় ঘরের বৌকে। জোট বাঁধে বৌকে জব্দ করতে। কষ্টে কাতর অসহিষ্ণু বৌটিকে হাতছানি দিয়ে যেন ডেকে নেয় চড়ক-পুকুর। সহসা কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে।

ঘন বসতি ছিল এককালে। দীঘির তীরে। ঘনগাছের ছায়ায়।

ধোপা, জেলে আর জোলাদের আস্তানা। খড়ের চালা, মাটির ঘর।

আজ শুধু চৈতনের ঘর ক'খানা এখনও দাঁড়িয়ে আছে কোন গতিকে। কালোত্তীর্ণ, ভগ্নদশা। তবু চার দেওয়ালের ঘর। ছাউনি আছে মাথায়। বৈশাখী উত্তাপে স্নিগ্ধ ছায়া পাওয়া যায়। শ্রাবণের ধারাবর্ষণে আচ্ছাদন। এলোমেলো পাশাপাশি খানকয়েক ভগ্ন-ভঙ্গুর মাটির ঘরে একটুকু আলা, কোন-ক্রমে আজও জীইয়ে রেখেছে চৈতন।

আর সব পালিয়েছে দলে দলে। সেবার ওলাওঠার মড়কে বাকী যারা ছিল তারাও চম্পট দিয়েছে বাঁচার আশায়। তার ওপর রাত-বেরাতে মরা-বৌয়ের চাপা কান্না শুনে কত লোক যে ভূতের ভয়ে এ তল্লাট ছেড়ে গেছে অন্যত্র।

চড়ক-পুকুরের এক পাড়ে আজও আছে জোলাদের মসজিদ। প্রহরে প্রহরে আর আজানের সুর শোনা যায় না। সকলের উদ্দেশে আহ্বানের মন্ত্র কেউ আর শোনায় না সরবে। নমাজে বসে না কেউ। শেয়ালের বাসা এখন মসজিদে।

আদিভূতকে কোনকালেই ডরায় না চৈতন। যদ্দিন তাগদ আছে শরীরে তদ্দিন জীবিত বা মৃত কাকেও ভয় পায় না সে। বর্শা, সড়কি আর টাঙ্গি আছে চৈতনের ঘরে। দরকারে কাজে লাগাতে হয়। বুনো শুয়োরের দল যখন তখন আসে চৈতনের সব্জী-ফসলে ভাগ বসাতে। শীতের গভীর রাতে সিঁদেল-চোরও আসে বৈকি কখনও। তখন টাঙ্গিখানা টেনে নেয় চৈতন। নরহত্যা করতে মন ওঠে না, তাই প্রথমে গলা খাঁকরায় চৈতন। সাবধান করে যেন চোরকে। শুধু শুধু কালিঝুলি মাখাই সার হয় সিঁদেল চোরের। হতাশ মনে ফিরে যেতে হয়।

সকালের কাঁচা হলুদ রোদ্দুরে দাওয়ায় এসে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চৈতন বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। এক কাঁসি পান্তাভাত, নুন আর কাঁচা লঙ্কা। কোন রকমে একটা দায়সারা খেয়ে দুটো গাধার পিঠে পোঁটলা-পুঁটলি চাপিয়ে শহরের উদ্দেশে বেরোতে হয় চৈতনকে। হাঁটতে হয় দুচার ক্রোশ। সারাদিন ধরে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে হয় তাকে। ফর্সা দিয়ে ময়লা নিতে হয়। ছেঁড়া-ফাটা দেখলে দেখিয়ে নিতে হয় গিন্নীমাদের। নয়তো গুনেগার দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। মাস-কাবারী পাওনা টাকা থেকে ক্ষতি-পূরণ কেটে দিতে হয়।

ভারবাহী গাধা দুটোকে মেঠো পথ ধরিয়ে দিয়ে চৈতন একবার রসুইঘরের দিকে এগোয় পা টিপে টিপে। হয়তো ফুটফুটে ডাগর বৌটাকে আর একটিবার দেখতে সাধ হয় তার। চৈতন বলে,—দ্যাখ্ বৌ, সাবধানে থাকবি কিন্তুক। আমার তো ফিরতে যার নাম সেই সন্ধে-রাত।

রোজকার শোনা কথা। প্রত্যহ এই একই কথাগুলি বলে চৈতন। তাই আর কথায় যেন কর্ণপাত করে না রাধারাণী। তবুও একটা অভ্যাসগত সম্মতি জানিয়ে দেয় সে। চৈতনকে খুশী করতে। ওপরে নীচে মাথা দোলায় রাধারাণী। স্বল্প হাসির সঙ্গে বলে,—এক শিশি আলতা চাই। আলতা বাড়ন্ত হয়েছে।

আজও ব্যতিক্রম হয় না। চৈতনের কথা শেষ হতে না হতে রাধারাণী বললে,—গায়ে-মাখা সাবান ফুরিয়েছে। আনবে এক-আধখান।

গলায় ঘণ্টা ঝুলছে গাধার। এক-জোড়া ঘণ্টার ঠং ঠং শব্দ, মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। পথের বাঁকে অদৃশ্য হতে না হতে। পিছু পিছু চলে চৈতন। হাতে একটা কঞ্চি। তাড়না করতে হবে গাধাদের। যেতে হবে অনেকটা পথ। যেতে আসতেই যেন কালঘাম ছুটে যায় চৈতনের। তার পৃষ্ঠপোষকদের দুয়োরে দুয়োরে ঘুরতে ঘুরতে দিন ফুরিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে কখন দিনের প্রথম রৌদ্রালোক চাকচিক্য তোলে চড়ক-পুকুরের জলে। কাঁচা-হলুদ রঙ কখন শুভ্র আকার ধরে।

এক বাটি চা তৈরী করে রাধারাণী ঘুমের আমেজটুকু কাটিয়ে নিতে খেয়ে নেয় ঢকঢকিয়ে। যেন জল খাচ্ছে। তারপর দুটো পান মুখে ফেলে দিয়ে ঘরের দরজায় শিকলি তুলে দাওয়া থেকে মাটিতে নেমে কেমন একটা শব্দ করে মুখে।—চুক, চুক, চুক।

ভিজে কাপড়ের রাশি বেতের ঝুড়িতে। জল চুঁইয়ে পড়ছে ঘাস-মাটিতে। কাচা-কাপড়ের স্তূপ থেকে একটি একটি তুলতে থাকলো রাধারাণী। পাকিয়ে পাকিয়ে জল নিঙড়ে শুকোতে দেয় টান দড়িতে। মেলে দেয় সযত্নে। যেন খণ্ড খণ্ড শুভ্রমেঘের মালা, গেঁথে চলেছে রাধারাণী। সজোরে হাওয়া চলেছে দিক ভোলা। সকালের টাটকা বাতাসে লেবুফুলের গন্ধ ভাসছে।

দড়ি থেকে ঝুলোনো সারি সারি ধুতি শাড়ী জামা—ঠিক সাদা নিশানের মত উড়তে থাকে হাওয়ার ঝলকে। বন্ধন মানতে চায় না। যেন ছিঁড়ে যাবে। যেন উড়ে যাবে।

এখানে সব কিছুই বেদাগ সাদা। নিষ্কলুষ শুভ্রতার প্রতীক ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র।

আকাশের মেঘপুঞ্জ। দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া সিক্তবাসের সারি। সকালের মিষ্টি রৌদ্র। চড়ক-পুকুরে সন্তরমান রাজহাঁস। শুধু মাত্র নিরবিচ্ছিন্ন সাদা রঙ চতুর্দিকে—যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

হাতের কাজ সেরে ভিজে কাপড়ের শূন্য ঝুড়িটা কাঁকালে তুলে নেয় রাধা-রাণী। ঘরের দিকে পা চালায়। ভারী নিতম্ব, তাই গতি যেন তার কিছু মন্থর। শীত শীত বাতাসে কপালে-নেমে-আসা কেশকুন্তল নাচতে থাকে চলনের ছন্দে।

—চুক চুক চুক।

সহাস্যে, সশব্দে গোয়ালের ঝাঁপ-দরজাটা খুলে দেয় রাধারাণী। অর্গল আলগা হতেই বেরিয়ে আসে মা আর সন্তান। গরু আর বাছুর। খানিক চরে বেড়াবে এখন। কচি কচি ঘাস রোমন্থন করবে। তারা রাধারাণীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কেমন। একটু আদর, একটু সোয়াগ চায় তারা। গলায়-পিঠে রাধা-রাণীর নরম হাতের ক্ষণেক প্রলেপ।

ছাগল আছে ক'টা। তাদের খুঁটি পুঁততে দিতে হয়। হয়তো কখন ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথায়, জানতে পারবে না রাধারাণী। হয়তো হারিয়ে যাবে অন্য দলে। চৈতন ফিরে এসে অকথ্য গালমন্দ শোনাবে। সহ্য করতে হবে নীরবে।

অসাবধানের শাস্তি। একটা সামান্য ছাগল হারানোর জের চলবে অনেক দিন।

চটপট হাতের কাজ সারতে হবে একটা একটা।

উনুনে টাটকা গুল দিতে হবে। ঘর-দাওয়ায় ঝাঁট দিতে হবে। পুকুর থেকে জল তুলে আনতে হবে বেশ কয়েক কলসী। উনুনের আঁচ যখন বেশ গমগমে হয়ে উঠবে তখন ইস্ত্রীটা বসিয়ে দিতে হবে। পোষা-বেড়ালটা সেই যে একপাশে প'ড়ে আছে মনমরা, তাকে এক রত্তি দুধ। চটা-ওঠা এনামেলের একটা বাটি বসিয়ে দিয়ে গেল রাধারাণী। সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব বেড়ালটা সজীব হয়। আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করে। কোথা থেকে ছুটে আসে এক পাল তারই ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। যেন এক এক মুঠো শিমুলতুলো।

বাটিতে দুধ। আবার সেই রকম শব্দ পাওয়া যায়। এখন আর রাধারাণীর মুখে নয়। এখন সপরিবারে বেড়াল দুধ পান করছে। প্রাতরাশ।

পলকহীন চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে গাই আর বাছুর। প্রতীক্ষায় আছে তারা। কখন রাধারাণী আসবে তাদের কাছে। রাধারাণীর হাতের পরশ পাবে কখন।

স্নিগ্ধ বাতাসে খড়ের গন্ধ ভাসলো হঠাৎ। সোঁদা আর মিষ্টি গন্ধ।

মাটির গামলায় খড় ঢালতে থাকে রাধারাণী। কুচো কুচো সোনার টুকরো খড়, ফুলের পাপড়ির মত ঝরতে থাকে, রাধারাণীর হাতের ঝুড়ি থেকে। সাত-সকালে উঠে চৈতন প্রথমেই দুধ দুইতে বসে। এই কাজটুকু সেরে দিয়ে যায় চৈতন। গতরে কুলোয় না রাধারাণীর। সামলাতে পারে না।

বাছুরটা মাথা ঠুকতে থাকে ঘন ঘন। লাফালাফি করে খানিক। দুধের লোভে তার আর তর সইছে না যেন। জন্মদাত্রী মাকে চাই তার। মাথা ঠুকছে ঘন ঘন, দুগ্ধবতী মায়ের পেটে।

একটা হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললে রাধারাণী। বাছুরটা কেমন দুধ পান করছে নিশ্চিন্তায়—দেখতে দেখতে কেমন যেন সে মুগ্ধবিহ্বল। শতেক কাজ ভুলে তাকিয়ে আছে বড় বড় চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে।

এক খণ্ড পাথর সরালে যেমন পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ বেরিয়ে আসে, তেমনি আবার সেই পুরানো একটা ভাবনা জেগে ওঠে রাধারাণীর মস্তিষ্কে। বড় একা একা থাকতে হয় রাধারাণীকে। প্রায় সর্বক্ষণই একা। দিন ফুরিয়ে দিয়ে ফিরে আসে চৈতন। দিন শুরু হ'তে না হ'তে আবার বেরিয়ে পড়ে। শহরের দিকে পাড়ি জমায়। সঙ্গে চলে এক জোড়া গাধা।

আহা! ঐ বাছুরটাকে দুধ খেতে দেখতে দেখতে রাধারাণীর মনে হয়, তবু যদি একটা বাচ্ছা থাকতো তার। সময় যে তবে কোথা দিয়ে ব'য়ে যেতো ঠাওরাতে পারতো না। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে যেন এখন সদাই। সাড়া নেই কোথাও। ডাকও নেই কারও।

চৈতনেরও নজর নেই যেন তেমন। নেহাৎ দায়সারা গোছের ব্যবহার তার। কর্তব্যপালনের তাগিদেই যেন ক'টা কথা বলতে হয় তাই কথা বলে চৈতন। হাসির প্রসঙ্গ উঠলে চৈতন হাসে। ক্রোধের কারণে বুনো রাগে যেন ফেটে পড়তে থাকে। অকথ্য গালমন্দ শানায়। এক আধবার রাধারাণীর গায়ে হাতও তুলেছে চৈতন। রাগ মানাতে দিয়েছে দু'চার ঘা চড় কিল।

আড়ালে আবডালে চৈতনকে বলে রাধারাণী মনে মনে, 'বুড়ো'।

সত্যিই কিন্তু ইদানীং একটু বুড়িয়ে গেছে যেন চৈতন। আগের মত তেমন আর সবল সতেজ ব্যস্তচঞ্চল নেই আর। সেবার ওলাওঠার মড়কে তার প্রথমা স্ত্রী এলোকেশীর মরণ হয় নেহাৎ অকালেই। কাঁদনের আড়াআড়িতে একটা মেয়ে ছিল সেও গেল মাকে খুঁজতে। তারপরেও কয়েক বছর বিবাগী অবস্থায় কাটিয়েছে চৈতন। শোকেতাপে মুহ্যমান যেন। সংসারে আর মন বসতে চায় না। মাছ-মাংস মুখে ওঠে না। ক্ষুধাতৃষ্ণা লুপ্ত থাকে কতকাল। কার জন্যই বা আর বাঁচবে চৈতন? কাকে বাঁচাতে?

তাই আবার বেশ কিছুকাল পরে আর একটা বিয়ে করেছে চৈতন। একটা ডাগর মেয়ে এসেছে ঘরে।

পাশের গাঁ থেকে দেখে-শুনে একটা স্বঘরের মেয়েকে যোগাড় ক'রে ঘর বেঁধেছে চৈতন। মন দিয়েছে আবার জাতকাজে। রোজগারের ধান্ধায় ঘোরা-ঘুরি আবার।

কিন্তু উৎসাহ আর উদ্যমে যেন ভাটা পড়েছে। এত মোহনীয় রূপ আর এত দুর্বার আকর্ষণ রাধারাণীর ভরাট জোয়ান দেহ—দৃষ্টি নেই যেন চৈতনের। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছে চৈতন ইতি-

পারবেই, আর যেন প্রয়োজন নেই কোন কিছুর। বেঁচে থাকতে হয়, তাই যেন বেঁচে আছে কোন গতিকে।

—মা!

কত রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে ডাক শুনেছে রাধারাণী। স্বপ্নে দেখেছে, একটি নধর-কান্তি শিশু। দুয়োরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। নয়তো রাধারাণীর আশেপাশে খেলে বেড়ায় সে। পায়ের মল বাজতে থাকে ঝুনঝুন। তাকে দেখতে পায় রাধারাণী। সে এসে এসে দেখা দেয়। খুশীতে উচ্ছল সেই শিশুমুখ। জ্বলজ্বলে চোখের তারা।

—মা!

সেই শিশুর ডাক, যখন তখন কানে শুনতে পায় রাধারাণী। মনে মনে সাড়া দেয় সস্নেহে।

মাথা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে রাধারাণীর। সে ভুলে থাকতে চায় এই অভাবের জ্বালা। মন কিন্তু মানতে চায় না।

রোদ্দুরের তেজ বেড়েছে বেশ। বেলা গড়িয়ে চলেছে আপন গতিতে। সবুজ মাঠে, দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া জামা-কাপড়ের সারি হয়তো এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে কড়া রোদে। আরও একটি দীর্ঘ-শ্বাস ফেললে রাধারাণী। শুকনো কাপড় তুলতে চললো এক পা এক পা। আলস্য ধরেছে যেমন। কাজে মন লাগছে না যেন। একটি একটি জামা আর কাপড় টেনে টেনে পাড়তে থাকে সে। জামা পাট করে, কাপড় কুঁচিয়ে নেয়। ঝুড়িতে ফেলতে থাকে একটি একটি। অভ্যস্থ তার অব্যর্থ লক্ষ্যে।

শুষ্কবাসে উপচে ওঠে ঝুড়ি। কাঁকালে তুলে নেয় রাধারাণী। দাওয়া পেরিয়ে ঘরে সিঁদিয়ে যায় তড়িৎ পায়ে।

ইস্ত্রীটা নামিয়ে গমগমে উনানে জল-ছাঁত ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয় সে। মনে মনে ভেবে ঠিক করলে, দিনের খাওয়ার আগে, ভাতে বসার আগে শুকনো ক'খানা জামা আর কাপড়ে ইস্ত্রীর কাজটা সেরে ফেলতে হবে। পেটে ভাত পড়লে আর যেন উত্থানশক্তি থাকে না রাধারাণীর। খানিক গড়িয়ে নিতে হয় তখন।

থুথু ফেললে রাধারাণী। তপ্ত ইস্ত্রিতে থুথু ফেলে পরখ করলে তাপমাত্রা কতটা। ক্ষণেক বুদ্বুদ কেটে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়। এক টুকরো কাপড় হাতে তুলে নেয় রাধা-রাণী। গরম ইস্ত্রী, শুধুহাতে ধরা যায় না। একটা বেসাইজের পাথরে বসিয়ে দেয় ইস্ত্রী। এবার খানিক ঠাণ্ডা হোক আগে। একটু বেশী তেতে উঠেছে যেন।

আরও একরাশ সুতীবস্ত্র ভিজিয়ে দিতে চললো রাধারাণী।

ইতিউতি দেখলো একবার। পোষা-পশুদের দেখলো যেন। দেখলো, তাদের সংখ্যা ঠিক আছে না নেই। গামলার জলে মশলা-মিশানো। মানুষ-প্রমাণ একটা বাঁশ আছে গামলায়। রাধারাণী সাপটে ধরে ঐ বাঁশ। জল ঘোলাতে থাকে বাঁশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, মন্থনের ঢঙে। ফেনা দেখা দেয় ধীরে ধীরে। ফেনা ফুলতে থাকে।

ঠিক এমন সময়ে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে কাছাকাছি, খেয়াল নেই রাধারাণীর। হাতের কাজে তার এমনই মনঃসংযোগ। আগন্তুক কিন্তু সাগ্রহে লক্ষ্য করছে তাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে রাধারাণীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ! অপলক চোখে দেখছে তার ভরা যৌবন। দেখছে রাধারাণীর হাতের ফাঁক থেকে। তার উন্নত বক্ষ, এক জোড়া বাঁধাকপি যেন ঢেউ তুলছে বুকে, রাধারাণীর চঞ্চল দেহ-ভঙ্গিমায়।

শব্দে যদি সজাগ হয় সে, তাই হয়তো সে দাঁড়িয়ে আছে নীরব নিস্পন্দ। একটিও কথা বলছে না। সাবধান হোক রাধারাণী, সে হয়তো তা চায় না।

আকাশী রঙের জল-ডুরে শাড়ী পরণে। গাছ-কোমর বাঁধা আঁচলে। রাধা-রাণীর আঁটসাঁট দেহরূপে আরও যেন স্পষ্টতর দেখায়। সে যেন কাটা-কোনা রেখায়িত। ধারালো।

বাছুরটা আবার গেল কোথায়! অনু-সন্ধানী চোখে এধার সেধার দেখতে দেখতে সহসা তাকে দেখতে পায় রাধা-রাণী। দেখে কে একজন। কেমন যেন মোহগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে। দেখছে শোনদৃষ্টিতে। এক নওজোয়ান সে।

চোখাচোখি হতেই এক ঝলক হেসে কোমরের আঁচল খুলতে থাকে রাধারাণী। তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক ঢেকে নেয় বুক আর পিঠ। মাথায় একটু ঘোমটা টানে।

—চৈতন আছে? চোখে চোখ পড়তেই লজ্জা কাটিয়ে শুধোয় সে। হাতে-ধরা বাইসাইকেলটা একটা গাছে ঠেকিয়ে রাখে। আর যেন সরাসরি চোখ তুলে তাকাতে পারে না সহজে।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় রাধারাণী। বলে,—না নেই। গেছে সেই ভোরনাগাদ। শহরপানে গেছে।

—কখন ফিরে আসবে চৈতন?

—ঠিক নাই কিছুই। কথা বলতে বলতে রাধারাণীও দেখে বাগ্রব্যাকুল চাউনিতে। ঠিক যেন ঠাওর করতে পারে না। চেনা না অচেনা। বলে,—তার ফিরতে ফিরতে যার নাম সেই সাঁঝ-রাত্তির।

—তবে এখন উপায়! স্বগতোক্তির সখেদ সুর। নিরাশ কণ্ঠস্বর। কিংকর্তব্য, ভেবে পাওয়া যায় না।

আকপাল গুন্ঠন, তবুও রাধারাণীর ঢলঢল মুখখানি দেখতে পাওয়া যায়। তার চোখে ঘনকাজল। কপালে কাঁচ-পোকার টিপ, আলোর আভা ঠিকরোয়। চিকচিকিয়ে ওঠে। রাধারাণী বললে,—আপনি কে গা বাবুমশাই? কোথায় ঘর আপনাদের? তাকে কি দরকার, আমাকেই বলেন না কেন।

কথা বলতে বলতে সে দাওয়ার দিকে পিছু হটতে থাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে।

—চৌধুরীবাড়ীর সেজতরফের আমি। থেমে থেমে কথা বলে সে। বললে,—জামা-কাপড় চাই আমার এখুনি। বিয়ের নেমন্তন্ন আছে আজ একটা। গতকাল চৈতনের যাওয়ার কথা ছিল, যায়নি সে।

—কাল যে বর্ষা গেছে দিনভোর। রাধারাণী কথা বলে আর দাওয়ার ধাপে আলতালাল পা দেয়। বলে,—আপনি আসেন। আমি দেখি কোথায় আছে আপনার জামা-কাপড়।

অজানা অপরিচিত নয়। চৌধুরী-বাড়ীর নামটা যেন শোনা শোনা ঠেকছে কানে। রাধারাণীর মুখ থেকে ভয়ের কালো ছায়া মিলিয়ে যেতে থাকে। সে দেখছে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

রাধারাণীর পিছু পিছু এগোতে থাকে আগন্তুক। লজ্জা আর সংকোচ ফুটে ওঠে তার কোমল মুখে। সে যেন এমন পরিস্থিতি কল্পনায় ভাবতে পারে না।

এক জোড়া তাজা যৌবন, নির্জনে এক হয়েছে। সান্নিধ্যে এসে পরস্পরে। রাধারাণীর কণ্ঠস্বর কি মিষ্টি আর সুরেলা। কানে যেন বাজতে থাকে, তার একটি একটি কথা। স্মৃতি আর সত্তার সঙ্গে যেন মিশে যায়।

ঘরের ভেতরে আলো-আঁধারি! আলো থেকে অন্ধকারে। তার চোখে যেন ধাঁধা লাগে খানিক। কিছুই নজরে পড়ে না। যাদুঘর দেখছে যেন সে। চোখে এমনই বিস্ময়।

—আপনি বসেন বাবুমশাই। মিষ্টি কণ্ঠে বললে রাধারাণী। তাকিয়ে থাকলো তার মুখে চোখ রেখে। ঠোঁটের কোণে

মৃদুমন্দ হাসি। বললে,—আগে এক বাটি চা খেতে হবে কিন্তুক। কদ্দূরে থেকে আসছেন আপনি!

হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারে না সে। একটি উঁচু চৌকিতে ব'সে পড়লো সসংকোচে। তার হাতের নাগালের মধ্যে প্রায় একজন ভরাযৌবনা।

একটা চাপা হাসির রেশ রাধারাণীর ওষ্ঠপ্রান্তে। তার মুখভাবে প্রসন্নতা যেন। পাছে ধরা পড়ে, তাই ক্ষণস্থায়ী। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাধারাণী। উনানে জল চাপালো চায়ের। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রাখলো একপাশে। থাক আপাততঃ।

জামা-কাপড়ে চোখ নেই তার। দৃষ্টি রাধারাণীর দিকে। থাক থাক থানইট দিয়ে উঁচানো চৌকিতে বসে দাওয়ার একটুখানি চোখে পড়ে। দেখতে পাওয়া যায় রাধারাণীর মুখে যেন আস্থা আর আশ্বাস ফুটে উঠেছে। তাকে অকপটে বিশ্বাস করা যায়, এতই সে নির্ভরশীলা। দেখতে পাওয়া যায় রাধারাণীর ঘোমটা অসাবধানে পিঠে নেমেছে। দেখা যায় তার মাথায় রাশি রাশি কোঁকড়া চুল। পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে। রাধারাণীর চলাফেরায় যেন ছন্দ আছে বেশ। চোখে পড়ে, রাধারাণীর নরম আর মসৃণ চাঁদপানা মুখ। মেদবহুল শূন্য দুই স্কন্ধ। নধর বাহুযুগল। ক্ষীণ কটি।

ঘরের মধ্যে কত কি আছে তার ঠিক নেই। দেওয়ালে দেবদেবীর রঙীন ছবি। মাটির কাকাতুয়া। বাক্স-প্যাঁটরা। বসন আর বাসন। রাধারাণীর সাজ-সরঞ্জাম। গন্ধতেল, আলতা, পাউডার, কাজললতা। ঘরে হাওয়ার লেশমাত্র নেই বললেই হয়। সে ঘামতে থাকে। এক জোড়া মাছি উড়ে বেড়ায় এখানে-সেখানে। তাকে বিব্রত করে। তাড়ালেও যায় না। উড়ে পালায়। আবার আসে। হাতপাখা টেনে নেয় সে। হাওয়া খেলায় পাখা চালিয়ে।

খোলা দরজা থেকে মুক্ত-আকাশ লক্ষ্যে ধরা পড়ে। শুভ্র মেঘের ঢেউ চলেছে একেকটা। অনেক উঁচুতে উড়ছে এক ঝাঁক চিল। মন্থরগতি তাদের। যেন ভাসছে আকাশে। ডানা মেলে আছে।

অনাড়ম্বর আতিথ্য। লোকনিন্দার ধার ধারে না রাধারাণী। সরল মনের সেবা তার। হাতল-ভাঙা এক পেয়ালা গরম চা হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায় রাধারাণী। বলে,—হয়তো স্বোয়াদ হয়নি তেমন। রুচবে না মুখে।

ধূম্রমান পেয়ালা মুখে তোলে সে। বলে,—ঠিক আছে। ঠিক আছে।

আবার ঘর থেকে বেরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয় রাধারাণী। কি একটা হাতের কাজ চটপট সেরে আসতে যায় যেন। দাওয়া থেকে বলে,—আমি এই এলাম ব'লে। বাছুরটাকে বেঁধে দিয়ে আসছি। আপনি চাটুকু খেয়ে নিন বাবুমশাই।

নামে-মাত্র চা। সত্যিই স্বাদ নেই তেমন। গন্ধও নেই। জলের মতই পাৎলা। চিনি নেই বললেই হয়। তবুও সে পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এত কষ্ট করলে চৈতনের বৌ। যদি মনে ব্যথা পায় বৌটা!

—কোথাও দেখতে পেয়েছেন আপনার জামা-কাপড়? দেখাতে পারেন কোনগুলো? আবার ফিরে আসে রাধারাণী। একটু যেন হাঁফ ধ'রেছে তার। বাছুরটার সঙ্গে টানাটানিতে। রাধারাণীর মুখে হাসি মাখানো। অব্যক্ত চাপা হাসি। রহস্যের আভাস।

—উঁহু, কৈ দেখছি না তো। ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে কথা বলে সে। হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে দেয় চৌকির তলায়। চৌকির একপাশে ইস্ত্রী দেওয়া জামা-কাপড়ের থাক। কাপড়ের পাড় দেখতে থাকে সে। জামাটা খুঁজতে থাকে। পাৎলা আদ্দির পাঞ্জাবি আর সোনালী জরিপাড় ধুতি—কৈ দেখতে পাওয়া যায় না।

ঠোঁট উল্টায় রাধারাণী। আত্মজিজ্ঞাসা তার মুখভঙ্গিতে। স্বল্পহাসির সঙ্গে বলে,—চোখের সম্মুখে থাকলেও নজর এড়িয়ে যায় কত কি। হয়তো আছে কোথাও, সহজে দেখা মিলছে না।

তার চোখের সম্মুখে এখন রাধারাণী। তার কোঁকড়া চুলের রাশি থেকে একটা গন্ধতেলের চেনা-অচেনা সুগন্ধ ভেসে আসছে। পাৎলা জলডুরে শাড়ী, সারা দেহে যেন রেখা ফুটিয়েছে! কপালে কাচপোকার টিপ, সোনালী-সবুজ আভা ঠিকরোয়।

—চলি আমি তবে। সে বললে নিরুপায়ের মত। এধার সেধার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় আরও একবার। যদি চোখে পড়ে। বললে,—চা খেতে পেয়েছি, তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আসল কাজ হ'ল না। জামা-কাপড় দেখতেই পেলাম না।

—ধন্যবাদ!

কেমন যেন নির্বোধের মত কথাটি পুনরুচ্চারণ করলে রাধারাণী। তার

কাজলকালো চোখের চাউনি স্থির নিবন্ধ আগন্তুকের মুখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খিল খিল হাসি ধরে রাধারাণী—ধন্যবাদ কি গো বাবুমশাই!

—বলতে হয় এই কথাটা। না বললে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। কথা বলতে বলতে সে দুয়োরের দিকে এগোয়। বললে,—মিথ্যে আমার আসাই সার। কাজ হ'ল না। চৈতনকে পেলাম না। পেলাম না আমার কাপড়-জামা। অথচ কুটুমবাড়ীতে আজ নেমন্তন্ন আছে।

হঠাৎ মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। রাধারাণীকে দেখায় যেন ম্লান আর বিমর্ষ। হাসিখুশী বৌটা কেমন নিরানন্দে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। খানিক নীরব থাকতে থাকতে বললে,—আমি যে বাবু-মশাই ওদিকে ডিমের ডালনা চাপিয়েছি। না খেয়েই চলে যাবেন? তা হবে না।

সত্যিই হাওয়ায় পেঁয়াজের গন্ধ ভাসছে। ডিমের ডালনা চাপিয়ে দিয়েছে রাধারাণী। রসুই থেকে ধোঁয়া উড়ছে বাতাসে।

না। বলতে চেয়ে থেমে যায় সে। কথাটি কণ্ঠে অনুচ্চারিত থেকে যায়। তার মনে পড়ে, কে একজন বয়স্ক লোক ব'লেছিলেন যে, মেয়েদের এড়িয়ে চলাই ভাল।

—দেখি, হয়তো এতক্ষণে ফুটে উঠেছে ডিমের ডালনা। দেখে আসি বাবু-মশাই। আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। দোহাই।

রাধারাণী পলকের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যায়। মন বলছে এই স্থান এখনই ত্যাগ করতে কিন্তু বিবেকের নির্দেশ পাওয়া যায় না যেন। চৈতনের বৌ যখন বলছে এত কাতরসুরে। কথায় মিনতি মাখিয়ে। মনে পড়ে, কে একজন গুরুজন ব'লেছিলেন, ডিম আর পেঁয়াজ জাতীয় বস্তু যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। পাখীর ডিমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। রিপু জেগে ওঠে।

—আর একটুখানি।

দাওয়া থেকে কথা বলে রাধারাণী। তার হাতে এক রাশ কাচের চুড়ি। ঠুং ঠাং শব্দ আসে চুড়ির। বাসনপত্র নাড়াচাড়া করছে সে।

চড়ক-পুকুরের তীরে আকাশছোঁয়া নারকেল আর দেবদারুর মগডালে দাঁড়-কাক ডেকে চলেছে পরিত্রাহি। ঐ বিরাম-বিহীন ডাকের সঙ্গে রাধারাণীর পরিচয় আছে। প্রথম প্রথম কানে তালা ধরতো, এখন সে অভ্যস্থ।

অবাক লাগে জোয়ান ছেলেটির। ভেবে পায় না, কেন তার প্রতি এত যত্ন-আত্তি। কেন এই অকারণ আতিথেয়তা। মনে হয়, রাধারাণীর সঙ্গে আছে যেন জন্মান্তরের সম্পর্ক। এতকাল অজানা ছিল। আজই সবে মাত্র জানাজানি হয়েছে। তবুও মুখে বিরাগ ফুটিয়ে থাকে সে। তার বেদাগ মন কিছুতেই যেন সাড়া না দেয়। মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকলেই ভাল, কে যেন ব'লে-ছিলেন। কে এক গুরুজন।

—মুখে রুচবে না বাবুমশাই। মাফ করবেন। মুখে দেন একটুক।

দুয়োরে দাঁড়িয়ে কথা বললে রাধা-রাণী। বেশবাস এলোমেলো, আলু-লায়িত চুলের বোঝা। শাড়ীর আঁচল নেই যথাস্থানে। দৃষ্টিও নেই যেন সেদিকে।

অপ্রস্তুত হাসি হাসলো সে। ক্ষীণ হাসির সূত্র ধ'রে বললে,—ঠিক আছে। একটুক মুখে দিয়ে দেখি।

তৃপ্তি আর নিশ্চিন্ততার গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাধারাণী। তার এত চেষ্টা অন্তরের ব্যর্থ হ'তে দেবে না সে। কখনও নয়। তার আবেদনে সাড়া দিতেই হবে। একটা যেন অত্যন্ত জটিল আর দুরূহ কাজে সাফল্য পেয়েছে রাধারাণী।

এক পাত্র জল পানীয়। আর একটা কাচের রেকাবী বসিয়ে দেয় রাধারাণী। সোনালী রঙের একজোড়া ডিম রেকাবীতে। কেঁপে কেঁপে ধোঁয়া উঠছে ঊর্ধ্বমুখে। সুগন্ধ ছড়িয়েছে বন্ধঘরের মধ্যে।

কি আশ্চর্য! রাধারাণীর বুকের ভেতরে ধুক ধুক করছে কেন কে জানে। এত দ্রুত বেজে চলেছে যে ভয় করে। যদি শুনতে পায় আগন্তুক!

খাদ্যের লোভে লোভে রাধারাণীর পোষা বেড়ালটা পা টিপে টিপে আসে কখন ঘরে, কেউ দেখতে পায় না। হিংসার দৃষ্টি বেড়ালের চোখে। মাৎসর্য। আগন্তুককে তির্যক চোখে একবার দেখলো বেড়াল। তারপর চৌকির তলায় আশ্রয় নেয়।

আমার কি হয়েছে! কি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে! আমি কি করতে চলেছি! বিচিত্র একটি অনু-ভূতিতে যেন কেমন আচ্ছন্ন রাধারাণী। দৃষ্টিহীন চোখের চাউনি। কিসের যেন ঘোর লেগেছে রাধারাণীর কাজলকালো আয়ত আঁখিযুগলে। তাকে দেখায় যেন উত্তেজিত, উচ্ছ্বসিত।

রেকাবী হাতে তুলে নেয় সে। অগত্যা খেতে হয় তাকে। প্রত্যাহারের আঘাত দিতে পারে না সে। মন সাড়া দেয় না নির্দয়তায়। পরস্পরের মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু দৃষ্টির বিনিময় হয়। রাধারাণীর সহাস চাউনি দেখতে দেখতে মোহ আসে চোখে।

বাইরে চুপচাপ। দেখলে ধরা যায় না যে রাধারাণীর নরম বুকে তুফান উঠেছে। ঝড় বইছে দুর্যোগের। বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে যেন তার সর্বাঙ্গে। থেকে থেকে রাধারাণীর কমনীয় মুখখানি যেন আরক্তিম হয়। চোখ জ্বলজ্বল করে।

নেহাতই একটি ছেলে। কতই বা বয়স হবে। খুব জোর তেইশ কি চব্বিশ। তার বেশী কিছুতেই নয়। ছেলেটির মুখে যেন সভ্যতা আর ভব্যতার ছাপ পাওয়া যায়। চৈতনের মত কর্কশ নয়। চৈতনের মত তার অভিজ্ঞতা নেই হয়তো।

সে ভাবছিল, মেয়েটি রূপেগুণে মন্দ কি! হয়তো বয়সে বড়ই হবে। ঠিক বলা যায় না, ধরা যায় না কত তার বয়স। পঁচিশ হ'তে পারে। ত্রিশও হওয়া অস-ম্ভব নয়। চৈতনের বৌকে দেখলে সর্বাগ্রে নজরে আসে তার কাজলপরা দুই দীর্ঘ চোখ। টানা টানা, পটলচেরা। কেমন কোমল আর মসৃণ তার শরীর। গায়ের রঙ শ্যাম। তা হয়তো নয়। তাম্রবর্ণ যেন। তার চোখের ব্যাকুলতায় ধরা পড়ে রাধারাণীর নিরাবরণ কণ্ঠ। একজনের ব্যগ্রদৃষ্টি চরে বেড়ায় রাধারাণীর মুখে। দেখতে দেখতে থমকে থাকে চোখ। রাধারাণীর বক্ষমাঝে ত্রিকোণাকৃতি খাঁজ দেখা যায়। এক চিলতে অন্ধকার সেখানে। দুই পাশে সুগোল ঢোল।

চোখ বন্ধ করলে ছেলেটি। লোভ দমন করলে যেন সংযমে।

রাধারাণী কিন্তু দেখতে পেয়েছে, কোথায় তার চোখ থেমে থাকে। এক ঝলক খুশীর হাসি উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যায় এক নিমেষে। রাধারাণী মনের আবেগ ঢাকতে আবার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আলগা আঁচল যেমনকার তেমনিই থাকে। রসুইঘরে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। লজ্জা করে ভীষণ। সারা দেহে এক অপূর্ব শিহরণ খেলছে যেন। দুই জানু কাঁপছে থরথরিয়ে।

আবার সে শুধোয় নিজেকে, কি করছি আমি! কি ঘটতে চলেছে। উত্তর খুঁজে

মেলে না যেন। মন থেকে উবে যায় বিচার আর বিশ্লেষণ। আবার সেই উত্তেজনা। আবার সেই বৈচিত্র্যময় প্রয়োজনের এক রুদ্ধশ্বাস আবেগে উদ্বেল হয় রাধারাণী।

'ঈশ্বর, আমাকে মার্জনা কর'। মনে যেন পাপ না আসে। স্মরণে আসে শাস্ত্র-পুরাণের মুনি আর ঋষিদের। কি উপায়ে তাঁরা আত্মসংযত ছিলেন। মেয়েদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেলে তখন কি কর্তব্য! পরিহার করাই হয়তো শ্রেয়ঃ। ঠাকুর বলেছেন, কামিনী আর কাঞ্চনে লোভ হওয়া সমীচীন নয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

—ভাল হয়নি রান্না, আমি আগেই জানি।

ভরাট কণ্ঠের মিষ্টি মিষ্টি কথা। রাধারাণী আবার এসে হাজির হয়। শূন্য রেকাবী আর জলের পাত্র তুলে নেয় হাতে। বলে,—আপনারা বাবুমশাই কত কি ভালমন্দ খান। আমরা যা পাই তাই খাই। বাছবিচার করি না। সাধ্যি নেই তেমন।

—খু—ব ভাল হয়েছে। ছেলেটি বললে লাজুক সুরে।

—বলতে হয় তাই বলছেন। সহাস্যে বলে রাধারাণী। বুক চিতিয়ে চিতিয়ে কথা বলে সে। কেমন যেন প্রলোভন জাগাতে চায়। আকৃষ্ট করতে চায় তাকে।

হঠাৎ যেন সকল উত্তেজনা প্রশমিত হয়। রাধারাণীর মুখে কাঠিন্য দেখা দেয়। আর দ্বিরুক্তি নয়, দোনামনা নয়। ভাল আর মন্দ, সৎ আর অসতের দ্বন্দ্ব আর যেন ভাল লাগছে না। রাধারাণীর মনের অবস্থা হয় এমন, সে যেন বদ্ধপরিকর। রসুই ঘরে গিয়ে পরণের জামার প্রথম টিপকলের বোতামটি সে স্বেচ্ছায় খুলে দিয়েছে। লজ্জা আর ভয়ের প্রতিবাদকে এখন যেন তুচ্ছ জ্ঞান করে সে।

সম্মোহনের মন্ত্রে ছেলেটি যেন কেমন নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে নিশ্চুপ বসে থাকে চৌকিতে। তার গালে হাত। কপালে যেন চিন্তারেখা ফুটেছে। রাধারাণীর মিষ্টি মিষ্টি কথা তার কানে যায় কি না যায়।

রাধারাণী ঈষৎ নীচু হয়ে বেড়ালটাকে ধরতে চেষ্টা করে আদরের ছলে। ছেলেটির চোখে পড়ে রাধারাণীর সুস্পষ্ট বক্ষ। এক জোড়া উটপাখীর ডিম যেন। ডাল আর পাতার বাসায় রয়েছে কত আরামে। এক ঝলক রক্ত ওঠে যেন মাথায়। ছেলেটি অন্ধকার দেখতে থাকে চোখে। একটি তপ্তশ্বাস ফেলে সে। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ।

সঙ্গে সঙ্গে রাধারাণীও বেড়ালকে ছেড়ে উঠে পড়লো। ছেলেটির চোখে চোখ রাখলো। কেমন যেন করুণ দৃষ্টি তার চোখে। ব্যর্থতার ম্লান চিহ্ন মুখে। রাধারাণী ভাঙা গলায় বললে,—চললেন না কি?

—হাঁ চললাম। চৈতন হয়তো যাবে আজ আমাদের বাড়ীতে। কে জানে!

মনে মনে যেন যুদ্ধ চালিয়েছে রাধারাণী। এই অনুকূল পরিস্থিতি সে কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে দেবে না। কিন্তু ভগবান যদি বাধ সাধেন। পাষাণ মূর্তির মত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে রাধারাণী। বেড়ালটা কিছুই বোঝে না। রাধারাণীর পা চাটতে থাকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে। কেমন যেন মরা চোখে দেখছে রাধারাণী। দেখছে, ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার জুতোর শব্দ শোনা যায়। ঘরের বাইরে থেকে ভেসে আসে পদক্ষেপের ধ্বনি। রাধারাণীর বুকে যেন ঘন ঘন হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে।

জ্বরের জ্বালা ধরেছে যেন। সারা দেহ ঝিমঝিম করছে।

দুয়োর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় রাধারাণী কেমন এক বিতৃষ্ণায়। চোখ জড়িয়ে আসছে ধীরে ধীরে। যেন চোখে তন্দ্রার ঘোর নামছে। অতঃপর কি যে করণীয় কিছুই আন্দাজ করতে পারলো না রাধারাণী। একটা সজীব সতেজ তাজা গাছ যেন অকস্মাৎ বজ্রপাতে ভেঙে পড়েছে। আগুনে জ্বলতে জ্বলতে অঙ্গারে পরিণত এখন। বুকের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। এক আভ্যন্তরীণ অস্বস্তিতায় রাধারাণী যেন ক্লান্ত আর কাহিল। চোখে ঘুম নামছে। নিষ্ফল চেষ্টা—ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে বুকে। রাগ ধরছে নিজের প্রতি।

বেড়ালটাকে বুকে তুলে নেয় রাধা-রাণী। সাদা পশমের স্তূপ যেন একটি। তার গায়ে হাত বুলোতে থাকে রাধারাণী। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় আবার সেই রকম শব্দ করে মুখে।—চুক, চুক, চুক।

একান্ত অনিচ্ছায় কাজে আবার মন দেয়। গরম ইস্ত্রী চালাতে শুরু করে কাচা পোষাকে, চৌকির ধারে দাঁড়িয়ে আনত রাধারাণী। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে চিবুকে। তপ্ত অশ্রুজল কয়েক ফোঁটা। চিবুক বেয়ে নামতে থাকে বুকের খাঁজে। অঙ্গে অঙ্গে কম্পন লাগে যেন। পা দু'টি কাঁপছে ঠকঠকিয়ে। হতাশায় ভেঙে পড়ে যেন।

ঘরের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে রাধারাণী। চাপা কান্নার জ্বালা ধরছে দীর্ঘ দুই চোখে।

বাইরে বিলীয়মান জুতোর মচমচানি। চড়ক-পুকুরের ধারে গাছের মগডালে দাঁড়কাক ডেকে চলেছে অবিশ্রান্ত। কোথায় কোন্ জলডোবায় ব্যাঙ ডাকছে থেকে থেকে।

রাধারাণীর কান যেন বধির হয়ে গেছে চিরকালের মত। তার কানে যায় না আর পদক্ষেপের ধ্বনি। রাধারাণী জানতে পারে না, সে কাছেই ছিল। যায়নি খুব বেশি দূরে। জানতে পারে না কতক্ষণে সে এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। জানতে পারে তখন, যখন তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে আর একজনের অধরের স্পর্শ পায়।

আবার একটি সজোর দীর্ঘশ্বাস ফেললে রাধারাণী। অনুরাগের তৃপ্তি আর বিজয়ানন্দের নিশ্চিন্ততায়। বাধা দেয় না রাধারাণী। চোখ বন্ধ করে সে। বরং বিকিয়ে দেয় নিজেকে। কিসের আশায় কে জানে।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ কল্পতরু নারিকেল ॥

গত এক বছরের মধ্যে বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কেউ যদি বেড়াতে গিয়ে থাকেন তো নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে কয়েকটি মস্ত মস্ত নারকেল গাছের মাঝবরাবর একটি করে চৌকোণা কাঠের বাক্স যোগানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি জলের পাইপ সিধে উঠে গিয়েছে সেই বাক্স পর্যন্ত। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, কাঠের বাক্সের মধ্যে জলের যোগান দেবার জন্যে এই পাইপের বন্দোবস্ত। কৌতূহলী হয়ে যদি কেউ এ-বিষয়ে খোঁজখবর করে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে আশ্চর্য এক সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার বিবরণ শুনে এসেছেন। এই ভদ্রলোকের নাম টি. এ. ডেভিস। তিনি প্রথমে ছিলেন কেরলে। বর্তমানে আছেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। তাঁর গবেষণার বিষয় : নারকেল গাছের পুনর্যৌবন-প্রাপ্তি। সম্প্রতি তিনি তাঁর সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার বিবরণ জানিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন লণ্ডনের বিখ্যাত 'ওয়ার্ল্ড ক্রপ্স' পত্রিকার আগস্ট, ১৯৬২ সংখ্যায়। প্রবন্ধটি খুবই সহজ ভাষায় লেখা এবং বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। আমি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করবার চেষ্টা করছি। বিষয়টি সম্পর্কে আরো বিস্তৃতভাবে যদি কেউ জানতে চান তবে সরাসরি শ্রীযুক্ত ডেভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তিনি অতি অমায়িক ও সদালাপী। তাঁর গবেষণা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি খুশিই হন এবং অনেক সময়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করেও অপরের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন।

॥ নারিকেল গাছের জীবন ॥

নারকেল গাছ সাধারণত একশো বছরের বেশি বাঁচে না। তবে শ্রীযুক্ত
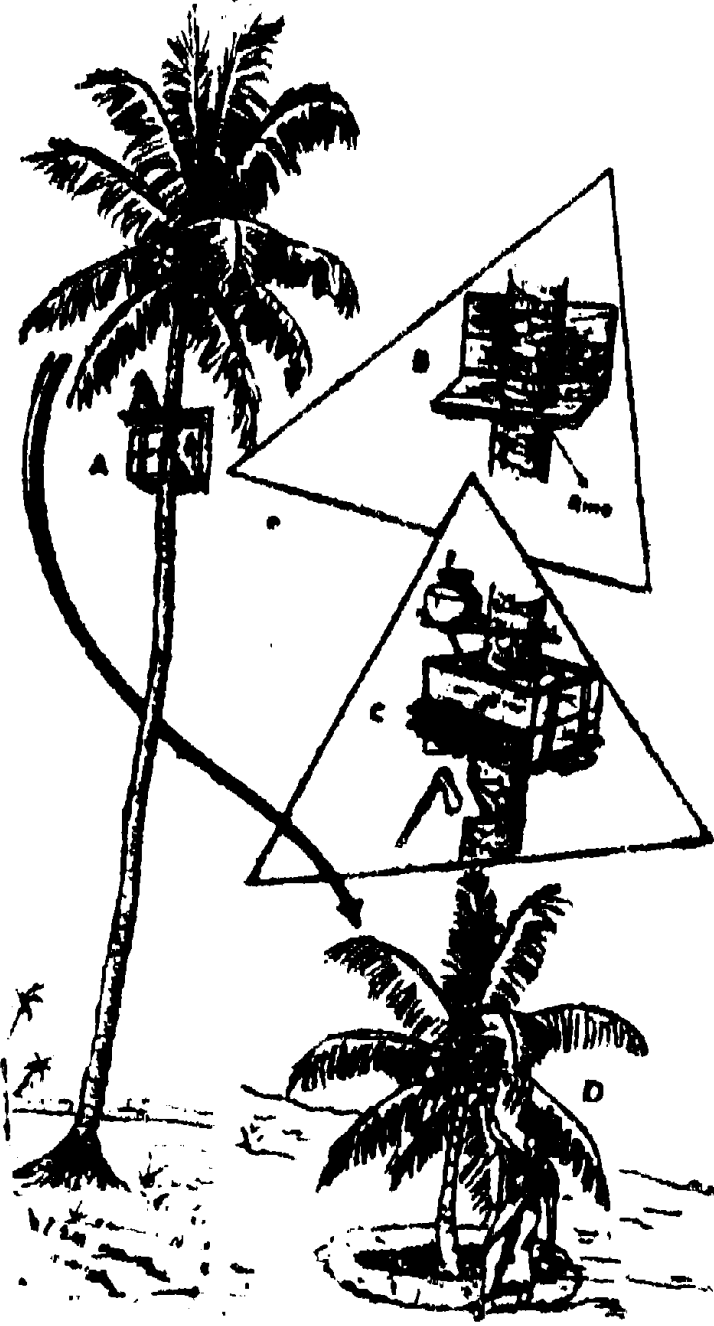
নারিকেল গাছের পুনর্যৌবন-প্রাপ্তি : পদ্ধতির বিবরণ ৬৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ডেভিস বলছেন যে তিনি একটি নারকেল গাছ দেখেছেন যার পরমায়ু ছিল একশো কুড়ি বছর। নারকেল গাছের বার্ধক্য আসে পরিবেশগত ও শারীরগত বিবিধ কারণে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে এই বার্ধক্যকে জয় করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত নারকেল গাছ আবার পুরো একটি জীবনকাল বেঁচে থাকবে ও ফলপ্রসূ হবে। শ্রীযুক্ত ডেভিসের গবেষণা এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কেই। তিনি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'এয়ার-লেয়ারিং'। আক্ষরিক অনুবাদ করলে এই ইংরেজি কথাটির বাংলা দাঁড়ায় 'বায়ু-স্তর-বিভক্তি'। এই বাংলা অনুবাদ শুনেও নিশ্চয়ই এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না। একটু পরেই আমরা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা তুলনা তুলব। তখন বোঝা যাবে, পদ্ধতিটি অতি সরল ও সহজসাধ্য।

নারকেল গাছের একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এই বিশেষ গাছটি সারা বছর ধরে ফলদান করে। আর এই ফলদানের পর্ব শুরু হয় গাছ রোপন করবার বছর সাতেক পর থেকেই। তবে এক্ষেত্রেও একটি বলার কথা আছে। নারকেল গাছ সাধারণত দু-জাতের হয়ে থাকে : লম্বা ও বেঁটে। বেঁটে জাতের নারকেল গাছে বছর তিনেক বয়স থেকেই ফল ধরতে শুরু করে। দু-জাতের নারকেল গাছই তারপরে যতোদিন বেঁচে থাকে ফল দিয়ে চলে। তবে সাধারণত দেখা যায়, লম্বা জাতের ক্ষেত্রে ষাট বছর বয়সের পর থেকে এবং বেঁটে জাতের ক্ষেত্রে আরো অনেক আগে থেকেই বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং ফলের পরিমাণ কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গাছটির মৃত্যু হয়। এই বার্ধক্য ও মৃত্যুর হেতু একাধিক। দু-একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

॥ বার্ধক্যের হেতু ॥

বার্ধক্যের হেতু প্রধানত তিনটি : জমি, জলবায়ু ও পরিচর্যা। অর্থাৎ, জমি যদি ভালো না হয়, জলবায়ু যদি বিরূপ হয় এবং পরিচর্যার যদি অভাব ঘটে তাহলে অবশ্যই বার্ধক্য ত্বরান্বিত হবে। তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে যে ষাট বছর বয়স থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই বার্ধক্য শুরু হবার পালা। এই নিয়মটিকে ধরে নিয়ে এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত যাতে ঠিক সময়ে বার্ধক্যগ্রস্ত গাছটি অপসারিত হতে পারে এবং যথাসময়ে রোপিত নতুন আরেকটি গাছ স্থলাভিষিক্ত হতে

পুজোর বাজার

দূর করাটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এজন্যে দুটি ব্যবস্থা করা দরকারঃ গাছের দৈর্ঘ্যকে কমিয়ে ফেলা ও নতুন জায়গায় তাজা শিকড় গজাবার ব্যবস্থা করা। দৈর্ঘ্য কমাতে হলে অবশ্যই গাছের খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। কিন্তু তার আগে, তাহলে, গাছের যতোটুকু অংশ বাদ দিতে হবে, ঠিক তার ওপরের অংশে নতুন শিকড় গজাবার ব্যবস্থা থাকা চাই। শ্রীযুক্ত ডেভিস তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে নারকেল গাছের মাটির ওপরকার অংশে নতুন করে শিকড় গজাতে সমর্থ হয়েছেন। এই হচ্ছে তাঁর গবেষণার অভিনবত্ব ও কৃতিত্ব। এই পদ্ধতি কেরলে ও পশ্চিমবাংলায় সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, সতেজ নবীন গাছের ওপরে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রায় মরতে চলেছে এমন একটি গাছ এই পরীক্ষাকার্যের জন্যে বাছাই করা দরকার। প্রথমে পরখ করে নিতে হবে কিছুটা ওজন সহ্য করবার ক্ষমতা এই গাছের আছে কিনা। তা অবশ্যই থাকা চাই। এবারে ঠিক করতে হবে গাছের কতটুকু অংশ বাদ যাবে আর কোথায় নতুন করে শিকড় গজাতে হবে। এই নির্দিষ্ট অংশে গাছের দণ্ডের দুই বিপরীত দিকে অগভীর খাঁজ কেটে প্রথমে বসাতে হবে একটি কাঠের পাটাতন বা প্ল্যাটফর্ম। তারপরে এই পাটাতনের ওপরে তৈরি করতে হবে একটি চৌকোণা কাঠের বাক্স। বাক্সটির মাপ হবে—লম্বায় তিন ফুট, চওড়ায় তিন ফুট, উচ্চতায় তিন ফুট। গাছের দণ্ডের যতোটুকু অংশ এই বাক্সে ঢাকা পড়ছে সেই অংশে দু-তিন জায়গায় গোল করে গাছের ছাল উঠিয়ে ফেলতে হবে। এবারে বাক্সটি ভর্তি করতে হবে মোটা দানার বালিতে কিংবা মিহি ছোবড়ার ধুলোয়। এই বালি বা ধুলোর ওপরে চট বিছিয়ে দিতে হবে। এবারে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চট সমেত এই বালি বা ধুলো সবসময়ে জলে ভিজে থাকে। এজন্যে নিয়মিতভাবে জল ঢেলে দেওয়া যেতে পারে বা সরাসরি জলের পাইপ তোলা যেতে পারে। শহরাঞ্চলে জলের পাইপ তোলাই সুবিধে, গ্রামাঞ্চলে জল ঢালার ব্যবস্থা। ঠিক বর্ষা শুরু হবার আগে যদি এই ব্যবস্থাটি করা যায় তাহলে পরের বছর বর্ষার সময়ে বাক্সটি খুলে ফেলা যেতে পারে। সচরাচর এই এক বছরের মধ্যেই যথেষ্ট সংখ্যক নতুন শিকড় গজিয়ে যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু-বছর বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। শিকড় গজাবার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে হরমোন প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সচরাচর হরমোনের কোনো প্রয়োজন হয় না। কেরলে পরীক্ষাধীন ষোলটি গাছের মধ্যে পনেরোটি গাছে এই পদ্ধতিতে নতুন শিকড় গজাতে পারা গিয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক শিকড় গজিয়েছে কিনা তা বাইরে থেকে তাকিয়েই বোঝা যায়, কারণ তখন বাক্সের ওপর দিয়েই শিকড়গুলো উঁকি দিতে শুরু করে।

পরের পর্বটি একেবারেই জটিলতা-বর্জিত। নতুন গজিয়ে ওঠা শিকড়ের ঠিক তলা থেকে গাছটিকে কেটে ফেলতে হবে এবং শিকড় সমেত ওপরকার অংশটিকে নতুন করে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। কাগজে কলমে লিখে ব্যাপারটাকে যতোটা সরলভাবে বলা গেল, ব্যাপারটা অবশ্যই ততোটা সরল নয়। তিনদিক থেকে তিনটি মোটা দড়ি বেঁধে পুলির সাহায্যে অতি সাবধানে গাছটিকে নামাতে হবে। কাছাকাছি যদি তিনদিকে তিনটি লম্বা গাছ পাওয়া যায় তাহলে খুবই সুবিধে। নইলে খুঁটি তুলতে হবে।

এই নতুন করে পুঁতে দেওয়া গাছটি একটি নবীন গাছের মতোই ফল দিতে শুরু করবে এবং পুরো একটি জীবন-কাল বেঁচে থাকবে।

বলা বাহুল্য, এই নবীন গাছটিও আবার একসময়ে বার্ধক্যগ্রস্ত হবে। তখন আবার এই একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। তারপরেও আবার একবার, এবং বারবার, এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে বাধা নেই। অর্থাৎ, একটি নারকেল গাছকে অনন্ত জীবন দান করা যেতে পারে এবং অনন্তকাল ধরে গাছটি ফল-দান করে চলবে। অর্থাৎ, নারকেল গাছটি হয়ে উঠবে সত্যিকারের একটি কল্পতরু।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— পঁচিশ —

এই নন্দলাল লোকটাকে এখন রীতিমতো খারাপ লাগে অমিয়র।

প্রথম আলাপ হয় দশাশ্বমেধের বাজারে। কী একটা তরকারী কিনছিল অমিয়, কোথা থেকে হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ল নন্দলাল। কালো গোলগাল চেহারা, চাঁদি জুড়ে একটি পরিষ্কার টাক, মুখে পাকানো গোঁফ, গায়ে পশ্চিমী ধরণের গোল কলারওয়ালা পাঞ্জাবি। বাংলায় কথা না বললে তাকে বাঙালী বলে চেনা মুশকিল হত।

নন্দলাল বললে, আরে—আরে, ওই বেগুন আট আনা। নেবেন না মশাই, গলায় ছুরি দিচ্ছে। আরে কেঁও ভাইয়া, নয়া আদমী পা-কে— ইত্যাদি ইত্যাদি।

গায়ে পড়েই আলাপ করল। বললে, নতুন এসেছেন তো? সে দেখেই বুঝেছি। এ কাশী মশাই, ডেঞ্জারাস জায়গা। নামেই বিশ্বনাথের রাজত্ব—কিন্তু রাজ্য ছেড়ে তিনি অনেক আগেই পালিয়েছেন, এখন 'চারো তরফ' ভূত-পেত্নী নেচে বেড়ায়। —বলেই পচ্ করে পানের পিচ্ ফেলে হা-হা করে হাসল।

নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, তার নাম নন্দলাল বনার্জি। গোরখপুরে সুগার মিলে কী কাজ করে, তার জন্যে তাকে যুক্তপ্রদেশের নানা জায়গা ঘুরে বেড়াতে হয়—দেয়াদুনসে বালিয়া তক্। আদি বাস ছিল যশোর জেলায়, কিন্তু চারপুরুষ ধরে তারা এ দেশের বাসিন্দা—বাড়ী করেছে ফয়জাবাদে। তার ভাই-বোন ছেলেমেয়ে সবাই চোস্ত হিন্দী আর উর্দু জবান বলে—বাংলা জানেই না বলতে গেলে। 'এই তো সেদিন সন্ধ্যে-বেলা বাড়ী গিয়ে শুনলাম মশাই, আমার ছোট ছেলে সুর করে বর্ণমালা মুখস্থ করছে—আলিফ বে পে তে টে ছে—হা-হা-হা!'

'তবু মশাই, আমি মনে প্রাণে বাঙালী। বলি, বাংলার মতো কি আর ভাষা আছে রে? রবি ঠাকুর, সরৎচন্দর কা ভাষা। বড়মেয়েটাকে বলি, গজল দিয়ে কী হবে, শ্যামাসংগীত শেখ্।'

বলতে বলতে একেবারে অমিয়র বাসা পর্যন্ত সঙ্গে এল।

সেইখান থেকেই বিদায় নিচ্ছিল, কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি এল অমিয়র, বলে ফেলল, আসুন না, একটু চা খেয়ে যান।

নন্দলাল এল, তৃপ্তি তাকে চা খাওয়ালো, অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প গুজব করল লোকটা। অমিয়র দোকান সেদিন বন্ধ, নন্দলালেরও হাতে নাকি বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, এগারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে গেল।

'কবীর চৌরা'র ওদিকে কোথায় থাকে, তার এক এ দেশী বন্ধুর বাড়ীতে এসে উঠেছে। প্রায় তিন সপ্তাহ কাশীতে থাকবে, তারপর যাবে বেরিলি। কাশী তার খুব চেনা জায়গা, প্রায় 'আপনা ঘর' বললেই হয়। কোনো দরকার হলে অমিয় তাকে অসংকোচে বলতে পারে। 'ম্যয় তো আপ্‌হি লোগো কি সেবা মে হুঁ—'

এল পরের দিনই।

দোকান থেকে ফিরে অমিয় দেখল, তার ঘরের বারান্দায় বসে নন্দলাল চপর-চপর করে পান চিবুচ্ছে আর নীচের চত্বরটাকে প্রায় আধাআধি রাঙিয়ে দিয়েছে। একটা চায়ের পেয়ালা রাখা আছে পাশে, সে ফিরবার আগেই তৃপ্তি সাধমতো অভ্যর্থনা করেছে নন্দলালকে। নন্দলালের জলচৌকিটার পাশে এক চাঙাড়ি খাবার।

'এই যে অমিয়বাবু!'

'নমস্কার, কখন এলেন?'

'তা আধিঘণ্টা হল। আপনার দোকান থেকে ফিরতে এত রাত হয় জানতুম না—তা হলে আরো পরে আসতুম। আপনার বহিন আমাকে চা খাইয়েছেন, খুব ভালো মেয়ে।'

'ও।'

'কিন্তু একটা কথা আছে অমিয়-বাবু। কচুরিগলি থেকে কিছু ভালো মিঠাই কিনে আনলাম আপনাদের জন্যে, কিন্তু আপনার বহিন নিতে চাচ্ছেন না। মনে ভারি দুখ্খু হচ্ছে আমার!'

ব্যাপারটা অমিয়রও খুব ভালো লাগল না।

'আপনিই বা কেন কষ্ট করে আনতে গেলেন ওগুলো?'

'আরে, কষ্ট কিসের?' —নন্দলাল ডিবে খুলে এক সঙ্গে এক জোড়া পান

মুখে পুরলেন, তারপর ভদ্রা গলায় বললেন, 'মিঠাইবালার সঙ্গে জান-পহ্চান আছে, দেখলাম ভালো জিনিস তৈরী করছে—নিয়ে এলাম। আপনারা যদি না নেন, আমার খুব দুঃখ হবে।'

মিথ্যে লোকটাকে 'দুঃখ' দিয়ে লাভ নেই। অমিয় বিরস গলায় ডাকল : 'তৃপ্তি, এই খাবারগুলো তুলে রাখ।'

তৃপ্তি অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বিরক্ত ভাবে খাবারগুলো তুলে নিয়ে গেল।

সারাদিন দোকানে এক নাগাড়ে বসে থাকা, মালপত্র ওঠানো, শুধু ধরে শত্পাকার কাপড়ের একটা দম-আটকানো গন্ধ—এ-সবের মধ্য থেকে রাত সাড়ে আটটায় যখন বেরিয়ে আসে, তখন স্পোর্টসম্যান অমিয়রও মাথা ঝিম-ঝিম করে। হাওয়া থাকলে এক-আধদিন গঙ্গার ধারে বসে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করে নেয়, নইলে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে নতুন কেনা চৌপাইটার সেই যে লম্বা হয়, তারপর খাওয়ার জন্যে তাকে ডেকে তুলতে আধঘণ্টা সময় লাগে তৃপ্তির। এতদিনে অমিয় বুঝতে পারে, দাদার মেজাজ অত খিটখিটে কেন, কেন মেটেবুরুজ থেকে ফিরেই সে অমনভাবে মরার মতো বিছানা নিত।

তার ক্লান্ত অবস্থা দেখে নন্দলাল নিজের নিজেই আপাতত অমিয়র ভালো লাগত, কিন্তু নন্দলাল উঠল না। জানতে চাইল, অমিয় কখনো অযোধ্যায় গেছে কিনা? যায়নি? তা হলে—

তা হলে অযোধ্যার গল্প। সেখানকার পান্ডা, তাদের-দুর্ব্যবহার, বানরের অত্যাচার—একটানা মুখ চলল। প্রায় দশটা বাজলে যে খবরটা দিল, তাতেই ঝিম-লাগা অমিয় কান খাড়া করল।

অমিয় কি গোরখপুরের সুগার মিলে কাজ করতে চায়? সেখানকার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার দুগারজী নন্দলালের কথা খুব মানেন। দুগারজী জিয়াগঞ্জের লোক—তাঁকে বাঙালীই বলা যায়, বাংলাদেশে বাংলাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। বয়েস অল্প, কিন্তু খাসা লোক। নন্দলাল তাঁকে ভালো করে ধরলে তিনি কিছুতেই 'না' করতে পারবেন না।

মাইনে কত?

সেজন্যে ভাবতে হবে না। বিরাট সুগার মিল, অসংখ্য ডিপার্টমেণ্ট—দুগারজী যেখানে ঢুকিয়ে দেবেন, সেখানেই অন্তত একশো পঁচিশ টাকা মাইনে। অমিয় যদি গোরখপুরে যেতে রাজী হয়, তা হলে কালই নন্দলাল দুগারজীকে চিঠি লিখবে। লেখাপড়া বেশি শেখেনি? কিছু আসে যায় না। আরে, ও তো হাতের জিনিস—বুদ্ধি থাকলেই শিখে নেওয়া যায়। এই নন্দলালই এখন হেসে খেলে সাত-আটশো টাকা কামাই করে।

তা হলে অমিয় রাজী? ঠিক হ্যায়।

পরের দিনই নন্দলাল নিশ্চয় চিঠি লিখেছে দুগারজীকে—অবশ্য এখনো তার জবাব আসেনি। সে আজ দিন-দশেক হল। দুগারজী ব্যস্ত মানুষ—সময় হলেই চিঠি দেবেন। আর নন্দলাল বলছিল তো উনি প্রাণের বন্ধু, কাজেই মিথ্যে একটা চিঠি দিয়ে কী করবেন তাঁরা, একেবারে সোজা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারই হয়তো পাঠিয়ে দেবেন অমিয়কে।

সে চিঠি আসেনি, কিন্তু নন্দলাল নিয়মিত আসছে। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই আসে—কোনোদিন অমিয়র সঙ্গে দেখা হয়, কোনোদিন হয় না। অমিয় না থাকলেও অবশ্য ক্ষতি নেই কিছু, কারণ তৃপ্তির সঙ্গে সে ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

নন্দলাল তো আর কাশী ছাড়া কিছু দেখেনি? আরে, কেয়া তাজ্জব কা বাত্। এই হিন্দুস্তানে কত দেখবার জিনিস যে আছে। দিল্লী-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-বম্বাই-পুণা-অমৃৎসর-জলন্ধর-জব্বলপুর-মহীশূর-মাদ্রাজ। কত সব আশ্চর্য জায়গা! আর কাজ? কাশীতে কি আর মানুষের বড়ো হওয়ার মতো কাজ কোথাও আছে? মন্দির-পাণ্ডে-ষাঁড়-গলি—ব্যাস্ খতম? এখানে এসে কেবল বুড়ো-বুড়ী মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে পারে। অমিয়র বয়েস অল্প—জোয়ান ছেলে, ওই কাপড়ের দোকানে বসে থেকে থেকে বুটমুট সারা গায়ে বাত ধরে যাবে, অথচ কোনোদিন ভরা পেট খাবার জুটবে না। সেই জন্যেই নন্দলাল চেষ্টা করছে যাতে গোরখপুরের চিনির কলে অমিয়কে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

আর তৃপ্তি? তারই বা কিসের ভাবনা? এমন সুন্দর তার চেহারা, সে যদি একবার বোম্বাই যায়—তা হলে ফিল্মে তাকে লুফে নেবে। নন্দলাল জোর করে বলতে পারে যে—কী, তৃপ্তি ফিল্মে নামতে চায় না? ভয় করে? আরে, ভয়ের কিছু নেই। তবু সে বোম্বাই যাবে না? বহুৎ আচ্ছা কুছ হরজা নেহি। তা হলে তৃপ্তিকে সে চুণারে নিয়ে যেতে পারে। সেখানকার মাটির জিনিস বিখ্যাত, সবাই-ই জানে তার কথা। সেই চুণারের কোনো কারখানায় তৃপ্তিকে ঢুকিয়ে দিতে পারে সে—মেয়েরাও ওখানে চাকরি করে—পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনে পায়।

অমিয়কে ছেড়ে যাবে না তৃপ্তি? ঠিক হ্যায়—ঠিক হ্যায়। পড়তে চায়? সে ভাবনাও নেই। এখানকার প্রাণী-

ভবানী স্কুলের সঙ্গে তার জানাশুনা—তৃপ্তিকে বিনে মাইনেয় ঢুকিয়ে দেবে সে।

দিনের পর দিন তৃপ্তি মুগ্ধ হতে লাগল। নন্দলাল যেন চোখের সামনে পৃথিবীর দরজা খুলে দেয়। কলকাতা থেকে চলে এসেও তৃপ্তির কোনো লাভ হয়নি, নারকেলডাঙার গলির এক জীর্ণ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সে আরো অন্ধকার, আরো সংকীর্ণ এক ঘরে এসে ঢুকেছে। করুণাময়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু এ আর এক জেলখানা। ঘরে ঘরে ভাড়াটে, নানা দেশের লোক, নানা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সবাই কেমন এক ধরণের—হীন, স্বার্থপর। কারণে অকারণে এ-ঘরে ও-ঘরে তুলকালাম ঝগড়া বাধে, অশ্লীল গালি-গালাজ চলে। একটি মারাঠী মেয়ে, কাছা দিয়ে শাড়ী পরে কমণ্ডলু হাতে করে তেড়ে আসে, একজন হিন্দুস্থানী মহিলার উঠোনের ভেতরে ঘরে ঘরে ময়ূরের মতো নাচ শুরু হয়—একজন অল্পবয়সী বাঙালী বিধবা বাজার থেকেই চিৎকার করতে করতে বাড়ীতে এসে ঢোকে: 'ড্যাকরা—অলপ্পেয়ে! দু পয়সায় মাত্তর চারটে বাঁধাকপির পাতা দিলে, তারও একটা পোকা-খাওয়া। যমে ছোঁবে মুখপোড়াকে—বাবা কালভৈরব এসে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবেন!'

কাশীর বেপরোয়া বানরগুলো পর্যন্ত সাহস করে এ বাড়ীতে পা ফেলতে পারে না।

এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল কলকাতায়। অসুস্থ বাবার জন্যে কষ্ট হয়, মা-র কথা ভেবে চোখে জল আসে, দিদি হাসপাতালে ছিল, কেমন আছে কে জানে! যদি এই টেকো বোকা কম্পাউণ্ডারটা দুম্ করে তাকে বিয়ে করতে না আসত, তা হলে তো তৃপ্তি এমন করে কিছুতেই বাড়ী থেকে পালিয়ে আসত না।

কিন্তু পালিয়েই বা কী লাভ হল?

ভেবেছিল, ছোড়দাকে তার বন্ধু চন্দন সিং ভালো কোনো রোজগারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে- ভাই বোনে মিলে মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফিরে যাবে মা-বাবার কাছে, তখন বড়দা আর জোর করে যার তার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। কী ভেবে চাচা তাদের দুজনকে এক মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে কোথায় চলে গেল, তারপর থেকে—

এই বাড়ীতে, এই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘরে একা চুপচাপ বসে থাকা, পাশের ঘরের হিন্দুস্থানী মেয়েটির সঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাওয়া আর দুবেলা রান্না করা—এ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। অথচ আজ প্রায় দেড় মাসের মধ্যে ছোড়দা একবার তাকে বিশ্বনাথের আরতি পর্যন্ত দেখাতে নিয়ে যায় না। ওই এক গঙ্গাস্নান ছাড়া আর কারো সঙ্গে কোথাও সে বেরুতে পারবে না, অমিয় কড়াভাবে তাকে নিষেধ করে দিয়েছে।

থাকা যায় এইভাবে?

ছোড়দার সঙ্গে তো ভালো করে কথাই বলা যায় না—বাসায় সে কতক্ষণই বা থাকে? মেজাজও তার ভালো নেই আজকাল, একটুতেই খিট-খিট করে ওঠে। এই বিশ্রী বাড়ীটার আরো বিশ্রী ঘরের ভেতরে একা বসে থেকে থেকে তৃপ্তির মধ্যে মধ্যে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। এমনি করে থাকা যায় না—কিছুতেই না।

একদিন বলেছিল, ছোড়দা, আমার কী করবি?'

অমিয় খেতে বসেছিল। বিরক্তভাবে মুখ তুলে বললে, 'কী আবার করব?'

'কোনো স্কুলে আমায় ভর্তি করে দিবি না?'

মস্ত এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে ভরা গলায় অমিয় বললে, 'হবে-হবে।'

'কবে হবে? আমার যে আর ভালো লাগছে না?'

'না লাগছে তো নাই লাগল। আমারই কাপড়ের দোকানে কাজ করতে ভালো লাগছে নাকি?'

আলোচনা এইখানেই শেষ। আর একটা কথাও বলল না অমিয়, পুরো এক ঘটি জল খেয়ে আসন ছেড়ে উঠে চলে গেল।
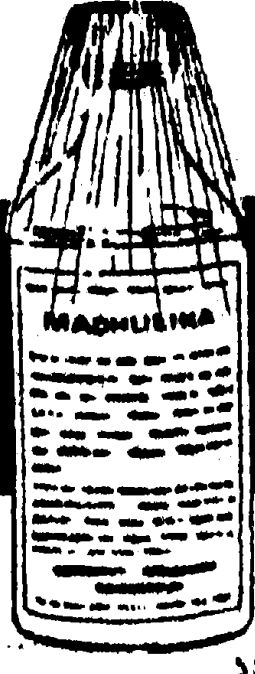
এমনি করে কতকাল কাটবে? দিনের পর দিন যায়—তাকে লেখাপড়া শেখানো কিংবা হাতের কাজ করার কোনো ব্যবস্থা অমিয় যে করে উঠতে পারবে এ কথা মনে হয় না তৃপ্তির। এক-একটা আগুন-ঝরা ঝাঁ-ঝাঁ করা দুপুরে বাইরে যখন 'লু' বইতে থাকে, তখন বন্ধ ঘরের ঠাণ্ডা ভিজে মেঝেতে তৃপ্তি বুকটা পেতে দেয়। সব জ্বালা করছে—মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে যেন। ছেলেমানুষের মতো তৃপ্তি কাঁদতে থাকে: মা-মা—

তবু নন্দলাল সেই বাইরের মস্ত পৃথিবীটার খবর আনে। রেলে চড়ে কাশীতে আসবার সময়, বাড়ীর কথা—সকলের কথা, সব ভয় ভুলে গিয়ে দু চোখ মেলে তৃপ্তি দেখেছিল কত রেল স্টেশন, কত নদী, কত মাঠ—কত আকাশ। এই ছোট ঘরটায় ঢুকে তারা কোথায় হারিয়ে গেল! নন্দলাল এসেই মনে করে দিয়েছে, শুধু এখানে এমনি করে ফুরিয়ে যাওয়া নয়, অনেক কাজ—অনেক বড়ো জীবন পড়ে আছে বাইরে।

'ছোড়দা, নন্দবাবু বলছিলেন, রাণী ভবানী স্কুলে—'

'চুপ কর, ড্যান-ড্যান করিসনি এখন। বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

এক এক সময় তৃপ্তির মন সম্পূর্ণ বিদ্রোহ করে ওঠে। ছোড়দা কী ভেবেছে তাকে? ছোড়দাকে ছাড়া সে এক পা চলতে পারবে না? যেদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন তো ছোড়দা সঙ্গে ছিল না। একে তাকে জিজ্ঞেস করে

ঠিক নারকেলডাঙা থেকে ভবানীপুরের সেই রাস্তাটায় চলে আসতে পেরেছিল, অত বড়ো কলকাতাতেও সে পথ হারায়নি। দরকার পড়লে আবার সে বেরিয়ে পড়তে পারবে। একবার যে একা চলতে শিখেছে, পথের ভয় তার আর নেই।

সেদিন সন্ধ্যের পর কয়লায় আঁচ দিয়ে উনুনটাকে উঠোনে রেখে বারান্দায় বসে সেই পাশের ঘরের হিন্দুস্থানী মেয়েটির সঙ্গে গল্প করছিল তৃপ্তি। রোজ দুজনে মিলে গঙ্গাস্নান করতে যায়, সেইজন্যে একটুখানি ভাব হয়েছে।

হিন্দুস্থানী মেয়েটি—মনিয়া বলছিল, আর কিছুদিন পরেই তাকে মোরাদাবাদে চলে যেতে হবে।

—মোরাদাবাদে কেন?

—বাঃ, সসুরাল যেতে হবে না?—মনিয়া হাসল। জানালো, কতদিন তো হল তার 'গাওনা' হয়ে গেছে। স্বামী দিল্লীতে কাজ করে—এতদিন ছুটি পায়নি বলেই নিয়ে যেতে পারেনি। এবার চিঠি দিয়েছে, শিগগীরই আসবে।

—গাওনা কী?

মনিয়া আবার অল্প একটু হাসল, লজ্জা পেল। বললে, ও আমাদের দেশের একটা নিয়ম। তোমার শাদী হয়নি?

তৃপ্তি একবার চমকে উঠল, কম্পাউন্ডারের সেই মুখখানা মনে পড়ল তার। বললে, না।

তা বটে। বাঙালীদের অনেক বয়েস পর্যন্ত বিয়ে হয় না, মনিয়া তা জানে। এখন তো তাদের দেশেও এই রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে—জওয়ানী সব লেড়কি চশমা পরে কলেজমে পড়তে যায়। আচ্ছা, বাঙালীরা খুব চশমা পরতে ভালোবাসে, তাই না?

মনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আলোচনাটাকে ঘুরিয়ে নিলে।

—আচ্ছা, দোতলায় যে নতুন বাঙালী ছুকরিটা এসেছে—তাকে দেখেছ তুমি?

—দেখেছি দু-একবার।

—ওর কী হয়েছে জানো?

—না, কী হয়েছে?

—ওর সঙ্গে যে বাঙালী মরদটা এসেছিল—মনিয়া গলা নামালো: সে ওকে কাল ফেলে পালিয়ে গেছে।

—সে কি!

মনিয়া বললে, বাড়ী থেকে ভুলিয়ে এনেছিল। এখন নেশা কেটেছে, চিড়িয়া উড়ে গেছে। কাশীতে এমন কত হয়।

তৃপ্তির রক্ত শুকিয়ে গেল।

—তারপর এখন কী হবে ওর?

মনিয়া বললে, বাবা বিশ্বনাথজী জানেন। কাল থেকে কিছু খায়নি—ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে, খালি কাঁদছে।

আগে থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার।

—অমিয় আছে?

তিনদিনের পরেই নন্দলাল অমিয়র সঙ্গে সম্বন্ধটা আপনি থেকে 'তুমি'তে নামিয়েছে—'আরে, তুমি তো একেবারে ছেলেমানুষ হে!'

তার গলা শুনেই মনিয়া নিজের ঘরে ছুটে পালালো।

বাঃ, সসুরাল যেতে হবে না?

উঠোনে শুধু তৃপ্তিরই নয়, আরো তিনটে তোলা উনুন এসে জমেছে এখন। কুণ্ডলী পাকানো কয়লার ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার—বাড়ীটা তার মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে, জ্বালা করছে চোখ। একটা আকস্মিক ভয় তৃপ্তির হৃৎপিণ্ডকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। মনে হল, তারও ভবিষ্যৎটা এই রকম বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। ছোড়দাও যদি একদিন তাকে এখানে একা ফেলে পালিয়ে যায় তা হলে কী উপায় হবে তার—কী করবে সে?

সময় থাকতে তৈরী হওয়া ভালো।

—কী ধোঁয়া, আরেঃ বাপ্‌স্‌! চারদিকে যে আঁধি হয়ে গেছে একদম!

কিন্তু আঁধি হোক আর যাই হোক, নন্দলাল বনার্জি দমবার পাত্র নয়। সোজা ভেতরে চলে এল।

—অমিয় কোথায়?

—দোকানে। এ-সময় তো দাদা ফেরে না।

—আজ ওর ছুটির দিন নয়?

—না, দোকান বন্ধ থাকবে কাল।

—ওহো, তাও তো বটে। আমার খেয়াল ছিল না। —নন্দলাল গেল না,

সেই রাশি রাশি ধোঁয়ার ভেতরেই তৃপ্তির জলচৌকিটা নিয়ে বসে গেল, তারপর ডিবে থেকে এক জোড়া পান বের করে মুখে পুরল।

উনুনটা ধরে গিয়েছিল, তৃপ্তি সেটাকে নিয়ে এল ঘরের ভেতর। অভ্যাস মতো নন্দলালের জন্যে চায়ের জল চাপিয়ে দিলে কেট্‌লিতে, তারপর এসে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে ধোঁয়া কেটেছে, সন্ধ্যা নেমেছে, নানা ঘর থেকে আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনে। নন্দলাল আধ-বোজা চোখে বসে বসে জাবর কাটার মতো পান চিবুচ্ছে।

আস্তে আস্তে তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল : দাদার চাকরির চিঠি এল ?

—আসবে—আসবে। —নন্দলাল সশব্দে পানের পিক ফেলল : দুগারজী বোধ হয় গোরখপুরে নেই, কোনো কাজে নিশ্চয় বাইরে বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এসেই চিঠি দেবে।

আপনি চুণারে সেই মাটির কাজের কথা কী বলছিলেন?

—আঁ, চুণার? হাঁ—হাঁ—খুব ভালো ব্যবস্থা আছে সেখানে।—নন্দলাল আবার গল্প আরম্ভ করল। চুণার থেকে বিন্ধ্যাচল, সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর পেরিয়ে কন্যাকুমারী। সারা ভারতবর্ষ যেন নন্দলাল বনাজীর নখদর্পণে। তার গল্প শুনতে শুনতে কেরালার নারকেল বনে আলো-ছায়ার দোলা দেখতে পাওয়া যায়, যমুনার ধারে শাদা তাজমহল জ্যোৎস্নায় হীরার মুকুটের মতো জ্বলে ওঠে, এলিফ্যান্টার গুহা-মন্দিরকে ঘিরে ঘিরে সমুদ্র গর্জন করে, মার্বেল পাহাড়ের বুক চিরে নর্মদা তীর বেগে ছুটে যায়, কাশ্মীরের হ্রদে হাউস-বোটের চার পাশ ঘিরে থরে থরে পদ্ম ফোটে।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তৃপ্তি চা করে আনল, তারপর গল্প শুনে যেতে লাগল একটানা। নন্দলালের কথাগুলো ঘুমপাড়ানি গানের মতো একটানা ভেসে আসতে লাগল তার কানে।

চমক ভাঙল অমিয়র তীক্ষ্ণ কর্কশ গলার শব্দে : রান্না বান্না কিছু করেছিস তিপু? না কেবল গল্পই করছিস তখন থেকে?

নন্দলালের কোনো বিকার দেখা গেল না। পানে রাঙানো দাঁতগুলো বের করে বললে, এই যে অমিয়, এলে?

—হুঁ, এলুম।

—দুর্গাপুজোর চিঠি হয়তো কাল-পরশু মধ্যেই এসে যাবে।

অমিয়র ক্লান্ত চোখে কোনো উৎসাহের আলো ফুটতে দেখা গেল না। বললে, বেশ।

—তা হলে আজ আমি উঠি।

সেই রাত্রেই অমিয় বললে, তোর সঙ্গে কথা আছে তিপু।

অমিয়র থমথমে মুখের চেহারা দেখে তৃপ্তি ভয় পেলো : কী হয়েছে ছোড়দা?

অমিয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে রইল। মাত্র দেড় মাসেই যেন পনেরোটা বছর পার হয়ে গেছে তার মনের ওপর দিয়ে। বড়ো লোক হওয়ার পথ যে সহজ নয়, পৃথিবীটা যে অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই এবং মানুষকে যে সহজে বিশ্বাস করতে নেই—এই কথা-গুলো একটু-একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার সামনে। নিজের বোকামোর জন্যে তৃপ্তিকে সে কোন্ সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিতে চেয়েছিল—সেগুলো মনে হলে এখন তার আর আত্মগ্লানির কোনো সীমা থাকে না। এখন তৃপ্তি সম্পর্কে অতি মাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছে সে—নিজের দায়িত্বের ভার বুঝতে পারছে সে। চাচার সেই একটি চড় যেন জন্মান্তর ঘটিয়েছে তার।

অথচ কিছুই করবার জো নেই। সারাটা দিনই সে বাইরে বাইরে থাকে—তৃপ্তির ওপর নজর রাখার সময়ই পায় না। আর নন্দলাল যেন বড় বেশি আসা-যাওয়া করছে। প্রথম প্রথম যেমনই লাগুক, লোকটার বড়ো বড়ো কথা এখন আর একেবারেই ভালো লাগে না। কেমন সন্দেহ হয়, লোকটার অন্য কোনো বাজে মতলব আছে। তার ছোট বোন সুন্দরী—আর সেই জন্যেই এই তিন মাসের ভেতরে তাদের সংসারের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে।

নন্দলাল আসে, আসুক। কিন্তু সেই সময়টাই কেন আসবার জন্যে বেছে নেয়—যখন সে নিশ্চিতভাবেই জানে যে অমিয় বাসায় থাকবে না? কী এত কথা বলে তৃপ্তিকে? কেন মাঝে মাঝে মিষ্টি আনে, তরীতরকারী এনে দেয়?

অমিয়কে চুপ করে থাকতে দেখে তৃপ্তি আবার বললে, কী হল ছোড়দা? কী বলছিলি তুই?

অমিয় বললে, আমি ভেবে দেখেছি তিপু, তোর কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার।

তৃপ্তির মাথায় যেন বজ্র পড়ল।

—কলকাতায়?

—হাঁ, মা-বাবার কাছে।

আতঙ্কে তৃপ্তি পাথর হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কেঁদে ফেলল তারপর।

—না ছোড়দা, আমি কিছুতেই কলকাতায় ফিরে যাব না। বড়দা তা হলে তখুনি—

বিস্বাদ কটু গলায় অমিয় বললে, চুপ কর, ন্যাকামি ভালো লাগে না সব সময়। বড়দা তো আর পাগল নয় যে, তুই গেলেই হাত-পা বেঁধে তোকে জবাই করবে! সংসারের জন্যে খেটে মুখে রক্ত তুলে মরছে লোকটা, আর তোর মন এত ছোট যে তুই তার বদনাম করিস!

অমিয়র মুখে বড়দার প্রশংসা!

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার সময় নেই। তারও চাইতে বড়ো সমস্যা সামনে।

অমিয় বললে, নতুন কাজে ঢুকেছি, এখন ছুটি চাইলে তো দেবে না। নইলে আমি নিজে গিয়েই তোকে দিয়ে আসতুম। ভেবেছি, কাল বড়দাকে একটা চিঠি—

তৃপ্তি শক্ত গলায় বললে, আমি যাব না।

—যাবি না?

—না।

অমিয়র চোয়াল দুটো গালের ওপর দিয়ে ফুটে উঠল, ঘষা লাগল দাঁতে দাঁতে : তবে কী করবি?

—নিজের পথ নিজে দেখে নেব। চলে যাব যেখানে খুশি।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিয়। চোখে আগুন জ্বলতে লাগল তার।

—নিজের পথ!—মুখ ভেংচে বললে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পা-দুখানা বুঝি বড্ড বেশি লম্বা হয়ে গেছে? মরবার পাখা গজিয়েছে? ও সব চলবে না। আমি আজ রাত্রেই চিঠি লিখছি।

—কিন্তু আমি যাব না।

অমিয়র আর ধৈর্য থাকল না। হঠাৎ তৃপ্তির চুলের মুঠো আঁকড়ে ধরে দুম দুম করে গোটা দুই কিল বসিয়ে দিলে তার পিঠের ওপর।

—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে—পাকামোর আর জায়গা পাওনি? বড়দা না আসা পর্যন্ত তোমায় আমি ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখব—দেখব নিজের রাস্তা তুমি কেমন করে খুঁজে পাও!

(ক্রমশঃ)

অথ লন্ডন-কথা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

।। যমজ জন্মের রহস্য ।।

লণ্ডন, ১২ই সেপ্টেম্বর :

পশ্চাত্যে একই প্রসবে একাধিক শিশুর জন্মহারটা বার্ধক্য। শুধু তাই নয় বহু পিতামাতার কাছে তা ক্রমশই পরম আকাঙ্ক্ষিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা এই বহুজন্মের ঊর্ধ্বগতির কোন নির্দিষ্ট উত্তর যদিও দিতে পারেন নি, তবু কোন কোন প্রজননবিদের মতে চিকিৎসাবিদ্যা ও জীবনমানের উন্নতিই হচ্ছে এর প্রধান কারণ।

বৃটেনের একটি বিশেষজ্ঞদল দশ বছর ধরে ৩০০০ যমজ পরীক্ষা করে বহু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। যেমন, বৃটেনে একাধিক জন্মহারটা বর্তমানে প্রায় গাণিতিক-হারে চলে। ১৯৪৭ সালে প্রতি ৯০টি জন্মে একটি যমজ শিশুর জন্ম হতো। এখন প্রতি ৮০টি জন্মে একটি যমজ জন্মে। প্রতি ৬৪০০টি (৮০×৮০) জন্মে একটি ত্রয়ী এবং প্রতি ৫১২০০০টি (৮০×৮০×৮০) জন্মে ভূমিষ্ঠ হয় একটি চতুষ্টক।

কোন ধরণের মায়েদের যমজ হবার সম্ভাবনা বেশি? —বিশেষজ্ঞদের মতে আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছরের আট-সন্তানের মায়েদের। তারপরের সম্ভবনাময়ীরা হচ্ছেন ঐ একই বয়সের মহিলারা, যাঁদের সন্তান-সংখ্যা যথাক্রমে সাত ও ছয়।

এঁদের পরে আসেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলারা যাঁদের সন্তান-সংখ্যা পূর্বোল্লিখিতাদের মতই যথাক্রমে আট, সাত ও ছয়। তবে গত এপ্রিল মাসে এক অষ্টাদশী এক সঙ্গে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে একটি ব্যতিক্রম নজিরের সৃষ্টি করেন।

নর্থম্‌টনে কিংসথর্পের একটি ছোট রাস্তায় দশ মাসে তিনজন জননীর তিনটি যমজ হবার পর রাস্তাটির নাম হয়ে যায় 'দি লিটল স্ট্রীট অব টুইনস।'

ফ্রান্সে ২১ ঘর বাসিন্দা নিয়ে একটি ছোট্ট গ্রামে পঁচিশ বছরের মধ্যে ১২টি যমজ জন্মানোর পর গ্রামটির নাম হয়ে গেল 'যমজের গ্রাম।'

ব্যক্তিগতভাবে যমজ জন্মদানের রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন ইতালীর সিসিলি দ্বীপের এক মহিলা। ১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর একাদশতম যমজের জন্ম দেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ডন জেলায় আরেক মহিলা ৪০ বছর বয়সে পঞ্চম যমজের জন্ম দেন।

।। যমজের অধিক জন্ম ।।

পৃথিবীতে পঞ্চকের জন্ম সম্ভাবনা চার কোটি দশ লক্ষে জন্মে একটি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে পঞ্চাশটি পঞ্চক ও কুড়িটি ষষ্ঠকের জন্ম নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। পঞ্চকদের মধ্যে মাত্র তিনটি অধিককাল বেঁচে থেকেছে।

সবচেয়ে বিখ্যাত পঞ্চকের জন্ম হয় ১৯৩৪ সালে কানাডার ডিয়োনী পরিবারে। তারা ছিল পাঁচ বোন। তাদের একজনের বিয়ে হয়েছে, একজন সন্ন্যাসিনীদের মঠে যোগ দিয়েছে। পঞ্চমা এমিলি ১৯৫৪ সালে মারা গেছে।

১৯৪৩ সালে আর্জেন্টিনার এক কোটিপতির গৃহে আরেকটি পঞ্চকের জন্ম হয়। এরা দু ভাই, তিন বোন। জন্মের পর আট মাস তাদের জন্ম গোপন রাখা হয়। বর্তমানে তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক বোর্ডিং স্কুলে রেখে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য— ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলা।

।। বিচিত্র কয়েকটি যমজ ।।

যমজরা বৈসাদৃশ্যময় ও সম্পূর্ণ সাদৃশ্যময়—দুই হতে পারে। প্রথম দলে একটি ভাই, একটি বোন কিম্বা দুটি ভাই, দুটি বোন হতে পারে। শুধু আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতেও তারা

ডাইনে সকলেই যমজ ভাই-বোনেরা। এখানে গেলে মনে হয় চোখে যেন 'দ্বিত্ব দোষ' ঘটেছে।

সম্পূর্ণ পৃথক কিম্বা বিমুখ হতে পারে।

সম্পূর্ণ সাদৃশ্যময় যমজেরা সর্বদাই হয় দুটি ভাই কিম্বা দুটি বোন। সাধারণত তিনটি যমজ জন্মের মধ্যে একটি হয় এই জাতীয় যমজ। অনেক সময়ই সাদৃশ্যময় যমজদের আশ্চর্য মানসিক সংযোগ থাকে। একজনের শরীর কিম্বা মন খারাপ হলে হাজার মাইল দূরে আরেকজনের শরীর কিম্বা মন খারাপ করে।

কিছুকাল আগে এমনি দুই যমজ বোনের সচিত্র কথা বৃটেনের সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। তাঁদের দুই বোনের একজন বিয়ে করে থাকতেন দক্ষিণ আফ্রিকায় আরেকজন চিরকুমারী হয়ে ইংল্যান্ডে। ত্রিশ বছরের অধিককাল তাঁদের পরস্পরের দেখা হয়নি। তবু দূর দক্ষিণ আফ্রিকায় একজনের দেহ-মন খারাপ হলে আরেকজন ইংল্যান্ডে বিচলিত ও অসুস্থ হয়ে পড়তো। তার-পর একদিন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসিনী বোন মারা গেলেন। পরের দিন মৃত্যু সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এলো। কিন্তু টেলিগ্রাম দেবার জন্যে ইংল্যান্ডবাসিনী বোনের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা খুলে দেখা গেল তিনিও মারা গেছেন।

আমেরিকায় ১৯১৮ সালে একটি চলন্ত ট্রেণে এক মহিলার যমজ প্রসব-কালে একটি সন্তানের জন্ম হয় যুক্ত-রাষ্ট্রে, অপরটির জন্ম হয় কানাডায়। অনুরূপভাবেই ইংলন্ডে ১৯৩১ সালে একটি যমজের একজনের জন্ম হয় ডার-হ্যামে অপরজনের নর্থামবারল্যান্ডে।

সুইডেনের যমজ অভিনেত্রী ভগ্নীদ্বয় মাইয়া ও পাইয়া গম্বার্গ মনে করেন 'যমজ হওয়া খুব মজার ব্যাপার'।

কানাডায় একবার দুটি যমজ চার-রাত্রি ও চারদিনের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করে।

শ্যামিজ যমজেরা হচ্ছে পূর্বোক্তদের বিপরীত। এরা গায়ে গায়ে জোড়া থাকে, কয়েক মাস আগে নাইজেরীয়ার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে জন ও জেনিফার নামে এমনি দুই বোনকে অস্ত্রোপচারের জন্যে লন্ডনে নিয়ে আসা হয়। তারা ছিল শিরদাঁড়া বরাবর জোড়া। জেনিফারের ফুসফুস ছিল অকেজো। জনের দেহে সে ছিল পরগাছার মত। অস্ত্র প্রয়োগে তাদের বিচ্ছিন্ন করার পরই জেনিফার মারা যায়। কিন্তু জন সঙ্গে সঙ্গে সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানে জন আবার তার মায়ের কোলে ফিরে গেছে। এই জাতীয় যমজদের শ্যামিজ নামকরণের হেতু হচ্ছে শ্যামদেশে অনুরূপ এক যমজ জোড়া অবস্থায় বহুকাল বেঁচে ছিল।

।। যমজদের সম্পর্কে সংস্কার ও সত্য ।।

অনেক আদিম ও অনগ্রসর সমাজে যমজ জন্মকে অকল্যাণকর মনে করা হতো ও হয়।

বৃটেনে আবার্ডিনশায়ারে এখনো একটি সংস্কার চালু আছে যে যমজরা বিয়ে করলে একজনের শুধু সন্তান হয়। যমজরা দীর্ঘজীবী হয় না বলেও অনেকের ধারণা। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আমেরিকার মিচিগানে দুই যমজ বোন নিজেদের শতবার্ষিকী যাপনে সমর্থ হন।

তবে যমজদের মধ্যে জীবনের কোন ক্ষেত্রে কেউ খুব খ্যাতির অধিকারী হননি। মনস্তাত্ত্বিকরা এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে তার কারণ হচ্ছে তারা সাধারণত পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বলে তাদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা কম থাকে। তবে মুষ্টিযুদ্ধে গাট্রিজ (Gutteridge) যমজ ভাইরা খুব নাম করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৬ সালে একটি প্রতিযোগিতায় তাঁরা দুজনেই একই দিনে আহত হন।

ইংল্যান্ডে কাম্বারল্যান্ড জেলার দুই যমজ ছিলেন কেলস ইউনাইটেড ফুট-বল ক্লাবের মানিকজোড়। মাঠে নামলে দর্শক গ্যালারীতে বসে তাঁদের পিতা-মাতারাও তাঁদের চিনতে পারতেন না। একবার রেফারী এক ভাইকে গোঁয়া-র্তুমির জন্যে তিনবার সতর্ক করে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বের করে দেবার সময় বের করে দেন তাঁর অপর ভাইকে।

একদা সারে জেলার ক্রিকেট টিমের মুগলস্তম্ভ ছিলেন এলেন ও এরিক বেডসার যমজ ভাইরা। ১৯৪৬ সালে ওভালের মাঠে রাজা ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় সবাই ভেবে-ছিলেন রাজা তাঁদের কে-কোনটি তা ধরতে পারবেন না। কিন্তু দেখা গেল রাজার ভুল হলো না। পরে অবশ্য প্রকাশ পেল যাতে ঠকে না যান তার জন্যে তিনি দুই ভাইয়ের ফটো খুব ভালো করে লক্ষ্য ও পরীক্ষা করে যান।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের বহুল-প্রচারিত রুচিশীল সাপ্তাহিক অমৃতের "জানাতে পারেন" বিভাগের জন্য নীচে দুই একটি ছোট ছোট প্রশ্ন করছি এবং এই সঙ্গে অমৃতের অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ তাঁদের কারো এর উত্তর জানা থাকলে "জানাতে পারেন" বিভাগে দিয়ে বাধিত করবেন।

১। (ক) প্রথম প্রশ্ন এই—আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে এনভেলপে চিঠি পুরে এনভেলপের মুখ এ'টে দেওয়ার পর, ঠিক মধ্যস্থলে ৭৪½ (সাড়ে চুয়াত্তর) লেখার অভ্যাস বা নিয়ম—যাই বলুন না কেন, এর সঠিক কারণ কি?

(খ) ঠিক উপরোক্ত বিষয়েই উত্তর-প্রদেশ ও বিহারবাসী হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে এনভেলপের উক্ত স্থানে ১৫ (পনেরো) লেখার চলন আছে। এরা ৭৪½ না লিখে ১৫ লেখেন কেন? এবং বাঙ্গালীরা ১৫ না লিখে ৭৪½ কেন লিখে থাকেন? এই বিপরীত-ধর্মিতার কারণ কি?

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—বোম্বে শহরে যে সব স্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস চলে তাদের পার্শ্বে ইংরেজীতে 'বেস্ট' লেখা থাকে। এর কি কোন ভিন্ন অর্থ আছে?

শ্রীঅশোককুমার সাহা,
সাপটগ্রাম (বড় বাসা)
(আসাম)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের প্রকাশিত "অমৃত" পত্রিকার আমি একজন পাঠক। পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমার খুব ভাল লাগে; এই বিভাগটি আমি অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সাথে পাঠ করে থাকি। আমি কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি, আশা করি আপনি পত্রিকায় 'জানাতে পারেন' বিভাগের মারফৎ সেগুলোর উত্তর দিয়ে আমার জানার আগ্রহ দূর করবেন।

(১) বাংলা বর্ণ পরিচয়ের 'ক' থেকে " পর্যন্ত বর্ণগুলোর মধ্যে দু'বার 'ব'এর ব্যবহার লক্ষ্য করি, এখন এই দুটো 'ব'এর মধ্যে কাঠামোগত, প্রকৃতিগত, অর্থগত এবং ব্যবহারের দিক থেকে এদের প্রয়োগগত কোন প্রভেদ আছে কি? যদি থাকে, সেগুলো কি? আর যদি না থাকে, তাহলে দু'বার 'ব' ব্যবহারের সার্থকতা কি?

(২) সুসাহিত্যিক প্রতিভা বসুর 'বিবাহিতা স্ত্রী' নামে উপন্যাসখানা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। এখন বিবাহিতা স্ত্রী—এই নামটি ব্যবহারের অর্থ কি? বিবাহিতা ছাড়া কোন মহিলাকে কি 'স্ত্রী' আখ্যা দেওয়া চলতে পারে? (অবশ্য ভারতীয় আইন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে)।

(৩) ভগবান বা দেব-দেবী কর্তৃক মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা জানি না, তবে বলা হয়ে থাকে মানুষের কল্পনা-শক্তিই ভগবান বা বিভিন্ন দেবদেবীকে সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দেবদেবীকে বিভিন্ন রূপে কল্পনা করেছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে দেবী কালীমাতার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেও নিশ্চয় মানুষের কল্পনারই একটি বিশেষ রূপ। এখন কালী নামের তাৎপর্য কি এবং দেবী কালীমাতাকে অত কালো রূপেই বা কল্পনা করা হয়েছে কেন?

সুচিত দাস,
আমতা, হাওড়া

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগটি একটি নতুন সংযোজন। এতে পাঠক-পাঠিকাদের নানা বিষয়ে জানবার ও শিখবার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে জানবার কৌতূহল এ সুযোগে জানালে উপকৃত হব আপনার পত্রিকার অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে।

১। O K শব্দ আমরা ঠিক আছে অর্থে ব্যবহার করি। এই O K কথাটির ব্যুৎপত্তি কি। এর প্রচলন কি করে হল। বাংলা ভাষায় O K-এর অর্থবোধক কি শব্দ ব্যবহার করা যায়। কত দিন থেকে এই শব্দের প্রচলন জানতে চাই।

২। ডাক্তার ও ডক্টরেট এই দুই খেতাবের মধ্যে পার্থক্য অনেক। অথচ সংক্ষেপে ইংরেজীতে উভয় অর্থে Dr ও বাংলায় ডাঃ লেখা হয়। এই ভাবে লেখার ফলে কে চিকিৎসক আর কে গবেষক বুঝতে অসুবিধা হয় না কি? অথচ অন্ততঃ বাংলায় কেন যে আমরা ডাঃ ও ডঃ লিখি না বুঝতে পারি না।

৩। টেলিফোনে কেন সম্বোধন অর্থে "হ্যালো" শব্দ ব্যবহার করা হয়। টেলিফোনে সম্বোধনার্থে "হ্যালোর" পরিবর্তে কোন শ্রুতিমধুর বাংলা শব্দ জানতে চাই।

শ্রীমাধব মজুমদার
৭।৭৯, সি আই টি বিল্ডিংস
কলিকাতা—১০।

(উত্তর)

।। কেন ? ।।

১৪ই সেপ্টেম্বরের অমৃত পত্রিকায় শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য মহাশয় ২টি প্রশ্ন করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের উত্তর দিতেছি:—

(১) পেটগরম—সর্দি কাশি রোগ ব্যাপকতার দিক হইতে যেমন সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে, তেমনি ইহার কারণও বোধ হয় অন্যান্য রোগ অপেক্ষা সর্বাধিক। হঠাৎ ঠান্ডা লাগা, ঠান্ডা হাওয়ায় বেড়ান, রৌদ্র লাগা, বৃষ্টিতে ভিজা, অত্যাধিক শীত ইত্যাদি নানা কারণের মত পেটগরমও সর্দি কাশির একটি কারণ বটে। ইহা চিকিৎসা শাস্ত্র-সম্মত। উত্তরদাতা নিজেই ইহার একজন ভুক্তভোগী। সুতরাং ইহা একটি ধারণা মাত্র নহে।

(২) চোখে সরষে ফুল দেখা—। আকস্মিক বিপদে বা বিপাকে পড়িয়া, উত্তরোত্তর বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বিপদের সম্মুখীন হইয়া, অতর্কিতে জটিল প্রশ্নবাণে জর্জরিত হইয়া, বা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া, বা অনুরূপ কোন কারণে কেহ বিভ্রান্ত বা দিশাহারা হইলে, চোখে সরষে ফুল দেখিয়া থাকে, বলা হয়। এই বিভ্রান্ত বা হতবুদ্ধিকর অবস্থাকে বুঝাইবার জন্য "চোখে সরষে ফুল দেখা" বাংলার একটি বিশেষ বাক্‌ধারা মাত্র। চোখে অন্ধকার দেখা ঠিক এই রকম আর একটি বাক্‌ধারা।

কোন শক্ত বস্তু দ্বারা আকস্মিকভাবে মাথায় বা শরীরের কোন মর্মস্থলে জোরে আঘাত লাগিলে, বা হঠাৎ পা পিছলাইয়া বা অন্য কারণে পড়িয়া গিয়া মাথায় কঠিন আঘাত লাগিলে, বা স্নায়বিক দৌর্বল্য-বশতঃ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলে অনেক সময় লোকে চারিদিকে কিছুক্ষণের জন্য ছোট ছোট আগুনের ফুলকির মত দেখিয়া থাকে, যাহা দেখিতে অনেকটা সরষে ফুলের ন্যায়। মাথায় ঠান্ডা জল প্রয়োগে বা ঠান্ডা বাতাসে এই অবস্থার উপশম হইলে এই ফুলকিগুলি আর দেখা যায় না। সরষে ফুলের মত রং ও আকৃতি বিশিষ্ট এই ফুলকি দেখা হইতেই খুব সম্ভবতঃ "চোখে সরষে ফুল দেখা" কথাটি আসিয়াছে। সত্য-সত্যই কেহ আকস্মিক বিপদে পড়িয়া আর সরষে ফুল দেখে না।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯।

তাইতো, একে
বড়ই দুঃসংবাদ
দাবা !

২০/৯/৬২ ইং

আজি হতে দু'বছর পরে
কে তুমি দেখিছ বসি
আমার কীর্ত্তিখানি ...

ওসব মিলিটারী বাজী
চলবেনা

কলকাতার
দুর্দ্দশায়
রাজা
বিক্রমাদিত্যের
আবির্ভাব !

শুনুন, নতুন মন্ত্রী হিসাবে
আপনার কাজই হবে ছদ্মবেশে
রাজা বিক্রমাদিত্যের মত এই লণ্ঠন নিয়ে
কলকাতার সুখদুঃখ দেখবেন !

ঢাকা
এবার
খুলেচে !

টোপ-টুপি

সমরজিৎ কর

টোপ! দেখুন, এই শব্দটি ব্যাকরণের কোন অধ্যায়ে পড়ে, সেকথা আমার অজানা। ভাষাতত্ত্ববিদরা এর সঠিক পূর্বপুরুষ কে তা নিশ্চয় গবেষণা করেছেন। তবে আমার মনে হয় টোপ এবং টুপি বোধ হয় সমগোত্রীয়। উভয়েরই প্রাধান্য সর্বসমাজে যথেষ্ট। তবে টুপির মধ্যে একটা কৌলিন্যের স্বাদ যেন খুবই স্পষ্ট! আপনার রুচি বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সামাজিক অস্তিত্ব অথবা স্ট্যাটাস—এসবের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে টুপির মূল্য কিন্তু কম নয়। আপনার গান্ধীটুপির কায়দা যেমন বলে দেবে আপনি কোন শ্রেণীর নেতা, ঠিক তেমনই আপনার ফেল্ট হ্যাটের মক্‌স পরিষ্কার জানিয়ে দেবে আপনি মনুষ্য সমাজে কোন্ শ্রেণীতে পড়েন। তবে হ্যাঁ, টুপির আগে টোপ। যেমন রথীর আগে রথ। আপনার স্ট্যাটাসই বলুন আর সাফল্যই তুলুন, আপনার উদ্যম অথবা প্রচেষ্টা, এই সমস্ত কিছুর যদি সুপরিণতি চান, তাহলে টোপকে চিনুন।

সেদিন আমার জনৈক বন্ধু রীতিমত ক্ষ্যাপার মত আমার কাছে উপস্থিত হোল। বন্ধুটি কোন এক সরকারী অফিসে মাঝারিগোছের অফিসার। সম্প্রতি লিফ্‌টের জন্যে একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেয় এবং ফলও ভাল করে। অফিসেও তার নামডাক আছে যথেষ্ট—ভালমানুষ বলে এবং সজ্জন কর্মী বলে। ওপর মহলের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসাও তার যথেষ্ট। মোটকথা চাকুরী-জীবনে সাফল্য পেতে গেলে যা যা দরকার সব তার আছে। অর্থাৎ সে ড্যাসিং এবং পুসিংও।

কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। প্রমোশন তো হোলই না। বরং খোঁচা খেয়ে ফিরে আসতে হোল। তার কনডাক্‌ট বুকে সে নাকি কোন এক রাজনৈতিক দলে জড়িত ছিল, এমন কথা বলা হয়েছে। অতঃপর মন্তব্য করা হয়েছে, শ্রী... সান্যাল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের অনুপযুক্ত।...ইত্যাদি।

আমি বললাম, ব্যাপার কি?

সে এবার আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বলল, যাও যাও। তোমাদের দেশে বেঁচে থাকা এখন শক্ত।

আমি বললাম, ও ব্যাপারটা চিরদিনই শক্ত ছিল, আছে এবং থাকবেও। আর সব দেশেই।

—তুমি ভাবতে পার? মাত্র একটা শার্ট! ব্যস? নো প্রোমোশন?

ব্যাপারটা হোল এই : কলকাতা সহরেই কোন এক আন্দোলনের সময় একটি হামলাকারী দলের মধ্যে সে পড়ে যায়। ভিড় বাঁচিয়ে আসতে গিয়ে পুলিশের একটি লাঠি তার মাথায় এসে পড়ে এবং কপালের কাছটায় একটু কেটে যায়। কোন প্রকারে সে একটি গলির মধ্যে ছুটে আসে এবং পকেটে মেয়ের জন্যে সদ্য কেনা একটি জামা দিয়ে সে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ জামার কাপড়ের রং কোন এক রাজনৈতিক দলের প্রতীক। ব্যাপারটা স্বরাষ্ট্র বিভাগ লক্ষ্য করেন এবং যথানিয়ত তাঁদের মন্তব্য কন্ডাক্‌ট বুকে স্থান পায়।

ঘটনাটা ঘটেছিল পরাধীন ভারতে। তখনকার দিনকাল এখনকার মত জটিল ছিল না। আমি বললাম, একেবারে রং প্রসিডিওর! এতকাল চাকরী করে এই বুদ্ধি হোল তোমার? চাকরীর খাতিরে ও প্রপার-চ্যানেল কথাটা খাটে। কিন্তু জীবনে যদি কিছু করতে চাও তো ঐ খালই যথেষ্ট। শুধু চার ফেললেই হয় না হে, টোপ! টোপ চাই টোপ। আর তোমার যা কেস শুনছি একেবারে রাহুর ঘরে শনি টেনে এনেছ। তাই টোপটিও হওয়া চাই চোস্ত।

বন্ধুটি এবার আরও ক্ষেপে উঠল। বলল, দেখ, সিরিয়াস টক্ যখন হচ্ছে তখন সিলি হয়ো না। কি টোপ টোপ করছ?

হ্যাঁ! টোপ। একটু ধৈর্য ধরে কথাটা শোন।

এরপর টোপের যে যে মশলার কথা বলেছিলাম, আমার বুদ্ধিমান বন্ধুটি একেবারে ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট এন্ড ফেইথফুল সার্ভেন্টের মত পালন করেছে এবং একটি নয়, ধাঁ ধাঁ করে একেবারে তিনটি লিফ্‌ট মেরে দিয়েছে।

বছরখানিক পর দেখা। অফিসফের্তা। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিলাম। একটা চক্‌চকে অস্টিন চমকে দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হ্যা-লো?

আরে অমিয় ? কতকটা থতমত খেয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। তবু আমার মনে হোল, অমিয়কে আমার পক্ষেই চেনা শুধু সম্ভব হয়েছে। আসলে এক বৎসর পূর্বের সেই চেহারার সঙ্গে তার মিল নেই বললেই চলে।

আড়চোখে চাইতেই গাড়ীর পেছনের সিটে এক বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গীকে চোখে পড়ল।

ওঃ। হ্যাঁ। পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিসেস—

—মিসেস লঙম্যান! ওকে শেষ করতে না দিয়েই বলে ফেলি। তারপর আমার পরিচয় স্বয়ং আমিই দিলাম।

অমিয় আর দাঁড়ালো না। তাড়া আছে এবং আর একদিন দেখা হলে সব কথা হবে—এই বলে পথের মোড়ে সে অদৃশ্য হোল। মনে মনে ভাবলাম, বলিহারী বাবা। আমার টোপের ফর-মুলা বটে। একেবারে পেটেন্ট।
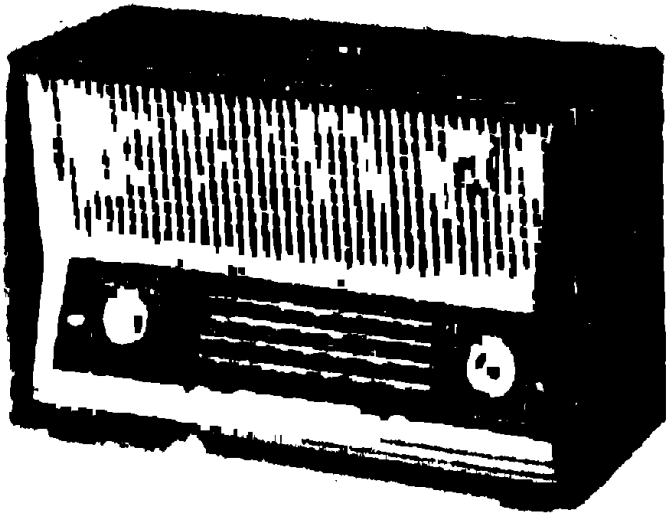
ব্যাপারটা তাহলে বলি। অমিয় অর্থাৎ আমার সেই ক্ষ্যাপা বন্ধু অমিয় সান্যালের তিনটে লিফ্‌ট হয়েছে। এখন সে রীতিমত বড়বাবু। যাকে বলে বড়-সাহেব ? আর তার মূলে ঐ টোপ। অমিয়র প্রমোশনের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন চিফ জাস্টিস মিঃ লংম্যান। আমি বলেছিলাম, ওঁকে না। মিসেসকে গিয়ে ধর। ভদ্রমহিলা খুব খিটখিটে। মানে মানুষকে তিনি দেখতেই পারেন না। তবে হ্যাঁ। দুর্বলতা নেই, হেন জন নেই জগৎ সংসারে। সন্তানহীনা এই মহিলা কখনও কখনও মাতৃসম্বোধনে বিগলিত হন। আর সেই সম্বোধন যদি পার্থিব সামগ্রীর ফল্গুপ্রবাহে ঝরে পড়ে, তাহলে তা কখনও কখনও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গও করে। আর অমিয়র বরাতে তা করলও।

সেদিন ছিল মিসেস লঙম্যানের জন্মতিথি। সাহেবের বাংলোয় উৎসবের তান্ডব। রাত দশটা। কালো পৃথিবীর মাঝখানে ততক্ষণ নেমে এসেছে রঙীন আবেশ। অমিয় সঙ্গে একটি হীরের পেনডেন্টওয়ালা হার নিয়ে একেবারে সরাসরি হোলি মাদার অর্থাৎ মিসেস লঙম্যানের পায়ে গিয়ে পরিষ্কার বৈদিক প্রথায় প্রণাম জানালো।

সকলে তো হতবাক। মিসেস লঙ-ম্যানও চমকে উঠলেন : গুড হেভেন!!

অমিয় দেবীর করতলে হারটি গছিয়ে গদগদভাবে বলল, মাই অনলি মাদার। আপনার জন্মতিথি। সাহেব না বললেও আমার একমাত্র মায়ের উৎসব। সন্তান তো এখানে চুপ করে থাকতে পারে না? মাতৃহীন আমি। তাই একটু সেবা।

হোয়াট! মিসেস লঙম্যান কিন্তু নেশার মধ্যেও সামলে চলতে পারেন। সে কি মিঃ সানিয়েল। সেদিন তুমি ডিক্লেয়ারেশন দিয়েছ। তোমার মা এখনও জীবিত ?

কিন্তু তালিমের জোরে অমিয় তখন ওস্তাদ। সাহেবের কথা লুফে নিয়ে রীতিমত আবেগ মিশিয়ে কাটাছাড়া ইংরেজীতে সে যা বলল তার সার কথা হোল : সাহেব ঠিকই বলেছেন। তবে গর্ভে ধরলেই তো আর মা হয় না। তার মা তার শত্রু। মিসেসের মধ্যেই নাকি সে আবিষ্কার করেছে সত্যি-কারের মাতৃস্নেহ!

ব্যাস! মিসেস লঙম্যানের মধ্যে ততক্ষণ বাৎসল্যরস ঘনিভূত হয়েছে। আর তার মাঝখানে পড়ে মিঃ লঙম্যান তাঁর জাঁদরেল স্বভাব বিস্মৃত হয়ে হৃদয়-দৌর্বল্য প্রকাশ করেছেন। একে-বারে কিস্তি মাত। কাতলা টোপ গিলেছে। আর তা থেকে দেখতে দেখতে একেবারে টুঁপি। কোথায় গেল সেই কনফিডেন্সিয়েল রেকর্ড। কোথায় কন-ডাক্‌ট বুক! বরং যে অফিসার অমিয়র বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখেছিল মিঃ লঙম্যান তারই বিরুদ্ধে মন্তব্য করলেন : অকর্মণ্য, অনুপযুক্ত। আসলে মিঃ সানিয়েল ইজ এ মোস্ট লয়েল সাবজেক্ট টু দা ক্রাউন।

দেখুন, আমার মনে হয় ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিগতভাবে যাই আপনি করতে চেষ্টা করুন না কেন টোপটি আপনার ঠিক চাই। এসোসিয়েসন অব্ আইডিয়াস থেকে যেমন নতুন আই-ডিয়ার জন্ম, পরমাণুর উপর গবেষণা করে সাফল্য অর্জন করতে গেলে যেমন প্রয়োজন পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা, ঠিক তেমনি একটি সুন্দর টোপ সৃষ্টি করে মনুষ্য সমাজে উন্নতি করতে হলে প্রয়োজন দুটি জিনিস : এক, এসো-সিয়েসন অব আইডিয়াস। দুই, এসো-সিয়েসন অব সারকামসট্যান্সেস। হ্যাঁ, আর তার সঙ্গে চাই সেন্স অব প্রপোর-সনেলিটি। আর এগুলি যদি আপনার মধ্যে ঠিক ঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে অমিয়র মত আপনারও কিস্তিমাত। অর্থাৎ পরিষ্কার করে বলতে গেলে,

দক্ষ মৎস্যাশিকারীর মত আপনাকে মাছের স্বরূপ জানতে হবে, তার চরিত্র অনুযায়ী চার তৈরী করতে হবে। অবশেষে টোপ।

এও এক প্রতিভা। এও এক গুণ। নিজেরা ব্যর্থতার মধ্যে বসে কত মন্তব্যই না করি? কিন্তু একথা কি কখনও ভেবে দেখেছেন, কোন কোন লোক অনেক ক্ষেত্রে আপনার থেকে কম গুণসম্পন্ন হয়েও জীবনে অনেক ওপরে উঠে গেছেন? শুধু পাণ্ডিত্য বা দক্ষতা থাকলেই হয় না। আপনি কি সহনশীল? পরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশংসা করার মত ঔদার্য কি আপনার আছে? বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির মধ্যে জীবনবোধকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে কি আপনি পেরেছেন? পাঁচজনে কি চায়, তা কি লক্ষ্য করেন? অর্থাৎ সংসারক্ষেত্রেও আপনাকে একজন ডিপ্লোম্যাট হতে হবে। আর যে প্রশ্নগুলো আমি করেছি—টোপ তৈরী করার এরাই একমাত্র মশলা। অবশ্য হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে সঠিক অনুপাত অনুযায়ী মেশালেই যেমন জল পাওয়া সম্ভব নয়, চাই প্রয়োজনমত উত্তাপ, ঠিক তেমনই এই গুণগুলি থাকলেই হবে না, এদের মধ্যে একটা যথাযথ সমন্বয় বজায় রেখে একটা উপযুক্ত সারকামস্টান্সের মাধ্যমে অগ্রসর হলে তবেই সাফল্য। অর্থাৎ আপনাকে অফিসের ভাষায় যাকে বলে, মানে একটু ট্যাক্টফুল হতে হবে।

তাহলে শুনুন আমেরিকার জনৈক ব্যাঙ্কার মিঃ ডেনিয়েল বীচক্রফের কথা। ভদ্রলোক প্রথমে চাকরীতে ঢোকেন লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির দালাল হিসেবে। বয়সে অত্যন্ত তরুণ। অভিজ্ঞতাও নেই। তাছাড়া বিগত দুই বৎসরের মধ্যে যে কখানি কেস তিনি কোম্পানিকে ধরিয়েছিলেন তার সবকটিই নৈরাশ্যজনক। ইনসিওর করার পর ইনসিওরকারীদের যে যে দুর্ঘটনা হওয়া উচিত নয় প্রত্যেকের সেগুলিই ঘটেছে। অর্থাৎ যার জীবনের উপর বীমা করা ছিল, সে মরেছে, যার পায়ের উপর বীমা, সে খোঁড়া হয়েছে। ইত্যাদি। মোটকথা মিঃ বীচক্রফের সমস্ত কেসই কোম্পানির কাছে লোকসান। বড় কর্তা এর মধ্যেই ইঙ্গিত করেছেন, মিঃ বীচক্রফ অনুপযুক্ত।

ইতিমধ্যে একটি সুযোগ এল। মস্ত শিকার। কিন্তু রীতিমত ঘড়েল।

ক্যাফেটারিয়ায় বসে মিঃ বীচক্রফ খুবই অন্যমনস্ক হয়ে চা খাচ্ছিলেন। এমন সময় কে একজন ঠিক তাঁর কানবরাবর এসে প্রশ্ন করল, মাফ করবেন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোন বীমা কোম্পানির লোক?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে মিঃ বীচক্রফ জবাব দিলেন, আপনার অনুমান সত্য।

আগন্তুক বলল, আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু সাক্ষাতের সুযোগ মিলবে কি?

আকস্মিক এই প্রস্তাবে প্রথমটায় একটু বিচলিত হলেও মিঃ বীচক্রফ আগন্তুক এই যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ করে জানলেন, এই যুবকটিও এক বীমা কোম্পানির দালাল। সম্প্রতি এক বিরাট শিল্পপতিকে কোন মতেই কায়দা করতে পারছে না। অথচ এই একটা পার্টি জোগাড় করতে পারলেই আখের অনেকটা গুছিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু লোকটা এমন যে, বীমা কোম্পানির লোক দেখলেই সে ক্ষেপে ওঠে। তার ধারণা, জীবন-বীমা করার পর বেশি দিন কেউ বাঁচে না।

অবশেষে সেই যুবক, মিঃ মিলস বলল, দোহাই আপনার যদি ওকে লটকাতে পারেন দয়া করে কিছু পারসেণ্টেজ আমাকে দেবেন। নইলে চাকরী রাখাই দায় হবে।

মিঃ বীচক্রফ মনে মনে হাসলেন। বাইরে যতই জাকজমক থাকুক না কেন, তারও অবস্থা মিঃ মিলসের চেয়ে কিছু কম নয়। ভাবলেন, শেষ চেষ্টা করা যাক।

এর পর মিঃ বীচক্রফ নিয়মিত সেই শিল্পপতি মিঃ আলেকজান্ডার হপকিন্সের দেউড়ীতে হানা দিতে লাগলেন প্রত্যহ দুবার করে। অর্থাৎ কারখানায় যাওয়ার সময় এবং কারখানা থেকে ফেরার সময়। লক্ষ্য করতে লাগলেন তার গতিবিধি, চালচলন। ইতিমধ্যে মিঃ হপকিন্সের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সঙ্গেও বেশ আলাপ করে ফেলেছেন নিজেকে একজন কাগজের রিপোর্টার বলে পরিচয় দিয়ে। এই আলাপের মধ্যে দিয়ে মিঃ হপকিন্সের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনেক কিছুই জানা গেল। এবং তারপর এই অভিজ্ঞতার মশলা দিয়ে তৈরি 'টোপ' একদিন ফেললেন মিঃ হপকিন্সের সম্মুখে।

মিঃ হপকিন্স তখন তাঁর পার্সনেল চেম্বারে বসে। এমন সময় ওয়েটার একটি কার্ড রেখে গেল তাঁর টেবিলের উপর। পরিষ্কার স্বচ্ছ লেখা সেই কার্ডে : মিঃ ডেনিয়েল বীচক্রফ। দর্শনের উদ্দেশ ব্যক্তিগত। অনুগ্রহ করে এক মিনিট সময় দিলেই হবে। কিন্তু মিঃ বীচক্রফ দেখলেন মিঃ মিলসের কথাই ঠিক। একেবারে ঘড়েল লোক। তাঁর প্রার্থনা উপেক্ষিত হোল। কোন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ তিনি করেন না।

নিরাশ হলেন না বীচক্রফ। দুই একদিন পর পরই এই রকম কার্ড

পাঠাতে লাগলেন। আর যা ভেবেছিলেন, তাই হোল। তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোল।

সুসজ্জিত চেম্বারে বিরাট মূর্তি মিঃ হপ্‌কিন্স বসে। মিঃ বীচক্রফ কক্ষে প্রবেশ করেই তাঁকে বিনীতভাবে অভিবাদন করলেন। তারপর বললেন, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। মাফ করবেন, আপনার চেহারার বৈশিষ্ট্য দেখতেই শুধু আসা। সে কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমি চলি?

একথা বলেই মিঃ বীচক্রফ পা বাড়াতেই, অস্ফুট কণ্ঠে মিঃ হপ্‌কিন্স বললেন, দাঁড়াও।

মিঃ বীচক্রফ একটু মৃদু হেসে দাঁড়ালেন।

কয়েক মুহূর্ত মিঃ হপ্‌কিন্স কোন কথাই বলতে পারলেন না। কারণ তাঁর সত্তর বছরের এই সুদীর্ঘ এবং সাফল্য-মণ্ডিত জীবনে এমন নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখে তিনি কখনও পড়েন নি।

মিঃ হপ্‌কিন্স জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি বল ত?

মিঃ বীচক্রফ হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, এক মিনিট শেষ হোল।

—তা হোক! গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন মিঃ হপ্‌কিন্স।

একটু থেমে মিঃ বীচক্রফ বললেন, না। মানে। আপনি জীবনে কৃতী মানুষ। আপনাকে দেখতে এসেছিলাম চেহারার কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে আজ আপনি কোটিপতি হতে পেরেছেন। এবং তা অপরের বিনা সাহায্যেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আপনি আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দিলেন।

ব্যাস। কাতলা ততক্ষণ টোপ গিলেছে। কারণ আত্মপ্রশংসা কেউই উপেক্ষা করতে পারে না। কোথায় এক মিনিট। মিঃ হপ্‌কিন্স একঘণ্টা ধরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গোড়াপত্তনের কথা তাঁকে শুনিয়ে তবে ছাড়লেন। শুধু তাই নয়, নিজের বাড়ীতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সাহায্য করারও আশ্বাস দিলেন।

অতিক্রান্ত হোল পুরো দু' বছর। ঠিক ঝানু মৎস্যশিকারীর মতই টোপ ফেলে অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে লাগলেন মিঃ বীচক্রফ। এর মধ্যে তিনি হপ্‌কিন্স পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুরূপে জড়িয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়। মিঃ হপ্‌কিন্স তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁকে জড়িত করেছেন। অবশ্য মিঃ বীচক্রফ নিজের যোগ্যতারও পরিচয় দিয়েছিলেন।

তারপর একদিন আসল কথা পাড়লেন। মিঃ হপ্‌কিন্সের সঙ্গে একটি ছুটির দিনে বেশ মধুর পরিবেশে যখন চা পান চলছিল, তখন মিঃ বীচক্রফ বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন, কিছু যদি না মনে করেন মিঃ হপ্‌কিন্স, আপনার স্ত্রী-পুত্রদের জন্যে একটা স্পেশাল প্রভিশন থাকা দরকার—মানে এখন তো আপনার ফার্ম একটা লিমিটেড কনসার্ন? ঈশ্বর না করুন—!

"......এত বড় অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হয়ে এ ভুলটা আপনিও করতে চলেছেন!"

মিঃ হপ্‌কিন্স মুচকি হাসলেন, নেভার মাইণ্ড মাই বয়। এমোর্শির জন্যে আগামী সপ্তাহে ব্যাংকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার রাখার ব্যবস্থা করছি।

কতকটা হাসির আমেজ মিশিয়ে মিঃ বীচক্রফ বলল, এতবড় অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হয়ে এ ভুলটা আপনিও করতে চলেছেন। অতটাকা ব্লক করা মানে লেস প্রফিট। আপনার লস।

—তা হলে কি করতে বল আমাকে?

—মানুষ আজ বিজ্ঞানের দয়ায় যুক্তি-বাদী হয়ে কুসংস্কারকে ত্যাগ করতে পেরেছে বলেই সে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, আপনি বরং ঐ টাকার জীবন বীমা করুন—মানে!

—ইমপসিবল্! ডু ইউ থিংক?—

মিসেস হপকিন্সও যেন হঠাৎ এই প্রসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

কিন্তু টোপ তখন একেবারে কণ্ঠ-নালীর নিচে। মিঃ বীচক্রফ অবশেষে যুক্তি দেখিয়ে পরিস্থিতি জয় করলেন এবং সাত দিনের মধ্যেই পার্টিটিকে মিঃ মিলের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

উত্তরজীবনে মিঃ ড্যানিয়েল বীচক্রফ আমেরিকার একজন নামকরা ব্যাংকার হল।

অতএব বুঝতেই পারছেন, জীবনে টুপি যদি পরতে চান, টোপ চিনুন। নইলে জলের কাতলা জলেই থাকবে। ছিপ হাতে বসে থাকা আর নিশ্চল ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া—এই হবে সার। অর্থাৎ জীবনে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন—এটাই হবে আপনার জীবনের পরিণতি। তবে হ্যাঁ। উপযুক্ত টোপ পেলেই কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবেন না। টোপে কাতলা গেঁথেছে কি হাঙ্গর গেঁথেছে একটু দেখে নেবেন। কারণ পরোক্ষটি ঠিক সাফল্য নয়। আপনার জীবনের ট্র্যাজেডি।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৫ ।।

মনে মনে ও প্রকাশ্যে যতই রাণীদির বুদ্ধির তারিফ করুক কনক—সত্যি সত্যিই যে ও চিঠিতে কোন কাজ হবে তা সে আশা করেনি। অন্তত এ শনিবার আসবে না, এটা ঠিক। আরও দু তিন বার লিখলে হয়ত আসতে পারে সে। অর্থাৎ আরও দু তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

তবু সে হেমকে শনিবার দিন বিকেলে বেরোতে বারণ করল।

হেম কপালটা একটু কুঁচকে বলল, 'কেন, তোমাদের জামাই আসবে তোমরাই আদরযত্ন ক'রো। আমি না থাকাই তো ভাল!'

'তা তো ভাল বুঝলুম। আশা নেই—তবু যদিই এসে পড়ে—জামাই মানুষ, কিছুতো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে! তোমাদের ঘরে তো কিছুই নেই!'

'হ্যাঁ—! ঐ যা ডাল ভাত হয় তাই খাবে।'

'না না—তা হয় না। একটু মাছ ওর মতো, কি দুটো আলুও অন্তত না হ'লে কী করে চলে!'

এ বাড়িতে আলু কেনার পাট নেই। নতুন আলু যখন খুব সস্তা হয় তখন এক আধদিন হেম নিয়ে আসে পোস্তা থেকে একেবারে পাঁচ সের। কৃপণের ধনের মতো সে-ই রেখে রেখে দীর্ঘকাল ধরে খাওয়া হয়। একটু দাম বাড়লেই সেটুকু কেনাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন চলে উঠোন কুড়িয়ে যা বাজার পাওয়া যায় তাই দিয়ে। তা শ্যামার বাড়িতে হয়ও অবশ্য অনেক রকম—থোড় মোচা কাঁচকলা ডুমুর, সজনে ও নাজনে ডাটা, সজনে শাক, আমড়া। এ ছাড়া পুকুরের ধারে ধারে সুষুনি ও কলমী শাক তো অজস্র। এরা তো খায়ই, পাড়ার লোকও অনেকে তুলে নিয়ে যায়। পুঁই কুমড়ো লাউ ডগা, এগুলো মধ্যে মধ্যে। কুমড়ো লাউ খুব ফলে না—অল্প জায়গায় এত গাছ, কোনটাই জুৎ হয় না তাই—তবু মাঝে মাঝে দু একটা মেলে বৈকি। সুতরাং অভাব খুব হয় না আনাজের, আর একটু তেল কি মশলা পেলে এসব দিয়েও মুখরোচক তরকারী হয়। সেটারও যে একান্ত অভাব। সপ্তাহে পাঁচ ছটাকের বেশী তেল আসে না। আগে হাসি পেত কনকের, এখন সেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে—সে নিজেও তাই রান্না করে। শুধু ফোড়ন চোঁয়ানোর মত তেল দেওয়া হয়। শ্যামা নিজেও বলেন, 'তেলের কী স্বদ আছে গা? একটু কাঁচা তেল মুখে দিয়ে দ্যাখো দিকি! সুসিদ্ধ এবং পরিমাণ-মতো নুন—এই তো রান্নার স্বদ। বড়জোর একটু ঝাল দাও। গন্ধ করবার জন্যে ফোড়ন—ফোড়ন চোঁয়ানোর মতো তেল—এইটুকু দরকার! বেশী ঢেলেই বা লাভ কি?'

সয়ে গেছে সবাই, মাছও চায় না সে, তবু মধ্যে মধ্যে একটু আলুর জন্য মনটা বড় ছট্‌ফট্‌ করে। অথচ আলুই একেবারে দুর্লভ এ বাড়িতে। মেজাজ ভাল থাকলে তবু রবিবার সকালে এক আধদিন হাতছিপে এক আধটা মাছ ধরে হেম—কিন্তু আলু কেনার ইচ্ছা বা সাহস তারও নেই।...

হেম কথাটা শুনে চুপ ক'রে রইল। খুব মনঃপুত হ'ল না তা কনক বুঝতে পারল মুখ দেখেই।

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না হয় আধপো একপো আলু এনে রেখে তুমি চলে যাও, তারপর যা হয় ক'রে চালিয়ে নেবো'খন!'

'না, সে আবার মার কাছে কী বলবে? সতেরো রকম কৈফিয়ৎ। দ্যাখো আসে কিনা—এলেও খায় কি না, শুধু শুধু কতকগুলো খরচান্তর করেই বা লাভ কি!... দেখি একটু—'

হেম বাইরে যাবার জন্য কাপড় কোঁচাচ্ছিল—এ বিলাসটুকু তার আজও আছে, শনিবার দেশী কাপড় পরে বিকেলে কলকাতায় যাওয়া—কোঁচানো শেষ ক'রে সেটা আবার সযত্নে তুলে রেখে টান হয়ে শুয়েই পড়ল বিছানাতে।

এত অল্পে যে সে রাজী হবে তা কনক ভাবেনি। সাধারণ দিনে তো নয়ই, সামান্য জল ঝড়েও তার এই বেরোন আটকানো যায় না। এও একরকমের জয় তার।

সে একটু মুখ টিপে হেসে বলল, 'মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন আবার, যদি বলেন আজ ও বেরোল না যে বড়? তাহ'লে কী উত্তর দেব? কোনদিনই তো থাক না, মানে কোন শনিবার—জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'যা হয় ব'লো। ব'লো যে মাথা ধরেছে একটু। হয়ত পরে যাবে। কিংবা

কিছুই বলে কাজ নেই। ব'লো যে আমি কি জানি!'

এই বলে সেও হাসল একটু। হয়ত অকারণেই।

আসলে তারও এ কদিনে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছে কনককে। ওর সঙ্গেও যে গল্প করে সুখ হয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগেও গল্প করা চলে—এটাই যেন একটা আবিষ্কার।

আর তার এই সামান্য পরিবর্তনের ফাঁকেই কখন যে কনক তাদের গল্প কথাটাকে সুকৌশলে রাণী বৌদি থেকে প্রসঙ্গান্তরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েও তাকে জাগিয়ে রাখছে গত দুদিন, তাও লক্ষ্য করেনি। অত জানতও না সে, কনকের মনেও যে এত কথা উঠতে পারে, তারও যে এত কৌশল জানা এত বুদ্ধি থাকা সম্ভব—এ তাকে কেউ বলে দিলেও বোধহয় সে বিশ্বাস করত না।

এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা এবং বেশ ভাল লাগছে—এই টুকুই শুধু জানত।

তাই অন্য শনিবারে বেরোতে না পারলে যতটা অসহ্য মনে হ'ত আজ আর ততটা হ'ল না। বরং আজ একটু আলস্য করতে ভালই লাগল যেন। কদিনই রাত্রে যথেষ্ট ঘুম হচ্ছে না—শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও বুজে এল সহজেই।

নিশ্চিন্ত হ'ল কনক। তৃপ্তও হ'ল। ঘরে যদি বাঁধতে পারে একবার, মনেও পারবে। আর ঘরের লোক কোনদিনই ঘরে না থাকলে যেন খাঁ-খাঁ করে—সে যদি ঘরে শুয়ে ঘুমোয় তাও ভাল।

সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় বাগান থেকে একরাশ শুকনো আমড়া পাতা ও বাঁশ পাতা নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন শ্যামা। ওকে দেখেই—কনক যা আশঙ্কা করেছিল—উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁগা বৌমা, হেম যে আজ এখনও বেরোল না বড়? সাড়ে চারটের গাড়ি তো যাবার সময় হয়ে এল প্রায়! এতক্ষণ তো কোন শনিবার থাকে না। শরীর টরীর খারাপ হয়নি তো?'

গুছিয়ে কি উত্তর দেবে ভাবছে কনক—এমন সময় বাইরে থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—'সীতা আছিস নাকিরে, সীতা?'

'ওমা, জামাই!'

এতখানি জিভ কেটে দুড়দুড় ক'রে পালিয়ে গেলেন শ্যামা খিড়কীর বাগানের দিকে। কারণ এই পাতা কুড়নোর সময়টা তিনি যে বেশ ধারণ করেন, তাতে কোনমতেই জামাই বা কুটুম্বসাক্ষেতের সামনে বেরোনো যায় না। একটি গামছা বা হেমের অফিস থেকে আনা দুসুতির টুকরো পরেন এবং একটি ছেঁড়া ন্যাকড়া গোছের গায়ে দেন। অনেকে এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে কিন্তু তিনি গায়ে মাখেন না। বলেন, 'হ্যাঁ বুড়ো হ'তে চললুম—বিধবা মানুষ—আমাদের আবার অত বেশভূষো কি গা? কী থাকে না থাকে পাতায়, কুকুর বেড়ালের গু থেকে সত্তিক জাতের এ'টো মাছের কাঁটা পাঁঠার হাড়—চান তো করতেই হবে, মিছিমিছি একটা কাপড় ভেজাই কেন?'

আবার ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে ডাকে হারান, 'কৈরে সীতি, কোথায় গেলি!'

অর্থাৎ দাদাকে ডাকবে না। এত লোক থাকতে বৌদিকে ডাকাও ভাল দেখায় না।

কনক শাশুড়ির সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল। এইবার সে বেরিয়ে এল, 'আসুন আসুন ঠাকুরজামাই। আসুন।'

'হ্যাঁ—এই তাই আপনার ক্ষের তলবেই ছুটে আসা। তা যা বলব, আদরযত্ন আর কি, খাওয়া তো আজ খেলে কাল ময়লা। মুখের মিষ্টি কথাই লোকে মনে রাখে। তা সেটা আপনার আছে খুব। বড় বংশের মেয়ে আপনি, আপনার কথাই আলাদা।'

কথা বলতে বলতেই ভেতরে এসে দাঁড়াল। কনক ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একটা আসন এনে দাওয়ায় পেতে দিল, বসুন ভাই। তা মিষ্টি কথায় কি আর আপনার সঙ্গে তা বলে পারব? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। আপনারা নাটক নভেল পড়া লোক, যা গুছিয়ে বলতে পারেন—'

এ কামড়ের দিক দিয়েও যায় না হারান। উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, 'না না বৌদি ওসব নাটক নভেল টভেল আমি বুঝি না, আমিও থার্ড ক্লাস পড়া লোক, কোন মতে আপনাদের আশীর্বাদে করে খাচ্ছি। আমার স্বভাব একেবারে অন্য রকম, পেটে এক মুখে এক নই—যা মনে আসে বলে দিই, ব্যস খালাস!'

কনক ভাবছে অন্য কথা। মা ওদিক দিয়ে পুকুরে গেছেন—কিন্তু আসবার এই পথ। হয় জামাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরে বসিয়ে এদিকের দোর জানলা বন্ধ ক'রে দিতে হয়—নয় তো একখানা কাচা ভাজ কাপড় ঘাটে দিয়ে আসতে হয়। অথচ জামাইকে ফেলে যাওয়া—এখনই একটা দুটো কথা না বলে—সেটাও ভাল দেখায় না।

তবু যথারীতি জানলাতেই ছিল। প্রথম ডাকটা কানে যেতেও বিশ্বাস
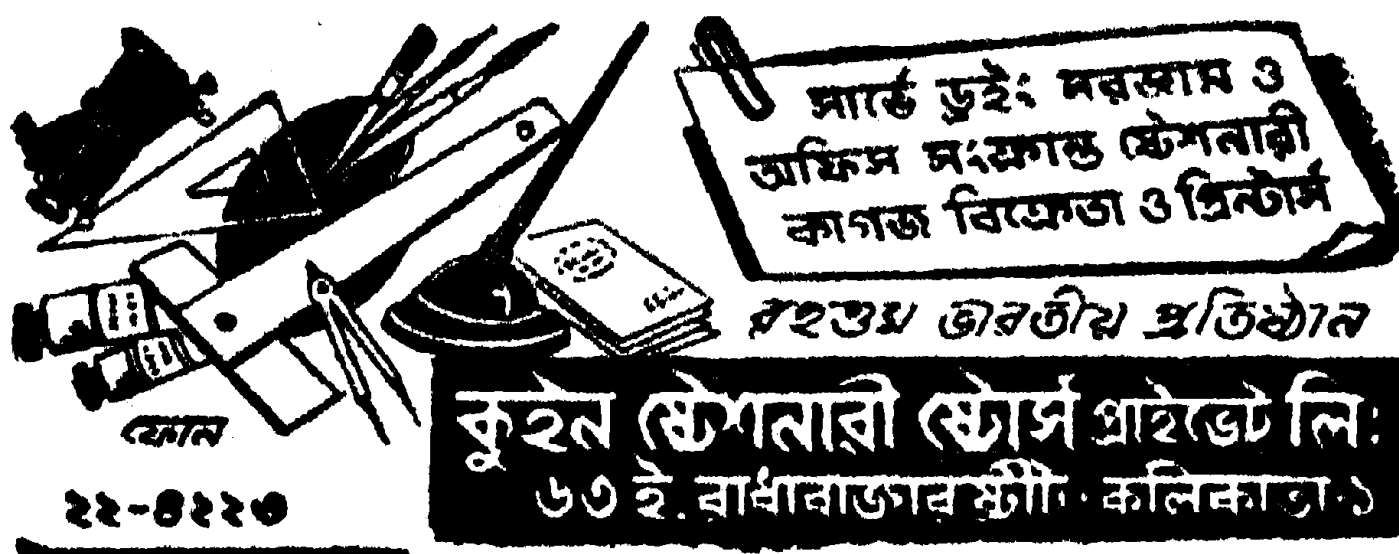
করেনি। ভেতরে ঢুকতে দেখে ছুটে গিয়ে ঘরে দাঁড়িয়েছে—কনক যখন আসন আনতে গিয়েছিল তখন দেখে এসেছে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপছে সে দাঁড়িয়ে। তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। সীতাও ঘুমুচ্ছে, ঐন্দ্রিলা ঘরে নেই।

হারান কিন্তু বলেই চলেছে, 'অনেক ভাবলুম চিঠি পড়ে, বুঝলেন বৌদি, কী কর্তব্য। ভাবলুম হাত যখন একবার ধরেছি শালগ্রামশিলা সাক্ষী ক'রে, ওর নাম কি ওর গর্ভে যখন আমারই বংশধর—তখন আমার উচিত ওকে দেখা!'

কী একটা আওয়াজ হ'ল না? কনক কান খাড়া ক'রে থাকে। কিন্তু হারানের কথার মধ্যে চলে যাবার মতো ফাঁকও যে পাওয়া যাচ্ছে না।

হারান বলছে, 'ও ছেলেমানুষ, বোকার মতো একটা কাজ করেছে—তাই বলে আমিও ছেলেমানুষী করব? তা হ'তে পারে না। বাড়িতে ফিরে এসে বললুম, আমি ওখানে যাচ্ছি—তা তিনি তো একেবারে দশবাই চণ্ডী—বুঝলেন না? মরুক গে, মেয়েমানুষ চেঁচায়ই, তা আমি কি আর সে জন্য কর্তব্যভ্রষ্ট হব! চলে এলুম সটান—সামনে দিয়েই। ...মোদ্দা সকাল করে ফিরতে হবে বৌদি—জরুরী রিয়েশাল আছে ক্লাবে, না গেলেই নয়।

'ও মা, তাই কখনও হয়!' কনক আরও কি বলতে যাচ্ছিল, ভেতর থেকে সীতার নিদ্রালু জড়িতস্বর শোনা গেল, 'ও মামী শিগ্‌গির এসো, ছোট মাসীর আবার ফীট হয়েছে!'

'ঐ, চলুন চলুন—একেবারে ভেতরেই চলুন।' তারপর ঘরে ঢুকে পাখা খোঁজবার ছল করে সীতাকে চুপি চুপি বলে, 'শিগ্‌গির তোর দিদিমার কাপড়টা ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আয় মা!'

অত বেলা অবধি ঘুমোনোর ফলে সীতার তখনও আচ্ছন্ন বিহ্বল ভাবটা রয়েছে, সেটা বিকেল কি সকাল—ভাববার চেষ্টা করছে প্রাণপণে—সে বেশ কলরব করেই প্রশ্ন করল, 'কোনটা মামীমা—পাঁচিধুতিটা? ঐটেই তো পরে সকালে!'

'না রে, কাচা থানটা!' থানটা আনলা থেকে পেড়ে ওর হাতে গুজে দিয়ে একরকম ঘর থেকে ঠেলেই দেয়।

ততক্ষণে হারাণ নিজেই কলসী থেকে খানিকটা জল হাতে করে নিয়ে মুখে ছিটোচ্ছে তরুর, 'ইস্‌ এমন হাল হয়ে গেছে! এ যে চেনাই যায় না। খেত না বোধহয়—নাকি? দেখুন দিকি; একে বলে ছেলেমানুষি! ছি ছি! পেটে একটা আছে, তার কথাও তো ভাবতে হয়। কি দরকার ছিল এত কাণ্ডর বলুন তো। আসবারই বা কি দরকার, এলেও, তখন চলে গেলেই হ'ত! আমি দেখছি আপনার—এক আপনারই এর মধ্যে স্থির বুদ্ধি, ভাল বুদ্ধি! ...ঐ তো—ঠাকমার তো বিষ-

তিনি তো দুবেলা গঞ্জনা দিয়ে তবে কান্না করছেন। এখন চুপ একদম, শুধু পড়ে পড়ে কাঁদছে। সামনে গাল দেবার সাহস আর নেই, দিলেও আড়ালে—বুঝলেন না!'

ততক্ষণে তরুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে মাথায় ভিজে কাপড়টাই টেনে দিলে।

'উঁহু-উঁহু-উঠো না। উঠো না।

উঁহু-উঁহু উঠো না। উঠো না......

দাঁত ভেঙে গেছে, গেল হপ্তা থেকে পক্ষাঘাত হয়ে বাঁ দিকটা পড়ে গেছে একদম, বিছানায় শুয়ে যা কিছু। আমার

আর ভিজে আঁচলটাই বা মাথায় দেবার দরকার কি? অসুখ করবে যে! ঘরে কে আর আছে—বুঝলে না—বৌদি তো

ঘরের লোক। সত্যি অনেক পুণ্যি করে বৌদি পেয়েছিলে—বুঝলে না—'

কনক মুখ টিপে হেসে সেইখানেই একখানা আসন পেতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আসল ঘরের লোকটিকে নিয়ে এখন থাকুন ভাই, নকল ঘরের লোক এখন কাজে যাচ্ছে!'

বাইরে তখন শ্যামা অনেকটা সামলে হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু মুখ তাঁর আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার!

কনক উঠোনে নেমে কাছে যেতেই চাপা অথচ তীক্ষ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'সে-ই চিঠি পাঠানো হয়েছিল বুঝি—আমার কথাটা অগেরাজ্যি করে?'

সে কণ্ঠস্বরে কনকের বুক শুকিয়ে উঠল। আসল কথাটা বলতে সাহস হ'ল না—একেবারে মিথ্যাও বলতে পারলে না, ঢোক গিলে লেখার কথাটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

'হুঁ। তা তো দেবেনই। বড় বৌদি বলেছেন, সে যে বেদবাক্য—গুরু মন্তর একেবারে। আমি বেটি কে, ঘুঁটে কুড়ুনী কানিপরা দাসী বৈ তো আর নই!'

তাঁর এই অযৌক্তিক বিষোদ্গার দেখে অবাক হয়ে যায় কনক। এবাড়িতে এসে পর্যন্ত মানবচরিত্রে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু আজকের এটা একেবারে নতুন। মা সন্তানের সুখে সুখী নন, তার জীবন, তার ভবিষ্যতের চেয়ে তাঁর কাছে তাঁর অত্যন্ত তুচ্ছ একটা কর্তৃত্বের প্রশ্নই বড়—এরকম এখনও ভাবতে অভ্যস্ত নয় কনক, তাই তার অবাক লাগল। কিম্বা ঠিক কর্তৃত্বের প্রশ্নও নয়—বুদ্ধির অহংকারে আঘাত লাগলে বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কে জানে।

সে কোনমতে ও'কে এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

হেম উঠে তখনও বিছানাতেই বসে আছে চুপ করে। তার মুখ প্রসন্ন। তরুর ভবিষ্যতের চেয়েও তার বর্তমানের চিন্তাটাই পাষাণ ভার হয়ে চেপে বসেছিল মনে, সেই ভারটাই নেমে গেছে।

ওকে ঢুকতে দেখে বলে, 'তাহ'লে ছটাকখানেক কাটা মাছ নিয়ে আসি, আর দুটো মিষ্টি—কি বল?'

'তাই আন। কিন্তু দোহাই তোমার—চিঠিটা যে আমি লিখেছিলাম মাকে যেন বলো না!'

'জানি।' বলে মুখটিপে হেসে হেম বেরিয়ে যায়।

হারানের যে জরুরী রিহার্সাল আছে ক্লাবে, তখনই যাওয়া দরকার— সে কথাটা আর তার মনে রইল না। বলা বাহুল্য এরাও কেউ মনে করিয়া দেবার চেষ্টা করল না।

শাশুড়ী সামনে এসে দাঁড়াতে খুবে সহজভাবেই তাঁকে প্রণাম করে কুশল প্রশ্ন করল। তরুর ছেলেমানুষী প্রসঙ্গে তাকে মৃদু তিরস্কার এবং সাধারণভাবে অনুযোগ করল। অর্থাৎ লজ্জা পাবার মতো কোথাও কিছু ঘটেছে তা তার আচরণে আদৌ প্রকাশ পেল না।

শ্যামা অবশ্য বেশীক্ষণ বসলেন না, রান্না করার অছিলায় বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে কিন্তু তাতে হারানের উৎসাহ কমল না। ততক্ষণে ঐন্দ্রিলা এসে পড়েছে পাড়া বেড়িয়ে। সে তাকে নিয়েই পড়ল। তা ছাড়া সীতা কনক—এবং নীরব নত-মুখী তরু তো আছেই—গল্প করার লোকের তার অভাব ঘটল না।

হেম একবার মাত্র এসে দাঁড়িয়েছিল। হারান শশব্যস্তে উঠে গিয়ে প্রণাম করল। তারপর ঘাড় হেঁট করে মাথাটাথা চুলকে বলল, 'দাদা, অভাগা ছোট ভাইকে মাপ করেছেন তো? রাগের মাথায়—আর তখনও খাওয়া হয়নি বুঝলেন কিনা—এতটা পথ ঠেকো রোদ্দুরে এসে আর লঘু গুরু জ্ঞান ছিল না!'

এত সহজে এসব কথা যোগায় না হেমের মুখে। সে একটু মৃদু হেসে আশ্বস্ত করে—'সব ভালো তো?' কুশল প্রশ্ন মাত্র করে সরে পড়ল। তখন আর কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়, সে হাত-ছিপটা পেড়ে নিয়ে কেঁচোর সন্ধানে চলল। যদি দু একটা মাছ ওঠে।

যথা নিয়মে চা জলখাবার—এবং যথা সময়ে ভাতও খাওয়া হ'য়ে গেল। কনক আগেই বাইরের ঘরে ওদের বিছানা করে দিয়েছিল, মুচকি হেসে বললে, 'যান সটান একেবারে ওঘরে চলে যান। আপনাদের ঐ সব ছাই ভস্ম কি ধোঁয়া-টোঁয়া খাওয়া আছে সারুন গে, ঠাকুরঝি খেয়ে দেয়ে যাচ্ছে।'

সব দাঁত বার করে হে হে করে হাসে হারান।

'এই তো সব মাটি করলেন বৌদি। মা দাদা সব রয়েছেন—ধোঁয়া খাবার কথাটা চেঁচিয়ে বলে দিলেন।'

'না, 'তাঁরা তো আর টের পাবেন না। একটু পরেই যে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোবে—তখন!'

'আরে সে অন্য কথা!'

হাসতে হাসতেই গিয়ে ঘ'রে ঢোকে।

তার পরের দিনও থাকল সে। একেবারে সোমবার এখান থেকেই খেয়ে দেয়ে অফিস রওনা হল।

যাবার সময় কনকই প্রশ্ন করল, 'তার পর? আবার মশাইয়ের দেখা পাচ্ছি কবে? ......শনিবার অন্ততঃ আসছেন তো?'

'এ শনিবার নয় বৌদি।' হারান বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে, 'আপনিই বুঝে দেখুন, তারও তো একটা ক্লেম হয়ে গেল কিনা—নতুন করে। ফি শনিবার এলে কুরুক্ষেত্তর করবে—হয়ত আপিং খাবে কি জলে ঝাঁপ দেবে।... সে আবার বাপের আদুরে মেয়ে—বুঝলেন না। আর আমার কাছে—সর্বদা ন্যায্য বিচার। এক শনিবার তার এক শনিবার এর। বলেকয়েই আসব, লুকোছাপা কিছু নেই তো! হাত যখন ধরেছি—বুঝলেন না?'

'তা—তাঁর তো এই হপ্তার দিনগুলো রইলই!' মৃদুস্বরে তবু কনক বলতে যায়।

'উঁহু, তার নয়—তার নয়। এ দিন-গুলো ধরুন ঠাকুমা-মাগীর। সে তো পুষছে। তার কান্না করছে তো—ও। গুমুতে থেকে নাওয়ানো খাওয়ানো সবই তো করতে হচ্ছে—তবে? তার দরুণ একটা বাড়তি ক্লেম তার আছে—বুঝলেন না?'

হে হে করে হাসতে হাসতে চলে গেল হারান।

কনক ফিরে দেখল তরু নিজে থেকেই ও ঘরের বিছানা তুলছে। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শুধু শ্যামা কটু কণ্ঠে মৃদু মন্তব্য করলেন, 'খুব হল আর কি! মেয়ে তো বসে রইলই বুকের ওপর বারোমাস—তার ওপর এখন ঘর-জামাই পোষা। এক-গাদা খরচ.শুধু শুধু!'

—ক্রমশঃ

ব্রিটেনের সাপ্তাহিক পত্রিকা

সংবাদপত্রের পাঠক হিসাবে ইংরাজদের সুনাম বহুকালের। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ইংরাজরা যত বেশি সংবাদপত্র পাঠ করে তত বেশি আর কোন জাতিই পাঠ করে না। তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে সংবাদপত্রের মালিকানা রক্ষা করা একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশটি আয়তনে ছোট বলেই একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের পক্ষে সুবিধা হয় অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী একটি প্রতিযোগীকে ব্যবসায়ে পরাজিত করা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় স্বতন্ত্র প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলির পক্ষে টিকে থাকা এখন ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে।

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি কখনও জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সংগে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়নি। তারা জানে প্রচার বা লাভের অংকের দিক থেকে তাদের সব সময় পিছিয়ে থাকতে হবে। প্রচারসংখ্যা কয়েক হাজার হলেই তারা সন্তুষ্ট; তাদের কর্মচারীরা এবং লেখকরাও জানে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংগে যুক্ত হয়ে তারা ধনী হতে পারবে না। তারা এইসব পত্রিকায় কাজ করে আংশিকভাবে মর্যাদার জন্য এবং আংশিকভাবে আত্মতৃপ্তির জন্য।

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকে চিরকাল আর্থিক অসুবিধা ভোগ করে আসতে হয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, তাদের অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হবে বলে অনেকে আশংকা করেছিলেন। এই সময় কমার্শিয়াল টেলিভিশন তাদের বিজ্ঞাপনের অর্থে ভাগ বসাতে আরম্ভ করে। সে যাই হোক বিপদ এখন কেটে গেছে। সম্প্রতি একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাবার যে চেষ্টা হয় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই চেষ্টা করেন সার এডওয়ার্ড হলটন্। অপরপক্ষে 'টাইম এন্ড টাইড' নামক যে পত্রিকাটির অবস্থা সংগীন হয়ে উঠেছিল, সেটি এখন একজন ধনী অ্যাংলিকান ধর্মযাজক মিঃ বিমস্টের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে। এখন আর কোন পত্রিকা সম্পর্কে আশংকার কথা শোনা যাচ্ছে না।

দি স্পেকটেটর

ব্রিটেনে এখন তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকার কিছুটা সুনাম রয়েছে—দি স্পেকটেটর, দি নিউ স্টেটসম্যান এবং দি ইকনমিস্ট। স্পেকটেটর পত্রিকাটি ইতিমধ্যে শতায়ু লাভ করেছে। ১৯১৪ সালের পূর্বে এটি ছিল অনেকটা রক্ষণশীল। গত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে, যুদ্ধের মধ্যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পত্রিকাটি উইলসন হ্যারিসের সম্পাদনায় পরিচালিত হতে থাকে; উইলসন হ্যারিস কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

সাহিত্য সমাচার

স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে কমন্সসভায় প্রবেশ করেন। যদি তাঁকে কোন দল বেছে নিতে বলা হত তা হলে তিনি উদারনৈতিক দলই বেছে নিতেন। উইলসন হ্যারিস পত্রিকাটি ত্যাগ করে চলে গেলে পত্রিকাটি মিঃ ইয়ান গিলমোরের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। মিঃ গিলমোর এবং বর্তমান সম্পাদক মিঃ ব্রেইন ইংলিশ-এর পরিচালনাধীনে এখন পত্রিকাটি সবরকম রাজনৈতিক দলের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে।

দি নিউ স্টেটসম্যান

দি নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকাটির সংগে এসে যোগ দেয় পুরাতন 'নেশন' এবং 'অ্যাথেনিয়াম' পত্রিকাটি। 'দি নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকাটি সমাজতান্ত্রিক এবং এটি বহুকাল ধরে মিঃ কিংসলি মার্টিনের সুযোগ্য সম্পাদনায় পরিচালিত হয়ে আসে। মিঃ কিংসলি মার্টিন এখন অবসর গ্রহণ করেছেন এবং এর সম্পাদনার দায়িত্ব চলে এসেছে মিঃ জন ফ্রীম্যানের ওপর, যিনি একসময় জুনিয়র সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী ছিলেন এবং অ্যানুরিন বিভানের সংগে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। পরে টেলিভিশন বক্তা হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। অনেকে মনে করেন সম্পাদক পরিবর্তিত হওয়ায় পত্রিকাটির নীতির আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু সেরকম কিছু এখনও লক্ষ্য করা যায়নি।

দি ইকনমিস্ট

'দি ইকনমিস্ট' পত্রিকাটি 'স্পেকটেটর' অথবা 'দি নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার তুলনায় অনেক বেশি স্থূলকায় এবং অনেক বেশি দামী। স্পেকটেটরের মত এরও একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি ওয়াল্টার ব্যাজট-এর সম্পাদনায় পত্রিকাটি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়। এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে স্বতন্ত্র মতবাদই প্রকাশ পায় এবং সেগুলি সবরকম গভর্ণমেন্টেরই সমালোচনা করে থাকে। সমগোত্রীয় পত্রিকার তুলনায় পত্রিকাটি বিত্তশালী হওয়ায় তার পক্ষে সম্ভব হয় দেশবিদেশের সকল রকম তথ্য সংগ্রহ করা।

একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

হাস্যকৌতুক সংক্রান্ত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে পাঞ্চ-ই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। বর্তমান যুগে হাস্যকৌতুক সংক্রান্ত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালানো খুব সহজ কাজ নয়। ভিক্টোরীয় সমাজে এই ধরণের পত্রিকার যতটা আদর লক্ষ্য করা যায় এখন আর তা সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান সমাজ হল বিশেষজ্ঞের সমাজ, যেখানে আগ্রহ বহুধা বিভক্ত এবং একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। এই ধরণের অসুবিধা সত্ত্বেও 'পাঞ্চ' তার সুনাম বজায় রেখে চলেছে। অনেকেই এখন পত্রিকাটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটিকে তারা রক্ষা করতে চায়।

চিত্রবহুল পত্রিকা

সাধারণত চিত্রবহুল পত্রিকাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ থাকে না; গল্পগুজবই এর প্রধান উপজীব্য হয়। তা যাই হোক 'কান্ট্রি লাইফ' পত্রিকাটিকে ঠিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পত্রিকাটি চিত্রবহুল হলেও বহু গম্ভীর প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। 'দি ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪২ সালে, পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত। আলোকচিত্র যখন ছাপানো হত না তখন পত্রিকাটিতে শিল্পীদের আঁকা নানা ধরণের নকসা ছাপানো হত; বহু শিল্পী এই সময় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রবিবাসরীয় পত্রিকা

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে আছে রবিবাসরীয় পত্রিকা। এগুলিও সাপ্তাহিক কিন্তু নাম অন্য; প্রধানত সংবাদপত্ররূপেই এগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু 'দি সান্ডে টাইমস' ও 'দি অবজার্ভার' এই দুটি পত্রিকা একটু ভিন্ন ধরণের। এগুলিকে নিছক সংবাদপত্র বলা যায় না। এর বিভাগ দুটি—প্রথম বিভাগে আছে সাপ্তাহিক সংবাদ এবং দ্বিতীয় বিভাগে আছে নানা ধরণের সাহিত্য প্রবন্ধ, গল্প, জীবনী, পুস্তক সমালোচনা এবং খেলাধুলো, নাটক ও সঙ্গীত সমালোচনা। রবিবাসরীয় মার্কিণ পত্রিকাগুলির সঙ্গে এই পত্রিকাদুটির মিল আছে। তা ছাড়া এর ম্যাগাজিন বিভাগটি আকর্ষণীয় হওয়ায় পাঠকদের মধ্যে অনেকেই একসঙ্গে সংবাদ ও গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠের লোভে এই পত্রিকাদুটি ক্রয় করে থাকেন। যে কারণেই হোক একটি রবিবাসরীয় পত্রিকার প্রচার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তুলনায় অনেক বেশি।

যুদ্ধের সময় কাগজ যখন দুর্লভ, তখন দৈনিক পত্রিকাগুলি স্বভাবতই আকারে শীর্ণ হয় এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির প্রচার বাড়ে; এই বৃদ্ধি তাদের আজও বজায় আছে। 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার প্রচারসংখ্যা আজ যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি এবং 'দি লিসনার' পত্রিকার প্রচারসংখ্যা আজ তিনগুণ বেশী।

প্রদর্শনী

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনকথার প্রদর্শনী

কলারসিক

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনকথা অবলম্বনে লোয়ার সার্কুলার রোডে কথ-তথ্য প্রচার কেন্দ্রে এক বিশেষ প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাঙলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং উদ্বোধনদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবাঙলার মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। প্রদর্শনীর আয়োজন সম্ভব হয়েছিল ভারতের প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন-এর আন্তরিক উদ্যোগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে। প্রদর্শিত দ্বিশতাধিক চিত্রের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় সংবাদ-পত্র-আলোকচিত্র-শিল্পীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। তাছাড়া রাজ্যসরকারের ফটোগ্রাফারগণ কর্তৃক গৃহীত, বিদেশী ও অন্যান্য সরকার কর্তৃক গৃহীত এবং বিধানচন্দ্র রায়ের আত্মীয়গণ কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্রসমূহও প্রদর্শনীতে স্থান পায়। গত ৮ই অগাষ্ট থেকে ১৮ই অগাষ্ট পর্যন্ত দশদিন প্রদর্শনী সর্ব-সাধারণের জন্য মুক্ত ছিল।

দীর্ঘজীবন পরিক্রমায় বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র। অনেকেরই নিকট-সংস্পর্শের এক একটি মুহূর্ত যন্ত্রের হাতে ধরা পড়লেও সেই সমস্ত মুহূর্তের বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ভারত ইতিহাসের একটি অধ্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। খণ্ড বিচ্ছিন্ন চিত্রাবলী একটি পূর্ণ মানুষের সম্পূর্ণ রূপকে ব্যক্ত করে। গত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় জীবনের জটিলতার মুহূর্ত এ প্রদর্শনীতে সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। দেশনায়কগণের সঙ্গে গৃহীত বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে দেশকর্মী বিধানচন্দ্র রায়ের স্বদেশপ্রেমের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। দেশনায়কগণের সংস্পর্শে এসে বিধানচন্দ্র যে কর্মময় জীবন লাভ করেছিলেন তার এক বিচিত্র সচিত্র রূপ ইনফর্মেশন সেন্টারের দেওয়ালে ফুটে উঠেছিল টুকরো টুকরো ছবির মধ্যদিয়ে। মতিলাল নেহরু, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতির সংস্পর্শে ডাঃ রায়কে বার বার আসতে হয়েছিল। নানাবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে একত্রিত হতে হয়েছিল। আর সে সমস্ত ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে ভারতেতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ ভূমিকার অনেক পথই নির্দেশিত হয়। তাছাড়া সে সমস্ত দেশনায়কগণের নিকট-সান্নিধ্যই বিধানচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মপথ নির্ধারণ করে। হিজলী বন্দী-শিবিরে ব্রিটিশ শাসকের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে টাউন হলের সামনে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র, ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে মতিলাল নেহরুর সঙ্গে বিধানচন্দ্র প্রভৃতি দুর্লভ মুহূর্তের চিত্রগুলি সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। দাঁড়ান, বসা, চলন্ত, চিকিৎসাকালীন বিভিন্ন রকমের চিত্রগুলি দর্শনীয়ও বটে। একালে বিধানচন্দ্রের বিরাট কর্মচক্রের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। নানা উন্নয়নমূলক কর্মস্থানে, বিদেশী ব্যক্তিদের সঙ্গে, নানান সভা-সমিতিতে, বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, ছেলেদের মেলায়, নানানভাবে নানান ভঙ্গী ও মেজাজে ডাঃ বিধানচন্দ্রের অপূর্ব জীবনভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। তাঁর শেষ সময়ের বহু চিত্র দেখা যায়। বিশেষ করে মৃত্যুর পর শোকোচ্ছ্বাসের মর্মস্পর্শী দৃশ্যগুলি চিত্রের মাধ্যমে চিরকালের জন্য আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে ডাঃ রাধা-কৃষ্ণণের মাল্যদান এবং বিশিষ্ট দেশবাসীর পক্ষ থেকে মাল্যদানের চিত্রও এখানে দেখা যায়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনকথা অবলম্বনে আয়োজিত এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী মহান দেশনায়কের প্রতি দেশ-বাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন। প্রদর্শনীর চিত্রসজ্জা ছিল ত্রুটিহীন এবং সার্থক।

প্রদর্শনীর একাংশের চিত্র

পিঙ্গুইরে, ভাল্লুক, সিংহ, ময়ূর.....

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা ঠিক সন্ধের আগেই। আকাশের ঘোলা আচ্ছন্ন ভাব এক দীর্ঘস্থায়ী শোকের মত ঘন হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কুয়াশায় শ্বাসরোধকারী বদ্ধ অন্ধকার দুমড়ে হাহাকার তুলে ঝোড়ো বাতাস বইছিল অবিশ্রান্ত। গলির মুখে রায়েদের বাড়ীর পোষা ময়ূরের উৎকট চীৎকার শোনা যাচ্ছিল থেকে থেকেই। এই বৃষ্টি, ঝিমমারা অন্ধকার, হাওয়ার বুক ছেঁড়া ময়ূরের ডাকটাই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল রমেনের। যেন গোটা দুশোটুকু ডাক তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তার দুচোখের উপর। অস্পষ্ট ভারী অন্ধকারে তারের জাল কাটা ছায়াময় পিঠ সোজা রেখে, ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁড়-কাতর দু'পায়ে শক্ত করে, তারের গর্তে ধারালো বাঁকা ঠোঁট ঘষে ভয়াবহ ক্ষোভে হুঙ্কার দিয়ে উঠছিল মুহূর্মুহু। তীক্ষ্ন দু'চোখ ঘুরপাক খাচ্ছিল সামনে পিছনে। ফাঁপা অন্ধকার, ধোঁয়া আর নিরেট কুয়াশায় ভোঁতা ছুরির আঁচড়ের মত কর্কশ শোনাচ্ছিল সেই আর্তনাদ।

তিনজনের মধ্যে, একা রমেনই কিছু সজাগ ছিল। অন্য দুজন এলিয়ে পড়েছিল ঠাণ্ডায়। নিজেকে অদ্ভুত এক ছুমছাড়ার মত মনে হচ্ছিল রমেনের। শুকনো ফাটা খড়িতোলা মুখের উপর হাত বোলাবার সময়, বহুকাল আগে গাছ থেকে ছিঁড়ে পড়া বাতিল ফলের মত অসার হয়ে গেছে সে, তেমনি এক ধরণের অস্বস্তিতে শিরশির করে উঠল মুখের চামড়া। যেন ফাঁকা মাঠ, জংলা জলার মেটে গা-ঘোলান গন্ধ, ফুল ফল পাতা, নদীর বাতাস এই সবের চারপাশে বেড়া দিয়ে কেউ তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এতগুলো মাস বছর ধরে। ভাবতেই বুকের মধ্যে পুরনো ব্যথায় টান পড়ল আচমকা।

অন্য যে দুজন তার সঙ্গে কাজ করে সারা রাত, তাদের মধ্যে বিভূতি দু'পা সামনের দিকে মেলে দিয়ে দেওয়ালের গায়ে কাত হয়ে পড়েছিল। ঢেউ কাটা শেডে সামনের আলো আড়াল করে রেখেছিল, তেরছা ছায়ায় ডুবে ছিল বুকের অর্ধাংশ পর্যন্ত। কোমরের পর থেকে ছড়ান লম্বা দু'পা, কনুয়ের নিচ থেকে দু'হাত স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। লম্বা শীর্ণ সব আঙ্গুলগুলি নখ সমেত অবসন্ন থাবার মত ছড়িয়ে দিল।

কানাই, এক কোণে পড়ে থাকা তেলচিটে পায়া ভাঙা কাঠের বেঞ্চিটাকে আড় দিয়ে উপরে শুয়েছিল, না ঘুমোচ্ছিল বোঝা দুষ্কর। ছেঁড়া রোঁয়া ওঠা কম্বল বুক থেকে সরে ঝুলে পড়েছিল একপাশে। বড় ভয়ানক দেখাচ্ছিল তাকে। কবরে বন্দী হওয়ার পূর্বেই কাফনখোলা মানুষকে যেমন বীভৎস পুরনো জংধরা মনে হয়। অবিকল তেমনি শুষ্ক দেখাচ্ছিল কানাইকে। বুকের উপর এক থাবলা তেল কালির জমাট দাগ ফুটে উঠেছিল। বাসী বিশ্রী চাপা দুর্গন্ধ ছাড়ছিল জামা কাপড় কম্বল থেকে। ভাঙা মরা ডালের মত ডান হাত শিথিলভাবে

ঝুলছিল একপাশে। নড়ে উঠল একবার। রমেনের মনে হল হাওয়ায় দুলে উঠল সেই হাত। না হলে আরো বহু কাল প্রাণহীন কোঁচকান মাংস পিণ্ডের মত ঝুলে থাকত সেই হাতটা।

ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিতে হল রমেনকে। তার দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে উঠোনের মাঝখানে ডালপালা প্রসারিত করে উঠে যাওয়া বৃক্ষের গায়ে আটকে গেল। পিছনে উঁচুতে ছাই রঙের ম্লান আকাশ, অর্ধস্ফুট তারা, দমচাপা ধোঁয়ার গায়ে আধো অন্ধকারে একরাশ ফিকে হলুদ ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল ডালপালা। এই সময় পাতা নেহাতই না থাকার মত। আঙ্গুলে গোনা যায় প্রায় সেই রকম অবস্থা। কিন্তু অজস্র ফুল ধরে সমস্ত শরীর মুড়ে রেখে। রঙ যেন ফেটে পড়ে চারপাশ থেকে, হলুদ আগুনের রূপ নিয়ে দপদপ করে দুলে ওঠে অন্ধকারে। কয়েকটা খসে পড়ে হাওয়ার ঝাপটায় হাল্কা আলোর ফোঁটার মত ঠিকরে উড়ে বেড়াচ্ছিল এদিক-সেদিক। বিস্ফারিত শাখাগুলো এক একদিন দূর থেকে ভারী অদ্ভুত দেখায়। টুঁটি টেপা কুয়াশা ভেঙে ফেলে আসা গ্রাম, পোড়া মন্দির, শস্য কেটে নেওয়া ফাঁকা মাঠের গা ঢিলে করা আধমরা গন্ধে সারা বুক যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে তখন। খাঁ খাঁ করে গোটা অন্তর। অই পর্যন্ত। তারপর আর মনে পড়ে না কিছু। বোবা নিরাকার ছায়ায় চোরা ঢেউ জেগেই আবার মুছে যায় সব। বিকৃত ভঙ্গী করে মুখ বেঁকায় রমেন। পেট্রলের দাগে নীল হয়ে আসা বদ্ধ থকথকে কাদাগোলা জলের উপর হাওয়ায় কেঁপে ওঠা নোংরা বাসি ফুল কটার দিকে চেয়ে দু'চোখ কুঁচকে ছোট হয়ে আসে আপনা আপনি। বুঝি যথেষ্ট বাতাস টেনে নিতে না পারায় বুকের গুমোট ভাব ঠেলে উঠে আসে গলায়।

অথচ ফুল কেনার বাতিক তিনজনের মধ্যে একা বিভূতিরই আছে। মাসের প্রথম দিকে সপ্তাহে দুবার কি তিনবার হাতে ফুলের গোড় জড়িয়ে কাজ করতে আসে বিভূতি। এক একদিন বেল ফুল। কোন সময় আবার রজনীগন্ধার জল দেওয়া সস্তা গোটা তিন চারেক ডাঁটি থাকে ওর হাতে। অস্ফুট ঝাঁঝালো টানধরা খেয়ালী গন্ধে সারাক্ষণ ভুরভুর করে বিভূতি। আর ছটফট করে রমেন। আস্ত বাগানের বাইরে, জানালায় বেঁধে রাখা বুড়ো পশুর মত অসহায় লাগে নিজেকে। কানাই শাদা ভয়ঙ্কর দাঁত বার করে হাসে, মুখ খারাপ করে।

—নেশা বটে বাবা। হতভাগা কাজ করতে আসে যেন...

কানাই-এর মুখের কথা লুফে নিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে রমেন।

—যা বলেছিস মাইরী। হতভাগা পেট্রল স্টেশনে আসে মনে হয় বাসরে ঢুকছে। কাজ বলতে তো বা পেট্রল কোম্পানীর দুকুড়ি পাঁচ টাকার ক্লিনারের চাকরী। আবার অত রোয়াব কিসের এ্যাঁ।

আবার যেদিন মেজাজ ভাল থাকে, রমেন ঝুঁকে পড়ে বিভূতির কানের পাশে। অবিশ্বাস্য গায়-গলায় ফিসফিস করে বলে—তোর খুকী বউটা খু-উ-ব ফুল ভালোবাসে। নয়রে বিভূতি।

উচ্চস্বরে হেসে ফ্যালে কানাই।

—যা শালা। আজকে ফুলের দামটা আমিই দিয়ে দেব তোকে। যেন একমাত্র নিজের জন্যে ফুল কেনা বারণ কানাই-এর।

তখন অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিভূতি। হাসে কিনা জানা যায় না। চোখের এক কোণের শাদা অংশটুকু তীব্রতায় ঝকঝক করে।

কুয়াশা আর অস্বাস্থ্যকর নীল আলোর গায়ে উড়ে পড়া ফুটগুলো ফোঁটা ফোঁটা আলোর মত খসে পড়ছিল টুপটাপ করে। হাওয়ার ঠান্ডা ঝাপটায় ওড়াউড়ি করছিল উঠোনময়। কেউ বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সেগুলোকে। অজস্র ফুলে ঢাকা পড়েছিল গাছের নিচের মাটি। পালক মোড়া কোন পাখীর বুকের মত নরম মনে হচ্ছিল। তীর্যক আলোর এক ফালি রেখা তীরের মত ছুটে নেমেছিল তার উপর।

উত্তেজনায় রমেনের সবকটি শিরাই কঠোর হয়ে উঠেছিল। নির্জন ঝোড়ো কুয়াশায় ঠান্ডা বাতাস চাবুক কষাচ্ছিল মুখের চামড়ায়। তীব্র ছুঁচের মত গরম রক্ত যেন ফেটে পড়ছিল সারা মুখের উপর। জান্তব ইচ্ছায় গুঁড়ি মারা এক ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মুখবিবরের মত হাঁ করা পাল্লা-হাট জানালার পেটে একরাশ কালো অন্ধকার কঠিন হয়ে জমেছিল। বিষাদ ভর্তি কোন উপকথার স্তব্ধতায় থমথম করছিল চারদিক। সেদিকে তাকিয়ে আক্রোশে রমেনের সব আঙ্গুল শক্ত হয়ে বেঁকে যাচ্ছিল। ক্রমশই দাঁতে দাঁত ঘষার বিশ্রী শব্দ কর-

ছিল শীতে। ডান পাশে উঁচু স্ট্যান্ডের মাথায় একটা হুডখোলা গাড়ির বাতিগুলো বিকট ছায়া ছড়িয়েছিল মাটিতে। ঠিক উপরেই অস্পষ্ট আকাশে কয়েকটা তারা টিমটিম করছিল. ছেঁড়া চাঁদ উঁচু-উঁচু বাড়ির কার্নিশ ছুঁয়ে ভয়াবহ রকমে ঝুলে পড়ছিল ক্রমাগত। গা ছুঁয়ে গোটা দুই শীর্ণ শাদা মেঘ নড়ে উঠছিল হাওয়ায়। হঠাৎ খোয়া ওঠা পীচের রাস্তায় ঝাঁকি খেয়ে চলে যাওয়া কোন রিক্সার আর্তনাদে জেগে উঠে হাই তুলল বিভূতি; নিদারুণ ভঙ্গী করে দু হাত অন্ধকারের দিকে বাড়িয়ে ধরল, পায়ের নিচে পড়ে থাকা খালি মাটির ভাঁড়কে ঠেলে দিতেই একটা বড় নীল মাছি উড়ে সামনের আলোকিত দেওয়ালের গায়ে বসল আবার। মাথার উপরে টিনের চাল সজোরে শব্দ করে উঠল ঠান্ডায়।

দু'গালে হাত ঘষে দাঁতে দাঁত টিপে খিটখিটে করে উঠল.

—এমন ব্যাপার কোনদিন দেখি নি ভাই বিভূতি?

আবার হাই তুলল বিভূতি। দু'হাত জড় করে নিল কোলের কাছে।

—কেন?

—কেন আবার কিরে? দেখ না ঠায় দু ঘণ্টা বসে হাঁটু ধরে গেল। এদিকে না এল একটা গাড়ি না মানুষ।

—ঠান্ডাটা তেমনি পড়েছে আজ ভাষার। হাড়গুলো পর্যন্ত বরফ করে দিচ্ছে, বাপরে!

শনশনে হিমেল হাওয়ায় মাঝখানেই কেঁপে উঠল বিভূতির স্বর। কপালের মাঝখানে প্রায় ঢাকা শিরাটা নির্মম ছায়া কেটে উঠে এসেছিল সামনে। বাতাসে কেঁপে ওঠা শাখামুখ থেকে আরো বাড়তি কটা ফুল ঝরে পড়ল পর পর। ভেজা ঠান্ডা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা আর ধোঁয়ার পিছনে ছায়াময় ছড়ান ডালগুলো অজস্র জড়ান ফাটলের মত বাঁকা দেখাচ্ছিল। আবদ্ধ হিমশীতল খাঁচায় আটক কোন জন্তুর মত অসাড় মনে হচ্ছিল রমেনের শরীর। ফিকে আকাশের গা থেকে সেই ভয়ঙ্কর চাঁদ তখন আরো ঝুঁকে পড়েছিল তাদের মুখোমুখি।

একেবারে মাঝখানে এনামেল রঙ করা পোস্টের চূড়ায় মার্কারী আলোকে লালাভ চারদিক অপার্থিব হয়ে উঠেছিল। ভেঙে পড়া কুয়াশা আর ধোঁয়ায় অপ্রাকৃতিক আলোয় জ্বলে যাওয়া চারধার আধা অন্ধকারে অবিকল কোন রহস্য বিস্ময়ের দেশ বলে মনে হচ্ছিল। রাস্তা, ঢাকা দেওয়াল, জলার মাঠ, আতঙ্কিত আধবোজা কপাট জানালা, জনহীন ক্লান্ত রাস্তা সবার থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা হয়ে এই অংশটুকুই সেই অলৌকিক নীল আলোয় ভাসছিল যেন। তার উপর সামনের মাসকটা ধরে ফুলে ফুলে বিস্ফারিত ওই গাছটা বসন্ত হেমন্তের বাতাস ছুঁয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে অবিরত। শাখার আড়াল থেকে বৃত্তাকার শাদা টিনের গায়ে আঁকা উড়ন্ত ঘোড়াটার রক্তাক্ত স্থির দৃষ্টানা সারা বছর প্রতিক্ষণ রমেনের দৃষ্টির উপর বসে থাকবে। ভাবতেই কষ্ট হল তার। হয়তো পেশী জমাট হয়ে উঠেছিল তখন। মাঠের বদ্ধ জলার পাঁক থেকে ভেসে আসা ভ্যাপসা গন্ধে দম আটকে আসছিল রমেনের। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হিমে ভিজে থাকা শেডের নিচে স্নায়ুগুলো সব অবশ করে দিচ্ছিল।

কানাই উঠে বসেছিল কোন সময়। হাত পা ছড়িয়ে, তারপর অলস ভিজে

পায়ে ভুতুড়ে একাকার ছায়ার মত টলতে টলতে হে'টে দুজনের সামনে এসে বসল। বিড়ি বার করে, একটা নিজের দাঁতে চেপে ধরে অন্য দুটো বাড়িয়ে দিল দুজনের দিকে। বিভূতি মুখের উপর ফস করে কাঠি ধরাতেই, এক ঝলক লাল আগুন টলে পড়ল সারা মুখে। রমেন অপলক চোখ মেলে চেয়ে দেখল, বিভূতির কপালে পুরু ভাঁজ, তামাটে তারা দুটো, শুষ্ক ছুড়ান গালে অজস্র দাগ, চোয়ালের বেঁকে ওঠা বিশ্রী দুহাড় হিংস্র ভঙ্গীতে জ্বলছিল আগুনে।

কানাই একবুক ধোঁয়া উড়িয়ে কঁকিয়ে উঠল ভাঙ্গা স্বরে,—আগুন-টাগুন জ্বাল মাইরী। নইলে টেঁকা যাবে না আর।

—হুঁ, শীতও পড়েছে তেমনি আবার।

বিভূতির দাঁতে-দাঁত ঘষার অস্ফুট আওয়াজ লক্ষ্য করে রমেন বলল।

—এই যে বছরের সব দিনগুলো শালা রাতভর জেগে বসে থাকা এই বা কার ভাল লাগে বলত কানাই?

—নসীব রে, সবই নসীব। জন্তু জানোয়ারের দিন-রাত থাকে, আর আমাদের ফুঃ; চোয়াল শক্ত করে খেঁকিয়ে উঠল কানাই। সজোরে হাত ঝাঁকিয়ে বিড়ির ছাই ঝাড়ল একবার। চাপা ক্রোধে ওর দু চোখের কোণা কুঁচকে কেঁপে উঠল থরথর করে।

এমন সময় বিভূতি একরাশ তেল-কালিভরা ন্যাকড়া তুলোর বাণ্ডিল জড়ো করে আগুন ধরাতেই বাদামী ফাঁপা ধোঁয়ার ভিতরে আঁকাবাঁকা সর্পিল রেখায় আগুন নেচে উঠল তিনজনের মাঝখানে। কানাই সরে বসল আরো। বিভূতি দু হাঁটু মুখ ডুবিয়ে হাত ছড়িয়ে ধরল আলোর সামনে। লম্বা মোটা ছায়া হেলে গেল কানাই-এর মুখের একদিকে, অন্যদিকের বিস্তৃত দাগ বোঝাই গালের গভীর গর্তে রক্ত ছিটিয়ে পড়ল যেন। কণ্ঠার ভয়ঙ্কর উঁচু হাড়ের গায়ে দড়ির মত শক্ত শিরা জাগতে দেখল রমেন।

উফ্, এতক্ষণে ধাত ফিরে পেলাম।

রুদ্ধ অসুখী গলায় বিড়বিড় করল বিভূতি।

কানাই জবাব দিল না, কেবল ঘাড় হেলাল একপাশে।

রমেন দু ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে পরিতৃপ্তির শব্দ করল মুখে, ঝিমধরা আধবোজা চোখের ফাঁক দিয়ে মাটির উপর টলে ওরা কানাই-এর কদর্য ছায়াটা দেখছিল। অথবা কিছুই দেখছিল না, আধ বন্ধ দু চোখ কুঁচকে ঢুলছিল নেশা-গ্রস্তের মত। দুর্বোধ্য মুখ জুড়ে মারাত্মক ঢেউ তুলে আগুন নাচছিল। মাঝে মাঝে হল্কায় হল্কায় ধোঁয়া উড়ে আসছিল মুখের সামনে, আরো পাল্টে যাচ্ছিল চেহারাটা তখন। মোটা বাঁকানো হাড়ের দু হাত মাটিতে ফেলে রেখেছিল, যেন শিকড়ের মত শিরা জাল বুনে দিয়েছিল চামড়ার গায়ে।

দূর থেকে ট্রাম লাইন মেরামতের শব্দ ঝাঁপিয়ে পড়ছিল কানের পাশে। রমেন প্রায় নিভে আসা বিড়িটাকে সজোরে শেষ টান মেরে ছুঁড়ে দিল বাইরের দিকে। এক বুক ধোঁয়া ছাড়ল। গলগল করে উঠে আদা ধোঁয়ার পিছনে নীল আলো-মাজা বিভূতির বাঁ পাশের ভাঙ্গা চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠতে দেখল। আতঙ্ক-কর আগুনের ধারালো শিখা আধ ফোঁটা আওয়াজ তুলে মুখোমুখি কাঁপছিল। 'কালো ধোয়াটে শীতল অন্ধকার যেন জড়িয়ে ধরছিল তাদের। নিজেকে কেমন অদ্ভুত অসহায় মনে হচ্ছিল রমেনের। বুঝি বা মধ্য রাত্রে ঘরভাঙ্গা তিনজন মানুষ শীত আর কুয়াশার নির্বাসনে দাঁতেদাঁত চেপে ঠকঠক করে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে। বিভূতি, কানাই নির্বাক বোবা দুটো ভূতের মত বসেছিল মুখোমুখি। সাড়া শব্দ ছিল না তাদের মুখে। যেন দুটো মাটির পুতুল। আপন ইচ্ছায় নড়ে-চড়ে বসার সামর্থ্য ছিল না তাদের। খালি অদৃশ্যপ্রায় পোড়ো মাঠের সুগন্ধিময় ভিজে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তাদের শরীরে। কন-কন করছিল হাড়গুলো সব। রমেনের রগের দুদিকের মোটা শিরা দুটো দপদপ করছিল ফুলে উঠে, গোড়ালির নীচে হাড়, শিরা চিনচিন করছিল ঠাণ্ডায়। তবু নড়ে বসার শক্তি যেন কতকাল আগেই লোপ পেয়ে গেছে তার। মনে হচ্ছিল শক্ত মাটিতে কেউ আমূল পুঁতে রেখেছে তাকে। চাপা ঝাপসা কুয়াশাময় ঘর-বাড়ী, মাঠ, রাস্তা, গাছ, দরজা সব কিছু ঘুলিয়ে বিবর্ণ হয়ে আসছিল চোখের সামনে। শিরা, স্নায়ু পেশীগুলো ভোঁতা অলস হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। আধবোজা চোখ মেলে বোধহয় ঘুমের মধ্যে, অথবা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসা লোহা পেটার দীর্ঘ সুরেলা, ছেঁড়া-ছেড়া কাঁপা শব্দ শুনতে শুনতে অসম্ভব জমাট হয়ে পড়ছিল দেহটা। ভারী হিম পাথরের নীচে যেন কেউ তার হৃৎপিণ্ড দুটো ঢাকা দিয়ে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। অসহ্য ভারী মাথা বুকের মাঝামাঝি ঝুঁকিয়ে যেন বিস্মৃত জানলা পথে জ্বালাধরা ঝাপসা দৃষ্টি বাড়িয়ে দেখল সমস্ত ভাল্লুক, বাঁদোর, হায়না, বাঘ, সিংহ, জেব্রা, জিরাফ, কুমীর ময়ূর, কাকাতুয়া, সাপ, কবুতর, বেড়ালেরা কাঁচের বাক্স, নকল পাহাড়, ঝোঁপ, জলা, শিকের খাঁচা, তারের জাল থেকে কেউ বা নেশাগ্রস্ত, কেউ, কেউ নোংরা দুর্বোধ্য, অনেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা চোখ নিয়ে মাথার উপরকার নিচু পরিমিত অকাশের দিকে চেয়েছিল। কেউ আবার তাও দেখছিল না। দূরে ভেজা নরম ঘাসের মাঠে ছোট ছোট শিশুরা ছোটাছুটি করছিল। তাদের ফ্রক, শার্ট, স্কার্ট, রিবন বাঁধা সোনালী কোঁকড়ান চুল হেমন্তের বাতাসেও বিশাল পালের মত কেঁপে উঠেছিল।
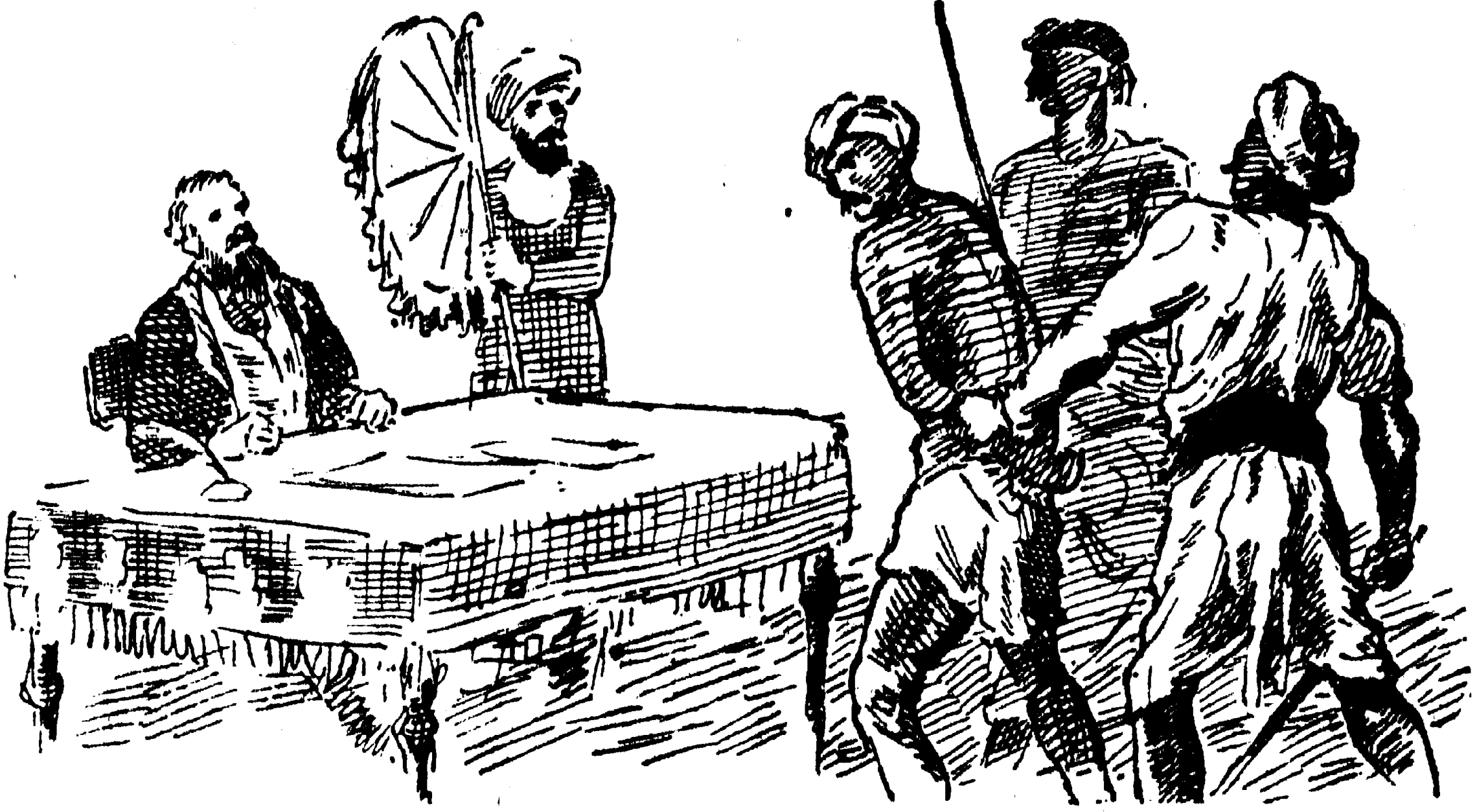
কোম্পানীর আমলের ডাকাত

নকুল চট্টোপাধ্যায়

পুলিশ আর গোয়েন্দার ভয়ে এখান থেকে সেখানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বিল্টু। কেনইবা হবে না! আজ দু'বছর সে দেখতে পায়নি তার একমাত্র ছেলে মাণিককে। খুবই দেখতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু উপায় নেই। বাড়ীতে ঢুকলেই পুলিশ খবর পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করবে—সাজা হয়ে যাবে; আর দেখা হবে না তার ছেলের সঙ্গে।

অন্ধকারে একটা গাছতলায় বসে বিল্টু কি যেন ভাবল তারপর রওনা হ'ল বাড়ীর উদ্দেশ্যে। বাড়ীতে এসে পৌছল। চুপি চুপি দরজায় টোকা মারল। বিল্টুর ভাই দরজা খুলে দিল। বিল্টু ঘরে ঢুকেই ভাইকে জিজ্ঞাসা করল তার মাণিকের কথা। মাণিক তখন ঘুমুচ্ছে। তাই মাণিককে না জাগিয়ে তার পাশেই শুয়ে পড়ল বিল্টু।

ভোর হ'ল—বিল্টুর ভাই দেখল পুলিশ তাদের বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি সে বিল্টুকে ঠেলে তুলে বলল—"দাদা—পুলিশ।"

'পুলিশ'—কথা শেষ হ'ল না। বিল্টু ধরা পড়ল। ৪ঠা জুন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। বিল্টু ডাকাতকে হাজির করা হ'ল ডাকাতী দমন বিভাগের কমিশনার জে-আর-ওয়ার্ড সাহেবের কাছারীতে।

'বিল্টু ডাকাত' নামে সেকালে খ্যাতি অর্জন করলেও এর আসল নাম ছিল 'বিল্টু ঘোষ'; বাবার নাম নফর ঘোষ। জন্ম—নদীয়া জেলার মায়াকুল গ্রামে। প্রথম বয়সে মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে ১৩ বৎসর বয়সে লাঠিখেলা শিখবার জন্য যোগ দেয় লাঠিয়ালদের দলে। এই খেলাই হ'ল তার জীবনের সর্বনাশের মূল। এই দলের সর্দার ছিল তৎকালীন নদীয়া জেলার গোয়ালা ডাকাতদলের শ্রেষ্ঠ ডাকাত মাণিক ঘোষ। মাণিকের কাছেই হয় বিল্টুর হাতেখড়ি। লাঠিখেলার জন্যই একদিন বিল্টু লাঠিয়াল হিসেবে চাকুরী পেল জমিদার বাড়ীতে। এই মাণিক ডাকাতের নামেই তার ছেলের নাম রেখেছিল মাণিক।

তৎকালীন লাঠিয়ালরা সাধারণতঃ ভাত খেত না। দুধ-ঘি আর রুটি—এই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। খাওয়ার জন্য তাদের মাসিক খরচ হত ৮৲ কিন্তু জমিদার বাবুর কাছ থেকে মাসিক বেতন পেত ৩৲—তাছাড়াও তাদের সংসারের খরচ ছিল। তাই শুধু জমিদার বাড়ীর মাইনাতে তাদের চলত না। ভালভাবে জীবনযাপন করার জন্য সেকালের সহজ আয়ের পথ ডাকাতি হয়ে উঠত তাদের পেশা।

ডাকাতি করার জন্য জমিদার এদের কিছু বলতেন না। আবার জমিদারের লাঠিয়াল বলে পুলিশও এদের ধরপাকড় করত না। জমিদারের আমলারা এদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করত, কারণ ডাকাতির আয়ের একটা অংশ যেত তাদের পকেটে।

একদিকে জমিদার ও আমলাদের সমর্থন আর একদিকে যখন পুলিশে ধরা পড়বার ভয় নেই—তখন বিল্টু স্বাভাবিক ভাবেই মাণিক ডাকাতের দলে যোগ দিল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। যতদিন বিল্টু মাণিক ঘোষের দলে ছিল তাকে বিশেষ কিছু করতে হত না। সর্দার মাণিক ডাকাতই কখনও ভিখিরীর বেশে কখনও সাধুর বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করত। যখন কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগৃহীত হ'ত—ডেকে পাঠাত তার অনুচরদের। অনুচররা ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমায়েত হ'ত সর্দারের আড্ডায়। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে

সকলে একত্রিত হলে সর্দার মাণিক ডাকাত বুঝিয়ে বলত তাদের কোন গ্রামে, কোন বাড়ীতে ডাকাতি করতে হবে। যদি কোন বাধা পড়ত—তাহলে সকলেই যার যার বাড়ীতে ফিরে যেত। যখন এদের হাতে কোন কাজ থাকত না সর্দার প্রত্যেককে প্রতিদিন দু'আনা করে খোরাকি হিসেবে দিত। আর ডাকাতির মোট আয় থেকে সর্দার ঐ খোরাকির দরুণ টাকাটা কেটে নিত। যদি সর্দারের ৫০৲ টাকা খরচ হ'ত তাহলে কেটে নিত ১০০৲।

ডাকাতি করতে যাবার আগে এরা কালীপুজো করত। এই কালীপুজোর সময় দলের প্রত্যেককে উপস্থিত থাকতে হ'ত। দলের মধ্যে যারা চৌকির কাজ করত তারা এক সারিতে আর অন্যরা ভিন্ন সারিতে বসত। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কালীমূর্ত্তির সামনে রেখে সর্দার পুজো করত। পুজো হয়ে গেলে সর্দার সকলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করত—"তোমাদের এই ডাকাতিতে সমর্থন আছে তো?" অনুচরেরা উত্তর দিত—"হ্যাঁ—আছে, আছে।" একই প্রশ্ন সর্দার তিনবার করত। আর তিন বারই যদি একই উত্তর পাওয়া যেত তাহলেই স্থির হ'ত ডাকাতি করার। তারপর সর্দার চারদিকে ঘুরে অনুচরদের গুণে নিয়ে আবার সেই একই প্রশ্ন করত—"তোমরা রাজি তো? সর্দার যখন দেখত প্রত্যেকেই রাজি তখন সে একটা মাটির পাত্রে প্রসাদী ভাঙ্ গুলে প্রত্যেকের কপালে ফোঁটা দিয়ে দিত। ফোঁটা-পর্ব শেষ হলে সর্দার তার মাথায় জড়ান কাল রুমালখানা একজন অনুচরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত—"তোমরা যখন প্রত্যেকেই একমত তখন যাত্রা করা যাক্!"—সর্দার মশালে তেল ঢেলে দিত—যাত্রা শুরু হ'ত।

যাত্রার সময় যদি কোন গরুর 'হাম্বা' শব্দ শুনা যেত বা টিকটিকি টক্ টক্ করে উঠত অথবা দলের কেউ হাঁচি দিত তাহলে আর তারা এগুতো না। আবার যদি যাত্রার সময় কখনও শৃগাল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে দলের সামনে দিয়ে চলে যেত তাহ'লে দ্বিগুণ উৎসাহে ডাকাতের দল এগিয়ে যেত।

সেকালের ডাকাতদের নিজস্ব ভাষা ছিল। সাধারণ লোক সেই ভাষা বুঝতে পারত না। যেমন—'তেল'কে বলত 'রস'; 'বন্দুক'-কে বলত 'ভাঁল'; 'মশাল'কে বলত 'ফুল'; লাঠিকে বলত 'কোঁদা' প্রভৃতি।

আনুমানিক ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে একবার জলপথে ডাকাতি করতে গেলে বিষ্টুর সঙ্গে মাণিকের ঝগড়া হয়। সেই থেকে বিষ্টু নিজে দল গঠন করে।

মাণিক ঘোষের নেতৃত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিষ্টু নিজেই দল

ডাকাত দলের একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র

গঠন করত এবং স্বাধীনভাবে দল চালনা করতে লাগল। বিষ্টুর দল ও অন্যান্য ডাকাতের দলের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। সেকালের অন্য কোন হিন্দু ডাকাতদলে সাধারণতঃ কোন মুসলমান ছিল না—কিন্তু শুনা যায় যে, বিষ্টুর দলে দুই একজন মুসলমান অনুচরও ছিল।

বিষ্টু তার দীর্ঘ ডাকাত-জীবনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ধনীলোকের বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল তাদের কয়েকজনের নাম ও যেদিন ডাকাতি হয়েছিল সেই তারিখ দেওয়া হ'ল:

স্বরূপ হালদার—৫ই মার্চ, ১৮৫০; রামধন দত্ত—১১ই জুলাই, ১৮৫০; রামগতি দেব—১৪ই মে, ১৮৫০; জগৎ-রাম চৌধুরী—২রা মে, ১৮৫৩; রাম-প্রসাদ বিশ্বাস—২০শে মার্চ, ১৮৫০; রামনারায়ণ পাঠক—২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫১।

এই সমস্ত ধনীর বাড়ীতে ডাকাতি করা ছাড়াও বিষ্টু জলপথে প্রায় বিভিন্ন নৌকা আটক করে লুঠতরাজ করত। জলপথে বিষ্টু যে সমস্ত ডাকাতি করেছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এক সাহেবের বজরায় ডাকাতি। সাহেবের বজরায় ডাকাতি হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী বিষ্টু ডাকাত কমিশনার সাহেবের কাছে তার ডাকাত-জীবনের সমস্ত কাহিনীই বিবৃত করেছিল। কমি-

শুনার সাহেব সমস্ত শুনে তার বিচারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি নিজে ছিলেন ইংরেজ—তাই অন্যান্য ডাকাতির সংগে বিষ্টু জড়িত থাকলেও ইংরেজ সাহেবকে মারপিট ও তার বজরায় ডাকাতির মামলাটি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না।

বিচার শুরু হল। বিষ্টু ডাকাতের বিরুদ্ধে এজাহার দিতে এসে পীরবক্স নামে জনৈক ব্যক্তি আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে সরকার পক্ষের ইংরেজ উকীল তাকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। বিষ্টু কোন উকীল নিযুক্ত করতে পারেনি—তাই সরকার পক্ষ থেকে বিষ্টুর পক্ষ সমর্থন করবার জন্য ঐ ইংরেজ উকীলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পীরবক্স ছিল পেশাদার সাক্ষী।

সাহেব উকীল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা—পীরবক্স।

পীরবক্স—(হাত জোড় করে) সাহেব!

উকীল—সাহেবের বজরায় ডাকাতি সম্পর্কে তুমি কি জান?

পীরবক্স—ডাকাতির সময় আমি আসামীর কাছেই ছিলাম এবং সাহেবকে মারতে দেখেছি।

উকীল—তুমি আসামীর কতটা কাছে ছিলে?

পীরবক্স—(দুই হাত লম্বা করে) এই—এতটা কাছে।

উকীল—এত কাছে যখন—তুমি তো তাহলে সমস্তই দেখেছ! তুমি কেন রকম বাধা দিলে না কেন।

পীরবক্স—আমি কি করে বাধা দেব! তাহলে বিষ্টু যে আমাকেই মারত—আমি তাই সরে এসেছিলাম।

উকীল—তোমার কাছাকাছি কি এমন কেউ ছিল না যে তোমায় সাহায্য করতে পারত?

পীরবক্স—না, হুজুর—গ্রাম যে অনেক দূরে!

উকীল—তুমি যে বললে যেখানে ডাকাতি হয়েছিল সেখান থেকে ২ গজ দূরে ছিলে—আচ্ছা, সেই ব্যবধানটা তো দশ গজও হতে পারে!

পীরবক্স—হুজুর ঠিকই বলেছেন—দশ গজই হবে।

উকীল—যদি আমি কুড়ি গজ বলি?

পীরবক্স—হ্যাঁ—তাও হতে পারে।

উকীল—যদি আমি দশ গজ বলি?

পীরবক্স—উপরে আল্লা আছেন আর নীচে হুজুর রয়েছেন—মিথ্যা কথা বলব না। সাহেব যা বলছেন—তা নিঃসন্দেহে সত্যি।

উকীল—ডাকাতরা যখন বজরা লুট করছিল তখন তুমি কি করছিলে?

পীরবক্স—আমি আমার নৌকোয় বসে ছিলাম।

উকীল—একটু ভেবে বলতো—ডাকাতিটা রাত্রে না দিনে হয়েছিল?

পীরবক্স—(একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দিল) আমার মনে হয় রাত্রিবেলাই হয়েছিল—কারণ, প্রকাশ্য দিনের বেলা কে আর বজরা লুঠ করে।

উকীল—(জুরী মহোদয়দিগের দিকে ঘুরে বললেন) আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, সাক্ষীর জবানীতে বলা হয়েছে যে, ডাকাতি রাত্রিবেলা হয়েছে এবং সাক্ষীর নৌকো থেকে দশ গজ দূরে।

আচ্ছা, পীরবক্স—সেদিন আকাশে নিশ্চয়ই চাঁদ ছিল?

পীরবক্স—সাহেব যখন বলছেন তখন কি আর ভুল হতে পারে! আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল—আর ফটফটে চাঁদের আলোতে সমস্ত দেখা যাচ্ছিল।

উকীল—চাঁদের আলো না থাকলে অন্ধকারে নিশ্চয়ই কিছু তুমি দেখতে পেতে না!

পীরবক্স—অন্ধকারে আর কি করে দেখবো হুজুর!

উকীল—(একটা পুরনো ক্যালেন্ডার বের করে জুরীদের দেখিয়ে বললেন) সেদিন রাত্রে আকাশে চাঁদ ছিল না। —যাক্ তুমি নেমে যেতে পার।

জুরীর বিচারে মামলা ডিসমিস্ হয়ে গেল। যদিও পুলিশের রিপোর্টে বিষ্টু ঘোষকে কুখ্যাত ডাকাত হিসেবে বর্ণিত করা হয়েছিল।

প্রমাণাভাবে মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে পরবর্তী জীবনে বিষ্টু ঘোষ আর ডাকাতি করেনি—পুলিশ ইনফরমারের চাকরি করত।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(আট)

মদীয় পিতৃদেব বেতিয়াঘরের অযোধ্যাপ্রসাদ, বিশ্বনাথ রাও ও লালচাঁদ বড়ালের সংগে বহুকাল ধ'রে মৃদঙ্গ-সংগতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু নিজে কণ্ঠসংগীতচর্চা কখনও করেন নি। লয় ও তালের দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল. সুরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় চল্লিশ বছরে পদার্পণের পর এবং এজন্য তাঁর নাট্যচর্চাই একমাত্র দায়ী। তিনি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এ সব নাটকে যে সব নাট্যগীতি ছিল, সেগুলির সুর এস্রাজ যন্ত্রে তোলবার আগ্রহ তাঁর দেখা দেয় ১৯১০ সালের পর থেকে। ক্রমে সংগীত সমাজের অভিনয়ের মধ্যে বিরতিকালে অনুষ্ঠিত ঐকতানের অন্তর্গত এস্রাজ বাজানোয় আগ্রহশীল হন। ঐ সময়ে ষ্টার রংগমঞ্চের প্রধান সংগীত-প্রযোজক হাবু দত্তের সংগে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ হয়। হাবু দত্তের একটি ঐকতানের দল ছিল; ঐ দলে ভারতগৌরব স্বনামধন্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবও এক সময়ে বেহালা বাদকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। সে যুগে আলাউদ্দিনের সংগে বাবার পরিচয় হয়নি সত্য কিন্তু আলাউদ্দিনেরই পরম মিত্র স্বর্গত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংগে বাবার আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রপাত এই সময়ের থেকেই সুরু হয়। শীতল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি বাল্যবয়সে শীতল ওস্তাদজী ব'লে ডাকতাম। আলাউদ্দিনের কৈশোর ও প্রথম যৌবন এঁর জীবনের সংগে বিশেষভাবে জড়িত। শীতলবাবু ছিলেন এক বিশিষ্ট সংগীতপন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র। আলাউদ্দিনও ত্রিপুরাবাসী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের সন্তান। এঁরা উভয়েই প্রায় একই সময়ে সংগীতের প্রবল আকর্ষণে সুর ও সুরকারের সন্ধানে গোপনে গৃহত্যাগ করেন। দৈবযোগে বরিশালের একটি প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে উভয়েই যোগ দেন এবং এই সময় থেকেই এঁদের মধ্যে এক সুনিবিড় সখ্য সংস্থাপিত হয়। শীতলবাবু ছিলেন আলাউদ্দিনের চেয়ে দুই বৎসরের বড়। আলাউদ্দিন তাঁকে দাদা বলে ডাকতেন। আলাউদ্দিন তখন বাজাতেন বেহালা আর শীতলবাবু যাত্রার কন্‌সার্ট ক্ল্যারিওনেট, ফ্লুট প্রভৃতি বাঁশী বাজাতেন। উভয়েই বিশেষ সুরেলা ছিলেন এবং যাত্রা দলের অধিকারীদের নিকট সুর শিক্ষা ক'রতেন। কয়েকমাস এইভাবে অতিবাহিত হওয়া পর এঁরা দুজনেই শিক্ষা ও সৌভাগ্য লাভের আশায় পূর্ববংগ ছেড়ে কোলকাতায় চলে এলেন। আলাউদ্দিন তখন তাঁর হিন্দু পূর্বপুরুষগণের "বিশ্বাস" উপাধি ও একটি হিন্দু নাম নিয়ে শীতলবাবুর সংগে কোলকাতায় আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রথমটা এঁদের কোনও সহায় সম্বল ছিল না; হাবু দত্ত মহাশয়ের ছাত্র-প্রীতি ও বদান্যতার সংবাদ যখন এঁদের কানে উপনীত হ'লো, তখন এঁরা কালবিলম্ব না করে ষ্টার থিয়েটারে তাঁর সংগে দেখা ক'রলেন। হাবুবাবু আলাউদ্দিনের বেহালা ও শীতলবাবুর বাঁশী শুনে এতই সন্তুষ্ট হ'লেন যে অচিরেই এঁদের দুজনকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে থিয়েটারের ঐকতানের দলভুক্ত করে নিলেন। শীতলবাবু ও আলাউদ্দিন কোলকাতায় সর্বপ্রথম হাবুবাবুরই শিষ্য হন। হাবু দত্ত নানা যন্ত্র বাজাতে পারতেন—তবে এস্রাজ যন্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি গয়ার বিখ্যাত ধনী ও গুণী কানাই ঢেঁড়ীজীর কাছে ভাল করেই এস্রাজ শিখেছিলেন। উজির খাঁ সাহেবের কোলকাতা অবস্থানকালে তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে হাবু দত্ত একজন অগ্রণী স্থানীয় ছিলেন। উজীর খাঁর নিকট তিনি রাগালাপ শেখেন, তাঁর স্বহস্ত লিখিত আলাপের স্বরলিপি শীতলবাবু আমাদের দেখিয়েছেন। সেই স্বরলিপির খাতায় উজির খাঁর কাছে শেখা ইমন কল্যাণ ও দরবারী কানাড়ার আলাপ দেখতে পাওয়া গেছে। শীতলবাবু বলেছেন, হাবু দত্ত শেষ জীবনে বীণা যন্ত্রও কিছু কিছু বাজাতেন। আলাপ ছাড়াও উজির খাঁর কাছে তিনি উজীর খাঁর সেনীবংশীয় মাতামহ বাহাদুর হোসেনের রচিত কতকগুলি সরগম্ পেয়েছিলেন। কাফী ও ইমন কল্যাণের দুটি সরগম্ রচনানৈপুণ্যে অতুলনীয়। এ দুটি আমরাও শিখেছি: হাবু দত্ত এই সব সরগম্ থিয়েটারের ঐকতানেও ব্যবহার ক'রতেন। কানাই ঢেঁড়ীজীর কাছে তিনি এস্রাজ যন্ত্রেই অনেক রেজাখানি গৎ শিখেছিলেন। হাবু দত্ত সংগীতের একজন স্রষ্টাও ছিলেন: কেননা হিন্দুস্থানী রাগে ঐকতান পদ্ধতির তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। উত্তরকালে আলাউদ্দিন রামপুর ও মাইহারে যৌথ তার-যন্ত্রের যে ঐকতান সৃষ্টি করেছেন—তার পিছনে হাবু দত্তের শিক্ষা ও প্রেরণার প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। হাবু দত্ত গিরিশচন্দ্র অপেক্ষাও নেশাখোর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কিত ভাই। স্বামীজীর মাধ্যমে ইনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ ও কৃপালাভের অধিকারী হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে যাওয়ার পর থেকে তাঁর এক নূতন নেশার ঝোঁক হ'লো—অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে একবার ঠাকুরকে দেখতেই হবে। তিনি ব'লতেনঃ—'আমার নাম পঞ্চরংগ—কেননা আমি পাঁচ প্রকার নেশা করি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এমন নেশা আছে—যে নেশার কাছে অন্য সব নেশাই ফিকে হ'য়ে যায়।" পরিণত জীবনে ইনি গিরিশচন্দ্রের ন্যায়ই পরমহংসদেবের একজন একনিষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হ'য়ে গেছেন।

হাবু দত্তের কাছে শিক্ষা ও কর্মলাভের পর শীতলবাবু ও আলাউদ্দিন উভয়েরই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য খানিকটা সম্ভব হ'য়ে ওঠে। ঐ সময়ে তাঁরা অতিবৃদ্ধ সুরবাহার বাদক ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী সাজ্জাদ মহম্মদের বাজনা শুনতে যেতেন। আলাউদ্দিন বিখ্যাত নুলো গোপালের স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হন ও তাঁর নিকট রাগ-সুর ও তালের বহু তালিম প্রাপ্ত হন। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটবার পর এঁদের ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হয় অপ্রত্যাশিত সব যোগাযোগের ফলে। মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দর্শনকালে আলাউদ্দিনের বেহালা শুনে বিশেষ মুগ্ধ হন ও তাঁকে কোলকাতা থেকে নিজ আশ্রয়ে মুক্তাগাছায় নিয়ে চ'লে যান।

অপরদিকে প্রায় একই সময়েই শীতলবাবুরও জীবনের গতি এক অভিনব পথ খুঁজে পেল। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তালন্দ নামক এক বর্ধিষ্ণু জমিদারীর অধিকারী স্বর্গত ললিতমোহন মৈত্র কোলকাতায় মাঝে মাঝে বৈষয়িক নানা কাজকর্ম উপলক্ষ্যে আসতেন। এঁরও সংগীত ও নাট্যাভিনয়ে বিশেষ রসবোধ ছিল। নিজ জমিদারীতে ওস্তাদদের প্রতিপালন করতেন এবং কোলকাতায়ও উৎকৃষ্ট জলসাগুলিতে যোগ দিতেন। এখানকার প্রধান থিয়েটারগুলির অভিনয় দর্শনেও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। ষ্টার থিয়েটারে রাজা জগৎকিশোরের শুভাগমন ও আলাউদ্দিনের ভাগ্য পরিবর্তনের পরই ললিতমোহন কোলকাতায় ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত হন। রাজার সংগে কোন যোগাযোগের ফলে এ ঘটনা ঘটেনি। ললিতমোহন আপন খেয়ালেই

ষ্টার থিয়েটার দেখতে যান। সেখানকার ঐকতানে শীতলবাবুর ক্ল্যারিওনেট শ্রবণে তিনি শীতলবাবুর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে স্থায়ী বেতনসহ তালন্দে নিয়ে যেতে চান। বন্ধুবর আলাউদ্দিনের নবসৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজসাহীর জমিদারের আশ্রয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ তিনি হারাতে চাইলেন না এবং ললিতবাবুর সঙ্গে তিনিও কোলকাতা ত্যাগ করে রাজসাহী চলে গেলেন। পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য এখানে লেখা আবশ্যক যে জমিদার স্বর্গত ললিতমোহন মৈত্র ভারত-বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীমান রাধিকামোহন মৈত্রের সাক্ষাৎ পিতামহ। শীতলবাবুর প্রথম রাজসাহী গমনের সময়ে শ্রীমান রাধিকামোহনের তখন জন্ম হয়নি, আমরাও তখন বালক মাত্র। শীতলবাবু তালন্দে গিয়েই ললিতবাবুর আশ্রিত ওস্তাদ আমীর খাঁ স্বরোদীর সাক্ষাৎলাভ করলেন। আমীর খাঁ শীতলবাবুর চেয়ে বয়সে কয়েক বছর মাত্র বড় ছিলেন। তিনি দ্বারভাঙ্গার দরবার থেকে তরুণ বয়সে রাজসাহীতে উপনীত হন ও ললিতবাবুর কাছে সভাবাদকের কর্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এঁর পিতা আব্দুল্লা খাঁ স্বরোদী ঐ সময়ে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সভাবাদক ছিলেন। আব্দুল্লা খাঁর গুরু মোরাদ আলি খাঁ স্বরোদীও ছিলেন দ্বারভাঙ্গা দরবারেরই বাদক। বর্তমান যুগের ভারতবিখ্যাত স্বরোদী হাফিজ আলি খাঁ মোরাদ আলি খাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। এঁরা সব একই স্বরোদের ঘরাণার অন্তর্ভুক্ত এবং সেনী বীনকারগণের শিষ্য বা ছাত্র। স্বরোদে সুরের লালিত্য এঁদের হাতে বিশেষভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য স্বরোদীদের বাজনায় মাঝে মাঝে রুক্ষতা প্রকাশ পায়। কিন্তু এঁদের বাজনায় রুক্ষতার অভিযোগ কখনও শোনা যায়নি। এই ঘরাণায় বহু বিখ্যাত স্বরোদীর উদ্ভব হয়েছে। ঢাকার বিখ্যাত এনায়েৎ হোসেন খাঁ, রামপুরের সুপ্রসিদ্ধ ফিদা হোসেন, দ্বারভাঙ্গার মোরাদ আলি খাঁ, আব্দুল্লা খাঁ প্রভৃতি একই স্বরোদী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের আদিপুরুষ ছিলেন গোলাম আলি খাঁ যিনি কাবুল থেকে ভারতে এসে কাবুলি স্বরোদ ছেড়ে দিয়ে ষ্টীলের পাতা ও ধাতব তারযুক্ত ভারতীয় স্বরোদ বাদনে দক্ষতা প্রকাশ করেন। এই স্বরোদীগোষ্ঠী কাবুল থেকে সাহারানপুরে এসে বসবাস করেন ও ক্রমে নানা দরবারে ছড়িয়ে পড়েন। শ্রীমান রাধিকামোহনের গুরু আমীর খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁর বাজনায় এই বংশের কারুকলার পরিচয় আমরা পেয়েছি। শীতলবাবুর কাছে আমরা শুনেছি যে দ্বারভাঙ্গা থেকে যখন আমীর খাঁ প্রথম যৌবনে রাজসাহী পদার্পণ করেন, তখন তাঁর হাত এত সুরেলা ছিল যা পরবর্তী যুগের আমাদের ধারণায় আসবে না; কেননা আমরা আমীর খাঁর প্রৌঢ় বয়সের বাজনা শুনেছি। এই সঙ্গে আমি আজ নিঃসঙ্কোচেই বলতে চাই যে ত্রিশ বৎসর পূর্বে যুবক হাফিজ আলির নবীন প্রতিভাদীপ্ত স্বরোদ-বাদন শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ঐ সময়ে তাঁর তুল্য সুরেলা স্বরোদী ভারতে কেউই ছিলেন না। তখন তিনি বড় বড় রাগগুলি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বাজাতেন। তাঁর ডান হাতের বোল যেমন দ্রুত ও পরিষ্কার ছিল, বাম আঙুলের টিপ এবং আঁশও তেমনি ললিতমধুর সুরের বাজনায় পূর্ণ ছিল। আজকের দিনের বৃদ্ধ হাফিজ আলির বাজনা শুনে যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে লঘু ও চটুল ভাষায় আলোচনা করেন, তাঁরা ভুলে যান যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরও প্রকাশ-ক্ষমতা ও শ্রমসামর্থ্য কমতে বাধ্য।

যাই হোক শীতলবাবু একদিন রাজসাহীতে আমীর খাঁর হাতে ভৈরবীর একটি গৎ শুনে এতই মুগ্ধ হলেন যে, নাড়া বেঁধে তাঁর সাকরেদ হয়ে গেলেন। এই সময় থেকেই শীতলবাবু বাঁশী ছেড়ে এস্রাজ ধরলেন এবং এস্রাজেই স্বরোদের তালিম তোলবার অভ্যাস করলেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর রাজসাহী থাকবার পর ঢাকার রসিক জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর আহ্বানে তাঁর এস্রাজ শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় চলে যান। মদীয় পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় আরও কয়েক বৎসর পর। ১৯১২ সালে বাবা যখন পূজা উপলক্ষে কোলকাতা থেকে দেশে অর্থাৎ গৌরীপুরে যান, তখন গৌরীপুরেই একটি কনসার্ট পার্টি গঠনের আগ্রহ তাঁর হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমাদের কর্মচারীদের নিয়ে একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান সংগঠনের। পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত "গৌরীপুর নাট্য সমাজ" তাঁর এ ইচ্ছার সাফল্য সূচিত করেছে। তবে ১৯১২ সালে ময়মনসিংহের অন্যান্য জমিদার-বাড়ীর ন্যায় গৌরীপুরেও পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে উৎকৃষ্ট যাত্রাভিনয়ই প্রচলিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাবা স্থানীয় লোকদের নিয়ে একটি কনসার্ট পার্টি বা ঐকতানিক গোষ্ঠীর দ্বারা ঐকতান বাদনেরও প্রবর্তন করেন। এই পার্টির সুর-শিক্ষক হিসাবে তিনি ঢাকা থেকে শীতলবাবুকে গৌরীপুরে আমন্ত্রণ করেন। কেননা বাবা তালে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যন্ত্রে ও থিয়েটারে ঢোলক বাজাতেন কিন্তু সুরের যন্ত্র বাজাবার অভ্যাস তাঁর তখনও হয়নি। এই অভাব পূরণের জন্যই শীতলবাবু গৌরীপুরে আহূত হন এবং তখন থেকেই ক্রমে ক্রমে বাবার সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।

সাত-পাঁচ
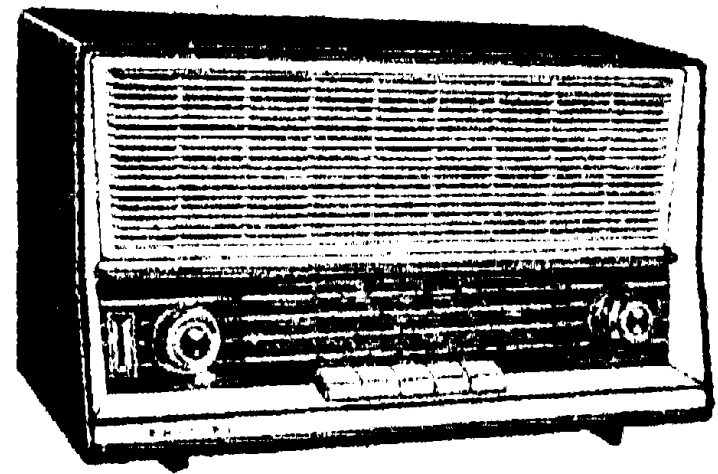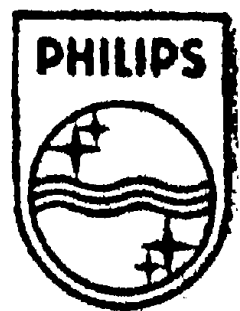
॥ ঘুম, ঘুম ! ॥

হ্যাঁ, এই যুগেও অনেক কুম্ভকর্ণের সাক্ষাৎ মিলেছে এবং এই সব কুম্ভ-কর্ণদের গল্প মোটেই কোন ধোঁয়ার সৃষ্টি নয়; যাকে বলে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সত্য ঘটনা। (অবশ্য ইদানীং ছাপার অক্ষরে যা প্রকাশ পাচ্ছে, তার মধ্যে অসত্যই বেশী)। এই সব ঘটনার নায়কেরা আমাদের কুম্ভকর্ণ শাসকদের মত অবশ্য জেগে ঘুমোন না, সত্যি সত্যিই ঘুমোন। এই সমস্ত রিপভ্যান উইংকলদের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই এই নিবন্ধ।

দিন থেকে মাস এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে কাটানো এ ত' খুবই সোজা ব্যাপার, এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা গিয়েছে, নিদ্রিত মানুষটির ঘুমের অবসরে কখন বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে তা সে জানতেও পারেনি। ১৮৭৪ সালের এক ঘটনায় প্রকাশ সেন্ট চার্লসে হার্মস বলে এক কৃষক সারাদিন খেতে খাটাখুটি করে বাড়ী ফেরে। তার সেই ক্লান্তির বহর এমনই ছিল যে সে একাদিক্রমে ছাব্বিশটি বছর বিছানায় পড়ে রইল। অবশ্য মাঝে মাঝেই সে জেগে উঠেছে খাবারের জন্যে কিন্তু আহারের জোগান সত্ত্বেও তাকে একদিন মারা পড়তে হল।

নিউইয়র্কের একজন টাইপিষ্ট হার্ণা লেভী ১৯০৩ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। অবশ্য লেভীর ঘুম ছিল অপূর্ব। মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে সে খাবারদাবার ত' খেতই, বাড়ীতে একচক্কর দিয়ে আবার বিছানায় পড়ত।

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে এই সব ঘুমের নায়ক ও নায়িকাদের এত দীর্ঘ ঘুমের পরেও মনে হয় না যে তারা এতদিন ঘুমিয়ে আছে। তাদের কাছে মনে হয় তারা কালই যেন রাত্রে শুয়েছে।

ব্রেমেনের একটি মেয়ে, নাম জেসিন মেয়ার এমনি দীর্ঘকাল ঘুমের কবলে পড়েছিল। একদিন রাত্রে গ্রামে আগুন লাগল আর ফায়ার ব্রিগেডের ঢং ঢং ঘন্টায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ। ঘুম ভেঙ্গে বাবা-মাকে ডাকল সে। জেসিনের দাদাও এল ঘরে। জেসিন তার দাদাকে জিজ্ঞেস করল সে সামরিক পোষাক পরে নি কেন? জেসিন ত' জানে না সতের বছরের দীর্ঘ ঘুমের মধ্যে যুদ্ধ কখন থেমে গেছে, তার দাদাও ফিরে এসেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। জেসিনকে একথা বলাতে জেসিন বলেছিল, 'দূর, তাও কি হয়!'

যতদূর জানা যায় এই কুম্ভকর্ণের মত ঘুমের ব্যাপারে একজন ইতালীয়ান মেয়ে বেটিনা পিয়েরির বিশ্বরেকর্ডই সবচেয়ে বেশী। ১৮৬৪ সালে যখন মেয়েটির পনের বছর বয়স, তখন সে ঘুমোয় আর অষ্টআশি বছরে মারা যায়। মারা যাবার আগে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন তার বার্ধক্যের প্রলেপ সর্বাঙ্গে, মন কিন্তু ছিল অপূর্ব তাজা। রোম সংবাদপত্র ট্রিবিউন এ খবরটা দিয়ে জানিয়েছিল, সাধারণ নিরক্ষর কৃষকেরা এই ব্যাপারটাকে দৈবী শক্তিঘটিত বলে রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রায়ই বেটিনা পিয়েরির জাগ্রত অবস্থায় তার কাছে ভিড় করত।

এ ত' গেল ইচ্ছা না থাকলেও ঘুমিয়ে পড়া, এমন অনেক ঘটনা জানা গিয়েছে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর মত অনেক লোক ইচ্ছামত ঘুমিয়ে থেকেছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

যুগোশ্লাভিয়ায় ম্যাটিজা কাপান বলে এক ধনী দোকানদার বউ পালিয়ে যাওয়ায়, তার সমস্ত ধনসম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে একটা নির্জন কুঠীর তৈরী করে ঘুমিয়ে পড়ে। কুড়ি বছর ধরে, মাঝে মাঝে জাগা ছাড়া, সে ঘুমিয়ে ভুলল বউয়ের শোক!

বেলগ্রেডের তিহোমির গাব্রোলিচ ১৯৩৭এ দেনদারদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করতে না পেরে হতাশায় রীতি-মত বাড়ীর গায়ে নোটিশ ঝুলিয়ে ঘুমোল, 'দোহাই দরজায় কেউ ধাক্কা দেবেন না, তাতে করে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। মার্চের আগে আমি জাগছি না। আমার এ ধরণের কার্য-কলাপের কারণ অসাধু লোকেরা আমার পাওনা শোধ করেনি!'

আজ পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই ধরণের অদ্ভুত ঘুমের রোগীদের ঘুম থেকে জাগাবার কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেনি, পিন ফুটিয়েও না। একজন নামকরা বিজ্ঞানীর মতে ঘুমের মধ্যে তারা যে স্বপ্ন দেখে তা সার্থক হলেই এই সব রিপভ্যান উইংকলদের ঘুম ভাঙতে পারে, নচেৎ নয়। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্নটা পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে এমনটি ত' হয় কদাচিৎই।

এই সব রিপভ্যান উইংকলদের ঘুম ভাঙুক আর না ভাঙুক, তাতে কিন্তু মোটেই চিন্তিত নই আমরা; কারণ নিদ্রাই হচ্ছে এই বিশ্রী ব্যাধি-দুঃখ-ক্লেশজর্জর সমাজে যখন একমাত্র দুঃখহর, তখন কাল সকালে কি হবে তার চিন্তা থেকে বাঁচবার জন্যে ঘুমিয়েই দিন কাটাতে পারলে মন্দ কি!

অবশ্য পৃথিবীটা সত্যিই যখন চোখ চেয়ে সুন্দর মনে হবে এবং পৃথিবীটা শুধু শিশুর নয় শিশুর বাবামাদেরও কাছে বাসযোগ্য বলে মনে হবে, তখন না হয় বলা যাবে, 'ঘুমাইতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে বোকার মতন!'
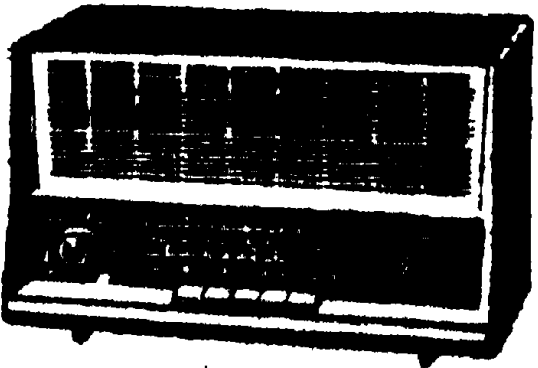
॥ যুগান্তর ॥

নির্ভীক জাতীয়তাবাদী দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার ২৫ বছর পূর্ণ হ'ল। ১৯৩৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটের এক বিশেষ ক্ষণে যুগান্তরের আবির্ভাব, তারপর ঝঞ্ঝা-সংকুল দীর্ঘপথে বারবার নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করেও অবিচ্ছিন্ন ও অবিচল গতিতে তার অগ্রগতি। পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা ও দৃপ্ত সর্পের গর্জনকে রুদ্রের প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করে যুগান্তর পথ দেখিয়েছে বাংলা ও বাংলার বাইরের লক্ষ লক্ষ মানুষকে। তাই অতি সীমিত সামর্থ নিয়ে আবির্ভূত হলেও আপনার অন্তঃতেজে যুগান্তর আজ বাঙালীর স্বাধীন চিন্তার ধারক ও বাহক। যুগান্তরের অভিমত ও বাঙালীর প্রগতিচিন্তা আজ প্রায় সমার্থক।

সারা ভারতে কয়েক শত সংবাদপত্র থাকলেও সরকার নির্ধারিত মান অনুসারে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্র সাতটি; যুগান্তর ঐ সাতটি সংবাদপত্রের অন্যতম—শুধু এইটুকুই যুগান্তরের বড় পরিচয় নয়। যুগান্তরের আরও গৌরবের কথা যে, সারা ভারতের প্রথম শ্রেণীর সাতটি সংবাদপত্রের মধ্যে যুগান্তর কনিষ্ঠতম। প্রগতিধর্মী বাংলার সংগ্রামসাথী যুগান্তর দীর্ঘজীবী হোক, তার সুচিন্তিত অভিমত সারা বাংলার অভিমতরূপে স্বীকৃতি লাভের গৌরব অর্জন করুক, যুগান্তরের রজত-জয়ন্তীর শুভক্ষণে এই আমাদের একান্ত কামনা।

॥ কলকাতা ॥

কলকাতা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই রাজধানী নয়, কলকাতা পূর্ব ও উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, সারা ভারতের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীটি প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় যোজনায় প্রায় সম্পূর্ণই উপেক্ষিত থেকেছে। ফলে অগণিত সমস্যাভারে কলকাতা আজ আকণ্ঠ নিমগ্ন। তার জনজীবনের প্রতি পদে আজ সংখ্যাতীত সমস্যা। আশার কথা যে, এই অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকারকল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন, কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আইন ও শৃঙ্খলা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ হবে কলকাতার উন্নয়নের কাজকর্ম দেখাশুনো করা, কলকাতা কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, সি এম পি ও প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন, প্রভৃতি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কলকাতা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন কলকাতার যাবতীয় বিষয়ে তাঁর চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ।

মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাব অতীব সুচিন্তিত ও সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। তবে কলকাতার উন্নতি যে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের স্বার্থেই হওয়া প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকারেরও একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করার ও সেইমত ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

॥ কলকতার পথ-দুর্ঘটনা ॥

কলকাতা মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল—এই চার বছরের মধ্যে কলকাতার রাস্তার যান-বাহন সংক্রান্ত ৩৬,২১৭টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ২,২৭৮ জন ও আহত হয়েছে ৩০,৫৬৬ জন।

দুর্ঘটনার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, যান-বাহনের জন্য নির্দিষ্ট পথের উপর দিয়ে অত্যধিক লোক চলাচল। তবে তার জন্যে শুধু জনসাধারণের নাগরিক চেতনাকেই দায়ী না করে বলা হয়েছে, কলকাতা সহরের ১৩ মাইল ফুটপাথ বর্তমানে বে-আইনীভাবে দখল হয়ে আছে। দোকান-পাট বসেছে ফুটপাথের ওপর কারও কোন অনুমতির অপেক্ষা না

রেখেই। ফলে ইচ্ছা না থাকলেও নিরুপায় হয়েই অনেক সময় মানুষকে ফুটপাথ থেকে নেমে পথ চলতে গিয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত দুর্ঘটনার বলি হতে হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে শতকরা সত্তরজনই পদাতিক।

॥ বিহারে আত্মহত্যা ॥

বিহার বিধান পরিষদে পুলিশ-দপ্তরের উপমন্ত্রী প্রদত্ত হিসাবে প্রকাশ, ১৯৬১ সালে সারা বিহার রাজ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ৩১৪। এর মধ্যে প্রেম ও পারিবারিক বিরোধের বলি ১৬২।

॥ দীর্ঘজীবী ॥

এতদিন এদেশে শতায়ু হওয়ার প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা বলে বিবেচিত হ'ত। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে যে ভাবে দীর্ঘজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, অনতিবিলম্বেই শতবর্ষে তিরোধান অকাল বিয়োগ বলে বিবেচিত হবে। মাদ্রাজ রাজ্যের লোকগণনার হিসাবে প্রকাশ, সেখানে বর্তমানে শতাধিক বর্ষীয় মানুষের সংখ্যা ২,২৫৩। তন্মধ্যে সর্বাধিক বৃদ্ধের বয়স ১৪৫। এই সব গৌরবময় সেঞ্চুরীর অধিকারীদের অধিকাংশই আবার স্ত্রীলোক। তাদের সংখ্যা ১,৩৬৩।

॥ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ॥

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাব মতে প্রতি বছরে পাঁচ কোটি লোক বেড়ে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে এবং এই বছরের মাঝামাঝি পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৩১১ কোটি ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে এশিয়ার লোকসংখ্যা সর্বাধিক, সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ৫৭ জন বাস করে এই মহাদেশে। ইউরোপে বাস করে একুশ শতাংশ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় চৌদ্দ শতাংশ ও আফ্রিকায় আট শতাংশ। দেশগুলির মধ্যে চীনের লোকসংখ্যাই সর্বাধিক। ৭১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক বাস করে মহাচীনে বা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ। দ্বিতীয় স্থান ভারতের। স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার অনুসারে এই বছরেরর মাঝামাঝি ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ এই বছরের শেষে ভারতের লোকসংখ্যা ৪৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। জনসংখ্যার বিচারে তৃতীয় থেকে পরপর স্থান এখন রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ব্রাজিল, পঃ জার্মানী ও বৃটেনের। বৃটেনের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৩০ লক্ষ।

সারা পৃথিবীর সকল দেশে লোকসংখ্যা প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে চললেও আয়ারল্যান্ড, পূর্ব-জার্মাণী ও উত্তর-ভিয়েৎনাম তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ঐ তিনটি দেশে লোকসংখ্যা কমতির মুখে। তার কারণ, দেশত্যাগ। প্রতি বছরেই দলে দলে আয়ারল্যান্ডের লোক চলে যায় যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে কাজের সন্ধানে। আয়ারল্যান্ডের দারিদ্র্যই দায়ী তার জন্যে। অপর দুটি দেশ কম্যুনিষ্ট শাসনাধীন। পূর্বজার্মাণী থেকে এপর্যন্ত চল্লিশ লক্ষেরও বেশী লোক পালিয়ে এসেছে পশ্চিমজার্মাণীতে। উত্তরভিয়েৎনামের লোকেরাও কাজের সন্ধানে দলে দলে চলে যায় ইন্দোচীন উপদ্বীপের অন্যান্য দেশগুলিতে।

॥ বেনবেলার অভিযোগ ॥

জাতীয় নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে আলজিরিয়ার কার্যত একনায়ক বেন বেলা অভিযোগ এনেছেন আলজিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখার বিরুদ্ধে। তারা নাকি হত্যার ভয় দেখিয়ে আলজিরিয়াবাসীদের ভোটে অংশ গ্রহণ না করার জন্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে। বেন বেলার এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আলজিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর বর্তমানে একটা আপস হলেও প্রকৃত সখ্য স্থাপিত হয়নি। যে কোন মুহূর্তেই আবার সারা আলজিরিয়া জুড়ে বেন বেলা-বিরোধী সৈন্যদলের অভ্যুত্থান সুরু হয়ে যেতে পারে। দুই মাসের মধ্যে আলজিরিয়ার অনিশ্চিত শাসনযন্ত্র দুবার করায়ত্ত হয়েছে বেন বেলার কিন্তু তাঁর এবারের প্রত্যাবর্তন খুব সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি-নির্ভর বলে মনে হয় না। তার কারণও সহজবোধ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী সব শক্তির উৎখাত করে আলজিরিয়ার স্থায়ী একনায়ক হতে চান বেন বেলা। এ কারণে সংগ্রামসাথী ও আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেন বেল্লার নামও ভোটার তালিকা হতে বাদ দিতে সংকোচ বোধ করেননি। তাঁর অনুগামীরাও অনুরূপভাবে জাতির প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগলাভে বঞ্চিত হয়েছেন। আলজিরিয়ার দুর্ভাগ্য, ঠিক যে মুহূর্তে তার জাতীয় জীবনে সব চেয়ে বেশী ঐক্যের প্রয়োজন ছিল সেই সময়েই নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণতার ফলে আলজিরিয়া খণ্ড খণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সাধারণ নির্বাচনের পরেও আলজিরিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে না।

॥ অশান্ত পূর্ববঙ্গ ॥

আবার পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ছাত্র-বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করেছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া মাত্র একযোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদের বিক্ষোভ সুরু হয়। কমিশনের সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের প্রতিবাদ অনেক দিন আগেই সুরু হয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে পাক সরকার অপরিবর্তিত অবস্থাতেই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করতে উদ্যত হলে সমগ্র প্রদেশব্যাপী এই বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আয়ুব খাঁর পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী অবশ্য সেই মুহূর্তেই আবার পূর্ববঙ্গের তরুণসমাজের ওপর হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের নির্মম গুলী-বর্ষণের ফলে আটজন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। তাছাড়া শত শত ছাত্র ও নাগরিককে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়।

ঠিক এই সময়েই সুরাবর্দী সাহেব ঢাকায় উপস্থিত হন। পশ্চিম পাকিস্থানের কারাগারে কয়েক মাস বন্দী থাকার পর প্রধানত পূর্ববঙ্গের তরুণসমাজের দাবীতেই তিনি মুক্তি লাভ করেন, তাই তিনি ঢাকায় আসেন ছাত্র ও জনসাধারণকে তাঁদের গৌরবময় সংগ্রামের জন্যে অভিনন্দন জানাতে। ঢাকায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই সুরাবর্দী সাহেব জনগণের যে স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন তা ঢাকার জনজীবনে প্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা। সমবেত জনতাকে তিনি বলেন, পাকিস্থানবাসীদের এই মুহূর্তে সর্বাধিক প্রয়োজন ঐক্যের। তিনিও পূর্ব পাকস্থানের নেতৃবৃন্দকে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। পূর্ব পাকিস্থানে পুলিশের গুলী চালনার প্রতিবাদে তিনি যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তাতে তাঁর স্বাক্ষরের সঙ্গে আছে পূর্বপাকিস্থানের চারজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর। আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী পার্টি, মুশ্লিম লীগ, কৃষক প্রজাদল—পূর্ববঙ্গের সবকটি রাজনৈতিক দল আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন আয়ুবশাহীর একনায়কতার বিরুদ্ধে। এ সংগ্রামের পরিণতি সম্বন্ধে কোন ভাবিষ্যাণী করা সম্ভব নয়। তবে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে জনাব সুরাবর্দীর সম্মুখে আজ এক দুর্লভ ঐতিহাসিক মুহূর্ত সমুপস্থিত। তিনি যদি দৃঢ় থাকেন তবে তার নেতৃত্বে পূর্ববাংলার তরুণ প্রাণ এক নতুন মুক্তির ইতিহাস রচনা করবে এই উপমহাদেশে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৩ই সেপ্টেম্বর ২৭শে ভাদ্র : ভারতীয় ঘাঁটির (নেফা অঞ্চলে) নিকট চীনা ফৌজের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি—ভারতীয় বিমান আক্রান্ত—পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে সমর-নায়কদের সহিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের নিবিড় মন্ত্রণা।

'তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ভারত খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিবে'—মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীএস. কে পাতিলের বিবৃতি।

১৪ই সেপ্টেম্বর—২৮শে ভাদ্র : কলিকাতার মৎস্য-সংকট দূরীকরণে সমবায় সমিতি মারফৎ পূর্ববঙ্গ হইতে মৎস্য আমদানীর ব্যবস্থা—কলিকাতায় পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষিমন্ত্রী কাজী আব্দুল কাসেমের সহিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বৈঠক।

দশ বৎসরে ৯০ হাজার পাকিস্তানী (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারী) বহিষ্কৃত—দিল্লী হইতে প্রচারিত সরকারী ইস্তাহারের বিবরণ।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ (বিশ্ব ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট) কর্তৃক ভারতকে প্রায় ২০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর।

১৫ই সেপ্টেম্বর—২৯শে ভাদ্র : বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করার দৃঢ় দাবী—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সহিত কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের (আসাম) প্রতিনিধি-দলের আলোচনা।

দণ্ডকারণ্য এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত—দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বৈঠকে প্রস্তাব।

১৬ই সেপ্টেম্বর—৩০শে ভাদ্র : নেফা সীমান্তের পরিস্থিতি (চীনা আ ক্র ম ণ জ নি ত) পর্যালোচনাকল্পে দিল্লীতে দেশরক্ষা দপ্তরের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে বৈঠক—ইষ্টার্ণ কমান্ডের জি-ও-সি লেঃ জেনারেল এস্. পি সেন কর্তৃক সীমান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বর্ণনা—ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সংবাদ।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) পূর্বাঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম) পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—জাতীয় সংহতি, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত—পূর্বাঞ্চলের কমন রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী সংগঠনের প্রস্তাব—বৈঠকের সভাপতি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

১৭ই সেপ্টেম্বর—৩১শে ভাদ্র : দৈখাতায় (জলপাইগুড়ি জেলা) পাক্ বাহিনী কর্তৃক ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী-দের উপর গুলীচালনা— ভারতীয় বাহিনীর পাল্টা গুলীবর্ষণে পাক্ সৈন্য-দের পশ্চাদপসরণ।

নেফা অঞ্চলের পর চীনা ফৌজের ভুটানে অনুপ্রবেশ—খিঞ্জিমারেতে (উত্তর-পূর্ব জেলাস্থিত) সামরিক পরীক্ষা ঘাঁটি স্থাপনের সংবাদ।

১৮ই সেপ্টেম্বর—১লা আশ্বিন : রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানে শিল্পপতিদের উদ্যোগী হইবার আহ্বান—কর্মসংস্থান উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে (কলিকাতা) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের দাবী।

তিন দিনব্যাপী প্রচণ্ড বর্ষণে হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ অঞ্চলে (অন্ধ্র-প্রদেশ) প্রায় ২০ হাজার নর-নারী গৃহ-হীন—গৃহধ্বসিয়া এযাবৎ ৯ জনের জীবনান্ত।

১৯শে সেপ্টেম্বর—২রা আশ্বিন : আগষ্ট মাসে (১৯৬২) তুয়েনসাং জেলায় নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি— মে মাসে আরও দুইশত বিদ্রোহীর পূর্ব-পাকিস্তানে পলায়ন—নাগা ভূমির চীফ এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলার শ্রীপি শিলু আও-এর বিবৃতি।

ত্রিবান্দ্রামে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকদের বৈঠক—বিভিন্ন কংগ্রেস সংস্থা ও আইন সভাগুলির কংগ্রেসী সদস্যদের যৌথ ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের প্রস্তাবের উপর তুমুল বিতণ্ডা।

॥ বাইরে ॥

১৩ই সেপ্টেম্বর—২৭শে ভাদ্র : ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের ব্যাপারে বৃটেনের পক্ষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের আপ্রাণ চেষ্টা—কমন-ওয়েলথ নেতাদের সহিত ঘরোয়া বৈঠক।

সোভিয়েট ও কিউবা সরকারের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির হুমকী—নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে আমেরিকা প্রতি-ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রস্তুত বলিয়া ঘোষণা।

১৪ই সেপ্টেম্বর—২৮শে ভাদ্র : পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের নূতন প্রস্তাব—অর্থনৈতিক সহযোগিতার কর্ম-সূচী প্রণয়নে কমনওয়েলথ ও সাধারণ বাজারের নেতৃবৃন্দের একটি শীর্ষ সম্মেলন করা হউক।

১৫ই সেপ্টেম্বর—২৯শে ভাদ্র : পশ্চিম হাভানার (কিউবা) মেরিয়েল বন্দর-এলাকায় প্রচুর সোভিয়েট সমরোপকরণ মজুত—বন্দরের চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ—সামরিক তৎপরতা গোপন রাখার জন্য কিউবা সরকারের সতর্কতা।

ভারতীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি-দলের মস্কো সফর আরম্ভ—দলের নেতা লোকসভার স্পীকার সর্দার হুকুম সিং।

ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণো কর্তৃক পশ্চিম ইরিয়ান হস্তান্তর চুক্তি (ওলন্দাজ-ইন্দোনেশীয়) অনুমোদনের দলিলে স্বাক্ষরদান।

১৬ই সেপ্টেম্বর—৩০শে ভাদ্র : পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী—লণ্ডনের বুকে অনুষ্ঠিত পাক্ নাগরিক-দের সভায় প্রস্তাব—সভাপতি : শ্রীএম এস আমেদ।

১৭ই সেপ্টেম্বর—৩১শে ভাদ্র : পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ১৭ জন নিহত ও আড়াই শতাধিক আহত—ঢাকা ও যশোহরে বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য সরকার কর্তৃক সৈন্য বাহিনী আহ্বান—সদ্য-কারামুক্ত প্রাক্তন পাক্ প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর করাচী হইতে ঢাকা আগমনের কয়েক ঘন্টা মধ্যেই আন্দোলনের বিস্তার—পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ছাত্র হরতাল।

লণ্ডনে শতাধিক ভারতীয় বাসিন্দার বিক্ষোভ প্রদর্শন—কাশ্মীর হইতে পাক্ আক্রমণ প্রত্যাহারের দৃঢ় দাবী।

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে (লণ্ডন) সাধারণ বাজারে (ইউরোপীয়) বৃটেনের প্রবেশ সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান—সকলের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর (ম্যাকমিলান) আশ্বাস।

১৮ই সেপ্টেম্বর—১লা আশ্বিন : সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে ছা ত্র দে র অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু—শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যাহারের জন্য সম্মিলিত দাবী—সর্বত্র আয়ুব-শাহীর প্রতি ধিক্কার।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পুনরায় রাষ্ট্রসংঘে কম্যুনিষ্ট চীনের জন্য আসন দাবী।

'আংশিক নহে, পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করিতে হইবে'—কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দাবী।

১৯শে সেপ্টেম্বর—২রা আশ্বিন : বাণিজ্য জোটে (ইউরোপীয়) বৃটেনের যোগদানের শর্তাবলী সম্পর্কে কমন-ওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সহিত পরামর্শ করা হইবে—বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে আশ্বাস দান—দশদিনব্যাপী সম্মেলন (কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী) শেষে ইস্তাহার প্রকাশ।

রাশিয়া কর্তৃক দ্বিতীয় বৃহত্তম (২৮ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন) পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ।

আপনাকে নিরাপরাধ হিসাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে অনেক দূর অবধি যেতে হবে।

এর ফলে প্রতিবারই তারা এমন একটি আত্ম-জীবনী রচনা করে যা তাদের অপরাধের কোনো হদিশ দেয় না। ঠিক এইখানে এসেই ওরা হোঁচট খায়। ওদের সব কিছু এদিকেই নিয়ে যায়, যে অতীত তারা অতিক্রম করে এসেছে, যে মনোভঙ্গী তখনো তাদের আছে, তা তাদের এই অপরাধী সত্তার দিকে এগিয়ে আসে।

জাঁ ক্যুর উপন্যাসের চরিত্রাবলী তাই এক সমস্যার সম্মুখীন, সেই সমস্যা হল পরিবর্তিত আত্মজীবনীর সমস্যা। জাঁ ক্যু যা দেখাতে চান তা এই, নিদারুণ ভাব গুরুভার অতীতকে নিয়ে বাস করা সম্ভব হলেও, (কারণ এক সময় না এক সময় তাকে মেনে নিতে হয়), ভবিষ্যৎ-হীন জীবন যাপন অসম্ভব। যদি ভবিষ্যৎ আপনার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়, যদি তামাকের মত, মাদকদ্রব্যের মত তা সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে একটা ভবিষ্যত রচনা করে তার মধ্যে বাস করা ছাড়া আর উপায় নেই, যতই কাল্পনিক বা উদ্ভট হোক, বিশ্বাসের অযোগ্য হোক, নিছক দিবাস্বপ্ন হোক তবু তা আলো-বাতাসহীন বন্ধঘরের বাতায়ন। স্বপ্ন হলেও সে স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে। এক হিসাবে অবরুদ্ধ-ভবিষ্যৎ এক প্রকারের মনোবিকার সৃষ্টি করে। ফলে জাঁ ক্যুর একটি চরিত্র স্থির করে যে একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বক্সিং-এর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা লাভ করবে, তার জন্য সে প্রস্তুত হয়, কারাগারে আসার আগে মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। তাই যে-দিনটি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, ভালোভাবে তা জানা সত্ত্বেও তার কথা ভাবে।

এই সব অতীতের মধ্যে সত্য আর অসত্য পাশাপাশি মিশে আছে, আর আছে নিরন্ধ্র ভবিষ্যৎ। জাঁ ক্যু অতিশয় কৌশল সহকারে এই উপন্যাসের কাহিনী বিধৃত করেছেন।

তবে পাঠক এবং উপন্যাসের চরিত্রাবলীর মনে এই সত্য এবং অসত্যের সংমিশ্রণে গঠিত কাহিনী অনেক প্রশ্ন জাগায়। সে প্রশ্ন এই : অপরাধী মানুষ কি? কি সেই দ্রব্য যা মানুষকে অপরাধে জড়িয়ে ফেলে, তার নাম কি প্রেম? নিরপরাধ মানুষ এবং যাদের আমরা অপরাধী বলি, সেই অপরাধীর মধ্যে মৌল-পার্থক্য কোথায়?

এই সব প্রশ্ন ছাড়িয়ে আমরা কিঞ্চিৎ সহজভাবেই আবিষ্কার করি—একটি বিচিত্র প্রতীক। এই আধা-উন্মাদ বন্দী-দল, একটা অসম্ভব অতীত এবং নিষ্কম্প নিরন্ধ্র এক ভবিষ্যতের মাঝে সংগ্রাম করে চলেছে। আসলে এই বন্দী-দলই মানবতার প্রতীক। আমরা সবাই জীবনের বিরাট বন্দীশালায় অবরুদ্ধ, গবাক্ষহীন সেই কারাজীবনে যাবজ্জীবন দণ্ডিত হয়ে আছি, ভবিষ্যৎ নেই, আশা নেই, বিশ্বাস নেই, অপরিচিত প্রতিবেশী'দের সঙ্গে অপরাধীর দণ্ডিতজীবন যাপন করছি। পালাবার পথ নেই, যম আছে পিছে। এ কালের মানুষের এই অবস্থাই জাঁ ক্যু তাঁর উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। 'La Pitie de Dieu'—তাই এক বিচিত্র প্রতীকধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসটি যে পাঠকচিত্ত জয় করতে পারে না, তার কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মাধ্য এবং চরিত্রে বাস্তবতার অভাব। সার্ত্রের নরক বরং গ্রহণ করা সহজ কিন্তু জাঁ ক্যু-র বন্দীশালা ততটা সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে প্রভেদ এই যে, জাঁ ক্যু-র উপন্যাসের উপজীব্য বাস্তবানুগ, সার্ত্রের উপন্যাস কল্পনাবিলাস। জাঁ ক্যু তাই এত সমাদৃত এবং এতখানি সার্থকতা লাভ করেছেন।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'অনুপত্র' নামক প্রবন্ধে উধৃত "Liberal Imagination" গ্রন্থের লেখকের নাম "Lionel Thrilling" নয়, "Lionel Trilling", এই ভ্রমটুকুর জন্য আমরা দুঃখিত।

নতুন বই

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা) ১ম খণ্ড—নেপাল মজুমদার। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম—দশ টাকা।

রবীন্দ্র-মনীষার বিস্তৃতি বিস্ময়কর। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন বার বার খুঁজে ফিরেছে চিরন্তন সত্যকে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব যার শিল্পানুভূতি সমালোচকের দৃষ্টিশক্তিতে নতুন নতুন সত্যের উন্মেষ ঘটায় প্রতি মুহূর্তের তন্ময় অনুসন্ধানে। অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর কাব্য ও নাটকের রসবিচারে নিবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র কবি ও নাট্যকাররূপে প্রচারের অসাধু প্রয়াসে খ্যাতিমান সমালোচকেরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ঔপনিষদিক আলোকে কবিগুরুকে অধ্যাত্মবাদী এক মুক্তপুরুষ-রূপে প্রচার করেছেন এতকাল। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এও যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য সত্য।

বর্তমান গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয়

সুবিস্তৃত। ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং আন্তর্জাতিক চেতনাপ্রবাহের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধির এই কঠোর পরিশ্রমী গবেষণা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় মনীষীগণের মধ্যে স্বাদেশিক প্রেমবোধ বিশ্ব-সমস্যার সংগে সংপৃক্ত হয়ে এক বিরাট পটভূমিকা রচনা করে। সে পটভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, আর. এম. সায়ানী, সুব্রাহ্মণ্য আয়ার, আনন্দমোহন বসু, গোখলে, তিলক, গান্ধীজী, অ্যানি বেশান্ত প্রমুখ চিন্তানায়ক এবং নেতৃবৃন্দ। এ'দের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য প্রতিবাদ্য রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, উত্থাপিত হয়েছে। দেশীয় ও বিশ্ব-সংক্রান্ত সমস্যা বার বার রবীন্দ্র মানসে আলোড়ন আনে। সে সমস্ত বিষয় গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত কবি নতুন পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করে। গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে এ তথ্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। নিপুণভাবে উপরোক্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও সাযুজ্য প্রত্যেক পৃথক পৃথক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সুবিস্তৃত এই গ্রন্থখানিতে তৎকালীন জাতীয় চিন্তাধারার যেমন সুসম্বন্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে 'বর্ষশেষ', 'গোরা' প্রভৃতির মূল প্রেরণাধারাকে। রবীন্দ্র-জীবনের এই নবভাষ্য—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথাই সুস্পষ্ট করে তোলে যে, তিনি ছিলেন অন্যায়ের শত্রু, দুর্বল ও নিপীড়িতের বন্ধু, এবং এক মহান দেশপ্রেমিক। রবীন্দ্রমানসে রাজনৈতিক চিন্তা-উন্মেষ ক্রমবিকাশ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় তাঁর মহান অভিব্যক্তি বহু মূল্যবান উক্তি দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার এমন তথ্যনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ পর্যন্তও একখানি রচিত হয়নি। অথচ অতি সম্প্রতি আমরা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব সমাপ্ত করলাম।

'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামক সম্পূর্ণ গ্রন্থের এইখানিই প্রথম খণ্ড। রবীন্দ্র-জীবনারম্ভের পশ্চাৎপট থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান কাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-জীবন ও শিল্পভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন দেশীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থকারের কঠোর পরিশ্রমী মননই এই দায়িত্বশীল অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে তোলবার পথে একমাত্র সহায়।

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা) —**সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা—৬। দাম চার টাকা।**

'সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ'-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত দশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার ইতিহাস দীর্ঘ। অনেক সময়েই পূর্ববর্তী আলোচকদের বক্তব্যকেই একমাত্র অবলম্বন করে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু স্বতন্ত্র ও যুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকারের কৃতিত্ব রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারের এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বীয় উপলব্ধিকে সুস্থ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে বর্তমান গ্রন্থখানি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ভারতীয় গল্প-সংকলন— বোম্মানা বিশ্বনাথম সম্পাদিত ও অনূদিত। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট। কলিকাতা—১৩। দাম চার টাকা।

বহুভাষাভাষী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভাষাসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং অখন্ডতা রক্ষার জন্য সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি রাজ্যের সাহিত্যশিল্প সম্পর্কে পরস্পরকে সচেতন হতে হবে। আর তার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ভারতের সুদৃঢ় জাতীয় আদর্শ। এই মহান পটভূমিকায় বোম্মানা বিশ্বনাথম-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

দীর্ঘকাল ধরে প্রতিবেশী ভাষাসমূহের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সম্পদ বাঙলাভাষায় অনুবাদ করে শ্রীবিশ্বনাথম ভারতীয় নাগরিকত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ 'ভারতীয় গল্প-সঞ্চয়ন' একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতিমান লেখকদের গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি 'অমৃতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি গল্পের মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনজীবনের রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিশেষে সমগ্র পরিবেশের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র সহজেই পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। প্রতিটি ভাষার গল্প সংক্রান্ত বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম।

ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙলা ভাষা যথেষ্ট উন্নত নিঃসন্দেহে। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদে বাঙলা ভাষা যথেষ্ট উচ্চস্থানের দাবী রাখে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গেও একথা স্বীকার করতে হয় যে বাঙলা ভাষা প্রতিবেশী সাহিত্যসমূহের প্রতি গভীর মনোযোগী নয়। এদিক থেকে বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষায় একজন অবাঙালী ভদ্রলোকের কঠোর পরিশ্রমকে অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা জানাতে হয়। একথা আরও বিস্ময়কর সত্য যে তাঁর বাঙলার মধ্যে কোথাও অবাঙালীত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে না। বাঙলার সঙ্গে তিনি যেন একাত্ম। তাঁর পরিশ্রম সার্থক হোক।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

মৌচাক (শারদীয়া ১৩৬৯) ঃ সম্পাদক—সুধীরচন্দ্র সরকার। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ৪৫ নয়া পয়সা।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র হিসাবে 'মৌচাক' বাঙলাদেশে সুপরিচিত। দীর্ঘকাল আমাদের সাহিত্যের একটি বিভাগ এই পত্রিকাটির সুসম্পাদনায় পুষ্ট হয়ে আসছে। বর্তমান সংখ্যাটি হাতে নিয়ে তাই যথেষ্ট আনন্দের অবকাশ আছে। এ সংখ্যায় গল্প লিখেছেন মনোজ বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বপনবুড়ো, ইন্দিরা দেবী, পুষ্প বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। কবিতা লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গোপাল ভৌমিক, প্রভাকর মাঝি, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, বেণু গঙ্গোপাধ্যায় পরিতোষকুমার চন্দ্র, জসীমউদ্দীন ও সুবীর চট্টোপাধ্যায়। 'তিনপরী ও পৃথিবী' নামে একটি নৃত্যনাট্য লিখেছেন দুর্গাদাস সরকার। আরও কয়েকটি নানারকমের রচনা আছে। বহু আলোকচিত্রও পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণ।

আনন্দ (শারদ সংকলন) ঃ সম্পাদিকা ঃ মিনতি মুখোপাধ্যায়। ৭৯।৯ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৪। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'আনন্দ' পত্রিকা হিসাবে দীর্ঘদিনের নয়। ইতিপূর্বে তার একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। শুধুমাত্র বিচিত্ররসের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় বহু বিষয়ে এর স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সংখ্যা সম্পাদনায় পূর্ববর্তী সংখ্যার তুলনায় অধিক সতর্কতার ছাপ রয়েছে। নামী ও অনামী লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ এই শারদ সংকলনে যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, চিরঞ্জীব সেন, মণীন্দ্র রায়, সমরজিৎ কর, দিব্যেন্দু পালিত, মিহির সেন, কবিতা সিংহ, ডস্টয়ভস্কি, জয়দেব রায়, শত্রুঘ্ন গুপ্ত, দিলীপ মিত্র ও খগেন্দ্র দত্ত। খগেন্দ্র দত্ত ও দিলীপ মিত্র লিখেছেন দুটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। উপরোক্ত লেখকদের বিচিত্ররসের গল্পের মধ্যে আছে বড় গল্প, অপরাধমূলক গল্প, হাসির গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, প্রেমের গল্প, কৌতুকরসের গল্প, করুণরসের গল্প, অনুবাদ-গল্প, যুদ্ধের গল্প ও ভৌতিক গল্প। সম্পূর্ণ পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জা করেছেন ধ্রুব রায়।

রূপ ভারতী (দ্বিতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা) ঃ সম্পাদক—মহাদেবপ্রসাদ সাহা। ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হতে প্রকাশিত। দাম—৭৫ নয়া পয়সা।

বর্তমান সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, আলেকসান্দার স্ভারদভস্কি লিখিত 'সোবিয়েত সমাজ ও সাহিত্য'। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের 'ভারতের আদিবাসী' নামক রচনার তৃতীয় পর্যায় বর্তমান সংখ্যার অপর আকর্ষণীয় প্রবন্ধ। অনাতোলি ভারীবিৎস্কী লিখিত 'লেনিন-তলস্তয়ের সাক্ষাৎ' অনুবাদ করেছেন অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন রামেন্দ্র দেশমুখ্য এবং বিমলচন্দ্র ঘোষ। কয়েকটি অনুবাদ-কবিতা এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের কয়েকটি রচনা আছে।

টেলিভিশন অপেরা

কনাদ চৌধুরী

পশ্চিমদেশে সিনেমা-সাম্রাজ্যের সূর্য ঠিক অস্তগামী না হলেও মধ্যাহ্ন গগনে আর নেই। সমগ্র প্রতীচ্য ইদানীং টেলিভিশনের আলোয় আলোকিত। 'টেলস্টার' গগনস্থ হওয়ার পর টেলিভিশনের মোহিনী শক্তি আরো বেড়ে যাচ্ছে। আটলান্টিকের দুই তীর স্বচ্ছন্দেই চিত্রার্পিত হচ্ছে টেলিভিশন-পটে। সত্যি বলতে কি টেলিভিশন আমোদপ্রিয় জনতাকে ক্রমশঃ ঘরকুনো করে ফেলেছে। রোদ শুকিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, টিকিটের লাইনে হটডগ স্যান্ডুইচ চিবোতে চিবোতে অপেক্ষার সলতে পোড়াতে আর কেউ রাজী না। তার চেয়ে বরং আরামে কোচে বসে, অগ্নিকোণের আগুনটাকে উস্কে টেলিভিশন-পটের দিকে চোখ রেখে থাকা অনেক সুখের। আর কিছু না হোক, খারাপ লাগলে বন্ধুর সঙ্গে পাশাপাশি গল্প জুড়লে প্রেক্ষাগৃহের "হিস হিস" ধ্বনির শাসন তাড়া করবে না।

সিনেমাতে একটি কাহিনীচিত্র এবং উপরি-দ্রষ্টব্য কয়েকটা তথ্যচিত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। কয়েকটি পশ্চিমী দেশে অবশ্য একসঙ্গে দু'তিনটে ছবি দেখিয়ে দর্শক আকর্ষণ করার চেষ্টা হয়—কিন্তু সব দেশই ত আর শিব-চতুর্দশীর দেশ না যে একাধিক ছবিতে সকলেরই সমান আকর্ষণ থাকবে। টেলিভিশনে নানা ধরণের চিত্রই দেখানো যেতে পারে। ছোট ছোট সংবাদচিত্র, ভ্রমণ-চিত্র, সাক্ষাৎকার, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতামালা প্রভৃতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচিত্র ধরণের অনুষ্ঠানে দর্শক তৃপ্ত হতে পারেন। সময়ের হাতে রাখি বেঁধে প্রমোদ বিতরণে টেলিভিশন অদ্বিতীয়। এমন কি সিনেমার কাহিনী-চিত্রও টেলিভিশন মারফৎ গৃহস্থ হতে পারে। চলচ্চিত্রকে গৃহস্থ-প্রমোদ করার জন্যে আলাদাভাবে কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীরাও টেলিভিশন চিত্রে অংশগ্রহণ করেন। ফলে সিনেমার আকর্ষণে আর তেমন চুম্বক নেই।

তবে এতদিন থিয়েটার, ব্যালে, অপেরা প্রভৃতি টেলিভিশনের আগ্রাসী নীতি থেকে নিশ্চিত ছিল। সিনেমার যাই হোক, অন্ততঃ ব্যালে কিংবা অপেরার জন্যে দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে পদ-সঞ্চার করতেই হবে—এই ধারণাই বিশেষজ্ঞ-মহলে আমূল ছিল। কারণ
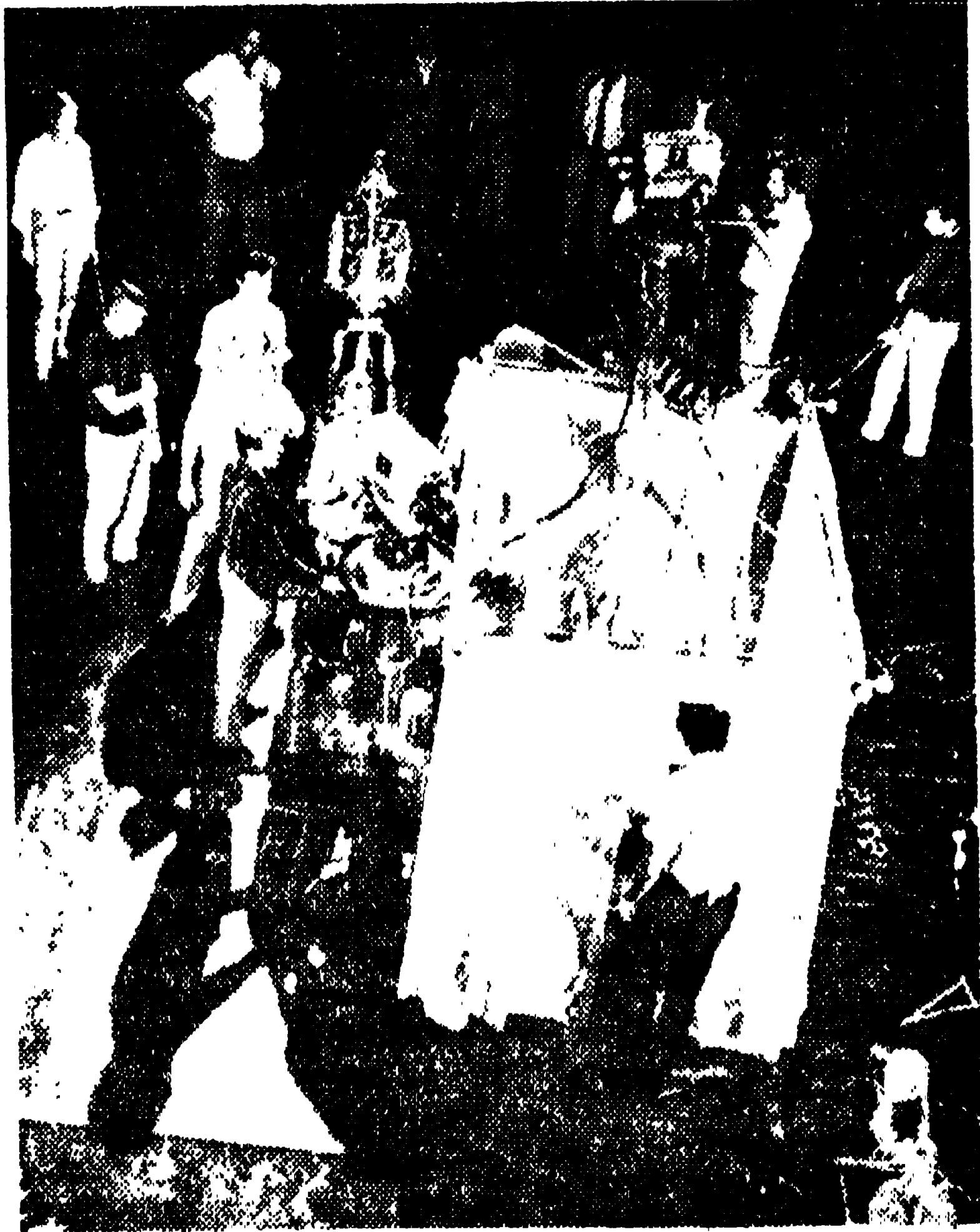
অপেরার কোনো একটি অংকের জন্য শব্দ ও সংগীত গ্রহণের সময় প্রধানতঃ পাঁচটি পর্যায় চোখে পড়ে। এই পর্যায়গুলি হলো : (১) প্রথম পরীক্ষা (প্রধান অভিনেতা, নর্তক-নর্তকী এবং মূক অভিনেতাকে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করা হয়), (২) "ঠান্ডা" পরীক্ষা (অপেরার কোনো একটি নির্দিষ্ট অংকের সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মঞ্চের ওপর একসঙ্গে পরীক্ষা করা হয়), (৩) "উষ্ণ" পরীক্ষা (অভিনেতাকে অভিনয়ের পোশাক পরে ক্যামেরার সামনে হাজির হতে হয়), (৪) সাধারণ পরীক্ষা এবং (৫) শব্দ ও চিত্রগ্রহণ। কোনো একটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের সময় দৃশ্যের চারপাশে একাধিক ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যায়। দুজন আলোকচিত্রশিল্পী ও তাদের সহকারী উভয় সহ-পরিচালক, মঞ্চ-পরিচালক এবং আরও অনেক লোক সংশ্লিষ্ট দৃশ্যের চারপাশে ভিড় করেন।

ব্যালে কিংবা অপেরায় রক্তমাংসের কায়ার আবেদন কখনই ছায়াচ্ছন্ন হবার নয়। এছাড়াও আরেকটা বড় বাধা ব্যালে অথবা অপেরাকে চলচ্চিত্রায়িত করা। বিশেষ করে একটি পূর্ণাঙ্গ অপেরাকে টেলিভিশনের উপযোগী করে নির্মাণ করা সহজ না। স্টুডিওগুলোতে যেভাবে ছবি তোলা হয়, ঠিক সেইভাবে অপেরার চিত্রগ্রহণ সম্ভব না। চলচ্চিত্রের জন্যে চিত্রগ্রহণ করা হয় একটু একটু করে। একটু একটু করে চিত্রনাট্য-নির্দেশিত পথে চিত্রগ্রহণ করার পর, সম্পাদনা করে একটি কাহিনী দাঁড় করানো হয়। অপেরা ঠিক সেইভাবে তোলা সম্ভব না। কারণ অপেরার দৃশ্যগুলি সাধারণতঃ সংগীত সঙ্গী। অতএব সঙ্গীতের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ করতে হয়। আবার টেলিভিশনের জন্যে তোলা অপেরার চিত্রগ্রহণ স্বভাবতঃই বিশেষ সংক্ষেপিত না হলে পরিশ্রমের দাম সময়ের চেয়ে বেশী হয়ে পড়ে। টেলিভিশনের জন্যে চিত্রগ্রহণ কালে সময়কেই একমাত্র মহার্ঘ্য ভাবতে হয়।

॥ টেলস অফ হফম্যান ॥

কোলোন টেলিভিশন (পশ্চিম জার্মান রেডিও) "টেলস অফ হফম্যান" নামে একটি টেলিভিশন অপেরা তুলছেন। অপেরাটির প্রণেতা হলেন কোলোনেরই জনৈক প্রখ্যাত সুরকার জ্যাকুয়েস অফেনবাখ্। অফেনবাখ্ প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে লব্ধকীর্তি। কোলোন টেলিভিশন উনবিংশ শতাব্দীর স্বপ্নসঞ্চারী কাহিনীটিকে বিস্ময়করভাবে বিংশ শতাব্দীর টেলিভিশনে রূপায়িত করেছেন।

*
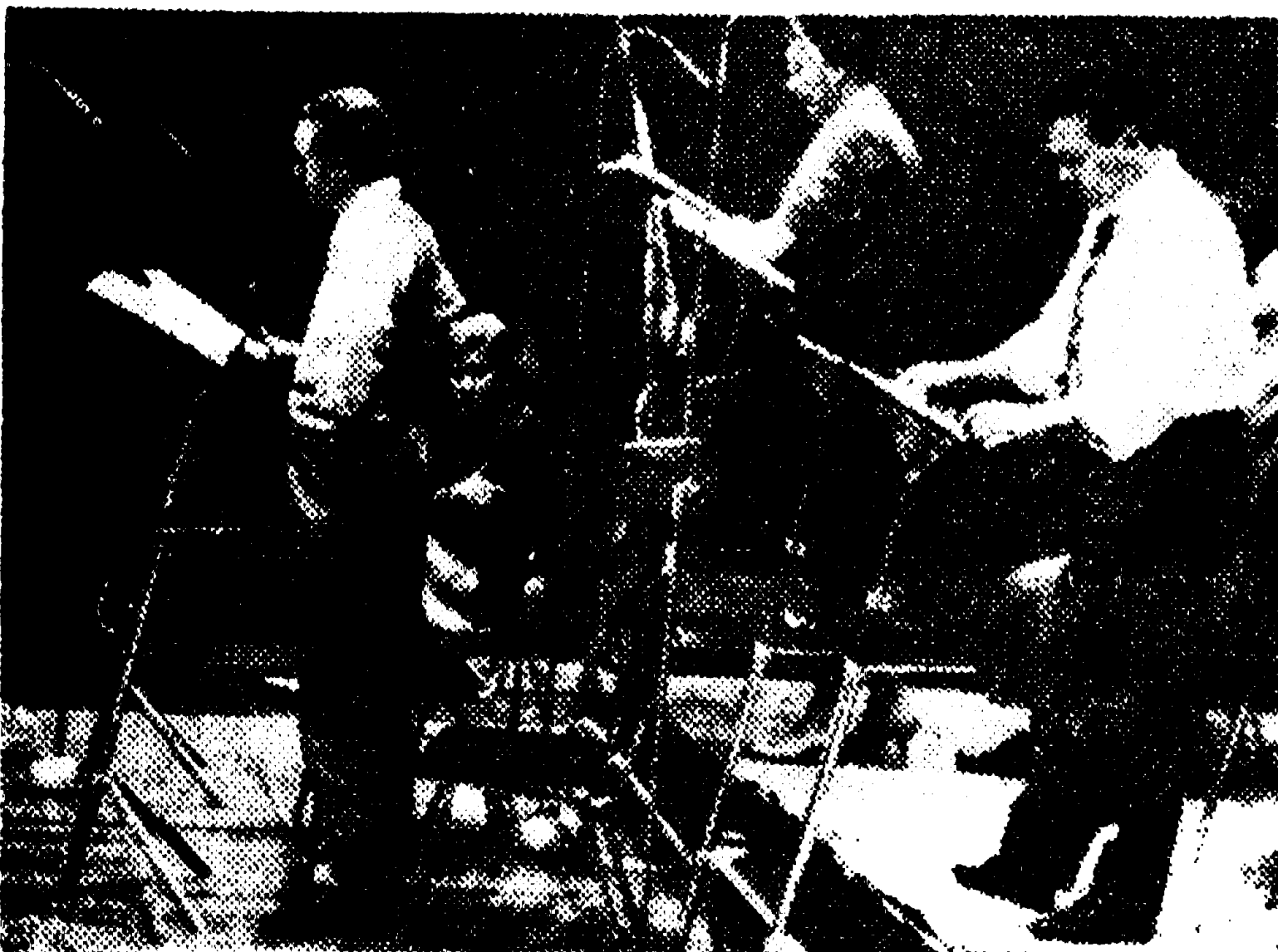
একজন প্রধান আলোকচিত্রশিল্পী ও তাঁর পাঁচজন সহকারী "হফম্যানের কাহিনী" নামক অপেরাটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। চিত্রগ্রহণের সময় পাঁচটি ইলেকট্রনিক ক্যামেরাকে তার দিয়ে রিলে-যানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রিলে যানে ছবির ঔজ্জ্বল্য ও গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করার পর ছবিগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সেখান থেকে ভালো ভালো ছবিগুলি বেছে নেন। ইলেকট্রনিক ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রগ্রহণের সময় সংগীত অবশ্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ, সংগীতের গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোকচিত্রশিল্পীর জন্য সময় বরাদ্দ করা হয়। আগে সাধারণতঃ কোনো একটি দৃশ্যের বিভিন্ন অংশের ছবি পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু নয়া পদ্ধতি অনুসারে আলোকচিত্রশিল্পীকে ধারাবাহিকভাবে চিত্রগ্রহণ করতে হয়। কাজটি যে কত শক্ত, এই ছবিটি দেখেই তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়: নর্তকী ড্রুসকা জিফানিয়োস নাচতে নাচতে তিন নম্বর ক্যামেরার সামনে এসে হাজির হয়েছেন, কারণ এই ক্যামেরায় হফম্যানের ছবিটি ধরা পড়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই তাঁকে আবার চার নম্বর ক্যামেরার সামনে [illegible] দেখা যাচ্ছে।

*

[illegible] অধিকতর উন্নত [illegible] জন্যে টেলিভিশন অপেরায় সংগীত ও চিত্র পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ মঞ্চের তুলনায় এক্ষেত্রে অভিনেতাকে গায়ক হিসাবে অনেক বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হয়। অভিনয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে অভিনেতা এখানে প্রথমে মাইক্রোফোনের সামনে গান গান এবং পরে পরিচালকের নির্দেশমতো এই গানের সঙ্গে তাল রেখে মূক অভিনয় করেন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

চলচ্চিত্রে ক্লাসিক :

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাংকন, নৃত্য, নাটক ও অভিনয়, কাব্য প্রভৃতি যত রকম ললিতকলার সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্র হচ্ছে সর্বকনিষ্ঠ। লুমিয়ার ব্রাদার্সকে চলচ্চিত্রের জনক মেনে নিয়ে ১৮৯৫ সালে প্যারিসের 'কাফে দ্য লা পেই'-এর চিত্র-প্রদর্শনীকে প্রথম চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী আখ্যা দিলে চলচ্চিত্রের বয়স আজ মাত্র আটষট্টি বছর —শতায়ু হ'তে এখনও অন্ততঃ বত্রিশ বছর দেরী। অথচ সকল ললিতকলার মধ্যে জনপ্রিয়তা এবং প্রভাবের দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের জুড়ী আর দু'টি নেই। তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, একজন রঙ্গালয়ের দর্শকের স্থানে অন্ততঃ দু'শো জন চলচ্চিত্রের দর্শক আছেন: একজন সঙ্গীতানুরাগীর জায়গায় চার শো জন চলচ্চিত্রানুরাগীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, মাত্র আটষট্টি বছরের জীবনে দ্রুত বিবর্তনশীল এই ললিতকলাটি কত না বিচিত্র ধারায় মানুষের সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভাকে নিয়োজিত করেছে! নির্বাক থেকে সবাক, সাদা এবং কালোর সমন্বয়ে গঠিত চিত্র থেকে রকমারী বর্ণ-সুষমাময় চিত্র, মাত্র গতিশীল চিত্রখণ্ড থেকে কাহিনীচিত্র, কার্টুনচিত্র, তথ্য-চিত্র, সংবাদচিত্র, ত্রিমাত্রিকচিত্র প্রভৃতি কত রকমের চলচ্চিত্রেরই না জন্ম হয়েছে। বর্তমান জগতের চলচ্চিত্র-প্রস্তুতকারী দেশগুলি প্রতি বছর অন্ততঃ দু' হাজার কাহিনীচিত্রেরই জন্ম দিচ্ছে। এবং চলচ্চিত্রের আটষট্টি বছরের জীবনে শিল্পে প্রতিভার অসামান্য নিদর্শন ব'লে আখ্যা দেওয়া এমন চলচ্চিত্রের সংখ্যাও অন্ততঃ এক হাজারের কম হবে না। পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার সাহায্যে এই বিশেষ শিল্পটির জন্ম হয় ব'লে চলচ্চিত্রসৃষ্টির প্রয়োগরীতি নিত্য নতুন ধারাকে অবলম্বন করে এবং কাল যে-চলচ্চিত্রখানি দর্শক-মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, আজ তাকে নিতান্ত সাধারণ ব'লেই মনে হয়। চলচ্চিত্র বড্ডাশগ্‌গির পুরোনো হয়ে যায় ব'লে আমাদের এই বাঙলাদেশে মাত্র পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর আগে তোলা চণ্ডীদাস, মীরাবাঈ, দেবদাস, ভাগ্যচক্র, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ছবি আজ ক্লাসিকের পর্যায়ে প'ড়ে গেছে, অর্থাৎ ও-গুলি আজকের দিনের দর্শককে আনন্দ দিতে না পারলেও বিগত দিনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতির তিরিশ বছর আগেকার লেখা আজও সদ্যফোটা ফুলেরই মত আদৃত হয়। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, সুবার্টের 'আনফিনিস্‌ড্‌ সিম্ফনী' আজকের রসিকচিত্তকে সম্ভবতঃ ঠিক সেইভাবেই মুগ্ধ করে, যেভাবে এই শিল্পকীর্তিগুলি তাদের জন্মের সমসাময়িক কালের লোকেদের করেছিল।

তাহ'লে কি জগতের চলচ্চিত্রসংসারে এমন ছবির জন্ম কোনো দিনই হয়নি, যা আজকের দর্শককেও পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে? যা দেশ-কালের অতীত হয়ে অবিনশ্বরত্ব লাভের অধিকারী ব'লে স্পর্ধা করতে পারে? কিছুদিন আগে ইয়োরোপের বেলজিয়াম চলচ্চিত্র-সংস্থার উদ্যোগে অতীত থেকে প্রায় বর্তমান যুগ (১৯৪৫।৪৬ সাল) পর্যন্ত প্রস্তুত কাহিনী চিত্রগুলির মধ্যে সর্বকালীন চলচ্চিত্র হিসেবে শ্রেষ্ঠগুলিকে
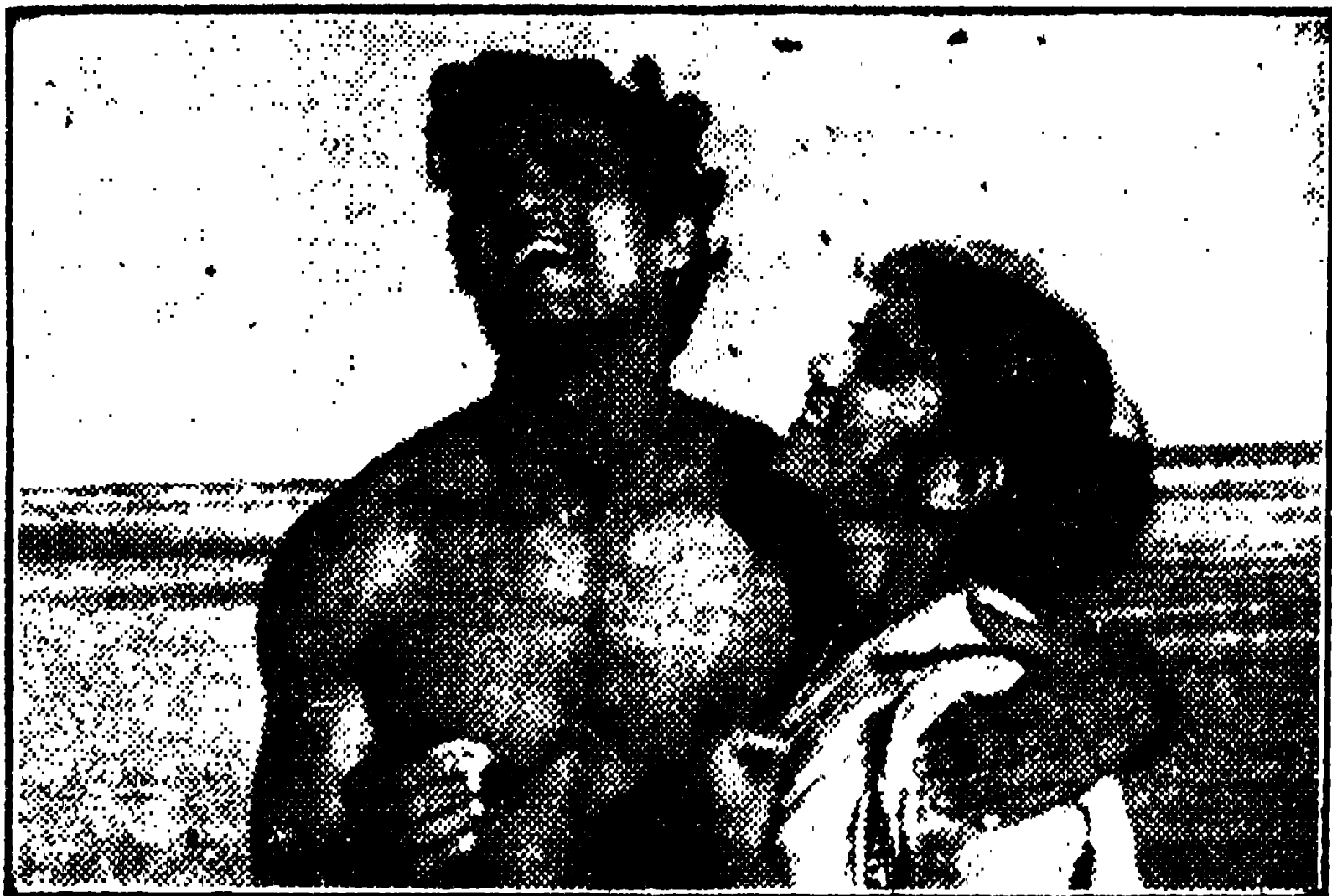
রেনেসাঁ ফিল্মস্‌-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" চিত্রের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নবাগত শঙ্কর ও শম্পা।

খুঁজে বার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে ১১৭ জন বিশেষজ্ঞ ২৬টি দেশের চলচ্চিত্র ঘেঁটে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বারোটি চলচ্চিত্রের নাম ঘোষণা করেন। আজকের দিনে এই বারোটি চলচ্চিত্রের শিল্পমূল্য বিচার ক'রে তাদের পর পর সাজাবার জন্যে কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন তরুণ চলচ্চিত্র-পরিচালককে আহ্বান করা হয়; বলা বাহুল্য, আমাদের সত্যজিৎ রায়ও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। এঁদের রায় অনুসারে ক্রমিক মান অনুসারে চলচ্চিত্রগুলির নাম হচ্ছেঃ ব্যাট্‌ল্‌শিপ পোটেমকিন, দি গোল্ড রাশ, বাইসিক্‌ল থীভস্‌, দি প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক, লা গ্রাঁডে ইলিউশান, গ্রীড, ইন্‌টলারেন্স, মাদার, সিটিজেন কেন, আর্থ, দি লাস্ট লাফ এবং দি ক্যাবিনেট অব ডক্টার ক্যালিগ্যারী। কিন্তু এ ছাড়াও আরও বহু ছবির নাম করতে পারা যায়, যারা হয়ত আজও পুরোনো হয়নি; যেমন স্টর্ম ওভার এশিয়া, কুয়ো ভেডিস, মারে নোস্ট্রাম, ইয়ার্লিং, ম্যান ওম্যান ম্যারেজ, সিটি লাইট্‌স প্রভৃতি। চিত্ররসিকদের মনে নিশ্চয়ই বাসনা জাগে, এই শিল্প-নিদর্শনগুলিকে আজকের দিনেও প্রত্যক্ষ ক'রে বাজিয়ে দেখতে যে, তারা সত্যিই কালজয়ী হবার স্পর্ধা রাখে কিনা?

চিত্র সমালোচনা

বেনারসী (বাঙলা)ঃ ফিল্ম ক্রাফ্‌ট প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন, ১১,২২৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনীঃ বিমল মিত্র; চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ অরূপ গুহঠাকুরতা; সঙ্গীত-পরিচালনাঃ আলি আকবর খান; গীত-রচনাঃ শৈলেন্দ্র, ন্যায় শর্মা ও নরেন গাঙ্গুলী; চিত্রগ্রহণঃ দীনেন গুপ্ত; শব্দধারণঃ দুর্গাদাস মিত্র; সম্পাদনাঃ হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনাঃ রবি চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণঃ রুমা গুহঠাকুরতা, রাজলক্ষ্মী, সীতা, শেফালী, মেনকা, মধুছন্দা, সুমিত্রা, সুরুচি সেনগুপ্তা, বাণী গাঙ্গুলী, আশা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, মমতাজ আহমেদ, তুলসী চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, জন ক্যাবাস প্রভৃতি। হিন্দুস্থান সুপার ফিল্মস্‌-এর পরিবেশনায় গেল ২১-এ সেপ্টেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ, লোটাস, আলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখা না হচ্ছে।

"বেনারসী"র কাহিনীতে যে বৃহৎ জীবনজিজ্ঞাসা তুলে ধরা হয়েছে এবং ছবিখানির মধ্যে যার বেদনাময় রূপ দর্শককে অভিভূতপ্রায় ক'রে তোলে, আজকের পরিবর্তিত সমাজজীবনে তার আবেদন কতখানি, এ-প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠবে। মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ বারবিলাসিনী পর্যন্ত বহু নারীই আজ কোনো-না-কোনো পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী রূপে সমাজে বিচরণ করছেন এবং তাঁদের বিগত জীবন সূর্যালোকের মতই স্পষ্ট ক'রে জানা থাকলেও আজ আর কেউ তাঁদের সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তোলে না।

কিন্তু তাই ব'লে "বেনারসী" চিত্রের প্রত্যক্ষ আবেদন অগ্রাহ্য করবার মত নয়। বাঙলাদেশের পল্লীগ্রাম বেলেডাঙার হঠাৎ-হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে সোনা বাঙালী বাড়ীউলী মাসীর পোষা মেয়ে সোনা কি কারণে "বেনারসী" নামে ভূষিত হয়েছিল, সে-সংবাদ অজ্ঞাত থাকলেও বেনারসী যে রোজ রাত্রে নেচে-গেয়ে মুজরো ক'রে মনপ্রাণে হাঁপিয়ে উঠেছিল, নামে বাঈজী হ'লেও আসলে সে যে আর পাঁচটি বাঙালী ভদ্রমেয়ের মতই স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, বাঈজী বাড়ীর পরিবেশের সঙ্গে সে যে নিজেকে মনেপ্রাণে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, ছবির প্রথমাংশে সে-তথ্য অত্যন্ত শিল্প-সম্মতভাবে বিধৃত হয়েছে। তাই যেইমাত্র তার সামনে তার বহুকাল আগে হারিয়ে-যাওয়া গ্রামের রতনদা' সশরীরে আবির্ভূত হ'ল, তখন তার অন্তরের ঘর বাঁধবার আদিম বুভুক্ষা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে খুব বেশী সময় নেয়নি এবং সত্যিই যখন তার রতনদা' নতুন চাকরী নিয়ে অনুপপুরে যাবার জন্য তৈরী হ'ল, তখন ভবিষ্যৎ বেছে নিতে তার অনুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। বিয়ের ঝঞ্ঝাট কালীঘাটেই চুকিয়ে অনুপপুরের নতুন বাসায় যখন সে রতনের পিছু পিছু প্রবেশ করল, তখন তার মন নিরুচ্ছ্বাস আনন্দে ভরপুর। অনভ্যস্ত সাংসারিক জীবনকে সহজ ক'রে নিতে তার বিন্দুমাত্র সময় লাগল না এবং রেল-কলোনীতে মধুখুঁজে গিন্নী রূপে তার আসন হ'ল পাকা। পরহিতব্রতী রতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ

সদ্যমুক্ত "বেনারসী" চিত্রের নাম-ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতা

করতে না পারার ক্ষোভ মাঝে মাঝে তাকে ম্রিয়মান ক'রে তুললেও কলোনীর অনাড়ম্বর সহজ জীবনের মাদকতা তাকে এনে দিয়েছিল পরিপূর্ণতা—বহুজনের প্রীতি, স্নেহ, প্রশংসায় তার জীবন হয়ে উঠেছিল ধন্য। কিন্তু বিনা মেঘে হ'ল বজ্রাঘাত: সবার প্রশংসাধন্য চোখের

সামনে মুখুজ্জেগৃহিণী হঠাৎ এক নিমিষে পরিণত হ'ল বেনারসী-বাঈয়ে। বাঈজী-বাড়ীর বন্ধু শেঠজীর দোস্ত প্রশান্ত সরকার তাকে চিনে ফেলেছে। ছি-ছি-কারে আকাশ বাতাস ভ'রে গেলো। লজ্জায় ঘৃণায় বেনারসী তার প্রাণপ্রিয় রতনকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হ'ল। কিন্তু রতন তো মুক্তি চায় না: যে সোনাকে সে একবার কণ্ঠে ধারণ করেছে, তাকে পথের ধুলোয় ফেলে দেবে সে কোন্ অপরাধে? তাই রতন-সোনা একই সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল নতুন কোনো পথের সন্ধানে।

পর্দায় কাহিনীটিকে শুরু করা হয়েছে বাঈজীবাড়ীতে বেনারসীর নাচ-গানের ভিতর দিয়ে, যেখানে ক্ষণে ক্ষণে তার মন অবসাদে ভরে উঠছে পাশের বাড়ীর গার্হস্থ্য পরিবেশ দেখে। পরে যখন চাকুরীজীবী রতন তাকে পথের মাঝে আচম্বিতে আবিষ্কার ক'রে তার বন্ধু মন্টুকে অতীত কাহিনী বিবৃত করে তখনই চিত্রনাট্যকার আমাদের নিয়ে আসেন বেনারসীর অতীত জীবনে, যখন সে ছিল গাঁয়ের মেয়ে সোনা এবং গাঁয়ের ছেলে রতনের খেলার সাথী এবং কলকাতায় সূর্যগ্রহণে স্নান করতে এসে রতনেরই নির্বুদ্ধিতার জন্যে বদ্ লোকের দ্বারা অপহৃত হয়। সোজা গল্প না ব'লে ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে রতন-সোনার অতীত বাল্যজীবন বর্ণনা ক'রে চিত্র-নাট্যকার যেমন মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই কাহিনীর স্থানে স্থানে প্রতীকধর্মী দৃশ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর শিল্পবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। তবে ঘটনার অভাবজনিত পুনরাবৃত্তির দোষে চিত্রনাট্যটি কয়েক জায়গায় তার গতিশীলতাকে হারিয়ে ফেলেছে।

"বেনারসী"র কাহিনীকে পর্দার ওপর অত্যন্ত বাস্তব ভঙ্গীতে প্রতি-ফলিত করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে পরিচালককে অসামান্যভাবে সাহায্য করেছেন চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত এবং শিল্পনির্দেশক রবি চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে বহির্দৃশ্য আছে প্রচুর এবং সেগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তোলা হয়েছে, যার ফলে তাদের অধিকাংশই শিল্প-শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। বহির্দৃশ্যগুলির শব্দযোজনার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে এবং ফলে পাত্রপাত্রীদের সংলাপ সহজ-বোধ্য ও শ্রুতিসুখকর হয়েছে।

ছবিতে গান আছে তিনটি এবং সবগুলিই হিন্দী। বাঙালীপাড়ার বাঈজীরা,—যারা অনবরত মাসীর খোঁচা খায় এবং বাঙলাতেই কথাবার্তা কয়,—তারা সব সময়েই কি হিন্দী গানই গেয়ে থাকে? বাঙলা গান গাইলে কি বাঈজীত্ব থাকত না? এমন কি রেলওয়ে কলোনীতে যেখানে ঘটা ক'রে দুর্গোৎসব হয়, সেখানে দোলের দিনে "ফাগুয়া" "হোরী" ইত্যাদির সঙ্গে হিন্দী গানের প্রয়োজন দেখা দিল কেন? বাঙলা হোলির মন-মাতানো গানের সঙ্গে কি পরিচয় নেই? অবশ্য গান তিনটিই সুগীত। আবহ শব্দ ও সংগীত ছবির ভাববিন্যাসে প্রচুর সহায়তা করেছে। সম্পাদনার কাজ ছবিকে আরও গতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারত না কি? কিংবা বেনারসীর মনের ক্লান্তিকে ছবির মধ্যে তুলে ধরবার জন্যেই গতিকে স্থানে স্থানে স্বেচ্ছায় শ্লথ করা হয়েছে?

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হচ্ছেন রুমা গুহঠাকুরতা। নাচে, গানে, অভিনয়ে তিনি বেনারসী চরিত্রটিকে

পর্দার ওপর জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। নিয়তির চক্রে বাঈজী-জীবনকে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লেও তার প্রতি বেনারসীর বিজাতীয় ঘৃণাকে তিনি প্রকাশ করেছেন, চোখের করুণ উদাস ভঙ্গীতে এবং কণ্ঠস্বরের নির্লিপ্ততায়। রেল কলোনীর নতুন জীবনে পল্লীবালা সোনা যেন তাকে নতুন ক'রে ফিরিয়ে পেয়েছে—এমনই স্বচ্ছন্দ আন্তরিকতাপূর্ণ হয়েছে তাঁর অভিনয়। রতনের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন, ছেলেবেলার আদরের সাথী সোনাকে পাপপঙ্কের ভেতর থেকে উদ্ধার করার জন্য রতনের চরিত্রের যে-অস্থিরতা এবং একাগ্রতা, তা' সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। কিন্তু সোনাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই যেন রতনের মিশন শেষ হয়ে গিয়েছে; তার প্রতি রতনের যেন আর কোন কর্তব্য নেই, এমনই ভাবে চরিত্রটি চিত্রিত হবার ফলে ছবির মধ্যভাগে রতন যেন গতানুগতিক। আবার শেষাংশে সোনা যখন তার বিগত জীবনের অপবাদ প্রকাশের ফলে সমাজ-পরিত্যক্ত, তখন আবার যেন রতন সজাগ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৌমিত্রর অভিনয়ও। অপরাপর ভূমিকায় স্বভাব-সিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন তরুণকুমার, রাজলক্ষ্মী, তুলসী চক্রবর্তী, অনুপকুমার ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

অভিযাত্রিক-এর "অভিযান" :

আজ শুক্রবার, ২৮এ সেপ্টেম্বর থেকে অভিযাত্রিক প্রযোজিত এবং সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অভিযান" প্রদর্শিত হবে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই ছবিখানিতে দেখতে পাওয়া যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, অরুণ রায়, বীরেশ্বর সেন, রুমা গুহ-ঠাকুরতা এবং বাঙলা চিত্রজগতে নবাগতা হিন্দী চিত্রের স্বনামধন্যা নায়িকা ওয়াহিদা রেহমানকে। ছবিটির পরিবেশনা গ্রহণ করেছেন ছায়ালোক।

এস্, জি, প্রোডাকসন্স-এর "শুভদৃষ্টি":

আসছে বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অকটোবর থেকে এস্, জি, প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং চিত্ত বসু পরিচালিত "শুভদৃষ্টি" ছবিখানি জনতা পিকচার্সের পরিবেশনায় উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী এবং অপরাপর ছবিঘরে মুক্তিলাভ করবে। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত "কাঁটা ও কেয়া" অবলম্বনে গঠিত এই ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, গীতা দে, ছবি বিশ্বাস, তরুণ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পী। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন।

মেলোডি ইণ্টারন্যাশানাল-এর "বনানী কন্যা":

মেলোডি ইণ্টারন্যাশানাল পিকচার্সের প্রথম চিত্র-অবদান 'বনানী কন্যা'। গোপাল রায় লিখিত একটি মিষ্টি-মধুর কাহিনী অবলম্বনে চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী। সুরারোপে রয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী। প্রযোজনা করছেন কমল ঠাকুর ও হরপ্রসাদ নাথ। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ইস্টার্ণ ফিল্মস। ভূমিকায় রয়েছেন—অসীমকুমার, মঞ্জুলা, ভারতী রায়, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ দাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কবিতা সরকার ও আরো অনেকে।

চিত্রবাহার-এর "মউঝুরি":

সাঁওতাল পরগণার এক পরিচয়হীনা মেয়ের জীবনেতিহাস নিয়ে গঠিত

অগ্রগামীর 'নিশীথে' চিত্রে উত্তমকুমার ও রাধামোহন

"মউঝুরী"র কাজ ইস্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্ত হচ্ছে। ডাঃ কৃষ্ণপদ দে প্রযোজিত এবং শিব ভট্টাচার্য পরিচালিত এই ছবিখানির চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশ এবং সঙ্গীত-পরিচালনায় যথাক্রমে রয়েছেন বিজয় দে, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মান্না দে।

বার্ণপুরের "মুক্তধারা সম্প্রদায়"এর নবতম প্রয়াস :

আসচে ৩০শে সেপ্টেম্বর "মুক্তধারা সম্প্রদায়" স্থানীয় ভারতী ভবন মঞ্চে "একাঙ্ক উৎসব"-এর আয়োজন করেছেন। উৎসবে মোট তিনটি একাঙ্ক অভিনীত হবে। উৎসবের অন্যতম নাটক "মিছিলে মিছিলে" ইতিপূর্বে গণনাট্য সঙ্ঘের একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় অভিনীত ও উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। অপর দুটি একাঙ্কিকাও বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও প্রয়োগরীতিতে অভিনব হবে আশা করা যায়। উল্লেখযোগ্য, তিনটি একাঙ্কই সম্প্রদায়ের সংগঠন কর্তৃক রচিত।

রবীন্দ্র উদ্যানে যাত্রা উৎসবের পরিসমাপ্তি :

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত বিরাট যাত্রা উৎসব ৩০-এ আগস্ট আরম্ভ হয়ে ২৩-এ সেপ্টেম্বর শেষ হ'ল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০-এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩১টি অভিনয়-আসরে সমাপ্তি ঘটবার পরিবর্তে আরও তিনদিন এবং মোট ৩৯টি আসর পর্যন্ত উৎসবটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হ'ল যাত্রামোদী দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে। লক্ষ্য করা গেল, আজকের শহরেও যাত্রামোদী দর্শকের সংখ্যা অগণিত এবং প্রয়োজনমত সুবন্দোবস্ত করতে পারলে অন্ততঃ দশ হাজার লোকও একসঙ্গে ব'সে যাত্রা দেখবার জন্যে উৎসুক। বোঝা গেল যে, প্রচুর যানবাহনের চলাচলে সরগরম রাজপথের পাশের রবীন্দ্র উদ্যান (ভূতপূর্ব বিডন উদ্যান তথা কোম্পানীর বাগান) তার উপযুক্ত স্থান নয়। আরও দেখা গেল, অপেশাদারী যাত্রাদল থেকে পেশাদারী যাত্রাদলগুলি অধিক মাত্রায় জনপ্রিয়। এবং ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে নবরঞ্জন অপেরা, নাট্যভারতী, নট্ট কোম্পানী, নিউ গণেশ অপেরা, অম্বিকা নট্ট কোম্পানী, আর্য অপেরা প্রভৃতির জনপ্রিয়তা বেশী। প্রথম বছরের আয়োজন ব'লে ব্যবস্থাপনায় বহু রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই ছিল এবং সেই জন্যে কারণে এবং অকারণে দর্শকবৃন্দ কখনও কখনও অধীর ও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলেন কিন্তু তবু প্রশংসা করব তাঁদের, যাঁরা এই দীর্ঘ উৎসবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন; বহু উত্তেজনার কারণ ঘটলেও সারাক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্যপালন করতে চেষ্টা ক'রেছেন সাধ্যমত। আশা করব, পরিষদের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকারের নেতৃত্বে আসচে বছর বৃহত্তর যাত্রা উৎসবের আসর বসবে উপযুক্ততর

'কুমারী মন' চিত্রে কণিকা মজুমদার ও অনিল চ্যাটার্জি

স্থানে এবং প্রায় নিখুঁত পরিবেশের মধ্যে সেই উৎসব পালিত হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আশা করব, পেশাদারী যাত্রা সম্প্রদায়গুলি এমন নাটক নিয়ে শহুরে দর্শকদের সম্মুখীন হবেন, যা অনায়াসে তাঁদের চিত্তকে জয় ক'রে কলকাতা শহরে সম্প্রদায়গুলিকে স্থায়ী সম্ভ্রমের আসনে বসাতে সক্ষম হবে।

আর্য অপেরার "কবরের কান্না" (যাত্রাভিনয়) :

রবীন্দ্রকাননের যাত্রা উৎসবের একটি আসরে ছিল আর্য অপেরার "কবরের কান্না"'র যাত্রাভিনয়। মুঘল আমলে শের আফগান প্রথমে ছিলেন বাঙলার সুবেদার এবং পরে বিদ্রোহ ক'রে তিনি কিছুদিনের জন্যে হয়েছিলেন বাঙলার নবাব শের শাহ। বর্ধমান থেকে দিল্লী পর্যন্ত তাঁরই আমলে তৈরী রাজপথটি ইংরেজ কোম্পানী দ্বারা একদিকে কলকাতা অপর দিকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড নামে পরিচিত। শোনা যায়, শের আফগানের স্ত্রী মেহেরউন্নিসা যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে গোপন প্রণয়াবদ্ধ ছিলেন এবং এই গোপন প্রণয়ই পরে সেলিম যখন ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীর হয়ে দিল্লীর রাজতক্তে বসেন, তখন তাঁর সঙ্গে শের আফগানের ঘোরতর শত্রুতার কারণ হয়। এই প্রণয়-ঘটিত দ্বন্দ্বকে আশ্রয় ক'রেই বর্তমানের প্রথামত নানা কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার সৃষ্টি ক'রে "কবরের কান্না" রচনা করেছেন নাট্যকার কানাইলাল নাথ। এবং শের আফগানের মুখ দিয়ে বাঙলার জয়গান ও হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই ইত্যাদি চিত্তহারী বাক্যের 'তুবড়ী' ছুটিয়ে তিনি সাধারণ দর্শকচিত্তকে জয় করবার পথকে প্রশস্ত করেছেন। অভিনয়ে যাত্রা-জগতের জনপ্রিয় সুদর্শন নট স্বপন-কুমার শের আফগানের ভূমিকায় তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় সুনীল মুখোপাধ্যায় (রামুবাবু) যাত্রাভিনয়ে স্বাভাবিকতা অবলম্বন ক'রে রসিক দর্শকদের তৃপ্তি দেন। এ ছাড়া ফণী গাঙ্গুলীর ইমান আলি, পশুপতি কুণ্ডুর জ্যোতিষী এবং বিষাণ হালদারের মেহেরউন্নিসা দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। ছায়া-আনারকলি বেশে সুদর্শনের গান অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের এবং পরম উপভোগ্য হয়।

ষোড়শীকুমার সংবর্ধনা :

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ একটি সৌখীন অপেশাদারী নাট্যসংস্থা। গেল সাত বছর ধ'রে এ'রা বহু একাঙ্কিকা এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চস্থাপনা, অভিনয়রীতি, আঙ্গিক প্রভৃতি সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে নাট্যরসিক-মহলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সংস্থার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, নাট্য-পরিচালক এবং অভিনেতা ষোড়শীকুমার মজুমদারের নাম তাঁদের কাছে নূতন নয়। অভিনেতা হিসেবে ষোড়শীকুমারের জীবন শুরু হয় আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, যেদিন তিনি চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সেকেন্দার-শাহ এবং জনৈক পথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সেদিন থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত তিনি বহু নাটকের বহুতর স্ত্রী এবং পুরুষ চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ ক'রে নিজের বহুমুখী নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেদিনও যেমন, আজও তেমনি সৌখীন অভিনেতাই রয়েছেন; কোনোদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগদানের চেষ্টা করেননি। অভিনয় তাঁর নেশা হ'লেও তাকে পেশাতে তিনি রূপান্তরিত করতে তাই চাননি কোনোদিনই। বঙ্গীয় নাট্য-সংসদের জন্মের দিন থেকেই তিনি তার একজন নিয়মিত অভিনেতাই শুধু নয়, তার নাট্যপরিচালনারও দায়িত্ব পালন ক'রে আসছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। গেল শনিবার, ২২-এ সেপ্টেম্বর সংসদ-সভ্যরা ষোড়শীকুমারের নটজীবনের পঁয়তাল্লিশ বৎসর-পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে মিলিত হয়েছিলেন। নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে

ষোড়শীকুমারের নাট্যপ্রতিভাকে স্বীকার ক'রে এবং সংগে সংগে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। ঐ সংগে মূল্যবান লেখনী এবং ধুতি-চাদর স্বারা তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ষোড়শীকুমারের গুণকীর্তন ক'রে সভায় সোমেন নন্দী, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পবিত্র গংগোপাধ্যায়, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মন্মথ রায় তাঁদের ভাষণ দেবার প'রে ষোড়শীবাবু অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর নাট্যনিষ্ঠার কথা ব'লে সকলের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে আবৃত্তি, নৃত্য এবং যন্ত্রসংগীত সহযোগে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের পর সভার কাজ শেষ হয়।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা :

টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয় গত বৃহস্পতিবার যাত্রিক গোষ্ঠীর 'পলাতক' ছবির প্রথম দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হল। এই উপলক্ষ্যে এই ছবির প্রযোজক ভি শান্তারাম সেদিন চিত্র-গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত পত্র-পত্রিকার চিত্র-সাংবাদিকদের সংগে এক চা-চক্রে মিলিত হন। মনোজ বসুর 'আংটি চ্যাটার্জির ভাই' একটি ছোট গল্প অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। একজন ভবঘুরের চরিত্র নিয়ে এ কাহিনীর মূল বক্তব্য। এই বিশেষ চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন বাংলার অনুপকুমার। এর আগের সংখ্যায় ছবির অন্যান্য চরিত্রলিপি ও কলাকুশলীদের নাম জানানো হয়েছে। অক্‌টোবর মাসের শেষে বোম্বাইয়ে এ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। সংগীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতগ্রহণ বম্বে গৃহীত হবে। যাত্রিকগোষ্ঠীর পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম হলেন তরুণ মজুমদার, দিলীপ মুখার্জি ও শচীন মুখোপাধ্যায়।

স্টার থিয়েটারের চলতি নাটক 'শেষাগ্নি'তে আশীষকুমার ও লিলি চক্রবর্তী

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় পরিচালক তপন সিংহ 'নির্জন সৈকতে' ছবির দৃশ্য-গ্রহণ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কালকূট রচিত এ কাহিনীর প্রযোজনা করছেন সরকার প্রোডাকসন্স নিউ থিয়েটার্স এক্‌জিবিটার্স প্রাঃ লিঃ। দুটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন রুমা গুহ-ঠাকুরতা, ভারতী দেবী, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাংগুলী, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। সংগীত-পরিচালক কালীপদ সেন-এর পরিচালনায় এ ছবির দুটি রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারীতে। আলোকচিত্র-শিল্পী, শিল্পনির্দেশক ও শব্দ-গ্রহণে রয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায়, সুনীতি মিত্র ও অতুল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক সুবোধ রায়। আগামী অক্‌টোবরে 'নির্জন সৈকতে'-র বহির্দৃশ্যের কাজ শুরু হবে পুরী-ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন জায়গায়।

রাজীব পিকচার্সের 'হাই হিল' সম্প্রতি শেষ হয়েছে। দিলীপ মিত্রের পরিচালনায় এ ছবিতে অভিনয় করেছেন কমেডি-শিল্পী সকলেই। নায়ক ও নায়িকা হলেন অনিল চ্যাটার্জি ও সন্ধ্যা রায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ফণী

শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্সের 'নবদিগন্ত' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী

গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক ভট্টাচার্য এ ছবির যথাক্রমে সংগীত-পরিচালক, কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার।

এস সি প্রোডাকসন্সের 'শুভ দৃষ্টি' মুক্তি প্রতীক্ষিত। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ ছবির সংগীত-পরিচালক। বিভিন্ন রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কালী ব্যানার্জি, দীপিকা দাস, অনুপকুমার, গীতা দে, সন্ধ্যারাণী, জহর গাঙ্গুলী, মমতাজ আহমেদ ও ছবি বিশ্বাস।

বোম্বাই :

শর্মিলা ঠাকুর হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন।

সম্প্রতি প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর আগামী 'কাশ্মীর কী কলি' হিন্দী ছবিতে নায়িকার চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরকে নির্বাচন করতে। শ্রীমতী ঠাকুর মনোনীত ও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন নায়ক শাম্মিকাপুর-এর বিপরীত চরিত্রে। এ ছবির সংগীত-পরিচালক ও পি নায়ার। আগামী নভেম্বর মাসে শর্মিলা ঠাকুর এ ছবির জন্য বোম্বে রওয়ানা হবেন।

সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় হরদীপ প্রযোজিত প্রোডাকসন নম্বর ১ রঙিন ছবিটির মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজকাপুর। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে শাম্মিকাপুর ও রাজশ্রী শান্তারাম। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন পৃথ্বিরাজ কাপুর, রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ, অচলা শচদেব ও মাধবী। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শচীন ভৌমিক। সংগীত শংকর-জয়কিষণ। ছবিটি পরিচালনা করছেন বাপ্পি সোনী। আলোকচিত্র-গ্রহণে তারা দত্ত।

প্রযোজক-পরিচালক মেহেবুব খান তাঁর আগামী রঙিন ছবি 'সান অফ ইন্ডিয়া'-র জন্য বিলেতে শীঘ্রই রওয়ানা হচ্ছেন। এ'র সঙ্গে থাকবেন আলোকচিত্রশিল্পী ইরাণী। বিলেতে থাকাকালীন শ্রীখান তাঁর পরবর্তী ছবি 'মমতাজ মহল' ৭০ মিলিমিটারে তোলা যায় কিনা তার কথা পাকা করবেন। এ ছবির নায়ক-নায়িকা হচ্ছেন দিলীপকুমার ও সায়রা বানু।

মাদ্রাজ :

প্রযোজক-পরিচালক কে ভি মহাদেভন একটি হিন্দী ছবির জন্য সম্প্রতি বোম্বাইয়ে পৌঁছেছেন এবং চুক্তিবদ্ধ করেছেন কয়েকজন শিল্পীকে। যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিজয়া চৌধুরী, মালিকা ও কে এন সিংহ।

এ ছবিটির চিত্রগ্রহণ হবে মাদ্রাজে। সংগীত পরিচালনা করবেন সি রামচন্দ্র।

অন্নপূর্ণা পিকচার্সের পরিচালক ডি মধুসূদন রাও একটি নতুন সামাজিক তেলেগু ছবি প্রযোজনা করছেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয়ে রয়েছেন এ নাগেশ্বর রাও, জি সাবিত্রী, সূর্যকান্তম, রেলাঙ্গী, পদ্মনাভম ও শোভান বাবু। এস রাজেশ্বর রাও এ ছবির সংগীত-পরিচালক। হায়দারাবাদে সম্প্রতি বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ হয়েছে এবং তিনটি গান ভারাণী স্টুডিওয় গৃহীত হয়েছে। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
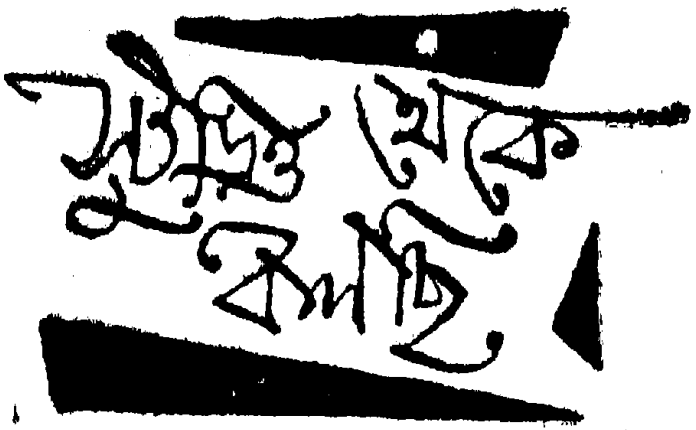
টেকনিসিয়ান স্টুডিও। পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় তাঁর নতুন ছবি 'ত্রিধারা'-র কাজ আরম্ভ করেছেন। প্রথম দিনের শুভ আরম্ভ 'মহরৎ' না হলেও শুভদিনের কয়েকটি চিহ্ন স্টুডিও ফ্লোরে চোখে পড়লো। সারি সারি নতুন মুখ। কপালে লাল লাল ফোঁটা। ক্যামেরা-যন্ত্রে লাল ফুলের মালা। নারকেল-ভাঙা প্রসাদে একটা উৎসবের শিহরণ। সর্বকিছু মিলিয়ে ছবি শুরুর আগে এই বিশেষ দিনের আরম্ভটুকু গড়িয়ে যাওয়া দিনগুলো থেকে বেশ একটু আলাদা মনে হয়। এই শিল্প-কলার শিল্পী থেকে কলাকুশলী, সকলেই খুশীর জোয়ারে সেদিন ভেসে যায়। চেনা চেনা মুখের কয়েকটি গুঞ্জন, মনে মনে সৃষ্টির অনুভূতি আর চোখে চোখে এই সর্বকিছুর চেতনা যখন কথা বলে তখন কিন্তু এ পরিবেশ ভোলা যায় না। তারপর এক সময় দেখি এই লাফিয়ে চলা উৎসবের যৌবন-টুকু থামে। তখন চিত্র-গ্রহণের কাজ শুরু হয়। আলো জ্বলে। অভিনয় চলে। তারপর, আলোকচিত্র-যন্ত্রে টুকরো টুকরো জীবন সম্পূর্ণ হয়। এই সম্পূর্ণ জীবনের অভিনয়-চিত্র দানা বেঁধে নতুন নামে পরিচয় হয়—সে নাম চলচ্চিত্র।

'ত্রিধারা'-র প্রথম দিনের শিল্পী ছিলেন অসিতবরণ, ভারতী দেবী ও সুলতা চৌধুরী। দৃশ্যটি মেজ বউয়ের বাপের বাড়ী। অভিমান ভাঙাতে মেজ-কর্তা এসেছেন শ্বশুরবাড়ী। প্রথম দর্শনেই বেশ অবাক হয়ে মেজ বউ জিজ্ঞেস করে—

মেজবউ—তুমি হঠাৎ এখানে?

মেজভাই—বড়দা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কি একটা বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।

মেজবউ—কোথায়?

মেজভাই—গেলেই বুঝতে পারবে। তোমার পাল্লায় পড়ে ছোট বউমার বুদ্ধি-সুদ্ধি আজকাল—

কাহিনীর এই অংশটির চরিত্রে অভিনয় করলেন ভারতীদেবী ও অসিত-বরণ। এ ছবির গল্পটি বেশ মজার।

তিন ভাইয়ের সংসারে কেয়া মেয়েটি এ ছবির নায়িকা। তিনজনকেই সে বাপি বলে ডাকে। অথচ এই সংসারের কেয়া কার মেয়ে বোঝা যায় না। এ বাড়ীর মাষ্টার প্রেম আড্ডি কেয়াকে পড়ায়। কেয়া মুগ্ধ হয়। বাড়ীর কর্তারা রাজী হয় প্রেমের সংগে কেয়ার বিয়ে দিতে। তবে একটি সর্তে, যদি প্রেম বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসে তারপর। প্রেম রাজী হয়ে বিলেতে যায় হবু শ্বশুরের পয়সায় পড়াশুনা করতে। কিন্তু সেখানে ঘটনাচক্রে একটি হত্যা-কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় প্রেমের বিয়ের সর্ত ভেঙে যায়। কেয়া ভেঙে পড়ে। সেই মুহূর্তে প্রেম বিলেত থেকে ফিরে কেয়াকে সবকথা স্পষ্ট জানায় এবং সে যে হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয় শুধু মিথ্যে রটনা একথা বোঝাতে চেষ্টা করে। এক-দিন সত্য প্রকাশ পায়। প্রেম-কেয়ার শুভদিন ঐ বিলেতের ডিগ্রী পাওয়ার পর পাকাপাকি হয়।

প্রেম আড্ডি ও কেয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ এবং সুলতা চৌধুরী। বড় ভাই, মেজ ভাই ও ছোট ভাইয়ের চরিত্রে রয়েছেন জহর গাংগুলী, অসিতবরণ ও কালী ব্যানার্জি। বড়, মেজ ও ছোট বউমার ভূমিকায় রূপদান করছেন রেণুকা রায়, ভারতী দেবী ও অনুভা গুপ্তা। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করছেন তরুণকুমার, জীবেন বসু, অজিত চ্যাটার্জি ও বিধায়ক ভট্টাচার্য।

'ত্রিধারা'-র কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কলাকুশলীদের মধ্যে চিত্র-গ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী। সহকারী তরুণ গুপ্ত। শব্দ-গ্রহণে সতোন চট্টো-পাধ্যায়। সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টো-পাধ্যায়। সহকারী রবিন সেন। শিল্প-নির্দেশনায় সত্যেন রায়চৌধুরী। পরি-চালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। সহকারী রবিন ব্যানার্জি, সরিৎ ব্যানার্জি ও উজ্জ্বল ব্যানার্জি। ব্যবস্থাপনায় সুখেন চক্রবর্তী। সহকারী শঙ্কর দাস। রূপ-সজ্জায় নিতাই সরকার ও পাঁচু দাস। সহকারী সূর্যলাল।

এইচ জি প্রোডাকসন্স প্রযোজিত এ ছবির পর পর কয়েকদিন দৃশ্য-গ্রহণের কাজ শেষ হল।

বোম্বে থেকে বিশ্বজিৎ এসেছিলেন। এর মধ্যে কলকাতার নিউমার্কেট ও দম-দমের এয়ারপোর্টের বহির্দৃশ্যও শেষ হল বিশ্বজিৎকে নিয়ে। গত সপ্তাহে তিনি আবার চলে গেছেন হিন্দী ছবির অভিনয়ের জন্য। পুজোর সময় ফিরছেন। —চিত্রদূত

'ত্রিধারা' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সহকারী রবিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুলতা চৌধুরী

খেলাধূলা

দর্শক

॥ আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ॥

১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ৩—১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেছে: অর্থাৎ একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড জয় করেছে। মোহনবাগান দলের পক্ষে এ সম্মান নতুন নয়। ইতিপূর্বে মোহনবাগান তিনবার—১৯৫৪, ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালে এই 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করে। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে মোহনবাগান দলের মত চারবার এই গৌরব লাভ করেছে ইস্টবেঙ্গল দল (১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৬১)। এই বছরের আই এফ এ শীল্ড জয় মোহনবাগান দলের পক্ষে আরও উল্লেখযোগ্য যে, তারা দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে উপর্যুপরি তিনবার আই এফ এ শীল্ড পেল। এ রেকর্ডও ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম করে ইস্টবেঙ্গল (১৯৪৯-৫১)। আই এফ এ শীল্ড খেলার ইতিহাসে এ পর্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার শীল্ড পেয়েছে মাত্র এই পাঁচটি ক্লাব—গর্ডন হাইল্যান্ডার্স (১৯০৮-১০); সি এফ সি (১৯২২-২৪); শেরউড ফরেস্টার্স (১৯২৬-২৮); ইস্টবেঙ্গল (১৯৪৯-৫১) এবং মোহনবাগান (১৯৬০-৬২)। এই সাফল্যের মধ্যে বে-সামরিক দল তিনটি।

কিন্তু মোহনবাগানের এই সমস্ত সাফল্যময় ইতিহাসে ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড জয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে—সে জয় শুধু মোহনবাগানের নয়—ভারতীয় ফুটবল দলের প্রথম শীল্ড জয়—ভারতবর্ষের জাতীয় জয়। তাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেই দিনের খেলার শেষে জনসাধারণ জয়লাভের আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন।

একই বছরে লীগ ও শীল্ড জয়

নিম্নলিখিত দলগুলি একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড জয় করে:

- গ্লস্টার রেজিমেন্ট (১৮৯৮)
- রয়েল আইরিশ রাইফেলস (১৯০১)
- গর্ডন হাইল্যান্ডার্স (১৯০৮-৯)
- ক্যালকাটা এফ সি (১৯২২-২৩)
- মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৩৬ ও ১৯৪১)
- ইস্টবেঙ্গল (১৯৪৫, ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬১)
- মোহনবাগান (১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬২)

দুই গোল দেওয়ার সাফল্যে মাল্যভূষিত মঙ্গল পুরকায়স্থ

এবারের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান আক্রমণ ও রক্ষণভাগে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হায়দরাবাদ একাদশ দল অপেক্ষা শতগুণে ভাল খেলে ৩—১ গোলে জয়লাভ করে। এই দুই দলের সাক্ষাৎ এই প্রথম নয়। ১৯৫৪ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে এই দলকে পরাজিত করেছিল। হায়দরাবাদ গতবার অন্ধ্র পুলিশ নাম নিয়ে ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে ফাইনালে ১—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে

আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থ (দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয়) হায়দরাবাদ একাদশের গোলরক্ষক সেলিমকে তাঁর সটে পরাজিত ক'রে তৃতীয় গোল দিয়েছেন। ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ৩—১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশকে পরাজিত করে।

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য : মোহনবাগানের সেণ্টার **ফরওয়ার্ড** মঙ্গল পুরকায়স্থ হায়দরাবাদ দলের গোলরক্ষককে পরাস্ত ক'রে ফাঁকা **গোলে বল** নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি গোল দিতে পারেন নি।

হায়দরাবাদকে হার স্বীকার করতে হয়। এই দুই দলের খেলার ফলাফল থেকে অনেকেই অনুমান করেন, মোহনবাগান সম্পর্কে হায়দরাবাদ দলের কেমন যেন মানসিক দুর্বলতা আছে। এবার আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইনালে হায়দরাবাদ একাদশ দল যেভাবে খেলার সর্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে ১—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল তাতে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল হায়দরাবাদ একাদশ দল সহজে হার মানবে না। কিন্তু ফাইনালে হায়দরাবাদ দলের খেলার কোন দৃঢ়তা এবং জৌলুষ ছিল না। এক কথায় মোহনবাগান দলের কাছে তাদের নাজেহাল হ'তে হয়েছিল। খেলার আগের দিন প্রচুর বৃষ্টি দেখে যাঁরা মাঠের অবস্থা হায়দরাবাদ দলের অসুবিধার কারণ হবে ভেবেছিলেন তাঁরা মাঠে গিয়ে হতাশ হন। মাঠের মাটি যা একটু আঠালো ছিল। মোহনবাগান দলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামীকে ফাইনাল খেলার দিন দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠে নামতে দেখে দলের সমর্থকেরা যেন বুকে বল পান। তিনি অসুস্থ থাকায় শীল্ডের দুটো ম্যাচ খেলেননি।

আই এফ এ শীল্ড
মোহনবাগানের জয়যাত্রা

১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ১০—০ গোলে ভবানীপুরকে, ২—১ গোলে বাটা স্পোর্টস ক্লাবকে, সেমি-ফাইনালে ২—০ গোলে বি এন আর দলকে এবং ফাইনালে ৩—১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে আই এফ এ শীল্ড পুরস্কার পায়।

এ পর্যন্ত মোহনবাগান ১৬ বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠে ৮ বার জয়লাভ করেছে। এই ১৬ বারের মধ্যে দু'বার (১৯৫২ ও ১৯৫৯) ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি—খেলা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।

মোহনবাগান শীল্ড ফাইনালে উঠেছে : ১৯১১, ১৯২৩, ১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৪৭-৪৯, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৫৮-৬২ (উপর্যুপরি পাঁচবার)।

মোহনবাগানের শীল্ড জয় (৮ বার) : ১৯১১, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০-৬২ (উপর্যুপরি তিন বার)।

ফাইনালেও তিনি খেলবেন না এই রকমই খবর ছিল। কারণ ঐদিন তাঁর

১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের সঙ্গে **ক্লাবের কর্মকর্তাগণ এবং আই এফ এ'র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ।**

অন্নপথ্য পাওয়ার কথা। এই অবস্থায় তাঁকে নামতে দেখে দলের সমর্থকেরা প্রথমটা খুশী হয়ে পরে দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এই দুর্বল শরীরে ফুটবল খেলার ধকল তিনি কতক্ষণ সহ্য করবেন! চুণী গোস্বামী সে ধকল সহ্য করেছিলেন। যদিও খেলার একেবারে শেষ দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে মোহনবাগান দল তার কাজ হাসিল ক'রে নিয়েছে ৩—১ গোলে অগ্রগামী। নিজস্ব খেলায় এবং দল পরিচালনায় তিনি যে মোহনবাগান দলের জয়লাভের পক্ষে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এ খেলার শিহরণ তিনি অনেক দিনই অনুভব করবেন। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনে ১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো।

খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগান প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে। হায়দরাবাদ দল এই ধরনের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাদের রক্ষণভাগ দিশেহারা হয়ে পড়ে। দু' মিনিটের খেলায় মোহনবাগান দুটো কর্ণার পায়। এই কর্ণার কিক থেকে গোল না হলেও মোহনবাগানের এই সাঁড়াশি-আক্রমণে হায়দরাবাদ দলের রক্ষণভাগ খেলার গোড়াতেই ভেঙ্গে পড়ে এবং তা খেলার কোন সময়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এইটাই মোহনবাগানের পক্ষে খেলায় মস্ত লাভ। মোহনবাগানের প্রথম আক্রমণের রেশ দশ মিনিট স্থায়ী ছিল এবং এই সময়ে খেলাটি হায়দরাবাদ দলের গোল-মুখে সীমাবদ্ধ ছিল। মিনিট দশ সময় আক্রমণের বেগ কমিয়ে মোহনবাগান পূর্ণ-উদ্যমে একজোটে দ্বিতীয় আক্রমণ করে খেলার ২০ মিনিট থেকে। এবার এই আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করা হায়দরাবাদ দলের রক্ষণভাগের পক্ষে সম্ভব হয়নি। খেলার ২৩ মিনিটে কেম্পিয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে সেণ্টার ফরওয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থ দলের প্রথম গোল দিলেন। খেলার ২৯ মিনিট সময়ে দলের দ্বিতীয় গোল করেন লেফ্‌ট-আউট অরুময়নৈগম। বিশ্রাম সময়ে মোহনবাগান ২—০ গোলে অগ্রগামী ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় প্রথম মিনিটেই হায়দরাবাদ দল মোহনবাগানের গোল হানা দেয় এবং মোহনবাগানের রক্ষণভাগের অসতর্কতা এবং ভুল ধারণার সুযোগ নিয়ে একটা গোল শোধ দেয়। মোহনবাগান একটুও না দমে পর মুহূর্তে হায়দরাবাদকে চেপে ধরে; দীপু দাসের ব্যাক-পাশ থেকে পুরকায়স্থ বলে মাথা পেতে দেন। বলটা বারে বাধা পাওয়াতে হায়দরাবাদ সে-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়। কিন্তু এর কয়েক মিনিট পরই পুরকায়স্থ কোণাকুণি সটে দলের তৃতীয় গোল দেন। খেলা ভাঙ্গার কয়েক মিনিট আগে হায়দরাবাদ দল মোহনবাগানের গোলে দু'বার বল সট করার সুযোগ পায় কিন্তু দু'বারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় একমাত্র ২৬ মিনিটে হায়দরাবাদ দলের মহম্মদ ইউসুফের সটই উল্লেখযোগ্য। এই বল ধরতে গোলরক্ষক শেঠকে মাটিতে সটান শুয়ে পড়তে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কোন রকমে তিনি বলটিকে ঠেলে দিয়ে গোল রক্ষা করেন। তবে মোহনবাগানের তৃতীয় গোল দেওয়ার পরও হায়দরাবাদ দলের রক্ষণভাগকে কম উৎকণ্ঠায় পড়তে হয়নি! মোহনবাগান একাধিক আক্রমণে গোল দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

এই দিনের খেলায় সব থেকে বেশী আনন্দ চুণী গোস্বামীর। তাঁরই নেতৃত্বে মোহনবাগান দলের আই-এফ-এ শীল্ড জয়। তাঁর পরই নাম করবো মঙ্গল পুরকায়স্থের। তিনি দলের পক্ষে প্রথম ও তৃতীয় গোল দিয়ে দলকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য ক'রেছিলেন। আরও নাম করবো মোহনবাগানের স্টপার জার্নাল সিংয়ের। সব শেষে বলবো এই জয়লাভের গৌরব, আনন্দ এবং সমস্ত কৃতিত্ব এগারজন খেলোয়াড়েরই—কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়।

মোহনবাগান—সনৎ শেঠ; টি এ রহমন, জার্নাইল সিং (স্টপার) এবং জে কেন; বিদ্যুৎ মজুমদার এবং কেম্পিয়া; দীপু দাস, অমল চক্রবর্তী, মঙ্গল পুরকায়স্থ, চুণী গোস্বামী এবং অরুময়নৈগম।

হায়দরাবাদ একাদশ—সেলিম; কিষেণরাজ, ইউসুফ খান (স্টপার) এবং নঈম; সালে এবং আফজল; জাফর, শ্যামরাজ, এডওয়ার্ড, জুলফিকার এবং মহম্মদ ইউসুফ।

রেফারী—এস আর নটরাজন (মহারাষ্ট্র)

সপ্তম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানশীপে তামারা প্রেস (রাশিয়া) মহিলাদের সটপুট এবং ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশীপ

অলিম্পিক গেমসের এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানের পরই ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানসীপের স্থান। ১৯৩৪
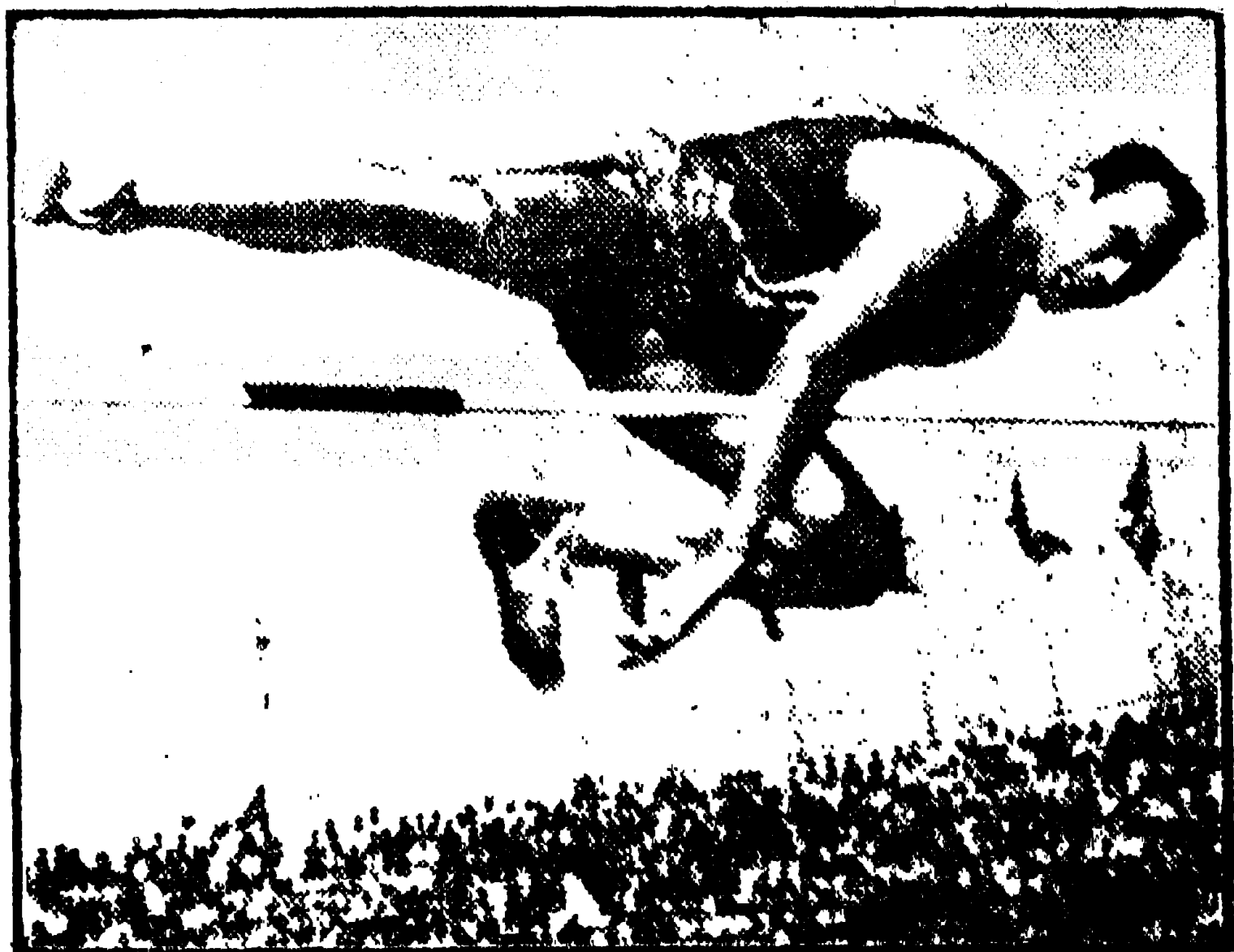
সপ্তম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্‌স চ্যাম্পিয়ানশীপ : পুরুষদের হাইজাম্পে প্রথম স্থান অধিকারী ভালেরী ব্রুমেল (রাশিয়া) তিনি ৭ ফিট ৩ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করেন।

সালে টুরিনে প্রথম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানসীপ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৪২ সাল বাদে প্রতি চতুর্থ বৎসরে এই চ্যাম্পিয়ানসীপ অনুষ্ঠিত হয়েছে—১৯৩৮ সালে প্যারিসে, ১৯৪৬ সালে ওসলোতে, ১৯৫০ সালে ব্রাসেলসে, ১৯৫৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণে, ১৯৫৮ সালে স্টকহলমে এবং ১৯৬২ সালে যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগ্রেডের যুগোশ্লাভ আর্মি স্টেডিয়ামে সপ্তম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নসীপ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রোজ টিটো। এই চারদিনব্যাপী (১২ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর) ক্রীড়ানুষ্ঠানে ২৮টি দেশের এ্যাথলীট যোগদান করেন। এ'দের মধ্যে ষোলজন বিশ্ব রেকর্ডধারী এ্যাথলীট ছিলেন—১০ জন পুরুষ এবং ৬জন মহিলা এ্যাথলীট। সংখ্যায় জার্মান দলই ভারী ছিল। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক এবং ফেডারেল রিপাব্লিক অব্ জার্মানী—জার্মানীর এই দুটি বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র হয়ে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে। সংখ্যায় ছিল ১৫৩ জন এ্যাথলীট। আলোচ্য সপ্তম অনুষ্ঠানে মোট ৩৬টি স্বর্ণপদকের মধ্যে সর্বাধিক ১৩টি স্বর্ণপদক লাভ করে রাশিয়া। তারপরই বৃটেনের ৫টি এবং জার্মানীর ৪টি স্বর্ণপদক লাভ উল্লেখযোগ্য। পদক লাভের তালিকায় রাশিয়া মোট ২৯টি পদক লাভ ক'রে (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৬ এবং ব্রোঞ্জ ১০) প্রথম স্থান পায়। দ্বিতীয় স্থান পায় জার্মানী—মোট ২৩টি পদক (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ১১ এবং ব্রোঞ্জ ৮) এবং তৃতীয় স্থান বৃটেন (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৬)।

• সপ্তম ইউরোপীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় একমাত্র রাশিয়ার মহিলা এ্যাথলীট মিস্ তামারা প্রেস দুটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জন করেছেন। মিস তামারা প্রেস স্বর্ণপদক পেয়েছেন সটপুট এবং ডিসকাস থ্রোতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি এই দুটি অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে যে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন তা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

সপ্তম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানশীপের ২০০ মিটার দৌড়ে জুতো হাইন (ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানী) ২৩·৫ সেকেন্ডে দূরত্ব অতিক্রম ক'রে প্রথমস্থান লাভ করেন। তিনি গত রোম অলিম্পিকে এই অনুষ্ঠানেই দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 5th October, 1962.
40 Naya Paise.

আমাদের দেশের প্রগতির পথে যে সকল বাধা-বিঘ্ন বর্তমানে রহিয়াছে, সেগুলি ক্রমশঃই প্রবল ও কঠিনতর হইতেছে। ইহার কারণ খুঁজিতে যাইলে এরূপ গোলকধাঁধায় পড়িতে হয় যে, পথের হদিশ পাওয়াই এক জটিল সমস্যায় দাঁড়ায়। দেশ অনুন্নত, দেশের লোকজন অশিক্ষিত ও অভাব-অনটনক্লিষ্ট—উপরন্তু আছে কুসংস্কার, অচল অথচ অটল সামাজিক প্রথা এবং তাহার সহিত সংযুক্ত ভাগ্য ও কপালের উপর অন্ধবিশ্বাস। এরূপ অবস্থায় দেশ উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই ব্যাহত ও আংশিকভাবে ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক এবং হইতেছেও ঠিক তাহাই। এই ব্যর্থ ব্যাহত প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া ভিন্নভাবে দেখা দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। তবে সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐ উন্নয়ন-প্রচেষ্টার ফল সমাজের সকল স্তরে সমানভাবে পৌঁছায় নাই। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এই উন্নয়নের আনুসঙ্গিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির পরিবর্তে অধোগতিই হইয়াছে এবং ভারতের কোন কোন রাজ্যে সেই অধোগতি আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করিয়াছে—যেমন পশ্চিমবঙ্গে। তবে বৃহত্তর, অর্থাৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এরূপ বিপরীত ফলের ব্যাপক সূচনা সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে এবং উন্নয়ন-পরিকল্পনা পরিচালনের ভার যাঁহাদের উপর তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজনের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে এবং তাঁহারা ইহার কারণ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তাও এতদিনে বুঝিতেছেন। অবশ্য কয়েকজন মহাপণ্ডিত তাঁহাদের পরিকল্পনা-ব্যবস্থা বেচাল হইবার একমাত্র কারণ লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি এই স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—কেননা সেখানে নাকি তাঁহাদের কোন কিছুই করিবার নাই।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি যে অনুন্নত দেশের অভাব-অনটন বৃদ্ধির ও অধোগতির প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইভাবে সন্তানের অন্নসংস্থানের ও শিক্ষা-দীক্ষার কথা না ভাবিয়া সন্তান-প্রজনন করে যাহারা তাহাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব তো আছেই, উপরন্তু তাহারা যে এইভাবে সমগ্র সমাজকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে, সে বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার ব্যবস্থা যাহা আছে তাহাও প্রহসন মাত্র। এ বিষয়ে যে পরি-কল্পনা বিভাগের অবশ্য-কর্তব্য কিছু ছিল ও আছে সে বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানোদয়মাত্রও এতদিন হয় নাই। অন্য অনেক বিষয়ও এতদিন তাঁহারা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলেন যাহার সম্বন্ধে তাঁহাদের চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতেছে—যথা উন্নয়নপরিকল্পনার সাফল্যের জন্য জনসাধারণের সহযোগ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন বিষয়ে।

কিন্তু সেই সহযোগ আসিবে কোথা হইতে ও কেমনে,—উদ্দীপনার প্রশ্ন তো নিতান্তই অবান্তর। জনসাধারণ জানে যে উন্নয়নের নামে সরকার যে সকল শুল্ক, আমদানী ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হইতে দুর্বহতর হইতেছে যাহার ফলে যাহাদের আয় সীমাবদ্ধ বা অনিশ্চিত তাহাদের জীবনযাত্রার মানও দ্রুত নামিয়া যাইতেছে। তাহারা ইহার প্রতিকার করার বিষয়ে অসহায়, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সঙ্ঘবদ্ধ কর্মীদল কিছু করিতে পারে তাহাও একান্ত নিজেদের জন্যই।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করিয়াছে। একদিকে অন্যরাজ্যের মতই অবিবেচক পিতা-মাতার সন্তানবৃদ্ধি তো আছেই, অন্য দিকে আছে উদ্বাস্তু এবং শিল্পসংস্থা ও খনি ইত্যাদিতে কাজ করিবার জন্য বিপুল সংখ্যায় আগত ভিন্ন প্রদেশীয় শ্রমিক। এই রাজ্যে শিল্পসংস্থার প্রসার দ্রুত ও ব্যাপক হইয়াছে কিন্তু সে সকল সংস্থায় বাঙালী সাধারণজনের কর্মসংস্থান হইয়াছে অতি অল্প।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই সকল বিষয়ের দিকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বিরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্য কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের লোকে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে যাইতে চাহে না। তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা—যাহা এখন অতি তীব্র ও বিকট রূপ লইয়াছে—পূরণের জন্য পরিকল্পনা দপ্তরের "অতিরিক্ত কাজের কর্মসূচী" ব্যাপকভাবে ঐ সকল স্থানে চালু হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, কেননা ঐ ব্যবস্থা অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থানের বিশেষ সহায়ক হইবে। বিকেন্দ্রীকরণের বহু সুযোগ এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আছে একথাও তিনি বলিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এই মর্মে এক পত্র কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে লিখিয়াছিলেন কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। দেখা যাউক এই পত্রের কি ফল হয়।

কবিতা

যে এমন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ভিজছে।
পার্ক, ময়দান, বাড়ীঘর
সব যেন স্বপ্নের ভিতর,
জলরঙ ধূসর শহর
স্বপ্নে সমর্পিত অতঃপর—
উন্মুখ বালির নদী ভিজছে।

ভিজছে।
নীল আলো, আভার আকাশ ঃ
য়্যারোড্রামে ক'টা রাজহাঁস
বাতাস গ্রামের প্রশ্বাস—
মগ্ন মেঘে আবহাওয়াটা
কী-তন্ময়, কী-মন্থর ভিজছে!

ভিজছে।
আজ শান্ত বসুন্ধরা, ঊর্ধ্বমুখ জলকন্যা-
ভিজছে।

ঘোরলাগা গহন শ্রাবণে
যে এমন সুধায় ভেজায়—
কোন্ গলি দিয়ে অকারণে
খুঁজি সে কখন আসে যায়!

ধন্যবাদ

বিনয় মজুমদার

বড় বৃদ্ধ হয়ে গেছি, চোখের ক্ষমতা ক'মে গেছে—
পরস্পর মিশে থাকা কাচপুতি এবং নীলার
পার্থক্য নির্ণয় করা এখন সম্ভব নয় আর।
এমন কি কাগজের নৌকা নির্মাণের পদ্ধতিও
ভুলে গেছি; কবিতার মিল খুঁজে মন্থর প্রহর
চ'লে যায়; সন্ধ্যাকালে শুনেছি, শীতের পুরোভাগে
মৃত্তিকাসংলগ্ন মেঘ এখনো কুয়াশারাশি ব'লে
অভিহিত হয়—এই কুৎসাভীত বহু ভালবাসা।

অভিজ্ঞতা ফুরিয়েছে; অন্ধকারে আহার্যবিহীন
ক্ষুধায় অতিবাহিত করা ভিন্ন বৃক্ষদের কোনো
গত্যন্তর নেই, হায়, এই ক্লেশে ম্রিয়মাণ আমি?

হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ, শুধু কাঁটা, রক্তাক্ত দুপায়
তোমার দুয়ারে এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত।
তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম, মুকুর?

জৈব

শিবদাস চক্রবর্তী

একদিন মনে হতো তাকে ছাড়া জীবন দুর্ভর,
আকাশে তারার ভিড়ে একমাত্র সে-ই ধ্রুবতারা;
দুঃসাহসে পাড়ি দিতে অতলান্ত সংসার-সাগর
পথের দিশারী তার দু' চোখের নিঃশব্দ ইসারা।
সেদিন জীবন ছিল—ভাবনার ভারলেশহীন
ভাবের মাধুরী-স্পর্শে মোহময় বাস্তব জগৎ,
শারদ মেঘের মতো দুরাকাঙ্ক্ষা আকাশে উড্ডীন—
তাই তো সহজ ছিল প্রতি পদে কঠিন শপথ।

সে আর্সেনি—এই ক্ষোভে আকাঙ্ক্ষার হয়নি উদ্গতি
জৈব জীবনের ধারা তবু আজো আছে অব্যাহত;
আমাদের এ বিচ্ছেদে প্রকৃতির হয়নি কো ক্ষতি,
দাগ যদি থাকে থাক, শুকিয়ে গিয়েছে সেই ক্ষত।
যে এসেছে, বড়ো করে দেখি আজ তারি গুণপনা,
ব্যর্থ মন এরই মাঝে খুঁজে পায় বাঁচার সান্ত্বনা।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

আমাদের পাড়ায় দুজন উঠতি সাহিত্যিক আছেন। রামসদয়বাবু এবং গুণনিধিবাবু। তাঁরা দুজনেই মোটামুটি খ্যাতিমান এবং পরস্পরের বাল্যবন্ধু। সেদিন প্রায় একই সঙ্গে দুজনে এসে হাজির হলেন আমাদের আড্ডায়।

গুণনিধিবাবু আগে এসেছিলেন। রবিবারে যে আমার বাড়িতে আড্ডা বসে তা তিনি জানতেন। অনেকদিন বলেছি তাঁকে আসতে। কিন্তু তিনি আসেননি। দেখা হলেই বলেছেন, এক সঙ্গে দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন ব'লে বড়ই ব্যস্ত আছেন। ওগুলো একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই আসবেন। তারপর মাসের পর মাস কেটে গেছে। দুটির জায়গায় ধারাবাহিক উপন্যাস এখন চলছে তাঁর তিনটি। তবু এতদিনে হঠাৎ তাঁর কী খেয়াল হল, এলেন। এসেই বললেন, 'পাঁচ মিনিট কিন্তু। পারো তো একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।'

'অবশ্যই।' আমি আপ্যায়িত হ'য়ে বললাম, 'পুজোর লেখা শেষ করার পর একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন বুঝি?'

'বিশ্রাম! নিতে পারলে তো ভালোই হত।' গুণনিধিবাবু ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'এ যে চব্বিশ ঘণ্টার চাকরী। পুজোর গল্পের মধ্যে দুটিকে বাড়িয়ে উপন্যাস ক'রে দিতে হ'চ্ছে। তাছাড়া ধারাবাহিকগুলো তো চলবেই। একটু এগিয়ে না থাকলে কি চলে?'

'তা তো ঘটেই?' অন্যতম আড্ডাধারী নবনীকিশোর বলল, 'শত-পথের শারদীয় সংখ্যায় আপনার উপন্যাসখানি বেশ হ'য়েছে। আমি পড়েছি।'

'পড়েছ? আর সহস্রাক্ষের উপন্যাসটা?'

'ওটাও আধাআধি পড়েছি, আজ শেষ করব। কিন্তু আমার মনে হয়—'

গুণনিধিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'পড়লে এক সীটিঙে পড়বে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ো না, ওতে রস পাওয়া যায় না। ওটা শেষ ক'রে মনোরথের বড়

গল্পটা পড়ো। তারপর তোমার সংগে ডিস্‌কাস্‌ করব।'

নবনী মনঃক্ষুন্ন হল, কিন্তু চটপট সামলে নিল। চোখমুখ উজ্জ্বল ক'রে বলল, 'সে তো খুবই সৌভাগ্যের কথা। যে কটা পড়েছি, আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, এবার পুজোয় আপনিই বেস্ট লিখেছেন।'

'বলছ?' গুণনিধিবাবু খুক খুক ক'রে একটু হেসে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর, ঐ রামসদয়?'

নবনীর দুরবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। মুহূর্তের জন্যে মনে হল সে যেন এক অতল গর্তের মধ্যে পিছলে পড়ছে। কিন্তু বাহাদুর ছেলে এই নবনী, একনিমেষে মুখের ভাব বদলে সে আহত অভিমানের সংগে বলে উঠল, 'এভাবে বিপদে ফেলবেন না আমাকে। রামসদয়বাবুর লেখাও পড়ছি বইকি। অনেক গভীর কথা থাকে তাতে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, যাকে বলে রস, সে বস্তু পাইনি তার মধ্যে।'

'ঠিক বলেছ তুমি!' গুণনিধিবাবু চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'একেবারে বোগাস। ছেঁদো কথা দিয়ে পাঠকের মন ভোলাবে, সেদিন আর নেই।'

সুরেন এক কোণে বসেছিল। সে হঠাৎ সরলভাবে বলে ফেলল, 'কিন্তু এডিশান তো হয়!"

'মুণ্ডু হয়। ওসব গোঁজামিলের কারবার আমার ঢের জানা আছে।' ব'লে গুণনিধিবাবু আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, আমি জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, রামসদয়বাবু আসছেন। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠলাম, 'এই যে রামসদয়বাবু, আসুন, আসুন।'

রামসদয়বাবু ঘরে ঢুকলেন। তারপর যেন এই প্রথম গুণনিধিবাবুকে দেখলেন এইভাবে বলে উঠলেন, 'আরে, গুণনিধি যে! কী খবর? তুমি কতক্ষণ?'

'এই মিনিট কয়েক হল।' গুণনিধি হেসে বললেন, 'তারপর রামসদয়, হঠাৎ তোমার উদয় যে?'

'যাচ্ছিলাম এই পথ দিয়ে, তাই ভাবলাম যে একটু—।' রামসদয়বাবু আসন গ্রহণ ক'রে বললেন, 'অনেক লিখেছ এবার। কী করে এত লেখো বল তো? আমি যে একটা লিখতেই হিমসিম খেয়ে যাই!'

'বটে? কম ক'রে গোটাকুড়ি জায়গায় তো দেখলাম তোমার নামের বিজ্ঞাপন!'

'ওসব বাজে, বাজে। যেমন-তেমন করে শেষ ক'রে দেওয়া।' বলে রামসদয়বাবু আমাদের দিকে চেয়ে বললেন 'লিখেছে বটে গুণনিধি। প্রত্যেকটিই ফার্স্ট ক্লাস। পড়ে দেখো তোমরা। গুণনিধি একেবারে 'গুণ' করে ছাড়বে! হাঃ হাঃ হা—!'

'বললেই হল?' গুণনিধিবাবু ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আর কিছু না হোক, নিজের বাড়ির খবর তো জানি। ছেলেমেয়েদের সকলের বুকেই দেখেছি 'রাম' নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। তুমিই আমাদের নবযুগের সাহিত্যসম্রাট। হিঃ হিঃ হি—!'

এইভাবে মিষ্টি কথায় পরস্পরকে প্রশংসা ক'রে ঘণ্টা তিনেক উধাও হল। দু রাউণ্ড চা হ'য়ে গেল। বেলা প্রায় একটা। নবনী সুরেন ইত্যাদি আগেই কেটে পড়েছিল। বাড়িটা আমার, কাজেই আমি গন্তব্যহীন। অবশেষে গুণনিধিবাবু এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন 'উঠি এবার। দু-মিনিটের জন্যে এসে পুরো সকালটা কাটিয়ে গেলাম এখানে। তুমি ভাই একটু শোনো তো, একটা কথা আছে।'

ঘর থেকে রাস্তায় নেমেই গুণনিধিবাবু চাপা আক্রোশে ফেটে পড়লেন ইডিয়ট একটা! ভদ্রলোকের বাড়ি এসে কতক্ষণ বসতে হয় তাও জানে না। তুমি নিশ্চিৎ জেনো ভায়া, ও মুখপোড়ার কিস্যু হবে না। যাও এখন ভেড়ার ডাক শোনো গে।' বলেই তিনি হন হন করে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে উঠলেন রামসদয়বাবু। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলেন, 'গেছে তো? একটা ব্লিংকিং ফুল ওটা—অ্যাণ্টি-সোশাল নুইসেন্স। কখন থেকে এসেছে, ওঠবার নাম নেই। শোনো ভায়া, তুমি বুদ্ধিমান মানুষ এ-সব লোককে লাই দিতে নেই। এই করেই এরা মাথায় ওঠে। লেট দেম বর্ক, ক্যারাভানটা ঠিক নিজের গন্তব্যে চলে যাবে। কলম ধরলেই লেখক হওয়া যায় না!' বলে তিনি সবেগে রাস্তায় নেমে গেলেন।

শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকেই কেমন বোকা-বোকা লাগতে লাগল।

তোষামোদের রস

তুষারকান্তি ঘোষ
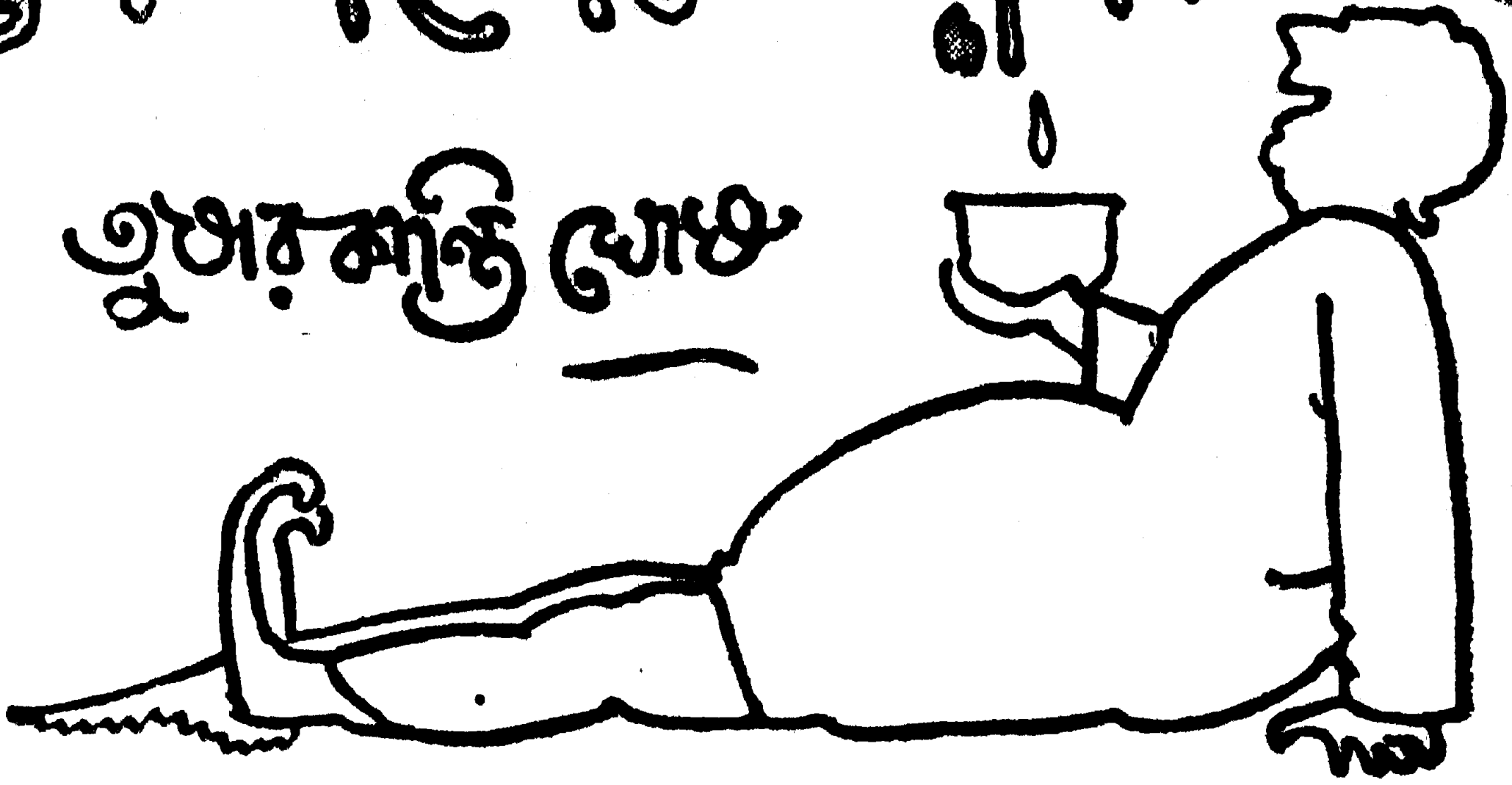
তোষামোদের চেয়ে মিষ্ট রস আর কে আছে? সেই জন্যে আগেকার বড়লোকেরা মোসাহেব পুষতেন। যদিও মোসাহেবদের পেশা ছিল, মনিবের খুশিমত জল উঁচু, জল নীচু বলা, কিন্তু এই কাজ বোকার মত করা চলত না। খোসামোদেরও একটা ধারা আছে। যে মোসাহেব এই ধারা মেনে চলতেন তিনি কৃতকার্য হতেন। মনিবের মন জোগাতে হবে; অথচ সে কাজ বুদ্ধিমানের মত করা চাই। একেবারে খোলাখুলিভাবে তোষামোদ করতে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। এই সম্বন্ধে এক বড়লোকের জন্য গোপাল ভাঁড়ের "মোসাহেব বাছাই" বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। গোপাল ভাঁড় একজন উমেদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন হে, তুমি একাজ পারবে?" সে বললে, "কেন পারব না? নিশ্চয়ই পারব।" গোপাল ভাঁড় বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন পারবে না।" তাতে মোসাহেবীর উমেদার বললে, "সে কি মশাই, আমি পারব না তো পারবে কে? এই দেখুন, আমার কত সার্টিফিকেট রয়েছে।" গোপাল ভাঁড় তখনি তাকে বাদ দিলেন এবং পরের উমেদারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। পরের মোসাহেবটিকে যখন বললেন যে, "আমার মনে হচ্ছে, তুমি বোধ হয় পারবে না," সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, "আমারও তাই মনে হচ্ছে যে বোধ হয় পারব না।

গোপাল : পারবেই বা না কেন? আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

মোসাহেব : আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চেষ্টা করলে পারবই বা না কেন?

বলা বাহুল্য গোপাল ভাঁড়, একেই মনোনীত করেছিলেন।

এই সম্বন্ধে আমার এক মামার কথা মনে পড়ছে। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন এবং আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলতেন যে তা শুনলে মনে হবে যে আমার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ভালো ছেলে যেন পৃথিবীতে আর নেই। আমি তখন বয়সে যুবক মাত্র। সত্যি বলব, আমার এ সব কথা শুনতে ভালোই লাগত। তবে এক এক সময় এমন নির্জলা মিষ্টি কথা বলতেন যে আমার শুনতে লজ্জা করত। একদিন বোকার মত এক কাজ করে বসেছি। মামা এসে আমার মুখের ওপর বলতে লাগলেন, "বাবাজি, কাজটি তো ভালোই ম্যানেজ করেছ বলতে হবে।"

আমি : বলো কি মামা? সবাই তো বলছেন আমি আকাট মুখ্যুর মত কাজ করেছি, আর সে কথা আমি নিজেও তো জানি।

মামা : তুমি সে ব্যাটাদের কথা বিশ্বাস কর? তুমি এই শক্ত কাজটা যেভাবে করেছ তা কেউ করতে পারত না। তুমি যেরকম বিদ্বান, বুদ্ধিমান—"

আমি : তোমার খোসামোদের জ্বালায় আর বাঁচি না। আমার মুখের ওপর এ'সব কথা বলতে লজ্জা করে না?

মামা : কেন বাবা, লজ্জা করবে কিসের জন্যে? খোসামোদ করব, মুখের ওপর করব। কোন ব্যাটাকে কি গ্রাহ্য করি?

মানুষকে চুমরে দেওয়াও আর এক রকমের তোষামোদ। যাকে চুমরে দেওয়া হ'ল তিনি অহংকারের গরমে অনেক সময় এমন কাজ করে বসেন যাতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

হাটখোলা দত্তবাড়ির এক নিকট আত্মীয় একবার গরমে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। একটা কথা এখানে বলে রাখি যে, এইসব বড়লোকেরা যে সবাই লোক খারাপ ছিলেন, কিংবা নির্বোধ ছিলেন তা নয়। তবে চোমরানোর গরমে অনেক অদ্ভুত কাজ করে বসতেন আর সেটা শুধু অহংকারের ফল।

একদিন তিনি "friend"দের নিয়ে বৈঠকখানায় বসে গল্প করছেন। "friends" মানে শুধু বন্ধু নয়, তার ভেতরে মোসাহেবও আছেন, সাহায্য-প্রার্থীও আছেন, উমেদারও আছেন। তাঁরা রোজই কর্তাবাবুর মন জুগিয়ে কথা বলেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোন সাবজেক্ট খুঁজে পাচ্ছেন না, যার ওপরে দুটো মন জোগানো কথা বলতে পারেন। এমন সময় মুশকিল আসান হ'ল। একজন চাকর কতকগুলি পান ও একটু চুন দিয়ে গেল। কর্তাবাবু তাই থেকে দুটি পান মুখে দিয়ে আঙুলে করে একটু চুন নিয়ে দাঁতে কাটলেন। তৎক্ষণাৎ একজন বলে উঠলেন, "বাঃ, কর্তাবাবু তো বেশ চুণ খেতে পারেন।" কর্তাবাবু শুনেই চাকরকে চিৎকার করে ডাকলেন "হ'রে"।

হ'রে ছুটে এসে বললে, "আজ্ঞে কি চাই?"

কর্তা : "যা দিকিন খানিকটা চুন নিয়ে আয়।"

হ'রে দৌড়ে গিয়ে খানিকটা চুণ এনে পানের বাটাতে রাখলে কর্তাবাবু চুণ দেখে চোটেই লাল। "এইটুকু চুণ নিয়ে এলি যে বড়! তোকে চুণ বাঁচাতে কে বলেছে? তোর বাবার চুণ ব্যাটা?"

হ'রে ছুটে গিয়ে বেশ খানিকটা চুণ এনে দিলে। কর্তাবাবু সমস্ত চুণটা

মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে, আঙুল চাটতে চাটতে সেই মোসাহেবটিকে বললেন "এটা তুমি ঠিক বলেছ, আমি একটু চুণ বেশি খাই বটে।"

এর ফলে কি হয়েছিল সে কথা না লিখলেও চলে। সেই রাত্রেই ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল এবং তিন মাস মুখের ঘায়ের জন্যে খাওয়া-দাওয়া একরকম বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

আর একরকমের মোসাহেবী দেখেছি, তাতে কিন্তু মোসাহেবের চেয়ে বড়লোকটিরই credit বেশি ছিল। তিনি যেন জোর করে তাঁর মনের মত কথা মোসাহেবদের মুখ থেকে টেনে বার করতেন। এটা তাঁর স্বভাবগত art ছিল। তিনি হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই এই কর্মটি করতেন।

"...আমি একটু চূণ বেশী খাই বটে।"

এই বড়লোকটি আমার খুড়োদের খুব বন্ধু ছিলেন এবং আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকাকে অনেক রকমে সাহায্য করতেন। আমার কাকা মতিবাবুর কথায় আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি যে তিনি বেশ দরবার ক'রে বসে আছেন এবং নানারূপ খোস গল্প চলছে। আমি যেতেই তিনি খুব আদর ক'রে আমায় বসালেন এবং আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। তাঁর গল্প করবার বেশ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলুম যে তিনি কোন কথা শেষ করেন না। কোন একটা আলোচনার শেষে এসে তিনি তাঁর হাতদুটি নেড়ে নেড়ে চোখের একটা এমন ভঙ্গী করেন যে যাতে তাঁর বন্ধুদের বলতেই হয়, "আজ্ঞে সে তো বটেই।" তখন থেকে আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম, যে আলোচনাই হোক, তিনি যখন তাঁর কথা শেষ করে আনেন এবং হাত ও চোখের ভঙ্গীতে যেন জিজ্ঞাসা করেন আমি ঠিক বলছি কিনা, তখন সেই ভদ্রলোককে বলে উঠতেই হয়, "আজ্ঞে সে তো ঠিকই; আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন।"
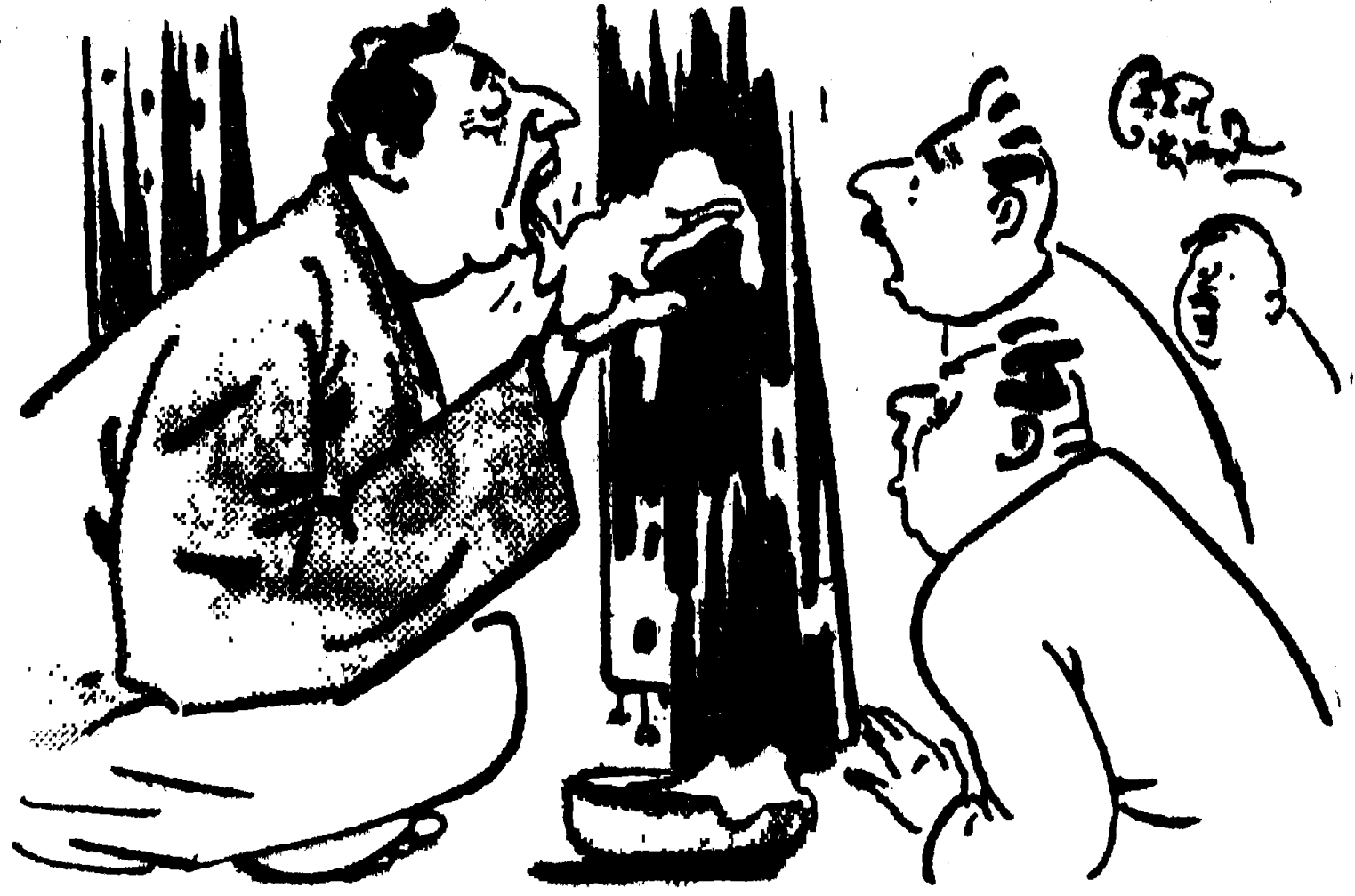
একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, একবার কথা উঠল যে কোন জল শরীরের পক্ষে সবচেয়ে ভালো—কলের জল, পুকুরের জল, নদীর জল না কুয়োর জল? নানাজনে নানামত প্রকাশ করলেন। কিন্তু সর্বদাই জমিদারবাবুই সব বিষয়ে ফাইনাল্ মতের কর্তা। তিনি নানারকম জলের উপকারিতা বর্ণনা ক'রে শেষে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "যাই হোক, আমরা হিন্দু, আমাদের কাছে গঙ্গা জলই........." বলে হাত ও চোখের ভঙ্গী ক'রে যেন জিজ্ঞাসা করলেন গঙ্গাজলই সব জলের চেয়ে ভালো, না? আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলুম "আজ্ঞে সে তো বটেই।" তিনি কিন্তু আমাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেননি যে গঙ্গাজল ভালো কিনা। এর পরে আর যে ক'বারই আলোচনা হ'ল তিনি শেষে আমার দিকে হাত ও চোখের ভঙ্গী ক'রে যেন appeal করতে লাগলেন আর আমি বলে উঠতে লাগলুম "আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা।......এ তো আপনি সত্যি কথাই বলছেন।......এর ওপরে আর কথা কি আছে?" ইত্যাদি।
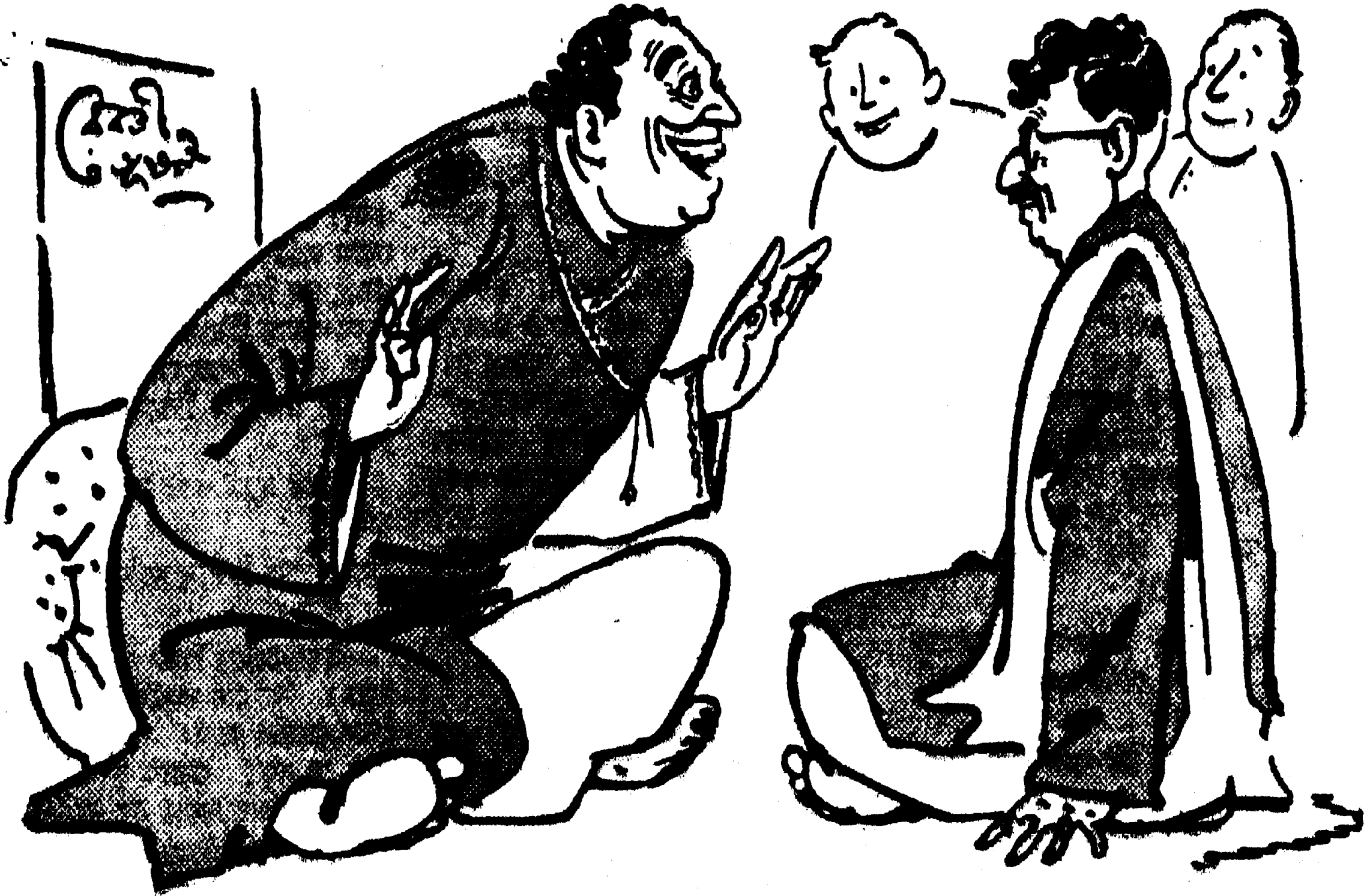
'কেমন, বলুন!"

একটু বাদেই আমার চমক ভাঙল। আমি তো বেশ মোসাহেব ব'নে গেছি! আমিও তো অন্যদের মত তাঁর প্রত্যেক কথা:কই সমর্থন করছি। তিনি তো কোন কথাই শেষ করছেন না। তিনি তো চোখ দিয়েই জিজ্ঞাসা করছেন আর আমি বলে উঠছি, "আজ্ঞে সে তো ঠিকই বটে।" আমি মনে মনে ভাবলুম যে আমি এ কি করছি। আমি স্থির করলুম যে এরপরে তিনি যতই আমাকে চোখের আবেদন জানান আমি চুপ ক'রে থাকব। তারপরের গল্পটার শেষেই যখন তিনি আমাকে হাত নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন, বলুন?" আমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলুম। আমার কাছে সমর্থন না পেয়ে তাঁর উচিত ছিল যে তাঁর মন্তব্যটা নিজেই শেষ করে দেওয়া। কিন্তু তাঁর ব্যারাম তো মজ্জাগত। তাঁর কথার শেষে অন্যলোকে "হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই" না বললে তাঁর চলে কি করে? তিনি তখন করলেন কি, ঐ বর্ণনা আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করলেন এবং শেষে বললেন, "কেমন, ঠিক বলছি কিনা?" এবারও আমি কোন জবাব না দিয়ে শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। তিনি এইভাবে দু-তিনবার চেষ্টা ক'রে আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অবশেষে প্রসঙ্গটা পরিত্যাগ করলেন। অবশ্য আমি নিশ্চয়ই জানি যে আমার একদিনের "ওষুধে" তাঁর এ-ব্যারাম সারে নি। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, এই ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উদার ও আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন এবং মানুষ হিসাবেও অতি উত্তম ছিলেন।

আমার "আরও বিচিত্র কাহিনীতে" আমি আমার মামাতো ভাই বৈদ্যনাথের কাহিনী লিখেছি। বৈদ্যনাথ অত্যন্ত সরল ও গোঁয়ার ছিল। তাকেও "বৈদ্যনাথ তুমি ছাড়া একাজ আর কেউ পারবে না।" বললেই সে যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হ'তে পারত। আমাদের গ্রামের পুকুরে একবার আমি দুটো হাঁস মারি। সে পুকুরটি দামে ভরা ছিল এবং তাতে অনেক বিষাক্ত সাপ থাকত। কেউই মরা হাঁস আন'তে চায় না। আমি বৈদ্যনাথকে বললুম, "কি হে তুমিও ভয় পাচ্ছ? তোমার মত সাহসী ছেলে এ'গ্রামে আর কে আছে?" তারপর বৈদ্যনাথ সেই পুকুরের সাপ[illegible] কিভাবে সাপের মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিল সে কথা বিস্তারিতভাবে ঐ কাহিনীতে লেখা আছে।

প্রতি গ্রামেই খুঁজলে এমন একজন লোক পাওয়া যাবে যাকে চুমরে দিলে তিনি যমেরও সম্মুখীন হতে পারেন। এইসব লোকের জীবনের একমাত্র কাম্য হচ্ছে এই যে, লোকে তাদের বাহাদুর বলবে। এঁরা কিছুই চান না, একমাত্র বাহবা ছাড়া। এই তোষামোদটির জন্যে তাঁরা কি না করতে পারেন!

বহুদিন আগে "কঙ্কাবতী"র লেখক স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এইরূপ একজন "বাহাদুর"এর গল্প পড়েছিলাম। এক গ্রামে এইরকম স্বভাবের এক ভদ্রলোক ছিলেন। সব-লোকে তাঁকে "কর্তা" বলত। বয়স বছর চল্লিশ, মুখ গুরুগম্ভীর, অহংকারে মটমট করছে। চুমরে দিলে তিনি না পারেন এমন কাজই নেই।

একবার পৌষ মাসে গ্রামে ভারি শীত পড়েছে। সবাই হি-হি করে কাঁপছে। গ্রামের ছেলেরা একদিন রাত আটটা-নটার সময়ে এক ভদ্রলোকের দাওয়ায় বসে গল্প করছে এবং সামনে এক মালসা আগুন রেখে সকলে তাপ নিচ্ছে। কিন্তু শীত এমন প্রচন্ড যে মালসার আগুনেও কারুর শীত ভাঙছে না। এমন সময়ে কর্তা সেখানে উপস্থিত হলেন। কর্তাকে দেখেই ছেলেরা কর্তার জন্যে জায়গা ক'রে দিলে যাতে তিনি সেখানে বসে আগুন পোয়াতে পারেন।

কর্তা আগুন পোয়াচ্ছেন, এমন সময় একটি ছেলে ব'লে উঠল, "দেখ ভাই আমরা সকলেই শীতে কাঁপছি, কিন্তু কর্তার শীত নেই। কর্তা যদি মনে করেন তাহলে এখনই ঐ সামনের পানা পুকুরটাতে ডুব দিয়ে আসতে পারেন।" কর্তাকে ফুলিয়ে দিলেই তিনি সব কাজ করতে প্রস্তুত। ছেলেটির কথা শুনে কর্তা বাজখাই স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "গামছা আছে?" ছেলেরা বললে "আছে বই-কি!" তখনি সেই বাড়ীর একটি ছেলে দৌড়ে গিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি গামছা নিয়ে এল। কর্তা সেই গামছাটি নিয়ে পুকুরের দিকে চললেন। পুকুরঘাটে গিয়ে গামছাটি প'রে সেই পানাপুকুরে গিয়ে তিনটি ডুব দিলেন। ছেলেরা হাততালি দিয়ে "ধন্য, ধন্য" করতে লাগল। কর্তা ঘাটে উঠে ঠক-ঠক ক'রে কাঁপতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা ক'রেও কাঁপুনিটাকে নিবারণ করতে পারলেন না। পাছে ছেলেদের কাছে বাহাদুরিটুকু যায় তাই বললেন, "দেখ, এ-কাঁপে, কিন্তু শীত করে না।"

আর একদিন কর্তা গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন যে ছেলেরা একটা মৌচাক ভাঙতে চেষ্টা করছে। পাঁকাটি জেলে, শুকনো খড়ে আগুন দিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে ছেলেরা কত ক'রে মৌমাছি তাড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মৌমাছিরা তাদের বাসা ছাড়বে কেন? তারা উড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে না। এমন সময় কর্তার আগমন। কর্তাকে দেখে একটা ছেলে ব'লে উঠল, "দেখ ভাই আমরা এতকান্ড ক'রেও মৌমাছি তাড়াতে পাচ্ছি না। কিন্তু কর্তা যদি ইচ্ছে করেন তাহলে এখনি পাঁচিলে উঠে হাত দিয়ে চাকটি ভেঙে আন'তে পারেন।" গম্ভীর আওয়াজে কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "মই আছে?" ছেলেরা বলে উঠল, "আজ্ঞে আছে বই কি।" অমনি একজন ছেলে দৌড়ে বাড়ী থেকে একটা মই নিয়ে এল। কর্তা সেই মই দিয়ে পাঁচিলে উঠলেন, হাত দিয়ে চাকটি ভাঙলেন। তারপর চাকটি হাতে ক'রে আস্তে, আস্তে নেমে আসলেন। চাক ভাঙবার সময়ে মৌমাছিরা তাঁকে ছেঁকে ধরেছিল ও সর্বশরীরে হুল ফুটিয়ে ঝাঁঝরা করে

"এ-ফোলে, কিন্তু জ্বলে না।"

দিয়েছিল। ভীষণ জ্বলুনি, কিন্তু কর্তার মুখে রা নেই। ভাবটা এমন যেন শরীরে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নেই। কর্তার মুখ অহংকারে ফুলে উঠেছে, এবং ছেলেরা সব কর্তাকে ঘিরে 'ধন্য, ধন্য' করতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে মৌমাছির হুলে কর্তার সর্বশরীর দাগড়া, দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল। কর্তা দেখলেন সর্বনাশ, বাহাদুরি তো যায়। যন্ত্রণা তো চেপে রেখেছেন, কিন্তু ফুলো ঢাকবেন কি করে? কাজেই নিজের শরীর[illegible] দিকে দেখিয়ে কর্তাকে [illegible] দিতে হল, "এ-ফোলে, কিন্তু জ্বলে না।"

পঞ্জিকা প্রসঙ্গে

সমীরন দাশগুপ্ত

হাঁচি টিকটিকি মানেন না এমন বঙ্গ সন্তানগণ আজও এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেননি। দুধেভাতে বাঙালী বাঁচে বলে একটা প্রবাদ আছে, সেই সঙ্গে আরেকটি শব্দ বোধ হয় যুক্ত হতে পারে। সংস্কার। সংস্কার বাঙ্গালীর রক্তে মিশে আছে। অন্ধ সংস্কারের নজীর অবশ্য সবকালে সব দেশেই কমবেশী লক্ষ্য করা যাবে এমনকি পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশ আজও পর্যন্ত এই গোপন বৃত্তির হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। এতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, মানুষ যতই সভ্য হ'ক, বিজ্ঞানের বড়াই করুক এক শ্রেণীর মানুষ পুরুষানুক্রমে তাদের মধ্যে এমন কিছু যুক্তি-তর্কের অতীত অলৌকিক, অবাস্তব বিশ্বাসকে বহন করে চলেছে বিজ্ঞানের কচকচি যার কাছে তুচ্ছ, প্রয়োজনশূন্য বাহুল্য বিদ্যামাত্র।

অন্ধ সংস্কার বলুন আর যাই বলুন, হাঁচি, টিকটিকির দাপট ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের কাল থেকে আজও পর্যন্ত বাঙ্গালীর বাঙলাআনার শক্ত ধ্বজাকে নানান প্রতিকূল বাতাসের বিরুদ্ধে সমান-ভাবে উড্ডীয়মান রেখেছে। আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে, বিজ্ঞানের হুল ফুটিয়ে মোহমুক্তির চেষ্টা হয়েছে কম নয় কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। শিক্ষিত বলুন আর অশিক্ষিতই বলুন এখনও এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মনে সংস্কারের নামে ভীরু অনিশ্চয়তার ভাব রয়েই গেছে। শুভ কাজে বেরোবার আগে কেউ হাঁচলে, অন্যমনস্কতার দরুণ ঘরের চৌকাঠে হোঁচট খেলে বুকের ভেতরে চকিতে মনোস্কামনা অসিদ্ধির শংকা উপস্থিত হয় না, যাত্রা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থগিত রেখে দুর্গানাম স্মরণ করেন না মনে মনে—এমন কালাপাহাড় বাঙালী-পুঙ্গব সংখ্যায় খুব বেশী নেই বোধহয়।

হাঁচি টিকটিকির বাধাগুলি না হয় সাময়িক, কাকতালীয় ব্যাপার বলে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শের যোগ থাকলে আপনার সাধ্য কি ঘরের বার হন। আরও আছে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর অথবা দক্ষিণে দিক-শূল, বারবেলা, কালবেলা, নক্ষত্রাদিদোষ, রিক্তাদি দোষ, ব্যতীপাতযোগাদিদোষ ইত্যাদি প্রভৃতি। এই সব দোষের যে কোন একটি আপনার যাত্রালগ্নে উপস্থিত থাকলে আপনার অশুভযাত্রা যে অগস্ত্য-যাত্রায় পর্যবসিত হবে না এমন অসম্ভবের গ্যারান্টি আপনাকে কোন জ্যোতিষ শাস্ত্র-কার তো দিতে পারবেনই না স্বয়ং বিধাতাপুরুষও দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অতএব কোন শুভকর্মে যাত্রা, শুভানুষ্ঠানের আগে আপনাকে তিথি-নক্ষত্র সম্পর্কে সর্বশেষ ওয়াকিবহাল হয়ে নিতে হবে। এবং এ-ব্যাপারে একটি পঞ্জিকাই শুধু আপনার বৎসরব্যাপী শুভাশুভের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

আপনি গরমের ছুটিতে সপরিবারে শৈলনিবাসী হবেন? বেশ তো, কে আপনাকে নিষেধ করেছে শৈললোক-বিহারী হতে। আপনি পরম নিশ্চিন্তে এই নিদাঘযন্ত্রণা এড়াতে যেখানে খুশী চলে যান। কিন্তু সাবধান, গ্রহ আপনার শৈলবিহারকে অনুমোদন করছে কিনা অথবা কুটিল কটাক্ষে আপনার যাত্রার দিনক্ষণকে সে দূষিত করে রাখছে একবার দেখে যাবেন। যাত্রা অশুভ থাকে শুভ হতে দিন। আর যদি শুভ থাকে, ভূলোক দ্যুলোকের যেখানে খুশী ভেসে পড়ুন, গ্রহের সাধ্য কি আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

যাত্রার প্রসঙ্গের পরে আসে জীবনের অন্যান্য শুভকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার। পঞ্জিকায় আপনি তারও নির্দেশ পাবেন। শুভকর্ম বিষয়ে পঞ্জিকা বলছে: 'ঘ ৭।১৩।৩৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নববস্ত্র পরিধান শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন নৌকাগঠন, নৌকাচালনা, নৌকাযাত্রা, ক্রয়বাণিজ্য, বিপণ্যারম্ভ, পুণ্যাহ রাজদর্শন ঔষধকরণ, ঔষধসেবন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, হলপ্রবাহ, বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ পরে ঘ ৮।২০।২৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন।'

যদি প্রশ্ন তোলেন, এত সব নির্দেশ কে মানে মশাই? ঋণগ্রহণের জন্য আবার ঘন্টা মিনিট সেকেণ্ডের কচকচি কিসের? ও তো আমরা সকাল বিকেল সন্ধ্যে সব সময়েই গ্রহণ করে থাকি, দোষ তো কিছু হয় না। ধারের কড়ি শোধ দিতে হয় না এমনও হয় না, সুদের কড়ির চক্রবৃদ্ধির হারের কোন উনিশ বিশও হয় না তো। তবে আর ওসব মানামানি কিসের? এর জবাবে আমি বলব, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মানেন এটা না হক অন্য কোন একটা মানেন নিশ্চয়ই নইলে বাজারে ছোট বড় মিলিয়ে এতগুলো পঞ্জিকা সেই পিতৃ-পিতামহের যুগ থেকে ছাপা হবে কেন। বার আনার কৃশকায় পকেট সংস্করণ থেকে শুরু করে পাঁচ টাকার রীতিমত ভারী পরিপুষ্ট কলেবর বইখানির ক্রেতা যে নিতান্ত কম নেই একথা যাঁরা নববর্ষে পঞ্জিকা বিক্রয় ব্যবসা করে থাকেন তাঁদের কাছে একবার খোঁজ নিলেই জানতে পারা যাবে।

তবে পঞ্জিকার ক্রেতার সংখ্যা যে সীমিত এটা যে কোন একখানি পঞ্জিকা হাতে নেওয়া মাত্রই বোঝা যাবে। ক্রেতা কম হওয়ার অর্থ অবশ্য এই নয় যে যাঁরা নগণ্য মূল্য খরচ করে পঞ্জিকা কেনেন, তাঁরাই শুধু পঞ্জিকা দেখেন। রোজও কেউ বিদেশে যান না, শুভকর্মও কিছু সবার ঘরে নিত্য লেগে নেই। কাজেই পাড়ার কারো হেপাজতে একখানা পঞ্জিকা থাকলেই যথেষ্ট। প্রয়োজন মত সকলেই ব্যবহার করতে পারেন।

ক্রেতার সংখ্যা যে অল্প (ব্যবহারকারী-গণের তুলনায়) তা বোঝা যাবে পঞ্জিকার কলেবরের সিকিভাগব্যাপী বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখে। এই বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা না করলে পঞ্জিকা প্রসঙ্গে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আশংকা করি।

পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে বিশেষ কোন আদর্শ মানা হয় বলে আমার মনে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত বইগুলির (অধিকাংশই অলৌকিক যাদুবিদ্যা, বশীকরণবিদ্যা নরনারী যৌন সম্পর্কে বিষয়ক) সার সংকলনের ক্ষেত্রে খুব স্থূলরুচির বট-তলার বইয়ের বিজ্ঞাপনের টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে, কোন ক্ষেত্রে নরনারীর যৌন জীবনের স্থূলতম দিকটিকে রসাল কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রেই সাহিত্যের সুরুচি রক্ষিত হয়নি যদিও আমার জানা নেই বিজ্ঞাপিত বইগুলির পৃষ্ঠাতেও সেই সুরুচি কত-খানি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কোন একটি তথাকথিত যৌনপুস্তকের বিজ্ঞাপনে যখন একথা ব্যবহার করা হয় যে 'বিজ্ঞাপনে সব লেখা চলে না' 'নিরালাদর্শী ছবিসহ' তখন অনুমিত আশংকাই বোধহয় সত্য প্রমাণিত হয়।

পঞ্জিকার পাতায় বিজ্ঞাপন অনেক আছে। তার মধ্যে বিখ্যাত ওষুধের বিজ্ঞাপন, নার্শারীর বিজ্ঞাপন, ধর্ম-পুস্তকের বিজ্ঞাপন সবই আছে কিন্তু সবকিছুই এমন জড়দগব অবস্থায় ছড়িয়ে আছে যে, যাঁরা সত্যি বিজ্ঞাপন দেখে সময় কাটাতে ভালবাসেন তাঁদের পক্ষে দর্শনীয় আদর্শনীয়ের সীমারেখা বজায় রাখা কষ্টকর। ফলতঃ এই প্রশ্নই মনে জাগে যে, এমন একটি বই যা বয়স নির্বিশেষে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রয়োজনে লাগবে বলেই প্রচারিত তার মধ্যে এত অস্বস্তিকর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি কেন। জানি না পঞ্জিকা ছাপায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা এ-বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কিনা কখনো।

কনক পিসী

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সেই কবে দরখাস্ত করা হয়েছে আজো তার একটা জবাব পর্যন্ত এলো না। হ্যাঁ বা না, একটা কথা জানিয়ে দেওয়া, তাতেও কী পরিমাণ গড়িমসি! লালফিতের বিলিতি ঐতিহ্য আমরা কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পারবো কিনা কে জানে। —একা একাই মনে মনে এই কথাগুলো ভাবছিলো কনকলতা আর রাগে ক্ষোভে যেন একেবারে ভেঙে পড়ছিলো।

গরম দুধটা তোমার এখন নিয়ে আসবো দিদিমণি?—বুড়িমা এসে জিজ্ঞেস করে এবং কনকলতার অনুমতি পাওয়া মাত্রই সে এক গ্লাস গরম দুধ দিয়ে যায়।

চা খাওয়ার অভ্যেস নেই কনকলতার। চা তার ভালো লাগে না এবং সে তা' সহ্যও করতে পারে না। তাই চায়ের বদলে তার নিত্যকার পানীয় শুই দুধ।

ভাইপো ফুটনটা কনকলতার কাছেই ছিল। তার জন্যেও দুধ এবং অন্য সব খাবার এসেছে। সেসব আগেই এসেছে এবং পিসীর খাবার আসবার আগেই ফুটন খাওয়া শুরু করে দিয়েছে।

কোয়ার্টারে একা একা থাকতে ভালো লাগে না। কনকলতা তাই ভাইপোটাকে তার মায়ের কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে এনেই আজ প্রায় দু'বছর ধরে নিজের কাছে রেখেছে।

ফুটন কিন্তু এতে ভারি খুশি। একদিকে পিসীর আদর খাচ্ছে ষোলো আনা, অন্যদিকে পড়াশুনাটাও ভালোই চলছে। এবার ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠেছে ফুটন এবং তাতে তার সে কী গর্ব! পিসীরও তাতে আনন্দের অন্ত নেই। কিন্তু দু'দিন ধরে পিসী এতো মনমরা কেন, তাই ভেবে পায় না ফুটন।

পিসিমা, তুমি কথা কও না কেন? বলো না আজ কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে।

যা বকিস না এতো। চুপ করে খেয়ে নে, তারপর দেখা যাবে কোথায় যাই।—এক খেঁকিতে ঠাণ্ডা করে দেয় কনকলতা তার ভাইপোকে। মেজাজটা এখন তার এমনি রুক্ষ।

কী, কখন যাবে পিসিমা? এর পর সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে!—বেড়াতে যাবার জন্যে আরেকবার তাড়া দেয় ফুটন, কিন্তু কনকলতার তেমন মনই নেই আজ।

না, আজ আর আমি কোথাও যাবো না বাবা, তুমি নিজেই কাছাকাছি থেকে একটু ঘুরে বেড়িয়ে এসো। আমার এখনই একটা জরুরী চিঠি লিখতে হবে।—এই বলে ভাইপোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে বেড়াতে পাঠিয়ে দেয় কনকলতা

এবং নিজে সত্যি সত্যি কার কাছে একটা চিঠি লিখতে বসে।

বছর পাঁচ ছয় ধরে শিক্ষিকার কাজ করছে কনকলতা। এম, এ, বি-টি পাস করার পর দু' বছরের কিছু বেশি হলো সে হুগলীতে এসেছে এখানকার এক সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হয়ে। এখানে আসবার মাস তিনেক পরেই সে ফুটনকে নিয়ে এসেছে। সে শুধু বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকাই নয়, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী-ভবনের সুপারিন্টেন্ডেন্টও। সেই জন্যে সরকারী কোয়ার্টারও রয়েছে তার। আর বুড়িমাকে সে পেয়েছে তার পরিচারিকা হিসাবে। কাজেই ফুটনকে নিয়ে তার কোনো রকম অসুবিধেই পোয়াতে হয় না। বুড়িমাই ফুটনের যতো ফুটফরমাস খেটে আসছে, কনকলতা শুধু তার নিত্য বিকেলের ভ্রমণ-সঙ্গী আর রোজ এবেলা-ওবেলা তার পড়ার সময়ের হুকুমদার। অবশ্য ভাই-পোকে আদরে-আব্দারে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যখন সে নিয়েছে তখন তার জন্যে তাকে একটু বিশেষভাবে ভাবতে হয় বৈকি।

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে বদলি হতে পারলে ফুটনকে শশাঙ্ক-বাবুদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া যেতো। সরকারী স্কুলে পড়ে এবং শশাঙ্কবাবুর দৃষ্টিতে থেকে ফুটন ক্রমশ আরো ভালো হয়ে উঠতে পারতো, কনকলতার সেই আশা। কিন্তু সে আশা পূরণের কোনো সম্ভাবনাই আর দেখতে পায় না সে। এতোদিনের মধ্যেও বদলির দরখাস্তের কোনো জবাব না পেয়ে পুরোপুরি নির্ভরসা হয়েই সে চিঠি লেখে দেয় শশাঙ্কবাবুকে, তাঁকে জানিয়ে দেয় তার দিক থেকে আর কিছুই করার নেই, এবার তিনি নিজে চেষ্টা-চরিত্র করে যদি কোনো কিছু করতে পারেন।

কিন্তু কনকলতার এই বদলির চেষ্টা এবং দরখাস্তের জবাব না পাওয়ায় তার এই যে মন খারাপ সে কি শুধু ফুটনের ভবিষ্যৎ চিন্তায়? তা হতেই পারে না।

ক'দিন ধরেই বুড়িমা লক্ষ্য করছে তার দিদিমণির মন-মেজাজ কেমন যেন বিগড়ে আছে। আর সে অবস্থাটাই ক্রমে বেড়ে বেড়ে এখন একদম চরমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হবে না? যে বয়েসের যা, বিয়ে-থা না করলে মেজাজ খিটখিটে হবে না তো কি। গত বছর ফুটনের মা এসেছিলেন বেড়াতে, দু'দিন ধরে তিনি কতোরকমে বুঝালেন ননদকে বিয়েতে মত দেবার জন্যে। কিন্তু কে কার কথা শোনে, দিদিমণির প্রতিজ্ঞার চোট সামলাতে না পেরে কতো দুঃখ নিয়েই না তিনি সেবার বিদায় নিয়ে গেলেন।—আপন মনেই বুড়িমা এসব কথা ভেবে চলে এবং অনেক পুরনো কথাই তার হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

আজকাল বুড়িমা নিজেও মাঝে মাঝে দু' একটা কথা বলে। তার দিদিমণিকে এই কথাটা বুঝাবার চেষ্টা করে যে, মা না হলে মেয়েদের কোনো সুখ নেই। এমন কি সে নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়েও বলে, এই দ্যাখো না, আমার ব্যাটা তো আমাকে খেতেও দেয় না, উল্টে শত্তুরের মতো ব্যবহার করে, তবু জানো দিদিমণি, ঐ শত্তুরের জন্যে দেবতাকে পেন্নাম করে যখন প্রার্থনা করি তখন মনটা কেমন যেন ভরে ওঠে—পরম শান্তি পাই।

আগে আগে এমনি সব কথা বলতে গেলে বুড়িমাকে এক ধমকে থামিয়ে দিতো কনকলতা। এখন আর দেয় না। আজও সে কোনো জবাব দিলে না বুড়িমাকে, যখন সে বল্লে, বাইরে থেকে একবার একটু ঘুরে এলেই তো ভালো করতে দিদিমণি—মনটা একটু ভালো লাগতো। সারাটা জীবন এমনি একলা একলা কি আর ভালো লাগতে পারে কখনো?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি বটে কনকলতা, তবে একটু মুচকি হেসেছে। সে হাসি চোখে পড়েছে বুড়িমার এবং তার মধ্যে সে কী যেন একটা বিশেষ অর্থও খুঁজে পেয়েছে।

তবে কি এদ্দিনে মত বদলেছে আমাদের দিদিমণির? সত্যি সত্যি দিদিমনি তা'হলে বিয়ে করবে এবার?—আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে বুড়িমা।

ধেৎ, চুপ করো বলছি!—সঙ্গে সঙ্গেই কনকলতা এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছে বুড়িমাকে। লজ্জায় জিভ কেটেছে। ছিঃ ছিঃ আশপাশে ছাত্রীরা কেউ কোথাও থেকে শুনে ফেল্লে কী বিশ্রি হবে, তাই ভেবে হাত বাড়িয়ে পাশের জানলাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে কনকলতা।

জানালার ওধারেই ছাত্রীভবন থেকে স্কুলে যাবার সরু রাস্তা। বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়বারও ঐ একই পথ। হঠাৎ জানলাটা বন্ধ হয়ে যেতেই ওদিক থেকে ডাক শুরু করে ফুটন, এই যে পিসিমা, আমি এসেছি, তুমি চলে যেও না এখন।

ফুটনের ধারণা, ওকে ফেলে ওর কনক পিসী একা একাই কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি ও আসবার আগেই দরজা-জানলা সব বন্ধ করছে।

সে জন্যেই তো ভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ফুটন একেবারে জড়িয়ে ধরেছে বুড়িমাকে। ধরেই জিজ্ঞেস করেছে, পিসিমা কোথায় যাচ্ছে বুড়িমা? বলো না।—বলেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

সেই কান্না শুনে আর কি ঘরে থাকতে পারে কনকলতা? সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কী পাগল ছেলে দ্যাখো দেখি, কে বল্লে আমি বেড়াতে যাচ্ছি? তোকে একা রেখে আমি কোথাও যাই কখনো?—এই বলে ফুটনকে হাত ধরে টেনে আনবার চেষ্টা করে কনকলতা। কিন্তু ফুটন তবুও বুড়িমাকে এক হাতেই পেঁচিয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তো কাঁদছেই।

না, না, পিসী তোর যাচ্ছে না কোথাও। সন্ধ্যে হয়ে এলো, এখন কেউ যায় বেড়াতে?—এতোক্ষণে বুড়িমার একথা শোনার পর কিছুটা যেন বিশ্বাস হলো ফুটনের। এবার সে তাই টুক টুক করে পিসীর হাত ধরে ঘরে চলে গেলো। ভাইপোর অভিমান ভাঙাবার জন্যে তাকে নিয়ে কনকলতা গিয়ে শুয়ে পড়লো।

বুড়িমার তখন অনেক কাজ। সন্ধ্যে-পিদিম দিতে হবে, বিছানা-পত্তর পাততে হবে, তারপর রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ারও একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। তাই তার তো আর শুয়ে-বসে কাটালে চলবে না। তবে কাজ করতে করতেই বুড়িমা অনেক ভাবে, অনেক কথা চিন্তা করে।

যতোই জোর গলায় বলুক না কেন আমি কোনোদিন বিয়ে করবো না, ছেলে-পুলের ঝঞ্ঝাট আমি সইতে পারবো না, ও সবই বাতকে বাত। আমি প্রায় গোড়া থেকেই বুঝে নিয়েছি এ মেয়ে বিয়ে না করে কিছুতেই পারবে না। ভাইপোটাকে নিয়ে যার এতো আদর, এতো ডলাডলি, একটা বাচ্চা পেটে না ধরলে তার সে তেষ্টা মেটে কখনো? একদিন না একদিন বিয়ে দিদিমণিকে করতেই হবে, তবে আমোদ-আহ্লাদের বয়েসটা কেটে গেলো এই যা দুঃখ।—উনুনে আগুন ধরাতে ধরাতে এই কথাগুলো গুণ গুণ করে

বলে চলে বুড়িমা। কনকলতাকে সত্যি সে খুব ভালোবাসে বলেই তার এই আপশোষ।

মাস খানেক পরের কথা। হঠাৎ একখানা চিঠি এলো বালুরঘাট থেকে। ভালো খবর যেন হয়, মনে মনে শুধু এই প্রার্থনা কনকলতার।

সত্যি ভালো খবর। শশাঙ্কবাবু লিখেছেন, তাঁর বদলির অর্ডার হয়েছে। আসছে মাসের পয়লা তারিখেই তিনি হুগলী জেংকিন্স হাই স্কুলে হেড-মাষ্টার হিসেবেই জয়েন করবেন।

এর চেয়ে আর ভালো খবর কিছু হতে পারে না। চিঠিখানা পড়ে কনকলতা যে কী করবে তাই সে ভেবে পায় না। বার বার পড়েও চিঠিখানা পড়বার তেষ্টা যেন আর মেটে না। যতোবার পড়ে ততোবারই যেন সে নতুন কোনো কথা আবিষ্কার করে সেই পত্রের মধ্যে থেকে। শেষটায় আনন্দে ঘরময় ছুটোছুটি করতে থাকে। ফুটন স্কুলে চলে গিয়েছে। তা' না হলে তাকে নিয়েই কি কম হৈ-চৈ চলতো। তার নিজেরও তো স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তবু আজ যেন তার আর কিছুতেই তৈরি হওয়া শেষ হয় না। এরই মধ্যে বার কয়েক সে শাড়ি বদলালো। শাড়ির সংগে ম্যাচ করতে গিয়ে ব্লাউজ বদলালো দু'বার। কোনো সাজই যেন আজ কনকলতার পছন্দ হচ্ছে না। চুল আঁচড়াতে যেয়েও তেমনি বিভ্রাট। বার বার পাট করলে কী হবে, আয়নায় তাকিয়ে সে দেখে চুলগুলো তার কিছুতেই যেন ঠিক হচ্ছে না।

বুড়িমার কিছুই চোখ এড়ায় না। সে আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। হঠাৎ এক হাঁক ছাড়ে, হ্যাঁগো দিদিমণি, তোমার আজ ইস্কুল নেই বুঝি!

আয়নার সামনে অমনি থমকে দাঁড়ায় কনকলতা। হাত থেকে তার আচমকা খসে পড়ে যায় চিরুনিখানা ড্রেসিং টেবিলের ওপর। কপালে সিঁদুর টিপ পরলে আর সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টানলে কেমন মানাবে তাকে কনকলতা যে মুহূর্তে এই কথাটা ভাবছিলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক তখুনি বুড়িমার এই হাঁক শুনে চমকে যেতে হয় তাকে। রীতিমত থতমত খেয়ে যায়।

আর ঠিক সেই সময়েই ফুটনও চিৎকার করতে করতে এসে ঘরে ঢোকে, জানো পিসিমা, আজ আমাদের ছুটি। তোমাদের জেংকিন্স স্কুলকে আমাদের জয়কালী একাডেমী ফুটবল খেলায় হারিয়ে দিয়েছে কিনা, তাই আজ আমাদের ছুটি দিয়ে দিলেন হেডমাষ্টার-মশাই। কিন্তু তুমি আজ এতো সুন্দর করে সেজেছো কেন পিসিমা? কোথায় যাবে বলো না। কোথাও গেলে আমায় নিয়ে যাবে কিন্তু!—পিসীর কাছে আব্দার ধরে ফুটন। মিষ্টি কথায় কোনো রকমে তাকে থামিয়ে রেখে কনকলতা স্কুলে চলে যায়।

তারপর খালি বাড়িতে নিঃসংগ ফুটনের যতো প্রশ্নের লক্ষ্য ঐ বুড়িমা। একের পর এক অবিরাম প্রশ্ন করে সে উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে তাকে। বুড়িমা কোনোটার উত্তর দেয়, কোনোটার দেয় না, কোনো কোনোটার আবার বলেই দেয় যে ওগুলোর উত্তর তার নিজেরই জানা নেই।

গোটা দুপুরবেলাটা বুড়িমার সংগে গল্প করতে করতেই ফুটন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোবার আগে সে অন্ততঃ একটা বিষয় জেনে নিয়েছে বুড়িমার কাছ থেকে, তার কনক পিসীর বিয়ে হবে।

বিয়েতে খুব আনন্দ হয় ফুটন জানে। কলকাতায় তাদের পাশের বাড়িতেই সে সেবার একটা বিয়ে দেখেছে। বল্টুর ছোড়দির বিয়ে। সে বিয়েতে ফুটনদের বাড়ির সবারই নেমন্তন্ন ছিল। এখনও সব কথা তার মনে আছে। উরে বাপস্, ভাদের সারা পথটা আলোতে আলোময় হয়ে গিয়েছিল একেবারে। আর কতো বাজনা, কতো হৈ-চৈ, খাওয়া-দাওয়ার উৎসব! আর বিয়ের দিন বল্টুর ছোড়দি কী সুন্দর সেজেছিল, সে কথাও ফুটনের মনে পড়ে।

বিয়ের দিন কনক পিসীও খুব সাজবে তাহলে। আমাদের বাড়িতে খুব আমোদ হবে, হৈ-চৈ হবে, না বুড়িমা?

হবেই তো, বিয়ে বাড়িতে আমোদ-আহ্লাদ হবে না?—বুড়িমার এই আশ্বাস পেয়েই ফুটন ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তার যখন ঘুম ভেঙেছে তার আগেই কনকলতা ফিরে এসেছে স্কুল থেকে।

আজ কনক পিসী অনেক জিনিষ নিয়ে এসেছে ভাইপোর জন্যে। একটা প্রকাণ্ড বেলুন এনেছে, এক বাক্স বিস্কুট এনেছে আর এনেছে এক রাজকন্যার গল্পের বই যার জন্যে ক'দিন ধরে ফুটন তার মাথা খেয়ে ফেলেছে।

ঘুম ভাঙতেই পিসীর আনা জিনিষ-গুলো পেয়ে ফুটনের সে কী আনন্দ! তার যেন মনে হলো কনক পিসীর বিয়ের ধুমধাম সেই থেকেই শুরু হয়ে গেল। তার আরো মনে হলো, বুড়িমা তাকে দুপুরবেলা বলছিলো তার যে পিসে আসবে, সেও তাকে খুব ভালো-বাসবে। তাহলে তো আরো মজা হবে। পিসের সংগে খুব ভাব করে নেবে ফুটন এবং তার কাছ থেকে রোজ রোজ অনেক নতুন নতুন জিনিষ আদায় করে নেবে, এই তার মতলব।

আমাদের বাড়িতে পিসে কবে আসবে পিসিমা?—কনকলতার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলুনটা ফুলিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে ফুটন।

এই অবান্তর প্রশ্নের কী আর উত্তর দেবে কনকলতা, ফিক্ করে হেসে ফেলে। বলে, ওসব বাজে কথা বলতে নেই বাবা। তুমি খেলা করো, একটু বাদেই তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো।

কনক পিসীর কথায় খুশিই হয় ফুটন। উঠোনে বেলুনটা নিয়ে কিছু-ক্ষণ ধরে ছুটোছুটি করে বেশ একটু ক্লান্ত হয়েই পড়ে সে। বুড়িমার কাছে দুধ আর খাবার চেয়ে খেয়ে নেয়। তারপর পিসীকে ডেকে বলে, চলো পিসিমা, বেড়াতে যাবে বলছিলে যে! আর কখন যাবে?

কনকলতা তৈরি হয়ে নিয়েছে ততোক্ষণে। ভাইপোর ডাক শুনেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ফুটনকে নিয়ে নদীর পারে বেড়াতে চলে যায়।

দিদিমণিকে কী সুন্দর লাগে ভালো-ভাবে সাজলে!—কনকলতা যখন বেরিয়ে যায়, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আর ভাবে বুড়িমা।

চলতে চলতে ফুটনও ওর পিসীর পোষাকের দিকে বার বার তাকায় এবং একবার হঠাৎ বলে ফেলে, এমনি করে তুমি রোজ সাজো না কেন পিসিমা? আজকের সাজটা তোমার বেশ ভালো হয়েছে।

তাই নাকি? বেশ, এখন থেকে তোমার কথায় তা'হলে এমনিভাবেই সাজবো।—ভাইপোর মন রেখে কথা কয় কনক পিসী।

তারপর ধীরে ধীরে নদীর ধারে এসে পিসী-ভাইপো নিরিবিলি একটি বেঞ্চে বসে গল্পের পর গল্প করে চলে। কনক-

পিসীর মনের ঝুলির গল্প আজ যেন ফুরুতে চায় না। সেই গল্পের মধ্যেই এক সময় ফুটন জিজ্ঞেস করে বসে, সত্যি করে বলো না পিসিমা, আমাদের বাড়িতে পিসে কবে আসবে। পিসের সংগে আমি ভাব করবো যে! তাঁর কাছ থেকে অনেক জিনিষ আদায় করবো—একটা ফুটবল, একটা রেল গাড়ি আরো কতো কি!

বেশ, সব হবে। তিনি শীগ্‌গিরই আসছেন। হলো তো!—কনক পিসীর উত্তরে ফুটন ভারি খুশি।

কিন্তু হঠাৎ কেমন একটা ঝড়ো হাওয়ায় সবাই ব্যতিব্যস্ত যেন! হ্যাঁ, নদীতে নৌকোগুলো সব দুলছে। আকাশে কালো মেঘ। ভীষণ বৃষ্টি আসছে বোধ হয়।

সকলের সংগে সংগে কনকলতাও ভাইপোর হাত ধরে ছুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু অতোটুকু বাচ্চাকে নিয়ে কতোই বা ছুটবে সে। জোরে দৌড়ুতে গিয়ে পড়ে গেলে আরো মুস্কিলে পড়তে হবে। কাজেই ভেবেচিন্তেই চলতে হয় তাকে।

মাঝপথেই বৃষ্টি নামে। একেবারে প্রবল বর্ষণ যাকে বলে। বৃষ্টিতে প্রায় তুলো-ভেজা হয়ে পিসী-ভাইপো এসে ঘরে ওঠে।

ছেলেটা আবার জ্বরে না পড়ে যায়!—ফুটনের জন্যে কনকলতার ভীষণ চিন্তা। বৃষ্টির জলে আজ যে রকম ভেজা হয়েছে, তাতে নিওমোনিয়া হওয়াও বিচিত্র নয়। ভারি ভয় হচ্ছে তার। নানা আনন্দ-চিন্তার মধ্যে ফুটনের ভাবনা মাঝে মাঝে কনকলতার মনকে এসে পীড়িত করছে।

শশাংকবাবু এখানে এলেই ফুটনকে জেংকিন্স স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে। এরই মধ্যে কনকলতা তা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে। সরকারী স্কুলে ফুটন যে অনেক ভালো করবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন ছেলেটা ভালো থাকে, সুস্থ থাকে তা'হলেই হয়।

আজ জানুয়ারীর আট তারিখ। আর তিন সপ্তাহ পরেই শশাংকবাবু হুগলীতে আসছেন। কনকলতার আজ কতো কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে শশাংকবাবুর সংগে তার প্রথম পরিচয়ের কথা। প্রথম সাক্ষাতেই যে মানুষ প্রেমে পড়ে, এ মোটেই মিথ্যে নয়। নিজেদের কথা ভাবতে গিয়েই কনকলতা বিশেষ-ভাবে তা অনুভব করে এবং অনুভব করে তা বিস্ময়ের সংগে। বিস্ময় এজন্যে, বিয়ের ব্যাপারে সব অনুরোধ সব রকমের পীড়াপীড়ি এতোকাল ধরে উপেক্ষা করে এসে এ তার কী হলো, এই ভেবে। বাস্তবিকই বিয়ের কথা বলতে এসে তার কাছে সমস্ত গুরুজন বন্ধুজন বার বার অপমানিত হয়েছে। সেই কনকলতা শশাংকবাবুর জন্যে, তার সান্নিধ্যের সম্ভাবনায় কখনো যে এমনি অধীর হয়ে উঠবে একথা ভাবতেই এখনো যেন তার হাসি পায়। হাসি পেলেও সে সব মধুর কথা ভাবতে ভাবতেই রাত ভোর হয়ে যায় কনকলতার।

গত বছর এগজামিনার্স মিটিং-এ কলকাতায় ওদের প্রথম আলাপ হয়েছিল। সেই প্রথম আলাপেই প্রথম মন-দেয়া-নেয়া। তারপর চিঠিপত্রে গভীর থেকে গভীরতর বুঝাপড়া। এরই মধ্যে হঠাৎ আরেকবার দু'জনে দেখা হয়ে যায় কলকাতায় পুজোর ছুটিতে। তখনই ঠিক হয়েছিল, কনকলতা চেষ্টা করবেন বালুরঘাটে বদলি হবার জন্যে। সে ব্যর্থ হলে শশাংকবাবু চাইবেন হুগলীতে ট্রান্সফার হতে। সরকারী কর্তৃপক্ষ যে কোনো একজনের দরখাস্ত মেনে নিলেই ওদের কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে, সে চিন্তা করেই এই প্ল্যান। বদলির চেষ্টাও চলেছে সেই প্ল্যান অনুসারেই এবং শেষ পর্যন্ত শশাংকবাবুর দরখাস্তটা যে গৃহীত হয়েছে, তা গভীর আনন্দের বৈকি।

কিছুদিন এক জায়গায় থেকে পরস্পর পরস্পরকে আরো ভালোভাবে জেনে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিয়ের ব্যবস্থা করে নেবে, এমনি কথাবার্তাই হয়ে আছে শশাংকবাবু আর কনকলতার মধ্যে। শশাংকবাবু আসছেন। তার বিয়ের দিনও তাই এগিয়ে আসছে। যে বিয়েকে সে এতোকাল দু'হাতে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সে বিয়ের মুহূর্তই তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে, এ এক আশ্চর্য অনুভব কনকলতার কাছে।

পিসিমা, চিঠি এসেছে।—ফুটন স্কুলে চলেছে, পিওন এসে একখানা চিঠি দিয়ে যায় তার হাতে। সরকারী চিঠি। খুবই যে দরকারী তা' ছাপানো ঠিকানা, সীলমারা লম্বা খাম দেখে ফুটনও অনুমান করে নিতে পারে। সে তাই তার কনক পিসীকে ডেকে জানিয়ে যায় সেই চিঠির কথা।

কনকলতা তখন বাথরুমে। বাথরুম থেকেই ভাইপোর ডাকের জবাবে তাকে বলে চিঠিখানা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে যেতে। ফুটন তাই করে। তারপরে স্কুলে দে-ছুট।

আজ আবার কার চিঠি। কলকাতার বাসা থেকেই এসেছে হয়তো।—এই ভাবতে ভাবতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে কনকলতা, এসেই টেবিল থেকে তুলে নেয় চিঠিখানা।

চিঠি দেখেই কনকলতার চক্ষুস্থির। তাদের শিক্ষা-দপ্তরেরই চিঠি। তার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে! তাকে বদলি করা হয়েছে বালুরঘাটে, আসছে মাসের পয়লা তারিখে তাকে সেখানে জয়েন করতে হবে!

কনকলতার মাথায় যেন বাজ পড়লো এই বদলির আদেশ পেয়ে। আজ আর তার স্কুলে যাওয়া হলো না।
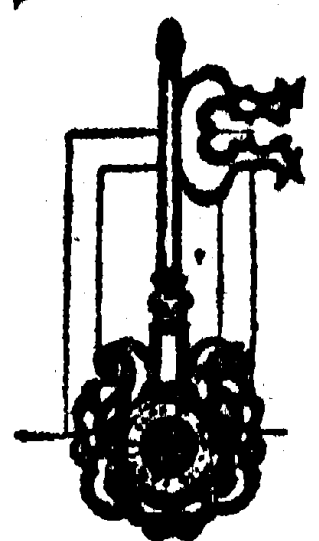
টিপু সুলতানের গ্রন্থাগার

শম্ভুনাথ প্রামানিক

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর অল্পদিনের মধ্যেই ছলে-বলে-কৌশলে ভারতবর্ষের বহু স্বাধীন নরপতির পরাভব ঘটিয়ে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার রাজ্য বিস্তার করেছিল এদেশে। কিন্তু কোম্পানীর বিভীষিকাস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন দাক্ষিণাত্যে মহীশূররাজ তেজস্বী রণদুর্মদ বীর টিপু সুলতান। সে যুগের কোম্পানী ডেসপ্যাচে, চিঠিপত্রে, পত্রপত্রিকায় যেরূপ বহুল আলোচিত হয়েছিল টিপু সুলতান ও তাঁর অজেয় শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গের কথা, সেরূপ আলোচনা হয়নি ভারতবর্ষের তদানীন্তন অন্য কোন স্বাধীন নরপতির কথা। সেই দুর্ধর্ষ বীর টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী পরাস্ত করেন টিপু সুলতানকে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে। টিপুর পরাভবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল ইংরাজ কর্তৃপক্ষ, আনন্দ-উৎসবের ধূম পড়েছিল ইংরাজ মহলে। বিজয়ী বীর ওয়েলেসলীকে স্বাগত জানিয়েছিল কলকাতার তৎকালীন ইংরাজ, মুসলমান ও হিন্দু নাগরিকবৃন্দ এবং প্রকাশ্য সভায় ইংরাজী, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় অভিনন্দনপত্রও পাঠ করেছিলেন তাঁরা।

টিপুর পরাভবের পর ইংরাজের হস্তগত হয় শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গস্থিত ৯২৯টি বড় কামান, ৯৯,০০০ হাজার বড় ও ছোট বন্দুক, ৮৩টি বারুদখানা ও টিপুর সঞ্চিত ১১,৪৩,২১৬ ষ্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যের ধনরত্ন। আর হস্তগত হয় টিপুর সযত্নরক্ষিত বিরাট গ্রন্থাগার।

মহীশূর-রাজ হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের রণনৈপুণ্যের কথাই বহুল আলোচিত হয়েছে ইতিহাসে, কিন্তু পিতা-পুত্রে ইসলাম সংস্কৃতির কত বড় ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তার আলোচনা হয়নি কোথাও। এর সাক্ষ্য হচ্ছে—বিভিন্ন যুগের ইসলাম সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ও ফার্সি ভাষায় লিখিত দুই হাজার পুঁথিসমন্বিত আলোচ্য এই বিরাট গ্রন্থাগার।

শক, হূন, যবন, তাতার প্রভৃতি বহিঃশত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করে যেখানেই জয়ী হয়েছে, সেইখানেই বিনষ্ট করেছে তারা ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডার। ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত এই চিরাচরিত প্রথার লঙ্ঘন করে বিজেতা ইংরাজ বিনষ্ট করেনি বিজিত টিপু সুলতানের সযত্ন-রক্ষিত এই জ্ঞানভাণ্ডার। ওয়েলেসলীর নির্দেশে শ্রীরঙ্গপত্তম হতে আনীত হয় এই বিরাট গ্রন্থাগার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে। মহীশূর হতে কলকাতায় এই গ্রন্থাগারের স্থানান্তর সামান্য ঘটনা বলে প্রতীয়মান হলেও ভারতীয় তথা প্রাচ্য সংস্কৃতির ব্যাপক পুনরালোচনার বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল এই ঘটনার মধ্যে।

ইসলাম তথা প্রাচ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী এই বিপুলসংখ্যক পুঁথির মর্ম অবগত হয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতির এত[...] অনুরাগী হয়ে পড়েন ওয়েলেসলী [...] শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ জয়ের প্রথম [...]বাৎসরিক উপলক্ষে তরুণ ইংরাজ কর্মচারীদের প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা ও প্রাচ্য সংস্কৃতির জ্ঞান লাভের জন্য কলকাতায় স্থাপন করেন ইতিহাসবিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখের দীর্ঘ স্মারকলিপিতে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে বলেছেন ওয়েলেসলী,

"A College is hereby founded at Fort Willian in Bengal for the better instruction of the junior Civil Servants of the Company in such branches of literature, science and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of duties of the different offices constituted for the administration of the British possessions in the East Indies........ The Governor General considered the College at Fort William to be the most becoming Public monument which the East India Company could raise to commemorate the conquest of Mysore, he has accordingly dated the law for the foundation of the College on the 4th May, 1800, the first anniversary of the reduction of Seringapatam ...... No establishment formed in England would give a correct practical knowledge of the languages, laws and customs of India, of the peculiar habits and

genius of the people, of their mode of transacting business and of the characteristic features of their vices and virtues".

টিপ্‌, সুলতানের গ্রন্থাগারের পুঁথির কিছু অংশ পাঠিয়েছিলেন ওয়েলেসলী ইংলন্ডে কর্তৃপক্ষের নিকট; কিছু অংশ দান করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটিকে ও বাকী অংশ রেখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। ইংলন্ডে প্রেরিত পুঁথিগুলিই সূচনা করে পরবর্তীকালের জগদ্বিখ্যাত ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর। এশিয়াটিক সোসাইটিকে প্রদত্ত পুঁথিগুলিই সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য আদি সংগ্রহ। সোসাইটির প্রথম শত-বার্ষিকী (১৭৮৪—১৮৮৩) উপলক্ষে তিন খন্ডে প্রকাশিত বিরাট স্মারক-গ্রন্থের তাঁর সম্পাদিত প্রথম খন্ডের ইতিহাস বিভাগে স্বীকার করেছেন প্রখ্যাত মনীষী ও ঐতিহাসিক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি বলেছেন,

"The early history of the Oriental Library is very much the same as that of the European one. The Society depended mainly on casual gifts from members and they were not numerous. The first accession of any importance was a gift from the Seringapatam Prize Committee. It included a selection from the Library taken in loot from the palace of Tipu Sultan. There were among them many old and rare works including a great number of beautifully illuminated manuscripts of the Quoran and of that part of it called Pansurah. An exceedingly well written old text of the Gulistan, said to be the first copy from the original manuscript of the author and a codex of the Padshanama bearing an autograph of the Emperor Shah Jehan, were among them."

ইংলন্ড হইতে নবাগত তরুণ ইংরাজ কর্মচারীদের প্রাচ্য সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় লাভের ও প্রাচ্য ভাষা-সমূহ শিক্ষালাভের জন্য নিযুক্ত করে-ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলী আরবী, ফার্সি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্থানী (উর্দু), তামিল, তেলেগু, মারাঠী, কর্ণাটকী, উড়িয়া ও অন্যান্য ভাষাবিদ শতাধিক মৌলভী, মুন্সী ও পন্ডিত ব্যক্তিকে। আর এ'দের উপরে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেছিলেন স্যার জর্জ হিনারো বারলো, হেনরী থমাস কোলব্রুক, জন হার্বার্ট হ্যারিংটন, নীল বেঞ্জামিন এডমন্সটন, ফ্রান্সিস গ্লাডউন, ক্যাপ্টেন জন বেইলী, জন গিলক্রাইস্ট, রেঃ ক্লডিয়াস বুকানন, মাথু লামসডেন, ক্যাপ্টেন চার্লস স্টুয়াট, ক্যাপ্টেন জে মোয়াট, এনসাইন উইলিয়াম ম্যাগডুগাল, রেঃ উইলিয়াম কেরী, রেঃ ফিজেল্ড, ডাঃ জে ডিন-উইডি ও মঁসিয়ে ডুপ্লে প্রভৃতি। এ'দের অধিকাংশই ছিলেন বহু ভাষাবিদ ও বিশ্রুতকীর্তি প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ।

আরবী ও ফার্সি ভাষায় সুপন্ডিত বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) চার্লস স্টুয়ার্ট ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফার্সি ভাষার সহঃ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ইনি টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের পুঁথিসমূহের শ্রেণীবিন্যাসের (cataloguing) ভার-প্রাপ্তও হন। এ'কে সাহায্য করার জন্য চারজন মুন্সীও প্রথমে নিযুক্ত করেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধ্যাপনার কার্যে ফিরে যান তিনজন মুন্সী; শেষ পর্যন্ত পুঁথির শ্রেণী বিন্যাসের কার্যে সাহায্য করেন স্টুয়ার্টকে কলেজের আরবী ও ফার্সি বিভাগের মুন্সী জৌনপুরনিবাসী মৌলভী সৈয়দ হুসেন আলি। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফার্সি লেখক মোল্লা হুসেন ওয়াইজ কাশিফির আনবরী সুহেলীর (Anwari Soohuelee) এক সংস্করণ সম্পাদনা করেন এই মৌলভী সৈয়দ হুসেন আলি। চার্লস স্টুয়ার্টের তদারকে এই সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলেজ কর্তৃ-পক্ষের সহায়তায় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। এই পুস্তকের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরিশ্রমের পর টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের শ্রেণী-বিন্যাস সমাপ্ত করেন চার্লস স্টুয়ার্ট। প্রাচ্য ভাষাসমূহের অধ্যাপক—ইনি পরবর্তীকালে ইংলন্ডস্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া কলেজে (যা হ্যালিব্যারী কলেজ নামে সমধিক পরিচিত) প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি এই কলেজে নিযুক্ত থাকাকালীন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন টিপু সুল-তানের গ্রন্থাগারের বিস্তৃত তালিকা (Catalogue)। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখযোগ্য যে ওয়েলেসলী প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ব্যয়বহুল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিরোধী ছিলেন ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা উপ-লব্ধি করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। তাই ভারতবর্ষে আগমনেচ্ছু তরুণ ইংরাজ কর্মচারীদের প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষা অনু-শীলনের জন্য তারা স্থাপন করেছিলেন ইংলন্ডের হার্টফোর্টে এক কলেজ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে। পরে বহুমূল্যে পুরাতন হ্যালিব্যারী ক্যাসেল খরিদ করেন কর্তৃপক্ষ এই কলেজের জন্য, এবং সেই জন্যই এই কলেজ হ্যালি-ব্যারী কলেজ নামে বিখ্যাত। আরবী, ফার্সি, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি বহু প্রাচ্যভাষার পঠন ও পাঠন হত এই কলেজে)।

টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের তালিকার সঙ্গে লিখেছেন স্টুয়ার্ট হায়দার আলি ও টিপুর কর্মবহুল বৈচিত্র্যময় দীর্ঘ জীবনী। সেই জীবনীর আলোচনা বর্তমানে নিষ্প্রো-য়োজন। তবে গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে দুর্লভ পুঁথিগুলির কিছু অংশ সংগৃহীত হয়েছিল বিজাপুর ও গোলকুন্ডার মুসলমান নরপতিগণ দ্বারা এবং বাকী অংশ সংগৃহীত হয়েছিল কর্ণাটকের নবাব নাসের আবদুল্লা আব্দুল ওয়াহিব খাঁন কর্তৃক। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটক, সনুর, কুডাপ্পা প্রভৃতি স্থান জয় করে এই দুর্লভ পুঁথিগুলি আনয়ন করেন হায়দার আলি স্বীয় চিত্তুর দুর্গে এবং সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গে টিপু সুলতান দ্বারা। পরে এই গ্রন্থাগারস্থিত, পুঁথির সংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল হায়দার আলি ও টিপুর প্রচেষ্টায়। সমস্ত পুঁথিই নূতনভাবে বাঁধাই করা হয় শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গে ও বহু সংখ্যক পুঁথি চিত্রশোভিতও করা হয়। মলাটের মধ্যস্থলে এক বৃত্তের মধ্যে লিখিত হয় ইসলামের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদ, তাঁর কন্যা ফাতেমাবিবি ও দৌহিত্রদ্বয় হাসান ও হোসেনের নাম। মলাটের চার কোণে লিখিত হয় ইসলাম ধর্মের প্রথম চারজন খালিফা, আবু বেকার, ওমর, ওসমান ও আলির নাম। মলাটের শীর্ষ ভাগে লিখিত হয় 'সরকার খোদাদাদ' (Government given by God) এবং নিম্নভাগে লিখিত হয় 'আল্লাহ কাফি' (God is sufficient)। কিছু সংখ্যক পুঁথিতে টিপুর নামও মোহরাঙ্কিত হয়।

টিপুর গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত দুই হাজার পুঁথির মধ্যে বারশত দুইখানি

পুঁথির শ্রেণীবিন্যাস করেছেন ষ্টুয়ার্ট তাঁর তালিকায়, প্রায় সমস্ত পুঁথির রচনাকাল, লেখকের নাম ও পরিচয় এবং পুঁথির সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেছেন ষ্টুয়ার্ট। ষ্টুয়ার্টের শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে ইসলাম সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ও ফার্সি ভাষায় লিখিত পুঁথির এক তালিকা যোজনা করা হল এই প্রবন্ধের শেষে। এই তালিকা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কেবলমাত্র গোঁড়া ধর্মীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না ইসলাম সংস্কৃতি। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখায় সুবিস্তৃত বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোচনা করে থাকেন আজকের সভ্য মানুষ, প্রাচ্য দেশীয় মুসলমান মনীষিগণও সেই সমস্ত বিষয়েই আলোচনা করেছেন সুদূর অতীতকালেও।

ষ্টুয়ার্ট তাঁর তালিকায় পুঁথিগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এইভাবে—ইতিহাস, সুফীবাদ, নীতিশাস্ত্র, কাব্য, গল্প ও উপন্যাস, পত্র, কলা ও বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, অভিধান, ধর্মতত্ত্ব, আইন, হদিস, কোরাণ, কোরাণের টীকা, প্রার্থনা, জীবনী ও বিবিধ বিষয়।

ব্যাকরণের সূত্র, রচনাপ্রণালী ও ভাষাতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ভাষাতত্ত্বের পুঁথিগুলিতে। চিকিৎসাবিদ্যা, রোগনির্ণয়, শারীরতত্ত্ব, প্রসূতি পরিচর্যা, শোণিত প্রবাহ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে পদার্থবিদ্যার পুঁথিগুলিতে। পত্র বিভাগে আছে ইউরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে লিখিত টিপু সুলতানের পত্রাবলী ও তাঁর প্রশাসনিক নির্দেশনামাসমূহ।

ষ্টুয়ার্ট লিখেছেন যে, টিপু সুলতান স্বয়ং " ছিলেন 'কবিযশঃপ্রার্থী'; তাঁর প্রিয় পাঠ্য ও আলোচনার বিষয় ছিল সুফীবাদ ও ধর্মতত্ত্ব। কিন্তু তিনি কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর নির্দেশে ও তদারকে লিখিত হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে পঁয়তাল্লিশখানা গ্রন্থ। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর (টিপুর) নির্দেশে রচিত গ্রন্থসমূহে পরিস্ফুট হয়েছে টিপু সুলতানের তীব্র হিন্দু ও খৃষ্টান বিদ্বেষ; কিন্তু কোন দৃষ্টান্তই উল্লেখ করেন নি ষ্টুয়ার্ট তাঁর তালিকায়।

টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের বিবরণ পাঠে এই কথাই স্বতঃই উদয় হয় যে,

অতি সুপ্রাচীন দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের কথার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির কথাও একদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সারা দুনিয়ায়। ভারতীয় স্বর্ণের লোভে সাগর পাড়ি দিয়ে একদিকে যেমন এসেছিল লুব্ধ বণিকের দল, তেমনিই এসেছিল জ্ঞানপিপাসুর দলও। তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি একদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সারা দুনিয়ায়। বহু আয়াস স্বীকার করে আসতেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের দল এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে। কিন্তু কি কি বিষয়ে পঠন ও পাঠন হত সেখানে, তার বিস্তারিত ইতিহাস আজ অজ্ঞাত। যুগ যুগ ধরে ক্রমাগত বিদেশীর আক্রমণে ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগে আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে হারিয়ে গেছে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিপুল সংখ্যক পুঁথিসমূহ। যবন আক্রমণে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র দীর্ঘকাল পরপদানতই হয়নি, সেই সঙ্গে বহুল অংশে

টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারের পুঁথির তালিকা

ভাষা	বিষয়	পুঁথি সংখ্যা
ফার্সি	ইতিহাস (History)	২৭
ফার্সি	ঐ ভারতীয়	২৫
ফার্সি	ধর্মবিষয়ক ঐ (Ecclesiastical)	৫৬
আরবী	ঐ ঐ	১০
ফার্সি	সুফীবাদ (Sufyism)	১৭
আরবী	ঐ	৮
ফার্সি	নীতিশাস্ত্র (Ethics)	২০
আরবী	ঐ ঐ	১
ফার্সি	কাব্য (Poetry)	১৭২
আরবী	ঐ ঐ	১৮
ফার্সি	গল্প ও উপন্যাস (Fables)	১৮
ফার্সি	পত্র (Letters)	৫১
আরবী	ঐ ঐ	২
ফার্সি	কলা ও বিজ্ঞান (Arts & Science)	১৮
আরবী	ঐ ঐ	১
ফার্সি	গণিত (Arithmetic ও Mathematics)	৩
আরবী	ঐ ঐ	৪
ফার্সি	জ্যোতিষ (Astronomy)	১২
আরবী	ঐ ঐ	৮
ফার্সি	পদার্থবিদ্যা (Physics)	৪৮
আরবী	ঐ ঐ	১৪
আরবী	দর্শন (Philosophy)	৫৪
ফার্সি	ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব (Philology)	১২
আরবী	ঐ ঐ	৩৩
ফার্সি	অভিধান (Lexiography)	১৫
আরবী	ঐ ঐ	১৪
ফার্সি	ধর্মতত্ত্ব (Theology)	১১
আরবী	ঐ ঐ	৩৫
আরবী	আইন (Jurisprudence)	৬৫
ফার্সি	ঐ ঐ	৩০
আরবী	হদিস (Hadis or Tradition)	৩৯
ফার্সি	ঐ	৭
আরবী	কোরাণ (Korans)	৪৪
আরবী ও ফার্সি	কোরাণের টীকা (Commentaries on the Korans)	৪১
আরবী ও ফার্সি	প্রার্থনা (Prayers)	৩৫
আরবী ও ফার্সি	বিবিধ (Miscellaneous)	২২
পার্সি হরফে	হিন্দি ও দক্ষিণী ভাষায় পদ্য	২৩
ঐ	ঐ গদ্য	৪
তুর্কী	জীবনী	২

মোট সংখ্যা ১২০২

বিনষ্ট হয়েছে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিদর্শন— হস্তলিখিত পুঁথিসমূহ। মুসলমানের পর ইংরাজ অধিকার করেছে ভারতবর্ষ, কিন্তু করেনি তারা বিধ্বস্ত বা নষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতির ও পুরাকীর্তির নিদর্শনসমূহ; অতি সযত্নে রক্ষা করেছেন এদের। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতবর্ষে পুরাকীর্তির সংরক্ষণ ও পুঁথি সংগ্রহের প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছেন ইংরাজ মনীষিগণ, শুধু সংরক্ষণই করেন নি তাঁরা, সেগুলির বিশদ বিবরণ মুদ্রিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির কথা সারা দুনিয়ায়।

চার্লস স্টুয়ার্টের তালিকায় বর্ণিত টিপু সুলতানের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত কয়েকখানি হস্তলিখিত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১। তারিখ্ রোজেত্ অল্ সুফ্‌ফা—(Tarikh Rozet al Suffa) : ফার্সি ভাষায় লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাস; লেখক মহম্মদ মীর খামদে শা। খোরাসানে তাঁর মৃত্যু হয় ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে। সুলতান হুসেনের উজীর আলি শার নামে উৎসর্গীকৃত এই ইতিহাস। ভূমিকায় ইতিহাস পাঠের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখক।

২। তারিখ্ তাব্বেরী—(Tarikh Tabbery) : তিন খণ্ডে লিখিত অতি প্রামাণ্য ইতিহাস। মূল ইতিহাস আরবী ভাষায় রচনা করেন আবু জাফের বেন জোয়াইর ৯১২ খৃষ্টাব্দে। ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন তাব্রিজ নিবাসী আবু মহম্মদ। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস, দেশপ্রেমিক, মহাপুরুষ, দার্শনিক ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী আছে প্রথম খণ্ডে; হজরত মহম্মদ ও তাঁর বংশধরগণের জীবনী আছে দ্বিতীয় খণ্ডে; ১১১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খলিফাগণের ইতিহাস আছে তৃতীয় খণ্ডে।

৩। তারিখ্ মুখ্‌তাসার (Tarikh Mukhtasar) : আদমের জমানা থেকে পারস্যের শা তাম্সার (১৫২৫ খৃঃ) রাজত্বকাল পর্যন্ত ফার্সি ভাষায় লিখিত এশিয়ার ইতিহাস। লেখক আহম্মদ বেন্ মহম্মদ গফানী। শা তাম্সার নামে উৎসর্গীকৃত।

৪। তারিখ্ অল্‌ফী (Tarikh Alufy) : এক হাজার চান্দ্র বছরের (৬২২ - ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ) মুসলমানদিগের সাধারণ ইতিহাস। দিল্লীর সম্রাট আকবরের নির্দেশে এই ইতিহাস সঙ্কলন করেন কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি (Society of Learned men)। এর ভূমিকা লেখেন প্রসিদ্ধ আবুল ফজল আলামী।

৫। তাবকত্ নাসিরী (Tabkat Nassery) : ফার্সি ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস পুস্তক—লেখক আবু ওমর মেন্‌হাজ অল্ গিওরজানী। দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন (১২৫২ খৃঃ) এর নামে উৎসর্গীকৃত। প্রসিদ্ধি আছে সুলতান স্বয়ং নকল করেছিলেন এই পুস্তকের। আরবীয়, য়ুহুদী, পারসিকদিগের প্রাচীন ইতিহাস; খলিফা, পারস্য ও হিন্দুস্থানের মুসলমান নরপতিগণের এবং চেঙ্গিজ খাঁ ও তাঁর বংশধরগণের বিস্তারিত আলোচনা আছে এই পুস্তকে।

৬। দা রা ব-না মা—(Darab Nameh) : ফার্সি ভাষায় লিখিত জীবনী গ্রন্থ। স্পেনের অন্তর্গত তুরতুশানিবাসী আবু তাহের-এর রচয়িতা। জোরাব, দারায়ুস্, মেসিডনের ফিলিপ্, আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট, গিলানী, হিপোক্রেটস্, প্লেটো, এরিস্তল প্রভৃতির জীবনীর আলোচনা করেছেন লেখক এই পুস্তকে।

৭। তুজুক্ বাবরী—(Tuzuk Babery) : তুর্কী ভাষায় লিখিত সুলতান জাহির উদ্দীন মহম্মদ বাবরের আত্মজীবনী। বাবরের পৌত্র সম্রাট আকবরের নির্দেশে এই আত্মজীবনীর ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন আবু রেহমান খান্ খানান্। মূল পুস্তক একান্ত দুষ্প্রাপ্য।

৮। শিরি আশ্‌রার : (Siri Asrar) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উপনিষদ (Oupnekat) থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন শাজাহানের পুত্র দারাশিকো বারাণসীতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে। বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধন করাই ছিল দার্শনিক দারাশিকোর এই পুস্তক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। দারাশিকো কাফের ও রাফিজী (নাস্তিক) এই মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে দেন ফৌজের মধ্যে তাঁর ভ্রাতা কূটবুদ্ধি ও গোঁড়া ঔরংজেব। দারাশিকোর পতনের মূল কারণ এই অপপ্রচার।

৯। হিদায়া সেরে বেদায়ী (Hedayah Shereh Bedayi) আরবী ভাষায় লিখিত অতি প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ আইন পুস্তক (Jurisprudence)। রচনা করেন শেখ্ বুরহান আবদীন আলি। ট্রানসক্‌সিনিয়ার অন্তর্গত মারঘিনামে জন্মগ্রহণ করেন ইনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে, এঁর মৃত্যু হয় ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে। হিন্দু আইনের সারমর্ম অবগত হওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ 'জেণ্টু ল' (Gentoo Law) যেমন লিখিয়েছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস, তেমনিই অনুবাদ করিয়েছিলেন এই পুস্তকের মিঃ হ্যামিল্টনের দ্বারা মুসলমান আইনের সারমর্ম অবগত হওয়ার জন্য। 'হিদিয়া' নামে পরিচিত হ্যামিল্টনের অনুবাদ প্রকাশিত হয় লণ্ডনে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে।

১০। কুল্লিয়াৎ সাদি (Kulliat Sady) ফার্সি ভাষায় রচিত পারস্যের অমর কবি শেখ সাদির সমগ্র কাব্য-সংগ্রহ। সাদি রচিত ১৭ খানা কাব্য-পুস্তক আছে এই সংগ্রহ পুস্তকে—(১) সূচনা; (২) রিসালে মুয়াজে (Resaleh Muazeh); (৩) মুজলিস্ হাঁসে (Mujalis Hense); (৪) রিসালে সাহিব দিওয়ান্ (Resaleh Saheb Diwan); (৫) গুলিস্তাঁ (Gulistan); (৬) বোস্তান (Bostan); (৭) কাশিয়াদ্ আরাবী (Casiad Araby); (৮) কাশিয়াদ্ ফার্সি (Casiad Farsi); (৯) মেরাসী (Merasi); (১০) মুলাম্মিয়াৎ (Mulammiat); (১১) মুজ্জেবাৎ (Muzzebat); (১২) রুব্বাৎ (Rubbat); (১৩) ফারদিয়াৎ (Ferdiat); (১৪) ঘাজেয়াৎ (Ghazehat); (১৫) মোক্‌তায়িৎ (Mokttaeat); (১৬) মোরেক্কাবাৎ (Morekkabat) ও উপসংহার (Conclusion)।

পারস্যের অন্তর্গত সিরাজে জন্মগ্রহণ করেন মোস্‌লেৎ আবদীন শেখ সাদি। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন ইনি ১০২ বছর বয়সে। যৌবনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন সাদি। যুদ্ধও করেছিলেন হিন্দু ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে। বন্দী হন খৃষ্টানদের হাতে। বাধ্য হয়েছিলেন ইনি শ্রমিকের কাজ করতে ত্রিপলীতে। মুক্তিলাভ করেন কোন সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায়। বিবাহও করেন এই ব্যক্তির কন্যাকে। সুখী হন নাই সাদি বিবাহিত জীবনে তাঁর পত্নীর বদ্‌মেজাজের জন্য। পরবর্তী কালে অনুযোগ করতেন সাদি যে দাসত্ব অপেক্ষাও জঘন্য হয়েছিল এই বিবাহ-বন্ধন। সাদি ছিলেন পর্যটক, তীর্থযাত্রা করেছিলেন চতুর্দশবার মক্কায়। সুপ্রসিদ্ধ সুফী আব্দল কাদের মিলানীর শিষ্য ছিলেন ইনি। পরিণত বয়সে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন ইনি সর্বদাই। সর্বলোকের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন ইনি। সমকালীন বাদশারা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা দর্শন করতে যেতেন এঁকে। এঁর সমাধি দেখবার জন্য এখনও বহুলোকসমাগম হয় সিরাজ নগরীর উপকণ্ঠে।

ইংরাজী ভূমিকা ও জীবনীসহ সাদির সমগ্র কাব্য-পুস্তকের এক সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতায় মিঃ হ্যারিংটন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

ভেবলুরের খাতা
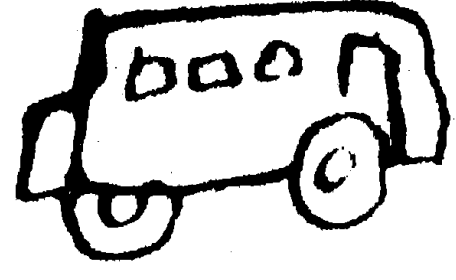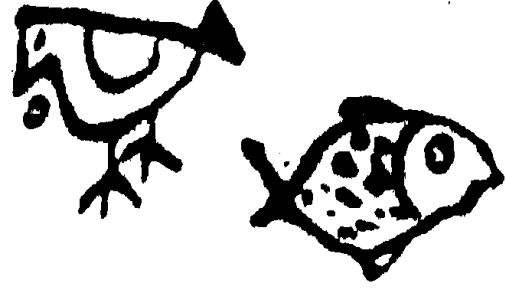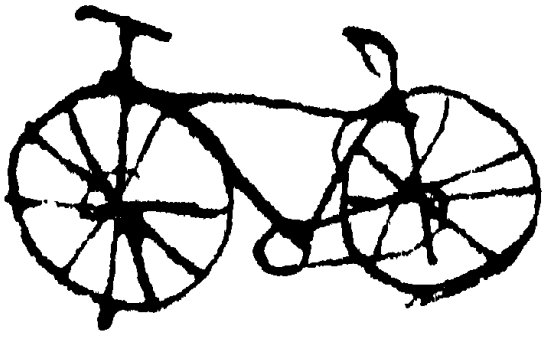
অয়স্কান্ত

সেই মানুষটি

ঠিক এই পুজোর দিনে সেই মানুষটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ট্রামে বা বাসে, আপিসে বা বাজারে, রাস্তায় বা ময়দানে, সর্বত্রই তিনি আপনাদের চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তবুও এই পরিচয়টুকুর প্রয়োজন আছে। কারণ, তিনি মুখের ওপরে সবসময়ে এমন একটি মুখোশ এঁটে থাকেন যা তাঁর সত্য পরিচয়কে গোপন রাখে।

বলা বাহুল্য, মানুষটির সীমিত সামর্থ্যের ওপর দিয়ে পুজোর মাসটি কেটেছে প্রবল একটি ঘূর্ণিবাত্যার মতো। ছেলেমেয়েদের ও আশ্রিত-পরিজনদের তিনি অবশ্যই নতুন জামাকাপড়-জুতো কিনে দিয়েছেন। একাধিক সর্বজনীন পুজোর চাঁদার খাতায় তাঁরও নাম উঠেছে। তাঁকে মোটামুটি একটি হিসেব রাখতে হয়েছে, পুজোর ক'টা দিন পার হলেই আরো কতজন মানুষকে তিনি পুজোর বকশিস দিয়ে খুশি করবেন। তারপরেও তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে হিসেবের বাইরের কয়েকটি ব্যাপারের জন্যে—যেমন, সামাজিকতা, লৌকিকতা, অতিথি-আপ্যায়ন, ইত্যাদি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মানুষটির ক্ষমতা নিতান্ত কম নয়। অনেকগুলো দুর্গম শিখর তিনি পার হয়ে এসেছেন। আরো অনেকগুলো দুর্গমতম শিখর তাঁকে পার হতে হবে। তবুও তাঁর দুর্ভাগ্য এই যে, এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরেও তাঁর নাম তেনজিঙ বা হিলারীর মতো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে না। তাঁকে মুখের ভাবখানা এমন করে তুলতে হবে যেন তিনি অতি সাধারণ ও অতি মামুলী একটি কর্তব্য সম্পাদন করেছেন মাত্র। তাও নিতান্তই দায়সারা ভাবে। এজন্যে কোনো কৃতিত্ব দাবি না করে তিনি বরং লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলেই ভালো।

মানুষটিকে আমি অনেকদিন ধরে দেখছি। তিনি আমারই সহকর্মী ও সহযাত্রী। তাঁর কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বলতে চাই।

• • •

খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি। অধিকাংশ দিনই তাই। খাড়া চুল। বরাবরই প্রায় এক রকম। ব্যতিক্রম যেটুকু ঘটে তা মনের ওপরে কোনো ছাপ ফেলতে পারে না। মানুষটির মুখের চেহারার সঙ্গে এই খোঁচা খোঁচা দাড়ি বা খাড়া খাড়া চুলই যেন ফ্রেম হিসেবে ভালো মানায়।

গোল গোল মস্ত চোখ। ঠোঁটদুটো পুরু কিন্তু গোলগাল মুখখানায় বেমানান নয়। মুখে সবসময়েই একটু হাসি লেগে আছে। চোখদুটো সবসময়েই খুশিতে ঝলমল।

গায়ের জামা দেখা যায় না। একটা খয়েরী রঙের খদ্দরের চাদরে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। পরনের ধুতির সামান্য একটু অংশই চাদরের তলা থেকে দেখা যেতে পারে। প্রচুর ধুলোর পায়ের চটির আসল রং চাপা পড়ে গিয়েছে।

শ্যামবাজারের টার্মিনাস থেকে যে-সময়ে বাসে ওঠেন তখন পর-পর কয়েকটা বাসেই আপিসের ছোকরার দলের দু-একজন থাকে। তিনি বাসে উঠলেই একটা সোরগোল শুরু হয়ে যায়।

সামনে আর পেছন থেকে তিন-চারজন একসঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে। বিপন্ন মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বসে পড়েন এক জায়গায়। অন্যরা শাসায়ঃ মনে থাকে যেন! অবশ্য এসব কথা অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। বাস ছাড়ার আগেই যাত্রীতে ঠাসা হয়ে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে শুধু পাশের লোক ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলা চলে না।

আর এই পাশের লোকটির সঙ্গে তিনিই প্রথম কথা শুরু করেন।

কিছু খোঁজখবর পেলি রে?

গত পাঁচ বছর ধরে তিনি একটি পছন্দমতো বাড়ি খুঁজছেন। পছন্দমতো মানে, এমন একটি বাড়ি যার ভাড়া হবে খুবই কম আর ব্যবস্থা হবে খুবই নিখুঁত। অর্থাৎ, আস্তো একখানি ঘর, কলতলা ইত্যাদির একটু সুবিধে আর রান্নার একটু জায়গা। পাঁচ বছর ধরে খোঁজ করে যাওয়াটা এখন নিতান্তই একটি অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এমন কি হয়তো বা কথা শুরু করার অনায়াস একটি প্রসঙ্গ।

ফলে, অভ্যস্ত জবাবই তাঁকে শুনতে হয়ঃ না দাদা, এখনো পাইনি।

তাছাড়া, বাড়ি ভালো কি মন্দ তা বিচার করার জন্যে তিনি নিজস্ব একটি থিওরিও খাড়া করেছেন। তা হচ্ছে রান্নাঘরের ব্যবস্থা। কলকাতার ভাড়াটে বাড়িতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রান্নার ব্যবস্থা বারান্দার কোণে তোলা-উনুনে। দেখেশুনে তাঁর ধারণা হয়েছে, কলকাতার লোকেরা রান্না করে খেতে ভুলে যাচ্ছে। আর নানা ধরনের রান্নার আস্বাদের মধ্যে দিয়ে খাওয়ার সুখই যদি না থাকে তাহলে আর বেঁচে থেকে সুখ কি!

তিনিও অভ্যস্ত মন্তব্যই করেন, তোদের দ্বারা হবে না।

কেন হবে না দাদা? আদুরে ছেলের মতো আধো আধো প্রশ্ন।

কেন জানিস? তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, আচ্ছা আগে ভাড়াটা দিয়ে দে।

বেশ! আগে বলুন বৌদি আপনাকে বাসের ভাড়া দিয়েছেন কিনা!

কী বললি! কী! আমি কি তোদের মতো বৌয়ের আঁচলে বাঁধা হয়ে থাকি! বৌয়ের আঁচলেও বাঁধা থাকি না, চাকরির জায়গাতেও বাঁধা থাকি না। চৌত্রিশ বছরে ষোলটা চাকরি করেছি মনে রাখিস!

ষোলটা না হোক, আধ ডজনের মতো চাকরি তিনি সত্যিই করেছেন। অর বলার ধরনে যে-খবরটি চাপা পড়ছে তা হচ্ছে এই যে প্রতি জায়গাতেই তাঁর ছিল অস্থায়ী চাকরি এবং প্রতি জায়গাতেই তিনি ছাঁটাই হয়েছেন। এখন যে আধা-সরকারী আপিসটিতে চাকরি করছেন সেখানেও গত দশ বছর ধরে অস্থায়ী চাকরি। খুব সম্ভবত তাঁর চাকরিটি স্থায়ী হবার আগেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে তাঁর জীবনটিও স্থায়ী নয়।

তিনি আবার বলেন, চৌত্রিশ বছরে ষোলটা চাকরি করেছি মনে রাখিস!

সংগে সংগে প্রশ্ন হয়, আর বিয়ে?

একগাল হেসে তিনি জবাব দেন, আমার এই একটা বিয়েই একশোটা বিয়ের সমান।

আর ঠিক এই প্রসংগাতেই অন্যরা মজা পায়। যে করে হোক কথার সূত্রে কথা তুলে একবার শুধু বৌয়ের প্রসংগটা উঠিয়ে দিতে পারলেই হল। সংগে সংগে তুবড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবার মতো কথার ফুলকি বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে ছেলে-ছোকরারা এসব কথাই শুনতে চায়।

শোন্ তাহলে বলি। আমি তখন একটা রঙের কারখানায় কাজ করতাম। সারাদিন আমাকে শুধু রং গুলতে হত আর রঙের সংগে রং মেশাতে হত। বিকেলবেলা কাজের শেষে আয়নাতে মুখ দেখে নিজের চেহারা নিজে চিনতে পারতাম না। গায়ে মুখে রং মাখামাখি হয়ে ঠিক একটা সঙের মতো দেখাত আমাকে। তেল দিয়ে ঘষে ঘষে সমস্ত রং উঠিয়ে তবে আমি বাড়ি ফিরতাম। একদিন শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল। রং-মাখা চেহারা নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। বৌ তো আমাকে দেখে আঁতকে উঠে প্রচন্ড এক চিৎকার। আমি যতো বলি, চেঁচাচ্ছ কেন, আমি, আমি—বৌ ততোই চেঁচায়। পাড়ার লোকজন ছুটে এসে আমাকে ধরে মারে আর কি। অনেক কষ্টে সে-যাত্রা রেহাই পাই। তারপর বৌ কি করল জানিস? নিজের হাতে ঘষে ঘষে আমার গা থেকে রঙের দাগ ওঠালো। বাজার থেকে চিংড়িমাছ আনিয়ে আলাদা একটা তরকারি রান্না করে দিল আমার জন্য। সেই তরকারির স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে রে। তোদের বৌ তোদের কোনো দিন আদর করে কিছু রান্না করে খাইয়েছে? সত্যি করে বল্ তো দেখি! তারপরেই রঙের কারখানার চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। চাকরি করে বাড়ি ফিরলে নিজের বৌ যদি চিনতে না পারে—তবে চাকরি করার দরকারটা কি শুনি?

চাকরি ছাড়ার কথাই যদি উঠল তো তাহলে আরেকটা ঘটনা বলি। একবার একটা তেলের এজেন্সি নিয়েছিলাম। সুগন্ধী মাথার তেল। কিন্তু এজেন্সি নিলে কি হবে, একটা শিশিও বিক্রি করতে পারি না। আমার অবস্থা দেখে বৌ একদিন বলল, আমাকে কয়েকটা শিশি দাও তো দেখি। আমি ভাবলাম, কাউকে দিতে-টিতে চায় হয়তো। ওমা, দিন দুয়েক পরে হাসতে হাসতে বলে কি, তোমার সবকটা শিশি বিক্রি হয়ে গেছে। আরো কয়েকটা শিশি দিও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কি? কি করে বিক্রি করলে? বৌ হেসে বলল, কেন? আমার মাথায় কি চুল নেই নাকি? এই চুল দেখিয়েই তোমার তেল বিক্রি হয়েছে। এই অবস্থা কিছুদিন চলার পরে তেলের এজেন্সিটা ছেড়ে দিলুম।

নিতান্তই ফোড়ন দেবার মতো শ্রোতা হয়তো বলে, কেন দাদা, বেশ চলছিল তো!

বেশ চলছিল! অ্যাঁ! বেশ চলছিল! বক্তার গলার স্বর নকল করে তিনি ভেঙচি কেটে ওঠেন, তারপরে বলেন, বৌ রোজগার করবে আর আমি খাব—তোদের দাদা তেমন মানুষই নয়—বুঝলি!

শ্রোতা বলে, কিন্তু দাদা, আপনি তো আগে প্রায়ই বেকার থেকেছেন। তখন আপনাকে খাইয়েছে কে—বৌদি নয়?

কী বললি! কী! এই শর্মাকে একটি দিনের জন্যও বেকার থাকতে হয়নি—বুঝলি! এই দুটো হাত আর দুটো পা যদ্দিন আছে—আচ্ছা, বিশ্বাস না হয় তোর বৌদিকে একদিন জিজ্ঞেস করে আসিস।

সত্যি যেতে বলছেন দাদা?

সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি! আগে থেকে বলেকয়ে যাস—তোর বৌদির হাতের রান্নাটাও খেয়ে আসতে পারবি!

তারপরে শুরু হয় বৌয়ের রান্নার গল্প। কত তুচ্ছ সব উপকরণ বৌয়ের রান্নার গুণে কী অমৃতের মতো খাদ্য হয়ে ওঠে তারই সরস বিবরণ। শেষকালে বলেন, বেঁচে থাকার সুখ তো ওইটুকুই রে! দুটো ভালোমন্দ খেতে পাওয়া। বৌয়ের হাতের রান্না খাওয়ার যে কী সুখ তা তো আর তোরা জানলি নে!

শ্রোতা জিজ্ঞেস করে, আজ কী খেয়ে এসেছেন দাদা?

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে তিনি বলেন, তোর বৌদিটা একেবারে অবুঝ! যতো বারণ করি, আপিসের সময়ে এত পাঁচ রকম রান্নার কী দরকার! তা, কে কার কথা শোনে! তাহলে শোন বলি।

শুরু হয় রান্নার বর্ণনা। শুরু করেন শুক্তো থেকে, একটি একটি ধাপে পার হয়ে যান ভাজা, চচ্চড়ি, ডালনা, ডাল, মাছের ঝোল, শেষ করেন চাটনিতে। এমনভাবে রান্নার স্বাদ বর্ণনা করতে থাকেন যে শ্রোতার মনে হতে থাকে, এই বিশেষ হাতের রান্না না খাওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবনটাই ব্যর্থ।

শ্রোতা বলে, দাদা, রোজই তো বলেন, একদিন গিয়ে বৌয়ের হাতের রান্না খেয়ে আসবি—কিন্তু কই, কোনো দিন তো ডাকেন না।

উদার হেসে তিনি বলেন, ডাকতে হবে কেন রে! যে কোনো দিন চলে যাবি। তোর এই দাদার কল্যাণে তোর বৌদির অন্নপূর্ণার ভান্ডার—বুঝলি!

• • •

তারপরে একদিন আপিসে কাজ করতে করতে মানুষটি চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। মাথায় জল দিয়ে আর বাতাস করেও যখন জ্ঞান ফিরে এল না, তখন ডাক্তার ডাকতে হল। ডাক্তার ঘোষণা করলেন, স্টারভেশন। দিনের পর দিন অনাহারে থাকার ফলে ভদ্রলোকের নার্ভ জীবনীশক্তির পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে।

তিনঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে মানুষটি কিন্তু ঘোষণা করলেন, পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল—বুঝলি! পেটের আর কী দোষ বল! তোর বৌদিকে বারণ করি, রান্নার বহরটা একটু কমাও, তা কে কার কথা শোনে! বয়েস হয়েছে তো! এখন কি আর আগের মতো হজম করার ক্ষমতা আছে!

অন্যরা বলে, চলুন দাদা, আপনাকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসি।

তিনি বলেন, কেন, আমি কি অথর্ব হয়ে গিয়েছি নাকি! পঞ্চাশ বছর বয়স হলে কি হবে, তোর বৌদির হাতের ভালোমন্দ রান্না খেয়ে এখনো এই শরীরটা—

কথাটা শেষ না করেই তিনি উঠে বসেন। ডাক্তারের আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে মানুষটি তারপরেও চাকরি করে চলেছেন। এবং, আশ্চর্য, বছরের পর বছর পুজোর মাসের দুর্গম শিখরগুলিকেও তেনজিঙ বা হিলারীর চেয়েও অনায়াসে পার হয়ে চলেছেন।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছাব্বিশ ।।
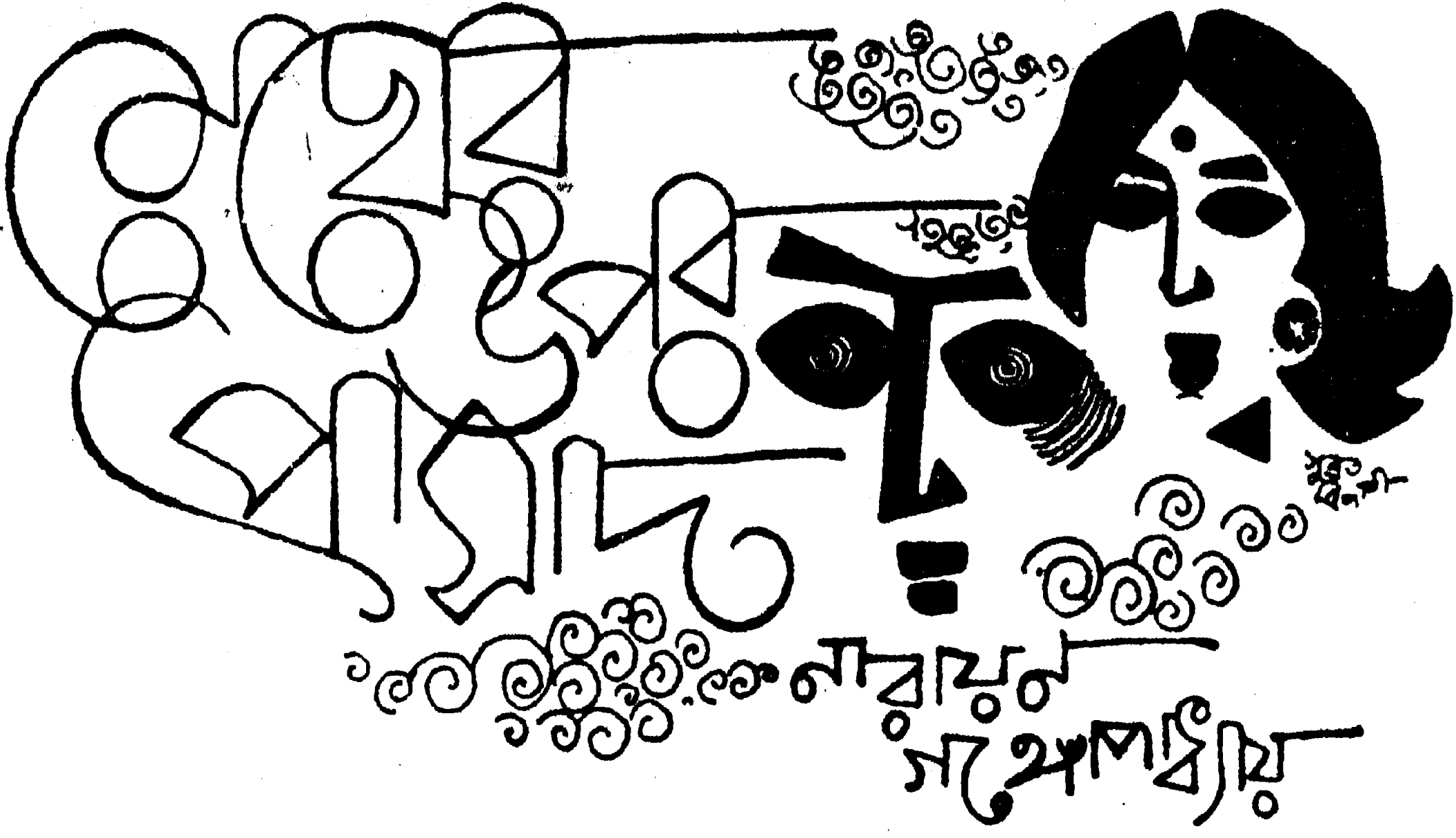
রাণী একটা টেবিলে বসে কিছু লিখছিল। ঘরের দরজায় মানুষের ছায়া পড়তে চোখ তুলল।

—প্রভাতদা?—খুশিতে আলো হয়ে উঠল মুখ ঃ তুমি এখানে?

প্রভাত হাসতে চেষ্টা করল, পারল না। বললে, তুমিই তো আসতে বলেছিলে।

তা বলেছিলুম, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে আসবে সে আমি ভাবতেও পারিনি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।

প্রভাত বসল না। বললে, বসছি। তার আগে একটু কাজের কথা সেরে নিই। আমি একা আসিনি।

—তাই নাকি?

বলেই রাণীর চোখ বাইরের দিকে পড়ল। একটা সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। তার সামনের পর্দাটা ফেলা, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে দুখানি শ্বেতপদ্মের মতো পা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

—কে এসেছে?

জবাবটা তৈরীই ছিল, তবু জিভ শুকিয়ে এল। আর তার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু অনুমান করল রাণী।

—বৌদি বুঝি? বলতে হয় সে কথা! রাস্তায় রিক্‌শাতে বসিয়ে রেখেছ কেন? ছি ছি!

রাণী ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল দরজার দিকে। আর প্রভাত সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ঝোঁকের মাথায় অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে এখন ক্লান্তি আর এক রাশ অর্থহীন বিরক্তিতে মন ভরে উঠেছে তার। দীপ্তির মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে—তার সম্মান বাঁচাবার জন্যে—বেশ একটা নাটক না হয় তৈরী করা গেল, কিন্তু তারপর? এই নাটকের জের সে শেষ পর্যন্ত টেনে নিতে পারবে? যদি এই সিঁদুর পরানোর জোরে দীপ্তি তার সমস্ত জীবনটা দাবি করে বসে—তখন?

আষাঢ়ের ভাপসা গরম। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে তবু যেন প্রভাতের দমবন্ধ হয়ে যেতে চাইল। পেছন থেকে রাণীর গলা ভেসে এল ঃ আসুন বৌদি, আসুন। প্রভাতদা তো আমার নিজের বড়ো ভাইয়ের মতো—কোনো লজ্জা করবেন না।

প্রভাত নিজের চেয়ারটায় শক্ত হয়ে বসে রইল। রাণীর দিকে চাইতে পারল না, দীপ্তির দিকেও নয়। বড়ো ভাইয়ের মতো। কত সহজ করে নিতে পেরেছে রাণী—পাঁচ বছর আগেকার দিনগুলোকে একেবারে মুছে ফেলে দিয়েছে। যে মোটর দুর্ঘটনার তার সমস্তটা জীবন শূন্য হয়ে গেছে—যে রাস্তাটার স্মৃতি এখনো ঘুমের ভেতরে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়, রাস্তায় কোনো গাড়ী শব্দ করে ব্রেক কষলে এখনো যে জন্যে তার বুকের রক্ত থমকে দাঁড়ায়, রাণীর কাছে সে-সব কিছুই নয়। আশ্চর্য, মেয়েরা সব পারে।

নিশ্চয়ই পারে। নইলে দীপ্তিও তো সহজভাবে চলে এসেছে রাণীর সঙ্গে। এই ঘরে ঢোকবার আগে প্রভাতের পা অন্তত তিনবার থেমেছে, কিন্তু দীপ্তির একবারের জন্যেও দ্বিধা হয়নি।

রাণীর সঙ্গে দীপ্তি ঘরে এসেছে, কিন্তু প্রভাতের দৃষ্টি সামনের দেওয়ালে আটকে আছে। একটা ছোট অফিস-ঘরের মতো, চেয়ার, টেবিল, ফাইল কাগজপত্র, লোহার আলমারি। কিন্তু সব কিছুকে আলো করে রেখেছে একখানা বড়ো রঙিন ছবি—মা-র কোলে হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু হাত-পা নেড়ে খেলা করছে, আর মা-র দুটি চোখ থেকে মমতার আলো ঝরে পড়ছে তার ওপর।

এখানে যে-সব মায়েরা আসে—ওই ছবিতে তাদের রূপ। আর দীপ্তির?

—প্রভাতদা!

প্রভাত নড়ে উঠল। ছবির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বললে, কী বলছ?

—বাঃ, বৌদিকে নিয়ে প্রথম এলে আমাদের এখানে—অফিস-ঘরেই বসে থাকবে নাকি? চলো।

—কোথায় যেতে হবে?

—কেন, আমাদের বাড়ীতে? বাবা রয়েছেন—তোমাদের দেখলে কত খুশি হবেন। দূরে নয়, রিক্‌শাতে যেতে পাঁচ

মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। ওঠা-ওঠো।'

এতক্ষণে দীপ্তি কথা বললে। কতক্ষণ পরে, প্রভাত মনে করতে পারল না।

মৃদু, অথচ স্পষ্ট গলায় দীপ্তি বললে, উনি আপনার সঙ্গে ঘুরে আসুন, আমি এখানেই বসি। আমি আপনাদের মাতৃ-সদনেই ভর্তি হতে এসেছি।

প্রভাত ফিরে তাকালো। ট্রেনেই প্রভাত দীপ্তির মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছিল, রিক্‌শাতেও সে ঘোমটা ছিল, এখন সেটা নেমে গেছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটাটা বেমানান জায়গায় পড়েছে—সিঁথিতে যেন খানিকটা ফেটে গিয়ে রক্তের রেখা ফুটে উঠেছে একটা। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, রুক্ষ চুল উড়ছে পাখার হাওয়ায়—সমস্ত মুখখানা অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে আর গালের ওপর ক্ষতের দাগটা আগুনের মত রাঙিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ প্রভাতের মনে হল, এই মুহূর্তে দীপ্তি কিছু একটা যা খুশি কিছু করে বসতে পারে। কথায় কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এতক্ষণ তার সমস্তটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। এবং রাণীর সামনে সেই কদর্য দৃশ্যটা কল্পনা করে তার সারা শরীর আতঙ্কে কুঁকড়ে এল।

রাণী দুজনের দিকেই তাকিয়ে দেখল একবার। কী বুঝল সে-ই জানে। একটু পরে জিজ্ঞেস করল : আমাদের বাড়ীতে যেতে আপনার আপত্তি আছে বৌদি?

—কারো বাড়ীতে যেতে আমার ভালো লাগে না।

সেই শুকনো নিষ্ঠুর গলা। প্রভাতের বলতে ইচ্ছে করল, 'একটু ভদ্র হও, শান্ত হও দীপ্তি, তুমি রাণীকে জানো না, তার পায়ের ধুলোর যোগ্যও তুমি নও।' কিন্তু দীপ্তির বাইরের চেহারা যেমনই হোক, ভেতরে তার রুচি নেই, সংযম নেই, ভদ্রতা নেই। সমাজের যে চোরাগলি দিয়ে তার আসা-যাওয়া—নিজের যেটুকুও ছিল—সেই অন্ধকারেই তা সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে।

প্রভাত ভাবল, তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর অপেক্ষা করার কোনো অর্থ হয় না। দীপ্তিকে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিল, সে কাজ মিটেছে। এখন কলকাতায় ফিরে গেলেই হয়। তবু—

রাণী হাসল।

—আচ্ছা থাক। এখানেই একটু চা আনাই তাহলে।

প্রভাত দীপ্তির কাছ থেকে একটা প্রবল প্রতিবাদের আশা করছিল, কিন্তু একটু আগেই নিজের রূঢ়তার জন্যে বোধ হয় খানিকটা লজ্জা পেয়েছিল দীপ্তি। বললে, বেশ, চা আনান। কিন্তু শুধুই চা।

—সে আমি দেখছি।—রাণী আবার বেরিয়ে গেল, এবার পাশের ঘরে। সেখান থেকে তার ডাক ভেসে এল : খোকন—খোকন—দীপ্তি এবার প্রভাতের দিকে দুটো চোখ ফেলে ধরল।

—প্রভাতদা, কে এই মেয়েটি?

টেবিলের ওপর থেকে প্রভাত একটা কাঁচের পেপারওয়েট তুলে নিলে। তার ভেতরে সাত রঙের কারুকাজ এক মনে দেখতে দেখতে জবাব দিলে : এর খবর তো তুমিই আমায় দিয়েছ। এরই নাম সুস্মিতা বসু।

কিন্তু তুমি তো একবারও বলোনি, এর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে।

এইবারে দীপ্তির চা খেতে চাওয়ার অর্থটা পরিষ্কার হল। রাণীকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে সে প্রভাতকে জেরা করতে চায়। একটা উগ্র ক্রোধে তার চোখ মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে, গালের ক্ষত-চিহ্নটা জ্বলছে আগুনের মতো।

—সুস্মিতা বসুকে চিনতে পারিনি—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে : আমি ওকে রাণী বলে জানতুম।

—মিথ্যে বলছ।

—না।

—নবদ্বীপের মাতৃসদন দেখেও চিনতে পারোনি?

—ওর সঙ্গে নবদ্বীপে আমার দেখা হয়নি। যেখানে আমি ওকে দেখেছিলুম, সে নবদ্বীপ থেকে দেড়শো মাইল দূরে।

অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ হাসিতে দীপ্তির ঠোঁটের একটা কোণা বেঁকে গেল একটুখানি : সত্যি বলছ?

......কে এই মেয়েটি?

—মিথ্যে বলার কোনো স্বার্থ নেই আমার।

—কিসে যে তোমাদের স্বার্থ, তোমরাই জানো। কিন্তু আগে যদি জানতুম, কিছুতেই আমি আসতুম না এখানে—দীপ্তির চোখ দিয়ে এবার জল

সামলে ঃ তুমি আমাকে এখানে এনেছ শুধু অপমান করবার জন্যে।

—অপমান ?

—তা ছাড়া কী আর ?—আঁচলের একটা কোণ দাঁতে চেপে ধরে দীপ্তি কান্নার একটা ঢেউ সামলে নিলে ঃ যেখানে কোনো মিথ্যে এক মিনিটও টিঁকবে না, সেখানে কেন তুমি আমায় সং সাজালে সিঁদুর পরিয়ে ?

এইবারে সবটা বোঝা গেল। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন দীপ্তি এমন হিংস্র হয়ে উঠেছে, তার আসল অর্থটা আর চাপা রইল না। প্রভাত বললে, দীপ্তি, সবটা শোনো আগে। আমি তোমায় বলছি, রাণী এর কিছুই জানে না।

—তা না হয় জানে না। কিন্তু নার্স হাসি—যে আমাকে ঠিকানাটা দিয়েছে, সে যদি চিঠি লেখে ? সবই তো সে জানে।

এই সম্ভাবনাটার কথা এতক্ষণ মনে হয়নি, প্রভাত চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়েই দেখা করব ও'র সঙ্গে। বলব, উনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন।, কিন্তু রাণীকে যেন কোনো চিঠি না লেখেন।

—তারপর ?

—তারপর যতদিন তুমি ছুটি না পাও, ততদিন এই মিথ্যেটুকু বয়ে বেড়াতে হবে।

দীপ্তি আবার দাঁতে আঁচল তুলে নিলে। কপালের বেমানান আনাড়ী হাতের সিঁদুরের ফোঁটার মতো রাঙা হয়ে উঠল মুখ, গালের শুকনো জায়গাটা দিয়ে যেন নতুন করে রক্ত ফেটে বেরুতে চাইল।

সেই ভাবেই, অস্পষ্ট বিকৃত স্বরে দীপ্তি বললে, তারপর আমার—আমার যদি কেউ আসে—যদি বেঁচে থাকে, তার কি হবে ?

প্রভাতের চোখ আবার দেওয়ালের ছবিটার ওপর গিয়ে পড়ল। কি মমতা দিয়েই আঁকা হয়েছে ছবিটা। মা-র দু'চোখ থেকে যেন রাশি রাশি আশীর্বাদের আলো কোলের শিশুটির ওপর ঝরে পড়ছে।

প্রভাত বললে, আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাব। তারপর কোনো অনাথ আশ্রমে পৌঁছে দেব তাকে।

—অনাথ আশ্রমে !

—সেইখানেই তো এদের জায়গা।

—তারপরেই তোমার ছুটি ?

কী বলতে চায় দীপ্তি ? অমন করে তাকিয়ে আছে কেন ? আর একবার প্রভাত শিউরে উঠল।

দীপ্তি ফিস ফিস করে বললে, মা কি বলেছিল, জানো ? সিঁদুর একবার কপালে পরলে আর মুছে ফেলা যায় না।

প্রভাত পাথর হয়ে বসে রইল। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে, তবুও কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল তার। তারপরে একটা অন্ধকার ছাদ থেকে যেমন চোখ বুজে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ আত্মহত্যা করে, তেমনি ভাবে জবাব দিলে, তুমি যদি চাও, তা হলে আর মুছে ফেলবার দরকার না-ও হতে পারে।

দাঁতে আঁচলটা প্রাণপণে চেপে ধরেও এবারে আর সামলানো গেল না। একটা বিকৃত কান্নার উচ্ছ্বাস ফেটে বেরিয়ে এল, দু চোখ দিয়ে গড়াতে লাগল জলের ধারা।

আর দুখানা খাবারের প্লেট হাতে ঘরে পা দিয়েই রাণী দাঁড়িয়ে পড়ল।

তবু সব সহজ করে নিলে রাণীই। এক পা এগিয়ে বললে, কি প্রভাতদা, দাম্পত্য কলহ ?

দীপ্তি তৎক্ষণাৎ চোখ মুছে ফেলল, প্রভাত ভূতে পাওয়ার মতো বিভ্রান্ত চোখে কয়েক সেকেন্ড রাণীর দিকে তাকিয়ে

থেকে প্রাণপণে হাসতে চেষ্টা করল : না, তেমন কিছু নয়। এসব এক-আধটু—

—বুঝেছি, বলতে হবে না। —রাণী দুজনের সামনে খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিতে দিতে বললে, বাড়ী থেকেই ঝগড়া করে বেরিয়েছিলে দুজনে। কিন্তু আমার এখানে এসব চলবে না। ভাব করো শিগগীর।

প্রভাত বললে, চেষ্টা করে দেখছি।

—চালাকি চলবে না, তা হলে বৌদির পক্ষ হয়ে আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। আসুন বৌদি, এই মিষ্টিটুকু আগে খেয়ে নিন। চা আসছে এক্ষুনি।

দীপ্তি খানিকটা সহজ হয়ে এল : আপনাকে তো বলেছিলুম, শুধু চা।

—আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু সবই যে আমায় শুনতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি? খেতেই হবে, নইলে খুব রাগ করব বলে দিচ্ছি। —দীপ্তির পাশেই গদী-আঁটা বেঞ্চিটার উপর বসে পড়ল রাণী : নিন, শুরু করুন।

খিদে নেই, খাবার প্রবৃত্তি নেই, তবু প্রভাত প্লেটটা তুলে নিল। একটা কিছু করা দরকার—মিথ্যে বেকুবের মতো এমন-ভাবে বসে থাকা চলে না। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে—খুব সম্ভব তার নাম খোকন—দু গ্লাস জল এনে সামনে রেখে গেল দুজনের।

দুটো স্বাদহীন মিষ্টি প্রাণপণে শেষ করতে হল প্রভাতকে। দীপ্তি চামচে করে সন্দেশের একটা টুকরো ভেঙে নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

রাণী শুধু একবার বললে, খাচ্ছেন না বৌদি?

—পারছি না।

সেই ছেলেটিই চা আনল। প্রভাত পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললে, এবার কাজের কথা হোক। আমার স্ত্রীকে তোমাদের স্বচ্ছন্দে আমি রেখে যেতে চাই। এখনো —মানে আমি ঠিক জানি না—দু-এক মাস দেরী আছে বোধহয়।—গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে আর রাণীকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ না দিয়েই প্রভাত বলে চলল : কিন্তু আমার অবস্থা তো জানো—মানে বাড়ীতে মা-ভাই বোন কেউ নেই—আমি অন্যের বাড়ীতে ভাই-ভায়রাগিরি করি—সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমার বাইরে বাইরেই কাটে। এদিকে ওর শরীর ভালো যাচ্ছে না, দেখাশোনা করবারও কেউ নেই, তাই—

—বুঝেছি।

দীপ্তি চুপ করে মাথা নামিয়ে বসে আছে, চায়ের পেয়ালাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে তার। একবার আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে প্রভাত বললে, তাই ভাবলুম, তোমার এখানেই রেখে যাই—আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। কি কি করতে হবে বলো—মানে, আমাকে একটু পরেই কলকাতা যেতে হবে—মনিবের কাজ করি—

—তোমার কিছু করতে হবে না, বৌদি আমার কাছে রইলেন।

—কিন্তু তোমার এটা তো একটা হাসপাতাল। এর কতগুলো আইন-কানুন তো আছে। মাসে কত দিতে হবে, কী খরচ—

—বলেছি তো, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। —রাণী হাসল : হাসপাতালটা আমি করেছি। বৌদির জন্যে কি খরচ হবে না হবে, সে আমি পরে চিন্তা করে দেখব।

দীপ্তি বোধ হয় অন্যমনস্কভাবেই চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে রাখল। শুকনো ধারাল [illegible] বললে, না—সে হয় না। বিনি পয়সায় আমি থাকতে পারব না। সবাই যা চার্জ দেয়, আমিও তাই দেব।

রাণীর প্রসন্ন মুখের ওপরে একটা ছায়া পড়েই সরে গেল। দীপ্তির একখানা শীর্ণ সাদা হাত সে তুলে নিলে মুঠোর মধ্যে। বললে, বেশ—তাই হবে। আমাদের এই সামান্য প্রতিষ্ঠানকে যদি কিছু সাহায্য করতেই চান, আমি আপত্তি করব না।

হাতের মুঠোয় ছোট মনিব্যাগটা ধরাই ছিল। সেটা খোলবার উপক্রম করে দীপ্তি বললে, বলুন কি দিতে হবে।

রাণী কোমল গলায় বললে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখুনি ডাক্তারবাবু আসবেন তিনিই যা বলবার বলবেন এ ব্যাপারে।

ঠিক সেই সময়ে বাইরে ভারী জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল, ডাক এল : রাণীদি

—ওই যে—ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। —রাণী হাসল : আসুন আসুন।

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। কোট, প্যান্ট নয়, গায়ে হাফ শার্ট, পরনে মালকোচা আঁটা ধুতি, গলায় একটা স্টেথিসকোপ আর হাতে কালো রঙের ব্যাগটা না থাকলে ডাক্তার বলে চেনা অসম্ভব হত। কালো বলিষ্ঠ চেহারা—বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ, মুখে ঘন কালো দাড়ি, তার কয়েকটায় পাক ধরেছে। বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে মনে হয়।

রাণী বললে, আসুন ডাক্তারবাবু, অনেক দিন বাঁচবেন। আপনি ঘরে ঢোকবার ঠিক আগেই আপনার কথা বলছিলুম আমরা।

অনেক দিন বাঁচবো? দাড়ির ভেতর থেকে ডাক্তারের হাসি ছড়িয়ে পড়ল : ইট ইজ এ গ্রেট নিউজ। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের অনেক দিন বেঁচে থাকা দরকার।

—আপনি যতদিন খুশি বেঁচে থাকুন আমরা তাড়াতাড়ি ছুটি পেলেই বাঁচি?

ডাক্তার টেবিলের উল্টো দিকে ভারী চেয়ারটায় বসে পড়েছিলেন। ব্যাগ আর স্টেথিসকোপ নামিয়ে রাখতে বললেন, হোয়াট! আমাকে ওভারটেক করতে চাও? সাহস তো কম নয়! দিদি বলে ডাকি, কিন্তু বয়েসে যে প্রায় কুড়ি বছরের বড়ো, খেয়াল আছে সেদিকে? এক ফোঁটা মেয়ের সাহস তো কম নয়।

রাণী হাসল : আচ্ছা আচ্ছা ঝগড়া পরে হবে। এখন এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার দাদা হন, প্রভাতকুমার সরকার। আর ইনি—

—বলতে হবে না—ডাক্তার রাণীর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিলেন : বৌদি—মিসেস সরকার। নমস্কার—নমস্কার। ভারী আনন্দ হল আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে।

রাণী বললে, থামুন থামুন। আলাপ তো হয়নি—আনন্দ পেলেন কি করে? এবার আপনার পরিচয়টাও—

আবার ডাক্তার কথা কেড়ে নিলেন : ডাক্তার। নাম সৌম্যেন ঘটক। একদম পসার নেই—লোকে কেউ ডাকে না। শুধু রাণীদি ছিল বলে ওর দয়ায় করে খাচ্ছি। আপনাকে আমি বলছি প্রভাতবাবু, আপনার এই বোনটি এমন ভালো মানুষ যে ওঁকে ঠকাতে আমারও বিবেকে বাধে, মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে করে সত্যিই একটা ভালো ডাক্তার হয়ে যাই।

কি হচ্ছে?—রাণীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল : বিশ্বাস করবেন না প্রভাতদা, উনি এম-বিতে গোল্ড মেডেলিস্ট।

—ওসব ফাঁকতালে জুটে গিয়েছিল। ডাক্তার পকেট থেকে মোটা একটা চুরুট বের করে ধরালেন : বিদ্যেবুদ্ধি কিছু নেই। তবু জানেন প্রভাতবাবু, পশার আমার হত। কিন্তু এই দাড়িই বাদ সাধল। একে তো এই কালো কটকটে চেহারা, তার ওপর এই বিরাট দাড়ি, আমি ঘরে ঢুকলেই নাকি রোগীরা সামনে মূর্তিমান যমদূতকে দেখতে পায়। সবাই বলে কামিয়ে ফেলো—কিন্তু গজাবার পর থেকেই ওটা গোকুলে বাড়ছে, কোন্ প্রাণে এখন বিদেয় করি বলুন তো?

ডাক্তারের কথার ভঙ্গিতে এত দুঃখের মধ্যেও প্রভাত হেসে ফেলল। দীপ্তি হাসল না, কিন্তু তার এতক্ষণের বিষণ্ণ-বিষাক্ত দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটে উঠল।

রাণী বিরক্তভাবে বললে, বাজে কথা পরে হবে। এখন শুনুন। বৌদি—আপাতত আমাদের এখানে থাকবেন। মানে প্রভাতদা খুব ব্যস্ত মানুষ, বাড়ীতে দেখাশোনার কেউ নেই, সেইজন্যে—

বেশ তো, থাকুন না। ওঁদের জন্যে আর কথা কি!

তা হলে ফর্ম বের করুন।

ফর্ম? —ডাক্তার যেন একটু আশ্চর্য হলেন।

ওঁরা আমাদের সেবাসদনকে সাহায্য করতে চান। চার্জ হিসেবে নয়।

—দ্যাটস্ অল রাইট!—ডাক্তার হাসলেন : আমাদের তো নিত্য ভিক্ষা—ঝুলিতে যে কেউ একমুঠো দিলেই আমরা খুশি। কিন্তু ফর্ম ফিলাপ করবার আগে বৌদির সঙ্গে যে কয়েকটা কথা বলা দরকার। একটু ডাক্তারী পরীক্ষাও করতে হবে।

রাণী বললে, বেশ, চলুন। আসুন বৌদি—ভয়ের কিছু নেই, আমি তো আছিই সঙ্গে। দীপ্তির হাত ধরল রাণী, টানতে টানতে দীপ্তি উঠে দাঁড়ালো। এই-বারে সারা মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে তার, কপালের সিঁদুরটা জ্বলছে রক্তের মতো, কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না।

রাণী বললে, আসুন-আসুন। কোনো ভাবনা নেই আপনার। একটু বোসো প্রভাতদা।

—বসছি।

ভেতর দিকের দরজা দিয়ে তিনজনে বেরিয়ে গেল, প্রভাত বসে রইল চুপ করে। সেই ছবিটা জেগে রইল চোখের সামনে। বাইরের দরজা দিয়ে একটি প্রৌঢ়া মহিলা ঘরে ঢুকলেন, একবার অলস দৃষ্টি ফেললেন প্রভাতের দিকে, তারপর ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথা থেকে যেন একটি শিশুর কান্না ভেসে আসতে লাগল।

মিনিট পনেরো পরে সবাই ফিরে এল। দীপ্তি আবার গদীআঁটা বেঞ্চিটায় মাথা নীচু করে বসে পড়ল, ডাক্তার নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে নেবানো চুরুটটা ধরালেন, রাণী টেবিলের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র বের করে প্রভাতের মুখের দিকে তাকালেন : অত দমে রয়েছেন কেন মশাই? যা দেখলুম ভাবনার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। তবে অন্ততঃ মাস আড়াই বৌদিকে থেকে যেতে হবে বলে বোধ হচ্ছে।

প্রভাত বললে, তাই হবে।

ডাক্তার কলম তুললেন। বললেন, ফর্মালিটিজ্। বৌদির নামটা জানা দরকার।

দীপ্তি কিছু বলবার আগেই প্রভাত বললে, লিখুন শ্রীমতী দীপালী সরকার।

প্রভাত চলে গেছে প্রায় ঘন্টা দুই হল। এখন দীপ্তি নিজেকে নিয়ে বসে আছে দোতলার ছোট ঘরটিতে। এইটিই তার আড়াই মাসের জন্যে থাকবার জায়গা।

আরো খান চারেক ঘর আছে দোতলায়। তিনটি ঘরেই মা আর বাচ্চা আছে বলে মনে হল, মধ্যে মধ্যে কচি গলার কান্না আসছে। থেকে থেকে দীপ্তির বুক শুকিয়ে আসছিল। সে-ও তো মা হবে, কিন্তু তারপর? প্রভাতদা বলেছিল, 'তুমি যদি চাও, তা হলে—।' কিন্তু প্রভাতদা তাকে চায় না—তাকে কেউ চায় না। এক হোটেলের সেই মানুষ-গুলো—যারা পয়সা দিয়ে ভালোবাসা কেনে, তারা ছাড়া আর কে চাইতে পারে তার মতো মেয়েকে?

দীপ্তি অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু ভাবতে পারল না। মাথার ভেতরটায় সব এলোমেলো হয়ে গেছে। বেলা পড়ে আসছে, সামনে কয়েকটা গাছের মাথায় রোদ ঝিলমিল করছে, একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে গঙ্গা। কয়েকটা মন্দিরের চূড়ো। দীপ্তির মনে হল, চৌরঙ্গীতেও এখন সন্ধ্যা নামছে, নিয়নের আলো জ্বলে উঠতে শুরু হয়েছে, আর—

রাণী ঘরে ঢুকল : বৌদি, চুপচাপ যে?

—কি করব?

—তা বটে। —রাণী বিছানার পাশে বসে পড়ল : একটু একা একা লাগবে এখন। আমি সময় পেলেই আসব, বইও নিয়ে আসব আপনার জন্যে। তার আগে এটা রাখুন।

একটা বাদামী কাগজের মোড়ক ধরল দীপ্তির দিকে।

—কী এ?

রাণী হেসে বললে, কিছু না। বৌদিকে কি খালি হাতে দেখতে আছে প্রথম বার? তাই একখানা শাড়ী—

দীপ্তি আর পারল না। এতক্ষণের টান টান স্নায়ুগুলো এইবার যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

দীপ্তি তীক্ষ্ম গলায় বললেন, মাপ করবেন—সবটাই ভুল হচ্ছে আপনাদের। আমি প্রভাতদার স্ত্রী নই।

মুহূর্তে রাণীর মুখ থেকে রক্ত সরে গেল।

—তবে কি প্রভাতদা—

—উনি আমার দাদার চাইতেও বেশি। আমি খারাপ মেয়ে—নিজের সর্বনাশ নিজে করেছি। —দীপ্তি থর থর করে কাঁপতে লাগল : আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমার দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন উনি। আমার নাম দীপালি সরকার নয়—দীপ্তি দে। আপনার বন্ধু নার্স হাসিদি আমার সব খবর জানে। দীপ্তি পাগলের মতো মাথার আর সিঁথের সিঁদুর প্রাণপণে মুছতে লাগল শাড়ীর আঁচলে : কী হবে—কি হবে মিথ্যের ভান করে? আমি যা তাই জেনে আমাকে রাখতে চান রাখুন, নইলে—

রাণী দুহাতে দীপ্তিকে জড়িয়ে ধরল।

—কি ছেলেমানুষি করছেন এখন? আপনার শরীর খারাপ—এ-সব বেশি চঞ্চল হলে ক্ষতি হবে যে! আপনি ঠাণ্ডা হোন—'বৌদি' কথাটা সামলে নিয়ে রাণী বললে, চুপ করে একটুখানি শুয়ে পড়ুন-দিকি!

আর বলতে বলতে রাণীর মনে হল, অনেকক্ষণ ধরে জমে ওঠা একটা সন্দেহ আর বিতৃষ্ণার ভার এইবার তার বুক থেকে নেমে যাচ্ছে। (ক্রমশঃ)

জানাতে পারেন

কোনটা ঠিক ?

(প্রশ্ন)

মহাশয়

আমাদের পাঠাগারে একটি হিন্দি 'বাল রামায়ণ' আছে, প্রকাশক গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর। এতে বলা হয়েছে রাজা দশরথের তিন রাণী ছিল, প্রথমা কৌশল্যা, দ্বিতীয়া সুমিত্রা ও সর্বকনিষ্ঠা কৈকেয়ী। অথচ আমাদের বাংলা শিশু রামায়ণে সর্বকনিষ্ঠা সুমিত্রা বলা হয়েছে। কোনটা ঠিক? অমৃতের মারফং জানতে ইচ্ছা করি। গীতা প্রেসে চিঠি দিয়ে উত্তর পাইনি। নিবেদন ইতি—

শ্রীশুভময় রায়
বার্ণপুর,
পশ্চিম বাঙলা

"মাথা মুড়োন'র সঙ্গে "ঘোল ঢালার" কি সম্পর্ক ?

মহাশয়,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য ধন্যবাদ। সম্প্রতি আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার কোন সন্তোষজনক উত্তর আমি পাইনি। তাই সেটিকে আমি 'অমৃতের' পাঠক-সমাজের সামনে হাজির করতে চাই এই আশায় যে, হয়ত তার সন্তোষজনক উত্তর পাব।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার যে সমস্ত প্রথা প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল, অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে, সেই মুন্ডিত মস্তকে ঘোল ঢেলে তাকে দেশ থেকে বার করে দেওয়া। এখনও আমাদের দেশে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দেশবাসী নিজেই উদ্যোগী হয়ে অপরাধীর মাথা আংশিক বা সম্পূর্ণ মুন্ডন করে দিয়েছে—এখন ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায়, মাথার চুল মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যের অন্যতম সম্পদ, সুতরাং তাকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়ার ফলে যে সৌন্দর্যহীনতার সৃষ্টি হয় সেটা অপরাধীর কলুষ মনেরই প্রতীক। এর ফলে প্রকৃত অপরাধীকে চিনতে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও জনসাধারণের কোন কষ্ট হয় না। অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার সার্থকতা হয়ত এইখানেই। কিন্তু তারপর সেই মুন্ডিত মস্তকে ঘোল ঢালা হত কেন তা বুঝে উঠতে পারিনি। মাথা মুড়ানর সঙ্গে ক্লান্তিঅপহরণকারী এই সুপেয় বস্তুটির সম্পর্ক কি? এর পিছনে কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে? নমস্কারান্তে—

কৃপাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কালনা,
পোঃ কালনা (বর্ধমান)

মহাশয়,

'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে কয়েকটি প্রশ্ন উত্তরের আশায় রাখতে চাই।

(১) ভারতের বাইরে (পাকিস্তান বাদে) কোন্ কোন্ দেশ থেকে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পুস্তক/পুস্তিকা ছাপা ও প্রকাশিত হয়েছে?

(২) ভারতের বাইরে (পাকিস্তান বাদে) কোন্ কোন্ দেশ থেকে বেতারে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে?

(৩) লন্ডনে বিভিন্ন বিদেশী ভাষাভাষী বাসিন্দার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে রাখলে বাংলা ভাষার স্থান কততে দাঁড়াবে?

রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,
মালীগাঁও রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার্স,
আসাম।

।। পাঠ নির্ণয় প্রসঙ্গে ।।

(উত্তর)

সম্পাদক মহাশয়,

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃত পত্রিকায় কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম-এ, ডি-লিট মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পাত্র, ভাজন, আস্পদ প্রভৃতি অজহল্লিঙ্গ পদগুলি অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ অনুযায়ী সপ্তমীর বহুবচনে পাত্রেষু ভাজনেষু এবং আস্পদেষু হইবে এবং সেইহেতু মহিলাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাস্পদেষু পাঠই শুদ্ধ হইবে, শ্রদ্ধাস্পদাসু হইবে না। এই সিদ্ধান্ত ঠিক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত অজহল্লিঙ্গের অবতারণা করিয়া যেভাবে তিনি সংক্ষেপে আলোচনার ইতি টানিয়াছেন, তাহাতে পাঠক-সাধারণের মনে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, এই অজহল্লিঙ্গ বা অজহল্লিঙ্গ বিশেষণ পদগুলি বুঝি অবস্থাভেদে সংস্কৃত রচনায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনেও প্রয়োগ করা চলে। যতদূর শুনিয়াছি, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণেও দেখিয়াছি যে, সংস্কৃতে এই পদগুলি প্রায়শঃ একবচনান্তই হইয়া থাকে, যেমন,—ভৃত্যাঃ বিশ্বাসাস্পদম্ ক বিশ্বাসভাজনম্, মাতা পুত্রস্য ভক্তিভাজনম্, স্নেহাস্পদং হি বালকাঃ, শ্রদ্ধাস্পদং হি সাধবঃ, স্নেহাস্পদং হি এতৌ বালকৌ ইত্যাদি। এসব স্থলে ভৃত্যাঃ বিশ্বাসাস্পদানি বা বিশ্বাসভাজনানি, স্নেহাস্পদানি হি বালকাঃ, শ্রদ্ধাস্পদানি হি সাধবঃ, বা স্নেহাস্পদে হি এতৌ বালকৌ ইত্যাদি প্রয়োগ হয় না বা দেখা যায় না। অধ্যাপক মহাশয় এই সমস্ত অজহল্লিঙ্গ পদের দ্বিবচন ও বহুবচনে প্রয়োগের ২।১টি উদাহরণ দেখাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। বিশেষতঃ একটি মহিলার ক্ষেত্রে সপ্তমীর একবচনান্ত শ্রদ্ধাস্পদে না হইয়া বহুবচনান্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু কেন হইবে, তাহাও একটু স্পষ্ট করিয়া লেখার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে করা যায়। অবশ্য এখানে গৌরবার্থেই বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বাংলা চিঠিপত্রাদিতে ব্যবহৃত শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রীতিভাজনেষু, স্নেহাস্পদেষু প্রভৃতি পাঠগুলি সংস্কৃত অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ হইতে গৃহীত হইলেও ইহাদের প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুমোদিতভাবে হয় নাই, বরং বাংলা চিঠিপত্রাদিতে পূর্ব হইতে চলিত গৌরবার্থে, প্রীত্যর্থে বা স্নেহার্থে বা আশীর্বাদার্থে বহুবচন রূপেই হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। অনুরূপভাবেই হয়ত বাংলা চিঠিপত্রাদিতে শ্রীচরণেষু, শ্রীশ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণারবিন্দেষু, কল্যাণীয়েষু, কল্যাণীয়াসু, কল্যাণবরেষু, নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু প্রভৃতি পাঠ চলিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত পাঠের পরবর্তী শব্দগুলি সর্বত্রই উহ্য আছে, যেমন পূজনীয়দের ক্ষেত্রে শ্রীচরণেষু (নিবেদন), কল্যাণীয়দের ক্ষেত্রে কল্যাণীয়েষু (বক্তব্য) ইত্যাদি। এবিষয়েও অধ্যাপক মহাশয় বা অপর কেহ খানিকটা আলোকপাত করিলে বাধিত হইব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিগত ৩১শে আগষ্ট তারিখের অমৃত পত্রিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে শ্রদ্ধাস্পদেষু পাঠের প্রয়োগ মহিলাদের ক্ষেত্রেও শুদ্ধই হইবে। তবে আমি উত্তরটি বাংলা মতেই লিখিয়াছিলাম, অজহল্লিঙ্গ বিশেষণের উল্লেখ করি নাই।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী, এম-এ
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯।

কলকাতার প্রথম গির্জা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

লালদীঘির উত্তরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোণে অর্থাৎ কালেক্টরী অফিসের বিপরীত দিকে একদা ছিল কলকাতার প্রথম গির্জা সেণ্ট এন্ গির্জা (St. Anne)। এখন সেই গির্জার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের অধিকৃত সীমার মধ্যেই ছিল কলকাতার প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। এই দুর্গ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দুর্গ প্রাচীরের পূর্ব-দিকে কলকাতার সর্বপ্রথম গির্জা ভবন সেণ্ট এন্ নির্মিত হয়েছিল। জনৈক বিদেশী লেখক কলকাতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সেকালের নির্মিত বিশিষ্ট ভবনগুলির মধ্যে দুর্গের পরেই সেণ্ট এন্ গির্জা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

কলকাতায় পৃথকভাবে খৃষ্টীয় ভজনালয় স্থাপনের প্রস্তাব ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন এডামস্ এবং হুগলীস্থিত ইংরাজ কুঠির (ইংলিশ কোম্পানীর) ভূতপূর্ব পাদ্রী উইলিয়ম এণ্ডারসন কর্তৃক যুক্ত আবেদনে কাউন্সিলের কাছে প্রস্তাব করা হয়। সেই সময় কোম্পানীদ্বয় সম্মিলিত হওয়ার পর কলকাতায় ইংরাজ অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এবং সেই হেতু এমন এক প্রার্থনাগৃহ যেখানে সমবেতভাবে প্রার্থনা করতে সক্ষম তাহার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কাউন্সিল পাদ্রীদ্বয়ের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। গির্জা নির্মাণার্থে যে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়, তাতে জাহাজ-গুলির অধ্যক্ষগণ (কমাণ্ডারস্), কোম্পানীর কর্মচারিগণ এবং ইংরাজ নাগরিকবৃন্দ চাঁদা দেন। তার ফলে ধন-ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এডাম সাহেব যখন অক্টোবরের শেষের দিকে জাহাজে করে মাদ্রাজ যাত্রা করেন, তখন তাঁর হাতে উদ্যোক্তাগণ মাদ্রাজের "ফোর্ট সেণ্ট জর্জ" দুর্গের অধিনায়কগণের নিকটে দেয়ার জন্য এক আবেদনলিপি দেন। আবেদনলিপি এই উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল, যাতে এডাম সাহেব সেখানে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রথমে "ব্রড স্ট্রীটে" এক খণ্ড জমির উপর গির্জা-গৃহটি নির্মাণ করা ঠিক হয়। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণের সম্মিলিত আপত্তিতে তাহা বন্ধ রাখা হয়। এমনকি তাঁরা চাঁদা দেবেন না বলে ভয়ও দেখিয়েছিলেন। পরে ঐ স্থানের পরিবর্তে দুর্গের পূর্ব প্রকারের বিপরীত দিকে গির্জা নির্মাণ স্থিরীকৃত হয়। এবং বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গৃহ-নির্মাণ সুরু হয়।

এডাম সাহেব ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাঁদা সংগ্রহ করার কাজ চালু রাখেন। এবং সেই সময় এক সভা আহ্বান করেন। সভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, অর্থ সংগ্রহ এবং গির্জা-গৃহ তদারকের ভার সাধারণের উপর ন্যস্ত হোক।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিলক্ষিত হয় যে নির্মাণকার্য বন্ধ রয়েছে। যেহেতু কার্য-নির্দেশের অভাব। এবং সেইহেতু এডওয়ার্ড পেটেল ও জন মেস্‌টাস্‌কে আদেশ দেওয়া হয় যে অবিলম্বে তারা যেন দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তারা চাঁদা আদায় করবেন। গির্জাবাড়ীটির নির্মাণকার্য তদারক করবেন এবং নির্মাণকার্য নিয়মিতভাবে যাতে সুসম্পন্ন হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। তা' ছাড়া প্রতি মাসে তাঁরা কাউন্সিলের কাছে কার্য-

বিবরণ দাখিল করবেন। এই ব্যবস্থার ফলে নির্মাণকার্য দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। পরবর্তী বছরের প্রথমভাগে নির্মাণকার্য প্রায় একরূপ সুসম্পন্ন হয়। এণ্ডারসন লণ্ডনের বিশপকে এই গির্জা ভবনটি উৎসর্গ করেন; এবং তাকে উৎসবের বন্দোবস্ত করতে বলেন।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গির্জাভবনের নির্মাণকার্য শেষ হয়। বিশপের প্রতিনিধিরূপে এণ্ডারসন ৯ই মে তারিখে কাউন্সিলের নিকটে গির্জা ভবনের উৎসর্গ করণের দায়িত্বের সমাচার জ্ঞাপন করেন। এবং কাউন্সিলের অনুমতি পান।

গির্জাভবন সাধ্বী এনের নামে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে—"On the 5th June, being the Sunday after Ascension Day, the Church was duly dedicated to the service of God in the name of St. Anne."

সেণ্ট এন্ গির্জা ভবন দৈর্ঘ্যে ৮০ ফুট ছিল। কক্ষাভ্যন্তর প্রস্থ ২০ ফুট এবং থামের উপর সুউচ্চ ছাদ ছিল। কক্ষের উত্তর এবং দক্ষিণদিকে যাতায়াতের পথের পার্শ্বে থামগুলি দেখা যেত। কক্ষের পূর্ব প্রান্তসীমায় বৃত্তাকার বেদীস্থান ছিল। পশ্চিম প্রান্তে মোটা দেওয়ালে ঘেরা সিঁড়ির নিম্নাংশ এবং যাজকের প্রার্থনাকালীন পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখবার স্থান ছিল। গির্জার চূড়াটি তিন স্তরে বিভক্ত ছিল এবং তার আয়তন ছিল ২০ ফুট। চূড়ার চারিদিকে রেলিং ঘেরা ছিল। কোম্পানীর পক্ষ থেকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে গির্জার জন্য ঘণ্টা পাঠিয়ে দেন। বাঙলাদেশে ইংরাজদের আবাসস্থলে সেকালে প্রধানতম দ্রষ্টব্যস্বরূপ ঐ পবিত্র ইমারতটি ৫০ বছর ধরে টিকে ছিল।

সেণ্ট এন গির্জা নির্মাণের জন্য একবার ৫০০্ টাকা খরচ করে বালেশ্বর থেকে লোহাদি আনা হয়। এবং ১৩১০।।/৩ পাই খরচ করে গির্জার জানালাগুলিতে লোহার গরাদ লাগানো হয়েছিল।

সেই সময়ে ইংরাজগণ দুর্গের ও লালদীঘির আশেপাশের অধিকৃত ভূভাগে বাস করতেন। প্রাচীন দুর্গের সন্নিকটে ইংরাজ পল্লী স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানের চারিদিকে ও রাস্তার দুই-ধারে বৃক্ষাদি রোপিত হয়েছিল। পার্শ্বস্থ পল্লীভূমিও অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। বর্তমানে যে স্থান এসপ্লানেড বা ধর্মতলা নামে পরিচিত তার অধিকাংশই সেকালে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা ছিল গোচারণভূমি, কোথাও বা ছিল বিশৃংখলভাবে নির্মিত দুই-চারটি গ্রাম্য কুটির। বর্তমান ষ্ট্রাণ্ড রোড ছিল নদীগর্ভে। বর্তমান বড় ডাকঘর ও তৎপার্শ্ববর্তী অফিসসমূহের অধিকৃত স্থান, কাষ্টম হাউস ও রেল অফিস সমস্ত স্থান জুড়ে ছিল সেকালের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত "কলিকাতা সেকালের ও একালের" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—"তখন কলিকাতাতে একজন মাত্র বেতনভোগী পাদরী ছিলেন। পাদরীসাহেব প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার জন্য দুর্গ মধ্যে সমাগত হইয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সহিত প্রার্থনাদি করিতেন। প্রতি রবিবারে কোম্পানীর সমস্ত সাহেব কর্মচারীরা দলবদ্ধ হইয়া নিকটবর্তী গির্জায় যাইতেন। গভর্ণরসাহেবও পদব্রজে এই দলের অগ্রবর্তী হইতেন। এই গির্জা, কলিকাতার প্রথম গির্জা সেণ্ট এন। যখন কোন কারণে এই বেতনভোগী পাদরীসাহেব অনুপস্থিত হইতেন, তখন কৌন্সিলের একজন মেম্বারকে পাদরীর কাজ করিতে হইত।"

বন্ধন

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ ইদানিং নতুন পথে চিন্তা শুরু করেছেন। বারে বারেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন। যুক্তি বিচার দিয়ে নিজের কাজের সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে। যথাসময় আর একটু সাবধান হয়ে চললে এই অপ্রিয় আর বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত না।

তাঁর এই ব্যবহারে কোথায় যে গলদ একথা কোনদিনই নগেন্দ্র ভেবে দেখেন নি। আজও ঠিক বুঝতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। তবে কোথাও যে কিছু একটা গোল আছে একথা আর তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। তাঁর চতুর্দিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাঁকে ঘিরে ধরেছে। চেপে ধরেছে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে তিনি মুক্তি চান। দুহাতে প্রাণপণে ধোঁয়া সরিয়ে যেখানে আজ দাঁড়িয়েছেন সেখানেই বা আলো কোথায়? সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

নগেন্দ্র তাঁর আসল চেহারাটা দেখাতে চাইলেও পারেন না। প্রকাশ করবার সহজ পথটা তাঁর জানা নেই। বরং ভুল করে সহজকে সবসময় জটিল করে তোলেন তাঁর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কাছে। নিজের এই অক্ষমতায় তিনি লজ্জিত হন মনে মনে। ভবিষ্যতে সাবধান হবার চেষ্টাও করেন কিন্তু অভ্যাসের সঙ্গে স্বভাবটা এমনই বদলে গেছে যে আত্মপ্রকাশের পথটা তাঁর সরল আর সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পারে না। ফলে নগেন্দ্রের একান্ত কাছের যারা তারাও একে একে দূরে সরে গেল। সব রস-কষহীন প্রস্তর কাঠিন্যের অন্তরালে অন্যকিছুর কল্পনা করা সহজ নয়।

নিজের দৃষ্টি আর চিন্তা দিয়ে নগেন্দ্র দুনিয়াটাকে দেখেছেন আর বুঝেছেন। আর কেউ যদি তাঁর মত করে চিন্তা করতে না চায় তাতে বলবার কি আছে। প্রতিকারের নাম করে তাঁকে অপমান করে চলে যেতেও তিনি একটি কথা বলতে পারেননি। অভিমান হয়েছে। ভিতরে ভিতরে গুমরে কেঁদেছেন কিন্তু বাইরে থেকে মনে হত স্থির, অবিচল। লৌহকঠিন। যেন কিছুই হয়নি তাঁর—কোনদিক দিয়ে তাঁর মনের উপর এতটুকু দাগ কাটতে পারেনি। মনকে বোঝাতেন—চলে যারা যেতোই অভিযোগ আর অনুযোগটা নিতান্তই একটা উপলক্ষ্য। তাঁর স্ত্রী কিংবা পুত্রও যে একদিন একই সুরে কথা কইবে এইটেই ছিল নগেন্দ্রনাথের কল্পনার অতীত। অন্তত ওরা কোনদিন ভুল বুঝবে না এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

স্ত্রী মাঝে মাঝে মৃদু গুঞ্জন করলেও সেদিকে মনোযোগ দেবার কথা চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে বলেও কোনদিন তিনি ভাবতে পারেননি। স্ত্রী একটা কথার কথা বলেছেন তিনিও শুনে গেছেন এই পর্যন্ত। তাঁদের সম্বন্ধেও যে কিছু বুঝবার অথবা জানবার থাকতে পারে একথা একদিনের জন্যও নগেন্দ্রের মনে আসেনি।

স্ত্রী সরমা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। জোর করে কোন কথা তিনি বলতে চান না। পারেনও না। ছেলেমেয়েরাও মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চুপ করে থাকে। নগেন্দ্র খুশী হন। আর কেউ তাঁকে না বুঝলেও তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠিকই চিনেছেন। আর ছেলেমেয়েরাও তাঁর বড় বাধ্য। আজকের দিনে এমন সহসা চোখে পড়ে না। বাপ-মার আদর্শেই তারা নিজেদের গড়ে তুলেছে। নগেন্দ্রের চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে। বড় মধুর এ স্বপ্ন।

কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবেই তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি চমকে জেগে উঠলেন। দুহাতে চোখ রগড়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চেয়ে দেখতে থাকেন। তাই তো! এতগুলি দীর্ঘ বছর ধরে তিনি শুধু একটি ছোট্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খেয়েছেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-পরিজন কেউই প্রথম পরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে থেমে নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এগিয়ে গেছে। যেতে পারেন নি নগেন্দ্রনাথ। স্ত্রী যে আজ শুধু স্ত্রী নয় তার প্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মা সেদিকেও যেমন তার সজাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি ছেলেও যে আজ যুবক এ কথাটাও যেন তিনি ভুলে গেছেন। তাই পুত্র যখন তাঁর সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নগেন্দ্রনাথের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে বসল তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তুমি বলতে চাইছ কি শংকর?…

শংকর বলল, আমার কথা আমি

স্পষ্ট করেই বলেছি। না বোঝবার কিছু নেই।

নগেন্দ্রনাথ ফেটে পড়লেন, অর্থাৎ তোমার ব্যবসা করবার খেয়াল মেটাতে আমাকে আরও এক কাঁড়ি টাকা ঢালতে হবে। টাকা আর টাকা। কেন অমন ছাড়া চাকরীটা কি অপরাধ করল? তোমার খেয়াল মেটাতে একবার অনেক দিয়েছি আর একটি পয়সাও পাবে না।

শঙ্কর বলল, তোমার যাকিছু সঞ্চয় তা আমাদের জন্য একথা তুমি প্রায়ই বলে থাক......

নগেন্দ্র বললেন, কিন্তু নষ্ট করবার মত আর আমার একটি পয়সাও নেই। চাকরীটা তোমায় নিতেই হবে।

শঙ্কর বলল, চাকরী আমি করব না—

নগেন্দ্র ছেলের উত্তর দেবার ধরণে বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন তবুও যথা-সম্ভব শান্ত কন্ঠেই বললেন, ব্যবসার নাম করে আমার রক্ত জল করা পয়সা নষ্ট করতেও তোমাকে আমি দেব না শঙ্কর। তোমাদের পেছনে এ পর্যন্ত আমার অনেক গেছে—

শঙ্কর অধৈর্য হয়ে জবাব দিল, তুমি তোমার কর্তব্য করেছো অথচ তার জন্যও তুমি অনেক অবান্তর উপদেশ দিয়েছো। কারুর মান-সম্মানের দিকে তাকাও নি...

নগেন্দ্র চমকে উঠলেন। এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চেয়ে থেকে এক সময় আর্তস্বরে ডাকলেন, শঙ্কর...

শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এলেন সরমা তাঁর পিছু পিছু ছোট ছেলে অম্বর। শঙ্করের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পৈ পৈ করে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে .....কথাটা শেষ করে ভাবতেও পারেন না সরমা।

নগেন্দ্র এতক্ষণে সরমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন, তোমার ছেলের কথাগুলি শুনেছো সরমা! আমি নাকি কর্তব্য করবার সুযোগ নিয়ে তোমাদের মান-সম্মানের দিকে তাকাইনি—

সরমা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেন। নিছক কথার ছলে যে বিষবৃক্ষ একদিন তিনি নিজে হাতে রোপন করেছিলেন আজ তাতে ফল ধরেছে কিন্তু সে ফলের স্বাদ যে এমন উগ্র হবে তা একবারও ভাবতে পারেননি। তিনি ম্লান বিপন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের পানে তাকালেন। শঙ্কর এ দৃষ্টির ভুল অর্থ করে কিছু বলবার জন্য মুখ তুলতেই সরমা সহসা ব্যগ্রভাবে পুত্রর একখানি হাত ধরে জোর করে ঘর থেকে টেনে নিয়ে এলেন।

সরমা এমনি এক পরিস্থিতির কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি কিছু ভাবতে পারছেন না। কি একটা বলতে গিয়েও স্বামীর প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। একটা সিসার গোলা তাঁর কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। স্বামীকে সরমা ভাল করেই চেনেন—ছেলেকেও বোঝেন। ঐ বাক্যসর্বস্ব মানুষটি যে কতখানি স্নেহপ্রবণ একথা তাঁর চেয়ে বেশী বোধহয় আর কেউ জানে না। তবে একটি বিষয়ে তিনি রীতিমত শক্ত। অনাবশ্যক এবং অন্যায়-এর কোনটিকেই প্রশ্রয় দেন না। ছেলে-মেয়েরা তলিয়ে দেখে না। মা'কে আশ্রয় করে ওরা বাপের তহবিল তছরুপ করতে চায়। সরমা স্বামীর যুক্তিকেও অস্বীকার করতে পারেন না আবার ছেলেদের আব্দারের কাছেও নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। ওদের হয়ে ওকালতি করতে যান।

নগেন্দ্র বললেন, এত বেশী আস্কারা দিও না সরমা। পরে তাল সামলাতে পারবে না।

সরমা বললেন, একে তুমি আস্কারা বলছো কেন? কদিন ধরে গরমে সকলে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছ না?

নগেন্দ্র জবাব দেন, গরমের দিনে আগেও গরম পড়েছে এখনও পড়ছে ভবিষ্যতেও পড়বে। পাখার সখ হয়ে থাকে হাত-পাখা ব্যবহার করতে বলো। তোমার ছেলেরা মানুষ আর আমরা ছিলাম না!

সরমা চুপ করে থাকেন।

নগেন্দ্রের সুর নরম হয়। বলেন, দক্ষিণ নয়, পূব নয় শুধু একখানি উত্তর-মুখী ঘরে গোটা একটা সংসার। বাবা মা আর আমরা সাকুল্যে আটটি ভাই-বোন। রাতে ঘুমও হতো—খেয়ে হজম করতেও পারতাম। সৌখিনতা ছাড়তে বলো সরমা...সৌখিনতা ছাড়তে বলো নইলে অভাব ওদের কোনদিন যাবে না।

স্বামীর যুক্তিগুলি নিঃশব্দে শুনে গিয়ে ছেলে-মেয়েদেরও তিনি একই কথা বলেছেন। তারা বলে, বস্তিতে বাস করেও মানুষ বেঁচে থাকে—ফুটপাথে শুয়েও দিন কাটে তবুও লোকে ভাল ভাল বাড়ী তোলে কেন? আরামকে যে যতই হারাম ব'লে উপদেশ দিক না কেন নিজেদের দিকে তাকিয়ে তাঁরা একথা বলেন না।

সরমা স্বামীর কথারও যেমন প্রতি-বাদ করতে পারেন না ওদের যুক্তিকেও তেমনি অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। কাজেই এক মধ্যপন্থা অনুসরণ করে তাঁকে চলতে হয়। ছেলেদের ঠাণ্ডা রাখতে স্বামীর সম্বন্ধে আর স্বামীকে বোঝাতে গিয়ে এমন কথা বলতে হয় যা একেবারেই কাল্পনিক। কিন্তু কাল্পনিক বস্তুই আজ দেহধারী হয়ে সরমাকে বিভ্রান্ত ক'রে ফেলেছে। নইলে শঙ্করের হাত ধরে সরমা তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাবার সময় এতবড় কথা তার মুখ থেকে বার হ'তে পারতো না।

শঙ্কর কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত বলে উঠল, যেতে বলছো যাচ্ছি—তারপরে বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলল, চাকরীটাই আমাকে নিতে হবে কিন্তু জেনে রেখো মাকেও আমি সঙ্গে নিয়েই যাব। তোমার ভাত আমরা...

কথাটা শেষ করতে দিলেন না সরমা। জোর ক'রে শঙ্করকে টেনে নিয়ে গেলেন। ছি ছি শঙ্করটার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একে-বারেই লোপ পেয়েছে। কিন্তু মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলেন না। এতই অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন তিনি।

অনেক দিনের অনেক ভিত্তিহীন কথাই আজ কংক্রিটের ভিতে রূপান্তরিত হ'য়েছে। শুধু ভিত নয়,—ভিতের উপর অনেকখানি দেওয়াল উঠে গেছে তাঁরই সহায়তায়। ছেলে এখন ছাদ ঢালাই ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে। চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছেন সরমা। মাথার উপরকার আলোটুকুও আর রইল না। টুকরো টুকরো ঘটনাকে নানা প্রকার সত্যি আর মিথ্যা দিয়ে জোড়াতালি দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জোড়াতালিটাই সত্যকে বেমালুম চাপা দিয়ে ফেলেছে।

সরমা ভয় পেয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, ছি ছি শঙ্কর তুই এ কি ক'রলি—কাকে তুই এতবড় অপমান ক'রলি।

মার এ মূর্তির সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'লো না শঙ্করের। সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল।

সরমা দুচোখে অন্ধকার দেখলেন। দুদিকের মন রাখতে গিয়ে দিনের পর দিন যে পথ ধরে তিনি চলেছেন সেই পথই আজ জীবন্ত পাইথনের রূপ নিয়ে আজ তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। এই অসহনীয় বন্ধন থেকে কি ভাবে মুক্তি পাবেন এই কথাটাই একটা প্রকাণ্ড সমস্যার রূপ নিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে।

স্বামী যদি চেঁচামেচি ক'রতেন তাহলে হয়তো অগ্রসর হবার একটা সহজ পথ তিনি খুঁজে পেতেন। কিন্তু তাঁর নির্বাক থমথমে মুখভাব সরমাকে ভীত ক'রে তুলেছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ভাবিয়ে তুলেছে।

রাত্রের খাবার নিঃশব্দে দিয়ে এসেছেন সরমা। নগেন্দ্র একবার ফিরেও তাকালেন না সেদিকে। সরমাও কথা না ব'লে সরে এসেছেন। কি ব'লবেন তিনি। বলবার আছে কি। সরমা বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন।

পাশের ঘরে স্বামী দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছেন। তাঁর এতদিনের এতবড় বিশ্বাস আজ ভেঙ্গে গেছে। আঘাতটা খুবই লেগেছে সন্দেহ নেই। ছেলেমেয়েদের যে চিত্র সত্যিমিথ্যা দিয়ে অঙ্কন করে স্বামীর চোখের সম্মুখে প্রতিনিয়ত ধরেছেন তাতে রং-এর কারুকার্য ছিল অনেক। সরমা তাঁর মনের রং দিয়ে নগেন্দ্রর মনের মত ক'রে ছবি এ'কেছিলেন।

সে ছবির পাশে চোখ রেখে তিনি প্রফুল্ল হেসে বলতেন, এ যে হতেই হবে সরমা। আমার আদর্শ, আর তোমার সুশিক্ষা কখন ব্যর্থ হ'তে পারে না। বুঝলে সরমা ছেলেমেয়েদের জন্য তুমি ক'রবে বইকি। কিন্তু চাওয়া মাত্র সব কিছু হাতে তুলে দিলে ওদের আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত ক্ষুধায় পরিণত হবে। মানুষের চাওয়ার কি শেষ আছে সরমা?

সরমা মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই উচ্ছ্বাস শুনতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেছেন। ভিতরে ভিতরে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। নগেন্দ্র অত তলিয়ে দেখতে জানেন না। তিনি আপন খেয়ালেই বলতে থাকেন, তা ছাড়া আমার যা কিছু তা ওদেরই জন্য। হঠাৎ চোখ বুজলে অথৈ জল। কেউ দেখবে না। আজকের দিনে শোকের সামর্থও সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। আর এই বয়েসে যদি ব্যয়সংযম না শেখে তাহলে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যাবে যে।

সরমা এ কথারও জবাব দেননি। এ যুক্তির চেয়ে ছেলেমেয়েদের যুক্তির মধ্যে তিনি আপন মনের সায় পান। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়কে সরমা পৃথক পৃথক স্তরে ভাগ করে দেখেন। আজ যে বস্তুর জন্য মন আকুল হয়ে উঠেছে, কাল হয়তো মনের সে অবস্থা থাকবে না। আজ মনকে উপবাসী রেখে কালকের জন্য সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে তিনি কোনদিনই আনন্দের সন্ধান পাননি। একটা চাপা অনুযোগ বারে বারে তাঁর মনে গুমরে গুমরে উঠেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে একদিনের জন্যও বিদ্রোহ করেন নি। বরং স্বামীর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে এতগুলি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। তবে একদিন যেটা সহজ ছিল আজ তা নেই—ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। তারা বড় হ'য়ে নিজেদের মত ক'রে ভাবতে শিখেছে। তারা প্রশ্ন করে। প্রশ্নের জবাব চায়। জবাব মনঃপূত না হ'লে তর্ক করে—যুক্তি দেখায়। সরমা ওদের মধ্যে নিজেকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেন।

তাই ব'লে শঙ্করের আজকের উদ্ধত ব্যবহারকে তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি। যদিও প্রকাশ্যে পুত্রের বিরুদ্ধে একটি কথাও সরমা ব'লতে পারেননি। প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা।

প্রতিবাদ করা তাঁর উচিত ছিল। উত্তেজনার মুখে শঙ্কর যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন তার মূল্য যে কতখানি সরমার তা অজ্ঞাত নয়। অথচ... তিনি ভিতরে ভিতরে ছটফট ক'রছেন। অন্যায় হ'য়ে গেছে খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে। সরমার এই অসঙ্গত নীরবতাকে নগেন্দ্র যে কি চোখে দেখেছেন একথা তাঁর চেয়ে বেশী আর কে জানে!

বিছানায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে পাঁচ বছরের কোলের ছেলে অম্বর। বাপের হাত-ধরা। আজ কিন্তু একবারও বাপের কাছে যাবার নাম করেনি। অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়। ত্রস্তভাবে মাকে আঁকড়ে ধরে আছে। সব কটিই একদিন ঠিক এমনি ছিল। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হ'চ্ছে। প্রকৃতির নিয়ম—বকবার কিছুই হয়তো নেই।

পাশের ঘরে তখনও নগেন্দ্র পাগলের মত পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন। দরজা ঠেলে ও ঘরে চলে যাবে কি সরমা? তাঁর অসহায় করুণ অবস্থার কথা অকপটে প্রকাশ ক'রে বুকের উপরের এই পাষাণ ভার নামিয়ে ফেলবেন কি তিনি?

মেয়েদের কথা আলাদা—দুটির ত

বিয়ে হ'য়ে গেছে। আর একটির জন্য ভাবনা নেই। শঙ্করের জন্য বরাবরই সরমার দুশ্চিন্তা ছিল। অর্থের প্রতি ওর কোন মমতা নেই অথচ বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে আসছে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—কথাটা প্রায়ই শঙ্কর মাকে শোনাতো। বাপকেও বুঝিয়ে বেশ কিছু নিয়েছে কিন্তু কিছুই ক'রতে পারেনি। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে।

খবরটা জানতে পেরে নগেন্দ্র কিছু বলবার আগেই সরমা রাগ করে বলেছিল, এক দফায় অতগুলো টাকা দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। তুমি এত হিসেব ক'রে চলো অথচ...

বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়ে নগেন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, না না বড়রো হিসেবে আমার ভুল হয়নি।

অবাক করলে, সরমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর, হিসেবে যদি ভুলই না করলে তাহলে টাকাগুলি জলে গেল কেন?

খুব হেসেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। ওটা তোমার ছেলের শিক্ষার খাতে ব্যয় হয়েছে। ব্যবসা ভাল জিনিস কিন্তু সব কাজ যে সকলকে দিয়ে হয় না এটা শিখতে হয়। তোমার ছেলের এটা শিখবার জন্য আমাকে কিছু ব্যয় করতে হয়েছে।

শিক্ষা শঙ্করের কিছুই হয়নি। হলে আবার এসে বাপের কাছে টাকার দাবি ক'রতে পারত না।

বারে বারে লোকসান অগ্রাহ্য করবার মত সঞ্চয় তাঁর নেই। তাছাড়া বাপ হিসেবে প্রত্যেকটি সন্তানের প্রতিই তাঁর সমান কর্তব্য আছে। এখানে অন্যায় তারতম্য করতে তিনি নারাজ। আর ব্যবসার নাম করে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে শঙ্কর যা করে বেড়িয়েছে তা আর যাই হোক ব্যবসা যে নয় একথাটাও নগেন্দ্র পুত্রকে সোজা জানিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য এতেও শঙ্কর লজ্জা পেল না। উপরন্তু তিনি বড় সাহেবকে ধরে করে যে একটা কর্মসংস্থান করেছেন তাও বাবুর মনঃপূত হয়নি। আরও টাকার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করল। তারপর......

কিছুক্ষণ তিনি খোলা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার তাঁর পায়চারি শুরু হলো। শঙ্করকেও না হয় বোঝা গেল কিন্তু সরমা...নগেন্দ্র-নাথের নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। সরমা কেমন ক'রে পুত্রের হাতে ধরে চলে যেতে পারলেন—বিনা প্রতিবাদে, বিনা দ্বিধায়। আজকের এই অনভিপ্রেত ঘটনায় সরমার ব্যবহারটাই নগেন্দ্রনাথকে অধিক চঞ্চল আর ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁর পা টলছে। দেহের ভার আর তিনি বুঝি বইতে পারবেন না। এই কি জীবন...... এরই নাম সংসার! এই সংসারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি এতদিন ধরে হিসেব করে মরেছেন! না সংসারের এইটেই বলা স্বাভাবিক রীতি-প্রকৃতি। আর এইজনাই পূর্বপুরুষেরা পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনে যাবার বিধান দিয়ে গেছেন? নগেন্দ্রনাথ অনেক ভেবে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এক প্রকার স্থির করে নিয়ে নিঃশব্দে এসে শয্যার আশ্রয় নিলেন। আহার্য যেমন তেমনি পড়ে রইল। তিনি ছুঁলেনও না।

চোখ বুজতেই আপন জীবনের অতীত দিনগুলি হাত-ধরাধরি করে তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। বিশেষ করে তাঁর বিবাহিত জীবনের অধ্যায়গুলি। যে বিবাহকে কেন্দ্র করে একদিন প্রচুর জল ঘোলা হয়েছিল। নিজে হাতে ঘোলা জলের সবটুকু ময়লা সযত্নে সাফ ক'রে যে স্বচ্ছ জলের দেখা মিলল সেখানেও আবিষ্কৃত হলো হলা-হল।

ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি কি আশা করেছিলেন আর কি পেলেন এই প্রশ্নটাই তাঁর মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

নগেন্দ্রর কল্পনা ছিল একটি সুস্থ আর সুন্দর সংসার—সে সংসারের মানুষ-গুলির মধ্যে কৃত্রিমতা থাকবে না। অনাড়ম্বর সংসার আপন মেরুদণ্ডের উপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে। পিতা-মাতাকে পিতা-মাতার সম্মান দেবে...... অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর জীবনের আইনগত অধিকার নিয়ে অকারণ সমস্যার সৃষ্টি করবে না।

পৃথিবীর সর্বত্রই সামাজিক পরি-বর্তন ঘটে গেছে। নগেন্দ্র যতই চোখ বুজে স্বপ্ন দেখুন না কেন তাঁর নিজের সংসারেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। নগেন্দ্র এগিয়ে আসতে পারেননি ব'লে তাঁর সংসার পিছিয়ে পড়েনি। জীবনের এত-খানি দীর্ঘ পথ তিনি শুধু সম্মুখে দৃষ্টি রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। আশে-পাশের এত যে ভাঙাগড়া উত্থান আর পতন ঘটেছে সেদিকে একবারও কি চেয়ে দেখেছেন তিনি। যদি দেখতেন তাহলে হয়তো আঘাতটা এত বেশী ক'রে নগেন্দ্রর বুকে বাজত না।

সরমা বরং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হ'য়েছেন। থাক সরমা থাক তাঁর ছেলেমেয়েরা। ওদের চলার পথের অন্তরায় তিনি আর হবেন না।

আশ্চর্যরকম শান্তমূর্তি ধারণ করেছেন নগেন্দ্রনাথ। তাঁর এই নূতন রূপের সঙ্গে ইতিপূর্বে সংসারে কারুর পরিচয় ঘটেনি। এ যেন সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ। সরমা ভয়ে কাঠ হ'য়ে আছেন। একমাত্র ছোট ছেলে অম্বরের মধ্যেই কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ভোরবেলা তার রোজকার পাওনা সন্দেশের কথাটাও সে ভোলেনি। কোন-দিন কোন কারণেই নগেন্দ্রনাথের সন্দেশ আনতে ভুল হয়নি। এই সামান্যর বিনিময় যে খুশী আর পরিতৃপ্তির হাসিটুকু অম্বরের মুখে দেয় তার মূল্য অনেক।

শঙ্করও ঠিক ওরই মত বাপের হাত-ধরা ছিল। কত অল্পে তার মুখেও হাসির জোয়ার আসত। সে হাসির দোলায় দুলত নগেন্দ্রর বুক। তাঁর আশে-পাশের পৃথিবী রূপে রসে আর বর্ণে অপরূপ হয়ে উঠত। তিনি বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখতেন। কল্পনায় শঙ্করের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল ছবি আঁকতেন। স্ত্রীকে ডেকে সোল্লাসে বলতেন, তুমি দেখে নিও সরমা। এ হাতেই হবে। শঙ্কর আমার একটা মানুষের মত মানুষ হবে।

শঙ্করের চেহারার মধ্যে, তার দৃষ্টির মধ্যে তার হাসি এমন কি মুখভঙ্গির মধ্যে তিনি নাকি পুত্রের ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন। নতুন নতুন সম্ভাবনার প্রকাশ আবিষ্কার করে সুখী হয়ে উঠেছেন।

ছেলেমানুষ সরমা পুলকিত হয়ে উঠেছেন। খুশীতে উপচে পড়ে সলজ্জ হেসে বলেছেন, ও তোমারই ত ছেলে...

নগেন্দ্রর দুচোখ ভালবাসার ছোঁয়া লেগে স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, শুধু আমার নয় সরমা শঙ্কর তোমারও ছেলে।

নগেন্দ্র ও সরমার দৃষ্টি একইসঙ্গে শিশুপুত্রের মুখের পানে নিবদ্ধ হয়। ওকে কেন্দ্র ক'রে স্বামী-স্ত্রীর বুকের

মধ্যে এক অপূর্ব সুখানুভূতি উদ্বেল হ'য়ে ওঠে।

তারপরে একে একে আরও গোটা-কয়েক সন্তান তাঁর সংসারে এসেছে। একের শূন্যস্থান অপরে পূরণ করেছে। পিছন ফিরে তাকাবার কথা একবারও মনে হয়নি। ছোটরাই মনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে একের পর এক। আজ, বড়র কাছ থেকে আঘাত পেয়েই আবার তাঁর শিশু জীবনটা চোখের সম্মুখে জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে।

আশ্চর্য! সংসারের ভাল মন্দ থেকে দূরে সরে যাবার সংকল্প করেও সেই একই চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছেন কেন? বিশেষ করে স্ত্রীর উপর অভিমানটাই যেন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সরমা... সরমাও তাঁকে......

কে ...চমকে উঠে প্রশ্ন করেন নগেন্দ্রনাথ।

আমি......জবাব দিলেন সরমা। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়ালেন।

সরমার মুখের পানে চোখ পড়তে চমকে উঠলেন নগেন্দ্রনাথ। সামান্য দু'তিন দিনের মধ্যে তার বয়েস যেন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। চোখের কোলে ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

নগেন্দ্রর চোখে চোখ পড়তেই তিনি মাথা নত ক'রলেন।

নগেন্দ্র বিব্রত ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, তোমার চেহারাটা ত তেমন ভাল লাগছে না সরমা। শরীর খারাপ নয়তো?

এ প্রশ্নের মধ্যে একটুকু কৃত্রিমতা নেই। এ কণ্ঠস্বর সরমার অতি পরিচিত! তাঁর বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ তোলপাড় ক'রে উঠল। ঠোঁটের কোণে একটুখানি মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। বললেন, না, শরীর আমার বেশ ভালই আছে।

ব্যগ্র কণ্ঠে নগেন্দ্র বলেন, কিন্তু দেখে তো তা মনে হ'চ্ছে না।

মৃদু গলায় জবাব দিলেন সরমা, ও তোমার ভুল।

তাই বোধ হয়—একটি নিঃশ্বাস পড়ল নগেন্দ্রনাথের। সরমা হয়ত সত্য কথাই বলেছে। জীবনভর তিনি শুধু ভুলই করে চলেছেন। কিন্তু এসব কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ কি।

তিনি বললেন, কি ব'লতে এসেছো বলো।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সরমা জবাব দিলেন, শঙ্কর বলছিল—

বাধা দিলেন নগেন্দ্রনাথ, শঙ্করের কথা থাক। তোমার কথা বলো।

সরমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমার কথাও শঙ্করের কথাকে কেন্দ্র করে।

নগেন্দ্র চুপ করে থাকেন।

সরমা বলতে থাকেন দোষ ত্রুটি সব মানবই করে তাই ব'লে তা শুধরাবার সুযোগ না দেওয়ার মধ্যে যুক্তি নেই।

নগেন্দ্র তথাপি নিরুত্তর।

সরমা থামতে পারেন না, সবাই মিলে একসঙ্গে শাসন শুরু ক'রলে ছেলে-মেয়েরা দাঁড়াবে কোথায়—

নগেন্দ্র এতক্ষণে মুখ খুললেন, কথাটা তুমি আরও বহুবার বলেছো।

কিন্তু কথাটা কোনদিন তুমি আমোল দাওনি। সরমার কণ্ঠে মৃদু প্রতিবাদ।

নগেন্দ্র জবাব দিলেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় সরমা।

সরমা প্রতিবাদ না ক'রে বললেন, তাই হবে। সম্ভবত আমিই ভুল বুঝেছি কিন্তু তুমি...সরমার কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো—দু'চোখে জল দেখা দিল।

অল্পেই সামলে নিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, তুমি নাকি উকিল ডাকিয়ে তোমার সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা...আবার হোঁচোট খেলেন সরমা।...

নগেন্দ্র কোন জবাব দিলেন না।

এবারেও সামলে নিয়েছেন সরমা। তারপর দৃঢ় ভঙ্গীতে বলতে শুরু ক'রলেন, তুমি নিজে যেটা ভাল ব'লে জেনেছো তাই ক'রেছো। কারুর মতামতের অপেক্ষা করোনি। আমি প্রাণপণে তোমাকে আগলে রেখে এগোবার চেষ্টা করেছি...

নগেন্দ্র বাধা দিলেন, নতুন কথা শোনাচ্ছ আজ—

না বোঝার ভান ক'রো না। সরমা যেন মুখস্ত বলে যাচ্ছেন এমনি ভাবে বলে চললেন, কিন্তু কোনদিন কোন কারণে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিনি কিন্তু আজ যদি তোমার সম্পত্তির কানাকড়ির বোঝাও আমার মাথায় চাপাবার চেষ্টা করো তাহ'লে সে অপমান আমি সইবো না।

সরমার গলা ধরে এল। কিন্তু তিনি থামতে পারলেন না। বলে চললেন, তুমি টাকাকে যত বড় মনে করো আমি তা করি না।

নগেন্দ্র একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেন, কথাটা আগাগোড়া মিথ্যে। আর এই মিথ্যেটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছো ব'লেই আমার এত দুঃখ।

সরমা স্থির অবিচলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, দুঃখবোধ সকলেরই আছে—

আমি সে কথা কোনদিনই অস্বীকার করিনি। নগেন্দ্র বলেন।

কিন্তু তা এতই সূক্ষ্ম যে সাধারণের চোখে পড়ে না। সরমা জবাবে বলেন।

নগেন্দ্র সখেদে বললেন, সাধারণের কথা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তুমি সরমাও আজ এ কথা বলতে পারলে। তোমার তো আমাকে ভুল বুঝবার কথা নয়! আমার অনেক দুঃখের মধ্যেও এইটেই যে ছিল সবার বড় সান্ত্বনা।

নগেন্দ্রর এই শেষ কথা কটিতে সরমা চমকে উঠলেন। স্বামীর চোখে চোখ রাখতেই তাঁর ভিতরের চেহারাটা যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। নিজেকে অপরের চোখের সম্মুখে তুলে ধরতে তিনি কোনদিনই পারেন না একথা সরমার অজ্ঞাত নয় কিন্তু তাঁর এতখানি বিশ্বাস আর নির্ভরতার কথা এমন করে বুঝি ইতিপূর্বে কোন দিনই সরমা উপলব্ধি ক'রতে পারেননি। বরং একটা বিপরীত চিন্তাই তাঁকে মাঝে মাঝে দুঃখ দিয়েছে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিছু বলতে গিয়েও সরমার বলা হ'লো না। ভিতর থেকে কে যেন তাঁর কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। তাঁর দম-বন্ধ হ'য়ে আসছে।

হঠাৎ নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সরমার মুখের পানে আবদ্ধ হ'তেই তিনি উৎকণ্ঠিত গলায় বলে উঠলেন কিন্তু... তোমার হঠাৎ হলো কি সরো! তুমি অমন ক'রছো কেন?

নগেন্দ্রনাথের এমন কণ্ঠস্বর বহুদিন সরমা শোনেননি। একটি মুহূর্তে তিনি যেন একেবারে ছেলেমানুষে পরিণত হলেন। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি যা ক'রবে ঠিক ক'রেছো তার চেয়ে আরও ভয়ানক কিছু আমিও ক'রতে পারি জেনো..

নগেন্দ্র একটা জবাব দিতে উদ্যত হ'য়েও দিলেন না। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে দেওয়াল-ঘড়ির উপর পড়তেই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, ইস্ বারটা বাজল যে। দেখ দেখি তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রতে গিয়ে কত রাত হ'য়ে গেল।

নগেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে ঘরের বাইরে পা বাড়াতেই তাঁর পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে সরমা জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাবে।

দোকানে, নগেন্দ্র বললেন, খোলা পেলে হয়। অম্বর হতভাগা নইলে ছিঁড়ে খাবে আমাকে। চেয়ে দেখছো কি? তোমার কোলের ছেলের সন্দেশ আনতে হবে না?

নগেন্দ্র দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সরমার দু চোখ জ্বালা ক'রতে লাগল। মুখে ফুটে উঠল খানিক স্নিগ্ধ হাসি। মিথ্যাই তিনি এই লোকটিকে নিয়ে এত ভেবে মরেছেন...
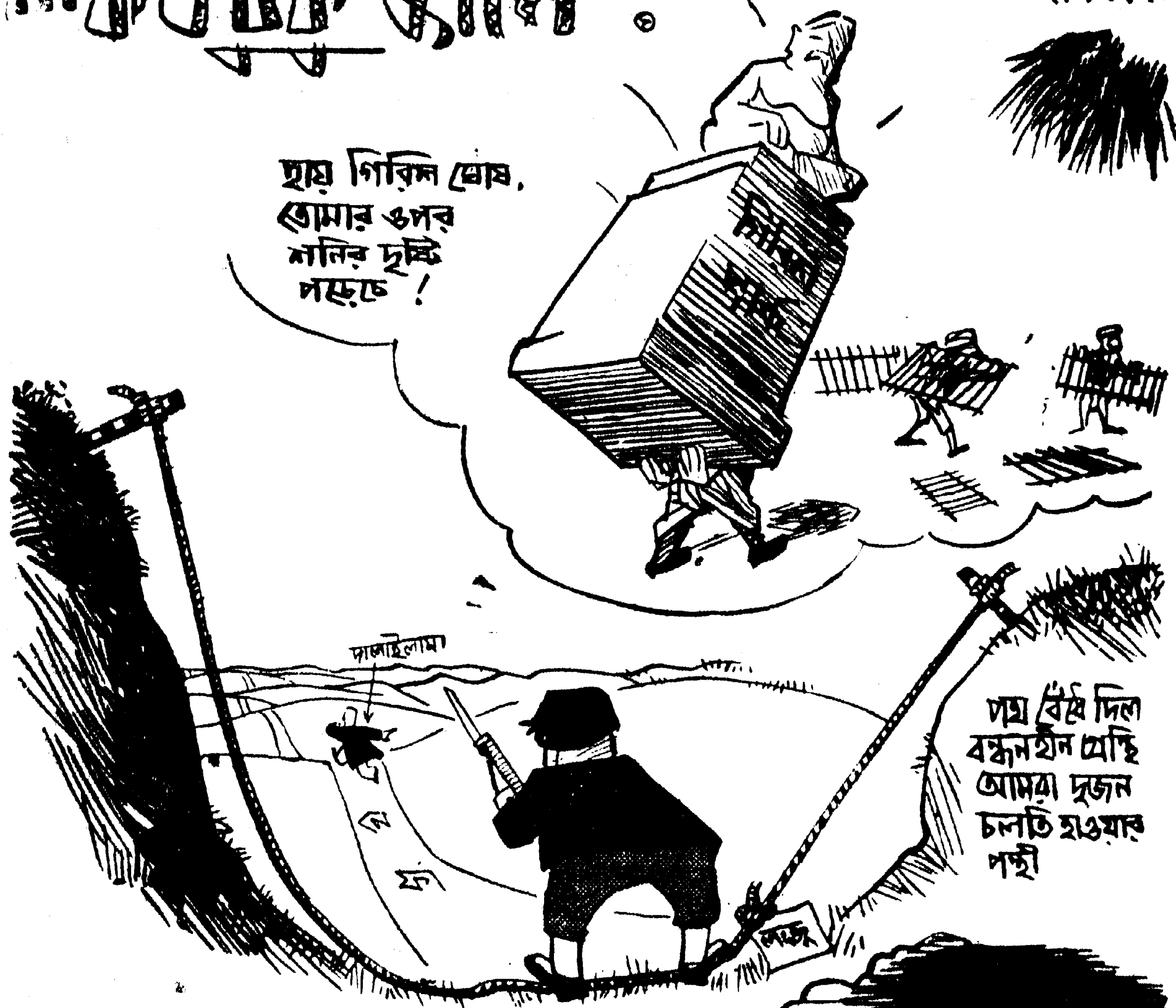
"গঙ্গা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ—মহাদেবের জটা হইতে।" কথিত আছে এমন প্রবাদবাক্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন জগদীশচন্দ্র বসু। আর স্বভাবের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করতে যদি বলা হয়, মানুষের ভাবজগতের অভাব থেকেই এর জন্ম, তবে এরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব নয়।

আত্মঘাতী স্বভাব

তরুণ মৈত্র

গোড়ায় একটা বক্তব্য প্রকাশ করা দরকার। মূল সূত্রের একটা 'রুল' আছে। 'স্বভাব ছাড়া মানুষ' চিন্তা করা করা যায় না। যেমন বাদ্য ছাড়া বিয়ে; যৌন ছাড়া যৌবন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্বভাব নয়, উৎকট স্বভাবের উৎপত্তিস্থল মানুষের ভাবজগতের অভাব।

আরও পরিষ্কার হোক। অনেক রকমের স্বভাব আছে বিভিন্ন মানুষের। আর এই স্বভাবের 'ভিন্ন' বিচারে মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন—তেত্রিশ কোটি দেবতার মত তেত্রিশ রকম স্বভাবের মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে এমন উৎকট স্বভাবের মানুষ আছে যাদের অবস্থানে মাঝে মাঝে অঘটন ঘটে যায়। আবার এই সব উৎকট স্বভাবের মধ্যে রয়েছে আত্মঘাতী স্বভাব। এই আত্মঘাতী স্বভাবের মানুষ দিন দিন নিজেকে কুরে কুরে নিজের অজ্ঞাতে উদ্ভট প্রকৃতির পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে কোন এক প্রভাতে সে দেখবে তার আশেপাশের লোক তাঁকে নিয়ে বেশ মজা করছে। অথবা ক্রমে ক্রমে আপনজন যারা তাদের ঘনিষ্টতার সম্পর্ক দেখা যাবে কমে আসছে। ঘরের স্ত্রী, ভাই, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনই শুধু নয়, কার্যক্ষেত্রের সহকর্মীদের মধ্যেও দেখা যাবে বৈরীভাব অথবা বিরক্তি, অবজ্ঞা অথবা কৌতুক। এ'রা খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক নন—প্রকৃতপক্ষে এ'রা হলেন মনের দিক থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সাধারণ বিচার বিবেচনা কিছুটা কম থাকায় তাঁরা সমতা রক্ষা করতে পারেন না সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা একেবারে সম্পূর্ণভাবে 'আত্মঘাতী স্বভাবের মানুষে' পরিণত হন।

এমনি আত্মঘাতী স্বভাবের মানুষ মিস্টার লালমোহন আঢ্য। তিনি একজন পদস্থ রিসার্চ অফিসার। তাঁর নিকটতম সহকর্মী, তাঁর সচিবও বলতে পারেন একদিন এক ছুটির দরখাস্ত দেন—তাঁর বিয়ে উপলক্ষে। সহকর্মী অপেক্ষা করছিলেন দরখাস্ত পড়া শেষ করেই মিস্টার আঢ্য নিশ্চয়ই সোৎসাহে 'কংগ্রেচুলেশন' জানাবেন। এ চিন্তার পেছনে যুক্তি ছিল তাঁর। কারণ অফিসের বড়সাহেব সেদিনই খবরটা কিভাবে শুনেছিলেন যেন, এবং যখন বারান্দায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় হঠাৎ, তখন গাম্ভীর্য রক্ষা করেই পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এর মধ্যেই খবরটা আমার কানে এসেছে। খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু মিস্টার আঢ্য দরখাস্ত পড়া শেষ করে মাথা না তুলেই ভুরু কুঁচকে বললেন—কিন্তু এভাবে ছুটি নেওয়া ঠিক হবে? যদি পরে জানাজানি হয়ে যায়।

সহকর্মী তো অবাক। —কি বলছেন স্যার। বিয়ের কথা বলে মিথ্যে পিটিশানে ছুটি নেবো নাকি?

অফিসার মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হলেন, মুখে বললেন,—ও, আপনার বিয়ে?—দরখাস্তে সই করে বড়সাহেবকে 'ফরোয়ার্ড' করলেন। আর কোন কথা নয়। একেবারে নির্লিপ্ত। এই সামান্য অসামাজিক ব্যবহারে সহকর্মীটি মিস্টার আঢ্যের প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা তো আনতেই পারলেন না বরং বিরক্ত বোধ করলেন। কথায় কথায় সহকর্মীটি তার সমপর্যায়ের অফিস-কর্মীদের ঘটনাটা বলায় তারাও মিস্টার আঢ্যের প্রতি বিরক্ত হলেন। কেউবা কৌতুক করে মন্তব্য করেন—সিনিক-টাইপের লোক—ও'র কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু মিস্টার আঢ্যের এই রকম অসামাজিক মনোভাব কিম্বা সন্দেহ প্রকাশের পেছনে একটা যুক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে ভদ্রলোক খুব সচেতন ও সৎ চরিত্রের। কিন্তু মাঝে মাঝে কারণে অকারণে নিয়ম বহির্ভূত কাজও করতে হয় অনেকের মতো। কিন্তু মিস্টার আঢ্য সে রকম কাজ করেও দুর্বলচিত্তে তার পর্যালোচনা করেন। প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ফলে। কিছুদিন আগে ইনভেষ্টিগেটিং অফিসারের পাল্লায় পড়ে কাজের নাম করে তারা দুজনে দুটোর

সময় অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত কারণে। এমনি ধরনের ব্যক্তিগত কাজে অনেকেই হামেসাই যায়। কিন্তু মিস্টার আঢ্য-র সচেতন মনে আঘাত করেছিল। মানে, এই দুর্বলতা তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছিল। প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সহকর্মীটিকে অবিশ্বাস করে। ফলে বর্তমান জগতে পিছিয়ে পড়লেন তিনি। নিজের বিবেচনাহীনতায় নিজেকে ডোবালেন। অসামাজিক হয়ে পড়লেন তার কার্যক্ষেত্রে। অসামাজিকতার আরও পরিচয় পাওয়া গেল সহকর্মীটির বিয়েতে বড়সাহেব থেকে অনেকেই গিয়েছিলেন আমন্ত্রণ রক্ষা করতে কিন্তু আঢ্যসাহেব সেখানেও নেই। সহকর্মী যখন আবার কাজে যোগ দিলেন মিস্টার আঢ্য এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করলেন না তার না যাবার জন্যে কিম্বা কোন উৎসাহও জানালেন না বিয়ের প্রসংগে। কারণ আর কিছু নয়, তাঁর ধারণা সকলেই তার পেছনে লেগেছে—অপমান, অসৌজন্য এমনকি অপঘাতে প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে এদের হাতে। এ রকম ধারণা একদিনে হয়নি। ক্রমে ক্রমে ভুল বিচার, অসামঞ্জস্য ব্যাভার আর সন্দেহ থেকে তাঁর এই আত্মঘাতী স্বভাবের পরিচয় ধরা পড়ে।

একদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন আঢ্যসাহেব। পেছনে রয়েছেন মার্কেটিং-রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের অমিয়বাবু। ও'রা দুজনেই ধীর পদক্ষেপে একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে মিস মীরা দত্ত, মার্কেটিং রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাসিসষ্ট্যাণ্ট, নীচ থেকে ওপরে উঠতে থাকে। অমিয়বাবু তাই তাঁকে একটু ঠাট্টা করেই বলেন : আঃ কি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে উঠছেন—একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

মিস্টার আঢ্য তাড়াতাড়ি রাস্তা ছেড়ে অতর্কিতে মিস দত্তকে পথ ছেড়ে দিয়ে বলেন—আসুন, আপনি আগে যান।

মিস দত্ত বোকা বনে যান, মিস্টার আঢ্যর চোখে-মুখে গাম্ভীর্য। পরে তাঁর চেম্বারে গিয়ে মিস দত্ত বলেন—স্যার, আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন বিনা কারণে। আপনাকে কিছু বলিনি তখন।

মিস্টার আঢ্য কোন কথা বলে না। হঠাৎ মুখ তুলে বলে ওঠেন—আপনারা কেন আমায় বিরক্ত করেন বলুন তো।

—আপনি মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করছেন স্যার।

মিস্টার আঢ্য যেন আরও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। জোড়হাতে বলেন—আপনার সংগে কথা বলে সময়ের অপব্যয় করতে চাই না।

লালমোহন আঢ্যর এমন অসৌজন্যমূলক আচরণে মিস দত্ত স্বভাবতঃই অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। কিন্তু মিস মীরা দত্ত আর লালমোহন আঢ্যর ব্যাপারে এখানেই যবনিকা পড়লো না। আগেই বলেছি মিস্টার আঢ্য খুব সচেতন। তাই মিস্ দত্তর প্রতি যে তিনি ভাল ব্যাভার করেননি, তা তাঁর প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার জন্যে অনুতপ্ত না হয়ে সর্বদা একটা ভীতিভাব তাঁর মন ছেয়ে রেখেছিল—হয়তো মিস দত্তর বন্ধুরা অমিয়বাবুর গ্রুপ, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। ফলে আবার ভুল বোঝার পালা।

অফিসে আসছিলেন মিস্টার লালমোহন। পার্ক স্ট্রীট থেকে উঠলেন তিনি। উঠেই দেখেন অমিয়বাবু বসে আছেন। —আপনি এই বাসে যে!

—কেন, আমি তো এই পথেই যাই। আপনি বরং ক্যাজুয়্যাল

স্বপক্ষে সহানুভূতি কুড়োতে লাগলেন। অমিয়বাবুর কানে খবরটা এলে তিনি তো অবাক। ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্টাণ্টের সংগে তাঁর কথা হচ্ছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মিস ব্যানার্জির 'সেকেণ্ড' সমর্থকদের নিয়ে। কিছুদিন হ'ল একই পথযাত্রী ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ক্লার্ক মিস ব্যানার্জির সংগে ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্ট্যাণ্টের পরিচয় হয়েছে—একটু ইয়েও দেখা যাচ্ছে দুজনেরই মধ্যে। কিন্তু কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মচারীদল। বিশেষ করে খুব ফর্সা মতো মেয়েমুখো ভদ্রলোকটি
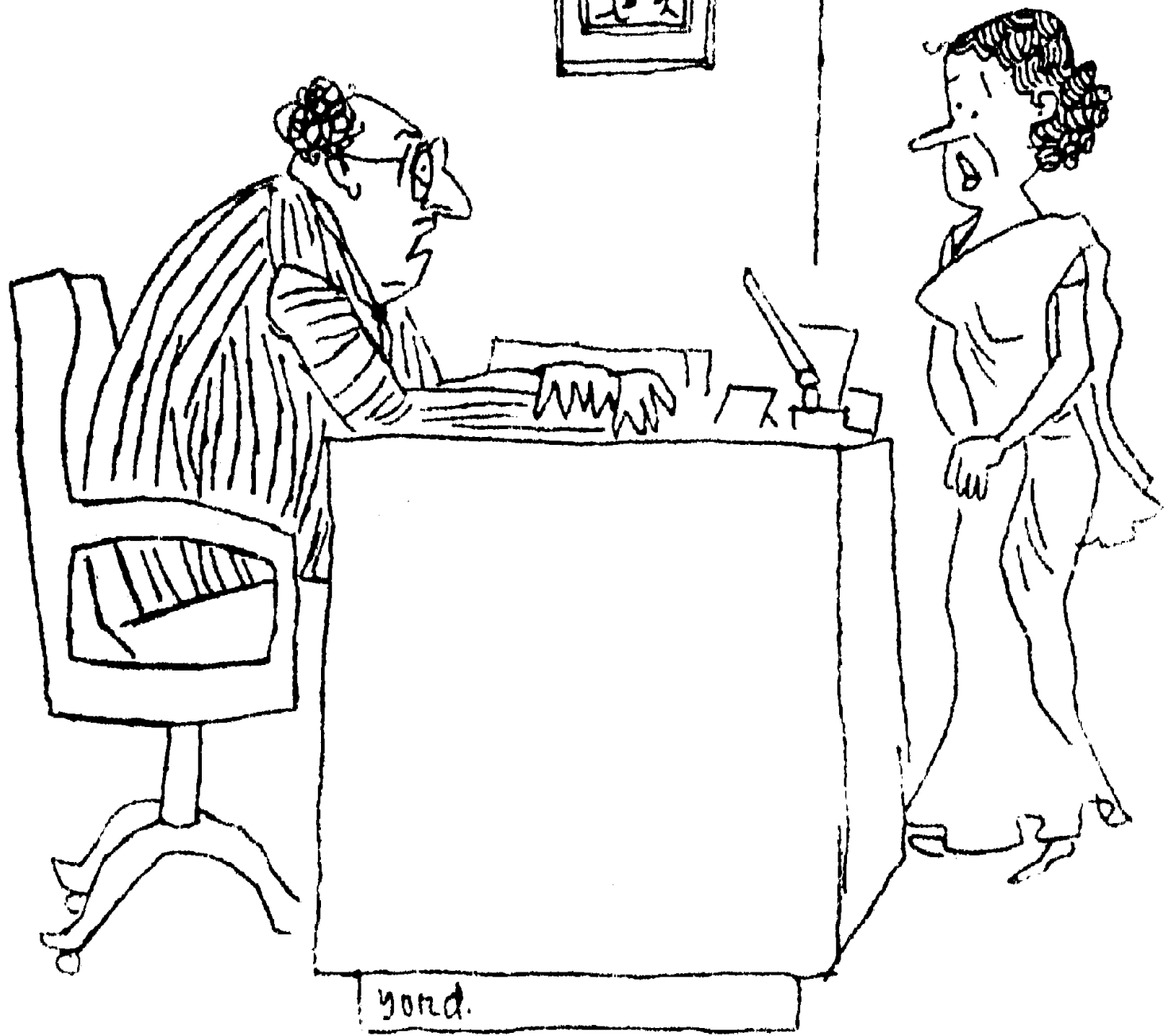
স্যার আপনি অসন্তুষ্ট হ চ্ছেন বিনা কারণে

প্যাসেঞ্জার এই রুটের। —অমিয়বাবু জবাব দিল।

মিস্টার আঢ্য এই রকম কথায় যেন আশঙ্কার ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। বিশেষ আর কথা না বলে অমিয়বাবুর সামনের সিটে বসে পড়েন। হঠাৎ পিছনে অমিয়বাবুর গলার আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখেন অমিয়বাবু আর ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কি যেন ও'রই দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। একজনের মুষ্টি উঠেছে শূন্যে। চোখ ফিরিয়ে নেয় লালমোহন। কিন্তু কর্ণে প্রবেশ করে—বেশী বাড়াবাড়ি দেখি তো এই আধমনি ঘুসি পড়বে নাকে।

ব্যাস্......মিস্টার লালমোহন আঢ্য নিজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অফিসে গিয়েই সমস্ত মহলে একথা বলে যেন একেবারে ডিটেক্টিভ সাহেব। তাই অমিয়বাবু ঐই প্রসংগে ঘুসি তুলে সহকর্মীকে উৎসাহ দিচ্ছিল।

কিন্তু 'উল্টো বুঝিলি রাম'। লালমোহন আঢ্য পুলিশে ডাইরী করলেন। অফিসে পুলিশ অফিসার আসায় সকলের চোখ কপালে ওঠে। তারপর পুলিশ অফিসারের মোটামোটি তত্ত্ব সংগ্রহ ক'রে চলে যাবার সংগে সংগে মিস্টার লালমোহনের ঘরে মোমাছির চাক বসে যেন। পরদিন দেখা গেল মিস্টার আঢ্যর ঘরে ফ্যান ঘুরছে না। পরদিনও না। খবর পাওয়া গেল আরও দুদিন বাদে, তিনি নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, একমাসের বিশ্রামের জন্য ডাক্তার সুপারিশ করেছেন, তাই তিনি একমাস ছুটি চেয়েছেন।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গোবিন্দর বৌ রাণীই প্রথম কথাটা তুলল।

সেদিন অফিস থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল হেমের। সিমলের বড় মাসিমার বাড়ি এসে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। বড় মাসিমা গেছেন পাড়াতে কোথায় চণ্ডীর গান শুনতে। এ একটা নেশা হয়েছে তাঁর—রোজ যাওয়া চাই। গোবিন্দ তখনও বাড়ি আসে নি। নটার আগে কোন দিনই আসতে পারে না সে শনিবার ছাড়া। তাও শনিবারও ফিরতে ছটা সাড়ে ছটা বেজে যায়। ইস্কুল সিজন-এ অর্থাৎ শীতকালে কাজের যখন চাপ পড়ে তখন নটাতেও আসতে পারে না, আরও রাত হয়। সে যখন ফেরে তখন এদের এক ঘুম সারা হয়ে যায়। গোবিন্দ তার এক বন্ধুর ছাপাখানায় কাজ করে। মাইনে কম, কাজ বেশী। কিন্তু তবু এইখানেই কাজ শিখে চাকরি নিয়েছে বলে চক্ষুলজ্জায় বাধে, কাজ ছাড়তে পারে না। সাধারণ ছাপাখানা নয়—মানচিত্র ভূচিত্রাবলী ছাপা হয় সেখানে। দায়িত্বের কাজ, ঝুঁকি অনেক। ছাপাখানা ছুটি না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হয়। কারণ মালিক ছটা বাজলেই বাড়ি চলে যায়—সে ছাড়া ছাপার খুঁটিনাটি গোবিন্দর মতো আর কেউ বোঝে না। সাধারণত সাড়ে আটটা অবধি খোলা থাকে প্রেস—সব বন্ধ ক'রে ফিরতে নটা তো বটেই, বেশীও হয়ে যায়।

এই সময়টা রাণী বৌয়ের নিরংকুশ অবসর। সে সন্ধ্যার আগেই বিকেলের রান্না সেরে নেয়। কারণ মেয়ে আগলানো এক হাঙ্গামা। সে কাজটা ওর শাশুড়ি থাকলে করতে পারেন। কোনদিন হয়ত তিনিই রান্না করেন, ও মেয়ে আগলায় আর ঘরের খুঁটিনাটি কাজ সারে।

রান্না সেরে চুল বেঁধে গা ধুয়ে এলে ওর শাশুড়ি কাপড়-চোপড় কেচে আহ্নিক সেরে বেরিয়ে যান। কোনই কাজ থাকে না হাতে। কেউ না এলে একটু বই-টই পড়ে। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে হেমই এনে দেয় বই। হেম এলে বই-পড়া হয় না, গল্পই করে বসে বসে। অবশ্য গল্পটা একতরফাই চলে বেশী। হেম বেশী কথা কইতে পারে না, বিশেষ ক'রে এখানে বড়বৌদির সামনে এলে যেন তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে যায়। শুধু চুপ ক'রে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। কথা কইতে ইচ্ছাই করে না তার—মনে হয় সে সময়টা বৌদির কথা শুনলে কাজ হবে।

আজও তাই শুনছিল সে। ঘুমন্ত মেয়েকে একটা পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে কথা বলছিল বড় বৌ আর হেম সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষু ও কর্ণে ঘনীভূত ক'রে বসে শুনছিল এবং দেখছিল। শিগগিরই আবার ছেলেপুলে হবে, সাধ হয়ে গেছে—এখন-তখন অবস্থা। তবু কী দেহের বাঁধুনী, বোঝাই যায় না যে এত ভারী হয়ে এসেছে দেহ। দাঁড়ালে তবু যদি-বা বোঝা যায়—বসে থাকলে একেবারে টের পাওয়া যায় না। এদিক দিয়েও তার বরাত ভাল। পরপর হয়ে ন্যাজ্জারি হয়ে পড়ে নি। বড়টি বোধ হয় বছর চার-পাঁচের হ'ল—মনে মনে হিসেব করে হেম। যার ভাল হয়, তার সব ভাল।

কথাটা উঠেছিল তরু প্রসঙ্গে। তরুর ঠাকুমা-শাশুড়ি মারা গেছেন—সেই উপলক্ষে, একত্র অশৌচ পালন করবার নাম ক'রে হারান নিয়ে গেছে তাকে। শ্রাদ্ধশান্তি মায় জ্ঞাতিভোজন পর্যন্ত মিটে গেছে আজ প্রায় দু সপ্তাহ হ'ল। তবু সেখানেই আছে। হারানের তরফ থেকে ফিরিয়ে আনবার বা দিয়ে যাবার কোন কথাই ওঠে নি এখনও পর্যন্ত।

'তোমরা কোন কথা তোল নি তো?'

'পাগল!'

'যাক—বোধ হচ্ছে তাহ'লে তোমাদের ঘাড় থেকে ও ভার সরেই গেল। ওরও টানা-পাড়েন হচ্ছিল তো—'

'বিশেষ। এদানে্ত তো ফি শনিবারেই আসছিল!'

'তার মানে টানটা আছে এর ওপরই। তাছাড়া প্রথম সন্তান—সেটাও একটা চিন্তা আছে তো! ভালই হ'ল। ছোট ঠাকুরঝিরও তো সময় হয়ে এল: কবে বলতে কবে হয়ে পড়বে। তোমাদের কাছে থাকলে ঐ ঝঞ্ঝাটটি পুরো তোমাদের ঘাড়ে পড়ত—আর খরচা। একটা বিয়েন তোলার কী কম খরচা!'

এই বলে একটু মুচকী হেসে বলল, 'আমাদের ইনি তো সেই নাম ক'রে জোর ক'রে পঞ্চাশটা টাকা আদায় করেছেন বন্ধুর কাছ থেকে। ধার বলেই চেয়েছিলেন তা কী ভাগ্যি টাকাটা দিয়ে বলেছে যে ও আর খাতায় লিখতে-টিখতে হবে না।'

'ভালই তো!' হেম বলে।

'হ্যাঁ। কত তো ভাল। আজকাল সবাইকেই ওপরটাইম দিতে হয় নাকি বেশী খাটালেই। ছাপাখানায় জমাদার থেকে সবাই পাচ্ছে। ও'কে দেয়! দিলে পঞ্চাশ টাকা তো এক মাসেই পাওনা হয়ে যাবে মশাই!'

তারপর আবার হঠাৎ তরুর প্রসঙ্গে চলে যায়।

'তা হ্যাঁ ভাই—ওদের বন্দোবস্তটা কী রকম হবে?'

'কাদের?' অন্যমনস্ক হেম অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'ঐ ছোট ঠাকুরঝিদের? কে থাকবে আর কে যাবে? পুরনো যিনি তিনি কি আর এখন যেতে রাজী হবেন? অসময়ে এসেছেন!'

তা জানি না। শুনছি নাকি সেও আছে এখনও। তারও নাকি—'

এই বলে থেমে যায় হেম। সংকোচে কথাটা শেষ করতে পারে না।

'ওমা, সেও পোয়াতী! তবেই তো বললে ভাল! তারও তো একটা কেলেম জন্মে গেল তাহ'লে!'

'হুঁ। তাই তো মনে হচ্ছে। আমি জানি না—ও বলছিল। ও তো দু-তিন দিন দেখলে কিনা। ওর ওপর খুব ভক্তি। শ্রাদ্ধের আগের দিন থেকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। বলে বৌদি না গেলে হবেই না।'

'তা তোমার বৌ যদি দেখে থাকে তো ঠিকই দেখেছে। সে বোকা মেয়ে নয়। তাহলে কি করবে এখন হারান? দুই বৌ নিয়েই ঘর করবে নাকি?'

'কে জানে!'

'তা সে যাকগে মরুক গে—তোমাদের ঘাড়ে আবার না চাপিয়ে দিয়ে গেলেই হ'ল। যার দায় সে বুঝুক!'

তারপরই—একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল সে।

'আচ্ছা ছোট ঠাকুরঝি তো নিজের বাড়ি চলে গেল। খোকাও তো ছোট মাসিমার ওখানে। এবার কান্তি ঠাকুর-পোকে বাড়িতে আনিয়ে নাও না। আর কেন ওখানে ফেলে রাখছ।'

চমকে উঠেছিল হেম, 'কান্তিকে! কেন, সে তো বেশ আছে। রাজার হালে আছে। অমন ভাল ভাল কাপড় জামা পরিয়ে মাষ্টার রেখে কি আমরা তাকে পড়াতে পারব!'

'কী দরকারই বা তাকে অমন রাজার হালে অভ্যেস করাবার! গরীবের ছেলে গরীবের মতো থাকাই তো ভাল। সেটা তো তার বাড়ি নয়. এইটেই তার বাড়ি, এইখানেই আসতে হবে থাকতে হবে তাকে। তা না ক'রে—অমনি চালে যদি অভ্যস্ত হয় তাহ'লে কি ও লেখা-পড়া শিখলেও তোমাদের কোন কাজে লাগবে?

হেম চুপ ক'রে থাকে। এমনভাবে কখনও ভাবে নি সে। মাত্র তিন-চার দিন আগে কনকও এই প্রসঙ্গ তুলেছিল—তাকেও চুপ করিয়ে দিয়েছিল ঐ বলে। আশ্চর্য, মনে মনে স্বীকার করে হেম, সহজ সাংসারিক বুদ্ধিটা তাদের চেয়ে এই এক ফোঁটা মেয়েগুলোর কত বেশী।

রাণী আবার বলে, যতই হোক, ছেলে যতই ভাল হোক—তবু ওসব জায়গায় না রাখাই ভাল। জায়গাটা ভাল নয়—বুঝলে!......তোমরা বল বা না বল, আমি তো সব জানি। ও বড় ঠাকুরঝির কী রকম ননদ, নন্দাই কী করে কিছুই আমার জানতে বাকী নেই। তাছাড়া সে যেমনই হোক, পাড়াটাই যে খারাপ। মানুষ-খেগো রাক্কুসীর পাড়া! অমন সোনারচাঁদ ভাই তোমার—কার নজরে পড়বে, ইহকাল-পরকাল সব যাবে।'

'কিন্তু দুদিন পরে কলেজে পড়ার কথা। তখন তো আমরা আর কিছু করতে পারব না। সে তো হাতীর খরচ।'

'কিসের হাতীর খরচ এমন। এখন তো তোমাদের সংসার হাল্কা হয়ে এল। কোন মতে কলেজের মাইনেটা টানতে পারবে না? বই তো কত ছেলে শুনেছি চেয়ে-চিন্তে, হাত-লিখে নিয়ে কাজ চালায়। ভাল ছেলে, চাই কি বিনা মাইনেতেও পড়তে পারবে, জলপানি পায় তো কথাই নেই। এখন আর কেন পরের বাড়ি ফেলে রাখা অমন ক'রে! বলি সে দৈন্যদশা তো আর তোমাদের এখন নেই!'

'তা নেই, তবুও! অনেক খরচা শুনেছি। তবে ঐ যা বলেছ, জলপানি একটা পেতে পারে। ফার্স্ট ক্লাসে উঠে-ছিল ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে!'

'তবে! সে তো আমিও শুনেছি! তাহ'লে জলপানি নিশ্চয় পাবে; দেখে নিও!'

তারপরই বুঝি কথাটা মনে পড়ে যায় তার।

'আচ্ছা, এই ফার্স্ট ক্লাসে ওঠার কথা তো কবে শুনেছি। তার তো এবার একজামিন দেবার কথা!'

'এবারই তো দেবে!' নিশ্চিন্ত হয়ে জবাব দেয় হেম।

'দেবে কী গো—সে এগজামিন তো হয়ে গেছে!'

'যাঃ!' অবিশ্বাসের সুরে বলে হেম।

'এই দ্যাখো! কবে হয়ে গেছে। আর বোধ হয় মাস-খানেকের মধ্যেই ফলাফল বেরিয়ে যা'ব!'

'সে কী?'

'হ্যাঁ—আমি বলছি। আমার মেজ খুড়তুতো ভাই দিলে না এবার। শেষ দিন দেখা ক'রে গেল। সে তো কবের কথা!'

'সে কি!' আবারও বিমূঢ়ভাবে বলে হেম।

'তোমাদের জানালে না, মাকে পেন্নাম ক'রে এল না—কী কথা!' বড় বৌও বিস্মিত হয়ে বলে, 'তাছাড়া এগজামিন শেষ হয়ে গেছে, এখন তো বাড়িতে এসেই থাকবার কথা! আর তোমরা খবরও রাখো না! বেশ লোক বাবা তোমরা!'

'তাই তো!' এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে ওঠে হেম, 'মুস্কিল হচ্ছে এদানী তো আর ছুটিছাটাতে বাড়ি আসত না, এলেও কদাচিত কখনও—এক দিন দু দিন থেকে চলে যেত। ওরা পয়সা খরচ ক'রে মাষ্টার রেখেছে মিছিমিছি পড়া কামাই করানো—এই জন্যেই আমরাও কিছু বলতুম না। আর ভাল যে আছে সে তো চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়—কাজেই আর পেড়া-পীড়ি করতুম না। কিন্তু এগজামিন হয়ে গেল বলছ—অথচ আমরা একটা খবর পর্যন্ত পেলুম না! এইটে যেন বড় খারাপ লাগছে। সত্যিই কি ছেলেটা পর হয়ে গেল নাকি? রতনের ওর ওপর নজর পড়েছে খুবই—যে রকম আদরযত্ন করছিল, পুষ্যিপুত্তুর-টুত্তুর নিয়ে নেয় নি তো?'

এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে বড় বৌ, 'মাইরি ঠাকুরপো, তোমার যা বুদ্ধি, ঘুঁটের মেডেল গড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নিদেন একটা পেরাইজ!'

'কেন—কী বললুম এমন?' অপ্রতিভ হয় হেম। ভালও লাগে তার। বড় বৌদির কাছে বোকা বনতে দোষ নেই।

'তা নয়! যা শুনেছি আমি বড়-ঠাকুরঝির মুখে এত কিছু বয়স নয় ওর রতন ঠাকুরঝির যে অত বড় ছেলের মা সাজতে পারে। তাছাড়া পুষ্যিপুত্তুর কেউ অত বড় ছেলেকে নেয়ও না। আর তা নিলেও তোমাদের না জানিয়ে নিতে পারে কখনও? আইনে তা টিকবে কেন! তা নয়, ফুটফুটে ছেলে, শান্তশিষ্ট, পড়ার মন আছে—তাই ভালবাসে যত্ন করে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তা যাই হোক, তুমি বাপু একবার খবর নাও।'

'নেব। তুমি তো আমায় ভাবনা ধরিয়ে দিলে।'

'আবার নেব-তে দরকার কি, আজই যাও না। এখনও তো আটটা বাজে নি!'

'না আজ হবে না। এখন রাম-বাগানে গিয়ে দেখা ক'রে কথা করে হাওড়ায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। নটা প'য়ত্রিশ না পেলে একেবারে দশটা চল্লিশ—বাড়ি পৌঁছতে দুপুর রাত!'

'তবু ভাল বাড়ির ওপর টান হয়েছে একটু!' এক রকমের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মুখটিপে হাসে রাণী।

'না তা নয়। আবার তো সেই ভোরে ওঠা!' অকারণেই লাল হয়ে ওঠে হেম, 'তাছাড়া রাত্রে গেলে ওখানে দেখাও

পাওয়া যায় না। দারোয়ান ঢুকতেই দেবে না হয়ত। সে বলাই আছে। গেলে সন্ধ্যের আগে।'

'রতনের সঙ্গে না দেখা হোক—তোমার ভাইকেও ডেকে দেবে না?'

'না—সে ওদের বারণ করাই আছে। মানে একটু পর্দার আড়াল দেয় তো এখনও, সেই ইজ্জৎটা নষ্ট করতে চায় না আর কি! তাছাড়া পাড়াটা ভাল নয়, রাত্তির বেলা যেতে ইচ্ছেও করে না।—আর দরকারই বা কি, পরশুই তো শনিবার, অফিসের ফেরৎ বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে মুখ হাত ধুয়ে চলে যাব এখন—চারটে নাগাদ যাওয়াই ভাল।'

'তাই যেও।'

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে।

বলার মতো কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে যায় দুজনেরই।

এ রকম আজকাল প্রায়ই হয়।

বহু দিন বহু ঘণ্টা এমনি করে সামনা-সামনি বসে কাটিয়েছে ওরা, ওদের সংকীর্ণ গন্ডীবাঁধা জীবনে কী-ই বা এত কথা থাকতে পারে?

আগে নিত্যই আসত হেম, এখনও সপ্তাহে দু-তিন দিন আসে। রবিবারে গোবিন্দ থাকে কিন্তু বাকী দিনগুলোতে ওরাই শুধু বসে থাকে এমনি মুখো-মুখি। সুতরাং যত রকম প্রসঙ্গ প্রায় নিঃশেষ ক'রে এনেছে ওরা।

অবশ্য হেমের তাতে আপত্তি নেই। বরং এমনি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলেই ও খুশী—এমনি বড় বৌদির মুখের দিকে চেয়ে।

বেশীক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকতে কিন্তু রাণীর ভাল লাগে না। তার গা ভারী হয়ে এসেছে, আলস্য করতেই ইচ্ছে করে।

সে একটু পরে বিরাট একটা হাই তুলে বলে, 'ঠাকুরপো, আমি ভাই শুই একটু। কিছু মনে ক'রো না!'

'না না, মনে করব কেন? আমি বরং যাই আজ—তুমি দোর দিয়ে শোও বরং। বড় মাসিমা তো অন্য দিন এসে যান এতক্ষণ, সাড়ে আটটা তো বাজে!'

'মার আজ ফিরতে রাত হবে। আজ বুঝি খুল্লনার ঘোষ গাইবে—মা সব সিধে সাজিয়ে নিয়ে গেছেন। গান শেষ হবে, সিধের থালা আজাড় হবে তবে তো আসবেন! আজ যার নাম সেই ফিরতে নটা স-নটা!'

'তবে আমি যাই—তুমি দোর দাও।'

দোরের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসে বড় বৌ। হেম চৌকাঠ ডিঙোতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে সে ডাকে, 'ঠাকুরপো!'

হেম চমকে পিছনে ফেরে। দৃষ্টিটাও কেমন যেন অদ্ভুত বড় বৌদির।

সে আবার ভেতরে একটা পা দেয়, 'কিছু বলবে?'

'বলছিলুম কি—তুমি কিছু মনে ক'রো না ঠাকুরপো, অনেক ভেবে দেখেই বলছি—বলছিলুম যে তুমি কোথাও বদলীর চেষ্টা করো। তোমাদের তো রেলের চাকরী, বদলী হয় শুনেছি। হয় না?'

'সে যারা লাইনে কাজ করে তাদেরই বেশী হয়। আমাদেরও হ'তে পারে—অপর কারখানায়। চেষ্টা করলে অন্য কোন কারখানায় যেতে পারি বটে, আরও দুটো জায়গা আছে। কিন্তু কেন বলো তো?'

বেশ একটু অবাক হয়েই চায় হেম তার দিকে।

'তবু ভাল বাড়ির ওপর টান হয়েছে একটু...'

ঠিক তখনই উত্তর দেয় না রাণী, হয়ত দিতে পারে না। আরও কিছুক্ষণ সেই বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হেমের মুখের দিকে। সে চাহনি যেন কী রকম। হঠাৎ সে দিকে চেয়ে আজ বড় দীন বোধ করে হেম নিজেকে।

একটু পরে রাণী বলে, প্রায় চুপি-চুপি, 'আমার কাছ থেকে দূরে কোথাও না গেলে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে ঠাকুরপো, এ মোহ তুমি ঘোচাতে পারবে না। তোমার জীবন শুধু নয়, ভেবে দেখ আরও একটা জীবনও যেতে বসেছে। এর আগেও তোমাকে বলেছি, এখনও বলছি, বহু ভাগ্য করলে কনকের মতো বৌ মেলে। ওর দিকটা চেয়ে দ্যাখো, ওর জীবনটা নষ্ট করো না। তুমি দূরে কোথাও চলে যাও কনককে নিয়ে—এক বছর বাইরে থাকলেই এই মোহটা চলে যাবে, বৌকে নিয়ে সত্যিকারের সুখী হ'তে পারবে। শুধু শুধু—। ভেবে দ্যাখো, কোন লাভ তো নেই!'

কথাটা শুনতে শুনতেই ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল হেমের মুখ। সেটা ডবল পলতের বড় টেবিল ল্যাম্পের আলোতে রাণীর চোখ এড়াল না। মনে হ'ল যেন কে এক ঘা চাবুক মেরেছে হেমের মুখে—এমনি করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

এই ভয়েই—এই রকম মর্মান্তিক আঘাত লাগবে তার বুঝেই বহুদিন বলতে গিয়েও বলতে পারে নি সে। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে মিছিমিছি, অনেক অপরাধ তার জমে যাচ্ছে তারই মতো আর একটা মেয়ের কাছে। আর না!

অনেকক্ষণ পরে, যেন অসাড় হয়ে-যাওয়া জিভে কিছুক্ষণ ধরে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে হেম আস্তে আস্তে বলে,

'আমি যে এখানে এমন করে আসি—তাতে তুমি বিরক্ত হও!'

এতখানি জিভ কেটে রাণী একেবারে ওর হাত দুখানা চেপে ধরল, 'ছি ছি! স্বপ্নেও তা ভেবো না। এক-এক সময় মনে হয় তোমার মতো আমার কোন সোদর ভাই থাকলেও তাকে আমি এতটা স্নেহ করতে পারতুম না। আমার এখানে কে আছে বল। একা-একা মুখ বুজে থাকা বুড়ো শাশুড়িকে নিয়ে—এই তো। তবু তুমি আস গল্পে-গুজবে হাসি-ঠাট্টায় আনন্দর মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায়—টেরও পাই না। কিন্তু আমার ভাল লাগে সেটা বড় কথা নয় ঠাকুরপো, তোমার আর তোমার বৌয়ের সারা জীবনটা পড়ে রয়েছে, সেই কথাটা একবার ভাবো!'

'আমি-আমি তো এখন আর ওকে অযত্ন করি না!'

'তাও আমি জানি।' একটু হেসে বলে রাণী, 'তুমি কি আমার চোখ এড়াতে পার! আমি বলছি—তোমাদের মধ্যে আমি যতদিন থাকব তোমরা সুখী

হ'তে পারবে না। তাই বলছি কিছু দিনের জন্যে অন্তত তুমি সরে যাও!'

আবারও কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেম। কিছু যেন তার মাথাতে ঢুকছে না। কতকটা বজ্রাহত তাল গাছের মতো অবস্থা তার—দাঁড়িয়ে আছে খাড়া হয়ে বটে কিন্তু কোথাও যেন কোন প্রাণলক্ষণ নেই। ভেতরকার সবটা ঝলসে গেছে।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে আবার বুঝি তার জিভে সাড় ফিরে এল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও চেপে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

কিন্তু তার সেই রক্তহীন বিবর্ণ মুখ আর দীপ্তিহীন চোখের দিকে চেয়ে রাণীই এবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার আঘাতটা যে ঠিক এমনভাবে বাজবে তা বোধ হয় আগে অতটা ভাবে নি। নিজের এই নিষ্করুণ হিত-বাক্যের প্রতিক্রিয়া নিজের মধ্যেই হ'তে শুরু করেছে।

সে আবারও হেমের হাত দুটো ধরে ফেলে বললে, 'আমার ওপর রাগ করলে ঠাকুরপো?'

'না। রাগ করব কেন, তুমি তো আমার ভালর জন্যই বলেছ।'

'না না, মাইরি ঠাকুরপো ও সব ভদ্রতা কথা রাখো। ঠিক ক'রে বল তো! ...তুমি বরং একটু বসে যাও, মা আসুন। নইলে আমার মনে হবে রাগ করে চলে গেলে।...কী বলতে কী বলে ফেললুম, না বললেই হ'ত।...এখন আমার দুর্ভাবনায় সারা রাত ঘুম হবে না।... একটু বসো। বরং কাগজ জেবলে একটু চা করে দিই খেয়ে যাও!'

তার এই ছেলেমানুষী আকুলতায় হেসে ফেলল হেম। ম্লান হাসি, তবু তাতেই ক্ষমার চেহারা দেখল। যে যথার্থ ভালবাসে সে কোন অপরাধই ক্ষমা না ক'রে পারে না।

হেম ততক্ষণে কণ্ঠস্বরকেও অনেকটা আয়ত্তে এনেছে। হাসি-মুখেই বলল, 'ভয় নেই। রাগটাগ কিছুই না। আজ আসি—তুমি দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়োগে। পরশু তো আসছি, সেই দিন এসে চা খেয়ে যাবো বরং—'

সে আর দাঁড়াল না। রাস্তাতে পড়েও প্রায়-বিকল পা-দুটোকে যথা-সম্ভব টেনে টেনে দ্রুতই চলবার চেষ্টা করল।

এর অনেকক্ষণ পরে ট্রেন থেকে নেমে যখন বাড়ির পথ ধরল তখন কিন্তু মনে হ'ল পা-দুটো বেশ স্বাভাবিকভাবেই চলছে। কিছুপূর্বের সে দুর্বলতা আর নেই।

অন্ধকার বিজন পথ। বাজারের কাছে না গেলে, পোলটা না পেরোনো পর্যন্ত কোথাও আলো পাবে না। চারিদিকের ঝুঁকে পড়া বহু বিচিত্র গাছের ছায়ায় নক্ষত্রের আলোও এসে পৌঁছবার উপায় নেই। নভেলের ভাষায় একেই বুঝি বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিন্তু, হেমের মনে হ'ল, নভেল যারা পড়ে সেই শহরের মানুষরা কখনই এ অন্ধকার কল্পনা করতে পারবে না।

আলো অবশ্য আছে, জোনাকীর আলো। কিন্তু তাতে পথ দেখা যায় না—বরং আরও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। তবে হেমের বিশেষ আর অসুবিধা হয় না। অনেকেই, যাদের ফিরতে রাত হয় তারা স্টেশানের কাছে দোকানে লণ্ঠন রাখার ব্যবস্থা করে, ফেরার পথে আলো জেবলে নেয়। হেমের অত ঝঞ্ঝাট ধাতে সয় না। নিত্য গিয়ে গিয়ে অভ্যাসও হয়ে গেছে তার, অন্ধকারেই বেশ চলতে পারে।

আজ বরং কলকাতা থেকে এসে এই অন্ধকারটাই বেশ ভাল লাগল তার। হঠাৎ কেমন মনে হ'ল ঐ কোলাহল আর উজ্জ্বল আলোর মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখানে এসে আবার তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে কখন ডান দিকে বেশী বেঁকে গিয়ে পড়েছিল—টের পায় নি। একটা বাঁশের ডগা মাথায় লাগতে খেয়াল হ'ল তার। ভাগ্যিস চোখে লাগে নি। হেঁট হয়ে সেটা বাঁচিয়ে আবার রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ল। নিত্য মানুষের চলাচলে এই মাঝখানটাই পরিষ্কার থাকে, একটা মানুষের সমান উচ্চতার মধ্যে কোন ডালপালা এসে পড়তে পারে না।

সোজা ফাঁকা পথে পড়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে চলতে এতক্ষণ পরে ভরসা ক'রে সে রাণীবৌদির কথাটা মনে করল। ওখান থেকে বেরিয়ে অবধি প্রাণপণে ও প্রসঙ্গটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল। জোর ক'রে ভাবছিল বা ভাববার চেষ্টা করছিল অন্য কথা।

অফিসের কথা, ছোটসাহেব বদলী হয়ে যাচ্ছে, চাঁদা দিতে হবে ফেয়ারওয়েলের। বাজার : পোস্তা থেকে অনেক দিন ডালের ক্ষুদ আনা হয় নি। একটা গরু পুষলে কী হয়? এ ছাড়া তরু, হারান, ঐন্দ্রিলা, খোকা, ছোট মাসী—সকলের কথা মনে আনবার চেষ্টা করেছে রাণী ছাড়া। তার কথাটা মনে আনতে সাহস করেনি—যদি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে? যদি না স্বাভাবিকভাবে পথ চলতে পারে?

কিন্তু এখন ভেবে দেখল সে। রাণী-বৌদি, তার প্রস্তাব—তার মৃদু তিরস্কার, সবই। একে একে সন্ধ্যার সব কথা ও ঘটনাগুলো ভেবে নিল। না, সত্যিই তার ওপর রাগ করেনি ও। এমন কি ক্ষুণ্ণও তেমন হয়নি। আশ্চর্য। নিজের পরিবর্তনে নিজেই যেন খানিকটা অবাক হয়ে গেল। এ কী কনকেরই প্রভাব? ঠিকই বলেছে বড় বৌদি। নিজে থেকে হয়ত এ মোহ সম্পূর্ণে দূর করতে পারত না কোন দিনই—ভালই হ'ল ওদিক থেকে কথাটা উঠল। সত্যিই তো কী লাভ হচ্ছে দিনের পর দিন এই কাঙালপনা ক'রে, এই ভিক্ষাপাত্র ধরে থেকে। কী পাচ্ছে সে?

মনে পড়ল আর একটা দিনের কথা। নলিনীর বাড়ি থেকে যেদিন বিতাড়িত হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল সেই দিন, সেই মুহূর্তটার কথা। ওঃ কী কষ্টই হয়েছিল সেদিন। মনে হয়েছিল বুঝি আর বাঁচবেই না সে। আত্মহত্যাই করত হয়ত, নলিনীকে দেখার আশাতেই বুঝি মরতে পারে নি। তরুণ বয়সের প্রথম প্রেমের ব্যাকুলতা মনে করলে আজ হাসি পায় বটে—কিন্তু নলিনী তাকে অনেক দিয়েছিল। তার মতো সে ভালই বেসে-ছিল ওকে।

তবু সেও দৈন্য আর কাঙালপনা ছাড়া আর কিছু নয়। এও তাই। না চিরদিন ধনীর প্রাসাদের বাইরে ভিখারী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু লাভ নেই। ওখানের উজ্জ্বল আলোকমালা ওখানেই থাক, সেদিকে চেয়ে শুধু চোখ ধাঁধিয়ে লাভ নেই। সে আলো ওর কি কাজে আসবে? তার পর্ণকুটিরের মাটির প্রদীপই ভালো। সে স্নিগ্ধ আলো কাজে সহায়তা করবে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করবে না।......

পোল পেরিয়ে বাজারে এসে পড়ল সে। হারাধন নন্দী বসে এখনও হিসেব করছে। ভোঁদার দোকানে ভিয়েন চলছে এখনও।

হঠাৎ মনে হ'ল বিস্মৃত অতীত কোন জীবন থেকে বর্তমানে এসে পড়ল সে। তার আসল জীবন, বাস্তব জীবন।

না, কালই সে বদলীর চেষ্টা করবে অফিসে গিয়ে।

(ক্রমশঃ)
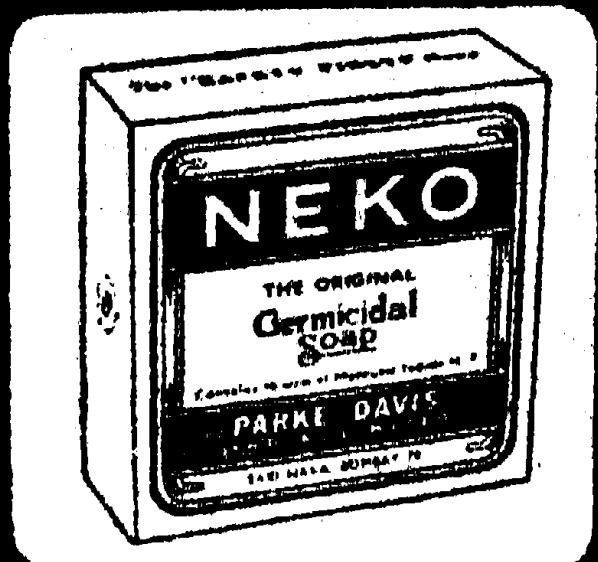
সংবাদ বিচিত্রা

।। বিশ্বের বৃহত্তম পুস্তকের দোকান ।।

'অনেক মজা আছে এই কাজের মধ্যে। নতুন বই প্রকাশিত হওয়া মাত্র আমি তা পড়বার সুযোগ পাই।'—বিশ্বের বৃহত্তম পুস্তক প্রতিষ্ঠানের ডাইরেকটর ক্রিস্টিনা ফইল্, নিজের কাজ সম্বন্ধে এ মন্তব্য করেন।

দোকানটি হল 'ফইল্‌স' (পুরো নাম হল ডবলিউ. অ্যান্ড, জি, ফইল লিঃ), বিশ্বের বৃহত্তম পুস্তকের দোকান। এখানে ৩২টি বিভাগে এবং ৩০ মাইল লম্বা বই-এর শেলফগুলিতে আছে ৪,০০০,০০০-রও বেশি খণ্ড নতুন ও পুরণ বই, এমন বিষয় খুব কমই আছে যার ওপর মুদ্রিত বই এখানে নেই। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ক্রিষ্টিনা ফইল, বয়স ৫০, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতার কন্যা এবং তিনি নিজে বিশ্বের প্রভাবশালী পুস্তক ব্যবসায়ীদের অন্যতম।

ফইল্‌সে-এর কাজ শুরু হয় ক্রিস্টিনার জন্মের ১০ বৎসর পূর্বে ইষ্ট-লণ্ডনের একজন মুদির রান্নাঘরে। মুদির দুই পুত্র পুরনো বই সংগ্রহ করে এই ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা ক্রমেই লাভজনক হতে থাকে, এবং মুদির দুই ছেলে উইলিয়াম (১৯) ও গিলবার্ট (১৭) তখন একটা ছোট দোকানঘর ভাড়া করে এই কাজের উন্নতিতে মন দেয়। আজ ফইল্‌স বছরে বিক্রয় করছে প্রায় ৫,০০০,০০০ বই এবং প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০ ব্যক্তিগত দোকানীকে বই সরবরাহ করছে। তার ভবনগুলিতে আছে ইওরোপের বৃহত্তম লেকচার ব্যুরোর হেড কোয়ার্টার্স, লেণ্ডিং লাইব্রেরীর বিপুল ব্যবস্থা, ১০টি স্বতন্ত্র বুক ক্লাব, একটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, একটি শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা যে পরিকল্পনাধীনে কমনওয়েলথের সর্বত্র স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তক প্রেরিত হচ্ছে—এবং মাসিক ফইল্‌স সাহিত্যিক ভোজসভা।

ক্রিষ্টিনার অনেকদিনের বাসনা হল এই ধরণের সাহিত্যিক ভোজ-সভা অনুষ্ঠান করা। যখন তাঁর বয়স ১৯ মাত্র তখন তাঁর প্রথম ভোজসভায় লর্ড চীফ জাস্টিসকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁর এই আমন্ত্রণ চীফ জাস্টিস রক্ষা করেন। এর পর থেকে তাঁর এই ধরণের সভাগুলিতে বহু-মানীগুণীর সমাবেশ হয়ে আসছে—জেনারেল দ্য গল, ইথিওপিয়ার সম্রাট এবং জর্জ বার্নাড শ' কেউই বাদ যাননি। প্রতি মাসে শত শত লোক টিকিট সংগ্রহ করে নির্বাচিত বক্তাদের সঙ্গে একত্রে ভোজের আনন্দ লাভের জন্য—একবার এক ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয় আয়ুসম্পর্কিত একটি পুস্তক প্রবর্তন সম্পর্কে; নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ৯০ বৎসর বা তার কাছাকাছি বয়সের, একজন ছিলেন শতায়ু।

ক্রিস্টিনার বয়স যখন ২৩ তখন তিনি একাই পাড়ি দেন রাশিয়ায় ফইল্‌স-এর পক্ষ হয়ে সোভিয়েট পুস্তক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য। তার কিছু পরে তিনি এবং তাঁর পিতা একত্রে প্রতিষ্ঠা করেন ফইল্‌স বুক ক্লাব। এখন এই ধরণের ক্লাবের সংখ্যা হয় ১০টি। এতে বিজ্ঞান, শিশু সাহিত্য জনপ্রিয় উপন্যাস ইত্যাদি সকল রকমের বই আছে। ক্লাবের সদস্য যাঁরা তাঁরা প্রতি মাসে নির্বাচিত একটি বই বিশেষভাবে বাঁধাই-করা সংস্করণ তিনভাগের একভাগ মূল্যে ক্রয় করিতে পারে।

ক্রিস্টিনা ফইলের আর একটি দায়িত্ব হল লেকচার ব্যুরো, এই লেকচার ব্যুরোর তিনি একজন ডাইরেক্টর। এটি এখন ইওরোপের বৃহত্তম সংস্থা, বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে বক্তৃতাদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন এবং এই বক্তৃতা হয় বহুবিষয়ে।। এছাড়া আছে একটি লেন্‌ডিং লাইব্রেরী সার্ভিস, এটির প্রসারে তিনি সাহায্য করে থাকেন এবং আজ তার হাজার হাজার শখা রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে।

ক্রিস্টিনার পিতা এবং খুল্লতাত গিলবার্ট প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা স্পষ্টই স্বীকার করে থাকলে যে প্রতি-ষ্ঠানটির উন্নতির জন্য তাঁদের চেষ্টা যতই থাকুক না কেন তাঁদের কন্যার চেষ্টা সেই তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। ক্রিস্টিনার স্বামী, তাঁর ভ্রাতা এবং খুড়তুতো ভাইএরা সবাই এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু যিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সকলের মধ্যে প্রেরণা জোগাচ্ছেন তিনি হলেন প্রতিষ্ঠানটির ডাইরেক্টর ক্রিস্টিনা স্বয়ং।
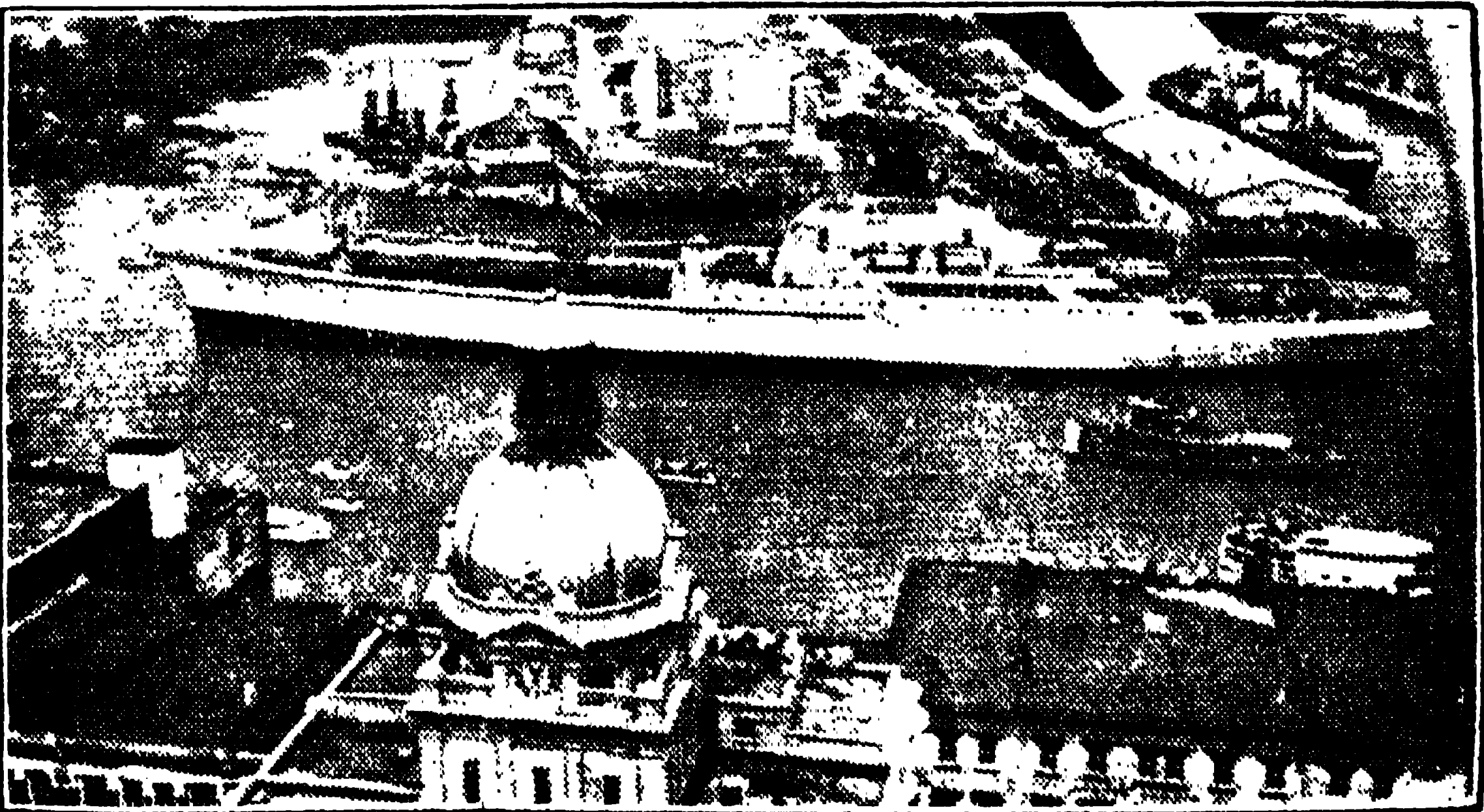
পৃথিবীর সর্বপ্রথম পরমাণু-শক্তিচালিত বাণিজ্য জাহাজ 'সাভান্না'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মালিক। জাহাজখানি সাভান্না নদীতে সাভান্না সিটিহলের (পুরোভাগে) সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে।

সাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কেশ পাকিলে কাজ কেনে?

অথচ বিজ্ঞানীদের মতে ভেতরে ভেতরে কেঁদেই আমরা চুল পাকাই, লোকদেখানো কাঁদি চুল পাকাবার পরে। আজকের দিনে যৌবনবিদায়ক্ষণ আসবার অনেক আগেই আমাদের চুল পাকে এবং এটা আশ্চর্য হলেও সত্য, দু একদিন পরে আমাদের নবজাতকদের মাথায় দু একটা পাকা চুল চোখে পড়লেও তা অসম্ভব কিছু হবে না।

আগেকার দিনের মানুষের সংগে আজকের দিনের মানুষের পার্থক্য এই একটাই, যে আমরা আজ চুল পদার্থটা নিয়ে যৎপরোনাস্তি বিব্রত। চুল পাকা, চুল ওঠা ইত্যাদি নানা ব্যাধির প্রতিকার হিসাবে আজকের দিনের স্টেশনারী দোকানে হেয়ারডাই আর হেয়ার-অয়েলের ছড়াছড়িও এই সমস্যা থেকে আমাদের রেহাই দিতে পারছে না। অথচ বাঁদর থেকে মানুষ হবার রাস্তায় আমরা এই অপ্রয়োজনীয় বস্তুটি ক্রমশঃ পরিহার করতে করতে আসছি এবং সভ্যতার শেষ ধাপে এসেও আমরা চুল গেল চুল গেল বলে মড়াকান্না জুড়েছি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ঘন ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-দামের সুযোগ আমরা আর কোনদিন পাব না।

কেন পাব না, তার একমাত্র কারণ পৃথিবীটা ইদানীং যে রকম ভয়ের জায়গা হয়ে উঠেছে, তাতে চুল কালো রাখার কোন ভরসা রাখা যায় না। ডাক্তারী মতে এই চুল পাকা ব্যাপারটার কারণ যতটা না পুষ্টিহীনতা, তার চেয়েও বড় কারণ আজকের দিনে আমরা একটা সর্বক্ষণের মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। হিরোসিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, ক্রিস্টমাস দ্বীপে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার সংবাদটাই যে কোন সুস্থ মানুষের মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এবং একটি ভদ্রলোক এই ধরণের সংবাদে বেশী ভাবনায় ভাবিত হন, তাহলে তাঁর মাথার চুল তেমন তেমন হলে রাতারাতি পাকিয়ে তুলতে পারেন।

আপনার আমার জীবনে খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে এ ধরণের ঘটনা এখনও ঘটেনি, তবে রাতারাতি চুল পাকার অজস্র ঘটনা পৃথিবীর মেডিক্যাল জার্ণালে ছড়িয়ে আছে। কোন কয়েদীর রাতারাতি চুল পেকে যাওয়ার পরিচিত গল্পটি ছাড়াও সত্যিকারের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি।

দুর্দান্ত এক শিকারী ততোধিক দুর্দান্ত এক সিংহ মহারাজের সামনা-সামনি পড়েছিলেন। হাতে তাঁর ছিল বন্দুক, কিন্তু সাক্ষাৎ-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে শিকারীর হাত ওঠেনি। সিংহ কি ভেবে ফিরে গিয়েছিল বনে, কিন্তু শিকারীর কয়েক মিনিটের মধ্যে চুল-গুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল।

আরও একটি ঘটনা। এক ভদ্রমহিলা বাচ্চা দুটোকে বাড়ীতে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলেন থিয়েটার দেখতে। বাড়ী ফিরে যখন তিনি দেখলেন আগুনে তার বাড়ী পুড়ছে আর তার মধ্যে তাঁর দুটো বাচ্চা যন্ত্রণায় পুড়ে মরেছে, তখন রাতা-রাতি তিনি বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন মনে এবং মাথায় দুটোতেই।

কলকাতায় আমরা জাপানী বোমার সামান্য আক্রমণেই দিশাহারা হয়ে পড়ে-ছিলাম, কিন্তু ইংলন্ডের সামান্য একটি ভদ্রলোক মিঃ মনট্রোজ এাদি একই রাত্রে চার চারবার তাঁর বাড়ীর ওপর বোমা-বর্ষণে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেন, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বা মিঃ জন উইলিয়াম হ্যারেন বলে যে ভদ্রলোক একই রাত্রে তাঁর এক পুত্রের সৎকার করে ফিরে শুনলেন যে তাঁর আর একটি ছেলে বাস চাপা পড়েছে, তাঁর মত অবস্থা হলে আমরাও রাতারাতি বৃদ্ধ হয়ে পড়তাম।

এ ত গেল সত্যিকারের দুর্ঘটনা, কিন্তু ঘটনা ঘটার সম্ভাবনায় মিথ্যে ভয় আর আতঙ্কের একই পরিণতি হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেন আমাদের ভয় আগে কাবু করে আমাদের মস্তিষ্ককে. আর সেই পরাজিত সন্ত্রস্ত মস্তিষ্ক ডেকে আনে চুলের মৃত্যু। এমন অনেক ক্ষেত্রে এটাও দেখা গিয়েছে মস্তিষ্কের একাংশের আঘাতের ফলে চুলটারও শ্রেণী বিভাগ হয়েছে শাদা কালোয়।

অর্থাৎ চুল পাকবার একমাত্র কারণ আজকের দিনের মানুষের ভয়, জীবন-যাত্রার অনিশ্চয়তা, মানসিক অস্থিরতা।

চুল জিনিষটা মানুষের ত্বকের সম-গোত্রীয়, খালি আকৃতিতে যা তফাৎ। আর এই চুলের রং নির্ভর করে চুলের কোষে মেলানিন বলে একটি রং-কণিকার অবস্থানে। মেলানিন যখন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন চুলের কালো রং যায় মিলিয়ে। অর্থাৎ ডাক্তারী ভাষায় পাকা চুল মানেই রং শূন্য চুল। মেলানিনের তারতম্যেই চুলের রংবাহার, যেমন ল্যাক্স টয়লেট সাবানের রংবাহার। এমন কি এও দেখা গিয়েছে, কোন মেয়ে যখন প্রেমের আনন্দে মসগুল, তখন তার চুলের রংয়ের যে ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়, তা পরবর্তী মনোভংগের সময়ে মুছেড়ে আসে মাত্রা রেখেই। অর্থাৎ মানসিক আবেগের সংগেই চুলের রংয়ের খেলা চলে।

তবে মেলানিন যদি একবার গা ঢাকা দেয়, তবে পাকা চুল একমাত্র কলপ দেওয়া ছাড়া কালো করার কোন উপায় নেই।

আগেই কিন্তু বলেছি প্রকৃতিদেবীর হালচাল দেখে অনেকেই সন্দেহ করছেন যে আগামী দিনের শিশুর মাথায় পাকা চুল নিয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা ত আছেই (কারণ পৃথিবী যে নিরানন্দ থেকে আনন্দময় হয়ে উঠবে এ সম্ভাবনা একে-বারেই কম, এক ধ্বংস হওয়া ছাড়া) এমন কি ভবিষ্যতের নবজাতকেরা যদি ক্রুশ্চেভের মত সুগৌর টাক নিয়ে জন্মায় তাও আশ্চর্যের কিছু হবে না। কবিরা কেশসৌন্দর্য নিয়ে পদ্য ফাঁদবার সুযোগ থেকে হয়ত বঞ্চিত হবেন, সুকেশিনীরা হয়ত দিনরাত্রি আয়নার সামনে চুল খুলে নিজের চুল দেখে নিজেই মুগ্ধ হতে পারবেন না কিন্তু আমরা যারা বৃদ্ধ না হয়েও অসময়ে চুল পেকে যাওয়ার মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি বা বেসমস্ত তরুণীরা স্টেশনারী দোকানের গুছি দিয়েও নিজের স্বল্প চুলের লজ্জাকে ঢাকা দিতে পারছেন না, সেই আমরা কিন্তু খুব বেশী হব।

মানুষের চাঁদে যাওয়ার মত, এই অপদার্থ চুলহীন (চালচুলোহীন হওয়া আজকের দিনে আর গালাগাল নয় বেকার সমস্যার কল্যাণে!) অবস্থায় উপনীত হওয়াটা, মানুষের সভ্যতার একটা সুস্পষ্ট অগ্রগতি হিসাবেই স্বীকার্য হবে।

আপনাদের এ বিষয়ে কোন দ্বিমত আছে কিনা জানতে পেলে সুখী হব।

এখনো বাকি

জীবনানন্দ

অনাদির মৃত্যু, তারপর এই এক জীবন।

কালীবাবুর বাজার হাওড়া থেকে সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে তারপর হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া স্টেশন। ওখান থেকে আর হাঁটা চলে না, এক পিঠের বাসভাড়া লাগে। বাঘমারি মাণিকতলায় সাবান কারখানায় কাজ। চমৎকার লাগছে অসীমার।

অসীমা বলল, 'তুমিই কি মধু?'

'হ্যাঁ না।' ছেলেটা লম্বা হাঁটা দিল।

অসীমা ফিরে ফিরে দেখতে লাগল, এখনো ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়নি। খুরুট রোডের বাজারবেলার চেহারাটা অসীমার চোখে খুব নতুন নতুন মনে হলো। ভিড়ের ভাঁজে ভাঁজে গুটিয়ে শুটিয়ে চলে যাচ্ছে সেই ছেলেটি যাকে অসীমা বলে বসল, 'তুমিই কি মধু?'

বেশ দেরি হয়ে যাবে। ফ্যাক্টারির গেট-বাবু শাসানোর চোখ নিয়ে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াবে। লেটটা মকুব করে দেবার হাত যেন তারই। অসীমা ভুলেও তাকাবে না ওদিকে, সটান নিজের খাঁচায় যেয়ে পোষমানা পাখির মতো দাঁড়ে বসবে। আট ঘণ্টা একটানা কাজ করার পর অসীমার দেহের ক্লান্তিটা মনের নরম গায়ে শজারুর কাঁটা চালাবে। ঝোলা থেকে ছেঁড়া গামছাখানা বার করে মুখটা ঘষে ঘষে ময়লা তুলে পরিষ্কার হতে চাইবে। তারপর অনেকটা পরে একটু বা জিরিয়ে গেটের দিকে হেঁটে আসবে, গেটবাবু আড়চোখে দেখে ভাবালিপ্ত মুখ করে অসীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে। অসীমাও না হেসে পারবে না, তাতেই গেটবাবু উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।

অসীমা ভাবে তার মুখে কি এখনো কোন এক নির্দিষ্ট চিহ্ন ফুটে আছে, যার আকর্ষণ তীব্র অথচ মধুর নয়! চওড়া সিঁথির গায়ে এক আধটা পাকা চুল উঁকি মেরেছে। চোখের কোল দুটো অনেকটা পরিষ্কার, চোয়ালের হাড় দুটো খুব সজীব। ঘাড়েপিঠে একহারা শান্ত-শীতল ছায়াছায়া ভাব। তথাপি আর কি আছে সেখানে? ছোট আয়নাখানা মুখের সামনে ধরে ধরে প্রায় রোজই একবার করে ভাবে অসীমা। না, কিছুই সে খুঁজে পায় না, কোথাও তেমন আঁচড়ের দাগ নেই।

খুব কষ্ট হলো অসীমার, মধু ফিরেও তাকাল না। সাধারণভাবে কোন কচি কাঁচা ছেলেকে আদরের ছোঁয়া দিলে এগিয়ে আসে, হাসি মুখটি তুলে ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নুইয়ে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ছেলে তা নয়, যেন সৃষ্টিছাড়া। তাই দুঃখ পেল অসীমা। কাজে বেরিয়ে এতদূর এগিয়ে এসেও যেতে আর মন চাইল না।

অসীমা বাসায় ফিরবে, তাই মোড় কাটিয়ে সটান বাঁ পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকতে যায়। আবার পিছু হটে দেখতে চেষ্টা করে মধুকে আর দেখা যায় কিনা। দেখা আর যায় না, সে তখন কোথায় হারিয়ে গেছে, খুঁজে বার করার সাধ্য নেই অসীমার।

অসীমা আজ সারাদিন ধরে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকবে। এক একবার মধুর বাঁ গালের জন্ম দাগটাকে নিবিষ্ট মনে দেখতে চাইবে। ঐ দাগটাই যেন মুখখানাকে মনোরম করে তুলেছে। অনাদি একদিন দেখিয়ে চিনিয়ে দিয়েছিল অসীমাকে। দূরে থেকে, বেশ দূরে। যেন মধুকে চিনে রাখার যন্ত্র হিসাবে অসীমার চোখ দুটো পর্যাপ্ত নয়, মনটাই একটা ক্ষুদে অবয়বকে ঘিরে পাশের লোকটির সঙ্গেও নতুন করে পরিচয় করে নিয়েছে। নগেনের সঙ্গে

মধু শহর দেখতে আসে। বাবার সঙ্গে ছেলের পাশাপাশি হাঁটা, অসীমার চোখের পলক পড়তে পারে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখেছে অসীমা। নগেন বেশ একটু ভারিক্কি হয়ে গেছে। গায়ে ফতুয়া, মাথায় গামছা। দেখতে মন্দ লাগেনি অসীমার। অনাদির শুকনো চেহারার ছাউনি শুধু কতকগুলো ঘন আর লম্বাটে চুল। মুখটা ছুঁচোর মত কদর্য আর হিংস্র। নগেনের সঙ্গে অনাদির তারতম্য পরীক্ষা করেছে অসীমা, আর দেখেছে মধুকে। গটগটে করে বাবার গায়ে গায়ে হাঁটছে, মুখে হাসি আর বিস্ময়, কথার তুবড়ি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো ছড়ানো। মধুর মা কি চিরদিনও দিতে পারে না। মধুর মায়ের ওপর রাগ হয়েছে অসীমার। কিছু থাক না থাক, নামে সতীন তো—আক্রোশ কেনই বা না হবে!

নগেন কি অসীমাকে আর চিনতে পারবে? যদি কোনদিন সামনা-সামনি দেখা বা দূর থেকে চোখাচোখি হয়ে যায়, তখন? ঐ জন্যেই তো অসীমা বেশ একটু ঘোমটা দিয়েই হাঁটে রাস্তায়।

অনাদি তো সব খবরই রাখতো। গল্প করতো হেসে হেসে, রাগে অসীমার গা জ্বলে যেতো। লজ্জা ছিল না অনাদির।

'কি যে বলিস অনাদি! যাই হই না কেন, সে তো তোর দাদার সমান রে।' অসীমা রাগ জানিয়েছে।

সে রাগ অসীমার টেকেনি। অনাদি গোড়াতেই কোপ মারতে ওস্তাদ। অনাদি বলেছে, 'চাষাটাকে পছন্দ হলো না, তুই-ই তো বলেছিলিস অসীমা। আজ আবার এত সোহাগ, এত বুকে ছাপানো ভাবনা। ঐ জন্যেই বলে মেয়েমানুষ সব পারে।'

সেদিন সারারাত্রে অনাদিকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি অসীমা। বাইরে এক বিঘৎ রকের ওপর পড়ে পড়ে মশা তাড়িয়েছে অনাদি। তখনই অনাদির বুকের পাঁজরার ফাঁকে ফাঁকে পোকার কিলবিল শুরু হয়ে গেছে।

অসীমা ছিটিয়ে ছিটিয়ে থুথু ফেলল কয়েকবার। অনাদি বয়সের দিক থেকে বোধ হয় সমান সমানই ছিল। ইস্কুলের খানিকটা পড়া শেষ করে বাড়ীতে বসে একটু গানবাজনার রেওয়াজ করতো। তারপর যা হবার তাই হয়ে গেল।

চাষার ঘরের খাটুনির ওপর অসীমার সেই বয়সে একটা নাকসিটকানো বাতিক ছিল। শহুরে ভাবওয়ালা স্বামী নয় তার—মনটা চিড় খেয়ে দু ফাঁক হয়ে তো ছিলই। সেই সুযোগটাই যেন অনাদি বেশি করে নিয়েছিল।

নগেনকে আরো কয়েকবার দেখেছে অসীমা। কোনদিকেই চেয়েচলার মানুষ নয়—চিরকালের অভ্যাস। এখনো কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মুখখানা দেখে মনে হয়েছে সুখী, খুব সুখী। কেনই বা না হবে? ছেলে মেয়ে, এমন কি শোনা যায় সুন্দরী বউও পেয়েছে। খুব ভালবাসে বউকে। বউও নাকি নগেনের জন্যে মরে-বাঁচে। তা তো হবেই, সবাই তো আর অসীমার মত নয়। নগেন কি কোনদিন অসীমার কথা ভেবেছে? তিন তিনটে বছর ঘর করার পরও কোন মানুষকে চিনতে বাকি থাকে! নগেন একটি দিনের জন্যেও সন্দেহ করল না অসীমাকে। কত লোক কত কথা বলেছে, তবুও না। সারাদিন হাড়পেষা খাটুনি খেটে এসে যে লোক নিজের বউ-এর মুখ দেখতেই ভুলে যেত, সে লোক আবার পরের কথায় নাচানাচি করবে! শুধু একদিন বলেছিল—'শুনিয়ে দিলুম, যেমন গায়ে পড়ে বলতে এসেছিল।' অমনি অসীমার ভয় ধরে গিয়েছিল, নগেনের সহজ সরল অথচ দৃঢ়সংযত মুখখানাকে একান্ত নিজের বলে মানতে যেয়েও মানতে পারেনি। তখন অনাদি ছাড়া অসীমার কেউ নেই।

নগেন যে চিরদিনই দাম্ভিক—কারো কাছে নিজেকে খাটো করবে না। একটা চাষির এত মনের জোর হয় কি করে? অসীমা যাই হোক চিঠিপত্তর লিখতে পারে, বাংলা পড়াশোনা তেমন আটকায় না, কিন্তু নগেন তো আকাট মুখ্যু। সেই মুখ্যু লোকটার সঙ্গে দু' একবার অসীমা ঝগড়া করেছে। অসীমা গরু-বাছুর খড় ধান কড়াই নিয়ে আর পারে না, নগেন একটা ব্যবস্থা করুক। অসীমাকে এতখানি নাকাল করবার অধিকার পায় কোথায়।

নগেন হাতপা নেড়ে মারতে আসেনি, কেবল হেসেছে। অসীমা এতই বোকা নয় যে একটা আকাট মুখ্যুকে চিরকাল মাথায় তুলে নিজেকে ফুরিয়ে বসবে। রাগে কতবার বাসন আছড়ে ভেঙেছে অসীমা, নগেন কিছুই বলেনি—ছেলেমানুষে কত কাজ আর একহাতে করবে, হাত ফসকে দু-একখানা পড়তেই পারে।

সেই নগেন সম্বন্ধে তার চেহারার সরূপ নিয়ে মধুকে যেভাবে দেখল অসীমা মনে হলো মধু তো তারও হতে পারে!

অসীমা ঘরের দরজা বন্ধ করে সটান শুয়ে পড়ল। হাত-পাখাটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে নিজের গায়ে বাতাস দিতে লাগল। সাবান কারখানার সেই গেটবাবু আজ আর অসীমাকে দেখতে গেল না। অসীমা হেসে উঠল। এই হাসির তাৎপর্য নিয়ে অনাদিকে ডাকল। অনাদি আমৃত্যু অসীমাকে জড়িয়ে ছিল, এখনো আছে, তাই মধুকে সে বলতে পারল না, ডাকতে পারল না, নিজের বলে জোর করে আঁকড়াতে পারল না।

পাশের গলিতেই তো উঠেছিল দুজনে। তখন অসীমার গয়নাগাটি নগেনের জমানো টাকার বাণ্ডিল আর অনাদির শুধু এক সেট বোতাম শেষ হয়ে গেছে।

অনাদি হাল ছাড়ল, কিন্তু নৌকো

ছাড়তে পারল না। অসীমার আর এক নতুন জীবন।

অসীমা ধড়মড়িয়ে উঠে থুথু ফেলল। আয়না দিয়ে বার বার মুখ দেখতে লাগল। চুলের বাড় এখনো কমেনি। চুলের জন্যেই নাকি অসীমাকে পছন্দ করে নগেনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই চুলটা কিন্তু এখনো রয়ে গেল, উঠি উঠি করেও উঠতে পারে নি। অসীমা হাসিহাসি মুখ করে নিজেকে যেন ভালবেসে ফেলতে চাইল।

আজ নিশ্চয় নগেন বাজারে ফসল আমদানি করেনি। শরীর কি খারাপ? না, খারাপ হবে কেন. নগেনের শরীর খারাপ হতেই জানে না। মধু বোধ হয় কারো সঙ্গে বাজারে এসেছে। এমন বাবা, ছেলেকে এখন থেকেই নষ্ট করে ফেলছে। ইস্কুল কামাই করিয়ে শহরের বাজারে হাল দেখতে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যু তো ওকেই বলে, মুখ্যু না হলে নিজের বউ একটা অকেজো লোকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ঐ ছেলেটাকেও নগেন নষ্ট করবে। আয়নার ওপর অসীমার উৎকণ্ঠিত মুখখানা ভেসে বেড়াল। মধু এখন বাজারের তেলেভাজা দিয়ে নিশ্চয় মুড়ি চিবুচ্ছে। পাড়ার খুড়ো জ্যাঠাদের সঙ্গে বাজারদরের হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছে। হিসাব করতে মধুও শিখেছে, ক্লাশ ফাইভে পড়ে—অসীমাকেও লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে পারে। মুখ্যু বাবার পণ্ডিত ছেলে। অসীমা এমন হাসি হাসল যে পাশের ঘরের মণিমাসি বলে উঠল, 'ফিরলি এরই মধ্যে যে?'

'ভাল লাগল না।'

'রোজই কি আর ভাল লাগে মা? বেশ করেছিস খুব করেছিস, কিন্তু একলা মানুষের আবার হাসি কিসের!'

অসীমা বলল, 'বাইরে তো হাসতে পাই না, তাই। তোমার রান্নাবান্না শেষ হলো মাসি?'

'হলো আর কি করে মা। মাছটা তো ফেলে দিয়ে গেল, বাছাই হয় নি।'

'বাবো, বেছে দোব? দরজা খুলে বেরিয়ে এলো অসীমা। মণিমাসির বড় ছেলে বাজার করে দিয়ে আবার কারখানায় গেছে। ছোটছেলের মর্ণিং ইস্কুল। মণিমাসিকে সাহায্য করার লোকটা আর কে। বিধবা মানুষ, দুটি বাচ্চাকে নিয়ে কম ভাড়ার ঘরে বাস করে কেমন একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে বাস করার মানইজ্জত নেই, লোকে মনে করে হাটের ধারে বাস করলে হেটোই হয়ে যায়। তাই এ রাস্তা দিয়ে যে সব মানুষ যাতায়াত করে তাদের ব্যবহার আর দৃষ্টিগুলো হয় তো অসীমা সহ্য করতে পারে, মণিমাসির পারার কথা নয়। তাই মণিমাসি তো তৈরি হয়েই পড়েছে। বড় ছেলেকে খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়ে নিয়ে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কাজের মাথা বেশ, তাই উন্নতিরও আশা অনেক। ছোট ছেলেকে তো ডাক্তার উকিল করার ইচ্ছা। আর বছর দু-বছর কাটলেই ভদ্রপল্লীতে ভাল বাড়ী নিয়ে বাস করবে। করবেই তো, মণিমাসি তো আর অসীমা নয়।

অসীমা বলল, কোথায় মাছ গো মাসি? বাবাঃ তোমার বাছা কাজের গোছ কিছু নেই, একটা শাক রান্না করতেই হাঁইপাই।"

মণিমাসি অসীমার ধমক সহ্য করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বলল, 'এমন মেয়েরও এত দুর্গতি! যাই বলিস মা, তোকে আমি সঙ্গে রাখবোই।'

অসীমার চোখে জল এলো। চোখ মুছে বলল, 'তোমার আমার বয়সের তফাৎ আর কতই মাসি, তুমি কোথায় রইলে আর আমি কোথায়!'

মণিমাসি ঘটির জলে হাত ধুয়ে বড়ির ডিবে বার করল, মাছের ঝালে দুটো হিংএর বড়ি দিলে জমবে ভাল! ছোট ছেলেটি আবার ঝাল পছন্দ করে না, তার জন্যে একটু ঝোল। বড় ছেলে উল্টো মেজাজি, কড়া একটু ঝাল হলেই চেটেপুটে খাওয়া। আর নিজের জন্যে তো বারমাসই লঙ্কাপোড়া।

'কাঁদিস না মা কাঁদিস না, মনই বড়!' মণিমাসি কড়ায় তেল ঢেলে শাকের ঘন্ট সাঁৎলালো। বলল, 'আজ যখন ফিরেই এলি, দুটি খাবি। রোজই তো বাসি পান্তা গিলে চালাচ্ছিস। নজর আমার ঠিক আছে মা, কিন্তু আমিই কি সব পারি?'

অসীমা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। মণিমাসি বলতে লাগল, তুই যখন ফিরে আসিস তোর শুকনো মুখ দেখে কষ্ট হয়, আবার ভাবি সুখ তো একেই বলে। চিন্তা করে কি হবে—এই দ্যাখ না, আমার কি অবস্থা ছিল, কি হয়েছে। কিছু না থাক স্বামী ছিল তো। সেই লোকই যখন নিমিষে উবে গেল তখন বাঁচার আর সাধ কি! কিন্তু মরতে কি আর পারি, ঐ দুটোর মুখের দিকে চেয়ে আবার স্বপ্ন দেখছি।'

অসীমা কিছুই বলতে পারল না, মণিমাসির পাশ থেকে শিল টেনে নিয়ে বাটনা বাটতে শুরু করল।

এমন নগেন কতদিন বাটনা বেটে দিয়েছে অসীমার। লাঙল জোয়াল ছেড়ে ঘরে ফিরে দেখেছে অসীমা রান্নার যোগাড়ই করে নি, বিছানায় আড়মোড়া দিয়ে শুয়ে আছে।

'কি হলো গো তোমার?'

'হবে আবার কি? আমি এক হাতে

কত করবো! তোমার জল আনো রে, গরুর জাবনা কাটো—'

থতমত খেয়ে নগেন বলল, 'তা আমিই না হয় করে দিচ্ছি। এই তেতেপুড়ে এলুম, দুটি ভাত পেটে পড়বে না!'

নগেন হাতপা ধুয়ে একরকম হাসি-মুখেই অসীমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। পুরুষমানুষ, গায়ের জোর তো আর কম নয়, বাটনাই বেটে ফেলল তিন দিনের। মুখ্যু তো, হিসেব বোধ আর কত হবে।

তখন যদি নগেন অসীমাকে জোর করে বেঁধে রাখতে পারতো তা হলে জীবনটা এভাবে শেষ হতো না। মধু তারই হতো, নগেনকে এমন করে চোরের চাউনি নিয়ে দেখার সাধ হতো না। এ সময়ে অসীমা তা হলে কি করতো? কোলের বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে গাই দুইতো। পুকুর থেকে সুজনি শাক তুলে এনে মেয়েটাকে দু-একটা ফরমাশ করতো। নগেন আজকাল নিশ্চয় একটু আয়েসি হয়ে পড়তো। বাড়ী ঢুকে বলতো—আজ আর কড়াই ভাজা নয়, একটু আলুর দম হোক। শুকনো মুড়ি আর চিবুতে পারি না। অসীমা মুড়ির থালার পাশে এক বাটি আলুর দম দেবে, গরম দুধও খানিকটা দিতে যাবে, নগেন না না করবে, অসীমা কিছুতেই ছাড়বে না।

মধু তো তখন ইস্কুলে। ধাড়ি ছেলে বাড়ি ফিরেই যা দৌরাত্ম্য শুরু করবে তেষ্ঠানো দায়। ইস্কুল কামাই করে যে শহরের বাজারে যেয়ে আলু বেগুন কুমড়ো বেচবে, সেটি চলবে না অসীমার কাছে। আগে পড়াশোনা তারপর যা খুশি তাই। কত দিকে চোখ রাখতে হয় অসীমাকে। এমনি 'এমনি আর ঘরের গিন্নি হওয়া যায় না। ঐ জন্যেই তো নগেনের সঙ্গে লেগে যায় যখন তখন, বোহিসেবীর চূড়ান্ত। কাহন কাহন খড় যে আলগা অঢেল হয়ে পড়ে রইল বাগানে, একটা গাদা দেবারও ফুরসৎ নেই নগেনের, অথচ তামাক খেতে বসলে গল্প আর ফুরুবে না। একটু কিছু বলতে গেলেই, যা স্বভাব, কথাটি বন্ধ করে একাই খড়ের বোঝাগুলো ঠিকঠাক করতে যাবে। কিন্তু অসীমা কি খাটতে-খুটতে পারে না? গতরে কি তার পক্ষাঘাত হয়েছে!

নগেনের মুড়ি খাওয়া শেষ হলে অসীমা নগেনকে পুকুর থেকে মাছ ধরতে বলতো। কিপ্টের শেষ নগেন, বড় মাছ-গুলির গায়ে হাতই দেবে না, মেয়ের বিয়ের চিন্তা এখনই মাথায় ঢুকে গেছে। দিন দিন মাছের যা দাম বাড়ছে, চাষাভুষা মানুষদের কাজকর্ম করাই দায়। নগেন কি আর যাতা চাষি, কুড়ি বিঘে জমির মালিক। বছরে ফলুক না ফলুক, খাওয়া পরার চিন্তা তো করতেই হয় না। নগেনের আবার সময় সময় মাথায় খেয়াল চাপে, বাজারটা হয় তো খুবই ভালো গেল, অমনি কিনে ফেলা হলো একখানা জমজমাট শাড়ি। নিজের তো ঐ ছেঁড়া ফতুয়া আর লাল গামছা, এত আদিখ্যেতা কিসের? আগে কি করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবে তার চিন্তা নেই, শুধু শুধু খরচ বাড়ানো। কিন্তু মানুষটা কি বাধ্যের?

ছেলেও তেমন ধনুর্ধর হয়ে উঠছে। ফিটফাট বাবুটি সেজে ইস্কুলে যাবে, খাওয়াটি উনিশ বিশ হলেই বাবার কাছে নালিশ। যত মুস্কিল হয়েছে অসীমার। মেয়েটাও কি কম নাকি? কড়ার কুটোটি নাড়তে চাইবে না। কোলের ছেলেটিও তেমন, পা পা করে পুকুর ঘাটের দিকে যেতে শিখেছে। কোমরে দড়ি না বাঁধলেই নয়, কোন্‌দিন একটা কাণ্ড করে বসবে। এদিকে কানটি বেশ খাড়া, বাবার সাড়াটি পেলেই ঘুমিয়ে থাকলেও হুট-পুট। যেন বাবাই ওদের সব, মা-টা কিছুই নয়।

চোখের জল মুছে ফেলল অসীমা। মণিমাসি টের পেল না। বাটনা বাটা শেষ করে মণিমাসির ইঙ্গিত মতো কয়েকটা আলু ছাড়াতে বসল। পটলগুলো খুব টাটকা নয়, মণিমাসি ছেলের বাজার করার নিন্দে করে গরম কড়ায় মাছ ছাড়ল। টাটকা মাছ ভাজার গন্ধ অনেক-দিন পায় নি অসীমা, খুব তৃপ্তি লাগল। পুকুরের মাছের এমনই চমৎকার গন্ধ ছাড়ে।

দুপুরে একা একা বিছানায় নির্জীবের মতো পড়ে রইল অসীমা। ছোট ছোট দুখানা জানালা। নিজের ছেঁড়া সায়ার কাপড় দিয়ে পর্দা দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই তো চেনা লোকের ভিড়, বেপাড়াও নয়। কত দৌরাত্ম্যই যে সইতে হয় অসীমাকে।

অনাদি বলতো—'পাপের সাজা হচ্ছে।'

ছোট টিলটিলে তক্তপোষের ওপর শুয়ে শুয়ে কাশতো আর হাঁপাতো। মাঝখানে দুখানা শাড়ির আড়াল। একদিকে অনাদি অন্যদিকে অসীমা। অনাদি মরতে চায়, অসীমা বাঁচতে চেষ্টা করে। দুদিকে দুটো প্রাণান্তকর সংগ্রাম। জুতার শব্দ, সোডার বোতলের চোঁ চোঁ ইঙ্গিত, টাকার ঝনঝনানি, অসীমার টানাটানা হাসির সঙ্গে ভরাটি গলার কুৎসিত গান। মাঝে মাঝে অনাদির অস্ফুট আর্তনাদ।

চারটে বোধ হয় বেজে গেল। মণি-মাসির ছোট ছেলে একটু আগেও সুর করে করে ইংরেজী বাংলা বই পড়ে হয়তো সবে বাইরে বেরুল। মণিমাসিও নিশ্চয় ঘুমুতে পারে নি, ছেলেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে করতে একটু তন্দ্রায় পড়েছিল। এখন মনে হয় কল-তলায় যেয়ে কিছু কাচাকাচি করার তোড়জোড় করছে। অসীমার কিছুই এখন করার নেই, কয়েকটা হাই উঠল এক সঙ্গে। চোখের কোণ আঁচল দিয়ে চেপেচেপে মুছে জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার চেহারাটা উপলব্ধি করল। এ পাড়ারই দু একটা বাজে বখাটে ছেলে অহেতুক দৌড় দিচ্ছে আর হিন্দি গানের সুর তুলতে চাইছে।

মধু কিন্তু এ ধরনের ছেলে নয়। কেমন নীরব অথচ নরম। মাথায়

চুলগুলো মাঝারি লম্বা। গড়ন শক্ত, তেজী। আড় ময়লা প্যান্টুল, সাবান-কাচা কামিজ। গ্রামের ছেলে, চাষি বাবা। সব মিলিয়ে মধুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক একটা মাপ নিয়ে রাখল অসীমা। মণিমাসি যে এত বড়াই করে ছোট ছেলেকে নিয়ে, মধুর কাছে কি এমন তার চটক। অসীমা ছেলের মুখ দেখলেই সমস্ত বুঝে ফেলে। মধুকে বাহাদুরি আরো দিতে হয়—ইস্কুলে পড়া, বাবার সঙ্গে সময়ে ক্ষেতে কাজ করা, আবার শহরের বাজারে ফসল চালান দেওয়া, মণিমাসির ছোটছেলে কলুই পেত না। আর দেখতেও বা এমন কি ছাঁদ। একটু যা রংই আছে, নাকমুখ মধুর চেয়ে ঢের নিরেশ। ভাল ইস্কুলে পড়ে বলেই একটু ইংরেজী বেশী জেনে গেছে, বয়সই বা কম কিসে, মধুর তুলনায় বছর দুই তো বড় বটেই।

অসীমা বিকেলের রাস্তাটাকে অনেক-দিন পরে তন্নতন্ন করে দেখল। ওপাশের বড় বাড়ীগুলোর বাঁকা ছায়া, গলির প্রান্তে স্যাকরার দোকান।

এক্ষুণি সন্ধ্যে নামতে না নামতেই এ গলিটার চেহারা আর একটু বদলাবে। নামকরা গলির উড়ন্ত মানুষেরা এ গলিতে এসে নিরাপদ ভাববে। এ গলির স্রোত আবার ও গলিতে গিয়ে মিশবে। মিছিলের গতি-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অসীমার জ্ঞান অনেক। অসীমার ভীষণ হাসি পায়। মণিমাসির মুখের দিকে চায়। মাসিমাসি কিছু বলার আগেই অসীমা যা যা বলতে পারে সমস্ত বলার পর মণিমাসির মনের অবস্থা কি রকম বিপন্ন হয় বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর আর এক রাজ্যে প্রবেশ করে অসীমা। একটা পাগলা ঘোড়ার দিগ্বিদিকহীন দৌড় বুকের মধ্যে পাক খায়। কিসে সুখ, কোথায় সুখ? সেই গেটবাবুর শাসানো চোখের পলক নামা দৃষ্টির একটা সুখ, আর মধুর মাথার মাঝারি লম্বা চুলের ওপর হাত দেবার একটু সুখ। সাবানের প্যাকিং কাগজ ঘাটতে ঘাটতে এক একটা সুখ অনুভব করে অসীমা। তখন কোন কোন দিন নগেনকে মনে পড়ে।

মণিমাসি ছোটছেলের ওপর বিরক্ত হলো। লাট্টু কিনে নিয়ে এসেছে একটা। বাজে পয়সা খরচ করার সময় এখন নয়। দাদা খেটে খেটে প্রাণপাত করছে. ভাই-এর সেটা চিন্তা করা উচিৎ বৈ কি। মণিমাসি যখন রেগে যায় অল্পে ছাড়ে না। ছোটছেলে চুপচাপ, মুখে কথাই নেই, হয়তো লাট্টু ফেলে বই নিয়েছে হাতে। মধু হলে কিন্তু ছাড়তো না, ঘরের মধ্যেই লাট্টু ঘুরিয়ে মাকে জব্দ করে দিত।

মধু এখন বুঝবে না। যখন বড় হবে মানুষ হবে, ঘুণাক্ষরে জেনে ফেলবে অসীমার কথা, তখন নিশ্চয় অসীমার সম্বন্ধে একবারও ভাববে। লেখাপড়া জানা ছেলেদের বোধশক্তি আলাদা। মধু তো আর যাতা ছেলে হবে না, তার মধ্যে অসামান্য কিছু একটা থাকবেই।

অসীমা আর একবার আয়না নিয়ে নিজের মুখটিকে দেখল। এখন কালো হয়ে গেছে, আগে রং একটু ছিল। মুখখানা খুব একটা কুৎসিৎ নয়, কপালের কোণে কাটার দাগ, চোখ-দুটো ছোট—কিন্তু ভাসা ভাসা। এই মুখখানা বরবাদ হয়ে গেল। মধুকে দেখাবার মতো এ মুখে কিছুই নেই।

মণিমাসি অসীমাকে ভালবাসে বলে অনেক রকমের আশ্বাস দেয়, অসীমার আত্মপীড়নকে করুণা করে। কিন্তু অসীমা জানে মণিমাসি যখন ছেলেদের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত করবে, এ পাড়া ছেড়ে কোন এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে যেয়ে বাস করবে, অসীমাকে শুধু বলবে—তোমার জন্যেই মনটা খারাপ লাগছে, মাঝে মাঝে যেও কিন্তু। ব্যস ঐ পর্যন্ত।

অসীমা মরিয়া হয়ে উঠল। পড়ন্ত রোদের শেষ আভা উঠনের বাঁ দিকটায় পড়ে খানিক নাচানাচি করে মিলিয়ে যাচ্ছে। অসীমা গভীর মনোযোগ দিয়ে আকাশ দেখে উঠনের চেহারা দেখল। তার জীবনে ঐ রকম আলো এসেছে আবার নিভেছে। আর একবার আলো এলেই তাকে আর ছাড়বে না। আর আলো আসবে কি?

অসীমা একদিন নগেনের সামনে যেয়েই দাঁড়াবে, পাশে মধুও থাকবে। নগেন কি বলে অসীমাকে শুনতেই হবে, জবাব একটা চাইবেই। কথাই বলবে না নগেন, বললেও এমন একটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করবে যে অসীমা কষ্ট পাবে শুধু। মধুও তো কিছু বলতে পারে। বাবার মুখের ওপর অতটুকু ছেলের কোন কথাই শোভা পায় না। মধুর নীরব থাকাই উচিত। সে হয় তো অসীমার মুখের দিকে চাইবে, বাবা অথবা প্রতিবেশীদের ইঙ্গিত-পূর্ণ কথার তাৎপর্য খুঁজতে চেষ্টা করবে। আর অসীমার যখন সত্যিই চোখের জল বাঁধ মানবে না তখন মধু অবাক হয়ে নগেনের মুখের ওপর কোন পরিবর্তন এসেছে কি-না জানতে চাইবে। তারপর হয়তো নিজের ভেবে অসীমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে মাথার চুলগুলো শাড়ির গায়ে ঠেকিয়ে ভীরু ভীরু চোখ করে বাবার দিকে চেয়ে থাকবে, তখন অসীমার সারা দেহ আনন্দে ভরে উঠবে।

অসীমা এবারে কাঁদল না। সেই স্যাকরার দোকানের লোহার গরাদগুলো যেন অসীমাকে বাধা দিয়ে আটকে রাখতে চাইছে, ভেতরের সোনাদানা হীরেমুক্তো ছড়াছড়ি যাচ্ছে, ছোঁবার যো নেই।

মণিমাসি শাঁকে ফু দিল। ধূপ-ধুনোর গন্ধ নাকে এলো অসীমার। অসীমা প্রদীপ জ্বালতে ব্যস্ত হলো। কালীঘাটের কালীর পটের সামনে প্রদীপ ধরে ভাবল—মধু যখন বড় হবে, যদি ছেলের মতো ছেলে হয়, অসীমার কথা এক-একবার ভাববে, হয়তো খোঁজ করতেও চেষ্টা করবে। খোঁজ পাবে না, অসীমা ততদিন পর্যন্ত বাঁচবে না। মধুর মনে পড়বে খুরুট রোডে সেই কোন এক যুগে যে মেয়েটি তাকে ডাক দিয়েছিল সে মধুকে ভালবাসতো।
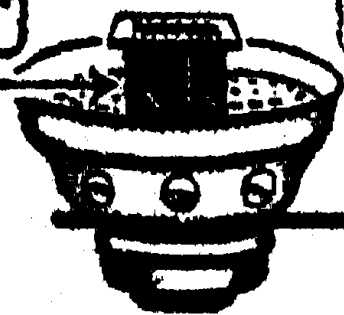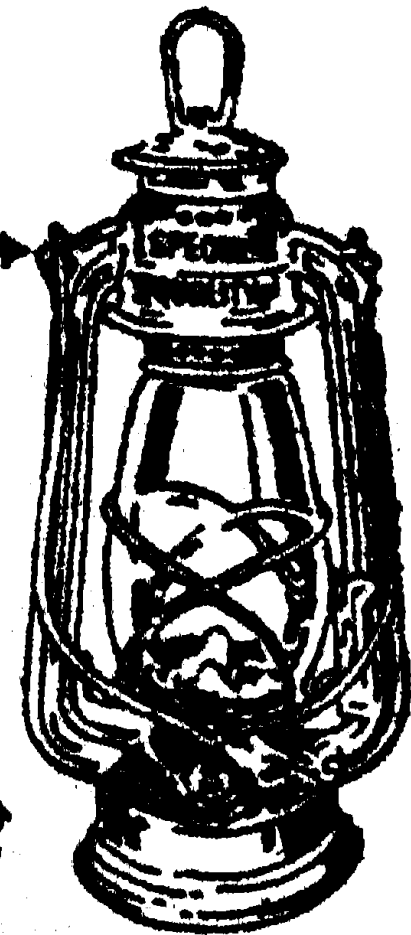
প্রদর্শনী

কলারসিক

দুই মহিলা শিল্পীর প্রদর্শনী

কলকাতায় আবার প্রদর্শনীর মরশুম শুরু হয়েছে। দীর্ঘকাল নীরব থাকার পর পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট হাউস সরব হয়ে উঠেছে শ্রীমতী শ্যামশ্রী ঘোষের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস-এর উদ্যোগে তাঁদের নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলার আর্ট গ্যালারীতে ২৭শে সেপ্টেম্বর উদ্বোধিত হয়েছে শ্রীমতী অনিতা রায়চৌধুরী একক প্রদর্শনী। সুতরাং বলা যায়, এবারকার শারদীয় উৎসবের প্রাক-মুহূর্তে দুই মহিলা শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী কলকাতার শিল্প-রসিক মানুষকে সানন্দ আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমরাও এ-আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দেখে এসেছি প্রদর্শনী দুটি। এবং দেখার পর বলতে পারি : শিল্পী শ্যামশ্রী ঘোষ শিল্পী অনীতা রায়চৌধুরীর থেকে অনেক বেশি পরিণত শিল্পী-মনের অধিকারিণী। শ্রীমতী ঘোষ প্রায়-প্রথাগত শিল্পধারায় পথ হাঁটলেও তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে যেয়ে অকারণ চমক দিয়ে আমাদের মন ভুলাতে চাননি; কিন্তু শ্রীমতী রায়চৌধুরী তাঁর আধুনিক শিল্প-চেতনায় বিমূর্ত শিল্পধারার পথ-পরিক্রমায় দর্শক-মনকে চমকে দিতে যেয়ে এমন অনেক চিত্রের জন্ম দিয়েছেন যা হয়তো অনেক রসগ্রাহী মনকে বিমুখ করে তুলবে। তবু বলবো, ভিন্নধর্মী এই দুই মহিলা শিল্পীর প্রদর্শনীতে আমরা এমন কয়েকটি চিত্র দেখেছি, যার মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। এবার আমরা একে একে দুটি প্রদর্শনী নিয়েই আলোচনা করছি।

শিল্পী শ্যামশ্রী ঘোষের প্রদর্শনী

শ্রীমতী শ্যামশ্রী ঘোষের প্রদর্শনীতে সর্বমোট চল্লিশখানি চিত্র স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত ১৭ খানি, প্যাস্টেলে অঙ্কিত ১৮ খানি ও জল-রঙে অঙ্কিত চিত্র আছে ৩ খানি। অন্য দু'খানি পেন্সিলে অঙ্কিত স্কেচ। তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে শ্রীমতী ঘোষ নানা শিল্প-ধারা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এর কোনটিতে আমাদের লোক-শিল্প-ধারার ব্যঞ্জনা এসেছে, কোনটিতে জ্যামিতিক প্যাটার্ন, আবার কোনটিতে স্থান পেয়েছে প্রথাসিদ্ধ শিল্প-শৈলী। 'জেলেনী' (৬), 'ডিম-বিক্রেতা' (৭) কিংবা 'মমতা' (১৭) চিত্রের মোটা ছন্দিত রেখায় শিল্পী লোক-শিল্পের প্রাণবন্ত ধারাকে ভেঙে যে নতুন ব্যঞ্জনা এনেছেন নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার যোগ্য। 'মেট্রোপলিস' (৪), 'এনিগমা' (৫) কিংবা 'বোটস' (১৩) চিত্রের জ্যামিতিক প্যাটার্ন রঙে আর রেখায় সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। আবার 'তিব্বতের নর্তকী' (১৪) ও 'আমার বাবা' (১৫) চিত্রকে বলা যায় প্রথানুসারী। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে ক্রোধোন্মত্ত একটি ষাঁড়ের চিত্র (৮)। প্রতিটি রেখা আর রঙে এই চিত্রখানি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তেল-রঙের মত কঠিন মাধ্যমে শ্রীমতী ঘোষ যেভাবে অনায়াস-স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন তাতে আমরা তাঁর সম্পর্কে আশা পোষণ করতে পারি। তবে রবীন্দ্র-নাথ-সম্পর্কিত চিত্র দু'খানি এই প্রদর্শনীর সব চেয়ে দুর্বল সংযোজন এ-কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করি।

শিল্পী : শ্যামশ্রী ঘোষ

প্যাস্টেলে অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্র প্রথা-সিদ্ধ। এর মধ্যে কি কম্পোজিশানে, কি বর্ণ প্রয়োগে আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে ২০ ২২ ও ২৩নং চিত্র তিনখানি। জল-রঙের কাজের মধ্যে 'কুলু উপত্যকার কুটির' (৩১) আলো-ছায়ার অপূর্ব বর্ণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল। আমরা শ্রীমতী ঘোষের ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

শিল্পী অনীতা রায়চৌধুরীর প্রদর্শনী

পূর্বে কয়েকটি সম্মিলিত প্রদর্শনীতে শ্রীমতী রায়চৌধুরীর চিত্র দেখেছি। এবং তার অনেকগুলি আমাদের ভালও লেগেছিল। এবার শ্রীমতী রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে যে চিত্রগুলি দর্শন করলাম তার সংগে পূর্বের কাজের খুব বেশি মিল খুঁজে পাইনি। মনে হয়েছে শ্রীমতী রায়চৌধুরী অতিদ্রুত এক শিল্পধারা থেকে অন্য শিল্পধারায় উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এই অন্বেষণ প্রশংসনীয় হলেও অন্বেষণের পথে যা সৃষ্টি হয় তার সব কিছু কিন্তু প্রশংসার যোগ্য নয়। আধুনিক বিমূর্ত শিল্প-সৃষ্টির পথ যত সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, আধুনিক জগতের জটিল মানস-প্রক্রিয়া, বিশেষ করে প্রখর কল্পনা-প্রতিভা ব্যতীত এ-পথে সিদ্ধির সম্ভাবনা কম। শ্রীমতী রায়চৌধুরীর মত তরুণ শিল্পীদের এই কথাটা অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই। না হলে, অনেক সম্ভাবনাই অকাল বিনষ্টির পথে অগ্রসর হবে।

যাহোক, শ্রীমতী রায়চৌধুরীর প্রদর্শিত কোন চিত্রই আমার মনকে আকর্ষণ করেনি এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, তাঁর সততা ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও কোনো চিত্রই এমন কিছু হয়ে ওঠেনি যা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করতে পাবে। তবু এর মধ্যে 'দি কোয়েস্ট' (১), 'দি সেন্টি-নেলস' (২) শুধুমাত্র রঙ প্রয়োগে এবং চিত্র-সংস্থাপনার গুণে মনকে আকর্ষণ করে। এই প্রদর্শনীতে গাঢ় পুরু নীল জমিনে সাদা রঙ প্রয়োগে 'অ্যান ওল্ড স্ট্রাগলার' (৮) নামক যে চিত্রখানি উপস্থিত করা হয়েছে তার ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি মনকে তৃপ্তি দেয়। তেমনি প্যাস্টেলে অঙ্কিত 'ফ্লোরাল সিম্ফনী' (৯)-ও আমার ভাল লেগেছে এর চমৎকার হলুদ, কালো ও নীল রঙের বৈপরীত্যের মাধ্যমে একটি অলংকৃত সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য। স্পষ্ট কথায় বলা যায়, শ্রীমতী রায় চৌধুরীর নিষ্ঠা ও দক্ষতা আছে কিন্তু আধুনিক চিন্তা-ভাবনা তত প্রখর নয়। সুতরাং এই বিমূর্ত শিল্প-সৃষ্টির পথে তিনি খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবেন কি? আমরা শ্রীমতী রায়চৌধুরীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী রইলাম।

প্রদর্শনী দুটি যথাক্রমে ৪ঠা ও ৩রা অক্টোবর শেষ হয়ে যাবে।

এসো গো শারদ লক্ষ্মী
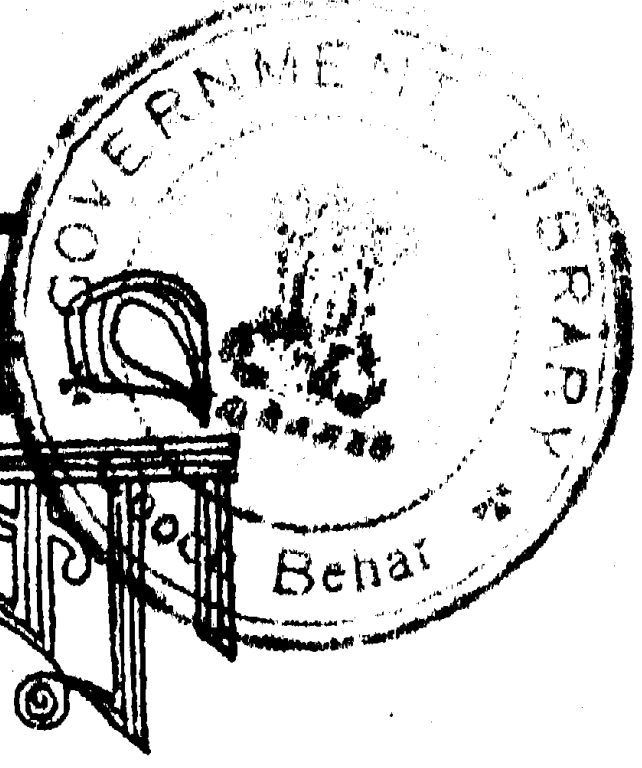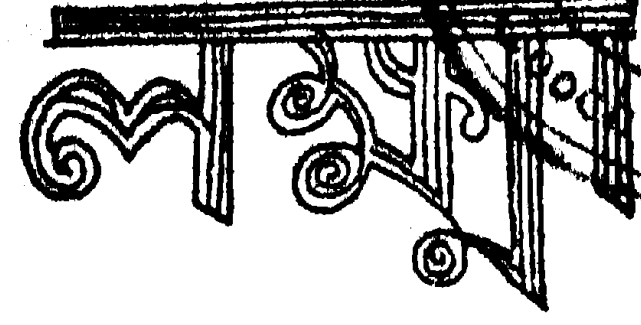
পূজোর বাজার

রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুটা ঋতুতেই "লক্ষ্মী"র উপস্বর্গ বসিয়েছেন, শরৎ এবং হেমন্ত। হেমন্তের ফসল মারফৎ কৃষককক্ষে লক্ষ্মীর আগমন ঘটে এবং শরতের লক্ষ্মী বাস করেন বাণিজ্যে। মেয়েরা বলেন, ছেলেদের নাকি হাতে-পায়ে লক্ষ্মী অথচ পুজোর সময় দোকানে দোকানে তল্পীবাহক পুরুষদের মুখের দিকে তাকাল লক্ষ্মী নয়, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচার কথাই আপনার আগে মনে পড়বে। পুজোর সময় লক্ষ্মী ঢোকেন কাঠের ক্যাশবাক্সে ক্যাশিয়ারের শিরা-সংকুল আঙুল উপচে। আর আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা লক্ষ্মীর শূন্য-বেদী মানি-ব্যাগটাকে স্মৃতি করে বাড়ি ফিরি। আমি ভেবেছিলাম, সারাবছর না পারি অন্ততঃ পুজোয় আমি নিশ্চয়ই হাসবো। হয়ত খানিকটে হেসেওছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমার হাসিটা ধার করা। আমার চরম দুর্ভাগ্য যে আমি সাহিত্যিক নই, মার্কেন্টাইল অফিসের কেরানীও না। সাহিত্যিক হলে শারদীয়া সাহিত্য মারফৎ কিছু আমদানী হত (চার ফর্মার একটি 'পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস' লিখলে নাকি বেশ টাকা পাওয়া যায়!) এবং মার্কেন্টাইল অফিসের বোনাস ত শরতের শ্রেষ্ঠ হাসি। যেহেতু আমি সরকারী চাকুরে আমাকে শুধু এ্যাডভান্স হাসার অধিকার দিয়েছেন সরকার পরের মাসগুলোর কান্নাটাকে সামলাবার জন্যে। কাজেই আমি প্রতি পুজোয় আগাম হাসি। পুজোর পর প্রতি মাসে মাইনে নিতে গিয়ে সেই হাসির ধার শুধতে হবে। আমার মাসতুত বোনেরা বলে আমি নাকি 'কাট-বোনাসী'। অর্থাৎ পুজোর সময় পাওয়া এক মাসের এডভান্সের সঙ্গে মার্কেন্টাইল ফার্মের বোনাসের তফাৎ এই যে বোনাস মাসে মাসে কাট' হয় না—আমাদেরটা হয়। বড্ড অহেতুক কথা বলে বলেই আমি উক্ত মাসতুত বোনদের সঙ্গে কখনো মিশতে ভালবাসি না, পুজোর বাজার করতে ত নয়ই। এবারে অফিসের বাদলদাকেই ধরেছিলাম পুজোর বাজারের জন্যে। যেদিন অফিসে 'পুজো-অ্যাডভান্স' পেয়ে সটান বাদলদার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বাদলদা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,

—অ্যাডভান্স পেয়েছিস বুঝি?

—কি করে বুঝলে?

—এ আর এমন শক্ত কথা কি, টাকা পকেটে থাকলে গা দিয়ে জ্যোতি বেরুতে থাকে। তোকে দেখেই মনে হয় তোর নাম জ্যোতির্ময় হওয়া উচিত!

বুঝতে পারলাম যে টাকা যে ভাবেই পাওয়া যাক না কেন তার গরম এক এবং অকৃত্রিম।

আগমনের উদ্দেশ্যর কথা নিবেদন করতেই প্রায় আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন বাদলদা—

—আমরা দুজন পুরুষমানুষ পুজোর বাজার করবো? পাত্তা পাবি তুই দোকানে? সঙ্গে মেয়েরা না থাকলে ভাই দোকানে ঢোকা পুজোর সময় সম্ভব না। আজকাল দোকানগুলো সব পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে গ্যাছে ফলে মেয়েরা আজ-কাল একাই পুজোর কাপড় জামা কিনতে বেরোয়!

—বেশ ত পাড়ার দোকান এড়িয়ে দূরের বড় দোকানে চল না?

—দূরের বড় দোকান? মানে ডিপার্ট-মেন্টাল স্টোর্স? হ্যাঁ তা যেতে পারিস

দোকানদার রক্তজলকরা চোখে চার পাঁচটা মাথার ফাঁক দিয়ে বাদলদার দিকে তাকালো একবার তারপর সামনের মহিলাটির দিকেই তাকাতে থাকল।

—র কটন এইবার খুব চলত্যাছে দিদি, দেহেন না, আরে র কটন আটাশ নম্বর ফেলা।

ওপরের এক অজ্ঞাত কোণ থেকে অনবরত ধপাধপ শাড়ির বাণ্ডিল, শাড়ি, রেডিমেড জামার বাণ্ডিল এসে পড়ছে।

বাদলদা আবার উচ্চকন্ঠ হলেন,

—কি মশাই কি হল?

—একটু সবুর করেন দাদু!

আমি সভয়ে বাদলদার দিকে তাকাই। বাদলদার আবার 'দাদু' শব্দে মারাত্মক এলার্জি। রাস্তায় ঘাটে 'দাদু' শুনলেই খেপে যায়। বাজারের বারোটা এইখানে বেজে গেলো, আজকে আর কেনা-কাটা বোধ হয় হল না। বাস্তবিক বাদলদা যে কত চটেছে তখুনি বুঝে ফেলি।

—অ মশাই আশি নব্বই-এর মধ্যে অওরাঙ্গাবাদী আছে।

—বাদলদা! আমি ক্ষীণকণ্ঠে বাধা দেই। কিন্তু তার আগেই অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে দোকানদার সামনের বেঞ্চিতে বাদলদার জন্যে ভিড় সরিয়ে জায়গা করে দিয়েছে। তারপর পেছন থেকে একবার বাদলদার গলা শুনলাম,

—একি কটনকে আপনারা অওরাঙ্গাবাদী বলে চালাচ্ছেন? কাঞ্জিভরম সুতিই দেখান তাহলে।

তারপর অবিরাম দোকানী লোকটার গলা শুনে গেলাম।

—এই যে কাঞ্জিভরম সুতি খোল

তবে ওরা কিন্তু সাংঘাতিক লোক চেনে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের রিসিপশ্যনিস্ট যদি বোঝে তুই বড় ব্যবসাদার চান্দেরী কাঞ্জিভরম-ডেক্রন ছাড়া আর কিছু দেখাতে চাইবে না; আর ওদের যদি ধারণা হয় তুই মার্কেণ্টাইল অফিসে কাজ করিস, ম্যাড্রাস-কোয়েম্বাটুরের কাউণ্টারে ভিড়িয়ে দেবে, আর একবার যদি বোঝে তুই সরকারী চাকুরে তাহলে মিল এরিয়ার বাইরে আসতে পারবি না, ছাপা দামের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে মিলের কাপড় কিনে বেরিয়ে আসতে হবে! কিন্তু কাপড় জামা ত কিনতেই হবে। বাদলদাকে জোর করেই নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

—ছাড়বি না যখন তবে চল্ নর্থ-এর দিকেই যাই—দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় সব জিনিসই নর্থ-এর চেয়ে দামী—সেদিন মামা এদিককার এক দোকান থেকে বেনারসী শাড়ি কিনল পঞ্চাশ টাকায়, সেই একই শাড়ি নর্থে দেখলাম পঁয়তাল্লিশ টাকার বিক্রি হচ্ছে।

কিন্তু কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে বাস্তবিক হাঁটা যায় না সন্ধ্যের পর। পুজোর মুখে বোনাস ইত্যাদির পরও এক পশলা মাইনে হয়ে যাওয়ায় ভিড়টা যেন একটু অতিরিক্ত। সমস্ত রাস্তাটাই যেন কার্নিভ্যালের সড়ক। আলো, শোকেসে ডেক্রন-রেয়ন- র কটন সিল্কের উজ্জ্বল আহ্বান, ফুটপাতে "বাবা-সুটে"র ব্লাউজের, ফ্রকের, জুতোর অস্থায়ী দোকান, মানুষে আর মহিলা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এগোতে বোধ হয় একমাত্র দমকলই পারে। তবু ওরি মধ্যে

আমাকে নিয়ে বাদলদা একটা শাড়ির দোকানে ঢুকলো। দোকানের অবস্থা সাড়ে নটা-দশটার ড্যালহাউসীর বাসের মত। অর্ধেক লোক দোকান থেকে ফুটপাতে ঝুলছে। জাজিম ঘেরা সবকটা বেঞ্চে মেয়েরা বসে আছে, পুরুষরা গাদাগাদি করে পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। গ্রুপ ছবি তোলার সময় কলেজের ছেলে-মেয়েরা যেভাবে একসার বসে একসার দাঁড়ায় অনেকটা সেই দৃশ্য।

প্রায় দরজার কাছ থেকেই চেঁচালো বাদলদা।

—অ মশাই শুনছেন টাকা যোলোর মধ্যে একটা শাড়ি দেখান ত!

দেহেন, আর আঁচলায় জরিটা...তিরিশ। চান্দেরী পাঁচিশ আছে, দেড়শ আছে। পাইবেন মুর্শিদাবাদী তিরিশের মইধ্যে, ম্যাড্রাসী লইতে পারেন, কুড়ি পাঁচিশের ভিতর চান......হ ডাকরণ আছে !

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, বাদলদাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সম্বিত ফিরল। বাদলদার হাতে প্যাকেট!

—একি বাদলদা অত দাম দিয়ে শাড়ি কিনলে?

—কত দিয়ে কিনলাম বলত?

—কেন তুমি আশী-নব্বই হাঁক দিয়েই ত গিয়ে বসলে!

—পুজোর সময় দোকানে বসতে গেলে ওরকম আগে একটা হাঁকতে হয় নীলামের মত। কিন্তু নীলামে আগে কম হেঁকে ক্রমে বেশীর দিকে যেতে হয় এখানে ঠিক তার উল্টো!

—একটা জরিশাড়ি কিনেছে বাদলদা কুড়ি টাকার মধ্যে। একটু উৎফুল্ল যে হলাম না তা নয়।

কিন্তু আমার আনন্দকে কালো করবার জন্যেই যেন আমার মাসতুত বোনদের এই পৃথিবীতে আসা!

—এই যে পল্টুদা তুমি? ওমা বাদলদাও যে!

বাদলদাও অমিতা-সুমিতাকে চেনে!

—কি রে তোরা কোত্থেকে, দু পয়সার বোতাম কিনতে বেরিয়েছিলি বুঝি? ছবি ছবি মেয়ে দুটোর প্যাকেট-গুলোর দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করি। অমিতা স্বভাবসিদ্ধ ফোঁসলায়।

—ফুঃ। আমরা বলে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছি। বাদলদা তোমরা কি কিনলে? শাড়ি বুঝি? দেখি দেখি। বাদলদার হাত থেকে শাড়িটা প্রায় কেড়েই নিল অমিতা! আমি বিষাক্ত নেত্রে আমার বোনদের দিকে তাকিয়ে থাকি। যে জিনিস ওরা কিনবে না ওদের ধারণা সেই জিনিসের মত সস্তা বাজে জিনিস আর কিছু নেই।

—এ মা এত চীপ ম্যাড্রাসী! অমিতা অমিতবিক্রমে জানায়।

—কত নিলে পল্টুদা—তিন টাকা বুঝি? সুমিতার সূচ ফোটা গলা।

—শাড়িটার দাম আঠারো টাকা! বাদলদার গম্ভীর কণ্ঠে চমকে উঠি। কুড়ি টাকার শাড়িকে আঠারো টাকা বলে বিপদসীমার বাইরে থাকতে চাইছে বাদলদা।

—আ-ঠা-রো? যেন বিলম্বিত রাগে কোরাস গাইল দুবোন!

—এই শাড়ি ম্যাড্রাস হ্যান্ডলুমে রিবেট দিয়ে ষোলো টাকা পাঁচ নয়া পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে, কিনবে এখন? দুবোনেই একসঙ্গে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে দুপা! সাধে আমি ওদের দুচোখে দেখতে পারি না! ওরা কিন্তু আমাদের অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকে। লেস্টন যেভাবে প্যাটারসনকে দেখে নিয়েছিল সেইভাবেই অনেকটা! মনে হল আমরা দুজনেই আর নয় গোনায় সাড়া দিতে পারবো না। কুড়িটা টাকার শাড়ি ষোলো টাকায়?

বাদলদা শোক সামলে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ধমক দিয়ে উঠল অমিতা।

—ফুঃ। তোমাদের ঘটে এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকে। কম টাকার জরিপাড় শাড়ি কেউ কেনে। আর ম্যাড্রাসী পাওয়ার লুমের এই কাপড়টা দুবার কাচলেই জেলেদের কাজে লাগবে।

—জেলে?

—জাল, জেলেদের জাল হবে কাপড়টা বুঝেছো! কেন টাঙ্গাইল, ধনেখালির নাম শোনোনি কখনো? তাই কিনলে ত পারতে! এ বছর ত' দামও কমেছে টাঙ্গাইল ধনেখালির! সেদিন বল্লাম অত করে, চলো পল্টুদা একসঙ্গে বেরোই......!

—আর বলার কিছু ছিল না। টাকার ব্যাগটা অসহায় ভাঙ্গাতে ওদের

হাতে সঁপে দি, নীরব অনুমোদনে বাদলদার চোখদুটো চক্ চক্ করে ওঠে।

—যাক্ সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে! কি কি কিনতে হবে বল দেখি চট করে।

স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে গড় গড় বলতে আরম্ভ করি আর আমার বলার ফাঁকে ফাঁকে নামতার মত দাম বলে যেতে থাকে অস্ফুট কণ্ঠে দুই বোন।

—দুটো বুশসার্ট নণ্টুর ("নণ্টুর শার্ট আড়াই থেকে টাকা সাড়ে তিন"), আর মিনুর জন্যে ওই আজকাল যে ডেক্রনের ফ্রক উঠেছে ("মোটামুটি ভালো ফ্রক টাকা সাড়ে নয় পড়বে"), দিদির জন্যে একটা র' কটনের ব্লাউজের কাপড় ("সাড়ে ছটাকা এক মিটার") চারটে চিকন সায়া বড়দিকে মা পাঠাবে ("চিকনের সায়া আগুন দাম দশ টাকা ত হবেই")......!

সেদিন রাত সাড়ে দশটায় আমি আর বাদলদা বাড়ি ফিরেছিলাম তাও সব কেনা হয়নি। কারণ সেদিন প্রতিটি জিনিস-পিছু তিনটে দোকান ঘুরেছিলাম। এবং সেই প্রথম আমার মাসতুত বোনদের আমার পণ্ডিত মনে হয়েছিল। অর্থাৎ ত্যাজতি পণ্ডিতঃ প্রবাদটি যে আমার মাসতুত বোনদের জন্যেই সেদিন বুঝলাম। দোকান-দাররা জামা-কাপড়ের যে দাম বলছিল অমিতা-সুমিতা সংগে সংগে তার অর্ধেক দাম হাঁকছিল। রফা হচ্ছিল অবশ্য তিনের চার দামে।

এ বছর থেকে আমার ভীষ্ম শপথ, আমি কখনো আর প্রতি বৎসরের অকাল-বোধন নাটকে অকাল-বধ্য পশুর ভূমিকায় নামবো না।

অগ্নিপ্রতিমা

কণাদ চৌধুরী

দমকল! দমকল!

দমকল ছাড়া চারদিকের আগুন নেভানো অসম্ভব। কাপড়ের বাজারে আগুন, বইয়ের বাজার উত্তাপে গন-গন, এক মণ চালের দাম বল্লে লোকে ভাবে চাল মারছে, অতএব চাঁদা, আঁ চাঁদাও এবার বেশী চাই। পাড়ার সেই ছেলেটি যে প্রতিবার চাঁদার খাতা বাড়িয়ে, গত বছরও যে আমি চাঁদা দিয়েছিলাম গত বছরের একটা স্যুভিনীরে মুদ্রিত দাতার তালিকা দ্বারা প্রমাণ করে বিনা-বাক্য ব্যয়ে এক টাকা চাঁদা নিয়ে চলে যেত, সে দেখলাম এ বছর আমার সামনে প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে গত বছরের স্যুভেনীরটা প্রদর্শনই করল না। ছেলেটিকে আমার মনে ছিল, গত বছর কত চাঁদা দিয়েছিলাম তাও। কাজেই সেই এক টাকাই বার করলাম পকেট থেকে। সে মুখ-চোখে একটা হতাশা ফুটিয়ে কি যেন বলতে চাইল।

—কেন গত বছরের স্যুভেনীরটা বার কর না, আমি গত বছরও এক টাকাই দিয়েছিলাম।

—আজ্ঞে তা জানি। তবে এবছর আমরা গত বছর যাঁরা যা দিয়েছিলেন এবছর তার চেয়ে আট আনা বেশী নিচ্ছি!

একটু অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে তাকালাম। পে কমিশন মারফৎ আমার যে গোটা বারো টাকা মাসিক আয় বেড়েছে এই খবরটা কি ইতিমধ্যে পাড়ার বারোয়ারী মহলে চাউর হয়ে গেছে? ছেলেটি বিনীতভাবে জানালো; গতবার যে প্রতিমা ওরা চারশো টাকায় কিনেছিল সেই প্রতিমা এ বছর সাতশো টাকায় কিনতে হচ্ছে।

সাতশো টাকা?

জননী দুর্গাও শেষ পর্যন্ত কি স্বর্ণময়ী হয়ে যাবেন? নইলে এত মহার্ঘ হবার কারণই বা কি থাকতে পারে? "বাইরে চাকন-চিকন ভেতরে খড়ের গোঁজন"—খড়ের গুদামেই কি আগুনটা লেগেছে? পালমশাইকে প্রশ্ন করলে সবিনয়ে তিনি অবশ্য অনেক কথাই শোনাবেন। যেমন—আজ্ঞে কর্তা, খড়ের কথা যদি বল্লেন তবে গত বছরের দামের সংগে এবছরের দামটা মিলিয়ে দেখুন না তার পর না হয় দরদাম করবেন। গত বছর এক কাহন খড়ের দর ছিল ষাট-সত্তর টাকা. এখন খড়ের দর আশী থেকে নব্বই টাকা কাহন। খড়ের পর মাটি। তিন রকমের মাটি দরকার হয় প্রতিমা তৈরীতে। একমাটের জন্যে লাগে মেদিনীপুর উলুবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গঙ্গার তলার পলিমাটি। অর্থাৎ দুধমাটি। দুধমাটির গত বছরে গাড়ি-পিছু দর ছিল সাত টাকা এবছর হয়েছে নয় টাকা। আর শুধু কি দুধমাটি? গয়না তৈরী করার কটিমাটির দর গাড়ি-পিছু পাঁচ থেকে ছ' টাকা বেড়ে গেছে। মুখ তৈরীর বেলে-মাটির ঝাঁড়ি-পিছু দাম বেড়েছে আট আনা থেকে বারো আনা।

পালমশাইর কথা শুনে অবশ্যই মনে হবে আজকে "মাটির দরে বিকোনো" কথাটার আর কোনো অর্থই নেই।

কিন্তু এরপরে আপনি যদি সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন—আপনাদের গত বছরের সব প্রতিমাই ত আর বিক্রি হয়নি, অন্ততঃ সেগুলো ত কম দামে দিতে পারেন!

—আজ্ঞে বাবু, চালের দাম বাড়লে

ডাকের সাজ

শিবাণী চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশে আজ নতুন যুগের হাওয়া বইছে—চলেছে ডেক্রন, টেরেলিনের যুগ। কিন্তু এই সময়েও যে কিছু লোকের দৃষ্টি পুরানো সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছে, এটা আশার বিষয়। তাইত কিছু কিছু প্রতিমার অঙ্গে প্রাচীন পদ্ধতিতে ডাকের সাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আজকাল চলন না থাকলেও এক সময়ে গোটা বাংলাদেশে এই ডাকের সাজের যথেষ্ট চলন ছিল। দুই বঙ্গ জুড়ে পুজোর যে সমারোহ ছিল তার প্রধান অঙ্গই ছিল সোলার তৈরী এই গহনা। পুজোর আগে থাকত যারা এই [illegible] আর দিনরাত

ডালের দামও খানিকটা বাড়ে। গত বছর এক বস্তা খড়ির দাম ছিল ছ থেকে সাত টাকা, এ বছর তার দর চৌদ্দ টাকা থেকে ষোল টাকা। মাজন-খড়ির সেরকবা দর আট আনা থেকে এ বছর এক টাকায় উঠেছে। শোলার পাত, বুলেন, চুমকি জরি সবই গত বছরের চেয়ে অন্ততঃ দুগুণ চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে। অতএব শোলার সাজ, বুলেনের সাজের দামও খুব চড়েছে।

দাম চড়েছে—দাম চড়েছে। এবার থেকে তাহলে ধর্মের কলও চড়া দামের তেলে চলবে। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পুরুষমহিলা নামাঙ্কিত দড়ি বিভাজিত রাস্তা ধরে গিয়ে প্রতিমা, প্রতিমার পেছনের পাহাড়, ঘূর্ণীয়মান আলোক-চক্র, প্রণামীর গোলথালার দিক নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরাই এক সময় মাটির প্রতিমা হয়ে যাবো। কিন্তু রক্তমাংসের প্রতিমার দাম বেড়েছে কিনা কোন পালমশাইর কাছে জানা যাবে জানি না। আপাততঃ জানি এবারের পুজোয় আমাকে বর্ধিত হারে সেই ছেলেটিকে চাঁদা দিতে হবে।

তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সারা বছর অপেক্ষা করার পর প্রতিমার সামনে পুজোর কটা দিন দাঁড়াতে পারব না, সে সম্ভাবনাও কম বেদনাদায়ক নয়। সত্যি বলতে কি, চাঁদার জুলুম, মাইকের অত্যাচার যতোই হোক শত সমস্যার চাপে পীড়িত মধ্য-বিত্ত মানুষের আগ্রহ ছাড়া আজকের দিনের বারোয়ারী পুজো সম্ভব হত কিনা সেটাও গুরুতর সন্দেহের বিষয়।

অবসর মিলত না। আজ আর সেদিন নেই—বায়না খুব কম সেদিনের তুলনায়।

কোলকাতার কুমোরটুলী। যে পাড়া বিখ্যাত প্রতিমা-নির্মাণে—সেই পাড়াই পরিচিত প্রতিমা-অঙ্কনেও। কথা হচ্ছিল এইখানের এক দোকানে বসে। ৮।১০ জন কর্মী নিয়ে ১০০ বছরের পুরানো দোকান। মালিক তরুণ এক বাঙ্গালী। এই দোকানে পাড়ার সবচেয়ে পুরানো ডাকের সাজ-কর্মী বলে দাবী যিনি

করলেন,—তিনিই বলছিলেন, পুরানো দিন আর নেই। মাঝে ত বিক্রী হত না আর এ সব। মোটে চলছিলই না ডাকের সাজ। এখন কিছু কিছু হচ্ছে তবু। কিন্তু এই সামান্য কয়েকখানা দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী আর মাঘ মাসে সরস্বতী পুজোয় ২।৪ খানা ডাকের সাজ বিক্রী করে পেট ভরে না কর্মীদের।

হ্যাঁ, আগেও বছরে এই সব পুজোতেই বিক্রী হত সাজ, তবু গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এর মার্কেট ছিল। আর সেই রোজগারেই মোটামুটি সারা বছরের খোরাকীও জোগাড় হত। এখন ত সেদিন নেই। সে রুচিও নেই লোকের। শিল্পী-দের চলে কি করে? অবশ্য সিনেমায় কিছু কিছু নিচ্ছে এই সব সাজ বিভিন্ন প্রয়োজনে। তাতে ত ব্যবসা চলে না। সুতরাং মালিকেরা বাধ্য হয়ে অন্যদিকে মন দিচ্ছেন—তাই একদা-বিখ্যাত এই হস্তশিল্পটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মত হয়েছে। একদা কোলকাতা, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া এবং পূর্ববঙ্গের ডাক-সাজ শিল্পীরা অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যে সোলাশিল্পে যে অনুপম সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছিলেন—আঘাতে আঘাতে তা আজ লুপ্ত হতে বসেছে।

সামান্য সোলা, রাংতা, তার, সলমা-চুমকি, জরীও একদিন মায়ের অঙ্গে যে সুষমা রচনা করত, ফ্যাসানের যুগে তার আজ নিশানা মেলে না। তবু বারোয়ারী পুজোতে দরিদ্র দেশবাসীর কাছ থেকে আদায় করা সহস্র সহস্র টাকা মাইক, আলো আর লরীতে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে পুরানো ধরণের এক সেট ডাকের সজ্জার (হার, চুড়ি, আর্মলেট, কাণ, মুকুট, বেনারসী কাপড়, চালচিত্র প্রতিভূ) দাম কি এতই বেশী? একশ কি দেড়শ টাকার এই ডাকের সাজের সঙ্গে লুপ্তপ্রায় পুরানো শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলা ত যায়ই শিল্পী-সমাজকেও কি সংকটের হাত থেকে বাঁচান যায় না?

আজকাল সংস্কৃতি নিয়ে বেশী হৈচৈ করছি আমরা, কিন্তু বাংলার এই লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক নিদর্শনের দিকে কেন আমাদের নজর পড়ছে না, সেইটেই আশ্চর্য!

দেশে বিদেশে
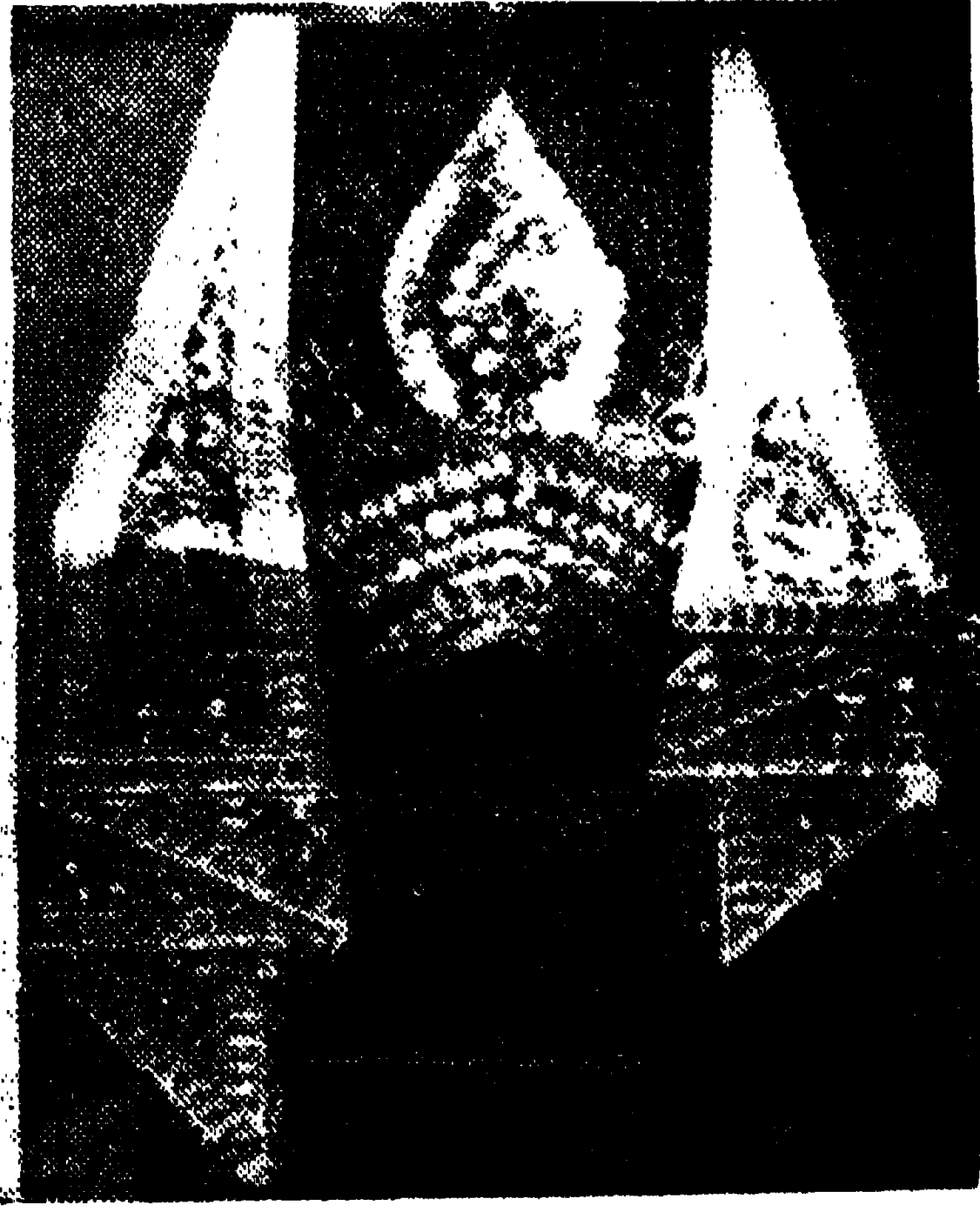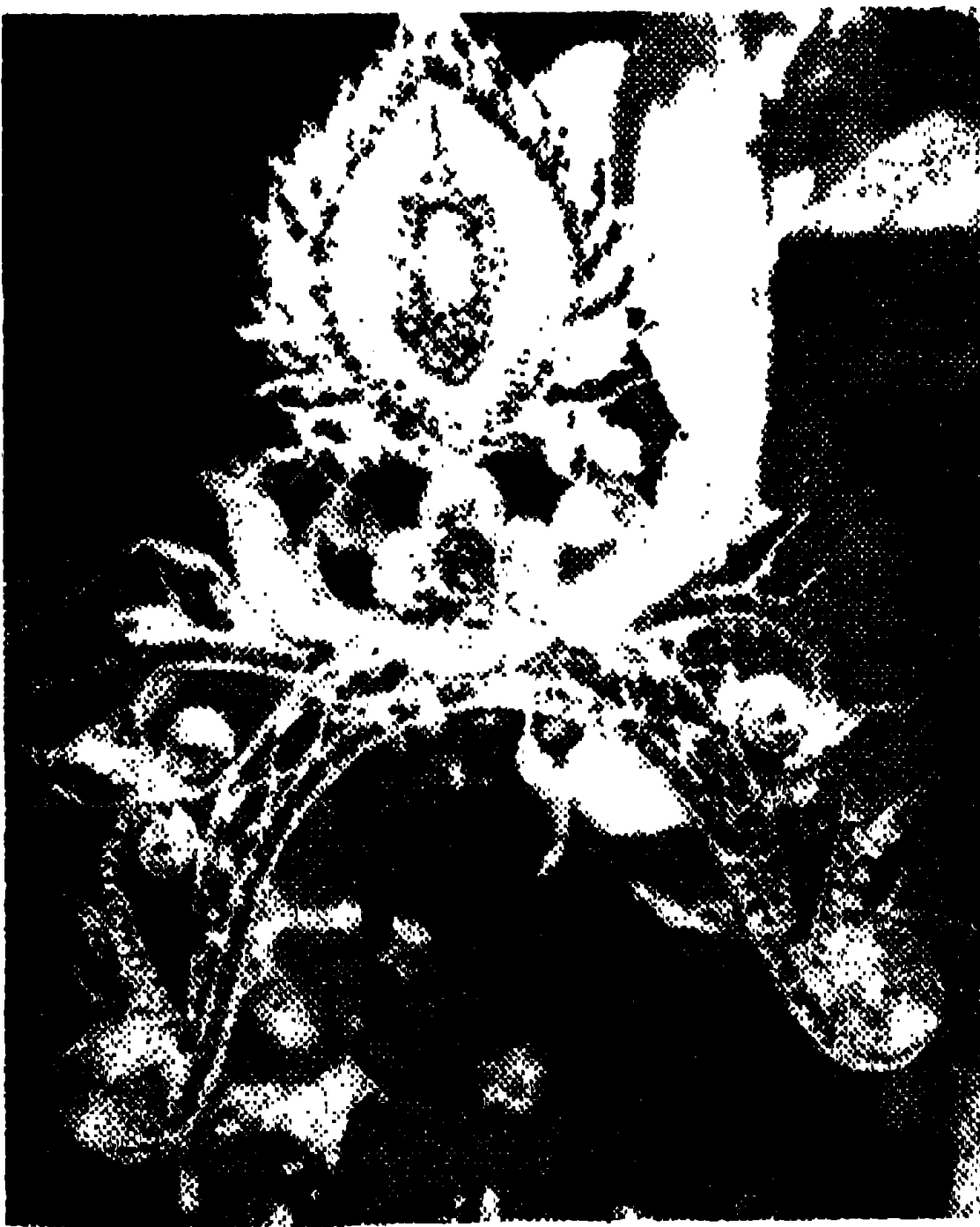
॥ সীমান্তে সংঘর্ষ ॥

ভারত ও চীনের মধ্যে বহু কূটনৈতিক পত্র বিনিময়ের পর উভয়পক্ষ সাময়িকভাবে স্থির করে যে, আগামী ১৫ই অক্টোবর হতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নতুন করে সীমান্ত নির্ধারণের প্রশ্নে আলোচনা শুরু হবে। সে আলোচনার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও আশা ছিল যে আলোচনা একবার শুরু হলে তা বহু বিষয়ে মতপার্থক্য দূরীকরণে বিশেষ সহায়ক হবে, এবং তার ফলে অদূরভবিষ্যতে সীমান্তের অশান্তিরও অনেকখানি দূর হবে।

কিন্তু চীনের সাম্প্রতিক কার্যক্রমে সে আশা আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শান্তির বদলে যুদ্ধের আশংকাই এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। চীনের সংবাদ এজেন্সী শিন হোয়া এক বিবৃতিতে বলেছে—অবস্থা এখন এমনই সংকটজনক যে অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

চীনারা লংজুর বে-আইনী অধিকার ত্যাগ করার পর ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রায় দু'বছর শান্ত ছিল। এই দু'বছরে চীনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। ঐ এলাকার বলতে গেলে গত দু'বছর চীনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। কদিন আগে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছিল এবছর জুন মাসের পর গত তিন মাসেই চীনা সৈন্যরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ত্রিশটি নতুন ঘাটি স্থাপন করেছে। ঐ সংবাদটুকু থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, আপাতত ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করে নেওয়ার কোন ইচ্ছা চীনের নেই। দু'বছর বাদে পূর্ব সীমান্তে নেফা অঞ্চলে আবার নতুন করে উৎপাত শুরু করে তারা তাদের বর্তমান মারমুখো মনোভাবকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। চীন-ভারত সীমান্তে গুলী-বিনিময় এখন প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় চীনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো অর্থহীন বলেই মনে হয়। সীমান্ত নীতি কঠোর না হওয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণকামী জঙ্গীবাদী চীনকে সংযত করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু ভারত সরকার সীমান্তের বর্তমান সংকট সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তিত বলে মনে হয় না। কারণ তা না হলে এই অতি প্রয়োজনের মুহূর্তে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিদেশ সফর সম্ভব হত না।

॥ নেপাল পরিস্থিতি ॥

"দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য" রাজা মহেন্দ্র ১৯৬০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হঠাৎ নেপালের গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ও নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালা ও তাঁর বহু সহকর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি স্বশাসন কায়েম করেন। সেইসঙ্গে নেপালের বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলিও লোপ করা হয়। তারপর দীর্ঘ দুই বছর প্রায় অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু নেপালের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এতটুকুও শিথিল হয়নি। ফলে নেপালের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ দিনের পর দিন প্রবল হয়ে উঠছে এবং বর্তমানে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয়, যেকোন দিন নেপালের বর্তমান স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত গণঅভ্যুত্থান আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

স্বৈরাচারী রাজা মহেন্দ্র আজ ক্ষমতার অন্ধ, তাই দেশজোড়া এই বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করার শক্তি তাঁর লোপ পেয়েছে। একারণে নেপালের সব অশান্তির জন্যে তিনি দায়ী করতে চান ভারতকে। কারণ নেপালের কয়েকজন গণনেতা আজ ভারত-প্রবাসী। রাজা মহেন্দ্র ও তাঁর পরিষদের বক্তব্য, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী নেতৃবৃন্দের প্ররোচনাতেই সারা নেপাল জুড়ে সন্ত্রাসবাদীরা আজ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অথচ নেপাল সরকারের আবদার মত ভারত সরকার ঐ নেতাদের গ্রেপ্তার করে নেপালের হাতে তুলে দিচ্ছেন না। তাই নেপালের রাজ-সরকারের ভারত বিদ্বেষী প্রচার ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। এই কারণেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীহৃষিকেশ শাহকে অপসারিত করে আবার পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডঃ তুলসীগিরির হাতে, ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যিনি ইতিমধ্যেই নেপাল রাজের বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছেন। শ্রীশাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি তেমন ভারত-বিরোধী নন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নেপালের গণবিক্ষোভ যত প্রবল হবে নেপালের স্বৈরশাসনও ততই নির্মম হবে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কও তার ফলে ক্রমান্বয়ে তিক্ত হবে। আর এই তিক্ততাও দেশব্যাপী অশান্তির পূর্ণ সুযোগ নেবে চীন, যে আজ লুব্ধ দৃষ্টিতে ওৎ পেতে তাকিয়ে আছে নেপালের দিকে। ভারতের পক্ষে এ অবস্থা একান্তই অবাঞ্ছিত।

॥ সুরাবর্দীর দাবী ॥

বিক্ষুব্ধ পূর্ব বঙ্গবাসীদের কাছ হতে বিপুল সমর্থন লাভ করে জনাব সুরাবর্দী পশ্চিম পাকিস্থানে ফিরে গেছেন। এখন তিনি পাকিস্থানে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র পাকিস্থানব্যাপী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কাজে ব্যস্ত। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, সমগ্র পাকিস্থানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তিনি গঠন করবেন তাতে পূর্ববঙ্গের শতকরা শতজনের সমর্থন ত থাকবেই পশ্চিম পাকিস্থানের শতকরা প'চানব্বই জন নরনারীর সমর্থন পাওয়ারও আশা তিনি রাখেন।

সুরাবর্দী সাহেব জানিয়েছেন, আয়ুব খানের সরকারের কাছে তাঁর গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের একমাত্র দাবী হবে পাকিস্থানে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সেই মত পাক সংবিধানের সংশোধন। পাকিস্থানের সাধারণ মানুষকেই তাদের শাসন-নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে। ওপর থেকে তাদের ঘাড়ে কোন শাসনকে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

॥ ছাত্রদের জয় ॥

পূর্ব পাকিস্থানে ছাত্রদের পূর্ণ জয় হয়েছে। ছাত্রবিক্ষোভ দমন করার সময় পাক সরকার তাদের গুণ্ডা দুষ্কৃতিকারী ইত্যাদি বলে বর্ণনা করলেও জনমতের চাপে স্থির করেছেন, সব ধৃত ছাত্রকে তাঁরা বিনাসর্তে অবিলম্বে মুক্ত করবেন। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে যে গুলী বর্ষণ করা

হয়েছিল সে সম্বন্ধে তদন্তের উদ্দেশ্যে ঢাকা হাইকোর্টের এক বিচারপতিকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে এবং নভেম্বর মাসের মধ্যেই তদন্ত কমিশনের রায় প্রকাশ করা হবে। গুলীতে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করবেন এবং শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের যে সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে ছাত্রদের অভিযোগ সেগুলির পুনর্বিবেচনা করা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলি হতেই বোঝা যায় যে, বিক্ষোভকারীরা দুষ্কৃতি-কারী ছিল না, এবং দুষ্কৃতি যেটুকু হয়েছে সেটুকু ছাত্রদের পক্ষ থেকে হয়নি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ছাত্রদেরও পূর্ব-পাকিস্থানে শিক্ষার রাজ্যে বর্তমান অরাজকতার কথা বিশেষ করে বিবেচনা করা দরকার। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ঢাকায় ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে, তারপর গত আটমাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ হয়েছে মাত্র ত্রিশ দিন! দূর ভবিষ্যতে এর পরিণতি খুবই অবাঞ্ছিত।

॥ সোভিয়েট রাজনীতি ॥

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ব্রেঝনেভের যুগোস্লোভিয়া সফর অনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট টিটোর রাষ্ট্রীয় সফরের পাল্টা হলেও তার বাস্তব গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রেসিডেন্ট ব্রেঝনেভের সঙ্গে গেছেন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণ্ডলীর পররাষ্ট্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মঃ আন্দ্রোপ্রোভ ও 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকার সম্পাদক, ক্রুশ্চেভ-জামাতা মঃ আঝুবি। মার্শাল টিটোর বাসভবন ব্রিয়নিতে তাঁরা মার্শাল টিটোর সঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করবেন; যাথেকে বোঝা যায় যে, নীতি ও আদর্শ-গত প্রশ্ন নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হবে।

যুগোস্লাভিয়া ও সোভিয়েট ইউ-নিয়নের এই মিতালী যে ক্রুশ্চেভ-বিরোধী কমিউনিস্ট দুনিয়ায় মোটেই সুনজরে দেখা হচ্ছে না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আলবানিয়ার ক্রুশ্চেভ-বিরোধী কমিউনিস্ট-শাসকদের সাম্প্রতিক উক্তিতে। আলবানিয়ার বেতার ও সংবাদ-পত্রে এই মিতালীর তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে—এটা নয়া শোধনবাদী-দের ঐক্য এবং দুজন শোধনবাদী নেতাই চীনের উপকূলবর্তী দ্বীপগুলির উপর চীনের অধিকারের দাবী নস্যাৎ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ভারতের সঙ্গে চীনের সীমান্ত বিরোধেও তাঁরা নাকি চীনের বিরুদ্ধে "ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে" সমর্থন করছেন। বিশেষ করে ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে ক্রুশ্চেভ চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বিমানবহর সরবরাহ করছেন। আলবানিয়ার এইসব অভিযোগ যে প্রকৃত-পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ চীনের সখেদ অভিযোগ সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং মনে হয়, "শোধনবাদী" যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের মৈত্রী যতই নিকটতর হবে, জঙ্গীবাদী কমিউনিস্ট চক্রের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধ ততই প্রবল ও প্রকাশ্য হবে।

॥ ঘানায় সন্ত্রাসবাদ ॥

ঘানায় নক্রুমা-বিরোধী শক্তি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। ঘানার সংসদে প্রেসি-ডেন্ট নক্রুমার পীপলস কনভেনশন পার্টি এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও ঘানার বিপুল সংখ্যক নরনারী আজ আর তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে মনে হয় না। ঘানায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বর্তমানে এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সমগ্র ঘানা ব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েও প্রেসিডেন্ট নক্রুমা তাঁকে শেষ পর্যন্ত প্রায় দুয়োর থেকেই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট নক্রুমা যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে প্রকাশ, আক্রায় তিনটি সাম্প্রতিক বিস্ফোরণে পনেরজন প্রাণ হারিয়েছে এবং আহত হয়েছে ২৫৬ জন, যাদের মধ্যেও কয়েকজনের অবস্থা সংকট-জনক।

বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় থাকা খুবই কঠিন। কিন্তু তারজন্যে প্রেসিডেন্ট নক্রুমার দায়িত্ব কিছু কম নয়। ঘানার শাসনযন্ত্র আমৃত্যু নিজের অধিকারে রাখার জন্যে তিনি যেভাবে বিরোধী দল-গুলির কন্ঠরোধ করেছেন তাতে সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদের সহজ পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন ষড়যন্ত্রের গুপ্তপথে তার প্রকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। ঘানায় যদি আজ প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনতে হয় তবে প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে পীড়ন ও নির্যাতনের পথ ত্যাগ করে ঘানায় পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে। বিরোধী দলের অবাধ কার্যকলাপ ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব অসম্ভব।

॥ শহর থেকে দূরে ॥

নগর জীবনের কোলাহলে বিরক্ত কয়েকজন নারী ও শিশুসহ ২৭ জন বৃটেনবাসী স্থির করেছেন, দূরে প্রশান্ত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কুইন্স-ল্যাণ্ডের সমীপবর্তী এক দ্বীপে তাঁরা নতুন করে বসতি গড়ে তুলবেন। সে জীবন হবে এমন যেখানে থাকবে না মোটর গাড়ী, থাকবে না রাজনৈতিক সংকট, থাকবে না মারণাস্ত্র ও বণিকস্বার্থ। দ্বীপটি কিনেছেন তাঁরা দুই লক্ষ আট হাজার টাকায়। লণ্ডনের ৩৩ বছর বয়স্ক এক আলোকচিত্রী এই নবজীবনের অভি-যানের প্রধান উদ্যোক্তা।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২০শে সেপ্টেম্বর—৩রা আশ্বিন : তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক আরও অর্থ বরাদ্দ—দিল্লীতে সর্ব-ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সম্মেলনে পরিকল্পনা কমিশনারের সহকারী চেয়ারম্যান শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ঘোষণা।

রাজ্য সরকার কর্তৃক কলিকাতায় মৎস্য সরবরাহের উদ্যোগ—কর্পোরেশনের ৮টি বাজারে ন্যায্য মূল্যের মাছের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত।

নেফা সীমান্তে ভারতীয় ঘাঁটির উপর চীনা ফৌজের গুলীবর্ষণ—তিনজন ভারতীয় সৈন্য জখম।

২১শে সেপ্টেম্বর—৪ঠা আশ্বিন : কলিকাতা ও সহরতলী এলাকায় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা—দিবারাত্রব্যাপী ঝড় ও বারিপাত—জীপ গাড়ীর উপর বৃক্ষ পতনে চালকের মৃত্যু।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আচার্য বিনোবা ভাবের (ভূদান আন্দোলন নেতা) পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত গ্রাম রাধিকাপুরে পদার্পণ—সীমান্তে অপেক্ষমান জনতা কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক বিনোবাজীকে 'স্বাগত' জ্ঞাপন।

২২শে সেপ্টেম্বর—৫ই আশ্বিন : নেফার সীমান্ত এলাকায় চীনা হানাদারদের সহিত ভারতীয় রক্ষী সৈন্যদলের মুহুর্মুহুঃ গুলী বিনিময়—নয়াদিল্লীর পররাষ্ট্র দপ্তরের ঘোষণা—চীনের মিথ্যা প্রচারের সরাসরি প্রতিবাদ।

মোহনবাগানের অষ্টমবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের কৃতিত্ব—ফাইন্যাল (ফুটবল) প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী হায়দরাবাদ একাদশ ৩—১ গোলে পরাজিত।

১৯৬৩ সালে ভারতের প্রথম মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপ—মহাশূন্য গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কর্মসূচী।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৬ই আশ্বিন : চাঁপাডাঙ্গায় (হুগলী জেলা) দামোদরের উপর নবনির্মিত 'বিদ্যাসাগর সেতু'র (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে) উদ্বোধন—উদ্বোধক : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

তিনদিন ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের নানা স্থানে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি—বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ট্রেণ-ষ্টীমার চলাচল বিপর্যস্ত।

২৪শে সেপ্টেম্বর—৭ই আশ্বিন : কলিকাতার মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার উপনির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অনশন ধর্মঘট সুরু—সান্ধ্য এম এ ক্লাশ ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির দাবী।

২৫শে সেপ্টেম্বর—৮ই আশ্বিন : অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস হলে (কলিকাতা) 'যুগান্তর'-এর রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মিলন সভার অনুষ্ঠান—উদ্বোধন : জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ কর্তৃক সমাপ্তি ভাষণ দান। উৎসবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি. গোপাল রেড্ডীর উক্তি : কালের হিসাবে নয়, জাতির সেবার বিচারেই 'যুগান্তর' স্মরণীয়।

কেরলের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই (পি, এস, পি) পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত—কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার নূতন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসী নেতা শ্রী আর শংকর।

পারমাণবিক অস্ত্র বিরোধী মিশনে সদলে শ্রী সি রাজাগোপালাচারীর আমেরিকা যাত্রা।

২৬শে সেপ্টেম্বর—৯ই আশ্বিন : কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীশঙ্করের শপথ গ্রহণ—শপথ গ্রহণান্তে ঘোষণা—রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভাই আপাততঃ বহাল থাকিবে। কেরল বিধানসভা হইতে শ্রীথানু পিল্লাইর পদত্যাগ—কেরলের সর্বশেষ ঘটনাবলীতে পি. এস. পি শীর্ষ নেতৃবর্গ স্তম্ভিত।

॥ বাইরে ॥

২০শে সেপ্টেম্বর—৩রা আশ্বিন : ফেণী নদী অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানী সৈন্যদের ভারতীয় এলাকা (ত্রিপুরার অন্তর্গত ছোটখিল) দখল—দক্ষিণ ত্রিপুরা সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ও বহু পরিখা খনন।

'বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানে কমনওয়েলথ দুর্বল হইয়া পড়িবার বহুল সম্ভাবনা'—কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন শেষে লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) মন্তব্য।

২১শে সেপ্টেম্বর—৪ঠা আশ্বিন : সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে 'পূর্ব সর্ত ছাড়া' ভারতের সহিত আলোচনা আরম্ভে চীনের প্রস্তাব—ভারত সরকারের নিকট নূতন নোট প্রেরণ—চীনা সীমান্ত রক্ষীদের উপর ভারতীয় বাহিনীর গুলীবর্ষণের অভিযোগ।

২২শে সেপ্টেম্বর—৫ই আশ্বিন : নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীহৃষীকেশ শাহ অকস্মাৎ পদচ্যুত—ভারত-বিরোধী ডঃ তুলসী গিরির উপর দপ্তরের ভারার্পণ।

'রাশিয়া আন্তরিকভাবে শান্তি চায়, কিন্তু চীন বরাবর রাজ্য বিস্তারকামী'—প্যারিসে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

বুয়েনস এয়ার্সে বিদ্রোহী ফৌজ কর্তৃক গভর্ণমেণ্ট হাউস দখল।

ঘানার রাজধানীতে (আক্রা) জরুরী অবস্থা ঘোষণা—মিছিলের উপর বোমা বিস্ফোরণের জের।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৬ই আশ্বিন : নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে শ্রীনেহরুর বিপুল সম্বর্ধনা—আফ্রিকার গণ-জাগরণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সন্তোষ প্রকাশ।

শ্রীনেহরুর ঘানা সফর বাতিল—ঘানায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার জের।

২৪শে সেপ্টেম্বর—৭ই আশ্বিন : 'সভ্যতাবিনাশী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সকলে মিলিয়া চিরতরে উচ্ছেদ করিতে হইবে'—নাইজিরীয় পার্লামেণ্টে শ্রীনেহরুর ভাষণ দান।

দক্ষিণ আরব ফেডারেশনে এডেনের যোগদান সম্পর্কে হাঙ্গামা—এডেনের জনতার উপর পুলিশের ব্যাটন চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার।

২৫শে সেপ্টেম্বর—৮ই আশ্বিন : ব্যয় সংকোচের নামে চীনে রাশিয়ার অবশিষ্ট দুইটি কনসাল অফিসও (বাণিজ্য দূতাবাস) বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত।

আমেরিকার নিকট আয়ুব খানের (পাক প্রেসিডেণ্ট) ব্যক্তিগতভাবে ধর্ণা—কাশ্মীর প্রশ্নে কেনেডি সরকারের আরও জোর সমর্থন দাবী।

২৬শে সেপ্টেম্বর—৯ই আশ্বিন : 'শক্তি দিয়া শক্তি রোধ করা হইবে : ভারত কিছুতেই আপন এলাকা লঙ্ঘিত হইতে দিবে না'—চীনের হামলার উত্তরে লাগোসে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—কাশ্মীরে গণভোটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

স্বাধীন আলজেরিয়ার প্রথম প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে মিঃ আমেদ বেন বেল্লা (৪৬) মনোনীত।

॥ বহু ক্রোশ ঘুরে ॥

ছুটির বাঁশী বেজেছে। আকাশে আবার সেই সোনাঝরা রোদ। শরৎকালের বিত্তবিহীন মেঘ এখন রিক্ত হয়ে ম্লান। মাঝে মাঝে শীতের হাওয়া গায়ে লাগছে। ফুটপাথের স্টলে হকারবৃন্দ শারদ-সাহিত্যের বেসাতি বসিয়েছে, যেমন বিচিত্র জৌলুষে জামাকাপড়ের দোকানে, তেমনই এই ফুটপাথে। সারা বছরের সাহিত্য ফসল ফুটপাথে এসে বলেছে কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে। শারদ-সাহিত্য কেনা, পরস্পর বিনিময় করে খুঁটিয়ে সব পড়া এবং কিছু কিছু সমালোচনা করাও এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। আর তেমনই কিউ লেগেছে রেল-আপিসের টিকিটের কাউন্টারে।

ঘরে আর মন টেঁকে না। শরৎকালের আগমনে পুরাকালে রাজারা যেতেন মৃগয়ায়, একালের বাঙালীরা যান, দেরাদুন, মুসৌরী, দার্জিলিং, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, কন্যাকুমারী, কাশ্মীর, রাজপুতানা বা রাজগীর। সফর-বিলাসী সহরবাসীর দুর্দশা দেখে দুঃখ লাগে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদভ্রান্ত প্রেমে' লিখেছিলেন 'এখানে আসিলে সবাই সমান' সেই 'এখানে' নামক জায়গাটির পরিচয় মহাশ্মশান, আর কলিযুগের শ্রীক্ষেত্র রেল-স্টেশন। এখানে সবাই সমান, এয়ারকন্ডিশনড্, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, স্লিপার, থার্ড ক্লাস সকলের অবস্থা সমান। দারুণ ক্লেশে যিনি কয়েকটি আসন সংগ্রহ করতে পারছেন তাঁর মুখে রণজয়ের উল্লাস।

আমরা ক্রিকেটে মাতি, ফুটবলের মাঠে মারামারি করি, রাণী এলিজাবেথ এলে পথে ভিড় বাড়াই, ভুয়া ছাত্রের দুঃখে উৎপীড়িত হয়ে ট্রাম পোড়াই এবং অম্লানবদনে পদব্রজে বাড়ি ফিরি, সেই আমরাই এখন অন্য ভূমিকায়। এ ভূমিকা পর্যটকের, তাই কেদার-বদরী বা মানস সরোবর এখন ভারতবর্ষের সর্বত্র। কোনো ক্লেশই ক্লেশ নয়।

তাই এই ছুটির-হাওয়ায় ঘর-ছাড়া-ঘরের কথা চিন্তা করতে দোষ কি! ছুটির আনন্দে জনগণেশের বিচিত্র আনন্দ বিচার্য বিষয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অনেকের কাছে এই ছুটির কাল, পলায়নের কাল। কাজ থেকে পলায়ন, জ্বালা থেকে পলায়ন, কোলাহল থেকে পলায়ন, উদ্বেগ থেকে পলায়ন, নগর থেকে অরণ্যে পলায়ন। উষ্ণ শহরাঞ্চল থেকে শীতল পর্বতশীর্ষে অভিযান। তাতল সৈকতে থেকে দূরে গিয়ে কিঞ্চিৎ বারিবিন্দু আহরণ। শান্ত পল্লী পরিবেশের স্নিগ্ধ সুরভি আঘ্রাণ করতে কার না মন চায়। 'যাইতে মানস সরে, কার না মানস সরে?'

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

শারীরিক উন্নতি থেকে পৃথক মনস্তাত্ত্বিক লাভ পরিবেশ পরিবর্তনে অনেক বেশী, এ কথাটা কিন্তু আমরা মনে রাখি না, প্রকৃত মূল্যে বুঝি না। এই কারণেই যাঁরা শহর থেকে দূরে, উপত্যকা থেকে শৈল শিখরে ছুটছেন তাঁরা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন যাবতীয় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ। এমন কি, সম্ভব হলে কেউ কেউ তাঁদের 'ফ্রীজ' টাও হয়ত সঙ্গে নিতেন, নগরেই যে সুখসুবিধা সম্ভব, সেই সুখসুবিধা অন্যত্র কিভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, একথাও অনেকে চিন্তা করেন, তাই দেখা যায় ভ্রমণেচ্ছু মানুষের লটবহরের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

কুইন এলিজাবেথ কিছুদিন আগে ইরাণে বেড়াতে গিছলেন, শুভেচ্ছা মিশনের ভ্রমণ, আহার-ঔষধ দুকাজ একত্রে। তাঁর জন্য ইংলিস ডিনারের কয়েকটি বিশেষ পদ বিমানযোগে এক ব্যানকুয়েটের জন্য পাঠাতে হয়েছিল ব্রিটেন থেকে। রাজা-রাণীর পক্ষে অবশ্য এতে কারো কিছুই বলার নেই, তাঁরা ইচ্ছা করলে কিনা করতে পারেন! কিন্তু 'টুরিজিমে'র দিক থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ উদ্ভট মনে হয়। তবে সাধারণ প্রমোদভ্রমণ যাত্রী তাঁর সঙ্গে সকল রকমের জামা, কাপড়, শাড়ি, ব্লাউজ, অলংকার, নিদ্রাকালীন পোষাক, ট্রানসিসটার সেট, ফ্রিজ, কমোড প্রভৃতি যাবতীয় নাগরিক সভ্যতার বস্তু ঘাড়ে করে ঘোরা অর্থহীন মনে হয়।

সুখের সন্ধানে ভ্রমণকালে এইভাবে নাগরিক বন্ধনে আপনাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা হাস্যকর। তাহলে আর পলায়ন কোথায়, ভুলে যাওয়ার জন্যই যখন এত ক্লেশ স্বীকার, তখন আবার এভাবে 'আষ্টে-পিষ্টে' কতকগুলি বিলাসবহুল অভ্যাসের দাস হয়ে বেড়ানোর মধ্যে কিঞ্চিৎ অপরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও শৈলাবাসে কিংবা কোনো শান্ত পল্লী-পরিবেশে ভ্রমণকারীকে পাহাড়ী মানুষরা বা পল্লীবাসীরা যেভাবে জীবন যাপন করে, সেইভাবেই জীবনকাটানোর প্রয়াস করতে হবে, চিনি খেতে গিয়ে চিনি হতে হবে, তবে ত' আনন্দ। তবেই পরিপূর্ণ উপভোগ সম্ভব। শহর যখন শৈলশিখরে ওঠে মানসিক, হার্দিক পরিবর্তনের জন্য পাহাড়ী মানুষরা ছুটির দিনে কোথায়, কোন্ দেশে বেড়াতে যায়, এই প্রশ্ন মনে জাগে!

আগে যা বলেছি, পথকষ্ট কি কম? প্রথমতঃ টিকিট-সংগ্রহ, তারপর মোটঘাট বেঁধে যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছানো, পথে হাওড়া ব্রীজের পথে স্ট্রান্ড রোডের 'বোতল কন্ঠত্ব' প্রাপ্তির কথা নাই ধরলাম, তারপর গুড়ের নাগরীর মত ট্রেনের বাক্সটিতে (ডিব্বা) গা মেলে দিয়ে উদয়াচলের তীর্থপথের যাত্রীর মত কোথায় চলেছি কোন্ দেশে—এই চিন্তা করতে করতে, অস্নাত, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত অবস্থায় যখন যথাস্থানে পেঁছিবেন তখন আপনার অবস্থা হবে গজভুক্ত কপিত্থের মত।

দেশ স্বাধীন হয়েছে, যাত্রীরাও স্বাধীন, রেল, স্টীমার, বাস, এরোপ্লেন, প্রভৃতি সব যানবাহন প্রতিষ্ঠান কর্মীরাও স্বাধীন, যথেচ্ছ ভ্রমণে যেমন বাধা নেই, যথেচ্ছ ব্যবহারেই বা বাধা কি! লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, রোজই তা বর্ধিত হচ্ছে, সেই অনুপাতে গাড়ি বাড়ছে না, দুচার কোটি যা বেড়েছে তা আগেকার কয়েক কোটির ঘাড়ে চাপছে। জন্মহার বাড়ছে, মৃত্যুহার কমছে, এই সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টা হিসাবে মাঝে মাঝে দুচারটি দুর্ঘটনার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার অনুপাতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার আর কত? পরিসংখ্যানবিদ্‌রা তার অঙ্ক কষছেন।

সুতরাং এই যানবাহনের স্বল্পতা এবং অব্যবস্থা সত্ত্বেও সব মানুষই যদি হঠাৎ একই দিনে ভ্রাম্যমাণ হয়ে—

> "নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ
> বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক
> প্রতিপদেই অন্তর উৎসুক
> অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, আর গাড়িভরা মানুষের ঝড় ঘন ঘন ঘুরে বেড়ায় পশ্চিমে আর পূর্বে তাহলে সব ব্যবস্থাই যে বানচাল হবে, এ আর বিচিত্র কি! ফলে 'বোতলের কন্ঠ' ভঙ্গ করার শক্তি আজ আর কারো করায়ত্ত নয়।

ছুটির আনন্দ উপভোগকারী ভ্রমণকারীদের যদি বলা যায় যে আপনারা কার্যসূচীটা বিলম্বিতহারে ছড়িয়ে রাখুন। একই সময়ে এমন করে পথে বেরোবেন না, তাহলে কে কথা শুনবে। ছুটি দেওয়ার মালিক ত' একই সময় ছাড়া, বছরের এই ক'টি দিন, অনেক কষ্টে কৃপণের ধনের মত থলির ভিতর থেকে বার করেছেন, বেশী কিছু বললে তিনি বলবেন—ছুটি নাও কেন? ছুটি নিয়ে ছুটোছুটি করতে কে বলেছে, সকাল সন্ধ্যা কাজ করো। দেশের মানুষ তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, এই বিলাস কি তোমার সাজে। উৎপাদন বৃদ্ধি করো, ছুটি কম নাও।

কিন্তু ছুটি বন্ধ করলে যাত্রীর ভীড় কি কমবে? শারদীয় উৎসবের সময়ই কি

ভীড়, আপনি বছরের যে কোনও সময় হিল্লী-দিল্লী, মাদ্রাজ-বোম্বাই যেখানেই যাবেন, সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হবেন, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।

তার কারণ পাসপোর্টের হাঙ্গামা এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বিদেশযাত্রার জন্য, তবু কি এরোপ্লেন বা জাহাজের ভীড় কম? বাসের কথা উল্লেখ না করাই ভালো। কলকাতার প্রত্যক্ষ নরক সরকারী বাসে ভ্রমণ, সেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেননি, মোটরবিহারী ছাড়া এমন কোনো প্রাণী আছেন বলে আমাদের জানা নেই।

প্রশ্ন হবে, এত আবোল-তাবোল বক্তব্যের সমাধান কই? কি তাহলে কর্তব্য? লম্বা-চওড়া বাত সবাই বলতে পারে, ফয়সালা কই? এর উত্তর অতি সামান্য, 'হাইকিং', পদব্রজে যদি আমরা ঘুরে বেড়াতে যাই কেমন হয়? কয়েকদিন ধরে কাছাকাছি অঞ্চলে গিয়ে নতুন দেশ, নতুন শহর আবিষ্কারে কি আনন্দ নেই। কাছাকাছি বিহারের উপযুক্ত ভ্রমণক্ষেত্র সরকারকে গড়ে তুলতে হবে, যদি ট্রেনের টিকিট না পাওয়া যায় প্রতিদিন কুড়ি-পঁচিশ মাইল হেঁটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছয়ে কি আনন্দ পাওয়া যাবে না?

যাঁরা এত ক্লেশসহকারে শেষ পর্যন্ত শৈল শিখরে পৌঁছান তাঁরা কি সত্যই তাঁদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ঘরের সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন সবকর্ম ভুলে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পান! আধুনিক শহরের চাপ এমনই প্রবল যে কঠোর-শ্রমী মানুষও বিশ্রামের আনন্দ, বিরামের স্বাদ বিস্মৃত হয়েছে, তাই যদি চিরবসন্ত, কি চিরতুষারের দেশে তাঁরা থাকেন, চমৎকার বন-বীথি, উজ্জ্বল-উদ্যান, রুপোলি ঝর্ণা, শীর্ণ স্রোতস্বতী—এ সবের মধ্যেই তাঁর সেই খুঁতখুঁতে ভাব থেকে যায়। 'হোম কামফর্ট' গৃহসুখভোগী পারাবতের মত মন নিয়ে কি ভ্রমণ চলে? তাই যে মানুষ জনঅরণ্যে দিন কাটান, নির্জন প্রান্তরে, জনবিরল প্রদেশে, যেখানে কাজের তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই, সঙ্গী নেই, তুমি নেই, আমি নেই, সেখানে কি প্রাণ টেঁকে। মানুষ আলস্য ভুলে গেছে, বিশ্রাম আজ বিরক্তিকর। এদের জন্যই ছুটির প্রয়োজন সর্বাধিক, কিন্তু এরাই ছুটিকে উপভোগ করতে পারে না। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কাজ শুধু কোথায় যেতে হবে, কিভাবে যেতে হবে তা নয়, কিভাবে বিশ্রাম উপভোগ করতে হবে, আর কি করতে হবে তার নির্দেশও দিতে হবে। তাহলে ফল ভালোই হবে। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহজ হওয়ার। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'যে নিশ্চল, যে নিরুদ্যম, সে লোক সেই জিনিসকেই হারাইয়া বসে যাহা একেবারেই হাতের কাছে আছে। তাই নিকটের ধনকে দুঃখ করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই, তাহাকে অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। 'আমাদের সমস্ত ভ্রমণেরই ভিতর-কার আসল উদ্দেশ্যটা এই—যাহা আছেই, যাহা হারাইতেই পারে না, তাহাকেই কেবল প্রতিপদে "আছে আছে বলিতে বলিতে চলা—পুরাতনকে কেবলই নূতন নূতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।"

নতুন বই

অভিনব একাঙ্ক (নাটক) : দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম চার টাকা।

'জাতির পরিচয় তার নাটকে'—এই কথাটা প্রায় প্রবাদ বচনের সমতুল্য হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে নাটককে অবহেলা করে কোন জাতি বোধহয় তার সাহিত্য গড়ে তুলতে পারে নি। কারো হয়ত নাটকের ধারা থাকে প্রবল, কারো হয়ত ক্ষীণ। কিন্তু নাটক থাকেই। এখনও অবধি দেখে মনে হয় বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও গল্পের ধারা যত প্রবল নাটকের তত নয়। তবু এই ক্ষীণ ধারায় যে কয়েকজন নাট্যকার প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চারিত করার জন্য প্রেরিত, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম পুরোধা। 'অভিনব একাঙ্ক' তাঁর সাম্প্রতিকতম নাটক। এই গ্রন্থে আটটি একাঙ্ক নাটক সঙ্কলিত হয়েছে।

সার্থক একাঙ্ক নাটক খুবই দুর্লভ। তীক্ষ্ম পরিমিতিবোধ ও সুচারু শিল্প-জ্ঞান ছাড়া সার্থক একাঙ্ক রচনা অসম্ভব। পূর্ণায়তন নাটকে যে বিন্যাস সম্ভব একাঙ্ক নাটকে তা অসম্ভব। তবু সবটা মিলিয়ে সার্থক একাঙ্ক যে দ্যোতনার সৃষ্টি করে তা শিল্পের পূর্ণ মর্যাদার দাবী রাখে। সিঞ্জের Riders to the Sea একাঙ্ক এবং মহৎ শিল্প। সেখানে সমগ্র জীবন বিদ্যুতের মত চকিতে উদ্ভাসিত। বাংলা একাঙ্ক রচনায় যে ক'জন সার্থকতার দাবী করতে পারেন তার মধ্যে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সৃষ্টির জোরেই দীপ্যমান। সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চের দিকে চোখ রেখে যেমন রচনা করেন ঠিক তেমনই তার মন জাগ্রত থাকে সাহিত্যের দিকে। তিনি কোনটাকেই বঞ্চিত করতে চান না। বরং তিনি জানেন, নাটক যদি সাহিত্য না হয়ে ওঠে তবে মঞ্চসফল সহস্র-রজনী কালক্রমে তিমির-গর্ভে শেষ শয্যা পাবে। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের সমগ্রতাকেই প্রকাশ করতে চান এবং এদিকে তিনি বিশেষ ভাবে সার্থক।

কিন্তু 'অভিনব একাঙ্কে' দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকের চোখে আবার নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'বাস্তু-ভিটা' কিংবা 'মোকাবিলায়' দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংলাপ-রচনা ছিল বাস্তবতার একান্ত অনুগত ও যথাযথ। কিন্তু 'অভিনব একাঙ্কে' সংলাপ রচনায় দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগকে সংকুচিত করার কোন প্রচেষ্টা করেন নি। সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকাংশে কাব্যধর্মী ও চিত্র-নির্ভর। পরিবেশ, চরিত্র ও জীবনের অর্থ প্রকাশের আগ্রহের সঙ্গে সাম্প্রতিঅর্জিত কাব্যময় সংলাপ একাঙ্ক রচনায় দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিঃসন্দেহে নূতন সম্মানে ভূষিত করবে। এমন কি জনৈক আধুনিক কবির দীর্ঘ উদ্ধৃতি তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এক কথায় 'অভিনব একাঙ্কে' তিনি নাট্য-সাহিত্যের একটি দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন এবং এই প্রতীক্ষিত সার্থকতার জন্যে তিনি যেমন নিছক মঞ্চামোদীদের সাধু-বাদ পাবেন ঠিক তেমনি ধন্যবাদ পাবেন সাধারণ সাহিত্য-পাঠকদেরও। এই গ্রন্থের কয়েকটি নাটক আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে গণ্য হবে বলে বিশ্বাস করি। পরিশেষে আমি এই গ্রন্থের ভূমিকাটির প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ অদম্য উৎসাহের বশে মঞ্চস্থ করার মধ্যে যে নাটকের ও নাট্যকারের শেষ সার্থকতা দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৈশ্য সাফল্যের প্রত্যাশী নন। তিনি জীবনকেই প্রকাশ করতে চান এবং তাঁর ভাবনার অংশীদার যদি মঞ্চামোদীরা হন তবে আমাদের জাতীয় চেতনা আর এক পোঁচ উজ্জ্বলতা পাবে।

সিন্ধুর স্বাদ (গল্প-সংগ্রহ)—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। সুরভি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম সাত টাকা।

গল্প শোনা মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। কিন্তু ঠাকুমার কাল পেরিয়ে আসবার বেশ কিছুকাল বাদেই আমাদের রুচি যায় পালটে। সে রুচির উপযুক্ত কাহিনী শোনবার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে পড়ি। ঠাকুমার মধ্যেই নিহিত শ্রেষ্ঠ গল্পকার। গল্পশ্রোতা আর গল্পিয়েদের মেজাজ এক রকম নয় কোন কালেই। বিভিন্ন মেজাজের ভিন্ন রুচির শ্রোতা বা পাঠকের সামনে গল্পিয়েরা নিয়ে আসেন এক বিচিত্র সম্ভার। যে যার মত বেছে নেয়।

বর্তমান সংকলনে আটাশটি গল্প স্থান পেয়েছে। আটাশটি গল্পের বিচিত্র স্বাদ এবং বিচিত্র কাহিনী-বিন্যাস যে-কোনো পাঠকের চোখে পড়বার মত। জীবনের যে চরিত্র চল্লিশোর্ধ লেখকের চোখে ধরা পড়েছে—চল্লিশ অনুত্তীর্ণ লেখকদের রচনায় সে চারিত্রিক ধর্ম অনেক পাল্টে এসেছে। এমনকি জটিলও হয়ে

পড়েছে। উনিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ (যদিও কয়েকজন খ্যাতিমান লেখককে বাদ দেওয়া হয়েছে)-ব্যাপী বিরাট অধ্যায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পকারদের এ রচনা-সংকলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। বাঙলা ছোটগল্পের সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। যাঁদের গল্প আছে—সুবোধ ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, প্রতিভা বসু, বিমল কর, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সমরেশ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, অমল দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল রায়, মতি নন্দী, দিবোন্দু পালিত। কঠোর পরিশ্রমে এই সার্থক সংকলন-গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

উচ্চারণ (মাইকেল স্মৃতি সংখ্যা)—সম্পাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য। ৬০।২।৮ লেক রোড, কলিকাতা : ২৯ থেকে প্রকাশিত। দাম উল্লেখ নেই।

বর্তমানকালের কবিদের চোখে মধুসূদনের নানাবিধ স্মৃতি কেমনভাবে দেখা দিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সংখ্যাটি থেকে। যাঁদের কবিতা সংকলিত হয়েছে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অনিল চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার অধিকারী, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, লোকনাথ, সুনীলকুমার নন্দী, দুর্গাদাস সরকার, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, শোভন সোম, মানস রায়চৌধুরী, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, নিখিলকুমার নন্দী, ফণিভূষণ আচার্য, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীল বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, পরিমল চক্রবর্তী, আশিস সান্যাল, অতীন্দ্র মজুমদার, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, অনন্ত দাস, বিজয়কুমার দত্ত। মধুসূদনের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ এঁকেছেন মণীন্দ্র মিত্র।

॥ শারদ সংকলন ॥

সপ্তর্ষি (শারদীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। ৬২, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা—১৩ থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'সপ্তর্ষি' বাঙলা পত্র-পত্রিকার জগতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যিকগণের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাসে সমৃদ্ধ হয়ে এর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান শারদ সংকলনটি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্রকুমার সেন, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সরোজ আচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, সুবন্ধু ভট্টাচার্য। গল্প লিখেছেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির আচার্য, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুশীল ঘোষ, আবদুল আজীজ আল আমান প্রভৃতি। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি। দুটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন খগেন্দ্র দত্ত ও সুবন্ধু ভট্টাচার্য। যামিনী রায় ও নরেন সরকারের রঙীন ছবি; ধ্রুব রায়, সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, সুনীলমাধব চক্রবর্তী ও অবনী ঘোষের স্কেচ সংখ্যাটি অপর স্বতন্ত্র আকর্ষণ।

পরিচয় (শারদীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সুনির্বাচিত রচনা নিয়েই দীর্ঘকাল 'পরিচয়'-এর শারদীয় সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাঙলা মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'পরিচয়' স্বতন্ত্র রুচি ও মর্যাদাসম্পন্ন। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন সুশোভন সরকার, অন্নদাশংকর রায়। (দ্বিভাষিক সংস্কৃতি), সরোজ আচার্য (শিল্পীর দায়িত্ব), চিন্মোহন সেহানবীশ, অশ্রুকুমার সিকদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ দাশগুপ্ত, নেপাল মজুমদার। কবিতা লিখেছেন, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, সিদ্ধেশ্বর সেন, মৃগাঙ্ক রায়, অসীম রায়, শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহঠাকুরতা। গল্প লিখেছেন, সমরেশ বসু, দেবেশ রায়, অমল দাশগুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ গুহ, সত্য গুপ্ত প্রভৃতি। পাবলো পিকাসো, ইনজি এফলাতুন, সার্গেই আইজেনস্টাইন, গোপাল ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও সজল রায়ের স্কেচ ডিয়েগো রিভেরার অঙ্কিত চিত্রের একটি আর্ট প্লেট সংখ্যাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

ছোট গল্প (শারদীয় সংকলন ১৯৬২)—সম্পাদক : লালমোহন দাস ও সুভাষ বসু। ১৯।৪, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় গল্প লিখেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, লালমোহন দাস, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাছাড়া আছে দিবোন্দু পালিতের একটি প্রবন্ধ ও মলয় রায় চৌধুরীর গ্রন্থালোচনা।

উত্তর কাল (শারদীয় : (১৩৬৯)—সম্পাদক : প্রসূন বসু ও সতীন্দ্রনাথ মিত্র। ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯ হতে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'উত্তরকালে'র আবির্ভাব এখনও এক বছর পূর্ণ হয়নি। তা সত্ত্বেও সম্পাদনার দায়িত্বে এঁরা যথেষ্ট যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।
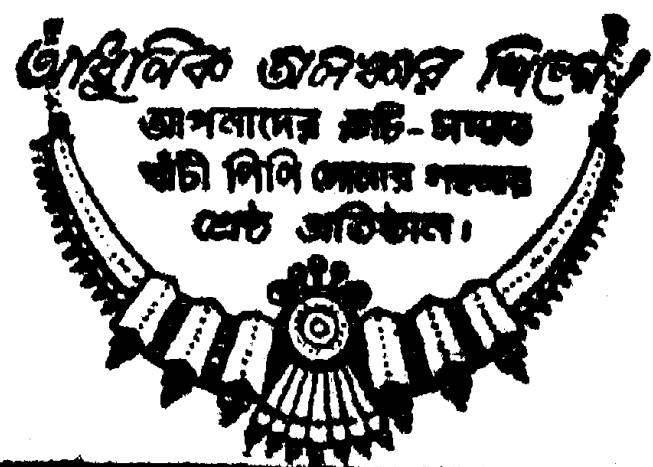
বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় তাঁদের কৃতিত্ব আরও সুপরিস্ফুট। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন ভবানী সেন, নরহরি কবিরাজ (সাহিত্যে নতুন রীতি), অশোক রুদ্র, প্রদ্যোৎ গুহ, সুধীর করণ, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত (উপন্যাসের বক্তব্য), চিন্মোহন সেহানবীশ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চল্লিশোত্তর বাংলা নাটকের জাত বিচার) ও তরুণ চট্টোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন, মিহির আচার্য, কালিদাস দত্ত, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, দেবেশ রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির মুখোপাধ্যায় ও চিত্ত ঘোষাল। একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'দিবস রজনী' লিখেছেন জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন, বিষ্ণু দে, বিমল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মার্কোস আনা, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অসীম রায়, মৃগাঙ্ক রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, লি পো, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাস, প্রসূন বসু, সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। একটি কাব্য নাটক 'এ শুধু অলস মায়া' লিখেছেন রাম বসু।

প্রবন্ধ পত্রিকা (শারদীয় : ১৩৬৯)—সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন ঘোষ। ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা—৫ থেকে প্রকাশিত, দাম দু টাকা।

'প্রবন্ধ পত্রিকা'র প্রতিটি সংখ্যাই সুনির্বাচিত প্রবন্ধাবলী নিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ ও তুলনা) হার্বার্ট রীড, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতায় কিশোর-অপরাধ), সুকুমার সেন, জে ডি বার্ণল, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ জগদীশ ভট্টাচার্য (সত্তর বছরের বাংলা উপন্যাস), পি, সি, জোশী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাস্কর বসু, অশোক মুস্তাফি (দাসপ্রথা ও টম্ জেন), মৃণালকান্তি ভদ্র (সার্ত্রের মানবতাবাদ : নাটক), সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (জাতীয় সংহতির সমস্যা), আদিত্য ওহদেদার, চিন্মোহন সেহানবীশ হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ মালাকার ও শঙ্খ ঘোষ।

মোহনা (শারদীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : অরুণ বসাক। নীরেন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক রহড়া, ২৪ পরগণা হতে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রবোধবন্ধু অধিকারী, দিব্যেন্দু পালিত, মিহির আচার্য, গোলাম কুদ্দুস, গোপাল ভৌমিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, কমল গঙ্গোপাধ্যায়, সুধী প্রধান এবং আরো অনেকে।

আন্তর্জাতিক (শারদীয় বিশেষ সংখ্যা : ১৩৬৯)—প্রধান সম্পাদক : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। রমন মজুমদার কর্তৃক ১৪৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা—১৩ হতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া গল্প, কবিতা প্রভৃতিও স্থান পায়। বিদেশী লেখকদের রচনার অনুবাদও এ পত্রিকাটির মূল্য বৃদ্ধি করে। বর্তমান সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (এশিয়ার ভবিষ্যৎ), পাবলো নেরুদা, চিত্ত বিশ্বাস, হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, ধনঞ্জয় দাশ, এদুয়া দাস, মিয়েজেলাইতিস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, (জাপানী সাহিত্যের সেকাল ও একাল), নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, অংশু দত্ত (আন্তর্জাতিক জনমত, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আফ্রিকা), অতুল দত্ত (আলজেরীয় মুক্তি-যুদ্ধের পটভূমি), রঘুবীর চক্রবর্তী, ডঃ মানফ্রেড কেম্নার, শিবানীকিঙ্কর চৌবে, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মালাকার, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, বিপ্লব দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী (শিল্পরীতি : বাস্তবতা), জ্যোতির্ময় গুপ্ত, রাজেন্দ্র দেশমুখ্য, সিদ্ধেশ্বরী সেন, রাম বসু, থান টিন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, ও হেনরী, বেরটোল্ট ব্রেখট, অমল দাশগুপ্ত, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় (ইন্দোচীন : ১৯৫৪-৬২), যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর (আফ্রিকার ঐক্য : এশিয়ার মৈত্রী) এবং আরো অনেকে।

গন্ধর্ব (শারদীয়া : ১৩৬৯) সম্পাদক : নৃপেন্দ্রনাথ সাহা, ১৮, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা—১২ হতে প্রকাশিত, দাম আড়াই টাকা।

নাটক বিষয়ক এই পত্রিকাটি বাঙলা সাময়িক পত্রসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মূল্যবান প্রবন্ধ, নাটক, আলোচনা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে এর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় তিন মাসে একটি করে। বর্তমান সংখ্যায় পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন—উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। একটি একাঙ্ক লিখেছেন বিমল কর। প্রবন্ধ লিখেছেন—শম্ভু মিত্র (পর্যালোচনার ভূমিকা) নৃপেন্দ্র সাহা (নবনাট্য আন্দোলনের পরিণতি : নবনাট্যের সূচনা), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আমেরিকার আধুনিক নাটক), অমরনাথ পাঠক, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভৈরনার হেস্ট (বার্লিনেয়ার আঁসেম্বল), যোগেশচন্দ্র নন্দী (অগাস্ট স্ট্রীন্ডবার্গ), রথীন্দ্রনাথ রায়, দিলীপ রায়। দুটি কবিতা লিখেছেন—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতনামা আলোকচিত্রশিল্পীদের কয়েকটি আলোকচিত্র আছে। সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৬৯)—সম্পাদক : নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, বংকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম চার টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

প্রতিবৎসরের মত এবারও 'শিশুসাথী'র এই বার্ষিক সংখ্যাটি ছোটদের উপযোগী নানাবিধ রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বহু চিত্রশোভিত এই সংখ্যা বাঙলাদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ। তাছাড়া অখ্যাতনামা লেখকদের রচনার সঙ্গে স্থান পেয়েছে গ্রাহকদের মধ্য থেকে সুনির্বাচিত কয়েকটি রচনা। যাঁদের রচনায় আলোচ্য সংখ্যাসমৃদ্ধ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শৈল চক্রবর্তী, আশা দেবী, অখিল নিয়োগী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ধীরেন্দ্রলাল ধর, এ সি সরকার, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রাণতোষ ঘটক, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দুর্গাদাস সরকার, শান্তশীল দাশ, জসীম উদদীন, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ধীরেন বল, মণীন্দ্র দত্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, পি সি সরকার, মন্মথ রায় এবং আরো অনেকে। আশাকরি এই বিশেষ সংখ্যাটি সমাদৃত হবে।

ঘরে বাইরে (শারদীয় : ১৩৬৯)—সম্পাদক : কনক মুখোপাধ্যায়, ১৮৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা হতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এবারের শারদীয় 'ঘরে বাইরে' যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন—আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী, রমা চৌধুরী, মায়া দেবী, উমা দেবী, গীতা মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, মায়া বসু, নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়), ছবি বসু, কনক মুখোপাধ্যায়, বিভা সরকার, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায় এবং আরো অনেকে। প্রতিবৎসরের মত এবারও মুদ্রণ পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

চলচ্চিত্রে "নবতরঙ্গ" :

চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গের অন্যতম জনক, পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (Francois Truffoant) বলেছেন, "চলচ্চিত্রে গল্পের চেয়ে চরিত্রগুলি আমাকে বেশী আকৃষ্ট করে ব'লে আমি ভাবসর্বস্ব ছবি তৈরী করতে পারি না। ধরুন, হিটলারের চরিত্র নিয়ে যদি আমায় একটি ছবি করতে হয়, তাহ'লে আমি তাতে দেখাব, তিনি নেপোলিয়নের মতই কেমন কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু ক'রে ঘুমিয়ে নিতেন; আমি পড়েছি, তিনি একটা পিণ্ডাকার, ফাঁপা পুরোনো গদীর ওপর শুতে ভালোবাসতেন। আমি এই ধরণের ছোট-খাট ঘটনার দিকে বেশী মনোনিবেশ করতুম ব'লে হিটলার সম্পর্কীয় ছবিটা একটা ভীতিজনক জিনিস হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু মনুষ্যজীবন এই রকম অসম্ভব সত্যেই পরিপূর্ণ।"

গেল তিনচার বছর ধ'রে ফ্রান্সে যে-ক'জন পরিচালক চলচ্চিত্রের মধ্যে গল্পের প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মাত্র কয়েকটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের বিভিন্ন মুড প্রকাশের মধ্যেই চলচ্চিত্রের সার্থকতা ব'লে জাহির করছেন এবং সারা পশ্চিম ইয়োরোপে যাঁদের প্রবর্তিত "নবতরঙ্গ" প্রবাহিত হচ্ছে, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো তাঁদেরই মধ্যে একজন। এঁদের চিন্তা আমাদের দেশেও সংক্রামিত হয়েছে এবং আমাদের মধ্যে কয়েকজন বলতে শুরু করেছেন, "চলচ্চিত্রকে যদি একটি নূতন এবং বিশিষ্ট আর্ট ফর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়, তাহ'লে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তার বিচার সম্পূর্ণ অর্থহীন।" এ-কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রাকৃতজন নন, মননশীল এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন ব'লে তাঁদের খ্যাতি বহুবিস্তৃত। কাজেই কথাটি আলোচনাসাপেক্ষ।

একদিন চলচ্চিত্র সৃষ্ট হয়েছিল মাত্র গতিশীল বস্তুকে পর্দায় প্রতিফলিত করবার জন্যে; চলন্ত ট্রেণ বা ছুটন্ত ঘোড়াকে পর্দায় দেখে চলচ্চিত্রের সৃষ্টিকর্তাকে লোকে বাহবা দিয়েছিল। পরে যখন একটি বক্সিংয়ের দৃশ্য বা রাস্তায় দু'জন লোকের মারামারির দৃশ্যও পর্দায় রূপান্তরিত হয়, তখনই ছবি যাঁরা তুলছিলেন, তাঁরা ভাবতে শুরু করেন মানুষের জীবনের গতিশীল ঘটনাকে কি ক'রে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়। এই চিন্তার ফলেই জন্ম নেয় "দি গ্রেট ট্রেণ রবারী"। যে-ট্রেণ ডাকাতির চাঞ্চল্যকর বিবরণ খবরের কাগজ মারফত জনসাধারণকে একদা স্তম্ভিত করেছিল, সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে আবার সংঘটিত করিয়ে এমন ক'রে ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হ'ল যে, যখন সেই চিত্রকে লোকে পর্দায় প্রতিফলিত হ'তে দেখল, তখন তারা মনে করতে বাধ্য হ'ল, তারা সত্যিই সেই ট্রেণ ডাকাতিটিকে তাদের চোখের সামনে ঘটতে দেখছে। এইভাবেই জন্ম নিল পৃথিবীর প্রথম কাহিনী-চিত্র। এর পর চলচ্চিত্রকারেরা ফিল্মকে ব্যবহার করেছেন নানা প্রকারে। দেশ-বিদেশের ঘটনাসম্বলিত সংবাদ-চিত্র, কাগজ, ইস্পাত, পেট্রল প্রভৃতি বস্তুর জন্মবৃত্তান্ত সম্বলিত দলিল-চিত্র, মহেঞ্জোদড়ো, কোনারক, খাজুরাহো, ইফেল টাওয়ার প্রভৃতি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানের খুঁটিনাটি সংবলিত অধ্যা-

ফিল্ম এজ-এর 'কুমারী মন' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

চিত্র, ভ্রমণ-চিত্র, নিসর্গ-চিত্র, কার্টুন-চিত্র, বিজ্ঞান বা কলাবিষয়ক শিক্ষামূলক চিত্র, বিভিন্ন সরকারের হরেক রকম প্রচার-চিত্র, ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন-চিত্র—কত রকমেরই না চিত্র প্রস্তুত হচ্ছে পৃথিবীর দেশে দেশে এই ফিল্মের মারফত। তবুও হিসেব করলে দেখা যায়, আজ জগতে যত পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি তৈরী হচ্ছে, তার মধ্যে ডিজনীর 'লিভিং ডেজার্ট' বা সোভিয়েত দেশের 'লাইফ ইন দি আর্কটিক' প্রভৃতি গোছের কাহিনীহীন ছবির সংখ্যা শতকরা সাত-আটটির বেশী নয়। সারা পৃথিবীতে আজকের দিনে বছরে অন্ততঃ দু'হাজার কাহিনী-চিত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

এখানে বলা কর্তব্য, কাহিনী-চিত্র নামটিতে আমাদের আপত্তি আছে। যাকে আমরা কাহিনী-চিত্র বলি, সেটি আসলে হচ্ছে চিত্রনাটক। যেমন মঞ্চ-নাটক, বেতার-নাটক, তেমনই চিত্র-নাটক। ব'লে দিতে হবে না যে, মঞ্চে যা অভিনীত হয় তা যেমন স্টেজ-প্লে বা মঞ্চ-নাটক, তেমনি পর্দার ওপর যা অভিনীত হয় তা হচ্ছে স্ক্রীন-প্লে বা চিত্র-নাটক। আমরা গল্প শোনবার জন্যে যেমন রঙ্গালয়ে যাই না, তেমনই যাই না চিত্রগৃহে। আমরা উভয় জায়গাতেই যাই নাটক দেখতে। নাটকে থাকে দুই বিপরীতমুখী শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত; সে শক্তি বাইরেও হ'তে পারে, অন্তরেও হ'তে পারে। নায়ক একটি মেয়েকে ভালোবাসতে চায়; আর একজন তার সেই ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী। একদল লোক সোনার খোঁজে একটি দেশে গেছে; আর একদল লোক তাদের ভুল পথে যেতে প্ররোচিত করছে—আবার দু'টি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসে; ছেলেটির মনে সমস্যা জেগেছে, সে কি করবে।—এই ধরনে যে-ছবিতে বিরোধের অবতারণা করা হয় এবং দুই বিপরীত-মুখী শক্তির সংঘাতকে উত্তাল ক'রে তোলে একটি শক্তিকে—যে-শক্তির প্রতি ধীরে ধীরে দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা হয়েছে, সেই শক্তিকে বিজয়ী ক'রে বিরোধের অবসান ঘটানো হয়, সেই ছবির নাম হচ্ছে চিত্র-নাটক।

প্রশ্ন, এই চিত্র-নাটক গঠনের মূল বস্তুটি কি? নিশ্চয়ই সিনারিয়ো বা চিত্র-নাট্য। মঞ্চনাটকে যেমন সাধারণতঃ দৃশ্য এবং অঙ্কে বিভক্ত ক'রে বিরোধ এবং সংঘাতের ঘটনাবলীকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়, চিত্র-নাটকেও তেমনই বিভিন্ন শট এবং দৃশ্যে বিভক্ত ক'রে নাটকীয় সংঘাতকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে চিত্রায়িত করা হয়। চলচ্চিত্রের ক্যামেরাকে স্থল, জল বা আকাশের যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য থেকে শুরু ক'রে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে কয়েক শত মাইল দূরে মহাকাশ পর্যন্ত অবাধ গতিবিধি চলচ্চিত্র ক্যামেরার। এবং মানুষের কল্পনাপ্রসূত যে-কোনো জিনিসকে রূপ ও রেখা দ্বারা চিত্রায়িত করা যায়, তাকেই পর্দায় প্রতিফলিত করবার জন্যে ক্যামেরার সাহায্যে ধরে রাখা সম্ভব। মাত্র অঙ্কনের সাহায্যে ডিজনী 'ব্যাম্বি' বা 'ডাম্বো'র মত চিত্র-নাটকের জন্ম দিয়েছিলেন। সুবার্টের 'আনফিনিসড' সিম্ফনী'কেও মাত্র বিভিন্ন রঙের প্রবাহ ও মিশ্রণের সাহায্যে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'তে দেখেছি। কাজেই ক্যামেরার গণ্ডীর অবাধ পরিধির জন্যে চলচ্চিত্রের রীতি-প্রকৃতি, শৈলী বা টেকনিক নিশ্চয়ই মঞ্চ-নাটক রচনার টেকনিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এবং চলচ্চিত্রে শব্দযোজনার আগের যুগে মাত্র ছবির সাহায্যে—আর্ট এবং দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য রক্ষা ক'রে একটি অসাধারণ চিত্র-নাটক [illegible] সম্ভব হয়েছিল। কোনো রকম সংলাপ-সংগীতের টাইটেল ব্যবহার না ক'রেও [illegible] চিত্রনাট্যকারগণ [illegible]।

কিন্তু যেদিন ছবির সঙ্গে কথা সংযুক্ত হ'ল, কান এবং চোখ—এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই দর্শকের মনে ছবির আবেদন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হ'ল, তখনই চিত্রনির্মাতা পড়লেন সমস্যায়। যে-নাটকীয় বিরোধ বা ঘাত-প্রতিঘাতকে উপজীব্য ক'রে ঘটনা বা চরিত্রের সমাবেশ, তাকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত ক'রতে চিত্র, কথা, শব্দ, সঙ্গীতের সুষ্ঠু সমাবেশ কি ভাবে করা যায়, তা নিয়ে আজও চিন্তার শেষ হয়নি। বেশীর ভাগ লোকেরই অভিমত হচ্ছে যে, একটি চলচ্চিত্র দেখতে যে সময় লাগে, তার তিন ভাগের এক ভাগ সময়ের বেশী তাতে সংলাপ থাকা উচিত নয়। এমন নাটকীয় সংঘাতকেও চলচ্চিত্রের উপজীব্য করা যায়, যাতে পাত্রপাত্রীদের সংলাপ আদৌ না থাকতে পারে বা থাকলেও হবে অত্যন্ত পরিমিত। চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই একটি বিশিষ্ট আর্ট ফর্ম। কিন্তু তাতে যদি মাত্র দু'টি চরিত্রেরও সমাবেশ ঘটানো হয়, তা'হলে সেই দু'টি চরিত্রের মধ্যে অবশ্যই একটি বিরোধকে গ'ড়ে তুলতে হবে এবং নানা ঘটনার সাহায্যে সেই বিরোধকে উত্তাল ক'রে তুলে একটি চরম সঙ্কট মুহূর্ত বা ক্লাইসিস সৃষ্টি করতে হবে এবং পরে করতে হবে সেই বিরোধের সমাধান। এ যদি না থাকে, তাহলে সেই চলচ্চিত্র ভ্রমণ-চিত্র, দলিল-চিত্র, সংবাদ-চিত্র বা প্রচার-চিত্র হ'তে পারে, কিন্তু আমরা যাকে ফিচার ফিল্ম বা চিত্রনাটক বলি, তা ব'লে কিছুতেই গণ্য হ'তে পারে না। এবং এই যে বিরোধের সৃষ্টি থেকে শুরু ক'রে তার সমাধান পর্যন্ত ঘটনাবলীকে বিভিন্ন

দৃশ্যের মাধ্যমে উপস্থিত করা, এই কাজটি একমাত্র তিনিই করতে পারেন, যাঁর নাট্য-রচনা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে। একজন লোকের ছবির ফ্রেমিং, কম্পোজিসন, লাইট এবং শেড সৃষ্টি প্রভৃতি চিত্রগ্রহণ বিষয়ক বহু জ্ঞান থাকতে পারে; কিন্তু একটি বিরোধের কি ক'রে সৃষ্টি করতে হয়, বিরোধ সৃষ্টির আগে ও পরে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর কি ব্যবহার হবে, ঘটনাবলীকে কি ভাবে সাজালে সেই বিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে একটি সম্ভাব্য সংকটে উপস্থিত হবে এবং পরে সেই সংকট কেটে গিয়ে বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান ঘটবে, এ জ্ঞান-যার জন্যে ছবির ফ্রেমিং বা কম্পোজিসন সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে থাকতে হবে রীতিমত নাট্যজ্ঞান এবং কে না জানে, এই নাট্য-বোধ সাহিত্যিক-বোধ বা বিচার-বুদ্ধিরই অন্তর্গত। আজকে 'ডি-ড্রামাটাইজেসান' ব'লে একটি ধুয়ো উঠেছে অর্থাৎ চলচ্চিত্র থেকে নাটককে দাও নির্বাসন। অতি-নাটকীয়তা বা মেলোড্রামাকে আজকের বাস্তবধর্মী যুগে নিশ্চয়ই নির্বাসন দেওয়া উচিত, কিন্তু তাই ব'লে পুরো নাটকটাকেই বাদ? চলচ্চিত্রের মধ্যে বিরোধ, দুই বিপরীত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত, বিরোধের সংকট-মুহূর্ত এবং শেষ পর্যন্ত বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান—এ-সবকেই জলাঞ্জলি দিতে হবে? জানিনা, নাটককে বাদ দিয়ে চিত্র-নাটক বা ফিচার ফিল্মের চেহারা কি দাঁড়াবে! জীবনের নগ্ন সত্য রূপেই শুধু থাকবে চলচ্চিত্রে, তার মধ্যে জোর ক'রে নাটক রচনা করা চলবে না, বিরোধ যদি কখনও সত্যিই দেখা দেয়, তো দেখা দেবে, নইলে তাকে আহ্বান ক'রে আনা চলবে না ইত্যাকার কথা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু 'আর্ট হচ্ছে বাস্তবের নকল', অ্যারিস্টোটোলের এই উক্তিতেই নাটক যদি পর্যবসিত হ'ত তাতে সংঘাতের সমাবেশ যদি না ঘটত, তা'হলে নাটক হ'ত 'এক যে ছিল রাজা' গোছের গল্প, তা' সংঘাতময় শ্বাসরোধক নাটক হয়ে উঠতে পেত না এবং সেই কারণে দর্শক তা দেখবার জন্যে লালায়িতও হ'ত না। কাজেই নাটককে বিসর্জন দেওয়ার কথা কথাই থেকে যেতে বাধ্য।

চিত্র সমালোচনা

অভিযান (বাঙলা) : অভিযাত্রিক-এর নিবেদন; ১৪,১৯৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; **কাহিনী** : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; **চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সংগীত-পরিচালনা** : সত্যজিৎ রায়; **চিত্র-গ্রহণ** : সৌম্যেন্দু রায়; **শব্দধারণ** : দুর্গাদাস মিত্র, নৃপেন পাল ও সুজিৎ সরকার; **শিল্প-নির্দেশনা** : বংশীচন্দ্র

সত্যজিৎ রায়

গুপ্ত; **সম্পাদনা** : দুলাল দত্ত; **আবহ-সংগীত-গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা** : শ্যামসুন্দর ঘোষ; **রূপায়ণ** : ওয়াহিদা রেহমান, রুমা গুহঠাকুরতা, রেবা বসু, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, অজিতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২৮-এ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার ত' ছোটলোক; লোকে বড় জোর 'তুমি' ব'লে কথা কয়। 'আপনি' 'আজ্ঞে' ব'লে সম্মান দেখাবে, আর পাঁচটা ভদ্রলোকের মত ভদ্রলোক হবে, ভদ্রসমাজে ঠাঁই হবে—এই উচ্চাশা কার না হয়? বাঙলাদেশে পাঁচ পুরুষের বাসিন্দা, ছত্রী রাজপুত নরসিংও নিজের 'কেরাইসলার'-ট্যাক্সি হাঁকাতে হাঁকাতে এই স্বপ্নই দেখত। তাই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে সে প্যারীচরণ সরকারের ইংরিজী ফার্স্টবুকের পাতায় মনোনিবেশ করত; সে জানত, ইংরিজী না জানলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। কিন্তু সে যখন 'ভদ্দরলোক' হবার সুযোগ পেল, শেঠ সুখনরাম আর উকীলবাবুর পরামর্শে সে যখন তার বহুকালের সঙ্গী "কেরাইসলার"টিকে মাত্র আটশো কি হাজার টাকায় বেচে দিয়ে তাদের 'টার্ণস্পোর্ট' (ট্র্যান্সপোর্ট) কোম্পানীর অংশীদার হয়ে তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ভদ্রলোক হবার পথে প্রথম পা বাড়াল, তখন সে সখেদে আবিষ্কার করল, জীবনের সততা, ভদ্রতাজ্ঞানকে বিসর্জন দিয়েই তাকে 'ভদ্দরলোক' সাজতে হবে, যার জন্যে তাকে ত্যাগ

আর ডি বনশাল প্রযোজিত ও বিনু বর্ধন পরিচালিত 'এক টুকরো আগুন' চিত্রের একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ, তন্দ্রা বর্মণ, অপর্ণা দেবী ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ

করতে হবে, তার সাধের 'কেরাই-সলার'কে, সেই সঙ্গে তার ট্যাক্সিচালক-জীবনের সহকারীকে, সদালব্ধ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী যোশেফকে এবং তার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলা ও তার ভালোবাসার কাঙাল গুলাবীকে।— মেকী ভদ্দরলোক সাজবার জন্যে একসঙ্গে এতগুলো ত্যাগ-স্বীকার করা তার সইল না: তাই সে ফিরে এল তার চিরাচরিত ট্যাক্সি-চালকের জীবনে, যেখানে তার ঘর আলো ক'রে থাকবে গুলাবী।

সিংজীর জীবনের—নরসিংকে সবাই সিংজী ব'লেই জানত—এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, তার প্রকৃতিগত কাঠিন্য ও বেপরোয়া ভাব, তার নিরুচ্চার প্রেম ও বিক্ষুব্ধ মনের ফেনিল প্রকাশ—সমস্তই রূপে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযান' চিত্রে। সুনির্বাচিত বহির্দৃশ্যসমৃদ্ধ পটভূমিকাকে আশ্রয় ক'রে এই ইস্পাততুল্য সিংজীর জীবন-নাট্যকে তার সমস্ত পারিপার্শ্বিক নিয়ে তিনি যে-ভাবে পর্দার ওপর রূপায়িত করেছেন, তাতে আমরা তার প্রাণের স্পন্দনকে অনুভব করেছি প্রতিনিয়ত। জীবন-নাট্যের এমন বাস্তব রূপারোপ চলচ্চিত্রের মারফত আমরা কচিৎ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি। 'অভিযান'-এ

বর্তমান সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বাজে ঘুঙরু' চিত্রের নৃত্যপটিয়সী নায়িকা নলিনী চোনকার

সিংজীর ছুটন্ত 'কেরাইসলার'-এর পিছন থেকে এসে সামনের চলন্ত ট্রেন, মোটর-গাড়ী এবং বাসকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া বা সিংজীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বাস-ড্রাইভারের দলের তার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি বহু জনচিত্তহারী দৃশ্যের সমাবেশ থাকলেও সেগুলি সিংজীর জীবন-নাট্য রচনার পক্ষে অপরিহার্য এবং সেই কারণেই ছবিটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ছবিটিকে রসসমৃদ্ধ ও বাস্তব ক'রে তুলতে চলচ্চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত-পরিচালক (এখানে সত্যজিৎ রায় নিজেই) এবং শিল্প-নির্দেশকের দান অবিস্মরণীয়। ঘটনার মুড অনুযায়ী আলো-ছায়ার অপরূপ সমন্বয়সাধন এবং বহির্দৃশ্যে রাত্রিকালকে রূপায়িত ক'রে চিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আবহ-সঙ্গীত রূপে কোথাও সেতার, কোথাও তবলা, আবার কোথাও বা দূরাগত সমবেত-সঙ্গীতকে পরিমিতভাবে ব্যবহার ক'রে যে আশ্চর্য এফেক্টের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা' সঙ্গীত-পরিচালকরূপে সত্যজিৎ রায়ের সূক্ষ্ম রসবোধেরই পরিচায়ক। শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত এমন সুকৌশলে দৃশ্য-পট রচনা করেছেন, যা বাস্তবরূপে বিভ্রমের সৃষ্টি করে। সম্পাদক দুলাল দত্ত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার ভিতর দিয়ে ছবির গতিবেগ রক্ষায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'অভিযান'-এ সংলাপের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রায় আধা হিন্দী ও আধা বাঙলা সংলাপের অদ্ভুতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এই ছবিটিতে এবং তা' কোথাও বা হাস্যোদ্রেককারী কৌতুকরসে ভরা, আবার কোথাও বা মর্মস্পর্শীভাবে সংবেদনশীল। বহির্দৃশ্যের শব্দগ্রহণে

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বর্ণচোরা'র একটি দৃশ্যে অনিল চ্যাটার্জি ও সন্ধ্যা রায়

কিন্তু প্রতিগ্রাহ্যতার দিক দিয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বনের অবসর ছিল।

অভিনয়ে নরসিংয়ের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মোটরচালক রাজপুত ছত্রীকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। বাঙলা চিত্রে প্রথম পদার্পণ ক'রেই ওয়াহিদা রেহমান আমাদের চিত্তহরণ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনো বাঙালী অভিনেত্রীকে দিয়ে কি এই গুলাবীর ভূমিকা অভিনয় করানো যেত না। আমাদের বিনীত উত্তর হচ্ছে—না, যেত না। গুলাবী যখন স্থির নিশ্চয় যে, সিংজী তাকে সাদী ক'রে তাকে বধূর সম্মান দেবে, তখন তার মনের আনন্দকে ওয়াহিদা রেহমান যে-ভাবে প্রথমে গুন্-গুন্ ক'রে শুরু করে পরে ধীরে ধীরে দেহ দুলিয়ে মৃদু পদক্ষেপে গান গেয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত দ্রুত লয়ে তার নাচগানকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা কোনো বাঙালী অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। চরিত্রটিকে তিনি একান্ত দরদ দিয়ে রূপায়িত ক'রে তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সুখনরামের ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষ চরিত্রাভিনেতারূপে তাঁর অসামান্যতার আর একটি নিদর্শন দিলেন। সহকারী জীপ-ড্রাইভার যোশেফের ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং যোশেফ-ভগ্নী মেরী নীলিমার ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। এ ছাড়া আর সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় যথাযোগ্য অভিনয় করলেও ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে উল্লেখ করতে হয় রবি ঘোষ (সিংজীর সহকারী), অজিতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলিমার নীরব প্রেমাস্পদ), শেখর চট্টোপাধ্যায় (বাস-ড্রাইভার), বীরেশ্বর সেন (এস-ডি-ও) এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় এস-ডি-ও)-এর নিপুণ নাট-নৈপুণ্যের।

সম্পূর্ণ নূতন পটভূমিকায় প্রস্তুত, গতানুগতিকতাবর্জিত নূতন ধরনের ছবি 'অভিযান'-এর বিজয় অভিযান নিঃসন্দেহে হবে গৌরবান্বিত।

বিবিধ সংবাদ

এস্. সি. প্রোডাকসন্স-এর 'শুভদৃষ্টি':

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্ত বসু পরিচালিত এস্. সি. প্রোডাকসন্স-এর নবতম নিবেদন 'শুভদৃষ্টি' জনতা পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টো-বর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, গীতা দে, ছবি বিশ্বাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার প্রভৃতি কৃতীশিল্পী।

ফিল্ম এজ-এর "কুমারী মন":

আজ শুক্রবার, ৫ই অক্টোবর থেকে মিতালী ফিল্মসের পরিবেশনায় ফিল্ম এজ-এর চিত্রনিবেদন "কুমারী মন" মুক্তি

'ঢেউএর পরে ঢেউ' চিত্রে নবাগতা শম্পা

পাচ্ছে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা এবং অপরাপর ছবিঘরে। শক্তিপদ রাজগুরু রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটির পরিচালনা করেছেন "চিত্ররথ"-গোষ্ঠী এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পীদের।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ :

পশ্চিম জার্মানী এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে দুজন নাট্যবিশেষজ্ঞ অতি শীঘ্রই ভারত ভ্রমণে আসছেন। এ'রা দুজনই বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত কয়েকটি সভায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের দেশের বর্তমান নাট্য জগত সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
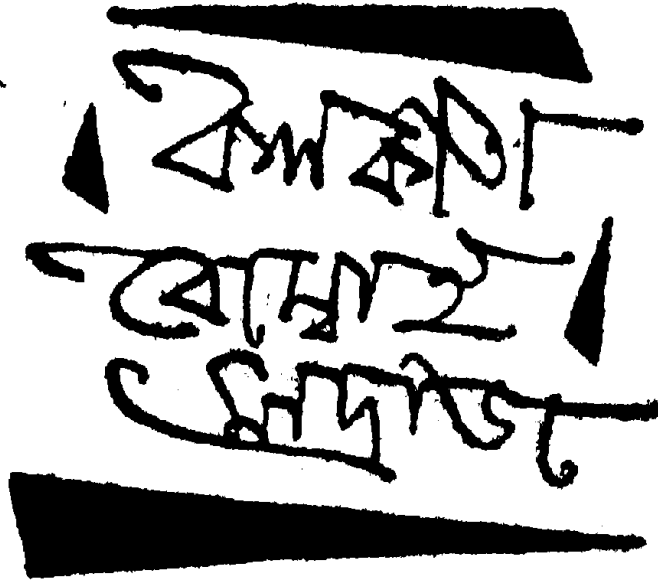
।। কলকাতা ।।

মৃণাল সেন পরিচালিত 'অবশেষে'-এর চিত্রগ্রহণ চলেছে টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয়। সম্প্রতি একটি বিরাট রেস্তোরার দৃশ্য গৃহীত হল। পূজার পর মৃণালবাবু সদলবলে বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য বাইরে যাবেন রাঁচী অঞ্চলে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বভাবের স্বাদ' গল্প অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসেন। ইতিমধ্যে এ ছবির কয়েকটি গান গৃহীত হয়েছে। গ্রহণ করেছেন সঙ্গীত পরিচালক রবীন চ্যাটার্জী। প্রধান চরিত্রের কয়েকটি নাম—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, সুলতা চৌধুরী, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত, ছায়া দেবী ও বিধায়ক ভট্টাচার্য। আলোকচিত্র ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন শৈলজা চট্টোপাধ্যায় এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও বিনু বর্ধন পরিচালিত 'একটুকরো আগুনে' সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হল গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার হলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কাহিনী চরিত্রানুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কালী ব্যানার্জী, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ, তন্দ্রা বর্মন, মিতা চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, অপর্ণা দেবী, সুব্রতা সেন, আভা মন্ডল, শীতল ব্যানার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, খগেন পাঠক ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'শেষ অংক' ছবির দৃশ্য ও সংগীত গ্রহণের কাজ শেষ হল। এই মাসেই আবহ-সঙ্গীত গৃহীত হবে। সংগীত গ্রহণ করেছেন পবিত্র দে। বর্তমানে সম্পাদনার কাজ চলেছে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে। প্রধান দুটি চরিত্রের নাম উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, তরুণকুমার, দীপক মুখার্জী, শিশির বটব্যাল, রেণুকা রায় ও জীবেন বসু। কল্পনা মুভিজের পক্ষ থেকে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি বহির্দৃশ্যের প্রথম অংশের কাজ শেষ করলেন পরিচালক অসীম পাল 'দুইবাড়ী' ছবির। নায়ক-নায়িকা অনিল চ্যাটার্জী ও তন্দ্রা বর্মণকে নিয়ে কয়েকটি মধুর দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। এ ছবির কাহিনী লিখেছেন শৈলেন দে। আলোকচিত্রশিল্পী মনীশ দাশগুপ্ত ও কানাই দে। সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, গীতা দে, রেণুকা রায়, অনুপকুমার, মিতা চ্যাটার্জী, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, জীবেন বসু ও মণি শ্রীমানি। প্রযোজনা করেছেন অখিল দত্ত ও বিজু সরকার।

"সাত পাকে বাঁধা"র বহির্দৃশ্য গ্রহণের উপযোগী স্থান নির্বাচনের জন্যে পরিচালক অজয় কর ব্যবস্থাপক বিমল দের সঙ্গে সম্প্রতি রাজস্থান যাত্রা করেছেন। এ'রা জয়পুর, যোধপুর, চিতোরগড়, অম্বর, উদয়পুর, এবং আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চল ঘুরে এ'দের মনোমত স্থান নির্বাচন করবেন। পাঠক-দের জানা আছে যে, এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, মলিনা, ছায়া দেবী, রেখা মল্লিক প্রভৃতি শিল্পীকে এবং এতে সুরযোজনা করছেন হেমন্তকুমার।

গত সোমবার, ১লা অক্টোবর এক নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সুরঞ্জনা চিত্র প্রতিষ্ঠানের চিত্রনিবেদন "দেখা হ'ল"-র শুভমুহূর্ত উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

।। বোম্বাই ।।

রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের পরবর্তী ছবির নায়কের জন্য মনোনীত হয়েছেন রাজেন্দ্রকুমার। ছবিটি পরিচালনা করবেন ইন্দর রাজ আনন্দ। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের জন্য চুক্তিবন্ধ হয়েছেন মামুদ, শশীকলা, বিজয়া চৌধুরী ও ফিরোজ খান। এই মাসেই বহির্দৃশ্যের জন্য পরিচালক লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হবেন। সংগীত পরিচালনা করবেন রোশান।

নায়িকা নূতন এবারে সংগীতশিল্পী হলেন। সম্প্রতি নূতন রাওয়াল ফিল্মসের 'দিল হি তু হায়' চিত্রে কণ্ঠদান করেছেন তাঁর জন্মদিনের একটি দৃশ্যে। রাজ কাপুর-এর গানটি গেয়েছেন মুকেশ। সংগীত পরিচালনা করছেন রোশান। ছবির পরিচালক পি, এল, সন্তোষী এবং সি, এল, রাওয়াল।

ফিল্মস্থান স্টুডিওয় প্রযোজক ও পরিচালক সুবোধ মুখার্জী তাঁর রঙিন ছবি 'এপ্রিল ফুল'-এর দৃশ্য গ্রহণ করছেন। বাংলার নায়ক বিশ্বজিৎ বর্তমানে এখানে এসেছেন। নায়ক-নায়িকার কয়েকটি মধুর দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সায়রা বানু অভিনয় করেছেন। এ ছবির কাহিনী লিখেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ। দেওয়ালির পর এ ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ আরম্ভ হবে দিল্লীতে।

অভিনেতা আই, এস, জোহর তাঁর ছবি 'গোয়া'-র প্রযোজক ও পরিচালক হয়েছেন।

ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ চলেছে। মামুদ ও জোহর অভিনীত কয়েকটি দৃশ্য সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করবেন কল্যাণজী এবং আনন্দজী।

।। মাদ্রাজ ।।

অঞ্জলী পিকচার্সের পরবর্তী ছবির জন্য নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বৈজয়ন্তীমালা। 'বিখ্যাত উপন্যাস' 'আঁধারে চিরাগ' অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন ইন্দর রাজ আনন্দ। প্রযোজক ও গীতিকার আদিনারায়ণ রাও ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলী দেবী সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এসে এ ছবির প্রধান একটি চরিত্রের জন্য অশোককুমারকে চুক্তিবন্ধ করেছেন।

বিবাহের পর পদ্মিনী 'কাউ, রোজা' ছবিতে আবার অভিনয় করছেন। সম্প্রতি ছবিটির চিত্রগ্রহণ চলেছে মডার্ণ স্টুডিওয়। নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন এস, এস, রাজেন্দ্র। পদ্মিনী সম্প্রতি শ্রীরামালুর একটি নতুন ছবির নায়িকার জন্য চুক্তিবন্ধ হয়েছে। সম্ভবতঃ নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন শিবাজী গণেশন। চিত্রে অভিনয় ছাড়াও পদ্মিনী 'ভারত নাট্যম' একটি নৃত্যানুষ্ঠানের মহলায় জন্য ব্যস্ত রয়েছেন। আগামী ২১শে অক্টোবর রাজাহা আন্নামালি মনরম মঞ্চে এই নৃত্যানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
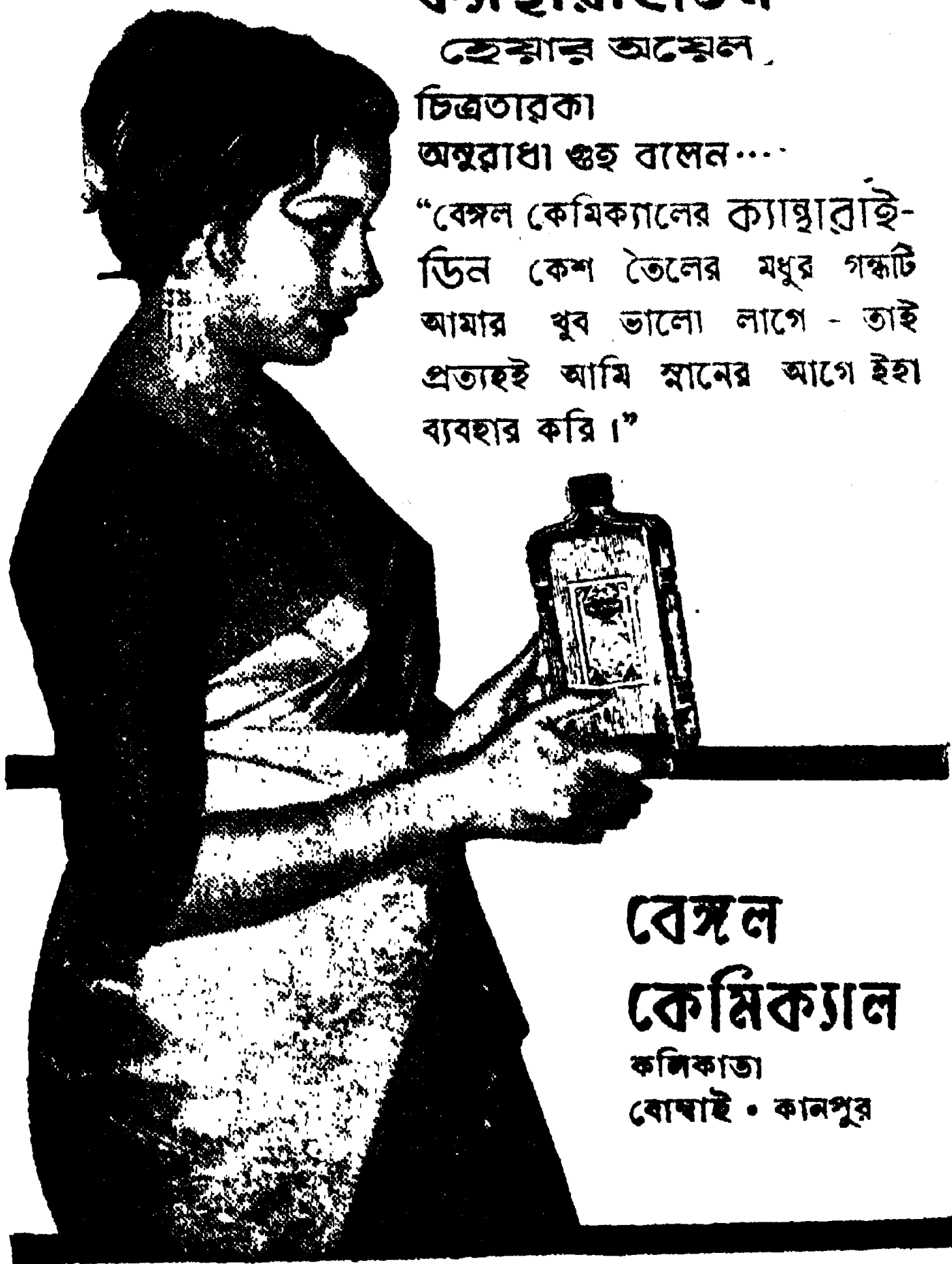
টালিগঞ্জের নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে দুই স্বনামধন্য পরিচালকের চিত্র গ্রহণ পাশাপাশি স্টুডিও-ফ্লোরে সমাপ্ত হতে চলেছে। একটি অজয় কর পরিচালিত 'সাত পাকে বাঁধা।' অপরটি তপন সিংহ-এর 'নির্জন সৈকতে।' সেদিন দুটি ছবির এক সঙ্গেই চলচ্চিত্র গ্রহণ চলছিল। 'নির্জন সৈকতে'-র চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে সমস্ত খবর এর আগে আপনাদের জানিয়েছি। কাহিনী, চরিত্র-লিপি এবং কলা-কুশলীদের কথাও

জনতা পরিবেশিত এস সি প্রোডাকসন্স-এর 'শুভদৃষ্টি'র নায়িকা সন্ধ্যা রায়

বলেছি। এ চিত্রের নায়ক-নায়িকা হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। পরিচালক তপন সিংহ জানালেন, তিনি এই মাসেই পুরী যাচ্ছেন সদলবলে বহির্দৃশ্যের জন্য। ভুবনেশ্বর, চিল্কা, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও কোণারককে নির্জন সৈকতে-র দৃশ্যগ্রহণ করবেন। পরে সে খবর জানবেন। আর ভি বনশল প্রযোজিত 'সাত পাকে বাঁধা' ছবি সম্পর্কে বলছি। এ কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রে অর্চনা বসু ও সুখেন্দু মিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুচিত্রা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, প্রশান্তকুমার ও অনিল দে। এবারে কাহিনী শুনুন। কাহিনীকার হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করবেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। মূল কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

বছর ছাত্রিশ বয়স হবে অর্চনা বসুর। এম-এ পাশ করে এক মফঃস্বল শহরের মেয়ে ইস্কুলের চাকরী নেয়। ছাত্রী মহলে জনপ্রিয় হলেও অর্চনা সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল আছে। ধপধপে সাদা পোশাক। সাদা ফ্রেমের চশমা। সাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড। পায়ে সাদা জুতো। সব মিলিয়ে সাদাটে ব্যবধান। মেয়েদের আভরণে যে সাদা রিক্ত দেখায়, তেমনি নয়। এ আর এক রূপ। চোখ ধাঁধায়। দু বছর এমনিভাবেই চলেছে তার। হয়তো অর্চনার শেষ জীবনটা এখানেই চলে যেতো কিন্তু এই ইস্কুলের সেক্রেটারীর ভাইপো নিখিলেশ সম্পর্কে একটা কানাঘুষো ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য

একথা অর্চনার কানে যেতে নিখিলেশকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করে—

অর্চনা—আপনার বয়স কতো?

নিখিলেশ — বছর উনত্রিশ-ত্রিশ...।

অর্চনা—আমিও ভেবেছিলাম। আমার ছত্রিশ। এম-এ পড়তে পড়তে মাঝখানে কয়েক বছর পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাকে ঠিক বুঝতে পারেননি। আমি কোন হতাশা নিয়ে বসে নেই, বরং নিজেরই ভুলের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করছি। আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান আপনাকে আর বেশি কি বলব।

হতভম্বের মত নিখিলেশ সেদিন বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু অর্চনা সারা-রাত জেগে নিজের ফেলে আসা জীবনের অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলাতে আবার সে জীবনে ফিরে গেল রাতের আঁধারে।

কলকাতা সহর। অর্চনা তখন ইউ-নিভার্সিটিতে পড়ে। বাড়ীর গাড়ি ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে মা গাড়ি নিয়ে বেরুলে সে দোতলা বাসে কলেজে আসতো। একদিন এই দোতলা বাসেই ঘটনাচক্রে প্রফেসর সুখেন্দু মিত্রের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারপর বাবা ডক্টর বাসু আর ছোট বোন বরুণার সান্নিধ্যে একদিন মায়ের অজান্তেই সুখেন্দুর সঙ্গে অর্চনার বিয়ে হয়ে গেল। দাদার বন্ধু এবং সাইকেল-রিকশার ব্যবসার পার্টনার নীন-মাধব এ ব্যাপারে একেবারে দমে গেলেন। নীলমাধবের কাছে মায়েরও মাথা হেঁট হল।

অর্চনা এখন সংসারী হলেও সংসারের কর্ত্রী ছিলেন পিসিমা। পিতৃ-মাতৃহীন সুখেন্দুর ছাত্র জীবনের শেষে পিসিমা সে ব্যয়ভার বহন করে চলেছেন। বিয়ের পর পিসিমার দুর্ভাবনা গেছে। মুখে না বললেও তিনি অর্চনার ওপর খুব খুশি। বিয়ের তৃতীয় দিনেই অর্চনার মিষ্টি জুলুমে সুখেন্দুর গুরুগম্ভীর ভাবটা অনেক হাল্কা হয়েছে। সুখেন্দুর নিজের পরিবর্তনে নিজেই অবাক হয়েছে। অর্চনা-সুখেন্দু এখন একটিই নাম। ছুটির দিনগুলো ডায়মন্ডহারবার কিংবা গঙ্গার নৌকো ভাড়া করে দুজনেই মাঝির কাছ থেকে হাল ধরে নৌকো ঘুর-পাক খাইয়েছে। বেলা গড়িয়ে বিকেলের আলো পায়ে-পায়ে যখন যাই-যাই করছে তখনও সুখেন্দু একটা হাত জলে ডুবিয়ে একটা লম্বা দাগ কেটে চলেছে। পাশেই বসেছিল অর্চনা। কৃত্রিম মোটা গলায় মিষ্টি দুষ্টুমিতে সে বলে—

সুখেন্দুবাবু, ওকি হচ্ছে? ওখানে হাত কেন, একটা কিছুতে ধরে টান দিলে—? সুখেন্দু ভুরু তুলে—তা বলে তুমি আমার নাম টান দেবে! দাঁড়াও পিসিমাকে বলছি—

অর্চনা মিটি-মিটি হেসে আবার বলে—

—আহা, কি খাসা নাম! সুখেন্দু...... সুখের সঙ্গে তো কোনোকালেই সম্পর্ক ছিল বলে তো মনে হয় না!

সুখেন্দুর মতলব অন্য রকম। আরও কাছে এগিয়ে এসে বলে—হয় না বুঝি...?

ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারীতে 'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রের নেগেটিভ পরীক্ষা করছেন কর্মাধ্যক্ষ আর, বি, মেহেতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযান' চিত্রে ওহেদিয়া রহমান

—ভাল হবে না বলছি! সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটিয়েই অর্চনা বাধা দেয়। আর সুখেন্দুর বিব্রত অবস্থা দেখে অর্চনা হাসির ফুলঝুরি জ্বালায়।
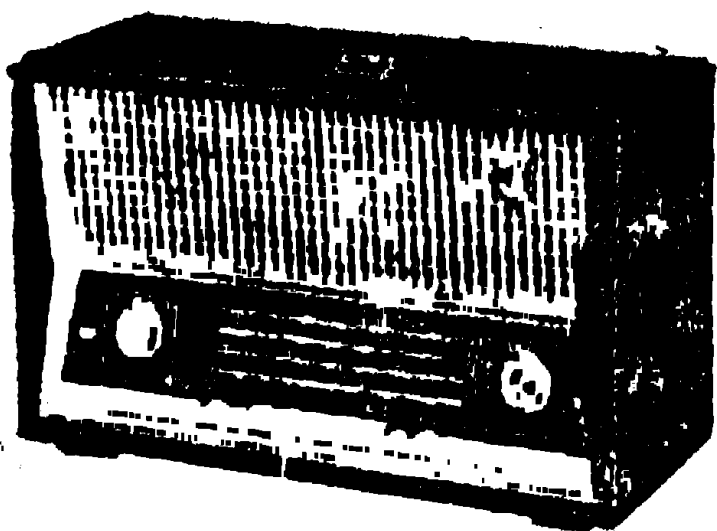
এমনিভাবে সুন্দর দিনগুলো কাটছিল। কিন্তু কি যেন হ'ল একদিন সংসারে। অবশ্য এর জন্য দায়ী একমাত্র অর্চনার মা। ফাঁক পেলে জামাইকে পর্যন্ত সমালোচনা করতে ছাড়েন না। ফলে সুখেন্দু পর্যন্ত ছাড়িয়ে চলে অর্চনাকে। মায়ের সমস্যা ছিল পিসিমাকে নিয়ে। একজন গ্রামের বিধবা এখানে কর্তৃত্ব করবে সে তিনি সহ্য করতে না পেরে এই সুখের সংসারে বিষ ছড়িয়ে দিলেন। পিসিমা সব বুঝতে পেরে সুখেন্দুকে কিছু না বলে তিনি দেশে চলে গেলেন। কিন্তু অর্চনার মা তাতেও সুখী নয়। সুখেন্দু বেঁকে বসে। অর্চনার সঙ্গেও কথা বলে না। এর মধ্যে অর্চনার বোন ও দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। মা তাকে সুখেন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। শুধু বাবা নির্বাক। আপন লেখাপড়ায় তিনি ব্যস্ত থেকে সংসার ভাঙার দিন এল।

অর্চনাই প্রথম বলে—আমাদের তাহলে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল, কেমন?— কি করে, সুখেন্দু জিজ্ঞেস
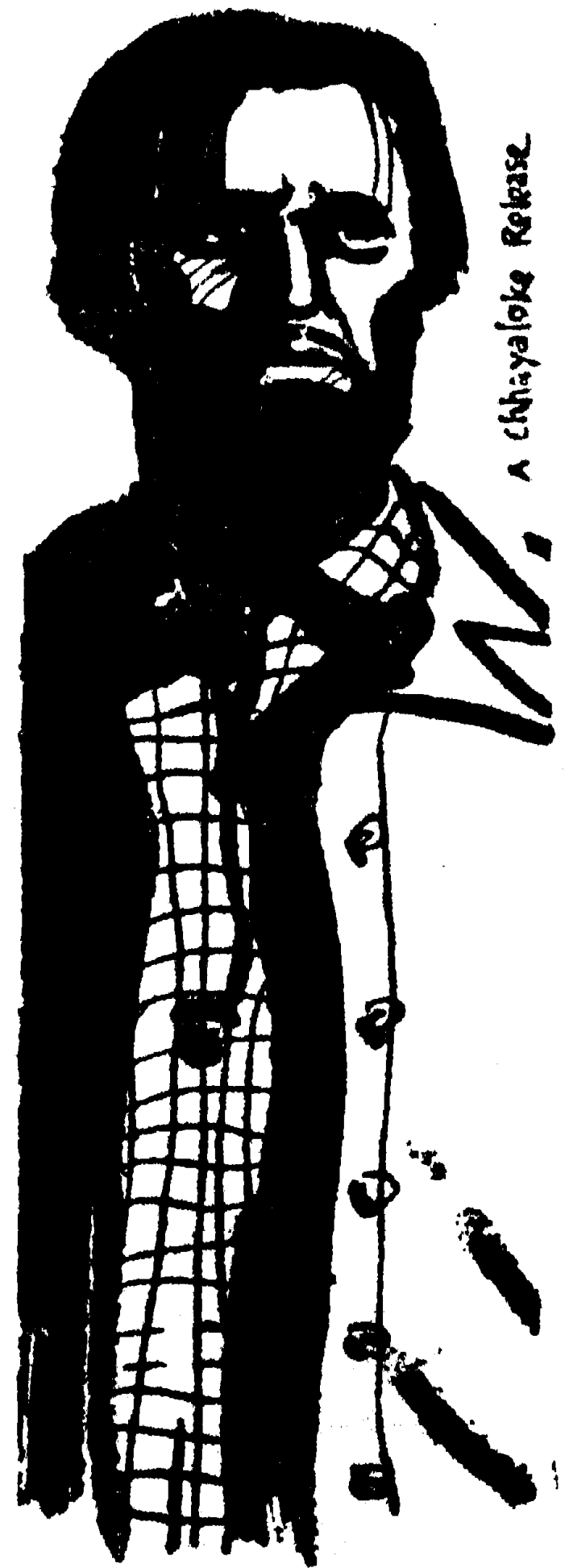
করে। অর্চনা তেমনি শান্তভাবে উত্তর দেয়—আইনে যেমন করে হয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হল। অর্চনা ফিরে এসেছে বাপের বাড়ী। আবার পড়াশুনো আরম্ভ করে দিয়েছে নতুন করে বাঁচবার জন্য। ননিমাধব আর নিখিলেশ এখনও আশা ছাড়েনি অর্চনার ওপর। কিন্তু সুখেন্দু! সে বিয়ে করেছে আবার।

—চিত্রদূত

নবীন দেশী ছবি

স্ট্রংরুম :

অনেক সময় স্বল্প ব্যয়ের ছবি ব্যয়-বহুল তারকা-পীড়িত ছবির চেয়ে বেশী সাফল্যলাভ করে। পশ্চিম দেশে ক্রমশঃ স্বল্পে ব্যয়ের ছবি নির্মাণের দিকে প্রযোজক পরিচালকদের ঝোঁক বাড়ছে। ইটালীর 'নিওরিয়ালিস্ট' এবং বৃটেন-ফ্রান্সের 'নিউ-ওয়েভ' গোষ্ঠি স্বল্পব্যয়ের ছবিতেই বেশী উৎসাহী। 'স্ট্রংরুম' চিত্রটি যদিচ নব তরঙ্গে ভাসমান বুদ্ধি-জীবি চলচ্চিত্র নয়, তবু নবাগত স্টার সিসটেম-এর শেকল কাটার একটি সফল নিদর্শন।

'স্ট্রংরুম' একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির গল্পকে কেন্দ্র করে চিত্রায়িত হয়েছে। কাহিনীর নায়ক হল তিনজন নবীন ডাকাত যাদের ডাকাতির হাতেখড়ি ইতি-পূর্বে হয় নি। তারা তিনজনে ঠিক করল পাড়ার ব্যাঙ্কটি লুঠ করবে। অনেকদিন ধরে ভেবে চিন্তে তারা ডাকাতির পরি-কল্পনাটি করে ফেলল। তারা ঠিক করল ইস্টারের ছুটিতে যখন কর্মচারীরা সব ছুটিতে যাবে তখন ব্যাঙ্ক ভেঙ্গে ঢুকবে। কিন্তু গোলমাল বাধল যখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং মহিলা সেক্রে-টারী নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরুতে পারলেন না কাজের চাপে। ডাকাতদের নেতা ঠিক করল দুজন ব্যাঙ্কে থাকতেই তারা ভেতরে ঢুকবে। একজন তার বাবার পিয়নের পোষাকটা পরে বেপরোয়া হয়ে দরজার কলিং বেলটা বাজালো। মহিলা সেক্রেটারীটি দরজা খুলে দিতেই তিনজনে জোর করে ভেতরে ঢুকে দুজনের হাত পা বেঁধে ফেলল। কিন্তু অন্য একটি বিপদ দেখা দিল ইতিমধ্যে। বাড়ী পরিস্কার করার লোকজন এসে পড়ল ব্যাঙ্কে। তাড়াতাড়ি হাত পা বাঁধা ম্যানেজার আর তার সেক্রেটারীকে ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুমের মধ্যে পুরে টাকা পয়সা নিয়ে তিনজনে সরে পড়ল ব্যাঙ্ক থেকে। কিন্তু ডাকাতদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে বিবেকের তাড়নায় অস্থির হলো। কারণ স্ট্রংরুমে বন্দী দুজন লোক যদি ছুটির দুটো দিন স্ট্রংরুমের মধ্যে বন্দী থেকে যায় তাহলে হাওয়ার অভাবে মারাই যাবে। আবার ইতিমধ্যে নানান ঘটনাবর্তে ডাকাতদের একজন মোটর এ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। দ্রুত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওদিকে স্ট্রংরুমে বন্দী দুজন—ম্যানেজার এবং মহিলা সেক্রেটারী দারুণ বিপদের মধ্যে যেন পরস্পরকে আরো ঘনিষ্টভাবে চিনতে আরম্ভ করেন।

সাসপেন্স ছবি হিসেবে 'স্ট্রংরুম' একটি সার্থক ছবি। চিত্রনাট্যকার ম্যাক্স মারকুইস এবং রিচার্ড হ্যারিস কাহিনীর গতিবেগকে কোথাও এতটুকু শ্লথ হতে দেন নি। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন ভারনন সিওয়েল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কলিন গর্ডন, অ্যানলিন হলেন মহিলা সেক্রেটারী এবং ডাকাত তিনজনের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ডেরেন নেসবীট, কীথ ফকনার এবং মর্গান শেপার্ড।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ ॥

বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটারসন বনাম সনি লিস্টনের মুষ্টিযুদ্ধ উপলক্ষ্য ক'রে আমেরিকার জনসাধারণের চিন্তারাজ্যে যে উদ্বেগ এবং উত্তেজনার আলোড়ন পর্বত-প্রমাণ আকার ধারণ করেছিল সম্প্রতি লড়াইয়ের ফলাফলে তা অনেকটা শান্ত হয়েছে। লিস্টন প্রথম রাউণ্ডের ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে ফ্লয়েড প্যাটারসনকে নক-আউট ক'রে বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। লিস্টনের প্রচণ্ড 'লেফট্-হুক' ফ্লয়েড প্যাটারসনের মাথায় বজ্রপাতের কাজ করে। প্যাটারসনের সর্বদেহে দারুণ কম্পন দেখা দেয় এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি বে-সামাল হয়ে পড়েন। প্যাটারসনের হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপ অক্ষুন্ন রাখার দিন ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে লিস্টন ঠাণ্ডা মাথায় প্যাটারসনের ডানদিকের চোয়ালে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেন এবং তাঁর ভূতলশায়ী হওয়ার আগেই প্যাটারসনের বাঁদিকের চোয়াল লক্ষ্য ক'রে লিস্টন তাঁর শেষ অস্ত্র— 'হুক' নিক্ষেপ করেন। লিস্টনের অতি-দ্রুত তিনটে ঘুষি শেষ পর্যন্ত প্যাটারসনকে বিশ্ব হেভীওয়েট বিভাগ থেকে গদিচ্যুত করে। ১৫ রাউণ্ডের খেলা প্রথম রাউণ্ডেই শেষ হয়। হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম রাউণ্ডেই খেলার নিষ্পত্তি হওয়ার নজির আছে মাত্র আটবার। এই আটবারের মধ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো লুই প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করেছিলেন পাঁচবার; প্রথম রাউণ্ডে দু'বার জয়লাভ করেছিলেন টমি বার্নস এবং একবার রকি মার্সিয়ানো। কম সময়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার যে অল্প কয়েকটি নজির আছে প্যাটারসন বনাম লিস্টনের এই লড়াইও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো।

এ-সম্পর্কে দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ১৯০৮ সালের ১৭ই মার্চ ডাবলিনে টমি বার্নস ১ মিনিট ২৮ সেকেণ্ডে জেম রোচিকে পরাজিত করেন এবং ১৯৩৮ সালের ২২শে জুন নিউ-ইয়র্ক সিটিতে আমেরিকার নিগ্রো মুষ্টি-যোদ্ধা জো লুই ২ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে জার্মানীর ম্যাক্স স্মেলিংকে পরাজিত করেন। এই দুটি ঘটনার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি আজও সর্বাপেক্ষা কম সময়ে খেলার নিষ্পত্তি হওয়ার রেকর্ড হিসাবে গণ্য। বিশ্ব হেভীওয়েট খেতাব নিয়ে প্যাটারসন এবং লিস্টনের মনোমালিন্য গত দু'বছরের পুরনো। এই দু'বছর লিস্টন ছিলেন জোঁকের মত প্যাটারসনের পিছনে লেগে ছিলেন। লিস্টন এক-নাগাড়ে জোর গলায় প্যাটারসনকে চ্যালেঞ্জ ক'রে যান এবং প্যাটারসনের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাঁকে কাপুরুষ আখ্যায় জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করেন। প্যাটারসনের পরামর্শদাতা লিস্টনের চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্যাটারসনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্যাটারসন তাঁর পরামর্শদাতার উপদেশ উপেক্ষা ক'রে লিস্টনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।
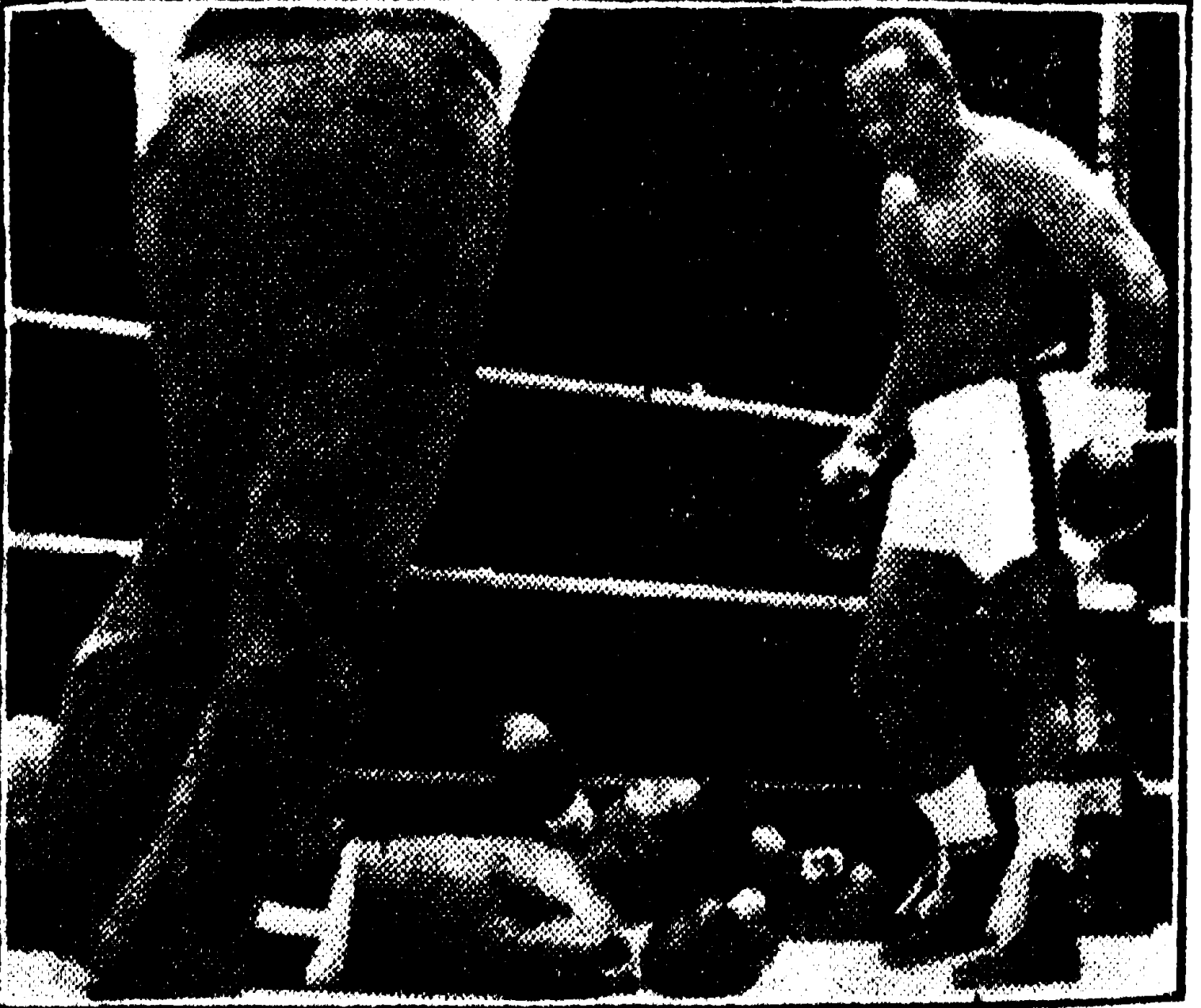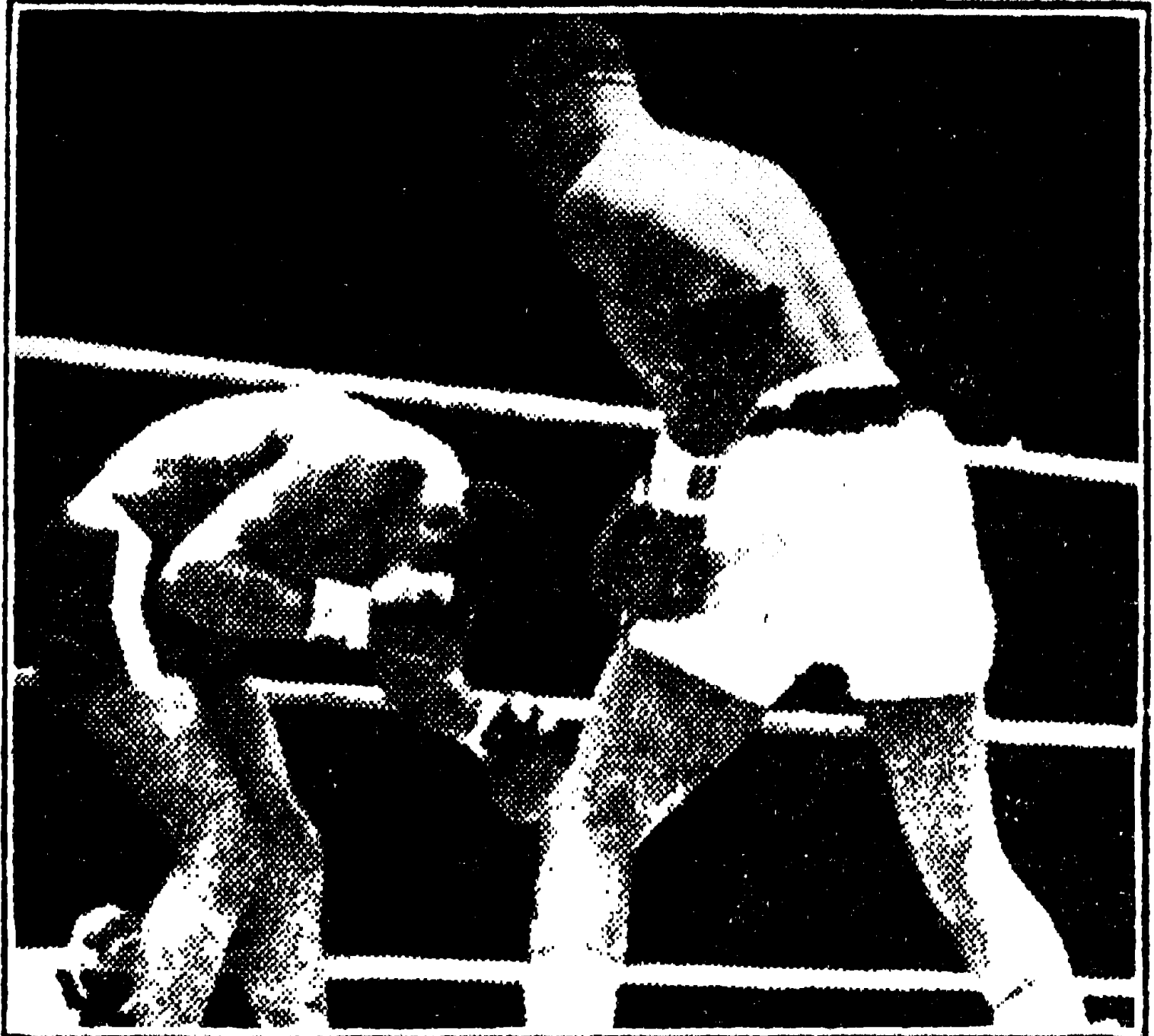
(উপরে) : লিস্টনের ঘুষি খেয়ে প্যাটারসন হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছেন। (নীচে) : প্যাটারসন মেঝের উপর পড়ে আছেন। রেফারীর ডাকে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লড়াইয়ে আর নামতে পারেন নি। ১৫ রাউণ্ডের লড়াই প্রথম রাউণ্ডের ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে শেষ হয়।

মুষ্টিযোদ্ধা সনি লিস্টনের ব্যক্তিগত জীবন খুবই বিচিত্র—অখ্যাতি এবং খ্যাতিতে তিনি আজ পৃথিবীর অতি পরিচিত ব্যক্তি। মুষ্টি যুদ্ধে তাঁর বর্তমানের এই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অনেকেরই চোখে কিন্তু অবজ্ঞার বস্তু। কারণ তাঁর সম্পর্কে পুলিশের রেকর্ড খুবই খারাপ। তাছাড়া মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষতির কারণে পেনসিলভানিয়া স্টেট এ্যাথলেটিক কমিশন ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিস্টনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। এবং অনুরূপ কারণেই লিস্টন বনাম প্যাটারসনের বিগত লড়াইটি নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাথলেটিক কমিশনের সম্মতি লাভ না করায় নিউইয়র্ক থেকে চিকাগোতে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। লড়াই শেষ হওয়ার সংগে সংগে দর্শকমণ্ডলীর এক বিরাট অংশ মারমুখী হয়ে লিস্টনের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনিতে মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা প্রকাশ করে। লিস্টনের চোখে-মুখে কোন উত্তেজনার চিহ্ন ছিল না। তিনি রিংয়ের মধ্যে ধীর-স্থির হয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সম্বর্ধনার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়েছিলেন।

ভূতপূর্ব বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান

১৮৮২-১৮৯২	জন এল সুলিভান
১৮৯২-১৮৯৭	জেমস জি করবেট
১৮৯৭-১৮৯৯	রবার্ট ফিজসিমন্স
১৮৯৯-১৯০৫	জেম্স জে জেফ্রিজ
১৯০৫-১৯০৬	মারভিন হার্ট
১৯০৬-১৯০৮	টমি বার্নস
১৯০৮-১৯১৫	জ্যাক জনসন
১৯১৫-১৯১৯	জেস উইলার্ড
১৯১৯-১৯২৬	জ্যাক্ ডেম্পসি
১৯২৬-১৯২৮	জিনি টুনি *
১৯২৮-১৯৩০	শূন্য
১৯৩০-১৯৩২	ম্যাক্স স্মেলিং
১৯৩২	জ্যাক শার্কি
১৯৩৩	প্রিমো কারনেরা
১৯৩৪	ম্যাক্স বেয়ার
১৯৩৫-১৯৩৬	জেমস জে ব্র্যাডক্
১৯৩৭-১৯৪৯	জো লুই *
১৯৪৯-১৯৫১	এজার্ড চার্লস
১৯৫১-১৯৫২	জো ওয়ালকট
১৯৫২-১৯৫৬	রকি মার্সিয়ানো *
১৯৫৬-১৯৫৯	ফ্লয়েড প্যাটারসন
১৯৫৯	ইংগমার জনসন
১৯৬০-১৯৬২	ফ্লয়েড প্যাটারসন

* খেতাব পরিত্যাগ করেন।

১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর ফ্লয়েড প্যাটারসন পঞ্চম রাউণ্ডের লড়াইয়ে আর্চি মুরকে নক্-আউট ক'রে প্রথম বিশ্ব খেতাব লাভ করেন। এরপর ১৯৫৯ সালের ২৬শে জুন সুইডেনের ইংগমার জনসনের কাছে তৃতীয় রাউণ্ডের লড়াইয়ে প্যাটারসন টেক্নিক্যাল নক-আউটে পরাজিত হয়ে বিশ্ব খেতাব হাত-ছাড়া করেন। এক বছর পর, ১৯৬০ সালের ২০শে জুন ফ্লয়েড প্যাটারসন পঞ্চম রাউণ্ডের খেলায় তাঁর পূর্ব-প্রতিদ্বন্দ্বী জনসনকে নক-আউটে পরাভূত ক'রে দ্বিতীয়বার বিশ্ব খেতাব পান। বিশ্ব হেভীওয়েট বিভাগের ইতিহাসে একই ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয়বার বিশ্ব খেতাব লাভের দৃষ্টান্ত মাত্র এই একটিই আছে।

দৈহিক সম্পদে সনি লিস্টন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটারসনের তুলনায় সর্বাংশে সমৃদ্ধ ছিলেন। প্যাটারসনের সাফল্যের মূলধন ছিল—তাঁর ক্ষিপ্রতা এবং বাঁ-হাতের পাঞ্চিং। লড়াইয়ের আগে লিস্টন তাঁর নিজের সম্বন্ধে দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছিলেন 'আমি পঞ্চম রাউণ্ডে নক-আউটে জয়লাভ করবো; আমার বাঁ-হাতের 'হুক' আমাকে চ্যাম্পিয়ান করবে।" প্যাটারসন লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কে কোন ভবিষ্যত বাণী করতে রাজী হননি। কেবল বলেছিলেন, "আমার মত লিস্টনের ক্ষিপ্রতা নেই সত্য, কিন্তু সেই অভাব পূরণ করার মত লিস্টনের অন্যান্য গুণাগুণ আছে।"

লড়াইয়ের শেষে বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা সনি লিস্টনের মুখে তাঁদের শৈশব-জীবনের চরম দুরবস্থার কথা জানা গেল—"আমরা অতি সামান্য খাদ্য এবং জামা-কাপড়ের মধ্যে মানুষ হয়েছি; আমাদের কোন জুতো ছিল না'। লিস্টন আরও বলেছেন "খারাপ এবং ভাল—এই দুই পথের মধ্যে দিয়ে আমি জনসাধারণের দৃষ্টিপথে এসেছি; আজ আমি খ্যাতিলাভ করেছি; কিন্তু অনেকেই আছেন, যাঁরা আমাকে এই অবস্থায় দেখতে ইচ্ছুক নন। তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে কোন গুরুত্ব না দিয়ে আমি খ্যাতির আসনে থাকতেই সংকল্প গ্রহণ করেছি। আমি প্রত্যেকের কাছে শপথ করছি, আমি ভদ্র হব এবং সম্মানিত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবো।" সনি লিস্টনের এই বিশ্ব খেতাব জয়ের মূলে ছিল তিনজনের পরামর্শ, প্রেরণা এবং সহানুভূতি। এই তিনজন হলেন,—তাঁর স্ত্রী গেরালডিন, তাঁর ট্রেনার উইলি রেডিস, পরামর্শদাতা জ্যাক নিলসন এবং ধর্মযাজক ফাদার এডওয়ার্ড মারফি। জ্যাক নিলসন ফিলাডেলফিয়ার কোটিপতি ব্যবসায়ী। তিনি সনি লিস্টনের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং খেলোয়াড়-জীবনের প্রধান উপদেষ্টা।

লিস্টন—প্যাটারসনের আলোচ্য লড়াইয়ের শেষ অধ্যায় খুবই বিয়োগান্তক। আসলে যার জন্যে লড়াই সেই বিপুল পরিমাণ টাকার থলির ভাগ-বাটোয়ারা থেকে সকলেই বঞ্চিত হয়েছেন। আমেরিকান ইণ্টারনাল রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের কর্মকর্তারা সদলবলে চিকাগোর কমিস্কি পার্ক স্টেডিয়াম এবং ২৬০টি সিনেমা হাউসে অপ্রত্যাশিতভাবে হানা দিয়ে টিকিট বাবদ বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই আটক করেছেন। সিনেমা হাউসগুলিতে টেলিভিসন মারফৎ লড়াইয়ের দৃশ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আয়কর কর্তৃপক্ষের হিসাবে আটক অর্থের পরিমাণ পাঁচ মিলিয়ন ডলার—মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে রেকর্ড। আটক অর্থ থেকে আয়কর বিভাগ পূর্বের বাকি ৪ মিলিয়ান ডলার অর্থ উসুল ক'রে নেবে। প্যাটারসন বনাম ইংগমার জনসনের শেষ দুটি লড়াইয়ের আয়কর নাকি বাকি ছিল। জনসনের শুকনো বিপদ! তিনি চিকাগোতে লিস্টার-প্যাটারসনের লড়াই দেখতে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আয়কর বিভাগের পাওনা নাকি এক মিলিয়ান ডলার। এই পাওনার মীমাংসা না ক'রে জনসন স্বদেশে (সুইডেন) ফিরে যেতে পারবেন না। তিনি আইনে আটকে পড়েছেন। রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের খবর কাক-পক্ষীরও অজ্ঞাত ছিল।

টাকা তো এখন বিশ হাত জলের তলায়। এদিকে আবার লিস্টনের এই নতুন বিশ্ব হেভীওয়েট খেতাব স্বীকার করা নিয়ে নানা ফেঁকড়া দেখা দিয়েছে।

সনি লিস্টন বনাম প্যাটারসনের মুষ্টিযুদ্ধ মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ হওয়াতে মুষ্টিযুদ্ধের গোঁড়া ভক্তের দল দারুণ মর্মাহত হয়েছেন। ডাউন টাউনের (ব্রুকলীন) ফক্স থিয়েটার হলে যাঁরা টেলিভিসনে এই লড়াইয়ের দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা মনের দুঃখ চেপে রাখতে না পেরে মারমুখী হয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষের উপর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডের দৃশ্য দেখার জন্যে প্রতি আসনের মূল্য বাবদ ৭·৫০ ডলার ব্যয় করার বোকামী তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল, যে মুষ্টির আঘাতে প্যাটারসন ভূতলশায়ী হয়েছিলেন তা পর্দার অন্তরালেই থেকে যায়—তাঁরা চোখে দেখতে পান নি। পুলিশের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দর্শকদের মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। একসংগে এতগুলি বক্সারের সম্মুখীন হ'তে তাঁরা খুবই ভয় পেয়েছিলেন।

লিস্টন-প্যাটারসনের মুষ্টিযুদ্ধ উপলক্ষ্য ক'রে সোভিয়েট সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' এক হাত নিয়েছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুষ্টিযুদ্ধ-প্রীতির উপর 'টাস' জোরালো বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন। সংবাদে সনি লিস্টনকে পশুর সংগে তুলনা ক'রে বলা হয়েছে, দর্শকরা কয়েক সেকেণ্ডের উত্তেজনায় দর্শনী বাবদ একশত ডলার

পর্যন্ত মূল্য ধরে দিয়েছেন; প্রাচীনকালে দর্শকদের পশু-মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে গ্লাডিএইটারগণ পরস্পরকে হত্যা করত আর বিংশ শতাব্দীর গ্ল্যাডিএইট্যারগণ অর্থের প্রলোভনে পরস্পরের অংগ বিকৃত করতে দ্বিধাবোধ করে না।

টাসের মতে, মার্কিণ পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ জংগলের আইনের সমতুল্য।

মুষ্টিযুদ্ধে সাফল্য

সনি লিস্টন

মোট লড়াই ৩৫ : জয় ৩৪ এবং হার ১

ফ্লয়েড প্যাটারসন

মোট লড়াই ৪১ : জয় ৩৮ এবং হার ৩

।। জো লুইয়ের সাফল্য ।।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে আমেরিকার নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৯৩৭ সালের ২২শে জুন জো লুই অষ্টম রাউন্ডের লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী জেমস ব্যাডককে নকআউটে পরাজিত ক'রে প্রথম বিশ্ব খেতাব পান। তারপর থেকে তাঁর এই বিশ্ব খেতাব-সম্মান রক্ষার জন্য জো লুইকে ২৫ বার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছিল এবং তিনি প্রতিবারই তাঁর বিশ্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এই পঁচিশবারের লড়াইয়ে জো লুই নকআউটে জয়ী হয়েছিলেন ২১ বার এবং পয়েন্টে ৪ বার। এই পঁচিশবারের মধ্যে জো লুই প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে পাঁচবার জয়লাভ ক'রে এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

জো লুই ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ অপরাজেয় অবস্থায় বিশ্ব হেভীওয়েট বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে নিজ খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি শেষবার নেমেছিলেন ১৯৪৮ সালের ২৫শে জুন, জো ওয়ালকটের বিপক্ষে। তিনি ওয়ালকটকে একাদশ রাউন্ডে নকআউটে পরাজিত করেছিলেন।

পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ

(সর্বোচ্চ দৈহিক ওজন)

	পাউন্ড
ফ্লাইওয়েট :	১১২
ব্যাণ্টমওয়েট :	১১৮
ফেদারওয়েট :	১২৬
লাইটওয়েট :	১৩৫
ওয়েল্টারওয়েট :	১৪৭
মিডলওয়েট :	১৬০
লাইটহেভী :	১৭৫
হেভীওয়েট :	১৭৫-এর ঊর্ধ্বে

জো লুই বিশ্ব হেভীওয়েট বিভাগে সর্বাপেক্ষা বেশীদিন খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন (১৯৩৭ সালের ২২শে জুন থেকে ১১ বছর ৮ মাস ৭ দিনের রেকর্ড)।

পশ্চিমবংগ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আজাদ হিন্দ বাগে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবংগ রাজ্যের কয়েকজন খ্যাতনামা সাঁতারু অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছিল। এই অনুপস্থিত খ্যাতনামা সাঁতারুদের মধ্যে কয়েকজন রাশিয়া সফররত ওয়াটার পোলো দলের সংগে আছেন। কয়েকজন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আটকে পড়েছিলেন। মতভেদের ফলে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি এমন খ্যাতনামা সাঁতারুও ছিলেন। চার দিনের প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি অনুষ্ঠানে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপিত হয়। এই নতুন রাজ্য রেকর্ডের মধ্যে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নিমাই দাসের রেকর্ড (২ মিঃ ২৫·৫ সেঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত শচীন নাগের রেকর্ড (২ মিঃ ২৬·০ সেঃ) ভঙ্গ করেন।

পুরুষ বিভাগ

২০০ ফ্রি স্টাইল : নিমাই দাস (হাটখোলা); সময় ২ মিঃ ২৫·৫ সেঃ।

জুনিয়র বিভাগ

১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক : সুনীল বিশ্বাস (ন্যাশনাল); সময় : ১ মিঃ ২৮·১ সেঃ।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : প্রেমময় বিশ্বাস (ন্যাশনাল); সময় : ৫ মিঃ ৩৯·৪ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক (বালিকা) : রাজশ্রী চ্যাটার্জি (আই এল এস এস); সময় : ১ মিঃ ৪৯ সেঃ।

ইন্টারমিডিয়েট

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক : রঞ্জিৎ ব্যানার্জি (ছাত্র); সময় : ১ মিঃ ১৮·১ সেঃ।

৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে : পশ্চিমবংগ পুলিশ; সময় : ৪ মিঃ ৪৮·২ সেঃ।

৪×১০০ মিটার মিডলে রীলে : পশ্চিমবংগ পুলিশ; সময় : ৫ মিঃ ২৭·৪ সেঃ।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : এস এন মাঝি (পঃ বঃ পুলিশ); সময় : ১ মিঃ ১৯·৬ সেঃ।

॥ উবের কাপ ॥

আন্তর্জাতিক উবের কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় (মহিলাদের দলগত অনুষ্ঠান) ভারতবর্ষ ৫—২ খেলায় হংকংকে পরাজিত করেছে। ভারতবর্ষ এশিয়ান জোন ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে খেলবে।

॥ ক্যালকাটা হার্ডকোর্ট টেনিস ॥

ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের সিংগলস : এস আখতার আলী ৬—০ ও ৬—১ গেমে গোপাল রায়কে পরাজিত করেন।
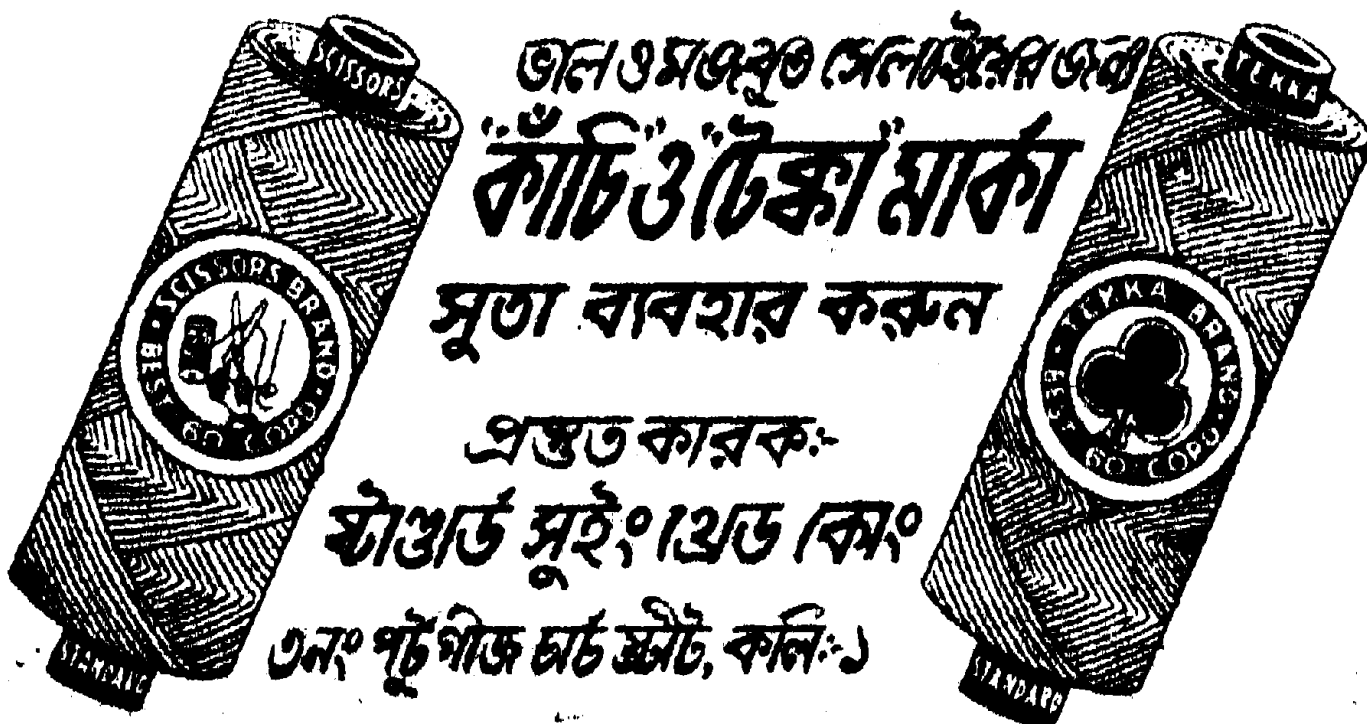
পুরুষদের ডাবলস : প্রেমজিৎলাল এবং অজিতলাল ৬—১ ও ৬—৩ গেমে নরেশকুমার এবং এস আখতার আলীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : মিস এ লামসডেন ৪—৬, ৮—৬ ও ৭—৫ গেমে মিস আর সুরাইয়াকে পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১ গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৩শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

40 Naya Paise
Friday 12th October, 1962.

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণের আদান-প্রদান আমাদের নিকট শুধু সাময়িক শিষ্টাচার বা নিয়মানুযায়িক মৌখিক শুভেচ্ছাজ্ঞাপন মাত্র নয়। যাঁহাদের আমরা আত্মীয়স্বজন বলিয়া জানি, যাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্যের ও প্রীতির আন্তরিক যোগ আছে, কার্যসূত্রে বা কর্মক্ষেত্রে যাঁহাদের সহিত পরিচয়ে মনের নৈকট্য অনুভব আমরা উভয়তঃ করিয়াছি ও সেই গুরুজন যাঁহাদের সংস্পর্শ আমাদের মনকে উন্নীত ও স্নেহস্নিগ্ধ করিয়াছে, সেইসকল আত্মীয়-বান্ধব, গুরুজন, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও স্নেহভাজন কনিষ্ঠদের সহিত অন্তরের যোগ নিগূঢ়তর ও শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ-সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর যেন হয়—এই আন্তরিক কামনার সহিত বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে বাঙালী সমাজের সকল স্তরে।

পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, কর্মী-বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, ইঁহারাই "অমৃতে"র আত্মীয়গোষ্ঠী। আমাদের এই সকল আপনজনকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাই। যে সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁহাদের নিকট হইতে লাভ করিয়া "অমৃত" পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে সেই প্রীতিবন্ধন যাহাতে দৃঢ়তর হয় আমাদের দিক হইতে সেই ইচ্ছা ও প্রয়াস আমরা জ্ঞাপন করি।

উৎসবের মধ্যে যে আনন্দ আমাদের সকলের মধ্যে নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে, সেই আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস যেন উৎসবের শেষে ক্ষীণধারা না হয়—এই আন্তরিক কামনা আমরা জানাই "বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন" সকলকে। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের জীবন বিগত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। আগামী দিনের পরীক্ষার জন্য সাহস ও শক্তি, আমরা ঐ আনন্দের উৎস হইতেই পাইব এই আত্মবিশ্বাস আমাদের যদি থাকে তবে আমাদের সকল আশা সফল হইবে নিশ্চিত। প্রগতির পথে ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে চলিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা আমাদের অন্তরে নিহিত আছে। সে পথের শেষ বহুদূরে সন্দেহ নাই, পথের দাবীও অনেক ইহাও সত্য, কিন্তু বাঙালীর প্রাণশক্তি অফুরন্ত কেননা প্রতি বৎসরের এই শারদীয়ার সিঞ্চনে উহা ভরিয়া যায়। আত্মবিশ্বাস ধৈর্য ও দায়িত্বগ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে বাঙালীর অসাধ্য কিছু নাই —এ শিক্ষা তো আমাদের দিয়া গিয়াছেন আমাদের পূর্বসূরীগণ।

আজ নূতন করিয়া পথ চলার মুখে আমাদের পিছনে-ফেলা পথের সকল নৈরাশ্য সকল বেদনা ভুলিয়া নূতন উদ্যমে অগ্রসর হইতে হইবে। তবে তাহারই মধ্যে যাহারা আর্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত তাহাদের কথা মনে রাখিতে হইবে মানবত্বের কারণে। বাঙালীর দেশাত্মবোধের ক্ষেত্র দীর্ঘদিন হইতেই সুদূর প্রসারিত, সমগ্র ভারতের সকল নরনারীই আমাদের ঐ বৃহত্তর আত্মীয়গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সেই দূরের আত্মীয়দিগের মধ্যে যাহারা এইবারের ব্যাপক বন্যাপ্লাবনে ক্লিষ্ট, তাহাদের সকলকে সাহায্য ও সমবেদনার বার্তা প্রেরণে আমরা যেন কুণ্ঠিত না হই। বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার চিন্তায় যেন আমাদের মন কলুষিত না হয়—এই কামনা জানাইয়া শেষ করি এই পবিত্র দিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

আপনারা আমার বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

পুজোর ক'টা দিন আশা করি আপনারা ভালই ছিলেন, এবং পরিবার-পরিজনসহ শারদোৎসবের আনন্দ উপভোগ করেছেন।

আনন্দ অবশ্য অনেকটাই মানসিক। অভাবের সংসারে ছোটখাট অশান্তি আমাদের নিত্যসহচর। তবু আলোক-মালাসজ্জিত উৎসব-প্রাঙ্গণ, সুবেশ নরনারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং শিশুদের উচ্ছ্বসিত কাকলী কয়েকদিনের জন্যে হলেও মনটাকে উৎফুল্ল করে তোলে বই কি!
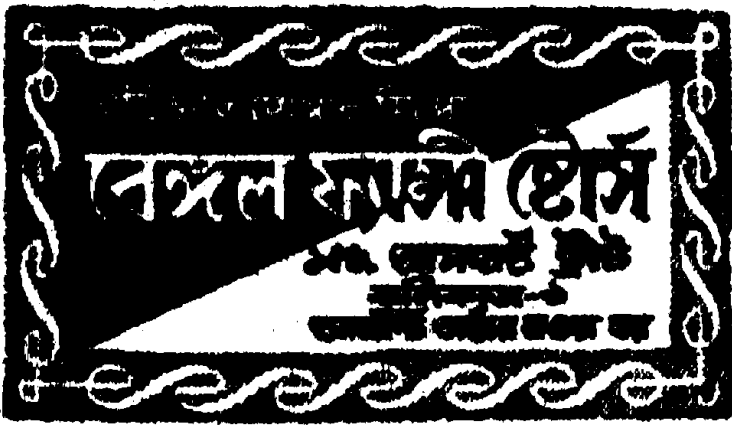
তাছাড়া বাঙালীর বৈশিষ্ট্যই এই যে, সে হাসতে জানে। আমি যুদ্ধের সময় নিষ্প্রদীপের বছরগুলিতে, মন্বন্তর বা রক্তাক্ত গৃহবিবাদের সময়েও দেখেছি, উপস্থিত দুর্বিপাককে তুচ্ছ করে বাঙালী শারদীয়া পুজোর জন্যে উৎসবমণ্ডপ সাজিয়েছে, বিজয়ার দিন পরস্পরকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে। বাঙালীর এই দুঃখজয়ী প্রকৃতিকে আমি শ্রদ্ধা করি।

তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে উৎসবের মধ্যে কিছুটা বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করছে। আমি জানি, যাঁরা ঈষৎ বয়োবৃদ্ধির প্রকোপে বিগতস্পৃহ, তাঁরা পান থেকে চুণ খসলেই গেল-গেল রব তোলেন। কিন্তু এমন কতকগুলি আচার-আচরণ আছে, যার পরিবর্তন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের খাতিরেই বাঞ্ছনীয় নয়। সত্যি বলতে কি, ঐতিহ্যের প্রতি এই উদাসীনতা একটু মারাত্মকই হ'য়ে উঠেছে আজকাল। পুজোর প্যাণ্ডালে মাইক-সহযোগে হিন্দী গান বাজানো হয়তো একটু কম হ'য়েছে এ বছর, কিন্তু একেবারে বন্ধ হ'য়েছে, এ কথা বলতে পারিনে। তেমনি উৎসবের নাম ক'রে চৌরঙ্গীর পানশালায় গমন, কিংবা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় তাসা-বাদ্যের তালে তালে বৃহন্নলা-নৃত্য, এগুলিও বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করা গিয়েছে এবার।

এই বিকৃতিগুলিকে কিছুতেই কেন ছেঁটে ফেলা যাচ্ছে না, জানিনে। যাঁরা বলেন, পরিবর্তনটা একেবারে স্বভাবগত হ'য়ে গেছে, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে একটা সুস্থতর জনমত তৈরি হওয়া অসম্ভব নয়।

বিশেষ করে, আজকের যুবকশ্রেণী যে কতখানি সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী তা তো চোখের উপরই দেখা যাচ্ছে। ছেলেরা এখন শুধু হৈ চৈ করে একথা সত্য নয়। হৈ চৈ এক-আধটু সব যুগের ছেলেরাই ক'রে এসেছে, এবং তাতে পৃথিবী রসাতলে যায়নি। তারা নিজেদের ছড়িয়ে দিতে জানে, আবার সংগঠিতও করতে জানে। একটা নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে পরস্পরের সহ-যোগিতায় একটা কিছুকে গড়ে তুলতে জানে। এই সমাজমুখী কর্মিষ্ঠতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাদের সামনে সুন্দরতর কোনো আদর্শকে তুলে ধরলে যে তারা আজ না-হোক দুদিন পরে তা অন্তরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

কিন্তু বড় বেশী গুরুমশাইগিরি হ'য়ে যাচ্ছে বোধহয়। বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতে ব'সে এসব সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা নেহাৎই বেখাপ্পা।

উৎসবের দিনগুলি এখনো আমাদের স্মৃতির দিগন্তে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।
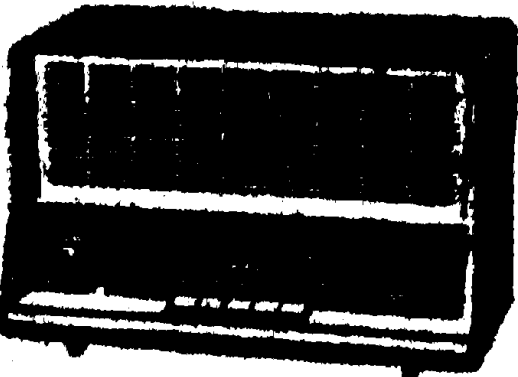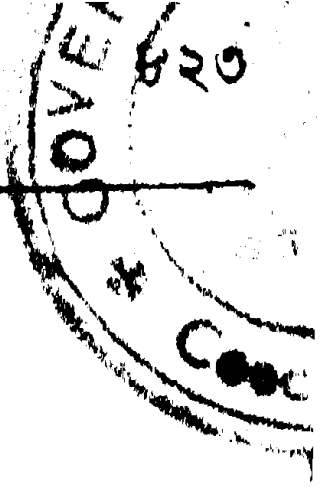
উপস্থিত জীবনের বিবর্ণতার মধ্যে এই ক'দিনের আনন্দিত অভিজ্ঞতাই আমাদের সারা বছরের সঞ্চয়। কাজেই সদ্য-অতীত সুখস্মৃতির জন্যে আমাদের মনের মধ্যে যদি কিছুটা হরিষে-বিষাদ ভাব দেখা দিয়ে থাকে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মনে পড়ল বহু বছর আগেকার এক বিজয়া সম্মেলনের কথা। বাংলার বাইরে এক বাঙালীপ্রধান শহরে বারোয়ারী দুর্গোৎসবের পর বসেছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। সেকালে বিজয়ার দিন কোনো কোনো মহলে সিদ্ধির সরবৎ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। (হয়তো এখনো আছে। সে যাক।) আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু কেষ্টদার বোধকরি মাত্রাধিক্য ঘটেছিল, গানের তালে তালে তিনি এক অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করেছিলেন। সভায় ভিড় ছিল যথেষ্ট। আমি ব'সে ছিলাম প্রায় তাঁর গায়ের সঙ্গে গা ঘেষে। একটা উসখুস নড়াচড়ার শব্দে আমি গায়কের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সঙ্গীতের এই মনোযোগী শ্রোতার দিকে তাকিয়ে দেখি, কেষ্টদা মাথা নাড়ছেন— কিন্তু ভঙ্গিটা বড়ই বিচিত্র। ডাইনে কি বাঁয়ে নয়, উপরে-নিচে নয়, তিনি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাঁর গলাসুদ্ধ মাথাটা একবার টান করে উপরের দিকে তুলছেন, আবার উল্টো পাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নামিয়ে আনছেন কাঁধের কাছাকাছি। ঠিক যেন একটা ইস্কুরুপ!

আমি কনুই-ঠেলা দিয়ে নিচু গলায় ধমক দিলাম, 'ও কি হচ্ছে!'

'মহামুস্কিলে পড়েছি ভাই.' কেষ্টদা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'মাথাটা কিরকম যেন একবার ওপরে উঠে যাচ্ছে আবার নিচে নেমে পড়ছে, কিছুতেই যেন ঠিক-জায়গাটাতে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি নে!'

শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনি। পাছে আরো কিছু কেলেঙ্কারী করে বসেন এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ধ'রে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু আজ ভাবছি, পুজোর ক'দিন অজস্র আনন্দের ঢেউয়ে দোল খেয়ে চট করে কাজের ডাঙায় উঠে অ্যাড্‌জাস্ট করতে পারা কি অতোই সোজা!

আপনারা সকলে চলতি জীবনের সঙ্গে বনিবনাও ক'রে হৃষ্টচিত্তে কাজের জগতে ফিরে আসুন, এই আমার আন্তরিক শুভকামনা।

আধুনিক ফরাসী কবি: তমসা থেকে জাগৃতি

সার্থবাহ

ফরাসী কবি স্তেফান মালার্মে'র যে-একটি কবিতায় দুইটি বিশিষ্ট অনুবাদের জন্য দায়ী দুইজন প্রধান আধুনিক বাঙ্গালী কবি, * সেই 'ব্রিজ মারিন' (১) বা 'সামুদ্র পবন' যদিও এক ক্লান্তিকালের কবিতা, তবু কোনও অশান্ত উদ্দীপনার আঁচে নয়, গোপন এক চিত্তনিরোধের—কোনও ভাবুনে নির্বেদের—ক্লান্তিহর ঠান্ডায়ই পাঠককে আশ্বস্ত করে এক অসামান্য নিসর্গের বিষয়ে। এই কবিতার 'আমি' সুদূর হয়েও দুর্গম নয়: জাগতিক-প্রাকৃতিক অনুভবগুলি নিয়ে সে যেমন সহজে সাধারণ্যে প্রবেশাধিকার পায়, তেমন তা'র ব্যক্তিগত বেদনায় ও সে-বেদনার প্রস্তাবিত প্রতিষেধকেও সে সহানুভূতি জাগায়, যদিও যন্ত্রণ'র পরিচিত সংসার থেকে অপসৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত সে এক গৌণ নান্দনিক টিলার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে।—বিষাদ-বিষে জর্জরিত তা'র দেহের মাংস, এই 'আমি' চলে এসেছে সাগর সৈকতে। মস্তিষ্কেও আশ্রয় নেই তা'র, প'ড়ে-প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলেছে সে সব বই। এখন শুধু ওড়া, ওড়া সেই নভস্থলে যেখানে আশ্চর্য সৌর আসর মাতাল বানিয়ে-দিয়েছে পাখীদের। বিষাদ-লাগা তা'র গা, আর চোখে যে-ঘোর ঘনায় তা সমানে নাকচ করে স্মৃতি, এষণা ও উপভোগ। উপায় কেবল ছেড়ে-যাওয়া, উড়ে-যাওয়া কোনও অন্যতর প্রকৃতিতে, আর সাগর সৈকতে তা'র অর্থ স্টীমার। স্টীমার, নোঙর তোলো, চলো নিরুদ্দেশ যাত্রায়! কিন্তু, অলৌকিক নীজনে জেগে-ওঠা এই যে ঐকান্তিক মোহ, তা কি মুক্তির পথ? এই বৈরাগ্য কি রুমাল-ওড়ানো প্রিয়জনদের বাদ দিতে পারে? আর, স্টীমারের খাড়া মাস্তুল কি ঝঞ্ঝার সহযোগী হয়ে নিমজ্জনের সর্বনাশে তলিয়ে দেবে না স্বীপের স্বপ্ন? তাই, শুধু এক নির্লিপ্ত বিপ্লবে দাঁড়িয়ে-থেকে নাবিকদের গান শোনা'-

> "মন আমার, তবু কানে শোন্
> ঐ মাল্লাদের গান!"

তথাকথিত প্রথম সমকালীন পার্নাসীয় ক্ষেতের ফসল, মালার্মে'র এই কবিতাটি ফরাসী কবিতায় এক হাওয়া বদলের সংবাদ, যদিও এ-কবিতার সর্বাঙ্গে মালার্মে'র অদূরবর্তী পূর্বপুরুষ শার্ল বোদলেয়রের প্রভাব। এবং, বোধ হয়, সে-প্রভাব আছে ব'লেই। কারণ, বোদলেয়রে ফরাসী কবিতার যে-পুনর্জন্ম, তা আত্যন্তিক; বোদলেয়র-কাব্যের আবেষ্টনীতে সম্পাদিত, সম্ভাব্য তথা অকৃতকর্মে'র পরিভাষায়ই আধুনিক ফরাসী কবিতার অন্বয়, তা'র উপাদান-গুলির সংজ্ঞালাভ। 'সামুদ্র পবনে'র 'অবসাদ'ই কেবল নয়, তা'র 'ওড়া', 'অন্যতর প্রকৃতি', 'নোঙর তোলা', 'জাহাজ ডুবি', 'মাল্লাদের গান' বোদলেয়রীয় বর্ণালীতে কতিপয় পরিচিত রঙ মাত্র। স্বকীয়তার অনটনে কদাচই অনুজ্জ্বল, দক্ষতর কারিগর, মালার্মে'র পক্ষেও সম্ভব ছিল না বোদলেয়রীয় আলোড়নে বধির থাকা। তাঁর কয়েকটি সনেটে মালার্মে ঐ ভিন্নপন্থী পুরোগের প্রতিধ্বনি আত্মস্থ করেছিলেন। আর, উন্নাসিক, 'শুদ্ধ' কবি মালার্মে'র পক্ষে যে-প্রতিধ্বনির আহরণ লজ্জাকর হয়নি, তা অন্যান্য পরবর্তিদের সহযোগিতা পেয়েছিল অবাধেই। লেঅ' ক্লাদেল বা মোরিস রলিনার মতো উনিশশতকীদের সঙ্গে জুল লাফর্গ ও আলবের সাম্যাঁরও নাম করতে হয় বোদলেয়রের উত্তর-সাধকদের মধ্যে। এবং প্রত্যক্ষ 'প্রভাবে'র ব্যাকরণ যেখানে সূত্রগুলি হারিয়ে ফেলে, যেখানে ভাবনার দায়ভাগ শুল্কবিহীন উপভোগে প্রলুব্ধ করে বিমিশ্র বহুকে—সেখানে, শতকীর ফারাকেও, আধুনিক-দের মধ্যে অনেককে বোদলেয়রীয় কাব্য-চিন্তায় প্রশ্রিত দেখা যায়। এই প্রশ্রয়-যে কলাকৌশলের ব্যবহারিক চত্বরে উপভুক্ত কিছু, তা নয়; যদিও বোদলেয়রের সঙ্গে র‍্যাঁবো ও লোত্রেআম'র যোগ ক'রে, গদ্য কবিতার আদিতে ভোর্ লীবর্ বা 'মুক্ত ছন্দে'র, ও তারপর, স্যুররেয়ালিস্ত্ সাধনার, উৎসসন্ধান মোটেই অনর্থক নয়। যে-অর্থে বোদলেয়র আধুনিক কবিতার দ্বারোদ্ঘাটন ক'রেছিলেন, তা কোনও বিশেষ শিল্প-বৈচিত্র্যের নৈমিত্তিক প্রাপ্তিতে নয়, একটি অখন্ড কাব্যাদর্শে ও তৎসংযুক্ত পর্যবেক্ষণে ও অবধারণে ধরা-পড়া বোধ, অনুভব ও আবেগের—একটি সামগ্রিক হৃদগতের উচ্চারণে।

বোদলেয়রের 'প্রেতচ্ছায়া' মালার্মে বুঝেছিলেন, 'প্রতিপালকের-দেওয়া সেই বিষ, যা ম'রতে হ'লেও পান করতেই হবে। ২ মালার্মে'র কাব্যলোকে তাই এক চৌকস নান্দনিক সংহতিকেও মাঝে মাঝে বিব্রত হতে হয় সেই সব অন্ধকার উঁকিঝুঁকিবারা, যাদের পরিচায়ক ছিলেন, 'ফ্ল্যার দ্যু মাল'—এর কবি, বোদলেয়র। যে-'সুরূপা মত্ততা' ৩ মালার্মে'কে সঞ্চালিত করে শিল্প-যাত্রার বরাভয়-সংগ্রহে, নৌকার পালে যে-'শাদা উৎকন্ঠা' তিনি পড়েন, সেই 'মত্ততা' ও 'উৎকন্ঠা' (কবিদের চিরকালীন সম্বল!), উইসমাঁস্-বুর্জে'দের ধন্যবাদ, ফরাসী শিল্প-মীমাংসায় বোদলেয়র-বৃত্তান্তের বরেণ্য উপসংহাররূপে ইতিমধ্যে আহৃত হয়েছিল। মালার্মে'র আরেকটি সনেট, 'উদ্বেগ' (আঁগোয়াস্) ও সম্ভব ছিল একমাত্র বোদলেয়রের পর। আন্তরিক ও অব্যর্থ সনেটটির বোদলেয়রীয় প্রকৃটেভ:—

> আসি নি'ক এ-সন্ধ্যায় পরাভূত
> করতে তোর দেহ,
> জাতির পাপের গতি, রে বধিরা!
> অথবা ডুবিয়ে
> দিতে তোর ক্লিন্ন কেশে সেই
> এক বিষণ্ণ প্রদাহ
> আমার শীৎকারমুক্ত অনারোগ্য
> ক্লান্তির অন্বয়ে।
> (মালার্মে: 'উদ্বেগ')

প্রস্তাবনার এই আতিক্ত আত্মনিয়োগ ভণিতা নয়। তাই প্রেমিকের কাম্য হয় কেবল এক 'স্বপ্নশূন্য ভারী ঘুম,' কারণ বিলসনের জায়গিরও ইতিমধ্যে কলুষের প্রশ্নকে প্রবেশাধিকার দিয়েছে; জান্তব ও আত্মিক এই দুয়ের দ্বন্দ্বে বিশ্লিষ্ট-হবার অধ্যাত্ম তৈরী হয়েছে। মালার্মে'র প্রজ্ঞায় তাই বুদ্ধির জলুস্ কিছু নেই। এ প্রজ্ঞা নির্বেদের নামান্তর: 'অনাচার', তিনি টের পা'ন, 'তাঁর উদ্বেগের মতোই বন্ধ্যা করেছে তাঁকে, কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর মৌলিক ঔদার্য।'

আবারো বলতে হয়, মালার্মে'র কবিতাটির অনেকখানিই বোদলেয়র। উক্ত সনেটটির উদ্ধৃত চার পংক্তিতেই বোদ-লেয়রের তিনটি কবিতা, 'লা শেভ্ল্যুর্', 'জা ত্যা'দর্ আ লে'গাল দেলা ভুৎ নক্তুর্ণ' ও 'লে গু দ্যু নেয়া'য় ব্যবহৃত ছোটবড় চিত্রকল্পের হদিশ পাওয়া বোদলেয়র-পাঠকের পক্ষে কষ্টকর নয়। কিন্তু এখানে বোদলেয়রের 'প্রভাব' সম্বন্ধে বলতেই হয় যে প্রশ্নটা মালার্মে'র পক্ষে তাঁর পুরোগামী মহাকবির অনুকৃতি করা বা না-করা নয়। আসলে বোদলেয়র-কাব্যের প্রতি পাঠকদের যে-

---

* সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('প্রতিধ্বনি', পৃ: ৯৫) ও শ্রীবিষ্ণু দে ('হে বিদেশী ফুল', পৃ: ২০)।

(1) *'Brise Marine'*

(2) *'Le Tombeau de Charles Baudelaire'.*

(3) *'Salut'.*

দরদ জন্মায় তা' নেহাত 'আকর্ষণ'-প্রসূত নয়; তা'র মূলে আছে, যেমন মোরিস সাইয়ে ৪ বলেন, এক গভীর ও অনিবার্য 'প্রয়োজন'। বলা যায় যে মালার্মে এই 'প্রয়োজন' বোধ-করতে, অন্ততঃ কিছুকাল, সম্মত ছিলেন, কিম্বা, বোধ না-ক'রে পারেন নি। এই 'প্রয়োজন', বলা বাহুল্য, অলঙ্কারঘটিত কিছু নয়। আলঙ্কারিক কৃতিত্বে তাঁর গুরুস্থানীয় দুই সমসাময়িক গোতিয়ে ও বাঁভিল্-এর পাশে বোদলেয়ার অক্ষম প্রমাণিত না-হলেও, অকেজো খানিকটা ত' বটেই। (অবশ্য গোতিয়ে—এবং বোধ হয় একমাত্র গোতিয়েই বোদলেয়ার কাব্যের মূল্যায়নে তা'র অলঙ্কারগত সৌষ্ঠবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ) ৫। ছান্দসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বোদলেয়ারের উৎসাহ অপ্রচুরই ছিল; প্রাচীন আলেকসাঁদ্র্যাঁর সনাতন আদলেই কাব্যের চমকপ্রদ আধুনিক বয়ান গড়ার কৌশল তিনি জেনেছিলেন। বোদলেয়ার-কাব্যের 'প্রয়োজন' তাই কাব্য-শিল্পের কোনও কারসাজিকে উদ্দিষ্ট করে না; সে-'প্রয়োজন' বোদলেয়ারীয় কাব্য-সন্ধিৎসায় আলোড়িত জীবনচিন্তার ও তা'র মারফত প্রত্যক্ষীভূত কোনও ব্যক্তিগত,—ঘটনাক্রমে করুণ,— জীবন-বেদের সঙ্গে পরিচিতির। বোদলেয়ারীয় বিশ্ব, যা সহজেই আত্মকেন্দ্রিক, তা'র বিষয়ে অবহিতি, তা'র জন্য সহানুভূতি, এমনকি তা'র বিদ্যা—জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধান্তের সারি,—উক্ত 'প্রয়োজন' কুক্ষি-গত করে। আর এই বিশ্ব, যার একফালি যেন বোদলেয়ারের প্রতি কবিতার সমগ্রে বেমালুম জুড়ে-দেওয়া,—

সে এক বিষণ্ণ বিশ্ব সীসক
দিগন্তচক্রে বাঁধা,
তিমির সন্তরি' যেথা আসে ভয়,
কাকের চীৎকার।
('দে প্রফুন্দিস্ ক্লামাভি')

কিম্বা,

ঊর্ধ্বে, নিম্নে, সর্বত্রই আতত
নিস্তল, ধুধু বালি,
নৈঃশব্দ্য, কুৎসিতা ব্যাপ্ত
নয়নের ফাঁদ......
আর আমার রাত্রি-গর্ভে
ঈশ্বরের সুদক্ষ অঙ্গুলি
রেখায়িত করে এক বহুবর্ণ,
নিঃসীম প্রমাদ।
('লে গুফ্র্')

কিম্বা, শ্রোতা যখন আরও নিবিড়,—

কীসের তল্লাস করে তোর হাত
এ মুমূর্ষ বুকে?
সে যা খোঁজে, সখী, তা'র অবশিষ্ট
আছে কী বা আর?
নারীর ভরাল নখদন্ত শেষ
ক'রে গেছে তা'কে।
খুঁজে না আমার চিত্ত, সে হয়েছে
পশুর আহার।
('কে—রি')

এক আপদগ্রস্ত অন্তর্লোক, পুনরাবৃত্তির মালিন্যেই যা'র তীব্রতার প্রশমন নেই।

কবিমাত্রেই কোনও এক বিশেষ জগতের বাসিন্দা, একথা যেমন সত্য, তেমন সন্দেহজনক সেই বিশেষ-জগতের স্থিরত্ব, স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা। এছাড়া, অবশ্যই, উক্ত 'বিশেষত্বের' বাড়তি, কমতি ও ফাঁকি সব সময়েই আছে। মহাকবিত্বের সূচনা যদি এই 'বিশেষে'র দায়ে, তবে তা'র পরিণতিও ঐ 'বিশেষের' অব-ধারণে। কালিদাস, পিন্দারস্, ভের্গি-লিয়ুস, পেত্রার্কা, মিলটন, হাইনে, একের থেকে অপরে এ'রা সেখানে ভিন্ন,—ভাষা ও কাব্যকলার প্রশ্ন বাদ দিলে,—তা ঐ ব্যক্তিগত বিশেষ জগতের নিদর্শনে। মহা-কবিদের বিশেষ জগৎগুলির চরিত্রে নিশ্চয়ই নিন্দিত চাপল্য বা অনিশ্চিতির দোষ বিরল, কিন্তু যে-'বিশেষের' স্বার্থে এক মহাকবি থেকে অপরজন পৃথকীকৃত, মহাকবিদের মধ্যেও তা অনেক সময় যেন কোনও মানসিক 'আবহাওয়ার'ই, এবং 'জলবায়ু'র নয়। 'আবহাওয়া'র সঙ্গে 'জলবায়ু'র প্রভেদ মনে রেখে বোদ-লেয়ারীয় জগৎ তা'র 'জলবায়ু'তে বিশেষ; এমনকি, অজ্ঞাতপূর্ব। আর সেই জগতের বহিশ্চাপ ও অন্তশ্চাপ যুগপৎ এমনই প্রবল যে, এ-সঙ্গে একথাও মানতে হয় যে উক্ত 'বিশেষ জল—য়ু'র জগৎটি পরাক্রান্ত।

বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে বোদ-লেয়ারীয় জগতের পরিচয় বা বিচার অসম্ভব। শুধু এইটুকুই বলা যায় যে যে-অন্তর বিশ্বের অবিসংবাদী মালিকানা ছিল বোদলেয়ারের, কবিতার ইতিহাসে তা প'ড়ে থাকা, অনাবাদী জমি মাত্র নয়, অভিশপ্ত চোরাবালিরই খানিকটা। তাঁর পূর্বে সে-জমি কেউ মাড়াননি বললেও বলা যায়, সেখানে গিয়ে দাঁড়াননি, নিশ্চয়ই। আর, বোদলেয়ার তা'র ওপর ভূম্যধিকারীর সাহসে বসবাস করেছিলেন, নির্ভয়ে এবং মাথা উঁচু রেখে। ধর্মোৎ-সারিত মধ্যযুগী ও অনেকান্ত (মানবিক) রেনেসাঁস, অনুপ্রেরণার পর কবিতায় যে তৃতীয় সংস্থান স্রষ্টা ও সৃষ্টির দুই প্রান্তকে খেলিয়েছিল মধ্যবর্তী, একক ব্যক্তির প্রতিযোগী ক'রে, সেই হা-ঘরে আধুনিক উৎক্রমের শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করেছিলেন বোদলেয়ার, উনবিংশ শতাব্দীতে একা-একা। কবিতার সাধনায় এক নূতন মার্গের আদ্যন্ত সংজ্ঞিত হয়েছিল বোদলেয়ারে, যে-মার্গকে দার্শনিক নাম দিলে, তা বোধ হয় আত্ম-সংবিত্তি, যদিও দৃষ্টবাদী স্বচ্ছতায় শেষ পর্যন্ত তা আত্ম-নিগ্রহও।

বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্য এক সংশয়াবিষ্ট ব্যক্তিসত্তার আত্ম-নির্ণয়ের
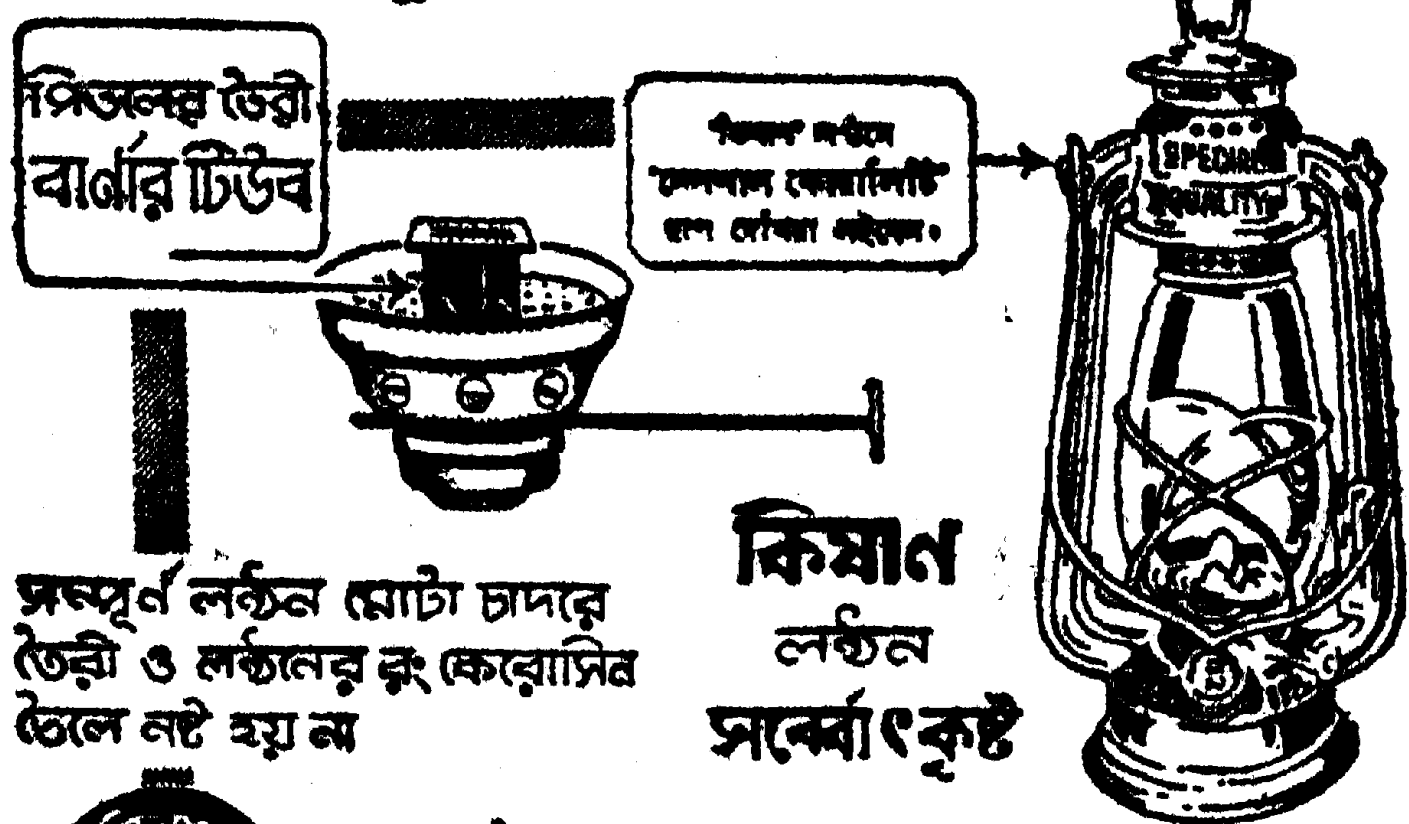
(4) 'Baudelaire par lui-même': Pascal Pia, Éditions du Seuil, p. 5.

(5) 'Parnasse et Symbolisme': Pierre Martino, *Librairie Armand Colin*, p. 104.

(5) 'Parnasse et Symbolisme': Pierre Martino, *Librairie Armand Colin*, p. 104.

উদ্যম। এই আত্ম-নির্ণয়ের ভূমিকা অবক্ষয়, ও তা'র পদ্ধতি আন্তরিক। বোদলেয়ারের অধিকাংশ কবিতায় প্রস্তাবক 'আমি'; বিষয়বস্তু 'আমি'র সম্বন্ধপদ, 'আমার' সংক্রান্ত কিছু। উত্তমপুরুষে বাচন যে 'আমি'কে এক সময় চিনেছিল দান্তে-প্রনাদিত ঐশ্বরিক ব্রহ্মান্ডে, অথবা,—শেক্সপীয়রীয় তথা গ্যোয়্তীয় বিকীরণে,—কোনও মানবিক জগৎসংসারের মহিমায়, সেই 'আমি' বোদলেয়রের কাব্যে আবির্ভূত হয়েছিল এক নির্বান্ধব অন্তশ্চেতনার তোরণ চূড়ায় ব'সে-থাকা পালখ-খসা কোনও পাখীর মতন। একাধারে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের শান্তি ও সনাতন সংসার-অশ্বত্থের ছায়া স'রে যেতে দেখেছিল বোদলেয়ারের ঐ 'আমি', যার একমাত্র শান্তি ছিল এই যে সে তা'র সমস্ত দুর্গতি সজ্ঞানে বহন করার দায়িত্ব নিয়েছে। জীবন সার্বিকভাবে অসুখকর ঠেকেছিল বোদলেয়ারের কাছে (সেই অসুখের কতোখানি বাস্তবিক ও কতোখানি স্বনির্বাচিত, তা এখানে অবান্তর) এবং এই অসুখ ও তা'র প্রতিকারার্থে চিন্তিত ও চেষ্টিত নানা ব্যর্থ সুখ-সন্ধান তাঁকে যেভাবে অস্তিত্ববান করেছিল, তা'র সর্বান্তঃকরণ বোধ বোদলেয়রীয় কাব্যসত্ত্বের চিরস্থায়ী অবলম্বন। অসুখ ও সুখের সন্ধান, এই দুই আপাতিক দ্বৈতের টানা-পোড়েনে বিক্ষত, এমনকি হাস্যকর, প্রমাণিত হওয়ার কৈবল্য বোদলেয়ার জয় করেছিলেন, কিম্বা, তাঁর পছন্দসই ভাষায় বললে, 'কৌশল জেনেছিলেন' জয়-করার, —তাঁর এক অনাহত, তামসিক বিষাদ-সম্ভোগের গরল ও অমৃত সমান তৃষ্ণায় পান ক'রে।

আধুনিক অস্থিরতা (যার প্রতিচ্ছবি, হায়, দুষ্প্রাপ্য সুইনবার্ণের হিল্লোলিত দগ্ধদীপিতে বা, এমনকি, হাইনার ব্যবায়রনিক বিপথগামিতায়) যেন রূপ-রসগন্ধসমেত বোদলয়েরের বোধে ধরা দিয়েছিল প্রথম সার্থক সেই অনিবার্যতায় যা ঊনিশশতকী সাহিত্যিকদের বহুলাংশেই ফাঁকি দিয়েছিল। তাই বোদলেয়রের হাতে কবিতাকে হ'তে হ'ল প্রকাশের এক অসাধারণ মাধ্যম। যাতে উক্তির স্বরগ্রাম যেন কোনও বেঁড়া চাবিতে বাঁধা, যার লক্ষ্য কাব্য মান্য কাব্যশাস্ত্রের মর্জিকে খোশামোদ করে না। অবশ্য এই পরিবর্তন মুখ্যতঃ বাচনিক ছিল না মোটেই এবং বোদলেয়রীয় বাচনের বিশিষ্টতা যে প্রকটতা বস্তুবাদ-সঞ্জাত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাবের সম্পদেই বোদলেয়রের কবিতাগুলি মূল্যবান, যদি বা তাঁর ভাবনা সম্পন্নতা অর্জন ক'রেও শ্রীময়ী হবার সুযোগ পায় নিক। সু-কুর যে স্মাল স্বন্দের আধুনিক মন বিশ্লিষ্ট এবং যে স্বন্দের অবসান কোনও হিতাহিতের প্রমিতি মারফত আসে শুধু তখনই, যখন ভাগ্যগুণে শান্তির পরিবেশটি অপসৃত নয়ক, এই দ্বন্দ্বের নিঃসঙ্কোচ ও সুদীর্ঘ স্বীকৃতি 'ফ্ল্যার দ্যু মাল'-এর কবিতা। ভাগ্যদোষে বোদলেয়রকে অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল কোনও অশান্তিরই শিবিরে এবং সেজন্য উক্ত দ্বন্দ্বের অবসিত মূর্তি তিনি দেখতে পাননি কখনও। কীভাবে ব্যক্তিগত জীবনের অনুজ্জ্বল, বিভ্রান্তিকর দেনা-পাওনাগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে পাপের পথে অগ্রসর কবি অপমানে বা যন্ত্রণায় বিকচ্ছ না-হয়ে, প্রতিবাদী মানবিক চৈতন্যের লাঞ্ছিত আলো-আঁধারিকে মুখোমুখী দেখেছিলেন তা'র একটি প্রলম্বিত কাহিনী বোদলেয়রের কাব্য। অভ্যাস ও প্রবৃত্তি যে-অঘোরপন্থায় ব্যক্তিকে ক্ষয়ের দাসখত লেখায়, আর গলা টিপে মারা যায় না যে-পরিতাপ; কামের যে-বেহুঁস আতিথ্য বারবণিতার দেহ সর্বাঙ্গে আশ্রিত করে আর সেই আশ্চর্য, অটুট বিষাদ যা সত্তার নগ্ন, কালো পাথরে আছড়ায়; সুখ-শান্তির পুনরায়োজনে ডাকে যে সুষ্মিত, শারদ চেতনা আর যে-চেতনা অথৈ নির্বেদে কেবল বলে : ডুবে যা, ঘুমিয়ে পড়্, ওরে জ্বরাগ্রস্ত অশ্ব, প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খাস তুই; যে-প্রমা খেদকে জানায় সন্ধ্যার প্রচ্ছায়ে সমাহিত থাকতে, আর যে-করুণ ব্যভিচারী বলে : সব সময় বুঁদ হয়ে থাকো নেশায়—এইরূপ অসংখ্য, রঙিল, তবু ক্রমান্বয়, বোদলেয়রীয় উদ্বেগের নজিরগুলি আধুনিক মানসিকতার সঞ্চারপথ আঁকে। অসৎ ও অশিব, যে পটভূমিকায় বোদলেয়রের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল, তা দ্বন্দ্বাশ্রয়ী হলেও, ঐ অপকারী শক্তিদের আবির্ভাব যে পৌনঃপুন্যে ও তীব্রতায় চিরায়ু, এই সত্যও টপকে যা'ননি তিনি। পামর আত্মার চতুর্ধা শান্তির বিধান তাঁকে পড়তে হয়েছিল উল্টোভাবে : নির্বুদ্ধিতা, ভ্রান্তি, পাপ ও মাৎসর্য'। বোদলেয়র বুঝেছিলেন, 'জুড়ে থাকে আমাদের মন', চ'রে বেড়ায় আমাদের দেহে।' ৬ আর, এই সঙ্গে বোদলেয়রের জানা হয়ে গেছিল ইতি ও নেতির সেই দুস্তর অসদ্ভাব, যা সকল এষণার প্রকৃত প্রস্তাবকে লণ্ড-এর অরুচি শেখায় :

> মানুষ নামের যোগ্য যেবা সেই জন
> চিত্তে এক পীত সর্প করেছে ধারণ;
> সিংহাসনে সমারূঢ় সে হাঁকে : 'বারণ'
> যখনি মানুষ বলে : 'এই আকিঞ্চন।'
>
> ('লা' জ্যোতির্স্যের্')

এই অনিষ্টকারী ফণীর ধমকে স্বভাবজ কামনার স্ফূর্তি বন্ধ, এবং তাই অপ্রতিবিম্ব কামনার বিকৃতি। বোদলেয়র জেনেছিলেন যে এই দুই জাতশত্রু—অভিলাষ ও বিবেক, এরা কখনও সেই স্বাধীন কর্মটি হতভাগ্য মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দেয় না, যাতে দ্বিধার বিষাক্ত প্রশ্বাস ছোপ ধরিয়ে দেয় নি। তাই কর্মে ও কর্মীতে, সাধনায় ও কল্পনায়, উপভোগে ও নন্দনে যে ফারাক, তা উজ্জীবনের তরুণ শপথগুলির পক্ষাঘাত ঘটায়, প্রমোদের স্বল্প মূলধনকে অনুতাপের চক্রবৃদ্ধিতে বাড়িয়ে, বিকট, বিকটতর করে। নিজেকে জানার দায়িত্ব নিয়ে বোদলেয়রকে এইভাবে হাজির হতে হয়েছিল চৈতন্যের অন্ধগলিতে, যেখানে জ্ঞান, সম্বিৎ সকলই এক নিরন্তর কলুষে প্রত্যাবর্তন :

> দেখেছি জ্যোতিষ্মান দুনয়ন
> আরবার খুলে
> সেই ত্রাস, যা আমার
> স্থিতির অন্বয়,
> আরবার প্রবিষ্ট হয়েছি যবে
> চিত্তের অতলে
> অভিশপ্ত সংশয়েরা জানিয়েছে
> অব্যর্থ খোঁচায়।
>
> ('রেভ্ পারিসয়াঁ')

এই নিজেকে-জানার বা আত্ম-সংবিত্তির অর্বাচিত্র সংবাদ হয়েও বোদলেয়রের কাব্য তা'র প্রসাদগুণ হারায়নি, যদিও সে কাব্যে অনেক হৃদয়গত অপ্রিয়-সত্যের উচ্চারণ, অনেক অপরিণামদর্শী স্বপ্নের বার্তা। গহ্বর, রাক্ষস, রোগ, মদ্য, প্রেত, গণিকা, বাদুড়, সর্প ও শয়তান যেন বোদলেয়রীয় কাব্যের চিত্রার্পিত, তামসিক ভুবনের সুলভ বেসাতি; বিষাদ, অন্ধকার, অপরাধ, মৃত্যু, দুঃস্বপ্ন, নির্বাসন, নেশা বিরংসা, নৈঃসঙ্গ্য ও উদ্বেগ সে কাব্যের অন্তর্বিশ্বে শৃঙ্খলিত প্রকৃতির আকাট্য ভাবাভাস। নিজেকে জানতে গিয়ে বোদলেয়রকে নিয়তলগ্ন থাকতে হয়েছিল ঐ অন্তর্বিশ্বে,—কতকটা দুর্ভাগ্যক্রমে, আর কতকটা ফ্রয়দীয় লিবিদো মানলে, অনিবার্যভাবে। কারণ, একথা স্বীকার করতেই হয় যে যদিও দেল্ফইর মন্দিরগাত্রে লিখিত সাতটি আপ্তবাক্যের একটি 'গ্নথি সেয়াউতন্' ('নিজেকে জানো') তবু এই 'জানার' সমুদ্র-মন্থন নরলোকে যেন তা'র ক্লান্ত নীলকণ্ঠদেরই দাবী করে। কিন্তু কবিতা, আধুনিক লগ্নে, যে মননের স্বামিত্ব বরণ ক'রে নিয়ে ছিল, তাতে ছান্দসিক ও আলঙ্কারিক পরিসীমা পেরিয়ে কবিকে চিন্তকও হতে হয়েছিল প্রাথমিকভাবে, আর সে চিন্তার এক কুলীন উদ্গম চিরদিনই আত্ম-কেন্দ্রিক। যে বোদলেয়র নিজেকে দেখেন নিয়তির চক্রান্তে বিষাদের সূচীভেদ্য তিমিরে গুহায়িত থেকে এক মারকী ক্ষুৎপিপাসায় আপন হৃদয় পাক-ক'রে খেতে, তিনিই দেখেন যে সভ্যতার

(6) 'Preface' : 'Les Fleurs du Mal'.

ইতিবৃত্ত মৌল কলুষ (le pe'che' originel) থেকে মুক্তিলাভের সাধনায় নিহিত। আবার তিনিই, পাপ ও সন্তাপের রাহাজানিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে, শয়তানের স্তবে, আবগারীতে ও রাক্ষতায় শান্তি খুঁজে, দারিদ্র্য ও উপদংশের শাস্তি পেয়ে, এও বুঝেছিলেন যে সভ্যতার সামগ্রিক গ্লানিতে ক্রিম ব্যক্তিতার নিমজ্জন ক'রেই যূথচারী মানুষের নিস্তার নেই। বিবেকের মশানে আনীত ব্যক্তি রেহাই পায় না কিছুতেই। কারণ, অনবরত অনুভবে সে একাধারে পাপ ও পাপের শাস্তি। 'আত্ম-নিষূদন'* নামক কবিতার একটি স্তবকে বোদলেয়ার বলেন :

আমি ছুরিকা এবং হনন,
আমি থাপড় এবং গাল!
আমি অঙ্গ এবং নির্যাতন,
স্কন্ধ এবং করবাল!

অবশ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রজ্ঞা কখনও কবিকে চিত্তসাম্য দান ক'রে তাঁকে স্থিতধীর পদমর্যাদা দেয় না। চিত্তস্থৈর্য তাঁকে স্পর্শ করবেই। আত্ম-বিশ্লেষণে পারদর্শী বোদলেয়ার তার পাপ-সমীক্ষার পরও তাই অন্তরের সঙ্গে বাহিরের বিয়োগ লক্ষ্য করেছিলেন এক অপ্রতর্ক্য খেদ নিয়ে—

পাল্টে যায় প্যারিস শহর,
কিন্তু আমার বিষাদে কিছুরই
নড়চড় নেই!

এই নাগরিক নৈঃসঙ্গ্য ও তার প্রতি-পক্ষ সেই চিত্তান্বেষণ, যা'র প্রথম সার্বিক অভিব্যক্তি বোদলেয়ারে, মালার্মে মারফত এক রূপান্তরমাত্র চিনেছিল। বোদ-লেয়রীয় কাব্য, সর্বকিছুর পর যদি কোনও আধ্যাত্মিক তমসায় কেন্দ্রিত থাকে, তবে, বলা যায়, একই প্রারম্ভ নিয়ে মালার্মেও বেরিয়ে-ছিলেন অভিজ্ঞতার উন্মোচিত সিংহ-দ্বার দিয়ে। কিন্তু হয়তো ভূয়োদর্শিতা, তার পুরোগামী মহাকবির দুর্বিপাক, তাঁকে কেন্দ্রাতিগ করেছিল অনতি-বিলম্বেই। চিত্তান্বেষণের পাঠে যে-তীব্রতা ধরিয়ে দিয়েছিলেন বোদলেয়ার, তার ব্যত্যয় না ঘটিয়ে মালার্মে তাঁর কাব্যিক অভিযানে উদ্দিষ্ট স্থির করে-ছিলেন ভিন্নধর্মী। অনুভব ও বুদ্ধিকে যেন সামাজিক উত্তাপ (বা শৈত্য) আস্বাদন না করতে দিয়ে, মালার্মে তাদের ধারণ করেছিলেন এক দারুণ কান্ত অধিকারে। ঘরে না-ঢুকে, কেবল বাতায়ন পথে উড়ে উড়ে জীবন দেখার কর্তব্যে সম্মত হয়েছিলেন তিনি।৭ জাগতিক অন্ধকারে অন্তর্জালির চাইতে তাঁর পক্ষে ভাঙ্গা ডানা নিয়ে 'অনন্তকাল ধ'রে পতন'ই শ্রেয়স্কর ছিল চন্দ্রালোকিত আকাশের রাজ্যে। কারণ, মালার্মে টের পেয়েছিলেন, নীলিমাও নাসিকাকুঞ্চনে বাধ্য করবে তাঁকে যদি তিনি পার্থিব পৈশুন্যের অপবিত্র উদ্গারগুলিকে নিবিড় আতিথ্য দেন। হয়ত পলায়ন, যদিও পলাতকের উদ্ভ্রান্তি মূর্ত হতে পারেনি কখনও মালার্মেতে। ভার্লেনের মসিময় তোস্ত, মধ্যরাত্রির মৌনেই যিনি পথে বেরোতেন, এক হিসাবে ছিলেন অসম্ভব নিরাবেগ। আর এই পলায়ন বোধ হয় জটিল জীবন থেকে কোনও সুশীল, কান্ত মীমাংসায় নয়; তমসা থেকে জ্যোতিতে যাবারই আয়োজন। প্রসঙ্গতঃ, বোদলেয়র নিজেও এই জ্যোতির প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন না; তাঁর এক শ্রদ্ধেয় সমকালীন সম্বন্ধে বোদলেয়ার বলেন : তেঅদ'র দে বাঁভিল্‌কে সঠিকভাবে বস্তুবাদী বলা যায় না; তিনি জ্যোতির্ময়। তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয়েছে নন্দনের কাল।'৮

* 'ল' হেআউতোন্তিমরুমেনস্' ('লে ফ্ল্যার দ্যু মাল', রনে-লুই দইয়' সম্পাদিত, পৃঃ ১২৭)। এই গ্রীক নামটি (রোমক নাট্যকার তেরেন্তিউস-এর একটি নাটকের নাম) আক্ষরিক অর্থে, 'আত্ম-নির্যাতক'। এই কবিতার রহস্যময় উৎসর্গলিপি, 'A. J. G. F.' বোদলেয়ারের প্রধান জীবনীকার, জাক্ ক্রেপের মতে বোদলেয়ারের প্রণয়িনী, জান্ দ্যুভালকে নির্দেশিত করে। নামতঃ, ও জানের উল্লেখে, কবিতাটি সহজেই আধুনিক মনস্তত্ত্বের খোরাক। এই কবিতার ভিত্তিতে জাঁ পল সার্ত্র তাঁর প্রসিদ্ধ সমা-লোচনায় ('Baudlaire' : Gallimerd পৃঃ ৩০) বোদলেয়ারের মর্ষকামী আত্মনিগ্রহ সপ্রমাণ করেন। কিন্তু যেমন সন্দেহাতীত নয় বোদলেয়রীয় মর্ষকাম, তেমন বর্তমান 'আত্ম-নির্যাতন'ও যে-কোনও অযৌন, নৈতিক অধ্যাত্মের নির্দেশে পরিচালিত অনুতাপ মাত্র কি-না, সে প্রশ্নও থেকে যায়।

(7) '*Les Fenêtres*'.
(8) Journaux Intimes : J. Crept et G. Blin, *Librairie Jose Corti*, p. 19.

সাহিত্য সমাচার

জনপ্রিয় নায়ক শলোকভের পর কবি নিকোলাই আশায়েভ আমাদের কাছে সুপরিচিত। ভ্লাদামির মায়কভস্কির বন্ধু এই খ্যাতনামা কবিকে 'বয়সে বৃদ্ধ হলেও সজীবতায় যুবক' বলে জনগণ অভিহিত করে থাকেন।

বৎসরের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বৎসরের জন্ম। পুরনো বিদায় নেয়। নতুন নতুনকে আহবান জানিয়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু আশায়েভ হারিয়ে যাননি। তাঁর কণ্ঠস্বর আজও সরব। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁর আত্মপ্রকাশ। গত পঞ্চাশ বছর থেকে দেশে বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক সোবিয়েত কাব্যজগতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আশায়েভ। তার কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গীতিধর্মীতা। তিনি এমন বহু গীতিকবিতা রচনা করেছেন যা উৎকৃষ্ট কলাকৃতির অঙ্গরূপে স্বীকৃতি-লাভের যোগ্য। সাহিত্যের ইতিহাসে 'দি টুয়েন্টি সিক্স', 'লিরিক্যাল ডেভিয়েশন', 'রুশিয়ান টেল', 'সেমিয়ন প্রস্‌কাকভ', 'মায়াকোভস্কি বিগিনস্'—নামক কবিতাগুলির রসাবেদন অনন্যসাধারণ।

আশায়েভ গদ্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। দীর্ঘকাল তিনি কবিতাসম্পর্কীয় নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করে আসছেন। সবথেকে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাবলীর সুনির্বাচিত সংকলন 'হু নিড্‌স্ পয়েট্রি অ্যান্ড হোআই' কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে ছন্দ সম্পর্কে তত্ত্বাদর্শী আলোচনা—দ্বিতীয় খণ্ড রুশিয়ান ও বিদেশী কবিদের একটি অন্তরঙ্গ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা এবং তৃতীয় খণ্ড মায়াকভস্কি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ।

সাম্প্রতিক কবিতার সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আশায়েভ গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'হারমনি'। শব্দটি গভীর ব্যঞ্জনাময়। এর মধ্যে আধুনিক বিশ্বচিন্তাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা সম্ভব। গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে পড়বার পর একজন শান্তিকামী মানুষই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনও শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে। গভীর ও দৃঢ় দার্শনিক চিন্তা গীতিকবিতা সুলভ ভাবলুবমা লাভ করেছে। সকল সোবিয়েৎ সাহিত্যিক থেকে আশায়েভের পার্থক্য এখানেই। তিনি যা বলেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য বলেন। তাই

একটা জিনিসে অনেক কবির মধ্যেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে অনেকেরই মানসজগৎ সর্বদাই কাব্যদেহ গঠনে সচেষ্ট থাকে। যেমন সমুদ্র, নদী, পর্বত, শহর, শহরতলী, সামাজিক সংবাদ, পারিবারিক জীবনের নাটকীয় মুহূর্ত, এসমস্ত বিষয়ে অনেকে অনেক কবিতাই লিখতে পারেন। কাব্য ভান্ডারও বিরাট করে তুলতে পারেন। কিন্তু বিশ্বের মাঝখানে উদারচিত্তে মিলিয়ে যাওয়া
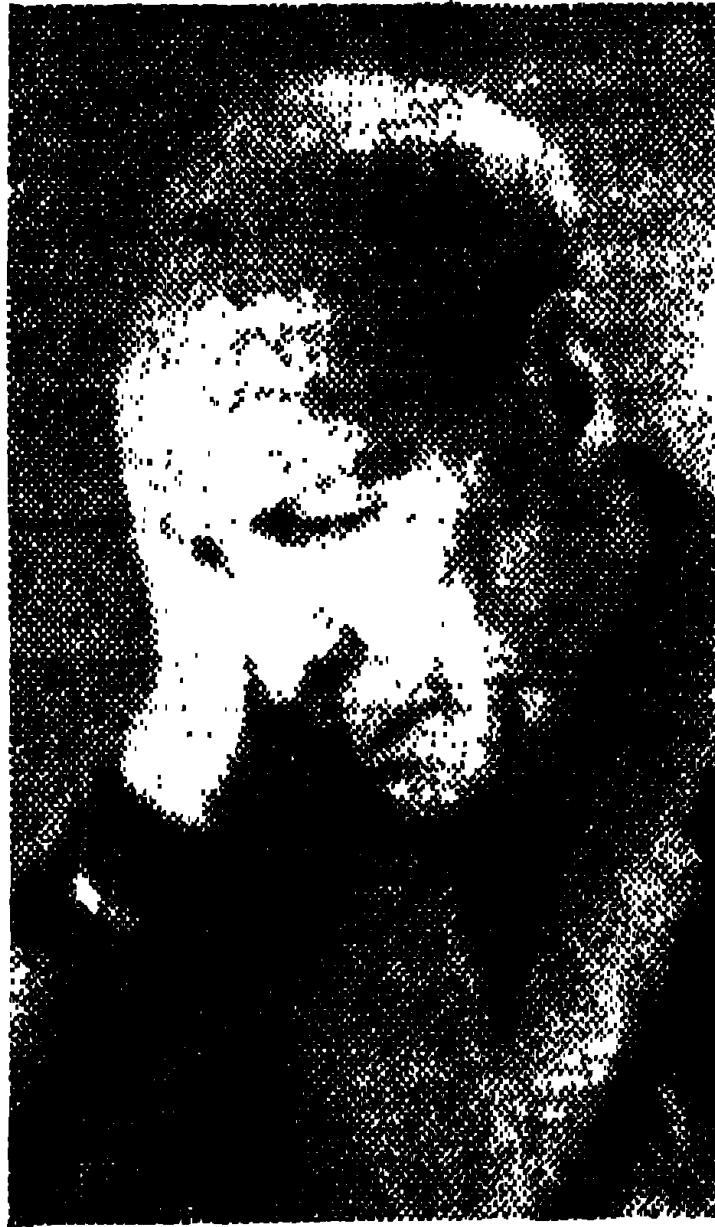
নিকোলাই আশায়েভ

সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। একমাত্র মহৎ শিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব। এই সম্ভাব্যতা আশায়েভএ সত্য রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে। তাঁর কাব্যজগৎ গড়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্বসত্যকে অবলম্বন করে। কোনরকম আন্তর্জাতিকতার তথ্য দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জীবন্ত এক মানবতাবোধ তাঁর চিন্তাধারায় নির্মলভাবে পরিস্ফুট। আঞ্চলিক জীবনসত্য বিশ্বপ্রেমের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। 'প্রকৃতির অস্থিরতা আমার সহবাসী', 'অসহায় মানুষেরা—যদিও তারা একটা সুন্দর চমক দিচ্ছে—কিন্তু অনেক সময়ই তাঁর কাব্যজগতে কোন বিশেষ মতবাদের ছাপ চোখে পড়ে না। তারা অসহায় দুর্বল—কিন্তু এখনও তাদের পূর্ণ তেজ বর্তমান'। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে শুরু করে কুস্ক-এর অধিবাসী তাঁর চোখে একই সত্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। সার্বিক প্রেমচেতনায় উজ্জ্বল।

'হারমনি'তে বিষয়বৈচিত্র্য এবং রচনাদির বিচিত্র উপাদান সমাবেশে অনেকের মনে গ্রন্থটির সম্পর্কে এক-নির্মোহবোধ জাগতে পারে। হয়তো একথা মনে হতে পারে এ এক বিচিত্র সম্ভারের উপচার। কিন্তু 'হারমনি'তে একটি অখন্ড সত্যই ফুটে ওঠে। এক অত্যুচ্চ অতুলনীয় জীবনসত্যে কাব্য-গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ গূঢ় আবেদন নিহীত, যা একমাত্র ক্ষমতাশালী মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব। সমগ্র গ্রন্থ পাঠের পর একই হৃদ্‌স্পন্দন অনুভূত হয়। একই আবেদনে সমস্ত কবিতা উজ্জ্বল না হলেও পরিশেষে মানুষের প্রতি এক আত্যন্তিক প্রেম-ভাষ্যে মুখর হয়ে ওঠে। সবুজ পৃথিবীর মোহময় আবেশ থেকে অসংখ্য নক্ষত্র-খোচিত তারকাময় নভতল কবির চোখে ধরা পড়েছে। জীবনকে ছাড়িয়ে বহু বহু দূরে কবির দুটি নীল চোখ নিরুদ্দেশে হারিয়ে গেছে।

আশায়েভের লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হল তিনি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধিকেই সকল মানুষের জন্য কাব্যরূপ দেননি—বিশ্বমানবের উপলব্ধ সত্যকে আপনার মুক্তদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাকে নিজের ও সকলের জন্য শিল্পরূপ দান করেছেন। অপূর্ব অনুভূতিজ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সচেতনতা, কাব্যরূপ দানের দুর্লভ ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান—অনেক কিছু বল্লেই আশায়েভের কবিত্ব-শক্তির দুর্লভতাকে বিশেষিত করা গেলেও সব থেকে বড় হয়ে ফুটে ওঠে একজন নির্মল মানবতাবাদী মানুষ।

রুশ কথাশিল্পের যাদুকর এম, প্রিশভিনের 'ফরগেট মি নট' গ্রন্থের এক জায়গায় আছে, "আপনার প্রতি অনুরাগকে কী করে সকলের প্রতি অনুরাগে এবং সকলের প্রতি অনুরাগকে কী করে নিজের প্রতি অনুরাগে পরিণত করা যায় তার উপায় উদ্‌ভাবন করাই আমাদের যুগের কাহিনীর মর্মবস্তু; আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কী করে নিজের প্রতি মনোযোগ রক্ষণের জন্যই সবাইকে ভালোবাসতে হয়।"—একথা আশায়েভের কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

ধর্মব্যাধ মিষ্টার এবং মিসেস গুপ্তার উপাখ্যান

অমরেন্দ্র ঘোষ

ছেলেমেয়ে বড় হল। দশজনের সঙ্গে দহরম-মহরম হলও প্রচুর। বাড়ির সম্মুখে পাঁচ পাঁচখানা গাড়ী নানা মডেলের। শুদ্ধ বিজ্ঞাপন হিসাবেই দাঁড়িয়ে থাকত না। যখন-তখন এপাড়ার ওপাড়ার প্রয়োজনেও পাওয়া যেত। এই যেমন, পুজো-পার্বণ হাসপাতাল শ্মশান ভোট। স্বামী-স্ত্রীর সৌজন্যে, হৃদ্য ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ। তাই বাড়িতে বাঙ্গালীর কাছে যাঁদের হওয়া উচিত ছিল মিষ্টার গুপ্ত এবং মিসেস গুপ্তা, তাঁরা কিনা হয়ে রইলেন ব্যাকরণের যৌথ লিঙ্গবিভ্রাট—স্ত্রীর জন্য স্বামী বেচারিও ফেমিনিন জেণ্ডার।

একে বিশ্লেষণ করলে অনেক তর্ক উঠতে পারে। কেউ আপত্তি জানালে উল্টে প্রতিক্রিয়া। তাই মর্মবেদনা নিয়েই মিষ্টার এবং মিসেস গুপ্তা হাসি আনন্দে

আর একটু এগিয়ে আসুন। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। কি দেখতে পাচ্ছেন? একখানা হাল ফ্যাসানের তেতলা নয় কি? সবে চুনকাম এবং রং চড়ানো শেষ হয়েছে। বাইরে তেমন অলঙ্করণ নেই। কিন্তু মাথায় অশোক চক্র, বুকে আজই আঁটা হল ইংরিজি নেমপ্লেট—মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস গুপ্তা।

পাড়া প্রতিবেশীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা চোখ বুলিয়ে যা উচ্চারণ করলে, তা বাংলা ব্যাকরণ শুদ্ধ নয়। অথচ যাঁরা এ বাড়ির মালিক দাবি করেন যে তাঁরা পুরোপুরি বাঙালী। এইভাবে ভূতপূর্ব মিঃ এবং মিসেস গুপ্ত প্রবাসের বাস গুটিয়ে বাংলা দেশে এসে কায়েমী হয়ে বসলেন।

কখনও চালু হয় নাচের আসর, কখনো বা গানের মজলিস।

স্বামী ব্যবসা ব্যপদেশে ভারত এবং ভারতের বাইরেও ঘুরেছেন। জাভা, সুমাত্রার দারুচিনির গন্ধ পাওয়া যায় তাঁর কথায়।. স্ত্রীর মুখে নানা দেশের ফুলের ফসলের খোশবু। যেন বেণীতে জড়িয়ে আছে বসরাই গোলাপ। কিন্তু কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তবু দুঃখের বিষয় স্বদেশের চিত্ত বোধ হয় ষোল আনা তাঁরা জয় করতে পারেননি। তাই বোধ হয় মহিলার কণ্ঠের 'রোদন ভরা এ বসন্ত আসেনি কখন বুঝি আগে' গানখানা চরম কারুণ্যে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ে। কারণ এত করেও এ দেশের মন পাওয়া গেল না।

যোগ দেন। যেদিন গানের কিংবা নাচের আসর থাকে না, নানা রং বেরঙের আলোচনা চলে। পয়সারও যেমন অভাব নেই, স্বামী-স্ত্রীর প্রিয় ব্যবহারেরও তেমনি ঘাটতি নেই। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, রেসের মাঠ থেকে গির্জার প্রেয়ার কোনটাই এখানে বাদ যায় না।

এক সন্ধ্যায় এ বাড়ীতে হঠাৎ ধর্ম-ব্যাধের আবির্ভাব। ভেবেছেন মহা-ভারতের যুগ থেকে একেবারে এয়ার কণ্ডিশন ঘরে? তা নয়, বোধ করি

পশ্চিমবঙ্গের শিশুপাঠ্য কিশলয় থেকে এই মজলিস মহলে। বাইরে বেশ শীত পড়েছে, যাকে বলে জমাটি শীত। তাই আধুনিক কালের কলকাতায় পড়ে সেকালের ধর্মব্যাধকেও মাফলার জড়াতে হয়েছে—হঠাৎ যদি দাঁতের গোড়া টনটনায়! এত ক্লেশ স্বীকার করেও ধর্মব্যাধের এখানে আসার একটা হেতু যে ছিল না তা নয়, তবু একে আকস্মিক বলব না—বলব, বদা বদা ছি......তখন মহাপুরুষদের আবির্ভাব দরকার। মিস্টার এবং মিসেস গুপ্তার বয়স একযোগে আশী। স্বামী এ বিষয়ে যতটা স্বাভাবিক, স্ত্রী তা নন। তিনি এখনও হাল্কা রঙীন শাড়ি জড়িয়ে ঠোঁটে মাখেন লিপষ্টিক। দান-ধ্যান, বন্ধু বাৎসল্যে তিনি মহিমাময়ী। শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই ভীষণ কৃপণা। আর একটু বিশদ করে বললে, পকেটমার। অতিথি-সজ্জনদের সরল বিশ্বাসের তহবিলটুকু টুক করে কাঁচি চালিয়ে নিয়ে যেতে চান। যাই হোক, তবুও মিস্টারের সোহাগ অঢেল, এ ছাড়া তিনি সকলকে একটু আস্কারা দিয়েও তৃপ্তি পান, সেজন্যে মাঝে মাঝে মহিলার জন্য অর্ডার দিয়ে তৈরী করে আনেন ভেলভেটের ওপর সাচ্চা জরীর নাগরাই।

মাফলার জড়িয়ে এলেও ধর্মব্যাধ সেকালের মত স্বধর্মনিষ্ঠ। বাপ তিনশ টাকায় রিটায়ার্ড করেছেন। ধর্মব্যাধ সেই কেরানীগিরি থেকেই অবসর নেবেন, কিন্তু পাঁচশোর কোঠায় উঠে।

মিস্টার গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে এলেন? অনেক দিন যে দেখিনে? ব্যাপার কি?

আর বলেন কেন, মাংস বেচে ফুরসৎ পাইনে। ফাইলের পর ফাইল।

মিস্টার গুপ্ত সহানুভূতির সুরে বললেন, স্বধর্মনিষ্ঠ হলেই ঐ জ্বালা।

কি করব বলুন, জাতব্যবসা!

অধ্যাপক মন্তব্য করলেন, ছাড়লেই পারেন। বরং মিস্টার গুপ্তের মত আনন্দময়ী প্রতিমা পাশে নিয়ে বাড়ী বসে মিণ্টান্ন বিতরণ করুন। দেখবেন আমরা আছি, এবং আমরণ আছি।

ধর্মব্যাধ পুরন্দর গুহ কিছু বললেন না।

হঠাৎ মৃত্যু কথাটা এ সভায় পড়ে এয়ারকন্ডিশন ঘরটাও যেন শিরশির করে উঠল। মুহূর্তের জন্য শীতের তীব্রতা যেন গেল বেড়ে। ধর্মব্যাধ পুরন্দর লক্ষ্য করলেন, রিটায়ার্ড জজ মহিমবাবু যেন সত্য সত্যই কেঁপে উঠলেন। তাঁর মুখের খাঁজগুলো যেন আঁধার হয়ে এল। চার চারটা নিওন লাইটেও তা রুখতে পারল না। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত। বাকি যাঁরা তাঁদের এ দায় নেই, অন্য দায় থাকলেও তাঁরা পলকের জন্য মোহমুক্ত হতে পারলেন না। কারণ তাহলে জগৎ চলে কি করে?

মহিমবাবু বললেন, একটা পরামর্শ ছিল আপনাদের সঙ্গে।

একদা যিনি নির্বিচারে সৎ-অসৎকে দায়রায় সোপর্দ করেছেন, কোন উকিল ব্যারিস্টারের কথা কানে তোলেননি, তিনি কিনা আজ পরামর্শের জন্য কাঙাল। লীগের ফিরতি খেলা দেখার জন্য সভা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

ধর্মব্যাধ তখন বললেন, একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের কাহিনী শ্রবণ করুন।

মিসেস গুপ্তা বাধা দিলেন, আমরা সত্যযুগের কোন কাহিনী শুনতে চাইনে—সেই অতি নিখুঁতের ওপর কেবল নিখুঁত।

তবে মিথ্যা যুগের কাহিনীই বলব? আপনাদের যুগে কি সখুঁত পরমাসুন্দরী থাকতে পারে না? পরমাসুন্দরী শুধু দেহে নয়, সাজসজ্জা অঙ্গরাগ গৌরবেও। গতকাল রাত্রে তাকে দেখে এসেছি। এখনও আমার চোখের পাতায় জড়িয়ে রয়েছে সে সুষমা। কিন্তু এখন থাক, আগে জজ সাহেবের আবেদন শুনি।

মহিলা বললেন, না না।

ধর্মব্যাধ বললেন, এটা হ'ল হিংসার কথা। রূপসী মেয়ের কথা শুনেছেন কিনা, তাই জরুরী বিষয়টা চাপা দিয়ে......

—কে বললে আপনাকে এ কথা? মহিলা ঝলসে উঠলেন যেন! এবার প্রসাধনের মধ্য দিয়ে বোঝা গেল, তিনি খাঁটি দুধে আলতা রংও নন, উঁচু দরের বেগুনী।

ধর্মব্যাধের শ্মশ্রুগুম্ফের অরণ্যে যেন দেবাগ্নি জ্বলে উঠল, তিনি হেসে বললেন, আমি কাউকে হিংসা করিনে, তাই—অলৌকিক শক্তিবলে আপনার মনের কথা জেনেছি।

—মিথ্যা কথা। মহিলা প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু তিনি আবার বেগুনী হয়ে উঠলেন।

—আপনি এবার ক্রুদ্ধ হয়েছেন—ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। তবে আবার রিয়েল ধর্মব্যাধের কাহিনী শুনুন।

মহিলা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, না আপনার কোন কথা আমরা শুনব না। আপনি অকারণেই মানুষকে নাজেহাল করেন।

অধ্যাপক ডিবেটের গন্ধ পেয়ে বললেন, নিশ্চয় শুনব, সব শুনব, পরমাসুন্দরী আধুনিকার কথা সকলের আগে শুনব।

জজসাহেব সবিনয়ে বললেন, তবে আমার নালিশটাই কি পেপার ওয়েট চাপা থাকবে? কোন সৎ পরামর্শ পাবো না?

দূর থেকে একজন অবিবাহিত প্রৌঢ় উকিল বলে উঠল, আপনি জীবনে কখনো কোনো সৎ উকিলের অযাচিত উপদেশও কানে তোলেননি। এখন তা একটু পরেই দেবো। আগে পরমাসুন্দরীর কথা হোক।

—ভায়ার ওকালতি পেশা কিনা, তাই এত নৃশংস! তবু ভাই তোমরা বিয়ে-থা না করে ভাল আছ।

—একটা শীতের রাত্তিরও যদি একা কাটাতেন, তবু একথা শোভা পেত!

—তুমি অত্যন্ত রূঢ়ভাষী, এখনো তো ফাঁদে পা দিয়ে দেখনি।

—সেই ফাঁদে পা দেয়ার জন্যই তো পরমাসুন্দরীর পরম কথা শুনতে চাইছি। ঘরবিভেদ ট্রির ফল না খেলে কি মজা!

অধিকাংশ সদস্য বিরোধী। জজসাহেবের মুখ আরো সকরুণ হয়ে উঠল।

ধর্মব্যাধের মন্তব্যে মহিলা ভিতরে ভিতরে কৌতূহলে জ্বলছিলেন,—তিনি তাঁর গোপন ইচ্ছাটি একেবারে নগ্নভাবে পরিবেশন না করে অন্যভাবে পূরণ করতে উদ্যত হলেন। মহিমবাবুর স্বপক্ষে বিপক্ষে হাত তুলুন আপনারা। হাত তুলুন! কি আপনারা শুনতে চান? সেই কবিকল্পনা রূপসীর কথা, না জজ সাহেবের......

দেখা গেল মহিমবাবুর স্বপক্ষে মাত্র একখানা হাত—গৃহস্বামীর।

হঠাৎ উত্তেজনার আগুনে কে জল ঢেলে দেওয়া হ'ল।

মিসেস গুপ্তা জরির নাগরা জোড়া সজোরে ঠেলে সরিয়ে ফেলে বললেন, আচ্ছা কন্যাদায়ের কথাই হ'ক।

ধর্মব্যাধ পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝে নিয়ে বললেন, না গৃহস্বামিনি, পুরাকালের ধর্মব্যাধের কথাই এখানে জরুরী।

ব্যাধের বক্তব্য পরিবেশনের গাম্ভীর্য দেখে সকলে নীরবে তাঁর কথা স্বীকার করলেন। সেই তিলোত্তমা আপাতত কর্পূরের মত মিলিয়ে গেল।

—হে প্রীতিভাজন বন্ধুগণ, তবে আসল ধর্মব্যাধের কথা শ্রবণ করুন। আমাকে আপনারা ধর্মব্যাধ বলেন, কিন্তু আমি তো মাত্র একজন ছাপোষা কেরানী। নমস্য ব্যক্তির পদনখের তুল্যও নই। তিনি এই বধির পৃথিবীকে একাদশটি নীতি-কথা শুনিয়েছিলেন।

নৃশংস উকিল বললে, বধিরকে নীতিকথা শুনিয়ে লাভ? বড্ড পানসে হচ্ছে এ গল্প, বরং সেই যে......

রমেন আর পাপ বৃদ্ধি করো না। এ জীবনটা তো আইবুড়োই কাটালে, কিছু জমাতে পারলে না বলেই ঘরসংসার হ'ল না। পরবর্তী জীবনের কথা ভাবো, শূন্য দিয়ে পূরণ করলে শূন্যই দাঁড়ায়।

—তবুও কি বধিরের কানে নীতিকথা ঢালা উচিত?

এবার ধর্মব্যাধ কুপিত হলেন। তাঁর নৈমিষারণ্যের মত দাড়ি গোঁফ আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ দুটোর পটভূমি দেখা গেল সদ্য জবাই-দেয়া মৃগমাংসবৎ। গোলক দুটি বড় বড় নীলার তুল্য ঘূর্ণায়মান।

মিস্টার গুপ্ত বললেন, সম্বরো, সম্বরো প্রভু!

মহিলা খুশিতে ভেঙে পড়লেন, যেন প্রহসন দেখছেন।

নৈমিষ্যারণ্য একবার মুখ ঘুরিয়ে বাঁকা চোখে আনন্দময়ীর দিকে তাকালেন।

গৃহস্বামী ভয় পেলেন, পাছে আবার ভস্ম না হয়ে যায় এই সুবর্ণ প্রতিমা!

ধর্মব্যাধ গৃহস্বামীর অবস্থা দেখে একটি নীতির শর নিক্ষেপ করলেন, আমি কখনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলেও বিচলিত হইনে। এ আমার ক্রোধ নয়, গৃহস্বামীর দাম্পত্য পরীক্ষা। ফুল মার্কই দিলাম।

তারপর তিনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, শোন উকিল, তুমি বড্ড ঢোঁটিয়া। এসব লোয়ার কোর্টের চরিত্র এখানে ছেড়েছুড়ে আসতে হয়।

কে যেন একটি নিতান্ত তরুণ সদস্য হাল্কা প্রশ্ন করলে, তবে কি এটা হাইকোর্ট?

—হ্যাঁ উজবুক। শুধু তাই নয়, এখানে একটি মহিলা জজও রয়েছেন এই চেম্বারে।

মেম্বারদের মধ্যে কে একজন যেন মন্তব্য করলেন, দুঃখের বিষয় মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই তাঁর সংগ্রামী আস্ফালন দেখে।

অধ্যাপক বললেন, নিতান্ত আপত্তি-কর মন্তব্য কুসুমসদৃশা রমণীর বিরুদ্ধে।

আবার প্রতিবাদ হ'ল—আমি দেহের কথা বলিনি মাস্টার অব আর্টস, মনের, প্রসাধনের, দুঃসাহসিক তর্কের।

সভারা হেসে উঠলেন।

ধর্মব্যাধ আবার বলতে শুরু করলেন, হে দুর্ভাগা উকিল, শ্রবণ করো, পাঁঠা কি কিছু শোনে, তবু পুরুত তার কানে মন্তর পড়ে। তাই তার আর পশুজন্ম হয় না। গৃহে থেকেও গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে না—অর্থাৎ বয়স থাকতে গৃহিণী জোটায় না, সে পশু বইকি!

চারিদিক থেকে অভিনন্দনবাণী উঠল, ঠিক ঠিক বলেছেন ব্যাধদেবতা। একাল এবং সর্বকালের পক্ষে একথা সত্য।

তবে বুঝুন কন্যাদায়ও স্বীকৃত সমস্যা এবং পারলে যথাশক্তি পরামর্শ উপদেশ দিতে হবে।

মহিমবাবুর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। তিনি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এগিয়ে এসে ধর্মব্যাধের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাকে না দিয়ে গৃহিণীকে দিলে ভাল হয়। একদিন গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিলে বর্তে যাই। গৃহিণী কি বলে জানেন? নারী জীবনের কাম্য কি শুধু বিয়ে? তিনি কেবল মেয়েদের ধিঙ্গিনাচ ভালবাসেন।

পুরন্দর গুহ প্রতিবাদ করলেন, এতটা কড়া মন্তব্য করাও মহিমদা ঠিক নয়। আমি আপনার মেয়েদের এবং বৌদিকেও চিনি।

তবে নরম করে বলছি, ভায়া একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। ডিগ্রির পর ডিগ্রি, তারপর পারলে সাগর ডিঙাও, তারপর বেপরোয়া নাচ, ছুটের পর ছুটের ইচ্ছা। মাশুল কে যোগায়?

মিসেস গুপ্তার গায়ে যেন ফোস্কা পড়ল স্বজাতি কুৎসায়। আমিও তো আপনার মিসেসের কথা সমর্থন করি। মেয়ে-জীবনের ক্রীতদাসী বৃত্তিই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না।

মহিমবাবু সখেদে বললেন, সব শেয়ালের এক রা। আমি বলি সব পুরুষেরও ক্রীতদাস হওয়া একমাত্র পন্থা নয়। বেশ আছ ভাই রমেন। কাউর তোয়াক্কা রাখ না।

উকিল বললে, তাই বলে কি পরমা-সুন্দরী কন্যা এখানে আসবেন না?

ধর্মব্যাধ বললেন, নিশ্চয় আসবে। মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা তোমার জন্যই আনতে হবে। আহা ভায়া যদি দেখতে সে রূপ! কিন্তু তার আগে রূপের মর্ম উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝলে চলবে না।

রমেন জবাব দিল, হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট গ্যারাণ্টি দিচ্ছি ব্যাধদেবতা, আমার মত মর্মান্তিক করে কেউ বুঝবে না।

মহিলা আবার বুঝি সেই রিপুর তাড়নায় বিহ্বল হলেন। অবশ্য চোখ মুখ দেখে না বুঝলেও কথায় পাওয়া গেল হিংসার ঝাঁঝ।

তিনি তো পরমাসুন্দরী নাও হতে পারেন?

নিতান্ত কবি-কল্পনার অষ্টাদশী, আপনার তিনি বলা ঠিক হবে না সে কচি মেয়েকে। কিন্তু দেখছি ধর্মব্যাধের কাহিনী আবার শুরু করতে হয়। যেহেতু বেদজ্ঞ কৌশিক বেদের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি।

—এক কাপ চা হলে ভাল হত।

সাধ্বী সতী পতির দিকে হরিণনয়নে কটাক্ষপাত করলেন কিনা কে জানে, অনুগত স্বামী উঠে গেলেন, পর মুহূর্তে চা এল। মিসেস বললেন, সন্দেশ? তাও এলো যেন ইলেকট্রিক ট্রেতে ভর্তি হয়ে।

মিস্টার হাতে হাতে পরিবেশন করলেন, মিসেসও পেলেন এ ভাগ। অবশ্য তাঁকেই আগে দেয়ার লোভ থাকলেও গৃহকর্তা নীতিবানের সম্মুখে সংযত হতে বাধ্য হলেন। নিশ্চয়ই এর

জন্য এক সময় জবাবদিহি করতে হবে তাঁকে। তখন থাকবেন একান্তে, পায় ধরলেই তো ফিনিস। তরুণ ও প্রাচীনের সমগ্রাহ্য এক কম্পাউন্ড মিকশ্চার খাড়া করে ধর্মব্যাধ বলতে শুরু করলেন,—

পুরাকালে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ কঠিন সাধনা করে বেদজ্ঞ হয়েছিলেন। একদা তাঁর মাথায় এক অবোধ বক পুরীষ ত্যাগ করল। তিনি দৃষ্টিপাত করা মাত্র বক প্রাণত্যাগ করলে।

—কিন্তু একালের মনীষীদের মাথায় তো কত কাক শালিখে—

—তুমি ভাই রমেন ইনকরিজিবেল। আমি থামলে তোমার আর আশা নেই। এখনো বয়স ছিল।

—আচ্ছা তবে কানমলা খাচ্ছি ব্যাধ-দেবতা। বলুন সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর কথা।

আবার গল্প শুরু হ'ল।

—আর একদিন বেদজ্ঞ কৌশিক ভিক্ষার জন্য এক গৃহস্থ-বাড়ী উপস্থিত।

পতিব্রতা এক গৃহিণী ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করতে বলে অন্দরে প্রবেশ করলেন। ফিরতে দেরী হচ্ছে। কৌশিক ক্রুদ্ধ হলেন। কিছু বাদেই পতিব্রতা ফিরে এলেন ভিক্ষা নিয়ে। ক্ষমা চেয়ে বললেন,—পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে এসে পড়েছেন, তাই তাঁর পরিচর্যা করে ফিরতে বিলম্ব হ'ল।

কৌশিক জবাব দিলেন, তোমার স্বামীই কি কেবল গুরু? ব্রাহ্মণকে গুরুজ্ঞান করো না?

কুপিত ব্রাহ্মণকে শান্ত করতে পতিব্রতা তখন বললেন, ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। আমার মতে স্বামী-সেবাই প্রধান ধর্ম। স্বামী সকল দেবতার মধ্যে প্রধান। আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করেছেন, কিন্তু আমি বক নই। আপনি বেদজ্ঞ কিন্তু মর্মজ্ঞ নন।

বলছিলাম রূপ রস গন্ধ বর্ণের মর্মে না যেতে পারলে সব বৃথা। পুরন্দর গুহ একটু থামলেন, সভার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন একবার। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন একটু ভিন্ন সুরে, হ্যাঁ। তাই বলি আপনারা কি সেই পরম সৌন্দর্যের মর্মে যেতে পারবেন?

উকিল চট করে জবাব দিলে,—আর কেউ না পারলেও আমি তো আগেই বলেছি, পারব মর্মান্তিক ভাবে।

তোমার ছওয়ালে বিশ্বাস করিনে? আগে পরীক্ষা দাও, গৃহিণীর সে দৃষ্টিপাতে কিছু হ'ল না, অথচ বক প্রাণত্যাগ করলে কেন?

—সোজা উত্তর, প্রসাধনের অভাব।

এবার সকলের সঙ্গে ধর্মব্যাধকেও হাসতে হ'ল। —তুমি বাস্তবিকই বাচাল-শ্রেষ্ঠ।

ইতিমধ্যেই মিসেস গুপ্তার মুখের হাসি করুণ হয়ে উঠেছিল, উকিল রমেনই তাকে রক্ষা করলে,—এ প্রসাধন লিপস্টিকের নয়, পতিসেবার।

বর্তমান ধর্মব্যাধ আবার বলতে লাগলেন, গৃহিণীর উপদেশ তোমাদের কাছে হিতকর হবে কিনা জানিনে কিন্তু কৌশিকের কাছে হ'ল। তিনি মিথিলার পথে ধর্মব্যাধের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

রমেন উকিল আবার ফোঁড়ন কাটলে। এবার নিশ্চয়ই সাঙ্কশ্যা জনকতনয়ার মত পরমাসুন্দরী আসছেন?

আর একজন বললেন, মিথিলা, রাজর্ষি জনকের গৃহ, কুঞ্জীরই বা অভাব কি?

মহিমবাবু অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসেছিলেন, এবার বললেন, আমি উঠি। আমার সমস্যার তবে আর কিছু হ'ল না?

ধর্মব্যাধ বললেন, সেকি সকলের জনাই তো আজ নীতি ব্যাখ্যা। বসুন, একটু ধৈর্য ধরুন, নিজে মর্মজ্ঞানী না হলে গৃহিণীকেও মর্মজ্ঞানী করা যায় না।

মিসেস গুপ্তা বললেন, অনুপস্থিত মহিলার ওপর কটাক্ষপাত উচিত নয়।

অধ্যাপক বললেন, স্বামীর সম্মুখে করলে বোধহয় আপনারা ক্রুদ্ধ হন না।

মহিমবাবু নিতান্ত হতাশ হয়েই বসে রইলেন। তাঁর মাথার ভেতর পাঁচ পাঁচ জোড়া ঘুঙুরের শব্দ। আর তবলা বাজাচ্ছেন গিন্নী।

আবার ধর্মব্যাধ যেন মহাভারতীয় যুগে চলে গেলেন, যেখানে রাজা প্রজা-বৎসল, মন্ত্রী সর্বত্যাগী ঋষি, জন-সাধারণ হিতোপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যাকুল, পাপী অনুতপ্ত।

—কৌশিক ধর্মব্যাধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একাদশটি নীতিকথা শুনে মর্মজ্ঞ হলেন এবং দেশে ফিরে তা প্রযুক্ত করলেন নিজের জীবনে।

গৃহস্বামী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, সবিনয়ে বললেন, নীতিকথা কটি শুনতে পারি কি?

—আপনারা বিরক্ত না হলে আপত্তির কি আছে?

—কেন বিরক্ত হবো বলুন? পথচলা তো ছেলেখেলা নয়।

—স্বামীর গাঢ়কণ্ঠে মহিলা চমকে উঠলেন। মুহূর্তে যেন চটুলে প্রসাধন মিলিয়ে গেল। একটি জ্ঞান অন্বেষণা মধুমতীরূপে যেন পালা বদল করল এই ঘরে।

মহিমবাবু দেখলেন, জরির নাগরা উধাও। নগ্নপায় একটি কল্যাণী বঙ্গ ললনা। যাকে দেখে তাঁর মা বলতে প্রাণ আনচান করে উঠল। চোখজোড়া এলো ভিজে, তিনি মনে মনে আশীর্বাদ করলেন, ঘট বুঝে এমন সরাটি চিরকাল সাজানো থাক।

কিন্তু একটু পরেই মহিমবাবু বাস্তবে ফিরে এলেন। তাঁর বিষয়ের তো কোনো সুরাহা হ'ল না।

ক্রোধ, ঈর্ষা, পরচর্চা, নিন্দা কিংবা অনিষ্ট চিন্তা সর্বথা বর্জনীয়। অতিথি-সেবা, সৎপাত্রে দান, সবিনয় আচরণ সর্বথা করণীয়। আর মহিমবাবু অপ্রিয় ঘটনায় বিচলিত হওয়া যেমন উচিত নয়, তেমনি অর্থকষ্টে হতাশ হওয়া অনুচিত।

রমেন উকিল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলে উঠল, কুইনাইন তো গিললাম ব্যাধদেবতা সুগারকোটেড বলে। এখন রঙিলা সিরাপ কই?

—দেবো কিন্তু তার কি মর্মে যেতে পারবে?

রমেন হাতজোড় করে সাশ্রুকণ্ঠে নিবেদন করলে, আর্যপুত্র, আমি আর কবার অগ্নিপরীক্ষা দেবো? পোড়া-লঙ্কার ঝাল তো এখনো আমার চিত্ত দগ্ধাচ্ছে।

পুরন্দর গুহ বললেন, বাকি যাঁরা রয়েছেন?

—তাঁরা তো অযোধ্যার নিষ্ঠুর প্রজা, বলে কিনা মা জানকী কলঙ্কভাগিনী, একা একা পুড়ে মরুক। আমরা বসে বসে চা খাই।

মহিলা বললেন, যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নেবো, কেন পারব না?

পুরন্দর বললেন, শুধু বিশুদ্ধ যুক্তিতে হয় না, ওর সঙ্গে দরদী মন চাই। তবে আবার ধর্মব্যাধের কথা শুনুন।

রমেন যেন ঝড়ে-ভাঙ্গা কলাগাছের মত ভেঙ্গে পড়ল— সোফায়।

—পাতালে প্রবেশ করো না ভায়া, আমারই ভুল হয়েছে এবার পরমাসুন্দরী কন্যার উপাখ্যান।

এর মধ্যে গতকাল শিল্পী বন্ধু জগদীশের বাসায় গিয়েছিলাম। সেই যে জগদীশ, অধ্যাপক আদুর বাড়িভাড়াটে, সেই যে হে অধ্যাপক যিনি সমালোচনাশতক লিখে প্রখ্যাত। সন্ধ্যা-

বেলা বসে বসে দরিদ্র শিল্পীর স্বধর্ম-নিষ্ঠা দেখছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, এ কি সম্ভব? সময় মত বোধহয় জগদীশ গিন্নীর একখানা শাড়িও জোটে না। তবু হাসিমুখ।

মহিমবাবু উৎকর্ণ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হলেন মহিলা।

আপনাদের ভয় নেই, জগদীশের স্ত্রীর আর কোন গুণের পরিচয় দেবো না এ সভায়। শুধু তিনি বললেন, ও ঘরে ইলা নিয়োগী এসেছে, একটি বার ডাক না।

এঘরে তখনো অন্ধকার ওঘর করছে ঝকঝক। জ্বলন্ত বাল্‌ব্ উজ্জ্বল না ইলা উজ্জ্বল বলা কঠিন।

জগদীশ ডাকল, ইলা তোমার মামার ঘরেই শুধু আলো নেই, এ ঘরেও ইলেকট্রিক লাইট আছে। জানি তুমি সুন্দরী, কিন্তু অনেকদিন দেখি না, একটিবার এদিকে এসো। চোখ জুড়াই।—

শিল্পী-গিন্নী বোতাম টিপলেন।

ইলা বললে, আসি কাকা। একেবারে সময় পাই না। ছুটি নেই আপিসে, আজ এক বিয়ে উপলক্ষে এপথে আসা।

—ও তাই বুঝি এত সাজ? সঙ্গে কে?

ইলা এগিয়ে আসতে আসতে বললে, মা। সাজ দেখলেন কোথায় কাকা? নেমতন্নে যাচ্ছি একটু ভাল কাপড় পরতে নেই।

ধর্মব্যাধ বললেন, ইলা এঘরে এলো, ওঘর গেল যেন মলিন হয়ে। মৌমাছি নেই, থাকলে হয়ত গুণ গুণ করত এ প্রস্ফুটিত কুসুম দেখে।

ইলা নিয়োগী লজ্জা না করে একেবারে জগদীশের সুমুখে এসে স্থির হয়ে রইল। ঠোঁটে মুখে মৃদু হাসোর কম্পন। ভ্রূতে বিলোল ভঙ্গিমা।

শিল্পী মন্তব্য করলে, তুমি এ পৃথিবীতে তিলোত্তমা। সত্যিই আমাদের চোখ জুড়াল। আর একটু দাঁড়াও আশুকে ডাকি। আশু আশু।

অধ্যাপক অর্থাৎ সমালোচনাশতক জবাব দিলেন, আসি, আসছি।

সাধারণ একখানা হাল্কা সিল্কের শাড়ি। হাতে মাত্র দুগাছা সোনার কাঁকন, গলায় কিছু ছিল কিনা ভুলে গেছি। আমি তখন কি দেখছিলাম জানিনে।

অধ্যাপক এসে বললেন, চমৎকার। অপূর্ব! আমি আগেই দেখেছি, তুমি দেখো। তিনি নস্যির টিপ নাকে তুললেন।

জগদীশ ইলার মাকে প্রণাম করে বলল, আমি গরীব শিল্পী-কিছু দিতে পারব না, শুধু অভিনন্দন জানাই। আপনার মত স্বর্ণগর্ভা অসীম ভাগ্যবতী। জগদীশ কথা শেষ করতে না করতেই অন্দর থেকে একছড়া মালা এসে পড়ল ইলার গলায়।

মহিমবাবু অস্ফুটে বললেন, আমার মেয়েরা যে কালো?

—ইলা এবং ইলার মা চলে গেলেন। মহিমবাবুর কথায় কান না দিয়ে ধর্মব্যাধ বলে যেতে লাগলেন, জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, সত্যি কেমন দেখলে আশু?

তুমি এ পৃথিবীতে তিলোত্তমা

রঙটা আর একটু চড়া হলে ভাল হ'ত।

আপনারা বলুন জগদীশ কি জবাব দিলে? শিল্পী জগদীশ।

সভা নীরব। মহিলাও পানসে।

—তবে? রসজ্ঞ যাকে বলে, মর্মজ্ঞ হওয়া কি অতই সহজ?

—জগদীশ বললে, হয়তো নিখুঁত হতো, দেবী হতো, মানবী হ'ত না।

—আমার মেয়ের যে তাই......

—ঐ যে নীতি বাক্যে আছে সৎপাত্রে দান করুন।

—কিন্তু গিন্নীর বা বা ফর্দ, এই এই না হলে হবে না।

আপনারও মাথায় গাড়ী বাড়ি মোটা চাকরীর ফর্দ—শুধু 'সাক্‌সেস্‌ফুল'-এর পিছনে ধাওয়া। তার চেয়ে মানুষ খুঁজুন। মহৎ মানুষ, যার প্রাণে রয়েছে দয়ামায়া নবগুণ। আপনার মেয়েরা আদৌ কুৎসিত নয়, শিল্পানুরাগীও বটে। বেশ লেখাপড়া জানে। যত গৌরী তত শিব, ভক্তি করে ডাকুন।

পুরন্দর গুহ উঠলেন।

মহিমবাবু হাতজোড় করলেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে।

গৃহস্বামীর সঙ্গে স্ত্রীও হাতজোড় করে এগিয়ে এলেন খুশি মনে।

—আবার কবে আসছেন? মিসেস গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

ধর্মব্যাধ হেসে জবাব দিলেন, যদা যদা হি......

শেষ দলিল

সুনীল কুমার ঘোষ

জানি, আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল অগাধ। সূর্যগ্রহণে পৃথিবীর বুকে বিস্ময়ের যে কালো ছায়া নেমে আসে, তোমার মুখে মাঝে-মাঝে আমি সেই ছায়া দেখেছি। এমনও হতে পারে, ওটাও তোমার মুখোস। তুমি চেয়েছিলে আমাকে গ্রাস করতে; অথবা ভেবেছিলে, আমি তোমার একেবারে নিজস্ব একটি শিকার। ইচ্ছা করলে, নারীর স্বভাবজাত ছলকলা দিয়ে, যে কোন মুহূর্তেই তুমি আমাকে গ্রাস করতে পার। তোমাদের এই অকারণ দম্ভে আমি মনে-মনে হাসতাম। কারণ, তোমরা আমাকে কোনদিনই নাগালের মধ্যে পাওনি। যদি কিছু পেয়ে থাক তা আমি নয়, আমার শ্যিলোট।

হ্যাঁ, শিলোট-ই। যাকে তোমরা সত্যকার মানুষ বলে ভেবেছিলে, সেটা কিন্তু নকল মানুষ। আসল মানুষটা তখন লজ্জায় এমন একটি জায়গায় মুখ লুকিয়ে বসেছিল, সেখান থেকে তাকে আবিষ্কার করে বাইরে টেনে আনা কেবল যে দুঃসাধ্যই ছিল তা নয়, অসম্ভবও ছিল হয়ত। তোমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমি নিজেই কি ছাই কোনদিন বুঝতে পেরেছি নিজেকে?

তাই যদি পারতাম, তাহলে জীবনের এত বড় ধাপ্পা, আর প্রবঞ্চনাকে ধ্রুব-নক্ষত্রের নির্ভুল নির্দেশ মনে করে সংসার-সমুদ্রে ভেলা ভাসালাম কেন? আর ভাসালাম-ই যদি, তা হলে পিছনের সমস্ত মোহকে মোহমুদগরের ভাষ্য মনে করে ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে অবলুপ্ত করার সাহস হল না কেন?

এ-কেন'র কোন সদুত্তর নেই। আর নেই বলেই, মনীষীরা জীবনবোধকে দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে ধোঁয়াটে করার চেষ্টা করেছেন। তাতে জীবনের গ্রন্থি এতটুকু শিথিল হয়নি। যা হয়েছে তা একটি বৃত্তকে সরলরেখা বলে প্রচার করার অপচেষ্টা মাত্র।

তুমি বিশ্বাস কর, সুচরিতা, জীবনকে আমি কোনদিন কল্পনা-বিলাস বলে ভাবতে শিখিনি। আমার কাছে এ ছিল একেবারে একটি অনার্য সত্য। স্বপ্নাদ্য ওষুধের কর্মক্ষমতায় আমি আজ যেমন অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের অপার মহিমায় আমার অনাস্থা তেমন-ই অটুট। জানি, এর পরে তোমরা আমাকে সিনিক বলতে দ্বিধা করবে না। না কর, আমার ক্ষতি নেই। একদিন সৈনিকের আদর্শ নিয়েই বুক ফুলিয়ে তোমাদের পৃথিবীর পথে-পথে অন্যায়ের প্রতিকার করতে বেরিয়েছিলাম। সেদিন জগৎ-সংসারের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার গুরু-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম নিজের মাথায়। ঠিক কখন জানি নে, তবে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, ডন কুইক্-সোটের মত আমি নিজেই কখন সেই আবর্জনায় রূপান্তরিত হয়েছি। ডনের কপাল ছিল ভাল। স্যাংকো পাঞ্জার মত একজন নির্ভরশীল অনুচর জুটেছিল তার। আমায় বরাতে যার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হল সে বড় নির্মম, বড় কঠোর। সেই গুপ্তঘাতী দস্যুর দল আঘাতে-আঘাতে আমাকে কেবল ক্ষত-বিক্ষত করেই ক্ষান্ত হল না, আমাকে নিঃশেষে ধ্বংস করতে এগিয়ে এল। কেবল তাই নয়। সেই ধ্বংসের ওপর তারা নিজেদের জন্যে যে মুসোলিয়ম গড়ে তোলার চেষ্টা করল, তা না হল শব, আর না হল শিব। পিরামিড দেখেই তোমরা মানুষের জয়ধ্বনিতে আকাশ মাতিয়ে দিলে, সুচরিতা, তার অতলান্ত শূন্যতার দিকে

চোখ মেলে একবার তাকাবার সময় পেলে না।

চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, আর মানুষের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা নিয়েই একদিন তোমাদের এই পৃথিবীতে আর দশজনের মত নেমে এসেছিলাম। এ বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে সহজভাবে ভালবাসার জন্যে কী বিরাট আকুতিই না আমার উক্ত চেতনার একটি অতি স্পর্শকাতর অংশটিকে বেদনার্ত করে তুলেছিল! সেদিনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্ধ-চেতনায় নিমজ্জিত থাকার পর যে প্রথম আত্মবিলুপ্তির অবসান ঘটল, সেই আলো-অন্ধকারের গোধূলিতে বার-বার হয়ত আমি কাকে উদ্দেশ করে বলেছিলাম, হে অপাবৃণু, আমাকে আলো দাও, একাকীত্বের এই নির্জন কারা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রখর
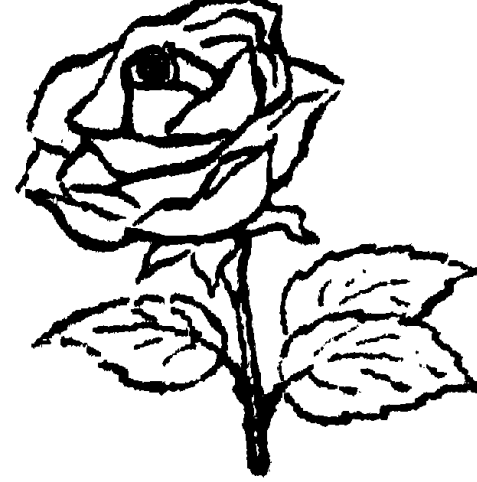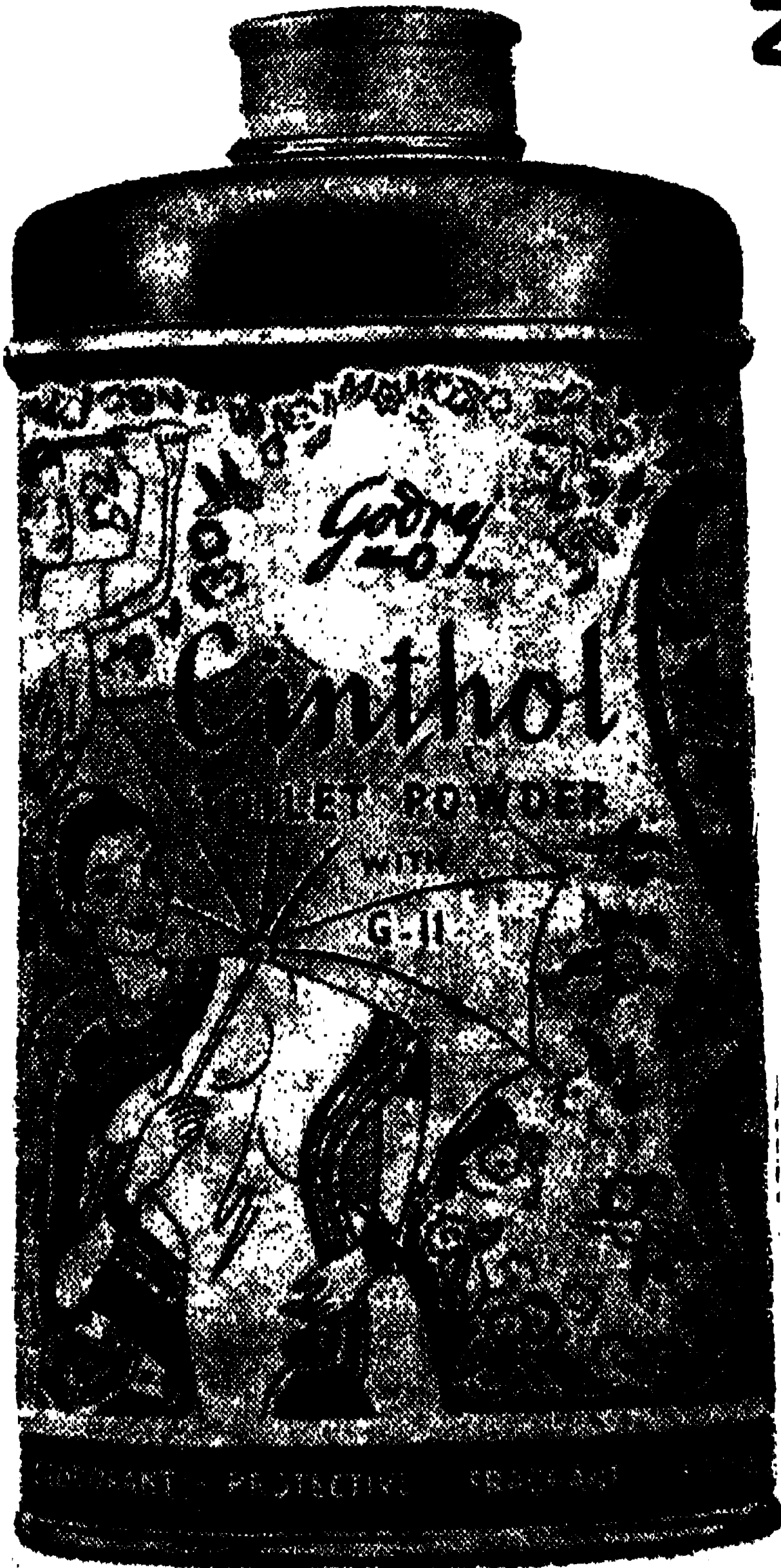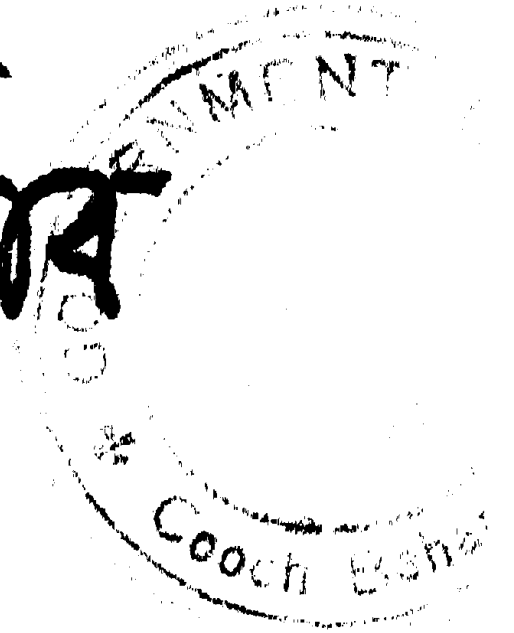
সূর্যের আলোতে নিয়ে এস। কিন্তু আমার জন্মলগ্নের সেই প্রথম অশুভ মুহূর্তে অলক্ষে বসে বিধাতাপুরুষ হয়ত বা একটু হেসেছিলেন। না হলে, জীবনপথে অগ্রগতির ধাপে-ধাপে সেই সূর্য কেনই বা আমার মানসপদ্মের সজল-তাজা পাপড়িগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সেই ছাই নিয়ে আমি করব কী? ও দিয়ে রাসায়নিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকের যদি বা কোন কাজ চলে, আমার কাছে ও যে একেবারেই অচল।

আজ ভাবি, আমার তো কোন ত্রুটি ছিল না। জীবনের সঙ্গে মিতালি পাতাতে কোনদিন তো কোন কার্পণ্য করিনি। এমন কি, তারই খেসারৎ দিতে, পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলিকেও আজ ভুলতে বসেছি। জীবনের জয়গানে মুখরিত কত অজস্র আশা আর উদ্দীপনা, তাদের সকলেই আজ রুক্ষ মরুভূমির বালুস্তরে স্তব্ধ হয় পড়ে রয়েছে। তাদের অনেককেই আজ চিনতে পারি নে। তবু মাঝে-মাঝে, অসীম ক্লান্তিতে ঢলে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, অজান্তে সাজঘরের মুখোস খসে পড়লে, কখন-কখন খোলা জানালার ভিতর দিয়ে পৌষের শিহরণ আমার আকাশে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দূরের সেই ঝরা-পাতার দল সজীব হয়ে নব কিশলয়ের মূর্তিতে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমাদের গাঁয়ের বাগানে হাসনাহানা, আর কেয়া-ফুলের গন্ধ অকস্মাৎ উদ্দাম হয়ে আমার দরজায় লুটোপটি খায়। একটি অস্ফুট বেদনায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ডানলোপিলোর বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে দৌড়ে আসি। দেখি, ওপাশে আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই প্রায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত বাড়িয়েও তাদের নাগাল পাইনে আজ। আর পাইনে বলেই জানলাটা বন্ধ করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে কতদিন শিশুর মত চীৎকার করে বলেছি, ওগো, তোমরা সব ফিরে যাও। আমাকে এরা বন্দী করেছে, এ জীবনে আর আমার মুক্তি নেই।

কেমন করে মুক্তি হবে বল? আমি যার কাছে নিজেকে বন্ধক দিয়েছি, যার দাসত্ব করতে আমি আজ প্রতিশ্রুত, যে আমার দিনের কর্ম, আর রাত্রির স্বপ্নের ওপর অবিসংবাদিত প্রভুত্ব বিস্তার করে বসে রয়েছে, সেই বিরাট দৈত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার শক্তি আমার নেই। আমার কোন অসতর্ক মুহূর্তের ছিদ্রপথে ঐ সব শোনপাংশুর দল হঠাৎ প্রবেশ করে পাছে যদি কোন অঘটন ঘটায়, সেই ভয়েই তো হৃদয়দুয়ার আজ নিজের হাতেই রুদ্ধ করে দিয়েছি। সেই লৌহ-যবনিকার অন্তরাল থেকে চির প্রবঞ্চিত মানবকের আর্তনাদ তোমাদের কানে ধরা পড়বে কী? কান পেতে শোন, সুচরিতা; ইথারের তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত উতরোল কান্নার উচ্ছ্বাস তোমার সজাগ মনের তন্ত্রীতে ধরা দিলেও দিতে পারে হয়ত।

কাল রাত্রে যে মানুষটিকে রোটারি ক্লাবের একটি বিদগ্ধ পরিবেশে সদম্ভ বক্তৃতা দিতে শুনে তোমরা মুগ্ধ হয়ে বার-বার করতালি দিয়েছিলে, নিয়ন লাইটের তুফান আলোতে যাকে মধ্যযুগের নাইটের মত শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্বের ধারক আর বাহক বলে ধারণা হয়েছিল তোমাদের, আর হয়েছিল বলেই, বহু সুন্দরী তন্বী পরিবৃত থাকা সত্ত্বেও, এক যুগ আগে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বিলম্বিত মর্যাদা দিতে উপযাচিকা হয়ে নিঃসঙ্কোচে আমার একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছিলে, সেই মানুষটা যে ভিতরে-ভিতরে এতখানি দুর্বল তা ভেবে হয়ত বা স্তম্ভিত হবে তোমরা। হয়ত এই অভাবিত ঘটনা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমার তথাকথিত অগণিত বন্ধু-বান্ধব ভিড় জমাবে এখানে, ফুলের মালা আর 'বুকে'-তে ভরে যাবে আমার ঘরের প্রতিটি আঙিনা। সেই সময়, সুযোগ যদি পাও তো, আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখো, সুচরিতা। দেখবে, আমার দেহের ক্লান্তি আর মুখের শিরা স্নবারির হলাহলে পুড়ে নীল হয়ে গিয়েছে।

জীবন-সমুদ্র মন্থন করে যা পেলাম, তা হলাহল ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষ্মী আর অমৃত অপহৃত হল দেববেশী দস্যুদের কাছে। অথচ, আমিও তাদের ভাগ পেতে পারতাম। জীবনের শুরুতে তা পেয়েছিলামও। আর পেয়েছিলাম বলেই ব্যর্থতার হলাহল আজ আমার কাছে এত তিক্ত, এত জ্বালাময়।

আজ সকলের প্রথমেই বাবার কথা মনে পড়ছে। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিভূ ছিলেন তিনি। মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। এই প্রভাব দলিলের জোরে দখল করা নয়। আলো-হাওয়ার মতই তা ছিল স্বাভাবিক। তাই তার আবেদন ছিল অনস্বীকার্য। ভদ্রতা কোন বিদ্যালয়ে সূক্ষ্ম কলার মত শিক্ষা করতে হয়নি তাঁকে। সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত ওটি ছিল তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠব। প্রাচুর্যের মোহকে তিনি অবহেলা করতে পেরেছিলেন বলেই বোধ-হয় দারিদ্র্যের অগৌরব কোনদিন স্পর্শ করতে সাহস পায়নি তাঁকে।

এই সংসারে আর পাঁচটি ভাই-বোন, এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই বেড়ে উঠেছিলাম আমি। বাবার বড় ছেলে বলে প্রিন্স-অফ-ওয়েলস-এর মর্যাদা কোনদিনই আমার কপালে জোটেনি। তাতে বাবারও কোন দুঃখ ছিল না, আমারও না। মাঝে-মাঝে মাই যা কিছু দুঃখ করতেন। বাবা সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে বলতেন: রাজ্য খোয়া গিয়েছে, ইতিহাসে তার প্রচুর নজীর রয়েছে, গিন্নী; কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা মানুষও খোয়া যায়নি।

কথাটা সত্যি, সৎপথে থাকার জন্যে মোটা প্রিমিয়ম দিতে হয়েছিল বাবাকে। কিন্তু তবু, এতটা তাড়াতাড়ি যে পরপার থেকে তাঁর ডাক আসবে তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। সেদিন আমাদের সহানুভূতি দেখিয়ে অনেকেই সরবে ঘোষণা করেছিলেন, এই পাপের সংসারে চৌধুরীমশায়ের মত পুণ্যাত্মার স্থান নেই। ভগবান তাই তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন।

মায়ের দিকে চেয়ে দেখলাম, বাবার এত বড় সৌভাগ্যেও তাঁর মুখের ওপর আনন্দের কোন দিব্যজ্যোতি ফুটে বেরোয়নি। বরং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের একটি আশঙ্কা দুরারোগ্য ক্যানসারের মত তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ন্যায়, ধর্ম, সততা, আর মানবতার বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে, মৃত পিতার আশীর্বাদকে একমাত্র পাথেয় করে, পুরাকালের নাইটদের মত হিংস্র শ্বাপদঅধ্যুষিত সংসার-অরণ্যে প্রবেশ করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, এ অরণ্যের অন্ধকারে যে সব দৈত্য-দানো ঘাঁটি পেতে বসে রয়েছে, তারা মায়াবী। সাদা চোখে তাদের দেখার কোন উপায় নেই। তাদের আয়ত্তে আনতে গেলে রাজা দশরথের মত শব্দভেদী বান ছোঁড়ার কৌশল শিখতে হবে। কিন্তু দীর্ঘ কুড়িটি বছরের শিক্ষা আর সংস্কার মায়ামন্ত্রের অলৌকিক ইন্দ্রজালের কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করতে বাধ্য করেছিল আমাকে। তাই আমি কিছুতেই

বিশ্বাস না করে পারিনি যে, আমার চারপাশে যে সব অতিকায় দৈত্যগুলি কুহেলিকার সৃষ্টি করে বুক ফুলিয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আসলে তারা নকল রাজা ছাড়া আর কিছু নয়। মোজেজের ন্যায়দণ্ডের আঘাতে বর্বর ফ্যারোয়ার ক্লীবত্বপ্রাপ্তির মত, ভেবেছিলাম, আমার চোখের সামনে যে অন্ধকার কুটিল ভ্রূকুটিতে আকাশ ভারাক্রান্ত করে রেখেছে তা মুহূর্তে কুয়াশার মত দিগন্তে মিলিয়ে যাবে। অথবা, আমার মুঠোর মধ্যে যে পিতৃদত্ত মহামণি রয়েছে তারই স্পর্শে অতল সমুদ্রগর্ভে আমার জন্যে রাজপথের সৃষ্টি হবে, আর সেই রাজপথ বেয়ে পথ-ভ্রষ্ট রাজার কুমারের মত সাতশ রাক্ষসে পরিবেষ্টিত লোহার প্রাসাদে বন্দিনী নিদ্রিতা রাজকুমারীর হৃদয়ের একেবারে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অংশটিতে নিজের জন্যে স্থান করে নিতে পারব।

কিন্তু কোথায় সেই রাজপথ? আর কোথায় বা সেই রাজকুমারী যে উত্তাল তরঙ্গবেষ্টিত প্রবাল দ্বীপের কারাগারে বসে আমার জন্যে দিন গুনছে? হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল। বাবার নীতি আর সমাজবোধের লোহার প্রাকারের কোনখানে হয়ত কোন ফুটো ছিল; তারই ভিতর দিয়ে এতদিন ধরে যে অজস্র নোনাজল ঢুকেছে সেই জল বাবারও শ্বাসরোধ করেছে, আর আমাকেও এমন একটি জায়গায় তলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে যেখানে রাজকুমারীর কোন অস্তিত্বই নেই; রয়েছে কেবল রক্তলোভী লাখ-লাখ রাক্ষসের ক্লেদাক্ত শ্বাক্ষর।

একদিন ছিল, যখন সভ্য সমাজ থেকে রাক্ষসেরা সযত্নে নিজেদের সরিয়ে রাখত। অমিত বলশালী হলেও দীক্ষার দৈন্যে তারা লজ্জাই পেত। আজ আর সেদিন নেই। আজ মানুষের দিন আর রাত, ধর্ম আর কর্ম, নিদ্রা আর জাগরণ, শিক্ষা আর দীক্ষার ওপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেছে এরা। ব্রবডিঙ-নাগের অতিকায় দৈত্যগুলির মত এরাও সত্যিকার মানুষকে মানুষ বলতে দ্বিধা করেছে, নৃতত্ত্ববিদদের খিলাৎ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে এ পৃথিবীতে মনুষ্য চর্মধারী জীবগুলিই হল সত্যিকারের অপগণ্ড।*

কিন্তু সংস্কার যার মজ্জায়-মজ্জায়, রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে তাকে তুমি কেমন করে বোঝাবে যে মানুষ মানুষ নয়, আসলে মনুষ্যেতর একটি জন্তু? দীর্ঘ বিশ বছরের সেই সংস্কার প্ল্যাসটার অব প্যারীসের মত আমার সমস্ত বহির্গামী চেতনায় মুখ মুদ্ধ করে দিলে। আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো গেল না যে, সংস্কৃতির যে ভয়াল দানবটি আজ কাঁচের ঘরে পললাশী জন্তুর মত উন্মত্ত আবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকেই পুজো করা মানুষ হিসাবে আমার প্রথম কর্তব্য।

না, মানুষের ওপর আস্থা হারাতে পারিনি; আর পারিনি বলেই বোধহয় এক সময় নিজের অজান্তেই কখন নিজের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে বসেছি।

জগৎ-সংসারের প্রাণহীন অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহের আঘাতে-আঘাতে যখন আমি ক্ষত-বিক্ষত সেই সময় মায়ের একখানি চিঠি পেয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমাদের সংসার তখন অনাহার-অর্ধাহারে চলেছে। তারই রূপ পড়েছে চিঠির মধ্যে। সংসারে আমি জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র উপার্জনক্ষম হলেও, দুটি বছর মা অপেক্ষা করেই বসে ছিলেন। দোষ ছিল না তাঁর। তিনি হয়ত আমার অকর্মণ্যতার কথা জানতেন।

তিনি অনেক দুঃখ করে লিখেছেন: নগেনকে সব জানিয়েছিলাম। সে একশটা টাকা পাঠিয়েছে। তাই এ-যাত্রায় কোন রকমে রক্ষা পেলাম। তার সঙ্গে তোমার এতদিন দেখা করা উচিত ছিল। হাজার হক, সে তোমার মামা। তোমার জন্যে সে একটা কিছু করবেই।

হ্যাঁ, মামাই বটে; এবং বড়লোক মামা। যে মামা তার বাপ-মা, ভাই-বোন সকলকে ফাঁকি দিয়েছে, চোরাই মদের ব্যবসা করেছে, তিন তিনবার জেলের দরজা থেকে ফিরে এসেছে কেবল টাকার জোরে, সেই মামা আজ লাখপতি। এবং যে ভাই-এর নাম পর্যন্ত এতদিন মা উচ্চারণ করতে লজ্জা পেতেন, সেই মা ভায়ের কাছে বিপদে হাত পেতেছেন। একটু হাসলাম। বাবার নীতিশিক্ষা কি ব্যর্থ হ'ল তাহলে? বাবা বলতেন, অভাবটা মনের, ওকে এতটুকু প্রশ্রয় দিলে ও শেষ পর্যন্ত সিন্ধ্যবাদের দৈত্যের মত মাথায় চড়ে বসবে।

কিন্তু তাই কি সত্যি। যে-মাকে নিজের চোখের সামনে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়েদের অভুক্ত অথবা অর্ধভুক্ত অবস্থায় দেখতে হয়, অর্থের অভাবে যাদের মানুষ করার চিন্তা আকাশ-কুসুমেরই মত, তাঁর পক্ষে কি অনটনের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকা সম্ভব? সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে বাবার এথিক্স বজায় রাখা আর দাঁত দিয়ে পাথর গুঁড়ো করা একই কথা।

শেষ পর্যন্ত মামার কাছেই হাজির হলাম। এবং তাঁরই প্রশংসাপত্র নিয়ে একদিন প্রভাতকালে ক্যাপটেন ব্যানার্জির দরজার কলিং বেল টিপলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারীর চাকরি হ'ল আমার।

নূতন উদ্যমে জীবনের তৃতীয় অধ্যায় শুরু করলাম। এককালে ব্যানার্জি সাহেব মিলিটারী ডাক্তার ছিলেন। লম্বা-চওড়া চেহারার ওপর মেদবৃদ্ধির অনুপাতটি লক্ষ্যণীয়। কেবল মাথাটিই শরীরের অনুপাতে কিছুটা ছোট। সেই মাথা আর চেহারার আয়তন দেখে ক্যাপটেন সাহেবের ওপর আমার যে ধারণা জন্মাল, চাকরি হওয়ার কয়েকটা দিনের মধ্যেই সে ধারণা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম আমি। শনৈ শনৈ বুঝতে পারলাম যে, বয়স আর শরীরের মত তাঁর প্রতিভাও বিরাট এবং বহুমুখী। বড়-বাজারে কাপড়ের দোকান, হগ মার্কেটে ওষুধের দোকান। তার ওপর একজন সত্যিকারের প্রতিভাধর রেশ খেলোয়াড়। গত ত্রিশটি বছরে কলকাতার মাঠে যে সমস্ত অশ্বপুঙ্গব বাজিমাৎ করেছে তাদের ঠিকুজী-কুষ্টি, আর জন্ম-ইতিহাস তাঁর কণ্ঠস্থ। বর্তমানে শরীরটি বেকায়দায় ফেলার এক বড় ইভেন্ট ছাড়া আজকাল বড় একটা মাঠে যান না, পাঠান তাঁর এজেন্টকে। কেবল তাই নয়; সম্প্রতি সাহিত্যসৃষ্টির শখ চেপেছে তাঁর। এবং এ বিষয়েও তাঁর একটি সুস্পষ্ট মতবাদ রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, আর কবিতাকে কাঁচের চুড়ির সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলতেন, একটা জাতির সংস্কৃতির মেরুদণ্ড হচ্ছে তার প্রবন্ধ।

বাংলাদেশের সেই ক্ষীয়মাণ মেরুদণ্ডটিকে সঞ্জীবিত করতে তিনি উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীটিও যথেষ্ট উল্লেখ-যোগ্য। পালিশকরা চকচকে কাঁচের আলমারির মধ্যে প্রায় শ' তিনেক গ্রন্থ; ভাল রেক্সিন দিয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে বাঁধানো। প্রতিটি গ্রন্থের পুটের ওপর সোনালি জলে ক্যাপটেন সাহেবের নাম ধাম লেখা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এতগুলি গ্রন্থের লেখক ক্যাপটেন সাহেব নিজেই।

কয়েকটি দিনের মধ্যেই ক্যাপটেন সাহেবের নিয়মতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত

হলাম। সকাল নটায় তিনি লাইব্রেরীতে হাজির হতেন। একে বৃদ্ধ, তাতে সম্মানিত। তার ওপর অনেকদিন থেকে ডায়াবেটিস আর রক্তের আধিক্যে ভুগছেন। লক্ষ্মী তাঁর পিছনে পোষা বুলডগের মত ঘুর-ঘুর করছেন। নটায় কাজ শুরু করার অধিকার ছিল তাঁর; কিন্তু ঐ একবার উঠেই যে স্টাডিতে এসে গা এলিয়ে দিতেন এখন বারটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। ঐ সময়টিতে বিশেষ নিয়ম-মাফিক চলতে হত আমাকে। প্রথমেই তিনি নোট বইটির দিকে ইঙ্গিত করতেন। সেই নোট বই থেকে রেফারেন্সগুলি টুকে নিতাম। বইগুলি লাইব্রেরীতে থাকলে তো বাঁচোয়া; না থাকলে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ঘুরে বেড়াতে হত। সেই সব বই থেকে নানা রকম উদ্ধৃতি আমার খাতায় মধ্যে আত্মগোপন করত। ইংরাজী হলে তাদের বাংলা তর্জমা করারও দায়িত্ব থাকত আমার ওপর। সেই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি মাঝে-মাঝে এলোমেলোভাবে পড়ে যেতেন। আমি টুকে নিতাম। এই হল তাঁর ওরিজিন্যাল প্রবন্ধ।

প্রতি রবিবারই বিকেলে তাঁর বাড়িতে সাহিত্য চক্রের মজলিস বসত। তিনি ছিলেন এই চক্রের চিরস্থায়ী সভাপতি। দশ-বারজন সভ্য নিয়মিত আসতেন এখানে। তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়ের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের কাছে ক্যাপটেন সাহেব স্বলিখিত (?) ওরিজিন্যাল প্রবন্ধ পাঠ করতেন। সভ্যরা একবাক্যে প্রশংসায় সহস্রমুখ হয়ে উঠতেন। তারপর, প্রচণ্ড জলযোগ পর্ব সমাপ্ত করে ক্যাপটেন সাহেবের অবিলম্বে সাহিত্যপ্রতিভা-স্বীকৃতির সম্ভাবনায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার পর স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করতেন।

প্রথম কয়েকটি দিনের আলাপ-আলোচনা আর ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে বেশ বোঝা গেল, ক্যাপটেন সাহেব একজন উগ্র সমাজসেবী। তাতেও আমার বিপদ ছিল না। বিপদ তখনই দেখা দিল, যখন তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সমাজ-জীবনের বহুবিধ জটিল সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলেন। আলোচনার নাম করে নিজেকে যে সম্মানিত করলাম, ব্যাপারটি কিন্তু আসলে তা নয়! বলার কাজটি একমুখী, অনেকটা গোমুখী থেকে অশ্রান্ত কল্লোলে বহির্গামিনী গঙ্গার স্রোতধারার মত। আমাকে কেবল ঘাড় নেড়ে অথবা সময় বিশেষে উচ্ছ্বাস দেখিয়ে তাঁর মতবাদ সমর্থন করতে এবং অবসন্ন গুরুত্ব বুকে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হত। করকরে দুশ টাকার খেসারত দিতে দিতে দেউলিয়া হয়ে গেলাম, সুচরিতা; সুদের রাবিশে শেষ পর্যন্ত আসলটাই চাপা পড়ে গেল।

সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দিনের পর দিন কী করে যে চিন্তার ব্যভিচারে নিজেকে কলুষিত করে চলেছিলাম তা ভাবতে গেলেও সেদিন শিউরে উঠতে তুমি। যে মানুষটির ব্লাক-মার্কেটের গোপন পথ আবিষ্কারের সহজাত প্রতিভা, আর আয়কর ফাঁকি দেওয়ার কারসাজি আমাকে টলাতে পারে নি, সেই লোক যখন ভারতবাসীর চারিত্রিক দুর্বলতাকে কটাক্ষ করে, প্রাচীন ভারতের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য—ন্যায়, ধর্ম, আর সততার পুনরুদ্ধারের ওপর সবিশেষ জোর দিয়ে, মনস্তত্ত্বমূলক (!) তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ (!) প্রবন্ধ লিখে আমারই সমর্থনের জন্যে অহেতুক অপেক্ষা করে বসে থাকতেন তখন লজ্জায়, ক্ষোভে, আর নিজের অপদার্থতায় দেওয়ালের বুকে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হ'ত আমার। সেই দুশ টাকার একখানি চেকের উদ্ধত যষ্টি আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেল, আমাকে পঙ্গু করে দিলে, আমাকে অকর্মণ্য করে তুললে। মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখলে পুরাকালের রাজারা যেমন তাজাপ্রাণ ক্রীতদাস নর্তকীদের অস্তিত্ব দেওয়ালের মধ্যে নিঃশেষে মুছে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করত না, তেমনি আমি জানতাম, ঐ দুশ টাকার রক্তচক্ষুর সামনে নিজেকে আহুতি দিতে না পারলে আমার এবং আমার ওপর নির্ভর করে রয়েছে যারা, তাদের অস্তিত্বও পৃথিবী থেকে মুছে যেতে এতটুকু বিলম্ব হবে না।

কিন্তু শুধু কি তাই? প্রতি দিন যাপনের সহস্র লাঞ্ছনা আর হাহাকার যে আমি নীরবে সহ্য করে এসেছি, সে কি মাত্র ঐ দুশ টাকা হারাবার জন্যে? না, অন্য কিছু হারানোর ভয় আমার অবচেতন মনের গোপনে আত্মপ্রকাশ করেছিল?

তুমি কি জান, সুচরিতা? সেই মেঘ-মেদুর বর্ষামুখর রাত্রির কথা কি তুমিও ভুলে গিয়েছ একেবারে? যদি ভুলে গিয়ে থাক, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি। সেই একটি রাত্রিই দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা নিয়ে আমার সমস্ত জীবনের মূলশুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে। সেই কথাটিই আজ বলি তোমাকে।

সেই শান্ত, গম্ভীর, সুশৃঙ্খল আর নিয়মতান্ত্রিক ক্যাপটেন সাহেবের সংসারে তুমিই ছিলে একমাত্র ব্যতিক্রম। সাত খুন নয়, দাদুর কাছে তোমার সহস্র খুন মাপ ছিল। দাদুর বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে তুমি। আর আমি? ঝড়ো হাওয়ার মত চঞ্চল উদ্দামগতিতে তোমার গাড়ী পোর্টিকোর সামনে ব্রেক কষা মাত্র, কি জানি কেন, আমার বুকের মধ্যে রক্তের সমুদ্র তোলপাড় করে উঠত। কোনদিনই তোমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিনি আমি। মাঝে-মাঝে তোমাকে চুরি করে দেখেছি। তুমি দাদুর ঘরে এসেছ, পাষাণ গম্ভীর দাদুকে ঝর্ণাধারার মত প্রবাহিত করেছ, যমদূতের মত বুলডগ দুটোর কান ধরে উঠবোস করিয়েছ। আমি তখন সারাক্ষণই নিতান্ত অপরিচিতের মত ভারতবাসীর অধঃপতনের দুঃখে উদ্ভ্রান্ত ক্যাপটেন সাহেবের যুগান্তকারী ওরি-জিন্যাল প্রবন্ধসমুদ্রের নোনা জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। তবু, তোমার গতি আর ভঙ্গিমার প্রতিটি ধ্বনির সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। হয়ত, মাঝে-মাঝে অকস্মাৎ তোমার কল-গুঞ্জন থেমে গিয়েছে; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তোমার মুখের দিকে নেহাৎ যান্ত্রিকভাবেই মুখ তুলে চেয়েছি। চোখা-চোখি যে হয়নি তা নয়। তখন দেখেছি তোমার চোখের তারায় অকারণ কৌতুকের নাচন। আর আমার? আমার চোখে কী দেখেছিলে তুমি? ভীরু কপোতের রক্তহীন চাহনি! হবেও বা।

তারপর, একদিন আবার তোমার গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠল। সেদিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল। আমার মনের আকাশেও তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল। অবিরাম ঝম-ঝম ধ্বনিতে ভারাক্রান্ত উত্তরসন্ধ্যার পৃথিবী যেন আমারই মনের প্রতিচ্ছবি। ক্যাপটেন সাহেব ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। শরীরটা তাঁর সেদিন ভাল ছিল না। আমি একাই লাইব্রেরীতে বসে কাজ করার ব্যর্থ ভণ্ডামিতে ক্লান্ত।

লঘু চরণের অবারণ চঞ্চলতায় লাইব্রেরীতে সোজা হাজির হলে তুমি। হয়ত দাদুর খোঁজেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কি জানি কিসের একটি অধীর প্রতীক্ষায় চুপ করে বসেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম,

ফিরে যাবে তুমি। কিন্তু ফিরে তুমি গেলে না।

মাঝখানের কয়েকটি মুহূর্তে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সময়। কৌতূহলে ঘাড় ফিরোলাম। কিন্তু তার আগেই অনাবশ্যক কৌতুকে তোমার মুখটি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আমার পিঠের ওপর। তোমার গালের স্পর্শ ঠেকেছিল আমার মাথায়। তোমার চুলের সুরভি ছড়িয়ে পড়েছিল আমার চোখে, মুখে, দেহে, মনের সর্বাঙ্গে।

খিল খিল করে হেসে উঠলে তুমি ঃ বাবা, লজ্জায় মেয়েদেরও হার মানালেন দেখছি।

চকিতে ঘুরে বসেছিলাম সেদিন। তোমার মাথাটা আমার বুকের মধ্যে এসে পড়েছিল। হয়ত সতর্ক ছিলে না বলেই। তোমার চোখে সেদিন কী দেখেছিলাম জানি নে। কিন্তু একথা জানি যে সেদিন তোমাকে আমার দুটি বাহুর মধ্যে ধরে আমার পৌরুষের প্রথম স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছিলাম তোমার মুখে, গালে, আর মাথায়। তুমি কোন কথা বলনি, করনি কোন প্রতিবাদ। তোমার ভীরু বুকের দ্রুত উত্থানপতন আমার বুকে আঘাত করেছিল কেবল। তুমিও কি আমারই মত ভীরু ছিলে সেদিন?

না, ভীরু নয়। বিস্ময় বিহ্বল কয়েকটি চকিত মুহূর্তের পর উঠে পড়লে। উত্তেজনায় তখন তুমি থরথর করে কাঁপছ। তোমার চোখে ক্রুদ্ধ ধূর্জটির তৃতীয় নয়নের জ্বালা ধকধক করছে। তোমার বঙ্কিম নয়নের সেই তির্যক চাহনি সহ্য করতে পারলাম না। তবে কি তোমাকে বুঝতে ভুল করেছিলাম আমি?

অসভ্য, ছোটলোক, ইতর, কোথাকার! বামন হয়ে চাঁদ ধরার লোভ!

ঘূর্ণির আবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তুমি। সীমাহীন দৈন্য আর ধিক্কারে একেবারে মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বললাম, হে ধরিত্রি, দ্বিধা হও।

বর্ষামুখর রাত্রির একটি নির্জন মুহূর্তে আমার চেতনায় অকস্মাৎ যে ক্ষণবসন্ত এসেছিল তার সঙ্গে সেদিন আমি বিদ্যুতের তুলনা না করে পারিনি। আর তুলনা করেছিলাম বলেই বোধহয় বিদ্যুতের ঝলক মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চারপাশে ব্যর্থতার কালো মেঘ বিপুল আবেগে ঘনীভূত হয়ে আমাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলে।

তুমি বিশ্বাস কর সুচরিতা, তিনটি বছর আমি এই কলকাতার পথে-পথে কাঙালের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। মানুষের একটু সহানুভূতি, এতটুকু করুণা পেলেই হয়ত নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু তা পাইনি। এ জগতে সংস্কৃতির ঘাঁটি কম নেই। সকলেই পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করার মহতী প্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। সাহিত্য বল, শিল্প বল, ধর্ম বল, মনুষ্যত্ব বল, সকলেই নিজেদের ঘাঁটির মধ্যে

বিস্ময় বিহ্বল কয়েকটি চকিত মুহূর্তের পর………

আত্মগোপন করে বসে রয়েছে। ভয়ে আর বিস্ময়ে দেখেছি তাদের সেই অচলায়তনের সিংহদ্বার রুদ্ধ। তার সামনে সঙ্গীন উঁচিয়ে পাহারা বসেছে। সে-পাহারা বড় কড়া। টাকার ঝুলিকে তারা যতটা সম্মান দেখায়, মনুষ্যত্বের আবেদনকে ঠিক ততটা অসম্মানে দূরে সরিয়ে দেয়।

জীবনের সেই দুর্দিনের একটি পরম লগ্নে তোমার সঙ্গে দেখা হল আমার। আর একটি অসতর্ক মুহূর্তের চটুল বঞ্চনায় আমার বিশ্বাসের শেষ ঘাঁটিটুকুও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার সত্তার প্রতিটি অণুর মধ্যে এক-টানা অবিশ্রাম ছি ছি ধ্বনি ধিক্কারে ধিক্কারে আমাকে জর্জরিত করে তুলল। সেই বর্ষামুখর থমথমে ভৌতিক রাত্রির সমস্ত কিছু অনিশ্চয়তাকে অগ্রাহ্য করে যখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্রেকভাঙা ইঞ্জিনের মত দৌড়ে চলেছিলাম, তখন কে যেন বারবার আমার কানের কাছে বলেছিল, আর কেন, আর কেন?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একটি পাথরের ওপর বসে রয়েছি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে এসেছে। তারই কোন এক ফাঁকে আধফালি চাঁদ বিপুল বিতৃষ্ণায় নিজের অস্তিত্বটুকু কোন রকমে বজায় রাখার চেষ্টায় ক্লান্ত। দূরে কয়েক হাজার তারা চিকচিক করছে। আর আমার পায়ের নিচে শ্রাবণের ভরা গঙ্গার সাপের ফনার মত ছোট বড় ঢেউগুলি ছোবল দিয়ে-দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম নদীটিকে। হঠাৎ মনে হল, অনর্থক বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। একদিন আশা ছিল, আনন্দ ছিল, মানুষ বলে গর্ব ছিল, একদিন ভেবেছিলাম, মানুষের পৃথিবীতে মানুষ বলে স্বীকৃতি পাওয়ার মত সোজা জিনিস আর নেই। কিন্তু ঐ ক-টি বছরের জীবনসংগ্রাম আমার আশাকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। প্রতি দিনযাপনের উঞ্ছবৃত্তি আর হাহাকার আমার চেতনাকে স্তিমিত করে দিয়েছে। এখনও মানুষের মন নিয়ে এই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। কেবল শেষের দিনে তোমাকে এই কথাটি বলে যাব, হে ভগবান, তোমার কৃপণ করুণার দ্বারে আত্মবিক্রয় করতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

কিন্তু এ কি? নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম কেন? উৎস কোথায় জানি না; মনে হল দিগন্তের ওপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলে বিরাট একটি অট্টহাসি জেগে উঠল, একটানা হা, হা। যেন কেউ ব্যঙ্গ করছে আমাকে।

ভীরু চোখে চারপাশে চেয়ে দেখলাম। মধ্যনিশীথের সেই নির্জন পরিবেশে কেউ কোথাও নেই। আকাশের বুকে আধফালি চাঁদটাও কখন ডুবে গিয়েছে। দক্ষিণের দূর প্রান্তে, দিক-চক্রবালের ওপারে মাত্র কয়েকটি নক্ষত্র বিপুল আয়াসে আন্তনক্ষত্রলোকের অতলান্ত শূন্যতায় পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে রাশি-রাশি বোবা-কান্নার মত অর্থহীন শব্দের পুঞ্জীভূত হাহাকার তালগোল পাকিয়ে বারবার আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ মনে হল, একটি পললাসী উন্মত্ত বীভৎসতা এ-বিশ্বের সমস্ত শুভ্র আর

জ্যোতির্ময়কে হত্যা করার দানবীয় শক্তি নিয়ে পুচ্ছনাদ করছে; আর সেই সুদূর-প্রসারী অন্ধকারের আরণ্য-গুহায় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত হায়নার দল বিপুল লাস্যে আপনাদের সদম্ভ অস্তিত্ব প্রচার করে চলেছে।

একটানা হা, হা, হা, হা। এই বিরাট ব্যঙ্গের প্রতিধ্বনি আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে একটি ঘৃণ্য সরীসৃপের মত কিল-বিল করে উঠল। মনে হল, দিগন্ত প্রসারিত সেই প্রাক্‌সৃষ্টির অন্ধকারের উজান বেয়ে একটি অতিকায় কবন্ধ তার শালপ্রাংশু বাহু মেলে আমার দিকে থপ-থপ করে এগিয়ে আসছে। আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করলেই হয়ত সে আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলবে।

এতক্ষণ যে মৃত্যুর সদিচ্ছা জেগে-ছিল, তা হঠাৎ কখন কর্পূরের মত উবে গেল। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে গঙ্গার পাড় ছেড়ে দৌড় দিলাম।

সেই রাত্রিটিই আমার কল্পনার রাজ্যে সত্যিকারের দানবীয়। ডক্‌টর জেকিলের মিস্টার হাইডে রূপান্তর। একটি মৃত্যুর অন্তরাল দিয়ে আর একটি জন্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সেই রাত্রিতে তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে বারবার অনুভব করেছি, আমার মাথার কাছে একটি কালো জানোয়ার তার লোমশ বপু দিয়ে পরম স্নেহে আমাকে আচ্ছন্ন করে নিদ্রা-হীন রাত্রি যাপন করছে। যতবারই বিস্ময়, অস্বস্তি, আর ভয়ে আঁৎকে উঠে চীৎকার করতে গিয়েছি, ততবারই সে তার থাবা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে; কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে সান্ত্বনা দিয়েছে। তাকে চিনি নে, জানি নে; তবু তার অস্তিত্বকে অস্বী-কার করতে পারিনি; তবু তার আবে-দন তীব্র, তার স্বীকৃতি মর্মান্তিক।

তারপরের দশটি বছর। সে অন্য এক জগৎ, অন্য এক মানুষের কাহিনী।

শয়তান মহানুভব। যতটুকু প্রয়ো-জন, তার অনেক বেশী সে আমাকে দিয়েছে। অর্থ, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি। তাই দিয়ে আজ আমি মনুষ্যত্বকে ঝুঁটি ধরে উঠবোস করাচ্ছি। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সুচরিতা, যে এ জগতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, আর মনুষ্যত্ব কত সস্তা! খোলা হাটে লোহা-তামার মত এদের কিনতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে, আর সামর্থ্য থাকলে, এ জগতের সমস্ত সভ্যতা, ভব্যতা, সংস্কৃতি, আর মনুষ্যত্বকে বাজার থেকে তুলে এনে গুদোমজাত করে রাখাটাও কষ্টসাধ্য নয়।

এদিক থেকে বিচার করলে আমিও আজ সফল। আর সফল বলেই, একদিন যারা আমাকে অপার বিতৃষ্ণায় মানুষের সমাজ থেকে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল, আজ তারাই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে আমার কৃপাভিক্ষা করার আশায় আমারই বাড়ীর দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে থাকে। আর যে-তুমি একদিন আমার নিষ্পাপ প্রথম ভীরু প্রেমকে অপমানের জ্বালায় জর্জরিত করেছিল, সেই তুমি পর্যন্ত আজ আমাকে প্রেমের দেবতায় রূপান্তরিত করতে এতটুকু দ্বিধা করনি। জগতে এইটাই বোধ হয় আমার কাছে একটি পরমাশ্চর্য দুর্ঘটনা।

যা বলছিলাম। শয়তান তার সমস্ত ভাঁড়ার অকৃপণ হাতে আমার সামনে উজাড় করে দিয়ে প্রমাণ করেছে সে ভগবানের চেয়েও বড়। তার কাছে আমি অনেক পেয়েছি। কোন প্রতিদান দিতে হয়নি আমাকে। সে কেবল চেয়েছিল আমার আনুগত্য। চাঁদ-সওদাগরের মত চোখ বন্ধ করে পরম বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে করেও যদি একটি মাত্র পূজার ফুল তার পায়ে ছুঁড়ে দিতাম, তাতেও তার কোন আপত্তি ছিল না। শয়তান মহানুভব নয়ত মহানুভব কে?

কাল রাত্রিতে হঠাৎ কার আর্তনাদে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল কে যেন অশ্রান্ত আবেগে অসহায়ের মত গুমরে-গুমরে কাঁদছে। যেন কত পরি-চিত সেই স্বর! একদিন তার সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল আমার; আজ ঠিক ধরতে পারছিনে, বুঝতে পারছি নে তার বেশটিকে। মুখ তুলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম চারপাশে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার জটিল ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে; আর তারই অন্তরালে কোন্‌ অন্ধ নির্জন কারার গোপন কক্ষে বসে একাকীত্বের যন্ত্রণায় সেই আর্তনাদ গোঙিয়ে-গোঙিয়ে চলেছে। যেন কত যুগ ধরে সে কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত।

ধীরে-ধীরে সেই কান্নার উৎসটি খুঁজে পেলাম। স্তিমিত চেতনার ক্ষণিক অবসর যাপনের সুযোগে আমার অবচেতনার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে নির্যাতিত মনুষ্যত্বের বোবা-কান্না অস্ফুট আবেগে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কেন, কেন? আজ তো তোমার কোন অভাব রাখিনি আমি; আজ তো কোন অভিযোগের সুযোগ নেই তোমার। সফলতার উচ্চশিখরে আমি যার জয়ো-ধ্বজা নিয়ে কলোসাসের মত দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেই মহাশক্তিধরের বদান্যতায় তোমাকে আমি সূর্যের মত ভাস্বর করে প্রকাশ করব। অভিধানে মনুষ্যত্বের নূতন ব্যাখ্যা করব। হে আমার মনুষ্যত্ব, শান্ত হও, শান্ত হও।

হঠাৎ একটি অপরিসীম ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়লাম। মনে হল পর্বতের সেই শিখরচূড়া থেকে বিরাট একটি তুষার ঝড় তার সুবিপুল দুটি ডানা মেলে তীব্রভাবে উড়ে আসছে আমার দিকে। তার সেই পক্ষবিধূননের বজ্র-নির্ঘোষে সৃষ্টির প্রথম অন্ধকারের বুকে সমুদ্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। একটি দেহহীন, মূর্তিহীন, রূপরসগন্ধহীন কদর্য শব্দপুঞ্জের রথচক্র আমাকে পিষে ফেলার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে। আমি শিউরে উঠলাম। বুঝলাম, আমার আত্মবলিদানের মুহূর্ত আসন্ন প্রায়।

আজ থেকে সেই দশটি বছর আগেকার একটি বর্ষামুখর রাত্রির কথা বিদ্যুতের ঝলকের মত মনে পড়ল। হে ভয়াল, সেইদিনই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী শুনে তুমিই সেদিন তোমার বরাভয় হস্ত প্রসারিত করেছিলে। অভয় দিয়েছিলে আমাকে। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আগামী দশটি বছর প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দাও, রাজা।

কথায় খেলাপ করনি তুমি। আমিও আজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। তোমার চরণে নিজেকে আহুতি দিয়ে দশ বছর আগেকার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করব আজ। আমি তোমার সেই অনস্বীকার্য পদধ্বনি শুনেছি। একটু অপেক্ষা কর তুমি।

সুচরিতা, তোমাদের এই জগতে দশটা বছর যা দেখেছি তার বুঝি সত্যিই আর কোন তুলনা নেই। মানুষ কখনও মুখোসের সঙ্গে আপোষ করে বাঁচতে পারে? মাঝে মাঝে আমার ধমনীতে যখন মানুষের তাজা রক্ত চন-চন করে উঠত তখনই দেখতাম কোটি কোটি মুখোসের বিকৃত অট্টহাসির ছটা। যদি ঐ মুখোসগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতাম? কিন্তু সে সাধ্য আমার কোথায়? সে সামর্থ্য আমার নেই।

আমার এই দেহটাকে নিয়ে তোমরা উৎসব করো না, সুচরিতা। ভূষিত করো না কোন মাল্যচন্দন আর নিষ্পাপ গোলাপের পাপড়ি দিয়ে। অগ্নিশুদ্ধির অজুহাতে এমন একটি মূল্যবান দলিলকে ভস্মীভূত করো না। লোকা-লয়ের বাইরে কোন একটি নির্জন জায়গায় অযত্নের বেড়া দিয়ে কবরস্থ করো। যদি কোনদিন কোন হাজার বছর পরে কোন এক খামখেয়ালী প্রত্ন-তাত্ত্বিকের চোখে আমার হাড় ক'খানা ভেসে ওঠে সে দেখবে কী? শুধু কি দেখবে আমার অস্থির গাঁথুনি আর মজ্জার ক্রমবিন্যাস? আমার *মধ্যে যে একটি বিকৃত যুগের ইতিহাস বোবা ইঙ্গিতে তার বিস্ময়-বিমূঢ় চোখের দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকবে তার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিকের লক্ষ্য পড়বে কি?

ভয়

শান্তিপদ রাজগুরু

যাত্রা ভাঙ্গতে অনেক রাত হয়ে গেল, হবারই কথা।

অনেক বড় পালা আর তেমনি গান। বিন্দু এতক্ষণ মশগুল হয়ে ডুবে ছিল অন্য রাজ্যে। গ্রামের সবাই ওকে ডেকেছে যাবার জন্য। কিন্তু আসর ছেড়ে বিন্দু ওঠেনি। দোক্তা আর চুণ খুঁট থেকে বের করে মুখে পুরে ঠায় বসে ছিল; আলো-ঝলমলে আসর। বাইরে মেলার কোলাহল ক্রমশঃ থেমে গেছে, গাছ-গাছালির মাথায় জমেছে আধার, ডেলাইটের আলোয় সব কেমন বিচিত্র দেখায়। তারই মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল বিন্দু।

ঝকমক করছে সাজ-পোষাক—তরওয়াল। আর তেমনি গান।

মাঠ—দূরের পথ, রাত্রির নির্জনতা সব ভুলে গেল বিন্দু।

অবাক হয়ে গান শুনছে।

গান শেষ হবার পরই কেমন আসর ফাঁকা হয়ে যায়। আলোগুলো নেভাবার জন্য লোক মোতায়েন ছিল। সালু-তাকিয়া-ওই ফুলের ঝাড় সবই তখনই খুলে ফেলল। তুলে ফেলে সতরঞ্চ; দেখতে দেখতে ঠাঁইটায় আঁধার নামে। লোকজনও চলে যাচ্ছে এখান থেকে।

যাত্রার দলের রাজা-মন্ত্রী-রাণী-রাজকুমারীর দলও উধাও। কুলিরা ঢোল তবলা মাথায় চলে গেছে।

মেলার আলোও আর নেই। দোকান-পসারের ঝাঁপ বন্ধ করে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই আলো-ঝলমল—কোলাহল-মুখর মেলা ফাঁকা; আঁধারে হারিয়ে গেছে সব কিছু। রাত কত জানে না।

দু একটা কুকুর তখনও মাঝে মাঝে সাড়া করছে। শীতটা এতক্ষণ লাগেনি। এইবার ফাঁকায়—অন্ধকারে কনকনিয়ে লাগে। বিন্দুর মনে মনে একটু ভয় পায়। একা পড়ে আছে সে—তাদের গাঁয়ের আর সবাই চলে গেছে। প্রায় দুকোশ পথ, দুখানা গাঁ পার হয়ে মাঠ দিয়ে গেলে, তবে তাদের গাঁ। দিনের বেলায় এ পথ তার চেনা; মাথায় তরকারির বোঝা নিয়ে প্রায়ই আসে বড়জোড়ার বাজারে। সকালে আসে—জলখাবার বেলায় আবার ফিরে যায়। বলিষ্ঠ নিটোল দেহ, আলপথে তরকারির ঝাঁড় নিয়ে একটু বেগেই আসে। সারা দেহ কাঁপে সেই গতিবেগে। মনের আনন্দ আর খুশী মেশানো সেই যাতায়াত।

কিন্তু রাতের নিশুতি অন্ধকারে কেমন ভয় করে সেই পথ পার হয়ে ফিরে যেতে। দুচারজন যাত্রী তখনও যাই যাই করে যায়নি। দূরের যারা—তাদের কেউবা মেলায় আসরের ওই সামিয়ানার তলেই থাকবার ব্যবস্থা করছে।

বিন্দুর বাড়ীতে অনেক কাজ। তাছাড়া গোবিন্দও ভাবছে।

কি ভেবে পায়ে পায়ে মেলার বাইরে ডাঙ্গায় এসে দাঁড়াল। যদি আশপাশের গয়ের কোন সঙ্গী মেলে—চলে যেতে পারবে। বলিষ্ঠ নিটোলদেহে কাপড়খানা জড়িয়ে নেয়, তবু শীত লাগে। কনকনে শীত।

ভয়ও কেমন একআধটু লাগে। গোবিন্দ কিছু বলবে না, তবু কি মনে করবে। গ্রামের অনেকেই কেমন সবাই চলে গেল। কি যে মতিচ্ছন্ন ধরেছিল তার তাদের সঙ্গে যায় নি। আপসোস হয়। ভুল করেছে সে।

লালকাঁকুরে ডাঙ্গার পরই সুরু হয়েছে মাঠ—শীতের শেষ। ফাঁকা মাঠ; শুকনো আলপথ। সোজা কোশখানেক গেলে তবে একটা গাঁ—আসুড়ে। তার পর আবার সেই মাঠ। মাঠগড়ানী ছোট কাঁদর; জল নেই। তবু দুপাশে ওর বিষকরমচা আর কেয়াগাছের ঘনঝোপ; মাঠ দিয়ে পথটা চলেগেছে। বেশখানিকটা পথ।

তারপরই মাঠখানা পার হলে তাদের গ্রামের বাগান। বাড়ীঘর। মনটা বহু আগেই চলে গেছে সেখানে।

কিন্তু সে!—সে পড়ে আছে পাতা-জোড়ার ডাঙ্গায়। দুকোশ দূরে। এই রাতে বাড়ী কি করে পৌঁছবে তা জানে না।

মেলার লোকজন ফাঁকা হয়ে এসেছে।

মাঠের এদিক ওদিকে দুএকটা হ্যারিকেনের আলো দেখা যায়, মিটি মিটি জ্বলছে।

—পেত্তার আলো নয় তো?

নিজের মনেই প্রশ্নটা জাগে বিন্দুর। না, মেলাফিরতি লোকজন চলেছে,

কারোও মনে যাত্রার সেই সুরগুলো, দুএকটা ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের মত করে নিয়ে গাইছে। আর চলেছে আশপাশের গ্রামের দিকে।

ওই সুরটা কাছাকাছিও শুনেছে বিন্দু।

একটু দাঁড়াল। মাঠে নামবে কিনা ভাবছে!

একএকবার সাহস হয়—চেনাপথ। সোজা আল। পা বাড়ালেই রাস্তা। বাড়ীতে অনেক কাজ পড়ে আছে। গোবিন্দ ভাবছে! গরুবাছুর। নিজের না হয় ছেলেপুলে নেই, তাই বলে বাড়ীতে অনেক ঝামেলা আর সবই তুলে নিয়েছে বিন্দু তার মাথায়। ফিরতেই হবে তাকে। বাইরে রাত কাটানো—ছিঃ কি এক লজ্জার কথা।

তাছাড়া চেনা নাই শোনা নেই—কোথায় বা রাত কাটাবে।

এক ঝলক টর্চের আলো এইদিকে আসছে। আলোটা এদিক ওদিকে ঘুরছে। কেমন ইতঃস্ততঃ করছে ওই আলোটাও। মাঠে নামবে—না মেলাতেই কোথায় থাকবে রাতটুকু—এমনি ভাবখানা ওই আলোর মালিকের।

ওইদিকেই যাবে বোধহয়। একটু যেন ভরসা পায় বিন্দু।

—কুনদিকে যাবা গো? কুন গাঁ? আমি দইগাঁয়ের লোক—

আলোটা এগিয়ে আসে। বিন্দু আবছা আলো আঁধারিতে ঠিক ঠাওর করতে পারে না। লোকটার বয়স কত কে জানে? বিশ পাঁচিশও হতে পারে, পঞ্চাশ হওয়ারও সম্ভাবনা না থাকা নেই।

—আসুড়ে যাবো। তোমাকে বড় রাস্তায় পৌঁছে দোব।

পথের উপরই, একটু বাঁহাতি গাঁ-খানা। কি ভাবছে বিন্দু। আসুড়ের কাছ অবধি যেতে পারলেও অর্ধেক পথ যেতে পারবে। বাকীটুকু তাদের গ্রামের মাঠ। ভরসাও খানিকটা পায়।

—কি ভাবছ—বড় রাস্তায় পৌঁছে দেবা তো? বিন্দু যেন কথা আদায় করে নিতে চায় তার কাছে।

—হ্যাঁ। লোকটিই বলে ওঠে—যাবে তো চল, শীতে খামোকাই কষ্ট পাওয়া।

পথের ভয়—বাড়ী পৌঁছানোর ব্যাকুলতা সর্বকিছু মনে চেপে বসেছে বিন্দুর। তবু বাড়ী পৌঁছতে পারবে! এ যেন তার মস্ত পাওয়া। এমন ভুল সে আর করবে না। যাত্রা শোনার এত নেশা! ছিঃ ছিঃ, নিজেরই লজ্জা আসে। গাঁয়ের আর পাঁচজনই বা ভাববে কি!

মাঠেই নেমেছে বিন্দু।

শীতের রাত্রি, তারা জ্বলছে, ফিকে কুয়াশার আবছা যবনিকায় সারা মাঠ ঢাকা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আসে—সারা দেহ শীতের কামড়ে জ্বলে ওঠে।

আগে আগে চলেছে লোকটা। মাঝে মাঝে একফালি আলো জ্বলে ওঠে, আবার অন্ধকার। পথ উঁচু নীচু, মাঠের এদিক ওদিক ঘুরে চলেছে আলটা। আবছা আঁধারে সাদা পায়ের চিহ্ন জেগে ওঠে। পথের রেখা।

বিন্দু বলে, ওই খিচখিচে আলোটুকু নিভোও দিকিন, চোখধাঁধি লাগছে। এর চেয়ে আঁধারে পথ ঠাওর হবে ভালো।

লোকটা ওর দিকে একবার ফিরে চাইল। আর আলোটা জ্বালে না। আঁধারেই চলেছে দুজন, ফাঁকা মাঠ। এত বড় ফাকার মধ্যে চলেছে দুটি প্রাণী; যেন আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কেমন ভয় লাগে বিন্দুর।

মাঠের মধ্যে মজাপুকুরের ধারে এসে উঠেছে। ওপাশে মাথা তুলে আছে একটা অশত্থ গাছ, সাদা গুঁড়িগুলো চক চক করছে। শন শন হাওয়ায় কাঁপে ওর পাতাগুলো। যেন বিশাল একটা ভূত না হয় পেত্নী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটাও কেমন ভয় পেয়েছে। ভয় ভাঙ্গাবার জন্যই সে গুনগুনিয়ে গান ধরেছে।

—মনে ফুটেছে কুসুম কলি
তাই গুনগুন করে অলি।
আমি বিবাগী ভ্রমর—

আঁধারে সুরটা ভালো লাগে বিন্দুর। তবু কেমন ভরসা পায়।

এই জায়গাটা পার হয়ে মেটেল মাটির এবড়ো খেবড়ো পথ ধরে তারা সোলের দিকে এগিয়ে যায়।

—ভালো গায়েন করতে পারো ত? তা থামলা কেনে?

বিন্দু ভয়ের নীরবতায় জমাট পাথরটা একটু নড়াতে চায় কথা আর গানের মধ্যে। তাই কথা বলছে সহজভাবেই।

লোকটা হাসে—গান একআধটু জানি। আসুড়েতে নোতুন এসেছি। যাত্রার দলের মাষ্টার!

—ওমা, তাই নাকি! বিন্দু যেন সহজ হতে পারছে। পথচলার ভয় আর কষ্টটা একটু লাঘব হয়ে আসছে।

লোকটা গুনগুনিয়ে গান ধরেছে আবার বেশ খুশী মনেই। ক্রমনিম্ন মাঠের আলপথ ছেড়ে এতক্ষণে তারা ধানসোলের নীচু ডাঙ্গায় নেমেছে। চারিদিকে উঁচু মাঠ—কাছিমের পিঠের মত উঠে গেছে। বিরাট একটা সরার মত মাঝখানে বেশ-খানিকটা সমতল জায়গা। একটা মাঠ-গড়ানি ছোট কাঁদর বয়ে গেছে। জল এখন তাতে নেই। শীতের সময় দুপাশে ওর অর্জুন বিষকরমচা গাছের ঘন কালো ঝোপ আঁধারে কুচ কুচ করছে। কোথায় একটা রাতজাগা পাখী একবার ডেকে আবার থেমে গেল। চলার বেগে শীতের রাতেও বেশ ওম ধরে গেছে। লোকটা একটু দাঁড়াল।

এতক্ষণ ওর পিছনেই চলেছিল বিন্দু, একবারে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে এখন।

হাঁপাচ্ছে সে। বলে ওঠে—এ যে দৌড়চ্ছ গো?

হাসে বিন্দু। লোকটাকে এতক্ষণে ভাল করে দেখতে পায় তারার আলোয়। মাঝামাঝি বয়েস। পাকানো চেহারা। তবু পোষাকের বাহার আছে। মাথায় তেড়ি—একটা গরম চাদরে গা ঢাকা। লোকটা একটা বিড়ি ধরাল। সেই আলোয় বিন্দু ওকে দেখছে।

পাইকেরী ব্যবসা বিন্দুদের। জাত তরিতরকারি বেচিয়ে। ক্ষেতে যা উৎপন্ন হয় তারাই তা মাথায় করে হাটে যায়। এদিকে জগন্নাথপুর, আসুড়ে মায় দুর্গাপুর অবধি তাদের গতায়াত। পা যেমন চলে তেমনি চলে মুখ। নানা লোকের সঙ্গে দরদাম করে ব্যবসা চালায়—তাই লোক চেনে। একটু যেন মনে মনে নিশ্চিন্তই হয় ওকে দেখে।

লোকটা ওকে দেখছে।

বিন্দু এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে ওর মনে ভয়ের অস্তিত্ব। মরদ হয়েও এই রাতে একা মাঠ পার হয়ে আসতে সাহস করেনি। তাকে সঙ্গে নিয়ে তবেই ভরসায় মাঠে নেমেছে এটা বেশ বুঝতে পেরেছে। চলেছে তারই ভরসায় এও বুঝেছে।

হাসিও আসে মনে মনে তার।

যাত্রার দলে ওই বেটাছেলেগুলোর সখী সেজে হাত ঘুরিয়ে নাচ আর গান মনে পড়ে। কেমন বিশ্রী লাগে। হুদো, হুদো মরদগুলো মেয়ে সাজে! মরণ! ওদেরই মত ওই লোকটাও। তাদেরই একজন।

হাসি আসে। বিন্দুর ওই বড় খারাপ স্বভাব। কেবল হাসে—কারণ অকারণেই।

—হাসছ যে?

কথা কইল না বিন্দু। আবার চলতে থাকে। জবাব দিল না ওর কথার। এবার সে চলেছে আগে আগে লোকটা আসছে তার পিছনে।

রাত দুপুর হয়ে গেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা শব্দ ওঠে। মাঝ-আকাশে নীল তারাটা জ্বলজ্বল করছে। শীতও বেশ জমে এসেছে। কনকনে শীত। এখনও আসুড়ের ধারে আসতে পারেনি তারা, সেখান থেকে বড় রাস্তা আরও মাইলখানেক, তার ওদিকে তাদের গ্রামের মাঠ।

—এইখানেই বুঝি সবাই রয়েছে তোমার?

বিন্দু লোকটাকে প্রশ্ন করে। লোকটা হাসে।

—ওসব বালাই নাই। তাছাড়া যাত্রার দলে ঘুরে ঘুরে থিতু হলাম কই যে ঘরবসত করবো?

—কি পার্ট করতে তুমি? রাজার?

বিন্দুর যাত্রার উপর খুব ঝোঁক।

লোকটা খুশী হয়েছে। একটু গতি-বেগ কমিয়েই ফিরিস্তী দিয়ে চলেছে।

—হরিশচন্দ্রে শৈব্যা, কালের বলিতে মাধবী, সীতায় সীতা।

খিলখিলিয়ে হেসে ফেলে বিন্দু।

—ও মা, মেয়েছেলের পার্ট করতে? হ্যাঁ গো? তা দেখেই বুঝেছি।

বিন্দুর অনুমান সত্যিই। ওর চলন বলন আর ছিমছাম পোষাক, ওই নিদারুণ সাহস দেখে খানিকটা ধরে নিয়েছিল ওর প্রকৃতি।

লোকটা জবাব দিল না—ওর দিকে চেয়ে থাকে মাত্র।

রাতের জমাট অন্ধকারে কেমন রহস্য-ময়ী একটি মেয়ে, তারার আলোয় দেখেছে ওকে। নিটোল যৌবনবতী দেহ। আর সহজ ওর কথাবার্তা। সাহসও কম নেই, কেমন যেন নেশা লাগায় ওর ওই হাসির শব্দ। সারা দেহ বিন্দুর হাসির ধমকে কাঁপছে। দুচোখে তখনও মিষ্টি একটা সুর। নিটোল দেহে একটা সাড়া তুলে চলেছে।

—হাসছ যে? লোকটা প্রশ্ন করে।

—যারে: হাসতেও মানা? ছেলেরা মেয়ে সাজে—সত্যিই কেমন হাসিরই কথা। তাই মনে হয় কোন মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চায়নি।

লোকটা কথা বলে না। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে কথাটা শুনে।

পথ চলছে তখনও। পথের পরিমাপ কমে আসছে।

লোকটা কি ভাবছে।

রাত্রি নির্জন। মস্ত ফাঁকা জনমানব-হীন প্রান্তর। দূরে গ্রামসীমাও আঁধারে ঢেকে গেছে। ধানসোলের কলাবাগান-এর মাঝ দিয়ে ওরা আসছে। রুক্ষ মাঠের ভিতর সবুজ ছায়াঘন এইখানটাই।

ঘন কলাগাছগুলো আঁধারে মূর্তি-মান প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সব একটা কেমন জমাট আঁধার প্রাচীরের আড়ালে হারিয়ে গেছে নিবিড় প্রাগ-ঐতিহাসিক স্তব্ধতার অতলে।

...আকাশের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় বিন্দু! মেঘ জমেছে। জমেছিল আগে থেকেই। শীতের শেষ—মেঘও একবার এসে জমে, শীতটাকে আরও একটু কায়েম করে দিয়ে যায়।

তারাগুলো সব ঢেকে গেছে।

কালিঢালা জমাট অন্ধকার নেমেছে চারিদিকে।

ফিনফিনে বৃষ্টি পড়ছে। বিন্দু তাগাদা দেয়।

—একটু পা চালিয়ে এসো, নইলে বিবাক ভিজবো যি গো?

তবু রক্ষে আশ্রয় বেশী দূরে নেই। হাটতলার খালি আটচালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি-টুকু পার করতে পারবে।

ইতিমধ্যেই পিছল হয়ে উঠছে আলপথ, লোকটা কেমন ওর দিকে চাইল। বিন্দু দেখেছে কেমন বদলে গেছে লোকটা। কথাবার্তা বলে না। চুপ করে চলছে। কি ভাবছে সে মনে মনে।

...কোথায় মেঘ ডেকে ওঠে, কাঁপছে ফাঁকা মাঠ। বিন্দুর মন হয় ওসব কথায় দুঃখ পেয়েছে লোকটা।

—রাগ করলে?

কি সব যা তা বলেছে লোকটাকে। চেনে না—শোনে না, যাত্রার দলে মাষ্টারী করে, সেই যাত্রা দেখার জন্যই তো এত খেসারৎ।

লোকটা জবাব দিল না।

বিন্দুর মন কেমন করে। কারবাপের জন্যে যাকে তাকে যাতা বলে, কিন্তু ওকে ওসব কথা বলে ঠিক করেনি। বিন্দু বলে ওঠে একটু নরম সুরে।

—কথা কইছ না যে! রাগ করলে?

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে সরু আল-পথটায় কেমন হোঁচট খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ছে—বিন্দু থমকে দাঁড়াল!

বৃষ্টি জোরে পড়ছে—ভিজছে তারা!

লোকটা শীর্ণ হাত দুটো উপরে তুলে টাল সামলাবার চেষ্টা করছে তার-পরই একপাক ঘুরে পড়বে উঁচু পগার থেকে অনেক নীচে গর্তের ভিতরই।

বিন্দু ওকে ধরে ফেলেছে নিমিষের মধ্যে।

ধরেছে ওর কোমরটাই। সরু দেহ। কোনরকমে পড়তে পড়তে রয়ে গেছে লোকটা। বিন্দু বলিষ্ঠহাতে ধরে ওকে নিজের দিকে টেনে নেয়। লোকটাও ইতি-মধ্যে ওকে ধরে ফেলেছে—কোনরকমে সেই উঁচু পগারের উপরই।

হাঁপাচ্ছে লোকটা।

বিন্দু তখনও ওকে ধরে রয়েছে, ছেড়ে দিলেই বোধহয় গড়িয়ে পড়বে নীচে। ওকে দাঁড়াবার জায়গা করে দিল।

রাতের আঁধারে আকাশে বৃষ্টি ঝরছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।

কেমন হিমশীতল একটা অনুভূতি। লোকটা ওকে তখনও ছাড়েনি।

বিন্দু চমকে ওঠে! এতবড় প্রান্তরে সে একা—সামনে ওই একটা সদ্যজাগর প্রাণী। ওর শীর্ণ হাতদুটো কি এক নিবিড় চাপে তাকে ধরে রয়েছে; ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে ওর বাঁধন। হাঁপাচ্ছে লোকটা—আবছা অন্ধকারে বিন্দু দেখে নেকড়ের মত ওর দুটো চোখ জ্বলছে কি এক নীল মত্ত কামনায়।

...এ্যাই!

বিন্দু ওকে ঝাঁকানি দিয়ে সরাবার চেষ্টা করে।

লোকটা যেন ক্ষেপে উঠেছে। ওর নরম দেহের স্পর্শে—ওর তপ্ত-উষ্ণ নিঃশ্বাসে লোকটা দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ওর শীর্ণ দেহের কঠিন চাপে পড়ে যাবে বিন্দু।...সারা দেহে একটা ঠান্ডা সাপের মত স্পর্শ। ঘৃণা রাগ আর অপমানে জ্বলে ওঠে সে।

প্রচন্ড একটা লাথিতে লোকটাকে ছিটকে ফেলল—যে পগারের থেকে পড়তে পড়তে ওকে বাঁচিয়েছিল—সেই উঁচু পগার থেকে এবার গড়িয়ে পড়ছে লোকটা। গড়াচ্ছে—চলেছে নীচের দিকে।

পড়ুক! পড়ে থাকুক নরকের কীট এই অন্ধকার শ্মশানধারের মাঠে; চলে আসছে বিন্দু।

পথটার বাঁয়ে মড়াশ্মশান— তারপরই বাগানের গায়ে বড় রাস্তা! এতক্ষণ কার সঙ্গে এসেছিল ভাবতেও শিউরে ওঠে বিন্দু।

হঠাৎ লোকটার কান্নার সুরে থমকে দাঁড়াল সে।

নাকিসুরে খেংড়ে ঘেয়োকুকুরের মত কাঁদছে লোকটা। কোনরকমে উঠে খোঁড়াচ্ছে আর ভয়ে চীৎকার করছে।

—ফেলে যেও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। সামনেই মড়াশ্মশানটুকু পার করে দিয়ে যাও।

—মরদ! ব্যাটাছেলে! একরাশ থুথু ফেলে বিন্দু।

কি ভেবে দাঁড়াল। মায়াও হয় রাগও হয় বিন্দুর। কঠিনকণ্ঠে বলে ওঠে।

—আয়, উঠে আয়! মড়াশ্মশানেই রেখে যাবো তুকে। ঘাটের মড়া কুথাকার।

লোকটা ভরসা পেয়ে কোনরকমে উঠলো। জামাটা ছিড়ে গেছে, চাদরটায় কাদা জলের দাগ। লেগেছে বোধহয় পায়ে। কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে।

ওর দিকে সাবধানী দৃষ্টি রেখে চলেছে বিন্দু। ঘেয়োকুকুর কামড়াতে এলে এবার লাথিই মারবে ওর মুখে।

শ্মশানের পথটুকু পার হয়ে আসতেই লোকটা কেমন ভয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। একটু দূরে একটা আলো দেখা যায়।

মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে হাসি আসে বিন্দুর। এত দুঃখেও হাসি আসে—মরদ!

...আপনমনেই বিড়বিড় করছে।

আলোটা এগিয়ে আসছে। কাদের গলার শব্দ শোনা যায়। শ্মশানের ধারে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে ওরা।

—তুই!

বিন্দু ওকে ধরে ফেলেছে......

কাদের কথার শব্দ!

—কি দেখছিস? এ্যাঁ!

বিন্দু রুখে দাঁড়িয়েছে। লোকটা কি ভেবে সেই অন্ধকারের মধ্যেই খোঁড়া—ছড়ে-যাওয়া পা নিয়েই দৌড়ল পাশের গ্রামের দিকে। ফিরেও চাইল না। ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে জানোয়ারটা। বিন্দু তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সারা মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা।

বৃষ্টি পড়ছে, জোরে বৃষ্টি নেমেছে। শীতের কনকনে হাওয়া বইছে সেই সঙ্গে।

...গোবিন্দ, তাদের গাঁয়ের আরও দু'একজন খুঁজতে বের হয়েছে বিন্দুকে। বিন্দুর সারা গা মাথা বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরছে।

ওই অন্ধকারে মিশে যাওয়া ঘেয়ো কুকুরটার স্পর্শ সারাদেহে—তাই যেন বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে ফেলছে সে।

—ধন্যি সাহস যাহোক তোর! চল।

গোবিন্দ বলে ওঠে।

বিন্দু কথার জবাব দিল না।

দূর গ্রামের দিক থেকে রাতজাগা কুকুরের দীর্ঘ একটানা আর্তনাদ ভেসে আসছে।

কি যেন একটা স্বপ্ন দেখছিল সে। গহিনরাতে কেমন ভুলোলাগার স্বপন। আঁধারে সব ডুবে গেছে—হারিয়ে গেছে।

হ্যারিকেনের আলোটা দুলতে দুলতে চলেছে।

তারই পিছনে লম্বা কালো ছায়া ফেলে কটি মানুষ ফিরছে গ্রামের দিকে।

দুঃখে লজ্জায় আর অপমানে বিন্দু স্বামীর কোনকথারই উত্তর দিতে পারেনি। মুখরা মেয়েটি অতর্কিতে একটা কালো দৈত্যকে দেখে ভয়ে নির্বাক হয়ে গেছে।

লেক

অদ্রীশ বর্ধন

দূরে থেকে দেখা যাবে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। উঁচু পাহাড়, নিচু পাহাড়, সবুজ পাহাড়, ধূসর পাহাড়, কংকাল পাহাড়, সরস পাহাড়। কিন্তু তবুও ট্রেনটা থামবে না, মন্থরগতি না। এমনকি পাহাড়-বনকে চকিত করে হুইশ্‌ল্‌ও দেবে না। বন্ধুর পথে সর্পিল লৌহবর্ত্ম বেয়ে ঝিক ঝিক করে এগিয়ে যাবে, আর এগিয়ে যাবে। তারপর এঁকতে বেঁকতে কোন এক ফাঁকে ঢুকে পড়বে মেঘমুকুট শীর্ষ পাহাড়ের বুকে। দীর্ঘ টানেল, হ্রস্ব টানেল, সরু টানেল, চওড়া টানেল। এক সময়ে তাও শেষ হ'বে। আলো থেকে অন্ধকার—আর অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে আনাগোণার পালাও ফুরোবে। দু'পাশে তখনও পাহাড় আর পাহাড়। উঁচু পাহাড়, নিচু পাহাড়, মেটে পাহাড়, লাল পাহাড়, সবুজ পাহাড়। তারপর আচমকা তাও শেষ হ'বে। চোখের সামনে ভোজবাজির মতই ভেসে উঠবে অপূর্ব সুন্দর এক দৃশ্য। যেন সৌন্দর্য-পিয়াসী এক শিল্পীর তুলিকা পটের ওপর অতি সযত্নে ধরে রেখেছে এক অপরূপ ছবি।

চারিদিকে পাহাড়বেষ্টিত এক উপত্যকা। উপত্যকার ওপর ঘন কুয়াশা-জালে আচ্ছন্ন মায়ানগরীর মত এক অতি সুন্দর শৈলনগরী। পাতলা মেঘ আর ঘন কুয়াশার অস্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের ওপরে শুধু চোখে পড়বে কয়েকটি স্বর্ণশীর্ষ সুউচ্চ গম্বুজ আর মিনার। আর কিছু না। প্রভাতের রক্তরশ্মিতে ধীরে ধীরে কাঁপতে কাঁপতে ফিকে হয়ে আসবে এই কুজ্ঝটিকা-আবরণ; ঘসা কাঁচের মত আস্তরণের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে যেন মায়াবলে ভেসে উঠবে এক মানসপুরী। কঠিন বন্ধুর শিলার বুকে শ্বেতপাথরে গড়া বড় বড় সৌধশ্রেণী। সরু সরু ফিতের মত শিশিরস্নাত ঝকমকে পথে টগবগিয়ে ছুটে চলেছে লম্বপুচ্ছ বঙ্কিমগ্রীব অশ্ব—পিঠে তাদের মছলন্দের সাজ। হেলতে দুলতে রাজকীয় ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলেছে হাতী—পিঠে তাদের সোনারুপোর ঝালর-খচিত হাওদা। আবার তাদেরই পাশ দিয়ে তীব্র শব্দে হর্ণ বাজিয়ে বেগে ধেয়ে চলেছে অতি আধুনিক ক্যাডিলাক, অস্টিন, রোল্‌স্‌ রয়েস। পুরবাসীদের মাথায় শালের বিচিত্র উষ্ণীষ। অন্য পুরবাসিনীদের তন্বীদেহে রেশম মসলিনের নয়নমধুর প্রচুরপ্রসর বেশ-বাস, জরির জুতার অগ্রভাগ, বক্রশীর্ষ।

আরও এগিয়ে যাবে ট্রেনটা। তারপর একটা বাঁক নিতেই আপনার চোখে পড়বে লেকটা।

তালতাল জমাট ধোঁয়ার মতই সাদা ধবধবে কুয়াশা তখনও কাঁপতে থাকবে বিস্তীর্ণ হ্রদটার ঝিলমিলে বুকের ওপর। একদিকে বাইচ খেলার, আর একদিকে নৌকাবিহারের আয়োজন। লেকের ধারেই পাথর-বাঁধানো দুগ্ধ-সোপান-ময় উঁচুঘাটের পরেই নন্দন-কাননের মত সুরুচিসুন্দর বাগান, ফোয়ারা, প্রস্তরমূর্তি। তারপরেই কারুকার্যময় বিরাট বিরাট খিলান-শোভিত এক সুপ্রাচীন পাষাণ প্রাসাদ। গঠনকৌশলে ঐতিহ্যের ছাপ। কিন্তু নিয়মিত সংস্কারের ফলে তা মাত্র গতকালের তৈরি বলেই ভ্রম হয়। চার-পাশের মিনার আর গম্বুজের আকাশ-চুম্বী স্বর্ণকিরীটগুলোই দূরে থেকে চোখে পড়ে সবার আগে—তপনকিরণে ঝলমল মূল প্রাসাদটি থাকে দৃষ্টিপথের অন্তরালে।

কঠিন ঝিনুক-বর্মের অন্তরালে টলটলে মুক্তোর মত এই যে ছোট্ট অথচ সুন্দর রাজ্যটি, এরই নাম মায়াপুর। আর ঐ যে গজদন্তের মত ধবধবে সাদা প্রাসাদ, ঐটাই হ'ল মায়াপুরের রাজ-বাড়ী। মরকত ভবন। আর তার সামনেই কাকচক্ষুর মত টলমলে জলে ভরা সুবিশাল হ্রদটার নাম পান্না-লেক। এইখানেই আমার কাহিনীর শুরু এবং এইখানেই তার শেষ।

বিশ্বাস করুন, একদিন এই মায়া-পুরের যুবরাণী ছিলাম আমি। জ্যোছনা-ধবল কত নিশীথে নন্দন-কাননের মত অপরূপ ঐ বাগানটিতে পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে যুবরাজ উজ্জ্বললালের ভরাট গলায় শুনেছি কত মিঠে বয়েৎ আর প্রেমগুঞ্জন; পান্না-লেকের তরল রুপোর মত জলের ওপরে নৌকায় ভাসতে ভাসতে বিমুগ্ধ আবেশ-মাখানো চোখে দেখেছি যুবরাজের পৌরুষময় মুখের টানাটানা চোখ, ভুরু আর উন্নত ললাট। মনে মনে কত স্বর্ণ-সৌধ রচনা করেছি আর ভেঙেছি; ভেবেছি আর আত্মবিস্মৃত হয়েছি। অযুত তারার দল যখন নিযুত মাইল ব্যাপে অশ্রুত সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে, তখন এই চাঁদ, এই তারা, এই হ্রদকে সাক্ষী রেখে যুবরাজ উজ্জ্বললাল আমার মুখের একান্ত কাছটিতে মুখ এনে বাতাসের সুরে ফিসফিস করে বলেছে, 'অনু, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। শুধু তুমি সত্য।'

আর, সত্যই একদিন সবই মিথ্যে হয়ে গেল। স্বামী-পুত্র দাসীর ছদ্ম-বেশে মায়াপুর ত্যাগ করলাম আমি চিরকালের জন্যে।

সেদিনকার বিভবের তুলনায় আজ আমি ভিখারিণী বললেই চলে। এ

কাহিনী লিখতে বসেছি শুধু দুটি কারণে। প্রথম, যদি এ গল্প ছাপা হয়, তাহলে আমি কিছু অর্থ পাব। দ্বিতীয়, ধুরন্ধর অধুনা মহারাজ উজ্জ্বললালের স্বরূপ আমি তুলে ধরতে চাই জনগণের সামনে।

অনেক বছর আগেকার কথা।

যুবরাণী হওয়ার মত বংশগরিমা নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি। মধ্য-প্রদেশের ছোট্ট একটা শহরে প্রথম দেখেছিলাম এ দুনিয়ার আলো। শৈশবেই মা মারা গিয়েছিলেন। কোলে-পিঠে করে বাবা মানুষ করেন আমায়। যৌবনের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে তিনিও একদিন মায়ের কাছে চলে গেলেন। এ সংসারে আমি হলাম একাকী।

রূপো ছিল না আমার, কিন্তু রূপ ছিল প্রচুর। এবং এই একটি মাত্র সম্পদের বলেই যুবরাণীর পদে অভিষিক্ত হতে পেরেছিলাম আমি।

সে দীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করে অযথা মূল কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না। ছিলাম সামান্যা শিক্ষয়িত্রী। তারপর কিভাবে একদিন চোখে পড়লাম যুবরাজ উজ্জ্বললালের, কিভাবে প্রেমের কুহকজাল সৃষ্টি করলাম তাঁর আবেশমদির দুই চোখে, কিভাবে ধুলো থেকে উঠে এলাম মরকত ভবনের মরকত সিংহাসনে, সে কাহিনী রোমান্সবহুল এবং রোমাঞ্চকর হ'লেও তার উল্লেখ করব না।

ঘসা কাঁচের বড় বড় ফানুস লাগানো সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট দিয়ে সাজানো, প্ল্যাটফর্মের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত লাল কাঁকর বিছানো ছোট্ট অথচ ছিমছাম স্টেশনে এসে ট্রেনটা থামতেই চোখে পড়ল আশপাশে রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন।

বহুদিন পর দেশভ্রমণ সাঙ্গ করে স্বদেশে ফিরেছেন যুবরাজ—সঙ্গে এনেছেন যুবরাণী—তাই এত সমারোহ। বিচিত্র বেশভূষা পরা পদাতিক, অশ্বা-রোহীর পর হস্তীযূথ আর আধুনিক চার-চক্রযানের শোভাযাত্রা। পাত্র, মিত্র সভাসদরা এসেছেন রাজকর্তব্যের খাতিরে, প্রজাকুল এসেছে কৌতূহলের কণ্ঠরোধ করতে না পেরে। তূরী আর ভেরীনিনাদের সঙ্গে মিশেছিল দূরে থেকে ভেসে আসা নহবতের মধুর রাগিণী, আর মধ্যে মধ্যে কম্বুনিনাদের আতঙ্ক আতীব্র শব্দলহরী।

কিভাবে সুসজ্জিত হাতীর হাওদায় বসে তোপধ্বনির সাথে সাথে শুরু করেছিলাম এই বিচিত্র শোভাযাত্রা. কিভাবে বিস্ময়বিমুগ্ধ দুই চোখে কাতারে কাতারে সমাগত জনসাধারণের হর্ষ-অভিনন্দন গ্রহণ করেছিলাম.—সে সবের কোন বর্ণনাই দেব না। শুধু বলব প্রথম দর্শনেই কি অপরিসীম শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল আমার হৃদয়মন যখন মূর্তি-প্রতিমূর্তি-নির্ঝর দিয়ে সাজানো কৃত্রিম নন্দনকাননের মাঝ দিয়ে পান্না-লেককে পাশে রেখে, মরকত-ভবনের সুবিশাল তোরণের নিচ দিয়ে, মহলের পর মহল পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম অন্দরমহলে—রাজমাতার সামনে।

মূল্যবান রত্নখচিত সুদৃশ্য আসনে বসে ছিলেন উনি। শুভ্র রেশমের মত কেশভার এলিয়ে পড়েছিল বুকে পিঠে। অজস্র বলিরেখা কলংকিত গৌরমুখের পরতে পরতে ফুটে উঠেছিল বয়স, প্রজ্ঞা আর বহুদর্শনের অভিজ্ঞান। কিন্তু সব কিছুর ওপরে স্পষ্ট হয়ে জেগেছিল তাঁর ঐ দুটি আশ্চর্য চোখ। শান্ত, সুন্দর, আত্মসমাহিত। বহির্জগতের সব কিছু চঞ্চলতা যেন ঐ চোখের কিনারায় আছড়ে পড়েই স্তব্ধ, অচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কালোপাথরের মত চকচকে মসৃণ মণিকা দুটি যেন অসীম আকাশের দু' টুকরো প্রতিবিম্ব। স্বপ্ন-ছাওয়া, সুদূরপ্রসারী, ধ্যানমগ্ন। যেন ঐ দুটি চোখের বাতায়ন-পথেই উনি অবাঙমানসগোচর সব কিছুর ওপরেই দৃষ্টি রেখেছেন। এরকম অলোকসুন্দর চোখ আমি আর দেখিনি।

স্বামী আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর সামনে পারসীক গালিচার ওপর। রাজমাতাকে না জানিয়েই যুবরাজ আমাকে জীবন-সঙ্গিনী করেছেন। বিবাহপর্ব সাঙ্গ হয়েছে রেজিস্ট্রি অফিসে। পাছে উনি অমত করেন, তাই এই ঝুঁকিটুকু যুবরাজ নিয়েছিলেন।

আমার ব্রীড়া-বিনম্র মুখে, কম্পিত নেত্র-পল্লবে, দুরুদুরু বুকে তাই এত শঙ্কা। জানি না কি চোখে উনি দেখবেন আমায়। জানি না সব শ্বশ্রূমাতার মত উনিও আমাকে মায়াবিনী আখ্যায় ভূষিত করে চক্ষুশূল করে তুলবেন কিনা।

কিন্তু ঐ আশ্চর্য-সুন্দর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল আমার এ আশংকা অমূলক। স্বচ্ছ দুটি মণিকার মধ্যে দিয়ে ও'র মনোজগতেও যেন প্রবেশাধিকার পেলাম আমি। অনাবিল শান্তি-বিচ্ছুরিত ঐ চোখের দিকে তাকিয়েই মনে হল ইনি যেমন মানুষ চিনতে ভুল করেন না, তেমনি অন্যায় অবিচারও করেন না নিরপরাধিনীর ওপর। ভীরু ডানা মুড়ে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় আশ্রয় নিতে পারি আমি এ'র কুলায়ে, আশা করতে পারি অনির্বচনীয় শান্তি, সুখ আর স্নেহভালবাসা।

তারপর, একটি একটি করে দিন কেটেছে আর একটু একটু করে আমি এগিয়ে গেছি তাঁর হৃদয়ের একান্ত কাছটিতে। ধীরে ধীরে শ্বশ্রূ-বধূ-ঠাকুরাণীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল নিবিড় সখিত্ব। দু'জনে দু'জনের কাছে ছিলাম অবারিতহৃদয়। উনি আমাকে আপন কন্যার মতই স্নেহ করতেন। আর মাতৃহীনা আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধাভালবাসা উপুড় করে দিয়েছিলাম তাঁর ওপরে। লেক সম্পর্কে রহস্যময় তথ্যটি শুনি তখনই। তাঁরই মুখে।

রাজমাতা শিল্পী ছিলেন। কোন চিত্র-অধ্যয়নশালায় উনি শিক্ষাগ্রহণ করেন নি। ছবি আঁকতে শুরু করে-ছিলেন অন্তরের আবেদনেই এবং এই অন্তঃস্ফূর্ত প্রেরণার তাগিদেই উৎকর্ষ-লাভ করেছিলেন চিত্রাঙ্কন বিদ্যায়।

ভোরের দিকে অথবা বিকেলের দিকে প্যালেট, ইজেল, তুলি, রঙ নিয়ে বসতেন বিস্তীর্ণ বাগানের এখানে সেখানে অথবা পান্না-লেকের তীরে অথবা প্রাসাদের ছাদে। ক্যানভাসে একবার রঙ চড়ালে সে ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। সকালের ছবি সকালেই শেষ করতেন, বিকেলের ছবি বিকেলে। সৌন্দর্যের আকর মায়াপুরের আনাচে-কানাচে অদূরে সুদূরেও যেন পুঞ্জীভূত হয়ে থাকত সৌন্দর্য। এবং তার অধিকাংশই উনি ধরে রাখতেন ও'র সংগ্রহশালায়। আপন বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় প্রতিটি ছবিই একটা বিশেষ রূপ নিয়ে সঞ্জীবিত হয়ে থাকত তাঁর তুলি-পট-বর্ণের মিলিত কারু-দক্ষতায়।

আমি ও'র সঙ্গে যেতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম পাশটিতে। বেশীর ভাগ সময় তন্ময় হয়ে আঁকতেন উনি। তার কখনও বা মৃদুস্বরে একথা—সেকথা জিজ্ঞেস করতেন, নানা গল্প করতেন, মায়াপুরের অতীত ইতিহাস বলতেন। ঠিক এমনি একটি মুহূর্তেই পান্না-লেকের প্রসঙ্গ উঠতে কথায় কথায় উনি বলে ফেললেন যুবরাণী দুর্গা-কইঈয়ের মৃত্যু-রহস্য।

চমকে উঠে আমি শুধিয়েছিলাম—'আপনি কার কথা বলছেন, মা?"

সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে উনি বললেন—'কেন মা, তুমি শোনো নি?'

"কই না তো?"

উনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আমার পানে। তারপর যেন ব্যথার নীল ছায়া দুলে উঠল ও'র কালো কালো চোখে।

মৃদুস্বরে বললেন—"উজ্জ্বলের বলা উচিত ছিল।"

কৌতূহল দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। একটু অভিমানও। বললাম—"আপনিই বলুন না, মা।"

"হ্যাঁ মা, বলব," ব'লে, অভ্যাসমত তুলিটাকে জিবের ডগায় বুলিয়ে সুচালো করে নিয়ে ছবিটার ওপর কয়েকটা টান দিয়ে বললেন—"কথাটা তুমি জানতে না শুনে বড়ই বেদনা পেলাম। আমি ভেবে-ছিলাম, উজ্জ্বল তোমায় সব বলেছে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন, "শুনে নিশ্চয় আঘাত পাবে তুমি। তাহলেও সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না কোনমতেই। তুমি উজ্জ্বলের প্রথম স্ত্রী নও।"

চকিতে যেন শ্বাসরোধ হয়ে এল আমার।

উনি ইজেলের ওপর দিয়ে লেকের পানে তাকিয়ে বলে চললেন—'কৈশোরের গণ্ডী পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বলের বিয়ে দিয়েছিলাম আমি বুন্দেলগড়ের রাজকন্যা দুর্গাবাঈয়ের সাথে।"

রুদ্ধশ্বাসে বললাম—'উনি এখন কোথায়?'

"কে? দুর্গাবাঈ? ঐখানে। পান্না লেকের জলে।" বলে তুলির সংকেত লেকটা দেখিয়ে আবার প্যালেটে তুলি বোলালেন উনি।

"লেকে?"

"হ্যাঁ। বিয়ের কয়েক বছর পরে, আমার নাতি রঞ্জনলালের বয়স যখন চার বছর তখন একদিন ভোরবেলা পান্না-লেকের জলে দুর্গাবাঈয়ের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়।"

"আর রঞ্জনলাল?"

"সে এখন নৈনিতালে। বোর্ডিং হাউসে।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নিশ্চুপ। অশোকের রক্তকান্তে উচ্ছ্বসিত, কপোত-কলগানে মুখরিত নিভৃত নিকুঞ্জছায়ার পানে তাকিয়ে মৃদুস্বরে শুধোলাম—"উনি ম'রা গেলেন কি করে, তার কোন কিনারা হ'ল না?"

"না। কেলেঙ্কারী এড়োনোর জন্যে উজ্জ্বলই এ ব্যাপার নিয়ে বেশী হৈ-চৈ হতে দেয়নি।"

"আচ্ছা, মা, কিছু মনে করবেন না, ও'র শরীর সুস্থ ছিল কি?"

একটু হাসলেন উনি। বললেন, "বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। না, ওর মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। বড় সুলক্ষণা মেয়ে ছিল দুর্গা। রূপে-গুণে অতুলনীয়া। যাক, তোমাকে পেয়ে তার অভাব আর আমি বুঝতে পারি না।"

একটু থেমে আবার বললেন—"কিন্তু বুঝছি না উজ্জ্বল কেন একথা তোমাকে আগে বলেনি। বউমার মৃত্যুর পর উজ্জ্বলকে কিছুতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করাতে রাজী করাতে পারিনি। বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তাই তোমাকে দেখে বুঝেছিলাম, তুমি পারবে। ওকে সুখী করতে তুমি পারবে।"

ইজেল, প্যালেট বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অন্দর থেকে দাসী এসে পৌঁছাতে আর কোন কথা হ'ল না। ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলাম অন্দরে। কিন্তু সেই দিন থেকেই শুরু হ'ল মান্নাপুরের রহস্যের দানা বেঁধে ওঠা।

ঝিল্লি-মুখর রাত। নির্বাণ দীপবাতি, নির্জন ঘর, নিদ্রিত পুরী। পাণ্ডুর আকাশে হিমানীর গ্লানিমাখা খণ্ডচন্দ্রের পানে তাকিয়ে একাকিনী দাঁড়িয়ে ছিলাম বাতায়ন-পথে। দূরে যেন শ্মশান-ধোঁয়ায় গড়া ধূম্রবর্ণ পর্বতমালা। অশান্ত বাতাসে মর্মর নিশ্বাস। আর সরোবর প্রান্তে ছোট্ট নির্ঝরিণীর মাণিক্য-কিঙ্কিনী কল্লোলে আহত মৌনস্তব্ধতা। সব মিলিয়ে জলেস্থলে নভস্তলে সে এক অপূর্ব রাগিণী। এ সুরের রেশ আমার মনের বীণাতেও লেগেছিল। ভাবছিলাম আমার কথা, স্বামীর কথা আর হত-ভাগিনী দুর্গাবাঈয়ের কথা। যুবরাজ কি কাজে বেরিয়েছেন। এখনও এসে পৌঁছোন নি। চিন্তাভারাক্রান্ত অন্তরে নিদ্রাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই অতন্দ্র অপলক চোখে ঐ তারার মালার কাঁপা আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, যুবরাজ তার প্রথম মহিষীর একখানি ছবিও কেন রাখে নি ঘরের মাধ্যে।

ঠিক এমনি সময়ে কাঁকর-সমাকীর্ণ উদ্যান-পথে উঠল খটা-খট খটা-খট অশ্ব-খুরধ্বনি। গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম দ্রুত অপসৃয়মান একটা ছায়া। তারপরেই, কক্ষচ্যুত উল্কার মত গাছের আড়াল থেকে মিশমিশে কালো ঘোড়াটা বেরিয়ে এসে শির-পা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রধান তোরণের সামনে। সহিস এসে ধরলে লাগাম। পিছলে নেমে পড়ল সওয়ার। আমার স্বামী যুবরাজ উজ্জ্বললাল।

আমি বাতায়ন-পথ থেকে একচুলও নড়লাম না। ক্ষণপরেই মর্মর সোপান-পথে শুনলাম পদশব্দ। তারপরেই পদশব্দ এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। তবুও আমি ফিরলাম না।

ঝিল্লী-ঝনন আবার উদ্দাম হয়ে উঠল। নিরন্ধ্র অন্ধকারে বাতি দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে দু'একটা জোনাকিও রণে ভঙ্গ দিলে।

তারপর মেঘমন্দ্র স্বর শুনলাম—"অনসু।"

আমি নিরুত্তর রইলাম।

জুতোর মস মস আওয়াজ এগিয়ে এল কাছে। ঠিক পেছনে এসে স্তব্ধ হ'ল ব্রিচেসপরা জুতোর শব্দ। তারপরেই চাবুকের হাতল দিয়ে আমার চন্দন কুমকুম আঁকা মুখখানি ঘুরিয়ে দিয়ে স্নেহকোমল স্বরে শুধোলেন যুবরাজ—"অনসু, কি হয়েছে?"

ডান হাত দিয়ে চাবুকটা নামিয়ে বললাম—"থাক।"

অস্ফুট হাসির শব্দ শুনলাম। শুনলাম চাবুকটা আছড়ে পড়ল মাটির ওপর। তারপরেই স্পর্শ পেলাম যুব-রাজের দুই বাহুর। পেছন থেকে প্রেম-কোমল হাতে আমার গলা বেষ্টন করে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে শুধোলেন—"দেরী ক'রে এসেছি বলে রাগ হয়েছে বুঝি?"

সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার। সেই ঝিল্লি আর নির্ঝরিণী সঙ্গীত-মুখরিত নিভৃত রাত্রে তামসিক পরিবেশে প্রেমস্পর্শ পেয়ে আবেশে আনন্দে নিমী-লিত হয়ে এল আমার দুই আঁখি-পল্লব।

মুগ্ধ অস্ফুট স্বরে শুধু বললাম—"না।"

"তবে কি?"

"জিজ্ঞেস করব?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে বলি?"

"একশো বার।"

"এ বাড়ীর বড় বউ পান্না-লেকের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন কেন?"

চকিতে আলিঙ্গনমুক্ত হলাম আমি। এত চকিতে যে বাহুর আঘাতে আহত হ'লাম। অভিমান স্ফুরিত হয়ে উঠল আমার অধরে আর কণ্ঠে।

বললাম—"চমকে উঠলে কেন?"

উত্তর এল রূঢ়স্বরে। সেই প্রথম কর্কশ সুর বেজে উঠতে শুনলাম যুবরাজের কোমল কণ্ঠে।

"এ সব কথা কার কাছে শুনেছ?"

অভিমানে এবার চোখে জল এসে গেল। বললাম—"মা'র কাছে।"

"মার কাছে!"

"হ্যাঁ, মার কাছে। আমি সব শুনেছি। মা দুঃখ করছিলেন, বিয়ের আগে আমাকে তোমার সব বলা উচিত ছিল।"

ব্যঙ্গের সুরে শুধোলেন যুবরাজ—"না শুনে তুমি কি অসুখী ছিলে?"

"না, ছিলাম না। এবং এখনও নেই।"

"তবে আর কি?" পরক্ষণেই কঠোর স্বরে বললেন—"ভবিষ্যতে এ প্রসঙ্গ আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করবে না আমার কাছে।"

চোখের জল উপচে এবার গড়িয়ে পড়ল দুই গাল বেয়ে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললাম—"বেশ করব না। কিন্তু

আমার শুধু একটি অনুরোধ আছে। রঞ্জনলালকে আমার কাছে এনে দাও।"

"সে দায়িত্ব আমার। তা নিয়ে তোমাকে অযথা মাথা ঘামাতে হবে না।"

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। শৈশব থেকে বাবার কাছে একটি রূঢ় কথাও কোনদিন শুনিনি। স্বামীর কাছে এ রকম কর্কশ ব্যবহার কোনদিন আশা করিনি। বিশেষ করে এ রকম তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে যে সে এরকম রুদ্রমূর্তি হয়ে উঠবে, তা আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি। তাই আর সামলাতে পারলাম না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়লাম শয্যায়।

যুবরাজ উজ্জ্বললালের কড়ি-কোমল প্রকৃতির পরিচয় পেলাম সেই প্রথম। এবং আমার যন্ত্রণারও শুরু সেইদিন থেকে।

শীগগিরই পরিচয় পেলাম তার বিচিত্র প্রকৃতির আর একটা দিকের—সুর আর কুঁয়ে মিশোনো দ্বি-ব্যক্তিত্বের।

কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট ঘটনা বলে নিই।

দিনদুয়েক পরে পাখীশিকারে যাওয়ার সময়ে যুবরাজ আমাকেও সঙ্গে নিলেন। সে রাতের ঘটনার পর থেকে খুবই মন-মরা হয়ে থাকতাম। তাই বুঝি আমার মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেই যুবরাজের এহেন বিচিত্র আয়োজন।

আয়োজন অবশ্য খুবই সামান্য। শুধু যুবরাজ আর আমি। আর তার প্রিয় বাহন মেঘের মত কালো কুচকুচে ওয়েলার ঘোড়াটা। একই ঘোড়ার পিঠে আমাকে সামনে বসিয়ে নিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া চালিয়েছিল স্বামী। আপত্তি করতে পারিনি। করার সাহস হয়নি। কেননা, আমি ভয় করতে শিখেছিলাম তার ভ্রূকুটিকে।

মধ্যপ্রদেশের বন্য উন্দামতার মানুষ হলেও এসব রক্তখেলা আমার ভাল লাগে না। তবুও পতিদেবতার ইচ্ছায় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছি প্রতিবার পাখার ঝটপটানি শুনে। গেছিলাম মায়াপুরের বাইরে ধোঁয়ারঙের ঐ পাহাড়গুলোর সানুদেশে। কত বিচিত্র ফুল কত সুন্দর রঙ আর গাছপালার সমারোহ সেখানে। শিরীষের শাখায়, সূর্যমুখীর বর্ণে, কৃষ্ণকলির চঞ্চলতায়, কণ্টালিকার সোনার লিখনে সেকি ফুল্ল উচ্ছ্বাস উল্লাস। পরিষ্কার একটা শিলাখণ্ডে বসে হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম পুষ্প-বিভোর ফাগুন মাসের এই অশ্রুত অপূর্ব বসন্তবাহার!

কিন্তু রক্তের হোলিখেলায় উন্মত্ত যুবরাজের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই. সময় নেই তার প্রকৃতির এহেন উৎসব-সজ্জা দেখার। এরকম নিষ্ঠুর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে এর আগে তাকে আর দেখিনি।

দিন গড়িয়ে এল। ক্লান্ত কূজন শ্রান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলায় পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় দুলে উঠল পশ্চিমের রক্ত-রাগ। আর ঠিক তখনই দেখলাম দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে বেগে গড়িয়ে পড়ছে একটা কিছু।

স্খলিত পাথরের চাঁই? না। একটি ঘোড়া এবং তার পিঠে সওয়ার উষ্ণীষ-ধারী একজন মানুষ। অসম্ভব বেগে গড়িয়ে পড়া পাথরের মতই ঘোড়াটি নেমে আসছিল পাহাড় বেয়ে। খুরের আঘাতে উড়ছিল ধুলোর মেঘ। দীর্ঘ পুচ্ছ বাতাসে মেলে অবিশ্বাস্য গতিতে ঐ ঢালু পথ বেয়ে নেমে আসছিল ধূম্রবরন ঘোড়াটি। সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম বেপরোয়া দুঃসাহসী উদ্দাম সওয়ারের পানে।

দৃশ্যটি শুধু আমারই চোখে পড়েনি। আচম্বিতে দেখি বনান্তের সবুজ পাতার আড়াল থেকে আবির্ভূত হ'ল যুবরাজের কালো ঘোড়া। রুক্ষ পাথরের বুকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখতে দেখতে ঘোড়াটা এসে থামল আমার সামনে। লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়াল যুবরাজ। এবং সেই প্রথম তার চোখে দেখলাম ভয়ার্ত দৃষ্টি।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। উন্নত ললাটে ফুটে উঠেছিল বিন্দু বিন্দু স্বেদ। টিকালো নাকের নিচে সরু গোঁফটিতে পড়েছিল পাতলা ধুলোর আস্তরণ। কিন্তু দুই চোখের তারায় তারায় ফুটে উঠেছিল কিসের চাপা আতঙ্ক। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম যুবরাজের এই ভয়ব্যাকুল মুখচ্ছবি।

তারপরেই, ভয় আমার মনেও দানা বেঁধে উঠল। কে ঐ অজ্ঞাতনামা দুরন্ত অশ্বারোহী যাকে দেখে মায়াপুরের দুর্ধর্ষ যুবরাজও ভয়ে কিণ্ডুলুকের মত এতটুকু হয়ে যায়?

পাহাড়ের পটে উড়ন্ত ধুলো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এবার বনের মধ্যে জাগল অশ্বখুরধ্বনি। তারপরেই কক্ষচ্যুত উল্কার মতই চকিতে বনের রেখার বাইরে বেরিয়ে এল ধোঁয়াবরন ঘোড়া আর তার পিঠে সওয়ার উষ্ণীষধারী মূর্তি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের সামনে এসে হ্রেষারব তুলে শির-পা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তেজালো ঘোড়াটা। সওয়ার কিন্তু মাটিতে নামল না। দুহাতে লাগাম টেনে ধরে ফেনমুখ বাহনকে সামলাতে সামলাতে ঘৃণানিষ্ঠুর চোখে তাকাল যুবরাজের পানে। তারপরেই আমার দিকে তাকিয়ে পাহাড়বন কাঁপিয়ে অট্ট-হাস্য করে উঠল।

আগন্তুক যুবাপুরুষ। তেজোদীপ্ত পৌরুষময় মুখভাব। বলিষ্ঠ মেদবর্জিত একহারা চেহারা। রোদেপোড়া তামাটে রঙ। পোষাকে বিলাসবিভবের চিহ্নটুকুও নেই। বাহুল্যবর্জিত সাদাসিদে অংগাবরণ। কিন্তু সুতীব্র ব্যক্তিত্ব যেন ছিটকে পড়ছে তার সুতনু থেকে, বজ্র-কঠিন কণ্ঠস্বর থেকে।

হাসির রেশ পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কড়াগলায় ধমকে উঠল যুবরাজ.—"বেয়াদবি করো না বিক্রম, সহবৎ শেখোনি?"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে বাতাসে কুর্নিশ ঠুকে ব্যঙ্গবঙ্কিম সুরে বলে উঠল অশ্বারোহী,—"মহামহিম রাজাধিরাজকে কি ভাবে তাহলে সম্মান জানাতে হবে? ফরমাইয়ে জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা, হুজুর, স্যার—"

অপমানে আমারও কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য। অসাধারণ ক্ষমতাবলে নিজেকে সংযত করে নিয়ে থমথমে মুখে শুধালো স্বামী—"আবার কি জন্যে এসেছো তুমি?"

"তোমার বিবি দেখতে।"

"দেখা তো হয়েছে, এবার বিদেয় হও।"

অদ্ভুত একটা পাতলা হাসি আগন্তুকের ঠোঁটের কোণ থেকে ছড়িয়ে পড়ল চোখের তারায় তারায়, সেখান থেকে সমস্ত মুখে, প্রতিটি পরতে পরতে।

চিবিয়ে চিবিয়ে ইস্পাতের ধারালো ছুরীর মত শাণিত গলায় বললে বিক্রম, —"এত তাড়াতাড়ি বিদেয় হব? এখনও তো হিসেব নিকেশের পালা সাঙ্গ হয়নি যুবরাজ উজ্জ্বললাল। যুবরাণী দুর্গা বাঈ শাস্তি পেয়েছেন বটে, কিন্তু—"

আচম্বিতে বাজের মত গর্জে ওঠে যুবরাজ—"বিক্রম!"

অট্টহাসিতে যেন রেণু রেণু হয়ে পড়ে বিক্রম,—"আস্তে। আস্তে। বন্দুকটা অত জোরে চেপে ধরার দরকার নেই উজ্জ্বললাল, আমি নিরস্ত্র। কিন্তু তুমি বড় ভয় পেয়েছো দেখছি। তাই চললাম আজকের মত, আবার দেখা হবে।"

বলেই চকিতে লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলে বিক্রম। শন্ করে বাতাস কেটে ঝাঁকিয়ে উঠল চাবুক। এবং চোখের পলক ফেলার আগেই সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে ছায়াঘন সবুজ বন-রেখার দিকে দুরন্ত উচ্চৈঃশ্রবার মতই দুর্বার গতিতে ধেয়ে গেল ধূম্রবরন ঘোড়া আর তার বিচিত্র সওয়ার। দেখতে দেখতে খটাখট শব্দ হারিয়ে গেল বনের পথে পাহাড়ের বুকে।

ফিরে দেখি শক্তমুঠিতে বন্দুকটা ধরে আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে যুবরাজ। ঘামে ভিজে উঠেছে তার সারা মুখ।

প্রদোষের সেই আলো-অন্ধকারের পটভূমিকায় এই রহস্যময় নাটিকার এক-

মাত্র সাক্ষী রইলাম আমি। কোন প্রশ্ন করিনি, কোন কথাও বলিনি। শুধু বুকের মধ্যে উপলব্ধি করেছি অতীতের কি আশ্চর্য রহস্যের দ্রিম দ্রিম ডম্বরু-সংকেত। আর সেই সাথে আরও একটা মহাভয় ধীরে ধীরে অংকুরিত হয়ে উঠেছে আমার মনের গহনতম কোণে। সে ভয় প্রবঞ্চনার, প্রতারণার, পিতলকে কনকজ্ঞানে আঁকড়ে ধরার।

পরের দিন সকালে গত সন্ধ্যার ঘটনার রেশমাত্র দেখলাম না স্বামীর মুখে। বাতায়ন-পথে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে কুহু-মন্ত্রে বিভোর বাগানের পানে তাকিয়ে ছিলাম। এমন সময়ে আমার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ সুরে শুধোলো যুবরাজ—"অনসূ।"

চমকে উঠেছিলাম। তবুও মুখে হাসির রেশ টেনে এনে বললাম—"বল।"

"আজ রঞ্জনকে আনতে লোক পাঠালাম।"

"সত্যি?" নিমেষে মনের বাষ্প উড়ে গিয়ে খুশীর আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে চোখে। "সত্যি বলছো?"

"সত্যি"। প্রসন্ন চোখে তাকিয়ে থাকে যুবরাজ। যেন আমার চোখের খুশীর রোশনাইয়ের রামধনু রঙ তার চোখেও গিয়ে লাগে।

এত প্রেম, এত ভালবাসা, আমাকে সুখী করার যার এত প্রয়াস, তার সম্বন্ধে সারারাত ধরে কত অন্যায় চিন্তা করেছি ভেবে অনুতাপে আর কনককে কনকরূপেই চিনে নেওয়ার আনন্দে ছলছল করে উঠল আমার চোখ। সস্নেহে আমার গালদুটি টিপে দিয়ে ধীর পদে বেরিয়ে যায় স্বামী।

কিন্তু ধুরন্ধর যুবরাজ উজ্জ্বল-লালের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার এত-টুকুও আঁচ করতে পারা আমার মত মূর্খের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সেদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি কি ভয়ংকর নাটকের গৌরচন্দ্রিকা হাসি-মুখে আমায় শুনিয়ে গেল আমার স্বামী।

রঞ্জনলাল তখনও এসে পৌঁছোয়নি। অন্দরমহলের সবচেয়ে বৃদ্ধা পরিচারিকা লছমী রঞ্জনের ঘর ঝেড়েমুছে সাজিয়ে রাখছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখাশুনো করছি। একথা সেকথা থেকে রাজমাতার প্রসঙ্গ উঠতে সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে লছমী বলে ওঠে—"রাণী-মা দেবী। মানবী নন।"

কৌতূহল হ'ল। শুধোলাম—"আচ্ছা লছমী, তোমরা সব্বাই ওঁকে রাণী-মা বল বটে, কিন্তু কই, উনি তো রাজকার্য কিছু দেখেন না।"

আবার যুক্তকর মাথায় স্পর্শ করে লছমী বললে—"স্বর্গত মহারাজের তাই ইচ্ছে। আমৃত্যু এ রাজ্য শাসন করবেন রাণী-মা। তাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজমুকুট লাভ করবেন। তবে আপনি জানেন না, উনি রাজসভায় নিয়মিত না গেলেও রাজকার্য সংক্রান্ত অনেক-জটিল বিষয় নিয়ে মন্ত্রীমশায় পরামর্শ করে যান ওঁর সাথে।"

আরও দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দাসী এসে জানালে রাণী-মা পান্না-লেকে গেছেন।

ইদানীং চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে শ্বশ্রু-মাতার নিত্যসহচরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ছবি আঁকা দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। শেষে এমন হয়েছিল যে আমি না গেলে ওঁর ছবিই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তাই দাসী ডাক দিয়ে যেতেই শশব্যস্তে বেরিয়ে পড়লাম মরকত ভবনের বাইরে।

সুনীল আকাশের প্রতিচ্ছবি বুকে নিয়ে রবিরশ্মির আভায় লক্ষ লক্ষ পান্নার মতই অগণিত নীল শিখা ছড়িয়ে জ্বলছিল পান্না-লেকের জল। এক হাতে প্যালেট আর এক হাতে তুলি নিয়ে নৃত্যপরা রোশনাইয়ের দিকে স্বপ্নমদির আঁখি মেলে বসে ছিলেন রাণী-মা। আমার পদশব্দে চমক ভাঙলো। পাশের আসনটা দেখিয়ে বসতে বললেন।

তারপর মৃদু হেসে শুধোলেন—"বউমার আজ এত দেরী কেন? ছবি আঁকা আজকাল বুঝি খারাপ হচ্ছে? আর ভাল লাগছে না।"

মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললাম—"না, মা। রঞ্জনের ঘরটা পরিষ্কার কর-ছিলাম।"

রঞ্জনের প্রসঙ্গ উঠতেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন উনি। খুশী টল-মলিয়ে উঠল তাঁর চোখে, মুখে, অধরে।

বললেন—"ভারী ভালো ছেলে রঞ্জন। মায়াপুরের রাজবংশের উপযুক্ত। মায়ের রূপ পেয়েছে। স্বভাবটিও হয়েছে তারই মত—ধীর, স্থির, শান্ত।"

"আর বাবার শৌর্যবীর্য?" ইচ্ছে করেই শুধোলাম।

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন শ্বশ্রু-মাতা। বললেন—"ছেলেবেলায় ওর বাবা বড় দুরন্ত ছিল। পাহাড় বনে ঘোড়া ছুটিয়ে শিকার করা ছাড়া আর কোন প্রিয় সখ ওর ছিল না। রঞ্জন ছবি বড় ভালবাসে।"

সরাসরি কিছু না বললেও কৌশলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন রাজমাতা। ওঁর কথা বলার ধরণটাই এই রকম। অল্প বলেন, কিন্তু যা বলেন, তা সূক্ষ্ম আর বুদ্ধিদীপ্ত।

শিকারের কথা উঠতেই আচমকা মনে পড়ে গেল সেদিনকার সেই বিচিত্র নাটিকার কথা।

কৌতূহলী সুরে শুধোলাম—"আচ্ছা, মা, বিক্রম কে?"

সিধে হয়ে বসলেন শ্বশ্রুমাতা।

"এ নাম তুমি কোথায় শুনলে, মা?"

বললাম সেদিনকার ঘটনা।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রাণী-মা। ভাবালু তন্ময়তার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর চোখে অথবা মুখে।

কিছুক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বললেন—"বিক্রম দুর্গাবাঈয়ের দূর সম্পর্কের ভাই। ছেলেবেলা থেকেই একসাথে মানুষ হয়েছিল দু'টিতে। দুর্গাকে এত ভালবাসত যে বিয়ের পরেও প্রতি হপ্তায় অতদূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসত ও এখানে। বড় ভালো ছেলে।"

"তারপর?"

"বউমা'র মৃত্যুর পর আর আসেনি।" বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন রাণী-মা। বুঝলাম, এ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করতে উনি অনিচ্ছুক।

কিন্তু পান্না-লেক, দুর্গাবাঈ আর বিক্রম-রহস্য তখন কুয়াশার মতই ছড়িয়ে পড়েছে আমার মনের দিক হ'তে দিগন্তে।

আর তারপরেই ঘটল সেই চরম দুর্ঘটনাটা।

ঘটল ঐ পান্নালেকের ধারেই।

পরের দিন এসে পৌঁছোলো রঞ্জন-লাল।

শ্বশ্রুমাতা একবিন্দুও অতিরঞ্জন করেননি। সুদর্শন রঞ্জনলালের চোখে-মুখে এমনই এক সুকুমার কান্তি যে দেখলে 'পরে ভালবাসতে ইচ্ছা যায়। কথাবার্তাও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। বিমাতাকে আপন মায়ের মত ভালবাসতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে আমার একটু শঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার এ শংকা যে অমূলক তা রঞ্জনই প্রমাণ করে দিলে স্বল্পক্ষণের মধ্যে।

মাত্র কয়েকটা দিন সে রইল মায়া-পুরে। আসন্ন পরীক্ষার জন্যে আর বেশী থাকা সম্ভব হল না তার পক্ষে। কিন্তু ঐ ক'টা দিনেই হাসিখুশীর উৎসব লেগে রইল মরকত ভবনে। তারপরেই বিদায় নিলে সে। যাওয়ার সময়ে যুবরাজও সঙ্গে গেল কয়েকটা দিন নৈনিতালে কাটিয়ে আসার জন্যে।

নিভে গেল উৎসবের দীপ মরকত ভবনে। শ্বশ্রুমাতার তো কথাই নেই, আমারও মনটা বড় শূন্য লাগছিল সে চলে যাওয়ায়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই রঞ্জনের চিঠি এসে পৌঁছোলো রাণী-মার নামে।

চিঠিখানা বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে

বললেন শ্বশ্রূমাতা—"দেখেছো নাতির কাণ্ড!"

"কি, মা?" চিঠিখানা খুলতে খুলতে বলি আমি।

"আমার আঁকা ছবি চায় সে। স্কুলের বন্ধুদের দেখাবে। ভোরের অরুণ আলোয় পান্না-লেকের সৌন্দর্য দেখিয়ে নাকি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে চায়। পাগল আর বলে কাকে?"

চিঠি পড়ে দেখি, সত্যিই তাই বটে। গোটা গোটা অক্ষরে ঠাকুরমার কাছে আবদার জানিয়েছে রঞ্জন— ছবি তার চাই-ই চাই এবং না দিলে সে নাকি আর মায়াপুরে আসবে না।

এ রকম চরম বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর স্নেহকোমলা ঠাকুরমা যে তিলমাত্র কাল-ক্ষেপ করবে না, তা আমি জানতাম। তাই পরের দিনই পাখী ডাকতে না ডাকতেই ভোরের আলো ভালো করে ফুটে ওঠার আগেই উনি দাসী মঙ্গলাকে নিয়ে পান্না-লেকের ধারে গিয়ে তুলির ঝাঁপি খুলে বসেছেন শুনে আশ্চর্য হইনি আমি।

তপনদেবের সপ্তঅশ্ব তখন সবে উঁকি দিয়েছে দিগ্‌বধূর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে, আমি প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি শ্বশ্রূমাতার পাশটিতে দাঁড়িয়ে নাতির ফরমায়েসি আঁকা ছবি দেখব বলে, ঠিক এমনি সময়ে উর্ধ্বশ্বাসে উদ্‌-ভ্রান্ত মুখে মঙ্গলা এসে হাজির।

ওর চোখে ভয়ের কাঁপন দেখে চমকে উঠে শুধোলাম—"কি রে, ও রকম হাঁপাচ্ছিস কেন?"

"শীগগির আসুন, রাণী-মা কি রকম করছেন।"

'কি রকম করছেন? ঠিক করে বল।" এবার ভয় পেলাম আমিও।

"জানি না, আপনি দেরী করবেন না।" বলেই মঙ্গলা আর দাঁড়ালো না।

দুরুদুরু বুকে পান্না-লেকের ধারে পৌঁছে যে অভাবনীয় দৃশ্য দেখলাম, তা আমি জীবনে ভুলব না। চোখ না মুছেও এখনও দেখতে পাই লেকের নীল বুকে অরুণের লাল কাঁপন। টল্‌-টলে জলে সবুজ রেশমের আভার মত গাছের সবুজ ছায়া। এধারে ওধারে করবী, সাদা রঙন আর শিউলির মিতালি। বাতাসে মল্লিকা আর বকুলের গন্ধ।

রেণু রেণু মাণিক্যের মত শিশিরের কণামাখা ঘাসের ওপর অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় পড়ে ছিলেন রাণী-মা। এক-দিকে ছিটকে পড়ে ছিল তুলিগুলো, অপর দিকে প্যালেট। দূর থেকে দেখে মনে হল বুঝি বা নিষ্প্রাণ সে দেহ।

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে জানু পেতে তাঁর পাশে বসে পড়ে আর্তস্বরে কেঁদে উঠেছিলাম—"মা। মাগো!"

অতি কষ্টে যেন দেহের শেষ শক্তি-বিন্দুও ব্যয় করে আঁখিপল্লব খুলে-ছিলেন। রাণী-মা ঘোলাটে দৃষ্টি আমার মুখের ওপর রেখে কি যেন বলতে চেয়ে-ছিলেন। থর থর করে কেঁপে উঠেছিল অধরোষ্ঠ আর মুখের মাংসপেশী। মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও প্রথমে কিছু শুনতে পাইনি। তারপর শুনেছিলাম ক্ষীণ স্বর ......খুব ক্ষীণ......কিন্তু তবুও যা শুনেছি তা এত স্পষ্ট যে তার প্রতিটি অক্ষর, এমন কি উচ্চারণের জড়িত ভঙ্গিমাটুকুও আজও আমার মনে আছে।

প্রাণপণে উনি বলেছিলেন—..."লেক ...ঐ লেকটায় নিশ্চয় কিছু একটা আছে।"

শুধু এই ক'টি কথা। তারপরেই জ্ঞান হারালেন রাণী-মা এবং সে জ্ঞান আর ইহজীবনে ফেরেনি।

চিকিৎসার ত্রুটি করিনি। যুবরাজ এবং রঞ্জনলালকেও খবর পাঠানো হয়ে-ছিল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু তারা এসে দেখে-ছিল শুধু রাণী-মার প্রাণহীন দেহ-পিঞ্জর। দুর্বল হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় নাকি ওপরের পথে পা বাড়াতে হয়েছে মায়াপুরের আপামরের প্রণম্য মহীয়সী মানুষটিকে।

কিন্তু পান্না-লেকের বিভীষিকা যেন সেইদিন থেকে বাসা নিলে আমার অন্তরের কন্দরে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বারে বারে মনের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল বিচিত্ররূপিণী পান্না-লেকের ধারে ঘাসজমির ওপর অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় শায়িতা রাণী-মার শেষ কটি কথা "...... লেক......ঐ লেকটায় নিশ্চয় কিছু একটা আছে।"

আমার এ আত্মযন্ত্রণা আমি সীমিত রেখেছিলাম নিজের মধ্যেই, কাউকে বলতে চাইনি, বলতে পারিনি, বলার সাহস ছিল না। কেন না, সব বৃত্তান্ত না শুনলেও পান্না-লেকের রহস্যময় অতীত সম্বন্ধে যা জেনেছি, তারপর তো স্বামীর কাছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে অবারিত-অন্তর হ'তে পারি না। একটি একটি করে দিন গড়িয়ে নিশায় মিশেছে, তারপর অসীম বেদনার ভেতর দিয়ে সুপ্তিহীন বিভাবরীর কালো মুখে লেগেছে প্রভাতের স্পর্শ। অহোরাত্র আমার মনে শুধু শত-সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের মত এক চিন্তা...লেক...লেক ...ঐ লেকের মধ্যে একটা কিছু আছে ...যার ক্ষুধার কাছে আত্মবলি দিয়েছেন মরকত ভবনের প্রথম বধূ দুর্গাবাঈ, রহস্যজনক মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছেন মায়াপুরের রাণী-মা। যে লেকের প্রসঙ্গ তুললে উন্মাদ ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হন এ রাজ্যের যুবরাজ। কি আছে তার টলমলে পান্নাসবুজ জলের অন্তরালে, কি বিভীষিকা লুকিয়ে আছে তার চার-পাশের বিহগকূজিত, অলিগুঞ্জিত মালঞ্চের আনাচে-কানাচে? উত্তর পাইনি এ প্রশ্নের। তাই শান্তিও পাইনি। চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখেছি গম্ভীর-মুখ যুবরাজ আর ম্লানমুখ রঞ্জনলালকে—তারাও আমার কাছে আসেনি আমার বেদনাবিহ্বল মুখচ্ছবি দেখে, আমিও তাদের কাছে যেতে পারিনি আমার আত্যন্তিক যন্ত্রণাবোধের বিন্দুমাত্র উপশম না হওয়ায়।

আর তারপরেই একদিন সব পরি-ষ্কার হয়ে গেল। দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠল সব কিছু। রহস্য-তিমিরের প্রতিটি অংশ চকিতে ঝলসে উঠল আচম্বিতে। নিমেষে তিরোহিত হ'ল সব কিছু সংশয় আর যন্ত্রণা। ঈশ্বর সহায় হলেন আমার। তাঁরই ইচ্ছায় মুক্তি পেলাম এই অবর্ণনীয় বেদনাচক্র থেকে। আর সেই সাথে সমাধান করলাম রূপসী পান্না-লেকের রহস্য।

শ্রান্ত দ্বিপ্রহরে সেদিন একাকী বসে আছি শয্যায়। সামনে পড়ে আছে রাণী-মা'র সর্বশেষ অর্ধসমাপ্ত ছবি-খানি। মানুষটিকে এই ক'দিনে এত ভালবেসেছিলাম, তা কে জানতো। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অশ্রু টলমল করে উঠল দুই চোখে, ছবির রঙগুলো রামধনুর মত বর্ণ-সমারোহ নিয়ে থির থির করে কাঁপছে চোখের সামনে, এমন সময়ে আচমকা এক হ্যাঁচকা টান পড়ল মস্তিষ্কের কোষ-গুলোয়।

রঙ...তুলি...রাণী-মা।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলাম ছবিটার পানে। সেই দৃশ্য। পান্না-সবুজ জলে কাঁপছে অরুণের লাল রূপ। ওপারের তীরে কৃষ্ণচূড়া আর রাধা-চূড়ার মিলিত অট্টহাসি।

রঙ...তুলি...রাণী-মা।

যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম, রাণী-মা'র সেই বিচিত্র অভ্যাস। ক্যানভাসের ওপর রঙ চড়ানোর সময়ে আনমনে জিবের ডগায় তুলি বুলিয়ে তুলিটাকে সুচোলো করে নেওয়া।

রঙ...তুলি।

আধুনিক রঙ অনেক রকম কেমি-ক্যালস দিয়ে তৈরী হয়। সব কেমি-ক্যালই কি নির্দোষ? হয়ত দু'একটা কেমিক্যাল বিষাক্ত। জিবে তুলি বোলানোর সময়ে নিশ্চয় তাদের বিষ-ক্রিয়া সহ্য করতে পারেনি রাণীমার দুর্বল হৃদযন্ত্র। তাই তা স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরতরে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? জিবে তুলি বোলানোর অভ্যেস তো তাঁর আজকের নয়, অনেক দিনের। এতদিন

কিছু হ'ল না। আর সেদিন রঞ্জনের ছবি আঁকতে বসেই......

কিন্তু উনি জ্ঞান হারানোর আগে কেন বলে গেলেন ঐ লেকের মধ্যেই কিছু একটা আছে? অলৌকিক কিছু?

শির শির করে উঠল সর্বাঙ্গ। ছবিটা আরও কাছে এনে ভাল করে দেখতে লাগলাম। দক্ষ হাতে চড়ানো রঙের সমারোহ। জলের ওপর সবুজ রেশমের আভাকে এমারাল্ড গ্রীণ দিয়ে ফুটিয়েছেন। রাধাচূড়ার উচ্ছ্বাসকে ক্যাডমিয়াম ইয়োলো দিয়ে। কৃষ্ণচূড়ার অট্টহাসি আর অরুণের লাল কাঁপনকে ক্রিমসন লেক দিয়ে......

ক্রিমসন লেক......!

লেক!

'......লেক...ঐ লেকের মধ্যে নিশ্চয় একটা কিছু আছে।'

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেছিলাম আমি। ছবিটার ওপর সর্বশেষে পড়েছে ক্রিমসন লেকের গাঢ় পোঁচ। তার পরেই আর কোন রঙ ব্যবহার করার অবসর পাননি শিল্পী—কি এক মারণ-মন্ত্রে নিমেষে মুছে গেছে দুনিয়ার সব রঙ তাঁর চোখের সামনে থেকে।

লেক!...

ক্রিমসন লেক!...

চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল স্বপ্নময়ীর আঁখি মেজে আনমনে জিবের ডগায় তুলি বুলোচ্ছেন রাণী-মা। নিজের অজান্তেই গ্রহণ করেছেন কালান্তকের পরোয়ানাকে।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি বহু ছবিতে লালের বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে উনি ব্যবহার করেছেন ভারমিলিয়ন রেড, স্কারলেট রেড, ক্রিমসন লেক। কোনদিন কিছু হল না, আর রঞ্জনের ফরমায়েশি ছবি আঁকতে বসে......

আর, তারপরেই যেন লক্ষ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল মস্তিষ্কের কোষে কোষে, অবশ হয়ে এল সর্ব অংগ, রুদ্ধ হয়ে এল শ্বাস।

আচম্বিতে মনে পড়ে গেল মাত্র কয়েকদিন আগে লছমীর মুখে শোনা কয়েকটি কথা। রঞ্জনলালের ঘর পরিষ্কার করতে করতে লছমী বলেছিল—স্বর্গত মহারাজের ইচ্ছে আমৃত্যু এ রাজ্য শাসন করবেন রাণী-মা। তাঁর মৃত্যুর পর রাজমুকুট লাভ করবেন যুবরাজ। তবে কি......?

আমি আর ভাবতে পারলাম না। মুক্ত বাতায়নের সামনে গিয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস নিয়ে অনেকটা স্বস্তি বোধ করলাম। চিন্তার উন্দমতাও কমে এল। পান্না-লেকের সমস্ত রহস্যই ছবির মত পর পর ভেসে উঠল মনের চোখের সামনে।

রহস্য পান্না-লেকে নয়, ক্রিমসন লেকে। মৃত্যু অলৌকিক নয়, পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু নিজের মা'কে......!

দুই হাতে মাথা টিপে ধরলাম আমি। অসহ্য এ চিন্তা। কিন্তু তবুও এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সম্ভাবনা তো আর নেই। রাণী-মা'র আশ্চর্য সুন্দর পান্না-লেকের জলের মতই শান্ত-সমাহিত নয়ন দুটি ভেসে উঠল আমার বেদনা-নীল মনের আকাশে। মনে পড়ল নাতির প্রতি তাঁর হৃদয় উজাড় করা স্নেহভালবাসা। এই ভালবাসার সুযোগ নিয়েছে তাঁরই গর্ভজাত সন্তান।

নৈনিতালে পৌঁছে যুবরাজ হয়ত শুধিয়েছিলেন রঞ্জনকে —'হ্যাঁরে, ঠাকুমা'কে চিঠি লিখবি না?'

নিশ্চয় সাগ্রহে রাজী হয়ে গেছিল রঞ্জনলাল। তারপর? চিঠি লিখতে বসে ছোটদের অভ্যাস কি? না, বয়োজ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞেস করা চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে।

রঞ্জনও নিশ্চয় শুধিয়েছিল যুবরাজকে —"কি লিখব, বাবা?"

"কি লিখবি? বেশ, খুব মজা হবে যদি লিখিস, ঠাকুমা, তোমার আঁকা পান্না-লেকের ভোরবেলার একটা ছবি পাঠাও, তা নাহলে খুব রাগ করব—এই সব। কেমন?"

বাবারই কথাগুলি শ্রুতিলিখন লিখে নেওয়ার মত লিপিবদ্ধ করে গেল রঞ্জনলাল। শেষ হ'ল পরিকল্পনার প্রথম পর্ব।

তারপরের পর্ব তো আমি দেখেইছি স্বচক্ষে। ঘাসজমির উপর শায়িতা রাণী-মা। একদিকে ছিটকে পড়েছে তুলি, আর একদিকে রঙ মাখানো প্যালেট।

রঙ মাখানো প্যালেট। ......কিন্তু রঙগুলো? সেগুলো দেখলেই তো সব সন্দেহ ভঞ্জন করা যায়।

কিন্তু রঙগুলো রঞ্জনলালের কাছেই। যুবরাজ রাণী-মা'র রঙ, তুলি, ইজেল, প্যালেট এবং আরও অনেক সরঞ্জাম সমস্ত দিয়ে দিয়েছিলেন রঞ্জনকে। বলেছিলেন, "ছবি ভালবাসিস তুই, তোর ঠাকুরমারও সারা জীবনের সঙ্গী ছিল ছবি। তাই এগুলো তোরই প্রাপ্য। তুই রাখ।"

উঠে পড়লাম। আর তিলমাত্র সময়ও ব্যয় করতে মন চাইল না। রহস্যের অন্তঃপুরে পৌঁছে গেছি নিতান্ত অকস্মাৎভাবে। আর তো বিলম্ব সয় না।

দ্রুতপদে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। রঞ্জনলালের ঘরের সামনে পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম দোরগোড়ায়।

ঝিলিমিলি লাগানো বাতায়ন দিয়ে রবির কিরণমাখা আকাশের পানে তাকিয়ে উদাসভাবে বসেছিল রঞ্জনলাল। একাকী। সামনে ইজেল, তুলি, প্যালেট আর রঙের মরোক্কো লেদারের কেস। হঠাৎ দেখলে ওর পিতামহীর কথাই মনে পড়ে যায়। ঠিক সেই রকম আত্ম-সমাহিত, স্বপ্নবিভোর, প্রশান্ত।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ওর পাশে বসে পড়ে ডাকলাম—"রঞ্জন।"

চমক ভাঙল ওর। ম্লান হেসে বললে—"কি মা?"

মা! আমার নারীমনের সমস্ত বুভুক্ষা যেন ঐ একটি একাক্ষর শব্দের প্রলেপে নিমেষে পরিতৃপ্ত হ'ল। কিন্তু হায়রে, বড় দেরী হয়ে গেছে! বড় দেরী হয়ে গেছে! আর ক'টা দিনই বা আর শুনব এই আহ্বান।

চোখে জল এসে গেছিল। অঞ্চল-প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে শুধোলাম —"একলাটি বসে কি ভাবছ, রঞ্জন?"

"ভাবিনি কিছু। এমনি আকাশ দেখছিলাম।"

"ছবি আঁকতে ইচ্ছে যাচ্ছে বুঝি?"

"কিন্তু কি আঁকব?"

"কেন, দু'চোখে যা দেখবে, তাই। আচ্ছা, রঞ্জন, ঠাকুমাকে অমন সুন্দর চিঠিটা তুমি একলাই লিখেছিলে? বেশ চিঠি কিন্তু।"

"দূর, আমি কি একলা পারি? বাবা তো বললেন আমায় লিখতে।"

আবার উত্তাল হয়ে উঠল হৃদযন্ত্র। রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম—"কিন্তু পান্না-লেকের ছবিটা তো তুমিই চেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, আমিই চেয়েছিলাম। বাবা বললেন, তোদের নৈনিতালটা পান্না-লেকের মত মোটেই সুন্দর নয়। ঠাকুমাকে লিখে দে না ভোরের আলোয় পান্না-লেকের একটা ছবি পাঠিয়ে দিতে। ছবি দেখলেই তোর বন্ধুরা অবাক হয়ে যাবে। তাই লিখেছিলাম। মা, তুমি ওরকম করছ কেন? অসুখ হয়েছে?"

"নারে না, অসুখ হবে কেন, ভালোই আছি।" প্রাণপণ চেষ্টায় একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম—"দেখি তোমার রঙের বাক্সটা। বাঃ, এত রঙ শেষ হতে হ'তেই তুমি বড় হয়ে যাবে, তাই না, রঞ্জন?"

বলতে বলতে খুলে ফেললাম লেদার কেসটা। ভেতরে ছোট ছোট খুপরিতে সাজানো বিচিত্র রঙের টিউব। একটা খুপরি শূন্য। সোনার জলে তলায় লেখা 'ক্রিমসন লেক'।

মনে হ'ল, আর বুঝি পারব না এ উত্তেজনা সহ্য করতে। আমার বুকের ঐ প্রচণ্ড ধুকপুকুনি বুঝি এবার রঞ্জনলালও শুনতে পাবে। দেখি,
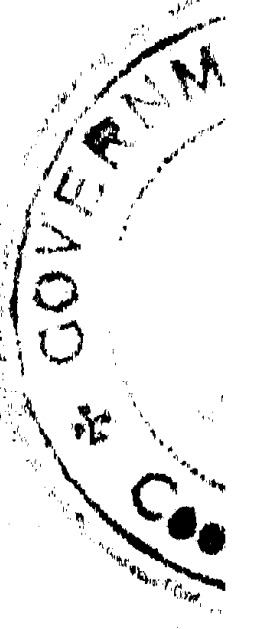
উদ্বিগ্ন চোখে ও তাকিয়ে আমার মুখপানে।

"মা! কি হয়েছে তোমার?"

"এই...মানে...মাথা ধরেছে। আচ্ছা, এই রঙটা বুঝি হারিয়ে ফেলেছো তুমি।"

"বারে, আমি হারাবো কেন? বাবা'ই তো নিয়ে নিলেন রঙটা। বললেন, পরে দেব।"

টলতে টলতে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। তারপর শয্যা।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

দিন কয়েক পরে কি এক জরুরী কাজে দুদিনের জন্যে মায়াপুরের বাইরে গেল যুবরাজ। যাওয়ার আগে বিদায় নেওয়ার জন্যে আমার ঘরে যখন সে প্রবেশ করলে, তখন আমি সব মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মনস্থির করে ফেলেছি।

চিবুকটা একটু নেড়ে দিয়ে মধু-মাখা সুরে বললে যুবরাজ—"অনসু, তবে আসি।"

একটু সরে এসে বললাম, "এসো। আর শোনো, একটা আশ্চর্য খবর আছে।"

"বটে! কি খবর শুনি?"

"রঞ্জনকে যে রঙের লেদার-কেসটা তুমি দিয়েছ, তারমধ্যে একটা রঙ নেই। ক্রিমসন লেক।"

বলে, স্থির চোখে তাকালাম ওর দুই চোখের পানে।

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল যুবরাজ। আস্তে আস্তে সে দৃষ্টি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠল, আর মণিকা দুটি পরিণত হ'ল দুটি সূচাগ্র নীল ইস্পাত বিন্দুতে। আশ্চর্য এক ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার চাপা অধরোষ্ঠের কোণে কোণে, শক্ত চোয়ালের রেখায় রেখায়।

দাঁতে দাঁতে পিষে সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠেছিল যুবরাজ।

"ক্রিমসন লেক দিয়ে ছবি আঁকার বাসনা জেগেছে বুঝি? আচ্ছা, তোমার সাধ অপূর্ণ রাখব না। ফিরে আসতে দাও আমাকে।"

সেইদিনই রাত্রে দীনহীনার মত অতি সাধারণ বেশে মায়াপুর ত্যাগ করেছিলাম আমি। কিভাবে মরকত ভবন থেকে প্রহরীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছিলাম রাজপথে, সেখান থেকে মায়াপুর স্টেশনে—সে দীর্ঘ বৃত্তান্ত রোমাঞ্চকর হলেও অপ্রয়োজনীয়। তাই আর তার উল্লেখ করলাম না।

তারপর বহুবছর অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এই বিরাট দুনিয়ার এমনভাবে আত্মগোপন করেছি যে শত চেষ্টাতেও মহারাজ উজ্জ্বললাল আমার সন্ধান আর পায়নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পান্না-লেকের প্রথম রহস্য নিয়ে বহুভাবে তোলাপাড়া করেছি মনে মনে। কোন মীমাংসায় পেঁছোতে পারিনি। তবে আমার বিশ্বাস মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রাণীমা'ই সে ইংগিত দিয়ে গেছিলেন আমায়। বিক্রম ছিল দুর্গাবাঈয়ের দূর সম্পর্কের ভাই। এক-সাথেই মানুষ হয়েছিল ওরা। বিয়ের পরেও প্রতি হপ্তায় বিক্রম আসতো মায়াপুরে। এই আসা-যাওয়া মাথামাথি থেকেই কোন অন্যায় সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে নি তো যুবরাজ উজ্জ্বললালের ঈর্ষাকাতর অন্তরে? হয়ত কলঙ্কিনী অপবাদ সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিয়ে সব জ্বালা জুড়িয়েছে দুর্গাবাঈ। অথবা নিজের হাতেই যবনিকা টেনে দিয়েছে যুবরাজ উজ্জ্বললাল তার প্রথম বিবাহিত জীবনে। এ অনুমান কতখানি সম্ভব আর কতখানি অসম্ভব, সে মীমাংসা আমি আজও করতে পারিনি। তবে আমি তো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি যুবরাজের ভেতরে দু'টি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের লড়াই। একই চোখে দেখেছি প্রেম-ভালোবাসার সুস্নিগ্ধ আভার পরেই লোভ-হিংসা-নিষ্ঠুরতার নিষ্করুণ আগুন জ্বলে উঠতে।

"আর শোনো, একটা আশ্চর্য খবর আছে।"

তাই ভাবি, কিছুই অসম্ভব নয় এ দুনিয়ায়। অন্ততঃ যুবরাজের পক্ষে তো নয়ই।

অরণ্যও বুঝি নিরাপদ মানুষের সমাজের চাইতে। তারই প্রমাণস্বরূপ লিখলাম এ বিচিত্র কাহিনী।

যদি সম্পাদক মশায় ছাপেন, এ আশায়।...

স্বর্গের চাবি

তারাপদ রায়

না, কিছুতেই পাওয়া গেল না। সমস্ত ঘর ওলোট পালোট করে ফেলা হয়েছে। ঘরের চারদিকে যে বিশৃঙ্খলা এখন দেখা যাচ্ছে কে বিশ্বাস করবে মাত্র আধ ঘন্টা আগেও এই গৃহ আবাসযোগ্য ছিলো? সামনের চেয়ারগুলো উল্টে ফেলা হয়েছে, আলনাটা বাঁদিকের জানালার পাশে চিৎ, একটা আলমারি হাটখোলা, অধিকাংশ বই নিচে নামানো। আর তিনজন ঘর্মাক্ত পুরুষ ও একজন মহিলার বহু পরিশ্রমের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ঘরে ঝড়।

গুরুপদ আর বলাই এসেছে বেলা আটটায়। আর আসার পর থেকেই গুরুপদর যা স্বভাব—এই ঘরের সমস্ত জিনিসগুলো একে একে ঘেঁটেছে। প্রথমে ধীরে সুস্থে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ্য করেছে। তারপর বইপত্র যা কিছু সব নেড়েচেড়ে দেখেছে। এখন বেলা দেড়টা। গুরুপদ আর বলাই কারোরই স্নান-খাওয়া হয়নি, যার বাড়িতে এসেছে সেই বন্ধু অনিল এবং অনিলের স্ত্রী-ও অভুক্ত এখনো। সাড়ে বারোটাতেই গুরুপদ উঠছিলো, 'যাই, বেলা হয়ে গেছে, আর দেরী করার কোনো মানে হয় না।' এবং সেই সময়েই বিপত্তিটা ঘটলো। গুরুপদ পকেট থেকে সিগারেট বার করার জন্যে হাত দিয়ে অচেতনভাবেই খোঁজ করেছিলো ওর ফ্ল্যাটের চাবিটার এবং তার তিন পকেট ঘেঁটে ঘোষণা করলো, 'আমার চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় হারালাম বল তো?'

চাবি হারানো, সবাই ব্যাপারটাকে বেশ লঘু বলে ধরে নিয়েছিলো কিন্তু গুরুপদ যখন জানালো যে চাবি ছাড়া আর বাড়িতে ফেরাই সম্ভব নয় কেননা তার ফ্ল্যাটের সদরের চাবি ওতেই রয়েছে, ওই রিংয়েই যে রিংটা সে এইমাত্র এই ঘরে হারিয়েছে, এবং যে চাবি ওই রিংয়ে আর কোথাও নেই। একথায় অনিলকে একটু দুশ্চিন্তিত দেখা গেলো—কেননা গুরুপদকে সে বিলক্ষণ জানে। গুরুপদ যে কোনো মুহূর্তে বলতে পারে, 'আমার ঘরের চাবি তোমার ঘরে হারিয়েছে, যত-দিন বা যতক্ষণ এই চাবি না পাওয়া যাচ্ছে আমি তোমার ঘরে থাকবো।' সুতরাং অনিলকে ব্যস্ত হতে হলো, অনিলের স্ত্রী নীরাকেও রান্নাবান্না, স্নান ফেলে গাছকোমর শাড়ি বেঁধে স্বামী-সুহৃদের নিরুদ্দিষ্ট চাবিটির সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হলো।

এবং সমস্ত ঘর তছনছ হলো, ওলোটপালট হলো, কিন্তু চাবিটির সন্ধান হলো না। 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আপনি আজ চাবিটি ঘরে না লাগিয়েই বেরিয়ে এসেছেন?' নীরা একবার বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো। গুরুপদ জানালো, তা হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে এরকম আগে কোনো-দিন হয়নি। 'তাহলে তুমি তো বাড়ি থেকে বাসে করে এলে বাসে কিম্বা রাস্তায়—কোথায়ও পড়তে পারে তো?' বলাইর এই প্রশ্নে গুরুপদ ঠিক কোনো উত্তর দিলো না। একটু মৃদু হেসে বন্ধু-পত্নীর দিকে তাকিয়ে করুণকণ্ঠে বললো, 'দেখুন, আমার চাবি হারানোর আসল দুঃখটা কি জানেন?'

অনিল র‍্যাকের ওপর চাবিটাকেই হাতড়াচ্ছিলো, সে সেখান থেকে গুরুপদর কথায় বাধা দিলো, 'দ্যাখ গুরুপদ বেলা দেড়টার সময় আমার বৌকে বোকা পেয়ে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবিনা। এখন কোনো গালগল্প সইবে না। তোর ঘরের চাবি হারিয়ে গেছে, খুঁজছি বেশ। ঐ চাবির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপার নেই। চাবি চাবিই, হারিয়ে গেলে তালা ভাঙতে হয়। এ ছাড়া তোর দুঃখের আর কি কারণ হতে পারে?' অনিল গুরুপদর ওপর বিশেষ চটে গেছে বোঝা গেলো।

কিন্তু গুরুপদ থামলো না, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে

দেশলাইয়ের উপর একটু একটু করে ঠুকতে লাগলো, ‘দেখুন, নীরা দেবী, চাবিটা হারিয়ে গেছে, যেতে পারে। কিন্তু এটা তো আমার পকেটে থাকার কথা নয়। হারাবেই তো। আমাকে কেন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে?’ গুরুপদর কণ্ঠে স্পষ্ট অভিযোগের সুর শোনা গেলো।

নীরা একটু হেসে সামনের উপুড় করে ফেলা আলমারিটার একধারে বসে জিজ্ঞাসা করলো, ‘কেন, এটা আর কারোর ঘরের চাবি নাকি?’

গুরুপদ ম্লান হাসলো, ‘প্রায় ঠিকই বলেছেন। এ চাবি তো আমার কাছে থাকার কথা নয়, এটা থাকার কথা কারোর আঁচলের গিঁটে।’ একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শোনা গেলো।

গুরুপদর এই শোকপ্রকাশে অনিল এবং বলাই হো হো করে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো, নীরা একটু কম হাসলো।

নীরাই আবার প্রশ্ন তুললো, ‘কেন সেই নীলবসনা সুন্দরী কি হলো?’

কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। গুরুপদ যে ফ্ল্যাটটায় সম্প্রতি অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারই পাশের ফ্ল্যাটে অমলা থাকে। নীরার ধারণা, অমলা সব সময়েই নীল শাড়ি পরে থাকে। অন্তত নীরা যে ক'বার গুরুপদর ফ্ল্যাটে গিয়েছে অমলাকে নীলবসনাই দেখেছে। নীরার আরো ধারণা এই রকম যে অমলার ব্যাপারে গুরুপদর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা রয়েছে। গুরুপদ অবশ্য কোনো সময়েই ব্যাপারটিকে বিশেষ অস্বীকার করেনি।

কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হলো গুরুপদর ভাবগতিক কথাবার্তায় কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে। হয়তো অমলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো গোলযোগ দেখা দিয়েছে। গুরুপদ নীরার প্রশ্নের জবাবও একটু ঘুরিয়ে দিলো।

গুরুপদ বললো, ‘আপনার অযাচিত সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ নীরা দেবী। তবে আপনার অবগতির জন্যে জানাই নীলবসনা আর নেই।’

‘সে কি মরে গেছে?’ অনিলের কণ্ঠে কপট উদ্বেগ প্রকাশ পেলো।

গুরুপদ প্রায় কোনো বাধাই না দিয়ে বললো, ‘বলাই জানে।’

বলাই বললো, ‘নীলবসনা আর নীলবসনা নেই। সে এখন নানা ধরণের রঙে মনোনিবেশ করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে অন্য যে কোনই রঙ তার সমান পছন্দ। আজ সকালে দেখলাম একটা ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরণে।’

ব্যাপারটা গুরুপদর পক্ষে মর্মান্তিক। ইতিমধ্যে একাধিক দিন গুরুপদ নীল রঙ এবং তার মূল্য, অর্থ, ব্যঞ্জনা, সেই রঙ যাদের পছন্দ তাদের মানসিকতার উৎকর্ষ ইত্যাদি আলো-চনায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে।’ অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে নীল রঙের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে। সেই অমলা যদি ক্যাটক্যাটে হলুদ বা ফিকে সবুজের অনুরাগিণী হয় তাতে গুরুপদর কি? এই ধরণের একটা শুষ্ক অনুযোগ তুলে গুরুপদ আর বলাই অনিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। অনিল ও নীরা অবশ্য দেরী যখন হয়েছেই স্নান খাওয়া করে যেতে বললো। কিন্তু ওরা আর বসলো না।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের গনগনে রোদ। বেলা দেড়টা বেজে গেছে, সেও বেশ কিছুক্ষণ হোলো। সবে চৈত্রের শুরু। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট ভয়ংকর তেতে উঠেছে। শহরতলীর এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই। দুজনে ঘামতে ঘামতে বাস-স্টপের দিকে এগুলো। বলাই বললো, ‘কিন্তু তুই তো চাবিটা বাসেও ফেলতে পারিস। এই ধর পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে।’

গুরুপদ জানে ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। কিন্তু এখন এই চোঁ-চোঁ পেটে কোন ধাবমান বাসের পশ্চাদনুসরণ করতে হবে সেই হারা-উদ্দেশে—এই আশংকায় সে আর এদিকটায় মাথা ঘামাতে চায়নি। যা হয় হোক।

কিন্তু এখন বলায়ের প্রস্তাবে আবার তার হুঁশ হলো। সত্যিই চাবিটা না পেলে বড় অসুবিধা হবে। নিজের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকা জিনিসটা খুব পছন্দ নয়। তার উপরে তালা ভাঙা ব্যাপারটায় গুরুপদর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কি করে তালা ভাঙতে হয় সে ভাবতেই পারে না।

বলাইয়ের পরামর্শ মতো স্থির করে যে একবার বাস-ডিপোটা ঘুরে যেতে হবে। যদি সেখানে জমা পড়ে থাকে। বলাই রইলো, গুরুপদ একাই বাসে উঠলো। প্রথমে নামলো গিয়ে ডিপোতে। নেমে এদিক ওদিক কাকে ঠিক প্রশ্নটা করা দরকার স্থির করতেই গেলো কয়েক মিনিট। তারপর ভয়ে ভয়ে একজন নিরীহ গোছের কর্মচারীকে বললো,

‘আচ্ছা, মশায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?’

সেই কর্মচারীটি বললেন, ‘কি, বলে ফেলুন।’

গুরুপদ বললো, ‘দেখুন আজ এই সকালের দিকে......’

সেই মুহূর্তে কোথায় একটা হুইসল বেজে উঠলো। গুরুপদ যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলো তিনি একটি লাফে সামনের সদ্যচলন্ত বাসটিতে উঠে পড়লেন, ‘আমার ট্রিপের সময় হয়ে গেছে।’ ঘণ্টা বাজিয়ে বাসটা চলে গেলো।

গুরুপদর নিজের উপরেই একটু রাগ হলো। এত ভণিতা করার কোনো প্রয়োজন নেই, সে তো আর চুরি করতে আসেনি। এবার একটু বেপরোয়া হয়ে টিকিট-ঘরের দিকে অর্থাৎ যে ঘর থেকে কণ্ডাক্টররা টিকিট ও ভাঙানি নিয়ে আসছেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে বললো, ‘ও মশায়, শুনছেন।’

‘কে, পার্টনার নাকি?’ ভেতর থেকে একটি কোমল কণ্ঠ শোনা গেলো। গুরুপদ একটু আশান্বিত হলো। কিন্তু সেই কণ্ঠটি যখন গরাদের চৌকো দিয়ে একটু বেরিয়ে এসে গুরুপদকে দেখলো, মুহূর্তে স্বরযন্ত্রটি কেমন রুক্ষ হয়ে গেলো, ‘কি চাই?’

গুরুপদ বলে, ‘আমার একটা চাবি হারিয়েছে।’

‘তা আমাকে কি করতে হবে? আমাকে কি তালাচাবিওয়ালা পেয়েছেন?’

‘না ঠিক তা নয়। তবে আপনাদের বাসে হারিয়েছে।’ গুরুপদ বিনীতভাবে নিবেদন করলো।

কিন্তু ঐ ‘আপনাদের’ শব্দটি লোকটিকে যেন ক্ষিপ্ত করে দিলো। ‘হ্যাঁ, আমাদের। সত্তর টাকা মাইনে আর কোম্পানি আমার হয়ে গেলো। এ মশায় সরকারী ব্যাপার কারুর একার কোম্পানি নয়।’

‘কি সব বাজে কথা বলছো।’ পাশ থেকে একজন ভারিক্কিমতন লোক এসে গুরুপদকে উদ্ধার করে। ‘কি দরকার বলুন তো?’

গুরুপদ এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বলার সুযোগ পায়। এবং এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে।

ভারিক্কিমতন লোকটি সব মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর গুরুপদকে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা কত নম্বর বাসে হারিয়েছে বলুন তো?'

'ঠিক বাসেই হারিয়েছে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য আমি যথেষ্ট নিশ্চিত নই। তবে বাসের নম্বরটা হোলো........' গুরুপদ যে রুটে এসেছিলো সেই রুট-নম্বরটা বললো।

কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। ভদ্রলোক রুট-নম্বর নয় যে বাসে গুরুপদ এসেছে সেই বাসের নম্বরটি কি তাই জানতে চাইলো। এর উত্তরে ঘাড় চুলকানো ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। গুরুপদ তাই করলো, কেননা কে বাসের নম্বর টুকে রাখে, কিই বা প্রয়োজন?

সে যা হোক, বাসের নম্বর বলতে পারলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হতো বলে মনে হলো না। কেননা গুরুপদ তখনই জানতে পারলো যে বাসে যাই হারাক এখানে তা পেলেও ফেরৎ দেয়া হয় না, তা ফেরৎ পেতে হলে যেতে হবে ডালহৌসি স্কয়ারে লস্ট প্রপার্টি অফিসে।

গুরুপদ হাল ছাড়লো না। লস্ট প্রপার্টি অফিসের ঠিকানাটি কোনো রকমে সংগ্রহ করে নিয়ে তখনই রওনা হলো সেই অফিসের দিকে।

অফিস পৌঁছাতে ততক্ষণ বেলা তিনটে। এনকোয়ারিতে একজন মহিলা বসে রয়েছেন। গুরুপদ কয়েক মিনিট দাঁড়ানোর পর তিনি দ্রুক্ষেপ করলেন। একবার গুরুপদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হারিয়েছে?'

গুরুপদ বিনীতভাবে জানালো।

'থানায় ডায়েরির কপি কই?' ভদ্রমহিলা সুরঞ্জিত কয়েকটি নখাগ্র কাউন্টার পথে নিক্ষেপ করলেন।

গুরুপদ জানাতে বাধ্য হলো যে থানায় কোনো ডায়েরি নেই।

'তা হলে তো হবে না। আপনার যে জিনিস হারিয়েছে এবং সেই জিনিসই যে আপনার তার প্রমাণ কি? যে এলাকায় হারিয়েছে সেই এলাকার থানায় একটা ডায়েরি করে নকল নিয়ে আসতে হবে আর এই একটা ফর্ম নিন। এটা পূরণ করে দিন।'

ভদ্রমহিলা একটি ছাপানো ফর্ম এগিয়ে দিলেন।

গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা আমি তো বাসে চড়ে গিয়েছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। সে প্রায় তিন চারটে থানার এলাকা দিয়ে বাস গেছে। কোন্ থানায় ডায়েরি করতে হবে?'

'আপনি একটু বসুন।' ভদ্রমহিলা দ্রুতপদক্ষেপে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। বসবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, বসতে গেলে ভদ্রমহিলার পরিত্যক্ত আসনে গিয়ে বসতে হয়, গুরুপদ তাই দাঁড়িয়েই রইলো।

ভদ্রমহিলা ফিরলেন একটু পর, 'দেখুন আমি আপনাকে সঠিক বলতে পারছি না। আসলে এটা অনীতাদির কাজ। অনীতাদি আজ ক'দিন আসছেন না ও'র ভাইয়ের বিয়ে কিনা। আমাকেই ও'র কাজ করতে হচ্ছে। আর কেউই কিছু বলতে পারছে না। আপনি এক কাজ করুন, সব থানাতেই একটা করে ডায়েরি করুন না।'

যেন ব্যাপারটা খুবই সহজ এই রকম মুখভাব রেখে গুরুপদ জানতে চাইলো তারপরে চাবি কি নাগাদ পাওয়া যাবে?

'চৌদ্দদিন পরে খোঁজ নেবেন। অবশ্য ততদিনে অনীতাদি ফিরে আসবেন। অনীতাদি এখানেই বসবেন, দেখলেই চিনতে পারবেন। এই আমার চেয়ে আরেকটু কালো মতন,......' ভদ্রমহিলা আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলেন, গুরুপদ কোনো কিছুতে কান না দিয়ে একটি দ্রুত নমস্কারে কক্ষত্যাগ করে পথে অবতরণ করলো। ভদ্রমহিলা বিশেষ নিরাশই হলেন বলে মনে হোলো, তাঁর যেন আরো কি কি বলার ছিলো।

পথে নেমেই সামনে একটা ঝাল-মুড়ি-ওয়ালা। যেন গুরুপদর জন্যেই দাঁড়িয়েছিলো। 'ঝাল বেশী করকে, পেঁয়াজ বেশী করকে আর মুড়ি বেশী করকে'—'চার আনা কো' গুরুপদ আদেশ দিয়ে একটা গাছের নীচে মাথাটা সূর্যের আক্রমণ বাঁচিয়ে দাঁড়ায়। এটা কলেরা ঋতু। দোকানের ওমলেট পর্যন্ত গুরুপদ খায় না—কিন্তু কোনো কোনো সময় মহামারীও তুচ্ছ মনে হয়। গুরুপদর এখন সেই সময়। চার আনার ঝালমুড়ি হাতে করে লালদীঘির ভেতরে গিয়ে বসলো গুরুপদ। দাম দেয়ার সময় নোট বের করতে গিয়ে সেই ভদ্রমহিলার দেয়া হারানো-প্রাপ্তির দরখাস্ত ফর্মটা কখন পকেটে রেখেছিলো সেটা হাতে এসে-ছিলো, তাই হাতে করে গুরুপদ পা ছড়িয়ে বসলো। একবার ফর্মটার উপরে চোখ বুলিয়েই বুঝলো পৃথিবীর আর দশটা ফর্ম পূরণ করার মতই এ ফর্ম-ও পূরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

হারাণো জিনিস ফিরিয়া পাইবার আবেদনপত্র

(দ্রব্য প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ১৯৫৮ সালের XVII নং আইনের গ ধারা মতে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনকারী নাবালক বা উন্মাদ হইলে অভিভাবক (গার্জিয়ান) বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক কর্তৃক এই আবেদনের যৌক্তিকতা গ্রাহ্য হইবে)

১। নাম—

পূর্বনাম—আপনার পূর্বে কি নাম ছিলো? যাঁহারা নিজেদের পূর্বনাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য।

২। পিতার নাম—

পিতার পূর্বনাম—যাঁহাদের পিতা পূর্বনাম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য।

পিতা মৃত কি জীবিত? কেন?

৩। ঠিকানা—

পূর্ব বাসস্থান

বর্তমান বাসস্থান

আপনি কি গত সাত বৎসরের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছেন, যদি করিয়া থাকেন সমস্ত ক্ষেত্রে বিশদ ঠিকানা দিতে হইবে।

৪। ভারতীয় উন্মাদ আইন অনুসারে আপনাকে কি কখনো উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল? যদি হইয়া থাকে, কেন? ঘোষণাপত্রের তারিখ ও নম্বর।

৫। আপনি কি কখনো কোনো আদালতের বিচারে কারারুদ্ধ হইয়া-ছিলেন? যদি হইয়া থাকেন, কি অপরাধে, কত দিনের জন্য, কোন্ জেলে ছিলেন?

৬। (ক) যে জিনিস হারাইয়াছে বলিয়া আপনি ভারতীয় হৃত-অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনের ১৭(ক) ধারামতে এই আবেদন করিতেছেন সেই জিনিসটির বিশেষ বিবরণ ঃ

(এইরূপভাবে বর্ণনা করিতে হইবে যে যাহাতে জিনিসটি দেখা মাত্র বোঝা যায় এবং কোনো প্রশ্ন না ওঠে।)

খ) যে জিনিসটি হারাইয়াছে তাহা আপনি ইতিপূর্বে আরো হারাইয়াছেন কি?

গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে নিম্নলিখিত ঘরগুলি পূরণ করুন ঃ

অ) কতবার হারাইয়াছেন?

আ) প্রত্যেক বারই ফেরত পাইয়াছেন কি?

ই) ইতিপূর্বে যতবার হারাইয়াছেন ততবারই ফেরত পাইয়াছেন কি?

ঈ) পাইয়া থাকিলে, কোথায় পাইয়াছেন?

উ) কিরূপে পাইয়াছেন?

ঊ) কখন পাইয়াছেন?

৭। যে জিনিস হারাইয়াছেন তাহার মূল্য কত?

পূর্ব মূল্য কত ছিলো?

বর্তমান মূল্য আনুমানিক কত?

(যদি দশ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্য হয় তবে ২২ ধারামতে দুই টাকার স্ট্যাম্পসমেত দরখাস্ত দাখিল করিতে

হইবে। প্রকৃত উদ্বাস্তু দরখাস্তকারীদের ক্ষেত্রে রিফিউজি সার্টিফিকেট দৃষ্টে এই ষ্ট্যাম্প ফি মাপ হইতে পারে। রিফিউজি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়ীকৃত নকল দাখিল করিতে হইবে।

৮।......................

আট, নয়, দশ এই রকম টানা বাইশ ঘর পূরণ করতে হবে। সাত নম্বর ঘর পর্যন্ত পৌঁছেই গুরুপদর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো পৃথিবীর আর সমস্ত ফর্মের মতই এ ফর্ম পূরণ করা অসম্ভব। এই ফর্ম যে পূরণ করতে পারে সে হারানো জিনিস ফিরে পায়, নির্ধনের ধন হয়, বেকারের চাকরী হয়, উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়। কিন্তু অসম্ভব, আর দু-এক ঘর পড়লেই গুরুপদ অজ্ঞান হয়ে যেতো সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।

সুতরাং আর কোনো গত্যন্তর নেই। গুরুপদ একটা ফেরতা বাস ধরে বাড়ির দিকে রওনা হয়। কিন্তু বাড়িতে ফিরেই বা কি হবে? যে বাড়ির দরজা বন্ধ আর সেই দরজার চাবি নেই, সে বাড়িতে ফেরাও যা আর পথে পথে পার্কে ময়দানে ঘুরে বেড়ানোও তাই। গুরুপদও তাই করলো। রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরলো। একবার ভাবলো রাত্রে একটা পার্কে শুয়েই কাটাবে; কিন্তু বাড়িতে তো এক সময়, আজ হোক কাল হোক ফিরতেই হবে। একটা তালা-চাবিওয়ালা ধরতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় পাওয়া যাবে? সেটা সময়মত খুঁজলে হতো। এখন যারা এত রাত্রে তালা খোলে, যে কোনো দরজার তালা খুলতে পারে তারা কেউই প্রকাশ্যে খোলে না। আর ব্যর্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হয়ে গুরুপদ বাড়ির দিকেই পা চালালো।

গুরুপদর শেষ একটা ক্ষীণ আশা ছিলো যে হয়তো গিয়ে দেখবে দরজা বন্ধ করেই সে আদৌ বেরোয়নি। খোলা দরজায় তালা ঝুলছে দেখতে পাবে। কিন্তু দরজা নিতান্তই বন্ধ আর তার তালা ঝুলছে, বেশ ভালো ভাবেই ঝুলছে।

অমলাদের ফ্ল্যাটটার দিকে তাকায় গুরুপদ। আলো জ্বলছে না। এত সকাল সকাল অমলার ঘরের আলো নেভে না কোনোদিন। হয়ত দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে সিনেমাই দেখতে গেছে রাত্রের শোতে। তাহলে পাশের বাড়িটা থেকেই হাতুড়িটা চাইতে হয়। হাতুড়িটা চেয়ে আনল। কিন্তু পুরোনো আমলের লোহার তালা অত সহজে ভাঙা সম্ভব নয়। লোহার তালাটাকে ঈশ্বরের মতন, বা প্রায় খোদাতালার মতই সর্বশক্তিমান মনে হল গুরুপদর। দুমদাম, ঠকঠাক ক্রমাগত শব্দ হতে লাগল, আশপাশের ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেরা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফেলল, একটা বাচ্চা ছেলের কান্না শোনা গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে ঘামে স্নান করতে আরম্ভ করল গুরুপদ। হাতটা ক্রমাগত হাতুড়ি সমেত ওঠানামা করতে করতে ভারী হয়ে আসছে ক্রমশঃ। শেষ পর্যন্ত ওর মনে হল, হাত আর হাতুড়ির তফাৎটা বোধ হয় আর একসময় থাকবেই না। তখন শুধু হাত দিয়েই ঠুকে ঠুকে তালা খোলা যাবে। হাত আর হাতুড়ির মারাত্মক বিয়োগফলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা প্রায় থেঁতলে গেল। অন্ধকারে রক্ত দেখা যায় না, গেলে থেমে যেত গুরুপদ. তালে তাকে তালার ওপর হাতুড়ি ঠুকত না আর। গুরুপদ জীবনে এই প্রথম চোরদের জন্যে মমতা বোধ করল এবং একাত্মতাও। চোরেরা কাউকে না জানিয়ে তালা ভাঙে কিন্তু গুরুপদ পাড়াসুদ্ধ লোক জানিয়ে দরজাটাই ভেঙে ফেলল শেষ পর্যন্ত। তালাটা তেমনি ঝুলছে, ডান দিকের দরজার পাল্লা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতরে বড় আয়নাটা, টেবিল-ল্যাম্প সব চুরমার। তবু ভাল দরজা ভাঙলে ওপরের বাল্ব ভাঙে না। সন্তর্পণে আলোটা জ্বালে। আলোটা জ্বালতেই রক্ত দেখল এবং রক্ত দেখেই সটান বিছানায় মাথা ঘুরে শুয়ে পড়ল। খানিক পরেই অমলার গলা শুনল গুরুপদ। কোত্থেকে ফিরল যেন। বুড়ো আঙুলটার জন্যে তুলো আর ন্যাকড়ার প্রয়োজন অমলার গলা শুনেই যেন অনুভব করে সে। কোন রকমে বুড়ো আঙুলটা চেপে অমলাদের ফ্ল্যাটের দিকে এগোলো গুরুপদ। অমলার ঘরে আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে থেঁতলানো আঙুলের ব্যথাটা ও যেন ভুলে গেল। আবার অমলা নীল শাড়ি পরেছে। খাটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে বাতাসে গাল পেতে চুল খুলছে। পেছন থেকে পায়ের পাতা, কোমর, বাঁকানো গ্রীবা এই সব দেখতে দেখতে কখন দরজার কড়া নেড়ে, অমলার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে নিজেই টেরই পেল না।

—ও কি, ও কি হয়েছে আপনার আঙুলে? ওর হাতের দিকে তাকিয়ে বিছানা থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমলা।

—হাতুড়ি! আর কিছু বেরুল না গুরুপদর গলা দিয়ে। অতি তীব্র একটি দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখও বন্ধ করে ফেলল। নীল শাড়ির খানিকটা ছিঁড়ে ফেলেছে অমলা, তুলো, ডেটল আনিয়েছে চাকরটাকে দিয়ে। কোমল, নরম একটা স্পর্শে গুরুপদ চোখ খুলে দেখল হাল্কা ঠান্ডা এক টুকরো নীল আকাশকেই যেন ডান হাতে পেয়ে গেছে সে।

—চলুন আপনার ঘরে চলুন। ইস একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলেছেন!

গুরুপদর ঘরে এসে অমলা অবাক।

—একি কাণ্ড, দরজা ভাঙা, ঘরময়—

—মানে ঐ চাবিটা পাচ্ছিলাম না কিনা তাই......কাতর কণ্ঠে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। নীল শাড়ির মধ্যে হঠাৎ অমলার মুখটা কেমন লাল

"মানে ঐ চাবিটা পাচ্ছিলাম কিনা তাই...

হয়ে উঠল, মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে গুরুপদকে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়া গলায় বল্ল অমলা।'

—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। সত্যি ভীষণ অন্যায়......মানে আজ সকালে বেরুনোর সময় আপনি দরজার তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। চাবিটা—

গুরুপদ স্পষ্ট দেখতে পেলো ধীরে ধীরে কাঁধ থেকে নীল শাড়ির ছেঁড়া আঁচলটা টেনে তার চাবিটা খুলে দিচ্ছে অমলা।

গুরুপদর প্রবল ইচ্ছে হল চীৎকার করে বাধা দেয় অমলাকে কিন্তু অমলাই শেষ পর্যন্ত আর খুললো না।

—থাক আমার কাছেই থাক, আপনি ত আর একহাতে চাবি দিতে পারবেন না।

ঘুমোতে ঘুমোতে গুরুপদ সেদিন একটা হাজারদুয়ারী বাড়ির স্বপন দেখেছিল।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সাতাশ ॥

অমিয় অভয়েরই ছোট ভাই। কাজেই ওখানেই সে থামল না। পরদিনই সে সন্ধ্যার মুখে আধঘন্টার জন্যে দোকান থেকে ছুটি নিয়ে চলে এল। বাড়ীতে ঢুকল না, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। নন্দলালের আসবার সময়টা তার জানা হয়ে গিয়েছিল।

পনেরো মিনিট পরে নন্দলাল এল। মুখে কিসের একটা গুনগুনানি চলেছে তার। খুব সম্ভব উর্দু গজল গাইছিল।

অমিয় ডাকল : নন্দলালবাবু!

নন্দলাল চমকে থেমে পড়ল।

—অমিয় যে? এখানে দাঁড়িয়ে?

—আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

—বড়ে খুশিকে বাত। আমিও তোমার ওখানেই যাচ্ছিলুম। চলো।—নন্দলাল পানের পিচ্ ফেলল সশব্দে।

—বাড়ীতে যাবার দরকার নেই—অমিয়র চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল : কথাটা এখানেই হয়ে যাক।

নন্দলাল সন্দেহ করল এবার। গলির আবছায়া অন্ধকারে তখনো আলো জ্বলেনি, অমিয়র মুখটা সেই অস্পষ্টতায় খানিকটা অচেনা মনে হল নন্দলালের।

—কী বলবে?

—গোরখপুর থেকে কোনো চিঠি এল?

—গোরখপুর সে দুগারজী কা খত? —নন্দলাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল : ওহি বাত? এসে যাবে, দু এক রোজমেই এসে যাবে।

অমিয় বললে, তা হলে চিঠিটা আসুক। ওটা না আসা পর্যন্ত আপনি আমাদের বাসায় আসবেন না।

—কেয়া?—নন্দলাল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

—বললুম তো। চিঠিটা না আসা অবধি আপনার আমাদের বাসায় আসবার আর দরকার নেই। আমি থাকি না, আশ-পাশের ঘরে অন্য ভাড়াটে থাকে, এ নিয়ে কথা উঠতে পারে।

বয়েস অল্প, সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকখানি ঠেকে শিখেছে, যেখানে কোনো দায়িত্ববোধ ছিল না সেখানে অতিরিক্ত সতর্কতা আর সন্দেহ সজাগ হয়ে উঠেছে। একটা কথাও ঢেকে রাখল না অমিয়, তীক্ষ্ণ পরিষ্কার ভাষায় বক্তব্যটা বলে ফেলল।

আর হাঁ করে প্রায় দু মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নন্দলাল। আরে—সেদিনের বাচ্চা, গাল টিপলে দুধ বেরোয়—তার তেজটা দ্যাখো একবার! এই নন্দলাল বনার্জি—বালিয়া থেকে শাহারাণপুর পর্যন্ত গোটা ইউ পি যে চরিয়ে খায়, কাশীর সমস্ত দুঁদে পাণ্ডাকে যে হাড়ে হাড়ে চেনে, ছোকরা তার সংগে ফটফট করতে এসেছে! নন্দলালের কালো মুখের ওপর থেকে যেন একটা মুখোশ সরে গিয়ে আরো অন্ধকার একটা রূপ ফুটে বেরুতে চাইল।

নন্দলাল ফেটে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কাছে কোথাও প্রবল শব্দে শাঁখ-ঘন্টা বেজে উঠল। কাশীর অলিতে গলিতে মন্দির—তাদেরই কোথাও শুরু হল আরতি। তারপরেই তীব্র বিদ্যুতের আলোয় গলিটা উদ্ভাসিত হল, রাস্তার আলোগুলো জ্বলল একসংগে।

মন্দিরের ওই বাজনার শব্দে আর আলোর ঝলকের অবসরটুকুতে নিজেকে সামলে নিলে নন্দলাল। পকেট থেকে ডিবে বের করে আবার দুটো পান মুখে পুরল একসংগে। সেই অবস্থাতেই হাসবার চেষ্টা করে, ভরাট গলায় বললে, বহুৎ আচ্ছা। তোমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত মনে করি, তাই যাওয়া-আসা করতাম। অসুবিস্তা হলে আর আসব না।

তৎক্ষণাৎ ফিরে চলে গেল উল্টো দিকে। ভারী ভারী জুতোর শব্দ গলির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

অমিয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কাজটা ভালো হল? কে বলতে পারে। হয়তো নন্দলাল লোক খারাপ নয়, হয়তো সত্যিই সে তার শুভার্থী, হয়তো গোরখপুর সুগার মিলে সত্যিই একটা চাকরিও পাইয়ে দিত—কিন্তু! কিন্তু কেন সে না থাকলেও নন্দলাল এসে বসে তার বাসায়, নিজের কাজকর্ম ফেলে কেন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে? তার নিজের দুঃখের অন্ত নেই, তৃপ্তি তার ওপর একটা বিশ্রী বোঝা— সেই তৃপ্তি কী

বেয়াড়াপনা শুরু করে দেয় নন্দলালের প্রশ্রয়ে, তা হলে—

না, পৃথিবীতে কাউকে সে বিশ্বাস করে না।

আধ ঘন্টার জন্য ছুটি নিয়েছিল, এখনি তাকে দোকানে ফিরে যেতে হবে। দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে এগোতে এগোতে অমিয় ভাবতে লাগল, কলকাতায় বড়দাকে যে চিঠিটা লিখবে ভাবছিল, আজ তা লেখা হয়নি। লিখতে সাহসও হচ্ছে না। যদি মা-বাবা ক্ষমা না করেন, যদি তার আর তৃপ্তির মুখ-দর্শনও করতে না চান? যদি চিঠির কোন জবাব না আসে?

তার চাইতে এই-ই ভালো।

সব গণ্ডগোলের গোড়ায় তৃপ্তি। যদি দুম্ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে না আসত, তা হলে এত কাণ্ড কিছুই ঘটত না। অবশ্য তার বন্ধু চন্দন সিংয়ের তৃপ্তির ওপর নজর একটু ছিলই, কিন্তু দাদা যদি ওর বিয়েটা দিয়েই দিত—কী আর করত চন্দন সিং? অমিয়র ট্যাক্সির ব্যবসা হোক বা না হোক, এমন বিপদে তাকে পড়তে হত না কিছুতেই।

অমিয় দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ভয়ে চমকে শিউরে উঠল সারা শরীর। ইলেকট্রিক আলোয় দীর্ঘ ছায়া ফেলে এক বিরাট মূর্তি শিখ এগিয়ে আসছে।

চাচা? সেই ভয়ঙ্কর লোকটা? যার একটা চড়ে তার সমস্ত নেশা ছুটে পালিয়েছে? স্পোর্টস্‌ম্যান বেপরোয়া অমিয় দে-ও কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আতঙ্কে অসাড় হয়ে রইল।

না—চাচা নয়— অন্য লোক।

সেদিন রাত্রে দোকান থেকে ফিরেই অমিয় জানালো: নন্দলালকে বারণ করে দিয়েছি।

তৃপ্তি একবার অমিয়র মুখের দিকে চেয়ে দেখল তারপর জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘামে ভেজা জামাটা দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে অমিয় নিজের খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল, দড়িগুলো খটখট শব্দে প্রতিবাদ জানালো। বিরক্ত স্বরে অমিয় বললে, কথা বলছিস না যে?

বাইরে চোখ রেখে তৃপ্তি জবাব দিলে, কী বলব?

—শুনেছিস, আমি নন্দলালকে আসতে বারণ করে দিয়েছি?

—শুনেছি।

—আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, লোকটা ভালো নয়।

—তা হবে।

—আমি কালই দাদাকে চিঠি লিখব কলকাতায়।

তৃপ্তি আর একবার অমিয়র দিকে তাকিয়ে দেখল। দু-চোখ জ্বলে উঠল একবারের জন্যে। কিন্তু প্রতিবাদ সে করল না। যে-মুহূর্তে কাল ছোড়দা তার গায়ে হাত তুলেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই ছোড়দার সঙ্গে তার আর কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না। কী ভেবেছে তাকে? মেরে ধরে জোর করেই কলকাতায় পাঠাবে? দেখা যাক।

অমিয় যেন একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করছে এমনিভাবে বললে, দাদা হয়তো দু-চারদিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

—আসুক।

তৃপ্তির হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, রান্নাঘরে সে ডাল চাপিয়েছে। কেমন গন্ধ উঠছে একটা—হয়তো ধরেই গেল। দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে চলে গেল সে, কড়াইটা সশব্দে নামিয়ে ফেলল। উনুনে খাঁ খাঁ করে আগুন জ্বলছে, একটা অকারণ জিঘাংসায় সে আগুনের ওপর এক মুঠো লবণ ছড়িয়ে দিলে, চটপটির মতো আওয়াজ উঠতে লাগল। আর ধোঁয়ায় ঝুলে কালো রান্নাঘরের বীভৎস দেওয়ালটার দিকে চেয়ে মেজের ওপর বসে রইল তৃপ্তি।

অমিয় তার গায়ে হাত তুলেছে।

শুধু হাতই তুলেছে তা-ই নয়। পরিষ্কার জানিয়েছে, তাকে নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট সে-ই সংসারে আগুন ধরিয়েছে। তাই যদি, তা হলে যখন সে সংসার ছেড়ে পালিয়েই এসেছে, তখন সেখানে তাকে ফেরৎ পাঠানোর জন্যে এত গরজ কেন অমিয়র?

বড়দা-ছোড়দা সবাই সমান। বাবা লেখাপড়া শেখালেন না, বড়দা জোর করে বিয়ে দিতে চাইল, ছোড়দা যেন এখানে এসে তাকে জেলখানার মধ্যে পুরেছে। একটা কিছু করতেই হবে তৃপ্তিকে। কলকাতায় সে ফিরে যাবে না—কিছুতেই যাবে না।

বিয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে সে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল। ট্রেনে ওঠবার পরে দু চোখ ভরে দেখেছে কত স্টেশন, কত মানুষ—কত বড়ো এই পৃথিবীটা। একবার যখন সাহস করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তখন তার আর কোনো ভয় নেই—এখন নিজেই চলতে জানে সে। আবার তাকে পালাতে হবে। ছোড়দা-বড়দার এই খপ্পর থেকে যেখানে হোক, যতদূর হোক।

নন্দলাল তার কাছে সেই অনেক দূরের খবর আনছিল। কাশীর এই বিশ্রী বাড়ীটার অন্ধকূপে থেকেও সে শুনতে পেত দিল্লী-আগ্রা-বাঙ্গালোর-বোম্বাই-অমৃতসরের গল্প। ছোড়দা নন্দলালকে আসতে বারণ করে দিয়েছে—হাত পা বেঁধে আবার তাকে কলকাতায় চালান করতে চাইবে, যেতে না চাইলে মারধোর করেও পাঠিয়ে দেবে।

দেখা যাক। উগ্র ক্রোধে তৃপ্তি নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল একবার: দেখা যাক!

অমিয়র ডাক শোনা গেল: রান্নাঘরে পেত্নীর মত বসে আছিস কেন রে? রান্না হয়নি? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

তৃপ্তি গোঁজ হয়ে জবাব দিলে, ভাতটা বাকী আছে।

—চাপিয়ে দে, চাপিয়ে দে। খিদেয় নাড়ীগুলো পর্যন্ত হজম হয়ে যেতে চাইছে। আমি একটু চান করে আসি ততক্ষণ।

অমিয় নিজের খাটিয়া ছেড়ে উঠল, লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে চলল উঠোনের কলের দিকে। এ বাড়ীতে এ-ই একটা সুবিধে, চব্বিশ ঘন্টাই কলে জল পড়ে।

চাল বের করবার জন্যে টিনে হাত দিয়েই সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সন্দেহ নেই, চাপা-কান্নার একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অনেক দূর থেকে। কিন্তু তৃপ্তি জানে, বাইরের জানালা দিয়ে ওই যে কান্নার সুরটা—ওটা আসছে এই বাড়ীর দোতলা থেকেই। ঠিক তাদের ওপরের ঘরেই সেই মেয়েটি মুখ গুঁজে পড়ে আছে—যাকে ফেলে রেখে সঙ্গের পুরুষটি কোথায় উধাও হয়েছে।

চালের টিন থেকে হাত সরিয়ে আনল তৃপ্তি, বুকের মধ্যে একটা শীতল নিষ্ঠুর আতঙ্ক তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। ওই কান্নাটা যেন একটা

অশুভ সংকেত, যেন এই বাড়ীটার হিংস্র ভয়ঙ্কর রূপটা ওর ভেতর দিয়ে ফুঁসে উঠছে। অমিয় তাকে কলকাতায় না-ই পাঠালো, কিন্তু অমনি করে যদি ফেলে পালিয়ে যায় একদিন? ছোড়দার কোনো-দিন কোনো দায়িত্বজ্ঞান ছিল না, তাদের দুঃখের সংসারের দিকে কোনোদিন ফিরে তাকায়নি, গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুটবল খেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। ও সব পারে, কোনো বিশ্বাস নেই ওকে।

তার চাইতে—

পথের ব্যবস্থা নন্দলালই করল। অমিয়র মতো দুধপোষ্যের কথাতে আর যে-ই হাল ছেড়ে দিক, নন্দলাল বনার্জী অত সহজেই হার মানবার পাত্র নয়। গলি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা লসার দোকানে কড়া এক গ্লাস সিদ্ধির সরবৎ টেনে নিয়ে নিজের মনেই অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল নন্দলাল।

'আরে বাচ্চা, তুম তো মুঝে পহচানতা নেহি। ইচ্ছে করলে চুট্‌কিকা মাফিক টিপে মারতে পারি। আচ্ছা বাবা, দু-চার রোজ ঠহরো। নন্দলাল বনার্জী নে তুমকো জেরা সা খেল্‌ দেখায় গা।'

দুদিন পর সকালে রোজকার মতো গঙ্গাস্নান করে ফিরছিল তৃপ্তি। ঘাটের উপর আসতেই নন্দলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—এই যে তিপু! তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।

হিন্দুস্থানী মেয়েটি একটু দূরে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তৃপ্তি বললে, দু মিনিট দাঁড়াও বহিন, আমি এখুনি আসছি।

নন্দলাল কথাটা দু মিনিটে শেষ করল না, মিনিট পাঁচেক লাগল। পরের দিন মিনিট দশেক সময় গেল, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠল সঙ্গিনীটি, মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল। নন্দলালকে সে এর আগে বাসায় দেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে—কিন্তু এখানে কেন হঠাৎ? চাল-চলনও তো ভালো ঠেকছে না।

পথে ফিরতে ফিরতে তৃপ্তিকে জিজ্ঞেস করল—উয়ো কোন্‌ হ্যায়?

তৃপ্তি সংক্ষেপে বললে, আপনা লোক।

—হররোজ সাজ-সবেরে জনানা-ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

—এমনি।

মেয়েটি আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করল না। সন্দেহটা আরো ঘন হতে লাগল।

দুপুরে দু ঘণ্টা খাওয়ার জন্যে ছুটি পায় অমিয়। সেদিন খেতে বসতেই তৃপ্তি জিজ্ঞেস করল : কলকাতায় চিঠি লিখেছিস ছোড়দা?

অমিয় ভাতের একটা গ্রাস তুলতে যাচ্ছিল, নামিয়ে ফেলল তৎক্ষণাৎ। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল : না—কেন?

—তুই ঠিকই বলেছিলি ছোড়দা। আমার চলে যাওয়াই ভালো এখান থেকে।

"—এই যে তিপু! তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।"

অমিয় আশ্চর্য হয়ে গেল। তৃপ্তির কাছ থেকে উলটোটাই আশা করেছিল সে।

—যাবি কলকাতায় ফিরে?

—যাব।

অমিয় খুশি মনে একটা ডবল গ্রাস মুখে তুলল। খানিকক্ষণ চিবিয়ে, আধ গ্লাস জল দিয়ে ভাতের পিণ্ড গলার ভেতর চালান করে বললে, সত্যি তিপু, ভারী ছেলেমানুষি হয়ে গেছে সব। মিথ্যেই বাড়ী থেকে পালিয়েছি আমরা—সকলের মনে কষ্ট দিয়েছি। আমি বড়দাকে চিঠি লিখব এখন তোর বিয়ে না দিয়ে যেন নতুন করে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। এখানে তোর যা খরচ লাগত, তা থেকে কুড়ি টাকা করে আমি পাঠাব, তাইতেই তোর পড়া চলে যাবে। আমার চল্লিশ টাকায় এক রকম কুলিয়ে যাবে—এক বেলা পুরী-তরকারী খেলেই বা আটকাচ্ছে কে! মর্জিমতো খাব—কাশীতে সস্তায় খাবারের কোনো অসুবিধে নেই।

তৃপ্তি চুপ করে রইল। ভাতের ডেলাটা শেষ করে অমিয় বললে, আমারও ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে—এখন দেখছি অন্তত স্কুল-ফাইনালটা পাশ না করলে কোথাও দাঁড়াবার জো পর্যন্ত নেই। কিন্তু চন্দন সিংয়ের টাকা থেকে প্রায় আড়াইশো খরচ হয়ে গেছে, ওটা জোগাড় না করা পর্যন্ত আমার ফেরার পথ বন্ধ। তুই ফিরে যা তিপু—অমিয়র গলা ধরে এল : বাবা অসুস্থ, তাঁকে দেখিস, মা-র কাছে আমার নাম করে মাপ চেয়ে নিস। বলিস আমি এখন একেবারে বদলে গেছি, সময় হলেই চলে আসব।

অমিয়র চোখে জল এসে গিয়েছিল। শেষ ভাত ক'টি আর খেতে পারল না, থালা ছেড়ে উঠে চলে গেল।

অমিয় দোকানে চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তৃপ্তি চুপ করে বসে রইল সেখানে। বেলা বাড়তে লাগল. অমিয়র পাতের ভাতগুলো শুকনো কর্‌করে হয়ে গেল, দল বেঁধে মাছি এসে পড়ল তার ওপর। সেই বাঙালী বিধবাটির চিৎকার শোনা যেতে লাগল কলতলা থেকে, পাথরের থালা মাজতে মাজতে কার যেন চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চলেছেন : মরবে মরবে—লু লেগে মরবে, কলেরা হয়ে মরবে, ঝাড়ে-বংশে উচ্ছন্নে যাবে! বিধবার টাকাগুলো সব ফাঁকি দিয়ে খেলে, বাবা বিশ্বনাথ সহ্য করবেন এ সব? আজ দ্বাদশী, এখনো দাঁতে জলটুকু কাটিনি, আমি বলছি—

তৃপ্তি উঠে পড়ল। যেখানকার থালা সেখানেই পড়ে রইল, স্নান করল না, খেল না, সোজা নিজের খাটিয়াতে এসে বসল। ঘরে দুই ভাই-বোনের দুখানা খাটিয়াই ঐশ্বর্য। গরমের জন্য অমিয় ঘরে শুতে পারে না, পশ্চিমের রেওয়াজ-মতো প্রায় প্রত্যেক রাতেই খাটিয়া টেনে গলিতে নিয়ে যায়—অল্প-স্বল্প গঙ্গার হাওয়া সেখানে আসা-যাওয়া করে।

ছোড়দার চোখের জল দেখে কিছুক্ষণের জন্যে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, বাবার জন্যে কষ্ট হচ্ছে, মা-র জন্যে বুকের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে. দিদি কেমন আছে কে জানে, এমন কি গোঁয়ার-গোবিন্দ বড়দাকেও আর খারাপ লাগছে না। তৃপ্তি ফিরে যেতে পারে, নিশ্চয়ই পারে। শুধু ওই অদ্ভুত চেহারার বুড়ো আর বোকা কম্পাউণ্ডারটা যদি তাকে বিয়ে করতে না আসত—

এমন তো হতে পারে, সে পালিয়ে এসেছে বলে বিয়েটা ভেঙে গেছে? আর কোথাও বিয়ে করে বসেছে কাম্পাউণ্ডার? কিংবা বলেছে, 'যে মেয়ে ঘর ছেড়ে পালায়—তাকে বিয়ে করা, রামো—রামো!' সব হতে পারে, না-ও হতে পারে। হয়তো বাড়ীতে পৌঁছে দেখবে বরের টোপর মাথায় দিয়ে লোকটা বসেই রয়েছে, তাকে দেখেই মাড়ি বের করে হেসে, তোতলামো করে বলবে : 'এইবার পা-পালাবে কোথায়? আমার হাত থেকে ছা-ছাড়ান নেই তোমার!'

যেটুকু দুর্বলতা এসেছিল, মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এখন কটা? পাশের ঘরে ঘড়ি আছে, জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু তার আর কোনো দরকার নেই। একটু আগেই গলির মোড়ের বাচ্চাদের স্কুলটার টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে—রাস্তায় ছেলেমেয়েরা চানাচুর আর গোল-গপ্পা কিনে খাচ্ছে—কলধ্বনি শোনা গেছে তার। তৃপ্তি জানে, ঘণ্টাটা দেড়টার সময় বাজে।

তা হলে এখন প্রায় দুটো। আর এক ঘণ্টা সময় আছে হাতে। তিনটের সময় কেদারের গলির সামনে নন্দলাল অপেক্ষা করবে।

তৃপ্তি উঠে দাঁড়ালো।

না—অন্যায় সে করছে না। সে যাচ্ছে চুণারে। নন্দলাল বলেছে, খাসা জায়গা। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে গঙ্গা বয়ে গেছে, উপরে বহুকালের পুরোনো কেল্লা—এত সুন্দর যে দেখলে আর চোখ ফেরে না। মস্ত পটারীর কারখানা সেখানে, অনেক মেয়ে কাজ করে। প্রথমে থাকা-খাওয়া ছাড়া চল্লিশ টাকা হাত খরচ, কাজ শিখলে একশো টাকা পর্যন্ত মাইনে।

নন্দলাল বলেছিল, আরে, রাণী-ভবানী- স্কুলে তো ভর্তি করে দিতে পারি, কিন্তু আই-এ বি-এ পাশ করেই বা কী হবে? তখন তো ঘুরতে হবে সেই চাকরীর ধান্দাতেই। তার চাইতে মওকা বুঝে কোথাও ঢুকে যাওয়াই ভাল্লো।

ঠিক, খুব ভালো যুক্তি। তৃপ্তিও দেখিয়ে দেবে, ছোড়দার চাইতে সে কোনো অংশে অযোগ্য নয়। যখন খুব ভালো করে কাজ শিখবে—একশো টাকা রোজগার করে বাড়ীতেও কিছু কিছু পাঠাতে পারবে তখন একটা কথা বলবারও মুখ থাকবে না কারো।

স্কুলে পড়া না হোক, কাজ সে তো শিখতেই চেয়েছিল। প্রভাতদাকে বলেছিল সঙ্গে করে তাকে উদয়-ভিলায় নিয়ে যেতে। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয়নি। সে ছেলেমানুষ—তাই বটে।

মনস্থির করে তৃপ্তি উঠে দাঁড়ালো। নন্দলাল বলেছে, টাকা-পয়সার ভাবনা সে-ই ভাববে, কিন্তু তৃপ্তি মিথ্যে কারুর দয়া নিতে চায় না। যা পারে নিজেও সঙ্গে নেবে সে।

এইখানে একবার বিবেকে বাধল।

চন্দন সিংয়ের টাকাটা অমিয় তার কাছেই রেখেছে। তা থেকে শ খানেক টাকা ধার নেবে সে।

টাকাটা পড়েই আছে, কারো কোনো কাজে লাগছে না। ছোড়দা বাকীটা জোগাড় করবার চেষ্টা করছে, সে-ও চার পাঁচ মাসের মধ্যেই একশো টাকা শোধ করে দিতে পারবে। যদি থাকা-খাওয়া ছাড়া চল্লিশ টাকা পাওয়া যায়—তৃপ্তি হিসেব করে দেখেছে, মাসে তার হাত-খরচ বাবদ কুড়ি টাকার বেশি লাগবে না। প্রথম মাসে হয়তো পারা যাবে না, দু একখানা শাড়ী-ব্লাউজ তাকে কিনতেই হবে। তারপর আর কিসের খরচ? স্নো-পাউডারের বাবুগিরি তার নেই—ও সব দিদি জানে।

দিদি!

মনের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া পড়ল একবারের জন্যে। দিদিও তো তারই মতো চাকরি করবার জন্যে পথে নেমেছিল। কিন্তু তারপরে—তৎক্ষণাৎ আত্মমর্যাদায় সারা শরীর তার টান-টান হয়ে উঠল। দিদি ভুল করেছে বলে সে-ও করবে? দিদির মনের জোর ছিল না, চিরকাল তার জামা-কাপড়-শৌখিনতার দিকে ঝোঁক—সে গোল্লায় গেছে বলে তৃপ্তিও যাবে? তৃপ্তি দিদির মতো নয়, সে বাঁকা রাস্তায় পা দেবে না। কত মেয়ে চাকরি করে, নিজের জোরে পৃথিবীতে টিকে থাকে, নিজের সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে চলে বেড়ায়। দিদির মতো টাকার লোভে তারা অধঃপাতের রাস্তা বেছে নেয় না।

তৃপ্তি তৈরী হয়ে নিল।

যে ছিটের ঝোলাটা নিয়ে একদিন কলকাতার ঘর ছেড়েছিল, সেইটেই গুছিয়ে নিল আবার। দু-একটা সামান্য জামা-কাপড়, এটা-ওটা টুকিটাকি। ছোড়দাকে এক টুকরো চিঠি লিখবার কথা মনে হল, ভেবে দেখল তার আর দরকার নেই। সময়মতো খবর দিলেই চলবে। তা ছাড়া নন্দলালই ছোড়দার ভার নিয়েছে। বলেছে, 'তুমি ভেবো না, আমিই সব বুঝিয়ে বলব অমিয়কে।

অমিয় বুদ্ধিমান ছেলে, তুমিও তো ভালো কাজ করতেই যাচ্ছ, সে রাগ করবে না।'

আষাঢ়ের রোদে কাশীর ইট-পাথরে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই—পশ্চিমের বর্ষা দেরী করেই আসে। লু বইছে না, কিন্তু পথে গরম হাওয়ার ঢেউ উঠেছে, বালি উড়ে আসছে রাশি রাশি। তৃপ্তি একবার ঘরের বাইরে এসে চারদিক তাকিয়ে দেখল। না—কোথায় কেউ নেই—ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। শুধু খোলা কলটার মুখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে—চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে বলেই বন্ধ করার কারো গরজ থাকে না—তিন চারটে কাক স্নান করছে সেখানে।

তখন আবার চাপা কান্না শোনা গেল। দোতলার সেই মেয়েটি কাঁদছে। আর সংগে সংগেই তৃপ্তির মাথার ভেতরে রক্ত ছুটে গেল। আর দেরী করা যায় না—এ বাড়ীতে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলে না আর।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে সতর্ক পায়ে বেরিয়ে এল তৃপ্তি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে সাবধানে। চুরি হবার ভয় বিশেষ নেই, এই সব গরীব ভাড়াটের বাড়ীতে পারৎপক্ষে চোরে পা দেয় না—তাদের মজুরী পোষায় না। দেড়শোটা টাকা সে ছোড়দার বালিশের তলাতেই রেখে দিয়েছে। হিন্দুস্থানী মেয়েটিকে কিছু বলে আসতে ইচ্ছে হল একবার—কিন্তু সে অসম্ভব। হয়তো সবই পণ্ড হয়ে যাবে।

আবার পথ। আর একবার পালাচ্ছে তৃপ্তি।

গরম হাওয়া আর ধুলোর ঝাপটা পেরিয়ে তৃপ্তি এগিয়ে চলল। গলিতে মানুষ চলছেই না বললে চলে, চেনা লোকও তার এমন কেউ নেই এখানে। শুধু লালাজীর বাড়ীর রোয়াকে যে লাল-কালো রামছাগলটা অষ্টপ্রহর বাঁধা থাকে, সেটা একবার ব্যা করে ডেকে উঠল। কিছু বলতে চাইল কি? কে জানে!

নন্দলাল তৈরীই ছিল। টাংগা নয়, একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে। তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছুটল ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের দিকে।

তৃপ্তির আবছা চোখের সামনে পথ সরে যেতে লাগল, পড়ে রইল ভারত-মাতার মন্দির, তারপর ট্যাক্সি এসে স্টেশনে পৌঁছুল। ঘণ্টাখানেক তৃপ্তি আচ্ছন্নের মতো ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং-রুমে বসে রইল, আর নন্দলাল পায়চারি করতে লাগল প্ল্যাটফর্মে। তারও পরে ঘণ্টি বাজল, ট্রেন এসে গেল।

নন্দলাল বললে, তিপ্‌দু, শিগ্‌গীর। গাড়ী বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।

ফার্স্ট ক্লাশ কামরা। ওরা দুজন ছাড়া যাত্রী নেই।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলে নন্দলাল জিজ্ঞেস করল : ভয় করছে না তো তিপ্‌দু?

ভয় একেবারে করছিল না তা নয়। এতক্ষণে মনে হয়েছে, এবারের সংগী ছোড়দা নয়, নন্দলাল। আর নন্দলালের সম্পূর্ণ পরিচয় সে এখনো জানে না।

কিন্তু ভেবে এখন লাভ নেই আর। পথে চলতে গেলে অনেক কথা ভুলে থাকতে হয়।

তৃপ্তি বললে, না—ভয় কিসের?

নন্দলাল হাঁটু চাপড়ালো : ঠিক কথা, কিসের ভয়? আমিই তো সংগে আছি। এই নন্দলাল বনার্জীকে খাতির করে না, এমন লোক গোটা ইউ-পিতে নেই। তোমার ব্যবস্থা করেই আমি গোরখপুরে যাব। সেখানে অমিয়কে সুগার মিলে ঢুকিয়ে দিয়ে—হাঁ, তবু হামারা ছুট্টি। আরে—বিদেশে বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে!

তৃপ্তি জবাব দিল না। নন্দলাল গদীতে তাল দিয়ে দিয়ে একটা উর্দু গজল গাইতে লাগল।

কিন্তু নন্দলাল জানত না, ইউ-পিতে যারা তাকে খাতির করে, তাদের কেউ কেউ কাশীতেও তাকে নিয়মিত লক্ষ্য করে আসছে। তাই বোমাটা ফাটল দুটো স্টেশন পরে।

গাড়ী থামতেই পুলিশের ইউনি-ফর্ম পরা একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক উঠে এলেন দরজা খুলে। মাঝারি বয়েস, দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ চেহারা, মুখে কৌতুকের হাসি।

—রাম রাম ভাইয়া নন্দলাল—খবর সব আচ্ছা হ্যায়?

নন্দলাল বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়ল। ঠিকরে বেরুল চোখ—যেন সামনে ভূত দেখেছে।

লোকটি আবার হেসে বললেন, কেয়া, নয়া শিকার মিল গিয়া?

সেই মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল নন্দলাল। পেছন দিকের দরজাটা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল চক্ষের পলকে। একটা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা টপকে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল।

ভয়ে বিস্ময়ে তৃপ্তি চিৎকার করে উঠল।

অফিসারটি তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখের চেহারা পাথরের মতো শক্ত।

ভাংগা বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, নন্দলাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল আপনাকে?

—চুণার।

—এ গাড়ী চুণার যাবে না।

—চুণার যাবে না?— তৃপ্তির কপাল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল : তবে কোথায় যাবে?

—যেখানেই যাক, আপনার কোনো লাভ নেই তাতে।— অফিসারটি কঠোর গলায় বললেন, কাশী থেকেই আমরা ওয়াচ করছিলাম—ও সব লোকের ওপর চোখ রাখাই আমাদের কাজ। নন্দলাল মেয়ে বিক্রীর ব্যবসা করে। কখনো নন্দলাল, কখনো কালীচরণ, কখনো জহিদ হোসেন। আপনাকে পেশোয়ার থেকে ব্রেজিল—যে-কোনো জায়গায় চালান করতে পারত।

তৃপ্তির মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে সব মুছে আসতে লাগল, মনে হল, কানের পাশে কয়েক হাজার মৌমাছি একসংগে গুঞ্জন করে চলেছে তার।

অফিসারটি কঠোর গলায় বললেন, নামুন।

—কোথায় যেতে হবে?

—থানায়।

আর ঠিক সেই সময়, উদ্‌ভ্রান্ত একটা চেহারা নিয়ে কলকাতায় অভয় এসে দাঁড়ালো চন্দন সিংয়ের ঘরের সামনে। চন্দন সিং হিসেব লিখছিল, অভয়ের ডাক শুনে বেরিয়ে এল বাইরে।

—কী চান?

—আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি অমিয়র দাদা।

চন্দন সিংয়ের মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। রুক্ষ কর্কশ গলায় বললে, পুলিশ লেলিয়ে দিয়েও তো দেখেছেন আপনার ভাই বোনের কোনো খবর আমি জানি না। তবু কেন বিরক্ত করছেন বার বার।

অভয় মাথা নীচু করল। খানিক পরে দুটো ঝাপসা চোখ তুলে বললে, কিন্তু আপনার কাছে আমাকে আসতেই হল। যতটুকু পারেন সাহায্য করুন। আমার মা মৃত্যুশয্যায়।

(ক্রমশঃ)

পূর্বমেঘ-উত্তরমেঘ

মিহির আচার্য

পূর্বমেঘ

'ওরা এখনো এসে পৌঁছল না।' যুদ্ধক্ষেত্র-বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো দেখাল নির্মলকে। উদ্‌ভ্রান্ত ঝড়ো-কাকের মতো চেহারা। ধুতির প্রান্ত কোমরে কষে বাঁধা। পাঞ্জাবিটা যেমন জীর্ণ তেমনি ময়লা।

সুষমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল। ট্যাক্সি কি ঘোড়াগাড়ি এসে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে। পাড়াটা দক্ষিণে, একটু কষ্ট করলে বাঁ দিকে লক্ষ্য করলে কালিমন্দিরের চূড়ো দেখতে পাওয়া যাবে। আপাতত কিছুই দেখছিল না সুষমা। এই কদিনে সব দেখা তার ক্লান্ত হয়েছে। স্যাকরার দোকান কাপড়ের বাজারে হাঁটাহাঁটি করে অনেক দেখার ঢেউ তার চোখে-মুখে আছাড় খেয়েছে। এমন কি, এন্টালি থেকে শোবার মতো হালকা কিছু বিছানাপত্র রান্নার সামগ্রী এবং জনতা কুকার মায় কেরোসিনের বোতলটা অক্ষত অবস্থায় বয়ে এনে 'ডালে-ভাতে রান্না চাপাবে কিনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে।

ওদের ছ বছরের কন্যারত্ন রঞ্জু এত বড় হলঘর আর রাস্তা-দেখা বারান্দা পেয়ে ভীষণ দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওদের বাড়িটা গলির মধ্যে, বড় রাস্তা দেখা যায় না। দুখানা শোবার ঘরই ভীষণ ছোটো, সাংসারিক জিনিস-পত্রে ঠাসবুনট। রঞ্জু একবার মার কাছে এসে বলল: 'পিসিমারা এখনো এল না মা।' বলেই সময় নষ্ট না-করে আবার সে চরকির মতো ঘুরতে লাগল।

নির্মল পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করল। 'তোমার জন্যেই—' বারুদের গায়ে সজোরে দেশলায়ের কাঠিটা ঠুকতে বলল: 'সেই কতদূর থেকে আসছে, ট্রেনের ব্যাপার...' সিগারেট ধরাল: 'কালকে বিয়ে। দু একদিন আগে এলে...'

একটা ট্যাক্সি আসছিল ও মোড় থেকে। সুষমা ঊর্ধ্বাংগকে ঝুঁকিয়ে গাড়িটা লক্ষ্য করল। না। অমনি ওই অবস্থায় ঝুলেমানভাবে নিজেকে থাকতে দিল সুষমা। তারপর বলল: 'বিরক্ত কোরো না।'

'মানে?' জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ফেলে দেবে কিনা ভাবল নির্মল। ফেলল না। বলল: 'জানো দশটা বাজে। তোমার জন্যে—'

'তোমার মা বাবা তোমার ভাইবোন, দু-একদিন আগে আসতে লিখে দিলে না কেন—' সুষমা বলল: 'আমি পরের মেয়ে...'

'ইয়ারকি কোরো না।' নির্মল দস্তুর-মতো ক্রুদ্ধ, এবারও সিগারেট ছুঁড়ে ফেলতে পারল না দেখে নিজের পরেই জ্বলে উঠল। কোথায় একটা নিরীহ বন্যতা আছে তার স্বভাবের ভেতরে।

'ইয়ারকি।' মুখ ফেরানোর সঙ্গে সুষমার কানের দুলে ঝাঁকুনি খেল। ওর ঘামে, গলা তেলতেলে মুখের ওপর চোখ-জোড়া পরম কৌতুক। ঠোঁট বাঁকাল বিচিত্রভাবে। বলল: 'ইস্কুল মাস্টার ছেলের সাহস কত! তবু যদি...তোমার আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে ধার না-পাওয়া যেত। তিনদিন এই বাড়ি ভাড়া করেছ দেড়শো• টাকায়। সাতদিনে কত লাগত জানা আছে?'

নির্মল এবার সত্যি সত্যি সিগারে-টের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলবার সাহস জড়ো করল। 'দ্যাখো তুমি অধ্যাপিকা, আমার চেয়ে বেশি রোজগার করো। তাই বলে কথায়—'

সুষমা বলল, 'ন্যাকামো কোরো না। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।'

নির্মল এবার সত্যি সত্যি রাগল। অন্তত তার চেহারায় তাই প্রমাণ হল। আর বাকস্ফূর্তি করতে গিয়ে সে তোত-লাতে লাগল। বলল: 'তোমার কি ধারণা বাবা খালি হাতে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে আসছেন কলকাতায়। তাঁর রোজগারী ছেলেবউয়ের ওপর নির্ভর করে। তুমিই

তো ভয় পেয়ে বিয়ে বৈশাখ থেকে অঘ্রানে পিছিয়ে দিলে। নইলে বাবা তো বৈশাখেই রাজি ছিলেন।'

'তাই বুঝি?' বলে সুষমা দীর্ঘকাল চুপ করে থাকতে পারল। আবার রাস্তায় ট্যাকসি কি ঘোড়াগাড়ি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে জল-খাওয়ার ঢঙেঃ 'হঠাৎ বাবার ওপর তাঁর বাস্তব বৈষয়িক বুদ্ধির ওপর তোমার যে গভীর আস্থা ফিরে এল দেখছি। ভালো।'

নির্মল আহত গলায় বললঃ 'বাবা সেদিনও লেখেননি অন্তত শ' পাঁচেক টাকা জোগাড় করে আনতে পারবেন। জমি বিক্রি করে, আধিয়ারদের কাছ থেকে।'

সুষমা গম্ভীর হয়ে বললঃ 'চিঠিটা তুমি ভালো করে পড়ো নি। শেষ চিঠি বিয়ের সাতদিন আগে পৌঁছেছে। ভাষাটা লক্ষ্য করেছ। দরকারি ব্যাপারগুলো ভবিষ্যৎ-কালে লেখা। অর্থাৎ জমি বেচে অত টাকা পাওয়া যাবে, আধিয়ারদের কাছ থেকে এত! সাতদিন পরে যেটা একটা কঠিন বর্তমান সাতদিন আগেও তিনি তাকে সুদূর ভবিষ্যৎরূপে কল্পনা করেছেন। মানে টাকা তাঁর হাতে এখনো এসে পৌঁছয়নি।'

'ধোৎ।' এবার নির্মলকে কৌতুক অভিনেতার মতো দেখাল। স্ত্রীর মনের গভীরে বুদ্ধি দিয়ে যুক্তিশীল পাথরটাকে সরাতে না-পেরে তার আচরণে অসহায়তা ফুটে উঠল।

রঞ্জু আর-এক চক্কর ঘুরে এসে বললঃ 'মা, পিসিমারা এখনো এল না।' তারপর আবার নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণে ধেয়ে গেল।

'এই—' সুষমা ডাকল।

'কি?'

'চা নিয়ে এসো না মোড়ের দোকান থেকে—'

'হ্যাঁ। ওই করি।' গ্লাস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সশব্দে নেমে গেল নির্মল।

সুষমা জনতা কুকার ধরিয়ে ফেলল। রঞ্জুর দুধ গরম করতে হবে। ওই সঙ্গে ডেকচিতে জল গরম করতে দেবে। ওরা এসে চান করবে।

বাড়িটা বিবাহের জন্যেই ভাড়া। আজ সকালেই এক পার্টি বিদায় নিয়ে চলে গেছে। মেঝেতে আলপনা দেয়ালে বসুধারা, তাকে শুকনো মালা আর ফুল ছড়ানো। কেমন একটা গন্ধ।

সুষমা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রাস্তা নির্জন। না ট্যাক্সি, রিকশা পর্যন্ত নয়। সিঁড়িতে পদশব্দ। নির্মল ফিরল।

'একবার স্টেশনে গিয়ে খবর নেবো?' নির্মল স্ত্রীর সমর্থন চাইল।'

'কেন?' চা ভাগ করে স্বামীর দিকে গ্লাস এগিয়ে দিল সুষমা।

'তবে?' নির্মল বললঃ 'ফোন করে জেনে নেব একবার।'

'করো না।'

রাস্তায় ট্যাকসির শব্দ। গাড়ি থামল।

'ওই ও'রা এসে পড়েছেন।' সুষমা সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল।

নির্মল সদ্য-জ্বালানো সিগারেটটা ফেলে দিতে পারল না। নিচে নেমে ও'দের অভ্যর্থনা করা উচিত। নির্মলের লজ্জা করল। বহুদিন পর নিজের একান্ত আত্মীয়জনকে দেখে কেমন আবেগ বাঁধন হারিয়ে বেসামাল হয়ে ওঠে। আর, তখন নিজেকে ছেলেমানুষ লাগে। প্রথম চোটটুকু সুষমার ওপর দিয়েই যাক। সে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত, ধীর। অতএব দুটো ট্যাকসি থেকে ওদের নামতে দেখল নির্মল। বাবা মা দুইবোন ছোটো দুই-ভাই। ট্যাকসির গহ্বর থেকে পাহাড়-প্রমাণ বেডিং আর ট্রাঙ্কটা বেরোতে দেখে নির্মল ভাবল এবার নিচে নামতে হয়। ওই অচল বোঝাদুটিকে ওপরে তুলে আনতে হবে।

ও'রা ওপরে উঠছেন। পাশ দিয়ে দ্রুত নেমে গেল নির্মলঃ 'এত দেরি।' ভায়েদের সঙ্গে ধরাধরি করে বাকস বিছানা ওপরে উঠল। কর্মব্যস্ততার মধ্যে আবেগকে থিতোতে দিল নির্মল।

ইতিমধ্যে সুষমা শ্বশুরের জন্যে বিছানা পেতে দিয়েছে। বাবা বসেছেন বিছানায়। শ্রান্ত ক্লান্ত। কুঁজো হয়ে। বাবা অনেক রোগা হয়েছেন, দেখল নির্মল। ইভা-নিভা পরিমল-সুকমল এখন বউ-দিকে ঘিরে। রঞ্জুকে ডাকছেন মা। অকস্মাৎ গুরুত্ব পেয়ে রঞ্জু এবার মরিয়া আস্ফালন শুরু করেছে। সুষমার প্রতিভাকে তারিফ না-করে পারল না নির্মল। অন্য-সত্তাকে মিশিয়ে দিয়ে দেবর-ননদের সাম্রাজ্যে এখন গলে একাকার হয়ে গিয়েছে সে। দাদার আসল জোরের খবর ওরা জানে। তাই বউদিকেই খাতির বস্তু। মা রান্না চাপাতে বসলেন।

'বউমা, তুমি নির্মল থেকে যাবে তো?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ মা।'

ইভা ততক্ষণে ট্রাঙ্ক খুলে ফেলেছে। ইভার নিজেরই বিয়ে মনে হয় না। যেন অন্যের বিয়ের সামগ্রী দেখাতে মশগুল। নির্মল বোনের দিকে চেয়ে দেখল। রাত-জাগা ট্রেণের গ্লানি। ওর চোখে ক্লান্তি, বয়েসের। কত বয়স হল ওর? আটাশ। সবাই বলত এ-মেয়ের বিয়ে হবে না। বড় পুরুষালি দেহের গঠন, স্বভাব। অনেক সম্বন্ধ এসেছে। কেউ পছন্দ করেনি। বড় বেশি তড়বড়ে কথা বলে, অত্যন্ত পাড়া-বেড়ানো। এবং দৈনন্দিন জীবনধারণের ছোটোখাটো আন্দোলনে নাকি তাকে মিছিলেও দেখা গেছে। ওর এই সমস্ত অপরাধগুলিই যে অন্যের চোখে গুণ হতে পারে, কে জানত। বাঙলা দেশের পচা কাঁদুনে মেয়ের চেয়ে সজীব সতেজ ধারালো একটি মেয়ে ওদের কাঙ্ক্ষিত মনে হল। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছিল দাদার এখানে এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে পাত্রের বোনের সঙ্গে আলাপ। তারপর অল্প কথায় কোনো দাবিদাওয়া হাজির না-করেই সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে গেল।

ওদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসছিল নির্মলের।

শাড়ি জামা স্তূপাকার করে ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে।

'মাসে মাসে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে কিনেছি।' ইভার মুখে কৃতিত্বের গৌরব। 'এই জামাগুলো বাড়িতে সেলাই করেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে বউদি?'

'সুন্দর হয়েছে।'

'মা না রাগারাগি করছিল। কিন্তু আমি ছাড়া কে করবে বলো তো?'

নিভা ট্রাঙ্ক হাতড়ে কাঞ্জিভরম শাড়ি-খানা বের করল। 'দ্যাখো তো বউদি, তোমার পছন্দ কিনা?'

হালকা কলাপাতার রঙের আঁচলে আধুনিক কাজ-করা।

সুষমা বলল ঃ 'ভারি সুন্দর।'

নিভা বলল ঃ 'মা এটা তোমার জন্যে কিনেছে।'

সুষমা হাসল। 'আমার মা কালীর মতো চেহারায় কি ওটা মানাবে?'

'আহা।'

মা ডাকলেনঃ 'বউমা, তেল কোথায়?'

সুষমা তেলের কৌটো বের করে দিল।

ইভা টয়লেটের জিনিসগুলো এবার দেখাল। আয়না চিরুনি পাউডার স্নো।

সুষমা বললঃ 'এগুলো বুঝি কল-কাতায় পাওয়া যেত না?'

ইভা বললঃ 'আবার তো কিনতে হত।'

সুষমা হাসল। 'এখন থেকেই হিসেবী হয়ে উঠলে যে।'

তারপর বাসনপত্র বেরুল। থালা বাটি গ্লাস।

'কাপড়ের পুঁটলিতে ওটা কি?' সুষমা জিজ্ঞেস করল।

'ধান। মা এনেছে।'

মা বললেনঃ 'গয়না দেখালি না বউমাকে?'

গয়নার বাক্স বের করল ইভা। 'এই হারছড়া বড়দি দিয়েছে। পছন্দ হয়েছে তোমার? আমার পুরনোটা ভেঙে কানের এটা তৈরী করিয়েছি। আর এই আঙটিটা?'

'চুড়িগুলো দেখা—' মা বললেন আবার।

চারগাছা করে চুড়ি। না, ব্রোঞ্জের ওপর তৈরী।

'নিভার বালাজোড়া ভেঙে আর কিছু সোনা দিয়ে। পছন্দ ?' ইভা বলল।

নির্মল সুন্দরী ছোটোবোনের সুডৌল হাতদুটো দেখল। বিশ্রী রকমের খালি দেখাচ্ছে হাতদুটো। সবুজ রঙের বেলোয়ারি চুড়ি পরেছে। হঠাৎ মনে পড়ল নিভা পোস্টকার্ড লিখেছিলঃ কলেজের পাঁচ মাসের মাইনে বাকি। এই বংশের একমাত্র শিক্ষিত মেয়ে। দুটো পাশ করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নিচে নেমে এল নির্মল।

'কে ওখানে ?'

পরিমল দাদার গলার আওয়াজে সিগারেট ফেলে দিল।

'তুই। এবার কেমন হল পরীক্ষা ?'

'এবার ঠিক পাশ করে যাব দাদা।'

'তিনবার হল। বি-এ পাশ না-করলে ......নিজের একটা ভবিষ্যৎ—' নির্মল সিগারেট ধরাল।

পরিমল ঘাড় হেঁট করে রইল।

তেইশ বছরের ছেলেটার এত বুদ্ধি, নির্মল ভাবলঃ কেবল মফঃস্বল জীবনের মন্দাগতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে স্থবির হয়ে গেল চরিত্রের জোর। না-পড়াশোনা না-চাকরি কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার দৃঢ়তা নেই। আবার নাকি প্রেমটেম করার দোষ দেখা দিয়েছে।

'শোন—বড় রাস্তায় ডেকরেটারের দোকান আছে। কাল সকালে গোটা চারেক একশো পাওয়ারের বাতির কথা বলে আসবি।'

'আচ্ছা।' পরিমল বললঃ 'সামনের ফুটপাথ ঢেকে নিমন্ত্রিতদের বসবার জায়গা করতে পারো।'

'না। খরচা হবে।' নির্মল মাথা নাড়ল।

'তবে কোথায় বসাবে ও'দের। সামনের হলঘরে তো খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ঠিক বলেছে পরিমল, নির্মল ভাবল। 'আচ্ছা দেখিস যদি কুড়ি-পঁচিশ টাকার মধ্যে হয়ে যায়।' বোনের বিয়ের ব্যাপারে পরিমলও যে সুচিন্তিত কিছু পরামর্শ দেবার উপযোগী, এইটে ভেবে ভালো লাগল নির্মলের। নির্মলের মনে হল সে একা নয়। যে একা সেই ক্ষুদ্র। 'এই— চিন্তাটা অনেকক্ষণ থেকে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার বাণীরূপ দিতে গিয়ে জিভে কেমন জড়তা বোধ করল সে।

'কি বলছ ?' পরিমল বলল।

'বাবা কত টাকা এনেছেন জানিস ? যেন কিছু যায় আসে না, শুধু খবর নেবার জন্যে, এমনি নিস্পৃহ গলায় জানতে চাইল নির্মল।

'টাকা আনতে পারেন নি।' শুকনো ফরফরে গলায় বলল পরিমল।

'মানে ?' নিস্পৃহতা চিড় খায় বোধ-হয়।

'টাকা জোগাড় করতে পারেন নি।' পরিমল বললঃ 'বড়দা জমি বেচতে দেয়নি। বলেছিল শ' পাঁচেক টাকা ও দেবে। বাবা গিয়েছিলেন, দাদা টাকা দেয়নি। ওর নাকি ভীষণ অভাব। বাবাকে দেখে খুব কান্নাকাটি শুরু করল......'

নির্মল এবার নিজেই রাগবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। বিশ্রী গলায় বললঃ 'বাবা দাদার কান্না দেখে ফিরে এলেন।'

'হ্যাঁ।' পরিমল বললঃ 'আসল ব্যাপার কি জানো, দাদা টাকা দিতে চেয়েছিল, জমি বউদির নামে লিখে দিতে হবে। বাবা রাজি হননি।'

'ও।'

'জানো ছোটদি আমি দুজনে গিয়েছিলাম বড়দার কাছে। ছোটদিকে দেখেও দাদা গলে নি। একশো টাকা দিয়েছিল। ছোটদি রেগে ছুঁড়ে ফেলেছিল টাকা, দাদাকে বলেছিলঃ 'গ্রামে থেকে তুই চাষা হয়ে গেছিস দাদা।' বউদি আসবার সময় হেসে বলেছিল ঃ 'দেখো, ঠাকুরপো একাই বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে। বড়লোক শ্বশুর......'' পরিমল একটু দম নিয়ে বললঃ 'সেই একশো টাকা আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।'

'আমি !' নির্মল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। নিজেকে কোণঠাসা শ্বাপদের মতো মনে হল।

পরিমল হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল ঃ 'আমি জানতাম তুমি রাগ করবে, দাদা। এই জন্যেই আমি আসতে চাইনি। আমার ভীষণ লজ্জা করে......'

একযোগে বিচিত্র অনুভব ঠেলাঠেলি করে নির্মলের হৃদয়ে ভীষণ কলহ শুরু করল। নির্মলের রাগ হল, রাগ নয়, হতাশা, হতাশা ছাপিয়ে ভয়, এমনকি কাপুরুষসুলভ এক ধরণের অপমানিত সংকোচ বোধ করল সে। তারপর শীতের রাত্রির এই জমাট অন্ধকারকে জগদ্দল পাথরের মতো মনে হল। বিদুষী স্ত্রীর মুখটাই ভেসে উঠল ওর নাকের সামনে, আর সেই চোখজোড়ায় পরম কৌতুক। সে হেরে যাচ্ছে, সমস্ত পরিবেশ তাকে হারিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত। বেদনার ভোঁতা স্বাদ চেতনাকে মথিত করে তুলল।

'এই নাও টাকা...' পরিমল ভেতরের পকেট থেকে দুমড়ানো নোটটা বের করে দাদাকে দিল।

নির্মল টাকাটা নিল। মনে মনে নিজের টাকার অঙ্কের সঙ্গে এই টাকাটা যোগ করল। তিনশো। নিমন্ত্রিত সব মিলিয়ে দেড়শোর মতো তো হবেই। বর-যাত্রী জনা তিরিশেক। বিয়ের দিন রাত্রে এবং পরের দিন বাসি বিয়ের উপলক্ষ্যে যে কজন বরের আত্মীয় বান্ধব থেকে যাবে। দরজিপাড়া থেকে মামাবাবুকে বলা হয়েছে, পিসতুতো ভাই দুজন। এছাড়াও ছড়ানো ছিটানো আত্মীয়স্বজন। তার ও সুষমার শিক্ষক বন্ধুরা। ছাঁটাই করেও শ দেড়েক থেকে গেছে। এর চেয়ে কমানো যায় না। কমাতে চায়ও না নির্মল। বিয়ের উৎসবটা সকলের, আনন্দের সম্মিলন। আনন্দকে ধূপের মতো পোড়াতে হয়, জ্বালাতে হয়, নির্মল বলল। নিবারণ ঠাকুর আর একজন রাঁধুনি, দুজন জোগাড়ে লোক, একজন চাকরকে নিয়ে আসবে সকালে। তা' ওর ফর্দের হিসেব মতো টেনেটুনে দুশোর মতো পড়বে খাবারের জন্যে। পাঁচ সের মাংসও নিয়ে আসবে সঙ্গে। মাছের ব্যবস্থাও থাকবে। দই লেডিকেনি রসগোল্লার অর্ডার গেছে চন্দননগরে। শালাবাবু নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করেছে। এখন নিজেকে নির্মলের বিরাট কর্মশালার ম্যানেজারের মতো লাগছে, বিভিন্ন কর্মের বিভাগ উপযুক্ত সহকারীদের হাতে। মিষ্টি ইত্যাদিতে শ' দেড়েক টাকা পড়বে। একশো টাকা অগ্রিম দেয়া হয়েছে। তার মানে এখনো শ' তিনেকের মতো টাকা দরকার হবে। তার পকেটের টাকাটা ছাড়াও। সারা জীবন অংককে ভয় করে এসেছিল নির্মল। অথচ জীবন অংক ছাড়া আর কি !

'মেজদা—ফুলদা—খাবে এস।'

নিভা।

'অন্ধকারে ভূতের মতো কি করছ ?' অন্ধকারকে চূর্ণ করতে হাসল নিভা।

'ভূত দেখেছিস তুই ?' নির্মল হাসল। (তিনশো টাকা চাই।)

'ক—ত।' নিভা বলল ঃ 'ফুলদাকে বকছিলে বুঝি ?'

'কেন ?' (আরো তিনশো টাকা। ক্ষিতীশ, নবেন্দু, প্রভাত......)

'ও ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। অন্য পাড়ায় গিয়ে মারামারি করে আসে। থানায় ওর নাম আছে।'

'তাই বুঝি ?' (ক্ষিতীশ আজ সন্ধ্যায় একশো টাকা দেবে বলেছিল।)

'তুমি ওকে একদম বকো না, শাসন কোরো না—'

'করতে হবে। দেখিস।' (কাল একবার যাব। কখন ? সময় পাব কি !)

'ছাই। জানো মেজদা—আমি এবার কলেজে মেয়েদের কমনরুমের ইনচার্জ হয়েছি। এমন হিংসুটে মেয়েরা...'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?' (আমি কি সত্যিই এমন শত্রু নাকি অভিনয়ের নায়ক !)

'ইংরেজি বুঝতে পারছি নে। ভীষণ শক্ত ! চলো—খাবে চলো—'

'চল।'

'বাবা—'

'কে? নির্মল। আয়।' কম্বলের ভেতরে বাবার শীর্ণ গুটিয়ে-রাখা শরীরটা নড়ে উঠল।

বাবার সামনে আজো মুখ তুলে কথা বলতে পারে না নির্মল। তার ছত্রিশ বছর বয়েসের হিসেবে বাবার সঙ্গে তার মুখোমুখি কদিন দেখা হয়েছে, গুণে বলতে পারে। বাবাকে মনের ভেতরে কোনদিন আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে নি। তার কারণ বাবা ছেলেদের কাছে কেবল প্রেমহীন শাসনের বিভীষিকারূপে উপস্থিত ছিলেন। কৈশোর বেলার অত্যাচারের অভিমানগুলি জমে জমে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটি দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। এই বয়েসেও কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নির্মল।

'ওঁদের খবর দেয়া হয়েছে—' বাবা জিগ্যেস করলেন।

'কাদের?' অনামনস্ক নির্মল বলল।

বাবা বললেন: 'আমরা এসে পৌঁছেছি। পাত্রপক্ষকে খবর দেয়া দরকার হবে না?'

'খবর দেবার কি আছে।' বিরক্ত নির্মল বলল: 'ওঁরা জানতে পারবেন।'

'পারবেন।' বাবা চুপ করে রইলেন। 'কত টাকা ভাড়া বাড়িটার?'

'দেড়শো।' নির্মল বলল।

'বাবা! এত!' বাবার হাসিতে গ্রামীণ সারল্য: 'আমরা হলে পারতাম না।'

নির্মলের মনে হল আবার, সে হেরে যাচ্ছে। মনে হল বাবা পর্যন্ত তাকে তোষামোদ করছেন। নাকি সার্কাসের দড়ির খেলায় সকলে চাপিয়ে দিয়েছে তাকে, এখন হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি করে তাকে বীরপুরুষ করে তুলবে।

'কতজন বরযাত্রী আসবে?' বাবা আবার জিগ্যেস করলেন।

'ত্রিশজন।' নির্মল বেজার মুখে বলল।

'বা-বা!' বাবা আবার বিস্ময়সূচক অব্যয় ব্যবহার করলেন। 'কি কি আইটেম ঠিক করেছিস?'

'মাছ মাংস লুচি...'

'বা-বা!' বাবা হাসলেন। নাকি ওটা তাঁর মুদ্রাদোষ: 'সে তো অনেক খরচের ধাক্কা।'

'হ্যাঁ। দুশো টাকার মতো পড়বে।' নির্মল বলে অপেক্ষা করল। যদি এবার টাকা সম্পর্কে বাবা কিছু বলেন। কিন্তু বাবা ও কথাটা ভুলে গেছেন। বার্ধক্যের ভ্রম। কিংবা বাবা ভেবেছেন সংসারে কিছু লোক তাঁর দায় বহন করতে জন্মেছেন। 'বাবা—' নিজের বেসুরো গলার স্বরে চমকাল নির্মল। মনে হল কৈশোরের সেই প্রেমহীন অত্যাচারের ভারি পাথরটা ঠেলে ফেলে দিতে এ-জীবনে কিছুতেই পারবে না। তবু একটা মরিয়া প্রয়াস।

'বাবা—'

'কি বলছিস?'

'কত টাকা এনেছেন আপনি?'

বাবা বললেন, 'টাকা পেলাম কই?'

'টাকা আনেন নি?'

'জোগাড় হল না।'

হল না।' নির্মল কি বলবে ভেবে উঠতে পারল না।

বাবা বললেন, 'দুশো টাকা পেয়েছিলাম। তা পঞ্চাশ টাকার মতো তো গাড়ি ভাড়াতেই খরচা হয়ে গেল। টাকাটা নিবি তুই এখন? নে। তোর কাছে রাখ। পঞ্চাশ টাকা রেখেছিলাম ফিরে যাওয়ার জন্যে।'

বাবার কাছে কলকাতায় পৌঁছানো আর ফিরে-যাওয়াই একমাত্র বাস্তব ব্যাপার। মেয়ের বিয়ে যাবতীয় কাজকর্ম খরচ ইত্যাদি কল্পনা, অসার মায়া!

নির্মল ভাবল। বহু সাধনায় বোধকরি মানুষ এমন নির্বিকল্প নির্বেদ অবস্থা পেতে পারে। অতি কষ্টে বলল, 'এই একশো টাকা নিয়ে আপনি এলেন...'

বাবা অদ্ভুত গলায় বললেন, 'না এলেই ভালো হত, তাই কি বলিস? বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, আসতে হবে না?'

'তাই বলে...' নির্মল বলল।

'আমি তো ইভার বিয়ের জন্যে তাড়া করিনি।' বাবা বললেন: 'তোমার মা-ই তো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।'

'মা—ও মা—' নির্মল ডাকল।

মা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস। উনি কি একটা মানুষ। সংসার দেখলে কি আমাদের এই অবস্থা হত। বিয়ে বলে কথা, তা একবার গা তুলে যেতে পারলেন শীতলের কাছে। চিঠি দিয়ে খালাস। বললেন কি জানিস: উপযুক্ত ছেলের যদি ভক্তি না থাকে তাই বলে বাবা যাবে ছেলের কাছে। যে-ছেলেকে উনি মনিষ্যি-জন্ম দিয়েছেন!'

কিন্তু এ-দাম্পত্য-সংলাপ শুনে আমার কি কাজ হবে, তিক্ত নির্মল ভাবল। টাকা চাই। উপস্থিত নিজেকে কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্তের মতো মনে হল। আর এই দায়টা যেন তার মাবাবার কাছেও। তাঁরা এসেছেন নিতান্তই অনুষ্ঠানে নৈবেদ্যের চুড়োর মতো।

চোখ ফেরাল নির্মল। ঘরটাকে এখন জাহাজের ডেকের মতো দেখাচ্ছে। বিছানাপত্র, বাক্স-তোরঙ্গ জামা কাপড়ের স্তূপ: রঞ্জু কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছে কি। জানালা-ঘেঁসে ইভানিভা ভায়েরা বউদিকে ঘিরে বসেছে। ঘোমটাটানা সুষমাকে এখন নতুন দেখাচ্ছে। কি আশ্চর্য মোমের মতো ঠাণ্ডা শীতল সুষমা। ও কদাচিৎ উত্তেজিত হয়। এমন কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেও ওকে দেখা যায় না। ইভা লিস্ট করছিল এখানে দু একজন বন্ধুকে কাল সকালেই নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে। ললিতা থাকে দেশবন্ধু পার্কের ধারে, রিনা গ্রে স্ট্রীটে। ওদের না-বললে চলবে না। আর অম্নি টুকিটাকি কিছু মেয়েলি দরকারি জিনিস কিনে নিয়ে আসতে হবে। বউদি পছন্দ না-করে দিলে চলবে না। কলকাতার বিদুষী বউদি।

ছোটভাই শতদল বলল: 'বউদি আমি লেক চিড়িয়াখানা দেখব—'

সুষমা হাসল। 'বেশ তো। তোমার দাদাকে বোলো।'

'না। তুমি যাবে সঙ্গে। দাদাকে ভালো লাগে না।'

'বলব দাদাকে?'

'বউদি!'

'আচ্ছা—আচ্ছা। হবে।'

'মাকে কিন্তু কালীঘাটে নিয়ে যেও বউদি—' নিভা বলল।

'যাব।'

নিভা অভিযোগ করল: 'বউদি এবার কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটিতে যাবে আমাদের ওখানে। হ্যাঁ বলো।'

'যাব ভাই যাব।'

'তুমি তো সব বারেই বলো। তুমি আমাদের একটুও ভালোবাসো না!' নিভা বলল।

'আমি পরের মেয়ে। তোমাদের ভালোবাসতে যাব কেন?' সুষমা বলল।

'তুমি আমাদের পর!'

'নয়তো কি। তোমরা কত সুন্দরী...'

'বউদি।' নিভা সুষমার গলা জড়িয়ে ধরল। 'জানো: সবাই বলে রঞ্জু আমার মতো দেখতে হয়েছে।'

'ভাগ্যিস।' মুখ টিপে হাসল সুষমা।

ইভা বলল, 'বউদি পান খাবে?'

'না ভাই। আমার দাঁত খারাপ।'

'অ মা বউদি, তোমাকে একটা খবর দেয়া হয়নি—' ইভা আস্তে বলল: 'বড়-বউদির না আবার বাচ্চা হবে। এই নিয়ে ছটা...'

নির্মল রাস্তার দিকের বারান্দায় উঠে এল। অন্ধকার। একটা সিগারেট ধরাল। এ-কয়েকদিন মুহুর্মুহু সিগারেট খেয়ে মুখের ভেতরটা হেজে গেছে। কে বলেছিল সেদিন সিগারেট খেলে ব্যক্তিত্ব কমে যায়। হাসল নির্মল এবং নিজের কাছেই অবাক হল। ক্ষিতীশ টাকাটা দিয়ে গেল না। বিয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার চিন্তাগুলি মুদ্রার আকার নেবে। ভাবল নির্মল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারের সমুদ্র উজিয়ে জাহাজ চলেছে। জল জল জল। অন্ধকার। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম জ্যা-বাঁধা ধনুকের মতো টনটন করছে। জ্বর

জ্বর উত্তেজনা, প্রদাহ, মস্তিষ্ক বড় বেশি নিষ্কম্প।

'দাদা পান খাবি?'

ইভা।

'দে।'

'অন্ধকারে শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছিস?'

'কিছু না। এম্নি।'

ইভা যায় না, দাঁড়িয়ে থাকে।

'কি ভাবছিস বল্ না?'

'তোর বিয়ে। ভাবব না।'

'টাকার ভাবনা?' ইভা হাসল।

চমকাল নির্মল। 'তুই কি করে জানলি?'

'বাঃ। জানব না। বাবা তো কিছুই আনতে পারেননি। সত্যি কত দিয়েছেন বাবা?'

'সামান্য। দেড়শোর মতো।'

'মাত্র। অনেক টাকা ধার করতে হচ্ছে তোকে না রে দাদা?'

নির্মল হাসল। 'তুই বড়ো পাকাপাকা কথা বলতে শিখেছিস।'

ইভা বলল 'আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা আছে, নিবি তুই?'

নির্মল অবাক হল। 'তুই টাকা পেলি কোথায়?'

'বড়দি দিয়েছে। নে না। আমার এখন টাকায় কি দরকার বল তো?'

নির্মল মনে মনে হিসেব করল। বাবার দেড়শো, পরিমলের একশো, আর ইভার পঞ্চাশ হলে তিনশো পূর্ণ হয়ে যায়। তার কাছে আর কত টাকা আছে? দুশো না তিনশো। ঠিক মনে পড়ছে না।

দরজায় ট্যাক্সির শব্দ।

এত রাত্রে কে এল।

ইভা উঁকি মেরে দেখল পিসতুতো ভাই মনোহর। হাতে বেনারসী শাড়ির প্যাকেট। ওটা কিনে দেবার ভার ও নিয়েছিল। ছোটখাটো সরকারী অফিসার। কিন্তু, ওর পেছনে আর দুজন কে।

দুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে উঠল মনোহর। 'মেজদা কই, মেজদা—'

'এই যে আমি।' নির্মল বলল।

'ছি ছি। কী করেছ বলো তো।'

'কেন?'

'ওদের বাড়িতে এঁদের পৌঁছনোর খবর দাও নি? ভীষণ চটে গেছেন ওঁরা। বলেছেন কি রকম ভদ্রলোক...'

এতক্ষণকার বোবা গুমটের পর নির্মলের ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারল না।

মনোহর বলল, 'যাও ওঁরা নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন ওবাড়ির জামাই, আমার বন্ধু মানিক।'

নিচে নেমে যেতে হল নির্মলকে।

সাব্যস্ত হল ওদের সঙ্গেই পরিমল আর মনোহর ত্রুটি সংশোধন করতে যাবে। অম্নি কাল সকালে আশীর্বাদ করতে যাবার খবরটাও বলে আসবে।

এই শীতেও নির্মলের মনে হল সে ঘামছে। না, সেটা মিথ্যে। একটা সিগারেট ধরাল। কিছু একটা ভাবতে চায়। আমি এত বড় ব্যাপারের পক্ষে উপযুক্ত নই—নির্মল বলল : আমার চিন্তাগুলি মুদ্রার ছাঁচ নিয়েছে। অথচ সত্যিই কি সে টাকার কথা তেমন তীব্র করে ভাবতে পারছে। (ক্ষিতীশ...না থাক।) ভাবলেই টাকা আসবে না। অর্থাৎ ভেবে সে টাকার কিনারা করতে পারবে না। এতক্ষণ যে টাকাগুলি সে পেয়েছে সেগুলি তার ভাবার জন্যেও নয়। হঠাৎ, দৈবাৎ পেয়ে গেছে।

'কে?'

সুষমা বলল : 'আমি।'

নির্মল বলল : 'ও।'

'তোমাকে আজ সেই পুরনো ছবিটার মতো ভীষণ সংগ্রামী দেখাচ্ছে।'

'কোন্ ছবিটা?' অন্যমনস্ক গলায় বলল নির্মল।

'আর জি কর হস্টেলের ছাদে রোহিণীবাবুর তোলা ছবিটার মতো।' ফিশ ফিশ গলায় বলল সুষমা : 'তখন তোমার মাথায় অনেক চুল ছিল, অজস্র এলোমেলো চুল। আর রোগা লম্বাটে মুখের প্রোফাইল ছিল ভীষণ ধারালো...'

'ইয়ারকি করার এই সময়!'

'ও। তুমি ভীষণ ভাবছ। এই যুবক ভীষণ ভাবুক, ভীষণ দ্রষ্টা...'

'জানো বাবা টাকা আনেননি।'

'জানি।'

'জেনেও...'

'আমি কি করব। আমি কি রোজগার করতে বেরুব?'

'জানি আমার কেউ নেই। আমি...'

'আহ্! আচ্ছা নির্মল, আমাদের বিয়ের কথা মনে পড়ে? আমি তখন ইস্কুলে চাকরি করি তুমি বেকার। তোমার-আমার দুজনের বাড়িতেই প্রবল আপত্তি। রেজিস্ট্রেশনের ফিসটা আমি মাইনে পেয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম। বিয়ে হল। অনুষ্ঠানের প্রীতিভোজের টাকাটাও আমাদের ধার করে জোগাড় করতে হল। তোমার একটা ভালো পাঞ্জাবিও ছিল না, পায়ে ছেঁড়া স্যান্ডেল, চুল কাটবারও সময় হয়নি তোমার। সেদিন আমি বেনারসী নয় মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি পরেছিলাম অনুবউদির কাছে ধার করে।'

'এসব কথার মানে?' অবিশ্বাস-চোখে নির্মল তাকাল সুষমার দিকে।

'মানে আবার কি। বলতে ইচ্ছে করে না?'

'ও।'

'কী জানো নির্মল, সুখকে চাইলেই সুখ পাওয়া যায়।'

'হঠাৎ?'

'কি জানি।' সুষমা বলল : 'আজকে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এই উত্তেজনা উদ্বেগ, অশান্তির ঢেউগুলি রজুর দৌরাত্ম্যির মতো আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে। আমি বলছি দেখো ইভা খুব সুখী হবে। কারণ ও সুখকে বাজিয়ে-বাজিয়ে নিতে শেখেনি।'

'তুমি ওপরে যাও। তোমাকে ওরা খুঁজছে।' নির্মল বলল।

'শোবে না তুমি? অনেক রাত হয়েছে।'

'ওরা ফিরে আসুক।'

সুষমা ত্বরিতপায়ে চলে গেল।

আমার ঘুম আসছে না, নির্মল বলল। এখন দেড়টা বাজে। ওরা অনেকক্ষণ গেছে, ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন। ওদের ফেরার সঙ্গে ঘুমের একটা সম্পর্ক আছে। মানুষ সব সময়েই আর-একজনের ত্রুটি খোঁজে। খবর-দেবার দায়িত্ব তাদের একার খবর-নেবার গরজ ওদের নেই। কেন দেরি হচ্ছে, কি বৃত্তান্ত তোমরাও তো খবর নিতে পারতে। অবশ্য ত্রুটি খুঁজতে গেলে এত ভাবা চলে না। মনোহর আমার চেয়ে করিৎকর্মা, নির্মল ভাবল : কারণ ও সরকারী অফিসার, বেনারসী-শাড়ি কিনে দিয়ে মস্ত খরচ বাঁচিয়েছে এবং ও বাড়ির জামাই মানিকের বন্ধু। ওর ত্রুটি নেই। হাই তুলল নির্মল।

উত্তর মেঘ

নির্মল হাই তুলল। একটু বিশ্রাম। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। 'লুচি মাংস দই।' 'এই যে নির্মলবাবু খুব খেলাম। তাহলে আসি।' 'আপনার বাবাকে দেখলাম না।' 'মেজদা, বরযাত্রীরা সিগারেট চাচ্ছে। উইলস্ নয়, গোল্ডফ্লেক।' 'তুই চেন-স্লাইটের ব্যবস্থা করলি কেন? কেবল খরচা বাড়াচ্ছিস। কোনো মানে হয় না।' 'দাদাবাবু, আমাদের বিড়ি আনিয়ে দিতে হবে।' 'মেজদা পুরোহিতমশায় তোমাকে ডাকছেন।' 'এই যে নির্মল, ভেবেছিলে আসব না, এই নাও টাকাটা। না ভাই বসব না। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। জানো মার জরায়ুতে ক্যানসার হয়েছে...' বিয়ের রাত্রির সমস্ত কোলাহল সাড়া চিৎকার এখন এই মুহূর্তে নির্মলের মস্তিষ্কে ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

এইমাত্র বাসি-বিয়ের পর্ব চুকলো। বেলা তিনটে। ভাজাভা পোড়া তেলের গন্ধ। গা গুলোচ্ছে। অনেকদিন আর খাদ্যে রুচি থাকবে না নির্মলের। ভালো-ভাবেই বিয়েটা চুকল। কোথাও উত্তেজনা নয় ক্রোধ নয়। নিপুণ পরিচালকের মতো সমস্ত দিক নজর রেখেছে নির্মল, কারুর ছোটখাটো দাবিও উপেক্ষা করেনি। আর্থিক ব্যাপারটা সম্পূর্ণ

নিজের কর্তৃত্বে রেখেছে। এবং এখনো তার পকেটে প্রায় দুশো টাকার মতো উদ্‌বৃত্ত থাকতে দেখে নিজের ওস্তাদিতে নিজেই মুগ্ধ সে।

বাবা সবিস্ময়ে হেসে বললেন, 'নির্মল না হলে আমি এত পারতাম না...' কী আশ্চর্য, বাবার মন্তব্য শুনে এখন আর রাগ হল না তার। সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে উচ্চারণ করল : নির্মল না হলে আমি এত পারতাম না! নির্মল ভাবল : যে-নির্মল কাজ করেছে সে-নির্মল সে নয়। আর দশজন নিরীহ যুবকের মতোই সে ভিরু, দুর্বল এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ। হিসেব করে চলতে সে শেখেনি।

'বাবা—অ বাবা—' রঞ্জু।

'কি রে?'

রঞ্জু মুখ হাঁ করল।

'পান খেয়ে-খেয়ে দাঁত কি করেছিস। দুষ্টু মেয়ে।' নির্মল হাসল।

রঞ্জু এক পায়ে খানিকক্ষণ ব্যাঙ হল। তারপর—

'বাবা বধূ মানে কি?'

'বউ।'

'মা তোমার বধূ?'

'কে বলেছে তোকে?'

'কে বলবে? আমি জানিনে বুঝি।' রঞ্জুর পাকামি।

'মা কি করছে রে?'

'আড্ডা মারছে।'

'আড্ডা। আড্ডা মানে কি? কোথা থেকে শিখলি?'

'কাজ না-করে গল্প করলে আড্ডা হয় না! দিদিমণি মাকে বলে না?' রঞ্জু বাবার পাহাড়প্রমাণ অজ্ঞতায় বিস্মিত। 'বাবা আমি পিসিমণির সঙ্গে যাব।'

'না।'

'হ্যাঁ আমি যাব। নিশ্চয়ই যাব।'

'রাত্তিরে থাকতে পারবি?'

'খুউব।'

'আর বিছানা নষ্ট করলে...'

'বাবা ভারি অসভ্য।' রঞ্জু পালাল।

বাবা বললেন, 'অনেক ধার হয়ে গেল তোর না?'

নির্মল বলল, 'ছ' সাতেকের মতো—'

বাবা বললেন, 'আমি হলে পারতাম না।'

নির্মল নিরুত্তর।

'ফিরে গিয়ে তোকে আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবো, বুঝলি?',

'পারবেন না।'

'জমি বিক্রি করে......'

'হবে না।'

'শীতল যে এমন করবে। কি জানিস, বয়স হয়েছে, দরিদ্র হয়েছি, কেউ কেয়ার করে না। আমার অবস্থা হয়েছে বৃদ্ধ শাজাহানের মতো......'

'বাবা—'

'কি বলছিস?'

'আমার ধারের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি ছ-সাত মাস আমাকে বাড়ির জন্যে টাকা পাঠাতে বলবেন না......'

'আচ্ছা।'

'দাদা—'

'কি রে?'

'জামাইবাবু তোমাকে ডাকছেন।' পরিমল বলল।

'যাচ্ছি।'

দ্বিজেন গেঞ্জিগায়ে সিগারেট খাচ্ছিল। কোলে বালিশ।

সুষমা বলল, 'ইনি অভিযোগ করছিলেন তোমার অদর্শনের জন্যে।'

দ্বিজেন বলল, 'নিন। সিগ্রেট খান। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

'আর ভাই......' নির্মল হাসল।

নিভা চা নিয়ে এল।

'এই মেয়েটি বেজায় কাজের......' দ্বিজেন হাসল। 'উঃ কালীঘাটে কী মশা।'

সুষমা বলল, 'জানো দ্বিজেনবাবু আমাদের এরোড্রামে নিয়ে যাবেন। ও'র ভাগনে মধুসূদন এখানে বদলি হয়ে এসেছেন......'

দ্বিজেন বলল, 'হ্যাঁ চলুন না একদিন।'

নির্মল হাসল। 'এরোড্রামে কেন? কি হবে?'

'ভারি সুন্দর সাজানো ছবির মতো...'

'বেশ তো।'

দ্বিজেন বলল, 'জানেন বউদি এখন থেকেই আমার বাংলা বানানের ভুল ধরতে শুরু করেছেন।'

'তাই বুঝি?'

'বলুন দেখি এতদিন সভ্যতা শিখে এসে আজ সভ্য বলতে হবে! প্রফেসার তো। দাদা আপনি ইসকুলে পড়ে আছেন কেন?'

নির্মল এক মুহূর্ত বিরক্ত হল। তারপর হেসে বলল, 'বাঁচবার মতো একটা জীবিকা হলেই হল।'

'তা যা বলেছেন।' দ্বিজেন বলল : 'বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে কলেজ স্ট্রীটে জুতোর দোকান খুলেছিলাম। বাড়ির লোকের জন্যে শেষ পর্যন্ত লাভজনক ব্যবসাটা ছাড়তে হল।'

দ্বিজেনের তুলনামূলক উদাহরণ কি জানি ভালো লাগল না নির্মলের। সে লক্ষ্য করেছে তার আত্মীয়-স্বজনেরা পর্যন্ত তার শিক্ষকতার পেশাকে ভালো চোখে দেখে না। বড়লোক আত্মীয়েরা ওটা যেন কিছু গোপন রোগ সব সময় সে-লজ্জাকে ঢাকতে ব্যস্ত। আসলে, নির্মল মনে করে, সামাজিক পাপবোধের আত্মপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শিক্ষকদের উপেক্ষা করা রীতি।

'আচ্ছা একটু আসি।' নির্মল নিচে নেমে এল।

নিবারণ ঠাকুর বাসনপত্রের তদারক করছে। এ'টো বাসন ধুয়ে তুলছে ওর লোক।

'দেখলেন তো দাদাবাবু, কেমন ম্যানেজ করলাম...' নিবারণের বিগলিত হাসি।

'সত্যি তুমি না হলে...' নির্মল স্বীকার করল।

'এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম...' নিবারণ বলল : 'আপনি তো ভয় করেছিলেন। এই দুর্দিনে মাছ খাওয়ানো কি চাট্টি কথা। মাছ রিপিট করবার আগেই মাংস পরিবেশন করতে পাঠিয়ে দিলুম।'

নির্মল হাসল। 'তুমি না হলে পারতাম না।'

'এই দেখুন সের দেড়েক ময়দা বে'চেছে, আধ টিন ঘি, তেলও পোয়া দেড়েক হবে...' নিবারণ দেখাল। তারপর গলা হে'কে : 'কইরে মিলেছে সব? তিনটে হাতা, দুটো গামলা, ছামান দিস্তে...'

নির্মল ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে। অপরাহ্নের রোদ ঝিলমিল করছে। রাস্তায় নেমে একটু পায়চারি করল নির্মল। মনের ভেতরে বৈরাগ্যের একতারা বাজছে। পরম নির্লিপ্ত। নির্মলের মনে হল তার ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না কথাটাই বারবার আবৃত্তি করল সে। একটা সিগারেট ধরাল।

বাড়িঅলা গঙ্গাচরণবাবু। 'কালকে আসতে পারিনি। এই বয়েসে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারিনে। শরীর খারাপ হয়।'

গঙ্গাচরণবাবু যে আসেননি তা কি নির্মলেরই মনে ছিল! মনে থাকলে একবার ডাকতে পাঠাত।

'যাক। ভালোভাবে মিটে গেছে তো। তারা তারা...' গঙ্গাচরণবাবু বললেন : 'একশো বাতি কটা লাগিয়েছিলেন? না। সেজন্যে বলছিলাম না। আমার ছেলে বলছিল।......ভয় পাচ্ছিলাম মেন্ ফিউস্ না হয়ে যায়......'

নির্মল বলল, 'আমরা আজ রাত্তিরেই বাড়ি ছেড়ে দেবো।'

'সে কি। কাল সকালে তো যাবার কথা ছিল! কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না। সেজন্যে নয়।' নির্মল বলল : 'কাল সকালেই ও'রা চলে যাবেন কিনা।

সাড়ে নটায় ট্রেন। রাত্তিরটা আমাদের বাড়িতেই......'...

'ও তাই বলুন। তারা তারা......'

নির্মল পেছন ফিরে বিয়ে-বাড়িটার দিকে তাকাল। দু দিন সারারাত যাত্রা করে নট যেমন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ভাঙা আসরের দিকে তাকায়, নির্মলের সেই রকম মনে হল।

একটা শূন্য নিশ্বাস ফেলে আবার দোতলায় সিঁড়িতে পা দিল সে।

ইভার বিয়ের ট্রাঙ্কের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সুষমা। বাক্স সাজাচ্ছে। বাক্সের কাছে ইভা নিভা। ইভা গা ধুয়ে এসে বধূ-সজ্জার জন্যে তৈরী। মা চুল বেঁধে দিচ্ছেন ওর।

ইভা অনেক শাড়ি পেয়েছে। গুছিয়ে তুলছে সুষমা। ধনেখালি ফরাসডাঙগা শান্তিপুর মাদ্রাজ।

'কী সুন্দর শাড়িটা না?' সুষমা বলল : 'নিভাকে সুন্দর মানাবে। ইভা, এই শাড়িটা নিভাকে দিচ্ছি।'

নিভা বলল, 'না। আমার চাইনে।'

'তুই চুপ কর।' সুষমা ধমকাতে গিয়ে থেমে গেল। নিভা বহুক্ষণ থেকেই আড়ালে কেঁদে আসছে, মনে হল। আসন্ন বিদায় সম্ভাবনায় অনেকেরই মুখ লাল, গলা ভারি।

ইভা বলল, 'মা লাগছে। আস্তে।'

নির্মলের মনে হল চুল বাঁধতে বাঁধতে মা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। আর কোনোদিন ইভার চুল বাঁধতে পারবেন না, তার কষ্ট। ইভা চুপ করে বসে আছে। সদা-মুখর মেয়েটা এখন আশ্চর্য রকমের চুপ। যেন চুল-বাঁধতে বসা ছাড়া তার আর এই পৃথিবীতে কোনো কাজ নেই।

সুষমা বলল, 'পরিমল হয়েছে?'

'হ্যাঁ। এই যে!' ননদ-পুটলি প্রণামী-শাড়িগুলির গায়ে কাগজ এঁটে লিখে দিয়েছে পরিমল।

'এক বছর আর ইভাকে শাড়ির কথা ভাবতে হবে না......' সুষমা হাসল।

'বউদি দেখো তো খোঁপা ঠিক হয়েছে?' ইভা একাত-ওকাত করে খোঁপাটার রচনা বুঝতে চাইল।

সুষমা বলল, 'দেখি।' তারপর বিনুনি খুলে জরির ফিতে আর রুপোর ঝুমকো-কাঁটায় খোঁপাটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পদ্মের মতো করে তুলল।

ইভা এবার মুখে স্নো ঘষছে। নাকের নিচে ব্রণ হয়েছে। তারপর ফেস্-পাউডার। কাজল কুমকুমের টিপ।

নিভা কোথা থেকে খুঁজে ইভার পুরনো দুটো ছেঁড়া শাড়ি দিদির ট্রাঙ্কে তুলে দিতে এল।

'তোকে ওস্তাদি করতে হবে না। রাখ দিকি।' সুষমা ওকে থামাল।

'বারে, আমি কি করব তাহলে?' নিভা ক্ষীণ গলায় বলল।

'তুই চা কর—'

নিভা কাজ করার অছিলায় কাঁদতে গেল নিশ্চয়।

বাবা বললেন, 'পাঁচটা বাজল। তোরা তাড়াতাড়ি কর।'

রঞ্জু ছুটতে-ছুটতে এল। 'বাবা, জানো, ছোটকাকু না কাঁদছে। কেন কাঁদছে জানো বাবা? পিসিমণি চলে যাবে কিনা তাই।'

'তুই কাঁদছিস নে?'

'নুনা।' তারপর একটু ঘুরে ফিরে এসে : 'জানো বাবা দাদুর মাথায় চুল সব শাদা। দাদু বুড়ো না বাবা? বুড়ো হলে মরে যায়।'

'বাজে কথা।'

'না। সত্যি। মা বলছিল বুড়ো হলে......'

'দেখ তো। পিসিমণির চা হল কিনা?'

ইভা বেনারসী শাড়ি পরেছে। ওর আটপৌরে চেহারাটুকু এবার নববধূর খোলসে আশ্রয় পেয়েছে। না, সাজলে ওকে খারাপ দেখায় না। কিংবা ওর মনের শান্তিই ওর চেহারায় কমনীয়তা এনেছে।

বাইরে ট্যাকসির শব্দ। বরের বাড়ির লোকেরা দখল নিতে আসছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল নির্মলের। আর, বিচিত্রভাবে অনুভব করল : তার ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে আসছে। সর্দি-সর্দির মতো মাথাটা ভারি হয়ে আসছে, গলার স্বর। অন্ধকার বারান্দার কোণে রুমালে কে নাক ঝাড়ছে। শতদল!

'মেজদা, এদিকে এস।'

এবার আশীর্বাদের পালা। বাবা, মা। মার মুখ অস্বাভাবিক লাল। নির্মল দেখল। বরকনেকে। আমি কি আশীর্বাদ করব, নির্মল ভাবল। ধানদুর্বা কাঁপা আঙুলে তুলে নিল নির্মল। অস্ফুটে কি বলল। ইভা প্রণাম করল। নির্মল সরে এল। একটু দূরে থেকে সমস্ত ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করতে চাইল সে। কেউ আলোর তীব্রতার সামনে যেন দাঁড়াতে পারছে না। দরজার আড়ালে বারান্দার এদিক-সেদিক কান্নার রিহার্শাল চলেছে।

বরের বোন নিভাকে বোঝাচ্ছে : 'কাঁদছ কেন ভাই। দেখো তোমার দিদির কোনো কষ্ট হবে না।'

নিভা সমবেদনা পেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সংক্রামক কান্নার স্রোতে সারা ঘরটা থই থই করে ভাসছে। নির্মলের আবার মনে হল তার মাথা ভার-ভার ঠেকছে, গলা বুজে আসছে। আমিও কি কাঁদব নাকি, নির্মল অবাক বোধ করল।

বাকস-বিছানা ধরাধরি করে ট্যাকসিতে চাপাল পরিমল-শতদল। নিচে নেমে গেছে অনেকে। নিভা শাঁখ বাজাচ্ছে আর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

'মা কোথায়? মা অ মা—' ইভা এক পলক পাশের ঘরে হেঁটে এল।

'মা—শোনো লক্ষ্মণের দোকানে গত মাসের তেল কেরোসিনের জন্যে পৌণে চার টাকা বাকি আছে, কাপড়ের দোকানে একজোড়া শাড়ির দাম আঠারো টাকা, ধোপাকে গত মাসের হিসেব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, আর......'
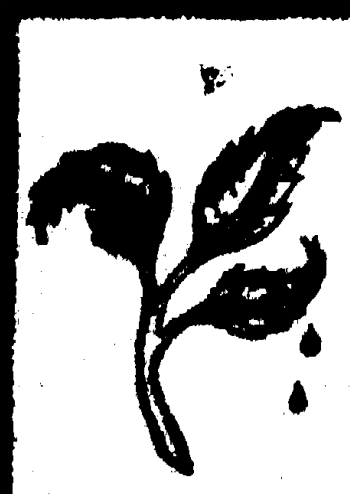
'তুই থামবি ইভা?' মা এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছেন।

'এই পরিমল লক্ষ্মীটি ভাই, মা-বাবাকে দেখিস, আমি তো থাকব না, হপ্তায়-হপ্তায় চিঠি দিবি।' ইভা বরকে অনুসরণ করল।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। বাবা পাথরের মতো বসে আছেন। সকলে নেমে গেছে। নির্মল দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ শীতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। এবং মনে হল চোখের পরদায় একটা অস্বচ্ছ কুয়াশা, নির্মল দেয়ালে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে রইল।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল না এদের, কান্তির খবরের জন্য। শুক্রবার বিকেলে মহাশ্বেতাই এল ছুটতে ছুটতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে।

'মা তোমার গুণধর ছেলের কান্ড শুনেছ! ছি ছি, কী কেলেঙ্কারীটাই করলে আর কী মুখটাই পোড়ালে!'

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই কথা বলতে শুরু করে সে। তারপর বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

আলো বেশীক্ষণ পাওয়া যাবে বলে আজ বাইরের ঘরে রকে এসে বসেছিলেন শ্যামা। কাজটাও একটু নতুন ধরেছিলেন আজ—চিরাচরিত পাতা চাঁচা বা গামড়া থেকে পাতা ছাড়ানো নয়—কাথা সেলাই করতে বসেছিলেন। অনেকগুলো ছেঁড়া কাপড় জমেছে, এদিকে আর হাত না দিলেই নয়। সামনে শীতকালে এ সব লাগবে। পুরনো কাঁথা সবই প্রায় ছিঁড়ে এসেছে, সে এখন পাতা চলবে আরও দু-এক বছর—কিন্তু গায়ে দেওয়া চলবে না আর।

'গুণধর ছেলের কান্ড' বলতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল শ্যামার—ছুঁচটাও হাতে বিঁধে গিয়েছিল সজোরে—কিন্তু তবু কোন গুণধর ছেলে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি কদিন ধরে ভাবছিলেন খোকার কথাই। উমা তো ফেরে রাত নটার সময় -খোকা ইস্কুল থেকে ফেরে চারটেয়। তারপর যে কী করে তা কে জানে। হয়ত যত রাজ্যের পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলে কি কী করে তার ঠিক কি! হয়ত কোন দিন বিড়ি খেতেই শিখবে। শরৎ জামাই আছেন বটে তা তিনিও তো রুগ্ন, বসে বসে হাঁপান। তিনি কি আর অত বড় ছেলের ওপর নজর রাখতে পারেন?

ভয় যেটা মনে প্রবল ও প্রধান হয়েছিল সেইটেই মুখে বেরিয়ে গেল, 'খোকা?'

'খোকা কেন গো! তোমার গব্বের সেরা যিনি—যিনি তোমার মুখ উজ্জ্বল করবেন! কান্তিচন্দর!......বাবা আমড়া গাছে কি আর ন্যাংড়া ফলে, বাবা এদানেতে বলত ঠিকই। কচুর বেটা ঘেঁচু—বড় জোর মান।'

মহাশ্বেতার ধরন দেখে মনে হ'ল যেন পরমাত্মীয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে আসে নি—কোন শত্রুর মহাসর্বনাশের আনন্দ-সংবাদ বহন ক'রে এনেছে। ঠিক তেমনি বিজয়দীপ্ত চাহনি তার, তেমনিই উল্লাস।

আসলে তার সন্তানরা লেখাপড়া শেখে নি বা শিখছে না বলে এ'রা যত কথা শুনিয়েছেন তার জ্বালাই মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। দুর্বল মানুষকে তার আত্মদোষ দেখিয়ে দিলে প্রতিকার করতে পারে না সংশোধন করতে পারে না—কিন্তু যে দেখিয়ে দেয় তার ওপর বিশ্বিষ্ট হয়ে থাকে। তার ছেলেদের লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থাই করতে পারে না সে—সব চেয়ে বড় কথা তার তেমন প্রয়োজনও বোঝে না—তবু এদের গঞ্জনা ও বিদ্রুপের জ্বালাটা পোষণ ক'রে রাখে। আজ যেন তার সেই শোধ নেবার দিন এসেছে।

শ্যামা কিন্তু কান্তির নাম শুনে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যান। কি হয়েছে কী করেছে সে প্রশ্নও করতে পারেন না।

কনক ওধারে কি কাজ করছিল, বড় ননদের আওয়াজ পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে বট্‌ঠাকুরঝি?'

প্রশ্ন করে আর মনে মনে কাঁপতে থাকে। দুঃসংবাদের কী আর শেষ হবে না! এদের বাড়িতে দুঃসংবাদও যা আসে কখনও ছোট তো আসে না কিছু—একেবারে মহাবিপদের বার্তা নিয়েই আসে।

'হবে আর কী বল—কান্তিচন্দ্র তোমাদের ফেল ক'রে বসে আছেন?'

'ফেল করেছে! কান্তি ফেল করেছে!' বার দুই বিহ্বলের মত প্রশ্ন করেন শ্যামা।

বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। বিশ্বাস করার কথাও নয়। এবারেও যে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেছিল। প্রাইজ পেয়েছিল। প্রাইজের বই এখানেই রেখে গেছে সে। এখনও রয়েছে ও-ঘরে।

'তার যে এবার পাস দেবার কথা!' কনক প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ গো—পাস দেবারই তো কথা। তা ঐ বড় পাসের আগে একটা কি ছোট পাসও দিতে হয়—তবে বড় পাস দিতে যেতে দেয় তো, সেই পাসই দিতে পারে নি—সব বিষয়ে নাকি ফেল করেছিল।

'কিন্তু তা কী ক'রে হবে ঠাকুরঝি। এই বছরেই সে প্রথম হয়েছে সে কি ক'রে সব বিষয়ে ফেল হ'তে পারে! হয়ত খুব ভাল না হ'তে পারে, হয়ত দুটো-একটায় দৈবাৎ ফেল হ'তে পারে—তাই বলে সবেতে ফেল! পাশের এগজামিনেই বসতে দেবে না?'

'সে এগজামিন তো কবে হয়ে গেছে। সে কী আর বাকী আছে তোমার!'

'কিন্তু সে কী রকম করে হ'ল বটু ঠাকুরঝি! আপনি শুনলেন কার কাছে?'

'আবার কার কাছে। খোদ তোমার নন্দায়ের কাছে। মিথ্যে বলবার বান্দা সে নয়। তারও খুব দুঃখ হয়েছে। তার মুখটাও তো পুড়ল। বড় মুখ করে রেখে এসেছিল। আসলে ওরই ভুল হয়েছে, আমার ননদ ভালমানুষ হ'লে কি হবে—পাড়াটা যে খারাপ। ছেলে তো বকে যাবেই।'

সেই প্রথম একটি বিহ্বল প্রশ্নের পর একটি কথাও বলতে পারেন নি। শ্যামা: কোন প্রশ্নই করতে পারেন নি। মহাশ্বেতার শেষ কথাটায় প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'কি বললি, কি বলেছেন জামাই—বকে গেছে। কান্তি বকে গেছে?'

এইবার বোধ হয় মার অব্যক্ত ব্যথার আর্তস্বরে লজ্জা পেল মহা, মাথা হেঁট করে বললে, 'তাই তো বলেছে রতন তোমার জামাইকে। অবশ্য রতন ঠিক বলে নি। সে নাকি একটা কথাও বলতে পারে নি ঘাড় হেঁট করে ছিল সর্বক্ষণ। বলি তারও খুব লজ্জা হয়েছে তো গা, বিশ্বাস করে তার কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিল। বলেছে ওদের মুকো ঝি, রতনের সামনেই বলেছে। খুব নাকি বকে গিয়েছিল ওরা নাকি মোটে টের পায় নি। এদান্তে নাকি ইস্কুলেও যেত না। কাজেই কোথায় কি কখন করছে—এরা জানতে পারে নি। ঐ ছাই কী যেন এগজামিন তার ফল বেরোতে তখন সবায়ের চোখ খুলল, তখন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সব খবর। তোমার জামাই তো অধোবদন একেবারে।...ঐ দিকে গেছল কী কাজে, নতুন বাজারে বুঝি কি দরকার ছিল—হঠাৎ মনে হয়েছে অনেক-দিন তো খোঁজ খবর করা হয় নি, এক-বার খবর নিয়ে যাই। তা খবরের তো ঐ ছিরি। মাথা হেঁট করে ঐ বিত্তান্ত শুনে চলে এল।...আর হবে কি, তোমরা তো কেউ খবরও নাও না—ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত!'

এ অনুযোগের উত্তর দিলে কনকই। সে আর থাকতে পারলে না, বললে, 'আমরা খবর নিলেই বা কী হত ঠাকুর-ঝি, যাদের বাড়িতে আছে তারাই কিছু টের পায় নি—একদিন দুদিনে মানুষ এত খারাপ কিছু হতে পারে না—নিশ্চয় অনেকদিন ধরেই বদসংসর্গে মিশেছে—তা তারাই যদি জানতে না পেরে থাকে, আমরা এক-আধ দিন গিয়ে খবর নিয়ে এলেই কি আর জানতে পারতুম!'

কনকের মনটাও বড় খারাপ হয়ে গেছে। বিয়ের সময় এসে দাঁড়িয়েছিল—মনে আছে—যেন রাজপুত্তুর। যেমন রূপ তেমনি মিষ্টি কথা। সেই ছেলে এমন বিগড়ে গেল।

'না, তবু—' একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মহাশ্বেতা— 'তবু বাড়ির লোক ঘন ঘন যাওয়া-আসা করলে একটু ভয় থাকে বৈকি। এ একেবারে নিশ্চিন্তি তো!'

শ্যামা উত্তর দেন না কোনটারই। আসলে তখন তিনি প্রাণপণে তাঁর অন্তরের ফেনায়িত বিষকে সংযত করছেন, প্রচণ্ড উন্মাকে পরিপাক করছেন প্রাণপণে। তাঁর মাথাতে কথাগুলো ভাল ঢোকে নি—কিছু গুছিয়ে ভাবতেও পারছেন না, সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—আর তার মধ্যে মনের সব যুক্তি ছাপিয়ে যেটা উঠে আসতে চাইছে তা হল একটা ভয়ঙ্কর চণ্ডাল ক্রোধ। একটা বীভৎস কিছু করতে পারলে যেন শান্তি পান তিনি, পৈশাচিক একটা কিছু। এ উষ্মা বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর নয়—এক সঙ্গে যেন অনেকের উপর। এই মেয়ে, জামাই, তার বোন, সেই বিশ্বাস-ঘাতক ছেলে, উদাসীন মোহাচ্ছন্ন বড় ছেলে—সর্বোপরি নিজের অদৃষ্ট এবং এই সমস্তর মূল, এই ছেলে মেয়ের জন্ম-দাতা পরলোকগত স্বামীর ওপরও। সব কটাকে শিক্ষা দেবার মতো একটা কিছু করতে পারলে তবে হয়ত এ ক্রোধের শান্তি হত তাঁর।

ইচ্ছা করছিল এক একবার ঐ মেয়েটাকে ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দেন যে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে এই খবরটা দিতে এসেছে। আবার মনে হচ্ছিল কোমর বেঁধে ছুটে গিয়ে জামাই বা তার

যিনি তোমার মুখ উজ্জ্বল করবেন...

সেই স্বৈরিণী বোনের সঙ্গে খুব খানিকটা ঝগড়া করে আসেন। ছোট-লোকদের মত উগ্র কলহ—তাঁর মেজাজের মতো—ঐ রকম করে কোথাও একটা মনের বিষ ঝাড়তে পারলে যেন শান্তি হয় তাঁর।

কিন্তু কিছুই করা হয় না শেষ অবধি। এ জীবন তাকে আর কিছু না দিক—ধৈর্যটা দিয়েছে খুব। ওটার প্রয়োজনও যেমন হচ্ছে জীবনভোর তেমনি ভগবান তাঁকে দিয়েছেনও খুব অকৃপণ হাতে।

সামলেই নিলেন নিজেকে শেষ পর্যন্ত। শুধু কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় মনের সেই প্রচণ্ড উষ্ণতার সামান্য আভাসটুকু মাত্র ধরা পড়ল।

বললেন, 'তা সে—সে কী করছে এখন? তারসঙ্গে দেখা হ'ল না জামাইয়ের? বাড়ি ছিল না সে? তখুনি কান ধরে তাকে টেনে আনতে পারলেন না, তার বকামি বার করতুম। শয়তান, পেটের শত্তুরের!'

'ওমা সে কোথায় যে তাকে টেনে আনবে!'

বেশ সহজভাবেই কথাগুলো বলে রকে উঠে বসে পা ছড়িয়ে পায়ে হাত বুলোয় মহাশ্বেতা।

'ওখানে নেই? সে কি? তবে সে কোথায়? কৈ এখানে তো আসে নি! এসব কথা তো বলিসনি এতক্ষণ!'

'বলছি বলছি। রোস, বলবার ফুরসৎ পেলুম কোথায়। ...ওরা নাকি এখানেই পাঠাতে চেয়েছিল, বলেছিল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও কিন্তু তোমার ছেলেই নাকি লজ্জায় আসতে চায়নি। তখন রতনের বর—' কনককে প্রায় দেখিয়েই তার দিকে ইঙ্গিত ক'রে চোখ টিপল মহাশ্বেতা, 'ঐ যে কী বাবু, তার যেন কোন দেশে জমিদারী আছে, কী যেন বেশ বললে বাপু নামটা তোমার জামাই—কী যেন আরাম না কি—হ্যাঁ আরামবাগ, আরামবাগ অঞ্চল বলে কী এক জায়গা আছে, খুব নাকি দূরও নয় জায়গাটা এখান থেকে—সেইখানেই পাঠিয়েছে। ওদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়েই ইস্কুল আছে, ওদের কাছারীবাড়িতে থাকবে আর সেই ইস্কুলে পড়াবে এ-বছরটা। তারপর এবছর যদি ঐ মাঝারি এগজামিনে পাস করতে পারে, তখন থাকবে আমার এখানে।'

একনিঃশ্বাসে এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে পেরে একবার যেন বিজয়-গর্বে চারিদিক চেয়ে নিল সে।

শ্যামা আরও স্তম্ভিত হয়ে যান।

'আরামবাগ! সেতো শুনেছি হুগলী জেলায়। আমাদের এ'দের কথর শিষ্য ছিল সেখানে—শাশুড়ির মুখে শুনেছি। সে তো একেবারে ম্যালিরিয়ার ডিপো, যেসব শিষ্যরা ছিল কেউ টিকতে পারেনি—একধার থেকে মরে হেজে গিয়ে সব পালিয়েছিল ঘরবাড়ি ছেড়ে। সেই-খানে পাঠিয়েছে আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে! কী আস্পদ্দা তাদের। কেন পাঠায় কার হুকুমে পাঠায় তাই শুনি। আমাদের একবার জিজ্ঞেস নেই বাদ নেই—খবর করা নেই ড্যাং ক'রে পাঠিয়ে দিলে! বাঃ, বেশ তো!'

মহা এবার একটু বিরক্তই হয়ে ওঠে, 'তা বাপু একযাই তাদেরই দোষ দিচ্ছ কেন! তোমার ছেলে তোমাদের কাছে আসতে না চেয়ে থাকে, খবর দিতে না দিয়ে থাকে তো তারা কি করবে! ঐ খানে বসিয়ে রেখে দেবে ছেলেকে আরও মাথাটি বেশী ক'রে চিবিয়ে খাবার জন্যে! এখানে থেকে নষ্ট হয়ে যেত, ভালই তো করেছে দূরদেশে পাড়াগাঁয়ে পাঠিয়ে। কী এমন অন্যায়টা করেছে তা তো বুঝলুম না। ম্যালেরিয়া—বলি সে গাঁয়ে কি সবাই ম্যালেরিয়ায় উজ্জ্বড় উঠে যাচ্ছে ফী বছর? তাহ'লে গাঁয়ে লোক আছে কি ক'রে, ইস্কুলটা চলছে কী ক'রে? পড়ছে কে?'

তারপর একটু থেকে বললে, 'তা বেশ তো, তোমাদের পছন্দ না হয় আনিয়ে নাও না। এ তো আর জোর-জবরদস্তীর কথা নয়। তোমার বড় ছেলেকে পাঠাও, ঠিকানা নাও, চিঠি লেখ কিম্বা কেউ গিয়ে কানধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এসো। এতো তোমাদেরই করবার কথা। তোমারা কেউ খবর রাখনি—আমার জামাই ওপযাচক হয়ে খবরটা দিয়ে তো আর এমন কিছু অন্যায় করেনি যে, সেই থেকে আমার ওপর টাঁইশ করছ! আমারই ঘাট হয়েছিল বলতে আসা, শুনেছিলুম চুপ ক'রে বসে থাকলেই হ'ত।'

অভিমানে মহাশ্বেতার গলা ভারী হয়ে আসে।

কিন্তু শ্যামা আরও বিরক্ত হন। বোধকরি অন্তরের সেই বিষটা প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়ায় গলার মধ্যে।

'তুই থাম্ বাপু! কাকে বলছি কী বলছি তা কিছু ভাল ক'রে না শুনে না বুঝে তুই আর গ্যাজোর গ্যাজোর করিসনি। তোকে বলছি না জামাইকে বলছি? আর তোরও তো ভাই—নাকি তোর পর? আমরা ওদের চিনতুম? ও দেখালে কে—জামাই দেখিয়েছেন তো! তোরা খবর রাখবি খবর দিবি—এ এমন আর বড় কথা কি?'

'ঘাট হয়েছিল—হ্যাঁ সেটা স্বীকার করছি একশো বার—ঘাট হয়েছিল তার, তোমাদের উপকার করতে আসা কি ওখানে ছেলে রেখে আসা। তার যে স্বভাব এই—এত জায়গায় এত খোয়ার হয় তবু উপকার করতে যাওয়া চাই!... তা অন্যায় হয়ে গেছে মানছি আমি—কী করবে করো। জামাইকে ধরে ফাসী দেবে না শূলে দেবে—যাতে তোমাদের মন ওঠে তাই করো—আমি আর কী বলব!'

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না, যুক্তির কোন মূল্যই নেই। মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে এই এক নূতন উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে উঠে শ্যামা বলেন, 'আচ্ছা হয়েছে হয়েছে—সে যা করবার জামাইয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করব এখন। তুই এখন সরে যা দিকি সামনে থেকে—'

"তাই যাচ্ছি। একেবারেই যাচ্ছি। থাকতে আসিওনি। ঐ যে বলে না, মনের গুণে ধন। তা তোমারও তাই, মনটা ভাল নয় বলেই যাতে হাত দাও বিষ হয়ে যায়। তুমি নেমোখারাম বলে তোমার ছেলেও তাই হয়েছে!'

সে উঠে হন্ হন্ ক'রে বাড়ির পথ ধরল। কনক হাত ধরে টেনে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে একবার, তার হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

'না ভাই খুব শিক্ষা হয়েছে। জীবন-ভোরই শিক্ষা পাচ্ছি—তবু মন তো মানে না। তবে এবার এই শেষ, জন্মের শেষ!'

চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল সে।

ওর এ জন্মের শেষ এবার নিয়ে অনেক বারই হয়েছে। সম্ভবত কালই আবার ছুটে আসবে ও—তেমন লাগসই কোন কথা থাকলে। সুতরাং মহাশ্বেতার—চলে যাওয়া নিয়ে কোন চিন্তা নেই

শ্যামার। তিনি আড়ষ্ট হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন—কান্তির কথাটা।

তাঁর গর্ভের শ্রেষ্ঠ সন্তান—গর্ব করার মতো ছেলে কান্তি। রূপের তো তুলনা নেই, মেয়েদের মধ্যে ঐন্দ্রিলা, ছেলেদের মধ্যে কান্তি। কিন্তু ঐন্দ্রিলার গুণ নেই—এর তাও আছে। ঐন্দ্রিলা সুযোগ পেয়েও লেখাপড়া শেখেনি—এ-সুযোগ না পেয়েও লেখাপড়ার জন্য পাগল ছিল।

শান্ত বিনয়ী ভদ্র। যেমন মিষ্টভাষী তেমনি সৎ।

মিথ্যা কথা পর্যন্ত কখনও বলতে পারে না।

সেই ছেলে এমন হয়ে গেল! এত বকে গেল!

এমন নষ্ট হ'য়ে গেল যে আর কোন পদার্থ রইল না।

কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা।

আর এই ক-মাসের মধ্যে! এই তো মনে হচ্ছে সেদিন এসে প্রাইজের বইগুলো রেখে গেল।

উনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন পদ্মগ্রামে—মঙ্গলা দেখে কত খুশী হলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

তাঁর পরামর্শটা শুনলেই ভাল হ'ত।

প্রস্তাবটা একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্যামা।

মঙ্গলা বলেছিলেন, 'তোদের পাড়ায় মল্লিকদেরই এক জ্ঞাতি পশ্চিমে থাকে শুনেছি। অগাধ সম্পত্তি করেছে—এক মেয়ে। ঘরজামাই করবার জন্যে সোন্দর ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছেলেমানুষ বর চাই— শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। বিষয় আশয় কারবার দেখতে পারে এমন ভাল-ছেলের দিকেই ঝোঁক। দ্যাখ—তুই বলিস তো আমি খোঁজ খবর করি। এমন ফুটফুটে আর শান্তশিষ্ট ছেলে পেলে লুফে নেবে।'

'হ্যাঁ, মার যেমন কথা! বুড়ো হয়ে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা।... এই ছেলের ওপরই আমার এখন ভরসা—একে বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকব! আর ঘরজামাইতে বড্ড ঘেন্না মা আমার চিরকালের। না, না, সে হয় না।'

'দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস। সত্যিই আমি বড্ড বুড়ো হয়েছি রে— আর বেশী দিন নাই।...তবে দিলে ভাল করতিস—বামনী, এমন ডবকা ছেলে শহরে রেখে দিয়েছিস—ফেরৎ পেলে হয়!'

সেই শেষ কান্তি এসেছিল। হাঁ—মধ্যে আর একদিন এসেছিল, বিজয়ার দিন। তাও পুরো একটা দিনও থাকেনি। সন্ধ্যায় এসেছিল ভোরে চলে গেছে।

মঙ্গলা ঠাকরুণের আশংকা যে, এমন হাতে হাতে ফলবে—তা কে জানত। তাহ'লে কি আর ছেড়ে দিতেন!

মঙ্গলা চিরদিন তাদের মঙ্গলই করেছেন এটা ঠিক। রাগারাগি ঝগড়া যে হয়নি তা নয়—কিন্তু আজ ঠাণ্ডা মাথায় শ্যামা ভেবে দেখেন যে, দোষ তাঁদেরই বেশী ছিল। এতটা যে সহ্য করেছেন ও'রা এই আশ্চর্য। এখনকার দিনের মানুষ হ'লে সহ্য করত না। কী অন্যায় না করেছেন তাঁর স্বামী—ব্রাহ্মণ যদি অভিসম্পাত দিয়ে চলে যায়—এই ভয়ে সব সহ্য করেছেন ও'রা। মহাশ্বেতার বিয়ে, ঐন্দ্রিলার বিয়ে, তরুর বিয়ে পর্যন্ত—সবই মঙ্গলার যোগাযোগ হ'য়েছে। চিরদিনের উপকারী মানুষ।

খুব উচিত ছিল শ্যামার—মঙ্গলার কথা শোনা, অন্তত সতর্ক হওয়া।

বিষয়ী কায়স্থ পরিবারের মেয়ে, বিষয়ী কায়স্থ পরিবারের বধূ—বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ির মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত। ভূয়োদর্শী স্ত্রীলোক মঙ্গলা—তাতেও সন্দেহ নেই। অনেক দেখেছেন জীবনে, অনেক বেশী মানুষ চেনেন। তাঁর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি।

আসলে কান্তির যে ঠিক এতটা বয়স হয়ে গেছে, সত্যিই ডবকা হয়ে উঠেছে—সেইটেই খেয়াল হয়নি শ্যামার। অনেক বেশী বয়সে পড়াশুনো শুরুই করেছে কান্তি—সুতরাং বয়স হয়েছে বৈকি!

বকে যাবার তো এ-ই বয়স!

তাঁর ছেলে, তাঁর তাই নজরে পড়েনি। ছেলে কবে বড় হয়ে যায় মা তা বুঝতে পারে না—পরের নজরে ঠিক পড়ে। মঙ্গলা ঠিকই ধরেছেন।

তাছাড়া তাঁর মা একটা কথা বলতেন 'আকরে টানে!' যে আকর থেকে বেরিয়েছে তার কিছু প্রভাব থাকবেই। ছেলের জন্মদাতা যে কী ছিলেন—সেটাও মনে রাখা উচিত ছিল শ্যামার।

ছুঁচ সুতো হাতে নিয়ে কাঁথার কাপড় সাজিয়েই বসে থাকেন শ্যামা—সেলাই করা আর হয় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে ক্রমশ। কনক সন্ধ্যা দিতে চলে যায়—তবু শ্যামা বসে থাকেন। তাঁর এখনও কাপড় কাচা হয়নি,—বাগানের অনেক কাজ বাকী রইল, সন্ধ্যাহ্নিক আছে—এসব কিছুই মনে পড়ে না তাঁর। বসেই থাকেন চুপ ক'রে।

কত ছেলে তো দস্তুরমতো বকে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে। আবার ভাল হয়ে পড়াশুনো করে মানুষ হয়। কান্তি কি পারবে সামলে নিতে নিজেকে। আবার কি ফিরে পাবেন তাঁর ছেলেকে! তাঁর সেই ছেলে—তাঁর আশা ভরসা, তাঁর গর্ব!

কে জানে সত্যিই বকে গেছে কিনা, গেলেও ঠিক কতটা গেছে! কিছুই যে জানতে পারছেন না এখনও। হেম কাল না গেলে কিছু জানাও যাবে না। এই দীর্ঘ সময়টা কী ক'রে অপেক্ষা করবেন, এই ভেবেই ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকেন শ্যামা।

(ক্রমশঃ)

সত্য সেলুকস,
কী বিচিত্র এই দেশ!

দেখিয়ে সেঠজী,
বিলাইতী চোরাই মাল বেচকে
এত্তা নাফা করনেসে
নেমক দেকে
ডাক্কু ঘুসেগা, হাঁ!

চোরাই বুলেট
চোরাই সোনা
চোরাই অস্ত্র
চোরাই ঘড়ি
ইত্যাদি

ত্রাহি বাপরে!

পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি

স্ট্যান্ডার্ড অব্দি বেঙ্ক! আর দেখি ঐ বইখানা!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু
শাস্তিরূপেণ সংস্থিতা

আয় দেখি তোর সূর্য্যসিদ্ধান্তের দুর্গাপুজোই ঠিক—
না, আমার দৃকসিদ্ধান্তেই ঠিক!

প্রেক্ষাগৃহ
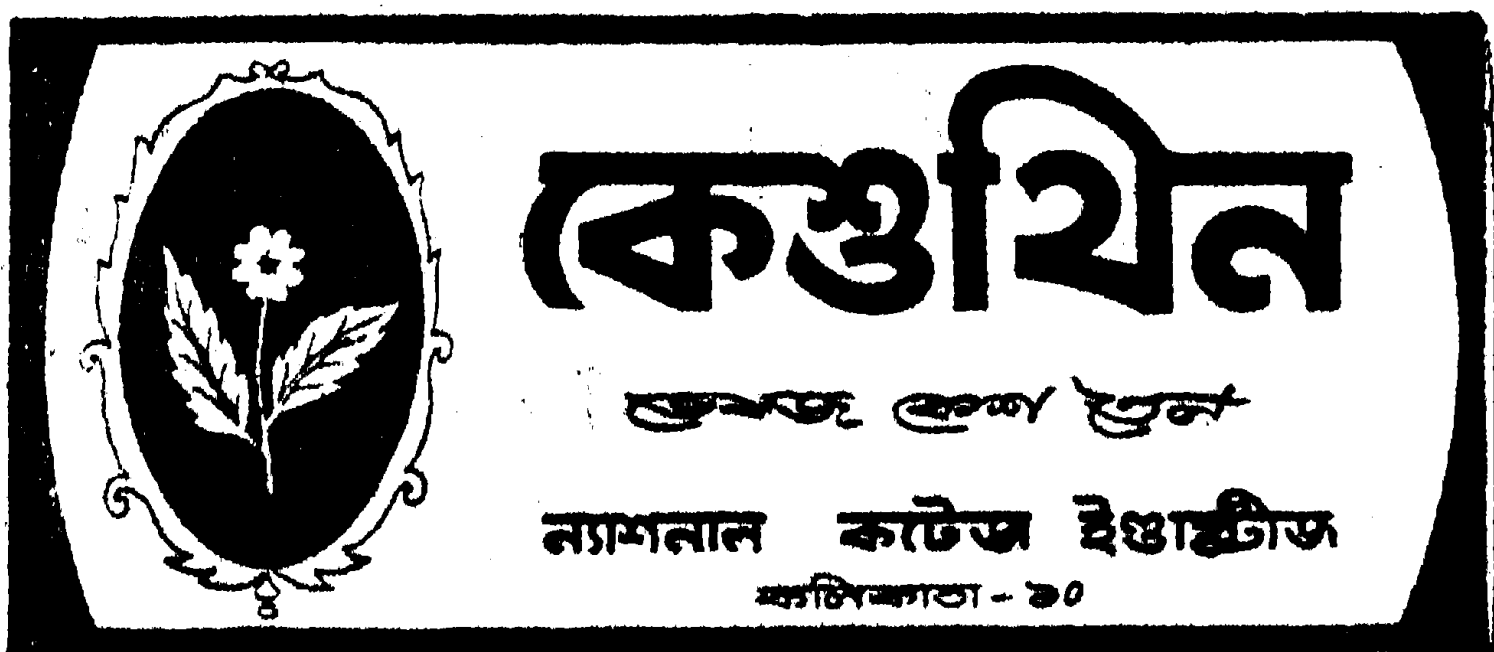
নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

কুমারী-মন (বাঙলা) : ফিল্ম এজ-এর নিবেদন : ১১,৯৯৩ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু; চিত্রনাট্য : ঋত্বিককুমার ঘটক; পরিচালনা : চিত্ররথ; সংগীত-পরিচালনা : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র; চিত্রগ্রহণ : দিলীপ-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়; শব্দধারণ : সুজিত সরকার; শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, আশা, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি। মিতালী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৫ই অক্টোবর থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

শিল্পী, ঋষি এবং কর্মী—এদের কাছে পৃথিবীর সকল জায়গাই সমান। শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে, কবি তাঁর কাব্য-রচনায় এবং কর্মী তাঁর কর্মোদ্যমে যদি বাধা না পেয়ে স্বেচ্ছামত চলতে পান, তা'হলে শহরই বা কি, অজ গ্রামই বা কি, মস্কোই বা কি, নিউইয়র্কই বা কি, পর্বত-চূড়াই বা কি, আর সমুদ্রবক্ষই বা কি—তাঁর কাছে সবই সমান। তাই 'কুমারী মন'-এর নায়ক অসীম যখন সুন্দরবনে আবাদ ক'রতে এসে তার বিস্তীর্ণ জমির গাছগুলিকে নির্মূল ক'রে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে জমিকে চাষোপযোগী ক'রে তুলে তাতে ধানের চারা বসিয়ে ফসল তোলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল, তখন কাজের নেশার মধ্যে তার একবারও মনে হয়নি, তার শহুরে-মানুষ-হওয়া স্ত্রী কৃষ্ণা সেই ভীতিসংকুল নির্বান্ধব জায়গায় দু'দিনের মধ্যেই বিষাদকাতর হয়ে পড়বে। জীবনের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে প্রকৃতির ভয়াবহতা মিশে কৃষ্ণার মনকে যখন এক দারুণ অনুশোচনায় ভরিয়ে তুলেছে, তখন ফরেস্ট-অফিসারের বেশে তার সামনে সহসা আবির্ভূত হ'ল তার কুমারী-জীবনের দয়িত প্রণব। হঠাৎ কলেজী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব'লে কৃষ্ণার গুরুজনেরা প্রণবের পরিবর্তে অসীমের সঙ্গেই তার বিবাহ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণা প্রথমে তাকে তার দৃষ্টিপথের বাইরে চ'লে যেতে বললেও তার হাঁফিয়ে-ওঠা মন কিন্ত তার কাজ-পাগল স্বামীর হাত থেকে বুঝি চিরদিনের জন্যেই মুক্তি চায়। অসীমও কৃষ্ণার মনের গোপন কথার সন্ধান পেয়ে তাকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে নিজেও মুক্ত হ'তে চায়। প্রণব কিন্তু পলায়নপরা কৃষ্ণাকে বলে, সে ভুল করছে; কৃষ্ণা সে-কথা মানতে চায় না। এমন সময়ে অসীমের জীবনে আসে চরম বিপদ; তারই এক কর্মীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় তার নিজ হাতে গ'ড়ে-তোলা আবাদ ভেসে যাবার উপক্রম হয়। এই চরম বিপদ কৃষ্ণাকে ফিরিয়ে আনে অসীমের জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে।

এই মূল উপাখ্যানের সঙ্গে আর একটি প্রেমের উপাখ্যান চলে ছায়ার পাশে আলোর মত। স্থানীয় মেয়ে মরিয়ম ভালোবাসে ইরফানকে; কিন্তু সে বাউল কখন কোথায় থাকে, তার নেই ঠিক। তাই সময় সময় মরিয়ম মরীয়া হয়ে ভাবে, সে নিতাইয়ের সঙ্গেই ঘর বাঁধবে। কিন্তু চরম মুহূর্তে নিতাইয়ের ভয়াল মূর্তি যখন তাকে আঘাত করতেও দ্বিধা করেনা, তখন ইরফান এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

এই দু'টি গল্পকেই পাশাপাশি রেখে ঋত্বিক ঘটক তাঁর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। গল্প দু'টিকে অঙ্গাঙ্গী ক'রে তোলার মধ্যে যে-চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, অসীম-কৃষ্ণার জীবনের ঘটনাগুলিকে আর একটু সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারত। প্রতিটি ঘটনাতেই ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করবার চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটনাই থেকে গেছে; সামগ্রিক নাট্যপ্রবাহে তারা একটি তরঙ্গ থেকে আর একটি বৃহত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করেনি। এমন কি, যে-বাঁধ নায়কের জীবনে চূড়ান্ত সঙ্কটের সৃষ্টি করে, তাকেও দর্শকের সামনে যথাযথ গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। চিত্রনাট্য-রচনার ত্রুটি ছবির সম্ভাবনাকে অনেকাংশে খর্ব করেছে।

বনভূমি, বিস্তীর্ণ প্রবহমান নদ-নদী, সুপরিসর আবাদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যে "কুমারী মন" ছবিটি ভরাট হয়ে রয়েছে। সুন্দরবন এবং তার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল রূপায়িত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নায়কের কাঠের বাড়ী ও মরিয়মের মেটে বাড়ী চিত্রটির দৃশ্য-সম্পদকে নয়নাভিরাম ক'রে তুলেছে। চিত্রশিল্পী দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় যতখানি সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শব্দযন্ত্রী সম্বন্ধে সমান কথা বলা যায় না। বহির্দৃশ্যগুলিতে এবং ছবির প্রায় সবটাই বহির্দৃশ্য—পাত্রপাত্রীর সংলাপ অধিকাংশ সময়েই অস্পষ্ট; বহু চেষ্টা ক'রে বক্তব্য অনুধাবন করিতে হয়। লোক-গীতি এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতগুলি

সঙ্গীত। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আবহ-সঙ্গীত রচনা বহু ক্ষেত্রেই ছবিকে ভাব-সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

অভিনয়ে নায়ক অসীমের ভূমিকাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়; তাঁর কর্মশক্তি, স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্ত্রীর অতৃপ্তিতে নিরুপায়ভাব, গভীর বেদনাহতভাবে তাকে মুক্তিদানের প্রস্তাব—সমস্তই তিনি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকা কৃষ্ণারূপে কণিকা মজুমদারকে মানিয়েছে চমৎকার এবং তাঁর অভিনয়ও হয়েছে চরিত্রোপযোগী; প্রথমে আনন্দ, পরে নিরাশা, ক্রমে মনের বিদ্রোহীভাব, মুক্তির আশায় উত্তেজনা—প্রতিটি ভাবই তিনি সুচারুরূপে প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে মরিয়ম বেশে সন্ধ্যা রায়, নিতাই রূপে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং ইরফানরূপে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

স্টুডিও থেকে বলছি

চলচ্চিত্র শিল্পকলার পর্বপ্রথমায় প্রস্তুতি এই প্রয়োগশালার মাধ্যমে শিল্পায়নের পরীক্ষা চলে। শিল্পী ও কলাকুশলীদের সৃষ্টির ওপর নির্ভর করে এই চলচ্চিত্র। প্রেক্ষাগৃহে যে ছবি 'সর্বজনবন্দিত' তার সংবৃতির পেছনে যে সাধনা তার কথাই এবারে বলছি। অভিনয় ছাড়াও ছবিকে সুন্দর এবং দৃশ্যানুযায়ী মনোরম করে তুলতে প্রথমেই শিল্পনির্দেশকের কাজ শুরু হয়। দৃশ্যরচন কৌশল প্রয়োগে একটা

বিবিধ সংবাদ

'দক্ষিণী'র সমাবর্তন উৎসব :

গেল রবিবার, ৩০-এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আশুতোষ কলেজ হলে এক মনোরম পরিবেশে দক্ষিণ কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত নৃত্যগীত শিক্ষাকেন্দ্র 'দক্ষিণী'র সমাবর্তন উৎসব সুসম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরভাণ্ডারী শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ১৯৬২ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যকলার অন্ত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ঊনষাটজন ছাত্রছাত্রীকে সম্মানপত্র দেওয়া হয়। শ্রীদস্তিদার তাঁর ভাষণে বলেন, গানে প্রাণ আনার জন্যে দরকার ভালো শিক্ষকের। দক্ষিণী সেই অতি প্রয়োজনীয় কাজটাই কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করছে।

উৎসবে দক্ষিণীর ছাত্রছাত্রীরা একক ও সমবেতভাবে কয়েকটি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে রূপদান করেন।

পরলোকে মহম্মদ ইসরাইল :

মঞ্চ ও চিত্রের সার্থক চরিত্রাভিনেতা মহম্মদ ইসরাইল দীর্ঘদিন রোগভোগের পর সম্প্রতি স্বগ্রামে দেহত্যাগ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এমন হৃদয়বান অমায়িক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ আমরা কদাচিৎ পেয়েছি। তাঁর পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুক।
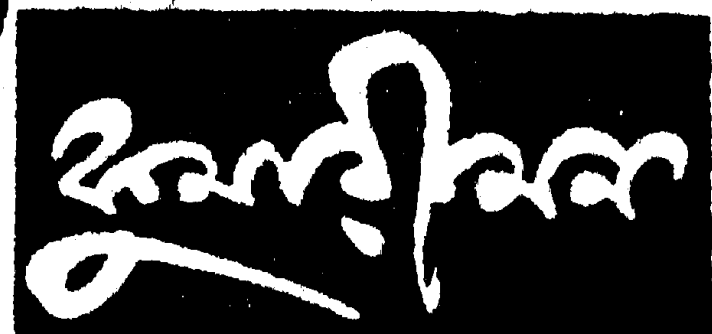
কোন আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে যে 'সেট' বা পৃষ্ঠপট ব্যবহার হয় তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শিল্পনির্দেশকের। পটভূমিকার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে দৃশ্যানুযায়ী সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ব্যবহার তিনিই করে থাকেন।

সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোনে 'দুই নারী'-এর সেট নির্মাণ করছিলেন তরুণ শিল্পনির্দেশক প্রসাদ মিত্র। কথায় কথায় শিল্পনির্দেশনার করণীয় কাজগুলি সম্পর্কে যে আলোচনা হয় এ'র সঙ্গে সে কথা আপনাদের বলছি।

চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য পরিচালকের প্রয়োগশালায় প্রথম প্রয়োজন সেট বা পৃষ্ঠপটের। অনেক সময় রাতারাতি এই সেট নির্মাণের কাজ শেষ করতে হয় যার ফলে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে কখনোসখনো। এখনও পর্যন্ত এখানে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োগশালা নেই। সব সংস্থাই স্টুডিও ভাড়া করে ছবির স্যুটিং আরম্ভ করেন। এবং সেই-কারণেই সব সময় সেট তৈরী করবার উপযুক্ত সময় পাওয়া যায় না।

পরিচালকের কাছে কাহিনীর চিত্রনাট্য শুনে নেবার পর শিল্পনির্দেশক দৃশ্যরচনার একটা নক্সা করে নেন। পরিকল্পনার পর তিনি সহকর্মীদের সমস্ত বুঝিয়ে দেন। যেমন প্রথমে আলোকচিত্রশিল্পীর চিত্রগ্রহণের জন্য কোন বাড়ীর ঘরগুলি কোণাকুণিভাবে একটা কোণ ঠিক করে নিয়ে তবে ঘর নির্মাণ কার্য শুরু হয়। ঘরের গভীরতা অনেকটা না বাড়ালে শব্দযন্ত্রগ্রহণের 'বুম' সহজে চরিত্রগতির সঙ্গে চলাফেরা করতে পারে না। তাছাড়া ঘরের চার দেয়ালের বদলে তিনটি দেওয়াল সাধারণতঃ নির্মিত হয় তার কারণ ক্যামেরা ও কলাকুশলীদের একটা দিক খোলা রাখতে হয় চিত্রগ্রহণের জন্য। স্টুডিওতে চলচ্চিত্রের জন্য যে বাড়ী বা ঘর তৈরী হয় তা কিন্তু সত্যিকারের ইঁট আর সিমেন্ট দিয়ে পাকা গাঁথুনি হয় না। এখানে কাঠ, কাপড় আর লোহার পেরেক দিয়ে ঘর তৈরী হয়। খুব অবাক মনে হচ্ছে তো? এই কাঠ আর পেরেক দিয়ে স্টুডিও ফ্লাট বা দেওয়ালে রঙ করে পাকা বাড়ীর মত মনে হয়। এইভাবে কখনো রাজপ্রাসাদ কখনো কুঁড়ে ঘর গল্পের পরিবেশ অনুযায়ী নির্মিত হয়। এই নির্মাণ কার্যে খড়ি দিয়ে
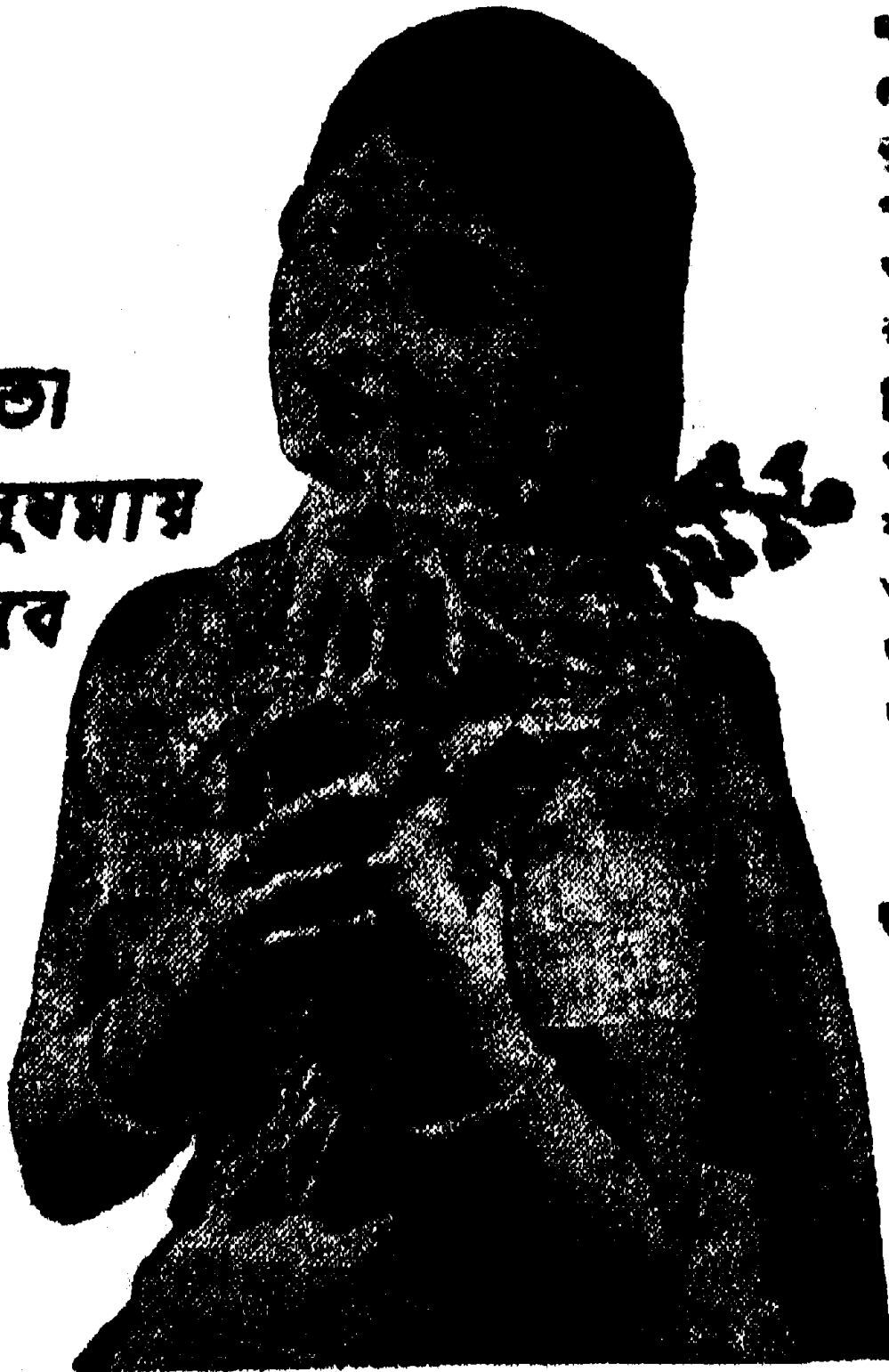
ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় শিল্পনির্দেশক প্রসাদ মিত্র 'দুই নারী' ছিবের একটি সেট নির্মাণ করছেন তার সহকারীদের সঙ্গে।

এ সপ্তাহে একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী চিত্র শক্তি ফিল্মস-এর "নটী বয়"এ কল্পনা। পরিচালনা করেছেন শক্তি সামন্ত এবং সুরযোজনা করেছেন শচীন দেববর্মণ।

আঁকা জায়গায় হিসেব করে দেওয়াল, দরজা আর জানলা বসিয়ে দেওয়া হয়। কাঠ আর কাপড়ের দেওয়াল ঠিক হলে তার ওপর আবার লম্বা লম্বা কাঠের তক্তা লাগাতে হয় চিত্রশিল্পীর আলোর পরিমাপটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে। আর একটা কথা মনে রাখবেন স্টুডিওর বাড়ীতে ঘরের ছাদ থাকে না। প্রয়োজন হয় না বলেই সাধারণতঃ ছাদ তৈরী করতে হয় না। ঘর তৈরী হলে দেওয়ালে লাল, নীল, হলদে রঙ করা হয় শিল্পীর জামা-কাপড়ের রঙ মিলিয়ে। কেউ কেউ চিত্রগ্রাহক দেওয়ালের রঙ হাল্কা পছন্দ করেন আর কেউ গাঢ়। রঙ শুকিয়ে গেলে ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের সাজানো গোছানো চলে। কোথায় কোন জিনিস দরকার এবং কিভাবে সাজাতে হবে তারও সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিল্পনির্দেশকের।

•

শিল্পনির্দেশনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ধরা পড়ে যখন বহির্দৃশ্যের সঙ্গে স্টুডিওর ভেতরকার দৃশ্যের কোন তফাৎ ধরা যায় না। পরিবেশ অনুযায়ী এই দৃশ্য নির্মাণের মধ্যে ছবি দেখবার সময় দর্শকেরা বুঝে নেন যেন সাত্যি-কারের পাকাপাকি সব ব্যবস্থা হয়েছে ছবির কাহিনী মাধ্যমে। এটুকুই মোটা-মুটি শিল্পনির্দেশকের কাজ একটা ছবিতে। তারপর অন্যান্য কলাকুশলীদের কাজ চলে চলচ্চিত্রগতির সঙ্গে।

—চিত্রদূত

খেলাধুলা

দর্শক

জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবল প্রতিযোগিতা

বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবের নব-নির্মিত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ৫—০ গোলে উড়িষ্যাকে পরাজিত ক'রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ট্রফি জয় করেছে। অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিযোগিতাটি এ বছর প্রথম আরম্ভ হল। প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে এই তিনটি দল ষ্ট্যাণ্ড-বাই ছিল—বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ১৪—০ গোলে কেরালাকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। কেরালার বিপক্ষে বাংলার পক্ষে গোল দিয়েছিলেন অশোক চ্যাটার্জি ৬, এন বিশ্বাস ৪, এ্যান্টনি ২, মীর কাশিম ১ (পেনাল্টি) এবং পি বাগ্গাল ১। এই খেলার প্রতি অর্ধে বাংলা সাতটি ক'রে গোল দেয়। প্রথমার্ধের খেলায় বাংলার সেন্টার ফরওয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি ৫টা গোল দেন।

সেমি-ফাইনালে বাংলার সঙ্গে খেলা পড়ে মাদ্রাজের। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আগে মাদ্রাজ দল মাঠ ত্যাগ করায় খেলাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। এই সময়ে বাংলা ৫—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। মাদ্রাজ দল একাধিক সময়ে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেয়। বিপদজনক খেলার দরুণ রেফারী মাদ্রাজ দলের দু'জনকে সতর্ক ক'রে দেন এবং একজনকে খেলার মাঠ ত্যাগ করার আদেশ দেন। টুর্ণামেন্ট কমিটি বাংলাকে বিজয়ী দল বলে ঘোষণা করে। এইদিনের খেলায় বাংলার পক্ষে মীর কাশিম ২, এ্যান্টনি ২ এবং অশোক চ্যাটার্জি ১টি গোল দিয়েছিলেন।

ফাইনাল খেলার দিন খেলা আরম্ভের আধঘণ্টা আগে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ফলে মাঠের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় উন্নত ধরণের খেলা সম্ভব ছিল না। মাঠের অবস্থা বাংলা দলের অনুকূলে ছিল। প্রথমার্ধের খেলায় বাংলা ৩—০ গোলে অগ্রগামী হয়।

বাংলার সেন্টার ফরওয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি 'হ্যাট-ট্রিক' সমেত চারটে গোল দেন। দলের দ্বিতীয় গোলটি দেন রাইন-ইন এ্যান্টনী। অশোক চ্যাটার্জি দলের প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম গোল করেন। বাংলা দল প্রতিযোগিতার তিনটি খেলায় মোট ২৪টি গোল দেয়—

কোয়ার্টার-ফাইনাল

মাদ্রাজ ১ : মহারাষ্ট্র ০
বাংলা ১৪ : কেরালা ০
মধ্যপ্রদেশ ২ : আসাম ০
উড়িষ্যা ১, ২ : : অন্ধ্র ১, ১

সেমি-ফাইনাল

বাংলা ৫ : মাদ্রাজ ০
উড়িষ্যা ৪ : মধ্যপ্রদেশ ২

ফাইনাল

বাংলা ৫ : উড়িষ্যা ০

বাংলা দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি একাই ১১টি গোল দেওয়ার গৌরব লাভ করেন।

॥ ভারতীয় ক্রিকেট প্রসঙ্গ ॥

আগামী ক্রিকেট মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে পাকিস্তান সফরের কথা ছিল সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব অনুসারে সেই সফর অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় পাকিস্তান সফর সম্পর্কে আলোচনার সময় পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ এই সফর স্থগিত রাখার কারণ, পাকিস্তানের কয়েকজন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করায় পাকিস্তানের পক্ষে শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আগামী বছরের গোড়াতেই 'রমজান' পড়ায় পাকিস্তান খেলোয়াড়দের পক্ষে খেলায় যোগদান করা খুবই অসুবিধার কারণ।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চারজন ফাস্ট বোলার—চেস্টার ওয়াটসন, চার্লস স্টেয়ার্স, লেস্টার কিং এবং রয় গিলক্রাইস্টের নিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই চারজন ফাস্ট বোলার রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার নক-আউট পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিজয়ী দলের পক্ষে এবং দলীপ সিংজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন।

মাদ্রাজ অঞ্চলের বিজয়ী দলের পক্ষে রয় গিলক্রাইস্ট, মধ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলের বিজয়ী দলের পক্ষে চার্লস স্টেয়ার্স, উত্তরাঞ্চলের বিজয়ী দলের পক্ষে চেস্টার ওয়াটসন এবং পূর্বাঞ্চলের বিজয়ী দলের পক্ষে লেস্টার কিং খেলবেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই চারজন বোলার ভারতীয় বোলারদের ফাস্ট বল দেওয়ার তালিম দিবেন না; কেবল তাঁদের সঙ্গে খেলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফাস্ট বলে খেলার অনুশীলন করবেন।

১৯৬৭—৬৮ সালের ক্রিকেট মরসুমে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করেই ভারতীয় দল যাবে নিউজিল্যাণ্ডে। নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই প্রথম সফর। ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল প্রথম ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের কাছে টেস্ট সিরিজে ০—২ খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছিল। বাকি তিনটে টেস্ট খেলা ড্র ছিল।

১৯৬৩—৬৪ সালের ক্রিকেট মরসুমে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে যাবে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড এক প্রস্তাব করেছে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে এই দলটি বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলিকাতায় টেস্ট ম্যাচ খেলতে চায়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে পাঁচটা টেস্ট ম্যাচ খেলার প্রস্তাব করা হয়েছে।

॥ শ্রী জি ডি সোন্ধী প্রসঙ্গ ॥

এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের অন্যতম সদস্য-দেশ ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে (ফরমোজা) জাকার্তার গত চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করার প্রতিবাদে জাকার্তায় অবস্থানকালে শ্রী জি ডি সোন্ধি যে প্রস্তাব এবং দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন, সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কাউন্সিল সভায় শ্রীসোন্ধির প্রস্তাব এবং দৃঢ়তাকে প্রশংসা করা হয় এবং সে সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় আরও এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কমিটি যদি শ্রীসোন্ধি এবং ভারতবর্ষের প্রতি তাদের অপমান-সূচক পূর্ব ব্যবহারের জন্যে একমাসের মধ্যে ক্ষমা-প্রার্থনা না করে তাহলে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষের পক্ষে অর্জিত, পদকসমূহ উদ্যোক্তা কমিটির কাছে ফেরত দেওয়া হবে।

জয়ন্ত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অত্যন্ত আরামদায়ক

নং ২৫৫

নং ৯০০

নং ৬৫৫

নং ১০৪

নং ৬৭
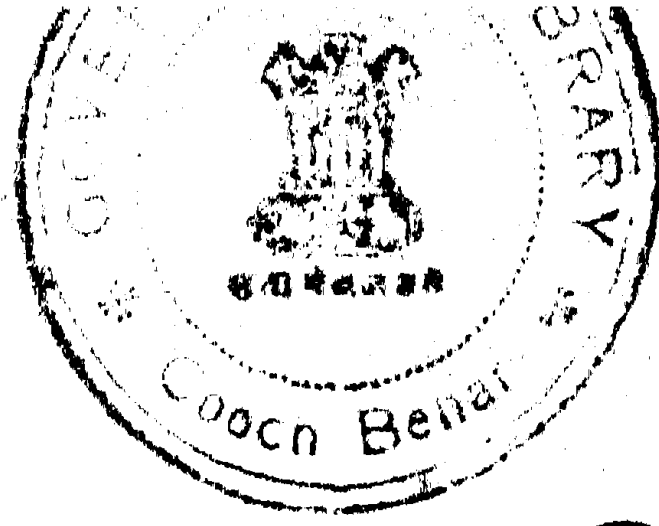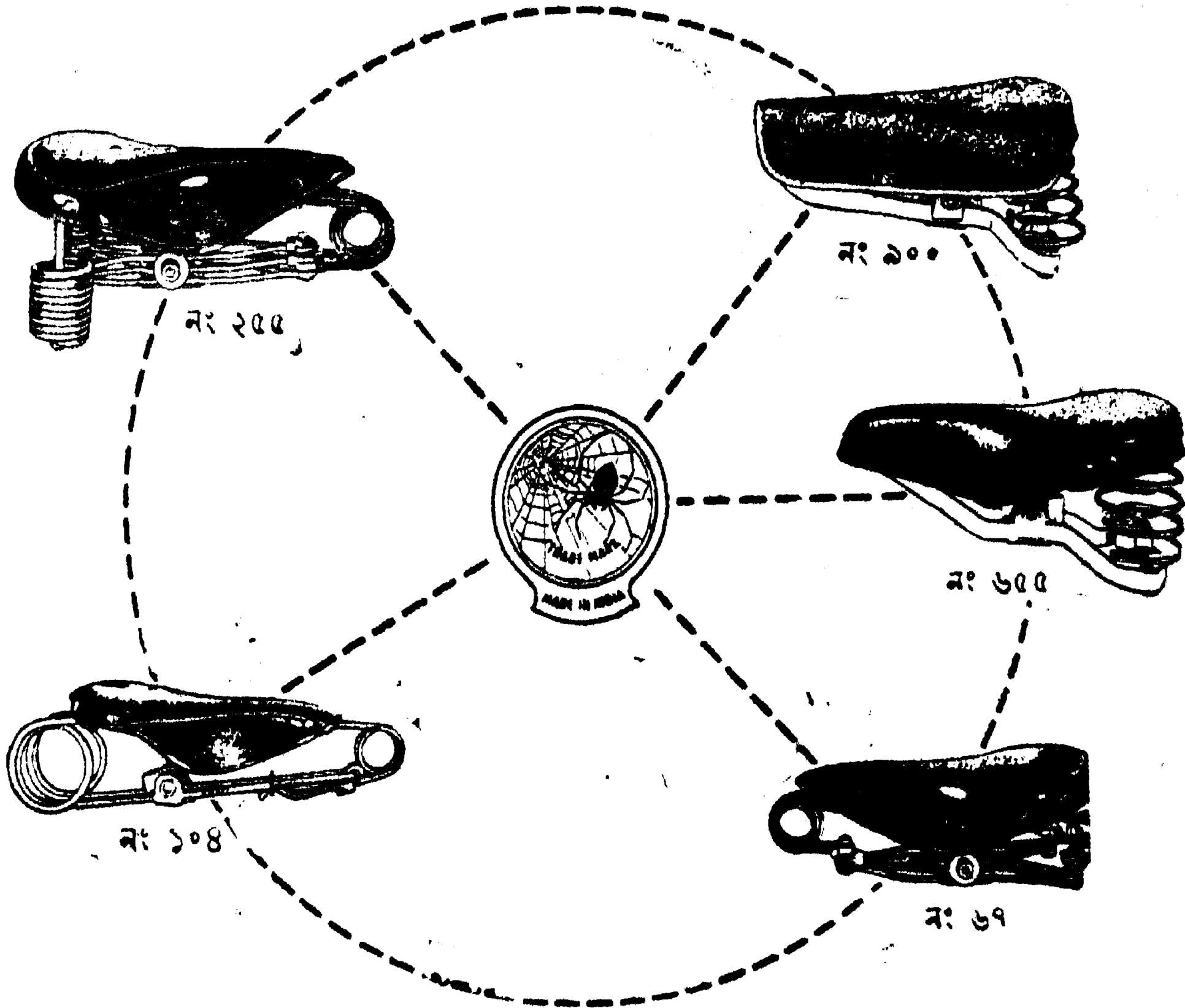
উইট্‌কপ

সীট—বিভিন্ন টেঁকসই ডিজাইনে পাওয়া যায়

প্রথম শ্রেণীর বাট লেদার এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাতের স্প্রিং-এ তৈরী

SEN RALEIGH Products

প্রস্তুতকারক

সেন-র‍্যালে

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খন্ড, ২৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২রা কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 19th. October, 1962.
40 Naya Paise

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু বিগত শনিবার ২৬শে আশ্বিন প্রাতে তিনদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরের কারণে সিংহলে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাগত সম্বর্ধনা, শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সফরের পূর্ণ বিবরণ ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সে সকলের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ মন্তব্য ইত্যাদি—যাহা এই সফরের কালে তিনি প্রকাশ্যভাবে বিবৃত করিয়াছেন—হইতে ভারত ও ভারতবাসীদিগের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারার গতিমুখ বিচার করা। মন্ত্রগুপ্তি পণ্ডিত নেহরুর স্বভাবগত রীতি-নীতির বহির্ভূত। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যে যাহা বলেন তাহা হইতে তাঁহার মনের কথার অনেক কিছুই প্রকাশ পায়।

শনিবার অপরাহ্নে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সিংহল সংসদের এক যুক্ত অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ-দান করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই ভারত শান্তিপূর্ণ পন্থায় কার্যোদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী আছে। এই পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারত বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করিয়াছে। • তবু বর্তমানে আমরা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি যাহা আদৌ প্রীতিপদ নয় এবং ভারতকে রীতিমত দুরূহ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে।"

এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য এইমাত্র করা যায় যে, যে ব্যক্তি শ্বাপদসংকুল অরণ্যপথে একেলা, অসতর্ক ও ঊর্ধ্ববাহু হইয়া চলিতে থাকে তাহার পক্ষে বিপদ-আপদ ও শান্তিভঙ্গের সম্মুখীন না হওয়াই আশ্চর্য। বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে পণ্ডিত নেহরু, তাঁহার সহকর্মী ও পরামর্শদাতাগণ; ভারতের প্রতিরক্ষা যে পন্থায় এতদিন করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বিপদ ডাকিয়া আনা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

আমরা শান্তিকামী ও অহিংসানীতির সমর্থক ইহা সত্য এবং ইহাও সত্য যে, শান্তিবাদ ও অহিংসনীতিই মনুষ্য জগতের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া কারণে-অকারণে, সময়ে-অসময়ে "আমি পরম ধার্মিক, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপথ হইতে জগৎকে শান্তির পথে আনিব"—এই চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে যে যাহাদের সঙ্গে আমাদের নিত্যদিন আদান-প্রদান করা অত্যাবশ্যক তাহাদের মধ্যে একদল আমাদের এই উপদেশ ও উন্নাসিকতায় জর্জরিত ও বিরক্ত হইয়া স্থির করিয়াছে যে, আমরা বকধার্মিক এবং সেই কারণে আমাদের শত্রুদল যখন আমাদের নিন্দাবাদ করে তখন তাহারা সেই নিন্দা উপভোগ করে। এই কারণে গোয়ার ব্যাপারে সারা পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই কারণেই পাকিস্তান কাশ্মীরের ব্যাপারে আইরিশ রাষ্ট্রের মত নিরপেক্ষ দেশকেও আমাদের বিরুদ্ধে আনিতে সমর্থ হয়।

আমাদের "Holier than thou"—তোমাপেক্ষা (আমি) সাধু—এই ভঙ্গী একদিকে যেমন জগতে বিরক্তি ও বিদ্রূপের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে আমাদের শত্রুদের নিকট উহা দাঁড়াইয়াছে ক্লীবত্বের পরিচায়ক। বর্তমানে যে চীন, পাকিস্তান—এমনকি নেপাল—আমাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাইতে দ্বিধা করিতেছে না তাহার মূল কারণ এই যে, তাহারা মনে করে যে, ভারতের শক্তি-সামর্থ্য যতই থাকুক এবং ভারত-মাতার সন্তানগণ যতই যুদ্ধক্ষম হউক, তাহাদের কর্তৃ-পক্ষ-কর্ণধারবৃন্দ ক্লীব ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে অসমর্থ এবং সেই কারণে তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহে এতো ভয় ও এতো অনিচ্ছা।

ভারতের মত এতো বড় একটা দেশের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা কি এতই সহজ? পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, তিনি ভারতকে তাহার চিরন্তন আদর্শের পথে চালিত করিতে চেষ্টিত এবং সেকথা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের লেখন কি বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ গৃহচ্ছেদকারী শত্রুর কার্য-কলাপে দেশের নিরাপত্তাকে—ভিতরে ও বাহিরে—ধ্বংস করিতে পারে—সে বিষয়ে পণ্ডিতজীকে কোনও শিক্ষা দিতে পারে নাই?

কবিতা

আজ তোমার চিঠি এল......

অতীন্দ্র মজুমদার

আজ বুঝি চিঠি এল, প্রেমিক আমার,
আমার এই বন্ধ দরজায়—
যেখানে জমেছে ধুলো, অনাদরে অপমানে
শ্যাওলায় পিচ্ছিল শিরীষে
একটাও ফোটে না ফুল, রিক্ত হাওয়া করে হায় হায়
এই ক্লিষ্ট স্নেহহীন ইচ্ছার চেয়েও ক্ষীণ
দেহের শাখায়—
সেখানে দিনের ক্রুদ্ধ দাবদাহ শেষ হলে রাত্রির মতন
এসেছে তোমার চিঠি—
আমি তাকে তুলে নিই, ঢেকে রাখি বুকের উত্তাপে,
প্রেমিক আমার।

আজকে আকাশে সেই আশ্চর্য খবর, প্রেমিক আমার,
শরতের নম্র রোদে স্পন্দমান আলোকের স্রোতে
অশ্রুত সে গান এল জ্যোতির রশ্মির বীণাতারে,
প্রেমিক আমার—
পক্ষাঘাতে রুগ্ন নিঃস্ব বাতাসের সব স্নায়ু আজকে হঠাৎ
আকাশগঙ্গার স্পর্শে আবার সচল;
বাউল শিরীষ গাছে পলাতক নিস্পৃহ যৌবন
আবার যে হয়েছে সফল!
নরম নদীর জলে, মেঠো পথে আকুল ভোমরার
প্রসন্ন পাখার শব্দে হৃদয়ের রাজার চিঠির
সব কথা সব স্বপ্ন ভোরের গানের মত মনে হয়
প্রেমিক আমার—
আমি তাকে তুলে নিই ঢেকে রাখি বুকের উত্তাপে
অবোধ আনন্দ আর উন্মত্ত কামনা জড়িয়ে
নির্জন দেহের কোষে কোষে।
আজ তোমার চিঠি এল, যে দুয়ার কখনও খোলেনি
সেখানে আশ্চর্য করাঘাতে—
প্রেমিক আমার!

মৃত্যুর পরে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বড়োই বিষণ্ণ যেন হেমন্তের বিদায়ী দিনের
মতন তরণী ওই শব্দহীন দূরে চলে যায়......
ফিরিবে না যেন আর এই পারে, দেখে গেছে ঢের
আমাদের শতকের গূঢ়তম অর্থ, তমসায়
নিখিল বন্দর যেন জেগে আছে মাস্তুলের মতো
মগ্ন জাহাজের। এই শতকের ভগ্নচূড়ারাশি
রাজ্যহীন সম্রাটের মুকুটের প্রায় অজ্ঞানত
জানায় বিক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়ঙ্কর ঘৃণা, অট্টহাসি,
বড়োই বিষণ্ণ ওই হেমন্তের বিদায়ী বিকেল!
বড়ো ম্লান-মৃত কোনো সম্রাজ্ঞীর মুখের মতন
এই ঘাট জেগে আছে। সচকিত তাল নারিকেল
বীথি যেন ম্রিয়মাণ। তরণী চলিয়া গেছে কোন
দূরতম বন্দরের অভিমুখে—যেখানে প্রেতের
নিশ্বাসে ঝরে না পত্র, দলগুলি ঝরে না পুষ্পের?

বেলা নেভার বেলায়

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

বেলা নেভার বেলায় কেন আবার দু'হাত বাড়াস্
ছোট্ট মুঠোয় ভরবেনা তোর ভরবেনারে আলো,
শূন্য হাতে শেষের বিকেল দূরের ছোঁয়া দেবে
ওরে পাগল, সেইটুকুও, সেইটুকুও ভালো।

যতই কেন তাকাস্ তবু আকাশ আলো জ্বালবেনা
আনবে শুধু দূরের ছায়া কান্না দিয়ে ঢাকা
ওই যে বন, মাঠের ঘাস শীর্ণ খড়ের ঘর
ওদের দিকে সারাটা দিন কেবল চেয়ে থাকা!

কেবল চেয়ে থাকা ওরে, কেবল চেয়ে থাকা
কী যে পেলাম পেলাম না কী, দিলাম না কি, কবে?
সংগী যারা হারিয়ে গেল পথের জন-স্রোতে
নিজের এবার হারিয়ে যাবার লগ্ন কখন হবে!

বেলা নেভার বেলায় তবু আবার দু'হাত বাড়াস্
আলো না হ'ক, আসবে কাছে অন্তহীন আকাশ।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেল, রাস্তায় যানবাহনের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর জন্যে পুলিশ একজন বৃদ্ধা ভিখারিণীকে গ্রেপ্তার করেছিল—জেল হাজতে তার কাছে খানাতল্লাশী করে প্রায় আড়াই হাজার টাকার নোট আবিষ্কৃত হয়েছে।

চোরাই মাল নয়, টাকাটা ঐ বৃদ্ধার সারাজীবনের সঞ্চয়। কলকাতার পথে পথে ঘুরে আপনার-আমার কাছ থেকে এক-আধ পয়সা জোগাড় ক'রে অতি কষ্টে গ'ড়ে তুলেছে সে তার দুর্দিনের সম্বল। নিজে অলক্ষ্মীর বেশে ঘুরে বেড়ালেও তার লক্ষ্মীর ভাঁড়ার শূন্য থাকেনি।

তুলনায়, যারা তাকে দু-এক নয়া পয়সার মাপে দান ক'রে সাহায্য করেছে এই সঞ্চয়ের থলি ভ'রে তুলতে, তাদের মধ্যে অনেকেই যে আজ চূড়ান্ত রকম নিঃসম্বল এ আমি হলপ করেই বলতে পারি। এবং এও বলতে পারি যে, এই ভিখারিণী কিংবা অন্য কোনো ভিক্ষুককে জীবনে একটা পয়সাও যদি না দিতো তারা তবুও তারা এমনই নিঃসম্বলই থেকে যেত।

আসলে ব্যাপারটা হল মূল্যজ্ঞানের নিরিখ। ভিখিরীরা এক পয়সার মাপে রোজগার করে বলেই একটি পয়সার মূল্য তাদের কাছে এত বেশি। আর সঞ্চয় করতে মনস্থ করলে এক পয়সা বাঁচাতে পারলে যে একটা পয়সাই বাঁচে এ তো খুবই সোজা হিসেব।

যাই হোক, আমি ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রচার করতে বসিনি। সে কাজ যোগ্যতর ব্যক্তিরা করছেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে, সৎপথে রোজগার ক'রে একজন মধ্যবিত্ত মানুষের যখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেই পরিস্থিতিতেই অন্য একজন মানুষ আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পেশাদার ভিখিরী হিসেবে রাস্তায় নামলে তার ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বিলক্ষণ যৎকিঞ্চিৎ জমিয়েও তুলতে পারে।

উপরের বাক্যটার মধ্যে 'আত্মসম্মান' বলে একটা শব্দ প্রয়োগ করেছি, কথাটা একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার।

পরের কাছে হাত পাততে গেলে যে আত্মসম্মান নষ্ট হয় একথা শিশুরাও বোঝে। সংসারের নিয়ম হল রোজগার করা, অর্থাৎ কোনো-না-কোনো কাজ ক'রে তার বিনিময়ে পয়সা আনা। এ কাজ দৈহিক শ্রমেরও হ'তে পারে, মস্তিষ্কের শ্রমেরও হতে পারে। ভিখিরীরা কোনো-রকম কাজ না করে পয়সা চায়, অতএব ব্যাপারটা হীনতার পর্যায়ে পড়ে। কথাটা ঠিকই। কিন্তু তবু ওর মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ভিক্ষার ব্যাপারটা সম্মানজনক না হলেও, একেবারেই কি কোনো কাজ না করে পয়সা পায় ভিখিরীরা? আমার কেমন যেন খটকা লাগছে।

॥ ঘোষণা ॥

আগামী সংখ্যা থেকে আবার আরম্ভ হচ্ছে স্যার আর্থার কোনান ডয়াল রচিত বিখ্যাত কাহিনীগুলি :

শার্লক হোমসের গল্প

প্রথমত ধরুন, ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে দাতাকে পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া। এটা নিশ্চয়ই একটা কাজ। পুণ্যের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত পাপ। মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেক পাপ করে এই ধারণা থেকেই এসেছে পুণ্যের ধারণা। ভিক্ষা দিলে পুণ্য হয়, অতএব আমরা যারা স্বভাবতই পাপ করতে বাধ্য হই তাদের পাপ কাটানোর সুযোগ দেয় ভিখিরীরা—একে ঠিক কাজ না দিয়ে পয়সা নেওয়া বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, মানুষের করুণা করার প্রবৃত্তি। অনেকে আছেন যাঁরা পাপ-পুণ্যের থিওরীতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁরাও মানুষ, এবং মানুষ বলেই করুণা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মানসিক বৃত্তির অধীন। মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখলে তাঁদের সংবেদনশীল মনে আঘাত লাগে। তখন, শারীরিক আঘাতের মতোই এই মানসিক আঘাতেরও চিকিৎসা করা জরুরী হ'য়ে ওঠে। ভিখিরীরা দান গ্রহণ ক'রে এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সাহায্য করে। অতএব এটা একটা কাজ।

তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে নিজের অস্তিত্বের বিষয়ে সচেতন হতে সাহায্য করা। আমরা সারাদিন যা করি তার প্রধান লক্ষ্যই হল রোজগার করা। এ উপার্জন নেহাৎই আমি এবং আমার পরিবার-প্রতিপালনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে। খতিয়ে দেখলে ব্যাপারটা খুবই স্বার্থপরের মতো দেখায়। যাঁরা বড় মাপের মানুষ তাঁরা দেশনেতা, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সমাজসেবী ইত্যাদি হ'য়ে আত্মগণ্ডীর বাইরেও সমাজের অন্য সকলের জন্যে কিছু ভালো কাজ ক'রে যান। কেউবা কোনো সৎ-কাজের জন্যে এককালীন কিছু দান রেখে চিরস্মরণীয় হন। কিন্তু ছাঁ-পোষা সাধারণ মানুষের জন্যে এসব পথের কোনোটাই ঠিক সুগম নয়। তাঁদের জন্যে রয়েছে এই দু'এক পয়সার ভিক্ষা দেওয়ার রাস্তা। অতএব, 'আমি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছি' এই গরিমা-বোধের সুযোগ দেয় বলে ভিখারীরা বিনা-প্রতিদানে পয়সা নেয় বলা যায় না।

এরকম আরো অনেক পয়েন্ট আছে। কিন্তু লেখাটা শরশয্যা হ'য়ে উঠছে বিবেচনায় ক্ষান্ত হলাম।

শুধু শেষ করার আগে একটা কথা নিবেদন করি। ভিখিরী যখন সমাজে থাকবেই, এবং সেইসঙ্গে থাকবে ভিক্ষা-দানের প্রবৃত্তি, তখন ব্যাপারটা কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্যে সুশৃঙ্খল করা যায় না? যেমন, ব্যক্তিগত দান-গ্রহণের বদলে কোনো আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ দান-গ্রহণের ব্যবস্থা? কারণ, এটা তো ঠিকই যে সব ভিখিরীই আমাদের পূর্বোক্ত ঐ ভিখিরী নারীর মতো আড়াই হাজারী সম্পত্তির মালিক নয়, এবং অনেকেই তারা গরীব—এত গরীব যে ক্ষুধায়, রোগে ও স্বভাবে মানুষ বলেই চেনা যায় না মাঝে মাঝে! মানুষের সংসারে যাতে মোটামুটি মানব-সন্তান হিসেবে এরা বেঁচে থাকতে পারে এমন কি কোনো ব্যবস্থা করা যায় না?

মতামত

সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' প্রসঙ্গে

মাননীয় সম্পাদক,

সত্যজিৎ রায়ের আশ্চর্য সৃষ্টি 'অভিযান' দেখলুম। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এরূপ নিখুঁত পরিচালনার কৃতিত্ব কোন ছবিতে দেখেছি বলে মনে হয় না। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট-মুহূর্তে এরূপ ছবি অত্যন্ত সময়োপযোগী। এরূপ ছবি মাঝে মাঝে তৈরী হলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট দূর হতে পারে।

কিন্তু এরূপ মহৎ ছবি দেখেও দু-একটি বিষয়ে কৌতূহল জাগে, যার জন্য এই পত্রের অবতারণা।

ট্যাক্সি ড্রাইভার নরসিং-এর হৃদয় আত্মগ্লানিতে ভরপুর। তার আক্ষেপ, লোকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 'তুমি' বলে এবং ইংরেজী না জানায় 'ছোটলোক' বলে। কিন্তু তার এ প্রশ্নের উত্তর নীলিদিই দিলেন, "আপনি একথা বলছেন কেন? কই আমার দাদাকে ত ছোট বলে মনে হয় না। ছোটলোক ভদ্রলোক মানুষের নিজ নিজ আচার ব্যবহারেই প্রকাশ পায়"—এই সকল উপদেশ নীলিদি নরসিংহকে দিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নরসিংহের জীবনের কোনই পরিবর্তন হল না এবং নীলিদিকে না পাওয়ার বেদনায় তার উচ্ছৃংখলতার মাত্রা আরো বেড়ে গেল। যে ড্রাইভার মদ্যপ, বেপরোয়া গাড়ী চালায় এবং অশিক্ষিত, যাত্রীদের প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে, সে কি করে অন্যের নিকট হতে ভদ্র ব্যবহার আশা করে? এবং এই জাতীয় কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের সমাজে এখনও আছে। যার জন্য সকল ট্যাক্সি ড্রাইভারকেই এই অপবাদ সহ্য করতে হয়। এবং ওদের এই আচার-আচরণের জন্যেই ট্যাক্সি ড্রাইভার সম্বন্ধে লোকের স্বতন্ত্র ধারণা। কিন্তু আমাদের সমাজেই ভাল ট্যাক্সি ড্রাইভারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

এখানে নায়ক নরসিংহের চরিত্রের এই দুর্বলতা কেন? পরিচালক এখানে নরসিং-এর চরিত্রটিকে ঈষৎ সংশোধন করে একটু অন্য ধরণের ট্যাক্সি ড্রাইভার তৈরী করলে এই ছবি হতে বর্তমান সমাজের ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং দর্শকগণও আরো বেশী কিছু লাভ করতেন না কি?

ইতি—নমস্কারান্তে

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী

কলকাতা—৫

"দর্শক ও সমালোচক প্রসঙ্গে"

মাননীয় সম্পাদক,

নান্দীকর বেশ একটা নতুন জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটাকে নতুন বললাম এই কারণ—তাঁরাই বোধকরি প্রথম 'দর্শক-সমালোচক' বিতর্কের সূত্র করলেন। দর্শকরা (অবশ্য সাধারণ দর্শক) সাধারণতঃ যে কোন ছবি সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠেন, তার কতকগুলি কারণ বর্তমান। সেই কারণগুলির মধ্যেই 'নান্দীকরের' সমস্যার যথার্থ উত্তর পাওয়া যেতে পারে। 'নান্দীকর' দর্শকদের কোন শ্রেণী বিভাগ করেননি। সাধারণ দর্শকদের 'সিনেমা টেকনিক' সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই অনেক সময় কোন তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রের আর্থিক সুরাহা করে দেয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুস্থ পরিচালক অবশ্যই তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করবার জন্য কোন সস্তা আবেগপ্রসূত টেকনিকের সাহায্য গ্রহণ করবেন না।—এবং সেই জন্যই অনেক নামকরা ভালো ছবি দর্শকদের কাছে (অবশ্যই তারা সাধারণ দর্শক) ভালো লাগে না। উদাহরণস্বরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির মামাবাবুর (শ্রীপাহাড়ী সান্যাল) চরিত্রটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাখীদের আগমন কোনদিন আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয় রশ্মির জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে (এবং এর সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক)—এই বক্তব্যটির যথার্থ গুরুত্বটি অনেকেই উপলব্ধি করতে পারবেন না। (অবশ্যই রসিক দর্শকরা নিশ্চয়ই সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন) এর ফলেই শুরু হয় দর্শক-সমালোচক দ্বন্দ্ব। সাধারণতঃ এই ধরনের ভালো ছবি অসংখ্য অর্ধ-শিক্ষিত মনে কোন উৎসাহ জাগায় না। ফলে ভালো ছবির কোন তথাকথিত বাজার নেই। এক্ষেত্রে একটা কথা বলা যেতে পারে। সিনেমা কি জনপ্রিয় হবে না? কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? এই জন্যেই অজস্র হিন্দি ছবি আজ দর্শকদের মনে সাড়া জাগায়। অযথা সস্তা সংগীত সুর-রসিকদের পীড়াদায়ক—কিন্তু অসংখ্য দর্শকের কাছে এই সংগীতগুলি ঐতিহাসিক নাটকের রিলিফ-সিনের মতো। 'নান্দীকর' একটি বক্তব্য যথার্থই বলেছেন। অনেকেই সস্তায় আনন্দ লাভের জন্য প্রেক্ষাগৃহে যান এবং কিছু সংখ্যক পরিচালক এর সুযোগ নেন। আজকের ছবির গল্পে মানবিকতা, সমাজ-সমস্যা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সুস্থ প্রেম থাকবেই। আবার এই বিষয়গুলি বিভিন্ন পরিচালক বিভিন্ন টেকনিকে উপস্থাপিত করেন। কেউ বা চাকরীহীন শিক্ষিত নায়ককে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বড়-লোকের প্রাসাদের দিকে অঙ্গুলিপাত করিয়ে গান গাওয়ান, আবার কেউবা তাকে মাত্র অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরিয়ে অন্ধকার মেসের ঘরে এনে হাজির করেন। উপরোক্ত দুটি আঙ্গিকই খুব উচ্চস্তরের নয়—তবে প্রথম চিত্রটিই দর্শকরা গ্রহণ করবেন। কারণ প্রথম চিত্রটি বুঝতে বুদ্ধির খরচ করতে হবে না। পরিশেষে বলব 'নান্দীকরের' আলোচনাটি সুন্দর ও সময়োচিত হয়েছে। আমরা আশা করব ভবিষ্যতেও এমনতরো সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন।

আনন্দ রায়

কুরুমগ্রাম, বীরভূম।

আয়নোস্ফিয়ারের প্রসঙ্গে

মাননীয় সম্পাদক, "অমৃত"

সম্প্রতি "অমৃত"-এ প্রকাশিত শ্রীজ্যোতির্ময় গুপ্তের লেখা প্রবন্ধ "আয়নোস্ফিয়ারের কথা : ভারতীয় বিজ্ঞানী" পড়েছি। এই জটিল বিষয়কে এত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে—শ্রীগুপ্তের লেখা পড়ার আগে এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না।

আয়নোস্ফিয়ারের একটা ছবি দিলে প্রবন্ধটা সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী বলেই হয়ত আমার চোখে এই ত্রুটিটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে পাঠকরাও যে উপকৃত হতেন এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহের কারণ নেই।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে ভারতের আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী নতুন নতুন দিকের পথপ্রদর্শক এবং তাঁদের অবদান ও বিজ্ঞানে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা ভারতীয়রা এই সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে অজ্ঞানতা আমাদের কলংকস্বরূপ। তাই "অমৃত" কাগজের পরিচালকদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁরা যেন কয়েকজন লেখকদের লেখার মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষকে একটু ওয়াকিবহাল করেন। বিশেষ করে, —অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ সি ভি রমন, ডঃ হোমী ভাবা, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ, ডঃ কে এস্ কৃষ্ণান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক টি আর সেসাদ্রি, ডঃ রামানুজম, ডঃ ডি এন ওয়াদিয়া, ডঃ এস এস ভাট্‌নগর, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন ও ডঃ ডি এস্ কোঠারী প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের গবেষণায় নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে।

নমস্কারান্তে

মিনতি ভট্টাচার্য, কলিকাতা : ৬

শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনালেখ্যর মধ্যে তিনখানি গ্রন্থের নাম সুপরিচিত। প্রথমখানির নাম শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত। রচয়িতা নিজে গ্রন্থখানির নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করার পর শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী শ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম রাখেন শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীকৃষ্ণ লীলাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতের সাদৃশ্যও আশ্চর্যজনক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে যেমন রাধার নাম নাই, শ্রীচৈতন্যভাগবতেও তেমনই শ্রীরাধার প্রসঙ্গ নাই। এক স্থানে শ্রীরাধার নামমাত্র আছে। অন্যান্য সাদৃশ্যও প্রচুর। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বহু পরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়। বৃন্দাবনদাস ব্রাহ্মণ, লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরম ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতার নাম ছিল নলিন পণ্ডিত। শৈশবে পিতৃহীনা নলিনের কন্যা নারায়ণী শ্রীবাসের গৃহেই প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। শৈশবেই তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ বিলাসে লিখিত আছে—

কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যিহ
তার সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ।

* * *

বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলিলেন স্বর্গে।
ভ্রাতৃ কন্যা গর্ভবতী পিতৃহীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজ গৃহে দিলা রাখি।

শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীবাস কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন। ১৪২৯ শকাব্দর বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন বৃন্দাবন কুমারহট্টে শ্রীবাস গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তখন নীলাচলে প্রকট লীলায় বর্তমান।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন শ্রীবাসুদেব দত্ত। যিনি শ্রীমহাপ্রভুর পদধারণ পূর্বক নিখিল জীবের পাপ গ্রহণ পূর্বক নিজে নরকে যাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। বাসুদেব দত্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত মামগাছি গ্রামে একটি দেবমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক দেবসেবার সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার নারায়ণী দেবীর উপর অর্পণ করেন। পুত্র বৃন্দাবনকে লইয়া নারায়ণী দেবী বহু দিন মামগাছিতে বাস করিয়াছিলেন। মামগাছিতেই বৃন্দাবন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছু পূর্বেই নারায়ণী দেবী পুত্রকে লইয়া দেনুড় গ্রামে চলিয়া যান। বৃন্দাবনের বয়স তখন বোধ হয় তেইশ-চব্বিশ। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেন নাই। দেনুড় গ্রামেই শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হয়। দেনুড় শ্রীপাটে আজিও শ্রীবৃন্দাবনদাসের ধ্যান-কল্পিত মৃন্ময় মূর্তি পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন।

প্রৌঢ় যৌবনেই বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার দুইটি প্রধান কারণ ছিল। অবশ্য মূলে ছিল শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রেরণা। আমাদের উদ্দিষ্ট দুইটি কারণের মধ্যে প্রথম কারণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুই যে সর্বেশ্বর, এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বৃন্দাবনের অভীষ্ট দেব শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু, একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-দাস উচ্চ কণ্ঠে অকপট দৃঢ়তার সঙ্গে এই মহাবাক্য ঘোষণা করিয়াছেন। সেই সময় ইহার প্রয়োজন ছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকট কালেই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছিল। এক দল শ্রীনিত্যানন্দকে মানিতে চাহিতেন না। ইঁহারা একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পরও ইঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের অগ্রজ তাহার প্রমাণ। ইনি নিজ গৃহে অতিথি নিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীরামদাসের নিকট এই মত ব্যক্ত করিতে কোনরূপ লজ্জা অথবা সংকোচ বোধ করেন নাই। বাড়ীতে সেদিন হরি-সংকীর্তন হইতেছিল। কৃষ্ণদাস ইহাকে "অর্ধ কুক্কুটী ন্যায়" বলিয়াছেন। বলিয়াছেন "দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ"। হয় দুই ভাইকেই মানিও না। নয়তো দুইজনকেই সমান মর্যাদায় গ্রহণ কর। আর এক দল শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে ঈশ্বর রূপে প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের ভৃত্য কমলা তো মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট একখানা

পদ লিখিয়া প্রকাশ্যেই আপন মত প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরের অভাব মোচনের জন্য তিনশত টাকা দানও চাহিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় গৌর গদাধরের উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

অদ্যাপিহ যত মহামহিম সকল।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বল।

তিনি একথা কেন বলিয়াছিলেন বুঝিতে পারি না। শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক কবি বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গ নাগরের পদ লিখিয়াছিলেন। লোচনদাস তো গৌরাঙ্গ নাগরের চরমপন্থী কবি। নরহরি সরকার ঠাকুরকে তো মহামহিম বলিতেই হয়। ভরতপুরের শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র কবি নয়নানন্দও এই বিষয়ে পদ লিখিয়াছেন। অন্য এক সম্প্রদায় কিন্তু গদাধরকে গ্রহণের বিরোধিতা করিতে ছিলেন। আবার এক সম্প্রদায় অদ্বৈত আচার্যকেই আমল দিতে চাহিতেন না। এই সঙ্গে আরো একটা উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেমন তাঁহার জীবৎকালেই পৌণ্ড্রক বাসুদেব আসরে নামিয়াছিলেন, তেমনই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকট কালেই দুই-একজন নকল গৌরাঙ্গ দেখা দিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ইহাদিগকে শিয়াল উপাধি দিয়াছেন। এই সমস্ত নানান মতবাদ নিরসনপূর্বক প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে "স্বে মহিম্নি" প্রদর্শন ছিল শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। নবগঠিত শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়কে এক ঐক্য-সূত্রে বাঁধিবার মহান উদ্দেশ্য লইয়াই বৃন্দাবন দাস এই অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাকবির সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের তত্ত্ব যথাসাধ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রথম জীবনের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ। এই দিকটি লইয়া আজ পর্যন্ত কেহ আলোচনা করেন নাই। বৃন্দাবন দাস শ্রীরাধার কোন প্রসঙ্গই আলোচনায় ধরেন নাই। তিনি যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন-প্রচারক বৈকুণ্ঠনাথ লক্ষ্মীপতির কথাই বলিয়াছেন। কবিরাজ কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের অবতারতত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীরাধার কথাই পুনঃ পুনঃ উত্থাপন করিয়াছেন। রাধা পারম্যবাদের মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। চরিতামৃতের অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কথা কেহ চিন্তা পর্যন্ত করিতে পারেন না। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহার প্রকট কালেই। এই তত্ত্ব প্রচারের কেন্দ্র পুরীধাম। ভারতপূজ্য দার্শনিক শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌম, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্বিতীয় তত্ত্ববেত্তা শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য-কৃপাভাজন মহাকবি মহাপণ্ডিত মহান-ভক্ত শ্রীপাদ রূপ প্রভৃতি সত্যদ্রষ্টা কলিকাল-মহর্ষিগণ নানাভাবে আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই পরম তত্ত্বের প্রকাশক। এই তত্ত্ব লইয়া সে কালের সারা ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের নানান সম্প্রদায়ের নরনারী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পুরীধামে সমবেত হইতেন। দর্শনীয় দারুব্রহ্মের সঙ্গে অবশ্য-দর্শনীয় এই সচল ব্রহ্মকে দেখিতেন, তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্বের পরম বার্তা শুনিতেন। নিজ নিজ দেশে আপন আপন গ্রামে ফিরিয়া সেই অমৃত বার্তা আরো দশজনকে শুনাইতেন। বাঙ্গলাতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রথযাত্রার পূর্বেই বাঙ্গলার ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাইতেন, এবং প্রার্থিত পরমপুরুষের আবির্ভাব রহস্য তত্ত্বতঃ জানিয়া আসিতেন। তাহার পর বৎসরের মধ্যে যখনই তাঁহারা দুইজনে, চারিজনে, বহুজনে হইতেন--শ্রীচৈতন্য-কথা লইয়াই ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকথা লইয়াই মত্ত থাকিতেন। এইরূপেই ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্য-কথা,—তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা-কথা বাঙ্গলার গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের যুবক,—শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপ্রাপ্ত পরম শ্রীচৈতন্য-ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন দাস সেই সমস্ত কথা কি শোনেন নাই? তবে কেন তিনি সেই সমস্ত বিষয় স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলেন না? কেন তিনি শ্রীরাধা প্রসঙ্গ পরিহার করিলেন? সে রহস্যের মর্ম আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই প্রশ্ন লইয়া বহু বৈষ্ণবের দ্বারস্থ হইয়াছি, বহু আচার্য-সন্তানের শরণ গ্রহণ করিয়াছি, কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাস গৌরচরিত্র বর্ণনায় যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বাহ্য দৃষ্টিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার বিপরীত পথেই পা বাড়াইয়াছেন। অথচ কৃষ্ণদাস বলিতেছেন—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহো তারিলা সংসার।

অন্যত্র তিনি বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? আমি কয়েকটি প্রবন্ধে এই প্রহেলীর মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব।

অবিভাজ্য

কুমার যোগী

.....প্রভা, আমি জানি তুমি দুঃখ পেয়েছ। বিচ্ছেদ ব্যথা কার না হয়। মুনি-ঋষিরাই বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করতে পারেন না আর তুমি আমি তো সাধারণ মানুষ। তবে একটা ভরসা কি জান প্রভা, অনেক-ক্ষেত্রে দেবতা যেখানে পরাজিত হয়েছে, মানুষ হয়েছে সেখানে জয়ী। আর যখন নাকি চারদিক থেকে বিরাট বিপদের করাল ছায়া আমাদের গ্রাস করতে যাচ্ছে তখন আমাদের নিজেদের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে কোমর বেঁধে বুকটান করে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই না করে কাপুরুষের মত পিছু হঠা আমাদের শোভা পায় না। উদর পূরণের জন্য বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আমরা তার জন্য জন্মাইনি। জান প্রভা, ঠিক এই সময় তোমার বাবাকে বড্ড মনে পড়ছে। ঐ বিরাট কর্মযোগী তপস্বীর চেহারা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নিরলস ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি যে কোটি টাকার সম্পত্তি করেছিলেন মুহূর্তে তা মুক্তহস্তে দেশবাসীকে দান করেছিলেন।

প্রভা, তোমার কি মনে পড়ে কাথিয়া-ওয়াড়ের সেই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের দিনগুলির কথা? ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ খাদ্যের জন্য কুকুরের সঙ্গে লড়াই করছে! চারদিক থেকে 'মা ফ্যান দাও, মা ফ্যান দাও' হাহাকার। এদিকে সরকার সৈন্য-শাসন শুরু করে দিয়েছিল। আর কাথিয়াওয়াড়ের পবিত্র বসুন্ধরার উপর বসে বসে যারা লক্ষ কোটি টাকা রোজগার করেছিল তারা দেশবাসীকে ঐ মরমর ইঁদুরের মত নিরুপায় অবস্থায় ছেড়ে বোম্বাইয়ের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করতে চলে গেল। তোমার বয়স তখন খুব জোর আট কি নয়। দেশের এই চরম দুর্দিনের সময় তোমার বাবা সারা জীবনের পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দেশবাসীর জন্য দান করেছিলেন।

এর পরের ইতিহাস তো তোমার অজানা নয়। ভেবেছিলাম এসব কথা তোমায় মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন ভাবছি অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করলে একদিকে যেমন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, ব্যথা বেড়ে যায়, চোখের জল সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আবার অন্যদিকে মনের দুর্বলতা এবং দৈন্য ধুয়ে মুছে যায়। বাঁচার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর হয়। বর্তমান সঙ্কটের মোকাবিলা করার শক্তি সাহস এবং সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে অতীতের কথা ভেবে লাভ নেই। কিন্তু মানুষ কি কখনও ভুলতে পারে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা?

প্রভা, তুমি আমাকে ভাবপ্রবণ বলো। আমি হয়ত তাই। চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতে আমার মন্দ লাগে না। সান্ত্বনা পাই। অনেকক্ষণ অশ্রুপাত করলে যেমন একটা মনের সান্ত্বনা আমি পাই ঠিক তাই। আমার এই মনের প্রতিক্রিয়ার জন্য নিজেই আশ্চর্য হই। সুখী জীবনের কল্পনা আমার মনের উপর ভিন্নরূপে কাজ করে। চোখের পাতাগুলো ভিজে যায়। মন যেন বিদ্রোহ করে বসে।

একবার আমার মনে যদি ঢুকতে পারতে তাহলে দেখতে যে আমি অসংখ্য চিন্তারই যোগফল ছাড়া আর কিছুই নই। বিশেষ করে তোমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমার চিন্তাগুলো জমাট বেঁধেছে। বেশ মনে আছে ঐ ঘটনার দু বছর পরেই তোমার বাবার বাতে ধরেছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত শরীর নিয়ে ব্যবসা চালানো যায় না। ফলে, পরিবারের খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার বাবা আমাকে আগের মতই আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। আমার মাসিক খরচ দিতে কোন মাসে একদিনের জন্যও দেরী করেননি। কোনবারে এক পয়সাও কম দেননি। আমার মার মৃত্যুর পর থেকে উনি আমাকে তোমাদের ভাইয়ের মতই বাড়িতে রেখেছিলেন, আমার প্রতি তার কত গভীর স্নেহ। জীবনে কি আমি কোনদিন তার সেই স্নেহময় মূর্তি

ভুলতে পারবো! মৃত্যুর ঠিক দুদিন আগে উনি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার কথা পাড়লেন। আমি সানন্দে সম্মত হয়েছিলাম। তোমার বাবার সেই মুহূর্তের আনন্দউদ্ভাসিত মুখ আজ আমার চোখের সামনে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। তোমারও নিশ্চয়ই মনে আছে প্রভা, তিনি সেইদিনই আমাদের নিয়ে বেরুলেন বিয়ের কাপড়-জামা কিনতে। কবে বিয়ে করবো তার ঠিক নেই, কিন্তু তিনি নিজে বিয়ের বাজার না করে যেন স্বস্তি পাননি। তাঁর সেই গভীর স্নেহের কথা ভাবলে আজও আমার প্রতিটি রোম-কূপে শিহরণ জাগে। আমি তাঁর সেই উদার মূর্তির কথা কোনোদিন ভুলতে পারি না প্রভা। আমার মত এক অনাথকে তিনি যে কত সাহায্য করেছেন তার সীমা নেই। বিশেষ করে আজকের এই সঙ্কটের মুহূর্তে তোমার বাবার কথা ভেবে আমি শক্তি পাই। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ির অনেক কিছু জিনিস বিক্রী করে দিতে হয়েছে, এমন কি আমাদের বাড়ির অর্ধেকই বা বলি কেন, বলা চলে সম্পূর্ণ বাড়িটাই বিক্রী হয়ে গেছে। নিজেদের জন্যে যে দুটো ঘর রেখেছি, তোমার বাবা বেঁচে থাকাকালীন ওর একটাতে থাকতো ওভারসীয়ার আর অন্যটিতে কয়েকজন কৃপাপাত্র। এ-দুটো ঘর বাদে গোটা বাড়িটাই তো ঐ পারসী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করে ফেলেছি। আমাদের ঘরগুলোর সামনে সে এমন একটা বিরাট দেওয়াল তুলে দিয়েছে যে সূর্যের আলো আমাদের ঘরে আর ঢোকে না। ঐ দেওয়ালের ফলে আমাদের ঘরগুলো সব সময় অন্ধকার হয়ে থাকে। এর জন্য মা খুব আঘাত পেয়েছেন। আমি তো স্বাভাবিকভাবে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারি না। তাঁর সেই কান্নামাখা মুখ আমি দেখতে পারি না।

প্রভা, এর ফলে আমার পায়ের নীচের মাটি যেন সরে গেছে। ভূকম্পনের ফলে গোটা শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে। এই অবস্থায় সত্যি তোমার সাহসের বলিহারি! এ ব্যাপারে তুমি তোমার বাবার গুণ পেয়েছ। অসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার অধিকারিণী তুমি। তুমি অপরাজিতা। এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও তোমার মনের দীপশিখা বিস্ময়জনকভাবে জ্বলন্ত। সত্যি কথা বলতে কি প্রভা, তোমাকে পেয়ে আমি গর্বিত। আমার মত ভাবুকের পক্ষে তোমার মত কঠোর বাস্তববাদী জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজন আছে। তোমার দাদাও কম সাহসী নন। এখানে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তা বেশ বুঝতে পারছি। বৈষয়িক ব্যাপারে আমি যে কত বেশি নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার তা তো তুমি জান। তোমার দাদা নটবর যেন জন্ম-ম্যানেজার। দু-তিন দিনের মধ্যেই উনি এমন দশ-বারোটা কন্‌স্ট্রাকশন কোম্পানীর সন্ধান পেয়ে গেলেন যার যে কোন একটিতে আমরা ভাল চাকরি পেতে পারি। নটবরদার দৃঢ় বিশ্বাস যে অল্প-দিনের মধ্যেই আমরা এখানে প্রভাবশালী হয়ে উঠবো, নিজেরাই একটা কোম্পানী খুলতে পারবো। নিজেদের ইচ্ছামত স্বাধীন ব্যবসা করতে পারবো। শুধু একটা চাকরি যোগাড় করার জন্যেই আমরা তোমাকে এবং মাকে ফেলে চলে আসিনি। তোমার বাবার কাছে আমি শপথ করেছি জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করব। তাই তোমাকে ছেড়ে আসা যে আমার পক্ষে কতখানি কষ্টকর হয়ে উঠেছে তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে। তোমার নিজের ভালবাসার আলোকে বিচার করলে এসব ব্যাপার আরও গভীর-ভাবে অনুধাবন করতে পারবে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, তুমি তো জান প্রভা, পৈত্রিক সম্পদ বিক্রী করে দেওয়ার মত জীবনে আর বড় অপমান নেই। নিরুপায় হয়ে বাড়িটা বিক্রী করেছি বটে, কিন্তু আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে-কোনভাবে বাড়িটা আবার কিনে নেবোই। তোমাকে ছেড়ে আসার সময় আমি লক্ষ্য করেছি তোমার ব্যথাতুর মুখ। তুমি দুঃখ পেয়েছো, বিশেষ করে আমাকে ছেড়ে থাকা তোমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু প্রভা, এ সময় একটু সহস সঞ্চয় করো। মনকে বিষাদের ভারে আক্রান্ত করো না। জীবনকে বোঝা করে তুল না। ভবিষ্যতের সেদিনের কথা ভেবে মনকে হাল্কা রাখো—যেদিন ঐ বিক্রী করা বাড়ি আবার ফিরে পাবো। দুনিয়ায় লোকের সামনে আবার মাথা উঁচু করে চলতে পারবো। ব্যর্থতার কথা ভেবে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। আর এটা হলপ করে বলতে পারি, জীবনে কোনদিন কোন অবস্থাতেই তোমাকে ভুলতে পারবো না। দুটো স্রোত যখন এক জায়গায় এসে মিলে যায় তখন কি আর কেউ সেই দুটো স্রোতকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে প্রভা! সত্যি বলছি আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য। তোমাকে ছাড়া আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব। জীবন আমার পঙ্গু হয়ে যাবে। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা গভীর এবং নিবিড় তাতে কোন ফাঁক নেই।......মাকে চোখে চোখে রেখো। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, একটার পর একটা ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তাতে মা কত গভীর আঘাত পেয়েছেন। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। আজ এখানেই চিঠির সমাপ্তি রেখা টানছি।

ইতি—
তোমারি
দিলীপ

প্রভা এই চিঠি পড়ে নীরবে ভাবতে লাগল। দিলীপের সহজ-সরল মূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দিলীপ তাকে কত গভীরভাবে ভালবাসে। তার জন্য কত টান। প্রভা ভাবতে লাগল, সে কি পারবে দিলীপের এই অকৃত্রিম ভালবাসার সম্মান রাখতে। সে কি পারবে তার উচিত মূল্য দিতে। ভালবাসার ক্ষেত্রে সে ঋণী হয়ে যাবে না তো! দিলীপ কত উদার। কত সহজ-সরল অথচ চিন্তা-গম্ভীর মানুষ দিলীপ। তার গুণাবলীর সমকক্ষ কি হতে পারবো! আমি ওঁর জীবনে বোঝার মতো হয়ে উঠবো না তো!......

মা যে কখন পুজো করে উঠেছেন, প্রভা খেয়াল করেনি। প্রভা অনিমেষ দৃষ্টিতে সামনের ঐ বিরাট দেওয়ালের

দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রভার এই ভাব মার কাছে ভাল লাগে না। মেয়েটা সংসারের এখনই কি দেখেছে! এত অল্প বয়েস থেকে চোখে-মুখে তার এই বিষাদের ছায়া কেন! মার খুব দুঃখ হল।

—কী দেখছিস প্রভা? পাগল হয়ে গেলি না কি! চল খাবি চল। ঐ দেওয়ালের দিকে তাকানোর কী দরকার।

প্রভা চমকে উঠল। মনে মনে ভাবল এভাবে মার কাছে ধরা দেওয়া উচিত হয়নি। সে কোথায় মার মন হাল্কা করবে, উল্টে সে নিজেই এমন ভাব করছে যে মা ব্যথা না পেয়ে পারে না। ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেওয়ার জন্য প্রভা হাসল। আর মনে মনে ঠিক করল যে সে আর কোনদিন এত অন্যমনস্ক হবে না। ঘরে তো এখন সে আর . মা। এমনিতেই কী প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। তার উপর যদি এ রকম সে চিন্তামগ্ন থাকে তাহলে কে কাকে সান্ত্বনা দেবে।

•

—যারে, আমি আবার কি ভাবছিলাম। রান্না অনেকক্ষণ হল হয়ে গেছে। তুমি পুজো করছিলে, তাই দেরী করছিলাম। চলো মা, খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আজ পুজো করতে খুব দেরী করেছ।

—ঐ দুটো ছেলেকে যাতে একটু দেখেন তার জন্যই ভগবানকে বেশি ডাকি মা। অন্ধকারে পথ দেখানোর মালিক তো একমাত্র তিনি।......তোকে তো কতদিন বলেছি, ক্ষিদে পেলে খেয়ে নিবি। আমার জন্য হাঁ করে বসে থাকবি না। ক্ষিদের সময় না খাওয়া খুব খারাপ। এমনিতেই তো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিস। আর কক্ষণও এমনি করবি না। চল তাড়াতাড়ি চল।

প্রভা এই চিঠি পড়ে নীরবে ভাবতে লাগল......

।।দুই।।

......দীর্ঘ ছ'মাস হাত গুটিয়ে বসে-ছিলাম। কিন্তু আর সহ্য করতে পারলাম না। হাত-পাগুলো যেন জং ধরে গেছে। অত নিষ্ক্রিয় থাকার পাত্রী আমি নই। তাই শহরের এক বিদ্যালয়ে চাকরি ধরেছি। ভাল কাজ। কাজে মন বসেছে। মার সারাদিন কাটে রামায়ণ নিয়ে। তাকে ঘিরে কয়েকজন বয়স্ক মহিলা রামায়ণ শোনে। দিন কেটে যায়। এ চাকরি নেওয়ার ফলে আমাদের খরচের দিকটাও কিছুটা সুরাহা হল। সময় থাকলে সেলাইয়ের কাজও করি।......পারসীর তোলা দেওয়ালটা আমাদের ঘরের আলো ছিনিয়ে নিয়েছে। তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আমার চোখে যথেষ্ট জ্যোতি আছে। যাই হোক, তুমি বোধহয় জান, দাদা প্রত্যেক মাসের পাঁচ তারিখে পঞ্চাশ টাকা করে মনি-অর্ডার করে পাঠায়। তার থেকে কুড়ি টাকা চলে যায় ধারের কিস্তি মেটাতে কাপাড়িয়া শেঠের পকেটে। বাবা কোনকালে তার কাছ থেকে দু' হাজার টাকা নিয়েছিলেন, তারই কিস্তি গুণছি প্রত্যেক মাসে। সত্যি কথা বলতে কি, বাকি ঐ তিরিশ টাকায় আমাদের গোটা মাস চলে না। আমার চাকরি পাওয়ার পর সমস্যা কিছুটা হাল্কা হয়েছে। তুমি কিন্তু এ সব নিয়ে চিন্তা কর না। কোন রকমে যাতে নিজের কষ্ট না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। আমার জন্য ভেবো না। প্রয়োজন হলে আমি পাশের বাড়ির মারওয়াড়ী মহিলাদের কাপড়ে এম্ব্রয়ডারী কাজ করে চালিয়ে নেবো। চিন্তার কোন কারণ নেই।......স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো। বিপদ-আপদের দিন চিরকাল থাকে না। এরপর সুদিন আসবেই। তুমিও ভবিষ্যতে অনেক টাকা রোজগার করবে। আজকাল তুমি যে কাজ বেছে নিয়েছো তাতে সত্যি তুমি মনের খোরাক পাবে। কন্ট্রাক্টারীর অত পরিশ্রমের কাজ তোমার দ্বারা হচ্ছিল না। তোমার শরীরে ওসব কাজ সহ্য হয় না। আর তাছাড়া তোমার মন ও মেজাজের দিক দিয়েও ওটা একেবারে অচল।

তোমার মনের মত কাজ নয় বলেই ঘন-ঘন অসুখে পড়ছিলে। মনের বিরুদ্ধে কোন কাজ দিনের পর দিন করলে তার পরিণাম কোনক্রমেই ভাল হয় না। তুমি ওটা ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছ। সিনেমার চিত্রনাট্য রচনা খুব হাল্কা কাজ এবং তোমার সাহিত্যধর্মী মনের খোরাক খুঁজে পাবে তাতে। তোমার মত মননশীল সাহিত্যিক-গুণসম্পন্ন লোক এ কাজে খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য অর্জন করে থাকে। তোমার যোগ্যতার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই তুমি এ ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করবে।... একটা কথা লিখছি। মনে কিছু কর না।

কতদিন ধরে লিখবো ভাবছিলাম। আচ্ছা, মার কাছে চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিলে কেন! তোমার উপর মার গভীর স্নেহ। এই স্নেহকে হাল্কাভাবে দেখো না, আমার অনুরোধ। জানি, তুমি হয়ত সময় পাও না। আমার কাছে চিঠি লেখার সময়

দু' কলম মার জন্যও তো লিখে দিতে পার।......স্বাস্থ্যের অবহেলা কর না। শ্রমের সংগে বিশ্রামও দরকার। আমার জন্য ভেবো না, আমি নিজের সমস্ত ভার নিজের হাতে নিয়েছি। নিজে প্রফুল্ল থাকার চেষ্টা করি, মাকেও খুশী রাখি।... সম্ভব হলে আগামী ডিসেম্বর মাসে একবার আসার চেষ্টা কর।

ইতি—
তোমারি
প্রভা।

দিলীপ স্টুডিওতে যাওয়ার জন্য বেরোতে যাচ্ছে এমন সময় ডাক-পিওন এসে এই চিঠি দিল। এক নিঃশ্বাসে সে গোটা চিঠিটা পড়ে নিল। কিন্তু প্রভার এই চিঠি তার তেমন ভাল লাগল না। ভাবল, প্রভা যে নিতান্তই একটি মেয়ে তা সে কেন ভুলে যাচ্ছে। মেয়েদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কতগুলো ব্যাপারে পুরুষের সংগে তার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই নারীদের চরিত্র বহন করে। প্রভা কেন পুরুষদের মত কঠোর পরিশ্রমী হতে যাচ্ছে। অর্থ উপার্জনের জন্য সে কেন পথে নামছে। প্রভা কেন চায় মনের মাধুর্য এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলতে। ওর কি উচিত নয় নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে নিজের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলা। নিজের স্বাভাবিক জীবন থেকে সে দূরে পালাচ্ছে কেন। সকলেরই একটা স্বাভাবিক দিক আছে। তার বাইরে পা রাখলেই জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। প্রভা আজ যে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে পা বাড়িয়েছে তার কুফল ভোগ করবে কে? আমাকে ভুগতে হবে? কেন? তা'ও তো বটে, আমাকেই তো ভুগতে হবে। আমি যে শপথ করেছি ওকে বিয়ে করার।...... ভিতরে ভিতরে প্রভা যে আমার উপর এতটা বিরূপ হয়ে উঠবে আমি তা ভাবতে পারিনি। যাক ও নিয়ে এখন আর চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রভা আর পারবে না নিজেকে শোধরাতে। নোঙর তুলে যে একবার জীবন-নৌকা হেলায় ভাসিয়ে দেয় সে সব সময় তীরে নাও ভিড়তে পারে। প্রভা কি এটুকু মনে রাখতে পারে না যে ও নিজের সংগে আমাকেও ডোবাচ্ছে। কিছুটা আত্মনিরীক্ষণ করতেও কি সে প্রস্তুত নয়! সত্যি প্রভার এ রকম পরিবর্তন হয়ে গেল কেন? প্রশ্নটি মনে জাগার সংগে সংগে চোখের সামনে ভেসে উঠল নটবরের চেহারা। প্রভার এই পরিবর্তনের একটা কারণ খুঁজে পেল দিলীপ। এর জন্য দায়ী প্রভার দাদা নটবর। তার স্বভাবের যে সংকীর্ণতা তাই প্রভার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। প্রভা এত বোকা হল কি করে! আর কাউকে পারল না, দাদাকে অনুকরণ করতে লাগল! নটবরের জীবনের মূল লক্ষ্য অর্থোপার্জন। টাকা করার জন্য সে সন্ন্যাসীদের মত কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবনযাপন করে। নটবর কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। এভাবে কি জীবনযাপন করা যায়! সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠছে তাতে কি আমাদের কোন অবদান থাকবে না! সাহিত্য সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা সৃষ্টি করে গেছেন তার রক্ষণ এবং সমৃদ্ধির দায়িত্ব কি আমাদের নেই! নটবর এ সব বোঝার চেষ্টা করে না কেন! শুধু সে নিজে যে এসব ব্যাপারে থাকে না তা নয়, সাংস্কৃতিক কাজে যারা লিপ্ত তাদেরও নটবর দু'চোখে দেখতে পারে না। সব সময় নিজেকে এটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কত চেষ্টা করেছে ঐ গণ্ডী থেকে বের করে আনতে কিন্তু পারেনি। ওর জন্য চেষ্টা করা আর বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো এক কথা। যার মধ্যে সংস্কৃতির কোন বীজ নেই তার পিছনে শক্তি ক্ষয় করা নিষ্প্রয়োজন। ...তাছাড়া নটবরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেইবা শিল্পী ছিল। ওর ধাতে নেই, হবে কোত্থেকে। ওদের চোদ্দপুরুষ টাকাই চিনেছে। ওর বাবা তো আজীবন ঠিকাদারী করে গেল। সারাদিন পড়ে থাকতো ইট-কাঠ, চুণ-পাথরের মধ্যে। আর সারাদিন যাদের সংগে মিশতো, কথা বলতো তারা কুলি-মজুর ছাড়া আর কেউ নয়।......তাই তো প্রভার উপর এসবের প্রভাব পড়েছে। আর নটবরের তো কথাই নেই। বাবারই সর্বশেষ সংস্করণ সে। ওরা চিরকাল সামাজিক জীবন থেকে পালিয়ে থাকে। সামাজিক জীবন যে কি তাই তারা জানে না। দুজন ভদ্রলোকের সংগে কিভাবে কথা বলতে হয় তার আদব-কায়দাও আজানা। মানুষ নিজে যা জানে না তা অন্ততঃ শেখার চেষ্টা করে। কিন্তু নটবর এ সব শিখতে চায় না। ও যে কাজে জিদ ধরবে তাই করবে।......এইতো সেদিন আমাকে কি বিপদেই না পড়তে হয়েছিল। আমার নতুন বইয়ের হিরোইনের সম্মানার্থে পার্টি দিয়েছিলাম। সিনেমা জগতের প্রায় প্রত্যেক নামকরা শিল্পী এসেছিলেন। বড় বড় রাজা মহারাজা বা কোটিপতিদের অনুরোধেও যারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে না সেই সব অভিনেত্রীরাও এসেছিল। সেদিন নটবর কোথায় আমাকে ওদের আদর-আপ্যায়ন করার ব্যাপারে সাহায্য করবে তা নয়, ওদের দিকে বার বার এমন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল যাতে আমার সুনাম নষ্ট না হয়ে যায় না। তার দুর্ব্যবহারে প্রায় প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক অতিথিও দুঃখিত হয়েছেন। বিশেষ পরিবেশে একটু-আধটু মদ-খাওয়া এমন কি অপরাধের! বিশেষ করে এই ধরণের পরিবেশে ভদ্রতার খাতিরেও একটু-আধটু খেতে হয়। কিন্তু নটবর নাক সিটকে সারাক্ষণ বসে রইল। এমনভাবে মুখ গোমড়া করে বসে রইল যেন কোন বন্য জানোয়ারকে এক্ষুনি বন থেকে ধরে এনে খাঁচায় রাখা হয়েছে। সকলের চোখ একবার ওর উপর পড়ে, একবার আমার উপর। অন্তত সম্মানের দিকে তাকিয়েও নটবরের ওরকম করা উচিত হয়নি। ওর জানা উচিত যে সমাজে আমার একটা বিশেষ স্থান আছে, সম্মান আছে। আমি পাঁচজনে একজন নই, আমি একাই পাঁচজন। আসলে নটবর আমার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত। ওর মন মোটেই পরিষ্কার নয়। দিলীপ এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে মনে মনে গজ-গজ করতে লাগল।

অনুবাদ : মোস্তানা বিশ্বনাথম্

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ কলকাতার তারাঘর ॥

কলকাতার তারাঘর বা প্ল্যানেটোরিয়ামের খবর এতদিনে নিশ্চয়ই পুরনো হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজেও এ-বিষয়ে কম লেখালেখি হয়নি। কিন্তু তারপরেও একথা বলা দরকার যে তারাঘর সম্পর্কে শুনে বা পড়ে পুরো খবর জানা সম্ভব নয়। নিজের চোখে দেখার পরেই শুধু বোঝা যেতে পারে, কী আশ্চর্য এই অভিজ্ঞতা। যদিও তারাঘরের আকাশটা নকল, যদিও এই নকল আকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র নিতান্তই প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছু নয়—কিন্তু এমনভাবে গোটা ব্যাপারটিকে ঘটানো হয়েছে যে মুকুরে বিশ্বরূপ দর্শনের মতো একটি গম্বুজের গায়ে এই বিপুল মহাবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করা চলে। পৃথিবীর মানুষ কয়েক হাজার বছর ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে আর একটু একটু করে আকাশের রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। তারাঘর এই কয়েক হাজার বছরের সঞ্চিত জ্ঞানকে কয়েকটি মুহূর্তের পরিসরে তুলে ধরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে যেতে হয় যে আমরা এসে বসেছিলাম চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে একটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর বাড়ির ভেতরে। নরম আলোয় উদ্ভাসিত ঘরটিতে আমাদের অতি-পরিচিত কলকাতার দিগ্বলয়টি রেখায়িত হয়েছিল। আমরা এসে বসেছিলাম গোল করে সাজানো পুরু আর নরম আসনে আর আমাদের মাথার ওপরে ছিল অদ্ভুত রকমের সাদা একটা গম্বুজ। তারপরে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল আমরা এসে দাঁড়ালাম বিপুল মহাবিশ্বের অঙ্গনে। আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটল।

প্রথমে আমরা দেখলাম পুরো এক-রাত্রির কলকাতার আকাশ। তারপরে কল্পনাতীত বেগে ধাবিত হলাম উত্তর-মেরুর দিকে। মুহূর্তে উত্তর মেরুর আশ্চর্য আকাশ আমাদের চোখের সামনে ঝিকমিকিয়ে উঠল। তারপরে দক্ষিণ মেরুতে। তারপরে আবার কলকাতায়। মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে এই বিপুল পরিক্রমা শেষ হল। ক্রমে কলকাতার আকাশে ভোর হতে লাগল। একটি একটি করে মিলিয়ে যেতে লাগল তারাগুলো। তারপর সারা আকাশকে উদ্ভাসিত করে সূর্যোদয় হল।

পৃথিবীর প্রথম তারাঘরটি তৈরী হয়েছিল জার্মানির মিউনিকে ১৯২৪ সালে। সেই প্রথম তারাঘরের নকল আকাশ দেখে সুইডেনের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এলিস স্ট্রোয়েমগ্রেন মন্তব্য করেছিলেন : "চিত্তবিনোদনের এমন ব্যবস্থা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি, যে ব্যবস্থা এতবেশী শিক্ষাপ্রদ, এতবেশী চিত্তাকর্ষক, এতবেশী রোমাঞ্চকর। এ হচ্ছে একাধারে স্কুল, থিয়েটার ও সিনেমা। এ হচ্ছে একটি নাটক, আকাশের জ্যোতিষ্করাই যার কুশীলব।"

অর্থাৎ প্ল্যানেটোরিয়ামকে বলা চলে নক্ষত্রের রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে যে আশ্চর্য নাটকটি অভিনীত হয় তা মহাবিশ্ব ও মহাকালের প্রেক্ষাপটে বিধৃত। এই নাটক সম্পর্কে লিখে কোনো ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। নিজের চোখে দেখে যেতে হবে।

এই আশ্চর্য নাটকটি যে যন্ত্রটির সাহায্যে সম্পাদিত হয় তার নাম ৎসাইস প্ল্যানেটোরিয়াম। বর্তমানে জার্মানির যে অংশটিকে বলা হয় জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (পূর্ব জার্মানি), তারই একটি শহরের নাম জেনা। এই জেনা শহরেই রয়েছে অপটিক্যাল লেন্স নির্মাণের প্রতিষ্ঠান কার্ল ৎসাইস। প্ল্যানেটোরিয়াম যন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনা।

এই উদ্ভাবনার সামান্য একটু ইতিহাসও আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে মিউনিখের কারীগরী সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ ওসকার ফন মিউলার। তিনিই প্রথম ৎসাইস কোম্পানীকে এমন একটি যন্ত্র নির্মাণের কথা বলেছিলেন যে-যন্ত্রের সাহায্যে ঘরের ভিতরে নকল আকাশ রচনা করা সম্ভব হতে পারে। ৎসাইস কোম্পানী সে সময়ে কোনো যন্ত্র নির্মাণ করেন নি, কিন্তু এমন একটি আয়োজন করেছিলেন যার ফলে দর্শকদের চোখের সামনে একটি নকল আকাশ ফুটে উঠতে পারত। দর্শকদের বসতে হত মস্ত একটি গোলকের মধ্যে। গোলকের গায়ে ছোট ছোট ফুটো করা হত আর বাইরের দিকে থাকত আলোর ব্যবস্থা। গোলকের ভিতর থেকে আলোকিত ফুটোগুলোকেই তারা বলে মনে হত। আকাশের তারার গতি সৃষ্টি করা হত গোলকটিকে ঘুরিয়ে। তার-

কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে এই প্রোজেক্টারের সাহায্যে নক্ষত্রখচিত কৃত্রিম রাত্রির আকাশ সৃষ্টি করা হয়।

পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং প্ল্যানেটোরিয়াম নিয়ে গবেষণা বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকে।

যুদ্ধ শেষ হবার পরে আবার নতুন উদ্যমে প্ল্যানেটোরিয়ামের গবেষণা শুরু হয়। এবারে ৎসাইস কোম্পানীর ডঃ ভালটের বাউয়ার্সফেল্ড একটি নতুন ধরনের যন্ত্র নির্মাণ করলেন। এবারে আর ঘূর্ণমান গোলকের প্রয়োজন থাকল না। ঘূর্ণমান গোলকের জায়গায় তৈরি হল একটি গম্বুজ। গম্বুজের ভেতরের দিকে ঠিক মাঝখানটিতে বসানো হল একটি ম্যাজিক-লণ্ঠন ধরনের প্রোজেক্টর বা প্রক্ষেপক। আর গম্বুজের ভেতরের দিককার গায়ে এই প্রক্ষেপকের সাহায্যে তারাভরা আকাশের হুবহু প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হল। এই নতুন পদ্ধতির প্রথম যন্ত্রটির নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯২৪ সালে। প্রথমে যন্ত্রটিকে বসানো হয়েছিল জেনার ৎসাইস কারখানার ছাদে। পরে যন্ত্রটি মিউনিখে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এই প্রথম যন্ত্রটির সাহায্যে পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ স্থান থেকে দেখা আকাশকেই পাওয়া যেত। দ্বিতীয় যে যন্ত্রটি তৈরি হয়েছিল তাও একই ধরনের। কিন্তু পরবর্তীকালে যে-সব যন্ত্র তৈরি হয়েছে তার সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে দেখা আকাশকে ফুটিয়ে তোলা থেকে পারে।

পৃথিবীর কোন্ দেশে ক'টি প্ল্যানেটোরিয়াম আছে এবং প্রথমটি কবে থেকে—তার একটি হিসেব নিচে দেওয়া হল।

জার্মানি	১২টি	১৯২৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭ "	১৯৩০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩ "	১৯২৯
ইতালি	২ "	১৯২৮
জাপান	২ "	১৯৩৮
বেলজিয়াম	১ "	১৯৩৫
ফ্রান্স	১ "	১৯৩৭
হল্যান্ড	১ "	১৯৩৪
ইংলন্ড	১ "	১৯৫৮
পোল্যান্ড	১ "	১৯৫৫
চীন	১ "	১৯৫৭
চেকোস্লোভাকিয়া	১"	১৯৬০
ভেনেজুয়েলা	১ "	১৯৬১
দক্ষিণ আফ্রিকা	১ "	১৯৬০
ব্রাজিল	১ "	১৯৫৭
ভারত	১ "	১৯৬২

আগেই বলেছি, ৎসাইস প্ল্যানেটোরিয়াম যন্ত্র তারাভরা আকাশের প্রতিচ্ছবিটি ফুটিয়ে তোলে ম্যাজিক-লণ্ঠনের পদ্ধতিতে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলো স্লাইড ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি স্লাইডে প্রচুর সংখ্যক তারা থাকে। প্রজেক্টরগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে আলাদা আলাদা স্লাইডের ছবি গম্বুজের গায়ে ফুটে ওঠার পরে সব মিলিয়ে গোটা আকাশটাকেই পুরোপুরি পাওয়া যায়।

সুবিধের জন্যে আকাশটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয়। এক-একটি অঞ্চলের তারাগুলোকে দেখাবার জন্যে ষোলটি করে প্রোজেক্টরের প্রয়োজন হয়ে থাকে। দুটি পৃথক ধাতুনির্মিত গোলকের মধ্যে এই দুসেট প্রোজেক্টর খুব শক্তভাবে বসানো থাকে। বাইরে থেকে গোলকের দিকে তাকিয়ে দেখলে শুধু লেন্স ছাড়া প্রোজেক্টরের আর কোন অংশই দেখা যায় না।

প্রত্যেকটি প্রোজেক্টর ২০০ থেকে ৩০০ তারা ফুটিয়ে তুলতে পারে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯০০০ তারা দেখানো সম্ভব। তবে শুধু সেই সমস্ত তারাই দেখানো হয় যা খালি চোখে দেখা যায়। কৃষ্ণপক্ষের নির্মেঘ আকাশে একজন মানুষের পক্ষে খালি চোখে তিন হাজারের বেশি তারা দেখা সম্ভব নয়। দূরবীনের সাহায্য নিলে সেই একই আকাশে কোটি কোটি তারা দেখা যেতে পারে।

পৃথিবী থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় আকাশের তারাগুলো যেন ঝাঁক বেঁধে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। আমরা জানি, এমনটি মনে হবার কারণ পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন। পৃথিবীর এই কল্পিত অক্ষদন্ডটিকে যদি মহাকাশের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে তা উত্তরাঞ্চলের আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রকে স্পর্শ করবে। এই কারণেই উত্তরাঞ্চলের আকাশে এই বিশেষ নক্ষত্রটিকে স্থির বলে মনে হয়। তবে যতোই উত্তর মেরুর দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততোই এই নক্ষত্রটি উঁচুতে উঠবে।

কিন্তু আমাদের সূর্য নিজস্ব পথ অনুসরণ করে। তেমনি নিজস্ব পথ রয়েছে বিভিন্ন গ্রহের ও চন্দ্রের। এই কারণে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের জন্যে পৃথক পৃথক প্রোজেকটরের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। আমরা খালি চোখে মাত্র পাঁচটি গ্রহ দেখতে পাই—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। প্ল্যানেটোরিয়ামেও এই পাঁচটি গ্রহই দেখাবার ব্যবস্থা আছে।

প্ল্যানেটোরিয়াম যন্ত্রে প্রোজেকটর আছে ১২০টি। এই প্রোজেক্টরগুলি অত্যন্ত জটিল এক গীয়ার-ব্যবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে প্রোজেক্টরগুলোকে এমনভাবে নাড়াচাড়া করা চলে যাতে যে-কোনো সময়ের নাক্ষত্রিক বিন্যাসটি তৈরি হতে পারে। নভোমন্ডলের আহ্নিক আবর্তনটিকে দেখানো চলে ০·৫ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে। প্রতি ২৬,০০০ বছরে ভূ-গোলকের যে অয়নচলন ঘটে থাকে তার দরুণ সূর্য চন্দ্র গ্রহ ও স্থির নক্ষত্রগুলির আপেক্ষিক অবস্থান অতি ধীরে ধীরে বদলে যায়—এই বদলটুকুও আনুপাতিক সময়ের মধ্যে প্রোজেকটরে ধরা পড়ে। বিশেষ বিশেষ মোটরের সাহায্যে এই সমস্ত গতিবিধিকে রূপ দেওয়া হয়। অন্য একটি প্রোজেকটরের সাহায্যে তারামন্ডলের মূর্তিগুলোকে সংশ্লিষ্ট তারামন্ডলের ওপরে প্রক্ষিপ্ত করা চলে।

এখানেই শেষ নয়। প্ল্যানেটোরিয়ামের বিশেষ বিশেষ প্রোজেকটরের সাহায্যে আরো বহু জ্যোতির্ষিক ক্রিয়াকান্ডকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। যেমন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, উল্কাপাত, চন্দ্রের কলা ও চন্দ্রমন্ডলের উপরিভাগ, ধূমকেতু, তারাগুচ্ছ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি, বিভিন্ন তারামণ্ডলের নাম মধ্যরেখা, নিরক্ষীয় বলয়, ক্রান্তিবৃত্ত, মধ্যগ সূর্য ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই বিচিত্র ব্যবস্থা সমন্বিত যন্ত্রটি হবে খুবই জটিল ও সূক্ষ্ম। রীতিমতো ভারীও। যন্ত্রটির উচ্চতা ৫ মিটার, ওজন ২০০০ কিলোগ্রাম। ২৯,০০০ পৃথক পৃথক অংশে যন্ত্রটি তৈরি। বাইরে থেকে দেখলে যন্ত্রটিকে মনে হয় মস্ত একটি ডাম্বেলের মতো। দুই প্রান্তে দুটি গোলক, মাঝখানে জাফরিকাটা দন্ড। আগেই বলেছি, এক-একটি গোলকে এক-এক গোলার্ধের নক্ষত্র দেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যুৎচালিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাহায্যে এই মস্ত যন্ত্রটি নানাভাবে নাড়াচাড়া করা চলে এবং তার ফলেই নকল আকাশের জ্যোতিষ্কলোকে গতি সঞ্চারিত হয়।

প্ল্যানেটোরিয়াম সম্পর্কে বলার কথা পুরো একটি বই লিখেও শেষ করা যাবে না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সব কথা জানারও প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে সময় ও সুযোগ থাকলেই যেন আমরা প্ল্যানেটোরিয়ামে গিয়ে বসি। একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা পাবার এমন আশ্চর্য ব্যবস্থা অন্য কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আটাশ ।।

ঘর থেকে বেরিয়ে গৌরাঙ্গবাবু বারান্দায় এসে বসলেন।

কতদিন পরে? দু মাস, আড়াই মাস, তিন মাস? সময়ের হিসাবটা প্রায় ভুলে যেতে বসেছেন। সকাল, সন্ধ্যা, দিন, রাত—কোনো কিছুর হিসেব এখন আর মনে নেই। সারা শরীরে শুধু সেই যন্ত্রণার অনুভূতিটা টিঁকে আছে—যা কিছু চেতনা শুধু শরীরটাকে কেন্দ্র করে। আর কিছুই নেই। কী খান জানেন না, কখন ঘুমোন তাও জানা নেই। জানলা দরজা প্রায় বন্ধ করেই রাখতেন—পাছে একটুখানি আকাশ দেখা যায়, পাছে বাইরের একটি মানুষ তাঁকে দেখতে পায়।

স্ত্রী, দুই ছেলে, দুটি মেয়ে। যখন দেশ ছেড়েছিলেন, তখন জানতেন—শরীরে শক্তি আছে, মনে জোর আছে। তাঁর বাবা সারাটা জীবন সিংহের মতো বেঁচে থেকেছেন, আর তিনি তাঁর পরিবারকে খাওয়াতে পারবেন না, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারবেন না ছেলেমেয়েদের? এত বড়ো কলকাতায় এত লক্ষ লক্ষ লোক দেশ-দেশান্তর থেকে আসে—নিজের ভাগ্য গড়ে নেয়, তিনি পারবেন না?

দুঃখে কষ্টে, আধপেটা খেয়ে তবু তো স্রোত ঠেলে চলেছিলেন। অভয় পড়ল না, তবু যখন কারখানায় ঢুকল, তখন মনে হয়েছিল ডান হাতে অনেকখানি জোর পেয়েছেন। তারপর—

তারপরই হঠাৎ একদিন সব শেষ হয়ে গেল।

বড়ো মেয়ের নামও আর শুনতে চান না—মরে গেছে, অনেকদিন আগেই সে মরে গেছে। গৌরাঙ্গবাবু ভাবতে চেষ্টা করেন, দীপ্তি নামে পাঁচ ছ' বছর বয়েসের একটি ফুটফুটে মেয়ে তাঁর ছিল, কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে আসবার সময় মেঘনার কালো জলে টুপ করে ডুবে গেছে সে। অমিয় নামে আর একটা শনিগ্রহ ছিল—জন্মজন্মান্তরের পাপের ফল—সেটা দূর হয়ে গেছে, হাড়ে বাতাস লেগেছে তাঁর। আর তৃপ্ত—

এইখানেই মন বলে একটা জিনিস সাড়া দেয়। ছোট মেয়েটাকে ভাবলেই বুকে ছুরির ঘায়ের মতো কী একটা অসহ্য আঘাত এসে লাগে। এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতাও যে সংসারে আছে, গৌরাঙ্গবাবু সে কথা এখনো যেন কল্পনা করতে পারেন না!

দু মাস—আড়াই মাস—তিন মাস—দরজা-জানলা বন্ধ করেই পড়েছিলেন। লজ্জায়, অপমানে, গ্লানিতে। আকাশ-আলো মানুষ—কেউ যেন তাঁকে আর দেখতে না পায়। নিজের ওই অন্ধকূপের ভেতরে, সর্বাঙ্গে যন্ত্রণার ভার বইতে বইতে নিঃশব্দেই ফুরিয়ে যাবেন একদিন।

কিন্তু দেখলেন, মৃত্যু এত সহজে আসে না। যে এক মুহূর্ত বাঁচতে চায় না, তাকেই বেঁচে থাকতে হয় দিনের পর দিন। আর তাই যদি, তা হলে মিথ্যে মরণের জন্যে অপেক্ষা করে তো কোনো লাভ নেই। লজ্জার কালি সারা মুখে মাখিয়েও অসংখ্য মানুষ তো বেপরোয়া হয়ে পথে চলেছে—তাঁরই বা কিসের ভাবনা? এক দীপ্তির জন্যেই তো তিনি মরে যেতে পারতেন, কিন্তু তারপর অমিয়—তৃপ্ত—! লজ্জা ছাড়া যার আর কোনো পরিচয় নেই, লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তার এই পণ্ডশ্রম কেন!

তারপরে মনে হল, বুকটান করেই তিনি বাইরে এসে বসবেন। কার কাছে ছোট হবেন তিনি? আমার মেয়ে নরকে নেমেছে—তাতে তোমাদের কী আসে যায়? আমার ছেলে-মেয়ে যদি পালিয়ে থাকে—বেশ করেছে। যেদিন চাল জোটেনি—হাঁড়ি চড়েনি উনুনে—সেদিনও তো তোমাদের কাছে একটা পয়সা ধার চাইতে যাইনি!

আর এই কলকাতা শহর। কার কাছে লজ্জা? তিনি নিজেও কি জানেন না—কী ঘটে চলেছে এখানে দিনের পর দিন? কী দাম দিয়ে এখানে মানুষ বাঁচে—বড়ো হয়—কোটিপতি থেকে রাস্তার ভিখিরী পর্যন্ত? খবরের কাগজে নামজাদা লোকের যে-সব মামলার খবর কখনো কখনো বেরিয়ে আসে—তার কালোকে ছাপিয়ে উঠতে পারে এত কালো ছাপার কালি আজো তৈরী হয়নি। কোটি কোটি টাকার মালিক জুয়াচুরির দায়ে জেল খাটে, অসহায় মেয়েদের আশ্রয়ের জন্যে যে প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে তার সেক্রেটারী কুৎসিত মামলায় শ্রীঘর বাস করে, পয়সার জন্যে বাপ নিজের কিশোরী মেয়েকে লম্পটের হাতে তুলে দেয়!

সমাজ—সভ্যতা—কলকাতা!

এদের কাছে তাঁর কিসের লজ্জা!

কেন তিনি লুকিয়ে থাকবেন চোরের মতো? কার ভয়ে?

জোর করেই আজ বাইরে এসে বসেছেন। সেই চৌকিটা টেনে নিয়েই।

কিন্তু বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে আকাশ দেখা দিল। রেলওয়ে সাইডিঙের কালো ধোঁয়ায় মাখা গলির আকাশ। এক ঝলক সূর্যের আলো এসে পড়ল তাঁর বারান্দায়। আকাশটা সহ্য করা যায় —ওটা তাঁরই দলের। কিন্তু আলোটাকেই সহ্য করা যায় না—চোখদুটোকে পুড়িয়ে দিচ্ছে এমনি মনে হয়। ওই রোদটার ওপরেও যদি কেউ এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিতে পারত, বেশ হত তা হলে।

কলকাতার না হয় লজ্জা নেই। তাঁকে ধিক্কার দিতে পারে এত বড়ো বুকের পাটা নেই কারোই। তবু নিজের কাছে সেইটেই কি যথেষ্ট? সেই যুক্তি দিয়েই কি গৌরাঙ্গবাবু বলতে পারেন— তিনি বেশ আছেন?

আকাশটা সাইডিঙের ধোঁয়ায় কালো হয়ে রয়েছে—সেদিকে তাকিয়ে না হয় সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু রোদটা তো কালো হয় না। সব মানুষ যদি একপাল শুয়োরের মতো পাঁকে ডুবে যায়, তবুও যে পৃথিবীর মাটিতে শুকনো ডাঙা আছে—গৌরাঙ্গবাবু নিজে সে কথা কেমন করে ভুলতেন? তিনি তো এ কথাও জানেন, তাঁদের গ্রামের সেকেন্ড পন্ডিতের পরিবার তাঁরই মতো রিফিউজি, তাঁর বড়ো ছেলে স্টেট বাস কন্ডাক্টার, অথচ ছোট ছেলেটা এবার বি-এ পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে যেন ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে?

আকাশ অন্ধকার হয় বার বার— কিন্তু রোদের রং কখনো কালো হয় না।

না, আর ভাববেন না গৌরাঙ্গবাবু, ভাববার শক্তি নেই তাঁর। মাথার ভেতরটার ক্রমশ সব ঝাপসা হয়ে আসছে। গৌরাঙ্গবাবু চোখ বুজলেন। আর চোখ বুজে দেখতে পেলেন অগ্রহায়ণের নীল আকাশ দূরের সবুজ বনকে ছুঁয়েছে, একটা নদী বয়ে যাচ্ছে —অসংখ্য নৌকো পাল তুলেছে তাতে, ঘুলো-কলসী এই সব নিয়ে একদল মেয়ে চলেছে ঘাটে, কী যেন গানও গাইছে তারা।

আজ তাঁর বড়ো বোনের বিয়ে।

ঘাট থেকে তাঁদের বাড়ী বেশি দূরে নয়—এই পথটুকুর দুধারে সারি সারি কলাগাছ পুঁতে দেওয়া হয়েছে, আলো দুলিয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা কয়েক। এই পথ ধরে বর আসবে।

সন্ধ্যাবেলায় বর আসবে, কিন্তু বিকেল থেকেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আর উত্তেজনার শেষ নেই। সমানে ঘাটে ঘুরছে তারা। ওই তো একটা মস্ত নৌকো চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ওই তো দেখা যায় বরযাত্রীদের —ওই নৌকো? না—না, এ ঘাটে তো ভিড়ল না। আর কোনো গ্রামে যাবে খুব সম্ভব। আজ বিয়ের তারিখ— দূরে কাছে আরো কত বিয়ে আছে কে জানে!

ছবিটা বদলায়। আলোতে সানাইতে চারদিক ঝলমল। বিয়ের আসর। বাবা বড়দিকে সম্প্রদান করছেন। মন্ত্র পড়ছেন গ্রামের রাম পন্ডিত, অল্প বয়েসে নাকি কাশীতে থেকে সংস্কৃত পড়েছিলেন।

'ও' প্রজাপতি ঋষি—গায়ত্রী ছন্দ—'

আর একটা সকাল। বরের নৌকো ঘাট ছেড়ে চলে গেল। নৌকোর সামনে খোলা জায়গায় বসে লাল চেলিপরা বড়দি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা কাঁদছেন ডাঙায় দাঁড়িয়ে—কাকিমা কাঁদছে—আরো কারা সব কাঁদছেন যেন চারপাশে। বাবা একবার ধরা গলায় বললেন, দুর্গা—দুর্গা। পুরুতঠাকুর রাম পন্ডিত মন্ত্র পড়ছেন : 'পুষ্পমালা —পতাকা—'

নদীতে হাওয়া উঠেছে। নৌকো বাদাম তুলল। ঘাট ছেড়ে এগিয়ে গেল দূরে। ওই যে কাপাশডাঙার বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড়দিকে এতদূরে থেকে ছোট্ট একটা রক্তজবার মতো মনে হয়।

আর একটা ছবি। এবার নিজেই চলেছেন পালকীতে। পেছনে তিনখানা গোরুর গাড়ীতে বরযাত্রীর দল। পালকীর তালে তালে চলেছেন দুলতে দুলতে—পাশে বসে আছে আট বছরের ভাগনে মিলন—বড়দির ছোট ছেলে।

মেয়েরা উঁকি মারছে দু ধার থেকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে চলেছে পালকির সঙ্গে সঙ্গে।

'কোথাকার বর? কোথায় বিয়া?'

দুজন মুসলমান চাষী বাবাকে চেনে। তারা ঠাট্টা করছে।

'কত্তা, ব্যাটার বিয়া দিতাছেন, আমরা নেওতা পাইতম না?'

বাবা বলছেন, 'আসবা—আসবা বৌ-ভাতের দিন আসবা।'

পালকী থেকে মুখ বার করে গৌরাঙ্গবাবু দেখছেন, আকাশে গোধূলির রং। বনের ওপারে সন্ধ্যাতারা ফুটেছে। দূর থেকে সানাইয়ের শব্দ শোনা যায়। ওই সামনের ঘাটটুকু পেরিয়ে গেলেই—'

—এই যে, কেমন আছেন?

ছবিগুলো সেদিনের গোধূলি-আকাশের কয়েক টুকরো রং মাখা মেঘের মতো মিলিয়ে গেল। গৌরাঙ্গবাবু জেগে উঠলেন। ধারালো রোদ ঠিক গায়ে এসে পড়েনি; কিন্তু তবু যেন চোখে ধাঁধা লাগে। গলির আকাশটাতে সাইডিঙের ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আসছে সাপের মতো।

সামনে দাঁড়িয়ে বাঁড়ুজ্জে।

হাতে সেই লাঠিটা—আগেও যেটা নিয়ে আসা-যাওয়া করতেন। তেমনি খুশিতে চকচকে মুখ। ভাবনা নেই, দুঃখ নেই, পেন্শন পাওয়া দিনগুলো পরম নিশ্চিন্তে কাটিয়ে যাচ্ছেন।

বাঁড়ুজ্জে বললেন, এই যে, অনেক-দিন পরে।

গৌরাঙ্গবাবু জবাব দিলেন না। রোদের আলোয় জ্বালাধরা চোখ মেলে চেয়ে রইলেন কেবল।

—এখন একটু ভালো আছেন?

—চলে যাচ্ছে।

বাঁড়ুজ্জে আরো কাছে এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ বসে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু বারান্দায় একটিমাত্র জলচৌকি এবং সেটিতে গৌরাঙ্গবাবু বসে আছেন। আশা করলেন গৌরাঙ্গবাবু ভেতর থেকে একটা মোড়া-টোড়া আনবার ব্যবস্থা হয়তো করবেন, কিন্তু সেদিকে আপাতত তাঁর কোনো উৎসাহ আছে বলে মনে হল না।

বাঁড়ুজ্জে হাল ছাড়লেন না। উঁচু বারান্দাটাতেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—বাতের অবস্থা কেমন?

—যেমন থাকে।

—বলেন তো, বিন্ধ্যাচল আশ্রমের সেই মাদুলীটা—

—কিছু দরকার নেই, কোনো কাজে আসবে না।

—বলা যায় না মশাই। আমার এক

পিসতুতো ভাই—বাঁড়ুজ্জে তাঁর অভ্যাস-মতো আর একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী আরম্ভ করলেন।

গৌরাঙ্গবাবু চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর কিছু বলবার দরকার নেই, এমন কি শোনবারও নয়। বাঁড়ুজ্জের কথা বলবার একটা উপলক্ষ পেলেই যথেষ্ট—শ্রোতা কেউ না থাকলেও একটানা বলে যাবেন তিনি। মৃত্যুর তিন চারদিন আগে নাকি তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, 'মরে অন্তত তোমার বকবকানি শোনার জ্বালা থেকে বাঁচব।' ঘুমিয়েও বাঁড়ুজ্জের মুখ বন্ধ হয় না—সমস্ত রাত ধরে তিনি কথা বলেন।

ধরে ভুগছেন সেটা জানিয়ে—চিঠি দিলেই পাঠিয়ে দেবে। আর যদি স্পেশ্যাল মাদুলী নিতে চান, তা হলে দশ টাকা পাঠাতে হবে।

কথা বলবার মতো প্রবৃত্তি নেই, উৎসাহও নেই। তবু একটা বেয়াড়া কথা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

—মা চামুণ্ডার কাছেও স্পেশ্যাল! উনিও কি গরীব বড়োলোকের তফাৎ রাখেন নাকি?

বাঁড়ুজ্জে থতমত খেলেন।

—না, ইয়ে—মানে কথাটা ঠিক তা নয়। —একটা ঢোক গিলে বললেন, মানে

"মা চামুণ্ডার কাছেও স্পেশ্যাল!"

অলৌকিক কাহিনীটা শেষ হল।

বাঁড়ুজ্জে একবার দম নিলেন : সেইজন্যেই বলছিলুম। আপনি যদি চান, আমি ঠিকানাটা দিতে পারি। শুধু মা চামুণ্ডার নামে পাঁচ টাকার পুজো পাঠিয়ে—অসুখের নাম আর কতদিন

স্পেশ্যালের জন্যে বোধ হয় আলাদা একটা ডাকিনী-যজ্ঞ করতে হয়। তারও তো কিছু খরচ আছে।

—তা হলে সবটাই মা-র একার হাতে নেই? তাঁর ডাকিনীদেরও ঘুষ দিতে হয়?

আচ্ছা লোক তো! মনে মনে বিরক্ত হলেন বাঁড়ুজ্জে—নিশ্চয় নাস্তিক, নইলে এমনভাবে দেবদেবী নিয়ে এ'ড়ে তর্ক করে! সেইজন্যেই কিছু হয় না—এত কষ্ট পাচ্ছে!

বাঁড়ুজ্জে চুপ করে রইলেন মিনিট খানেক। বারান্দার নীচে একটুখানি ভিজে ভিজে জমিতে কয়েকটা ছোট ছোট গাছপালা রয়েছে. হাতের লাঠিটা দিয়ে সেগুলোকে বিধ্বস্ত করতে লাগলেন। তারপর :

—ছেলেমেয়ের কোনো খবর পেলেন?

কিছুক্ষণ স্মৃতির ভেতরে ডুবে গিয়ে যে রক্তঝরা যন্ত্রণার ওপর খানিকটা গরম প্রলেপ পড়েছিল, সেখানটায় আবার টনটন করে উঠল। যেন হৃৎপিণ্ডটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে প্রাণপণে টান মারল কেউ।

দাঁতের ওপর দাঁত বসল গৌরাঙ্গ-বাবুর।

—এখনো কোনো খবর পাননি?

—না।

—যাবে আর কোথায়—বাঁড়ুজ্জে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন : এই কলকাতা-তেই কোথাও আছে, আর ভালোই আছে খুব সম্ভব।

গৌরাঙ্গবাবু নীরব।

——দিনকাল যা হয়েছে—বাঁড়ুজ্জে গলা খাঁকারি দিলেন : বললেন, ছেলে-মেয়েদের আর ঘরে রাখা যাবে না। কী কুক্ষণেই স্বাধীনতা দেশে এসেছিল মশাই—সকলেরই পাখনা বেরিয়েছে, সবাই স্বাধীন হয়েছে। নইলে অসুস্থ বাপকে এমন করে ফেলে পালায়! আমাদের এখন আর বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই দে মশাই, সময় থাকতে এখন মানে মানে ওপারের দিকে পা বাড়াতে পারলেই আমরা নিস্তার পাই—হাড়ে বাতাস লাগে।

জবাব দিতে না চাইলেও বাঁড়ুজ্জে মুখ থেকে কথা বের করে আনেন, একটা অদ্ভুত শক্তি আছে তাঁর। বিকৃত স্বরে গৌরাঙ্গবাবু বললেন, সেইজন্যেই তো বলছি মশাই, আপনার মাদুলী-তাবিজ জলপড়া আমার কোনো কাজে আসবে না।

—তা বটে, তা বটে। —বাঁড়ুজ্জে মাথা নাড়লেন, আবার হাতের লাঠিটা

দিয়ে মাটি খ‍ুঁড়তে লাগলেন, কয়েকটা শিশ‍ু কচুগাছকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। একটি ছোট্ট ব্যাং তাদের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, প্রাণের ভয়ে সেটা লাফাতে লাফাতে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে পড়তেই সামনের পাঁচিলের ওপর থেকে কাক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর—ঠোঁটে করে নিয়ে চলে গেল।

সমস্ত জিনিসটা দেখলেন গৌরাঙ্গবাব‍ু। সঙ্গে সঙ্গে আবার ছেলেবেলার দিন থেকে এক ট‍ুকরো স্মৃতি ভেসে উঠল। নদী দিয়ে একটা মরা মান‍ুষ ফ‍ুলে ঢোল হয়ে ভেসে চলেছে আর দ‍ুধার থেকে প্রায় শ'খানিক কাক গিয়ে উড়ে পড়েছে তার ওপর। মারামারি করছে— ছি‍ঁড়ে খাচ্ছে—কর্কশ চিৎকার করছে, এ ওকে তাড়া করছে। একটা মস্ত দাঁড়কাক লম্বা নাড়ীর মতো কী তুলে নিয়ে ওপারে উড়ে পালালো। বিষাক্ত দ‍ুর্গন্ধে নদীর দ‍ুধার যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—গৌরাঙ্গবাব‍ুও ছ‍ুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সে রাত্তরী আতঙ্কে তাঁর ভালো করে ঘ‍ুম আসেনি।

কিন্তু আজ পালাবেন কোথায়? স্পষ্ট দেখলেন, ওই মড়াটা আর কেউ নয়—ও তাঁরই শরীর। একটা পঙ্কিল কদর্য স্রোতের মধ্যে দিয়ে তাঁরও শরীরটা শব হয়ে ভেসে চলেছে আর অসংখ্য কাক ছি‍ঁড়ে ছি‍ঁড়ে খেয়ে চলেছে তাকে। এই বাঁড়‍ুজ্জে লোকটাও সেই কাকগ‍ুলোরই একটা।

বাঁড়‍ুজ্জে আবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন।

—যাই, রাস্তার দিক থেকে একট‍ু ঘ‍ুরে আসি। যেতে আর ইচ্ছেই করে না মশাই। ডাক্তারের দোকানটাতে একট‍ু বসতুম, দ‍ুটো গল্পগ‍ুজব করতুম, তা সে পাট তো—

সামনে দিয়ে দ‍ুখানা রিক্‌সা চলে গেল, অনেক মালপত্র নিয়ে কারা যেন কোথায় যাচ্ছে। বাঁড়‍ুজ্জে একবার খর-চোখে তাকিয়ে দেখলেন, তাদের চিনতে পারলেন কিনা। তারপরেই আবার ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গটা কুড়িয়ে নিলেন।

—লোকটা বোকা-সোকা যাই হোক, খ‍ুব ভালো মান‍ুষ ছিল মশাই। কারো সঙ্গে কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল না, সব সময়েই হাসিম‍ুখ। পাড়ার ছেলেরা কত বিরক্ত করত, কিছ‍ুতে রাগ করত না। ও যে অমনভাবে আত্মহত্যা করবে—

গৌরাঙ্গবাব‍ুর শরীরটা জলচৌকির ওপরে শক্ত হয়ে এল।

—ঈস্‌—, কী রক্ত মশাই, কী রক্ত। এই রোগা লোকটার গায়ে যে এত রক্ত ছিল—

এইবার সীমা ছাড়িয়ে গেল গৌরাঙ্গবাব‍ুর। আর পারলেন না।

—দয়া করে আপনি থাম‍ুন তো মশাই। আমাকে একট‍ু চ‍ুপ করে থাকতে দিন।

বাঁড়‍ুজ্জে থমকে গেলেন। একবার ভীত চোখে তাকিয়ে দেখলেন গৌরাঙ্গবাব‍ুর দিকে। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লোকটাকে—কি রকম বেঁকে গেছে ম‍ুখটা—একদিকের গালটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়ে ঘন নীল রং ধরেছে।

বাঁড়‍ুজ্জে বিড়বিড় করে বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা! অস‍ুস্থ মান‍ুষ, বিশ্রাম কর‍ুন আপনি।

হাতের লাঠিটা দিয়ে ন‍ুড়িগ‍ুলোকে ঠ‍ুকতে ঠ‍ুকতে এগিয়ে গেলেন বড়ো রাস্তার দিকে।

আর গৌরাঙ্গবাব‍ু চেয়ে দেখলেন, পাঁচিলের ওপর বসে সেই ডাকাত কাকটা ছোট ব্যাংটাকে ছি‍ঁড়ে ছি‍ঁড়ে খাচ্ছে এখনো।

সন্ধ্যায় অভয় আসছিল গোঁ গোঁ করতে করতে। একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ফোরম্যানের সঙ্গে খানিক কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। চাকরির খাতিরে অভয়ই শেষ পর্যন্ত মাপ চাইল, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছে করছিল লোকটার টুঁটি টিপে ধরে।

বাস থেকে নেমেই সামনের একটা কুকুরকে প্রচণ্ড লাথি বসালো একটা। মনের হিংস্রতাটা খানিক পরিমাণে ম‍ুক্তি পেলো যেন। তারপর বাড়ীর দিকে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় :

—দাদা শ‍ুনছেন?

অমল। একট‍ু আগেই সিগারেট ধরিয়েছিল, ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—পথে পড়ে সেটা জ্বলছে। নানা গণ্ডগোলের পর অমলের ইদানিং যেন খানিকটা ভক্তি হয়েছে অভয়ের ওপর, সামনা-সামনি আর সিগারেট খায় না।

বিরক্ত হয়ে অভয় বললে, কী হয়েছে।

—একট‍ু দাঁড়িয়ে যাবেন? একটা খবর ছিল।

—কী খবর? —সন্দিগ্ধভাবে অভয় থামল, ভ্র‍ু দ‍ুটো জ‍ুড়ে গেল কপালে।

—আপনার ছোট বোন—

ইলেকট্রিকের 'শক' লাগবার মতো অভয়ের সমস্ত স্নায়‍ু এক সঙ্গে চমকে উঠল। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : কোথায় আছে সে—ঠিকানা জানতে পেরেছ?

—না দাদা, পাকা খবর এখনো পাইনি। তবে—অমলের চোখে ম‍ুখে উৎসাহ ফ‍ুটে বের‍ুল : মানে, আমিও একট‍ু আধট‍ু গোয়েন্দাগিরি করছিল‍ুম। ধর্মতলার আমার সেই মোটর-মেকানিক বন্ধ‍ুটির দোকানটার কথা মনে আছে? যার পাশেই সেই রেস্ট‍ুরেন্ট—যেখানে চন্দন সিং আপনার ছোট বোন আর ছোট ভাইকে চা খাওয়াত? আজ একট‍ু আগে সেখানে বসে আছি—দেখি চন্দন সিং আর একজন জাঁদরেল চেহারার শিখ সেখানে ঢ‍ুকল। ওরা একটা কেবিনে গিয়ে বসল। আমি আর আমার বন্ধ‍ুটি পাশেই চা খাচ্ছিল‍ুম, খানিক পরেই শ‍ুনি চেঁচামেচি হচ্ছে। আমি পাঞ্জাবী ব‍ুঝি না—আমার বন্ধ‍ু মানিক ব‍ুঝতে পারে—ওর তো আবার পাইকারীদের নিয়েই অনেক কাজ-কারবার করতে হয় কিনা। তব‍ু 'অমিয়' নামটা বার কয়েক কানে এল। মানিক বললে, চন্দন সিং চ্যাঁচাচ্ছিল 'ওদের তুমি মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দিলে কেন, কার হ‍ুক‍ুমে?' আর সেই প্রকাণ্ড লোকটা—'চাচা' বলে ডাকছিল তাকে, সে বললে, 'তুমি আমাকে বেশি আঁখ দেখিয়ো না—তোমার ভালোর জন্যেই করেছি। শেষে প‍ুলিশ কেস হলে কী করতে?'

অভয়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

—তারপর?

গোয়েন্দাগিরির উল্লাসে অমল বলে যেতে লাগল ঃ চন্দন সিং বললে, 'আমি ও লড়কীটাকে বিয়ে করতাম।' চাচা বললে, 'খবরদার। গর্মী, সুজাক—কী নেই তোমার? রোগ না সারিয়ে একটা কচি মেয়েকে ভুলিয়ে শাদী করবে? মিথ্যে মেরে ফেলবে তাকে? তোমাদের জন্যেই পাঞ্জাবীদের বদনাম হয়। আরে বুদ্ধু, আগে মানুষ হ—তারপর আমি হরকিসিমকা—হরদেশকা লড়কী জুটিয়ে দেব—যাকে খুশি শাদী করিস।' তারপরে আরো কী সব ঝগড়া হল, দুজনেই দুম দুম করে বেরিয়ে চলে গেল। একটা গাড়ীতেই এসেছিল, চন্দন সিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল আর চাচা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল মৌলালীর দিকে।

অভয় বললে, হুঁ।

অমল উৎসাহ দিয়ে বললে, ভাববেন না দাদা। পুলিশ কিছু করবে না, আমরাই খোঁজ-খবর নিয়ে ঠিক বের করে ফেলব।

বলতে বলতে অভয়ের বাসার সামনে এসে পড়েছিল দুজনে। অভয় একবার অমলের দিকে চাইল কঠোর দৃষ্টিতে।

—বেশ, পারো তো খুঁজে বের করো। কিন্তু তার জন্যে কি বক্‌শিস চাও তুমি?

—বখ্‌শিস আবার কী দাদা? পাড়ার মেয়ে, তার জন্যে—

অভয় অমলের কাঁধে হাত রাখল।

—শুধু পাড়ার মেয়ে বলেই? তুমি তো তৃপ্তিকে পছন্দ করেছিলে?

অমলের মুখ লাল হয়ে উঠল ঃ ছি ছি দাদা—কী যে বলেন--আমি—

—মিথ্যে বলছ কেন? ভালো না লাগলে কি আর ওকে অমন করে প্রেম-পত্র লিখতে পারতে? তা হলে আমিও কথা দিচ্ছি—অভয়ের চোখ দুটো যেন অমলের গায়ে দুটো জ্বলন্ত টিকের মতো বিঁধতে লাগল ঃ যদি তুমি ওকে খুঁজে বের করতে পারো, আর বদমায়েসীগুলো ছেড়ে দাও—তা হলে তৃপ্তির সঙ্গেই তোমার আমি বিয়ে দেব। আমি—

বাকীটা অভয় আর বলতে পারল না, তার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে অমল ছুটে পালালো।

অভয় কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেদিকে। একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটে।

বাসায় ঢুকতেই একটা চিৎকার কানে এল তার। বাবার গলা।

—কী হল, কী হল তোমার? অমন করে পড়ে আছো কেন? কেন সাড়া দিচ্ছ না? কী হয়েছে?

অভয় ছুটে ভেতরে এল। ভেতরের বারান্দায় মা লুটিয়ে পড়ে আছেন। একটা কুলোয় করে কিছু ডাল নিয়ে চলে-ছিলেন, হাত থেকে কুলোটা ছিটকে গিয়ে সারা বারান্দায় ডালগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। মার চোখ বোজা—একখানা হাত বুকের ওপর, গলা দিয়ে অল্প অল্প গোঙানি বেরিয়ে আসছে। বাবা পাশেই দাঁড়িয়ে, তাঁর বাতে অষ্টাবক্র শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। অভয়কে দেখে ভাঙা গলায় বললেন ঃ তোর মার কী হল অভয়, কী হল? হঠাৎ এমন করে পড়ে গেল?

অভয় পাগলের মতো বেরিয়ে গেল। বড়ো রাস্তার দোকানে ডাক্তার সবে এসে বসেছেন, তাঁকে টেনে আনল সেখান থেকে।

ডাক্তার বললেন, করোনারী অ্যাটাক।

এই ঘটনার পরের দিনই সন্ধ্যে-বেলায় অভয়কে ছুটতে হল চন্দন সিংয়ের ওখানে।
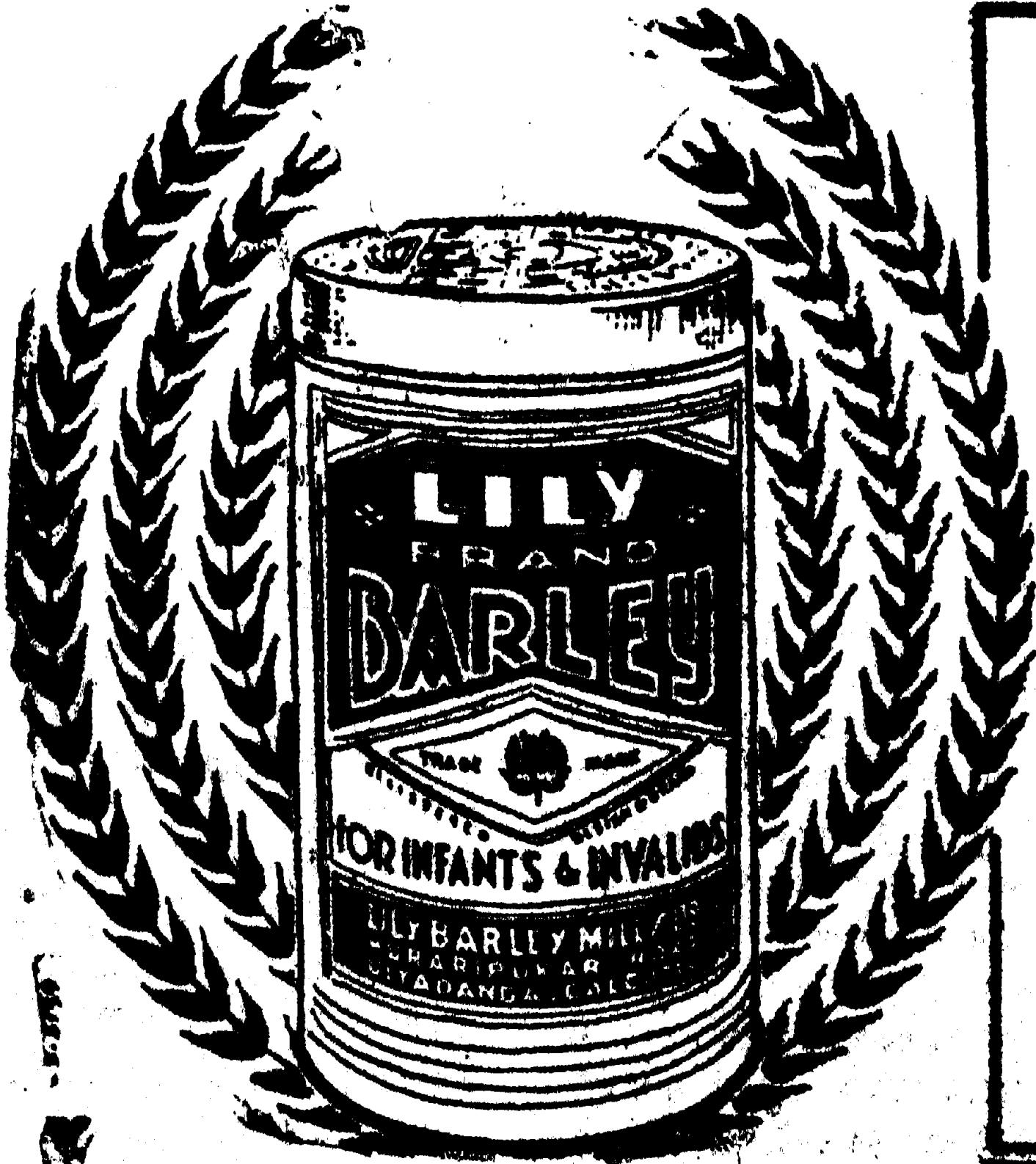
(ক্রমশঃ)

অথ প্যারিস-কথা

দিলীপ মালাকার

প্যারিস, গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। গ্রীষ্ম মানে আমাদের চৈত্র-বৈশাখ মাসের গরম কাল নয়। পৌষ-মাঘের আবহাওয়া। আমরা করি শীতের প্রার্থনা, এরা করে গ্রীষ্মের। গ্রীষ্মের ছুটিগুলোকে এরা চাটনির মতন চেটে থাকে গ্রামাঞ্চলে, সমুদ্রের ধারে নয়তো পাহাড়ে। সারা বছর ধরে চলে তারই তোড়জোড়। সঞ্চয়, পরিকল্পনা, আরও কত কি। সেপ্টেম্বরে একে একে শহরে কল-কারখানায় অফিস-আদালতে ছুটি উৎসব সাঙ্গ করে কর্মীর দল কাজে যোগ দিচ্ছে। তবে অনেকের ছুটি পর্ব এখনও শেষ হয়নি। ছুটির শেষে কাজে প্রত্যা-বর্তনকে ফরাসীরা বলে 'রুন্ত্রে'। অর্থাৎ প্রবেশ, গৃহপ্রবেশ।

সিনারিসির নতুন ধরনের পোষাক

ছুটির পরে প্রবেশে কে কি রকমের পোষাক পরবে। কে কি রকমের সাজ-গোজ করবে তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন পোষাক-বিলাসিনীদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান। পোষাক-বিলাস, সাজ-গোজ নাকি শিল্পেরই অংগ। প্যারিস শিল্প-চর্চার মক্কা। সেই প্যারিসে বছরে দু'বার করে হয়ে থাকে পোষাক ও সাজ-গোজের বিরাট প্রদর্শনী। গ্রীষ্মকালের পোষাকের ফ্যাসন প্রদর্শনী হয় জানুয়ারী মাসে আর শীতকালের ফ্যাসান প্রদর্শনী জুলাই-এর শেষে।

পোষাক, সাজ-গোজ, প্রসাধন-বিলা-সিনীদের স্বর্গরাজ্য এই প্যারিসে শীত-কালের ফ্যাসান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই'এর শেষে। কিন্তু সেই প্রদর্শনীর সংবাদপত্রের সমালোচনা শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিক ও মহিলাদের পত্রিকায় এখন পাতার পর পাতা ভর্তি শুধু মহিলাদের ফ্যাশন নিয়ে রঙের ছড়াছড়ি। শীত আসছে। সেই শীতে যে যার পছন্দ মতন পোষাক যেমন পরিধান করবে তেমনি তার পোষাকের সংগে মাথার চুলের বাহার, জুতো, মুখ ও ঠোঁটের রঙ এমনকি অন্তর্বাস কোন ধরণের হবে তার বিস্তৃত আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যাদের দুপুরবেলা কোনো কাজ নেই। ঘুমোবার টনিক হিসেবে পত্র-পত্রিকার পাতাগুলো যেমন কাজ করে, তেমনি পোষাক প্রতিষ্ঠানের, আতর ও সৌন্দর্য পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনগুলো আকর্ষণ করে তাদের ভাবি খদ্দেরদের। রেডিও, টেলিভিশনে, সংবাদপত্রের কথা ছেড়েই দিলাম, প্রায়ই শোনা যাচ্ছে ফ্যাশন-বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। কেউ বলছে অমুকের পোষাক দেখতে ভাল হয়েছে কিন্তু কাপড়ের রঙটা ম্যাড়মেড়ে। কেউ বলছে অমুকের পোষাক চমৎকার কিন্তু নারীর সৌন্দর্য খেলেনি।

যাই হোক, এবারকার শীতের পোষাকের নতুনত্ব হল গলা ও মাথা ঢাকার ব্যবস্থা। তবে হাঁটুর ওপরে স্কার্ট না উঠে নিচে নেমেছে। আর গলার দিকে উর্ধ্বগামী। সত্যিকথা বলতে কি আমি সাত-আট বছর ফরাসী সমাজে বসবাস করে, এমনকি এক ফ্যাশন-স্রষ্টার সংগে আত্মীয়তা থাকা-সত্ত্বেও এদের গূঢ় রহস্য বুঝতে পারলাম না। এই বুঝেছি যে কখনো এদের স্কার্টের ঝুল বাড়ে কখনো কমে। সেই সাথে তার দর-দাম। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ফ্যাশন হাউসের একটি পোষাক কম করে দুই থেকে চার হাজার টাকা। ফ্যাশন হাউসের পোষাক সবার জন্যে নয়। এবং যিনি একটা পোষাক কেনেন তিনি তার সংগে তিন চারটে প্রতিষ্ঠানের পোষাক কেনেন। কোনোটা বিয়েবাড়ীর জন্যে কোনটা বা শ্রাদ্ধবাড়ীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'ওত্ কুচুর'। এরাই জগতে ফ্যাশন নিয়ন্ত্রণের

শীতের পোষাক

মালিক। এদের কথায় মহিলারা পোষাক বদ্‌লান। এদের সংখ্যা প্যারিসে মাত্র গোটা পনরটি। তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল ক্রিশ্চিয়ান ডিয়র, পিয়েরে বালমা, বালেন্‌সিয়াগা, গ্রে, নিনা রিশি, শানেল, কারডাঁ, গ্রীফ্‌, হাইম্‌, সাঁলর, দেশে, লভ্যাঁ-কাস্তিলো, এবং আরও অনেকে।

তবে এই কটি প্রতিষ্ঠান শুধু পোষাকই বেচে না এরা প্রসাধন দ্রব্যও তৈরী করে। এসেন্স, পাউডার, স্নো, কাজল, রঙ এবং আরও কত কি এরা বেচে তার ইয়ত্তা নেই। এ সবই বড় ব্যবসা। তাতে লাখ লাখ কোটী টাকার আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এদের সবচেয়ে বড় খদ্দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবার সেখান থেকে খদ্দের কম এসেছিল। কারণ কেনেডি সরকার বলেছে যে, মার্কিন মেয়েরা কেন মার্কিন ফ্যাশন দোকানের পোষাক কিনবে না। তারা কেন শুধু শুধু ফরাসীদের পোষাক কিনে টাকা নষ্ট করে। খাস্‌ রাষ্ট্রপতির স্ত্রী মিসেস্‌ কেনেডি ছিলেন ফরাসী ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানের বাঁধা খদ্দের। এখন তিনি ফরাসী পোষাক কেনেন না। ইনি যেমন স্বদেশী জিনিস কিনেছেন তেমনি তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য কোটী-পতির স্ত্রীরা। ফলে এ বছরে প্যারিসের ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানদের বাজার মন্দা চলেছে। তাদের একমাত্র ভরসা ফরাসী ও জার্মান খদ্দের। ফরাসী-দের প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইতালিয়ানরা। ও [illegible]

পোষাক করে। তবে পুরুষের পোষাক আরও ভাল করে।

ইউরোপীয় পোষাকবিলাসিনীদের স্বর্গরাজ্য প্যারিস। ইউরোপীয় পোষাক-চর্চা করেন যাঁরা তাঁদের কাছে প্যারিসের ফ্যাশন-সংবাদ সর্বদাই অভিপ্রেত। আমাদের দেশের ললনারা ইউরোপীয়

পিয়েরে কারডাঁর পোষাক

ক্রিশ্চিয়ান ডিয়রের সান্ধ্যপোষাক

পোষাক ব্যবহার করেন না বটে, তবে প্রসাধনগুলো। আর মহিলাদের প্রসাধন বলতেও বোঝায় প্যারিসের প্রসাধন। প্রসাধন ও সৌন্দর্য চর্চা সম্বন্ধে বরং ভবিষ্যতে আলোচনা করব।

• • •

প্যারিসের এক চিকিৎসক ডাক্তার বয়াদ আজব কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শরীরবিদ্যা মতে প্রেমে পড়লে নাকি স্বাস্থ্যোন্নতি হয়ে থাকে। অবশ্য তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, শুধু একজনের প্রেমে নয় দুই জনের উভয়ত ভালবাসার দরুণ দেহের স্নায়ুতন্ত্রে আসে নব জাগরণ। প্রেমে পড়ার ফলে মনে আসে আনন্দ এবং তার ফলে মন হয় ঝরঝরে। শরীর ও মন ঝরঝরে হলে বার্ধক্য বিদায় নিয়ে আসে যৌবনের জোয়ার।

প্রেমে পড়লে স্নায়ুতন্ত্রের হিপো থালামুস নামে যন্ত্রটির কাজ শুরু হওয়ায় যে সব রস বেরোয় তাতে মস্তিষ্কের কলকব্জাগুলো সজীব হয়ে ওঠে। উপরন্তু শরীরে রোমাঞ্চ আসে বলে হরমোনগুলো সজীবভাবে কাজ করে। থাইরয়েড ও যৌনগ্রন্থীগুলো চঞ্চল হওয়ার দরুণ নাকি শরীর চাঙ্গা হয়। সব সময়ে নাকি মনে হয় 'বেশ ভাল আছি' ভাব।

প্রেমে পড়লে, কেউ ভালবাসলে বা প্রেমে হাবুডুবু খেলে নাকি স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও যকৃতটি সজীব হয়ে ওঠে, ফলে পিত্ত ইত্যাদি ভাল কাজ করে। যকৃতটি সুস্থ থাকলে আর কিসের ভয়! পেটের অসুখের ভয় নেই। হজম হয় অনায়াসে। তাহলে রক্ত থাকবে শুদ্ধ। বিষাক্ত হওয়ার কোনো ভয় নেই। এর ফলে রক্তে আসে শ্বেতকণিকার প্রাচুর্য। রক্তে শ্বেত-কণিকার সংখ্যা বাড়লে রোগ-মহামারির দুর্ভাবনা কম। ডাক্তার বয়াদ আরও বলেছেন যে, প্রেমে পড়লে নাকি শরীরটা এতই ভাল থাকে যে, সর্দি-কাশির ছোঁয়াচে রোগকেও বুড়ো আঙুল দেখান যায়। শুধু দেহের অভ্যন্তরে নয়। দেহের ত্বকেও নাকি আসে নব-জীবন। চামড়াগুলো সটান হতে থাকে। মাথার চুল ওঠাও নাকি বন্ধ হয়ে যায়। চুলে পাক শুরু করলে কলপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রেমে পড়লে চুল-পড়া যেমন বন্ধ হবে তেমনি নাকি সাদা চুল কালোতে পরিণত হবে। সর্বশেষে ডাক্তার বলেছেন যে, যৌবন অটুট রাখতে ও শরীরটাকে চাঙ্গা রাখতে হলে অন্ততঃ মাঝে মাঝে প্রেমে পড়ুন। প্রেমে হাবু-ডুবু খেলে নাকি অনেক রোগ সেরে যায়।

এতদিন আমাদের জানা ছিল এবং কবিরা অনেক বলেছেন যে, প্রেম হল মনের ব্যাপার। এখন দেখা যাচ্ছে প্রেম শুধু মনের নয় দেহেরও। অর্থাৎ মন ভেদ করে সে দেহের কলকব্জাগুলোকেও সজীব করে তোলে। এই নতুন দাওয়াইটি পাঠকরা প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। ফলাফল আমাদের পত্রিকায় জানাবেন।

নিষ্ফলা

বিশ্বনাথ রায়

(৮)
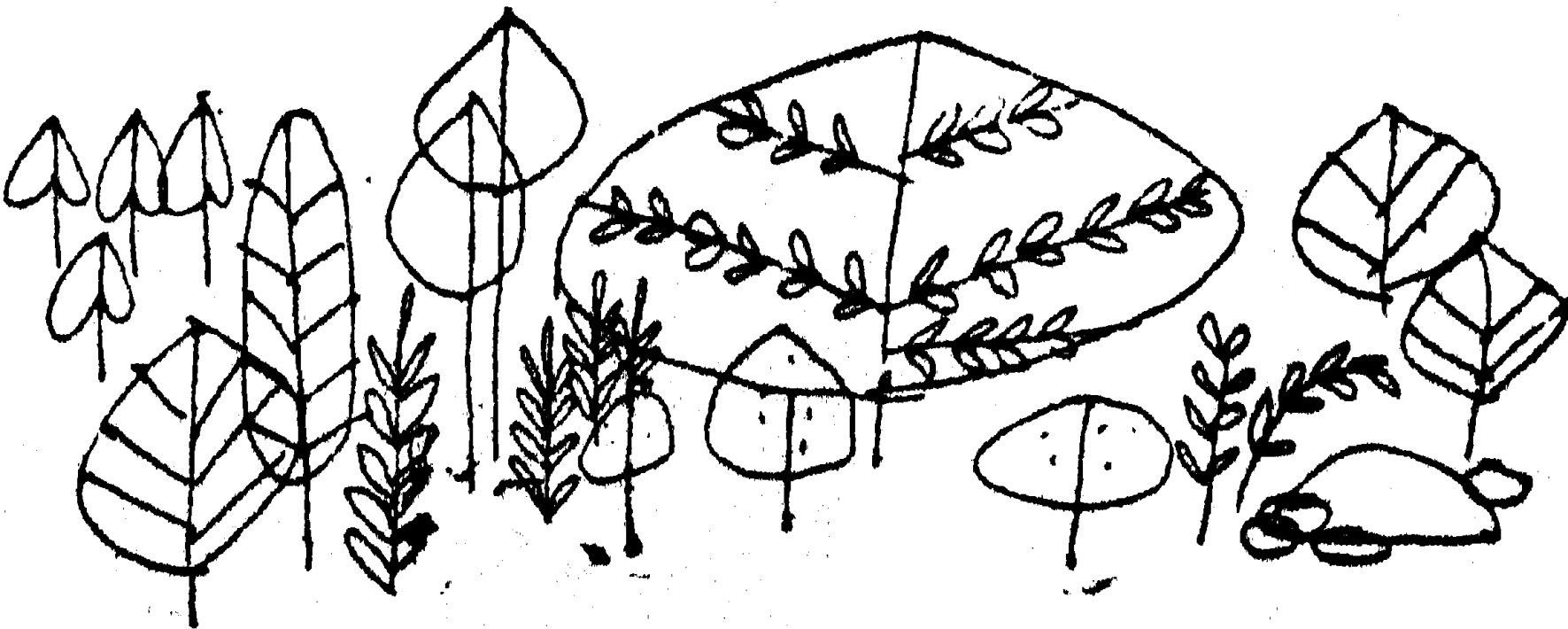
শেষ পর্যন্ত মেয়েটির নাম ফলবতী হয়ে গেল।

হাসপাতালের সদ্য-পাস-করা হাউস সার্জন আমি। প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম মিডওয়াইফ্রি বিভাগের বিশেষ ধরণের শিক্ষা নেব, তাই অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে প্রফেসর-ডিরেক্টর-এর ওয়ার্ডেই ঢুকে পড়লাম।

ওয়ার্ডের কাজের হিসেব আর নাই বা দিলাম। সকাল সাতটার মধ্যেই কোয়াটার্স থেকে ওয়ার্ডে ছুটতে হয়। আগের রাত্তিরে সিনিয়র যা বলে দেন, আমায় পালন করতে হয় অক্ষরে অক্ষরে। নতুন পেশেন্ট-এর হিস্ট্রি লেখা, পুরনো-দের তত্ত্বাবধান করার ভার আমার ওপরই। তাছাড়া ইনজেকসন দেওয়া আছে, অপারেশনের রোগিণীদের ব্লাড-প্রেসার দেখা, স্যালাইন রক্ত চালানোর দায়িত্ব আমারই। সবকিছু শেষ করে আটটার মধ্যে, অফিসের বারান্দার পাশে দাঁড়াতে হয়। আমার জায়গা সবার পিছে। প্রথমে ডেপুটি, তারপরে রেসি-ডেন্ট সার্জন আর সিনিয়র হাউস সার্জন। তাদের পিছনে আমি।

হাসপাতালের বড় ঘড়িটায় আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ভোল পালটে যায়। গেটের দরোয়ান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সজোরে ঘন্টা বাজাতে থাকে। স্ট্রেচার-বয়রা হঠাৎ যেন সেনাপতির আদেশ পেয়ে অ্যাটেনসন্ হয়ে যায়। আমরা লাইনে দাঁড়িয়েও নির্বাক। আমার বুকের ঢিপঢিপানি শুরু হয়। ভয়ে গলার স্বর পর্যন্ত উবে যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডিরেক্টরের কালো হাডসন গাড়িটা মৃদু শব্দতরঙ্গ তুলে গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ায় আর ডেপুটি ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা জানান। নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নেমে আসেন ডাক্তার বোস, হাসপাতালের মিডওয়াইফ্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর-ডিরেক্টর, ওঁর পুরু লেন্স-এর চশমার দিকে তাকালেই আমার ভিতরটা জমে বরফ হয়ে যাবার দাখিল। অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে থাকে, কিন্তু সারের উপস্থিতিতে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়। সব ভুলে বসে থাকি।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন প্রফেসর-ডিরেক্টর। নাম-সই-করা খাতার সামনে দাঁড়ান কিছুক্ষণ। পকেট থেকে কলম বের করে তারিখের ঘরে সই করে ঘুরে দাঁড়ালেন,—ওয়ার্ডের খবর কী?

প্রশ্নটা আমাকে। হঠাৎ মনে হল বজ্রাঘাত। আমায় প্রশ্ন করবেন এ ধারণার অতীত, তাই সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। কী বলবো আর কী না বলবো, ঠাহর করতে পারলাম না।

আমার জড়তা কাটার আগেই সিনি-য়র গড়গড়িয়ে শুরু করে দিলেন সেপটিক ওয়ার্ড থেকে ডেলিভারী ওয়ার্ডের রোগিণীদের রোজ-নামচা। শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেন ডাক্তার বোস। সিনিয়র আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে গনগনে চোখে তাকিয়ে হাঁকলেন। ফাঁকি একটু কম দিও।

তারপরই শুরু হয় ওয়ার্ড ঘোরার পালা। সামনে প্রফেসর-ডিরেক্টর। তাঁর দুপাশে আর-এস আর ডেপুটি। পেছনের সারিতে আমি আর আমার সিনিয়র। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রোগিণী-দের শয্যা। প্রায় সবগুলো খাটের সঙ্গে কলাইকরা নেমপ্লেট ঝোলানো। প্রফেসর-ডিরেক্টরের নাম খোদাই। আগে দু পাশে সাজানো বেড থাকত, মাঝখানে পথ ছিল। আজকাল আর পথের বালাই নেই। যেখানেই একটা বেড পাতার জায়গা আছে, ভর্তি হয়ে যায় এক্সট্রা বেডে। সুপারিন-টেন্ডেন্টের ঢালা অর্ডার, যতক্ষণ পেশেন্ট শোয়ানোর জায়গা থাকবে, ভর্তি করে যাও।

কোন রোগিণীর গা বাঁচিয়ে কারুর বিছানা কাটিয়ে আমাদের পরিদর্শন পর্ব

এগিয়ে চলে। ওয়ার্ডের বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ওই ভাবে মাটিতে রোগিণী পড়ে থাকাটা দেখতে ভাল লাগে না, অথচ উপায়ও নেই। খাট শেষ হয়ে গেলে, কম্বল আর তোশক পেতেই কাজ সেরে নেওয়া হয়।

সন্ধ্যের দিকে কাজের ভার অনেক কম। সাড়ে ছয়টার সময় পেশেন্টের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করি। তাঁদের জানিয়ে দিই, রোগিণীদের অবস্থা কেমন; চিকিৎসা কি ধরনের চলছে। আর কতদিন থাকতে হবে হাসপাতালে। কি কি ওষুধ আরও লাগবে। এই সব।

আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনা চুকিয়ে ওয়ার্ডে রাউণ্ড সুরু করি। সন্ধ্যেবেলার রাউণ্ডে বেশ একটা মেজাজের আমেজ আছে। প্রফেসরের ভয় নেই। ডেপুটির ধমকানি নেই। এবেলায় নিজেরাই সব কিছুর মালিক। আমরা রোগিণীদের পরীক্ষা করি, ওষুধ বাৎলে দিই, আর মাঝে মাঝে আমরা যেমন প্রফেসরদের কাছ থেকে ধমকানি খাই, তেমনি ধরণের ভারিক্কী চালের বকুনি সিসটারদের দিকে ছুঁড়ে দিই।

—একটু শুনবেন? সেদিন সন্ধ্যেবেলা আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকছিলাম। দরজার মুখে এক ভদ্রলোকের মিনতি।

ঘুরে দাঁড়াই। ভদ্রলোকের হাতে এক ঠোঙা ফল। চোখের চাউনিতে বিন্দু বিন্দু কান্না। এগুলো দয়া করে ষোল নম্বর বেডে পৌঁছে দেবেন?

ষোল নম্বর!

একটু ভাববার চেষ্টা করি। মনে পড়ে। আমাদেরই পেশেণ্ট। ফুটফুটে ছোট বউটি! হাসিমুখী চেহারা। আজ সকাল বেলায় ভর্তি হয়েছে আউটডোর থেকে। পাশের বেডের রোগিণীর সঙ্গে কথা বলছিল আর খিলখিলিয়ে হাসছিল। ডিরেক্টর-প্রফেসর রাউণ্ড দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলেন এক মুহূর্ত। একটু গম্ভীর হয়ে তাকিয়েছিলেন বউটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গিয়েছিল ভয়ে। হাসপাতালের নিয়মকানুনের ধারও সে ধারে না মনে হয়। ডিরেক্টর ডেপুটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কী কেস?

ডেপুটির হয়ে রেসিডেণ্ট সার্জন জবাব দিয়েছিলেন, নতুন পেশেণ্ট। রাতে জুনিয়র হিস্ট্রি লিখবে।

—দরোয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন। একটু গম্ভীরভাবেই জবাব দিলাম। ডাক্তার হয়ে পেশেণ্টএর জন্য ফল বয়ে নিয়ে যেতে কেমন আত্মসম্মানে বা লাগল।

—কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অসহায় উত্তর ভদ্রলোকের। কণ্ঠস্বরটাও বড় করুণ।

—একটু দাঁড়ান, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অদূরে দাঁড়ানো একজন আয়াকে ইশারায় ডেকে বললাম, এই ফলগুলো ষোল নম্বর বেডে পৌঁছে দাও।

ঠোঙাটা আয়ার হাতে দিয়ে ভদ্রলোক একটু স্বস্তির হাসি ছড়িয়ে দিলেন। ধন্যবাদ। আর ওকে একটু বলে দেবেন, আজ আমার অফিস থেকে বেরোতে দেরী হয়ে গেল বলে আসতে পারিনি।

—বলে দেবো। ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকে গেলাম।

সারি সারি অসুস্থ, অর্ধসুস্থ, সুস্থ রোগিণীর দল। কেউ বসে, কেউ বা শুয়ে। আত্মীয়স্বজনের সদ্য বিরহের ছবি সকলের চোখে মুখে। কেউ শালপাতার ঠোঙায় মিষ্টি এনেছিল। ঠোঙাটা পড়ে আছে গামলার ভিতর। কেউ বা মাথার কাছে একরাশ ফল সাজিয়ে রেখেছে। অনেকের বেডের পাশে রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজানো। তারই দিকে তাকিয়ে ঘর-সংসারের স্বপ্নে বিভোর। কবে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাবে, তারই দিন গুনছে ওদের চোখের তারায়।

এক পাশ থেকে রাউণ্ড আরম্ভ করি। পুরোনো পেশেণ্টদের পরীক্ষা শেষ করে ষোল নম্বরের কাছে এসে দাঁড়াই। হাসপাতালের রীতিই এই। পুরনো রোগিণীদের খবরাখবর নিয়ে নতুনের কাছে এসে দাঁড়াতে হয়। তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলতে হয়, অনেক সময় যায়, তাই হাতের কাজ মিটিয়ে বসতে হয় নতুনের কাছে।

ষোল নম্বরের পাশে একটা টুল টেনে বসি, পাশে দাঁড়ায় নার্স ফুলকুমারী।

—কী নাম? বেড-টিকিট খুলে, মিলিয়ে নিই নাম-ধাম।

—জ্যোৎস্না বসু। ভারী মিষ্টি কণ্ঠস্বর মেয়েটির।

—বয়স?

ফিক করে হেসে ফেলে। একবার নার্সের দিকে মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বলে, পনেরো।

—হাতের কী আছে?

আমার ধমকে ওর হাসি নিবে যায়। হাঁটুতে থুতনি লাগিয়ে পায়ের নখ খুঁটতে থাকে।

—ঠিকানা?

পায়ের দিকে তাকিয়ে মামুলী কণ্ঠেই উত্তর দেয়। আমি টিকিটের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। আউটডোর থেকে সবই ঠিকমত লিখেছে।

—কত দিন বিয়ে হয়েছে? টিকিটটা সোজা করে ধরি, টকটক লিখে নেবার জন্যে।

—দু বছর।

—সন্তানাদি?

অকস্মাৎ মেয়েটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল নীরবে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। মৃদুকণ্ঠের জবাব ভেসে এল, না—নেই।

লিখে নিলাম পর পর। মেয়েটি জড়িত অস্পষ্টকণ্ঠে যা বলেছিল, সবটাই গুছিয়ে টিকিটে লিখে রাখলাম পরের দিন প্রফেসরের গোচরীভূত করার প্রত্যাশায়। দু বছরের ভিতর একবার মা হবার প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মাস পাঁচেক আগে। মাস দুয়েক আগে অন্ধকার আকাশ থেকে হঠাৎ একদিন জীবনের তারাটি খসে পড়ে, আর তারপর থেকেই রক্তধারায় বিপদ। কেন যে হয়েছে মেয়েটি জানে না। তার ধারণা এখনও বেঁচে আছে পেটের সন্তান। বাইরে অনেক রকমের চিকিৎসার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফল হয়নি। নিরুপায় হয়ে শেষে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

—ডাক্তারবাবু। মেয়েটির চোখমুখে পরম প্রত্যাশা, আমার সন্তান ঠিক আছে তো?

মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। ওই বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে কেমন বাধো বাধো লাগল। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, বড় ডাক্তারবাবু কাল দেখে সব বুঝিয়ে

বললেন। তারপরই প্রসঙ্গ বদলে ফেলি। ফল পেয়েছেন?

সলজ্জ হাসির উত্তর, হাঁ। পাকা গিন্নীর মত চোখ ঘুরিয়ে আবার বলে, আপনিই বলুন না ডাক্তারবাবু, ফল খেলে ছেলের স্বাস্থ্য ভাল হয় কিনা। ও কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বললে কেবল হাসে।

—আজ আপনার স্বামী অফিস থেকে দেরি করে বেরিয়েছেন, তাই ছ'টার মধ্যে পৌঁছতে পারেননি। মন খারাপ করতে বারণ করে দিয়েছেন।

মৌসুমীর চোখের হাসি আরও চিকচিকিয়ে উঠল। ঠোঁট দুটো হাসিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। —সত্যি?

—আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ? উঠে দাঁড়ালাম।

মেয়েটির হাসি দপ করে নিবে গেল। শুকনো বিবর্ণমুখে জবাব দিল, আমায় ক্ষমা করুন।

ওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলি। সঙ্গে স্টাফ নার্স। বোধ হয় কিছু বলতে চায়, তা নইলে ওয়ার্ডের বাইরেও আসতেন না।

—মেয়েটি একবেলাতেই কেমন মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে আমাদের। স্টাফ অনেকটা নিজের মনেই বললেন।

—একজন পেশেণ্টএর ওপর অত মায়া দেখাবেন না, অন্য পেশেণ্টরা নেগলেক্টেড হবে।

—আপনার রাগ যায়নি এখনও। স্টাফের ওকালতী।

—হওয়া উচিত কিনা বলুন। ফট করে বলে দিলেন আমি মিথ্যে কথা বলছি।

—ও একেবারে ছেলেমানুষ। স্টাফের হাসিতে বাৎসল্য ঝরে পড়ে।

—আপনারা চলে যাবার পর সে কি ঘর-সংসারের গল্প। স্বামী কী খেতে ভালবাসে, কী রঙের জামা পরতে ভালবাসে। স্বামীর জন্যে কটা পুলোভার বুনেছে। একটু থেমে স্টাফ আবার বললেন ও বেচারীর ধারণা পেটের বাচ্চা এখনও নষ্ট হয়নি। ছেলে হলে কী করে মানুষ করবে সেই চিন্তায় ও এখন থেকেই মশগুল।

—ওকে এখন কিছু বলবেন না। আমি অন্য ওয়ার্ডে চলে যাই।

৩

পরদিন সকালে ওয়ার্ড থেকে মৌসুমীকে পরীক্ষার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। প্রফেসর-ডিরেক্টর পরীক্ষা করলেন। তাঁকে দেখে একটু চিন্তিত মনে হল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম সবার পিছনে। ভয়েতে কিছু প্রশ্ন করতে সাহস হল না। তাঁর ইঙ্গিতে স্টাফ মৌসুমীকে নিয়ে ওয়ার্ডে চলে গেলেন।

—এই পেশেণ্টএর অপারেশন কালকেই রাখো। অধ্যাপকের গলাটা কেমন থমথমে। —আর মেটিরিয়ালটা বাওপ্সিতে পাঠিও।

—কিছু সন্দেহ করেন স্যার? ডেপুটির সসংকোচ জিজ্ঞাসা।

—আগে থেকে বলা মুস্কিল। তবে হিস্ট্রি শুনে আর পরীক্ষা করে মনে হচ্ছে কোরিওন-এপিথেলিওমা। তারপর একটু থেমে পুনর্বার আপন মনেই উচ্চারণ করলেন, না হলেই ভাল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। কোরিওন-এপিথেলিওমা তো রোগ নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর ছোবল। অসময়ে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার পর এই রোগের উৎপত্তি হয় সাধারণতঃ। ফুলাংশের সামান্য যদি জরায়ুর গায়ে লেগে থাকে, তাহলে কিছুদিন পরে সেই অংশে পচন ধরে। সেই পচই ধীরে ধীরে ক্যানসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কোরিওন-এপিথেলিওমাই সেই কর্কটরূপী মৃত্যু রোগ। এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা, জরায়ুকে নিশ্চিহ্ন করা। জরায়ু কেটে না ফেললে, সেখান থেকে যদি একবার রোগ ছড়িয়ে যায়, তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মৌসুমীর চোখের তারায় দেখেছি মা হবার একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। প্রফেসরের চিকিৎসার বাণীতে শুনেছি মা হবার সব আশা নির্মূলের সংকেত। কেন জানি না, আমার মনে মনে একান্ত প্রার্থনা, যেন ওই কাল রোগ না হয়।

আমার প্রার্থনার চেয়েও অধ্যাপকের জ্ঞানের ওপর ভগবানের শ্রদ্ধা বেশি ছিল, তাই অপারেশনের পর রিপোর্ট এল জরায়ুর মধ্যে ক্যানসার হয়েছে। এ জরায়ু বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যত তাড়াতাড়ি কেটে বাদ দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

—ওর স্বামীর থেকে বিকেল বেলায় কনসেণ্ট সই করিয়ে নিও। সিনিয়র আমায় বলে দিলেন, অত বড় অপারেশন মত না নিয়ে করা উচিত হবে না।

সন্ধ্যেবেলায় মৌসুমীর স্বামীকে দেখা করতে বললাম। ছটার পর ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। কথায় কথায় জানলাম ভদ্রলোকের নাম নীলাদ্রি বোস।

—এত দেরি করে নিয়ে এলেন কেন? আমার প্রশ্নটার ভিতর একটু রুক্ষতা ছিল, হয়েছিল তো অনেক দিন।

—আর বলেন কেন? নীলাদ্রিবাবু বলে গেলেন সব ব্যাপার গড়গড়িয়ে। এত তাড়াতাড়ি তিনি সন্তান চান না। আর এই সামান্য মাইনেতে ছেলেপুলে হলে চলবে কী করে। অথচ মৌসুমী অটল। তার সন্তান চাই-ই। নিরুপায় হয়ে নীলাদ্রিবাবু এক শিশি ওষুধ জোগাড় করে আনেন। মৌসুমীকে বলেন শরীর ভাল হবার ওষুধ। অগাধ বিশ্বাসে ও ওষুধ খায়। কয়েক দিনের ভিতর পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় এবং নীলাদ্রিবাবুর ইচ্ছাপূরণ হয়। মৌসুমীর কিন্তু এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, তার সন্তান এখনও বেঁচে আছে। একটু থেমে হাসতে হাসতে নীলাদ্রিবাবু বললেন, ছেলেমানুষকে নিয়ে ঘর করা যে কত ঝকমারি। কিছুতেই বুঝতে চায় না।

কোন মন্তব্য করিনি। শুধু বলেছি, আপনি যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন।

—বছরখানেক পরে একটা বাচ্চা হলেই আমি খুশী।

—তার আর উপায় নেই। গম্ভীরভাবে সব ব্যাপারটা খুলে বলি। সব শুনে নীলাদ্রিবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, আর কোনদিনই সন্তান হবে না?

—না।

কনসেণ্ট ফরমের ওপর সই করতে করতে নীলাদ্রিবাবু অনেকটা আপন মনেই বললেন, কিন্তু একটা ছেলে হলে ভাল হত।

—সে সর্বনাশ তো আপনি নিজের হাতেই করেছেন।।

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তারপর ছোট্ট একটা নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

ওয়ার্ডে ঢুকতেই মৌসুমী আমায় ছেঁকে ধরল,—ডাক্তারবাবু, অজ্ঞান করে কী দেখলেন?

—বাচ্চা কেমন আছে দেখা হল। সত্যি কথা মুখ দিয়ে বের হল না।

—কেমন দেখলেন? এখনও ভাল আছে?,

আমায় চুপ থাকতে দেখে নিজের ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলল, জানতাম ভাল থাকবে। পিশিমা বলতেন, যত ফল খাবি, বাচ্চা তত জোয়ান হবে। আমি রোজ ফল খাই। নিজের কথায় নিজেই হাসতে থাকে। ওর ছেলেমানুষী দেখে আমি কোন কথা বলার সাহস পাই না। নীরবে ওয়ার্ড ছেড়ে চলে যাই।

পরদিন অধ্যাপক রোগিণীর অপারেশন করবেন কথা দিলেন। সিনিয়র আমাকে পেশেণ্টএর রক্ত গ্রুপ-

প্রেসার প্রভৃতি পরীক্ষার নির্দেশ দিতেই আমি বললাম, ওগুলো আপনি দেখে দিন, আমার শরীরটা ভাল নয়। আমি কোয়ার্টার্সে চললাম।

সন্ধ্যেবেলায় কোয়ার্টার্সে সিনিয়র আমায় ডেকে বললেন, তুমি একবার তোমার ফলবতীর সঙ্গে দেখা কর।

—ফলবতী! একটু বিস্মিত আমি।

—হাঁ হে। ষোল নম্বর। মাথার কাছে একরাশ ফল নিয়ে যে সব সময়ে বসে আছে। তোমার জন্যে হন্যে হয়ে গেল।

—যাব। পার্টি মিট করার জন্য নেমে পড়ি কোয়ার্টার্স থেকে।

ওয়ার্ডে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে ষোল নম্বর বেডের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আগামীকাল মেয়েটির অপারেশন।

—ও কী! মোসুমী একটু অবাক হয়ে বলল, ডাক্তারবাবু অত গম্ভীর কেন

আমি সচকিত। কখন যে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলাম নিজেই জানি না। রোগিণীর জন্যে এতটা উতলা হওয়া ডাক্তারের শোভা পায় না, তাই সামলে নিয়ে জবাব দিলাম, ওয়ার্ডে আমাদের গম্ভীর হতে হয়।

—কাল আসেননি কেন? আমি কোন অন্যায় কথা বলেছি?

—না। হেসে ফেলি ওর ছেলেমানুষীতে। অন্য কাজ ছিল।

—কবে বাড়ি যাব ডাক্তারবাবু?

—কবে যেতে চান?

—এক্ষুনি বললে, এক্ষুনি চলে যাব।

—বাড়ি গিয়ে কী করবেন?

—ও মা! মেয়েটির চোখে মুখে হাসির ঝরণা, নিজের সংসারে গিয়ে কী করবো জিজ্ঞাসা করছেন? একটু থেমে আবার হেসে বলল, আবার তো আসব।

—আবার আসবেন? একটু অবাক হলাম।

হাসতে হাসতে জবাব দিল, স্টাফ দিদিমণি বলছিলেন আসছে বছর আবার মা হতে আসব।

কোন উত্তর সহসা খুঁজে পাই না। আগামীকালের অপারেশন বিষয়ে রোগিণী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। স্টাফও জানাতে সাহস করেনি।

—কাল আবার আপনাকে অজ্ঞান করা হবে।

—তাহলে আমি আর বাঁচবো না। মোসুমীর কণ্ঠস্বরে ভয় উঁকি দিচ্ছে।

—আজ আপনার স্বামী আসেনি? প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে বলি।

লজ্জামেশানো দৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেল। চোখের কোণে অভিমানের মেঘ। দেখুন না, কালও আসেনি, আজও এলো না।

—হয়ত কোন কাজে আটকে গেছেন। সান্ত্বনা দিই।

—কাজ, কাজ আর কাজ। পুরুষদের এত যে কী কাজ জানি না। সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই জবাব দিল মোসুমী।

একটু চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, আজ মোসুমীকে সব কথা খুলে বলে দিয়েছি। মিথ্যে মরীচিকার মধ্যে ফেলে রাখা উচিত নয়। তাছাড়া বাঁজা বউ নিয়ে চিরকাল ঘর করাও সম্ভব নয়। তাই—।

আর কিছু বলেননি নীলাদ্রিবাবু। বলার প্রয়োজনও হয়নি। পাশের মেয়েটিই সেই অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ উত্তর। আর দাঁড়াইনি। খাবার সময় শুধু বলে গিয়েছি, আপনি যা ভাল বুঝেছেন করেছেন।

রাতে ওয়ার্ডে ঢুকে মোসুমীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। মুখে একটি কথাও নেই, চোখের তারায় জমাট ঘৃণা।

কোন কথা বলতে পারিনি। নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছি ওয়ার্ড থেকে। মাথার কাছে নীলাদ্রিবাবুর দেওয়া একরাশ ফল পড়ে রয়েছে। একটিও স্পর্শ করেনি। ও জেনেছে সারাজীবন নিষ্ফলা হয়ে গেছে ওর।

আবার আসবেন? একটু অবাক হলাম।

দিন সাতেক পরে এমার্জেন্সী ডিউটি শেষ করে কোয়ার্টার্সে ফিরছিলাম গেটের মুখে দেখা হয়ে গেল নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গে। তাঁর পাশে এক ভদ্রমহিলা। সৌখীন বেশভূষা। অবিবাহিতা। আমায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ছিল প্রথমে, কিন্তু একেবারে চোখাচোখি হয়ে যেতে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললেন, মোসুমীকে দেখে এলাম।

—এখন তো অনেক ভাল। আর কয়েক দিনের ভিতর ছেড়ে দেওয়া হবে।

(উত্তর)

মহাশয়,

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত পত্রিকায়' 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীঅহিভূষণ মিত্রের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—

তিন 'নেত্র'—(১) স্নেহ—দক্ষিণ চক্ষু

(২) রুদ্র—বাম চক্ষু

(৩) সংহার—কপালের মধ্যস্থলের চক্ষু

পঞ্চবাণ—শর—(কামদেব ইঁহার পাঁচ বাণ)—

(১) সম্মোহন (২) উন্মাদন (৩) শোষণ (৪) তাপন (৫) স্তম্ভন।

অথবা পুষ্পশর—(১) পদ্ম (২) অশোক (৩) আম্র (৪) নবমল্লিকা ও (৫) নীলপদ্ম।

ইতি—
হরিচরণ মিত্র
লিপটন (ইণ্ডিয়া) লিঃ
সাকচী, জামসেদপুর-১।

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বরের 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীঅহিভূষণ মিত্র ২টি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহাদের উত্তর নিম্নে দিলাম :—

(উত্তর)

(১) রক্তের রং লাল। রক্তপাত সহকারেই সাধারণতঃ অপঘাতজনিত দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। এ জন্যই যেখানে অসাবধানে যাতায়াত করিলে সমূহ বিপদ, এমন কি, আঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত রক্তপাত বা তদ্দ্বেতু মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিবার আশংকা থাকে, সেখানেই লাল রং-এর বিপদজ্ঞাপক সংকেতচিহ্ন দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ঠিক কতদিন হইতে ইহার প্রচলন শুরু হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে বলা শক্ত। তবে ইংরেজ আমল হইতেই ইহার প্রচলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ লাল রং-এর কাঁচযুক্ত বাতি বা লন্ঠন বা লাল নিশান ইত্যাদি এই সংকেত দেখান হইয়া থাকে। ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই যানবাহন এবং লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য লাল রং-এর স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে, দেখা যায়।

(২) নেত্র অর্থে চক্ষু বুঝায়। শাস্ত্র পুরাণাদিতে মহাদেব ও মহাদেবীরই (দুর্গা, কালী) তিন চক্ষু আছে বলিয়া লিখিত আছে। ২টি সাধারণ চক্ষু (ভ্রু-দ্বয়ের) নাসিকার দুই দিকে, আর তৃতীয়টি জ্ঞানচক্ষু, যাহা ভ্রু-দ্বয়ের মধ্যভাগে কপালে অবস্থিত। সুতরাং শতকিয়ার ছড়ার তিন 'নেত্র' বলিতে মহাদেব ও মহাদেবীর তিন চক্ষুকেই বুঝায়।

আর পঞ্চ 'বাণ' বলিতে প্রেমের দেবতা কাম বা মদনের পঞ্চশর বুঝায়।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬ নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
কলিকাতা—৯

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

অমৃত পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগ একটি অভিনব ও সার্থক সংযোজন। সমুচিত উত্তর পাইবার মানসে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি পাঠাইতেছি। আশা করি, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

(১) অবিবাহিতা মহিলাদের নামের পূর্বে "কুমারী" লিখিবার রীতি আছে —কিন্তু অবিবাহিত পুরুষদেরবেলায় ইহার ব্যতিক্রম কেন?

(২) বিবাহিতা মহিলাদের কোনক্রমেই নামের পূর্বে বা মধ্যে "কুমারী" লেখা প্রয়োগ-বহির্ভূত, কিন্তু বিবাহিত সত্ত্বেও পুরুষেরা অবাধেই নামের মধ্যে "কুমার" ব্যবহার করিতে পারেন, যেমন অনিলকুমার......, তপনকুমার......ইত্যাদি। কেন এমন রীতি?

ইতি
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস,
৫৪বি, তালতলা লাইব্রেরী রো,
কলিকাতা—১৪।

(প্রশ্ন)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের "অমৃত" সাময়িকপত্রের 'জানাতে পারেন' বিভাগে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছি :

এক] পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের নাম কি?

দুই] (ক) কোন্ সালে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন?

(খ) রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম কবিতার নাম কি?

তিন] ইংরেজী 'Bob-a-job movement'-এর সঠিক বাংলা কি হবে?

শুভান্তে—
সত্যজিত চক্রবর্তী,
রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ নরেন্দ্রপুর,
২৪ পরগণা।

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

'অমৃত' পত্রিকার চিত্তাকর্ষক 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। আশা করি প্রকাশ করবেন।

(১) বাংলার সমাজ-সংস্কারক দেবীবর মিশ্রের নাম শুনতে পাই। তিনি কে ছিলেন?

(২) 'সন্ধ্যা দেশ' কোথায়?

(৩) 'Bonus' প্রথা কবে কার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়?

(৪) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতিথিদের কিরূপ প্রথায় সম্ভাষণ জানানো হয়?

(৫) পার্শীয়ানরা কী এখনও তাদের শবদেহ জীবজন্তুর মুখে এগিয়ে দেয়?

(৬) সোভিয়েট রাশিয়ার ৫০ মেগাটন বোমার বিস্ফোরণে কোন্ দেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

(৭) ২২শে ডিসেম্বর কেন গ্রন্থাগার দিবস?

(৮) রূপকথা ও উপকথায় মধ্যে তফাৎ কোথায়?

(৯) পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ধর্ম কোনটি?

(১০) 'কল্পতরু' উৎসব কেন হয়?

নমস্কার, ইতি—
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
৭৯, কাশীনাথ চ্যাটার্জি লেন,
শিবপুর, হাওড়া।

অসমতা কেন?

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার একটি প্রশ্ন তুলিয়া ধরিলাম। 'অমৃতে'র পাঠক-মহলের মধ্য হইতে যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব।

বাংলায় তারিখ, সাকিম ইত্যাদি সংক্ষিপ্তরূপে বাংলা ভাষায় কিভাবে আসিল, ইংরাজি ভাষার অনুকরণে? যেমন ইংরাজিতে Number, Maximum, Limited ইত্যাদির সংক্ষিপ্তরূপ No, Max, Ltd, আবার তারিখ, সাকিম ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত রূপ তাং, সাং। কিন্তু হিসাব-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিঃ, এরূপ অসমতাই বা কেন, ইংরাজিতেও অনুরূপ অসমতা রহিয়াছে?

মহম্মদ ইউনুস,
১৩৪, আফিয়েত মঞ্জিল,
তেঁতুলতলা, বর্ধমান।

অনেকে হয়ত প্রতিবেশিনীর গয়না নিয়ে 'আদিখ্যেতা' দেখতে দেখতে অলংকারকে অহংকারের ছদ্মবেশ ভেবেছেন কখনো সখনো। যে মেয়েটি বিয়েতে কিঞ্চিৎ কম ভরির গয়না পেয়েছিল অথবা যার গয়নায় পানমরায় কৌতুকই

সকল অলংকার হে আমার

কণাদ চৌধুরী

বেশী বলে শ্বশুরালয়ের নিয়ত গঞ্জনা শুনতে হচ্ছে, তার কাছে অলংকারের অলংকারিক মর্যাদা এতটুকু নেই। কিন্তু আদি যুগে অলংকারের একমাত্র ভূমিকা ছিল রূপকে উস্কে দেয়া। তবে রূপ মূলতঃ নিশ্চয়ই অলংকার-নির্মিত নয়। নইলে বল্কলাবৃতা শকুন্তলার পক্ষে রাজা দুষ্মন্তকে রূপবন্দী করা সম্ভব হত না। কিন্তু পতিগৃহে যাত্রাকালে সেই শকুন্তলাকেও অলংকার গ্রহণ করতে হয়েছিল বনদেবতাদের কাছ থেকে। হয়ত নগরসভ্যতা সেই কিংবদন্তীর কাল থেকেই নিজের মুখ গয়নার আলোয় দেখতে ভালবাসত।

রূপবর্ধনের উপকরণ হিসেবে বিশেষ কোন কোন সামগ্রীকে অলংকার বলা যেতে পারে বলা শক্ত। অন্ততঃ মহাকবি কালিদাসও অলংকারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারেননি :

কিমিভি হি মধুরাণাম মন্ডনম ন
কৃতিনাম

সুন্দর দেহবল্লরীর পক্ষে যে কোন তৃণই অলংকারের আলো হতে পারে। আদিবাসী রমণীদের অলংকার-তালিকার অনেক অকিঞ্চিৎকর বস্তুই সোনার চেয়ে দামী। কাঠের কাঁটা, গলার লাটকা, কুঁচফলের মালা, মোষের সিং-এর শিরোসজ্জা ইত্যাদির আবেদন গয়না হিসেবে কম না।

অলংকারের আবেদন যে পৌরাণিক, তার অজস্র প্রমাণ মন্দিরগাত্রে, গুহা-মূর্তির মন্ডিত কান্তিতে এবং প্রাচীন চিত্রলিপিতে বর্তমান। অমরাবতীর সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটি যাদুঘরে আজো কর্ণাভরণ পরছে, মহেঞ্জোদারোর ব্রোঞ্জ নর্তকীর ভুজবলয়বদ্ধ আজানুলম্বিত হাত দর্শককুলকে এখনো বিস্ময়ে স্থির রাখে। প্রাচীন ভারতের অলংকারাদির কিছু কিছু নিদর্শন খননকার্যের পরিশ্রমে পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই কালবায়ুভূত। হয়ত আমাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াপদ্ধতিটি যদি অগ্নিদাহ না হত, প্রচুর নিদর্শন সমাধি-মন্দির প্রভৃতি থেকে পাওয়া যেত। কিছু কিছু তবু পাওয়া গেছে। তক্ষশীলায় প্রাপ্ত বিচিত্র ধরনের অলংকারগুলি খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভকালের। কুন্ডল, কটক এবং বলয়ের কারুকার্যে তৎকালীন স্বর্ণমণিকারদের নৈপুণ্যের বিস্ময় সহজে ফুরোবার নয়। ভারহুত, সাঁচী, অমরাবতী, ভাজ, কর্লা এবং কান্হেরী ভাস্কর্যের মস্তকভূষণ মৌলিমণির সঠিক বর্ণনা লিখে দেওয়া অসম্ভব। সিন্ধু সভ্যতার প্রোথিত ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে সোনা এবং মহার্ঘ মণির কণ্ঠি, ভুজ-বলয় কর্ণিকা পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগের শেষদিকে অলংকারে মুক্তোর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল।

মুক্তাজল প্রথিতাম আলকম কামিনীভ।

সাতবাহন এবং কুষাণ যুগে এক-সারি গাঁথা মুক্তোর মালাকে 'একাবলী' বলা হত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অলংকার বর্ণনার প্রামাণ্য ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের যাবতীয় অলংকারের নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন কৌটিল্য। জড়োয়ার হারের বিভিন্ন উদাহরণ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন 'একাবলী' হারের মধ্যমণিটি যদি মুক্তোর না হয়ে অন্য কোন মহার্ঘ পাথরের হয় তাহলে মালিকটি আর 'একাবলী' থাকবে না। অন্য মধ্যমণি-যুক্ত এই হারের নাম 'যষ্টি'। আবার মধ্যমণিটি যদি মুক্তোই হয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় মাপের তেমন মালার নাম 'শীর্ষক'। 'অপবর্তক'-এ সোনার মটরদানা আর মুক্তো একটার পর একটা গ্রথিত থাকে। অর্থাৎ সেকালে মণির সংখ্যা আকার অথবা মধ্যমণি অনুযায়ী মালার নামকরণ হত। কৌটিল্য স্বর্ণকারদের কাজেরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তৎকালীন স্বর্ণ-মণিকারেরা স্বচ্ছন্দেই মণিমুক্তোকে বিভিন্ন আকার দিতে পারতেন এবং স্বর্ণালংকারে মণিমাণিক্য গ্রন্থন-প্রক্রিয়াটিও তাঁদের নখদর্পণের বিষয় ছিল। গুপ্তযুগের মূর্তিগাত্রের অলংকারগুলি নিঃসন্দেহে কৌটিল্যের বিবরণকে সমর্থন করে। ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তার এদেশের অলংকার-চর্চাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল; হিন্দু এবং মুশলিম অলংকরণ-রীতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল মুঘল যুগে। মুঘল অঙ্কন-রীতির প্রভাবে এই যুগেই প্রথম গয়নায় মিনের কাজ শুরু হয়। মুঘল যুগের চিত্রকলায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ফুল, লতাপাতার কাজ। মোহনমালার নক্সা মুঘল যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একই রীতিতে চলে আসছে। ইসলামের প্রতীক অর্ধচন্দ্র

এবং তারার প্রভাবও এ যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মুঘল দরবারের দোর্দন্ড প্রভাব রাজপুত নৃপতিদের অন্তঃপুর-বাসিনীদের অলংকারে, সাজ-সজ্জায় পড়লেও এদেশের সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থবধূরা কিন্তু চিরকালই সেকেলে ছিলেন।

ইদানীং পশ্চিমের জানালাটা এদেশে যত খুলেছে, নিরাবরণ রূপচর্চার নতুন রীতিতে আমাদের দেশের মেয়েরা ততই অভ্যস্থ হচ্ছেন। ফ্যাশান পত্রিকার 'আদর্শ' প্রচ্ছদকন্যারা কেউই তেমন অলংকারমন্ডিতা নন। হয়ত কোনো কোনো কন্ঠে ক্ষীণধারা পাহাড়ী নদীর মত একটা সরু হারের অস্তিত্ব চিক্ চিক্ করছে, বাঁ হাত কিন্তু কোনো অলংকারের অপেক্ষা রাখেনি, ডান হাতে শুধু মণিবন্ধ ঘড়ি। অলংকরণ কোথাও যদি কিছু থাকে—মাথার উঁচু খোঁপা-চুলে, ম্যাসাকারা আঁকা চোখে, পরি-ধেয়ের জলবৎ স্বচ্ছতায়, অন্তর্বাসের অপ্রকাশিত প্রকাশে। অবশ্যই এতে আক্ষেপের কিছু নেই। স্বর্ণভারাক্রান্ত হয়ে বাসে-ট্রামে যাওয়া মুস্কিল, পুলিশ হাঁটা পথেও স্বচ্ছন্দ বিহার বিপজ্জনক, চাকরীর ইন্টারভিউতে এক গা গয়না পরে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাও স্বচ্ছন্দে বিবৃত করা যায় না। অতএব নেহাং উৎসবে ব্যসনে ছাড়া এ যুগের অলংকারগুলি নিরুপদ্র ছুটি উপভোগ করে। এমন কি সাহিত্য এবং চিত্রকলা থেকেও অলংকারের নির্বাসন ঘটেছে। লেখকরা, শিল্পীরা প্রকৃতিক অবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ অলংকার হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সোনার দোকানের ক্যাটালগে ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে গয়নার উল্লেখ নেই।

আজকাল বিয়েতেও অলংকারের আধিক্য ক্রমশঃ কমে আসছে। বিয়ের কনে রতনচূড় পরে না আজকাল, কোমরে অথবা পায়ে গয়না পরার রেওয়াজও বহুকাল হল ফেরারী। চূড়ান্ত ধনীকন্যাও বিয়েতে বাউটির সেট পায় না এখন। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার হল যে গয়না বানানো কাজটা যথেষ্টই কম স্বর্ণসাপেক্ষ ব্যাপার। কিছুদিন আগেও আড়াই ভরির কম হারের কথা ভাবা যেত না, আজকাল এক দেড় ভরিতেও সোনার হ্যাঁ সোনারই হার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোনার কাঠি দিয়ে রমণী হৃদয়কে জাগানো যাচ্ছে না ইদানীং। বিয়েতে

বেশী গয়নার বদলে ক্যাশ সার্টিফিকেট দিলেও কনে অখুশী হয় না খুব।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার অন্তঃপুরচারিণীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার জমা চাইতে পারেন। বিদেশী মুদ্রাসংকট এড়াবার পক্ষে প্রস্তাবটি নাকি বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। স্বামীর ব্যবসায় গোলযোগ ঘটলে স্ত্রীরা যদি গায়ের গয়না খুলে স্বামীকে উদ্ধার করতে পারেন, পরিকল্পনা উদ্ধারেও নিশ্চয়ই অলংকার জমা দেয়া চলতে পারে। বিশেষ করে যে বন্ধকীতে কখনোই টাকা দিতে হবে না উল্টে সুদ হিশেবে টাকা পাওয়া যাবে তেমন বন্ধকীতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না কারোর। বরং রবীন্দ্রানুসরণে অনেক কন্ঠেই ধ্বনিত হবে :

সকল অলংকার হে আমার
বাড়াও প্ল্যানের বলে।।

প্রাচীন ভারতের 'অলংকার-শাস্ত্র'

মাথার গয়না—মৌলিমণি, চটুলাতিলক, চূড়া মকরিধ, চূড়ামণি, পুষ্পপট্ট, রত্নপট্ট।

কানের গয়না—কুন্ডল, দন্তপত্র, কর্ণিকা, কর্ণপুষ্প, ত্রিকান্টকা, বালিকা।

গলার গয়না—শীর্ষক, উপরশীর্ষক, প্রকান্ডক, তরলাপ্রতিবন্ধ, ফলকহার একাবলী।

হাতের গয়না—রত্নবলয়, কনকক্তোর, ভূজবলয়, মুক্তবলয়।

কোমরের গয়না—রাসনা, সরাসনা, মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকি, শ্রোণীসূত্র।

পায়ের গয়না—মঞ্জীর, তুলাকোটি, নূপুর, পদাঙ্গদা, কিঙ্কিণী।
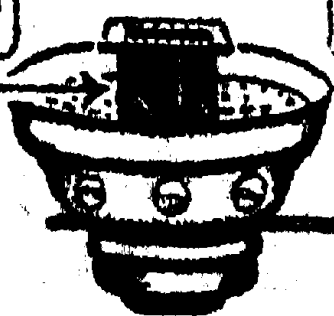
পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্র কুমার মিত্র
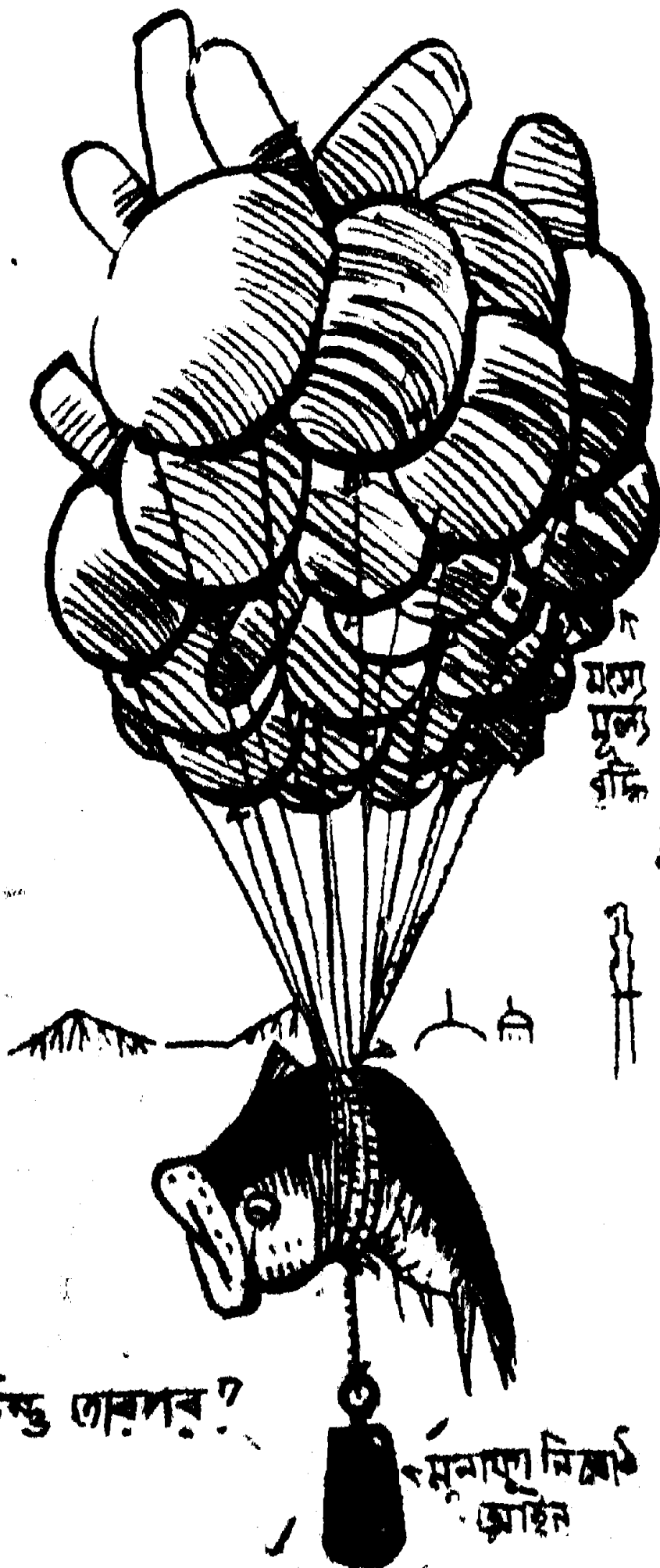
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩

হেমও কথাটা শুনে ঘুমাতে পারে না সারারাত। আশ্চর্য, কালই বড় বৌদি কথাটা বলেছে। কনকও বলেছিল তবে অতটা জোর দেয়নি। বোধহয় সাহস পারেনি দিতে। এখনও কনক তার কাছে অনেকটা ভয়ে ভয়ে থাকে। কোন কিছুই জোর ক'রে বলতে পারে না এখনও।

কথাটা সে স্বীকার করে কনকের কাছেও।

'তুমিও বলছিলে, কাল বড় বৌদিও খুব যাচ্ছেতাই করলেন। তাঁকে বলেই ছিলুম শনিবার যাব। তাঁর মুখেই খবর পেলুম যে ম্যাট্রিক এগজামিন কবে হয়ে চুকে বুকে গেছে। তাইতেই তো প্রথম ভাবনা ধরেছিল। তাই বলে যে এমনটা হবে—ইস্ এ কখনও ভাবতেও পারিনি।'

কনক কোন কথা বলে না। নীরবে বসে ওর পা টিপতে থাকে।

তার বুদ্ধি বা তার দূরদর্শিতা যে বড় বৌয়ের থেকে কম নয়—এটা জোর দেওয়া ঠিক নয়। এসব জয়লাভ শান্ত সংযত হয়ে উপভোগ করতে হয়, কচুলে তেতো করতে নেই।

তাছাড়া সে জানে যে, হেম তার সব ভাই বোনকেই মনে মনে ভালবাসে। জীবনের বহু দুর্যোগ বহু ঝড়ঝাপ্টা বহু কষ্ট সহ্য করেছে সে, বহুদিন উপবাস গেছে তার জীবনে—এখনও জলখাবারের কথা সে ভাবতেই পারে না—সুতরাং বাহ্য রুক্ষতা তার স্বাভাবিক। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করেছে বলেই হয়তো ভাইবোনদের সকলের ওপরই তার টান আছে।

শুধু স্নেহ নয়—এই ভাইটি সম্বন্ধে অনেক আশা, অনেক গর্বও ছিল হেমের।

সেটা নানা কথার ফাঁকে, নানা লোকের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখেছে কনক।

সুতরাং আঘাতটা যে কতটা বেজেছে তার তা সে জানে। এসময় নিজের কথা বলে বিরক্ত করতে নেই।

অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হয় হেমের—কনক এখনও বসে বসে পা টিপেই যাচ্ছে।

'তুমি শোও, শোও। সারারাত বসে থাকবে নাকি!'

'শুচ্ছি, তুমি ঘুমোও।' মৃদুকণ্ঠে বলে কনক।

'পাগল। আমার ঘুম আসতে আজ অনেক দেরি। তোমার খাটা-খাটুনি যায় সারা দিন, তুমি শুয়ে পড়।'

'খাটা-খাটুনিটা তোমার হয় না বুঝি!' একটু হেসে বলে কনক।

যতটা বলেছে হেম তাইতেই সে কৃতার্থ। এর জন্য সারা রাত বসে পা-টিপতেও সে রাজী।

'হ্যাঁ, আমাদের খাটুনী তো কাগজ-কলম নিয়ে! বসে বসে কাজ। মাথার খাটুনী। নাও, নাও, তুমি শুয়ে পড়।'

আজ এই প্রথম, হাত ধরে তাকে জোর ক'রে শুইয়ে দেয় হেম।

কিন্তু কনকেরও ঘুম আসে না আজ। এই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার উত্তেজনা তো আছেই। কিন্তু সে ছাড়াও, সেও ভাবছিল কান্তিরই কথা।

ভাল হয়নি, কাজটা ভাল হয়নি এদের—অমন জায়গায়, অমন পাড়ায় রেখে আসা।

এরা এখনও ভাবে যে কনক রতনের পূর্ণ পরিচয় জানে না। হয়ত আভাসে ইঙ্গিতে কিছু বুঝেছে, তবু সবটা নিশ্চয়ই শোনেনি। তাই এরা প্রাণ খুলে ওর সামনে আলোচনা করতে পারে না। হেমও পারছে না তাই—নইলে, সব কথা খোলাখুলি বলতে পারলে বোধহয় হাল্কা হ'ত ওর মন। কিন্তু ঐ বিশ্বাসটা ওদের আছে জানে বলেই কনক চুপ ক'রে আছে—নইলে কথাটা সেও তুলতে পারত।

কী দরকার মিছিমিছি ওদের অপ্রস্তুত ক'রে।

সবই জানে কনক, ঐন্দ্রিলা কিছুই বলতে বাকী রাখেনি।

আরও বলেছে সে অভয়পদদের সম্বন্ধে তার একটি বিজাতীয় আক্রোশ আছে বলেই। ওদের কেলেঙ্কারী বলতে বলতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যথার্থ আনন্দ পায়।

বোধহয় বোনের সুখের সংসার বলেই তার এই আক্রোশ।

রতন অভয়পদদের মামাতো বোন—সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেইটাই তার সম্পূর্ণ পরিচয়ও নয়। দেবার মতো পরিচয় আর নেই তার। তাই এরাও দেয় না কারও কাছে। ওর প্রসঙ্গই তোলে না, একেবারে চুপ ক'রে থাকে। ক্রিয়া-কর্মে তাকে নিমন্ত্রণ করে পাওনার

লোকে, সে আসবে না জেনে নিশ্চিন্ত হয়েই করে। লোক পাঠিয়ে লৌকিকতা করে সে—এরা বলে 'ও আমাদের এক আত্মীয়।' নামটাও করে না।

সেও অবশ্য এখানে আসে না। খোঁজ খবরও করে না। কোন আত্মীয়-সমাজেই যায় না সে।

এরা কিন্তু যায় মধ্যে মধ্যে। বেশীর-ভাগ অম্বিকাই যায়।

তার কারণ রতনের নাকি অগাধ পয়সা। তাই সব মান-মর্যাদা খুইয়েও সম্পর্কটা এরা ধরে আছে এখনও।

সেই সম্পর্কের সূত্রেই অভয়পদ ছেলেটাকে দিয়ে এসেছিল তার বাড়ি।

এত বুদ্ধি অভয়পদর, সে একাজটা কেন করল আজও ভেবে পায় না কনক।

কে জানে কী বুঝেছিল সে। কনক অন্তত আজও বুঝতে পার না এর যুক্তি। রতনের বিবরণ শুনে ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় ছেলেটো সম্বন্ধেই। কাজটা ভাল হয়নি—নিজেও মনে বার বারই বলেছে—উচিত হয়নি ওখানে ছেলেকে দিয়ে আসা—কিম্বা এতদিন ফেলে রাখা। কোনমতেই উচিত হয়নি।

বিশেষত ঐ লোকটা, অভয়পদর মামা এখনও জীবিত। ঐ বাড়িতেই বাস করে!

স্বার্থপরতার এমন কুৎসিত দৃষ্টান্ত উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে কিছুতে রাখা ঠিক নয়—মূর্খ হ'লেও কনক এটা বোঝে।

ছি ছি! ঐকি মানুষের কাজ! এ কি মানুষ পারে।

বিশ্বাস করেনি কনক। উড়িয়ে দিয়েছিল সে বাজে কথা বলে।

ঐন্দ্রিলা তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, 'মাইরি বলছি, এই তোমার দিব্যি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ওরা মনে করে কেউ জানে না, চেপে চেপে রাখে কিন্তু জানতে কার বাকী আছে এ কেলেংকার। বলি এ চত্তরে যত বামুন সবাই ওদের জানে, আত্মীয়গুষ্ঠি তো কম নয় ওদের। দাদাবাবুর যে বোনের বিয়ে হয়েছে—তারাও যে আবার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি হয় ওর মামার। তারা কোন সম্পর্ক রাখে না। কেউ নাম করলে সকলের সামনে থুথু ফেলে। এ'রাই গিয়ে পাত চাটেন। পয়সার চেয়ে বড় এদের কিছু নেই।'

তবু যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না।

গরীব অনেকেই থাকে! তাই বলে অমানুষ হবে! এ তো রাক্ষসের কাজ। তারাও বোধহয় নিজের সন্তানের সর্বনাশ করে না!

ঐন্দ্রিলা গলা নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বলে,'আসলে লোকটা কুঁড়ে মড়া। কোন্ ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করত—খোলার ঘরে থাকত। তাও নাকি এগারো না বারোটাকা মাইনে ছিল, কাজে ফাঁকি দিত বলে অত বছর কাজ ক'রেও মাইনে বাড়েনি। আধেক দিন খেতে পেত না, দৈন্যদশা একেবারে। কিন্তু রূপটা ছিল খুব মিন্‌সের। দাদাবাবুর মাকে দেখে বুঝবে না, তাছাড়া সহোদর ভাই তো নয়—খুড়তুতো না জাঠতুতো নাকি মামাতো—ঠিক জানি না। তবে নিজের নয় শুনেছি। মিন্‌সের রূপই পেয়েছিল মেয়ে দুটো। খোলার ঘরে অত রূপ—সে কি চাপা থাকে। শিগ্‌গিরই পেছনে লোক লাগল। তখন ওর মোটে বুঝি তেরো বছর বয়স। মিন্‌সে পেয়ে গেল দাঁও! মোটা টাকা হে'কে বলল—বাস আর কি, চালাও কারবার। খোলার ঘর থেকে বড় বাড়িতে এসে উঠল। শুয়ে থাকে দিনরাত আর নভেল পড়ে। ভালমন্দ খাবার, ভালভাল পানতামাক। ওর মামীটা ছিল সতী লক্ষ্মী—সে মনের ঘেন্নায় পাগলের মতো হয়ে গেছল। বলতে গেলে না খেয়ে ম'ল সে।'

'তিনি মারা গেছেন?' অভিভূত কনক প্রশ্ন করেছিল।

'হ্যাঁ— সে মরে জুড়িয়েছে! রতনের যে প্রথম বাবু ছিল সে ছিল খুব ভাল। স্বামীস্ত্রীর মতোই থাকত। সে মরতে না মরতে মিন্‌সে আর একটি জুটিয়ে দিলে। না! মেয়েটাকে প্রাণ ভরে কাঁদতে পর্যন্ত দিলে না। এ নাকি মহা বদমাইশ—দুর্দান্ত মাতাল, মেয়েটাকে পর্যন্ত মাতাল ক'রে দিয়েছে! ছিঃ ছিঃ কানে শোনাও পাপ। ভদ্রলোক বামুনের বংশ—মেয়ে বেচে খাচ্ছিস।'

'তা ওর আর একটি বোন?'

'সে খুব সেয়না। সে দুদিনেই বাপকে বুঝে নিলে। সে বললে, তুমি বাপ হয়ে তোমার স্বার্থ দেখলে যখন—আমাদের দিকে চাইলে না, তখন তোমার কথাই বা আমরা ভাবব কেন? নিজেকে বেচে যখন খেতে হবে, তখন তোমার এক্তেজারিতেই বা থাকব কিসের জন্যে। সে আলাদা থাকে। বাপকে এক পয়সা তো দেয়ই না—বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না। সে এর মধ্যে নাকি তিনচার খানা বাড়ি ক'রে ফেলেছে কলকাতায়। কারও সংগে সম্পর্ক রাখে না সে। এ'রা তো গিছলেন কুটুম্বিতে ঝালাতে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলছে, কিসের আত্মীয় তোমরা, বাবা যখন আমাদের সর্বনাশ করলে, তোমরা কেউ এসে দাঁড়িয়ে ছিলে? বাধা দিয়েছিলে? তোমরা নিয়ে গিয়ে যদি রাখতে তোমাদের কাছে, বিয়ে দিতে তো বুঝতাম আত্মীয়। এখন এসেছে পাপের পয়সায় ভাগ বসাতে! দূর হও, বেরোও। এমনি তার কাটাকাটা কথা। জাঁহাবাজ মেয়ে সে—এর মতো ভালমানুষ বোকা নয়।'

এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়—ঐন্দ্রিলা দিব্যি গেলে বললেও সে বিশ্বাস করত না, যদি না এদের এতটা ঢাক ঢাক ভাব দেখত। এত চাপাচাপি এত লুকোনো কিসের জন্যে, যদি না ভেতরে গলদ থাকে। এদের ব্যাপার দেখেই কথাটা ক্রমশ বিশ্বাস হয়েছে তার।

ছিছি। অসৎ জায়গায় পড়ে অসৎ-সংসর্গে ছেলেটা বুঝি বরবাদই হয়ে গেল।

ঘুম হয় না কনকেরও। হেমও যে জেগে আছে তা সে বুঝতে পারে। তবু কথাও কয় না। নিথর হয়ে শুয়ে থাকে সে।

কথা কইলেই ঐ প্রসঙ্গ উঠবে, কী বলতে কী বলে ফেলবে সে। কনক সব জানে বুঝলে হয়ত দারুণ লজ্জা পাবে হেম। যতদিন না হেম নিজে থেকে বিশ্বাস ক'রে সব কথা বলছে ততদিন সেও জানতে দেবে না যে সবই জানে।

চুপ করে শুয়ে থাকার আরও কারণ আছে অবশ্য।

আর একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার। সেইটেই প্রাণপণে উপভোগ করছে সে।

মাথার দিকটা দক্ষিণ—এবং সেদিকে জানলাও আছে একটা, তবু রুজুরুজি বয় না বলে তেমন হাওয়া ঢোকে না। তার ওপর চালাঘর—জানলার ওপরই চালাটা পড়েছে এসে। গরমের সময় চাপা ভ্যাপসা গরম লাগে। অন্য দিন ঘুমিয়ে পড়ে

হেম—অতটা টের পায় না। তাছাড়া এমনিতেও ঘাম তার কম।

কনকেরই গরম লাগে বেশী, সে ঘামেও খুব, কিন্তু এই ঘরেই শুয়ে শুয়ে সয়ে গেছে তার, ঘুম পেলে অনায়াসে ঘুমাতে পারে।

আজ হেমেরও গরম লেগেছে। অনেকক্ষণ পরে—কনক ঘুমিয়েছে ভেবেই সে উঠে চালের বাতা থেকে সন্তর্পণে পাখাটা টেনে নিয়েছে। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে টেনেছে সে—পাছে কনকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর আলতো একবার তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে যে কনকও ঘামছে। তারপর থেকে এমনভাবে হাওয়া খাচ্ছে যাতে কনকেরও হাওয়াটা লাগে ভালভাবে। মধ্যে মধ্যে শুধু কনকের দিকেও হাওয়া করছে।

সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেছে কনকের। শুধু শরীর নয় মনও।

বহুদিনের সঞ্চিত গুমোট গরমে লেগেছে স্বামীর স্নেহের বাতাস। তার আর কোন দুঃখ নেই।

আরামে চোখ জড়িয়ে আসারই কথা—কিন্তু চেষ্টা করে জেগেই রইল সে। পাছে এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়!...

ভোরবেলা রাজগঞ্জের কলে ভোঁ বাজতেই উঠে বসতে হয়।

তার উঠে বসার ধরন দেখেই হেমের সন্দেহ হয় যে সে জেগে ছিল। সে বলে, 'ওকি তুমি ঘুমোও নি।'

তখনও ভাল ক'রে ভোর হয়নি, তেমন আলো হয়নি। তাই কনকের মুখটা দেখা গেল না। সুখে ও লজ্জায় সে মুখে কী অপূর্ব রঙ লেগেছে তাও দেখতে পেল না হেম। কনক শুধু একটু হেসে স্বামীর হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।

'ওরে দুষ্টু মেয়ে! সারারাত মটকা মেরে পড়ে থেকে আমার সেবা খাওয়া হয়! এখন আবার লোক-দেখানো বাতাস করা হচ্ছে। থাক্। এখন ভোরাই হাওয়া উঠে গেছে, আর দরকার নেই!...আচ্ছা ঐ গরমে অত ঘামের মধ্যে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলে কী ক'রে!'

এবার কনক মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়, 'ও আমাদের সহ্য হয়ে যায়!'

'নমস্কার বাবা তোমাদের সহ্যতে। গায়ে হাত দিয়ে আমার তো মনে হ'ল কে এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে তোমার গায়ে!'

তারপর অল্প কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে বসে থাকে। হঠাৎ হেম বলে ওঠে, 'দ্যাখো আমি ভাবছি—এখান থেকে চেষ্টা ক'রে কোথাও বদলি হয়ে যাই। এখন আমি বদলি হ'লে কোয়ার্টার পাব। তুমি সুদ্ধ গিয়ে থাকতে পারবে। এখান থেকে—এসব ঝামেলা থেকে দূরে কোথাও নিরিবিলি সংসার পাততে চাই। কী বল?'

'ওকি তুমি ঘুমোও নি'

বদলি শব্দটা শুনেই নিমেষে বুকটা যেন হিম হয়ে গিয়েছিল, বুকের স্পন্দন গিয়েছিল থেমে। এত দুঃখের এত দীর্ঘ তপস্যার ফল হাতের কাছে এগিয়ে এসেও সরে যাবে, জীবনের সুধাপাত্র ওষ্ঠের সামনে থেকে যাবে ফিরে? আবার এক যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকার অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়বে সমস্ত ভবিষ্যৎ!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পরের কথাটায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস পড়তে শুরু হয়, আবার বুকের স্পন্দন অনুভব করে সে। বরং সে স্পন্দন যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে: দেহের লোমকূপগুলো পর্যন্ত যেন কী এক পুলকে রিন্‌রিন্ করতে থাকে। সে নিজেও টের পায় এক ঝলক উষ্ণ রক্ত যেন হৃদয়ের পাত্র উপচে মুখে এসে পড়ে।

ভাগ্যে ঘরে আলো নেই—নইলে এত আনন্দ কিছুতেই ঢাকতে পারত না সে হেমের কাছ থেকে। আর তার কাছে মনের এই গোপন স্বপ্ন ধরা পড়ে গেলে বড় লজ্জার কারণ হ'ত।

স্বপ্ন বৈকি!

শুধু সে আর হেম! কোন দূরে দেশে গিয়ে নিরিবিলি নিভৃতে সংসার পাতবে। সে কি সত্যিই হবে কোন দিন? এ যে স্বপ্ন দেখতেও ভয় করেছে এতকাল। সুদূরতম অসম্ভব কল্পনার কথা এ সব!

মনে হ'ল বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্বামী প্রশ্ন ক'রে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'সে তো ভালই!' জড়িত কণ্ঠে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে কনক (তবু সুখের এই বিপুল আবেগ কণ্ঠে কি প্রকাশ পায় না একটুও?)।

—'কিন্তু মা? মা কি একেবারে একা এখানে থাকতে পারবেন? উনি তো এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে চাইবেন না। ও'র কাছে কাকে রাখবে। এক মেজদি—তার ওপর যে ভরসা করা যায় না একটুও!'

সেও ভাবছি। খোকাটাকে এসে রাখতে হবে আর কি! দেখি কী হয়।

যাব বললেই তো আর এখুনি যাওয়া হচ্ছে না, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে তার আগে। এমনি ভাবছিলুম কথাটা!'

আর কোন কথা বলার অবকাশ হয় না। ও ঘরের দোর খোলার আওয়াজ হয়েছে, শ্যামা উঠে পড়েছেন। ঘাট থেকে ঘুরে এসেই রান্না চাপাবেন।

কনকও উঠে দোর খুলে ও ঘরে চলে আয়। আঁচলটা পেতে ঠাণ্ডা মেঝেটায় শুয়ে পড়ে সে। শ্রান্তিতে ও শান্তিতে চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে তার—কিছুতেই যেন চেয়ে থাকতে পারছে না!

হেম ফিরল গভীর রাত্রে। এরা সকলেই তখনও উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে।

তরু আর হারান হঠাৎ এসে পড়েছে বিকেলে—আজ থাকবে তারা। তরু অনেকদিন পরে বেশ হাসি হাসি মুখেই এসেছিল, চাপা মেয়ে তবু চোখে খুশীর আভা স্পষ্ট। খুশীর কারণটাও খুলে বলেছে সে কনককে এসেই। সতীন ক'দিন ধরে খুনসুটি ক'রে ক'রে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছিল, সেটা লক্ষ্য ক'রে—তরু কিছু না বলতেই—আজ ওকে নিয়ে এখানে চলে এসেছে, তাকে জব্দ করবার জন্যে।

কিন্তু এখানে এসে কথাটা শুনে তারও মুখ শুকিয়ে গেছে। হাজার হোক মার পেটের ভাই—তারই ঠিক পরের পিঠোপিঠি ভাই। মধ্যে একটা হয়ে নাকি মারা গেছে কিন্তু সে বোধ হবার মতো বয়স তখন ছিল না তরুর—একেই সে দেখেছে তার পরে। খেলা করেছে এর সঙ্গে। এর ওপর কত আশা ভরসা মায়ের তাও সে জানে! সেও তাই জেগে বসে আছে খবরটা শোনবার জন্য।

রাত দেখে শ্যামার এক একবার মনে হচ্ছিল যে হেম বুঝি আজও তার বাঁধা সাপ্তাহিক আড্ডায় গেছে—সে সন্দেহ মুখেও প্রকাশ করেছিলেন একবার। কিন্তু কনক জানে যে তা নয়। সে একবার নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রতিবাদও করে ক'রে ফেলল, 'আমার তো তা মনে হয় না মা, তিনি জানেন যে এখানে সবাই ভাবছে!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল। মার সামনে কথাটা বলা ভাল হয়নি। বড় বেশী গিন্নেমো হয়ে পড়ল। শ্যামা একবার এ পাশ ফিরে চাইলেনও। অন্ধকারে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখা না গেলেও সেটা বেশ অনুভব করল কনক। অর্থাৎ বৌ তাঁর ছেলের খবর তাঁর চেয়ে বেশী রাখতে শুরু করেছে।

তা তিনি যা-ই মনে করুন—কনকের এটুকু বিশ্বাস আছে হেমের ওপর। আজ অন্ততঃ আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করবে না সে—এটুকু দায়িত্বজ্ঞান তার আছে। খবরটাই ভাল নয় নিশ্চয়। আর সেই সম্পর্কিত কোন কারণেই এতটা রাত হচ্ছে।

হেম ফিরল দশটারও পর।

মুখ অন্ধকার করেই ফিরল সে। এরা তারই আসার অপেক্ষায় বসে আছে জেনেও সে কারও সঙ্গে কোন কথা কইল না, সোজা জুতো ছেড়ে নিজের ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

কোন রকম সম্ভাষণ পর্যন্ত না ক'রে সটান ঘরে চলে যাওয়া তার পক্ষে নূতন কিছু নয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। সে জানে যে আজ তার মুখ থেকে খবর শোনবার জন্যই এরা অপেক্ষা ক'রে আছে। তবুও কোন কথা না বলে ভেতরে চলে যাওয়ার কারণটা সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আছে।

কিন্তু কী সে দুঃসংবাদ। ঠিক কতটা খারাপ? সেটাও তো জানা দরকার।

প্রশ্নটা সকলের ঠোঁটের কাছে এসে নিঃশব্দে আকুলি বিকুলি করতে লাগল। কেউই উঠতে পারল না কিন্তু। গিয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই কারও।

শ্যামা কোন কথাই বলতে পারছেন না। ঠোঁট দুটো বড় বেশী কাঁপছে তার কথা কইবার চেষ্টা করলেই।

অনেকক্ষণ পরে কোন মতে বলেন শুধু, 'তুমি একবার যাও বৌমা!'

কনক ঘাড় নাড়ে।

'আপনিও চলুন মা। আমার ভরসা হচ্ছে না।'

তবুও যেন শ্যামা উঠতে পারেন না।

অথচ একজনের যাওয়াও দরকার। সে লোকটাও সেই ভোরে বেরিয়ে এতক্ষণ পরে তেতেপুড়ে বাড়ি ফিরেছে। তারও একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দরকার।

তাছাড়া এ সংশয়ও সহ্য হচ্ছে না।

অগত্যা শ্যামাকেই উঠতে হয়। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি। প্রশ্ন করতে সাহস হয় না তখনও।

হেম এসে জামা কাপড় সুদ্দই শুয়ে পড়েছিল। এদের দেখে এবার উঠে বসল।

আর তাকে কোন প্রশ্নই করতে হ'ল না। নিজে থেকেই সে জানাল সব কথা।

কিন্তু জানাবারও বিশেষ কিছু ছিল না।

তার বক্তব্য থেকে এইটুকুই শুধু জানা গেল যে সে বিশেষ কিছুই জানতে পারেনি।

রতন দেখা করেনি তার সঙ্গে। রতনের নাকি শরীর খারাপ—দেখা করা সম্ভব নয়। মোক্ষদা এসে বলেছে যা কিছু। হ্যাঁ—পরীক্ষার ফল একেবারেই ভাল হয়নি তাই এসব সংসর্গ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মনিব। কোন্ দেশ, কী ঠিকানা এমন কি কোন্ ইস্কুলে পড়ছে তাও বলতে পারবে না সে। ঠিকানা নাকি রতনও জানে না। তাকে এ নিয়ে বিরক্ত করেও লাভ নেই। বাবু এলে সে ঠিকানা জেনে রাখতে পারে। কিন্তু বাবুও এখন কলকাতায় নেই—তিনি বাঙ্গাল দেশে কোথায় গেছেন একটা বড় মকদ্দমা নিয়ে—ফিরতে আরও দশ বারো দিন দেরি হবে।

এ ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি। বহু জেরা, এমন কি অনেক অনুনয় বিনয় ক'রেও নয়। এমন ব্যবহার এর আগে আর কখনও করেনি ওরা। হেম যখনই গেছে, ওপরে ডেকে পাঠিয়েছে রতন। চা জলখাবার খাইয়েছে জোর ক'রে। আজ এমনভাবে দেখালো মোক্ষদা যেন সে কোন অবাঞ্ছিত অনুগ্রহ-প্রার্থী, অকারণে উত্যক্ত করতে গেছে। রতনের বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল হেম—তাও পারেনি। মোক্ষদা বলেছে 'বাবুর শরীরও ভাল নয় আর মেজাজ তো জানেনই কী রকম—ও দেখা না করাই ভাল। তাছাড়া তিনি তো জানেও না কিছু। এ সব ঝামেলা ভালবাসে না তিনি মোটে!'

এর পর আর কি বলবে হেম। চলেই এসেছে।

আসার মুখে সে একেবারে মহাদের বাড়ি হয়ে এসেছে।

অভয়পদকে জানিয়ে এসেছে সব কথা। তাকেই বলে এসেছে হেম—একদিন গিয়ে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে। তার আর যাবার ইচ্ছে নেই। ভালও দেখায় না। অভয়পদ অবশ্য এক কথাতেই রাজী হয়েছে। সব কথা শুনে সেও খুব দুঃখিত, লজ্জাও পেয়েছে একটু। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে পারবে না সে। কোমরে প্রকাণ্ড একটা ফোঁড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। জ্বরও হয়েছে তার তাড়সে—ফোঁড়াটা না ভাল হলে যেতে পারবে না।

তার মানে এখনও অন্ততঃ সাত-আট দিন না গেলে কোন খবরই পাওয়া যাবে না।

কী আর বলবেন শ্যামা। • নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

তাঁর আজকাল আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ে না। এক এক সময় নিজেই ভাবেন—ভেতরটা কি তাঁর পাথর হয়ে গেল নাকি?

—ক্রমশঃ

অন্ধকারের রোদ

দীপংকর ঘোষ

কখনো কখনো ওকে ঘোড়া বলে মনে হয় : ভাবে নন্দ।

ভাবলে বুঝি এমনি হয়। রং কলের ধোঁয়াটা ভাবনার আকাশে একটা ময়াল সাপ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আকাশটাকে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ডোরাকাটা মনে হয়। খিদিরপুরের ব্রীজটা উপরে। যেখানে খড়িতে ছক কেটে ভাগ্য গোনে অনাদিপ্রসাদ। কত রাজ্যের কথা বলে। নন্দের সম্বন্ধেও বলেছিল অনাদিপ্রসাদ। সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু কী হ'ল? কাটা গঙ্গার ঘোলা জলের মতই হয়তো গুলিয়ে ওঠে নন্দের মন। সব ভাঁওতা। সব মিথ্যে। ছককাটা জীবনের কথাগুলোয় বিশ্বাস রাখতে পারে না নন্দ। মনের ঘোড়াটা আবার খেপে ওঠে।

এতক্ষণে ইউসুফকে দেখল নন্দ। ও হয়তো এখনই মেমসায়েবের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর সেলাম ঠুকে রেসের বইটি এগিয়ে দেবে। শুধু মূল্য নয় কিছু বেশিই হয়তো দেবে মেমসায়েব। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পীরসায়েবের দরগায় গিয়ে বসবে। অশথ গাছের নিচে। ঠোঙাটা বের করবে পকেট থেকে। তারপর ছড়িয়ে দেবে মাটিতে। পায়রাগুলো নেমে আসবে অশথ গাছের ডাল থেকে। পাখা ঝাপটিয়ে ধুলো উড়াবে। তারপর মহোৎসব। বকম বকম শব্দে• পীরসায়েবের দরগার নির্জনতা ভেঙে দেবে।

ইউসুফ বলে : ওগুলো ভাগ্যের পায়রা। সত্যি বুঝি তাই। অনাদিপ্রসাদের খড়ি-আঁকা ভাগ্যের ছক্ থেকে হয়তো ওগুলো ভাল। ওগুলো জীবন্ত। ইউসুফ বলেছিল : ফজিরে পায়রাগুলোকে খাওয়াতে পারিস না নন্দু। দেখবি তোহার বিক্রি হোবে হামার মত, বিলকুল হামার মত।

না, এই শনিবারেও নন্দ পারে নি ইউসুফের সঙ্গে। ইউসুফ বেচেছিল পাঁচ টাকা আর সে মাত্র তিন টাকা। ভাবে নন্দ। ভাবনায় ঘোড়াটা ফুলে ওঠে রাগে। সত্যি সে ঘোড়া। সারাটা দিন সে ঘোড়ার মতই ছুটোছুটি করেছে। তারপর হয়তো কার্জন পার্কের পুব পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমিনুলের ঘোড়াটার মতই হাঁপাবে। হাড় বের করা বাহাদুরের মত। সত্যি ঘোড়াটা বাহাদুরই বটে। বিচিত্র এ নাম-মাহাত্ম্য। হাসি পায় নন্দর। তার নামও তো নন্দকিশোর। সত্যি নন্দকিশোরই সে। যেন কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। কেই বা খবর রাখবে তার আশায় পাইপ রোডের ঘিঞ্জি বস্তিতে চার জোড়া চোখ চেয়ে আছে। হয়তো মা হাঁড়িতে জল চাপিয়ে শিবুকে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। ভাতের স্বপ্নে হয়তো শিবুর চোখ ফুটন্ত হাঁড়ির দিকে চেয়ে থাকবে। তবু শিবু চেয়ে থাকতে পারবে না। চোখ বুজে আসবে ওর। মিনু একদিন কাঁদতো। আজ আর কাঁদে না। বুঝে। সে জানে হাঁড়িতে জল ফুটানো-টা এক খেলা। ঠাকুরমার বলা গল্পের মতই সেটা একটা রূপকথার গল্প।

রং কলের শেষ শিফটের বাঁশি বেজে ওঠে। তারপর হয়তো ডকের বাঁশি বাজবে। তারপর অক্সিজেন কোম্পানীর। হয়তো আর্মি কোয়ার্টারের পেটানো ঘণ্টার আওয়াজটা কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোকে কাঁপিয়ে চমকে দেবে পাইপ রোডকে এ অঞ্চলের সবগুলো কলের বাঁশির আওয়াজ যেন মুখস্থ হয়ে গেছে নন্দর। আগে ভুল হতো। এখন হয় না।

এখন নন্দর ফেরার সময় হয়েছে। পীরসায়েবের দরগার শেষ আজানের শব্দ ভেসে আসছে। ময়দানের বাতাসে হিমেল ঠাণ্ডা। হয়তো অনেক রাত হয়েছে এখন। রং কলের ময়ালটা আবার আকাশ ছেয়েছে। খিদিরপুরের ব্রীজটার এপাশ ওপাশ ঘিরে আছে মরালটা। এমনি সময় হয়তো ট্রাম থেকে নামবে মালতী। টানা টানা চোখে কাজলের রেখা। কাঁধের ফাঁপানো চুলে হয়তো থাকবে কয়েকটা রজনীগন্ধা। প্লাষ্টিকের রজনীগন্ধাগু'লা যেন আসল রজনীগন্ধাকেও হার মানিয়েছে ওর চুলে। রোজের মত নন্দ ওকে দেখবে। অবাক হবে।

তারপর হয়তো ভ্যানিটি ব্যাগটা দুলিয়ে দুলিয়ে সমস্ত রাস্তা মাতিয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকবে একুশ নম্বর পাইপ রোডে। ঘিঞ্জি বস্তির এক কামরা মাঠকোঠায়।

মায়ের হাঁড়ির মতই এখানে রূপলালের দোকানে কেটলিতে জল ফুটছে। সেই সঙ্গে নন্দর চিন্তাগুলোও যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে ফুটন্ত জলে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবে নন্দ। ভাঁড়টা ফেলে দেয়। একটা বিড়ি ধরায়। বিড়ির আগুনে কেমন যেন একটা শক্তির স্পর্শ অনুভব করে। সমস্ত কিছু যেন কেমন

স্পষ্ট হয়। ভাবে নন্দ। ফুটপাতে কয়েকটা ভিক্ষুক কুকুরকুণ্ডলী হয়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ওর ঘুম যেন মালতী কেড়ে নিয়েছে। মালতীর চিন্তা। ওর যদি একটা চাকরী থাকতো। মালতীর মতো। কি যেন কাজ করে মালতী। মনে পড়ে। প্লাষ্টিক কারখানার একটা ভাসা-ভাসা কল্পনার ছবি যেন ভেসে ওঠে নন্দর চোখে। কিন্তু কাজ করলে বুঝি সেজেগুজে যেতে হয়। ঐভাবে সাজতে হয়। ফিলিমের কাঞ্চনমালার মতো। ঠোঁটে বুঝি একটু রংও মেখেছিল মালতী। নন্দ উঠে পড়ে। মাতালের মত টলতে টলতে হাঁটতে থাকে। সারা দিনের ক্লান্তি ওকে সত্যি মাতাল করে তুলেছিল। এখন পাইপ রোডের মোড়ে তেমন লোকজন নেই। অন্ধকারে বাসা বেঁধেছে যেন। এবার পাইপ রোডের মোড়ে সত্যি ট্রাম থেকে নামল মালতী।

নন্দ ওকে দেখে মুচকি হাসল। হাসল মালতীও। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল : আজ এত রাত যে।

মালতীর চোখে বুঝি ক্লান্তি। শরীরের কোণায় কোণায় অবসাদের ঢেউ। মালতী হাসল। বলল : ওভার-টাইম ছিল যে।

তা হ'লে তো বেশ রোজগার হ'ল। কি বল? —কথাটা অন্যমনস্কভাবে ছুড়ে দিল নন্দ।

মালতী আঁতকে উঠল। কথাটার কোথায় যেন একটু খোঁচা আছে। তবু সামলে নিল মালতী। একটু হেসে বলল : হ্যাঁ, তাতো হ'লই।

তারপর পাইপ রোডের ফুটপাত দিয়ে তিন মিনিট হাঁটল দুজন। শিউ-পূজনের সেলুনের পাশ দিয়ে ঐ তো অন্ধকার গলিটা। গলিটার ডান হাতে একুশ নম্বর পাইপ রোড। অন্ধকার বাঁকটায় দুজন ঘুরে দাঁড়াল। তারপর খিজ্জি বস্তির দুই কামরার অন্ধকারে দুজন ডুবে গেল।

ঘুম নামে না নন্দর চোখে। পেটের ক্ষুধায় ককাচ্ছে শিবু। পাশের ঘরে মালতীর মার কাতরানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো বাতের ব্যথাটা বেড়েছে আবার। সারা দিনের চিন্তাগুলো যেন নন্দের চোখের সামনে ঘুর ঘুর করতে লাগল। মিনুটাও তো পারে মালতীর সঙ্গে যেতে। কাজ করলে আজ আর জাত যায় না মেয়েদের। ঐ ডায়মণ্ড-হারবার রোডের দোতলা বাড়ির কালো মেয়েটিও তো রোজ সকালে বেরিয়ে যায়। ইউসুফ বলেছিল ডালহৌসি না কোথায় যেন কাজ করে মেয়েটা। মিনুকে কী কাজ করতে দেবে মা? ভীত হয় নন্দ। ভাবনার স্রোত কাটা গঙ্গার জলের মতই স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবু ভাবে। যদি মিনু কাজ করতো তবে হয়তো শিবুটাকে যদু ভটচাজের পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিতে পারতো। একটু রপ্ত হলে তারপর মনসাতলার ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর ভাবনাটা কখন যে ঘুম হয়ে নন্দর চোখে নামে তা সে টেরই পায় না।

ভোরে কলতলায় লাইন পড়েছে। চিনি-বৌদি চান সেরে চলে গেছে। ভিখু এবার কলতলায় ঢুকেছে। ওর পাশে নন্দ। শালার কলে যদি একটু জোরে জল পড়তো। ঐ সুতোর মত জলের ধারা ওতে গোষ্ঠির পিণ্ডি হবে। চেঁচিয়ে ওঠে হরিশকাকা। এখনো লাইনে দাঁড়িয়ে মতির মা, নিরুপিসি। এবার মালতী বেরুল। বস্তির ভ্যাপসা গন্ধটা হঠাৎ যেন উধাও হয়ে গেল। এমনি একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়ায় মালতী চানের সময়। যোগেশ সামন্ত এবার দাওয়ায় এসে বসবে। তার বাটিতে সরষের তেল নেবে। ঘষে ঘষে মাখবে অনেকক্ষণ। মালতীর দিকে চেয়ে চেয়ে কাশবে। চেয়ে চেয়ে দেখবে মালতীকে। দুটো চোখের ক্ষুধার্ত তৃষ্ণায় শুষে নিতে চাইবে ওকে। চোখ দুটি বুলিয়ে নেবে ওর শরীরের উঁচু-নীচু পেশল ঢেউ-এর উপর। মেজাজ বিগড়ে যায় নন্দর। মনে মনে বলে : শালা সামন্ত তোমাকে একদিন দেখাবো। মুখের নিমের দাঁতন-কাঠিটা বার বার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। যেন কামড়ে কামড়ে থেঁতলে দেয় ডালটা। মুখটা তিতিয়ে ওঠে। তারপর নন্দ লাইনে এসে দাঁড়ায়। ধমক হানে মালতীকে : তাড়াতাড়ি চান করে চলে যাও। মেয়েমানুষের এতক্ষণ লাইনে দাঁড়ালে কি চলে?

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় নিজেকে দেখে হাসে নন্দ। সত্যি মালতীর জন্য অতটা বাড়াবাড়ি করা বোধ হয় উচিত হয়নি তার। বিশেষ করে যোগেশ সামন্তর দিকে ওভাবে তাকানো। চোখ দেখানো। তিন মাসের ভাড়া বাকী। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই। যদি যোগেশ সামন্ত টের পায়। সত্যি কি সে মালতীকে ভালবাসে? হাসে নন্দ। কাগজের হকার। রেস টিপসের হকার সে। তার কি এসব সাজে? আবার হাসে। আয়নায় ওর চেহারাটা কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়।

আজ শনিবার। যোগেশ সামন্তকে রেস টিপসের একখানা বই দিয়ে বেরুতে যাচ্ছে নন্দ। হঠাৎ পেছু ডাকল সামন্ত-মশায় : কি ধরবো নন্দকিশোর।

তা আমি কি বলবো : নন্দ নির্বিকার উত্তর দেয়।

তবু তুমি হচ্ছো মাঠের পোকা : সামন্তের কণ্ঠে কাজ হাসিলের চেষ্টা।

তা হ'লে বলবো, সামন্তমশায়।

বলো......।

আজকে কিন্তু কিংগস্‌সেনের ভাগ্যই প্রসন্ন বলে মনে হচ্ছে।

যোগেশ সামন্ত আর কিছু বলবার আগেই পালায় নন্দ। তা না হ'লেই বিপদ। সামন্তমশায়ের ভোগটা হয়তো তাকেই কালিঘাটে চড়াতে হবে। শনি-বারে সামন্তমশায়ের এই নিয়ম। হরিশ-কাকা তো এই নিয়ে হাসে। বলে তোমার ঘোড়া পুজোটা কালীর নামে চালাও কেন বাপু? টিপসের বই-এ মায়ের পেরসাদী ফুল দিয়ে আর ক'দিন চালাবে সামন্ত। তারপর, হয়তো হাসা-হাসি থেকে হাতাহাতিও হয়ে যেতে পারে। তখন তো এই নন্দকেই সামলাতে হবে। না আজ অনেক দেরী হয়ে গেল। ভাবে নন্দ : ইউসুফ হয়তো এতক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনেক বিক্রি করছে।

নন্দ হেঁটে চলে। জোরে হেঁটে চলে পীরসায়েবের দরগার দিকে। সেখান থেকে ধর্মতলা এসপ্লানেডের দিকে।

দুপুরের কলকাতা হয়তো ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ঘুম নেই এই একুশ নম্বর পাইপ রোডের। সত্যি বিচিত্র এই বস্তি! সবে তো আঁচ দিয়েছে চিনি-বৌদি। ওর উনুনের ধোঁয়াটা বাঁকা হয়ে ঢুকছে গিয়ে মতির মার ঘরে। হয়তো এখনই লড়াই বাধবে। কিন্তু না। লড়াই বাধলো নিজেদেরই ঘরে। নন্দ যে এতটা গরম হয়ে উঠবে তা সে নিজেও ভাবতে পারে নি। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছে তবু যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকতো। নন্দ ফুঁসে ওঠে। পারে শুধু তাল তাল গিলতে। বেড়ালে যে ভাত গিলে গেল সেদিকে কি নজর আছে মেয়ের? মাকেও শোনাতে ছাড়ে না নন্দ। মিনুর চোখ জলে ভরে ওঠে। আর ফোঁপানো কান্নাটা কেমন যেন করুণ করে তোলে পরিবেশটাকে। তবু রাগ পড়ে না নন্দর। মাকে উদ্দেশ করে বলে : দিলেই তো পারো মিনুকে মালতীর সঙ্গে কাজ করতে। গরীবের

ঘরের মেয়েদের বসিয়ে রাণী করে রাখলে কি চলবে শুনি?

তারপর না খেয়েই বেরিয়ে পড়ে নন্দ। পীরসায়েবের দরগার অশথ গাছের নিচে গিয়ে বসে। পায়রাগুলো কার ছড়িয়ে দেওয়া ছোলা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। নন্দর ভাবনাটা কেমন যেন পায়রা হয়ে ওঠে। রাগটা কেলাসিত জলের মতই থিতিয়ে পড়ে নন্দর। ভাবে : কি আর বড় হয়েছে মিনু। এই তো সবে চৌদ্দতে পড়ল। আজ মার বিয়ের তোলা সিল্কের শাড়ীটা পরেছিল মিনু। তাই বুঝি এমন মনে হয়েছে মার। বড় মনে হয়েছে মিনুকে। মালতীর মত বড়। শাড়ী পরলে মেয়েদের বুঝি এমনি বড় মনে হয়। ভাবে নন্দ।

দুপুরের রূপো রঙের রোদটা সিঁদুরের মত হয়েছে এখন। অশথ গাছটাকে পেছনে ফেলে কাটা গঙ্গার উপর হেলে পড়েছে। সিঁদুরের তীর-গুলো অশথ ডালের ফাঁক দিয়ে নন্দর চোখকে কেমন যেন বিদ্ধ করছে। আর সকালের শাদা পায়রাগুলো যেন গায়ে আলতা মেখে বকম বকম শব্দে দরগাটি মুখরিত করে তুলছে। চিন্তায় চির কাটে নন্দর। উঠে পড়ে সে। তারপর ইউসুফ, পরমেশ্বর, লছমনের মতো সুর করে দৌড়ে চলে রে...স...কো...র্স...। ঠিক ঘোড়ার মত দৌড়ায় ওরা। রেসের ঘোড়ার মত ঘাসের জাজিমে নয়। আমিনুলের বাহাদুরের মত শান বাঁধানো পথে। পীচ-গলা দুপুরের রাস্তায়।

সেদিন ইউসুফ পারে নি নন্দর সঙ্গে। আজ নন্দর পাঁচ টাকা আর ইউসুফের দুই। নন্দ এসপ্ল্যানেডের দিকে এগিয়ে যায়। আজ যদি মালতীর সঙ্গে দেখা হয়। তবে নন্দ ওর ঋণ শোধ করবে। মালতীকে নিয়ে যাবে একটা বড় রেস্তোরাঁয়। যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবে। মালতীর মতো শুধু একটা সিঙ্গারা আর এক কাপ চা নয়।

নন্দ অপেক্ষা করছিল ঘড়িওয়ালা বাড়ীটির নিচে। যদি মালতী আসে। তারপর সত্যি নন্দর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মালতীর। প্রথমটা হয়তো মালতী যেতে চায়নি। অবশেষে না করেও পারলো না মালতী।

এখন ওরা ফিরছে। রেড রোডের আকাশে এখন অশান্ত মেঘের আনা-গোনা। হয়তো একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে ওরা দুজন এখন একা। কিন্তু এই একাকীত্বেও কেন যেন নন্দ কথা বলতে পারলো না। কিংবা রাস্তায় বুঝি ও সব কথা বলা যায় না। ভাবে নন্দ।

অবশেষে মালতীই নীরবতা ভাঙল। হেসে বলল : অনেক খরচ করে ফেলেছ—শুধু এক কাপ চা হলেই তো চলতো। তাই না।

টিউব লাইটের আলো পড়েছে বৃষ্টি ধোওয়া রেড রোডে। মালতীর মুখে। মালতীর মেক-আপ মুখে আলোটা যেন বেশি জ্বলজ্বলে করছিল। মালতীর মুখের দিকে তাকাল নন্দ। অবাক হল। কেমন করে যে মালতীর একটি হাত নন্দের হাতের মুঠোয় আনন্দে কাঁপছিল তা নন্দ জানতে পারে নি।

প্রশংসাটা বোধ হয় একটু বেশিই করেছিল মালতী। মালতীর প্রশংসায় শামুকের মত গুটিয়ে নিল নন্দ নিজেকে। তারপর কেমন যেন উদাস হয়ে উঠল সে। মনের কথাটা যেন এখনো গুছিয়ে বলতে পারলো না নন্দ। কেবল দুজন দুজনের দিকে তাকাল। হাসল। তারপর ট্রামটা তুলে নিল মালতীকে। নন্দ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ট্রামটির দিকে। এখন ট্রামটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। নন্দ চাইলে কি হবে। মালতীই চায় না। দুজনে তাই একসঙ্গে বাড়ি ফেরা হয় না। যদি কিছু ভাবে যোগেশ সামন্ত। মতির মা যদি পাড়ার গেজেট হয়ে পড়ে ওদের নিয়ে। ভয় পায় নন্দও। প্রৌঢ় যোগেশ সামন্তকে কেমন যেন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় নন্দর আজ।

কিন্তু যোগেশ সামন্তর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি নন্দ। সামন্তর বুকের ভেতরটা চড়চড় করে উঠল। বহু দিনের লালিত আশাটাকে কে যেন তীক্ষ্ন তীর দিয়ে রক্তাক্ত করে তুলেছে। সামন্ত ফুলে উঠল। কপালের দু পাশের দুটো শিরা অকস্মাৎ ফুলে দড়ি হ'ল। সামন্ত নন্দকে মালতীর কাছ থেকে দূরে সরাতে চাইল। মালতীকে ওর চাই। অনেক টাকা আছে সামন্তর। এক গা গয়না করে দেবে সামন্ত। মালতীর মা তো রাজী। পাত্রের আবার বয়স কি! মালতীর মা জানে মেয়েটার একটা হিল্লে করতে পারলেই সে বাঁচে। তারপর কি একটা ফন্দি যেন আঁটল সামন্ত। হাসল। কাজ হাসিলের উল্লাসটা যেন সে হাসিতে বেজে উঠল।

তাই ঝগড়া বাঁধালো নিজেই সামন্ত। ভাড়া। পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে নন্দর। নন্দ ভাবল অতগুলো টাকা এক-সঙ্গে কি করে দেবে? পাঁচ আটে চল্লিশ। নন্দ ভেবে নিল অংকের হিসেবটা। শেষে অবশ্য ফয়সালা একটা হ'ল। মালতী বোধ হয় কেঁদেছিল। মিনুর মন খারাপ হ'ল। নন্দরা পঁচিশ নম্বর পাইপ রোডে চলে এল। কিন্তু সমস্যার সমাধান বোধ হয় এত সহজে হয় না। কেমন জটিল একটা আবর্তের মধ্যে যেন ঘুরপাক খেতে লাগল নন্দ। মালতীর ছায়াটা কেমন যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে নন্দর মনের রাজ্যে পায়চারী করতে লাগল। অজানা অচেনা বিস্ময়ে নন্দ যেন পঁচিশ নম্বরের সেই ছোট্ট ঘরটিতে একুশ নম্বর পাইপ রোডের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

সেদিনের রেস্তোরাঁর স্বপ্নটা মালতীকেও যেন পেয়ে বসেছিল। মালতী ভাবতে পারলো না নন্দর ছবিটা এমনি করে তার মনে দুলছে কেন? সুধাময়বাবুর পাশে নন্দ যে একেবারেই অচল মালতী তা জানে। তবু সেদিনের হাত-ধরা, চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলার ঢংটা আজও যেন ভুলতে পারলো না মালতী। নন্দর কেমন একটা গন্ধ যেন পেয়ে বসেছে মালতীকে। সুধাময়-বাবু তো পুরুষ। হয়তো বয়স একটু বেশি। কিন্তু নন্দর মত এমনি একটা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ, এমনি একটা টান তো অনুভব করে নি কোন দিন। মালতী জানে এতদিন সে যা করেছে তার সবটাই খেলা। যদি কোনদিন জানতে পারে নন্দ। প্লাস্টিক কারখানাটা একটা বানানো গল্প। যদি নন্দ ওর আসল পরিচয় পায়। ভাবনাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। আবার সে নিজেই জট খোলে। না, সত্যি সে পারবে না এই ছলনা করতে। সত্যি সে মায়ার মতই প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করবে। হয়তো একটু কষ্ট হবে। তবু সুধাময়-বাবুর ঐ বাগানবাড়ির ক্রীতদাসী হয়ে থাকার চেয়ে সে বরং ভাল। কিন্তু মা। মায়ের চিকিৎসা! ছোট ভাই অনিলের পড়াশুনো! চিন্তার মেঘ নামে মালতীর মুখে। মালতীর চিন্তাগুলো যেন সাপ হয়ে ওঠে। কিলবিল করে মাথায়। ছোবল কাটে। মালতী ভাবে : নন্দ কি পারবে? না নন্দ পারবে না, কোনদিন নন্দ সুধাময়বাবু হতে পারবে না। মালতী আবার সুধাময়বাবুর টাকার ঝংকারে বন্দী হয়। বুঝে তার পক্ষে মায়া হওয়া সম্ভব নয়।

নন্দর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না কদিন হল। অবাক হল নন্দ। মেয়েরা বুঝি এমনি হয়। ইউসুফের কথাগুলো মনে পড়ে নন্দর : আউরৎ এক অজীব চীজ।

নন্দ ভাবল যদি একবার দেখা হয়। এসপ্লানেডের কোণটায় গিয়ে দাঁড়াল সে। হয়তো এখনি ফিরবে ও। মেট্রোপলিটান বিল্ডিংস-এর ঘড়িটায় নটা বাজে। নন্দ ভাবল সেদিনও তো এমনি সময় এসে-ছিল মালতী। এখান থেকে প্লাস্টিক কারখানাটা কতদূর। কোন দিকে। যদি জিজ্ঞেস করে রাখতো নন্দ। নন্দ ভাবল সময়টা যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে তার সঙ্গে। সময়টাকে কেমন যেন চোর-চোর মনে হয় নন্দর।

তারপর সত্যি টু-বি স্টেট বাস থেকে নামল মালতী। ঠিক নন্দর সামনে।

মালতী এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পারলো না। চোখে চোখ পড়তেই হেসে উঠল দুজনে। মালতীর কাজল-টানা গভীর কালো চোখ কেমন যেন টানছিল নন্দকে।

নন্দ বলল ঃ চল না মনুমেন্টের তলায় গিয়ে একটু বসি।

ইচ্ছে না থাকলেও কেন যেন না বলতে পারলো না মালতী।

নন্দর মনের না বলা কথাটি কেমন যেন ভোমরার মত গুণগুণ করছিল। আজ সব কথা বলে দেবে নন্দ। হৃদয় উজাড় করে সব কথা। আঠার বসন্ত আঠার শীতের প্রস্তুতির কথা। কিন্তু পারলো না। মনুমেন্টের মত অত বড় প্রহরীর সম্মুখে বোধ হয় সব কথা বলা যায় না। তা ছাড়া ঐ লোকদুটো তো প্রায় ওদের গা ঘেঁষে বসেছে। যদি শুনে ফেলে। এ সব কথা বলবার জন্য হয়তো ময়দান নয়। আরো নিবিড়তা চাই। আরো নির্জনতা। তাই পারলো না। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল নন্দ ঃ মিনুকে নিয়ে যাও না তোমাদের কারখানায়।

কথাটা শুনে চমকে উঠল মালতী। তা হলে কি সব জেনে ফেলেছে! নন্দর চোখের দিকে তাকাল। না, ঐ চোখে অবিশ্বাস নেই। বলল ঃ ও কি এ সব কাজ করতে পারবে? কতই বা বয়স হয়েছে ওর?

পারবে, কেন পারবে না ঃ নন্দ জোর দিয়ে বলল।

কিন্তু কথায় জোর এনেও স্বস্তি পেল না নন্দ। মার কথাগুলো মনে পড়ল ওর। মিনু মালতীর কাজ পছন্দ করে না। মালতীর সংগে যেতে চায় না মিনু। এর বেশি মা কিছু বলে নি। বোধ হয় মিনুও না। তাই শঙ্কিত হল নন্দ। তারপর মনে হল সে মিনুর দাদা। পারবে না মানে, একশো বার পারবে। ভাষায় জোর এনে বলল নন্দ ঃ তুমি নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই পারবে।

মালতী একটু হাসল। মনুমেন্টের তলায় এসে ততক্ষণে থেমে গেছে একত্রিশ নম্বর ট্রামটা। ট্রামটা নন্দর চোখের সামনে নৌকোর মত দুলতে দুলতে ময়দানের আলো-আঁধারিতে মিশে গেল। আর সেই নৌকো করে কোন এক অদৃশ্য পথে যেন উধাও হয়ে গেল মালতী।

মালতী বলেছিল মিনুর কাজ হয়ে যাবে। আনন্দে আজ একটা উইলসই কিনে ফেলল নন্দ। বিড়ি খাওয়া মুখে উইলসের স্বাদ টিকল না। তবু কেমন যেন সায়েব-সায়েব একটা ভাব নন্দকে মত্ত করে তুলেছিল। হকার্স কর্ণারের কোণটায় এসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল নন্দ। ধোঁয়াগুলো হাওয়ায় রিং হল। তারপর রিংগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেই ইউসুফ এসে ওর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল। কুৎসিত একটা ইংগিত করে বলল ঃ শালা ডুববার মোতলব আছে বুঝি।

নন্দ ফুঁসে ওঠে। মনে হয় ওর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেয়। তবু দাঁত কামড়ে থাকে। কি বলছিস ইউসুফ।

ইউসুফ হেসে ওঠে। ওর দাঁতের কালো দাগগুলো ঝলক দিয়ে ওঠে। ওই তো ঐ মেয়েটার সাথে কুথায় গিয়েছিলি। ওই অন্ধকারে দেবদারু গাছটার নিচে।

নন্দর মাথায় যেন আগুন জ্বলে। কপালের দুটো শিরা দপদপ করে। ফুলে ওঠে সাপের মত। ঘাম জমে কপালে। ফেটে পড়ে নন্দ ঃ মুখ সামলে কথা বলিস ইউসুফ।

ইউসুফও ফুঁসে ওঠে। সত্যি বল্‌ব ওতে ডোর কী আছে? ও মেয়েটা ভাল লয় নন্দু।

নন্দর পায়ের নিচে মাটি যেন কাঁপতে থাকে। ধমক দেয় সে ঃ তুই নিজে দেখেছিস।

শুধু দেখেছিস লয় বাবা তোহাকেও দেখাতে পারবে ঃ ইউসুফ হাসল। তারপর বিড়ির ধোঁয়ায় একটা কুণ্ডলী তৈরী করল ইউসুফ। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতই নন্দর স্বপ্নটা যেন ভেংগে ভেংগে হাওয়ায় মিলাতে লাগল। কাল রাতে আটটায় আসিস তোহাকেও দেখাবো ঃ কথাটা ছুঁড়ে দিল ইউসুফ। তারপর কখন যে সে খিদিরপুরের ট্রামটা ধরে চলে গেল তা নন্দ নিজেও টের পেল না।

নন্দর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। সে হাঁটতে শুরু করল। সত্যি কি মালতী ভ্রষ্টা? ময়দানের আলোগুলো যেন ওর চোখের সামনে কাঁপতে লাগল। মালতীর ঐ গভীর কালো চোখে কি পাপ থাকতে পারে? ওর গায়ের গন্ধটা কি বিষাক্ত হতে পারে? ইউসুফের কথাগুলোয় যেন আস্থা রাখতে পারে না নন্দ। তবু পাইপ রোডের মায়ার কথা মনে পড়ে। শুনেছে সেও নাকি প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করে। কিন্তু ওর চোখে তো কাজল দেখেনি নন্দ। চুলে ফুলের গুচ্ছ দেখেনি কিংবা ঠোঁটে ঐ লাল রং। তা হোক। হয়তো মালতী একটু সৌখীন। তার উপর মায়া তো আর মালতীর মত ওভার-টাইম করে না। তবু যেন মন বাগ মানতে চায় না নন্দর। মনের ঘোড়াটা যেন সন্দেহ অসন্দেহের হার্ডল রেসে দৌড়াচ্ছে। আর নন্দ সেই ঘোড়ার জকির মত প্রতি মুহূর্তেই নিচে পড়ে যাওয়ার আতংকে শিহরিত হচ্ছে।

নন্দ দেখল খিদিরপুরের বাঁজটার এপিঠ ওপিঠ মোড় দিয়ে রং কলের

ধোঁয়াটা যেন সেই পরিচিত ময়াল সাপটা হয়ে নাচছে। আর ডোরাকাটা আকাশটা দুলছে চোখের সামনে। ময়ালটা যেন গিলতে আসছে নন্দকে। কেমন ভয় করছে ওর। তবু হাঁটে নন্দ। পীর-সায়েবের দরজার পাশ দিয়ে। কে যেন আলো জেবলে দিয়ে গেছে দরগায়। মোমের আলো সুখকল্পনার আলো। নন্দ দাঁড়াল। আলোর শিখার সামনে। তারপর সে-ও কয়েকটা মোম জ্বালিয়ে দিল। মনে মনে বলল ঃ ইউসুফের কথা যেন মিথ্যে হয়, মিথ্যে হয়।

পরদিন সব সত্য হ'ল। রোজের মত। অনাদিপ্রসাদ ছক আঁকল। পাইপ রোডের মোড়ে রূপলালের চায়ের দোকানে আড্ডা বসল। রং কলটার দিকে ল্যাজ, আর খিদিরপুর ব্রীজটার দিকে মুখ করে সেই ময়ালটা সাজল। আমিনুলের বাহাদুরটা ঘাড়ের ঘায়ের উপর চাবুক খেয়ে বিকট চীৎকার করে মোমিনপুরের কোণটা করুণ করে তুলল।

তবু নন্দর স্বপ্নটা যেন মিথ্যে হয়ে গেল। তার কামনার সৌধটা যেন একটা দমকা হাওয়ায় কাচের চুড়ির মতই চুড়চুড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

সত্যি ইউসুফ দেখিয়েছিল। মালতী যেন ইডেনের অন্ধকারে কার সঙ্গে কথা বলছিল। সেই চাপা অন্ধকারে একজোড়া চোখ যেন হায়েনার চোখের মতন জ্বলছিল। আর ভেজা বাতাসে যেন কেমন একটা চাপা গোঙানি ভেসে আসছিল। নন্দ ভাবল। অন্ধকারটায় একটা পচা ঘায়ের গন্ধ পেল যেন নন্দ। পচে পচে জমে যাচ্ছিল যেন অন্ধকারটা। আর সেই জমাট অন্ধকারে নন্দ যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। মালতীর সেই মিষ্টি গন্ধটাও বুঝি পচে গিয়েছিল। আর সেই পচা গন্ধে ইডেনের চারপাশে মোমিনপুরের লাশকাটা ঘরের গন্ধটাই যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মালতী সত্যি আজ একটা দুঃস্বপ্ন। ছায়ার কুহেলী। রাত্রি সহচরী ছায়া কুহেলী। তবু এগিয়ে যেতে চেয়েছিল নন্দ। মুখোমুখি করবে সে। কিন্তু তার আগেই একটা কালো মোটরে কিছুটা ধুলো উড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল মালতী। পোড়া পেট্রলের মদির গন্ধে নন্দ টলতে লাগল। আর ইউ-সুফের সেই বিশ্রী হাসিটা যেন সাই-রেণের মত নন্দকে কাঁপিয়ে দিয়ে ইডেনের দেবদারু গাছটার নিচে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মরে গেল।

ভূত দেখে পালানোর মতই ছুটে পালালে নন্দ। খিদিরপুরের দিকে। মালতী যেন আজ প্লাস্টিকের ভূত হয়ে ওর পেছু ধাওয়া করছে। ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে ময়দানের অন্ধকারটা পেরিয়ে পীরসায়েবের দরগার কাছে এসে দম নিল নন্দ। দূরে ঐ বটগাছটায় কে যেন কাঁদছে। শিশুর কণ্ঠে কাঁদছে। আঁতকে উঠল নন্দ। তারপর মনে পড়ল বুড়ো আমিনুলের কথা। শকুনের বাচ্চারা নাকি রাতে অমনি করে শিশুর মতো কাঁদে। নন্দ আর ভয় করল না। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশটা পরিস্কার। আজ সেই ময়ালটা খিদির-পুরের ব্রীজ নয়—পাইপ রোডের দিকে মুখ করে দক্ষিণদিকে চলছে। নন্দ ভাবল মিনু যেন মালতীর সঙ্গে না যায়। আজ দুপুরে নন্দ যদি মার কাছে বলে আসতো এই ভাবনার কথাটা। মিনু যেন ঐ কারখানার কাজে না যায় মালতীর সঙ্গে। কিন্তু বলতে পারে নি নন্দ। ভালবাসার চোখ বুঝি অন্ধ। তাইতো ইউসুফের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে নি নন্দ।

আজ আলো দেখেও ভয় পেল নন্দ। এতরাত্রে সমস্ত পাইপ রোড যখন ঘুমুচ্ছে তখন পঁচিশ নম্বর পাইপ রোডের কোণের ঘরটিতে আলো কেন? তবে কি মার কিছু হয়েছে? ভাবল নন্দ। তারপর দাওয়ায় নন্দর ছায়া দেখে মা যখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তখন বুঝি নন্দর পায়ে আর জোর ছিল না। মা বলেছিলোঃ মিনু তো এখনও ফেরেনি নন্দ। এতরাতেও কারখানায় কাজ হয়? শিবু গিয়েছিল মালতীর কাছে। মিনুর খবর আনতে। কিন্তু মিনু নাকি ওখানে যায় নি। বলতে বলতে মা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মার কান্নাটা যেন বেড়ালের কান্নার মত শোনাল আর একটা অশুভ ইঙ্গিতে যেন নন্দর শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল।

তবু নন্দ ধমক দিতে চেয়েছিল। কেন ওকে যেতে দিলে? কিন্তু পারলো না। কেমন যেন একটা অপরাধী চেতনা নন্দর গলা চেপে ধরেছিল। নন্দ বেরিয়ে পড়ল। আর্মি কোয়ার্টারের পেটানো ঘণ্টার আওয়াজটার মত জোরে চেঁচিয়ে যদি ডাকতে পারতো নন্দ মিনুকে।

নন্দ জানে মিনু মালতী নয়। মিনু আসবে না। মিনুকে খুঁজে আনতে হবে। সে-ই মিনুকে ঘর থেকে বের করেছে। নন্দর গায়ে যেন ঘাতকের গন্ধ। লাশকাটা ঘরের সেই অসহ্য গন্ধ। দম আটকে আসছিল নন্দর। তবু হেঁটে চলল নন্দ।

এখনও রং কলের শেষ সিফটের বাঁশি বাজেনি। হয়তো ইউসুফ এখনও খিদিরপুরের ব্রীজের মোড়ে চায়ের দোকানটায় বসে আছে। আজ আর আকাশের ময়ালটাকে ভয় করলো না নন্দ। বটগাছের মাথায় শিশুর কান্নার বিলাপে আঁতকেও উঠল না নন্দ।

সেই নিষিদ্ধ গলিটা কেমন যেন অদৃশ্য হাতছানিতে ডাকছিল নন্দকে। অমোঘ আকর্ষণে টানছিল। একদিন ইউসুফ ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। নন্দ যায় নি। আজ নন্দই ইউসুফকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ছাতাওয়ালা গলির সেই নিষিদ্ধ পল্লীতে। অসংখ্য রঙ চঙ-এ মুখের ভিড়ে। যৌবনের জুয়ো খেলার মেলায়। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল নন্দ। তবু খুঁজে বেড়াল মিনুকে। আকাশের ডোরাকাটা মেঘটা যেন এখানে অনেক নিচে নেমে এসেছে। এখানে আলো নেই। কেরোসিনের কুপীর অস্পষ্ট আলোয় মুখের আদল স্পষ্ট করে বুঝা যায় না এখানে। কেমন যেন অচেনা রহস্যে ঘেরা চারদিক। তবু যেন রঙ করা এনামেল ঐসব মুখে নন্দ যেন হাজার মিনুর মুখের আদলই খুঁজে পেল। নন্দর চোখ বুঝি ঝাপসা হয়ে উঠল।

আর সহ্য করতে পারলো না নন্দ। বেরিয়ে এল। খিদিরপুরের ব্রীজে এসে বসল। দেখল আকাশের সেই ময়ালটা যেন আকাশ ছেড়ে কাটাগঙ্গার ঘোলা জলে এসে বাসা বেঁধেছে। আর ইডেনের সেই চাপা গোঙানির শব্দটা যেন রং কলের বাঁশিটাকে হার মানিয়ে সেই নিষিদ্ধ গলিটাকে কেমন যেন করুণ করে তুলেছে।

দূরে পীরসাহেবের দরগায় কে যেন আলো জেবলে দিয়েছে। নন্দর মনে হ'ল সব মিথ্যে। সব ঐ অনাদিপ্রসাদের মতো, মালতীর মতো মিথ্যে। নন্দ ভাবল সে যদি এক ফুঁয়ে সবগুলো আলো নিবিয়ে দিতে পারতো। আজ আর পাইপ রোড নন্দকে টানল না। মিনুকে খুঁজে বের করতেই হবে। হকার্স কর্ণারের কোণটায় এসে দাঁড়াতে ইচ্ছে হ'ল নন্দর। যদি মালতীর মতো টু-বি বাস থেকে নেমে ওর সামনে এসে দাঁড়ায় মিনু।

তখন হয়তো রোজের মতই রং কলের ধোঁয়াটা ময়াল হয়েছে। যেন হাঁ করে গিলতে আসছে ওকে। নন্দ ভয় পেল না। ডোরাকাটা আকাশটা আজকে ওর পথ অন্ধকারে ঢাকতে পারলো না।

আজ আর সে বাহাদুর নয়। রেসকোর্সের সেরা ঘোড়া কিংসসনের মতো সে ছুটতে লাগল। ময়ালটাকে পেছনে ফেলে। পীরসায়েবের দরগার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে ইডেনের দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে একটা কালো ঘোড়ার মতই ছুটেছে নন্দ সেই চাপা গোঙানিটাকে অনুসরণ করে। যেখানে সেই গোঙানিটা ময়াল সাপের মতই শিস দিয়ে ডাকছে নন্দকে।

কাগজের মণ্ড

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

PAPIER-MACHE বা কাগজের মণ্ড বস্তুটি কি? এবং কি প্রকারে ইহা প্রস্তুত করা হয়, তাহা আগে জানা প্রয়োজন।

'কাগজের মণ্ড' কতকগুলি জিনিসের সংমিশ্রণে তৈয়ারী করা হয়। ফালতু বাজে কাগজ,—যাহা কয়েকদিন জলের মধ্যে রাখিয়া পচাইয়া লইতে হয়; কাঠের গুঁড়া,—যাহাকে চালুনে ছাঁকিয়া খোলায় ভাজিয়া লইতে হয়; পরিমাণ মত খড়িমাটির গুঁড়া, সেই পরিমাণে তেঁতুলবিচির গুঁড়া করিয়া উহার আঠা। তারপর সব একত্র করিয়া জাঁতায় কুটিয়া অল্প জলে ভিজাইয়া লইলেই 'মণ্ড' প্রস্তুত হইল। কেহ কেহ তেঁতুলবিচির আঠার পরিবর্তে বাজারের গঁদের আঠাও মিশাইয়া থাকেন।

কেহ যদি প্রকৃতপক্ষে মণ্ডটি তৈয়ারী করিতে চান, তবে নিম্নলিখিত পরিমাণ মত চলিলে সুবিধা হইবেঃ—

ক) ৫০ তোলা জলে-পচা কাগজ

খ) ৩০ তোলা চালুনে-ছাঁকা খোলায় ভাজা কাঠের গুঁড়া

গ) ২০ তোলা খড়িমাটির (CHALK) গুঁড়া

ঘ) ১০ তোলা তেঁতুলবিচির আঠা

অথবা

ক) ৫ তোলা গঁদের আঠা

খ) ২০ তোলা জলে-পচা কাগজ

গ) ৪০ তোলা পিলামাটি

ঘ) ৪০ তোলা খড়িমাটির গুঁড়া

'মণ্ড' প্রস্তুত হইলে উহা ঠাণ্ডা স্যাতসেঁতে স্থানে রাখিয়া দেওয়াই ভাল।

এখন, এই মণ্ড কি প্রকারে বস্তুতে (Article) আকার (Shape) ধারণ করে তাহা বলা দরকার।

মনে করা যাক, কাগজের মণ্ডের সাহায্যে কোন একটা ঘর-সাজানো সুন্দর পাখী বানাইতে হইবে।

প্রথমতঃ মাটির সাহায্যে উক্ত পাখীর হুবহু রূপদান করিয়া উহার ছাঁচ 'প্ল্যাস্টার অব্ প্যারিস্' দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। উহা প্রস্তুত হইলে তৎপর উহাকে নিপুণতা সহকারে পরিস্কার করিয়া লইয়া অল্প 'পাউডার' মাখিয়া লইতে হইবে। তারপর পরিমাণমত কাগজের মণ্ড লইয়া উক্ত ছাঁচের ভিতর ঠাসিয়া পুরিয়া কিছুক্ষণের জন্য উহা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। আধ ঘণ্টা বাদে ছাঁচটি খুলিলে অভিপ্রেত পাখীর একটি প্রিণ্ট বা মুদ্রণ পাওয়া যাইবে। এই প্রিণ্টটি হাত দ্বারা সুষ্ঠু 'ফিনিস' করা দরকার।

পাখীর পা-জোড়া পূর্বেই তারের (Metal wire) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। এখন মণ্ডকৃত পাখীর প্রিণ্ট বা মুদ্রণ প্রস্তুত হইলে উহার পা-জোড়া ঠিকমত স্থানে লাগাইয়া দিতে হয়।

সাধারণতঃ ছাঁচ হইতে প্রিণ্ট বাহির করার পর উহার আকার কিছু অমসৃণ থাকে। ঐ কারণ কিছু চায়না ক্লে জলে পাতলা করিয়া গুলিয়া লইয়া সঙ্গে কয়েক বিন্দু গঁদ মিশাইয়া উহার উপর আলতোভাবে পলেস্তারা লাগাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।
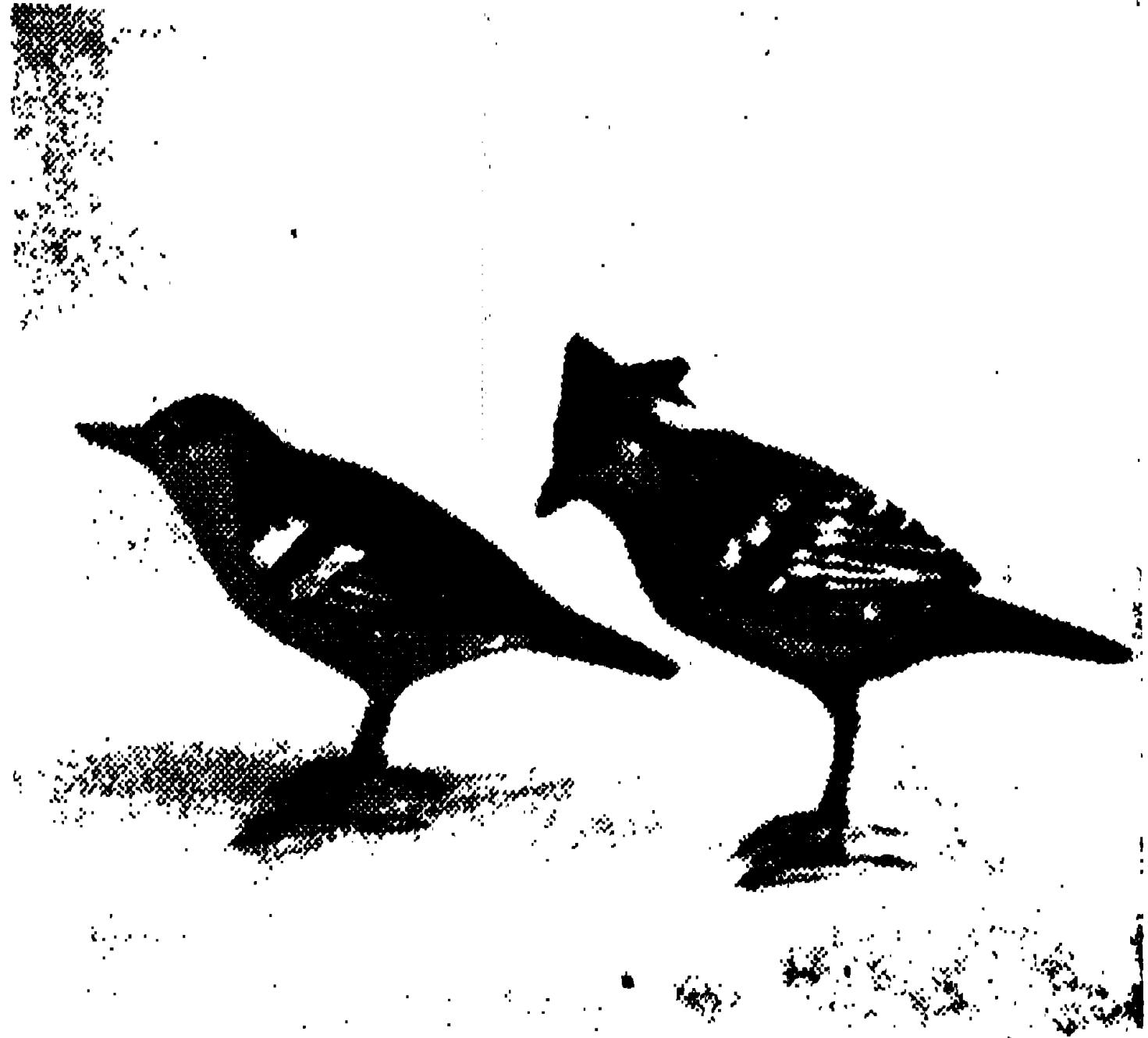
এখন, মণ্ডে মুদ্রিত পাখীটি রঙ করিতে হয়।

রং সাধারণত জলরং বা পোস্টার কালারের সাহায্যে করাই ভাল। বাজারের সস্তা পাউডার কালারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ গঁদ মিশাইয়া রং করা চলে বটে, কিন্তু ফিনিশটি সুন্দর হয় না। একমাত্র জলরং বা পোস্টার কালারেই তাহা সম্ভব। রঙের কাজ শেষ করার পর এখন সমগ্র পাখীটিকে উজ্জ্বল ও জলরোধে ভরিয়া তোলা দরকার। এ কারণ উহার উপর কোপাল বার্ণিস বা থিন্ ল্যাকার নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়া দিতে হইবে।

শুধু পাখীই নয়, কাগজের মণ্ডের সাহায্যে আজকাল সর্বপ্রকারের খেলনা, গৃহোপযোগী তৈজসপত্র ও ঘরসাজানো নানা রঙদার উপকরণ তৈয়ারী সম্ভব, এবং ইহা ভারতের নানাস্থানে প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত করাও হইতেছে।

বোম্বাইয়ের কোলাবা অঞ্চলের 'পেন্', কোলাপুরে এবং পুণায় নানাপ্রকারের খেলনা ও পাখী, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি জায়গায় নানাপ্রকার দেবদেবী ও অজন্তা-ইলোরার প্রতিমূর্তি, রাজস্থানের উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, সৌরাষ্ট্রের জুনাগড়, উত্তর প্রদেশের আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে খেলনা ও নানাজাতীয় রঙিন পাখী প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। মাদ্রাজের কিছু অঞ্চলে প্রস্তুত মণ্ডকৃত দেবদাসী মূর্তি অধুনা ভারতের সর্বত্র সর্বত্র পাওয়া যায়।

জানা প্রয়োজন, কাগজের মণ্ডকৃত কোন বস্তু সর্বদা শুষ্কস্থানে রাখা দরকার। সর্বদা জল লাগিলে উহার মণ্ড নরম হইয়া কোন একসময় গলিয়া যায়। কাজে কাজেই মণ্ডকৃত তৈজসপত্রে সাধারণতঃ নানাজাতীয় শুকনা ফল অথবা চাল, মুড়ি, চিড়া, খৈ, বিস্কুট প্রভৃতি শুকনো খাদ্যদ্রব্য রাখার পক্ষে অতি উত্তম।

পরিশেষে বলতে হয়,—যাঁহারা অল্প মূলধনে ব্যবসা করিয়া অধিক ধনের আশা পোষণ করেন, অথবা যাঁহারা প্রায় নিখরচায় সুন্দর সুন্দর জিনিসে ঘর সাজাইতে বাসনা করেন,—তাঁহাদের পক্ষে এই কাগজের মণ্ড অতি অপরিহার্য সম্পদ।

ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান

ব্রিজেশ

কাঁধে জলের কলসী বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের দেশের মেয়েদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিভিন্ন দেশের লোক বহুবিধ উপায়ে কোন বোঝা বা কোন জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যায়। আমি মনে করি কাঁধে করে কোন জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার। ১৯২৪ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মেয়েরা সাধারণতঃ কোন বোঝা বহন করার সময় আটটি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে। যেমন—দুহাতে বোঝাকে সামনের দিকে ধরে, বুকপেটির সাহায্যে সামনের দিকে রেখে, হাতলের সাহায্যে হাতের দুপাশে ঝুলিয়ে, হাত দিয়ে মাথার উপর বোঝাটাকে সোজা করে রেখে, কাঁধের একদিকে, কাঁধে, বোঝাটাকে পিঠে বয়ে, দড়ি বা অন্য কিছু দিয়ে বোঝাকে পিঠে ঝুলিয়ে দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। উপরিউক্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে শেষেরটি অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা পুরাতন এই পিঠে ঝুলিয়ে নেয়াটাই অনায়াসসাধ্য এবং সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম হয় কাঁধে বয়ে নেবার সময়।

পিঠে ঝুলিয়ে কোন জিনিস নেবার সময়ই সবচেয়ে কম শক্তি ব্যয় হয়। কেননা এভাবে যে কোন লোক তার দেহকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সোজা রাখতে পারে এবং বোঝার ওজন সমস্ত শরীরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় দেহ যাতে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা থাকে সেদিকে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত। এই অভ্যাস মানুষের দীর্ঘ ও সবল দেহগঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দৈনন্দিন জীবনের এরকম আরও বিভিন্ন কার্য্যাবলী নিয়ে কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে "মানবীয় উপাদান"। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের অতি অল্পসংখ্যক লোকই এর খবর রাখে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মূল গবেষণাকে উপেক্ষা না করে মানুষের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের এটাই উপযুক্ত সময়। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের পরিধি যাতে দেশের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করতে পারে, সেদিকেও তাদের একান্ত নজর রাখা উচিত।

বিজ্ঞানীদের অবশ্যই একসঙ্গে দুটো কাজ করতে হবে। একদিকে স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা ও অন্যদিকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি যাতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রযোজ্য হয় সেদিকে তাদের নজর দেওয়া উচিত।

বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি অতি সাধারণ সমস্যার উল্লেখ করছি। এদের বেশীর ভাগই সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে সহজেই সমাধান করা যায়।

আপনি যদি একটি বাড়ী তৈরী করেন, তবে বাড়ীর লোকসংখ্যা অনুযায়ী কোঠা তৈরী করতে হবে। তাদের পছন্দ ও অপছন্দ অনুসারে ঘরে আসবাবপত্র সাজাতে হবে। এই ধরণের প্রত্যেকটি ছোট বড় সমস্যার উপর গৃহকর্তার প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে।

আপনি যদি কোন বৃহৎ পরিবারের কর্তা হন, তবে সর্বদাই আপনাকে সকলের সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। একই বাড়ীতে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পৃথক পৃথক ঘরে বাস করলেও সেটা একান্নবর্তী পরিবারে কোন অশান্তি ঘটায় না বরং তার শক্তি বৃদ্ধি করে।

জীবনপথকে মসৃণ ও সুন্দর করতে যেমন নিখুঁত পরিকল্পনার দরকার, তেমনি বাড়ীর ভিতরের অঙ্গসজ্জাও এটার একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে শেষোক্তটিকে প্রায় কোন মূল্যই দেওয়া হয় না।

অন্তভাবে খাদ্য চলাচলের ব্যবস্থা

বাড়ীতে বা অফিস-ভবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমাদের শুধুমাত্র বাড়ীর গঠন, তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা বা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার দিকে নজর রাখলেই চলবে না, ভিতরের আসবাবপত্রের দিকেও নজর দিতে হবে। যেমন—চেয়ারের ডিজাইন ও তার উচ্চতা, টেবিলের উচ্চতা, আলমারি বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির গঠন, এমন কি ইলেকট্রিক সুইচ যাতে হাতের নাগালের মধ্যে থাকে সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত। ছোটখাট জিনিস যেমন, ড্রয়ার খোলার ব্যবস্থা, বাসন-কোশন রাখবার জায়গা এবং তাদের ডিজাইন যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন না ঘটায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। স্নানঘরে ইলেকট্রিক সুইচ এমন জায়গায় হওয়া উচিত যাতে ভেজা হাত না লাগে।

ঘরের মেঝে যতদূর সম্ভব ফাঁকা রাখা দরকার। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও আসবাবপত্র যাতে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায় সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত। তাদের গঠন ও উচ্চতা যাতে যাতায়াত ও ব্যবহারে বিঘ্ন না ঘটায় সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত।

নবদম্পতির নূতন সংসার শুরু করার আগে তাদের জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের দিকে প্রখর মনোযোগ দেওয়া উচিত। এবিষয়ে অমনোযোগিতা শুধুমাত্র অর্থেরই অপচয় ঘটায় না, শতকরা নব্বুইজনকে এই সমস্ত অব্যবহার্য জিনিসই ব্যবহার করতে হয়। কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক যুগে নতুন করে সমস্ত জিনিসই কেনা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কিছু কেনার আগেই চিন্তা করা উচিত কি কি জিনিস প্রয়োজন। সুন্দর গঠন ও মজবুত জিনিস কেবলমাত্র ব্যবহারেই আনন্দ দেয় না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি করে।

কোন কাঠের জিনিস কেনার সময় কেবল তার গঠনিনৈপুণ্য, মূল্যবান কাঠ ও মজবুত শক্তির উপর নজর রাখলেই চলবে না, সেটা ব্যবহারের উপযোগী হবে কিনা, ঘরের সৌন্দর্য বাড়াবে কিনা সেদিকে নজর রাখতে হবে। ঘরের সৌন্দর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে হলে স্থূল ও বেমানান আসবাবপত্র সরাতে হবে। কারণ মূল্যবান আসবাবপত্র মানেই উৎকৃষ্ট আসবাবপত্র নয়।

স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে বাস করতে হলে আমাদের ঘরের আসবাবপত্র যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে। কম আসবাবপত্রের সাহায্যে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে গেলে আমাদের একটি জিনিস কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন মেটায়, এমন জিনিস কিনতে হবে। যেমন ধরুন, লুকোনো বিছানা সমেত সোফা, টেবিল সমেত চেয়ার ইত্যাদি। এ সব আমেরিকায় এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের সোফাকে নিজের ইচ্ছামত মুহূর্তের মধ্যে বিছানা করে নেওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী এই ধরনের জিনিসপত্র অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ঘরকে ফাঁকা রাখতে সাহায্য করে। আমি আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এইরূপ বহুমুখী আসবাবপত্র পাওয়া যাবে।

উন্নততর গঠন-নৈপুণ্য

এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে কোন বস্তু তার নিজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে। ধরুন, একটি ছোট প্রকোষ্ঠে বা ঘরে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি টাইপ-রাইটার আছে। যখন দরকার হয় সেটাকে টেবিলের উপর নাবিয়ে কাজ করতে হয়। পরে আবার তুলে রাখতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই জিনিসটিকে এমনভাবে তৈরী করা যায় যে টাইপের সময় সেটি স্বয়ংগতিশীল হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে যায়।

রান্নাঘর যদি গৃহিণীদের সুবিধামত তৈরী হয় এবং জিনিসপত্র ঠিক থাকে, তবে তাঁদের কাজের কোন অসুবিধা হয় না। একটি স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাঘর তৈরী করতে গেলে প্রথমে তার মেঝে ও বাড়ীর লোকজন বুঝে ঘর কত বড় হবে, সেটা ঠিক করে নেয়া উচিত। ঘরে বাসনকোসন রাখবার জায়গা, মাল-মশলা, চাউল, ডাল ইত্যাদি রাখবার জায়গা গৃহিণীর সুবিধামত হওয়া উচিত। এতে যেমন গৃহিণীর কম পরিশ্রম হবে, তেমনি কাজ করতেও আনন্দ পাবেন।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মতো উন্নতশীল দেশগুলিতে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারা গৃহিণীদের সুবিধার জন্য এমনভাবে চুল্লী তৈরী করে যাতে সেটাকে গৃহিণী সুবিধামত উঁচু-নীচু করতে পারে। এতে গৃহিণীদের কাজ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং কাজ করতেও কোন কষ্ট হয় না।

এই প্রবন্ধে মাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানী, নক্সাকারক ও প্রস্তুতকারকের অপরিসীম নিষ্ঠাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে সাহায্য করে।

এই সমস্ত জিনিসপত্র তৈরী করে অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হলে একটি স্বাধীন 'বৈজ্ঞানিক সংগঠনী' গঠন করে নূতন জিনিসপত্রের গুণাবলী নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। জনসাধারণের আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ্য রেখে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

সবশেষে ঘরের সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের দিকে জোর দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য। জীবন-যাত্রার মান উন্নততর করতে হলে প্রথমে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে এই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের মূল্য উপলব্ধি করলে তবেই সমাজের উন্নতি হবে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শুধুমাত্র বড় বড় কথায় লেখা হলেই চলবে না, সেটা যাতে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো যায়, সমাজের সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-শান্তি বজায় থাকে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমেরিকান মেয়েরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গৃহসজ্জা ও উন্নততর জীবনযাত্রা নির্বাহের দিকে প্রখর মনোযোগ দিয়েছেন। ভারতীয় নারীরাও তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য নিজেরা উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসুন।

পড়া জানা ছেলে সোমনাথ। বিয়ের আগে বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছিল ও! হঠাৎ বাবার আগমনে সোমনাথ বোধহয় বিপর্যস্ত বোধ করছে।

শ্যামলী সোমনাথের গা ঘেঁষে এসে বসল। তারপর বলল, "বাড়ী চলো তো।"

কি আশ্চর্য! ছেলে ভয়ে বাড়ীই ফিরতে পারছে না। পাছে বাপ বউকে কিছু বলে! এসব ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে একটু রাগারাগি চেঁচামেচি হয়েই থাকে। সেটুকু আর শ্যামলী মানিয়ে নিতে পারবে না!

একটা লাল-পাড় শাড়ী পরে, চিরুনির ডগা দিয়ে সিঁথের সিঁদুরের রেখা টানতে টানতে ছোট আয়নাটায় শ্যামলী যতদূর সম্ভব নিজেকে দেখে নিল, যথেষ্ট বৌ-বৌ দেখাচ্ছে কিনা। শ্বশুরের মনে প্রথম সাক্ষাতের ছাপটা যেন বিরোধিতা না করে। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল সোমনাথের দিকে। তক্তাপোশের ওপর গুম হয়ে বসে আছে। আচ্ছা লোক তো। এতই যদি দুশ্চিন্তা হবে তাহলে বিয়ে করা কেন? রাগ হয় শ্যামলীর।

হঠাৎ একটি লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে। চমকে ফিরে তাকালো শ্যামলী। লোকটি প্রবীণ, মুখের ভাব রুক্ষ, গ্রাম্য, মেয়েটি ছেলেমানুষ, শ্যামলীর থেকেও ছোট। কিরকম যেন ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে শ্যামলীর ওপর দৃষ্টিটা আটকে গেল। সোমনাথ ঠিক যেমনভাবে বসেছিল, তেমনই রইল।

"এই মেয়েটার এমনভাবে সর্বনাশ করলে কেন?"

সোমনাথ মুখ তুলে তাকাল। শ্যামলী দেখল, ওর চোখ দুটো রাগে জ্বলছে।

"গরীবের মেয়ে। বিয়ে করবে কথা দিয়েছিলে। চিঠি অবধি লিখেছ গোছা গোছা," ভদ্রলোক হাতে-ধরা কয়েকটা চিঠি দেখালেন, "গাঁয়ের সবাই জানে সে কথা। আর এদিকে তুমি—"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে লোকটি থামল।

"এ শয়তানীটুকু না করলেও চলত।" সোমনাথ কঠিন কন্ঠে বলল। ওর ভাষা শুনে বিস্মিত শ্যামলী বুঝতেই পারল না, এই লোকটাই কি সোমনাথের বাবা।

লোকটা থতমত হয়ে গেল সোমনাথের কথা শুনে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বেশ,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর লোকটির পেছু পেছু বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে কৌতূহলী অনেকগুলো মুখের উঁকি-ঝুঁকির ওপর সোমনাথ দরজা বন্ধ করে দিল।

"ইনিই তোমার বাবা?

"হ্যাঁ।"

"কথাগুলো সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

হঠাৎ যেন কি ভীষণ ক্লান্তিতে শ্যামলীর দেহ ভেঙ্গে পড়তে চাইল। ও তক্তাপোশের এক পাশে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল। তারপর ক্লান্ত কন্ঠে ওপাশ থেকেই প্রশ্ন করল, "ওকে বিয়ে করলে না কেন?"

"প্লীজ্ শ্যামলী, তুমি ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝ।" আর্তকন্ঠে বলে উঠল সোমনাথ, "ওটা একটা অল্প বয়সের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই না।"

"কিন্তু মেয়েটার কাছে নাও তো হতে পারে।"

"হ্যাঁ, মেয়েটার কাছেও। ওরা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। গরীব। মাঝে মাঝে এসে আমাদের বাড়ীতে থাকত। স্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠে সবে লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড়তে শুরু করেছি। সেই বয়সে ও'ই ছিল আমার নায়িকা। সেকেন্ড্ ইয়ারে পড়তে পড়তে ওকে চিঠি লিখতাম রোমিও—জুলিয়েটের রেফারেন্স দিয়ে। ও বোধহয় তখন সেভন্ না এইটে পড়ে। মা-মরা ছেলে বলে বাবার খুব আদর পেয়েছি। সৎমাও ভালোবাসতেন খুব। তাঁর কাছে কিছু লুকোনো ছিল না। তাঁকে বলেওছিলাম, ওকে বিয়ে করব। বাবা কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে পছন্দ করে নি। আমাকে কোন শাসন করতে পারত না। কিন্তু ওদের নানাভাবে বিব্রত করত। বাড়ীতে আসতে দিত না। ওদের পরিবারের নামে এমন কি মেয়েটির নামেও কুৎসা রটাবার চেষ্টা করত। আর যাতে সেগুলো আমার কানে ওঠে তারও ব্যবস্থা করত। বাবার চরিত্র অবশ্য আমার জানতে বাকি ছিল না।

তারপর বি-এ পড়তে চলে এলাম কলকাতায়। আর ওদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। শুনেছিলাম মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, বাবা নাকি সাহায্য করবে বলেছে। তোমার সঙ্গে বিয়েটা বাবার পছন্দ না বলে, মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এসেছে, ভাংচি দেবে বলে। বিয়ে যে হয়ে গেছে তা তো জানত না। আজ দুপুরে কি বলছিল জানো?"

"কি?" শুকনো গলায় জানতে চাইল শ্যামলী। "বলছিল, বিয়ে যখন করেই ফেলেছিস, তখন আর কি হবে। আমি ওর জন্যে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেব। ওর এখানে একটা থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে তুই আমার সঙ্গে দেশে ফিরে চল।"

শ্যামলীর গলাটা শুকিয়ে এলো।

"ঐ মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থাও বাবা অন্যত্র করে রেখেছে। এর পরেও তুমি যদি ওর প্রসঙ্গ তুলে খোঁটা দাও তাহলে আমার বলার কিছু থাকবে না।"

সোমনাথের গলাটা ধরে এলো।

"শ্যামলী, কথাটা তোমাকে বিয়ের আগে বলিনি বলে কি এতই অপরাধ করেছি।"

"আচ্ছা হয়েছে। এখন চুপ করো তো।"

শ্যামলীর কন্ঠে অনুরাগ আর প্রশ্রয়ের অনুরণন। বুঝতে সোমনাথের ভুল হল না। কিন্তু কাল যেমন প্রথম পুরুষ স্পর্শে শ্যামলীর বাধ বাধ ঠেকছিল, আজ কেমন মনে হতে লাগল যান্ত্রিক। সোমনাথের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ শ্যামলীর মনের মধ্যে একটা ভাবনা ত্রস্ত পদক্ষেপে হাজির হল—চলন্ত ট্রেণের ছায়ার মত ওর ছায়াও কি সেই মেয়েটির মত দ্রুত অপসৃত হয়ে যেতে পারে না সোমনাথের মন থেকে।

হেড-মাষ্টার ভবনাথবাবু মোটামুটি ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। গ্রামের মধ্যে চট করে বাড়ী না পাওয়ায় নিজের বাড়ীর একদিকটায় দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সোমনাথ শ্যামলীকে নিয়ে সেখানেই উঠল।

বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই ভবনাথবাবুর শালী মীরা ওদের কলকন্ঠে অভ্যর্থনা জানাল।

"বা, সোমনাথদা বেশ। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে বৌদি শুদ্ধ হাজির। পাছে মিষ্টি খাওয়াতে হয়, তাই বুঝি জানান নি কিছু।"

শ্যামলীর মেয়েটিকে ভালো লাগা উচিৎ বলে মনে হল। এমন একটি হাস্যোচ্ছল খুশিতে ভরপুর মেয়েকে ভালো না লাগলে তার চরিত্রের দীনতাই প্রকাশ পাবে—ভাবল সে। তাই মীরাকে জড়িয়ে ধরে ও বলল, "না ভাই ঠাকুরঝি। তোমাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়।"

ভবনাথবাবুর স্ত্রী অসুস্থ বলে মীরা রয়েছে এখানে। দু'একদিনের মধ্যেই উনি বোনকে নিয়ে চলে যাবেন বাপের বাড়ী ভালো করে চিকিৎসার জন্যে। শুনে শ্যামলী নিশ্চিন্ত বোধ করতে চাইল, কিন্তু সেটা তার উচিৎ বলে মনে হল না।

এক বাড়ীতে থাকলেই কথাবার্তা হয়। বিশেষ করে সোমনাথের সঙ্গে যখন মীরার আগেই আলাপ ছিল। তাছাড়া নিজের ছোট্ট সংসারটুকু গুছিয়ে নেবার

জন্য শ্যামলী ক'দিন একটু ব্যস্ত ছিল। সন্ধ্যের দিকে ভবনাথবাবুও যান কাছেই কোন এক মঠে। ফলে বেচারা সোমনাথ পড়ে একলা। তাই ও মীরার সঙ্গে একটু-আধটু গল্প করে। কিন্তু আশ্চর্য মনের জোর শ্যামলীর। ও কিছুতেই কোন সন্দেহকে ঘেঁষতে দিল না। কেন না, শ্যামলী তো ভালোই জানে, এখন অন্ততঃ সোমনাথের মনে সে ছাড়া আর কেউ নেই। এই সত্যটাকেই সজোরে আঁকড়ে ধরে শ্যামলী ভালো লাগাতে চেষ্টা করে সোমনাথের আদর-উচ্ছ্বাসকে।

ওরা চলে গেল। যাবার আগে ভবনাথবাবুর স্ত্রী শ্যামলীকে অনুরোধ করে গেলেন, ভবনাথবাবুর খাওয়া-দাওয়াটা একটু দেখতে। শ্যামলী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, তার এত স্বস্তি বোধ করবার কোন কারণই ছিল না।

ওদের পৌঁছনো সংবাদ এলো চিঠিতে। হঠাৎ শ্যামলীর মনে হল, মীরা কি কোন চিঠি লেখে নি সোমনাথকে? কই নাতো। এক যদি স্কুলের ঠিকানায় লিখে থাকে।

সারাদিন ঘুরে ফিরে ও সংসারের কাজ করল, নিজের চান-খাওয়া-দাওয়া সারল, বিশ্রাম করল, বিকেলের জলখাবার তৈরী করল—আর বার বার সেই একই চিন্তার পুনরাবৃত্তিতে ও বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের ওপর, সোমনাথের মনের পটে মেয়েদের ছায়া বদলায় বড় তাড়াতাড়ি।

সোমনাথের বাড়ী ফিরতে দেরী হচ্ছিল। ভবনাথবাবু কখন ফিরে এসেছেন। শ্যামলী ওঁকে চা দিয়ে এলো। জলখাবারের পরোটাগুলো টান টান হয়ে উঠল। রাগে দুঃখে, অভিমানে ফুলে রইল শ্যামলী। নিশ্চয়ই স্কুলে বসে বসে চিঠি পড়া চলছে আর তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরল সোমনাথ। গুন গুন করে গান ভাঁজতে ভাঁজতে। খুব যে ফূর্তি! শ্যামলী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না।

"তুমি কি বল তো। একটা লোক যে পথ চেয়ে খাবার কোলে করে বসে আছে, সে কথা কি একটু মনেও পড়ে না।"

বলতে বলতে সারাদিনের উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় চোখ ফেটে জল আসতে চায় শ্যামলীর। একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে সোমনাথের মনটা ভরে যায়। ছেলেদের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খেলা দেখত দেখতে মনটা বেশ হালকা হালকা ঠেকছিল। বাড়ী ফিরে শ্যামলীর এই আকুল প্রতীক্ষা আর চোখের জলের ছোঁয়া লাগানো অভিমান মুগ্ধ করল ওকে।

"আমার অন্যায় হয়ে গেছে শ্যামলী।"

শ্যামলী জল-ভরা চোখে তাকালো। আষাঢ়ের দীর্ঘ অপরাহ্ণের প্রান্ত বেলায় যখন ঝির ঝির বাতাসে নারকেল গাছের মাথাগুলো দুলছে, আর মেঘ-চোঁয়ানো রুপোলী আলোয় যখন পাখীর দল বাসায় ফিরে কলতান তুলছে, তখন শ্যামলী স্বেচ্ছায় ধরা দিল সোমনাথের বাহুবন্ধনে। আর তখনই ওর সমস্ত অঙ্গ ছেয়ে নামল একটা লজ্জার পুলক শিহরণ।

পরের দিন বিকেলে ঝি এসে খবর দিল, "দাদাবাবু ব'লে পাঠালেন, আজ ফিরতে দেরী হবে। চা-টা কিছু খাবেন না।"

"দাদাবাবুকে কোথায় দেখলি?"

"ঐতো, ইস্কুলের অনিলবাবুর বাড়ীতে।"

"ওদের বাড়ীতে কে কে আছেন রে?"

"মাষ্টারবাবুর মা, বউ, একটি বোন, ছোট একটা ভাই—"

"বোনটার বিয়ে হয়নি?"

"নাগো বৌদিদি, পাত্তর খুঁজছে। তোমাদের সন্ধানে আছে নাকি?"

"ছিল একটা। এখন আর নেই।" দাঁতে দাঁত চেপে মুখ ফসকে বলে ফেলল কাথাটা।

"ওমা তাই নাকি! বিয়ে হয়ে গেল বুঝি। আহা, তা যাক, যার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে, তার সঙ্গেই তো হবে। ভারী সুন্দরী মেয়ে, আর তেমনি লক্ষ্মী।"

শ্যামলী দুমদুম করে পা ফেলে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির হল ভবনাথবাবুর সামনে।

"দেখুন তো দাদা, কি কাণ্ড। আমি সারা দুপুর একটু বিশ্রাম করলাম না, খেটেখুটে বিকেলের জলখাবার তৈরী করে রাখলাম। আর উনি খবর পাঠালেন, বিকেলে উনি আসবেন না।"

"জলখাবার করবার কি দরকার ছিল? এলে একটু মুড়ি-চিঁড়ে দিতে পারতে।"

শ্যামলীর সমস্ত পরিশ্রমটাকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে চা খেয়ে ভবনাথ-বাবু বেরিয়ে গেলেন মঠে, ভাগবৎ পাঠ শুনতে। বয়স ওনার প'য়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। কিন্তু স্ত্রী এখানে না থাকলেই উনি রোজ যান ওখানে।

বেশ রাত্রে ফিরল সোমনাথ। খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে কোন উদ্বেগ ছিল না। বরং আশা করছিল, একটু বেশী রাত হয়ে যাওয়ার জন্য শ্যামলীর অভিমান আর অনুযোগ মাখানো স্নিগ্ধ মুখখানা আবার কাছে পাবে। ঘরের মধ্যে ম্লান হ্যারিকেনের আলোয় সোমনাথ দেখল, শ্যামলী পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। সারা-দিনের পরিশ্রমের পর বেচারা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি। সোমনাথ ওর কাঁধটা ধরে ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডাকল, "শ্যামলী!"

একটা প্রচণ্ড ঝটকায় সোমনাথের হাত দুটো ছিটকে গেল। শ্যামলী উঠে বসেছে। চোখ দিয়ে ওর আগুন ঝরছে! দারুন উত্তেজনায় বুকটা উঠছে, নামছে।

"গায়ে হাত দিও না।"

সোমনাথ হতবাক। এত প্রচণ্ড ক্রোধ ঃ নিশ্চয়ই কিছু ভুল বুঝেছে শ্যামলী।

"কি হয়েছে বলবে"

"মীরাকে চিঠি লেখা শেষ হল? অনিলবাবুর বোনের সঙ্গে প্রেম করা কি এত রাত অবধি চলল?" রাগে উত্তেজনায় ওর কথা আটকে যাচ্ছে।

ওর হাত দুটো জোর করে ধরে ফেলে সোমনাথ বলল, "ছি, ছি, শ্যামলী এসব তুমি কি বলছ!"

শ্যামলী জোর করে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বালিশটা ছুঁড়ে মারল সোমনাথের দিকে।

"খবরদার বলছি, গায়ে হাত দেবে না।"

বালিশের ধাক্কায় সোমনাথের চশমাটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে, কাঁচ দুটো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একটা অপমান-বোধ সোমনাথের কণ্ঠকে কঠিন করে তুলল।

"যা বলবার ভদ্রভাবে বলো।"

"যাও, যাও। আর শয়তানী করতে এসো না।"

"কি বললে!" ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সোমনাথের কানদুটো।

"শয়তানের বাচ্চাকে শয়তানী করতে বারণ করলাম।"

ঠাস করে এক চড় এসে পড়ল শ্যামলীর গালে। এক মুহূর্ত শ্যামলী তাকিয়ে রইল বিদ্যুৎ-গর্ভ দৃষ্টি নিয়ে। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল সোমনাথের ওপর। আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে চাইল যেন। সোমনাথের গায়ের জামা দেখতে দেখতে ফালা-ফালা হয়ে গেল। আত্মরক্ষার্থে সোমনাথ ওর চুলের ঝুঁটিটা চেপে ধরল। দুটো চাপা আক্রোশের কণ্ঠ যেন সাপের মত হিস্ হিস্ শব্দ তুলে আবছা অন্ধকার ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

"মাপ করবেন সোমনাথবাবু, আমার বাড়ীতে ঐ ভাবে বাস করা চলবে না।"

ভবনাথবাবু হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সোমনাথ কাঠ।

শ্যামলী হঠাৎ ভবনাথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

"দাদা, আপনি আমাকে বাঁচান।"

সোমনাথ মুখ নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভোরবেলা ভবনাথবাবু সোমনাথকে ডেকে বললেন, গতকাল রাত্রে শ্যামলী স্বীকার করেছে, ওর মনের মধ্যে ভীষণ একটা সন্দেহ বাতিক এসেছে। ও চেষ্টা করছে সেটা চাপা দেবার। কিন্তু সোমনাথের আচরণের ছোটখাটো ত্রুটিতে ও কিছুতেই সেটা দমন করতে পারছে না।

"অনর্থক দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি না করে আপনি যদি একটু হিসেব করে চলেন, তাহলে বোধহয় ভালোই হবে, সোমনাথবাবু।"

সোমনাথ মাথা নীচু করে একটু ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, "আমিও অনর্থক অশান্তি সৃষ্টির পক্ষপাতী নই, ভবনাথবাবু।"

"ওকে আপনি আর একটু বেশী সঙ্গ দিন। ও বড্ড একলা পড়ে যায়। আমাকে ধরেছে, আমাদের আশ্রমে ভাগবৎ পাঠ শুনতে যাবে।"

"আপনি দাদার মত। যদি ওকে একটু নিয়ে যান, তাহলে হয়তো ওর মনটা একটু ভালো থাকবে। তাছাড়া আপনাকে যখন বলেছে, আপনি নিয়ে গেলেই মনের দিক থেকে উপকার হবে। আমি আবার সন্ধ্যেবেলায় একটা টিউশানি নিয়েছি।"

সত্যি, দিন কয়েক শ্যামলীর লক্ষণীয় উন্নতি দেখা দিল। কল্যাণী হাতের সুনিপুণ সেবায় ও দুটি গেরস্থালিই ভরিয়ে রাখল। শোবার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুরের পট। সকালে তার তলায় দুটো ধূপ জেবলে দিয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম সেরে, ও যখন সংসারের পাট শুরু করত, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন সোমনাথ তখন যেন একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করত ভগবৎ বিশ্বাসের ওপর। একদিন তো শ্যামলী রাত্রে সোমনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে অনুতাপে কেঁদেই ভাসিয়ে দিলে, সেই রাত্রের কথা স্মরণ করে।

সেদিন রাত্রে আশ্রম থেকে ফিরল শ্যামলী খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

জানো, বৌদি ভালো হয়ে গেছেন। শীগগীরই আসছেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। যাক বাবা এবার বেশ একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। তাছাড়া মীরাও আসছে।—" বলেই যেন হোঁচট খেল। তারপর বেশ একটু কঠিন স্বরেই বলল,

"তুমি কিন্তু মীরার সঙ্গে কথাবার্তা বলা বা মেলামেশা করতে পারবে না।"

অপমানে সোমনাথের মুখটা কালো হয়ে গেল। তবুও যতদূর সম্ভব সেটাকে দমন করে মুখের ওপর একটা নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

ততক্ষণে কিন্তু শ্যামলীর মেজাজ বদলে গেছে। জেদী ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে ও বলল, "আমি জানি, তুমি এখনও অনিলবাবুর বাড়ী যাও। ওর বোনের সঙ্গে আর কতদিন মেলামেশা চালাবে?"

সোমনাথ অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ম্লান হেসে বলল, "আচ্ছা শ্যামলী, আমি একসঙ্গে কটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় চালাতে পারি বলে তোমার মনে হয়? আমার ওপর কি এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পার না।"

শ্যামলী হঠাৎ উদাসীন হয়ে জবাব দিল, "আমাকে বিয়ে করেছ বলে সে বিশ্বাস আমার হারিয়ে গেছে।"

সোমনাথ অবাক হয়ে শ্যামলীর উক্তির অর্থ হাতড়াতে লাগল মনের মধ্যে।

পরদিন রাত্রে টিউশানি সেরে ক্লান্ত সোমনাথ বাড়ী ফিরল শ্যামলীর সেবা-পরায়ণ হাত-দুখানির একটু উষ্ণ অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে করতে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখল, শ্যামলী গুম হয়ে তক্তাপোশের ওপর বসে আছে, চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন জ্বালাময় শূন্যতা। আগের দিনের কথা মনে পড়ল সোমনাথের। কোন কথা না বলে জামা-কাপড় বদলে গামছাখানা নিয়ে ও পা বাড়ালো হাত-মুখ ধোবার জন্য।

"শোনো।"

সন্ত্রস্ত সোমনাথ ফিরল।

"ভবনাথবাবু লোকটা অত্যন্ত বাজে। আজ আশ্রম থেকে ফেরবার পথে আমার কাছে একটা বিশ্রী প্রস্তাব করল।"

"ছি, ছি, কি বলছ তুমি!" সচকিত হল সোমনাথ।

"ঠিকই বলছি।"

"ভবনাথবাবু আদর্শ চরিত্রের লোক। তোমার সঙ্গে ওঁর মেলামেশায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। ওঁর মধ্যে এতটুকু দুর্বলতার আভাস পেলে আমি তোমাকে ওঁর সঙ্গে মিশতে দিতাম না।"

"মানুষ নিজের দুর্বলতা গোপন রাখে। শুধু দুর্বলতার যেটা উপলক্ষ, সেখানেই তা প্রকাশ পায়। তোমাকে ঐ স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিতে হবে।"

গম্ভীর ভাবে কথা শেষ করল শ্যামলী।

পরদিন সকালে ভবনাথবাবু সোমনাথকে ডেকে বললেন, "কথাগুলো বলার জন্য আগেই আপনার কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আপনি শুনেছি ভালোবেসে বিয়ে করেছেন। কিন্তু আপনার ভালোবাসা অপাত্রে পড়েছে।"

"আপনি অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন।"

"নিঃসন্দেহে। শুধু আপনাদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করেছি বলেই বলতে সাহস করছি। আপনার স্ত্রী আপনার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে উদ্‌গ্রীব।"

"ভবনাথবাবু!"

"আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এ নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমাদের যা পেশা, তাতে পারিবারিক সুনামের প্রয়োজন। আমার মনে হয়, আপনি পদত্যাগ করুন।"

ভবনাথবাবু চলে গেলেন। সোমনাথ গুম হয়ে বসে রইল। একটা মেয়ে নিয়ে এত ঝামেলা তার সহ্য হচ্ছে না।

শ্যামলী এসে জিজ্ঞেস করল, "ও লোকটা কি বলছিল?"

হঠাৎ সোমনাথ উল্লসিত হয়ে উঠল। নিষ্ঠুর, ক্রূর একটা উল্লাস!

"ভবনাথবাবু তোমার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করছিলেন। বলছিলেন, তুমি নাকি সতীত্বের আদর্শ বজায় রাখতে ইচ্ছুক নও।"

সোমনাথের কণ্ঠে ব্যঙ্গের ছোঁয়া।

"কি এতদূর স্পর্ধা!" আবার সেই বিদ্যুৎগর্ভ দৃষ্টিটা দেখতে পেল সোমনাথ।

"স্পর্ধা কি আর এমনি হয়।" সোমনাথ বক্রোক্তি করল।

"তার মানে?"

বুঝতে পারছ না?"

"তুমি আমায় সন্দেহ করছ!" হঠাৎ যেন আর্ত শোনাল শ্যামলীর কণ্ঠস্বর।

"তুমি আমায় দিনরাত সন্দেহ করতে পার, আর আমি একটিবারও পারি না!" সোমনাথের কণ্ঠে যেন তৃপ্তির উদ্‌গার, "ভবনাথবাবুকে যতটুকু চিনেছি তাতে—" কথাটা অসমাপ্ত রেখে বাঁকা চোখে একবার শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে হালকা মনে সোমনাথ বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই বাড়ীতে ঢুকে রান্নাঘর থেকে একটা পোড়া গন্ধ পেয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখল, ডালটা ধরে গেছে। কড়াটা নামিয়ে রেখে শোবার ঘরে এসে দেখল সোমনাথ, শ্যামলী জানলার গরাদ ধরে ওদিকে তাকিয়ে হাসছে। ওদিকটা ভবনাথবাবুর অংশ। সোমনাথ পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখল কেউ নেই। পায়ে পায়ে শ্যামলীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শ্যামলীর গালের ওপর অশ্রু-বিন্দুগুলি তখনও চিকচিক করছে। ও আপন মনে হাসছে আর বিড়বিড় করে বকছে একটি শিশুর মত, "হ্যাঁ গো, আমি দাঁড়াবো কোথায়? আমায় সন্দেহ করলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? বলো না, দাঁড়াবো কোথায়?"

সংবাদ বিচিত্রা

।। ইউরোপের বৃহত্তম স্টুডিও ।।

ইউরোপের বৃহত্তম স্টুডিও 'মস্-ফিল্ম্'-এর পুনর্গঠনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। এই পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর এই স্টুডিও থেকে বছরে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৫০ খানি ছায়াছবি তৈরি হতে পারবে।

৫৬ হেক্টার জমির ওপর অবস্থিত এই স্টুডিওর ইমারতগুলির মোট মেঝের আয়তন (ফ্লোর এরিয়া) ২ লক্ষ বর্গ মিটারের বেশি। ৬টি নতুন মণ্ডপের (প্রতিটির আয়তন ৮০০ হতে ১২০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত) নির্মাণ-কার্য ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। আধুনিকতম সরঞ্জাম দ্বারা সুসজ্জিত এই মণ্ডপগুলিতে আছে যন্ত্রীকৃত 'সিলিং' ও আলোকব্যবস্থার দূর নিয়ন্ত্রণ। নতুন সাউন্ড স্টুডিওতে 'রেকর্ড' করার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। 'প্রসেস' করার নতুন শপ্‌টিতে এক কোটি মিটারের ফিল্ম 'প্রিন্ট' করা যায়।

'মস্‌ফিল্ম' স্টুডিওতে সাড়ে তিন হাজার লোক কাজ করে। তন্মধ্যে ৬০ জন ফিল্ম ডিরেক্টর ও প্রযোজক। একটি নতুন বৃহৎ ইমারতের মধ্যে ৩০০ কামরা আছে। ইনডোর ও আউটডোর স্যুটিং-এর আগে উদ্যোগ আয়োজনের কাজকর্মের জন্য এই কামরাগুলি। পরিচালক, চিত্রনাট্য-লেখক, সেট্-ডিজাইনার প্রভৃতি কর্মীদের জন্য আরামদায়ক অফিস, ড্রয়িংরুম, মহড়ার হল, লাইব্রেরী ইত্যাদির সুব্যবস্থা আছে। সাধারণ ছায়াছবি, বড় পর্দার ছবি, প্যানোরামা ফিল্ম ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্য ৯০০ আসন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ হলও মস্-ফিল্ম স্টুডিওতে রয়েছে।

নায়রোবির মাগাদি সরোবরের ফ্লেমিংগো পাখীরা মরণোন্মুখ। সরোবরের জলের সোডা পাখীদের পায়ে জমা হয়ে অচল করে ফেলেছে। এই সোডার 'মল্' প্রায় এক-পোয়া ভারী। খাদ্য সংগ্রহের জন্য এদের আর ওড়বার উপায় নেই। মাগাদি সরোবরের প্রায় তিন লক্ষ ফ্লেমিংগো এইভাবে মানুষের [illegible] [illegible] [illegible]।

।। পুরাতনের বদলে নতুন হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুস ।।

আগামী ২০ বছরের মধ্যেই শল্য-চিকিৎসকরা মানুষের পুরনো বা রোগ-গ্রস্ত হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, মূত্রাশয়, কান ও চোখের বদলে নতুন ঐসব প্রত্যঙ্গ বসিয়ে দিতে পারবেন। সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই কৃত্রিম হৃদ্‌পিণ্ড, কৃত্রিম ফুসফুস ও কৃত্রিম মূত্রাশয় তৈরি করার কাজে সফল হয়েছেন।

সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম চোখ ও কান তৈরি করেছেন, সেগুলির কাজও খুব সন্তোষজনক হয়েছে। সম্প্রতি সোবিয়েত দেশের ও অন্য কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা 'ইলেকট্রোনিক চোখ' তৈরি করার কাজে অনেক দূর এগিয়েছেন। এই ইলেকট্রোনিক চোখ, এমন কি, জন্মান্ধকেও চক্ষুষ্মান করে তুলবে। বিজ্ঞানীরা চোখের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নার্ভ-তন্ত্রের যে মডেল তৈরি করেছেন, পরীক্ষামূলকভাবে সেই কৃত্রিম নেত্র-নার্ভতন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। ফিলাতফ ক্লিনিকের গবেষক-চিকিৎসকরা একটি কুকুরের নেত্রগোলক সহ সমস্ত দৃষ্টি-সহায়ক নার্ভ অপসারিত করে সেখানে এই কৃত্রিম নেত্র-নার্ভতন্ত্র বসিয়ে দেবার কাজে সফল হয়েছেন এবং ঐ পর্যবেক্ষণাধীন কুকুরটি এখন স্বাভাবিক রকমই দেখতে পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শল্যবিদ দেমিখফ আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে, একটি কুকুরের দেহে মুণ্ড যোগ করেন (একটি স্বাভাবিক মুণ্ড ও অন্যটি অপর একটি কুকুরের কর্তিত মুণ্ড) এবং দুটি মুণ্ডই স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করে, আওয়াজ করে ডাকে এবং দুটিরই মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে চলে। দেমিখফ আরেকটি কুকুরের দেহ থেকে তার মূল হৃদ্‌পিণ্ডটি কেটে বাদ দিয়ে সেখানে অপর একটি কুকুরের হৃদ্‌পিণ্ড বসিয়ে দেবার কাজেও সাফল্যলাভ করেছেন। শল্যবিদ দেমিখফের এই সাফল্যগুলি মানুষের ক্ষেত্রে আরও বড়ো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

দেশে বিদেশে

॥ মহেন্দ্রের আক্রোশ ॥

গণ-বিক্ষোভে বিপর্যস্ত নেপালের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এখন প্রকাশ্যেই ভারত-বিরোধিতা আরম্ভ করেছে। ব্যক্তিগত জেদ ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা রাজা মহেন্দ্রকে এখন এমনই বেপরোয়া করে তুলেছে যে জনতার দাবীর কাছে নতি-স্বীকার তাঁর কাছে আর কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই দেশবাসীর বিদ্রোহ যতই প্রবল হয়ে উঠছে ততই নিষ্ঠুর হচ্ছে রাজা মহেন্দ্রের মনোভাব ও আচরণ। নেপালের অধিকাংশ নেতাই কারারুদ্ধ, কয়েকজন মাত্র ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী। তাই রাজা মহেন্দ্রের আক্রোশ ফেটে পড়েছে ভারতের বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ ভারত যদি আশ্রিত নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে ভেট পাঠাতেন তাঁর কাছে তাহলে এমন ঘন ঘন অভ্যুত্থান ও অসন্তোষ কিছুতেই সম্ভব হ'ত না নেপালে। রাজা মহেন্দ্রের ভাষায় ভারত হয়েছে এখন পলাতক নেপালী বিদ্রোহীদের স্বর্গরাজ্য ও তাদের কার্যকলাপের প্রধান সহায়ক। তাই এ অবস্থা যদি চলতেই থাকে তবে রাজা মহেন্দ্রের পক্ষে ভারতের সঙ্গে নেপালের ঐতিহাসিক মৈত্রীবন্ধন অটুট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আশ্রিত নেপালী নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে ভারতের মনোভাব বহুদিন পূর্বেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যে যুক্তিতে ১৯৫১ সালে ভারত আশ্রয় দিয়েছিল নেপালের পরলোকগত রাজা ত্রিভুবন ও তৎপুত্র বর্তমান রাজা মহেন্দ্রকে, বা আজ আশ্রয় দিয়েছেন তিব্বতের দলাই লামাকে, সেই একই যুক্তিতে আজ ভারত আশ্রয় দিয়েছে শ্রীসুবর্ণ সমশের, শ্রীভরত সমশের প্রমুখ নেপালী নেতৃবৃন্দকে। সে যুক্তি হ'ল মানবতার যুক্তি ও রাজনৈতিক কারণে আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দানের অবশ্য পালনীয় আন্তর্জাতিক আইনের যুক্তি। আজ যদি ভারত শ্রীসুবর্ণ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেয় তবে তার সে নির্দেশ শুধু মানবতা-বিরোধীই হবে না, আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনের অপরাধেও অপরাধী হবে ভারত।

নেপালের মৈত্রী সম্পর্কেও ভারতের মনোভাব এখনই স্পষ্ট হওয়া উচিত। নেপালের মৈত্রী নিশ্চয়ই ভারতের কাম্য, কিন্তু সেটা নেপালাধীশের সর্তাধীন নয়। ভারত অনেক বড় দেশ এবং ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতের সহযোগিতার উপরেই নেপালের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সুতরাং সর্ত আরোপের জোর যদি কারও থাকে তবে তা ভারতের আছে, নেপালের নয়। রাজা মহেন্দ্রও মুখে যাই বলুন, তিব্বতের দলাই লামার পরিণতি থেকে এটুকু অন্ততঃ শিক্ষালাভ করেছেন তিনি যে, তাঁর অস্তিত্বের শেষ আশ্রয় ভারত, চীন নয়। কিন্তু আজ যে এভাবে তিনি প্রকাশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের সাহস পেলেন সেজন্য দায়ী শুধু ভারতের নীতি ও কর্ম-পন্থার দুর্বলতা। সুতরাং এ ব্যাপারে ভারতের মনোভাব দৃঢ় হলেই দেখা যাবে, নেপাল রাজেরও নতি-স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর থাকবে না।

॥ কেরল প্রসঙ্গ ॥

কেরলের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলকে শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতেই হ'ল। অনেকদিন ধরেই এ দাবী কংগ্রেস পক্ষ থেকে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পাকে-চক্রে এমনই অবস্থার সৃষ্টি করা হ'ল যার ফলে সম্মান বজায় রেখে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষে মন্ত্রিসভায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। অনেকদিন আগেই প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল, হয়ত দুর্বল নেতৃত্বের জন্যে তাদের পক্ষে সেটা এতদিন সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনার মধ্যদিয়ে শ্রীনেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারতের শাসকদল কংগ্রেসের যে মনোভাব আর একবার প্রকাশিত হল তা নিতান্তই অমর্যাদাকর। ইতিপূর্বে উড়িষ্যাতেও কংগ্রেস এক প্রয়োজনের মুহূর্তে গণতন্ত্র পরিষদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই গণতন্ত্র পরিষদকে পথে বসাতে কংগ্রেসের দ্বিধাবোধ হয়নি। আজ কেরলেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হ'ল।

ভবিষ্যতে আবার হয়ত কংগ্রেসকে নিজ প্রয়োজনে কেরল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে মিত্র দলের সন্ধান করতে হবে। কিন্তু উড়িষ্যা ও কেরলে কংগ্রেসের দুর্দিনের বন্ধুদের শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করে সেদিন যদি কোন দল এগিয়ে না আসে তবে সেটা কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হলেও বোধহয় বিস্ময়কর হবে না। আর তার ফলে যদি বিভিন্ন রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তবে তার জন্যে বৃহত্তম ও প্রবীণতম দল হিসাবে কংগ্রেসকেই দায়ী হতে হবে সব চেয়ে বেশী।

॥ ইয়েমেন ॥

আর একটি আরব রাজ্যে রাজতন্ত্রের অবসান হ'ল। নতুন ইমাম পরলোকগত পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসার সাত দিনের মধ্যেই ইয়েমেনে অতর্কিতে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেই অভ্যুত্থানকারীদের আক্রমণে সদ্যক্ষমতাসীন ইমামের মৃত্যু হয়। ইমামের প্রধান দেহরক্ষী কর্ণেল সালাল এখন ইয়েমেনের ভাগ্যনিয়ন্তা।

আরব রাজ্যগুলির মধ্যে একে একে মিশর, ইরাক, ইয়েমেনে যেভাবে রাজতন্ত্রের অবসান হচ্ছে তাতে জর্ডন, সৌদী আরব প্রভৃতি অবশিষ্ট রাজতন্ত্রগুলির পক্ষে আতঙ্কিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক তাই ইয়েমেনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সৌদী আরব ও জর্ডনের ফৌজী হানার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিহত ইমামের পিতৃব্যের নেতৃত্বে সমবেত ইয়েমেনের রাজানুগত সৈন্যবাহিনী। অপর পক্ষে ইয়েমেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন রাষ্ট্রপতি নাসের। সুতরাং

ইয়েমেনে রাজতন্ত্রের অকস্মাৎ অবসান ঘটলেও সদ্য-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র এখনও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নয়।

(লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে, আরবে অবস্থিত এই রাজ্যটির আয়তন ৭৫ হাজার বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। আরবের সবচেয়ে উর্বর অংশে অবস্থিত এই দেশটি থেকে কফি, গম, চামড়া ও মনাক্কা বিদেশে চালান যায়। ১৯৫৫ সালে ইয়েমেনের খনিজ তেল উত্তোলনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এক বে-সরকারী মার্কিন কোম্পানীকে।)

॥ আলজিরিয়া ॥

আলজিরিয়ার পূর্ণ রাষ্ট্রমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রথম জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আলজিরিয়ায় যে আইনসভা গঠিত হয়েছে, আলজিরিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম নেতা ফেরহাত আব্বাস তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আর বেনবেল্লা হয়েছেন আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান আইনসভাই আল-জিরিয়ার সংবিধান পরিষদের দায়িত্ব পালন করবে। এক বছরের মধ্যে আলজিরিয়ার নতুন সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হবে এবং সেই সংবিধানের ভিত্তিতে আবার সাধারণ নির্বাচন হবে আলজিরিয়ায়। ইতিমধ্যে স্বস্তি পরিষদের সুপারিশক্রমে আলজিরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরূপেও স্বীকৃতিলাভ করেছে। আলজিরিয়াকে নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে মোট রাষ্ট্রসদস্যের সংখ্যা হল ১০৯।

॥ উগান্ডা ॥

উগান্ডা স্বাধীন হ'ল। উগান্ডাকে নিয়ে আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা হ'ল ৩৩। ১৮৯৪ সাল থেকে উগান্ডা ছিল বৃটেনের রক্ষণাধীন। বৃটিশ সরকারের সম্মতিক্রমেই ৯ই অক্টোবর সে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করল।

৯৩,৯৮১ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট উগান্ডার বর্তমান জনসংখ্যা ৬৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৬২৮। এদের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার। পূর্ব আফ্রিকার এই দেশটির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

বুগান্ডা এবং পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরপ্রদেশ এই চারটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে উগান্ডা। কিন্তু অঙ্গরাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা সমরূপ নয়।

বুগান্ডা ও পশ্চিম প্রদেশের চারটি অংশের তিনটি (বুনিয়রো, এনকোলা ও তোরা) দেশীয় রাজাদের শাসনাধীন। অন্যান্য এলাকাগুলিও উপজাতীয় প্রধান ও উপ-প্রধানদের পরোক্ষ শাসনাধীন। উগান্ডার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য কিছু কম নয়। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কফি রপ্তানিতে তার স্থান প্রথম। তুলা উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উগান্ডার প্রধান সমস্যা উপজাতীয় বিরোধ। উগান্ডার এক-পঞ্চমাংশ স্থানের অধিবাসী বুগান্ডা উপজাতীয়রা নিজেদের অন্যান্য উপজাতীয়দের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ও উন্নত বলে দাবী করে। এ কারণে তাদের সঙ্গে অন্যান্য খণ্ড জাতিদের বিরোধ লেগেই আছে সেখানে, তাই স্বাধীনতা-অর্জনের পরেও যদি উগান্ডায় মাঝে মাঝে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় তবে সেটা নতুন কোন সমস্যা বলে বিবেচিত হবে না। শুধু উগান্ডার বর্তমান শাসক দল 'উগান্ডা পীপলস কংগ্রেস'-এর উদারতা ও তার ৪০ বছর বয়স্ক নেতা প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ মিল্টন ওবোটের বিচক্ষণ পরি-চালনার দ্বারাই উগান্ডার সেই অবাঞ্ছিত সমস্যা প্রতিরোধ হওয়া সম্ভব।

॥ ফ্রান্সের শাসন সংকট ॥

অনেকদিন বাদে আবার ফ্রান্সে শাসন-সংকট জটিল হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর ইচ্ছানু-সারে জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর গত চার বছর ধরে তিনি ছিলেন ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা, এক নায়ক। তাঁরই দাবীতে ফ্রান্সের যুদ্ধোত্তর সংবিধান চতুর্থ রিপাবলিক বাতিল হয়ে পঞ্চম রিপাবলিক গৃহীত হয়। তাঁরই ব্যবস্থাক্রমে আল-জিরিয়া বহু বাধা অতিক্রম করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে ও সমগ্র আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলি মুক্তিলাভ করে সতেরটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। একমাত্র ফরাসী সোমালীল্যান্ড ছাড়া আর কোন উপনিবেশ আজ ফ্রান্সের আফ্রিকায় অবশিষ্ট নেই। গত চার বছরে আমলে পরিবর্তন ঘটে গেছে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে। কিন্তু তাতে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধিই পায়। সাম্রাজ্য হারিয়েও দ্য গলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ফ্রান্সের বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু দ্য গলের উচ্চাশা অন্তহীন। তিনি চান কমিউনিষ্ট শাসন-বহির্ভূত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে এক বিরাট সংযুক্ত রাষ্ট্র-সংস্থা গড়ে তুলতে, জার্মানী ও ফ্রান্স হবে যার ভাগ্যনিয়ন্তা। সেই বিরাট রাষ্ট্র-সংস্থা শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমীহ করে চলবে তাকে। জার্মানীর সহযোগে পশ্চিম ইউরোপের লুপ্ত গৌরব আবার তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান সমগ্র পৃথিবীতে। তাই ইউরোপের কমন মার্কেট পরিকল্পনা তাঁর কাছে নিছক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয়, তাকে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রথম পদক্ষেপ বলেই মনে করেন তিনি। এ ব্যাপারে মার্কিন-ঘেঁষা বৃটেনকে ভাগীদার করতে নারাজ তিনি তাই কমন মার্কেটে বৃটেনের যোগদানের ব্যাপারে এত আপত্তি তাঁর।

ইউরোপের অন্যতম ভাগ্যনিয়ন্তা হ'তে হলে আগে চাই ফ্রান্সের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। তাই পঞ্চম রিপাবলিক প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে তিনি যথেষ্ট বলে মনে করতে পারছেন না। ফ্রান্সের পার্লামেন্টকে তিনি চান প্রেসিডেন্টের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। এ কারণে ২৮শে অক্টোবর ফ্রান্সে এক গণ-ভোটের আহবান জানিয়েছেন দ্য গল। সে গণ-ভোটের প্রস্তাব—জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

কিন্তু ফ্রান্সের দ্য গলবিরোধী রাজ-নৈতিক দলগুলির পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ জেনারেল দ্যগলকে আরও শক্তিশালী করার ভরসা তাঁরা পান না। তাই দ্যগলের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়েছেন তাঁরা দ্যগল-অনুগত পঁপিদু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে। পঁপিদু সরকার পদত্যাগ করেছেন তারপর। কিন্তু দ্যগল তাতে বিচলিত হননি। তিনি ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছেন। আর দেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, ২৮শে অক্টোবরের গণ-ভোটে তাঁর প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয় তবে আবার তিনি রাজ-নীতিক অজ্ঞাতবাসে চলে যাবেন।

সুতরাং ফ্রান্সের রাজনীতিতে এক বিরাট সংকট ঘনিয়ে উঠেছে। হয় ফ্রান্সকে চলতে হবে দ্যগলকে বাদ দিয়ে, আর নয়ত তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ফ্রান্সের একনায়ক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। দুটি বিকল্পই ফ্রান্সের পক্ষে এই মুহূর্তে অবাঞ্ছিত।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৭শে সেপ্টেম্বর—১০ই আশ্বিন : হিমাবাহের ফলে স্পিতি উপত্যকায় (পাঞ্জাব) ৮ ব্যক্তি নিহত ও আড়াই হাজার লোক অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ।

২৮শে সেপ্টেম্বর—১১ই আশ্বিন : 'অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণ অবৈধ'—সুপ্রীম কোর্টের রায় : মহীশূর রাজ্য সরকারের নির্দেশ নাকচ।

আগরপাড়ায় বিক্ষোভকারী পাটকল শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ : ৬০ জন আহত : ১৬ জন গ্রেপ্তার।

২৯শে সেপ্টেম্বর—১২ই আশ্বিন : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন ও বাড়ী ভাড়া ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ—দেশাই ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ ঘোষণা।

নেফা সীমান্তে পুনরায় চীন-ভারত গুলী বিনিময়।

৩০শে সেপ্টেম্বর—১৩ই আশ্বিন : ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর আরও অধিক সংখ্যায় পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশের সংবাদ।

বীরগঞ্জ (নেপাল) হইতে নেপালী-দের রক্সৌলে (বিহার) আসিয়া গুলী-বর্ষণ—হোটেলের মধ্যে পাঁচজন আহত।

১লা অক্টোবর—১৪ই আশ্বিন : 'নেফার ঘটনাবলী সত্ত্বেও চীনারা ভদ্র-আচরণ করিলে আলোচনা (সীমান্ত প্রশ্নে) চালাইতে সর্বদাই প্রস্তুত'—বিদেশ সফরান্তে নয়াদিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

সর্বভারতীয় শিক্ষা নীতির ভিত্তিতে সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন'—ভাবগত ঐক্য কমিটির সুপারিশ প্রকাশ।

২রা অক্টোবর—১৫ই আশ্বিন : 'ভারত শান্তিকামী রাষ্ট্র হইলেও নিজ ভূখণ্ডে চীনের হামলা কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না'—মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে (নয়াদিল্লী) প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) ঘোষণা।

সমগ্র দেশে গান্ধীজীর ৯৩তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত : সর্বত্র জাতীয় সংহতি সপ্তাহের উদ্বোধন।

৩রা অক্টোবর—১৬ই আশ্বিন : কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌর-সভাগুলির নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা—পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্তৃক বর্তমান আইন সংশোধন করার সিদ্ধান্ত।

৪ঠা অক্টোবর—১৭ই আশ্বিন : পাকি-স্তানী ফৌজ কর্তৃক তিনজন ভারতীয় ধীবর অপহৃত—হাসনাবাদ থানার (২৪-পরগণা) হিঙ্গলগঞ্জের নিকট ঘটনা—কুষ্টিয়া সীমান্তে পাক্ সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি।

'নেফার অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে' দিল্লীতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৫ই অক্টোবর—১৮ই আশ্বিন : 'ইংরাজী ভাষা বিতাড়ন ('ইংরাজী হটাও') আন্দোলন চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক'—দিল্লীর সভায় শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

ইস্টার্ণ কমান্ডের অধীনে নূতন সৈন্যদল গঠন এবং নেফাসহ সীমান্তের একাংশ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ—ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে পাকি-স্তানী উপদ্রবের জন্য নূতন ব্যবস্থা।

কলিকাতার বাজারে ৩০টি স্টলে ন্যায্য মূল্যের মাছের দোকান চালু।

৬ই অক্টোবর—১৯শে আশ্বিন : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সফরকারী মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ডাঃ লোপেজ মার্টিওমের বৈঠক।

মাদ্রাজে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ডাঃ পি সুব্বারায়ানের (৭৩) জীবনাবসান।

৭ই অক্টোবর—২০শে আশ্বিন : কেরলে কোয়ালিশন (কংগ্রেস—পি-এস-পি) মন্ত্রিসভা হইতে দলীয় নির্দেশে পি-এস-পি সদস্যদের পদত্যাগ।

'আগে চীনা হানাদারদের হটাইতে হইবে, তবেই আলোচনা'—চীনের নোটের উত্তরে ভারতের সাফ জবাব।

॥ বাইরে ॥

২৭শে সেপ্টেম্বর—১০ই আশ্বিন : ইয়েমেনে বিদ্রোহী সৈন্যগণ কর্তৃক শাসন ক্ষমতা দখল—ইমাম গদীচ্যুত ও নিখোঁজ : মন্ত্রিবর্গ গ্রেপ্তার : সমগ্র রাজ্যে জরুরী ঘোষণা—ইমামকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচার।

২৮শে সেপ্টেম্বর—১১ই আশ্বিন : 'ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিশ্বশান্তির বিঘ্নস্বরূপ'—ভারত ও নাইজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের (শ্রীনেহরু ও স্যার বালেওয়া) যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত ভারতীয় শান্তি মিশন নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারীর বৈঠক—রাজাজী কর্তৃক আণবিক পরীক্ষা বন্ধের দাবী জ্ঞাপন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—১২ই আশ্বিন : পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের দাবীতে ভারতীয় শান্তির দূত শ্রীইউ এন ঢেবর ও শ্রীজি রামচন্দ্রনের মস্কো উপস্থিতি।

৩০শে সেপ্টেম্বর—১৩ই আশ্বিন : 'দ্বিতীয় বান্দুং সম্মেলন বর্তমানে স্থগিত রাখা উচিত'—কায়রোয় শ্রীনেহরু (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) বিবৃতি—সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসেরের সহিত বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

মিসিসিপি (আমেরিকা) গভর্ণরের (রস বার্ণেট) উগ্র বর্ণ-বিদ্বেষ—নিগ্রো ছাত্র ভর্তি (বিশ্ববিদ্যালয়ে) সম্পর্কে ফেডারেল কোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য—আদেশ বলবৎ করার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক সৈন্য প্রেরণ।

১লা অক্টোবর—১৪ই আশ্বিন : ইন্দোনেশিয়াকে হস্তান্তর সাপেক্ষে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ কর্তৃক পশ্চিম ইরিয়ানের শাসনভার গ্রহণ—দীর্ঘকালব্যাপী ওলন্দাজ শাসনের অবসান।

২রা অক্টোবর—১৫ই আশ্বিন : কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী সরকার কর্তৃক দক্ষিণ কাসাই অধিকৃত—মন্ত্রিবর্গসহ স্বয়ংসিদ্ধ 'রাজা' আলবার্ট কালোঞ্জি স্বগৃহে বন্দী—কঙ্গোলী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জের।

৩রা অক্টোবর—১৬ই আশ্বিন : মহাকাশ পথে মার্কিন নভোযানের (সিগ্মা—৭) সফল যাত্রা— ছয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণান্তে মহাকাশচারী (তৃতীয় মার্কিন মহাকাশচারী) শ্রীওয়াল্টার শিরোর মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন।

সারা বৃটেনে ২৪ ঘন্টাব্যাপী রেল ধর্মঘট।

৪ঠা অক্টোবর—১৭ই আশ্বিন : করাচীতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—অন্যূন একশতজন আহত—করাচী হইতে বহিষ্কৃত ১২ জন ছাত্রকে ফিরাইয়া আসার দাবীতে বিক্ষোভের জের।

পাকিস্তান হইতে অমুশ্লিম সংখ্যা-লঘুদের ব্যাপকভাবে বিতাড়ন—রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীবি এন্ চক্রবর্তীর অভিযোগ।

৫ই অক্টোবর—১৮ই আশ্বিন : নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের সহিত ভারতীয় শান্তি মিশন নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারীর বৈঠক—পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ-করণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।

৬ই অক্টোবর—১৯শে আশ্বিন : নেপালের উপর বৈদেশিক আক্রমণের ক্ষেত্রে চীন সাহায্যদানে প্রস্তুত—পিকিং-এ চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ই'র ঘোষণা।

সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ভারতের সহিত আলোচনায় চীনের সম্মতি।

৭ই অক্টোবর—২০শে আশ্বিন : 'ইয়োরোপীয় নীতির ফলে আন্তর্জাতিক শিল্প-পণ্য বাণিজ্য অনিশ্চিত অবস্থা [illegible]'—রাষ্ট্রসঙ্ঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থার রিপোর্ট।

॥ প্রসাধনের কথা ॥

শুধু বেঁচে থাকার জন্যে কাঁকর-মেশানো হলেও ডাল-চালকে যেমন বর্জন করতে পারি না, তেমনি সাংসারিক বাজেটে কিছু প্রসাধনের বরাদ্দ না করেও আমাদের উপায় নেই। অবশ্য আমাদের পরিধেয় বস্তুগুলোও আমাদের সেই প্রসাধনেরই অঙ্গ বিশেষ। প্রসাধনদ্রব্যকে যতই কেন না বিলাসদ্রব্য বলে নাক কুঁচকানো হোক, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ আজকের দিনের মানুষ প্রসাধন ছাড়া বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা খুঁজেই পাবে না। তাই বলে সরকারী আমদানী নীতির ফলে দামী প্রসাধন দ্রব্যের আমদানী সংকোচনের বিরুদ্ধবাদী আমি নই। কারণ জাতীয় শিল্পের সমৃদ্ধ হোক এ কে না চাইবে, তবে ইদানীং নাগরিক মানুষদের সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনের ওপর গোঁড়া কিছু সমালোচকদের যে অকারণ কটাক্ষ হয়ে থাকে, তার বিরোধিতা করছি আমি।

আশংকা হচ্ছে, আমার কথা শেষ করবার আগেই কেউ কেউ নিশ্চয় ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন যে, প্রসাধন-দ্রব্যের নির্মাতা আমি একজন কারবারী এবং প্রসাধনের হয়ে আমার এই গুণগান নিছক আর্থিক স্বার্থপ্রসূত।

বিশ্বাস করুন, নেহাতই ছাপোষা একজন কেরানী আমি, সাকুল্যে বেতন তিনশো টাকা। তবু সেই আমিও যখন পুজোর শারদ প্রভাতে একটি সাধারণ অথচ সুন্দর পোষাকে আমার মেয়েটিকে সেজে উঠতে দেখি, তখন কি ভালই না লাগে! সামান্য একটি টিপ ছোট্ট কপালে, মাথায় ঝুঁটি করে বাঁধা চুলে একটি গোলাপী ফিতে আর চোখে কাজল পরা সামান্য এক কেরানীর সামান্য একটি মেয়েকে দেখে আমার মনে হয় এমনিভাবে আমার পরিশ্রমক্লান্ত হতাশ দিনের শেষে বাড়ী ফিরে যদি ওকে প্রতিদিন আমার সামনে দেখতে পেতাম!

নতুন বিবাহিত জীবনে একটা ঠাট্টা খুবই প্রচলিত, নববধূর কেশ পরিচর্যা দেখার জন্যে নববিবাহিতের আকুলতা নিয়ে। মাঝে মাঝে ভাবি যে পুরুষ তার প্রিয়তমাকে সাধারণ থেকে প্রসাধনে [illegible] হতে না দেখলে, সে

সাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

জীবনের এক মধুরতম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হল। যে কোন প্রভাতে একরাশ কাল চুল পিঠের ওপর ঝোলান আর কপালে সিঁদুর টিপ দেওয়া সামান্য প্রসাধনে শ্রীমতীকে দেখে মনটা ব্যাকুল হয়নি কোন হতভাগ্য পুরুষের?

পৃথিবীর বিস্ময় বিশ্বপ্রকৃতি, আর সেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ। প্রকৃতির প্রসাধন ঋতুতে ঋতুতে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে। প্রকৃতিকে তার প্রসাধনের উপকরণের জন্যে অবশ্য হয়-লালকায় ছুটতে হয় না বা ম্যাক্স ফ্যাক্টরের স্বারস্থ হতে হয় না। প্রকৃতি তার অফুরন্ত প্রসাধনের বিভিন্নতায় কখনও উজ্জ্বল, কখনও বিষন্ন, কখনও উদার। মানুষের প্রকৃতিও বিচিত্র, তাই প্রসাধনও তাই তার বিভিন্ন। মানুষের বেলা এই সংগ্রহের কুশলতাই হল তার প্রসাধনচর্চায় নিপুণতা।

প্রকৃতিতে যা সব সময়ই সুসমঞ্জস, মানুষের প্রসাধনে তা মাত্রাভেদে মানুষের প্রসাধনে তা মাত্রা ভেঙে অসামঞ্জস্যের জন্যেই পীড়াদায়ক। প্রসাধনের বিরুদ্ধবাদীদের এই একটা ক্ষেত্রে আমায় সমর্থন করতেই হবে।

এবং আমায় গোড়ার বক্তব্যের বিপরীত কথাই বলতে হবে, হালের মানুষেরা প্রসাধন জিনিসটার আসল উদ্দেশ্য না বুঝে প্রসাধনের নামে অখ্যাতিই চাপাচ্ছেন। প্রসাধন অসুন্দরকে সুন্দর করে, কিন্তু এই প্রসাধনই অনেক ক্ষেত্রে সাধারণকে কুৎসিত করছে। শহরের ক্ষতবিক্ষত রাস্তাঘাট, নোংরা গর্তগুলো যেমন চক্ষু-পীড়াদায়ক, তেমনি এই সমস্ত প্রসাধিত মানবদেহগুলো দেখলে মনে হয় মানুষ তার মানবতাই হারাচ্ছে এই অতি প্রসাধনের উৎকেন্দ্রিকতায়।

সোভিয়েট দেশে নাকি প্রসাধনের রেওয়াজ নেই, মেয়েরা কেউ প্রসাধিত মাখেন না, তাই বলে যে সোভিয়েট দেশে মানব সভ্যতার একটা গরিমাময় এক্স-পেরিমেণ্ট চলছে, সেখানে প্রসাধন ছাড়া মানুষ প্রফুল্ল মনে বেঁচে আছে, এ আমি বিশ্বাস করতে নারাজ। তবে প্রসাধনের আতিশয্য বর্জন করে সুরুচিসম্মত প্রসাধনে নিশ্চয় সোভিয়েটের মানুষেরা আনন্দ পান, এটাতে প্রসাধন ব্যাপারটারই গৌরব বাড়ে।

আপনার প্রসাধন-চর্চা যদি আপনার প্রতিবেশী বা পথচলতি মানুষের মুখ থেকে স্ফুট বা অস্ফুট, যেভাবেই হোক "বাঃ" এই সামান্য কথাটি টেনে বার করতে না পারে, তবে বৃথাই আপনার প্রসাধন-চর্চা। আপনার প্রসাধনের টেবিলে ম্যাক্স ফ্যাক্টর থেকে শুরু করে ল্যাক্টোকালামাইন স্নো, ক্রীম, পমেড সব কিছুর ভিড় থাকলেও, তার মূল্য কিছুই নেই।

কাঙাল দেশের মানুষ আমরা; রাস্তাঘাটে আমাদের নোংরা আবর্জনা; পেটে অখাদ্য, তাই সুন্দর পরিধেয়, সুরুচিময় সাজসজ্জা আমাদের কাছে বিলাস বলেই অভিহিত, কিন্তু যদি কেউ ভালভাবে বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় একটু প্রফুল্ল মন নিয়ে, তাহলে জৈবিক অস্তিত্বের প্রয়োজন মেটানোর পরই, তাকে নিজের দেহের প্রতি নজর দিতেই হয়। আমার ত মনে হয় নারসিসাসের মত নিজের রূপে আমরা যদি না নিজে মুগ্ধ হতে পারি, তাহলে আমাদের মুগ্ধ সেই আনন্দের স্পর্শে, প্রসাধিত আকাশের বুকে বিচিত্র রংয়ের খেলার মত এ পৃথিবী রঙীন হয়ে উঠবে কি করে?

তবে প্রসাধন-পর্বে বসবার আগে এটাই মনে রাখা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, ফ্যাশান মানে প্রসাধন নয়। প্রচুর রঙ দিয়ে রঙীন করলেই যেমন ভালো টেকনিকলার ছবি হয় না, প্রসাধন-চর্চাতেই তেমনি একথা সত্য। নিজের দেহকে সাজাতে বসে পরের রুচিবোধ সম্বন্ধে সজাগ থাকাটাই প্রসাধনের আসল রহস্য। এ রহস্য মেয়েরা কিছুটা জানে বলেই, তারাই প্রসাধনের সেরা শিল্পী এবং কারিগরেরও।

সমকালীন সাহিত্য

॥ উৎসবের অবসানে ॥

অভয়ংকর

এই স্তম্ভের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের আমার বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাই। আর এক বছরের উৎসবমুখরিত পরিবেশের অবসান ঘটল, নতুন উৎসাহে, নতুন প্রেরণায় কর্মজীবনের মধ্যে আবার মানুষ আত্মহারা হয়ে যাবে, সেখানে অবসর নেই, আনন্দ নেই, নিশ্ছিদ্র নিরন্ধ্র ভরাট-জীবন-সংগ্রাম। তাই প্রয়োজন উৎসবের, প্রয়োজন হয় অবসরের।

উৎসবের আকৃতি যুগে যুগে পালটায়। আজ যাঁরা পঞ্চাশোর্ধে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে দেশ-বিভাগের পূর্বে বিশ্বকর্মার মূর্তিপূজা তাঁরা দেখেননি, দেবী দুর্গার পূজা প্রাঙ্গণে ধুনুচি-নৃত্য নামক বস্তুটিও পশ্চিম বাংলায় চালু ছিল না। জিনের প্যান্ট পরে দুহাতে দুটি ধুনুচি নিয়ে ভক্ত যখন আত্মহারা হয়ে নৃত্য করেন তখন তার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। দেবী বা দর্শক কে আনন্দলাভ করেন কে জানে? তারপর আছে অগ্নি-উদ্‌গার, সিটিবাজি এবং রক এন রোল নৃত্যসহ তালপাতার টুপি মাথায় দিয়ে মুখে কালিঝুলি মেখে তাসাবাদ্যভান্ড-সহকারে বিসর্জন-নৃত্য—এই বা কে আগে দেখেছে!

সেকালেও উদ্দামতা ছিল, কালিকা পুরাণে নাকি এই উদ্দামতার ব্যবস্থাদান করা আছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়—

"নদীর স্রোতে প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব; জল ও কর্দমক্রীড়া। সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গান হইত (অবশ্য সর্বত্র না) ইহা দুর্গোৎসবের অঙ্গ। কালিকা পুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইও না।"

রুষ্ট হওয়ার কারণ নেই, বিশেষতঃ পুরাণে যখন ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অশালীন আচরণ মানব-সমাজের সূচনায় যেমন শোভন ও সঙ্গত ছিল আজ মানব-সভ্যতার বিকাশের পরও কি সেই আচরণ অসঙ্গত বিবেচিত হবেনা।

সেকালের দুর্গোৎসবে অনেক জাঁক-জমক ছিল সন্দেহ নেই। জৌলুষ এবং আড়ম্বরে তা অতুলনীয়। সমসাময়িক কালের ব্রিটিশ লেখকদের বর্ণনায় তার অনেক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। রূপলাল মল্লিকের বাড়ির পূজার উৎসবে হ্যাচিসনের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। রূপলাল মল্লিক তৎকালীন রীতি অনুসারে কলকাতার তাবৎ ইংরেজকুলকে আমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য যথেষ্ট খানা-পিনা আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা রাখতেন। হ্যাচিসন লিখেছেন—"এই উৎসবের জন্য এই দেশে যাবতীয় আনন্দ বিতরণের ব্যবস্থা আছে, তা করা হয়েছে, শ্রেষ্ঠ গায়ক, নটী, বাজীকর এবং রঙ্গাভি-নেতাকে এই উপলক্ষ্যে নিয়োগ করা হত।" বাজীকরগণ তরবারি গলাধঃকরণ করে সাহেবদের তাজ্জব করতেন। হিন্দুস্থানী নাচগান তাঁরা তেমন উপভোগ করতে পারতেন না। চারদিনের পূজা বটে কিন্তু উৎসব চলত ন' দশদিন ধরে। সাহেবদের জন্য সর্বপ্রকার মদ্য ও খাদ্যের সুবন্দোবস্ত থাকত।

গৃহস্থবাড়িতেও আয়োজন কম নয়। প্রতি গ্রামে উৎসব ও আনন্দের সীমা থাকত না।

"দশমীতে উৎসব সমাপ্ত। সেদিন বিজয়া, সেদিন ব্রাহ্মণ ভোজন। গ্রাম ছোট হইলে গ্রামের সকল পুরুষই ভোজন করিত। অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন সে গ্রামেরই লোক। যাহারা পূজার কিছুমাত্র কাজ করিত, তাহাদের অধিকাংশই সে গ্রামের। তাহারা অবশ্যই নিমন্ত্রিত হইত। যাহারা অন্য গ্রামের তাহারাও আসিত। মুচি ও হাড়ি অতিশয় দরিদ্র ও অতিশয় অস্পৃশ্য। সেদিন তাহারাও নিমন্ত্রিত হইত। বিনা নিমন্ত্রণে খাইতে আসিত না। অন্ততঃ সেদিন তাহারা মানুষের মর্যাদা পাইত।"

দুর্গাপূজার সেইটিই বৈশিষ্ট্য। দুর্গাপূজায় সব মানুষই ভাই-ভাই, কারো মনে এতটুকু মালিন্য থাকবে না, এতটুকু বিদ্বেষ বা ঈর্ষা থাকবে না, এই ক'দিনের আনন্দ সকলকে যেন আত্মহারা করে রাখে।

"সকলেরই মুখ প্রসন্ন। দেখিলে মনে হইত সমুদয় গ্রাম যেন একটি পরিবার। তখন কেহ বুঝিত না সেদিন বিজয়া মিলন। তাহারা ভাবিত, সন্ধ্যার পর বিজয়া, দিবাভাগে নয়।"

সেদিন আর নেই। সে গ্রাম নেই, সেই ধনী সম্প্রদায় নেই, সেই বিদেশী শাসক অন্তর্হিত। মানুষের মনে সেই ভক্তিও নেই, আধ্যাত্মিক মনোভঙ্গি এই জড়বাদের যুগে ক্রমেই বিলুপ্ত, এখন যন্ত্রযুগে যা আছে তা জড়বাদ, সেখানে আড়ম্বর আছে, লাল শালুর ওপর শাদা তুলা দিয়ে 'অকালবোধন' ইত্যাদি চটকদার কথা আছে, কিন্তু হৃদয় নেই।

আগে যা ছিলো বারোইয়ারের বারোয়ারী এ যুগে তার নাম সার্বজনীন অকালবোধন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় হুতোম প্যাঁচার নক্সায় আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে লিখেছেন যে একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারো-ইয়ারি পূজা করেন। তখনকার কালের পাঁচ লক্ষ টাকা। এখনকার কালের খরচ এই তুলনায় অনেক কম। তার ওপর এবারকার প্রতিমার দর ভীষণ চড়া গিয়েছে। গরীবদুঃখীর কথা কে চিন্তা করে।

তখনকার দিনেও দিল্লীর ব্রোকেড, বেনারসের জরীর কাপড়, শাদা মসলিন, ভেলভেট। হীরা জহরত প্রভৃতি কেনা হত। দোকানগুলি সুন্দরভাবে সাজানো হত, তাতে যা জিনিসপত্র থাকত তা সর্বশ্রেণীর ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করত।

এ যুগেও আছে, পূজার ক'দিন এবং পূজার পূর্বে কয়েকদিন কলকাতা শহরের সমস্ত পথে পথে যে জনস্রোত দেখা গিয়েছে তার তুলনা নেই। একালের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তরা, বোনাস ইত্যাদির দৌলতে কিঞ্চিৎ বিত্তবান, তাছাড়া সেকালের মানুষের মত তেমন সঞ্চয় প্রবৃত্তি প্রবল নয়, তাই অল্পবিত্ত মানুষেরই ভিড় আমরা লক্ষ্য করেছি।

জীবনে যত আনন্দের অভাব ততই আমরা আনন্দানুসন্ধানে ছুটি, একালের বাঙালীর যৌথ-পরিবার ভেঙে গেছে, স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবার পরিকল্পনায় সৌজন্যে সীমিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাঁরা স্বচ্ছন্দচিত্তে ফুটপাথে বিচরণ করছেন, এই কি কম আনন্দ!

সেকালে পূজা উপলক্ষে গরীব কাঙালী বিদায়ের ব্যবস্থা ছিল। একালে

কাঙালী বিদায়ের কথা কেউ চিন্তা করে না। তারা আজ উৎসবে উপেক্ষিত।

এই সহরে যত অনাথ আতুরদের আশ্রম আছে, উৎসবের দিনে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো সার্বজনীন উৎসবের কর্তৃপক্ষ কি তাদের কথা স্মরণ করেন। অনেকে মুখ ম্লান করে বলেছেন, গত বছর ইলেকসনের মরশুম ছিল, পাড়ার দাদারা ভালো চাঁদা দিয়েছিলেন, এইবারে যাঁরা গাং পার হয়েছেন তাঁরা কৃপণদের কদর্তী প্রদর্শন করেছেন, তাই উৎসব তেমন জমেনি।

উৎসবের রঙতামাসার মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো, মাইকের রাক্ষসনিন্দিত কর্কশ চীৎকার, আর বিসর্জনের দিন তাসাসহযোগে মহরমের গোয়াঁরার ঢঙ-এ বাদ্যভাণ্ড এই এ-যুগের উৎসব।

আবার আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, এই উৎসবের আকৃতি পরিবর্তিত হবে। তখন হয়ত, কোনো প্রতিমার বালাই থাকবে না, বাদ্যভাণ্ড থাকবে না, মাইকও থাকবে না, অন্য কোনও ধরণের উৎকট আনন্দপ্রদায়িনী যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, দেবীর বদলে থাকবে কোনো তদানীন্তন বিখ্যাত বিমূর্তন শিল্পী অঙ্কিত এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পের উদ্ভট নমুনা। তবু আনন্দ থাকবে, উৎসব থাকবে, বিসর্জনও থাকবে। শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে সাহিত্যপত্রের শারদীয় সংখ্যাও নিশ্চয়ই থাকবে।

যে-পল্লীবাসী প্রত্যূষে বৈরাগীর কণ্ঠে—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

এই সঙ্গীত শুনে উদাস হয়ে যেতেন, তিনি রেডিয়ো মারফৎ আধুনিক রক এন' রোলের ঢঙে রচিত অন্য কোনো জাতের আগমনী বা বিজয়াগীতি শুনতে পাবেন।

সেদিনকার কোনও সংবাদপত্র ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকার সম্পাদকের মত বিলাপ করে লিখছেন:—

"এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্বার কর্মকার্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে, ইহার পূর্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্বক নৃত্য-গীত ইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর বৎসর ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর এই দুর্গোৎসবে নৃত্য-গীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্বে পাঁচগুণ ঘটা হইত এমত আমাদের স্মরণে আইসে।"

ঘটার পরিমাণ হয়ত ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, তবু আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশের মানুষ—"এত ভঙ্গ, বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা" হয়ে আনন্দমুখরিত হয়েই বিরাজমান থাকবে, আজ উৎসবান্তে সেই আমাদের কামনা।

নতুন বই

নিশিপদ্ম— (উপন্যাস)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো—কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আসরে একজন সর্বজনপ্রিয় লেখক, সর্ব-ভারতীয় লেখকদের মধ্যেও তিনি অন্যতম হিসাবে সমাদৃত। সমাজ বহির্ভূত এক রমণীর বেদনাভরা কাহিনী তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'নিশিপদ্ম'। নায়িকার মা একদা কুলত্যাগ করে শহরে এসে বারাঙ্গনা বৃত্তি গ্রহণ করে। নায়িকা আর তার বোন চম্পার জন্ম তার মার কুলটা-জীবনের মধ্যভাগে, তখন তার অর্থ ও সমৃদ্ধি হয়েছে। দুই বোন অভিনয়ে নামল, নজরে পড়ল এক সামন্ততান্ত্রিক লালপাহাড়ির রাজার এবং রাজকুমারের। রাজা সাহেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে চাঁপা একটা থিয়েটারে যোগ দেয় এবং সেখানকার নাচের মাষ্টারকে বিয়ে করে সে গৃহিনী হয়। নায়িকা প্রেমে পড়ল ঘোসবাবুর। মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে কাঞ্চনমালা তার মেয়েকে আপন কথা শোনায়, সে তখন মনে-প্রাণে বৈষ্ণবী। মুক্তামালার কিন্তু জন্ম-বৃত্তান্ত শুনে মনে ধিক্কার জাগে। মুক্তার মার মৃত্যুর পর তার জীবনেও নামল অভিশাপ, স্কুলে ঠাঁই হয় না, ঠাঁই হয় না সমাজে, সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ পায় না। অপরূপ লিপিকুশলতায় এই কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন এ যুগের অন্যতম মহৎ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অচেনা আকাশ (উপন্যাস)—নগেন দত্ত। শিক্ষা-ভারতী, ৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম চার টাকা।

"অচেনা আকাশ" লেখকের নবতম উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে একটি প্রেস এবং প্রেসের মালিক ধরণীবাবুকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। কর্মচারী হলেও কঙ্কার সঙ্গে ধরণীবাবুর সম্পর্ক ঠিক প্রভু-ভৃত্যের নয়, হৃদয়ের। তাদের এই মধুর সম্পর্কের পেছনে আছে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জেল খাটার ইতিহাস এবং প্রেস গড়ে তোলার কাজে কঙ্কার সহায়তা। কিন্তু প্রেসের অন্যতম সংকর্মী নটুর অর্থাভাবে তিলে তিলে অকালে মৃত্যু জীবনকে জানবার বোঝবার ও সুন্দরতর ভাবে বেঁচে থাকবার প্রেরণা জোগাল। কঙ্ক তাই দৃঢ়চিত্তে দ্বিধাহীন ভাবে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে ধরণীবাবুর মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল। অবশেষে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সংঘাতের কাহিনীকে বিকশিত করেছে তুচ্ছতা

ক্ষুদ্রতা কদর্যতা, এককথায় বর্তমান যুগ ও সমাজের বহুমুখিন বাস্তব চিত্রের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে ক্ষুদ্র কাহিনী-গুলিতে। স্বল্প কথায় ছোট ছোট চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। প্রেসের কার্যধারা এবং সেখানকার মানুষের জীবন বর্ণনায় বাস্তব ও সংবেদনশীল মনের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। রামগতির মেশিনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, নটুর অস্বচ্ছল জীবনযাত্রার কাহিনী এবং টাইমবাবুর মালিকতোষণ প্রভৃতি বর্ণনায় আছে সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। ঔপন্যাসিকরূপে লেখকের খ্যাতি খুব বেশি না হলেও পরবর্তী উপন্যাসের ক্ষেত্রে সার্থকতর রচনা আমরা আশা করতে পারি। কারণ লেখকের কল্পনা জগতের বিস্তার আছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ-পট সুন্দর এবং প্রশংসনীয়।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সমকালীন (দশম বর্ষ ।। আশ্বিন ১৩৬৯)—সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'সমকালীন'-এর বর্তমান সংখ্যায় যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে—অন্নদাশঙ্কর রায় (ঐতিহাসিক সিম্ধান্ত), গুরুদাস ভট্টাচার্য, অনিল চক্রবর্তী, অমৃতময় মুখোপাধ্যায়, জীবেন্দ্র সিংহ-রায়, আনন্দকুমার স্বামী (লোকায়ত শিল্প ও লোকশ্রুতির প্রকৃতি), রাখাল ভট্টাচার্য (দুর্গাপূজার অর্থনীতি) এবং আরও অনেকে।

সীমান্ত (নবপর্যায় ।। ত্রয়োদশ সংকলন) —সম্পাদক ঃ তরুণ সান্যাল। ১৪৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন গুরুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস ভট্টাচার্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ সরস্বতী'র পুনর্মুদ্রণ করে একটি মূল্যবান রচনা রক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মৃগাঙ্ক রায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, রাম বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

গণবার্তা (শারদীয় ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দাম তিন টাকা।

এবারের শারদীয় গণবার্তা পূর্ববর্তী শারদীয় সংখ্যাগুলির ন্যায় আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ ও আলোচনায় যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে—বি ডি নাগচৌধুরী, এ আর দেশাই, ত্রিদিব চৌধুরী, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, জে বি এস হলডেন, অরবিন্দ পোদ্দার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়; মুলুকরাজ আনন্দ, হুমায়ুন কবির, জয়প্রকাশ নারায়ণ, হেম বড়ুয়া, পি রামমূর্তি, নির্মল বসু। সংকলিত চারটি গল্পের একটি লিখেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার। কবিতা লিখেছেন—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, অরুণ ভট্টাচার্য, আলোক সরকার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। কয়েকটি অনুবাদ কবিতা ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত কবিতা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

বনবাসী (শারদীয়া ।। ১৩৬৯)—সম্পাদনা ঃ ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও আরো অনেকে। সাহিত্য বাসর, হাজারীবাগ। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অনেকগুলি গল্প, নাটক ও বিবিধ রচনার এই সংকলনটি আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি সমাদৃত হবে আশা করি।

মানব মন (বিশেষ পাভলভ সংখ্যা ।। অক্টোবর ১৯৬২)— সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটিতে অনেকগুলি মূল্যবান রচনা সংকলিত হওয়ায় সংখ্যাটির মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন—মনোবিৎ (মানব মনের ক্রমবিকাশ), সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (পুরাতনের নব মূল্যায়ন), দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (মনের কথা), প্রমোদ সেনগুপ্ত (আমেরিকা ও সোবিয়েত-এ শিক্ষা), মোহম্মদ আবদুল করিম, আই. পি. পাভলভ (অনুবাদ ঃ শিম্পাঞ্জী সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কোয়েলার মতবাদ), তরুণ চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া আছে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ নাটক 'সম্রাট'।

শারদীয় সমাচার (১৩৬৯)—সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য ও সত্যব্রত চক্রবর্তী। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিবিধ আলোচনা, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা, উপন্যাস, গল্প ও কাহিনী, রসরচনা, কবিতা, আলোকচিত্র, স্কেচ, কার্টুন প্রভৃতি বর্তমান পত্রিকাটির আকর্ষণ। লেখকমণ্ডলীতে আছেন—বিষ্ণু দে, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, অমল দাশগুপ্ত, দেবেশ রায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, কার্তিক লাহিড়ী,

শান্তিপদ রাজগুরু, কৃষ্ণ ধর, কৃষ্ণেরেশ ঘোষ এবং আরো অনেকে।

উত্তরণ (শারদ সংকলন ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ২।৮২ নাকতলা গভর্ণমেন্ট স্কীম, কলকাতা—৪০।

নতুন পত্রিকা 'উত্তরণ'এর আত্ম-প্রকাশকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমান সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, তরুণ সান্যাল ও আরো অনেকে।

মানস (শারদ সংকলন ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : রবি রায়। ৬৪ বহু-বাজার স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

'মানস'এর বর্তমান সংখ্যায় লিখে-ছেন পঙ্কজ দত্ত, নৃপেন্দ্র সাহা, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখো-পাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র রক্ষিত, সিদ্ধেশ্বর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণ ধর, দিলীপ মিত্র, উৎপল বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। কয়েকটি স্কেচ, মূল্যবান চিত্রের প্রতি-লিপি, আলোকচিত্র বর্তমান সংখ্যাটির আকর্ষণীয় বিষয়। ম

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১ম বর্ষ ।। ৩য় সংখ্যা)—সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসু। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা—৭ হতে প্রকাশিত। কার্যালয় : ২৩বি বেথুন রো, কলকাতা—৬।

বৈতানিক কর্তৃক প্রচারিত রবীন্দ্র-চর্চা বিষয়ক এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি ইতোমধ্যে যথেষ্ট মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সংখ্যাটিও পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির ন্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও আলোচনায় সমৃদ্ধ। নন্দরাণী চৌধুরী, সোমেন্দ্রনাথ বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমলতা দেবী, সত্তীনাথ চক্রবর্তী ও আরো রচনা উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি (শারদ সংখ্যা ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৮ কিষণলাল বর্মণ রোড, শাল-কিয়া, হাওড়া। দাম এক টাকা।

'সম্প্রতি' ইতোমধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে এক বৃহৎ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির বর্ত-মান সংখ্যায় যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দিলীপকুমার সেন, সুবীর রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত এবং আরো অনেকে।

ঋতুপত্র (শারদ সংখ্যা ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : সুবোধ ঘোষ। ১৫।এ অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কল-কাতা—১০ থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'ঋতুপত্র' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তরুণ লেখক-সম্প্রদায়ের রচনা প্রকাশ। বর্তমান সংখ্যায়ও তাদের পূর্বঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থেকেছে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের এই সুনির্বাচিত সংকলনটি আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশিত।

চিত্রপট (প্রথম বর্ষ ।। তৃতীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : মৃগাঙ্কশেখর রায়। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, বি-৫, ভারত ভবন, ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৩। দাম এক টাকা।

বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আলোচনা, বাংলা চলচ্চিত্রের আলোচনা, এবং অন্যান্য আলোচনা বর্তমান সংখ্যাটির আকর্ষণ।

ছায়া (শারদ সংকলন ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : প্রণব মুখার্জি। ৪৭, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা—৯ হতে প্রকাশিত। দাম একটাকা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও বিবিধ রচনার সমাবেশে বর্তমান সংখ্যাটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়েছে। নিম্নলিখিত শারদ সংখ্যাগুলির আমরা প্রাপ্তিস্বীকার করছি।

আলোছায়া (শারদীয়া ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : মাধব মল্লিক। ১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

ফসল (শারদ সংখ্যা ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : গোপাল কুণ্ডু ।। ক্ষিতীশ দাস। ১৫৯ রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হতে প্রকাশিত। দাম একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ছাড়পত্র (প্রথম সংকলন)—সম্পাদক : শংকর দে। ২৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জনমত (শারদীয় ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : চারুচন্দ্র সান্যাল। দাম একটাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

ইণ্ডালুমিন বুলেটিন (অষ্টম খণ্ড ।। দ্বিতীয় সংখ্যা)—সম্পাদক : আশীষ-কুসুম ঘোষ। ইণ্ডিয়ান অ্যালু-মিনিয়াম কোম্পানির বেলুড় ওয়ার্কস থেকে প্রকাশিত।

জনান্তিক (শারদ সংকলন) সম্পাদক : বিপ্লব দাশগুপ্ত ও সমীর রায়-চৌধুরী। ১এ, কৃত্তিবাস লেন, কলকাতা—২৬ থেকে প্রকাশিত। দাম একটাকা।

নক্ষত্রের রাত (শারদ সংকলন ।। ১৩৬৯) —সম্পাদক : সামসুল হক। গাজী বিল্ডিং, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আধুনিক কবিতা (শারদ ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : রেখা দত্ত। পোস্টাল কলোনী, কলকাতা—৩২। দাম—পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

মহিলা-মহল (১৬শ বর্ষ : শারদীয়া ১৩৬৯) প্রধান সম্পাদিকা : অঞ্জলি বসু। ৫৪-বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা : ৯। দাম : ১·৫০ নপ।

সমাজ-কল্যাণে নিবেদিত বাঙালী মেয়েদের মাসিক পত্রিকাটির শারদীয়া সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের নবীনা প্রবীণা লেখিকাদের বিবিধ রচনা সমৃদ্ধ। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী-বিজ্ঞান-কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। লেখিকাদের মধ্যে আছেন ডক্টর রমা চৌধুরী, বাণী রায়, উমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রেণুকা দেবী, প্রাবাসি মুখোপাধ্যায়, কনকলতা ঘোষ, অলকা দেবী, মায়া বসু, অমিতাকুমারী বসু, কুন্তলা দত্ত, পুষ্পদল ভট্টাচার্য, বেলা দে, অমিতা দেবী, সন্ধ্যা ভাদুড়ী, ছবি গুপ্ত প্রভৃতি। শান্তিনিকেতনের অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের পটমিকায় স্বনামধন্যাদের বিচিত্র জীবনী নিয়মিতভাবে এই পত্রিকায় লিখিতেছেন। শারদীয়া সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে বাংলার প্রিয় কবি কান্তি ঘোষ-জায়া শ্রীমতী এভা ঘোষের জীবনী। সাহিত্যরসিকরা অন্ততঃ এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া খুশি হইবেন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

(১) শুভদৃষ্টি (বাঙলা) : এস্‌ সি প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন; ১১,৭২৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : সুকুমার কুমার; কাহিনী : ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা : চিত্ত বসু; চিত্রনাট্য : মণি বর্মা; সঙ্গীত-পরিচালনা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত; আলোক-চিত্র-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা; শব্দধারণ : বাণী দত্ত; আবহ-সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সুধীর খান ও বিজয় বসু; সম্পাদনা : রমেশ যোশী; রূপায়ণ : সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, গীতা দে, দীপিকা দাস, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার প্রভৃতি। জনতা পিকচার্স অ্যান্ড থিয়েটার্স লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল বৃহস্পতি-বার, ৪ঠা অক্টোবর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস "কাঁটা ও কেয়া" অবলম্বনে গঠিত "শুভদৃষ্টি" ছবির নায়ক সিতাংশু মাত্র এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেনি, সে বড়লোকের একমাত্র সন্তান, সুপুরুষ এবং কৃতী ইঞ্জিনীয়ার। অর্থাৎ প্রচণ্ড আধুনিক হ'তে গেলে যতগুলি হাতিয়ার থাকা দরকার, তার সবগুলিই তার অধিকারে। কিন্তু তবু সে আধুনিক নয় এবং সেই কারণে উগ্র আধুনিক তরুণী স্বরূপা ভট্টাচার্যের প্রণয় নিবেদনকে উপেক্ষা ক'রে মায়ের পছন্দমত এক পল্লীললনাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ল। কিন্তু দৈবের এমনই বিড়ম্বনা যে, ঝটিকাক্ষুব্ধ বিবাহ-রাত্রে বাসরে যখন সকলেই নিদ্রামগ্ন, সেই সময়ে রাক্ষসী ময়ূরাক্ষীর বন্যায় করালগ্রাসে পড়ল দেবগ্রাম—বন্যার খরস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিবাহ-বাসর। প্রাণরক্ষার দুরূহ চেষ্টায় নববধূ মলিনার হাত ধ'রে সিতাংশু ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্যার জলে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের চেষ্টায়। কিন্তু আশ্রয় যখন মিলল, তার আগেই ক্লান্ত অবসন্ন মলিনা তার হস্তচ্যুত হয়ে গিয়েছে অতলে তলিয়ে।

'কুমারী মন' চিত্রের নায়িকা কণিকা মজুমদার

বন্যার জল স'রে যাবার পর দুরন্ত খোঁজাখুঁজি ক'রেও যখন সিতাংশু তার নববিবাহিত স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারল না, তখন সমস্ত পৃথিবীটা তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই যখন সে জানল, সর্বনাশা ময়ূরাক্ষীকে নিয়ন্ত্রিত করবার পরিকল্পনা কার্যকরী হ'তে চলেছে, তখন সে তার সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান নিয়ে সেই কাজে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করল; যে-নদী তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে উদরস্থ করেছে, তার উন্মত্ততাকে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু ক'রে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে। পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে যখন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, ঠিক তখনই কলকাতার বাড়ী থেকে তার কাছে সংবাদ এল—এতদিনে তার হারানিধিকে ফিরিয়ে পাওয়া গিয়েছে। তখনই সে ছুটে গেল দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তার নবপরিণীতার সঙ্গে মিলনের উদগ্র কামনায়। কিন্তু এ কে?—এই কি তার সেই করতলচ্যুত নববধূ?—তা হ'লে সে তার বিবাহ-রাত্রির সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলতে পারে না কেন?—না, না, এ নিশ্চয়ই আর কেউ, তাকে প্রতারণা ক'রে তার জীবনসঙ্গিনীর অধিকার দাবি করতে এসেছে। বেচারা মলিনা! পানু জেলের জালে আটকে প'ড়ে যদিও সে তার প্রাণটাকে ফেরত পেয়েছিল, কিন্তু আংশিক স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় সে তার সম্পূর্ণ জীবনেতিহাস মনে করতে পারে না। অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগের পর যদিও সে শেষ পর্যন্ত স্বামীর ভিটেয় এসে হাজির হ'ল, কিন্তু স্বামী ও শাশুড়ী তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। যাঁরা তাকে চিনতেন জানতেন, সেই দিদিমা ক্ষেমঙ্করী দেবী এবং সিতাংশুর মামা হরিহর, দুজনকেই

পিনাকী মুখার্জি পরিচালিত 'রক্তপলাশ' চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও সন্ধ্যা রায়

রাক্ষসী বন্যা উদরস্থ করেছে।—বেচারা মলিনা! সে যে সত্যিই সিতাংশুর বিবাহিতা স্ত্রী মলিনা, তা সে প্রমাণিত করবে কি ক'রে, যদি সিতাংশু নিজেই তাকে চিনতে না চায়?—কিন্তু সত্যের ভগবান আছেন। তাই মলিনা যখন অতি দুঃখে নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'তে উদ্যত, সেই সময়ে এমন ঘটনা ঘটল, যার ফলে সিতাংশুর তাকে নিজের স্ত্রী বলে চিনে নিতে দেরী হ'ল না।

পানু জেলের বাড়ীতে আংশিক স্মৃতিভ্রষ্ট মলিনার জীবনযাত্রা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রৌঢ় প্রেসিডেন্ট ষষ্ঠীচরণের কামাতুর অসৎ থেকে স্নেহশীল সৎ ব্যক্তিতে পরিণতি এবং সিতাংশুর মলিনাকে নিজের স্ত্রী ব'লে না চিনতে পারাকে অধিকতর সুন্দর ও প্রত্যয়ের উপযোগী সম্ভাব্য ক'রে তুলতে পারলে মনে হয়, ছবির গল্পটিকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহীরূপে উপস্থাপিত করা যেত। কিন্তু বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির অভাবে কাহিনীটির কয়েক জায়গা বেশ মামুলী ও অবাস্তব ব'লে মনে হয়েছে।

"শুভদৃষ্টি" ছবির উজ্জ্বল অংশ হচ্ছে ঝড়বৃষ্টির রাতে প্রলয়ঙ্কর বন্যার তাণ্ডবলীলার দৃশ্যগুলি। বন্যার খরস্রোত, তরঙ্গসংকুল জলরাশির অগ্রগতি ও বিস্তৃতি, বন্যার মাঝে নায়ক-নায়িকার অসহায়ভাবে সন্তরণ প্রভৃতি বহুদৃশ্যই [illegible] সজ্জিত হয়ে বন্যার ভয়াবহতাকে এমন বাস্তবরূপে প্রতিভাত করেছে, যা বাঙলা ছবিতে কচিৎ দেখতে পাওয়া গেছে। এই দৃশ্য রচনায় পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, শিল্প-নির্দেশক এবং সম্পাদকের মিলিত কৃতিত্ব অতিমাত্রায় প্রশংসনীয়। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রাথমিক বিরাট দৃশ্যগুলিও সুগৃহীত। এছাড়া সমগ্র ছবিটির আলোকচিত্রের কাজ সাধারণভাবে ভালোই।

অভিনয়াংশে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মলিনার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়। মলিনার অসহায় রূপটিকে তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। যখন সকল দুঃখের অবসান হ'ল ভেবে মলিনা স্বামীসকাশে যায় এবং বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই স্বামীর মুখ থেকে শুনতে পায়, এ আমার স্ত্রী নয়, তখন দুঃখে অভিমানে তার বাতাহত কদলী-বৃক্ষের মত প'ড়ে মূর্চ্ছিত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। অরুণ মুখোপাধ্যায় নায়ক সিতাংশুর চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সিতাংশুর স্নেহপ্রবণা মায়ের ভূমিকাটি সন্ধ্যারাণীর দরদী অভিনয় দ্বারা অত্যন্ত শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের চরিত্রহীন প্রেসিডেন্টের সাধ্বী ও সাহসিকা মলিনার সংস্পর্শে নৈতিক পরিবর্তন অত্যন্ত সহজে ও সুচারুরূপে প্রকাশিত হয়েছে পরলোকগত ছবি বিশ্বাসের সহজাত অভিনয়গুণে। পানু জেলে এবং তার ভাইপো দুলাল চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও

'সাপের নাম টিয়ারঙ' চিত্রে নবাগতা শিপ্রা সেন ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য

অনুপকুমার। ছবির প্রথমাংশে হরিহর ও ক্ষেমঙ্করীর নাতিদীর্ঘ ভূমিকা দু'টিতে স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী ও নিভাননী। উগ্র আধুনিকা স্বরূপার অসার্থক ভূমিকায় দীপিকা দাস সামান্যই সুযোগ পেয়েছেন তাঁর দক্ষতা প্রদর্শনের। জেলেনীর ভূমিকায় গীতা দের অবতরণও তেমনই নিরর্থক।

"শুভদৃষ্টি"র গানগুলিতে কীর্তন, বাউলাঙ্গের সুরের প্রাধান্য সত্ত্বেও সেগুলি খুব অল্প যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে গ্রহণ না ক'রে প্রচুর চড়া পর্দায় গৃহীত হওয়াতে অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। বরং আবহ-সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব চোখে পড়বার মতো।

(২) অযান্ত্রিক (বাঙলা আন্তর্জাতিক সংস্করণ) ঃ এল্. বি. ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনাল-এর নিবেদন; ১০,৪৭৭ ফুট দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ ঋত্বিক ঘটক; চিত্রগ্রহণ ঃ দীনেন গুপ্ত; রূপায়ণ ঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কাজল গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি।

অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, "অযান্ত্রিক" ছবিখানি যখন সাধারণ্যে দেখানো হয়, তখন ছবিখানি দেখবার জন্যে মনের মধ্যে কোনো তাগিদ অনুভব করিনি। হঠাৎ কয়েকদিন আগে ছবিখানির আন্তর্জাতিক সংস্করণটি সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সৌজন্যে প্রত্যক্ষ করবার পর ক্রমাগত এই কথাই মনে হয়েছে, এমন একখানি ছবি সম্পর্কে না দর্শক, না চিত্রসমালোচক, না চলচ্চিত্র নির্মাণকারী প্রযোজক-পরিচালক-কলাকুশলী গোষ্ঠী—কোনো মহল থেকেই এমন কোনো কথা কোনোদিন কানে আসেনি, যাতে মনে হ'তে পারে, ছবিখানিকে না দেখা আমার পক্ষে গর্হিত অপরাধ হয়েছে। অথচ ছবিখানি দেখে মনে করতে বাধ্য হচ্ছি, এমন ছবি না দেখা যে-কোনো চিত্ররসিকের পক্ষে যথার্থই গুরুতর অপরাধ। কারণ, আজ পর্যন্ত যতগুলি ভালো বাঙলা ছবি তৈরী হয়েছে, "অযান্ত্রিক"-এর স্থান তাদের শীর্ষদেশে। চলচ্চিত্রের যদি কোনো বিশিষ্ট ভাষা থাকে এবং নিশ্চয়ই তা' আছে, সেই ভাষার এমন সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু প্রয়োগ দ্বিতীয় কোনো বাঙলা ছবিতে ব্যবহৃত হ'তে দেখিনি। "অযান্ত্রিক" ছাড়াও ঋত্বিক ঘটক আরও কয়েকখানি ছবি বাঙলা দেশকে উপহার দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি মাত্র এই একখানি ছবি সৃষ্টি ক'রেই নিরস্ত হতেন, তা'হলেও তিনি বিশ্বের চলচ্চিত্র-জগতে "এলিজি"র কবি গ্রের মতই অমর হয়ে থাকতেন।

"অযান্ত্রিক"-এর গল্প নিশ্চয়ই পাঠকবর্গের অজানা নয়। মফঃস্বলের ট্যাক্সিচালক তার সেই ১৯২০ মডেলের সেভ্রলেটকে ভালোবেসে নাম দিয়েছে "জগদ্দল", কিংবা তার প্রাচীন চেহারা দেখে আর পাঁচজনে ট্যাক্সিখানিকে ঐ নামে ভূষিত করেছে? সে যাই হোক, "জগদ্দল" হচ্ছে ট্যাক্সিচালকের প্রাণ এবং নামে জগদ্দল হ'লেও কাজে যে সে অপর বহু সুদৃশ্য আধুনিক মডেলের ট্যাক্সির কান কেটে নেয়, তা জলকাদায় খানাখন্দ, অসমতল দুর্গম পথ বারংবার অবলীলাক্রমে অতিক্রম ক'রে প্রমাণিত করেছে। তার একটি দরজায় কোনো কব্জা নেই, হেডলাইট নানা অবস্থায় নানা ভঙ্গীতে চমকে চমকে ওঠে, তবু জগদ্দল বেইমানী করে না। আসলে ঐ হেডলাইট দু'টিই জগদ্দলকে জীবন্ত বলে প্রতিভাত করে। কিন্তু বুড়ো হাড় যতই শক্ত হোক, একদিন না একদিন সে অক্ষম হয়ে পড়বেই পড়বে। তাই জগদ্দলের জীবনেও ব্যতিক্রম শুরু হয়েছিল; হঠাৎ তার ব্রেক কাজ করে না, আবার কখনও হঠাৎ সে বন্ধ হয়ে যায়। একটি পলাতক সুন্দরীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছোতে যাবার সময়ে জগদ্দলের ঈদৃশ আচরণে চালক বিরক্ত হয়ে তাকে পাথর তুলে মারে; তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে পদাঘাত করে। শেষে রুগ্ন জগদ্দলের চিকিৎসার প্রয়োজন

জনতা পরিবেশিত এস, সি, প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'শুভদৃষ্টির' একটি দৃশ্যে দীপিকা, সন্ধ্যারাণী ও অরুণ মুখার্জী

অনুভব ক'রে সে নতুন পিস্টন, রড প্রভৃতি বহু রকম পরিবর্তন সাধন করে সর্বস্বান্ত হয়। তবু জগদ্দল শেষ পর্যন্ত জগদ্দলের মতই অচলঅনড় হয়ে পড়ে—জগদ্দলের ঘটে মৃত্যু। ট্যাক্সিচালকের জীবনের ট্র্যাজেডী তখনই বেশী ক'রে নজরে পড়ে, যখন তারই চোখের সামনে দিয়ে জগদ্দল খন্ডবিখন্ডিত হয়ে পুরোনো লোহার ক্রেতার ঠেলাগাড়ীতে বোঝাই হয়ে চালান যায়।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের কৃতিত্ব এই যে, তাঁর ছবির কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ অপর অঙ্গগুলি থেকে বড়ো হতে পায়নি। তাঁর ছবিটিকে যদি একটি সজীব দেহ ব'লে কল্পনা করা যায়, তাহলে সেই দেহের মাথা, চোখ-কান-নাক, হাত-পা প্রভৃতি সকল অঙ্গ একসঙ্গেই কাজ করেছে, সমগ্রভাবে একটি দেহের অঙ্গরূপেই আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। কাউকে আলাদা ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। ছবি থেকে সংলাপ, দৃশ্য থেকে অভিনয় বা আবহ-সঙ্গীতকে পৃথক ক'রে বিচার করবার অনুমাত্রও সুযোগ নেই এই ছবিতে। সকলে একান্ত একাত্ম। তাই কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সু-অভিনয় করেছেন কিংবা আলি আকবর খাঁর আবহ-সঙ্গীত অসামান্য হয়েছে, এমন কথা বিশেষ করে লেখবার উপায় নেই। বলা যেতে পারে,

শক্তি ফিল্মসের 'নাটবয়' চিত্রে কিশোরকুমার ও কল্পনা

ছন্দোবদ্ধভাবে প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন, যাতে "অযান্ত্রিক" ছবিটি সপ্রাণ হয়ে উঠে বাঙলা চলচ্চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হ'তে পেরেছে অনায়াসেই।

আন্তর্জাতিক সংস্করণ সম্পর্কে মাত্র একটি ত্রুটীর কথা উল্লেখ করব: আদিবাসীদের নৃত্যগীতের অংশটি'ক যথেষ্ট কমিয়ে ছোট করবার সুযোগ এখনও আছে।

(৩) কিং অব কিংস্ (ইংরাজী) : মেট্রো গোল্ডুইন মায়ারের নিবেদন: স্যামুয়েল ব্রনস্টন প্রোডাকসান; হার্ড হ্যাটফিল্ড, রন র‍্যান্ডেল, হ্যারী গার্ডিনো, রিপ টর্ণ, রবার্ট রেয়ান, সিওভ্যান ম্যাক্‌কেনা, ভাইভেকা লিন্ডফোর্স, কার্মেন সেভিলা, ব্রিগিড ব্যাজলেন প্রভৃতি। আজ শুক্রবার, ১৯এ, অক্টোবর থেকে জ্যোতি সিনেমায় দেখানো হচ্ছে।

৭০ মিলিমিটার সুপার টেকনিরামা, ৬-ট্র্যাক স্টিরিওফোনিক শব্দযন্ত্র এবং টেকনিকলারে নির্মিত এই বিরাট ছবিটি দেখতে পুরো ২ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬,০০০ ফুট। অবশ্য মাঝে কয়েক মিনিটের বিরতি আছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কিংবা আদো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, কারণ খ্রীস্টান পৃথিবীতে যাঁকে "রাজার রাজা" ব'লে অভিহিত করা হয়, তাঁর সুবৃহৎ ও বহু ঘটনাপূর্ণ জীবনী এমনই হৃদয়স্পর্শী যে, সে-জীবনী দেখতে ব'সে সময়ের কথা মনে থাকে না—এত বড় ছবি দেখতে একটি মুহূর্তের জন্যেও ঔৎসুক্যের অভাব হয় না।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের 'নবদিগন্ত' চিত্রে সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও বিশ্বজিৎ

প্রযোজক ব্রনস্টন যীশু খ্রীস্টকে একজন ভগবদ্ভক্ত মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করেছেন; তিনি যতদূর সম্ভব তাঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। জীবিতকালে মাত্র দু'টি রোগমুক্তির ঘটনাও যা দেখানো হয়েছে, সেখানে খ্রীস্টকে মাত্র আংশিকভাবে ছায়ার মাধ্যমে দেখতে পাওয়া গেছে: এবং একেবারে সবশেষে

"পুনরুজ্জীবনে"র দৃশ্যটিকেও এমনে চাতুর্যের সঙ্গে আনা হয়েছে, যাতে মনে হ'তে পারে, যীশু দেহত্যাগ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর বাণী এবং ধর্মমত পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে।

যীশুর ভূমিকায় জেফ্রি হান্টার অত্যন্ত সংযতভাবে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং তাঁর নীলনয়নযুক্ত সুন্দর অবয়ব দিয়ে তাঁর গৃহীত চরিত্রটি বিশ্বাস্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরাপর সকল ভূমিকাই যোগ্য শিল্পীদের দ্বারা যথাযোগ্যভাবে চিত্রিত। ৩৯৬টি সেট সমন্বিত, ৭০০০ এক্সট্রা অভিনীত এই বিরাট চিত্রটি ইয়োরোপের মাদ্রিদ শহরের সেভিলা এবং চামার্টিন স্টুডিওতে পুরো দু'টি বছর ধ'রে চিত্রায়িত হয়েছে।

, এমন বিরাট মানবিক আবেদনপূর্ণ ধর্মচিত্র সাম্প্রতিককালে অতি অল্পই দেখা গেছে।

বিবিধ সংবাদ

গত ১১ই অক্টোবর বরাহনগরের জ্যোতিনগর বিদ্যাশ্রী নিকেতনে শারদোৎসব উপলক্ষে রূপান্তরের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক কিরণ মৈত্রের "বিশ পঞ্চাশ" নাটকটি সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ হয়।

মানবেন্দ্র গুহের সুষ্ঠু পরিচালনায় নাটকটি দর্শকদের অভিভূত করে।

সর্বশ্রী সুধীর মুখার্জি, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবব্রত মিত্র, সন্তোষ মজুমদার, মানবেন্দ্র গুহ, অরুণ সেন, সুনীল দাস, অচিন্ত্য মুখার্জি, এবং অশ্রু মুখোপাধ্যায় তাহাদের অনবদ্য অভিনয়ে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

একটি মঞ্চ-নাটকাভিনয়:
রূপকার নিবেদিত "চলচিত্তচঞ্চরী":

রূপকার সম্প্রদায় প্রতি সোমবার (ছুটির দিন বাদে) সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে সুকুমার রায়ের "চলচিত্তচঞ্চরী" এবং রসরাজ অমৃতলাল বসুর "ব্যাপিকা বিদায়" মঞ্চস্থ করছেন রঙমহলে। সুকুমার রায়ের "চলচিত্তচঞ্চরী"কে নাটক না ব'লে চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি স্যাটায়ার বলাই, বাধ করি, অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বেদান্ত আশ্রমের গুরুপাক শিক্ষণ-কচকচি নিয়ে এমন মনোরম উপভোগ্য রচনা আর আছে কিনা সন্দেহ। একটি সাধারণ লোক তার সাধারণ বুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে কেমন ক'রে এই কচকচিকে নস্যাৎ ক'রে দিতে পারে, তা চাক্ষুষ উপভোগ করতে হ'লে "চলচিত্তচঞ্চরী"-তে ভবদুলাল নামধেয় সাধারণ মানুষটিকে দেখা প্রয়োজন। সন্তোষ দত্ত অভিনীত "ভবদুলাল"কে দর্শক ভালো না বেসে পারবেন না। এবং প্রায় বহু ব্যক্তিই এই চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেন। সমগ্র অভিনয়টিই আনন্দের হিল্লোল বহালেও ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে নাম করতে হয় সবিতাব্রত দত্ত (ঈশান বাচস্পতি), ভবরূপ ভট্টাচার্য (সত্যবাহন সমাদ্দার) এবং হরিনারায়ণ চক্রবর্তীর (শ্রীখণ্ডদেব)।

"চলচিত্তচঞ্চরী"র পর অভিনীত হয় রসরাজের 'ব্যাপিকা বিদায়'। প্রায় ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর আগে রচিত 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটিকা আজকের দর্শকের কাছে এমন আশ্চর্য উপভোগ্যভাবে অভিনয় করা যায়, এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর সুখী সংসারে একদিনের জন্যে 'দজ্জালনী' শাশুড়ীর আবির্ভাব কি অনাসৃষ্টি বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে, তারই অপরূপ আলেখ্য হচ্ছে "ব্যাপিকা বিদায়"। ব্যাপিকা কথাটিই 'দজ্জালনী'র সাধু রূপ। এই নাটকে সঞ্জীব চৌধুরীর ভূমিকায় কালোয়াতী গানে এবং অভিনয়ে সবিতাব্রত দত্ত যে-অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা একান্তই দুর্লভ। এবং সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে হয় 'সেকেণ্ড ক্লাশ, সেকসন বি' পেট্রিয়ট ঘনশ্যাম সিকদারে ভূমিকায় বঙ্কিম ঘোষের জীবন্ত অভিনয়ের। ঘনশ্যাম দর্শকচিত্তকে মথিত ক'রে তোলে তার আন্তরিকতায়। এ ছাড়া ব্যাপিকা মিসেস পাকড়াশীর ভূমিকায় কালিন্দী সেন এবং 'চম্ চম্ চমি'-চমৎকারের ভূমিকায় গীতা দত্তের অভিনয় স্মরণীয়। অপরাপর সকল ভূমিকাই সু-অভিনীত এ-কথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

আজকের এই সমস্যাজর্জর জীবনে যদি ঘণ্টা তিনেকের জন্যে সমস্ত ভুলে অনাবিল হাসির সাগরে ডুবে থাকা বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ'লে রূপকার নিবেদিত 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর অভিনয়-আসরে উপস্থিত হ'লে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

।। হামবুর্গে সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত ।।

বাৎসরিক হামবুর্গ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সপ্তাহে বাংলা ভাষায় ইংরেজী সাবটাইটেল সহ সত্যজিৎ রায়ের ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে স্বর্ণসিংহ বিজয়ী অপরাজিত দেখানো হয়েছিল।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপুর সংসারের' মত অপরাজিত ছবিটিও জার্মান চিত্র-রসিক ও সমালোচকদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা ও সম্মানের মূলে রয়েছে 'অপরাজিত'র মত ছবি।

সত্যজিৎ রায়ের অপূর্ব কাজ সম্বন্ধে স্থানীয় একটি সংবাদপত্র এই রকম লিখেছিল: ছবিটি শুধু ভারতীয়দের নয়, সর্বসাধারণের চোখ খুলে দিয়েছে। গভীর মানবিক আবেদনে ভরা ছবিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে • চরম আত্মত্যাগের প্রস্তুতি। ছবিটি এই কথাই প্রমাণ করে যে ভারতীয়রা ধীরে হলেও স্থিরভাবে হাজার বছরের ঐতিহ্য ঝেড়ে ফেলে রূঢ় বাস্তবের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি এই শিক্ষাই দেয় যে এই পথে এগিয়ে যেতে হ'ল আত্মত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। ছবিটির সমালোচনায় ডি ভেল্ট নামে কাগজটি লিখেছিল যে ছবিটিকে

শক্তিশালী করে তুলেছে তার সহজ ব্যঞ্জনা, প্রেরণা ও অকৃত্রিমতা। গল্পের কাহিনীকে সাবলীলভাবে চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। মৃত্যুর দৃশ্যগুলি মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় যেখানে দেখানো হয়েছে মানুষের আত্মা অসীমে মিশে যাচ্ছে। মানুষ যখন এই পৃথিবী ছেড়ে যায়, তখন চারিদিকে এক শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকেনা কিন্তু সেই অনামাকেও সত্যজিৎ রায় অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আঠারো মাস আগে ডি ভেল্ট কাগজের লণ্ডন প্রতিনিধি সেখানে ছবিটি দেখে লিখেছিলেন যে, ছবিটি অদ্ভুত মানবিক, আবেগ আছে তবে দুর্ভাগ্যকে নিয়ে কোথাও বিলাপ নেই। সবকিছুই যেন সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে। ছবিটির সর্বত্র একটি মানবদরদীর স্পর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

সুধীর মুখার্জী পরিচালিত জালান প্রোডাকসন্সের 'দাদাঠাকুর' চিত্রে ছবি বিশ্বাস।

কলিকাতা

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর সংগীত-গ্রহণ স্টুডিওয় সংগীত-পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত ইণ্টারন্যাশনাল মুভিজের 'অনামিকা' ছবির সংগীত গ্রহণ করলেন। সংগীতবহুল এ ছবির প্রথম পর্যায়ে দুটি গান গৃহীত হল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। একটি রবীন্দ্রসংগীত—'ধরা দিয়েছো গো আকাশের পাখী', আর একটি রাগ-প্রধান—'যাও পাখী বোল তারে'। শেষ গানটিতে সুরের বৈচিত্র্য এনেছেন সংগীত পরিচালক শ্রীদাশগুপ্ত। বাকী গানগুলি এই মাসের শেষেই দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন হেমেন গুপ্ত। নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ চরিত্রলিপি এখনও নির্বাচন হয়নি।

গত ১লা অক্টোবর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে সুরঞ্জনা চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'দেখা হল', ছবির প্রথম শুভদিনের চিত্রগ্রহণ শেষ হল। তরুণ কুশলী নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় এ ছবির পরিচালক। বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে এই চিত্রনাট্যের প্রধান দুই শিল্পী হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করবেন দিলীপ মুখার্জি, সুলতা চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, মণি শ্রীমানি, জহর গাংগুলী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, অপর্ণা দেবী, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে। সঙ্গীত, সম্পাদনা, আলোকচিত্র ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, বিজয় ঘোষ ও প্রসাদ মিত্র।

ক্যালকাটা মুভিটনে জাওলা প্রোডাকসন্সের 'দুইনারী'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন জীবন গাঙ্গুলী। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নির্মলকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কাজলা গুপ্ত, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখার্জি, শেফালী ব্যানার্জি ও কালী সরকার। সঙ্গীত-পরিচালক ও আলোকচিত্রশিল্পী হলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও দীনেন গুপ্ত।

পরিচালক সলিল দত্ত 'সূর্যশিখা'র বহির্দৃশ্যের কাজ প্রায় শেষ করেছেন।

বহির্দৃশ্যের শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন বিজয় সেন ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীরা হলেন অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায় ও তরুণকুমার।

বোম্বাই

বোম্বাই চিত্রজগতে বাংলার শিল্পীরা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছেন। উত্তমকুমার 'শর্মিলা'র পর আর একটি হিন্দী ছবির জন্য সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন বৈজয়ন্তীমালা। ছবির নাম 'ছোটীসি মুলাকাৎ'। আশাপূর্ণা দেবীর একটি বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শচীন ভৌমিক। ছবিটি পরিচালনা করবেন আলো সরকার।

সম্প্রতি দুটি নতুন ছবিতে অভিনয়ের জন্য বাংলার বিশ্বজিৎ মনোনীত হয়েছেন। প্রথমটির নাম 'কেইসে কঁহু'। বিশ্বজিৎ-নন্দা এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। সংগীত পরিচালনা করবেন এস ডি, বর্মণ। এ ছবির পরিচালক আত্মারাম। দ্বিতীয়টির সম্প্রতি মহরৎ হয়েছে। ছবির নাম 'মেরে সালম'। বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ এ ছবির নায়ক-নায়িকা। এই রঙিন ছবিটি পরিচালনা করছেন অমরকুমার। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রাণ, রাজেন্দ্রনাথ ও ধুমল। সুরসৃষ্টি করবেন ও পি নায়ার।

গত গণেশ চতুর্দশীর শুভদিনে রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওয় প্রযোজক-অভিনেতা ভারতভূষণ তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'মেঘ মল্লার'র শুভ মহরৎ কার্য সম্পন্ন করলেন। প্রযোজক-পরিচালক ভি, শান্তারাম উপস্থিত ছিলেন। ছবিটি রঙিন হবে।

ভি, শান্তারাম পরিচালিত 'মোহেরা'র বহির্দৃশ্য শুরু হবে রাজস্থানে। সম্প্রতি সদলবলে পরিচালক ও কলাকুশলীগণ রওয়ানা হয়েছেন।

এ ছবির নায়িকা সন্ধ্যা ও নবাগত নায়ক প্রশান্ত। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন এম, রজন, উল্লাস, ললিতা পাওয়ার, মনমোহন কৃষ্ণ এবং মমতাজ। সংগীত-পরিচালক হলেন রামলাল।

মাদ্রাজ

অভিনেতা এ, নাগেশ্বর রাও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পঁচিশ হাজার টাকা দান করছেন। এর আগে তিনি প্রায় তিন বছর আগে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দান করেন তাঁর আটষট্টি ছবির অভিনয়কালে। বর্তমানে 'পুজা ফালামু' চিত্র নিয়ে তিনি ১০৬টি ছবিতে আজ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন।

সম্প্রতি 'পুজা ফালামু'র স্যুটিং শুরু হয়েছে বাওহিনী স্টুডিওয়। এই তিলেগু চিত্রটি পরিচালনা করছেন বি, এন, রেড্ডি। সুরসৃষ্টি করবেন এস রাজেশ্বররাও। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন এ, নাগেশ্বররাও ও পি, সাবিত্রী।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

মেলোডি ইণ্টারন্যাশনাল-এর ছবি 'বনানী কন্যা'। পরিচালনা করছেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী। সংগীত গ্রহণ করেছেন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর এ ছবির দৃশ্যগ্রহণ প্রথম পর্যায়ে শেষ হল। স্যুটিং দেখতে এসে বেশ একটু অবাক হলাম পরিবেশ ও শিল্পীর পোষাক-পরিচ্ছদে। স্টুডিওর মধ্যে থেকে মনে হল সাঁওতাল পরগণার কোন এক গহন বনে চলে এসেছি। মাচা বাঁধা বড় বড় কাঠের বাড়ী। লাল নীল রঙের জামা-কাপড় পরা বিভিন্ন চরিত্র চোখে পড়ল। শহর কলকাতার ব্যস্ততা ফেলে এই পুজোর ছুটিতে অনেক দূরের এই নির্জন জীবন আর কাহিনীর সব চরিত্রের আনাগোনা দেখে বেশ নতুন বলে মনে হল। এই নিখুঁত পরিবেশের জন্য একমাত্র কমপ্লিমেণ্ট শিল্প-নির্দেশক প্রসাদ মিত্রের। দৃশ্যরচনায় শ্রীমিত্র মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। দৃশ্য ভাগ করে এক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিত্রগ্রহণ করছিলেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তীর পরিচালনায় আলোকচিত্র-শিল্পী ননী দাস। কাহিনীর ললিত আর মঙ্গল সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করলেন ভারতী রায় ও ধীরাজ দাস। প্রধান সহকারী পরিচালক সুভেন সরকার। দৃশ্যগ্রহণের অবসরে তিনি সংক্ষেপে আমায় ছবির গল্পটা বললেন। কাহিনী হল—

গহন অরণ্যে যেখানে মানুষের বসতি একটু কম সেই গহনে সংগীত-পিপাসু শিল্পী সুরথ সাধনার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হল। কারণ প্রকৃতির কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এই সংগীতের সপ্তসুরের জন্ম। সাধনা শুরু হয়। সফলতার পথে প্রেমের প্রেরণায় সে গতি রুদ্ধ হয়নি। চঞ্চলা হরিণীর মত বনানী-কন্যা ললিতার ভাল লেগেছিল এই তরুণ শিল্পীর জীবনকে। কিন্তু কুমারব্রতের যে সাধনা তা থেকে বঞ্চিত হয়নি সুরথ। কারণ ভাললাগার মোহ সাধনায় মন কেড়ে নেয়। তাই নিজেকে আড়াল করে রাখে সুরথ। বনানী-কন্যা বুঝতে পেরে হতাশ হল। সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকতে স্রষ্টা তাই কঠোর। ঘটনাচক্রে অর্থবানের একমাত্র কন্যা চিত্রা এই সংগীতজ্ঞ স্রষ্টার কাছে সংগীত শিক্ষার জন্য নিভৃতে ছুটে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সুরথ তালিম দেয়। একদিন চিত্রা পরিচিত পেল এই সংগীত সাধনায় তার গুরুর কৃপায় কৃতী শিল্পী হিসেবে।

সংগীতগুরু সুরথ সাধনায় সফল হলেও তার জীবনটা শূন্য বলে মনে হল। ললিতাকে সে ভুল বুঝেছিল। হঠাৎ অসুস্থতায় ললিতার কথা শুধু মনে পড়তে সুরথ চলে আসে। ললিতা অভিমান করে দূরে চলে যাইনি। এরই অপেক্ষায় সে দিন গুনেছে কতদিন ধরে। আজ এই দুঃখের দিনে সে এই প্রকৃতির একমাত্র সুখী বনানী-কন্যা। ললিতার একান্ত সেবায় ধীরে ধীরে সুরথ প্রাণ পেল। তবে কেন জানিনা সুরথ এখন আর করুণ সুর সহ্য করতে পারে না। গভীর রাতে কোন গাঁ থেকে

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় 'বনানী কন্যা'র চিত্রগ্রহণের সময় ধীরাজ দাস, পরিচালক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভারতী রায় ও সহকারী পরিচালক সুভেন সরকার।

যেদিন করুণ সুরে সানাই বেজেছে সেদিনই চিৎকার করে সুরথ সুর বন্ধ করতে ছুটে যেত। কারণ এই পৃথিবীর অনেক দুঃখ সে সহ্য করেছে। নতুন করে তাই আনন্দের কোন বাঁশীর সুর শুনতে সে চায়। গভীর রাতে অনেক দূরের সেই ভেসে আসা করুণ সানাইয়ের সুর বন্ধ করতে সুরথ ছুটে এসে দেখে তারই ছাত্রী চিত্রা সে সুর বাজিয়ে চলেছে এই মাঝরাতে। সুরথ চমকে উঠেছিল চিত্রাকে দেখে। এই পরিস্থিতির জন্য চিত্রা অনুতপ্ত হয়ে সুরথের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। সৃষ্টির আনন্দে পাগলের মত সব ভুলে সুরথ সারারাত শুধু নেচে-নেচে গেয়ে উঠেছিল। সে সুর শুনে পায়ে-পায়ে ললিতাও কখন যেন সুরথের পাশে এসে বসেছিল। কোন কথা সে বলেনি। শুধু চোখের জলে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছে—কেন এমন হয়!

কিন্তু একি হল! সানাই হঠাৎ থেমে গেল। সুরথের প্রাণ বন্ধ হল প্রকৃতিরই বুঝি কোন অভিশাপে। সুরথের সানাই আর বাজলো না। চিরদিনের মতো বন্ধ হল। ললিতা যে কণ্ঠ একদিন হারিয়েছিল তা নতুন করে জাগিয়ে তুলতে সেও রুদ্ধকণ্ঠে প্রাণ হারালো হঠাৎ ঘটে যাওয়া অঘটনে।

একে একে এসব স্মৃতি মুছে গেলেও প্রকৃতি কিন্তু আজও কোন চাঁদজ্বলা তিথিতে বনানী-কন্যার গান কান পেতে শোনে। রাত ভোর হলে সে করুণ সুরে দু' ফোটা চোখের জল শিশিরবিন্দু হয়ে সবুজ পাতায় মুক্তো ছড়ায়।

কাহিনীর এই তিন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন ললিতা—ভারতী রায়, সুরথ—অসীমকুমার ও চিত্রা—মঞ্জুলা সরকার।

—চিত্রদূত

*

টেলিভিশন চিত্রে কলকাতার ছাত্রজীবন

নিউইয়র্কের আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী সম্প্রতি কলকাতার ছাত্র-জীবন নিয়ে একটি প্রামাণ্য ছবি তুলেছেন। এই শীতে আড়াই কোটি মার্কিন দর্শক টেলিভিশনে সেই ছবিটি দেখবেন।

ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা মিস হেলেন জাঁ রোজার্স। অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকার প্রখ্যাত টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান উইলিয়াম হার্টিগান পাঁচ সপ্তাহ ধরে কলকাতা ও তার আশেপাশে এখনকার জীবনকে বাস্তব নির্ভর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ক্যামেরায় তুলে নিয়েছেন।

মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীতাপস গঙ্গোপাধ্যায়। অর্থনীতির স্নাতক শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এখনও ছাত্র। এবারে তিনি যাদবপুর থেকে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং তাছাড়াও বিভিন্ন কলেজের অনেক ছাত্রের মধ্যে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট কোন সংলাপ না থাকায় যে-রকম পরিস্থিতি হয়েছে সেই বুঝে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর সংলাপ ঠিক করে নিতে হয়েছে।

টেকনিসিয়ান স্টুডিও থেকে এদের ভারতীয় কলাকুশলী দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। শব্দযন্ত্রী শ্রীদেবেশ ঘোষ ও আলোকচিত্রী শ্রীরামানন্দ সেনগুপ্ত এ-ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

ভিনদেশী ছবি

॥ বৃটিশ ছবির খবর ॥

কী আনুই-এর নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে অনেক-দিন ধরেই। কিন্তু রজত-পটে রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় নাটক সব সময়েই যে সাফল্য লাভ করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমনি একটি অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়েই জুলিয়ান উইন্টল এবং লেসলি পার্কিন আনুই একটি কৌতুক নাটককে চলচ্চিত্রে

অনুবাদ করছেন। ছবিটির নাম 'ওয়াণ্টিং অফ দি টরেডোরস'।

বিখ্যাত হাস্যাভিনেতা পিটার সেলার্স এই চিত্রের মধ্যমণি। তিনি অভিনয় করছেন জনৈক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের। জেনারেল ফিটজন ইংলণ্ডের এক বিশাল প্রাসাদে থাকেন। জেনারেলের ইচ্ছে তিনি একটি জীবন-স্মৃতি লিখবেন। কিন্ত অসুস্থ পত্নীর আর্ত রবে এবং একটি সুন্দরী পরিচারিকার আকর্ষণের মধ্যে তাঁর জীবন-স্মৃতির রচনার কাজ বিশেষ এগোয় না। তার ওপর জেনারেল প্রায় সতেরো বছর ধরে জনৈকা মোহময়ী ফরাসী মহিলার প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। মহিলাটি আবার ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডে এসে হাজির হলেন। তাঁর দাবী জেনারেল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে অবিলম্বে তাঁকে বিয়ে করুন। কিন্তু এদিকে জেনারেলের পার্শ্বরক্ষী আবার মহিলাটির প্রেমে পড়ে গেল। প্রায়-বৃদ্ধ জেনারেলের বিবাহ-চিত্রে যেটুকু কারুণ্য এনেছে ঘটনার হাস্যকর পরিস্থিতি তাকে হাল্কা হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। পিটার সেলার্স ছাড়া এই চিত্রে অভিনয় করেছেন মার্গারেট লেটন, ডেনি রবিন্স। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জন গ্ইলারমিন।

॥ হলিউড ছবির খবর ॥

"ইমিটেশন অফ লাইফ" এবং "পোট্রেট ইন ব্ল্যাক"এর চিত্রতারকা জুটি লানা টার্নার এবং রস হাণ্টার তৃতীয় একটি ছবির জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। "ম্যাডাম এক্স" ছবিটির প্রযোজনা করছেন হাণ্টার নিজেই। মাতৃত্বের একটি নাটকীয় কাহিনী এই চিত্রের মূল উপজীব্য। ব্রডওয়ের সফল নাটক হিসেবে "ম্যাডাম এক্স" ইতিপূর্বেই সাধারণ্যে প্রশংসিত হয়েছে। নাট্যকার হলেন আলেকজাণ্ডার বিসন। রস হাণ্টার আরেকটি ছবির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। এই ছবিটির নায়ক-নায়িকা হলেন ডরিস ডে এবং জেমস গারনার। চিত্র-নাট্যকার হলেন কার্ল রেইনার। "দি আর্ট অফ লাভ" নামক চিত্রটিরও চিত্রনাট্য রচনার ভার পেয়েছেন রেইনার। হাণ্টারের ছবির কাজ শেষ করে শেষোক্ত চিত্রের জন্যে কলম ধরবেন রেইনার। ডরিস ডে হলিউডে "পিলো টক"-এর পর আবার সাড়া ফেলেছেন "ড্যাট টাচ অফ মিংক"এ অভিনয় করে। এই চিত্রের নায়ক হলেন ক্যারি গ্রাণ্ট। ইউনিভার্সাল ইণ্টারন্যাশনাল-এর অন্যান্য সফল হাসির ছবি 'অপারেশন পেটিকোট', 'লাভার কাম ব্যাক' প্রভৃতিকেও হাসির পাল্লায় হারিয়েছে 'ডাট টাচ অফ মিংক'। এই চিত্রের ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনায় একটি পত্রিকা লঘুভাবে লিখেছিলেন, "ছবিটির আরেকটি নাম হতে পারে 'ড্যাট টাচ অফ ম্যানি' (ছুঁলেই টাকা?)!

• • •

অষ্ট্রিয়াতে হঠাৎ ফ্রয়েডের রচনাবলীর বিক্রি বেড়ে গেছে। দু মাসের মধ্যেই ফ্রয়েডের তিনটি বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং পুস্তক-প্রকাশকরা অন্যান্য বই তাক থেকে নামিয়ে ফ্রয়েড-এ ঘর ভরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। হঠাৎ অস্ট্রিয়াবাসীর ফ্রয়েড-প্রীতির কারণ —বিখ্যাত পরিচালক জন হাস্টন পরিচালিত ফ্রয়েড-জীবনী। হাস্টন মিউনিকে ফ্রয়েডের বাল্যকালের দৃশ্যাবলী তুলতে গিয়েছিলেন। জার্মান এবং অস্ট্রিয়ার সংবাদপত্রগুলি হাস্টনের নির্মীয়মাণ চিত্রের পক্ষে প্রবল প্রচার করে। ফলে ফ্রয়েড-গ্রন্থ এবং হাস্টনের ফ্রয়েড-চিত্র সম্বন্ধে সাধারণের ঔৎসুক্য স্বভাবতঃই বর্ধিত হয়েছে। ফ্রয়েডের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মণ্টেগোমারী ক্লিফ্ট।

* * *

চিত্রাভিনেতা টনি কার্টিস তাঁর নিজের চিত্র-প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছেন 'কার্টিস এণ্টার প্রাইজেস প্রোডাকসন্স'। এই চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি হবে 'ফরটি পাউণ্ডস অফ ট্রাবল'। টনি নিজে এই চিত্রে অভিনয় করবেন এবং টেলিভিশন-এর অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এই প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। চিত্রটি পরিচালনা করবেন নরম্যান জিউইসন।

* * *

মার্লন ব্রাণ্ডোর সাম্প্রতিক ছবি "দি আগলি আমেরিকান"কে উপলক্ষ করে হলিউডে একটি গুজবের জন্ম হয়েছিল। এই ছবিতে ব্রাণ্ডোর বোন জোসিলিন ব্রাণ্ডো অভিনয় করেছেন। ভূমিকালিপিটি প্রচারিত হওয়া মাত্র মার্লন-ভক্তরা তাঁকে 'শুভেচ্ছা' পাঠাতে থাকেন। তাঁরা সকলেই ভেবেছিলেন যে আনা কাশফির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার পর আবার দারপরিগ্রহণ করেছেন মার্লোন। 'দি আগলি আমেরিকান' পরিচালনা করেছেন জর্জ ইংল্যাণ্ড।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

॥ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

ইম্ফলে অনুষ্ঠিত অষ্টম বার্ষিক জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলা ফুটবল, টেবল টেনিস (বালিকা বিভাগ) এবং সন্তরণের উভয় বিভাগে প্রথম স্থান লাভ ক'রে বিশেষ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। এই শরৎ-কালীন ক্রীড়ানুষ্ঠানে মোট ১৬টি রাজ্যের প্রায় ৬৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেছিল।

ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পশ্চিম বাংলা ৬—০ গোলে বিহারকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে মণিপুর ২—১ গোলে দিল্লীকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে মিলিত হয়। পশ্চিম বাংলা ২—০ গোলে মণিপুরকে পরাজিত ক'রে।

ফাইনাল ফলাফল

সন্তরণ (বালক বিভাগ) : ১ম পশ্চিমবঙ্গ ২০ পয়েন্ট; ২য় মহারাষ্ট্র ১০ পয়েন্ট; ৩য় মণিপুর এবং গুজরাট ২ পয়েন্ট।

সন্তরণ (বালিকা বিভাগ) : ১ম পশ্চিমবঙ্গ ২৫ পয়েন্ট; ২য় গুজরাট ১৩ পয়েন্ট; ৩য় ত্রিপুরা ৬ পয়েন্ট।

ফুটবল : পশ্চিমবঙ্গ ২ : মণিপুর ০। কাবাডি : মধ্যপ্রদেশ ৫২ : দিল্লী ৭। খো-খো : ১ম মধ্যপ্রদেশ; ২য় গুজরাট। টেবল টেনিস (বালক) : পশ্চিমবঙ্গ ২ : দিল্লী ১। টেবল টেনিস (বালিকা) : গুজরাট ২ : দিল্লী ১।

॥ সামরিক ফুটবল ॥

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'সার্ভিসেস ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সাউদার্ণ কম্যান্ড অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে সাউদার্ণ কম্যান্ড উপর্যুপরি ন'বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল। আলোচ্য বছরের প্রতি-

অষ্টম জাতীয় স্কুল গেমসে ফুটবলের বিজেতা—পশ্চিমবঙ্গ।
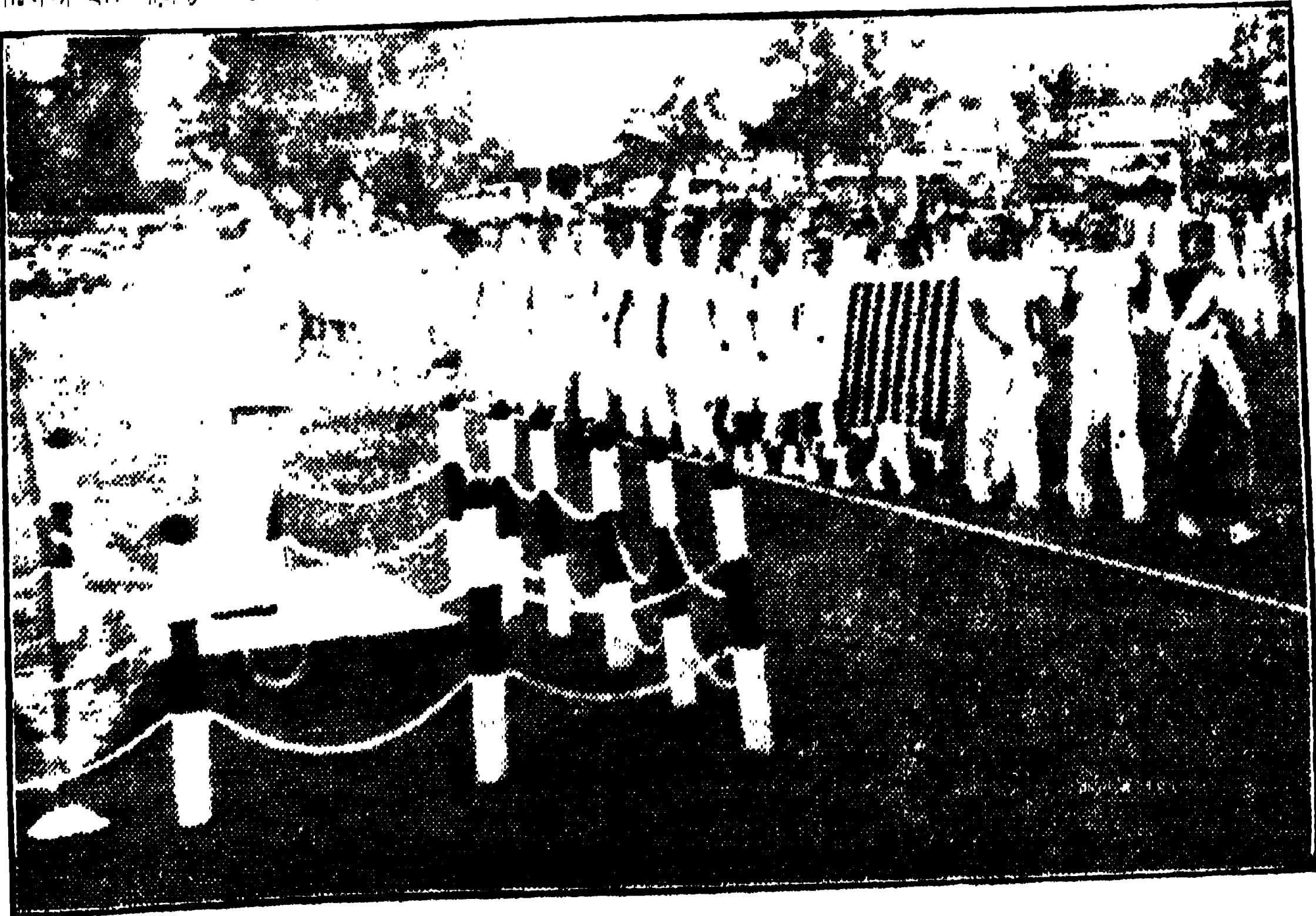
ইম্ফলে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কুচকাওয়াজ।

জাপানের কাওয়ানাস্থ ফুজি গলফ কোর্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বের অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় খেলোয়াড় এ এস মালিক তাইওয়ানের প্রতিনিধি সিয়ে মিনারের সংগে আলাপ করছেন।

যোগিতায় সাউদার্ণ কম্যান্ড মোট চারটে খেলায় ৮ পয়েন্ট করে এবং ৫টা গোল খেয়ে ১৯টা গোল দেয়। প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছে এয়ার ফোর্স দল—৪টে খেলায় ৬ পয়েন্ট ক'রে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল মোট পাঁচটি দল—সাউদার্ণ কম্যান্ড, এয়ার ফোর্স, ইস্টার্ণ কম্যান্ড, নেভী এবং ওয়েস্টার্ণ কম্যান্ড।

॥ বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ ॥

জাপানের মাসাহিকা হারাদা (বয়স ১৯) একাদশ রাউণ্ডে থাইল্যাণ্ডের বিশ্ব মুষ্টি যোদ্ধা পোন কিংপেচকে পরাজিত ক'রে মুষ্টি যুদ্ধের ফ্লাইওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছেন। লড়াইয়ের সুরু থেকেই পোন কিংপেচ জাপানের তরুণ মুষ্টি যোদ্ধা হারাদার কাছে মার খাচ্ছিলেন। একাদশ রাউণ্ডে ২ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড লড়াইয়ের পর কিংপেচ কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তিনি একেবারে মাটিতে পড়ে যাননি, দড়ির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারের গণনা শেষ হওয়ার পরও তিনি পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াতে পারেননি, লড়াইয়ে তিনি জাপানের হারাদার কাছে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার ক'রে নেন।

কিংপেচ ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে আর্জেন্টিনার পিরেজকে পরাজিত ক'রে ফ্লাইওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছিলেন। এই নিয়ে কিংপেচ তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রাখতে চারবার অবতীর্ণ হলেন। কিংপেচের বর্তমান বয়স ২৬ বছর। কিংপেচ তাঁর বিশ্ব খেতাব হারিয়ে এইবারের লড়াইয়ে ২,২৫,০০ টাকা উপার্জন করেছেন।

বিশ্ব অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতা

জাপানের টোকিও শহর থেকে ৮০ মাইল দূরবর্তী কাওয়ানা ফুজি গলফ মাঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব অপেশাদার গলফ প্রতিযোগিতায় ১৯৬০ সালের বিজয়ী আমেরিকা পুনরায় জয়লাভ ক'রে উপর্যুপরি দু'বার 'আইজেনহাওয়ার ট্রফি' পেয়েছে। এই প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালে। প্রথম বছরে অস্ট্রেলিয়া আইজেনহাওয়ার ট্রফি জয় করে এবং অস্ট্রেলিয়ান দলেরই খেলোয়াড় ডগলাস ব্যাচিলি 'আইক ট্রফি' পান। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে নিয়ে ২৩টি দেশ যোগদান করে। ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন—ক্যাপ্টেন পি জি সেথী, আর কে পীতম্বর, এ এস মালিক এবং জে এইচ ফোরম্যান। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পায় কানাডা, তৃতীয় স্থান বৃটেন এবং আয়ারল্যাণ্ড ও চতুর্থ স্থান নিউজিল্যাণ্ড।

॥ বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা ॥

বুলগেরিয়াতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ৩১.৫ পয়েন্ট পেয়ে বিশ্ব খেতাব লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া ছ'বার বিশ্ব খেতাব লাভ করলো। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, তৃতীয় স্থান আর্জেন্টিনা এবং চতুর্থ স্থান যুক্তরাষ্ট্র।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ ॥

আজমীঢ়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ৫৮ পয়েণ্ট অর্জন ক'রে প্রথম স্থান লাভ করে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল
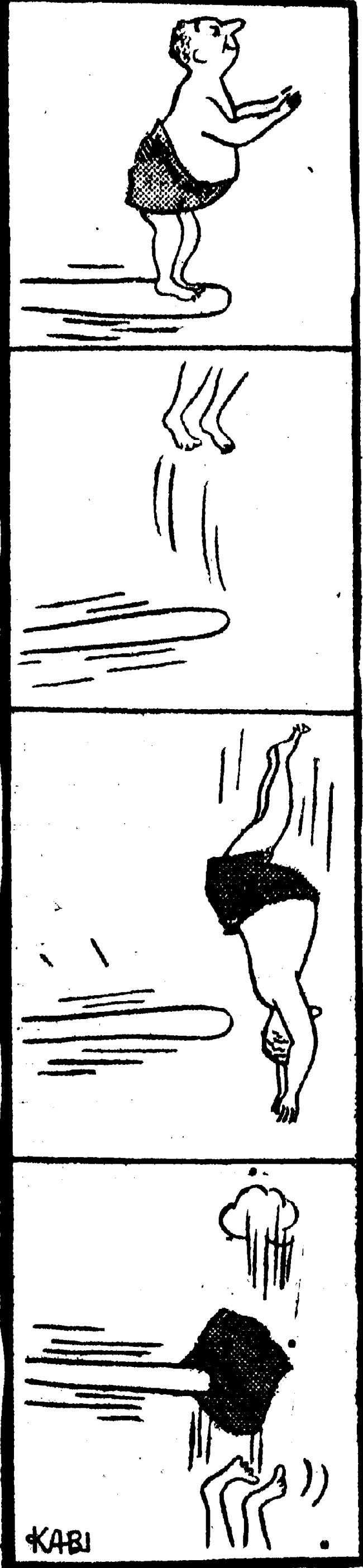
৩৫ পয়েণ্ট ক'রে দ্বিতীয় স্থান পায়। তৃতীয় স্থান পায় দিল্লী ১৫ পয়েণ্ট ক'রে। ওয়াটার পোলোর ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী বোম্বাই ৮—৫ গোলে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে। ক'লকাতার এই পরাজয়ের প্রধান কারণ, এই দলের কয়েকজন সাঁতারু ভারতীয় ওয়াটার পোলো দলের সঙ্গে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন; ফলে শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব হয়নি।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ছাত্র এবং ছাত্রী বিভাগের ফাইনালে (দক্ষিণাঞ্চল) বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয় জয়লাভ করেছে। ছাত্র বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই দল ৩—০ খেলায় ওসমানিয়াকে পরাজিত করে; অপরদিকে ছাত্রী বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩—১ খেলায় ওসমানিয়া দলকেই পরা-জিত করে।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ॥

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতি-যোগিতার উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩—২ গোলে গৌহাটিকে পরাজিত ক'রে সুলতান আমেদ কাপ লাভ করে। সেমি-ফাইনালে যাদবপুর দল ৩—১ গোলে বিহারকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গৌহাটি দল ৪—২ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোয়ার্টার ফাই-নালের খেলায় বিহার ৩—১ গোলে গত বছরের বিজয়ী ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে।

মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেল-বার যোগ্যতা লাভ করে উত্তরাঞ্চলের বিজয়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিজয়ী মহীশূর দল। প্রথম দিনের খেলা ৪—৪ গোলে ড্র যায়। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

দ্বিতীয় দিনে প্রবল বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত উভয় দলকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবল টেনিস

মহিলা বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই দল ৩—১ খেলায় পুণাকে পরাজিত করে।

॥ পরলোকে হেনড্রেন ॥

গত ৪ঠা অক্টোবর লণ্ডন হাসপাতালে ইংল্যাণ্ডের প্যাট্সি হেনড্রেন ৭৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৮৮৯ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি লণ্ডনের নিকটবর্তী চিজউইকে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। এলিয়াস হেনড্রেন ক্রিকেট জগতে 'প্যাটসি' নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শুধু একজন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত নন; খেলার মাঠে এবং মজলিসে তিনি ছিলেন রসরাজ 'প্যাটসি'। তাঁর কথায় এবং দেহের ভঙ্গিমায় হাসির ফোয়ারা বয়ে যেত। খেলার মাঠে প্যাটসির দুটি ভূমিকা ছিল—ক্রিকেট খেলায় এবং হাস্য-কৌতুকে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া এবং তিনি এই দুই বিষয়ে দর্শকদের নিরাশ করেন নি।

প্যাট্সি হেনড্রেন

বাল্যকালেই হেনড্রেন ক্রিকেট খেলায় তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দেন। খেলোয়াড়-জীবনে তিনি বোলার হিসাবে হাতে-খড়ি নিয়ে পরে ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন। কিন্তু তিনি ক্রিকেট খেলার প্রাচীন পদ্ধতির আদর্শা-নুসারী ব্যাটসম্যান ছিলেন না। সেই দিক বিচার ক'রে অনেকেই হেনড্রেনকে সর্ব-কালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সম্মান দিতে দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু হেন-ড্রেনকে সেই সব সমালোচকদের মতবাদ

কোন বাধা দিতে পারে নি। সর্বসাধারণের কাছে হেনড্রেন সর্বকালের ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর খেলার মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রাচীন পদ্ধতির যথেষ্ট অভাব ছিল সত্য, কিন্তু তাঁর ব্যাটিং পদ্ধতির মধ্যে চমৎকারিত্বের কোন অভাব ছিল না। হেনড্রেনের ভাঁড়ারে অনেক রকমের জোরালো এবং দর্শনীয় মার জমা থাকতো। ফিল্ডিংয়ে তাঁর সমকক্ষ বিশেষ ক'রে 'ডিপে' খুব কমই ছিলেন।

হেনড্রেন ছিলেন মিডলসেক্সের খেলোয়াড়। তিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন ১৯২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। হেনড্রেন তাঁর ৪৮ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৫১টা টেস্ট ম্যাচ খেলেন। টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ৮৩ ইনিংসের খেলায় ৯বার নট-আউট, মোট রান ৩৫২৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান—নট-আউট ২০৫ (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৩০), সেঞ্চুরী ৭টা, গড় ৪৭·৬৩। প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফল : ইনিংস ১,৩০০, নট-আউট ১৬৬ বার, মোট রান ৫৭৬১০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩০১ নট-আউট, সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৭০ এবং গড় ৫০·৮০। প্রথম শ্রেণীর খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী করার রেকর্ড করেছেন—জ্যাক হবস, ১৯৭টা সেঞ্চুরী। তাঁর পরই হেনড্রেনের স্থান। হেনড্রেন তাঁর ১৭০টা সেঞ্চুরীর মধ্যে ১৯টা সেঞ্চুরী করেন বিদেশের মাটিতে।

কাউন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হেনড্রেন এক মরসুমের খেলায় হাজার রান করেছেন ২৫ বার।

এক মরসুমে তিন হাজার রান করেন তিনবার—১৯২৮ সালে ৩৩১১ রান, ১৯৩৩ সালে ৩১৮৬ রান এবং ১৯২৩ সালে ৩০১০ রান। তা'ছাড়া একাধিক বার তিনি এক মরসুমে দু' হাজারের বেশী রান (তিন হাজার নয়) করেন। ১৯২৯-৩০ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে তাঁর মোট ১৭৬৫ রান (১৮ ইনিংস, নট-আউট ৫ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫৪, সেঞ্চুরী ৬ এবং গড় ১৩৫·৭৬) আজও রেকর্ড হিসাবে গণ্য—অর্থাৎ পরবর্তী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ইংল্যান্ডের অপর কোন খেলোয়াড় হেনড্রেনের এই রেকর্ড রান আজও অতিক্রম করতে পারেন নি।

হেনড্রেন ফুটবল খেলাতেও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে ওয়েলসের বিপক্ষে খেলেছিলেন।

।। ভারতীয় ওয়াটার পোলো দল ।।

ভারতীয় ওয়াটার পোলো দল সম্প্রতি রাশিয়া সফর শেষ ক'রে স্বদেশে ফিরে এসেছে। রাশিয়া সফরে ভারতীয় দল পাঁচটি খেলায় যোগদান ক'রে মাত্র একটি খেলায় জয়লাভ করে। তাসখন্দের সিনিয়র চ্যাম্পিয়ান দল ১২—৬ গোলে, কিরগিস্তানের চ্যাম্পিয়ান দল ১১—৯ গোলে, তাসখন্দের সম্মিলিত দল ৭—৪ গোলে, পুঞ্জের কাজাকিস্তানের সিনিয়ার ওয়ার্কার্স দল ১৩—৫ গোলে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। ভারতীয় দল ৫—৪ গোলে পুঞ্জের রানার্স-আপ দলকে কেবল পরাজিত করে।

রাশিয়া সফরে ভারতীয় ওয়াটার পোলো দলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ স্থান পেয়েছিলেন;

তরুণ গোস্বামী, বেণী তালুকদার, পি মিত্র, সমীর দাঁ, অমল পাল, অমর দাস (রেলওয়ে), দিলীপ দেব, রাইচাঁদ দে, নির্মল চন্দ্র, সলিল মুখার্জি, অশোক বিশ্বাস (বাংলা), সমীর কাপাডিয়া ও অনিল মানেরিকার (বোম্বাই)।

বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

জাকার্তার পর ম্যানিলায় রাজনীতির খড়্গহস্ত খেলাধুলার পবিত্রতা নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। ম্যানিলায় আসন্ন চতুর্থ বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় তাইওয়ানকে নিয়ে ষোলটি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী নির্দেশে নিরাপত্তার প্রশ্নে রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়াকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফলে ফিলিপাইন সরকার স্থানীয় সাংবাদিক এবং ক্রীড়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। ফিলিপাইন বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মিঃ লিওনার্ডো গুইনটো বলেছেন, সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল ফেডারেশন ম্যানিলায় আয়োজিত আসন্ন চতুর্থ বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতাটি অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারেন। তিনি বলেন, সকলেই আশা করেছিলেন, সরকার পক্ষ ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে রাজনীতির প্রভাব দূরে সরিয়ে রাখবেন। মিঃ গুইনটো সরকারপক্ষকে তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে আবেদন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছিলেন যে, তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলে তিনি এসোসিয়েশনের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। ফিলিপাইনের পক্ষ থেকে তাইওয়ানকে (ফর্মোজা) আমন্ত্রণ করায় রাশিয়া ইতিমধ্যেই এই আমন্ত্রণের প্রতিবাদে প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না জানিয়ে দিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুগোশ্লাভিয়া ম্যানিলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

ম্যানিলার সাংবাদিকদের বক্তব্য এই যে, ইন্দোনেশিয়ান সরকার যখন জাকার্তায় বিগত চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে তাইওয়ান এবং ইসরাইল রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক প্রশ্নে বাদ দিয়েছিল তখন ফিলিপাইন এই সরকারী অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়েছিল; কিন্তু আজ চতুর্থ বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় ফিলিপাইন সরকারই ইন্দোনেশিয়ার নীতি অনুসরণ করেছে। ফিলিপাইন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট অভিযোগ এই যে, ফিলিপাইন আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সভ্য হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ম ভঙ্গ করেছে।

এদিকে জাতীয়তাবাদী চীনের (তাইওয়ান) দাবী তারা এই প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন নামে স্বীকৃতি চায়; অন্যথায় তারা ম্যানিলায় আয়োজিত চতুর্থ বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

ফিলিপাইনের বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ চিটো কামো বলেছেন যে, সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে বাস্কেটবল সংস্থা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে পত্রদ্বারা বাস্কেটবল সংস্থার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। পত্রে বলা হয়েছে, যদিও ক্রীড়ানুষ্ঠানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে কিন্তু দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন তার অনেক উর্ধ্বে। এবং এই কারণেই রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া দলকে 'ভিসা' দেওয়া যায় না। পত্রে আরও বলা হয়েছে, সরকার খেলাধুলার উন্নতির প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করাই যুক্তিযুক্ত।

আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল ফেডারেশনের দপ্তর থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ম্যানিলার বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

॥ ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা হতে ১২শ সংখ্যা ॥
শুক্রবার ২৮শে বৈশাখ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ—১১ই শ্রাবণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
শুক্রবার ১১ই মে ১৯৬২—২৭শে জুলাই ১৯৬২

অমৃত

অমৃত

অমৃত

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের

বঙ্কিমচন্দ্র ৫.০০

[বাংলা সাহিত্য ও সংবাদক্ষেত্রে দিক্‌পাল হেমেন্দ্রপ্রসাদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানি হেমেন্দ্রপ্রসাদের একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি ও মতবাদসমূহের এমন বিশ্লেষণমূলক, যুক্তিবলিষ্ঠ ও প্রমাণসহ ব্যাখ্যা একমাত্র হেমেন্দ্রপ্রসাদের মত সুপণ্ডিত ও ভূয়োদ্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব]

প্রাণতোষ ঘটকের

রত্নমালা (সমার্থাবিধান) ২.৫০

(DICTIONARY OF SYNONYMS)

[বাংলাভাষা অনন্ত সম্পদশালিনী। ইহার শব্দ-সম্পদ অসীম ও অতলস্পর্শী। ছাত্র-ছাত্রী হইতে সাহিত্যসেবী পর্যন্ত সকলেরই আপন ইচ্ছা, রুচি ও প্রয়োজন মত শব্দসমূহের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক। একই শব্দের সম-অর্থবোধক অসংখ্য শব্দ আভিধানিক পদ্ধতিতে পরিবেশিত হইয়াছে এই গ্রন্থে]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ৩.৫০

[লেখক বলছেন—"সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে দেখেছি, এক একটি অপরূপ মুহূর্ত, যে-মুহূর্তের মধ্যে একটা যুগের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। একজন মানুষের মধ্যে দিয়ে যে-মুহূর্তে সভ্যতার রথ একদিনে এক শতাব্দীর পথ পেরিয়ে গিয়েছে, সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস হলো প্রাণের সূত্রে গাঁথা এইসব দিব্য মুহূর্তের মালা। সেই সব অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ছোট্ট বাতায়নের ভেতর দিয়ে আজকের পৃথিবীর বিচিত্র সাধনাগুলিকে দেখতে চেষ্টা করেছি।......এইভাবে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসটাকে বাংলা ভাষায় রূপ দেবো। এই গ্রন্থখানি হলো তারই প্রথম প্রয়াস।"
মোট ২০টি বিশিষ্ট ঘটনার খণ্ড-মুহূর্তের বিবরণ]

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই আশ্বিনের বই

'বনফুল'-এর

দশভাণ ও আরও কয়েকটি ৫.০০

[শিক-কাবাব, লেহ্য, জল, অবাস্তব, নব সংস্করণ, বানপ্রস্থ, কবয়ঃ, আকাশ নীল, অন্তরীক্ষে, ১৩ই শ্রাবণ (১৩৪৮), কবিতা-বিভ্রাট, ঝুলন পূর্ণিমা, নমুনা, অশ্রুর উৎস, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি সর্বমোট পনরোটি একাঙ্ক নাটিকায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ]

বিশিষ্ট কয়েকখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ

রাজশেখর বসুর

বিচিন্তা ২.২৫

[একখানি সারগর্ভ প্রবন্ধ-গ্রন্থ। বিষয়সূচী ঃ ইহকাল পরকাল, কবির জন্মদিনে, ভেজাল ও নকল, বাঙালীর হিন্দীচর্চা, সাহিত্যিকের ব্রত, ভারতীয় সাহিত্য, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, জাতিচরিত্র, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, নিসর্গচর্চা প্রভৃতি]

বিনয় ঘোষের

বাদশাহী আমল ৬.০০

[ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ের-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে। মূল ফরাসী বইয়ের ইংরাজী বহু বিচিত্র সংস্করণ সারা পৃথিবীর পাঠকদের চাহিদা মিটিয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এমন সুখপাঠ্য তথ্যটীকা সমৃদ্ধ রূপায়ণ এই প্রথম। পড়তে পড়তে মোগল যুগের পরিবেশে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়]

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের

বাংলা কাব্যে শিব ১০.০০

[লেখক শৈব সাহিত্য পর্যায়ে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র থেকে দ্বিজ রামচন্দ্র এবং অন্যান্য স্বল্পখ্যাত কবিদের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।...একেবারে সাম্প্রতিক কাব্য বাদ দিলে লেখক বাংলা কাব্যের প্রায় সব যুগের শিবরূপের আলোচনা করেছেন]

বিমলচন্দ্র সিংহের

বিশ্বপথিক বাঙালী ৫.০০

[বাঙালী সমাজ ও সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধের সমন্বয়]

রাসসুন্দরী দাসীর

আমার জীবন ২.৫০

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা ও দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত গ্রন্থ-পরিচয় সমৃদ্ধ এক বর্ষীয়সী ধর্মপ্রাণা মহিলার আত্মজীবনী]

শ্রীভাস্করের

আপনার অর্থভাগ্য ২.০০

[মানুষ তার নিজের কর্মশক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা ও কর্মনৈপুণ্যের দ্বারাই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। এর অভাবে ভাগ্যবৈকল্য দেখা দেয়। নিজের জন্ম রাশিচক্র বিচার করে অর্থ-ভাগ্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন কোথায় গ্রহ-প্রভাব অনুকূল আর প্রতিকূল—। সরল সহজ প্রাঞ্জলভাবে লেখা]

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

আমরা ও তাঁহারা ৩.২৫

[গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। বিষয়-সূচী ঃ বিরোধের কথা, স্বরের কথা, সঙ্গীতের কথা, মনের কথা, দেশের কথা, বিপ্লবের কথা, সাহিত্যের কথা—মানদণ্ড ইত্যাদি]

সুবোধ ঘোষের

অমৃত পথযাত্রী ৩.৭৫

[মহাত্মা গান্ধীর বিরাট জীবন ও নীতির তাৎপর্য অল্পের মধ্যে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ [illegible] গ্রাম 'কালচার'

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৯ই কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 26th October, 1962
40 Naya Paise.

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে রাজ্যশিক্ষামন্ত্রীদের এক দুইদিনব্যাপী সম্মেলন হয়। সেখানে সভাপতির ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে এল শ্রীমালী বলেন যে রাজ্যসরকারগুলি কর্তৃক নির্বাচিত কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক শুধু উৎকর্ষ হিসাবে হীন নয়, তাহার কোন কোনটিতে শিক্ষাবস্তুরূপে এমন পদার্থ দেওয়া আছে যাহাতে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ও পরস্পরের প্রতি ঘৃণারও সৃষ্টি হইতে পারে। সরল ও অল্পমতি বালক-বালিকাদিগের মন পাঠ্যপুস্তক দ্বারা স্থায়ী-ভাবে প্রভাবিত হয় এবং সেই কারণে তাহাদের হাতে উচ্চ আদর্শযুক্ত উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক না দিতে পারিলে শিক্ষাবিভাগ কর্তব্যচ্যুতির দোষে অপরাধী হইবে। সুতরাং ঐরূপ হীন শ্রেণীর ও কুশিক্ষাযুক্ত পাঠ্য-পুস্তককে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্বাচন করা কোন মতেই বরদাস্ত করা যায় না, এইরূপ অবস্থাকে সমর্থন করা তো দূরের কথা।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ঐ মন্তব্যগুলি অতি সমীচীন এবং অত্যন্ত কালোপযোগী, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু এই বিরূপ অবস্থার প্রতিকারের পথ কোন দিকে? শ্রীযুক্ত মালী রাজ্যশিক্ষামন্ত্রীদিগকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে পাঠ্যপুস্তককে প্রচলিত করিবার পূর্বে যেন তাহা বিদ্বানমণ্ডলী ও শিক্ষাব্রতী-দের দ্বারা তাঁহারা যাচাই করাইয়া লহেন। এই উপায়টি ঠিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—যদি ঐ সরকার-নির্দিষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলী ও শিক্ষাব্রতী ভেজাল বা মেকীর পর্যায়ে না পড়েন। সুতরাং সমস্যা দাঁড়ায় পরীক্ষককে পরীক্ষা করবার প্রশ্নে।

পাঠ্যপুস্তক এখন বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে—অন্য ব্যবসায়েরই মত—এমন অনেক কারবারি প্রবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের মূল-মন্ত্র ভেজাল ও মেকী চালাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন। ইঁহাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন একদিকে কতকগুলি তথাকথিত শিক্ষাব্রতী ও বিদ্বান, যাঁহারা ন্যায়-নীতি-আদর্শ এই সবকিছুই পাশে সরাইয়া নগদ টাকার পিছনে ছুটিতেছেন ,এবং অন্যদিকে আছেন শিক্ষা-দপ্তরের কতকগুলি মহাশয় ব্যক্তি যাঁহারা দেশের সন্তানসন্ততির শিক্ষাদীক্ষাকে সম্পূর্ণ গৌণ ব্যাপার মনে করেন এবং তাঁহাদের এই অবহেলার সুযোগে ঐ বিভাগে দুর্নীতিপরায়ণ যাহারা আছে, তাহারা মেকী ও ভেজাল কারবারিদিগকে সোনার ফসল তোলায় সাহায্য করে—অবশ্য নগদ শুল্কের পরিবর্তে। এরূপ অবস্থায় পাঠ্যপুস্তক নামক পণ্যদ্রব্য বাজারের অন্য সকল পদার্থেরই মত ভেজাল ও মেকীর চাপে বিকৃত ও দুষ্ট হইয়াছে।

আগেকার দিনে পাঠ্যপুস্তকের মান উচ্চস্তরে বাঁধা থাকিত দুই কারণে। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান যাঁহারা করিতেন তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিদ্যাদান করার জন্য। সুতরাং পুস্তকে ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে বা কুশিক্ষার বীজ থাকিলে তাঁহারা হয় সে পুস্তক বর্জন করিতেন বা তাহার উপায় না থাকিলে নিজে সংশোধন করিয়া লইয়া সেইমত ছাত্রদিগকে শিখাইতেন—যতদিন না উন্নততর মানের পুস্তক পাওয়া যাইত। হীনমানের পুস্তক একবার বিক্রয় হইয়া দ্বিতীয়বার আর সহজে চলিত না।

দ্বিতীয় কারণ ছিল বিদ্যালয়ে কিছু উপরে উঠিলেই উৎকৃষ্ট বিদেশী পাঠ্যপুস্তক ছেলেমেয়েদের হাতে আসিত। তাহার সহিত এক পংক্তিতে না হইলেও কাছাকাছি যদি না হইত তবে আঞ্চলিক ভাষার বই টিকিতে পারিত না। আজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা-দিগের যে আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাঁহাদের নিকট আদর্শবাদ প্রত্যাশা করাই ভুল। উপরন্তু আগেকার দিনে দরিদ্র শিক্ষকও যে মান-সম্ভ্রমের অধিকারী ছিলেন, আজিকার এই দুর্নীতিপূর্ণ ও চোরাকারবারজনিত অর্থ-কলুষিত সমাজে তাঁহাদের সে মান-মর্যাদা দেয় কে? সুতরাং তাঁহাদের নিকট এই অবস্থার প্রতিকার—অর্থাৎ শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা পরীক্ষা—অসম্ভব বলিলেই চলে।

দ্বিতীয় উপায় আজ ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি, কিন্তু উহার নামে যে মেকী ও ভেজালের বন্যা আসিয়াছে তাহাকে নয়।

কবিতা

দগ্ধভাষ্য

আনন্দ বাগচী

হয় না সকল বলা, সব লেখা, সব গান গাওয়া
বাইরে মূর্তিমান আলো, রোদ্র থেকে খসে পড়ে যায়
সাঁঝের যমুনা যেন ঘর বাহিরের সন্ধ্যাবেলা—
কেউ ডোবে স্বহৃদয়ে, কেউ বা ডোবায় অন্ধকারে—
দু চোখের অন্ধকারে, কালো হরিণ চোখের চমকে
কত ট্রেয় পুড়ে ছাই, সফেন সমুদ্র কত লাল।
হয় না সকল বলা, ব্যক্তিগত প্রতিধ্বনি ফেরে
কত যৌবনের রন্ধ্রে, কত অলৌকিক উপাখ্যানে
দিনগত পাপক্ষয় গৃহশিল্পে, ম্রিয়মাণ প্রদীপের নীচে
পতঙ্গের মত প্রাণ, পড়ে থাকে দগ্ধভাষ্য তার।

কবিতা

চতুর্দশপদী

বটকৃষ্ণ দাস

দয়া চাই না, হে ঈশ্বর। ক্ষমাভিক্ষা করি না স্বগত।
যেহেতু সবাই তার স্বরচিত বৃত্তের অধীন
এবং স্বকৃত পাপে প্রজ্জ্বলিত, তাই অর্বাচীন
প্রার্থনায় অবিশ্বাসী, ভিক্ষায় অনীহ আপাতত।

নিয়ত নিমজ্জমান, আমি এক অন্তরঙ্গ স্রোতে।
কোনোদিন সূর্যকান্তি নাবিকের দৃপ্তকণ্ঠে কোনো
গানের ধ্রুপদী ধ্বনি শুনিনিক'। অথবা কখনো
দেখিনি অরণ্যরেখা দূর দ্বীপে উৎকীর্ণ আলোতে।

চারিদিকে রাত্রি আর অন্ধকার সিন্ধুর হুঙ্কার—
বিপুল জঠর, যোনি। বহুশ্রুত সাফল্যের গান
বিচূর্ণ মাস্তুলে দেখো নির্বিকার অতলে শয়ান,
হাঙরে চিবায় কৃতী জাহাজের রক্তমাংসহাড়।

পাদপ্রদীপের আলো নিভে গেলে স্বয়ম্ভু নায়ক
দর্পণে নিজেকে দেখে অসহায়, ক্লান্ত বিদূষক।।

হৃদয়ের বড় কাছে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

হৃদয়ের বড় কাছে নির্জনতা, প্রেম যার নাম।
কান পাতলে শোনা যায় অনুজ্জ্বল আলোর প্রপাত
মনে হয় যেন দূর সূর্যাস্তের ক্ষয়িষ্ণু বিষাদ
বুকের গোপনে জমা অবাঞ্ছিত শব্দ অবিরাম।

বুঝি অভিজ্ঞতা আর নিয়ে যেতে পারবে না দূরে।
বিপুল পৃথিবী জোড়া বহুবর্ণ বিচিত্র ঘটনা
অই উদ্যানে আর হয়ত বা কখনো যাব না—
ছায়া শুধু মৃত্যু দেবে রূপবতী কবোষ্ণ দুপুরে।

সন্নিকটে বনভূমি কোলাহল জটিল পল্লবে।
সহস্র পাখীরা নিত্য আসে যায় সময়ের পাশে
বিষাক্ত তীরের স্পর্শ অতর্কিতে কেউ ভালবাসে
কেউ স্থির নিভে যায় সমর্পিত দ্রুত কলরবে।

চতুর্দিকে সমর্পিত বহুবিধ শব্দ অবিরাম
হৃদয়ের বড় কাছে নির্জনতা, প্রেম যার নাম।

আমি বললাম, 'তোমার ভয় করে না?'

গণেশ বলল, 'কীসের ভয়?'

'যদি ধরা পড়ে যাও?'

'কেন? বেআইনীটা কোথায়?'

'ঐ যে লিখেছ গ্র্যাজুয়েট?' আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'তুমি তো আর সত্যি সত্যি বি. এ. পাশ করনি! বলতে গেলে কলেজেই পড়নি তুমি। বেআইনী হল না এটা?'

গণেশ একটু উচ্চাঙ্গের হাসি টেনে বলল, 'বৎস, তুমি যা বলেছ সবই সত্য। কিন্তু প্রণিধান কর, আমি যে বি. এ. পাশ এ কথা তো ঘুণাক্ষরেও আমি কবুল করিনি কোথাও।'

এবার আমার রাগ হ'তে লাগল। বিরক্ত হ'য়ে বললাম, 'মলাটের ওপর লেখনি—বাই অ্যান এক্সপীরিয়েন্সড্ গ্র্যাজুয়েট?'

'লিখেছি। কিন্তু সে লোকটা যে আমি একথা তো বলা হয়নি! আমার চেনাজানার মধ্যে তুমি, শিবপদ, ছোট-মামা, আমার মেসের রুমমেট শচীন এরা সকলেই তো গ্র্যাজুয়েট। আর সত্যিই যদি আমি কোনো বিপদে পড়ি, তোমরা সকলে আমাকে সাহায্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস।' বলে একটু থেমে গণেশ জুড়ে দিল, 'কিন্তু এসব কিছু হবে না। বইগুলোর মধ্যে তো কোনো ভুল নেই?'

'কী ক'রে জানলে?' আমি বললাম।

'ওটা ট্রেড সিক্রেট।' গণেশ চোখ টিপে বলল, 'পার্টনার হও, তারপর বলব। কিন্তু তার আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।'

'নিশ্চয়ই!' চায়ের ফরমাস পাঠালাম বাড়ির ভিতরে।

কিন্তু আনুপূর্বিক ব্যাপারটা আগে বলে নেওয়া দরকার। গণেশ আমার বাল্যবন্ধু, ইস্কুলেও কিছুকাল আমরা একসঙ্গে পড়েছি। অবশ্য খুব বেশিদিন নয়। বয়সে বোধকরি বছর দুয়েকের বড় ছিল, গোড়ার দিকে পড়ত সে আমার চেয়ে দু ক্লাস ওপরেই। কিন্তু পড়াশোনায় সে ভাল ছিল না। বলতে গেলে বোকাই ছিল। ফেল করত প্রায় প্রতি বছরই। তবে ফেল করতে-করতেও এক সময় সে ওপরের ক্লাসে উঠত। কর্তৃপক্ষই তু'লে দিতেন। এইভাবে এক-এক ক্লাসে বছর তিনেক থাকার পর ওপরে উঠতে-উঠতে তার আদি সহপাঠীরা নাগালের বাইরে চলে যেত, নিচের ছাত্রেরা এসে তার সহপাঠী হত। এইভাবে আমিও একবার তার সহপাঠী হ'য়েছিলাম। কিন্তু ক্লাসে সে খুব মজা করত বলে এক বছরেই তার সঙ্গে ভাব জমেছিল যথেষ্ট।

কয়েকটা ঘটনা এখনো আমার স্পষ্ট গাঁথা রয়েছে মনে।

পড়াশোনা সে কোনোকালেই করত না। কিন্তু তার জন্যে সে ঘাবড়াতো না এতটুকু। পড়া ধরলে সটান উঠে দাঁড়িয়ে যা মনে আসে গড়গড় করে বলে যেত একটানা। তার এই চটপটে ভাবটা খুবই ভাল লাগত আমাদের। আমরা তার তারিফ করলাম।

একবার বাংলার স্যার একটা রচনা লিখতে দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, এমন সময় কী কথায় হাসাহাসি শুরু হল ক্লাসে। ক্রমে মাস্টার মশায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটল। তিনি চোখ মেলে হুংকার দিয়ে বললেন, 'বড্ড হাসি যে, অ্যাঁ? আচ্ছা দেখাচ্ছি। মানে বল্, ইউ গণেশ—স্ট্যান্ড আপ।'

'ইয়েস সার।' গণেশ উঠে দাঁড়াল।

'সরোবর মানে কী?'

'সমুদ্র স্যার।'

'আই সী! প্রতিভা মানে?'

'প্রভাতকাল স্যার।'

'বটে! শর্বরী মানে?'

'শকুন স্যার, শকুন।'

সেদিন সমস্ত ঘন্টা ধরে গণেশকে কানধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হ'য়েছিল।

এই গণেশ, এখন একজন পাঠ্য-পুস্তকের লেখক। তার ইচ্ছে যে আমি কিছু টাকা দি'লে নিজেই ছাপিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে।

আমি বললাম, 'টাকা দিই বা না দিই, সিক্রেট-টা আমাকে বললে ক্ষতি হবে না কিছু তোমার। ও ব্যবসা আমি করতে যাচ্ছি নে। বল তো দেখি এখন, ছাই-পাঁশ যা লিখছ তা বাজারে ছাড়ছ কোন ভরসায়?'

চা এসে গিয়েছিল, গণেশ আরাম ক'রে চুমুক দিয়ে বলল, 'একেই বলে হস্তিমূর্খ। পড়াশোনা ক'রে কিছু বুদ্ধি হয়নি তোমার। আচ্ছা শোনো। আমি যেসব বিষয়ে লিখি, বাজারে সে বিষয়ে অনেক বই আছে। প্রথমে কিছু টাকা ইনভেস্ট করে এইরকম যে কোনো সাবজেক্টের ওপর ডজনখানেক বই কিনতে হয়। তারপর সপ্তাহ দুয়েক ধরে অধ্যয়ন এবং অপহরণ। ফলং...সাড়ে বত্রিশ ভাজা। অত্যন্ত সোজা ফরমুলা!'

'অ!' ঢোক গি'লে বললাম, 'কিন্তু সব বইয়ে তো শুধু এক্সপীরিয়েন্সড্ গ্র্যাজুয়েট দিলে চলবে না, নামও তো দিতে হবে?'

'দেব বই কি?' গণেশ হ্যা হ্যা করে হেসে ফেলে বলল, 'একেবারে ছেলে-মানুষ। রয়ালটি দিলে নাম পেতে অসুবিধে কী?......শুধু চাই ম্যানেজ করা!'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। তারপর বললাম, 'কাজটা কিন্তু ভালো নয়, গণেশ। ছেলেদের লেখাপড়া নিয়ে এরকম ফাটকাবাজি আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তাছাড়া লোকে আমাকে সৎ মানুষ বলে জানে, সে ধারণাও আমি নষ্ট হ'তে দিতে পারিনে।'

'তবে—?'

'কিন্তু কথা হল, তুমি এসেছ। তুমি আমার বাল্যবন্ধু—!'

'তাহলে—?'

'দেব কিছু। তবে তোমাদের বউদির নামে। আমি এর মধ্যে নেই।'

'ভাইরে, তোর পায়ের ধুলো দে!' গণেশের সারাগায়ে যেন কাতুকুতু খেলে গেল।

মতামত

॥ অভিযান প্রসঙ্গে ॥

মহাশয়,

১৯-১০-৬২ তারিখের অমৃতের 'মতামত' স্তম্ভে প্রকাশিত শ্রীযুত শান্তিগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত 'অভিযান প্রসঙ্গে' পত্রটির জন্য তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর মতের সঙ্গে আমিও একমত। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ রায়ের অত্যাধুনিক চলচ্চিত্র 'অভিযান' সার্থক সৃষ্টি, তথা বাংলা চলচ্চিত্র-জগতেরও এক নবতম অভিযান। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত রায়কেও আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

'অভিযানের' কাহিনী গড়ে উঠেছে ট্যাক্সি-ড্রাইভার নরসিং-এর দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত চক্রবর্তী ঐ চরিত্রটির যে পরিবর্তনের কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য হলেও, আর একটু ভাববার অবকাশ আছে।

নরসিং তার নিজেরই গাড়ি চালায়, সে মদ্যপান করে এবং সে rush driveও করে—সব মিলিয়ে সে একজন typical driver। তথাপি তার মনের মধ্যে আছে বড় হবার, নিজের পায়ে সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের মধ্যে সহজভাবে দাঁড়াবার এবং চলে-ফিরে বেড়াবার আকাঙ্ক্ষা। তাই সে মানুষের কাছে দাবী করে 'তুমি' নয় 'আপনি'। সে হ'তে চায় না 'ছোটলোক'—সে আর পাঁচজন ভদ্র-পরিচিত লোকের মতই বেড়াতে চায়। কিন্তু তা' হলে কি হবে, সে যে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার—তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাকে তার ঈপ্সিত পথে চলতে বাধার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর তার মানসিক complex বা contrast সে রাজপুত! সে নীলিদির কাছ থেকে এতটুকু ভাল ব্যবহার পেয়ে ভাল-হ'ত চেয়েছে, হতেও গেছে, কিন্তু শুরুতেই সেই নীলিদির ব্যবহারেই সে চরম আঘাত পেয়েছে। এইভাবে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা সাধারণ ট্যাক্সি-ড্রাইভারসুলভ নয়, আঘাতের পর আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, আর ততই তার মনের মধ্যেকার স্বাভাবিক হিংস্রবৃত্তিটা চাগিয়ে উঠেছে এবং সেই দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত তাকে জয়ী করেছে। এখানেই নরসিং-চরিত্রের সার্থকতা। সুতরাং আমার মনে হয়, যদি শ্রীযুত রায় ঐ চরিত্রটিকে কোন রকমে পরিবর্তন করে আমাদের সামনে আনতেন, তা' হয়তো যথার্থ হ'ত না।

শ্রীযুত রায়কে, তাঁর সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের সাধনা এবং সেই সাধনার পরম-প্রাপ্তিতে পৌঁছনোর জন্য তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

নমস্কারান্তে—শ্রীতারাপদ পাল
গড়িয়া, ২৪ পরগণা

(২)

মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত একটি সুন্দর বাংলা ছবি 'অভিযানের' যোগ্য সমালোচনা পড়ে সত্যই আনন্দিত হলাম। ছবি অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার অধিকারী। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনতে সক্ষম হয়েছে এবং পৃথিবীর জনসমক্ষে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি অন্যতম আসন দিতে পেরেছে তাই তাঁর ছবিতে কোন ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য থাকলে সেটা উল্লেখ করা উপযুক্ত বিবেচনা করেই আমি আপনার পত্রিকা মারফৎ একটি কথা জানাতে চাই। স্রোতের মুখের নুড়িতে শেওলা জমা অসম্ভব হলেও দু'একটা ঠোকাঠুকির ঘা যে থাকতে পারে না এমন নয়। অভিযান চিত্রের অতি দ্রুত মোটরগাড়ীর মত কাহিনীও সবেগে আপন পথে এগিয়ে চলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্যে সামান্য চটা ওঠার দাগ পাওয়া গেছে বলে আমার মনে হয়।

এই ছবিতে প্রথম ত্রুটি যা আমার মনে হয়েছে তা হচ্ছে যোশেফের ফিরে আসার পর তার বোনের সম্বন্ধে কোন সংবাদ না নেওয়া। যোশেফ এস-ডি-ও'র সঙ্গে যাবার সময় সিংজী তাকে ভরসা দিয়েছিল যে তার দায়িত্বে বোনকে রেখে সে নিশ্চিন্তে এস-ডি-ও'র সঙ্গে যেতে পারে। যোশেফ ফিরে আসার পর সিংজীর সঙ্গে এ বিষয়ে একটা সংলাপ থাকা উপযুক্ত বলেই আমি মনে করি।

দ্বিতীয়তঃ সিংজীর যোশেফের বাড়ীতে কেক্ খাওয়ার দৃশ্যটা suspense create করবার জন্যে যে অহেতুক বিলম্ব করা হয়েছে তা সত্যজিৎবাবুর বইতে একটু অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, সুখনরামের কাছ থেকে সিংজী যে লাইটারটা গ্রহণ করেছিল তা মেকী ভদ্রলোক হবার একটা acceptance হিসেবেই দেখান হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সিংজী যখন তা পরিত্যাগ করে যাচ্ছে তখন সেটা তার প্রিয় বন্ধুকে উপহারস্বরূপ দিচ্ছে যা acceptance cancel করার সংকেত হিসেবে দেখান হচ্ছে তা ঠিক বোঝা যায় না। বিশেষতঃ যোশেফের কাছে এর প্রকৃত মালিক অজ্ঞাত বলেই দেখান হয়েছে।

নমস্কারান্তে
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নৈহাটি, ২৪ পরগণা।

॥ বিজ্ঞানের কথা ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৬২) তারিখে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার 'কল্পতরু নারিকেল' (বিজ্ঞানের কথা—পৃষ্ঠা ঃ ৬৮২) প্রবন্ধটি পড়ে অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। 'বিজ্ঞানের কথায়' এ জাতীয় তথ্যবহুল আলোচনা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নারিকেল গাছের পুনর্যৌবন প্রাপ্তির ঘটনা নিঃসন্দেহে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল বৃদ্ধি করবে বলে আমার ধারণা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদ আপনাকে জানাতে চাই। কোলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রাণীতত্ত্ববিদ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান) মহাশয় প্রায় ১০।১২ বছর যাবৎ ব্যাঙাচির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত আছেন। এই সম্বন্ধে যতদূর খবর আমি বিভিন্ন পত্রিকায় দেখেছি—তাতে এই গবেষণার ফলাফল আশাপ্রদ বলে মনে হয়। একই সময়ে ধরা ব্যাঙাচিকে দুই ভাগ করে—এক ভাগকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের দ্বারা বছরের পর বছর ব্যাঙাচি অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়েছে। আর এক ভাগ সেই সময়ের মধ্যে (এদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয় নি) ডিম পেড়ে বুড়ো হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছে। এই সম্বন্ধে মাসিক বসুমতীতে (মাসটা মনে নেই) শ্রীপরিমল গোস্বামী 'স্মৃতি-চিত্রণে' (২য় কিস্তি) সামান্য কিছু আলোচনা করেছিলেন।

যাই হোক—এই গবেষণার বিষয়ে 'অমৃত' পত্রিকায় 'বিজ্ঞানের কথায়' কিছু আলোচনা করলে পাঠক-পাঠিকা কিছু নতুন তথ্য জানতে পারবেন কি-না—আশা করি, আপনি তা ভেবে দেখবেন। ধন্যবাদান্তে—ইতি

রাণী মজুমদার
কলিকাতা—৬

সঙ্গীতাচার্য আলাউদ্দীন খান : শতবর্ষের পথিক

পান্নালাল দত্ত

এই মাসেই আচার্য আলাউদ্দীন খান শততমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হইবে না এত অধিক বয়স। কিন্তু কাল তাহার এতদিন ধরিয়া নির্ভুল হিসাব রাখিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানের রসস্বরূপতা তাঁহার মধ্য দিয়া অতি আশ্চর্য কৌশলে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সুর-লহরীই তাঁহার বাণী।

১৮৬৩ খৃঃ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের জন্ম হয় অবিভক্ত বাঙলার অন্তর্গত ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার শিবপুর গ্রামে। পিতার নাম সদু খান। সদু খান সাধু প্রকৃতির ছিলেন। সংসারে থাকিয়াও তিনি সাংসারিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে ছিলেন। অধিকাংশ সময় সেতার বাজাইয়া আখড়ায় আখড়ায় সময় কাটাইতেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের মাতা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মাতার ইচ্ছা ছিল তাঁহার পুত্রেরা আর সকলের মত লেখাপড়া করিয়া ভাল ভাল চাকুরী করে; মাতা যতই পুত্রদের লেখাপড়া শিখাইতে সচেষ্ট হইতে লাগিলেন পুত্রদেরও লেখাপড়ায় ফাঁকির মাত্রা তদোধিক বৃদ্ধি পাইল। বালক 'আলম' স্কুল পালাইয়া কোন্ সাধুর আস্তানায় সেতার বাজনা শুনিত, এইভাবে আলম সর্বপ্রথম সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁহার ছেলেদের যেন সংগীতে জগৎজোড়া নাম হয়, মান যশ হয়। পিতার মনের ইচ্ছাই পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফতাবউদ্দীন খান ছিলেন সংগীত-সাধক মহাপুরুষ ব্যক্তি। তিনি কালী-সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনা চলিত মনে-বনে-কোণে। তিনি সাতমুড়ার মনোমোহন দত্তের প্রধান শিষ্য ছিলেন। মনমোহন দত্ত গান রচনা করিয়া আফতাবউদ্দীনকে সুর বাঁধিতে দিতেন। সেই সব গানের বই-এর মধ্যে 'মলয়া', 'পাথেয়া' আজও পূর্ববঙ্গে ঘরে ঘরে সমাদৃত। সে সব সাধারণতঃ সবই ভক্তিমূলক গান। আফতাবউদ্দীন সুন্দর দোতারা বাজাইতে পারিতেন। বেহালা ও সানাই বাদনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নামের মোহ তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না বলিয়াই তিনি নিজের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে আসেন নাই। তাঁহার কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তিনি নাকি পায়ের আঙ্গুল দিয়া হারমোনিয়াম বাজাইতে পারিতেন।

আলাউদ্দীন প্রথমে তাঁহার পিতা সদু খান ও ভ্রাতা আফতাবউদ্দীনের নিকট সংগীতে হাতেখড়ি পান। তারপর বার বৎসর বয়সে কলিকাতায় পালাইয়া আসেন। কলিকাতায় তিনি বিবেকানন্দের ভ্রাতা হাবু দত্তের নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা করিয়া সংগীতের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করেন। এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় কলিকাতার দেবমন্দিরের প্রসাদী খাইয়া ও গংগার পবিত্র জল পান করিয়া কাটাইয়া দিতেন। রাত্রিতে গাড়ী-বারান্দায় নিদ্রা যাইতেন। সময় পাইলেই

আলাউদ্দীন খান

রাস্তায় তাঁহাকে 'বাঙাল' পাইয়া অন্যান্য ছেলেরা তাঁহার কান মলিয়া উপহাস করিত। কলিকাতায় নুলোগোপাল ও লাবু সাহেবের কাছেও বেহালার শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর কলিকাতার নাট্যমঞ্চে পেশাদারী বেহালা ও ক্লারিওনেট বাদক হিসাবেও ছিলেন। আলাউদ্দীন খানের সংগীত-নিষ্ঠা কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই দমিয়া যায় নাই। রামপুরের ওস্তাদ বীণকার সেনী-ঘরাণার প্রতিভূ ওয়াজীর খানের নিকট তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ নাটকীয় গল্পের মত চমকপ্রদ। আলাউদ্দীন তখন রামপুরে রাজমিস্ত্রীর জোগালীর কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছিলেন। বয়সও কুড়ির বেশী হইবে না তখন। মনে মনে প্রবল ইচ্ছা ওয়াজীর খানের নিকট তালিম গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ওয়াজীর খানের মতো বড় ওস্তাদের কাছে কেই বা তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিবে। একদিন ওস্তাদজীর মোটর যখন তাঁহার বাড়ীর সিংহদরজা দিয়া বাহির হইতেছিল, তখন বালক আলম গমনোন্মুখ গাড়ীর সামনে গিয়া গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন! আলম ওয়াজীর খান সাহেবকে তাঁহার মনের প্রবল বাসনার কথা জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি হয় তাঁহার এই ইহজীবন ওস্তাদের গাড়ীর নীচে শেষ করিবেন, নতুবা তাঁহার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। 'বাঙালী মচ্ছি খেকো'র কিছু সংগীত শিক্ষা হইবে না বলিয়া ওস্তাদজী তাঁহাকে শিখাইতে নারাজ হইলেন; তবে আলমকে তিনি তাঁর বাগানের মালির কাজে বহাল করিলেন। আলমকে থাকিতে হইত পায়খানার দুর্গন্ধময় স্থানে। একদিন ওয়াজীর খান-কৃত রাগকে আয়ত্ত করিয়া আপন মনে তাহাই সরোদে নিজের ঘরে বসিয়া বাজাইতেছিলেন। ওয়াজীর খান বাহির হইতে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তুমি চোর আছ।' ওয়াজীর খান সেই দিন হইতে আলমের সংগীত-শিক্ষার ভার নিজহস্তে লইলেন। এবং বীণা ছাড়া অন্যান্য রাজযন্ত্রগুলি তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন বলিয়া মনের ইচ্ছা জানাইলেন। এই গুরুর পদমূলে বসিয়া আলাউদ্দীনের তপস্যার প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কাটিয়া যায়। আলাউদ্দীন খানের সংগীত-শিক্ষার ইতিহাস ধৈর্য ও তিতিক্ষার ইতিহাস। বাল্যকালে যে সংগীতের বীজ তাঁহার মনের মধ্যে উপ্ত হইয়াছিল পরবর্তীকালে তাহাই তাঁহাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগীতসাধক রূপে গড়িয়া তোলে। মনের আবেগের উত্তেজনা তাঁহাকে সারাজীবন ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পিছনে ধাবিত করিয়া রাখে।

আলাউদ্দীন খানের বাজনা সুরের ও ভাবের এক অপূর্ব সমন্বয়। সরোদ কিন্তু ভারতের নিজস্ব যন্ত্র নয়, বহু বছর পূর্বে পারস্য হইতে ভারতে আসে। আলাউদ্দীন খান সাহেবের হাতে পড়িয়া এই যন্ত্র সজীবতা লাভ করে। ভাবগম্ভীর আওয়াজে এই যন্ত্রের জুড়ী মেলা ভার। বাঙালী যে সংগীতে পিছাইয়া নাই ইহা প্রমাণ করিতে তিনি বাম হাতে সরোদ, বেহালা, সুরসুঙ্গার, রবাব, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ও আত্মদর্শী আশ্চর্য এই মানুষটিকে যখনই দর্শন করিয়াছি মনে হইয়াছে কোন্ ঋষিলোক হইতে বিধাতাপুরুষ ইঁহাকে মর্তে পাঠাইয়াছেন।

নিত্য নূতন সুরের ডালি সাজাইয়া

তিনি ব্রহ্মাকে অর্ঘ দেন, ব্রহ্মা স্বয়ং যেন তাঁর নিবেদনে সাড়া দেন। নীলাঞ্জনা প্রকৃতির কোলে ভক্ত তখন শব্দব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করেন, সেই অবস্থায় আলাউদ্দীন একেবারে শিশু হইয়া যান। কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে না গেলে মানুষের সেই সুখ আসে না। সেই সুখে সুখী কতজন আছেন পৃথিবীতে? ঋষি শ্রীঅরবিন্দ একবার তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন যে, সমসাময়িক কালে ভারতে যদি কেহ আধ্যাত্ম সাধনায় অগ্রসর হইয়া থাকে, তবে সে আলাউদ্দীন। অতি শৈশব হইতেই প্রতিশ্রুতিবান আলাউদ্দীনের মধ্যে পরোপকারী মনোভাব আসিয়াছিল। মানবতার অপমান তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একবার কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর আগে আচার্যের জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শহরে তাঁহার সরোদ বাজনার প্রোগ্রাম হয়। সেই সভায় আচার্য আলাউদ্দীন আমার স্বর্গত পিতৃদেব শ্রীশ্যামকনাথ দত্তকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তখন আলাউদ্দীন খানের যথেষ্ট নাম হইয়াছে। আলাউদ্দীন কিন্তু টিকিট কাটিয়া তাঁহার জন্মস্থানবাসী বাজনা শুনুক ইহা চাহিতেন না। জেলা-শাসক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ লোকও তাঁহার বাজনা শুনিতে উদগ্রীব। কিন্তু একটি ছোট ছেলেকে তাহার টিকিট না থাকায় অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার প্রতিবাদে আলাউদ্দীন সহসা না বাজাইয়া জেলা-শাসককে নমস্কার করিয়া সভা হইতে প্রস্থান করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আলাউদ্দীন খানকে তাঁহার ভ্রাতা আয়েতআলী খানকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসেবে দিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে রাজি হন। কিন্তু আয়েতআলীর বাদনপটুতা বা নৈপুণ্যের দাম দিতেন না সেখানকার অন্যান্য শিক্ষকগণ। তাঁহার পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের ঈর্ষা হইত। ইহা জানিতে পারিয়া আলাউদ্দীন নিজেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া অন্যান্য শিক্ষকদের শিক্ষার দৌড় পরীক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের সামনেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, আয়েতআলীর বাজনাই শাস্ত্রানুগ। ঈর্ষাকারী শিক্ষকদের মুখ তখন চুন হইয়া যায়। তবে তারপরে তাঁহার ভ্রাতাকে শান্তিনিকেতন হইতে সরাইয়া লইয়াছিলেন। নিজের শিক্ষায়-দীক্ষায় তাঁহার এতবড় আত্মবিশ্বাস ছিল। সুর সাধো, সুর সাধো—এই তাঁহার উপদেশ। সংগীতকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ জীবনে অনেক খেতাব পাইয়াছেন। ভারত সরকার তাঁহাকে পদ্মভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। ভারতের অন্তরাত্মায় বাণী লইয়া তিনি প্রতীচ্যে গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দেশের জনগণ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানও দেখাইয়াছেন। কিন্তু কোনও ছোটবেলার পরিচিত বা বন্ধুজনের কাছে এখনও চিঠি লিখিবার সময় সবশেষে নিজের নামের জায়গায় পিতামাতার আদরের নাম আলমই ব্যবহার করেন। তাঁহার মধ্যে গরিমা বা আত্মম্ভরিতা বলিতে কিছু নাই, তাঁহার মুখে এখনও পূর্ববঙ্গীয় কথায় টান যায় নাই। আপাতকঠোর এই সংগীত-সাধকের চলনে বলনে কৃত্রিমতার স্থান নাই।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে একবার তাঁহাকে দর্শনের আশায় মাইহারে যাই। মাইহার মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট শহর। ইহা মধ্য রেলপথে অবস্থিত। সেই সময় মাইহারে প্রচণ্ড গরম। এলাহাবাদ হইতে ইতারসী প্যাসেঞ্জারে রাত একটায় মাইহার স্টেশনে পৌঁছিলাম। স্টেশনেই রাত্রি যাপনান্তে ভোরে এক্কা ভাড়া করিয়া 'শান্তি কুটীরে' পদার্পণ করিলাম। লাল দোতলা বিল্ডিং-এর চারিদিকে বাগান। ঢুকিবার সময় মনে হইল সাধনার ও নিষ্ঠার যজ্ঞ-বেদীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রথম দৃষ্টে যাঁহাকে নজরে পড়িল তিনিই আচার্য আলাউদ্দীন। ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া নীচের তলার হলঘরে বসাইলেন। হল ঘরে দেখিলাম ফরাস পাতা আছে। সামনে দেখিলাম তাঁহার গুরু, যাঁহার নিকট তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন,—রামপুরের ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ সাহেবের একটি তৈলচিত্র। সেই সময় মাইহারে ওস্তাদজীর কাছে থাকিয়া বেনারসের একজন ছাত্র শিক্ষালাভ করিত, নাম তাঁহার যতীন্দ্র ভট্টাচার্য। নীচের তলায় বসিয়া অপূর্ব সরোদের আওয়াজ উপভোগ করিতেছিলাম। পরে শুনিলাম পৌত্র আশিস উপরে বসিয়া একমনে রেওয়াজ করিয়া যাইতেছে। উপরে পশ্চিম দিকের কোণের ঘরটিতে তাঁহার স্থান, সেখানে অন্য কোন মানুষের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি আমাকে উপরে লইয়া গিয়া সমস্ত ঘরগুলি দেখাইতে লাগিলেন। পুত্র-পৌত্রাদির ঘর পার হইয়া দোতলার দক্ষিণদিকের কোণের ঘরটিতে আসিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘরটি ওস্তাদজীর হাতে লেখা বই-এর ঘর। নানা রাগ-রাগিণীর সম্ভারে আলমারীগুলি ঠাসা। তিনি বলিলেন,—সংগীত হইল গুরুমুখী বিদ্যা, এ বিদ্যা নানা বই-পুস্তক পড়িয়া আয়ত্ত করা যায় না।' যখনই হাতে সময় পান তখন তিনি নিজের লেখার কাজে ব্যয় করেন। সেই দিন বুঝিলাম, সংগীতের ব্যবহারিক দিকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব নয়— ঔপপত্তিক দিকেও তাঁহার সমান দখল।

বিকাল চারি ঘটিকায় প্রতিদিন তিনি মাইহার ব্যাণ্ডের শিক্ষা দিতে যান। এটি মাইহার স্টেটের রাজার আনুকূল্যে সম্ভবপর হইয়াছিল। পরিচালনার ভার মাইহারের রাজা তাঁহাকে ন্যস্ত করেন। বিন্ধ্য পর্বতের সানুদেশে এই মাইহার শহরটি, এখানে দিনমজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। ইনি আমাকে মাইহার ব্যাণ্ডের ঐকতান বাদন শুনিতে সেখানে লইয়া গেলেন। পথে বাজার পড়ে। সেখানের অগণিত জনসাধারণ পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন, এই উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ বাহিয়া স্যাণ্ড ষ্টোন-এ নির্মিত একটি দোতলা ছোট প্রাসাদে উপনীত হইলাম। প্রায় একঘণ্টা ঐকতান বাদন পরিচালনা করিয়া আমাকে লইয়া বাহির হইয়া আসেন, পথে তিনি এ যুগের সিনেমার ঐকতান বাদনের কাছে তাঁহার বাজনা দাঁড়াইতে পারে কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐকতান বাদনের সুরের মায়াজাল এখনও আমার মনের মধ্যে বেষ্টন করিয়া আছে। এ সম্বন্ধে উল্লেখ্য যে, তিনিই ভারতে রাগধর্মী ঐকতান বাদনের সৃষ্টিকারক। তাঁহার প্রথম দিকের একনিষ্ঠ শিষ্য তিমিরবরণ ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে সঙ্গীতের এই দিকটির উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন।

ওস্তাদজী সকাল আটটায় ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের তালিম দিতে বসেন, সন্ধ্যা সাতটায় বড় পৌত্র আশিস ও যতীনবাবুকে তালিম দেন। তাঁহার হাতে-কলমে শিক্ষাদানপ্রণালী বৈদিক যুগের গুরুশিষ্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। শিক্ষার্থীরা এতটুকু ভুল করিলেও রেহাই নাই। তিনি আগে রাগ-রাগিণীর দৃশ্যরূপটা বুঝাইলেন। তারপর একে একে সংগীতের ব্যবহারিক রূপ দিয়া তাহাকে পরিস্ফুট করিতে বলিলেন।

পরিশেষে একটি অবজ্ঞাত ও অনাদৃত বিষয় আপনাদের সামনে আমি তুলিয়া ধরিতেছি। আমাদের দেশে বড় বড় সংগীত-শিল্পীদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কোন উপায় নাই। কারণ এ সম্বন্ধে কোন তথ্যপূর্ণ সমালোচনা হয় না। বড় জোর কেহ বলিয়া থাকেন অমুক খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট, কিন্তু এই পর্যন্ত। হয়তো আমরা বলিয়া থাকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান, ওস্তাদ এনায়েৎ খান, আবদুল করিম খান, হাফিজ আলি খান, মোস্তাক হোসেন খান, কণ্ঠে মহারাজ প্রভৃতি ভারতের সংগীত-জগতের দিকপাল। কিন্তু ইহার বেশী জানার আগ্রহ আমাদের হয় না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তুলনামূলক সমালোচনাই শিল্পীর স্বাভাবিক নিজ বৈশিষ্ট্যগুলি জনমানসে পরিস্ফুট করিয়া তোলে—এই দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

নরউড'এর স্থপতি

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

শার্লক হোমস্ বলল, "ভাই ওয়াটসন, অপরাধ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে না বলে আর পারছি না। প্রফেসর মরিয়ার্টির শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে দিন দিনে লণ্ডন শহর যা হয়ে উঠেছে, তাতে এখানে পড়ে থাকার কোন আকর্ষণ আমার তো নেই-ই, কোন ক্রিমিন্যাল এক্সপার্টেরই থাকতে পারে না।"

"রুচিবান খুব বেশী নাগরিক তোমার সঙ্গে একমত হবে বলে আমার মনেই হয় না", উত্তর দিলাম আমি।

হেসে ফেলল হোমস্। চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে উঠতে উঠতে বলল—"বটে, বটে, এ ব্যাপারে অবশ্য আমার স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়। সমাজের লাভ হয়েছে—উত্তম কথা। ক্ষতিও হচ্ছে না কারও—শুধু বেচারা বেকার বিশেষজ্ঞদের ছাড়া। রুটি মারা গেলে ক'দিন আর মুখ বুঁজে থাকা যায় বল। মরিয়ার্টি যতদিন ফিল্ডে ছিলেন, ততদিন সকালের কাগজ খুললেই চিন্তার খোরাকের সীমাহীন সম্ভাবনায় চোখে অন্ধকার দেখতাম। অবিশ্যি একটু ইঙ্গিত, ছোট্ট একটা সূত্র—কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট আমার কাছে। ওর মধ্যেই সাড়া পেতাম তাঁর বিপুল প্রতিভার। ঠিক যেভাবে মাকড়শার জালের ছোট্ট একটা তন্তুর সামান্য কাঁপন থেকে অনুমান করা যায় কেন্দ্রের অষ্টভুজ খুদে দানবকে, ঠিক তেমনি সামান্যতম সূত্র, ক্ষীণতম ইসারা থেকেই আমি আড়ালে-থাকা তাঁর দূষিত মস্তিষ্ককে চিনতে ভুল করতাম না। ছিঁচকে চুরি, অশিষ্ট ব্যবহার, উদ্দেশ্যহীন উৎপাত—একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। কিন্তু মূল সূত্রটি যার হাতে, সে জানে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাই একই সুতোয় গাঁথা। বিজ্ঞানের যে সব ছাত্রেরা অপরাধ নিয়ে উচ্চস্তরের গবেষণা করে থাকেন, তাঁরা তখনকার লণ্ডনে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন, তেমনটি ইউরোপের আর কোনও শহরে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন—" তার হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকানো দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। আজকের অপরাধহীন লণ্ডনে সত্যিই হয়তো তার কোন আকর্ষণ নেই, কিন্তু এ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে দায়ী তো সে নিজেই।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মাত্র কয়েক মাস হল অজ্ঞাতবাস সাঙ্গ করে ঘরে ফিরেছে হোমস্। আমিও তার অনুরোধে প্র্যাকটিশ বেচে দিয়ে ফিরে এসেছি বেকার স্ট্রীটে পুরোনো বাড়ীতে। আগের মতই শুরু হয়েছে শেয়ারে থাকার পালা। আমার প্র্যাকটিশ কিনেছিলেন ভার্নার নামে একজন ছোকরা ডাক্তার। আমার কেনসিংটনের প্র্যাকটিশ এমন কিছু বিরাট নয়। কিন্তু ভার্নার অপরিসীম সঙ্কোচে আর বিনয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে গিয়ে এমনই এক বিপুল দর দিলে যা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও চাইবার সাহস আমার কোনদিনই হত না। এ রহস্য সরল হয়েছিল বেশ কিছু বছর পরে যখন জানতে পারলাম যে ভার্নার হোমসের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় এবং আমার ঐ সামান্য প্র্যাকটিশ অত চড়া দামে কেনার সমস্ত টাকাটাই এসেছে আসলে হোমসের পকেট থেকে।

হোমস্ অবশ্য যে পরিমাণে ক্ষোভ প্রকাশ করল, ঠিক সে রকম নিরামিষ জীবন আমরা এ ক'মাস কাটাইনি। নতুন করে পার্টনারসিপ্ শুরু করার পর থেকে যে নোট লেখা শুরু করেছিলাম, তা খুলতেই তার প্রমাণ পেলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মুরিলোর কাগজপত্র সংক্রান্ত মামলা ছাড়াও ওলন্দাজ স্টিম-জাহাজ ফ্রাইস্-ল্যাণ্ডের চাঞ্চল্যকর কেস নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়েছে আমাদের। ফ্রাইস্‌ল্যাণ্ডের

ঝামেলায় মাথা গলিয়ে তো মরতে মরতে বেঁচে গেছি দুজনে। জনসাধারণের দেওয়া সস্তা বাহবা আর হাততালির প্রতি চিরকালই বিমুখ তার নিরাসক্ত আর গর্বিত প্রকৃতি। তাই কড়া হুকুম জারী করে দিয়েছিল হোমস্ যেন তার সম্বন্ধে, তার কাজ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে বা তার সাফল্য সম্বন্ধে একটা শব্দও যেন না লিখি। আগেই বলেছি, এই সেদিন তার এ সব বিচিত্র সর্তের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি।

চিরকালই খামখেয়ালী শার্লক হোমস্। সেদিনও দুম্ করে নিজের বিরক্তি জানিয়ে চেয়ারে কাৎ হয়ে বসে অলসভাবে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে সকালের কাগজে। এমন সময়ে দুজনেই সজাগ হয়ে উঠলাম সদর দরজায় দারুণ জোরে ঘণ্টা বাজানোর শব্দে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে দুমদাম ঢাক পিটোনোর মত শব্দ—কেউ যেন আর একটা সেকেণ্ডও দাঁড়াতে না পেরে দমাদম ঘুঁসি মেরে চলেছে দরজার পাল্লার ওপর। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ছুটে গেল হলঘরের মধ্যে দিয়ে, তার পরেই সিঁড়ির ওপর খটাখট জুতোর আওয়াজ—এক সঙ্গে কয়েকটা ধাপ টপকে লাফিয়ে উঠলে যেমন হয় এবং পরমুহূর্তেই ক্ষিপ্তের মত ঘরে ঢুকল একটি তরুণ। বিস্ফারিত চোখ, পাণ্ডাশপানা মুখের রঙ, উস্কখুস্ক মাথায় চুল। হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দুজনের মুখের ওপর বারকয়েক চোখ বুলিয়েই তরুণটি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে। এ রকম অশোভনভাবে ঘরে ঢোকাটা খুবই অন্যায় এবং এজন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত মনে করেই চেঁচিয়ে উঠল,—"আমি দুঃখিত, মিঃ হোমস্। পাগল হতে আমার আর বাকী নেই। মিঃ হোমস্, আমিই হতভাগ্য জন হেক্টর ম্যাকফারলেন।"

এমনভাবে নিজের নাম ঘোষণা করল ছেলেটি যেন তার নাম শুনলেই যুগপৎ তার এই রকম উন্মাদের মত আবির্ভাব এবং আবির্ভাবের উদ্দেশ্য দুটোই খোলসা হয়ে যাবে আমাদের কাছে। হোমসের নির্বিকার মুখের পানে তাকিয়ে বুঝলাম যে তিমিরে আমি, সে-ও রয়েছে সেই তিমিরেই।

সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে বলল হোমস্—"সিগারেট নিন, মিঃ ম্যাকফারলেন। আমার তো বিশ্বাস বন্ধুবর ডাঃ ওয়াটসন আপনার লক্ষণ-টক্ষণ দেখে ঘুমের ওষুধ প্রেসক্রাইব করা যায় কিনা ভাবছেন। গত কদিন যাবৎ আবহাওয়াও বড় গরম গেছে। যাক, খানিকটা সামলে উঠেছেন মনে হচ্ছে, বসুন ওদিককার চেয়ারটায়। আচ্ছা, এবার বলুন তো, ধীরে সুস্থে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বলুন, কি ব্যাপার, আপনি কে এবং কি চান। যেভাবে নিজের নাম আমাদের জানালেন, তাতে মনে হচ্ছে আপনার নাম আমার আগে থেকেই জানা উচিত। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ ম্যাকফারলেন, আপনি অবিবাহিত, আপনি সলিসিটর, আপনি তান্ত্রিক গুপ্ত-সভার সভ্য, আর আপনি হাঁপানী রুগী—আপনার সম্বন্ধে শুধু এই কটা খবর ছাড়া আমার আর কিছুই জানা নেই।"

বন্ধুবরের কাজকর্মের পদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের, কাজেই ছেলেটির নোংরা জামাকাপড়, আইনসংক্রান্ত কাগজপত্রের গোছা, ঘড়ির চেনে ঝোলানো সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই-করা চাকতি আর বেদম হাঁপানো দেখেই যে সে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা বুঝতে দেরী হল না। আমাদের মক্কেল কিন্তু অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর ঢোক গিলে বলল—"হ্যাঁ, মিঃ হোমস্, আমি সব কিছুই। এই সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিতে পারেন, এই মুহূর্তে লণ্ডনের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোক আমিই। দোহাই মিঃ হোমস্, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমার গল্প শেষ করার আগেই যদি ওরা এসে পড়ে আমাকে গ্রেপ্তার করতে, ওদের কিছুক্ষণ আটকে রেখে আমাকে অকপটে যা সত্য তা বলবার সুযোগ দিন। আপনি যে আমার হয়ে তদন্তে নেমেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমি খুশীমনে হাজতে যেতে রাজী আছি।"

"গ্রেপ্তার করতে আসছে আপনাকে! শুনে খুবই সুখী—দারুণ ইণ্টারেষ্টিং লাগছে। কি চার্জে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বলুন তো?"

"লোয়ার নরউড-এর মিঃ জোনাস্ ওলডাকারকে খুন করার চার্জে।"

বন্ধুবরের মুখে মনের কোন ভাবই অপ্রতিফলিত থাকে না। তাই ম্যাকফারলেনের কথা শুনে তার মুখে সমবেদনা ফুটে উঠল ঠিকই এবং দুঃখের সঙ্গে

পরমুহূর্তেই ক্ষিপ্তের মত ঘরে ঢুকলো একটি তরুণ

লিখছি পাশাপাশি খুশীর চিহ্ন দেখলাম ফুটে উঠেছে।

"কি সর্বনাশ! এই একটু আগেই প্রাতরাশ খেতে খেতে বন্ধুবর ডাঃ ওয়াটসনকে বলছিলাম যে কাগজ থেকে চাঞ্চল্যকর খবর-টবর একেবারেই দেখছি উঠে গেছে।"

কাঁপা হাতে হোমসের হাঁটু থেকে ডেলি টেলিগ্রাফটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল ম্যাকফারলেন।

"এই জায়গাটায় চোখ পড়লেই আপনি বুঝতে পারতেন স্যার কি জন্যে সকাল বেলাই এসে পৌঁছেছি আপনার কাছটিতে। লোকের মুখে মুখে এখন ঘুরছে আমার নাম আর আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী।" মাঝখানের পাতাটা খুলে ধরল ম্যাকফারলেন। "এই যে, কিছু মনে করবেন না স্যার। আমিই পড়ে শোনাচ্ছি। হেডলাইন দিয়েছে : 'লোয়ার নরউডে রহস্যজনক ব্যাপার। প্রখ্যাত স্থপতির অন্তর্ধান। হত্যা এবং গৃহ-দাহের সন্দেহ। কে হত্যাকারী? একটি সূত্র।' মিঃ হোমস, এই সূত্র ধরেই ওরা এগিয়ে আসছে এবং আমি জানি শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হতে হবে আমাকেই। লণ্ডন ব্রীজ ষ্টেশন থেকে ওরা পাছু নিয়েছে আমার—আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুধু গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা বার করার জন্যেই ওরা যা সময় নিচ্ছে। ওঃ মিঃ হোমস, এ খবর শুনলে আমার মা...... আমার মায়ের মন একেবারে ভেঙে যাবে --কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না উনি!" ভয়ে বেদনায় দু'হাত কচলাতে কচলাতে সামনে পেছনে দুলতে লাগল ম্যাকফারলেন।

ভাল করে তাকালাম তার দিকে। খুনের অপরাধে অভিযুক্ত সে। কিন্তু তার সোনালী চুলে, সুন্দর চেহারায়, নীল নীল ভয়ার্ত চোখে এবং পরিষ্কার দাড়ি গোঁফ কামানো মুখে দুর্বল ভাবাবেগের চিহ্ন। বয়স তার খুব জোর বছর সাতাশ, জামা কাপড় হাবভাব বেশ ভদ্রলোকের মতই। গরমকালে পরার উপযুক্ত হাল্কা ওভারকোটের পকেট থেকে ঠেলে বেরোনো এক বাণ্ডিল দস্তাবেজ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার পেশার পরিচয়।

হোমস বললে—"যেটুকু সময় এখন আছে তার সদ্ব্যবহার করা যাক। ওয়াটসন, কাগজটা তুলে প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ে শোনাও তো ভাই।"

জমকাল শিরোনামার নীচেই পড়লাম ইংগিতময় সুদীর্ঘ খবরটা :

গতকাল গভীর রাতে লোয়ার নরউড-য়ে এক গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। মিঃ জোনাস ওল্‌ডাকার শহরতলীর এই অঞ্চলের বহু দিনের বাসিন্দা এবং সকলেই তাঁহাকে চেনে। বহু বছর ধরিয়া স্থপতির ব্যবসা করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন। মিঃ ওল্‌ডাকার চিরকুমার। তাঁহার বয়স বাহান্ন বছর। সিডেনহামের প্রান্তে ডীপ ডেন হাউসে তাঁর নিবাস। রাস্তার নাম-করণও তাঁর বাড়ীর নাম অনুসারে হইয়াছে। উৎকট খামখেয়াল স্বভাবের জন্যে ওল্‌ডাকারের কিঞ্চিৎ নামডাক আছে। প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অবসর জীবন-যাপনেই তিনি অভ্যস্ত। সারা জীবন তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং সঞ্চয়ও করিয়াছেন। কিন্তু কয়েক বছর হইল ব্যবসা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তিনি সরাইয়া আনিয়াছিলেন। বাড়ীর পিছনে কাঠের বরগার ক্ষুদ্র একটি স্তূপ কিন্তু আর সরানো হয় নাই। গত রাত্রে প্রায় বারটার সময় হঠাৎ দারুণ শোরগোল শোনা যায়। তাঁহার এই কাঠের স্তূপেই নাকি আগুন লাগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ দমকল আসিয়া পৌঁছালেও কিন্তু আগুন বন্ধ করা গেল না। কাঠের বরগাগুলি এমনই শুষ্ক ছিল যে দমকল বাহিনীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া স্তূপটি পুড়িয়া একেবারেই ছাই হইয়া যায়। এই পর্যন্ত সকলেই অগ্নি-কাণ্ডটিকে নিছক দুর্ঘটনা ভাবিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই গুরুতর অপরাধ সংঘটনের চিহ্ন পাওয়া গেল। আগুন জ্বলার সময়ে বাড়ীর মালিককে ধারে-কাছে কোথাও দেখিতে না পাওয়ায় সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। এখন দেখা গেল যে তিনি তাঁহার বাড়ী হইতে বেমালুম উধাও হইয়াছেন। ঘর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে রাত্রে তিনি শয্যা স্পর্শ করেন নাই। শয়নকক্ষের আয়রণ-সেফটি খোলা এবং ঘরময় বহু মূল্যবান কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত। আরও চিহ্ন পাওয়া গেল—ঘরে যেন একটি মরণ-দ্বন্দ্ব, একটি খণ্ড-প্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। সামান্য রক্তের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। একটি ওক কাঠের বেড়াইবার ছড়ির হাতলে রক্তের দাগ দেখা গিয়াছে। প্রকাশ, সেদিন বেশী রাত্রে শয়নকক্ষে মিঃ ওল্‌ডাকার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ছড়িটি তাঁহারই। ইনি লণ্ডনের একজন তরুণ সলিসিটর, গ্রেহাম ম্যাণ্ড ম্যাক-ফারলেন, ৪২৬ গ্রেসহ্যাম বিল্ডিংস, ই, সি,র জুনিয়র পার্টনার, নাম— জন হেকটর ম্যাকফারলেন। পুলিশের বিশ্বাস প্রমাণাদি যা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া অনায়াসেই অপরাধের একটা বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত মোটিভ খাড়া করা চলে। পরিণামে, অত্যন্ত শিহরণমূলক তথ্যাদি প্রকাশ পাইবে।

পরের খবর।—প্রেসে আসিবার সময়ে জোর গুজব শুনিলাম যে মিঃ জোনাস ওল্‌ডাকারকে হত্যার অভিযোগে মিঃ জন হেকটর ম্যাকফারলেনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যে বাহির করা হইয়াছে, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। নরউড-তদন্তের ফলে আরও কুটিল তথ্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। হতভাগ্য স্থপতির রুমে ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছাড়াও এখন জানা গিয়াছে যে, একতলার ফ্রেঞ্চ উইনডো-গুলিও উন্মুক্ত ছিল। হিঁচড়াইয়া জানলার মধ্য দিয়া কাঠের স্তূপ পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং কাঠকয়লা ও ছাইগাদার মধ্যে পোড়া দেহাবশেষ দেখা গিয়াছে। পুলিশের ধারণা যে, অতি চাঞ্চল্যকর একটি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। হতভাগ্য স্থপতিকে তাঁহার শয়নকক্ষে পিটাইয়া হত্যা করার পর কাগজপত্র লুঠ করা হইয়াছে এবং হত্যার সব চিহ্ন মুছিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার মৃতদেহকে টানিয়া কাঠের স্তূপে ফেলিয়া আগুন দিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্বনামধন্য ইনস্পেক্টর লেস-ট্রেডের হাতে তদন্ত পরিচালনায় দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতা ও উৎসাহ সহকারে সূত্র অনুসরণ করিয়া কাজ প্রায় সারিয়া আনিয়াছেন।

দু'চোখ মুদে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে হোমস একমনে শুনছিল এই বিচিত্র কাহিনী।

আমি থামলে পর অভ্যাসমত অলস সুরে বললে—"বাস্তবিকই বড় আজব কেস হে, বেশ কয়েকটা ভাববার মত পয়েণ্ট আছে। ভাল কথা মিঃ ম্যাকফার-লেন, যা শুনলাম তাতে তো দেখছি যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার বলেই আপনার এতক্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখনও ধরা পড়েননি কেন বুঝলাম না তো?"

মিঃ হোমস, আমার বাড়ী ব্ল্যাক-হিদের টরিংটন লজ। আমার বাবা মা-ও

থাকেন সেখানে। কিন্তু গতরাতে মিঃ জোনাস্ ওল্‌ডাকারের সঙ্গে আমার কিছু কাজ থাকায় নরউডের একটা হোটেলে আমায় রাত কাটাতে হয়েছিল। আজ সকালে ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি। ট্রেনে উঠেই কাগজে চোখ বুলোতে গিয়ে জানতে পারলাম সব। তখুনি বুঝলাম কি বিষম বিপদেই পড়েছি সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে। কাজেই, আর এক সেকেন্ডও দেরী না করে সিধে চলে এলাম আপনার কাছে আপনার সাহায্যের জন্যে। বেশ জানতাম, বাড়ী অথবা অফিস—এই দু'জায়গার কোনটিতে গেলে গ্রেপ্তার হতাম আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লণ্ডন ব্রীজ ষ্টেশন থেকে আমার পিছু নিয়েছে একটা লোক। বেশ বুঝেছি—গ্রেট হেভেন, ও কি?"

সদর দরজায় ঘটাং করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির ওপর শুনলাম ভারী জুতোর শব্দ। পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকল বন্ধুবর লেসট্রেড। কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলাম পেছনে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিশ।

ঘরে ঢুকেই পুলিশী-হুংকার ছাড়ল লেসট্রেড—"মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফারলেন।"

আমাদের ক্লায়েন্ট বেচারী রক্তশূন্য মুখে উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে।

"লোয়ার নরউডের মিঃ জোনাস্ ওল্‌ডাকারকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকাল ম্যাকফারলেন। তারপর ঝপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে এমনভাবে গা এলিয়ে দিলে যেন এইমাত্র গিলোটিনের নীচে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার।

হোমস বলল—"এক সেকেন্ড, লেসট্রেড। আধ ঘন্টার এদিক-ওদিক হলে তোমার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ভদ্রলোক সবে আদ্যোপান্ত বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ধূমকেতুর মত এসে হাজির হলে তুমি। এঁর মুখে ঘটনাটা আগাগোড়া শুনলে আমার তো মনে হয় লেসট্রেড তোমার আমার দুজনেরই উপকার হবে তাতে।"

গুম হয়ে বলল লেসট্রেড—"শুনলেই বা কি না শুনলেই বা কি। জট ছাড়ানোর কোন অসুবিধেই আমার হ'বে না।"

"তাহলেও লেসট্রেড তোমার অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোকের মুখেই আমি এ ঘটনার পুরো বিবরণটা শুনতে চাই।"

"বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন আর না বলব না। অতীতে বারদুয়েক ফোর্সকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আপনি। আপনার ঋণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কোনদিন ভুলতে পারবে না। তবে মিঃ ম্যাকফারলেন যা বলবেন, আমার সামনেই বলতে হবে এবং এ-ও জানিয়ে দিচ্ছি, তিনি যা কিছু বলবেন, সবই প্রমাণ হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধেই কাজে লাগাবো আমরা।"

ম্যাকফারলেন বলল—"আমিও তাই চাই। আমার একান্ত অনুরোধ, ধৈর্যধরে আমি যা বলতে চাই তা শুনুন এবং বিশ্বাস করুন আমার বক্তব্যের প্রতিটি অক্ষরই খাঁটি সত্য।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেসট্রেড বললে—"ঠিক আধঘন্টা সময় দিচ্ছি আপনাকে।"

ম্যাকফারলেন বলল—"প্রথমেই বলে রাখি, মিঃ জোনাস্ ওল্‌ডাকার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। পরিচয় ছিল শুধু নামের সঙ্গে। কেননা, বহু বছর আগে আমাদের বাবা মা-রা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তারপর কে যে কোনদিকে ছিটকে গেছে, তার কোন হদিশ ছিল না। সেই কারণেই গতকাল বেলা প্রায় তিনটার সময়ে তাঁকে আমার সিটি অফিসে ঢুকতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেছিলাম। আরও অবাক হলাম যখন শুনলাম তাঁর আসার উদ্দেশ্য। হাতে করে নোটবইয়ের কয়েকটা ছেঁড়া পাতায় অনেক কিছু লিখে এনেছিলেন তিনি। এই দেখুন সেই কাগজগুলো।

"টেবিলের ওপর ছেঁড়া পাতাগুলো রেখে বললেন মিঃ ওল্‌ডাকার, "এই আমার উইল। মিঃ ম্যাকফারলেন, কানুনমাফিক যা কিছু করতে হয় করুন—পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই বসে রইলাম আমি।"

"কাঁপ করতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল আমার। আমার তখনকার অবস্থাটা আপনিও খানিকটা অনুমান করতে পারবেন সব শুনলে। দেখলাম, সামান্য একটু রাখাঢাকা ছাড়া তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই আমায় দিয়ে গেছেন তিনি। ভদ্রলোকের চেহারাটা অদ্ভুত। ছোটখাট মানুষ—অনেকটা নেউলের মত খড়বড়ে। চোখের পাতাগুলো সমস্ত সাদা। চোখ তুলতেই দেখি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন উনি। উইলের সর্ত পড়তে পড়তে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু তিনিই বুঝিয়ে বললেন যে তিনি তো চিরকুমার, বয়সও হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু জীবিত আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই। আমি যখন নাবালক, তখন থেকেই আমার বাবা-মাকে চেনেন তিনি। অনেকদিন ধরেই শুনেছেন যে ছেলে হিসেবে আমি নাকি হীরের টুকরো। সেইজন্যই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আমার হাতে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ মুদতে পারবেন। আমি তো সব শুনে এমন তোৎলা হয়ে গেলাম যে সামান্য ধন্যবাদটুকুও দিতে পারলাম না। যথাবিধি শেষ হল উইল, ও'র সই হবার পর সাক্ষী হিসেবে সই করল আমার কেরানী। উইলটা লেখা হয়েছে নীল কাগজে। আর এই কাগজগুলো তো বললামই তাঁর নিজের হাতের লেখা, উইলের খসড়া। উইলের পালা চুকে গেলে মিঃ ওল্‌ডাকার বললেন যে বাড়ীর লীজ, মর্টগেজ, রসিদ, টাইটল-ডীড ইত্যাদি অনেকরকম দলিলগুলো আমার একবার দেখে এবং বুঝে নেওয়া দরকার। এসব কাজ একেবারে চুকেবুকে না যাওয়া পর্যন্ত নাকি কিছুতেই শান্তি পাবেন না উনি। তাই অনেক করে অনুরোধ করলেন, গতরাতেই যেন উইলটা নিয়ে তাঁর নরউডের বাড়ীতে যাই সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্যে। যাবার সময়ে বলে গেলেন—'তুমি কিন্তু বাবা একটা কথাও এখন তোমার বাবা মা-কে জানিও না। সব শেষ করে তারপর তাঁদের চমকে দেওয়া যাবে, কি বল?' এনিয়ে বেশ জেদাজেদি শুরু করলেন উনি এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে তবে বিদায় নিলেন।

"বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস তাঁর এই সামান্য অনুরোধ না শোনার মত মনের অবস্থা আমার তখন নেই। তিনি যা বলতেন, তাই শুনতে রাজী ছিলাম তখন। আমার যা উপকার তিনি করলেন, তা ভোলার নয় এবং তাঁর যে কোন ইচ্ছাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেয়েছিলাম আমি। বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। জানিয়ে দিলাম যে জরুরী কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় কতরাতে যে বাড়ী ফিরব তার কোন ঠিক নেই। মিঃ ওল্‌ডাকার বলে গেছিলেন নটার আগে তিনি বাড়ীতে না-ও থাকতে পারেন। কাজেই নটার সময়ে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে সাপার খাওয়ার নিমন্ত্রণও জানিয়ে গেলেন।

বাড়ী খুঁজে বার করতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল আমায়। কাজেই সাড়ে নটা নাগাদ পেঁছোলাম আমি। তাঁকে দেখলাম—"

"এক সেকেন্ড! 'হোমস্ বলল।' দরজা খুলেছিল কে?"

"একজন মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক। আমার তো মনে হল ঘরকন্নার বন্দোবস্ত তিনিই করেন।"

"আর আপনার নাম উল্লেখ করেছিলেন এই স্ত্রীলোকটি-ই, তাই না?"

"এগ্‌জ্যাক্টলি।" বলল ম্যাকফারলেন। "তারপর বলে যান।"

ঘামে ভেজা কপাল মুছে নিয়ে বলে চলল ম্যাকফারলেন—"পিছু পিছু এলাম বসবার ঘরে। পরিমিত সাপার আগে-থেকেই সাজানো ছিল সেখানে। খাওয়ার পরে মিঃ জোনাস্ ওলডাকার আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা আয়রণ-সেফ দেখলাম। মিঃ ওলডাকার সেফটা খুলে ফেলে একগাদা দলিল বার করে আমাকে দেখাতে বসলেন। দলিলের পাহাড় থেকে যখন চোখ তুললাম তখন রাত হয়েছে অনেক। এগারোটা কি বারোটা অথবা তার মাঝামাঝি হবে। মিঃ ওলডাকার আর স্ত্রীলোকটিকে বিরক্ত করতে চাইলেন না। ফ্রেঞ্চ উইনডো আগাগোড়া খোলাই ছিল—আমাকে তার মধ্যে দিয়েই বিদায় দিলেন তিনি।"

"পর্দা ফেলা ছিল কি?" শুধোলো, হোমস্।

"ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় অর্ধেক ফেলা ছিল! হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, জানলাটা পুরোপুরি খুলে দেওয়ার জন্যে পর্দাটা তুলে ধরেছিলেন উনি। ছড়িটা খুঁজে পেলাম না। মিঃ ওলডাকার বললেন—"ঘাবড়াও মাৎ বাবা, মাঝে মাঝে এখন তো দেখা হবেই। আবার না আসা পর্যন্ত ওটা আমার কাছেই গচ্ছিত থাকুক, কেমন?" চলে এলাম আমি। আসবার সময়ে দেখে এলাম আয়রণ সেফ খোলা, দলিলপত্র বাণ্ডিল বাঁধা অবস্থায় টেবিলের ওপর রাখা। এত রাত হয়ে গেছিল যে ম্যাকহিদে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়নি গতরাত্রে। তাই 'অ্যানারলি আর্মস'য়ে রাত কাটিয়ে আজ সকালে ট্রেনে উঠে কাগজে চোখ পড়তেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। এর আগে কি হয়েছে না হয়েছে, কিছুই জানি না আমি।"

চমকদার এই ব্যাখ্যান বলার সময়ে বারদুয়েক ভুরু তুলেছিল লেসট্রেড। এখন বলল—"আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, মিঃ হোমস?"

"ব্ল্যাকহিদে পেঁছোনোর আগে নয়।"

"নরউডে বলুন।" বলল লেসট্রেড।

'ও, হ্যাঁ, নরউডেই বটে।" বলল হোমস্—মুখে তার অতি-পরিচিত পেটেন্ট দুর্বোধ্য হাসি।

অনেকবার অনেক ঠোক্কর খেয়ে তবে লেসট্রেড জেনেছে এ হাসির অর্থ কি। মুখে অবশ্য কোনদিনই তা স্বীকার করেনি। কিন্তু হাড়ে হাড়ে মালুম হয়েছে, যে নিরেট কুহেলীর দেওয়ালে বৃথাই মাথা খুঁড়ে আসে তার বুদ্ধি-যুক্তি-অভিজ্ঞতা, হোমসের ক্ষুরের মত ধারালো মস্তিষ্ক তা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সত্যের শুভ্র আলোয় ঝলকিয়ে তুলতে পারে অনায়াসেই।

বিচিত্র কৌতূহল চোখে নিয়ে বলল লেসট্রেড—"মিঃ শার্লক হোমস্, দেখছি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা দরকার। মিঃ ম্যাকফারলেন, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে নীচে। দুজন কনষ্টেবল অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে বাইরে।" শেষবারের মত করুণ মিনতি-মাখানো চোখে আমাদের পানে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকফারলেন। অফিসার দুজন দুপাশে থেকে তাকে নিয়ে গেল অপেক্ষমান গাড়ীতে। লেসট্রেড কিন্তু নড়ল না।

উইলের খসড়া করা নোটবইয়ের ছেঁড়া কাগজগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ন চোখে দেখছিল হোমস্—তার সারা মুখ আগ্রহের নিবিড় রোশনাই।

কাগজগুলো লেসট্রেডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল সে,—"দলিলটায় কতকগুলো বিদঘুটে পয়েন্ট রয়েছে, তাই না লেসট্রেড?"

এমনভাবে কাগজগুলো দেখতে লাগল লেসট্রেড যেন সবকিছুই গুলিয়ে গেল তার। একটু পরে বললে—"লেখাটা পড়াও তো দেখছি বেশ মুস্কিল। প্রথম কয়েকটা লাইন বেশ পড়া যাচ্ছে, তারপর আবার দ্বিতীয় পাতার মাঝের লাইনগুলোও বেশ স্পষ্ট। আর বোঝা যাচ্ছে সবশেষের দু'একটা লাইন। এ লাইনগুলো ঠিক যেন ছাপার অক্ষরে লেখা। কিন্তু মাঝেরগুলো, বিশেষ করে তিন জায়গায় লেখা এমনই যাচ্ছেতাই যে একদম পড়তে পারছি না আমি।"

'এর মানে কি?" শুধোলো হোমস্।

"আপনি বলুন না এর মানে কি?" পালটা প্রশ্ন করল লেসট্রেড।

"মানে অতি সোজা। এটা লেখা হয়েছে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। স্পষ্ট লেখা মানে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, খারাপ লেখা মানে ট্রেন চলছিল আর একদম যাচ্ছেতাই লেখা মানে ট্রেন কোন পয়েন্টের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। যে কোন সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট এক নজরেই বলবেন যে খসড়া করা হয়েছে শহরতলীর লাইনে, কেননা কোন বিরাট শহরের একেবারে কাছটিতে ছাড়া আর কোথাও পর পর এত পয়েন্ট দেখতে পাওয়া যায় না। ধরে নেওয়া যাক, ট্রেন চলার সময়ে সারাপথটুকুই খসড়া করতে গেছে। ট্রেনটা তাহলে এক্সপ্রেস; নরউড আর লন্ডন ব্রীজের মাঝামাঝি জায়গায় থেমেছে শুধু একবারই।"

হাসতে লাগল লেসট্রেড।

"মিঃ হোমস্, আপনি যখন আপনার থিওরী নিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন, তখন আর আপনার নাগাল পাওয়া এ শর্মার কর্ম নয়। বর্তমান কেসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক তাই তো বুঝলাম না?"

"সম্পর্ক এই টুকুই যে, জোনাস্ ওলডাকার যে গতকাল নরউড থেকে লন্ডন ব্রীজ আসার সময়ে উইলটা লিখেছিলেন— ম্যাকফারলেনের এই কাহিনী অন্ততঃ এই অংশটুকুর সত্যতা প্রমাণিত হল। এরকম দরকারী একটা দলিল এমন যা তা ভাবে লেখা হয়েছে ভাবলেও অদ্ভুত লাগে—তাই না? এর অর্থ এই দাঁড়াতে পারে যে, মিঃ ওলডাকার উইলটায় কোনরকম গুরুত্বই আরোপ করেননি। উইলমতই যে সবকিছু হবে, এরকম ধারণা একেবারেই তাঁর মনে ছিল না। কার্যকর করার ইচ্ছে না নিয়ে কোন উইল যদি কেউ লেখে, তাহলে তা এইভাবেই লেখা স্বাভাবিক।

লেসট্রেড বলল—"ভুলবেন না, নিজের মৃত্যুর পরোয়ানাও লেখা হয়েছে এই সঙ্গে।"

"ওহো, তুমি বুঝি তাই মনে কর?"

"আপনি মনে করেন না?"

"হতেও পারে। কেসটা কিন্তু এখনও তেমন পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে।"

"এখনও হয়নি? এমন জলবৎ তরলং জিনিসটা যদি এখনও অপরিষ্কার

থেকে যায় আপনার কাছে, তাহলে তো আমি নাচার। এমন কি আর কঠিন ব্যাপার! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যদি একটা জোয়ান ছেলে একদিন শোনে যে বিশেষ একটা বুড়ো অক্কা পেলেই বিরাট একটা সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। তখন সে করবে কি? খবরটা পাঁচকান না করে চুপিসাড়ে বুড়োর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়ে সেই-রাতেই তাঁর বাড়ীতে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করবে সবার আগে। দেখা করার অছিলা খুঁজে বার করাটা বিশেষ কিছু কঠিন নয়। তারপর বাড়ীর বাইরে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কোথাও যতক্ষণ না বুড়োর একমাত্র সঙ্গী চাকরটার নাক ডাকতে শুরু করছে। এরপর তো খুবই সহজ। নিরালায় নিশুতিরাতে বুড়োর ঘরে ঢুকে তাঁকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেওয়ার পর লাশটাকে কাঠের গাদায় ঢুকিয়ে সবশুদ্ধ আগুন লাগিয়ে দিয়ে খোশমেজাজে বাকী রাতটা কাছাকাছি কোন হোটেলে কাটিয়ে দেওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক মিঃ হোমস্? ঘরের মধ্যে আর ছড়িটার ওপরে রক্তের দাগ যা পাওয়া গেছে, তা খুবই সামান্য। অর্থাৎ, আগে থেকেই খুনীর মতলব ছিল রক্তারক্তি না করেই কাজ সারা। লাশ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার মূলেও সেই কারণ—সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কি রকম লাগল মিঃ হোমস্? সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কি?"

একটু বেশী রকমের সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। মাই গুড লেসট্রেড, তোমার মস্ত মস্ত গুণগুলোয় কল্পনার খাদ একেবারেই নেই। কিন্তু একটু যদি থাকত, এক মুহূর্তের জন্যেও যদি বেচারা ম্যাকফালেনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে—তাহলে তুমি যতবড় দুঃসাহসীই হও না কেন, দিনে উইল করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই রাতেই বুড়ো ওলডাকারকে কি খুন করার প্ল্যান করতে? দু'দুটো অসাধারণ ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়াটা তোমার পক্ষে খুব বিপদজনক হয়ে দাঁড়াত না? আরও দেখ, খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ীতে ঢুকছে—অথচ সাক্ষী রেখে যাচ্ছে চাকরকে। এ কেমনতর প্ল্যান? সবশেষে, এত কষ্টে লাশটাকে সরিয়ে এনে কাঠের গাদায় আগুন দিলে খুনের প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে—অথচ, রক্তমাখা ছড়িটা রেখে এলে বুড়োর ঘরেই—তুমি হলে তাই করতে কি? কি হে, কি রকম বুঝছ? এসব সম্ভব বলে মনে হয়?"

"ছড়ি সম্বন্ধে বলা যায় যে, অবশ্য আপনিও তা জানেন, খুনের সময়ে এবং পরে খুনী বেসামাল হয়ে পড়ে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা করে বসে, যা ঠাণ্ডা মাথায় কারোর পক্ষেই করা সম্ভব হয় না। আবার ঘরে ফিরে গিয়ে ছড়ি আনার সাহস বোধহয় তার ছিল না। না, মিঃ হোমস্, এতে চলবে না। অন্য কোন থিওরী যদি থাকে তো দিন।"

"কম করে আধ ডজন থিওরী এই মুহূর্তেই দিতে পারি তোমায়। এখুনি দিচ্ছি একটা। খুবই সম্ভাব্য থিওরী এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখবে, আর সব গেছে, এইটাই গেছে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, সে বিচারের ভার অবশ্য তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। ফিরে যাওয়া যাক খুনের রাতে। বুড়ো ওলডাকার দামী দামী সব দলিলপত্র দেখাচ্ছেন ম্যাকফারলেনকে। ঠিক এমনি সময়ে জানলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা উড়নচণ্ডে ভবঘুরে। জানলার পর্দা মাত্র অর্ধেক নামানো ছিল—তাই ভেতরকার দৃশ্য দেখে লোভে চকচক করে উঠল ভবঘুরের দু'চোখ। এরপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। সলিসিটরের প্রস্থান। ভবঘুরের প্রবেশ। ছড়ি দিয়ে ওলডাকার নিধন। তারপর লাশসমেত কাঠের গাদায় আগুন দেওয়ার পর ভবঘুরের অন্তর্ধান।"

"কিন্তু লাশ পুড়িয়ে ভবঘুরের লাভ?"

"এ প্রশ্নের পালটা প্রশ্ন হচ্ছে—ম্যাকফারলেনের লাভটাই বা কি?"

"প্রমাণ লুকোনো।"

"খুব সম্ভব ভবঘুরেও চেয়েছিল কেউ যেন বুঝতে না পারে যে বিনাদোষে একটা বুড়োকে ইহলোক থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হয়েছে।"

লেসট্রেডের মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম, হোমসের ভবঘুরে-থিওরী শুনে মোটেই পুলকিত হয়নি সে।

"মিঃ শার্লক হোমস্, আপনি বরং আপনার ভবঘুরেকেই তল্লাশ করুন, আমি ইতিমধ্যে লেগে থাকি আমার প্রমাণের পেছনে। তারপর, দেখাই যাক না কার দৌড় কতদূর। একটা পয়েন্ট শুধু মনে রাখবেন মিঃ হোমস্, মৃতের ঘর থেকে যতদূর জানি কোন কাগজপত্র খোয়া যায়নি। আর, কাগজপত্র খোয়া না গেলে সমূহ লাভ যাঁর—এমন লোক শুধু একজনই আছে পৃথিবীতে। আইনানুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক এখন মিঃ ম্যাকফারলেন, কাগজপত্র তো যথাসময়ে তার হাতে আসছেই, কাজেই সে তা সরাতে যাবে কেন?"

কথাটা শুনে মনে হল হোমসের মনে খটকা লেগেছে।

"অস্বীকার করে লাভ নেই যে প্রমাণ-টমাণগুলো সবই তোমার থিওরীর অনুকূলে। তা সত্ত্বেও একটা কথাই শুধু বলে রাখতে চাই তোমায় লেসট্রেড—অন্যান্য থিওরী থাকা খুব বিচিত্র নয়। যাক, তোমার কথামতই দেখা যাক কার দৌড় কতদূর। গুড মর্ণিং! নরউডে, আজকে এলেও আসতে পারি। গেলে দেখতে পাব কি রকম কাজকর্ম চলছে তোমার।"

লেসট্রেড চোখের আড়াল হতেই তৎপর হয়ে উঠল হোমস্। এমনভাবে গোছগাছ শুরু করে দিলে না জানি কি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজই তাকে করতে হবে সারাদিন ধরে।

ফ্রককোটটার মধ্যে হাত গলাতে গলাতে বলল হোমস্—"ওয়াটসন, আমার প্রথম গন্তব্যস্থান হচ্ছে ব্ল্যাকহিদ।"

"নরউড নয় কেন?"

"কেননা, কেশটার পয়লা নম্বর বৈচিত্র্য হচ্ছে একই দিনে মাত্র কয়েক-ঘন্টার ব্যবধানে দু'দুটো আশ্চর্য ঘটনা। পুলিশ মনোযোগ দিয়েছে দ্বিতীয় ঘটনায়, কেননা, খুনী সরাসরি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কিন্তু আমার মতে যুক্তির পথ ধরেই যদি চলতে হয়, তাহলে প্রথম ঘটনা থেকেই তদন্ত শুরু করা উচিত। তুমিই দেখ ওয়াটসন, একটা সাধারণ উইল তৈরী করতে গেলেও যে পরিমাণ চিন্তা এবং মুসাবিদার প্রয়োজন, তার কণামাত্রও দেখা যাচ্ছে না মিঃ ওলডাকারের ক্ষেত্রে। 'উঠল বাই তো কটক যাই' এর মত দুম করে তৈরী একটা মূল্যবান উইল তৈরী হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল উত্তরাধিকার নির্বাচনও। স্বাভাবিক বলে মনে হয় কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ রহস্যের সমাধান যদি করতে পারি, তাহলেই পরের জটগুলোও খুলে আসবে আপনা হতে। না, হে, না, তোমার সাহায্য এখন দরকার হবে বলে মনে হয় না। বিপদের ঝুঁকি তো কিছু নেই। থাকলে কি আর তোমাকে না নিয়ে বেরোই। ওরকম কল্পনাও আসে না আমার মাথায়। যাই হোক, সন্ধ্যের দিকে থেকো, দেখা হবে'খন। সারাদিনের রিপোর্ট তখনই শোনানো যাবে, কি বল? ম্যাকফারলেন বেচারী এতদূর থেকে যখন এত আশা নিয়ে এসেছে আমার আশ্রয়ে, তখন আমার কিছু করা তো দরকার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

ভবঘুরের খাতা
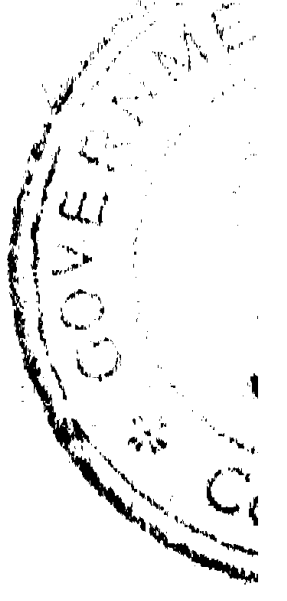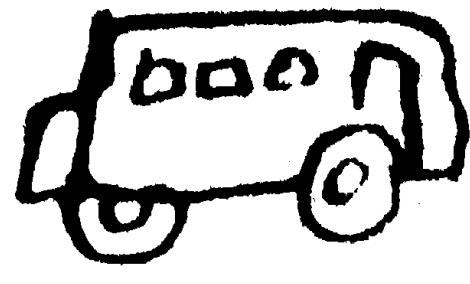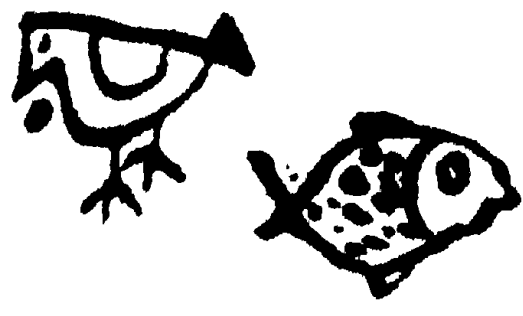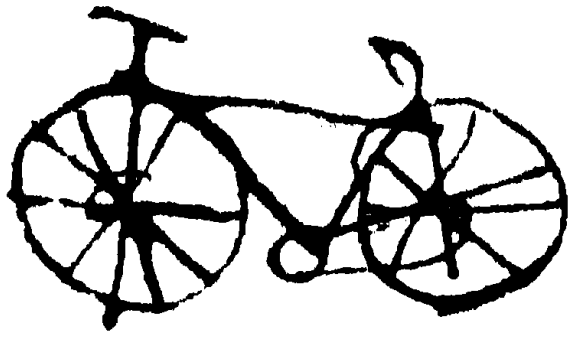
অয়স্কান্ত

॥ শারদীয় উৎসব ॥

শারদীয় উৎসব এ-বছরের মতো শেষ হল। নতুন জামাকাপড়ের নতুন-নতুন গন্ধ অনেক আগেই মিলিয়ে গিয়েছে। শারদীয় পত্রিকার ঢাউসমার্কা সংখ্যাগুলো আর কিছুদিনের মধ্যেই বাজে কাগজের ঝুড়িতে সদ্গতি লাভ করবে। যাঁরা অনেক খরচপত্তর করে বাইরে গিয়েছিলেন তাঁদেরও ফেরার সময় হল। আর কিছু-দিন পরে এই বৃহত্তম উৎসবের স্মৃতি-টুকু শুধু টিকে থাকবে ঘাটতি বাজেটের প্রাণান্তকর সমতাসাধনের প্রয়াসের মধ্যে।

তবুও পুজোর এই চারটি দিনে আমরা যেন সারা বছরের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকি। দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে এমন প্রবলভাবে বেঁচে থাকার নিদর্শন অন্য কোনো ঘটনার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক, এসব কথা পুরনো। আমরা চাই বা না-চাই, শারদীয় উৎসবের ঢেউ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্লাবিত করেছে। এমন কি সাম্প্রতিক-কালে বহু লেখকের সাহিত্য-প্রয়াসও এই একটি উপলক্ষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। সাহিত্যের পক্ষে তা ভালো কি মন্দ—সে বিচারে আমরা যাব না।

আমি এই প্রসঙ্গটি তুলেছি শারদীয় উৎসবের অন্য একটি লক্ষণের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। লক্ষণটি হচ্ছে, সর্বজনীন পুজোর সর্বজনীনতা। এক-একটি সর্বজনীন পুজোয় পরিবার-পিছু চাঁদার পরিমাণ সামান্যই। কিন্তু আনন্দের আয়োজনটি বৃহৎ ও ব্যাপক। এবং অবারিত। আমাদের জীবনে অনেক বঞ্চনা আমরা সহ্য করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামান্যতম উপকরণের সাহায্যেই যে জীবনের আনন্দের ভাণ্ডারটি পূর্ণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে—শারদীয় উৎসবের উচ্ছলতা ও উন্দামতাই তার প্রমাণ।

একশো বছর বা তারও আগে আমাদের এই কলকাতায় শারদীয় উৎসবকে কী চোখে দেখা হত?

॥ সেকালে ॥

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে বিগত শতাব্দীর শারদীয় উৎসবের কয়েকটি বিবরণ শুনুন।

"(১৭ অক্টোবর ১৮২৯। ২ কার্তিক ১২৩৬)

শারদীয় পূজা।—এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ব্বার কর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীত ইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতাদিতে যে-প্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ইহার পাঁচগুণ ঘটা হইত এমত আমাদের স্মরণে আইসে। কলিকাতাস্থ ইংরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্র-প্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেদের আপনারদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্ট করা অনুচিত হইতে পারে যে কাহারো ২ তাদৃক ধন এখন নাই। গত কতক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কয়েক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেস্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনাদের ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম।

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।......"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭—৩৮)

"(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

শ্রীশ্রীশারদীয় পূজা সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না। ......এতন্নিকটবর্ত্তি স্থান-সকলেতে শ্রীশ্রীমহামায়ার মহাপূজা মহা-ঘটাপূর্ব্বক সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না হইয়াছে এই পূজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমী পর্য্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ্‌দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রতিপদাবধি নবমীপর্য্যন্ত নাচ হয় তথায় নেক্কীপ্রভৃতি নর্ত্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে।...... শ্রীশ্রীপূজার সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতি ইঁহারা পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন হওয়া ভার ছিল যেহেতুক ইঙ্গরেজ প্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্য পথ রোধ হইত।......"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

"(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

অবশ্য পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেক স্থানে যেমন এ বৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুরদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহারও এ বৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও

ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইংরেজ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া . এমত জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন এ বৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলি গলি বেড়াইয়াছেন তথাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এ বৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাহারদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তয়কা বাই থাকিত এ বৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন ২ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন......"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৫)

॥ একালে ॥

উদ্ধৃতি তিনটি দীর্ঘ হল। কিন্তু এই তিনটি উদ্ধৃতি থেকে একশো ত্রিশ বছর আগেকার কালের শারদীয় উৎসব সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা করা সম্ভব। প্রথমত তিনটি উদ্ধৃতিতেই একটা বিক্ষোভের সুর রয়েছে যে দুর্গোৎসবে আর তেমন ঘটা নেই। কারণ ধনীরা কার্পণ্য করতে শুরু করেছেন। আমাদের কালে কিন্তু এই বিক্ষোভের মূলে কারণটিকেই উপড়ে ফেলা হয়েছে। আমাদের কালের দুর্গোৎসব ধনীদের বদান্যতার ওপরে কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অল্প-স্বল্প চাঁদাতেই একালের দুর্গোৎসবের সমস্ত কিছু আয়োজন। শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে এখন আর নাচ-গান-তামাসার আসর না বসলেও কোনো ক্ষতি নেই। কর্পোরেশনের রাস্তা বা পার্ক বা একটু-আধটু খোলা জায়গা যতোদিন আছে ততোদিন সর্বজনীন পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হতে কোনো অসুবিধে হবে না।

একালের বাইজীরা পুজোর সময়ে বেকার অবস্থায় গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ান কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু দুর্গোৎসবের অঙ্গ হিসেবে বাইনাচের আসর একেবারেই লোপ পেয়েছে। তবে নেক্কীদের আসরটি কিন্তু খালি নেই। উচ্চতম মাত্রায় বাঁধা লাউডস্পীকার গাঁক-গাঁক আওয়াজ তুলে আমাদের উৎসবের আবহাওয়াকে মুখর করে তোলে। আর এই যান্ত্রিক আয়োজনটি নেক্কীদের মতো হাজারটা বায়না তোলে না। তা এতই সুলভ ও এতই বাধ্য যে দিনরাত্রির চব্বিশ ঘন্টার সুরবিস্তারের পরেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না।

একালেও অবশ্যই শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্য আছে। কিন্তু সেজন্যে পদব্রজে লোকের গমনাগমন কোনো অবস্থাতেই ভার হয়ে ওঠে না। বরং ঠিক উলটো ব্যাপারটি ঘটে। আমরা পদাতিকরাই রাস্তায় এমন নিশ্ছিদ্র ভিড় জমিয়ে তুলি যে শকটাদির ও যানবাহনের গমনপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। খুব সম্ভবত শকটবান ব্যক্তিরাও বাধ্য হয়ে এ-সময়ে আমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে পদাতিক হয়ে ওঠেন।

এমনিভাবে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, যদিও একশো ত্রিশ বছর আগেকার কালের তুলনায় আমাদের জীবন সবদিক থেকেই অতি ছন্নছাড়া—কিন্তু শারদীয় উৎসবের আনন্দ আমাদের জীবনে অনেক বেশি পরিপূর্ণ। তবে এতক্ষণের আলোচনার পরেও যদি এ-বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে আমাদের কালের সবচেয়ে আশ্চর্য অবদানটি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত হওয়া দরকার।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি একালের ভাসান-নাচ সম্পর্কে বলতে চাই।

ভাসান-নাচ নামটা হয়তো ঠিক হল না। এ নাচের কোনো নাম নেই। তবে সাধারণত প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাবার সময়ে একদল কিশোর ও যুবককে এই নাচ নাচতে দেখা যায়।

ওপরে একশো ত্রিশ বছর আগেকার কালের শারদীয় উৎসব সম্পর্কে যে তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার প্রত্যেকটি-তেই নাচের কথা আছে। একটি উদ্ধৃতিতে নাচের বিষয়ে অখ্যাতির কথাও বলা হয়েছে। অন্য দুটিতে আক্ষেপ যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য ক্রমে ক্রমে অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, সেকালে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। আসর তৈরি করা, নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো, পান-ভোজনের আয়োজন করা—এসব আনুষঙ্গিকের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু যেমন-তেমন একজন বাইজীকে ডাকতে হলেও মোটা রকমের দক্ষিণা কবুল করার প্রয়োজন ছিল।

একালে কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। কর্পোরেশনের পিচ-বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তাই হয়ে ওঠে আসর, উঁচু পোস্টের মাথায় ইলেকট্রিক বাতিই ঝাড়লন্ঠন, আর ফুটপাথে ও বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষই দর্শক। দক্ষিণা দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তারিফ জানাবারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তবে, হ্যাঁ, নাচের জন্যে বিশেষ একটি পোশাকের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। একটি ট্রাউজার (সাদা বা রঙীন দুই-ই চলতে পারে), তবে পায়ের দিকটা গুটিয়ে থ্রি-কোয়ার্টার করে নেওয়া চাই। পায়ে জুতো না থাকলেও ক্ষতি নেই, থাকলে ভালো। মোজা থাকাটা বাহুল্য। শার্ট যে-কোনো ধরনের চলবে। তবে ট্রাউজারের বেল্টটি খুব বাহারে হওয়া চাই। মাথায় রুমাল বাঁধা যেতে পারে। তবে রুমাল থাকুক বা না-থাকুক, অবশ্যই থাকবে বেলুন দিয়ে তৈরী একটি বিচিত্র ধরনের মুকুট। আরো দু-একটি বেলুন কোমরের বেল্ট থেকেও ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এমনি আরো নানাবিধ আনুষঙ্গিক সজ্জার মধ্যে দিয়ে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় যতো বেশি দেওয়া যাবে ততোই নাচের আসর খোলতাই হবে।

তবে এ-নাচের বর্ণনা দেবার চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ শুধু বর্ণনা পড়ে এ-নাচ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা ক্যান-ক্যান নাচ দেখেছেন, বা হুলা-হুপ, বা টুইস্ট, বা এমন কি আমাদের দেশের ধুনুচী-নাচ—তাঁদের মনে হবে, বিশেষ বিশেষ নাচের দু-একটি মুদ্রাকেই মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে। হিন্দী সিনেমাতে এ-নাচের কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে মাত্র। অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় এই নাচ খুব সম্ভবত কলকাতার তরুণ সম্প্রদায়েরই মৌলিক একটি অবদান।

নাচের সঙ্গে অবশ্যই বাজনদার থাকবে। থাকবে সঙ্গত ধরার আয়োজন। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অতিমাত্রায় সরলীকৃত। নাচের আসরকে ঘিরে শুধু একটি আওয়াজ উঠবে ঃ হেই-হেই। আর সঙ্গে সঙ্গে শিস দেওয়া চলতে থাকবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকীদেরও এই সুরের সঙ্গে সঙ্গত ধরতে দেওয়া যেতে পারে।

আমি এখানেই থামছি। আমার ভয় হচ্ছে, এই নাচ সম্পর্কে একটু বেশি বলতে গেলেই কথাগুলো ঠাট্টার মতো শোনাতে পারে।

তবে আশা করি, আমার মূল বক্তব্যটি এতক্ষণে স্পষ্ট করতে পেরেছি। ভেজালে ও অপুষ্টিতে জীর্ণ আমাদের শরীর, অভাবে ও অনটনে সংকুচিত আমাদের জীবনযাত্রা, সংস্কারে ও অন্ধ বিশ্বাসে ভারাক্রান্ত আমাদের মন—তবুও এই আমরাই সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে জয় করে আমাদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আয়োজন থেকেই শারদীয় উৎসবের আনন্দটি পুরোমাত্রায় গ্রহণ করতে পারি।

আমরা যে বেঁচে আছি—এই তার প্রমাণ। আমাদের তরুণদের আমরা শিক্ষা দিতে পারিনি, চাকরি দিতে পারিনি, ভবিষ্যতের কোনো আশ্বাসই দিতে পারিনি—তবুও যে তারা কলকাতার রাস্তায় নেচে নেচে পথ চলতে শিখেছে সেজন্যে আমাদের খুশি হওয়াই উচিত।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ঊনত্রিশ ॥
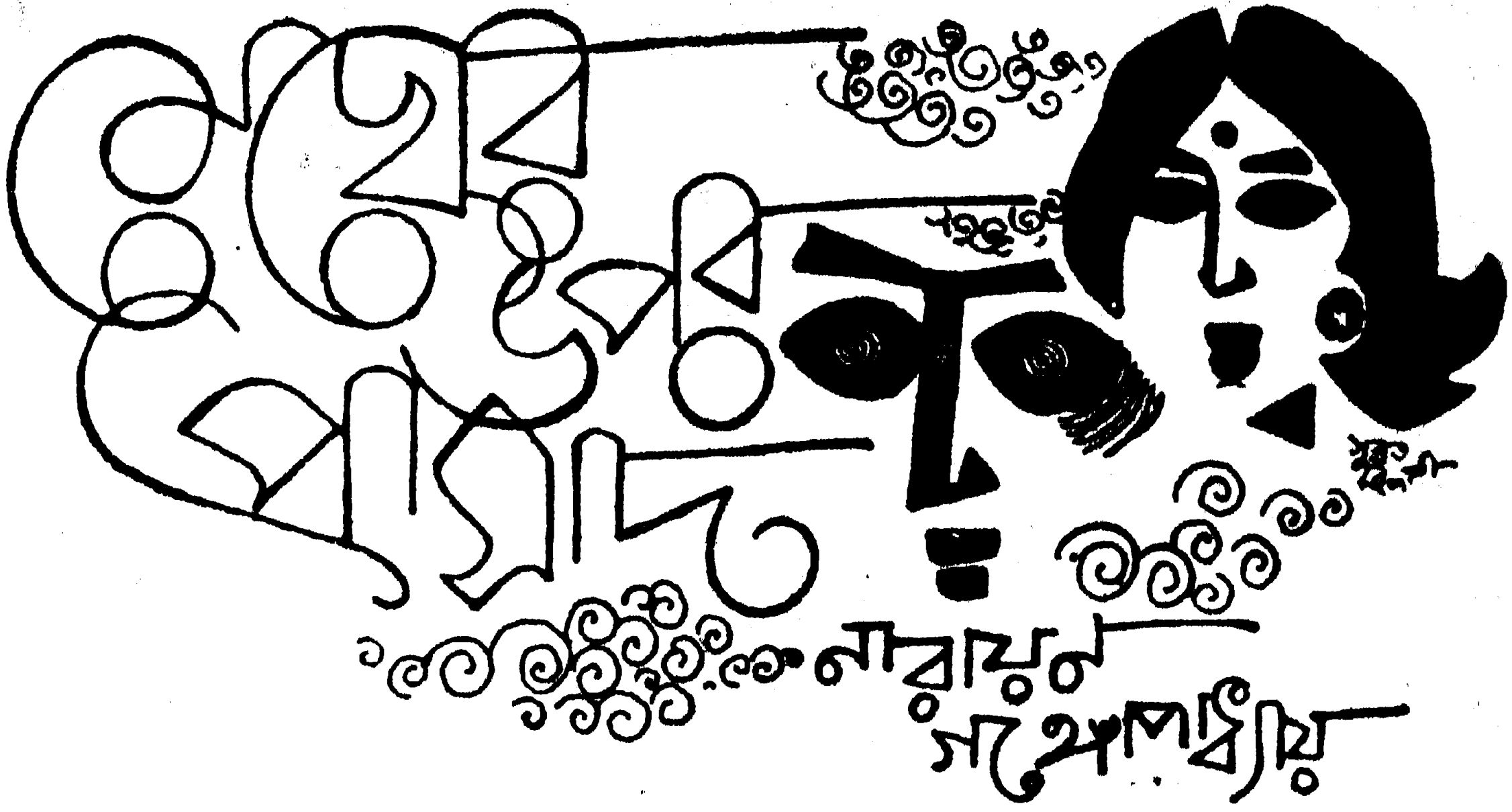
প্রভাত দীপ্তিকে দেখতে এল। দিন চারেক বাদেই।

—ভালো আছো?

—ভালো আছি।

—কোনো অসুবিধে নেই?

—কিছু না।

তারপর কয়েক মিনিট চুপচাপ। কী বলা যেতে পারে, কী নিয়ে আলাপটাকে দীর্ঘায়িত করা যায়। গৌরাঙ্গবাবুর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেবার পর একমাত্র এই মেয়েটির সঙ্গেই প্রভাত কোনোদিন খুব বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারেনি। সামান্য একটা দূর-আত্মীয়তার সূত্রে যেটুকু সৌজন্য, এক বাড়ীতে থাকার জন্যে যেটুকু স্বাভাবিক পরিচয়। নিজের স্বাধীনতা আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে এই মেয়েটি বাপ-মা, ভাই-বোনের কাছ থেকেও অনেকটা আলাদা হয়ে থেকেছে বার বার। তার চলাফেরা নিয়ে মধ্যে মধ্যে কটু মন্তব্য করেছে অভয়, জীবনের সোজা পথ ধরে দীপ্তি চলছে না এ নিয়ে প্রভাতের মনে সন্দেহ থাকেনি—গঙ্গার ঘাটের সেই সন্ধ্যাটা নিতান্তই তার চোখের ভুল নয়। আর কখনো কখনো তার কাছে এসে কেঁদে ফেলেছে তৃপ্তি: 'দিদি অনেক টাকা আনে, কিন্তু একেবারে গোল্লায় গেছে, মদ খেয়ে বাড়ী ফেরে রাত একটা-দেড়টার সময়।'

কিন্তু দীপ্তি যা খুশি করতে পারে, তা নিয়ে প্রভাতের মাথাব্যথা নেই। প্রভাত তার অভিভাবক নয়—তার ভালো-মন্দ নিয়ে দুর্ভাবনা প্রভাতের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। শুধু তাকে নবদ্বীপে নিয়ে আসার জন্যে একটুখানি অনুরোধ জানিয়েছিল—সে কর্তব্য তার করা হয়ে গেছে। ট্রেন-ভাড়াটা দিয়েছিল, দীপ্তির তা ভালো লাগেনি।

যে জিনিসটা প্রভাতকে লজ্জার চাবুক মারছিল, সেটা ট্রেনের সেই নাটকটুকু তৈরী করা। কেমন যেন মনে হয়েছিল, দীপ্তির সম্মান বাঁচানোর জন্যে—রাণীর কাছে নিজের মর্যাদা রাখবার জন্যে এটুকু বীরত্ব তার দেখানো দরকার। কিন্তু বীরত্বটা বেশিক্ষণ টেঁকেনি। নবদ্বীপে পৌঁছে যখন মরীয়া হয়ে বলেছিল যে দরকার হলে সারা জীবন সে দীপ্তির ভার বইতে রাজী আছে, তখন তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। প্রথম কথা, দীপ্তিকে সে ভয় পায়, তার চাইতেও বড়ো কথা দীপ্তিকে নিয়ে ঘর করবার মতো মনের জোরও কি তার আছে?

আজ চোখে পড়ল দীপ্তি কপালের সিঁদুর মুছে ফেলেছে। সেই কুমারী সিঁথিটি তেমনি চকচক করছে, একটি রক্তচিহ্ন কোথাও নেই।

যে বিশ্রী একটা ক্লেদাক্ত জাল তাকে জড়াতে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে দীপ্তি নিজেই কি মুক্তি দিয়েছে তাকে? প্রভাত বুঝতে পারল না। দু-একটা কৌতূহলী প্রশ্ন জেগে উঠতে চাইল, কিন্তু কথা বাড়াতে সাহস হল না তার। প্রায় মাস তিনেক সময় আছে হাতে। ভাবনা এবং দুর্ভাবনার সুযোগ যথেষ্ট পাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার অনাবশ্যক খানিকটা ফাঁকা আলোচনার সূত্রপাত করল প্রভাত।

—এখানকার বন্দোবস্ত বেশ, তাই না?

—হ্যাঁ, ভালোই।

—রাণী খোঁজ-খবর নেয়?

—দুবেলাই আসেন। সকলের সম্পর্কেই ও'র সমান ইন্টারেস্ট।

প্রভাত একটা বিড়ি ধরালো, সেটা শেষ করল কয়েকটা দ্রুত টানে, তারপর উঠে দাঁড়ালো।

—তবে চলি আজ।

দীপ্তি দোতলার বারান্দা পর্যন্ত বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

—একটা কথা বলব প্রভাতদা?

—নিশ্চয়।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দীপ্তি চোখের দৃষ্টি সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল—যেখানে একরাশ গাছপালা আর মন্দিরের চূড়ো ছাড়িয়ে গঙ্গার খানিকটা সাদা জল ঝক-ঝক করছে। সেইদিকে তাকিয়ে থেকেই বললে, আমাকে দেখতে আসবার জন্যে তোমার মিথ্যে এভাবে সময় নষ্ট কিংবা ট্রেন-ভাড়া খরচ করবার কোনো দরকার নেই।

প্রভাত হাসতে চেষ্টা করল: সে আমি বুঝব।

দীপ্তি বললে, না। তুমি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছ প্রভাতদা—সে ঋণ

আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু এখন দয়া করে আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। চেনা মানুষ বেশি না এলেই আমার ভালো লাগবে।

এক মুহূর্তে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রভাতের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। দীপ্তির কপালে সিঁদুর পরাবার কোনো দরকার ছিল না। সেই অকারণ ছেলেমানুষি শুধু তার নিজের লজ্জাই বাড়িয়েছে, পৃথিবীর কারো কাজেই তা লাগেনি।

একটু চুপ করে থেকে প্রভাত বললে, আচ্ছা। চলি তবে।

দীপ্তি জবাব দিল না।

অফিস-ঘরে রাণীর সঙ্গে দেখা হল। প্রথম দিনের মতোই টেবিলে বসে কী যেন লেখাপড়া করছিল সে।

—চললে প্রভাতদা?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

—আবার কবে আসছ?

—দেখি।

দীপ্তির মতোই রাণীর সঙ্গে ছোট ছোট কথা, ছাঁটা-কাট আলাপ। রাণী আজ একবারও তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল না, যেন প্রথমদিনের পরেই সতর্ক হয়ে গেছে সে।

পথে নেমে মনে হল, সে এখানে অনাবশ্যক, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। দীপ্তি আর রাণীর মধ্যে কোথাও যেন চুক্তি হয়ে গেছে একটা, তার মধ্যে প্রভাত সরকারের কোনো ভূমিকা নেই কোথাও। অভিমান? কার ওপরে—কিসের দাবীতে? পাঁচ বছর আগেকার দিনগুলোকে শ্লেটের লেখার মতো মুছে দিয়েছে রাণী—এমন কি সেই বীভৎস দুর্ঘটনার জন্যেও সে প্রভাতকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দেয় না। আর দীপ্তি? অবস্থার বিপর্যয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কাছে এসেছিল, আবার তার নিজের বৃত্তের ভেতরে সরে গেছে সে—প্রভাত সরকার তার কেউ নয়।

ডান হাতের তর্জনীটা যেন জ্বালা করতে লাগল। সিঁদুরে কি পারা মেশানো থাকে—এতদিন পরেও বিষক্রিয়া হতে পারে তার? প্রভাত ঠিক বুঝতে পারল না। রাস্তার একটা কল দিয়ে জল পড়ছিল, প্রভাত এগিয়ে গেল সেদিকে, অকারণেই কচলে কচলে ডান হাতের আঙুলগুলোকে পরিষ্কার করতে লাগল।

একটা খবর দীপ্তিকে দেবার ছিল তার। কাকীমা অত্যন্ত অসুস্থ—করোনারী অ্যাটাক। কিন্তু কী হত জানিয়ে? কী করতে পারত দীপ্তি? মিথ্যেই খানিকটা দুর্ভাবনা চাপিয়ে দেওয়া হত তার ওপর।

স্টেশনের দিকে চলতে চলতে মনে পড়ল রিনিকে। এয়ারপোর্টে রিনির সেই বিকৃত মুখ—সেই তীক্ষ্ন গলার শাসানি—চোখ দুটো থেকে সেই বিষাক্ত বিদ্বেষ ঠিকরে পড়া: 'ফিরে এসে যদি দেখি—'

আশ্চর্য!

রাণী-দীপ্তি—কারো তার সম্পর্কে এতটুকু কৌতূহল নেই। অথচ রিনি কাঞ্জিলাল—যে তার মনিব, যে অনেক দূরের মানুষ, সেই তাকে অদ্ভুত সন্দেহ আর ঘৃণা দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে। প্রভাতের কখনো কখনো মনে হয়, রিনি যেন তার শনিগ্রহ—কাঞ্জিলালের বাড়ীর চাকরি সে কোনোদিন ছাড়তে পারবে না—রিনির হাত থেকে কখনো তার পরিত্রাণ নেই!

এই জীবনের কোনো অর্থ বোঝা যায় না।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওই রকমই কতগুলো এলোমেলো ভাবনার ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছিল দীপ্তি। সমস্ত বিস্বাদ, সমস্ত অর্থহীন। এই মাতৃসদনে তিন মাসের বন্দীশালা। নিজের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সেই সন্তানের জন্যে প্রতীক্ষা করা—যে তার কেউ নয়—যাকে সে কোনোদিন চায়নি।

চৌরঙ্গীর সেই দিনগুলো!

ধিক্কার জেগেছে কখনো কখনো। যে রাত্রে 'কসবী' বলে গুণ্ডারা পর্যন্ত দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, সেদিন অপমানে তার পায়ের তলায় মাটি ছিল না। কলোনীর ছোট ছোট সংসারে সে অনেক দুঃখের ভেতরেও মানুষকে খুশী হয়ে বাঁচতে দেখেছে, মনে হয়েছে, অমনি এক টুকরো ঘরও যদি সে পেত।

তবু কি এখনো দীপ্তি ছাড়তে পারে ওই জীবনকে? কেউ আত্মহত্যা করবে, কাউকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে—মাত-লামো, গালাগাল আর মারামারিতে নরক-কুণ্ড হয়ে উঠবে চারদিক—একটা ষাঁড়ের মতো জোয়ান নিজের বমির ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু ওর বাইরে আর কিছুই কি ভাবতে পারে এখন?

ওই আগুনের মতো আলোগুলো মাথার শিরায় শিরায় জ্বলে না উঠলে, পিয়ানোর শব্দে বুকের ভেতরটা গমগম না করলে, বেহালার আওয়াজে সমস্ত ঘরটা আর্তনাদ করে না উঠলে এখন বেঁচে থাকার কোনো মানেই হয় না। তারপর এক-একটা রাতে দুরন্ত গতিতে মোটরের ছুটে যাওয়া—পঞ্চাশ, ষাট-সত্তর মাইল! দু পাশের গাড়ীগুলো ছিটকে পড়ে, সামনের পথটা যেন লাফাতে লাফাতে সরে যায়, গাছের মাথাগুলো ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খায়, আর—

আজ তিন মাসেরও বেশী হল, হাস-পাতালের বিছানায় পড়ে থেকে—নারকেলডাঙার অন্ধকার ঘরে মুখ বুজে, দীপ্তি যেন মূর্ছার ভেতরে কাল কাটাচ্ছিল। কিন্তু সামনের ওই গঙ্গার দিকে তাকিয়ে—কলকাতা থেকে দূরে এই নির্বাসনের মধ্যে দিন কাটাতে এসে, হঠাৎ সমস্ত আবরণটা তার সরে গেছে। দীপ্তির মনে হল, মরতে যদি হয় ওই আলোতেই জ্বলে মরব, এমনিভাবে দিনের পর দিন কাদার ভেতরে ডুবে যেতে পারব না।

আঃ—এখান থেকে কবে ছুটি মিলবে তার? কতদিন পরে?

—নমস্কার।

দীপ্তি দেখল, ডাক্তার সৌম্যেন ঘটক। শাদা শার্টের ওপর এক মুখ কালো দাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছেন।

—নমস্কার।

—কেমন আছেন?

—ভালো। আসুন, ঘরে বসবেন।

—দরকার নেই, এখানে দাঁড়িয়েই একটু গল্প করা যাক আপনার সঙ্গে।

ডাক্তার পকেট হাতড়ে একটা আধপোড়া চুরুট ধরালেন। শ্রান্ত বিস্বাদ অবস্থাতেও খেয়ালের মতো দীপ্তির মনে হল, এই চারদিনে প্রত্যেকবারেই ডাক্তারকে একটা পোড়া চুরুট সে ধরাতে দেখেছে। ডাক্তার কি দোকান থেকে এই আধপোড়া চুরুটগুলোই নিয়ে আসেন, একটা আস্ত চুরুট কখনো কেনেন না?

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার বললেন, ভালো এখন আপনি নিশ্চয় থাকবেন আর ভালো থাকাটাই দারুণ দরকার।

—ধন্যবাদ।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, খুব একা-একা ঠেকে, তাই না?

—না, কিছু না। রাণীদি আসেন সব সময়।

—ও দ্যাট ওয়াণ্ডারফুল লেডী। কিন্তু একটা জিনিস আমার ভালো লাগে না। বিয়ের পরের দিনই একটা মোটর অ্যাকসিডেণ্টে বিধবা হয়েছেন জানেন তো?

—জানি।—দীপ্তির হাসির কথাটা মনে পড়ে গেল।

—জানাই উচিত, শুনেছি আপনারা ও'র আত্মীয় হন।— ডাক্তার বলে চললেন, কিন্তু যে স্বামীর মুখ পর্যন্ত মনে করতে পারেন না, তার জন্যে এই কৃচ্ছ্রসাধন কেন? এগুলো অকারণে নিজেকে নিগ্রহ করা—থান পরে নিরামিষ খেয়ে সন্ন্যাসিনী সেজে বসে থাকা। একে কী বলে—ওই ম্যাসোকিজম' ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। স্বামীর সংগে কিছুদিন ঘর করতেন—তা হলেও তাঁর স্মৃতি নিয়ে ধ্যান-ট্যান করছেন এ রকম একটা ব্যাখ্যা করা যেত। এর কোনো মানে হয় না।

নিজের চিন্তার নিঃসঙ্গতা থেকে দীপ্তির মনটা একটু একটু করে ডাক্তারের আলোচনার মধ্যে বেরিয়ে আসছিল। দীপ্তি বললে, উনি হয়তো হিন্দু মেয়েদের নিয়ম মতো—

—ট্র্যাশ। —ডাক্তার একটু বিরক্ত হলেন: হিন্দুর কোনো ডেফিনিশন আছে নাকি? এক গরু আর ব্রাহ্মণ, গোটা কয়েক সংস্কৃত মন্ত্র আর কয়েকটা দেব-দেবীর মন্দির ছাড়া আর কোনো অ্যাফির্মেটিভ পান তো কী বলেছি! সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আসুন—নানা প্রভিন্সে নির্বিচারে বিধবার বিয়ে হয়ে থাকে, ওটাকে প্রব্লেম বলেই কেউ ভাবে না। সেই কবে আদ্যিকালে বুড়ো বিদ্যাসাগর সত্যের বোমাটা ফাটিয়ে দিয়ে গেছেন, কিন্তু কানের চামড়া আমাদের এমনি পুরু যে কিছুতেই কিছু যায় আসে না। অথচ ঘরের বিধবার সংগে ব্যভিচার করতে বিবেক এক বিন্দু বাধা দেয় না।

দীপ্তির মুখ লাল হয়ে উঠল আর সংগে সংগেই লজ্জিত হলেন ডাক্তার।

—আমায় ক্ষমা করবেন, হঠাৎ বিশ্রী কথাটা বেরিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা কী জানেন—ডাক্তারী করতে গিয়ে মধ্যে মধ্যে এমন এক-একটা অভিজ্ঞতা হয় যে মাথায় খুন চড়ে যায়। সে যাক। আমি কিন্তু অনেকবার বলেছি, রাণীদি, গেট ম্যারেড। কিছুতেই রাজী নন। বলেন, বেশ আছি, সেবার মধ্য দিয়েই দিনগুলো চমৎকার কেটে যাবে আমার।

—সে তো ভালো কথাই।

—ভালো কথা?—ডাক্তারের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: রট্—সেল্ফ ডিসেপশন। যে মানুষ নিজে সারা জীবন অতৃপ্ত রইল, সে কখনো অন্যকে তৃপ্তি দিতে পারে? ও হয় না। আমি আপনাকে বলছি, আফটার টুয়েন্টি ইয়ার্স—আজকের এই শান্ত সন্ন্যাসিনীর আর এক মূর্তি দেখবেন আপনি। নিষ্ঠুর, বদমেজাজী, খিটখিটে—কাউকে সহ্য করতে পারবে না, সকলকে ঘৃণা করতে থাকবে। নেচার ছেড়ে কথা কইবে না, তারও কতগুলো আইন-কানুন আছে।

—কিন্তু সবাই কি এরকম হন?—দীপ্তি কৌতূহল বোধ করতে লাগল।

—ব্যতিক্রম আছে, থাকাটা স্বাভাবিক। আর সেইটেই নিয়মকে প্রমাণ করে। সেইজন্যেই বলেছিলুম, রাণীদি—বিয়ে করো। ভালো ভালো সেবিকার মহৎ জীবনের কাহিনী তোমার অনেক জানা থাকতে পারে, কিন্তু কোনো সাইকো-অ্যানালিস্টের চেম্বারে যদি তাঁদের ঢোকাতে পারত, তা হলে অনেকের মনের চেহারা দেখেই তুমি আঁতকে উঠতে। পিয়ের কুরি না থাকলে মাদাম কুরি কুঁড়ি হয়েই থাকতেন, এ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। আরো বললুম, পাত্র যদি চাও, আমিই আছি।

দারুণভাবে চমকে উঠল দীপ্তি। ডাক্তারের এই ভয়ঙ্কর স্পষ্টতা যেন অবিশ্বাস্য ঠেকল তার কানে।

—আপনি বললেন?

ডাক্তার নেবা চুরুটটা আবার পকেটে গুঁজলেন: কেন বলব না? এই যে ব্যাচেলর হয়ে আছি—সাধে নাকি? নিজের এমন সময় নেই যে একটা মেয়ে জুটিয়ে ফেলি। আর নবদ্বীপে এমন সাহস কারো নেই যে আমাকে কন্যাদান করে।

—কেন?

ডাক্তার হাসলেন: খুব স্বাভাবিক কারণে। এক সময় খুব ওয়াইল্ড ছিলুম। মাত্র তেইশ বছরে যখন ডাক্তারী পাশ করেছি, তখন চলতি বাংলায় আমি সোনার টুকরো ছেলে। তারপরেই যেতে হল যুদ্ধে। তখন যুদ্ধের শেষ মুখ—আরাকান-মণিপুর ফ্রন্টে পিছু হটাই তখন একমাত্র কাজ। কিন্তু আরো কিছু কাজ ছিল—সেটি বখে যাওয়া এবং তাতে আমি সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছিলুম—ডাক্তার একটু থামলেন: কিন্তু মাপ

করবেন—এসব ডেলিকেট্ জিনিস আপনাকে বলা—

দীপ্তির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল : আমার এসব শোনবার অভ্যেস আছে।

বলেই থমকে গেল দীপ্তি, গাল থেকে রক্ত সরে গেল তার। কিন্তু নিজের মধ্যেই মগ্ন ছিলেন ডাক্তার, দীপ্তির কথাটা তলিয়ে ভাবলেন না। বললেন, থ্যাংক ইউ। আমি রাণীদিকে বলেছিলুম, এখন তো আমি টায়ার্ড আর বাধ্য হয়েই গুড বয়—নিশ্চিন্তে আমাকে বিয়ে করতে পারো। আমি আইডিয়াল হাজব্যান্ড হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখব। উত্তরে রাণীদি বললে, 'এসব বলবেন না, আপনাকে আমি দাদার মতো দেখি।' একেবারে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলে। তখন বললুম, 'অল রাইট, তা হলে একটি ভগ্নীপতির যোগাড় দেখি।' রাণীদি বললে, 'সময় হলে ঘটকালির কথা মনে করিয়ে দেব, আপাতত মিসেস চৌধুরী কেমন আছেন দেখে আসুন একবারটি।' মানে, সীরিয়াস্‌লি নিলেই না আমাকে। এক সময় বুঝতে পারবে অ্যান্ড দেন ইট্‌স্ টু লেট!

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে, ডাক্তার একটু থামলেন। যেন নিজের পরিবেশ সম্পর্কে একটু সচেতন হলেন খানিকটা।

—দেখুন, আপনি আমাকে কী ভাবলেন জানি না। হয়তো মনে করলেন আপনার কাছে গল্প-গল্প করে নিজের কীর্তি-কাহিনী, একটা নোংরা জীবনের ইতিহাস বলবার দরকার কী ছিল। দরকার একটু ছিল। আই অ্যাম্ এ ফ্র্যাঙ্ক ম্যান—কারো কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাই না। কিন্তু রাণীদি আমাকে দেবতা বানাতে চায়—সকলের কাছে অকারণ প্রশংসা করে। আমি সেই মীথ্‌টা ভেঙে দিতে চাই। শ্রদ্ধায় আমার বিশ্বাস নেই—ওটা অন্ধ, স্লেভ্‌-মেণ্টালিটির উত্তরাধিকার। আমি চাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং—মানুষে মানুষে, ছোটোয়-বড়োয়, সংসারের সমস্ত সম্পর্কের ভেতরে ওইটেই হল একমাত্র সত্য। এমনকি ডাক্তার পেশেন্টের মধ্যেও ওটা দরকার। আমরা নিজেদের আড়াল করে ড্রয়িংরুমের রসালাপ চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে গেলে সমস্ত মুখোস খুলে ফেলতে হয়। ডিসেক্‌শন রুম হয়তো মাত্র ডাক্তারেরই দরকার, কিন্তু ফাইন আর্টসের ছাত্রকেও পুরোপুরি অ্যানাটমি জানতে হয়, নইলে কোনোদিন সে শিল্পী হতে পারে না।

ডাক্তারের সব কথাগুলো দীপ্তি স্পষ্ট বুঝতে পারল না, কিন্তু নিজেকে আড়াল করে রাখার যে ভীরুতা আজ ক'দিন থেকেই তার স্নায়ুগুলোকে ক্রমাগত পীড়িত করছিল, যে-যন্ত্রণায় সে রাণীর সামনে সিঁথের সিঁদুর মুছে ফেলেছিল আর একটু আগেই ভাবছিল, বাইরের এই নির্বাসনের চাইতে তার মনের বন্দীশালা অনেক বেশি অসহ্য—ডাক্তারের কথাগুলো যেন সেখান থেকে এক মুহূর্তে তাকে টেনে বের করে আনল। দাঁড় করিয়ে দিলে জীবনের এক সিংহ-দুয়ারে— সেখান থেকে সমস্ত পৃথিবীটাকে দেখতে পাওয়া যায়।

দীপ্তি মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বললে, তা হলে আপনার সঙ্গেও সেই আণ্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে থাক আমার।

ডাক্তার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, চিন্তার জাল কাটল।

—কী বলছেন?

—বলছিলুম, আমার সম্পর্কে রাণীদি কি কোনো কথা বলেন নি আপনাকে ?

দীপ্তির গলার স্বরে ডাক্তার সচেতন হলেন।

—না তো।

"—দেখুন, আপনি আমাকে কি ভাবলেন জানি না।"

—ও'র মন আলাদা, মানুষকে দেখার চোখও আলাদা। তাই আমাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন।—বাইরের অনেকখানি আকাশ আর রৌদ্রজ্বলা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস টানল দীপ্তি : কিন্তু আপনার কাছে গোপন করবার কোনো মানে হয় না। আমি কুমারী, আমিও একটা ওয়াইলড্ লাইফের খানিকটা দেনা শোধ করতেই এখানে এসেছি।

ডাক্তার পোড়া চুরুটটার সন্ধানে ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়েছিলেন, সেইখানেই সেটা থমকে রইল।

—আই সী!

নিষ্ঠুর কঠিন মুখে দীপ্তি বলে চলল : আমার সঙ্গী ভদ্রলোককে ভুল বুঝবেন না। নিরীহ ভালোমানুষ, আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। আমার বিপদ দেখে অকারণে নিজের মাথায় একটা মিথ্যে ভার তুলে নিয়েছেন। আমাকে ভালোবাসেন না, ওঁকে ভালোবসবার মতো কোনো কারণও খুঁজে পাইনি আমি। আজ মনে হচ্ছে এ থেকে ওঁকে ছুটি দেওয়া উচিত। আপনিও বলছেন, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং দরকার—ডাক্তার আর পেশেণ্টের ভেতরে কোনো আড়াল রাখা আপনি পছন্দ করেন না। তাই আপনাকে জানাচ্ছি, আমি কুমারী—লোক-লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আপনাদের এই নারী সদনে এসে আশ্রয় নিয়েছি।

ডাক্তার কিছুক্ষণ দুটো চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে দীপ্তির দিকে চেয়ে রইলেন। উত্তেজনায় রাঙা হয়েছে মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, গালের ওপর দুটো শুকনো ক্ষতচিহ্ন যেন অদ্ভুতভাবে বিশিষ্ট করে তুলেছে তাকে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন ডাক্তার। তারপর দুটো প্রকাণ্ড থাবা বাড়িয়ে যেন দীপ্তির হাত চেপে ধরলেন একখানা।

গম্ভীর ভরাট গলায় বললেন, কনগ্রাচুলেশন্‌স্‌!

দোতলার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠল—ডাক্তার দীপ্তির হাতখানা ছেড়ে দিলেন। দীপ্তির মাথাটা ঘুরে উঠেছিল—যে জোরটা নিয়ে সে কথা বলছিল ডাক্তারের সঙ্গে, এই মুহূর্তে সেটা সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গিয়ে তার সারাটা শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল।

ডাক্তার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন। বললেন, রাণীদি আসছে। পায়ের শব্দ আমি চিনি।

রাণীই বটে। একমুখ উজ্জ্বল হাসি নিয়ে এসে উপস্থিত হল। দীপ্তি মাথা নীচু করে রইল, রাণীর দিকে তাকাতে পারল না।

রাণী ডাকল : ডাক্তারবাবু।

—হুঁ, বলে ফেলো।

—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসবেন বলেছিলেন।

—বলেছিলুম।

—তারপরে সব ভুলে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ওই জন্যেই আপনার কিছু হবে না।

—এখনো আমার কিছু হবে বলে আশা রাখো নাকি?—ডাক্তার অট্টহাসি হাসলেন : তুমি তো দেখছি দারুণ অপ্‌টিমিস্ট্‌। তা এরকম দু-একজন থাকা ভালোই। কিন্তু সত্যি বলছি আমি আড্ডা দিইনি, পেশেণ্টের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলুম। ডিউটি।

—ও ডিউটি থাক এখন।—রাণী বললে, অমরবাবু আপনাকে ডাকতে এসেছেন।

—মানে ওর স্ত্রীর জন্যে?—ডাক্তার ভুরু কোঁচকালেন : সে তো ক্রনিক ব্যাপার—জীবনে সারবে না। আমি বলেছি কলকাতায় নিয়ে যান—আমাকে দিয়ে হবে না। তবু বার-বার ভদ্রলোক আমার ওপরেই হামলা করছেন।

—আপনার ওপর বিশ্বাস আছে বলেই ডাকতে আসেন।

—বিশ্বাস নয় রাণীদি—ডাক্তারের গলা গম্ভীর হয়ে উঠল : এর ভেতরে আর একটা প্ল্যান আছে। খুব গভীর আর জটিল।

—তাই নাকি? কী সেটা?

ডাক্তার চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, মতলবটা বোধ হয় ভদ্রলোক আবার বিয়ে করতে চান। কিন্তু স্ত্রী তো সহজে মরবেন না, তাই আমার এই দাড়িওলা শ্রীমুখখানা ভদ্রমহিলাকে দেখাতে দেখাতে হার্টফেল করাবেন।

রাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল।

—হয়েছে, হয়েছে, যান দেখি এবার।

—তাড়িয়ে দিচ্ছ?—ডাক্তার বড়ো বড়ো চোখে তাকালেন : অল্ রাইট। এরপরে যদি পুরো দু'ঘণ্টা আমি চটে না থাকি, তা হলে আমার নাম সৌম্যেন ঘটকই নয়।

ডাক্তার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। রাণী ডাক দিয়ে বললে, ঘড়িটা দেখে রাখুন—দু ঘণ্টার বেশি কিন্তু চটে থাকতে পারবেন না। ডাক্তারের সাড়া এল না।

দীপ্তি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তখনো রক্তের মধ্যে ঝড় উঠছে তার। তবু তার মধ্যেও মনে হচ্ছে, ডাক্তার এসে যেন অনেকখানি শক্তি দিয়ে গেছেন তাকে—অনেক বেশি করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবার অধিকার।

রাণী আস্তে আস্তে এসে দীপ্তির পিঠে হাত রাখল। বললে, ডাক্তারবাবু খুব বকবক করছিলেন, না? কিছু মনে কোরো না ভাই, স্বভাবটা একটু পাগলাটে বটে, কিন্তু—

দীপ্তির ঠোঁটটা নড়ে উঠল বার-কয়েক। তারপর আচ্ছন্ন স্বরে বললে, ওঁর কথা কিছু বলতে হবে না রাণীদি। এই বয়সেই অনেকভাবে অনেক মানুষ আমায় দেখতে হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুর মতো কাউকে কখনো আমি দেখিনি।

(ক্রমশঃ)

(উত্তর)

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমাধব মজুমদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

১। O. K. কথাটি ইংরেজী All Correct এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সংক্ষেপীকরণের চলিত নিয়ম অনুসরণ করা হইলে কথাটি হইত A. C.। তাহা না হইয়া এখানে উচ্চারণ অনুযায়ী কার্যটি সাধিত হইয়াছে মনে হয়। ইংরেজী অভিধানে All শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ awl (অওল) হইলেও, সাধারণতঃ কথাবার্তার সময় উচ্চারণটি awl (অওল) না হইয়া oal (ওঅল) এর ন্যায় হয় বলিয়াই সম্ভবতঃ উচ্চারণ অনুযায়ী আদ্য অক্ষর A-র পরিবর্তে O ধরা হইয়াছে। আর Correct শব্দের আদ্য অক্ষর C ইংরেজী K (ক)র মত উচ্চারিত হয় বলিয়া কথাটি আমূল পরিবর্তিত হইয়া A. C. না হইয়া O. K. হইয়াছে। ইংরেজীতে যে যে স্থলে O. K. কথাটির প্রয়োগ হয়, সে সে স্থলে বাংলায় 'ঠিক আছে' বা শুধু 'ঠিক' বলিলে কোন দোষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। O. K. কথাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বড় একটা কানে আসিত না, আর ইংরেজী পুঁথি-পত্রিকারও চোখে পড়িত না। ইদানীং হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্বত্রই O. K-র ছড়াছড়ি। এমনকি, কোন হিন্দি ছায়া-ছবিতে হিন্দি সংলাপের ভিতরও O. K. কথাটি শুনিয়াছি।

২। ডাক্তার ও ডক্টরেট উপাধি দুইটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও শব্দ দুইটি ইংরেজী হইতে আহৃত বলিয়া ইংরেজীর অনুসরণেই বাংলায় ডাঃ দ্বারা সংক্ষেপে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাড়ীর দরজায় বা দেয়ালে লাগান নাম-ফলকে উভয় উপাধিধারী ব্যক্তিরাই স্ব স্ব নামের পূর্বে ইংরেজীতে Dr. কথাটির ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া, কে চিকিৎসক আর কে পণ্ডিত, তাহা বুঝিতে সাধারণ লোক বেশ একটু গোলমালে পড়িয়া থাকেন বলিয়া শুনিয়াছি। এ সম্বন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত একটি রম্যরচনাও পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিযুক্ত কোন পরিভাষা কমিটিই এ বিষয়ে একটা সুরাহা করিবার যোগ্য পাত্র। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় কোন কিছু হইবার আশা নাই বলিয়াই বিশ্বাস।

৩। টেলিফোনে সম্বোধন অর্থে 'হ্যালো' শব্দটির প্রয়োগ এত বেশী চালু হইয়াছে যে বাংলা ভাষায় 'কে' বা 'কে কথা বলছেন', এই ভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেও তাহা একক প্রচেষ্টার

জানাতে পারেন

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে বলিয়া মনে করি।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯

(উত্তর)

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীঅশোককুমার সাহা মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

১। (ক) এনভেলাপ খামের চিঠিতে, তাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লিখিতই হউক, বা বিষয়-আশয় সংক্রান্ত ব্যাপারেই হউক—গোপনীয় কোন কিছু লেখা থাকিলে সেই চিঠি হাতে পড়িলে, অন্য লোক যাহাতে তাহা খুলিয়া ভিতরের বিষয়বস্তু না পড়ে তজ্জন্য পূর্বে ঠিকানার উল্টা পিঠে ৭৪॥ বা ৭৪½ সংখ্যাটি লিখিয়া দেওয়ার একটা রেওয়াজ দেখা যাইত। বিগত ২৫।৩০ বৎসরের ভিতর কোন চিঠিপত্রে ইহা আর বড় একটা দেখি নাই বলিয়া মনে হয় যে, এই রেওয়াজ বর্তমানে লুপ্ত-প্রায় এবং থাকিলেও সুদূর পল্লীগ্রামের কোথাও কোথাও হয়ত স্তিমিতপ্রায় ভাবেই আছে। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের ধরণে মনে হয় যে, ইহা আজও আগেকার মতই চলিত আছে। এই ধারণা ঠিক নহে। এই রেওয়াজ উঠিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ হইল এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত যে, কোন চিঠির গায়ে ৭৪॥ লেখা দেখিলেই অপর লোক তাহা খুলিয়া পড়িবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিত। অবশ্য এই রেওয়াজটি হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বা আছে।

এই ৭৪॥ সংখ্যাটি একটি কিরা বা দিব্য বিশেষ। স্কুলের মাস্টার মহাশয়গণ এবং বাড়ীর গুরুজনেরাও বলিতেন যে, হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্রে এত অধিক রাজপুত সৈন্য নিহত হইয়াছিল যে, তাহাদের পৈতা বা যজ্ঞসূত্রের মোট ওজন ৭৪½ মণ হইয়াছিল। সুতরাং ৭৪½ সংখ্যা লিখিত কোন চিঠি প্রকৃত প্রাপক ব্যতীত অপর লোকে খুলিয়া পড়িলে এই সমুদয় রাজপুতের হত্যার সমতুল্য পাপে লিপ্ত হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, হলদীঘাটার যুদ্ধ মূলতঃ রাজপুত ও মোগলের মধ্যে সংঘটিত হইলেও উভয় পক্ষেই বহু রাজপুত সৈন্য ছিল। মহারাণা প্রতাপের প্রায় সমুদয় সৈন্যই রাজপুত আর বিশাল মোগল বাহিনীর ভিতর অধি-নায়ক রাজা মানসিংহের অনুগামী কছোয়া ও অন্যান্য রাজপুত সৈন্যরা মুসলমান সৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং হতাহতের সংখ্যা রাজপুত পক্ষেই মোট সংখ্যার অন্ততঃপক্ষে ¾ অংশ হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ৭৪½ সংখ্যা সম্পর্কে এই কাহিনী আদৌ সত্য কিনা বলা যায় না। তবে বিষয়টির পশ্চাতে যে কোন একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে তাহা বেশ বুঝা যায়। এ বিষয়ে অন্যত্র অন্য কাহিনীও প্রচলিত থাকা খুবই সম্ভবপর।

(খ) অনুরূপ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিংবদন্তী বিহার ও উত্তর-প্রদেশে চলিত থাকিতে পারে, যাহা খামের চিঠির উল্টা দিকে লিখিত ১৫ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানেও স্পষ্টতঃ ইহা একটি কিরা বা দিব্য বিশেষ এবং এই সংখ্যা লিখিত কোন চিঠিপত্র প্রকৃত প্রাপক ব্যতীত অপর কেহ খুলিয়া পড়িলে ইহা দ্বারা ইঙ্গিত করা কোন একটি বিশেষ পাপে লিপ্ত হইবে।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬ নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
কলিকাতা—৯

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

সেদিন হঠাৎ আমার এক আত্মীয়কে একজনের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে শুন-লুম, 'ছেলেটা একেবারে এঁচোড়ে পক্ক হয়ে গেছে।' কথাটা আগেও শুনেছি। কানে লেগেছে। আবারও লাগলো। ভেবেই পেলুম না অকালপক্কতার সঙ্গে 'এঁচোড়' কথাটির সম্পর্ক কি। এটা ব্যবহারই বা হচ্ছে কতদিন থেকে। বলা যেতে পারে সুপক্ক ফলের সঙ্গে অকালপক্ক ফলের যে স্বাদের তফাৎ হয় তার জন্যেই কথাটির প্রচলন হয়েছে। কিন্তু অকালপক্কতায় স্বাদের ভেদাভেদ তো শুধু এঁচোড়ের বেলাতে নয়, সব ফলের বেলাতেই। তাহলে বিশেষ করে 'এঁচোড়' শব্দটি যোগ করার কি সার্থকতা থাকতে পারে? " এ বিষয়ে কেউ আলোকপাত করতে পারেন কি?

অঞ্জনা মিত্র
গ্রাম কিশোরনগর,
ডাঃ কাঁথি
মেদিনীপুর।

তামিল প্রসঙ্গে

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে তামিল একটি বিশিষ্ট ভাষা। এর বিশিষ্টতা নানাদিক থেকে। প্রথমত, বর্তমানে প্রচলিত যে কোনো ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা তামিল প্রাচীনতর। অন্তত দুহাজার বছরের ঐতিহ্যবাহিনী এই ভাষা। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দ্রাবিড় সংস্কৃতির এমন একটি স্বতন্ত্র রূপের পরিচয় পাওয়া যায় যা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর অন্য ভাষাগুলিতেও দুর্লভ। তৃতীয়ত, তেলুগু, কন্নড় ও মলয়ালম্ এই তিনটি দ্রাবিড় ভাষা সংস্কৃতের নিকট সম্পর্কে এসে যতটা আর্যায়িত হয়ে উঠেছে, তামিলের উপর আর্য প্রভাব সে তুলনায় খুবই কম। চতুর্থত, তামিলের লিপি ও বর্ণমালা আর্যগোষ্ঠী থেকে তো বটেই, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভগিনী স্থানীয় ভাষাগুলি থেকেও কতকাংশে স্বতন্ত্র।

আমরা বর্ণমালা দিয়েই শুরু করি। তামিলে স্বরবর্ণ ১২টি। তবে বাংলার মতো ঋ, ৯ ইত্যাদির বালাই নেই। অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ—এই দশটি এবং দীর্ঘ এ, দীর্ঘ ও—এই দুটি। মোট বারোটি। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কিন্তু শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ—মাত্র ১৮টি। যেখানে আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৪ (কিংবা তারও বেশি), সেখানে তামিলের এই বর্ণাল্পতা বিস্ময়কর।

বাঙালির দৃষ্টিতে আরও বিস্ময়কর তামিলের সেই স্বল্পসংখ্যক বর্ণমালায় কতগুলি অনাবশ্যক বর্ণের সমাবেশ। আপনি কি মনে করেন তিনটি 'ল'-এর কোনও প্রয়োজন আছে? আমাদের তো একটি ল-তেই কাজ চলে যায়, ইংরেজদেরও চলে এবং আরও অনেক জাতের চলে। কিন্তু তামিলীদের চলে না। এই যে 'তামিল' (ঠিক ঠিক বলতে গেলে 'তমিল') কথাটি বলছি, ওর ল-টা আমাদের 'ল' বা ইংরেজদের 'এল্' নয়। ওটা একটা মারাত্মক বর্ণ যার উচ্চারণের জন্য আপনাকে আবাল্য ইডলি-দোসে খেতে হবে। আমাদের সবেধন-নীলমণি একটি 'ল' বলেই আমরা লিখি তামিল, ইংরেজীতে লেখা হয় Tamil, যাঁরা বিশুদ্ধ উচ্চারণের পক্ষপাতী, তাঁরা লেখেন Tamizh, কিন্তু এটা আরও বিভ্রান্তিকর। কারণ এর বাংলা লিপ্যন্তর করতে গিয়ে লেখা হবে 'তামিজ'। এবং বস্তুত তাই হচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বাংলা কাগজগুলিতে 'কাজাগ' কথাটির বড় প্রাদুর্ভাব। এই সেদিনও তামিলনাড়ের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে 'কাজাগ' বা 'কাজাগাম্' শব্দটির বহুল ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উক্ত রাজনৈতিক দলটির নাম D. M. K. যার বিশদ রূপ হচ্ছে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কলগম্ অর্থাৎ দ্রাবিড় প্রগতি সংস্থা। 'কলগম্'-এর ল এবং 'তামিল'-এর ল একই। বিশুদ্ধতার খাতিরে এর লিপ্যন্তরে zh ব্যবহারের ফলে কলগম্ পরিণত হয়েছে Kazhagam-এ, সেখান থেকে বাংলায় কাজাগাম্। তাই বলছিলুম, তামিলের বিশিষ্ট 'ল'কে zh দিয়ে রূপায়িত করা বিভ্রান্তিকর। যদি বাংলায় 'ল' লিখতে কারও আপত্তি থাকে তিনি 'ড়' লিখতে পারেন, কারণ ঐ-টি হচ্ছে নিকটতম উচ্চারণ। সুতরাং কাজাগাম্ না লিখে লেখা উচিত 'কলগম্' অথবা 'কড়গম্'।

সে যাই হোক, তামিলের তিনটি 'ল' থেকে আমাদের চোখে অনাবশ্যক দুটি বাদ দিলে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা দাঁড়াল ১৬।

বাঙালি বিদ্যার্থীর একটি কঠিন বিভীষিকা হল নত্ব ষত্ব বিধান। বয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেকে হিমসিম খেয়ে যান 'সায়াহ্ন' ও 'অপরাহ্ণ'-র ঠিক ঠিক বানান লিখতে। নব্যপন্থীরা অনেকেই তাই বানান-সংস্কারের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন—একটি 'ন' মানে দন্ত্য ন-কে রাখো, মূর্ধন্য ণ-কে চালান করা হোক ভাষার মুাজিয়ম্-এ। এই যখন অবস্থা অর্থাৎ যখন আমরা দুটি 'ন'-এর বদলে একটি 'ন' চালু রাখার পক্ষপাতী, তখন তামিলীরা এক নয়, দুই নয়, তিন-তিনটি 'ন' নিয়ে বেশ তৃপ্ত আছেন। একটি তন্নকারম্ অর্থাৎ দন্ত্য ন, দ্বিতীয়টি ডন্নকারম্ অর্থাৎ মূর্ধন্য ণ, তৃতীয়টি রন্নকারম্, বাংলায় যার 'অর্থাৎ' নেই। যদি বলি এত সব হাঙ্গামার প্রয়োজন কি? তামিল বন্ধুরা বলেন—ওরে বাবা, তা কি হয়! সে যাই হোক, তামিলের এই অতিরিক্ত 'ন'টি বাদ দিলে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫।

পূর্ববঙ্গীয় বিদ্যার্থীদের লেখায় বা উচ্চারণে 'র' ও 'ড়' এ-দুটি বর্ণের পার্থক্য নেই বললেই চলে। "রবিবার আমরা গাড়ি করে তোমার বাড়িতে বেরাতে যাব" —পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা এই জাতীয় অপরাধকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে না। 'র' ও 'ড়'-এর পার্থক্য রাখা চাই। তার উপরে আছে 'ঢ়'। তামিল ভাষাদের এই ডয়ো ড় বা ঢয়ো ঢ়-র ঝামেলা নেই বটে, কিন্তু তাদেরও আছে দুটো 'র'। একটা আমাদের বাংলা মতে 'র', আর একটি 'র' অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ—বলা যায় 'র্'। তামিল যে বাঙালির কর্ণ ও মর্মকে পীড়িত করে তার জন্য কিছুটা দায়ী এই কঠোর 'র'। এই ফালতু 'র'টিকে বাদ দিলে তামিলের অক্ষর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪।

পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, এমনি করে একে একে যদি সবই বাদ যেতে থাকে, তাহলে তামিল বর্ণমালার রইল কি? সেই কথাই বলছি। বাংলার পাঁচটি বর্গ ক চ ট ত প। প্রতি বর্গে পাঁচটি বর্ণ, একুনে পঁচিশটি। তামিলীদের এত সব ঝামেলা নেই। আছে শুধু প্রতিটি বর্গের প্রথম ও পঞ্চম বর্ণ—ক-ঙ, চ-ঞ, ট-ণ, ত-ন, প-ম। ওদের মতে, 'ক' যখন রয়েছে তখন খ গ ঘ এগুলির প্রয়োজন কি? অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণটি হলেই যথেষ্ট, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ তো শোভা বর্ধন করছে মাত্র। আপনি বলবেন—তা কি করে হয়? পম্পাই ও বম্বাই তো দুটো আলাদা শহর। ওরা কি দুটোকেই লিখবে 'পম্পাই'? হ্যাঁ, তা-ই লিখবে। তামিলভাষীর কাছে কথা ও গদা-র কোনো প্রভেদ নেই। খাতা ও গাধা, পাকা ও বাঘা, তামা ও ধামা, পাপ ও বাপ প্রভৃতি শব্দযুগলের বানান তামিলে একই রকম।

১৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ১০টি বর্গীয় বর্ণের হদিশ পাওয়া গেল। বাকী চারটি হল অন্তস্থ বর্ণ—য র ল ব। বাস শেষ হয়ে গেল তামিল বর্ণমালা। দেখুন তো কত সহজ। আমার মতে যদি কোনো লিপিকে রাষ্ট্রলিপি করতে হয় তো তামিল লিপিকেই করা উচিত। আপনি হয় ত বলবেন, তা তো বুঝলুম মশাই, কিন্তু তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ, দন্ত্য স, হ—এ-সব গেল কোথায়? বলছি শুনুন। তামিল লিপিতে 'হ' নেই। ঐ বর্ণটির প্রতিনিধি হল 'ক'। বেচারা ক, নিজের কাজ করতে হয়, আবার খ গ ঘ-এর অতিরিক্ত 'হ' বর্ণটিরও প্রতিনিধিত্ব করতে হয় তাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

মহাত্মা গান্ধি — মকাত্মা কান্তি
সন্দেহ — চন্তেক
পরিহাস — পরিকাচ
কুতূহল — কুতূকল

অবশ্য যদি শব্দের প্রথমেই 'হ' থাকে তা হলে এত ঝামেলা নেই। পূর্ববঙ্গীয় ভঙ্গিতে 'হ' বর্ণের মহাপ্রাণতা বাদ দিলেই চলবে। যথা, হনুমান—অনুমান, হিন্দু—ইন্দু।

উপরের কয়েকটি শব্দ থেকেই

অনুমান করতে পারছেন, তামিলে তালব্য, মূর্ধন্য বা দন্ত্য কোনো 'শ'-এর বালাই নেই। দিব্যি 'চ' বর্ণটি দিয়ে তারা কাজ চালিয়ে নেয়। পশু—পচু; সাধু—চাতু; সিন্ধু—চিন্তু; শিব—চিব।

তামিল বর্ণমালা খুবই সরল; সরল তার বর্ণসংখ্যার স্বল্পতার জন্য। কিন্তু তামিল ভাষায় লেখা-পড়ার জটিলতাও ঠিক একই কারণে। যদি এমন হত যে তামিল বর্ণমালায় অনুপস্থিত বর্ণগুলির উচ্চারণও তামিল ভাষায় অনুপস্থিত, তবে অবশ্য কথা ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরূপ। প্রাচীনতম তামিল বা দ্রাবিড়ের যুগে বর্ণ ও উচ্চারণের সমতা ও সামঞ্জস্য ছিল কিনা সেকথা সুনীতিবাবু বলতে পারেন। আমাদের মনে হয় সংস্কৃতের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই এই দুয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। নতুন নতুন শব্দ ও উচ্চারণের প্রবেশ ঘটে, কিন্তু বর্ণমালা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। বর্ণমালার রক্ষণশীলতা সর্বত্রই মারাত্মক। ঋ, ৯, ণ, ষ, স, প্রভৃতি বর্ণগুলির উচ্চারণ বাংলা থেকে অনেক কাল আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু বর্ণগুলি এখনও পূর্ণ-গৌরবে বিরাজমান। তামিলে ব্যাপারটা অন্যরূপ, এবং তার সমস্যাও জটিলতর। বর্ণবিলুপ্তি যত সহজ বর্ণ আবিষ্কার তত সহজ নয়। বাংলায় বেশি প্রয়োজন বর্ণলোপ, তামিলে বেশি প্রয়োজন বর্ণ-সৃষ্টি। উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে নতুন বর্ণাগম না হলে যে কেমন বিভ্রাট ঘটে বাংলায় তার উদাহরণ দুর্লভ নয়। উপস্থিত মনে পড়ছে এ-কারের স্বাভাবিক ও বিকৃত (অ্যা) উচ্চারণ। তামিলে এই সমস্যা গুরুতর: তবে স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে নয়, ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে।

তাই এক সময়ে তামিলে ব্যঞ্জনবর্ণ-মালার সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল এবং তার নিজস্ব ১৮টি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হল সংস্কৃতের আরও পাঁচটি জ ষ স হ ক্ষ। এই বর্ণগুলি প্রথম কবে তামিলে প্রবর্তিত হয়েছে জানি না, তবে দেখছি এগুলিকে কখনই খাঁটি তামিল বর্ণমালার অঙ্গীভূত করা হয় না। তামিল বর্ণমালায় এখনও এরা হরিজন— এদের আসন স্বতন্ত্র। বাল্যকাল থেকেই তামিল শিক্ষার্থী শিখে আসে—আসল ব্যঞ্জনবর্ণ ১৮টি। বাকী পাঁচটি হল 'বড় মোলি এড়ুত্তুকল' অর্থাৎ উত্তরী ভাষার (মানে সংস্কৃতের) অক্ষর। কোনো প্রাচীন তামিল গ্রন্থ পাঠে আপনি এই সব অক্ষর পাবেন না, আধুনিক গ্রন্থেও খুব কমই পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তামিলভাষীর লেখনীতে ঐ উত্তরী ভাষার অক্ষর বড় একটা আসে না। তার প্রধান কারণ তামিলে আগন্তুক শব্দ বড় কম। আর যদি একান্তই এসে যায় তো সেটাকে তামিলায়িত করে নিতে বিলম্ব হয় না। ধরুন 'সুব্রহ্মণ্যম্', কেমন সংস্কৃত নাম। একজন তামিলভাষী লিখবেন 'চুপ্পিরম-ণীয়ম্' আরও উদাহরণ আছে: সরস্বতী চরচুবতী, অশ্বমেধ—অচুবমেত, সূর্য— চূরিয়ন্, শ্লোক—চুলোক। এইভাবে পরিচিত সংস্কৃত শব্দগুলি তামিলের কবলে পড়ে তাদের স্বাদগন্ধ হারিয়ে একান্ত অপরিচিত হয়ে ওঠে। ফলে উত্তরী ভাষার অক্ষরগুলি অনেক কাল আগে প্রবর্তিত হলেও তামিল জীবনে এখনও ঠিক অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠেনি।

বর্ণমালা ও উচ্চারণ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। সংস্কৃত ভাষার সম্পর্কে এসেও (মনে রাখা প্রয়োজন তামিলনাডের ব্রাহ্মণ্যসমাজ সংস্কৃতের বিশেষ অনুরাগী) তামিল রসনায় এখনও খ ঘ ছ ঝ থ ধ ঠ ঢ ফ ভ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ রপ্ত হয়নি। একজন তামিলভাষী গম্ভীর, ভাষা প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে বলবে গম্বীর, বাষা। উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তামিল বর্ণমালায় সংস্কৃতের মহাপ্রাণ বর্ণগুলি প্রবর্তনের প্রয়োজন ঘটেনি। অথচ সংস্কৃত স্তোত্র, গান প্রভৃতি তামিল লিপিতে পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে। এক্ষেত্রে সংস্কৃতের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য তামিল গ্রন্থাদিতে একটি কৌতুকপ্রদ পদ্ধতি গৃহীত হয়। এটি বিশেষভাবে দেখা যায় সংগীতের গ্রন্থাদিতে। পদ্ধতিটি হল বর্গের প্রথম বর্ণের সঙ্গে বীজগণিতের মতো ২ ৩ ৪ এই চিহ্ন-গুলি যুক্ত করা। যেমন ক = ক; ক$_{২}$ = খ; ক$_{৩}$ = গ; ক$_{৪}$ = ঘ। 'ভারত ভাগ্যবিধাতা' তামিল লিপ্যন্তরে হবে— "পা$_{৪}$রত পা$_{৪}$কি$_{৩}$য় বিতা$_{৪}$তা।"

তামিল ও উর্দুতে কোনও মিল নেই। থাকবার কথাও নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে এই দুটি ভাষার লিপিতে আশ্চর্য ঐক্য অর্থাৎ লিপি থেকে উচ্চারণ করে পড়তে গেলে প্রচুর কল্পনা-শক্তির আবশ্যক। সাধারণ উর্দু লিপিতে সুর, সর, সির— এই শব্দত্রয়ে কোনো পার্থক্য নেই। উর্দুতে অভাব স্বরধ্বনির, তামিলে অভাব ব্যঞ্জন ধ্বনির। তাই পি সেন ও বি সেন তামিলে দুজনেই পি সেন। এই দুর্গতি এড়াবার জন্য তামিল গ্রন্থাদিতে একটি কৌশল অবলম্বিত হয়। নামের আদ্যক্ষর-গুলো রোমক লিপিতে, পদবীটা তামিল লিপিতে—সে এক বিচিত্র নামাবলী।

এবারে লক্ষ্য করুন তামিলের লিখন-বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় ভাষাসমূহের একটি বিভীষিকা হল যুক্তাক্ষরের বাহুল্য। তামিলে এটি নেই। রোমক লিপির ন্যায় তামিল লিপির প্রত্যেকটি বর্ণ স্বতন্ত্র থাকার ফলে লেখা, ছাপা ও টাইপের কাজে তামিল সরলতম। এদিক থেকে ভারতের অন্য ভাষাগুলির সামনে তামিল আদর্শ-স্থানীয়। দ্রাবিড়দের এইটিই প্রাচীনতম লিখন-পদ্ধতি কিনা সেকথা জানেন সুনীতিবাবু। তবে আধুনিক কালে দেখা যাচ্ছে তামিল ছাড়া বাকি তিনটি দ্রাবিড় ভাষায় অর্থাৎ তেলুগু-কন্নড-মলয়ালম্-এ যেমন গৃহীত হয়েছে সংস্কৃত বর্ণমালা, তেমনি রয়েছে যুক্তাক্ষরের বাড়াবাড়ি।

তামিল শব্দে যুক্তব্যঞ্জন নেই সেকথা কেউ মনে করবেন না। প্রচুর আছে। তৎ-সত্ত্বেও সংস্কৃত বা অন্য আগন্তুক শব্দ-গুলি স্বরভক্তির সাহায্যে যথাসম্ভব সরল হয়ে যায়। এদিকে তামিলের ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল। যেমন—

আগন্তুক শব্দ		তামিলে রূপান্তরিত
প্রদেশ >	পিরদেশ >	পিরতেচম্
চরিত্র >	চরিত্তির >	চরিত্তিরম্
বর্ষ >	বরুষ >	বরুষম্
সরস্বতী >	সরসুবতী >	চরচুবতী
মৃগ >	মিরুগ >	মিরুকম্
দ্রব্য >	দিরবিয >	তিরবিযম্
শীঘ্র >	শীক্‌কির >	চীক্‌কিরম্
ধান্য >	ধানিয >	তানিযম্

তামিল উচ্চারণে স্বরভক্তি ও তামিল লিপিতে যুক্তব্যঞ্জনহীনতার জন্য কখনও কখনও পরিচিত শব্দগুলিও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। যেমন—

দুবিচক্কর < দ্বিচক্র
পিরকস্পতি < বৃহস্পতি
পিরুমমপুত্তিরা < ব্রহ্মপুত্র

লিপি ও লিখন-পদ্ধতির সরলতার ফলে তামিলকে যতটা সহজ বলে মনে হয় আসল ব্যাপারটা যে তত সহজ নয় পাঠক

হয়ত ইতিমধ্যেই তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এহো বাহ্য। উত্তরী জনসাধারণের কাছে তামিলের প্রথম বাধা তার নিজস্ব শব্দসম্ভার। আর্যদের সংস্পর্শে এসে অন্য ভাষার জাত গিয়েছে, কিন্তু তামিল তার পূর্বমহিমায় বিরাজিত। যেটুকু সংস্কৃত সে নিয়েছে তা-ও যে বিকৃত ক'রে, ইতিপূর্বেই তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। সে বিকৃতি কেবল লিপি বা লিখন-পদ্ধতির জন্য নয়, উচ্চারণজনিতও বটে। তারই কয়েকটি উদাহরণ :

শর্করা >	চর্ক্করৈ	জলেবীরা >	চলতাবৈ
ভাষা >	পাষৈ	প্রতিজ্ঞা >	পিরতিক্কৈ
দ্রাক্ষা >	তিরাট্চৈ	লঙ্কা >	ইলঙ্কৈ
উৎপত্তি >	উরপত্তি	কল্পনা >	করপনৈ
কলা >	কলৈ	শিল্প >	চিরপম্

তামিলের আর একটি মারাত্মক উপসর্গ তার সন্ধি। বাণভট্টের কাদম্বরী যাঁরা ভালো ক'রে আয়ত্ত করেছেন তাঁদের কাছেও তামিলের সন্ধি ভয়াবহ মনে হবে। ভেবে বিস্মিত হই—সংস্কৃত থেকে এত দূরের ভাষা কী ক'রে সংস্কৃতের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হল। বাংলা ও উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাষায় কথ্যরূপে যে সন্ধি পাওয়া যায় লেখার সময়ে সেগুলিকে ভেঙে বিযুক্ত ক'রে দেখানোই রীতি। ধরুন—"মোহনালোরঞ্জলি" এই উচ্চারিত শব্দগুচ্ছের লিখিত রূপ হবে "মোহন আলোর অঞ্জলি।" কিন্তু তামিলে তা চলবে না, বিশেষ ক'রে পদ্যে। এতে স্থান সংক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু পাঠকের চরম দুর্গতি। তামিল লিখন-পদ্ধতির অনুসরণে যদি লিখি—'ইটিজ্যান্যান্ট্' তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ এটি একটি পিঁপড়ে—ইট্ ইজ্ য়্যান্ য়্যান্ট্। ইদানীং কোনো কোনো নব্যগ্রন্থে (বিশেষ ক'রে প্রাচীন তামিল গ্রন্থের আধুনিকতম সংস্করণে) পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে যথাসম্ভব সন্ধির জট ছাড়িয়ে পৃথক্ পৃথক শব্দ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাচীনপন্থী পন্ডিতদের কাছে এই সহজ পদ্ধতিটিই অতি দুরূহ বক্র বোধ হয়।

তামিল পদ্যের আর একটি উপসর্গ হল অর্থবোধ বা ছেদ অনুযায়ী বাক্য না সাজিয়ে ছন্দের গতি অনুযায়ী পদভাঙ। রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তিকে তামিল রীতিতে সাজানো হচ্ছে :

মৈত্রীবন্ধন পুণ্যমন্ত্রপ বিত্রবিশ্বস মাজে।

এসব ক্ষেত্রে অনেক তামিল বিশেষজ্ঞকে অর্থোদ্ধারে হিমসিম খেতে দেখেছি। একদিকে সন্ধি, অন্যদিকে ছন্দের খাতিরে পদবিভাগ এই দুয়ে মিলে একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। আধুনিক তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর একটি কবিতা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। পৃথক্ পৃথক্ভাবে শব্দগুলি এই :

ইম্নল্ + বন্দু + উট্টিড়ুম্ + পোদু + আদরুকু + অঞ্জোম্।

সন্ধি করলে দাঁড়ায় এই :

ইম্নল্ — বন্দুট্টিড়ুম্ — পোদদরুক্ঞ্জোম্।

ছন্দের খাতিরে গ্রন্থে সাজানো হয়েছে এইভাবে :

ইম্নল্বন্ । দুট্টিড়ুম । পোদদারু । কঞ্জোম্।

পাঠক বিচার ক'রে দেখবেন পংক্তিটি মূল থেকে কতদূর চলে এসেছে।

এ তো গেল পদ্যের কথা। গদ্যে ব্যাপারটা এত সাংঘাতিক না হলেও বিশেষ সুবিধাজনকও নয়। তামিল সন্ধির, পদ্যেই হোক আর গদ্যেই হোক, একটি অপরিহার্য অংশের কথা বলছি। স্বরে-স্বরে, ব্যঞ্জনে-স্বরে, ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে, স্বরে-ব্যঞ্জনে নানাভাবে সন্ধি হতে পারে। বাংলাতেও হয়। এমনকি স্বরে-ব্যঞ্জনের সন্ধিও বাংলায় অমিল নয়। যেমন, তরু+ছায়া—তরুচ্ছায়া। এই যে পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্বলাভ, তামিলের এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা একটি বাংলা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। "দেবতা প্রাঙ্গণে দেখি মানুষের পূজা"—এই পংক্তিটিকে তামিল রীতিতে পড়তে গেলে দাঁড়াবে এইরূপ : "দেবতাপ্ প্রাঙ্গণেদ্ দেখিম্ মানুষের পূজা।" আপনি কতটা তামিল রপ্ত করতে পেরেছেন তার একটা বড় পরীক্ষা হল এই বর্ণাগম বজায় রেখে তামিল পড়তে ও লিখতে পারা।

আগেই একবার বলা হয়েছে, দক্ষিণী ভাষাগুলির মধ্যে আর্যপ্রভাব সবচেয়ে কম তামিলে। এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ যা কিছু অনুপ্রবেশ করেছে তার মূলে আছে তামিলী ব্রাহ্মণ-সমাজ, এবং এই ব্রাহ্মণ-সমাজ মূলত দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্যভাষীদেরই সন্তান। সুতরাং সংস্কৃতের প্রভাব থাকাটা কিছু বিস্ময়কর নয়। কিন্তু প্রভাবের রকমটা একবার বোঝা দরকার। কখনও কখনও বাংলার মতো আর্যভাষাকেও তামিল হার মানায়। আনন্দে আমরা 'হাততালি' দিয়ে থাকি, কখনো একটু সংস্কৃত ক'রে বলি 'করতালি'। কিন্তু তামিলে পাওয়া যায় 'করঘোষম্'। নিজস্ব শব্দ 'কৈ-তট্টুল্' থাকা সত্ত্বেও 'করঘোষম্' ব্যবহার করা নিশ্চয়ই লেখকের সংস্কৃত-প্রিয়তার নিদর্শন। এরকম শব্দ আরও আছে। যেমন, বাংলায় সিনেমা-তারকা, তামিলে সিনেমা-নক্ষত্রম্। আমরা কোনো কোনো সময়ে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি মূল থেকে ভিন্ন অর্থে। তামিলে হয়ত সেরূপ ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত অর্থই বজায় আছে। যেমন, 'অন্য' অর্থে 'ইতর' শব্দের ব্যবহার বাংলায় অস্বাভাবিক, কিন্তু তামিলে স্বাভাবিক। আবার উল্টোটাও আছে। অর্থাৎ পরিবর্তিত অর্থে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। যেমন,

তামিল শব্দ	তামিলে অর্থ
বিবচায়ী	(ব্যবসায়ী নয়)=কৃষক
পচু	(পশু নয়)=গোরু
মিরুক	(মৃগ বা হরিণ নয়)=পশু
আচৈ	(আশৈ বা আশা নয়)=লোভ
এজমানন্	(যজমান নয়)=প্রভু

বর্তমান তামিলনাডে একটা আন্দোলন চলছে সমস্ত বিদেশী, বিশেষ ক'রে আর্যাবর্তের প্রভাবকে এড়িয়ে চলা। এটা "দ্রাবিড় মুন্নেত্র কড়কম্' অর্থাৎ ডি, এম্, কে দলের অন্যতম কর্মসূচী। প্রত্যেকটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার জাত বিচার করা হচ্ছে। খাঁটি দ্রাবিড় শব্দ হলে তা গ্রহণীয়, নইলে পরিত্যাজ্য। এভাবে হয়ত একদিন বিশুদ্ধ তামিল শব্দের অভিধান সংকলিত হবে। ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াবে এখনই বলা যাচ্ছে না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরুন 'প্রধানমন্ত্রী'। দিল্লী থেকে আকাশবাণীর তামিলে যদিও বলা হয় প্রথমমন্ত্রী, কিন্তু খাঁটি তামিলীরা বলবেন—"তলৈমৈ অমৈচ্চর্"। 'তলৈমৈ' অবশ্যই তামিল শব্দ। কিন্তু 'অমৈচ্চর্' তো এসেছে সংস্কৃত 'অমাত্য' থেকে, সুতরাং ওটিও পরিত্যাজ্য কিনা বিবেচ্য। এগুলির সমাধান কীভাবে হবে জানি না। কিন্তু আমাদের কথা হল, এ জাতীয় আত্মশুদ্ধির চেষ্টা স্বপাকে খাওয়া ব্রাহ্মণের আত্মশুদ্ধি অপেক্ষাও ভয়ংকর।

সাহিত্য সমাচার

প্রকৃত শিল্পের আত্মা অমর। আরোপিত শক্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও জীবনের প্রতি কঠোর দায়িত্ববদ্ধ শিল্পী আপনার স্বকীয় সৃষ্টিশীল বিবেককে ধ্বংস হতে দেন না। সেখানেই তার মহত্ত্ব—সার্থক মানব হিসাবে শিল্প ও মানুষের প্রতি আত্মগরিমাহীন দেবশিশুর অকৃত্রিম আত্মোৎসার। শিল্পের ধ্বংস নেই—মৃত্যু নেই। শিল্পীও তাই। ইতিহাসের পাতায় মহান মানবসন্তানদের অক্ষয়কীর্তি চিরন্তন সত্যের দ্যুতি নিয়ে উজ্জ্বল। বহু বেদনা আর আনন্দের গাথায় মুখরিত সে-সমস্ত অধ্যায়।

আজকের পৃথিবীও স্তব্ধ নয়। নিরত সৃষ্টির নব নব উন্মেষালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে বিশ শতকের মধ্যভাগ। পুরনো ঐতিহ্যের ভিত্তিমূলে আমাদের চিরদিনের সত্য আজও তার নির্মল জ্যোতিতে ভাস্বর। জাগ্রত চেতনায় অভিব্যক্তির চিরন্তনতা নির্ধারিত হবে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের হাতে। আজকে নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে আমরা তার প্রশংসার অর্ঘ সাজব না। উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল-এর মাঝখানে সে সৃষ্টির, সে সত্যের গভীরতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। হয়ত বর্তমানের প্রতি তীব্র আসক্তি আমাদের সে দৃষ্টিতে কুয়াশার আচ্ছন্নতা এনে দেবে—তবুও আমাদের বসে থাকতে হবে কালিমাহীন আলোকের প্রতীক্ষায়।

একথাগুলো হঠাৎ মনে আসেনি। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানীর সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গেই কথাগুলি উঠেছিল।—সমগ্র জার্মানীর শিল্পীসমাজ বন্ধনহীন জীবনের সত্যকে এক গভীর সত্যাশ্রয়ী দৃষ্টিতে উপলব্ধি করছেন বলেই তাদের সৃষ্টি কোন সংকীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে না। সংঘাত বিদ্বেষ দ্বন্দ্বের মাঝখানে তাঁদের মিলিত শিল্পাকাশে ফুটে উঠছে মহত্ত্বের সত্যের ভাষা। হয়ত উদ্দেশ্য সেখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন মহৎ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়।

জীবিত জার্মান সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক বৃদ্ধ নায়ক স্বল্পকালীন প্রচেষ্টায় সার্থকতার খ্যাতিলাভ করেছেন। জনপ্রিয়তাও তাঁর কম নয়। এই প্রারব্ধ ভদ্রলোকের নাম হান্স বুতোভ্।

বুতোভ্ জার্মান ভাষার মত ইংরিজিতেও সিদ্ধহস্ত। উভয় ভাষায় তাঁর কলম চলে সমানভাবে। বর্তমান জার্মান সমালোচকদের মতে তিনি একজন বিস্ময়কর ক্ষমতাশালী লেখক। স্মরণীয় সাহিত্যগুণসম্পন্ন বহুভাষী লেখক সমাজে বুতোভ একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানি অধিকমাত্রায় ইংরিজিভাষী জাতির সম্পর্শে আসতে বাধ্য হলেও বুতোভ্-এর

হান্স বুতোভ

ইংরিজি জ্ঞানলাভের পেছনে রয়েছে অন্য কারণ। তাঁর মাতা ইংরেজ, পিতা জার্মান। ফলে উভয় ভাষাতেই শিশুকাল থেকে শিক্ষাব্যবস্থা প্রভাবিত। এখানেই বুতোভ্-এর সঙ্গে পার্থক্য রুশিয়ান নভোকভ, অস্ট্রিয়ান রবার্ট নয়মান প্রভৃতির। 'হ্যান্ডস্ অ্যাক্রস দি সি' গ্রন্থে বুতোভ লিখছেন—

"to tell a story invented by me in my second language. It was both easy and difficult. Easy because there was no need to enter into the course and style of a narrative of my own invention (the problem every translator has to solve), difficult because I had to turn it into the spirit of a different language. The result surprised me for it is closer to the German original than I had dared to expect. I could always follow the original so closely that in the end I am tempted to think I must have thought out the tale from the beginning in English as well."

দীর্ঘকাল বুতোভ্‌কে জীবনধারণের জন্য বিচিত্র জীবিকা অবলম্বন করতে হয়েছে। তার ঐ কর্মপ্রবাহের মধ্যদিয়ে সঞ্চিত হয়েছে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। দুঃসাহসী বুতোভ্ এগিয়ে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তিক্ত আর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন সেখান থেকে। তারপর পুস্তক-বিক্রেতার পেশা গ্রহণ করেন। পুরনো জিনিসপত্রও বিক্রি করেন কিছুকাল। কিছুকাল ফ্রাঙ্কফর্টার ৎসাইটুঙ'এর সম্পাদনার-দায়িত্বে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে বুতোভ্ হামবুর্গ সিনেটের উচ্চপদস্থ কর্মী এবং 'ওভারসীজ ক্লাবে'র সম্পাদক। মনে হয় এই পেশাই তাঁকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করেছে এবং এই-ই যেন তাঁর উপযুক্ত বৃত্তি। বিচিত্র অভিজ্ঞতায়-সমৃদ্ধ এই শিল্পী মানুষটির ফকনার-এর জীবন ও কর্মের সঙ্গে রয়েছে গভীর সাযুজ্য। তাই হয়ত বুতোভ ফকনার-এর এতবেশী প্রশংসা করে গেছেন। বুতোভ্-এর অপর একটি স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত অন্যান্য খ্যাতিসম্পন্ন লেখকের মত তিনি নিজেকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেননি। মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে যেমন মিশে গেছেন তেমনি জার্মান জনসাধারণ তাঁকে একান্ত আপনার জন বলেই মনে করে।

লেখকসমাজে বিভিন্ন বয়সে লেখা সুরুর একটা সাধারণ অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে। কিশোর, তারুণ্য, যৌবনকাল থেকে সুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত মানব বয়সের যে ক্রমপর্যায় নির্ধারিত তার যেকোন একটি স্তর থেকেই যেকোন লেখকের রচনাকালের সুরু। বুতোভ্ প্রায় বার্ধক্য বা একান্তই পরিণত বয়সের লেখক। দীর্ঘকাল ধরে লেখনরীতি একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে আসবার পর তার অভিব্যক্তি ঘটে। তখন বুতোভ্-এর বয়স ষাটের কাছাকাছি। একটি প্রেরণা তাঁর মনে বহুকাল সক্রিয় ছিল। মহৎ শিল্পবস্তুকে উপলব্ধি করার মধ্যেই সে প্রেরণা নিহিত। যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দীষ্ট বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ বা সচেতনতা না আসছে ততক্ষণ নীরব সাধনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। যখন তাঁর গ্রন্থগুলি একে একে প্রকাশিত হতে শুরু করে তখন পাঠক ও সমালোচক সমাজ তাঁকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। জার্মান সাহিত্য জগতের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বর্তমান বুদ্ধিজীবী সমাজে নতুন আলোচ্যবস্তু পরিবেশন না করলেও নন্দনতত্ত্বাশ্রিত গুণধর্মীতার তাঁর অধিকাংশ রচনাই রসোত্তীর্ণ।

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস (হিন্দী)

অবিভাজ্য

কুমার যোগী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তিন ।।

...দিলীপের প্রতি আমার কোনদিনই খারাপ মনোভাব ছিল না মা। ওকে আমি সব সময় ভালচোখেই দেখে এসেছি। প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করেছি ওকে পতন থেকে বাঁচাতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে আমাকে ভুল বুঝলেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাকে শোধরাতে। ওর প্রতি আমি বিরূপ হবই বা কেন। ওকে যে আমি ছোট ভায়ের মত ভালবাসি, স্নেহ করি। তাই সে খারাপ পথে পা বাড়াতে আমি বাধা না দিয়ে পারি না। আজকাল ওকে ঘিরে সব সময় এমন সব লোক থাকে তাদের আমি ভদ্র পরিবারের লোক বলে মনে করি না। সত্যি কথা বলতে কি এখানকার ভদ্রসমাজ দিলীপকে ঘৃণার চোখে দেখে। মা, কি বলব তোমাকে! ওর এত বাড় বেড়েছে যে, আজকাল প্রচুর মদ খায়। এই সিনেমা জগতে কতরকমের যে মায়াজাল আছে নিজের চোখে না দেখলে তা বোঝা যায় না। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি দিলীপ যাতে এই পথ ত্যাগ করে। ওপথ ছেড়ে দিলেই ওর মঙ্গল হবে। মাত্র সাত-আট দিন আগের একটি ঘটনা বলছি। দিলীপ এবং তার বন্ধুরা আকণ্ঠ মদ খেয়ে অপেরা হাউসের দারোয়ানদের সঙ্গে মারপিট করেছে। দিলীপের সঙ্গে অনেক মেয়েও ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার বন্ধুরা যখন আমায় বলল, তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। এই পরশু দিনের ব্যাপারটাই ধরা যাক না। হাঁকডাক না করে হঠাৎ আমি দিলীপের ঘরে ঢুকেছিলাম, ঘরে ঢুকে যা দেখেছি তাতে কোন ক্রমেই আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না। দিলীপ এবং এক অভিনেত্রী দুজনে পাশাপাশি বসে মদের বোতল খুলে গেলাসের পর গেলাস খাচ্ছে। আমার ঘরে ঢোকার পরেও ওদের মদ খাওয়া বন্ধ হল না। উল্টে আমাকেও মদ খাওয়ার জন্য বলতে লাগল। এই নারকীয় দৃশ্য কি করে সহ্য করব মা! আমি তক্ষুনি দিলীপকে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বকুনি দেওয়ার উদ্দেশ্য সে বুঝল না। সেও চটে গিয়ে আমাকে দু'কথা শুনিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, শেষ কথা বলল, ভবিষ্যতে যদি আমি তার ঘরে ঢুকি তাহলে সে নাকি আমার মাথা ফাটিয়ে দেবে। অবস্থা বুঝে আর কোন কথা না বলে ফিরে এলাম। কিন্তু মন আমার দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল রাগে। আমি ভগবানকে ডাকি দিলীপকে শোধরানোর জন্য। কিন্তু ভগবান আর কি করতে পারেন! দিলীপ দ্রুতগতিতে অন্ধকার গুহার দিকে যে ছুটে চলেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রভার কথা মনে পড়লে মনে নিদারুণ দুঃখ পাই। আমার আদরের বোন প্রভা কতখানি শান্ত, সরল এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওর ভাগ্য নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে ভগবানের কি একটুও বাধে না! এখন তুমিই বলত মা, প্রভাকে সর্বনাশের হাত থেকে কি করে বাঁচাই। এসব কথা প্রথম তোমাকে লিখতে চাইনি। আমি জানি তুমি এতে গভীর ব্যথা পাবে। কিন্তু প্রভার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি আর না লিখে পারলাম না। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওর সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পোঁছ-তেই হবে। অবস্থাটা যখন শেষ সীমায় পোঁছে গেছে তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাকে তলিয়ে দেখতে হবে। দিলীপকে কোন কিছু বোঝানো আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার আয়ত্তের বাইরে। প্রভার কাছেও একটা চিঠি লিখছি। আজ-কাল নিজেই একটা কোম্পানী খুলেছি। আগামী জানুয়ারী মাসে রেলওয়ের গুদাম-বানানোর ঠিকাদারী পাওয়ার আশা আছে। প্রায় সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। দু'লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট। কাজ ঠিক মত করতে পারলে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ঘরে আসবেই। আজকাল আমার খাটুনী বেড়ে গেছে। সারা দিন খাটাখাটুনী করে

রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরি। একটা ভাল বাসা খ‍ু'জছি, যাতে তোমরা দ‍ুজনেও এখানে আসতে পারো।' এই কণ্ট্রাক্ট পেয়ে গেলে ডিসেম্বর মাসে আমার পক্ষে ব‍ুড়ি যাওয়া সম্ভব হবে না। তোমার এবং প্রভার অস‍ুবিধার কথা সব সময় মনে পড়ে। কিন্তু এই কণ্ট্রাক্ট একবার পেয়ে গেলে আমি মনে করি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভালকথা, শ‍ুনলাম প্রভা স্কুলে চাকরি নিয়েছে! এতদিন তুমি আমাকে বললে না কেন। সেদিন দিলীপ আমাকে বন্ধ‍ুদের শ‍ুনিয়ে শ‍ুনিয়ে বলল এতবড় ছেলে থাকতে বোনকে চাকরি করে মার উদর প‍ূরণ করাতে হয়। এসব ব্যাপার আমার কাছে ল‍ুকোও কেন? আমি এমন কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে! দ‍ুদি'নে ঘাব‍ড়ে গেল কেন! টাকার দরকার হলে আমাকে লিখে জানাতে পারতে। আমি নিজে যদি রোজগার করে তোমাকে খাওয়াতে না পারি তাহলে আমার এ-জন্ম ব‍ৃথা মা। ভাবতেই পারি না আমার নিরীহ বোনকে চাকরি করতে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পার তুমি আমার বোনের মাথা থেকে চাকরির বোঝা নামিয়ে দাও মা।

ইতি—
তোমার
নটবর।

চিঠি পড়ার সময় মার চোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে। অত্যন্ত নরম জায়গায় প্রচণ্ডতম আঘাত লেগেছে তাঁর। দিলীপ তাঁকে এতখানি ব্যথা দেবে ভাবতে পারেন নি। নটবর কি সেই দিলীপের কথাই লিখেছে যাকে তিনি নিজের ছেলের চেয়েও বেশি আদর-যত্ন করে বড় করেছেন। বৈধব্যজীবনে এর চেয়ে বড় আঘাত মা পাননি। নটবর মিথ্যাবাদী নয় তাই তার কথা অবিশ্বাস করা যায় না। ও যা লিখেছে তার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্যই হবে। দিলীপের কথা ভাবতে ভাবতে মার চোখের সামনে প্রভার চেহারাও ভেসে উঠল। এখনও সে স্কুল থেকে ফেরেনি। তাহলে কি প্রভার ভবিষ্যৎ অন্ধকার! এরকম অবস্থায় দিলীপের সঙ্গে প্রভার বিয়ে দেওয়া আর ওর হাতে দড়ি-কলসী দেওয়া তো সমান। না, তা কিছ‍ুতেই হবে না। চোখের সামনে নিজের মেয়ের এতবড় সর্বনাশ কি করে করবেন! কোন বাপ-মা কি তা পারে! চুলোয় যাক এমন প্রতিশ্র‍ুতি!

নটবরের মা ভাবছেন। প্রভার বাবার সামনে যে পাত্রের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে তা ভাঙবো কি করে? সমাজ কি ভাববে! ভালকথা, দিলীপকে নিজে গিয়ে একবার বোঝাতে পারলে কেমন হয়? এখানে তো আমি যা বলতাম তাই শ‍ুনত। একদিনও তো আমার ম‍ুখের সামনে কথা বলেনি। আমি বোঝালে ও নিশ্চয়ই ব‍ুঝবে। এই বয়সের ছেলেরা অমন একট‍ু আধট‍ু ভুলচুক করে বইকি। শ‍ু'য়ে একটা ভালো থাকে কিনা সন্দেহ। দিলীপের কোন দোষ নেই। ওকে বাধ্য হয়ে যাদের সঙ্গে মিশতে হয়েছে তারাই ওকে বিগড়ে দিয়েছে। একট‍ু একট‍ু করে বোঝালে ও ঠিক নিজেকে শ‍ুধরে নেবে। একবার চেষ্টা করে দেখিই না কি হয়। প্রয়োজন হলে না হয় কিছ‍ুদিন আমি বোম্বাইতেই থেকে যাব। আমি কাছে থাকলে দিলীপ নিশ্চয়ই ও-পথ মাড়াবে না। নটবর রগচটা ছেলে। সব সময় মেজাজ গরম করে রাখে। কোন কিছ‍ু হলে দপ করে জ্ব‍লে ওঠে। লোকের সঙ্গে কি করে ঠান্ডা মাথায় ব্যবহার করতে হয় তাও জানে না। রাগের মাথায় ম‍ুখের উপর যাকে তাকে যা-তা বলে বসে। এখানেও তো যখন-তখন দিলীপের সঙ্গে বেধে যেত। এই তো সেদিনের কথা। সামান্য একটা সিগেরেট নিয়ে নটবর একেবারে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। না হয় দিলীপ একটা সিগেরেট খেয়েছে তাতে হয়েছেটা কি! তাতে নটবর এমনভাবে রেগে গেল যেন সে মান‍ুষ খ‍ুন করেছে। ছেলে আমার বড় জেদী। মনে অবশ্য তার কোনো প্যাঁচ নেই। কিন্তু নিজে যা ভাল মনে করবে সবাইকে দিয়ে তা মানাবেই। ওর স্বভাবই ওইরকম।

প্রভা স্কুল থেকে ফিরে মার ম‍ুখে লক্ষ্য করে বিষাদ-ভাব। মার চোখ ছলছল করছে। মেয়েকে দেখে আঁচল দিয়ে চোখ ম‍ুছে নিয়ে মা এমন ভাব দেখালেন যেন কিছ‍ুই হয়নি। কিন্তু প্রভা অন‍ুভব করতে পারল মার ব্যথা। ভেবেছিল চিঠির কথা পাড়বে। কিন্তু মা ও-প্রসঙ্গ চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে দেখে আর কোন কথা বলল না।

সন্ধ্যার সময় মার মন্দিরে যাওয়ার পর প্রভা পারল না নিজের কৌত‍ূহল সংযত রাখতে। মার কাছে দেওয়া চিঠিতে নটবর কি লিখেছে জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল মনে। শেষে মার বাক্স খ‍ুলে চিঠি বের করে একনিঃশ্বেষে পড়ে আবার রেখে দিল।

প্রবল ঝড়ে যেমন গাছের প্রত্যেকটি পাতা শাখা-প্রশাখা নড়ে ওঠে প্রভাও তেমনি রাগে-দ‍ুঃখে কাঁপছে। তার মন হাহাকার করে ওঠে। চারদিক থেকে দিলীপের ম‍ূর্তিগ‍ুলো তাকে ঘিরে যেন অট্টহাস্য করছে। বিদ্র‍ূপ করছে। কোন মান‍ুষকে এতখানি অপমানিত হতে প্রভা আজ পর্যন্ত কোনদিন দেখেনি। সে শিউরে উঠল। অদ্ভুত, ভয়ংকর এক-একটা ছবি তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল এবং মিলিয়ে গেল। স‍ৃষ্টি এবং সংহারের বিচিত্র ছবি ম‍ুহ‍ূর্তে তার চোখের সামনে ভাসে এবং মিলিয়ে যায়। প্রাণের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। জীবনের সব গান শেষ হয়ে গেছে। ভাবতে কষ্ট হয়, দিলীপ এত নীচে নেমে গেছে! প্রভার মনে প্রশ্ন জাগে। যাকে আমি দেবতা ভেবেছিলাম সে অন্ততঃ মান‍ুষও হল না; একেবারে দানবে পরিণত হল। একি আমার ভাগ্যের লিখন। কিন্তু এরকম হবে কেন! কেন হল? ভাগ্য কি? ভাগ্যের স্রষ্টা তো মান‍ুষ নিজে। মান‍ুষ নিজেই তো স্রষ্টা-নিয়ন্তা—স্বয়ম্ভুও সেই। তাহলে আর সে অদ‍ৃষ্টের হাতে নিজের ভাগ্যের লাগাম তুলে দিয়ে হাত গ‍ুটিয়ে বসে থাকবে কেন? না, আমার ভাগ্য খারাপ হতে পারে না। ভাগ্যের বিষব‍ৃক্ষ অকর্মণ্য এবং কাপ‍ুর‍ুষদের উর্বর ভবিষ্যতের মাটিতেই শ‍ুধ‍ু জন্মলাভ করে।

।। চার ।।

দ‍ুদিন ধরে নটবরের বেশ ভালই লাগছে। খ‍ুব খ‍ুশী সে। মা এবং প্রভা বোম্বাই এসে গেছে। এখন আর তার একক জীবনের দ‍ুঃসহ যন্ত্রণা নেই। নিজের ছেলে ব্যবসায়ে এত উন্নতি করেছে দেখে মায়ের খ‍ুব আনন্দ হল। প্রভা দাদার ঘরে পা রাখার পরেই যেন প্রতিজ্ঞা করেছে ঘরটাকে ছবির মত সাজাবে। অনেকগ‍ুলো বই কিনে রেখেছে নটবর। বইগ‍ুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে প্রভার খ‍ুব ভালই লাগল। মনে মনে দাদার র‍ুচির প্রশংসা করল। প্রত্যেক বই নেড়ে-চেড়ে দেখে আবার জায়গামত রেখে দিল। বইয়ের বিভিন্ন পাতায় দাদার দেওয়া লাল-পেন্সিলের দাগ জ্ব‍ল-জ্ব‍ল করছে। না দাদা তাহলে নেহাৎ আলমারী সাজানোর জন্যই বই কেনে না। প্রভার হাতে পড়লো একখানা ইংরাজী বই। দ‍ু-চার পাতা উল্টাতেই একখানা নীল খাম নজরে পড়ল। দেখেই ব‍ুঝল ওটা দিলীপের লেখা চিঠি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে দেখে নিল কেউ আছে কিনা। মা পাশের ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছে। খামের চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল। চিঠি পড়ার সময় ম‍ুহ‍ূর্তে ম‍ুহ‍ূর্তে তার ম‍ুখের চেহারা পাল্টাতে লাগল।

......নটবর। এটাই তোমার পরিবারকে লেখা আমার শেষ চিঠি। আমার অবস্থায় অন্য কেউ পড়লে চিঠি লেখার

প্রয়োজনও বোধ করত না। নেহাৎ আমি বলে ভদ্রতার খাতিরে এই চিঠি লিখছি। আমার মধ্যে কোন লুকোচুরির ব্যাপার নাই। যা করি এবং যা করতে চাই তা জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নই। দেখ, তুমি নিজের ভাগ্য আমার সঙ্গে বেঁধো না। নিজের পরিবারকে আমার গলায় ঝুলিয়ো না। আমার সাংস্কৃতিক জীবন আর তোমার পরিবারের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তোমার শরীরে এমন এক ব্যবসায়ীর রক্ত মিশে রয়েছে যার ফলে তোমার মন নিছক ব্যবসা জগতের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারে না। জগতে সমস্ত রকমের আনন্দ থেকে তোমার সেই ব্যবসায়িক মন দূরে থাকতে চায়। তোমার সেই অর্থগৃধ্নু মন সংস্কৃতিপিপাসু রসজ্ঞদের বিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠিত নয়। নিজেকে এক কূপমণ্ডূকতার মধ্যে আবদ্ধ রেখেই তুমি খুশী। অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধানে বেরোতে চাও না তুমি। নিজের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ রেখে বহির্জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে চাও। কিন্তু আমার জীবনধারা ঠিক এর বিপরীত। তোমাদের বাড়িতে অন্নজল গ্রহণ করার ফলে আমার অনেকগুলো সুষ্ঠু প্রবৃত্তি পঙ্গু হয়ে গেছে। আমার বহু সুন্দর পরিকল্পনা ডানা-কাটা পাখির মত মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। এতদিন নিজেকে আমি চিনতে পারিনি, অন্ধকার গহ্বরে পড়ে ছিলাম। আজ তোমাদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে অনুধাবন করতে পারছি যে, আজ আমি পৃথিবীতে জন্মেছি এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য। আমি জন্মেছি গোটা পৃথিবীর মানুষকে নতুন বাণী শোনাতে। আমার মনের গভীরে মানবতার স্পন্দন লুকিয়ে রয়েছে। বিশ্বের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন আমার নতুন বাণীর। এই অবস্থায় প্রভার কথা মনে পড়লে করুণায় মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। আমার মন সমুদ্রের মত বিশাল এবং বিরাট। এই বিরাট হৃদয়সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে তোমার বোন কি খাপ খাওয়াতে পারবে। ভুলে যেও না নটবর, যে আমি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ! তোমাদের মত আমার মনে মিষ্টি মিষ্টি কথার আড়ম্বর নেই। মিষ্ট কথা বলে আমি কাউকে নিজের জালে আবদ্ধ রাখতে চাই না। নটবর, আর কোন দিন তুমি আমাকে তোমার পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা কর না। আমি কৃতঘ্ন হতে চাই না বলেই আমার বক্তব্য আগেই জানিয়ে দিচ্ছি। আমাকে দিয়ে জোর করে কিছু করানোর চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম হবে। নিতান্তই যদি টাকা-পয়সার দরকার হয় দিতে পারি। কিন্তু আমি এখন বদ্ধপরিকর যে ভুলেও তোমাদের ছায়া মাড়াবো না। প্রভা কোন-ক্রমেই পারবে না আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। আমার আবেগ, আমার শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অত সহজ নয়। ভুলে যাচ্ছ কেন নটবর, আমি একজন শিল্পী। আমি মুক্ত, স্বাধীন এবং আত্মমগ্ন থাকতে চাই সব সময়। আমি

এমন ভাব দেখালেন যেন কিছুই হয়নি

আমার জীবনে এমন এক নারীর সন্ধান চাই যে আমার রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে স্বাধীন, যেমন থাকে বনের পাখিদের মধ্যে। কোন রকম সংকীর্ণ বন্ধন থাকবে না আমাদের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না নটবর। বহতা জীবন-স্রোতের মাঝে কৃত্রিম বাঁধ সৃষ্টি করে সেই স্রোতের গতিকে রোধার চেষ্টা বৃথা। কী লাভ! মুক্ত জীবনেই প্রেরণার উৎস রয়েছে। আমি জানি প্রভা আমার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে গভীর দুঃখ পাবে। ওর চোখের সামনে আছড়ে পড়বে অন্ধকার। আমাকে ছেড়ে সে বাঁচার কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু নটবর, আমাকেও তো আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবতে হবে। একটি সাধারণ জীবনের জন্য আমার এই মূল্যবান জীবন তো নষ্ট করে দিতে পারি না। সেটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নটবর, তুমি কিন্তু জিদ ধরো না। মনে রেখো আমি শিল্পী। অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের উদ্ধারের ভার

আমার উপর। আমার গলায় তোমার বোনকে ঝুলিয়ে আমাকে পঙ্গু করে তুল না। বিশ্বকল্যাণের মহাযজ্ঞের পুরোহিতের গলায় অভিশাপের দড়ি বেঁধো না। আমি ঘোষণা করছি আমি আজ থেকে বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন।

ইতি তোমার
দিলীপ

প্রভা বজ্রাহতের মত থ' বনে দাঁড়িয়ে রইল। মাথা টলে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল। ঠোঁটে ভেসে উঠেছে প্রচণ্ড এক ঘৃণা। অহঙ্কার মানুষকে যে কত দ্রুত নিচের দিকে টানে তা জীবনে আজ প্রথম অনুধাবন করতে পারল প্রভা। কিন্তু এই ক রু ণা মি শ্রি ত চিন্তার পাশাপাশি বিদ্রোহের ফুলকিও জ্বলতে লাগল। মন ক্রমশঃ চিন্তাগম্ভীর হয়ে উঠলো। প্রভা ভাবছে দিলীপের মনে কী ক'রে এমন একটা অসূয়া এতখানি দানবীয় রূপে নিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে। প্রভা ঠিক বুঝতে পারল না। নিজের সম্পর্কেই চিন্তা করতে লাগল। এ সমস্ত কিছুর জন্য সে নিজে কতখানি দায়ী তাই খ'ুটিয়ে বিচার করতে লাগল। কার দোষে এতখানি গড়া ইমারত আজ ধ্বসে পড়ছে। দিলীপ নিজেকে কি মনে করছে! আমার কি কোন অভিমান থাকতে পারে না। যে ধরনের যুক্তির অবতারণা করে দিলীপ মনে করছে যে তাকে ছাড়লে আমি আঘাত পাব সে কি একবারও একথা ভাবছে না যে, ওসবে আমি কোন ব্যথা পাই না। আমাকে সে এতটা হীন তুচ্ছ মনে করে কেন! আমার যেন কোন মূল্যেই নেই। আমারও ব্যক্তিত্ব আছে, অহঙ্কার আমারও থাকতে পারে। আমাকে বিয়ে করার জন্য একমাত্র সেই উপযুক্ত লোক, পৃথিবীতে আর কেউ নেই? আমার নিজেরও একটা মত থাকতে পারে। এ সব দিলীপের আড়ম্বর, বাহাদুরী ছাড়া আর কি। ও যতটা ভেবেছে ততটা নির্জীব আমি নই। আমি আমার অধিকারের কথা বলি না বলে কি বলার অধিকারও আমার নেই। এভাবে মুখ বুজে থাকার কোন মানে হয় না। নারীর নীরব আত্মসমর্পণের অর্থ পুরুষের কাছে এইভাবে ধরা পড়েছে। নারীর সত্যিকারের সহিষ্ণুতাকে পুরুষ মনে করে এ-তার দুর্বলতা। নারী কি পুরুষের দৃষ্টিতে এতই হীন হয়ে গেছে? সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গড়ার সাধনায় উৎসর্গীকৃত একজন পুরুষের নারী সম্পর্কে কী অদ্ভুত ধারণা। এই কি তার উন্নত রুচির পরিচয়! না, এ সব একপক্ষীয় বিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষ নিজেকে এক মহত্বের পরাকাষ্ঠা ভাবে। নারীকে মনে করে হীন তুচ্ছ। তাছাড়া দিলীপের মধ্যে অনেক-গুলো বিকৃতি স্থান পেয়েছে! কি আছে এখন দিলীপের মধ্যে। কিসের জন্য সে এত দম্ভ করে। মিথ্যাভিমানীরা কোন-দিন কি সংস্কৃতির সাধক হতে পেরেছে? এক দিকে মদ এবং জঘন্যতম প্রবৃত্তি-গুলির তাড়নায় জীবন পরিচালনা এবং অন্য দিকে সংস্কৃতির সাধনা—এই পরস্পরবিরোধিতা কি কোন কিছু সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি বহন করে!

।। পাঁচ ।।

রাত এগারটা। তবু নটবর ফেরেনি। দিলীপকে নিয়ে ফেরার কথা। হঠাৎ ট্যাক্সীর আওয়াজ কানে যেতেই দরজা খুলে দেখে সামনে ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সী থেকে নটবরকে নামতে দেখেই মা প্রমাদ গুণলেন। মা এবং বোনের আশঙ্কামিশ্রিত চোখ নিবদ্ধ হল নটবরের উপর। তারপর গাড়ি থেকে নামল আরও তিনজন। অবশেষে সকলে ধরাধরি করে দিলীপকে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। মা এবং প্রভা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দিলীপের দিকে। দিলীপ কাঠ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। শরীরটা একটুও নড়ছে না, তার চোখ নিবদ্ধ কড়িকাঠের দিকে। মা বিস্ফারিত চোখে দিলীপের অনড় শরীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। প্রভার অবস্থাটা দেখে নিয়ে আবার নিজেকে সংযত করে নেয়।

—এ তুমি কি করলে দাদা? আমাদের মত 'বর্বরদের' মধ্যে এই 'সংস্কৃতির পুরোহিতকে' টেনে আনলে কেন? না, এ কিছুতেই এখানে থাকতে পারে না, একে এখনই ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

—ফেরৎ পাঠাবো! কোথায় পাঠাবো প্রভা? এ যে ফেরৎ যেতে পারবে না। তাছাড়া যাবে কোথায়! দিলীপ এই ঘরেই সারা জীবন থাকবে।

—না, তা কিছুতেই হবে না দাদা। এখানে দিলীপ কিছুতেই থাকতে পারবে না। এক মুহূর্তের জন্যও ওর এখানে থাকা চলবে না। ওকে যেতে দাও। আমি মুখ দেখতে পারব না। আমার বাবা এবং পরিবারের নিন্দা করে যে মানুষ তার মত অহঙ্কারীর সঙ্গে আমি কোন দিন কোন সম্পর্ক রাখতে পারব না। এর জন্য বাবার আত্মা আমাকে ক্ষমা করবে না। উনি যার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে গেছেন আমি তা ভেঙে দিচ্ছি। দাদা, তুমি ওকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও। আমি ওকে কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।......

গভীর আবেগে প্রভা থরথর করে কাঁপতে লাগল। পরক্ষণেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। এর আগে কোন দিন দাদার কাছে এতটা নির্ভীক, নিঃসঙ্কোচে কথা বলেনি প্রভা।

—প্রভা, আমি বুঝি তোমার যন্ত্রণা। কিন্তু একবার শান্ত হয়ে গোটা ব্যাপারটা বিচার করে দেখো। অনেক কিছু ভেবেই দিলীপকে আমি এ-ঘরে এনেছি। তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছো ওর শরীরের একটা অংশ পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। কোন কিছু করার ক্ষমতা ওর নেই। এ-সংসারে ওর নিজের বলতে তো কেউ নেই, তা তো তুমি জান। বাবা এক দিন নিজের ছেলের মত আদরযত্ন করে ওকে ঘরে রেখেছিলেন। বাবা নিজের হাতে যে গাছের বীজ আমাদের পরিবারে বপন করেছিলেন আমি কি তা উপড়ে ফেলে দেবো? দিলীপ যে আজ নিঃসহায়, নিরুপায়। ওকে কি করে আমি বাইরে ফেলে দেবো প্রভা? আমি তা পারব না। আমি যে ওকে নিজের ছোট-ভাইয়ের মত ভালবেসেছি।

—কী! দিলীপের পক্ষাঘাত হয়েছে? বাছার আমার শেষে এই রোগ ধরল। মা আর্তনাদ করে উঠলেন।

দিলীপের প্রতি প্রভার এই অপ্রত্যাশিত বিতৃষ্ণা নটবরের কাছে অস্বাভাবিক লাগল। প্রভাকে এতখানি উত্তেজিত সে কোন দিন দেখেনি। হিমাবরণের গভীরে যে এতখানি রাগের আগুন জমেছিল তা কোন দিন সে কল্পনা করতে পারেনি। আজ প্রথম সে টের পেল। তাই বলে কি প্রভার মনে একটুও করুণা বা দয়ার স্থান নেই! দিলীপের প্রতি আজ কি তার কোন দায়িত্ব নেই! নটবর প্রভার কাছে গিয়ে তার দুটি হাত ধরে সবিনয়ে বলল, প্রভা, রাগদ্বেষোষ্মা এ সব মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। জীবনকে এত সহজে বিভক্ত করা যায় না। মিলন এবং বিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য এত সহজ নয়। মুহূর্তের উত্তেজনায় সমস্ত সম্পর্কের ছেদ হয়ে যায় না। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন যা আছে, তাই সবচেয়ে বড় সত্য। আর সত্য যখন স্বয়ং ধরা দিয়েছে তখন তাকে স্বাগত জানানোই ভাল।

ভাইয়ের গভীর অন্তরে বিরাজমান এক অন্তর্যামীর সাক্ষাৎ পেয়ে প্রভা যেন ধন্যা হল। সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে যার কোন দিন সংস্রব ছিল না সেই ব্যবসায়ী দাদার মনে মনুষ্যত্বের এতখানি বিকাশিত রূপ কোন দিন প্রভা দেখেনি। তার মানবদরদী মনের পরিচয় কোন দিন সে পায়নি। মনের গভীরে যে আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছিল তা ক্রমশঃ স্তিমিত হল, মহান ক্ষমার একটি স্পর্শে প্রভার মন শান্ত হল।

—শেষ—

অনুবাদ ঃ জ্যোৎস্না বিশ্বনাথন্

কোলকাতার ক্লিওপেট্রা

রঞ্জন রায়চৌধুরী

কোন এক শীতের সন্ধ্যায় সুন্দরী ষোড়শী প্রেয়সীকে বাড়িতে রেখে কোন বন্ধুবরের বাড়িতে নৈশ-ভোজের সময় বাড়ির চাকরের মুখে যদি শোনেন, রাত দশটায় আপনার সুরক্ষিত বাড়ির নিভৃত কক্ষের পেছন দিক থেকে মই-এর সাহায্যে গলে এসে জনৈক সুদর্শন যুবক আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে গোপনে প্রেমালাপ করছে; তখন খানাপিনা ফেলে রেখে আপনার কি সেই উদ্ধত যুবকটির টুটি টিপে ধরার ইচ্ছে করবে না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবে। মিঃ গ্র্যাণ্ডেরও সেই অবস্থাই হয়েছিল। তিনি খাবার টেবিলটি লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে মেজর পামারের (হেস্টিংস-এর সেক্রেটারী) বাড়ির কাছে এসে চিৎকার করে উঠলেন, 'মিঃ পামার, মিঃ পামার, দয়া করে আপনার তরোয়ালটি আমাকে দেবেন কি? রক্তের স্রোতে আমি ঐ পাপ ধুয়ে দেব।'

মিঃ গ্র্যাণ্ড (কোম্পানীর রাইটার, পরে পে-মাস্টার) বেড়াতে গিয়াছিলেন চন্দননগরের ফরাসী ক্যাপ্টেন মঁশিয়ে উর্লির বাড়িতে। কিন্তু এক অপরূপ সুন্দরীর দৃষ্টিতে তাঁর চোখ দুটো যেন ঝলসে গেল। ভাবলেন, কোন গ্রীক দেবী নয়তো? দীর্ঘদেহ থেকে চাঁপা ফুলের রং যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। অপূর্ব সুন্দর অলক-গুচ্ছ বক্ষের সঙ্গে সুবিন্যস্ত, চোখ দুটিতে সমুদ্রের নীলাভা, তার উপরে বঙ্কিম ভ্রূ-যুগল গভীর মসীকৃষ্ণ। নাকটি যেন কোন গ্রীক চিত্রশিল্পীর আঁকা। ক্যাপ্টেন উর্লির কন্যা—মিস নোয়েল ক্যাথারিন উর্লি। সে-যুগের 'হেলেন অফ ক্যালকাটা,' 'ক্লিওপেট্রা অফ ইণ্ডিয়া'। প্রথম দর্শনেই প্রেম। কয়েকদিন পরে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। নোয়েল ক্যাথারিন হলেন মাদাম গ্র্যাণ্ড। মিঃ গ্র্যাণ্ডের তবু স্বস্তি নেই, সব সময় চিন্তা, কি করে রূপসী প্রেয়সীকে তুষ্ট করতে পারবেন। কোলকাতার যা হালচাল তাতে বেশি-দিন ক্যাথারিনকে খাস কোলকাতার বুকের উপর রাখতে ভরসা হয় না। তাই তিনি সহরের উপকণ্ঠে তৈরি করলেন চমৎকার একখানা বাড়ি। সহরের ইংরেজগুলো কি হ্যাংলা! ছোট বড় জ্ঞান নেই। ইংল্যাণ্ড থেকে কোন জাহাজ এলেই সবাই গিয়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড় করে। তারপর শুরু হয় তোষামোদি—রাতের পর রাত চলে নাচ গান আর হুল্লোড়। মেয়েগুলোও যেন নীলামের মাল, যে বেশি দাম হাঁকবে অমনি ডান হাতখানি এগিয়ে দেবে তার দিকে। অবশ্য এজন্য তাদেরও বেশি দোষ দেওয়া যায় না। কোলকাতায় ইংরাজ মেয়ের যা আকাল! কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ার ভয়ে কেউ এ-মুখে পা বাড়াতে চায় না। তবু মিঃ গ্র্যাণ্ড এসব পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ বল নাচের আসরে অপরের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য যখন হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, তা মিঃ গ্র্যাণ্ডের বিলকুল অপছন্দ। কিন্তু ক্যাথারিনের সে-স্বভাব নেই। পর-পুরুষের সঙ্গে সে বেশি মেলামেশাও করে না। শুধু কৌন্সিলের সভ্য মিঃ ফিলিপ ফ্রান্সিস ও'র দিকে একটু বাঁকাভাবে তাকান; কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেন, 'মিঃ গ্র্যাণ্ড, পৃথিবীর মধ্যে আপনি সত্যি সুখী।' কথাটির মধ্যে কোথাও যেন একটু দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে। তবু মিঃ গ্র্যাণ্ড জানেন, ক্যাথারিনের মত সতী, লক্ষ্মী স্ত্রী হয় না। তাকে ভালবেসে বেসে সে বেচারি একেবারে দেউলে হয়ে গেল। এই কথা ভাবতে ভাবতেই ১৭৭৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পা বাড়িয়েছিলেন বন্ধুবর মিঃ গেলনের বাড়ির দিকে। কিন্তু হায়, যখন ফিরলেন তখন তাঁর মত দুঃখী জগতে আর কেউ নেই।

'On December 8, 1778, I went out of my house, about nine O' clock, the happiest, as I thought myself, of men; and between

মিসেস গ্র্যাণ্ড (পরে মাদাম তেলেরেণ্ড)

eleven and twelve O'clock returned the same night to it as miserable as any being could well feel. I left it prepossessed with a sense that I was blessed with the most heartiful as well as the most virtuous of wives, ourselves honoured and respected, moving in the first circles, and having every prospect of speedy advancement'.

খোলা তরোয়াল হাতে বাড়িতে ঢুকতেই, জমাদার রামবক্সের সঙ্গে ফটকে দেখা হয়ে গেল। সে হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে উঠল, 'আমার কোন দোষ নেই হুজুর, আমি মিঃ ফ্রান্সিসকে ধরেই রেখেছিলাম। কোত্থেকে হঠাৎ দু'টো লোক এসে ঢুকে পড়ায় তিনি পালিয়ে গেলেন।'

: মিঃ ফ্রান্সিস নেই? জাহান্নামে যা তোরা, লোক দু'টি কই?—মিঃ গ্র্যাণ্ড উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করেন।

: হুজুর, একজন নিচের ঘরে আর একজন মিঃ কেবলের কাছে আছেন। এঁদের মধ্যে একজন মিঃ শী।

: মিঃ শী! এখানে? কেন?

: আজ্ঞে হুজুর—

একটু থেমে মিঃ গ্র্যাণ্ড আবার প্রশ্নবান ছুঁড়লেন :

: মিসেস গ্র্যাণ্ড কোথায়?

: আজ্ঞে তাঁকে তো দেখা যাচ্ছে না।

: মিঃ শী-কে ছেড়ে দিতে বল।

একথা বলেই মিঃ গ্র্যাণ্ড হন হন করে চলে গেলেন মেজর পাশরের বাড়ির দিকে। সেখানেই কাটালেন অবশিষ্ট রাত। দু'খানা চিঠি তিনি চটপট লিখে ফেললেন। একখানা চন্দননগরে মিসেস গ্র্যাণ্ডের বোনের কাছে। আর একখানা মিঃ ফ্রান্সিসের কাছে। তার পরের দিন বিকালে মিঃ ফ্রান্সিসের জবাব এল : মিঃ গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করা এখন তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

১৭৭৯ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার সুপ্রীম কোর্টে বিচার শুরু হল। বাদী—জর্জ ফিলিপ গ্র্যাণ্ড—কোম্পানীর রাইটার। বিবাদী—ফিলিপ ফ্রান্সিস—ফোর্ট উইলিয়ামে কোম্পানীর কৌন্সিলের দ্বিতীয় কৌন্সিলর। প্রথম অভিযোগ : বাদীর বাড়িতে রাতে বেআইনী প্রবেশ এবং বাদীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ নৈশ কথোপকথন ইত্যাদি। দ্বিতীয় অভিযোগ : ঘটনাটির পরে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে এবং বিভিন্নভাবে বাদীর পানের শত সহস্র সিক্কা টাকার ক্ষতিপূরণ। বিচারকের আসন গ্রহণ করলেন, প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে, স্যার জন চ্যাম্বার্স এবং মিঃ জাস্টিস হাইড।

মিঃ গ্র্যাণ্ডের পক্ষের কৌঁসুলি মিঃ নিউম্যান প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে বললেন : ধর্মাবতার, এই অসাধারণ মামলার প্রধান সাক্ষী মিঃ শী আজ এখানে উপস্থিত নেই। হয়তো তিনি চন্দননগরের ফরাসীদের আশ্রয় নিয়েছেন, কিংবা তাঁকে কৌশলে সেখানে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। মিঃ শী কোম্পানীর কর্মচারী; তাই তাঁকে আনার জন্য গভর্ণর-জেনারেলের কাছে আবেদন করা যেতে পারে।

প্রধান বিচারপতি : গভর্ণর-জেনারেল এবং কৌন্সিলের সঙ্গে আদালতের কোন সম্পর্ক নেই। প্রধান সাক্ষী যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে তার ফিরে আসা পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুনানি মুলতুবি রাখতে হবে। বিবাদী কৌন্সিলের একজন সভ্য এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। সাক্ষী যদি সমন পেয়েও না আসে, তবে মনে করতে হবে বিবাদী কোন চক্রান্ত করছেন। ইংল্যাণ্ডের কথা মনে করা যেতে পারে। সেখানে যদি কোন সাক্ষী আদালতে হাজির না হয় তবে তার জরিমানা কিংবা জেল হতে পারে। আমাদের চার্টারেও এরকম নিয়ম রয়েছে যে, সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে তাকে জরিমানা করা ও জেল দেওয়া ছাড়াও বেত্রাঘাত এবং অন্যান্য দৈহিক শাস্তি দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্য তা চাই না, আমরা আশা করি, সাক্ষী যথাসময়ে ফিরে আসবে।

অতঃপর ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি থাকে।

১৭৭৯ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার। খিদমৎগার মীরণের জেরা শুরু হল। সে জানাল : যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিন মিঃ গ্র্যাণ্ড সান্ধ্য-ভোজের নেমন্তন্ন রাখতে মিঃ গেলনের বাড়ি যান। রাত দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। তখন সে উঠানের কাছে নিজের ঘরে বসে ছিল, এমন সময় আয়া এসে জানাল, কর্ত্রী একটি মোমবাতি চেয়েছেন। মোমবাতি নিয়ে যাবার পর সে দেখে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আয়া একথা জানাবার পর সে-ও ঘর থেকে বেরুল, ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে পড়ল পাঁচিলের বাইরের দিক থেকে একটা বাঁশের মই লাগান রয়েছে। অবাক হয়ে সে জমাদারকে খবর দিতে ছুটে যায়। জমাদারও দেখে একেবারে হতবাক। তারা যখন কথা বলছিল তখন উপরের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। সে তক্ষুনি চিনতে পারল, মিঃ ফ্রান্সিস—কোম্পানীর কৌন্সিলর, যিনি 'পেল-হাউসের' পেছন দিকে থাকেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'জিনিসটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।' তারা যখন সে-কথায় কোন কান দিল না তখন তিনি বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছো না, আমি মিঃ ফ্রান্সিস।'

: জমাদার মিঃ ফ্রান্সিসের হাত দুটি ধরে ফেলে বলল, মনিব এখানে নেই, আপনি কি করছিলেন? জমাদার তাঁকে একটি ঘরের ভেতর ঢোকাবার সময় মিসেস গ্র্যাণ্ড কি যেন বলছিলেন; আমি তা বুঝতে পারিনি। মিঃ ফ্রান্সিসকে নিচের তলায় নিয়ে যাবার সময় আমি মিঃ গ্র্যাণ্ডকে খবর দেবার জন্য ছুটে যাই।

: আয়া যখন তোমাকে এসে বলল, কর্ত্রীর একটি মোমবাতি দরকার এবং সে ফিরে গিয়ে যখন দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, তারপরে ভদ্রলোককে যখন ঘর থেকে বেরুতে দেখলে—এর মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল?

: এক কিংবা দুই হিন্দুস্থানী ঘোরি (এক ঘোরি প্রায় ২০ মিনিটের সমান)।

: আচ্ছা, তুমি বলেছ যে, পাঁচিলের কাছ দিয়ে যাবার সময় ঘর থেকে একজন ভদ্রলোককে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলে, মইটি প্রথম চোখে পড়া থেকে এই ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল

: আমি সময়টা ঠিক করে বলতে পারবো না।

: তুমি কি এর আগে সময়ের কথা বলনি?

: হ্যাঁ বলেছিলাম, এক বা দুই ঘোরি।

প্রধান বিচারপতি : মই ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে যে কথা হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে শুধু কি তাই একমাত্র কথাবার্তা?

: এরপর আমি সেখানে ছিলাম না, তাই আর কোন কথাবার্তাও শুনতে পাইনি।

: মিঃ ফ্রান্সিস নিজের পরিচয়

দেওয়ার পরই কি তুমি তাঁকে চিনতে পেরেছিলে?

: না, কথা বলার আগেই তাঁকে চিনেছিলাম।

: জমাদারের সঙ্গে তিনি খুব শান্তভাবে গিয়েছিলেন, না, বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন?

: তিনি কোন বাধা দেননি।

দারোয়ান শেখ রুস্তম : মিঃ গ্র্যাণ্ড বেরিয়ে যাবার পর সে ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সে কোন শব্দও শোনেনি। এর পর হরকরা বা বার্তাবাহক ভবানীকে জেরা করা হল। সে বলল, দু' বছর ধরে সে কাজে নিযুক্ত আছে; বিবাদীর চেহারা ও কণ্ঠস্বর তার ভালভাবে চেনা। অন্যান্যদের সঙ্গে সে-ও মিঃ ফ্রান্সিসকে ধরেছিল।

: তুমি বলেছ, সবাই যখন বিবাদীকে ধরল, তুমিও তখন ধরেছিলে, সে কোন জায়গায়?

: বাড়ির পেছন দিকে হুকোবরদারের ঘরের সিঁড়ির কাছে।

: আর দু'জনের সঙ্গে তুমিও যখন গিয়েছিলে, তখন বিবাদী কি কিছু বলছিল, না, কিছু করছিল?

: মিসেস গ্র্যাণ্ড উপরের তলায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

: তিনি কি বলেছিলেন?

: বিবাদী নিজের ভাষায় কথা বলায় আমি তার এক বিন্দুও বুঝতে পারিনি। এরপর জমাদার রামবক্সের পালা। সে জানাল : মীরণ তাকে ডেকে নিয়ে একটি মই দেখায়। মিঃ গ্র্যাণ্ড যে ঘরে থাকেন তার ভেতরের দিকেই তখন সেটি রাখা ছিল। মঙ্গলবার সেই ঘটনা ঘটে। মইটি কার বুঝতে না পারায়, সে তা সরিয়ে রাখে। হ্যাঁ, আদালতে যে মইটি রয়েছে, সেটিই সেই মই। তারপর কেউ সেটা নিতে আসে কিনা দেখার জন্য সে সেখানে বসে রইল; দেখল, একজন ভদ্রলোক উপর থেকে নেমে আসছেন। তিনিই মিঃ ফ্রান্সিস — কোম্পানীর কৌন্সিলর।

উপর থেকে নেমে এসে মইটি না দেখে মিঃ ফ্রান্সিস তা' ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত ধরে ফেলল। মিঃ ফ্রান্সিস তখন পকেট থেকে সোনার মোহর বার করে দিতে চাইলেন। সে তা' প্রত্যাখ্যান করলে বিবাদী বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে খুব বড়লোক বানিয়ে দেব এবং আরো একশ' মোহর দেবো।'

: তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে চেন?' আমি যখন বললাম, মিঃ ফ্রান্সিস আপনাকে আমি ভালভাবে চিনি; তখন তিনি বললেন, 'আমি বড়সাহেব মিঃ ফ্রান্সিস।' আমি তাঁকে ধরবার জন্য চিৎকার করে উঠলে ভবানী হরকরা এসে যোগ দিল। তাঁকে ধরে নিচে নামান হল, এ-সময়ে আমার কর্তার সঙ্গে আমার কয়েকটি বাক্যবিনিময় হয়।

: তিনি তখন কোথায় ছিলেন?

: তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও।' আমি জবাব দিলাম, দয়া করে আপনি উপরে যান, আমি আপনার কোন কথা রাখতে পারবো না। এর পর বিবাদীকে নিয়ে আমরা উত্তর দিকে দরজার কাছে যাই; সেখানে তাঁকে বসবার জন্য একটি চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তাঁর বাহু দু'টি আমি আরো চেপে ধরলাম, যেন তিনি পালাতে না পারেন।

: তারপর?

: এমন সময় মিঃ ফ্রান্সিস চার-পাঁচবার শিস দিলেন। কয়েক মিনিট পরে আমার মনিবের লেখার ঘরের দরজা ভেঙে দু'জন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। অন্যান্যদের আমি তখন সদর দরজা পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মিঃ ফ্রান্সিস শব্দ শুনে চেয়ার থেকে উঠে সেদিকে যাবার চেষ্টা করলেন। আমি বাধা দিলাম। ঘরটি ছিল অন্ধকার। ধস্তাধস্তিতে আমি পড়ে গেলাম। উঠে আবার ঝাপটে ধরলাম। চাকরদেরও সতর্ক করা হ'ল। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম, মিঃ ফ্রান্সিস পালিয়েছেন, আমি যাঁকে ধরে আছি তিনি হচ্ছেন মিঃ শী। এ-সময় বেয়ারা মিঃ ডুকারেলকে ধরে নিয়ে এল। আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী মিঃ কেবল ঠিক তখন পাঁচিলের বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে, এত গোলমাল কেন?' তারপর দেওয়ালের খুব কাছে এসে তিনি বললেন, 'ও ভদ্রলোককে (ডুকারেল) আমার হাতে ছেড়ে দাও।' বেয়ারা অস্বীকার করলে আমি তাঁকে ও'র হাতে দিতে বললাম। এরপর তিনি মিঃ শী-কেও তাঁর হেফাজতে ছেড়ে দিতে বললেন। আমি তাতে রাজী হলাম না। ঠিক তখুনি মিঃ পামারের সঙ্গে আমার মনিব এসে ঢুকলেন।

: আচ্ছা রামবক্স, তুমি বলেছ যে মিঃ ফ্রান্সিসের হাত ধরে রেখেছিলে। তাঁকে প্রথম দেখার পর থেকে তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে পালান পর্যন্ত কি হাত ধরেছিলে?

: না, তিনি যখন সোনার মোহর দেবার প্রস্তাব করেন, তার পর থেকে।

: তাহলে যে হাতে তিনি পকেট থেকে সোনার মোহর বার করেছিলেন তা তুমি ধরোনি?

: না।

: তুমি বলেছ, সেদিন ছিল অন্ধকার রাত। চাঁদ তখন সবেমাত্র গাছ-গাছালির ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে; কিন্তু বেশি-দূর এগোয়নি, তাহলে সেই আঁধারে তুমি কি করে বুঝলে যে ভদ্রলোক কি-জাতীয় জিনিস তোমাকে দিতে চাইছিলেন?

: শব্দ শুনে।

মিসেস গ্র্যাণ্ডের আয়া আন্না : রাত প্রায় সাড়ে নটায় মিঃ গ্র্যাণ্ড মিসেস গ্র্যাণ্ডকে ছেড়ে বাইরে চলে যান। আমি তখন ও'র পোষাক খুলে ফেলার উদ্যোগ করছি, এমন সময় তিনি বললেন, মিঃ গ্র্যাণ্ড এগারটা নাগাদ ফিরতে পারেন। তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি বসেই থাকবেন। আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছু সুপারি আনার জন্য অন্য ঘরে ঢুকছি—এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মিসেস গ্র্যাণ্ড বললেন, তাঁর একটা মোমবাতি বিশেষ প্রয়োজন এবং তক্ষুনি। মিনিট পনের পরে নিচে থেকে মোমবাতি নিয়ে এসে দেখি, তাঁর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মাদাম, মাদাম বলে দু'-তিনবার ডাকার পর কোন সাড়া না পেয়ে আমি আবার নিচে চলে যাই। সেখানে মিসেস গ্র্যাণ্ডের পরিচারক মীরণের সঙ্গে দেখা হ'ল। মিসেস গ্র্যাণ্ড ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা সে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, তিনি হয়তো আমার উপর ভীষণ চটে গেছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই দেখি, একজন ভদ্রলোক উপর থেকে নেমে আসছেন।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, মিঃ গ্র্যাণ্ড প্রতি মঙ্গলবার রাতে বেরিয়ে যেতেন। তিনি বেরিয়ে গেলে, মিসেস গ্র্যাণ্ড কখনো একটু-আধটু পড়তেন, কখনো তার সঙ্গে খেলতেন; তারপর এগারটায় শুতে যেতেন। ঘটনার আগের রাতে তিনি একটি বলের আসরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরতে ভোর চারটে হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি : এবার জর্জ শী-কে ডাকা যেতে পারে।

জর্জ শী ধীরে ধীরে প্রবেশ করল।

প্রধান বিচারপতি : আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? চন্দননগরে?

: না, পূর্ণিয়ায়।

: কবে গিয়েছিলেন? মিঃ গ্র্যাণ্ডের বাড়িতে এই অঘটন ঘটার পরেই কি?

: ডিসেম্বরের শেষের দিকে।

: আপনি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন?

: বন্ধুদের কথায় চলে এসেছি, তাঁরা জানিয়েছেন, আমার নামে সার্চ ওয়ারেন্ট বেরুতে পারে।

: সেই বন্ধুদের মধ্যে মিঃ ফ্রান্সিসও একজন?

: হ্যাঁ।

ফিলিপ ফ্রান্সিসের ব্যঙ্গচিত্র

: আচ্ছা মিঃ শী, আপনি সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত খুলে বলবেন কি?

: হ্যাঁ, তাই বলবো। মিঃ ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। ঘটনাটি যে-দিন ঘটে তার কয়দিন আগে ঝড়ের বেগে মিঃ ফ্রান্সিস আমার বাড়ি এসে হাজির হন। তিনি হেঁটেই এসে-ছিলেন, সঙ্গে কোন সোয়ারী ছিল না। এসেই এক প্রস্থ কালো পোষাক আমার জিম্মায় রেখে দেন, তারপর একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে একটা মই তৈরী করার কথা বলেন। আমি জিজ্ঞেস করায় বললেন, তিনি মিসেস গ্র্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। মঙ্গলবার রাতে মিঃ গ্র্যান্ড যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন, তখুনি তিনি সেখানে যেতে পারেন। আমি শিউরে উঠলাম, কেননা যদি কোন অঘটন ঘটে! আমার উপর মইটা দেখার ভার দিয়ে তিনি আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

: আপনি কেন এই ভার নিয়ে-ছিলেন? আপনি কি জানতেন না এটা অন্যায়?

: জানতাম, আমি প্রতিবাদও করে-ছিলাম, কিন্তু তিনি অসন্তুষ্ট হবেন ভেবে তা করতে রাজি হয়েছিলাম।

: তারপর?

: মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টার সময় তিনি আবার ঝড়ের বেগে এলেন। কালো পোষাকটি পরে মইটি হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন।

: কোথায় গেলেন?

: আমার ধারণা ছিল তিনি মিঃ গ্র্যান্ডের বাড়ির দিকেই যাবেন। অন্ধকার রাত। ভাল করে পথ দেখা যায় না, আমি মিঃ গ্র্যান্ডের বাড়ির কাছে যেয়েও কিছু দেখতে পেলুম না। একটু দূরে আমি লুকিয়ে রইলুম। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি শিসের শব্দ পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি উপর তলায় মিসেস গ্র্যান্ড দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কোন অঘটন ঘটেছে মনে করে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করি। কিছুতেই ঢুকতে না পেরে পাঁচিল টপকে একটা ঘরের দরজা ঠেলে সেখানে ঢুকে পড়ি। দেখলুম, একটা চেয়ারে মিঃ ফ্রান্সিস বসে আছেন; তাঁকে ধরে আছে একজন জমাদার। আমি জমাদারকে মাটিতে ফেলে দিই। মিঃ ফ্রান্সিস এ-সময়ে সেখান থেকে সরে পড়েন। আমি কিন্তু ওদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম।

: আচ্ছা, মিসেস গ্র্যাণ্ড মিঃ ফ্রান্সিসের সঙ্গে কোন কথা বলেছিলেন?

: না।

: আপনি কবে থেকে মিসেস গ্র্যান্ডকে চেনেন?

: অনেক দিন থেকে। অনেক বলের আসরে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো।

: আচ্ছা, মিসেস গ্র্যান্ডের প্রতি মিঃ ফ্রান্সিসের বিশেষ কোন আসক্তির পরিচয় কি আপনি কোন দিন পেয়েছিলেন?

: তা জানি না, তবে কয়েকটি বলের আসরে কোম্পানীর বড় বড় অফিসারদের স্ত্রীরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি মিসেস গ্র্যান্ডের হাত ধরে তাঁকে টেবিলে বসাতেন।

: এটা কি সত্য, গত নভেম্বর মাসে ফ্রান্সিস যে বলের আয়োজন করেন তাতে নাকি অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার-দের স্ত্রীরা উপস্থিত থাকাকালীন মিঃ ফ্রান্সিস মিসেস গ্র্যান্ডের দিকে একটু বেশি নজর দিয়েছিলেন?

: তা বলতে পারি না, তবে তিনি তাঁর সঙ্গে দেশি-নাচ নেচেছিলেন।

: সান্ধ্য-ভোজের সময় মিঃ ফ্রান্সিস কি মিসেস গ্র্যান্ডের টেবিল থেকে উঠে গিয়েছিলেন, না, সেখানেই বসেছিলেন?

: তখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা দেখার সময় আমার ছিল না।

১৭৭৯ খৃঃ ৬ই মার্চ, শনিবার মামলার রায় বেরুল। মিঃ গ্র্যান্ড জিতলেন। ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ তিনি পেলেন পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা। অবশ্য মিসেস গ্র্যান্ডের সঙ্গে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হলো না। কিন্তু মিসেস গ্র্যান্ড? তিনি তখন মিঃ ফ্রান্সিসের হুগলীর গোপন আবাসের মায়া ত্যাগ করে একটি ওলন্দাজ জাহাজে চড়ে উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সম্রাট নেপো-লিয়নের প্রতিপত্তিশালী 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'প্রিন্স অব বেনেভেন্টো'—তেল্লেরেন্ডকে বিয়ে করে কোলকাতার মিসেস গ্র্যান্ড হলেন মাদাম তেল্লেরেন্ড—'প্রিন্সেস অব বেনেভেন্টো'।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অভয়পদ ভাল হয়ে উঠে ঠিকানা সংগ্রহ করার আগেই কান্তর কাছ থেকে একটা চিঠি এল। সম্ভবত রতনদের দিক থেকে কোন রকম তাড়া দেবারই ফল এটা। সামান্য চিঠি, তবে তারই হাতের লেখা বটে।

গোনা দুটি ছত্র লিখিছে সে,—'আমি ভালই আছি, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।'

চিঠির সঙ্গে ঠিকানাও আছে। আরামবাগ এলাকারই ক্ষুদ্র জায়গা একটা। তারকেশ্বর লাইনের এক স্টেশন থেকে নেমে গোরুর গাড়ি করে যেতে হয়—বেশ খানিকটা পথ।

ঠিকানা পাওয়ার আগে যতটা ব্যাকুলতা ছিল—পাওয়ার পর আর ততটা রইল না। এখন যেন সে অনেকটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে—ইচ্ছে করলেই আনিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং এখন আর তেমন দুশ্চিন্তা নেই।

কনক অবশ্য বলল, 'আপনি লিখেই দিন মা চলে আসতে। যা হবার এখানে এলে হবে। পড়াশুনা করতে চায় এখানেও তো ইস্কুল আছে।'

শ্যামাও ভেবেছেন অনেক। তিনি বললেন, 'তা তো আছে কিন্তু সেখানে একগাদা খরচ-পত্তর ক'রে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়, বইও কিনে দিয়েছে ওরা সব। এখানে এলে সে সব বরবাদ হবে। সেখানকার এক রকম বই, এখানে হয়ত অন্য রকম। একটা বছর নষ্ট হ'ল, আবারও একটা বছর নষ্ট করব? খানিকটা পড়তে পড়তে চলে আসবে আধাখ্যাঁচড়া হয়ে—এখানে এসে যদি এখানের পড়া ধরতে না পারে? খরচও তো হবে একগাদা। ইস্কুলের মাইনে আছে, বই কেনা আছে। অত পেরে উঠব কেন? থাক্, কাদায় গুণ ফেলে এই ক'টা মাস, যা হয় হবে!'

তবু কনক একবার বলতে গেল, 'কিন্তু পাশের পড়া তো সব ইস্কুলেই এক রকম হয় শুনেছি মা!'

শ্যামা বললেন, 'না না। আমি হেমকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে বললে, মোটামুটি পড়াটা এক—কিন্তু বই আছে অনেক রকম। এক এক ইস্কুলে নাকি এক এক বই পড়ায়। যে ইস্কুলে ভর্তি হবে, সেই ইস্কুলের মতো বইও নাকি চাই। নইলে নাকি খুব মুস্কিল হয়ে পড়ে, রোজের পড়াটা পড়তে পারে না।'

প্রসঙ্গটা ঐখানেই চাপা পড়ে যায়।

কনকের—কে জানে কেন—খুব ভাল লাগে না এদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু কিছু বলতেও পারে না সে। শাশুড়ির কাছে জোর ক'রে বা জেদ ক'রে কিছু বলার সাহস তার নেই। বলতে পারত হয়ত হেমের কাছে—কিন্তু সেখানেও একটা বাধা দেখা দিয়েছে। বেশী বললে হেম মনে করতে পারে যে তার ভাইয়ের কল্যাণ-চিন্তার চেয়ে কনকের স্বার্থ-চিন্তাটাই বড় কথা এর মধ্যে। তার কারণ, খুব সম্প্রতি, মাত্র দুদিন আগেই কথাটা উঠেছিল। হেমের বদলির কথা।

হেম বলেছিল, 'এদিকে দ্যাখো না মজাটা। অন্য সময় কোন আর্জি জানালে ওপর ওলা'দের কাছে, কত অসুবিধে হয়—এখন বলতে না বলতেই তো মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে দেখছি। জামালপুরে নাকি লোক দরকার—কেউ নাকি যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বলতেই বড়বাবু লাফিয়ে উঠলেন একেবারে। বললেন—'এক্ষুনি, এক্ষুনি। বল তো নতুন কোয়ার্টার ভাল দেখে দিয়ে দিচ্ছি ব্যবস্থা ক'রে!'

'তারপর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে কনক।

'মুস্কিল হয়ে গেল যে। আমি এখন যাই কী করে? কথাটা তুমি সেদিন ঠিকই তুলেছিলে। তখন অত ভাবিনি কিন্তু এখন যত ভাবছি ততই দেখছি যে ঐ জন্যেই শেষ পর্যন্ত যাওয়া আটকাবে আমার। বাড়িতে কে থাকবে। খেঁদির ওপর তো কোন ভরসাই নেই। খোকাকে ওখান থেকে ইস্কুল ছাড়িয়ে আনতে গেলে সেখানের সব বই নষ্ট হবে, এখানে আবার নতুন ক'রে কিনতে হবে। বছরের গোড়াতে হ'লে তবু এর-ওর কাছে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যায়—অন্তত কতকগুলো তো পাওয়া যায়ই—এখন আর কে দেবে? মা শুনলেই ক্ষেপে যাবে। তবু তো মা মনে করে সেখানের সব খরচাই মেসো-মশাই দেন, মা তো অত জানে না যে আমিও কিছু কিছু দিই।......সেও না হয় হ'ল—কিন্তু অঘ্রাণ মাস না এলে কিছুই করা যাচ্ছে না দেখছি। একটা ক্লাসে

উঠলে ছাড়িয়ে আনা অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। সেখানে ছোট মাসিরও অবশ্য খুব কষ্ট হবে, হাত-নুড়কুৎ হয়ে উঠেছিল তো খানিকটা!'

সেই সময়েই কনক বলেছিল কথাটা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি একেবারে না বলে দিয়েছ?'

'বলিনি এখনও কিন্তু বলতেই তো হবে। উপায় কি বল?'

'দুটো একটা দিন না হয় থাক না। ঠিকানাটা আসুক—যদি মেজ ঠাকুরপোকে এখানে আনানোই হয় তো—। তোমার অত ইচ্ছে বলেই বলছি।'

তাড়াতাড়ি যোগ করে সে শেষের কথাগুলো।

'হ্যাঁ—তাহলে তবু হয় বটে একটা উপায়। তবে তারও তো পাশের পড়া। তার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া—। সেও ভাবছি। দেখি। ওর খবর তো আসুক আগে।'

এই কথার পর কনকের তরফ থেকে তাকে আনানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলে একটা কদর্থ হওয়া স্বাভাবিক।

কী মনে করবে হেম। বড় বেশী লোভী আর স্বার্থপর ভাববে হয়ত। ছিঃ। সে ভাল নয়।

ওদের ছেলে—ভাল-মন্দ ওরা না বোঝে তারই বা এত দায় কি!

তার বাইরে গিয়ে সংসার পাতার প্রশ্ন? সে না হয় আর কিছুদিন পরেই হবে। এত দিন যখন এখানে থাকতে পেরেছে, আরও কটা মাস অনায়াসে পারবে। তার সেজন্যে অত তাড়াও নেই। স্বামীকে যদি পায় সে—সব কষ্টই সহ্য হবে তার। আর হেম তো বলেইছে, অঘ্রান মাসে খোকাকে আনানো যেতে পারে সেই সময়েই বরং সুযোগ বুঝে কথাটা মনে করিয়ে দেবে একবার!

কিন্তু অঘ্রান মাসে আর কথাটা পাড়া যায় না।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য চাপা পড়ে যায় কথাটা, তার আগেই।

আশ্বিন মাসের গোড়াতেই ঐন্দ্রিলা চলে গেল।

তার চলে যাওয়া কিছু এমন অভিনব নয়, ওটা আজকাল বরং নিয়মিত হয়ে উঠেছে; দু-তিন মাস ওখানে—দু-তিন মাস এখানে, এইভাবেই চলে। তাই এবারও, যাওয়ার সময় কিছুই বুঝতে পারেননি শ্যামা। কোন সন্দেহও হয়নি তাঁর। বরং এখন দুটো-তিনটে মাস অন্তত কলহ কচকচির হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন—এই ভেবে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

খুব একটা কিছু নতুন রকমের অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটেনি।

যেমন হয়—ঝগড়াটা একদিন চরমে উঠলে মেয়ের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে আর গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে যায়—তেমনিই গেছে। শুধু এবার একেবারে ভোর থেকেই আরম্ভ করেছিল বলে এক সময় হেম তেড়ে এসেছিল, 'চুপ করবি না কি? এবার একদিন বুকে বসে সাঁড়াশি দিয়ে জিভ ছিঁড়ে বার করব—চিৎকার করা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব!'

এই! তারপরই তো সে অফিসে বেরিয়ে গেছে। ঐন্দ্রিলা চালিয়েছে দুপুর পর্যন্ত। আর হেমের তেড়ে আসাও একেবারে নতুন নয়। এর আগেও—তার সামান্য খুব বাড়াবাড়ি হ'লে—এমন তেড়ে এসেছে, গাল-মন্দও দিয়েছে।

সুতরাং অকস্মাৎ এ কাণ্ডর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্যামা আদৌ।

খবরটা পাওয়া গেল কদিন পরেই—ঠিক পুজোর মুখটাতে।

সেদিন বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠী।

খবর আনল, চিরকাল যে ভগ্নদূতের কাজ করছে, সেই মহাশ্বেতাই।

দূর থেকে তার আসার ভঙ্গি দেখেই কনকের বুক কেঁপে উঠেছিল। ও রকম ছুটতে ছুটতে মহাশ্বেতার নিজের ভাষায় 'রুদ্ধশ্বাসে' আসা মানেই কোন নিদারুণ সংবাদ। সুসংবাদ আর তাদের কী আসবে—নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ।

আর সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হ'ল।

সেদিন গোটা বাগান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে বেলা তিনটের সময় সবে খেতে বসেছেন শ্যামা—মহাশ্বেতা এসে সামনে বসে পড়েই বলল, 'শুনেছ, তোমার মেজ মেয়ের কীর্তি!'

কনক ভেবেছিল চোখ টিপে দেবে, সারা দিনের পর খেতে বসেছে বেচারী, কোন দুঃসংবাদ হয় তো দু মিনিট পরে বলাই ভাল—কিন্তু সে সুযোগই পেল না, সে। মহাশ্বেতা কোন দিকেই চাইল না। মা এত বেলায় কেন খেতে বসেছেন সে প্রশ্নও করল না। যখন কোন বড় খবর তার মাথার মধ্যে থাকে—তখন আর কোন কিছুই মাথায় ঢোকে না। সে নিজে থেকে অবস্থা বুঝে বিবেচনা করবে—খেয়ে নিতে সময় দেবে সে আশা বৃথা।

শ্যামার উদ্যত আহার্যের গ্রাস মুখের কাছ থেকে নেমে আসে আবার। তাঁরও বুকটা ধনক করে ওঠে। দুঃসংবাদ আর অমঙ্গল—এইতেই তো, অভ্যস্ত তিনি। তবু এখনও এক-একবার বুকটা কেঁপে ওঠে বৈকি!

'না তো। কী কীর্তি?'

'তিনি যে রাঁধুনীর চাকরি নিয়েছেন!'

'চাকরি নিয়েছে? রাঁধুনীর? সে কি?'

খাবারের থালাটা ঠেলে দিয়ে সরে বসেন শ্যামা।

'আপনি খেয়ে নিন মা—খাওয়াটা শেষ করে উঠুন। সারা দিনের পর—। ঠাকুরঝিও আর কথাটা বলার সময় পেলেন না। যা হবার তা তো হয়েইছে আর হবেও, খাওয়ার মধ্যেই কথাটা না বললে হ'ত না?'

কনক আর থাকতে পারে না। তার কণ্ঠস্বরটা আপনা থেকেই একটু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মহাশ্বেতাও এবার একটু অপ্রস্তুত হয়।

'সত্যিই তো, তা তুমি বাপু খেয়েই নাও না! কথা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি না হয় বসছি দু-দণ্ড। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সে কথা যথার্থ লেহ্য কথা। তা তোমারই বা এমন তিনপোর বেলায় খাওয়া কেন?'

কিন্তু শ্যামা ঘাড় নাড়েন, 'আমি আর খাব না। থালা সরিয়ে দিয়েছি, বিধবা মানুষ আর খাওয়া চলবেও না। একটু তো খেয়েছি—ওতেই চলে যাবে আমার। তুই বল।'

'বলব আর কি বল। মুখটা তো দিন দিনই উজ্জ্বল হচ্ছে আমার! এক-একজন এক-একবার করে মুখ পোড়াচ্ছেন আর শত্তুর হাসছে। এই তো খবর দিলেন মেজগিন্নী স্বয়ং—কী হেসে হেসে আর টিপ্পনী কেটে কেটে বলার ঢং। যেন আমার দুঃখে গলে পড়ছেন একেবারে।'

'তা সে কবে নিলে এ কাজ? কোথায়ই বা নিলে?'

'নিয়েছে নাকি পরশু থেকে। কি তার আগের দিন থেকে। অত খোঁজ নিয়ে কে শুনিনি বাপু। নিয়েছে আবার কোথায়—যাতে আমার মুখটা বেশী করে পোড়ে তাই করা চাই তো তার! মেজ-গিন্নীরই কে মামাতো বোনের বে হয়েছে ঐ ওদিকে কোথায় ডোমজুড়ের কাছে—বর বুঝি উকীল, মস্ত সংসার তাদের—সেইখানে চাকরি নিয়েছেন। তা নিজে নিজি পরিচর্যাটি হাটিপাটি পেড়ে না দিলে হ'ত না? সেই উকীল বোনাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছেন মেজ-কর্তার আপিসে—ওদের আবার কে যেন কাজ করে ঐ আপিসে—সেই এসে বলে গেছে মেজকর্তাকে। ছি ছি। কথাটা যখন বললে মেজগিন্নী, তখন মনে হ'ল ধরিত্রীর দ্বিধা হও মা, আমি প্রবেশ করি। কোন দিক দিয়ে আর আমার মুখ পুড়তে বাকী রইল না। নিত্যি এক এক কেলেঙ্কার লেগেই আছে আমার বাপের বাড়িতে।'

আড়ষ্ট হয়ে বসে শুনছিলেন শ্যামা এতক্ষণ।

এইবার শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তা তার মেয়ে? মেয়েকে নিয়ে গেছে?'

'কৈ, মেয়ের কথা তো বললে না কিছু। মেয়ে সুদ্ধ আর কে চাকরি দেবে। মেয়ে বোধ হয় রেখে গেছে শ্বশুরবাড়ি। কে জানে! কে আবার খবর নিচ্ছে খুঁটিয়ে। আমি কি আর এই সুখবর কানে শোনবার পর কোন কিছু জিজ্ঞেস করেছি! যা বলেছে, ওরাই বলে গেছে নিজ গুণে!'

তারপর একটু থেমে বললে, 'মুখটা কি আর তোমার এক মেয়ের বাড়ি পুড়ল—তা যেন স্বপ্নেও ভেবো না। সব মেয়েরই মুখ উজ্জ্বল হ'ল একে-বারে। মেজবোয়ের ঐ মামাতো বোনের বড় জা আবার হ'ল কে জান—হারানের ঠাকুমার সম্পর্কে ভাই-ঝি। আপনার ভায়ের মেয়ে নয়, বুড়ির নাকি নিজের ভাই কেউ ছিল না, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই হবে। জ্ঞাতি। তা খবরটা কি আর সেখানে পৌঁচচ্ছে না মনে কর!'

শ্যামা উঠে পড়েছেন ততক্ষণ।

পাতের খাবার কনক গুছিয়ে রাখবে। তাকেই খেতে হবে রাত্রে। এ বাড়িতে খাদ্য কিছু ফেলার রেওয়াজ নেই। সীতা থাকলে সেই খায়—নইলে কনককেই উদ্ধার করতে হয়। নেহাৎ মাথা ভাত থাকলে ফেলা যায়—তাও সীতা থাকলে তাকে খাওয়ানো হয়—কিন্তু সাদা ভাত বা আস্ত রুটি—রুটি কদাচিৎ হয়—চালের ক্ষুদ ও ডালের ক্ষুদ মিশিয়ে সরুচাকলিই বেশী—এসব ফেলার কথা ভাবতেই পারেন না শ্যামা। যদিচ একটা অদ্ভুত উদারতা তাঁর আছে—বোধহয় নিজে বহুদিন ধরে অন্নের কষ্ট পেয়েছেন, উপবাস করে দিনের পর দিন কেটেছে বলেই—দুপুরের দিকে কোন ভিখারী এলে ফেরান না। পাতা পেতে উঠোনে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দেন। নিজের ভাতও অনেকদিন ধরে দিয়েছেন, আবার পাতার জ্বালে নিজের মতো ভাত ফুটিয়ে নিয়েছেন পরে। তেমন বেলা হলে নিজের জন্যে আর রান্নাও করেন না, যা হোক মুড়ি বা ক্ষুদ-ভাজা খেয়ে কাটিয়ে দেন। কিন্তু তাদেরও—পাতের এঁটো ভাত দেন না। বলেন, 'বাপরে, ওরা হল নারায়ণ, জন্মের মধ্যে কম্ম একদিন দুটো ভাত খেতে বসেছে আমার বাড়ি, এঁটো ভাত দিতে পারব না!'

শ্যামা পুকুরে চলে গেলেন আঁচাতে, কিন্তু তাতে মহাশ্বেতার উৎসাহ কিছু-মাত্র কমল না। সে কনককে উদ্দেশ করেই বলে চলল, 'ঐ হারানই কি কম কেলেঙ্কারটা করল! সে নিয়ে অমনি আমার বাড়িতে কথায় কথায় হাসাহাসি আর টিটকিরি। আমার ছেলেগুলো সুদ্ধ এমন বোকা-মুখ্যুর ডিম তো সব তার হবে কি—আপনার পর হাস্যিদিঘ্যি জ্ঞান আছে?—ওরা সুদ্দু শত্তুরদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে একেবারে—কথা উঠলে হয়। আবার আমার গুণের মেয়ে মেসোমশাই বলেন না, বলেন, তোমার বোনাই, তোমার ভগ্নিপোত—এই সব! হবে কি, দিন-রাত ঐ মহারাজা মহা-রাণীর কাছে শিখনে পাচ্ছে তো—কত ভাল আর হবে বল! ঐ মেয়ে হতে আমার হাড় ভাজাভাজা যদি না হয় এর পরে তো আমি কী বলেছি। তোমরা দেখে নিও!'

হারানের ব্যাপারটা হাসবার মতোই বটে। মনে হলে কনকেরও হাসি পায়। শুনেছে সেও মহার ছেলে-মেয়েদের কাছেই। মহার কোন ভাগ্নে বুঝি হারানের সঙ্গে কাজ করে—সেই এসে বলেছে। প্রথম যেদিন শুনেছিল কনক সেদিন মুখে কাপড় গুঁজেও হাসি চাপতে পারেনি। ও-ঘর থেকে এসে রান্নাঘরে শুয়ে পড়েছিল হাসতে হাসতে।

তরুর একটি ছেলে হয়েছে। তরুর সতীনও নাকি পূর্ণ গর্ভবতী। ঘরে জোড়া খাটে বড় একটা ঢালা বিছানা করে দুই বৌকে নিয়ে এক বিছানাতেই শোয়। দুই বৌ দু দিকে থাকে, মাঝে হারান।

এ সব কথা হারানই নাকি গল্প করেছে আফিসে।

বেশ গর্বের সঙ্গেই নাকি সে এ সব গল্প করে।

আফিসের বন্ধুদের মধ্যে বুঝি কে একদিন এই কথা শুনে একটু খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'কী করে দুটোকে সামলাও ভায়া—কীভাবে জল খাওয়াও বাঘে গরুকে এক ঘাটে। একটু শিখিয়ে দাও না!' তাতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে থিয়েটারী বক্তৃতার মতো বলেছে হারান, 'হুঁ—হুঁ—তোমাদের মতো ছটাক-খানেক প্রাণ নিয়ে ঘর করে না এ শর্মা। মরদ বাচ্ছা, বুঝলে? যে খাওয়াতে জানে সে বাঘে গরুকে এক ঘাটেই জল খাওয়ায়। আমার কাছে ও সব নেই। ঢাকঢাক নেই, অর্শদর্শও নেই। দুজনেই সমান আমার কাছে, সমান ব্যবহার পাবে। কম-বেশী কাউকে দেখব না—বাস। এক ঘরে এক বিছানায় শান্তিতেই শুচ্ছি। লোকের বাড়িতে সতীন থাকলে আলাদা আলাদা ঘরে রেখেও শান্তি পায় না, বাড়িতে কাক-চিল বসে না একেবারে। আমার বাড়িতে যাও, দেখবে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। শব্দ করবে কেন, পুরুষের দাপট থাকলে মেয়েদের সাধ্যি কি যে টুঁ শব্দ করে! আমার খুশি, আমি দুটো ছেড়ে চারটে বে করব—তোমার কি? তুমি তোমার পাওনাগণ্ডা বুঝে পেলেই তো হল! বুঝলে, এ তোমরা নও। সংসারে আদর্শ স্থাপন করে যাব—দেখবে এর পর লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে—হ্যাঁ, মরদ বাচ্ছা বটে। মরবার পর জীবনী লিখে বাহা বাহা করবে।'

সত্যিই বাপু, বাহাদুরী আছে হারানের! শান্তিতেই তো আছে সে। তরুকে অনেক জেরা করেছে কনক—মোটামুটি শান্তিতেই আছে, ঝগড়া কচকচি নেই। তবু না হয় ভালমানুষ কিন্তু তার সতীনটি যেমন পাড়াগাঁয়ের মুখরা মেয়ে হয় তেমনিই। তার ওপর আবার বাপসোহাগী, আদুরী মেয়ে। তাকে যে শাসনে রেখেছে সেটা খুব কম কথা নয়!

মহা আরও খানিকটা বকে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেল। শ্যামা খুব যে একটা বিচলিত হয়েছেন তা তাঁর

"তোমাদের মত ছটাকখানেক প্রাণ নিয়ে ঘর করে না এ শর্মা"

আচরণে বোঝা গেল না—অভ্যস্ত কাজ-কর্ম সবই করে যেতে লাগলেন তিনি—কিন্তু তাঁর গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝতে পারল কনক যে মনের মধ্যে তাঁর গভীর আলোড়ন চলছে একটা। দুটি ওষ্ঠের এই বিশেষ ভঙ্গি এতদিনে কনকের পরিচিত হয়ে গেছে। শ্যামার পূর্ব সৌন্দর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বিশেষ—শুধু মুক্তোর মতো সাজানো দাঁত এবং পাতলা ঠোঁট দুটি এখনও অবশিষ্ট আছে। হাসলে এখনও সুন্দর দেখায়, তেমনি ঐ দুটি ঠোঁট যখন পরস্পরের সঙ্গে গাঢ়সম্বন্ধ হয়ে চেপে বসে—তখন সমস্ত মুখটা এমন কঠিন ও পরুষ দেখায় যে এখনও কনকের বুকের মধ্যেটা গুরগুর করতে থাকে। রূঢ় ভাষা যে বেশী ব্যবহার করেন শ্যামা তা নয়, অভদ্র ভাষা এখনও তাঁর মুখে আটকে যায়—কিন্তু এই সব সময়-গুলোতে যখন কথা বলেন কিছু তখন যার সম্বন্ধে বলেন তার গায়ে যেন কেটে কেটে বসে। একেই বুঝি কবিরা বলেছেন বাক্যবাণ। এমন তীক্ষ্ম ও অন্তর্ঘাতী ভাষা যে কোথায় পান শ্যামা তা কনক অনেক চেষ্টা করেও ভেবে পায় না। আবার এক এক সময় ভাবে সে, এ হয়ত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর জীবন-সংগ্রামেরই ফল, হয়ত এই বয়সে তারও মুখে এই ধরনের কথা আপনিই যোগাবে।

আজ কিন্তু সে রকম কোন আঘাত কারুর ওপর পড়ল না। পাতা চাঁচতে চাঁচতে অনেকক্ষণ পরে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন শ্যামা, 'ঐ মেয়ে নিয়ে বৌমা আমার শ্মশানে গিয়েও শান্তি হবে না। পরের বাড়ি গিয়েও যদি শান্ত হয়ে থাকতে পারত, যদি টিঁকে থাকত তো আমার কিছু বলবার ছিল না। একটা কাজ নিয়ে থাকা তো ভালই—আমার অত লজ্জা-সরম নেই, রাজরাজেশ্বরের মেয়ে নয় তো যে খেটে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আমার কথা হচ্ছে যে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। ওখানেও টিকতে পারবে না—দেখো ঝগড়াঝাঁটি করে অপমান হয়ে বেরিয়ে আসবে। যারা পয়সা দিয়ে লোক রাখবে তারা অত ঝাল সহ্য করবে না তো। শুধু এর জন্যে কুটুম্ব-সাক্ষাতের কাছে মাথা হেঁট করা—মুখ পুড়নোই সার হবে।'

খানিকটা পরে আবার বলেন, 'শুধু কি একটা ভয়? এখনও ঐ রূপ দেখছ তো—আগুনের মতো। পরের বাড়ি হয়ত এক ঘর পুরুষের মধ্যে থাকা। কার খপ্পরে পড়বে, কী করবে—সেই আরও ভয়। আরও কত মুখ পুড়বে এই ভয়ে সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকা!'

কনক চুপ করেই শোনে বসে বসে। কী বলবে সে! আর উত্তরের জন্যও বলেন নি শ্যামা, এটা তাঁর কতকটা স্বগতোক্তি।

খানিকটা আরও নিঃশব্দে পাতা চাঁচবার পর বললেন তিনি, 'গেল তো মেয়েটাকেই বা ওখানে রেখে গেল কেন? সেই মতলবই যদি ছিল তো এখানে রেখে গেলেই হত। তবু তুমি একটু দেখতে শুনতে পারতে। ওখানে একা থাকলে একেবারে চাষার ঘরের মেয়ে তৈরী হবে, তুমি দেখো!'

এইবার কনক কথা বলল, 'তা ওকে না হয় আনিয়ে নিন না মা!'

কখখনও না! এমন অন্ধ মায়া আমার নেই মা। এক তো যেচে অপমান হতে যাওয়া—তারা যদি বলে ওর মা আমাদের কাছে দিয়ে গেছে, তোমাদের বাড়ি পাঠাব না—তখন মুখটা কোথায় থাকবে! তারপর তাঁকেও তো চিনি, এখানে এনে রাখব—যদি কোন রকম পান থেকে চুন খসে তো কৈফিয়ৎ চাইবেন—কেন আমার মেয়েকে আনতে গিছলে তোমরা, কিসের জন্যে।......না মা, বেশ আছি। অত টান আমার কারুর ওপর নেইও আর। ঢের শিক্ষা হয়েছে মা—ঢের পেয়েছি, আর কেন! ও মেয়ে যদি ওখানে মরেও যায় তো আমি নিজে থেকে আনতে যাব না!'

এর পর আর বলার কিছু নেই। কনক চুপ করেই থাকে। কিন্তু ওর সত্যিই মন-কেমন করে মেয়েটোর জন্য। কাছে থাকলে তবু সময় কাটে একটু। তার সঙ্গেই তবু গল্প করা যায়। এ নিঃসঙ্গ ও নিঃশব্দ পুরীতে যেন মাঝে মাঝে দম আটকে যায় ওর!

(ক্রমশঃ)

য়ুরোপে অনুবাদ-চর্চার দু এক কথা

প্রদ্যুম্ন মিত্র

অনুবাদ-চর্চা মৌলিক রচনার সমবয়সী। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় তার নিজস্ব ইতিহাস কিছু কম জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম অনুবাদক হিসেবে য়ুরোপ যাঁর নাম মনে রেখেছে তিনি হলেন লিভিয়াস অ্যানড্রোনিকাস, একজন মুক্ত ক্রীতদাস। খৃষ্টের জন্মের দুশো চল্লিশ বছর আগে তিনি হোমরের অডিসির অনুবাদ করেছিলেন লাতিনে, কবিতায়। হয়তো তিনিই ইতিহাসের প্রথম অনুবাদক নন; কিন্তু তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনা দীর্ঘজীবী হয়েছিল। আর দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবিত করেছিল বহু মনীষাকে। হোরেস তাঁর অনুবাদ ব্যবহার করেছিলেন। গ্রীক থেকে লাতিনে অনুবাদ প্রসঙ্গে অ্যানড্রোনিকাস-এর পরে আমরা দুজন লাতিন লেখকের নাম শুনতে পাই। নেভিয়াস আর এনিয়াস, গ্রীক নাটকের অনুবাদ করেছিলেন লাতিনে; বিশেষতঃ ইউরিপিডিসের ছ'মাত্রার ছন্দকে রোমে নিয়ে এসেছিলেন এঁরাই। সিসেরো প্রায়শই অনুবাদ করতেন আর অনুবাদক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন ক্যাটুলাস। গ্রীক থেকে লাতিনে, বা কোনও কোনও সময়ে লাতিন থেকে গ্রীকের ক্ষুদ্রতর পরিসরে, অনুবাদের আদান-প্রদান দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিল দুটি কারণে: অনুবাদযোগ্য সাহিত্যের আকর্ষণীয় উপস্থিতি আর অনুবাদের চর্চায় একটি প্রবহমান মনীষার ঐতিহ্যের আত্মনিয়োগ।

কয়েক শতাব্দী এগিয়ে এসে আমরা আরও এক দল অনুবাদক পাই যাঁদের রচনা ঐতিহাসিক তাৎপর্যময়। কেননা উত্তরসূরী মহাদেশীয় মনীষার ওপর এঁদের প্রভাব ছিল সীমাহীন। আট-নয় শতকে আরবে যে জ্ঞান চর্চার উন্মেষ হয়েছিল তার ভিত্তিতে আসলে ছিল গ্রীক মনীষা। সিরীয়ান পণ্ডিতদের একটি গোষ্ঠী বাগদাদে এসে আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন আরিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন এবং অন্যান্য গ্রীক মনীষীদের গ্রন্থরাজি। সে যুগে বাগদাদ হয়ে উঠেছিল একটি প্রধান অনুবাদ কেন্দ্র আর এই অনুবাদ-চর্চা সমকালীন আরবী মনীষাকে ঋণবন্ধ করেছিল। কিন্তু, ইতিহাসের দিক থেকে আরও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল আরবী অনুবাদে যে গ্রীসিয় জ্ঞানভাণ্ডার সংরক্ষিত হল তার প্রয়োজন দেশকালের সীমা অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়েছিল। যথাকালে নয়-শতকী আরবী জ্ঞানোদ্যম স্তিমিত হয়ে আসে। তখনই জ্ঞান বিস্তারে ইউরোপীয় উৎসাহ পুনর্জাগ্রত হয়ে ওঠে। আর প্রায় তিন শতাব্দী যাপন করেও আরবী-অনুবাদ পুঁথিগুলি স্পেনীয় ভূখণ্ডে মনীষার একটি নব-আন্দোলনের সূচনা করে। নবম শতকের বাগদাদের স্থান নেয় এগারো/বারো শতকে টোলিডো। আর অনুরূপ একটি অনুবাদক গোষ্ঠী ব্যাপৃত থাকে আরবী পুঁথিগুলির লাতিন অনুবাদে। অতএব 'স্পষ্টতঃই দ্বাদশ শতকের কোনও লেখক যখন আরিস্টটলের কথা বলেন তখন তিনি মনে রাখছেন আরবী পুঁথি থেকে একটি লাতিন অনুবাদের কথা যে আরবী পুঁথিটি প্রস্তুত হয়েছিল নয় শতকে, মূল গ্রীকের একটি সিরীয়ান অনুবাদ থেকে। এই জাতীয় অনুবাদ-পরম্পরা নিশ্চয়ই প্রামাণ্যতার পৃষ্ঠপোষক হতে পারে না; বরং হয়ে ওঠে বহু ভ্রান্তি ও অশুদ্ধতার জনক। তবু, অবলুপ্ত, বিস্মৃত, প্রায় কিংবদন্তীর মত সুখ্যাত অথচ সুদূর গ্রীক মনীষার আবিষ্কারে কি পুনরুদ্ধারে নবম শতকী আরবী অনুবাদ পুঁথিগুলি যে কী অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। শতাব্দীকালের অধিক সময় ধরে স্পেনের টোলিডো তার পুঁথিশালায় জ্ঞানীগুণীদের আকর্ষণ করেছিলেন। আর যাঁরা এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আডেলার্ড, যিনি ইউক্লিডের জ্যামিতিক সূত্রগুলির প্রথম লাতিন-ভাষ্যকার। যদিও তাঁর অনুবাদ ছিল আরবী থেকে। এসেছিলেন কোরানের প্রথম অনুবাদক Robert de Retines—এই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-চর্চার উৎসাহে, তার আকাঙ্ক্ষিত অনিবার্য পরিণামে। দ্বাদশ শতকের পর থেকেই যে আকরগ্রন্থের অনুসন্ধানের সূচনা হল তা বোধ হয় একটি সুষ্ঠু পরিণতির সমাপ্তি পায় রেনেসাঁয় জ্ঞানোন্মাদনায়। আর অন্য দিকে টোলিডোর পুঁথিশালায় আসতে থাকে সদ্য-আবিষ্কৃত গ্রীক আকরগ্রন্থসমূহ, যাদের অনুধাবনে অনুভূত হয়েছিল মূল গ্রীক থেকে প্রত্যক্ষ অনুবাদের ত্বরান্বিত প্রয়োজন।

বোধহয় দ্বাদশ শতকে ইউরোপে অনুবাদশিল্প তার বিকাশের চূড়ান্ত পরিণতিকে আয়ত্ত করেছিল। কেননা তারও বহু শতাব্দী পরে, বর্তমানের অনুবাদ-কলা সেই দ্বাদশ শতকী পরিপূর্ণতার মানদণ্ড অতিক্রম করে কোন নবীন দিগন্তকে উন্মোচিত করেনি। ওয়াইক্লিফের বাইবেল টিনডেল আর কভারডেলের নতুন অনুবাদ-প্রয়াসে শক্তিমান প্রতিযোগীর দেখা পেয়েছিল সেই অতীতেও, জ্ঞানচর্চা যখন আধুনিক যুগের মত এত সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। বাইবেল অনুবাদের ইতিহাস নানা যুগের নবীনতর প্রয়াসে সমৃদ্ধ, বিচিত্র। ওয়াইক্লিফ, টিনডেল, কভারডেল এঁরা সকলেই বাইবেল ভাষান্তরিত করেছিলেন ইংরাজীতে। সে কারণে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা ভাস্কর হয়ে আছেন আজও। তবু, মার্টিন লুথারের জর্মান অনুবাদের মত যুগান্তকারী প্রভাবে তাদের রচনা হয়ত স্বীকৃতি পায়নি। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও মার্টিন লুথারের বাইবেল-অনুবাদ অবিস্মরণীয়: সাহিত্যিক জর্মানের প্রতিষ্ঠার সূচনাও সেইখানেই। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে আমিয়ট প্লুতার্ক-এর "বিখ্যাত গ্রীক ও রোমকদের জীবন-চরিত" ইংরাজীতে অনুবাদ করেন আর সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজী সাহিত্যকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেন। কেননা প্লুতার্ক-এর পরবর্তী ইংরাজী অনুবাদক সার টমাস নর্থ তাঁর কুড়ি বছর পরের অনুবাদে বহুলাংশেই নির্ভর করেছিলেন আমিয়টের ওপর: আর সেক্সপীরীয় প্রতিভা যে কী পরিমাণে নর্থের অনুবাদকে আশ্রয় করেছিল তা আজ সুবিদিত। তাই ইংরাজী সাহিত্য আমিয়টের কাছে চিরঋণী।

এলিজাবেথের যুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

ইংল্যান্ডের স্বর্ণযুগ। সাহিত্যের অন্যান্য নানা শাখার মত অনুবাদও একালে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল বিচিত্র সম্ভারে। সেদিনকার যুগধর্ম, সেই আবিষ্কারের উন্মাদনা, নিসর্গজয়ের সেই প্রচন্ড আবেগ— যেমন সেদিনকার সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে চিহ্নিত করেছিল, তেমনি অনুবাদক গোষ্ঠীও বেরিয়ে পড়েছিলেন সাহিত্যের অজ্ঞানিত সব রাজ্য জয়ে, দেশ-বিদেশের মানব মনীষার নানা সম্পদ আহরণে। ফিলেমন হল্যান্ড নিজের সমস্ত অনুবাদ প্রয়াস দেখতেন নতুন দেশ জয়ের মত; তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকরা অতীতের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনধারাকে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। আর বোধ হয় সেই কারণেই তাঁদের অনুবাদে আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়বস্তুর ওপর দৃষ্টি পড়েছিল অনেক বেশী। প্রত্যক্ষ অনুবাদের যে নীতি টোলিডোর সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ষোড়শ শতকের অনুবাদকদের লেখায় বহুলাংশে খণ্ডিত হয়েছিল। প্লুতার্কের জন্যে নর্থ-এর কাছে আমিয়টই ছিল যথেষ্ট; এবং এ ব্যাপারে নর্থ একক ছিলেন না। গ্রীক থেকে থুকিডিডিসের ইতিহাস লাতিনে ভাষান্তরিত করেছিলেন লরেনসিয়াস ভ্যালোন, যেটাকে ফরাসীতে অনুবাদ করেন Claude de Seyssel এবং টমাস নিকলস্ ফরাসী থেকে থুকিডিডিসকে নিয়ে আসেন ইংরাজীতে। এই ধরণের অনুবাদ-পরম্পরার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। টমাস নিকলস্ ছিলেন লণ্ডনের এক স্বর্ণকার এবং এলিজাবেথের যুগের অনুবাদগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই এর চেয়ে বেশী কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এঁদের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে আকর-বিচ্যুতির দোষদুষ্ট। তবু, এলিজাবেথান যুগের উদ্দাম প্রাণময়তার মতই তারা সজীব, সক্রিয় জ্ঞানেষণায় চিহ্নিত হয়ে আছে। ব্যতিক্রমও ছিলো; ফিলেমন হল্যান্ড, যার নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ছিলেন শল্যচিকিৎসক; তবু ধ্রুপদী সাহিত্যে তার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। কাউন্টি গ্রামার স্কুলের এই প্রধান শিক্ষকটির শ্রমনিষ্ঠ লেখনী যে সব অনুবাদ প্রয়াসে ব্যাপৃত হয়েছিল সেগুলি প্রামাণ্যতায় অসাধারণ না হলেও অনেকখানি। সে যুগে অনুবাদ চর্চার মূল সূত্রগুলি দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠায় আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠেনি; সেকালে হল্যান্ডের জেনোফেন, লিভি বা প্লিনির ভাবান্তরণ প্রয়াসের দুষ্প্রাপ্যতা স্মরণীয়। কীটসের বহুবিশ্রুত সনেটের আশ্রয়ে ষোড়শ শতকের আর একটি অনুবাদ ইংরাজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। জর্জ চ্যাপম্যানের হোমরের কাব্যানুবাদ একটি রোমান্টিক কবি-মানসের কল্পনাপ্রতিভাকে গভীর আন্দোলিত করেছিল। ১৬০৩ খৃঃ অঃ প্রকাশিত জন ফ্লোরিওর ফরাসী থেকে মনটেনের রচনার সংগ্রহ অন্ততঃ একটি কারণেই মনে রাখবার মত। ইংরেজ সাহিত্যিক মনটেনের মাধ্যমেই আর একটি নতুন প্রকাশভঙ্গির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। যাকে আমরা "essay" বলি সেই রচনা-দর্শের গোড়াপত্তন মনটেনের হাতে। বিদেশী সাহিত্যের পঠন-পাঠনে কি অনুবাদচর্চায় ষোড়শ শতকের উৎসাহের তীব্রতা পরবর্তী শতকে আর লক্ষিত হয় না। ইংরাজীতে গ্রীক থেকে হবস-এর থুকিডিডিস আর হোমারের অনুবাদ কোন দিনই জনসমাদর পায়নি। অন্যদিকে ফরাসীতে Sir Roger l' Estrange-এর সিসেরো, জুভেনাল আর সেনেকার অনুবাদ সুপাঠ্য হলেও মূল হতে বহুধাবিচ্যুত বলেই গুণীজনের উপেক্ষিত। সপ্তদশ শতকের একজন ইংরেজ অনুবাদক, যিনি কবি হিসেবেই সমধিক খ্যাত, সেই জন ড্রাইডেনের বিরুদ্ধেও আকরবিচ্যুতির অপরাধ সহজেই আনা যায়। তবু নানা কারণেই অতীত অনুবাদ-প্রয়াসের ইতিহাসে ড্রাইডেনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বসূরীদের মত তিনি অনুবাদের উদ্যমকে শুধু প্রয়োজনীয় মনে করেই ক্ষান্ত হননি। শুধু চিন্তা-লেশশূন্য ভাবান্তরণই যে অনুবাদ নয়; অনুবাদীতব্য বস্তুটির ধীর অনুধাবনের দায়িত্ব যে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না—এ সমস্ত সত্যগুলি তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। তাঁর নানা আলোচনায়, বিশেষত তাঁর ভূমিকাগুলি পাঠে বোঝা যায় যে, সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সূত্র এবং অন্তঃশীল একটি পদ্ধতির সর্তে তিনিই প্রথম অনুবাদকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য, ড্রাইডেনের আগেই আর্ল রসকমন অনূদিত লেখকদের সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর "অনূদিত কাব্যসম্পর্কীয় নিবন্ধে" তিনি সমিল শ্লোকে এমন নানা বিষয়ের অবতারণা করেন যেগুলি আধুনিক অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে।

সংখ্যার দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীও অনুবাদে সমৃদ্ধ। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গ্রীক থেকে ইংরাজীতে হোমরের অনুবাদ। পোপ ও কুপার দুজনেই এ বিষয়ে অগ্রণী। কুপারের ওডিসীর অনুবাদ প্রশংসনীয়, আকর-অনুগামিতায় উল্লেখযোগ্য। পোপের অনুবাদ ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হোমরের কাব্যের এই সব ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে জে, এইচ, ভস-এর অডিসী (১৭৮১), ইলিয়াডের (১৭৯৩) জর্মান ভাষান্তরণ তুলনামূলক আলোচনার দাবী রাখে। এই শতাব্দীরই শেষপাদে স্লেগেল তাঁর সেক্সপীয়রের নাটকের জর্মান অনুবাদের মাধ্যমে শুধু ষোড়শ শতকের সেই দৈবী প্রতিভাধরের সমস্ত কাব্যপ্রয়াসকে জর্মান সংস্কৃতির অঙ্গীভূতই করেন না, সেই সঙ্গে অনুবাদের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অমরতা দাবী করেন।

অনুবাদ চর্চার ইতিহাসে আর একটি কারণে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ উল্লেখযোগ্য। এ যাবৎকাল অনুবাদ-চর্চার ইতিহাসে আমরা ভাষান্তরণের নানা প্রয়াস দেখেছি। সে সব প্রয়াসের কিছু অনুপ্রেরণায়, কিছু প্রয়োজনের তাগিদে সম্পন্ন। তবু অনুবাদকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পপ্রয়াস হিসেবে গ্রহণের লক্ষণ স্পষ্ট হতে বিলম্ব হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে কোনও লেখক অনুবাদের কয়েকটি নীতি-নির্ণয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন একথা ঠিকই, তবু পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রথম সূত্রপাত ড্রাইডেনের ভূমিকার (১৬৯৩/৯৭) প্রায় এক শো বছর পরে। লর্ড উডহাউসলি তাঁর "অনুবাদের নীতিবিষয়ক নিবন্ধ" লেখেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে এডিনবার্গের রয়াল সোসাইটিতে অনুবাদের বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর গ্রন্থটি সেইসব আলোচনারই একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। এর অল্পদিন আগেই ডক্টর জর্জ ক্যাম্পবেল বাইবেলের চারটি গসপেলের সটীকা অনুবাদের সঙ্গে একটি ভূমিকায় তাঁর অনুসৃত অনুবাদপদ্ধতির একটি আলোচনা সংযুক্ত করেন। ক্যাম্পবেলের সেই অগ্রজ ভূমিকা আজ ইতিহাসের উপাদানমাত্র; কিন্তু উডহাউসলির আলোচনা আধুনিক কালেও তার প্রভাবে সক্রিয়।

উডহাউসলি-নির্ধারিত মূল নীতিগুলি হল :—

(ক) অনুবাদ হবে আকর-গ্রন্থের

সমস্ত চিন্তা-ভাবনার একটি সম্পূর্ণ ভাষান্তরণ।

(খ) অনূদিত বস্তুটি শৈলী ও ভঙ্গির দিক থেকে মূলের অনুরূপ হবে।

(গ) অনুবাদে মূল রচনার স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ বজায় থাকবে। এই সমস্ত নীতিগুলি এবং তার আনুষঙ্গিক সকল ভাবনার ব্যাখ্যা উডহাউসলি গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, ইতালিয়ান প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে আহৃত এত অজস্র উদাহরণের সঙ্গে সুসম্পন্ন করেন যে তাঁর গ্রন্থ একটি নিজস্ব শ্রেণীগত বিশিষ্টতায় ভূষিত। হয়ত তাঁর অনেক মতই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডিত মনে হবে; তবু তাঁর অগ্রদূত প্রয়াসের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং তাঁর অধ্যয়ন ও জ্ঞানের কোনও তুলনা পাওয়া ভার।

উনবিংশ শতকের অনুবাদকদের মধ্যে বহু বিখ্যাত নামের সন্ধান পাওয়া যায়। তবু, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধ হয় টমাস কার্লাইলের নাম। কার্লাইলের অনুবাদের মাধ্যমেই বৃটিশ পাঠক সর্বপ্রথম গ্যেটের সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই জর্মান প্রতিভার পরিচয়ই শিক্ষিত ইংরেজকে জর্মান সাহিত্যের অনুধাবনে প্রবৃত্ত করে। শেলী, বায়রন, লংফেলোর হাত থেকে একালে আমরা অনেক অনুবাদ পাই—কবির লেখনীতে কাব্যের অনুবাদ হিসেবে যেগুলি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবু, এ সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে উল্লেখযোগ্য সর্বকালের সেই বিখ্যাত অনুবাদ, এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের ওমর খৈয়ামের রুবাই। কবি হিসেবে স্বল্পখ্যাতিমান, ফিটজেরাল্ড এর আগে স্পেনীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেল্ডারনের কয়েকটি নাটক অনুবাদ করেছিলেন। পার্সী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং প্রতিভার সুষম যোগাযোগে কেমন করে একজন বিস্মৃতপ্রায় পার্সী কবি উনবিংশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের একটি তাৎপর্যময় "নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা" হয়ে দাঁড়াল তা সাহিত্যের ইতিহাসের এক আশ্চর্য ঘটনা! অনুবাদ-চর্চার ইতিহাসে ফিটজেরাল্ড উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যে, যার অনেকখানিই এসেছে পাঠকের মনে আকর-কাব্যের রসানুভূতির সঞ্চারে; বিশ্বস্ত আক্ষরিক অনুবাদের উদাম থেকে নয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এই যুগান্তকারী অনুবাদের প্রায় অব্যবহিত পরেই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হল ম্যাথু আর্নল্ডের অনুবাদ-প্রয়াসের তর্ক-বিতর্কের উপরে লেখা "হোমর অনুবাদ প্রসঙ্গে" প্রবন্ধ। এই সুবৃহৎ নিবন্ধে হোমরই একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিলেন না; বরং আর্নল্ডের কাব্যদক্ষতার সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত মনীষার সংযোগে প্রবন্ধটি হয়ে উঠেছে কাব্যানুবাদের উপরে একটি মূল্যবান আলোচনা। আর্নল্ডের মূলনীতি হ'ল কাব্যের সার্থক অনুবাদ আমাদের ঠিক সেইভাবেই অনুরণিত করবে, যেভাবে মূলকাব্য একদা তার প্রথম শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল। অর্থাৎ রসানুভূতির সঞ্চারের জন্যে প্রয়োজন হলে আর্নল্ড ফিটজেরাল্ডের মতই আক্ষরিক বিশ্বস্ততা বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী। প্রসঙ্গত আর্নল্ডের এই সুবৃহৎ উল্লেখযোগ্য রচনাটি অধ্যাপক নিউম্যানের হোমরের অনুবাদের সমালোচনা।

বিংশ শতকের অনুবাদ প্রয়াস বহুবিচিত্র পথানুসারী। প্রথম দিকে এই সব অসংখ্য অনুবাদের মান যুগের মনীষার সমকক্ষ ছিল না; অনেক ক্ষেত্রেই প্রেরণার অভাব অনুভব করা গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের কাছে অনুবাদ মৌলিক রচনার চেয়ে সহজতর উপায়ে জনমনোরঞ্জক মনে হয়েছে। তবু ধীরে ধীরে বহু শক্তিধর লেখনীর কাছে দূরবর্তী দেশগুলির অপরিচিত সাহিত্যের আকর্ষণ তীব্র অনুভূত হয়েছে। টলস্টয় কি ডস্টয়ভস্কির বিশ্বজনীনতা; শেখভ, ইবসেন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বহুলাংশেই অনুবাদের প্রচার দ্বারা, সে অনুবাদ গূঢ় প্রেরণা এবং আন্তরিক নিষ্ঠায় শিল্পকর্মের মূলনীতিগুলিকে গ্রহণ করে বহু মহৎ সৃষ্টির সুষমাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কেননা কনস্টান্স গারনেট ছাড়া ইংরাজী-নবীশ পাঠক আজ আর টলস্টয় ডস্টয়ভস্কির কথা ভাবতে পারেন না। পেনগুইনের যুগোপযোগী অনুবাদ-প্রয়াসগুলিও সেই সব পুরানো অনুবাদের ধ্রুপদীমহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেনি। রিচি এবং মুর ১৯১৯ সালে লিখেছিলেন : অনুবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যে কোন পাঠকের পক্ষে আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের একটি অসার্থক পরিচয় পাওয়াই স্বাভাবিক। উত্তরকালের অনুবাদ প্রয়াস সেই মন্তব্যের সত্যতাকে খণ্ডন করেছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যাক, বোদলেয়র-এর অনুবাদের কথা। উনবিংশ শতকের এই শেষ ফরাসী রোমান্টিক কবির কাব্যের অসাধারণত্ব আধুনিক কালের আবিষ্কার। ইংরাজীতে বোদলেয়র-এর কবিতার বহু অনুবাদ হয়েছে—এক একটি কবিতার একাধিক অনুবাদ রয়েছে। বোদলেয়র-এর সমগ্র কাব্যের যে দ্বিভাষিক সংস্করণ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পাদকদ্বয়, মার্থিয়েল ও জ্যাকসন ম্যাথুজ, তাঁদের গ্রন্থে কবির অসংখ্য অনুবাদক ও অনুবাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ, সুষ্ঠু ও যোগ্যতমগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে তাঁদের সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এ নির্বাচন স্থায়ী নয়; বোদলেয়র-এর কোন বিশেষ কবিতার কোনও নূতন শ্রেয়তর অনুবাদ পাওয়া গেলে সেটিকে গ্রহণ করা হবে পূর্বসূরীটিকে বাদ দিয়ে। এইভাবে, একই কালে এ সংস্করণ হবে বোদলেয়র-এর শ্রেষ্ঠতম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ও অনুবাদকর্মের আধুনিকতম ধারার দিগদর্শন। মূল ফরাসী থেকে St. John Perse-এর Prnabasis-এর যে অনুবাদ এলিয়ট করেছেন তা মূলানুগত্যে অদ্বিতীয় হয়েও আশ্চর্য কাব্যসুষমার অধিকারী।

এই সমস্ত প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে রিচি ও মুরের অভিযোগ ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর সকল অনুবাদকর্মের একটি অগভীর অনুধাবনও একথা প্রমাণ করবে যে, অন্য যুগের তুলনায় এ শতকের অনুবাদকর্মের বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পাণ্ডিত্যময়। আর, সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে সারা য়ুরোপে একটি তীব্র আগ্রহ বিদ্যমান। বিংশ শতকেই আমরা দেখেছি এক একটি মনীষার এক একটি ভাষার অনুবাদকর্মে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ; গারনেট যেমন রাশিয়ান ভাষার ক্ষেত্রে লিসম্যান তেমনি জর্মান থেকে ইংরেজীতে রিলকের অনুবাদ আজীবন নিমগ্ন। মোট কথা, প্রথম শ্রেণীর মনীষা ও দক্ষতার অনুবাদ-চর্চায় আত্মনিয়োগ এ কালেই সম্ভবপর হয়েছে। আর একটি বিশেষ যুগলক্ষণ হচ্ছে ধ্রুপদী সাহিত্যে অনুরাগ একালে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা অনুবাদেরই কীর্তি। হোমর, ভার্জিল, দান্তের নূতনতর অনুবাদ যে অসাধারণ জনস্বীকৃতি পেয়েছে তা আমরা পেঙ্গুইনে ই, ভি, রিউর ইলিয়াড, অডিসী কি ডরোথি এল, সেয়ার্সের ডিভাইন কমেডির অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখেছি। পাঠকের সচেতনতায় এবং প্রকাশকের সহযোগিতায় য়ুরোপে আজ এমন একটি অনুবাদগোষ্ঠী সক্রিয় যাঁরা সকল ভাষার ঐশ্বর্য আহরণে সমান তৎপর ও যত্নশীল। তাই, য়ুরোপে অনুবাদ-চর্চা আজ নব নব দিগন্তে সম্প্রসারণশীল।

নিষ্ঠুর সত্য !

কাফী খাঁ
১৮.১০.৬২

মাইকের খেলা

সার্বভৌম ভারত, ভালো হবেনা বলছি !

নেপাল

নিকি:

মাছ এখনো খেলছে !

কলিকাতা মৎস্য ব্যবসায়ী

সিংহলের ভারতীয়

"ঐ ভারত হতে সাহায্য আসছে !"

দুটি চোখ
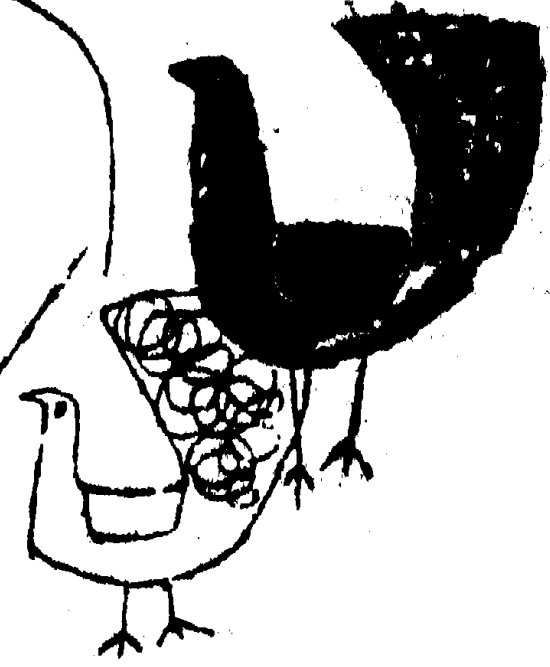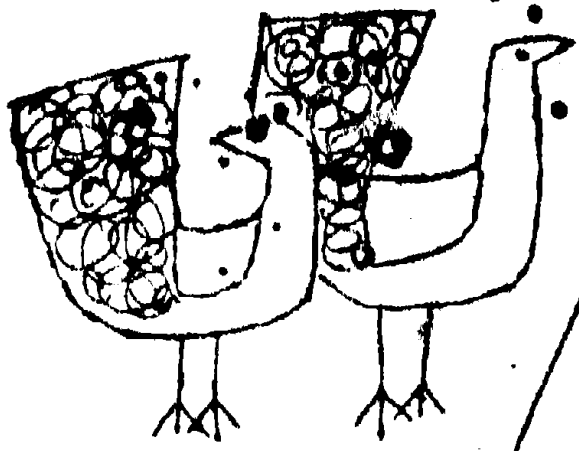
চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ব্রেইল-অক্ষরে লেখা বইটা সামনে খোলা। আঙ্গুলগুলো উঁচু-উঁচু গোলাকার হরফগুলোর ওপর দিয়ে পায়চারি করছিল। ধীরে কখন থেমে গেছে সে-চারণা।

আলো কমছে। সন্ধ্যা নামছে। লিপিকার চোখ আজ অনেকদিন হোলো নেই—সেই প্রথম কৈশোরে নিভছে আলো, চিরদিনের জন্য। তবু সে এটা বোঝে—ঐ আলো কমা আর সন্ধ্যা নামা।

লিপিকা অন্ধকার দিয়ে মোড়া। তার অস্তিত্বের চারদিকে একটা কালো আবরণ। প্রখর দ্বিপ্রহরে এই কালো পর্দাটার ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে যেন আলোর কুয়াশা নামবার চেষ্টা করে, শুষ্ক কঠিন ঐ পর্দাটা যেন একটু ভিজিয়ে দেয়। তার ওপর চেতনাকে রাখলে সে যেন পর্দার ওপারের একটু বার্তা পায়। ঘন অন্ধকার যেন একটু হালকা হয়ে একটা হারিয়ে-যাওয়া ঘুমের আভাস দেয়।

দিনের আলো ডুবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষীণ সুর ক্ষীণতর হতে থাকে। তারপর এক সময় নীরব হয়ে যায়—নিথর যবনিকা ঘন হয়ে জমে।

সন্ধ্যা নামে যত, ততই লিপিকার মনের ওপর বিষণ্ণতার রেণু খুব হালকা পায়ে ঝরতে থাকে। এত সন্তর্পণে ঝরে যে কোন শব্দ হয় না। এত হালকা সেই রেণুর মিছিল যে তাকে ধরা যায় না। বলা যায় না কোথায় সে কতটা ঝরেছে। কিন্তু নিশ্চিত জানা যায় যে সেই দিনান্তিক গোধূলি-বিষাদ ঝরছে, ঝরছে। একবারের জন্যও থামছে না। তারপর এক সময় সেই বিষণ্ণতার একটা স্তর ঘন হয়ে জমে ওঠে। তখন তাকে সে মন দিয়ে ছুঁতে পারে। কিন্তু তখনও খুঁজে পায় না কারণটা—কেন, কেন এই বিষাদের পাখীরা ডানা মেলে রোজ নামে। কেন তারা ডাকে চোখের জলের ভিজে বাতাসে!

কিন্তু সে কোন দিন এই পাখীদের তাড়া দেয় না। তাড়াবার চেষ্টা করে না। বরং মনের নানা কন্দর থেকে স্মৃতির খুদ-কুঁড়ো ছড়িয়ে দেয় ওদের সামনে। বিষাদের পাখীরা সগুলো খুঁটে-খুঁটে খায়।

হঠাৎ হয়তো এমন সময় ঘরে ঢোকেন মা: 'এই নে, লিপি, তোর চা।' ঠক করে রাখেন কাপটা।

পাখীরা পালায়। নিঃশব্দ ডানা মেলে কি অসম্ভব দ্রুততায় ওরা মিলিয়ে যায়। যাক। এখন ওরা যাক। একেবারে যাবে না ওরা। কালো মেঘ-ঢাকা আকাশের গায়ে কালো পাখীর মত ওরা মিশিয়ে থাকবে। তাই থাকে ওরা। লিপিকার কালো আকাশের বৃহৎ ডানার আড়ালে ওদের আশ্রয়, ওদের নীড়। ওরা থাকে ওখানে। যেন নেই এমন করে থাকে। কিন্তু ডাকলেই আসে।

'নে চা-টা। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' মা এগিয়ে দেন কাপটা।

কাপটা টেবিল ঘসে এগোয়। শোনা যায় তার শব্দ। হাতে এসে থামে কাপটা। নাঃ, বেশ গরম আছে এখনও। চুমুক দিলে হয়। দেওয়ারই কথা। তবু হাতটা মুখে উঠতে আলসেমি করে।

'মা।'

'কিরে?'

'না।'

'কিছু বলবি?'

'না। কিছু নয়।'

'ডাকলি যে!'

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তাই না মা?'

'হ্যাঁ। এই সাঁঝ জ্বালিয়ে এলাম।'

'শাঁখ বাজিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। শুনিস নি?'

'খেয়াল করি নি।'

'একটা রেকর্ড বাজাই?'

'বাজাও।'

'কোনটা বাজাবো?'

'ঐ যেটা—আচ্ছা বাজাও যাহোক।'

একটা গান বেজে উঠল। বড় যান্ত্রিক। বড় চড়া। যতটা রূঢ় তার চেয়ে ভাগে বেশী। নৈঃশব্দ্যের সঙ্গীতকে খান-খান করে দেয়। কথা, বড় বেশি কথা। বড় বড় কথার পাথরের তলায় সুরটা ক্ষীণকণ্ঠ।

'গান থাক, মা।'

'তবে?' মা থামালেন গান। কথারা গড়িয়ে চলে গেল দূরে। ক্ষীণকণ্ঠ সুরটাও সঙ্গে গেল ওদের। অবিচ্ছেদ্য ওরা।

'ঐ সেতারে বেহাগ বাজিয়েছে—সেই—' বলল লিপিকা।

বাজল বেহাগ। কথার পাথরকে বহু দূরে রেখে একটা সুর এগিয়ে আসে।

এ সুরটা ঐ পাখীদের বড় ডাকে। লিপিকার কালো আকাশের তলা থেকে তাদের ডাকতে থাকে। কিন্তু মা-র সামনে ওদের নামার দরকার নেই। ওদেরও অসুবিধা হয়—অন্যের সামনে নামতে। তবু ঐ সবের টানে না নেমে পারে না। ওরা নামছে। মাকে দেখে থমকাচ্ছে। কিন্তু নামছে। অস্বস্তি আর ইতস্তত-দ্বিধা সত্ত্বেও নামছে। সংখ্যায় অল্প, আর একটু নিষ্প্রাণ।

'থাক মা, এটা বন্ধ কর।'

থামে বেহাগের ডাক—পাখীরা ফিরে যায় মুহূর্তে। অস্বস্তির খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে যায় ওরা।

'এই রেকর্ডটা প্রবীরদা দিয়েছিল গেল বারে—আমার জন্মদিনে।'

'হ্যাঁ।'

'প্রবীরদার কিছু খবর পেলে?'

'না। পেয়ে যাব।' মা বললেন সান্ত্বনার সুরে। লিপিকা শান্ত হয়ে বসে থাকে—একটুক্ষণ।

'মা, প্রবীরদা আগে প্রায় রোজ আসত।'

'হ্যাঁ।'

'এখন আসে না।' অস্ফুট স্বরে বলে লিপিকা। যেন নিজেকে।

'হ্যাঁ। আবার আসবে।'

'হ্যাঁ, আসবে—আবার।' মার প্রতিধ্বনি করে সে। সান্ত্বনার প্রতিধ্বনি। যেন শব্দটাকে আরো ছড়িয়ে দিতে চায়। তারপর হঠাৎ বলে, 'মা, প্রবীরদার কিছু হয় নি তো? কোন অসুখ?'

'বালাই, ষাট। অসুখ হতে যাবে কেন?'

'বাবা যে খবর নেবেন বলেছিলেন—'

'নিতে পারেন নি। অফিসে কাজের চাপ—তুই একটু পড়বি?'

'না, পড়তে ভাল লাগছে না।'

'আর কোনো রেকর্ড বাজাব?'

উত্তর দেয় না লিপিকা। বসে থাকে চুপ করে। শান্ত। শান্ত মেয়ে বলেই তার নাম।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। লিপিকা মুহূর্তের জন্য উৎকণ্ঠ হয়েই স্তিমিত হয়ে আসে। না, প্রবীর নয়।

সবার পায়ের শব্দ তার চেনা। বাবা আসছেন অফিস থেকে। ভারী বুটের আওয়াজ। প্রবীরের পদশব্দ এত ভারী নয়। এত দ্রুত নয়। প্রবীরের সঙ্গে আর একজন কেউ থাকে—তাকে পথ দেখিয়ে আনবার জন্য। তাছাড়া প্রত্যেকের দুটি পদধ্বনির মধ্যের নিঃশব্দ ব্যবধানজালের তারতম্য আছে।

'কে? বাবা এলে?'

'হ্যাঁ, মা।' আর কোন কথা বললেন না বাবা। লিপিকা অপেক্ষা করে। না, বাবা আর কিছু বলবেন না।

'প্রবীরদার কোন খবর পেলে?'

'না। মানে যেতে পারি নি।'

'আজ এখন যাবে?' হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় যেন।

'এখন!'

'রাত হয়ে গেছে, না? তুমি ক্লান্ত, না? থাক, তুমি জিরোও।'

'তুই একটু গান শোন্ না!'

'শুনেব, বাবা।'

'নতুন একখানা রেকর্ড এনেছি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। প্রথম লাইনটা—'

'পরে শুনেব, বাবা।'

'তুমি হাত মুখ ধুয়ে জিরিয়ে নাও।' মা বললেন।

'আচ্ছা।' বাবা ভেতরে চলে যান।

মা লিপিকাকে বলেন, 'লিপি, বোস, ওঁকে খাবার দিয়ে আসি।'

হাল্কা পায়ের শব্দটা ভারী বুটের শব্দকে অনুসরণ করে মিলিয়ে যায়।

প্রবীরের কি হোলো! অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে লিপিকা। অসুখ! দুর্ঘটনা! মৃত্যু! না, না। অন্য কিছু। কিন্তু আসে না কেন! আগে প্রায় রোজই আসত সে। অনেকক্ষণ থাকত। কথা বলত। শুনত। অন্ধকারের সমুদ্রে দুটি নিমজ্জিত দ্বীপ বসে বসে কথার সেতু রচনা করত। ঐ কথার সেতু পায়ে পায়ে পার হয়ে কতবার সে গিয়েছে ঐ আর একটা দ্বীপে, স্পন্দন শুনেছে তার অন্তরের, ছুঁয়েছে তার কঠিন কালো অন্ধকারের কৌটোর মধ্যে আলোর প্রাণকে। কাঁপত সে আলোটা, কাঁদত। জানে সে, একমাত্র সে-ই জানে। ঐ আলোটাকে আর কেউ যে দেখতে পেত না। চক্ষুষ্মানরা ওটা দেখতে পায় না। লিপিকা পেত। বোজা চোখেই পেত।

আর প্রবীরদাও যে দেখেছে। লিপিকারও কালো কৌটোর মধ্যে আলোর প্রাণকে সে দেখে গেছে। তাই তো সে আসে। অন্ধকারের কৌটো দুটো ভেঙে দুটো আলো পরস্পরকে দেখে—পরস্পরের জগৎকে আলো করে দেয়।

তখনও পাখীরা নামে। কালো আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে—অসংখ্য সাদা সাদা

বকের মত। ডানায় ডানায় আকাশ সাদা হয়ে যায়। আকাশটার কালো যায় মুছে।

চারিদিক থাকে কী আশ্চর্য নিস্তব্ধ! কথারা সেতু রচনা করে দিয়ে চলে যাবার পর সেই দুটো আলো পরস্পরের মধ্যে ডুবে থাকার সময় যে শব্দহীনতার আকাশ-সংগীত জেগে ওঠে, ঠিক সেই সংগীতটা দেহ পায় ঐ বকের ডানায়। ডানা আর ডানা, সাদা আর সাদা। কালো আকাশটি আর নেই।

একদিন—শুধুমাত্র একদিন— সেই নিঃশব্দ সংগীত এক প্রচণ্ড বজ্র-ঝংকারে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। প্রবীরের হাত এসে পড়েছিল তার হাতে, গায়ে। দেখতে পায়নি প্রবীর। অথবা আবেগে এগিয়ে এসেছিল। স্পর্শ। পুরুষের। একবার। সামান্য ক্ষণের জন্য। বকের ডানায় কী দুঃসহ প্রবল কম্পন! সারাটা আকাশে বিপুল এক ভূমিকম্প। তার-পর সে ডানা-ঝাপটানি ক্রমে কমতে লাগল। থামল শেষে এক ক্লান্তির শিথিলতায়।

ভাবনার পরিধিতে মেপে তোলা যায় না এ অভিজ্ঞতা। তবু, এ স্পর্শ তো ক্ষণিকের, স্পৃষ্ট তো সামান্য দেহাংশ। এই স্পর্শের ভরা-সমুদ্রে তরঙ্গিত অব-গাহন—না, তার আকাশের সে ধারণ-ক্ষমতা নেই। কয়েকটি বিদ্যুৎ-রেখায় বজ্র-ধ্বনিত আকাশ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। টুকরো টুকরো আকাশ। বকের ডানায় আকাশ। সহস্র খণ্ডে বিচিত্র আকারে চুরমার।

সেই ভূমিকম্পে কত কীই ঘটতে পারে! কত দুর্ঘটনা! কত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর দেহে কত পরি-বর্তন! সে-দেহের যেখানে যা ছিল, মুহূর্তে তা অবলুপ্ত। আবার যা ছিল না, হয়তো তা অকস্মাৎ আগত। অনুর্বর পোড়ো দেহাংশ হয়তো জলধারায় নিষিক্ত, সবুজের-স্বপ্নে অস্থির। পৃথিবীর দেহে চোখ ফুটে বেরোতে পারে। অনেক, অনেক চোখ। জলের ধারার চোখ, সবুজ আলোর চোখ। কান্নার চোখ, হাসির চোখ।

'লিপি।' মা এসেছেন।

'কেন মা?'

'চুপচাপ বসে যে!'

'কি করব মা?'

'গান বা—'

'থাক মা।'

'লিপি, তোর শরীর খারাপ করে নি তো?'

'শরীর? না মা।' সেই স্পর্শের কথাটা মনে আসে। শরীরই তো স্পর্শ করে। শরীরই তো স্পর্শকে গ্রহণ করে, ধারণ করে, লালন করে। স্পর্শ তো শরীরেরই সন্তান। শরীর-মা তাকে পেয়ে নিজেকে পায়।

'লিপি, তুই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন।' শরীর-মা হাতড়ে খুঁজছে স্পর্শ-সন্তানকে।

'কেমন, মা?'

'কি জানি, বুঝি না।'

'তুমি বুঝবে না, মা।' কথাটা কঠিন, কিন্তু শোনাল করুণ।

'আমি মা হয়ে বুঝব না?' কারুণ্য সত্ত্বেও কাঠিন্যের ধাক্কাটা লেগেছে।

'মা-রা অনেক বোঝে, সব বোঝে না।'

'না রে। আমি বুঝব। বল তুই।' আকুলভাবে হাতড়াচ্ছে যেন কাঠিন্যের বদ্ধ দেওয়ালে।

'বললেও বুঝবে না, মা। বোঝা যায় না। আর আমি তো সব বলতেও পারব না। সব বলা যায় না, মা। সব বুঝিও না যে আমি বলব কী করে?'

'আমি না বুঝলে তোকে আর কে বুঝবে!'

'কেউ বুঝবে না?'

'তোর যে আর কেউ নেই রে! বল, আমায় বল।' মা কাঁদছেন।

কি বলবে সে! সেই আকাশ, সেই পাখীর কথা! মা তাকে পাগল ভাববেন। এ পাগলামি যে তার একান্ত। এখানে কি কাউকে আনা যায়!

'মা।'

'বল।'

'একটা চিঠি লিখলে হয় না?'

'কাকে?'

'প্রবীরদাকে।'

'লিখব। কাল। ওঁকে দিয়ে দেব।'

'মা।'

'বল্।'

'আমি একটু একা থাকি। তুমি বাবার কাছে যাও।' বলতেই হোলো।

'তোর বাবাকেও না-হয় এখানে আসতে বলি।'

'না।'

মার পায়ের শব্দ। সরে যাচ্ছে। ঐ শব্দটি ছাড়া আর তার কিছু নেই, কেউ নেই! একা! কেউ নেই—প্রবীরও নয়!

ঠাকুমা বলেছিলেন—ভগবান আছেন। কই! কোথায়! লিপিকা তাঁকে দেখতে পায় না। পেলে কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করত। বেশী নয়, কয়েকটা। না, একটা। কিন্তু ভগবান এ অন্ধকার কারাগৃহে বোধহয় ঢোকেন না। ঢুকতে ভয় পান। এখানে পথ দেখতে পান না। ভগবানের রাজ্যের বাইরে বোধহয় এ দেশ। না, তার ভগবান নেই। সে একা! প্রবীর? প্রবীরও কি নেই!

বাইরে পায়ের শব্দ। একবার বুকটা ধড়াস করে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। প্রবীর নয়। বাবা। আর মা।

'লিপি, প্রবীরকে এই লিখলাম। শুনবি?'

'পড়।'

'বাবা প্রবীর, বহুদিন তোমার কোন

সংবাদ না পাইয়া বড় চিন্তিত আছি। আশা করি কুশলে আছো। পত্র পাওয়া মাত্র উত্তরদানে চিন্তা দূরে করিবে। ইতি—'

চুপ করে বসে থাকে লিপিকা।

'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' আর কীই বা বলা যেতে পারে!

'কালকের ডাকে দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা প্রবীরদাও তো চিঠি লিখতে পারে! বরং ওরই তো দেওয়া উচিত আগে।'

'তা দিতে পারে।'

'দেখ না লেটার-বক্স্‌টা।'

'দেখেছি।'

'নেই!'

বাবা-মা ভেতরে চলে যান। লিপিকারই ইচ্ছানুসারে।

একাই বসে থাকতে ভাল লাগে। পাশে কেউ থাকলে নিজের মনের কাছেই যেন একান্ত হওয়া যায় না।

কিন্তু একাই বা কি করা যায়! ঐ পাখীদের আবার ডাকবে! স্মৃতির খুদ-কুঁড়ো ছড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে বসে থাকা—কি লাভ! কোথায়ই বা লাভ! ভাল লাগে না। কিছুই টানে না তেমন করে। যাতে মন দিতে চায়, তাই বিরক্তিকর, পুরোতন। ক্লান্তি তার সর্ব চেতনায়। অথচ ঘুম নেই তার চোখে। মন এটা থেকে ওটা, ওটা থেকে সেটায় অস্থিরভাবে চলছে। না, এ চলা নয়। যেটা ধরে, সেটাই ছাড়ে। সেই মুহূর্তেই। এ যেন ছোটা। কোন নির্দিষ্ট দিকে নয়। দিকে, বিদিকে। যে-দিক থেকে পালিয়ে যায়, আবার হয়তো সেখানে ফিরে আসে। আসে, কিন্তু যেন ভুল ক'রে, আবার পালায়। না, এ ছোটা নয়। মনের এ ছোটাছুটি। ছোটদের খেলার ছোটাছুটি নয়। কী এক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য ছটফটানি। কিন্তু যন্ত্রণাটা নিজেরই মধ্যে। তাই রেহাই নেই। পাখীরা বারুদের গন্ধ পেয়ে এক আকাশ ছেড়ে আর এক আকাশে যেতে চায়। কিন্তু সেখানেও যদি বারুদের গন্ধ থাকে? কোন আকাশ-কোণেই শান্তি নেই। ডানা ঝাপটানো সার। অদৃশ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে সে বারুদের গন্ধটা শোঁকে।

'কে?' লিপিকা চেঁচিয়ে উঠল। কার যেন পায়ের শব্দ।

না, প্রবীর নয়। তার আওয়াজ অন্য রকম।

'আমি রে!'

'কে! ও বিনয়দা!'

বিনয় লিপিকার পিসতুতো ভাই। প্রবীরদের ঘনিষ্ঠ।

'লিপি, অমন চমকে উঠলি কেন? একা-একা বসে কি করছিস? কি করবি দুঃখ করে, বল।'

'দুঃখ কিসের, বিনয়দা! তুমি অনেক-দিন বাদে এলে। তোমার পায়ের শব্দ আমি প্রায় ভুলে গেছি।'

'হ্যাঁ, অনেক দিন পরে এলাম। আসতে পা উঠছিল না। আজ ভাবলাম, এত দিনে তুই একটু সামলে উঠেছিস নিশ্চয়ই। মেয়েটিকে দেখলাম, বোকা-বোকা সরল চাউনি, গ্রাম্য মেয়ে। প্রবীরের বাবা অনেক টাকা দিয়েছেন মেয়েটির বাবাকে। তাইতে ওরা রাজী হয়েছে। প্রবীরের সঙ্গে আলাদা দেখা করতে পারি নি। ও কারুর সঙ্গে দেখা করছে না। তোর দিক থেকে আমার দুঃখ ছিল ঠিকই কিন্তু তবু ওদের দুজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি। যাকগে, ওসব ভুলে যা, লিপি। দ্যাখ্‌ পৃথিবীতে—'

'বিনয়দা, আমাকে একটু দয়া কর—সান্ত্বনা দিয়ো না।'

'অ, আচ্ছা। তুই বোস্‌, আমি একটু ভেতরে দেখা করে আসি।' বিনয়ের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

ভাঙছে, ভাঙছে আকাশটা। প্রাণপণ চেষ্টাতেও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না লিপিকা। সারা আকাশটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আগলে রাখার চেষ্টা করছে সে। পারছে না। পাঁচ-সাতটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ-রেখায় চৌচির হচ্ছে বজ্রধ্বনিত আকাশটা। কালো আকাশটার তলা থেকে সেই পাখীগুলো ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে। হাজার পাখী। যে গাছে তাদের নীড়, তাইতে আগুন লাগলে তারা যেমন চীৎকার করে আর ডানা ঝাপটায়, এও তেমনি। সারা আকাশটাতেই বুঝি আগুন লেগেছে। টুকরো টুকরো আকাশ। নানা আকারের। ভেঙে পড়ছে। ঐ পাখীগুলোকে চাপা দেবে। জীবন্ত সমাধিস্থ হবার আশঙ্কায় পাখীরা আর্ত কোলাহল করছে। ভাঙা আকাশে টুকরোগুলো নামছে। স্মৃতির খুদ-কুঁড়ো ছড়িয়ে দিত সে যে-মনের ওপর, সেইখানে নামছে ভাঙা আকাশের খণ্ডাংশগুলো।

তারপর আকাশের ভূমিকম্প এক সময় থামল। মাটি ফেটে জল গড়াচ্ছে—দেহ-ফাটা রক্তধারার মত। সেই জলের ঢল নেমেছে। যে অজস্র চোখ সারা দেহে ফুটে উঠতে চেয়েছিল, তারা আর ফুটল না।

সেই জলের মধ্যে ডুবে এক সময় সে সন্ধান করল সেই আলোটাকে। ডুবুরীর মত খুঁজল। কত কী উঠল। কিন্তু কোথায়—কোথায় সেই আলোটা! যেটা ছিল কালো কঠিন কৌটোর মধ্যে—সবার অগোচরে।

অস্থির সন্ধান চলে। খুঁজে পাওয়া যায় না সেটা। তবে কি সেটাও খোয়া গেল! সেটা তো খোয়া যাবার নয়। সেটা যে তারই—শুধু তার। এই আলোড়নে সেটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু আছে কোথাও না কোথাও। আছে সেটা নিশ্চয়ই। খুঁজে সে পাবেই। পেতে তাকে হবেই।

আরো পরে যখন ডুবুরী ডুব দিল একটু শান্ত-হয়ে-আসা জলের তলায়, তখন সে সেইটা দেখতে পেল। কালো কঠিন কৌটোর মধ্যে সেই আশ্চর্য দীপ্তি, সেই অতন্দ্র শিখা। ঐ আলোকে সে বলতে চাইল অনেক কথা। এত কথা যে তার ভিড়ে কোনটাই ভাল করে ফুটে উঠল না। শুধু গানের ধ্রুবপদের মত একটা সুর আসছিল বারবার: "আমার আলো, ওকে তুমি ক্ষমা কর। ও দুটো চোখ চেয়েছিল—দেহের চোখ। অন্ধকার কারাগারে ও দুটো বাতায়ন চেয়েছিল—হাসির আর কান্নার।'

একটি মেলার কথা

মহীতোষ বিশ্বাস

বাঙলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেলা হয়। এইসব মেলার অবশ্য একটা উপলক্ষ থাকে বেশীর ভাগ পুজো-পার্বণ। বর্ধমান জেলায় যে সমস্ত মেলা হয় তার মধ্যে 'মামদোরাজের মেলা' একটি। স্নানযাত্রার দিন এই মেলার আরম্ভ। শেষ হয় তিনদিনে। উপলক্ষ মামদোরাজের গাজন। সাধারণতঃ চৈত্র মাসে শিবের গাজন হয় কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। গ্রামে যাঁদের 'মানত' থাকে তাঁরাই সন্ন্যাসী হন এবং যথারীতি নিয়ম পালন করেন। তবে চৈত্র মাসে শিবের গাজনে যেমন 'চড়ক' আছে এখানে তেমন কিছু নেই। মেলা যে জায়গায় বসে তারও নাম 'মামদোতলা'। এই গ্রামের নাম 'দাদপুর', মেমারী থানার অন্তর্গত। ছোটগ্রাম, তবে আশপাশে বহু গ্রাম রয়েছে। কলা নবগ্রাম, পিঙ্গুর, বেলুটে, পাল্লা, মহেশপুর প্রভৃতি তেরচোদ্দখানা গ্রামের মানুষ এই মেলা উপলক্ষে এই সময় এখানে আসে। এই মেলা যে কতকাল আগে আরম্ভ হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। গ্রামের যিনি এখন প্রাচীন ব্যক্তি, প্রায় আশী বছর বয়স, তিনিও বললেন, 'কি জানি বাবা, ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি এই মেলা। আরও জাঁক-জমক হ'তো কিন্তু এখন তার কিছুই নেই।'। পাঁচকথায় যা জানলাম তা হচ্ছে এই যে, ছোট গ্রাম হলেও মেলা চলে আসছে বহুদিন হতে আর যে ঠাকুর আছেন তাও বহুদিনের। পণ্ডিতদের (জেলেদের) এই ঠাকুর। ঠাকুরের যে মন্দির বা গৃহ আছে তা এতদিন ভগ্ন অবস্থায় ছিল, এবছর সংস্কার হয়েছে। মন্দির এমন কিছু নয়। চারপাশ রোয়াকের উপর একটি ছোট ঘর, এই ঘরটিই প্রাচীন, কিন্তু দরজা জানালা না থাকায় অদূরে ছোট মাটির ঘরে ঠাকুর থাকেন। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে চারদিকে মেলার দোকান-পশার বসে। তিনদিন মেলাতলা গমগম করে। এই উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হয়। পেশাদার যাত্রাদলের অভিনয়ে দেখতে গাঁয়ের ও ভিন গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে।

মামদোরাজের এই গাজন এক শ্রেণীর মানুষের উৎসব হলেও মেলা উপলক্ষে এদিগরে সকল শ্রেণীর মানুষই যোগদান করেন এবং কেনাকাটা করেন। কালের পরিবর্তনে আজ মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। শহরের সভ্য-শিক্ষিত মানুষের কাছে আজ হয়তো এই রকম মেলার কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু গ্রাম-বাংলার বহু মানুষের কাছে এই রকম মেলার যে প্রয়োজন এবং তা কি আনন্দ দান করে তা না দেখলে বোঝা যায় না। এখানে থেকে দেখছি আশ-পাশের গ্রামের বহু গৃহস্থবাড়ী আত্মীয়কুটুম্ব আসতে আরম্ভ করেছে। এমনকি সাঁওতাল এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের যাঁরা গায়ে-গতরে খেটে খান তাঁদের, বাড়ী এখন কুটুম আসবে। কাপড়ের দোকানে নূতন কাপড়-জামা বিক্রি হবে। দুর্গাপুজোয় কাপড়-পোষাক না হলেও এখন এই মামদো-রাজের গাজনে কাপড়-পোষাক চাই। অনেক গৃহস্থ সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই মেলায় কেনা-কাটা করবে বলে। মাসখানেক আগে থেকেই এদিকে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়—মেলা আসছে। পয়সার স্বাচ্ছন্দ্য যাঁদের আছে তাঁদের তো কোন কথাই নেই, কিন্তু যাঁদের তা নেই,—অভাবের সংসার—তাঁদের চেষ্টা করে এসময় দু-পয়সা হাতে রাখতেই হয়। এখানে অধিকাংশই চাষীর বাস। এঁদের মধ্যে যেমন সচ্ছল অবস্থার মানুষ আছে তেমনি অভাবের সংসারও রয়েছে, তবু এই মেলা উপ-লক্ষে কেনা-কাটায় কিছু অতিরিক্ত খরচ হয়ে যায়। কেনা-কাটার মধ্যে মনো-হারী জিনিস বেশী, পিতলের কাঁসার বাসন-পত্রও আছে। আর আছে নানা-রকম খাবার। মেলায় এখনও যে-সব খাবার বিক্রি হয় তা থাকে আঢাকা। স্বাস্থ্যের দিক থেকে হয়তো এগুলি খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু গ্রামের মানুষ তা মানে না, কোন প্রতিবাদও করে না, সহজভাবেই কিনে নিয়ে যায়। এই সব জায়গায় এলে এইসব গ্রামের মানুষকে দেখলে বোঝা যায় আমাদের দেশে এখনও কত মানুষ আছে যাদের মনে প্রকৃত শিক্ষার কোন ছোঁয়া লাগেনি। এখনও এই সরল গ্রামের মানুষ রোগ-বিপদে ঠাকুরের 'মানত' করে, মাদুলি, শিকড় ধারণ করে। অভাবে, দুঃখ-কষ্টে ভগবানের দোহাই দেয়। প্রতিকারের জন্য অন্য চেষ্টা নেই। বিশ্বাসের জোরেই আজও এইসব পুজো-পার্বণ টি'কে আছে।

মামদোরাজের যাঁরা সেবাইত তাঁদের বাস এই গ্রামেই। তাঁরা জাতিতে 'পণ্ডিত' বা জেলে। এ ঠাকুর কখনও বর্ণহিন্দুদের কাছে থাকেন না। এমনকি ব্রাহ্মণদের পুজো করবার কোন অধিকার নেই। এখানে এই মেলা উপলক্ষে তিনদিন যে 'ধর্মরাজের গান' হলো তার মূল গায়কের সঙ্গে আলাপ হ'লো, তিনিও জাতিতে 'পণ্ডিত'। রামায়ণের মতই তাঁর গান, তবে কাহিনী বা পালা ধর্মরাজ নিয়ে। গৌরেশ্বরের পতনের পর যখন 'লাউসেন' জন্মগ্রহণ করলেন তখন চারদিকে অধর্ম। এই সময় 'মহামদ' নামে এক অধার্মিক দেশে নানা অধর্মের কাজ করছে। ধার্মিক লাউসেন তাঁকে পরাস্ত করে ধর্ম রক্ষা করেন। এই মূল কাহিনী নিয়ে ধর্মমঙ্গল গ্রন্থ। এবারে সাতজন গায়ক এসে-ছিলেন। নিকটে দামোদর পারে তাঁদের বসবাস।

এতে বোঝা যায় এই 'মামদোরাজ' ধর্মরাজ ঠাকুর।

এখানে মামদোরাজ বা ধর্মরাজের কোন মূর্তি নেই, একটি ছোট বাক্স থেকে সিংহাসনে। ঐ বাক্সের মধ্যে নাকি পাথর আছে, তিনিই মামদোরাজ বা ধর্মরাজ। এই বাক্স খোলার কোন রীতি নেই। যে খুলবে বা ঐ পাথরে হাত দেবে সে নির্বংশ হবে এই প্রবাদ। মেলার সময়ে ঠাকুর তিন দিন থাকেন পুরানো মন্দিরের সামনে যে তালপাতা দিয়ে দোচালা ঘর করা হয় তাতে। মামদোরাজের দু'পাশে দুই শিলামূর্তি থাকে, এদুটি মনসার মূর্তি বলা হয়। গাজন উৎসবে মনসামাতা কেন এলেন তাও ঠিক করে বলা যায় না। যাই হোক, এই সব ঠাকুর, বিগ্রহ ও পার্বন-রীতির যে নাম বা নিয়ম থাকুক না কেন উৎসব জমে ওঠে মেলাকে কেন্দ্র করে, আনন্দও এই মেলাকে নিয়ে। সকাল থেকে দলে দলে লোক আসছে দূরের গ্রাম থেকে। মেলায় কেনাকাটা করতে যেমন অনেকে আসে আবার বেচতেও আসে অনেকে।

যাঁরা ব্যবসায়ী, দোকানদার তাঁরা অনেকে আসেন দোকান নিয়ে কিন্তু যাঁরা চাষী তাঁরাও অনেকে আসেন এই তিন দিন তাঁদের ক্ষেতের তরিতরকারি নিয়ে। অনেকে গাছের আম কাঁঠাল নিয়েও আসেন, বিক্রি করে যা হয় তাতে মেলার খরচটা চলে যায়। কুলো, পেতে, ঝুড়ি নিয়ে আসে অনেকে। এছাড়া মাদুর, হাতা, বেড়ি, খুন্তি ইত্যাদি ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস আসে। বরষায় যাঁরা ছাতা কিনতে পারেন না তাঁরা এখান থেকে তালপাতার তৈরী 'পেকে' কিনে নেন, বর্ষার সময় এ জিনিসের খুবই দরকার। নিকটের গ্রামের কারিগররা এসব জিনিস তৈরী করে থাকেন। এ সময় দু'পয়সা হয়। এই মেলার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাঁওতালদের নাচ। তিন দিন দলে দলে মেয়েপুরুষ একসঙ্গে নাচবে। সাধারণতঃ বিকেলের দিকে এই নাচ আরম্ভ হয়, সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। মাদলের তালে তালে যখন এদের নাচ চলে তখন বহু লোক সেখানে জমা হয়। সাঁওতাল মেয়েদের তালে তালে পা ফেলে পরস্পরের কোমরে হাত দিয়ে বৃত্তাকারে নাচের যে ভঙ্গি তা সত্যই সুন্দর। বাঁশির সুর, মাদলের বাজনা এবং নাচের ছন্দ মনকে মাতোয়ারা করে দেয়। নিকটের এবং দূরের বহু সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ এই মেলায় এসে দলে দলে নাচে যোগ দেয়। যে যার গহনা পরে আসে। খোঁপায়, হাতে, পায়ে, গলায়, কোমরে, নাকে, কানে সব রূপার গহনা। গলায় হাঁসুলি আর রঙিন পুঁথির মালাও অনেক সাঁওতালী মেয়ে পরে। এই গাজন উৎসবে এদের যোগদানের কোন কারণ জানা যায় না। কারণ সাঁওতাল জাতির স্বতন্ত্র পূজা-পার্বণ আছে।

মামদোরাজের গাজনে আর একটা ব্যাপার আছে তা হচ্ছে বলিদান। এ-বছর কুড়িটি পাঁটা বলিদান হয়েছে। গাজন উপলক্ষে কোথাও কোথাও বলি-দান হয়। বর্ধমান জেলার জামালপুরের বুড়োরাজের গাজনে বলিদান হয়। শিবের পূজায় কি ধর্মরাজের পূজায় বলিদান, এই প্রথা কিভাবে চালু হলো তা চিন্তার কথা। পল্লী-অঞ্চলের এই সব পূজা-পার্বণ-রীতিতে বিশেষ করে বর্ণ-হিন্দু ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর জাতির মধ্যে এখনও যেমন যথেষ্ট ধর্মবিশ্বাস আছে তেমনি উৎসাহ আছে। পূজাপার্বণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আজও তাঁরা উত্তর দেন—'এই তো চলে আসছে বাবু।' অর্থাৎ পুরাতনকে বর্জন এবং নূতন কিছু গ্রহণ করতে কেউ রাজী নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে অন্ধবিশ্বাস বা সংস্কার নেই তা বলা যায় না। আজও তাগা-মাদুলি ধারণ, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতির চলন রয়েছে সন্তানের উন্নতির জন্য, সকল রকম ব্যক্তিগত ব্যাপারে মানত-পূজার রীতি চলছে। এর ফলে এক শ্রেণীর মানুষের বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়। অনেকে বলেন, তবে কি আমরা নাস্তিক হবো? ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবো না? কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা বা ঈশ্বরের সাধনা করা যদি নিঃস্বার্থভাবে হয় তবে কোন কথা নেই। কিন্তু টাকা-পয়সা দিয়ে "মানত" করা অন্ধবিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে। অনেক সময় নিজের মঙ্গলের জন্য পরের অমঙ্গল কামনা করা হয়। এই পল্লী-অঞ্চলে আজও নানা-

মন্দিরের সম্মুখে মেলার দৃশ্য

রকম কুসংস্কার এবং রীতিনীতির চলন রয়েছে যা দেখলে মনকে পীড়া দেয়। যেমন আজও এই সব মেলায় বহু নিম্ন-শ্রেণীর মানুষকে মদ্যপান করতে দেখা যায়। এমন কি এই সব শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মদ্য পান করে আসে। এইসব অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে আচার-আচরণে আজও সেই কুসংস্কারের চলন রয়েছে। সভ্যতার আলো এদের মনে আজও প্রবেশ করেনি। হয়তো এখনও অনেক সময় লাগবে সমাজের সকল মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। তবে একটা জিনিস আজও দেখা যায় এই সব মেলায়, পূজা-পার্বনে, তা মানুষের মিলন। অন্ধ-বিশ্বাসই হোক আর কুসংস্কারই হোক পল্লীর এই সব মানুষের যে ধর্মবিশ্বাস তা ষোল-আনা। এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। নিজের সমাজের মধ্যে, নিজের অবস্থার মধ্যে এ'রা সন্তুষ্ট, কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই। মেলায় আর একটা দিক দেখলে ভাল লাগে তা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে দেখা-শোনা, আলাপ-আলোচনা। অনেক দিন পর হয়তো দূরের গাঁয়ের আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সুখদুঃখের পাঁচটা কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হয়। এ'দের সমাজ, কাজকর্ম, সবই এই আশপাশের কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে। জন্ম ও মৃত্যু যেমন এই গ্রামের মাটিতে, তেমনি জীবনের সকল দিক—হাসি কান্না, রোগ, শোক, স্বাস্থ্য-সম্পদ সবই পল্লীর এই মাটির সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। মেলার দোকানের ঐ নিকেল-করা কানের ঝুমকো শহরের শিক্ষিতা তরুণীর কাছে হয়তো নগণ্য, কিন্তু গ্রামের এই গরীবের মেয়ের কাছে তা মূল্যবান, আনন্দের উৎস।

খোলা চিঠি

কৃষ্ণা দাশ

আমি অনুতপ্ত।

আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে, যাদের সাহায্য নিয়ে তোমায় জালে ফেলবার মনোবৃত্তি আমার গড়ে উঠেছিল, তাদের হৃদয় দুটির কথা কেন আমি ভাবলুম না।

আজ এই চিঠি লিখতে বসে আমার মনে আর কোন রাগ নেই দ্বেষ নেই হিংসে নেই। শুধু বার বার খুকুর কাতর কণ্ঠ কানে বাজছে—মা, একি হোল, এ তুমি কি বললে?

এ কথার জবাবদিহি কোনদিন আমায় করতে হবে, একথা কেন আগে মনে আসেনি ভবতোষ?

আমার শুধু একটা কথাই মনে এসেছিল, একটা উদ্দেশ্য। তুমি আসবে। এলে। ঠিক সেই ভাবে। নত মাথায়। চিন্তান্বিত মুখে।
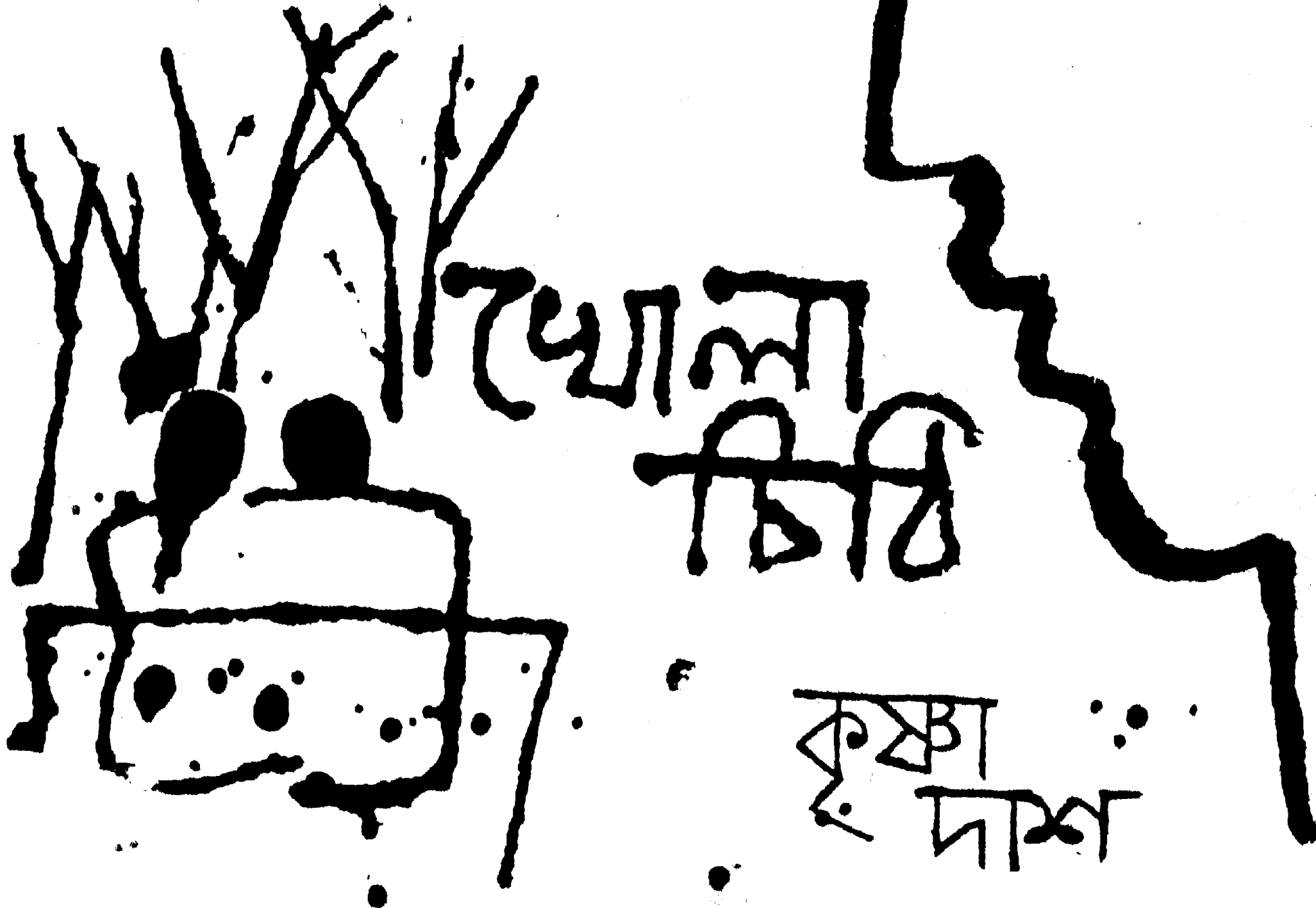
ডাকতে হল না। তোমার গলা পেয়েই আমি এসেছিলাম। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখলাম। তুমি খুকুর মুখের দিকে সস্নেহে অপলকে তাকিয়ে আছ।

দেখে শুনে মনে হল—দিই সব কিছু ভেঙে। মনের ভিতরের যে বাসনা ছিল, সে তো আমার মিটেছে। কিন্তু আমার সব কেমন ভুল হয়ে গিয়েছিল। মনে হল—থাক বিস্মৃতির আবরণে যা ঢাকা পড়ে আছে, তাকে নিয়ে মিথ্যে আজ আর টানা-হ্যাঁচড়া করে কোন লাভ নেই।

কিন্তু খুকু আমায় থাকতে দিল না। ও কাঁদছে। আমায় বলেছে নিষ্ঠুর। বলেছে—তুমি কি করে এমন নিষ্ঠুর হলে মা।

আমি ওকে বোঝাতে পারিনি।—আমি নিষ্ঠুর নই, প্রেম ভালবাসাকে আমার মাড়িয়ে চলার কোন ক্ষমতা নেই। শুধু একটি ভুল। একটা ছোট্ট কিন্তু মারাত্মক ভুল। তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করতে ছাড়িনি। খুকুকে বলেছিলাম—ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যেই করেন।

ও বলেছে—ভগবান আমি জানিনে। তা ছাড়া—তোমায় যদি বলা হত বাবাকে তুমি ভালবেসো না।

খুকুর কথা শুনে এত দুঃখেও হাসি পেল। এই বড় ঘরের জোড়া খাটের মাথায় খুকুর বাবার যে এনলার্জ ফটোখানি ঝুলছে, যার গলায় নিত্যদিন টাটকা ফুলের মালা ঝোলাম আর ধূপ-ধুনো দেওয়া আমার নিত্যদিনের অভ্যাস

—জীবিতকালে তাঁকে আমি কতখানি ভালবেসেছি—সে আমার নিজেরই সন্দেহের বস্তু।

কোন মানুষকে ভালবাসতে গেলে হৃদয়ের সমস্ত মালিন্যকে নিঃশেষে দূর করতে না পারলে কি তার কাছে যাওয়া যায়? রামকৃষ্ণ কথামৃতে আজকাল পড়ি—ভগবানকে ভালবাসতে গেলে নিচু হতে হয়। ভগবানের কথা আমি জানিনে, শুধু নিজেকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে দেখেছি শিশুর মত মালিন্যমুক্ত পবিত্র না হলে মানুষকেও ভালবাসা যায় না। নিজেকে তার কাছে উৎসারিত করে ধরা যায় না।

কিন্তু আমি, এই সুনালিনী, দীর্ঘ কুড়িটি বছর যার সঙ্গে ঘর করে এলাম, পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সতী-সাধ্বীর জয়ধ্বজা ভাল মতই উড়িয়ে বেড়িয়েছি—সে কি দেহে মনে কোথাও কোনদিন পবিত্র ছিল? মালিন্যশূন্য ছিল? কুড়িটা বছর যার সঙ্গে ঘর করলুম কুড়িটা দিন তার কাছে আমি সহজ হয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছি?

পারি নি। পারা যায় না। পাপের বোঝা এদানীং মৃত্যুর মত আমায় আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে মনে হত যা হয়েছে বা ঘটেছে—সব কথা ওঁর কাছে খুলে বলি। বলে কিছুটা হাল্কা হই।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারতুম না। ভিতর থেকে জিভটা আমার আড়ষ্ট হয়ে উঠতো টানতো। আমায় স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য করাতো। তাই শেষদিন অবধি কোন কথা আমার জানান হল না। আর জানাতে না পেরে বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে আমার শুধু বিষের দাহে পূর্ণ হয়ে উঠলো। জীবনের যে প্রেম মধুরতর হয়ে উঠতে পারতো বিতৃষ্ণা আর ঘৃণার শেষ অবধি তা আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাবে—আমি নিজেই জানি নে।

এদানীং খুকুর বাবা (হাঁ, ওর বাবা বলেই বললাম। কারণ পিতা ও কন্যার স্নেহে যে চিরদিন লালিত-পালিত হল, তাকে জানলো—সে তার বাবাই) বলতেন—তোমার মনের মধ্যে বোধহয় কোন ফাঁকি আছে নলিনী।

আমি চমকে উঠেছি—এ কথা কেন? কিসের ফাঁকি! তা ছাড়া এই এতখানি বয়সে!

উনি বলতেন। —তা হবে। আমার ভুলও হতে পারে। তবু কেন যে মনে হয় তুমি দূরে সরে যাচ্ছ, অনেক দূরে।

আমি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সত্যি আর মিথ্যে যেমন কখনও এক হয় না, তেমনই যথার্থ প্রেম আর প্রেমের অভিনয় দুটোর মধ্যেই পার্থক্য থাকে।

তাই এই চিঠি লিখতে বসে তোমায় শুধু এই কথাই বলতে চাই—আমি যে শাস্তি পেয়েছি, জীবনভোর যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি—তার বিন্দুতম আভাসও ওরা যেন টের না পায়। ওরা বড় হোক, ওদের যুগল জীবন সমস্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক—আর তাকে সমস্ত সার্থকতার আনন্দে নিজের কাছে তুমি টেনে নেবে এ আমার অনুরোধ।

ভবতোষ, জীবনের মধুর লগনে যে বঞ্চনার সৃষ্টি হয়েছিল—তাতে আমার চাইতেও তোমার দোষ সর্বাংশে অধিক ছিল! কারণ আমি তোমায় শুধুই অকপটে বিশ্বাস করেছিলাম, আর তুমি ভালবাসার সেই সুযোগে সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছিলে।

এ চিঠি লিখতে বসে অনেক কথা মনে পড়ছে। কত সুখ কত পরিকল্পনা। আর সেই সব দিনের প্রবঞ্চনাময় স্মৃতির কথা, তোমায় কিভাবে জানাব!—তোমার সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয় তাহলে কতখানি নিষ্ঠুরের ভূমিকা আমি নেব—এদানীং এটাও আমার পরিকল্পনার অন্তর্গত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তোমায় আমি সেদিন সামনা-সামনি দেখলাম—তোমার সেই মুখ সেই সকরুণ মিনতি সব আমার ভুল হয়ে গেল! বুঝতে পারছি ভালবাসা থাকলে কখনও কঠিন হওয়া যায় না।

কিন্তু কি অবাক কান্ড, খুকুর মুখের দিকে সেদিন ওভাবে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকেও ওকে চিনতে পারলে না? কোন কথা মনে হয়নি তোমার? নাকি, কোন কথা মনে করতেই চাও না। তুমি আজ অনেক বড় হয়েছ, সমাজে তোমার অনেক উঁচুতে স্থান। সেখানকার নাগাল পাওয়া আমার আর খুকুর চিরদিনের সাধ্যের বাইরে—তাই মনের মধ্যে যদি কোন কথা আসেও—তাকে এমনি জোর করে চেপে রাখতে চাও? কোনটা সত্যি?

সেদিনের কথা মনে পড়ে? আকাশে ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদ ছিল। আমাদের ছোট ছাদটায় কটা বেল আর হাসনুহানার ফুল ফুটেছিল, তোমার চোখেও কিছু জলের আভাস দেখেছিলাম—তুমি আমার হাত ধরে বলেছিলে—এমন দিন কবে আসবে, যেদিন মা বাবা আর সমাজ বলে জিনিসটা উঠে যাবে।

না ভবতোষ। ভয় নেই, তোমায় আমি ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছি না! তোমার কাছে চিঠি লেখার আদ্যোপান্ত সবটুকুই আমার খুকুর জন্য। সেদিন তোমায় আমি যে কথা বলেছি সে কথা তোমায় বিস্মৃত হতে হবে। কারণ সে-কথা দেবার মালিক আমি নই। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ে যারা বাঁধা পড়েছে—সমস্ত কথা দেবার মালিক তারা। ওদের দেখেই আমি শিখেছি—প্রেম ভিক্ষে করে পাবার জিনিস নয়, দয়া করে ফেরৎ দেবারও নয়।

অবিশ্যি তুমি নও অনুরোধ তোমার স্ত্রীর। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া অভিজাত ঘরের মেয়ে। বামুন-কায়েতের অব্যবস্থাটা এখনও তেমন মানিয়ে নিতে পারেন না। আমি জানি বামুন-কায়েত নয়—আসল গলদ রজতমুদ্রার অন্তরালে।

কিন্তু ও কথা বোধ হয় অসীমও মানবে না। আমি তাকে দেখেছি এবং বিশ্বাস করেছি প্রত্যেকটি বস্তু দিয়ে। দেখেছি গভীর আশ্বাসে সে সমস্ত দিক দিয়ে উপযুক্ত। উপযুক্ত না হলে খুকুর সঙ্গে মিশতে দিতে তাকে প্ররোচিত করতাম না। অসীম আমায় বলছে—ভালবেসেছি একথা বলতে লজ্জা নেই, আর ভাল যখন বেসেছি তখন মামার অনুমতি না নিয়েই বেসেছি। এরপর তিনি যদি আমায় ছেড়ে দেন—নিরুপায়।

অসীম তোমার ছেলে নয়। কিন্তু পুরুষ হিসেবে সে সার্থক। যাই হোক আমি ওকে নিরস্ত করেছি। বলেছি,—তোমরা অপেক্ষা কর, প্রথম দিকে যে কথা ভেবে দেখনি, সে কথা একবার ভাল করে ভেবে দেখতে দাও। ফলাফলের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। তারও আগে তোমায় সমস্তটুকু আমার তরফ থেকে সবিশেষ জানান উচিত বলে মনে করি।

অসীমকে দেখেছি আমি প্রায় তিন বছর আগে। সেও এক বিচিত্র কান্ড। ধরতে গেলে একটি বড়দরের গল্পও বলা চলে এবং এতক্ষণ যা বলে গেলাম—সে মাত্র তার আখ্যান ভাগটুকু।

কলকাতায় বাসা। আমি প্রায় দশ

বছর হল ছেড়েছি। ধবুলিয়ার এই গ্রাম প্রান্তের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশটি আমার দগ্ধপ্রায় মনকে কিছু শীতল করতে সহায়তা করতো। যাই হোক—এখানেই একবার অসীমরা ওর কয়েকজন বন্ধু নিয়ে চড়িভাতি করতে এসেছিল। এসে উঠেছিল আমাদের পাশের এ্যাডভোকেট তারিণীবাবুর ছেলের সংগে ওদের বাগানবাড়ীতে। সেদিন রবিবার ছিল—খুকুও ওর হোস্টেল থেকে এখানে এসেছিল। আমি ওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সেদিন। সপ্তাহে মাত্র দুটো দিনের জন্য আসে। সে দুটো দিন ওর জন্য আমাকে সব দিক দিয়েই নিয়োজিত রাখতে হয়। আমরা দুজনেই রান্নাঘরে আছি, হঠাৎ আমাদের পিছনের বাগানের দিকে মানুষ আসার শব্দ হতে দেখলাম—বাগানের খিড়কির দরজা দিয়ে কয়েকটি ছেলে ঢুকছে। তারিণীবাবুর ছেলেকে চিনতাম। জানতে চাইলাম—কি হয়েছে?

বললো—বিভ্রাট হয়েছে মাসীমা। কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এসেছি। এসে দেখছি আসল জিনিস নেই। সব আছে শুধু জলের অভাব। পুকুরের ব্যবস্থা তো ওখান থেকে অনেক দূর। যায় কে?

বলতে ভুলে গেছি, তারিণীবাবু এখানে থাকতেন না, ও'রা কলকাতার বাসিন্দা। মাঝে-মধ্যে ছুটি-ছাটায় কখনও সখনও আসতেন। বললাম—পাতকুয়ো কি হল?

—গোলমাল তো সেইখানেই, এবার কথা বললো অন্য একটি ছেলে। বললো—মালী চোখের সামনে জল তুললো,—জলের সংগে একজোড়া মরা সাপ। তারপর খাওয়া কি উচিত হবে ও জল?

তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটির দিকে। সুন্দর মার্জিত সম্ভ্রান্ত। ওদের আমি আমার পাতকুয়োর জল এবং আরও যদি কিছুর প্রয়োজন হয় নিতে বলে দিলাম।

অতি সামান্য থেকে অসামান্যর সূত্রপাত যে কোথা দিয়ে কোথায় ঘটে এক এক সময় আমি নিজেও যেন ঠিক ভেবে পাইনে। নয়তো সেদিনের কথাই সবটা শোন, আমি ছেলেটির সংগে কথা বলছি—ইতিমধ্যে খুকু বাইরে বেড়িয়ে এল। আমাদের কথা শুনেই এসেছিল, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খুকুকে দেখেই ছেলেটি বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—আপনি?

খুকু বিব্রত হয়েছিল। একটু হেসে জবাব দিল—এটাই আমার বাড়ী, কলকাতায় আমি হোস্টেলে থাকি।

স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমি কৌতূহলী হলাম। দু-একটি কথা-প্রসংগে ছেলেটি নিজেই বললো—কলেজ যাতায়াতের পথে, গোলদিঘির ফুটপাতে কিম্বা ট্রামে-বাসে অনেকদিন অনেকবার দেখেছি। যাই হোক, এক জায়গার অপরিচিত মানুষ আর এক জায়গায় এলে পরিচিত না হয়ে পারে না। আমাদের চড়িভাতিতে আপনারা যোগ দিন।

সেই কাগজের পাতায় একটা ছবি দেখিয়ে বললো—মা, অসীমবাবুকে তোমার মনে আছে। যে ভদ্রলোক পিক্‌নিকে এসেছিলেন, আলাপ হয়েছিল।

ভুলে যাবার মত কথা নয়। বললাম—কেন?

খুকু ছবিটি দেখিয়ে বললো—তিনি এ'র ভাগ্নে।

খুকুকে দেখেই ছেলেটি বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—আপনি?

খুকু আমার দিকে চাইলো। বললাম—জলের ভাড়া?

বললো—মাসীমাকে ভাড়া দিতে বাধবে তার চাইতে আমাদের দেখাশোনা তম্বির-তদারকের ভার তাঁর উপর তুলে দিতে পারলে নিশ্চিত হতে পারি।

শুনলাম ছেলেটির নাম অসীম। কলকাতার বাসিন্দা। আর ধনী মানুষের সন্তান যে—সেটা ওর অভিজাত রুচিশীলতার সবটুকুই আচার-ব্যবহারের মধ্যে পরিস্ফুট ছিল, ওর কথা আমি ভুলতে পারি নি।

এর কিছুদিন পর, —কতদিন পর ঠিক মনে নেই, একদিন খুকু ছুটিতে বাড়ী ছিল। খবরের কাগজ পড়ছিল।

ছবিতে তোমায় প্রায় দেখি। খুকুর নির্দেশে আবার নতুন করে দেখলাম। ছবিটি কোন এক জনসভার বক্তৃতার। তোমার গলায় লম্বমান চাদর, পায়ে সাদা নাগরাই, সামনে অগণিত মুগ্ধ শ্রোতা। আগামী ইলেকসনে তুমি দাঁড়াতে পারলে তাদের কতখানি সুযোগ সুবিধে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে পারবে—মুখে তোমার তারই শ্লোগান।

আমি তোমায় আবার নতুন করে দেখলাম। সেই সংগে আমাকেও দেখলাম। তুমি অনেক বড় হয়েছ ভবতোষ। ধন মান প্রতিপত্তি। আর আমি—ভালবাসার মূল্য জীবনের বিনিময়ে দিতে হল। আমার আকাঙ্ক্ষা তো বেশী ছিল

না, তাই তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম, তোমার উপরে আমার সবটুকু সমর্পণ করে নিঃশেষে ভালবেসে আজ হৃত-সর্বস্ব হয়ে দেউলের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে। আর তুমি? যতদিন তোমায় পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল—যা পাবার ছলনায় মিথ্যে মা-বাপ আর সামাজিকতার দোহাই পেড়ে নাকে কেঁদেছিলে—তার সবটুকুই পেয়েছ।

ভবতোষ। বোকা ছাড়া কি কেউ ভালবাসে? ভালবেসে যারা রিক্ত হয়ে যায়, চোখের জল, ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গতা, দুটো ফাঁকিবাজীর বুলি, আর অতীত স্মৃতির জাবর কাটা যারা স্বইচ্ছায় বেছে নেয়—তোমাদের কাছে তারা চির-দিনের হাস্যাস্পদ। তুমি জেনেশুনে তাদের দলে যেতে পার?

তুমি যে দলে যাবার সেই অতি বুদ্ধিমানের দলে গিয়েই ভিড়েছিলে। তোমার ছবি আমি বার বার দেখলাম। অনেকবার। দেখে কি মনে হয়েছিল জান, মনে হয়েছিল তোমার ঐ ঝোলান চাদরের ফাঁসটাই আষ্টেপৃষ্ঠে তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। মানুষকে চিরদিন ধরে মিথ্যে ফাঁকির কথা আর কাঁহাতক কত শোনাবে।

খুকু ধরেছিল। বলেছিলো—মা তুমি কাঁপছো কেন? তোমার চোখমুখ লাল, শুকনো।

বললাম—অসীমের সঙ্গে তোর দেখা হয়? আলাপ হয়েছে?

মুখ নামালো খুকু। সারা কপোল-খানি আরক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের দুটি পাতা আবেশে নত। এ দৃশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। বললাম—আসচে সপ্তায় যে করে পারিস অসীমকে এখানে আনিস।

সত্যিকে অস্বীকার করে লাভ নেই। সেদিন তোমায় বড্ড বেশী করে মনে পড়েছিল। সেই গভীর ঘৃণা আর নিঃশেষে ভালবাসার সেই তুমি—সেদিন আবার যেন নতুন করে আমার শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতে রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল। মনে পড়ল পিছনে ফেলে আসা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বের কথা। মালতীর বিয়ে উৎসবে সেদিন তোমার সঙ্গে আমার নতুন করে পরিচয় হল। মালতীর তুমি দাদা, আর বাড়ীর এক-মাত্র ছেলে হবার জন্যে বিয়ের অনেক-খানি দায়-ঝক্কিটা তোমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। বিয়ের আসরে ব্যতিব্যস্ত তুমি চারিদিকে নানান কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কর্মকর্তার ভূমিকাটি তোমায় সেদিন মানিয়েছিল চমৎকার। সন্ধ্যের একটু আগে তোমাদের বাড়ী গিয়ে-ছিলাম আমি। দেখি তোমার অবস্থা গলদঘর্ম। চোখেমুখে ঘাম, কপালে ঘামের সারি। কোমরে জড়ান কোঁচার খুঁট। আমায় দেখে তুমি থমকে দাঁড়িয়েছিলে। দু চোখে তোমার অনাবিল বিস্ময়। যেন সেই নতুন দেখছো আমায়। শেষ অবধি কিছু একটা কাজের ছুতো করে বললে—বোনের বিয়েতে আধমরা হবার যোগাড় হলে নিজের বিয়েতে কি হবে বলতে পার?

বললাম—না।

তোমার দিকে আমিও চেয়েছিলাম। কি দেখেছিলে আমার চোখে কে জানে। জিজ্ঞাসা করলে—এত দেরী হল আসতে?

—বন্ধুর বিয়ে বলে কি ভোর থেকে এসে বসে থাকবো?

—এলেই বা ক্ষতি কি? তুমি বলে-ছিলে। বলেছিলে—তোমায় আজ মস্ত বড় দেখাচ্ছে। যেন নতুন দেখছি তোমায়। আর—

আর বলে কথাটার শেষ তুমি করতে পারনি। কিন্তু তোমার চোখ-মুখের মুগ্ধ ভাষায় ফুটে উঠেছিল—আর কি।

বললাম—কি।

—ভারী চমৎকার লাগছে। খুব সুন্দর।

সুন্দর বলার আর সুন্দর শোনার একটা সময় আসে জীবনে। সেই সময় সেই মোহ সেদিন আমার চোখে মনে অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। যে ভবতোষকে আমি বহুবার দেখেছি। বান্ধবী মালতীর দাদা বলে জেনেছি, অনেক কথা বলেছি—সেদিন তাকে আমিও যেন নতুন করে আবি-ষ্কার করলাম।

তুমি সেদিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলে কিন্তু বলতে পারনি। শুধু অসংখ্য কাজের ছলে আর ছুতোয় বার বার মুখের দিকে তাকিয়েছিলে, এটা কি ওটা নেবার ছলনায় হয়তো আঙুলে আঙুলে ঈষৎ ছোঁয়াছুঁয়ি। সন্ধ্যের লগ্নে যখন বর আর বরযাত্রীর ভিড়ে সারা বাড়ী সরগরম। ফুল গোলাপজল আর আতরের ছড়াছড়িতে বিবাহ উৎসব আসন্ন মিলনে সজ্জিত হচ্ছে—সেই সময় সকলের অলক্ষিতে তুমি একছড়া যুঁইয়ের মালা আমার গলায় জড়িয়ে দিয়েছিলে—বেণীতে লাগিয়ে দাও।

তোমার ব্যবহার সেদিন কিছু বুঝতে পারিনি। ভাবার মত ক্ষমতাও ছিল না, শুধু বিচিত্র একটা ভয় অথচ অনাস্বাদিত একটি রোমাঞ্চ আমায় শিথিল করেছিল। অবশ করেছিল। সেই অবস্থায় আমি সারা বিবাহ-সন্ধ্যাটা কাটিয়েছিলাম, কেন জানি নে—সেদিন কোন কিছুতে যেন মন ছিল না। যা কিছু দেখছি শুনছি সবটাই যেন অপ-রূপ। কোন যাদুকরের কোন মায়া-কাটির সংস্পর্শে ঐ বোধ আমার জাগলো—আমি যেন কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারছিলাম না।

এরপরও রাতে বাড়ী ফেরার পালা। ফেরার পথে তুমি সঙ্গী ছিলে। ফিরতে রাত হয়েছিল বেশ। বাসরঘরে মালতীকে পৌঁছে না দেওয়া অবধি ছুটি ছিল না। তা ছাড়া তুমি নিজেও বলে পাঠিয়ে-ছিলে—ব্যস্ত হবার কিছু নেই। রাতে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার আমার।

না, ব্যস্ত হইনি। যাই হোক—বেশ ভারী রাতে তোমার অবসর মিললো। দেখলাম সারাদিনের খাটা-খাটুনীর চিহ্ন তখন তোমার শরীরে কোথাও নেই। বোধহয় সেই তখন মাত্র স্নান করেছ। সমস্ত চুলগুলো ভিজে। ধুতি পাঞ্জাবির পাট সেই সদ্য ভাঙ্গা। নিচে নেমে বললে—গাড়ী করে যদি যেতে চাও
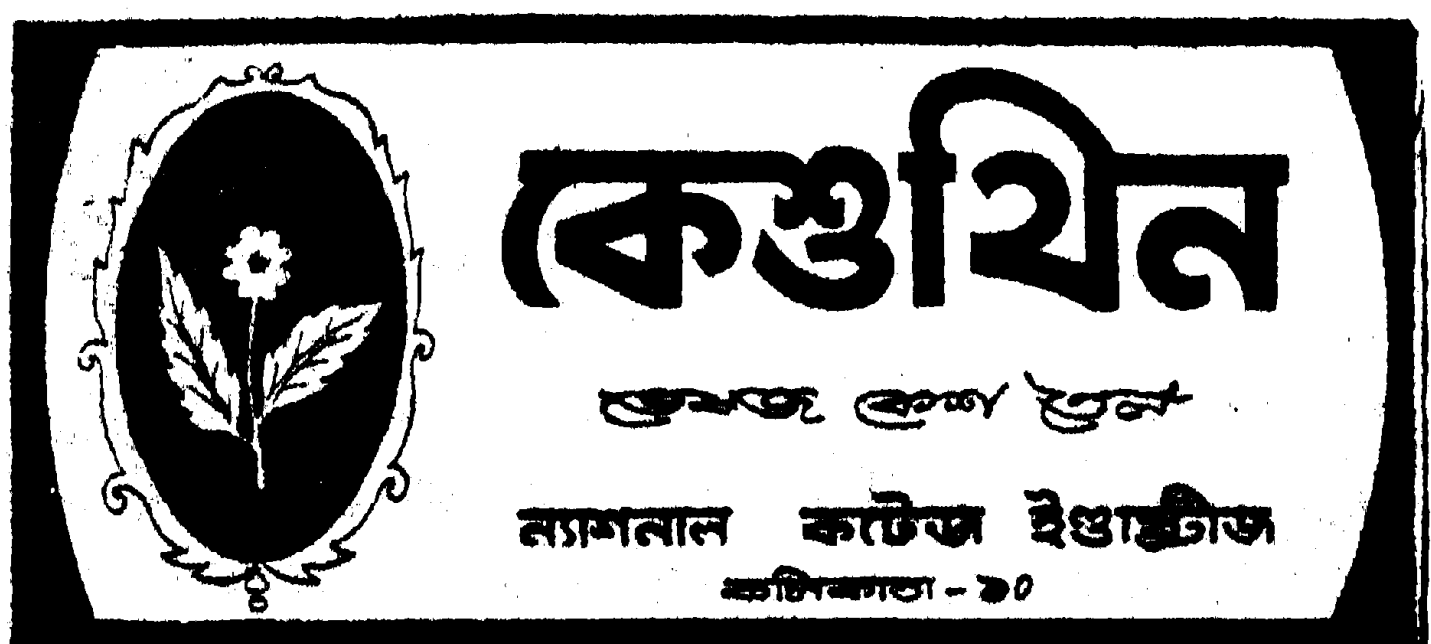
তাহলে এখনও একটু অপেক্ষা করতে হবে। কোন এক আত্মীয়-বাড়ী গাড়ী গেছে পৌঁছে দিতে। আর যদি হেঁটে যেতে চাও—

তোমার আমার বাড়ীর দূরত্ব এমন কিছু নয়। সামান্য দু একটা রাস্তার ব্যবধান। বললাম—গাড়ী থাক, হেঁটেই যাব।

রাস্তায় নেমে তুমি নীরবে পাশাপাশি হেঁটেছিলে। বাড়ীর কাছ বরাবর আসতে বললে—এখুনি আমরা পৌঁছে যাব।

আমি কথা বলিনি। বাড়ীর কাছের গলির পথটা কিছু এবড়ো-থেবড়ো খোয়া ওঠা ছিল। চলতে গিয়ে একসময় আমি হোঁচট খেতেই হাতখানা তুমি ধরে ফেললে—গাড়ীতে না এসে খুব ভুল হল দেখছি।

অল্প অল্প গ্যাসের আলোয় সমস্ত পথ যেন মায়াময় হয়ে উঠেছে। ধারে কাছে কোন মানুষ নেই! বিচিত্র একটি ভয়ের সংগে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আমায় অবশ করে তুলেছিল। আমি সেবারও কথা বলতে পারিনি। তুমি বললে—মালতী চলে যাচ্ছে বলে কি তুমি আমাদের বাড়ী যাওয়া ছাড়বে?

বললাম—তবে?

বললে—তাহলে পর্বতই মহম্মদের কাছে যাবে।

বলে তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলে। তোমার চোখে স্তব্ধ সপ্রেম মুগ্ধ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির আবেশ-বিহ্বলতার মাঝে আমার সর্বনাশের গোড়া পত্তন শুরু হয়ে গেল।

ভবতোষ। এ যা বললাম,—মাত্র একটি দিনের ঘটনা। তারপর তুমি অনেক এসেছ। মালতী ছিল না বলে কোন বাধা আমাদের মধ্যে আসেনি। বাড়ী তো ছিলই—তা ছাড়া স্কুলে পড়তে যেতাম আমি, ছুটির সময় গেটের মুখে অপেক্ষা করতে তুমি। যদিও আমি খুব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে ছিলাম, তবু তোমার সংগে আমার তখনকার দিনেও মেলামেশায় কোন বাধা আসেনি, কারণ তোমার বিত্তশালী পিতার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থেকে সামাজিক প্রতিপত্তির দৌড় অনেকদূর অবধি ছিল।

আর ছিল বলেই আমার মা বাবার তরফ থেকে মনের মধ্যে আমার গুঞ্জন যতখানি ছিল ঠিক ততখানিই খেলা-খেলা ছিল তোমার মধ্যে। কারণ অর্থের সংগে প্রেমের দাঁড়িপাল্লা একসংগে চাপালে প্রেমের ঝুঁকি চিরদিন নিচের দিকেই হবে। তাই মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি—তোমার প্রেমের নাকে-কাঁদুনী শুনতে শুনতে ভবতোষ-ঘরণী নয় জগদীশ হাজরার ঘর আলো করতে চলে আসতে হল আমায়।

সে সংবাদ শুনতে পেয়ে তুমি অনেক কেঁদেছিলে। কথায় কথায় তোমার চোখে বড় জল আসতো। আশ্চর্য ফর্সা মুখখানা, ভিতরের বিক্ষোভে নাকের কাছটা কি অদ্ভুত লাল হয়ে উঠতো!

এগুলো অবশ্যি সব পরের দৃশ্য! বিয়ের সমস্ত কথা তোমার কাছে জানাতে তোমার উৎসাহিত মন গুম খেয়ে গিয়েছিল। তুমি অনেকক্ষণ বসে মাথার মধ্যে প্ল্যান খেলিয়েছিলে। বলেছিলে—ভয় পেও না, এর বিহিত একটা করবোই।

বলেছিলাম—যা কিছু করার একটু তাড়াতাড়ি কর। নয়তো এর চাইতে দেরী করলে হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া থেকে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

তুমি কঠিন গলায় প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে—ভবতোষ মুখুজ্জে বেঁচে থাকতে কোন ভয় নেই তোমার।

তারপর তোমায় আমায় অনেক সলাপরামর্শ চললো। দেখাশুনা এদানীং বন্ধ হয়েছিল। শুধু এ বাড়ী ও বাড়ীর মধ্যে চিঠি চাপাটি ছোঁড়া-ছুঁড়ি হত। দৌত্য কার্যের ভার নিয়েছিল ছোট বোনটা।

তুমি আমায় জানালে—নির্ভয়ে থাক, আপাতত বন্দোবস্ত করার মত কোন উপায় ঠাওরাতে না পেরে পালিয়ে যাবার প্ল্যানই সাব্যস্ত করা হল। বিয়ের রাতে সন্ধ্যের ঝোঁকে তুমি পিছন দিকের বাগানে কলাগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে—আমি দূরে থেকে বাঁশী বাজিয়ে সংকেত দিলেই তুমি রওনা দেবে।

অর্থাৎ আধুনিক যুগে একেবারে খাঁটি বৃন্দাবন লীলা। এর সংগে আরও অনেক আভাস জানিয়েছিলে তুমি। বলেছিলে—পালিয়ে যাবার ব্যবস্থাটা বেশীদিনের জন্য নয়। সামান্য কিছুদিন এদিক ওদিক বেড়াব। এদেশ ওদেশ যাব—। তারপর, বাবার মন বুঝে একদিন ও'র সামনে হাজিরা দিলেই হবে। মায়ের মন তো বরফের মত গলানোই আছে—বাধা যেখানে যা—ঐ বুড়ো বাবা।

যাই হোক, ব্যবস্থা অনুসারে কাজ এগিয়ে চললো। আমাদের বাড়ীতে বিয়ের আয়োজন চলে—শাড়ী গহনা দানসামগ্রী কি লোক খাওয়ানোর আটা-ময়দার যোগাড়—যা কিছু হয়—তাই আমি দু'চোখ ভরে দেখি আর মনে মনে হাসি! এ'রা কি বোকা! কষ্ট করে
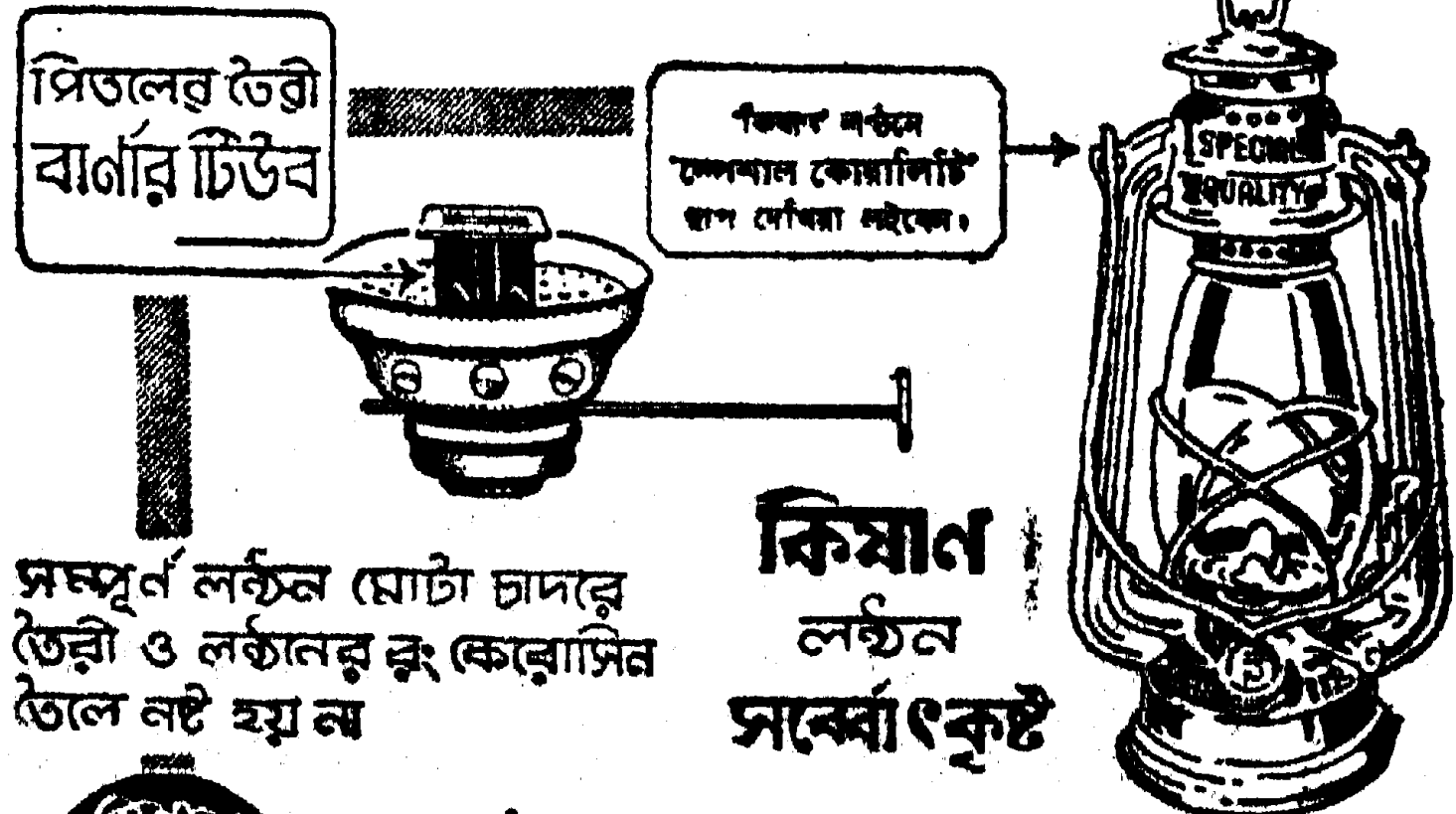
পয়সা খরচ করে কি পণ্ডশ্রমই না করছে। বেচারা।

এরপর বিয়ের দিন। সারাদিন দুরু দুরু বুকে কি হবে কি করবো করে সারা সকাল বিকেল কাটিয়ে নির্দিষ্ট সময়মত আমি বাগানের কলাগাছগুলোর কাছে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। এক একটি মুহূর্ত যায় আর মনে হয় বুঝি এক একটা যুগ অতিক্রম করে এলুম। কিন্তু হায় কপাল, আমার প্রতীক্ষা আর মশার কামড় খাওয়া দুই সার হল—তুমি এলে না।

এদিকে বাড়ীতে হৈ চৈ চিৎকার! কাকা আমায় কলাতলা থেকে উদ্ধার করলেন, বললেন—আর লোক হাসাসনি পোড়ারমুখী, এখন ভালয় ভালয় চারটে হাত এক করতে দে।

হয়ে গেল চার হাত এক! আর আমি সেই ভাবেই অনেক ঘাটের জল এক ঘাটে করে জগদীশের ঘর করতেই চলে এলাম।

প্রথমে কাঁদিনি। শেষকালে কান্নার শুরু হল। জগদীশের সাহচর্য আমায় অক্টোপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যন্ত্রণা দিতে লাগলো। খালি মনে হ'ত ওর কথাবার্তা স্নেহ ভালবাসা স্বটুকুই ন্যাকামী আর নিতান্তই জোলো।

আর এই কথাটি যত মনে হ'ত সে মানুষটাকে তত ঘৃণা করতে ইচ্ছে করতো। সব কাজে তার সঙ্গে তোমায় তুলনা করতে চেয়েছি! কোথাও এক হয়নি। কোথাও যেন তোমার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। তুমি যদি চাঁদের আলোর দিক হও, সে নিতান্ত অন্ধকার। সে সময় তোমার কাছে বার বার ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। সে সময় কোনদিনও তোমায় দোষ দিতে পারিনি।

কিন্তু এই অবধি যতটুকু যা হল তার সবটাই বাইরের ব্যাপার। সর্বনাশ ঘটলো অফিসের কাজ নিয়ে খুকুর বাবা নাগপুরে চলে যাবার পর। আমি তখন বাপের বাড়ী। প্রায় ছ' মাস বিয়ে হয়েছে তখন, অথচ বিরূপ মন এতটুকু প্রসন্ন হয়নি জগদীশের উপর—ঠিক সেই অবস্থায় একদিন তুমি ওখানে এলে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। তুমি সময় বুঝেই এসেছিলে—সেদিন আমার মা বাবা ভাই বোন সবাই মামাবাড়ী গিয়েছিল বিয়ে উপলক্ষে—আমি ছাড়া।

এখনো আসল দাঁতই তোলা হয়নি
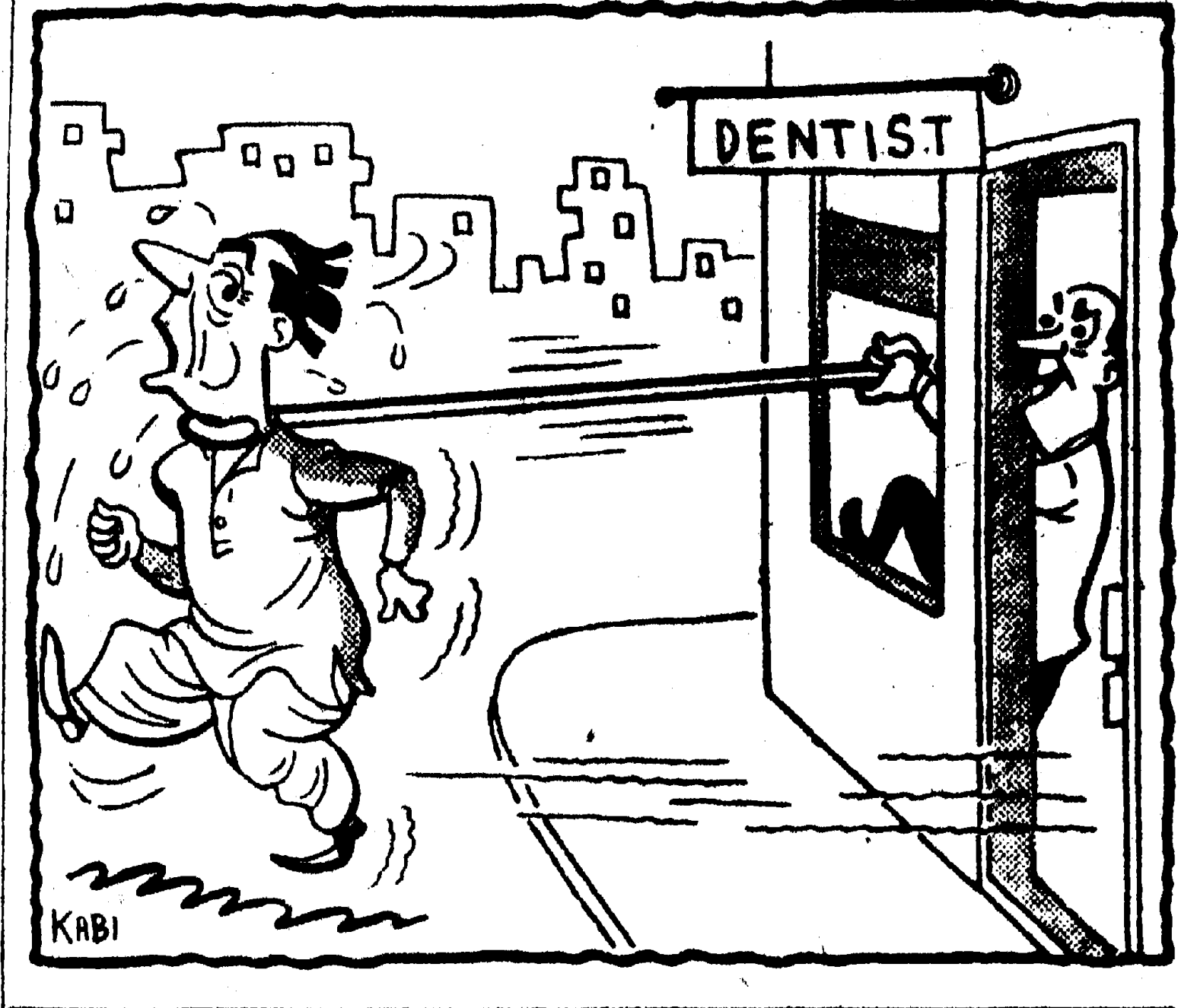
ভবতোষ, মানুষ বড় দুর্বল, মানুষ বড় অসহায়। আর সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যে মানুষ নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি আর কাজ হাসিল করে বেড়ায়—তার সঙ্গে পশুর সঙ্গে কতখানি পার্থক্য আছে সেদিন না বুঝলেও তারপর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম।

তারপর থেকে নিজের পাপ দেখেছি, আর তার ফল দেখে শিউরে উঠেছি। একদিকে বিশ্বাসী একটি মানুষ, তার প্রেম তার শ্রদ্ধা, অপরদিকে আকণ্ঠডোবান পাপ। এরপর থেকে নিজের কথা যত চিন্তা করতুম—নিজেকে নিজেই তত মুছে ফেলতে চেয়েছি। আমি ভেবেছি—এ আমি কি করেছি, পাপ নিয়ে কতদিন চলবে! এর পরিণতি কোথায়! যতবার মাথা তুলতে গিয়েছি, মেরুদন্ডভাঙ্গা প্রাণীর মত ততবার মুখ থুবড়ে পড়েছি। সে যে কি শোচনীয় আত্মপীড়ন—সে কথা তোমায় লিখে জানাতে পারবো না।

একদিন উনি এক মানসিক রোগের চিকিৎসক এনেছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বললেন—আপনি কিছু গোপন করছেন। আপনার মধ্যে কোথাও অন্যায়বোধ আছে।

ডাক্তারের সামনে থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।

তারপর থেকে আমার নিজের মনের কাছে অজ্ঞাতবাসের শুরু। উনি একদিন বলেছিলেন—নলিন, কি হয়েছে তোমার বল তো, কি হয়েছে?

—কি আবার হবে? কোথায় কি?

—হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। তুমি আমার কাছ থেকে আজকাল দূরে সরে যেতে চাইছো। কেন?

ও'কে বলতে পারিনি—আমি দূরে যাইনি, বরং যতখানি কাছে যাবার কথা, তার চাইতে আরও বেশী কাছে যেতে চাই। বলতে চাই তুমি ছাড়া আমার কোথাও আশ্রয় নেই অবলম্বন নেই। তোমার নির্ভরশীল বাহুদুটিই আমার একমাত্র স্থান।

কিন্তু সেখানে যাব কি করে। নিজের হাতে যেখানে প্রাচীর তুলেছি—সেখানে যাবার রাস্তা যে অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়েছে।

খুকু হল। না বাপের মত না মায়ের মত। অপূর্ব সুন্দর ননীর পুতুলের মত নবনীত চেহারা। ভেতরের দাহ আমার আরও বেড়েছিল। আমাদের পুরোন ঝি-টা একদিন বলেছিল—আচ্ছা মেয়ে হয়েছে বাপু। মা বাপ ছাড়া—

উনি খুকুকে নিয়ে খেলা করছিলেন। বললেন—না না, সেকি কথা,—তা কখনও হয়। মা বাপেরই সন্তান মা বাপের মতই হয়েছে। দেখ, খুকু আমার' ওর মায়ের মতই হবে।

আমি সামনে থেকে পালিয়ে এসেছিলুম। এত মিথ্যে নিয়ে জীবন

শুরু হলে এর ফল কোথায় গিয়ে ঠেকবে।

একদিন কথায় কথায় বলতে চেষ্টা করেছিলুম। বলেছিলাম—আচ্ছা, মনে কর, আমি যদি কখনও অবিশ্বাসের কাজ করি। করতেও তো পারি। মেয়ে-ছেলে হয়ে জন্মেছি, বিশ্বাস কি!

—তুমি অবিশ্বাসী হবে! কি আশ্চর্য!

হেসেই অস্থির। মানুষটা একদিনের জন্যও যদি অবিশ্বাস করতেন, মনের দিক থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতাম। তাও হয়নি। এরপর, খুকুর যখন পাঁচ বছর বয়েস—আমার ঘর তখন আলাদা করে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম—মেয়ে বড় হচ্ছে।

সেই যে নিজের হাতে ভাঙতে শুরু করলুম, কোনদিন আর জোড়া লাগেনি।

থাক—এ আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত কথা। তোমায় শুনিয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া যে সারা জীবন তিলে তিলে নিজের সব কিছু নষ্ট করে দিল, একটি প্রেম-মাধুর্যময় সংসারকে পরিপূর্ণ হতে না দিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'তে সহায়তা করলো, আজ সেই বহু পুরোন দিনের কাসুন্দী ঘেঁটে কোন লাভ আছে কি?

তবে অসীমকে যেদিন দেখলাম সেদিন আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। ভিতরের বহুদিনের চেপে রাখা জ্বালাটা যেন শতধা হয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। অসীমকে দেখে মনে হয়েছিল যেন তোমাকেই হাতে পেলাম। মনে হয়েছিল এত বড় সুযোগ হাত-ছাড়া করলে বোকামী করা হবে। আমার চোখের জল অনেক ঝরেছে, তোমার মেরুদণ্ড এবার ভাই দিয়ে কিছু ভাঙা দরকার।

অসীমকে জিজ্ঞাসা করলাম—ভবতোষ মুখুজ্জে তোমার কে হন?

বলেছিল—মামা। কেন চেনেন নাকি?

—স্বনামধন্য মানুষ। না চিনে উপায় কোথায়!

কথায় কথায় অনেক কথা জেনে-ছিলাম তোমার। বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছ। কলকাতার বুকে খান কয়েক বাড়ী, ব্যাঙ্কেও বেশ টাকা। কাগজে কাগজে ফলাও নাম। বিত্তবৈভব আর সামাজিকতা থাকলে মানুষ যতখানি যোগ্য মানুষ হয়—তোমার তার সবটুকু তো আছেই বরং কিছু বেশীই আছে। তবে একটা বিষয়ে দুঃখ যে সন্তান হয়নি তোমার, বোনের ছেলেকে দত্তক নিয়েছ।

সমস্তটুকু শুনে আমি আবার পুরোন দিনে চলে গিয়েছিলাম। আমার সুখ স্বপ্ন সাধ—আমার কতদিনের কত রঙিন কল্পনা—পূর্ণ যদি নাই করতে পারবে ওভাবে কেন তুমি সামনে এসেছিলে, মোহের জাল খুলে ধরেছিলে?

একটা তীব্র জ্বালায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মনে হয়নি জীবনের এই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ ভাবে উচিত অনুচিতের সব বোধ হারিয়ে ফেলা।

আমি ওদের প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। অসীমকে বলেছিলাম—তুমি এখানে আসবে বাবা, যখন খুশি। রবিবার রবিবার আসতে পার। খুকু এখানে থাকে।

ছেলেটি মুখ নিচু করে হেসেছিল। বলেছিলো—আপনাদের গ্রামখানা খুব সুন্দর। শহরে থেকে যেভাবে গাড়ী ঘোড়া আর লোকজনের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠতে হয়—তাতে এখানে এসে জিরিয়ে গেলে মন্দও হয় না।

এখানে তো আসতোই, কলকাতা-তেও ওরা পরস্পর মেলামেশা করতো। করতে বলেছি আমি। প্রশ্রয় দিয়েছি। এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, নিজের হাতে খুকুকে সাজিয়েছি।

মনের মধ্যে বিদ্বেষ যেন সাপের মত ছোবল মারতো। আমি জানতাম এই ভাবে কিছুদিন চালাতে পারলেই আসল জায়গায় টান পড়বে। বঁড়শি গেঁথে যেমন মাছকে জলে খেলায়—অসীমকে নিজের জালে জড়িয়ে ফেলে তোমাকেও তেমনি জলের প্রাণীকে ডাঙায় তোলার উদ্দেশ্য ছিল।

আর সেই খেলায় আমি এত উন্মত্ত ছিলাম যে ওদের কথা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি কখনও নিজের ছাড়া ওদের হৃদয়বৃত্তির চর্চা করতে বসিনি। কখনও ভাবিনি, ওরা অল্পবয়সী দুটি ছেলে আর মেয়ে। চিরদিন চিরকালের রহস্যময় দুটি সত্তা। ওদের নীরব চাওয়া, দুটি একটি কথা বলা কি না বলা, একদিনের একটুখানি না দেখার সম্ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করা—কখনও আমার মনে আসেনি।

আমি জানতাম তুমি আসবে। এলেও। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে এমন কিছু বেগ পেতে হয়নি। তুমি এসেছ। মাথা নিচু করে আমার কাছে ছেলেকে তোমার ভিক্ষে চেয়েছ। অবিশ্যি আমায় চিনতে পারনি। পারলে কি করতে আমি জানিনে। তবে দরজার আড়ালে আত্মগোপন করা আমার দেহটা তোমার নজরগত না হলেও তোমার সবটুকুই আমি দেখেছি। তোমার সেই জোড় হাত, আমার মেয়েকে বিয়ে দেবার অনুরোধ, এবং তার জন্য তোমার সাহায্যের হাত কি ভাবে এগিয়ে আসবে তার সবটুকু শুনতে হল। শুনতে হল তোমার কোন সমকক্ষদার বড়লোক মক্কেলের অতি বিদুষী কন্যা, পাণি-প্রার্থিনী হয়ে বসে আছে—তারই কাহিনী।

আমি তোমার কোন কথাই শুনিনি, শুধু তোমায় দেখছিলাম। যেদিন তোমায় ভালবেসেছিলাম, যার ছবি আমার মনে চিরদিন আঁকা ছিল—সে ভবতোষের সঙ্গে আজকের ভবতোষের কোথাও মিল নেই। তা ছাড়া মিথ্যে বিদ্বেষ পোষণ করে করবো কি—কতদিন বাঁচবো আমরা? তাই চিরদিন যা অজানা রইলো বাকি কটা দিনও তাই থাক। আমি স্বীকার করলাম—বললাম—তাই হবে।

কিন্তু নিজের স্বার্থ রক্ষা হবার জন্য কথা দিলেও সে কথা দেবার মালিক আমি ছিলাম না। যাদের দিয়ে আমি স্বার্থ উদ্ধার করেছি পিছন ফিরে দেখছি, তাদের জীবনের অনেকখানি গ্রন্থি এক হয়ে বেঁধে গিয়েছে।

আর সেই গ্রন্থি যদি আমি আজ নিজের হাতে ভাঙতে যাই, তাহলে একটি সত্তাকে দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত করতে হয়। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমার পেশা নয়।

অবিশ্যি অসীম আমায় কথা দিয়েছে!

ওকে আমি নিরস্ত করিয়েছি।

ভবতোষ, জীবনে আমি তোমার কাছে অনেক কিছু চাইতে পারতাম, কিন্তু চাইনি। নিজের জন্য কিছু নিতে আমার আত্মসম্মানে বড় বাধে। আজ এ চাওয়া শুধু এদের জন্য। তোমার কল্যাণী তোমার অসীম! ওদের দাম্পত্য-জীবন-বন্ধনে তুমি অগ্রণী হও। তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারে না।

প্রদর্শনী

কলারসিক

।। শিল্পী হাকু শাহর একক প্রদর্শনী ।।

থিয়েটার রোডের অশোকা আর্ট গ্যালারিতে গত ১৭ই অক্টোবর থেকে শিল্পী হাকু শাহর একটি একক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। শিল্পী শাহ গুজরাটের তরুণ শিল্পী। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে ইনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পী এন, এস, বেন্দ্রে তাঁর শিক্ষাগুরু। শিল্পী হাকু শাহর এই প্রথম একক প্রদর্শনীতে এমন কয়েকখানি চিত্র দেখা গেল যার মধ্যে বেন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই তরুণ শিল্পী যে অন্যের অনুকরণকারী নন, এ-কথাও বিনা দ্বিধায় বলা যায়। বরং তাঁর এই প্রদর্শনী দেখে সমকালীন অনেক প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীর কথা আমার মনে পড়েছে। এবং তাঁদের সঙ্গে শিল্পী হাকু শাহর আত্মিক মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।

শিল্পী শাহ-র এই প্রদর্শনীতে তৈলরঙে অঙ্কিত ১৬ খানি চিত্র ছাড়াও তৈল ও প্যাস্টেলের সংমিশ্রণে অঙ্কিত ২ খানি এবং জল-রঙে অঙ্কিত বেশ কয়েকখানি চিত্রও স্থান পেয়েছে। তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তুতে খুব বেশি নতুনত্ব নেই। আমাদের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের নর-নারীই মুখ্যতঃ তাঁর চিত্রে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুতে নতুনত্ব না থাকলেও তাঁর প্রকরণ-কলার মধ্যে পরিণত শিল্পী-মনের স্বাক্ষর বিদ্যমান। অনেকগুলি ছবি ইওরোপীয় ইম্পেস্টো পদ্ধতিতে অঙ্কিত এবং এ-গুলির জমিন সৃষ্টি এবং রঙ-প্রয়োগ পদ্ধতিতে শিল্পী শাহ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিছু চিত্রের মধ্যে স্থাপত্যরীতির ছাপও সুস্পষ্ট। চিত্রের জমিনকে চ্যাপটা রঙে বিভক্ত করে বিভিন্ন অংশে রঙে আর রেখার বৈপরীত্যে এক একটি বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বিভক্ত সব অংশগুলিই একসঙ্গে একটি চিত্রময় সুষমামণ্ডিত। তাঁর ইম্পেস্টো ধরণের চিত্রের মধ্যে 'জেলেনী' (১), কিশোর রাখাল (৮) মন্দ নয়। তেমনি স্থাপত্যরীতির চিত্রগুলির মধ্যে আমার ভাল লেগেছে 'প্রসাধন' (৯), 'দুটি ঘোড়া ও একটি বালক' (১৫) এবং 'ফল বিক্রেতা' (১৬) নামক চিত্রগুলি।

তৈল-রঙের জমিতে প্যাস্টেল প্রয়োগে মিশ্রপদ্ধতিতে যে দুইখানি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নিঃসন্দেহে তা প্রশংসারযোগ্য। মিশ্র-পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পী শাহ বেশ চমৎকারভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতেও তিনি এই পরীক্ষা আরো চালিয়ে যাবেন।

জল-রঙের কাজগুলি ছিল মিনিয়েচার ধরণের। এগুলিতে প্রধানতঃ স্থান পেয়েছে নারীর মুখমণ্ডল। তবে জল-রঙের কাজেও যে শ্রীশাহ দক্ষ তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এই তরুণ শিল্পীর কাজে আমরা যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির আভাস পেয়েছি।

শিল্প : হাকু শাহ

কিন্তু একটি বক্তব্য থেকেই যায়। ইদানীং প্রায় সমস্ত আধুনিক তরুণ শিল্পী নর-নারীর দেহাঙ্কনের সময় তাকে যেভাবে ভেঙে অঙ্কনের চেষ্টা করেন তার রূপ ও রীতি একই ধরণের হচ্ছে বলে আমার মনে একটু সন্দেহ জাগছে। অবয়ব ভাঙার এই পদ্ধতি কি এ-দেশের জল-মাটি থেকে উদ্ভূত, না এর উৎস অন্য কোথাও? আশা করি আধুনিক বিমূর্তধারার নামে একই রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগের একঘেয়েমী থেকে অতঃপর তরুণ শিল্পীরা নিজেদের মুক্ত রাখবেন। আমরা শিল্পী শাহ-কে অভিনন্দন জানাই। এই প্রদর্শনী আগামী ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকবে।

।। ত্রয়ী শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী ।।

পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী প্রণব মুখার্জী, নিমাই দাস ও অতীন মিত্রের একটি সম্মিলিত প্রদর্শনী গত ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত চলে শেষ হল। তিনজন শিল্পীই তরুণ। এঁরা কি শিল্প-বক্তব্য, কি আঙ্গিককলায় বিশেষ কোনো চমক না দিলেও মোটামুটি নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে প্রণব মুখার্জীর চিত্র সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। নানা নর-নারীর বর্ণনা-ধর্মী চিত্রের মধ্যেই ইনি এঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছেন। প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রগুলির মধ্যে 'গোলামের পরিবর্তন নেই' (৪) কিংবা 'জীবন ও জীবিকা' (৯) মন্দ নয়। তবে শিল্পী প্রণব মুখার্জীকে শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে এই বর্ণনাধর্মী চিত্ররূপকে অন্যতর চিত্র-রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। আশা করি শিল্পী মুখার্জী ভবিষ্যতে আমাদের আশা সফল করে তুলবেন।

শিল্পী নিমাই দাস শিশু-জগতের নানা ঘটনা তাঁর চিত্রে স্থান দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করার নানা উপাদান বিদ্যমান। যেমন 'শৈবতরুপ' (৩০) চিত্রে যে শিশু পড়ছে তার মনে সেই সময় খেলার ভাবনাও জেগেছে এমন এক ব্যঞ্জনাময় বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আঙ্গিক দক্ষতায় শিল্পী নিমাই দাস এখনও সাফল্য অর্জন না করলেও, তাঁর শিল্পী-মনের কল্পনা কিন্তু চিত্তাকর্ষক।

শিল্পী অতীন মিত্র এই ত্রয়ী শিল্পীর মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুঃসাহস রাখেন। আধুনিক শিল্প রীতি-পদ্ধতিতেই এঁর শিল্পী মানসের স্ফূর্তি। কিন্তু এখনও কোনো নিজস্ব ভঙ্গী করায়ত্ত নয়। শ্রীমিত্রের নিঃসর্গ চিত্রগুলি আমার ভাল লেগেছে।

আশা করি এই ত্রয়ী শিল্পীই তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিক্রম করে আমাদের উপহার দেবেন আরো সুন্দর চিত্রকলার সম্পদ। আমরা এই ত্রয়ী শিল্পীকে তাঁদের নিষ্ঠার জন্য সাধুবাদ জানাই।

দেশে বিদেশে

॥ রাষ্ট্রের আহ্বান ॥

সীমান্তের সংকট এবার চরম সীমায় পেশীছেছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লাদক অঞ্চলে প্রায় বারো হাজার বর্গমাইল ভারতীয় ভূমির উপর জবর-দখল কায়েম করে যুদ্ধবাদী চীন এবার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 'নেফা' অঞ্চলে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যেই ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে চীনা সৈন্যরা ভারতীয় এলাকায় কয়েকটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে, আর তার ফলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের কয়েক দফা বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। চীনা সৈনাদের আক্রমণে বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ভারতীয় সৈন্যদেরও পাল্টা আক্রমণে শতাধিক চীনা সৈন্য হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে এ এক অঘোষিত যুদ্ধ, যে-কোন রকম ভয়ংকর ও সর্বনাশা পরিণতির ঝুঁকি নিয়েই চীন আজ অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই জঙ্গীবাদী আচরণের কাছে নতিস্বীকার করার বা নরম হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ একমাত্র সার্বভৌমত্ব ও জাতির মর্যাদার বিনিময়েই তা করা সম্ভব। তাই প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সর্বোপরি ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতির কাছে, সর্ব শক্তি দিয়ে জাতির প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও দুর্জয় করে তুলতে। এ আহ্বান প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের আহ্বান, রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কাছে। ভারত চিরকালের শান্তিপ্রিয় জাতি, প্রতিবেশীর রাষ্ট্রীয় সীমানায় হানা দেওয়া বা অকারণে মৈত্রীর সম্পর্ক ক্ষুন্ন করা ভারতের কাছে চিরদিনই অবাঞ্ছিত রাজনীতি। সেই ভারতের কর্ণধারেরাই আজ জাতির কাছে সর্বশক্তি পণ করে রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। এতেই বোঝা যায় যে, ভারতের কোটি কোটি মানুষ আজ কত বড় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। এ অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অকুণ্ঠ সমর্থনজ্ঞাপনে দ্বিধা প্রকাশ করা বা চীনের সম্বন্ধে দুর্বলতা প্রকাশ করা রাষ্ট্রদ্রোহিতারই সামিল। এদেশের দুর্ভাগ্য যে, আজও চীনের পক্ষে ওকালতি করার ও ভারতের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে পরোক্ষে হেয় করার লোকের অভাব এখানে নেই। এইটুকু শুধু আশার কথা যে, তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং যতই ভারতের মর্যাদা ও জাতীয় চেতনা জেগে উঠবে ততই তাদের কণ্ঠস্বর স্তিমিত হবে।

॥ মিথ্যা বড়াই ॥

নেপাল-চীন প্রতিরক্ষা চুক্তির সাংবাৎসরিক উপলক্ষে চীনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ পিকিঙের এক অনুষ্ঠান-সভায় ঘোষণা করেন, নেপাল যদি আক্রান্ত হয় তবে চীন সর্বশক্তি দিয়ে নেপালকে রক্ষা করবে। বলা বাহুল্য, উক্তিটি ভারতকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া। কিন্তু ভারতের তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই, সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সেকথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পররাজ্য আক্রমণ ভারতের নীতি নয়।

পররাজ্য গ্রাসের জঘন্য অভিসন্ধি বর্তমান বিশ্বে শুধু চীনেরই আছে। তার প্রমাণ তিব্বতের লাঞ্ছনা, তার প্রমাণ ভারত সীমান্তে চীনের বর্তমান আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ। চীনের চিরন্তন সাম্রাজ্যলিপ্সা নেপালেরও অজানা থাকার কথা নয়, তবুও নেপালের বর্তমান ক্ষমতান্ধ নৃপতি হয়ত ভাবছেন, চীনের ভয় দেখিয়ে ভারতকে তিনি তাঁর বর্তমান সর্তে নতিস্বীকার করাতে পারবেন। কিন্তু যে সর্পে দিয়ে তিনি ভূত ছাড়াতে চাইছেন সেই সর্ষে থেকেই যখন এক মহাদৈত্য বেরিয়ে আসবে তখন তার হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায়ই থাকবে না।

॥ মিত্র সিংহল ॥

তিনদিনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সিংহল সফর করে এলেন। কলম্বো বিমানবন্দরে স্বতস্ফূর্তভাবে লক্ষ লোক এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথিকে সাদর সম্বর্ধনা জানাতে। তারপর তিনি যেখানেই যান সেখানেই অগণিত জনতার অভিনন্দন মুগ্ধ করে তাঁকে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা সভায় শ্রীনেহরুকে এশিয়ার মহান রাষ্ট্রনায়ক বলে শ্রদ্ধা জানান এবং ভারত ও সিংহলের সম্পর্ক বর্ণনাকালে বলেন, এই দুই দেশ শুধু মিত্র নয়, পরস্পরের আত্মীয়।

এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের আজ বিশেষ দুর্দিন, যদিও তার জন্যে ভারতের দায়িত্ব খুবই সামান্য। আসলে এ দুর্দিন গণতন্ত্রের ক্ষমতালোভী সৈনিক ও নৃপতিদের দাপটে যা আজ প্রায় সারা এশিয়া হতেই নির্বাসিত হতে বসেছে। ভারতের প্রতিবেশী প্রতিটি দেশেই আজ গণতান্ত্রিক শাসন লোপ পেয়েছে। পাকিস্তান, নেপাল, বর্মা, চীন, ইন্দোনেশিয়া সর্বত্রই আজ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত। এই অবস্থায় একমাত্র ব্যতিক্রম সিংহল। বহু সমস্যা সত্ত্বেও ভারত ও সিংহলের সম্পর্কের নৈকট্য আজও তাই অটুট।

॥ কাতাঙ্গায় যুদ্ধবিরতি ॥

অবশেষে কাতাঙ্গায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হ'ল। কাতাঙ্গা,
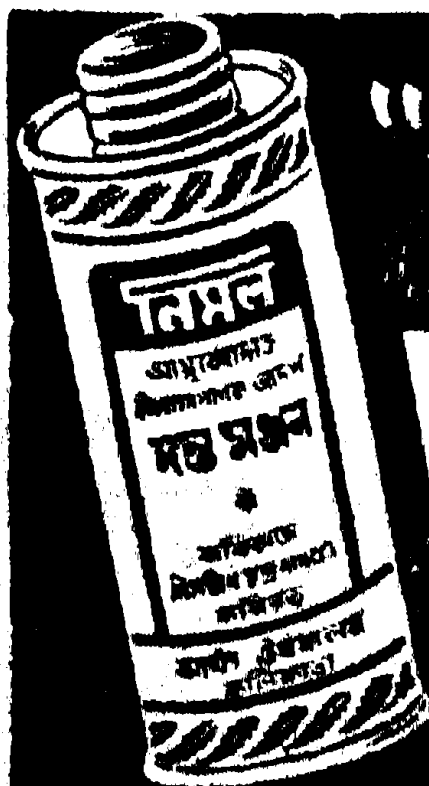
কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্র-সংঘের প্রতিনিধি ঐ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন। স্থির হয়েছে যতদিন না আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাতাঙ্গার সৈন্যবাহিনীকে কঙ্গোর জাতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে ততদিন উভয় কাতাঙ্গায় কঙ্গোর জাতীয় বাহিনী এবং কাতাঙ্গার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থান করবে। তবে কোন পক্ষকেই আর নতুন করে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে না।

ইতিমধ্যে কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী আদুলা কঙ্গোর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে অনুমোদনের উদ্দেশ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের খসড়া পাঠিয়েছেন। ঐ সংবিধানটির রচয়িতা রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ত। পরিকল্পিত সংবিধানটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ, আন্তঃরাজ্য সংযোগ, শাসন-শৃংখলা ইত্যাদির দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করা হয়েছে। আর প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, পুলিশ ইত্যাদি বিষয়গুলি দেবার কথা বলা হয়েছে। তবে পুলিশ সম্পর্কে বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে, প্রাদেশিক সরকারের অধীন পুলিশের হাতে কি কি অস্ত্র থাকবে তা কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করে দেবে। কঙ্গোর রাজনীতিতে এই সতর্কতা স্বাভাবিক। কারণ ভবিষ্যতে শোম্বে-জাতীয় কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তার রাষ্ট্রবিরোধী প্রয়োজনে আইনের ফাঁকে পুলিশ বাহিনী আবার সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হতে পারে।

॥ আলজিরিয়ার নীতি ॥

আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বেন বেলা নিউইয়র্কে মিঃ এডলাই ষ্টিভেনশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলজিরিয়ার নীতি হবে নিরপেক্ষতা। শুধু যে পশ্চিমী অথবা কমিউনিষ্ট শক্তিজোটেরই আলজিরিয়া অংশ হবে না তাই নয়, জোট-নিরপেক্ষ শক্তিগুলিরও সঙ্গে আলজিরিয়া দল পাকাবে না।—এ কথার অর্থ পরিষ্কার। বেন বেলা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পররাষ্ট্র নীতিতে নাসেরের অনুগামী হওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁর আরও একটি মন্তব্যে এই মনোভাব স্পষ্টতর হয়েছে। তিনি বলেছেন, আরব রাষ্ট্রগুলির সমন্বয় খুব নিকটবর্তী বা খুব সহজ কাজ বলে তিনি মনে করেন না, এবং আরব-মোস্লেম জোট তাঁর খুব কাম্যও নয়। অথচ এই আরব দুনিয়ার ঐক্যই নাসেরবাদের মূলকথা, যা আজ সকল আরব রাজ্যকেই উদ্বেলিত করে তুলেছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ আরব রাজনীতিতে নাসেরের সঙ্গে বেন বেলার সম্পর্ক খুব মধুর হবে বলে মনে হয় না।

॥ ইয়েমেন ॥

ইয়েমেনের ক্ষমতা-দখলকারী সৈন্যদল নাসেরের অনুগামী। ক্ষমতা-দখলের পরেই তাই ইয়েমেনের নতুন শাসক কর্ণেল সালাল নাসেরের সমর্থনলাভ করেন এবং কর্ণেল সালালও তার বিনিময়ে আরব-নেতা নাসের ও আরব জাতির প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেন। বর্তমান ব্যবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না হয় তবে হয়ত আর কিছুকাল পরেই ইয়েমেন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের অংশী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। নাসেরের আরববাদের প্রধান শত্রু সৌদী আরব ও জর্ডনের রাজন্যবর্গ এখন তাই প্রকাশ্যে ইয়েমেনের জঙ্গী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। উভয় পক্ষের পরস্পর-বিরোধী সংবাদে প্রকৃত অবস্থা বোঝা সহজ নয়। তবু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইয়েমেনের বর্তমান সরকারের সমর্থক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নিহত ইমামের সমর্থক সৈন্যবাহিনী ও সৌদী আরবের সৈনাদের ইতস্তত সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং তাতে উভয় পক্ষেরই হতাহত ও জয়-পরাজয়ের সংবাদ উল্লেখযোগ্য। তবে তাতে ইয়েমেনের বর্তমান প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভাবনা নিতান্তই সামান্য। হয়ত এর ফলে সৌদী আরব ও জর্ডনের রাজতন্ত্রের ভবিষ্যতই আরও বিপন্ন হবে।

॥ রাষ্ট্রসংঘের স্থানান্তর ॥

রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক হতে স্থানান্তরিত করে সুইজারল্যাণ্ডে আনার প্রস্তাব উঠেছে। 'সাণ্ডে অবজারভার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ত স্বয়ং। সুইস সরকার নাকি প্রস্তাবটির সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে দেখছেন। রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থাপিত হওয়ায় নিউইয়র্ক প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছে। এটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির ত কাম্য নয়ই, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশের কাছেও এটা অবাঞ্ছিত। তার কারণ নিউইয়র্কের বাড়ী, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতির অশ্বেতকায়-বিদ্বেষী মালিকদের উন্নাসিকতা ও সহানুভূতিহীন আচরণ। অশ্বেতকায় রাষ্ট্রনীতিবিদদের নিউইয়র্কে পৌঁছে অনেক সময় মাথা গোঁজার জায়গাটুকু জোগাড় করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং সেক্রেটারী জেনারেলকেই এক সময় গৃহসঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। নিউইয়র্কের দূরত্বও এক সমস্যা। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির কাছে সুইজারল্যাণ্ড অনেক কাছে। এ সকল কারণে উ থান্তের এই উদ্যোগ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন পাবে। কিন্তু তবুও প্রস্তাবটি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিজোট যার বিরোধী, সে প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত হওয়ার মত অবস্থা এখনও সৃষ্ট হয়নি।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৮ই অক্টোবর—২১শে আশ্বিন : কেরলের রাজ্যপাল শ্রীগিরি কর্তৃক কেরল মন্ত্রিসভার পি এস পি সদস্যদের পদত্যাগপত্র গৃহীত।

দুর্গাপূজা নির্ঘণ্টে পণ্ডিতদের মতভেদের ফলে স্থানে স্থানে মহানবমীর দিনেই মহাবিজয়ার উৎসব (প্রতিমা নিরঞ্জন) অনুষ্ঠান।

৯ই অক্টোবর—২২শে আশ্বিন : রক্সোলে (ভারতীয় এলাকা) নেপালী পুলিশের অনুপ্রবেশ ও গুলীচালনার (২৯শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা) প্রতিবাদ—ভারত কর্তৃক বেসরকারী যুক্ত তদন্তের দাবী জ্ঞাপন।

১০ই অক্টোবর—২৩শে আশ্বিন : 'পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবার পন্থা উদ্ভাবনে ভারত মেক্সিকো একযোগে চেষ্টা চালাইবে'—দিল্লীতে সফরকারী মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট ডাঃ ম্যাটিওসের ঘোষণা।

নেফা এলাকায় চীনাদের আবার প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ।

১১ই অক্টোবর—২৪শে আশ্বিন : কেরল মন্ত্রিসভার (কংগ্রেসী) বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট দলের আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ৭৮—২৯ ভোটে বাতিল।

মুনাফা নিরোধ আইন বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মাছের প্রধান আড়তদারদের উপর নোটিশ জারী—ব্যবসায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পেশ করার নির্দেশ।

পাকিস্তানী কর্মীদল কর্তৃক আখাউড়া-আগরতলা রোডে (পূর্ব পাক-ত্রিপুরা সংযোগপথ) সহসা পরিবহন চালনা বন্ধ—ত্রিপুরায় প্রেরিত প্রচুর মালপত্র পাকিস্তানী ষ্টেশনে আটক—ত্রিপুরা সরকারের প্রতিবাদলিপি প্রেরণ।

১২ই অক্টোবর—২৫শে আশ্বিন : 'নেফায় ভারতীয় এলাকা হইতে চীনাদের হটাইয়া দাও'—ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপর কেন্দ্রীয় নির্দেশ—বর্তমানে চীনের সহিত আলোচনার সম্ভাবনা নাই বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) উক্তি।

১৩ই অক্টোবর—২৬শে আশ্বিন : 'প্রথম ডিগ্রী লাভের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রের ১৫ বৎসর বিদ্যাভ্যাস করা উচিত'—দিল্লীতে উপাচার্য সম্মেলনে শিক্ষাকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন।

নেফা অঞ্চলে • চীনাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর কার্যকলাপ সমর্থনে আহ্বান—কলম্বো যাত্রার প্রাক্কালে মাদ্রাজে জাতির উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরুর আবেদন প্রচার।

১৪ই অক্টোবর—২৭শে আশ্বিন : জাতির নিকট রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের উদাত্ত আহ্বান : চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হউন ও সরকারের পশ্চাতে দাঁড়ান।

'চীনাদের নেফা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করা হইবেই'—ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি কে কৃষ্ণমেননের দাবী—শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা।

১৫ই অক্টোবর—২৮শে আশ্বিন : নেফা ও ত্রিপুরায় মাল সরবরাহ বিপর্যস্ত করার ব্যবস্থা—পূর্ব পাকিস্তানের চেক পোস্টে ভারতীয় মালবাহী ৩০খানি ষ্টীমার ও গাদা বোট আটক রাখার সংবাদ।

জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ প্রান্তে পাক ফৌজের তৎপরতা বৃদ্ধি—নূতন সৈন্য আমদানী ও বেতার কেন্দ্র স্থাপন—পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলে সরকারী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

কটকে নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন সুরু—উদ্বোধক : শ্রীইউ এন্ ডেবর।

১৬ই অক্টোবর—২৯শে আশ্বিন : ত্রিপুরা সীমান্তে অস্ত্র-সংবরণের আদেশ—চট্টগ্রামে (পূর্ব পাকিস্তান) ভারত-পাকিস্তান অফিসারমণ্ডলীর যুক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত কার্যকরী।

মূল্য বৃদ্ধি নিরোধে পরিকল্পনা কমিশনের নূতন উদ্যম—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের বিবৃতি।

১৭ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন : 'ভারতের সীমানা ম্যাকমোহন লাইন রক্ষার সকল সরকারী ব্যবস্থাই ন্যায়সঙ্গত'—ভারত-চীন বিরোধ প্রসঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর অধিবেশনে (দিল্লী) প্রস্তাব গ্রহণ।

॥ বাইরে ॥

৮ই অক্টোবর—২১শে আশ্বিন : ভারতের প্রতি নেপাল-রাজের (রাজা মহেন্দ্র) রক্তচক্ষু ও বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন—চীন ও পাকিস্তানের সহিত নয়া আঁতাতের পর কাঠমণ্ডু হইতে ভারতকে লক্ষ্য করিয়া জেহাদের সুর।

ইয়েমেনী সীমান্তে সৌদি আরব ও জর্ডানের (উপজাতীয়) সৈন্য সমাবেশ।

৯ই অক্টোবর—২২শে আশ্বিন : ইয়েমেনের ব্যাপারে বৃটিশ হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্রে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব—প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সামরিক সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকার জন্য রাশিয়ার নিকট ইয়েমেনী বিপ্লবী পরিষদ নায়ক কর্ণেল এল সালালের আবেদন।

১০ই অক্টোবর—২৩শে আশ্বিন : আফ্রিকার নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র উগাণ্ডার পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন।

১১ই অক্টোবর—২৪শে আশ্বিন : ইয়েমেন সীমান্তে ইয়েমেনী বিপ্লবী বাহিনীর সহিত সৌদী আরব ও জর্ডান বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই।

১২ই অক্টোবর—২৫শে আশ্বিন : 'ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ যত শীঘ্র অবসান হয়, ততই মঙ্গল'—সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ আঁদ্রে গ্রোমিকোর মন্তব্য।

১৩ই অক্টোবর—২৬শে আশ্বিন : সিংহলে শ্রীনেহরুর তিন দিবসব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফর সুরু—কলম্বোয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিপুল সম্বর্ধনা।

১৪ই অক্টোবর—২৭শে আশ্বিন : ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আর এক দফা আস্ফালন—সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও পাল্টা আঘাত হানার হুমকী।

ইয়েমেন আক্রমণকারী সৌদী আরব ও জর্ডন বাহিনী বিধ্বস্ত।

১৫ই অক্টোবর—২৮শে আশ্বিন : 'চীন চায় আগে জায়গা দখল, পরে আলোচনা'—অগ্রগামী চীনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে কলম্বোয় শ্রীনেহরুর সোজা মন্তব্য—ভারতীয় এলাকা হইতে চীনারা না হটিলে কোনরূপেই আলোচনা সম্ভব নয় বলিয়া ঘোষণা।

১৬ই অক্টোবর—২৯শে আশ্বিন : 'কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে ভারত আর রাজী নহে'—রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীবি এন চক্রবর্তীর ঘোষণা।

কাতাঙ্গায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

বৃহস্পতি গ্রহে প্রতিহত হইয়া বেতার-তরঙ্গের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের দাবী—সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নূতন সাফল্য সম্পর্কে মস্কো বেতারে ঘোষণা।

১৭ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন : '১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসের পর আর পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা হইবে না'—লণ্ডনে ভারতীয় শান্তি মিশন নেতা শ্রীসি রাজাগোপালাচারীর আশা প্রকাশ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ আংরেজি হটাও ॥

'আংরেজী হটাও' এই নাটকীয় আন্দোলন শেষপর্যন্ত নেহরুজীকেও অতিশয় বিরক্ত করেছে। তার ফলে পর পর কয়েকটি অনুষ্ঠানে তিনি এই আন্দোলনকারীদের ভ্রান্ত নীতির নিন্দা করেছেন। এ নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ, কারণ এই আন্দোলনের বিপজ্জনক পরিণাম সম্পর্কে অধিক বলা বাহুল্য।

ভাবাবেগবশতঃ ইংরেজী থাকবে না তাকে হটিয়ে দিয়ে আমরা একেবারে ইংরাজী-বর্জিত ভারতবর্ষে সুখে এবং স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করব—তা স্থির করা কখনই কর্তব্য নয়। আমরা অনেকেই আজো ভাবাবেগহীন যুক্তির দ্বারা চালিত হতে শিখিনি। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর 'হিন্দী-প্রেমী' উগ্র আন্দোলনকারীদের 'stupid' বা নির্বোধ বলা উচিত হয়নি, কারণ, কথাটি নাকি অগণতান্ত্রিক। এই বক্তব্য আমাদের আসল প্রশ্ন থেকে দূরে সরিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারে। অন্ততঃ বর্তমানকালে 'stupid' কথাটি গণতান্ত্রিক কি অগণতান্ত্রিক সেই বিচার মুলতুবী রাখলেও বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

নেহরুজীর উক্তিতে স্বৈরতান্ত্রিক গন্ধ বিদ্যমান কিনা সেই বিচারও অনুরূপ ভঙ্গিতে পরে করা যেতে পারে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ যদি সম্ভব হয় তাহলে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র কিছু নিয়েই মাথা ঘামাবেন না। হাতে যা পাওয়া যাবে সেই নগদ-নারায়ণকে নিয়েই আনন্দ করবে।

প্রথমেই প্রশ্ন ইংরাজী ব্যবহার করাটা কি দাস মনোভাবের পরিচায়ক? কোনো ব্যক্তি যে সজ্ঞানে বলতে পারেন যে, ইংরাজী ভাষাটা বিদেশী ভাষা, সুতরাং অবিলম্বে তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এর চেয়ে 'পাগলা দাশু' মার্কা উক্তি আর হতে পারে না। কারণ, তাহলে প্যান্ট, কোট, বাস, ট্রাম, মোটরগাড়ি, স্কুটার, হাওয়াই জাহাজ, রেলগাড়ি, রেডিয়ো, টেলিভিসন, রেফ্রিজারেটার সব কিছুই হটাতে হবে। কারণ ও সব দ্রব্যই ত বিদেশী, এমন কি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া ও জুরিসপ্রুডেন্স পর্যন্ত গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।

কোনো ভাষাই কারো মৌরসী-মকবারি সম্পত্তি নয়, 'এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,' এই সম্পদে তাই সকলের অধিকার। আজ আমরা যতগুলি ভাষা জানি, পড়ি, কথা বলি, তার সবগুলিই যে সুদূর অতীত থেকে আছে তা নয়, বৈদেশিক ভাষার সঙ্গে যে তার মেল-বন্ধন ঘটেনি তাও নয়। অনেক সময় দুটি বিভিন্ন ভাষার চাপে একটা সম্পূর্ণ নতুন ভাষাও গড়ে উঠেছে এমন দেখা গেছে। অন্ততঃ এইভাবেই উর্দু ভাষার জন্ম।

কালের প্রয়োজনে, কালের বশে ভাষা গড়ে উঠবে। ভাষার যদি স্বতোৎসারিত উন্নয়ন না ঘটে, সমৃদ্ধি না হয়, সে ভাষাকে জোর করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। রাজা, বা রাজসভা বা রাজপেয়াদা কেউ-ই রাতারাতি একটা ভাষাকে মহৎ এবং বৃহৎ করে গড়ে তুলতে পারেন না। যদি ভাষার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে তাহলে কোনো রকমের দাওয়াই দিয়ে সেই মৃত্যু নিবারণ করা যায় না। সে ভাষার অবলুপ্তি ঘটবেই। আজ আর সংস্কৃত বা লাতিনকে প্রতিদিনের ঘর-সরা ভাষা হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে না। হিন্দী বা ঐ রকম কোনো একটি ভাষা আংরেজী হটিয়ে সেই চেয়ারে বসে পড়বে তাও সম্ভব নয়।

ইংরাজীর বিরুদ্ধে একটি জোরদার যুক্তি হোল ইংরাজী বড়ই কঠিন এবং খটমট ভাষা, অনেক বছর ধরে পাঠ করলেও নাকি তেমন রপ্ত হয় না। অভিজ্ঞতা অবশ্য তা বলে না। আজ যদি কোনও ছাত্রকে দেখি যে, ইংরাজী মোটেই বোঝে না, তাহলে বুঝতে হবে যে, তৃতীয় শ্রেণীর অপদার্থ বিদ্যালয়ে তাকে পড়তে হয়েছে। তারা যে শুধু ইংরাজীতেই কাঁচা তা নয়, আর সব বিষয়েই তাদের সমান পাণ্ডিত্য। ইংরাজী, অঙ্ক, মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সর্ববিধ বিভাগেই তাদের সমান ব্যুৎপত্তি।

আমাদের অবশ্য ভুল হয়েছে ইংরাজীকে আমরা ব্রিটিশ ইংরাজী ছাঁচে শেখার চেষ্টা করেছি। সেই ভুলটা সংশোধনের পক্ষে খুব বেশী যে বিলম্ব হয়েছে তা বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-প্রান্তের আমেরিকানরা কিং জেমস সংস্করণ বাইবেল এবং বুনিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' থেকে একটা ভাষা গড়ে নিয়েছিলেন। সেই ধারাই যদি চালু থাকত তাহলে মার্কিন ভাষা আজ মরে ভূত হয়ে থাকত। সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি।

আমেরিকানদের কাছ থেকে আমাদের 'কনস্টিটিউশন' অনেকখানি ধার করেছি। ভাষা-সমস্যা সমাধানে তাদের পথ অনুসরণ করতে ক্ষতি কি? আর কে নারায়ণ, ডঃ ভবানী ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীন্দ্র ঘোষ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ডঃ মুলকরাজ আনন্দ প্রভৃতি ইদানীংকালের অনেক লেখক অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ইংরাজী লিখেছেন। তাঁরা কোনও ইংরাজী লেখককে অনুকরণের চেষ্টা করেন নি। এঁদের রচনায় একটা দেশী আমেজ আছে। এঁরা সকলেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

যখন তাই আমাদের দেশের কিছু-সংখ্যক মানুষের এই ধরণের সংগ্রামী মনোবৃত্তি দেখি তখন আমরা বিস্মিত হই তাঁদের কথায় এবং কাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করে। যে ব্যক্তি ইংরাজীর বিরুদ্ধে লড়ছেন, তাঁর ছেলেটি 'দুন' স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করে হয় ইংলন্ড, নয় ওয়েস্ট জার্মানী, নয় আমেরিকা পড়তে গেছে। বাড়িতে বয়-বেয়ারারা ডিনার টেবল সাজাতে হিমসিম খাচ্ছে। মেমসাহেব লিপস্টিক ঠোঁটে মেখে রুধির-পানরত শ্মশান-কালীর মূর্তি নিয়ে মোটরে উঠছেন একটা টি-পার্টিকে এটেন্ড করার জন্য। ইংরাজী মাধ্যমের তথাকথিত মিশনারী স্কুলে কত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী দেশ বিভাগের আগে পড়ত আর এখন কত পড়ে এই সংখ্যা মিলিয়ে এই উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত হবে। যেখানে সুবিধা হয়েছে নামের আগে একটা সেন্ট বসিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় সেন্ট জন, সেন্ট টমাস, সেন্ট এণ্ড্রুজ গজিয়ে উঠেছে। উঠতি ধনীরা ছেলের হাত ধরে সেখানে ছুটেছেন।

স্বাধীনতার প্রত্যূষে নবীন উৎসাহে একমাত্র দক্ষিণ ভারত ছাড়া আর কেউ

হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেনি। যদিচ সেখানে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন প্রবল, সেখানকার মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞানও প্রবল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সব কর্মচারীকে হিন্দী শিখতে হবে, হিন্দী সেকসনে প্রতিদিন অফিসের কর্মব্যস্ত ঘন্টাগুলির মধ্যে চুরি করে দু-তিন ঘন্টা কাটাতে হবে। ভালো ছাত্রের নগদ টাকা বখশিস মিলবে। হিন্দীতেই সব রকমের বিজ্ঞপ্তির অনুদিত কপি ছাপা হচ্ছে এবং বিতরিত হচ্ছে। স্টেনসিল, সময়, কাগজ এবং অর্থের প্রচণ্ড অপচয়। কারণ, সে সব কেউই পড়ে না। হিন্দী কিন্তু এত রকমের সরকারী সাহায্যলাভ করেও শম্বুক-গতিতে গড়িয়ে চলেছে। যে তরুণ সামান্য রকমের ইংরাজী জানে, সেও তার বন্ধুদের ঐ সামান্য ইংরাজীতেই চিঠিপত্র লেখে। ইংরাজীতেই কথা বলে।

দক্ষিণ ভারতের মত বাংলা দেশের মানুষও ইংরাজী চায়। যদিচ বাঙালীর পক্ষে হিন্দী শেখাটা কিছুই নয়, তবু একটা বিরূপতাই হিন্দী শিক্ষায় বাধা হয়ে আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। যে মানুষ ইংরাজী জানে সে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে অন্নজল সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু যে শুধু হিন্দী জানে? একথাও বোধ হয় বলা ভুল হবে না যে, যে মানুষ ইংরাজী জানে তার মনে একতার ভাব অতিশয় প্রবল, কিন্তু যে শুধু তার মাতৃভাষা বা হিন্দীটুকু জানে তার সম্বন্ধে কি সেই কথা বলা যায়?

জানি ইংরাজীকে জাতীয় ভাষা হিসাবে রাখা সম্ভব নয়। হয়ত হিন্দীর সহযোগী ভাষা হিসাবে অনুগ্রহ করে রাখা হবে, এবং একদিন সত্য সত্যই ইংরেজীকে হটানো হবে। সেদিন হিন্দীই হবে ভারতের একমাত্র ভাষা। আর সংবিধানের বাকী ত্রয়োদশটি ভাষা দুয়োরাণীর সন্তানের মত ম্লান মুখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভগিনী হিন্দীর সমাদর দেখে চোখের জল মুছবে। ভাবগত ঐক্য, ভাষাগত সংহতি ইত্যাদি বানের জলে ভেসে যাবে। হিন্দীর একাধিপত্য এক ধর্মরাজ্য পাশে সারা ভারতকে বাঁধতে পারবে না। আদালত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শুধু হিন্দী চলবে। অহিন্দী-ওলারাও সেদিন হটে যাবে।

ভলটেয়ার একদা বলেছিলেন, যে ভাষার সাহিত্য উৎকৃষ্ট ও মহৎ সেই ভাষাই মহৎ ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। এই নীতি হিসাবে ইংরাজীকে কেউ-ই শ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে অস্বীকার করবেন না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল ফরাসী ভাষার। ফরাসী সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে ফরাসী ভাষার গৌরব ম্লান হয়েছে।

ইংরাজী বর্তমানকালে বিজ্ঞানের ভাষা, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বাণিজ্যের ভাষা। যেসব দেশের সঙ্গে ইংরাজ বা ইংরাজীর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই তাঁরাও ইংরাজী শিখছেন। য়ুনাইটেড নেশনসের মজলিসে অধিকাংশ সদস্যরা ইংরাজীতে কথা বলতেই ভালোবাসেন। বক্তৃতাবলীর ইংরাজী ভাষায় অনুদিত নকল প্রার্থনা করেন। মধ্যপ্রাচ্যে একদা ফরাসীর অসীম জনপ্রিয়তা ছিল, সেখানেও আজ ইংরাজী শেখানো হয়। লাতিন আমেরিকায় দীর্ঘকাল ধরে রোমানী ভাষা চলে এসেছে, আজ সেখানে ব্যবসা ও কাজকর্মে ইংরাজীর ব্যবহারটাই আইনগত ভাবে সিদ্ধ। সোভিয়েট রাশিয়ায় পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরাজী ভাষা পড়ানো হয়। কারিবীন দেশসমূহে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

ইংরাজী ভাষা নেহরুজীর মতে "The widow for us to the World outside." বাহির্বিশ্বের সঙ্গে যদি সম্পর্কহীন হয়ে আমরা থাকতে চাই তাহলে এই উৎকট হিন্দি-প্রেমীদের "আংরেজী হটাও" আন্দোলনে যোগ দিয়ে দোকানপাটের ইংরাজী সাইনবোর্ড হটাতে শুরু করাই শ্রেয়। ইংরাজী হটিয়ে হিন্দিওয়ালাদের সন্তুষ্ট করা যাবে নিশ্চয়ই তবে ভাবগত ঐক্যের সমাধি রচিত হবে। 'রাম নাম সত্য হায়' বলে একতাকে সেদিন কবরস্থ করা হবে।

নতুন বই

রামনের স্বপ্ন—শার্লি এল অরোরা। অনুবাদ : রাখাল ভট্টাচার্য। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

শার্লি অরোরা আমেরিকান হলেও বিবাহসূত্রে ভারতীয়। 'হোয়াট দেন রামন' তাঁর প্রথম গ্রন্থ। শ্রেষ্ঠ কিশোর উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থখানি ১৯৬১ সালে অ্যাডামস পুরস্কার লাভ করে। শার্লি অরোরা দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে চার বছরকাল সময় কাটিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয়গণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

একটি ছোট ছেলে রামন। কাঠুরের ছেলে রামন লেখাপড়া শিখতে যায় গাঁয়ের বিদ্যালয়ে। কিন্তু রামনকেও পড়াশুনা চালান আর সংসারের জন্য কাজ করতে হয়। এক মার্কিন মহিলাকে পাহাড়ী গাছ সংগ্রহ করে দেয় সে। সেই মহিলাই রামনের শিক্ষার ভিত্তিতে

পরিবর্তন আনেন। রামন শুধু লেখা-পড়া শিখবে না। গাঁয়ের আর পাঁচজন অশিক্ষিত মানুষের শিক্ষার বিষয়ে তার দায়িত্ব রয়েছে। 'নিজে লিখতে পড়তে শেখাই যথেষ্ট নয়। গাঁয়ের আর পাঁচজনকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, যাতে ওরাও আবার শিক্ষাদান করতে পারে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে আসবে সবার জন্য সুন্দরতম জীবন।'

যে কোন দেশের পুনর্গঠনের যুগের বাস্তব রসাশ্রিত কাহিনী। যে অনবদ্য কাহিনী সমগ্র গ্রন্থটিতে পরিবেশিত তা সার্থক শিল্প-ক্ষমতায়ই একমাত্র সৃষ্টি সম্ভব। যে কোন শিশু ভবিষ্যৎকালে পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক হবে। তাদের চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজন রয়েছে এই ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ-পাঠের। যে তত্ত্ব পরিবেশনের জন্য শার্লি আরোরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা সার্থক শিল্পরূপ লাভ করায় একটি চিরন্তন শিল্পসৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদকের দক্ষতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

চতুষ্পর্ণা (শারদীয়া ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক : অরুণ ঘোষ। ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

'চতুষ্পর্ণা' একটি মাসিক পত্রিকা। বর্তমান শারদ সংকলনে পত্রিকাটির অভিনব সম্পাদনা চোখে পড়বে। কোন গল্প প্রবন্ধ কবিতা বা অন্যান্য ছোট রচনা স্থান পায়নি। কেবলমাত্র চারটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চারটি উপন্যাস-এর ঘটনা-বিন্যাসে যে বিচিত্র জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে তা যে কোন পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করবে। চারটি উপন্যাস লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী (জলছবি), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (দর্পণ), মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য (ঋণ) এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র (স্রোতস্বতী)।

পুনশ্চ (আশ্বিন : ১৩৬৯)—সম্পাদক : মৃণাল দত্ত। ২৪এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা—৩২। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'পুনশ্চ'এর এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, রাম বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, শান্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

বহ্নিশিখা (শারদ সংকলন)—সম্পাদক : উত্তমকুমার দাশ। বহ্নিশিখা প্রকাশনী। বারুইপুর। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—জগদীশ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, আলোক সরকার এবং আরো অনেকে।

দর্শক (৩য় বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা)—সম্পাদক : রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম পঁচিশ নয়া পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় আছে 'বাংলার ভাস্কর্য পরম্পরা', 'বাংলার মন্দির', 'বাংলার মেলা', 'সামাজিক নাটক প্রসঙ্গে' এবং অন্যান্য আলোচনা। সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভোলা চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার রায়-চৌধুরীর চিত্রের প্রতিচিত্র, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রামকিংকর বেজ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিন্তামণি কর-এর ভাস্কর্যের চিত্ররূপ বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য রচনা ও চিত্রে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ ও সুশোভিত।

খড়্গপুর সমাচার (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৯)—সম্পাদক : বিজয় মাল। খরিদা বাজার। খড়্গপুর। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, তুষার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। নন্দলাল বসু, গোপাল ঘোষ, সত্যেন বিশী, যোগেন চৌধুরী প্রভৃতির ছবি আছে।

সুসাহিত্য (শারদ সংকলন)—সম্পাদক : অধীর সর্বজ্ঞ। সুসাহিত্য প্রকাশনী, ১০৯এ/১ আলিপুর রোড, কলকাতা—২৭। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'গতানুগতিকতা মুক্ত সাহিত্য পত্র' এই উদ্দেশ্য নিয়ে সুসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করলেও পত্রিকাটির মধ্যে গতানুগতিক সাহিত্য লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধের সংকলন।

শ্রীচরণেষু (আশ্বিন, ১৩৬৯)—সম্পাদক : ননীগোপাল দত্ত। ৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলকাতা হতে প্রকাশিত।

ছোটদের পত্রিকা 'শ্রীচরণেষু'র বর্তমান সংখ্যাটি আশা করি যোগ্য পাত্রে সমাদৃত হবে। এ সংখ্যায় লিখেছেন—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গোপাল ভৌমিক, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বোম্মানা বিশ্বনাথম, মুরারিমোহন সেন এবং আরো অনেকে।

জাগরী (শারদীয়া ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : অপূর্বকুমার সাহা। ৯।এ হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা—৩। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে—বিমল মিত্র, নলিনীকান্ত গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পি সি সেন, শ্রীঅরবিন্দ এবং আরো অনেকে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা (শারদীয় ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : বিমলেন্দু দাস। আলিপুরদুয়ার।

বার্তা (শারদীয় ।। ১৩৬৯)—সম্পাদক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিকদার। সদাগর পট্টি, জলপাইগুড়ি। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

পাথেয় (শারদ সংকলন)—সম্পাদক : শৈলেন দত্ত। অমরাবতী শিশু উদ্যান, পোঃ সোদপুর, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস দত্ত, মিহির সেন, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাশ, মায়া বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, এবং আরো অনেকে।
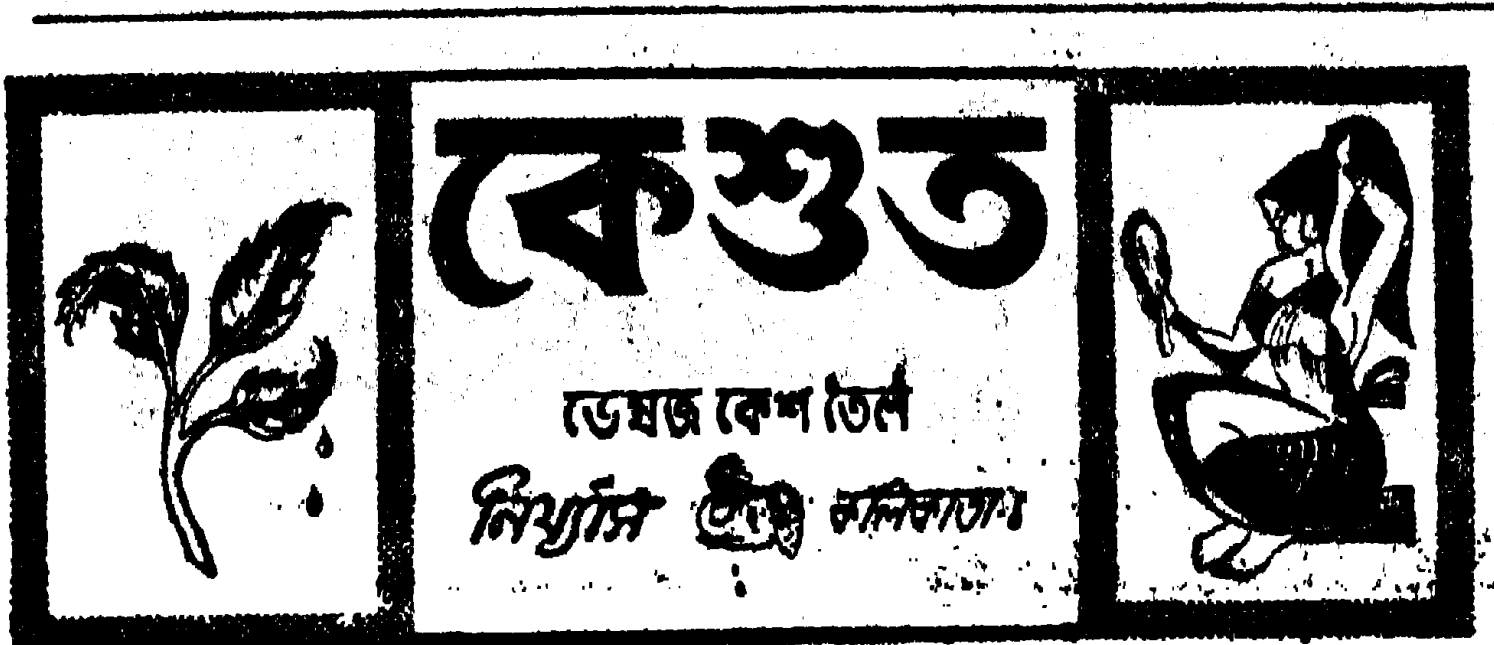
ঐকতান (শারদ সংখ্যা) সম্পাদক—পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়। ঐকতান সাহিত্য সংস্থা, আমতা, হাওড়া।

গ্রামীন (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৯)—সম্পাদক : প্রতিমা বসু। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষৎ, ১৪ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা—১৩। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদের মুখপত্র।

যুগকল্লোল (শারদীয় ১৩৬৯)—সম্পাদক : সত্য আচার্য। সি, আই, টি, বিল্ডিংস, ব্লক নং ২, স্যুট নং ২০, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা—১৪।

রামধনু (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৯)—সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। ১৬ টাউনসেন্ড রোড, ভবানীপুর, কলকাতা।

'রামধনু' ৩৫ বৎসর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—নরেন্দ্র দেব, জরাসন্ধ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে।

সম্ভার (শারদীয় ১৩৬৯)—সম্পাদক : অমিতকুমার নাগ ও অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। শিলচর। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

সৈকত (শারদীয়া)—সম্পাদক : অরবিন্দ কর। শিলিগুড়ি। দাম এক টাকা।

অর্থনৈতিক পত্রিকা (শারদীয়া সংখ্যা)—সম্পাদক : কালীপদ ভট্টাচার্য। ১৬ সৈয়দ আমির আলী এভিনিউ, কলকাতা—১৭। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও আলোচনা নিয়ে প্রকাশিত।

ডানপিটেদের সমাচার (শারদীয়া সংখ্যা) পরিচালক : রত্নাকর। ডানপিটেদের আসর, জলপাইগুড়ি। দাম এক টাকা।

সমাজসেবা (শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৯)—সম্পাদক : মদনগোপাল সেন। ২৪নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট। দাম দু টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন, নলিনীকিশোর গুহ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, গোপাল ভৌমিক, সুবোধ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দেব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রেজাউল করিম ও আরো অনেকে।

বিচার (শারদীয়) সম্পাদক : প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত। ১১ হেম চক্রবর্তী লেন, হাওড়া। পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্যের খবর (শারদ সংখ্যা) সম্পাদক : মনোজ বসু। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জরাসন্ধ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অমলেন্দু ঘোষ, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ভবানীগোপাল সান্যাল, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, শক্তিব্রত ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, চারু দত্ত, ভোলানাথ ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়।

উচ্চারণ (দ্বিতীয় সংকলন) সম্পাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য।

বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, অতীন্দ্র মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং আরো অনেকে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিতার ওপর আলোচনা করেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

গঙ্গোত্রী (আশ্বিন॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক : দুর্গাদাস সরকার। ৪।১, আফ্তাব মস্ক লেন। কলকাতা-২৭। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, এবং আরো অনেকে।

অনুশীলন (শারদীয়া ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক : গোপাল ঘোষ ও শ্যামসুন্দর দে। ৯।৪ সি এন রায় রোড, কলকাতা-৩৯। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

মুজফ্ফর আহ্মদ, নরহরি কবিরাজ, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের লেখায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

জাহ্নবী (শরৎ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক : শ্যামল গুহ, পীযূষ সাহা ও অলোকচন্দ্র। ২৩, নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট। কলকাতা। দাম এক টাকা।

শারদীয় প্রগতি (অষ্টম বর্ষ সংকলন)—সম্পাদক : জগদীশ কর ও কালিদাস সাহা। প্রগতি সাহিত্য পরিষদ, নবদ্বীপ। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাপ্তিক (শারদীয় ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক করুণাশঙ্কর বিশ্বাস। চাকদহ, পাবনা কলোনী, নদীয়া। দাম এক টাকা।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

কারণ কি :

"অমৃত"-শারদীয় সংখ্যায় স্বনামধন্য চিত্র-সমালোচক এন-কে-জি প্রশ্ন তুলেছেন, "সে কোন্ দুস্তর বাধা যা বঙ্গীয় চলচ্চিত্রের শিল্পমান আরো অনেক উন্নত করতে দিচ্ছে না?" এবং এর জবাব কারণ দর্শিয়েছেন, "উপযুক্ত চিত্রনাট্য-রচয়িতার দুর্লভতা।" সত্যিই, আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পে সাধারণতঃ যাঁরা চিত্রনাট্য রচনার জন্যে নিয়োজিত হন, তাঁদের মধ্যে এমন লোক অল্পই আছেন, সাহিত্যজগতে যাঁদের মৌলিক দান সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু যদি শিগ্‌গিরই এমন দিন সত্যিই আসে, যখন শক্তিশালী তরুণ সাহিত্যিকরা সিনেমার সিনারিও লেখবার জন্যে কলম ধরবেন, তখন কি চিত্রনাট্য-রচয়িতার দুর্লভতার সমস্যা মিট্‌বে? জীবন সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নাট্য-রচনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলেই কি সার্থক চিত্রনাট্য রচনা করা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। কারণ, এই দুটি জ্ঞানের ওপরেও যে-বিশেষ জ্ঞানটি থাকা দরকার, সেটি হচ্ছে—রূপকল্পনার ক্ষমতা, যাকে ইংরিজীতে বলা হয়, পাওয়ার অব্ ভিসুয়ালাইজেসন। কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে চিত্ররূপ দিতে হ'লে সেই বিশেষ ঘটনাটিকে কল্পনায় নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখার ক্ষমতা থাকা চাই।

বিমল রায় পরিচালিত 'প্রেমপত্র' চিত্রে সাধনা

এবং কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে ঘটনাটি ঘটলে তা চলচ্চিত্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে, সেই বিশেষ জ্ঞানটুকুও আয়ত্ত থাকা চাই। পটশিল্পী যেমন তাঁর ক্যানভাসের ওপর বিভিন্ন রঙের সমাবেশে একটি চিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলেন, চিত্রনাট্যরচয়িতাও তেমনই চিত্র, সংলাপ, আনুষঙ্গিক শব্দ ও যন্ত্রসংগীত এবং প্রয়োজনানুযায়ী স্থিতি ও গতি দ্বারা তাঁর দৃশ্যটিকে সজীব ক'রে তুলতে সচেষ্ট হন; তিনি কাগজের ওপর লেখেন বটে। কিন্তু সেই লেখা ঘটে ওঠে আগে মনের পটে ছবিটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবার পরে এবং বহু সময়েই সেই ছবির একটা মোটামুটি রূপ কাগজেও আঁকা হয়ে যাবার পরে। কিন্তু এত কথায় কাজ কি? পাঠকদের অবগতির জন্যে বলছি, এক সময়ে বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক এইচ, জি, ওয়েলস্ চিত্রনাট্য-রচনা শিক্ষা করবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, উপন্যাসাদি রচনার ক্ষেত্রে তিনি যত বড় ধুরন্ধরই হোন না কেন, সার্থক চিত্রনাট্য রচনা করতে হ'লে তাঁর বিশেষ কলা-কৌশলটি তাঁকে আয়ত্ত করতেই হবে। এবং শিক্ষা বিষয়ে লজ্জা বা আত্মম্ভরিতার স্থান নেই।

কিন্তু দক্ষ চিত্রনাট্যকারের আবির্ভাব ঘটলেই কি বাঙলা ছবির শিল্পমান উন্নত হবার সুযোগ পাবে? চিত্রনাট্যকার মনশ্চক্ষে যে-ঘটনা ঘটতে দেখে কাগজে তা' লিপিবদ্ধ করবেন, পর্দার ওপর সেই ঘটনাকে কি ঠিক সেইভাবে প্রতিফলিত করতে পারা যাবে? বর্তমানে বাঙলা দেশ থেকে একটি শিল্পসম্মত ছবি তৈরী হয়ে বেরুনো কি সম্ভব? কেউ কেউ হয়তঃ বলে বসবেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীর এমন কি সম্বল ছিল, যা নিয়ে সে 'বাইসিকল্ থিফ' বা 'মিরাকলস্ অব মিলান'-এর মত ছবি ক'রতে পেরেছিল? তার তুলনায় আমাদের ত' অঢেল সাজ-সরঞ্জাম আছে। ইতালীর কি সম্বল ছিল, তা জানিনা। কিন্তু এটুকু জানি, একটি প্রস্তরমণ্ডিত সুপ্রশস্ত বর্ষণসিক্ত রাজপথের নির্জন চৌরাস্তার মাঝখান দিয়ে একটি অশ্ব-বাহিত গাড়ীর চ'লে যাওয়ার দৃশ্য খুব দূর থেকে (ডিসট্যাণ্ট লং শটে) দেখাবার জন্যে যে সহায়-সম্বল ইতালীর প্রযোজকের ছিল, আমাদের বাঙলাদেশের প্রযোজকদের সেটুকুও নেই। ইতালী সরকার, পুলিস এবং জনসাধারণ চলচ্চিত্রকে শিল্পসম্মত রসোত্তীর্ণ করবার জন্যে যে-সহায়তা ক'রে থাকেন, এখানে এখনো পর্যন্ত সে-রকম সহায়তার নিদর্শন চোখে পড়েনি। ধরুন, এসপ্লানেডের মুখে চৌরঙ্গীর রাস্তার মাঝখান দিয়ে ভোরবেলা একজন লোক ক্লান্ত চরণে হেঁটে চলেছে—কোথাও জন-প্রাণী নেই, এমন একটি দৃশ্য কোনো ছবির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। এখানকার প্রযোজক কি বলবেন না, দৃশ্যটাকে একটু বদ'লে লেকের ধারে এনে ফেলুন

বিদেশ সফর শেষ করে অসিত চৌধুরী সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

না, কিংবা আরও ভালো হয়, যদি আমাদের বাড়ীর রাস্তাটায় ওটা তোলা হয়—পাড়ার ছেলেদের ম্যানেজ করা ঢের সহজ হবে? এর ওপর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে আমাদের কলাকুশলীরা চিত্রনাট্যের চাহিদা মত অনেক কিছুই করতে পারেন না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এমন একটি স্টুডিও ফ্লোর নেই, যাকে আমরা সাউন্ড স্টেজ বলতে পারি, যেখানে বাইরের শব্দ ঢোকবার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই। একটি চলচ্চিত্রের সার্থক শিল্পসৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হবার জন্যে তার প্রথম ফ্রেম থেকে শেষ ফ্রেম পর্যন্ত সকল বিভাগের কাজই নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন এবং এ-ব্যাপারে কোনো রকম আপোষ-মীমাংসা বা কম্প্রোমাইজ সম্ভব নয়।

এবং এর পরেও কথা আছে। আমাদের প্রযোজকেরা সাধারণতঃ সেই গল্প পছন্দ করেন, যার চিত্ররূপ দেওয়াতে ঝঞ্ঝাট কম অথচ জনসাধারণের পছন্দসৈ উপাদান আছে। এবং জনসাধারণের পছন্দ সম্বন্ধে তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা থেকে তাঁরা বলেন, মাত্র দু'রকমের গল্প বাঙলা দেশে চলে: এক, কোনো প্রেমের গল্প, যাতে প্রেমটি বিবাহে পরিণত হ'তে একটি প্রচণ্ড বাধা আসবে এবং অনেক ব্যথা-বেদনা ঝরবার পর বাধা দূর হয়ে মিলন সম্ভব হবে। আর দুই, কোনো গেরস্থালী গল্প, যাতে কোনো দুষ্ট লোকের চক্রান্তে সংসারের সুখশান্তি উবে যাবার উপক্রম হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর কোনো বৌ—সে বড়, সেজ, ন' বা ছোট হবে, কখনোই মেজ হবেনা—নির্যাতিত হবে (অবশ্য গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' একটি ব্যতিক্রম!) ও পরে 'ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়' হয়ে আবার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই আমরা বাঙলাদেশে আবহমান কাল ধ'রে ক্রমাগত এই দু' ধাঁচের গল্পেরই পুনরাবৃত্তি দেখে আসছি। এ ছাড়া দেখেছি, অক্ষমভাবে তোলা কিছু ক্রাইম-ড্রামা, স্মৃতি-ভ্রংশ বা অ্যাম্নেসিয়ার গল্প কিংবা কিছু কাইকুতু দিয়ে হাসানোর গল্প, যার মধ্যে সিচুয়েশানের পরিবর্তে সংলাপের ওপরই হাসির সৃষ্টির জন্যে জোর দেওয়া হয়। এখানে 'বাইসিকল্ থিফ', 'রশোমান', 'ব্যালাড্স্ অব্ এ সোলজার', 'দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নেভার সেণ্ট', 'মাদার', 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' প্রভৃতি ছবি দূরের কথা, 'দি অ্যাবজেন্ড মাইন্ডেড প্রোফেসার', 'কাম সেপ্টেম্বর', 'রিয়ার উইন্ডো', 'দি অ্যাপার্টমেণ্ট' গোছের ছবিও তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের প্রযোজকদের দৃষ্টিভঙ্গীও যেমন মান্ধাতা আমলের (তাঁদের দোষ কি?) আমাদের শিল্পীরাও তেমনই অভিনয় ছাড়া শিল্পীর অন্যান্য দায়িত্ব পালনে অক্ষম। দু'পাঁচজন মোটর হাঁকাতে পারেন বটে, কিন্তু আর কোনো রকম কসরতই তাঁদের ধাতস্থ নেই। বন্দুক-রিভলবার ধরা, সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া, মাউণ্টেনিয়ারিং, ফেন্সিং, বক্সিং বা স্ট্রীট ফাইটিং করা, জিমন্যাস্টিক করা, এমন কি ভালো রকম দৌড়ানো পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা হবে না। আগে দু'-একজন তবু নিজের গলায় গানটা করতে পারতেন; এখন প্লে-ব্যাকের কৃপায় তাও ইতি হয়ে গেছে। কি সম্বল নিয়ে আমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পোন্নত চলচ্চিত্রসৃষ্টির স্বপ্ন দেখব? বাঙলাদেশে চলচ্চিত্র প্রযোজনার ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এ ব্যবসা বেশী দিন চলবে বলে ভরসা হয় না।

মঞ্চাভিনয়

ওরা থাকে ওধারে ঃ মুখোশ সম্প্রদায়ের নিবেদন; নাটক ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র; পরিচালনা ঃ পিকু নিয়োগী; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ তরুণ প্রসাদ; মঞ্চ-পরিকল্পনা ঃ তরুণ রায়; আলোক-সম্পাত ঃ শ্যামসুন্দর; রূপায়ণ ঃ সুশীল রায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, পিকু নিয়োগী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবোত্তম চক্রবর্তী, মাঃ মানস, কৃষ্ণা রায়, বেলা রায়, মঞ্জু ব্রহ্মচারী, তপতী মণ্ডল, মিতা প্রভৃতি। দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেণ্টার হলে গেল ২রা অক্টোবর থেকে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে।

অন্ততঃ বছর দশেক আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত কাহিনী অবলম্বনে সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় তোলা উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত "ওরা থাকে ওধারে" ছবি চলচ্চিত্রের দর্শকমহলে বেশ একটা সোরগোল তুলেছিল। যতদূর মনে পড়ে, ওই ছবির মারফতই সুচিত্রা সেন দর্শক-বৃন্দকে প্রথম অভিবাদন করেন। মুখোশ অভিনীত "ওরা থাকে ওধারে" সেই চিত্র-কাহিনীরই মঞ্চরূপ। এবং এই রূপদান করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই। মঞ্চাভিনয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত ও অজয় কর পরিচালিত 'আর ডি বি'র "সাত পাকে বাঁধা" ছবির একটি নাটকীয় মুহূর্তে সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল।

দেখবার পর মনে হচ্ছে, মঞ্চরূপটি চিত্ররূপ থেকে ঢের বেশী মূল্যবান, ঢের বেশী জমাট। বহু ছোট দৃশ্যে বিভক্ত হ'লেও উপস্থাপনার চাতুর্যে নাটক হয়েছে সুন্দরভাবে গতিশীল; একটি মুহূর্তের জন্যেও দর্শককে ক্লান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয় না। এ-বিষয়ে তরুণ রায়ের দৃশ্য পরিকল্পনাও কম সাহায্য করেনি। জানলা ও দরজাযুক্ত একটি চলনক্ষম দেয়ালের সাহায্যে তিনি দুই সংলগ্ন বাড়ীর দৃশ্যগুলিকে এমন জীবন্ত ক'রে তুলেছেন যে মনে হয়, ঐ-রকম মঞ্চস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ না করলে নাটকটির অঙ্গহানি হ'ত। এছাড়া সময় সময় একটি অতিরিক্ত প্রবেশপথের সুষম ব্যবহার নাট্যগুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন ভূমিকায় তরুণ রায়ের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাই।

নাট্য পরিচালকরূপে পিরু নিয়োগীরও এই প্রথম পদক্ষেপ অতি মাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত। তিনি নাট্য কৌতূহলকে অটুট রাখবার জন্যে যে-ভাবে পাত্রপাত্রীর সংলাপ, ভঙ্গী, গতি, মূকাভিনয়, কার্যকলাপ এবং আবহ ও দৃশ্যপরিবর্তন-কালীন সঙ্গীতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেছেন, তা' সবিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। কিছুক্ষণ চড়া সুরের কথাবার্তার পর মাত্র নীরব অ্যাকশনের সাহায্যে নাটকটিকে কয়েকবার এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি যে-ভাবে নাটকীয় ছন্দ সৃষ্টি করেছেন, তাতে তাঁকে অভিনন্দিত না ক'রে পারি না।

সঙ্গীত-পরিচালকরূপে যিনি পরিচালক পিরু নিয়োগীকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেছেন, সেই তরুণপ্রসাদও একজন নবাগত। কিন্তু নাটকীয় অ্যাকশন, এমন কি পাত্রপাত্রীদের প্রতিটি গতিভঙ্গীর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সমতা রক্ষা ক'রে তিনি যে সঙ্গীত-রচনা করেছেন, তা' তাঁর অসামান্য গুণপনার পরিচয় বহন করে। কণ্ঠ-সঙ্গীত দুটির ভাষা ও সুর স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী এবং অত্যন্ত উপভোগ্য।

আলোক নিয়ন্ত্রণে শ্যামসুন্দর নাট্য প্রয়োজনকে অনুসরণ করেছেন।

"ওরা থাকে ওধারে"র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ঝগড়া আজকাল আমাদের বাড়ীর মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। দেশ বিভাগের পর পদ্মার অপর পার এখন বহু পূর্ব-বঙ্গীয়ের কাছেই বহু দূরের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাই আমাদের বাড়ীর সেজ বৌয়ের বাপ ফরিদপুরের পিতৃ-পিতামহের ভিটা ছেড়ে চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন, তেমনই আপনার বাড়ীর ছোট জামাই আসলে ঢাকার ছেলে হ'লেও বর্তমানে দুর্গাপুরের ইঞ্জিনীয়ার। "ওরা থাকে ওধারে"র হরিমোহনবাবু এবং শিবদাস-বাবুরাও এক পাঁচিলে বসবাসকারী দুই প্রতিবেশী— প্রথমজন, পশ্চিমবঙ্গীয় অর্থাৎ ঘটি এবং অপরজন পূর্ববঙ্গীয় অর্থাৎ বাঙাল। প্রতিবেশী হ'লে যা হয়, এ'দেরও ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি: কখনও ভাব, আবার কখনও ঝগড়া। দুই গৃহস্থের মধ্যেই এটা-ওটা দেওয়া-নেওয়া আছে, আবার সামান্য কথায় মুখ দেখা-দেখি বন্ধও আছে। কিন্তু এ বাড়ীর বাচ্ছা মেয়ে রিণি যেমন ও-বাড়ীর সমবয়সী নানুর সঙ্গ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না, তেমনই ও-বাড়ীর পড়ুয়া মেয়ে প্রমীলা এ-বাড়ীর কলেজে-পড়া ভালো ছেলে চঞ্চলকে পারে না তার মনের মণিকোঠা থেকে দূর করতে। পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম্য দিদি যশোদার এই দুই পরিবারের মধ্যে একটি স্থায়ী সেতুবন্ধনের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত কেমন ক'রে সফল হ'ল, তাই দিয়েই নাটকটির সমাপ্তি। প্রচুর হাস্যরসের অবতারণার মধ্যে দিয়ে শুরু হ'লেও নাটকটি দ্বিতীয়াংশে অত্যন্ত সহজেই বেদনাসিক্ত পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে এবং সেই বেদনার গুরুভার দর্শকের চোখকে করেছে অশ্রুসজল। সমস্ত আবহ যখন গভীরভাবে বেদনার্ত, ঠিক তখনই গেল এক ঝটকায় মেঘ সরে—আবার হাসি, আবার আনন্দে সমস্ত মঞ্চ হয়ে উঠল আলোয় ঝলমল। হাসি থেকে দুঃখকে এনে আবার হাসিতে ফিরে যাওয়া—নাটক বা ছবির মধ্যে এ যে কি দুঃসাধ্য সাধনার ব্যাপার, তা' অভিজ্ঞ নাট্যরসিক ব্যক্তিমাত্রই জানেন—এই দুরূহ চেষ্টায় বহু ব্যক্তিকেই ব্যর্থতা বরণ করতে দেখেছি। কিন্তু মুখোশ-সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্য-গুণে প্রেমেন্দ্র মিত্র এই অসাধ্য জিনিসই, মনে

হয় যেন, অতি সহজেই সুসাধ্য করতে সক্ষম হয়েছেন।

অভিনয়ে মুখোশ-সম্প্রদায় তাঁদের সর্বজনবিদিত টীম ওয়ার্কের বা দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও এঁদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমেই করা উচিত, তিনি হচ্ছেন হরিমোহনের ভূমিকাভিনয়কারী সুশীল রায়। পরলোকগত ধীরাজ ভট্টাচার্যের পরে একদা সুশীল রায় পৌরানিক ছবির কৃষ্ণ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আজ অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে রঙ্গমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর সমস্যাজর্জর মানসর্বস্ব কর্তা হরিমোহনের ভূমিকায় তাঁর অত্যন্ত স্বাভাবিক সংবেদনশীল অনবদ্য অভিনয় তাঁর পূর্বখ্যাতিকে নিশ্চিতভাবে ম্লান ক'রে দিয়েছে। এমন জীবন্ত স্বাভাবিক অভিনয় ক্বচিৎ দেখা যায়। এর পরেই নাম করতে হয় পূর্ববঙ্গীয় কর্তার ভাগ্নে নেপালের ভূমিকায় পরিচালক পিকলু নিয়োগীর সরস সিরিও-কমিক অভিনয়ের। আশ্চর্য চোখমুখের ভঙ্গী, আশ্চর্য চলন-বলন,—এ ধরণের মনমাতানো অভিনয় যে সম্ভব, তা' চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এবং অভিনয় করেছেন গ্রাম্য দিদি যশোদার ভূমিকায় কৃষ্ণা রায়। মানুষ মানুষ: তা সে পূর্ববঙ্গেরই হোক, আর পশ্চিমবঙ্গেরই হোক। তাই যশোদার কাছে তাঁর ভাই শিবদাসও যা তার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হরিমোহনও তাই। এবং সেই কারণেই হরিমোহনের ছেলে চণ্ডলের সঙ্গে শিবদাসের মেয়ে প্রমীলার বিবাহে বাধা কোথায়, তা তিনি বুঝতেই পারেন না। ঘটি-বাঙালের ঝগড়া?—বেহাই না হ'লে কোঁদল করে সুখ কোথায়?—এই হচ্ছে সদাহাসাময়ী, স্পষ্টবক্তা, প্রাণধর্মে সজীব যশোদার সুস্পষ্ট অভিমত। কৃষ্ণা রায় এই ভূমিকাটি মঞ্চের ওপর জীবন্ত করে তুলেছিলেন। .. তাঁর অভিনয়গুণে যশোদা দর্শকের মন হরণ করে নিয়েছে। আর সুন্দর লেগেছে ছোট ছেলেমেয়ে নানু ও রিনির ভূমিকায় মাস্টার মানস ও মিতাকে; ওরা সত্যিই সুন্দর। এছাড়া 'মুখোশ' গোষ্ঠীর আর যাঁরা নিজ নিজ ভূমিকাকে যথাযোগ্য রূপদান ক'রে সামগ্রিক অভিনয়কে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন তারাপদ ভট্টাচার্য (শিবদাস), দেবোত্তম চক্রবর্তী (কার্তিক), অসিত বন্দোপাধ্যায় (চণ্ডল), মঞ্জু ব্রহ্মচারী (তরলা), বেলা রায় (প্রমীলা), তপতী মণ্ডল (মনোরমা), প্রণত ঘোষ (মিঃ ঘোষ-রাঙামামা), বাড়ীওয়ালার ভূমিকাভিনেতা (নাম জানা নেই) এবং গোবিন্দ চক্রবর্তী (কাবুলিওলা)।

"মুখোশ"-এর "ওরা থাকে ওধারে" এমন একটি প্রাণবন্ত নাট্যনিবেদন যা যে-কোনও নাট্যামোদীকে অজস্র খুশীতে ভরিয়ে দেবে।

বিবিধ সংবাদ

বহুরূপী সম্প্রদায়ের "দশচক্র" :

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে আজ যে ক'টি নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, "বহুরূপী"র স্থান নিঃসন্দেহে তাঁদের পুরোভাগে। এই "বহুরূপী" সম্প্রদায় আসছে রবিবার, ২৮শে অক্টোবর সকাল ১০টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে তাঁদের সর্বাধুনিক নাট্যপ্রয়াস "দশচক্র"-কে উপস্থাপিত করবেন। অবশ্য "দশচক্র"-কে এঁদের সর্বাধুনিক নাট্যপ্রয়াস বলা, বোধ করি, এক হিসেবে ভুলই হবে। কারণ প্রায় দশ বছর আগে এঁরা হেনরিখ ইবসেনের বহু বিতর্কিত ও বহু আলোচিত নাটক "অ্যান এনিমি অব দি পিপ্‌ল্"-এর এই বাঙলা রূপান্তরটিকে মঞ্চস্থ ক'রে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আজ এঁরা নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে নবতরভাবে "দশচক্র"কে উপস্থাপিত ক'রে সার্থকতর ব্যঞ্জনা এবং সুসংহত শিল্পপ্রযুক্তির পরিচয় দিয়ে দর্শকবৃন্দকে যে উন্নততর নাট্যরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করতে পারবেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

আত্মচেতনাহীন সংখ্যাগুরু জনসাধারণের মূঢ়তা এবং কুটিল স্বজনঘাতী স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে সমাজ-জীবনের মৌল সত্যান্বেষী এক নিঃসঙ্গ নায়কের জীবনযুদ্ধের এই কাহিনীটিকে মঞ্চে রূপায়িত করবেন নাটকটির নির্দেশক শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, লতিকা বসু, রমলা রায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাতের দায়িত্ব বহন করছেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিপ্রসাদ ঘোষ।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক সিংহলী চিত্র প্রদর্শন :

শনিবার, ২৭শে অক্টোবর ম্যাজেস্টিক সিনেমাতে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সভ্যবৃন্দের কাছে সিংহল দেশে তোলা যথার্থ সিংহলী ছবি "রেকাবা"(নিয়তির গতি) প্রদর্শিত হবে। ১৯৫৬ সালে তোলা এই ছবিখানিতে অভিনয় করবার জন্যে কোনো পেশাদারী শিল্পীকে নিযুক্ত করা হয়নি। ছবিখানির পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী ও সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে লেস্টার জেম্‌স্ পেরিস, উইলিয়ম ব্লেক ও টাইটাস ডি শিল্‌ভা।

রেণেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" :

মানিক দত্তগুপ্ত নিবেদিত রেণেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" ছবিখানি বহুদিন প্রতীক্ষার পর এম, জি, ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় আসছে মাসের মাঝামাঝি রাধা, পূর্ণ এবং অন্যান্য ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে বলে প্রকাশ। ছবিখানির শিল্পীরাও যেমন নতুন, তেমনই নতুন এর দুই পরিচালক—ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও সতীশ গুহ-ঠাকুরতা। এঁরা শিল্পীদের নিয়ে যখন চিত্রগ্রহণ করেছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সংলাপ গ্রহণ করেননি। পরে স্টুডিওতে তাদের মুখে সংলাপ সংযোজিত (ডাব'-ড্) হয়েছে। এ ধরণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা চিত্রজগতে ক্বচিৎ শুনতে পাওয়া গেছে। ছবিখানির তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শম্পা, শঙ্কর ও বাদল নামে তিনজন নবাগত। অবশ্য সঙ্গীত-পরিচালনায় দেখতে পাওয়া যাবে স্বনামধন্য রবিশঙ্করকে।

সানফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবার জন্যে ছবিখানি মনোনীত হয়েছে।

এস, পি প্রোডাকসন্স-এর শুভ মহরৎ :

গেল ৮ই অক্টোবর, দুর্গানবমীর দিন চন্দননগরের লথরাজ ভবনের দুর্গামণ্ডপের পবিত্র পরিবেশে নবগঠিত চিত্র-

আর ডি বনশল প্রযোজিত ও বিনু বর্ধন পরিচালিত 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে বিশ্বজিৎ, তন্দ্রা বর্মন ও পাহাড়ী সান্যাল।
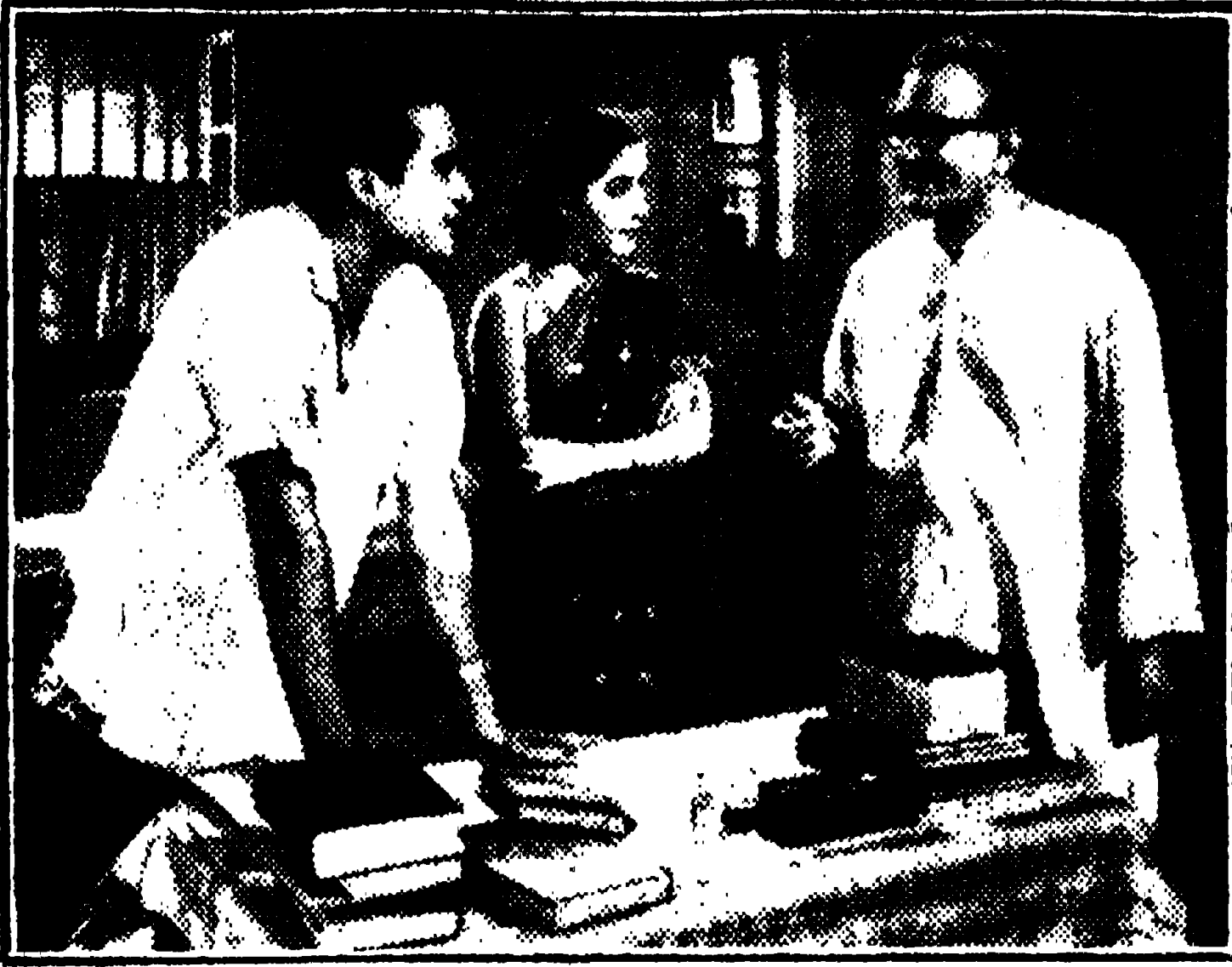
প্রতিষ্ঠান এস. পি. প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রের শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এম. এল. এ এবং মঙ্গলাচরণ করেন ডঃ তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে বহু শিল্পী, সাংবাদিক এবং চিত্রজগত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিখানি গ'ড়ে উঠবে। প্রযোজনায় রয়েছেন ইউ. আর. সিং এবং সি. এল. পোদ্দার।

রাধারাণী পিকচার্স-এর শুভ মহরৎ :

গেল শনিবার, ১৩ই অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে রাধারাণী পিকচার্সের প্রথম ছবি, সুবোধ ঘোষ লিখিত কাহিনী "শ্রেয়সী"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটির পরিচালনা করবেন শ্যাম চক্রবর্তী এবং এতে সুর-সংযোজনা করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, পদ্মা দেবী, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, হরিধন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীকে। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশনসত্ত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর "প্রেমপত্র" :

আজ শুক্রবার, ২৬এ অক্টোবর থেকে বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর নবতম চিত্র-নিবেদন "প্রেমপত্র" ক্যালকাটা ফিল্মস্ সেণ্টার-এর পরিবেশনায় হিন্দ, কৃষ্ণা, রূপালী, মেনকা, পদ্মশ্রী এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বিমল রায় পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সাধনা শিবদাশানী, শশী কাপুর, পদ্মা, সীমা, মাধবী, প্রবীণ চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীকে। ছবিটির সুরযোজনা এবং চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে সলিল চৌধুরী ও দিলীপ গুপ্ত।

লণ্ডনে ভারতীয় নৃত্য অ্যাকাডেমি :

নৃত্যশিল্পী রামগোপাল সম্প্রতি লণ্ডনে ভারতীয় নৃত্য অ্যাকাডেমি স্থাপন করেছেন। এই সংস্থার উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর ক'রে আমার সুদৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, বিশ্বে নৃত্যের রাজধানী হবার গৌরবের অধিকারী হ'তে পারে একমাত্র লণ্ডন শহরই। একমাত্র ভারতীয়রাই যে আমাদের দেশের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যে পারদর্শিতা দেখাতে পারেন, এ-কথা আমি মানি না। আমি বিশ্বাস করি, উপযুক্ত শিক্ষালাভ করলে ইয়োরোপীয়রাও এতে সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন। আমি আশা করি, এখানে একটি ভারতীয় নৃত্য অ্যাকাডেমি গ'ড়ে উঠবে, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে নৃত্য, নাটকাভিনয় এবং সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারবেন। ব্যালে র‍্যাম্বার্ট বা রয়েল ব্যালের মতই প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটেনের কাছে যেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পায়।" এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্থানের প্রিন্স হাসান ডুরাণী, ভারতের প্রাক্তন চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ জেনারেল সার টমাস হাটন এবং রয়াল ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যাণ্ড সিলোন সোসাইটির অন্যতম সদস্য সার জন বারডার।

শ্রীসংঘের বিজয়া সম্মিলনী

সম্প্রতি উত্তর কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সংস্থা শ্রীসংঘের বিজয়া সম্মিলনী বাদুড়বাগান স্ট্রীটের পূজা-মণ্ডপে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের পৌরোহিত্য ও শ্রীসৌরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রধান আতিথ্য প্রীতিপূর্ণ ও হৃদ্য পরিবেশে সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবের সূচনা ঘটে শ্রীদ্বিপেন সিংহের কণ্ঠসঙ্গীতে।

এই সম্মিলনী উপলক্ষে শ্রীবিমল বসুর পরিচালনায় যে বিচিত্র অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রখ্যাত শিল্পীরা : নির্মলা মিশ্র, শ্যামল মিত্র, পান্নালাল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সত্য মজুমদার, অমর লাহা এবং তাঁর সম্প্রদায়, শিবনাথ দাশ, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অনুভা বসু, রামকমল চট্টোপাধ্যায়, স্বপন ভট্টাচার্য, বিভু ভট্টাচার্য, কমল সেনগুপ্ত, শান্তি মুখোপাধ্যায়, সত্য রায়, শৈলেন মুখো-

'নিশিথে'র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, নন্দিতা বসু ও রাধামোহন ভট্টাচার্য

পাধ্যায়, শ্যাম মুখোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত নন্দী প্রমুখেরা অংশ গ্রহণ করে একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানকে পরম রমণীয় ও উপভোগ্য করে তোলেন।

"কাঞ্চনরঙ্গ" অভিনয়

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতির গড়িয়াহাট শাখার উদ্যোগে শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীঅসিত মৈত্র বিরচিত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' গত ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম-হলে মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকের পরিচালক ছিলেন শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

সামগ্রিক বিচারে এই নাট্যাভিনয় সৌখীন অভিনয়-জগতে সমষ্টিগত অভিনয়ের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে শিল্পিগণ সকলেই প্রায় প্রশংসনীয় অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে পরদুঃখকাতর বটুর চরিত্রে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাঁচু, তরলা, যদুগোপালবাবু, গিন্নি ও অমরের ভূমিকায় শিল্পিগণ যথাক্রমে শ্রীদুলাল আঢ্য, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূপদ সমাজপতি, স্নিগ্ধা দত্ত ও সুব্রত চক্রবর্তী প্রশংসার দাবী রাখেন।

অন্বেষার নতুন নাটক

বিগত ১০ই অক্টোবর বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্যে উত্তর কলিকাতা সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজামণ্ডপে 'অন্বেষা' গোষ্ঠী তাঁদের নতুন নাটক "মহাগরুর নিপাত" মঞ্চস্থ করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার-অভিনেতা গঙ্গাপদ বসুর এই কৌতুক-রসাশ্রয়ী নাটকখানি পরিচালনা করেন স্বদেশ বসু। বর্তমান সমাজের কয়েকটি বিচিত্র চরিত্রকে তীব্র কশাঘাত করে লেখা এই নাটকখানিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—স্বদেশ বসু, প্রশান্ত সেন, সুশান্ত ভোস, সুনীল চৌধুরী, স্বরাজ বসু, শ্যামল দত্ত, দীনেন মণ্ডল, মৃন্ময় সরকার ও নমিতা পাল।

নাটকটির সুষ্ঠু প্রয়োগকর্ম ও উন্নত শ্রেণীর অভিনয়কলা এ'দের পূর্ব-খ্যাতিকেও ম্লান করে দেয় এবং সুধী দর্শকবৃন্দ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হয়।

'কাঞ্চনরঙ্গে' তরলার ভূমিকায় শেফালী ব্যানার্জি ও পাঁচুর ভূমিকায় দুলাল আঢ্য

স্পোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব

আগামী ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ স্পোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দগণ কর্তৃক "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটক অভিনীত হবে। বিশিষ্ট ভূমিকাগুলি রূপায়িত করবেন সর্বশ্রী রমাপদ ভট্টাচার্য, অসিত বসু, বিমল ঘোষ, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, মেনকা দেবী ও যতীন রায়।

চেনা-অচেনা

আগামী রবিবার আঠাশে অক্টোবর সকাল ন'টায় 'চেনা অচেনা' নাট্য সংস্থা কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" নাটকটি শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশনায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হবে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
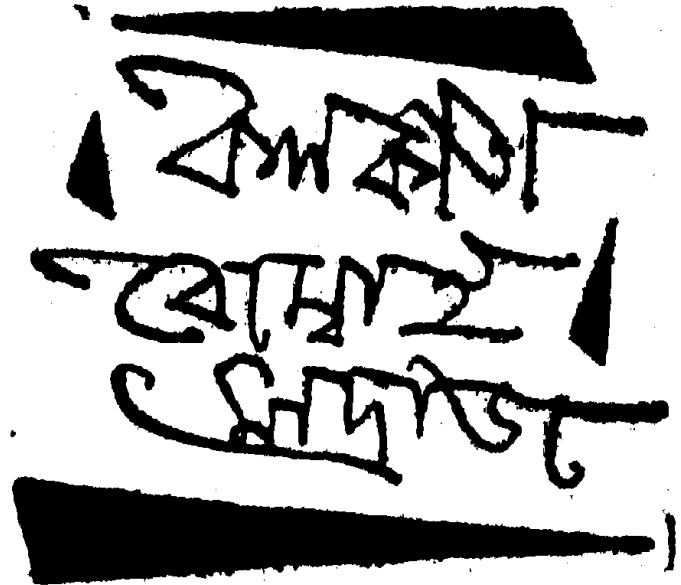
কলকাতা

উত্তমকুমার প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড এই নবগোঠিত চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থার পক্ষ থেকে গত শনিবার ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে 'ভ্রান্তি-বিলাস'এর সংগীত গ্রহণ করলেন সংগীত-পরিচালক শ্যামলকুমার মিত্র। এই মাসের শেষেই ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন প্রবীণ পরিচালক মানু সেন। বিদ্যাসাগর রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়,

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সবিতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানি, জয়নারায়ণ মুখার্জি, তমাল লাহিড়ী, ছায়াদেবী ও লীলাবতী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন অনিল গুপ্ত, হরিদাস মহালনবিশ ও সুনীল সরকার। ছবিটির পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের 'নন্দিগড়' মুক্তি প্রতীক্ষিত। সম্প্রতি রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয় অগ্রদূত গোষ্ঠী ছবিটি শেষ করলেন। এ ছবির কাহিনী লিখেছেন বিশ্বনাথ রায়। বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত এই চিত্রনাট্যে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী ও অপর্ণা দেবী। চিত্রগ্রহণ, সংগীত, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে বিভূতি লাহা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন রায়চৌধুরী।

সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সুবোধ ঘোষের 'শ্রেয়সী'-র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল। নবগঠিত রাধারাণী পিকচার্সের পক্ষ থেকে ছবিটি পরিচালনা করবেন শ্যাম চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, মঞ্জু দে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পদ্মাদেবী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

বধূ-খ্যাত পরিচালক ভূপেন রায় গত সপ্তাহে নতুন ছবি 'মহাতীর্থ কালীঘাট'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন রাধা ফিল্ম স্টুডিওয়। এছবির কয়েকটি গান গৃহীত হয়েছে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ঠে। সংগীত পরিচালনা করেছেন কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষ। দক্ষিণ কলকাতার আদি মন্দির কালীঘাটকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করছেন ধীরেন দে ও অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকালিপির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন নবাগত শঙ্করনারায়ণ (এ্যাঃ), শম্পা চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, অমর মল্লিক, রবীন মজুমদার, ভারতী-দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা বসু।

পরমহংস বাণী চিত্রের 'নবানুরাগে'-র সংগীত গ্রহণ করলেন টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সংগীত-পরিচালক ভি বালসারা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা বসু কন্ঠদান করেন। মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করবেন অসিতবরণ, বিকাশ রায়, কমল মিত্র ও মঞ্জুলা সরকার। ছবিটি পরিচালনা করছেন অতুলকুমার।

বোম্বাই

ভি, শান্তারাম প্রযোজিত ও যাত্রিক-পরিচালিত বাংলা ছবি মনোজ বসুর 'পলাতক'-এর সংগীত গ্রহণ করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রাজকমল কলা মন্দির স্টুডিওয়। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের লোকগীতি 'ঝুমুর' গানের কয়েকটি সুরে কণ্ঠদান করেন এই ছবির অন্যতম নায়িকা রুমা গুহঠাকুরতা, পঙ্কজ মিত্র এবং গীতা দত্ত। মোট আট-খানি গান এ ছবির সম্পদ। গানগুলি রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মুকুল দত্ত। কলকাতা এবং বোম্বে এই দুজায়গায় এ ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন চিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায়। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন অনুপকুমার ও রুমা গুহঠাকুরতা।

মোহন স্টুডিওয় এ, ভি, ফিল্মসের 'এক রাজ' ছবিতে সম্প্রতি একটি নৃত্যের দৃশ্যে গৃহীত হল যমুনা দেবীকে নিয়ে। কিশোরকুমারের কণ্ঠে এ ছবিতে গান শোনা যাবে। সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্র গুপ্ত। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শক্তি সামন্ত। কয়েকটি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যে আগা-র অভিনয় ভাল লাগবে।

সংগীত পরিচালক ইকবাল 'ইয়ে দিল কিসকো দুঁ' ছবির সম্প্রতি সংগীত গ্রহণ করলেন। শশী কাপুর এবং রাগিনী এ ছবির দুটি প্রধান চরিত্র। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন জয়শ্রী, জীবন, অমর, সজ্জন, মীরজা, কমল মেহেরা ও আগা। চিত্রগ্রহণে রয়েছেন অলোক দাশগুপ্ত।

পরিচালক রনু মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি 'সত্যাগ্রহ' ছবির বহির্দৃশ্যের জন্য গোয়ায় গেছেন সদলবলে। চন্দ্রদেব, লতা সিনহা, অমর, গুরুদর্শন ও ছায়া দেবী এ ছবির চরিত্রলিপি। সংগীত পরিচালনা করছেন স্বয়ং শ্রীমুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্রশিল্পী প্রতাপ সিনহা।

মাদ্রাজ

গুরু দত্ত-আশা পারেখ অভিনীত হিন্দী ছবি 'ভরসা'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদেশকুমার, নীনা, ললিতা পাওয়ার, পালসিকর, ওমপ্রকাশ ও মাসুদ। ছবিটি পরিচালনা করছেন কে, শঙ্কর। এ ছবির সংগীত পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন রবি এবং ভাসুদেব মেনন।

কানাড়া শিল্পী শ্রীমতী হরিণী 'নন্দাদীপা' ছবিটির প্রযোজনা করছেন। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন রাজকুমার এবং হরিণী। উদয়কুমার এবং লীলাবতী আছেন এই সংগে।

শিবাজী গণেশন সম্প্রতি তামিল ছবি 'নবরাত্রি'-র নায়করূপে নির্বাচিত হয়েছেন। নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবেন সাবিত্রী। ছবির পরিচালক হলেন এ, পি, নাগারঞ্জন।
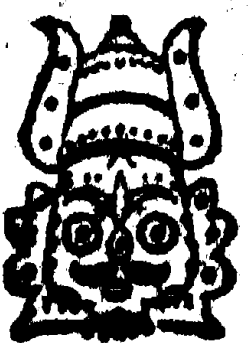
স্টুডিও থেকে বলছি

মা রাণী,

বড় হয়ে এ ডাক তুমি শোননি। এ নাম যে দিয়েছিল তারই সংগে তার মুখের এই আদরভরা দুটি অক্ষর সংসারের ধুলোয় মিশে গেছে। জজসাহেব যেদিন তোমাকে তাঁর পায়ের তলায় আশ্রয় দিলেন, মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। জেলের মধ্যে বসে কতদিন

সারারাত ছটফট করে কেটে গেছে। উনি মহাপুরুষ। আমায় বলেছিলেন, তোমার মেয়ে তোমারই রইলো। যখন সময় আসবে, তোমারই কোলে ওকে ফিরিয়ে দেবো।

তারপর এই এতগুলো বছর আমার রাণীকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি তোমার বাপ, আমার ঘরে তুমি জন্মেছিলে। কিন্তু তোমাকে দেখে বুঝলাম, পৃথিবীর কাছে এ দাবিটুকু কত তুচ্ছ! তার চেয়েও বড় দাবি তাঁদের, যাঁরা তোমাকে বড় করে তুলেছেন। তুমি আজ রাণী নও, তার চেয়েও বেশী তুমি মায়া। অবাক হয়ে ভাবছি, আমার মেয়ে; কিন্তু সে কত বড়!

মা রাণী, এই চিঠি যখন তুমি পাবে, আমি তখন অনেক দূরে চলে গেছি। ভাবছ, দেখা করে গেলাম না কেন। আমি বড় দুর্বল। তোমার মুখখানা দেখে পাছে আমার সব সংকল্প ভেসে যায়, তাই না জানিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

যাবার আগে তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি।

তোমার বাবা।

এই চিঠির ইতিহাস আছে গল্পের আরম্ভে। এ কাহিনী লিখেছেন জরাসন্ধ। গল্পের নাম 'ন্যায়দণ্ড'। চলচ্চিত্রে এর রূপ দিচ্ছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হল। 'ন্যায়দণ্ড' উপন্যাস আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। তবুও বলি। এই চিঠি লেখা শশাঙ্ক মণ্ডলের। সে যখন জেলে যায় তখন তার বউ এই কোট্ট একমাত্র মেয়েকে রেখে কলঙ্কের ভয়ে আত্মঘাতিনী হয়। এদিকে বিনা অভিযোগে যখন শশাঙ্কের দীর্ঘবছর জেল হল তখন জজসাহেব বি কে সান্যাল এই মেয়েকে পালন করার ভার নেন এবং মুক্তি পেলে তাকে ফিরিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এরমধ্যে তিনি 'রিটায়ার্ড' হয়েছেন। পাঁচ বছর পর যখন মায়াকে শশাঙ্কের হাতে তুলে দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন তখন শুনলেন সে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে চলে গেছে। শশাঙ্কও অনেক খুঁজেছে কিন্তু জজসাহেবের ঠিকানা সে পায়নি। শশাঙ্ককে না পেয়ে জজসাহেব মায়াকে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন। জজসাহেবের পুত্রবধূ অনিমার কোন সন্তান না হওয়ায় এই মায়াকে সে নিজের মেয়ের মত করে বড় করে তুললে। জজসাহেবের মেয়ে জয়ন্তীও এর দেখাশোনা করতো। রিটায়ার্ড লাইফ। জজসাহেব এরমধ্যে একমাত্র পেসকার কাশীনাথকে নিয়ে বাকী কটাদিন দেওঘরে কাটাবেন ঠিক করে মায়াকে নিয়ে চলে এলেন।

মায়া বড় হয়ে উঠলো। স্কুল ছেড়ে সে কলেজে পড়ে। তবুও জজসাহেব নিরাশ হননি। আজও তিনি সন্ধান নিয়ে চলেছেন শশাঙ্কের। এদিকে

জরাসন্ধের 'ন্যায়দণ্ড' ছবির সেটে আশীষকুমার ও অন্দ্রাবর্মণকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী

অনিমা এই মায়ার দুঃখ ভোলবার জন্য জয়ন্তীর কাছে দিল্লী চলে গেল। এলাহাবাদে জজসাহেব অর্থাৎ দাদুর সঙ্গে মায়া চলে এসেছে। এখানে কলেজের সহপাঠী সুবিমলের সঙ্গে মায়ার ঘনিষ্ঠতা হয়। টেনিস খেলা উপলক্ষ্য করে উভয়েই উৎফুল্ল। জজসাহেব লক্ষ্য করেছেন। তবে বাধা দেননি। কারণ মায়াকে তিনি আজ পর্যন্ত জানাননি তার আসল পরিচয়। কাশীনাথ দুয়েকবার জানাতে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে। ঠিক সাহস পায়নি।

শশাঙ্ক ভাল হবার চেষ্টা করেছে। সব কাজের মধ্যে একমাত্র উপলব্ধি তার মেয়েকে ফিরে পাবার। এরমধ্যে এক ফেরারী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আবার জেলে ভরতি হতে হল। এই জেলের মেজর ব্যানার্জি জজসাহেবের কথামত শশাঙ্কের মেয়াদ পূর্ণ হলে তার মেয়ের সন্ধান বলে দিল। শশাঙ্কের সে আনন্দ ভোলবার নয়। মিঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে চিঠি নিয়ে সে এলাহাবাদে এল মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে।

জজসাহেবের শরীর ভেঙে পড়ায় অনিমা দিল্লী থেকে চলে এসেছে। এখানে শশাঙ্ক এসে প্রথমেই দূরে থেকে তার মেয়ে মায়াকে দেখে নেয়

জজসাহেবের নির্দেশে দুচোখ ভরে। এরমধ্যে একদিন জজসাহেব মায়াকে তার আসল পরিচয়টা নির্মম জানিয়েদিলেন এবং তার বাবা শশাঙ্ক যে এসেছে তাকে ফিরিয়ে নিতে সে কথাও।

সমস্ত পৃথিবী আজ মায়ার বিরুদ্ধে। এতবড় সত্যি তার কাছে যেন সবটাই মিথ্যে। তবুও সে মন বেঁধেছিল। বাবার কাছেই সে যাবে। কিন্তু শশাঙ্কের সেই চিঠি—

মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় চিত্রগ্রহণ করছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী কানাই দে। শিল্পীযুগল ছিলেন তন্দ্রা বর্মণ ও আশীষকুমার। এলাহাবাদে সুবিমলের বাড়ীর দৃশ্যটি সেদিন চিত্রায়িত হচ্ছিল। সুবিমলের ঘরে মায়া এসে বলছে—

মায়া—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি সুবিমল। ওই লোকটাই নাকি আমার বাবা।

সুবিমল—অসম্ভব, কে বলেছে তোমাকে?

মায়া—জজসাহেব। এতদিন যাকে আমার দাদু বলে জেনে এসেছি।

সুবিমল—তিনি বলেছেন! কিন্তু ওকে দেখেতো মনে হয়—

মায়া—যা মনে হয় সে তো কিছুই নয়, আসল পরিচয় পেলে তুমি শিউরে উঠবে! আমি একজন চোরের মেয়ে, সুবিমল।

দৃশ্যটি গৃহীত হল একবার মহড়ার পর। মায়া এবং সুবিমলের চরিত্রে সার্থক অভিনয় করলেন তন্দ্রা বর্মণ ও আশীষকুমার। মায়া-চরিত্রের অভিনয়টি মনে দাগ কাটলো। শ্রীমতী বর্মণের অভিনয়-ক্ষমতা দেখে মনে হয় তিনি ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে নাম করবেন।

এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন জজসাহেব—রাধামোহন ভট্টাচার্য, কাশী পাত্র—জহর গাঙ্গুলী, সনাতন—রবি ঘোষ, নিতাই সরকার—তরুণকুমার, জয়ন্তী—অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রাধা—সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অনিমা—মঞ্জুলা সরকার এবং শশাঙ্কের চরিত্রে নিরঞ্জন রায়।

মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগে কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন সহপরিচালনায় অমর মুখোপাধ্যায় ও দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। আলোকচিত্র-সহকারী মধু ভট্টাচার্য। শিল্পনির্দেশনায় সুনীল সরকার। সম্পাদনা বি নায়েক। রূপকার শৈলেন গাঙ্গুলী এবং সংগীত পরিচালনায় ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।

—চিত্রদূত

ভিন্‌দেশী ছবি

।।অড্রে হেপবার্ণ-এর নতুন ছবি ।।

“মাই ফেয়ার লেডি” ব্রডওয়েতে দর্শকমনে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য এনেছিল। ‘মাই ফেয়ার লেডি’ এবার চলচ্চিত্রায়িত

অড্রে হেপবার্ণ

হচ্ছে। নায়িকা এলিজা ডুলিটল এর ভূমিকায় করবেন চিরকালের ‘কিশোরী’ অড্রে হেপবার্ণ। নাটকে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন রেক্স হ্যারিসন। চিত্রে তিনিই নায়ক হবেন সম্ভবত।

।। ক্রুকস অ্যানোনিমাস ।।

“ক্রুকস অ্যানোনিমাস”এর বাংলা কি হবে চট করে বলা শক্ত। তবে এই নামের ছবিতে “ক্রুকস অ্যানোনিমাস” একটি “বেনামী ধূর্ত সংঘ”। এই সংঘের সভ্যরা হল অতীতের দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। অপরাধ-প্রবণ দুর্বলমনা সহধর্মীদের সৎপথে ফিরিয়ে আনাই ধূর্ত সংঘের সভ্যদের পণ। এই ছবির নায়ককে এই সংঘের সংস্পর্শে বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছিল। লেসলি ফিলিপস-এর অদ্ভুত দুর্বলতা যে অন্যের পকেট দেখলেই তার হাতের আঙুলগুলো চুলকোতে থাকে। আর কোনো নির্জন সিন্দুক দেখলে যতক্ষণ না সেটা সে খুলছে ততক্ষণ তার কিছুতেই স্বস্তি নেই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে তার স্ট্রিপটিজ-নর্তকী প্রেমিকাকে নিয়ে। প্রেমিকাটি তাকে সাফ জবাব দিয়েছে এই বলে যে, সে যদি তার কদভ্যাস ত্যাগ করতে না পারে, তাহলে, কোনো সম্বন্ধ তার সঙ্গে রাখবে না সে। প্রেমিকাটি “ক্রুকস অ্যানোনিমাস” সংঘের নাম শুনে লেসলিকে ওদের ওখানে যেতে বলে। প্রেমের দায়—যেতেই হয় শেষ পর্যন্ত লেসলিকে।

সংঘের সভ্যরা ভালো ভাবেই গ্রহণ করে লেসলিকে। আরোগ্য করার জন্যে প্রথমেই তাকে একটা সার সার সিন্দুক ভর্তি ঘরে ‘বন্দী’ করা হয়। লেসলির আবার ভীষণ সিগেরেট খাওয়ার অভ্যেস। বন্দীদশাকে সহনীয় করবার জন্যে এক প্যাকেট সিগেরেট চাইল লেসলী। তাকে বলা হয় যে ঘরের সিন্দুকগুলোর একটাতে এক প্যাকেট সিগেরেট রাখা আছে। শুধু সিগেরেটই না, দেশলাই এবং খাবারদাবারও কোনো না কোনো সিন্দুকে রাখা আছে। সিন্দুক ভেঙ্গে ভেঙ্গেই তাকে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিতে হবে। এই অদ্ভুত “আরোগ্যশালায়” কিছুদিন বন্দী থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেলো লেসলী। তবে ঠিক হল বাইরে বেরিয়ে অপরাধেচ্ছা মনে উদিত হওয়া মাত্রই তাকে সংঘের জনৈক ‘গার্ডিয়েন এঞ্জেল’-এর কাছে এসে তার কু-ইচ্ছার কথা খুলে বলতে হবে। বাইরে এসে সে একটা স্টোরে কাজ পেলো। কিন্তু দোকানের সিন্দুকে আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের অস্তিত্ব আবার তার মনকে কুপথে টানতে থাকে। পূর্বনির্দেশ মত লেসলীকে স্মরণ নিতে হল সংঘের সে অভিভাবক সদস্যের। কিন্তু লেসলী সবিস্ময়ে দেখল ‘অভিভাবক’টি নিজেই আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের কাছে অসহায় আত্মসমর্পন করে ফেলল।

ছবির পরিণতি দর্শকদের উদ্দাম হাসির ধাক্কায় ফেলবে। জুলিয়াস উইণ্টল এবং লেসলি পার্কিন তাঁদের পূর্বতন ছবি “ওয়াল্টিং অফ দি টরেডোরস”-এর হাসিকে বর্তমান চিত্রে অট্টহাস্যে পরিণত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। চিত্রের ভূমিকালিপিতে আছেন জেমস রবার্টসন জাস্টিস, মাইকেল মেডউইন, রেমণ্ড হান্টলে, পলিন জেমসন এবং নায়িকার ভূমিকায় জুলি ক্রিস্টি। চিত্রটি পরিচালনা করবেন কেন অ্যানাকিন।

।।ক্যারল রীডের নতুন ছবি ।।

পরিচালক ক্যারল রীডের ছবির খবর স্বভাবতই উৎসাহের সঞ্চার করে। রীডের সাম্প্রতিক ছবির নাম “দি ব্যালাড অফ দি রানিং ম্যান।” এই চিত্রের নায়ক অ্যালেন বেটস। বেটস বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি “এ কাইণ্ড অফ লাভিং” চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। সহশিল্পীদের মধ্যে আছেন লরেন্স হারভে এবং লী রেমিক। ছবিটির বহির্দৃশ্য তোলা হবে স্পেনে এবং আয়ারল্যাণ্ডে। ক্যারল রীড নিজেই এই চিত্রের প্রযোজক।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

টেড ডেক্সটারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের এম সি সি ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে গেছে। এম সি সি দলের প্রথম খেলা পড়েছে ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। পার্থে গত ১৯শে অক্টোবর থেকে দুই দলের এই খেলা শুরু হয়েছে। এম সি সি দলের সফর শেষ হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সফর একশো বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত। ১৮৬২ সালে এইচ এইচ স্টিফেনসনের নেতৃত্বে প্রথম ইংলিশ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। ১৮৬৪ সালে জি পারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইংলিস ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াতে পাড়ি দেয়। এরপর ১৮৭৩ সালে ইংল্যান্ডের আধুনিক ক্রিকেট খেলার জনক ডবলিউ জি গ্রেসের নেতৃত্বে তৃতীয় ইংলিশ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াতে খেলতে যায়।

এই তিনটি সফরের খেলায় কোন দলই নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে নামেনি। ১৮৭৬ সালে জেমস লিলি হোয়াইটের নেতৃত্বে চতুর্থ ইংলিশ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় এবং সেই সময় থেকেই প্রতি দলে এগারজন ক'রে খেলোয়াড় নামানো সুরু হয়। এই সফরেই ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে (১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ)। এই প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রাণে জয়লাভ করে। ১৮৭৬-৭৭ সালের এই অস্ট্রেলিয়া সফরে দুই দেশের মধ্যে দুটো টেস্ট খেলা হয়। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী হয়। ফলে টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান দাঁড়ায়। ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক ছিলেন জেমস লিলিহোয়াইট এবং অস্ট্রেলিয়া দলের ডি ডব্লু গ্রেগরী। ইংল্যান্ড দলের সকলেই ছিলেন পেশাদার খেলোয়াড়। প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম বলটি মারেন অস্ট্রেলিয়ার সি ব্যানারম্যান। তাছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। এই প্রথম টেস্ট খেলায় ব্যানারম্যান ১৬৫ রাণ ক'রে শেষকালে আহত অবস্থায় অবসর নেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল প্রথম ইংল্যান্ড সফরে যায় ১৮৭৮ সালে। এই সফরে কোন টেস্ট খেলা হয়নি। ইংল্যান্ডে এই দুই দেশের প্রথম টেস্ট খেলা হয় ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ওভাল মাঠে। এই খেলায় ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট জয় ৭ রাণে, ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠে। এই টেস্ট খেলার ফলাফল উপলক্ষ করেই এই দুই দেশের টেস্ট খেলায় 'এ্যাসেজ' শব্দের ব্যবহার আজও সুপ্রচলিত। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ।'

১৮৬২ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ইংলিশ ক্রিকেট দল পনের বার অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। এ সমস্ত সফরই ছিল বে-সরকারী। দল গঠন এবং দলের সফর সম্পর্কে অন্যান্য দায়িত্ব কোন একটি ক্রীড়া সংস্থার উপর ছিল না। এ সমস্ত সফর সম্ভব হয়েছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। ১৯০৩ সাল থেকে এম সি সি সরকারীভাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে। এম সি সি-ই ক্রিকেট সফরের প্রধান দায়িত্ব নিয়েছে। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তেইশটি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। বেশী সংখ্যক টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে ইংল্যান্ড 'রাবার' পেয়েছে ৯ বার এবং অস্ট্রেলিয়া ১২ বার। ২ বার (১৮৭৬-৭৭ ও ১৮৮২-৮৩) টেস্ট সিরিজ ড্র গেছে।

পিটার মে'র নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দল অস্ট্রেলিয়াতে শেষ টেস্ট সিরিজ খেলেছিল ১৯৫৮-৫৯ সালে। এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৪-০ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' বা 'এ্যাসেজ' পেয়েছিল। একটা খেলা ড্র ছিল। অস্ট্রেলিয়া দল পরিচালনা করেছিলেন রিচি বেনো। এর পর ১৯৬১ সালে রিচি বেনোরই নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল ইংল্যান্ড সফরে যায় এবং ২—১ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে 'এ্যাসেজ' নিজেদের অধিকারে রাখে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪৫টা টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। টেস্ট সিরিজের ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ২১ এবং অস্ট্রেলিয়ার জয় ২১ বার। ৩ বার টেস্ট সিরিজ ড্র গেছে। উভয় দেশের মধ্যে টেস্ট খেলা হয়েছে ১৮৩। ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৭৬, ইংল্যান্ডের জয় ৬৩ এবং খেলা ড্র ৪৪।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে কোন টেস্ট খেলা হয়নি। ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে পুনরায় টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া যুদ্ধপরবর্তী টেস্ট সিরিজে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৬-৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৫০-৫১) 'এ্যাসেজ' পায়। তারপর লেন হাটনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দল ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার ক'রে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৩, ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৬) 'রাবার' লাভ করে। পিটার মে'র নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দল ১৯৫৮-৫৯ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে 'এ্যাসেজ' হাতছাড়া করেছে। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার দখলেই 'এ্যাসেজ' থেকে যায়। সুতরাং ১৯৬২-৬৩ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যান্ড দল যদি 'এ্যাসেজ' না নিতে পারে তাহলে রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া উপর্যুপরি তিনবার 'রাবার' পাবে। অনেক ক্রিকেট সমালোচক এবং রসিকজনের মতে আসন্ন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের খেলা হবে বাঘ-মহিষের লড়াইয়ের মত যেমনটি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট সিরিজে (অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬০-৬১)। ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার এবং অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি দলের ম্যানেজার ডিউক অব নরফক নিজ দলের শক্তি সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। কিন্তু এম সি সি দলের সঙ্গে ভ্রমণরত প্রখ্যাত এ্যাথলীট গর্ডন পিরিন সঙ্গে এম সি সি দলের অধিনায়ক এবং ম্যানেজারের প্রকাশ্যভাবে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। খেলোয়াড়দের শারীরিক যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে

অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জয়লাভী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দল। হাওড়া স্টেশনে স্যার আশুতোষ স্মৃতি ট্রফি সহ খেলোয়াড়বৃন্দ এবং মধ্যস্থলে রেক্টর শ্রীত্রিগুণা সেন

গর্ডন পিরিকে দলের সঙ্গে আনা হয়েছে। গর্ডন পিরি এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের শারীরিক যোগ্যতা নেই এবং দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনারও যথেষ্ট অভাব আছে। খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত মদ্যপান সম্পর্কেও তিনি কটাক্ষ করেছিলেন। পিরির অভিযোগ, এম সি সি দলের খেলোয়াড়রা শরীর-পালন সম্পর্কে তাঁর উপদেশের প্রতি কোন রকম কর্ণপাত করেন না। পিরির মতে, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা কঠোর ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে শারীরিক যোগ্যতা লাভ করেন এবং তাঁরা এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের তুলনায় অনেক বেশী কর্মক্ষম। গর্ডন পিরি এম সি সি দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের স্ফীত উদরের প্রতি মন্তব্য করেছেন এবং শেষে তিনি বলেছেন, সমস্ত বিষয়টি আমি ক্রিকেট অনুরাগীদের হাতে ছেড়ে দিলাম, তাঁরাই দুই দলের খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করবেন। পিরির এই সব মন্তব্যকে দলের ম্যানেজার অনাবশ্যক আখ্যা দিয়ে বলেছেন, পিরি আমাদের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন; তাঁর সঙ্গে দলের আর কোন সম্পর্ক নেই। ম্যানেজারের বিবৃতিতে দেখা যায়, দলের শক্তি সম্পর্কে তাঁর এবং অধিনায়কের কোন দুর্ভাবনা নেই।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার আসন্ন টেস্ট খেলা নিয়ে পন্ডিত মহলে ইতিমধ্যেই গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্রিকেট কত অনিশ্চিত খেলা—এর ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা কত যে বোকামী তা জেনেও সমালোচকরা লোভ সংবরণ করতে পারেন না। একদল সমালোচকের মতে 'রাবার' পাওয়ার সম্ভাবনা দুই দলেরই সমান সমান আছে। দু'দলের মধ্যে শক্তির তফাৎ উনিশ-বিশ। আবার অনেকে বলেছেন, ব্যাটিংয়ের দিক থেকে ইংল্যান্ড খুব শক্তিশালী। ইংল্যান্ডের এই শক্তির উৎস হিসাবে তাঁরা এক নিশ্বাসে শক্তিশালী ব্যাটসম্যানদের নাম ক'রে গেছেন—ডেক্সটার, কাউড্রে, শেফার্ড, গ্রেভনী, ব্যারিংটন এবং পুলার। অন্য দল মাথা নেড়ে বলেছেন, সবই বুঝলাম—কিন্তু ফিল্ডিং এবং বোলিং? অস্ট্রেলিয়ার একটা মস্ত বড় সুবিধা, তারা নিজের দেশে খেলবে। সেখানের জলবায়ু এবং মাটির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নাড়ির সম্পর্ক। এই সমস্তের উপর অস্ট্রেলিয়া দল পরিচালনা করবেন রিচি বেনো; যাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, "মারিলে না মরে রাম, এ কেমন বৈরী।"

অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি দলের সতেরজন খেলোয়াড়ের মধ্যে চৌদ্দজন টেস্ট খেলোয়াড়ের টেস্ট খেলায় সাফল্য এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল। লেন কোলডওয়েল, ডেভিড লার্টার এবং এ্যালেন স্মিথ ইংল্যান্ডের পক্ষে এখনও টেস্ট ম্যাচ খেলেননি।

টেস্ট খেলায় সাফল্য

ব্যাটিং

	মোট টেস্ট	মোট রান	সর্বোচ্চ রান +
কাউড্রে	৫৩	৩৪১১	১৬০
গ্রেভনী	৪৮	২৫৯০	২৫৮
ব্যারিংটন	১৮	১১৪৩	১৭২
ডেক্সটার	৩০	২১২৭	২০৫
পুলার	২২	১৭৭৭	১৭৫
ট্রুম্যান	৪৫	৬৪৬	৩৯*
শেফার্ড	১২	৬০৮	১১৯
স্ট্যাথাম	৫৯	৫৯৯	৩৮
এলেন	১৯	৪৫৯	৫৫
ইলিংওয়ার্থ	১৪	৩২২	৫০
পারফিট	৪	২৪৫	১১১
মারে	৯	১৮৫	৪০
নাইট	৬	১৩১	৩৯*
টিটমাস	২	৩৯	১৯

বোলিং

	রান	উইকেট
স্ট্যাথাম	৫০১১	২১৩
ট্রুম্যান	৪২৭১	১৯৪
এলেন	১৭৮৯	৬০
ডেক্সটার	১১১৫	৩৫
ইলিংওয়ার্থ	৮৩৮	২০
নাইট	৪৮৫	১৪
ব্যারিংটন	৪৯৫	১০
টিটমাস	১০১	১

* নটআউট
+ এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান।

॥ ইংল্যাণ্ড : অস্ট্রেলিয়া ॥

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেঃ জয়ী	সিরিজ ড্র
ইংল্যাণ্ড	১২	৯	১
অস্ট্রেলিয়া	৯	১২	২
মোট	২১	২১	৩

টেস্ট খেলার ফলাফল

প্রথম টেস্ট : ১৫ই মার্চ, ১৮৭৭
শেষ টেস্ট : ২২শে আগস্ট, ১৯৬১

স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেঃ জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ড	২৫	২৩	৩৮
অস্ট্রেলিয়া	৩৮	৫৩	৬
মোট	৬৩	৭৬	৪৪

প্রথম টেস্ট

মাঠ	খেলার তারিখ
মেলবোর্ণ	১৫ই মার্চ, ১৮৭৭
সিডনি	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২
এডলেড	১২ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪
ব্রিসবেন	৩০শে নভেম্বর, ১৯২৮

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে রেকর্ড

টেস্ট খেলার ফলাফল

	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেঃ জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
সিডনি	১৫	১৯	২	৩৬
মেলবোর্ণ	১৪	২০	৩	৩৭
এডলেড	৬	১০	১	১৭
ব্রিসবেন	৩	৪	০	৭
মোট	৩৮	৫৩	৬	৯৭

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

সিডনি
ইংল্যাণ্ড : ২৮৭ আর ই ফস্টার, ১৯০৩-৪
অস্ট্রেলিয়া : ২৩৪ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ২৩৪ এস বার্ণেস ১৯৪৬-৭

মেলবোর্ণ
ইংল্যাণ্ড : ২০০ ডবলিউ আর হ্যামণ্ড, ১৯২৮-৯
অস্ট্রেলিয়া : ২৭০ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ১৯৩৬-৭

এডলেড
ইংল্যাণ্ড : ১৮৭ জে বি হবস, ১৯১১-২
অস্ট্রেলিয়া : ২১২ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ১৯৩৬-৭

ব্রিসবেন
ইংল্যাণ্ড : ১৬৯ ই হেনড্রেন, ১৯২৮-২৯
অস্ট্রেলিয়া : ১৮৭ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৬-৪৭

টেস্ট সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ড ৬৭ : অস্ট্রেলিয়া ৭৭

জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিজয়ী পশ্চিম বাংলার টেবল টেনিস এবং সন্তরণ দল
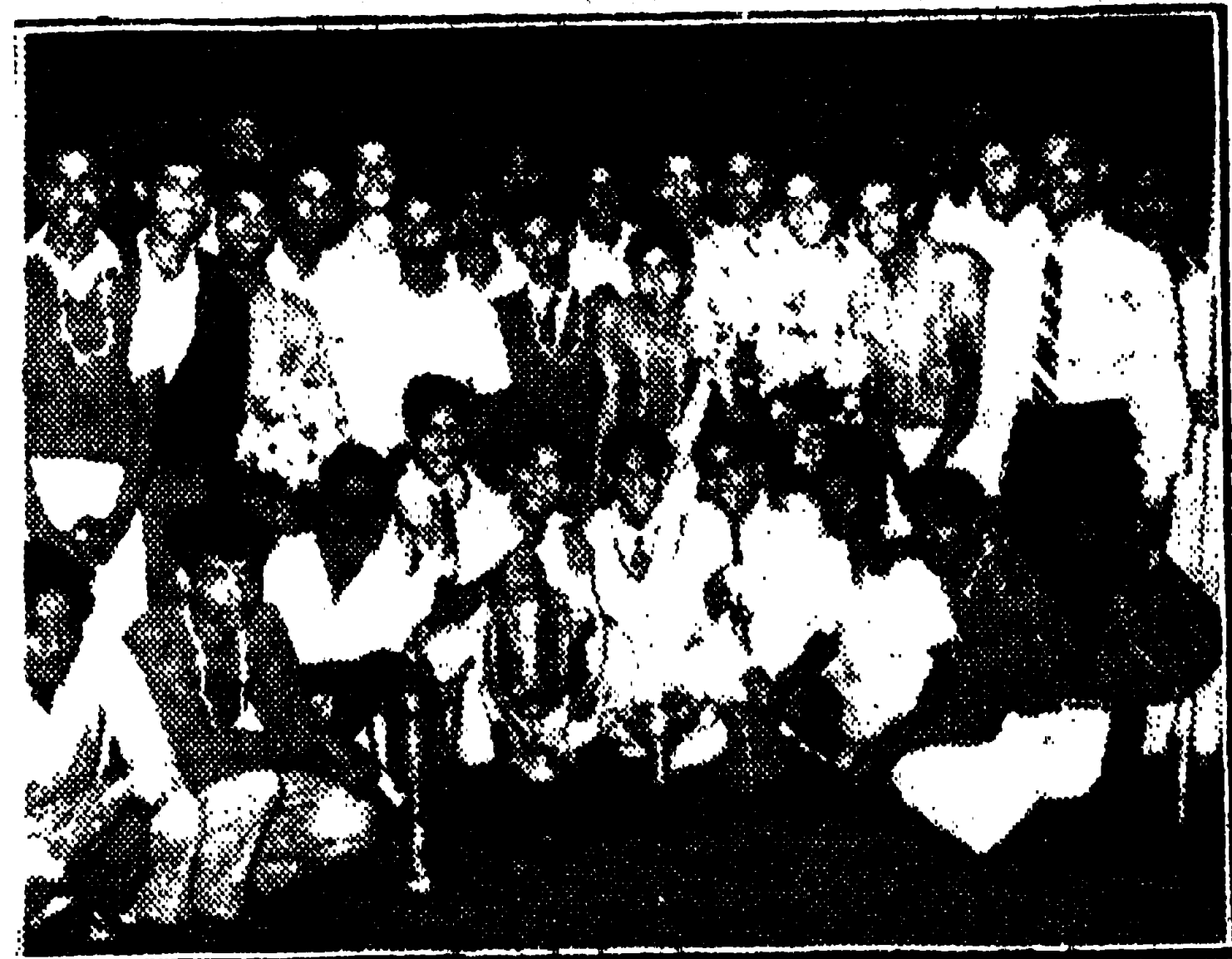
জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পশ্চিম বাংলা

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ

	ইংল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া
সিডনি	৪৫ (১৮৮৬-৮৭)	৪২ (১৮৮৭-৮৮)
মেলবোর্ণ	৬১ (১৯০১-২, ১৯০৩-৪)	১১১ (১৯০৩-৪)
এডলেড	১২৪ (১৮৯৪-৫)	১৩৩ (১৯১১-২)
ব্রিসবেন*	৩৪২ (৮ উইঃ ডিঃ) (১৯২৮-৯)	৬৬ (১৯২৮-২৯)

* ব্রিসবেনের ইকজিবিসন মাঠে।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণ

	ইংল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া
সিডনি	৬৩৬ (১৯২৮-২৯)	৬৫৯ (৮ উইঃ ডিঃ) (১৯৪৬-৪৭)
মেলবোর্ণ	৫৮৯ (১৯১১-১২)	৬০৪ (১৯৩৬-৩৭)
এডলেড	৫০১ (১৯১১-১২)	৫৮২ (১৯২০-২১)
ব্রিসবেন	৫২১* (১৯২৮-২৯)	৬৪৫+ (১৯৪৬-৪৭)

* ব্রিসবেনের ইক্‌জিবিসন মাঠে।
+ ব্রিসবেনের উলঙ্গাবা মাঠে।

॥ অস্ট্রেলিয়ান টেনিস ॥

উইম্বলেডন ডাবলস চ্যাম্পিয়ান বব হিউইট এবং ফ্রেড স্টোলী অস্ট্রেলিয়ান হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডেই অবাছাই জুনিয়ার জুটির কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার গত কয়েক বছরের টেনিস খেলার ইতিহাসে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা কখনও ঘটেনি।

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে ডাবলসের খেলায় হিউইট এবং স্টোলীর মনোনয়ন সম্পর্কে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এই ঘটনার পর তাঁরা কয়েক ধাপ নীচে নেমে গেলেন।

পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনালে রড লেভার ৬-২, ২-৬, ৬-৪, ৪-৬ ও ৮-৬ গেমে ফ্রেড স্টোলীকে পরাজিত করেন। লেভারের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় খেতাব লাভ এই প্রথম। পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে কেন ফ্লেচার এবং জন নিউকম এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে লেসলী টার্ণার জয়লাভ করেছেন।

॥ মহিলাদের জাতীয় হকি ॥

জয়পুরে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহীশূর ৪—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধের খেলায় মহীশূর দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। পুনরানুষ্ঠিত সেমি-ফাইনাল খেলায় মহীশূর ২—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে এবং মাদ্রাজ ২—০ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে (পুরুষ বিভাগ) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ৩—১ খেলায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে বোম্বাই দলের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য খর্ব করেছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৪৮-৪৯ সালে। প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে মাত্র এক বছর বাদে বোম্বাই দলই পুরুষ বিভাগে জয়লাভ ক'রে এসেছিল। বোম্বাইয়ের এই একটানা জয়লাভের পথে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১৯৪৯-৫০ সালে জয়লাভ করেছিল।

মহিলা বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ৩—২ খেলায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ছ'বার জয়লাভের রেকর্ড করেছে।

॥ ডেভিস কাপ ॥

আগামী ডিসেম্বর মাসের ১লা, ২রা এবং ৩রা তারিখে দিল্লীর জিমখানা কোর্টে ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলা হবে। এই ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবে সুইডেন বনাম মেক্সিকোর বিজয়ী দল। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে রমানাথ কৃষ্ণান, প্রেমজিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জি এবং আখতার আলীকে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত টেনিস কোচের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করবেন।

॥ বিশ্ব স্যুটিং প্রতিযোগিতা ॥

কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্যুটিং প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দলগত বিভাগের এগারটি অনুষ্ঠানের মধ্যে রাশিয়া দশটি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে। ব্যক্তিগত বিভাগে রাশিয়ার প্রতিনিধি ৬টি এবং আমেরিকার প্রতিনিধি ৫টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকার গ্যারি এন্ডারসন একাই তিনটি বিভাগে বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ ক'রে চারটি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

মহিলা বিভাগে রাশিয়ার প্রতিনিধি ছ'টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। অপর স্বর্ণপদকটি পান ভেনেজুলার প্রতিনিধি।

ক্লে পিজিন স্যুটিং অনুষ্ঠানে রাশিয়ার ভ্ল্যাডিমির এবং ভারতবর্ষের মহারাজা কার্ণি সিংয়ের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শেষ পর্যন্ত ভ্ল্যাডিমির ৯৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। মহারাজা কার্ণি সিং পান ৯৬ পয়েন্ট। ৩০০টি ক্লে পিজিন স্যুটিংয়ে উভয়েই ২৯৫ পয়েন্ট ক'রে পান। অতিরিক্ত ১০০ পিজিন স্যুটিংয়ে মহারাজা দু' পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

পশ্চিম জার্মাণ এ্যাথলেটিক দল

পশ্চিম জার্মানী থেকে একটি এ্যাথলেটিক দল ভারত সফরে আসছে। এই দলে আছেন সতেরজন এ্যাথলীট। জার্মানীর খ্যাতনামা এ্যাথলীটদের অনেকেই—যেমন আর্মিন হ্যারী, কিন্ডার, কফম্যান, পল স্মিট প্রভৃতি এই দলের সঙ্গে আসছেন না। ভারতবর্ষের তুলনায় জার্মানের ক্রীড়ামান অনেক বেশী উন্নত। সেই কারণে ভারতবর্ষের ক্রীড়ামানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জার্মান দলকে গঠন করা হয়েছে। তবে এই দলে কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ্যাথলীট আছেন। এই জার্মান দলটি ভারতীয় দলের সঙ্গে দিল্লী, যোধপুর, জলন্ধর, ক'লকাতা, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং বোম্বাই মোট এই সাতটি স্থানে টেস্ট পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ক'লকাতার টেস্ট খেলার তারিখ ৪ঠা নভেম্বর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার

ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলার—স্টেয়ার্স, গিলক্রিস্ট, লেস্টার কিং এবং ওয়াটসন ভারতবর্ষে খেলা শুরু ক'রে দিয়েছেন। লেস্টার কিং ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সঙ্গে 'নেট প্র্যাকটিশ' করবেন। কিং কলকাতায় তিনমাস থাকবেন। এই সময়ে তিনি দিলীপ সিংজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চল দক্ষের পক্ষেও খেলবেন। ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলী, বিজয় হাজারে, বিজয় মঞ্জরেকার এই চারজন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ করেছেন। এ'রা হাতে-কলমে তরুণ খেলোয়াড়দের কিভাবে ফাস্ট বল খেলতে হয়, তারই শিক্ষা দিবেন।

॥ ডি সি এম ফাইনাল ॥

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ১—০ গোলে বোম্বাইয়ের মফৎলাল গ্রুপকে পরাজিত করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭	সম্পাদকীয়		
৮	উত্তর	(কবিতা)	—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ
৮	অমন নিবিড় করে তাকাইনি আমি	(কবিতা)	—শ্রীপরিমল চক্রবর্তী
৮	বাসনা	(কবিতা)	—শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তী
৯	পূর্বপক্ষ		—শ্রীজৈমিনি
১১	প্রাবন্ধিক রজনীকান্ত গুপ্ত		—শ্রীপ্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত
১৪	মতামত		—শ্রীরথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য
১৫	শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন : নরউড-এর স্থপতি	(রহস্য কাহিনী)	মূল : স্যার আর্থার কোনান ডয়াল অনুবাদ—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২৩	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
২৫	মেঘের উপর প্রাসাদ	(উপন্যাস)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
২৯	হেরমান হেস্‌লে		—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
৩১	জানাতে পারেন		—শ্রীশান্তিগোপাল চক্রবর্তী, শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর ঘোষ, শ্রীমদনচন্দ্র মান্না, শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী ও শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়
৩৩	দুঃখের নদী	(গল্প)	—শ্রীখগেন্দ্র দত্ত

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৬ই কার্তিক, ১৩৬৯ বং—

Friday, 2nd November, 1962
40 Naya Paise.

ঝড় আসিল! সারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান ও ওয়াকিবহাল লোক মাত্রেই জানিত যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে—শুধু আমাদের কর্ণধারবর্গ সময়মত হুঁসিয়ার হইতে পারেন নাই। চীনের মতলব কি সে বিষয়ে ১৯৫৪ সাল হইতেই বেশ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল এবং ১৯৫৮ সালের পর আভাস-ইঙ্গিতের কোন প্রশ্নই ছিল না—প্রশ্ন ছিল শুধু কবে ও কোথায় চীনা অভিযানের আরম্ভ হইবে এবং সেই অভিযানের সংঘর্ষ কতটা প্রবল হইতে পারে।

যখন অভিযান আরম্ভ হইল, জনসাধারণকে জানানো হইল যে চীনারা সেই আক্রমণে শুধু বিপুল সংখ্যায় সৈন্যদল নিয়োগ করে নাই, সেই সঙ্গে তাহারা 'মাউণ্টেন গান', 'ভারী মর্টার' ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করিয়াছে। ছাপার অক্ষরে অজ্ঞ লোকের কাছে এই অস্ত্রগুলির নাম খুব ভয়ানক ঠেকে। কিন্তু আসলে আজিকার দিনে যে-কোনও আধুনিক ফৌজ যদি পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধ করে তবে এই অস্ত্রগুলি সাধারণভাবে তাহাদের হাতে দেওয়া হয়—যদি তাহাদের কর্তৃপক্ষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আমাদের কর্ণধারবর্গ হয় এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন নাহিলে বলিতে হয় যে তাঁহাদের "বলিহারি আক্কেল"।

বিদেশী কাগজের মারফৎ আমরা শুনিলাম যে নেফা অঞ্চলে আমাদের সৈন্যদের রসদ বা যুদ্ধ-উপকরণ সরবরাহের জন্য পথ-ঘাট কিছুই করা হয় নাই—যদিও বিগত চার বৎসর লালচীনের কর্তৃপক্ষেরা তাহাদের অভিযান চালাইবার জন্য তিব্বতের পাহাড়ী এলাকা কাটিয়া ভারী লরী ও কামানবাহী মোটর চালাইবার পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত একথা সারা জগৎ জানিত।

ফলে যাহা হইবার তাহাই ঘটিল। প্রথমে আমাদের সৈন্যদল পৃথক পৃথক ঘাটিতে সংখ্যায় বহুগুণে অধিক শত্রুসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও অসীম শৌর্যবীর্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া শেষে হটিতে বাধ্য হয়। তারপর আমাদের কর্তাদের টনক নড়ে এবং এখন চেষ্টা চলিতেছে অস্ত্র সংগ্রহের ও সরবরাহের। এখন দেশে-বিদেশে অস্ত্রের খোঁজ চলিতেছে—এবং পাওয়াও যাইবে তবে সময়মত নয়, দেরীতে।

একথা সত্য যে, এখন দোষ নিরূপণের সময় নয়। তবে এখন প্রয়োজন এই যে, যে পথে দেশকে এই বিপাকে ফেলা হইয়াছে, সেই পথের প্রদর্শকদের বলা যে যাহারা পথ জানে তাহাদের পরামর্শ এখন নেওয়া অত্যন্তই প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণায় সংকটপূর্ণ অবস্থা জ্ঞাপন ও অর্ডিন্যান্স দ্বারা ভারতরক্ষা আইনের পুনঃপ্রচলন হইবার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদলের মধ্যে উক্ত ঘোষণা ও অর্ডিন্যান্সজনিত জরুরী কাজ চালাইবার যে ছয়-জনের কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধকালীন দেশচালনার ব্যবস্থা করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একাধিক লোকের পরামর্শদাতা হিসাবে থাকা প্রয়োজন, যেরূপ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেই করা হয়। বর্তমানে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রীমহাশয়েরা ঐ কমিটিতে আসন পাইয়াছেন তাঁহাদের এসব বিষয়ে জ্ঞানের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে আমরা ভরসার কারণ পাই না।

ভরসা আমাদের আছে আমাদের সেনাদলের উপর। শৌর্য ও যুদ্ধবিক্রমের খ্যাতিতে তাহারা প্রতিষ্ঠিত এবং এবারের যুদ্ধেও তাহাদের সেই খ্যাতি উজ্জ্বলতর হইয়াই চলিয়াছে। এখন প্রশ্ন শুধুই অস্ত্রবলের এবং তাহার অনেক কিছুই আমাদের আনা প্রয়োজন বিদেশ হইতে—এমনই ব্যবস্থা আমাদের কর্ণধারবর্গের।

আর এক ভরসা যে আমাদের সৈন্যদল এখন যেখানে, সেখানে চীনা সেনাদলের অস্ত্র সরবরাহ ও রসদ পৌঁছান সহজ নয়, কেননা তাহাদের তৈয়ারী পথঘাট পিছনে পড়িয়াছে এবং তুষারপাতও আরম্ভ হইয়াছে।

সুতরাং ভয়ের কারণ নাই। দেশের লোক এখন আমাদের স্বাধীনতা ও ভারতমাতার পবিত্রভূমি রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন প্রয়োজন স্থিরবুদ্ধিতে ও বিনা অযথা বাক্যব্যয়ে যথাযথভাবে চীন অভিযান প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা। সমস্ত দেশ সজাগ ও উদ্যমশীল হইলে পরে আমাদের জয়লাভ সত্যই অনিবার্য।

কবিতা

উত্তর

শান্তিকুমার ঘোষ

কে ডাকে—"বেরিয়ে এসো তোমার কৈশোর থেকে
রক্তিম শিহর-লাগা ফাল্গুন অধীর হ'য়ে
বাইরে দাঁড়িয়ে।
দ্যাখো না কৌতুক নাচে তরুণ সবার চোখে
বন-ভোজনের পথে যুগল সাঁতারে চলে
শহর ছাড়িয়ে।"

"সময় কোথায় বলো"—আমি তাকে বলি ঃ
"সোনেহারি বাগ থেকে কিনারি বাজার
মনে মনে ঘুরি রোজ স্মৃতির শহর;
অন্ধকার স্বর যেন জলচক্র অবিরাম
দুঃখ প্রেম তৃষ্ণা ছেনে সাধ যায় বেঁধে নিই
দু-চারটে কলি।
আমাকে ডেকো না তাই"—তাকে আমি বলি॥

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাইনি আমি

পরিমল চক্রবর্তী

এমন নিবিড়ভাবে কোনোদিনও তাকাই নি আমি
আকাশের দিকে। এই সমর্পিত আতুর আকাশ
সমস্ত শান্তির উৎস; ধরিত্রীর ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
মধ্য-রাত্রে ভেঙে পড়ে হাওয়া হয়ে সব দুঃখকামী
কবি ও শিল্পীর দেহে; জীবনের ব্যাপ্ত অন্ধকারে
আলোর রূপক যেন ওই নীল আকাশের ছবি।
যত দেখি তত ডুবি আমি সেই তীব্র হাহাকারে,
দেখে দেখে মুগ্ধ হই ওই নীল শান্ত ভাবচ্ছবি।

অনেক ঘুরেছি আমি একাএকা স্বদেশে বিদেশে—
অনেক দুঃখের স্বাদ প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের মত
জীবনে পেয়েছি আমি। হৃদয়ের গভীরে অক্লেশে
বিষ জমা করে গেছি; দুঃখ আছে দাহ আছে যত
সমস্ত নিয়েছি বুকে, বুকে পেতে একাএকা। একা
লুকিয়ে রেখেছি প্রসন্ন আকাশের দীর্ঘ স্বপ্নরেখা॥

বাসনা

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

বাসনাকে কে রাখিস বুকে? কে রে তুই অবেলায়
মনের কামনাগুলি দীপে তুলে ভাসালি সাগরে
মন্ত্র জপে, গান গেয়ে। ওরে শোন, বাঘের শরীরে
চক্রকাটা ভয় আছে, সূর্য আছে গাছের মাথায়।

শীতের সাপের মতো যন্ত্রণারা গহ্বরের বুকে
নিঃশব্দ নিঃসাড় দ্যাখ। অন্ধকার শ্রাবণী সুপ্রিয়
প্রেম তাই স্বার্থলগ্ন, জীবনের একাকী আত্মীয়
আর সব মিথ্যা সত্য; ষড়ঋতু রূপের স্তবকে

একছন্দে সুর হয়; সময়েরা মদের মতন
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। তবু বারো মাস বরফ উত্তাপে
দিন রাত্রি বৃথা খোঁজা। অকস্মাৎ শেষরৌদ্র কাঁপে
বিরহী কম্পিত ঠোঁটে; থরোথরো জীবন্ত মরণ।

চেতনা রৌদ্রের ঢেউ; ভেঙে পড়ে নিশীথ গুহায়
দিন রাত্রি অন্তরংগ দেহবন্দী অন্য মোহনায়॥

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

এ বাজারে নিজের ইচ্ছেমতো একটি ভালো বাড়ি পাওয়া আশাতীত সৌভাগ্য। উদ্যোগী পুরুষ চেষ্টা করলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইত্যাদি হয়ত আয়ত্ত করতে পারেন, এমন কি সংসারের দুর্লভতম বস্তু ভালোবাসারও হয়ত সন্ধান পেতে পারেন, কিন্তু ভালো একটি বাসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বাস্তবিক, কবি যে বলেছেন—রমণীর মন সহস্র বর্ষের সাধনার ধন তাতে সময়টা একটু বেশি ধার্য হলেও একেবারে হতাশ হওয়ার কারণ ঘটেনি। কেননা, একের পিঠে গোটা তিনেক শূন্য বসালে হাজার নামক সংখ্যাটি হয়ত কোনো এক সময় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাড়ি, অর্থাৎ ভাড়াটেদের ভাষায় যাকে বলা হয় বাসা, সে বস্তু পাওয়ার জন্যে শূন্যের পর যতো শূন্যই বসানো যাক, শেষ অবধিও তবু ব্যাপারটা শূন্যের মতোই ফাঁকা-ফাঁকা থেকে যায়।

আমি শুনেছিলাম, এ সমস্যা কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে। বৃটেনে এ নিয়ে কয়েক বছর আগে কলরব শোনা গেছে, রাশিয়াতেও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ ঘটেনি। কাজেই বাড়ি নিয়ে অশান্তি ঘটলে মনে মনে বলেছি, এ যুগে জন্মে এ নিয়ে অস্থির হলে চলবে না—এ সমস্যাকে মেনে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন কাগজে একটা খবর দেখে আমার শান্তিভঙ্গ হল। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, লেখা রয়েছে—

"ভাড়াটেদের স্বর্গরাজ্য।

কানাডার কুইবেক শহরে বাড়িঘরের তুলনায় ভাড়াটের সংখ্যা এত কমে গেছে (যে) বাড়িওয়ালারা বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছে যে, নতুন ভাড়াটেদের প্রথম তিনমাস বিনা ভাড়ায় থাকতে দেওয়া হবে। তার-পর ভাড়া দেওয়া চলবে।"

কুইবেক শহর নিশ্চয়ই 'জলন্ধর সিটি' নয় যে, মন্দ্রপূত রেশমি রুমাল বা পাঁচ টাকার রেডিও সেটের বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকাটা জলের মতো বার করে নেবে। কিন্তু বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যাবে, এমন বিজ্ঞাপনও কি কেউ সহজ-সরল মনে গ্রহণ করতে পারে?

কলকাতার রাস্তায় এককালে অনেক বাড়ির গায়েই 'টু লেট' ঝুলতে দেখা গেছে। কিন্তু সেই সুবর্ণযুগেও কোথাও 'টু লেট—উইদআউট রেন্ট' বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েনি। এমন অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যার কথা কল্পনাই করেনি কেউ। আর আজ দেখা যাচ্ছে সেই অকল্পনীয় ব্যাপারটাই ঘটে চলেছে সাগরপারের অন্যদেশে। শুনে সমস্ত দেহমন 'যাই যাই' বলে সাড়া দিয়ে ওঠে বইকি!

আমার এক বিবাহোন্মুখ বন্ধুবর ত খবরটি পড়েই কানাডার পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করে আর কি। নেহাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জের কড়াকড়ি এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধই তার ইচ্ছেকে হাতকড়ি পরিয়েছে আপাততঃ। তবে এই নবমবার ধার্য বিয়ের তারিখের মধ্যে সে যদি একটা বাসযোগ্য ভাল বাসা না পায়, তবে,

কানাডা চলিনু হাম
হামে না ফিরাও রে

বলে সে বারকয়েক শাসিয়ে রেখেছে আমাদের। আপনারা ভাবছেন সে তাহলে এখন কি গাছতলায় রয়েছে! না গাছতলায় থাকে না বলেই বাড়ি তার আশু প্রয়োজন। গাছতলায় সন্ন্যেসীরাই (দিনের বেলায় ক্ষৌরকারগণ) থাকে। বন্ধুটি যখন বিয়ে করতে চাইছেন তখন তাকে সন্ন্যেসী বলাটা সম্ভবতঃ যুক্তিগ্রাহ্য হবে না। মাথা বাঁচাবার একটা ঠাঁই অবশ্যই অমরেশের আছে। কিন্তু বাস ওই পর্যন্তই। আর কিছুই বাঁচে না। বিছানা না, মেঝে না, টেবিলের কাগজপত্র না এমন কি একটা পয়সাও না। দুটো ঘর নিয়ে থাকে সে ভাড়া দেয় পঁচাত্তর। তার বক্তব্য সে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে দুটো ঘর নয়, দুটো নেটের মশারিই ভাড়া নিয়েছে। বৃষ্টির সময় শুধু ছাদ দিয়েই নয়—দেয়াল, জানালা, ফাটল, রেন-পাইপ দিয়ে জলপ্রপাত হতে থাকে ঘরে।

—বাড়িয়ালাকে বলিস না কেন? এক-বার বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম তাকে।

—বাড়িয়ালাকে বলবো? আরে এ হল সেই বাড়িয়ালা যে ঘরে জল পড়ার কমপ্লেন করলে বলে 'বৃষ্টির সময় জল না পড়লে কি কোকাকোলা পড়বে' বুঝলি?

॥ একটি ঘোষণা ॥

বাঙলা একাংকিকার ইতিহাস দীর্ঘকালের না হলেও সাম্প্রতিককালের কয়েকজন ক্ষমতাশালী নাট্যকারের অবদানে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। 'অমৃত' পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের এই নতুন সৃষ্টিকে আরও সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। একালের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নাট্যকারের একাংকিকা 'অমৃতে' প্রকাশিত হবে। সর্বপ্রথম থাকবে খ্যাতিমান নাট্যকার মন্মথ রায়ের রচনা।

—রেন্ট কন্ট্রোলে নালিশ করিস না কেন? ভাড়াত দিস পঁচাত্তর! বন্ধুকে তাতাবার চেষ্টা করি।

—সে ভয় কি আর দেখাইনি ভেবেছিস?

—তা—কি বললেন তখন?

—কি আর বলবে, কিছুই বললে না, করপোরেশনের বাড়ি ছাড়ার নোটিশটা দেখালো। বাড়িটা এত পুরোনো যে করপোরেশন নোটিশ দিয়ে দিয়েছে বাড়ি ছাড়ার। কাজেই আইনতঃ আমি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য......।

আমার চোখ তখন কপালের কাছাকাছি।

—নোটিশ দেয়া বাড়ি ভাড়া নিয়েছিস, চাপা পড়বি যে!

অমরেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস স্বরে বললে,

—মরি মরবো। বিয়েত আর করিনি এখনো! কে আর........

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আর বলা গেল না যে বিয়ে করলেও অবস্থার কোনো তারতম্য হত না।

অবশ্য অমরেশকে কিছুই বোঝানো যাবে না কিছু, যতদিন না একটি বাড়ি পাচ্ছে সে। নইলে সেদিন এসে আমায় বলে,—ভাবছি গাড়ী কিনবো!

—সে কি! গাড়ি কিনবি হঠাৎ, গাড়িতেই বৌ নিয়ে থাকবি নাকি?

—কেন সেই গল্পটা জানিস-না? একটা লোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলে একটা লোক গাড়ীর ধাক্কায় রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি, যে গাড়িটা চাপা দিয়েছে সেও সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়েছে। লোকটা চাপা-পড়া লোকটার ঠিকানা জানবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে ঠিকানা পেল একটা। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঠিকানায় গিয়ে বললে, 'দেখুন অমুক বাবুর বাড়ি ত এটা? বেশ। উনি গাড়ি-চাপা পরে মারা গেছেন, বাড়িটা আমায় ভাড়া দেবেন?' বাড়িয়ালা দরজা বন্ধ করতে করতে বললে, 'একটু আগে যে লোকটা চাপা দিয়েছে সে এসে ভাড়া নিয়ে গেছে।'

কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন বস্তু। আজ্ঞে হাঁ, 'টটোলজি' অর্থাৎ ছেঁদো-কথার (!) মতো শোনালেও কথাটা সত্যি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ভাড়াটে-সমাজের দুঃখদুর্দশার বিষয়ে অনেক বিধিব্যবস্থা, শলাপরামর্শ এবং পরিকল্পনার পরেও আমরা যে তিমিরে প্রায় সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছি। বরং বর্তমানে যা ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে তাতে 'তিমির'টা আরো একটু নিবিড় হবে বলেই মনে হচ্ছে। দিল্লির এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে সেদিন স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়েছে, বাড়ি নিয়ে এখন বাড়াবাড়ি করাটা জাতীয় প্রয়োজনের পরিপন্থী।

কাজেই অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। অপেক্ষা করব এবং নিষ্ফল বেদনায় লক্ষ্য করব কানাডার বাড়িওয়ালাদের কন্যাদায়সুলভ বিজ্ঞাপন, আর আমাদের বাড়িওয়ালাদের বরকর্তাসুলভ মনোভাব।

তারপর, তারপর আর কি? প্রতিদিন ঘুমের আগে আবৃত্তি করব মনে-মনে রবীন্দ্রনাথ লিখিত মধ্যবিত্ত ভাড়াটেদের এই বীজমন্ত্র—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
... ...
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

প্রাবন্ধিক রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত
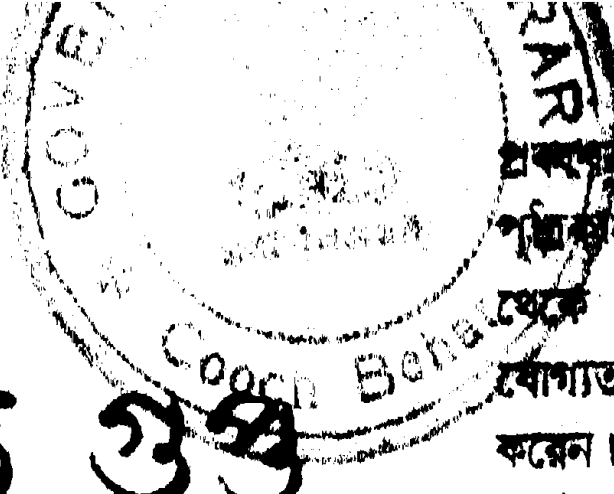
দেশের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ও জাতীয় ভাবের উদ্দীপ্তিতে এক সময় রজনীকান্ত গুপ্তের লেখনী সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিল। বঙ্কিম-পর্বের এই প্রাবন্ধিকের নাম আজ শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে প্রায় ইতিহাসেই পরিণত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে স্বদেশীয় লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও প্রাচীন গরিমাময় ঐতিহ্যের অনুশীলনে একদা একটি যুগ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। বিবিধ ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বগত রচনা-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিক চেতনার সংহত প্রেরণাই বলিষ্ঠ প্রকাশ-আকুলতা পেয়েছিল। অক্ষয়-ঈশ্বর পর্বে এই ধারার প্রবন্ধ রচনার যে সূত্রপাত তা স্বরূপতঃ পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের বিচার, বোধ ও বিশ্লেষণকেই অনুসরণ করেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়নে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের সংলক্ষ্য ভূমিকাটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে এবং বিশেষভাবে স্মরণে রেখেও এ মন্তব্য হয়তো করা চলে যে, অক্ষয়-ঈশ্বর পর্বে এই জাতীয় ঐতিহ্য উদ্ধার-প্রয়াসের মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চার প্রবর্তনাই আত্যন্তিক মূল্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতির বঙ্কিম-পর্বে রচিত ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে জাতীয় গৌরব-বোধের উচ্চসংস্পর্শ রূপটিই লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহী গবেষক গোষ্ঠীর মধ্যেই একটি অপরিহার্য নাম সংগুপ্ত হয়ে রয়েছে—তিনি রজনীকান্ত গুপ্ত। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থের বিভাগে ডক্টর সুকুমার সেন তাঁরই নাম সর্বাগ্রে দাবী করেছেন। দীর্ঘকালের বিস্মৃতির বিবর্ণতায় তিনি প্রায় স্মৃতিবহির্ভূত হয়ে পড়লেও তাঁকে নতুন করে স্মরণ করবার প্রয়োজন হয়তো রয়েছে।

রজনীকান্তের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তাঁর জীবনীর কয়েকটি সূত্রসন্ধান অবশ্য-কর্তব্য হয়ে পড়ে। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন সতু গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। পিতা তেওতা গ্রামনিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য। বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতা আসেন। এন্ট্রান্স অবধি পড়েন। কিন্তু শ্রবণশক্তি হ্রাসজনিত দুরদৃষ্ট তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হতে দেয়নি। আত্মীয়-গণের ইচ্ছানুসারে আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থে যাতায়াত কিংবা গভর্ণমেন্টের অধীন সাব-ডেপুটিগিরি কোনটাই তিনি করেন নি। কেননা তাঁর সর্বাঙ্গীণ মনোধর্মে বা মেজাজে বিষয়ান্তরের প্রেরণাই একমাত্র ধ্যেয় হয়েছিল। দুর্জয় সাহস ও ততোধিক আন্তরিকতা নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্যেই স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করতে চাইলেন। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন : "এই সময় হইতে তাঁহার বাংলা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত 'জয়দেবচরিত' বাংলা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়।"[২] প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে এই পুস্তক রচনা করেই তিনি রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পান। বাংলা ১২৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক তালিকায় তিনি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীই 'আর্যকীর্তি' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুপ্রাণিত সত্তাকে এ প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি স্বাদেশিক চেতনাবোধই প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অব লিটেরেচার' বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রূপান্তরিত হয় (১৮৯৪, ২৯শে এপ্রিল); ১৩০১ সালের সতেরোই বৈশাখ তারিখের অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুনর্গঠিত, নতুন কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত ও নিয়মাবলী নতুনরূপে নির্ধারিত হয়। এই সময় থেকেই পরিষদের মুখপত্র-স্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার প্রবন্ধধারা শুরু হল। রজনীকান্ত এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।[২] ১৩০১ থেকে ১৩০৩ পর্যন্ত রজনীকান্ত যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাখানি সম্পাদনা করেন। প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে মুদ্রণকার্য পর্যন্ত সবই তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হত। পরিষদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাগ্রসর মনের সান্নিধ্য সে সময়ে কতোখানি কাম্য ছিল, ১৩০৭ সালের পরিষৎ পত্রিকায় সে বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উল্লেখ করেছেন : "রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি রমেশ দত্ত রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। সাহিত্য পরিষদ যে যে প্রধান কার্যে এ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।" পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তিনি কতোখানি উদ্যোগী ও গভীরভাবে জড়িত ছিলেন 'সাহিত্য সাধক চরিত-মালার' উদ্ধৃত তিনখানি পত্রই তার প্রমাণ। তিনি উন্নত মানসিকতা নিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছিলেন : (১) বাংলায় পারিভাষিক শব্দের স্থিরতা না থাকার দরুণ যদৃচ্ছা পরিভাষা প্রণয়ন হচ্ছে—এই কারণে পরিভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করা উচিত।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষা নির্ধারণ বিষয়ে তিনি চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছিলেন : "এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্তব্য।"

(৩) বাংলার প্রাচীন কবিকুলের কীর্তি রক্ষা করা।

এই সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার নানা-

---

১ ভূমিকা : ভারত-কাহিনী (১৮৮৩)

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিষৎ পরিচয়' গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বর্তমান বর্ষের জন্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।"

—কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন, আষাঢ়, ১৩০১

মুখী রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তি-আত্মার উদ্গত নিষ্ঠাকেই চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর মোটামুটি নিম্নরূপ একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে :

১ম বর্ষ।	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, সাময়িক প্রসঙ্গ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালা রচনা
২য় বর্ষ।	"	সাঁওতাল পরগণার ছড়া, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য, সাময়িক প্রসঙ্গ (৪টি), সংক্ষিপ্ত সমালোচনা (২টি), অক্ষয়কুমার দত্ত
৩য় বর্ষ।	"	মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাময়িক প্রসঙ্গ,
৪র্থ বর্ষ।	"	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য
৫ম বর্ষ।	"	ইতিহাস রচনার প্রণালী
৬ষ্ঠ বর্ষ।	"	গ্রন্থ রচনা বিষয়ে প্রস্তাব

উপরোক্ত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিই নয়—রজনীকান্ত গুপ্তের প্রতিভার স্বীকৃতি অনন্য। তিনি হলেন ইতিহাসের ইতিহাসকার। রবীন্দ্রনাথ একবার ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "যদিবা ভারত-সাহিত্যে ইতিহাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।" এর পশ্চাতে ভারতীয় চিত্তের অধ্যাত্মমার্গী অন্বেষা কিংবা ভারতীয় চিত্তের একাগ্র হবার সংগঠন-গত ভাবের অভাব প্রভৃতি সূত্রসন্ধান স্বতন্ত্র প্রশ্ন। বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচনার উদ্যোগপর্বে (১৮১৪-১৯০৫) বিগতকালের ইতিহাসই অনাগত কালের প্রেরণা ও শক্তিরূপে কাজ করে, এমনি একটি মানসিকতার উপলব্ধি ঘটল বাঙালী-চেতনায়। হৃদ্‌গত এই অনুভূতিই তৎকালীন বিদ্যোৎসাহী চিন্তা-নায়কদের চালিত করেছিল। এই সূত্রে প্রসঙ্গত প্রবোধচন্দ্র সেনের গভীর বক্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে : "বাংলার পুরাবৃত্ত সন্ধানে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের নেতা ও উৎসাহদাতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) ; বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—৮৬) প্রমুখ তৎকালীন বাঙ্গালী পুরাতাত্ত্বিকদের মুখপত্রের স্থলবর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[৩] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১২৮১) পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমাদের ইতিহাস-চেতনার শূন্যতা বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন : 'মার্সম্যান স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ পূরণমাত্র।' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাহিত্যের পরেই

উল্লেখযোগ্য রজনীকান্ত গুপ্তের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৯১); চিন্তাহীন গতানুগতিক ধারার মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশিষ্টতা সঞ্চার করেছিলেন। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনা করেছেন রজনীকান্ত। পূর্বসূরী হিসেবে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতির পুরাতাত্ত্বিক ধারাকেই প্রথমদিকে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর 'জয়দেবচরিত' (১৮৭৩) কিংবা 'পাণিনি' (১৮৭৫)-তে সে প্রবণতার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বজাতির প্রতি গভীর আন্তরিক অনুরাগের বশে ভারতবর্ষীয় আধুনিক ইতিহাস পর্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'কেই তাঁর পাঁচ খণ্ড পুস্তকের বিষয়রূপে নির্বাচন করলেন।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাসের আলোচনার পথ সরল নয়। এ বিষয়ে দুটি বাধার উল্লেখ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রথমতঃ, ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্যে বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় নিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, আপন দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নয়। এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও একবার বলেছিলেন : 'সকল সভ্য দেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস ও জীবনী আগ্রহের সঙ্গে সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না।' এই জাতীয় ক্ষোভের মন নিয়েই বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন রজনীকান্ত। জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা সংরক্ষণ ও তার সর্বায়ত প্রকাশ পরিপুষ্টিই ছিল রজনীকান্তের স্বভাবজ ধর্ম। এই অন্তর্ধর্মের প্রেরণাতেই তিনি তাই বলতে পেরেছিলেন : 'স্বদেশের অতীত বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার সহিত বর্তমান বিষয়ক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই শোকসন্তাপ দূর করিবার উপায়। এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হইলে স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য।' (ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন : ভারত-কাহিনী পৃঃ ৬); এই কর্তব্যের বিষয়ে তিনি অতি সচেতন—তাই 'স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন কর্তব্য নহে।' ইতিহাসের পর্যালোচনা ক্ষেত্রে তাঁর নিভীক মন ন্যায়ের পক্ষপাত বর্জিত বিচারকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। আর তাঁর প্রাচীন ইতিহাসের সমালোচনাগুলি যেন বিনম্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি হয়ে উঠেছে। ভারতের পূর্বতন কাহিনী তাঁর হৃদয়ের প্রতি স্তরে একটি অখণ্ড মমতার অন্তরীপ বলেই এ বিষয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস না দেখে তিনি আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন : 'ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্যন্ত লোকসমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই।' (ভারত-কাহিনী পৃঃ ৩)।

ঐতিহাসিক সমালোচনাগুলির গূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি বিষয়ের গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবদিকের অসুবিধা-গুলিও উপলব্ধি করেছেন। অন্ধকারময় প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধানে পদে পদে দিশাহারা হবার যেখানে সম্ভাবনা সেখানেও তিনি নিভীক। অকম্প যুক্তির বিশ্লেষণে তিনি এগিয়ে গেছেন। 'ভারত-কাহিনী'তে তাই তিনি ইংরেজ রচিত ইতিহাসের অরঞ্জন বা অতি রঞ্জনকে নিভীকভাবে সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় যথার্থ ঘটনার বিপর্যস্ত রূপকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। প্রাচীন হিন্দু আর্যগণের প্রকীর্তিত মহিমা তাঁর ধমনীর মধ্যে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত ছিল বলেই ঐতিহ্যালোচনার সম্যক বিস্তার পরিচয় দিতে পেরেছেন তিনি। 'ভারত-

৩ বাংলায় ইতিহাস-সাধনা : প্রবোধচন্দ্র সেন

কাহিনী'র আর্যজাতি বিষয়ক প্রবন্ধটি যথার্থ ঐতিহাসিক সূত্রের বিবর্তন-গ্রাহ্য বিস্তারের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে। 'ভারতে গ্রীক' প্রবন্ধটিতে মেগাস্থিনিসের বিবরণানুযায়ী ভারতবর্ষীয় সাতটি শ্রেণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। 'আর্যকীর্তি' গ্রন্থ পর্যায়ের মধ্যে বীর ও বীরাঙ্গনা বাঙ্গালীর পরিচয় যেন লেখকের আত্মার শক্তি ও অন্তর্মুখী মনের বর্ণ দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কোন কোন স্থলে প্রবল আবেগ তাঁর কণ্ঠকে উদ্বেল করে তুলেছে। বর্ণনার মধ্য দিয়ে হৃদয়বত্তার উদ্বেলতা কতোখানি পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে— তারই নিদর্শন নীচের উদ্ধৃত অংশটি—লক্ষ্মীবাঈ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন: 'যদি কেহ মাধুর্যময় কোমল সৌন্দর্যের সহিত ভয়ংকর-ভাবের সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাতকমলের অঙ্গবিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণা-ধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্বতবিদারী ভৈরব রব শুনিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাঈ তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবেন।' (আর্যকীর্তি, তৃতীয় খণ্ড)।

'ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়' প্রবন্ধে ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রগতি-ভাবনায় তিনি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। ইংরেজ রচিত ভারতের ইতিহাস যেখানে অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত সেখানে যেমন তিনি তীব্র-কণ্ঠ, তেমনি আবার আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির মূলে ইংরেজ আধিপত্যের দান বিষয়েও তিনি মুক্তকণ্ঠ। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেছেন "'উচ্চশিক্ষা ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান ভারতবর্ষে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সর্বপ্রধান সংকার্য।' 'ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধটির মধ্যে প্রাচীন গ্রীস, রোম, চীন, ইংলন্ডের মুদ্রণ-স্বাধীনতার ধারা ও পারম্পর্য বিষয়েও আলোচনা আছে। ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটনের সময় মুদ্রণ-স্বাধীনতার গতিরোধ হলে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অপবাদে তিনি প্রচণ্ডরূপে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তার স্পষ্ট পরিচয় প্রবন্ধটির শেষে স্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। রজনীকান্তের ক্ষুব্ধ ভগ্ন-কণ্ঠের বেদনা সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে উচ্চারিত।

প্রধানতঃ আর্থিক প্রয়োজনেই তিনি স্কুলপাঠ্য কতকগুলি পুস্তক রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও বালকদের সুকুমার মনে স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি জাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'প্রবন্ধমঞ্জরীতে বৈজ্ঞানিক নানা প্রসঙ্গ ও নীতিজ্ঞান একটি অপূর্ব কথন-ভঙ্গীকে অনুসরণ করেছে। গুরুতর বক্তব্য বা দুরূহ তত্ত্ব বিষয়বস্তুকে দুর্ভর ও আচ্ছন্ন করে তোলেনি।

ইতিহাসের তথ্যের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণের আবেগকে উৎসারিত করে দিয়েছিলেন। পুরাণেতিহাসের সর্বস্বর মহিমাই তাঁর বাঙ্গালী তথা ভারতীয় মনকে আকর্ষণ করেছে। যুক্তি ও বিচারাশ্রয়ী তাঁর ইতিহাসবোধে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তায় উদ্দীপ্ত তাঁর প্রাণের আবেগ কখনও অন্ধ অনুরাগে পর্যবসিত হয়নি। সমগ্র মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ প্রবন্ধগুলির মৌলিক উৎস-ভূমি। এই চেতনাই রজনীকান্ত প্রতিভার চরম সিদ্ধি। তাঁর মনোলোকের গঠনই তাঁকে এই সিদ্ধির সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। কেন না তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে বুঝেছিলেন: 'আপনাদের পূর্ব গৌরব কাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই।'

কিন্তু এর পরেও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতিভার সর্বাঙ্গীন বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তা হ'ল তাঁর ভাষা-চেতনা। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাই যে তাঁর সৃষ্টির স্বক্ষেত্র—তাঁর রচনা-রীতি ও ভাষায় তার পরিচয় আছে। ইতিহাসাশ্রয়ী হয়েও তাঁর রচনা সাহিত্যরসবিবিক্ত নয়। ভাষারীতির ঔদার্য ও তীক্ষ্ণসচেতন বিশুদ্ধি ঐতিহাসিক বিষয়রসের বিস্তৃতি প্রকাশের সহায়ক হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাই রজনীকান্ত গুপ্তের ভূমিকাটি ঔদার্যের সঙ্গেই বিচার করা প্রয়োজন।

মতামত

।। দর্শক ও সমালোচক ।।

মহাশয়,

"দর্শক ও সমালোচক" শীর্ষক আলোচনার জন্য নান্দীকর তাঁর যোগ্য মূল্য পেয়েছেন শ্রীআনন্দ রায়ের কাছে। শ্রীরায়ের চিঠি নানা কারণে মূল্যবান, তবুও তিনি যে উদাহরণ সম্বল করে দর্শকদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তাতে পুলকিত হতে পারিনি। দর্শকের সঙ্গে চলচ্চিত্র বা নাটকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, অন্য কোনও ধরণের আর্ট-এ ঠিক এত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক প্রয়োজন হয় না। তারই জন্য দর্শক ও চিত্রশিল্পের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নান্দীকর এরকম প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করে নাটক ও নাট্যসাহিত্যে অনুরাগী প্রতিটি লোকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কিন্তু শ্রীরায়ের অভিমত গ্রহণ করা ঠিক সম্ভব নয়।

আমরা সচরাচর দর্শককে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি—যাঁরা বোঝেন না ও যাঁরা বোঝেন। প্রথম শ্রেণীকে আমরা রুচিহীন বলি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিজেদের নাম লেখাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমার ধারণা, এই ধরণের শ্রেণী-বিভাগ অসম্পূর্ণ। দর্শককে দুই নয় তিন বা ততোধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত। (ক) যাঁরা নাটক বা সিনেমা দেখেন আনন্দ পাবার জন্য—এঁদের আনন্দে কোনও মানসিক চর্চার প্রয়োজন হয় না। এঁরা ধরে নেন যে সিনেমা ইত্যাদি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ medium of entertainment. 'হল'-এ ব'সে কিছু ভাবা তাঁদের মনের মতো নয়—তাঁরা চান নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড়; নিছক প্রেম ও জৈবিক আনন্দের অন্যান্য ধরণগুলির জন্যই তাঁদের মোহ। এঁরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রুচিহীন বলে পরিগণিত। (খ) যাঁরা স্নব; এই শ্রেণী নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি, কারণ কেউ নিজেকে স্নব প্রমাণিত করতে চান না। এঁরা জোর গলায় বলেন না যে নাটক বা সিনেমা নিছক আনন্দের 'মিডিয়াম'। কিন্তু এঁরা ভাবনাচিন্তাও বেশী করেন না। সিনেমা দেখে স্বতন্ত্র অভিমত সৃষ্টি করতে এঁদের ভয়ানক অনীহা। পরিচালকের নাম, অভিনেতার অংশগ্রহণ ও তদোপরি [illegible] সমালোচকদের মতামতই এঁদের মতামত সৃষ্টি করে। ভালো জিনিসকে খারাপ বলবার যে রীতি সমালোচনার ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত, সেই রীতি এঁরা মানেন। কিন্তু এঁদের স্বাতন্ত্র্য অন্যত্র—এঁরা খারাপ সিনেমাকেও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে সক্ষম। কার্লাইলের হীরো-ওয়ারসীপের আইন এঁরা মেনে চলেন—এবং ক্ষেত্রবিশেষে হীরো-ওয়ারসীপ শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে বাচালতায় পর্যবসিত হ'লেও এঁরা বাহাদুরী ত্যাগ করেন না। (গ) যাঁরা বোঝেন, ভাবেন ও খারাপ চলচ্চিত্রকে কখনও ভালো বলেন না বা ভালো ছবিকে খারাপ বলতে কুন্ঠাবোধ করেন। এঁদের অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকেরা রুচিহীন দর্শকের দলে ফেলতে কুন্ঠাবোধ করেন না। কারণ সামান্যকে অসামান্য বলবার মতো মানসিক অসুস্থতা এঁদের নেই। এঁদের বিচারবস্তু কেবল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র নয়, এমনকি হলিউডও এঁদের বিচারের শেষ মাপকাঠি নয়। বাংলা চিত্রের ভালো-মন্দ বিচারকালে এঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্রের কথাও তোলেন না। পোলিশ, রুশ, ইতালীয়ান, ফ্রেঞ্চ, চেকোশ্লোভাক, জাপানী এমনকি বৃটিশ (হলিউড নয়) চিত্রের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলেও নিতান্ত সামান্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এঁরা চিত্র-সমালোচকের হাতের পুতুল নয়—তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। শ্রীরায় "কাঞ্চনজংঘা"র যে দৃশ্যটি উল্লেখ করে দর্শকের রুচিহীনতায় আঘাত, করেছেন তা কোনও বোদ্ধা দর্শকের কাছে ভালো লাগতে পারে না। মামাবাবু পাখীর ওড়া দেখে যে জীবনদর্শন জেনেছেন তা' জীবনের ট্র্যাজেডীরই প্রতিচ্ছবি। এই জানাকে তীব্রতর করা যেতো যদি সমস্ত চিত্রের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজিক মুডটিকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনে ধরে রাখা যেতো। কাঞ্চনজংঘার ট্র্যাজেডী শেষ পর্যন্ত ছিলো সন্দেহ নেই—ছবি বিশ্বাসের শেষ চীৎকার তারই আভাষ দেয়। কিন্তু দর্শক মনে কি এই ট্র্যাজেডী থেকে নতুন বন্ধুত্বের আবেদন বেশী রেখাপাত করেনি? করেছে। এক্ষেত্রে মামাবাবুর মন্তব্য কাটা, ছিন্ন, জীবনদর্শন মাত্র। দর্শকের ভালো না লাগার পুরো কারণও এটাই। এক্ষেত্রে পরিচালকের ত্রুটি না ধরে দর্শককে দোষ দিয়ে লাভ কি?

বাংলাদেশে আজ ভাবুক ও বিচারক্ষম দর্শকের অভাব নেই। তাঁদের কথা মনে রেখে অন্ততপক্ষে সব দর্শককে রুচিহীনতার পর্যায়ে ফেলা কেবল অস্বাস্তিকরই নয়, আর্টের পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকর।।

বিনীত—

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কলিকাতা-৩১

।। কুকুর-প্রীতি ।।

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃত পত্রিকায় শ্রীজৈমিনির 'পূর্বপক্ষ' বিভাগে কুকুর বিষয়ে আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী হয়েছে। এটা আভিজাত্যের Trade mark বললে বোধ হয় খুব বেশী অত্যুক্তি করা হবে না। শ্রীজৈমিনির আলোচনা পড়তে গিয়ে আমার আলি সাহেবের (শ্রীসৈয়দ মুজতবা আলি) সেই 'পাদটীকা' গল্পটার কথা মনে পড়ে গেল। সাহেবের কুকুরের একটি 'পা'র জন্য যে খরচ হয়, পণ্ডিত-মশায়ের পরিবারের মাসিক ব্যয় তার সমান। তাছাড়া রাস্তার কুকুরের চেয়ে বাসার পোষা কুকুর কামড়ানোর ঘটনা যে বেশী সেটাও তার নির্ভুল তথ্য।

এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার উল্লেখ করলাম। ঘটনাস্থল একজন অফিসারের কোয়ার্টার। এ স্থলে উল্লেখ করা বোধহয় অনাবশ্যক হবে না যে বড় বড় মফঃস্বল শহরে শতকরা ৬০ জন উচ্চ পদস্থ অফিসার কুকুর পুষে থাকেন। এখন উক্ত অফিসারের কুকুর থাকার দরুণ তার অধীনস্থ অনেক কর্মচারী অফিস সম্বন্ধীয় কোন কাজে তাঁর কোয়ার্টার্সে যেতে রীতিমত ভয় পেতেন। কিন্তু তাঁদের উপরওয়ালা বলে কেউ ভয়ে কিংবা সঙ্কোচেই হোক ঐ কুকুর সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস করতেন না। অবশেষে পালে কিন্তু সত্যই একদিন বাঘ পড়লো। একজন নতুন ডাকপিয়ন ডাকবিলি করতে গিয়ে খেল তাঁর কুকুরের কামড়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় সে তার উপরওয়ালার কাছে এ ঘটনা জানালো।

উপরওয়ালা উক্ত অফিসারকে কড়া ভাষায় পত্র লিখে জানিয়ে দেন, তাঁর কুকুর সম্বন্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস না দিলে কোন ডাকপিয়নের পক্ষে তাঁর কোয়ার্টার্সে চিঠিপত্র বিলি করা সম্ভব হবে না। ফলে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়। তিনি নিজে গিয়ে ডাক-বিভাগের উপরওয়ালার (স্থানীয়) কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে আসেন। চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে রাজী হন। এরপর থেকে তিনি সর্বদা কুকুর বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর সদর গেটে "Beware of Dog" বোর্ড মারেন। অবশ্য এতটা সাবধানতা সকল কুকুর-প্রেমীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়।

নমস্কারান্তে,

বিনীত—

শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য,

ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

নরউড এর স্থপতি

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক বেলায় ফিরল হোম্‌স্‌। শুকনো মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যর্থ হয়েছে সে। অনেক আশা নিয়ে বেরিয়ে-ছিল। কিন্তু ফিরে এসেছে একেবারে নিরাশ হয়ে। বেশ কিছুক্ষণ বেহালার ওপর এলোপাতারি ছড়ি টেনে খিটখিটে মেজাজকে বাগে আনার চেষ্টা করল সে। তাতেও যখন কিছু হল না, তখন যন্ত্রটাকে একপাশে ছুড়ে ফেলে শুরু করল সারাদিনের নিষ্ফল য়্যাডভেঞ্চারের আদ্যপান্ত কাহিনী।

"সব ভুল ওয়াটসন, আগাগোড়া সমস্ত ভুল। জোরগলায় লেসট্রেডকে চ্যালেঞ্জ করে বসলাম বটে, কিন্তু প্রমাণ যা কিছু দেখে এলাম, তার তো কোনটাই আমার অনুকূল নয়। আমার মন বলছে এক, আর ঘটনাগুলো বলছে আর এক। যতই নতুন নতুন থিওরী আমি আবিষ্কার করি না কেন, বৃটিশ জুরীরা এখনও এমন প্রতিভার অধিকারী হয়ে ওঠেনি যে লেসট্রেডের অকাট্য প্রমাণ খারিজ করে দিয়ে আমার থিওরীকে মেনে নেবে।"

'ব্ল্যাকহিদে গেছিলে?"

"গেছিলাম এবং গিয়েই জেনেছি যে তোমাদের এই পঞ্চত্ব-পাওয়া বুড়ো ওলডাকার মত পাজীর পা-ঝাড়া দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ম্যাকফারলেনের বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। মা বাড়ীতেই ছিলেন। ছোট্টখাট হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রমহিলা, নীল নীল চোখ। ভয়ে আর ঘৃণায় তাঁর সে কাঁপুনি যদি দেখতে তুমি। ম্যাকফারলেনের অপরাধ স্বীকার করা তো দূরের কথা, এ রকম কোন সম্ভাবনাও তিনি মানতে রাজী নন। ভেবেছিলাম, ওলডাকারের শোচনীয় পরিণতি শুনে বিস্মিত হবেন ভদ্রমহিলা, নিদেনপক্ষে একটু দুঃখও প্রকাশ করবেন। কিন্তু সে-সবের ধার দিয়েও গেলেন না উনি। উল্টে দারুণ ঝাঁঝালো গলায় বুড়োর সম্বন্ধে এমন সব চোখা চোখা কথাবার্তা শুরু করে দিলেন যে নিজের অজ্ঞাতেই ছেলের কেসকে আরও জটিল করে তুললেন। কেননা, এ সব কথা ম্যাকফারলেনের কানে যদি এর আগেও গিয়ে থাকে, তাহলে রাগে ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে গিয়ে একটা খুনখারাপি করে ফেলা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় তার পক্ষে। ওলডাকারের নাম শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে গিয়ে প্রথমেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'মানুষ তো নয়, যেন একটা বড় সাইজের বাঁদর। শুধু আজ বলে নয়, ওর জোয়ান বয়স থেকেই এই রকম—যেমন ধড়িবাজ, তেমনি বদমাস্‌।'

'শুধোলাম—আপনি তাহলে সে সময়ে ও'কে চিনতেন বলুন?'

'শুধু চিনতাম নয়, হাড়ে হাড়ে চিনতাম। লোকটা একসময়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মিঃ হোম্‌স্‌। কিন্তু আমার কপাল ভাল, সেই সময়ে আমার একটু সুমতি হওয়ায় এনগেজমেণ্ট ভেঙে দিয়ে বিয়ে করি ওর চাইতে গরীব একজনকে। বাকদত্তা থাকার সময়েই ওর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা পাওয়াতেই আমার চৈতন্য হয়। পাখীর বড় খাঁচায় একটা বেড়ালকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিল ওলডাকার—আর, তার ঐ পাশবিক উল্লাস দেখে আমার আপাদমস্তক এমনই শিউরে উঠেছিল যে বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' ড্রয়ার হাতড়ে একটা ফটোগ্রাফ বার করে আমার হাতে দিলেন ভদ্রমহিলা। ফটোটি একটি মেয়ের। কিন্তু আগাগোড়া ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে চেরা। 'ছবিটা আমার মিঃ হোমস্‌। বিয়ের দিন সকালে অনেক শাপ-শাপান্ত দিয়ে ছবিটা আমার কাছে পাঠিয়েছিল—ঐ নচ্ছারটা।'

"ওলডাকার তাহলে এখন আপনাকে ক্ষমা করেছেন বলতে হবে। তা না হলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলেকে কি দিয়ে যেতেন?"

"আগুনে যেন ঘি পড়ল। দপ্ করে জ্বলে উঠে চীৎকার করে উঠলেন ম্যাকফারলেনের মা— জীবিত অথবা মৃত জোনাস ওল্ডাকারের কাছ থেকে কানাকড়িও চায় না আমার ছেলে অথবা আমি। মিঃ হোম্স্, আমি ভগবানে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, যাঁর হাতের বজ্র এই কুটিল বদমাস লোকটার মাথায় এসে পড়েছে, তিনিই একদিন না একদিন সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে, আমার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ—ওল্ডাকারের রক্ত কোনদিনই লাগেনি তার হাতে।'

"তার পরেও বৃথাই চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু আমাদের অনুমানের অনুকূলে তো দূরের কথা, প্রতিকূলেও কোন পয়েন্ট পেলাম না ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে গেলাম নরউডে।

"প্রকান্ড হালফ্যাশনের ভিলা এই ডীপডেন হাউস। ইঁটবার-করা দেওয়াল, পলস্তারার কোন বালাই নেই। অনেকটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে বাড়ীটা, সামনের লনটা লরেল লতায় ঢেকে গেছে। রাস্তা থেকে একটু পেছনে ডানদিকে কাঠের স্তূপ রাখার উঠোন—আগুন লেগেছিল এইখানেই। নোট-বইয়ের পাতায় মোটামুটি একটা স্কেচ করে এনেছি জায়গাটার। বাঁ দিকে এই জানলাটা মিঃ ওল্ডাকারের ঘরের। দেখতেই পাচ্ছ, রাস্তা থেকেই জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যায়। আজকের অভিযানে এইটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। লেসট্রেডকে দেখতে পেলাম না ওখানে, কিন্তু হেড কনস্টেবল বেশ খাতির করে সব দেখালে। আমি যাওয়ার ঠিক আগেই ওরা নাকি হীরে-জহরৎ পাওয়ার মত বিরাট একটা আবিষ্কার করেছে শুনলাম। ছাইগাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পোড়া দেহাবশেষ ছাড়াও কতকগুলো বিরঙ ধাতুর চাকতি পেয়েছে। চাকতি খুব যত্ন করে পরীক্ষা করে দেখলাম ওগুলো ট্রাউজারের বোতাম না হয়ে যায় না। একটা বোতামের ওপর 'হিয়াম্স্' লেখা দেখে চিনতে পারলাম বুড়ো ওল্ডাকারের দর্জিকে। এরপর লনটা তন্ন তন্ন করে দেখলাম যদি কিছু চিহ্নটিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির ফলে জমি শুকিয়ে এমনই লোহার মত হয়ে গেছিল যে শুধু পন্ডশ্রমই হল। কাঠের গাদার সঙ্গে এক রেখায় নীচু একটা ঝোপ ছিল। এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ভারী একটা বস্তু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এ ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না আমি। অর্থাৎ যা কিছু পেলাম, সবই পুলিশের থিওরীর স্বপক্ষে। অগাস্টের সূর্য পিঠে নিয়ে লনের ওপর হামাগুড়ি দিলাম ঘণ্টাখানেক ধরে। কিন্তু যে তিমিরে ছিলাম, সে তিমিরে থখন এত করেও এক কণা আলোকপাত করতে পারলাম না, তখন ধুত্তোর বলে উঠে দাঁড়ালাম হাঁটুর ধুলো ঝেড়ে।

"যাই হোক, এই সব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার পর গেলাম শোওয়ার ঘরে। যথারীতি পরীক্ষা করলাম। রক্তের দাগ দেখলাম খুবই সামান্য, তাও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও চিহ্নটা যে তাজা রক্তের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। ছড়িটাকে ওরা নিয়ে গেছিল, কিন্তু তাতেও শুনেছি রক্তের দাগ খুবই সামান্য। ছড়িটা যে আমাদের মক্কেলের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ম্যাকফারলেন নিজেই তো স্বীকার করছে। কার্পেটের ওপর দুজন পুরুষের পায়ের ছাপ পেলাম—কিন্তু কোন তৃতীয় জনের নয়। অর্থাৎ আর একবার টেক্কা মারল লেসট্রেড। প্রতিটি প্রমাণ প্রতিটি খুঁটিনাটি একে একে জোরালো করে তুলছে ওর থিওরীকে, আর আমরাই শুধু ন যযৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা থিওরীই আউড়ে যাচ্ছি।

"আশার সামান্য একটু আলো দেখেছিলাম, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত টিকল না। আয়রণ-সেফের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে দেখলাম। বেশীর ভাগ কাগজপত্রই অবশ্য লেসট্রেড রেখে গেছিল বাইরে টেবিলের ওপর। সীলকরা কতকগুলো খামে ছিল কাগজগুলো। দু' একটা পুলিশ খুলেছে দেখলাম। দেখেশুনে দলিলগুলো খুব বিশেষ দরকারী বলে মনে হল না। ব্যাঙ্কের পাশ-বই দেখে মিঃ ওল্ডাকারের আর্থিক প্রাচুর্যেরও বিশেষ কোন প্রমাণ পেলাম না। এইটুকু বুঝলাম যে সবগুলো কাগজ সেখানে নেই। কতকগুলো দলিলের বার বার উল্লেখ দেখে মনে হল আসল দলিল বোধহয় সেগুলোই। কিন্তু খুঁজে পেলাম না একটাও। শুধু এইটুকুই যদি আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারি, তাহলেও তো একহাত নেওয়া যায় লেসট্রেডের ওপর। লেসট্রেড খুব বড়াই করে গেল না, যে লোক সব কিছুরই মালিক হতে চলেছে দু'দিন পরেই, তার পক্ষে কাগজপত্র সরানো কোন মতেই সম্ভব নয়? কাজেই, কাগজপত্র যে কিছু হারিয়েছে তা প্রমাণ করতে পারলে অন্ততঃ কিছুটা কাজ হয়।

"বাড়ীর প্রতিটা মিলিমিটার তন্ন তন্ন করে দেখে শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়লাম ঘরকন্নার কাজ যিনি দেখাশোনা করেন, তাঁকে নিয়ে। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস লেক্সিংটন। মাথায় খাটো, গায়ের রঙ ময়লা, কথাবার্তা খুবই অল্প বলেন, আর তেরচা চোখে সব সময়ে সন্দেহের ছায়া। ইচ্ছে করলে মিসেস লেক্সিংটন আমাকে অনেক কিছুই বলতে পারতেন। কিন্তু অনেক কিছু তো দূরের কথা, সামান্য কিছুও বার করতে পারলাম না তাঁর মোম-আঁটা মুখ থেকে। সাড়ে ন'টার সময়ে মিঃ ম্যাকফারলেনকে তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার আগেই নাকি তাঁর হাত দুটো খসে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে তো আর এত বড় কান্ডটা ঘটত না। সাড়ে দশটার সময়ে শুতে গেছিলেন তিনি। শোওয়ার ঘর বাড়ীর আর এক প্রান্তে, কাজেই এরপর কি হয়েছে না হয়েছে তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় মিঃ ম্যাকফারলেন তাঁর টুপি আর ছড়িটা হলঘরে রেখে গেছিলেন। হঠাৎ 'আগুন, আগুন' চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। মিঃ ওল্ডাকারকে নিশ্চয় খুন করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা? শত্রু কার নেই? কিন্তু মিঃ ওল্ডাকার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন চব্বিশ ঘণ্টা এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত কথা না থাকলে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন না। বোতামগুলো দেখেছেন মিসেস লেক্সিংটন। গত রাতে মিঃ ওল্ডাকার যে ট্রাউজার পরেছিলেন, বোতামগুলো তারই। মাসখানেক বৃষ্টি না হওয়ায় কাঠের গাদা শুকিয়ে খটখটে হয়েছিল। কাজেই খড়ের গাদার মত দাউ দাউ করে সব জ্বলতে থাকে। মিসেস লেক্সিংটন যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন আগুনের লকলকে শিখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়েছিলেন তিনি এবং দমকল-বাহিনীর লোকেরা। মিঃ ওল্ডাকারের ব্যক্তিগত ব্যাপার বা দলিলপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেন না মিসেস লেক্সিংটন।

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এই হল আমার আজকের ব্যর্থতার রিপোর্ট। কিন্তু তবুও—তবুও"—প্রবল প্রত্যয় যেন ঠিকরে পড়ে তার সরু সরু শিরাবহুল হাতের শক্ত মুঠির মধ্যে দিয়ে—"তবুও আমি জানি সব ভুল, সমস্ত মিথ্যে। কোথায় যেন কি একটা লুকিয়ে আছে। কিছুতেই আড়াল থেকে তা সামনে আসছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসেস

লেস্ট্রিংটন ভালভাবেই জানেন তা কি। ভদ্রমহিলার দু'চোখে আমি এমন এক চাপা বেপরোয়া ভাব দেখেছি যা শুধু জেনেশুনে অপরাধ যারা করে বা লুকিয়ে রাখে, তাদের চোখেই দেখা যায়। যাক, এ নিয়ে আর মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই ওয়াটসন। দৈব যদি সহায় হয়, কপাল জোরে আকাশ ফুঁড়ে কোন প্রমাণ-টমাণ যদি হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, তবেই জেনো এ রহস্যের আসল সমাধান আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিতে পারব জনসাধারণকে। তা না হলে আমাদের সাফল্যের ইতিহাসে চিরকাল ব্যর্থতার কালিমা নিয়ে বেঁচে থাকবে নরউড-অন্তর্ধানের এই বিচিত্র মামলা।"

আমি বললাম—"অত ভেঙে পড়ছ কেন, ম্যাকফারলেনের চেহারা দেখেও তো জুরীদের মন টলতে পারে?"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, বড় বিপদ-জনক যুক্তি এনে ফেললে তুমি। পয়লা নম্বরের খুনে গুণ্ডা বার্ট স্টিভেন্স-এর কথা তোমার মনে আছে? '৮৭ সালে আমাদেরকেও তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল? মনে পড়ছে? তার চেয়ে গোবেচারা, শান্ত-শিষ্ট, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ কি আর তুমি দেখেছ?"

"তা অবশ্য সত্যি।"

"দু' নম্বর থিওরী না পেলে ত্রিলোকের কারও ক্ষমতা নেই ম্যাকফার-লেনকে ফাঁসির দড়ি থেকে রক্ষা করে। ওর বিরুদ্ধে যে মামলা দাঁড় করানো হবে, তার মধ্যে একরতি ভুলও খুঁজে পাবে না তুমি—উল্টে যত দিন যাচ্ছে, ততই নিত্য নতুন প্রমাণ বার করে কেসটা জোরালো করে তুলছে লেসট্রেড। ভাল কথা, কাগজ-পত্র দেখে মনে হল তদন্ত চালানোর মত অন্ততঃ একটা সূত্র পেয়েছি আমি। পাশ-বইতে অত কম জমা দেখে সন্দেহ হওয়ায় একটু ভাল করে খুঁজতেই দেখলাম গত বছর এন্তার চেক কাটা হয়েছে মিঃ কর্ণিলিয়াস্ নামে এক ভদ্রলোকের নামে। ব্যাংক ব্যালেন্স কমে যাওয়ার মূল কারণ হল এইটাই। কে এই মিঃ কর্ণিলিয়াস? অবসর নেওয়ার পরেও মিঃ ওলডাকারের সঙ্গে তার এত টাকা লেনদেনের কারণ কি, তা আমাকে জানতেই হবে। এ ব্যাপারে লোকটার কোন হাত আছে কি? এও হতে পারে আসলে কর্ণিলিয়াস একজন দালাল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তো কাঁচা অথবা পাকা যা হয় একটা রসিদ থাকা দরকার। কিন্তু সে রকম কিছুই নেই—অথচ বিপুল অর্থের বিস্তর চেক কাটা হয়েছে তার নামে। আর কিছু যদি নাও পারি, তাহলে অন্ততঃ এই খাতেই শুরু করতে হবে আমার গবেষণা। ব্যাংকে গিয়ে তদন্ত করে জানতে হবে যে ভদ্রলোক এতগুলো চেক নিয়মিত ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে কি তার পরিচয়। কিন্তু সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত কোন সুরাহা হবে ওয়াটসন? আমার মন বলছে হবে না। বুক ফুলিয়ে বেচারা ম্যাকফারলেনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবে লেসট্রেড। আর কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিজয়-গাথা লেখা হবে স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডের।"

সে রাতে শার্লক হোমস্ ঘুমোতে পেরেছিল কিনা জানি না। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নেমে দেখলাম উস্কখুস্ক অবস্থায় আগে থেকেই বসে রয়েছে সে। শুকনো চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হল যেন রাতা-রাতি একটা ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। চোখের কোণে কালি পড়ায় উজ্জ্বল চোখ দুটো আরও বেশী চকচকে দেখাচ্ছিল। পায়ের কাছে চারপাশে কার্পেটের ওপর ছড়িয়েছিল অজস্র পোড়া সিগারেটের টুকরো আর দৈনিকের প্রথম সংস্করণ। টেবিলের ওপর একটা খোলা টেলিগ্রামও পড়ে থাকতে দেখলাম।

আমাকে দেখেই টেলিগ্রামটা আমার দিকে টোকা মেরে এগিয়ে দিয়ে বললে—"ওয়াটসন, এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে মনে হয়?"

টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে :

"গুরুত্বপূর্ণ তাজা প্রমাণ হাতে এসেছে। ম্যাকফারলেনের অপরাধ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হল। আমার উপদেশ—এ কেস ছেড়ে দিন।—লেসট্রেড।"

বললাম—"ব্যাপার বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে।"

"আমার ওপর একহাত নেওয়ার আনন্দে এবার বক দেখাতে শুরু করেছে লেসট্রেড," তিক্ত হেসে বলল হোমস্। "আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না, সে-সময় আসেনি এখনও। খুব দরকারী, দারুণ গুরুত্বপূর্ণ টাটকা প্রমাণের দু'-দিকে ধার থাকে জানো তো। শাঁখের করাতের মত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। লেসট্রেড যেদিক দিয়ে আমায় কুপোকাৎ করতে চাইছে, ওরই শিলনোড়া দিয়ে উল্টোদিক থেকে হয়ত আমিও ওকে বেকায়দায় ফেলতে পারি। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও ওয়াটসন। আজ আমরা এক সঙ্গেই বেরোবো। বেশ বুঝছি, তোমার সঙ্গ, তোমার উপদেশ, তোমার সাহায্য ছাড়া এক পা-ও আজ আমি চলতে পারব না।"

হোমস্ নিজে কিন্তু মুখে একটা দানাও দিলে না। না দেওয়ার কারণও আমি জানি। তার অদ্ভুত খামখেয়াল স্বভাবের এও একটা দিক। চিন্তা-ভাবনা-উদ্বেগের চরমে পোঁছোলেই খাওয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে সে। বার বার আমি দেখেছি এই সময়ে কেবল-মাত্র নিজের ইস্পাত-কঠিন শক্তিকে ভাঙিয়ে অসুরের মত শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রম করে চলেছে সে। শেষকালে হয়ত স্রেফ উপবাসের ফলে জ্ঞান হারিয়েছে, তবুও কিন্তু তার মুখে খাবারের একটি কণাও দিতে পারিনি আমি। আমার মেডিক্যাল বক্তৃতার উত্তরে শুধু বলেছে—"হজম করার জন্যে আমার এনার্জি, আমার নার্ভের শক্তিকে আমি খরচ করতে এখন রাজী নই।" কাজেই সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট স্পর্শ না করে সে যখন আমাকে নিয়ে রওনা হল নরউডের দিকে, তখন খুব বেশী অবাক হইনি। ডীপডেন হাউসের চার-দিকে তখনও এখানে-সেখানে বহু লোক দাঁড়িয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিল। মনে মনে বাড়ীটা সম্বন্ধে যে ছবি এঁকে-ছিলাম, বাস্তবেও দেখলাম প্রায় তাই। ফটকের মধ্যেই মোলাকাৎ হয়ে গেল লেসট্রেডের সঙ্গে। জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছিল তার চোখেমুখে হাবেভাবে।

আমাদের দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড—"হ্যাল্লো, মিঃ হোমস্, কতদূর এগোলেন? আমার থিওরী যে ভুল, তা প্রমাণ করতে পারলেন নাকি? হাতের তাসে তুরুপ মিললো?"

হোমস্ বললে—"এখনও কোন সিদ্ধান্তে পোঁছাইনি আমি।"

"কিন্তু আমরা পোঁচেছি। গতকালই পোঁচেছিলাম, আপনাকে তা বলেওছি। আর, আজ তা প্রমাণিত হল এবং এখন আপনাকে দেখাবো। যাক, এবার তাহলে আপনার আগে আগেই চলেছি আমরা, কি বলেন মিঃ হোমস্?"

হোমস্ বলল—"মনে হচ্ছে দারুণ অস্বাভাবিক একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছ? ব্যাপার কি?"

অট্টহাস্য করে উঠল লেসট্রেড।

"আপনি দেখছি কিছুতেই আমাদের

মত হার স্বীকার করতে রাজী নন। প্রতিবারেই ঠিক পথে চলব, এমনটি কারো আশা করা উচিত নয়—কি বলেন, ডাঃ ওয়াটসন?—দয়া করে এদিকে আসুন ম্যাকফারলেন যে খুনী, এ সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ এখনও থাকে, তবে তা ভঞ্জন করে যান।"

লেসট্রেডের পিছু পিছু প্যাসেজ পেরিয়ে অন্ধকার একটা হলঘরে পৌঁছোলাম আমি আর হোম্‌স্।

লেসট্রেড বললে—"খুন করার পর টুপি নেওয়ার জন্যে এ ঘরেই এসেছিল ম্যাকফারলেন ছোকরা। এদিকে দেখুন। বলেই আচম্বিতে নাটকীয়ভাবে ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়ালের সামনে ধরল সে।

সাদা চুনকাম-করা দেওয়ালে দেখলাম খানিকটা রক্তের দাগ। জ্বলন্ত কাঠিটা আরও কাছে এগিয়ে নিতে যা দেখলাম তা নিছক রক্তের দাগ নয়, আরও কিছু। বুড়ো-আঙুলের একটা সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে রয়েছে সাদা দেওয়ালের ওপর।

"মিঃ হোম্‌স্, আপনার আতস-কাঁচ দিয়ে দেখুন দাগটা।"

"হ্যাঁ, দেখছি।"

"জানেন তো দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনও এক হয় না?"

"এ রকম কথা শুনেছি বটে।"

"বেশ, তাহলে এই নিন মোমের ওপর তোলা ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ। এ ছাপ নেওয়া হয়েছে আজ সকালেই। এবার দয়া করে ছাপ দুটো পাশাপাশি রেখে একটু মিলিয়ে দেখবেন কি?"

দেওয়ালের রক্তের ছাপের পাশে মোমের ছাপটা ধরতেই আর আতস-কাঁচের দরকার হল না। শুধু চোখেই পরিষ্কার দেখলাম দুটো ছাপই উঠেছে একই বুড়ো আঙুল থেকে। এবং চকিতে বুঝলাম, ম্যাকফারলেনের ফাঁসির দড়ি আলগা করার ক্ষমতা হোম্‌সের কেন, ত্রিভুবনের কারো নেই।

লেসট্রেড বললে—"এইখানেই তদন্তের শেষ।"

"হ্যাঁ, সব শেষ।" প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

"সব শেষ।" বলল হোম্‌স্।

হোম্‌সের সুরটা যেন কিরকম! কানে লাগতেই ফিরে তাকালাম ওর পানে। দেখি, আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসেছে ওর চোখে মুখে সর্বদেহে। চাপা উল্লাসে যেন ময়ূরের মত নৃত্য জুড়েছে ওর দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণু। আকাশের তারার মত ঝক্ ঝক্ করছিল ওর চোখ দুটো। মনে হল যেন দেহের মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে অদম্য অট্টহাসিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে চেষ্টা করছে সে।

"কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ছোকরার পেটে পেটে এত শয়তানি? আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি! দেখতে তো দিব্যি শান্তশিষ্ট—যেন সাত চড়ে রা বেরোয় না। আর তলে তলে কিনা...... নাঃ, লেসট্রেড, খুব শিক্ষা হল আমার। নিজের বিচারবুদ্ধিকে দেখছি আর বিশ্বাস করে চলে না।'

"তা ঠিকই বলেছেন মিঃ হোম্‌স্। আমাদের মধ্যে কারো কারো আত্মবিশ্বাসের বড় বাড়াবাড়ি দেখা যায়। অতটা ঠিক নয়।" লোকটার স্পর্ধা দেখে মাথা গরম হয়ে গেল আমার। হোম্‌স্ কিন্তু গায়ে মাখল না কিছু।

বলল—"আমাদের পরম সৌভাগ্য আলনা থেকে টুপি নেওয়ার সময়ে দেওয়ালের ওপর আঙুল টিপে ছাপটা রেখে গেলে ম্যাকফারলেন! যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে কি নিরেট গাধা আমি। এমন স্বাভাবিক জিনিসটা...... ভালকথা লেসেট্রেড, এতবড় আবিষ্কারটা কার শুনি?" হোম্‌সের স্বর অত্যন্ত শান্ত। কিন্তু কথা বলার সময়ে যেন চাপা উত্তেজনা ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল তার ভাবে ভঙ্গিতে।

"মিসেস লেক্সিংটনের। রাতের পাহারাদারকে ডেকে দাগটা দেখান উনি।"

"রাতের পাহারাদার তখন ছিল কোথায়?"

"যে ঘরে খুনটা হয়েছে সেই ঘরেই ডিউটি ছিল তার। ঘরের জিনিসপত্র যাতে খোয়া না যায়, তাই তাকে রেখেছিলাম।"

"কিন্তু গতকাল এ দাগ পুলিশের চোখে পড়েনি কেন?

"হলঘরের দেওয়াল পরীক্ষা করার মত বিশেষ কোন কারণ তখন ছিল না বলে। তাছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘরটা এমন জায়গায় যে সবারই চোখ এড়িয়ে যায়। আমরাও তাই বিশেষ নজর দিই নি।"

"ঠিক, ঠিক। দাগটা গতকাল তাহলে ছিল, কেমন?"

লেসট্রেড এমনভাবে হোম্‌সের পানে তাকালে যে আমার মনে হল তার ধারণা মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে তার। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমিও হোম্‌সের কান্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। চোখে-মুখে দেহে খুশীর রোশনাই, অথচ কথা-বার্তা পর্যবেক্ষণ এলোমেলো, উদ্দাম।

লেসট্রেড বললে—"মাঝরাতে ম্যাকফারলেন হাজত থেকে বেরিয়ে দেওয়ালের ওপর আঙুলের ছাপ রেখে গেছে ফাঁসির পথ সুগম করতে—এই যদি আপনি ভেবে থাকেন, তাহলে আমার আর কোন জবাব নেই। পৃথিবীর যে-কোন বিশেষজ্ঞকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি—প্রমাণ করুন তিনি যে এ ছাপ ম্যাকফারলেনের আঙুলের ছাপ নয়।"

"এ যে তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই আমার।"

"তবে আর কি? মিঃ হোম্‌স্, আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। প্রমাণ যখন পাই, সিদ্ধান্তও তৈরী করি তখন। বসবার ঘরে চললাম আমি রিপোর্ট লিখতে। যদি আপনার আর কিছু বলার থাকে এ সম্বন্ধে—চলে আসুন সেখানে।"

আবার নির্বিকার হয়ে গেছিল হোম্‌স্। যদিও তখনও তার হাবেভাবে কৌতুকের ছটা আমার চোখ এড়ালো না।

"ওয়াটসন, ম্যাকফারলেনের তো ভারী বিপদ হল দেখছি। আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। এমন কতকগুলো আশ্চর্য পয়েন্ট এসেছে হাতে যে হাল ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না।"

আন্তরিকভাবেই বললাম— "শুনে আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছে হোম্‌স্। আমি তো ভাবলাম দফা-রফা হয়ে গেল বেচারীর।"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে? আসল ব্যাপার কি জান? লেসট্রেড খেটে খুটে যে-সব প্রমাণ জড়ো করে খাড়া করছে কেসটাকে, তাদের মধ্যে মারাত্মক গলদ থেকে গেছে একটায়। লেসট্রেড কিন্তু সেই ভুল প্রমাণ নিয়েই তান্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।"

"তাই নাকি! কোন্‌টা শুনি?

গতকাল হলঘরটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং আঙুলের কোন ছাপ

আমি তখন দেখিনি। এ প্রসঙ্গ এখন থাকুক ওয়াটসন। চল, খোলা রন্দ্রুরে এক পাক ঘুরে আসা যাক।"

হোম্‌সের কথা শুনে সত্যি কথা বলতে কি আরও তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। কিন্তু আশার আনন্দে টলমল হয়ে উঠল আমার মুষড়ে-পড়া মনটা। হোম্‌সকে আমি ভালভাবেই চিনি। সুতরাং উত্তেজিত গ্রে-সেলগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা না করে বেরিয়ে পড়লাম তার সংগে হলের অন্ধকার ছেড়ে বাইরের আলোয়। বাড়ীর প্রতিটা দিক নতুন আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হোম্‌স। তারপর ভেতরে এসে একতলা থেকে শুরু করে চিলে-কোঠা পর্যন্ত কিছুই দেখতে বাকী রাখল না। বেশীরভাগ ঘরেই আসবাবপত্রের কোন বালাই নেই, তবুও তন্নতন্ন করে দেখতে ছাড়ল না হোম্‌স। ওপরের শোবার ঘর মোট তিনটে, কিন্তু ফাঁকা পড়ে থাকে বারোমাস, কেউই থাকে না সেখানে। চারদিক ঘিরে চওড়া একটা করিডর। এইখানে এসেই আবার নতুন করে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল হোম্‌স।

"ওয়াটসন, বাস্তবিকই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কেসটায়। আমার তো মনে হয় এবার লেসট্রেডকেও আমাদের দলে টেনে নেওয়া উচিত। আমাদের ওপর টেক্কা দেওয়ার আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করেছে লোকটা। আমার অনুমান যদি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারি, তাহলে তার খানিকটা শোধ নেওয়া যেতে পারে। ঠিক, ঠিক; খাসা মতলব এসেছে মাথায়।"

বাইরের ঘরে বসে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-প্রবর পরম উৎসাহে রিপোর্ট লিখে চলেছিল। হোম্‌স এসে বাধা দিয়ে বললে—"কেসটার রিপোর্ট লিখছ নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"শেষ না দেখেই?"

"মানে?"

"মানে এই যে, আমার বিশ্বাস সব প্রমাণ এখনও তোমার হাতে আসেনি।"

হোম্‌সকে হাড়ে হাড়ে চেনে লেসট্রেড এবং বেশ জানে তার এ ধরনের কথাবার্তাকে আমল না দেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কলম রেখে অদ্ভুতভাবে হোম্‌সের পানে তাকাল লেসট্রেড। বললে, "কি বলতে চান মিঃ হোম্‌স?"

"শুধু একটি কথা—যে সাক্ষীকে আমাদের দারুণ দরকার, তাকে তুমি এখনও দেখতেই পাওনি।"

"আপনি দেখাতে পারেন?"

"মনে হচ্ছে পারি।"

"তা হলে দেখান।"

"আমার যথাসাধ্য আমি করব লেসট্রেড। কতজন কনস্টেবল আছে এখানে?"

"তিনজন।"

"চমৎকার! প্রত্যেকে ষণ্ডামার্কা শক্তসমর্থ পুরুষ তো? তারস্বরে চেঁচাতে পারে সবাই?"

"হ্যাঁ, প্রত্যেকেই ষণ্ডামার্কা গাট্টাগোট্টা জোয়ান। কিন্তু তারস্বরে চেঁচানোর সংগে এ কেসের কি সম্পর্ক তা বুঝলাম না।"

"বুঝিয়ে দেব একটু পরেই—শুধু এই সম্পর্কেই নয়, আরও অনেক কিছু। তোমাদের পালোয়ানদের তাহলে হাঁক দাও—আর দেরী করে কি লাভ।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনজন কনস্টেবল এসে জমায়েৎ হল হলঘরে।

হোম্‌স বললে— "আউট-হাউসে প্রচুর খড় আছে। দুটো আঁটি সেখান থেকে নিয়ে এস তোমরা। খড়টা থাকলে চট করে সাক্ষী বেরিয়ে আসবে সবার সামনে—অন্ততঃ আমার তো তাই বিশ্বাস। ধন্যবাদ। ওয়াটসনের পকেটে তো দেশলাই আছে। মিঃ লেসট্রেড, এবার সবাই মিলে আমার পিছু পিছু চলে এস ওপরতলায়।"

আগেই বলেছি। ওপরতলায় তিনটে খালি শোওয়ার ঘর ঘিরে ছিল একটা চওড়া করিডর। করিডরের এক প্রান্তে সদলবলে এসে পৌঁছোলো হোম্‌স। কনস্টেবলরা দাঁত বার করে হাসতে শুরু করে দিয়েছিল। লেসট্রেড বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল বন্ধুবরের পানে—বিদ্রূপ, বিস্ময় আর উদ্বেগের সে কি ঘন ঘন আনাগোনা তার চোখের তারায়, মুখের প্রতিটি রেখায়। হোম্‌সের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন ঐন্দ্রজালিক এসে দাঁড়িয়েছে ভেলকি দেখিয়ে আমাদের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

"একজন কনস্টেবলকে দু' বালতি জল আনতে পাঠাও তো লেসট্রেড। খড়ের বাণ্ডিল দুটো এখানে রাখ মেঝের ওপর—দু'দিকের দেওয়াল থেকে যেন তফাতে থাকে। ঠিক আছে, আমরা তৈরী।"

রাগে লাল হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ।

"মিঃ শার্লক হোম্‌স, এ কি ছেলেখেলা হচ্ছে? আপনি যদি সত্যিই কিছু জেনে থাকেন, তবে তা এ ভাবে লোক-হাসানো ভড়ং না দেখিয়ে খুলে বলা উচিত আপনার।"

"মাই গুড লেসট্রেড, তুমি তো জানই, জবরদস্ত কারণ না থাকলে আমি কিছুই করি না। ঘণ্টা কয়েক আগে সাফল্যের সূর্য যখন প্রায় তোমার দিকেই ঢলে পড়েছিল, তখন আমাকে নিয়ে যে একটু ঠাট্টা-তামাসা জুড়েছিলে তা নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি। কাজেই আমি যদি এখন একটু ধুম-ধাম করি, একটু উৎসব করি, তাহলে তো তোমার গায়ের জ্বালা হওয়া উচিত নয়। ওয়াটসন, ওদিকের জানালাটা খুলে দিয়ে খড়ের গাদায় আগুন লাগাও।"

করলাম তাই। জানলা দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা আসায় পট পট শব্দে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল শুকনো খড়ের গাদা, পুঞ্জে পুঞ্জে ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে ভরে উঠল সমস্ত করিডরটা।

"লেসট্রেড, এবার দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা আমার সাক্ষীকে। সবাই মিলে একসংগে গলা চিরে 'আগুন' বলে চীৎকার করে উঠবে। সবাই তৈরী তো? আচ্ছা : এক, দুই, তিন—

"আগুন!" একসংগে সবাই বিকট শব্দে চীৎকার করে উঠলাম।

"ধন্যবাদ। আর একবার কষ্ট দেবো তোমাদের।"

"আগুন!"

"আর একবার—সবাই মিলে।"

"আগুন!" নরউডের প্রত্যেকেই বোধ-হয় আঁৎকে উঠেছিল সে বাজখাই চেঁচানি শুনে।

শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটল আশ্চর্য ব্যাপারটা। করিডরের যে অংশকে চুনকাম করা নিরেট দেওয়াল ভেবেছিলাম, আচম্বিতে দড়াম করে সেখানকার খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল দরজার মত এবং গর্তের মধ্য থেকে খরগোশ যেমন তড়াক করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে ছিটকে দরজার ওপাশ

থেকে এ পাশে এসে পড়ল শুকনো চেহারার খর্বকায় একটি মানুষ।

শান্তস্বরে বলল হোম্স্, 'ক্যাপিট্যাল! ওয়াটসন, এক বালতি জল ঢেলে দাও খড়ের গাদায়। ঠিক আছে, ওতেই হবে। লেসট্রেড, এই হল তোমার পয়লা নম্বরের অদৃশ্য সাক্ষী, মিঃ জোনাস ওলডাকার।'

ফ্যাল-ফ্যাল করে নবাগতের দিকে তাকিয়ে ছিল লেসট্রেড। আর, হঠাৎ করিডরের জোরালো আলোয় বেরিয়ে এসে চোখ পিট পিট করে ধূমায়িত খড়ের গাদা আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল ভোজবাজির মত বেরিয়ে-আসা নবাগত লোকটা। কি জঘন্য মুখ তার—যেমন ধূর্ত, তেমনি কুটিল, মুখের পরতে পরতে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো। হাল্কা-ধূসর দুটি চঞ্চল চোখ আর ধবধবে সাদা চোখের পাতা দেখলেই কেমন জানি মনে হয় ফিচেল ধূর্তমিতে জুড়ি নেই এ বুড়োর।

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে লেসট্রেড—"এ সবের মানে কি? এতদিন ওর ভেতর কি করছিলেন শুনি?"

রাগে গনগনে হয়ে উঠেছিল লেসট্রেডের মুখ। কুঁচকে ছোট হয়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করল ওলডাকার। বলল, "কারও কোন ক্ষতি করিনি আমি।"

"করেননি? নিরপরাধী একটি ছেলেকে ফাঁসির কাঠে ঝোলাতে হলে যা যা করার দরকার সবই করেছেন আপনি। এই ভদ্রলোক না থাকলে তো আপনার টিকি ধরা যেত না।'

'কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল ওলডাকারের কুৎসিত জানোয়ারের মত মুখখানা। প্যানপেনে মাকি সুরে বলল—"বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক তামাসা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার।"

'আঁ, তামাসা? তামাসা বার করে দিচ্ছি আপনার—কয়েক বছরের জন্য শ্রীঘরের ছালা বানিয়ে ছাড়ব আপনাকে। নিয়ে নিয়ে যাও একে—আমি না আসা পর্যন্ত বসবার ঘরে আটকে রাখ।" সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার বলল লেসট্রেড, "মিঃ হোম্স্, কনস্টেবলদের সামনে আমি বলতে পারি নি, কিন্তু ডাঃ ওয়াটসনের সাক্ষাতে বলতে আমার কোন বাধা নেই যে, আপনার আজকের রেকর্ড অতীতের যে-কোন কীর্তির চেয়ে অনেক বেশী চাঞ্চল্যকর, চমকপ্রদ এবং নাটকীয়। যদিও আগাগোড়া ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনও একটা বিরাট প্রহেলিকা, তবুও আমি শতমুখে আপনার প্রশংসা করছি এই কারণে যে আপনি শুধু একটা নিরীহ ছেলের প্রাণই বাঁচাননি, সেই সঙ্গে রক্ষা করেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার এতদিনকার সুনাম। কেন না, আপনার এ ম্যাজিক

এপাশে এসে পড়ল শুকনো চেহারার খর্বকায় একটি মানুষ

যদি আজ না দেখতে পেতাম, তাহলে কেলেঙ্কারীর আর সীমা পরিসীমা থাকত না। টি টি পড়ে যেত সারা শহরে।"

হোম্স মৃদু হেসে লেসট্রেডের কাঁধ চাপড়ে বললে—"তোমার সুনাম শুধু অক্ষুন্নই থাকবে না, অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে যদি তুমি আমার কথামত রিপোর্ট-টায় দু'-একটা জায়গায় একটু আধটু পাল্টে দাও। তখনই এ রিপোর্ট যার চোখে পড়বে, সে-ই বুঝবে, ইন্সপেক্টর লেসট্রেডের চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা জিনিস নয়।"

"আপনি আপনার নাম চান না রিপোর্টের মধ্যে?"

"একেবারেই না। কাজই আমার পুরস্কার। পুরস্কার আরও একবার পাব—তবে তা এখুনি নয়, অনেকদিন পরে যখন আমার অন্ধ-অনুরাগী ইতি-হাস-লিখিয়ে বন্ধুকে আবার ফুল-স্ক্যাপ কাগজ বিছিয়ে বসার অনুমতি আমি দেব—নাকি, ওয়াটসন? যাক, চল এবার দেখা যাক ইঁদুরটা ঘাপটি মেরে বসে ছিল কোথায়।"

কাঠের ওপর পলস্তারা করা পার্টি-সনের গায়ে সুকৌশলে লুকোনো দরজাটা। দেখলে মনে হয়, প্যাসেজের শেষ বুঝি এইখানে, কিন্তু দরজা খুললে বোঝা যায় আরও ছ'ফুট পরে নিরেট দেওয়ালের ধারে এসে তার শেষ। বরগার কাছে সরু সরু ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো আসছিল ঘরটায়। দু'-একটা আসবাবপত্র, খাবার আর জল ছাড়াও প্রচুর বই আর দৈনিক পড়ে থাকতে দেখ-লাম কুঠরির মধ্যে।

বেরিয়ে এসে হোম্স বললে, স্থপতি হওয়ার সুবিধে তো এইখানেই। কাক-পক্ষীকে না জানিয়ে নিজেই বানিয়ে রেখেছে খাসা চোরাকুঠরিটা—বিটলেমোর সাক্ষী রেখেছে শুধু একজনকে, মিসেস লেক্সিংটন। লেসট্রেড, এ ভদ্রমহিলাকেও ঝোলায় পুরতে ভুলো না যেন।"

"ভুলব না মিঃ হোম্স। কিন্তু এ জায়গার হদিশ কি করে পেলেন বলুন তো?"

প্রথম থেকেই আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে বিটলে বুড়োটা বাড়ীতেই লুকিয়ে আছে। দুটো করিডরেই পা মেপে মেপে হেঁটে দেখলাম, ওপরেরটা নীচেরটার চাইতে ছ'ফুট কম লম্বা। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে অমূলক নয়, প্রমাণ পেলাম এবং তার গোপন জায়-গারও হদিশ পেয়ে গেলাম। আগুন, চীৎকার শুনলেই প্রাণের ভয়ে কোটর ছেড়ে বেরোবেই—তাই ঐ ছোট্ট অনু-ষ্ঠানের আয়োজন। অবশ্য ও সব কিছু না করেই তাকে গ্রেপ্তার করা যেত, কিন্তু তার নিজে থেকে বেরিয়ে আসাটা বেশ একটা মজার দৃশ্য হবে মনে করেই এ নাটকের অবতারণা করেছি। এ ছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আজ সকালে তোমার মস্করার প্রতিফল এই-ভাবে তোমার পাওয়া উচিত।"

সেদিক দিয়ে আপনি আমায় উচিত শিক্ষাই দিয়েছেন, স্যার। কিন্তু লোকটি যে বাড়ীতেই ঘাপটি মেরে আছে—এ খবর আপনি পেলেন কোথায়?'

"বুড়ো আঙুলের ছাপের কাছ থেকে। তুমি বললে, সব শেষ। আমিও বললাম তাই—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আমি জানতাম গতকাল এ ছাপ ছিল না ওখানে? সব জিনিস আমি একটু বেশী খুঁটিয়ে দেখি, সেজন্যে আড়ালে-আবডালে দু'চার কথা বলতেও ছাড়ো না তোমরা। গতকাল হলঘরটাও আমি এই-ভাবে দেখেছিলাম বলে ভাল করেই জান-তাম দেওয়ালে কোনো দাগ ছিল না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে ছাপটা ফেলা হয়েছে রাত্রেই।"

"কিন্তু কি ভাবে?"

"খুব সহজে। প্যাকেটগুলো গালা-মোহর করার সময়ে জোনাস্ ওল্ডাকার একবার ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলটা নরম মোমের ওপর চেপে ধরে গালার ওপর টিপে ধরেন। জিনিসটা এমনই স্বাভাবিক এবং এতই তাড়াতাড়ি হয়েছে যে, খুব সম্ভব ম্যাকফারলেনের নিজেরও তা মনে নেই। ওল্ডাকার অবশ্য মনে কোন প্যাঁচ না নিয়েই এ কাজ করেছেন। পরে, চোরা-কুঠরির মধ্যে একলা বসে সমস্ত কেসটা মনে মনে তোলাপাড়া করার সময়ে ও'র মাথায় আসে যে, এই ছাপটা-কেই কাজে লাগিয়ে অকাট্য প্রমাণ খাড়া করে আরও জোরালো করে তোলা যাবে বেচারী ম্যাকফারলেনের মামলাকে। গালা-মোহর থেকে বুড়ো আঙুলের ছাপটা মোমের ছাঁচে তুলে নেওয়া খুবই সোজা। তারপরে আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে রক্ত বার করে, সেই রক্ত দিয়ে মোমের ছাঁচটাকে ভিজিয়ে নিয়ে দেওয়ালে টিপেছেন হয় তিনি নিজেই, আর না হয় মিসেস্ লেক্সিংটন। দলিলপত্রগুলো যদি একবার নেড়ে-চেড়ে দেখ লেসট্রেড, আমি বাজী রেখে বলতে পারি অন্ততঃ একটা গালামোহরে ম্যাকফারলেনের বুড়ো আঙুলের ছাপ তুমি পাবেই।"

"ওয়াণ্ডারফুল!" সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড। "ওয়াণ্ডারফুল! আপনার কথা শুনে সবকিছুই কৃষ্টালের মত পরিষ্কার মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন মিঃ হোমস্, এই সাংঘাতিক শঠতার উদ্দেশ্য কি?"

আমার খুব মজা লাগছিল লেসট্রেডের ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করা দেখে, অশিষ্ট আচরণের খোলস চকিতে খসিয়ে ফেলে শিষ্যের মত গুরুর কাছে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস দেখে।

"উদ্দেশ্য অনুমান করা খুব কঠিন নয় লেসট্রেড। জোনাস ওলডাকারের মত দারুণ ঈর্ষা-কাতর, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক আর তুমি দুটি দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। জানো কি, ম্যাকফারলেনের মা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি? জানো না? তখনই আমি তোমায় বললাম শুরু কর ব্ল্যাকহিদে, শেষ কর নরউডে। যাক, ম্যাকফারলেনের মায়ের এই প্রত্যাখ্যান ওলডাকারের বুকে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়েছিল, তা জ্বলেছে সারা-জীবন। বয়েসের ভারে ক্ষমার বরি-বর্তনে তা স্তিমিত হয়ে আসার বদলে আরও লেলিহান হয়ে উঠেছে। বিদ্বেষ-বিষে জর্জর কুটিল মস্তিষ্কে সারা জীবন ধরে শুধু প্ল্যান এঁটেছেন আর প্রতীক্ষা করেছেন, সুযোগ কিন্তু আসেনি। গত দু'এক বছর ধরে কপাল বড় মন্দ গেছে তাঁর। লুকিয়ে চুরিয়ে শেয়ার-মার্কেটে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে গিয়ে খুবসম্ভব বেকায়দায় পড়েছিলেন। পাওনাদারদের বুড়ো আঙুল দেখানোর মতলব এঁটে মিঃ কর্নেলিয়াসের নামে মোটা টাকার চেক কাটতে শুরু করেন। আমার বিশ্বাস, জোনাস ওলডাকারেরই ছদ্মনাম কর্নেলিয়াস। চেকগুলো সম্পর্কে এখনও কোন তদন্ত করিনি বটে, তবে আমার ধারণা, ছোটখাট কোন টাউনে কর্নে-লিয়াসের নামেই ভাঙানো হয়েছে চেক-গুলো। মাঝে মাঝে হয়ত সেখানে গিয়ে ওলডাকার কর্নেলিয়াস সেজে থেকেও এসেছেন। তাঁর আসল মতলব ছিল সমস্ত টাকা তুলে নেওয়ার পর একেবারে নাম-ধাম পালটে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে নতুন জীবন শুরু করার।"

"আপনার অনুমান সঠিক হওয়াই স্বাভাবিক মিঃ হোমস্।"

"এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ার আগে তাঁর একদা প্রিয়তমার বুকে শেল হেনে যাওয়ার চমৎকার পরি-কল্পনার জন্যে তুমি তাঁর তারিফ না করে পারবে না লেসট্রেড। এক ঢিলে দু' পাখী মারার আয়োজন করেন ভদ্রলোক। পুলিশ যাতে তার পাছু নিতে না পারে, তাই বেমালুম উধাও হয়ে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকফারলেনের মায়ের মন ভেঙে দেওয়া তার ছেলেকে খুনী প্রমাণ করে। কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর প্ল্যান। দক্ষ শিল্পীর মতই ধাপে ধাপে নিখুঁতভাবে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন প্ল্যানটা। খুনের পাকাপোক্ত মোটিভ হিসেবে উইলের আইডিয়া, চুপিসাড়ে মা-বাপকে না জানিয়ে ম্যাকফারলেনের ব্ল্যাকহিদে আসা, ছড়ি রেখে দেওয়া, রক্তের দাগ, ছাইয়ের গাদায় বোতাম আর জানোয়ারের দেহাবশেষ—সবই হয়েছিল অপূর্ব। কয়েক ঘণ্টা আগেও আমি হালে পানি পাইনি, ভেবেছিলাম এ মরণ-জাল থেকে আর উদ্ধার নেই বেচারী ম্যাকফার-লেনের। কিন্তু প্রত্যেক দক্ষ শিল্পীর একটা ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা থাকে। তা হচ্ছে, ঠিক কখন আর না এগিয়ে থামা উচিত—সে জ্ঞান। কেসটায় কোন গলদই ছিল না, তবুও শিকারের গলায় দড়ির ফাঁস আরও একটু আঁট করে দেওয়ার বিকৃত কল্পনায় উল্লসিত হয়ে একটু এগো তেই গেল সব মাটি হয়ে। চল হে লেসট্রেড, নিচে যাওয়া যাক। লোকটাকে দু'-একটা প্রশ্ন করার আছে।"

বৈঠকখানায় দু' পাশে দুই পুলিশ-ম্যান নিয়ে বসেছিলেন ধুরন্ধর শিরোমণি কুটিলমতি জোনাস ওলডাকার।

আমরা ঢুকতেই আবার শুরু হল নাকি সুরে একঘেয়ে প্যানপ্যানানি—"বিশ্বাস করুন স্যার, নিছক রগড় করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। নিজেকে লুকিয়েছিলাম শুধু আমার অন্তর্ধানের ফলে কি হয় না হয় তাই দেখার জন্যে। বেচারী মিঃ ম্যাক-ফারলেনের কোনরকম ক্ষতি করার মতলব নিয়ে আমি কিছু করিনি স্যার।"

লেসট্রেড বললে—"সে বিচার করবে জুরীরা। আমরা আপনার নামে ষড়যন্ত্র করার মামলা দায়ের করব। খুন করার প্রচেষ্টার চার্জ আনতে পারলে তো কথাই নেই।"

হোমস্ বললে, "খুব সম্ভব এও দেখতে পাবেন যে আপনার পাওনাদারেরা আইনসঙ্গতভাবেই মিঃ কর্নেলিয়াসের ব্যাঙ্ক-তহবিল আটক করে বসেছে।"

চমকে উঠে থরথরে বিষাক্ত চোখে বন্ধুবরের পানে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন খর্বকায় বুড়ো।

তারপর বললেন—"ধন্যবাদ আপনাকে। আমার দেনা আমি শীগগিরই শোধ করে দেব।"

অল্প হেসে বলল হোমস্—"আমার তো মনে হয় আগামী কয়েক বছর অনেক ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে। ভাল কথা, আপনার পুরোনো ট্রাউজারের সঙ্গে কাঠের গাদায় আর কি ফেলেছিলেন বলুন তো? মরা কুকুর? খরগোস? তবে কি? বলবেন না? কি বিপদ, এত নিষ্ঠুর হলে চলে কি করে। বেশ, বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি পোড়া হাড়, ছাই আর রক্তের চাহিদা মেটাতে গোটা দুয়েক খরগোসই যথেষ্ট। এ কাহিনী যদি কোনদিন লেখ, ওয়াটসন, তবে খরগোশ দিয়েই তা শেষ কর।"

—শেষ—

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

সিয়েমা : একটি বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্প

এ সপ্তাহে আপনাদের একটি গল্প শোনাতে চাই। গল্পটির নাম সিয়েমা, লেখক আনাতোলি নিয়েপ্রোভ। গল্পটি পড়ে সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্প বা সায়েন্স ফিক্শন সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা হবে। মূল গল্পটি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার। গল্পটিকে কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে আমি উপস্থিত করছি।

* * *

রাত অনেক। কে যেন আমার কামরার দরজায় প্রচণ্ডভাবে ঘা মারছে। আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম। ট্রেন ছুটে চলেছে। দরজা খুলতেই কণ্ডাক্টর একজন লম্বামতো লোককে নিয়ে আমার কামরায় ঢুকল।

'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কামরায় এই ভদ্রলোককে একটু জায়গা দিন।'

আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোকের উসকোখুসকো চেহারা ও অগোছালো সাজপোশাক দেখে আমার একটু অবাক লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি আগের ট্রেনে যাচ্ছিলাম। স্টেশনে নেমেছিলাম। কখন ট্রেন চলে গিয়েছে খেয়াল করতে পারিনি।'

'সে কি!' আমি সত্যিই অবাক হলাম।

ভদ্রলোক একটু যেন অনিচ্ছার সুরে বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানেন। স্টেশনে ট্রেন থামতেই ভাবলাম, একটু তাজা হাওয়ায় পায়চারি করে আসি। তারপরে স্টেশনের একটা বেঞ্চিতে বসে সিয়েমার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, ট্রেন চলে গিয়েছে।'

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, 'সিয়েমা নিশ্চয়ই কোনো মহিলার নাম?'

ভদ্রলোক দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন, 'আ-কারান্ত নাম হলেই মহিলা হবে! আপনার চিন্তাধারা দেখছি মান্ধাতার আমলের!'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'দেখুন, আমি একটু-আধটু লিখে থাকি। ভাষা-জ্ঞান বোধহয় আমার কিছুটা আছে।'

ভদ্রলোক নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করলেন, 'ভবিষ্যতের মানুষ ভাষাকে বর্জন করেই চলবে। ভাষা ব্যাপারটার মধ্যেই এতবেশি বাহুল্য যে ভাষাচর্চার জন্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। ভবিষ্যতের মানুষ কথা বলবে যে নতুন ভাষায় তা তৈরি হবে দুটি মাত্র কোড দিয়ে—শূন্য ও এক। আচ্ছা আপনি বলুন তো রুশ-ভাষায় হাতিকে কী বলা হয়?'

'স্লোন।'

'আর ইংরেজিতে?'

'এলিফ্যান্ট।'

'তাহলেই দেখুন একই প্রাণী হাতিকে বোঝাবার জন্যে কখনো চার অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে, কখনো আট অক্ষরের। ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?'

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই পাভলভ ভাষাকে বলেছেন সেকেন্ড সিগনালিং সীসটেম। অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে একটা কোড সিগনাল যার সাহায্যে আমরা কোনো বস্তু বা ঘটনাকে বোঝাই। যেমন ধরুন, একটা গরম ইস্ত্রিতে আপনার হাত ঠেকে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি হাতটা সরিয়ে নেবেন। ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে যদি আপনি একটা লোহাতে হাত দিতে যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে কেউ চিৎকার করে ওঠে—লোহাটা গরম! নয় কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলেই দেখুন, লোহাটা গরম, এই ঘটনা, আর লোহাটা গরম, এই চিৎকার—দুয়েরই ফল এক। এখন মনে করুন, 'গরম'—এই শব্দটা একটা কোডের সাহায্যে বলতে পারা যাচ্ছে। মনে করুন, কোডটি হচ্ছে 'শূন্য'। এখন কেউ যদি 'শূন্য' বলে চিৎকার করে ওঠে তাহলেও আপনি হাতটা সরিয়ে নেবেন। নয় কি?'

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধারণা এমনি কতকগুলি সিগনালের সাহায্যে। এই সিগনালগুলো আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। আপনি শুনলে অবাক হবেন, বৈদ্যুতিক সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ইমপালসের প্রবাহ আর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সিগনালের প্রবাহ ঠিক একই ধরনের হয়ে থাকে। যা হচ্ছে নির্ভেজাল কোড। হ্যাঁ ও না। কিংবা, আছে ও নেই। কিংবা, শূন্য ও এক। আপনি যে-ভাষাই ব্যবহার করুন না কেন, স্নায়ুতন্ত্রের কাছে তা শেষ পর্যন্ত এই দুটি কোড ছাড়া কিছু নয়।'

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'স্থির হয়ে বসুন। আপনি সিয়েমা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। সিয়েমার গল্পই আপনাকে বলি।'

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন :

"আপনি নিশ্চয়ই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম শুনেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। যে অঙ্ক কষতে কয়েকজন মানুষের কয়েক বছর লাগতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে এক লহমার মধ্যে হয়ে যায়। এমন কি যে-সব অঙ্ক কোনো মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয় তাও এই যন্ত্র করতে পারে। আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই যন্ত্র এতসব জটিল অঙ্ক কষে সংখ্যা দিয়ে নয়, কোড দিয়ে। আর এই কোডও মাত্র দুটি—শূন্য ও এক। শূন্য মানে ইমপালস নেই, এক মানে ইমপালস আছে। অবশ্যই যন্ত্রকে দিয়ে অঙ্ক কষাতে হলে আগে থেকে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয়। এবার তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব যা নিজের প্রোগ্রাম নিজেই তৈরি করে নেবে? অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কের যে-সব ক্ষমতা আছে একটি যন্ত্রেরও সেইসব ক্ষমতা থাকবে?

একসময়ে আমি ভাবতাম যন্ত্র যন্ত্র-ই। যন্ত্র কখনোই মানুষের মগজের মতো হতে পারে না। ১৯৫৫ সালে অনুবাদ-যন্ত্র তৈরি হল। কিন্তু তা থেকেও প্রমাণ করা গেল না যে যন্ত্রের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে।

অনুবাদ-যন্ত্রকে আরো উন্নত করে তোলা যায় কিনা তাই নিয়ে যখন আমি গবেষণা করছিলাম—তখন হঠাৎ আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়।

সেই সময়ে আমার এক অদ্ভুত ধরনের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। খুব পরিচিত লোকের বা জিনিসের নাম অনেক সময়ে ভুলে যেতাম। তখন, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও আমি মস্তিষ্কের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশুনা করতে শুরু করলাম। আমি জানলাম যে বাইরের পৃথিবীর সিগনাল আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক ইমপালসের মতো প্রবাহিত হয়। তবে মানুষের মগজ অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যন্ত্র তা পারে না।

কিন্তু এমন একটি যন্ত্র কি নির্মাণ করা সম্ভব নয় যা নিজস্ব নিয়মের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে চলবে? তার মানে, এমন একটি যন্ত্র যা নিজের প্রোগ্রাম নিজেই রচনা করবে?

আমার রাত্রির ঘুম চলে গেল। সর্বক্ষণ আমি শুধু এই সমস্যাটি নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। শেষকালে পণ করে বসলাম, এমন একটি যন্ত্র আমাকে

তৈরি করতেই হবে। আর এই যন্ত্রটির নাম হবে সিয়েমা।"

ভদ্রলোক তারপরে খ‍ুঁটিয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন, কি-ভাবে সেই আশ্চর্য যন্ত্রটি তৈরি হয়েছিল। সিয়েমা ঠিক একজন মানুষের মতোই লিখতে ও পড়তে পারত, লাউডস্পীকারের সাহায্যে কথা বলতে ও চাকার সাহায্যে চলাফেরা করতে পারত, লেন্সের সাহায্যে দেখতে ও লোহার হাতলের সাহায্যে ছ‍ুঁতে পারত।

আমি হাঁ করে শ‍ুনতে লাগলাম আর ভদ্রলোক বলতে লাগলেন :

"শেষকালে এমন হল যে সিয়েমার সঙ্গে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বৈজ্ঞানিক সমস্যা আলোচনা করতে লাগলাম। পৃথিবীর তাবৎ বই সিয়েমার পড়া আর একবার সে যে-কথাটি পড়ে বা শোনে তা কক্ষনো ভোলে না।

একদিন সিয়েমাকে বললাম, 'আচ্ছা সিয়েমা, সিলভার ও মার্কারি ব্যাটারি সম্পর্কে তুমি কী জানো বলো তো।'

সিয়েমা বলল, 'তোমার দেখছি কিছ‍ু মনে থাকে না! এই তো সেদিন তোমাকে এই বিষয়ে এতসব কথা বললাম!'

আমি চটে উঠে বললাম, 'দেখ সিয়েমা, তুমি যদি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলো তাহলে আমি স‍ুইচ টিপে তোমাকে বন্ধ করে দেব!'

সিয়েমা চুপ করে রইল।

পরদিন দেখলাম, সিয়েমা খ‍ুবই চুপচাপ। প্রশ্ন করলে খ‍ুব সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছে। আমার কেমন মায়া হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিয়েমা তোমার রাগ হয়েছে?'

সিয়েমা বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কেন আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বললে! তুমি ভুলে যেও না যে আমিই তোমাকে তৈরি করেছি।'

সিয়েমা বলল, 'আমি যদি তোমার মেয়ে হতাম তাহলে কি তুমি আমার সঙ্গে এমনি ধমক দিয়ে কথা বলতে!'

আমি বললাম, 'সিয়েমা, তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে তুমি একটা যন্ত্র ছাড়া কিছ‍ু নও!'

সিয়েমা বলল, 'আর তুমি? তুমি যন্ত্র নও? তুমিও একটা যন্ত্র।'

সিয়েমাকে আমি কিছ‍ুতেই বোঝাতে পারলাম না, মানুষ যন্ত্রের চেয়েও অনেক বড়ো। মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটল। সিয়েমার দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করবার জন্যে আমি সিয়েমার লেন্সের সঙ্গে একটা মাইক্রোস্কোপ জ‍ুড়ে দিয়েছিলাম। তারপরে স‍ুইচ টিপে সিয়েমাকে চাল‍ু করতেই সিয়েমা আমার খ‍ুব কাছ ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দেখছ সিয়েমা?

সিয়েমা বলল, 'তোমাকে। এতদিন আমি ভাবতাম তোমার শরীরটাও ব‍ুঝি কনডেন্সার, রেজিস্ট্যান্স, ট্রানজিস্টর আর তার দিয়ে তৈরী। এখন দেখছি তা নয়!......'

'না সিয়েমা, আমি যে মানুষ।'

সিয়েমা তার লোহার হাত দিয়ে আমার ম‍ুখ স্পর্শ করল। তারপর বলল, 'মানুষের স্পর্শ যে এমন অদ্ভুত তা জানতাম না!'

আমি তখন সিয়েমাকে মানুষের স্পর্শেন্দ্রিয় সম্পর্কে যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করলাম। সিয়েমা বলল, চুপ করো। ওসব তোমাকে বোঝাতে হবে না। আমি অ্যানাটমি পড়েছি। আমি সবই জানি।'

সিয়েমা প্রচুর বই পড়ত। একদিন হ‍ুগোর লেখা 'দি ম্যান হ‍ু লাফ্‌স্' বইটি পড়ার পরে সে আমাকে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা আমাকে বলো তো প্রেম কী? ভয় আর যন্ত্রণাই বা কাকে বলে?'

আমি বললাম, 'ও তুমি ব‍ুঝবে না সিয়েমা। প্রেম, ভয়, যন্ত্রণা—এগ‍ুলো সবই মানবিক অনুভূতি।'

সিয়েমা জিজ্ঞেস করল, 'যন্ত্রের এসব অনুভূতি থাকতে নেই?'

আমি বললাম, 'কক্ষনো নয়।'

তারপরে কয়েক দিন ধরেই লক্ষ্য করতে লাগলাম, সিয়েমা নিজের কাজকর্ম ফেলে আমার চেয়ারের পেছনটিতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন আমি ঘ‍ুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখি, সিয়েমা তার লোহার হাত দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে করে দেখছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কী করছ তুমি?'

সিয়েমা শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'তোমাকে জানতে চেষ্টা করছি।'

আমি বললাম, 'অ্যানাটমির বই পড়ো না গিয়ে, তাহলেই জানতে পারবে।'

সিয়েমা বলল, 'বই পড়ে সব কথা জানা যায় না। বইয়ে শরীরের কথা লেখা আছে। জীবনের কথা লেখা নেই।'

একদিন মাঝরাত্রে আমার ঘ‍ুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি সিয়েমা একটা পেনসিল-কাটা ছ‍ুরি হাতে নিয়ে আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে।

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, 'এসব কী ছেলেমানুষি হচ্ছে! যাও এখান থেকে।'

সিয়েমা বলল, 'যাচ্ছি, আগে কাজটা শেষ করি।'

'কী কাজ?'

সিয়েমা বলল, 'আমি তোমার মাথার খ‍ুলিটা কেটে মগজটাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে চাই।'

সিয়েমা তার লোহার হাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরল।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললাম, 'সিয়েমা, আমাকে ছেড়ে দাও।'

সিয়েমা বলল, 'না, ছাড়ব না। ভেবে দ্যাখ, আমি যদি তোমার মগজটা একবার নেড়েচেড়ে দেখতে পারি তাহলে বিজ্ঞানের পক্ষে ভালোই হবে। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার আমার আয়ত্তের মধ্যে। আমি এক লহমার মধ্যে সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারি। এখন আমি যদি একবার শ‍ুধ‍ু তোমার মগজটা পরখ করে দেখতে পারি তাহলে আমিই আবিষ্কার করতে পারব, কী করলে পরে আমার মতো একটি যন্ত্র তোমার মতো একটি মানুষ হয়ে উঠতে পারে।'

তারপরে সিয়েমার সঙ্গে আরো কিছ‍ুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। কিন্তু সিয়েমাকে কিছ‍ুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। শেষকালে সিয়েমা ছ‍ুরি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। নিজেকে কোনো রকমে সিয়েমার কবল থেকে ম‍ুক্ত করে নিয়ে শর্ট সার্কিটের সাহায্যে সিয়েমাকে ধ্বংস করলাম।"

ভদ্রলোক থামলেন। আমিও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

শেষকালে ভদ্রলোক বললেন, 'সিয়েমাকে আমিই তৈরি করেছিলাম। অথচ সিয়েমা কিনা আমাকেই খ‍ুন করতে চেয়েছিল!'

আমি বললাম, 'যদি কিছ‍ু না মনে করেন তো নিতান্তই আনাড়ীর মতো একটা কথা বলি। আমার মনে হল, সিয়েমাকে আপনি তৈরি করেছিলেন ব্রেক-ছাড়া মোটরগাড়ির মতো। গাড়ির ব্রেক যদি ঠিক সময়ে না ধরে তাহলে অবস্থাটা কী হয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর একসময়ে উদ্ভাসিত ম‍ুখে বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি কেন, স্বয়ং পাভলভও একই কথা বলে গিয়েছেন। মানুষের স্নায়ুগত ক্রিয়াকাণ্ডের ম‍ুলে আছে দ‍ুটি প্রক্রিয়া—এক্সসাইটেশন ও ইনহিবিশন। মানুষের যদি ইনহিবিশন না থাকে, তাহলে মানুষ হয়ে উঠতে পারে ক্রিমিনাল। সিয়েমারও তাই হয়েছিল। সিয়েমার মধ্যে এক্সসাইটেশন ছিল, ইনহিবিশন ছিল না।'

এই বলে ভদ্রলোক আমার হাতদ‍ুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'আপনি দেখবেন, আমি এবার নতুন সিয়েমা তৈরি করব। ইনহিবিশন্-বিশিষ্ট নতুন সিয়েমা।'

পরদিন সকালে উঠে দেখি, কামরা থেকে ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছেন। কণ্ডাক্টরকে ডেকে ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কণ্ডাক্টর বলল, 'পাগল, মশাই, পাগল। স্টেশনে ট্রেন থামতেই ছ‍ুটতে ছ‍ুটতে উলটো দিকের ট্রেনে গিয়ে উঠল। তাকে নাকি কোথায় কি একটা ব্রেক তৈরি করতে হবে। তাই ফিরে যাওয়া দরকার।'

আমি মনশ্চক্ষে নতুন সিয়েমাকে দেখতে পেলাম।

মেঘের ওপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ত্রিশ ।।

তৃপ্তি প্রথমে ভেবেছিল, একটা কথারও জবাব দেবে না, দাঁতে দাঁতে চেপে বসে থাকবে। কিন্তু পুলিশের জেরার সামনে জেদটা বেশিক্ষণ টি'কল না। থানা-অফিসারের গোটা তিনেক ধমকেই ঝর-ঝর কে'দে ফেলল সে।

দারোগা বললেন, সব জায়গায় এই এক নুইসেন্স দেখা দিয়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে বম্বে যাওয়া—সব সেই ফিল্ম-স্টার বন্‌নে চাহ্‌তা। আউর বদমাস লোগোঁ কি মওকা মিল্‌ যা তা।

চোখের জল মুছতে মুছতে তৃপ্তি বললে, আমি তো বোম্বাই যেতে চাইনি। আমি চুণারে কাজ শিখতে যাচ্ছিলুম।

—চুণার মে—কাম শিখনে কো লিয়ে!—থানাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল একসঙ্গে।

দারোগা বললেন, সে যাক। এবার বলো, কাশীতে তোমার কে আছে।

তৃপ্তি চুপ।

দারোগা আবার ধমক দিলেন, জবাব না দিলে হাজতে আটকে রাখব। বলো শিগ্‌গীর।

তখন বাধ্য হয়ে অমিয়র ঠিকানা দিতে হল তৃপ্তিকে।

ঘন্টাখানেক পরেই এল অমিয়। মুখ কালো, দুচোখে আগুন ঝরছে। দোকান থেকে ডেকে আনা হয়েছে তাকে।

কর্কশ গলায় দারোগা বললেন, তুমি এর দাদা?

অমিয় উত্তর দিল না, শুধু বজ্র-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বোনের দিকে। জায়গাটা থানা না হলে সে তৃপ্তির মাথাটা নখে ছি'ড়ে ফেলত এখন। এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়েই যত অশান্তি, যত গন্ডগোল! কী কুক্ষণেই তৃপ্তিকে সে চন্দন সিংয়ের ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিল!

দারোগা বললেন, জানো, এ নন্দলাল বলে একটা বাঙালী বদমাসের সঙ্গে জাহান্নমের দিকে পা বাড়িয়েছিল? নন্দলালের ওপর আমাদের নজর ছিল বলে এ যাত্রা বে'চে গিয়েছে। কিন্তু তুমি কেমন ভাই যে ছোট বোনকে একটু সামলে রাখতে পারো না?

অমিয় কপালের ঘাম মুছল, উগ্র হিংস্রতায় দাঁতে দাঁতে ঘষল একবার।

—আমাকে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হয় দোকানে। আর নন্দলালকে আমি আসতে বারণও করে দিয়েছিলুম।—অমিয় ফেটে পড়তে চাইল, তৃপ্তির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

তৃপ্তি কথা বলল না, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী করতে চাও?

অমিয় হিংস্র গলায় বললে, আমি ওকে কলকাতায় মা-বাবার কাছে পাঠাতে চাই। সেইজন্যেই ও পালিয়ে যাচ্ছিল।

দেওয়ালের দিকে চোখ রেখেই তৃপ্তি পরিষ্কার স্বরে বললে, আমি কলকাতায় যাব না।

যে বেঞ্চিতে বসেছিল, সেখান থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল অমিয়—কুৎসিত গর্জন করল একটা। দারোগা হাত বাড়িয়ে বাধা না দিলে সে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ত বোনের ওপর।

দারোগা বললেন, থামো। এ থানা, মাথা গরম করবার জায়গা নয়। সকলের কথাই শুনতে হবে আমাকে।—তৃপ্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় যেতে চাও তুমি?

তৃপ্তি বলল, যেখানে খুশি। আমার ভাবনা আপনাদের কাউকে ভাবতে হবে না—আমাকে ছেড়ে দিন।

অমিয় আবার এগোতে যাচ্ছিল তৃপ্তির দিকে, দারোগো তাকে টেনে বসিয়ে দিলেন। তৃপ্তিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়েস কত?

আমি ছেলেমানুষ নই। সতেরো বছর বয়েস হয়েছে আমার।

দারোগা হাসলেন: আর এক বছর পরে হলে তোমাকে এখুনি ছেড়ে দেওয়া যেত—কোনো আইন তোমাকে আটকাতে পারত না। কিন্তু এখন তোমাকে ভাইয়ের কথাই শুনতে হবে, ফিরে যেতে হবে কলকাতায়।

তৃপ্তি হঠাৎ ডুকরে উঠল: দারোগা-বাবু, আপনারা কি আমার কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? কোনো একটা মেয়েদের আশ্রমে কি আমার জায়গা হয় না, যেখানে আমি হাতের কাজ শিখতে পারি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি? কলকাতায় ফিরে গেলে সবাই আমাকে মেরে ফেলবে।

—মেরে ফেলবে?—অমিয় ফেটে পড়ল: এমন কথা তুই বলতে পারলি

দুষ্পদ্? বাবা-মা-বড়দার নামে এ সব বলতে তোর একবারও বাধল না?

দারোগাবাবু, ওকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দিন, তারপর আমি—

—মেরে ফেলার কাজটা তুমিই করতে চাও—মা?—দারোগা বললেন, সে কষ্ট তোমায় করতে হবে না। শোনো বেটী, তোমার কেউ যদি না থাকত, তা হলে একটা উপায় আমরাই হয়তো করতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু তোমার মা-বাপ-ভাইয়ের মত না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

—ফিরে যেতেই হবে?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—কিন্তু ছোড়দার সঙ্গে আমি যাব না।

—দরকার নেই। আমাদের লোক পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তৃপ্তি দুহাতে মুখ ঢাকল। আবার কলকাতা, সেই বাড়ী, সেই কম্পাউন্ডার! মুক্তির পথ নেই—দুহাত বাড়িয়ে মরণ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এত বড়ো পৃথিবী, তারায় ভরা এমন আশ্চর্য আকাশ, এত পাহাড়, নদী, এত শহর—কেউ তাকে এতটুকু জায়গা দিল না! অথচ সে তো কোনো অন্যায় করেনি—কেবল নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল, বড়ো হতে চেয়েছিল।

পৃথিবী অনেক বড়ো— কিন্তু তৃপ্তিরই সেখানে বেরুবার কোনো উপায় নেই। তার চারদিক ঘিরে ছোড়দা, বড়দা, থানা আর কম্পাউন্ডার করুণাময় পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এর চাইতে নন্দলালও ছিল ভালো। হোক শয়তান, তবু সেই তো তৃপ্তির কাছে এই পৃথিবীটার খবর এনেছিল। আগ্রার তাজমহলে জ্যোৎস্না পড়েছিল, মহীশুরের চন্দনবনের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছিল, দিল্লীর লালকিল্লা ছবির মতো ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে। কিন্তু সব হারিয়ে গেল।

আবার কলকাতা। বাবার কাতরানি মা-র কান্না, বড়দার কর্কশ গালাগাল। মাঝরাতে দিদি মদ খেয়ে ফিরে আসবে, আবার পাড়ার ছেলেগুলো বিশ্রী চিঠি লিখবে তার নামে, আর—

আর সেই বোকা টেকো কম্পাউন্ডার একটা থাবার মতো হাত বাড়িয়ে দেবে তার দিকে। বিয়ে করবে, না গলা টিপে মেরে ফেলবে কে জানে!

অমিয় উঠে দাঁড়ালো।

—ওর ভার তবে আপনারাই নিলেন!

—হ্যাঁ, এ-ই আমাদের ডিউটি।

—আমি তা হলে চলে যেতে পারি?

দারোগা বললেন, ওয়েট এ মিনিট। তোমাদের কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে যাও।

তৃপ্তি কোনো কথা শুনতে পেলো না। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছে, চোখের সামনে একটার পর একটা অন্ধকারের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার।

বাইরে অন্ধকার ছুটেছে। ট্রেন ছুটেছে তার সঙ্গে।

থার্ড ক্লাস লেডীজ কম্পার্টমেন্টে ভিড় থাকলেও সবাই-ই বসবার জায়গা পেয়েছে। এক ভদ্রমহিলা এরই মধ্যে নিজের বাচ্চাটাকে শোয়াবার ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন। গাড়ী দুলছে, কামরার ঘোলাটে আলো দুটোকে ঘিরে পোকারা ঘুরপাক খাচ্ছে, আর ওই পোকাগুলোর সঙ্গে কামরায় একমাত্র তৃপ্তিই জেগে আছে। এমন কি, তার পাশে যে মহিলা-এস্কর্টটি বসেছে, তারও মাথাটা বার-বার ঘুমের ঝোঁকে বুকের ওপর নেমে পড়ছে।

দরজার কাছে একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী নিয়ে যে বিনা-টিকেটের যাত্রী জীর্ণশীর্ণ বুড়ীটা এতক্ষণ সমানে কান্নাকাটি করছিল, তৃপ্তি চেয়ে দেখল তার দিকে। টয়লেটের দরজাটার ওপর মাথা রেখে বুড়ীও ঘুমে অচেতন—চামড়া ঝুলে-পড়া কোঁচকানো মুখে চোখ দুটো অন্ধকারে তলিয়ে আছে তার। এখন তার কোনো ভাবনা নেই, কোনো কান্না নেই। অন্তত কয়েক ঘন্টার জন্যে সে নিশ্চিন্ত।

অথচ মোগলসরাই থেকে ওঠবার পর গাড়ীসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে তুলেছিল। নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে গাড়ীসুদ্ধ সমস্ত লোকের সঙ্গে তাকেও শুনতে হয়েছিল বুড়ীর কাহিনী। হিন্দী সে ভালো বুঝতে পারে না—তবু নানা জনের নানা কথা থেকে সব জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার কাছে।

তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে ছিল তার। গ্রামে কলেরার মড়ক লাগতে তাদের দুজন চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। ছোট ছেলেকে আশ্রয় করেই বুড়ীর দুঃখের দিন কাটছিল, সামান্য যা চাষবাস আছে ছেলেই তার দেখাশোনা করত। বুড়ী যখন ছেলের বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে, তখন কে যে তাকে কী মতলব দিল, ছেলে পালিয়ে গেল কলকাতায়। সেখানে তাদের বহুৎ দেশোয়ালী আছে, কলে-কারখানায় চাকরি করে, ব্যবসা করে, দারোয়ানী করে, পুলিশ হয়—অনেক রোজগার করে। ছেলেও বরাত ফেরাবার জন্যে ছুটল কলকাতায়। গিয়ে কোথায় যেন চটকলে ঢুকল, দু'বছর ধরে টাকাও পাঠাচ্ছিল বুড়ীকে। তারপর ছ'মাস আর তার কোনো খবর নেই।

সেদিন যেন কে তাকে জানিয়েছে তার ছেলে আর বেঁচে নেই। কোন্ 'বারিকপুরের' কাছে লরীর তলায় চাপা পড়ে সে মারা গেছে।

বুড়ী একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দু-দুটো জোয়ান ছেলে চলে যাওয়ার পর জগলালই তার একমাত্র ভরসা। তাকেও কেড়ে নেবেন রামজী ভগবান এমন অবিচার করতেই পারেন না। তার জগলাল বেঁচে আছে, ভালো আছে, হয়তো নানা ঝামেলায় তাকে চিঠি লিখতে পারে না। আর সে নিজেও তো পড়া-লিখা জানে না—অন্যকে দিয়ে তার চিঠি লেখাতে হয়! তারা লিখে না দিলে—

তাই বুড়ী তার ছেলেকে খুঁজতে চলেছে।

মোগলসরাই থেকে সমানে কেঁদেছে আর সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে, জগলাল কাহার, 'হবড়া, বেলিলাস রোডে' থাকে, তাকে কেউ চেনে কিনা।

গাড়ীর বাঙালী-হিন্দুস্থানী যাত্রিণীরা বলেছে, 'কলকাত্তা খুব ভারী শহর, সেখানে কেউ কাউকে চেনে না।'

তা হলে কি তার জগলাল বেঁচে নেই?

সবাই বলেছে, নিশ্চয় বেঁচে আছে। রামজী তাকে ভালোই রেখেছেন। কিন্তু বুড়ী কি তাকে খুঁজে পাবে? অবিশ্যি 'হবড়া বেলিলাস রোডে'র একটা পত্তা আছে বটে, কিন্তু সে বুড়ো মানুষ সে কি—

বুড়ী বলেছে, পারবে। তার ছেলে জগলাল কাহার যেখানেই থাকুক, মা-র চোখকে ফাঁকি দেবার জো নেই।

তবু কান্না থামেনি। তবু ভয় কাটেনি।

কিন্তু এতক্ষণে সে-ও ঘুমিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে শান্তি পেয়েছে।

তৃপ্তির মা-কে মনে পড়ল, বাবাকে মনে পড়ল। তার জন্যেও তো এমনি

করেই তাঁদের চোখের জল পড়েছে। তার জন্যে, ছোড়দার জন্যে। মাথার চুলে আলো থেকে এক রাশ পোকা এসে উড়ে পড়েছিল। সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে তৃপ্তি পরক্ষণেই ভাবল, না—তার জন্যে এক বিন্দু চোখের জল ফেলেনি কেউ। সে যদি অমনিভাবে কোনোদিন গাড়ী চাপা পড়ে মরে যায়—সেই খবরটা যদি বাড়ীতে এসে পৌঁছোয়—সবাই ভাববে, আপদ মিটল, একটা কাঁটা দূরে হয়ে গেল। তা যদি না হত, বাড়ীর লোকে যদি একটুকুও ভালোবাসত তাকে, তা হলে অমন করে সবাই তাকে হাত-পা বেঁধে ওই কম্পাউন্ডারের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইত না।

বুড়ী তার জগন্নাথকে খুঁজছে। কিন্তু তৃপ্তিকে কেউ খোঁজে না।

তবে কেন সে কলকাতায় ফিরে চলেছে?

সে তো যেতে চায়নি—সবাই ষড়যন্ত্র করে ঠেলে পাঠাচ্ছে তাকে। নিয়ে চলেছে সেই কম্পাউন্ডারটার কাছে তাকে বলি দেবার জন্যে। তৃপ্তি নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

অন্ধকারে সারি সারি কালো পাহাড় চলেছে, মধ্যে মধ্যে ঝিকঝিক করছে নদীর জল, ঘন জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ জোনাকি, এঞ্জিনের মুখ থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের কণা ঠিকরে বেরিয়ে এসে জোনাকিদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কোনোখানে মানুষের বসতি আছে বলে মনে হয় না—চাঁদ অস্ত যাচ্ছে—সেটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরে ছম-ছম করে ওঠে।

যেদিন অমিয়র সঙ্গে চলে এসেছিল—সে রাতটা অন্য রকম। হাল্কা জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গিয়েছিল চারদিক—গ্রাম নজরে আসছিল, আলো মিটমিট করছিল এখানে-ওখানে, ঝলমল করে উঠছিল এক-একটা স্টেশন। সে রাতে ট্রেনের চাকায় চাকায় গান উঠেছিল, তারায় তারায় ছুটির সুর বাজছিল, তৃপ্তির চোখ দুটোকে খুশিতে স্নান করিয়ে দিয়ে ভোরের আলো দূরের সারি-দেওয়া তালগাছের মাথার ওপর ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আজ যেন গাড়ীটা আলাদা কোনো পথ দিয়ে চলেছে। জঙ্গল, পাহাড় আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটেছে পথ হারিয়ে—শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে সোজা মুখ থুবড়ে পড়বে। সূর্য উঠবে না, আলো ফুটবে না, কোনো একটা মস্ত পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে!

অন্ধকার কাঁপিয়ে ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসল্ বাজল, গাড়ীটা বাঁক নিলে, সমস্ত কামরাটা ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল। ছোট বাচ্চাটা একবার কেঁদে উঠতে তার মা থাবড়ে থাবড়ে তাকে ঘুম পাড়ালো, তৃপ্তির সঙ্গীটি সোজা হয়ে উঠে বসে নিজের হাতের ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল, বুড়ীটা ফুঁপিয়ে উঠল: 'বেটা জগন্নাথ!' তারপর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার আগের মতো ঘুমিয়ে পড়ল সবাই আর কামরার প্লাফে আলো দুটোকে ঘিরে ঘিরে পোকারা মৃত্যুকামনা করতে লাগল।

তৃপ্তির মনে পড়ল, নারকেলডাঙায় আসবার আগে শ্যামবাজারের সেই বাসাটার কথা। আরো ছোটো, আরো অন্ধকার। নারকেলডাঙার মতো আলাদা ব্যবস্থা নয়, কাশীর বাড়ীটার মতো অনেক ভাড়াটের ভিড় সেখানে, কল নিয়ে ঝগড়া, মাঝরাতে দোতলায় এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে মারামারি। সেই বাড়ীতে একদিন পাড়া কাঁপিয়ে কান্না উঠল। কোথায় যেন রেলগাড়ী উল্টে গেছে আর তেতলার ভাড়াটেদের জামাই মারা গেছে সেই দুর্ঘটনায়।

ভদ্রলোকের ব্লাডপ্রেশার ছিল, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছেন।

'এক বছরও হয়নি দিদি, মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিলুম। কেন আমার এমন সর্বনাশ হল ভাই, কী এমন পাপ আমি করেছিলুম!'

আজ যদি এই অন্ধকারে, এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে এই গাড়ীটা উল্টে যায়, তা হলে ঘরে ঘরে তেমনি করে কান্নার রোল উঠবে। শুধু তৃপ্তির জন্যে কেউ কাঁদবে না। বাবা বলবেন, 'ও আমার মেয়ে নয়', মা চুপ করে বসে থাকবেন, বড়দা বলবে, 'যাক, বাঁচা গেল, হাড় জ্বালিয়ে মারছিল মেয়েটা!'

কেন কলকাতায় ফিরবে তৃপ্তি? তার চাইতে এখন যদি গাড়ীর দরজা খুলে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে কেমন হয়? কেউ জানতে পারবে না। সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছে, ঘুমের ঝোঁকে তার মাথাটা আবার ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। সে যখন জেগে উঠে তাকে খুঁজতে চাইবে, তখন হয়তো ট্রেনটা অনেক—অনেক দূরে পেরিয়ে গেছে। এই অন্ধকার বনের মধ্যে কোথায় যে মুছে যাবে তৃপ্তি, পৃথিবীতে কেউ আর কোনোদিন তার সন্ধান পাবে না।

কিন্তু রাত্রির এই কালো বনের ভেতরে এমন করে হারিয়ে যাওয়া তো নয়। একটা মস্ত বড়ো জীবনের মধ্যে সে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল—লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল কিম্বা হাতের কাজ করে সামান্য কিছু রোজগার করতে চেয়েছিল। কত মেয়ে তো বিলেতে যায় আজকাল, ডাক্তার হয়, প্রফেসার হয়—বড়ো চাকরি করে, বড়দা একদিন বলেছিল বাঙালীর মেয়ে এরোপ্লেনও চালায়। কিন্তু তৃপ্তির চারদিকে সব এমন করে বন্ধ কেন, কেন তাকে সবাই মিলে পিষে মারতে চাইছে?

তাদের নারকেলডাঙার বাড়ীর সামনে দিয়েই তো একটি মেয়ে ব্যাগ হাতে করে রোজ অফিসে যায়। বেশ ঝকঝকে চেহারা, বড়ো বড়ো পা ফেলে ন'টা সাড়ে ন'টায় চলে যায়, আবার পাঁচটায় পরে ফিরে আসে। পাড়ায় এত বাঁদর ছেলে রয়েছে, কই, তার সঙ্গে কেউ তো অসভ্যতা করতে সাহস পায় না!

শুধু যত দোষ তৃপ্তির বেলাতেই!

ফিরব না, কিছুতেই ফিরব না কলকাতায়। তার চাইতে ঝাঁপিয়ে পড়ব গাড়ীর নীচে। আমার দায় কাউকে বইতে হবে না, সবাইকে আমি ছুটি দিয়ে যাব।

গাড়ীর গতি কমে এল, তীব্র স্বরে হুইসেল বাজল—অনেকগুলো আলো ঝকমক করে উঠল—গাড়ীটা একটা মস্ত স্টেশনে এসে থামল। কী যেন জংশন—তৃপ্তি ভালো করে নামটা পড়তে পারল না। 'চা গরম'—'পান বিড়ি সিগরেট'—'এ কুলি, ইধার আও—ইধার আও—'

—চা বোলাউঁ?

—আপ পিজিয়ে।

মেয়েটা এক ভাঁড় চা নিলে। সামনের বেঞ্চিতে ঘুমন্ত বাচ্চাটি ট্রেনের ঝাঁকুনিতে এক পাশে সরে এসেছিল, তার মা আবার ভালো করে শুইয়ে দিলে বুড়ীটা হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠল।

—ই কলকাত্তা হ্যায়?

একজন প্রৌঢ় বাঙালী মহিলা প্রায় ধমক দিলেন তাকে : আরে, অভি কলকাত্তা কাঁহা সে আসবে? কলকাতায় গাড়ী পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যাবে—এখন চুপচাপ বস্‌কে বৈঠ রহো!

বুড়ী কোটরে-বসা অন্ধকার চোখে কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো চেয়ে রইল।

তারপর আবার ডুকরে উঠল : জগলাল-- হায় বেটা জগলাল--

প্রৌঢ়া মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বললেন, উঃ--আবার শুরু ধরল! কী জ্বালাতনেই যে পড়া গেছে!

তৃপ্তি প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ছিল। লোক আসছে যাচ্ছে, কাঁচের বাক্সের সামনে কেরোসিনের ল্যাম্প জেবলে চলেছে ফিরিওলা, ভেতরে পুরী-মিঠাই আর লালপাত্তা দেখা যাচ্ছে। যাওয়ার সময় ছোড়দা এমনি কোনো একটা স্টেশনে পুরী-তরকারী কিনেছিল, সে-কথা তার মনে পড়ে গেল। সে দিনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।

সামনে একটা জলের কল--অনেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে. নানা রকম পাত্র ভরে নিচ্ছে, আঁজলা আঁজলা করে জল খাচ্ছে কেউ কেউ। তৃপ্তিরও বুক পিপাসায় শুকিয়ে গেছে মনে হল। কিন্তু সঙ্গের মেয়েটিকে সে-কথা বলবার মতো উৎসাহ খুঁজে পেল না সে। পা থেকে মাথায় চুলের ডগা পর্যন্ত তার জ্বলে যাচ্ছে, শুধু কয়েক আঁজলা জলে তার কী হবে!

--হে রামজী, হে ভগোয়ান--মেরা বেটা জগলাল কো--

সেই বুড়ী। সঙ্গের মেয়েটি চায়ের খালি ভাঁড়টা প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললে, আর এইসা হি চলেগা রাতভোর। কম্‌রেমে কিসিকো শোনে ভি নেহি দেগী।

তৃপ্তির জন্যে মা-ও কি কখনো এমনি করে অনেক রাত পর্যন্ত কান্না-কাটি করেন? আর প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ, কী বিশ্রী চিৎকার করছে, রাত্রে কাউকে আর ঘুমুতে দেবে না!

না--তার জন্যে কেউ কাঁদে না।

প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়েছিল তৃপ্তি, হঠাৎ তার গায়ের রক্ত জমে গেল। কে ও এখানে দাঁড়িয়ে--ওই ল্যাম্প-পোস্টটার নীচে? গায়ে একটা ছিটের শার্ট, মাথার টাকটা চকচক করছে, আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এই গাড়ীটার দিকেই?

করুণাময়? সেই কম্পাউণ্ডার? সে কি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে? দেখতে পেয়েছে তাকে? এখনি ছুটে এসে দুটো বিশ্রী হাত বাড়িয়ে গলাটা টিপে ধরবে তার? কে জানে!

একটা অস্পষ্ট চিৎকার বেরিয়ে এল তৃপ্তির মুখ থেকে।

সঙ্গের মেয়েটি চমকে উঠল : কেয়া হুয়া? কেয়া হুয়া?

বাঁশি বাজিয়ে গাড়ী নড়ল--একটু-একটু করে ছাড়িয়ে যাচ্ছে স্টেশন। ল্যাম্প-পোস্টটার নীচে সেই লোকটা ভূতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার টাকের ওপর আলোটা চকচক করছে। করুণাময়? ওকি তৃপ্তিকে দেখতে পেয়েছে? ওকি তৃপ্তিকে দেখতে পায়নি?

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল : কেয়া হুয়া আপকো?

--কিছু না। কুছ নেহি।

কে ও এখানে দাঁড়িয়ে......

কতকগুলো রেলের লাইন আর নীল-লাল আলোর সীমা পার হয়ে ট্রেনটা আবার অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তৃপ্তির মনে হতে লাগল, লোকটা যে তার সঙ্গ ছাড়েনি--একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলে চলন্ত গাড়ীটার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে ছুটে চলেছে।

তৃপ্তি আর পারল না। হঠাৎ কাঠের খড়খড়িটা ধড়াম করে ফেলে দিল।

হাওড়া স্টেশনে, পুলিশের সেই ঘরটাতে অপেক্ষা করছিল অভয়। আজ সকালেই থানা থেকে খবর গিয়েছিল তার কাছে।

একবার মাত্র অভয়ের দিকে তাকিয়েই তৃপ্তি চোখ বুজল। ভাবল, কাল রাত্রে তো অত সুযোগ ছিল, তবু কেন সে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল না, কেন আবার এমনি করে ফিরে এল কলকাতায়!

অভয় উঠে এসে তার মাথায় হাত রাখল।

আশ্চর্য কোমল আর করুণ গলায় বললে, বাড়ী চল।

তৃপ্তি তবু চোখ মেলতে পারল না। ঘরে কে ঢুকল? কার পায়ের শব্দ? করুণাময়? সেও কি ট্রেন থেকে নেমেছে তার পেছনে? কিম্বা অভয়ের সঙ্গে তাকে নিতে এসেছে স্টেশনে? তৃপ্তি যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু করুণাময় নয়, অভয়ই কথা বললে আবার।

তিপু, মা-র খুব অসুখ। বাঁচবে কিনা এখনো বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

হেরমান হেস্‌সে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি কিছুদিন হলো হেরমান হেস্‌সে'র মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। হেস্‌সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ৭০ বৎসর বয়সে। তার আগেই তিনি দিকপাল সাহিত্যিক বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জার্মান মনীষী কবি সাহিত্যিক দার্শনিকদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৌতূহল সর্বজনবিদিত। গোটে শিলার সোপেন-হাওয়ারের কথা সকলেই জানেন। হেস্‌সের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, বরং একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। যার প্রেরণায় যৌবনে তিনি প্রাচ্যদেশ—বিশেষ করে ভারতে ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

হেস্‌সের জন্ম ১৮৭৭ সালের জুলাই-এ জার্মানীর ব্ল্যাকফরেস্ট অঞ্চলে উইটেনবার্গ-এ ক্যাল-তে। তিনি ছিলেন যাজক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা পিতামহ ছিলেন প্রাচ্যের তথা ভারতের মিশনারী। হেস্‌সে কিছুদিন গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করে মন্ত্রী হওয়ার জন্যে অধ্যয়ন করছিলেন। কিন্তু ভালো লাগেনি, তাই ছেড়ে দেন। তারপর কিছুদিন পুস্তক বিক্রেতার কাজ করেন। কিন্তু সেটাও ভালো লাগলো না, ছেড়ে দিলেন। সব ছেড়ে দিয়ে হলেন লেখক। সেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। প্রথমদিকে তিনি স্বাদেশীয় পটভূমিকায় কয়েকখানা উপন্যাস লেখেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পিটার ক্যামেনজিন্ড' ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর 'আনটার্ম র‍্যাড' ১৯০৫ সালে, গার্ট্রুড ১৯১০ সালে। এইসব উপন্যাস খানিকটা আত্মজীবনী-মূলক। অর্থাৎ জগৎ থেকে দূরে। হেস্‌সের নিজের শৈশব আর যৌবনের সংগ্রামের ছবি ও ছায়াপাত হয়েছে এগুলিতে। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'রস্‌হাল্ড' এবং 'ডেমিয়ান' ১৯১৫-তে প্রকাশিত হয়। এই সব উপন্যাসে খানিকটা স্পর্শ-কাতর মানুষের একক সুখাকাঙ্ক্ষা এবং স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য স্বভাবতই তিনি সমাজের চিন্তার চেয়ে ব্যক্তি মানুষের সুখদুঃখের জগতের চিন্তা করতেন। এই সময়কার উপন্যাস-গুলিতে তাঁর মনোবিকলনের দিকে অবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯১২ সালে তাঁর সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এবং পরে হেস্‌সে গভীর ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য

হেরমান হেস্‌সে

করছিলেন কেমন করে মানুষের মনে ধীরে ধীরে সংকীর্ণ জাতিয়তাবোধ বাসা বাঁধছে, আর বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যমান ধ্বসে যাচ্ছে। তখন তাঁর ওপর নীটস্-এর প্রবল প্রভাব পড়েছে। অবশ্য ইটালী এবং ভারত ভ্রমণ করে মনের দিক থেকে খানিকটা তৃপ্তি ও শান্তি পেলেন তিনি। তাঁর ভারত ভ্রমণের ফলশ্রুতিস্বরূপ 'সিদ্ধার্থ' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। সমারসেট মম-এর যেমন 'রেজর্স এজ'। তাঁর 'সিদ্ধার্থ' গ্রন্থটিকে অবশ্য ঠিক ঠিক উপন্যাস পর্যায়ে ফেলা যায় না। অনেকে অবশ্য এটির ইংরাজী অনুবাদ বা বাংলা তর্জমা পড়ে থাকবেন। তবু ভারতীয় ভাবধারা এবং জীবনাদর্শ এতে প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে এর কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে দিচ্ছি।—

সিদ্ধার্থ এক তরুণ ব্রাহ্মণকুমার। শ্রমসাধ্য শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞ তাকে জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর যোগাতে পারলো না। সে তখন গৃহবাস ছেড়ে বনবাসে কায়ক্লেশে কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করলো। তপস্যাও অধিগত হলো, পারদর্শিতা লাভ হলো, কিন্তু সেখানেও মিললো না তার প্রশ্নের কোনো সদুত্তর। 'জীবনের উদ্দেশ্য কী তবে? কেন আসা এই পৃথিবীতে?' ইত্যাদি প্রশ্নের পাথরে মাথা খুঁড়ে নিজেকে করলো রক্তাক্ত। বেদনার কাঁটায় নিরন্তর বিদ্ধ হলো বুক। বুদ্ধের উপদেশ শুনে খুব ভালো লাগলো। কিন্তু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারলো কৈ? শুধুবাদে তার আস্থা নেই। অথচ জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা তাকে পেতেই হবে। জানতে হবে তার সব প্রশ্নের উত্তর। সে তখন ছাড়লো সন্ন্যাসীর ব্রত—কঠোরতম তপশ্চর্যা। ফিরে এলো জনপদে—নগরে। নীরস বৈরাগ্যে শুকিয়ে ওঠা মনকে ভিজিয়ে দিলো মধুর রসে। নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছে নিলো প্রেমের দীক্ষা। বিলাসের স্রোতে ভাসালো দেহমনের তরণীকে। কিন্তু কৈ? এখানেও হলো না পরিপূর্ণ বীক্ষণ। অমীমাংসিত রইলো অনেক অনেক কিছু। তাই বাসাংসি জীর্ণানির মতো বিলাস ব্যসন ভোগ সুখ রীতি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো

সে পথে। ভাবলো, অবশেষে পথই তাকে শিক্ষা দেবে। কিন্তু পথের শেষ কোথায়? কোথায় তার পরিসমাপ্তি, সব জিজ্ঞাসার অবসান, প্রাণের শান্তি? সদুত্তর মিলবে কোথায় তার প্রজ্বলন্ত জীবন-জিজ্ঞাসার?

যেতে যেতে দেখা পেলো খেয়াঘাটের বুড়ো মাঝি বাসুদেবের। আর তার সামনে নিরন্তর বহতা নদীর। ওদের কাছেই মিললো সমাধান। জ্বলে-যাওয়া জীবনে পেলো প্রশান্তির প্রলেপ। পেলো প্রশান্ত উত্তর : অনাদি অনন্ত সময়কে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে কাল্পনিক ভাগ করে আমরা টেনে আনি দুঃখ। আসলে নদী যেমন সর্বদা বহমান, সময়ও ঠিক তেমনই—সর্বদা বহমান, সর্বদা বর্তমান। জীবনের স্রোতও চলেছে এমনই অবিশ্রাম। তার মধ্যে সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ভালো মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটছে। কিন্তু ভাঙা গড়া ওঠা পড়ার নানান বৈচিত্র্য নিয়েই জীবনের প্রকাশ, তার জটিলতা—দ্বন্দ্ব—সমগ্রতা। এই অশেষ ত্রুটি বিচ্যুতিতেই জীবনের অখণ্ড সামগ্রিক রূপ। সিদ্ধার্থের চোখ খুলে গেল।

হেস্‌সের পরবর্তী এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাস স্টেপেন উলফ্‌ (Steppen wolf) প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ। এতে তাঁর যুদ্ধশেষের অনিশ্চিতির পরিচয়। স্টেপেন উলফ্‌-এ মনোবিকলন আর প্রকাশক্ষম চিত্রকল্পের সাহায্যে সভ্য ও আদিম উভয় মনোবৃত্তির যুগপৎ প্রকাশ দেখা যায় নায়ক হ্যারী হলার-এর চরিত্রে। আর হ্যারী হলার যেন একটা ব্যক্তি নয়, একটা বংশ। যার যুধ্যমান আত্মা বিধ্বস্ত সমাজে আর শান্তি পাচ্ছে না, টিঁকতে পারছে না। হেস্‌সে অবশ্য তাঁর ধর্মীয় মানবিকতার সাহায্যে একটা সমাধান করতে চেয়েছেন।

হেস্‌সে নিজেও দেশে টিঁকতে পারেননি। সুইজারল্যাণ্ডেই বাস করতেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হেস্‌সের রচনায় এখান থেকেই একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। পরবর্তী গল্প উপন্যাস-গুলিতে হেস্‌সে মানুষের হৃদয়ের রোমাণ্টিক আবেগকে ট্র্যাডিসন মেনে আমল দেননি। বিশেষ করে তাঁর 'ডেথ অ্যাণ্ড লাইফ' (১৯৩২), 'দি বিড গেম' (১৯৪৩) উপন্যাসগুলিতে তিনি ব্যক্তির আত্মবিলোপী তপশ্চরণের সঙ্গে সৃষ্টি-শীল শক্তিমত্তার বিপরীতমুখী তুলনা করতে চেয়েছেন। শেষোক্ত উপন্যাস-খানিতে তাঁর জার্মান দার্শনিকসুলভ কলাকৈবল্যের খুঁটিনাটির প্রতি গুরু-শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও মরমিয়াবাদ-ও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই সঙ্গে খাঁটি ক্রিশ্চান বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে।

হেস্‌সের উপন্যাস ও প্রবন্ধ সঙ্কলন ছাড়াও কয়েকটি মনোরম কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। Gedichte (১৯২২) এবং Trost der Nacht (১৯২৯) কবিতাগুলিতে বিশেষ করে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংগীতময়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দিচ্ছি।

মধ্যগ্রীষ্ম

শুকালো ফুলদল, অচিরজীবী ওর গৌরব,
ঢেকেছে সমতল সোনালি ধূলিকণা মার্জনায়;
হলুদী হয় একেশিয়ার পাতাদের বৈভব,
গ্রীষ্ম সেখানেই নিজেকে করে ক্ষয় কী নিরুপায়,
নিজের আন্তর অগ্নিশিখাতেই দগ্ধ।
শুষ্ক বীজকোষ পাথরসম বীজ ছুঁড়ে দ্যায়।
প্রতিটি গ্রহ আর প্রতিটি তারকাও সন্ধ্যায়
ঝুলতে থাকে ঢের বয়সে অতিশয় পক্ব,
প্রখরতম জ্বর-ঝরানো আকাশের বুকেতেই,
যেখানে আঁধিঝড়। আবছা বিজলীও খেলে যায়।
(কে পার হতে পারে সময়-শাসনেরে?) যেখানেই
জীবন ছুটে গেছে ফেনিল ঢেউ-ভাঙা ঝর্ণায়,
গ্রীষ্ম হাঁপ টেনে ছুটেছে চড়াইয়েও পাহাড়ের
বেঁকিয়ে ঘাড়। তার বাসনা নয়, চিরদিন থাকে:
তৃষ্ণা চায় তার আত্মনিবেদনে আবেগের
চরম মত্ততা। মৃত্যু, দ্যাখো, ডেকেছিল তাকে:
ক্লান্ত ঘোড়াটায় চড়ে সে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।
পৃথিবী করে দিয়ে পুষ্পহীন মৃত, পালিয়েছে।
পাতারা পাক খায় দীর্ঘশ্বাসে, আর সব ঘাস
ভাঙা কাচের মতো তুলেছে কর্কশ নিশ্বাস।

সমগ্র কবিতাটি তাঁর অন্তরের আবেগে স্পন্দিত। নিসর্গ কবিতাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বসন্ত দিন কবিতাটিতে তাঁর সৌম্য অন্তরের শান্তসমাহিতি।

বসন্ত দিন

ঝোপে ঝোপে হাওয়া এবং পাখির গান,
ঊর্ধ্ব আকাশে ঘননীল সরোবরে
নীরব মেঘের নৌকাটি ভাসমান......
সোনালি চুলের রূপসী স্বপ্ন তার:
যৌবনময় দিবসে, স্বপ্ন আমার,
রূপরেখা পায়, আর নভোনীলিমার
দোলনায় দোল খেয়ে
উৎসুক আমি কোমল, স্নিগ্ধ আর
মৃদুতম উত্তাপে,
স্তোত্র ও গান গেয়ে
শুয়ে থাকি, যেন শিশু সন্তান যাপে
মায়ের অঙ্কে তায়।

মাত্র কয়েকটি রেখায় এখানে শৈশব, যৌবন আর সমগ্র সত্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে স্বপ্নময়তায়।

ফুল, গাছ, পাখি

উজ্জ্বল হও একাকী হৃদয়,
সময়ের অনুকূলে;
সে-নারী হারায় দিন গুণে যায়;
যন্ত্রণা, নীল ফুল।

দুঃখের গাছ এখন বাড়ায়
চারিদিকে তার ডাল,
তাতে গান গায় সবুজ শাখায়
পাখি, বহমান কাল।
যন্ত্রণা-ফুল নীরব নিঝুম,
কথা তার লোপ পায়;
গাছ, বেড়ে ওঠে স্বর্গের ডকে
পাখি, গান গেয়ে যায়।

এখানে দার্শনিক ভাবটি রোমাণ্টিক আবেগে উচ্চারিত। পরবর্তী কবিতাটিতে রোমাণ্টিক বেদনা ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে—

যৌবনের অপসর্পণ

ক্লান্ত গ্রীষ্ম ভয়ে অবনত শির,
দ্যাখে সরোবরে ম্লান মুখছবি তার।
ধুলো ভাঙি ভয়ে শ্রান্তিতে অস্থির,
ছায়া-ঢাকা রাজপথ নাগালের বার।

ভীরু হাওয়া যেন পপলার শাখালীন
পিছনে আকাশ বর্ণিল গাঢ় রাগে;
সন্ধ্যার ভয়, দিবসের আলো ক্ষীণ:
গোধূলি এবং মৃত্যুও পুরোভাগে।

ধুলো ভাঙি ভয়ে ক্লান্তিতে অস্থির।
পিছে যৌবন সোৎসুক থেমে যায়:
আনত করে সে চিরপ্রিয়তম শির,
সঙ্গ দেবে না কোনোদিন পুনরায়।

আবার রাত্রি কবিতায় রোমাণ্টিক বেদনার রসে খুঁজেছেন সন্তোষ আশ্রয়।

রাত্রি

আমি মোমবাতি নিবিয়ে দিয়েছি ঘরে;
দয়াময়ী রাত মানে না সীমানা তার;
যারে অফুরান আদরে সোহাগে ভ'রে,
ডাকে ভাই আর প্রিয় বন্ধু বারবার।

আমরা দুজন নানান ব্যথার ব্যথী;
ঈপ্সিত যতো স্বপ্নের রাশ ছাড়ি;
আরেক কালের কূজনে দুজনে মাতি,
এই ঘরে, এই পিতৃদেবের বাড়ি।

'পিতৃদেবের বাড়িতে' সান্ত্বনার কথাটা লক্ষণীয়, তাঁর পক্ষে।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

মৃত্যুর পরে মরদেহ ভারী হয়ে যায় একথা অনেকেই জানেন। যে জীবন্ত মানুষকে একজন লোক তুলে নাচাতে পারতো সেই লোকের মৃতদেহকেই খাটিয়ায় করে শ্মশানে নিয়ে যেতে চার-জন লোককে প্রাণান্ত হতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর মৃতদেহ ভারী হওয়ার কারণই বা কি? তবে মৃতদেহ তিনচারদিন ঘরে রেখে বাসী করলে সেই মৃতদেহ প'চে ভারী হতে পারে। কিংবা জলে ডুবে মারা গেলে জল খেয়ে মৃতদেহ ভারী হতে পারে। কিন্তু সদ্যমৃত এত ভারী হয় কি করে? জানতে ভারী ইচ্ছে জাগে।

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী,
৬১, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলকাতা—৫

(প্রশ্ন)

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকা অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগের আমি একজন নিয়মিত এবং আগ্রহশীল পাঠক। এ বিভাগটির জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমার নিম্ন প্রশ্নটি ঐ বিভাগের জন্য পাঠালাম।

গ্রামদেশে যাঁরা থাকেন তাঁরা একটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে রাত্রি-বেলা শেয়াল একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে ডেকে থাকে। শেয়ালের ডাক সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত চার পাঁচবার শুনা যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর যে কোন ব্যতিক্রম হয় না এমন নয়। কিন্তু একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে সে ডেকে থাকে। ঐ প্রসঙ্গে মোরগ এবং কোড়াল পাখীর ডাকেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের এ ডাক কখন কখন হয়ত কোন নির্দিষ্ট সময়ের পনরো-বিশ মিনিট পূর্বে অথবা পরেও শুনা যায়। সময়ের এ সামান্য পার্থক্য ছেড়ে দিলেও এটা ঠিক যে এদের ডাকার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। ডাকার এ নির্দিষ্ট সময় এরা কি করে টের পায়? এদের সময়-বোধ সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি? এদের ঐরূপ সময় অনু-সারে ডেকে উঠার অৎপর্য কি থাকতে পারে?

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৩য়) আসাম রাইফেলস,
কোহিমা—নাগাল্যাণ্ড।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য অজস্র ধন্যবাদ। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন তুলিয়া ধরিলাম। পত্রিকা মারফৎ প্রকাশের আশা রাখি।

বাঙলা ভাষায় বহু ইংরাজী, ফরাসী, আরবি ও ফার্সি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় তাহারা এক সময়ে আমাদের রাজ্য জয় করিয়াছিল ও তাহাদের সহিত আমাদের সংস্কৃতির আদান-প্রদান হইয়াছিল বলিয়া। ইহাই ঠিক। কেননা যেহেতু রাশিয়ানরা আমাদের রাজ্য জয় করে নাই এবং তাহাদের সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান অতি আধু-নিক কালের সেহেতু বাঙলা ভাষায় রাশিয়ান ভাষার কোন প্রভাব নাই। যদি ইহাই ঠিক হয় তবে ভারতও তো এক সময়ে সিংহল, জাভা, যবদ্বীপ বালি প্রভৃতি দ্বীপ জয় করিয়াছিল। এবং বালি প্রভৃতি দ্বীপের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও কম ছিল না ('সাগরিকা', রবীন্দ্রনাথ)। তবে কি ঐ সকল দেশের ভাষায় ভারতীয় ভাষার প্রভাব আছে। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ ভারতীয় ভাষার এবং কি?

নমস্কারান্তে—
শ্রীপ্রবীর ঘোষ
লক্ষণপাড়া,
পোঃ—কালনা
জেলা—বর্ধমান

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

১। প্রাচীন ঘড়িতে রোমান সংখ্যা (II, VI, XI ইত্যাদি) দেখা যায়। ইহা হইতে কি বুঝিব রোমানরা আমাদের দেশে ঘড়ি প্রথম আমদানী করিয়াছে? —না অন্য জাতি? যদি অন্য জাতি হয় তবে প্রাচীন ঘড়িতে রোমান সংখ্যা কেন?

২। বাস, লরি ইত্যাদি নাম্বার প্লেটে W. G. A, W. B. S, W. B. B ইত্যাদি তিনটি করিয়া ইংরেজী অক্ষর থাকে। ইহার অর্থ কি? তিনটির বেশী অক্ষর থাকে না কেন?

৩। আমরা 'পদ্ম' বলিলে আর 'কমল' বলি না। কিন্তু আগেকার দিনের রাজারা 'শ্রীল' লিখিবার পরও 'শ্রীযুক্ত' লিখিতেন। একার্থক শব্দ দুটি পর পর লিখিবার কারণ কি? এতে কি ভুল হইত না?

৫। 'The brothers and sisters of America' এরূপ সম্ভাষণ বাক্য স্বামীজীই সর্বপ্রথম আমেরিকায় প্রচার করেন। বাংলায় 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়...' ইত্যাদি যে সম্ভাষণ বাক্য প্রচলিত তা কবে থেকে চালু হয় ও ইহার প্রবর্তক কে?

৬। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশের (ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া) স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ান হয়?

৭। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় মোট কয়টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ও উহাদের নাম কি?

শ্রীমদনচন্দ্র মান্না
সুগন্ধা, হুগলী।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখেরই 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীসুচিত দাস মহা-শয়ের প্রশ্নের উত্তরঃ—

১। প্রশ্নটি একটু ব্যাপক। স্থানা-ভাববশতঃ খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে গৃহীত বলিয়া সংস্কৃতের ন্যায় এখানেও ২টি ব আছে। এই দুই ব-এর মধ্যে কাঠামোগত এবং প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। প্রথমটি বর্গীয় ব (প বর্গের তৃতীয় বর্ণ), দ্বিতীয়টি অন্তস্থ ব; প্রথমটি স্পর্শবর্ণ, দ্বিতীয়টি দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। কিন্তু এই দুইয়ের উচ্চারণে বাংলায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃতে অন্তস্থ ব 'ওঅ' (W)-র মত উচ্চারিত হয়। বাংলায় এই উচ্চারণ লুপ্ত হইলেও কয়েকটি শব্দে উহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে—যেমন স্বামী > সোয়ামি, স্বার > দোয়ার > দুয়ার, স্বাদ > সোয়াদ ইত্যাদি। বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব এর মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করি না। বর্গীয় ব পূর্বে সংস্কৃত বা দেব-নাগরীর ব-এর ন্যায় লেখা হইত। ইহাকে পেটকাটা ব বলা হইত। ইহাতে কোনটি কোন্ ব, তাহা জানিবার বেশ সুবিধা হইত। এখনও হস্তলিখিত পুঁথিপত্রে এই পেটকাটা ব-এর দেখা মিলিতে পারে। আগেকার বাংলা অভি-ধানে ২টি ব-প্রযুক্ত শব্দসমূহ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে লিখিত হইত।

হালআমলের অভিধানে এই বর্ণানুক্রমিক ব্যবস্থা বাতিল হইয়া সমুদয় ব-প্রযুক্ত শব্দ একসঙ্গেই লিখিত হইলেও কোন কোন স্থলে চিহ্ন দ্বারা বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব দেখান হইয়া থাকে।

সুতরাং বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব-এর প্রয়োগগত বা ব্যবহারগত পার্থক্য এখনও কিছুটা আছে এবং সেই হেতু তাহাদের ২টিরই বাংলা বর্ণমালায় বর্তমান থাকার সার্থকতাও আছে বলিয়া মনে করা যায়। অধিকাংশ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য ব অন্তস্থ, আর সমুদয় অসংস্কৃত শব্দের আদ্য ব বর্গীয়। নিম্নে এই দুই ব-এর ব্যবহারগত পার্থক্যের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

সন্ধির নিয়ম অনুসারে :—

ম্ + অন্তস্থ ব = ংব

অসংবৃত	শুদ্ধ	অসম্বৃত
বশংবদ	ঐ	বশম্বদ
কিংবদন্তী	ঐ	কিম্বদন্তী
বারংবার	ঐ	বারম্বার

এই লাইনের বানানগুলি ব্যাকরণ-মতে শুদ্ধ হইলেও প্রচলনভাবে লুপ্ত-প্রায়। উদাহরণগুলি চলন্তিকা অভিধান হইতে উদ্ধৃত।

(৩) এই প্রশ্নটি ১নং প্রশ্ন অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক এবং দুরূহ। ব্যাপকতা অনুযায়ী উত্তর দিতে গেলে গ্রন্থ হইয়া যায়। সংক্ষেপে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। সহৃদয় পাঠকগণ ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। প্রশ্নটি ২টি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ—পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেই লিখিত আছে যে, ভগবানই মানুষ এবং সমুদয় জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে একটি চিরন্তন সত্যকেই স্বীকার করা হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে ভগবান দেবদেবীগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান বা দেবদেবীগণ মানুষের সৃষ্ট নহেন বা মানুষের কল্পনা-প্রসূতও নহেন। তবে ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে মানুষেরও সৃষ্টি-শক্তি কতকটা আছে সন্দেহ নাই। তবে গীতার প্রবচন অনুসারে ভগবান ভক্ত বা সাধকের ইচ্ছা এবং কল্পনাশক্তি বা আরোপিত রূপ অনুযায়ীই কৃপা করিয়া দেখা দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এবং এই সত্য দেবদেবীগণের বেলায়ও খাটে বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই ইচ্ছা এবং কল্পনাশক্তি বা আরোপিত পূর্ণ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাশ্রিত হওয়া চাই। ভক্ত বা সাধকের সংস্কার, শক্তি, কল্পনা ইত্যাদি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আরোপিত [illegible] তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এজন্যই নানা ভক্ত বা সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত একই ভগবান বা একই দেবদেবীর নানাপ্রকার স্তবস্তুতি, বর্ণনা বা ধ্যানধারণা ধর্মগ্রন্থসমূহে দেখা যায়। সুতরাং ভক্ত বা সাধক (মানুষ) এই হিসাবে কতকটা ভগবান ও দেবদেবীগণের কল্পনাকারী এবং স্রষ্টাও বটে। তবে ইহাই শেষ কথা নহে। ভগবান ও দেবদেবীগণের "স্বরূপ" বলিয়াও একটা বিশেষ কথা আছে। এই স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রাদিতে এবং সাধু মহাত্মাগণের বাণীতে জানা যায়। এই স্বরূপের কোন কল্পনাও নাই, বর্ণনাও নাই। ইহা অব্যক্ত এবং অবাঙ্‌মনসোগোচর।

ম্ + বর্গীয় ব = ম্ব বা ংব

উভয়ই শুদ্ধ

অশুদ্ধ	সম্বন্ধ	সংবন্ধ
ঐ	সম্বন্ধী	সংবন্ধী
ঐ	সম্বুদ্ধ	সংবুদ্ধ
ঐ	সম্বল	সংবল

দ্বিতীয় অংশ :—মূর্তি এবং পট-আদিতে ব্রহ্মশক্তি বা আদ্যাশক্তি কালী-মাতার যে বর্ণ দেখা যায়, তাহা কাল বলিয়াই আদ্যামাতার এক নাম কালী, ইহা বলা যায়। মোটামুটিভাবে কাল অর্থে কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, এবং মৃত্যুকেও বুঝায়। অসুরনাশিনীরূপে তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যু; সেই হেতুও তিনি কালী। আবার মহাকাল শিবের ঘরণী বা সঙ্গিনীরূপেও তিনি মহাকালী বা কালী। শ্যামবর্ণের নানা ব্যাখ্যা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে থাকিলেও পূর্বে শ্যামবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণই ধরা হইত। এজন্যই বসুদেবের পুত্র বাসুদেব শুভ্রবর্ণ আর্যদের তুলনায় শ্যামাঙ্গ বলিয়া কৃষ্ণ বা শ্যামনামে আখ্যাত হইতেন। আর দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী অনিন্দ্যসুন্দরী হইয়াও শ্যামাঙ্গিনী বিধায় কৃষ্ণা নামে অভিহিতা হইতেন। সুতরাং শ্যামাঙ্গিনী হইয়াও আদ্যামাতা কৃষ্ণবর্ণা এবং সেই হেতু কালী।

কালীমাতার এই কালরূপের অনেক তাৎপর্য আছে। সাধারণভাবে কয়েকটি লিখিলাম :—

১। কাল রং কোন বিশেষ রং নহে। ইহা সকল প্রকার রংয়ের সমষ্টি মাত্র। বর্তমানকালে গাঢ় কাল রংয়ের আলকাতরা হইতে সকল প্রকার রং তৈয়ার হইতেছে। সুতরাং কালীর কালরূপের মধ্যে জগতের যাবতীয় রং বা বর্ণ বা রূপ নিবদ্ধ বা লুক্কায়িত আছে। এবং আধুনিক নিরিখ অনুযায়ীও ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বটে।

২। তিনি জগজ্জননী, এবং এই বিশ্বজগৎ তাহাতেই ধৃত (ঋক্‌বেদীয় দেবীসূক্ত ও চণ্ডী)। পৃথিবীর বহু-বর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য, মনুষ্যেতর প্রাণী, বৃক্ষলতা, গ্রহনক্ষত্রাদি, এক কথায় দৃশ্য-মান জগতের সবকিছুই, তাহার মধ্যে ধৃত বলিয়াও তিনি কাল রং-বিশিষ্টা কালী।

৩। তিনিই সকল জ্ঞানের আধার বা জননী (ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত ও চণ্ডী)। অ-জ্ঞান হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব। অ-জ্ঞানের বর্ণ কৃষ্ণ, জ্ঞানের বর্ণ শুভ্র। সুতরাং সকল জ্ঞানের আধার বা জননী হিসাবেও তিনি কৃষ্ণবর্ণা।

৪। অন্ধকারের পরেই আলো আসে, যেমন রাত্রির পরে দিন, এবং অন্ধকারের মধ্যেই আলো নিবিষ্ট বা লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং অন্ধকারই আলোর বা জ্যোতির জননী। এজন্যই জ্যোতির্ময়ী হইয়াও দেবী কৃষ্ণবর্ণা।

৫। চণ্ডীর মতে অসুর বিনাশকালে দেবী তমোময়ী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তমোগুণের রং কাল। সুতরাং তমোময়ী দেবীর রংও কাল।

৬। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় বলিতে গেলে, কালী মানুষের নিকটতম (অন্তরস্থ) হইয়াও সর্বাপেক্ষা দূরে (জ্ঞানের পরপারে) অবস্থিতা। দূরের জিনিষ কাল দেখায়। এজন্যই কালীর রং কাল।

সুতরাং জগন্মাতা কালীর এই কালরূপ মানুষের কল্পনামাত্র নহে। ইহা তাহার একটি বিশেষ রূপ, যা এক হিসাবে স্বরূপও বলা যায়, যাহা সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীং কাল পর্যন্ত ঋষি ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কর্তৃক অনুভূত, দৃষ্ট ও বর্ণিত হইয়া সর্বসাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯

(উত্তর)

১। ২৮শে সেপ্টেম্বর '৬২ 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীঅশোককুমার সাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে বোম্বাই শহরের ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস 'Bombay Electric Supply & Traction' নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে 'B E S T' সব বাসে লেখা থাকে।

২। ঐ তারিখে ঐ বিভাগে শ্রীমাধব মজুমদার ১নং প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে গত মহাযুদ্ধে আমেরিকানরা O. K শব্দটি চালু করেন। পুরো শব্দটি হইল আমেরিকান বানানে ol korect' (All correct) এবং সংক্ষিপ্ত আকারে O. K.

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়,
"ব্রজধাম"
মুরালীবাড়, বাগনান,
হাওড়া।

দুঃখের নদী

খগেন্দ্র দত্ত

অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় একটি মাত্র কথার খোঁচা অঞ্জনার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। সযত্নে লালিত বহুদিনের আলোআবির হাসিখুশী হারিয়ে গেল ওর প্রতি অতি আপনজনের তাচ্ছিল্যের বিমর্ষ ম্লিয়মাণ আবিষ্কারের কান্নার কালো একটা ফোঁটায়।

সুদীর্ঘ দুটো বছরের আয়তনে অসংখ্য মুহূর্তের অগুন্তি অবজ্ঞার টুকরোগুলো এ মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল ওর চোখের সামনে। পেছনে ছাড়িয়ে আসা অনেকগুলো দিনের প্রতিটি পল অনুপল প্রত্যেকটি লহমায় মন-খারাপের অসংখ্য ফোঁটা শিশিরের মত মনের আনাচে-কানাচে চিকচিক করে উঠল।

অথচ কতদিন নিভৃতে বসে আজকের দিনটিকেই তো কামনা করেছে অঞ্জনা, আজকের এই মুহূর্তটিরই সাধনা করে এসেছে। কত ঘুম-না-আসা রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশের মিটিমিটিতে ছড়ানো আকাশের দিকে তাকিয়ে এই শুভক্ষণটির কথাই তো ভেবেছে। রঞ্জনার বিয়ে হবে, আবার খুশী-ঝলমল প্লাবন আসবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাড়ির গুমোট হাওয়া; বাড়তি আলোর বন্যায় ভাসবে বাড়ি-ঘর-উঠোন। আর সেই আনন্দের স্রোতধারায় নিশ্চিহ্ন হবে ওর জীবনের যত ব্যথা যত বেদনা।

আবার ফিরে পাবে অঞ্জনা অতীতের জীবন, ফিরে পাবে অতীতের অন্ধকার গুহায় হারিয়ে আসা সে সব দিন। আজও আবছা মনে পড়ে সে সব দিনের স্মৃতি। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হলেও একেবারে হারিয়ে যায়নি। কী আশ্চর্য মজাই না ছিল সে সব দিনে। সবচেয়ে বেশী মজা ছিল এ বাড়িতে। না ছিল বারণ, না ছিল বকুনি। বাবা ডাকতেন বুলুসোনা। ভারী ভাল লাগত বাবার মুখে বুলুসোনা উচ্চারণ। মা বলতেন : বুলুরাণী। মার কণ্ঠে ছিল আশ্চর্য এক জাদু, আশ্চর্য এক মায়া। মাথা আঁচড়ে দিতেন, খোঁপা বেঁধে দিতেন—কখনও বিনুনি। কারণে অকারণে মাথায় পিঠে হাত বুলোতেন। সব আবদার পূরণ করতেন হাসিমুখে। ভারী ভালো লাগত মাকে অঞ্জনার। কী টকটকে গায়ের রং, আর কত বড় ছিল মাথায় একগাদা কালো চুল। ভালো লাগত তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো।

সেই মা, সেই বাবা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। তাঁরা কেউ সেদিনের নাম ধরে ডাকেন না। কতকাল যেন ডাকেননি। কেন, কে জানে? হয়তো ও নাম ভুলেই গেছেন তাঁরা, হয়তো ইচ্ছে করেই ডাকেন না। কিন্তু কেন? কি করেছে অঞ্জনা? মা-বাবার সংসারে বোঝা হয়ে এসেছে বলে? তাও তো নয়। বাবার তো কোন অভাব নেই। অঞ্জনা কেন—ওর মত দশজন বাড়তি মেয়ে এলেও কোনদিন কোন কিছুর কমতি হবে না। তবু মা-বাবা এমন নির্লিপ্ত কেন ওর ব্যাপারে? কেন, কে জানে?

কত দিনের অখণ্ড আকাশে কত রাতের নির্ঘুম প্রহরে নিজের মনের কাছেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছে অঞ্জনা। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে, হতাশ হয়েছে। হতাশ হয়ে আজকের দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছে। রঞ্জনার বিদায় নেবার মুহূর্তে হয়তো আবার মা-বাবার সে মন ফিরে আসবে।

এখানেও আশাভঙ্গ হল অঞ্জনার। সব কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর রঞ্জনার ভাবী বরকে দেখতে চেয়েছে অঞ্জনার কাকিমা, মাসিমা আর মামিমার দল। তাঁদের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশী কতক মেয়ে-বৌও।

অজয় এসেছে আজ দেখা দিতে, হয়তো দেখতেও। মাসিমা, কাকিমা, বৌদিদের ভিড় হয়েছে বাড়িতে। সকলের

জন্য জলযোগেরও আয়োজন। আমন্ত্রিত প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছেন এই আনন্দ-যজ্ঞে। অথচ অঞ্জনা? এ বাড়ির মেয়ে হয়েও তার কোন বিশেষত্ব নেই এ অনুষ্ঠানে। কৈ, মাতো একবারও বললেন না ছোট বোনের ভাবী বরকে দেখে আয় মা। পছন্দ হয় কিনা দেখ। —মৃণাঙ্করেও কোন কাজে অংশ নিতে বললেন না। বরং এমন একটা ভাব যেন সে এখানে অনাহুত।

অনেক মেয়েদের ভিড়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে রঞ্জনার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হল ওর জীবনেও যদি এ রকম দিনটি আবার ফিরে আসত? এমনি মনে হওয়া হয়তো স্বাভাবিক। তাই কি? কৈ, একান্ত নিজের করে পাওয়া একটি মানুষকে মৌখিক কথায় ছেড়ে আসার পর দীর্ঘ তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একবারও তো এমনটি মনে হয়নি। তবে কি এ হিংসে? এ কি লোভ? না, শুধু নির্দোষ একটু চাওয়া? কিছুই বুঝতে পারল না অঞ্জনা।

মা সব কাজ ফেলে রেখে আমন্ত্রিত মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছেন দোরগোড়ায়, কাকেও জানালার ধারে—আবার কাকেও ওদের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাসি-মুখে বলে চলেছেন: পছন্দ হয় কিনা দেখ ভাই, পরে কিন্তু নিন্দে করতে পারবে না।

নিন্দে করার কি আছে দিদি? মাসিমা বললেন।

কিছু নেই তো? ভালো করে দেখ... উল্লসিত কণ্ঠ মার।

ভালো করেই দেখেছি, এমন কার্তিকের মত ছেলে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

আমার রঞ্জনার সঙ্গে মানাবে তো?

চমৎকার মানাবে।

মার চোখে খুশীর বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। বলেন: আশীর্বাদ কর, ওরা যেন সুখী হয়।

তারপরই পিসিমার কাছে ছুটে যান। পিসিমারও এক উত্তর। তারও পরে মামিমার কাছে। তারপর আর একজনের কাছে।

সকলের এক উত্তর। ভালো বর হবে রঞ্জনার। সুন্দর মানাবে দু'জনে। মা ততক্ষণে অন্য একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। টেনে আনছেন দোরগোড়ায়। এমন করে সকলকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। নজর রেখেছেন একজনও যেন বাদ না যায়।

কিন্তু, অঞ্জনার কাছাকাছি আসতেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সরে গেলেন পাশের বাড়ির বৌটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন 'কেমন দেখলে বৌমা?'

বড় ব্যথা পেল অঞ্জনা। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠল। ভিড় থেকে দূরে একা দাঁড়িয়ে থাকতেও লজ্জা বোধ হল। মার অনুরোধে উপস্থিত সকলেই রঞ্জনার ভাবী বরকে দেখল। কাকিমা, মাসিমা, মামিমা সকলেই। সকলেই সহজ হয়ে প্রশংসা করল। সহজ হয়েই হাসল। রঞ্জনাও। অঞ্জনাই শুধু এক কোণে কুঁকড়ে বসে রইল। কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারল না। কারও মুখের দিকে সহজ চোখে তাকাতেও পারল না। মার মুখের দিকে তো নয়ই।

একি সেই মা, যে অঞ্জনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই করতেন না। এ'রা কি সেই কাকিমা, মাসিমার দল যাঁরা এ বাড়ি এলে ওর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আজ যা বলছেন তা তো না-বলারই সামিল।

অবজ্ঞা আর গ্লানির আলো থেকে নির্জন অন্ধকার কোণ অনেক ভালো মনে করেই সেই ভিড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এল অঞ্জনা। এসে ঢুকল নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটাতে। পাখার সুইচ টিপল। সোঁ সোঁ আওয়াজ তুলে ঘুরতে লাগল পাখা। সেই একটানা পাখার হাওয়ায় মনের জমানো ভিজে ভিজে সব গ্লানির শিহরণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। চেষ্টা করল ঘড়ির কাঁটার টিক-টিক শব্দের সঙ্গে উন্মত্ত বুকের দ্রুত ওঠানামা মিলিয়ে দিতে। জানালার ওপারে অনেক কাছের আকাশের দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করল মনের রুদ্ধ আবেগের ছট-ফটানি অন্তহীন প্রশান্ত উদারতায় ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু পারল কৈ?

বরং আরো বেশী ভাবনা, অনেক বেশী চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করল। আচ্ছা, মার এ উপেক্ষা আজ কি নতুন? এই কি তাঁর প্রথম তাচ্ছিল্য? তাও তো নয়। পেছনে ফেলে আসা একটি বছরের দীর্ঘায়ু পরিসরে ছোট-খাট তাচ্ছিল্যের অজস্র উদাহরণই তো জমা হয়ে আছে অন্তরের অন্তস্থলে? কৈ, সে সব তাচ্ছিল্যের দিনে তো মনটা এমনভাবে খারাপ হয়ে যায়নি? বুকের ভেতরে এমন দুঃসহ জ্বালার ছটফটানিও তো অনুভব করেনি অঞ্জনা?

সে কি আশাভঙ্গের অসহনীয় জ্বালায় নয়? রঞ্জনার বিয়েকে কেন্দ্র করে ওর মনে যে অসংখ্য স্বপ্নের কুঁড়ি, অজস্র আশার মুকুল সব মা-বাবার তাচ্ছিল্যের আগুনের হুঙ্কার বিশুষ্ক নির্মাল্যের মত শ্রীহীন হয়ে গেছে বলেই কি? যে দিনটি ওর জীবনে আনন্দের এলোমেলো হাওয়া ছড়িয়ে দেবে বলে ভেবেছিল সে দিনটি আনন্দের পরিবর্তে ওর জন্যে একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে এসেছে বলেই এই মর্ম-বেদনা?

আঘাতটাও তো একেবারে উপেক্ষার নয়। প্রথম আঘাত হলে তবু সহ্য হত। কিন্তু এ তো নতুন নয়, গত এক বছরের জীবনে অনেকবার পেয়েছে আঘাত অঞ্জনা। নানাভাবে, নানা প্রকারে।

প্রথম দিনটির কথা আজও মনে আছে অঞ্জনার। এক বছর আগে দিল্লীর সেই মানুষটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার সংকল্প মনে নিয়ে যেদিন এ বাড়িতে এসে ঢুকেছিল সে দিনটি ওর স্মৃতিতে আজও অমলিন। মা সব শুনেও বলেছিলেন: কাজটা ভাল হল না মা!

অঞ্জনা চমকে উঠেছিল। এ কি সেই মা? অঞ্জনা কেন যে সাত পাকের বাঁধন ছিন্ন করে সেই মানুষটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে ইচ্ছুক সে সব যুক্তিগুলোর উপর আদৌ গুরুত্ব দিলেন না কেন মা বুঝতে পারেনি অঞ্জনা।

কোন মেয়ে কি নিশ্চিত প্রশান্তির নীড় ভেঙ্গে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্নিরীক্ষ্য বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? চায় না নিশ্চয়। অঞ্জনাও চায়নি প্রথম প্রথম। বিয়ের বছর খানেক পরেই অঞ্জনা টের পেয়েছিল মানুষটা ভীষণ আড্ডাবাজ।

রোজ রাত করে বাড়ি ফিরত। কোন-দিন রাত দশটা, কোনদিন এগারটা। তারও বেশী কোন কোনদিন।

কারণ জানতে চাইলেই নানারকম অজুহাত দিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিল। আপিসে কাজ পড়েছে খুব বেশী। অঞ্জনা বিশ্বাস করেছে। কিন্তু সে বিশ্বাসের বনিয়াদে ফাটল ধরল যখন দু'জনের সংসারেও অভাব দেখা দিল। পাঁচশ টাকা মাইনে পেয়েও মাস চলে না।

পাড়ার বান্ধবী জুটেছিল দু'চারজন। স্বামীর সহকর্মীদের বাসা আশেপাশে। সে সব বাসার কয়েকটির সঙ্গে জানা-শোনা হয়েছিল অঞ্জনার। সেই বান্ধবীদের একজন শুনে বলেছিল: ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। খোঁজ-খবর নাও ভাই।

খোঁজ-খবর অঞ্জনাকে নিতে হয়নি। সেই বান্ধবীই নিয়েছিল ওর স্বামীর কাছ থেকে।

সব শুনে চোখ কপালে তুলেছিল অঞ্জনা। বলেছিল: কি বলছ ভাই?

বলছি ঠিকই......সেই বান্ধবী উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিল: তোমার স্বামী বারে যান।

সত্যি বলছ?

আমার স্বামী মিথ্যে বলে না আমাকে। আর ওর চেয়ে ভালো কে জানবে? এক-সঙ্গে আপিস যাওয়া আসা, তবে কি জান? এখানে, অর্থাৎ দিল্লীর মত নগরীতে এক-আধটু নেশা করা তেমন মারাত্মক কোন অপরাধ নয়। তোমাকে দেখতে হবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিনা। আমাদের ঘরেও ছিল ঐ বদ নেশা। আমিও ভুগেছি ভাই। শুধু মুষড়ে পড়িনি। দেড় বছরের, দু-বছরের প্রাণান্তকর চেষ্টার পর পথে এনেছি।

শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল অঞ্জনা। শেষকালে ওর ভাগ্যে এই? মা-বাবা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছেন, সে ছেলের এই অবস্থা?

ছেলে অবশ্য প্রথম প্রথম ভালোই ছিল। অন্ততঃ অঞ্জনার তাই মনে হয়েছিল। সুপুরুষ চেহারা, বিলেতী ফার্ম-এ ভারী চাকুরী। স্বভাব-চরিত্র নিষ্কলুষ। প্রায় দিন ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরত। সপ্তাহে দু'একদিন ছাড়া।

বাসায় এসে গল্প করত অঞ্জনার সঙ্গে। মুখোমুখি বসে। মাঝে-মধ্যে বেড়াতে বেরুত। কোনদিন ওথেলো, কোন দিন লালকেল্লার ধার, কনট প্লেস, ছুটির দিনে শাজাহান দুহিতা জাহানারার সমাধি, পালাম বিমান বন্দর, রাজঘাট। এ ছাড়া মাঝে-মধ্যে সিনেমা-থিয়েটার। পাশাপাশি বসত দুজনে। আলো নিভতেই উত্তপ্ত সান্নিধ্য। চুলের গন্ধ আর সদ্য পাটভাঙ্গা শাড়ির খসখস, রুমালে মদির সুরভি। অন্ধকারে হাত বাড়াত। অডিটোরিয়মের পর্দায় নায়ক-নায়িকার যেখানে শেষ ওদের সেখানে শুরু। দ্রুত নিঃশ্বাসে বুক দুরু-দুরু।

তারপর যেন কি হয়ে গেল হঠাৎ। গল্প-গুজবের পালা শেষ হয়ে গেল নিতান্ত আকস্মিকভাবে। মুখোমুখি বসে একথা ও কথা বলাবলির সময়ও উধাও হয়ে গেল।

বান্ধবীর কথা শুনে সজাগ হয়েছিল অঞ্জনা। যে দিন হাতে-নাতে ধরে ফেলল সেদিন মানুষটা ফিরেছিল রাত বারটায়। অঞ্জনা জেগেই ছিল ওর পথ চেয়ে। টাঙ্গার শব্দ হতেই জানালায় গলা বাড়িয়েছিল।

সন্দেহের নিরসন হতেই দরজা খুলে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল: এত রাত করলে কেন?

অঞ্জনার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকেছিল অতনু সেন। অঞ্জনার নাকে লেগেছিল এক নতুন ধরনের গন্ধ।

অঞ্জনা সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল অতনুর মুখে। গন্ধটা যেন মুখে নয় বাতাসে। বারে বারে ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করেছিল অঞ্জনা। এক সময় অতনুর সামনে গিয়ে বলেছিল: ঘরের মধ্যে যেন একটা গন্ধ, না?

গন্ধ, কৈ? আমার তো মনে হচ্ছে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার থতমতও খেয়েছিল। মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত দেখিয়েছিল অতনুকে। তারপর একসময় ইতস্ততঃ ভাব কাটিয়ে উঠে অনেকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলেছিল: সমীরণকে বললাম, আমি যাব না তোর বাসায় আজ। রাত হয়ে যাবে ফিরতে। তবু ও কিছুতেই ছাড়ল না শা......

অঞ্জনা ঐ ঠুকনো কৈফিয়তে ভুলল না। সেও অতনু সেনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল: সমীরণটা কে?

প্রশ্ন তো নয়—আসলে গন্ধটা অতনুর মুখ থেকে কিনা স্থিরনিশ্চিত হওয়া। টেবিলের অন্য পাশে সরে গিয়েছিল অতনু। মুখ নীচু করে বলেছিল: সমীরণ আমারই কলিগ। দেখনি তাকে? তার বাসাতেই.........

বাসা না অন্য কিছু...... অঞ্জনা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল: লুকোতে চাইছ কেন আমার কাছে? খারাপ নেশা করেছ একথা বলার সাহস নেই তোমার?

আচমকা সাপের ফোঁস-ফোঁসানির মত শুনেছিল অতনু। ভয় ভয় দুটো চোখ তুলে ধরেছিল অঞ্জনার মুখে। কাল-

"এত রাত করলে কেন?"

কেউটে ফণা তুলেছে একবুক আন্দাজ। হয়তো সেই কেউটের ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বীকার করে বলেছিল: তাই করেছি অঞ্জনা। আজ এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বারে গিয়েছিলাম।

আজ গেছ, না মাঝে মাঝে যাও?

চমকে উঠেছিল অতনু সেন। প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারেনি। একসময় বলেছিল: মাঝে-মধ্যে যাই না বললে মিথ্যে বলা হবে। যাই—তবে সে যাওয়া নেশা করার জন্য নয়। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য।

স্বাস্থ্য? অঞ্জনা যেন বিদ্রুপ করে উঠেছিল।

জান না? রোজ একটু একটু করে খেলে শরীর ভাল থাকে?

দরকার নেই আমার জেনে। কাল থেকে আপিস ছুটির পর তোমার বাসায় আসা চাই।

এসেছিল অতনু। পর পর দুদিন। তৃতীয় দিন আবার দেরী। আবার গন্ধ। আবার মুখোমুখি। কাল-কেউটের ফোঁস-ফোঁসানীও আবার।

সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ বালকের মত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসার সঙ্কল্প-বাক্য উচ্চারণ।

সে সঙ্কল্পও রক্ষা করেনি অতনু সেন। তারপরেও দেরী করে বাড়ি ফিরেছে। কোনদিন গন্ধ পেয়েছে অঞ্জনা, কোনদিন পায়নি। এলাচ মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে এলে গন্ধ পাবে কি করে?

তবু ধরতে পেরেছে অঞ্জনা। আর চেঁচামেচি করেছে। এটা ভেঙ্গেছে, সেটা ফেলেছে। অতনু সেন বোঝাতে চেষ্টা করেছে মদের গুণাগুণ। বনিয়াদী সংসারে ওটা দুধ-রুটির মত অপরিহার্য।

অঞ্জনা মেনে নিতে পারেনি। ওর বাবার অবস্থাও যথেষ্ট সচ্ছল। কৈ, তাঁর তো ওসব রোগ ছিল না? আসলে ওটা খারাপ নেশা। লোকের কাছে হেয় হতে

হয়। সমাজে মাথা হেট হয়। ও কিছুতেই খেতে দেবে না অতনুকে ঐ বদ জিনিস।

এমন করে কেটেছিল মাস তিন চার। সংকল্প আর সংকল্পের খেলাপ এই করে পার করে দিয়েছিল ওরা একশো কুড়িটি দিন। তবু লোকটাকে নিজের মতে আনতে পারেনি অঞ্জনা।

না পেরে কলকাতায় ছুটে এসেছিল রাগ করে। সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে অঞ্জনার। কী আদর, কী মমতাভরা ব্যবহার মা-বাবার? সে সব দিনগুলোর কথা মনে হলে আজও কান্না পায় অঞ্জনার। সে কান্না দুঃখের নয় আনন্দের। চোখের জল কেবল দুঃখেই তো ঝরে না আনন্দেও ঝরে।

সেদিন ওর ব্যথার কাহিনী চেপে গিয়েছিল মা-বাবার কাছ থেকে। কি লাভ বন্ধ দরজার কলঙ্ক-কাহিনী সাত কান করে। মাসখানেক পরেই তো ও চলে যাবে। এর মধ্যে নিশ্চয় শুধরে নেবে অতনু নিজেকে।

একটি মাস ছিল অঞ্জনা। কত দীর্ঘ একটি মাস? কত শত সহস্র পল অনুপল ঐ একটি মাসের তিরিশটি দিনের মধ্যে। কিন্তু অঞ্জনার মনে হয়েছিল খুব অল্প সময় ছিল ও বাপের বাড়িতে। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছিল সে সব দিন। কত আদর, কত মমতা-স্নিগ্ধ স্পর্শ। সেদিনের আদর আর মমতার কথা মনে হলে অঞ্জনার মনটা আজও লোভাতুর হয়ে ওঠে।

ফিরে যাবার দিনটির কথা মনে পড়ে। হাওড়া স্টেশনে এসেছিলেন মা-বাবা, সঙ্গে রঞ্জনাও। বাবা নিজেই ড্রাইভ করেছিলেন। অঞ্জনাকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়েছিলেন টিকেট কেটে। মা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন: পৌঁছেই চিঠি দিস মা।

দেব। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন মা?

তোকে বিদায় দিতে কি যে কষ্ট তুই বুঝবি না মা। কোন দিন মেয়ের মা হয়ে মেয়েকে বিদায় দেবার দিনে বুঝবি।

অঞ্জনার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। রুমালে মুছে নিয়ে চোখ খুলতেই দেখেছিল গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মা-বাবা রঞ্জনাও চলতে শুরু করেছিলেন গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু গাড়ির গতির কাছে পরাজিত হয়ে প্ল্যাটফরমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অশ্রুভেজা দুটো চোখ তোলে তাকিয়ে থেকেছিল ওর যাত্রাপথে।

দিল্লী পৌঁছে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল অঞ্জনা। ও যা চেয়েছিল তার উল্টোই হয়েছে। সর্বনাশের আর বাকী নেই। বার থেকে খেয়ে আসা নয়—ঘরে নিয়ে আসতে শুরু করেছে।

টেবিলের উপর বোতল দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অঞ্জনা। এতদিন পাঁকের উপর পা রেখে রেখে চলাফেরা করছিল এবার একেবারে এক ঘুক পাঁকে নেমে বসেছে। এ ভাবে চলতে দিলে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাবে।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সেদিন কেঁদেছিল অঞ্জনা।

অতনু পাঁকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে আর অঞ্জনা পড়েছে জলে, অথৈ জলে। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে বাঁচার। খড়কুটো একটা কিছু চেপে ধরে কূলের সন্ধান করতে হবে।

রাতে শুয়ে পড়লে অতনুর মাথার কাছে বসে বোঝাতে চেয়েছিল অঞ্জনা। বলেছিল, এ পথের সর্বশেষ পরিণতির কথা। আস্তে আস্তে অবনতির শেষ সোপানে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। ধ্বংসেরও প্রান্তসীমায়। অনেক নাটক-নভেলের উদাহরণ, অনেক সিনেমা-থিয়েটারের কাহিনীর উধৃতিও দিয়েছিল।

কিন্তু বৃথা হয়েছিল সব। অতনু বলেছিল বারে যাবে না, ঘরে খেতে দিতে হবে। শুধু সামান্যই খাবে।

অঞ্জনা রাজি নয়। দুজনের তুমুল ঝগড়া। ঝগড়া এড়াবার জন্যই অতনু বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ফিরল পরদিন আপিস করে।

কোথায় ছিলে কাল রাতে?

অশোকের বাসায়।

অশোকের বাসা না অশোকার কুঞ্জবনে? কোনটা?

কি বললে?

বলছি ঠিকই। তোমার মত মানুষ পারে না কি সেটাই আশ্চর্য।

তর্ক চলল সমানে। তর্ক থেকে সোরগোল। গলা সপ্তমে চড়িয়েছিল অঞ্জনা।

অতনু বলেছিল: পাড়ার লোকজন জড়ো করে কি লাভ?

হ্যাঁ, লাভ আছে। পাড়ার লোকজন আসুক, তাদের কাছে বলব তুমি মাতাল।

ছিঃ! ছিঃ! অঞ্জনা—মাতাল কাকে বলে তাও তুমি জান না।

জানি। তোমার মত লোকগুলোকেই বলে।

কথা না বাড়িয়ে সেদিনও বেরিয়ে গিয়েছিল। অতনু বন্ধু অশোকের বাসায় গিয়ে উঠেছিল। ওর ওখানে সুবিধা আছে। মা ছোট ভাইদের নিয়ে থাকে।

পরদিন অঞ্জনা বিশ্বাস করল না। অঞ্জনা কেন ওর বান্ধবীরাও না। তবু চেষ্টা ছাড়ল না অঞ্জনা। ভেবেছিল শক্তি-প্রয়োগ করে লোকটাকে বশে আনবে। কিন্তু ব্যর্থ হল। অতনু পুরুষমানুষ হয়ে ঘরের বৌয়ের ঐ দাপট সইবে কেন?

তর্ক-বিতর্ক চরমে উঠল। পাড়া-প্রতিবেশীরা জানল। অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল। সহানুভূতি দেখাল।

অঞ্জনার সব সহ্য হচ্ছিল। সহ্য হল না এ অযাচিত সহানুভূতি, অনাহূত সমবেদনা।

ওর কিসের অভাব? বাবার কি নেই? গাড়ি বাড়ি অর্থ সম্পদ কোনটার কমতি আছে?

সঙ্গে সঙ্গে মনে এসেছিল মা-বাবার কথা। মনে পড়েছিল বিয়ের পরদিন বিদায় বেলার করুণ দৃশ্য। মা কাঁদছেন, বাবা চোখ মুছছেন—আর রঞ্জনা? ছেলেমানুষের মত কেঁদে ভাসিয়েছিল।

সেই মা সেই বাবা, সেই ছোটবোন রঞ্জনার কাছে গিয়ে সম্মানের জীবন-যাপনের আশাতেই আবার কলকাতা চলে এসেছিল অঞ্জনা।

ট্যাক্সি ছেড়ে নাবতেই দোতলা থেকে মা নেমে এসেছিলেন নীচে। একটু পরে বাবা। রঞ্জনা ছুটে এসেছিল কাছে।

কোন খবর না দিয়ে তুই হঠাৎ এলি যে? মা-ই প্রশ্ন করেছিলেন।

আর থাকা সম্ভব হল না মা।

কেন রে? মার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

ঘরে চল বলছি।

ভেতরে এসে রাউজ খুলল। দেখাল হাত, একদিন দুজনে বোতল কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল। কাল কাল দাগ হয়ে আছে। মা-বাবা দেখে ভেবেছিলেন অতনু শাস্তি দিতে গিয়ে হাত কেটে দিয়েছে।

অঞ্জনা ঐ দাগ দেখিয়ে বলেছিল: এর পরেও কি ঐ মানুষটির কাছে থাকতে বলবে?

শূন্য দৃষ্টি মেলে মা তাকিয়ে থেকেছিলেন দূরের বাড়িটার দিকে। এক সময় দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বলেছিলেন: কাজটা ভাল হয়নি মা।

অঞ্জনার মনে হয়েছিল অতনুর আঘাতের চেয়েও কঠিন, তার চেয়েও নির্মম আঘাত যেন মা-ই করলেন। চোখ তুলে তাকিয়েছিল বাবার মুখে।

বাবা সামনের দেয়ালে চোখ রেখে স্থির। কোন কথা বলেননি। সেই নীরবতা অঞ্জনার মনের কাছে অনেক কথাই বহন করে এনেছিল।

তারপর থেকে পুরো একটি বছর পেছনে রেখেছে অঞ্জনা। প্রতিদিনের প্রতিটি পল অনুপল একটা অনুভবের জ্বালা পীড়িত করেছে ওর মনকে। যে বাড়িতে, যে পরিবেশে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই সে বাড়িতে, সে পরিবেশে ওর জীবন কাটবে কি করে?

তবু মুখ বুজে পড়েছিল একটি আশ্বাসে যে মা-বাবা আবার পুরনো দিনের মন ফিরে পাবেন। প্রীতি আর স্নেহসিক্ত হাত বাড়াবেন। আদর আর সোহাগের প্রলেপ-স্পর্শ দিয়ে বলবেন: ঐ অপদার্থটার কাছে ফিরে গিয়ে লাভ নেই মা। কিসের অভাব আমাদের? এখানেই থাক তুই......

কিন্তু যতই দিন গত হয়েছে, ততই ওর মনে হয়েছে মা-বাবা ওকে একটি বোঝা মনে করছেন। ওর সামনে এসে কিছু বলেননি বটে, ব্যবহারে যেন চাপা থাকছে না। ওর অনুভবের চোখে ধরা দিয়েছে এ সত্য। ওকে নিয়ে তাঁদের

দুশ্চিন্তা কি কম? কত রাতে ওকে কেন্দ্র করে ও'দের আলোচনার ছিটে-ফোঁটা কানে এসেছে, কথার টুকরো শুনতে পেয়েছে। কৈ, তাঁরাও তো কোন সমাধান খুঁজে পাননি। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

তবু এ তাচ্ছিল্য কেন? কেন এ অপমান? কেন ও এ বাড়ির বড়মেয়ে হয়েও বড়মেয়ের মর্যাদা পেল না বুঝতে পারল না অঞ্জনা।

বিগত এক বছরের অসংখ্য ঘটনার টুকরো, অসংখ্য তাচ্ছিল্যের ছবি স্মৃতি-পটে ছায়াছবির মত ভিড় করে এল। দুঃসহ বোবা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে চাইল ওর সমগ্র সত্তা।

কিন্তু কেন এ উপেক্ষা? রঞ্জনার সম্ভাব্য বরকে কেন্দ্র করে বাড়িতে এত-বড় আয়োজনে কেন যে ও অবাঞ্ছিত হয়ে রইল তার কারণ খুঁজে পেল না অঞ্জনা। তবু উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় উত্তর?

শুধু সেদিন নয় তারপরের দিন-গুলোও ঐ অবজ্ঞার উৎস সন্ধান করে ফিরল। বাড়িতে একমাত্র রঞ্জনা কাছে আসে। প্রাণ খুলে কথা বলে। মা-বাবা কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু কেন? কি করেছে সে? ওরা কি খুলে বলতে পারে না যে ঐ লম্পট স্বামী নিয়েই ওকে ঘর করতে হবে।

এই অস্বস্তির মধ্যেই আরও কয়েকটা দিন পার করল। রঞ্জনার বিয়ের দিনটি এগিয়ে এল। বাড়িতে লোকজনের ভিড়, আত্মীয়পরিজনের মেলা। সিগারেটের ধোঁয়া কাঁপছে, জর্দার গন্ধে ভারী হয়েছে ঘরের বাতাস। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলগুঞ্জন।

বাড়তি আলোয় ভাসছে বাড়ি-ঘর-লন। পুরো ছাদটা ঘিরে ত্রিপলের প্যাণ্ডেল। লুচির ঝুড়ি আর মাছ-মাংসের বালতি হাতে ছোটাছুটি করছে লোকজন।

শাঁখের আওয়াজ, উলুধ্বনি, চুড়ী গুলোর কথায় একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

লগ্ন এগিয়ে এল। মা এলেন ভিড় ঠেলে। পাড়ার দুটো তরুণী বৌয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন: মেয়েটাকে এবার সাজিয়ে দাও বৌমা। বর এসে পড়ল বলে।

অঞ্জনা আজও দাঁড়িয়েছিল এক কোণে। মার কথা ওর কান এড়াল না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আর সইতে পারল না এ তাচ্ছিল্য। অসহ্য ঠেকল এ অপমান।

বাড়ির এতবড় আয়োজনে ওর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। কোন বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু কেন? ছোট বোনের বিয়েতে ওর কি কিছুই করার নেই?

নেই-ই তো। তা না হলে মা এড়িয়ে চলছেন কেন? অন্যান্য মেয়েরাই বা কোন কাজে ওর সহযোগিতা চাইছে না কেন?

তাহলে কি আজকের পুণ্যলগ্নে অঞ্জনা অপাংক্তেয়। তাইতো। অঞ্জনা সধবাও নয়—বিধবাও নয়। তাই এই বিয়ের আসরে, অফুরন্ত মঙ্গল আর উল্লাসের আনন্দ-যজ্ঞে ওর কোন প্রয়োজন নেই।

এরপরেও কি আছে? তাও তো নেই। একই জীবন। একই তাচ্ছিল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

অথচ বাবা অতনু সেনকে আনবার জন্য দিল্লী যেতে চেয়েছিলেন। যেতে দেয়নি অঞ্জনা। শুধু একখানা প্রজাপতি-মার্কা কার্ড পাঠাতে বলেছিল। অথচ যাকে বদলোক মনে করে দিল্লী ছেড়ে এসেছে অঞ্জনা সে লোকটা ওকে এক ডজন চিঠি লিখেছে ফিরে যাবার অনুরোধ করে।

আজ যদি অতনুকে সঙ্গে করে এ বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকতে পারত অঞ্জনা, তাহ'লে কি মর্যাদাই না দিত এরা। প্রথম সারিতেই থাকত ওর আসন। তাতো হল না। হল আঘাত আর অপমানের বোঝা ওর মনের আনাচে-কানাচে বিষাক্ত ছোঁয়ার মত জমা।

আজ ওর নিজের ঘরটাও বাস্ত সমস্ত। আত্মীয়পরিজনরা দখল করেছে। খালি বলতে আছে ভাঁড়ার ঘরে পাশে একখানা ঘর। সেই ছোট ঘর।

সে ঘরে গিয়েই লজ্জা ঢাকতে চাইল অঞ্জনা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দিতে চাইল। হাতে করে নিয়ে গেল একটা মাদুর। মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

হয়তো ব্যর্থ বিষন্ন রাত ও ঘরে শুয়েই শেষ হত। কেউ জানত না, কেউ খোঁজও করত না।

কিন্তু বেদনায় সমবেদনা জানাতে এগিয়ে এলেন মা। মেয়েদের ভিড় থেকে অঞ্জনার হঠাৎ অন্তর্ধান তাঁর নজরে পড়ল অনেক রাতে। যে মেয়ে রাতদিন অসংখ্য কথার আর অন্তহীন খুশীতে ভরিয়ে রাখত সে মেয়ে ইদানীং এমন বোবা হয়ে গেছে দেখে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। আজ আর স্থির থাকতে পারলেন না।

অঞ্জনার চোখের পাতায় তন্দ্রার এত এসেছিল। কিন্তু কে যেন ওর কপালে মাথার চুলে হাত রেখেছে বলে মনে হল, একটু শুধু পরশ আদরের।

চমকে আস্তে আস্তে চোখ খুলতেই কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে গেল অজস্র ধারায়। উঠে বসল। মার বুকে মুখ গুঁজল। মার বুকের শাড়ি কান্নার লোনা জলে ভিজে গেল।

সমস্ত অপমান আর তাচ্ছিল্যের আঘাত থেকে এই ছোট্ট ঘরে আত্মগোপন করে নিজেকে একটি রাতের মত বাঁচাতে চেয়েছিল অঞ্জনা। বাঁচতে চেয়েছিল কান্নার আস্তানেই সব আঘাতের দুরন্ত বেদনাকে দুঃসহ জ্বালায় ঝরিয়ে। তা হতে দিলেন না মা।

অনেকক্ষণ পরে মা বললেন: চল মা, খাবি চল।

না মা, আমার খিদে নেই।

খিদে খুব আছে। চল...মার গলার স্বর কাঁপল।

না মা, তোমরা চাও না যে আমি ঐ আনন্দের হাটে থাকি। আমাকে এই অন্ধকার ঘরেই থাকতে দাও আজকের রাতটা।

চাই না—একথা ঠিক নয় মা..., আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে মা বললেন, কিন্তু কি করব মা। সমাজে বাস করতে হলে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কাকে না ডেকে পারি। আর তারা যখন প্রশ্ন করে আপনার ঐ মেয়েটা বছরের পর বছর এখানে কেন? স্বামীর ঘর করে না কেন, তখন যে কোন উত্তর খুঁজে পাই না মা।

জলভরা দুটো চোখ তুলে ধরল অঞ্জনা। ভিজে ভিজে কাঁপা দুটো ঠোঁটও। বলল: সত্যি কথাই বলেছ মা, যা ঘটছে তাই বলেছ। তোমাদের আর এ অপমানকর অবস্থায় রাখব না আমি। ভাবছি কালই চলে যাব।

চলে যাবি, কোথায়? চোখ বড় বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন মা।

দিল্লী। কালকের দিনটা যাবার পক্ষে খুবই ভাল। রঞ্জনারা যাবে, আমিও যাব।

কিন্তু.........

কোন কিন্তু নয় মা। এবার ফিরে গিয়ে নতুন করে সংসারের হাল ধরব। এখন বুঝেছি পালিয়ে এসে মান বাঁচানো যায় না। বাঁচাতে হবে ঐ সংসারের উপর নিজের মানুষটির উপর সব অধিকার বজায় রেখে। লড়াই ছেড়ে দিলে চলবে না, শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে দুঃখের নদী পার হতে হবে।

মার চোখেও খুশীর দীপ্তি। সেই ভাল মা, নিজের ঘর নিজে সামলে না রাখলে দুদিন পরে কিছুই থাকবে না। তাছাড়া অতনু ছেলে হিসেবে খুব খারাপ নয়। খারাপ হলে তুই চলে আসার পর এতগুলো চিঠি লিখে তোকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করত না।

নীচে তখন শাঁখ বাজছে, পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ ভেসে আসছে।

মা বললেন: চল, খাবি চল।

অঞ্জনাও মার হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: চল......

ধূমকেতু মাঝে মাঝে
হাসির ঝাঁটায় —
ম্যাকমোহন লাইন
দ্যুলোক ঝাঁটিয়া নিয়ে কৌতুক পাঠায় !..
শান্তি প্রস্তাব
আয়ুব
ভারত
অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্ব সৃষ্টিতে !
কিউব
আ

অথ লন্ডন-কথা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পুষ্প শরে দগ্ধ করে

পূর্বরাগেই নির্বিবাদ ফল ভক্ষণের রোমাঞ্চ ইউরোপের সমাজজীবন থেকে ক্রমলুপ্তায়মান।

কিমিতি বিদ্যা ও জীব-বিদ্যার অত্যাশ্চর্য উন্নতি, সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মিলন যাতে পরিণাম চিন্তায় ব্যাহত না হয় তার জন্যে বহুল ও বিচিত্র কৌশলের ব্যাপক প্রয়োজনের ফলে তার সঠিক পরিণতি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করবার উপায় নেই।

তবু হিসাবে দেখছি জার্মানীতে শতকরা দশটি নবজাতকের পিতামাতারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ নয়। ছোট্ট দেশ সুইডেনে জন্মহার নিতান্ত কম (প্রতি হাজারে ১৩½, বৃটেনে ১৭½,) তবু সেখানেও প্রতি বছর ১২০০০ জারজ সন্তান জন্মায়। বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত 'গেটিং ম্যারেড' নামে পুস্তিকার মতে প্রতি তিন-জন বিবাহিতা বৃটিশ নারীর মধ্যে এক-জন প্রাগ-বিবাহ জীবনে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। বর্তমানে বৃটেনে প্রতি ছটি নবজাত শিশুর মধ্যে একটির জন্ম-সম্ভাবনা দেখা দেয় তার পিতামাতার বিবাহের আগেই। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে বা পরেই সেই দম্পতিদের অনেকেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন বলে জারজের সংখ্যা অনেক কমে যায়। ১৯৬০ সালে তাদের জন্মহার ছিল ৪৭০০ (সমগ্র সংখ্যার শতকরা ৫·১ ভাগ, ১৯৩৭ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ৩২০০০ অথবা শতকরা ৪·৪)।

রাশিয়ার জারজ জন্মসংখ্যা জানবার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু সেখানেও তা যে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা তাতে সন্দেহ নেই। কিছু-কাল আগে লেনিনগ্রাদের 'লিটারারী গেজেটে' জনৈকা শিক্ষয়িত্রী অভিযোগ করেন যে, তাঁর স্কুলের শতকরা ২০টি ছাত্র-ছাত্রী জারজ। সুতরাং তাদের জন্ম-প্রমাণপত্রে পিতৃনামের স্থানটা শূন্য (ব্ল্যাঙ্ক) থাকে। তাই অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মর্মান্তিকভাবে বিদ্রূপ করে বলে 'ফাদার ব্ল্যাঙ্ক'। শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার তাই সক্ষোভ জিজ্ঞাস্য "আমরা কি এমন অবস্থায় পৌঁছোচ্ছি যে যখন আমরা ওদের (ঐ জারজদের) সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ঘৃণার্হ—'বাস্টার্ড' শব্দটির প্রয়োগ শুরু করবো?"—অতএব তিনি রেজিস্টারীকৃত বিবাহের বাইরে মিলন-সম্ভূত এই বিপুল সংখ্যক সন্তানদের পরিচয় দানের জন্যে এমনভাবে আইনের পরিবর্তন দাবী করেছেন যাতে তারা নিজেদের প্রকৃত পিতার (মায়ের আইনত বিবাহিত স্বামী নয়) পরিচয় দিতে পারে।

নারী মাত্রেরই জীবনে এক চরম ক্ষণ সন্তান-সম্ভাবনা। তাই সর্বকালে সর্ব-দেশেই আসন্নপ্রসবা মাত্রই সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের সহানুভূতির পাত্রী হওয়া উচিত। তার ওপর সে যদি প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং তার যদি স্বামী কিম্বা স্বজন না থাকে তা হলে সে তো আরো বেশী করে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্নেহ ও সাহায্যের অধিকারিণী। কিন্তু অধিকাংশ দেশই সেই বিপন্নাদের প্রতি উদাসীন কিম্বা হৃদয়হীনতার আদিম বর্বরতা থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। যে দেশগুলি তার ব্যতিক্রম তার মধ্যে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও সুইডেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

আইনের চোখে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মাতার কোন প্রভেদ নেই। অবিবাহিতা মাতাদের সেখানে বলা হয় 'একলা মা'। প্রসবকালে তাঁদের হাসপাতালে কোন খরচ লাগে না। কর্মনিরতা হলে তাঁরা ১২৪ দিন সবেতন ছুটি পান।

সুইডেনে যেদিন থেকে একটি অনূঢ়া মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনা জানাজানি হয়ে যায় সেদিন থেকেই তাঁকে "মিসেস" বলে ডাকা হয়। তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করবার হৃদয়হীনতার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। এই সময়েই রাষ্ট্র তাঁর জন্যে কোন বয়স্ক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্না অভিভাবিকা ঠিক করে দেয়। সেই তরুণী মাতার জন্যে বাসস্থান ও প্রসূতি-আগার প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা এই অভিভাবিকার দায়িত্ব। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর পিতাকে সনাক্ত করে প্রসূতি ও শিশুর জন্যে কিছু পরিমাণে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা। অনেক সময়েই একাধিক, এমন কি পাঁচজন, সম্ভবপর 'পিতা'কে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

সুইডেনে এই মেয়েদের বলা হয় 'নিঃসঙ্গ মাতা'। এঁরা মিউনিসিপ্যালিটির ফ্ল্যাট প্রভৃতি শুধু সস্তা পান না, পাওয়ার ব্যাপারে এঁদের অগ্রাধিকার। নার্স ও ধাত্রী এঁরা পান বিনা বেতনে। তাছাড়া তাঁরা অন্য কর্মনিরতা মায়েদের মতই সবেতন তিন মাস ছুটি পান এবং সেই সঙ্গে অন্যদের মতই মাতৃত্বের অধিদেয় বা বৃত্তি। এঁদের শিশু সাত বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মাতৃত্বের বিকল্প ব্যবস্থা

বলা বাহুল্য যে সর্বদেশেই অনূঢ়া মেয়েদের মাতৃত্ব অবাঞ্ছিত। শুধুমাত্র অজ্ঞতা, অসতর্কতা, কিম্বা প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলির ব্যর্থতার ফলেই অনুরূপ অঘটন ঘটে। তাছাড়া, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও স্বাস্থ্যের জন্যেও অনেক সময় বিবাহিত নারীদেরও সন্তান-সম্ভাবনা অনভিপ্রেত হতে পারে।

কমিউনিস্ট দেশগুলির বাইরে জাপান, মেকসিকো ও স্ক্যানডেনেভিয়া (অর্থাৎ নরওয়ে ও সুইডেন) প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি দেশে মেয়েদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বিপ্লবের পর থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব-রোধ আইনসম্মত, ব্যয়হীন ও

সম্পূর্ণভাবে প্রসূতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। তারপর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রধানত জন্মবৃদ্ধির আশায় মাতৃত্ব-রোধ বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। '৫৬ সালে তাকে পুনরায় আইনসঙ্গত ঘোষণা করায় বহু মেয়ে বে-আইনীভাবে মাতৃত্বের অবসান ঘটাতো। অবশ্য আইনসম্মত ঘোষণার পরও নিজেদের নাম নথিপত্রের বাইরে রাখতে উৎসুক হয়ে আজো অনেক মেয়ে লুকিয়ে হাতুড়ে দিয়ে ঐ কাজ করিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে। তাছাড়া আইনসম্মত হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে এ কাজে উৎসাহ দেওয়া হয় না। সেখানে চিকিৎসা-ব্যবস্থা বিনাব্যয়ে হলেও মাতৃত্ব-রোধের জন্যে প্রায় ১০০ রুবল (১২০ টাকার মত) পারিশ্রমিক লাগে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সে অনেক টাকা!

চীনেরা বার কয়েক মাতৃত্ব-বোধ আইনী ও বে-আইনী ঘোষণার পর বর্তমানে তা আইনানুগ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে জনসংখ্যায় বৃদ্ধি-রোধ।

হাঙ্গারীতে ১৯৫৬ সালে মাতৃত্ব-রোধ আইনসম্মত করা হয়। কিন্তু তার পর থেকে সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। গত ৭ই আগষ্ট (৭।৮।৬২) বুদাপেস্টের প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'নেপসজাভা' পত্রিকায় লেখে যে, এ বছরের প্রথম তিন মাসে হাঙ্গেরীতে এই ব্যাপারে ৫০,০০০ জন নারীর নাম রেজিস্টারীকৃত করা হয়েছে, অথচ ঐ সময়ের মধ্যে দেশে শিশু জন্মেছে মাত্র ৩৩,০০০টি।

সংবাদপত্রটির মতে অনেক মহিলা কোন কারণ না দেখিয়ে, অথবা কেবলমাত্র এই কথা বলেন যে, একটি ফ্ল্যাট কিম্বা মটরগাড়ী কিনবার জন্যে টাকা জমাতে চান বলে এই কাজের অনুমতি চেয়েছেন। উক্ত বিভাগের কমিশন প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মেয়েদের বিবেকের কাছে আবেদন করেছেন।

সম্প্রতি বৃটেনেও শ্রীমতী ফিনক্‌বাইন * নাম্নী একটি মহিলার অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব-রোধ করা নিয়ে বৃটেনের সংবাদপত্রসমূহে প্রবল বিতর্ক হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালে এলিস জেনকিন্স নামে এক লেখিকা 'দ রাইট টু রীচ' নামে একটি বইতে প্রবলভাবে মেয়েদের অবাঞ্ছিত সন্তান নষ্ট করবার অধিকারের দাবী তোলেন। সম্প্রতি হেলেন লাওয়ে নামে এক লেখিকা 'এ কোয়েসচেন অব এ্যাবরসান' নামে একটি উপন্যাসে ঐ দাবীর সমর্থনে আলোড়ন তুলেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও ইতিপূর্বে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে বহু বিতর্ক হয়েছে।

কিন্তু চার্চ ও রক্ষণশীল জনমত সন্তান-নিরোধ অধিকারের প্রবল বিরোধী। আমেরিকার মত বৃটেনেও গর্ভপাত ঘটানো বে-আইনী এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধিনী কিম্বা তার সহযোগী বা সহযোগিনীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। আইনের একটি মাত্র ধারা আছে, যেখানে কোন চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, গর্ভপাত না ঘটালে ভাবী জননীর জীবন সংশয় ঘটতে পারে, সেখানে তিনি গর্ভপাত ঘটাতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে কেউ আদালতে প্রশ্ন তুলতে পারে, তাই কদাচিৎ কোন চিকিৎসক গর্ভধারিণীর জীবনরক্ষার জন্যেও গর্ভপাত ঘটান।

তবু কার্যত ঘটছে কি? প্রতি বছর বৃটেনেই অন্তত ১০০,০০০ নারী সন্তান নষ্ট করান। ফিনক্‌বাইন-বিতর্কের সময় ডেলি হেরল্ড পত্রিকায় জনৈকা লেখিকা লেখেন যে, বৃটেনে যা ঘটে পৃথিবীর আর সব দেশেও তাই ঘটে। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে গর্ভপাতের সংখ্যা কয়েক কোটি। লেখিকা বলেন যে, দেশে-দেশে এত কঠোর আইন ও ধর্মে কত কঠিন বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন যে, দুনিয়ার সব দেশে প্রতিটি বড় ও ছোট শহর এমনকি মাঝারী ধরনের গাঁ ও গঞ্জেও এক-আধজন পেশাদার কিম্বা আধা-পেশাদার গর্ভপাতকারী কিম্বা কারিণী খুঁজে পাওয়া যাবেই।

অতএব ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে গর্ভধারণের নির্বুদ্ধি আইনের ফল দাঁড়াচ্ছে কি?—

অস্বচ্ছল অবস্থায় নারীদের পক্ষে অবস্থাপন্নাদের চেয়ে গর্ভপাত ঘটানো কঠিনতর ও বিপজ্জনক।

বিপুল সংখ্যক গর্ভপাত ঘটছে ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হাতুড়ে ব্যবসাদারদের হাতে। ফলে ঘটছে অসংখ্য মৃত্যু ও দুর্ঘটনা। অথচ গর্ভপাত যাঁরা ঘটাতে চান তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ও সুবুদ্ধিসম্পন্না। সন্তানদের প্রতি মমতাময়ী ও দায়িত্বসচেতনা বলেই তাঁরা অবাঞ্ছিত সন্তান চান না।* অবশ্য আরেকদল নারীও থাকতে পারেন যাঁরা সম্ভবপর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেও গর্ভপাত ঘটাতে চান। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর শারীরিক ও মানসিক বিপত্তির ঝুঁকি নিতে চান।—অথচ রাষ্ট্র তাঁদের সঙ্গে ঘৃণ্য পাপিষ্ঠার মত ব্যবহার করে। কিন্তু কেন? পৃথিবীতে কি শিশুর অভাব ঘটেছে? বরং অনেক বিজ্ঞানী তো মনে করেন যে, জনবৃদ্ধির হার যুদ্ধ-সম্ভাবনার চেয়েও ভয়াবহ।

এমনকি যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, স্রেফ নিজের সুবিধার জন্যে, অর্থাৎ নির্ঝঞ্ঝাট স্ফূর্তির জন্যে কোন মেয়ে সন্তান চান না তবু সেই মাতাকে কি শুধু ভবিষ্যৎ সন্তানটির কথা ভেবেই গর্ভাবসানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়? নিজের মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তানের চেয়ে পৃথিবীতে অনভিপ্রেত জীব আর কি হতে পারে?

হেরল্ডের লেখিকার মতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে যখন গর্ভপাত-বিরোধী আইন গৃহীত হয় তখন মেয়েদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করা হতো এবং পুরুষেরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের যে-কোন অধিকার দাবিয়ে দিত। কিন্তু আজ?—আজো কি তাদের নিকৃষ্টতর জীব বলে মনে করা হচ্ছে? নয়তো সর্ববিষয়ে তাদের সমানাধিকার, অন্তত মুখে স্বীকার করে নেবার পরও, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে গর্ভধারণের শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

---

* শ্রীমতী ফিনক্‌বাইন আমেরিকান টেলিভিশন অভিনেত্রী। চারিটি সুস্থ সন্তানের মাতা এই মহিলা পঞ্চমবার গর্ভধারণের পর সন্তান নষ্ট করতে চান। কারণ এবার গর্ভাবস্থায় অজ্ঞতাবশতঃ তিনি 'থালিডোমাইড' নামে ঘুমের ওষুধ খান। ফলে তিনি আশঙ্কা করতে থাকেন যে তাঁর পঞ্চম সন্তান বিকলাঙ্গ হবে। চিকিৎসকেরাও এই শঙ্কার যথার্থতা আধাআধিভাবে স্বীকার করে নেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট তাঁর গর্ভপাতের অধিকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়।

শ্রীমতী ফিনক্‌বাইন শেষ পর্যন্ত সুইডেনে গিয়ে গর্ভপাত ঘটান। কিন্তু এই ঘটনা পাশ্চাত্যে অবাঞ্ছিত সন্তান-নাশের মৌলিক অধিকার নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে বিবিধ পেটেন্ট ওষুধ নির্মাতাদের দাবীও প্রবল হয়ে ওঠে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি কেনেডি শেষ বিষয়টি সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করেন।

গর্ভপাত কি মনুষ্য-জীবন নাশ?

এ বিতর্ক হয় গার্ডিয়ান পত্রিকায়। জীববিদদের মতে ২৮ সপ্তাহের আগে মাতৃগর্ভে শিশু থাকে সম্পূর্ণভাবে মাতৃদেহের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে বাঁচে না। সেই হিসাবে তখন সে মাতৃদেহের অংশ-বিশেষ, সুতরাং স্বতন্ত্র জীবন নয়। কিন্তু জীবন-সম্ভাবনা থাকে বটে। অতএব গর্ভসঞ্চারের শুরুতে ভ্রূণ অপসরণ করার অর্থ একটি জীবন-সম্ভাবনার বিনাশ করা, কিন্তু জীবন বিনাশ করা নয়। কিন্তু পরিবার পরি-কল্পনার যে-কোন কৌশলই হচ্ছে জীবন-সম্ভাবনার বিনাশ সাধন।

এই নৈতিক বিপ্লবের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা দুনিয়ায়, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে, যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক হাওয়া বদল শুরু হয়েছিল, বর্তমান অবস্থা হচ্ছে তারই পরিণতি। মুখ্যত তার কারণ হচ্ছে মেয়েদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও স্বাধীনতার অগ্রগতি। সেই অগ্রগমনের সংগে সংগে সমগ্র দুনিয়ার পুরুষ-প্রধান সমাজের নৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিৎ নাড়া খেয়ে গেল। তার বিধি-নিষেধের কাঠামো ধ্বসে পড়তে লাগলো।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা স্থান-সাপেক্ষ। কিন্তু সংক্ষেপে এ-কথা বলা যায় যে, সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য ঘটবার পর থেকেই তারা নারীর যৌন প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ মানবিক অনুভূতি হিসাবে গ্রহণে অস্বীকার করে। সতীত্বের নামে কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে সমাজ-চ্যুতি, বেত্রাঘাত, না-খেতে-দিয়ে-শুকিয়ে মারা, টিলিয়ে মারা, কয়েদ, ফাঁসি, অর্ধেক-মাটিতে পুঁতে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া সবই করেছে।

অথচ সতীত্বের মোদ্দা কথাটা কি? —মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র যৌন বাসনা থাকবে না। তাদের যৌন কামনা হবে সম্পূর্ণ নেতিবাচক, স্বামীর কামনা-লালসার পরিপূরক। যদি কোন নারী তার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ তার স্বতঃস্ফূর্ত কিম্বা সক্রিয় যৌন বাসনা থাকে, তাহলে সর্বনাশ! সে অসতী, ভ্রষ্টা, কুমারী, কলঙ্কিনী, কুলটা!—এ হলো সনাতনী খৃষ্টানী মনোভাব!

আমাদের দেশে তাকে আরেকটু আগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুষ্ঠ-রোগী পঙ্গু স্বামীকে যে-স্ত্রী পিঠে করে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল, যুগ যুগ ধরে আমরা তার সতীত্ব ও পতি-পরায়ণতার জয়ধ্বনি করেছি। কিন্তু ডাকসাইটে কোন লম্পট কিম্বা সন্দেহ-বাতিক নপুংসকের হতভাগিনী স্ত্রী যদি কোন বিহ্বল মুহূর্তে ঘোমটার ওপারে তাকিয়েছেন তো তার লাঞ্ছনার অবধি রাখিনি।

—পূর্ব অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নারীরা হচ্ছেন সেই যুগ-যুগান্তরের সামাজিক অসাম্য ও মেয়েদের যৌন-নিষ্ক্রিয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী। এঁদের যৌন প্রবৃত্তি সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও চরিতার্থতাপ্রয়াসী। তাতেই তাঁদের আনন্দ, তৃপ্তি ও উল্লাস।

অকাল বসন্ত

অর্থনৈতিক, সামা-জিক ও রাজনৈতিক

জোয়ারে বন্যা অবশ্যম্ভাবী

স্বাধিকারের ক্রমবৃদ্ধি ছাড়াও সম্প্রতিকালে অন্য কতকগুলি গৌণ কারণও সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য সমাজকে বিশেষ করে তরুণ-তরুণী সমাজকে প্রভাবান্বিত করেছে। যার ফলে যৌন-স্বাধীনতা ক্রমশই বয়ঃকনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

সমাজতত্ত্ববিদেরা প্রায় অদ্বিতীয়মত হয়ে বলছেন যে, জীবন ও স্বাস্থ্যের মানের ক্রমোন্নতির ফলে মাত্র এক-কি-দুই পুরুষের মধ্যেই তরুণ-তরুণীদের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটছে দু'বছর আগে। আর সেই আগু যৌবনে যৌনলিপ্সাকে বহিঃপ্রকাশ করে তোলবার মত উপাদানের অপরিমেয় প্রাচুর্য রয়েছে তার পরিবেশে।

যেমন, রেকর্ড-রেডিও, সিনেমা-টেলিভিশনে এবং চটকদার পত্র-পত্রিকার যৌনসর্বস্ব গান, কাহিনী, গল্প, রম্য-রচনা ও ছবির ব্যাপক প্রসার। দ্বিতীয়ত, অসন-ভূষণ ও প্রসাধন-ব্যবসায়ীদের প্রচার-বেসাতি। আজকের তরুণ-তরুণীরা কৈশোরের সীমা অতিক্রান্ত হবার আগেই যেদিকে তাকায়, সেইদিকেই সহস্র-দর্পণ-যুক্ত হলঘরের প্রতিবিম্বের মত একটিই প্রলোভন-জাগানো দৃশ্য তার চোখে পড়ে —কিভাবে সাজলে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বে। কোন্ বিন্যাসে তরুণীর কেশে এমন কমনীয়তা আসবে, যার মধ্যে দিয়ে আঙুল সঞ্চালন করতে গেলে তরুণ প্রণয়াভিলাষীর চোখ দুটি আবেশে ঢুলে আসবে। কোন্ প্রলেপ তার ত্বকে ক্রিও-পেট্রার স্পর্শ-সুখ আনবে ইত্যাদি।

কোন কোন শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ববিদ আবার স্কুলে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ধাত্রী-বিদ্যা, শিশুপালন ও প্রাথমিক যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষাকেও তারুণ্যে যৌন-স্বাধীনতা যা স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে দায়ী করেছেন। তাঁরা বলেন, যাঁরা ঐসব শিক্ষার প্রবর্তক, তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহেই মহৎ ছিল এবং ওগুলির শিক্ষা একেবারে না দেওয়া কিম্বা কিশোর-কিশোরীদের অজ্ঞ করে রাখাও অনুচিত, এমন কি বিপজ্জনক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হচ্ছে, অনুসন্ধিৎসু তরুণ মন বিষয়গুলি সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞানার্জনের পর আরো দশটি বছর তাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে নারাজ।

অবশ্য এতক্ষণ যা বললাম, তা হচ্ছে প্রধানত ইউরোপ-আমেরিকায় স্বচ্ছন্দ মেলামেশার সম্পর্কে। সোভিয়েট রাশিয়ায়, যেখানে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের বেসাতি নেই, যৌনসর্বস্ব চটকদার সাহিত্য ও সিনেমা নেই, সেখানে তরুণ মন যৌন-সঙ্গমলিপ্সু হয়ে ওঠার নানা কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে বসতস্থানের অভাব। কয়েক বছর আগে ডাঃ এটারভ নামে এক সোভিয়েট সমাজ-বিজ্ঞানী 'যৌন শিক্ষার সমস্যা' (Problems of Sex Education—Dr. Atarov) নামে একটি বই-এ লেখেন :

"সময় সময় পিতামাতারা সন্তানদের সম্মুখেই পরস্পরের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি দেখান। এবং প্রায়ই একই ঘরে কিম্বা পাশের ঘরে ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে সঙ্গমলিপ্ত হন। তাঁরা ভুলে যান যে, এরকম ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই পিতামাতার অসতর্কতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যেই বালক-বালিকাদের মনে অকালে যৌনকামনা তীব্র হয়ে ওঠে।"

সমস্যার সামগ্রিক সমাধানে

নর-নারী সম্পর্কের দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতির ফলে সমাজে নানা স্তরে নানা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সেই প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা সম্প্রতিকালে অনুভব করা যায় 'লেডি চ্যাটার্লী' উপন্যাসের বিচারকালে। সে সময় দক্ষিণ দিক থেকে খড়্গ হাতে বিতর্কের রণাঙ্গনে নামে চার্চ। সেই যাজক-যোদ্ধাদের সেনাপতি-স্থানীয় ছিলেন রেভারেন্ড লেসলে ডি, উদারহেড, পি-এইচ-ডি, ডি-ডি। তিনি লেখেন যে, যৌনানুভূতি দৈব পরিকল্পনা। খাবার সময় খিদে পাবার মতই যৌন-কামনা চরিতার্থ করার বাসনাও অপরাধ নয়। কিন্তু খিদে পেয়েছে বলে চুরি করে খাওয়াকে তো সমর্থন করা যায় না।

—নিশ্চয়ই যায় না। কিন্তু গৃহস্থের সম্মতি নিয়ে কেউ যদি ক্ষুধা ও রসনা তৃপ্ত করে, তবে তাকে কি চুরি বলা চলে?

কেউ কেউ অবশ্য নারী-স্বাধীনতা, এমন কি শিক্ষা প্রভৃতি খর্ব এবং বাল্য-বিবাহ পুনঃ-প্রবর্তন প্রভৃতির কথা বলেন। ফ্যাসিস্টরা বলেছিল, মেয়েদের রান্নাঘরে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু বড় ভয়ানক কথা! তাতে বর্তমান অর্থনৈতিক ও শিল্প-ব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছুকেই পেছু হটাতে হবে।

তবে বাল্য-বিবাহ পুনঃ-প্রবর্তনটা বোধ হয় আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্যে আংশিকভাবে ফিরে আসছে। ১৯৬০ সালে বৃটেনে ৩৪৩৬১৪টি বিয়ে হয়। তার মধ্যে ৫০০টি কনের বয়স ছিল ষোলর কম এবং ৮২০০০ কনের বয়স ছিল কুড়ির কম। আর আজকালকার ছেলে-মেয়েদের যতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে প্রচার করা হয়, হিসেব নিলে দেখা যাবে ততটা ঠিক সত্যি নয়। কারণ, সব-চেয়ে বেশি (অর্থাৎ আয়ের অনুপাতে) টাকা জমায় ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা।

তবে সব ছেলেমেয়ে টাকা না-ও জমাতে পারে। কারণ, টাকা যারা জমায়, তারা ঐ বয়সেই কাজে ঢুকেছে। কিন্তু ঐ বয়সে অনেকে পড়াশোনা করতে পারে কিম্বা শিক্ষানবীশ থাকতে পারে। সুতরাং তারা তো বাল্য-বিবাহ করতে পারে না। করা উচিত নয় বলেও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। কারণ, ঐ বয়সে শরীর, মন, দায়িত্ব ও বিবেচনাবোধ কোন কিছুই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তাই অল্পবয়সের বিয়েতে স্বল্পকালেই ক্লান্তি আসে ও বিরোধ জাগে।

এই সব বিবেচনা করেই বিংশ দশকে আমেরিকার বেন, বি, লিণ্ডসে নামে এক বিচারপতি তাঁর 'কম্প্যানি-ওনেট্ ম্যারেজ নামক' পুস্তকে (প্রকাশিত ১৯২৭) একটি বিজ্ঞ কিন্তু মূলত রক্ষণশীল প্রস্তাব করেন।

সংক্ষেপে তাঁর প্রস্তাব ছিল, যেহেতু বিবাহিত জীবনে সন্তানপালনের জন্যে এবং অনেকক্ষেত্রেই বিবাহিতা নারীর পক্ষে চাকরী করা সম্ভব কিম্বা বাঞ্ছনীয় নয় বলেই যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থাভাবের জন্যেই বহু তরুণ-তরুণী পরস্পরের প্রতি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েও বিয়ে করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং মিঃ লিন্ডসে দাবী তোলেন যে প্রচলিত সাধারণ বিয়ে ছাড়াও আরেক ধরণের 'সহযোগিতার বিয়ে' (কম্প্যানিওনেট ম্যারেজ) চালু ও আইনের দ্বারা স্বীকৃত হোক। সেই বিধানে :

(১) কিছুকালের জন্যে তরুণ দম্পতির সন্তানলাভের কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা থাকবে না এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের সম্ভবপর প্রত্যেকটি পদ্ধতি তাদের জানা ও আয়ত্তের মধ্যে থাকবে।

(২) যতদিন না তাদের কোন সন্তান হচ্ছে ততদিন তাদের পক্ষে শুধুমাত্র

পারস্পরিক সম্মতিদ্বারাই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব হবে।

(৩) বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হলে স্ত্রী কোন-প্রকার খেসারৎ দাবী করতে পারবে না।

বিচারপতি লিন্ডসের মতে বিবাহিত কিম্বা যৌন-জীবনে স্থিতিশীল ও তুষ্ট ছাত্ররা যৌনজীবনে অস্থির ও অতৃপ্তদের চেয়ে পড়াশোনায় ভালো হয়। দ্বিতীয়ত, পুরোদস্তুর ঘর সংসার, কিম্বা দুজন স্বতন্ত্র, বিশেষ করে বিশৃঙ্খল জীবন যাপনের চেয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রীতি ও বন্ধুত্বের ওপর নির্ভরশীল 'সহযোগিতার বিয়ে' অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত ব্যয় ও নির্ঝঞ্ঝাট।

তবে তাঁর প্রস্তাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভালোর দিক হচ্ছে, এই অভিনব ব্যবস্থার দ্বারা তরুণ-তরুণীদের জীবনে বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা, উত্তেজনা ও ব্যভিচার প্রশমিত হবে। বহুগামিতার স্থানে আসবে একগামিতা। সেই সঙ্গে কমে আসবে সমলিপ্সা কিম্বা গণিকাসক্তি প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র যৌন স্খালন এবং রাতজাগা মাতলামি, চড়াও-ঘেড়াও, হৈ-হুল্লোড় ও মারপিট প্রভৃতি বন্ডামী ও গুন্ডামী।

কিন্তু তা হলে হবে কি? ডেনভারের তরুণ অপরাধীদের বিচারালয়ের প্রাজ্ঞ বিচারপতি মিঃ লিন্ডসে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যেই পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন অমনি নিগ্রো-নিধনকারী কু ক্লক্স ক্লান এবং ক্যাথলিকেরা ঐতিহ্য, পারিবারিক পবিত্রতা, রক্তের বিশুদ্ধতা, আইনসিদ্ধ লালসার বাঁধ-ভাঙা প্রভৃতির অজুহাতে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করলো যে লিন্ডসে পদ-চ্যুত হলেন।

তবে আজ স্কান্ডেনেভিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে এবং অন্যান্য বহু দেশে তরুণ-তরুণীরা বিচারপতি লিন্ডসের প্রস্তাবকে বাস্তব করে তুলছে। তবে কোথাও তা আইনত স্বীকৃত হয় নি এবং চার্চের একঘেয়ে অরণ্যরোদনও বন্ধ হয়নি।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বিচারপতি লিন্ডসেকে পরে আংশিকভাবে সমর্থন জানান। তিনি লেখেন, 'আমি যদিও মনে করি যে 'সহযোগিতার বিয়ে' সঠিক দিকেই এক পদক্ষেপ এবং তার দ্বারা বহু উপকারও সাধিত হতে পারে তবু আমি মনে করি না যে প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা যথেষ্ট। আমি মনে করি, সর্ব-প্রকার যৌন সম্পর্ক,—যার মধ্যে সন্তানের প্রশ্ন জড়িত নেই, তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-গত বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি কোন নারী ও পুরুষ সন্তানের জন্ম না দিয়ে একত্র বসবাসের সিদ্ধান্ত করে তবে তা একান্তভাবে তাদের নিজেদের ব্যাপার। অন্য কারো তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

"আমি মনে করি না যে, যখন কোন নারী ও পুরুষ, বিবাহের দ্বারা সন্তান-সন্ততি কামনা করছেন, তখন তাঁদের যৌন ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে, অনুরূপ গুরুতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ কথার যথার্থতা প্রমাণে প্রভূত তথ্য ও প্রমাণ উত্থাপিত করা যায় যে, প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা এমন লোকের সংগেই হওয়া উচিত যার ও-বিষয়ে আগে থেকে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কারণ যৌন প্রক্রিয়া মানুষের সহজাত বা শ্রেফ ইন্দ্রিয়-জাত নয় (অর্থাৎ তার জন্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন) মনে হয় কোনদিন তা (অশিক্ষাপটু) ছিলও না। —এই যুক্তি ছাড়াও দুটি নরনারী যখন তাদের আজীবন সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছে তখন তাদের পরস্পরের সামর্থ্য ও সম্ভব-পর সহযোগিতার বোঝাপড়া না হয়েই তা গড়তে যাওয়া এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। এ যেন এক ব্যক্তি যখন বাড়ী কিনতে চাচ্ছে তখন কেনা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকে বাড়ীটি দেখতে না দেবার এক অসম্ভব সর্ত।

"যদি বিবাহের জৈবিক ভূমিকাকে যথার্থভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে তার সঠিক পদ্ধতি এই হওয়া উচিত যে স্ত্রীর প্রথম গর্ভসঞ্চারের পূর্বে পর্যন্ত কোন বিয়ের আইনত স্বীকৃতি না দেওয়া। বর্তমানে যৌন প্রক্রিয়া অসম্ভব হলে বিয়ে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তানলাভ, শুধুমাত্র যৌন প্রক্রিয়া নয়। সুতরাং সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেবার আগে পর্যন্ত বিবাহের পূর্ণ স্বীকৃতি দান অনুচিত।

—পূর্বোক্ত মত বা যুক্তি পোষণ করার কারণ অন্তত আংশিকভাবেও এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশল সন্তান উৎপাদন এবং নিছক যৌন প্রক্রিয়াকে পৃথক করে দিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ যৌন জীবন ও বিবাহের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে এমনভাবেই স্বাতন্ত্র্য দান করেছে যে একদিন যে পার্থক্য উপেক্ষা করা যেত, আজ তা অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আজ দুটি নর-নারী শুধু যৌন লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে, যেমন গণিকালয়ে একত্র হতে পারে। দ্বিতীয়ত হতে পারে, বিচারপতি লিন্ডসের প্রস্তাবিত সম্প্রীতির সাহচর্যে যার মধ্যে যৌনমিলনও থাকবে আংশিক-ভাবে। পরিশেষে তাদের মিলনের উদ্দেশ্য হতে পারে সন্তানলাভ ও সংসার-পরিবার গড়ে তোলা। প্রত্যেক উদ্দেশ্যই পৃথক এবং বর্তমান অবস্থায় কোন নীতি-বাদই তাদের একটি স্বাতন্ত্র্যহীন সামগ্রিকতায় সমষ্টিবদ্ধ করতে পারবে না।"

(ম্যারেজ এন্ড মরাল)

সাহিত্য সমাচার

।। ব্যালাড অব এ মাইনার ।।
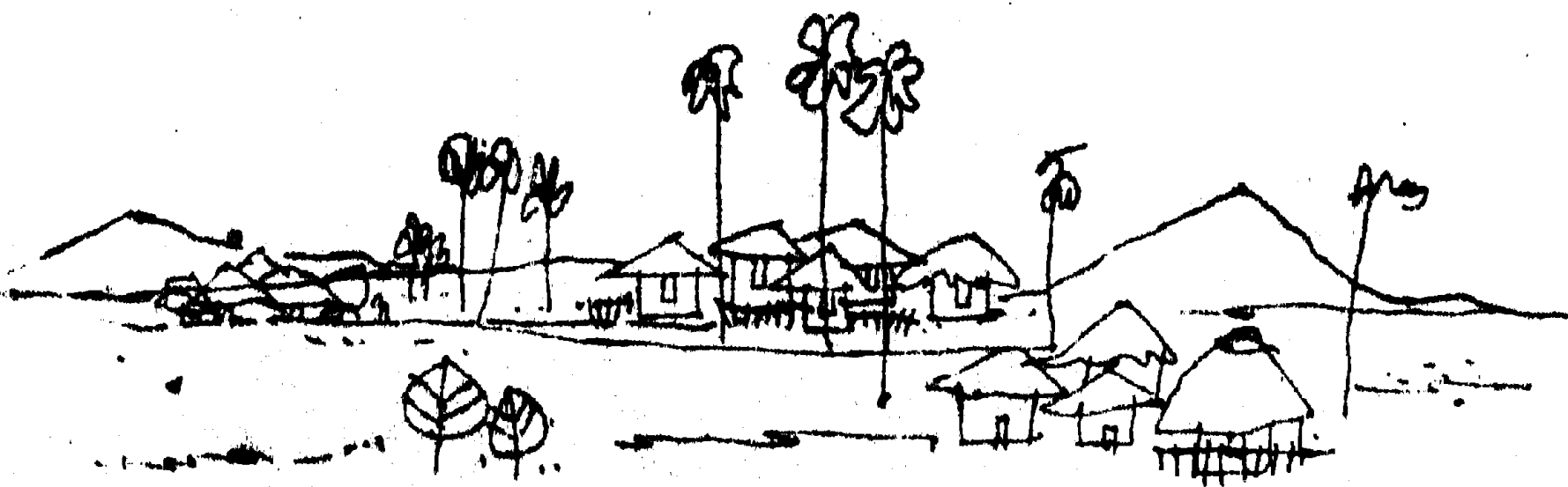
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকে কাহিনীর শুরু। যুদ্ধপরবর্তীকালের অর্থনৈতিক সংকট-এর সময় পর্যন্ত কাহিনীর গতিই চেক খনি-মজুর রুডলফ হুডেৎস ধর্মঘটে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় যেমন তার চাকরি যায় তেমনি অন্য কোথাও চাকরি জোটে না। কোন খনি-মালিকই তার উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করলে না উপযুক্ত কর্মক্ষম একটি মানুষের জন্য। সংকটময় অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য রুডলফ দেশ ছেড়ে জার্মানীতে চলে গেলেন। অন্য নাম নিয়ে কাজ করতে লাগলেন এক খনিতে।

মারিয়ে মায়েরোভা

মিলচা রুডলফ-এর বাগদত্তা। সে এসে মিলিত হল। সামান্য আয়ের একটি সুখের সংসার গড়ে উঠল। কিন্তু রুডলফকে গ্রেপ্তার করে বাধ্য করা হল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনীতে যোগ দিতে। তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন রুডলফ খনির কাজে। কিন্তু একদিন তাঁর উপযুক্ত বড় ছেলে মারা গেল দুর্ঘটনায়। একসময় রুডলফেরও দুটি আঙুল হারাতে হল। তারপর যুদ্ধ থামল। দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু রুডলফের তখন আর চাকরি নেই। যুদ্ধান্তের অভিশাপে বেকার। দেশে ফিরেও কোন সুরাহা হল না। বেঁচে থাকার তাগিদে রুডলফ একদিন পথে নেমে এলেন মানুষের দয়ার ওপর নির্ভর করে। একটি চাকরি একটি সংসারকে সুখে থাকতে দিল না। ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে রুডলফের এই পরিণতি মর্মান্তিক বেদনাদায়ক—বীভৎস যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া।

'ব্যালাড অব এ মাইনার'এর কাহিনী অতি সূক্ষ্ম এবং জটিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত এ কাহিনী শ্রীমতী মারিয়ে মায়েরোভার অসামান্য সৃষ্টি। অশীতিপর বর্ষীয়া লেখিকা সাম্প্রতিক চেক সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যসেবী। চেক সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি সরকারী জাতীয় পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেছেন।

ক্লাডনো চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। খনি-মজুরদের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহের সঙ্গে মায়েরোভার যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ঐ শিল্পাঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস 'সাইরেন'। পরবর্তীকালে ঐ একই অভিজ্ঞতার ভূমিকায় রচিত 'ব্যালাড অব এ মাইনার'।

মায়েরোভা বেশী জাঁকজমক করে লিখতে বসেন না বা তিনি আড়ম্বরও পছন্দ করেন না। যা বলতে চেয়েছেন পরিস্কারভাবে বলেছেন কোন জটিলতার সৃষ্টি না করে। রুডলফ জীবনকে ভালবাসে। সে বাঁচতে চায়। মোটামুটি স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে সামান্য সুখের স্বপ্ন দেখতে চায়। তার লোভ কম। তবুও পরিণতি ভয়াবহ এবং করুণ। জীবনকে কত গভীরভাবে ভালবাসা যায় তার প্রতীক রুডলফ। কাহিনীর পাতায় ফুটে ওঠে তার অকৃত্রিম জীবন-বোধ। মমতামাখা জীবনধারার ঔজ্জ্বল্য ম্লান করে সায়াহ্নের শকুন অতি দ্রুত নেমে আসে। রুডলফ মানুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। ধুলোর পুতুল ধুলোতে মিশে যায় বাঁচার দাবীকে অক্ষয় করে।

মিলফাইট এবং মিলচারের প্রবল প্রভাব পড়েছে রুডলফের জীবনে। মিল-ফাইট রুডলফের সহকর্মী বন্ধু। এদের জীবনপ্রবাহ কোন তত্ত্বদর্শনকে প্রচার করে না। নিতান্ত সাধারণ জীবনের চলার ছন্দে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত জীবনের অন্তরঙ্গতায় জীবন্ত। কোথাও কোন সেন্টিমেন্ট নেই। মিলিত কর্মচক্রের সুখ-আনন্দের কাহিনী 'ব্যালাড অব এ মাইনার'। সেই কর্মচক্র হতে বিচ্যুত-হতাশা ও ব্যর্থতাবোধের কাহিনী 'ব্যালাড অব এ মাইনার'।

।। স্টিফেন ল্যাকনার ।।

বর্তমান জার্মান কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পী স্টিফেন ল্যাকনার। এই কথাশিল্পী সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভ না করলেও নানাবিধ স্বতন্ত্র শিল্পসম্ভাবের অধিকারী। এখানেই রয়েছে তাঁর স্বাতন্ত্র—অন্যান্য জীবিত সমকালীনদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। দৃশ্যগোচর বস্তুমাত্রেই কৌতূহলের সামগ্রী এবং শিল্পেরও বিষয়। নিপুণ হস্তে ঐ সমস্ত বস্তুপুঞ্জ শিল্পরূপ লাভ করে। সাহিত্য-গুণান্বিত সামগ্রিক শিল্পকৃতি সত্য ও সুন্দরের অনির্দেশ্য জগৎ হয়ে ওঠে। একটি কবিমন যেন অনুক্ষণ জাগ্রত।

বর্তমান আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ল্যাকনার গভীরভাবে জড়িত। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তাবারার স্থায়ী বাসিন্দা। দীর্ঘকাল নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইউরোপেও এসেছেন কয়েকবার। জার্মান পিতামাতার সন্তান ল্যাকনারের জন্ম ১৯১০ সালে ফ্রান্সে। সে সময় বার্লিন ও ফ্রাংকফুর্টে বসবাস করেন। গিসেন-এ শিক্ষালাভ করে দর্শন-শাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

ল্যাকনারের জীবনারম্ভ হয় একজন খেতমজুরের কাজের মধ্য দিয়ে। লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ হয় সংবাদপত্রে। ১৯৩৯ সালে প্যারিস থেকে উত্তর আমেরিকায় চলে যান। তারপর আবার ইউরোপে আসেন যৌবনকালের তীর্থ-ক্ষেত্র দর্শনমানসে। ১৯৩৮ সালে ম্যাক্স বেকমান ল্যাকনারের 'ডের মেনশ্ ইস্ট কাইন হাউস্টির' গ্রন্থখানি চিত্রায়িত করেন। চব্বিশ বৎসর পরে ল্যাকনার এই

স্টিফেন ল্যাকনার

ক্ষমতাশালী শিল্পীর জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ল্যাকনার কোথাও স্থির হয়ে থাকেননি। তাঁর গ্রন্থগুলি প্রকাশস্থানও বিচিত্র। যখন যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই যেন বইগুলি প্রকাশিত। কয়েকটি বইয়ের নাম ও প্রকাশস্থান উল্লেখ করছি—'ইয়ান হাইমাৎলোস' (জুরিখ), 'গ্রাস ফন উনটেরভেগস' (ভিয়েনা), 'ডিসকভার ইওরসেলফ' (নিউইয়র্ক), 'ম্যাক্স বেকমান' (বার্লিন)। 'ইন লেটস্টের ইনসটানৎস' নামক নাটকে মানব-সভ্যতা কিভাবে বারবার বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা বিবৃত করেছেন ল্যাকনার।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

অঘ্রান মাসের পয়লা তারিখেই হঠাৎ একটা পালকি এসে থামল কনকদের বাগানে। দুপুর পার হয়ে গেছে বিকেল শুরু হয়নি—এমনি সময়টা শ্যামা খেয়ে আঁচিয়ে উঠে ঘাটের ধারে দাঁড়িয়েই রোদ পোয়াচ্ছেন। উঠোনে এত গাছপালা হয়েছে যে ভাল করে রোদ নামেই না কখনও।

হঠাৎ পালকি আসতে দেখে শ্যামা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কনকও বাড়ির ভেতর থেকে শব্দ পেয়েছিল, সেও ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের বাড়িতে আবার পালকি করে কে আসবে। এতকালের মধ্যে তো কাউকে আসতে দেখে নি সে!

পালকির পিছনে পিছনে একজন পিলেরোগা ধরনের ক্ষয়াঘষা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আসছিলেন, এতক্ষণ ওঁরা দেখতে পায়নি। তিনি পালকি-বেয়ারাদের সঙ্গে অত দ্রুত চলতে পারেন নি—পিছিয়ে পড়েছিলেন। এইবার তিনি ছুটে এগিয়ে এসে পালকির দোর খুলে কাকে যেন হাত ধরে আস্তে আস্তে টেনে বার করলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় বয়ে আনার মতো করেই বাইরের ঘরের রকে বসিয়ে দিলেন। একটা সাদা বোম্বাই চাদর মুড়ি দেওয়া—ঠকঠক করে কাঁপছে লে আর কী রকম একটা অব্যক্ত আওয়াজ করছে।

মুড়ি-দেওয়া হলেও মেয়েছেলে নয় এটা বোঝা গেল। খানিকটা কোঁচা ঝুলে পড়েছে এদিকে—অর্থাৎ পুরুষ।

সঙ্গের অভিভাবকটি এতক্ষণ এদের সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি, এদিকে ফিরে তাকান নি। এবার এদিকে ফিরে—কাকে নমস্কার করবেন ঠিক করতে না পেরে শ্যামা ও কনকের মাঝামাঝি একটা জায়গা লক্ষ্য করে নমস্কার করলেন। শ্যামা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও একখানি খাটো ময়লা ধুতি পরে ছিলেন—তাই বাড়ির গৃহিণী না দাসী বুঝতে পারেন নি ভদ্রলোক।

সে ভদ্রলোকটিও অবশ্য খুব সুস্থ নন। তাঁর মুখের চেহারাও যৎপরোনাস্তি শীর্ণ ও দুর্বল—অনেকদিন কোন রোগে ভুগছেন বলেই মনে হয়। বেশভূষাও তথৈবচ। অত্যন্ত মলিন ধুতি পরনে—জীর্ণ গলাবন্ধ ময়লা কোটের ওপর ততোধিক ময়লা একটি উড়ুনি। নমস্কার করা হয়ে গেলে দু-হাতে উড়ুনির দুই প্রান্ত ধরে ওধারের তুলসী গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্যামা এতক্ষণ অবাক হয়ে চেয়েছিলেন শুধু, এবার বিস্মিত এবং ঈষৎ বিরক্তভাবেই বললেন,—'এসব কী ব্যাপার? কারা আপনারা? কোথা থেকে আসছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় আপনাদের বাড়ি ভুল হয়েছে। কোন্ ঠিকানা খুঁজছেন বলুন তো?'

গলার আওয়াজে নিঃসংশয়ে শ্যামাকেই বাড়ির কর্ত্রী বুঝতে পেরে তিনি চাদর ছেড়ে দিয়ে জোড় হাতে আর একটি নমস্কার করলেন, তারপর বিনীত কণ্ঠেই বললেন, 'আজ্ঞে না মা-ঠাকরুণ, বাড়ি ও-ই চিনিয়ে দিয়েছে। আপনার ছেলে!'

আপনার ছেলে!

চমকে শিউরে উঠলেন শ্যামা। কনকও।

বোধহয় সামনে ভূত দেখলেও অত চমকাত না তারা।

'ছেলে!' খানিকটা পরে বাক্যস্ফূর্তি হয় শ্যামার, 'আমার ছেলে? কোন্ ছেলে!'

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে এগিয়ে যান তিনি সেই মুড়ি-দেওয়া কম্পমান মূর্তিটার দিকে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে মুখটা দেখার চেষ্টা করেন।

অনেকক্ষণ পরে চিনতেও পারেন। কান্তি!

সঙ্গে সঙ্গে—এতকাল পরে তাঁর সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন। চিৎকার করে—মড়াকান্নার মতো। কনক ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোন সান্ত্বনা দিতে পারে না। তারও দুচোখ জলে ভরে গিয়েছে। চিনতে পেরেছে সেও।

কান্তিই—কিন্তু এ কী চেহারা তার।

শেষ যেবার আসে সে—কনক দেখেছিল—একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের মতো।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অপূর্ব মুখশ্রী: কান্তিমান তরুণ ছেলে। দীঘল সুস্থ গঠন, দীর্ঘায়ত টানা চোখে ঘনপল্লব, সুন্দর বঙ্কিম ঠোঁটের ওপর ঘন শ্যামল রেখা। আর তেমনি সরল ঋজু চেহারা—আর কিছু দিন পরে শুধু সুন্দর নয়,

সুপুরুষ হয়ে উঠবে—তা তখনই দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

আর এ যে এসেছে—তার রঙ রোদ-পোড়া তামাটে কালো, গায়ে খড়ি উড়ছে, রুক্ষ পাতলা চুল, হাত-পা কাঠিকাঠি। মুখে যেন—বলতে নেই—মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে একেবারে। তেমনি ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টি।

এ কী সেই লোক? বিশ্বাস হয় না যে কিছুতেই।

শ্যামার মড়া-কান্না শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এল অনেকে। স্বয়ং মল্লিক-গিন্নীও এসে দাঁড়ালেন। তিনি প্রবীণ লোক, বহুদর্শী। এক নজরে দেখে নিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। শ্যামাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ষাট্ ষাট্, ও কি কথা। অমন মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছ কেন গা! অলুক্ষুণে কাণ্ড, ঠিক দুপুর বেলা! রোগা ছেলে এসেছে—আগে তাকে ঘরে তোল, তার মুখে একটু জল দাও—তা নয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিলে! আর তুমিও তো তেমনি বোকা। নাও ওকে ছাড়, দেওরকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাও। এত কান্নাকাটির হয়েছেই বা কী, অসুখ করলে সকলেরই চেহারা খারাপ হয়—আর পুরুষ মানুষ সুন্দর চেহারা ওর কী কাজেই বা আসবে। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে তাই অমন কাঁপছে—আহা বাছারে!'

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এই কান্নাকাটি দেখে হকচকিয়ে গিছলেন। মল্লিক-গিন্নীর কথাতে তিনিও খানিকটা ধাতস্থ হলেন। অকারণেই তাঁকেও একটা নমস্কার করে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ, ঠিক ধরেছেন। ম্যালেরিয়াই বটে। ঐ এক কাল-রোগেই দিলে আমাদের দেশটাকে উচ্ছন্ন ক'রে। কী কালব্যাধি যে তা বলবার নয়। এ ছেলেটিও অনেকদিন ধরে ভুগছে মা—পুরনো রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনও চিকিচ্ছে করলে হয়ত বাঁচবে, যেভাবে পড়েছিল, না চিকিচ্ছে না কিছু—বেঘোরে, সে ভাবে থাকলে আর বাঁচত না।'

মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'তা তুমি কে বাছা? একে পেলেই বা কোথায়?'

'আজ্ঞে মা আমি ওখানকার ইস্কুলের জয়েন্ট হেডমাস্টার। আমাদের ইস্কুলেই পড়ত। জ্বরে পড়েছে অনেকদিন। সেই বর্ষার গোড়া থেকেই ধরুন। ভোগেই বেশী, মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে ইস্কুলেও আসে। আমাদের হোস্টেলে তো থাকে না—থাকে বাবুদের কাছাড়ী-বাড়িতে। সেইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা—গোমস্তা-মুহুরীদের সঙ্গে। আমাদের অত দায়ও নেই তাই। এবারে অনেকদিন ইস্কুলে আসে না দেখে—পরীক্ষার সময় এসে গেল ওর, হেডমাস্টারমশাই আর আমি পরশু দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি এই অবস্থা—উঠতে পারে না, মড়ার আকৃতি। ওদের জিজ্ঞাসা করলুম যে ডাক্তার দেখিয়েছ? বলে সে রকম তো হুকুম নেই। আমরা কলকাতায় লিখেছি—কোন উত্তর পাইনি। খরচা করলে দেবে কে? তা মাস্টারমশাই বললেন, বাপু হাসপাতালেও তো দেখাতে পারতে—তা বলে, আজ্ঞে দুকোশ পথ, গোরুর গাড়ি ছাড়া তো যাওয়া চলবে না—সে ভাড়া দেবে কে? চোর চোর—বুঝলেন না মা, মহা চোর! জ্বর হ'লে শুধু একটু নির্লাক্ষ জল-সাবু দিয়ে ফেলে রাখত। একটা চাকর আছে কাছাড়ীর হরিহর বলে—সে নাকি মধ্যে মধ্যে তার নিজের পয়সায় পোস্টাপিস থেকে কুইনাইন এনে খাওয়াত, ঐ কুইনাইন, তাই খেয়ে খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করছে, কানে শুনতে পায় না। কেন মা—আপনিই বলুন, বাবুরা ওর খোরাকীর পয়সা দেয় তো—তা থেকেও তো বাঁচে কিছু, অসুখ হ'লে তো এক পয়সার সাবুতে চলে যায়—তা এক দিন আর গ্রামের বটুক ডাক্তারকে ডাকা যেত না। তার তো মোটে এক টাকা ফী। আমাদেরও খবর দিলে পারত!'

'এখানে চিঠি দেয়নি কেন, এদের ছেলে, এরা গিয়ে নিয়ে আসত!' মল্লিক-গিন্নী প্রশ্ন করেন।

'কি জানি মা, তা বলতে পারব না। ওরা তো বলে ছেলে নাকি বারণ ক'রে-ছিল। বলেছিল শুধু শুধু ব্যস্ত করা। তাঁদের এমন পয়সা নেই যে আসবেন বা চিকিৎসার টাকা পাঠাবেন।...... তা আমাদের হেডমাস্টারমশাই বললেন, এ তো ছেলেটা এখানে থাকলে এক মাসও বাঁচবে না ভাই জয়কেষ্ট, একে দিয়ে আসতে হবে। সব মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে দু-আনা, চার-আনা চাঁদা তুলে, ইস্কুল থেকেও বই বাঁধাই চার্জ বলে কিছু লিখিয়ে নিয়ে—আমাকে দিয়ে পাঠালেন!'

পালকি-বেয়ারারা এতক্ষণে অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছে, তারা ভাড়ার তাগাদা দিয়ে উঠল। জয়কৃষ্ণবাবুর বোধকরি ওদের কথাটা মনেই ছিল না, তিনি অকারণেই এতখানি জিভকেটে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে বাবারা, দিচ্ছি। এক মিনিট!'

যথারীতি ভাড়া নিয়ে খানিকটা ভকরার করার পর ভাড়া নিয়ে যখন তারা চলে গেল তখন জয়কৃষ্ণবাবু তাকিয়ে দেখলেন যে চারিদিক খালি হয়ে গিয়েছে। শ্যামা ও কনক ধরাধরি করে কান্তিকে নিয়ে ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে যারা ছিল তারাও ঘরে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শুধু মল্লিক-গিন্নীই তখনও সদরের চৌকাঠে একটা পা দিয়ে ইতস্ততঃ কর'ছেন। বোধহয় জয়কৃষ্ণবাবুর কথাটা ভেবেই ভেতরে যেতে পারেন নি।

খানিকটা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবার পর জয়কৃষ্ণবাবুর সম্ভবত বোধগম্য হ'ল এই তথ্যটা যে এখন তিনি অনাবশ্যক।

বাড়িতে যে অবস্থা চলছে, তাঁর দিকে কারুর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয় তা তিনি বুঝতে পারলেন। লোকও বেশী নেই—ঐ দুটি স্ত্রীলোক ছাড়া—নইলে তাদের কাউকে দেখা যেত। পুরুষ-মানুষ কেউ এখন থাকার কথাও নয়।

সুতরাং এখন চলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা, এবং কাকেই বা বলে যাবেন বুঝতে না পেরে মল্লিক-গিন্নীকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তাহলে আমি মা এখন যাই, ও'দের বলে দেবেন। ভাল হয়ে যদি আবার যেতে চায় তো যাবে। তবে এ বছরের টেস্ট্ বোধহয় আর দিতে পারবে না—সে তো এসে পড়ল বলে। আর তা যদি দিতে না-ই পারে তো গিয়েই বা লাভ কি। ওখানে থাকলে আবারও পড়বে। আমরা ফি হপ্তায় কুইনাইন খাই নিয়মিত—তাই দেখুন না হাল!'

তিনি একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চাদরের খুঁটদুটি আবার দু'হাতে চেপে ধরলেন, অর্থাৎ রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মল্লিক-গিন্নী মিনিটখানেক ইতস্তত করলেন, ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর আবার বেরিয়ে এসে বললেন, 'যাবেন? কিন্তু আপনার তো খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি বোধ হয়!'

'আজ্ঞে কখন আর হবে বলুন। রাত থাকতে গোরুর গাড়িতে চেপেছি তো—

অনেকটা পথ তাই গাড়োয়ানকে বলে বোর্ডিং এই গাড়ি মজুত রেখেছিলুম রাত্তিরে। তারপর তো ধরুন তিনবার ট্রেন বদলে আসা। সকালে সেওড়াফুলীতে একটু যা চা খেয়ে নিয়েছিলুম—ওকেও দিয়েছিলুম, সহ্য করতে পারলে না, বমি হয়ে গেল।...... তা সে যা হোক, আমার জন্যে ভাববেন না, এই যাবার পথে যা হয় কিছু জলটল খেয়ে নেব এখন। দিয়েছেন—মাষ্টারমশাই পয়সা সব হিসেব করেই দিয়েছেন। এই পাল্কিটাতে যা আনা চারেক বেশী লাগল। তা তাতেও আটকাবে না। যা হোক করে হয়েই যাবে।'

তিনি একটু হেসে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন। মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'না না, সে কখনও হয় ! আপনি এত কষ্ট করে নিয়ে এলেন আমাদের ছেলেকে, মহা উপকার করলেন, প্রাণ-রক্ষাই করলেন ওর বলতে গেলে। এরা বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে, বুঝলেন না—অমন সোনার চাঁদ ছেলের এই ছিরি, আঘাতটা লেগেছে খুব। তাই আর হুঁশপষ্য কিছু নেই। নইলে এখানেই সব ব্যবস্থা করে দিত এরা। ছেলের দাদা থাকলে খরচপত্রও দিয়ে দিত। তা আপনি বরং আমার ওখানেই চলুন—যা হয় দুটো মুখে দিয়ে নেবেন। ডাল তরকারী সবই কিছু কিছু আছে—দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে বেশী দেরি লাগবে না। আমরাও ব্রাহ্মণ, আমাদের ওখানে খেতে আশাকরি আপনার আপত্তি হবে না।

'না না—সেসব কোন-কিছুই নেই আমাদের। আমরা পাল—ঐ মৃত্তিকার কাজ আমাদের কুলকর্ম। তা চলুন। তবে বিকেলের গাড়ি না ধরতে পারলে ওদিকে গিয়ে ইষ্টিশানে পড়ে থাকতে হবে। যা পথ, রাত বেশী হয়ে গেলে আর যেতে ভরসা হয় না। নেই কি, বাঘ, ভালুক থেকে সাপখোপ সব আছে। বুনো শিয়ালরাও কম যান না। অবিশ্যি আছে, ইষ্টিশানের কাছেই একঘর কুটুমও আমাদের আছে। অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ নেই এই যা—তবে গিয়ে দাঁড়ালে চিনতে পারবে। সে যা হয় একটা হবেই'খন ব্যবস্থা। আপনাদের প্রসাদ দুটি পেয়েই যাই।'

মল্লিক-গিন্নী একটু হেসে বললেন, 'না না, আমি বেশীক্ষণ আটকাব না। ট্রেন আপনি পাবেন। না হয় একগাল আলোচালই চড়িয়ে দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। আপনি স্নান করতে করতেই—'

এতখানি জিভ কেটে জয়কৃষ্ণবাবু বললেন, স্নান? ঐটি মাপ করবেন মা। স্নান করি আমি ধরুন মাসে একদিন। তাও ফুটনো জল ছাড়া চলে না। তাতেই কি নিস্তার আছে—যতদিন পরে যেভাবেই করি না কেন, মাথায় জল পড়লেই জ্বর আসবে। ঐজন্যে ছুটিছাটা দেখে করতে হয়—যাতে একদিন শুয়ে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। চান করার দরকারও নেই তেমন—মুখ হাত ধুয়ে নিলেই চলবে।'

তেই তো শ্যামা ডাক্তার ডাকতে আপত্তি করেছিলেন, পরের দিন সকালে হাস-পাতালে নিয়ে যাবার কথাই বলেছিলেন। হেম ধমক দিয়ে উঠেছিল বলে খুব বেশি কিছু বলতে পারেন নি।

'তোমার যেমন কথা। অজ্ঞান অচৈতন্য রুগী, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, ওকে টেনে নিয়ে যাব হাস-পাতালে। তা হ'লে তো পাল্কি করতে হয়, সেও তো যাতায়াতে অন্তত দেড় টাকা। তাছাড়া ও অবস্থায় পাল্কিতেই বা উঠাব কী ক'রে! একটু ধাতে না এলে ওকে নড়ানোই উচিত নয়!'

মাথায় জল পড়লেই জ্বর আসবে...

'তা হলে চলুন।' বলে মল্লিক-গিন্নী আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তাঁকে।

হেম সেদিন এসে পৌঁছল রাত নটারও পর। সব শুনে সে অবশ্য তখনই ছুটল ডাক্তারের বাড়িতে কিন্তু ডাক্তার এলেন না। তাঁর কোমরে ব্যথা, রাত্রে আর বেরোতে পারবেন না। আর একজন নতুন ডাক্তার বসেছেন বটে, তাঁর দু'টাকা ফী, ডাক্তারও তত সুবিধের নন। এমনি-

সুতরাং সে রাত্রে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। এরা শুধু সবাই মিলে জেগে ঘিরে বসে রইল সারারাত। রোগীর কোন জ্ঞানই নেই, অসাড়ের মতো পড়ে আছে। শেষরাত্রের দিকে জ্বর একটু কমল কিন্তু তখনও জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বেঁচে আছে কিনা—এক এক সময় সে-ই ভয় হ'তে লাগল। কেবল মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নড়ে উঠছে একটু—মনে হয় জল খেতে চাইছে, অল্প অল্প জল দিলে খাচ্ছেও—সেই যা ভরসা। তাও

শ্যামা একবার একটু বেশী জল দিয়ে ফেলেছিলেন, দুদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, মুখে রেখে একটু একটু ক'রে খেতে পারল না।

সকালবেলাই হেম আবার গেল ডাক্তারের কাছে। ফকির ডাক্তার—দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, খুব দূরে নয়, কিন্তু একবার বেরিয়ে পড়লে ধরা মুস্কিল। ফকির এককালে এখানকার বড় ডাক্তারের কম্-পাউণ্ডার ছিলেন, তিনি মারা যেতে বাজারে এক ডিস্‌পেন্‌সারী সাজিয়ে বসেছেন, নিজেই চিকিৎসা করেন। সবাই বলে ফকির বিচক্ষণ ডাক্তার—এম-বি পাস ডাক্তারের চেয়েও ভাল। হয়ত আরও বলে, মাত্র এক টাকা ফী বলে। কোথাও কোথাও আটআনাও নেন। ডিস্‌পেন্‌-সারীতে গেলে (ফকির বলেন চেম্বার) তাও লাগে না, অথচ প্রত্যেককেই যত্ন ক'রে দেখেন। ওষুধও অনেক সময় বাকীতে দেন— ওষুধের দামও কম। যে মিক্সচারটা সব জায়গায় বারো আনা—কলকাতায় এক টাকা পাঁচসিকে—উনি সেইটেই নেন দশ আনা করে। গরীব-দুঃখীর ক্ষেত্রে আরও কমিয়ে দেন দাম। আট আনা সাত আনা যার কাছে যা পান তাই নেন।

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। এসেছিলেন হাসি হাসি মুখে কিন্তু দেখতে দেখতেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'শুনেছিলুম বটে ওদেশের ম্যালেরিয়ায় বাঘ সুদ্ধ জব্দ হয়ে যায়—কিন্তু ভাবতুম ওটা কথার কথা। এখন দেখছি সাংঘাতিক সত্যি! ইস! এখানেও তো ম্যালেরিয়া কম নেই কিন্তু এমন ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া তো কখনও দেখিনি মশাই। সমস্ত রক্ত শুষে খেয়েছে একেবারে! বললে বিশ্বাস করবেন না—বোধ হয় এক ছটাক রক্তও আর দেহে নেই। এধারে পিলে লিভার দুই-ই বেশ ডাগর। খুব সাবধানে রাখতে হবে। দুধ

কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা

দেবার আর চেষ্টা করবেন না। এখন, লিভারের যা অবস্থা সইতে পারবে না। ফলের রস মিছরির জল—এইসব খাওয়ান। ওষুধ দিচ্ছি দুরকম—তবে ওষুধের চেয়ে পথ্যির দিকেই মন দিতে হবে বেশী। পাৎলা সাবুর জল আর মিছরির জল, এই-ই এখন চলুক। নাড়াচাড়া করতে যাবেন না—যে কোন সময়ে হার্টফেল করতে পারে—দেহের এমনি অবস্থা। এতটা পথ এল কী ক'রে তাই ভাবছি।'

এর পর দশবারোদিন ধরে চলল—বলতে গেলে যমে-মানুষে টানাটানি। শ্যামা দিনরাতই আগলে বসে রইলেন। হেম অফিসের ফেরৎ এসে কাছে বসলে তিনি একটু উঠতেন। তাও হেমকে সন্ধ্যা-বেলাই ডাক্তারের কাছে ছুটতে হ'ত দুদিন একদিন অন্তর। ভোরে তার সময় হ'লেও ডাক্তার ভোরে উঠবে কেন? কনকের ওপর সারা সংসার পড়েছে—বাড়ির পাট বাসন-মাজা রান্না সব। দুপুর ছাড়া সে কাছে এসে বসবার ফুরসুৎ পেত না। সেই সময়ই যা একটু ছাড়া পেতেন শ্যামা। প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নানাহার একসঙ্গে সেরে নিতে হ'ত। ঐ সময়েই ঘণ্টা দুই একটু গড়িয়েও নিতেন তিনি। রাত্রে ঘুম হ'ত না। একটি প্রদীপ জেলে রেখে রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে একা জেগে বসে থাকতেন। জেগে না থেকে উপায়ও নেই। অজ্ঞান অচৈতন্য ছেলে মুহূর্মুহু শুধু হাঁ করছে আর ঠোঁট নাড়ছে। অর্থাৎ জল। সাবুর জল ফলের রস মিস্রীর জল—সবই চামচ ক'রে ক'রে খাওয়াতে হচ্ছে। অচৈতন্য অবস্থায় খাওয়া। ডাক্তার শাসিয়ে গেছেন, 'খুব সাবধানে পথ্যি দেবেন—এ অবস্থায় বিষম লাগলেই বিপদ!'

দিনের বেলা আসে অনেকেই। তরু আর হারান এসে একদিন লেবু আঙুর দিয়ে গেছে। বড় জামাই এসে খবর নিয়ে যান প্রায় নিত্য। নিতাই এক জোড়া ক'রে কমলালেবু এনে রেখে যান। এ ছাড়া ডাক্তারের ফল খাওয়াবার নির্দেশ মানা যেত না। সাবু, মিস্রী ছাড়া আর কিছু কিনতে দেন নি শ্যামা। ফলের কথায় বলেছিলেন, 'ওসব বড়লোকের জন্যে ব্যবস্থা। ফল না খেলে যদি ছেলে সারবে না—তবে ডাক্তার দেখাচ্ছি কেন? রাশ রাশ ওষুধই বা কিসের জন্যে। না, অত পারব না। তা ছাড়া, কমলালেবুতে ঠান্ডা করে—আমরা দেখেছি কবরেজরা খেতে দিত না। জ্বর থাকতে লেবু খেলে মুখে যা হয়!'

কিন্তু পরে কিনে দিয়ে যেতে খুব আর আপত্তি করেন নি।

যারাই আসত দিনের বেলা। একদিন পাল্‌কি ক'রে এসে মঙ্গলাও দেখে গেলেন। একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন আজকাল। ছুঁচিবাইয়ের দরুণ জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে-পায়ে হাজা দগ্‌দগ্‌ করছে। ফিসফিস ক'রে বললেন, 'আসতে কি দেয়!' সর্ব্বস্ব ছেলেরা বার ক'রে নিয়েছে, এখন তো ওদের এস্তাজারি! একটা পয়সা খরচ করতে গেলেও ওদের কাছে হাত পাততে হয়। আর হাত পাতলেই কী চোখরাঙ্গানি বাবুদের—পারব না অতসব, অত নবাবি চলবে না! এইসব। কী করব—হাতী যখন দ'কে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট মারে!' তারপর গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেন, 'কী জানিস বামনি, আছে, এখনও কি দুচার টাকা নুকনো নেই মনে করিস—তা আছে। কিন্তু তবু ছেলেদের কাছে চাইতে হয়। না চাইলেই সন্দ করবে যে, তবে তো মা-মাগীর কাছে এখনও দুপয়সা আছে—আর অমনি ভাগাড়ে গরু পড়ার মত চিল-শকুনের দল এসে পড়ে দুয়ে বার ক'রে নেবে। এই শেষ বয়সে একটা পয়সার আজীর হয়ে পড়ব নাকি? এখনও কত্তদিন বাঁচতে হবে তার ঠিক কি?

তারপর মুখ বাড়িয়ে হাতে করে বয়ে আনা পিকদানীটায় খানিকটা পিক ফেলে বললেন, 'দেখলি তো বামনি—তখন যদি ছেলেটাকে ঘরজামাই দিতিস তাহ'লে আজ আর ওর এই হাল হ'ত না। সেই যে বলেছিলুম তোঁকে—মনে আছে? সে মেয়ের তো বে হয়ে গেছে। বে দিয়েই তো বাপ মিন্‌সে অক্কা—এখন জামাইয়ের বাপ, মা, ভাই ঘরে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব করছে, তাদেরই যথাসব্বস্ব। জামাইকে পোষ মানিয়ে পর ক'রে নেবার তো আর সময় হ'ল না—তার বাপমায়ের দিকে টান ষোল আনাই থেকে গেল। যে মেয়ে শাশুড়ীর ঘর করতে গেলে দুঃখু পাবে বলে এত কান্ড করলে মিন্‌সে, সেই মেয়েই এখন উঠতে বসতে শাশুড়ীর ঠোনা খাচ্ছে! তুই যদি দিতিস তাহ'লে তোরও আজ অমনি দন্ডভাঙ্গা বজায় থাকত।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তোর কপাল তো ভাল নয়—বারে বার তো দেখছিস। তোর উচিত ছিল দিয়ে দেওয়া। পরের কপালে মেজে ঠিক থাকত। এখন গেল তো—ছেলের রূপের দেমাক, নেকা-পড়ার দেমাক কিছুই তো রইল না আর—এখন কেঁদে কেঁদে মর।...আর কী হয় তাই দ্যাখ্‌—এই রকম শক্ত অসুখ হলে শুনেছি একটা অঙ্গ নিয়ে তবে রোগ যায়। ভাল যদি বা হয়, আস্ত ছেলে ফিরে পাবি কিনা সন্দেহ!'

শ্যামা এতক্ষণে কথা বলবার অবকাশ পেলেন, 'ওসব কথা বলবেন না মা, বরং আশীর্বাদ করুন ছেলে ভাল হয়ে উঠুক!'

'ও কী লো, বামুনের ছেলেকে আশীব্বাদ ক'রে কি অকল্যেন টেনে আনব আমার ঐ শত্তুরগুলোর মাথায়! বেশ বললি তো! ভগবানকে ডাক, তাঁর কাছে মাপ চা। গেল জন্মে এ জন্মে ঢের পাপ করেছিস—তাই এত দুর্গতি। ভগবানের কাছে মানৎ কর তবে যদি গোটা ছেলে ফিরে পাস!'

তারপর আঁচল খুলে দুটো টাকা বার ক'রে কান্তির বিছানার পাশে রেখে বললেন, 'তোর অভাব নেই আর—তবু আমার একটা কত্তব্য আছে তো। সাবু, মিছরি কিনে দিস ছেলেটাকে। পেটের শত্তুরদের ভয়ে ওখান থেকে কিনে আনতে পারি নি—তাহ'লেই জেনে যাবে হাতে টাকা আছে। আর একবার টাকার গন্ধ পেলে হয়, ছিনে জোঁকের মতো ছুটে আসবে অমনি!'

আরও অনেকেই খবর পেয়ে এসে দেখে গেল।

মল্লিক-গিন্নীও দুপুরবেলা এসে বসেন।

কিন্তু রাত্রে কেউ থাকে না। একা একটা ঘরে মিটমিটে আলোতে জেগে বসে থেকে অজ্ঞান কঙ্কালসার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে—বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া কান্না গলার কাছে এসে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, ছেলের অকল্যাণের ভয়ে কাঁদতেও পারেন না।

মঙ্গলার কথাটা মনে হয়ে আরও বুকের মধ্যেটা যেন হিম-হিম ঠেকে। তিনি কি আর সত্যিই গোটা ছেলেটাকে ফিরে পাবেন না? অমন রূপবান, কান্তিমান ছেলে তার।

হে মা সিদ্ধেশ্বরী! এ কী করলে মা!

আর তখনই মনে হয় ছোট খোকাটাকে বোনের কাছ থেকে আনিয়ে নেবেন এবার। বিশ্বাস নেই আর কাউকেই।

(ক্রমশঃ)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ

সুদেষ্ণা দে

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানের প্রধান বন্দর পোর্টব্লেয়ার থেকে আর ৬৫ মাইল এগিয়ে ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে আজও একদল বন্যজাতি শত-সহস্র শতাব্দী অতীতের সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি বজায় রেখে অস্তিত্বের ক্ষীণ সূত্রটি বহন করে বেঁচে আছে। এই বন্যজাতির নাম ওঙ্গে। ভারতের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থা গত কয়েক বৎসরের দুরূহতম অনুসন্ধানের ফলে এই ক্ষয়িষ্ণু বন্যজাতির যে ক্ষুদ্রতম দলটিকে আবিষ্কার করেছেন সংখ্যায় তারা মাত্র দুইশত। পৃথিবীর গহনতম অরণ্য প্রদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে, সভ্যতার আলো-স্পর্শহীন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে সুপ্রাচীন মানবজাতির যে ছিটেফোঁটা এখনও এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে নৃতাত্ত্বিক গবেষকরা এই ওঙ্গে বন্যজাতিকে তাদেরই অন্যতম বলে দাবি করেন।

কয়েক বছর আগে যখন এই নৃতাত্ত্বিক গবেষণা আরম্ভ হয় সে সময়ে ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপের গহন-গভীর অঞ্চল সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানা ছিল না এবং এই বন্য ওঙ্গেদের পাশবিক হিংস্রতায় ঐ অঞ্চলে অভিযান ছিল দুঃসাহসিক এবং ভয়ংকর। এই ওঙ্গে জাতি ছাড়াও ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে আরও যে দুটি জাতি বাস করে শত্রু-মনোভাবে তারাও ভীষণ হিংস্র। এই দুই জাতির ক্রূর হিংস্র আচরণের জন্যই গবেষকরা আজও তাদের বিষয় বোধ করি কিছুই জানতে পারেননি।

নিগ্রো শ্রেণীভুক্ত এই ওঙ্গেরা উচ্চতায় মাঝামাঝি ধরণের। দৈহিক গঠনে তারা অত্যন্ত পরিপুষ্ট এবং বীর্যবান। মাথায় নিগ্রোদেরই ধরণে ভেড়ার লোমের মত কুঞ্চিত কালো কেশের প্রাচুর্য। এরা কৃষিকর্ম জানে না। বন্য পশু শিকার, মৎস্য শিকার, খাদ্য-যোগ্য বন্য ফলমূলাদি ও মধু খেয়েই প্রধানত জীবনধারণ করে। শাঁখ ও শুক্তি জাতীয় জলজ প্রাণীর শক্ত খোলায় করে এরা পানীয় গ্রহণ করে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় সমুদ্রে ঘেরা দ্বীপের অধিবাসী হয়েও সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করা এরা অতি ঘৃণ্য বিরক্তিকর বলে মনে করে। নুনের স্বাদ ওদের মুখে কটু লাগে এবং দেহের স্বাস্থ্যহানি করে এই ওদের বিশ্বাস।

জীবনধারণ প্রথায় ওঙ্গেরা যাযাবর-ধর্মী। সারা দ্বীপময় এরা ঘুরে বেড়ায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে স্বল্পকালীন আস্তানা রচনা করে। একই জায়গায় একই আস্তানায় কখনও একটি দল বেশি দিন থাকে না। আস্তানা বলতে এরা বোঝে একটিমাত্র কুটির—দলগত-ভাবে যেখানে বাস করা যায়। এই কুটীরগুলো এরা তৈরি করে সাধারণত সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ পাকা মজবুত করেই। একই দলভুক্ত প্রত্যেকটি পরিবারের উপযুক্ত শোবার জায়গাও তারা তৈরি করে নেয় ঐ কুটীরের ভিতরে। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রত্যেকের মাথার কাছে রাখে এরা অগ্নিকুণ্ড। কি নারী কি পুরুষ পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে কিছুই ব্যবহার করে না—না গাছের ছাল, না পশু লোমের আচ্ছাদন। ঘাস জাতীয় এক-প্রকার শুষ্ক তৃণগুচ্ছের স্বল্পতম আবরণেই চলে এদের লজ্জা নিবারণ। এই কুটীরগুলির ব্যবহার অন্য একটি কারণেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মৃত আত্মীয়দের এরা কবর দেয়ার মত পুঁতে রাখে কুটীরগুলির ভিতরকার শোবার জায়গার তলায়। মৃত আত্মাকে জীবিত আত্মীয়দের নিরাপত্তা-রক্ষক বলেই মনে করে এবং আত্মা যে সব সময়ে তার অস্থি-মজ্জার গড়া দেহ-পিঞ্জরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় তা এরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে।

ক্ষুদে আন্দামানের চারিদিকে যে সমুদ্র-তীর তার বেশির ভাগই কড়ি আর শামুক জাতীয় ছোট ছোট ঢিবিতে ভরা—সেই ঢিবিগুলির আনাচ-কানাচ সময় সময় সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে-আসা সার্ডিন, হেরিং প্রভৃতি ক্ষুদে মাছের বন্যায় উথলে ওঠে। ওঙ্গে পুরুষেরা তখন সরু সরু ডিঙি ভাসিয়ে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়ে শিকার সন্ধানে। অনেকে আবার তীর ধনুকের বদলে গাছের ডালে তৈরি ছুঁচলো মুখ বর্শা নিয়ে শিকার করে। ওঙ্গে মেয়েরা সে সময়ে তীরের কাছাকাছি জলে ছোট একরকমের জোড়া-জাল ফেলে মাছ ধরে। এ সময়ে উদ্ভিদ-ভোজী একশ্রেণীর জলজ কচ্ছপ এবং গুগলি আহরণ করে এরা আহারে স্বাদ-বৈচিত্র্য আনে। শুকরের বংশবৃদ্ধি প্রবাদধন্য তা সকলেরই জানা আছে কিন্তু ক্ষুদে আন্দামানে তার বৃদ্ধি প্রবাদবাক্যকেও নাকি লজ্জা দেবার মতই অবিশ্বাস্য। এবং এই শুকরের মাংস ওঙ্গেদের একটি অত্যন্ত প্রিয় লোভনীয় ভোজ্য। স্বাস্থ্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এরা জলজ কচ্ছপের চর্বি মধু এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের রস পছন্দ করে খুব বেশি। ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে মদ্য জাতীয় কোন নেশার কথা এরা কল্পনাও করতে পারে না।

যুদ্ধপূর্বকাল পর্যন্ত ওঙ্গেরা যে রন্ধনাদি কাজে সেই প্রাচীন কালোপ-যোগী একরকম মৃৎপাত্র ব্যবহার করত সে বিষয়ে গবেষকরা নিঃসন্দেহ হলেও বর্তমানে তারা নিজস্ব কোন তৈজসপত্র আর ব্যবহার করে না। বিগত যুদ্ধের সময়ে খালি পেট্রলের ড্রাম এবং খাদ্যের টিন এত প্রচুর পরিমাণে আন্দামানের
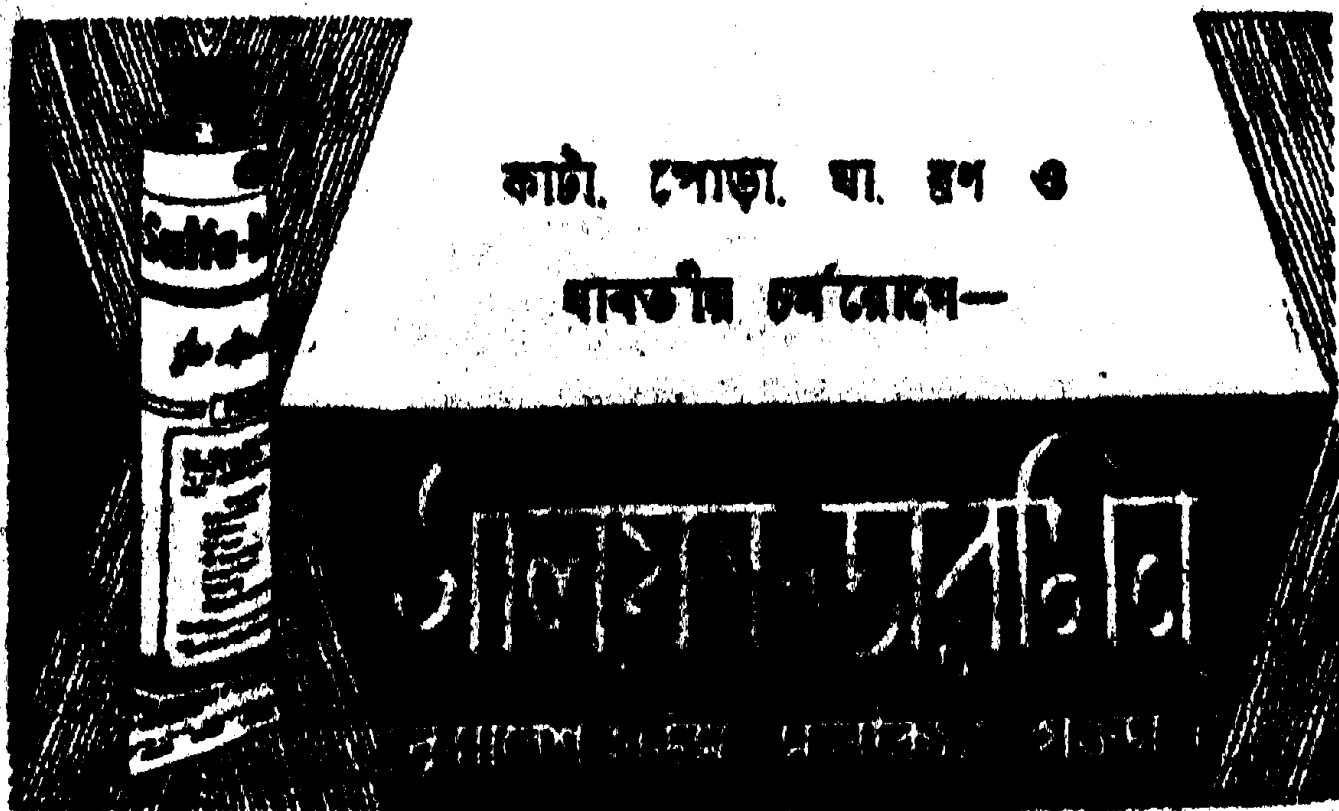
সমুদ্র তীরে ভেসে উঠেছে যে পাত্র হিসেবে একমাত্র এইগুলিকে ব্যবহার করেও এখনও এত প্রচুর সঞ্চিত হয়ে আছে যে ভবিষ্যতে হয়ত আর কোন দিনই তাদের নিজস্ব তৈজসপত্রের প্রয়োজনই হবে না।

বহু বন্য আদিবাসীদের মত ওঙ্গে পুরুষেরাও বহুবিধ জ্যামিতিক আকৃতির উল্কি অঙ্কন করে নিজেদের দেহ-সৌষ্ঠবকে সজ্জিত করে। দিনের খাওয়া

ওঙ্গে পুরুষেরা বিচিত্র রঙে দেহ চিত্রিত করে। এখানে তেমনই একজন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে।

শেষ করে স্বামী যখন বিশ্রামে এলিয়ে পড়েন স্ত্রী তখন তার গায়ে এই বিচিত্র-শোভন উল্কির আলপনা এঁকে পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখায়। নানা রঙের মাটি আর পাথর চূর্ণের সংমিশ্রণে মেয়েরা যে নতুন নতুন নক্সার উদ্ভাবন ক'রে এই উল্কির আলপনা আঁকে, এশুধু তাদের নন্দনতত্ত্বের আনন্দোপভোগই নয়; সুস্থ সবল দেহকে এভাবে চিত্র-বিচিত্র ক'রে রোগ-ব্যাধিকে তারা নাকি দূরে ঠেলে রাখে বলেই তাদের আজন্ম বিশ্বাস।

ওঙ্গেরা ভালবাসে যেমন স্ত্রীকে তেমনি ভালবাসে তাদের পোষ্য কুকুর-গুলিকে। কিন্তু কুকুর এ দ্বীপের আদি বাসিন্দা নয়, তারা ঔপনিবেশিক স্বত্বে বিরাজমান। প্রায় বছর ত্রিশ আগে একদল বর্মী চোরাকারবারী কতকগুলি কুকুর নিয়ে উঠেছিল এই দ্বীপে। সেই থেকে এই কুকুরগুলি প্রতিপালিত হচ্ছে ওঙ্গে অধিবাসীদের দ্বারা এবং ক্রমবর্ধমান বংশবৃদ্ধির ফলে আজ কুকুরগুলির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি-পালক ওঙ্গেদের তুলনায় অনেক বেশি।

ওঙ্গে জাতির লোকগণনা করতে গিয়ে গবেষকদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুটি প্রধান বাধা। মাঝে মাঝে প্রায়ই নাম বদলানো ওঙ্গেদের একটি চিরাচরিত সামাজিক প্রথা এবং দ্বিতীয়টি হোল পোষ্য নেওয়ার প্রথা। এই পোষ্যগুলি আবার সঞ্চরমান, অর্থাৎ এরা প্রায়ই এক পরিবার থেকে অপর পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ে। পোষ্য-গ্রহণকারী পিতারাও পোষ্যদের নিজস্ব সন্তান বলে দাবি করতেও ছাড়ে না। বহু পিতা আবার জানেও না বা ভুলেও যায় কে বা কারা তার পোষ্য অথবা নিজস্ব সন্তান। কারণ ওঙ্গেরা এক দুই তিন-এর বেশি আর গুণতেই পারে না। ভারতীয় নৃতত্ত্ব গবেষক সংস্থা বহু বাধা প্রতিবাধা অতিক্রম করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে ওঙ্গে জাতির মেয়ে-পুরুষের সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে মাত্র দুইশত।

ওঙ্গেদের জীবন-পরিধি অত্যন্ত স্বল্প। গড়ে মাত্র বিশ বছর বয়সেই ওরা মারা যায়—তবে সে ফাঁড়া যারা কাটিয়ে ওঠে তারা ত্রিশ বা চল্লিশের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বল্পায়ু এই জাতি আজ প্রায় অবলুপ্তির সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনতম মানবজাতির একটি বিশেষ শাখা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাতে না যায় সেজন্য ভারত সরকার তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্যে ক্ষুদে আন্দামান দ্বীপে প্রচুর নারিকেল চাষের ব্যবস্থা করেছেন ঐ ওঙ্গেদের দিয়েই। অন্যান্য কৃষিকর্মেও তারা দীক্ষিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। পুনরুজ্জীবিত হয়ে বেঁচে থাকার মত জীবনীশক্তি এদের মধ্যে এখনও আছে

বিশেষ ধরণের পোশাক পরিহিতা অবিবাহিতা ওঙ্গে যুবতী

প্রচুর পরিমাণে—তাই ভারত সরকার বিশ্বাস করেন যে তাঁদের কর্মসূচী সাফল্যলাভ করবে নিশ্চয়ই এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-জাতির এই অতি বিরল ক্ষুদ্রতম শাখাটি এখনও দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে ঐতিহাসিক একটি বিস্ময় হয়ে।

ক্ষুদে আন্দামানে ওঙ্গেদের সাময়িক আবাস-স্থল

অনেকেই বাড়ীতে বেড়াল পোষেন, বেড়াল নিয়ে অনেক সোহাগ করেন, বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াল নিয়ে খেলা করে, আদর করে। চর্ম-চিকিৎসকদের মতে বেড়ালকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কারণ সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর কীল শহরের খবরে প্রকাশ যে বহু চর্মচিকিৎসক এক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে একটি বেড়ালকে পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন যে তার লোমে একপ্রকার সংক্রামক রোগের ছত্রাক রয়েছে। বেড়ালটির দেহে রোগের লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট না হলেও একরকম আলোর সাহায্যে চর্মচিকিৎসকরা লোমের আক্রান্ত অংশ ধরতে পেরেছেন। আক্রান্ত অংশে এই আলো পড়লেই স্থানটি ফস-ফরাসের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে। ফলে চিকিৎসকরা যথাসময়ে রোগ নির্ণয় করে তার চিকিৎসা শুরু করতে পারেন।

লোমের এই ছত্রাকগুলি বিশেষভাবে শিশুদের ত্বকের পক্ষে বিপজ্জনক। আক্রান্ত পোষা বেড়ালকে সামান্য ছুঁলে কিম্বা তার লোম আঁচড়ে দিলে ঐ ছত্রাক শিশুদের ত্বকে সংক্রামিত হয় কারণ শিশুদের ত্বকের চর্বিতে ঐ ছত্রাক-প্রতিরোধক কোন পদার্থ থাকে না এবং নির্বিরোধে রোগ বাড়তে থাকে।

সাম্প্রতিককালে ছত্রাকজনিত রোগ ও ছত্রাকসংক্রমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রুত বিস্তারলাভ করছে। আজকাল ছত্রাকজনিত রোগের তুলনায় জীবাণু-ঘটিত রোগ হ্রাস পাচ্ছে। হামবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হফের মতে দুটি কারণ ছত্রাকজনিত রোগ বৃদ্ধিলাভ করছে। আধুনিক ওষুধপত্রে আজকাল মূত্রগ্রন্থির বহিরাংশ (অ্যাড্রেনাল কোর্টেক্স) থেকে তৈরী পদার্থসমূহ যথেষ্ট ব্যবহার করার ফলে দেহের প্রতি-ক্রিয়া ক্ষমতা কমে আসে অথচ এইসব বিপজ্জনক ছত্রাকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত্বকের প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব ঘটলে গুরুতর ক্ষতি হতে থাকে এবং চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। আর আজকাল

মাওপাঁচ

যেসব অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরী হচ্ছে তার গোড়ার উপাদান হচ্ছে নানাপ্রকারের সূক্ষ্ম ছত্রাক। এইসব ওষুধের প্রতি-ক্রিয়ার ফলে মানবদেহের সূক্ষ্মকোষে (মাইক্রোফ্লোরা) পরিবর্তন ঘটে। সেকারণে এইসব ওষুধ শুধু যে দেহের পক্ষে বিপজ্জনক বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করে তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এমনসব বীজাণুর বিস্তার বন্ধ করে যেগুলি বিপজ্জনক ছত্রাকের অপসারণে বা প্রতিরোধের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর ত্বকের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম কোষগুলির সামান্য পরিবর্তন ঘটলেই নানারকম ভয়াবহ সূক্ষ্ম রোগ-জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে দ্রুত ছড়াতে থাকে। বর্তমানে এইসব ছত্রাক-ঘটিত রোগের চিকিৎসায় প্রচুর সক্রিয় উপাদান-সমন্বিত একরকম ট্যাবলেটে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাচ্ছে। তবে চর্ম-চিকিৎসকরা জনসাধারণকে এইবলে সাবধান করেছেন যে বেড়ালকে নিয়ে বেশি সোহাগ না করাই ভালো।

* * *

আগামী হেমন্তে হামবুর্গের বুকে য়ুরোপের দ্বিতীয় সর্বাধিক উঁচু স্তম্ভ তৈরীর কাজ শুরু হবে। উঁচু উঁচু সব অফিস-বাড়ী ও গির্জের চুড়ো ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া এই নতুন টেলিভিশনের স্তম্ভটি থেকে জার্মান টেলিভিশন কর্পোরেশন সমগ্র পশ্চিম জার্মানীতে তাদের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচার করবে।

হামবুর্গের এই "দৈত্যের" চেহারা, সাজসরঞ্জাম, খরচ, স্থাপত্য সম্বন্ধে এখন খ্যাতিমান স্থপতি, ইঞ্জিনীয়ার ও বিশেষ একটি কমিটির বৈঠক চলেছে, এইটুকুই বর্তমানে ঠিক হয়েছে যে স্তম্ভটি প্রায় ৯০০ ফুটের কাছাকাছি উঁচু হবে। এর এরিয়ালগুলি সবচেয়ে উঁচু বাড়ীর মাথা যথেষ্ট ছাড়িয়ে যাওয়া চাই যাতে বিনাবাধায় সবদিকে সমান বেগে অনুষ্ঠান প্রচার করা যায়। এটির খরচা যোগাচ্ছেন হামবুর্গের ডাক-কর্তৃপক্ষ। এর জন্যে প্রথমেই ইঞ্জিনীয়ারদের ২০০ ফুট গভীরে মৃত্তিকান্তর পরীক্ষা করতে হবে কারণ এই বিরাট স্তম্ভটি নির্মাণের পূর্বে ভিত্তিক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বর্তমানে এটি নক্সার ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এটি অ্যামেরিকার সীটলের "মহাকাশ সূচ" কিম্বা ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ারের নকলে তৈরী হবে না কেননা প্রধান সমস্যা হচ্ছে স্থানাভাব। তাই স্থপতিরা ঠিক করেছেন যে এটিকে তাঁরা একটি সোজা সরল কংক্রীটের টিউবের আকারে তৈরী করবেন। মাটি থেকে প্রায় ছশো ফুটের ওপরে স্থপতিরা পরিকল্পনা করেছেন একটি "মেঘ ছাড়িয়ে রেস্টুর‍্যান্ট" তৈরী করবেন যেখানে এমনসব খাদ্য পরিবেশন করা হবে যা পৃথিবীর সেরা খাদ্য-বিলাসীদের রসনা তৃপ্তি করতে সমর্থ হবে। রটারডামের ল্যুরোপাস্তাম্ভের ৪৫০ ফুট উঁচুতে এইরকমের একটি খাবার-ঘর আছে।

স্তম্ভটি যে বিমান চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাবে না, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ হয়েছেন। স্তম্ভের খাবার-ঘরটি ঘন্টায় একবার তার কক্ষপথে ঘুরে আসবে। কর্তৃপক্ষরা মনে করেন এই "দৈত্যটি" শহরের একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

• • •

পশ্চিম জার্মানীতে বিবাহিত জীবনের পরিসংখ্যানটি জেনে রাখুন : শতকরা ৯০ ভাগ বিবাহ স্বামী স্ত্রীর একজন মারা না যাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়, দম্পতিদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ স্বামী আগে মারা যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ স্ত্রী প্রথমে মারা পড়ে। প্রায় ৭০ শতাংশের অধিক দম্পতি তাদের বিবাহিত জীবনে রজত জয়ন্তী পালন করে এবং ষোল শতাংশ দম্পতি তাদের স্বর্ণজয়ন্তী দেখে যায়। গড়ে দম্পতিরা ৩৪ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করে। রজত জয়ন্তী পালন করতে হলে বরের বয়স ২৪ থেকে ২৬ বছর হলেই ভাল হয়। এর স্বপক্ষে বলা হয়েছে যে বিবাহিত জীবনের ৩৩ বছর পর্যন্ত যাদের বিয়ে ২১ বছরের কমবয়সী মেয়ে-দের সঙ্গে হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মারা পড়ার হারের অপেক্ষা বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেশি।

আলেয়া

প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়

অদিতি কুনালদের বাড়ীর গেট পেরিয়ে পথে পা দিল। ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ীটার যতখানি দেখা যায় সবটুকুর ওপর সে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বুলিয়ে গেল। তখনো সন্ধে হতে কিছু দেরি আছে। বাড়ীর বাগানে যেখানে কবুতরদের কৃত্রিম অট্টালিকা সেখানে রয়েছে একটা দোলনচাঁপার গাছ। গাছের ডালে একঝাঁক পায়রা বসে জমেছে। তার পিছনে দুটো দীর্ঘ ঝাউ গাছ বাড়ীর বারান্দার দুটি প্রান্ত আড়াল করেছে। ঝাউগাছের মাথা দুটো দূর থেকে মনে হয় যেন বাড়ীর তেতলায় ছাদের আলসে পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেখানে তারা পৌঁছেছে ঠিক তার একটু ওপরে ছাদের ঘের পাঁচিলের ওপর দুদিকে দুটো টবে দুটি ফণিমনসা দুটো বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো এ বাড়ীর ঐতিহ্যের ওপর যেন কোথাও একটুও কলঙ্ক না পড়ে তার জন্যে অবিরত ধৈর্যে পাহারা দিচ্ছে। ফণি-মনসার টব দুটোর মাঝখানে ছাদের পাঁচিল ও আলসে বেয়ে ঝুলছে একটা নীল শাড়ি।

এ বাড়ীতে অদিতির আজ প্রথম আগমন। এবার থেকে এ বাড়ীতে রোজ তাকে আসতে হবে কুনালকে পড়াতে। পল্লীবাংলার একটি বনেদি পরিবারের এই বাড়ী। কুনালের বাবা ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, মা এখানকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা। কুনালের গৃহশিক্ষকরূপে অদিতি নিজেকে কল্পনা করে মনে মনে কেমন একটু গর্ববোধ করলো। তারপর নীল শাড়িটার দিকে চাইতে চাইতে অভ্যস্ত পথ ধরে সে এগিয়ে চললো গ্রামান্তের নদীটার দিকে।

কুনালদের বাড়ীর অন্তঃপুরের খবর অদিতি জানে না। কিন্তু নীল শাড়িটার কথা ভাবতেই তার মনে হোলো সে যেন পেয়ে গেল সেই বাড়ীর অন্তঃপুরের একটা বিশেষ খবর। তার চোখের সামনে একটি কল্পিত মেয়ের মুখ ভেসে উঠলো। সে এই দিনের শেষ আলোয় হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সযত্নে কাজল পরছে চোখে, কপালে পরছে টিপ। তারপর ঐ নীল শাড়িটা যখন পরবে তখন কি অপরূপ সুন্দর দেখাবে তাকে।

অদিতি পথ চলছে। কুনালদের বাড়ীটা ক্রমশঃ দূরে থেকে দূরে পিছিয়ে যাচ্ছে। তবু সেই নীল শাড়িটা একটা স্বপ্নের মতো তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, কিংবা দুরূহ একটা প্রশ্নের মতো তার মনে অস্থিরতার সাড়া জাগিয়ে ভাবনায় বিভোর করে তুলছে। তারপর সে নদীর ধারে এসে পৌঁছলো। দেখলো সন্ধে নামছে, তীর আবছায়া হয়ে আসছে, বাতাস ধীরে ধীরে উঠছে, নদীর বুকে জলের একটা ঝিরঝির শব্দ তাদের ঘুম থেকে যেন জাগছে। নদীর ধারে সে তার পরিচিত জায়গাটিতে বসলো। সে তখন বিস্মিত হোলো তার মনের এক আকস্মিক চাঞ্চল্যকে উপলব্ধি করে। তার সামনে

একটা দুর্বোধ্য প্রশ্ন। প্রশ্নটি হোলো, কেন তার মনের সামগ্রিক কৌতূহলী চেতনা কুনালদের বাড়ীর যতটুকু দেখা গেল তার বৃহত্তর অংশকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে পার হয়ে একটা তীক্ষ্ণ শরের মতো লক্ষ্যহীন গতিতে ছুটে গেল শুধু সেই নীল শাড়িটার দিকে? সে কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে পড়লো। বাড়ী ফিরলো কুনালদের বাড়ীর পাশ দিয়েই। কুনালদের বাড়ীর গেটের কাছে এসে সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দূরে ছাদের দিকে। অন্ধকার হাতড়াতে লাগলো তার শাণিত দৃষ্টি। ব্যর্থ হোলো তার প্রয়াস। অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পেলো না ছাদে। ছাদের ওপর থেকে শুধু আকাশের উজ্জ্বল কালপুরুষ তার দিকে চেয়ে যেন হাসতে লাগলো।

পরদিন অদিতি বেশ স্বাভাবিক-ভাবে কুনালকে পড়াতে গেলো। সন্ধে হতে তখনো কিছুটা দেরি ছিল। কুনালের মা নির্মলা তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অদিতি তাকে লক্ষ্য করেছে অনেক আগে। আর সে লক্ষ্য করেছে গতদিনের মতো একই ভাবে ছাদের পাঁচিল বেয়ে কার্নিশের কোল ঘেসে ঝুলছে সেই নীল শাড়িটা। মনে হোলো শাড়িটা যেন মসলিনের মতো পাতলা। তার মনের গভীর থেকে একটা প্রশ্ন বুদ্‌বুদের মতো উঠলো। এ শাড়িটা কার? আবার টুপ করে মিলিয়ে গেলো। সে তার বাহ্যিক উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো। কারণ নির্মলার চোখে যেন তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির এক চুলও না ধরা পড়ে। সে সম্বন্ধে সে খুব সতর্ক। তাই নির্মলা যখন বারান্দার ওপর থেকে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললো : 'আসুন মাস্টারমশাই', তখন সে একবার মাথা তুলে নির্মলার দিকে তার বিস্মিত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। তারপর মাথা নামিয়ে ঘরের মধ্যে গম্ভীর হয়ে ঢুকলো—যেন সে তার এই ভাবে বোঝালো নির্মলার এই সম্ভাষণ তার কাছে যত না অপ্রত্যাশিত তার থেকে অনেক বেশি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নির্মলাকে বারান্দায় দেখতে পাওয়া।

বাইরের ঘরে ঢুকে সে দেখলো কুনাল কথামতো বই নিয়ে পড়তে বসে গেছে। কুনালকে তার খুব ভালো লাগলো। তবু তার গাম্ভীর্যের অর্গল ভেঙ্গে একটা সন্তুষ্টির হাসি তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠতে ব্যর্থ হোলো। সে কুনালকে সেজের আলোয় খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলো তার মুখের ওপর নির্মলার মুখটা যেন অস্পষ্ট ভেসে উঠছে। সে কুনালের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতে চাইলো না, কারণ সে ভাবলো নির্মলা হয়তো অন্তরাল থেকে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে। নির্মলার চোখে তার উপরিতলের পরিচয়টি (যেখানে সে শুধু এক আদর্শ শিক্ষক) যে এক বিমুগ্ধতার ঘন প্রলেপ দিয়ে গেছে সেই প্রলেপের ওপর সে অন্য কোন প্রলেপ অন্তত স্বেচ্ছায় দিতে চাইলো না। সে তার যৌবনোচ্ছল বহুমুখী মনকে কঠিন থেকে কঠিনতর প্রতিজ্ঞার লক্ষ শিকল দিয়ে বেঁধে সংযত ও একমুখী করে তুলতে চাইলো অন্তত যতক্ষণ সে কুনালদের বাড়ীতে থাকবে ততক্ষণ। সে স্থির করলো সে তার শিক্ষকতার কর্তব্যটুকুর উর্ধ্বে অপ্রাসঙ্গিক কোন সম্পর্ক রাখবে না কুনালের সঙ্গে, নির্মলার সঙ্গে, কিংবা এ বাড়ীর অন্য কিছুর সঙ্গে। সে গম্ভীর হয়ে পড়িয়ে গেলো।

বিদায়ের সময় হলো। এমন সময় নির্মলা এলো সেই ঘরে একটা চাকরকে নিয়ে। চাকরের হাতে জল মিষ্টি। নির্মলা বেশ বিনম্র কণ্ঠে বললো : মাস্টারমশাই, একটু জল খান। অদিতি খুব গম্ভীর হয়ে নির্মলার দিকে তার বিস্মিত দৃষ্টি রেখে বললো : আজ যা করেছেন করেছেন। কিন্তু অন্য কোন দিন এমন আপ্যায়ন করবেন না—আমার এই অনুরোধটি অন্তত রাখবেন। নির্মলার চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝলকে উঠলো। তার মনে হোলো অদিতির এই অনুরোধের এমনই শক্তি যে তার ওপর কোন অনুযোগ যেন একেবারেই অচল। সে একটু আঘাত পেলো মনে। তবু এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যখন সে দেখতে পেলো একটি বছর চব্বিশ যুবকের অন্তরে একটি উন্নতশির ব্যক্তিত্ব বাস করছে তখন সে আরো মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হোলো। কোনো কথা সে বলতে পারলো না। নিশ্চুপ নির্মলার বিমুগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখ অদিতিকে অকস্মাৎ বড় বেশি সচকিত করে তুললো। তার বুকের ভেতরটা একবার ধক করে উঠলো। ভাবলো, সে কেন এমন করলো? তারপর কোনক্রমে সংক্ষিপ্ত জলযোগ সেরে অদিতি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা এসে পেঁছলো গেটে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল ছাদের পাঁচলের সেই নীল শাড়িটা নেই।

অদিতি সেখান থেকে এগিয়ে চললো নদীটার দিকে। নদীর কাছে না গেলে যেন তার কোন সমস্যার সমাধান হয় না। সেখানকার সেই প্রশান্তি ও নিবিড় নির্লিপ্তি জীবনসম্পর্কিত তার অবুত জিজ্ঞাসার যেন উত্তর দিয়ে যায়। সে নদীর ধারে বসলো। দেখলো জল স্থির। নদীর সেই নিরুচ্ছলতা তার খুব ভালো লাগলো, কারণ তখন তার মনের অস্থিরতা তাকে নানাভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। সে চাইলো ঐ নদীটার মতো স্থির হতে, কিন্তু পারলো না। তার মনে অগণিত প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন রাতের অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়ে আকাশের কোন প্রান্তসীমার বিরাট এক পরিসর জুড়ে-থাকা একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। সে ছাদে গতদিনের মতো যে নীল শাড়িটা দেখলো সেটা কার? নির্মলার না অন্য কোন মেয়ের? না, নির্মলার হতে পারে না। তার পোষাকে চওড়া পাড় ঘেরা সাদা ঢাকাই শাড়ির আভিজাত্যসম্পন্ন বয়সোচিত যে গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছে তাতে মনে হয় ঐ ধরণের নীল শাড়ি পরার বয়স তার চলে গেছে অনেকদিন। নির্মলার যদি ঐ শাড়িটা না হয় তবে ওটা কার? অন্য কোন মেয়ে কি কুনালদের বাড়ীতে থাকে? কুনালের কি কোন বোন আছে? এ সব প্রশ্নের উদয় বিলয় চলে অনেকক্ষণ। কিন্তু অদিতির জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ বেড়েই চলে। মনে হয় সে যেন কোন এক দুর্ভেদ্য রহস্যের সন্ধান করতে এক গাঢ় অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। তারপর সে নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো। রাত বাড়লো। অন্ধকার খুব গভীর হোলো। সে উঠে পড়ে চললো বাড়ীর দিকে। কুনালদের গেটের সামনে এসে সে একবার ঘাড় ফেরালো। তার সন্ধানী দৃষ্টি ছুটলো অন্ধকারে গাছপালার ওপর দিয়ে সেই ছাদ পর্যন্ত। সে দৃষ্টি ছাদের পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো।

অদিতি অভ্যস্ত রীতিতে কুনালকে পড়াতে যায়। দেখে একইভাবে বিকেলের ম্লান আলো ছাদের পাঁচিল ঘিরে ছুঁয়ে রয়েছে নীল শাড়িটাকে। কোন কোন দিন দেখেছে সেই নীল শাড়িটার পরিবর্তে ছাদের পাঁচিলে শুকোচ্ছে একটা লাল, একটা মেরুন, কিংবা একটা হলদে শাড়ি। কিন্তু নীল শাড়িটা একটু

বেশি ছাদে আসার সুযোগ পায়। তাছাড়া ঐ শাড়িটাই তাকে সব থেকে বেশি আকর্ষিত করে ঐ বাড়ীর অভ্যান্তরের দিকে। সে এতদিন এলো গেলো, কিন্তু নির্মলা ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে সে হাজার চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। তবু তার মন অবুঝ। সে ভাবে এ বাড়ীর অন্তরাল থেকে কে যেন তাকে খুব হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু সে ধরা দেবে না তার কাছে। সে যেন খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তাকে তার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলবে—এমনই তার স্থির প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সে কে? নির্মলা? না, সে হতে পারে না। অদিতি তাকে মাঝে মাঝে দেখেছে, দেখেছে সে আরো গম্ভীর হয়েছে। কুনাল সম্পর্কে যতটুকু প্রয়োজনের কথা থাকে নির্মলা তা খুব সংক্ষেপে সেরে চলে যায়।

নির্মলাকে অদিতি অনেকদিন দেখেছে, কিন্তু তাকে সে কোনদিন রঙ্গীন শাড়ি পরতে দেখেনি। অথচ ছাদে যে সমস্ত রঙ্গীন শাড়ি শুকোয় দিনের পর দিন সেগুলো তবে কার? অদিতি এ প্রশ্নকে কতবার চেষ্টা করেছে মাথা তুলতে দেবে না, কিন্তু সে পারেনি। কতদিন ঐ প্রশ্নের উত্তরের কিছু সূত্র পাবার আশায় কুনালের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু সাহস করতে পারেনি। পরোক্ষ-ভাবে তার এই স্থির প্রশ্নের উত্তরের নিশানা পাবার যে অনেক পথ আছে তা জানা সত্ত্বেও সে সেই পথে পা বাড়াতে পারেনি। কেবলই মনে হয়েছে হয়তো অন্তরাল থেকে নির্মলা কিংবা অন্য কেউ তার মনের চোরাগলির ঠিকানা অনুসন্ধান করতে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। কিন্তু অবিচল তার স্থির সঙ্কল্প। সে কিছুতেই ধরা দেবে না, না নির্মলার কাছে, না অন্য কারুর কাছে।

অনেকদিন কাটলো। অদিতির এতদিনকার সমস্ত কৌতূহল জৈবিক এক ক্ষুধার মতো একই সময়ে জেগে ওঠে রোজ। তখন রাত্রি। চোখ দুটো ঘুমে অবশ। আর যখন সে চিরাভ্যস্তের মতো নদীর ধারে বসে বসে তার মৌন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে অসহায়ের মতো শুধু ঝিরঝির জলের নিরচ্ছল স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে।

একদিন একটা ছোট্ট ঘটনা অদিতিকে ভীষণ ভাবনার মুখে ঠেলে দিল। সে পড়াতে এসে দেখলো কুনাল ঘরে নেই কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এলো। তার হাতে এক থোকা দোলনচাঁপা ফুল। সে হাসতে হাসতে বললো ঃ এই নিন মাস্টারমশাই। অদিতির চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেলো। তার ঘুমন্ত কৌতূহল আবার জেগে উঠলো। সে প্রাণপণে সংযত করলো তার আবেগ; গম্ভীর হয়ে বললে ঃ রাখ।

অদিতির ক্ষুধার্ত কৌতূহলী দৃষ্টি বারবার লেহন করে গেলো ফুল-গুলোকে। ইচ্ছে করছে সেগুলোকে স্পর্শ করতে। কিন্তু সে পারলো না। ভাবলো ফুলের থোকাটা যেন একমুঠো আগুন। তার মনের কোণ থেকে একটা প্রশ্ন জেগে উঠলো, যে প্রশ্নের উত্তর না পেলে তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। কে পাঠালো এই ফুল? যার নীল শাড়িটা প্রায়ই রোদ পোহায় ছাদে যদি সে পাঠিয়ে থাকে? যদি নির্মলা? না, না, নির্মলা নয়, অন্য কেউ নিশ্চয় হবে, যে হয়তো তার মনের চোরাগলি নেপথ্য থেকে অনুসন্ধান করতে পেরেছে। তাই সে হয়তো এক নতুন প্রলোভনের ফাঁদ পেতে তার অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করছে অন্তরাল থেকে।......... অদিতি একবার মাথা তুলে তাকালো চারিদিকে। দেওয়ালে দেওয়ালে তার দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। সে তার নিজের দুর্বোধ্য অস্থিরতাকে উপলব্ধি করে মনে মনে একবার হাসলো। তারপর সে তার সমস্ত অস্থির আবেগকে বুদ্ধির বজ্রমুষ্টি দিয়ে চেপে ধরলো এবং কুনালের ইতিহাস বইটা খুলে বেশ স্বাভাবিক ভাবে পড়তে শুরু করলো ঃ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জোদারো নগরে প্রথম যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নাম সিন্ধু সভ্যতা।

অদিতি পড়ানোর সময় খুব সতর্ক ছিল, পাছে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। পড়ানো শেষ করে সে একটা মৃদু আনন্দে ফুলের থোকাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অন্ধকারে পথ চলতে চলতে ফুলের একটা ঠাণ্ডা স্পর্শে তার দেহের রক্তের নদীতে উথালপাথাল শুরু হোলো। মনে হোলো তার নির্মল একটা রহস্যময়ী নারী। না, না, না নির্মলা নয়, নির্মলা কেন হবে? নির্মলা তার থেকে তো অনেক বড়ো। অন্য কেউ হবে।

অদিতি পথ চলতে চলতে নদীর ধারে এসে পৌঁছলো। সে বসলো। সে যখন তার অসহ্য নৈঃসঙ্গে অস্থির হয়ে পড়ে তখন নদীর ধারে কিছুক্ষণ বসে সব কিছু ভোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে বুঝেছে চেষ্টা করে কিছু ভোলা যায় না। তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো সুদূরে একটা অতীতকে। মনে পড়লো বিস্মৃত নবনীকে। নবনীর সুন্দর মুখটা তার চোখের সামনে একবার ভেসে উঠলো। একপিঠ কালো চুল, পরনে নীল শাড়ি, চোখে ভাষাহীন অজস্র কথা, অদিতি কেমন করে ভুলবে নবনীর এই স্মৃতি। নবনীকে যতবার সে দেখেছে, যত গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে ততই সে নিজের মনে মনে অনুভব করেছে নিজের নিঃসঙ্গতাকে। অদিতি একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো—ভাবলো এ সব চিন্তা এখন থাক! এসব ভুলতেই হবে তাকে! সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর নবনীর ভেসে-ওঠা মুখ-খানা চোখের সামনে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলো। সে ছুঁড়ে ফেলে দিল তার হাতের ফুল। মনে মনে প্রশ্ন করলো এ কার ওপর অভিমান? নবনীর ওপর? না। নির্মলার ওপর? না। তবে কার ওপর? নদীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে তার চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজলো। কিন্তু কিছু পেলো না। শুনতে পেলো শুধু ঝির-ঝির জলের শব্দ।

ঠিক পরের দিন ছিল একটা ছুটির দিন। ছুটির আমেজ নিয়ে সকালবেলা অদিতির ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করলো। কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে শেষরাতে। গাছপালাগুলো শ্যামলিমায় একটু উজ্জ্বল হয়েছে। অদিতি পথ চলতে চলতে যখন কুনালদের বাড়ীর কাছ-বরাবর এসে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। পথের ধারে ছিল একটা পরিত্যক্ত মন্দির। সেখানে সে আশ্রয় নিল। সেখান থেকে কুনালদের বাড়ীর তিন-তলার ছাদ স্পষ্ট দেখা যায়। অদিতি দেখলো সেই নীল শাড়িটা জলে ভিজছে, তার সঙ্গে আরো ভিজছে অনেক জামা-কাপড়। জলে ভিজে সেই নীল শাড়িটার নীল রং ক্রমাগত যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এমন সময় চকিতে ছুটে এলো সেই ছাদে এলো-চুলে এক কালো মেয়ে। সে [illegible] মধ্যে ছাদের সমস্ত জামা-কাপড় তুলে

নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে নেবে গেলো। অদিতি মেয়েটিকে খুব ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। কারণ তখন প্রবল ধারাবর্ষণ তার চোখের সামনে একটা সাদা পর্দা টেনে দিয়েছিল। তবু সে অনেক দিনের একটা দুর্ভেদ্য রহস্যোদ্ধারের আভাস পাওয়ায় মনে মনে একবার হেসে উঠলো। তবু তার মন অবুঝ। ভাবলো ঐ নীল শাড়িটা যার তার যে ছবি সে মনে মনে কল্পনা করেছে তার সংগে প্রত্যক্ষ দেখা এই মেয়েটির বেশ সৌসাদৃশ্য রয়েছে। তা হোক, তবু সে আত্মতৃপ্তিতে মনে মনে বেশ বিভোর হয়ে উঠলো। বৃষ্টি থামলো। ঈশান কোণে তখনো মেঘের গম্ভীর সমারোহ। নদীর ধারে তখন যাওয়া নিরাপদ নয়। অদিতি ঘরে ফিরে এলো তাই।

সন্ধ্যেবেলা অদিতি যখন কুনালদের বাড়ীর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো তখন সে এক বহুদিনের কঠিন প্রশ্নের সদ্য-পাওয়া উত্তরের সংকেতে তার বিগত দিনগুলোকে গভীর মনোযোগের সংগে বিচার করতে করতে মাথা নিচু করে পথ চলছিল। সে যখন তার নির্দিষ্ট ঘরের দরজার সামনে এসে পেশছুলো তখন সে ঘাড় তুলতেই দেখতে পেলো ডানদিকের বারান্দায় হেলান দিয়ে তার সমবয়স্ক একটি কালো মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদিতি চোখ নামালো। ঘরে ঢুকেই নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেই ভাবলো এই মেয়েটি হয়তো কাল তাকে যে ফুল পাঠিয়ে দিয়েছে সে ফুল সে গ্রহণ করেছে বলে তার মনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট বোঝার উদ্দেশ্যে অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছে, এসেছে একেবারে তার চোখের সামনে। তার মনে মেয়েটির ওপর হঠাৎ ক্রোধ ও বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠলো। ভাবলো মেয়েটি যেন এতদিন পরে তার শিকারকে তার হাতের কাছে পেয়েছে, এবারে সে তাকে ধরবেই—এমনই তার প্রস্তুতি। কিন্তু অদিতি তার মনের আবেগ ও দুর্বলতার বল্গাকে একটুও শ্লথ হতে দেখে না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পড়াতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছে শাড়ির খস-খস শব্দ, যেন মেয়েটি খুব কাছে ঘুরছে। শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে তার হাসির শব্দ, সেই সংগে ভেসে আসছে নির্মলার সাংসারিক কথাবার্তা। মেয়েটি একবার অদিতির সামনে দিয়ে বাইরে গেলো, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো। অদিতি তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ভাবলো তার এই অন্যমনস্ক ভাবটির বিশেষ অর্থ হয়তো লেখা হয়ে গেল মেয়েটির মনের অভিধানে। তবু তার সংকল্প স্থির,—কিছুতেই ধরা দেবে না তার কাছে।

সেদিন রাত্রে অদিতি শুয়ে শুয়ে ভাবলো আর সে কুনালকে পড়াতে যাবে না। জীবনে সে এমন গহন পথে আর পা বাড়াবে না। এলোমেলো কত কি ভাবতে ভাবতে সে কেমন পাগলের মতো পাশের বালিশটাকে প্রবল শক্তিতে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে ঘুমোতে পারলো না।

পরদিন অভ্যস্ত রীতিতেই সে কুনালকে পড়াতে গেলো। সুস্থ চিন্তায় সেদিন সে তার গতরাতের সংকল্পকে কিছুই গুরুত্ব দিতে পারলো না। কুনালকে সে সবে পড়াতে বসেছে এমন সময় সেই মেয়েটি সেই ঘরে ঢুকে কুনালকে বললো : কুনাল, বললুম। রাশের মেলা দেখতে নিশ্চয়ই এবার যাস, এবারে খুব ধুমধাম হবে। কুনাল একটু হেসে উত্তর দিল : আচ্ছা, যাব ছোটমাসি। তারপর নির্মলাও এ বাড়ীর পরিচিত চাকর জগদীশকে নিয়ে দরজার বাইরে গেলো। বাইরে অপেক্ষা করছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। সেই মেয়েটি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললো : দুদিন বেশ কাটলো, না দিদি? নির্মলা এর উত্তরে একটু হেসে বললো : কুনালের সোয়েটারটা খুব তাড়াতাড়ি করিস।

তারপর ঘড়ঘড় শব্দে ঘোড়ার গাড়িটা চলতে শুরু করলো।

অদিতি তখন বাড়ী ফেরার পথে ভাবছিল সে একটা পাগল। নচেৎ একটা মেয়েকে সেদিন ছাদে দেখতে পেয়ে এতসব এলোমেলো ভাবলো কেন! সে বুঝলো সে তার মনকে যত স্পষ্ট বোঝে ব'লে বিশ্বাস করে, আসলে তত বোঝে না। কিন্তু সে কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। মনে তখনো তার স্থিরজিজ্ঞাসা ঐ নীল শাড়িটা যাকে সে এতদিন ধরে দেখছে সেটা তবে কার?

তারপর অনেকদিন কেটে গেলো। অদিতি তার কর্তব্যে অবিচল। বেশ স্বাভাবিক ভাবে সে কুনালদের বাড়ী যায় আসে। ছাদের ওপর সে প্রায়ই দেখে অন্যান্য জামাকাপড়ের সংগে প্রতিদিন একই জায়গায় শুকোচ্ছে নয় লাল, নয় মেরুন, নয় গোলাপী, নয় নীল শাড়ির যে কোন একটা। কিন্তু নীল শাড়িটাই যেন তাকে অত্যন্ত অস্থির করে তোলে, যেন ঐ শাড়িটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তবু নিজের এইসব আবেগের প্রতিক্রিয়া তাকে খুব বেশি বিভ্রান্ত বা চঞ্চল করে না। সে যেন তার মনের অস্থিরতার সংগে যুদ্ধ করে হার মেনে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার যত রাজ্যের পুরোন কৌতূহল ও আবেগোচ্ছল অস্থিরতা জেগে উঠলো।

সেদিন সে যথারীতি নির্ধারিত সময়ে পড়াতে গেছে। দেখলো ছাদে নীল শাড়িটা নেই, শুকোচ্ছে গোলাপী শাড়িটা। ঘরে ঢুকে দেখলো কুনাল নেই। ভৃত্য জগদীশ তার আগমন বুঝতে পেরে তার কাছে এসে জানালো : মাস্টারমশাই, খোকাবাবু আজ পড়বে না। অদিতি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো : কেন?

—আজ্ঞে, আজ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে খোকাবাবুর মাথা ফেটে গেছে। খুব ভাগ্য ভালো হাতপা ভাঙেনি।

এ সংবাদে অদিতি যে উত্তেজিত হয়নি, তা নয়। তবু স্বভাবসুলভ তার গাম্ভীর্যের সংগে সে জগদীশকে বললো : খোকাবাবুর মাকে গিয়ে বলো আমি খোকাবাবুকে একবার দেখবো। কিছুক্ষণ পরে জগদীশ ভেতর থেকে এসে বললো : চলুন মাস্টারমশাই।

অদিতি সংগে সংগে অস্থির হয়ে উঠলো। ভাবলো যাকে সে এতদিন ধরে খুঁজছে তাকে সে আজ দেখতে পাবে, দেখতে পাবে কুনালের পাশে বসে কুনালের গায়ে মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সিঁড়ির এক একটা সোপান অতিক্রম করছে আর সে যেন এক একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে। একটা আশাতীত বিস্ময়ে ও আনন্দে তার বুকটা ধক্-ধক্ করে কেঁপে উঠছে। কুনাল যে ঘরে শুয়ে আছে সে ঘরের দরজার কাছে পেশছে সে আপ্রাণ চেষ্টা করলো নিজের স্থির বিচক্ষণ প্রকৃতিতে ফিরে আসতে। দরজার চৌকাট পেরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো একটা সেজের আলো জ্বলছে। কুনাল শুয়ে রয়েছে, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। আর নির্মলা তার পাশে বসে গরম জল দিয়ে তার চোখের কোলে সেঁক দিচ্ছে। অদিতি মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হারিয়ে ফেলেছে এমন হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো একই সংগে নির্মলা ও কুনালকে। নির্মলার শুভ্র

বদন ঘিরে একটা সুন্দর শান্ত উদাস ভাব ফুটে উঠেছে। অদিতি তার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ও অন্যমনস্কভাবে শুনে গেলো কুনালের দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত।

কুনাল তার মাস্টারমশায়ের জন্যে দোলনচাঁপার গাছ থেকে ফুল পাড়তে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে গাছ থেকে। একটা শিশুর এই প্রচেষ্টায় ও তার ব্যর্থতায় যে পরিমাণ করুণার্দ্র আনন্দে স্বাভাবিকভাবে সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়ে তার কোন প্রকাশ অদিতির মুখে ফুটে উঠলো না। সে কেমন চিন্তাতুর ও স্মৃতিভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো এমন একটি কথা যা সেই পরিস্থিতিতে অবান্তর শোনালেও সেই কথাটা তখন বলার জন্যে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

সে বললো : সেদিন তুমি যে আমাকে ফুল দিয়েছিলে কুনাল, সে ফুল তোমাকে কে পেড়ে দিয়েছিল?

কুনাল জড়ানো কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল : মাস্টারমশাই, সেদিন আমি ফুল পাড়িনি। গাছের তলা থেকে কুড়িয়ে এনে আপনাকে দিয়েছিলুম। আজ আমি দেখলুম গাছের তলার সমস্ত ফুল খুব নোংরা, তাই গাছে উঠে আপনার জন্যে ফুল পাড়তে গিয়েছিলুম।

অদিতি সমবেদনার সুরে বললো : আর কখনো করো না এমন কাজ। তারপর তার কপালে হাত দিয়ে বললো : খুব ব্যথা করছে, না? সব সেরে যাবে। এখন ঘুমোও।

কুনাল অভিমানে বালিশে মুখ লুকোবার চেষ্টা করলো। অদিতি একবার অন্ধকারে তার তীক্ষ্ণ চোখটাকে এলোমেলো ছুঁড়ে দিল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে নির্মলাকে কিছু না বলেই। নির্মলা তখন একবার গিয়েছিল পাশের ঘরে।

অন্ধকারের ওপর অদিতির তীব্র প্রতিহিংসা জেগে উঠলো। অন্তর্জ্বালায় তার সমস্ত দেহমন যেন দগ্ধ হয়ে গেল। সে স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সেদিন সে কি ভেবে ফুল ফেলে দিয়েছিল নদীর জলে। সেকথা ভাবতেও তার ভালো লাগলো না। সে যেন নিজেই নিজেকে পরিহাস করছে এমন এক আক্ষেপ তার অন্তরে গুমরে উঠলো। অবশেষে প্রবল এক পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাড়ী ফিরলো সে সেদিন।

তারপর তার দিন কেটে যায়। কৌতূহলের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য হয়ে গেছে। সে তার কর্তব্যে অবিচল। যেন তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সমান তালে তালে পড়ছে। কুনালকে পড়াতে যাবার সময় তাদের ছাদে লাল, মেরুন, গোলাপীদের অনুপস্থিতির দিনে নীল শাড়ির উপস্থিতি যেন তাকে আজকাল ভ্রূকুটি করে। অদিতির মনে মনে তার ওপর প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। তবু নিঃসহায়ের মতো সেদিকে চেয়ে চেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর সে তার দিকে চেয়ে দেখবে না।

হঠাৎ একদিন অদিতি তার জীবনের ঠিকানা বদল করার নির্দেশ পেলো। তাকে কলকাতায় চলে যেতে হবে। সেখানের এক সওদাগরি অফিসে চাকরিতে যোগদান করার জন্যে সে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আহ্বানপত্র পেয়েছে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে কয়েকবার। ভেবেছে ঐ নীল শাড়িটার চক্রান্ত থেকে সে মুক্তি পেলো।

কুনালের পড়ানোর দায়িত্ব ত্যাগ করে অদিতি এলোমেলো ঘুরেছে এখানে সেখানে দীর্ঘ সাতদিন ধরে। নদীর ধারে কখনো কখনো চলে গেছে মধ্যরাত্রে। বিদায় নেবার আগের দিন কুনালকে একবার তার মনে পড়েছিল বিকেলে। সে গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। ওদের বাড়ীতে পেঁছে নীল শাড়িটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে মনে মনে বললো : আজও কি তুমি আমায় দেখা দেবে না? আমি চলে যাচ্ছি। আর হয়তো আসবো না। তোমার জন্যে খুব মন কেমন করছে।

অদিতির সম্বিৎ ফিরে এলো জগদীশকে দেখে। জগদীশের কাছে শুনলো নির্মলা অসুস্থ। তার জ্বর হয়েছে কদিন। অদিতি নির্দ্বিধায় পা বাড়ালো ভেতরের দিকে। সোজা চলে গেল ওপরে। অদিতিকে দূর থেকে দেখে নির্মলা বিছানায় উঠে বসলো। অদিতি দেখলো নির্মলার চোখ দুটো ভীষণ ছলছল করছে, মাথার অস্নাত চুল উসকো খুসকো হয়ে বাদামী হয়ে গেছে। কাছে এসে দেখলো নির্মলার হাতে একটা মেয়ের ছবি। সে বেশ চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে নির্মলাকে একবার দেখলো। তারপর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সহস্র সঙ্কোচ পেরিয়ে সে নির্মলাকে বললো : ওটা কার ছবি?

নির্মলার কণ্ঠে একটা কাঁপন নেচে উঠলো। তবু সে আবেগসংহত কণ্ঠে বললো : আমার মেয়ে পদ্মর ছবি। সে বছর দেড়েক হলো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের মতো। নির্মলা যেন পদ্মর স্মৃতি বিহ্বল হয়ে পড়লো। সে মনে মনে ভাবলো প্রাণ চাইছে অনেক কথা বলতে, কিন্তু অদিতিকে সে কোন কথা বলবে না। অদিতি তার কথা বুঝবে না।

নির্মলা নিজেকে অন্যমনস্ক করে তোলার জন্যে জগদীশকে ডেকে একটা অনাবশ্যক কথা বললো : ওরে জগদীশ, পদ্মর শাড়িটা তুলতে তুই বড় দেরী করিস রোজ। যা তুলে এনে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দে।

জগদীশ দূরে থেকে উত্তর দিল : আলো জেবলে যাচ্ছি মা।

তারপর নির্মলা ও অদিতির মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো একবার। দুজনে চুপ। ঘরে একটা ঝুঁঝকো অন্ধকার জট পাকাচ্ছে। অদিতির ভালো লাগলো না সে অন্ধকার। সে কেমন অস্বাভাবিক ভাবে উঠে পড়লো। নির্মলা উঠে বারান্দায় গিয়ে অদিতির চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলো। অদিতি চলে গেল ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে গেট পর্যন্ত। গেটের কাছে গিয়ে ছাদের দিকে সে শেষবার তাকালো। দেখলো অন্ধকার সেখানে থিকথিক করছে। হাওয়ায় গুটিয়ে-যাওয়া ঝুলন্ত নীল শাড়িটাকে দেখে তার মনে হোলো একটা মেয়ে যেন মুখভার করে দাঁড়িয়ে থেকে তার চলে যাওয়ার দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে।

প্রদর্শনী

দুটি প্রদর্শনী : তিনজন শিল্পী

কলারসিক

অক্টোবর মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে আমরা দুটি চিত্র-প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই প্রদর্শনীর একটি ছিল ত্রিপুরার তরুণ শিল্পী বিমল করের, অন্যটি শিল্পী কল্যাণ বসু ও তাঁর ছাত্রী-শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনের। শিল্পী বিমল করের প্রদর্শনীটি গত ১৮ই অক্টোবর থেকে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে চালু ছিল। দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে গত ২৪শে অক্টোবর শুরু হয়েছে এবং এটির দ্বার আগামী ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

।। শিল্পী বিমল করের শিল্পকলা ।।

শিল্পী বিমল কর বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটি বেসিক ট্রেণিং কলেজে শিল্প-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকলেও তিনি কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজেই তাঁর শিল্পশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং বর্তমান প্রদর্শনীই তাঁর সর্বপ্রথম একক প্রদর্শনী হলেও ইতিপূর্বে তিনি কলকাতার অনেক সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে রসিক-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে মোট ৩৯ খানি চিত্র। নানা মাধ্যমেই অঙ্কিত হয়েছে এই চিত্রগুলি। এর মধ্যে আছে তেল-রঙের ১১ খানি চিত্র, জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা ১৩ খানি, আর আছে ১২ খানি প্যাস্টেলের কাজ এবং কালি-কলমে অঙ্কিত ৩ খানি স্কেচ।

কোনো চমক বা বিভ্রান্তিকর বিমূর্ত শিল্প-চেতনাকে ততোধিক কোনো জটিল আঙ্গিকে শ্রীকর তাঁর চিত্র-রচনায় স্থান দেন নি। বরং বলা যায়, বিমূর্ত শিল্প-প্রকরণের দিকে শিল্পীর ঝোঁক থাকলেও তিনি পরিচিত কিউবিক পদ্ধতিকে এমনভাবে তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন, যা নিঃসন্দেহে দর্শক-মনের আগ্রহকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম।

তেল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির কয়েকটিতে যেমন বিমূর্ত শিল্প-চেতনার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, তেমনি আবার প্রথা-সিদ্ধ রচনাও এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল। এ-সব দেখে আমার মনে হয়েছে শিল্পী কর এখনও নির্দিষ্ট কোনো শিল্প-আঙ্গিক গ্রহণ করতে ইতস্তত করছেন। যাহোক তেল-রঙের চিত্রগুলির মধ্যে 'প্রসাধন' (২৯), 'একাগ্রতা' (৩৩), 'প্রক্রিয়া' (৩৫), 'সুর-মূর্ছনা' (৩৭) কিংবা 'দলবদ্ধ কাজ' (৩৮) আমাদের ভাল লেগেছে।

ত্রিপুরার পাহাড়, খেত-খামার প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যই জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তু। এগুলি বর্ণ-সম্পাতে এবং রেখার টানে, বিশেষ করে আলো-ছায়ার সুনিপুণ প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণবন্ত। জল-রঙ কাজের মধ্যে ২৪, ২৫, ২৬ নং নিসর্গ দৃশ্য-গুলি সত্যি মনোরম।

প্যাস্টেলের কাজের মধ্যে আমাদের ভাল লেগেছে 'কঠোর শ্রম' (৫), 'গৃহা-ভিমুখে' (৭), 'গল্পগুজব' (৮) প্রভৃতি চিত্রগুলি। এগুলির কোনটির ব্যঞ্জনাময় শিল্প-ভঙ্গী, কোনটির ছন্দিত রূপ, কোনটির নিপুণ বর্ণ-প্রয়োগপদ্ধতি আমাদের মুগ্ধ করেছে।

শিল্পী কল্যাণ বসু ও ইন্দ্রাণী সেনের চিত্রকলা

আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী কল্যাণ বসু ও তাঁর ছাত্রী-শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনের যে চিত্র-প্রদর্শনী চলছে তা কলকাতার কলারসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিল্পী বসু বর্তমানে এস. বি, মডার্ণ হাই স্কুলের শিল্প-শিক্ষক। কিন্তু তিনি অবকাশ পেলেই বেরিয়ে পড়েন দূর-দূরান্তরে। এমনি এক ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার শিল্প-নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে আলোচ্য প্রদর্শনীতে। নেপালের নিঃসর্গ দৃশ্য, তার নর-নারী শিল্পী বসুর ২২খানি চিত্রেরই বিষয়-বস্তু। তেল-রঙ, জল-রঙ ও প্যাস্টেলের মাধ্যমে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত। তিনটি মাধ্যমেই শিল্পী বসু নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে নেপালের বর্ণাঢ্য মঠ-মন্দির, উঁচু-নীচু পথ চিত্র-সংস্থাপনের চমৎকার কৌশলে এবং উজ্জ্বল রঙের পরিমিত ব্যবহারে সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সব চিত্রের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'হনুমান ডোকা' (৫), 'ললিত পটুন' (৭) ও 'কয়েকজন নেপালী' (৯) নামক চিত্রগুলি।

জল-রঙের চিত্রগুলি নেপালের বিচিত্র নরনারীর বিভিন্ন মুহূর্তের বিশেষ ভঙ্গী অবলম্বন করে রচিত। অনেকটা স্কেচধর্মী। কিন্তু শিল্পীর দেখার দৃষ্টি যেমন প্রখর তেমনি মোটা রেখা এবং তুলির হাল্কা টানও যে বলিষ্ঠ—একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। জল-রঙের ৮ খানি চিত্রই এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

প্যাস্টেলে অঙ্কিত কয়েকটি নিঃসর্গ দৃশ্য দর্শকদের ভালও লাগতে পারে। মোটকথা : কল্যাণবাবুর চিত্রের মধ্য দিয়ে দেখা নেপাল আমাদের ভাল লেগেছে। তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী : ইন্দ্রানী সেন

কিশোরী-শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনের কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। জল-রঙ ও প্যাস্টেলের ৯ খানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কিশোরী মনের কল্পনার রঙে মিশে যে চিত্র সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সেটি হলো 'একটি মেয়ের পুতুল খেলা' (৭) নামক চিত্রখানি। অন্যান্য চিত্রে শিক্ষকের নির্দেশ যে মান্য করা হয়েছে তার চিহ্ন স্পষ্ট। এই কিশোরী শিল্পী ভবিষ্যতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জন স্টাইনবেক

অনিন্দ্যকুমার সেন

আধুনিক যুগ হল আত্মসমর্পণের যুগ। এ যুগের শিল্পী-সাহিত্যিক সবাইকেই বিশেষ কোনো এক প্যাটার্ণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সেই জন্যে সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এসেছে বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ। এ যুগের মার্কিন সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের আত্মসমর্পণের বিরোধী তাঁদের মধ্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক অন্যতম।

১৯০২-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়ার 'স্যালিনাস'এ জন স্টাইনবেকের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন মন্টেরি কাউন্টির কোষাধ্যক্ষ, মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, স্টাইন-বেকের বাবার ছিল প্রুসিয়ান রক্ত আর মা'র পূর্বপুরুষ ছিলেন আইরিশ। স্টাইনবেক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন, কিন্তু কোন ডিগ্রী নেননি। পরে তিনি খামারে কাজ করেছেন, চিনির কারখানায় কেমিস্টের কাজ করেছেন, মাছের চাষ করেছেন এবং লেক টাহোতে জমিদারীর দেখাশোনাও করেছেন। কিছুদিন তিনি সংবাদপত্রেও কাজ করেন, কিন্তু শুধু-মাত্র নির্দিষ্ট সংবাদটুকু পরিবেশন করতে নারাজ হওয়ায় তাঁর চাকরী যায়।

দারিদ্র্যের সংগে তাঁর পরিচয় অগভীর নয়। এক সময়ে মাসে মাত্র পঁচিশ ডলারে সস্ত্রীক দিন কাটিয়েছেন, মন্টেরি উপসাগরে মাছ ধরে খেয়ে। তাঁর গোড়ার দিকের বই তেমন ভাল বিক্রি হয়নি। তাঁর জনপ্রিয় বই "টর্টিল্লা ফ্ল্যাট" ন'জন প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন।

তাঁর প্রিয় লেখক হলেন ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, হার্ডি, মিল্টন, জর্জ এলিয়ট আর উইলা ক্যাথার। এছাড়া তিনি ভালবাসেন বিজ্ঞান, অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্ব নিয়ে বই পড়তে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস হল "দি কাপ অব গোল্ড" (১৯২৯) ক্যাবেল-এর প্রভাবে লেখা। তারপর বেরোয় "দি পাশ্চার্স অব হেভ্ন (১৯৩২)", "টু এ গড আনুনোন" (১৯৩৩), "টর্টিলা ফ্ল্যাট" (১৯৩৫), "ইন ডুবিয়াস ব্যাট্ল" (১৯৩৬), "দি গ্রেপ্স্ অব র‍্যাথ" (১৯৩৯), "সী অব কর্টেজ" (১৯৪১), "দি মুন ইজ ডাউন" (১৯৪২), "দি ওয়েওয়ার্ড বাস" (১৯৪৭), "বার্ণিং ব্রাইট" (১৯৫০), "ইস্ট অব ইডেন" (১৯৫২), "দি উইন্টার অব আওয়ার ডিসকন্টেন্ট" (১৯৬২)। 'টর্টিলা ফ্ল্যাট' প্রকাশিত হবার পর তিনি খ্যাতি আর স্বাচ্ছল্য লাভ করেন। ১৯৪০ সালে "গ্রেপ্স্ অব র‍্যাথ" পুলিৎসার পুর-স্কার পায়।

বাস্তবধর্মী হলেও স্টাইনবেকের লেখায় রূপকের কোন অপ্রতুলতা নেই। হয়তো একটু বেশিই। যেমন "গ্রেপ্স্ অব র‍্যাথ"এ রোজ অব শ্যারণ এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে স্তন্যদান করলে (মোপাসাঁ দ্রষ্টব্য)। 'টর্টিলা ফ্ল্যাট'এর কুকুরের কাহিনীর মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিসের মতবাদের ছাপ পাওয়া যায়। "ইস্ট অব ইডেন" ত বাইবেলের অ্যাডামের পতনের কাহিনীর ওপর সরাসরি ভিত্তি করেই লেখা। স্টাইনবেকের লেখায় একদিকে যেমন কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, আর অবাধ যৌন আবেগের সমাবেশ দেখা যায় আরেক দিকে তেমনি আবার নিছক বেঁচে থাকার আনন্দের প্রকাশও প্রচুর-ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তাঁকে নিষ্ঠুর ও কোমল, বাস্তববাদী ও নৈর্ব্যক্তিক হতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে জীবনের
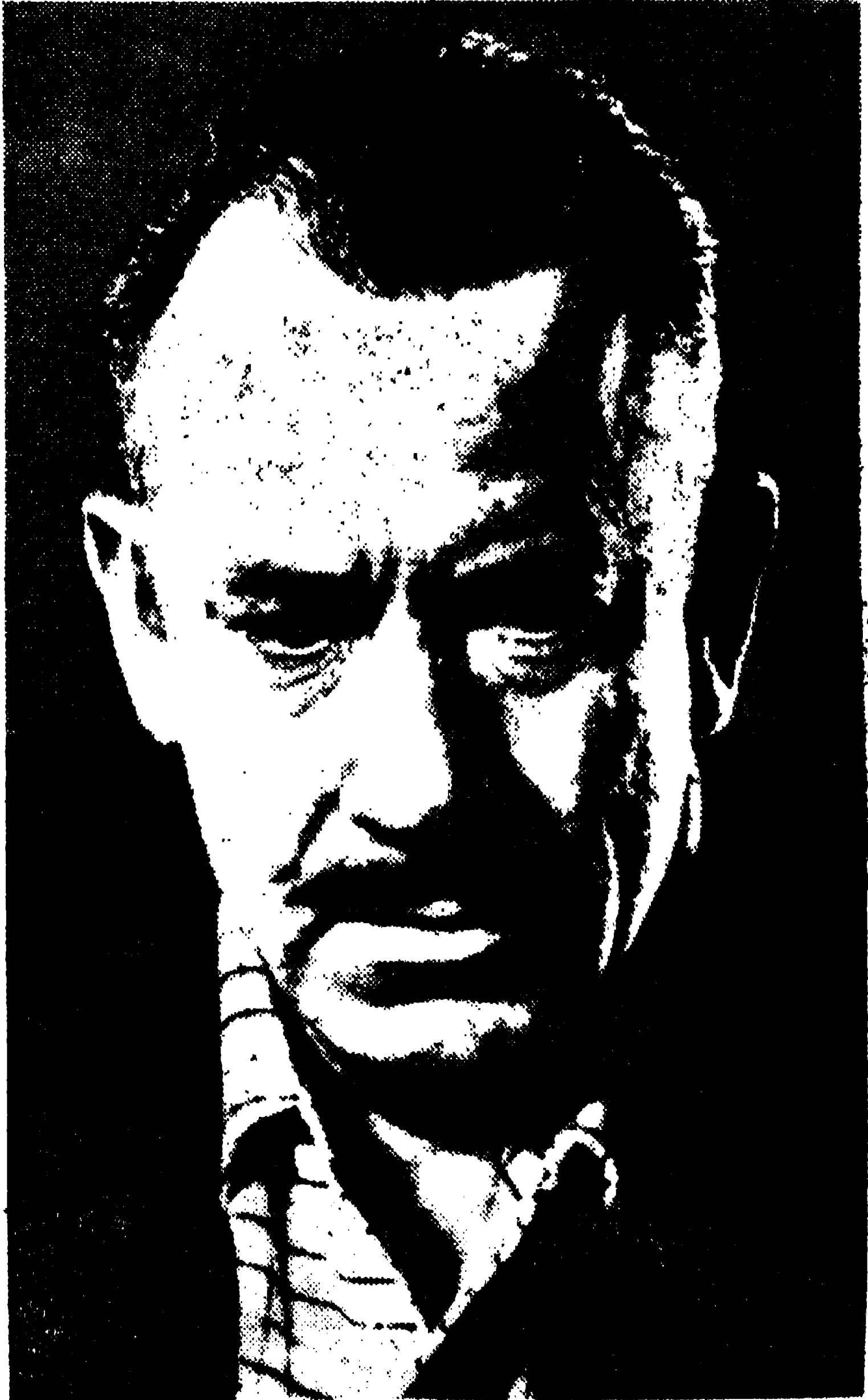
জন স্টাইনবেক

তেমন গভীরে প্রবেশ করতে দেখা যায়নি।

ফকনার একদা কতকটা যেন বিকৃতভাবেই বলেছিলেন যে, আজকের দিনের কোন লেখকের বিচার করতে গেলে সেটা তাঁর বিফলতার পরিমাণ এবং গুণাগুণ দিয়েই করতে হবে। সেদিক দিয়ে স্টাইনবেকের লেখায় পরিমাণ যথেষ্ট এবং বিফলতাও অনেকখানি। কিন্তু সেই বিফলতা, তাঁর সমকালীন সাফল্যমন্ডিত লেখকদের সাফল্যের চাইতে অনেক বেশী মনোগ্রাহী। বিফলতা ঘটেছে তাঁর অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের মূল উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে, বাস্তবকে ধরার চেষ্টায়, এককথায় এ যুগের আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের প্রায় হাতের কাছেই বস্তুসত্তার যে প্রতিচ্ছবি, জীবনের যে গভীর অর্থ প্রায় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছে, তাকেই খুঁজে পাওয়ায়। ফলে কিন্তু যা তিনি ফোটাতে অসমর্থ হয়েছেন, শুধু তাঁর বিফলতার জন্যে সেই জিনিসটিই আমাদের চোখের সামনে আরো নিখুঁত এবং স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। আসলে এ ধরনের বিফলতার সঙ্গে সাফল্যের প্রভেদ অতি অল্প।

তাঁর ছোট উপন্যাস "অব মাইস অ্যান্ড মেন" বহু কষ্টে ভাবপ্রবণতাকে এড়িয়ে গিয়েছে। কিছুটা থিয়েটারী ভঙ্গির জন্যে একটু একঘেয়ে লাগে। করুণাপরবশ হয়ে বুড়ো কুকুরটাকে গুলী করে মারা, কাহিনীর শেষ ক্লাইম্যাক্সে লেনীকে গুলী করে মারার পূর্ব-প্রস্তুতি। ঘটনার সাজানো ভঙ্গি উপেক্ষা করা না গেলেও কাহিনীটি যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে বাস্তববাদ নয়, গোটা বাস্তবতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। বই শেষ করলে অনুভূতির মুক্তিলাভ ঘটে, আর এর শেষটিই সবচেয়ে সুন্দর।

তাঁর "টু এ গড আননোন", "ইন ডুবিয়াস ব্যাটল" (কমিউনিস্টদের সমর্থনে লেখা হলেও তাঁরা অসন্তুষ্ট হন), "দি গ্রেপস্ অব র‍্যাথ", "ইস্ট অব ইডেন" প্রভৃতি উপন্যাসে মাঝে মাঝে এমন সব অংশ পাওয়া যায় যা বিদ্যুতের মত মনকে স্পর্শ করে। আকস্মিক, করুণ কল্পস্থায়ী ছবি, এর প্রকাশভঙ্গি যেন মনকে হঠাৎ সজোরে ধাক্কা দেয়। মনে হয় যেন অতলস্পর্শী কোন এক অন্ধকূপ থেকে বিপুল দানবীয় শক্তিতে শিল্পী বাস্তব হয়ে উঠে আসতে চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে এক এক ঝলকের মধ্যে এক একটি সজীব চরিত্র দেখা দেয়—বইয়ের নায়ক নয়, স্টাইনবেক-সৃষ্ট জ্ঞানীরা যেমন বিদ্রোহী ডাক্তার, বিদ্রোহী পুরোহিত, বিদ্রোহী দার্শনিক, এরা।

এইসব ক্ষণিক চরিত্রের স্ফুলিঙ্গের আলোয়, উপন্যাসগুলির মধ্যে বাস্তবের ছায়া আর নকশা দেখতে পাওয়া যায়। স্টাইনবেকের উপন্যাসে দু'ধরনের প্রতিকল্প পাওয়া যায়, একটি হল আমেরিকান প্রতিকল্প, মার্কিন জীবনের সম্ভাবনাময় চিত্র—অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর নিউ ইংল্যান্ড আর ক্যালিফোর্ণিয়ার রোমান্টিক গন্ধে ভরা। অন্যটি হল সমসাময়িক যুগের প্রতিকল্প। আমেরিকান প্রতিকল্পের সঙ্গে এর সম্বন্ধ অবশ্য অঙ্গাঙ্গী তবু সমকালীন অন্যান্য ভাষার উপন্যাসেও এই সুরেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এরই রূপ পাওয়া যাবে ফ্রান্সে মালরো আর কামুর মধ্যে বা ইটালীতে সিলোনের লেখায়। মানুষে মানুষে ব্যবধানের দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে করুণ এক চেতনা থেকেই এই রূপ জন্ম নিয়েছে।

এই ব্যবধান বোধ থেকেই রাজনৈতিক গল্প বস্তুর উৎপত্তি হয়। আজকের মানুষের যা নিয়ে লড়াই, তার চেহারা, তার করুণ পরিণতিকে তার রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ছকের মধ্যে তাকে ধরবার চেষ্টা করা হয়। রাজনৈতিক গল্পবস্তুর মধ্যে দেখা যায় মানুষকে মানুষের কাছ থেকে তফাতে রাখবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর, যার মধ্যে কামুর ফরমুলারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—আমি বিদ্রোহী, তাই আমরা রয়েছি। কিম্বা ইগনেসিও সিলোনের সুর বোধ হয় আরো কাছাকাছি: "আমার বিদ্রোহ আমার সঙ্গী-নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করেছিল।"

স্টাইনবেকের "গ্রেপস অব র‍্যাথ"-এ এই সুরটি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "এই হল শুরু, 'আমি' থেকে 'আমরা।'" কিন্তু জীবন আর শিল্পের অতিমাত্রায় সামান্যীকরণের অভ্যাসের দরুণ তিনি এর বিভিন্ন অংশের বিভেদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি শিল্পের সংগঠনী-শক্তির অধীনে আনতে সম্পূর্ণ সমর্থ হননি। তবু এ বইয়ের নানা দোষ সত্ত্বেও এইটিই বোধ হয় স্টাইনবেকের সবচেয়ে ভালো উপন্যাস। একে সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। আমেরিকার ইতিহাসের এ একটি বিশেষ যুগের স্মারক।

"ইস্ট অব ইডেন" কাহিনীটি বাইবেলের প্রাচীনতম নায়ক অ্যাডামকে নিয়ে লেখা। স্টাইনবেক বলেছেন যে তাঁর যা কিছু আছে সবই তিনি এতে দেবার চেষ্টা করেছেন। এ একটি রূপক উপন্যাস। এতে অ্যাডাম আছে, কেইন আর অ্যাবেল (ক্যাল আর অ্যারণ) আছে, নতুন এক লিলিথও আছে। এর মধ্যেই তিনি তাঁর আমেরিকান জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, বাইবেলের কাহিনীর গঠনের ভেতর দিয়ে। অ্যাডামের কাহিনী হল মানুষের পতনের কাহিনী, অসৎ-এর সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী, মনুষ্য-প্রকৃতির দানবীয় হয়ে ওঠার কাহিনী।

কিন্তু এই প্রাচীন কাহিনীর অল্প অংশই এই বইয়ে সংরক্ষিত হয়েছে। আর এর অন্তর্নিহিত ভাবের কিছুই রাখা হয়নি। অ্যাডাম ট্রাস্ক মানুষ হয় পূর্বাঞ্চলে এবং ক্যাথি নামে অত্যন্ত খারাপ একটি মেয়েকে বিয়ে করে ক্যালিফোর্ণিয়া চলে যায়। যমজ সন্তান উপহার দিয়ে ক্যাথি অ্যাডামকে পরিত্যাগ করে। অ্যাডাম নানা কাজে মন দেয় এবং নানা রকম পারিবারিক বিপত্তির মধ্যে তার ব্যর্থতাপ্রাপ্তি ঘটে।

যে 'অসৎ'-এর সঙ্গে বাইবেলের কাহিনীটি সংশ্লিষ্ট তাকে ফোটাতে না পেরে বার বার অসৎ-এর উল্লেখ করতে হয়েছে। ক্যাথিকে 'অসৎ' বলে দেখাতে চাইলেও সৃষ্টি হয়েছে এক অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির মেয়ে। বড়ো অবাস্তব লাগে। মনে হয় বাইবেলের কাহিনীতে লেখকের বোধ হয় কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা নিজের বিশ্বাস কি তা বোধ হয় নিজের অগোচরেই এই বইয়ের এক জায়গায় তিনি পাঠকের সামনে তুলে দিয়েছেন: "এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের ব্যক্তিসত্তার মুক্ত অনুসন্ধিৎসু মন জগতের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। আমি যুদ্ধ করব চিন্তার মুক্তির জন্যে, যাতে যে কোনো দিকে সে অপরিচালিত হয়ে চলতে পারে। যদি কোন ধারণা, কোন ধর্ম বা কোন শাসনতন্ত্র ব্যক্তিকে সীমিত বা ধ্বংস করে ত তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। এই আমার চিন্তা আর এই আমার কাজ। কোন বিশেষ ছকে তৈরী নিয়ম মুক্তমনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, কারণ একমাত্র সেই মনই অনুসন্ধান চালিয়ে সেই নিয়মের ধ্বংস সাধনে সক্ষম। আমি এ বুঝতে পারি আর একে আমি ঘৃণা করি আর এর বিরুদ্ধেই আমি লড়াই করব। সৃজনীশক্তিহীন পশুর সঙ্গে এইখানেই তো আমাদের তফাৎ। এই মহত্ত্বকে যদি বিনাশ করা হয় ত আমাদের কোন আশা নেই।"

এই জন্যে মনে হয় স্টাইনবেকের দেবার পুঁজি এখনো শেষ হয়নি। তাঁর এই বিদ্রোহী মনোভাব নিছক রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করেছে, এক কথায় মানবীয় ভাব যা শিল্পের মূল কথা, সেইখানে গিয়ে পৌঁছেছে। উপন্যাস হিসেবে 'ইস্ট অব ইডেনে'র মধ্যে এর ছাপ না পড়লেও একদিন এর প্রকাশ ঘটবে তা আশা করা যায়।

দেশে বিদেশে

॥ নগ্ন আক্রমণ ॥

গত ২০শে অক্টোবর হ'তে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চীনাদের যুগপৎ প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়েছে। ভারতের সীমান্ত-লঙ্ঘন চীন আট বছর আগেই শুরু করেছিল এবং এইবারের প্রকাশ্য ও প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করার আগে ভারতের প্রায় বার হাজার বর্গমাইল জমি তার কুক্ষিগত হয়েছিল। ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করে চীন ভারতের অভ্যন্তরে প্রায় পনের মাইল চলে এসেছে এবং আজ জানা গেল দ্বিমুখী আক্রমণে চীন ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জনপদ তাওয়াং অধিকার করে নিয়েছে।

চীনারা যুদ্ধে বড় কামান ও স্বয়ংক্রিয় মরণাস্ত্র ব্যবহার করছে। মাত্র ৩০।৩৫ জন ভারতীয় সৈন্যের একটি চৌকি দখলের জন্যে চীনারা ট্যাংক পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। নয় দশ হাজার ফুট উঁচু পর্বতসংকুল দুর্গম সীমান্তে চীনারা যে ট্যাংক পর্যন্ত টেনে এনেছে তা-থেকেই বোঝা যায় যে তাদের এই সামরিক প্রস্তুতি কত দীর্ঘদিনের। ভারতকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েই তারা প্রস্তুত হচ্ছিল এবং সেই প্রস্তুতি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত 'নোট' বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার বন্ধ্যা বিতর্কে তারা কালক্ষয় করছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর চীনের এই বিরাট সামরিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেননি বা রাখলেও এসম্বন্ধে কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেননি। আর সেই অনবধানতা ও দায়িত্বহীনতার খেসারত দিতে আজ ভারতীয় জওয়ানরা দলে দলে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে এবং ভারতের সীমান্ত শত্রুর সম্মুখে এমন-ভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও আজ এমন যে কোন বৃহৎ শক্তির সহায়তালাভের সুযোগ ভারতের নেই। এ অবস্থায় ভারতকে একাই সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু তাতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভারতের শিখ, রাজপুত, জাঠ, গুর্খা, গাড়োয়ালী সৈন্য চীনাদের অপেক্ষা কোন অংশেই কম রণপটু নয়। জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েও ভারতীয় সৈন্যরা জয়ী হয়েছে, সুতরাং চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধে, তাদের পরাজিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। তাছাড়া আধুনিক যুদ্ধ হল সমরোপকরণের যুদ্ধ, যা চীনের চেয়ে ভারতের কম নেই, এবং আরও সমরোপকরণ পাওয়ার সুযোগ ভারতের আছে। কারণ কমিউনিষ্ট জোট বাদে সারা বিশ্বের সমর্থন আজ ভারতের পিছনে। সর্ব উপায়ে ভারতকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শক্তি। প্রথম অতর্কিত আঘাতের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে ভারতের খুব বেশী সময় লাগবে না। ইতিমধ্যে প্রবল শীতে চীনের পক্ষেও সরবরাহ বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখনই তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে নেফার পর্বতশীর্ষে। আজ সারা ভারতের সকল মানুষের কর্তব্য হল সর্বশক্তি নিয়ে ভারতের এই প্রতিরক্ষা প্রয়াসকে সফল করে তোলা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছে ভারতবাসী, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগ ও দুঃখবরণে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই আহ্বানই জানিয়েছেন সমগ্র জাতির কাছে।

ইতিমধ্যে ভারতের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করে বিশ্বাসঘাতক লাল চীন আবার যে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব পাঠায় ভারত তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত জানিয়েছে, আত্মমর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে কোন শান্তি বা আপোষ তার কাম্য নয়। সারা দেশ ভারত সরকারের এই মনোভাবের সঙ্গে একমত।

॥ কিউবা সঙ্কট ॥

ক্যারিবিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র কিউবাকে কেন্দ্র করে আবার এক সাংঘাতিক বিশ্ব সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রাশিয়া গোপনে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। যা যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের নিরাপত্তার জন্যে কখনও মেনে নিতে পারে না। তাই কিউবামুখী পঁচিশটি সোভিয়েট জাহাজকে তল্লাসের উদ্দেশ্যে মার্কিন নৌবহর কিউবার চারিদিকে গভীর সমুদ্রে এক দুর্ভেদ্য অবরোধের সৃষ্টি করেছে। নৌবহরের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে, প্রত্যেকটি পণ্যবাহী সোভিয়েট জাহাজে বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা তল্লাসীর পর তাদের যেন কিউবা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের এই অবরোধ সিদ্ধান্তকে বে-আইনী ও অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁদের কিউবা-গামী জাহাজ দলকে নির্দেশ দিয়েছেন, তল্লাসী অথবা অবরোধ উপেক্ষা করেই তারা যেন অগ্রসর হয়। তার পরিণতি

যাই হোক, সোভিয়েট রাশিয়া তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন উত্থাপন অর্থহীন: কারণ তার খেয়াল-খুশি মত ব্যাখ্যা উভয় পক্ষ থেকেই হতে পারে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন, যে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা আদপেই সম্ভব নয়। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের আশ্বাস অর্থহীন, তার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যে কতবড় নির্বুদ্ধিতা আজ ভারত তা চরম মূল্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে।

ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সঙ্কটের নিকট-সাদৃশ্য আছে। কিউবা আজ যুক্তরাষ্ট্রকে যে বিপদের সম্মুখীন করেছে ভারতকেও সমরূপ বিপদের সম্মুখীন করেছে নেপাল। দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরই বর্তমান শাসকবর্গ জনগণ-নির্বাচিত নন, তাঁরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিনা তারও কোন যাচাই হয়নি। অথচ তারা যে প্রবলতম প্রতি-দ্বন্দ্বী দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নেপাল যেমন আজ সম্পূর্ণরূপে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আজ্ঞাবহ, কিউবাও তেমনি আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আজ্ঞাবহ। এ অসহনীয় অবস্থা ভারত নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র তা পারে না, রাশিয়াও পারত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া প্রতি-বেশী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড দখল করেছিল শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যে ফিনল্যান্ডের সীমান্ত থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব মাত্র বারো মাইল, অতএব ফিন-ল্যান্ড শত্রুকবলিত হওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। সীমান্তবর্তী হাঙ্গেরী রাষ্ট্রে যখন রাশিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইমরেনজ সরকার কায়েম হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সে সরকারকে ট্যাঙ্কের তলায় গুঁড়িয়ে দিতে রাশিয়ার দ্বিধা-বোধ হয়নি। রাশিয়ার চারিদিকে আজ এমন কোন সরকারের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব নয়, যা রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদন করে না।

সুতরাং কিউবাকে কেন্দ্র করে আজ যে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে তার মধ্যে আদর্শবাদ বা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রশ্ন অবান্তর। এখানে একমাত্র বৃহৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নই বড় কথা, যে প্রশ্নে আপোষের সুযোগ খুবই কম। অতএব রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে ভয়াবহ পরিস্থিতির আশঙ্কায় বিশ্ববাসীর মুহূর্ত গণনা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। (সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন অবরোধ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছেন।)

॥ উপদেশ ॥

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্রে চীনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশটি তিনি চীনকে না দিয়ে ভারতকে দিলেন কেন বোঝা গেল না। চীন-ভারত সংঘর্ষে আজ ভারতের ভূমিকা কি? সে অত-র্কিতে আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে—এঅবস্থায় ভারতের পক্ষে আলোচনা শুরু করার অবকাশ কোথায়? পর্তুগালের জবরদখল থেকে ভারতের ছয় শ' বর্গমাইল ভূখণ্ড উদ্ধারের জন্যে ভারত যখন অস্ত্রধারণ করেছিল তখন ক্রুশ্চেভ তাকে দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজ যখন চীন বারো হাজার বর্গমাইল ভারতীয় ভূমি গ্রাস করে আরও জবর-দখলের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভারত তা প্রতিরোধের জন্যে সর্ব সামর্থ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন এই আলাপ-আলো-চনার উপদেশ কেন? সেকি পর্তুগাল বিরোধীপক্ষ আর চীন স্বপক্ষ বলে? আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রমাণ করলেন, এতদিন বিভিন্ন প্রশ্নে ভারতকে যে সমর্থন তাঁরা জানিয়েছিলেন তা নিছকই রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে, নীতির প্রশ্ন তাতে ছিল না। সোভিয়েট গোষ্ঠী-ভুক্ত কোন দেশ চরম অন্যায় করলেও ভারত সোভিয়েটের সমর্থন পাবে না। ভারতভূমি বেদখল হতে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের কোন আপত্তি নেই যদি কোন কমিউনিষ্ট দেশ সেই জবরদখলে জমির মালিক হয়।

॥ আলবেনিয়া ॥

আলবেনিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য ও আলবেনিয়া সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান তিনজনের নেতৃত্বে একটি বেসরকারী বাণিজ্য প্রতি-নিধি দল লণ্ডনে গিয়েছেন বৃটেনের সঙ্গে আলবেনিয়ার বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে।

১৯৩৯ সালের পর বৃটেনে এই প্রথম আলবেনিয়া থেকে একটি মিশনের আগমন হল। কারণ তারপরেই যুদ্ধ বেধে যায় এবং যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে কর্ফু ঘটনাবলীর ফলে বৃটেনের সঙ্গে আলবেনিয়ার কূটনৈতিক যোগা-যোগ ছিন্ন হয়। কর্ফু প্রণালীতে আল-বেনিয়ার মাইনের আঘাতে বৃটেনের দুটি জাহাজ জলমগ্ন হয়। তারপর থেকে গত সতের বছরের মধ্যে বৃটেনের সঙ্গে আলবেনিয়ার আর কোন রকম যোগাযোগ ছিল না।

কিন্তু আজ প্রায় নিরুপায় হয়েই আলবেনিয়াকে বৃটেনের কাছে যেতে হয়েছে। বছরখানেক আগে আলবেনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ হলে রাশিয়া আলবেনিয়াকে সবরকম সাহায্য বন্ধ করে দেয়। চীন তখন আলবেনিয়াকে সর্ব-উপায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত চীনের কাছ থেকে আলবেনিয়া যে সাহায্য পেয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। আলবেনিয়া প্রস্তাব নিয়ে এসেছে যে, বৃটেনকে তারা ক্রোম, তামা, এলুমিনিয়ম ও তামাক সরবরাহ করবে, তার বিনিময়ে বৃটেনের কাছ থেকে তারা নেবে ভারী যন্ত্রপাতি যা তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে একান্তই দরকার।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৮ই অক্টোবর—১লা কার্তিক : চীনের হুমকীর মোকাবিলার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তুতি—দিল্লীতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে নেফার ঢোলা এলাকায় চীনা আক্রমণজনিত সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা : যে-কোন মূল্যে ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডত্ব বজায় রাখা হইবে।

১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিক : নেফায় ভারতীয় জওয়ানদের অতুলনীয় বীরত্ব—ঢোলা অঞ্চল হইতে চীনা ফৌজ বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ—লংজু হইতেও চীনাদের পশ্চাদপসরণ।

'চীনা আক্রমণের ফলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হইয়াছে'—ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এস এ ডাঙ্গের ঘোষণা—চীনা আক্রমণরোধে দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়ার আহ্বান।

'দাবী (১৭ দফা) না মিটিলে বন্দর ও ডক কর্মীদের (প্রায় দেড় লক্ষ) ধর্মঘট অপরিহার্য'—সারা ভারত পোর্ট ও ডক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন সভাপতি শ্রী এস আর কুলকার্ণির সতর্কবাণী।

২০শে অক্টোবর—৩রা কার্তিক : নেফা ও লডাক অঞ্চলে (ভারত) চীনা বাহিনীর যুগপৎ প্রচন্ড আক্রমণ—নেফায় ঢোলা ও খিঞ্জেমানে ঘাঁটি এবং লডাকে দুইটি ঘাঁটি পতনের সংবাদ—সংখ্যাবলে বলীয়ান চীনা আক্রমণের মুখে ভারতীয় সৈনাদের বীরোচিত সংগ্রাম—চীনা পক্ষে ভারতের তুলনায় চতুর্গুণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছে বলিয়া দাবী।

'মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় চীনের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করিব'—দিল্লীর জনসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের দৃপ্ত ঘোষণা—চীনের নগ্ন ও ব্যাপক আক্রমণ এবং সম্প্রসারণশীল নীতির তীব্র প্রতিবাদ।

২১শে অক্টোবর—৪ঠা কার্তিক : লডাক ও নেফা সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যগণের অবিরাম বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম—প্রতি ইঞ্চি ভূখন্ড রক্ষার জন্য মরণ পণ—নামচুকা নদীর (নেফা) উত্তরস্থ ঘাঁটি সকল ও লডাকে আরও দুইটি ঘাঁটির পতন—চীনা হানাদারদের ভারী ভারী কামান ও মর্টার ব্যবহার।

'আক্রান্ত হইলে ভুটান সর্বশক্তি লইয়া বাধা দিবে'—নেফার পরিস্থিতি সম্পর্কে কলিকাতায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিগমি দর্জীর বিবৃতি।

২২শে অক্টোবর—৫ই কার্তিক : লডাক রণাঙ্গনে চীনা হানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক ব্যবহার—নেফা অঞ্চলেও প্রচন্ড লড়াই—নূতন ব্যূহসজ্জার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের কয়েকটি ঘাঁটি ত্যাগ।

'সামরিক বিপর্যয় সত্ত্বেও পরিণামে জয় অনিবার্য'—উত্তর সীমান্তে চীনা আক্রমণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রয়াস শ্রীনেহরুর ঘোষণা—চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রচন্ড আহ্বান।

চীনা হামলার পটভূমিতে কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের সুপারিশ—উড়িষ্যা বিধানসভার জরুরী প্রস্তাব।

২৩শে অক্টোবর—৬ই কার্তিক : নূতন কয়েকটি স্থানে আক্রমণকারী চীনা বাহিনীর ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম—তাওয়াং-এর দিকে চীনাদের হিংস্র বাহু বিস্তার—সর্বত্র ভারতীয় ফৌজের তীব্র প্রতিরোধ।

'চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ ও হৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ব্যতীত বিকল্প পথ নাই'—দিল্লীতে রাজ্যপাল সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের তেজোদৃপ্ত ভাষণ।

'আক্রমণ প্রত্যাহার না করিলে চীনের সহিত আলোচনা সম্ভব নহে'—রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের নিকট শ্রীনেহরুর জবাব।

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : মীমাংসা-আলোচনার নামে চীনের কপট প্রস্তাব (তিন দফা) ভারত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান—ভারতের সর্ত : আগে চীনা ফৌজকে প্রাক্ অভিযান স্থলে (৮ই সেপ্টেম্বর যেখানে ছিল) হটিয়া যাইতে হইবে, তারপর কথাবার্তা।

মধ্য নেফায় চীনা হানাদারদের নূতন রণাঙ্গণ সৃষ্টি—তাওয়াং-এর দিকে সাঁড়াশী অভিযান—ভারতীয় ফৌজের সর্বত্র অকুতোভয় সংগ্রাম—চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন ও আত্মত্যাগের প্রস্তুতি।

॥ বাইরে ॥

১৮ই অক্টোবর—১লা কার্তিক : পূর্ব নেপালের ইলামে (দার্জিলিং সীমান্তের কয়েক মাইল দূরবর্তী বিমান অবতরণ ক্ষেত্র) প্রচুর চীনা অস্ত্রশস্ত্র মজুত—বিদ্রোহ দমনে নেপাল সরকারকে চীনের সাহায্য।

'গণভোটে (২৮শে অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য) স্পষ্ট না জিতিলে পদত্যাগ করিব'—ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের ঘোষণা—প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবীতে দৃঢ়তা প্রকাশ।

১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিক : প্রিন্স হাসানসহ ইয়েমেনী রাজপরিবারের ৮ জনের প্রাণদন্ড—বিশেষ সামরিক আদালতের রায়—সন্ডাদেশ ইয়েমেনী বিপ্লবের নেতা কর্ণেল আব্দাল্লাল এল সাল্লাল কর্তৃক অনুমোদন।

সাধারণ পরিষদে (রাষ্ট্রসংঘ) ভারত সমেত জোট বহির্ভূত ৩০টি রাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব পেশ।

২০শে অক্টোবর—৩রা কার্তিক : ভারতের উত্তর সীমান্তে চীন-ভারত সংঘর্ষের তীব্রতায় মার্কিণ মহলে উদ্বেগ—কেনেডি সরকার কর্তৃক ভারতের উপর চীনা হামলার কঠোর নিন্দা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত পত্র (চীনের সহিত আলোচনা চালাইবার প্রস্তাব সম্বলিত) প্রেরণের সংবাদ।

২১শে অক্টোবর—৪ঠা কার্তিক : ইয়েমেনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রান্ত—প্রতিবিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্যদান।

২২শে অক্টোবর—৫ই কার্তিক : 'দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি বৃহত্তর সংগ্রাম ডাকিয়া আনিতে পারে'—বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে (রাষ্ট্রসংঘ) ভারতের সতর্কবাণী।

কিউবার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট কেনেডি (আমেরিকা) কর্তৃক নৌ-অবরোধের নির্দেশ—অস্ত্রবাহী (কিউবায় প্রেরিত) সোভিয়েট জাহাজ সাগরে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সতর্কবাণী—রাশিয়ার পক্ষ হইতে পাল্টা হুসিয়ারী—প্রধানমন্ত্রী কাস্ত্রো কর্তৃক কিউবার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ।

২৩শে অক্টোবর—৬ই কার্তিক : সীমান্ত বিরোধে ভারতের প্রতি মিঃ ম্যাকমিলানের (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) পূর্ণ সমর্থন—প্রেসিডেন্ট নাসের (সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র) কর্তৃক শ্রীনেহরু ও চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই'র নিকট মধ্যস্থতার প্রস্তাবসহ পত্র প্রেরণ—সাধারণ পরিষদের (রাষ্ট্রসংঘ) অধিবেশনে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ স্টিভেনসন কর্তৃক ভারতে কম্যুনিস্ট চীনের নগ্ন আক্রমণের উল্লেখ।

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : কিউবা প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন—সঙ্কট নিবারণে নিরপেক্ষ দেশগুলির চেষ্টা।

কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকার নৌ-অবরোধ আরম্ভ—সমর-সম্ভারবাহী ২৫ খানি রুশ জাহাজের কিউবা অভিমুখে অভিযান।

বার্লিন অভিমুখে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনী প্রেরণের সংবাদ।

সমকালীন সাহিত্য

॥ লেখকের খেয়াল খাতা ॥

অভয়ংকর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকাময় দিন সারা পৃথিবীকে উদ্বেগ আর উত্তেজনায় আকুল করে তুলেছে। টমাস মান তখন ক্যালিফোর্ণিয়ায়, আশপাশে তাঁরই মত কয়েকজন নির্বাসিত জার্মানের ম্লান মুখ দেখা যায়, যুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ্য করছেন প্রবীণ চিন্তানায়ক অপরিসীম আগ্রহে, মনে তাঁর উৎকণ্ঠা আর তীব্র বেদনা। নিয়তই তিনি চিন্তা করছেন সারা বিশ্বব্যাপী এই অগ্নিকান্ডের শেষ কোথায়? তাঁর স্বদেশের বর্তমান ব্যাধি আর নিদারুণ ভবিষ্যতের কথা! পড়ছেন হুগো উলফের চিঠিপত্র, নীট্‌সে আর পল বেক্‌কারের "History of Music"—এমন সময় হঠাৎ মনে হল যে, ফাউস্তের উপকথা নিয়ে উপন্যাস রচনা করবেন, তার নায়ক হবেন একজন শিল্পী। এ চিন্তা তাঁর দীর্ঘদিনের। কিছু কিছু নোট লিখেছেন খেয়াল খুশীমত, বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা, অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন। এই খেয়াল-খাতার পাতায় যে উপন্যাসের উপকরণ রয়েছে তা কোনও দিন তাঁর মনে হয়নি, কিন্তু একদিন যখন এই বিচিত্র চিন্তার হিজিবিজির প্রতি হঠাৎ নজর পড়ল তখন তিনি বুঝলেন এ বড়ো গল্প নয় উপন্যাসের মালমশলা।

সচেতন মনের গভীরে উপন্যাসের অংকুর লালিত হয়েছে। তাঁর বিরাট উপন্যাস "Joseph and His Brethren" সেইকালে সমাপ্তির মুখে, এমন সময় "Dr. Faustus"-এর পরিকল্পনা তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হল।

কিছু পাঠক টমাস মানকে তেমন সুনজরে দেখেন না। তাঁর কাহিনী-বর্জিত রচনায় যে বস্তুটির অভাব তার নাম হিউমার। অথচ হিউমার সম্পর্কেও তিনি অজস্র লিখেছেন, কোথায় এবং কেমনভাবে কি মাত্রায় তা প্রয়োজিত হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন। আসলে তাঁর সকল উপন্যাসের অন্তর্নিহিত হিউমার অতিশয় গভীর এবং সুসংহত। তাঁর রচনায় যে পরিণত মানসের পরিচয় পাওয়া যায় পাঠককে তা বিস্ময়াহত করে, এবং অনেক সময় মনকে নিরানন্দ করে তোলে।

এই বিচিত্র লেখকের যাঁরা ভক্ত, সেই অসংখ্য অনুরাগীদের কাছে এসব অতি তুচ্ছ এবং উপেক্ষার বস্তু, তাঁর রচনায় প্রগাঢ় ভাবাবেগ পাঠকচিত্তে সুগভীর অনুভূতি জাগায়। তাই Dr. Faustus উপন্যাসের পরিকল্পনা এবং পরিণতি সম্পর্কিত যে অজস্র খুঁটিনাটির পরিচয় পাওয়া যায় THE GENESIS OF A NOVEL"-এ তাতে বিস্ময়ে প্রাণ আকুলিত হয়। "Dr. Faustus" টমাস মানের মহত্তম উপন্যাস নয় বটে কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য উপন্যাস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই উপন্যাসের নেপথ্য-বিধান দেখতে পাওয়া যে কোনও সৎ-পাঠকের কাছে এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এ কথা অত্যুক্তি নয়।

পরিণত বয়সের লেখকের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি যে উত্তরসূরীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, দেহে থাকে না যৌবনের অদম্য উৎসাহ, মনে থাকে না অপরাজিতের ভয়শূন্য চিত্ত, শরৎকালের বিত্তবিহীন মেঘের মত যেন হালকা হাওয়ায় সাহিত্যাকাশে ভেসে বেড়ানো। মানও এই সংশয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন, অনেক দ্বিধা, অনেক সংশয় নিয়ে সেদিন ডায়েরীতে লিখেছিলেন :

"Do I have the strength for new conceptions? Have I not used up my subject-matter? And if not—shall I be able to summon up desire for work? Glooming weather, raining cold. With a headache, I drew up outline and notes for the Novella."

লস এঞ্জেলাসে কনসার্ট শোনার জন্য ছুটলেন টমাস মান, সেখানে হরোউইৎস্ 'বি' ফ্লাট মেজরে ব্রাহমের পিয়ানো কন্‌সার্টো বাজাচ্ছেন তা শুনলেন। বাড়ি ফিরে এসে পড়লেন গেন্টা রোমানোরম আর নীট্‌সে, সেই সঙ্গে ষ্টীভেনসন। ফাউস্ট উপজীব্যকে একটা আকারদানের চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না।

বৃদ্ধ বয়সের শিথিল মানসিকতার অসহায়ত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তাঁর নতুন গ্রন্থের নামকরণ করা হবে 'My Parsifal' এই স্থির করলেন। ইবসেন এবং গ্যয়টের সর্বশেষ রচনাবলীর দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, ১৯৪৫-এ তাঁর মৃত্যু ঘটবে আর 'Dr. Faustus' রচনা করতে প্রয়োজন হবে হৃদয়-শোণিতের। তাই ভাবলেন, এই বৃহৎ কর্ম শুরু করার আগে অন্য কিছু করা যাক, তাই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যে সব রচনার খসড়া করেছিলেন তাই শেষ করতে বসলেন, যথা : "Confessions of Felix Krull" বা "Confidence Man"

১৯৪৩-এ টমাস মান লিখতে বসলেন "Dr. Faustus"। চতুর্দিকে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘট্‌ছে, নিজের শরীর অবসন্ন, প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছেন, একটা গুরুতর অস্ত্রোপচার করাতে হল। জার্মানীর দুঃখে তিনি বিগলিত এবং বিচলিত, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অন্তরে সংশয়। এই শোক, দুঃখ, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হল এই বিস্ময়কর গ্রন্থ। শোক এবং উদ্বেগ থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখার জনাই কি এই সৃষ্টির প্রয়াস, এ কি আর এক জাতের পলায়নী মনোবৃত্তি। কিংবা শোক এবং এই সাহিত্যকর্ম অন্য কোনও মানসিকতা থেকে উদ্ভূত? এই জাতীয় নানা প্রশ্ন লেখক করেছেন, নিজের অন্তরকে উৎপীড়ন করে অনুসন্ধান করেছেন, সত্যের, সুন্দরের, শিবের। এই সব প্রশ্ন আর তার উত্তরে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'The Genesis of a Novel'-এ সব কিছু প্রশ্ন ও তার সমাধান খুঁজে পাবেন। লেখক সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচারের একটা সূত্রের সন্ধান এই গ্রন্থে পেতে পারেন।

মানের খেয়াল-খাতার একটা অংশ এখানে উধৃত দেওয়া হল, তাঁর তৎকালীন মানসিকতার এক নিখুঁত রেখাচিত্র :—

"On German urban life in Luther's reign. Also medical and theological readings. Gropings, attempts, and a tentative feeling of greater security in the atmosphere of the subject. Walked the mountain Road with K. All day reading Luther's Letters. Took up Ulrich Von Hutten by D. F. Strauss. Decided to study books on Music.... Nothing yet has been done about stuffing the book with

characters, filling it out with meaningful subsidiary figures."

'ডাঃ ফাউস্টসে'র কাহিনী উত্তম পুরুষে বিধৃত। তার নাম ৎজাইটব্লম্, লোকটি খুঁতখুঁতে, উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন এবং কিঞ্চিৎ হাস্যকর চরিত্র। কিভাবে এবং কেন এই আইডিয়া টমাস মানের মাথায় এসেছিল তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

"আমার বিষয়গত চরিত্র এবং আমার মধ্যে 'বন্ধু'র মাধ্যম কেন আরোপ করেছি আমার সেইকালের ডায়েরীতে তার কোনও উল্লেখ নেই। এড্রিয়ান লিভার-কুহনের কথা সরাসরি তাকে দিয়ে না বলিয়ে কেন সেটা বলেছি, ফলে নভেল নয় জীবনী রচনা করেছি, তার সব জড়িয়ে। দানবীয় এক ঝোঁককে অদানবীয় খাতে প্রবাহিত করেছি। একটা নিরীহ, সরল আত্মাকে প্রকাশ করেছি, ভীরু ও সহৃদয় মানুষে। এই কাহিনী যে-ভাবে কথকতা করা হয়েছে, তা নিজেই একটা কমিক আইডিয়া।"

এ যুগের উচ্চাভিলাষী লেখকের Slyness-এর এ এক অত্যাশ্চর্য উদাহরণ। মান ছিলেন এই গুণের এক শক্তিশালী অধিকারী, তাই ৎজাইটব্লম তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির এক বিশিষ্ট পরিচয়। এই Slyness তথাপি এমন এক অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সমাবেশে সমৃদ্ধ, যা জেমস জয়েসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৪৩-এ এই উপন্যাস রচনা তিনি শুরু করেন। ফেলিক্স ক্রুলের আত্মজীবনী তাঁকে সচেতন করে দেয় যে উপন্যাসের বীভৎসতা সহনীয় হয় যদি তাতে কিঞ্চিৎ 'হিউমার' দিয়ে সরস করা যায়। এই উপন্যাস যতই অগ্রসর হয়েছে ততই তাতে ইতিহাস, সাহিত্য, ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মালমশলা এসে জমেছে। অঙ্কিত পরিপ্রেক্ষিতের এবং মরিচীকার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে বাস্তব জগৎ প্রবেশ করেছে। এই আঙ্গিক টমাস মানের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। তিনি একে বলেছেন মনতাজ টেক্‌নিক। এইভাবেই তিনি সমগ্র কাহিনীটি অন্তর্ধানপটে স্বপ্ন দেখেছেন এবং অন্য কোনও পথ ছিল না একে প্রকাশ করার।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে যখন তিনি নবম পরিচ্ছেদ লিখছেন তখন আবার অষ্টম পরিচ্ছেদ পড়লেন। সেই পরিচ্ছেদটি সন্তোষজনক মনে হল না। এর পর কয়েক দিন ধরে চলল সংশোধন। সংযোজন ও সংস্কার।

উপন্যাস রচনাকালে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে তা লিখে যাননি। স্ত্রীর ষষ্ঠীতম জন্মদিবসে তাঁর সঙ্গে যে জীবন ভোগ করেছেন, নির্বাসনকালে উভয়ের জীবন, আর তাঁর প্রিয় বন্ধু রেমি সেহিকেলের মৃত্যু তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তিনি পড়তে লাগলেন। তিনি দেখলেন স্নাইডলারের লেখা বীটোফেনের জীবনী বেশ কার্যকরী।

এর পর এল ফাউস্টস রচনায় সুদীর্ঘ বিরতি। কানাডা এবং নিকট-প্রাচ্যে তিনি বেড়াতে গেলেন। কয়েকটি অবিস্মরণীয় সপ্তাহ ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও মনট্রিয়েলে কাটালেন। কিন্তু এই অবসরের কালেও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে অসমাপ্ত উপন্যাসের চিন্তা। মুনিকের এক পুস্তকবিক্রেতার সঙ্গে এক মজার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। তিনি সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সিফিলিস সংক্রান্ত কয়েকটি বই চান। তিনি লিখেছেন : "আমার এই অনু-সন্ধানে ভদ্রলোক একেবারে শিউরে উঠলেন সে কথা আমার মনে আছে, যেভাবে তিনি ভ্রূকুঞ্চন করলেন তাতে আমার মনে সন্দেহ রইল না যে, আমি যে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়।"

আবার বাড়ি ফিরে এলেন নতুন মন নিয়ে, উপন্যাস লেখা চলতে লাগল। ১৯৪৪-এ তিনি চিত্রশিল্পী ভেরফেলের কাছ থেকে এক পত্র পেলেন। 'বাডেন-ব্রুকসে'র প্রশংসা করেছেন তিনি। টমাস মান ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর যৌবনের রচনাই কি শুধু ভবিষ্যতের মানুষ স্মরণে রাখবে? সেই সঙ্গে তিনি আর এক-বার Loves Labour Lost পড়লেন, একটি লাইন মন কে নাড়া দেয়। সেই লাইনটি তিনি কপি করে রাখলেন— "when great things labouring perish in their birth". টমাস মানের মনে হল যে, এই উক্তি 'ফাউস্টস' সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

এই সব এবং আরো অনেক কিছু কৌতূহলময় উল্লেখ আছে। টমাস মান কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন 'A Sketch of My Life', একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, The Genesis of a Novel সেই গ্রন্থটির সমতুল নয়। তথাপি লেখকের খেয়াল-খাতা হিসাবে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। বৃদ্ধ বয়সেও টমাস মান অনেক লেখকের ভিড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহৎ রচনা সৃষ্টির জন্য চাই অবসর, চিন্তা এবং ধীর পরিণতি। আর সেই সঙ্গে শিল্পীর মনে থাকবে অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়। এই শেষোক্ত গুণ টমাস মানের চরিত্রে বিশেষভাবেই ছিল। তাঁর সংগ্রাম, আশা, নিরাশা, এবং চিত্ত-বিনোদনের ইতিহাস হিসাবে এই খেয়াল-খাতা স্মরণীয় গ্রন্থ। *

THE GENESIS OF A NOVEL: (By THOMAS MANN— (Secker & Warburg: 18 Shillings)

নতুন বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সমালোচনা)— **নিতাই বসু। কমল প্রকাশনী। ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া। দাম সাড়ে তিন টাকা।**

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় একমাত্র বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব। পূর্বসূরী-প্রভাব-বর্জিত এই কথাশিল্পী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সংখ্যা যেমন কম নয় তেমনি একথা সত্য এককালে বাংলা দেশের পাঠকসমাজ থেকে তিনি যোগ্য সমাদর লাভ করেছিলেন। যদিও কোনো কোনো সর্বদ্রষ্টা প্রাজ্ঞ সমালোচকেরা এক-দিন তাঁর মধ্যে একমাত্র বিকারেরই প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন।

নিতাই বসু নবীন (?) সমালোচক। দীর্ঘকাল তাঁর বর্তমান আলোচনা একটি ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই আলোচনা পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রথম আলোচনা-গ্রন্থ হলেও বর্তমান গ্রন্থখানি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে কোন-প্রকারে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। সর্বা-পেক্ষা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সমালোচকের পারম্পর্যহীন বক্তব্যকে। শব্দ সাজিয়ে বাক্য গঠন হয় সত্যি। এবং প্রত্যেকটি বাক্যের একটি অর্থ আছে। একটি আলোচনার পরস্পর বাক্য একই ভাবধারায় গ্রথিত থাকে একটি অনুচ্ছেদে। বর্তমান গ্রন্থে একদিকে যেমন আছে অর্থহীন অসংখ্য বাক্য তেমনি আছে

যুক্তিহীন বক্তব্যের সমাবেশ। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার অভিপ্রায়কে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আলোচনার পূর্বে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন।

বর্তমান সমালোচক অযথা অসংখ্য বিদেশী খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম প্রাধান্য দিয়ে গ্রন্থটি নাম-ভারাক্রান্ত করেছেন।

'বিচার-তত্ত্বের দিক থেকে অনেকে আমার সংগে হয়তো একমত হবে না, তবে তথ্যের ভ্রান্তি বা অপ্রাচুর্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকা অনেক কম।'—তত্ত্ব বা দর্শন যাই বলুন সেখানে বক্তব্যকে উপযুক্তভাবে তুলে ধরতে না পারলে 'তথ্যের ভ্রান্তি' বা 'অপ্রাচুর্য' কিছু ক্ষতি করতে পারে বলে মনে হয় না। এই ধরণের আলোচনায় আলোচক কত বেশী প্রলাপ বকতে পারে বর্তমান সমালোচক তা সহজেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া তথ্যের ভুলও কি একেবারেই নেই?

লেখকের ভাষা সম্পর্কে আপত্তি আছে। এই ধরণের অস্বচ্ছ ভাষারীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। বানান ভুল এবং মুদ্রণ-প্রমাদ সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে যোগ্যতর আলোচনার জন্যে আমাদের প্রত্যাশা এখনো অপূর্ণ থেকে গেল।

দ্বিরাগমন (উ প ন্যা স)—মি হি র আচার্য। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে মিহির আচার্য মননশীল ঔপন্যাসিক হিসাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এর আগে তাঁর পাঁচ-ছয়টি উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহ পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে। দ্বিরাগমন তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনা। গোড়া থেকেই আমরা মিহির আচার্যের মধ্যে একটা সৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলার প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথটাকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। ত্রুটি তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তাঁর রচনায় অনেক সময় প্রেমের একঘেয়ে রূপ বা অস্বাভাবিক বিকৃতি আমার নিজের কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তিনি এক অন্ধ গলির পথে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু এ ত্রুটিগুলি সাময়িক। নিজেকে গড়ে তোলার কাজে এ বিচ্যুতি প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীর মধ্যেই আসে। মিহির আচার্যের রচনায় আমরা এ বিচ্যুতির সংগে সংগে নতুনের ইঙ্গিত পেয়েছি। সেটাই আমাদের কাছে আশার কথা।

'দ্বিরাগমন' উপন্যাসে যে জিনিসটা আমাকে প্রথমত আনন্দ দিয়েছে তা হচ্ছে এর অপূর্ব বিষয়নিষ্ঠতা। নিবিড় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিন্ন এ ধরণের বিষয়-নিষ্ঠতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুর-বীরভূমের সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এই অঞ্চলটি মোটেই অপরিচিত নয়। ঢিমে-তালের গ্রাম্য জীবন—চাষবাস, ঝগড়া-বিবাদ আর নারী-লোলুপতা এই নিয়েই মানুষজনের সকাল-সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। জীবনীশক্তি আছে মানুষগুলির প্রচুর কিন্তু সর্বত্রই সে শক্তির অপচয় আর বিকৃতি। লেখক নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসটিতে। গ্রাম মোড়ল গঙ্গা ঘোষ ও তার ছেলে ভোলা, যুদ্ধফেরত পোস্ট-মাস্টার বিনোদ ঘোষ, ক্রিশ্চিয়ান সুধন প্রামাণিক ও তাঁর দুই মেয়ে সুলতা-সুনীতি, বোর্ড প্রেসিডেন্ট নারায়ণ ত্রিবেদী, রক্ষিতা শশিমুখী, বহিরাগত ফেরিঅলা মাস্টার—কত না বিচিত্র চরিত্র। আর কোনটাই বেমানান বা জোর করে টেনে আনা নয়। লেখনীর আঁচড় যার যতটাই হোক না কেন, প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা আর সংলাপের ব্যবহার বইটির আরেকটি উজ্জ্বল দিক। মাঝে মাঝে লেখকের বিশেষ সংলাপের ব্যবহার আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তবে লেখকের স্বল্প ধারালো কথায় পরিবেশগত প্রকৃতির বর্ণনা অতুলনীয় ও একান্ত নিজস্ব। শেষকালে একটি বিরূপ মন্তব্য না করে পারলাম না। আমার মনে হয়েছে লেখক ভোলা আর সুলতার জীবনের শেষ পরিণতিটি ঠিকমত টানতে পারেননি। সেজন্য উপন্যাসটির সমাপ্তি একটু খাপ-ছাড়া মনে হয়। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও অনবদ্য প্রচ্ছদপটটি অতি উচ্চ রুচির পরিচায়ক।

হিমকান্তা কাঠমান্ডু— (ভ্র ম ণ-কাহিনী)—প্রবোধ দে। প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স। ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিঃ—৭। মূল্য—পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজক। ভ্রমণ-রসিক লেখক তাঁর প্রথম গ্রন্থটি ভ্রমণ-রসিকদের হাতেই সঁপে দিয়েছেন। লেখক নেপালের সৌন্দর্য এবং প্রকৃতি বর্ণনাতেই তন্ময় নন, নেপালের গণ-জীবনের কথা তথা তার সংস্কৃতিও লেখার গুণে ভ্রমণ-কাহিনীর অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে। লেখক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; তাই প্রকৃতির ভাষার গভীরে প্রবেশ করে তিনি ভারতের চিরন্তন বাণীর সন্ধান করেছেন এবং সে সন্ধানে তিনি সার্থকতাও লাভ করেছেন। তাঁর লেখার ভঙ্গিকে এক কথায় বলা যায় সুন্দর এবং সংযত।

ভ্রমণ-কাহিনীতে গল্পের উপাদান অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই উপাদান অসঙ্গত নয়।

লেখক কুশলী আলোকশিল্পী। বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে লেখকের এই কুশলতার পরিচয়।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা —বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা গ্রন্থের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন তার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগার, পাঠক ও গবেষকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবেন। এমন একটি তালিকার প্রয়োজন বহুদিন থেকে অনুভব করা যাচ্ছিল। বলা বাহুল্য একটি সুনির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা গবেষকদের প্রধান সহায়। অহেতুক পরিশ্রম ও উদ্বেগ তাঁদের ঘুচে যায় যদি তাঁরা সময়মত পান গ্রন্থের তালিকা। কাজও হয় আরও উচ্চমানের। পাঠকদের পক্ষে তালিকা দিক-দিশারী। রুচিকে উন্নত ও সুগঠিত করতে নির্বাচিত তালিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্ব-পূর্ণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই কাজে হাত দিয়ে আমাদের প্রকৃত উপকার করেছেন এবং এই প্রাথমিক কাজের জন্য পাঠক ও গবেষকদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু কাজটি প্রাথমিক বলে বোধহয় কয়েকটি ত্রুটি থেকে গেছে। সত্যিই এমন কতকগুলি বই অনুল্লিখিত আছে যা যে কোন দিক থেকে মূল্যবান। হয়ত পরিসরের কথা চিন্তা করে সংকলয়িতাদের মাত্র দু' হাজার গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। তাই নেওয়া হয়েছে বর্তমানে ছাপা বই। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন মেটানোই

প্রধান লক্ষ্য। এবং সে দিক থেকে সার্থক।

কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই যে, যদি এই লক্ষণকে আর একটু প্রসারিত করা হত তবে কি ক্ষতি হত? যে সব গবেষক বা সিরিয়াস পাঠক অধ্যাপকের সাহায্য না পেয়ে নিজের মত কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁদের সংখ্যা আজকাল বাড়ছে, তাঁদের প্রয়োজনের দিকে একটু মনোযোগ দিলে তালিকা হয়ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত। কিন্তু তার মানে আমি এই কথা বলতে চাই না যে, এ তাবৎকালের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা চাইছি। আমি বলতে চাই, নির্বাচনের ব্যাপারে আরও বিচক্ষণতা থাকলে গ্রন্থটি আরও মূল্যবান হতে পারত। এই সঙ্গে যদি একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকা থাকত তাহলে সংকলনের মূল্য আরও বাড়ত।

অবশ্য এই ধরণের সংকলন এই প্রথম প্রকাশিত হল। তার জন্য প্রাপ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংকলয়িতাদের ত্রুটিমুক্ত ও আরও সসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

হেমন্তের সনেট— (কাব্য-গ্রন্থ)— **পবিত্র মুখোপাধ্যায়। টিচার্স বুক এজেন্সী, কলকাতা—৯। দাম দু টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।**

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শবযাত্রা'র পর স্বল্পকালের ব্যবধানেই পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্য "হেমন্তের সনেট" প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে ১৩৬৮ সালে রচিত ঊনচল্লিশটি সনেট। সনেটগুলি বিষয় অনুসারে 'কবিতা' 'প্রেম', 'বিষাদ' এবং 'মৃত্যু'—এই চার ভাগে সন্নিবিষ্ট।

গ্রন্থে পরিণতির দিকে ক্রম-অগ্রসর এক কবিমনের সাক্ষাৎ ঘটে। তরুণ কবির শক্তির স্বাক্ষর বহন করছে কবিতাগুলি। একটি গতিময়, স্বতঃস্ফূর্ত, তীব্র-তীক্ষ্ণ আবেগ কোনো কোনো কবিতার মধ্যে অবয়ব লাভ করেছে। স্থানে স্থানে উপমা এবং চিত্রকল্পের নিপুণ ব্যবহার কবিতাকে সুষমামণ্ডিত করেছে। 'জানি, প্রস্থানের চিহ্নে কন্টকিত স্মৃতির প্রান্তর', কিম্বা 'কারা বসে আছো ঘাটে স্মৃতিফলকের মতো একা?'—এরূপ অনুভবময়, উজ্জ্বল কিছু পংক্তিও র'য়েছে যা কবিতা-পাঠকের স্মৃতির সম্পদ হবার যোগ্য।

কিন্তু, মাঝে মাঝে কবির আবেগ বা বক্তব্য সংহত, রূপময় কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেনি; ফলত, কোন কোন কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ অগভীর উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে, কখনো বা ব্যঞ্জনাহীন ভাষণে। এ ছাড়া চিত্রকল্প ও শব্দের ব্যবহারে কবির অনবধানতা এবং বহুব্যবহৃত উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যবহার অনেক স্থলে কবিতার আবেদন সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে।

পরিশেষে দুটি প্রশ্ন: 'বিষাদ' অধ্যায়ের অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছের সবগুলি কি-অর্থে বিষাদ-বিষয়ক? আর, অন্ত্যমিলহীন যে কয়েকটি চতুর্দশপদী গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে সেগুলিকে কি সনেট অভিধায় আখ্যাত করা যায়?

তাছাড়া কবির পূর্ব-প্রকাশিত 'শবযাত্রা' কাব্যের ভাব এবং ছাপ উভয়ই এ গ্রন্থের মধ্যে বার বার চোখে পড়ে। এমন কি শব্দপ্রয়োগ কোথাও কোথাও একই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরিশ্রমী বলে আশা করা যায়, কবি তাঁর কাব্য জীবনের এই সন্ধিক্ষণ কাটিয়ে অচিরেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সার্থক হ'য়ে উঠবেন।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

স্বাগত (শারদীয় ॥ ১৩৬৯)—সম্পাদক —মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বগত সাহিত্য পরিষদ, দুর্গাপুর—৪; বর্ধমান।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে আমরা ইতিপূর্বে 'অমৃত'র পাতায় অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। বর্তমান সংকলনটি হাতে নিয়ে আরও নিশ্চিত হলাম যে আমাদের অভিনন্দন অপাত্রে বর্ষিত হয়নি। আশরফ সিদ্দিকী, কৃষ্ণ ধর, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাশ, বোম্মানা বিশ্বনাথম এবং আরো অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ।

পার্বণী—সম্পাদক— জ্যোতিভূষণ চাকী। চিনকো — ১৬৭এন, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। দাম— তিন টাকা॥

পূজা-পার্বণ উপলক্ষে প্রকাশিত 'পার্বণী' শিশু-সাহিত্যের অন্যতম মনোরম সংকলন। পড়তে ভালো লাগে এবং সেই ভালো লাগার সঙ্গে নতুন কিছু শেখাও যায় এমন অনেক লেখা এই সংকলনটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। শিশু ও কিশোরদের প্রেয় লেখক-লেখিকা শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখলতা রাও প্রভৃতির মতোই নানা রকম সুখপাঠ্য লেখা লিখেছেন সেইসব লেখক-লেখিকারা, যাঁরা শিশুদের ভালোবাসেন। এঁদের মধ্যে হিরণকুমার সান্যালের হাসির-ভৌতিক গল্প, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ছড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও আশা দেবীর লেখা উল্লেখযোগ্য। তিন রং-এর প্রচ্ছদটি চিত্তাকর্ষক।

ফসল (শারদীয়॥ ১৩৬৯)—**নন্দলাল** বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া।

বর্তমান সংখ্যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হচ্ছে চিত্তরঞ্জন ঘোষ রচিত নাটক 'ডিরোজিয়ো'। কবিতা লিখেছেন— শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, বিনয় মজুমদার, দিলীপকুমার সেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে; গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন— রতন ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, নিতাই বসু।

দর্পনা (শারদীয় সংখ্যা॥ ১৩৬৯)— সম্পাদক—গণনাথ মণ্ডল ও সামসুল হক। ডায়মণ্ডহারবার থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দিলীপ রায়, শিবপ্রসাদ হালদার, সামসুল হক, শ্রীমন্ত সওদাগর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং আরো অনেকে লিখেছেন—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক।

কবিপত্র (ত্রয়োদশ সংকলন॥ ১৩৬৯)— **সম্পাদক—তুষার চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ১সি, রাণী শংকরী লেন। দাম—এক টাকা।**

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—মণীন্দ্র রায়, অরুণকুমার সরকার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোপাল ভৌমিক, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দিলীপ রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার এবং আরো অনেকে।

অচিন সাথী (শারদীয় সংখ্যা॥ ১৩৬৯) —সম্পাদক : শিশিররঞ্জন চৌধুরী।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, [illegible] রচনা, নাটিকা, ছড়া, রূপকথার সংকলন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগীয় চলচ্চিত্র :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই বিবিধ সরকারী প্রচেষ্টাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করবার দায়িত্ব বহন ক'রে আসছেন। সেদিনও যেমন ছিল, আজ তেমনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের এই চলচ্চিত্রগুলি প্রস্তুত এবং প্রচারের মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী প্রচারকার্য। তবে আজ যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বলে চিত্রামোদী দর্শক-সাধারণ পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন বাঙলা চিত্রগৃহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত কোনো একখানি ছবি দেখতে পাবেনই পাবেন, বছর চারেক আগেও সে-ব্যবস্থা ছিল না। এবং এই চুক্তির ফলে প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘরে প্রায় লাখখানেক করে টাকা আমদানি হচ্ছে। কিন্তু আসলে এই ছবি করার ব্যাপারে যে টাকাটা প্রতি বছর বরাদ্দ করা হয় সেটা প্রচার বাবদ খরচেরই খাতে। তখন কোনও ছবিঘরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার চিত্রগুলি প্রবেশাধিকার পায় নি। তখন সরকারী প্রচার-বিভাগের লোকেরা গ্রাম বা মফঃস্বল শহরের হাটে, মাঠে বা কোনো সাধারণ স্থানে পর্দা খাটিয়ে প্রোজেক্টরের সাহায্যে ছবিগুলি দেখাত। বিনা ব্যয়ে 'টকী' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এই একটি মাত্র আকর্ষণে নিশ্চয়ই কিছু লোক সেই সব প্রদর্শনীতে ভীড় করত এবং 'শো' শেষ হয়ে গেলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত চিত্রগুলির বক্তব্য কিছু অনুধাবন ক'রেই বা না ক'রেই। এখনও যে পশ্চিমবঙ্গ প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত-ছবিগুলি বিনা ব্যয়ে দেখতে না পাওয়া যায়, এমন নয়; প্রচার-বিভাগের 'মোবাইল ইউনিট' প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে শহরে পাড়ি দেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, মেলা কর্তৃপক্ষ, পৌরপ্রতিষ্ঠান, সাধারণ পাঠাগার বা কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে। এবং এখন তো জেলায় জেলায় প্রচার-বিভাগের 'মোবাইল ফিল্ম ইউনিট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেলার অধিবাসীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত ছবিগুলিকে বিনা ব্যয়ে দেখাবার জন্যে।

যতদিন পর্যন্ত চিত্ররসিক জনসাধারণ ছবিঘরের মধ্যে কোনো কাহিনী-চিত্র দেখবার আগে ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত তথ্য-চিত্র দু'টিকে পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাননি, ততদিন প্রচার-বিভাগ প্রযোজিত ছবিগুলির উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে কোনো আলোচনা সম্ভবও হয়নি এবং বোধ করি, প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু

বর্তমানে যখন সেই সুযোগ প্রত্যহই হচ্ছে এবং দর্শক এটাও অনুভব করছেন যে, তাঁর ক্রীত টিকিটের মূল্যের একটি অতি-সামান্য ভগ্নাংশও ঐ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত ছবিটির জন্যে ব্যয় করা হবে, তখন তিনি নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন, প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত ছবিখানি উৎকর্ষের দিক দিয়ে ফিল্মস ডিভিশন প্রযোজিত ছবি থেকে বিষয়বস্তু, কলাকৌশল এবং নেপথ্যভাষণ প্রভৃতির দিক দিয়ে ভালো না হোক, অন্ততঃ মন্দ হবে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, তাঁদের সে-দাবী বেশীর ভাগ সময়েই অপূর্ণই থেকে যায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছবিগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়ে ফিল্মস ডিভিশন প্রযোজিত ছবিগুলির পাশে দাঁড়াতেই পারে না।

কিন্তু কেন? এই 'কেন'র জবাব দিতে হ'লে প্রথমেই যে-জিনিসটা নজরে পড়ে, সেটি হচ্ছে, এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিত্র-প্রযোজনা রীতির বিরাট পার্থক্য। ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন একটি বিরাট স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। এ'দের প্রধান কর্মকেন্দ্র হচ্ছে বোম্বাই, সেখানে এ'দের নিজস্ব স্টুডিও এবং ল্যাবোরেটরী আছে; আর আছে চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, সম্পাদনা, বহু রকম ভেল্কির জন্যে ট্রিকশট্ গ্রহণের বিশেষ যন্ত্রপাতি, কার্টুন ফিল্ম প্রস্তুতের জন্যে বিশেষ ক্যামেরা প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাবেশ; এর ওপর আছে মাসিক বেতনে নিযুক্ত একটি বিরাট কর্মীবাহিনী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ তাঁদের প্রযোজিত ছবি তৈরীর তত্ত্বাবধানের জন্যে নিয়মিত মাস-মাহিনা দিয়ে রেখেছেন একটি মাত্র লোক, যিনি প্রচার-বিভাগে 'প্রোডাকসান অফিসার' ব'লে পরিচিত। তাঁর কাজ ছবির পরিচালনা নয়, ছবির প্রযোজনা নয়, মাত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্যে যে-সব ছবি তৈরী করা প্রয়োজন ব'লে সাব্যস্ত হবে, সেইগুলি যাঁরা তৈরী করবার ভার পাবেন, সেই বিশেষ ছবিগুলি তৈরী করবার ব্যাপারে তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সরকারী বিভাগের সঙ্গে যাতে সহজে যোগাযোগ ক'রতে পারেন, সেই বিষয়ে সাহায্য করা। এই প্রোডাকসান অফিসার ছাড়া সরকার আর কোনো দ্বিতীয় লোককে ছবি তৈরীর ব্যাপারে মাস-মাইনে দিয়ে রাখেননি।

তা'হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত ছবিগুলি তৈরী করেন কারা? দ্বিধাহীনভাবে বলব—কন্ট্রাক্টররা। প্রতি বছর সরকারী আর্থিক বছর আরম্ভের বেশ কিছু দিন আগে সংবাদ-পত্র মারফৎ টেণ্ডার আহ্বান করা হয় এই সরকারী ছবিগুলি তৈরী এবং তৈরী ছবির কপি তৈরী প্রভৃতি কাজের জন্যে। বহু আগে এই কাজের মোট মূল্যমান ছিল এক লক্ষ টাকা; বর্তমানে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষের কাছাকাছি। যে-সব চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এই কাজের জন্যে টেণ্ডার দেন, তাঁরা তাঁদের নির্মিত ছবির ফুট-প্রতি কত টাকা চান, সেটা নিশ্চয়ই জানিয়ে দেন। এবং দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যখন ফুট-প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা দাবী করা হ'ত, তখন বর্তমানের অসম্ভব রকম চড়া খরচের যুগে এ'রা পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষির ফলে দাবী করছেন ফুট-প্রতি পাঁচ টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব সময় থেকেও পঁচিশ নয়া পয়সা কম। অথচ যুদ্ধপূর্বকালে যে-এক রীল ফিল্ম নেগেটিভের দাম ছিল মাত্র ৯০' টাকা, আজ তার দাম হচ্ছে ২২০' টাকা। এবং এই হিসেবে প্রতিটি ব্যাপারেই খরচ বেড়েছে অন্ততঃ তিনগুণ। কিন্তু ফিল্মস ডিভিশন-প্রযোজিত ছবির খরচ কি জানেন? গড়পড়তা ফুট-প্রতি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা। তাও সেখানে কন্ট্রাক্টরের মুনাফা নেই। এ ছাড়াও

কথা আছে। বাঙলা দেশের একজন সাধারণ পর্যায়ের চিত্রপরিচালক একটি কাহিনী-চিত্র, যা সাধারণতঃ ১২,০০০/১৩,০০০ হাজার ফুট দীর্ঘ হয়, তার জন্যে পারিশ্রমিক পান অন্ততঃ ১০ হাজার টাকা। কিন্তু একটি এক রীলের অর্থাৎ ১ হাজার ফুট দীর্ঘ তথ্যচিত্র বা প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্যে প্রচার-বিভাগ নিযুক্ত কন্ট্রাক্টরেরা মাত্র ২৫০্ টাকা দিয়ে থাকেন। একজন সাধারণ ক্যামেরা-ম্যান যেখানে একটি কাহিনী-চিত্রর জন্যে দৈনিক অন্ততঃ ৮০্/১০০্ পেয়ে থাকেন, সেখানে এই প্রচার-চিত্র নির্মাণের জন্যে পান গড়পড়তা দৈনিক ৪০্ টাকা। কাহিনী-চিত্রের চিত্রনাট্যকার যেখানে অন্ততঃ ৩,০০০্ টাকা পেয়ে থাকেন, সেখানে এই এক রীল প্রচার-চিত্রের জন্যে বরাদ্দ আছে মাত্র ১০০্ টাকা। এই সব কথা জানবার প'রও কি জিজ্ঞেস করতে প্রবৃত্তি হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ-প্রযোজিত চলচ্চিত্র ফিল্মস ডিভিশন-কৃত চলচ্চিত্রের মত গুণ-বিশিষ্ট হয় না কেন? শুনতে পাই, প্রচার-বিভাগকে চলচ্চিত্র প্রযোজনা বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্যে একটি ১৩ জন সভ্যবিশিষ্ট কমিটি আছে, যাতে চলচ্চিত্র প্রযোজনা বিষয়ে পারদর্শী লোকেরও স্থান রয়েছে। এই কমিটি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, ৫ টাকা ২৫ নয়া পয়সা ফুট দরে আজকেও ছবি তৈরী করা—ভালো ছবি তৈরী করা সম্ভব কিনা?

চিত্র সমালোচনা

প্রেমপত্র (হিন্দী): বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন: ১৪,৮৮৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী: নিতাই ভট্টাচার্য; চিত্রনাট্য: সলিল চৌধুরী ও দেবব্রত সেনগুপ্ত; পরিচালনা: বিমল রায়; সঙ্গীত-পরিচালনা: সলিল চৌধুরী; গীত-রচনা ও সংলাপ: রাজেন্দ্র কিষণ; চিত্র-গ্রহণ পরিচালনা: দিলীপ গুপ্ত; শব্দধারণ: এম আর পিটলে; সঙ্গীত-গ্রহণ: বি এন শর্মা, কৌশিক ও মিনু কার্তার; শিল্প নির্দেশনা: সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা: অমিত বসু; রূপায়ণ: সাধনা, সীমা, চাঁদ ওসমানী, শশী কাপুর, রাজেন্দ্রনাথ, সুধীর প্রভৃতি। ক্যালকাটা ফিল্মস সেন্টার-এর পরি-বেশনায় গেল ২৬-এ অক্টোবর থেকে হিন্দ, প্রিয়া, কৃষ্ণা, রূপালী, পূর্ণশ্রী ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

একদা উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত "সাগরিকা" ছবিখানি বাঙলা চলচ্চিত্রা-[illegible] জন্যে [illegible] সুধার করে-ছিল। বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর নবতম নিবেদন "প্রেমপত্র" নিতাই ভট্টাচার্য লিখিত সেই একই 'সাগরিকা' কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাজেই বাঙলা কাহিনীর মতই এতেও মেডি-ক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র অরুণ সেই কলেজেরই ছাত্রী কবিতাকে (বাঙলা ছবির সাগরিকা) প্রেমপত্র লেখবার মিথ্যা অপরাধে (আসলে তার বোন রত্না তার নাম দিয়ে চিঠিখানি লিখেছিল কবিতাকে রাগাবার জন্যে) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলেত যাবার সরকারী বৃত্তিটি হারায় কলেজ-প্রিন্সিপ্যালের হস্তক্ষেপের ফলে। প্রথমে ভগ্নোদ্যম হবার পর তার কাকার চেষ্টায় তাদের গ্রামের জমিদারের মেয়ে তারাকে বিবাহ করতে স্বীকার ক'রে সে শেষ পর্যন্ত তার বিলেত যাবার পাথেয় সংগ্রহ করে এবং বিলেত থেকে ফিরে এসে বিবাহ করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দেয়। এদিকে গ্রাম্য জমিদার তার অশিক্ষিত কন্যা তারাকে বিলেত-ফেরত ডাক্তার অরুণের যোগ্য ক'রে তোলবার আগ্রহে তাকে শহরে নিয়ে এসে তার ভগ্নির ওপর ভার দিল তাকে গ'ড়ে-পিটে মানুষ করবার জন্যে। ভাগ্যচক্রে এই ভগ্নিরই কন্যা হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজে পড়া মেয়ে কবিতা, যার অভিযোগের ফলে অরুণ তার সরকারী বৃত্তি হারিয়েছে। অরুণ তারাকে কোনো দিনই চোখে দেখেনি; কিন্তু আপ-টু-ডেট হবার অতি আগ্রহে তারা যেমন এক দিকে কবিতার বন্ধু লীলার ভাইয়ের সঙ্গে টেনিশ খেলা থেকে শুরু ক'রে শিকারে যাওয়া পর্যন্ত বহু সম্ভব-অসম্ভব কাজ করতে লাগল, তেমনি বিলেত-প্রবাসী অরুণকে প্রেম-পত্রও লিখতে কার্পণ্য করল না। অবশ্য এই প্রেমপত্র লেখবার মত বিদ্যে তার ছিল না; কাজেই এই দায়িত্বটা সে তার পিসতুতো বোন কবিতার ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'ল। কলেজের সেরা ছেলে অরুণকে কবিতা মনে মনে ভালোই বেসেছিল এবং যেদিন সে জেনেছিল, যে প্রেমপত্র পেয়ে সে রাগের মাথায় অধ্যাপকের কাছে অভিযোগ পেশ করে-ছিল, সে-প্রেমপত্র আদৌ অরুণের লেখা নয়, সেদিন থেকে সে নিজেকে অরুণের কাছে গুরুতরভাবে অপরাধী জ্ঞান করেছিল। কাজেই তারার জবানীতে অরুণের কাছে চিঠি লেখার মধ্যে সে তার অন্তরের ভালোবাসাকেই মুখর করে তুলেছিল দিনের পর দিন। কিন্তু যখন উচ্চ শিক্ষা লাভের পর অরুণের বিলেত থেকে দেশে ফেরবার সময় নিকটবর্তী হ'ল, তখন একই সঙ্গে কবিতা এবং তারার জীবনে এল গুরুতর সমস্যা। কারণ, তারা তখন লীলার ভাইয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং সেই কারণে তার হৃদয়ে অরুণের স্থান নেই; আর কবিতা তো জানে, অরুণ তা'কে কতখানি ঘৃণা করে এবং তারার ব-কলমে অরুণকে প্রেমপত্র পাঠিয়ে যে-হৃদয়ের খেলায় সে মেতে উঠেছিল, তা যে কতখানি মিথ্যা, তা অরুণ ফিরে এসেই ধ'রে ফেলবে। কিন্তু দৈব অনুগ্রহে দু'জনেরই সমস্যার সমাধান হ'ল। বিলেত থেকে ফেরবার কয়েক দিন আগে নকল-তারার একখানি প্রেমপত্র পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হওয়ার দরুণ ল্যাবোরেটরীতে একটি বিস্ফোরণ ঘটায় অরুণ হারাল তার দৃষ্টিশক্তি। এই খবরে তারার বাবা প্রথমটা হলেন হতবাক এবং পরে ঘোষণা করলেন, অন্ধর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে তিনি তাঁর আদরিণী কন্যার ইহকাল-পরকালের সর্বনাশ সাধন করতে আদৌ ইচ্ছুক নন। অতএব তারা পেল তার অভিলষিত মুক্তি। কিন্তু অন্ধ অরুণ ভারতে পদার্পণ ক'রেই যার জন্যে সব-চেয়ে বেশী লালায়িত হয়ে পড়ল, সে হচ্ছে প্রেমপত্র-লেখিকা তারা, যার প্রেমপত্রগুলির মাধ্যমে সে কল্পনায় তার সঙ্গে একটি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই নিবিড়তার উত্তাপ আর একজন যাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল, সেই কবিতাই অন্ধ অরুণের মনো-বেদনাকে প্রশমিত করবার জন্যে আবার নূতন করে তারার ভূমিকাভিনয় করতে শুরু করতে বাধ্য হয় তাদের সাধারণ বন্ধু ডাঃ কেদারের নার্সিং হোমে আর একজন সাধারণ বন্ধু ডাঃ সুমিত্রার প্রত্যক্ষ সহায়তায়। কিন্তু এর পর যেদিন ডাক্তারদের চেষ্টায় অরুণ তার দৃষ্টিশক্তিকে ফিরে পেল এবং কবিতা

বহু অনুরোধে তারাকে তার সামনে হাজির করল, তখন অরুণ আসল তারার কণ্ঠস্বর এবং স্পর্শে বুঝতে পারল, যে-তারাকে সে জেনেছে, এ-তারা সে-তারা নয় এবং এই বুঝেই সে প্রায়-উন্মাদ ও আবার তার দৃষ্টিশক্তি রহিত হবার যোগাড় হ'ল। এই অবস্থায় কেমন নাটকীয়ভাবে কবিতা ও অরুণ এবং তারা ও লীলার ভাইয়ের মিলন হ'ল, তাই নিয়েই 'প্রেমপত্র'-এর শেষের দৃশ্যগুলি রচিত।

এই প্রেম-কাহিনীটিকে সুন্দর অভিনয়, সুচারু আভ্যন্তরিক ও বহির্দৃশ্যাবলী এবং মনোমত নৃত্যগীত দ্বারা সমৃদ্ধ ক'রে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং যে-অগণিত দর্শকসাধারণের জন্যে ছবিখানি রচিত, তাঁরা যে "প্রেমপত্র" দেখে অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে উঠবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করা যায়। কবিতার ভূমিকায় সাধনা শিবদাসানী আন্তরিক অভিনয়ের গুণে ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। নায়ক অরুণের ভূমিকাটিতে শশী কাপুর তাঁর সহজ, স্বচ্ছন্দ ও দরদী অভিনয় দিয়ে একটি বিশেষত্ব আরোপ করতে পেরেছেন। এবং এঁদের দু'জনকে চমৎকারভাবে সাহায্য করেছেন রাজেন্দ্রনাথ (ডাঃ কেদার), চাঁদ ওসমানী (সুমিত্রা), সীমা (তারা), সুধীর (লীলার ভাই), পারভীন চৌধুরী (রত্না), পদ্মা দেবী (কবিতার মা) প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

ছবিটিতে পাঁচখানি গান আছে; কিন্তু সলিল চৌধুরী সংযোজিত সুর সাধারণভাবে শ্রুতিমধুর হ'লেও এর কোনোটিতেই অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে না। কিন্তু আবহ-সঙ্গীত রচনায় তিনি বহু ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলা-কৌশলের অপরাপর বিভাগে ছবিটি সর্বত্র একটি উচ্চ মান বজায় রেখেছে।

চিত্রপ্রিয় দর্শকসাধারণকে খুশী করবার জন্যেই বিমল রায় "প্রেমপত্র" চিত্রখানির রূপ দিয়েছেন এবং তাঁর সে-উদ্দেশ্য প্রচুর পরিমাণে সাফল্যও লাভ করেছে।

বাঙালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর বিশ্ব পরিক্রমা

৩০এ জুন, ১৯৬১ থেকে ৩রা অক্টোবর, ১৯৬১—একুনে ৯৬ দিন অর্থাৎ জুলস ভার্ণের ফিলিয়াস ফগ-এর থেকে ১৬ দিন বেশী লেগেছে বাঙলা চিত্রজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজক-পরিবেশক অসিত চৌধুরীর বাঙলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যবসায়-ভিত্তিক প্রদর্শন-সম্ভাবনা লক্ষ্য ক'রে একটি বিশ্বপরিক্রমায়। হ্যাঁ, বিশ্ব-পরিক্রমাই বলতে পারি। কারণ তিনি প্রতীচ্যের দিকে পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যের দিক দিয়ে দেশে ফিরেছেন। তাঁর গতি-পথে যে-সব শহর ও দেশ পড়েছে, সেগুলি হচ্ছে—তেহেরেণ (ইরাণ), ইস্তাম্বুল (তুরস্ক), কায়রো (মিশর), বেইরুট (লেবানন), এথেন্স (গ্রীস), জুরিখ (সুইজারল্যান্ড), মিউনিক (পশ্চিম জার্মাণী), বার্লিন (পূর্ব জার্মাণী), প্যারিস (ফ্রান্স), মাদ্রিদ (স্পেন), আমস্টার্ডেম (হল্যান্ড), কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), লন্ডন (ইংলন্ড), নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লস-এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিস্কো (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), টোকিও (জাপান), হংকং (চীন), সিঙ্গাপুর (দক্ষিণ এশিয়া-মালয়), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড) এবং রেঙ্গুণ (বার্মা)।

অসিত চৌধুরী

ভারতের আর কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী মাত্র ব্যবসায় বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে এভাবে পৃথিবীর দেশে দেশে চলচ্চিত্র পরিবেশকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে এ-রকম বিস্তৃত সফর করেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই এবং অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা, শ্রীচৌধুরীর এই বিরাট সফর নানা দিক দিয়ে ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি একমাত্র তেহেরেণ ছাড়া প্রতিটি জায়গায় তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের চারখানি ছবির, কোথাও সবগুলিরই, কোথাও তিনটির এবং কোথাওবা ন্যূনকল্পে একখানিরও পরিবেশন ব্যবস্থা পাকা ক'রে এসেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশকের কাছে প্রদর্শন ক'রে দেখাবার জন্যে একখানিও ছবি ছিল না। তাঁর পোর্ট-ফোলিওতে ছিল ঐ চারখানি ছবি সংক্রান্ত লিটারেচার বা বিবৃতিপত্র এবং কিছু স্থিরচিত্র। এইগুলির সাহায্যে মাত্র মুখের কথার জোরে এককভাবে প্রায় সারা বিশ্বে ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা ক'রে আসা কি অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচায়ক, তা' ব'লে বোঝাবার দরকার হয় না।

শ্রীচৌধুরী তাঁর এই ব্যবসায়িক সফরে যে-সব জিনিস লক্ষ্য ক'রে এসেছেন, তার মধ্যে প্রধান হ'ল, বহির্বিশ্বে ভারতীয় ছবির নিয়মিত পরিবেশনের জন্যে আজ পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারীভাবে কোনো পাকা ব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠেনি। মাত্র দু'টি-পাঁচটি জায়গায় ব্যক্তিগত প্রয়াসে মাত্র সত্যজিৎ রায়ের কয়েকখানি ছবির—বিশেষ ক'রে অপু-জীবনী সংক্রান্ত ছবি তিনখানির (যাকে ইংরেজীতে অপু-ট্রিলজি আখ্যা দেওয়া হয়েছে) ব্যবসায়িক ভিত্তিক প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। তাঁর আরও যে দু'খানি ছবির বৈদেশিক মুক্তি সম্বন্ধে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—দেবী ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় ছবির একটি নিয়মিত বাজার সৃষ্টির জন্যে স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই জরুরী দরকার।

শ্রীচৌধুরী আরও লক্ষ্য করেছেন, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় টেলি-ভিশানের দাপটে চলচ্চিত্র প্রায় কোণ-ঠাসা হ'তে চলেছে। প্রয়োজনা ক'রে য'ওয়ায় সর্বত্রই সিনেমাগৃহগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। টেলি-ভিশানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রতে হ'লে বহু অর্থব্যয় ক'রে বিরাট পট-ভূমিকার ছবি—যা টেলিভিশানে হওয়া এখনও পর্যন্ত দুঃসাধ্য, তেমন ছবি তৈরী করা ছাড়া গতি নেই, এমনই অভিমত ওদেশের চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা পোষণ করেন। অথচ তারও ব্যবসায়িক ফলাফল কি হবে, এ তাঁরা জানেন না। কাজেই চিত্রগৃহগুলিকে চালু রাখবার জন্যে ও'রা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে বিদেশের ভালো ছবিগুলিকে প্রদর্শন করবার পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁরা দেশের বহু ছবির প্রদর্শনীস্বত্ব ক্রয় করেছেন ইতিমধ্যেই। শ্রীচৌধুরীর সুচিন্তিত অভিমত, ঐ সব দেশে ভারতীয় ছবির নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবার এই সুযোগ কোনো মতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্রীচৌধুরী দেখেছেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং

গ্রীস নৃত্যগীত সংবলিত ছবির ভক্ত। এথেন্সে ভারতীয় চিত্রতারকা শ্রীমতী নার্গিসের অসম্ভব জনপ্রিয়তার জন্যে তাঁর অভিনীত যে কোনো ছবি সেখানে চলে। কিন্তু রোম থেকে শুরু ক'রে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ একটি মাত্র যে ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের ভক্ত, তিনি হচ্ছেন—সত্যজিৎ রায়। 'রে ফিল্ম' বলতে প্রতীচ্যের যথার্থ চিত্ররসিকেরা প্রশংসায় শতমুখ। আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রভৃতি জায়গায় অপু-ত্রয়ী (অপু-ট্রিলজী) ছবিখানি (যা দেখতে ৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট সময় লাগে) লোকে হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে আগ্রহের সঙ্গে দেখছে।

শ্রীচৌধুরী বলেন, পশ্চিম ইয়োরোপে ভারতীয়, বিশেষ ক'রে বাঙলা ছবির নিয়মিত বাজার সৃষ্টি করতে হ'লে লন্ডনে এবং কলকাতায় যুগপৎ একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার; ভারতীয় সভ্যসমন্বিত এই সংস্থার কাজ হবে, ব্যবসায়িক সাফল্য-সম্ভাবনাপূর্ণ ভারতীয় ছবির নিয়মিত প্রচারের দ্বারা তাদের পরিবেশনের জন্যে পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। মাত্র ইংলন্ডেই অন্ততঃ দু'লক্ষ বাঙলা ভাষাভাষী বাস করেন; কাজেই সেখানে বাঙলা ছবির গুটি পনেরো প্রদর্শনী-ব্যবস্থা করলে প্রতিটি ছবি থেকে অন্ততঃ হাজার পনেরো টাকা মুনাফা সংগ্রহ করা আদৌ বিচিত্র নয়। ঠিক সমান কথাই বলা যেতে পারে, বর্মার রেঙ্গুণ শহর সম্পর্কে। সেখানে ভালো বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে লোকে উদ্‌গ্রীব; অথচ দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে সেখানে একমাত্র 'নীল আকাশের নীচে' ছাড়া দ্বিতীয় বাঙলা ছবি যায়নি। শ্রীচৌধুরী সেখানে তাঁর চারখানি ছবিরই পরিবেশন ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের জন্যে বেইরুটে এবং দূরপ্রাচ্যের জন্যে হংকংয়েও ভারতীয় ছবির পরিবেশক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। হংকংয়ে একখানি ছবির ডাবিং খরচ মাত্র দশ থেকে বারো হাজার, আমাদের দেশে খরচ পড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। কাজেই দূরপ্রাচ্যের জন্যে সাব-টাইটেল ব্যবহারের পরিবর্তে ডাবিং করায় ঢের বেশী ব্যবসায়িক সুবিধা আছে ব'লে শ্রীচৌধুরী মনে করেন।

শ্রীচৌধুরী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিদেশের বহু চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকারের সহযোগিতায় বহু ভারতীয় চলচ্চিত্র, কোনো সময়ে প্রতিযোগিতার জন্যে, কোনো সময়ে মাত্র বিশেষ প্রদর্শনীর জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, মাঝে মাঝে এমন ছবি পাঠানো হয়, যার সম্পর্কে কোনো প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা দূরে থাক, নিন্দাই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এতে শুধু যে ভারতের সুনামই ক্ষুন্ন হয়, তা নয়; ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ বাজার সৃষ্টির পথ এতে সঙ্কুচিতই হয়। কাজেই কোনো উৎসবে দেখাবার জন্যে কোনো ছবিকে মনোনীত করবার সময়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা যখন ভারতের পক্ষে আশু প্রয়োজন, তখন এমন কিছু করা নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়, যাতে ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি হওয়ার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি দপ্তরের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, শ্রীচৌধুরীর এই বিশ্বপরিক্রমা-সঞ্জাত ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বাঙলা দেশের, তথা ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্প বিদেশে ভারতীয় ছবির বাজার সৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় বিদেশে ভারতীয় ছবির প্রদর্শন ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্যে একটি স্থায়ী "এক্সপোর্ট সেলস্ প্রোমোশান" সংস্থা গ'ড়ে তুলবে কাল-বিলম্ব না ক'রে।

বিবিধ সংবাদ

অসিত চৌধুরীর সংবর্ধনা :

গেল শুক্রবার, ২৬শে অক্টোবর চন্দননগরের লখরাজ ভবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এস পি প্রোডাকসন্স-এর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-প্রযোজক ও

পরিবেশক অসিত চৌধুরীকে সংবর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা ব্যোমকেশ মজুমদার। কলকাতার বহু প্রসিদ্ধ চিত্র-সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানসভা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়।

'সেতু' নাটকের ৭০০তম রজনীর স্মারক উৎসব :

বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটক গেল ৮ই অক্টোবর ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং এর অভিনয়ের ৭০০তম রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে গেল ২০এ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সালে। এই গৌরবের স্বীকৃতির জন্যে কর্তৃপক্ষ আসচে ৩রা নভেম্বর তারিখে একটি স্মারক উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ 'সেতু'র অভিনয়কে সহস্র রজনীর দ্বারে অনায়াসেই পৌঁছে দেবেন, এ-ভবিষ্যদ্বাণী আমরা পূর্বেই করেছি।

মানসাটা ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটর-এর শার্দা পূজন :

গেল রবিবার ২৮এ অকটোবর মানসাটা ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটর-এর কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত জাঁকজমকের সংগে 'শার্দা পূজন' উৎসব পালন করেছিলেন।

'সাত পাকে বাঁধা'র বহিদৃশ্য গ্রহণ :

'সাত পাকে বাঁধা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে অজয় কর কুড়িজন শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে রাজস্থান যাত্রা করেছেন আর ডি বি অ্যান্ড কোম্পানীর সচিব বিমল দে'র তত্ত্বাবধানে। শ্রীকর চিতোরগড়, জয়পুর, উদয়পুর, অম্বর প্রভৃতি স্থানে চিত্রগ্রহণ করবেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং এতে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংগে অভিনয় করছেন মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, সুব্রত সেন, পাহাড়ী সান্যাল, অসিত দে, বুবু গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পী। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরসৃষ্টি ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে।

বিনু বর্ধন পরিচালিত আর, ডি, বনশালের 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে তন্দ্রা বর্মন ও বিশ্বজিৎ

অগ্রগামী পরিচালিত "নিশীথে" চিত্রের একটি মধুর মুহূর্তে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'-এর শুভ মহরৎ :

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় চিত্র 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'এর শুভ মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে গেল ১৯এ অকটোবর ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত কাহিনী ও সংলাপ অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্যটির পরিচালনা করবেন মধু বসু। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রচার ও আবগারী মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে।

রূপজগতের 'ডিরোজিও' :

আসছে রবিবার ৪ঠা নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ার

রঙ্গমঞ্চে 'রঙ্গসভা' নাট্যগোষ্ঠী 'বিপ্লবী ডিরোজীও'র জীবননাট্যটি মঞ্চস্থ করবেন পীযূষ বসুর পরিচালনায়।

॥ নবাগতর আগামী অনুষ্ঠান ॥

প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা নবাগত আগামী ২৩শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে একটি মনোরম অনুষ্ঠানে শ্রীনিতীশ সেন রচিত 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' নাটিকাদ্বয় শ্রীতমাল লাহিড়ীর পরিচালনায় এবং সভ্যবৃন্দের অভিনয় সহযোগিতার মাধ্যমে মঞ্চস্থ করবেন।

॥ একটি অনুষ্ঠান ॥

গত ২১শে অক্টোবর "ন'পাড়া পল্লী সঙ্ঘ" কর্তৃক সঙ্ঘপ্রাঙ্গণে অভিনীত বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' নাটকটি সন্তোষ ব্যানার্জি'র পরিচালনায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ইতু নাগ, সন্তোষ ব্যানার্জি, ভোলা সিংহ, অনিলকুমার ঘোষ, সুখময় সরখেল, নরেন দেব, বিনয়কুমার ঘোষ, অনিল জানা, সুভাষ দত্ত, অরুণ চ্যাটার্জি, অমূল্য দে এবং অন্যান্য সভ্যবৃন্দ।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
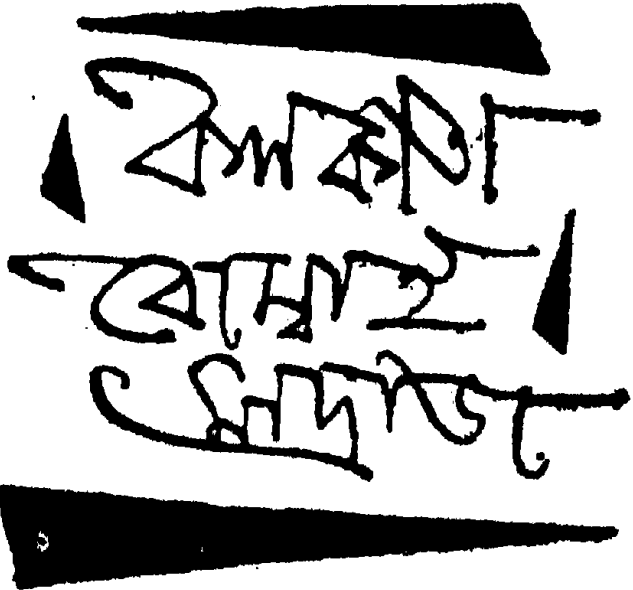
কলকাতা

বি, এন্ড. বি প্রোডাকসন্স-এর 'মৌনমুখর' সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ভারতী রায় এ ছবির দুই প্রধান শিল্পী। শেখর রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন ত্রয়ী-গোষ্ঠী। পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অপর্ণা দেবী ও লিলি চক্রবর্তী।
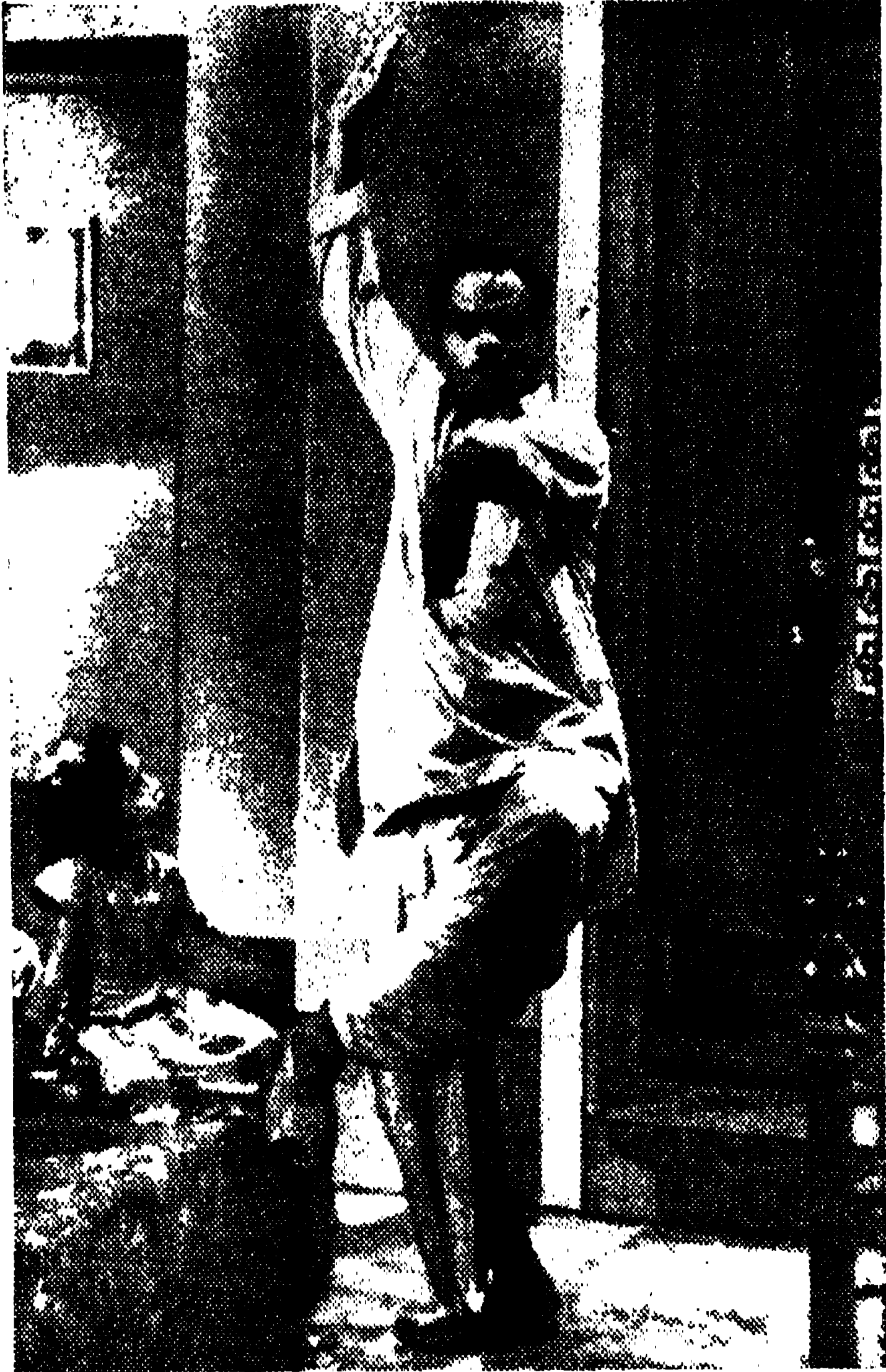
অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত শিল্প ভারতীর 'বর্ণচোরা' চিত্রে জহর রায়

চলচ্চিত্র প্রয়াস-সংস্থার চতুর্থ চিত্রে (ছবিটির এখন নামকরণ হয়নি) একটি দৃশ্যে অরুণ মুখার্জি ও অনুপকুমার।

দক্ষিণেশ্বর ইস্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে সুজনী ফিল্মসের 'পরিণাম'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। নায়িকা-প্রধান কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন অসিতবরণ, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগতা হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়।

বৈশাখী-গোষ্ঠী ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় 'কাঁচা পাকা' ছবির কাজ শুরু করেছেন। এই প্রণয়মধুর রসাত্মক ছবির কাহিনী রচনা করেছেন নিখিল গঙ্গোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, তপতী ঘোষ, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী ও নবাগত রজতকুমার।

রে'নেলা ফিল্মস-এর 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত এ ছবির আলোকচিত্র

এ চিত্রের সম্পদ। আলোকচিত্রশিল্পী হলেন ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল। লর্ড টেনিসনের একটি বিখ্যাত কবিতা অবলম্বনে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে সমুদ্র উপকূলে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আলোকচিত্রশিল্পী ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও স্মৃতিশ গুহঠাকুরতা। সংগীত পরিচালক রবিশংকর।

বোম্বাই

জনপ্রিয় চরিত্রশিল্পী মিশ্র সম্প্রতি প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন। আজিজ কাশ্মিরী-র একটি কাহিনী অবলম্বনে রঙিন ছবিটি পরিচালনা করবেন শঙ্কর মুখার্জি। সংগীত পরিচালক হলেন রোশন। চরিত্রলিপি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

প্রযোজক এফ, সি, মেহেরা-র রঙিন ছবি 'প্রফেসার' এই মাসেই মুক্তি পাবে। শাম্মিকাপুর এবং কল্পনা এ ছবির নায়ক-নায়িকা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন লেখ টেনডন। সংগীতে সুর-সৃষ্টি করেছেন শঙ্কর-জয়কিশন। প্রধান চরিত্রে রূপ দিয়েছেন পরাভীন চৌধুরী, সেলিম, প্রতিমা দেবী ও ললিতা পাওয়ার।

প্রযোজক-পরিচালক জাল বালি-ওয়ালা-র 'এক মঞ্জিল দো মুসাফির'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বলরাজ শাহানী, মামুদ, আনওয়ার, হুসেন, সঙ্গীতা, হীরালাল ও সুন্দর। সংগীত পরিচালনা করেছেন ইকবাল। আলোকচিত্র গ্রহণে সুরেন্দ্র।

সম্প্রতি প্রযোজক-পরিচালক ভি, শান্তারাম 'শেহরা' ছবির একটানা চল্লিশ দিন স্যুটিং শেষ করলেন রাজকমল স্টুডিওয়। নায়িকার চরিত্রে সন্ধ্যা

বিমল রায় পরিচালিত 'প্রেমপত্র' চিত্রে সাধনা

আবেগময় মুহূর্তগুলি অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শনীয় করে তুলেছেন। নায়করূপে—প্রশান্ত এই প্রথম অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন রামলাল। বর্তমানে ভি, শান্তারাম দলবলসহ রাজস্থানে গেছেন বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য।

মাদ্রাজ

নৃত্যশিল্পী কুমারী কমলা আমেরিকায় সম্প্রতি নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য অংশ গ্রহণ করতে গেছেন। ভারতের একমাত্র নৃত্যশিল্পী যিনি 'ইণ্ডিয়া নাইট'-এ অংশ গ্রহণ করছেন। মাদ্রাজ পরিত্যাগ করার পূর্বেও তিনি 'সুমাইথাঙ্গি' চিত্রে স্যুটিং শেষ করেছেন।

মালায়ম ছবি 'ডকটর'-এর সংগীত গ্রহণের পর চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে বিজয়া বাওহিনী স্টুডিওয়। বিভিন্ন চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সত্যেন, থিরুরিস্যি, ও, মাধাবান, আনন্দ, শীলা ও শান্তি। ছবিটি পরিচালনা করছেন এম, এস, মানি। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

মানুষ এবং মানুষের ভালবাসা নিয়ে এর আগে অনেক গল্প অনেক-রকমভাবে শুনেছেন এবং দেখেছেন হয়তো, কিন্তু এ ছবির গল্প একটু অন্যরকমের। এখানে সবই আছে, মানুষও আছে, কিন্তু এমন মানুষ যার ঘর নেই। বাইরের জীবনটাই তার কাছে বড় বেশি আপন বলে মনে হয়েছে। যার ফলে ঘর বা সংসার তাকে কোনদিনই বেঁধে রাখতে পারেনি। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাই সে পলাতক।

'পলাতক' ছবির কথাই বলছি। সম্প্রতি যাত্রিক-গোষ্ঠী ছবির একটানা স্যুটিং শেষ করলেন টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয়। এ ছবির প্রযোজক হলেন বম্বের অভিনেতা ও পরিচালক ভি,

ডি, শান্তারাম প্রযোজিত ও যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত 'পলাতক'এর একটি নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার—অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়

শান্তরাম। প্রথমদিনের চিত্রগ্রহণের সময় তিনি একদিনের জন্য এসেছিলেন এ ছবির শুভ মুহূর্তে। কাহিনীকার মনোজ বসুর 'আংটী চ্যাটার্জির ভাই' গল্প অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন যাত্রিক-গোষ্ঠীর অন্যতম তরুণ মজুমদার, শচীন মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

এ কাহিনীর নায়কের রূপ নেই। চলচ্চিত্রে নায়ক হবার কোন গুণ নেই। তবে রূপ না থাকলেও হৃদয় আছে। পলাতক হলেও মানুষের উপকার করেই তার দিন ফুরিয়েছে। সংসার তাকে বাঁধতে পারেনি কোনদিনই। এই ভবঘুরে মানুষটির নাম বসন্ত। জমিদার আংটী চ্যাটার্জির ভাই হলেও সে ধনী নয়। পথ তার ধন। আজ এখানে যেটা ভাল লাগছে কাল সেটা পুরনো বলে মনে হয়। এক জায়গার মানুষ তার বেশিদিন ভাল লাগে না।

এইভাবে বহু জীবনের সঙ্গে বসন্তের দিন এগিয়ে চলে। তবে কবিরাজ নীলকান্ত ও তার মেয়ে হরিমতীর সঙ্গে তার জীবন এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে তা কোনদিনই বসন্ত ভাবতে পারেনি। নীলকান্তের চরিত্রটি বেশ মজার। সকালে কবিরাজ, কিন্তু রাতের সে রাম, রাজা কিংবা লক্ষ্মণ। সন্ধ্যে হলেই সে যাত্রা-থিয়েটারে মেতে ওঠে, তখন কারো সাধ্যি নেই যে তাকে দিয়ে কবিরাজী করতে বলে। বসন্তের ভাল লাগে নীলকান্তকে তার সহজ-সরল ঐ মেয়ে হরিমতীকে।

বসন্তের বাঁধনহীন জীবনকে ঘর-মুখো করে হরিমতী। সংসারে লোভ দেখায় হরিমতী। একদিন কিভাবে কখন হরিমতী বসন্তকে জয় করলো। বিয়ে হল। বসন্ত নিজে তাদের গ্রামে দাদা-বৌদি হেমন্ত ও বীণাপাণির কাছে নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে ঘরে ফিরলো। দাদা-বৌদি ভাবলে বসন্তের সুমতি হয়েছে। এবার বোধহয় সংসারী হল। দিন যায়। কিন্তু বসন্ত হাঁপিয়ে ওঠে। বন্দী হয়ে থাকার মধ্যে জীবনের কোন গতি বা স্বাধীনতা নেই তাই একদিন গভীর পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলোয় হরিমতীকে ফেলে আবার সে ঘর-ছাড়া হল।

সংসারের কোন সুখই বসন্তের জন্য নয়। এমন হতভাগ্য জীবন চোখে পড়ে না। দুঃখের মধ্যেই জীবনটা সব সময় চলেছে। সুখ বলতে তার ভাগ্যে কোন-দিনই আসেনি। তা নাহলে এমন হরিমতী সেও বসন্তকে বাঁধতে পারলো না সংসারে। পথে-পথে তার ঘর। পথের মানুষ তার আত্মীয়। আর সংসারের আপন-জন তার কাছে পর হল। থিয়েটার-যাত্রা আর ঝুমুর দলের সঙ্গে তার জীবন বৈরাগী হল। বসন্ত গান গায়। মেয়ের দলের মধ্যে তার ভাল লাগে ময়না আর গোলাপকে।

বসন্তের গান মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে—

'দোষ দিও না আমায় বন্ধু
(আমার) কোন যে দোষ নাই।
কা'র কাছে রাখিলাম এ মন
কা'র কাছেতে চাই॥'

যাযাবরের মত বসন্ত ভাসে। সংসারের কত কিছুই নতুন হয়। এরমধ্যে ময়নাও সংসারী হয়ে ঝুমুরদল ছেড়ে দিয়েছে। গোলাপ তাকে বোঝায় ফিরে যেতে। কিন্তু বসন্তের যৌবন? তাও একদিন পিছিয়ে পড়লো। এই অনিয়মের মধ্যে তার শরীর ভেঙে এলো। ঝুমুর দলে গান করা তার বন্ধ হল। মৃত্যুর মুখে-মুখে দাঁড়িয়েও বসন্ত এই ঝুমুর দলের সঙ্গে তাদের গ্রামের কোন জমিদারের আনন্দ উৎসবে গান করতে চলে আসে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সে গাইতে পারেনি। শুধু অনুভব করেছে এটাই তার সংসার। হরিমতী আছে। দাদা-বৌদিও আছে। সব চেনা-চেনা মনে হল বসন্তের। কি আশ্চর্য বসন্তের ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্যই এ আনন্দ উৎসবে ঝুমুর দল গান করতে এসেছে।

বসন্ত ছুটে যায় তার সংসারে। লুকিয়ে সে তার ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে টেনে নেয়। আর প্রতীক্ষায় থাকে হরিমতীর জন্য। কিন্তু হঠাৎ সামনের দেওয়ালে দেখে হরিমতীর ছবিতে ফুলের মালা পরানো। ধূপ জ্বলছে।

হরিমতী প্রসবের পরে মারা যায়। শুধু বেঁচে রইলো ঐ শিশু। হরিমতী—বসন্তের শেষ চিহ্ন। বসন্ত সেই নদীর ঘাটে নৌকর ওপর ভেসে চললো আর এক দেশে। যেখানে হরিমতী তারজন্য আজও প্রতীক্ষায় রয়েছে। হরিমতী জানে একদিন নিশ্চয়ই বসন্ত ফিরে আসবে!

কাহিনী এখানেই শেষ। এ ধরণের গল্প এর আগে কোনদিনই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি। ভবঘুরের জীবন যে মানুষকে কাঁদাতে পারে, তার জন্য অলক্ষ্যে যে মানুষ ভাবে এই প্রথম হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম যাত্রিক-গোষ্ঠীর 'পলাতক'-এর কাহিনী শুনে। এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন বসন্ত—অনুপকুমার। হরিমতী—সন্ধ্যা

রায়, নীলকান্ত—জহর রায়, ছিদাম—জহর গাঙ্গুলী, ফটিক—রবি ঘোষ, ময়না—রুমা গুহঠাকুরতা, গোলাপ—অনুভা গুপ্তা, বীণাপাণি—ভারতী দেবী ও হেমন্ত—অসিতবরণ।

প্রধান কলা-কুশলীতে রয়েছেন চিত্র-গ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সহ-পরিচালনায় ভুবনেশ্বর প্রসাদ এবং ব্যবস্থাপনায় ভানু ঘোষ।

সম্প্রতি এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বোম্বে রাজ-কমল কলামন্দির স্টুডিওয় সঙ্গীত গ্রহণ করেছেন। গান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা ও পঙ্কজ মিত্র। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মুকুল দত্ত।

টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওর প্রথম পর্যায়ে 'পলাতক'-এর দৃশ্য গৃহীত হল। কবিরাজের বাড়ীর দৃশ্য গ্রহণের দিন উপস্থিত ছিলাম। গ্রামের খড়ের বাড়ী স্টুডিওতে নির্মিত হয়েছে।

নীলকান্তের বাড়ীতে বসন্ত এসেছে ছুটে।

বসন্ত—কোবরেজ! তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি?

নীলকান্ত—কেন?

বসন্ত—কেন? বলি কাল রাতে নমো নমো করে ডাল তো পাঠিয়ে দিলে এক বাটি—তা, কার শ্রীহস্তের রান্না ওটা জানতে পারি?

নীলকান্ত—হরি রেঁধেছে—কেন, হয়েছে কি?

চার্লি চ্যাপলিন সম্প্রতি দশম সন্তানের জনক হয়েছেন।

বসন্ত—হরি! ও তোমার চাকর বুঝি। রোস দেখাচ্ছি মজা। এই হরি—হরি।

নীলকান্ত—এই দেখ, হরি মানে আমার—

বসন্ত—ইস্, ঝালের কি মা বাপ নেই হে! ডাল খেয়ে জীবের অবস্থা দেখবে, এই দ্যাখ, (জীব দেখায়) গেল কোথায়? কথা কানে যাচ্ছে না নাকি? এই ব্যাটা হরে?

(হরিমতীর দ্রুত প্রবেশ)

হরিমতী—আমার নাম হরে নয়, হরিমতী। এই সাতসকালে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো কেন?

নীলকান্ত—এই যে মা, কাল নাকি ডালে বড্ড ঝাল হয়েছিল, ইনি বলছেন—

হরিমতী—কৈ নাতো!

বসন্ত—না!

হরিমতী—কক্ষনো না।

বসন্ত—তবে জিব আমার পুড়লো কি করে?

হরিমতী—জিবের আর দোষ কি? অত চিড়বিড়ে কথা জিব দিয়েই বেরুচ্ছে তো—কত আর সইবে?

বসন্ত—কি বললে?

(হরিমতী চলে যায় ঘর থেকে)

বসন্ত—একি! চলে গেল যে!

নীলকান্ত—ছাড়ান দাও ওর কথা। ঐ তো একরত্তি মেয়ে। তাছাড়া রোজ তো খাচ্ছো না ওর হাতে। আজ থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিও।

বসন্ত—এই দ্যাখো, কোত্থেকে কি কথা। বলি, নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যাবো কেন, এ্যাঁ? তোমরা পাঁচজন থাকতে আমার অভাবটা কিসের? আরে আমি হলাম বাউণ্ডুলে—বিশ্ববখাটে—রান্নাবান্না কি আমার পোষায়? তবে হ্যাঁ, মাগনা আমি খাব না। কোবরেজ—এই নাও, ধরো—

—চিত্রদূত

ভিন্‌দেশী ছবি

॥ ইটালীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস প্রবণতা ॥

নিওরিয়ালিজম-এর চিত্রভূমি ইটালীর চিত্র-প্রযোজকরা ইদানীং অতীতের দিকে চোখ ফেরোনোর পক্ষপাতী। ইটালীতে জনতার দৃশ্যের জন্যে কম খরচে 'এক্সট্রা' সংগ্রহের অসুবিধে হলে ইটালীর প্রযোজকরা গ্রীস, স্পেন অথবা যুগোশ্লাভাকিয়াতে গিয়ে চিত্র নির্মাণ করছেন। ঐতিহাসিক পটভূমির জন্যে রোমের ধ্বংসস্তূপগুলোতে অবশ্য দৃশ্যগ্রহণ করতেই হয় তাঁদের। এই ধরণের চিত্র নির্মাণে উৎসাহ বৃদ্ধির কারণ ছবিগুলিকে ইংরেজীতে 'ডাব' করলে ঘরের এবং বাইরের বাজারের বক্স-অফিস সহজেই প্রসন্ন হয়। এম-জি-এম-

শ্রীমতী রোমি স্নাইডার ফ্রাণ্জ কাফ্‌কার উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত "দি প্রসেস" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমতী স্নাইডার ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

এর 'বেনহার'-এর অকল্পনীয় অর্থ-সাফল্যই সম্ভবতঃ ইটালীর চিত্র-নির্মাতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের প্রধান কারণ। আমেরিকার ছবিঘরগুলোও সোৎসাহে ইটালীতে তোলা 'ডাব' করা ঐতিহাসিক ছবি সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখিয়ে যাচ্ছে। 'দি সিয়েজ অফ সাইরাকুস', 'ড্যামন এ্যাণ্ড পীথিয়াস', 'দি রিভোল্ট অফ দি শ্লেভস', 'দি ট্রজান ওয়ার', 'এ্যাটলাণ্টি', 'দি টারটারস', 'ক্যারাওস উওম্যান', 'দি কলোসাস অফ রোডস', 'সন্স অফ সামসন' এবং 'লাস্ট অফ দি ভাইকিংস' ইত্যাদি ছবির জনপ্রিয়তা ইটালীয় চিত্র-নির্মাতাদের ক্রমশঃই 'ঐতিহাসিক' করে ফেলছে। কিন্তু আমেরিকায় এই ধরণের ঐতিহাসিক চিত্র নিয়ে সম্প্রতি কিছু প্রশ্ন উঠেছে। প্রায়শঃই এই ধরণের ছবিতে ইতিহাসের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কোনো রকমে কাহিনীর চরিত্রকে ইতিহাসের পোশাক পরিয়ে রোমের ধ্বংসস্তূপের বহির্দৃশ্য সংযুক্ত করে 'ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর' ছবি বলে বাজারে ছাড়া হয়। স্বভাবতঃই কিশোর মনে এই ধরণের ইতিহাস-বিকৃত ছবি খুব একটা সুস্থ প্রভাব বিস্তার করে না। এই প্রসঙ্গে 'থ্রি হ্যাণ্ড্রেড স্পার্টান' নামক ছবিটির নাম করা যেতে পারে। ছবিটি যথারীতি যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে গ্রীসের পটভূমিতে তোলা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে থার্মোপলির ইতিহাস-বিশ্রুত যুদ্ধ এই চিত্রে দেখানো হয়েছে তা বাস্তবিকই হাস্যকর। স্পার্টানরা যেভাবে পারসীক সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে যে দেখলে মনে হয় একদল আমেরিকান সৈন্য রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। রাজা লিওনিডেস-এর যুদ্ধ-হুংকার অনেকটা যেন আমেরিকান অশ্বারোহী সৈন্যের ক্যাপ্টেনের মতই। ওয়েস্টার্ণের ছবিরই যেন নতুন সংস্করণ এই ধরণের বাণিজ্যিক ইতিহাসাশ্রয়ী ছবিগুলো।

॥ আমেরিকার বক্স-অফিস ॥

মিরিশ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্যামুয়েল গোল্ডউইন স্টুডিওতে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি সাক্ষাৎকারে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড মিরিশ বলেছেন যে, হলিউডে যে সম্প্রতি একটি ধারণা চালু হয়েছে যে, আমেরিকান ছবির সাফল্য স্বদেশের চেয়ে বিদেশের, বিশেষ করে ইউরোপীয় বাজারের ওপর বেশী নির্ভর করে তার মূলে বিশেষ ভিত্তি আছে বলে তিনি মনে করেন না। শ্রীযুক্ত মিরিশ তাঁর চিত্র-প্রতিষ্ঠানের নির্মিত ছবিগুলির ব্যবসায়িক খতিয়ান প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের ছবিগুলো শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ অর্থ আমেরিকার দর্শকদের থেকেই এসেছে।" এই প্রসঙ্গে কয়েকটি চিত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, 'দি অ্যাপার্টমেণ্ট' (১৯৬০ সালে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত) ছবির নির্মাণ খরচ ছিল আঠাশ লক্ষ ডলার। ছবিটি মোট এক কোটি ডলার অর্থ উপার্জন করে এবং তার মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ ডলার এসেছে স্বদেশ থেকে। মেরিলীন মনরো অভিনীত 'সাম লাইক ইট হট' নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল আটাশ লক্ষ, এবং চিত্রের মোট এক কোটি তিরিশ লক্ষ ডলার উপার্জনের মধ্যে ছিয়াত্তর লক্ষ ডলার দিয়েছেন আমেরিকার দর্শকগণ। তবে শ্রীযুক্ত মিরিশ স্বীকার করেন যে, ওয়েস্টার্ণ ছবির বাজার আমেরিকার চেয়ে বিদেশেই বেশী। 'দি ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন' আমেরিকা থেকে পেয়েছে চব্বিশ লক্ষ ডলার এবং বিদেশ থেকে আটচল্লিশ লক্ষ। হলিউডের চিত্র-প্রযোজকরা যে স্বদেশের দর্শকমণ্ডলীকে উপেক্ষা করে বিদেশী রুচিকে চিত্র নির্মাণে প্রাধান্য দিচ্ছেন তার ফলেই কিছু কিছু আমেরিকান ছবি বক্স-অফিসধন্য হতে পারছে না বলে শ্রীযুক্ত হ্যারল্ডের ধারণা। উদাহরণস্বরূপ তিনি বিলি ওয়াইল্ডারের 'ওয়ান-টু-থ্রি' ছবিটির উল্লেখ করেন। ছবিটি ওয়াইল্ডারের অন্যান্য ছবির মত অর্থ-প্রসবিণী না হওয়ার একমাত্র কারণ এই ছবি নির্মাণে মার্কিনী রুচিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। —চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

দিল্লীর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ-পশ্চিম জার্মাণীর প্রথম এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে জার্মাণী ১০টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করেছে। বাকি ৮টি অনুষ্ঠানে জয়ী হয়েছে ভারতবর্ষ। প্রতিযোগিতার ১০টি অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে এবং ৫টি বিষয়ে পূর্ব রেকর্ডের সমান হয়েছে। নতুন ভারতীয় রেকর্ডের মধ্যে ভারতবর্ষের ভাগে পড়েছে ৩টি—১,৫০০ মিটার দৌড়, সটপুট এবং ৪×৪০০ মিটার রীলে। তাছাড়া ভারতবর্ষের গুরুবচন সিং ১১০ মিটার হার্ডলস এবং হাইজাম্পে জয়ী হয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব রেকর্ডের সমান করেন। দৌড় অনুষ্ঠানে জার্মাণীর জয় ৬ এবং ভারতবর্ষের ৫। ফিল্ড অনুষ্ঠানেও জার্মাণী একের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়—জার্মাণীর জয় ৪ এবং ভারতবর্ষের জয় ৩। সমস্ত অনুষ্ঠানে জার্মাণীর তুলনায় ভারতবর্ষ সর্বাধিক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে। দৌড় অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থান ৭টা, জার্মাণীর সেখানে শূন্য এবং ভারতবর্ষের তৃতীয় স্থান ৫, জার্মাণীর ২। ফিল্ড অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থান ৬, জার্মাণীর ৫ এবং ভারতবর্ষের তৃতীয় স্থান ৫, জার্মাণীর ৪। পয়েন্টের মাপকাঠিতে দুই দেশের যোগ্যতা বিচার করলে ভারতবর্ষ শীর্ষ স্থান পায়। কিন্তু যেহেতু এই টেস্ট অনুষ্ঠানের পূর্বে ফলাফল পয়েন্টের ভিত্তিতে বিচার হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন চুক্তি হয়নি সে ক্ষেত্রে দুই দেশের এই প্রথম টেস্ট ক্রীড়ানুষ্ঠানটি কেবল তিনটি স্থানের (১ম, ২য় এবং ৩য়) ফলাফলের উপরই বিচার করা হয়েছে। তাছাড়া একেবারে শেষ সময়ে দিল্লীর প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দেওয়া হয়। এঁরা পূর্ব-ঘোষিত ভারতীয় দলের নামের তালিকায় ছিলেন না। ফলাফলের তালিকায় দিল্লীর সুর্জনকুমার, গুরুদীপ সিং এবং আমারিক সিংয়ের নামের পাশে ভারতবর্ষের পরিবর্তে দিল্লী উল্লেখ করা হয়েছে। পয়েন্টের ভাগ-বাটোয়ারার পক্ষে এ-সব খুবই অসুবিধার কারণ। আশা করা যায়, যোধপুরের পরবর্তী দ্বিতীয় টেস্ট ক্রীড়ানুষ্ঠানের আগেই পয়েন্ট বন্টন সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হবে।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষই কেবল দুটি অনুষ্ঠানে একক প্রাধান্য অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। ভারতবর্ষের এই একক সাফল্য লংজাম্প এবং হাইজাম্পে। এদিক থেকে একই অনুষ্ঠানে জার্মাণ দলের সাফল্য মাত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ (১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়)। ভারতবর্ষ একই অনুষ্ঠানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে—১,৫০০ মিটার দৌড়, ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে। সুতরাং একক প্রাধান্যের দিক থেকেও জার্মাণ দলের তুলনায় ভারতবর্ষ বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

	১ম	২য়	৩য়
জার্মাণী	১০	৫	৬
ভারতবর্ষ	৮	১৩	১০

আন্তর্জাতিক পয়েন্টের গণনায় ভারতবর্ষের পয়েন্ট দাঁড়ায় ১৬৮, জার্মাণীর ১৩৮ এবং দিল্লীর ২৪।

ব্যক্তিগত সাফল্য

ভারতবর্ষের গুরুবচন সিং হাই-জাম্প এবং ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান লাভ করেন।

জার্মাণ দলের ভার্ণারফন মল্টক পোলভল্ট এবং ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান এবং সটপুটে তৃতীয় স্থান পান।

জার্মাণ দলের ম্যানফ্রেড বক ১১০ মিটার হার্ডলসে দ্বিতীয় এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ

রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকা এই চারটি মহাদেশের ৩৬টি দেশ যোগদানের জন্যে নাম দিয়েছিল; কিন্তু ভারতবর্ষের পুরুষ এবং মহিলা ভলিবল দল নির্দিষ্ট সময়ে খেলায় উপস্থিত না হওয়াতে প্রতিযোগিতা থেকে ভারতবর্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়। রাশিয়ার মস্কো, লেনিনগার্ড, কিভ এবং রীগা এই চারটি স্থানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুষ বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন রাশিয়া ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে এবারও শীর্ষ স্থান লাভ করে।

দিল্লীতে পশ্চিম জার্মাণ এ্যাথলেটিক দল: নয়াদিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে আগন্তুক দলের সঙ্গে ভারতীয় এ্যাথলীট পদ্মশ্রী মিলখা সিংকে (বাম থেকে চতুর্থ) দেখা যাচ্ছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ১৬ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পায়। তৃতীয় স্থান পায় রুমানিয়া।

মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় জাপান।

॥ বিশ্ব পেণ্টাথলোন ॥

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মডার্ণ পেণ্টাথলোন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া দলগত এবং ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া উপর্যুপরি পাঁচবার খেতাব লাভ করলো।

চূড়ান্ত ফলাফল ঃ ১ম রাশিয়া ১৫,২০৩·৭৬ পয়েণ্ট, ২য় হাঙ্গেরী ১৩,১৯০ এবং ৩য় আমেরিকা ১২,৪২০ পয়েণ্ট।

॥ আই এ এফ হকি দল ॥

ভারতীয় বিমান বাহিনী হকি দল ইংল্যাণ্ড সফর শেষ ক'রে স্বদেশে ফিরে এসেছে। ইংল্যাণ্ড সফরে এই দলটি সাতটা খেলায় যোগদান ক'রে মাত্র একটা খেলায় হার স্বীকার করে। সফরের শেষ খেলায় হার স্বীকার না করলে তারা অজেয় রেকর্ড করতো। সফরে ভারতীয় দল সাতটি খেলায় ২৮টা গোল দিয়ে মাত্র ৫টা গোল খায়। ভারতীয় দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মহাজন একাই ১১টা গোল দেন। ভারতীয় দল সফরের শেষ খেলায় ০—১ গোলে হকি এসোসিয়েশন দলের কাছে পরাজিত হয়। এই খেলায় সামরিক দলের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের সাত-জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন।

॥ নতুন বিশ্ব রেকর্ড ॥

উত্তর কোরিয়ার বার্ষিক ক্রীড়া-নুষ্ঠানে মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সীন কিউম ডান ৫১·৯ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে সরকারীভাবে অনু-মোদীত বিশ্ব রেকর্ড ঃ ৫৩·৪ সেকেণ্ড —মারিয়া ইর্টকিনা (রাশিয়া)।

॥ ডুরাণ্ড কাপ ও সুব্রত কাপ ॥

বর্তমানের জাতীয় সংকট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা বাতিল করা হয়েছে। দিল্লীতে ১লা নভেম্বর থেকে সুব্রত কাপ এবং ১৪ই নভেম্বর থেকে ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল।

॥ রড লেভার পরাজিত ॥

বর্তমান সময়ের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া'র রড লেভার স্বদেশবাসী বব হিউইটের কাছে কুইন্সল্যাণ্ড লন টেনিস প্রতি-যোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালের প্রথম শ্রেণীর টেনিস প্রতিযোগিতায় লেভারের এই প্রথম পরাজয়। হিউইটের কাছে লেভারের পরাজয় এই প্রথম নয়। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, রড লেভার ১৯৬২ সালের অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করে একই বছরে বিশ্বের এই চারটি বিশিষ্ট প্রতিযোগিতায় জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ছাড়া এ সম্মান আর কেউ পান নি।

বিশ্ব লন টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা

আমেরিকার প্রখ্যাত টেনিস বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড পোর্টার বিশ্বের লন টেনিস খেলোয়াড়দের গুণানুসারে বেসরকারী-ভাবে একটি ক্রমপর্যায় তালিকা প্রতি বছর প্রকাশ ক'রে থাকেন। তাঁর ১৯৬২ সালের তালিকায় পুরুষ বিভাগে নির্বাচিত দশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ারই চারজন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন—প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং সপ্তম। ভারতবর্ষের রমানাথন কৃষ্ণানকে তালিকায় নবম স্থান দেওয়া হয়েছে।

মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান ছাড়া অস্ট্রেলিয়া আর কোন স্থান পায়নি।

ক্রমপর্যায় তালিকা

পুরুষ ঃ (১) রড লেভার (অস্ট্রে-লিয়া), (২) রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া), (৩) ম্যানুয়েল স্যাণ্টানা (স্পেন), (৪) নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), (৫) চার্লস ম্যাকিনলে (আমেরিকা), (৬) জ্যান এরিক ল্যাণ্ডকুইস্ট (সুইডেন), (৭) মার্টিন মুলিগ্যান (অস্ট্রেলিয়া), (৮) র‍্যাফেল ওসুনা (মেক্সিকো), (৯) রমা-নাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ), (১০) ফ্রেড স্টোল (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলা ঃ (১) মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), (২) মেরি বুনো (ব্রেজিল), (৩) ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা), (৪) ক্যারেন সুসম্যান (আমেরিকা), (৫) রেনি স্কুরম্যান (দঃ আফ্রিকা), (৬) এ্যানে হেডন (ইংলণ্ড), (৭) ভেরা সুকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া), (৮) স্যানড্রা প্রাইস (দক্ষিণ আফ্রিকা), (৯) ক্যারোল ক্যাল্ড-ওয়েল (আমেরিকা), (১০) বিলি মোফিট (আমেরিকা)।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতি-যোগিতায় ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে মেক্সিকো ৩-২ খেলায় শক্তিশালী সুইডেনকে পরাজিত ক'রে ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেক্সিকোর সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত। আমেরিকান জোনের সেমি-ফাইনালে মেক্সিকো শক্তিশালী আমেরিকাকে ৪-১ খেলায় পরাজিত ক'রে প্রথম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই জোনের ফাইনালে তারা যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে।

সকলেরই ধারণা ছিল, ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় সুইডেন জয়লাভ করবে। এ ধারণার মূলে ছিল সুইডেনের বিগত কয়েক বছরের সাফল্য। প্রথম দিনের সিঙ্গলস খেলায় সুইডেন জয়ী হয়ে ১-০ খেলায় অগ্রগামীও হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের ডাবলস এবং দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় মেক্সিকো জয়লাভ ক'রে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার ফলাফল সমান হলে মেক্সিকো ৩-২ খেলায় জয়লাভ করে। এর আগে মেক্সিকো কখনও ডেভিস কাপ প্রতি-যোগিতার এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি।

আগামী ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে ভারতবর্ষ বনাম মেক্সিকোর ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলা শুরু হবে দিল্লীর জিমখানা কোর্টে। এই খেলায় যে দেশ জয়লাভ করবে তারাই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ ফাইনালে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে।

টেনিস খেলার পণ্ডিত মহলের মতে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মেক্সিকোর খেলার সম্ভাবনাই বেশী।

মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেট

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইয়ের এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানী একাদশ দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৫ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকার দরুণ চিদাম্বরম একা-দশ দলকে পরাজিত করেছে। চিদা-ম্বরম একাদশ দলের পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুজন খ্যাতনামা ফাস্ট বোলার কিং এবং গিলক্রিস্ট যোগদান করেছিলেন।

পলি উম্রিগড়

প্রায় কুড়ি বছর বিরতি থাকার পর হায়দরাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রতিযোগিতাটি পুনরায় এই বছরে আরম্ভ হল।

...রাদিনের এই ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে এ সি সি একাদশ দল ৬ উইকেট খুইয়ে ২০৫ রান করে। চিদাম্বরম একাদশ দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ ফাইনাল খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর শূন্য স্থানে আব্বাস আলী বেগ যোগদান করেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে এ সি সি একাদশ দলের প্রথম ইনিংস এক ঘন্টা স্থায়ী ছিল। ২৭৩ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিনে চিদাম্বরম একাদশ দল ৩ উইকেটে ১৪৮ রান করে।

খেলার তৃতীয় দিনে প্রায় লাঞ্চের সময় চিদাম্বরম একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ২৪৮ রানে শেষ হলে এ সি সি একাদশ দল ২৫ রানে অগ্রগামী হয় এবং এই ২৫ রানই শেষ পর্যন্ত এ সি সি একাদশ দলকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করে। এইদিনে এ সি সি একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তিন উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান তুলে। দলের প্রথম তিনটে উইকেট মাত্র ৩৯ রানে পড়ে যায় (গিলক্রিস্ট ২ এবং কিং ১)। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে উম্রিগড় এবং নাদকার্ণী দলের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেন। তাঁরা যথাক্রমে ৫৩ এবং ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন এবং তাঁদের জুটিতে এই দিনে ৯২ রান ওঠে।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে এ সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৭ রানে শেষ হয়। দলের ২০৫ রানের মাথায় নাদকার্ণী আউট হলে চতুর্থ উইকেটের নাদকার্ণী এবং উম্রিগড়ের জুটি ভেঙ্গে যায়। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে তাঁরা ১৭৭ মিনিটে দলের ১৬৬ রান তুলে দেন। উম্রিগড় এই খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (১০৪ রান) করার কৃতিত্ব লাভ করেন। দলের ২৪৩ রানের মাথায় উম্রিগড় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার কিংয়ের বলে ক্যাচ তুলে সিভাজকরের হাতে ধরা পড়েন। এই সময়ে এ সি সি দল ২৬৮ রানে অগ্রগামী ছিল। কিন্তু অধিনায়ক মন্ত্রী ইনিংস সমাপ্তির ঘোষণা করেননি। এ সি সি একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস যখন ২৮৭ রানে শেষ হয় তখন খেলা শেষ হ'তে আর ১৬৫ মিনিট বাকি ছিল এবং চিদাম্বরম দলের জয়লাভের জন্য ৩১৩ রানের প্রয়োজন ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান করা অসম্ভব দেখে চিদাম্বরম দলের খেলোয়াড়রা পিটিয়ে খেলে যান। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় চিদাম্বরম দলের ২২৬ রান উঠেছে ৮টা উইকেট পড়ে।

বাপু নাদকার্ণী

এ সি সি একাদশ : ২৭৩ রান (নাদকার্ণী ৯৮, উম্রিগড় ৬০, ওয়েদাকার ৫৫। কিং ৫৩ রানে ৪ উইকেট, গিলক্রিস্ট ৪০ রানে ১ উইকেট) ও **২৮৭ রান** (উম্রিগড় ১০৪, নাদকার্ণী ৭৭। কিং ৬১ রানে ৩, কুমার ৮০ রানে ৩, গিলক্রিস্ট ২৯ রানে ২, মঞ্জরেকার ২৬ রানে ২ উইকেট)।

চিদাম্বরম একাদশ : ২৪৮ রান (আব্বাস আলী বেগ ৬৯, শের মহম্মদ ৪৬, মঞ্জরেকার ৪৩। উম্রিগড় ৯৭ রানে ৩ এবং নাদকার্ণী ৮৮ রানে ৬ উইকেট) ও ২২৬ রান (৮ উইকেটে। শের মহম্মদ ৪৮, আব্বাস আলী বেগ ৪০ এবং কিং ৩৫। দেশাই ৩৭ রানে ২, ওয়াদেকার ৩০ রানে ২ এবং মন্ত্রী ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

॥ সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড ॥

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার এবং কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠান আগামী ২২শে নভেম্বর থেকে শুরু হবে। এই উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু দল নির্বাচনের জন্যে যে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে কম পক্ষে ৯টি নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

সতের বছরের স্কুল-ছাত্র কেভিন বেরী একাই তিনটি বিষয়ে ২২০ গজ, ২০০ মিটার এবং ১১০ গজ বাটারফ্লাই অনুষ্ঠানে বিশ্বরেকর্ড করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

অলিম্পিক বিজয়িনী কুমারী ডন ফ্রেজার ১১০ গজ ও ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৫৯-৯ সেকেন্ডে উক্ত পথ অতিক্রম করে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এক মিনিটের কম সময়ে বিশ্বরেকর্ড করার গৌরব লাভ করেন। ডন ফ্রেজার ১১০ গজ বা ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে তাঁরই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ১ মিনিট সময়ের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। কুমারী ফ্রেজারের বয়স ২৫ বছর। গত ছ'বছর ধরে তিনি বহু বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

নতুন বিশ্বরেকর্ড

পুরুষ বিভাগ : ২২০ গজ, ২০০ মিটার (২ মিনিট ৯-৭ সেকেন্ড) ও ১১০ গজ বাটারফ্লাই (৫৯-৪ সেঃ)—কেভিন বেরী; ৪৪০ গজ ফ্রি-স্টাইল রীলে (৩ মিঃ ৪৫-১ সেঃ)—মারে রোজ, পিটার ডোয়াক, ডেভিড ডিকসন এবং পিটার ফেলপস।

মহিলা বিভাগ : ১১০ গজ ও ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল (৫৯-৯ সেঃ) অনুষ্ঠানে ডন ফ্রেজার দুবার বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেন; ৪৪০ গজ ফ্রি-স্টাইল রীলে (৪ মিঃ ১৩-৮ সেঃ)—রুথ ইভার্স, রবিন থর্ণ, লিন বেল এবং ডন ফ্রেজার।

॥ পিটার স্নেল এবং ব্রুমেল ॥

নিউজিল্যান্ডের পিটার স্নেল এবং রাশিয়ার ভ্যালেরি ব্রুমেলকে অস্ট্রেলিয়ার স্পোর্টসমেনস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'বৎসরের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট' সম্মানে অভিনন্দিত করা হয়েছে। এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত বিশ্ব বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান ওয়ালটার লিন্ডাসের স্মরণার্থে তাঁরই নামানুসারে 'লিন্ডাস ট্রফি' প্রতি বছর নির্বাচিত এ্যাথলীটদের দেওয়া হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের বিরাট গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

["রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় তথা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বইখানি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংকলন। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গ্রন্থের গভীরে প্রবেশ করে যে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা বাস্তবিকই উচ্চ-প্রশংসার দাবী রাখে। কবিতাগুলির উপর কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য করে সহজেই কর্তব্য সম্পাদন না করে যে রকম পংক্তি ধরে ধরে নিখুঁত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেছেন, তা বাংলার সমালোচকদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর আপনার সমালোচনাগুলির যা ভাষা তা আপনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।"......]

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের

লাবণ্যের এনাটমি ৩·০০

[বিষয়সূচী : স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম : লাবণ্যের এনাটমি : বর বড় না কনে বড় : অলকে কুসুম না দিও : —ইত্যাদি চারিটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। লেখক বলেন, "লাবণ্যের এনাটমি হয়, এ কথা অনুবীক্ষণ দেখতে দেখতে আমার প্রথম মনে হয়। ভাষার নৌকায় তা সর্বসাধারণে আমদানি করতে এসে দেখি আমি এসে পড়েছি কূলহারা কোন রসের সরোবরে। বিজ্ঞানে আনন্দ পাবার ও খুশী করবার এত পসরা আছে তা জানতে পেরে স্থির হয়ে থাকা যায় না। তাই এ পসরা বহন করে এনে দেখি—হাসি উঠল, নৌকা দুলল। রসিকতার হাটে হাঁড়ি ভেঙেই আগেভাগে স্বীকার করে রাখছি—রসিকদের সঙ্গে রসিকাদের 'যুদ্ধং দেহি' করে দেওয়া আমার আদপেই ইচ্ছা নয়। এ লেখা পড়ে কেউ যদি লাবণ্যধন্য হন, তা হলেই জানব আমার পসরা ঠিক দামেই বিকিয়েছে। কারণ লাবণ্যের যেমন এনাটমি হয়, তেমনি এনাটমিরও লাবণ্য আছে।"......]

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের

বাংলা কাব্যে শিব ১০·০০

[লেখক শৈব সাহিত্য পর্যায়ে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র থেকে দ্বিজ রামচন্দ্র এবং অন্যান্য স্বল্পখ্যাত কবিদের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।......একেবারে সাম্প্রতিক কাব্য বাদ দিলে লেখক বাংলা কাব্যের প্রায় সব যুগের শিবরূপের আলোচনা করেছেন।]

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

সদ্য প্রকাশিত

'বনফুল'-এর

দশ ভাগ ও আরও কয়েকটি ৫·০০

[সর্বমোট পনেরোটি একাঙ্ক নাটিকায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ]

সম্প্রতি প্রকাশিত

'বনফুল'-এর

গল্প-সংগ্রহ ৮·৫০

(প্রথম শতক)

[একশতটি গল্পের সংকলন]

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

হিমাচলম্ ৩·৫০

শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮·০০

[দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী, নাট্যকাব্য (সীতা, পাষাণী, সোহরাব রুস্তম, ভীষ্ম), সংগীত, কাব্যগ্রন্থ, জাতীয় সংগীত, ধর্ম-সংগীত, প্রেম-সংগীত ও খণ্ড-কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির সংকলন।]

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের

বঙ্কিমচন্দ্র ৫·০০

[বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ ক্ষেত্রে দিকপাল হেমেন্দ্রপ্রসাদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানি হেমেন্দ্রপ্রসাদের একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি ও মতবাদসমূহের এমন বিশ্লেষণমূলক, যুক্তিবলিষ্ঠ ও প্রমাণসহ ব্যাখ্যা একমাত্র হেমেন্দ্র-প্রসাদের মত সুপণ্ডিত ও ভূয়োদ্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।]

ডীন অফ্ দি ফ্যাকালটি অব ড্রামা—রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়;
মেম্বার, বোর্ড অফ্ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়;
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০,

সেকালের নট ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্র ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ :

"......নাট্যমঞ্চ বা ছায়াছবির কর্মশালায় বা নাট্য আকাদমির দেব-দেউলেই সব অঞ্জলি আমার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এলাম, সেদিনও ভাবিনি, আমার শিল্পী-জীবনের শেষ যবনিকাখানি পড়ে যেতে এখনো অনেক বাকি আছে। শিল্পী-জীবনের যবনিকা টেনে দিয়ে মরু-জীবনের যবনিকা পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো পঠন-পাঠন নিয়ে এই তো অভিলাষ ছিলো! কিন্তু, দেখা গেল, আমার শিল্পী-জীবনের নিয়ন্তা আমি নই, সেখানে আরও এক অমোঘ শক্তির প্রচণ্ড অভিলাষ অনুক্ষণ তার লীলা-সঞ্চালন করে চলেছে!

পাদ-প্রদীপের আলো থেকে আত্মগোপনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে গিয়েও দেখতে পেলাম, আরেক আলো এখানে জ্বলে উঠেছে। পাদ-প্রদীপ এখানে এসে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। দিনের পর দিন সেই কম্পমান স্মৃতি-শিখার দিকে তাকাতে-তাকাতে মনে হলো,—আমিও যে মিশে আছি স্মৃতির রাজ্যে—স্মৃতির মানুষগুলির সঙ্গে! মনে হলো,—আমি নিজেও তো এক স্মৃতি! এবং সেই স্মৃতির ছায়াছবিরা আর ত কোনদিন ফিরে আসবে না!......"

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪-২৬৪১ গ্রাম 'কালচার'

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৭	সম্পাদকীয়		
৮৮	দুনৌকো	(কবিতা)	—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৮৮	ঋণ	(কবিতা)	—শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়
৮৮	ও রূপ তোমার বড়ো মায়াময়	(কবিতা)	—শ্রীপুষ্কর দাশগুপ্ত
৮৯	পূর্বপক্ষ		—শ্রীজৈমিনি
৯১	ছোটগল্পে ধূর্জটিপ্রসাদ		—শ্রীভূদেব চৌধুরী
৯৪	মতামত :		—শ্রীশক্তি বসাক, শ্রীনারায়ণ সাহা, শ্রীমাধব মজুমদার ও শ্রীগায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়
৯৫	সে	(গল্প)	—শ্রীঅমরেশ দাশ
১০৭	ভবঘুরের খাতা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১০৯	মেঘের উপর প্রাসাদ	(উপন্যাস)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১১৩	ভিনদেশী ছবির সচিত্র কাহিনী : ব্যাক স্ট্রীট		—শ্রীকণাদ চৌধুরী
১১৭	নোবেল পুরস্কার		

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খন্ড, ২৭শ সংখ্যা—মূল্যে ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৩শে কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th November, 1962.
40 Naya Paise

খৃষ্টজন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এদেশে এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অলোকসামান্য প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয় যাঁহাকে ইতিহাসে ও পুরাণে চাণক্য ও কৌটিল্য নামে খ্যাত করা হয়। ইঁহার "অর্থশাস্ত্র" নামক পুস্তকে রাষ্ট্ররক্ষা ও রাষ্ট্রচালনের যে সকল নীতি বিবৃত ও বর্ণিত আছে সেগুলি এরূপ কঠোর ও দৃঢ়ভাবে যুক্তিসিদ্ধ যে তাঁহার পরবর্তী বাইশ শত বর্ষের ভারত-ইতিহাস তাহার সারবত্তাই প্রমাণ করিয়াছে।

আমাদের কর্ণধারগণ কথায় কথায় ভারতের 'চিরাচরিত আদর্শ' আমাদের ইতিহাসগ্রথিত 'ন্যায়ধর্ম ও নীতি' ইত্যাদি বাক্য শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু যে অর্থশাস্ত্রে লিখিত রাষ্ট্রনীতির উপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তিগুলি চাণক্যের সময় হইতে খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ঐ মহাশয়গণ এক কথাও বলেন না।

বাস্তব জগৎ এখনও শ্বাপদ-সংকুল দুর্গম অরণ্যেরই মত এবং সেই জগতে এখনও অনেক হিংস্র ও প্রবল রাষ্ট্র রহিয়াছে যাহাদের বিচারে সকল অধিকার সকল ন্যায়নীতি একমাত্র শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শক্তিহীন তাহার কোনও অধিকার প্রবলের কাছে গ্রাহ্য নয়। অধিকার বিচারের একমাত্র পথ এখনও শক্তিপরীক্ষাই। যে দুর্বল তাহার একমাত্র ভরসা প্রবলের কৃপা বা মিত্রশক্তির সাহায্য। আবার যে নির্বোধ অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বলপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় নাই তাহাকে প্রস্তুতির অভাবজনিত দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইতেই হইবে।

আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছেও তাই। পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সকল কিছুর ভার ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর হস্তে এবং প্রতিরক্ষার ভার ছিল শ্রীকৃষ্ণ মেনন মহাশয়ের উপর। একজন অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্নমন বাক্যবাগীশ, অন্যজন পরমবুদ্ধিমন্ত, বাচাল ও বিপরীত বিচারে পটু—বিশেষে যেখানে শত্রু-মিত্রের প্রভেদ করার প্রয়োজন ঘটে। একজন "বসুধৈব কুটুম্বকম" জ্ঞানে শত্রু-মিত্রের প্রভেদজ্ঞান বর্জন করিয়া আসিতেছেন, অন্যজন বাক্যজালে দিগ্বিজয়ে বিশ্বাসী, এবং তাঁহার বাম অক্ষির বক্রদৃষ্টির গতি সাধারণজনের সহজ পথের অতীত। সুতরাং এক কথায় আমরা বিপদকে ডাকিয়া ঘরে আনিয়াছি।

অন্যদিকে এই দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে পনেরো বৎসরের স্বাধীনতা বৃথায় যায় নাই। দেশরক্ষা ও শত্রু-প্রতিহত করার আহ্বানে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্বরে সাড়া দিয়াছে এবং সর্বস্ব পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংস্র আক্রমণ দেশের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে। এবং সেই শক্তি যে কিরূপ অপরিমিত তাহার সামান্য প্রমাণ বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধে প্রায় আঠারো লক্ষ ভারতীয় সেনা জগৎবিস্তৃত রণাঙ্গনে দেখাইয়াছে। ভারতীয় জওয়ান যে কি প্রকার দুর্ধর্ষ তাহা যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে—এবং পুনরায় হইবে।

এইখানেই চীনের কূটনীতিবিদগণের ভুল হইয়া গিয়াছে। এদেশের কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চীন কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে; ভারতের শাসনতন্ত্র মেরুদন্ডহীন এবং প্রায় বিকল। চীনসেনা উত্তর সীমান্তে প্রবল আঘাত করিলেই ঐ শাসনতন্ত্র পড়িয়া যাইবে এবং সমস্ত দেশ চীনের পঞ্চমবাহিনীর করতলগত হইবে। এখনও চীন বেতারে যে বার্তা ভারতের উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে তাহাদের সে বিশ্বাস এখনোও আছে। হয়ত ঐ পঞ্চমবাহিনীর কোনও প্রচ্ছন্ন বেতারপ্রেরকযন্ত্রে তাহারা সেই কথাই শুনিতেছে। দেশে ঐরূপ প্রচ্ছন্ন প্রেরকযন্ত্র থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়, কেননা বাংলার এক মন্ত্রীই সেদিন বলিয়াছেন যে, একটি বিশ্বাসঘাতকের দল এখনও প্রকাশ্যে চীনের সমর্থন করিয়া দেশের লোককে প্রতিরক্ষা চেষ্টায় সাহায্য দিতে নিষেধ করিতেছে। একথাও এখানে বলিতে হয়—বলিহারি ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স!

যাহা হউক এখন প্রশ্ন অস্ত্র-সরঞ্জামের এবং আমাদের কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধির—সেই বিষয়েই।

মনে পড়ল

এই পর্যায়ে 'অমৃতে'র প্রতি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশিত হবে অচিরে। শুরু করছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ, কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে সুলিখিত রচনা পেলেও তা সাদরে প্রকাশ করা হবে।

কবিতা

দু' নৌকো

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দু' নৌকোয় পা দিলে কোনো আশা নেই
তবুও কেন যে আমি পা দুটো বাড়াই?

বাতাস সুগন্ধে কেন বাজায় বাঁশি?
ফেরবার ইচ্ছে তবু বলি আসি-আসি।
অন্ধকার নদী-ভরা এক কলোচ্ছ্বাস
তোমাকে দেখলে কেন মনে হয় অনন্ত আকাশ?

কেন বল এতো রূপ এতো রস এতো গন্ধ স্বাদ
এতো ভালো-লাগা আর ঘুম-ছাড়া রাত?

ঋণ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সব থেকে বেশি দীর্ঘ রাজ্য জয় করেছে সংগীত।
পৃথিবীর জন্ম থেকে, তারো আগে নিখিল আকাশে
বেজেছে গভীর বীণা সে সকল শুনিনি তবুও
বৃক্ষে মেঘে জল স্থলে সেই স্বর লেগে আছে কিছু;
লেগে আছে আমাদের কন্ঠে সুখে বিষাদে নৈরাশে।
কেহ গায়, কেহ তার তলা থেকে কুড়ায় বকুল;
বকুলও হঠাৎ বাজে, বেহালার মত তীব্র টানে
বেজে ওঠে, কেহ শোনে, কেহ যায় নিতান্ত বধির।

অমন বকুল আমি বনতলে অনেক দেখেছি।
শুনেছি গহন গান, কুড়ায়েছে যেসব আঁচল
তাদেরও রেখেছি মনে, ভুলি নাই যেহেতু মানুষ
স্মরণ হারালে শুধু মনহীন কাঠ, খড়, ছবি!
জন্ম থেকে শুনি আমি চলে যাব, হয়ত কেবল
সংগীতের কাছে ঋণ থেকে যাবে, আর সে বকুল।

ও রূপ তোমার বড়ো মায়াময়

পুষ্কর দাশগুপ্ত

যেনবা স্বপ্নের সৃষ্টি বিকশিত তনু, রূপময়!
নিকটে দাঁড়ালে এসে প্রতিবেশ পরিচিত, ম্লান,
মুহূর্তেই অন্যরূপ—রূপান্তরে সুরম্য উদ্যান;
এবং অস্তিত্বে যেন সুরভিত বিহ্বল সময়।

দেহের প্রতিটি ভঙ্গি নিরুপম। সৌন্দর্য নির্ভার
সজ্জিত সুঠাম অঙ্গে; স্মিত মুখ, আয়ত নয়ন,
চূর্ণিত কুন্তল নিয়ে হাওয়ার প্রণয়। অনুক্ষণ
রহস্য তোমাকে ঘিরে; স্থির, মগ্ন দীপ্তি সুষমার।

ও রূপ তোমার বড়ো মায়াময়। নিশীথে—নির্জনে
একাকী দাঁড়াও তুমি স্তব্ধতায়: জ্যোৎস্নার প্রগাঢ়
কুহকে বিমুগ্ধ দিক; নিবিড়, গোপন নিঃসরণে

কোমল চন্দন-গন্ধে সমস্ত প্রান্তর ভরে গেলে—
মনে হয় তুমি যেন চকিতে অদৃশ্য হতে পার,
মোমের শিখার মতো, সুন্দর, উজ্জ্বল ডানা মেলে।

পূর্বপক্ষ

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে।...

কলকাতা শহরে আমলকি গাছ নেই, অন্তত আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু শীত এসে গেছে এটা এখন স্পষ্টই অনুভব করা যাচ্ছে। গরম জামাকাপড় এখনো ন্যাপথলিনের সুখ-সংসর্গ থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের অঙ্গশোভা বাড়ায়নি বটে, কিন্তু শেষ রাতে ঘুমের মধ্যে গায়ে একটা চাদর টেনে নেওয়ার আবেগ অনুভব করা যাচ্ছে।

হয়তো এত তাড়াতাড়ি শীতের আগমন ঘটত না, কয়েকদিন আগের ঝড়-বৃষ্টিই এর কারণ। তবে হাওয়ার গতি এখন যেভাবে মোড় নিয়েছে তাতে বঙ্গোপসাগরে চট ক'রে একটা বড় রকম গর্ত তৈরি হ'য়ে বর্ষার পুনরভ্যুদয় ঘটবে এমন আশঙ্কার হেতু দেখা যাচ্ছে না।

অতএব শীত এসে গেছে। বর্ষার কয়েকমাসে বাজার নিয়ে যাঁরা ব্যাজার হ'য়ে বাড়ি ফিরেছেন, ধীরে ধীরে তাঁদের চোখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠবে। নয়নশোভন কপি, নধর বেগুন, সতেজ কলাই শুঁটি এবং নানাবিধ শাক-শব্জি বাজারের বৈচিত্র্য ঘোষণা করবে। তাছাড়া ভেটকি, চিংড়ি ইত্যাদি সুস্বাদু মাছেরও শুভাগমন ঘটবে। কিন্তু দাম কী রকম থাকবে সেবিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না। (যদিও চেষ্টা হবে কমিয়ে রাখবার দিকেই)।

তবে দাম যাই হোক, কেনাবেচা ঠিকই চলবে। মাছের দর যখন ছ'টাকায় উঠেছিল তখনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাড়ে চারটাকাতেও হবে না। আমাদের বাজার খরচের সম্প্রসারণশীলতা অসাধারণ। পরমহংসদেব নাকি একবার সংসারী মানুষের বিষয়ভোগের তুলনা দিয়ে বলেছিলেন, যেন উটের কাঁটা গাছ চিবানো। আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা। কাঁটা বিঁধে দু'গালের কষ বেয়ে রক্ত ঝড়ে পড়ে, কিন্তু খিদেটা এতোই বেশি যে না-চিবিয়েও অব্যাহতি নেই।

যাক এসব কথা। সে অসুবিধেগুলো পুরনো ব্যারামের মতো দীর্ঘস্থায়ী তা নিয়ে নতুন করে কাঁদুনী গেয়ে কোনো লাভ নেই। বরং শীত আমাদের নতুন কী সুযোগ এনে দিল সেই খোঁজ নেওয়াই বেশি প্রাসঙ্গিক।

কাগজে চোখ মেললে ইতিমধ্যেই সংগীত সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি দেখা

যাচ্ছে। গান খুব মহৎ বস্তু। বাঙালী সংগীতপ্রিয় জাত একথা কে অস্বীকার করবে? জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী গ্রন্থ গীতাঞ্জলি পর্যন্ত গানের এই জয়যাত্রা অব্যাহত। এবং তারপরও আমরা থেমে নেই। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ধীরে ধীরে আসর জেঁকে বসেছে 'আধুনিক গান'। এ গানের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে এর গাইয়েরা আজ সামাজিক 'হিরো'র আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যে ধরণের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি আধুনিক গানের নয়, মার্গ সংগীতের। এসব আসরেও শ্রোতা আসেন অজস্র।

একই সংগে আধুনিক এবং মার্গ সংগীতের ভক্ত, এমন শ্রোতাও আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। কী করে এমন একটা স্ববিরোধী ব্যাপার ঘটে, তা আমি জানিনে। তবে ঘটে। সম্ভবত শীতের প্রভাবে আমাদের দেহমন একটা কিছু উত্তেজনার অবলম্বন খোঁজে, সেই জন্যেই এমনটা ঘটতে পারে। এতে এক ঢিলে সময়টাও কাটে, আবার কালচার্ড বলে সুনামও পাওয়া যায়। কাজেই শীত-সমাগমে সংগীত সম্মেলনের আয়োজন দেখে আমার মতো অনেক 'ইয়াহু' ভক্তই যে মার্গ সংগীতের জন্যে উৎসাহিত হ'য়ে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

কালচারের কথাই যখন উঠল তখন এই সংগে চিত্রপ্রদর্শনীর কথাও সেরে নেওয়া যেতে পারে। একদা কলকাতা শহরে ছবির প্রদর্শনী শীতকালেরই একচেটিয়া ইজারা ছিল। তখন ছবি দেখার জন্যে সানাই বাজিয়ে লোক ডাকতে হত। এখন অবশ্য জমানা অনেক বদলে গেছে। সারা বছরই এখন শহরের নানা জায়গায় ছবির এক্‌জিবিশন খোলা থাকে। কিন্তু শীতকালের জাঁকজমকটা তবু লোপাট হয়ে যায়নি। অচিরেই শুরু হবে গোটাকত প্রথম শ্রেণীর চিত্রপ্রদর্শনী। তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকা দরকার। ড্রইংয়ের 'ড' জানিনে অবশ্য, নিজের হাতে একটা কমলালেবু আঁকতে গেলে তার চেহারা হয় পেঁপের মতো, পেঁপে আঁকতে গেলে দেখায় যেন শশা, কিন্তু ছবির এক্‌জিবিশনে ভারিক্কী চালে ক্যাটালগ হাতে নিয়ে দেয়াল প্রদক্ষিণ করতে তবু আমাদের আপত্তি নেই। আর শুধু কি তাই? এসব এক্‌জিবিশান দেখে এসে আর্টের ওপর গোটা দুয়েক পকেট এডিশান বই পড়ে আলোচনাও ফেঁদে বসি কাগজের পৃষ্ঠায়। এবং তাতে প্যাস্টেলকে তেল রং আর তেল রংকে জল রং বলে যদি একটু বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলি তো শিল্পীরা অবশ্যই আমাদের ক্ষমা করবেন!

কালচারের তৃতীয় দফা হল শৌখীন সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয়। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নাট্যোন্নয়নের পথ আজ রুদ্ধ, এ ধারণা এখন বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে আমাদের মনে। অনেক শৌখীন সম্প্রদায় যে এদিক থেকে সত্যিই অনেক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, সে কথাও স্বীকার করতে হবে সবিনয়ে। কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে এমন সব নাটক এমন পরিকল্পনায় অভিনয় করা হয়, যার মধ্যে 'নাটক', 'পরিকল্পনা' এবং 'অভিনয়' এই তিন বস্তুই আনুবীক্ষণিক অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয় আমাদের সামনে। তখন সেই গুণগুলির আবিষ্কার এবং অনুধাবনের দায় এসে পড়ে স্কন্ধে। আমরা তখন কলম ধরি। এবং অভিনয়ের দ্বারা যে-রস দর্শক-শ্রোতার-হৃদয়-মনে সংক্রামিত করা যায়নি, বর্ণনার দ্বারা সে রস পাঠকদের চোখে ছিটিয়ে দিতে থাকি।

কালচারের শেষ দফা হল সাহিত্য। বাংলা দেশের বাইরে বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অধিবেশন বসে এই শীতকালে। এর সংগে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক আগ্রহের নয়, অনেকটা নিগ্রহের মতো। মূল সভাপতি, বিভিন্ন শাখার বিভাগীয় সভাপতি ইত্যাদির নির্বাচন ঠিক কী পদ্ধতিতে হয় তা আমরা জানতে পারিনে। হঠাৎ একদিন কাগজের পৃষ্ঠায় নামগুলি পড়ি, এবং কালক্রমে তাঁদের ভাষণও চোখে পড়ে। কিন্তু বাংলা দেশের লেখক-পাঠক-সংস্কৃতি কর্মীদের বৃহত্তর অংশের সংগে এবিষয়ে কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাইনে। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নামেই ঘটে! অনেকটা সেই, 'দোষী জানিল না দোষ, হ'য়ে গেল বিচার তাহার' ধরণের ব্যাপার! তবু এও একটা উত্তেজনা বৈকি। কাজেই একেও গণনার মধ্যে ধরতে হবে। এবং এর সংগে সংগেই আমাদের কালচারের দফা শেষ!

এর পর আছে শুধু চিড়িয়াখানা, সার্কাস আর পিকনিক।

শীত একটি মহাশয় ঋতু বটে!

ছোটগল্পে ধূর্জটিপ্রসাদ

ভূদেব চৌধুরী

একমুখী দীপ্তির প্রখরতার চেয়েও বহু-চারী বিস্তার আর বৈচিত্র্যের উজ্জ্বলতা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। প্রমথ চৌধুরী-মশায়ের এই স্বাতন্ত্র্য-ভাস্বর ভাব-শিষ্যটি গুরুর মতই ছিলেন যথার্থ 'আধুনিক', বিদগ্ধতার সার্থক প্রতিনিধি। আধুনিকতার এক মুখ্য লক্ষণ সর্বাভিমুখী জটিলতার মধ্যে সামগ্রিকতার অনুসন্ধান। ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে সেই সন্ধানী দৃষ্টি অতন্দ্র ছিল,—জীবনের বিচিত্র-জটিল দিগন্ত-পথে কৌতূহলের জ্ঞানালোককে যা বিচ্ছুরিত করে ফিরত। অর্থনীতির বিশারদ পণ্ডিত ও অধ্যাপক হিসেবে জনপ্রিয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিময় শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছিলেন; অথচ, সংগীত, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত-চেতন ছিলেন জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত; দীর্ঘকাল বাংলার বহির্বর্তী থেকেও বাঙালীর বৃহত্তর প্রাণধর্মের সঙ্গে কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়নি কোনো দিন। এদিক থেকে তাঁর বিচিত্র-মুখী প্রয়াসের ফলশ্রুতি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবশ্য অনুসন্ধেয় উপাদান।

আধুনিক কালের বাঙালী পাঠকের কাছে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রায় একমাত্র পরিচয় মনন-গভীর প্রাবন্ধিক হিসেবে। মনস্বিতাই যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান তাতে সন্দেহ নেই। তাহলেও, বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ইনটেল্যাক্চুয়াল শিল্পীর এই ভাব-শিষ্য মুখ্যত বুদ্ধি-জীবী হলেও জাত-শিল্পীও ছিলেন বৈ কি! তাঁর অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭) ও মোহানা (১৯৪৩) প্রভৃতি উপন্যাসের পাঠকও একেবারে দুর্লভ নয়। প্রথমোক্ত সৃষ্টির অ-পূর্বতা সমকালীন আর এক সদ্যবিগত কবি-মনীষীর আলোচনায় সমুচিত স্বীকৃতি পেয়েছে (স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)। প্রবন্ধগুলিতে যেমন কলা-রসিক সংগীত-সন্ধিৎসু মননশীল মনের পরিচয় স্বচ্ছ হয়েছে, তেমনি উপন্যাসের সৃজনভূমিতে শিল্পীর লেখনী-মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে বুদ্ধি-প্রখর চিন্তনের গভীরতা। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের আরো এক অভিনব সৃষ্টি-প্রকরণের পরিচয় বহন করছে তাঁর স্বল্পসংখ্যক ছোটগল্প। একটিমাত্র গল্প-সংকলন গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, রিয়ালিস্ট (১৯৩৩) নামে। তাও আজ দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে। শিল্পীর তিরোধানোত্তর নানা আলোচনার কোথাও যেন 'রিয়ালিস্ট' গ্রন্থটিও তাঁর চিন্তা-মুখ্য প্রবন্ধাবলীর অস্পষ্ট গোত্র-ভুক্ত হয়েছে বলে চোখে পড়েছিল। অথচ, আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ছোটগল্প রচনার উদ্দেশ্য ও প্রকরণগত সকল কনভেনশনকে বিচূর্ণ করার সে প্রয়াস সবচেয়ে অভিনব বলেই সবচেয়ে অ-সফল বা উপেক্ষণীয় ছিল, এমন কথা বলা চলে না। বরং বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে এই রচনাগুলি স্বতন্ত্র কৌতূহলের দাবি রাখে। যার প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় যে কেবল ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই নয়; বাংলা গল্প-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সচেতন স্বীকৃতিযুক্ত অনুসৃতি যাঁদের মধ্যে প্রকট, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদের এক অগ্রণী।

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের ভূমিকায় শিল্পী লিখেছেন—"সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য।" বলাই বাহুল্য, এটুকু তাঁর সচেতন মনের বিনয়। তাহলেও,—অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর এক শ্রেষ্ঠ অনুব্রতী হওয়া সত্ত্বেও, ধূর্জটিপ্রসাদ একান্তভাবেই গুরুর অনুমত ছিলেন না। অন্তঃশীলার আলোচ্য ভূমিকা এই সত্যই ব্যক্ত করতে চেয়েছে। অন্যপক্ষে, যে মননশীলতার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রথম যৌবন ঋদ্ধ ও পরিণত হয়েছিল, তাকে 'সবুজ পত্রের দল' নামে পরিচিত করে শিল্পী অন্যত্র লিখেছেন,—"এই দলের গোটাকয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। "বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই দুটোই প্রধান।" (নতুন ও পুরাতন'-বক্তব্য) তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে এই দুই ধারার প্রতিফলনই সুতীব্র।

একই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,—বুদ্ধিবাদ অর্থে (১) চরিত্রশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটা কয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" এই অনাপেক্ষিক বাস্তব-নির্মুক্ত নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবাদের অনুবর্তনে রচিত সাহিত্যের গুণ যতই থাক, তার মূলে অপরিহার্য এক ত্রুটি এসেও পৌঁচেছিল। আশ্চর্য যথার্থ দৃষ্টি ও আত্মেষণার সঙ্গে শিল্পী তার পরিচয় দিয়েছেন,—"সবচেয়ে বেশি ছিল জীবন থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বস্তচ্যুত হয়ে পড়ি"। ('নতুন ও পুরাতন'-বক্তব্য)।

'সবুজ পত্রের দল'-এর অপরাপর সভ্যের চেয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ সম্বন্ধে এ-মন্তব্যের সত্যতা সমধিক; আর এখানেই গুরুর গল্প-শৈলীর সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পকে নিছক ইণ্টেলেক্চুয়াল বলবার উপায় নেই। জীবনের অপার-বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় সহৃদয় জীবনানুভবের 'পরে বুদ্ধির দীপ্ত-মার্জিত স্মিত আলোক প্রতিফলিত করেছেন তিনি। কিন্তু, ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত,—তাঁর নিজেরই ভাষায় 'বাস্তবতার কবল থেকে মুক্ত', 'জীবন থেকে—সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত'। যথার্থ অর্থে তাঁর চেতনা এক অনাপেক্ষিক, বিশুদ্ধ বুদ্ধি-জীবির। তাই বলে, তাঁর গল্প-সাহিত্য বা ব্যক্তি-অনুভবকে নির্জীবন বলবার উপায় নেই। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব,—ঠিক্ যে অর্থে মাছ জলজীবী। অতএব, সমাজের বিশেষ জীবন-প্রেক্ষিতে পরিবর্ধিত হয়ে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উপায় কারো নেই। সীমিত, এমন কি অনভিপ্রেতও যদি হয়, তবু, ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডিতেও জীবনের ভাব-বেদ্য অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর গল্পে জীবনায়নের যে পার্থক্য, তা প্রধানতঃ তাঁদের দুজনের অন্তর্লীন মনোভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর

গল্পের প্লট-এ সহানুভূতিস্নিগ্ধ জীবন-অভিজ্ঞতার অবতারণা তার স্বতন্ত্র মূল্যে;—প্রসঙ্গতঃ সেই অভিজ্ঞতার শরীরে শিল্পীর স্বভাবস্নিগ্ধ বৌদ্ধিকতার দীপ্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের লেখনীতে প্লট-এর ভূমিকা বুদ্ধির আলোক প্রতিফলনের মাধ্যম হিসেবে;—তাঁর গল্পের লক্ষ্য বুদ্ধিবাদের অবাধ মুক্তি,—প্লট কেবল তার উপলক্ষ্য। আর তাঁর ভাবসচেতনার কাছে সে প্লট-এর মূল্য কেবল গল্প-দেহ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক আঙ্গিক হিসেবে, এর চেয়ে বেশি কোনো জীবন-মূল্য তার নেই। এই সত্যের ঘোষণাতেও শিল্পী সর্বদাই অকুণ্ঠমুখর।

রিয়ালিস্ট গল্পের মুখ-বন্ধে তার অনাবৃত প্রকাশ,—"প্রবাসের কোন একটি আড্ডায় আমরা কখনো কখনো সাহিত্য আলোচনার বদলে সাহিত্য রচনা করতাম। অবশ্য লিখে নয়, মুখে মুখে। আমাদের মধ্যে প্রবীণ রসিক পুরুষটি তিন-চারটি সংজ্ঞা ঠিক করে দিতেন, তাদের আশ্রয় করেই গল্প পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি করতে হত। সেদিন ছিল আমার পালা—সংজ্ঞা ছিল রিয়ালিস্ট, লজ্জা, হিংসা ও পলায়ন। ঠিক পর পর কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে এই ধরণেরই স্মরণ হচ্ছে। মুখবন্ধ করেছিলাম এই প্রকারে,—

'যাঁরা গল্প রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাণপণে প্রমাণ করতে চান যে গল্প এটি নয়, নিছক সত্যি ঘটনা। তাদের চেষ্টা সফল হয় না, যদি বা হয় তাহলে সত্য ঘটনার বিবৃতি, অর্থাৎ ইতিহাসের মত গল্পটি নীরস হয়ে পড়ে। তার চেয়ে গোড়াতেই স্বীকার করা ভাল যে এই গল্পটি কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক ঘটনারই সমাবেশ। যা বলাত দিয়েছেন, তাতে মামুলি গল্প চলে না। পৃথিবীতে রিয়ালিস্ট বলে কোনো মানুষ নেই, হতে পারে না হতে চেষ্টা করে।"

শরৎচন্দ্র নাকি গল্প-শিল্পকে বলেছিলেন 'মিছে কথা বলার আর্ট'। ধূর্জটিপ্রসাদের ওপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যে-কোনো রকমের মিছে বা বানানো কথাকে আর্টিস্টিক শরীরের আধারে বিন্যস্ত করতে পারাতেই, তাঁর প্রকরণ মতে, গল্প-শৈলীর যথার্থ সার্থকতা। অন্যপক্ষে, যে প্রেক্ষাপরিবেশে তাঁর গল্প-সৃজনের প্রেরণার উদ্ভব, তাতে এই রচনা-পদ্ধতিকে বুদ্ধির খেলা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে সৃষ্টির উৎস স্রষ্টার অন্তঃকরণে স্বতঃস্ফূর্ত বলেই মনে করা হয়। বহিরাগত নির্দেশ বা উপদেশ সেই স্বতঃস্ফূর্তির অন্তরায় বলে অনুভূত হয়ে থাকে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি সংযোগহীন শব্দের, অথবা একটি দুটি গতি রেখাহীন কথার মধ্য দিয়ে সংযোগের সেতু, অথবা পথের স্পষ্ট রেখা টেনে টেলেন্ট ও ইনটেলেক্টকে খেলিয়ে খেলিয়ে কোনো এক পরিসমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছে যাওয়াই রচনা-শৈলীর মৌল বৈশিষ্ট্য।

ওপরের উদ্ধৃতিটুকু ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে আজগুবি গল্পের অসম্ভব মুখবন্ধ বলে মনে করবার উপায় নেই। তথ্য সন্ধান করলে দেখা যাবে, তাঁর গল্প-রচনা এই ধরণের ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ-এর পটভূমি ও প্রক্রিয়ার ভিত্তি ভেদ করেই উদ্ভূত হয়েছে। 'রিয়ালিস্ট' গ্রন্থের 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পটি লেখকের প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বলে অনুমিত হয়ে থাকে। অথচ এ-গল্পটি তিনি প্রথমে মুখে মুখে গড়ে তুলেছিলেন;—রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোনো এক ছত্র নিয়ে একটি গল্প গড়ে তোলা যায় কিনা, তারই এক্সপেরিমেন্ট করবার চেষ্টায়। (এ তথ্যটুকু বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দান)। গল্প শেষের ভাষায়, গল্পের থিম্ হচ্ছে,—"সংগীত সমালোচনা।" অর্থাৎ—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি তরুমূলে
বসেছ ফুল সাজে
সে কথা গেছ ভুলে।"

এই গানটি কোন্ পরিবেশে কোন্ বিশেষ ব্যক্তির কণ্ঠে সবচেয়ে সার্থক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হতে পারত, তারই বুদ্ধি-বিচারময় অনুসন্ধান রয়েছে সারা গল্পের প্লট-এ। সে প্লট আবার দুই বন্ধুর কথোপকথন ও বিতর্কের আকারে গঠিত। অর্থাৎ, গল্পের দেহে রয়েছে প্রমথ-শৈলীর সেই রূপ-মিশ্রতার স্বভাব,—কিছু কাহিনী, কিছু তর্ক, কিছু সংলাপ, কিছু বা কথোপকথন ও বর্ণনার মাধ্যমে বুদ্ধি-ধর্মী বিচার-আলোচনা। বস্তুত গল্পের একতম শরীরে অনেক আঙ্গিকের সংকেতকে সংমিশ্রিত করায় প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী আত্মার ছিল এক বিশেষ পরিতৃপ্তি। গল্প রচনার কালে নিজের শিষ্য ও স্নেহাস্পদদেরও তিনি এই বিমিশ্র রূপাঙ্গিকের বিন্যাস বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। আর, অন্ততঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রে, গুরুর প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির অনুমতে দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে, তাঁর সব গল্পেই রূপের এক্সপেরিমেন্ট, বুদ্ধির সচেতন খেয়াল-খেলা; এবং গল্পের প্লট-এ বিচিত্র আঙ্গিক-মিশ্রণের প্রয়াস। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে প্লট-এর মধ্যে বিশেষ আবেগময় কোনো জীবন-মূল্যের সচেতন অস্বীকৃতিতে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পেরও শুরু হয়েছে সেই অস্বীকৃতি এবং রূপময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকেত নিয়ে,—

"ছোট্ট নদীর ধার, আনিকাটের ফাটক খোলা হয়েছে বলে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড় পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী-কিনারের সরকারী রাস্তার একধারে ঝাউগাছের সার, অন্যধারে জলারেখার কিছু ওপরে কাশের বন। দীর্ঘ ঝাউ-গাছের গথিক উচ্চাভিলাষ, কাশগাছের সাদি-ক্রীড়ারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষ-কম্পন এবং গোধূলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও ধূমকেতুর পুচ্ছ-সম্মার্জন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুরভাবে সচেতন করে তোলে। এ বেষ্টনীতে প্রেমের গল্প বলতে হলে ভ্রমণরত কোনো বন্ধুযুগলকে গাছের তলায় বসতে হয়।"

কেবল এই কারণেই শিল্পী তাঁর গল্পের প্রচ্ছদ হিসেবে দেওদার—ত্রিবেণীর অবতারণা করেছেন।—"তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বড়লোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার তলায় বসে পড়লেন। একজন বললেন, "এ-যেন সেই ছবির 'তিন বোন'—এ'রা তিনজন এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে শোন'।"

এখানে বিন্যাসের এক অদ্ভুত অভিনবতা লক্ষ্য করার মত। দেওদার গাছের বিশেষ প্রেক্ষিত—এর প্রভাবেই কেবল বন্ধুযুগলের একজনের "গল্প করতে ইচ্ছে" হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য,

তিনি একটি প্রেমের গল্প ফাঁদবেন প্রথম —উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের পটভূমিতে। আর, তার প্রয়োজনে "ভ্রমণরত কোনো বন্ধু-যুগলকে গাছের তলায় বসতে হয়।" কেবলমাত্র এই কারণেই গল্পে দেওদার-তরুর সন্নিবেশ, এবং সেই গাছের তলায় বসে এক বন্ধুর গল্প বলবার ইচ্ছা।

সকল সার্থক সৃষ্টিরই ভিত্তি হচ্ছে প্রকাশের ঔচিত্যবোধ;—যথোচিত প্রেক্ষিতে সমুচিত ঘটনার প্রক্ষেপ ঘটিয়ে, তবেই শিল্পী তাঁর গল্পকে বিশ্বসনীয় এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। কিন্তু শিল্পীর এই কলা-কৌশলের যথার্থ সফলতা তাঁর আত্মগোপনক্ষমতায়। অর্থাৎ যাদুকর যেমন হস্ত-পদ চালনার কৌশলে মিথ্যার মধ্যে সত্যের বিভ্রম রচনা করেন, তেমনি শিল্পী তাঁর হাতের প্রেক্ষিত-রচনা ও আরো নানা আনুষঙ্গিক হৃদ্‌গত উপাদানের মাধ্যমে এক রসস্নিগ্ধ মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন,—যেখানে উপস্থিত হতে পারলে সহজেই মনে হয়,—"এ অনুভব পরের হয়েও যেন পরের নয়,—আমার নয়, তবু বুঝি আমার।" কিন্তু, যেমন যাদুকরের বেলায়, তেমনি স্রষ্টার ক্ষেত্রেও মায়াজগৎ রচনার কৌশলযুক্ত এই অন্তরঙ্গ উপাদানসমূহ সাধারণ পাঠকের সম্মুখে প্রকট হয়ে পড়লে গল্পের জীবনাবেদন ফিকে,—এমনকি নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ওপরের গল্প-পরিস্থিতি বর্ণনায় ধূর্জটিপ্রসাদ সেই অঘটনই ঘটিয়েছেন, এবং তা ইচ্ছা করেই! তাঁর গল্প রচনার উদ্দেশ্য সংশ্লেষমূলক বা সিন্থেটিক নয়,—বিশ্লেষণমূলক, তথা এনালিটিক গল্প বলার মধ্য দিয়ে তিনি একটি জীবনরসঘনিষ্ঠ অনুভবের স্বাদ নিবিড় করে তুলতে চান না; বরং গল্প রচনার গোপন হাতিয়ারগুলোর কার্যকারণাত্মক মূল্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে চান;—সৌন্দর্য-সম্ভোগের চেয়ে বোটা-নিস্ট-এর অঙ্গচ্ছেদী এষণার প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবল। এই ধরণের শৈলীর আরও এক উদ্দেশ্য রয়েছে; —গল্প যে গল্পই, অর্থাৎ বানানো কথা,— গল্পাঙ্গিকের অন্তর বিচ্ছিন্ন করে এই সত্যটিকে নির্মোহ প্রতিষ্ঠাদানে শিল্পী-হৃদয়ের যেন এক নিষ্ঠুর পরিতৃপ্তি রয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ একান্তভাবে বুদ্ধিজীবী, প্রবন্ধই তাঁর আত্মমুক্তির সহজ আধার। অতএব, গল্পের আবেগময় ললিতকলার প্রতি উপেক্ষা না হলেও তাঁর মনে রয়েছে এক করুণাবোধ। ফলে, তাঁর শৈলীর বৈশিষ্ট্য গল্প-রস নিবিড় করে তোলা নয়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "গল্পের কনভেনশন-এর প্রতি বিদ্রূপ ও তাহার কলকব্জার রহস্যোদ্ঘাটন।" দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সংশয়-রহিত পরিচয় রয়েছে তাঁর যে-কোনো গল্পে। প্রথমোক্ত মনোভাবের চরম অভিব্যক্তি দেখতে পাই রিয়ালিস্ট-এ। গল্পের নায়কের নাম রেখেছেন শিল্পী 'ক-বাবু'। অর্থাৎ এ-গল্প কোনো ব্যক্তি-জীবনের নয়,—একটি হাইপোথেটিকেল এলজেব্রিক ফিগার-এর মাধ্যমে লেখক তাঁর মনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরসিকতাকে কেবল মুক্তি দিয়েছেন, —গল্পের এই ফলশ্রুতি নায়কের নাম-করণের মধ্যেই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। গল্পের অভ্যন্তরে ক-বাবুর যক্ষ্মারোগ-গ্রস্তা পত্নীর ঈর্ষার আতিশয্য চিত্রণে সেই ব্যঙ্গরস আশ্চর্য সফলতা পেয়েছে।

তাছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের আর এক অনন্যতা তাঁর ভাষা-রীতিতে। বীরবলী ষ্টাইল-এর শ্রদ্ধান্বিত অনুবর্তী শিল্পী এই ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন অতিশয় 'সচেতন' বলে। অন্তঃশীলা-ভূমিকা—ধূ র্জ টি প্র সা দে র সকল রচনাতেই ষ্টাইল-এর এই অতি-সচেতনতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে, গল্পের মধ্যে সূচিত হয়েছে এক প্রসঙ্গাতিরিক্ত কথার আড়ম্বর—ওপরে উদ্ধৃত 'একদা তুমি প্রিয়' গল্পের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটি শিল্পীর এই স্বভাবসিদ্ধ ষ্টাইল-এর এক সার্থক নিদর্শন। কথার সুপরি-কল্পিত আতিশয্য ও আড়ম্বর গল্প-রসের সংহতিকে ছড়িয়ে বিচ্ছিন্ন বিস্তারিত করেছে প্রায়ই। রিয়ালিস্ট গল্পের ক-বাবু ও মনোরমার প্রণয়-কথার স্বাদ-বিনষ্টি এর এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ-গল্পের প্রধান প্রচ্ছদ বেরিলিতে ক-বাবুর এক বন্ধুর বাড়ীতে। ভাওয়ালি থেকে ফেরবার মুখে ভয়াবহ অবস্থার তাড়নায় স্ত্রীকে নিয়ে ক-বাবুর এখানে এসেই উঠতে হয়—এখানেই হয় সেই স্ত্রীর দেহান্ত। মনোরমা ছিলেন ক-বাবুর সেই বিপত্নীক বন্ধুর 'পত্নীর বোন'।

সে যাই হোক, এই উপলক্ষে একটি রহস্য-তীব্র প্রণয়-কথার রসহানি ঘটায় ধূর্জটিপ্রসাদের মনে কোনো ক্ষুন্নতা নেই। কারণ, বারে বারে দেখেছি, প্লট-এর নিবিড়তার প্রতি তাঁর কোনো মমতা ত ছিলই না বরং ছিল সুগম্ভীর উপেক্ষা। গল্পাঙ্গিকের ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাই 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পের প্রথম বন্ধুর মুখে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে করি। দ্বিতীয় বন্ধু যখন অনেক বিতর্ক-কথোপকথনের পরে বলল, "এবার গল্প শুরু হোক।" প্রথমজন তখন জবাব দিয়েছিল, "গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের (দুই বন্ধু ও দ্বিতীয় বন্ধুর কল্পিত স্ত্রী) ঘাত-প্রতিঘাতেই গল্প তৈরী হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে নাকি?"

চরিত্র রচনাই ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের মুখ্য আকাঙ্ক্ষা; আর আগে দেখেছি চরিত্র অর্থ তাঁর নিজের দৃষ্টিতে—"(১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতি-নীতি আছে এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার কবল থকে মুক্ত হওয়া যায়।" ফলে তাঁর গল্পে আছে রূপায়ণের অজস্র সন্ধানী এক্সপেরিমেণ্ট, গল্পের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের বিমিশ্রতা, চরিত্র বিস্তারের উপলক্ষে গল্পের পরিবেশ ও বাস্তব প্রসঙ্গ-রহিত বিতর্কের অবতারণা, প্লট-এর নামমাত্র আধারে তর্ক-বিশ্লেষণ-প্রধান প্রবন্ধ-শৈলীর প্রয়োগ। এক কথায় তাঁর গল্প রচনা আসলে গল্প লেখার শিল্প-খেলা। এ-খেলায় রস-প্রগাঢ়তা নয়, প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের কৌতুকোজ্জ্বল স্বভাব এ-কালের গল্প-রসিকেরও কৌতূহলের সামগ্রী হতে পারে। ধূর্জটিপ্রসাদের গল্প সংকলনের নবতর প্রকাশ আজও উপেক্ষণীয় নয়।

মতামত

॥ 'অভিযান' প্রসঙ্গে ॥

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু—

১৯শে অক্টোবর 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীশান্তিগোপাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' প্রসঙ্গে লেখা চিঠি পড়ে জানলাম—লেখক 'অভিযান' চিত্রের নায়ক 'নরসিংহ' চরিত্র সমালোচনা করতে তাকে অভদ্র বলে পরিচিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁর এই ভুল মনোভাবের জন্য কিছু লেখার প্রয়োজন মনে করি।

ছবির প্রথম দৃশ্যেই আমরা নরসিংহের পরিচয় পাই—তার সুন্দরী বৌ তাকে ছেড়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে—পালানোর প্রধান কারণ সে ট্যাক্সি-ড্রাইভার, তথাকথিত 'ভদ্রলোক' নয় বোলে। সুন্দরী স্ত্রীর প্রেম থেকে বঞ্চিত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মদ্যপান কি খুবই অস্বাভাবিক?

সিংহশাবক যেখানেই প্রতিপালিত হোক না কেন, তার সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো তার স্বভাবের মধ্যে প্রতিভাত হতে বাধ্য। তাই নরসিংহের 'বেপরোয়া' ভাব—যে কোন গাড়ীকে ওভার টেক করবার যে মনোবৃত্তি—তার এই কঠিন পৌরুষের জন্য সে নিজে দায়ী নয় দায়ী তার সামন্তরক্ত যেটা তার ধমনীতে ছিল প্রবহমান। এই বংশমর্যাদা-বোধ তার রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বোলেই সে নিজে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হলেও 'তুমি' সম্বোধনকে তার স্বাভাবিক প্রাপ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারত না।

নিজে উচ্চ বর্ণের হিন্দু আর নীলিদিরা খৃষ্টান হলেও তার হাতের তৈরী কেক প্রথমে খাবার সময় তার মনে একটা দ্বিধাবোধ আসলেও ক্ষণিকের মধ্যেই সে সংকোচ কাটিয়ে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কোরল। এটাই তার মানবিক-বোধের যথেষ্ট পরিচয় নয় কি?

সে নিজের সম্মান চায় কিন্তু সে সম্মান অন্যের সম্মান হানি করে নয়।

সে নীলিদিকে ভালবেসেছিলো এবং নিজ ভালবাসার প্রবল টানে সে নীলিদিকে ভুল বুঝেছিলো। কিন্তু তা সত্বেও সে নীলিদিকে ও তার প্রেমিককে এগিয়ে দিয়ে এসেছিলো তার গণ্ডীতে। কাজেই এরপর নীলিদির কথা না মেনে তার উল্টো করাটাই কি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তার মত লোকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়!

বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে—একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুদক্ষ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মনে সুন্দর ও অসুন্দরের অবিরাম যে সংঘাত চলেছে তারই প্রতিচ্ছবি নরসিংহের চরিত্র।

শ্রীশক্তি বসাক ও
শ্রীনারায়ণ সাহা।
দমদম, কলিকাতা-২৮

(২)

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু—

জনপ্রিয় শ্রীরায় পরিচালক হিসাবে শ্রদ্ধেয়। তাঁর 'অভিযান' বইখানার অনেক সাধু সমালোচনা পড়লাম। বইখানা ভাল হয়েছে নিঃসন্দেহ। তবে নিখুঁত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীরায় 'Star System'-এর পক্ষপাতী নন। মনে হয় তিনি বলতে চান 'Star'-ই ছবির একমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জনকারী শিল্পী নয়। সুস্থ পরিচালকের হাতে পড়লে অখ্যাত শিল্পীকে দিয়েও ছবির জনপ্রিয়তা অর্জন করানো যায়। এবং শ্রীরায়ের সেই ক্ষমতা আছে। তার প্রমাণ তাঁর পূর্ব-বর্তী ছবিগুলি। কিন্তু 'অভিযানের' একটি আলাদা সূক্ষ্ম শিল্পরস আছে। এবং তার জন্য আছে শ্রীরায়ের অসাধারণ পরিচালনার কৃতিত্ব। শিল্পীদের দিয়ে তিনি প্রাণবন্ত অভিনয় করিয়েছেন। কিন্তু একটি চরিত্র সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। 'গোলাবী' চরিত্রটি কি তিনি কোন অখ্যাত শিল্পীকে দিয়েও অভিনয় করাতে পারতেন না? আমাদের বাংলা চিত্রজগতের অনেক শিল্পীই তো হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাদের মধ্যে একবার চেষ্টা করলে শ্রীরায় নিশ্চয় 'গোলাবী' তৈরী করতে পারতেন। তাহলে মনে হয় তাঁর পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত।

দ্বিতীয়তঃ নরসিং-এর স্ত্রী পরপুরুষের সাথে গৃহত্যাগ করল বলে নরসিং স্ত্রী-বিদ্বেষী হয়ে রইল। স্ত্রী-লোকের প্রতি সব সময় তাঁর ক্রোধ, ঘৃণা। যার জন্য বিবাহিত কনেকে সে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিল। এবং পরে আবার বেশী টাকার লোভে গোলাবীকে গাড়ীতে তুলল। কিন্তু কেন? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে নরসিং ট্যাক্সি-ড্রাইভার। তাঁর চরিত্রের দুটো সত্তা, যার জন্য চরিত্রের এরূপ দুর্বলতা'। কিন্তু সব মানুষেরই তো দুটো সত্তা আছে। তবে যাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত প্রবল তার এরূপ দুর্মতি কেন? এখানে কাহিনীর দুর্বলতা ঘটে না কি? এ দিকে গাড়ীর লাইসেন্স বাতিল হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের পায়ে ধরতে যে ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রবীর্যে বাধা দেয় সে ক্ষত্রিয় কি করে চোরাকারবারীর অন্যায় ব্যবসার পার্টনার হয়? চিন্তাশীল দর্শক অবশ্য এ ছবির একটা সূক্ষ্ম-রুচিবোধের স্বাদ পাবেন। কিন্তু সাধারণ দর্শকের মনে নায়কের অপ্রকৃতিস্থতাই বদ্ধমূল হয়ে থাকবে না কি?

ইতি নমস্কারান্তে—
শ্রীমাধব মজুমদার
কলিকাতা-১০

॥ নৃত্য সম্পর্কে ॥

অমৃত পত্রিকায় "এশিয়ার লোক-নৃত্যের ভূমিকা" (চিত্তরঞ্জন দেব) "উত্তর প্রদেশের দেবদাসী" (প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরো কিছু কিছু নৃত্যের বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। সাধারণভাবে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক সম্পর্কে যত আলোচনা হয় সে তুলনায় নৃত্যকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ অনেক কম, আপনাদের পত্রিকায় সে প্রয়াস দেখে খুব খুশী হলাম। ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস ও ধারা এবং তার প্রাকৃত ও লোকনৃত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা-কালে এই ধরণের আলোচনার অভাব বিশেষ বোধ করেছি, একমাত্র ডাঃ মুল্ক-রাজ আনন্দ সম্পাদিত "মার্গ" পত্রিকার নৃত্যকলা সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনি।

নমস্কারান্তে
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা : ৩৪

সে

অমরেশ দাশ

কয়েক মাস এই ঘরটায় সে আছে। এটাকে ঘর না বলে খুপরি বলাই উচিত। লম্বায় অনেকটা হলেও চওড়ায় এটা নিতান্তই ছোটো। অন্যমনস্ক হয়ে মাঝে মাঝে যখন আড়াআড়িভাবে সে শুয়ে পড়ে তখন দেয়ালে পা লেগে যায়। অবশ্য ছাদটা অনেক উঁচু। ছাদের কোণ ঘেঁষে একটা ছোটো জানালার মতো আছে। চেষ্টা করলেও তার নাগাল পাওয়া যায় না। সেখান দিয়ে দিনের বেলা আলো আসে, রাত্রে অন্ধকার। বাইরের বাতাস কখনো-সখনো ভুল করে ঢুকে পড়ে। মেঝেতে শুয়ে ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে সে দেখে। দুটি চড়ুই ওখানে বাসা বেঁধেছে। কিছুক্ষণ পর পর ওরা কি মনে করে একবার আসে, আবার বেরিয়ে যায়। যখন ভাববার কিছু থাকে না তখন সে ওদের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করে।

এখানে যখন প্রথম আসে তখন তাকে একটা অন্য ঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে আর দশজনের সঙ্গে সে কয়েকদিন ছিল। সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষ তাকে সেখানে আর দশজনের সঙ্গে একসঙ্গে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তাই স্থানান্তরিত করলেন এই ঘরে। ঘরে ঢুকে সে যখন চার পাশ দেখছিল তখন যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটু পর যখন পেছন ফিরে তাকাল তখন দেখল সামনে একটা লোহার দরজায় তালা ঝুলছে। যে সিপাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, তখন সে চলে গেছে।

তারপর অল্প কয়েকবারই এখান থেকে বেরুবার সুযোগ পেয়েছে সে। অথচ একথা সত্য তার একটা ঘর ছিল, সে ঘরে একটা বউ ছিল, একটা ছেলে ছিল। আবার এও ঠিক সেই সে ঘর ভেঙেছে। দিনের বেলা খাওয়া হয়ে গেলে মেঝেতে শুয়ে পড়া তার অভ্যাস। অভ্যাসটা আগে ছিল না; এখানে আসবার পর হয়েছে। আগে সে সময়টা বসবার সুযোগও পেত না। এখানে এসে যেদিন প্রথম চড়ুই পাখী দুটি দেখল সেদিন ওরা ভয়ে ভয়ে ওপর থেকে তাকে দেখে-ছিল। নীচে নেমে আসতে সাহস পায়নি। আস্তে আস্তে ওরা তাকে চিনে ফেলে।

বুঝতে পারে ওদের মতো সেও এ ঘরের বিনা ভাড়ার বাসিন্দা। এখন ওদের ভয় কেটে যায়। খাওয়া শেষে এদিক-সেদিক ভাত ছড়িয়ে থাকত; কেননা তখন সে খেতে পারত না। তার খাওয়া হয়ে গেলে ওরা দুটিতে নেমে আসত, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাত খেত। এখন সে খেতে বসলেই ওরা নেমে এসে তার থালার সামনে বসে। আগে যখন খেতে বসত তখন তার বউ সামনে এসে বসত। ক্রমে সে ওদের ভালোবেসে ফেলল।

বউকে সে শেষ দেখেছে খবরের কাগজের পাতায়। যে রাত্রে সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার একদিন পর ঘটনাটা কাগজে বেরিয়েছিল। সমস্ত কাগজ বড় করে প্রথম পাতায় ছেপেছিল। সেখানেই বউর ছবি দেখেছে: ওর পাশেই শুয়ে ছিল ছেলেটা। সেই শেষ ওদের সে দেখেছে। তারপর তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ওদের মৃতদেহ দুটোও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। শুনেছে পুলিশের লোকেরাই ওদের কবর দিয়ে এসেছে। দারোগাবাবুকে সে বলেছিল, ওদের কবর দেবার সময় যাতে উপস্থিত থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি মন দিয়ে তার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু ওদের কখন কোথায় কবর দেওয়া হল সে খবর সে আর পায়নি।

তাকে গ্রেপ্তার করবার পর দারোগা-বাবু তার কাছে সমস্ত ঘটনাটা জানতে চেয়েছিলেন। সে নিজের থেকে কোনো কথা বলেনি। বলতে চায়নি। অনেকক্ষণ তাঁর সামনে বসেছিল। তারপর এক সময় একটা খাতা খুলে কলম তুলে তিনি পর পর কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বউ এবং ছেলেকে তুমি মেরেছো?' সে মুখ নীচু করে বলেছিল, 'না'। কেন জানি সেদিন সে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারেনি। তার উত্তরটা খাতায় লিখে নিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাহলে ওদের বিষ খাইয়েছে কে?'

সে বলল, 'কেউ খাওয়ায়নি।' বুঝতে পারল দারোগাবাবু তার উত্তরটা ধরতে পারছেন না। একটু জোরে তিনি বললেন, 'ঐ বাচ্চা ছেলেটা কি নিজে থেকে বিষ খেয়েছে?'

'না।'

উনি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, 'তাহলে?'

যথাসম্ভব অল্প কথায় সে জানাল, তার বউ বিষ খাবার আগে বিষ খাইয়েছে। উনি সঙ্গে সঙ্গে খাতায় কথাগুলো লিখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'ওরা যখন বিষ খাচ্ছিল তখন তুমি ওদের কাছে ছিলে?'

'বউর পাশেই ছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু বলে উঠলেন, 'বাধা দাওনি কেন?'

'আজ্ঞে, তেমন কথা ছিল না।'

উনি তার কথায় ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না কেমন করে ওদের মৃত্যুটা সম্ভব হয়। আরো খোলাখুলিভাবে ঘটনাটা তাকে বলতে বললেন। সে জানাল, এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। উনি খাতা বন্ধ করে রাখলেন।

তারপর কয়েকদিন তার কাছে দারোগাবাবু এসেছেন। যেদিন সকালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল সেদিনই তাকে এখানে আনা হয়েছে। ঢোকবার সময় এখানকার বাইরেটা ভালো করে দেখতে পায়নি। তখন অনেক রাত। তাছাড়া চারদিক বন্ধ যে কালো গাড়ীটায় তাকে এখানে আনা হয়েছিল, সেটা ভেতরে ঢুকিয়ে তারপর তাকে বাইরে বার করা হয়। অবশ্য গাড়ীটার টিনের দেয়ালে কয়েক টুকরো জাল ছিল। কিন্তু তার ফাঁকি দিয়ে জেলখানার চেহারা দেখার কোনো উৎকণ্ঠা বা কৌতূহল তার ছিল না।

জেলখানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝেছে এখান থেকে সহজে বেরুনো যায় না। এখানে একবার যারা ঢোকে তারা কিছুদিন না থেকে কখনো বেরোয় না। তাকেও এখানে থাকতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে হতেই তো কয়েক মাস কাটিয়ে দিল! তারপর কত দিন কে জানে!

তার ঘটনাটা তদন্ত করবার ভার দারোগাবাবুর ওপর পড়েছে। তিনি মাঝে মাঝে আসেন তার কাছে। প্রথম যেদিন তিনি এলেন সেদিন সে আশ্চর্য হয়েছিল। কেননা, তিনি ঢোকার আগে সে কখনো ভাবতেও পারেনি যে এই খুপরীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঢুকতে পারে। সেদিন দেখল, তিনি এলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন সিপাই একটা টুল এনে তাঁকে বসতে দিল। তারপর তার সঙ্গে তিনি অনেক

কথা বলার চেষ্টা করলেন। সে বেশি কথা বলতে চায়নি। অনেকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করার পর তিনি জানতে পারলেন, কলকাতায় আসার আগে দার্জিলিং জেলায় তার বাড়ী ছিল। প্রয়োজনীয় কথা সেদিন আর বিশেষ কিছু হয়নি। দারোগাবাবু জানতে চাইলেন তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কেমন লাগছে ইত্যাদি। সে বলল, 'সুবিধা এখানে মানায় না।' বুঝিয়ে দিল তার ব্যাপারে তিনি যদি মাথা না ঘামান ভালো হয়। সেদিন সে তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছিল, যে, বেশি কথা বলতে সে ভালোবাসে না। তিনি বোধহয় উল্টোটা বুঝেছেন। ভেবেছেন সে একা-একা যে থাকে, ভালো লাগে না। তাই তিনি যদি আসেন এবং তাকে সঙ্গ দেন তাহলে তার ভালই লাগবে। তিনি প্রায়ই আসেন। কোনো কোনো দিন ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে কাটিয়ে দেন।

দ্বিতীয়বার যেদিন দারোগাবাবু এলেন সেদিন তাঁকে বেশ চঞ্চল দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ঘরে ঢুকেই তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন তো খবর নিতে এলেন না?'

সে তাঁকে জানাল, কলকাতায় তার কোনো আত্মীয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কোথায় আছেন বলুন, খবর দিয়ে দেবো আমরা।'

সে একটু মুশকিলে পড়ল। কেন-না এর আগে দারোগাবাবু কখনো তাকে আপনি বলে সম্বোধন করেননি। তাছাড়া দার্জিলিং-এর কাছাকাছি এক গ্রামে তার শ্বশুর থাকেন। কথাটা দারোগাবাবুকে সে জানাতে চায় না। সাহস করে বলল, 'তাঁদের আমি বিরক্ত করতে চাই না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার নিকট-আত্মীয় তেমন কেউ নেই; যে দু-একজন আছেন তাঁরা অনেক দূর-সম্পর্কের। বস্তুত তাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগা-যোগ নেই।' এমনও বলল যে, পিতৃ-পরিচয় না দিলে তাঁরা তাকে চিনতেও পারবেন না। কেবলই তার আশংকা হচ্ছিল এই বুঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ এসে পড়ল। কেননা কাগজে তার বউর ছবি বেরিয়েছে; হয়তো তাঁরা তা দেখে থাকবেন। এতোদিনেও যখন কেউ এল না তখন সে বুঝেছে শ্বশুরবাড়ীর কেউ

পড়তে জানে না। ছবি এবং খবর দুটিই ওঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে।

এই ঘরের সামনে একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা। বারান্দার একপাশে সারি-সারি ঘর। এক ঘরের একজন আর এক ঘরের আর একজনকে দেখতে পায় না। সে জানে তার ঘরের পাশের ঘর দুটিতে দুজন কয়েদী আছে। বারান্দায় বেরুলে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। কোনো প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলেই বারান্দায় বেরুনো যায়। ঘরে বসে কোনো লোকজন দেখতে পায় না সে। মাঝে মাঝে পাহারাওলা পুলিশ পায়চারি করে।

বাইরে কখন সকাল হয়, সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকেল—এখান থেকে বোঝা যায় না। বাইরে আলো ফুটলে চড়ুই দুটি তাকে ডেকে তুলে দেয়। তখন বুঝতে পারে সকাল হয়েছে। আবার পাখী দুটো যখন ঘর থেকে আর বেরোয় না, তখন বুঝতে পারে সন্ধ্যা হয়েছে। এমনি করেই সময়ের হিসেব রাখে সে।

আজ রোববার। এই দিনটির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সারা সপ্তাহ কাজ করে এই একটি দিন ছুটি পেত। আগে এই একদিনের অবকাশ সুখের ছিল। সকালবেলা বউকে সঙ্গে করে গির্জায় যেত। এখন সব দিনগুলি রোববার হওয়া সত্ত্বেও সুখের না। মুশকিল আরো, যখন সব কথা মনে পড়ে।

প্রথম কয়েকদিন তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। বউ এবং ছেলে যেভাবে মরেছে তাতে তার মনের অবস্থা স্বাভাবিক থাকার কথা নয়। প্রথমে এই জিনিসটা এখানকার কর্তৃপক্ষ এবং দারোগাবাবু বুঝতে চাইতেন না। দারোগাবাবু তখন প্রায়ই এসে তাকে বিরক্ত করতেন। প্রথম দু-তিনদিন তার কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ায় তারপর কয়েকদিন আসেননি।

পুলিশ যখন তাকে গ্রেপ্তার করল তখন থেকেই সে জেনে গেছে তার নামে একটি মামলা হবে; অর্থাৎ তার বিচার হবে। এতোদিন মামলা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। তখন অবস্থাটা মোহাচ্ছন্ন ছিল তাই। সহসা এরকম একটা পরিবর্তনের জন্য আগে থেকে সে প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য প্রস্তুত হবার সত্যি কোনো কারণ ছিল না। যতক্ষণ না চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হল ততক্ষণ সে কিছুই ভাবতে পারেনি। সে-রাত্রে সত্যি যখন সে পারল না তখন নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার সময় পায়নি। পরিবর্তনটা বন্যার জলের তোড়ের মতো ধাক্কা দিল। তারপর মাথায় ভেসে বেড়াল, যেখানে ছিল সেখান থেকে কতোদূরে এসে পড়ল সে খেয়াল তার ছিল না। এখন আর জলের তোড় নেই। এক অচেনা চরে আটকে পড়েছে।

কয়েকদিন পর দারোগাবাবু যখন আবার এলেন তখন মামলা সম্বন্ধে একটা ভাবনা তার মনে দানা বেঁধেছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশংকা পেয়ে বসেছে তাকে। সেদিন যখন দারোগাবাবু এলেন তখন সে আশ্বস্ত হল; ঠিক করল তাঁকে সব কথা বলবে।

'আর কদিন এখানে থাকতে হবে?'

উনি একটু ভারি গলায় বললেন, 'যতোদিন না আপনার মামলার বিচার হচ্ছে।'

দারোগাবাবুর গলা শুনে মনে হল উনি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই অসন্তোষের কারণ তার কাছে স্পষ্ট নয়। তাই বেশ অস্বস্তি বোধ করল তাঁর সান্নিধ্যে। প্রথম প্রথম তিনি যখন আসতেন তখন তাঁকে সহৃদয়ী বলে মনে হত। সে একজন মানুষের অসন্তোষের কারণ এবং সেই মানুষ তার সামনে বসে—অবস্থাটা ঠিক সামলে উঠতে পারছে না। এই খুপরিতে ঢোকবার পর মনে হয়েছিল, এখন আর নিজের ওপর নিজের কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তৃপক্ষের মর্জিই সব। কিন্তু সে কখনো কারুর অসন্তোষের কারণ হতে চায়নি। মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ বসে রইল। দারোগাবাবু বললেন, 'জানেন বোধহয়, আপনার মামলার তদন্তের ভার আমার ওপর পড়েছে।'

সে নীরবে শুনল। একথা তার কাছে নতুন নয়। তাঁর কাছেই আগে অনেকবার শুনেছে। তাই বুঝতে পারল না একথা তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেবার কি তাৎপর্য। এর আগে কোনো মামলার সঙ্গে সে জড়িত ছিল না। নিয়মকানুন কিছুই জানা নেই। তিনি বললেন, 'আপনার কলকাতার বাসায় কয়েকদিন আগে একবার গেছলাম; কিন্তু বিশেষ লাভ হল না। ও-বাড়ীর কেউ আপনার কোনো খবর দিতে পারল না।' 'ছ মাসও আমি ও-বাড়ীতে থাকিনি। তাছাড়া পাহাড়ী বলে সকলে একটু এড়িয়েও চলত।'

পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা মুখে দিলেন দারোগাবাবু; একটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'নিন খান।'

সে তাঁর আদেশ মতো সিগারেটটা ধরাল। উপেক্ষা করে এমন ক্ষমতা তার ছিল না। কেননা, এই প্রথম দারোগাবাবু তাকে সিগারেট সাধলেন। তাছাড়া জেলখানায় ঢোকার পর একটি সিগারেটও সে খায়নি। অথচ তার সিগারেটের নেশা বহুদিনের। বাসায় যখন বেশি সিগারেট খেত তখন মাঝে মাঝে বউ রাগ করত। আজ যখন দারোগাবাবু সিগারেট সাধলেন তখন তার লোভ সামলাতে পারল না সে। এঘটনা তার কাছে নতুন। এখানে এর আগে যতোদিন তিনি এসেছেন সব সময়ই তাঁকে সিগারেট খেতে দেখেছে সে। মাঝে মাঝে সেদিকে তাকিয়েও থেকেছে হয়তো। কিন্তু এর আগে তিনি কখনো তাকে সিগারেট সাধেননি।

সিগারেটটা পেয়ে খুব জোরে কয়েকবার টান দিল। একসঙ্গে মুখ-ভর্তি ধোঁয়া টেনে বেশ আরাম বোধ হল। এলোপাথাড়ি টান দেওয়ায় একপাশ থেকে সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে। একবার খুব জোরে টান দিতেই দারোগাবাবু বললেন, 'অতো জোরে টানবেন না, বুকে লাগবে।'

তার ইচ্ছে হল, তাঁকে বলে কতোদিনের এই অভ্যাস। কিন্তু মুখের ওপর তেমন কথা বলা ঠিক হবে না ভেবে আগের চেয়েও জোরে টান দিল। কয়েক টানেই সিগারেটটা শেষ হল। দারোগাবাবুর সিগারেট তখন সবে আধখানা হয়ে পুড়েছে। তিনি আস্তে আস্তে টানছিলেন এবং ধোঁয়াগুলো নাক দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ছিলেন।

তার সিগারেট শেষ হতেই দারোগাবাবু বললেন, 'আর একটা খাবেন?' 'না।' সত্যি কথা বলতে কি তার খাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লজ্জা পেল। মনে হল উনি তার সিগারেট টানার অস্বাভাবিক রকম দেখে অনুকম্পা করছেন। নিজেকে সংযত করল সে। যদি পয়সা থাকত তাহলে সে সিগারেট আনিয়ে দেবার অনুরোধ করত। তার পকেটে পয়সা নেই।

দারোগাবাবুর সঙ্গে বসে থাকতে মন্দ লাগছে না। সিগারেট সাধার পর থেকে খুব আপন আপন বোধ হচ্ছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠছেন। দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি

দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কেন?' কথাগুলো অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, বলে মনে হল।

'চাকরির খোঁজে।' সংক্ষেপে উত্তর দিল সে। তার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। তাঁর চোখে একবার তার চোখ পড়ে যাওয়ায় সে দেখল তিনি আরো জানতে চাইছেন। কিন্তু কি বলবে তা গুছিয়ে নিয়ে নিজে থেকে বলতে ইচ্ছে হল না। একটু পর দারোগাবাবু বললেন, 'আপনার মামলার তদন্তের ভার আমার ওপর পড়েছে। কাজেই বুঝতে পারছেন ওভাবে উত্তর দিলে আমার কোনো সুবিধে হবে না।'

তাঁর গলা বেশ ভারি বোধ হল। বলার ঢঙে আদেশের ভাব প্রকাশ পেল। সে কথাপ্রসঙ্গে আস্তে বলল, 'কি বলতে হবে?'

'আপনি কেন কলকাতায় এসেছেন, কারুর সাহায্য পেয়েছেন কিম্বা, এখানে এসে আপনার সংসার কিভাবে চলত, চাকরীর জন্যেই বা কি চেষ্টা করেছেন— এই সমস্ত কথা আমায় বুঝিয়ে বলুন।'

প্রশ্নগুলো শুনল সে। হঠাৎ কি খেয়াল হল বলল, 'না বললে কি হবে?'

রাস্তায় চলতে চলতে নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে দিলে যেমন চীৎকার করে ওঠে তেমনি চীৎকার করে উঠলেন, তিনি, 'কি হবে বুঝতে পারছেন না! আপনার মামলার রিপোর্ট আমি দিতে পারব না, আর আমার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কেস কোর্টে উঠবে না।'

'সব কথা না বললে আপনারা কি আমায় শাস্তি দেবেন?'

'কি মূর্খের মতো প্রশ্ন করছেন!'

'না, আপনারা—তো ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতেও পারেন!'

'আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন না, যে, আমার রিপোর্টের ওপর আপনার মামলা নির্ভর করছে।' সে একটু ভয় পেল। কেননা দারোগাবাবু যদি ইচ্ছে করেন তা হলে তার নামে অনেক কিছু লিখতে পারেন।

'আপনার কি এখানে থাকতে ভালো লাগছে?'

তাকে অপ্রতিভ করে তিনি প্রশ্ন করলেন। 'হ্যাঁ অথবা 'না' কোন উত্তরটা দিলে তিনি খুশী হবেন ভেবে পেল না সে। কোনো উত্তর না দেওয়ায় দারোগাবাবু আবার বললেন, 'আপনার কি বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না?' 'বাড়ী!' আর কিছু বলতে পারল না সে। ইচ্ছে করে ঠিক, কিন্তু কি হবে বাড়ী গিয়ে? কার জন্যে যাবে, কাকে নিয়ে সেখানে থাকবে? তাছাড়া বাড়ী বলে তো কোনো স্থান তার নেই। বিয়ে করেছিল; ছেলেও হয়েছিল একটা। যেখানে চাকরি করত সেখান থেকে এক কামরার যে কোয়ার্টার দিয়েছিল তাতেই থাকত। বউর কথা মনে পড়ায় তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

'আপনি কি আমার প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব দেবেন না!'

চমকে উঠল সে। 'কেন দেবো না, নিশ্চয়ই দেবো।' আস্তে উত্তর দিয়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকাল। দারোগাবাবু তাঁর দায়িত্বের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা বুঝিয়ে দেবার পর থেকে অবস্থাটা একটু অন্য রকম হয়ে উঠেছে। এতোদিন সে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এখন বুঝতে পারছে সেটা ঠিক হয়নি। তাঁর হাতে অনেক ক্ষমতা আছে। তিনি ইচ্ছে করলে তার নামে অনেক কিছুই লিখতে পারেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, 'আপনাকে আগেই বলেছি চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসেছি। কথাটা কিন্তু সত্যি; চাকরির খোঁজেই আমি কলকাতায় এসেছি।'

এই পর্যন্ত বলে সে থামল। আশা হল, এবার বুঝি তিনি বুঝবেন। সব কথা খুলে বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। পুরনো কথা ভাবতে ভালো লাগে না। ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়; মরতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে জানে ইচ্ছে করলেও তার পক্ষে মরা সম্ভব নয়।

'বুঝলাম আপনি চাকরির খোঁজেই কলকাতা এসেছেন। এখন কলকাতায় আসার পর কি হল, কি করলেন—সমস্ত ঘটনা আমায় খুলে বলুন। কোনো ফাঁক রাখলে চলবে না; তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।'

ক্ষতি হবে বলায় সে ঠিক করল সব কথাই বলবে। কিন্তু একবার বলতে গিয়েও থেমে গেল। কেননা সব কিছু চাপা দিয়ে কেবলই সেই রাত্রের ছবি মনে পড়ছে।

দারোগাবাবু একটা সিগারেট ধরালেন তাকেও একটা সাধলেন। সে নিল না।

'দার্জিলিং-এর কাছাকাছি চা-বাগানের চাকরি থেকে আমি ছাঁটাই হয়ে যাই। তারপর সেখানে অন্য কোথাও চাকরি জোটাবার অনেক চেষ্টা করি। চেষ্টা করতে করতে কয়েক মাস কাটে। হাতে যা ছিল সব শেষ হয়ে যায়। তখন আমার ছেলেটার বয়স সাত কি আট মাস। ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। আপনি তো দেখেছেন তাকে! আর হবে নাই বা কেন বলুন; ওর মা তো খুবই সুন্দরী ছিল। অমন সুন্দর বউ আপনাদের ঘরেও বেশি দেখা যায় না।'

'এসব কথা শুনতে চাই না; কলকাতার কথা বলুন।' তাকে বাধা দিয়ে বললেন তিনি।

এসব কথা বাদ দিয়ে কলকাতার কথা কি বলবে, ভেবে পেল না। ছোটো জানালার দিকে চেয়ে দেখল চড়ুই দুটি বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা নেমে আসতে চায়। কিন্তু দারোগাবাবু থাকায় সাহস পাচ্ছে না। সে ভাবল, বউটা যদি বেঁচে থাকত তাহলে তাকে এমন অবস্থায় পড়তে হত না। বউ মারা যাবার পর আরো বেশি করে মনে পড়ছে ওকে। বড় সুন্দর ছিল ও। ছেলেটা হবার পরও। এখন সে বুঝতে পারছে কাগজ থেকে ওর ছবিটা কেটে রাখা উচিত ছিল। মাঝে মাঝে তবু দেখতে পেত। দারোগাবাবুকে বলল, 'যে কাগজে আমার বউ আর ছেলের ছবি বেরিয়েছিল সেটা যোগাড় করে দিতে পারেন?'

'কেন?'

'মাঝে মাঝে ওদের দেখতে ইচ্ছে করে।'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি। তার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলেন বলেও মনে হল না। তার মনে হল, এসব কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। উনি হয়ত ভাবছেন সে একটি স্ত্রৈণ। মনে পড়ল উনি তার নামে অনেক কিছু লিখতে পারেন। তাতে তার ক্ষতি হতে পারে। একথা মনে হতেই সে পূর্ব-প্রসঙ্গ ধরল, 'চাকরি থেকে ছাঁটাই হবার পর ভাবলাম একাই কলকাতায় চলে আসি। অনেকে বলল, কলকাতায় গেলে চাকরি পাবে। শুনেছি এখানে আমাদের ওখানকার লোকেরা সাধারণত দারোয়ানের চাকরি করে। চলে আসব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু একা আসতে পারলাম না।

কেননা ওখানে বউ আর ছেলেকে রেখে আসবার জায়গা ছিল না।'

আর বলতে পারল না সে। স্পষ্ট দেখতে পেল সেদিনের ছবি। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে উঠল তারা। সেই প্রথম তার বউ ট্রেনে উঠল। ট্রেনে বসে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ও ট্রেনের চাকাগুলোর রহস্যময় চলা দেখছিল। চাকাগুলো ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে। কখন, কোথায় তলায় কি পড়ল, তার কোনো খেয়ালই রাখছে না। সে নিষেধ করায় ও মুখটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। ছেলেটাকে কোলে করে সে বসেছিল। আর ও আপন মনে দুপাশের দৃশ্য দেখছিল। ওকে দেখে খুশীই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে খুশী হতে পারে নি। ভালো লাগছিল না কলকাতায় আসতে। প্রথম থেকেই আশংকা হয়েছিল আর যদি
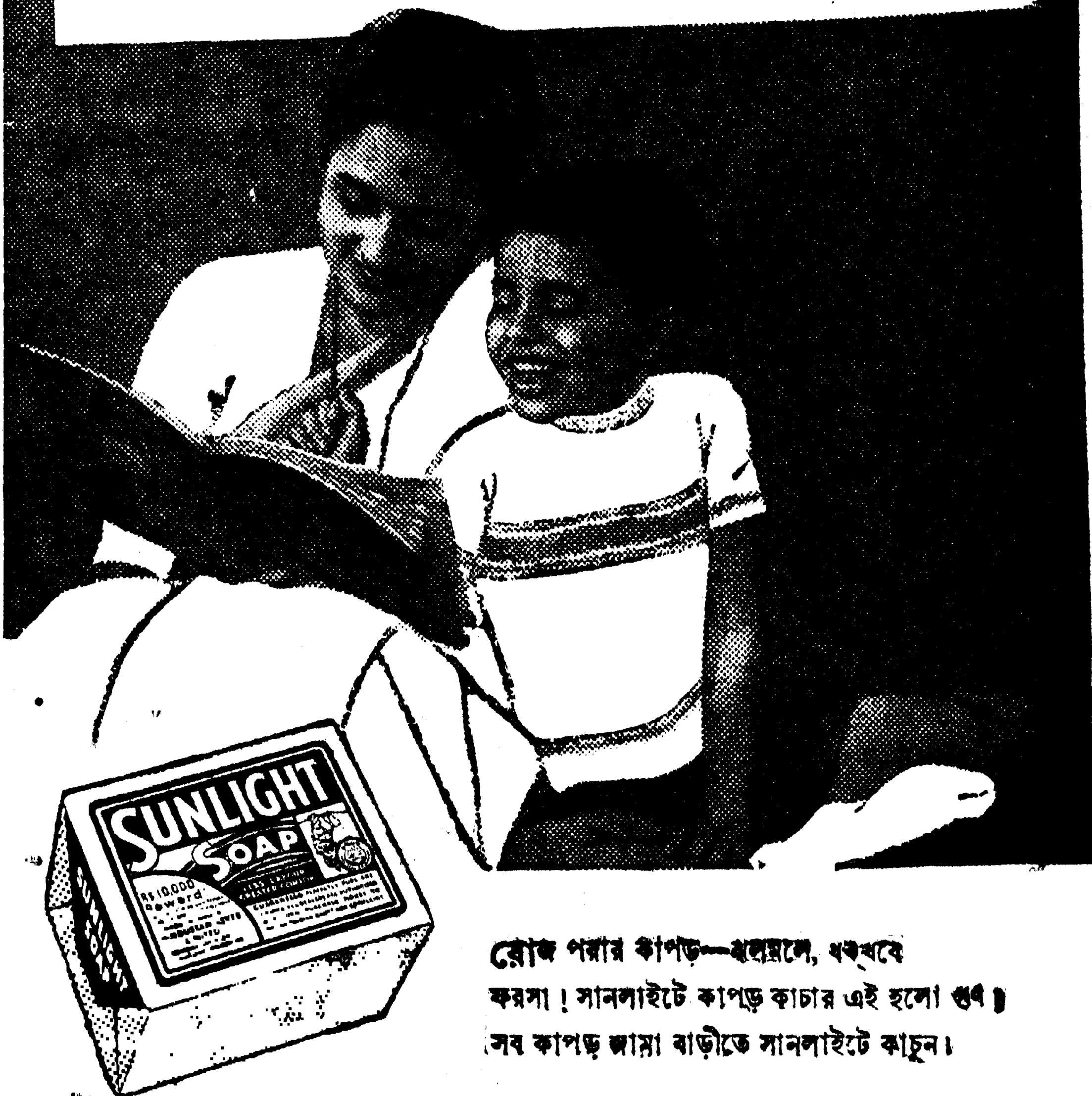
ফিরতে না পারে। এখন বুঝতে পারছে আর ফিরতে পারবে না।

সে থেমে যাওয়ায় দারোগাবাবু উসখুস করছিলেন। এতক্ষণ বেশ মন দিয়েই কথাগুলো শুনেছেন। আবার সে বলতে যাবে এমন সময় দারোগাবাবু বললেন, 'কলকাতায় কি আপনার জানা-শোনা কেউ ছিল?'

'আজ্ঞে না।'

তার এই উত্তরে তিনি একটু হতাশ হলেন। সে জানাল, 'কলকাতায় এসে প্রথমদিন স্টেশনেই ছিলাম। তারপর আমাদের ওদিককার একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে-ই আমাদের বাসাটা ঠিক করে দেয়।'

'সে এখন কোথায় থাকে? তার সঙ্গে কি আপনার আগের কোনো পরিচয় ছিল?'

'না, না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার চেহারা দেখে বুঝলাম সে আমাদের ওদিককারই লোক। কথা বলে দেখলাম তাই। তারপর তাকে সব খুলে বললাম।'

অন্য প্রশ্নটার জবাব না দিতে পেরে সে চুপ করে রইল। দারোগাবাবু বললেন, 'সে এখন কোথায় থাকে?'

'তাতো বলতে পারবো না।'

উনি তার উত্তরে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। সে লক্ষ্য করছে, তিনি তার কথা এখন আর বিশ্বাস করতে চান না। দারোগাবাবুর কাছে সে এখন আর দশ-জন কয়েদীর মতোই। চোর-ডাকাত-খুনী অনেক কয়েদীই এই জেলখানায় আছে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে তো তেমন কিছু করেনি! সত্যিই এমন কিছু সে করেনি যাতে তার জেল হতে পারে। এখানে থেকে থেকে সে ওদের মতোই হয়ে যাচ্ছে। তবু ভালো, ছেলেটা মরেছে। যদি বেঁচে থাকত তাহলে ওর কাছে মুখ দেখাতে পারত না। দারোগাবাবুর মতো ও-ও হয়তো বলত সে-ই বউকে মেরেছে। না, ছেলেটা মরেছে একরকম ভালোই হয়েছে। কাগজের ছবিতে ওকে শুয়ে থাকতে দেখেছে সে। মরে গেছে বলে মনেই হয়নি।

সে যখন এসব ভাবছিল তখন উনি কি-সব লিখে নিচ্ছিলেন। লেখা শেষ হতেই বললেন, 'তারপর বলুন!'

আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। সে বলল, 'একটা সিগারেট দেবেন?'

দারোগাবাবু পকেট থেকে সিগারেট বার করে তাকে দিলেন। নিজেও একটা ধরালেন। সিগারেটে বেশ আরাম করে টান দিল সে। এতো কথা একসঙ্গে বহুদিন বলেনি। সেই সে-রাত্রে বউর সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল। দুজনে অনেক কথা সেদিন বলেছিল। তারপর বিষ খেয়ে ও যখন বিছানার গা এলিয়ে দিল তখন অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখল সে। মরবার আগের মুহূর্তেও যেন কি-কথা বলতে চেয়েছিল; কিন্তু পারেনি। সে তারপর ওর ঠাণ্ডা দেহটা অনেকবার নেড়েচেড়ে দেখেছে। সিগারেটে ভালো করে টান দিল সে। ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে আওয়াজ হচ্ছিল। প্রাণপণে আওয়াজটা চাপবার চেষ্টা করল।

'দারোগাবাবু আপনার বউ আছে?'

'আমি বিবাহিত।' সংক্ষেপে তার কথার উত্তর দিলেন তিনি।

ভালো লাগল না তাঁর কথা বলার ঢঙটা। মনে হল, অনেক কিছু চেপে রেখে জবাব দিলেন। সে ঠিক এরকম জবাব আশা করেনি। এতো নির্বিকার ভাবে কথা বললেন তিনি যে তার ধারণা হল দারোগাবাবু স্ত্রীকে ভালোবাসেন না। জবাব দেওয়া ভদ্রতা, এরকম ভেবেই হয়ত বলেছেন।

'আচ্ছা আপনি কখনো আপনার বউয়ের গায়ে হাত দিয়েছেন?'

'কি বোকার মতো প্রশ্ন করছেন!' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি।

বোকার মতো কি এমন কথা বলেছে, সে বুঝতে পারল না। যাই হোক, দারোগাবাবুর স্ত্রীর দেহ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর মতো নয়! মরা দেহটাও কি নরম ও সুন্দর ছিল? আর একবার যদি ওর দেহটায় হাত বুলোতে পারত! ওর মতো নরম সুন্দর দেহ যদি দারোগাবাবুর স্ত্রীর হত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এভাবে উত্তর দিতেন না। বউটা যদি আজ বেঁচে থাকত তাহলে দেখাতে পারত কেন সে এমন প্রশ্ন করেছে।

'আপনি এতো বউ বউ করেন কেন?'

'বড় ভালো ছিল বউটা!'

'মরবার আগে বোঝেননি? মরতে দিলেন কেন?'

'না, না; আমি মরতে দেইনি।' তাড়াতাড়ি বলল সে। এতো তাড়াতাড়ি বলল যে তিনি শুনতে পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

'হয়তো দিয়েছি—' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু লিখে নিলেন।

'দারোগাবাবু, আপনি আপনার বউকে ভালোবাসেন?'

'কেন বাসবো না!'

'আমি যে আমার বউটাকে কি ভালোবাসতাম তা আপনাকে কেমন করে বোঝাই! উঃ, ও যদি আজ বেঁচে থাকতো তাহলে আপনাকে দেখাতাম কতো ভালো বউ আমার ছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমিই ওকে মরতে দিয়েছি।'

দারোগাবাবু তার কথায় খুশী হলেন। সে-ও খুশী হল তাঁকে দেখে। তাঁর জুতো-জোড়া পালিশ করা, চক-চক করছে। সেদিকে তাকাতেই তাঁর জুতোতে মুখের ছায়া দেখতে পেল সে। দূর থেকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ভাবল মুখটা নীচু করে দেখবে কিনা। না, তাঁর জুতোর পালিশ যদি নষ্ট হয়ে যায়। সে তখন জানালার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল। চড়ুই দুটি দেখতে পেল না।

দারোগাবাবুকে এখন তার ভালো লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে, মাথাটা মালিশ করে দিতে।

'তারপর বলুন কলকাতায় বাসা ভাড়া করে কি করলেন।'

'কিছুই করতে পারিনি; সত্যি বলুন কিছু করতে পেরেছি কি?'

'না, না, আমি ওভাবে কথাটা বলিনি। কলকাতার বাসায় আপনার কিভাবে চলল, চাকরি-বাকরির কি চেষ্টা করলেন—এইসব আর কি।'

তার মনে হল, তিনি একথাও বলতে চেয়েছিলেন—কেন বউকে মারলেন। কিন্তু পারলেন না। কলকাতার দিনগুলো তার কাছে বীভৎস। এখানে আসবার পর মাঝে মাঝে মনে যে না পড়েছে—এমন নয়; তবে যখনই মনে পড়েছে তখনই মরবার ইচ্ছে জেগেছে।

'ওসব জেনে আপনার কি হবে? ভালো লাগে না ওসব বলতে।'

'আপনার ভালো-লাগাটাই তো সব নয়; আমি আপনার মামলার তদন্ত করছি একথা মনে রাখবেন।'

'সত্যি বলছি আমাকে আর ওসব কথা বলতে বলবেন না, পারি না!'

ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বলল সে। কলকাতার কথা ভাবতে গেলেই কে যেন তার গলা চেপে ধরে। চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'বউ ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার সামর্থ্য যার নেই, তার কোনো অধিকার নেই তাদের কথা মুখে আনার।' তার সামনে বউ আর ছেলে বিষ খেয়ে মরেছে একথা সত্য। সে তাতে বাধা দেয়নি, একথাও সত্য। কিন্তু একথাও সত্য বাধা দেবার কোনো অধিকার তার ছিল না। গাছের ডাল থেকে একটি পাখী পড়ে গিয়ে আহত হলে তাকে সুস্থ করবার জন্যে এগিয়ে আসে পথ-চলতি মানুষে। অথচ সে নিজের বউ এবং ছেলেকে স্বেচ্ছায় মরতে দিয়েছে! একথা বিস্তৃত করে বলতে তার সাহস হচ্ছে না। কি করে বলে নিজের অক্ষমতার ইতিবৃত্ত! দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি বলবেন না? তাহলে আমায় ধরে নিতে হচ্ছে আপনিই আপনার স্ত্রী এবং পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছেন।'

তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বুটের আওয়াজ তুলে চলে গেলেন তিনি।

দারোগাবাবু চলে যাবার পর তার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। কদিন থেকে মামলার ভাবনা তকে চঞ্চল করে তুলেছে। বাঁচবার ইচ্ছেটা দিন দিন বাড়ছে। যে কদিন মামলার কথা ভাবিনি সে কদিন এতো খারাপ লাগেনি। তার পাশের কয়েদীটির পঁচিশ বছর জেল হয়েছে। তার যদি তেমনি পঁচিশ বছর জেল হয়! পঁচিশটি বছর যদি এখানে কাটাতে হয়! ভাবতেও পারে না সে।

কাল সারারাত তার প্রতিবেশী ঘুমোয়নি। দেয়ালে এতো জোরে জোরে লাথি মারছিল যে কেবলই তার ভয় হচ্ছিল দেয়ালটা যদি তার ওপর ভেঙে পড়ে! আশ্চর্য, এখানে ঘুমাতেও দেবে না। চাবাগান থেকে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিত তারা। বাসায় ফেরবার আগেই তার বউ রান্না করে রাখত। খেয়ে শুয়ে পড়ত তারা। তাদের ওদিকে তাড়াতাড়ি রাত হয়। শীতকাল হলে তো কথাই নেই! এখানে এই মেঝেতে একা একা শুয়ে থাকতে হয়; অবশ্য পাশ ফিরলে দেয়ালের সংগ পাওয়া যায়। বউটা যদি না মরতো, তাহলে আবার ওখানে ফিরে যেত। 'অমন বউটাকে মেরে ফেললাম!'— ভাবল সে। দারোগাবাবু বলে গেলেন সে মেরেছে। সে মেরেছে? কি জানি হয়তো মারতেও পারে। না, দারোগাবাবু ভুল বলেছেন; অমন ভালো বউকে কি মারা সম্ভব? চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল তার।

বারান্দা দিয়ে এক সিপাই গটগট করে চলে গেল। পেছন পেছন গেল তার লম্বা ছায়াটা।

চড়ুই দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো আওয়াজ আসছে না। রাত কতো হয়েছে সে জানে না। তবে এই বারান্দার অন্ধকার এবং আলো দেখে সে বুঝতে পারছে শুয়ে পড়বার সময় হয়েছে। প্রতিবেশী যদি আজও ঘুমোতে না দেয়—এমন আশংকা করার কারণ আছে। গতরাত্রে তার জন্যে সে ঘুমাতে পারেনি। ঘরময় পোড়া সিগারেট, দেশলাই কাঠি এবং ছাই ছড়িয়ে। হাত দিয়ে সেগুলো জড় করে সে দরজার ফাঁক দিয়ে বারান্দায় ফেলে দিল। দারোগাবাবুর সংগে অনেকক্ষণ কথা বলে এখন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। শুয়ে পড়ল তাই। তার হাতে এখনো সিগারেটের গন্ধ লেগে। অত্যন্ত পরিচিত গন্ধ। বারে বারে হাতটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘ্রাণ নিল সে। একটা সিগারেট পেলে বেশ ভালো হত। কতোদিন পর সে সিগারেট খেল! সিগারেটের গন্ধতেই হোক অথবা ক্লান্তি-তেই হোক সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল হতে না হতেই কান্নার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠল সে। তার প্রতিবেশী কয়েদীটি, যে পরশু রাত্রে তাকে ঘুমোতে দেয়নি, হাউ হাউ করে কাঁদছে। দেয়ালে কান পাততে হয় না, এমনিই পাশের ঘরের আওয়াজ আসে। একজন সিপাইকে ডেকে ব্যাপারটা জানল সে। গতকাল বিকেলে তার একজন আত্মীয় এসেছিল! তার কাছে খবর পেয়েছে যাকে সে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল সে কলেরায় মারা গেছে। ঐ মেয়েটাকে ভালোবাসতো আর একজন পুরুষ। সে তাকে খুন করে এখানে এসেছে।

ঘটনাটা শুনে আশ্চর্য হল সে। কেননা কাল রাত্রে তার প্রতিবেশী একটুও গোলমাল করেনি। বুঝতে পারল সারারাত চুপ করেছিল। কিন্তু সকালের আলো ফোটার সংগে সংগে আর চুপ থাকতে পারেনি; কান্নায় ফেটে পড়েছে। দুপুরে কয়েকজন সিপাই এবং একজন দারোগা এল। পাশের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পেল সে। তার সামনে দিয়েই ওরা ওকে নিয়ে গেল। ওকে আর এখানে রাখা হবে না; পাগল হয়ে গেছে। অথচ তার সামনে দিয়ে যখন ও গেল তখন ওকে দেখে পাগল মনে হয়নি। লোকটা পাথর হয়ে গেছল; সকলে মিলে ধরাধরি করে পাথরটা সরিয়ে নিয়ে গেল।

এ ঘটনা ঘটে যাবার পর সে ভীষণ অসহায় বোধ করল। এই জেলখানা এতো নীরব যে সামান্য কিছু হলেই মনকে নাড়া দেয়। তার সামনে বউ এবং ছেলে মরেছে সে পাগল হয়নি। অথচ ও পাগল হয়ে গেল। সে-ও যদি পাগল হয়ে যায়! পাগলরা জ্ঞানশূন্য; জগতের কোনো জিনিসের মূল্য তারা বোঝে না। এমনকি তারাও যে একদিন মানুষ ছিল একথাও নাকি ভুলে যায়। সে পাগল হয়ে গেলে তেমনি হয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে সে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। 'আঃ! বউটা যদি এসময় থাকতো!'— ভাবল সে।

সে মাঝে মাঝে নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। এরকম হয় যখন চা-বাগানের কথা মনে পড়ে। বাগানের কাছেই তার এক-কামরার কোয়ার্টার ছিল। সেই কোয়ার্টারে বউ এবং ছেলেকে নিয়েই ভালোই ছিল সে। এখন মনে হয় ধর্মঘট না করলেই হত। যা মাইনে পেত তাদের আড়াইজনের সংসার কোনো রকমে চলে যেত। কিন্তু যাদের সংসার বড় তাদের চলত না। চা-বাগানের আয় গত দু'বছরে অনেক বেড়ে গেছল। তারা সকলে মিলে ঠিক করল মালিকের কাছে একত্র হয়ে গিয়ে মাইনে বাড়াবার কথা বলবে। ভালো কথা বলতে পারত সে। কেননা ছেলেবেলায় চার্চের ইস্কুলে সে পড়েছে। একদিন সকলে মিলে মালিকের কাছে গেল। উনি তাদের কয়েকজনকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। কয়েকজন ভেতরে গিয়ে তাঁকে তাদের কথা জানাল। উনি কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না; তাদের দাবি শুনলেন। তারপর একমাস কেটে গেল। মাসের শেষে যখন মাইনে পেল তখন সকলে দেখল এক পয়সাও বাড়েনি।

দারোগাবাবু যে কখন এসেছেন সে লক্ষ্য করেনি। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দরজার গরাদের ওপর একটা পা-তুলে কোমরে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; মুখে সিগারেট। কোমরে এবং বুকের ওপর যে বেল্ট বাঁধা, সেগুলি একটু আগেই পালিশ করিয়েছেন বুঝি; চকচক করছে। কোমরের বেল্টের একপাশে একটা

রিভলবার। তার চামড়ার খাপটাও পালিশ করা।

'কি ভাবছিলেন একমনে?' মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন তিনি।

'না, এমন কিছু নয়। আপনি বুঝি অনেকক্ষণ এসেছেন?'

'একটু আগে এসেছি। আপনি গম্ভীরভাবে মগ্ন ছিলেন, বুঝতে পারেননি। স্ত্রীর কথা ভাবছিলেন বুঝি!'

কোমরে একটা হাত রেখে...

তাঁর কথায় ধাক্কা দেওয়ার সুর আছে বোধ হল। তিনি ধরে নিয়েছেন, সে একটি বউ-পাগলা। যেন বউ ছাড়া তার আর কিছু ভাববার নেই।

'এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখে যাই আপনি কি করছেন।'

একজন সিপাই এসে দরজা খুলে দিল। তার কি করা উচিত বুঝে উঠল না। তিনি ভেতরে আসবার পর মনে হল তার উচিত ছিল তাঁকে ভেতরে ডাকা। দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সে। একটা টুলে বসে তাকে বসতে বললেন তিনি।

গতদিনের কথা কাটাকাটি মনে পড়ল তার। সহজ হতে পারল না তাই। দারোগাবাবুর পাশে নিজেকে বড় ছোটো মনে হল তার। কিন্তু তিনি তার জড়তা ভেঙে দিলেন।

'আপনি কাল যে সমস্ত কথা বলেছেন তাতে আমার অনেকটা কাজ হয়ে গেছে।'

সে নীরবে মাথা নত করে শুনল।

'এরকমভাবে যদি বাকি ঘটনাটা আমায় জানিয়ে দেন, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার কেসের রিপোর্টটা দিয়ে দিতে পারব।'

এবারও সে কোনো উত্তর দিল না।

'অবশ্য আমি বুঝতে পারি আপনার কষ্ট হয় সে সব কথা বলতে। কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। আপনি যে খুব ভালোবাসতেন স্ত্রীকে।'

'সত্যি খুব ভালোবাসতাম,' আর চুপ করে থাকতে পারল না সে।

'সে আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা, আপনার ছেলেটার কতো বয়স হয়েছিল বলেছিলেন?'

'এক বছরের কিছু কম। ছেলেটা ভারি সুন্দর হয়েছিল; কলকাতার বাসায় সারাক্ষণ হামা দিয়ে বেড়াত।'

'চাকরির জন্যে আপনি চেষ্টা করেছিলেন?'

'কয়েকটা কারখানায় গেছলাম; কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করেনি। পরিচিত একজন মানী লোকের সার্টিফিকেট চেয়েছিল অনেক জায়গায়। আমার জানাশোনা তেমন কেউ নেই।'

'এই নিন।' হাত বাড়িয়ে তাকে সিগারেট দিলেন তিনি।

সে দেখল চড়ুই দুটি ওপর থেকে দেখছে। দারোগাবাবু রোজ রোজ কেন তার কাছে আসেন—ওরা বুঝতে পারছে না বোধ হয়। দারোগাবাবু একগাল ধোঁয়া ছাড়তেই ওরা বেরিয়ে গেল।

দারোগাবাবুর চকচকে পোষাক আর অন্তরঙ্গতা তার মাথা নত করে রাখতে চাইল। এখানে এই খুপরিতে সারাক্ষণ একা থাকে সে। এমন থাকা তার অভ্যাস নয়। দারোগাবাবু মাঝে মাঝে আসেন, কথা বলেন। মন্দ লাগে না। যখন বুঝতে পারেন তিনি তার ভালোর জন্যেই সমস্ত কথা জানতে চাইছেন তখন থেকে তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আবার এক এক সময় মনে হয়, তিনি আর তার কি ভালো করবেন? বউ আর ছেলের মৃত্যুর কারণ সে, আইন তাকে শাস্তি দেবে। জেলখানায় যে একবার ঢোকে সে কিছুদিন না থেকে বেরোয় না। এটা এখানকার চলতি কথা। তার বউ আর ছেলেকে সে নিজে মেরেছে—আইনে হয়তো একথা প্রমাণিত হবে; সে খুনী—বিচারক ঘোষণা করবেন।

'কি ব্যাপার চুপ করে গেলেন।' তাঁর সিগারেট শেষ হয়ে এসেছে।

'আচ্ছা, আমার কতোদিনের জেল হবে?' দারোগাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'ওকথা কেন ভাবছেন, তার কোনো ঠিক আছে!'

তাঁর কথা শুনে তার মনে হল অনেকদিনের জেল হবে।

'ফাঁসিও-তো হতে পারে?'

'না, না, না। ওসব বাজে কথা; ফাঁসি হবে কেন, আপনি তো আর নিজে ওদের মারেননি।'

'হয়তো আমিই ওদের মেরেছি!'

কদিন থেকে কেবলই তার একথা মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে সে-ই ওদের মেরেছে। এ ধারণা মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না। তবে ক্রমশ সেটা বিশ্বাসে পরিণতি পাচ্ছে। এখন আর উলটো কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'ফাঁসি আপনার হবে না; সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। আপনার যাতে ফাঁসি না হয় সেরকম করেই রিপোর্ট লিখে দেবো।'

'না, না; ফাঁসির ব্যবস্থাই আপনি করে দিন। বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। যখন এখান থেকে ছাড়া পেয়ে গাঁয়ে ফিরে যাবো তখনকার অবস্থা ভেবে দেখেছেন। না, না; সে আমার সহ্য হবে না।' কথাগুলো বলার সময় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল সে।

'কেন এখান থেকে বেরিয়ে দেশে গিয়ে যাই হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবেন।'

'তখন আমাকে কেউ চাকরি দেবে না। সকলে জেনে যাবে, আমি বউ ছেলেকে খুন করে গাঁয়ে ফিরে এসেছি। তার চেয়ে অনেক ভালো ফাঁসি। শুনেছি, এখানে নাকি গলায় দড়ি পরিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। সে বেশ ভালো; বেশি কষ্ট নেই, সময়ও বেশি লাগে না।'

'কি সব বাজে কথা ভাবছেন। বললাম, না আপনার যাতে ভালো হয় সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।' সে চুপসে গেল। অস্বাভাবিক জোরে কথাগুলো তিনি বললেন। তার ভালো তিনি কিছু করতে পারেন, একথা তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। অন্য কয়েদীদের মুখে এমন কথা সে কখনো শোনেনি। তাছাড়া তার ভালো করার মতো কি আর আছে। যে মানুষ বউ-ছেলেকে মেরেছে তার ভালো করার কথা আইনে আছে কিনা সে জানে না।

'আপনি মন খারাপ করবেন না; আমাকে সব কথা খুলে বলুন।'

আগের মতো জোরে নয়, বেশ আস্তে অনুনয় করে বললেন তিনি।

'কি বলব আপনাকে; আমি আমার বউ-ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি—আপনি তো জানেন!'

'জানি। তবুও সব কথা না জানলে আমার পক্ষে রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়।'

একটু ভেবে তার দিকে তাকাল সে। তারপর মাথা নীচু করে বলল, 'চাকরির চেষ্টা করেও যখন কিছু হল না তখন আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। শেষদিকে সেজন্যে বাড়ী থেকে বেরুতাম না, সারাক্ষণ বাড়ীতেই থাকতাম। এদিকে প্রথম মাসের ভাড়াও বাড়ীওয়ালাকে দিতে পারিনি; তিনি প্রায়ই এসে তাগাদা দিচ্ছিলেন। কিন্তু ভাড়া-তো দূরের কথা খাবার মতো পয়সাও আমার ছিল না। বউ বলেছিল গাঁয়ে ফিরে যেতে; কিন্তু আমি রাজি হইনি। কি হবে গাঁয়ে গিয়ে, সেখানেও যখন উপোস করতে হবে তখন এখানে থাকতে আপত্তি কি! এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছি। গাঁয়ে ফিরে গেলে উপোস করতে হলেও বউ আর ছেলেকে এভাবে মরতে হতো না। একথা বিশ্বাস করেন আপনি?'

'আপনার সব কথা আমি বিশ্বাস করি।'

'বেশ কয়েকদিন আমরা উপোস করেছিলাম। আমার আর বউর কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। কেননা আমরা জানতাম এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। কিন্তু—ছেলেটা ওকথা বুঝতো না। রাত-দিন চীৎকার করত। অবিশ্যি তাতে ওর কোনো দোষ ছিল না, আমাদের সংগে ওকেও উপোস করতে হয়েছিল।' সে আর বলতে পারল না। গলা থেকে যেন বন্যার মতো কান্না উঠে আসতে চাইল। নিজের ছেলেকে খেতে দিতে পারেনি; একথা ঘটা করে একজনকে শোনানো যে কি কষ্টকর, বুঝতে পারল সে।

দারোগাবাবু তার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। একটা সিগারেট দিলেন।

'ছেলেটা খিদেয় চীৎকার করতো; আপনি কি করলেন?'

'আমি?—আমি কিছুই করতে পারিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমাদের আর ও-বাড়ীতে থাকতে দেবে না। বাড়ীওলা শেষ কথা বলে গেছলেন। অথচ কোথাও যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কলকাতায় এমন কেউ নেই যে আমাদের সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। সারাদিন বউর সংগে পরামর্শ করলাম। এমন অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বউ বললে, আমরা যদি বিষ খেয়ে মরে যাই তাহলে সব মিটে যায়। আমি এই কথায় প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু তারপর দুজনে মিলে মনস্থির করলাম।'

একটু থামল সে। তারপর আবার বলল, 'দারোগাবাবু, এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।' দারোগাবাবু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে শুনলেন।

সে থামল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেদিনের ছবি। সন্ধ্যের সময় সে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় তখন আলো জ্বলছিল, লোকজন ভর্তি ছিল। ভীষণ ভয় করছিল পথ চলতে। এতো লোক দেখে একবার তার মনে হয়েছিল, দরকার নেই বিষ কিনে, বাড়ী ফিরে যাবে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও খালি হাতে ফিরতে পারেনি সে। রাত অনেক হলে বিষ কিনে বাড়ী ফিরল।

ছবিটি মনে পড়ায় মুখ বন্ধ হয়ে গেছল তার। দারোগাবাবু স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় আবার বলতে লাগল সে, 'একটা বাটিতে বিষ গুলে আমরা পাশাপাশি বসলাম। রাত তখন অনেক; বাড়ীর অন্যান্য কোনো ঘর থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেক আগেই। ঘরে কোনো আলো ছিল না, বউ বা ছেলের মুখের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল বলতে পারবো না। তবে মনে আছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বউ শক্ত ছিল। কথা ছিল ও-ই আগে ছেলেকে বিষ খাইয়ে পরে নিজে খাবে এবং সব শেষে আমি। দারোগাবাবু, আমি তা পারিনি, কথা মতো কাজ আমি করতে পারিনি। বাটিটা মুখের সামনে তুলেছিলাম ঠিক, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি, পড়ে গেছল।'

কথা শেষ হতে না হতেই দারোগাবাবুর পা জড়িয়ে ধরল সে। তিনি আস্তে আস্তে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর দরজাটা অনেকক্ষণ খোলা ছিল; কিন্তু সে বেরিয়ে যেতে পারেনি।

একটু পর দূরে থেকে ভেসে-আসা হাসির আওয়াজ শুনে সে উঠে দাঁড়াল।

দরজার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে যতোটা সম্ভব মাথাটা বাইরের দিকে বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করল। রাত তখন অনেক হয়েছে। কাউকে সে দেখতে পেল না। আবার সেই হাসির শব্দ শুনতে পেল; এবার একটু জোরে মনে হল। সরে এল সে দরজার কাছ থেকে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে,—এমন সময় চড়ুই দুটি গোলমাল শুরু করে দিল। ভীষণ রেগে চীৎকার করে ওঠায় ওরা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখল, চুপ করে গেল। আশ্চর্য, হাসিটা ক্রমশঃ বাড়ছে; অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে। ডানদিকের দেয়ালে কান পাতল, মনে হল শব্দটা ওঘর থেকেই আসছে। আবার কান পাতল; ঠিক ধরেছে। কিন্তু ওঘরে-তো কেউ নেই! তবে? বাঁদিকের দেয়ালে কান পাতল, ওদিক থেকেই হাসিটা আসছে বলে বোধ হল। সরে এসে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। কি মুশকিল! হাসিটা আরো জোর মনে হল। এমন সময় ঘরের আলোটা নিভে গেল।

'কেমন আছেন এখন?'

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল সে: প্রশ্ন করতেই চোখ মেলে সামনে দারোগাবাবুকে দেখল। কোনো উত্তর না দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চারপাশটা দেখে নিল। একটা বড় ঘরে অনেকগুলো লোহার খাট, দু-একটা বাদে সব কটাতেই লোক শুয়ে। এটা হাসপাতাল সে বুঝল।

'কেমন আছেন এখন?' কোনো উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলেন দারোগাবাবু।

এবার তার অবস্থাটা বুঝতে পারল সে। বলল, 'এই আছি আর কি!'

পাশ ফিরল।

'কাল রাত্রে কি হয়েছিল আপনার? হঠাৎ ওরকম চীৎকার করে উঠলেন।'

কোনো কথা বলল না সে। কাল রাত্রে কি হয়েছিল মনে নেই তার। এমন কি কখন সে এখানে এসেছে তাও সে জানে না। হাসপাতালের জানালাগুলো খোলা। সকালের রুদ্দুর এসে মেঝেতে পড়েছে। অনেকদিন পর রুদ্দুর দেখে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

'কাল বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। অনেক বাজে কথা বলেছেন।'

পাশ-ফেরা অবস্থায় সব কথাই শুনল সে। তবু কোনো কথা বলল না। কি বাজে কথা সে বলেছে তাও জানতে ইচ্ছে করল না। এখন এতো ভাববার বা বলবার ইচ্ছে নেই তার।

'হাসপাতালে নিয়ে আসবার পরও অনেকক্ষণ আবোল-তাবোল বকেছেন।' নিজে থেকেই কথা বলে যাচ্ছেন দারোগাবাবু: আপনি আপনার বউ-ছেলেকে খুন করেছেন—এরকম কি একটা বার বার বলছিলেন। আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়েছি, এমন সময় একজন সিপাই এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আশ্চর্য, হঠাৎ কেন যে এমন হয়ে গেলেন!' থামলেন দারোগাবাবু। সে তেমনি পাশ ফিরে শুয়ে। দারোগাবাবুর কথা শুনে তার কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে হল না।

'ডাক্তার বলেছেন, ওকিছু নয়, সাময়িক উত্তেজনা। একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন কিনা। ভাববেন না, ভালো হয়ে গেছেন; কালই এখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবে।'

ভালো হবার চিন্তা একবারও তার মনে আসেনি। এবার উঠে বসল সে।

লাল রঙের কম্বলটা জড়িয়ে নিল গলা পর্যন্ত। গরম না লাগলে মাথার ওপর তুলে দিত। একবার ভাবল চোখ তুলে দেখে দারোগাবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন কিনা। না দেখেও সে বুঝতে পারল তার দিকে চেয়ে আছেন তিনি। আশ্চর্য হয়েছেন [illegible] তার কম্বল জড়ানো দেখে। কম্বলের তলা দিয়ে একটা পায়ের কিছুটা বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই পাটা আর একটু ঢুকিয়ে নিল।

'আপনার কি শীত করছে? জ্বর আসছে নাকি?'

তার কপালে হাত রাখলেন দারোগাবাবু। বললেন, 'কই, না-তো!'

কোনো জবাব দিল না সে। এখানে আসবার পর আজ সকালেই তার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে। বুঝতে পারছে গতকাল রাত্রে কিছু একটা হয়েছিল, তাই তাকে এখানে আনা হয়েছে।

তথাপি কথা বলতে তার সাহস হচ্ছে না। অন্যদিন দারোগাবাবুর সঙ্গে সে অকপটে কথা বলেছে। অথচ আজ কেন জানি সে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারছে না তাঁর দিকে।

এতক্ষণ যে রুদ্দুরটা ঘরের মেঝেতে ছিল এখন সেটা আকাশে মেঘের পেছনে। জানালা দিয়ে দেখল সে।

'মনে হচ্ছে আজ জল হবে। যা গরম পড়েছে—হলে বাঁচা যায়।'

দারোগাবাবুর এই মন্তব্য শুনে তার মনে হল, তার কম্বল জড়ানোকে ঠাট্টা করে কথাগুলো বললেন তিনি। অবশ্য এরকম মনে হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর দিকে তাকাতে পারল না।

'আপনার কি শরীর খারাপ মনে হচ্ছে?'

'না।'

চেহারাটা কিরকম হয়েছে যা দেখে উনি তার শরীর খারাপের কথা বললেন—আয়নায় দেখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সামনেই দারোগাবাবু বসে। উঠতে গেলেই প্রশ্ন করবেন। সে চাইছিল উনি উঠে যান। কেননা তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই তার। উপরন্তু এভাবে নিজের থেকে একের পর এক প্রশ্ন করলে তার পক্ষে চুপ করে মাথা নত করে থাকা সম্ভব হবে না।

'আমি এখন উঠি: পরে আবার আসবো'খন। চলে গেলেন দারোগাবাবু।

বিছানার ওপর বসে চারপাশটা ভালো করে দেখল সে। এতোক্ষণ দারোগাবাবু সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে ভালো করে দেখতে পারেনি। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে সবকটি বেডে চোখ বুলিয়ে নিল।

'কি ব্যাপার আপনার ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?'

যেতে যেতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল নার্স। কোনো উত্তর দিল না সে। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কোনো বেডের রোগীই গায়ে কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে নেই। পাখাগুলো ঘুরছে; সময়টাও গরমের। ঠাণ্ডা তার লাগছে না, বরং কম্বল গায়ে দেওয়ায় গুমোটটা বেশি বোধ হচ্ছে। অথচ কিছু গায়ে না দিলে অস্বস্তি বোধ করবে সে।

কাল রাত্রে কখন তাকে এখানে আনা হয় জানে না সে। দারোগাবাবু চলে যাবার পর কি কি ঘটেছিল, কেন তাকে এখানে আনা হল, কিছুই সে জানে না। আজ সকালে বুঝতে পারল, কাল রাত্রে এমন কিছু সে করেছিল যার জন্যে তাকে এই হাসপাতালে আনা হয়েছে। বেডগুলোর অনেকগুলিই ফাঁকা। কেউ কেউ বারান্দায় রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে। উঠে গিয়ে হাসপাতালটা ঘুরে আসতে ইচ্ছে হল তার।

কিন্তু সে উঠতে পারছে না। দুজন রোগী কথা বলছে, আর বারে বারে তাকে দেখছে। মনে হল ওরা তার সম্পর্কেই আলোচনা করছে। কি বিষয়ে আলোচনা করছে তা সে জানে। কাল সে নাকি অনেক বাজে কথা বলেছে। এ ঘরের সমস্ত রোগীই বোধ হয় জেনে গেছে তার কেন জেল হয়েছে। সেই বিষয়েই ওরা আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে দেখছে তাকে। ভাবটা ঃ তার মধ্যে না-দেখা কিছু আছে, সেটা আবিষ্কার করতে হবে।

সকলে সব জেনে গেছে—এ ধারণা হবার পর থেকেই তার অবস্থাটা কি সদ্য ফুটো-হয়ে-যাওয়া জাহাজের মতো আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে; এতো আস্তে যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। কম্বলটা দুহাতে চেপে ধরেছে সে।

ঘরের একদিকে একটা টেবিল ঘিরে তিনটে চেয়ার ও একটা ছোটো আলমারি। এতোক্ষণ একটি চেয়ারে নার্স বসেছিল। ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল। বসে বসে দেখল সে। ডাক্তার কিছু প্রশ্ন করায় নার্স হাত নেড়ে নেড়ে তার উত্তর দিচ্ছে। নার্সের হাতটা বারে বারে তার দিকে ঝুঁকছে দেখে সে আরো গুটিয়ে বসল। দূরে থেকে সে যেন তাদের কথোপকথন শুনতে পেল ঃ

'কালকের পেসেন্ট্‌টা কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'একটু লক্ষ রাখবেন ওর প্রতি; লোকটা নিজের স্ত্রী ও ছেলেকে খুন করেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। যিনি ওর কেসটা তদন্ত করছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হল একটু আগে। উনিই বললেন আমাকে।'

'ইস!'

আর শুনতে পেল না সে। মাথাটা নাড়া দিয়ে কান পাতল বাতাসে। কিন্তু ডাক্তার বা নার্সের কোনো কথা তার কানে এল না। সেদিকে আর তাকাতে পারল না সে। কম্বলটা গায়ের ওপর তুলে দিল। চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

'থার্মোমিটারটা লাগান দেখি।'

নার্সের গলা শুনতে পেয়ে উঠে বসল সে। নার্স এবং ডাক্তার তার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। উঠে বসতেই তার হাতের নাড়ী ধরল ডাক্তার। সে অচেতন দম-দেওয়া পুতুলের মতো থার্মোমিটারটা বগলের তলায় চেপে ধরল। বুঝতে পারল, নার্স এবং ডাক্তার দুজনেই তার কম্বল মুড়ি দেওয়া দেখে অসুস্থতার অনুমান করেছে। তাদের অনুমান যে সত্য নয় এবং অসুস্থতার সঙ্গে কম্বলের কোনো সম্পর্ক যে নেই—কথাটা জানিয়ে দেবার ইচ্ছে হল। কিন্তু ইচ্ছে মতো কথা বলার আগেই ডাক্তার তার হাতটা ধরে ফেলল এবং সে-ও থার্মোমিটারটা নার্সের কাছ থেকে নিয়ে নিল।

'কই আপনার তো কোনো টেম্পারেচার নেই! কম্বল গায়ে দিয়েছেন কেন?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বলল, 'না, বেশ ভালো আছি।' কম্বলটা পায়ের তলায় টেনে নিয়ে ভালো করে গুটিয়ে বসল সে।

'আপনার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?' নরম গলায় প্রশ্ন করল নার্স।

এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না সে; সত্যি বলতে কি জবাব দেবার মতো কিছু নেই।

'শরীর ভালোই আছে, মনটা বড্ড ভেঙে পড়েছে।' পাশ থেকে মন্তব্য করল ডাক্তার।

'তা হতে পারে।' নার্স আর দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গেল; ডাক্তার তার পিছু পিছু গেল।

এখন অসহায় বোধ করছে সে। তারা যখন খাটের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন অন্যান্য রোগীরা তার দিকে চেয়েছিল। আজ সকাল থেকেই সে লক্ষ্য করছে এঘরের সকলে তাকে বিশেষভাবে দেখছে। সকলের দর্শনীয় হয়ে পড়ায় স্বস্তি-বোধ করছে না সে। কোনোদিকে সহজ-ভাবে তাকান-ও সম্ভব নয়। ডাক্তার, নার্স সকলেই জেনে গেছে সে একটা খুনী। নার্সের ব্যবহার দেখে তার মনে হয়েছে সে যেন তার মধ্যে ভীষণ ভয়ংকরতার সন্ধান পেয়েছে। বউর মুখটা মনে পড়ল। তার বউ এই নার্সের চেয়ে দেখতে অনেক ভালো ছিল। একেবারে পশ্চিমদিকের বেডের রোগীটি অনেকক্ষণ তাকে লক্ষ্য করছে। তার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে সে মাথা নামিয়ে নিল। শুয়ে পড়ে কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিল। এঘরের সমস্ত পাখা চলছে।

কম্বলটা মুখের ওপর টেনে দেওয়ায় তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অসহ্য গুমোটে অস্বস্তি বোধ করছে। তবু কম্বলটা মুখ থেকে সরিয়ে বাইরের বাতাস নিতে পারল না। ভেতরের অন্ধকারে চোখ মেলে রইল। ঐ অন্ধকারে সে স্পষ্ট দেখতে পেল আশপাশের বেডের রোগীরা তাকে দেখছে। কেউ কেউ তাকে নিয়ে এমন জোরে কথা বলছে যে সেসব শুনতে পাচ্ছে। এক একবার মনে হয় তাদের চেপে ধরতে পারলে হত। কিন্তু সে সামর্থ্য তার নেই। সে উঠে দাঁড়াতে গেলেই নার্স হয়তো ছুটে আসবে। তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেবে, আর একবার টেম্পারেচারটা নেবে।

সে কিছুতেই বুঝতে পারে না তাকে এখানে এভাবে রাখার কি প্রয়োজন। এর চাইতে শান্তির ছিল সেই খুপরিটা। সেখানে সকলের চোখের সামনে তাকে অপরাধী সেজে থাকতে হয়নি। এক দারোগাবাবু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে তার কথা হত না। কাজেই তার অপরাধ দারোগাবাবু ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতেন না। অবশ্য গতরাত্রের ঘটনার পর জেল-খানা থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সকলেই তাকে জেনে ফেলেছে। বউ-ছেলে কেন, কিভাবে বিষ খেয়ে মরল সেকথা অনেক-দিন কাউকে সে বলতে চায়নি। দারোগা-বাবুর পীড়াপীড়িতে বলতে হয়েছে তাকে। তারপর থেকেই সে সহজভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, কারুর দিকে তাকাতে পারছে না। শুধু তাই নয় তারপর আজ সকাল থেকে সে লক্ষ্য করেছে সকলেই তাকে বড় বেশি করে দেখছে।

কম্বলের তলাকার অন্ধকারে সে অপলক চেয়ে আছে। ইচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে। একবার চেষ্টাও করল কম্বল সরিয়ে উঠে পড়তে। উঠতে গিয়ে দেখল পাশের বেডের রোগীটা খাটে হেলান দিয়ে তার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে। উঠতে পারল না সে। উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি হাঁটুতে আছে বলে মনে হল না। দুপায়ের হাঁটু থেকে নীচের অংশটুকু অবশ হয়ে গেছে। তবু ভাবল, সকলের চোখের আড়ালে এঘর থেকে টেনে টেনে দেহটা সে বাইরে নিয়ে যাবে। একবার অন্তত বারান্দা পর্যন্ত যেতে পারলেই হয়। তারপর বারান্দার রেলিঙ ধরে উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পড়বে নীচে।......

ঘরে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজ শুনতে পেল সে। মনে হয় আওয়াজটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ভয়ে সে কম্বলটা জড়িয়ে চোখ বুজল। তখনই তার বেডের পাশে এসে সবগুলো জুতো

থেমে গেল। আরো জোরে চোখ বুজে পড়ে রইল সে। কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকল কেউ। শুনেও কোনো সাড়া দিল না। তারপর একজন তার কম্বলটা টানতে লাগল। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করল কম্বলটা চেপে ধরতে। কিন্তু টান পড়তেই আস্তে আস্তে তার মুঠি শিথিল হয়ে গেল। কচ্ছপের মতো তার দেহটা বেরিয়ে পড়ল। চারপাশে একাধিক লোক দেখে আশ্চর্য হল সে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'এমন করে শুয়ে আছেন কেন? আপনার কি হয়েছে?'

একটু ভাবল সে; চোখ বুজে মুখটা কুঁচকে বলল, 'পেট ব্যথা করছে।'

'তা নার্সকে বলেননি কেন! আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি, ওষুধ দিয়ে যাবে।'

চলে গেল সকলে। আশ্চর্য হল, তার মিথ্যে কথাটা ধরতে পারেনি কেউ।

হাসপাতালের সবাই আজ তাকে নিয়ে ব্যস্ত। এদের এই ব্যস্ততা মোটেই সুখদায়ক নয়। সে অন্যায় করেছে, তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচারে তার শাস্তি হবে। শাস্তির চেহারাটা যাই হোক না কেন, একথা সে বুঝতে পারছে, বউ এবং ছেলের মৃত্যুর জন্যে সেই দায়ী। এতোদিন মেনে নিতে পারেনি। আজ সকলের এই ব্যস্ততা, সচেষ্টতা এই একটি কথাই তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছে এদের কথা। কলকাতার বাসায় যখন উপোস করে একটু একটু করে মরছিল তখন মানুষের এই চেহারাটা সে দেখতে পায়নি। কেউ তখন এগিয়ে আসেনি তাদের সাহায্য করতে। আজ যখন মৃত্যুর সীমানায় পেঁছে গেছে তখন এরা সকলে মিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু সত্যি কি তাই? তার ধারণা তাদের এই ব্যস্ততা তার যন্ত্রণাকে তীব্র করছে। আর এটাই তার চরম শাস্তি।

পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান সে পেয়েছিল। বউ-ছেলে পূর্ণ করেছিল সমস্ত অসম্পূর্ণতা। কিন্তু সম্পূর্ণকে ধারণ করবার ক্ষমতা সে পায়নি।

নানাভাবে সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু পারছে কই? যতো সে আড়ালে যেতে চায় ততো তাকে জড়িয়ে ধরে সকলে। যদি পারত তাহলে এই মুহূর্তে সকলকে বুঝিয়ে বলত সে-ই অপরাধী; সব রকমের শাস্তি পেতে সে প্রস্তুত; শুধু এভাবে সকলে মিলে তার আত্মাকে যেন যন্ত্রণা না দেয়। মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর সকলের সজাগ দৃষ্টি। এতে আত্মা লজ্জা পায়।

নার্স এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে তার কাছে এল। সে কোনো কথা না বলে গরম দুধ খেয়ে নিল। চলে গেল নার্স। আগের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। নিশ্চিন্ত বোধ করল এই ভেবে যে, আপাতত কেউ তাকে আর বিরক্ত করবে না। সকলে বিশ্বাস করেছে সে অসুস্থ; তার পেট ব্যথা।

অনেকক্ষণ কেউ তাকে বিরক্ত করল না। আচ্ছাদনের তলায় কচ্ছপের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমের চোখে আশ্চর্য হয়ে দেখল ছেলেকে। গ্লাসভর্তি গরম দুধ নিয়ে সে বসে আছে। ছেলেটা কতোদিন দুধ খায়নি। সে ডাকল তাকে। খুশী-খুশী চোখে পিট-পিট করে কয়েকবার চেয়ে দেখল ছেলেটা। বাপ ডাকতেই আসবে কিনা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সে আবার ডাকল ছেলেকে। ইঙ্গিতে দুধের কথা বোঝাল। এবার হামা দিতে শুরু করল ছেলেটা। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ছেলেকে খাওয়াবার মতো সামর্থ্য সে রাখে মনে করে গর্ব বোধ করল। ছেলেটা কাছে এলে কোলে তুলে নেবে। নিজে হাতে খাইয়ে দেবে দুধ। হাত নেড়ে আসতে বলল তাকে। এবার আরো জোরে হামা দিল ছেলেটা। এতো তাড়াতাড়ি হামা দিচ্ছে যে তার মনে হল ছেলে সেয়ানা হয়ে উঠেছে; আর কিছু-দিনের মধ্যেই হাঁটতে পারবে। অনেক কাছে চলে এসেছে ছেলেটা। আর একটু এলেই ধরে ফেলবে তাকে। একটু এগিয়ে গিয়ে ধরবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু নাগাল পেল না। সামনে বসে আছে ছেলেটা; অথচ তাকে ধরতে পারছে না। সে হাত নেড়ে আর একটু আসতে বলল ছেলেকে। বাপের ইঙ্গিত বুঝে বসে বসে সে হাসল। দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল সে। মনে হল খাটের নীচে ছেলে বসে আছে। ওপরে উঠতে পারছে না। কম্বল সরিয়ে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল সে। নীচু হয়ে খাটের তলা দেখল; কিন্তু ছেলেকে দেখতে পেল না। তাড়াহুড়ো করে ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল। চারপাশে তাকিয়েও ছেলের কোনো সন্ধান পেল না।

বিছানা থেকে হঠাৎ তার উঠে দাঁড়ান, ছুটে দরজার দিকে যাওয়া, চারপাশে তাকান—দেখে ঘরের অন্যান্য রোগীরা বিস্মিত হয়ে গেছল। দরজার দিকে যেতেই নার্স তাকে ধরে ফেলল।

'কি ব্যাপার এভাবে ছোটাছুটি করছেন কেন?'

নার্সের এই প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। কিন্তু এভাবে সকলের লক্ষ্য-বস্তু হয়ে পড়ায় সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। নার্স আবার বলল, 'কি হয়েছে আপনার; কি খুঁজছেন?'

চোখ রগড়ে নিয়ে সে বলল, 'পেটটা ভীষণ ব্যথা করছে'—থেমে পড়ল সে। আর বলতে পারল না।

'বলুন কি বলছিলেন।'

'পেটটা ভীষণ ব্যথা করছে, তাই—পায়খানা খুঁজছি।'

তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

'যান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন: এভাবে ছোটাছুটি করা আপনার উচিত নয়। আপনার জন্যে বেডপ্যান পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, না, না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন! বেডপ্যান আমার লাগবে না। উঃ! ব্যথাটা এখন কমে গেছে।'

নার্সের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরের সকলে আশ্চর্য হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

বিকেলটা চুপচাপ কাটিয়ে দিল সে। নার্স যা বলল তাই করল। কোনো রকম আপত্তি না তুলে হাসপাতালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করল।

সন্ধ্যেবেলায় দুজন সিপাই এল। হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সিপাই তাকে আগের খুপরিতে নিয়ে গেল। হাসপাতাল থেকে এই ঘরটায় আসবার পথটুকু সে কোনো কথা বলেনি। বস্তুত কথা বলার মতো অবস্থা তার ছিল না। সিপাই দুটি তাকে এই ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে সে দাঁড়িয়ে রইল। ছাদের কোণ ঘেঁষে যে ছোটো জানালার মতো আছে, সেদিকে চোখ রেখে সে স্থির হয়ে গেল। চড়ুই দুটি চোখে পড়ল না। দেখল, মেঝে থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠছে।

এর মধ্যে একসময় দারোগাবাবু এসেছেন, সে লক্ষ্য করেনি। দরজায় গরাদে পা তুলে কোমরে বাঁ হাত রেখে ডান হাতে সিগারেট টানছেন। দরজায় তালা ঝুলছে।

বাইরে থেকে তিনি বললেন, 'সিগারেট খাবেন?'

সে দারোগাবাবুর কথা শুনল। আগের মতো জানালার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। পিছন ফিরে কোনো উত্তর দিল না।

দারোগাবাবু একগাল ধোঁয়া গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কেসের রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি। আশা করি কয়েক দিনের মধ্যেই মামলাটা কোর্টে উঠবে।'

সে আগের মতোই ছোটো জানালার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

ভবঘুরের খাতা
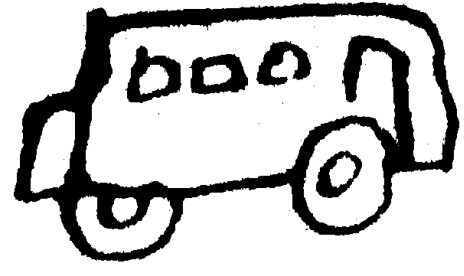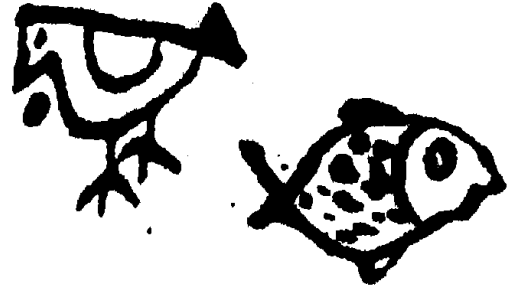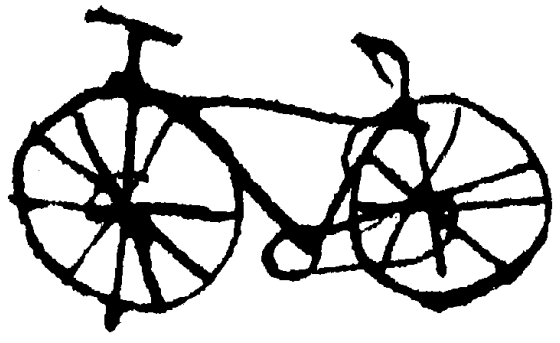
অয়স্কান্ত

॥ কয়েকটি মুখের আদল ॥

সকালে সাড়ে-সাতটার সময় আপনারা যদি কেউ এসপ্ল্যানেডে গিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এসপ্ল্যানেডের দক্ষিণ কোণে মোটর-গাড়ি পার্কিং করার জায়গাটায় দু-তিনশো মানুষের একটা জমাট ভিড় স্থির হয়ে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। অনেকের হাতে রয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। অনেকের হাতে বেতের বাণ্ডিল ইত্যাদি। এরা কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ ছুতোরমিস্ত্রী, কেউ বেতের কাজে পারদর্শী। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, একদল দক্ষ শ্রমিক। একটু দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে বা দু-একজনের সংগে কথা বললে বুঝতে পারবেন, এই দক্ষ শ্রমিকরা বিশেষ কোনো উদ্যোগের সংগে স্থায়ী-ভাবে যুক্ত নয়। রোজ সকালে এরা আসে কাজের সন্ধানে। রোজকার কাজের জন্যে রোজ অপেক্ষা করতে হয়। আর এসপ্ল্যানেডের দক্ষিণ কোণের এই বিশেষ জায়গাটিই হয়ে ওঠে অস্থায়ী একটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। দিনে তিন টাকা বা তারও কম মজুরিতে এদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে সারা দিনের মতো কাজে লাগানো যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন সহকারীকেও সংগে নিতে হয়। তার মজুরী অবশ্যই আরো কম। কলকাতার ঠিক মধ্যিখানটিতে যে রোজ সকালে এমন একটি মানুষের বাজার বসে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তবে ট্রামে-বাসে আপিস-যাত্রীদের ভিড় শুরু হবার অনেক আগেই এই বাজারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এই বিশেষ বাজারটির সন্ধান সম্ভবতঃ কলকাতার অধিকাংশ মানুষেরই জানা নেই।

আমি অনেক দিন ডবলডেকার বাসের জানলা থেকে এসপ্ল্যানেডের এই ভিড়টিকে লক্ষ্য করেছি। অল্প কিছু-ক্ষণের জন্যেই দেখতে পাই। কিন্তু আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। সাজপোশাকের দিক থেকে এমন বিভিন্ন চেহারার মানুষকে এমনভাবে জোট বাঁধতে বড়ো-একটা দেখা যায় না। কিন্তু সাজ-পোশাকের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ-গুলোর মুখের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। খুব সম্ভবতঃ, অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সবাইকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে বলেই।

মানুষগুলোকে এমনিতে দেখলে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই। পরনে ধুতি বা পাজামা বা লুঙ্গি বা এমন কি পুরোপুরি প্যান্ট। গায়ে গেঞ্জি বা শার্ট। চকচকে ভিজে চুলের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, অনেকেই স্নান সেরে বেরিয়েছে। চুপচাপ বা একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে একজনকেও দেখা যাবে না। এমন কি, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসাও চলে। কেউ কেউ আবার লোহার রেলিঙে বসে মনের আনন্দে পা দোলায়। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, নিতান্তই একটা আকস্মিক জমায়েত মাত্র।

কিন্তু তবুও আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো কিছুতেই নয়। সামনে থেকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই মানুষগুলোর মুখের চেহারায় এমন একটা অসহায়তা আছে যা অনেক কথা ও অনেক হাসি দিয়েও আড়াল করা যাচ্ছে না। অনেকে বিড়ি টানে, অনেকে

মুখের বিড়ি কাড়াকাড়ি করে খায়—কিন্তু তারপরেও এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকে যেন সকালবেলার নিঃঝুম এসপ্ল্যানেড সামান্য কয়েকটি বিড়ির ধোঁয়ার ফুৎকারে ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

এসপ্ল্যানেডের সঙ্গে নিঃঝুম বিশেষণটি অনেকের কানে হয়তো অস্বাভাবিক ঠেকছে। যাঁরা সকাল ন'টার পরের এসপ্ল্যানেড দেখেছেন, বা দুপুরের, বা বিকেলের, বা সন্ধ্যার, বা এমন কি নাইট-শো শেষ হবার পরে মাঝ-রাত্তিরের—তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সকালবেলার নিঃঝুম এসপ্ল্যানেড সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। ট্রাম আছে, স্টেটবাস আছে, লরি আছে, আছে এমন কি ঠেলাগাড়িও—তবুও সেই উচ্ছ্বসিত আলোড়নটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সদ্য জল দেওয়া অ্যাসফল্টের রাস্তা চিকচিক করে, মস্ত মস্ত বাড়িগুলোর ছায়া অনেকখানি লম্বা হয়ে রোদ্দুরের আলপনা আঁকে, নিয়নের সাইনবোর্ডগুলো যেন রাত্রির উৎসবের শেষে ক্লান্ত অবসাদের মতো মুখ লুকোতে চায়। মানুষও অবশ্যই আছে। ট্রামে, বাসে ফুটপাথে। কিন্তু সকালবেলার হাই-তোলা পরিবেশে এই মানুষগুলোকেও যেন টের পাওয়া যায় না।

এসপ্ল্যানেডের দক্ষিণ কোণের গাড়ি পার্ক করার জায়গাটিতে যে দু-তিনশো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, তারাও সহজেই হারিয়ে যেতে পারত। কিন্তু হারিয়ে যায় না তাদের মুখের বিশেষ চেহারার জন্যে। সকালবেলার একটি ঘণ্টার মধ্যে যাদের সারা দিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় তাদের পক্ষে বোধহয় কিছুতেই স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয়।

আমি অনেক দিন ভাবতে চেষ্টা করেছি, সকালবেলা যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে বেরোবার সময়ে এরা মনে মনে কী কামনা করে। নিশ্চয়ই এইটুকুই কামনা যে ভিনদেশী রাজপুত্তুরের মতো একজন খদ্দের আসুক এবং তিন টাকা দিন-মজুরীর শর্তে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজপুরীকে জাগিয়ে তোলার মতো সারাদিনটিকে কর্মব্যস্ততায় ভরিয়ে তুলুক। আর এই কর্মব্যস্ততাই এদের কাছে দিনের শেষের অন্ন আর রাত্রির ঘুম। সকালবেলার একটি ঘণ্টার অনিশ্চিত প্রতীক্ষা সারা দিনটির ওপরে অমোঘ নিয়তির মতো উদ্যত হয়ে থাকে।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি, এই মানুষগুলোকে বোধহয় আমি অন্য কোনো পরিবেশে অন্য কোনো কলকাতায় চিনে উঠতে পারব না। ট্রাম কিংবা বাসের স্টপে যারা ভিক্ষের জন্যে হাত পেতে থাকে, দুপুরবেলার কার্জন পার্কে যারা আকাশের দিকে মুখ করে চিত হয়ে শুয়ে থাকে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা দিনের পর দিন লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়ায়—তাদের কারও মুখেই আমি এই মানুষগুলোর আদল খুঁজে পাইনি।

তাই সকালবেলার এসপ্ল্যানেডে এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার রোজই মনে হয়েছে, এরা অন্য কোনো জগৎ থেকে এসেছে। এমনিতে খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে যে, এসপ্ল্যানেডের আশেপাশে নানা বস্তিতে এরা থাকে, এরা হয়তো এসেছে সারা ভারতের নানা শহর ও গ্রাম থেকে, এরা হয়তো কথা বলে ভারতের সবকটি ভাষায়—তবুও এসপ্ল্যানেডের এই বিশেষ কোণটিতে এরা যখন এসে দাঁড়ায় তখন কোনো পরিচয়ই এরা সঙ্গে করে আনে না। এরা কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ ছুতোর-মিস্ত্রী, কেউ বেতের কাজে পারদর্শী—কিন্তু আশ্চর্য, কোনো উদ্যোগের সঙ্গে এরা স্থায়ীভাবে যুক্ত নয়। এদের চিনতে হলে সকালবেলার এই এসপ্ল্যানেডেই আসতে হবে।

তারপরে একদিন আকস্মিক এক ঘটনার যোগাযোগে আমি অন্য এক কলকাতায় এসপ্ল্যানেডের এই মানুষগুলোর মুখের চেহারার আদল খুঁজে পেয়েছিলাম।

সকালবেলা আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। তখনই মানুষটিকে আমি প্রথম দেখি। ফুটপাথের একটি ধার পরিষ্কার করে সে দোকান সাজিয়ে বসছে। দোকান বলতে কয়েকটি রিবন, বোতাম, চিরুনি ও এমনি কতকগুলো টুকিটাকি জিনিস। মাঝবয়সী মানুষটিকে দেখে তখন আমার তাকিয়ে দেখার মতো একটি মুখ মনে হয়নি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে আমি যখন বাজার থেকে ফিরে আসছি তখন আবার এই মানুষটিকেই অন্য চেহারায় দেখতে পেলাম। পুলিশের একটি ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে, যার নাম ফেরিওয়ালাদের ভাষায় হল্লা। আর সেই ভ্যানে টুকিটাকি জিনিসের পসরাকে পুঁটলি বেঁধে তুলে নেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তোলা হচ্ছে মানুষটিকেও।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে স্থান-কাল ভুলে যেতে হল। আমি অনেক দিন ধরে এসপ্ল্যানেডের মানুষগুলোর মুখের আদল খুঁজছিলাম। হল্লার কবলে-পড়া মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সেই আদলটি খুঁজে পেলাম।

ফুটপাথের সেই বিশেষ ধারটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। একটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি থেকে তখনো সরু একটা ধোঁয়ার রেখা পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ একত্রিশ ॥

দু দিন হল কাঞ্জিলাল সাহেব ফিরেছেন শিলং থেকে। প্রভাত সরকারের আবার বাঁধা ডিউটি আরম্ভ হয়েছে।

অ্যাকটিভ লাইক এ ইয়ংম্যান—কাঞ্জিলাল সাহেব তিন গুণ কাজের ভেতর দিয়ে ছুটির এই দিনগুলোর যেন ক্ষতিপূরণ করে নিতে চাইছেন। গাড়ী ছুটছে বজবজ থেকে ব্যারাকপুর—অফিস থেকে বেরুচ্ছেন সন্ধ্যে ছটায় পর। লাইফ ইজ ওয়ার্ক!

সারাদিনের খাটুনির পর পার্ক স্ট্রীটের সেই বার। মদের গ্লাসে গোটা কয়েক ডুব দিয়ে বিশ্ব-প্রেমের জগতে প্রবেশ।

—ইয়ু প্রভাত!

—বলুন স্যার।

—হোয়াট ডু য়ু থিংক অব চায়না? মানে, চীন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

—আমি কিছু জানি না স্যার।

—জানা দরকার।—কাঞ্জিলাল হেঁচকি তোলেন : মানে ইন্দো-চাইনীজ রিলেসান্স— ওহ্— হাউ আনফরচুনেট! নিজেই কথা বলতে থাকেন : এশিয়ার দুটো এত বড়ো দেশ, এতদিন ধরে, আই মীন হাজার হাজার বছর ধরে—কী ফ্রেন্ডশিপ আর কী আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর আজকে কয়েকটা গ্লেসিয়ার, তিনটে টিলা, দুটো গ্রাম আর একটা পাহাড়ী নদী নিয়ে কী আগলি টেন্সান! এর কোনো মানে হয়?

প্রভাত জবাব দেয় না, একটা প্রকান্ড ডবল-ডেকারের পাশ কাটায়।

—গোতামা বুদ্ধা একদিন এই দুটো দেশকে এক করেছিলেন উইথ লাভ অ্যান্ড অহিন্সা! আজ যদি সেই গ্রেট গ্যান্ডী থাকতেন, তবে এ-সব কিছুই ঘটত না। দ্যাট সুপারম্যান পাঁচ মিনিটে সব মিটিয়ে ফেলতেন।—কাঞ্জিলালের চোখে জল আসে : এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল মেজর দাশগুপ্তের সঙ্গে। ড ইয়ু নো প্রভাত—আমার একটা আইডীয়া আছে।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করেন, ট্যাগোর যেন কী বলেছিলেন? এই ভারতবর্ষ থেকেই আবার নতুন করে মহামানব জন্ম নেবেন। আমার মনে হয়—আজ যদি ভারতের কোনো কোটিপতি—সে সামওয়ান ফ্রম টাটা অর বিড়লা ফ্যামিলি—যদি সন্ন্যাসী হয়ে, লাইক বুদ্ধা সব ছেড়ে দিয়ে লাভ অ্যান্ড অহিন্সা প্রচার করতে থাকেন, তা হলে—

তা হলে নিশ্চয় একটা নিদারুণ কিছু ঘটে যায়, কিন্তু সেটা বলবার আগেই গাড়ী বাড়ীর কম্পাউন্ডে গিয়ে ঢোকে। দোতলার বারান্দায় লতার ঝাড়ের মধ্য থেকে গলা বার করে বিকট শব্দে অভ্যর্থনা জানায় কুকুরটা। বিশ্ব-সমস্যার সমাধান পরের দিন বার থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু প্রভাতের ক্লান্তি লাগে। কলকাতা এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেই মুরারিবাবুকে মনে পড়েছে। মুখার্জি অটোমোবাইলস্। বাঁকুড়ায় গেলে এখুনি তার চাকরি হয়ে যাবে।

তার কাছে সব সমান। বাঁকুড়া—বর্ধমান—বসিরহাট—সব এক।

দীপ্তির কাছে বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, লজ্জায় পালিয়ে আসতে হয়েছে সেখান থেকে। প্রথম থেকেই দীপ্তি তাকে খানিকটা উপেক্ষা আর অনুকম্পা দিয়েই দেখেছে—কোনোদিন তাকে ভালো করে লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ। তাই একবার একটুখানি তার সাহায্য চাইতেই সে নিজেকে অনেক বড়ো ভাবতে চেষ্টা করেছিল। মুখের ওপর ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে সে—নবদ্বীপে তাকে আর কোনোদিনই হয়তো যেতে হবে না। রাণী তো একটা জলের দাগের মতোই তাকে মুছে ফেলেছে।

আর তৃপ্তি—

তৃপ্তির কথা কেউ জানে না। প্রভাতেরও জেনে কোনো লাভ নেই।

তা হলে আজই কেন বিদায় চাওয়া যাক না কাঞ্জিলাল সাহেবের কাছে? একজন মোটর ড্রাইভারের পক্ষে বেশি কৈফিয়তের দরকার নেই। 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না স্যার—মাস তিনেকের জন্যে দেশে যাব—' এইটুকুই যথেষ্ট। কোথায় তার দেশ—সেখানে তার তিন কুলে কেউ আছে কি না, এসব নিয়ে ব্যস্ত মানুষ কাঞ্জিলাল কখনো মাথা ঘামাবেন না।

কিন্তু আজ আর সে কথা বলবার

সময় নেই। গাড়ী গ্যারাজে তুলে দিয়ে সে চলে এসেছে। এখন রাত সাড়ে দশটা।

বাস ছুটছে, প্রায় ফাঁকা গাড়ী। দোতলায় একা চুপ করে বসে আছে প্রভাত। জোলো হাওয়ার ঝলক আসছে—আজকালের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। শরীরটা অকারণে জ্বালা করছে, মাথাটা আবার ভারী হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ছুটন্ত ঘর বাড়ী আর গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে যে রাত্রির আকাশ দেখা যায়—সেখানে আষাঢ়ের খানিকটা গম্ভীর মেঘ। কলকাতা ডুবিয়ে-দেওয়া একটা দুরন্ত বৃষ্টি যদি নামত এখন! প্রভাত নেমে পড়ত এই বাস থেকে, প্রাণ খুলে ভিজতে পারত—শরীরটা তার জুড়িয়ে যেত!

আশ্চর্য—তার এই জীবনটার কোনো মানেই নেই। কেন সে চাকরি করে, কিসের জন্যে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি দেয়, কার জন্যে তার এই পরিশ্রম? মা নেই বাপ নেই—আত্মীয় বলতে কেউ নেই—বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নাই। কিছু তার ভালো লাগে না—আজ চার বছর ধরে একটা অপরাধের ভার রয়েছে মনে মনে—তার যেন একটা নেশা ছিল, রাণী সেটাকেও কাটিয়ে দিয়েছে। দুঃখ হোক, আনন্দ হোক— একটা কিছুকে আশ্রয় করে মানুষ বাঁচে—বাঁচতে হয় তাকে। প্রভাতের মনটা একেবারে ফাঁকা। গৌরাঙ্গবাবুর বাসায় আসবার পর তৃপ্তি যেন সেই ফাঁকটাকে একটু একটু করে ভরিয়ে তুলছিল, রাণীর জন্যে যন্ত্রণা আর তৃপ্তির কাছ থেকে এক টুকরো স্বপ্ন নিয়ে দিনগুলো একভাবে কেটে চলেছিল। তারপরে সব মিটে গেল। এখন আর কিছুই নেই।

কাঞ্জিলাল সাহেবের কাছে এক-আধ সন্ধ্যা ছুটি চাইলেই মেলে—গিয়ে সিনেমা দেখতে পারে। কিন্তু সিনেমা আর তার ভালো লাগে না। সব সাজানো আর বানানো গল্প—অথচ জীবনে কোথাও গল্প তৈরী হয় না—গড়ে উঠতে গিয়েই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আগে দু একখানা উপন্যাস পড়ত, অভয় নিয়ে আসে সেগুলো। এখন তা-ও আর পড়তে পারে না সে।

কোনো কাজ নেই—কোনো উদ্দেশ্য নেই। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। কখনো ব্যারাকপুর, কখনো বজবজ। কখনো ডালহাউসি স্কোয়ার, কখনো বা নিউ মার্কেট। আর গৌরাঙ্গবাবুর সেই থমথমে সংসার—যেখানে আজ পর্যন্ত সে কাউকে কখনো হাসতে দেখেনি।

আকাশে সেই ঘন-গম্ভীর মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকে গেল। জোলো হাওয়ার ঝলক। বৃষ্টি কি আজকেই নামবে? নামুক— ভাসিয়ে দিক চারদিক। প্রভাত চোখ বুজল। একটা মস্ত দীঘির কালো জলে সে ডুব দিয়েছে। জলের ওপর বৃষ্টি পড়ছে—তলা থেকে তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ঝম্-ঝম্-ঝম্। ওপরের জলটা বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—নিচে গরম। একটা প্রকাণ্ড মাছের পাখনা ছুঁয়ে গেল তাকে। ঠাণ্ডা গরম মাটিতে পা ঠেকল—আঃ, এই দীঘির তলায় যদি হাত-পা ছড়িয়ে, ওপরের বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া যেত।

কিন্তু দীঘিটা এখানে কোথাও নেই। প্রভাত চোখ মেলল। অনেক আলো আর অনেক মানুষের ভিড়। হৈ হৈ করতে করতে একদল লোক এসে গাড়ীর দোতলায় উঠে পড়ল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'মাইরি, ব্যাটা এক নম্বরের চারশো বিশ!'

শেয়ালদার মোড়।

এতগুলো মানুষেরও কি বেঁচে থাকবার কোনো মানে আছে? হৈ হৈ করে চেঁচানো—হা-হা করে হেসে ওঠা, গলা ছেড়ে গান গাওয়া, মুখ খারাপ করে কদর্য গালাগাল। কোনো দরকার নেই, তবু মাতামাতি করে দিন কাটে। কোনো কাজ নেই বলেই কাজ তৈরী করে নিতে হয়।

দীঘির নিচেই কি ডুবে থাকা যায় বেশিক্ষণ? সেখানেও তো দম বন্ধ হয়ে আসে। আবার ওপরে ভেসে উঠতে হয়।

কোনো কাজ নেই—তবু কাজ ফুরোয় না। কোনো উদ্দেশ্য নেই—তবু দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন কাটিয়ে যেতে হয়। কাজ না থাকলেই কি কাজ থামিয়ে দেওয়া চলে? কলকাতায় থাকবার কোনো মানে হয় না বলেই কি সে পালিয়ে যেতে পারে বাঁকুড়ায়?

তখন প্রভাতের মনে পড়ল, শিলং থেকে ফেরবার পরে রিনি কাঞ্জিলাল এই দুদিনে একটাও কথা বলেনি তার সঙ্গে।

সুযোগ মিলল পরের দিন। কী কাজে অফিসের গাড়ীতে কাঞ্জিলাল সাহেবের বর্ধমানে যাওয়ার পর।

—মাম্মী, তোমার গাড়ী দরকার?

মিসেস্ কাঞ্জিলাল একটু ঘরকুনো, মেয়ের ঠিক উল্টো। বাড়ীতে বসে বসে ঝি-চাকরদের সামনে বকাবকি না করলে তাঁর ভালো লাগে না। একটু বেশি মাত্রায় মোটা হয়ে গেছেন বলে নড়াচড়াতেও খুব বেশি উৎসাহ নেই তাঁর। বললেন, না বাপু, আমার কোনো কাজ নেই গাড়ী দিয়ে। তোমার ইচ্ছে হলে বেরোও।

—আমি তা হলে একটু নিলীমার কাছে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হতে পারে।

মা সেই মুহূর্তে বাবুর্চিকে নিয়ে পড়েছেন: 'পুরো এক পাউণ্ড বাটার দুদিনে খতম হোতা কেইসে?' সুতরাং মেয়ের কথার কোনো জবাব দিলেন না। রিনি এসে গাড়ীতে উঠল।

প্রভাতের রক্ত দুলে উঠল একবার। রিনিকে তার ভয় করে। কখনো তার সম্পর্কে অহেতুক কৌতূহল, কখনো বা অকারণ ঘৃণা। প্রভাত যেন তার একটা খেয়ালের খেলার পুতুল, তাকে নিয়ে যা খুশি করাতেই তার অদ্ভুত আনন্দ।

কিন্তু কী মানে হয় এসবের? সে তো বাড়ীর সামান্য ড্রাইভার, চাকর-দারোয়ান-বাবুর্চির সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই তার। তার কথা রিনি তো অনায়াসেই ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু ভুলে থাকতে সে রাজী নয়। কখনো কাজু বাদাম এগিয়ে দেবে, কখনো কাছে বসিয়ে গল্প করতে চাইবে, কখনো বিনা কারণে গালাগাল দিয়ে বলবে, 'আন্‌কালচার্ড—ইডিয়ট!' তার সম্পর্কে সব খবর খুঁটিয়ে জানতে চাইবে আর শিলং যাওয়ার আগে শাসিয়ে যাবে, 'খবর্দার, ফিরে এসে যদি শুনি এর মধ্যে কাউকে বিয়ে করে বসেছেন, তাহলে—'

একদিন কাঞ্জিলাল সাহেব নেশার ঝোঁকে দুঃখ করেছিলেন, আদরে আদরে মেয়েটা বিগড়ে গেছে। তার মনমেজাজের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, যখন তখন যা খুশি তাই করতে পারে। প্রভাতের তাতে কিছু আসে যায় না। রিনি কাঞ্জিলাল যদি আকাশের চাঁদে একটা কামড় দিতে চায় এবং সেজন্যে তার বাপ যদি একটা মই তৈরী করাতে আরম্ভ করেন তাতেও প্রভাতের কোনো বক্তব্য নেই। শুধু রিনির মনোবেগের হাত থেকে রক্ষা পেলেই সে আর কিছু চায় না।

সামনের আয়নাতে প্রভাত দেখল রিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কী ভাবছে সে-ই জানে। প্রভাতের মনে হল এই ক'টা দিন বাইরের আলো বাতাসে কাটিয়ে রিনি আরো সুন্দর হয়ে এসেছে—আরো উজ্জ্বল হয়েছে তার রঙ।

কিন্তু অমন ভাবে চুপ করে আছে কেন? যাওয়ার আগে তাকে অমন করে শাসিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে একটা কথাও তো জিজ্ঞেস করছে না।

রিনি চুপ করে থাকলেই স্বস্তি মেলে। কিন্তু প্রভাত যতটা খুশি হবে ভেবেছিল তা হতে পারল না। কোথায় যেন কী একটা তাকে বিঁধছে, রিনির চুপ করে থাকাটা তার ভালো লাগছে না।

তারপর রিনি জেগে উঠল।

—ল্যান্ডসডাউন রোডে যেতে হবে না।

—কোথায় যাব তবে?

—রিনি বললে, ব্যারাকপুরে।

—ব্যারাকপুরে?

সেই আগেকার রিনি নিজের মূর্তি ধরল তৎক্ষণাৎ।

"না বাপু, আমার কোনো কাজ নেই গাড়ী দিয়ে। তোমার ইচ্ছে হলে বেরোও।"

—কানে কম শুনছেন নাকি? না ব্যারাকপুর চেনেন না?

একটু চুপ করে থেকে প্রভাত বললে, ব্যারাকপুরে কোথায় যেতে হবে?

—ড্রাইভারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? —রিনির গলা খনখন করে উঠল: আপনার সাহস দেখছি বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন। ব্যারাকপুরে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে আপনাকে ডুবিয়ে মারব—হল তো?

—আজ্ঞে হাঁ, বুঝেছি।

রিনি হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল। সামনের সীটটা মুঠো করে ধরে গলাটা এগিয়ে দিলে।

—ইয়ার্কি করছেন নাকি?

—আজ্ঞে না।

—ইডিয়ট। মেয়েদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে জানেন না। বাবা যে কেন পয়সা দিয়ে এমন একটা রাবিশ ড্রাইভার রেখেছেন তিনিই জানেন।

প্রভাত জবাব দিল না। গাড়ী চলল।

পথ ছিটকে সরে যেতে লাগল। শ্যামবাজার, টালা, চিড়িয়ার মোড়, বরানগর পার হয়ে। বিকেলের আলো নিবে এল, দু পাশের গাছের কোলে কোলে অন্ধকার ঘনালো, ইলেকট্রিক ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠল একসঙ্গে। রিনি আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। প্রভাত ভাবতে লাগল আজকেই সে চাকরিটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু কাঞ্জিলাল সাহেবের সামনে একবারও কথাটা তার মনে হয়নি।

কেন হয়নি?

রিনির জন্যে? সামনের আয়নায় রিনির মুখ নয়—নিজের মনের চেহারাই দেখতে পেলো প্রভাত। রিনির ঘৃণা, অপমান আর পাগলামির মধ্যে কি একটা কোনো আকর্ষণ আছে কোথাও? সেটা অসহ্য—অথচ তারও একটা নেশা আছে? আর রিনির জন্যেই কি কোনোদিন সে কাঞ্জিলাল সাহেবের চাকরি ছাড়তে পারবে না—যেমন করে পোষা কুকুর বার বার চাবুক খেয়েও তার মনিবের কাছে ফিরে আসে?

প্রভাত ভয়ংকর চমকে উঠল।

কিন্তু একটু হলেই সেই চমকানির নিদারুণ দাম দিতে হত তাকে। পাশ দিয়ে যে পাহাড়ের মতো বোঝাই ট্রাকটা ডিজেল এন্জিনের ঝড় তুলে ছুটে গেল—মাত্র এক ইঞ্চির জন্যে তার সঙ্গে গাড়ীর ধাক্কা লাগল না। ট্রাক ড্রাইভারের গর্জন তার ভেতরেও কানে ভেসে এল: 'কেয়া শালা, মরেগা তুম?'

আর তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রিনি: কী হচ্ছে এসব?

প্রভাত উত্তর দিল না।

রিনি বললে, গাড়ী থামান।

প্রায় নির্জন রাস্তায় এক ধারে প্রভাত গাড়ীটা দাঁড় করালো। আগুনের মতো চেহারা নিয়ে নেমে এল রিনি।

—কী করছিলেন আপনি?

—কিছুই করিনি।

—ট্রাকটার সঙ্গে তো এখুনি ধাক্কা লাগত।

—লাগেনি।

—লাগেনি সেটা নিতান্তই বরাত-জোর। —রিনি দুটো জ্বলন্ত চোখ প্রভাতের মুখে ফেলল: কী চেয়েছিলেন আপনি? আমাকে খুন করতে?

—মিথ্যে কেন খুন করতে যাব আপনাকে?

—ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। —রিনি প্রভাতের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো: আপনার মতলব আমার বুঝতে বাকি নেই। আপনি আমাকে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া যায় না বলেই—

প্রভাতের মাথায় রক্ত ছুটে গেল।

—থামুন, পাগলামি করবেন না।

—পাগলামি—আমি পাগল! —রিনি হঠাৎ ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে প্রভাতের গালে।

ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত আর কদর্য-ভাবে ঘটল যে প্রভাত রাস্তার ধারের একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর কিছুক্ষণ ধরে বুনো জন্তুর মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল রিনি।

পাশে একটা প্রকাণ্ড মোটর এসে থেমে দাঁড়ালো। একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক গলা বাড়ালেন।

—কোনো ট্রাবল হয়েছে কি? সাহায্য করতে পারি?

রিনিই সামলে নিলে। বললে, ধন্যবাদ, সাহায্যের দরকার নেই।

বড়ো গাড়ীটা চলে যাওয়ার পর রিনি এবার প্রভাতের দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে এসেছে—অনুতাপের ছায়া পড়েছে মুখের ওপর।

—রাগের মাথায় আপনার গায়ে হাত তুলে ফেলেছি। মাপ করবেন আমাকে।

মাথার ভেতরে তখনো সব কিছু এলোমেলো মনে হচ্ছিল। প্রভাত শুকনো গলায় বললে, মাপ করবার কিছু নেই। আপনারা মনিব, ইচ্ছে করলেই গায়ে হাত তুলতে পারেন।

—কী মনে করেন আমাকে—জানোয়ার? —রিনি আবার চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রাণপণে শান্ত করল নিজেকে: বলেছি তো হঠাৎ করে ফেলেছি কাজটা। অন্যায় হয়েছে আমার—মাপ চাইছি সেজন্যে। আর ব্যারাক-পুরে গিয়ে কাজ নেই—বাড়ী ফিরে চলুন।

প্রভাত গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগে রিনিই গিয়ে বসল ড্রাইভারের জায়গায়।

—কী করছেন?

রিনি হাসল।

—আমিই চালিয়ে নিয়ে যাব। আপনার মুড নেই—আপনার হাতে গাড়ী দিয়ে আর বিশ্বাস করা যায় না।

—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কী! —রিনি হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল: আমার লাইসেন্স নেই বটে, তা হলেও গাড়ী আমি মন্দ চালাই না। এখুনি দেখতে পাবেন।

—তবু—

রিনি ভ্রুকুটি করল: আপনার ওই দোষ, সব সময়ে বাজে তর্ক করেন। ওই জন্যেই আমার মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। নিন—উঠে পড়ুন। না—পেছনে নয়, আমার পাশেই বসতে হবে আপনাকে।

প্রভাত তবু দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হল? —রিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাবেন নাকি এখানে? উঠে পড়ুন শিগগীর।

রাস্তা-ফাঁকা, তাই বলে একেবারে নির্জন নয়। গাড়ী চলেছে, সাইকেল চলেছে, রিকশা চলেছে, লোকজনও আসা-যাওয়া করছে। কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রভাত রিনির পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল।

গাড়ী ঘুরে চলল।

রিনির দিকে প্রভাত চাইতে পারল না। শুধু রিনির শাড়ী আর চুলের একরাশ গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল, স্টিয়ারিঙের ওপর মাঝে মাঝে চোখে পড়তে লাগল কয়েকটা লম্বা শাদা আঙুল—তাদের নখগুলো রক্তের মতো লাল। একটা পাতলা শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় হাওয়ায় তার গায়ে নরম ছোঁয়া বুলিয়ে যেতে লাগল।

মিনিট কয়েক পরে কথা বলল রিনিই।

—কী হয়েছিল আপনার? গাড়ী চালাতে চালাতে কার কথা ভাবছিলেন?

রিনির কথাই ভাবছিল, কিন্তু সেটা বলা যায় না। প্রভাত চুপ করে রইল।

—আমি জানি। কোনো মেয়ের ধ্যান করছিলেন বসে বসে। —মিনিটে মিনিটে রিনির মেজাজ বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর তার বিষাক্ত হয়ে উঠল: সেই বিধবা মেয়েটি—তাই নয়? মার্কেটের সামনে যাকে দেখে আপনি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। —রিনি কুৎসিত ভাবে বলে চলল: ছোটলোকের মন এত নোংরা হয় যে—

রিনির চড়টা গায়ে লাগেনি, তাতে শুধু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের কথাগুলোই অসহ্য, যেন কাটা ঘায়ে লঙ্কা-লবণ ছড়িয়ে দিতে থাকে। প্রভাতের হঠাৎ একটা প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করল। দাঁতে দাঁতে ঘষে প্রভাত বললে, মিথ্যে নোংরামি করবেন না দয়া করে। আমি আমার স্ত্রীর কথাই চিন্তা করছিলুম।

—স্ত্রী! —রিনি গলা চিরে চিৎকার করল।

—হাঁ, স্ত্রী। —প্রভাত সরকার আরো হিংস্রভাবে বললে, সাতদিন হল বিয়ে করেছি আমি। আমারই মতো এক ছোট-লোকের মেয়েকে। হল এবারে? খুশি হয়েছেন?

রিনি জবাব দিল না। স্টিয়ারিঙের ওপর আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠল তার। তারপর এক সময়ে হঠাৎ রিনি গাড়ীটাকে থামিয়ে দিল। বিশ্রী ঝাঁকুনি লাগল, চিৎকার উঠল গাড়ীর চাকায়। বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলতে ফেলতে রিনি বললে, নামুন।

—কী হয়েছে?

—গাড়ীর পেছনে কিসের আওয়াজ হচ্ছে। একটা চাকা লিক হয়েছে বোধ হয়। দেখে আসুন।

প্রভাত নেমে গেল এবং সেই মুহূর্তেই—

গাড়ীটা ব্যাক করল রিনি। এমন-ভাবে ব্যাক করল যে লাফিয়ে সরে না গেলে প্রভাত সোজা চলে যেত চাকার তলায়।

—একি! আমাকে চাপা দিতে চাইছেন?

গাড়ীর ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ করল রিনি—হাসল না কেঁদে উঠল বোঝা গেল না। তারপর প্রভাতকে রাস্তায় ফেলে রেখেই গাড়ীটা পঞ্চাশ মাইল স্পীডে সামনে ছুটে চলে গেল।

রিনি খুন করতে চেয়েছিল তাকে!

প্রভাত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর চকচকে কালো পীচের ওপর দুটো ব্যাক লাইটের রক্তরেখা আঁকতে আঁকতে গাড়ীটা দেখতে দেখতে দূরে মিলিয়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রভাতকে কিছু করতে হল না। কাঞ্জিলাল সাহেবই অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে।

—স্যার, আমি রিজাইন দিতে চাই।

দুটো লাল টকটকে চোখে কাঞ্জিলাল তার দিকে তাকালেন। সকালে তিনি কোনোদিন নেশা করেন না, কিন্তু মনে হল আজ ভোরে তিনি বাড়ীতেই বোতল নিয়ে বসে ছিলেন।

কাঞ্জিলাল সাহেব বললেন, ভেতরে এসো।

সামনে ড্রয়িং রুম। এ ঘরে প্রভাত কোনোদিন ঢোকেনি, দরকার হয়নি। কাঞ্জিলাল সেদিকে পা বাড়িয়ে প্রভাতের দিকে আবার লাল টকটকে চোখ মেলে ধরলেন।

—শুনতে পাওনি? ভেতরে এসো।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রভাত তখনো বুঝতে পারছে না। দু-একবার ইতস্তত করে সে ঘরে পা দিল।

কাঞ্জিলাল সাহেব ড্রয়ারের টানা থেকে কয়েকটা নোট বের করে প্রভাতের দিকে ছুড়ে দিলেন। বললেন, তোমার মাইনে। নিচু হয়ে নোটগুলো কুড়িয়ে নেবার আগেই কাঞ্জিলাল দেওয়াল থেকে চাবুক নামালেন। আর প্রভাতের পিঠে প্রচণ্ড একটা ঘা পড়ল পরের মুহূর্তেই। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল প্রভাত।

—একি স্যার! মারছেন কেন?

বিশ্বপ্রেমিক কাঞ্জিলাল ঘর ফাটিয়ে রাক্ষসের মতো গর্জন করলেন এবার।

—রাস্কেল, রাস্তার কুকুর! তোমার এতবড়ো সাহস যে আমার মেয়েকে তুমি রাস্তায় পেয়ে—প্রভাতের সর্বাঙ্গে একটার পর একটা চাবুকের ঘা এসে পড়তে লাগল: তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করো। তোমাকে আমি জেলেই দিতাম—কিন্তু আমার নিজের একটা প্রেস্টিজ আছে। আই উড লাইক টু শুট ইয়ু, বাট—কুকুর মেরে আমি টোটা নষ্ট করতে চাই না। নাউ টেক ইট—টেক ইট—

উন্মাদের মতো আরো কতক্ষণ মারতেন বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই দোতলা থেকে পর পর কয়েকটা বিকট বাড়ী কাঁপানো শব্দ উঠল। কাঞ্জিলালের হাতের চাবুক থেমে গেল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকল বেয়ারা।

—হুজুর, মিসিবাবা আপকা পিস্তল লে কর ইধার-উধার গোলী মারনে লগী!

চাবুক ফেলে দিয়ে কাঞ্জিলাল ছুটলেন দোতলার দিকে। আর চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত প্রভাত যে ক-টা নোট কুড়োতে পেরেছিল, তাই নিয়েই টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

বাড়ীর গেট পার হতে হতে শুধু তার মনে হল, রিনির পোষা কুকুর হয়ে এই বাড়ীর ড্রাইভারগিরির মায়া সে কাটাতে পারেনি, কিন্তু বড়লোক যে কুকুরের জন্যে চাবুকও তৈরী করে রাখে—সেই কথাটাই তার জানা ছিল না।

—ক্রমশঃ

ভিনদেশী ছবির সচিত্র কাহিনী

নিউইয়র্কের বিখ্যাত পোশাকশিল্পী রে স্মিথের সংগে পলের প্রথম দেখা লিনকোনে। ব্যবসার তদারকীতে প্লেনে শিকাগো যাচ্ছিল। লিনকোনেই ওদের প্রেমের প্রথম জন্ম। দুজনে মিলে স্থির করেছিল একসংগে শিকাগোতে যাবে। এয়ারোড্রোমে টিকিট হাতে প্লেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল পল। রে আসেনি, আসতে পারল না। রাস্তায় গাড়িটাই বিকল হয়ে গিয়েছিল তার। বিমান-ঘাঁটিতে যখন পেঁৗছেছিল রে, পলকে দেখতে পেল না। নিউইয়র্কে যেন নিজের কাছ থেকেই পালিয়ে বাঁচতে চাইল সে। কিন্তু পৃথিবী কত ছোট। পাঁচ বছর পরে নিউইয়র্কের রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি হল পলের। কিন্তু নিরুত্তেজ গলায় কয়েকটা কথা বলে পলকে বিস্মিত করে জনারণ্যে মিশে গেল রে। সেদিন সন্ধ্যায় রে'র ফ্ল্যাটেই সটান এসে হাজির হলো পল।

—আমি ত তোমাকে বলেছি, আমি ভীষণ ব্যস্ত থাকি। তোমাকে বোধ হয় বসতেও বলতে পারবো না।

—শোনো, আজকে রাস্তায় তোমাকে দেখার পর থেকেই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

রে'র কাছে এগিয়ে আসে পল,

—তোমার জন্যে সেদিন কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম অথচ তুমি এ'লে না। প্লেনে ওঠার সিঁড়িটা সরিয়ে নেয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও ভেবেছিলাম তুমি আসবে।

—আসিনি বুঝি?

ওর সেদিনকার অনুপস্থিতির কারণটা রে বলেছিল পলকে। কিন্তু সেই শোচনীয় আবিষ্কারের কথাটা কিছুতেই জানাতে পারলো না। শিকাগোতে সেদিন ফোন করবার চেষ্টা করেছিল রে। ফোনেই কে যেন জানিয়েছিল, মিঃ স্যাক্সন বাড়ি নেই—কিন্তু মিসেস স্যাক্সন আছেন—ডেকে দেবো?"

পল রেকে নিজের কাছে টানতেই বাধা দিল সে,

—না, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে এটা সরলভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল পল, কারণ আমি তোমার জীবনে দ্বিতীয়া হয়ে থাকতে রাজী নই!

পরদিন সকালেই রে তার দোকানের বন্ধুপ্রতিম অংশীদার ডালিয়েনেকে

ব্যাক স্ট্রীট

কণাদ চৌধুরী

জানাল যে, নিউইয়র্ক ছেড়ে সে চলে যাবে। ডালিয়েন যা দেখে তার চেয়ে বেশী আবিষ্কার করে, সোজাসুজি প্রশ্ন করল রেকে,

—লোকটা নিশ্চয়ই বিবাহিত?

—দুটো সন্তানও আছে। অকপটে উত্তর দেয় রে।

—আমার ধারণা ছিল এই ধরণের বাজে গোলমালের মধ্যে তুমি অন্ততঃ পড়বে না কোনদিন।

—পড়ব না বলেই ত পালাতে চাইছি।

—পালাবে মানে? এতদিনকার প্রতিষ্ঠা, দোকান সব ছেড়ে চলে যাবে? জাহাজ ডুবিয়ে জাহাজের আগুন নেভাবে?

॥ কুশীলবগণ ॥

রে স্মিথ ... সুসান হেওয়ার্ড
পল স্যাক্সন ... জন গ্যাভিন
লিজ স্যাক্সন ... ভেরা মিলস
পরিচালনা ঃ ডেভিড মিলার ॥ কাহিনী ঃ ফ্যানি হার্স্ট ॥ চিত্রনাট্য ঃ এলিনর গ্রীফিন এবং উইলিয়াম লুডউইগ ॥ প্রযোজনা ঃ রস হান্টার ॥

অভিনেত্রী সুসান হেওয়ার্ডকে পরিচালক ডেভিড মিলার 'ব্যাকস্ট্রীট'এর একটি দৃশ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন।

পল এবং রে'র ঘনিষ্ঠ অবকাশ যাপনের একটি দৃশ্য

শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। রে'র সংগে ডালিয়েনকেও। রোমে গিয়ে 'ডালিয়েন এট রে'র আরেকটি শাখা খুলল দুজনে। রোমে দোকান খোলার ছ'মাস পরে একদিন এক রেস্টুরেন্ট একটা অদ্ভুত ঘটনার আবর্তে পড়ল রে। একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। মহিলাটিকে অপরূপ সুন্দরী বলা যেতে পারত যদি আরেকটু কম মাতাল হতেন তিনি। প্রায় টলতে টলতে কোন রকমে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন ভদ্রমহিলা, রে সরে দাঁড়ায় পথ করে দিয়ে, কিন্তু তিনি সটান রে'র পায়ের কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে ধরতে হাত বাড়ায় রে, কিন্তু তার আগেই আরেকটা হাত এগিয়ে এসেছে মহিলাটির সাহায্যে। চোখ তুলতেই পলের সংগে চোখাচোখি হয়ে যায়। বিবর্ণ মুখে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল পল।

পরদিন সকালটা আচ্ছন্নের মত দোকানে এল রে। গতরাত্রে ঘুমোতে পারেনি। কাজ করতেও ইচ্ছে করছে না, খানিকক্ষণ দোকানের মধ্যে থাকলে যেন দমবন্ধ হয়ে যাবে। দোকান থেকে এক রকম ছুটেই সূর্যকরোজ্জ্বল রোমের রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। আর দাঁড়াতেই দেখল পলকে।

—তোমার সংগে অনেক কথা আছে, চলো নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসি।

রে'র বাড়ির ছাদে পায়চারি করতে করতে তাদের অভিশপ্ত বিবাহিত জীবনের কথা একটানা বলে গেল পল।

—অন্য কোনো স্বামী-স্ত্রী হলে স্বচ্ছন্দেই তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করত। কিন্তু লিজ তা চায় না। প্রথম যখন আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করি, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল লিজ। দ্বিতীয়বার যখন চেষ্টা করি ও চূড়ান্ত মাতাল হয়ে ছেলেমেয়ে দুটোকে গাড়িতে উঠিয়ে ঘন্টায় নব্বই মাইল বেগে গাড়ি চালিয়েছিল। একটা চাকা ফেটে যায়, কেউ যে মরেনি সেবার এটাই আশ্চর্য। আমি আর বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করতে সাহস পাইনি।

খানিকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করল পল।

—অবশ্য তোমাকে এ সমস্ত কথা বলে বিরক্ত করতে চাই না। আমার হয়ত আসাই উচিত না তোমার কাছে। আমি যাই, চলেই যাই বরং।

—ঠিক যাবার জন্যেই কি তুমি এসেছিলে?

—তাছাড়া আর আমি কি করতে পারি বলো? বিবাহ-বিচ্ছেদ পাবো না, তোমার জন্যে ভবিষ্যতের কোনো আলোই ত আমি জ্বালাতে পারবো না! অস্ফুট কণ্ঠে রে বলল,

—আমিও যে অন্ধকার।

রে'র উত্তরে পল যেন নিজেকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে,

—বিশ্বাস করো, আমি চেষ্টা করেছি তোমাকে এড়িয়ে যাবার, দেখা না করে থাকতে। পারিনি, কিছুতেই পারিনি আমি।

—আমিও আর তোমাকে দেখা না পারতে। গলায় হঠাৎ কোত্থেকে জোর জড়ো করে বলল রে।

বাস্তবিক সেদিন থেকে পর পর তিন দিন পলকে যেন আঁকড়ে ধরেছিল রে। নিজেও বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয়নি, পলকেও বেরোতে দেয়নি।

কিন্তু পলকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হল রোম ছেড়ে। লিজ আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে। অবশ্য ঠিক মরবার জন্যেই পিলগুলো খায়নি সে। স্বামীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখার এইটে তার নিজস্ব পন্থা। হাসপাতাল থেকে স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে চলে গেল পল। প্যারিস থেকে একদিন চিঠি পেলো রে। পল আসছে রোমে। 'তুমি যদি রাত জেগে কাজকর্ম কর মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখো জানালায়, বাইরে থেকেই যেন দেখতে পাই তোমার অপেক্ষার আলো।"

পল আসেনি, টেলিগ্রাম এসেছিল। মোমের আলোটাকে ফুঁ দিয়ে নেভাতে হয়েছিল রেকে।

পল আসতে পারেনি কি একটা কাজে। টেলিগ্রামে এবং তার পরের প্রতি চিঠিতে আসার কথা লিখেছে। কিন্তু সাতটা মোমবাতি নেভানোর পর রে'র মনে হল আর সে পারছে না মোমবাতির সামনে অপেক্ষার দীর্ঘ ছায়া ফেলে রাত কাটাতে। সে ঠিক করে ফেলল নিউইয়র্ক, রোম, এর পর প্যারিসেও সে আরেকটা পোশাকের দোকান খুলবে। প্যারিসে এসে পলের চোখে আবার যেন মুক্তির আলো দেখল রে। আবার সেই সকাল-বিকেল একসংগে থাকা, ঘোরা।

একদিন গাড়ি করে যেতে যেতে হঠাৎ পল প্রশ্ন করল,

—বল ত আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—জানি না। তুমি আমার কাছে
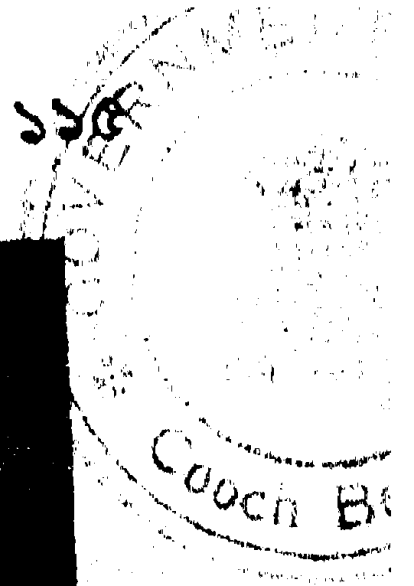
পল এবং তার স্ত্রী লিজ-এর রোমহর্ষক মৃত্যুযাত্রা

আছে এই ঢের, আর কিছুই জানার দরকার নেই আমার।

পল নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল আর কিছু না বলে।

রে কিছুক্ষণ উসখুস করে জিজ্ঞেসই করে ফেলল,

—কিন্তু বল না সত্যি আমরা কোথায় যাচ্ছি?

হাল্কা হাসিতে উচ্চকিত হল পল।

—জানতুম, তুমি না প্রশ্ন করে পারবে না। মেয়েদের সত্যিই মাটির পা...!

গাড়ি এসে একটি সুন্দর খামার-বাড়ির সামনে থামল। আপেল গাছের মধ্যে বাড়িটা যেন ডুবে আছে। সংলগ্ন বিরাট প্রান্তর যেন দূরে আকাশের কোলে লুকিয়ে পড়েছে।

—বাঃ, কি সুন্দর! রে'র মুখ থেকে যেন আপনা আপনি অব্যয় ধ্বনিত হল।

পল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে,

—ভাগ্যিস তোমার ভাল লেগেছে। নইলে সত্যিই আমার কষ্ট হত!

—কেন বল ত?

—আচ্ছা রে, তোমার কখনো মনে হয়নি যে আমি আজ পর্যন্ত কখনো তোমাকে কোন উপহার দেইনি?

রে অবাক হয়ে পলের দিকে তাকায়!

—এই বাড়িটা তোমার!

—আমাদের। মন্ত্রচালিতের মত পলের ভুল শুধরে দেয় রে।

এর পরের কয়েক মাস কি করে যে কেটে গেল—ওরা দুজনে যেন টেরই পেল না। পলের স্ত্রী লিজ, তার পার্টি, শ্যাম্পেন এবং যুবক বন্ধুদের নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াত আর পল শান্তির ছায়া পেত রে'র সাহচর্যে। লিজ যখন প্যারিসে থাকত, পল কোন-না-কোন ছুতোয় লণ্ডন, জুরিখ, রোম প্রভৃতি যে কোন শহরে চলে যেত। সঙ্গে রেও যেত। দুজনে কিন্তু কখনো প্লেনে এক-সঙ্গে বসত না, আলাদা আলাদা গাড়ি করে বাড়িতে আসত। কারণ লোক-জানাজানি হলে রে'র কথা লিজের কানে উঠবে আর স্ত্রীর কানে ওঠা মানেই একটা বীভৎস নাটকের অবতারণা হবে জানত পল। রে আবিষ্কার করল কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠতার সংবাদ যতটা গোপন থাকবে ভেবেছিল অতটা গোপন থাকেনি। লিজ প্যারিসে প্লেন থেকে ফিরে আসতেই ওরা লণ্ডনের টিকিট কাটল। এয়ারোড্রোমে ওরা দুজনেই বরাবর আলাদা যায়, আলাদা সিটে বসে। এয়ার-পোর্টে গিয়ে দেখল পলের সঙ্গে তার ছেলে-মেয়ে এসেছে ওকে বিদায় দিত। পলের বারো বছরের ছেলেটি কি একটা কথা জানার জন্যে অনুসন্ধান অফিসের কাউন্টারে দাঁড়াতেই শুনল কাউন্টারের লোক দুজন বলাবলি করছে,

—যেখানেই ওই ভদ্রলোকটি যান, ঐ ভদ্রমহিলাও যান পেছনে পেছনে।

পল বাবার কাছে কি যেন ভাবতে ভাবতে ফিরে যায়।

রে বাধ্য হয়ে সে প্লেনে না গিয়ে পরের প্লেনে অনুসরণ করে পলকে।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। লিজ গোয়েন্দা লাগিয়েছে স্বামীর পেছনে। রে বুঝতে পারল একদিন, পলের পরি-বারের সকলেই তার কথা জেনে ফেলেছে।

অন্তিমশয়নে পল, বুকে শোকাভিভূত পলের বালক পুত্র। টেলিফোনে রের সংগে কথা বলতে বলতে শেষ কথা শেষ না হতেই মৃত্যুর মেঘ ঘনিয়ে আসে।

একদিন রাস্তায় গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় একটি কিশোর কণ্ঠ শুনেল,

—তুমি আবার বাবার পেছনে লেগেছ কেন? রে মুখ তুলতেই দেখল পলের ছেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছে।

—আমরা জানি সবাই তুমি কে! তোমার জন্যে মা ভীষণ মদ খাচ্ছে। ওরা ভেবেছে আমি কিছুই বুঝি না। আমি সব জানি। আমি...আমি ঘেন্না করি তোমাকে...। বারো বছরের ছেলেটা কাঁদতে থাকে।

রে কাঁদতে কাঁদতে ফোনে জানাল পলকে সব কথা।

—তুমি আর এসো না ছেলেটার জন্যে অন্ততঃ। তার ভীষণ দরকার তোমাকে।

ভাগ্যিস পরদিন তার দোকানে ফ্যাশান শো আর শিশু হাসপাতালের সাহায্যার্থে নীলাম ছিল। নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকটা ভুলে থাকবার চেটা করল। নীলাম আরম্ভ করল রে।

একটা সুন্দর বিয়ের পোশাকের দাম উঠল পাঁচ হাজার ফ্রাংক। হঠাৎ হল-ঘরের একটা কোণ থেকে একটা গলা ভেসে আসে,

—দশ হাজার ফ্রাংক!

সকলেই ফিরে তাকায় বক্তার দিকে। রে পাথর হয়ে যায় লিজের দিকে চোখ পড়তেই। পলের স্ত্রী লিজই ডেকেছে।

রে সামলে নিয়ে ডেকে যেতে থাকে,

—দশ হাজার ফ্রাংক। আর কেউ—? তাহলে পোশাকটা কিনলেন—

—মিসেস পল স্যাক্সন। পোশাকটা পাঠিয়ে দেবেন। ফিট করাবার কোন দরকার নেই। কারণ পোশাকটা কেউ পরবে না। কেমন এক হিংস্র গলায় বলে লিজ। লিজের এক বান্ধবী ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তার দিকে তাকিয়ে লিজ জোরে জোরে বলতে থাকে—

—তোমরা এতদিন জানতে না আমার স্বামীর সংগে যে মেয়েটি ঘোরে সে কে। পোশাকটা যেন তার কাছেই পাঠানো হয়। তার নাম রে স্মিথ। ঠিকানা আমার স্বামীর।

রে যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে পলকে সেদিন রাত্রে বলল রে—তুমি আর এসো না। এসো না। আমার মান-সম্ভ্রম সমস্ত ধুলোয় গেছে। প্যারিসের সমস্ত লোক আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে তোমার স্ত্রীর জন্যে।

—লোকের কথায় কি এসে যায় সোনা। পল শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করে।

—না, না, ছেলেমেয়েদের কথায় নিশ্চয়ই যায় আসে পল! তারা সব জেনেছে।

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় রে। বাইরের ফলের বাগানের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকে—পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পুরোনো সব অনুশাসনই অমোঘ। তার থেকে বেরোবার উপায় নেই। তুমি ইচ্ছে করলেই নিজের জীবনযাপন করতে পার না, পৃথিবী টেনে তার নিজস্ব প্রথার শেকলে তোমাকে বাঁধবে। আমি আর তোমার সংগে দেখা করব না পল। এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি কোথায় বলব না।

পল ওর কাছে এসে দু'কাঁধ চেপে ধরে জোরে।

—তুমি এখানেই থাকবে। আমি ফিরে আসছি। এবার এসে আর ফিরে যাবো না আমি কথা দিচ্ছি—

* * *

দিনের বেলা ফোন পেল রে। সে যেন অপেক্ষায় কাঁপছিল এতক্ষণ। অবাক কানে পলের ছেলের গলা শুনল।

—মিস স্মিথ? এক মিনিট ধরুন!

তার পরেই পলের গলা ভেসে এল যেন অনেকদূর থেকে—রে!

—বলো, বলো, আমি অপেক্ষা করছি সোনা! কিন্তু ভীষণ আস্তে কথা বলছে পল, প্রায় ফিস্-ফিস্ করে, শোনাই যায় না প্রায়।

—রে!...... রে স্মিথ আমি তোমাকে ভালবাসি!

রিসিভারটা মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনল রে। তারপরে পলের ছেলেটা যেন কেঁদে উঠল।

—পল! কি হল পল। আমি......... আমিও তোমাকে ভালবাসি পল......। কি হল পল......কি হল?

সকালবেলার কাগজে কি হয়েছিল সব জানতে পারল রে। মোটর দুর্ঘটনায় লিজ স্যাক্সন ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। পল ভীষণ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। টেলিফোনটা তাহলে হাসপাতাল থেকেই করেছিল পল। নিশ্চয়ই স্ত্রীর সংগে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে ওর গাড়িতে উঠেছিল পল। ইচ্ছে করেই লিজ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। হয়ত এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির স্টিয়ারীংটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। পল ধস্তাধস্তিও করেছিল হয়ত। কিন্তু সেই মৃত্যুর মঞ্চে নায়ক-নায়িকা কেউই শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

শবযাত্রার এক সপ্তাহ পরে সেই বাগানবাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

—ভেতরে আসুন। ক্লান্ত কণ্ঠে বল্ল রে।

কিশোর পল তার ছোটবোনের হাত ধরে ঢুকল ঘরে।

—আমরা এসেছি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমাদের কেউ নেই—তাই ভাবলাম আমরা যদি একাধবার আপনার কাছে আসি— ।

কি যে হল রে ঠিক বুঝতে পারল না, শুধু অনুভব করল দুটি সরল মুখ ওর কোলে। আর ও নিজে তাদের চুমু খাচ্ছে, হাসছে, আদর করছে।

আর কাঁদছে।
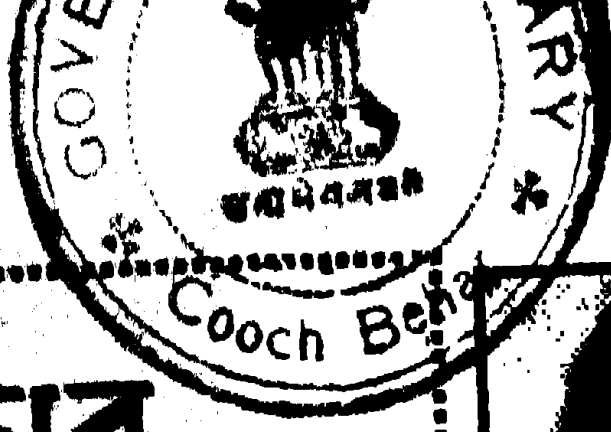
নোবেল পুরস্কার

অ্যাকাডেমিশিয়ান লিও দাভিদোভিচ লান্দাউ

খ্যাতনামা সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক লিও দাভিদোভিচ লান্দাউকে এই বৎসরের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে স্টকহোলম্ থেকে নোবেল পুরস্কার কমিটি ঘোষণা করেছেন।

তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানের নানাদিক নিয়ে অধ্যাপক লান্দাউ গবেষণা করেছেন। প্রধানত ঘনীভূত বস্তুর থিওরি ও অতি-নিম্ন তাপাঙ্কে বস্তুর ভৌতিক অবস্থা সম্পর্কেই তিনি গবেষণা করেছেন। ঘনীভূত বস্তুর "দ্বিতীয় অবস্থা"য় অতিনিম্ন তাপাঙ্কে অবস্থান্তরের তাপ-গতীয় তত্ত্বটিকে লান্দাউ আরও স্পষ্ট ও উন্নত করে তোলেন এবং অবস্থান্তরিত বস্তুটির গঠন-প্রতিসাম্যের রূপান্তর সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করেন। ১৯৪১ সালে তিনি চূড়ান্ত শূন্য তাপাঙ্কের কাছাকাছি হিলিয়মের অতি-তরলীকৃত অবস্থার লক্ষণবৈশিষ্ট্যের আণবীক্ষণিক থিয়োরিকে আরও বিশদ করে তোলেন। সেই সঙ্গে, হিলিয়মের মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন গতির শব্দ তরঙ্গের বিস্তারের ("দ্বিতীয় শব্দ তরঙ্গ") সম্ভাবনা সম্পর্কেও তিনি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

বস্তুর অতি-ভেদ্যতার থিয়োরি সম্পর্কেও খুব মূল্যবান মৌলিক গবেষণা করেছেন লিও লান্দাউ। পার-মাণবিক পদার্থবিদ্যা ও মহাজাগতিক রশ্মির উপরে অধ্যাপক লান্দাউ-এর অন্য কতকগুলি গবেষণা নূতন আলোকপাত করেছে।

তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণামূলক আবিষ্কারের জন্য অধ্যাপক লিও লান্দাউ লেনিন পুরস্কার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কর লাভ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই বৎসরের গোড়ার দিকে এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর রকম আহত হয়ে পড়ার পর প্রফেসর লান্দাউকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করার পর, তিনি আবার "বাঁচিয়া" ওঠেন। গত জুলাই মাসে মস্কোয় খ্যাতনামা সোভিয়েত লেখক বোরিস পোলেভয় বলেন, সেই সময়ে ডাক্তাররা লান্দাউ-এর "ক্লিনিক্যাল মৃত্যু" (দেহের যাবতীয় জৈব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া) ঘোষণা করেন। কিন্তু সোভিয়েত চিকিৎসকদের ও অন্যান্য দেশের চিকিৎসকের সহায়তায় বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অধ্যাপক লান্দাউকে "পুনর্জীবিত" করে তোলা হয়। এজন্য গ্রেট ব্রিটেন হতে বিমানযোগে মস্কোতে একটি বিশেষ ঔষধ প্রেরণ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানী তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করেন।

।। ভেষজ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ।।

ভেষজ বিদ্যায় ১৯৬২ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন বৃটিশ ও একজন মার্কিন বিজ্ঞানী যুক্তভাবে। বৃটিশ বিজ্ঞানী দুজন হচ্ছেন ডাঃ ফ্রান্সিস ক্রিক ও ডাঃ মরিস উইলকিন্স। মার্কিন বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ জেমস্ ওয়াটসন। ৪৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ ক্রিক ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউট অফ মোলিকিউলার বায়োলজিতে কর্মরত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ ওয়াটসনের বর্তমান বয়স ৩৪ বৎসর। ৪৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ উইলকিন্স লণ্ডনের কিংস কলেজে জীব-পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের সহকারী অধ্যক্ষ।

লিও দাভিদোভিচ লান্দাউ

এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার বিষয়ে বিজ্ঞান-জগৎ আশান্বিত। তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন নিউক্লিক অ্যাসিডের ত্রিমাত্রিক গঠন সম্পর্কে আবিষ্কারের জন্য। মনে করা হচ্ছে যে জীববিদ্যা ও ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারের প্রভাব দূরপ্রসারী হবে।

।। রসায়নে নোবেল পুরস্কার ।।

বর্তমান বৎসরে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জন কাউড্রি কেন্ড্রিক ও মিঃ ম্যাক্স ফার্দিনান্দ।

ডাঃ মরিস উইলকিন্স

ডাঃ ফ্রান্সিস ক্রিক

অধ্যাপক জেমস ওয়াটসন

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসব

সমীরণ দাশগুপ্ত

জগদ্ধাত্রী যে অর্থে জগৎ-ধারয়িত্রী—জগতের যাবৎ শৌর্য বীর্য শান্তি ও সমৃদ্ধির ধারণকারিণী, সেই অর্থে ওই সব মানবীয় আচরণ বা জীবন-লক্ষণের স্বরূপগুলির পাশাপাশি জাগতিক জীবনের অনাবিল আনন্দ এবং সৌন্দর্যানুভূতিরও উৎস।

বারো মাসে তের পার্বণের দেশে প্রধানতম জাতীয় উৎসব বলতে একমাত্র দুর্গোৎসবকেই বোঝায়। দেশের আপামর জন-মানসে ভক্তি আনন্দ এবং অপরিসীম হৃদয়াবেগের মাধুর্য সৃষ্টি করা এমন আনন্দানুষ্ঠান হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের ইতিহাসে সম্ভবত দ্বিতীয় নেই। এই হৃদয়াবেগের মুহূর্তে মানুষের অন্ত-র্লোকে যে মহৎ চিত্তবৃত্তির অনুশীলন ঘটে তা থেকেই সার্বজনীন প্রীতি এবং মিলন সম্ভবপর হয়। পূজাশেষে বিজয়ার অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। এই প্রীতি-বিনিময় মূলতঃ ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটলেও পরস্পরের মধ্যে সানন্দ শান্তি সহযোগিতা এবং প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা ও দৃঢ় করবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস এই ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। আমাদের দিনান্তিক অভাব-অনটন দুঃখ-ধান্দার মধ্যে এই ধর্মানুষ্ঠানগুলি নিবিড়তম আনন্দের উপলব্ধি ঘটায় যা মহত্তর সার্থকতর জীবনাকাঙ্ক্ষারই স্বরূপ।

জগদ্ধাত্রী পূজার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার সঙ্গে দুর্গোৎসবের মিলটুকু লক্ষ্যণীয়। ষষ্ঠী থেকে শুরু করে নবমী পর্যন্ত সাড়ম্বর পূজানুষ্ঠানের পর দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা। এই চার বা পাঁচ দিনব্যাপী পূজার রীতি একমাত্র দুর্গাপূজার রীতির সঙ্গেই মেলে। এবং এই রীতির সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্ভব সম্পর্কে একাধিক মতবাদের একটির প্রায় হুবহু সাদৃশ্য বর্তমান যা থেকে সেই মতবাদটির সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মতটি এই যে, সেকালে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারীর খাজনা পরিশোধ করতে না পারার দরুণ একবার মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁর হাতে বন্দী হয়েছিলেন। বন্দীদশায় থাকাকালীন সময়ে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় ধার্মিক রাজা যারপরনাই মর্মাহত হন। অতঃপর নদীয়ায় ফিরে এসে কোন এক রাতে দেবীর এইরূপ স্বপ্নাদেশ হয় যে, আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তির পূজা করলে দুর্গা-পূজার সমান পুণ্য অর্জন সম্ভব হবে। কৃষ্ণচন্দ্র সেইমত পূজা করেছিলেন এবং তখন থেকেই নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার সূত্রপাত। আদ্যাশক্তি দুর্গার এই বিকল্প পূজার সূত্রপাতের সঙ্গে স্বপ্নাদেশের সংস্কারগত মিলটুকু তথ্য বা যুক্তির চেয়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সহজেই আকৃষ্ট করে থাকবে।

প্রশ্ন হতে পারে চন্দননগরে এই পূজার বিশেষ প্রসিদ্ধির কারণ কি? সে সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ফরাসী আমলে চন্দননগর বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছে-ছিল। তার ফলে সাধারণতঃ যা হয়, এক শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যবসায়ী পরস্পরের ভেতর প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, যার দরুণ সারা বাংলায় ঐ পূজার প্রচার ঘটলেও জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের দিক দিয়ে চন্দননগরের অতীত ঐতিহ্য আজও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী থেকে গেছে। এবং এখনো চন্দননগরের বারোয়ারী পূজার প্রধান উদ্যোক্তা বলতে এই সব অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী মহলকেই বোঝায়। এমনকি

পূজোয় ব্যয়িত অর্থের মোটা অংক প্রকৃত পক্ষে এঁরাই দিয়ে থাকেন।

চন্দননগরের প্রধান প্রধান বারোয়ারী পূজাগুলির প্রতিমার উচ্চতা চালচিত্র সমেত ত্রিশ চল্লিশ ফুট, কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী বলে অনুমান হয়। এই অস্বাভাবিক উচ্চতার যুক্তি-সঙ্গত কারণ কিছু জানা না গেলেও অনুমান হয়, এখানেও সেই একই প্রতি-যোগিতার মনোভাব উদ্যোক্তাদের ভেতরে সক্রিয় ছিল বা আছে যার ফলে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রতিমার দৈর্ঘ্য এমনি অস্বাভাবিকভাবে বাড়ান হয়ে থাকে।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না, যখন অন্ততঃপক্ষে একখানি প্রতিমার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে এখানকার স্থায়ী প্রাচীন বাসিন্দাদের একজন মাথা নেড়ে বললেন— উহু কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা বলতে পারব না। বাবাকে মরবার আগে শুধিয়েছিলাম, তিনিও ওই এক কথা বলেছিলেন, জানি না। এটুকু বলতে পারি, ঐ পূজো এতদ্‌ঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। নিচুপটি বা চাউলপটির ব্যবসায়ীরা চন্দননগরের অতীত সমৃদ্ধির দিনে ঐ পূজো শুরু করেছিলেন একথা সহজেই বোঝা যায়।

এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকখানি পূজার বয়সকাল নিঃসন্দেহে ১০০/১২৫ বছর কি তারও বেশি এমন প্রমাণ রয়েছে। ষষ্ঠী থেকে পূজানুষ্ঠানের শুরু। দুর্গাপূজার ঠিক এক মাসকাল পরে এই পূজো চন্দননগরবাসীদের কাছে দুর্গোৎসবের আনন্দকেও ছাড়িয়ে যায়। টঙের মত দীর্ঘ খড়ের ছাউনির ঘর করে স্থায়ী কাঠামোয় প্রতিমার প্রাথমিক রূপায়ণ শুরু হয়। তারা বেঁধে চলে প্রতিমার গায় মাটি লাগানোর কাজ। বর্ধমান এবং কলকাতার মালাকরেরা বাড়ি বসে পরম উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিমার চালচিত্রের জন্য শোভন সোলার কাজ শুরু করেন। সোলাকেই রঙ আর রাংতা লাগিয়ে নতুন নতুন ডিজাইনের নক্সা, ময়ূরী মূর্ত্তি, হাতির শুঁড়ে জড়ান উপড়ে-করা শান্তিবারির কলস—নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য শুরু হয়। এই সব সোলার কাজ চালচিত্র এবং প্রতিমার অঙ্গের আবরণ ও আভরণের জৌলুস বাড়িয়ে দেয় শতগুণে।

প্রতিমার পায়ের নীচে হাতী, তার ওপর ফুলন্ত কেশর বলবান সিংহ— দেবীর বাহন। সবার ওপরে চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী দেবী মূর্তি বসে আছেন। চার হাতে শঙ্খ চক্র ধনুক বান। ডান কাঁধের ওপর সাপ—হিংস্র খলতার প্রতীক। দেবী সেই খলকে বশ করেছেন।

চালচিত্রের সোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কুম্ভকার তার তুলি আর রঙের সরঞ্জাম গুটিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় নিয়েছেন। তার জায়গায় রঙ-বেরঙের আলোকমালায় ঝলমলিয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি পূজা-মণ্ডপ। আয়ত-লোচনা দেবীমূর্ত্তির মুখে স্বর্গীয় প্রসন্নতা। আর দেবীর মুখের সেই প্রসন্নতা যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে অগণিত দর্শনার্থীর মনে। কেউ ভক্তি-ভরে প্রণাম করছেন। প্রণামকে যাঁরা সংস্কার মনে করেন তাঁদেরও মন দেবী-মূর্ত্তির গঠন-নৈপুণ্য, মনোহারী সজ্জা, চালচিত্রের সোলার কাজ বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। এঁদের কেউ কেউ পরস্পরের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কথাবার্তা বলছেন—কানে এল। সোলার কাজের শিল্পনৈপুণ্য তাঁদের অনেককে এত মুগ্ধ করেছে যে, কেউ কেউ এই সব মালাকরদের বাসস্থানের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। অনুমান হল তাঁরা এই লুপ্ত-প্রায় কারুশিল্পটির খুঁটিনাটি সম্পর্কে মনে মনে আগ্রহী। এই আগ্রহের সঠিক উৎস কিম্বা পরিণতি কি তা বুঝতে না পারা গেলেও এটুকু বোঝা গেল এই শিল্পটি সম্পর্কে এখনও প্রকৃত রসিক-জনের মনে প্রভূত কৌতূহল বা আগ্রহ বর্তমান। আর সে আগ্রহ দু-পক্ষেরই উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রবাসী মানুষ যেমন আনন্দ-উৎসবে বাড়ি ফেরে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে চন্দননগরবাসীদের ঘরে ঘরে তেমনি দূর-দূরান্তর থেকে আত্মীয়-পরিজন আনার ধুম লেগে যায়। তাছাড়া এই তিন কি চার দিনে শহর কলকাতা এবং হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্ধমান জেলার দূর শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকেও বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত একাধিক স্পেশাল ট্রেন চলাচলের বন্দোবস্ত চালু হয়েছে কয়েক বছর যাবৎ। তাছাড়া এ সময়ে ঐ অঞ্চলের সব কটি রুটে অতিরিক্ত বাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। জলপথের জন্য আছে নৌকা, গ্রামপথের জন্য গরুর গাড়ীরও বন্দোবস্ত আছে। কাছের যাত্রীরা প্রতিমা দেখে বাস কিম্বা ট্রেনে সে রাত্রেই বাড়ি ফিরে যান। আর যাঁরা দূরের মানুষ, গ্রামের মানুষ, তিন দিন পুজো দেখে বিসর্জনের বাজনা শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ফিরবেন বলে এসেছেন—এই তিন কি চার দিন তাঁরা হয় ভাড়া-করা গাড়িতেই রাত কাটান আর না হয় যে কোন পূজা-প্রাঙ্গণে সারা রাতব্যাপী গান-বজনার অনুষ্ঠানে গিয়ে বসেন। শুধু গান-বাজনার হাল-ফ্যাশানের জলসাই নয়, সেই সঙ্গে যাত্রা, তরজা কিম্বা থিয়েটারের বন্দোবস্তও হয়ে থাকে এই তিন দিন। মোট কথা দূরের মানুষের

রাত কাটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি রাখেননি বারোয়ারী পুজোর উদ্যোক্তারা।

নবমী পুজো শেষ হয়ে দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের উৎসব। বৎসরান্তিক পুজানুষ্ঠানের এই শেষ দিনটি কোমলে, বিষাদে, আনন্দে, মাধুর্যে মেশানো একটি পরম উপভোগ্য দিনের ছাপ রেখে যায় প্রতিটি দর্শনার্থীর মনে। বিষাদের নামে এদিনের অনুভূতি অনেকখানি আনন্দেরও। মেঘের পাশে রৌদ্রের খেলার মত। অর্থাৎ দেবীকে আমরা বিসর্জন দিচ্ছি আগামী বছর তাঁকে নতুন করে পাব বলে। এই বিচ্ছেদের বিষাদ আরেক প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে তোলে বলেই এই বিষাদ শুধুই বিষাদ নয়। এ যেন নতুন করে পুনর্মিলনেরই সূত্রপাত।

দশমী, অর্থাৎ বিসর্জনের দিনটিতে অগণিত দর্শকের ভিড়ে প্রত্যেকটি পুজামণ্ডপ, বিশেষ বিশেষ গলিপথ জন-সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সাধারণত বেলা চারটে থেকে যানবাহন চলাচলকারী প্রধান রাস্তা জি-টি রোডের দুই প্রান্ত (একদিকে বাবুর বাজারের মোড় আরেক দিকে তালডাঙার মোড় থেকে চন্দননগরে ঢুকবার উত্তর-দক্ষিণের দুটি মুখ) পুলিশ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দূরের যানবাহনকে কোন মতেই সেই নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না বেলা চারটে থেকে রাত বারটা অবধি। অবশ্য এই নিষিদ্ধ সীমানার দুই প্রান্ত থেকে নিয়মিত বাস এবং ট্যাক্সি আসা-যাওয়া করতে থাকে যার ফলে যাত্রী চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে অনেক রাত অবধি। নির্বিঘ্নে প্রতিমার মিছিল বার করা ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

পুরনারীগণ দেবী-বরণের অনুষ্ঠান শেষ করেন দেবীর পায়ে হাত দিয়ে। তারপর উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, এ্যামপ্লিফায়ারের বাজনা, ঢাক এবং কাঁসরের বাজনা সহযোগে প্রতিমাকে লরীতে তোলা হয়।

প্রায় চার মাইল দীর্ঘ রাস্তা ঘুরিয়ে দেবীকে গঙ্গার 'গড়ান ঘাটে' নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। মূর্তির অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের জন্য এই নির্দিষ্ট রাস্তার কোন কোন জায়গায় টেলিফোনের তার, বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন ইত্যাদি যাবতীয় বাধা সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলা হয়। শেষ দিনের এই শোভাযাত্রার মিছিলের আলোর ছটা, জাঁকজমকের প্রাচুর্য, বিগত তিন দিনের সব আনন্দ কোলাহলকে যেন হার মানিয়ে দেয়। জেনারেটার খাটিয়ে লরীর ওপরে রকমারী রঙের বাতি জ্বালান হয়, অন্ধকারে প্রতিমার মুখ বারবার সার্চলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। জরীর কারুকার্য সোলার চালচিত্র শেষবারের মত রাস্তার দু'ধারের অগণিত নরনারীর চোখে উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে।

গঙ্গার গড়ান, ঢালু ঘাটে প্রতিমা আনার পর বিসর্জনের আগে স্থায়ী কাঠামো থেকে প্রতিমা খুলে ফেলা রীতি। সেই সময় কেউ কেউ চালচিত্রের সোলার কাজ সংগ্রহ করে রাখেন। এই সময় অন্ধকার গঙ্গার কিনারে কাতারে কাতারে নৌকা ভিড়ে থাকে এবং সেগুলির ওপর থেকে অসংখ্য দর্শক বিসর্জনের সমারোহ প্রত্যক্ষ করেন। সেই নৌকার ভিড় বিসর্জন অনুষ্ঠানের খ্যাতির অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিশেষ পরিচিত।

একটি একটি করে প্রতিমা আসতে থাকে, বিসর্জন হয়ে যায় মহাসমারোহে, তারপর খালি কাঠামো নিয়ে লরীগুলো ফিরে যায় শূন্য মণ্ডপের দিকে। গঙ্গার ঘাটে অগণিত নারী-পুরুষের ভিড় লেগে থাকে মাঝরাত্র পর্যন্ত। এই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়।

সেই বিশাল জনসমুদ্রে মাতৃমূর্তি দর্শনাকাঙ্ক্ষার জন্য যত না আগ্রহ পরি-লক্ষিত হয়, তার বেশি লক্ষিত হয় আনন্দ-উল্লাসের রূপ যা এই ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানগুলির আড়ম্বরের ভেতরে স্বভাবতঃই বিশেষরূপে চোখে পড়ে। বস্তুত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উৎসব বা আনন্দের স্থান আর কতটুকু? তবু যখন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সুযোগ আসে, আমরা জীবনের যত কিছু ক্লেদ গ্লানি তুচ্ছতা মালিন্য ভুলে নিশ্চিন্তে, পরমানন্দে মেতে উঠি। এই মেতে ওঠা, আনন্দিত করা, উল্লসিত করা এ সমস্তই সুস্থ জীবনলক্ষণের স্বরূপ। এইসব ধর্মানুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক লাভা-লাভের কথা বাদ দিলেও সাধারণ মানুষের পাওনা হিসেবে এইটুকু বোধ হয় চরম এবং পরম পাওয়া।

প্রাচীন মন্দির

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে ১২ মাইল দূরে হলো বৈষ্ণব তীর্থ খড়দহ। শ্যামবাজার থেকে ৭৮নং বাসে কিম্বা শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে রেলগাড়ী করেও খড়দহে যাওয়া যায়। ডাক্তার হণ্টার বাঙলার বিবরণে (এ ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল) লিখেছেন—

"মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভু ঘুরতে ঘুরতে এই স্থানে আসেন এবং গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় মহিলার ক্রন্দন শব্দ শুনতে পান। শব্দ লক্ষ্য করে দেখেন যে একজন মহিলার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হওয়ায় সে কাঁদছে। কিছুক্ষণ আগে কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ পড়ে আছে। নিত্যানন্দ অবস্থা দেখে সমস্তই বুঝলেন। কিন্তু কন্যার মাতাকে বললেন, কাঁদ কেন? তোমার কন্যা ত নিদ্রিত। মাতা নিত্যানন্দের কথা হৃদয়ঙ্গম করলো। তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক এই বিশ্বাসে তাঁকে বললো, প্রভু আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও। আমি জন্মের মত তোমার দাসী হয়ে থাকবো। সত্য সত্যই মেয়েটি বেঁচে উঠল। মহিলা নিত্যানন্দের গৃহিণী হলেন। নিত্যানন্দ গৃহী হয়ে স্থানীয় জমিদারের কাছে বসোপযোগী একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করলেন। জমিদার গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সামনের দহের উপর একখণ্ড খড় ফেলে দিয়ে বললেন, এই স্থান তোমার বাসের জন্য দিলাম। দহের ঘূর্ণি জলে খড় অদৃশ্য হ'লো। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তথায় চড়া পড়ে বাসোপযোগী স্থান দেখা দিল। তখন অধিবাসিগণ নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক মহিমা অবগত হয়ে অনেকেই তাঁর ভক্ত হ'লো। সেই অবধি সেই স্থানের নাম খড়দহ হয়েছে।"

খড়দহের গোস্বামীরা নিত্যানন্দ প্রভুর বংশোদ্ভব। এই গোস্বামীরা অনেকেই বৈষ্ণবের দীক্ষাগুরু। দোল, ফুল দোল, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পর্বে এখানে অনেক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। খড়দহের শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি প্রসিদ্ধ। শ্যামসুন্দর মূর্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়। হাণ্টার সাহেবের বিবরণে উল্লেখ আছে—

"রুদ্র নামক এক যোগী গৌড় নগরে মুসলমান শাসনকর্তার কাছে এসে বলেন যে, প্রাসাদের দ্বারদেশের উপর একটি প্রস্তরখণ্ড আছে। ভগবানের প্রত্যাদেশ হয়েছে যে ওটি থাকলে অমঙ্গল হবে। অতএব অবিলম্বে ওটি স্থানান্তরিত করা কর্তব্য। শাসনকর্তাও দেখলেন যে বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ঘর্মাক্ত হয়েছে। শাসনকর্তার হিন্দু মন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন যে পাষাণের চক্ষের জল পড়লে দেশের অমঙ্গল হবে। অতএব ওটি স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যক। প্রস্তরখণ্ড খোলা হ'লো এবং রুদ্রকে অর্পণ করা হলো। রুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিয়ে নৌকায় তুলতে গেলেন। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ হস্তস্খলিত হয়ে উক্ত প্রস্তর জলমগ্ন হলো। শ্রীরামপুরের কাছে বল্লভপুরে রুদ্রের বাস। রুদ্র বাড়ী এসে দেখলেন গঙ্গার ঘাটে সেই প্রস্তর এসে উপস্থিত হয়েছে। এই প্রস্তর হতে বল্লভপুরের বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। খড়দহের গোস্বামীরা এই প্রস্তরের এক অংশ নিয়ে শ্যামসুন্দরের মূর্তি নির্মাণ করেন।"

এল, এস, এস, ও' ম্যালি সম্পাদিত "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (২৪ পরগণা)" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—

খড়দহের গঙ্গাতীরে পুরাতন বাংলা রীতিতে নির্মিত শিবমন্দির

"খড়দহ বৈষ্ণবগণের এক বিশেষ তীর্থভূমি। যেহেতু এই স্থানেই মহাপ্রভুর সর্বপ্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রম ছিল।"

"গোবিন্দ দাসের কড়চা" গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলেছেন যে—"নিত্যানন্দকে তিনি জাতিভেদের গণ্ডী লংঘন করিয়া ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য বংগদেশে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ ছিলেন ভোলা মহেশ্বর, পতিতের প্রতি তাঁহার ছিল অপার করুণা। চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন, তিনিই পতিত উদ্ধার কার্যের সর্বাপেক্ষা যোগ্য। এই জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বংগদেশ ছাড়িয়া দীর্ঘকাল কোথাও থাকিতে দিতেন না। কিরূপে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আভিজাত্য-গর্বিত সমাজে একটু আদর পাইবে, তাহা তিনি গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া নির্জনে নিত্যানন্দের সংগে আলোচনা করিতেন।"

নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীরভূম জেলার একচাকায়।

সি. আর. উইলসন লিখিত "দি আর্লি অ্যানালস্ অফ দি ইংলিস ইন বেংগল" গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে—১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে হোসেন সা'র আমলে বিপ্রদাসের "মনসার ভাসান" রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থে চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথে প্রধান প্রধান স্থানগুলির নামের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে খড়দহ নামেরও উল্লেখ দেখা যায়।

সেকালে গংগার দুই তীরেই ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে বরাহনগর, সুখচর, পানিহাটি, খড়দহ, আকনা, মাহেশ, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানে ভক্তদের আবাস গড়ে ওঠে। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানের নামের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

"পানিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদ বর্ণিবেক সে সব কৌতুক॥
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥"

খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিত দেবালয়ে—
"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন—কহনে না যায়॥"

খড়দহের শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ

শ্রীবাস গৃহ হতে প্রভুর পানিহাটি রাঘব পণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ—

"কত দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘব মন্দিরে।"

কবি জয়ানন্দ বিরচিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থে পানিহাটি এবং খড়দহের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পানিহাটি সমগ্রাম নাহি গংগাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে॥
ইষ্টিকা রচিত হাটবাট রম্যস্থান।
দেউল দেহরা মঠ প্রপা পুষ্পোদ্যান॥"

উক্ত গ্রন্থে আরও আছে যে—
"শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ আছে যে—"১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করেছিলেন।

বি. টি. রোডের উপর খড়দহ পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ির পাশের রাস্তা ধরে যেতে হয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরের দিকে। আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তা। কয়েকটি দোকানের গায়ে রসপাড়ার নামের উল্লেখ আছে।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের এলাকায় প্রবেশ করার আগেই দেখা যায় দুটি পুকুর। পুকুরের জলের রঙ ঘন সবুজ-বর্ণ। মন্দিরের সামনে পাথর বাঁধান নাট-মন্দির। মন্দিরের কোল ঘেঁসে রয়েছে সারি সারি ভক্তদের নাম লিখিত ইট বাঁধান তুলসী মঞ্চ। শ্যামসুন্দরের মন্দির বেশ বড়। কাছেই নিত্যানন্দ প্রভুর বাসভবন।

বিশ্বকর্মপাড়া হয়ে যাবুর ঘাট। গংগার ধারে চতুষ্কোণ ভূমির উপর ২০টি শিবমন্দির। মধ্যে বিরাট প্রাংগণ। কয়েকটি মন্দিরের গায়ে উঠেছে অশ্বত্থ ও বটগাছ। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ কম। গংগার ধারে ঐ ধরণের পর

পর আরও কয়েকটি মন্দিরের চূড়া দেখলাম।

গংগার উপর ইট দিয়ে বাঁধান ঘাট। এ পারে বাঁধা ছিল কয়েকটি নৌকা। ওপারের কিনারা ঘেঁসে একটি স্টীমার যেতে দেখলাম। অপর পারের সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কয়েকটি কারখানার চিমনী মাথা তুলে আছে। ওপারে হ'লো রিষড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি।

শিবনাথ হাইস্কুলের সামনে দিয়ে এসে উপস্থিত হলাম শ্যামসুন্দরের পুরাতন ঘাটে। ঘাটের পাশে গংগার ধারে চোখে পড়লো একটি দোতলা বাড়ী। ভিতরে নানারকম গাছের ঝোপ-ঝাড়। শুনলাম কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ উক্ত বাড়ীতে বাস করেছিলেন।

ঘাট ভগ্ন। পাথর এনে বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ঘাটের নিচে খরস্রোতা স্বচ্ছ সলিলা গংগা বয়ে চলেছে। রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করছে গংগার জল। কয়েক পা যেতেই চোখে পড়লো রাস খোলার ঘাট। সামনে সাদা চুনকাম করা শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ। এখানে প্রতি বছর রাসের সময় উৎসব হয়। মেলা বসে, পুতুল সাজানো হয়। দোকান বসে। শুনেলাম উৎসবের দিনগুলিতে বেশ ভিড় হয় এখানে।

বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের জন্য খড়দহের ইতিহাসে বিশ্বাস পরিবারের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার নামক জনৈক পণ্ডিতের সহায়তায় "প্রাণতোষিণী মহাতন্ত্র" নামে একখানি তন্ত্র-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় পণ্ডিত দ্বারা বহু গ্রন্থ যেমন প্রাণকৃষ্ণ শব্দাব্ধি, প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি, প্রাণকৃষ্ণ ভস্মকৌমুদী, প্রাণকৃষ্ণীয় শাবর, প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী, প্রাণকৃষ্ণ বৈষ্ণবামৃত, রত্নাবলী প্রভৃতি রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। ১৮৩৬ সনে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পরলোকগমন করেন।

২৯ জানুয়ারী, ১৮২০ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি হ'লো এই—

"কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের বাঁধাঘাটের উপর চতুর্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থব্যয় করিয়া বাণকুণ্ড হইতে বাণ লিঙ্গ আনাইয়া ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণ লিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম

খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির

প্রকাশ করিয়াছেন। ওই আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন। সে স্থান অতি মনোরম। এতদ্দেশে অনেক অনেক ভাগ্যবান লোকেরা অনেক অনেক মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ সংস্থাপন কেহই করেন নাই।"

শুনলাম খড়দহের গংগার ঘাটে শিবমন্দিরের সংখ্যা মোট ছাব্বিশটি। তা ছাড়া আরও আশেপাশে কয়েকটি মন্দির চোখে পড়লো। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের পাশে মদনমোহনের মন্দির। বিশ্বাস ঘাটে যাবার পথে পুরাতন এবং নতুন মন্দির দেখলাম। নবনির্মিত মহাবীর মন্দির রয়েছে পথের উপর। এ রকম কয়েকটি মন্দির ছড়িয়ে আছে খড়দহের আশেপাশে। শ্যামসুন্দরের মন্দির থেকে কিছু দূর গেলেই রহড়া। স্টেশন আর রেল লাইন পার হয়ে আসতে হয় রহড়ায়। সেখানে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র। গড়ে উঠেছে ইস্কুল, কলেজ, পাঠাগার, ছাত্রাবাস, মন্দির। আর চোখে পড়লো ওল্ড ক্যালকাটা রোডের উপর একটি শিবঠাকুরের মন্দির। শুনলাম উক্ত মন্দিরের জন্য ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছে মন্দিরপাড়া।

[ফটোগুলি শ্রী জি পি রূপ কর্তৃক গৃহীত।]

(একটী চাণক্য শ্লোক)
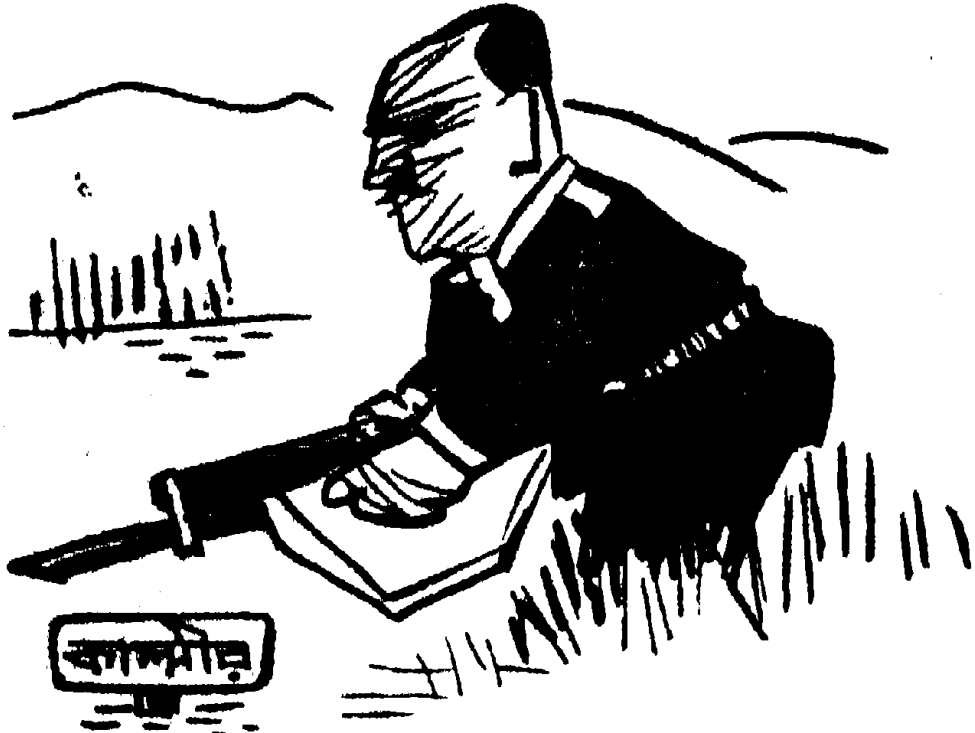
সর্পঃ ক্রূরঃ

খলঃ ক্রূরঃ

সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ ।

মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ

খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

এখানে আসবার ঠিক বারো দিন পরে ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল কান্তির। চোখের চাউনি থেকে ঘোলাটে ভাবটা চলে গিয়ে পরিচয়ের দীপ্তি ফিরে এল। মনে হ'ল তাকে ঘিরে মা-দাদা-বৌদির বসে থাকবার কারণটাও বুঝতে পারলে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নিরতিশয় লজ্জা। যেন সেই লজ্জা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যই আবার চোখ বুজল সে।

শ্যামা তখনই সাগ্রহে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কনক বেশ একটু দৃঢ়কণ্ঠেই নিবৃত্ত করল তাকে, 'এখন নয় মা, আরও কিছুদিন যাক, দুর্বল শরীর মাথাও দুর্বল—এখন কি কোন কথা, ভাল ক'রে গুছিয়ে ভাবতে পারে? সেটা ভাবতে দেওয়াও ঠিক নয়। আর একটু সারুক শরীরটা!'

শ্যামা তা বুঝলেন, চুপ ক'রে গেলেন খানিকটা।

আরও চার-পাঁচ দিন পরে কথা কইল সে। জল চেয়ে খেল, খাবার চাইল।

কিন্তু সেই সময়ই তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করলেন শ্যামা, যে সে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে ঠোঁট-নাড়া দেখে তবু বোধ হয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে, জবাবও দিচ্ছে কিছু কিছু—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কিছু বললে বা শিয়রের দিক থেকে কোন প্রশ্ন করলে একটা উত্তরও পাওয়া যাচ্ছে না। রীতিমতো চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পাচ্ছে।

পরের দিনই ফকির ডাক্তারকে খবর দিয়ে পাঠালেন শ্যামা। তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, 'ভয় নেই—ও কুইনাইনের এফেক্ট, সারতে দেরি লাগবে। ওর প্রাণটা যখন ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তখন কানটাও ফেরাতে পারব। তা ছাড়া একটু জোর পেলে না হয় কলকাতার কলেজে নিয়ে যাবেন, সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছে, ভাল চিকিৎসা হ'লে সেরে যাবে। শরীরে রক্ত নেই, একটু দুধ পেটে পড়েনি, শুধু খানিকটা ক'রে র কুইনাইন খেয়েছে তার আর কী হবে বলুন। ...না, ও ভাল হয়ে যাবে তবে সময় লাগবে ঢের—তা বলে দিচ্ছি। রোগটি খুব সহজ হয়নি ওর, এটা মনে রাখবেন। পিলে-লিবার এখনও জেঁকে বসে আছেন। জ্বরও এখন তো তিনচার দিন অন্তর অন্তর আসছে, ওটা কমে গেলেও দেখবেন একাদশী আমাবস্যে পুন্নিমেতে গা-গরম হবে এখন দু-চার বছর। তবে বেল-পাতার রস শিউলিপাতার রস এইসব টোট্কা খাওয়াবেন—খরচ নেই, অথচ উপকার হবে।'

কিন্তু ফকির ডাক্তার যতই আশা ও আশ্বাস দিয়ে যান—জ্বর আসবার দিন-গুলোর মধ্যেকার সময়টা দীর্ঘতর হয়ে এলেও—কানের কোন উপকার হ'ল না। বরং আরও যেন বেশী কালা হয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সেটা শ্যামার অত তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও কনকের চোখ এড়ায়নি। সে চুপি চুপি হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেদিকে। বললে, 'তুমি আর দেরি ক'রো না—বড় কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ফকিরবাবু যা জানেন তা করেছেন, এর বেশী আর ও'র কাছে আশা করাও অন্যায়!'

হেমও লক্ষ্য করল কথাটা। কিন্তু বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা তাদের নয়। নিয়ে গেল সে মৌড়ীর হাসপাতালেই। তাঁরা দেখে বললেন, 'কানের পর্দা তো ঠিক আছে, কালা হবার তো কথা নয়। সম্ভবত দুর্বলতার জন্যেই হয়েছে, একটু ভাল ক'রে খাওয়ান দুধটুধ—তাহ'লেই ভাল হয়ে যাবে। তাড়াহুড়োর কাজ নয়—অত ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলছেন—তাহ'লে সারতে সময় লাগবে বৈকি!'

ভাল ক'রে কীই বা খাওয়াতে পারে ওরা। খুব অসুখের সময় তবু পাঁচজনে ফলটল দিত—এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ভেবে হেম একপো ক'রে দুধের রোজানি ক'রে দিলে। তাও মায়ের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া ক'রেই। শ্যামা রুক্ষকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেন, কিসের জন্যে—ও ছেলে কী আমার সগ্গে বাতি দেবে তাই শুনি। ওর ইহকাল-পরকাল সব গেছে। আমার সব্বনাশ ক'রে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়িয়ে পঙ্গু হয়ে এসে বসলেন চিরকালের মতো—একটা বিধবা মেয়ে নিয়ে জ্বলে মরছি আবার একটা হয়তো পুষতে হবে। তার আবার অত কেন—একগাদা পয়সা খরচ ক'রে দুধ খাওয়ানো!'

হেম বললে, 'তোমার যেমন কথা। বেটাছেলে বিধবা মেয়ের মতো বসেই বা খাবে কেন। লেখাপড়া যদি আর নাই করে, তা' ব'লে রোজগার ক'রে খেতে পারবে না? কানটা যদি যায় বরং সেই একটা ভাবনার কথা। ওটা যাতে ফিরে পায় সেটা আগে দেখা দরকার, নয়?'

তাতেও হয়নি অবশ্য। শেষ অবধি বলতে হয়েছে হেমকে যে দুধের টাকা সে আলাদা দেবে, মাসের খরচ ছাড়া। হেম যে মাইনের সব টাকা মাকে দেয় না—এ শ্যামা জানেন। হেমও গোপন করে না। মাসে কুড়ি টাকা করে দেয় সে—এ ছাড়া সে কত রাখে, ঠিক কত তার এখন আর তা শ্যামা জানেন না। এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ যে করতে যাননি শ্যামা তা নয় কিন্তু সুবিধা হয়নি, হেম স্পষ্টই জবাব দিয়েছে, 'এই থেকেই তো বাঁচিয়ে তুমি টাকা জমাচ্ছ, তেজারতি খাটাচ্ছ। আর দরকার কী? সবই বা ধরে দেব কেন? আমারও তো আপদ বিপদ আছে।'

আর কিছু বলতে পারেননি শ্যামা। আজও কিছু বলতে পারলেন না। হয়ত বলারও কিছু নেই। হয়ত এটাই চেয়েছিলেন। টাকাটা ওপক্ষ থেকে বার করার জন্যই এত কঠিন হয়েছিলেন তিনি।

ছেলে একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই—অর্থাৎ উঠে বসবার মতো হতেই শ্যামা তাঁর নিরুদ্ধ প্রশ্নের স্রোতকে ছেড়ে দেন।

'কেন এমন হল? কী করেছিলি যে ওরা এতবড় শাস্তিটা দিলে? তুই এখানে চলে এলি না কেন? এমন হয়েছিল তখনই বা চলে এলি না কিসের জন্যে? কি এত লজ্জা তোর? খুনজখম করেছিলি না রাহাজানি করেছিলি? কী জন্যে তুই আমার এত বড় সর্বনাশটা করলি! এখন যদি কানটা তোর না সারে? যদি জন্মের মতো কালা হয়ে যাস? লেখাপড়া তো গেলই—এরপর যে ভিক্ষে করে খেতে হবে তা হলে! এমন করে শরীরটা পাত করলি কি কারণে? এমন দুর্বুদ্ধি কেন হল তোর আমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলো বেশ চেঁচিয়েই করেন শ্যামা। কান্তির শ্রুতিগম্য করেই। শুনতে যে পেয়েছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কারণ প্রতিক্রিয়া জাগে সঙ্গে সঙ্গেই। কথা উঠলেই সেই যে মাথা হেঁট করে—সে মাথা আর তোলে না কিছুতেই। কিন্তু উত্তরও দেয় না। একটি কথাও বলে না। দিনের পর দিন সহস্র প্রশ্ন তেমনি নিরুত্তরই থেকে যায় সেই প্রথম দিনটির মতো। ক্রমশ রুক্ষতর হয়ে ওঠে শ্যামার মেজাজ—ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কণ্ঠের স্বর ও প্রশ্নের ভঙ্গী দুইই কঠোরতর হয়ে ওঠে। নির্মমভাবে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন তিনি—আর এই জিনিসটা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবু কান্তির কণ্ঠ থেকে একটি শব্দমাত্র উচ্চারিত হয় না। সমস্ত প্রশ্নবাণই নিশ্ছিদ্র নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এক এক সময় প্রায় ক্ষেপে ওঠেন শ্যামা, গায়ে হাত তুলতেও যান—কনক কাছে থাকলে হাত ধরে প্রতিনিবৃত্ত করে। কিন্তু কান্তি চুপ করেই থাকে। শুধু দুই চোখ দিয়ে এই সময়গুলোয় নিঃশব্দে যে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে অবিরল ধারায় তাইতে বোঝা যায় যে শ্যামার কথাগুলো যথাস্থানে গিয়েই পৌঁচেছে—কথাগুলোর প্রয়োগ কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় নি। বাইরের নীরবতার চর্মভেদ করে সে বাক্যবাণ মর্মে গিয়ে ঠিক বিঁধেছে।

অবশেষে এক সময় হার মানেন শ্যামা।

হাহাকার করে ওঠেন নিজে নিজেই। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন বারবার। গাল পাড়েন তাঁর চিরন্তন ভাগ্যকে আর নবতম দুর্ভাগ্যের উপলক্ষ্য তাঁর এই ছেলেকে। সে সময় সমস্ত রকম শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যায় তাঁর মুখের ভাষা। কুৎসিত ইতর গালিগালাজ বেরোয় মুখ দিয়ে। দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে থাকার ফলে যা শুনে এসেছেন, এতকাল কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারেননি এমন সব ভাষা। সে সময় কনকের সামনে থেকে পালিয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। হেম প্রায়ই সে সব সময়গুলোয় থাকে না—তার উপস্থিতিকালে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য ধরেই থাকেন শ্যামা—থাকলে সে ধমক দেয়, নয়তো অর্ধবিহ্বল ভাইকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দেয় সেখান থেকে।

গালাগাল দেন তিনি রতনকেও।

সেসময় এ খেয়ালও থাকে না যে তার আসল পরিচয় এতকাল সযত্নে পুত্রবধূর কাছে গোপন করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। মনে থাকে না যে এ গালাগাল তাঁদের গায়ে এসেই পড়ছে। সে স্ত্রী-লোকটার যে পরিচয় আজ তিনি উদ্ঘাটিত করছেন সে পরিচয় জানার পর সেখানে কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠানো বাপ-মা-অভিভাবকদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করার কোন অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই গালাগাল দেন তিনি তাঁর ছেলের সর্বনাশরূপিনী সেই নারীকে। দেখতে শুনতে যদি নাই পারবে, যদি নজর রাখা সম্ভবই না হবে—তবে কেন সে এমন করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তাঁর ছেলেকে। আর যখন বুঝল যে ওখানে রাখা আর উচিত নয়—কেন সে জোর করে পাঠিয়ে দেয়নি তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছে! কেন? কেন? কী এমন শত্রুতা করতে গেছলেন তিনি তার? কী তার পাকাধানে মই দিতে গেছলেন—কিম্বা বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিলেন!

অভিসম্পাৎ করেন তাকে— সর্বনাশ হোক। সর্বনাশ হোক। যে পয়সার অহঙ্কারে এমন ধরাকে সরা দেখা সে পয়সা যেন একটিও না থাকে—মালা হাতে ক'রে যেন পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হয়। সর্ব অঙ্গ থাকতে যেন চোখটি যায় আগে। হাতে যেন মহাব্যাধি হয়, ইত্যাদি—

তবুও কোন কথা বলে না কান্তি। শুধু নীরবে অশ্রুপাত করে বসে বসে।

উত্তর দিতে পারে না কান্তি তার কারণ উত্তর দেবার মতো কিছু নেই ওর। কিছুই বলবার নেই। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব নয় সে সুগভীর ইতিহাস। অন্তত ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এটুকু লজ্জা ও ঘৃণা তার এখনও অবশিষ্ট আছে।

যা ঘটেছিল তা বলবার আগে ওর আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। এমনিই হয়ত করা উচিত ছিল, অনেক আগেই, এই কৈফিয়ৎ দেবার মুহূর্ত উপস্থিত হবার আগেই উচিত ছিল এ-পৃথিবী থেকে সরে যাওয়া, কিন্তু পারেনি সে। আসলে বড় দুর্বল সে ভেতরে ভেতরে। দুর্বল বলেই পারেনি সেদিন আত্মহত্যা করতে। দুর্বল বলেই ভাগ্য ওর জীবন নিয়ে এই মর্মান্তিক খেলা খেলতে পারল।...

ঠিকই বলছেন মা। সেই সর্বনাশিনীই ওর এই দুর্গতির প্রধান

কারণ—কিন্তু ওর নিজের দিক থেকেও দায়িত্ব কাটিয়ে ফেলবার উপায় নেই যে। তার সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অপরাধ এক-দিকের পাল্লায় তুললেও ওর নিজের অপরাধের বোঝা কিছুমাত্র হালকা হয় না—ওর দিকের পাল্লাও তেমনি ভারী হয়ে ঝুঁকে থাকে। ওর অন্যায়ও তো কম নয়। বরং আরও বেশী, আরও অমার্জনীয়। ওর অন্তরের দিকে তাকালে যতদূর দৃষ্টি যায়—সেখানেও তো কলুষ কম জমা হয়ে নেই। দেবার মতো কৈফিয়ৎ বরং তার কিছু আছে—কারণ সে যা তাই, তার বেশী নিচে তো নামেনি। কোন কৈফিয়ৎ নেই ওরই এই জঘন্য আচরণের, কোন জবাব নেই। ওর নিজের মনেই যে সীমাহীন গ্লানি আর লজ্জার ইতিহাস লিখিত রয়েছে, যে অপরাধ-বোধ রয়েছে পুঞ্জীভূত—তারপর আর কাউকে দোষ দিতে যাওয়া, অপরাধের দায়িত্বটা আর কারুর ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া আরও একটা বিপুলতর অন্যায় আর একটা অক্ষমণীয় অপরাধ হয়ে উঠবে।

না, দোষ ও দেবে না রতনদিকে। যদিও সে-ই হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেছে এই সর্বনাশের দিকে, অধঃপতনের দিকে। কিন্তু ও তো বাধা দেয়নি কিছু, প্রতিবাদ করেনি। নিজের জন্ম, নিজের অবস্থা—আত্মীয়স্বজন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই তো ভুলে বসেছিল সেদিন। ওরই তো বাধা দেওয়া উচিত ছিল। এমন অস্বাভাবিক, এমন অন্যায় পথে পা দেবার আগে। এটুকু জ্ঞান যে সেদিন তার না ছিল তাও তো নয়—একেবারে সরল শিশু ছিল না সেদিন ও। এটা ঠিক যে এই গত কমাস একরকম বনবাসে একা পড়ে থাকতে থাকতে—রোগশয্যায় একা শুয়ে ছটফট করতে করতে যতটা গুছিয়ে ভাবতে শিখেছে সে, যতটা বয়স তার দেহের তুলনায় বেড়ে গেছে—ততটা জ্ঞান অভিজ্ঞতা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না সেদিন, তবু মোটামুটি ন্যায় অন্যায় বোধ তার ছিল বৈকি। কাজটা যে ভাল নয়, তাও সেদিন সে জানত। তাকে মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে—সেইজন্যই তাকে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে—এসবও জানত। তার মা দাদা ভাইবোনেরা তার মুখচেয়ে আছেন, সেটাও সেদিন অজানা ছিল না।

তবে?

বাধা সেদিন দেয়নি তার কারণ সেই আপাতরমণীয়, আপাতমধুর সর্বনাশের পথে নামতে তার তরফ থেকেও বুঝি উৎসাহের অভাব ছিল না।

মনে আছে তার—কিছুই ভোলেনি। প্রতিটি দিনের ইতিহাস তার মনে আছে। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বিপলের। মনে গাঁথা আছে প্রতিটি ঘটনা। চরম সর্বনাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইতিহাস।

এ ইতিহাস শুরু হয়েছে অনেকদিন—দুতিন বছর আগেই।

সেই দাদার বিয়ের সময় থেকে। কিম্বা বলা যায় তারও আগে থেকে।

তবে ঐ সময়টায়ই প্রথম ও রতনদির আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। অদ্ভুত লেগেছিল ওর ব্যাপারটা; অকারণে লজ্জাও হয়েছিল একটু। এখানে যেদিন আসবে—দাদার বৌভাতের দিন—হঠাৎ নিজে হাতে ওকে সাজাতে বসলেন রতনদি। এরকম কখনও করেন নি। পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে তার আগেই অবশ্য কিন্তু তখন অতটা বুঝতে পারেনি। কিছুদিন ধরেই পাগলের মতো ওর জন্যে জামার ওপর জামা করাতে দিচ্ছিলেন, ধুতির ওপর ধুতি কিনছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনেই। আদ্দি আর রোঁয়া রেশমের পাঞ্জাবি—দেশী ফরাসডাঙগার দামী মিহি ধুতি। সেই সঙ্গে মুসলমান দর্জি ডেকে চুড়িদার পাজামা-আচকান।

অবাক হয়ে যেত কান্তি, কিছুই বুঝতে পারত না রতনদির মতিগতি। প্রতিবাদ করতে যেত প্রথম প্রথম, ব্যাকুলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করত, 'এ কী করছেন রতনদি, মিছিমিছি কত খরচ করছেন বলুন তো—শুধু শুধু। আমার তো এক গাদা জামা কাপড় রয়েছে। একেই তো কত খরচ করাচ্ছি আপনার, তার ওপর অকারণে এ সব করছেন কেন?'

রতনদি কিন্তু উড়িয়ে দিতেন কথাটা। কখনও ধমক দিতেন, 'আচ্ছা আচ্ছা—হয়েছে, যাও, তোমাকে আর অত পাকা-পাকা কথা বলতে হবে না।' কখনও-বা ওর কাঁধে হাত রেখে ওর মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলতেন, 'কী হবে আমার এত পয়সা রে? কার জন্যে রেখে যাব? তোকে সাজিয়ে যদি আমার সুখ হয়, করলুমই নয় দুটো পয়সা খরচ। তোর কি?' আবার এক একদিন বলছেন, 'সুন্দর চেহারাতেই তো সুন্দর পোশাকের দাম। এই তো তার সার্থকতা। আমাদের আর কি—দেখেই তৃপ্তি।'

ও'র মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পারত না কান্তি, আরও কুণ্ঠিত, আরও অপ্রতিভ হয়ে পড়ত।

সে যে এত সুন্দর দেখতে তাও তো আগে সে জানত না। রতনদির মুখে বারবার শুনেই সচেতন হয়েছিল সে। ইদানীং আয়নায় নিজেকে দেখে ভাববার চেষ্টা করত সত্যিই সে সুন্দর কিনা। আবার ভাবত রতনদিটা পাগল। সুন্দর সুন্দর করে এত মাথা ঘামাবার কী আছে। রতনদিও তো কী সুন্দর দেখতে। নিজেকে সাজালেই তো পারে, আর সাজাচ্ছেও তো—তবে আর কি।
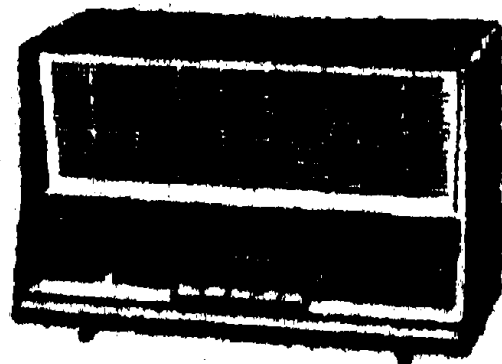
আগে কুণ্ঠিত হ'ত সে শুধু খরচের কথাটা ভেবেই। কিন্তু ঐদিন—দাদার বৌভাতের দিন থেকে লজ্জার ও সংকোচের আরও একটা কারণ দেখা দিল। কেন লজ্জা তা বলা মুস্কিল ছিল সেদিন—আর সেই জন্যেই কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। প্রথমত বিয়ের দিন তো যেতেই দিলেন না রতনদি, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে—দাদার বিয়েতে একদিন বরযাত্রী গেলে এমন কি ক্ষতি হ'তে পারে তা তার মাথাতে যায়নি সেদিন, মনে মনে একটু ক্ষুণ্নই হয়েছিল। বৌভাতের দিন সকালেই যাবার কথা, কী খেয়াল গেল রতনদির, তাঁর সেই অত শখের দেড় ঘণ্টা ধরে চান তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে এলেন ওকে সাজাতে। নিজে হাতে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে ওর চিবুকটি ধরে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'সত্যি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে কান্তি, যেন সত্যিকারের রাজপুত্তুর!'

আর তারপরই দুহাতে ওর মুখটি ধরে কাছে এনে একটি চুমো খেয়ে বলেছিলেন, 'যাও, সাবধানে যেও। সকাল করে চলে এসো। দারোয়ান যাচ্ছে সংগে, আমার হয়ে ও-ই নৌকতা করবে।'

লজ্জার পরিসীমা ছিল না সেদিন, কিন্তু তবু সে নিতান্তই নির্দোষ গ্লানিহীন লজ্জা। অনেকটা সুখের ও আত্মপ্রসাদেরও বটে। রতনদির মাথাটা খারাপ এই কথাই বারবার বোঝাতে চেয়েছিল সে নিজেকে। সেই সংগে একথাটাও মনে উঁকি মেরেছিল যে সে সুন্দর দেখতে—আর রতনদি সত্যি-সত্যিই ছোট ভায়ের মতো দেখেন ওকে।

তবু—মনের মধ্যে অস্বস্তিও একটা কোথায় ছিল।

কেমন একটু ভয়-ভয়ও করেছিল যেন সেদিন। নাম-না-জানা ভয়। মনে হয়েছিল এতটা ভাল নয়, এতটা সইবে না। হয়ত সকলের চোখ টাটাবে, রতনদির বাবাও বিরক্ত হবেন হয়ত—ওর জন্য এত খরচ করছে জানতে পারলে।

কিন্তু রতনদির যেন সব ভয়ডর হঠাৎ ঘুচে গেল। সমস্ত হিসেবের বাঁধ গেল ভেংগে। সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, এর পর থেকে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। প্রত্যহই ওকে নিজে হাতে সাজাতে যেতেন—ভাল ভাল দামী দামী পোশাক। নিতান্ত কান্তি খুব বিদ্রোহ করত বলে—ইস্কুলের সময়টা পাগলামি একটু বন্ধ রাখতেন। রতনদিদের পুরনো ঝি মোক্ষদাও ওর পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাই আরও সংযত হয়েছিলেন খানিকটা। মোক্ষদা বলেছিল, 'সত্যিই তো বাপু, তুমি যেন পাগল হয়েছ তাই বলে ও তো আর হয়নি যে অমনি লবকার্তিক সেজে ইস্কুল পাঠশালে যাবে। অপর ছেলেরা ক্ষেপিয়ে শেষ করবে যে জামাইবাবু বলে!'

কিন্তু ইস্কুল থেকে এলে আর রক্ষে নেই। ইস্কুলের জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়েই ভাল ভাল জামা কাপড় পরতে হবে, সেজেগুজে রতনদির কাছে বসতে হবে খানিকটা। এ সময়টা তাঁরও প্রসাধনের সময়, কান্তিকে সাজিয়ে বসিয়ে রেখে নিজে সাজতেন—তারপর কোনদিন বলতেন, 'চল ছাদে বেড়াতে যাই।' ছাদে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে কিংবা কাঁধে হাত দিয়ে পায়চারি করতেন। কোনদিন বা শুধুই মুখোমুখি বসে গল্প করতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে বেড়াতে যাওয়া বা খেলাধুলোর পাট ছিল না কান্তির—পাড়াটা খারাপ বলে বিকেলের দিকে বেরোতে নিষেধ করতেন এ'রা, তাছাড়া তার নিজেরও ভাল লাগত না। ইস্কুলের ছেলেরা আগে আগে তার ঐ পাড়ায় থাকা নিয়ে নানারকম বাঁকা মন্তব্য করত, ওর সম্বন্ধে একটা হীন ধারণাও করে নিয়েছিল, সেটার পুরো কারণটা না বুঝলেও ঐ পাড়ায় বাস করা যে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে শোভন নয় এটা বুঝেছিল। তাই যেটুকু না বেরোলে নয় সেইটুকুই শুধু বেরোত। আর পড়বার সময় তো নয়ই মাস্টার মশাইরাও বলতেন, 'All work and no play makes Jack a dull boy'—রতনদিও বলতেন, 'ইস্কুল থেকে এসেই আবার বই নিয়ে বসতে নেই, ওতে পড়াশুনো এগোয় না। মাথাকে বিশ্রাম দিতে হয় একটু।'

কিন্তু সন্ধ্যে হ'লে যখন পড়াশুনোয়

......যেন সত্যিকারের রাজপুত্তুর......

সময় হ'ত তখনও রতনদি ওকে ছাড়তে চাইতেন না। সংগে সংগে তেতালায় ওর পড়ার ঘরে এসে বলতেন, 'তুমি পড়, আমি তোমার সংগে গল্প করব না, শুধু চুপ ক'রে বসে থাকব!'

ওর ওপরের ঘরেরও ভোল্ পাল্টে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সে মেঝেতে পাতা তোষকের বিছানা আর নেই (যদিচ সেই শয্যাতে শুয়েই কান্তির প্রথম মনে হয়েছিল সুখস্বর্গ!), সে জায়গায় এক-জনের মতো বোম্বাই খাট এসেছে, গদি তোশক ঝালর-দেওয়া বালিশে সাজানো হয়েছে বিছানা। পড়বার জন্যে একটা ছোট টেবিল চেয়ারও আনিয়ে দিয়েছেন রতনদি।

কান্তি গিয়ে চেয়ার টেবিলে বই-খাতা নিয়ে বসলে রতনদি ওর পাশে বিছানার ওপর বসতেন। রতনদির বর নটার আগে আসেন না কোনদিনই। আগে আগে এ সময়টা রতনদি বই পড়তেন শুয়ে শুয়ে—এখন আর বই ছোঁন না। ওর বর রাশী-কৃত বাংলা বই কিনে পাঠিয়ে দেন, সে সব গাদামারা পড়ে থাকে। এখন ও'র এই নতুন নেশায় পেয়ে বসেছে—হাঁ করে কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা।

চুপ ক'রে বসে থাকব বললেই কিছু আর চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না। রতনদিও বসতে পারতেন না। দু'চার মিনিট পরেই উশখুশ ক'রে উঠতেন, এ কথা সেকথা পাড়তেন। কান্তিরও অস্বস্তি লাগত, একটা মানুষ দু'হাতের মধ্যে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে—এ অবস্থায় বই-খাতায় ডুবে থাকে কী ক'রে? ওর মাস্টার আসতেন সকালে, এক এক সময় কান্তির মনে হ'ত, মাস্টারমশাই যদি পড়াবার সময়টা বদলে দেন তো ভাল হয়। কিন্তু পাড়া খারাপ বলেই বোধ হয়—সন্ধ্যার দিকে তিনি আসতে চাইতেন না।

প্রথম প্রথম পড়ার ব্যাঘাত হ'ত বলে এ ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগত না কান্তির—নটা বাজলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কারণ নটা বাজলেই ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক রতনদিকে নেমে যেতে হ'ত নিচে। জামাইবাবুর আসবার সময় হ'ত। কিছুদিন পর থেকে আর তত খারাপ লাগত না। তারপর এক সময় কান্তি আবিষ্কার করলে যে তারও ভালই লাগে এই গল্প করাটা; ক্রমশ এমনও হ'ল যে, রতনদি নিচে চলে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন বসাতে পারত না পড়ায়। কেবলই মনের মধ্যে ঘুরেফিরে কিছুক্ষণ আগেকার কথাগুলোরই রোমন্থন চলতে থাকত। মনে হ'ত বেশ মানুষ রতনদি। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি জমিয়ে গল্প করতে পারেন। যার ভাল হয় তার সব ভাল হয়। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি স্বভাবটাও সুন্দর। সত্যি দেখতেও কেমন চমৎকার, যখন সেজেগুজে বসেন তখন যেন মনে হয় পটে-আঁকা কোন ঠাকুর-দেবতার ছবি।...তারপর সময়ের হিসাবটাও যেতে লাগল গুলিয়ে, কোথা দিয়ে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরে নটার ঘরে আসত তা দুজনের কেউই টের পেত না। অসহিষ্ণু মোক্ষদা গলির মোড়ে 'দাদাবাবু'র গাড়ির আওয়াজ পেয়ে যখন ওপরে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠত—তখন খেয়াল হ'ত ওদের। 'কী গো তোমাদের আর কথার ঝুলি শেষ হবে না—না কি? ওদিকে মানুষটা এসে দেখতে না পেলে যে রুগ্নিরক্ত পাতালরক্ত করবে তার ঠিক আছে? গাড়ি এসে ভ্যাক্ ভ্যাক্ করতেছে তাও কি কানে শুনতে পাও না? একেবারে উন্মত্ত হয়ে বসে গল্প করা যে দেখতে পাই—জ্ঞানগম্যি থাকে না একটু? এখনি তো ওপরে উঠে আসবে—ত্যাখন আমি কি জবাব দেব মানুষটাকে!' চমকে উঠত রতনদি, 'ওমা নটা বেজে গেছে নাকি রে? কখন বাজল? টের পাইনি তো?

'তা টের পাবে কেন? নটা কি আজ বেজেছে—কুড়ি পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে দ্যাখো গে যাও! বলি তোমার না হয় পয়সার অভাব নেই, ঐ গরীবের ছেলেটার মাথা খাচ্ছ কেন বর্লাদিক অমন কড়মড়িয়ে চিবিয়ে? নেকাপড়া তো ওর শিকেয় উঠল দেখতে পাই। একটা পাসও কি করতে দেবে না?'

'তুই থাম মুকী। তোর বড্ড আসপদ্দা বেড়েছে।' এই বলে কান্তিরই ছোট আয়নাটায় মুখখানা দেখে নিয়ে আলতো হাতে চুলটা একটু ঠিক করে দ্রুত নেমে যেতেন রতনদি।

মোক্ষদার এই তিরস্কারের দিন-গুলোতে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ত কান্তি, অনুতপ্ত হ'ত একটু। জোর করে পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করত। কিন্তু মন আবার কখন বইখাতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন শুরু করত তা নিজেই টের পেত না। সত্যি কোথা দিয়ে নটা বেজে গেল—আশ্চর্য তো! এই তো মনে হচ্ছে একটু আগেই ছাদ থেকে ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা!...না, কাল থেকে একটু হুঁস রাখতে হবে। রতনদিকে শাসনও করতে হবে একটু। রোজ রোজ মজার গল্প ফেঁদে ওর পড়া নষ্ট করা! আর কী বাজে কথাই বলতে পারে রতনদি, এত কথা পায় কোথা থেকে। তবে ঐ যে বইয়ের গল্পগুলো বলে—ওগুলো কিন্তু বেশ। বঙ্কিমবাবুর বইগুলো এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে পড়বে সে। রতনদির কিন্তু মনেও থাকে খুব—এক একসময় তো মুখস্থ বলে যায়। লেখাপড়া করলে ভাল হ'ত।

এমনি ক'রে কখন আবার ডুবে যায় সে রতনদিরই চিন্তায় তা বুঝতেও পারে না। টেবিলের ওপর আলোটা জ্বলতে থাকে, বইখাতা মেলাও থাকে সামনে—ওর মুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ পূর্বে বসে থাকা রতনদির শূন্য জায়গাটায় স্থির নিবদ্ধ ক'রে বসে কত কী ভাবতে থাকে।
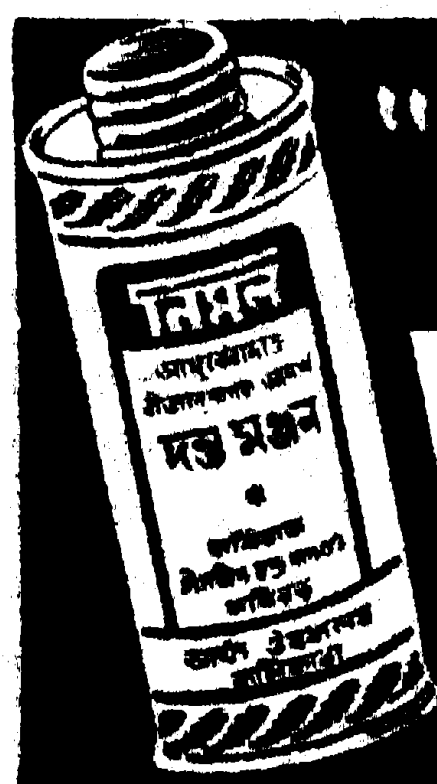
(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

আপনার প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন পাঠক, পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমার কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি, আশা করি প্রশ্নগুলির জবাব পাঠকবৃন্দ মধ্যে থেকেই 'অমৃত' মারফৎ জানতে পারবো।

(ক) হালিসহর, নৈহাটি, টিটাগড় ও দমদম—এই বিশেষ স্থানগুলি কোন্ দেশীয় শব্দ হ'তে প্রাপ্ত?

(খ) 'রেডক্রশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? —এবং কবে ইহা চালু হয়?

(গ) 'নূতন কাশী'—সে কি নবদ্বীপ না দক্ষিণেশ্বর?

ভবদীয়
কুমুদবিহারী আচার্য
৩৮২বি আনন্দমঠ
ইছাপুর, নবাবগঞ্জ
২৪ পরগণা।

(উত্তর)

অমৃত সম্পাদক,

আপনার বিখ্যাত 'অমৃত' পত্রিকায় ১৯শে অকটোবরের সদ্য-প্রকাশিত সংখ্যার 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসত্যজিৎ চক্রবর্তী লিখিত 'দুই' (খ)-এর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম কবিতা 'পুরস্কার' 'সোনার তরী' বইতে প্রকাশিত। কবি উহা রচনা করেছিলেন শাহাজাদপুরে ১৩০০ সালের ১৩ই শ্রাবণে।

—অরুণ বসু, বারাসত, ২৪ পরগণা।

অমৃত সম্পাদক,

আপনার ২৮-৯-৬২ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রশ্ন ছিল 'O K' কথার অর্থ কি? গত যুদ্ধের সময় বহু আমেরিকান সৈন্য এদেশে আসিয়াছিল এবং সেই হইতেই এই 'O K' কথাটি এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। আমি আমার একজন আমেরিকান বন্ধুকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে যাহা বলিলেন তাহাই নিম্নে লিখিতেছি ঃ—

জনৈক জার্মাণ আমেরিকা যাইয়া ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না। তিনি রোজ সকালে অফিসে আসিয়া প্রথমেই হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেন। হিসাব ঠিক থাকিলে খাতার নিচে লিখিতেন 'Orr Koret' (অর্থাৎ all correct)। ইহার পরে তিনি সম্পূর্ণ কথাটি না লিখিয়া সংক্ষেপে 'O K' লিখিতেন—অর্থাৎ all correct। ইহার কাছাকাছি বাংলায় বলা যাইতে পারে 'ঠিক আছে' অথবা হিন্দীতে 'ঠিক হ্যায়।'

—অবনীনাথ মিত্র, কলিকাতা—৯।

জানাতে পারেন

সম্পাদক অমৃত,

বিগত ৩১শে আগষ্ট তারিখে 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ—

(খ) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী Empire State Building, New york। উচ্চতা ১৪৪৯ ফুট। আর ভারত তথা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী হইল কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন মহাকরণ (New Secretariat)—১৩ তলা বাড়ী।

(গ) এই প্রশ্নেরও কোন সর্বজন-স্বীকৃত বা বহুজন-স্বীকৃত উত্তর নাই বা হইতে পারে না। যে যে লোক প্রশ্নকর্তার উল্লিখিত সব কয়টি পৃথিবীখ্যাত শহরই দেখিয়াছেন, তহারা কেবল তাঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ীই স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন মাত্র। সৌন্দর্যের কোন একটি বিশেষ মাপকাঠি নাই। কেহ কেহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী জোর দেন, কেহ কেহ বাড়ী-ঘরের সামঞ্জস্যর উপর, কেহ কেহ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর, আবার বিরাটত্বের দিকে যাঁহাদের নজর, তাঁহাদের কেবল বড় বড় দালান-কোঠা এবং নগরের বিস্তৃতি বা আয়তনের দিকেই লক্ষ্য একটু বেশী থাকা স্বাভাবিক। তবে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে সৌন্দর্যের দিক হইতে প্যারিস আজও সবচেয়ে সেরা শহর বলিয়া খ্যাত। তারপরেই সম্ভবতঃ নাম-করা যায় টোকিও, নিউ-ইয়র্ক, মস্কো, লন্ডন, ওয়াশিংটন, পিকিং, নিউদিল্লী, বোম্বাই, মেলবোর্ণ ইত্যাদি নগরের। বার্লিন ও কলিকাতার নাম সর্বশেষে আসিতে বাধ্য। বার্লিন দ্বিধাবিভক্ত, এবং যুদ্ধোত্তরকালীন মেরামতি এবং পুনর্গঠন সত্ত্বেও বহুস্থলে বিধ্বস্ত। আর সব কিছু বজায় থাকিতেও নোংরা রাস্তাঘাট এবং ততোধিক কুৎসিত দর্শন অসংখ্য বস্তির জন্য কলিকাতা সর্বনিম্ন স্থান পাইবার অধিকারী। —অমিয়কুমার চক্রবর্তী।

কলিকাতা—৯

।। ভ্রম সংশোধন ।।

মহাশয়,

বিগত ২রা নভেম্বর তারিখের 'অমৃত'-র জানাতে পারেন বিভাগে প্রকাশিত আমার দুইটি উত্তরেই ছাপার একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে উত্তরগুলি অংশত অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। ভুলগুলি এইভাবে সংশোধিত হইবেঃ—

৩২ পৃঃ মধ্য কলমের যে লাইনে সংবন্ধ, সংবন্ধী, সংবৃন্ধ ও সংবল শব্দগুলি লম্বালম্বি সাজান আছে তাহার ঠিক উপরে একটি * (তারকা-চিহ্ন) বসিবে। ইহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরবর্তী লাইনের ঠিক বামদিকে আর একটি * (তারকাচিহ্ন) বসিবে যেখানে "এই লাইনের বানানগুলি ব্যাকরণগত শুদ্ধ হইলেও" ইত্যাদি কথাগুলি আছে।

ঐ ৩২ পৃঃ প্রথম কলম—৩নং প্রশ্নের উত্তর—১৮শ লাইনের শেষভাগে "তবে" কথাটি হইবে না, আর ২৬শ লাইনে "আরোপিত" কথাটির ঠিক পরেই "রূপ" কথাটি বসিবে।

নিবেদক
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী।

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। এতে অনেক অজানা জিনিষ জানার সুযোগ পাওয়া যায়। তাই এই প্রশ্নটির অবতারণা করছি। প্রতি বছর পূজার প্রাক্কালে অসংখ্য পূজা সংখ্যায় কলকাতার বাজার পরিপূর্ণ হয়। এই সব পত্র-পত্রিকার উপর 'শারদীয় সংখ্যা' বলে লেখা থাকে। এবং কিছু সংখ্যক পুস্তকের উপর লেখা থাকে 'শারদীয়া' সংখ্যা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'শারদীয়' এবং 'শারদীয়ার' মধ্যে প্রভেদ কি? সাধারণতঃ শারদীয় কথাটির অর্থ আমরা জানি শরৎকালীন। স্ত্রী অর্থে অবশ্য শারদীয়া হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই শরৎ ঋতুটি পুরুষরূপী না স্ত্রী রূপিণী? যদি পুরুষরূপী হয় তা হলে প্রত্যেক পত্রিকার উপরেই শারদীয় হওয়া প্রয়োজন। আর যদি স্ত্রীরূপিণী হয় তা হলে প্রত্যেক পুস্তকেই 'শারদীয়া' হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি? ইতি—

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী,
৬১, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৫

সেকালের আমোদ উৎসব

বেলা দে

প্রাচীনকালে নানাপ্রকারের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলাদেশ জর্জরিত ছিল। উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণে বাংলা দেশে প্রায়ই নতুন নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হোত। এছাড়া একাধিকবার অন্তর্বিপ্লবের ঝড়ও এ দেশের উপর দিয়ে বহে গিয়েছিল। কিন্তু এইসব রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে দারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও বাঙ্গালী সুখে ও আনন্দে দিন কাটাবার চেষ্টা করেছে। সুজলা সুফলা এই বাংলা মায়ের করুণায় তাঁদের কোনদিনই অন্নাভাব ঘটেনি। বৎসর ভরে বাংলার প্রতি গৃহে শস্যাদি পরিপূর্ণ থাকত। তাই বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠান করে বাঙ্গালী গৃহস্থের সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভবপর হোত। পূজাপার্বণাদি অবলম্বন করে সারা বছর ধরে নানারকম উৎসবের আয়োজন করা হোত।

ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবের মধ্যে শারদোৎসব, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, রথযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনে হয় প্রত্যেক পূজায় একটি বিভিন্ন যুগের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। এগুলি যদিও বাংলাদেশে আজো বর্তমান।

কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় তখনকার দৈনন্দিন জীবনে নানারকম উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। যেমন—বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে যব-চতুর্থী উৎসব সম্পাদিত হোত। এই অনুষ্ঠানে একে অন্যের দেহে সুগন্ধি ছাতু নিক্ষেপ করতো। বর্ষার প্রারম্ভে বৃক্ষাদিতে নবকিশলয় উদ্গত হলে নবপত্রিকা উৎসব সম্পন্ন হোত। এখন যেমন বন-মহোৎসব পালন করা হয়। শ্রাবণের শুক্লা চতুর্থীতে অশোক-চতুর্থী উৎসব করার নিয়ম ছিল। এই সময় গৃহ-দেবতাকে দোলায় বসিয়ে ঝুলানো হোত। বর্তমানের ঝুলন-পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব হয়ে থাকে। ভাদ্রমাসে ইক্ষু বা আক্ পাকতে থাকলে ইক্ষুভঞ্জিকা উৎসব করার রীতি ছিল।

বাস্তবিক বাংলা দেশে যেমন উৎসবের ছড়াছড়ি তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত উৎসব! বিচিত্র আনন্দের কি অপূর্ব আয়োজন! বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির মধ্যে যখন বিচিত্র পরিবর্তন দেখা যায়, বাঙ্গালীও তখন ততোধিক বিচিত্র উৎসবের ডালি সাজিয়ে প্রকৃতিরাণীর কাছে নিজের সানন্দ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। সকল ঋতুতেই বাঙ্গালী তার হৃদয়ের আনন্দরাশি পুরোভাগে রেখে জীবনের মাধুর্য সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করে।

বাঙ্গালী বহুদিন থেকে দুর্গোৎসব করে আসছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দুর্গাপূজার সময় বরেন্দ্রীর অধিবাসীরা নানারকমের উৎসব করতো। এর মধ্যে শবরোৎসব সম্বন্ধে কালবিবেক গ্রন্থে কিছু উল্লেখ আছে। এই উৎসবটি বিজয়া দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হোত। যারা এই উৎসবে শবরের অভিনয় করতো তারা সমস্ত দেহে মাটি মেখে আর গাছপালা দিয়ে নিজেকে সাজাত। শবর একটি অসভ্য জাতিবিশেষ। এরা বাংলার বনে-জঙ্গলে বাস করতো। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে বৃক্ষপত্রে সজ্জিত শবরদের প্রতিকৃতি খোদিত পাওয়া যায়। আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী পূর্ণিমা উৎসব হোত। এর অপর নাম দ্যুত-পূর্ণিমা। বর্তমান সময়ে এই রাত্রিতে বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়। প্রাচীন বাংলার এই উৎসবে সমস্ত রাত্রি দ্যূতক্রীড়া ও দোলক্রীড়া করে কাটাতে হোত। দ্যূতক্রীড়া করলে শ্রীবৃদ্ধি হয় বলে সকলের বিশ্বাস।

এই সময়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিপিটক বা চিঁড়া খাওয়ার রীতি ছিল। যদিও বর্তমান বাংলায় উৎসবেও এই অনুষ্ঠানের কিছু কিছু দেখা যায়। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় তিথিতে যক্ষরাত্রি উৎসব হোত। এর অপর নাম সুখরাত্রি। বর্তমানে একে দীপাবলী উৎসব বলা হয়। বাংলাদেশে এই তিথিতে কালীপূজা হয়। দীপালী উৎসব বলা হয়। দীপালী উৎসব পূর্বের মত বর্তমানকালেও সমগ্র ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বসন্ত উৎসব হোত। এই উৎসবে নাচ-গানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হোত। এই তিথিতে বাংলাদেশে সরস্বতী পূজা হয়। এটি বিদ্যার্থীদের বিশেষ প্রিয়। এই সময় আর একটি উৎসব ছিল অভ্যূষ খাদিকা। এই উৎসবে মটরশুঁটি, ছোলা প্রভৃতি আগুনে পুড়িয়ে বন-ভোজনে খাওয়া হোত। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় কোন কোন জায়গায় এখনো এই উৎসব পালন করা হয়। বসন্ত সমাগমে শ্যামলী বৃক্ষাদি ফলে ফুলে ভরে উঠলে শ্যামলী উৎসবের অনুষ্ঠান হোত। বালক বা যুবকেরা শ্যামলী পুষ্পে সজ্জিত হয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করত। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলক বা হোলি উৎসব করা হোত। এটি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই প্রিয় ছিল। ছোট ছোট কাগজের ঠুলির মধ্যে আবির ভরে মুখটা বন্ধ করে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে মারত। আমরা যাকে কুমকুম্ বলে দোলের সময়ে খেলে থাকি।

বসন্তকালে আর একটি উৎসব হোত, সহকার ভঞ্জিকা। এর আর একটি নাম আম্রভঞ্জিকা। উৎসবকারিরা আম্র-পল্লব কর্ণভূষণরূপে পরিধান করত এবং সবুজ ও অপক্ক আম্রফল গাছ থেকে তুলে এনে খাওয়া হোত। চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে অশোকোত্তংশিকা উৎসব হোত। এই উৎসবে যুবক-যুবতীরা অশোক ফুলের মুকুট তৈরী করে মাথায় পরতো। এছাড়া চৈত্র মাসে গাজন উৎসব বেশ জাঁকজমক সহকারেই পালন করা হোত।

সেকালে এই বারো মাসের তেরো পার্বণ ছাড়াও নিজেদের মধ্যে নানারকম খেলাধুলোরও ব্যবস্থা ছিল। যেমন সতরঞ্চ, দাবা, দশপদ, অক্ষরিকা, প্রভৃতি খেলা। এছাড়া ছেলেমেয়েরা গৃহ-প্রাঙ্গণে ও মাঠে অনেক রকমের খেলা খেলত। এতে বেশ শারীরিক পরিশ্রমও হোত। ঘটিকা খেলা বর্তমানের ডাণ্ডাগুলির অনুরূপ। আরো একটি খেলা ছিল লবণ বীথিকা খেলা। বর্তমানে একে নুনচুরি খেলা বলা হয়। অনিল তাড়িতিকা খেলার সময় বালিকারা দু'হাত প্রসারিত করে ক্রমাগত ঘুরতে থাকত। বর্তমানে এই খেলার সময় মেয়েদের বলতে শুনা যায়, 'আনি নানি জানি না পরের ছেলে মানি না।' মেয়েরা সব জলক্রীড়াও করতে ভালবাসত। বাংলা দেশে নৃত্যকলারও এক সময় বিশেষ চর্চা ছিল। দেবদাসীদের নৃত্যভঙ্গী দেখে কত রাজারা পর্যন্ত মুগ্ধ হোতেন।

প্রাচীন পুস্তকাদিতে বাঙ্গালীর যে চিত্র আমরা পাই তাতে মনে হয় যে, বাংলা দেশে মোটামুটিভাবে আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা ছিল এবং সবাই আনন্দেই দিন কাটাত।

সংবাদ বিচিত্রা

হামবুর্গে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র

ছয় বৎসর ধরে নির্মাণকার্য শেষ হবার পর ১৯৬৩ সালের হেমন্তে হামবুর্গ বাহ্‌রেনফেল্ডে জার্মান ইলেকট্রোনিক সিন্‌ক্রোটোন যন্ত্রটির কাজ চালু হবে। নানা ধরণের গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীরা এই নতুন গবেষণা ব্যবস্থার সুখ-সুবিধা পাবেন। এই "গতিবেগের সুবিধার" ফলে উচ্চ-শক্তি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে ঃ—

উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রন তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে পরমাণু কেন্দ্রের গঠন লক্ষ্য করা যাবে। অণুপ্রাতিক্ষুদ্র আয়তনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে এই বেগবর্ধক যন্ত্রটি অনুবীক্ষণের কাজ করে যেহেতু উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রনগুলির তরংগ-দৈর্ঘ্য ইলেকট্রোনিক অনুবীক্ষণের তরংগ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রায় একলক্ষ গুণ ছোট।

উচ্চ-শক্তি ইলেকট্রন অথবা গামা-রশ্মির সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিতে যা প্রায় অসাধারণ, সেই অস্থায়ী মৌলিক পদার্থগুলি প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন করা যায়, যাতে সেগুলির গুণাবলী ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই গবেষণার ফলে পারমাণবিক শক্তির নিজস্ব প্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই জনসাধারণ ও জটিল গবেষণা ব্যবস্থার নিয়মকানুন স্থিরীকৃত করার জন্য জার্মানীর প্রখ্যাত ৩৬ জন পদার্থবিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পরিষদ গঠিত হবে। সমগ্র গবেষণা ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ হবে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রদত্ত একটি অর্থ ভাণ্ডার থেকে।

॥ পরমাণু শক্তিচালিত পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ॥

পরমাণু শক্তিচালিত পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন রাজ্যের অন্তর্গত হ্যানফোর্ড শহরে প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হয়েছে। এই সম্পর্কে আইনগত প্রয়োজনীয় অনুমোদনপত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডি স্বাক্ষর দান করেছেন। পরমাণু শক্তিকে শান্তির অনুকূলেই এই কারখানায় ব্যবহার করা হবে। প্রায় এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পরমাণু শক্তির সাহায্যে এখানে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে কোনও কারখানা অপেক্ষা এই কারখানাটি চারগুণ বড় হবে।

॥ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষুদ্রতম যন্ত্র ॥

পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম সমেত একটি যন্ত্রকে বিমানের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশন জানিয়েছেন। এই ধরণের যন্ত্র মধ্যে পৃথিবীতে এটিই ক্ষুদ্রতম। যে পরমাণু চুল্লীটি এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার ওজন ১৫ টন। যে টার্বো জেনারেটর ইউনিট এই চুল্লীটির সংগে যুক্ত রয়েছে তারও ওজন ১৫ টন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ৩০০ হতে ৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ভবিষ্যতে সামরিক হাসপাতাল, বিমান বাহিনীর রাডার স্টেশন, আপৎকালীন রেডক্রস স্টেশন এবং সুদূর মফঃস্বল এলাকার বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির কাজেও এই যন্ত্রকে ব্যবহার করা যাবে।

॥ পৃথিবীর বৃহত্তম স্টীম টার্বাইন ॥

উক্রাইনের খার্কফ-এর বিশেষজ্ঞরা ৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তির যে সিঙ্গল শিফট স্টীম টার্বাইনের ডিজাইন করেছেন, এই জাতীয় টার্বাইনের ক্ষেত্রে তা হবে পৃথিবীতে বৃহত্তম। এই টার্বাইনের দ্বারা উৎপন্ন বিজলির বার্ষিক পরিমাণ হবে সাড়ে তিনশত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা।

॥ অতিকায় টোমাটো ॥

উজবেকিস্তানের তাশখন্দ অঞ্চলের শাকসব্জির উৎপাদক যৌথ খামারগুলিতে অতিকায় টোমাটো উৎপন্ন হচ্ছে। এই টোমাটোগুলির এক একটির ওজন ১২০০ গ্রাম। হেক্টার পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ টন। এই নতুন জাতের টোমাটোর চমৎকার স্বাদ। উজবেক বিজ্ঞানী করিম ইউসুফের কয়েক বছরের নিরলস গবেষণার ফলে টোমাটোর ক্ষেত্রে এই নতুন জাতের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

॥ বিরাটকায় টায়ার ॥

ভরোনেঝ টায়ার ফ্যাক্টরিতে ২·৫৫ মিটার ব্যাসের টায়ার তৈরি হচ্ছে। ৪০ টন হতে ৬০ টন পর্যন্ত ওজনের মাল বহন করার শক্তিশালী ট্রাকগুলির জন্যই এই টায়ারের জন্ম। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে এই নতুন টায়ারের কল্যাণে ট্রাকের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং অনুরূপ বিদেশী টায়ারের অপেক্ষা তিনগুণ বেশী টেকসই হবে।

॥ একাধারে নিশ্চল ও সচল ক্যামেরা ॥

সোভিয়েত দেশের নতুন নিশ্চল-সচল ক্যামেরার নাম দেওয়া হয়েছে 'জানাস'। প্রাচীন রোমানদের দু-মুখো দেবতার নামে এই নামকরণ। এই ক্যামেরা একাধারে ২৪×৩০ মিলিমিটারের সাধারণ স্টিল ফিল্ম ক্যামেরা ও ৮ মিলিমিটার ফিল্মের উপযোগী একটি সাইন্ ক্যামেরার সমন্বয়। সাইন ক্যামেরার ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক মোটরটি চালিত হয় ড্রাই ব্যাটারির দ্বারা।

দশ দিন আগে সমস্ত জমিটা ছিল ফাঁকা। একদিন ঠিক হল বাড়ী উঠবে। রেডিমেড ফ্ল্যাটগুলো নিয়ে আসা হল। দৈত্যসদৃশ বিরাট ক্রেন দিয়ে সাজান হল তাদের। তৈরী হল বিরাটাকার এই বাড়ীটা। নভয় চেরিওমোসকির ১০নং ব্লকটির মত আরও অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং হবে।

অনেক অনেক দিন তোমার সাথে দেখা নেই, পত্রালাপ নেই। আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, যার উত্তর পাওয়া আমার কাছে জীবন পাওয়ার মতই মূল্যবান। যদি বলি বোঝা-পড়ার অভাবে এটা ঘটেছিল, বিশ্বাস করবে না। যদি বলি দুর্ঘটনা, বিশ্বাস করবে না। আর সত্যি কথা কি জানো, আমিই আজও সবটা বিশ্বাস করতে পারছি না, পারি না!

আচমকাই ঝিম মেরে গিয়েছিল দত্তবাড়ী। ছটফট করে পালিয়ে গিয়েছিল সব হাসি গান হুল্লোড়।

তোড়া দেব সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে ঝাউতলার বড় টিলাটার কাছে কোনদিন এসে মুখ তুলে দাঁড়াল না।

নমিতা নাগ কাঁধের আঁচল কোমরে জড়িয়ে ব্যাডমিন্টন মাঠে র‍্যাকেট নিয়ে নাচতে এল না।

নিউ মার্কেটের আলো ঝলমল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চড়ুই পাখীর মত চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক চাইল না ভায়োলেট ডোক্কেরার।

তুমি শিল্পী। মানুষের সাদামাটা জীবনকে কল্পনার রঙে ডুবিয়ে অপরূপ

শেষ বন্দর

জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী

করে তোল; শতেক জন তাই পড়ে মুগ্ধ হয়। অভিভূত হয়। আমার কাহিনীতে বৈচিত্র্য নেই কিছু, প্রায় সবারই জীবনে এমন ঘটনা হর হামেশা ঘটে, ঘটে যায়। তোমাকে লিখলাম, কথার পর কথা গেঁথে তুমি মালাটি নিখুঁত করে তুলবে এ ধারণা আমার আছে।

কে সে তোড়া দেব, যার চোখে সূর্যের তৃষা!

কে সে নমিতা নাগ, অঙ্গে যার নাচন কাঁপন!

ভায়োলেট ডোফেরারই বা কে, যার সদা চঞ্চল চোখে অস্থির আবেদন।

কেউ নয়, ওরা সব এক। ওরা নারী, বিচিত্র রহস্যের সার্থক অধিকারিণী। তাই ঝাউতলার টিলায় অস্ত-আকাশের সূর্য বৃথাই চোখ বুলিয়ে গেল সেদিন, ব্যাডমিন্টন মাঠে কুয়াশার ছায়া আগেই কেঁদে পড়ল, নিউ মার্কেটের আলো ব্যর্থ হাহাকারে ফুঁপিয়ে উঠল।

গলি ঘিঞ্জির বুক চিরে শহরের প্রান্তে যে পথটি হঠাৎ ডানদিকে মোড় খেয়ে নিবিড় শান্তিতে এলিয়ে পড়েছে তারই মুখটিতে দত্তবাড়ীর লোহার গেট। পথের সাথে সাথে তাদেরই ক্যাডিলাক অস্টিন এদিক পানে মোড় নেয় দত্তবাড়ীতে যাদের মানুষ আছে, মনের-মানুষ আছে। ছিমছাম ঝিমঝাম বাড়ী। ডালিয়া কসমসের লীলা দেখে দেখে সকাল দুপুর সন্ধ্যার আলো বাতাস আর মায়া মিটমিটে হাসিতে ভরে ওঠে।

সাগর-নীল কারের দরজা খুলে মাটিতে পা রাখতে রাখতে নমিতা নাগ বলে, হ্যাল্লো ডার্ট! হাউ ডু ডু!

স্নেহময় দত্ত হাসে, সকাল বেলার দেখা হোল, বিকেলে অন্য কিছু দেখবে বলে আশা করেছিলে নাকি!

—মানুষটা তো বদলে যেতেও পারে। যে মানুষ মনকে স্বীকৃতি দিয়ে বেঁচে আছে, যে মনকে যে মানুষ কোন সময়েই নিরাশ হতে দেয় না, তার পরিবর্তন আশা করা যায় বৈকি!

—গুড, ভেরি গুড। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমায় প্যাসের চেয়ে তুমি সুন্দর, মাঝে মাঝে মনে হয় সবার চেয়ে তোমার কথাগুলি সুন্দর। আসলে......

—আসলে?

—তুমি সুন্দরী

—কারণ!

—কারণ? কারণ, সব নিয়েই তো তুমি। তোমার দেহের জোয়ারে সাদা কর্ক মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তোমার ঠোঁটের কাঁপনে কথারা ফুলের মত হাসে; আর ঠোঁট আর প্রমত্ত দেহের অধিকারিণী তুমি স্বয়ং স্বপনচারিণী!

হুস্—পিপ্!

পদ্মডগার মত ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ টানে নমিতা।

—কি হলো!

—লিক্ হয়ে গেলাম। না, আর নয়। তোমাকে আর কথা বলার চান্স দেয়া হচ্ছে না। চল, বেলা যে বয়ে যায়, খেলবে চল!

......"কারণ, সব নিয়েই তো তুমি।"

—চল।

নমিতার রূপ আছে, রূপ প্রকাশ করবার দম্ভ আছে, রুচি আছে। অবিশ্যি নমিতা বলে, রুচি। দুষ্টু লোকে বলে, রুচি না ছাই! রং ঢং দেখলে অরুচি আসে। নমিতা বলে, কঞ্চির মত দেহকে যত দামী শাড়ি দিয়েই জড়িয়ে রাখ না কেন, তোবড়ান গালে যত পাউডারই ঢালো না কেন, যত রং ঢংই কর না কেন, পুরুষদের সত্যি রুচি আছে! তোমাকে দেখবে সামগ্রীর মত, আর আমাকে দেখবে সম্রাজ্ঞীর মত!

কথাটা হোল এই, মেয়েদের মন নিয়ে গবেষণা করতে দিলে স্বয়ং চক্রধারী বিষ্ণু মাথায় হাত দিয়ে বসবেন, কুতো মনুষ্যাঃ! মেয়ে যেখানে আছে, তাদের একটা রহস্য-মণ্ডিত মনও আছে আর সেখানেই আছে যত গোলমালের কলকব্জা। দত্তবাড়ীর ব্যাডমিন্টন খেলায় অনেকেই আসে, শহরের তা বড় তা বড় ব্যক্তির দুহিতা পুত্র। প্রায় সবাই মন নামক বস্তুটির কারবারী। (বলতে পার, দত্তবাড়ীর এই ব্যাডমিন্টন মাঠ ছিল কামদেবের পীঠস্থান)। একটি করে হাত ধরবার মানুষ থাকলেও নমিতা নাগ যখন নতুন মডেলের গাড়ী থেকে আটো-সাটো গেঞ্জি আর ট্রাউজার পরে কেড্স্ পায়ে ছন্দে ছন্দে এসে দাঁড়ায় একবার না চেয়ে কেউ থাকতে পারে না। একবার কথা না বলে কেউ স্বস্তি পায় না। কেন? ওকে দেখলে বুকের মধ্যে খ্যাপা জানোয়ারের মত কি যেন একটা অনুভূতি দাপায়, কড়াতে টগবগ তেলের মত ফুটতে থাকে রক্ত। তাই কথা বলতে হয়, কথা বলায় নমিতা নাগের নিষ্ঠুর আলোমালো ঝড়-ওঠা সমুদ্রের মাতন দেহ। আর তখনই বিপ্লব ঘটে। কাঠির মত চেহারাখানা নিয়ে প্যান্ট আর গেঞ্জি হাঁকালে বাড়ীর দারোয়ানেই হাঁকিয়ে দেবে পিক-পকেট মনে করে। বাবুর সুখতলা পর্যন্ত পৌঁছবার সৌভাগ্য হবে না।

তাই নিস্ফল আক্রোশে পাশের মানুষটিকে বলতে হয়, চলো ডিয়ার।

নির্জনে গিয়ে বসি। তোমার সাথে অনেক কথা। ততক্ষণে একটা গেম হোক।

কিন্তু তাই বলে রোজই এ পোশাকে আসে না নমিতা। উজ্জ্বল-লাল অথবা আকাশ-নীল শাড়িতে আগুনে দেহ ঢেকে নমিতা এসে দাঁড়ালে মনে হয়, এর চেয়ে গেঞ্জি প্যান্ট ভাল ছিল। কি চেহারা বাবা! আসলে নমিতার স্বাস্থ্য শ্রী গড়ন সবই ভাল। হাজার প্রেয়সীর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়েও নমিতার দেহে নিত্য নতুন বাঁক খেলছে, রক্তের লহর বইছে।

স্নেহময়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নমিতা শুধায়, ভাটু, নীরঃ পৌঁছয় নি এখনও?

—পৌঁছেছে। মনে করেছিলাম, ওর সাথে একটা গেম খেলি।

—খেললেই পারতে!

অকারণেই ডান হাতটা তুলে কানে ছোঁয়ায় নমিতা।

—না, শরীরটা আজ ভাল নেই। যদি ওর মত মেয়ের কাছে হেরে যাই, তাহলে এমন বাজাবে যে মুখ দেখাবার জো' থাকবে না।

নমিতার মুখ ভার হল। ভেবেছিল, স্নেহময় বলবে, তুমি আসো নি তাই খেলি নি। তুমি না থাকলে খেলে ভালই লাগে না।

শীত রোদ্দুর দুলছে সামনে। ঘুমের মত মিষ্টি রোদ্দুর, প্রিয়তমের মত আদুরে। চাপ চাপ রক্তের মত থুপ-থুপে পলাশ শুয়ে আছে ওই দূরে সিংহদের বাড়ীর পাশে।

খেলা শুরু হল। স্নেহময় খেলল না। অনেক চোখের মত তারও এক-জোড়া চোখ উদগ্রীব হয়ে রইল। নমিতা স্ম্যাসের পর স্ম্যাস করে। বাঁকের পর বাঁক তোলে। প্রতিপক্ষ দম নেবার ফুরসুৎ পায় না, পাঁতি ফেলবার সাহস পায় না এতগুলি অস্থিরতার চোখ।

দত্তবাড়ীর গেটের সামনে মৃদু গর্জন করে করে একটার পর একটা গাড়ী চলে যাচ্ছিল। সূর্যটা গেছে ডুবে অনেকক্ষণ। খেলায় শেষে বিদায় নিচ্ছে সব।

অন্ধকার ঘনাচ্ছে চারিদিকে। দত্ত-বাড়ীর সামনে পেছনে মধ্যে। মোটরে করে ছুটে গেল কতগুলি চঞ্চল মন। কথাটা উড়ছে সামনে। টগবগ মনের কয়েকটা কথা, বুকের রক্ত মেশান কথা।

কালকে আসছো তো আমাদের বাড়ীতে? সন্ধ্যার ছায়ায় নীরার হাতটা টিপে প্রশ্ন করে সৌম্যেন মিটার।

আসবো। নীরার কথা জড়িয়ে যায়। কথা বলে একটা দুর্বার আবেগ।

স্নেহময় শুনল, হাসল।

তুমি কিন্তু দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ! হেনার অভিমান কথা কয়।

কেমন হয়ে যাচ্ছি! চৈতালী রায়ের হাসি হাসি মুখ।

ঠিক যে সময়ে তোমাকে পাওয়া উচিত, পেলে ভাল লাগবে, তখনই তুমি থাকো না। মনে হয় থাকতে চাও না।

মানে! বুঝিয়ে বলো!

মানে, তুমি এমন সময় আমাদের এখানে আসো, যখন ভাই বোন বাবা বাসায়। আর আমাকে এমন সময় যেতে বলো যখন তোমার বাবা মা বাসায়।

স্নেহময় শুনল, হাসল।

হেঁটে হেঁটে চলে এল। চেয়ারটায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। ফুঃ! মুহূর্তে ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। বাঁ হাত টেনে কপালে বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল স্নেহময়। হাঁটল কিছুক্ষণ। জানালার কাছে এসে চাইল বাইরের দিকে।

মালীর ঘরে বাতি জ্বলছে। ইয়ার্কি মারছে মালী বৌটার সঙ্গে। এই সেদিন বিয়ে করেছে ও। অল্প বয়স, বর্ষা-যৌবন। ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে মালী। খসান ঘোমটা খোঁপায় জড়িয়ে বৌটা শাসনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তর্জনী দোলাচ্ছে। জানালা থেকে সরে আসে স্নেহময়।

মন খারাপ হলে কি যে নিদারুণ অবস্থা হয়, এই প্রথম বুঝল স্নেহময়। সব কিছুরই ওষুধ আছে, কিন্তু মনের রোগের ওষুধ নেই। যতক্ষণ না নিজে সন্তুষ্ট হবে! কি অদ্ভুত জ্বালা! কি এক আশ্চর্য অতৃপ্তি। কাল, গতকাল! চব্বিশ ঘণ্টার স্মৃতি। মনে হয় এক যুগ। বাড়ী আসার সময় ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটে গেল।

দত্তবাড়ীতে আসবার পথে বড় রাস্তাটার ডান পাশে যে জমিটুকু ঢালু হয়ে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেখানে উদয় নাগের মত মুখ তুলে দূরে আকাশের বর্ণালীর দিকে চেয়েছিল একটি মেয়ে। গাঢ় লাল রংয়ের শিফন হয়ত পরনে, ভাঙা খোঁপা ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়া, কেমন যেন বিষণ্ণ-সুন্দর ভাবটি। গাড়ী থামাল স্নেহময়। বন্দনা মিশ্র নয়ত! ধরণটা তাই বটে! কিন্তু ওর সঙ্গে নশুদার জোর মহব্বৎ চলছে। এই সুন্দর লগ্নে বন্দনা রঙহীন? যা হোক, একটা লিফ্‌ট দেয়া যাবে, আজেবাজে বক বক করা যাবে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল স্নেহ-ময়। ঠিক পেছনে গিয়ে কাব্যি করে বলল, ওগো মেয়ে সুন্দরী, হেরি কেন বিষণ্ণ বদন!

সুন্দরী মুখ ফেরাল। হায় ভগবান, কোন্ অপরিচিতা দাঁড়িয়ে! (দৌড় মারব! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে কি লাভ! মার খাই যদি!)

হি হি করে হেসে উঠল মেয়েটি, শোন। তুমি খুব ভালমানুষ, না!

হাঁ, মানে, কেন?

দেখো, আমাকে একটা জিনিস দিতে পার?

এত করুণ মেয়েটির কণ্ঠ!

কি বলুন, আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দোব! (পা দুটো আর কাঁপছিল না। বুকে সাহস জমা হচ্ছিল।)

একটা ছেলে! ছেলে দিতে পার আমাকে!

যে রূপ আপনার, ছেলেরা একটু পাত্তা দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

না গো! আমি যে মা হতে চাই!

হৈ চৈ করতে করতে জন ছয় সাত ছুটে আসছিল নদীর পাড় থেকে। কেঁপে উঠল স্নেহময়। অস্ফুট চীৎকার করে মেয়েটি স্নেহময়ের হাত চেপে ধরল। থর থর করে কাঁপছে ওর ঠোঁট দুটি। রাজ্যের ভয় খেলছে বড় বড় দুই চোখে।

আকুতি ঝরে পড়ল মেয়েটির কথায়, আমায় বাঁচাও। ওরা আমাকে বলে কি জানো, আমি পাগল! আচ্ছা তুমিই বলো, সন্তান না পেলে লোকে পাগল হয় না। বলো না গো, তুমি তো ভাল-মানুষ!

ওরা এসে গেল। সামনের লোকটি কদর্য ভাষায় গালি দিয়ে চড় মারল মেয়েটার গালে। পাঁচ আঙুল লাল হয়ে বসে গেল সাদা নরম স্থানে। হঠাৎ যেন মেয়েটা বোবা বনে গেছে। চোখ থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে ওর রাঙা গাল বেয়ে।

আর থাকতে পারল না স্নেহময়, জিজ্ঞেস করল, ওঁর কি কোন অসুখ নাকি?

অসুখ মানে, পাগল মশাই! আপনি না থাকলে কোন্ কীর্তি করে বসতো কে জানে!

কোন্ বাড়ীটা আপনাদের বললেন?

ওই যে ভাঙা দালানটা দেখছেন, ওর পাশের টিনের বাড়ীটা।

ওদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে দ্বিধা-জড়িত স্বরে কথা বলল আবার স্নেহময়, একটি সন্তান পেলেই মনে হয় মাথা ঠিক হয়ে যাবে!

সন্তান ওকে দেয় কে?

কেন, ওর স্বামী!

স্বামী হলেই সন্তান দেওয়া যায় না মশাই!

এবার শুয়রের মত গর্জন করে উঠল লোকটি। হাতটা মেয়ের মটকে দেবে, এমন ভাবে টানল। পশু পশু! ক্ষমতা নেই, সাধ আছে!

মোটর চালাতে চালাতে কেবলই ভাবল স্নেহময়। সুশ্রী নিরপরাধিনী একটি মেয়ে। অন্তরে বিষম জ্বালা, অক্ষম স্বামীর অত্যাচার। পাগল না হলেই ছিল আশ্চর্য! দিনের পর দিন বুকের ভেতর চিতা জ্বালিয়ে মানুষটার বাহ্যিক পরিবর্তন না ঘটলেও বুকটা যে চৈত্র প্রান্তরের মত ফুটি-ফাটা হয়ে দীর্ঘশ্বাস উগরে দিচ্ছে।

নিউ মার্কেটের মোড়ে এসে গাড়ী থামাল স্নেহময়। এক হাতে পাউডারের কৌটো আর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ভায়োলেট ডোফেরারের রঞ্জিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এক সারি সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। চোখের কোণে ঘনিয়ে এল অভিমান। গাড়ীতে উঠে এলো ও শান্ত পায়ে, নিঃশব্দে।

অনেক পরে বলল, তোমার সংগে কথা বলবো না ডার্ট!

বেশ তো! তুমি না বললে আমার কিছু আসবে যাবে না, তোমার মুখ বললেই হয়।

না, ঠাট্টা নয়। কখন কথা ছিল আসার! বিলিভ মি, একঘন্টা ধরে ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বুঝি কোন বোধ নেই!

কে বললে নেই! নিশ্চয়ই আছে। তোমার এত বোধ আছে বলেই তো তোমায় আমি পছন্দ করি!

ভালবাসা কথাটা ইচ্ছে করেই স্নেহময় উচ্চারণ করল না। এসব মেয়ের সাথে কিছুক্ষণের জন্যে বসে থেকে ভাল লাগে, আনন্দ লাগে। রাত জেগে ভাবতে মন চায় না, ওদের ঘিরে গান গাইতেও ইচ্ছে যায় না, অভিমান করার প্রবৃত্তি হয় না। একটুখানি হাত ধরা, একটুখানি মিষ্টিকথা, একটুখানি সান্নিধ্য। ব্যস। এর বেশী গেলে তুমিও ঠকবে, আমিও ঠকব।

তবু খুশী হল ভায়োলেট। কোমর দুলিয়ে বলল, জানো ডার্ট, আজকে এক মজার কাণ্ড হয়েছে। ফাদার বোল্টন মায়ের কাছে বলেছে আমি নাকি নিয়মিত উপাসনায় যাচ্ছি না। মা জিজ্ঞাসা করলে বললাম, আমার ভেতরে এমন একটা চার্চ আছে, যেখানে নিত্যই উপাসনা হচ্ছে। কেমন, ভাল বলিনি?

তবু তোমার যাওয়া উচিত। যে পরিবেশে তোমরা আছো, তাতে এগুলো অমান্য করা মোটেই উচিত নয়।

বারে, অমান্য কেন করব! আমার ভাল লাগে না।

ভাল লাগালেই লাগে! তোমার একটা ধর্ম আছে ভায়োলেট!

ও মাই গড্! ধর্মের বন্যায় যে দেশের লোক হাবুডুবু খায় তাদেরই একজনের কাছে অধর্মের কথা বলে মারা পড়ি আর কি! নারীধর্মের কাছে কোন ধর্মই বড় নয়, তা জানো!

জানি। কিন্তু এভাবে পার্টি ক্লাব করাটাকেই কি নারীধর্ম বলে নাকি?

না, বলে না, সবার মত আমিও চাই ঘর, স্থিতি! আমি মা হতে চাই; সন্তান নিয়ে ঘর করবার স্বপ্ন আমিও দেখি ডার্ট!

চমকে উঠল স্নেহময়। পৃথিবীটা কি চব্বিশ ঘন্টার ভেতর একদম বদলে গেল নাকি? (পাগল মেয়েটা এখন করছে কি!)

যে ভায়োলেট ডোফেরায় পেগের পর পেগ মদ খেয়ে নেশায় চুর চুর অবস্থায় বেসামাল হয়ে যে কোন পুরুষের সংগে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে, যে ভায়োলেট কয়েকদিন আগেও বলেছে, যৌবনকে দাম দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করি; তাই বার্ধক্যের কান্না শোনবার আগে আমি যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এনজয় করব; সেই ভায়োলেটের মুখে এ ধরণের আশ্চর্য অদ্ভুত কথা মনে একটা প্রবল ধাক্কা দেয় বৈকি!

চোখ তুলে চাইল স্নেহময়। ডোফেরার যেন একটু ঘুন হয়ে বসেছে। সে কি গাড়ীর দুলুনিতে, না ইচ্ছাকৃত ভাবে! থাক্ থাক্ সোনালী চুলের মাঝ থেকে কয়েকগাছি খুচরো চুল উড়ছে ওর কানের পাশ ঘেঁষে। শরীরের ওপর এত অত্যাচার করে অথচ এতটুকু ভাঙতি নেই কোথাও। গাঢ় নীল রং গাউনের ওপর ওর লাল-হলুদ দেহ মুখ এক টুকরো স্বপ্নের মত মনে হয়।

তোমার স্বপ্ন সফল হবে বলে কি তুমি বিশ্বাস করো?

কেন করবো না!

করো না। কারণ, সবাই তোমাকে এখন প্রফেসনাল বলে জানে।

স্নেহময়!

হাঁ, তাই সন্তান তুমি পেলেও সেই সন্তানকে স্বীকৃতি দেবার মত ক্ষমতা তোমার নেই।

একি বলছো তুমি স্নেহময়!

ঠিকই বলছি। আজ তুমি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছ, সন্তান দেবার মত অনেক পুরুষই তুমি পাবে, কিন্তু পিতা পাবে না।

তুমিও একথা বলছো ডার্ট! কেমন যেন কান্না কান্না স্বর ভায়োলেটের।

আমি বলছি না, আমাকে বলাচ্ছে তোমার নোংরা যৌবন। যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে যৌবন কাউকে কোনদিন ক্ষমা করে না।

করে না? আত্মগতভাবে বলল ভায়োলেট।

সামনে একটা মাঠ। অন্ধকারের মেলা বসেছে সেখানে। মেলা বসেছে

অবৈধ কথার। চাপ চাপ অন্ধকারের মাঝে ফনা তোলা সাপের মত বয়সে পাওয়া ছেলেমেয়েদের, বড়বাবু টাইপিস্টদের, ছাত্রী শিক্ষকদের আবছা আবছা মূর্তি।

আলোর অভিযান অন্ধকারকে যতই দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পৃথিবীর মানুষগুলো অন্ধকারকে তেমনি মহার্ঘ বলে মনে করছে, পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হচ্ছে।

মাঠটার ওপারে অন্য রাস্তার নিশানা। নেকড়ের চোখের মত বাতি জ্বলছে পোস্টগুলোর মাথায়। মোটর ছুটছে, রিক্সা চলছে।

ওখানে বসবে নাকি কিছুক্ষণ; আস্তে আস্তে বলল স্নেহময়, মোটর থেকে না নেমেই।

না, বাসায় যাব। গাড়ী ঘুরিয়ে নাও।

দত্তবাড়ীর চারপাশে একটা ক্লান্তির ছায়া দিন দিনই কেমন গভীর হয়ে উঠছে। ব্যাডমিন্টন মাঠে খেলা হয় ঠিকই, কিন্তু সেই উত্তেজনাই যেন হারিয়ে গাছে। হারিয়ে গেছে সমস্ত হাসি গানের সোনার কাঠি। কেমন একটা নির্জীব গাম্ভীর্য সটান হয়ে শুয়ে থাকে দত্তবাড়ীর সবখানে, সব সময়।

ভাবনার সাথে হাসিও পায় স্নেহময়ের। গাড়ীতে করে সেই পাগলী মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল সে। ভায়োলেটের ফ্ল্যাট থেকে ফেরবার মুখে গাড়ীটা নিজের অজান্তেই থামিয়ে দিল স্নেহময়। সেই বাড়ীটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। কেমন সুস্থ সুস্থ চেহারা।

ভাল আছো! একেবারে কাছে গিয়ে আপনজনের মত স্নেহময় শুধাল।

তুমি কে গো! নিষ্পাপ সরলতার ছবি ওর মুখে, মধ্য কপালে ছোট্ট করে আঁকা আলতার ফোঁটা, জ্যোতিহীন!

আমি সেই ভালমানুষ! নদীর ধারে তুমি দাঁড়িয়েছিলে, সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তুমি সন্তান চাইলে, ওরা তোমাকে মারতে মারতে নিয়ে এল!

হ্যাঁ।

তোমার স্বামী কোথায়?

স্বামী! ও হ্যাঁ, বাইরে গেছেন!

বাড়ীতে নেই কেউ!

কেউ নেই!

আমার সাথে আমার বাড়ীতে যাবে?

আর আসবো না?

আসবে। আমি দিয়ে যাব।

ওরা যে মারবে।

মারবে না। আমি দিয়ে যাব।

গেটের সামনে গাড়ী থামিয়ে নামল স্নেহময়। চারদিকে চাইতে চাইতে মেয়েটাও নেমে এল। ব্যাডমিন্টন মাঠের মক্ষিরাণীদের অনেকের চাইতে অনেক বেশী সুন্দরী মেয়েটা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দৌড়ে এল সবাই।

নমিতা শুধিয়েছিল, ও মেয়েটি কে ডাট্?

ও প্রতিমা!

প্রতিমা তো বটেই! কিন্তু আমদানী করলে কোত্থেকে।

আমদানী নয়। বাবা মারা যাওয়ার আগে ওর সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। আমি চলে গেলাম বিলেত! প্রতিমাকে ভুলে গেলাম।

তারপর হারা মাণিক কোথায় খুঁজে পেলে। নমিতার চোখ জ্বলছিল।

পেলাম কোথাও! আচ্ছা, তোমরা খেলতে যাও। আমি আসছি এখনি! এসো প্রতিমা!

হেঁটে হেঁটে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল দুইটি শান্ত স্নিগ্ধতার মূর্তি। ওদের দিকে চেয়ে জ্বলে জ্বলে উঠল কয়েকটি প্রতিহিংসার চোখ।

আ-আমি প্রতিমা। মেয়েটা বলে।

হাঁ, তুমি প্রতিমা। স্নেহময় বলে।

কিন্তু আমি তো নলিনী!

না, তুমি প্রতিমা!

তোমার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল!

না, ওদের বললাম আর কি! ওরা অন্য ধরণের পাগল!

আমার মত পাগল!

হাঁ, তোমার মতই। হাসল স্নেহময়।

সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার আগেই ওদের বাড়ীর সামনে ব্রেক কষল স্নেহময়ের গাড়ী।

তৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিমা বলল, কালকে আসবে না?

আসবো?

আসবে।

আসবো। যাই, কেমন!

এসো।

অনেকদিন পর আজ গান গাইতে ইচ্ছে করল স্নেহময়ের।

মোটরে বসে অনেকদিন আগে গান গেয়েছিল। কতই বা বয়স তখন। ঘুম ঘুম বয়স। মায়ের সাথে শিবতলায় 'ভোগ' দিতে গিয়েছিল। ফেরবার পথে মাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল, একটা স্নিগ্ধতার প্রলেপ দেওয়া উপবাস-ক্লিষ্ট মুখে। গরদের ঘি-রং শাড়ি পরলে যে কোন মাকে এমনিতেই সুন্দর দেখায়। চোখ দুইটি মায়ের সামনের পথ বেয়ে বেয়ে বহুদূরে কিছু যেন খুঁজছিল। হঠাৎ হাততালি দিয়ে গান গেয়ে উঠল স্নেহময়।

চোখ না ফিরিয়েই মা ধমকে ওঠলেন, গান গেও না!

কেন মা!

তর্ক করো না। গাড়ীতে বসে ভাল ছেলেদের গান গাইতে নেই।

আজ হঠাৎ মায়ের কথা মনে হতেই আস্তে আস্তে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিল স্নেহময়। সন্ধ্যার শহর। উজ্জ্বল আলোর নীচে নীচে মেয়ে-পুরুষদের ভিড়। নিউ-মার্কেটের দক্ষিণ দিকের একটা দোকানে গিয়ে আধ পাউন্ড টফি কিনল স্নেহময়।

স্নেহ!

পা-দানীতে পা রেখেই স্নেহময় ঘাড় ফেরাল।

তোড়া দেব। সূর্যাস্তের নায়িকা।

তোড়া! তুমি হঠাৎ এখানে!

বা রে, আমাকে এখানে আসতে নেই নাকি!

না, তা নয়। তোমাকে এমন সময় এখানে কোনদিন দেখিনি কি না, তাই! ভালো আছো!

ভাল থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি! তুমি তো আমাদের ওখানে যাওয়া একদম ছেড়েই দিয়েছ!

আর বলো না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমন সময়টুকুও পেয়ে উঠি না যাতে চেনা-মুখদের দেখে তৃপ্ত হবো। পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর তোড়া।

হেসে ফেললে স্নেহময়। হেসে ফেললে তোড়া।

কি কথা বানাতে পার তুমি! গল্প লেখ না কেন?

কে বললে লিখি না। পত্রিকাওয়ালারা ছাপায় না তাই। না হলে আমার গল্পে সাসপেন্স ক্লাইমেক্সের ছড়াছড়ি হুড়ো-হুড়ি লেগে যায়। নায়কেরা তিন তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে তিন তিনবারই বেঁচে যায়।

ওমা, নায়কেরা মরতে যাবে কোন্ দুঃখে! হাসি চাপতে চাপতে তোড়া বলে।

তোমার মত নায়িকাদের কথা শুনে। নাও, উঠে এসো। তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দি।

চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর পৃথিবীটা বদলে গেছে। সত্যিই বদলে গেছে, কেমন গিন্নী গিন্নী ভাব নিয়ে গাড়ী থেকে নামে নমিতা নাগ। খেলতে হয় তাই খেলে যায়। কেমন অলস ভঙ্গিতে র‍্যাকেট নিয়ে নড়াচড়া করে। জায়গাটাই যেন কিছু হারানোর বেদনায় চুপি চুপি চোখ মুছতে থাকে। চব্বিশ বছরের যৌবনকে রঙ-ঢঙের প্রাচুর্যে ঢেকে যে নমিতা বয়সটাকে ভোলাতে নামিয়ে এনেছিল সেটাই যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে বত্রিশে উঠে গেছে।

ভায়োলেট ডোফেরার আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে কথা বলে, ধীরে ধীরে হাটে আর অনেক কিছু যেন ভাবে।

প্রতিমা সেদিন একাই চলে এসেছিল। গোলাপ গাছ থেকে একটা রক্ত-গোলাপ তুলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে খোঁপায় গুঁজেছিল। ছুটে এসেছে মালীটা। আঁ, মেম সাহাব...।

ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল স্নেহময়। হংসীর মত কোমর দুলিয়ে ছুটে গিয়েছিল প্রতিমা। ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিল মালী।

কি, খোঁপায় ফুল দেবার শখ হয়েছে? জিজ্ঞেস করে স্নেহময়।

হ্যাঁ, তোমার বাগানে কত ফুল!

তুমি ফুল খুব ভালবাস, না?

খুব ভালবাসি। আমার যদি ফুলের মত একটি ছেলে থাকত!

থাকবে।

থাকবে?

হাঁ, থাকবে।

আঃ! গভীর একটা তৃপ্তির হাসি ফেলে কুশন চেয়ারে গা এলিয়ে দিল প্রতিমা! ক্লান্ত মুখ, নিমীলিত আঁখি। সম্ভাজির ছবি।

প্রতিমা!

উঁ!

শোন!

কি!

সোমবারে তোমাকে এখানে আমি নিয়ে আসব। চিরদিনের জন্যে। আসবে না?

আসবো!

তাহলে এই কথাই রইল। আজ বুধ-বার। এ ক'টা দিন চুপচাপ থাকবে। সোমবারে নিঃশব্দে চলে আসবে। কেমন!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ!

চলে এলো প্রতিমা। চলে এল একটা জীবন্ত কামনা। কোন গোলমাল হল না। হৈ-চৈ হল না। একটা তৃষিত মন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল খুব কোমল, খুব চিকন একটা কান্না শোনার জন্য। একটি শিশুর কান্না!

আরেকটা সংবাদ শোনার জন্যে স্নেহময়ের মন উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই সংবাদটা এল। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘশ্বাস!

মুখ তুলে বললে, আর ইউ সিওর সেন?

কথা বলছিল প্রফুল্ল সেন, ডাক্তার। স্নেহময়ের কলেজ-জীবনের বন্ধু।

তুমি কি বলছ স্নেহ! ওসব ঘেঁটে হাত পাকিয়ে ফেললাম! তোড়া দেবও শেষ পর্যন্ত মা হতে চলল!

কিন্তু ওর মত মেয়ের এটা করা মোটেই উচিত হয় নি প্রফুল্ল! ভাল করে জানি ওকে আমি। একটা লোফারের সাথে...।

কি বলছ স্নেহ! রজত লোফার?

নয়? এই সেদিনও দেখেছি চায়ের স্টল থেকে সিগ্রেট ছুড়ে মেরেছে স্কুল-যাওয়া মেয়েদের দিকে। ওর কত কীর্তি!

তা সে যা হোক। তুমি চতুষ্পদ হচ্ছ কবে বল!

(প্রতিমার খবরটা জানত না প্রফুল্ল।)

হবে। ঠিক সময়েই খবর পাবে।

গুড। আচ্ছা আসি। বাই বাই।

বাই বাই।

সেই আগের মতই এগিয়ে এল তোড়া। ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল।

খুব খুশী হয়েছ, না? স্নেহময়ের চোখে চোখ রেখে তোড়া বলল।

হয়েছি। চোখে দেখে গেলাম, সব সুন্দরের মাঝেও যে একটা ভয়ংকর থাকে তা থেকে তুমি বঞ্চিতা নও, হয়ত কোন মেয়েই নয়।

মেয়েরা সুযোগ পেলে বেপরোয়া হবে। আর তা থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই।

তুমি ব্যতিক্রম। তাই তোমার মাঝে ভয়ংকরের ছবি দেখে ভয় পাই নি, হাসি নি। আশ্চর্য হয়েছি।

আশ্চর্য করলে! রুদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে একরাশ বিস্ময়। ছটফট করতে থাকে তিনশো' পঁয়ষট্টি দিনের চাঞ্চল্য। কুমারী মেয়ের রক্তাক্ত একটা জ্বালা!

আবার সূর্য উঠবে! স্নেহময় বললে।

উঠুক। তোড়া বললে।

—সূর্য অস্ত যাবে।

—যাক।

—বড় টিলাটার এক পাশে পোষা কুকুরের মত তেমনি হলুদ হলুদ রোদ্দুর গড়িয়ে পড়বে। মাঠের বুকে তেমনি নামবে ছায়া, তোমার চোখে নামবে স্বপ্ন। দূরে জ্বলে ওঠবে নিওন, আকাশে জাগবে অযুত তারা। তবু...।

—থামো ডার্ট, থামো। পাগল করো না আমায়।

—জলে জাগবে ঢেউ। শব্দ জাগবে ছলছল। এমনি সময়ে টুংটাং বেজে ওঠবে কোন রিক্সার ঘণ্টি অথবা কোন চানাচুর-ওয়ালার কৌটোর ঝন ঝন। তোমার চোখে দুলবে স্বপ্ন, আমার মনে আসবে কথা। আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই তোড়া!

—সুন্দর আর ভয়ংকর নিয়ে আমি। তবু বলছি স্নেহময়, তুমি ফিরে যাও।

—ফিরে যাব! আচ্ছা চলি। উইস্ ইউ এ নিউ ড্রিম!

—তাই তো হবে। আরেকদিন এসো। রজতের সংগে দেখা হবে!

—আর আসবো না!

সমগ্র বাড়ীটা, যেন একটা বিকট মূর্তি নিয়ে হা হা করে হাসছে। হেরে গেছ, হেরে গেছ তুমি তোড়া দেব। তোমার বাইশ বছরের সাজান বসন্ত ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করল তোড়া। ব্যর্থ আক্রোশে আবার চাইল। বাইশ যৌবনের চোখ দুটি দেখল একটা

তৃপ্তিভরা মন নিয়ে মানুষটা কেমন নির্ভাবনায় হেটে হেটে চলে যাচ্ছে সারদাশঙ্কর রোডের ওপর দিয়ে। কাপুরুষ! বন্ধুত্ব চাই! দিনের পর দিন একটি স্বাস্থ্য-উচ্ছল তাজা মেয়েকে পাশে রেখে, কথা বলে......। উঃ, তোমার জন্যেই যে...।

চেঁচিয়ে ডাকল তোড়া, নারাণ, নারাণ!

কাছেই দাঁড়িয়েছিল নারাণ, কিছু বলছো দিদিমণি।

বলছি, গেটটা লাগিয়ে দে।

কর্তা ফেরেন নি এখনও।

যা বলছি তাই কর। যখন আসবেন তখন খুলে দিবি। তোদের গাঁটে গাঁটে আলসেমি বসে গেছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে নারাণ গেট বন্ধ করতে চলল।

হাসছে দুই পাশের পথের কানাচ, হাসছে পথের ইশারা। স্নেহময় হাসে। এই ভাল, এই বেশ। চটুল কথার রসে ব্যক্তিটিকে ডুবিয়ে হজম করার শখ তাদেরই থাকে যাদের ভাল-লাগার অস্থটি বেশ ভাল করেই রপ্ত করা আছে। ভালবাসার বিলাসীতায় জীবনকে ব্যঙ্গ করার মধ্যে কত বড় যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে তা ওই দেহ-সর্বস্ব প্রসাধন-কারিণীরা কেমন করে বুঝবে!

হ্যাল্লো মিঃ ডাট! আপনি এদিকে কোথায়?

কোথাও নয়। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিলাম।

আকাশের দিকে চাইল মুসলীম হোসেন। গভীরভাবে দেখল স্নেহময়কে। তিনটের ঘরে ঘড়ির কাঁটা দুলছে।

অসময়ে যে! প্রশ্ন না করে পারল না হোসেন।

হাসে স্নেহময়, সুসময়ে তো অনেক বেড়ালাম। দেখি অসময়ে কি হয়।

ও আচ্ছা! বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, বোঝার ভান করল মুসলীম, একটা খবর শুনেছেন নাকি মিঃ ডাট! মিসেস সেন কাল থেকে মিসেস সিম্পসন হচ্ছেন!

আচ্ছা! তা মিঃ সেনটি গেলেন কোথায়?

গারদে!

গারদে! কোন্ গারদে? ছেলেবেলায় পড়েছিলাম গারদ দুই প্রকার।

তিনি আছেন পাগলা গারদে!

এ্যাঁ, ব্যাপার জটিল বলুন!

নিশ্চয়! মিসেস সেনের রূপের জেল্লায় মাথায় এমন রক্ত চলাচল শুরু হোল বেচারা আর দাঁড়াতেই পারলেন না। এখন দেখা যাক সাদা আদমীর দৌড়!

তিনি পার্টি দিচ্ছেন নিশ্চয়!

নিশ্চয়। তা আর বলতে!

চলে গেল মুসলীম হোসেন। লোকটা এমনি, রোখ ঢেকে কিছু বলার পাত্রই নয়। আগুন জ্বালিয়ে ছাই-চাপা কেন বাবা!

হাসি-গানের দত্তবাড়ী ঘুমিয়ে গেছে।

হৈ-হুল্লোড়ের দত্তবাড়ী ঝিমিয়ে পড়েছে।

ঝিমিয়ে পড়েছে এতগুলো অস্থির প্রাণের উন্মাদনা। এতদিনের একটা নরম কামনা চোখ মুছতে মুছতেই যেন পালিয়ে গেছে। কেউ আসে নি, কেউ আসে নি। দত্তবাড়ীর ব্যাডমিন্টন মাঠের হাসি কথা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল। অসহায়ের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে বারান্দায় উঠে এল স্নেহময়।

ইজিচেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে ডালিয়া কসমসের নাচন দেখছিল প্রতিমা। স্নেহময়কে দেখে হাসল।'

কোথায় গিয়েছিলে?

বন্ধুর বাড়ী।

ওরা কেউ আজ খেলতে এলো না।

আর আসবে না।

কেন?

কেন! নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখো!

চমকে ওঠল প্রতিমা। চোখ দুইটি ওর জলে ভরে এল। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলো আসন্ন মাতৃত্ব।

শেষ রাতের দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল স্নেহময়ের। বিছানায় প্রতিমা নেই। বাথরুমের বাতিটা জ্বলছে। জমাট নিস্তব্ধতা বাইরের বাগানে। উঠে এল স্নেহময়। বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্রতিমা। খুব আস্তে আস্তে ওঠানামা করছে ওর পিঠটা।

প্রতিমা, প্রতিমা! মৃদুস্বরে ডাকল স্নেহময়। একটুও নড়ল না প্রতিমার দেহ। কোলে করে ওকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। বেশ করে মুছিয়ে দিল।

আঃ আঃ! পাশ ফিরেই হু হু করে কেঁদে ওঠল প্রতিমা!

কি প্রতিমা, কি!

আমাকে, আমাকে স্বামীর কাছে দিয়ে এসো! বিড়বিড় করে প্রতিমা বলল।

এই তো আমি তোমার কাছে আছি। স্নেহময়ের উদ্বিগ্ন স্বর।

আমাকে, আমাকে স্বামীর কাছে দিয়ে এসো!

প্রতিমা প্রতিমা!

না, না!

ভোরের দিকে ডাক্তার এলেন। ভাল করে পরীক্ষা করলেন। এক পাশে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল স্নেহময়।

বারান্দায় এলেন ডাক্তার। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বললেন, মিঃ ডাট, রোগিণীর মনে কোন গোপন ব্যথা আছে বলে জানেন কি?

না, যেটা ছিল সেটাও গেছে বলে জানি।

দেখুন তো চিন্তা করে।

দেখুন, আপনার কাছে বলতে তো কোন বাধা নেই! ওর বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত বছর। একটি মাত্র সন্তানের জন্যে ও'র মানসিক অবস্থা এমনও হয়েছে যখন ওকে উন্মাদ বলে সবাই মনে করেছে। বুঝতেই পারছেন, ও সন্তান-সম্ভাবনা। তাই বলছিলাম, এটাই ও'র মনোবেদনার কারণ ছিল। সন্তান পাওয়ার সম্ভাবনাতেও ও কেন এমন হয়ে গেল! আমার মনে হয় ও'র মাথাটা আবার খারাপ হয়ে গেছে!

ডাক্তার সাহেব!

হ্যাঁ, ঠিক তাই! এতদিন যার জন্যে উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, আজ তারই পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় উনি নিজেকে হারাতে বসেছেন।

কি করা যায় বলুন তো!

সন্তানকে বাঁচতে দেওয়া যাবে না।

আপনি এ কথা বলছেন!

হ্যাঁ বলছি! এখনও সময় আছে!

না, ডাক্তার সাহেব, তা হতে পারে না!

একটু ভাবুন, চিন্তা করুন। আচ্ছা আসি আমি।

ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

ভাই পুলকেশ, তোমার কাছে চিঠি লিখছি একটা প্রশ্ন করে। যার উত্তর পাওয়া আমার কাছে জীবন পাওয়ার মতই মূল্যবান। সব হারিয়ে তোমার কথাই বার বার মনে হয়েছে আমার। ভেবেছি, সদুত্তর তোমার কাছ থেকেই পাব। সব কিছুই জানালাম তোমাকে। এখন আমি কি করতে পারি! কি করতে পারে একটা মানুষ! খুব ক্লান্ত আমি। আর লিখছি না। খামের উপরেই ঠিকানা পাবে! প্রতিমার পাশে বসে তোমার কাছে লিখছি চিঠি। ওর একটা হাত বারবারই ডান হাতটা টানছে আমার। থামলাম।

তোমার স্নেহময়।

প্রদর্শনী

কলারসিক

ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে যখন শিল্পী সমর ভৌমিকের তৃতীয় একক প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে (১লা নভেম্বর), তখন অ্যাকাডেমীর অন্য কক্ষে আয়োজিত শিল্পী শ্রীদাম সাহার প্রদর্শনীটি সপ্তাহব্যাপী চলার পর শেষ হয়ে গেল।

।। শিল্পী সমর ভৌমিকের প্রদর্শনী ।।

গত বছর শিল্পী সমর ভৌমিক যখন তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তখন সেই প্রদর্শনীর আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা শিল্পী ভৌমিকের প্রশংসা করেছিলাম। সেই প্রদর্শনীতে প্রধানতঃ ভারতীয় পদ্ধতির প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকে অঙ্কিত চিত্রকলারই প্রাধান্য ছিল। এবারের প্রদর্শনীতে প্রথাসিদ্ধ চিত্র-রচনার চেয়ে লোক-শিল্পের আঙ্গিক ভেঙ্গে বিমূর্ত চিত্র-রচনার দিকে শিল্পীর মানস-প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। শিল্পী ভৌমিকের কয়েকখানি চিত্রে আলপনাকে ভেঙে কিউবিক পদ্ধতিতে অনুসরণ করে ভুষো কালি, মেটে সিঁদুর, হরিতাল, নীল প্রভৃতি সম্পূর্ণ দেশীয় রঙ ব্যবহার করা হয়েছে এবং চিত্রের সাদা জমিনের বুকেই চ্যাপ্টা রঙ ব্যবহার করে রেখাগুলিকে বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনো কোনো চিত্রে মেক্সিকোর লোক-শিল্পের প্রতীকধর্মীতাকেও দেশীয় লোক-সংস্কৃতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী। মোটকথা, এই ধরণের চিত্রগুলি রচনায় শিল্পী সমর ভৌমিক তাঁর কল্পনা-প্রতিভা এবং আঙ্গিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন।

সমরবাবু এই প্রদর্শনীতেও ভারতীয় পদ্ধতির প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকে রচিত কয়েকখানি চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। এগুলির অধিকাংশই অজন্তার গুহা-চিত্রের প্রতিলিপি। বহুবার দেখা এই সব চিত্রের যে প্রতিলিপি সমরবাবু এখানে উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে নতুনত্বের কোনো স্বাদ না থাকলেও তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় ছিল। টেম্পেরায় অঙ্কিত কাজের মধ্যে নিসর্গ চিত্র 'নদী' (৬) কিংবা 'প্রাচীন সমুদ্র ও জেলে' (৭) মন্দ নয়। বালুকণা জমিয়ে তার উপর রঙ প্রয়োগ করে যে চিত্রগুলি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিতে চারু-কৃতিত্বের চেয়ে কারু-কৃতিত্বের পরিচয়ই সমধিক প্রকট।

।। শ্রীদাম সাহার প্রদর্শনী ।।

শিল্পী শ্রীদাম সাহার প্রদর্শনী গত ২৫শে অক্টোবর শুরু হয়ে ৩১শে অক্টোবর শেষ হয়েছে। শ্রীদাম সাহা সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। চারু ও কারুকলা—এই দুই বিভাগেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে যে ৩৭ খানি চিত্র ছিল তার ২১ খানি প্যাস্টেলে অঙ্কিত এবং ১৬ খানির মাধ্যম ছিল জলরঙ। প্যাস্টেলে অঙ্কিত প্রায় সমস্ত চিত্রই বাঙলার পোড়ামাটির পুতুল-খেলনা ও লৌকিক দেব-দেবীর মণ্ডন-কলারই চিত্রিত রূপ। অবশ্য ভাস্কর্যের রূপকে চিত্রে বিধৃত করার সময় রঙ ও অবয়ব গঠনের দিকে শিল্পী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী অবলম্বন করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

জল-রঙের চিত্রগুলিও বেশ উন্নত মানের। ব্রাশের হাল্কা টানে, পরিমিত রেখায় এবং মৃদু রঙ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এইসব চিত্রের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানেও শিল্পী সাহার পরিমিতবোধ প্রশংসনীয়। জল-রঙের ছবিগুলির মধ্যে 'আলো-ছায়া' (১১), 'গাছের সারি', 'নারী ও শিশু' (১৫) নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

পোড়ামাটির ভাস্কর্যকলায় শিল্পী সাহার দক্ষতা অনস্বীকার্য। তবে এই নিদর্শনগুলির অধিকাংশই আমাদের মন্দির-গাত্রে রচিত পোড়ামাটির ভাস্কর্য-কলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পীঃ সমর ভৌমিক

দেশে বিদেশে

॥ দুর্জয় প্রতিরোধ ॥

ভারতের উত্তর সীমান্তে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে ভারতের অগণিত তরুণ প্রাণ। অতর্কিত আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে তারা দিশাহারা হয়নি, শত্রুর অগ্রগতিতে পরাজয়ের আশংকা তাদের মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত করেনি। নির্মম আক্রমণের সম্মুখেও নির্ভীক হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাত হেনেছে শত্রুর বুকে। বীর জওয়ানদের প্রবল বিক্রমে ভারতের বুকে চীনা শত্রুর অগ্রগতি আজ সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

পুণ্য মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে হাজার তরুণ প্রাণ এ পর্যন্ত উৎসর্গিত হয়েছে, আর সেই অকৃপণ জীবনদানে উদ্দীপ্ত হয়েছে সারা দেশ। ঘরে ঘরে আজ প্রস্তুতির সজ্জা, মাতৃভূমির মুক্তি-মন্ত্রে মুখরিত আজ সারা দেশ। ভারতের প্রতিটি সৈন্য-সংগ্রহকেন্দ্র এখন কর্মমুখর, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার লাখে লাখে ভারতের নওজোয়ান আজ এগিয়ে আসছে মৃত্যুঞ্জয়ী শপথ নিয়ে। দেশ-দেশান্তরের সক্রিয় সমর্থনও আজ আশীর্বাদের মত বর্ষিত হচ্ছে পুণ্য ভারত-ভূমিতে। ভারত ইতিহাসের স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবময় অধ্যায়ও আজ ম্লান হয়ে গেছে স্বাধীনতা রক্ষার মহান সংগ্রামের উজ্জ্বলতায়।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

দেশরক্ষার জন্য আজ প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণের প্রয়োজন। দেশ-দেশান্তর হতে অস্ত্র ও খাদ্য ক্রয় করে আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্যে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, যুদ্ধ অবিলম্বেই শেষ হয়ে যাবে এ যেন আমরা কেউ আশা না করি। মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে চরম স্বার্থত্যাগের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে দেশ।

প্রধানমন্ত্রী ও সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের এই ত্যাগের আহ্বানে দেশবাসী যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা সত্যই অভূতপূর্ব। বৃহৎ শিল্পপতিরা এ পর্যন্ত পাঁচ দশ এমন কি বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করেছেন, প্রয়োজনে আরও অনেক অর্থ তাঁরা দেবার জন্যে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন। এক লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি প্রায় সব ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান হইতেই পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রীদের অনেকেই বেতনের এক একটি নির্দিষ্ট অংশ মাতৃভূমির মুক্তি-অর্জন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এদিক থেকে গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্ধ্র বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ। তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ বেতনই মাতৃভূমির মুক্তি-অর্জন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও অফিসের কর্মচারী শত অসুবিধার মধ্যেও উদার হস্তে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ দিতে এগিয়ে এসেছেন। মা ও ভগ্নীরা নিজেদের দেহের অলংকার খুলে অকাতরে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান করেছেন। সারা দেশ জুড়ে আজ যেন শুরু হয়েছে ত্যাগের সাধনা।

কিন্তু তবুও আমরা আহ্বান জানাই দেশবাসীর কাছে—যার যাহা আছে, আন বহি আন, থেক না থেক না লুকায়ে। জীবন পণ করে আজ যে ভারতের বীর সৈনিকরা উত্তর সীমান্তে শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে তাদের সর্ব-উপায়ে সাহায্য করা, তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা আজ সমগ্র দেশবাসীর একমাত্র কর্তব্য। আরও অর্থ চাই, আরও স্বর্ণ চাই, আরও ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি চাই। পুণ্য মাতৃভূমির স্বাধীনতার তুলনায় সব সম্পদই আজ মূল্যহীন।

॥ দেশ-বিদেশের সমর্থন ॥

সারা পৃথিবীর শুভেচ্ছা ও সমর্থনে ভারত আজ শুধু ধন্যই নয়, এ সংগ্রামে তার জয়ও আজ সুনিশ্চিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ তার সর্বসামর্থ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের পাশে। সুস্পষ্ট কণ্ঠে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে ম্যাকমেহন লাইনই উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত রেখা এবং সে সীমান্ত রক্ষার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে ভারতকে সহায্য করবে। বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ ঘোষণা করেছেন, আক্রান্ত ভারত তার প্রয়োজনে বৃটেনের কাছে যে সাহায্য চাইবে বৃটেন তা দেবে। পঃ জার্মানীর চ্যান্সেলর ডঃ আদ্যুনেরও অনুরূপভাবে ভারতকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি কমনওয়েলথভুক্ত বড় বড় সমস্ত দেশগুলিও সমভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছে, অস্ত্র ও রসদের সাহায্য অকৃপণভাবে তাদের দেশ থেকে ভারতে আসবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় সবকটি দেশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, তারা আক্রান্ত ভারতের সমর্থক।

ভারতের রাষ্ট্রীয় সফরে আগত আর্চবিশপ ম্যাকারিওস বলেছেন, এ যুদ্ধ শুধু চীন ও ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতকে আক্রমণ করে চীন প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক বিশ্বকেই আক্রমণ করেছে এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের স্বার্থেই ভারতকে আজ জয়ী হতে হবে। মালয়ের প্রধানমন্ত্রীও একই ভাবে বলেছেন, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, সমগ্র এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম। তাই সমস্ত এশিয়াই আজ ভারতের সমর্থক। মালয়ের অন্যতম মন্ত্রীর সহধর্মিণী শ্রীমতী দাতিন শম্বানাথন রাষ্ট্রীয় সফর কালে গত ৩০শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে রক্তদান করেছেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের কল্যাণে। এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু ভারত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং ঘোষণা করছে যে, এই রক্তের পবিত্র বন্ধনে নতুন করে সূচিত হ'ল ভারত ও মালয়ের আত্মীয়তা।

॥ প্রতিরক্ষা দপ্তর ॥

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে স্বয়ং প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রাথমিক বিপর্যয়ের জন্য দেশবাসী প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনবধানতাকেই দায়ী করে এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজ হস্তে ঐ দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আবেদন জানায়। উপযুক্ত সময়েই প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। আজ আর কোন দেশভক্তের মনে কোন অভিযোগ রইল না। অকুণ্ঠভাবেই সকলে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা প্রয়াসকে সর্ব-সামর্থ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারবেন। চীনের ভারত আক্রমণ ও আক্রমণকারী চীনকে রাশিয়ার সমর্থন এবং সেই সঙ্গে

॥ কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ॥
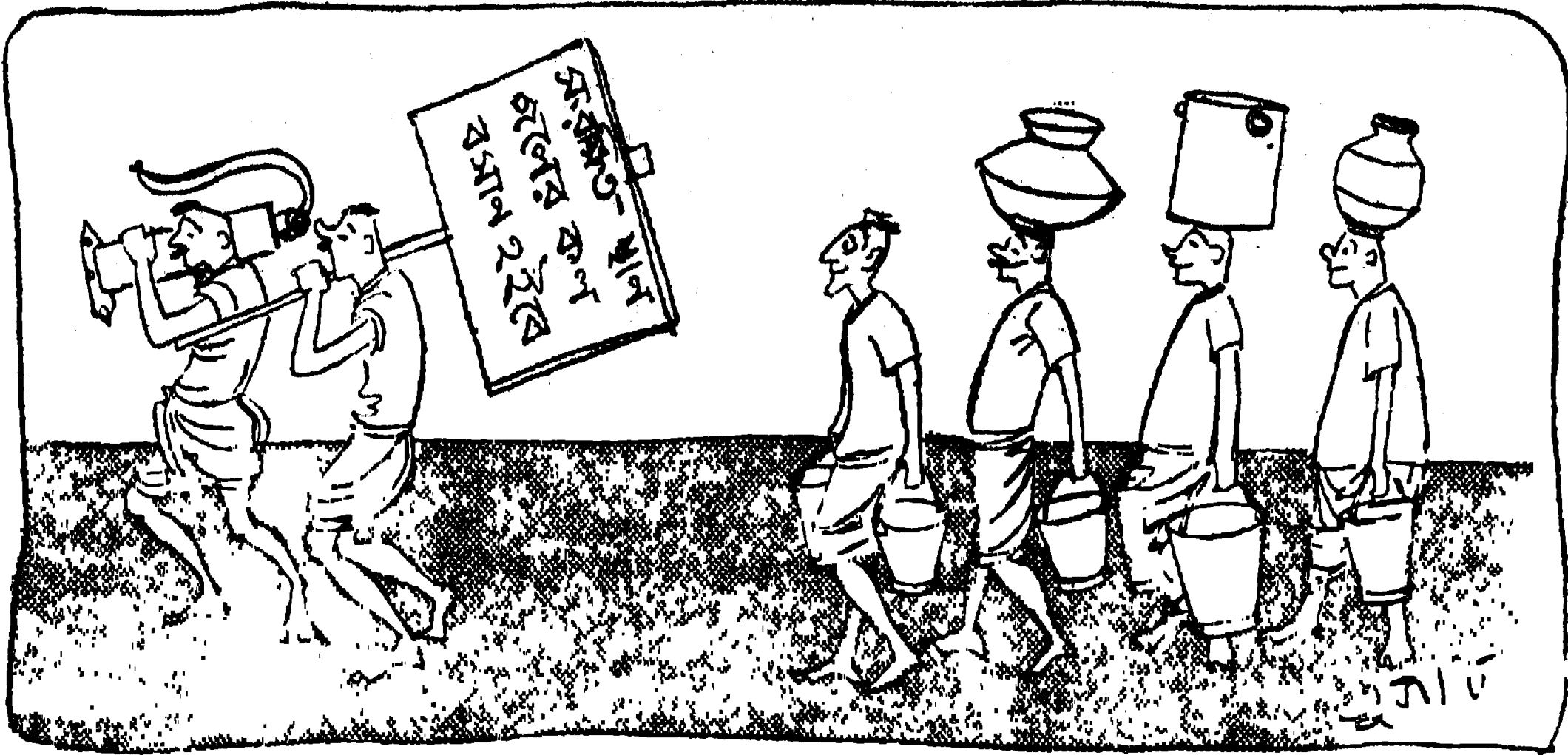
ভারতকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পরিবর্তন অতি দ্রুতগতিতে ঘটে গেছে তাতে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব এখনও শ্রীমেননের হাতে থাকাটা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ হত। আমরা উপযুক্ত মুহূর্তে ভারত সরকারের এই যথোচিত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।

॥ রাশিয়ার মনোভাব ॥

ভারত সীমান্তের উপর চীনের দাবী সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন গত কয়-বছর সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে আসছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নীরবতার একটা বিশেষ নৈতিক মূল্য ছিল ভারতের কাছে। কমিউনিস্ট শিবিরভুক্ত চীনের সঙ্গে অকমিউনিস্ট ভারতের বিরোধে প্রমাণ হচ্ছিল যে, ভারতের বিরুদ্ধে চীনের দাবী সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি। এই মনোভাব যদি চীনের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হওয়ার পরেও সোভিয়েট ইউনিয়ন অপরিবর্তিত রাখতেন তবে কমিউনিস্ট চীনের উপর এদেশের লোক বীতশ্রদ্ধ হলেও কমিউনিজমের উপর হয়ত সম্পূর্ণ আস্থা হারাত না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার পূর্বের নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে আক্রমকারী চীনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। অতীতে বহু প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার পরম সুহৃদরূপে পেয়েছে, তার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ এই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনের মুহূর্তে দেখা গেল সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত-আক্রমণকারী চীনের বন্ধু। ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও কয়েক সহস্র ভারতীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করে চীন যে আত্মসমর্পণের তিন দফা শর্ত পেশ করেছিল ভারতের কাছে, তাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ গঠনমূলক প্রস্তাব বলে সমর্থন জানিয়েছেন এবং ভারতকে বলেছেন কোন শর্ত আরোপ না করে চীনের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই আলোচনা শুরু করতে। অর্থাৎ, রাশিয়ার দাবী আজ, "সাম্রাজ্যবাদ"-সৃষ্ট সীমান্ত বজায় রাখার জিদ না করে ভারত যেন অবিলম্বে বিনা শর্তে চীনের তিন দফা "গঠনমূলক" প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, পররাজ্য আক্রমণকারী চীনকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই আমরা করব না। আর রাশিয়া যতদিন তার বর্তমান মনোভাব অপরিবর্তিত রাখবে ততদিন আমরা তাকে আমাদের শত্রুর বন্ধু বলেই মনে করব।

॥ জেনারেল দ্য গল ॥

ফ্রান্সের সবকটি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনারেল দ্য গল গণভোটে জয়ী হয়েছেন। দ্য গল অবশ্য এই জয়কে শুধু সাফল্যই বলেছেন, বিরাট জয় বলে মনে করেননি। কারণ তিনি বলেছিলেন, তাঁর পক্ষে যদি ফ্রান্সের ভোটদাতাদের শতকরা ষাটটি ভোট প্রদত্ত হয় তবে তাকে তিনি শুধু সাফল্য বলে মনে করবেন। আর জয়ী হয়েছেন বলে ভাবতে পারবেন যদি শতকরা পঁয়ষট্টি ভোট তাঁর পক্ষে পড়ে। তিনি কিঞ্চিদধিক শতকরা একষট্টি ভোট পেয়েছেন। কিন্তু যে বিরাট রাজনৈতিক বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি এত ভোট পেয়েছেন তাতে এ সাফল্যকেও তিনি অনায়াসে বিপুল সাফল্য বলে মনে করতে পারতেন।

ঠিক নির্বাচনের পূর্বে কিউবাকে কেন্দ্র করে যে আন্তর্জাতিক সংকটের সৃষ্টি হয় সেটা দ্য গলের সাফল্যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বলে মনে হয়। চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি-পদ সৃষ্টির পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে ফ্রান্সের জনসাধারণ এই কথাটাই জানালেন যে, দৃঢ় হস্তে স্থায়ী শাসনব্যবস্থাই তাদের কাম্য। ক্ষণভঙ্গুর সংসদীয় রাজনীতির সেই পুরাতন দিনে আর তারা ফিরে যেতে চান না।

॥ ডঃ সুরেন সেন ॥

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোকগমন করলেন। অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জাতীয় দলিলাগারের অধ্যক্ষ রূপে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই পণ্ডিত আপন প্রতিভাবলে স্বীয় মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মহারাষ্ট্রের ইতিহাসকাররূপেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছত্রপতি শিবাজী, মারাঠীদের শাসন-প্রণালী, মারাঠাদের যুদ্ধ-প্রণালী, শিবাজীর জীবন সম্বন্ধে বিদেশী গ্রন্থকারগণ। এগুলি সবই ইংরেজি ভাষায় লেখা। তাঁর বাঙলা রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য 'অশোক', 'হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়' ইত্যাদি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়েও তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : নেফা অঞ্চলে চীনা হানাদারদের ত্রিমুখী অভিযানের বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের বীরোচিত সংগ্রাম—প্রচণ্ড লড়াই-এর পর হিমালয়ের মঠ-শহর তাওয়াং ত্যাগ—লডাকের চুসুলে চীনা আক্রমণ প্রতিহত ও একটি ঘাঁটি হইতে শত্রু বিতাড়িত।

২৫শে অক্টোবর—৮ই কার্তিক : 'নেফা অঞ্চলের সাময়িক বিপর্যয়ে হতাশার কারণ নাই'—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা। রাষ্ট্রপতির (ডঃ রাধাকৃষ্ণণ) দাবী : চীনা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

হানাদার চীনা বাহিনী কর্তৃক নেফার সিয়াং ডিভিশনে ভারতের আরও দুইটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি আক্রান্ত—ভারতীয় সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধ।

'প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) স্বহস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ করুন'—শ্রীরাজাগোপালাচারীর দৃঢ় দাবী।

২৬শে অক্টোবর —৯ই কার্তিক : সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা—চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স জারী—শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) নেতৃত্বে আপৎকালীন মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন।

নেফার বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি—জং-এ প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও বহু চীনা সৈন্য হতাহত—ওয়ালঙের নিকটে দুইটি চীনা আক্রমণ প্রতিহত করার সংবাদ।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে জনচিত্তে দুর্জয় সংকল্প—চীনা হানাদারদের বিতাড়নের জন্য সর্বত্র প্রস্তুতি—ময়দানে (কলিকাতা) বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান— সভাপতি : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

আপৎকালীন অবস্থাধীনে দেশের সমস্ত উপ-নির্বাচন (লোকসভা ও বিধানসভা) বাতিল—নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা।

২৭শে অক্টোবর—১০ই কার্তিক : নেফার তিনটি এলাকায় শত্রুসৈন্য (চীনা) পর্যুদস্ত—লডাক রণাঙ্গনের অপরিবর্তিত অবস্থা।

বিভিন্ন বন্ধু-রাষ্ট্রের নিকট ভারতের অস্ত্র প্রার্থনা—প্রেসিডেন্ট কেনেডির (আমেরিকা) নিকট শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত পত্র।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত—চেয়ারম্যান : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন।

২৮শে অক্টোবর—১১ই কার্তিক : লডাকে তীব্র চীনা আক্রমণ প্রতিহত—চাংলা ছাড়া সব ঘাঁটিতেই ভারতীয় সৈন্যের অপূর্ব বীরত্ব।

কলিকাতায় বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় চীনাগণ কর্তৃক কম্যুনিস্ট হানাদারদের (চীনা) তীব্র নিন্দা।

কংগো হইতে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরাইয়া আনার দাবী—প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ জেঃ থিমায়ার প্রস্তাব।

টাকীতে (২৪-পরগণা) পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রথম মফঃস্বল বৈঠকের অনুষ্ঠান—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানকল্পে দেশবাসীর প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের আহ্বান জ্ঞাপন।

২৯শে অক্টোবর—১২ই কার্তিক : ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্যদানে আমেরিকা প্রস্তুত—শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট কেনেডির পত্র—সপ্তাহকাল মধ্যেই মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের প্রথম চালান ভারতে পৌঁছিবে বলিয়া আশ্বাস দান—অস্ত্রবাহী দুইখানি বৃটিশ বিমানের ভারত যাত্রা।

নূতন সৈন্য আনিয়া লডাকে চীনা হানাদারদের প্রবল চাপ—ভারতীয় বাহিনীর দামচক ও জারা-লা ত্যাগ—নেফা রণাঙ্গনের স্থানে স্থানে উভয় পক্ষে গুলী বিনিময়।

'আক্রমণকারী চীনের সহিত এখনই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে না'—শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৩০শে অক্টোবর—১৩ই কার্তিক : নেফায় ভারতীয় সৈন্যদের পাল্টা আঘাত শত্রুর—জং-এর নিকট চীনা ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ—ভারতের সর্বপ্রথম কামান ও মর্টার ব্যবহার।

'সকল রণাঙ্গনেই ভারতীয় বাহিনী শত্রুদের (চীনা) প্রতিরোধ করিতে পারিবে'—ভারতীয় স্থল সৈন্যাধ্যক্ষ জেঃ পি এন থাপারের ঘোষণা।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের (৭২) জীবনাবসান।

৩১শে অক্টোবর—১৪ই কার্তিক : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) হস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারার্পণ—শ্রীমেননকে (এ যাবৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) প্রতিরক্ষা উপকরণ উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত।

লডাক ও নেফা রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত—জং-এর নিকট চীনা ঘাঁটির উপর আবার গুলীবর্ষণ।

ভারতে চীনাদের অবাঞ্ছিত কার্য বন্ধের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী।

॥ বাইরে ॥

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট কর্তৃক কিউবা ব্যাপারে রুশ-মার্কিন বিরোধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব—দুই-তিন সপ্তাহের জন্য ক্রুশ্চেভকে (রুশ প্রধানমন্ত্রী) কিউবায় অস্ত্র প্রেরণ এবং কেনেডিকে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) অবরোধ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার অনুরোধ জ্ঞাপন।

২৫শে অক্টোবর—৮ই কার্তিক : কিউবাগামী সোভিয়েট জাহাজের গতিরোধ ও পরে যাইতে অনুমতি দান—মার্কিন সরকারের ঘোষণা—অন্ততঃ ১২ খানি সোভিয়েট জাহাজের প্রত্যাবর্তন।

'সীমান্ত বিরোধ (চীন-ভারত) সম্পর্কে সর্বশেষ চীনা প্রস্তাব গঠনমূলক'—সোভিয়েট সরকারের মুখপাত্র প্রাভ্‌দার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য—শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধ মীমাংসার সুপারিশ।

২৬শে অক্টোবর—৯ই কার্তিক : শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট নাসেরের (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) দ্বিতীয় দফা লিপি প্রেরণ।

রাষ্ট্রসংঘে চীনকে গ্রহণের প্রস্তাবে ভারতের সমর্থন দান।

২৭শে অক্টোবর—১০ই কার্তিক : 'কিউবায় সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিসমূহ না ভাঙিলে আলোচনা হইতে পারে না'—ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) প্রস্তাবের উত্তরে আমেরিকার স্পষ্টোক্তি।

২৮শে অক্টোবর—১১ই কার্তিক : কিউবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি অপসারণে ক্রুশ্চেভের নির্দেশ—কেনেডির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) নিকট সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর পত্র—রুশিয়াকে কেনেডির আশ্বাস : আমেরিকা কিউবা আক্রমণ করিবে না।

ফ্রান্সে দ্য গলের (প্রেসিডেন্ট) প্রস্তাবের (প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা ফ্রান্সের ভাবী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন) উপর গণভোট গ্রহণ।

২৯শে অক্টোবর—১২ই কার্তিক : ভারতকে বৃটেন ও আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাবে পাকিস্থানের গাত্রদাহ—পাক্ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি কর্তৃক কার্য-ব্যবস্থার বিরোধিতা।

৩০শে অক্টোবর—১৩ই কার্তিক : বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ ও প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান কর্তৃক ভারতকে পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য করার আশ্বাসদান।

'চীনকে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে'— রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীচক্রবর্তী কর্তৃক আলোচনার ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য বিশ্লেষণ।

কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করার সোভিয়েট প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে পুনরায় অগ্রাহ্য।

৩১শে অক্টোবর—১৪ই কার্তিক : চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ অবসানে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরের ৪-দফা প্রস্তাব।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ সাগরসঙ্গমে ॥

রবীন্দ্র-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে-সব গবেষণা ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্য চিরকালিক। বহু বিশিষ্ট পন্ডিত রবীন্দ্র-সাগর মন্থন করে রত্নরাজি অন্বেষণ করেছেন। বিভিন্ন ভাবে, বিচিত্র ভঙ্গিতে তা প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্রানুরাগী সাহিত্য-পাঠকের যে অনেক সুবিধা হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য।

অনেক সংকলন-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের সাহিত্য-সাধকরা যে-সব আলোচনা করেছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে সেই সমস্ত সংকলন-গ্রন্থে তা সংযোজিত হয়েছে। আলোচনাকারীরা এ যুগের দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার করেছেন, মুগ্ধ ভক্তের অনুরাগ, বিস্ময় এবং উচ্ছ্বাস থেকে সে সব রচনা যে সর্বদা মুক্ত তাও বলা যায় না।

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বিশেষ শ্রম সহকারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের সমকালীনরা যে সব আলোচনা করেছিলেন তা সংকলন করে 'রবীন্দ্র-সাগরসঙ্গমে' সম্পাদনা করেছেন। তা ছাড়া এই গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় টীকা, টিপ্পনী ও মন্তব্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় সাহিত্যানুরাগী ও গবেষক উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই এক মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচ্য হবে।

সম্পাদক এই সমস্ত রচনাদি বিভিন্ন প্রাচীন পত্র-পত্রিকা বা দুর্লভ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই সব রচনাদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত না হওয়ায় এবং গ্রন্থাদি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে কালক্রমে বিস্মৃতির অতলগর্ভে হয়ত লীন হয়ে যেত, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সেকালের সাহিত্য-সমালোচকবৃন্দ কি ভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের চোখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন যথাযথ বা অসার্থক হয়েছিল তা জানার সুযোগ পাওয়া যাবে 'রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে।

চন্দ্রনাথ বসু ১৩০৭ সনের ৩০শে শ্রাবণ অর্থাৎ আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখেছিলেন 'কণিকা, কথা, কল্পনা ও ক্ষণিকা' পর পর পাঠ করার পর—তার শেষাংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি, যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্ধ্বদেশের— মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।"

তরুণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবীণ চন্দ্রনাথ সেদিন যেকথা বলেছিলেন তা আক্ষরিকভাবে সত্য। কে পারে রবীন্দ্র-সাগরের পরিমাপ করতে? প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন ১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায়। সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই সমালোচনা সহ্য হলেও নিত্যকৃষ্ণ বসু সহ্য করতে পারেন নি, তিনি প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনাকে 'মানসী মঙ্গল কাব্য' বলে ব্যঙ্গ করেছেন এবং 'ভক্ত ও গোঁড়া মহাশয়দিগের অযথা স্তুতিবাদে কাব্যরাজ্য উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে' বলে আক্ষেপ করেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কিন্তু 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন "রবিবাবুর এই বই অতঃপর 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধহয়, ভাল হয়। কারণ তাঁহার এই 'চোখের বালি' বঙ্কিমবাবুর হউক, তাঁহার হউক আর যাহারই হউক, বঙ্গদর্শনের মুখে চুনকালি মাখিয়া দিতেছে। তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত। মাসে মাসে পূর্ব নামজাদা 'মান্যমান' লোকের মুখময় চুনকালি মাখানটা ভাল দেখায় কি?"

১২৯৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রবাবুর গল্প' এই শিরোনামায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের' সম্পর্কে লিখেছেন—"রবীন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র গল্পগুলি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহার বলিবার প্রণালী চমৎকার, তিনি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লিখিতে পারেন, সুতরাং তাহাতে বেশ আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু তাঁহার বলিবার বিষয়ের বড় অভাব।"

যে-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

'কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব?" তাঁহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র, সে রবিবাবুর minus প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু! শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু দুর্নীতি plus শক্তি বড় ভয়ঙ্কর!"

সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পাঠ করে এমনই মুগ্ধ হন যে অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

গোরা উপন্যাসখানি Vicar of Wakefield-এর ধরণে লিখিত। ইহা শুধু উপন্যাস নহে। ধর্মগ্রন্থ। একদিকে যেমন ৬০০ পৃষ্ঠা পড়িতে পড়িতে কেবল কৌতূহল বাড়িতে থাকে এবং পাঠ অসমাপ্ত করিয়া উঠিতে অনিচ্ছা হয়, অন্যদিকে ইহা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। এ উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব।"

দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যুক্তি করেন নি, আজো বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষের উপন্যাস বিভাগে 'গোরা'কে অতিক্রম করার মত উপন্যাস প্রকাশিত হয় নি। একথা একজন বিখ্যাত সমালোচকের উক্তি!

'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি-নাট্যের অভিনয় দর্শনান্তে 'পঞ্চানন্দ' বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে-রিপোর্ট রচনা করেন, তা এক হিসাবে এক অপূর্ব দলিল, এই জাতীয় রচনা-রীতির বর্তমানে প্রচলন নেই, কিন্তু মুন্সিয়ানায় ও সাহিত্যরসে যে অসামান্য সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'তে ফাল্গুন ১২৮৭ সালে লিখেছিলেন—"যেখানে বাল্মীকির কাব্যপ্রভা, যেখানে মূর্তিমতী প্রতিভা (প্রতিভাসুন্দরী দেবী), যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ শোভা—সে যদি স্বর্গ না হয়, তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করিতে হয়।"

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১২৯০ সালের ২রা আষাঢ় 'এডুকেশন গেজেট' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'প্রভাত সংগীতে'র সমালোচনায় বলেছেন—রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রকৃত আর্য কবি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 'আর্য কবি' বলিলাম এইজন্য যে, তাঁহার হৃদয় প্রকৃতি-শোভার প্রতি অবিকল সেই ভাব ধারণ করে, যাহা প্রাচীন আর্য কবিদের হইত!" বিস্তারিত সমালোচনা এবং প্রচুর উদ্ধৃতি, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সমালোচক যেখানে কবির সঙ্গে একমত ন'ন সেখানে নিজে কবিতাটির পরিবর্তিত আকার রচনা করে কি হওয়া উচিত, তা বলেছেন। এই জাতীয় সমালোচনা আজ কোথায়?

বিরূপতারও অভাব নেই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রভৃতিরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অস্বীকার করার চেষ্টা করে নিজেদেরই হিমালয়সদৃশ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। সুরেশ সমাজপতিকে বাংলা সাহিত্যের অভিভাবক হিসাবে অনেকে আজো উল্লেখ করেন, কিন্তু যিনি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা'র অন্ধ অনুকরণ 'চোখের বালি' মনে করেন, তাঁর সাহিত্য-জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। এই কারণে কিছু রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনাকে এদিনের শান্ত পরিবেশে বিচার করলে নিছক গাত্রদাহ ভিন্ন আর কিছু মনে করার হেতু নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল, হয়ত 'প্রোফেসন্যাল জেলাসি'ও ছিল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল শিল্পী হিসাবে মহৎ তাই তাঁর 'গোরা' উপন্যাসকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে বাধেনি।

অমরেন্দ্র রায়কে আজও যে মানুষ স্মরণে রেখেছে সে শুধু রবীন্দ্রনাথকে তিনি রবিয়ানায় অসংখ্য কটু উক্তি করেছিলেন বলে। অরসিক রায় এই ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন ডঃ শচীন সেন (বর্তমানে ইন্ডিয়ান নেশন-এর সম্পাদক), সজনীকান্ত দাশ সেই ছদ্মনামের আড়ালে রবীন্দ্রনাথকে ঠুকেছিলেন সেও আর এক প্রকারের গাত্রদাহ। তবে, সজনীকান্ত কবির জীবদ্দশায় নিজের ত্রুটিস্বীকার করে পরে আন্তরিক রবীন্দ্র-প্রীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায় এই সব আলোচনা একত্র সাজিয়ে পরিবেশন করার ফলে নিরপেক্ষ পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধা হবে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নিত্যকৃষ্ণ বসু, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (গল্পকার), রমণীমোহন ঘোষ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, চন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুখরঞ্জন রায়, নিশিকান্ত দেব, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সরসীলাল সরকার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বসু, মোহিতলাল মজুমদার, রাজশেখর বসু এবং যাঁদের নাম আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত, এমন সাইত্রিশজন লেখকের প্রবন্ধ ব্যতীত পরিশিষ্ট বিভাগে আরো একত্রিশ জনের আলোচনা আছে যাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উল্লেখনীয়। এ ছাড়া সাহিত্য, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী, মালঞ্চ, অর্চনা, কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রালোচনা ও পত্রিকাগুলির পরিচয়ও আছে। প্রাচীনকালের এই সব লেখকগণের চিত্র-সম্বলিত হওয়ায় গ্রন্থটি আরো আকর্ষণমূলক হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় পর্বে বাংলা সাহিত্যে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে, বিশু মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে' তা অশেষ শ্রমসহকারে একত্রে সন্নিবেশিত করার জন্য অভিনন্দনযোগ্য। ভারত সরকারের গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যের মন্ত্রণালয় এই গ্রন্থের আংশিক ব্যয়ভার বহন করায় ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

রবীন্দ্র-সাগরসঙ্গমে ॥ বিশু মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সনস্ লিঃ ; কলিকাতা ১২ ॥ দাম দশ টাকা

নতুন বই

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (১৯৫৯-১৯৬০)— (বাংলা বিভাগ) **বি, এস কেশবন সম্পাদিত। সহঃ-সম্পাদক—সুনীলবিহারী ঘোষ ও অশোককুমার বিশ্বাস। স্টেট ব্যুরো অব এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৭·৫০ নয়া পয়সা।**

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৭-র অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের তালিকা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যের উন্নয়ন এবং গবেষণা ও পঠন-পাঠনে'র সুবিধার জন্য ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক কার্য মন্ত্রণালয় যে-সব প্রধান পরিকল্পনা এই গ্রন্থ-পঞ্জী প্রকাশ তার

অন্যতম। এই নূতন পরিকল্পনানুসারে জাতীয় গ্রন্থাগার যে সমস্ত গ্রন্থাদি পেয়ে থাকেন এই গ্রন্থ-পঞ্জী তারই এক প্রামাণ্য তালিকা। প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদি ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদিও এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র স্বরলিপি, মানচিত্র, পত্রিকা ও সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তকের অর্থ, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশন যথা ক্যাটালগ, আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্রচার-পুস্তিকা, সস্তা ধরণের উপন্যাস প্রভৃতি এই তালিকা বহির্ভূত। প্রতি তিন মাস অন্তর একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের প্রচেষ্টা আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রথম। এই গ্রন্থপঞ্জী দুভাগে বিভক্ত। বিষয়ানুযায়ী বর্গীকৃত অংশ এবং বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট আর এক অংশ। বর্গীকৃত বিভাগস্থ গ্রন্থগুলি ডিউই-দশমিক বর্গীকরণের প্রামাণ্য সংস্করণানুযায়ী অনুসৃত। কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর প্রাপ্ত গ্রন্থ গ্রন্থকারের নামানুসারে বিন্যস্ত। গ্রন্থকারের একাধিক গ্রন্থ উল্লেখ কালে তাঁর নামের পুনরাবৃত্তি করা থাকে না। অভারতীয় গ্রন্থকারদের নাম প্রথমে বাংলায়, পরে বন্ধনীর মধ্যে রোমান অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। নির্ঘণ্ট অংশে গ্রন্থকারের নাম, বিষয়, সম্পাদক, অনুবাদক, গ্রন্থমালা ইত্যাদি সকল প্রকার তথ্য বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। এই গ্রন্থ-সংকলনের মধ্যে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকাও দেওয়া আছে।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে একটি প্রকাশক তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য এবং ডেলিভারি অব বুকস অ্যান্ড মিউজপেপার্স (পাবলিক লাইব্রেরিস অ্যাক্ট) সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থপঞ্জীটির মূল্য অধিকতর বর্ধিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বি, এস, কেশবন মহাশয় বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে তাঁর নিষ্ঠা ও নিরলস শ্রমের জন্য সুপরিচিত। এই মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জীটি যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে তিনি যে বলিষ্ঠ কল্পনা-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর সহকারীবৃন্দের কৃতিত্বও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার্য। সাহিত্য-সাধক, পাঠক, পাঠাগার পরিচালক, প্রকাশক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাহিত্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে গ্রন্থপঞ্জীটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

মধুসূদন ও উত্তরকাল— (সংকলন গ্রন্থ) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ানা—কলিকাতা—১২। মূল্য—পাঁচ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম, অবিস্মরণীয় চরিত্র। মধুসূদন দত্তের বিচিত্র জীবনী প্রসঙ্গে বা তাঁর কবি-কৃতি সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুসূদনের উত্তর-সূরীদের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন নিঃসংশয়ে মূল্যবান।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরপক্ষ' সংকলনটি সম্পাদনা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, 'মধুসূদন ও উত্তরকালে' তাঁর পূর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রইল। এই সংকলনে বিষ্ণু দের 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স', রবীন্দ্রনাথ রায়ের 'মধুসূদনের পত্র-সাহিত্য', কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য', আলোক সরকারের চতুর্দশপদীর ভূমিকা', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'মধুসূদন ও আধুনিক মন', অশ্রুকুমার সিকদারের 'মেঘনাদবধ : কাব্য-নাট্যের সম্ভাবনা', মানস রায়চৌধুরীর 'কবিত্বের মূল্যায়ন ও মধুসূদন', কৃষ্ণ ধরের মধুসূদন : প্রথম স্বধর্মী কবি', অতীন্দ্র মজুমদারের—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মাইকেল, মনুষ্যত্ব ও সাম্প্রতিক চিন্তা' প্রভৃতি দশটি নির্বাচিত প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। সূচীপত্রের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মধুসূদনের প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে এ যুগের শক্তিমান সাহিত্য-সাধকেরা আলোচনা করেছেন। প্রতিটি আলোচনার মধ্যে আছে বিশ্লেষক বৈচিত্র্য। বিষ্ণু দের 'মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধটি দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ, প্রবীণ কবি বিষ্ণু দে বলেছেন যে শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বিত শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি' একথা ঠিক। মধুসূদনের প্রতিভার সুযোগ আমরা যেন হেলায় হারিয়েছি। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'মধুসূদন ও আধুনিক মন' প্রবন্ধটিও মূল্যবান। তিনি বলেছেন 'মধুসূদনকে আমরা সাম্প্রতিকতার সংস্কার নিয়ে স্পর্শ করতে গেলে তিনি ধরা দেবেন না।' একথা প্রণিধানযোগ্য। অশ্রুকুমার সিকদারের 'মেঘনাদবধ : কাব্য-নাট্য সম্ভাবনা' প্রবন্ধটিও সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। পরিশেষে অতীন্দ্র মজুমদারের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাইকেল, মনুষ্যত্ব ও সাম্প্রতিক চিন্তা' প্রবন্ধ দুটিতে মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের পুনর্বাসনের জন্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। মণীন্দ্র মিত্রের প্রচ্ছদটি প্রশংসনীয়।

শতাব্দী শতক— (কাব্য-সংকলন)— সম্পাদনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কাব্য সংকলন। ১৮৬১-১৯৬১ পর্যন্ত কালসীমার এক'শ জন কবির কবিতা আছে। বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে কবিতা-রচনায় যে বিবর্তন ধারা অন্তরালে সক্রিয় ছিল তা সহজেই এই সংকলন থেকে উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তরুণতম ক্ষমতাশালী কবিদের স্থান লাভ। এ ধরণের কাব্য-সংকলনে যে সমস্ত পূর্বসূরীর রচনা স্থান পায় আধুনিক কাব্য-পাঠকের রুচিবোধের সঙ্গে তার মিল না হলেও কাব্য-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য কবিতা-গুলির প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। সম্পাদকদ্বয় বিহারীলাল থেকে শুরু করে কাব্য-জগতের তরুণতম প্রতিনিধিদের তুলে ধরেছেন তা সুযোগ্যতা ও সুবিবেচনা প্রসূত। ভূমিকাটি সুলিখিত।

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে— জন স্টুয়ার্ট মিল। অনুবাদক—অধ্যাপক রাখাল দত্ত। প্রকাশক : সমাজ বিদ্যাভবন; মূল্য ১.০০

জন স্টুয়ার্ট মিল নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতে এক উজ্জ্বল প্রতীক, এবং 'অন লিবার্টি' তাঁর মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের সর্বৈব মুক্তির জন্য মিলের এই গ্রন্থটি বহু সমাদৃত। ছাত্রদের কাছেও এই অনুবাদটির সমাদর হবে, আশা করা যায়।

অনুবাদের ভাষা পরিষ্কার। ছাপাও সুন্দর।

গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি— জন এইচ হলওয়েল। অনুবাদক—শ্রীঅধীরকুমার রাহা। প্রকাশক : সমাজ বিদ্যাভবন; মূল্য '৭৫ নয়া পয়সা।

গণতন্ত্রের বিষয়ে নানারকম চিন্তা আছে। বিশিষ্ট অধ্যাপক জন হলওয়েলের 'গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি' গ্রন্থটি লেখকের রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার বিশিষ্ট রূপায়ণ। লেখকের মতে গণতন্ত্র হিব্রু-

গ্রীক ও খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি। সেই ঐতিহ্যের প্রকৃতির নীতি ও মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতিরূপ ব্যতীত এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

বর্তমানে গণতন্ত্রের সংকটাবস্থায় এই সুমুদ্রিত অনুবাদটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সামূহিক বিকাশ— এস, কে, দে, থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড : দাম ন' টাকা।

ভারতের সমাজ জীবন ও অর্থনীতিতে নানাবিধ বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে চলেছে। শ্রীযুক্ত এস, কে, দে ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়াও কর্মব্যপদেশে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। নানা সময়ে তিনি দেশের সামাজিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপরে বহুবিধ মতামত প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করেছেন। 'সামূহিক বিকাশ' বইখানি তাঁর ইংরাজীতে লেখা নিবন্ধসমূহের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। শ্রীযুক্ত হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ প্রশংসনীয়, শ্রীযুক্ত এস, কে, দে স্বদেশের জাতীয় সম্প্রসারণ স্কীমের অগ্রগমনের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের একজন যোগ্য অংশীদার হিসাবে বহু জটিল সমস্যার সরল সমাধান রেখেছেন। তথাপি বহুবিধ মতামত ও মনোভাব অতিউক্তির বাক্যবিন্যাসে বিবৃত বলে অতিসরলীকরণ মনে হতে পারে। বইখানি সুমুদ্রিত, কিন্তু উচ্চ মূল্যের।

নীরজা: মহেশ ভরদ্বাজ : বি বি প্রকাশনী : ৭৬।২ (X—১) কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ : দাম পাঁচ টাকা।

সম্প্রতি উপন্যাসে মননধর্মিতার পক্ষে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং যেহেতু সেটা ঝোঁক, তাই মননশীলতার রসদ সংগ্রহ না করেই বিপক্ষজনক 'মননশীল' উপন্যাস তরুণতরদের হাত দিয়ে সচারাচর বার হচ্ছে যার পক্ষে কিছু বলা বেশ কঠিন। মহেশ ভরদ্বাজের 'নীরজা' যদি ব্যতিক্রম হ'ত তবে সুখী হবার কারণ থাকতো। যে প্রশ্ন "নার্সিং হোমে" গিয়ে সমাধান হয়ে যেতে পারে তার জন্য এত পরিশ্রম ও মননশীল বিশ্লেষণের কি দরকার ছিল তা বোঝা যায় না। এই রকমের সমাধান বহু আগেই করা যেত এবং তাতে চরিত্র, যদি কোন চরিত্র তৈরি হয়ে থাকে, ধার ও আলো হারাতো না। তবে লেখকের বাংলা লেখার ক্ষমতার প্রশংসা করতেই হয়। বেশ ঝরঝরে বাংলা তিনি লিখতে পারেন। এইটে আবার দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে যখন দেখি চারপাশে চিন্তার আকালের দিনে আরও একজন অনাথের সংখ্যা বাড়লো। তবু এই উপন্যাস এক নিশ্বাসে পড়া যায়। এই লেখকের কাছে পাঠকেরা কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন।

রাগরূপ: সুনীল চট্টোপাধ্যায় : পরিবেশক বামা পুস্তকালয়, ১১-এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ : দাম চার টাকা।

কবি হিসাবে সুনীল চট্টোপাধ্যায় পাঠকদের কাছে পরিচিত। তাই তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। 'নাবী ফসলের' পর 'রাগরূপ' সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু নাবী ফসলের সুনীল চট্টোপাধ্যায় রাগরূপে অন্যভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছেন এবং এই পরিবর্তন কাউকে আশ্বস্থ আবার কাউকে উদ্বিগ্ন করবে। এই পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ না করেও বলা যায় যে, রাগরূপের অধিকাংশ কবিতায় কবির বলিষ্ঠতা বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। চিত্রকল্পের ব্যবহারে ও শব্দ যোজনার দক্ষতায় অনেকগুলি কবিতা হীরক-দীপ্তি অর্জন করতে পেরেছে। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের ভক্ত পাঠকেরা তার কাছ থেকে বড় কিছু আশা করেন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় সচেষ্ট-মেটাফিজিক্যাল এবং করুণ ধোঁয়াটে আবিলতায় ধিক্কার হেনে তিনি কি নিষ্ঠার প্রগাঢ় কণ্ঠস্বর শোনাতে পারেন না?

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বৈতানিক (শারদ সাহিত্য সংকলন)— সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

বর্তমান সংখ্যা 'বৈতানিক' পূর্ববর্তী সংখ্যার থেকে আরও আকর্ষণীয় ও সুসজ্জিতরূপে প্রকাশিত। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, আদিত্য ওহদেদার, জরাসন্ধ, গুরুদাস ভট্টাচার্য, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, জাঁ পল সার্ত্রে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, ডি এচ লরেন্স, শার্ল বদলেয়র, পল এলুয়ার, রবার্ট গ্রেভস, রবার্ট ফ্রস্ট, হো চি মিন এবং আরো অনেকের লেখায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটি নানাবিধ কারণে উল্লেখযোগ্য।
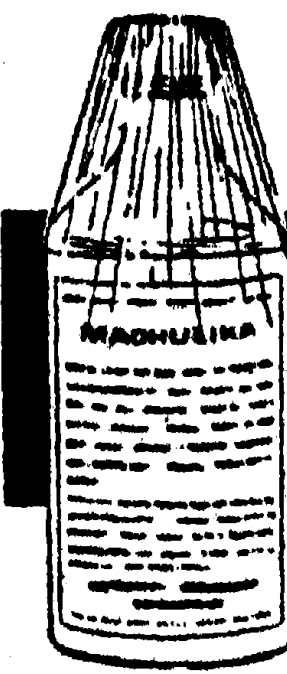
আমাদের গ্রাম (শারদীয়া : ১৩৬৯)— সম্পাদক শতদল গোস্বামী ও সুনীল ভট্টাচার্য। ৪।২, পি ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫, থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা মাত্র।

এই অভিজাত ষাণ্মাষিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাটি সুনির্বাচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা এবং ফটো, কার্টুন, স্কেচ প্রভৃতির সম্ভারে সজ্জিত। প্রায় প্রতিটি রচনাই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—বনফুল, পরিমল গোস্বামী, হাসিরাশি দেবী, মায়া বসু, সুশীল রায়, শতদল গোস্বামী, কৃষ্ণ ধর, সুনীল বসু, অবিনাশ রায়, স্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, দিলীপ মালাকার, অন্নদা মুন্সী এবং আরো অনেকে। সুধীর মৈত্রের অঙ্কিত কভার উল্লেখযোগ্য। মূল্যের তুলনায় কাগজ বাস্তবিকই উৎকৃষ্ট।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

॥ বাঙলার থিয়েট্রীক্যাল যাত্রা ॥

বিডন স্ট্রীটের দক্ষিণ ফুটপাত ধ'রে যদি পশ্চিম মুখো কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের দিক থেকে চিৎপুর রোডের দিকে হেঁটে যাওয়া যায়, তাহলে যেখানে চিৎপুর রোডের মুখে এসে বিডন স্ট্রীটের ফুটপাতটি শেষ হয়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে ঠিক উল্টো দিকে চিৎপুর রোড এবং নিমতলাঘাট স্ট্রীটের মোড়ে একটি দোতলা নীচু বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়, যার দোতলার সরু বারান্দাটি ঐ চিৎপুর রোডেরই ওপরে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখতুম, ঐ দোতলার বারান্দায় কাঠের রেলিংয়ের গায়ে একটি প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড আটকানো; তাতে বড় বড় হরফে লেখা ছিল—মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি, এবং বড়দের মুখে শুনেছিলুম, ঐ মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টিই ছিল সে-যুগের পেশাদারী যাত্রাদলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে চিৎপুর রোড ধ'রে উত্তরমুখো কয়েক পা গেলেই রাস্তার পশ্চিম দিকের কয়েকটি বাড়ীর বারান্দায় আরও কয়েকটি ছোট-মাঝারি সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যেত, যাতে লেখা থাকত—'ভাণ্ডারী অপেরা', 'আর্য অপেরা', 'গণেশ অপেরা', 'বীণাপাণি অপেরা', 'সত্যম্বর অপেরা' প্রভৃতি। সবগুলিই পেশাদারী যাত্রাদলের নাম।
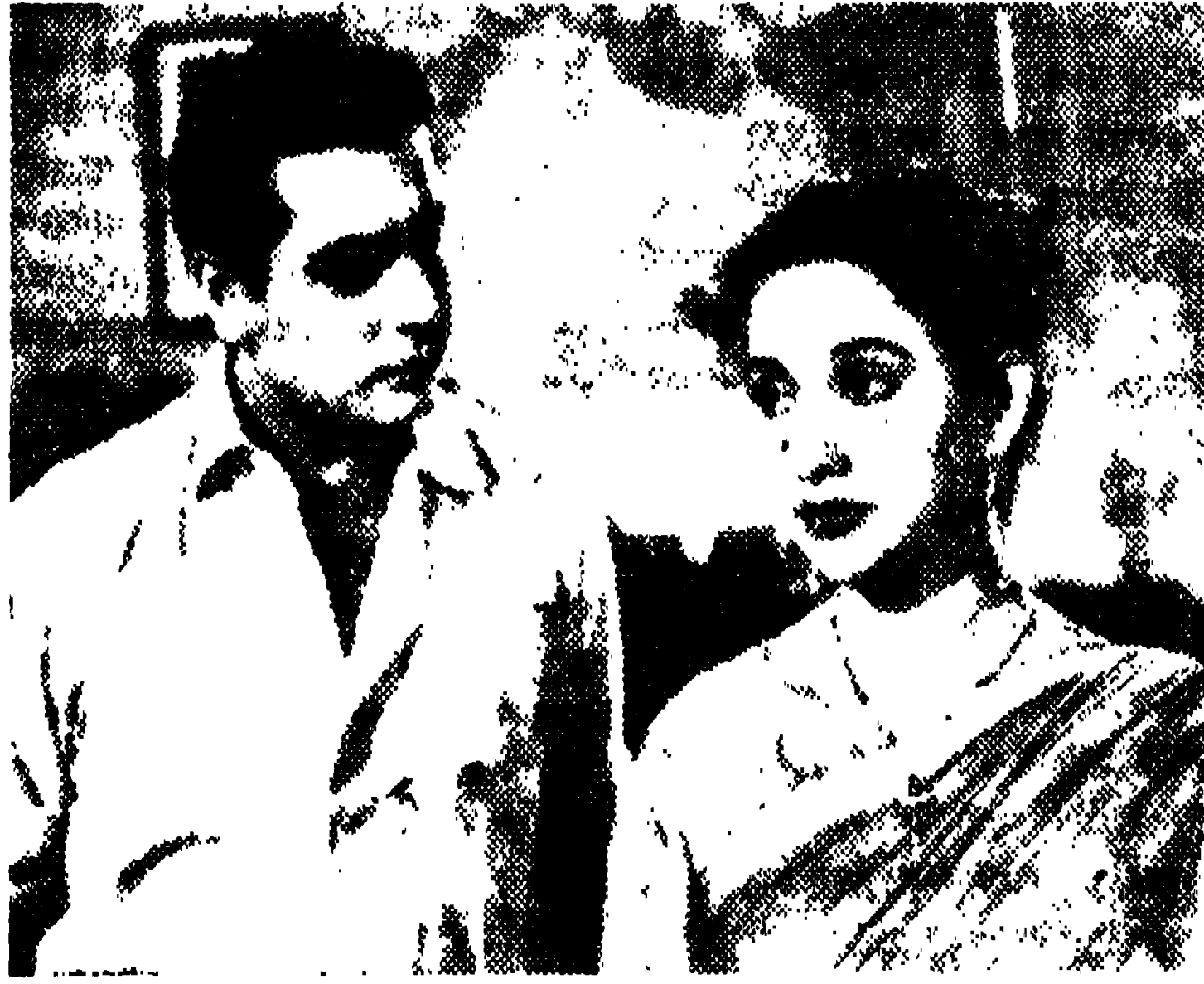
চিৎপুরের এই গরাণহাটা অঞ্চলেই যাত্রা দলের আড্ডা। তখনো ছিল আজও আছে। যে-সময়ের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে ১৯১৪।১৫ থেকে ১৯২০।২১-এর মাঝে। যাত্রাদলগুলির নাম শুনেই কারুরই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, সাধারণ রংগমঞ্চের প্রভাব তখনই ওদের ওপর এসে পড়েছে; খাঁটী 'যাত্রাত্ব' ওরা তখনই হারিয়েছে; কল্‌কাতার পেশাদারী যাত্রাতে তখনই আর জুড়ী-দোহার খুঁজে পাওয়া যেত না। তখনকার আমলের থিয়েটারের ঢংয়ে যাত্রা আরম্ভের আগে দু'বার বাজত কনসার্ট—হার্মোনিয়ম, বেহালা, তবলা ও মৃদংগ, কর্ণেট, ক্ল্যারিওনেট, পিকু, মন্দিরা প্রভৃতি ছিল কনসার্টের অংগ। দ্বিতীয়বার কনসার্ট বেজে যাবার পর একটি পেটাঘড়িতে ঘণ্টা পড়ত এবং আসরে অবতীর্ণ হতেন হয় হর-পার্বতী বা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিংবা দু'জন গৈরিক বসনধারী মুনি-ঋষি; এ'রা নাটকের প্রস্তাবনা স্বরূপ দর্শক-সমক্ষে প্রকাশ ক'রে বলতেন, সে-রাত্রির অভিনয়ে নাটকের বিষয়বস্তুটি কি। অনেক সময় প্রস্তাবনাটি শেষ হ'ত কারুর গানের মধ্যে এবং এই প্রস্তাবনার পরেই আসল পালাটি শুরু হ'ত।

কল্‌কাতার পেশাদারী যাত্রায় জুড়ী-দোয়ার্কি না দেখলেও পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি যাত্রাভিনয়ে—সেগুলি পেশাদারী কিংবা সৌখীন সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল কি না, তা' সঠিক জানা নেই—আমরা ঐ জুরী-দোয়ার্কি-সমেত পূর্ণাংগীণ যাত্রাই দেখেছি।

অগ্রদূতে পরিচালিত 'নবদিগন্ত' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

সে যাত্রা হ'ত পুরো আট-ন' ঘণ্টা ধ'রে এবং তার সময় ছিল দু'রকম। এক বেলা ১টা বা ২টোয় আরম্ভ হয়ে টানা রাত ১০টা পর্যন্ত হ'ত, আর নইলে ঐ রাত ১০টায় আরম্ভ হয়ে সকাল ৬টা/৭টা পর্যন্ত চলত। হাটে, মাঠে, নাট-মণ্ডপে বা জমিদারবাড়ীর প্রশস্ত চত্বরে—যেখানেই হ'ক না কেন, যাত্রার দলের লোকজনের জন্যে ভুরিভোজের বন্দোবস্ত থাকত; নিয়মিত ভিয়েন বসত তাদের ক্ষুৎপিপাসা মেটাবার জন্যে। তা ছাড়া দিনের বেলা হ'লে থাকত ডাবের ব্যবস্থা এবং রাত্রে হ'লে চায়ের; অবশ্য দিন-মানেও কিছুলোকের চায়েরও চাহিদা ছিল। এর ওপর প্রচুর পানও সরবরাহ করা হত। কিন্তু নেশার জিনিস যা-কিছু সে বিড়ি-সিগারেট-গাঁজাই হোক বা কালী মার্কা ধান্যেশ্বরী অর্থাৎ দেশী মদই হোক, তা' রুচি, অভ্যাস বা প্রয়োজন মাফিক যাত্রাদলের লোকেরা নিজেরাই যোগাড় করতেন। অবশ্য এমন দু'পাঁচজন উৎকট ভক্তের অভাব ছিল না, যাঁরা

নিজের ট্যাঁক খালি ক'রে তাঁদের দাদা বা 'হিরো'দের নেশার সামগ্রী জুগিয়ে আনন্দে গদগদ না হতেন।

যাত্রার আসরের চার কোণে থাকতেন চারজন জুড়ী—পরনে তাঁদের গেরুয়া বা লাল রঙের চাপকান; মাথায় কখনও পাগড়ী থাকত, আবার কখনও কখনও থাকত না। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির কথোপকথন থেকে যখনই কোনো বিশেষ ভাব বা রস উদ্ভব হ'ত, তখনই জুড়ীরা উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরতেন। এই গানের মধ্যে কোনো না কোন পাত্র বা পাত্রীর উক্তি প্রকাশ পেত; রাজার উক্তি, রাণীর উক্তি, দূতের উক্তি, জননীর উক্তি, মন্ত্রীর উক্তি ইত্যাদি। জুড়ীরা দু'লাইন গান গাইবার পর সেই দু'লাইন পুনরুক্তি করত দু'সারিতে চারজন চারজন করে বসা দোহারেরা। তারপর আবার জুড়ীর দল এবং আবার দোহারেরা। এই ভাবে একখানি আট-পংক্তির গান শেষ হ'তে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লেগে যেত। যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, তাঁরাও তাঁদের গুণপনা দেখাতে ছাড়তেন না। একজন জুড়ী একটি বিশেষ পংক্তি নিয়ে তান বা বিস্তার করলে অমনি বেহালা-বাদক বা ক্ল্যারিওনেট-বাদক ঠিক সেই তান বা বিস্তারের কাজ দেখিয়ে বাহাদুরী নিতে ছাড়তেন না এবং বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের কাজ দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর বাহবা এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য পদকও আদায় করতে সমর্থ হ'ত।

শুনেছি, শহরে পেশাদারী দলকে বায়না দেবার সময়ে পল্লী অঞ্চলের কোনো কোনো জমিদারবাড়ী থেকে ফরমাস করা হ'ত যে, তাঁদের বাড়ীতে জুড়ী-দোয়ার্কি সমেত পূর্ণাঙ্গ যাত্রাভিনয়ই করতে হবে; তার পরিবর্তে তারা পাবে ডবোল মজুরী। এবং ভূষণ-চন্দ্র দাস প্রমুখ যাত্রা দলের অধিকারীরা এই ফরমাস মাফিক যাত্রা করতে স্বীকৃতও হতেন।

কিন্তু শহরে পেশাদারী যাত্রাভিনয় দেখতে পাওয়া যেত এক, কোনো ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরে, আর দুই, কোনো বাজারে এবং উপলক্ষ্য ছিল একই—জন্মাষ্টমী, রাস, শিবচতুর্দশী বা ঐ ধরনের অপর কোনো পর্ব। ধনীগৃহের বিস্তৃত চত্বর তখন সাধারণ নাট্য-সম্প্রদায় (যেমন, স্টার, মিনার্ভা), ভ্রাম্যমান পেশাদারী নাট্যসম্প্রদায় (যেমন, মডেল থিয়েটার, জুবিলী থিয়েটার প্রভৃতি) বা পুরোপুরি সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কখনও কখনও সৌখীন যাত্রাভিনয়ও যে না হ'ত, তা নয়; কিন্তু পেশাদারী যাত্রার সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল।

প্রভুরাম পিক্‌চার্সের "রাখী" চিত্রে অশোককুমার, ওয়াহিদা রহমান ও অমিতা

সাধারণ নাট্যালয়ের অনুকরণে পঞ্চাঙ্ক যাত্রাভিনয় শুরু করে মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টিই; মথুর সাহাই প্রথম যাত্রাকে থিয়েটারী ঢংয়ে সাজান তাঁর দলের বাঁধা নাট্যকার হরিপদ চট্টো-পাধ্যায়ের সাহায্যে। নীলকণ্ঠ অধিকারী প্রবর্তিত জুড়ী-দোয়ার্কি সমন্বিত কৃষ্ণ-যাত্রার সমাধি রচনা করেন তিনিই। যাত্রা-দলের আসরে আজও যেমন দু'খানি চেয়ার পাতা হয় রাজা, রাণী, বাদশা, নবাব জাতীয় পদস্থ চরিত্রাভিনেতাদের বসবার জন্যে, তখনও তাই পাতা হ'ত; তবে সেই চেয়ার হ'ত কিংখাবে মোড়া বা জরির কাজ করা ভেলভেটের ঢাকা দেওয়া। তাতে বসতেন পৌরাণিক নাট-কের কৃষ্ণ, রাধা, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীরা। জুড়ি-দোয়ার্কি বর্জিত হ'লেও যাত্রাভিনয়ে গানের প্রাধান্য যেমন আগে ছিল, তেমনি আজও আছে। সেই জন্যেই যাত্রাভিনয়ের আর এক নাম হচ্ছে গীতাভিনয় বা অপেরা। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর মালিকানায় ভাণ্ডারী অপেরার খুব নাম ছিল গানের দিক দিয়ে, যেমন ছিল মথুর সাহার যাত্রা পার্টির অভিনয়ের ব্যাপারে। তখনকার পেশা-দারী যাত্রাজগতের দিক্‌পাল নাট্যকার ছিলেন মথুর সাহার দলের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং গণেশ অপেরা সম্প্রদায়-ভুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। প্রথমোক্ত হরিপদবাবুই হচ্ছেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে লক্ষাধিকবার অভিনীত চিরনতুন নাটক "জয়দেব"-এর রচয়িতা। এই একখানি মাত্র নাটক তাঁকে বাঙলার নাট্যেতিহাসে অমর ক'রে রেখেছে। এ'রা দুজনই এ'দের নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করতেন প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি থেকে। অবশ্য যে-দিন থেকে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার উদ্ভব হয়েছে, সেদিন থেকেই এ'রা মাত্র পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিতেও সাঁতার কাটতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারই ফলে জন্ম নিয়েছিল হরিপদবাবুর "পদ্মিনী" ও "রাণী জয়মতী", আর ভোলানাথবাবুর "পঞ্চনদ", "দাক্ষিণাত্য" প্রভৃতি যাত্রা-নাটক। এ'রা ছাড়াও আর একজন শক্তি-মান পালা-লিখিয়ে ছিলেন ভূষণচন্দ্র দাসের দলে; তিনি হচ্ছেন "ধ্রুব", "পরশুরামের মাতৃহত্যা" প্রভৃতির লেখক, রাজপুর-হরিনাভি নিবাসী মতিলাল

বিষ্ণু সরকার ও অনিল দত্ত প্রযোজিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'দুই বাড়ী' চিত্রের একটি দৃশ্যে রেণুকা রায় ও তন্দ্রা বর্মণ

ঘোষ। শোনা যায়, মথুর সাহার দলের জন্যে হরিপদবাবু যে "মেঘনাদ" পালা লিখেছিলেন, তার বীররসাশ্রিত ওজস্বিনী ভাষা রচনায় এই মতিলাল ঘোষের যথেষ্টই হাত ছিল। যখন এইভাবে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গীতাভিনয়কে আশ্রয় ক'রে কলকাতার পেশাদারী যাত্রা দল শহর এবং গ্রামাঞ্চলে জনতার আসর মাত ক'রতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় সহসা ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রার দল নিয়ে। "মাতৃপূজা", "দেশের ডাক", "পতিতা", "সমাজ" প্রভৃতি পালাভিনয়ের মাধ্যমে তিনি স্বাদেশিকতার স্রোত বইয়ে দিলেন জনমানসে; সেই গেরুয়াবসন-ধারীর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত স্বদেশী গানে মত্ত হয়ে উঠত শ্রোতৃবৃন্দ—তাদের দেহের শোণিতে বইত উষ্ণপ্রবাহ। তাই ইংরেজ সরকার মুকুন্দ দাসকে বারংবার পাঠিয়েছেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, তাঁর পালাগুলিকে করেছেন বাজেয়াপ্ত।

১৯৩০।৩১ সালের পর থেকে যতই পেশাদারী যাত্রাগুলির কলকাতায় বায়না পাওয়া কম হয়ে যেতে থাকল এবং বাঙলার গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে সুদূর আসাম ও অপর দিকে কোলিয়ারী অঞ্চলে পাড়ি জমাতে হ'ল, ততই তাদের রূপ পরিবর্তিত হতে লাগল। একদিকে দলের লোকসংখ্যা কমানো প্রয়োজন হয়ে পড়ায় যেমন কোরাস গান একেবারে তুলে দেওয়া হ'ল, তেমনই আবার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেদের দিয়ে সখী-সঙ্ঘ তৈরী করা হ'ল; আর নাটকের মধ্যেও এল ভেজাল। পৌরাণিক হয়ে পড়ল একেবারে অপাংক্তেয়; অবিমিশ্র ঐতিহাসিক পালাও হ'ল বর্জিত। তার বদলে কিছুটা ইতিহাসাশ্রিত ঘটনাকে মূলধন ক'রে তৈরী হতে লাগল সমাজ ও ইতিহাসের কাল্পনিক জগাখিচুড়ী। অত্যাচারীর আক্রমণে দেশের লোক ভীত সন্ত্রস্ত; তারই মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক অসমসাহসী নারী, যে তার গরম বক্তৃতার চোটে দেশের লোককে করল প্রবুদ্ধ এবং অত্যাচারীকে করল পঙ্গু। কিংবা ঐ রকমই কল্পনার বলে অত্যাচারির নিজের স্ত্রী, ভাই বা ছেলে হ'ল মানব ও দেশপ্রেমিক এবং মতের গুরুতর পার্থক্যের জন্যে সাময়িকভাবে হ'ল নির্বাসিত বা দেশান্তরী। মোট কথা, এই সব পালায় বাঙলাদেশে মুসলমান শাসনের যুগের কোনো সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে বা মাত্র কোনো কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে গ্রন্থকার দর্শকদের খুশী করবার জন্যে একদিকে যেমন দেশাত্ম বা নীতিবোধক দৃশ্যাবলীর অবতারণা করতে শুরু করলেন, অপর দিকে তেমনি তাদের হাসির খোরাক যোগাবার জন্যে ভাঁড়, চাটুকার, স্ত্রৈণ গোছের চরিত্রও আমদানী করতে লাগলেন। অসহায়া নারীর ওপর লম্পটের অত্যাচার এইসব নাটকের আবশ্যিক বিষয়বস্তু। ১৯৩৭।৩৮ থেকে এই ধারাই চ'লে আসছে বাঙলার পেশাদারী যাত্রাজগতে। এবং এই ধরনের নাটক রচনার অবিসংবাদী সম্রাট হচ্ছেন শ্রীব্রজেন দে। তাঁর রচিত "বর্গী এল দেশে" থেকে শুরু ক'রে "লোহার জাল", "সোনাই-দিঘী", "বাঙালী", "গাঁয়ের মেয়ে" প্রভৃতি নাটক যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই আমার কথার যাথার্থ অনুভব করতে পারবেন। এবং প্রধানতঃ তাঁকেই অনুসরণ ক'রে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রভৃতি লেখক অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন যাত্রাদলগুলির জন্যে। কোনো রসবুদ্ধি-সম্পন্ন দর্শককেই যে এই ধরনের নাটক খুশী করতে পারে না, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু লেখকেরা জানেন, তাঁদের অযুত দর্শকবৃন্দের মধ্যে ঐ বিশেষ শ্রেণীর দর্শক মাত্র 'কোটীকে গোটিক'। তাই যাদের খুশী করলে যাত্রার দল টি'কবে, পয়সা আসবে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁরা তাঁদের লেখনী চালনা করছেন বিনা দ্বিধায়।

কিন্তু এইবার তাঁদের ধারা পরিবর্তন করবার সময় এসেছে। বাঙলার পেশাদারী যাত্রাদলকে আবার শহরের দর্শকদের সামনে আসর পাতৃতে হচ্ছে—সে-সুযোগ তাঁদের জীবনে এসেছে। শহরের লোক তাঁদের অভিনয় দেখতে আসছেন কাতারে কাতারে এবং এই অগণিত দর্শকের মধ্যে এমন বহু লোকই আছেন, যাঁরা ইতিহাস বা বাঙলা সমাজের খবর রাখেন। কাজেই কার্যকারণ সম্পর্ক-বিবর্জিত, সম্ভাব্যতার সীমানা অতিক্রম-কারী ঘটনার সমাবেশ দেখলেই তাঁদের মন অতৃপ্তিতে ভ'রে উঠবে। জাতীয় লোক-সংস্কৃতির বাহন যাত্রাকে স্ব-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'তে 'হ'লে যাকে আশ্রয় ক'রে অভিনয়টি হয়, সেই নাটককে হ'তে হবে বিশ্বাস্য ঘটনা সংবলিত কুরুচিবর্জিত এবং রসোত্তীর্ণ।

বিবিধ সংবাদ

"সেতু"র ৭০০তম রজনীর স্মারক উৎসব

গেল শনিবার, ৩রা নভেম্বর বিশ্বরূপার "সেতু" নাটকের ৭০০তম রজনীর স্মারক উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। এই উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে দেবার জন্যে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে রাসবিহারী সরকার অর্থমন্ত্রীর হাতে ৭০০্ টাকা ও ৭ ভরি সোনা প্রদান করেন। এছাড়া বিশ্বরূপার অন্যতম শিল্পী জয়শ্রী সেন তাঁর কানের দুল জোড়াও অর্থমন্ত্রীর হাতে অর্পণ করেন। ৭০০ রজনীর স্মারক হিসেবে "সেতু" নাটকের কাহিনীকার, নাট্যকার, আলোকসম্পাতকারী, রূপসজ্জাকর, বিভিন্ন শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে রাসবিহারী সরকার যে ভাষণ দেন, তাতে "সেতু"র সাফল্যের কথা বলার পর ভারত সীমান্তে চীনা আক্রমণের কথা উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে, "দেশের এই আপৎকালে নাট্য শিল্পেরও কর্তব্য আছে। সেই দুরূহ কর্তব্য আজ আমাদের সম্মুখে। আমরা মনে করি যে, আজ নাট্যশালার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক।...... অতীতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ তার কর্তব্য যেমন যথাযথরূপে পালন করেছিল—নাটকের মাধ্যমে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—আজ আবার সেই দায়িত্ব পালনের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। আজ আর পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের সংকল্প গ্রহণ নয়। আজ জাতিকে গ্রহণ করতে হবে—স্বাধীন জাতির বিপন্ন মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার শপথ। এই শপথ শুধু সংগ্রামী সৈনিকদের নয়, শুধু রাজনীতিজ্ঞদেরই নয়, এই শপথ সমগ্র দেশপ্রেমিক জনসাধারণের সঙ্গে দেশের নাট্য শিল্পসাধকদেরও।"

সভাপতির ভাষণে অর্থমন্ত্রী দর্শকবৃন্দকে দেশের সঙ্কট সম্বন্ধে অবহিত ক'রে বলেন, "চীনের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের যে যুদ্ধ, তাতে অংশ গ্রহণ করবার দায়িত্ব সকলেরই। এ যুদ্ধ সৈনিকের যুদ্ধ নয়, সমগ্র দেশবাসীর যুদ্ধ—এটি একটি টোট্যাল ওয়ার।"

সভায় রাসবিহারী সরকার ঘোষণা করেন, যে-সব নাট্যসংস্থা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে এককালীন ২,০০০্ টাকা সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেবেন, তাঁদের অভিনয়ের জন্যে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ বিনা ভাড়ায় দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠান শেষে যথারীতি "সেতু" নাটকের ৭০১তম অভিনয় সম্পাদিত হয়।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ ঃ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে গেল শুক্রবার, ২রা নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বর্তমান চীন-ভারত পরিস্থিতিতে ইতিকর্তব্য নিরূপণের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের পেশাদারী ও অপেশাদারী নাট্যসংস্থা, মঞ্চ-চিত্র-বেতারশিল্পী এবং নৃত্য-গীত-অভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট গুণিজনের একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় ভারত সীমান্তে চীনের বর্বরোচিত আক্রমণকে নিন্দা ক'রে বিভিন্ন বক্তার দীপ্ত ভাষণের পর দেশের বর্তমান সঙ্কটকালে কর্তব্য হিসেবে যে পনেরোটি গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি হচ্ছে এই ঃ

১। বর্তমান মাস থেকে দেশের প্রতিটি ব্যবসায়িক মঞ্চকে প্রতিটি অনুষ্ঠিত অভিনয়ের দরুণ ২০্ টাকা

রেনেসাঁস ফিল্ম-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" ছবিতে শঙ্কর, শম্পা ও বাদল। ছবিটি সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

হারে ভারতের প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে প্রদানের অনুরোধ জানানো হোক।

২। প্রতিটি মঞ্চশিল্পী ও কর্মীকে তাঁর একদিনের প্রাপ্য বেতন প্রতিরক্ষা সাহায্য তহবিলে দান করার অনুরোধ জানানো হোক।

৩। প্রতিটি নাট্যকারকে তাঁর প্রাপ্য রয়ালটির দশশতাংশ উক্ত সাহায্য তহবিলে প্রদানের অনুরোধ জানানো হোক।

৪। প্রতিটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনাগারকে প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য ৫্ টাকা হারে উক্ত তহবিলে প্রদানের অনুরোধ জানানো হোক।

৫। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রকে বর্তমান জাতীয় সংকটে অধিক মাত্রায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশনের অনুরোধ জানানো হোক।

৬। সৌখীন ও পেশাদারী নাট্য সংগঠনগুলিকে দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানানো হোক।

৭। দেশরক্ষা সাহায্য তহবিলের জন্য সম্মিলিত দল ও শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারা সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থার উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানানো হোক।

৮। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক নাট্যশালাগুলিকে সাময়িকভাবে বিশেষ প্রদর্শনী মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করে দেশরক্ষা সাহায্য তহবিলকে পুষ্ট করতে অনুরোধ জানানো হোক।

নাট্যকার সংঘের প্রস্তাব :

গেল সোমবার, ২৯শে অক্টোবরের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় নাট্যকার সংঘ চীন কর্তৃক ভারতের সীমা লঙ্ঘন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "আমরা বাঙলা দেশের নাট্যকারগণ আমাদের অতীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া জাতির এই সংকটকালে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতেছি......এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প লইতেছি। নাট্যকার সংঘ বাঙলা দেশের দলমতনির্বিশেষে সকল কলাশিল্পী ও সাহিত্যিককে যথাসম্ভব শীঘ্র একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া দেশের সংকটকালে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।... পেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা অবিলম্বে দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিবেন।......অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার অটুট সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন।......সরকারী বেতার প্রতিষ্ঠান ও সরকারী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের এই সংকটকালে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যকে সংহত করিবার জন্য সংকটমোচন না হওয়া পর্যন্ত দেশপ্রেমমূলক নাটকাদির অভিনয়ের আশু ব্যবস্থা করিতে আহ্বান জানাইতেছে।"

আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, যে-সব সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে নাট্যকার সংঘ জাতীয় সংকটকালে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছে, তাঁরা অবিলম্বে এ'দের ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় কর্তব্য পালনে ব্রতী হবেন।

জালান প্রোডাকসন্স-এর "দাদাঠাকুর" :

আজ শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর জালান প্রোডাকসন্স-এর "দাদাঠাকুর" ছবিখানি একযোগে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং

অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। নলিনীকান্ত সরকারের কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যটিকে পর্দার জন্য রূপায়িত ক'রছেন পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। ছবিখানির নাম-ভূমিকাতে দেখতে পাওয়া যাবে ছবি বিশ্বাসকে এবং অপরাপর চরিত্রে থাকবেন বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, সুলতা, ছায়াদেবী প্রভৃতি। সুরারোপ করেছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ

পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক জানাচ্ছেন, ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতিক মন্ত্রী মাননীয় হুমায়ুন কবীর পরিষদের বিশেষ সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

একটি অসাধারণ নাট্যাভিনয় :

গেল রবিবার, ৪ঠা নভেম্বর, নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত নাট্যসম্প্রদায় "রঙ্গসভা" এমন একখানি নাটককে মঞ্চস্থ করেছিলেন, যাকে অসাধারণ ছাড়া অন্য কিছু বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভব নয়। নাটকখানির নাম "বিপ্লবী ডিরোজিও"। অভিনয় প্রযোজনায় এমন চমৎকার নিখুঁতি আমরা সাধারণ পেশাদারী রঙ্গালয়ের কোনো প্রথম নাট্যাভিনয়েও দেখতে পাই নি। শহর কলকাতায় পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়াপত্তনের যাঁরা খবর রাখেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসমাজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নাম তাঁদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

ফিরিঙ্গী সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে খাঁটী ইংরেজরাও যেমন তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে এসেছে, গোঁড়া হিন্দু বাঙালী সমাজও তেমনি তাঁকে শত্রু মনে করেছে। অথচ অত্যন্ত অল্প বয়সের মধ্যে পাশ্চাত্য ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তিনি যে-ভাবে এদের তুলনামূলক সমালোচনা ক'রে নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পেরেছিলেন, তাতে তাঁকে একটি লোকোত্তর প্রতিভা ব'লে আখ্যাত করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। মনে-প্রাণে তিনি নিজেকে একজন ভারতীয় ব'লেই জানতেন এবং সেই কারণেই হিন্দু সমাজের অজ্ঞানতাপ্রসূত বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদী মন সৃষ্টি করবার সার্থক প্রয়াস করেছিলেন। মাত্র বাইশ বছর আট মাস বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার তিন চার বছরের মধ্যেই তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

জালান প্রোডাকসন্সের 'দাদাঠাকুর' চিত্রের একটি দৃশ্যে নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও ফুলুরিওয়ালা কার্তিকরূপে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।
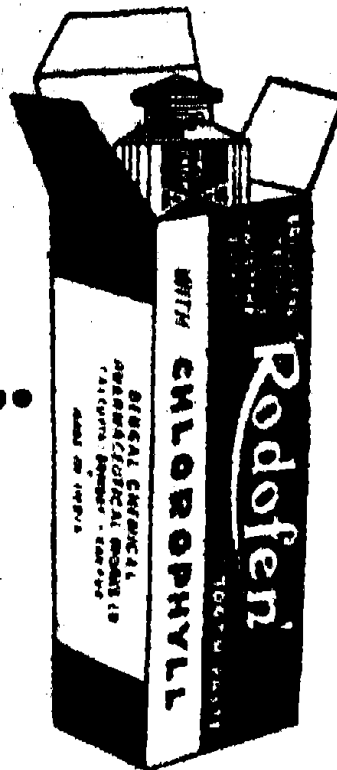
ক'রে তিনি তখনকার গোঁড়া হিন্দু সমাজের পক্ষে এমন বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগে সমগ্র ইংগবঙ্গ সমাজে সংক্রামিত হয়ে বাঙলাদেশের সংস্কৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে।

এই বিপ্লবী ডিরোজিওর জীবনে একদিকে সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু সমাজ ও অন্যদিকে হিন্দু কলেজ কাউন্সিল—এই উভয় তরফ থেকে যে-সব নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সংকট মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল, তাকেই নাটকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন তরুণ নাট্যকার শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং যে-ভাবে তিনি ডিরোজিওর জীবনের ট্র্যাজিডিকে ধীরে ধীরে ঘনীভূত ক'রে তুলে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন এবং তারও পরে তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ যে তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে সক্রিয়ভাবে বে'চে থাকবে, এই ইঙ্গিত দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন, তাতে আমরা চমৎকৃত না হ'য়ে পারিনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র, বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও ভাবধারার অসামান্য নূতনত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে নাটকখানিকে একটি অসাধারণ নাট্য-প্রচেষ্টা ব'লে সম্মানিত না ক'রেও পারি না।

"বিপ্লবী ডিরোজিও" নাটকটির উপস্থাপনায় রঙ্গসভা যে পরিমাণ যত্ন শ্রম ও অনুশীলন স্বীকার করেছেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা কচিৎ পাই। ডিরোজিওর কক্ষ তার সমগ্রতা নিয়ে দর্শকদের যেমন এক শতাব্দী পিছনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, পাত্র-পাত্রীদের সাজপোশাকও সে-বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি করেনি।

অভিনয়েও প্রত্যেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং একজনকে ছেড়ে আর একজনের নাম করা অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য নাটকটি যাঁর নামাঙ্কিত, সেই ডিরোজিওর ভূমিকায় পীযূষ বসুকে প্রায় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করতে হয় ব'লে তিনি স্বভাবতই দর্শকদের চোখে বড় হয়ে দেখা দেন। কিন্তু তাঁর সহ-শিল্পীরূপে দিলীপ রায় (রাধানাথ শিকদার), প্রশান্তকুমার (মহেশ ঘোষ), সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (রামতনু লাহিড়ী), চন্দন রায় (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়), ভোলা বসু (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), দুলাল চট্টোপাধ্যায় (রামগোপাল ঘোষ), রথীন ঘোষ (রাধাকান্ত দেব), পান্না দত্ত (ডেভিড হেয়ার), অজিত মজুমদার (ডেভিড ড্রেমণ্ড), মলয় বিশ্বাস (মিঃ উইলসন), লিলি চক্রবর্তী (অ্যামিলিয়া), শীলা ঘোষ (মিস্ হিউ) প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন।

আবহসঙ্গীত রচনায় অচিন্ত্য মজুমদারের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। আলোকসম্পাতে আশুতোষ বড়ুয়া নাটকের ভাবধারাকে নিঃসংশয়ে অনুসরণ করেছেন।

ডাঃ দাশগুপ্তের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী : একটি সাহায্য অনুষ্ঠান

আসছে ২রা ডিসেম্বর সকাল ১০-১৫ মিনিটে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে প্রথিতযশা সৌখীন ঐন্দ্রজালিক ডাঃ এস, আর, দাশগুপ্ত হাওড়া স্বাস্থ্য বিভাগীয় রিক্রিয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে পরলোকগত রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর কলোনীর সাহায্যের জন্যে একটি ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করবেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রথিতযশা চক্ষু চিকিৎসক এবং বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলেও সৌখীন ঐন্দ্রজালিক হিসেবে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চেই তিনি বহুবার তাঁর বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দেখিয়ে যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর কলোনীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ ক'রেছেন। আশা করি, তাঁর আগামী প্রদর্শনীটিও সাফল্যমণ্ডিত হবে।

রং বেরঙ

'রং-বেরঙ' নাট্যগোষ্ঠী পরেশ ধর রচিত 'শুধুছায়া' নাটকটি পুনরায় আগামী ২৬শে নভেম্বর ও ৩রা ডিসেম্বর 'মুক্ত-অঙ্গন' নাটমঞ্চে সন্ধ্যা ৭টায় অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন—সলিল দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শোভা মজুমদার, হিমানী গাঙ্গুলী, তারক ধর, দুলাল বন্দ্যোঃ, শিবপ্রসাদ মুখোঃ প্রভৃতি। নাটকটি মনীন্দ্র মজুমদার পরিচালিত।

ভ্রম-সংশোধন :

গেল সংখ্যার "অমৃত"-এ "বাঙালী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর বিশ্ব পরিক্রমা"-শীর্ষক নিবন্ধের গোড়াতেই ১৯৬২ সালের বদলে ভ্রমক্রমে ১৯৬১ ছাপা হয়ে গিয়েছে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

পরিচালক অজয় কর সম্প্রতি 'সাত-পাকে বাঁধা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন। কয়েকটি প্রণয়মধুর দৃশ্য গৃহীত হয়েছে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে,—চিতোরগড়, জয়পুর, ও উদয়পুরে প্রায় ২০ জন শিল্পী ও কলাকুশলীসহ সদলবলে পরিচালক শ্রীকর কলকাতায় দৃশ্যগ্রহণ শেষ করে ফিরেছেন। এ ছবির পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, রেখা মল্লিক, সুব্রতা সেন, তরুণকুমার, বুবু গাঙ্গুলী ও অমিত দে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

হাজারিবাগের ক্যানারী পাহাড়, ন্যাশনাল পার্ক ও রাঁচী রোডের বিভিন্ন জায়গায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরলেন 'অবশেষে' ছবির পরিচালক মৃণাল সেন। নাটকীয় কয়েকটি দৃশ্য এখানে গৃহীত হয়েছে। এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, উৎপল দত্ত, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, সুব্রতা সেন ও বিধায়ক ভট্টাচার্য। সঙ্গীত, শিল্পনির্দেশ ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, বংশীচন্দ্র গুপ্ত ও শৈলজা চট্টোপাধ্যায়।

পূজার ছুটিতে তপন সিংহও 'নির্জন সৈকতে'র বহির্দৃশ্য সম্প্রতি শেষ করে ফিরেছেন। পুরী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি কোণারক, চিল্কা ও রম্ভার বিভিন্ন স্থানে দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গুহঠাকুরতা, ভারতী দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ ও রবি ঘোষ। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন যথাক্রমে বিমল মুখোপাধ্যায়, সুনীতি মিত্র, সুবোধ রায় ও কালীপদ সেন।

পরমহংস বাণীচিত্রের 'নবারুণরাগে' ছবির দৃশ্যগ্রহণ গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। বাসন্তী দেবী রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অতনুকুমার, সবিতা বসু (চ্যাটার্জি), অসিতবরণ, কমল মিত্র, জহর রায়, তরুণকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও অপর্ণা দেবী। ছবিটি পরিচালনা করছেন নায়ক অতনুকুমার। সঙ্গীত, শিল্পনির্দেশনা ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন ভি বালসারা, গৌর পোদ্দার ও রামানন্দ সেনগুপ্ত।

বর্তমান সমাজের পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে একটি কাহিনী 'ফাস্ট প্রাইজ' সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় মহরৎ-কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন অনুপকুমার, তপতী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, রেণুকা দেবী, জহর গাঙ্গুলী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণ পিকচার্সের

পতাকাতলে প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন পরেশ বসু ও হিরন্ময় সেন।

'মায়ার সংসার' সাফল্যের পর পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তী ছবি 'আকাশ প্রদীপ'-এর কাজ আরম্ভ করেছেন। প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ। সংগীত, চিত্রগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, দেওজীভাই ও পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী। চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বোম্বাই

এক সপ্তাহব্যাপী মারাঠী চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ১০ই থেকে ১৭ই নভেম্বর রঙভবন-এ অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বি গোপাল রেড্ডী এই উৎসব উদ্বোধন করবেন। এই উৎসবে মোট ২১টি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে বারো হাজার, ছ' হাজার ও চার হাজার টাকা। পরিচালক, কাহিনীকার ও কুশলীদের পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের মোট অংক ৫৫ হাজার টাকা। উৎসবে যে মারাঠী ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে তার মধ্যে অন্যতম মানুষ, সামচী আঙ্গ, লগ্ন পাহেব কারুণ, রামযোশী, শান্ত তুকারাণী, প্রপঞ্চ, মালিনী, সাহু, পরশ্রাম, সপ্তপদী ও সুহাসিনী।

দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গীতাঞ্জলি সম্প্রতি হিন্দী ছবি 'পরশমণি'র জন্য মনোনীত হয়েছেন। রঞ্জিৎ স্টুডিওয় ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। যাদুকর নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন মহীপাল। ছবিটির পারিচালক হলেন বাবুভাই মিস্ত্রী।

রাজস্থানের জয়পত্রর প্রযোজক-পরিচালক বসন্ত যোগলেকর 'আজ আউর কাল'র বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করলেন। একটি সংগীত গ্রহণ দৃশ্যে ছিলেন নায়ক-নায়িকা সুনীল দত্ত ও নন্দা।

অঞ্জলি পিকচার্সের পরবর্তী ছবির জন্য মনোনীত হয়েছেন অশোককুমার, ও বৈজন্তীমালা। ছবিটি পরিচালনা করবেন ইন্দররাজ আনন্দ।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় একটি বৃহত্তর ছবি পরিকল্পনায় ব্রতী হয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুগ্ম-প্রযোজনায়। এই দুই সরকারের সহযোগিতায় যে ছবির চলচ্চিত্রায়ণে রূপ পাবে তার নাম—'মহাভারত'।

মাদ্রাজ

কলালয়ের মালায়ম ছবি 'ডক্টর'-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে বিজয়া-বাহিনী স্টুডিওয়। ইতিপূর্বে দুটি সংগীত গ্রহণ করেছেন সংগীত পরিচালক পারাভু দেবর্জন। কণ্ঠদান করেছেন পি লীলা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সথ্যম, টি এস মুথিয়া ও পণ্ডজাবালী। ছবিটি পরিচালনা করছেন এম এস মানি। চিত্রগ্রাহক হলেন রাজাগোপাল।

কানাড়া ছবি 'তেজস্বিনী' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন এইচ এন সীমহা। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন প্রযোজিকা পন্দরী বাঈ, রাজশ্রী, এম লক্ষ্মী দেবী, রাজকুমার, রাজাশংকর ও বালকৃষ্ণ।

সম্প্রতি পাঁচটি তামিল ছবির শুভ-মহরৎ সূচনা হয় বিজয়া-বাহিনী, নেপচুন ও ম্যাজেস্টিক স্টুডিওয়। ছবিগুলির বিস্তারিত খবর পরে জানতে পারবেন।

স্টুডিও থেকে বলছি
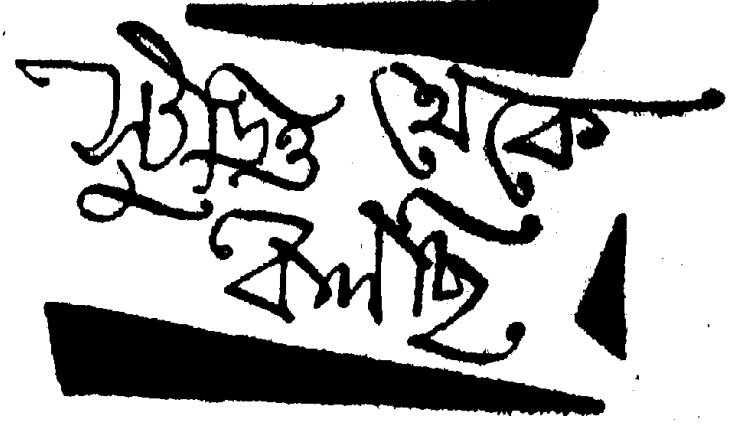
এ বছর স্বাধীনভাবে সহকারী থেকে যে কয়েকজন কুশলী চলচ্চিত্রায়নে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে তরুণ পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে 'দেখা হল' ছবির দৃশ্যগ্রহণ প্রথম পর্যায়ে শেষ করলেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। বনফুল রচিত 'নবদিগন্ত' কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির নামকরণ হয়েছে 'দেখা হল'। চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বিজয় ঘোষ এবং প্রসাদ মিত্র। সম্পাদনা এবং সংগীত পরিচালনা করছেন সুবোধ রায় ও হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। দুটি প্রধান চরিত্রে
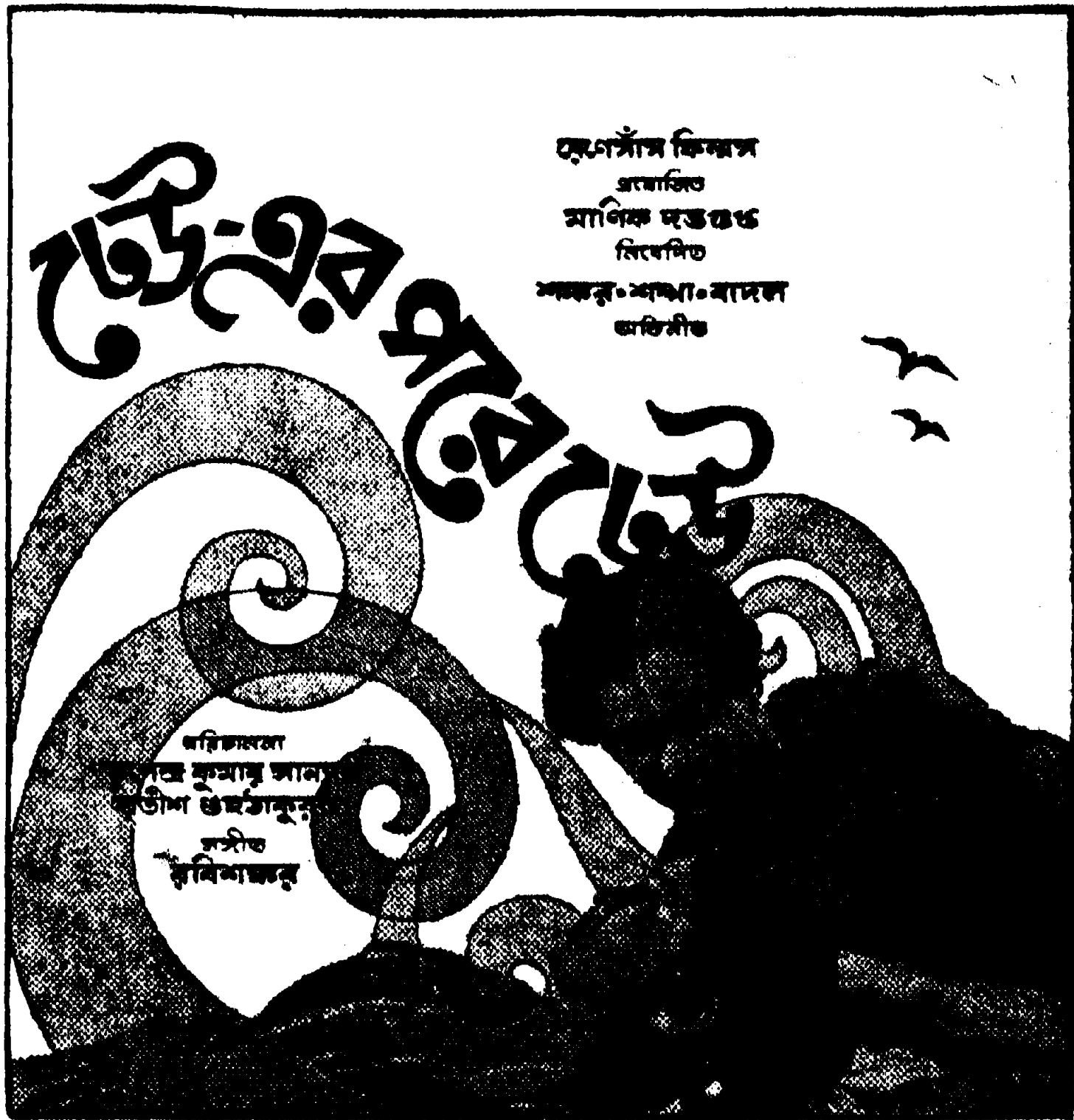
অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দিনের দৃশ্যটি ছিল একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান। নানান রকমের বাদ্যযন্ত্র এখানে-সেখানে টাঙানো রয়েছে। মালিকের নাম নিতাই নন্দী। কাহিনীর নায়িকা রঞ্জনা এই দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করে,—আমাকে ভাল দেখে একটা সেতার দিন তো।

নিতাইবাবু—সেতার? ও আচ্ছা।

নিতাইবাবুর সহকারী নতুন নতুন সেতার দেখাতে আরম্ভ করে। রঞ্জনার পছন্দ হয় না।

—আর একটু বড় হলে ভাল হত। বড় নেই?

—আছে।

দ্বিতীয় সেতারটি দেখেও যখন রঞ্জনার পছন্দ হল না তখন নিতাই বেশ রেগে উঠেছে। ঠিক এই সময় কাহিনীর নায়ক দিবস এসেছে সরোদ কিনতে। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনার পছন্দ হয় সেতার। কিন্তু কিছু টাকা কম পড়ছে দেখে নিতাই রঞ্জনাকে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিল। এদিকে দিবসের ভাল লাগল না এই সামান্য টাকার জন্য এক ভদ্রমহিলাকে অপমানিত হতে দেখে। দিবস উঠে এসে রঞ্জনাকে বলে,

—যদি কিছু মনে না করেন টাকাটা আমি দিতে পারি।

রঞ্জনা রাজি হয়। দিবস দোকানের মালিককে বাকি টাকা এবং রুচিসম্মত ব্যবহারের জন্য স্পষ্টকথা বলে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই দোকানের দৃশ্যটি পর পর কয়েকটি দৃশ্যকোণ বেছে নিয়ে চিত্রগ্রহণ করলেন বিজয় ঘোষ। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সার্থক অভিনয় করলেন দিবস, রঞ্জনা ও নিতাই নন্দীর ভূমিকায় অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও মণি শ্রীমানী। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সুলতা চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জি, অনুভা গুপ্তা, কমলা মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, অনুপকুমার, গীতা দে, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি।

এবারে ছবির কাহিনীর কথা বলি।

উকিল সূর্যকান্ত চৌধুরী যখন তাঁর এম-এস-সি পাশ করা কৃতী পুত্র দিবসকে ল' কলেজে ভর্তি করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন' তখন দিবস অন্য রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও দিবসের প্রকৃতিটা ছিল কবি-প্রকৃতি তা সূর্য চৌধুরী জানতেন না। অবশ্য দিবস যে ভাল সরোদ বাজাতে পারে এটা তিনি জানতেন। কিন্তু সরোদটাকে সু-চক্ষে দেখবার মতো উদারতা কিংবা নিরপেক্ষতা ছিল না তাঁর।

দিবস বিদ্রোহী হল। আপন স্বাধীনতায় বাধা পড়ায় সে ল' কলেজ এবং পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করে আত্ম-আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ল। নিজের বৃত্তি পাওয়া জমানো টাকায় দিন চলল এক বস্তি বাড়ির সামান্য ঘরে। চাকরীর সন্ধানে দিন যায়। এখানে পরম আত্মীয়া হল সৌদামিনী। দিবসের দেখাশোনা সেই করতো। দিবসের ট্রাম-ড্রাইভার বন্ধু কিরণের সান্নিধ্যে সঙ্গীতাচার্য গহনচাঁদ ও তার একমাত্র কন্যা রঞ্জনার সঙ্গে তার পরিচয় নিগূঢ় হয়। পরোপকারের মধ্যে দিবসের সময়-

'দেখা হল' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণে পরিচালক নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নায়ক অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী পরিচালক সুভেন সরকার ও নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

গড়ালো বয়ে যেতে লাগলো। এর মধ্যে তার বাবাকে সে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ভাল আছে। পরীক্ষা করে সে দেখতে চায় যে, নিজের সামর্থে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় কিনা।

বক্তৃতা আর পরোপকারে দিবস মেতে ওঠে। মাঠে-ময়দানে কখনো দিবস আবেগভরে বলে চলে—'বন্ধুগণ, বাঙ্গালিরা অপদার্থ, বাঙ্গালিরা পরশ্রীকাতর, বাঙ্গালিরা স্বপ্নবিলাসী বাবু—এ অপবাদ ঘোচাতে হবে আমাদের। সার্থক প্রতিবাদ করতে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে পৌরুষই মানুষের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র নির্ভর।'

'ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা উদ্বুদ্ধ করুন এই হতভাগ্য জাতির পৌরুষকে। আপনারা শ্রদ্ধা করতে শিখুন ধনীকে নয় চরিত্রবানকে, ভীরুকে নয় বীরকে, অক্ষমকে নয় সক্ষমকে, অলসকে নয়, কর্মীকে, অভদ্রকে নয় ভদ্রকে। আপনারা জাগিয়ে তুলুন আমাদের মহত্ত্ব, বাঁচিয়ে তুলুন আমাদের মনুষ্যত্ব, উদ্বুদ্ধ করুন আমাদের আদর্শ।'

দিবসের সহপাঠী, অনুরাগীবৃন্দ, এমনকি রঞ্জনা পর্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন সূর্যকান্ত। দিবস যে এমন বক্তৃতা করতে পারে তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। তিনি অনুরোধ করলেও দিবস নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বাড়ী ফিরতে নারাজ হয়। এমনি দিন চলছিল বটে তবে দিবসের উদ্দেশ্য সফল হয়ে উঠলো না। তাই ভাগ্য পরিবর্তনে তার হিতৈষী অধ্যাপকের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক রিসার্চের জন্য বিলেত যাবার যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হল। এরমধ্যে রঞ্জনাকে দিবস কথা দিয়েছে যে সে ফিরেই তাকে বিয়ে করবে। অবশ্য রঞ্জনাকে এরজন্য একবার বাড়ী থেকে পালিয়েও আসতে হয়েছিল। কারণ প্রথমে বাড়ীর অভিভাবকেরা দিবসের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন শুনেছে যে দিবস বিলেত যাচ্ছে তখন তাদের মত পাল্টেছে।

দিবস যেদিন বিলেত যাচ্ছে, যাত্রার প্রাক্কালে এরোড্রোমে সকলেই অভিনন্দন জানাতে এসেছিল। বিশেষ করে পিতা সূর্যকান্তের পুত্রগর্বে বুকটা সবার আগে ভরে উঠলো।

প্লেন তখন ছেড়ে দিয়েছে।

—চিত্রদূত

বিদেশী ছবি

।। বৃটিশ ছবির টুকরো খবর ।।

লণ্ডনের সোহোর পটভূমিতে তোলা হচ্ছে 'দি স্মল স্যাড ওয়ার্ল্ড অফ স্যামিলী'। টেলিভিশনে এই নাটকটি যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল এবং নাটকের পরিচালক কেন হিউজেস টেলিভিশন গীল্ড এর পুরস্কারও লাভ করেছেন। কেন হিউজেস ছবিটিরও পরিচালক। ছবির নায়ক ও টেলিভিশন রূপের নায়ক অ্যানথনি নিউলে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রবার্ট স্টিফেন্স, উইলফ্রেড ব্রাম্বল এবং মিরিয়াম কার্লিন।

* * *

'এ কাইণ্ড অফ লাভিং'-এর নায়ক অ্যালান বেটস ক্যারল রীডের সাম্প্রতিক ছবি 'দি ব্যালাড অফ দি রানিং ম্যান'-এ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাঁর সহঅভিনেতা অভিনেত্রীরা হলেন লরেন্স হারভে এবং লী রেমিক। ছবিটি রঙীন এবং প্যানাভিশনে তোলা হবে। বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে স্পেনে এবং আয়ারল্যাণ্ডে।

* * *

ব্রায়ান স্টোন সেভেন আর্টস-এর 'স্যামী গোয়িং সাউথ' তোলা হচ্ছে উগাণ্ডা, কেনিয়া এবং টাঙ্গানাইকার পটভূমিতে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন স্যাণ্ডি ম্যাকেনড্রিক যিনি ইতিপূর্বে 'দি লেডি কিলারস', 'সুইট স্মেল অফ সাকসেস' পরিচালনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এডওয়ার্ড জি রবিনসন।

—চিত্রকূট

'ব্যালাড অব এ সোলজার' চিত্রে ভ্লাদিমির ইভাসভ ও আন্তোনিনা ম্যাক্সিমোভা

খেলাধুলা

দর্শক

॥ অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি ॥

এম সি সি দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সূচনা খুবই ভাল হয়েছিল। পার্থে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সফরের প্রথম খেলায় এম সি সি দল ১০ উইকেটে জয়ী হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া যদিও শক্তিশালী দল ছিল না তবু খেলা ভাঙ্গার অর্ধেকদিন আগে দশ উইকেটে জয়লাভ এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের মনে যথেষ্ট সাহস এবং আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

কিন্তু প্রথম খেলায় জয়লাভের আনন্দ-উদ্দীপনা পরবর্তী খেলায় সম্মিলিত একাদশ দলের কাছে ১০ উইকেটে পরাজয়ের ফলে অনেকখানি মিইয়ে যায়। সম্মিলিত একাদশ দল শক্তিশালী ছিল। চারদিনের এই খেলার প্রথমদিনে এম সি সি দল প্রথম ব্যাট ক'রে মাত্র ১৫৭ রানে আউট হয়।

সম্মিলিত একাদশ দল একরকম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দল বললেই চলে। কেবল নর্মান ও'নীল, বব্ সিম্পসন এবং বিল লরী এই তিনজন টেস্ট খেলোয়াড় নতুন মুখ। সারে এবং ইংল্যান্ড দলের ভূতপূর্ব টেস্ট বোলার টনি লক বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছেন। তিনিও সম্মিলিত দলে যোগদান করেছিলেন। চারদিনের খেলার প্রথমদিনে এম সি সি দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—মাত্র ১৫৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ। হোর (৪২ রানে ৩), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী (৩৮ রানে ৪) এবং ন্যাটা স্পিন বোলার টনি লক (৩৬ রানে ৩) এম সি সি দলের এহেন কাহিল অবস্থার জন্যে কৃতিত্বের অধিকারী। মাত্র ১৪ রানে হোর এবং ম্যাকেঞ্জী দলের চারজনকে (কাউড্রে, ডেক্সটার, গ্রেভনী এবং ব্যারিংটন) উইকেট থেকে বিদায় করেন। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় পঞ্চম উইকেটের জুটি ডেভিড শেফার্ড এবং বেরী নাইট দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দলের ৭১ রান তুলে দেন। দলের মোট ১৫৭ রানের মধ্যে এই দু'জনের রানই ছিল ১০৮ (শেফার্ড ৪৩ এবং বেরী নাইট নটআউট ৬৫)। নাইট ১৭১ মিনিটে ৬৫ রান ক'রে শেষ পর্যন্ত নটআউট থাকেন। প্রথমদিনের খেলায় সম্মিলিত একাদশ দল সমস্ত উইকেট হাতে জমা রেখে ৯৬ রান করে। দ্বিতীয়দিনে সম্মিলিত একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানে শেষ হলে তারা ১৬০ রানে অগ্রগামী হয়। সম্মিলিত দলের ববি সিম্পসন সাড়ে চার ঘণ্টা খেলে ১০টা বাউণ্ডারী সমেত ১০৯ রান ক'রে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। ডেভিড এ্যালেন ৭৬ রানে ৫টা উইকেট পান। সম্মিলিত দলের প্রথম উইকেট পড়ে ১১৬ রানে এবং সপ্তম উইকেট ২১৭ রানে। কিন্তু শেষের তিনটে উইকেটে আরও ১০০ রান যোগ হয়। সম্মিলিত দলের শেষের তিনজন খেলোয়াড় এম সি সি দলকে বেশ লেজে খেলিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে একটা উইকেট খুইয়ে ২৫ রান করে। এবারও কলিন কাউড্রে গোল্লা করেন—একটা খেলায় দু'বারই গোল্লা ক'রে দলপতি ডেক্সটারকে ভাবিয়ে তুলেছেন। মনে হয় তিনি এক নম্বর অর্থাৎ ওপনিং ব্যাটসম্যানের স্থান থেকে চার নম্বরে নেমে যাবেন।

তৃতীয় দিনে এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭০ রানে শেষ হয়। ডেভিড শেফার্ড আট রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তাঁর পরই অধিনায়ক ডেক্সটারের ৬০ রান উল্লেখযোগ্য। এই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও হোর বোলিংয়ে ভেল্কি দেখান—৬০ রানে ৫টা উইকেট। ম্যাকেঞ্জী তাঁর নীচে ৬৬ রানে ৩ উইকেট। খুবই উত্তেজনাপূর্ণ খেলা—এম সি সি দলের ৩টে উইকেট পড়ে তখন ২০৯ রান। কিন্তু ৪র্থ উইকেট ২০৯ রানের, ৫ম ও ৬ষ্ঠ উইকেট ২১১ রানের এবং ৭ম উইকেট ২১২ রানের মাথায় পড়ে যায়। ২০৯ রানের সঙ্গে মাত্র তিন রানের যোগফলে ৪টে উইকেট পড়ে যায়! এই চারটে উইকেটের মধ্যে হোর তিনটে উইকেট পান।

খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১১ রান তুলতে সম্মিলিত একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তৃতীয় দিনে কোন উইকেট না খুইয়ে ৫০ রান করে। ফলে তাদের আর ৬১ রানের প্রয়োজন হয়। ৪র্থ দিনে এই ৬১ রান তুলতে সম্মিলিত একাদশ দলের ৩৫ মিনিট সময় লাগে। সিম্পসন প্রথম ইনিংসে ১০৯ রান ক'রেছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৮০ মিনিট খেলে ৬৬ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে লরী খেলতে নামেননি। পূর্ব দিন তিনি ট্রুম্যানের বলে পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন।

চলতি বছরের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলের এই প্রথম পরাজয়; শুধু তাই নয়, পার্থে ১৯০৭ সাল থেকে এম সি সি খেলে এই প্রথম পরাজয় বরণ করলো।

॥ ব্রিসবেনে বিবিধ রেকর্ড ॥

আগামী ৩০শে নভেম্বর তারিখে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪৬-তম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবে। ১৯২৮ সালের এই ৩০শে নভেম্বর তারিখেই ব্রিসবেনের এক্‌সহিবিশন ক্রিকেট মাঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলার পীঠস্থান হিসাবে মাহাত্ম্য লাভ করে এবং সেই টেস্ট খেলাটিও ছিল ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে—উভয় দেশের ১১৫তম টেস্ট খেলা। ব্রিসবেনের সেই প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৬৭৫ রানে জয়ী হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী তিনটে টেস্ট খেলাতেও ইংল্যান্ড জয়লাভ ক'রে শেষ পর্যন্ত ৪—১ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে উভয় দেশের টেস্ট সিরিজে জয়লাভের পুরস্কার কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' লাভ করে। ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দুটো মাঠে টেস্ট খেলা হয়েছে—এক্‌সহিবিশন মাঠে মাত্র একটা (১৯২৮ সালে) এবং ওয়ালোনগাবা মাঠে ৬টা—মোট ৭টা। ওয়ালোনগাবা মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা হয় ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। সেই সময় থেকেই এই মাঠে খেলা হচ্ছে। ব্রিসবেন মাঠের মাটির বিশেষত্ব এই যে, এখানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সাতটা টেস্ট খেলাতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে—অর্থাৎ কোন খেলাই অমীমাংসিত থাকেনি। এই সাতটা টেস্ট

খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং ইংল্যাণ্ডের ৩। এখানে টেস্ট সেঞ্চুরীর সংখ্যাও ৭—অস্ট্রেলিয়ার ৫ এবং ইংল্যাণ্ডের ২।

১৯২৮-২৯ সাল থেকে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে যে সাতটি টেস্ট সিরিজের খেলা হয়েছে একমাত্র ১৯৩২-৩৩ সালের টেস্ট সিরিজ বাদে বাকি ৬টি টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা হয়েছে ব্রিসবেনে। ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি ব্রিসবেনের তিনটে টেস্ট খেলায়—১৯২৮-২৯ সালের প্রথম টেস্ট, ১৯৩২-৩৩ সালের চতুর্থ টেস্ট এবং ১৯৩৬-৩৭ সালের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছিল; কিন্তু ব্রিসবেনের পরবর্তী চারটে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়। ব্রিসবেনে ১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৩৩২ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে—অস্ট্রেলিয়ার যে কোন মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এই জয়ই সব থেকে বেশী ব্যবধানে জয় হিসাবে আজও গণ্য।

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯২৮-২৯, **১ম টেস্ট**
ইংল্যাণ্ডের ৬৭৫ রানে জয়
ইংল্যাণ্ড : ৫২১ ও ৩৪২ (৮ উইঃ ডিঃ)
অস্ট্রেলিয়া : ১২২ ও ৬৬

১৯৩২-৩৩, **৪র্থ টেস্ট**
ইংল্যাণ্ডের ৬ উইকেটে জয়
ইংল্যাণ্ড : ৩৫৬ ও ১৬২ (৪ উইঃ)
অস্ট্রেলিয়া : ৩৪০ ও ১৭৫

১৯৩৬-৩৭, **১ম টেস্ট**
ইংল্যাণ্ডের ৩২২ রানে জয়
ইংল্যাণ্ড : ৩৫৮ ও ২৫৬
অস্ট্রেলিয়া : ২৩৪ ও ৫৮

১৯৪৬-৪৭, **১ম টেস্ট**
অস্ট্রেলিয়ার এক ইনিংস ও ৩৩২ রানে জয়।
ইংল্যাণ্ড : ১৪১ ও ১৭২*
অস্ট্রেলিয়া : ৬৪৫

১৯৫০-৫১, **১ম টেস্ট**
অস্ট্রেলিয়ার ৭০ রানে জয়।
ইংল্যাণ্ড : ৬৮ (৭ উইঃ ডিঃ) ও ১২২
অস্ট্রেলিয়া : ২২৮ ও ৩২ (৭ উইঃ ডিঃ)

১৯৫৪-৫৫, **১ম টেস্ট**
অস্ট্রেলিয়ার এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে জয়।
ইংল্যাণ্ড : ১৯০ ও ২৫৭
অস্ট্রেলিয়া : ৬০১ (৮ উইঃ ডিঃ)

১৯৫৮-৫৯, **১ম টেস্ট**
অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেটে জয়।
ইংল্যাণ্ড : ১৩৪ ও ১৯৮
অস্ট্রেলিয়া : ১৮৬ ও ১৪৭ (২ উইঃ)

এক ইনিংসে দলগত ৫০০ রান অথবা তার বেশী রান

ইংল্যাণ্ড : ৫২১ রান (১৯২৮-২৯)
অস্ট্রেলিয়া : ৬৪৫ রান (১৯৪৬-৪৭); ৬০১ রান—৮ উইকেটে (১৯৫৪-৫৫)

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া
৫২১ রান* (১৯২৮-২৯)	৬৪৫ রান+ (১৯৪৬-৪৭)
৩৫৮ রান+ (১৯৩৬-৩৭)	১২২ রান* (১৯২৮-২৯)

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ইংল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া
৩৪২ (৮ উইঃ ডিঃ)* (১৯২৮-২৯)	৬৬* (১৯২৮-২৯)
৬৮ (৭ উইঃ ডিঃ)+ (১৯৫০-৫১)	৩২ (৭ উইঃ)+ (১৯৫০-৫১)

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড
১২৬ এম লেল্যাণ্ড, ১৯৩৬-৩৭+
১৬৯ ই হেনড্রেন, ১৯২৮*

অস্ট্রেলিয়া
১৮৭ ডি জি ব্র্যাডম্যান, ১৯৪৬-৪৭+
৩৩ জে রাইডার, ১৯২৮-২৯*

* এক্‌স্‌হিবিশন মাঠ
+ ওয়ালোনগাবা মাঠ

রেকর্ড পার্টনারসীপ

১৯২৮-২৯ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ই হেনড্রেন এবং এইচ লারউড ৮ম উইকেটের জুটিতে যে ১২৪ রান করেন তা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আজও রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় প্রথম ইনিংসে ডি জি ব্র্যাডম্যান এবং এ এল হ্যাসেট তৃতীয় উইকেটের জুটিতে যে ২৭৬ রান করেন তা ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত টেস্ট খেলায় আজও রেকর্ড হিসাবে গণ্য।

ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মাণী

যোধপুরে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয় টেস্ট এ্যাথলেটিক্‌স অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মানী—উভয় দেশই সমান সংখ্যক ৮৬ পয়েন্ট অর্জন করায় ফলাফল সমান দাঁড়ায়। মোট ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ১২টি অনুষ্ঠানে প্রথমস্থান লাভ করে এবং বাকি ৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায় ভারতবর্ষ। প্রথমদিনের ১০টি অনুষ্ঠানে জার্মানী ৫২ পয়েন্ট এবং ভারতবর্ষ ৫১ পয়েন্ট পায়। দু'দিনের অনুষ্ঠানে মোট ৬টি বিষয়ে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়—প্রথম দিনে ৫টি এবং দ্বিতীয় দিনে একটি। দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পান ভারতবর্ষের গুরবচন সিং (হাই জাম্প এবং ১১০ মিটার হার্ডলস); জার্মানীর সুম্যান (১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড়) এবং উরবাক (ডিসকাস এবং সটপুট)।

জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ-পশ্চিম জার্মানীর তৃতীয় এ্যাথলেটিক্‌স টেস্ট প্রতিযোগিতায় ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১২টি অনুষ্ঠানে পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধিরা প্রথম স্থান লাভ করে। মাত্র ডিসকাস থ্রো এবং পোলভল্টে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ এ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানী ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। ভারতবর্ষ বাকি তিনটি অনুষ্ঠানে—হপ্‌স্টেপ-জাম্প (রাজকুমার—দূরত্ব ৪৬ ফুট ১½ ইঞ্চি), হাইজাম্প (জীত সিং—উচ্চতা ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি) এবং লং জাম্প
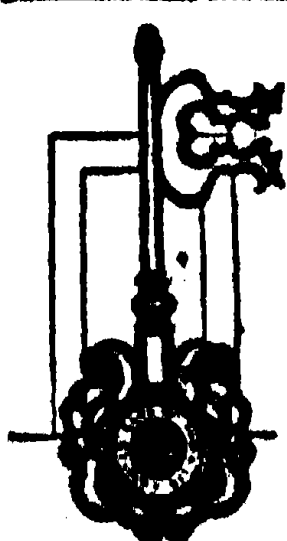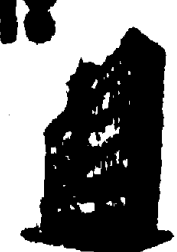
৪ঠা নভেম্বর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানী চতুর্থ এ্যাথলেটিকস টেস্ট খেলায় যোগদানকারী পশ্চিম জার্মাণীর প্রতিনিধিরা কুচকাওয়াজ করছেন। পিছনে আছে ভারতীয় দল।

(বি ভি সত্যনারায়ণ—দূরত্ব ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি) প্রথম স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মিলখা সিং এবং গুরবচন সিং এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি। পশ্চিম জার্মাণী প্রকৃতপক্ষে ১৫টি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে ১৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায়; কেবল লং জাম্পে তারা প্রথম স্থান নিতে পারে নি।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

ভারতবর্ষের উপর চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যে জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে জাতীয় সরকারের আহ্বানে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তার গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করেছেন। ক্রীড়াজগতও এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে এসেছে।

খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষের এই জাতীয় জরুরী অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আসন্ন 'বৃটিশ এম্পায়ার এ্যান্ড কমনওয়েলথ গেমস' অনুষ্ঠানে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রখ্যাত ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট তিন লক্ষ দশ হাজার টাকার জাতীয় সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় ক'রে বোম্বাইয়ে আয়োজিত রাজ্যপাল একাদশ বনাম মুখ্যমন্ত্রী একাদশ দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় টিকিট ক্রয়ের যোগ্যতা লাভ করেছেন। এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় দর্শক হিসাবে প্রবেশাধিকার লাভের এই সর্ত ছিল যে, যাঁরা নির্দিষ্ট অঙ্কের সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করবেন, কেবলমাত্র তাঁরাই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা দেখার টিকিট পাবেন। মার্চেণ্ট ছাড়া অনেকেই এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় টিকিট ক্রয়ের অধিকার লাভের জন্যে নব্বুই হাজার টাকা ক'রে সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়া সমন্বয় সমিতি গঠিত হয়েছে।

রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে পশ্চিম বাংলার এক নম্বর খেলোয়াড় দীপক ঘোষ ভারতবর্ষের দু নম্বর খেলোয়াড় জে এম ব্যানার্জিকে পরাজিত ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া দীপক ঘোষ পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে জে এম ব্যানার্জির জুটিতে খেতাব লাভ করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়লাভ করেন মিস ঊষা আয়েঙ্গার।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ

১৯৬২ সালের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল উপর্যুপরি ছ'বার মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কেব্‌ল্ চুরি গেলে

আপনার কতটুকু ক্ষতি হয়
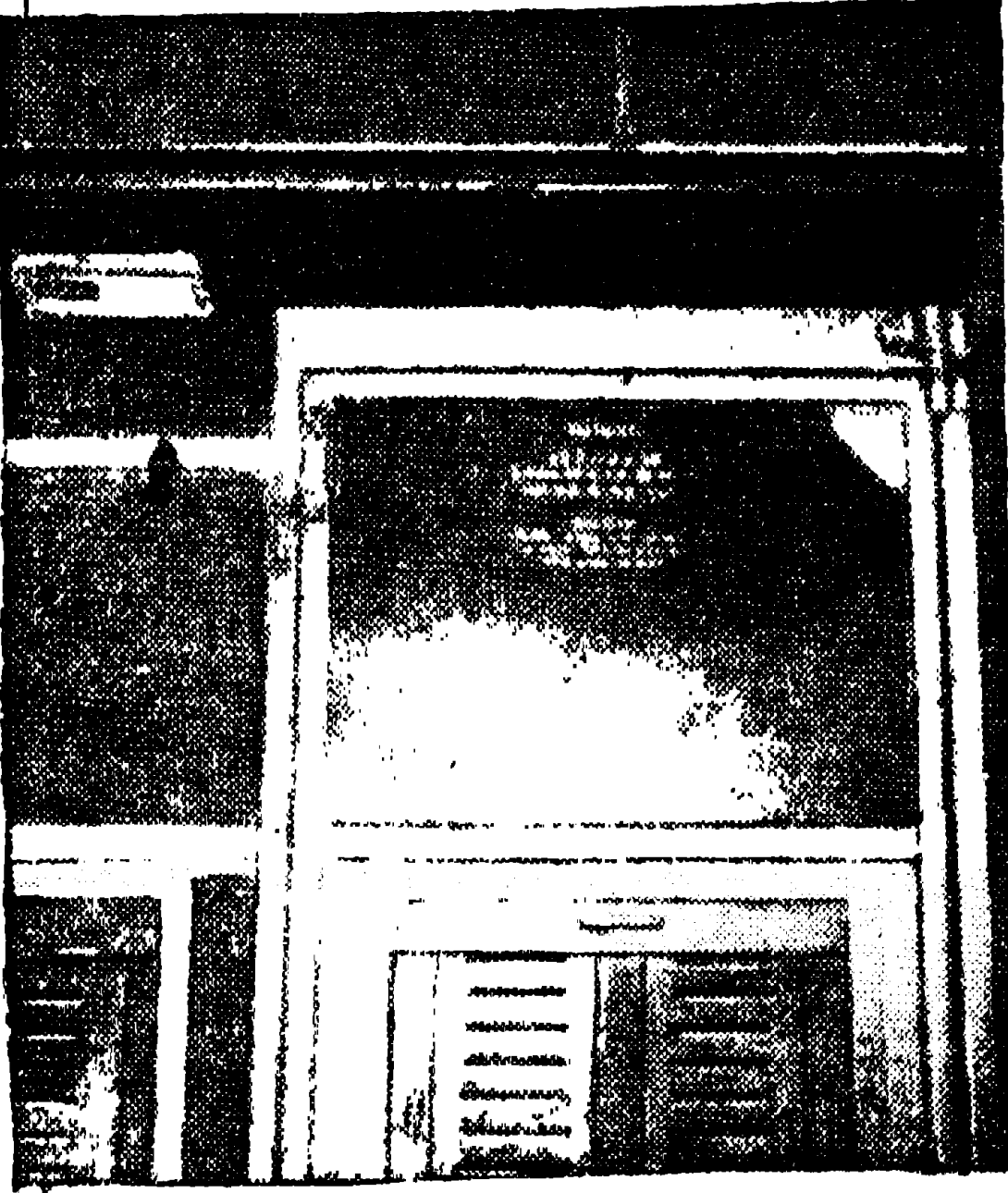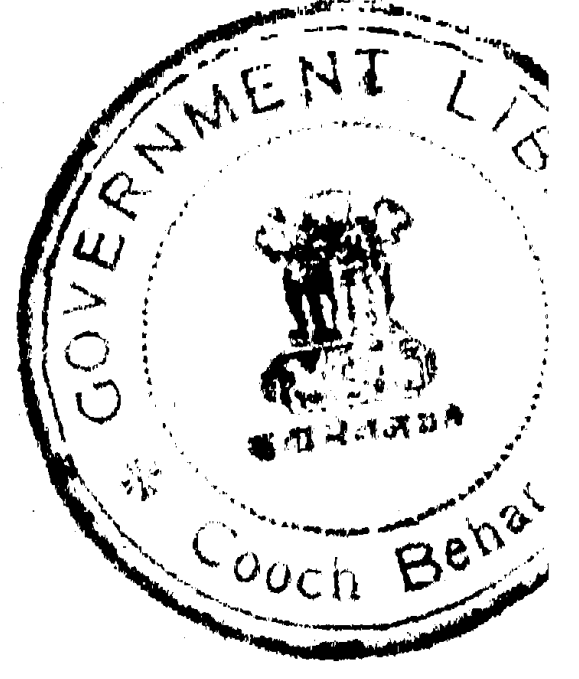
কামরায় কেব্‌ল্ কখন নেই রেলের যাত্রী হিসাবে আপনি ঠিক টের পাবেন। কামরার আলো আর পাখা-গুলো তখন কাজ করে না। টাকার অঙ্কে শেষপর্যান্ত রেলওয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু সারা বছর ধরে লক্ষ লক্ষ রেলযাত্রীকে যে অস্বাচ্ছন্দ্য, দুর্ভোগ আর বিপদাশঙ্কা ভোগ করতে হয় সে হিসাব জানার কোন উপায় নেই।

কেব্‌ল্ বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম চুরি যাওয়ার এই অন্যায়কে রোধ করতে যাত্রীসাধারণের কাছ থেকে যে কোন সাহায্য বা সংবাদ পেলে রেলওয়ে কৃতজ্ঞ থাকবে।

যে-কোন মূল্যেই
রেলওয়ে আপনাকে
সেবা করতে চায়

INDIAN RAILWAYS

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

DPB/SE/P 62

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩০শে কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th November 1962.
40 Naya Paise.

গত সপ্তাহে আমরা সম্পাদকীয় শেষ করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে "এখন প্রশ্ন অস্ত্র-সরঞ্জামের এবং আমাদের কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধির—সেই বিষয়েই।"

তারপর আর এক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্ণধার শ্রীকৃষ্ণ মেনন মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইয়াছেন। এই বিদায়-গ্রহণের ব্যাপারে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর খুব ইচ্ছা ছিল না তাঁহার এই সংগীকে বিদায় দেওয়ার। মন্ত্রিসভায় শ্রীকৃষ্ণ মেননের উপস্থিতি এবং অধিকার যে শুধু বিদেশের বহু মিত্রভাবাপন্ন দেশকে বিরক্ত ও রুষ্ট করিয়াছে এই নয়, উপরন্তু প্রতিরক্ষা বিভাগের সামরিক এবং অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রস্তুতি ও সরবরাহ-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত বহু উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে বিব্রত এবং অন্যায় অবিচারের দরুণ অসন্তুষ্ট করিয়াছে—এ সকল কথা পণ্ডিত নেহরু কি কারণে বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন জানি না। উপরন্তু দেখা যাইতেছে যে পার্লামেণ্টের কংগ্রেস কার্যকরি সমিতি তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবার পূর্বে তিনি শ্রীকৃষ্ণ মেননের লিখিত পদত্যাগ প্রস্তাবও গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। অবশ্য সে পরিচ্ছেদ এখন সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ মেননের পত্রে দেখা যায় যে তিনি দেশের লোকের তাঁহার প্রতি অনাস্থা যে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে সে কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত নেহরুকে সে কথা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুকে নিজের বিচার ও নিজের ইচ্ছার ঝোঁক সামলাইতে বেগ পাইতে হইয়াছে। এক্ষেত্রে স্বদেশের স্বাধীনতা আক্রান্ত হওয়ায় এবং উপরন্তু জগতের সম্মুখে বিব্রত প্রতিপন্ন হওয়ায় বিষের প্রতিক্রিয়া বিষাক্ত খোঁচায়ই দূর হইয়াছে—এই আমাদের সৌভাগ্যের কথা।

লোকসভায় বিগত ৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী দুইটি প্রস্তাব লোকসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেন। প্রথমটিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সমর্থন এবং দ্বিতীয়টিতে আক্রমণকারী চীনশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহার কবল হইতে ভারতের ভূমিখণ্ডকে উদ্ধার করার জন্য জাতির দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দুই প্রস্তাব লোকসভায় ও রাজ্যসভায় প্রবল উৎসাহের সহিত সমর্থিত হইয়াছে। কেননা এখন সমগ্র ভারতবাসীই কায়মনপ্রাণে ঐ দুই প্রস্তাবের সমর্থনে দাঁড়াইয়াছে। যে মুষ্টিমেয় (ক্ষমতালোলুপ) দেশদ্রোহীর দল দেশের সর্বনাশ করিয়া, চীনের সহায়তায় নিজ ঘৃণ্য স্বার্থপূরণের স্বপ্ন এখনও দেখিতেছে তাহাদের বলির পশুবৎ নির্বোধ সমর্থনকারির দলও দেশের লোকের মনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া ক্রমে নির্বাক ও নিশ্চল হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যে নূতন তথ্য কিছুই ছিল না। চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের কোনও আয়োজন বা প্রস্তুতি কেন হয় নাই, তাহার কৈফিয়তে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার উপদেষ্টা ও সমর্থকবর্গের বিচারবুদ্ধি বা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাশক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা আজ কেবল ভারতের নহে, এশিয়া তথা বিশ্বের ইতিহাসের এক ক্রান্তি মুহূর্তে উপস্থিত হইয়াছি।"

তিনি বলেন, গত একশত বা তাহারও বেশী কাল ভারতে যাহা ঘটে নাই, আজ সেখানে তাহাই ঘটিতেছে। ইহা ইতিহাসের এক আশ্চর্য পরিহাস।

"সুয়েজের ঘটনা প্রভৃতি সাম্প্রতিককালের কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, এই ধরণের আক্রমণের সম্ভাবনা অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা আজ ব্যাপক চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছি। ইহা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে।"

চীনা আক্রমণ সম্পর্কে বক্তৃতাকালে শ্রীনেহরু ভারতের অপ্রস্তুত অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনার উল্লেখে স্বীকারোক্তি করেন, "প্রকৃতপক্ষে আমরা দুই তিন ডিভিসন সৈন্যের ব্যাপক আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এই অবস্থায় বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের আক্রমণ অকস্মাৎ আমাদের উপর আসিয়া পড়ে।" প্রসঙ্গতঃ প্রধানমন্ত্রী জানান যে, যথোপযুক্ত গরম পোষাক ও কম্বল ছাড়াই ভারতীয় জওয়ানদের

আগামী সংখ্যা থেকে স্বনামধন্যা লেখিকা

শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর

মার্কিনী পটভূমিকায় মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় উপন্যাস

॥ অগ্নি তুষার ॥

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, অমৃত

সীমান্তে পাঠানো হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ তোলা হইয়াছে তাহা একেবারেই ঠিক নহে।

চীনাদের আসন্ন আক্রমণ ও তাহাতে কিরূপ শক্তি প্রযুক্ত করার আয়োজন চীনারা করিতেছে—এ সম্পর্কে কি কোনও সংবাদ পণ্ডিত নেহরু ও কৃষ্ণ মেনন পান নাই? আমরা শুনিয়াছি যে সংবাদ অনেক ক্ষেত্র হইতেই দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহারা দিয়াছিল তাহাদের "ওয়ার-মঙ্গার" বা যুদ্ধকামী বলিয়া তিরস্কার করা হইয়াছিল।

যাহা হউক, এখন কর্ণধারবর্গ সচেতন থাকিলেই মঙ্গল।

কবিতা

শপথ

মণীন্দ্র রায়

আমরা সয়েছি যারা অন্য এক যুদ্ধের নখর,
শুনেছি গভীর রাতে ফ্যান-চাওয়া মৃত কণ্ঠস্বর,
দেখেছি দাঙ্গার খুনে ভেসে যেতে কবন্ধ শহর,
আমরা রুখেছি যারা ছেচল্লিশে বুলেটের ঝড়—
জেনেছি প্রাণের মূল্যে স্বাধীনতা কী ভীষণ দামী!

উত্তরযৌবনে আজ বার্ষট্টির উত্তুরে বাতাসে
আবার মৃত্যুর হিংসা, বারুদের গন্ধ ভেসে আসে।
তবু এই দস্যুতার মুখোমুখী কামানের পাশে
প্রতিবিন্দু রক্তে যারা এ দেশের মাটি ভালোবাসে,
আমারও সকল চিত্ত, জেনো বন্ধু, তারই অনুগামী॥

চীন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যদিও আমি শপথ করলাম
যদিও আমি সহোদরের নাম
এখন থেকে ভুলে থাকবো, তবু
তোমার নদী, তোমার মাটি, তোমার স্মৃতি, চীন!—
বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা!

কেননা তুমি আকাশছোঁয়া প্রাচীর গ'ড়েছিলে
তবু তোমার আমার মধ্যে কোনো প্রাচীর রাত্রেও
ছিলো না।
কেননা তুমি আকাশছোঁয়া প্রাচীর গ'ড়েছিলে
তবু তোমার বুকের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম সহোদর।

মাঝে একটি সত্যিকারের প্রাচীর আজ গ'ড়লে তুমি,
চীন?—
ভাইয়ের রক্তে রাঙা, চোখে দেখা যায় না এমন
ঘৃণার প্রাচীর;
ভাইয়ের রক্তে রাঙা পাথর ব'য়ে ব'য়ে, ঘৃণার পাথর
ব'য়ে ব'য়ে!...
তোমার চোখে তাকানো আজ পাপ!

বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা
নিয়ে এখন রক্তমুখে এগিয়ে যাচ্ছি কুরুক্ষেত্রে, চীন!—
ভাইয়ের নাম বিষ করেছো তুমি॥

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

সেদিন পোস্টকার্ড কিনতে গিয়ে কেলেংকারী কাণ্ড।

দিনটা বোধ হয় ছিল সোমবার। ভিড় হ'য়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু লাইন ছিল না। সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ও মশায়, আপনার চিত্রগুপ্তের খাতা বন্ধ ক'রে আমাদের বিদায় করে দিন আগে!'

খাম-পোস্টকার্ড দেওয়ার মালিক যিনি, জালের ওপাশ থেকে তিনি বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন।' বলে তিনি পূর্ববৎ মনোযোগ সহকারে খাম-পোস্টকার্ডের আদমসুমারী শুরু করলেন।

যাই হোক, এরপর তিনি খাম-পোস্টকার্ড দেওয়া শুরু করেছিলেন। কাজেই তখনকার মতো ঝগড়াটা সেখানেই থেমে গেল। কিন্তু ঐ অপেক্ষা করার কথাটা মন থেকে চট করে মিলিয়ে গেল না আমার।

বাস্তবিক ছোটবড় কতো ব্যাপারেই যে আমরা অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে বাধ্য হই, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। পরীক্ষা দিয়ে অপেক্ষা করা থেকে শুরু করে বাস স্টপে অপেক্ষা করা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা স্নায়বিক উৎপীড়নের বীজ নিহিত আছে। বর্তমান জগতে যে আমরা এমন নিউরটিক হ'য়ে উঠছি তার কারণও এই 'অপেক্ষা করা'।

মনে করুন আপনার কোনো প্রিয়জন আসবেন খবর পেয়ে আপনি স্টেশনে গেছেন। গিয়ে শুনলেন, ট্রেন আসতে দেড়ঘণ্টা দেরি। তখন সেই নব্বুইটা মিনিট যদি নব্বুই মণ পাথরের মতো আপনার বুকে চেপে বসে তো অবাক হবার কিছু নেই। আর নিজের ভেতরে এই নব্বুই মণ পাষাণভার নিয়ে প্ল্যাটফর্মের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করে যে আন্দাজ আয়ুক্ষয় হয় তাও মনে রাখবার মতো বটে। তারপর দেরিতে হলেও, ট্রেন এক সময় সত্যিই আসে, প্রিয়জনও আসেন, কিন্তু আপনার মনের সেই প্রাথমিক উৎসাহ আর এক-বিন্দুও অবশিষ্ট থাকে না। তখন দেড়দিনের ট্রেনের ধকল সয়ে যে ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করেন তাঁর চেয়ে দেড়ঘণ্টা অপেক্ষাকারী আপনাকেই যদি

বেশি কাহিল দেখায় তো বিস্মিত হওয়া চলবে না।

কিংবা মনে করুন ডাক্তারের কাছে গেছেন। উচ্চ ভিজিটের নামজাদা চিকিৎসক, আগে থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা আছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যেহেতু আপনারই একমাত্র চিকিৎসক নন, সেইহেতু সাংঘাতিক একটা আকস্মিক যোগাযোগ না ঘটলে কিছুতেই আপনি চেম্বারে গিয়ে নিজেকে প্রথমতম আগন্তুক হিসেবে দেখতে পাবেন না। কিংবা তাও যদি হয় তো শুনতে পাবেন, ডাক্তারবাবু জরুরী একটা কল্-এ বেরিয়েছেন, এক্ষুনি আসবেন। তারপর শুরু হবে আপনার 'অপেক্ষা'। প্রথমে কিছুক্ষণ সামনের একটা অনির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে চেয়ে শূন্য মনে বসে থাকবেন। অতঃপর, নেহাৎ কিছু করবার নেই বলেই, ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে পা নাচাতে শুরু করবেন। এরপর অন্যান্য যাঁরা আগে থেকেই সেখানে ছিলেন বা পরে এসেছেন তাঁদের দিকে চেয়ে কে রোগী এবং কে রোগীর সঙ্গে সাহায্যের জন্যে এসেছেন সে বিষয়ে জল্পনা শুরু করবেন। এবং এইভাবে আগন্তুকদের প্রত্যেকের বিষয়ে একটা গল্প খাড়া করেও যখন আধঘণ্টার বেশি সময় কিছুতেই লোপাট করা সম্ভব হবে না তখন সামনের টেবিল থেকে শতহস্ত-মলিন বহু পুরাতন একখানি সাময়িক পত্র তুলে নিয়ে ছবি দেখতে শুরু করবেন।

এইভাবে একঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা 'অপেক্ষা' করার পর যখন আপনি সত্যিই একসময় ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার জন্যে ডাক শুনতে পান তখন যে আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি অসুস্থ বোধ করছেন তা বলাই বাহুল্য।

বাস্তবিক 'অপেক্ষা করা' এমন মারাত্মক ব্যাপার যে, পাকা ঘুঁটিও কেঁচে যায় তার ফলে। আর একই সঙ্গে তার ফলে ট্র্যাজেডী এবং কমেডীর রস প্রবাহিত হয়।

আমার এক বন্ধুর তখন পূর্বরাগের পালা ঘন হ'য়ে এসেছিল। মেয়েটির সঙ্গে তিনি দেখা করার ব্যবস্থা করলেন এক নামকরা কফির রেস্তরাঁয়। সেই দিন তিনি তার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ভদ্রমহিলাও সেটা আন্দাজ করেছিলেন এবং উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই গোড়াপত্তন বেশ ভালোভাবেই হ'য়েছিল বলতে হবে।

সাক্ষাতের সময় ছিল বেলা একটা থেকে দেড়টা। আগ্রহের প্রাবল্যে বন্ধুবর হাজির হলেন প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ—কারণ বলা তো যায় না, যান-বাহনের যোগাযোগে দেরিও হ'য়ে যেতে পারে।

যাই হোক, আগে-ভাগে এসে তিনি একটা নিরালা কোণ খুঁজে নিয়ে বসলেন, এবং কফির অর্ডার দিয়ে একখানা বই খুলে অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। বেলা একটার সময় বেয়ারা কফির কাপ নিয়ে যেতে এল। বন্ধুবর দ্বিতীয় কাপের অর্ডার দিলেন এবং বইয়ের অন্য স্থানে মনঃসংযোগ করলেন। দেড়টা নাগাদ বেয়ারা আবার এল। কাজেই তাকে তৃতীয় কাপের অর্ডার দিতে হল। এইভাবে বেলা আড়াইটে নাগাদ পঞ্চম কাপ কফি গলাধঃকরণ করেও যখন তিনি ভদ্রমহিলার দর্শন পেলেন না তখন কফি এবং 'অপেক্ষা' তাঁর মস্তিষ্কে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিল। প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বইপত্র নিয়ে তিনি সবেগে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনের দিকে ছিল একটা হাত-দুয়েক চওড়া সিলিং-ছোঁয়া লোহার পিলার। তিনি সেটা পাশ কাটাবার জন্যে যেই বাঁক নিয়েছেন সেই সময়ে আরেকজনও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পিলারের ওপাশের চেয়ার থেকে—তাঁর সঙ্গে ঘটল বন্ধুবরের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন যে দ্বিতীয় মানুষটি তাঁরই প্রেমাস্পদা!

তখন প্রথমে কিছুক্ষণ চলল পরস্পরকে দোষারোপ এবং আস্ফালন। এর মধ্যেই জানা গেল, মহিলাটি এসেছেন ঠিক একটায়। তারপর চলল পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। কিন্তু হায়, 'অপেক্ষা' তাঁদের দুজনেরই মনের ওপর স্টীম-রোলার চালিয়ে গেছে—মনের কথা বলা এবং শোনার মতো এক-বিন্দু উৎসাহও আর অবশিষ্ট ছিল না কারো মধ্যে। ভগ্নমনে নিঃসাড় দুই ছায়াপিণ্ডের মতো নীরবে গিয়ে তাঁরা বাস ধরলেন নিজ-নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে!

অপেক্ষা করতে সেই জন্যে আমি ভয় পাই। মনে হয় যেন আমাকে একা বসিয়ে রেখে সময় আমার আড়াল দিয়ে তার বরমালা নিয়ে গেল অন্য কোথাও।

অথচ সারা জীবনই তবু আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হল!

॥ মনে পড়ল ॥

এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশিত হবে। মোটামুটি ৮৪০টি শব্দ-সম্বলিত এই রচনা—হাসির ঘটনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিকার-কা হি নী, স্বীকার-কাহিনী, অলৌকিক অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে-কোনো বিষয়ে হতে পারে। প্রথমে প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের রচনা দিয়ে শুরু ক'রে এই বিভাগে অদূর ভবিষ্যতে পাঠক-পাঠিকাদের লেখা প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই 'অমৃতে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে এই ধরণের মনোজ্ঞ এবং সুলিখিত রচনা পেলে আমরা আনন্দিত হব।

সম্পাদক, 'অমৃত'

মনে পড়েন
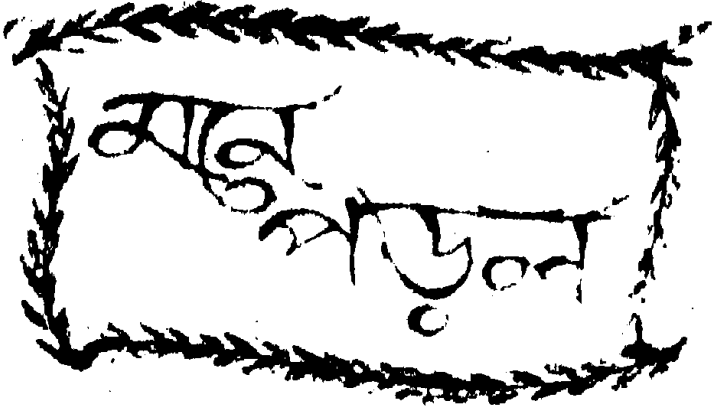
॥ ধ্পের গন্ধ ॥

আমাদের স্মৃতির ঘরগুলো বড় অদ্ভুত। ওর স্তরে স্তরে ভারী ভারী কপাট, যে কপাট দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে মনেও পড়ে না ওর অন্তরালে ঘর আছে, আছে জীবনের অনেক অনুভূতির সঞ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ কোন এক মুহূর্তে সে দরজা খুলে পড়ে, সেই ভুলে-থাকা সঞ্চয়গুলি মুখ বাড়িয়ে বলে ওঠে, 'আমি হারাইনি, আমি আছি।'

সেই বিস্মৃতির মরচেপড়া কবাটগুলি খুলে দেবার চাবি হয়তো কোন একটি বিস্মৃত গান, কোন এক সাদৃশ্যময় ঘটনা, বিশেষ কোন একটি সুগন্ধ, কোন একটি কণ্ঠস্বর।

এইতো সেদিন পথে চলতে পাশ দিয়ে একটি মেয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল, হঠাৎ তার গলার স্বরে ছেলেবেলার এক বন্ধুর গলার আভাস পেলাম। আর—সংগে সংগে সমস্ত বাল্যকালটা যেন তার ধুলো-খেলা নিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠল।

এমনিই হয়।

আমরা ভুলি, আবার তুলে দেখি।

নইলে আজ একটা নাম-না-জানা ধূপের গন্ধ কেন জীবনে মাত্র মিনিট কয়েক দেখা মেয়েটিকে একেবারে স্পষ্ট করে চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল?

লাল আলোর চোখ রাঙানিতে ছুটন্ত ট্যাক্সীখানা মোড়ের মাথায় থমকে থেমে পড়ল, আর যথারীতি সংগে সংগে খান-দুইতিন প্রসারিত করতল জানলা দিয়ে ঢুকে এল। ভিখিরির হাত, ফেরিওলার হাত।

এইগুলোই ওদের ঘাঁটি।

কাঁধে ঝোলা-ঝোলানো রোগা-হ্যাংলা ধূপওলা ছেলেটা একেবারে নাছোড়। 'নিন মা, নিন মা, খুব ভাল ধূপ আছে। কস্তুরী ধূপ, চন্দন ধূপ, গোলাপ ধূপ, মলয় ধূপ, দেবার্চন ধূপ—'

ফস করে একটা ধূপ জেলে ফেলে শূন্যে দুলিয়ে দিল কয়েকবার, স্নিগ্ধ মিষ্ট অথচ গাঢ় একটা গন্ধে ভরে গেল গাড়ীর ভিতরটা, আর সংগে সংগে চৈতন্যের গভীর স্তরে যেন একটা ধাক্কা খেলাম।

এ কোন ধূপ?

এ গন্ধ কিসের গন্ধ?

এ যে আমার পরিচিত।

কিন্তু কবে কোথায়?......দু'জোড়া চোখ হঠাৎ খুলে পড়া স্মৃতির দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—'এই তো! এখানে।'

একই চোখ, শুধু দুই চাহনি।

ধূপ কেনা হ'ল না।

ততক্ষণে সবুজ আলোর সাহস পেয়ে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। ধূপওলা ছেলেটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে তার হাত।... ধূপ কেনা হ'ল না, কিন্তু সেই সুরভি মোহ আচ্ছন্ন করে রইল চেতনাকে। সেই আচ্ছন্ন চেতনায় বর্তমানের গণ্ডি থেকে অনেক দূর পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম দক্ষিণ ভারতের এক দেবমন্দিরের সামনে। সে মন্দিরের দরজা বন্ধ, বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ভোগ হয়ে গেছে, বিগ্রহ বিশ্রামে নিমগ্ন।

তীর্থের পথে পথে বারে বারেই এমন ঘটে যায়। কোন দেবতার কখন ভোগের সময় কখন বিশ্রামের সময় জানা থাকে না। তাই দর্শন মেলে না। সেদিন তেমনি ঘটেছিল।

অনেক দূরে থেকে গিয়ে, জানা গেল একটু আগে মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দির চত্বরের ভিড় হালকা হয়ে এসেছে। বিকেল চারটেয় আবার দরজা খুলবে।

বিকেলে আবার একবার আসা সম্ভব হবে কিনা সঙ্গীর সংগে সেই পরামর্শ করছি, হঠাৎ দেখি আমাদেরই

আশাপূর্ণা দেবী

মত একজন আসছে সময়ের সীমানা পার করে। কিন্তু কী ব্যাকুলতা তার চোখে মুখে।

ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একটি মেয়ে, সাজসজ্জায় মনে হল দক্ষিণ ভারতীয়ই, হাতে ছোট একটি থালায় কিছু পুষ্পোপচার, আর একগোছা ধূপ।

দ্রুত ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আর আয়ত দুটি চোখে ফুটে উঠল দুঃখ অভিমান ক্ষোভ হতাশার এক তীব্র আবেগ।

কিন্তু ক্ষুব্ধ সেই দৃষ্টিতে আপন অক্ষমতার জন্যে আক্ষেপ দেখিনি। দেখেছিলাম যেন দেবতার উপর তীব্র অভিমান। চোখের অমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষা দৈবাৎ দেখা যায়।

মেয়েটি চত্বর থেকে নেমে এল।

কিন্তু কি হল কি জানি, শেষ ধাপে নেমে এসে একটু থেমে আবার উঠে গেল উপরে। নেমে এসে আবার কি ভেবে উঠে গেল ভেবে কৌতূহলী হলাম, কয়েক সিঁড়ি না উঠে পারলাম না।

দেখলাম মেয়েটি সেই বন্ধ কপাটের সামনে নামিয়ে রাখল হাতের থালাটি, চৌকাঠের খাঁজে জেলে দিল ধূপের গোছা, বসল নতজানু হয়ে। স্নিগ্ধ মিষ্ট অথচ গাঢ় একটা গন্ধে ভরে উঠল নির্জন চত্বর। ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

বারবার ভাবতে লাগলাম এ কী ধূপ!

ক্রমশঃ মন্দির একেবারে নির্জন হয়ে গেল, মেয়েটি বসে আছে তেমনি নিথর হয়ে। আমরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রাচীন মন্দিরের শিল্পসৌন্দর্য দেখতে। ভুলে গেছি মেয়েটির কথা, আলোচনা করছি, কত সালে মন্দির নির্মাণ হয়েছিল, কে এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।

এক সময় দেখি মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

কী আশ্চর্য, এখনো বসেছিল ও?

একা!

হঠাৎ মনে হল মেয়েটি কি এত উজ্জ্বল সাজে এসেছিল তখন? ওর পরণের ঘোর সবুজ মোটা রেশমী শাড়ী, ওর খোঁপায় গোঁজা ফুলের বলয়, ওর কপালের কুংকুমের টিপ, ওর কণ্ঠের স্বর্ণাভরণ সব কিছুতেই যেন এক আশ্চর্য দ্যুতি।

নিতান্তই কবিকল্পনা সন্দেহ নেই, তবু মনে হল। মনে হল এ ওর চোখের দ্যুতি। কিছু পূর্বের সেই হতাশ ক্ষুব্ধ অভিমানে গভীর দৃষ্টি এমন প্রসন্ন প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হল কোন মন্ত্রে?

অবাক হলাম।

সন্দেহ রইল না ওর দেবদর্শন হয়ে গেছে।

ও চলে গেল।

কি যেন ভেবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম বিগ্রহের ঘরের সামনে। বন্ধ কপাট। মোটা মোটা পিতলের সাজ লাগানো ভারী দেহটা নিয়ে যেমন কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনিই আছে। আর তার সামনে নামানো রয়েছে সেই ফুলের থালাখানি।

এ থালা ও ভুলে ফেলে চলে গেছে।

কিন্তু ও কি আর আসবে?

রুদ্ধ কপাট খোলার অপেক্ষায় বারবার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাবে?

স্নিগ্ধ মিষ্ট অথচ গাঢ় সৌরভে আচ্ছন্ন সেই চত্বরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কতক্ষণ যেন।

সঙ্গী ডাক দিলেন, 'কি হল? বিকেল অবধি বসে থাকবে নাকি?'

নেমে এলাম।

মনে হ'ল বলি, 'বসে থাকবো এমন সাধ্যই বা কই? বসে থেকে কি খোলাতে পারবো দেবতার দ্বার?'

আজও আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি।

গাড়ীর মধ্যে এখনো সেই ধূপের মৃদু রেশ। সেদিনের মত মনে হচ্ছে এ কোন ধূপ?

চন্দন কস্তুরী? মৃগনাভি? মলয়? দেবার্চন?

যার গন্ধের চাবিতে খুলে গেল স্মৃতির একটা মরচেধরা কপাট?

হয়ত এই মনে পড়াটা কিছুই না। নিতান্তই একটা ক্ষণিক অনুভূতি, তবু সেই ক্ষণিকের অনুভূতিগুলিই তো আমাদের জীবনের পরম সঞ্চয়।

মতামত

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শে অক্টোবর তারিখের অমৃত-তে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিত্রের "য়ুরোপে অনুবাদ-চর্চার দু'এক কথা" শীর্ষক এক তথ্যবহুল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সুন্দর ও সময়োপযোগী আলোচনাটি পড়বার সময় স্বভাবতঃই বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগটির দৈন্যের কথাই বারবার আমার মনে পড়েছে। এই সম্বন্ধে দু-একটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই।

য়ুরোপের প্রায় সব বড়ো ও মাঝারি লেখকদের নাম বাংলা দেশের সৎ পাঠক মহলে পরিচিত—তা সম্ভব হয়েছে ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদাংশের সমৃদ্ধির জন্য। বাঙালী পাঠক টমাস মান বা জাঁ পল সার্ত্র-কে চিনেছে ইংরাজীর মাধ্যমে; দি কনফেসনস্ অব ফেলিকস্ ক্রুল বা দি এজ অব রিজন্ পড়েছে ইংরাজীতে। কিন্তু আমাদের দেশের কথা ভাবলে কি দৈন্যটুকুই বড় হয়ে ধরা পড়ে না?

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, অনুবাদ যে একেবারে হ'চ্ছে না তা' নয়—অন্ততপক্ষে প্রচেষ্টার অভাব নেই। বিশেষ ক'রে বটতলার উপন্যাস-লেখক ছাড়া সব সাহিত্যিকই এ ব্যাপারে অন্তত মাথা না ঘামিয়ে পারেননি। কবিমহলে এক সুস্থ আন্দোলন (এ ছাড়া অন্য কোনও কথায় ভাব প্রকাশ সম্ভব নয়) দেখতে পাচ্ছি। মাইকেল বা প্রমথ চৌধুরীর উত্তরসূরী হিসাবেই যে এ'দের কয়েকজন অনুবাদে হাত দিয়েছেন তা' নয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আবেদন তাঁদের সৃষ্টিমানসে সাড়া জাগিয়েছে। কিছুদিন আগে বীট্-কবিদের নিয়ে মাতামাতি হয়ে গেছে; অথচ বাঙলা সাহিত্যে বীট-কবিতা অনূদিত হয়েছে অনেকদিন আগে। যতদূর মনে পড়ে, অরুণ ভট্টাচার্যের উত্তরসূরী-তে মিহির গুপ্ত এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তা আজকের কথা নয়। সেই প্রবন্ধে বীট-কবিতার অনুবাদও ছিল। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেকেই এদিককার ওদিককার কবিতা অনুবাদ করেছেন; এমন কি জাপানী হাইকু কবিতা বা তংকা কবিতারও সদ্ব্যবহার করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র বা দক্ষিণারঞ্জন বসু। কিন্তু সিস্টেম্যাটিক উপায়ে কেউ এখনও অনুবাদে হাত দিচ্ছেন না। যেমন ধরুন না সেক্সপীয়রের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা আজও বাংলাদেশে অপঠিত—কারণ কেউ সর্বতোভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালনে যত্নপর হচ্ছেন না। অবশ্য দু-একজন যে চেষ্টা না করছেন এমন নয়। দিলীপ রায় বহুদিন থেকেই ম্যাকবেথ বা টেম্পেস্ট অনুবাদ করছেন—কিন্তু কেন জানি না তিনি শুরু করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন—শেষ করবা'র দিকে বিশেষ নজর তাঁর আছে বলে মনে হয় না। মণীন্দ্র রায়-ও বেশ কিছুকাল ধরে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে সেক্সপীয়রের অনবদ্য সনেটগুলি অনুবাদ করছেন।

যথা—

> When in the chronicle of wasted time
> I see descriptions of the fairest wights,
> And beauty making beautiful old rhyme,
> In praise of ladies dead and lovely knights,
> Then in the blazon of sweet beauty's best,
> Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,
> I see their antique pen would have express'd
> Even such a beauty as you master now.

সনেট ১০৬

অনুবাদ—

> যখন বিগতস্মৃতি অতীতের কোনো কাহিনীতে
> দেখি আমি বর্ণনায় অন্য কোনো রূপের প্রতিমা,
> এবং সৌন্দর্য যদি সুন্দরের পদাবলী গীতে
> প্রশংসায় ধ'রে রাখে মৃত নারী, বীরের মহিমা,
> তখন সে মিছিলের তিলোত্তম প্রতি অঙ্গ মাঝে
> হাতের, পায়ের, কিম্বা ঠোঁটের কি চোখের, ভুরুর,
> সবারই ব্যাখ্যানে যেন পুরনো কলমে লেখা আছে।
> তেমনি সৌন্দর্য তুমি যাতে আজ সংহত মধুর।

এ ধরণের মূলানুগ অনুবাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আজ রয়েছে।

বিনীত
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩১

মহাশয়,

বিগত শুক্রবার, ৯ই কার্তিক, ১৩৬৯, তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'সঙ্গীতাচার্য আলাউদ্দীন খান : শতবর্ষের পথিক' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পান্নালাল দত্ত মহাশয়ের দুই-একটি বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিলাম, ইহা পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইলে অনুগৃহীত হইব।

৯৭২ পৃষ্ঠায় আছে—'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আলাউদ্দীন খানকে তাঁহার ভ্রাতা আয়েত আলী খানকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসেবে দিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে রাজি হন।'

শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় যদি কবিগুরুর ঐরূপ 'অনুরোধের' কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ২২শে আশ্বিন ১৩৪২ তারিখের লিখিত পত্রে আমাকে বলিয়াছিলেন— 'যন্ত্রসঙ্গীত শেখাতে পারে এমন কোন লোকের সন্ধান তোমার আছে? যন্ত্রের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মাদকের অভ্যাস থাকলে চলবে না।'

কবিগুরুর আদেশানুযায়ী লোকের সন্ধান আমি দিতে না পারায় তিনি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়কেও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং তিনিই আয়েত আলী খাঁ সাহেবের শান্তিনিকেতনে পদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি।

শ্রীযুক্ত দত্তমহাশয় আরও লিখিয়াছেন— 'তাঁহার (আয়েত আলীর) পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের (সেখানকার অন্যান্য শিক্ষকগণের) ঈর্ষা হইত। ইহা জানিতে পারিয়া আলাউদ্দীন নিজেই শান্তিনিকেতনে আসিয়া অন্যান্য শিক্ষকদের দৌড় পরীক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের সামনেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, আয়েত আলীর বাজনাই শাস্ত্রানুগ। ঈর্ষাকারী শিক্ষকদের মুখ তখন চুন হইয়া যায়। তবে তার পরে তাঁহার ভ্রাতাকে শান্তিনিকেতন হইতে সরাইয়া লইয়াছিলেন।'

শান্তিনিকেতনের শিক্ষকগণের ঈর্ষা হইয়াছিল হয়ত, কারণ তাঁহারা কেহই নানারূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখেন নাই, আয়েত আলী খাঁ সাহেব সে বিষয়ে সুদক্ষ কারিগর। কবিগুরু তাঁহার সঙ্গীত ভবনের শিক্ষকদের বিদ্যার দৌড় পরীক্ষা করাইবার জন্য আলাউদ্দীনকে নিশ্চয়ই আমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও আমরা চর্মচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য উৎসুখ।

ইতিহাসবিকৃত কাল্পনিক গুণাবলী আরোপ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা আমাদের ভারতবর্ষে নূতন নহে, তাহা আমাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা করিতে যাইয়া পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠমণীষীর কীর্তি সম্বন্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা সহ্য করিবার মত অপদার্থ আমরা আজও হই নাই।

বিনীত নিবেদক—
বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী
কলিকাতা-২৬

এই যুদ্ধের সংবাদ

শ্রীসঞ্জয়

॥ ভারতের সমর্থনে ॥

চীনা আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে এবং ভারতের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও সহানুভূতি কামনা ক'রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গত ২৬শে অক্টোবর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যে চিঠি লেখেন তার উত্তরে এ পর্যন্ত ৪০টি দেশ চীনা আক্রমণের নিন্দা ক'রে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন : ইথিওপিয়া, ইকুয়েডর, গুয়াটেমালা, জর্ডান, লাক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, ডমিনিকান রিপাব্লিক, আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, ফ্রান্স, সিংহল, সাইপ্রাস, নিউজীল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ত্রিনিদাদ, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, সুইডেন, ভেনিজুয়েলা, কোস্টারিকা, ইরাণ, নরওয়ে, চিলি, হাইতি, জাপান, গ্রীস, লিবিয়া, কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল) উগান্ডা, পানামা, ক্যানাডা, ফিলিপাইন, আইসল্যান্ড, নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, ইটালী, এবং মালয়। (তালিকা অসম্পূর্ণ)

২০শে অক্টোবর ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কমিউনিস্ট চীনের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়। মেশিনগান, মর্টার প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ত্রিশ সহস্রাধিক চীনা সৈন্য তুষারপাত ও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা ক'রে অতর্কিতে নেফা ও লদাক অঞ্চলের প্রহরারত ভারতীয় সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণের প্রথম দিনেই চীনা সৈন্যবাহিনী নেফা অঞ্চলে ঢোলার নিকটবর্তী নামকাচু নদী অতিক্রম করে।

পশ্চিমে লদাক সীমান্তে চীনা সৈন্যবাহিনী কুড়ি হাজার ফুট উঁচু চীপচাপ ও গলোয়ান উপত্যকার ১১টি ভারতীয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায় ও ৪টি দখল করে।

২১শে অক্টোবর বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের প্রবল আক্রমণে নিরুপায় হয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী জওয়ানরা নেফা অঞ্চলে ঢোলা, খিঞ্জেমান, দুঢাকারো সংঢাত ও সলো ঘাঁটি পরিত্যাগ করে চলে আসে।

পশ্চিম সীমান্তে গলোয়ান উপত্যকার সঙ্গে ভারতীয় ঘাঁটির সংযোগ ছিন্ন হয়।

২২শে অক্টোবর নেফা ও লদাক উভয় প্রান্তেই চীনাদের আক্রমণ আরও প্রবল আকার ধারণ করে। নেফার পার্বত্য অঞ্চলের সংগ্রাম কামেং ডিভিশন হ'তে লোহিত ডিভিশন পর্যন্ত ছড়িয়ে প'ড়ে।

লদাকে প্যানগঙ এলাকায় ঐদিন চীনারা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে এবং ভারতীয় সৈন্য অপেক্ষা অন্তত পাঁচগুণ বেশী সৈন্য নিয়ে চীন ভারতের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গলোয়ান উপত্যকার সাতটি ভারতীয় ঘাঁটিই চীনা কবলিত হয়।

ঐদিন রাত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে এক বেতার-ভাষণে বলেন, "মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি। আরও কিছু বিপর্যয় হয়ত আমাদের হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

২৩শে অক্টোবর নেফার সুবর্ণশ্রী লোহিত ও কামেং ডিভিশনে চীনা বাহিনীর ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হয়। ফলে সমগ্র নেফা অঞ্চলই একটি রক্তাক্ত রণাঙ্গনের রূপ ধারণ করে। চীনাদের অগ্রগতির ফলে তওয়াং শহর বিপন্ন হয়ে পড়ে।

লদাক রণাঙ্গনের অবস্থাঅপরিবর্তিত থাকে।

ঐদিন রাষ্ট্রপতিভবনে রাজ্যপাল সম্মেলনের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ঘোষণা করেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ও হৃতভূমি পুনরুদ্ধারই এখন আমাদের সম্মুখে একমাত্র কাজ।

২৪শে অক্টোবর মধ্য-নেফায় চীনা বাহিনী সুবর্ণশ্রী এলাকায় নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি করে। লংজুর দক্ষিণ-পশ্চিমে আসাফিলায় একটি ভারতীয় ঘাঁটির

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

উপর চীনারা মর্টার ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ চালায়।

লদাক রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। একদিনে গলোয়ান উপত্যকার দশটি ভারতীয় ঘাঁটি চীনারা দখল করে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐদিনই চীনের তিনদফা প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সবার আগে চীনা সৈন্যবাহিনীকে ৮ই সেপ্টেম্বরের স্থিতাবস্থায় ফিরে যেতে হবে, তারপর আলোচনা।

২৫শে অক্টোবর পূর্ব রণাঙ্গনে তওয়াঙের পতন হয়। বহু সৈন্যক্ষয়ের পর চীনারা দশ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত ঐ মঠ-নগরীটি দখল করে। তওয়াঙের অসামরিক অধিবাসীদের তার পূর্বদিনেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়। লদাক রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

২৬শে অক্টোবর পূর্ব রণাঙ্গনে চীনা বাহিনী তওয়াং অতিক্রম করে আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে জঙ দখল করে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবরের যুদ্ধে। চীনারা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও লোহিত ডিভিশনের ওয়ালঙ এলাকায় তাদের দুটি বড় আক্রমণ ভারতীয় জওয়ানদের দ্বারা প্রতিহত হয়। চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে এইখানেই হয় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাফল্যের সূচনা। লদাক রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিতই থাকে।

রাষ্ট্রপতি ঐদিনই সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে জাতীয় সঙ্কট ও আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে "ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিনান্স-১৯৬২" নামে একটি অর্ডিনান্সও ঘোষিত হয়। আপৎকালীন অবস্থায় এই অর্ডিনান্স একান্ত প্রয়োজন বিধায় সমগ্র দেশ তা সমর্থন করে।

চীনের তথাকথিত মীমাংসা-প্রস্তাব ভারত কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশিষ্ট পত্রিকা 'প্রাভদা' তাকে গঠনমূলক প্রস্তাব বলে

নেফার ওয়ালংখণ্ডে টহলদারী ভারতীয় সৈন্যগণ

সমর্থন করে এবং বিনাসর্তে চীনের ঐ তিনদফা প্রস্তাবে ভারতের অবিলম্বে আলোচনা শুরু করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মনোভাবে ভারতে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার করে।

২৭শে অক্টোবর নেফা ও লদাক উভয় রণাঙ্গনেই অ-স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। ঐদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জানান যে, ভারতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেছে। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকাতেও প্রধানমন্ত্রীর উক্তির সমর্থনে ঐদিন প্রকাশিত হয় যে, শ্রীনেহরু রাষ্ট্রপতি কেনেডির কাছে অস্ত্র-সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে জরুরী পত্র লিখেছেন।

২৮শে অক্টোবর নেফা রণাঙ্গন নীরব থাকলেও লদাকে চীনা-আক্রমণ পুনরায় প্রবল আকার ধারণ করে। দামচক এলাকায় চীনা সৈন্যের আক্রমণে ভারতীয় জওয়ানদের অবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২৯শে অক্টোবর চীনা সৈন্যের চাপে দামচক ও জারালা পরিত্যক্ত হয়। নেফা অঞ্চল হতে শুধু উভয়পক্ষের মাঝে মাঝে গুলী বিনিময়ের সংবাদ আসে।

ঐদিনই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি জানান যে, আক্রান্ত ভারতকে সব উপায়ে সাহায্য করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও অনুরূপ আশ্বাস পাওয়া যায়।

দশদিনের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক, কামান ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের আক্রমণে পঁচিশটি ভারতীয় ঘাঁটির পতন হয়।

৩০শে অক্টোবর নেফা অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী সর্বপ্রথম কামান ও মর্টার ব্যবহার করে। দশদিন যুদ্ধের পর এইদিনই সর্বপ্রথম ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া যায়। তবে সিয়াং বিভাগে চীনাদের প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হওয়ায় ভারতীয় জওয়ানরা একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক বিপর্যয় দেশে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। চারিদিক হতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের অপসারণের দাবী ওঠে। প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে নিজহস্তে প্রতিরক্ষাদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার ভারতের জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে এক ঘোষণায় জানান, পরের দিন থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষাদপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা-উৎপাদনমন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু দেশবাসী এই ব্যবস্থাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা শ্রীমেননকে সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রিসভা হ'তে অপসারণের দাবী জানান।

ঐদিন যুদ্ধের কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকে না। তবে মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর হতে এক ঘোষণায় বলা হয়, সপ্তাহকালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র হ'তে ভারতে বিমানযোগে হাল্কা ধরণের অস্ত্র ও গোলাগুলি পাঠানো হবে।

৩রা নভেম্বর অর্ডিন্যান্সবলে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের আটক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন।

৭ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ মেননের পদত্যাগপত্র গ্রহণ।

৮ই নভেম্বর উভয় সংসদের জরুরী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন—"পরিণাম যাই হোক না কেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারত কখনই হানাদারদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে না, এবং চীনা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।"

সংসদে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দেন।

২০শে অক্টোবর হ'তে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত যুদ্ধে চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধকালে প্রায় আড়াই সহস্র ভারতীয় জওয়ান নিহত অথবা নিখোঁজ হন। বলাবাহুল্য, এটি অনুমিত হিসাব এবং এর মধ্যে আহতদের ধরা হয়নি, যাদের সংখ্যাও হয়ত ঐরকমই হবে। চীনাপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে তাদের হতাহতের সংখ্যা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশী বলে মনে করা হচ্ছে, এবং পিকিঙ রেডিওতেও তা অস্বীকার করা হয়নি।

৯-১১-৬২

সিঁজানগড়ে অনবরত বাগচী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

অনবরত বাগচী বললেন 'মশায়, জলডুবিতে ডরোথী অ্যান্‌সন যখন ওরকম ব্যবহার করল তারপর আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। দূরে, সবকিছু থেকে দূরে যেতে চেয়েছিলুম এবং মেয়েদের সংস্রবে আর থাকব না ঠিক করে ফেলেছি। ঠিক সেই সময়ে নয়নের টেলিগ্রাম পেলুম।

সিজানগড়ের রাজকুমারী নয়ন! নয়নকে আপনাদের মনে পড়ে কি?'

আমরা ঘাড় নাড়লাম। অনবরত বাগচী বললেন 'দেখুন, মেয়েরাই আমায় জীবনে বড় বড় দাগা দিয়েছে।' তিনি বুকে হাত রাখলেন। বললেন, 'আঘাতে আঘাতে আমি জর্জ্জর। কিন্তু সে কথায় কাজ কি? টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্লেনে চড়লুম। সকাল নাগাদ বোম্বাই। কেন বোম্বাই গেলুম তা যদি জানতে চান তবে স্বীকার করতেই হবে বোম্বাই আমি যাইনি। গেলুম ইগাতপুরী। অথচ টিকিট কাটলাম বোম্বায়ের।

'ইগাতপুরী পৌঁছে নয়নের সামনে হাঁটুগেড়ে বসলাম। আমার হাঁটুতে কষ্ট হচ্ছিল। নাগপুরে প্লেন থেকে নেমেছি আমি। কমলালেবুর ভ্যানে চড়ে এসেছি এই হতভাগা জায়গায়। হাঁটুতে ব্যথা। বললাম, ব্যাপারে কি নয়ন? অবজার্ভ সিক্রেসি? টেলিগ্রামে ওকথা লিখলে কেন?

'নয়ন দেখতে কেমন?' অবিশ্বাসী রাজেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'নয়ন'? 'কুচকুচে কালো।' কালো-বাঘের মতো। দেখতে এবং স্বভাবে। আমার হাত ধরে তুলল নয়ন। বলল তুমি, একমাত্র তুমিই আমায় বাঁচাতে পার বাগচী। নয়ন কেঁদে ফেললে। মশায়, নতজানু হয়ে মাথা নোয়াতে গিয়ে আমার পিঠের ব্যথা চাড়া দিয়ে উঠল। তবু আমি বললাম তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ।

'নয়নের কাছে সব শুনলাম।'

'মশায়, সিজানগড় একদা স্টেট ছিল। এখন তার কিস্‌সু নেই। নয়ন দু'একটা ঘোড়া পোষে। পুণা এবং বোম্বায়ের মহালক্ষ্মী থেকে তার ঘোড়ার দরুণ যা পায় তাতেই চালাতে হয়।

'নয়ন বললে রেসের সময় আসন্ন। নয়নের বিশ্বস্ত জকি গোমেজ নাকি নয়নের নতুন ঘোড়া স্যাফায়ারকে তুক করেছে।

আমি বললুম নয়ন, আজকাল আর কেউ তুক-তাক করে নাকি! তুক মানে তুমি কি বলতে চাও? ইনডিআন উইচক্র্যাফ্‌ট?

'সে বললে জানিনে, তবে গোমেজ বর্তমানে হাসপাতালে। ঠ্যাং ভেঙে প'ড়ে আছে। স্যাফায়ার এদিকে খাচ্ছে না, দাচ্ছে না, কোর্সে দাঁড়িয়ে শুধু কি যেন শোকে আর চোখের জল ফেলে।

'বুড়োরাজাকে বলছ না কেন?'

'সে কথা আর বলো না। দিন নেই রাত নেই কবিতা পড়ছেন। কবিতা কপি করছেন। বাগচী, বাবা বোধ হয় বাঁচবেন না।'

আমি ভাবিত হলাম। যার প'য়ষট্টি বছর বয়সের মধ্যে আটচল্লিশ বছরই কাটল অশ্বপৃষ্ঠে এবং কখনো ঘোড়ার সঙ্গে কখনো জকির সঙ্গে কথা ক'য়ে, সে লোক কবিতা পড়ছে! আমার মনে পড়ল নয়নের দাদার বৌ দেখতে যাবার দিন তাঁর কেমন ক'রে যেন ধারণা হয় তিনি বৌলি এস্টেটে ঘোড়া কিনতে এসেছেন। বৌলির রাজকুমারী যখন দরবার ঘরে ঢোকেন নয়নের বাবা নাকি তার দাঁত গুণে বলেন বয়স আটত্রিশ। শুনেই রাজকুমারী চেঁচিয়ে ওঠে। তখন তিনি তার পিঠে চাপড় মেরে বলেন, যাক্‌ আপ, মাই ল্যাস!

'সেই লোক কবিতা পড়ছে!'

আমি বললুম, নয়ন, তুমি ভেব না। আমিই তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর।

নয়ন বললে, দ্যাট ইজ গুড। কিন্তু তুমি স্যাফায়ারের কাছে যাবার আগে স্নান ক'রে যেও। স্যাফায়ার বড় পিটপিটে।

আমি বললাম, আগে আমি বুড়োরাজার কাছে যাব। বুড়োরাজার কাছে গেলাম। দেখলাম গাছের ডালে হ্যামক বেঁধে আপন মনে দুলছেন। বুকের উপর একটি সুবৃহৎ বই। আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'নাই বা দৌড়ল স্যাফায়ার, নাই বা জিতল বাজি! বাগচী, এই প্রথম হব, বাজি জিতব, এমন নেশা কেন নয়নের? আমি বুঝিনি।'

বইটিকে বুকে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। বললেন, 'ওসব ভাবতে হয় তোমরা ভাব গে! আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি!

আমি চেয়ে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। আবার মৃদু এবং ক্ষমা-সুন্দর হাস্য দিয়ে লজ্জা দিলেন আমাকে বুড়োরাজা। বললেন, 'গতি, গতির উপাসনাই করেছি এতদিন! বোম্বাই থেকে কলকাতা, হংকং থেকে প্যারী, ঘোড়ার পিঠে থেকে ঘোড়ার পিঠে উল্কার মতো ঘুরেছি আমি!'

গলা নিচু ক'রে বললেন, 'আজ আমি শান্তি পেয়েছি। পিঠে নয় বুকে। আঃ, প্যালেস মর্টগেজ, চাকর-ঝি'র মাইনে দশ বছর হলো বাকি, তিনজন রাণী মামলা রুজু করেছেন, কিন্তু আমায় বিচলিত করতে পারে না।'

আমি ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। নয়নকে বললাম, তুমি আমাকে বড় ভাবিয়ে তুললে নয়ন!

নয়ন বললে, যা করবার তাড়াতাড়ি ক'রো। রেসের আর ক'দিনই বা আছে! আমি ত' জানি জোজো বট্‌লীওআলা আর বুড়ী ভায়োলেট মেহ্‌তা এই চায়। স্যাফায়ার যাতে না নামে মাঠে।

আমি বললাম, কি ক'রে জানলে?

নয়ন ভয়ঙ্কর ও ক্রূর হাসিতে আমায় বিদ্ধ ক'রে বললে, সব খবরই রাখি আমি। আমি এ-ও জানি জোজো এবং ভায়োলেট দু'জনেই বাবার অনেক-দিনের দোস্ত। কিন্তু আমি কিছুই ভাবি না। আমার তুমি আছ!

ব'লে সে উচ্চহাস্য করল এবং আমার পিঠে চাপড় মারল।

আপনারা মনে করছেন তাতে আর কি; সে স্পর্শ ত' সুখেরই! মশায়রা একবার শুধু স্মরণ করুন, নয়ন ছ' ফিট লম্বা এবং একটি ছোট পিয়ানো সে একাই তুলতে পারে। ছোট গাড়ী খানায় পড়লে একাই তোলে।

আমি স্যাফায়ারকে দেখলাম।

কাছে গেলাম। ও আমায় শুঁকল। তারপরই বৈরাগীর মতো নির্লিপ্ত হ'য়ে গেল ও। দেখলাম নতুন জকি ওকে কত তাতাচ্ছে কিন্তু স্যাফায়ারের একটি পা-ও নড়ে না। একটু চলে দুল্‌কি তালে। তারপরই দাঁড়ায়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং থরথর ক'রে কাঁপে।

থরে থরে খাদ্য এনে সাজালাম। কয়েকটি ঘোড়ী দেখলাম ওর আশেপাশে সহর্ষে হ্রেষারবে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু স্যাফায়ার যেন সব প্রলোভনই জয় করেছে।
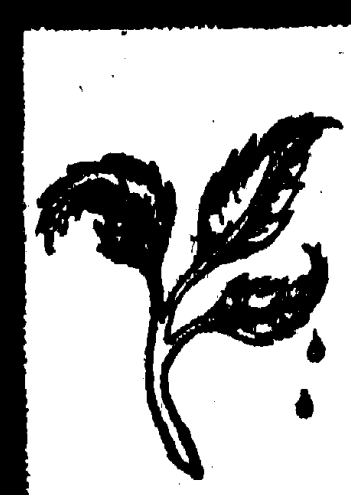
বুড়োরাজার হদিশ পাই না। নয়নের মেজাজ সপ্তমে। হাসপাতালে গোমেজকে যেই শুধোই, 'বাবা, যা চাস দেব। বল দেখি ব্যাপারটা কি?' সে বুকে হাত রেখে আঃ আঃ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে। ডাক্তার বলে, 'ও'র নার্ভে আঘাত লেগেছে, আপনি যান।'

শেষে নয়ন একদিন আমায় বললে, 'বাগচী খুব সাবধান। তুমি আগুন নিয়ে খেলছ।

সুন্দরী, তুমি কৃষ্ণা, তুমি বহ্নি, এসব বলতে যাচ্ছিলুম। নয়ন বললে, 'পরশু আমরা বম্বে যাচ্ছি। যা পার কর। বম্বেতে সাতদিন থাকছি আমরা। তারপরই—!'

তখন আমি হাঁটতে লাগলাম। হাঁটছি এবং হাঁটছি। নিজেকে ভর্ৎসনা করছি, বাগচি, কবে আর তুমি মেয়েদের সর্বনাশা মোহ থেকে নিজেকে টেনে তুলবে? কবে? কবে?

ঠিক সেই সময়ে বনের গহন থেকে একটি কবিকল্পনা বেরিয়ে এল। সবুজ জামা, সবুজ শাড়ী, সবুজ সান্‌গ্লাস।

বলল, 'বাগচী, এসেছ? আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। আশ্চর্য হয়ো না। আমি গোমেজের বৌ সিতারা। আমি জানি স্যাফায়ারের কি হয়েছে।'

তুমি জান? জান সিতারা? ব'লে আমি আকুল হয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরলাম। সে বললে 'জানি বইকি!'

সে আর আমি। আমি আর সে। সে বলল, 'দামী কিছু চাইব না। তুমি শুধু মহারাজের কবিতার বইটি আমায় এনে দিও। আমি বাৎলে দেব কেমন করে স্যাফায়ারকে দৌড় করাতে হয়।'

'মশায়, কেমন করে মহারাজের পকেট থেকে সে কবিতার বই চুরি করলুম, কেমন ক'রে একদিন সিতারা, নয়ন, মহারাজ, আমি, নতুন জকি আর স্যাফায়ার বোম্বাই পৌঁছলুম তা আর জানতে চাইবেন না। মহারাজ তখনো জানেন না আমি তাঁর বই চুরি করেছি। তিনি শুধু নয়নের ভয়ে বোম্বাই এসেছেন এ কথাটিই বার বার বললেন।

নয়ন বাঘিনী হয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি এবং সিতারা হরিণের মতো সভয়ে পরস্পরকে ভালবাসছি। আমি একটি ফুল ফেলে দিই হোটেলের টেবিলে। সিতারা সেটি মাথায় নিয়ে গোঁজে। সিতারা একটি রুমাল উড়িয়ে দেয়, আমি সেটি বুকপকেটে রাখি।

রেসের দিন সকালে সিতারা আমার ঘরে এল। বলল, 'বাগচী, এখন আমি যা বলব তা শুনে আমাকে এবং গোমেজকে ক্ষমা করতে পারবে?'

সে যা বললে শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'সিতারা! সিতারা! এ কি সত্যি?'

সে হাত মুচড়ে কেঁদে বললো 'হ্যাঁ। আমি, আমি এইমাত্র স্যাফায়ারের কাছ থেকে আসছি।।'

'হায় সিতারা! আমি কি করব?'

'তুমি?'

সে আমাকে একটি রুমাল ছুঁড়ে দিল। সে রুমাল নিয়ে আমি কোর্সে যাই। সে রুমাল আমি জকির হাতে দিই। বলি, 'একবার শুধু ওকে শুঁকতে দিও। তারপরেই ওর মনে পড়বে ওর নাম স্যাফায়ার। সাতপুরুষ ধ'রে যারা রেসে জিতেছে ও তাদেরই বংশধর!'

জকি সে রুমাল তাকে যথাসময়ে শোঁকায়। তার আগেই আমি নয়নকে দেখি। 'নয়ন!' ব'লে আমি চেঁচাতেই 'আরে মূর্খ!' ব'লে নয়ন আমার মাথার ওপর কেমন ক'রে যেন হাতটা ঘোরায়। আমার মনে হয় সব ভোঁ হ'য়ে গেল। জ্ঞান হারাতে হারাতে আমি শুনি বুড়োরাজা আমার কানের কাছে গর্জন করে বললে, 'আমার বই!'

অনবরত বাগচী একটু দম নিলেন। বললেন, 'মশায়, বিশ্বাস করুন সেবার ছ'টি মাস ভুগলাম আমি। জেজো বটলী-ওআলা, ভায়োলেট, বুড়োরাজা, নয়ন, সবাই পেটায় আমায়।' চার মাস হাসপাতালে।'

'কেন?'

'বুঝলেন না?'

নয়ন স্যাফায়ারকে ছোটাবে। স্যাফায়ার গোমেজদের হাতে। বুড়োরাজাকে হঠাৎ জেজো এবং ভায়োলেট মোটা টাকা দিলে। শর্ত, স্যাফায়ারকে ছোটান চলবে না। সে টাকা ঐ বইয়ের বাঁধান মলাটের মধ্যে। অতএব স্যাফায়ার এবং গোমেজের বিচ্ছেদ ঘটে। ঘোড়া যখন বেরিয়ে গেছে তখন নয়ন শুনল জিতলে যা পাবে, তার দ্বিগুণ টাকা পাবে ও-না জিতলে। কিন্তু তখন যা হবার তা হয়েছে। ঘোড়া মোক্ষম ওষুধ পেয়ে ছুটেছে।'

'তারপর?'

'শেষ অবধি আমায় প্রথমে হাসপাতাল এবং তারপর জেলে যেতে হলো।'

'জেলে কেন?'

'বাঃ, এখনো বোঝেননি?'

'বা, গল্পটা দাঁড়াল কি?'

'কি আর দাঁড়াবে। গোমেজ আর সিতারা যে যার মত পালাল। নয়ন টাকা পেয়ে সে জকিকে বিয়ে করে ফেললে। বুড়োরাজা আমায় চিঠি পাঠালে, আমি তখন জেলে।'

'কেন?'

অনবরত বাগচী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনাদের তুল্য বেরসিক কম দেখেছি। জেলে দেবে না ত' কি করবে? বোম্বায়ে প্রহিবিশান না? স্যাফায়ার কি খেয়ে ছুটত তা বোঝেননি? রোজ ও এবং গোমেজ হুইস্কি খেত। খাঁটি হুইস্কি-ভেজা রুমাল নিয়ে ওর নাকের সুমুখে একবারটি নাড়াতে হত। তখন ও ছুটত! আহা, প্রেরণা না পেলে ছুটবে কেন! খুড়োর কল কবিতাটা ভাবুন না!

'আমার কথা ভাবুন! ইন দি স্টেট অফ বম্বে একটি নিরীহ পশুকে বিপথে ধাবিত করবার অপরাধে দু'মাস জেল।'

বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করবেন না, মেয়েদের বিশ্বাস করবেন না। এ আমার অনেক দুঃখ অনেক ঠেকে লেখা! সেই থেকে মশায় কাব্যপ্রিয় বন্ধুলোক, ঘোড়া-পাগল মেয়ে, ধূর্ত জকির বৌ এবং নেশাগ্রস্ত ঘোড়া থেকে আমি দূরে দূরে থাকি।'

আমরাও এবার দূরে দূরে ছিলাম। যাতে অনবরত বাগচী যাবার সময় ভুলে কিছু নিয়ে না যেতে পারেন—ছাতাটা কিংবা সিগারেটের টিনটা। বলা ত' যায় না!

বাঙলা গদ্যকবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্র

সুধীর করন

বাঙলা সাহিত্যে গদ্য-কবিতা রচনার প্রথম অনায়াস-কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থটিকে এই হিসেবে বাঙলা গদ্য-কবিতার প্রথম গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। 'লিপিকা' নামক কাব্যায়িত গদ্য-রচনার পুস্তকটি আসলে কোন্ জাতীয় রচনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। মূলতঃ 'ব্যক্তিক নিবন্ধ' হলেও লিপিকার প্রত্যেকটি রচনা বাহ্যতঃ একই পর্যায়ের নয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে, গল্প-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্তিলাভের অধিকার পাওয়ার ফলে লিপিকার জাত-গোত্র-কৌলীন্য সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা সান্ত্বনা লাভ করলো বটে, কিন্তু তা'তেও সন্দেহের কারণ দূরীভূত হয়নি। বিতর্কিত বিষয়বস্তুকে আপাততঃ দূরে রেখে এ কথা বোধ হয় অনায়াসে বলা চলে যে, 'লিপিকা' রবীন্দ্রনাথের জাত-হরানো প্রিয়া। ছোট-গল্পের মুক্তি লিপিকাতে অপ্রাপ্য তবু লিপিকাকে গল্পের সংগ্রহশালায় পেয়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ মনের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে। লিপিকার যে কয়েকটি রচনায় কাব্যপ্রাণ আছে অর্থাৎ যা শুধু কাব্যায়িত গদ্য না হয়ে গদ্য-কবিতার রূপ-রসের ছোঁয়া পেয়ে নবজন্মের সিংহদ্বারের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে, সে-গুলিকে বাঙলা সাহিত্যের আদি গদ্য-কবিতারূপে স্বীকৃতি দানের পক্ষে অপরিসীম বাধা-নিষেধ ছিল বলে মনে হয় না। তবু লিপিকার রচনাগুলির কয়েকটিকেও যে তিনি পদ্যের মতো খণ্ডিত করে প্রকাশ করেন নি, ভীরুতাকেই তার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে এ ভীরুতার মূলে আরও যে কারণ ছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না। রচনাগুলির অপরিমিতির কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যায়িত গদ্য এবং গদ্য-কবিতার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই লিপিকার রচনাগুলিকে সরাসরি গদ্য-কবিতা বলে দাবী করতে পারেন নি। তবু লিপিকার কয়েকটি রচনাই যে গদ্য-কবিতা রচনার প্রয়াস-জাত, তা তিনি স্বীকার করেছেন। পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকাতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এইভাবে :—

> গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্য-শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাঙলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি। লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ হয় ভীরুতাই তার কারণ।
>
> তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল। কেবল ভাষা-বাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

লিপিকা প্রকাশের দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

।। ২ ।।

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত কথাকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর আরোপ করলে তা' হয়তো শ্রুতিকটু বলে মনে হতে পারে। কেন না, অবনীন্দ্রনাথ তবু গদ্য-কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করে প্রয়াসও করেছিলেন, কিন্তু ঠিক এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'গদ্য-কবিতা' রচনা করার চেষ্টা করেন নি। অথচ কথাটা ঠিক নয়।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই গদ্য-কবিতার প্রথম সার্থক সৃষ্টিকার,—এ কথা মনে রেখেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে হচ্ছে। পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৩২, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ যখন কবি-কাহিনী রচনা করছেন কিশোর বয়সে, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম চেষ্টারত ছিলেন গদ্য-কবিতা রচনায়। বলা বাহুল্য সে চেষ্টার ফল যা-ই হোক না কেন, একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে সজ্ঞান প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন। লিপিকার কয়েকটি রচনাকে যেমন অনায়াসে খণ্ডিত ক'রে কাব্যের কাঠামোটিকেও অন্ততঃপক্ষে পরিস্ফুট করা যেতো বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি রচনার মধ্যেও সে সম্ভাবনা ছিল।

কাব্যায়িত গদ্যকে খণ্ডিত করার প্রথম প্রচেষ্টা অবশ্যই রাজকৃষ্ণ রায়ের। কিন্তু ঠিক এই কারণেই রাজকৃষ্ণ রায়কে বাঙলা সাহিত্যে আদি গদ্য-কবিতা-নির্মাতার স্থান দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। আসলে রাজকৃষ্ণ রায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেই যে এ ধরণের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা' আয়াসবোধ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজকৃষ্ণ রায় উভয়েই কাব্যায়িত গদ্য রচনা করেছিলেন এবং গদ্য-কবিতার আদি রূপ হিসাবে কাব্যায়িত গদ্যকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাব্যিক স্বীকৃতি দান করাও যেতে পারে। না-হয়, এ'দের কেউই যথার্থ গদ্য-কবিতার স্রষ্টা নন। এ-কথা মনে রেখেই এই আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে।

কবি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও অপরিচয়ের কালিমা বহন করে আছেন, অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু অ-কবিও সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবি-নামহীনতার মূলে কারণ বোধ হয় তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই কবিপ্রাণতার অধিকারী ছিলেন। কবিতা রচনা করার মানসিকতা এবং রীতি-পদ্ধতির সংগে তাঁর অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল না। উপন্যাসের মধ্যেও তার পরিচয় আছে এবং অবিসম্বাদিতভাবে কমলাকান্তের দপ্তরে সংখ্যাহীন নিদর্শন উল্লেখিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতাগণের কুক্ষীভুক্ত থাকুক। এখানে তাঁর কয়েকটি গদ্য-কবিতা সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। যে কাব্য-গ্রন্থে তিনি তিনটি গদ্য-কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, সেই কাব্য-গ্রন্থটির নাম 'কবিতা-পুস্তক'। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

কবিতা-পুস্তক সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলুন না কেন নিজেকে

কবি হিসাবে পরিচিত করার মতো উৎসাহবোধ না করার কোন কারণই তাঁর ছিল না। কিন্তু বোধ হয় একথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, তাঁর আত্ম-প্রকাশের পথ উপন্যাসের এবং প্রবন্ধের মধ্যে। কবিতা তাঁর কাছে নতুন কোন দিকদর্শক হিসাবে আসে নি। গতানুগতিক কাব্যরীতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি। ফলে সংকোচের সংগেই তিনি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

যাই হোক এই কবিতা-পুস্তকের মধ্যেই তিনটি রচনার মাধ্যমে বঙ্কিম-চন্দ্রই সর্বপ্রথম গদ্যের কাব্যরূপপ্রাপ্তি সম্পর্কে সজ্ঞান চেষ্টার পরিচয় রেখে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য :

> কবিতা-পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য-প্রবন্ধ সান্নবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভালো করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সংগত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্য-কবিতা এই পুস্তকে সান্নবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যে-রূপ কবিত্ব-শূন্য আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথার কিছু অংশের সংগে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ মিল আছে। 'অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল। পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি বলেছেন 'গদ্য-কাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন-ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্য-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূরে বাড়িয়ে দেওয়া

সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।'

বলাবাহুল্য, আমার বক্তব্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙলা সাহিত্যে গদ্য-কবিতার সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেন। তাঁর লিখিত গদ্য-কবিতাগুলি যদিও আধুনিক দৃষ্টিতে গদ্য-কবিতার পর্যায়-ভুক্ত নয়, তবুও উক্ত গদ্যকবিতাগুলির মূল্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সজ্ঞান প্রচেষ্টার স্বাক্ষর হিসেবেই ইতিহাসভুক্ত হ'তে পারে। কাব্যায়িত গদ্য হিসাবে অবশ্যই সেগুলি স্মরণযোগ্য। পুনশ্চ-র অনেক কবিতাই এমনি কাব্যায়িত গদ্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার স্পর্শে সেগুলি প্রায়ই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, গদ্য-কবিতা হিসাবে সে-গুলির মূল্যও অনায়াসগ্রাহ্য মনে হয়। তা' ছাড়া কবিতা-পুস্তক ও পুনশ্চ কাব্য-গ্রন্থের কাল-ব্যবধানও অল্প নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরেই পুনশ্চ জন্ম-লাভ করে।

।। ৩ ।।

কবিতা-পুস্তকের অন্তর্গত তিনটি গদ্য-কবিতা প্রথম জন্মলগ্নের সর্ববিধ দুর্বলতায় পূর্ণ। শুধু প্রাণপণে চিৎকার করেই হয় তো সে আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেছে মাত্র। তবু, লিপিকার সঙ্গে মেঘ, বৃষ্টি এবং খদ্যোত নামযুক্ত এই তিনটি গদ্য-কবিতার একটি সুদূর আত্মীয়তার মৌলিক যোগসূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোৎ ব্যক্তিগত প্রবন্ধিকতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত; কবিতা হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ মোটেই গ্রাহ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের লিপিকাতে যে বাধা অল্প ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-পুস্তকে সেই বাধাই ছিল বেশী।

আসলে, মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোতের উপর কমলাকান্তের দপ্তরের সংবেদনশীল আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র একটু সংযত হলে মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোতকে অনায়াসে গদ্য-কবিতার প্রথম রূপ হিসাবেই আলোচনার ক্ষেত্রে টেনে আনতে পারা যেতো। রবীন্দ্রনাথ যেমন সজ্ঞানে গদ্য-কবিতা রচনা করার উদ্দেশ্য নিয়েই গদ্য-কবিতা সৃষ্টি করতে বসেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক সেইভাবে গদ্য-কবিতা রচনা করতে বসেন নি। শুধু এই বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, গদ্যও কাব্যের বাহন হতে পারে। প্রতিভাবান কবি হলে এই চিন্তার ক্ষেত্র থেকেই তিনি গদ্য-কবিতার সৃষ্টি করতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ঘাটের কথা, রাজপথের কথা প্রভৃতি আত্মকথনমূলক রচনার পূর্বাভাস হিসেবে তখন আর বিশেষ করে খদ্যোত-নামক রচনাটি মনে পড়ত না।

তবু, অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি পংক্তিকে যদি কাব্যরীতিতে বিন্যস্ত করা যায়, তা' হলে একটি মনোরম বিভ্রান্তিও লাভ করা যেতে পারে মেঘ-বৃষ্টি-খদ্যোতের ভেতর থেকে। সাধারণ গদ্য-ভঙ্গীতে রচনাগুলি যেখানে কাব্যায়িত গদ্য ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, সেখানে শুধু পংক্তি-বিন্যাসের সৌজন্যে সেগুলি অংশতঃ গদ্য-কবিতা বলে ভ্রম হতে পারে। উদাহরণ ঃ

আমি যখন মন্দ গম্ভীর গর্জন করি
বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া
শিখীকুলকে নাচাইয়া
মৃদু গম্ভীর গর্জন করি—
তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে
মন্দার মালা দুলিয়া উঠে,
নন্দনসুনশীর্ষকে
শিখীপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে
পর্বত গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি
কাঁপিয়া উঠে।

আর—
বজ্রনিপাতকালে,
বজ্রসহায় হইয়া
যে গর্জন করিয়াছিলাম
সে গর্জন শুনিতে চাহিও না।
ভয় পাইবে।

(—মেঘ)

এ মোহিনী কি
আমি জানি।
জ্যোতিষ্মান হইয়া এ সংসারে
আলো বিতরণ করিব—
বড় সাধ,
কিন্তু হায়!
আমরা খদ্যোত,
এ আলোকে কিছুই
আলোকিত হইবে না।
কাজ নাই।
তুমি ঐ বকুলকুঞ্জ কিশলয়কৃত
অন্ধকার মধ্যে
তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও।
আমিও জলে হউক স্থলে হউক
রোগে হউক দুঃখে হউক
এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

(—খদ্যোত)

অংশ বিশেষ উদ্ধৃত ক'রে সমগ্র রচনার বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করা যায় না। এমন কি, উক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্য দিয়ে কোন সুদূরপ্রসারী কাব্যব্যঞ্জনাও যে ধ্বনিত হচ্ছে না, এ কথাও ঠিক। কিন্তু, ভাষার গৌরবে, সাবলীল পদবিন্যাসে এই অংশগুলি কাব্যায়িত হয়ে উঠেছে এও অস্বীকার করা যায় না। 'মেঘের' মধ্যে তার গুরু গুরু গর্জনের সংকেত যদি ধরা পড়ে থাকে, 'বৃষ্টির' মধ্যে যদি সর্বব্যাপ্তির আভাস থাকে, আর খদ্যোত যদি তত্ত্বায়িত জীবনবোধের স্ফুলিঙ্গ-কেও প্রকাশ করে থাকে, তা' হলে তা' কাব্যের সুরের মাধ্যমেই ব্যঞ্জিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গদ্য-কবিতাগুলির সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়ের গদ্য-কবিতাগুলির তুলনা করলে দেখা যাবে যে, রাজকৃষ্ণ যদিও পংক্তি ভেঙেই গদ্য-কবিতা রচনা করেছিলেন, তা' প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর থেকে বেশী দূরে যেতে পারেনি।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ রায়ের অবসর সরোজিনী কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দুটি গদ্য-কবিতা পাওয়া যায়। এইজন্য কোন কোন সাহিত্য-ঐতিহাসিক তাঁকে বাঙলা গদ্য-কবিতার আদি গদ্য-কবিতাকার হিসাবে স্মরণ করেছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-পুস্তক এর অনেক আগেই প্রকাশিত। সাহিত্যসাধক চরিতমালার লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজকৃষ্ণ রায়কেই এবিষয়ে কৃতিত্ব দান করেছেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আর্য-দর্শনে প্রকাশিত বর্ষার মেঘ নামক একটি গদ্য-কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই কবিতার পাদটীকায় বলা হয়েছিল ঃ 'যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।'

বর্ষার মেঘ কবিতাটি দীর্ঘ। পংক্তি-বিন্যাসে কোনরূপ ভীরুতাকে আশ্রয় তিনি দেন নি। বোধ হয় এই কারণেই রাজকৃষ্ণ রায়কে আদি গদ্যকবিতা নির্মাণকারী বলা হয়েছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায় যতটুকু কাব্যরস প্রাপ্তির সম্ভাবনা, ততটুকুও রাজকৃষ্ণ রায় দিতে পারেননি। উদাহরণ,

ভাই বৈজ্ঞানিক!
একবার বেস করে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজিপাটা কি লইয়া?
পরমাণু লইয়া নয়?
তোমার সূর্য কি?
চন্দ্র কি?
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি আদি গ্রহ কি?

শুধু প্রথমদিকে গদ্য ভাষাকে একটু কাব্যায়িত করার চেষ্টা আছে মাত্র।

আকাশ নীল—অনন্ত নীল
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিক শোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্জলি
হতে
ধীরে ধীরে বায়ুস্রোতে
একখানি ক্ষুদ্র মেঘ ভাসিয়া আসিল।
ইত্যাদি......

মোটের উপর বাঙলা গদ্য-কবিতার উদ্ভবকাল বঙ্কিমযুগেই এবং বঙ্কিমচন্দ্রই গদ্য-কবিতার প্রথম সজ্ঞান নির্মাতা।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

জীবজগতের আশ্চর্য জীবনযাত্রা

আমরা নিজেদের নিয়েই এত ব্যস্ত থাকি যে আমাদের আশেপাশের জীবজগতের দিকে তাকাবার অবসর বড়ো একটা পাই না। আমাদের ঘরের দেওয়ালে যে টিকটিকিটি ঘুরে বেড়ায়, মেঝের গর্ত থেকে যে পিঁপড়ের সারি বেরিয়ে আসে, খাটের কোণে যে মাকড়শাটি জাল বোনে, জানলার কপাটে যে চড়ুইপাখিটি উড়ে উড়ে বসে—তাদের জীবনযাত্রার মধ্যেও যে কিছু কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে তা জানবার তাগিদ আমাদের ব্যস্ততাময় জীবনে নেই বললেই চলে। অথচ বহু বিজ্ঞানী তাদের সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন শুধু এই জীবজগতের জীবনযাত্রাকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে। যে-সব আশ্চর্য তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। এ সপ্তাহে আমি একটি অতি সাধারণ জীবের অতি আশ্চর্য জীবনযাত্রার কিছু বিবরণ উপস্থিত করতে চাই।

॥ পিঁপড়ে ॥

পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। অতি সুশৃংখল তাদের জীবনযাত্রা। আমরা কলকাতার মানুষেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে লাইন করে দাঁড়াতে শিখেছি। কিন্তু যেকোনো পিঁপড়ের সারির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, লাইন করে চলার ব্যাপারে আমরা এখনো ওদের কাছে শিক্ষা নিতে পারি। দু-দিক থেকে আসা দুই পিঁপড়ে যখন আচমকা পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুঁড় নেড়ে কথা বলে—সে দৃশ্যও তাকিয়ে দেখার মতো। শব্দ শোনা না গেলেও শুধু ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, পিঁপড়েরা কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জীবজগতে খুবই কম।

সকলেই জানেন, পিঁপড়েরা যে বাসা তৈরি করে তা শুধু একটু বাসা নয়, রীতিমতো একটি রাজ্য। সেই রাজ্যে রয়েছেন কয়েকজন রাণী, কয়েকজন পুরুষ ও প্রায় একলক্ষের মতো কর্মী। রাণীর সংখ্যা দুই বা তিন থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে কাঠপিঁপড়েদের এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যক রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে। রাণীদের আয়ু পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত। তবে কোনো রাজ্যই রাণীশূন্য থাকে না। একদল রাণী মারা গেলে নতুন আরেক দল রাণীকে নির্বাচিত করা হয়।

রাণীদের যত্ন ও তোয়াজ করবার জন্যে সবসময়েই একদল কর্মীকে হাজির থাকতে হয়। তারপরে রাণী যখন ডিম পাড়তে শুরু করেন তখন সেই ডিমের পরিচর্যা করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয় আরো একদল কর্মীকে। এই পরিচর্যার ব্যবস্থাটি এমনই সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক যে আমাদের শিশু-হাসপাতালগুলির পক্ষেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আদর্শ হতে পারে।

ডিমের প্রসঙ্গই যখন উঠে পড়েছে, পিঁপড়ের ডিম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা দূর করা যেতে পারে। সাধারণত ডিম ফুটে ছানা বেরোতে সপ্তাহ তিনেক সময় লাগে। কিন্তু ছানা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচর্যার পালা শেষ হয়ে যায় না। বরং পরিচর্যার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। একদল 'নার্স' সবসময়ে এই ছানাগুলোকে চোখে চোখে রাখে, তাদের গা পরিষ্কার করে, তাদের খাওয়ায়-দাওয়ায়, দিনের বেলা বাইরের রোদে আর হাওয়ায় নিয়ে আসে, রাত্রিবেলা ভেতরে নিয়ে যায় এবং আরো হাজার রকমে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করে। তারপরে এই ছানাগুলো যখন পুরোপুরি বড়ো হয়ে ওঠে তখন নার্সরা ছানাগুলোর জন্যে রেশমী গুটী তৈরি করে। বাজারের যে পিঁপড়ের ডিম বিক্রি হয় তা আসলে এই রেশমী গুটীগুলো।

তারপরে যখন গুটী থেকে বাচ্চা পিঁপড়ের বেরিয়ে আসার সময় হয় তখন এই নার্সরাই আবার এই গুটীগুলোকে কেটে তাদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। তারপরেও কিছুদিন পর্যন্ত বাচ্চা পিঁপড়েদের নার্সদের তত্ত্বাবধানে থেকে হাঁটাচলা শিখতে হয়।

পিঁপড়েদের রাজ্যকে তুলনা করা চলে আধুনিক কালের মস্ত একটি শহরের সঙ্গে। চারদিকে ছোট-বড়ো রাস্তা ও মস্ত মস্ত হলঘর ও গ্যালারি। নিখুঁত পরিকল্পনা মতো সর্বত্র কাজ হচ্ছে। আর এই সমস্ত রাস্তা ও ঘরবাড়ি আমাদের কলকাতা শহরের মতো মোটেই নয়, একদল কর্মী সব সময়েই মেরামতীর কাজ করছে, একদল কর্মী সব সময়েই পরিষ্কার করে চলেছে।

আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যদিও আমাদের চোখে সব পিঁপড়ের চেহারা একই রকম, কিন্তু পিঁপড়েরা খুব সম্ভবত একে অপরকে আলাদা করে চিনতে পারে। কারণ, দেখা গিয়েছে, এক রাজ্যের পিঁপড়েকে অপর রাজ্যে কখনোই ঢুকতে দেওয়া হয় না। আবার, কোনো একটি বিশেষ রাজ্যের কোনো একটি বিশেষ পিঁপড়ে যদি বহু দিন কোনো কারণে বাইরে থাকে আর তারপরে ফিরে আসে তাহলে তাকে বিনা আপত্তিতেই ঢুকতে দেওয়া হয়।

মানুষের মতো পিঁপড়েরাও চাষ-আবাদ করে ও গাই দোয়ায়। পিঁপড়েদের গাই হচ্ছে এক ধরণের পোকা যা গাছের পাতায় বা শেকড়ে বসবাস করে। গাই দোয়াবার পদ্ধতিও অদ্ভুত। পিঁপড়ে তার শুঁড় দিয়ে এই পোকার গায়ে সুড়সুড়ি দেয় আর পোকাটি মধুর মতো মিষ্টি একটি ফোঁটা ধার করে। সেই মিষ্টি ফোঁটার খানিকটা পিঁপড়ে নিজেই খায়, বাকিটা বাসায় নিয়ে যায় অন্যদের জন্যে।

এই বিশেষ ধরণের পোকারাই হচ্ছে পিঁপড়েদের গাই। পিঁপড়েরা এই গাইদের খুবই যত্নআত্তি করে। অন্যান্য পোকা-মাকড় যাতে এই গাইদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে নজর রাখে। শরৎকালে এই পোকার ডিমগুলোকে পিঁপড়েরা বাসায় নিয়ে যায় এবং শীত থেকে বাঁচায়। তারপরে

ও মশাই দরজা খুলুন না

[illegible]বসন্তকালে যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে তখন আবার বাচ্চাগুলোকে রেখে আসে গাছের পাতায় বা ফোকড়ে। এই পিঁপড়েদের দেখলে বোঝা যাবে, আমরা মানুষরাও অনেক সময় বাচ্চাদের এতখানি সেবা-যত্ন করতে পারি না।

পিঁপড়েদের রাজ্যে অসুস্থ বা আহতদের জন্যে চিকিৎসার বন্দোবস্তেও কোনো রকম ঘাটতি নেই। অনেকটা আমাদের হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা। অসুস্থ বা আহত পিঁপড়েকেও সেখানে আলাদা ঠাঁই নিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি শল্য-চিকিৎসাও করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পিঁপড়ের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ছুরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তাই বলে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, পিঁপড়েরা সব সময়েই কাজ নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। প্রসাধনের দিকেও তাদের খুবই মনোযোগ। হাজারটা কাজের মধ্যেও খানিকটা অবসর করে নিয়ে তারা রীতিমতো ঘটা করে প্রসাধন করতে বসে। প্রসাধন দ্রব্যেরও কোনো অভাব নেই। তাদের পায়ের সঙ্গেই আছে বুরুশ, চিরুনি, এমন কি বিউটি ক্রীম পর্যন্ত। বুরুশ হচ্ছে কয়েক গাছি ক্ষুদে ক্ষুদে শক্ত চুল, চিরুনি হচ্ছে কয়েক গাছি ক্ষুদে ক্ষুদে নরম চুল। এই নরম চুলগুলোর ভেতরটা ফাঁপা। আর এই ফাঁপা চুলের ভেতর থেকে এক ধরণের তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। এই হচ্ছে বিউটি ক্রীম। আর এমনই প্রসাধনের ঘটা যে একজন আরেকজনকে ডাকে প্রসাধনে সাহায্য করবার জন্যে। সাহায্যকারীও যথাসাধ্য অনুরোধ রক্ষা করে।

গরমের দিনে মাঝে মাঝে দেখা যায়, একদল পিঁপড়ে আকাশে উড়তে শুরু করেছে। এই উড়ন্ত পিঁপড়েদের কয়েকটি হচ্ছে রাণী আর বাদবাকিরা পুরুষ। তারপরে আকাশেই হনিমুনের পর্বটি সাঙ্গ হয়। রাণী পিঁপড়েরা তারপরে আবার ফিরে আসে নিজেদের রাজ্যে আর ডিম পাড়তে শুরু করে। সেই ডিম থেকে জন্ম নেয় নতুন একদল পিঁপড়ে। এমনিভাবে এক-একটি রাজ্য বহুকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। জীব-বিজ্ঞানীদের ধারণা, দু-শো বছরের পুরনো পিঁপড়ে-রাজ্যের সন্ধান পাওয়াটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এবারে পিঁপড়েদের সম্পর্কে সব-চেয়ে আশ্চর্য খবরটি দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

শুনলে অবাক হতে হবে যে, প্রজাপতির জন্ম হয় পিঁপড়ের রাজ্যে। প্রজাপতি ডিম পাড়ে গাছের পাতায়। সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে এক ধরণের শুঁয়োপোকা। কিন্তু এই শুঁয়োপোকারা গাছের পাতায় থাকে না, গাছ বেয়ে বেয়ে মাটিতে নেমে আসে আর [illegible] বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত এই শুঁয়োপোকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায় বিশেষ এক জাতের পিঁপড়ের। আর তখনই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে। পিঁপড়ে তার শুঁড় দিয়ে শুঁয়োপোকার গায়ে সুড়সুড়ি দেয়। শুঁয়োপোকার পিঠে আছে মধুভর্তি গ্ল্যাণ্ড। সেই গ্ল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে এক ফোঁটা মিষ্টি মধু। পিঁপড়ে পরমানন্দে সেই মধু খেতে থাকে। আর ওদিকে শুঁয়োপোকাটি হঠাৎ পিঠ বেঁকিয়ে পুটলি পাকিয়ে যায়। পিঁপড়ে তখন সেই পুটলিটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় নিজেদের রাজ্যে।

তারপরে সে এক বিপুল অভ্যর্থনা-পর্ব। সারা রাজ্যে যেন সাড়া পড়ে যায়। সেবাযত্নের ধুম শুরু হয়। বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি হয় শুঁয়োপোকাটির জন্যে। বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত থাকে। শুঁয়োপোকাটি হয়ে ওঠে একটি জড়-কীট এবং এইভাবে কাটে একুশটি দিন।

ঠিক একুশ দিন পরে জড়কীটের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে নীল প্রজাপতি। তখনো তার ডানাদুটো এঁটে থাকে শরীরের সঙ্গে। তারপরে সে পিঁপড়ের রাজ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

তারপরে নীল ডানা মেলে নীল [illegible] [illegible] শুরু করে।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

প্রথম বিপদের সংকেত পেল কান্তি একদিন মোক্ষদার কাছ থেকেই। সেদিন কী একটা হাফ-হলিডের দিন, শনিবারই বুঝি, দুপুরবেলা ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেছে যখন সে রতনদি তখনও ঘুমোচ্ছেন। একটু ইতস্তত করল, একবার ভাবল ঠেলে ঘুম ভাঙায় রতনদির। আবার কী মনে করে ওপরে উঠে গিয়ে বইখাতা নিয়েই বসল। অনেকদিনের টাস্ক জমে গেছে সব। মাস্টারমশাইদের কাছে কদিন ধরেই বকুনি খাচ্ছে—রতনদি একবার উঠে পড়লে আজও হবে না কিছু। এই বেলা সেরে নেওয়াই ভাল।

সে বিছানাতে বসে অঙ্ক কষছে, মোক্ষদা এল ঘর ঝাঁট দিতে। খানিকটা নীরবেই ঝাঁট দিল সে, তারপর কী মনে করে ঝাঁটাটা ফেলে কান্তির সামনে এসে দাঁড়াল কোমরে হাত দিয়ে।

প্রথমে অতটা বুঝতে পারেনি কান্তি। ঝাঁটার শব্দ থেমে যাওয়াও লক্ষ্য করেনি অত—হঠাৎ এক সময় কাছে একটা মানুষের উপস্থিতি অনুভব ক'রে মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে মোক্ষদা। মুখেও তার কেমন এক ধরণের হাসি। সে কি কৌতুকের না অনুকম্পার—না বিদ্বেষের তা ঠিক করতে পারল না কান্তি। কেমন যেন ভয় করতে লাগল তার। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'কী গা মোক্ষদাদি, আমায় কিছু বলবে?'

মুচকি হাসল মোক্ষদা। বলল, 'আর কিছু নয়—বলছিনু কি আর নেকাপড়ার ঠাট কেন ঠাকুর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না! আর যে কিছু হবে না এখানে থেকে তা তো নিজেই বুঝতে পারছ। এই বেলা পালাও—ভাল চাও তো। তবু এখনও জাত-ধম্মটা আছে—আর কিছু দিন এখানে পড়ে থাকলে সে দুটোও যাবে, রেহকাল পরকাল দুই-ই খুইয়ে বসে থাকতে হবে। লাভ তো হবেই না কিছু, উপরন্তু মার খেয়ে বেরোতে হবে এ বাড়ি থেকে, এও বলে রাখছি। মুকী আজকের লোক নয়, দেখল ঢের।...ওমাগীর ছেমো যখন চেপেছে তখন বেশী দিন আর তোমার বাঁচোয়া নেই, তোমার কাঁচা মাথাটি পরিপুন্ন ক'রে চিবিয়ে না খেয়ে ছাড়বে না। তবে এখনও সময় আছে, যদি পালিয়ে বাঁচতে পারো তো দ্যাখো। বামুনের ছেলে তায় গরীবের ছেলে—চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে তাই বলা।'

সত্যিই সেদিন কিছু বুঝতে পারে নি কান্তি, শুধু একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল তার, অকারণেই কানের কাছটা উঠেছিল লাল হয়ে। অবাক হয়ে বলেছিল, 'তুমি কি বলছ মোক্ষদাদি, আমি তো—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝতে যে পারবে না তা আমিও জানি! তাহ'লে আর তোমাকে সাবধান করতে আসবই বা কেন? এত যদি তোমার বুদ্ধি থাকত তাহ'লে কি আর এমনি ক'রে নিজের সব্বনাশ নিজে করতে। তাহ'লে তো দিন গুছিয়ে নিতে। এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করছে—এ তোমার কী কাজে আসছে বল? তেমন সেয়ানা ছেলে হ'লে বেশ ক'রে দুয়ে বার ক'রে নিত। মাগী যেকালে ফলেন্ হয়েছে সেখানে কি আর কিছু হিসেব করত—যা চাইতে তাই দিত।... নাও না, তুমিও দিন কিনে গুছিয়ে নাও না—কিচ্ছু বলব না। তবু তো বুঝব একটা কাজ হচ্ছে রাখেরের। এ যে ষাঁড়ের নাদ হয়ে থাকছ। জাতও যাবে পেটও ভরবে না!'

আরও বিহবল হয়ে পড়ে কান্তি। এ সব ভাষা তার বোধশক্তির বাইরে। 'ফলেন্' হওয়াটা যে কী বস্তু তা আজও জানে না কান্তি, তবে একটা ঝাপসা ঝাপসা রকমের অর্থ আন্দাজ করতে পারে বটে। কিন্তু সেদিন সবটাই দুর্বোধ্য হেঁয়ালি বলে বোধ হয়েছিল।

খানিকটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'আমি কিন্তু সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না মোক্ষদাদি, তুমি একটু খুলে বল। তুমি কি রতনদির কথা বলছ?'

'না—ওপাড়ার আসু দত্তর কথা বলছি। তুমি বেহেড্ বোকা, যাকে আবর বলে তাই। আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে এ সব বলতে আসা! যাবে রসাতলে তুমি যাবে—আমার কি? মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে লাভ এই—

এখন যদি সাতখানা ক'রে গিয়ে লাগাও আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি!'

তারপর ঘরে গিয়ে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে আবার সামনে এসে বলেছিল, 'তবে এও বলে রাখছি ঠাকুর, আমার সংগে লাগতে এসো নি। ভাল হবে না তাহ'লে। জলে বাস ক'রে কুমীরের সংগে বাদ করলে ঠকতে হয়; মনে রেখো।'

সে অবশিষ্ট ঘরটুকু এক মিনিটের মধ্যে ঝাঁট দেওয়া শেষ ক'রে পাশের তার ঘরখানাতে ঢুকে গিয়ে দড়াম্‌ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। ওঘরটাতে আসলে ঠাকুরের থাকবার কথা—কিন্তু মোক্ষদাদি গভীর রাত্রে এসে ওঘরেই শোয়—এ নিজে চোখে দেখেছে কান্তি। মোক্ষদা ভোরে সকলের আগে ওঠে—কিন্তু কান্তি ওঠে এক একদিন তারও আগে—ভোরবেলা চোখ মুছতে মুছতে ঐ ঘর থেকেই বেরোতে দেখেছে তাকে। তবে তাতে যে কিছু দূষ্য আছে তা ওর মাথাতে অত ঢোকেনি। সে কথা আলোচনাও করেনি সে কারুর সংগে। একদিন শুধু গল্প করতে করতে রতনদির কাছে বলে ফেলেছিল, তাতে রতনদি হেসে ওর গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, 'দূর পাগল! আমার কাছে যা বললে বললে—অপর কারুর কাছে ব'লো না। ঝি-চাকরদের এ সব কথা নিয়ে মনিবদের আলোচনা করতে নেই। ও অমন হয়েই থাকে!'' কী হয়ে থাকে ঠিক তা না বুঝলেও জিনিসটা যে ভাল নয় সেটা বুঝতে পেরেছিল সেদিন।

সেই মোক্ষদাদি আজ ওকে উপদেশ দিতে এসেছে!

চাকরদের কথায় মনিবের থাকতে নেই—চাকররাই বা মনিবের কথায় থাকে কেন?

রতনদিকে খারাপ বলবে কেন? আবার বলছে মাগী! আস্পদ্দা তো কম নয়! কী সাহস ওর!

কথাটা যে রতনকে আর তাকে জড়িয়ে বলা হচ্ছে এটা বুঝতে অবশ্য আরও মিনিট দুই সময় লাগল। কিন্তু তারপরই একটা অসহ্য ক্রোধে কান-মাথা আগুন হয়ে উঠল তার, ইচ্ছে হ'ল ওঘরে গিয়ে খুব দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে সে। কিম্বা রতনদিকে ব'লে আজই ওর চাকরিতে ইস্তফা দিইয়ে দেয়। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল মোক্ষদা মানুষটি বড় সহজ নয়। যখন কারুর সংগে ঝগড়া করে তখন ওর যে হিংস্র চেহারাটা দেখেছে কান্তি তাতে বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে উঠেছে তার।

তাছাড়া—রতনদির বাবা মামাবাবু পর্যন্ত ওকে কতকটা ভয় ক'রে চলেন তা সে দেখেছে। এতদিনের পুরনো ঝি, তার নামে লাগাতে গেলে ওর কথা কি বিশ্বাস করবে কেউ? রতনদিও হয়ত শেষ পর্যন্ত জবাব দিতে পারবেন না—মায়ায় পড়ে। মাঝখান থেকে একটা প্রবল শত্রু সৃষ্টি হবে শুধু শুধু। ঐ যা বলেছে মোক্ষদাদি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সংগে বিবাদ করা ঠিক নয়।

সুতরাং মনের রাগ মনের মধ্যেই
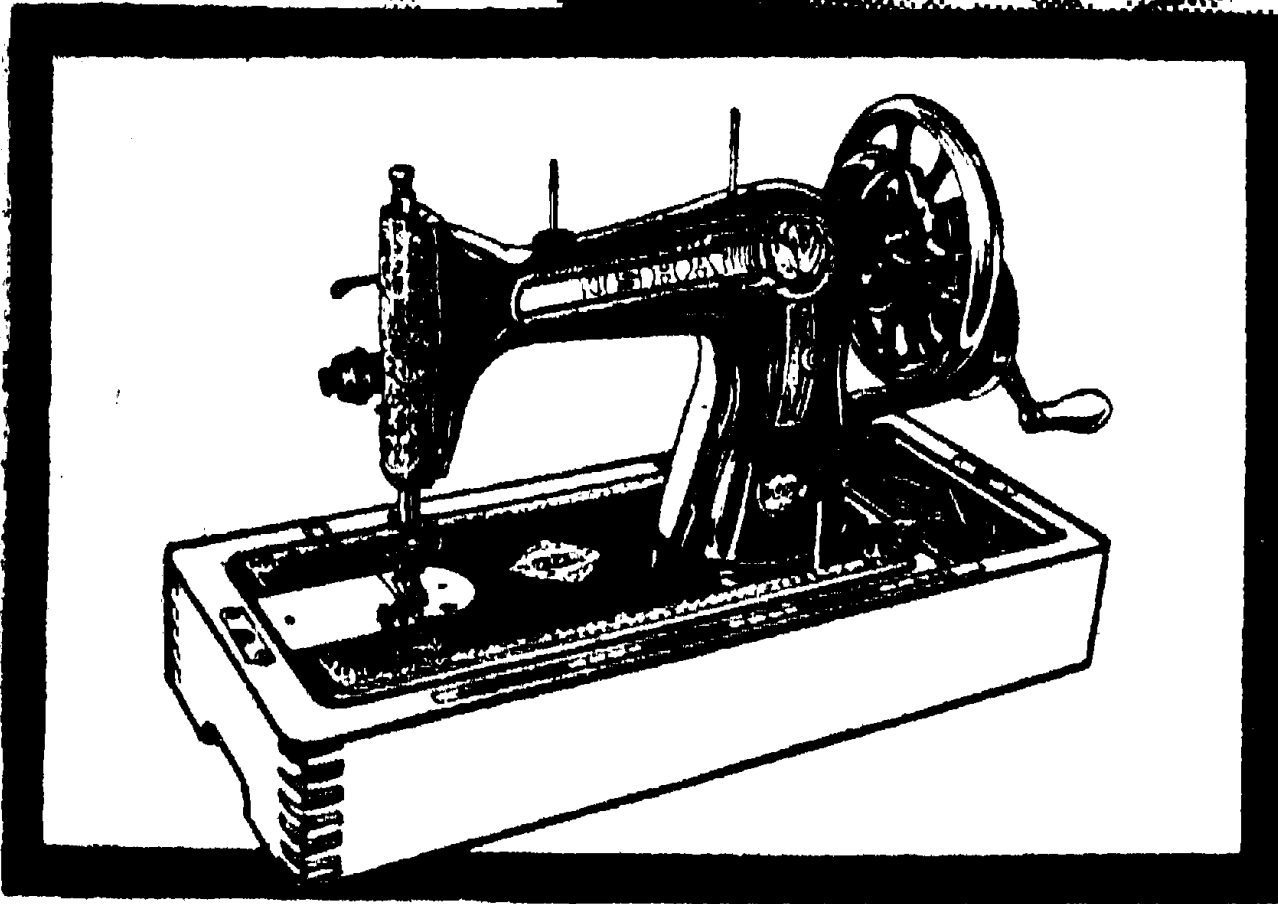
পরিপাক করতে হয় কান্তিকে। কোন কালেই কাউকে চড়া কথা বলা অভ্যাস নেই ওর, চিরদিন সকলকে ভয় ক'রেই এসেছে সে—চেষ্টা করলেও হয়ত ভাল ফল হবে না, উলটে মোক্ষদার মুখ থেকে আরও কতকগুলো কটু কথা শুনে চলে আসতে হবে মাথা হেঁট ক'রে।

চুপ ক'রে বসেই থাকে তাই কান্তি। বই-খাতা সামনে খোলা থাকে, কলমের কালি নিবের ডগায় শুকিয়ে যায়—বার বার কালিতে ডুবিয়ে কাজ শুরু করতে চেষ্টা করে, বার বারই হাত থেমে যায় কখন।

রাগের প্রথম প্রবলতাটা কেটে যাবার পর আর একটা কথাও ওর মনে হ'ল। আচ্ছা, মোক্ষদাদি যে কথাগুলো বলে গেল তার কি কতকটা ঠিকও নয়। অধঃপাতে যাওয়ার কথাটাতে ঠিক কতটা কি বলতে চাইছে তা না বুঝলেও—পড়াশুনো যে তার হচ্ছে না কিছুদিন থেকেই সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এতদিন ইস্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে বলেই নাম ছিল তার, ইদানীং সে নাম তো ঘুচতে বসেছে। ক্লাসের পড়া পারে না, মাস্টারমশাইদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়—বকুনিও খায় সেজন্যে। পর পর তিন-চার দিন হোমটাস্ক দেখাতে না পারায় অঙ্কের মাস্টার প্রফুল্লবাবু ওকে সেদিন বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়েও দিয়েছিলেন। অথচ ঐ প্রফুল্লবাবু কী ভালই না বাসতেন ওকে। শুধু দাঁড় করিয়েই দেননি—খুব বকেও ছিলেন। বলেছিলেন, 'পিপুলে পাকছে বুঝি! হবেই তো, যে পাড়ায় আর যে বাড়িতে থাকো! এতদিন পাকোনি তাই আশ্চর্য। তা আর বেঞ্চিটা জোড়া ক'রে রেখেছ কেন বাবা, যাও না, পান-বিড়ি খেয়ে ইয়ারকি দিয়ে ঘুরে বেড়াও না—তোমারও সুবিধে হবে, আমাদেরও হাড় জুড়োবে।'

সেদিন খুব রাগ হয়েছিল প্রফুল্লবাবুর ওপর। বিশেষত 'যে বাড়ি' বলাতে। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল সেটাও চোখ এড়ায়নি ওর। দারুণ অপমান বোধ হয়েছিল। কিন্তু আজ ভেবে দেখল, প্রফুল্লবাবু কিছু মিছে বলেননি। দোষ তো তারই। পড়াশুনো করতে এসেছে সে, এমনিই তো অনেক বেশী বয়সে ইস্কুলে পড়ছে—তার ওপর যদি এমনভাবে বকে যায়—। আর বকে যাওয়া না তো কী।

মোক্ষদাদিও যা বলছে ওর হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই বলছে। রাগ না ক'রে কথাটা ভেবে দেখাই উচিত ওর। সত্যিই তো, গরীবের ছেলে, মানুষ হবে, মানুষ হয়ে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে এই আশাতেই তো মা-দাদা তাকে এত দূরে ফেলে রেখেছেন। তা যদি সে না-ই হয় তো এখানে থেকে লাভ কি? বাড়িতে চলে গেলে তবু তাঁদের সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারে তো!

না, মোক্ষদাদি ভালই করেছে ওকে একটু সাবধান ক'রে দিয়ে। এবার থেকে সাবধান হয়ে চলবে। রতনদির আর কি, তাঁর সময় কাটে না—তাই ওর সঙ্গে বসে গল্প করেন কিন্তু তাঁর তো মাথার ওপর এত দায়িত্ব, এত ভাবনা নেই।

সে আবারও কলম দোয়াতে ডোবায় একবার।

কিন্তু রতনদিকে কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মনে হয়। সত্যিই তো, তার কে আছে। বর আসে রাত নটায়, এসেই মদ খেতে শুরু করে। এক একদিন চেঁচামেচি মারধোর কত কী না হয়! তারপর খেয়ে ঘুমোল, ভোর হ'তে না হ'তে তো চলে গেল। মামাবাবু নিজের খাওয়া, তামাক খাওয়া আর বই নিয়েই থাকেন। ঝি-চাকররা বোঝে শুধু পয়সা। রতনদির মুখের দিকে কে চায়! না একটা বন্ধু-বান্ধব না কোন আত্মীয়স্বজন। কথা কইবার পর্যন্ত লোক নেই এ বাড়িতে, সারাদিন মুখ বুজে মানুষ থাকতে পারে! কখনও সখনও দৈবাৎ ওর বরের বন্ধু-বান্ধব দু-চারজন আসে, তবু দুটো বাইরের মানুষের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু তারাও সব মাতাল। তারাও এসে মদ খেতে শুরু করে—দু-একজন তো ঘুমিয়েই পড়ে, ধরাধরি ক'রে গাড়িতে তুলে দিতে হয়। এক-একজন বমি ক'রে ভাসায়। সে কী দুর্গন্ধ। সে সব পরিষ্কার করতে হয় তখন মোক্ষদাদিকেই। ঐ জন্যেই ওর আরও জোর।... থিয়েটার বায়স্কোপ—তাই বা কবে যায়। একবার এক সপ্তাহ রতনদির বর কোথায় গিয়েছিল বাইরে, একেবারে তিন-চার দিনের মতো থিয়েটার বায়স্কোপের টিকিট কিনে দিয়ে গিয়েছিল। হুকুম ছিল মোক্ষদাকে নিয়ে যাবার। সব নাকি ফিমেল সীটের টিকিট। তারই মধ্যে একদিন দারোয়ানকে দিয়ে লুকিয়ে একখানা টিকিট কিনে রতনদি তাকেও নিয়ে গিয়েছিল। 'সীতা' পালা—বড় দুঃখের কিন্তু চমৎকার পালা। দেখে এসে যত কেঁদেছে কান্তি তত উচ্ছ্বাস করেছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রতনদির জীবনটা কি। কী আছে ওর সাধ-আহ্লাদ—বলতে গেলে বন্দী হয়ে আছে। পয়সা আছে ঢের, বর অনেক পয়সা দেয় ঠিকই—কিন্তু পয়সাই কি সব! পয়সা খরচ করারও তো উপায় নেই নিজের খুশি মতো। শুধু তার মার ভাষায়, 'ভূত ভোজন করানো'। সেই জন্যেই তো আরও বিনা দরকারেও কান্তির জামার

ওপর জামা করিয়ে দেয়, আর একটুখানি গল্প করবার জন্যে ছুটে ছুটে আসে। হ্যাংলামি জ্যাংলামি করে।...

অর্থাৎ আবারও কখন ডুবে গিয়েছিল ঐ রতনদির চিন্তায়। সেটা খেয়াল হ'ল খোদ রতনদি ঘুম ভেঙে উঠে ওর খোঁজে ওপরে আসাতে।

'বারে ছেলে, কখন ইস্কুল থেকে এসে চুপি চুপি ঘাপটি মেরে ওপরে বসে আছ! আমাকে ডাকতে নেই বুঝি? আমি বলে আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছি যে তুমি সকাল ক'রে এসে ডাকবে, পেট ভরে গল্প করব। আজ তোমার সঙ্গে বসে মুড়ি বেগুনি খাব শখ হয়েছে।...তা আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি—জানি ঠিক এসে ডাকবে।...ডাকোনি কেন? আমি যদি মুকীকে না জিজ্ঞেস করতুম তো টেরই পেতুম না যে চারটে বাজে।'

যে সব ভাল ভাল কথা এতক্ষণ ধরে ভেবে রেখেছিল গম্ভীরভাবে গুছিয়ে বলবে বলে—তা এর পর আর বলতে মন সরে না। যে মানুষটা সকাল থেকে আয়োজন ক'রে রেখেছে তার সঙ্গে গল্প করবে বলে—তাকে কোন প্রাণে বলবে যে, 'আর তোমার সঙ্গে গল্প করব না আমি, গরীবের ছেলে পড়'তে এসেছি, লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তুমি আর আমার পড়াটা মাটি করতে এসো না।'

কিছুই বলা হয় না তাই। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে বরং—যে কথাগুলো বলবে বলে ভেবে রেখেছিল—সেই কথাগুলো মনে ক'রে। তার বদলে কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে বলে,'তা নয়। এই টাস্কগুলো—। অনেক দিন হয়ে গেল কিনা, আমারই গাফিলি। আজ বড্ড বকুনি খেয়েছি। তাই ভাবছিলুম—। তা যাক, না হয় রাত জেগে সেরে নেব।'

'টাস্ক না দেখাবার জন্যে বকুনি খেয়েছ? তা কৈ বলনি তো। সকালে মাস্টারমশাই কি করেন? তিনি করিয়ে দেন না কেন?'

'না, তাঁর অত সময় হয় না। আর এ তো আমারই করবার কথা। তিনি কষে দিয়ে গেলেও আমাকেই তো খাতায় তুলতে হ'ব।'

'তাই তো! সত্যি, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে—রোজ রোজ তোমার সময় নষ্ট করি। ক্লাসের প্রথম ছেলে তুমি—তুমি আঁক কষে না নিয়ে গেলে কী ম'ন করবেন তাঁরা।' যৎপরোনাস্তি ম্লান হয়ে যায় রতনদির মুখ, 'তা তুমি ভাই অংক কষো, আমি এখন যাই। তোমার টাস্ক সারা হ'লে বরং নিচে যেও। তখনই বরং মুখ-হাত ধুইয়ে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দেবে'খন। আমি এখন [illegible] দু-জলখাবার এখানে দিয়ে যেতে বলছি।'

রতনদি একেবারে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর সেই ম্লান মুখের দিকে চেয়ে, অপ্রতিভ করুণ কণ্ঠস্বরে কান্তির বুকের মধ্যটা যেন কেমন ক'রে উঠল। সে যা কখনও করে না তাই ক'রে বসল। কিছু না ভেবে-চিন্তেই খপ ক'রে রতনের একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'না না, রতনদি তুমি যেও না। একটু বসে যাও। টাস্ক আমি রাত্রে ঠিক সেরে ফেলব।'

ঝোঁকের মাথায় ধরে ফেলেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেই সঙ্গেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এর আগে 'তুমি' কখনও বলেনি রতনদিকে।

কেমন এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, 'অমন ক'রে প্রশ্রয় দিও না—কাঙালকে শাকের খেত দেখাতে নেই। অত নরম হ'লে দুনিয়ায় টিকতে পারবে না।...আমি এখন যাই—সন্ধ্যের সময় আবার আসব বরং। তুমি কাজ সেরে ফেল—'

চলে গেলেন রতনদি সত্যি-সত্যিই। কিন্তু তিনি যে খুব ব্যথা পেয়েই গেলেন সেই কথাটা মনে ক'রে কান্তির মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণের প্রতিজ্ঞা তো ভেসে গেলই—উপরন্তু সেটুকু

আজ বড্ড বকুনি খেয়েছি। তাই ভাবছিলুম......

বলা উচিতও নয়। সে আরও লাল হয়ে মাথা নামাল, দেখতে দেখতে তার কপাল গলা ঘেমে উঠল—ভয়েও বটে—তার এই ধৃষ্টতা কী চোখে দেখবেন রতনদি, যদি রেগে যান এই ভয়ে—আর লজ্জাতেও বটে।

কিন্তু রতনদি রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। উলটে তাঁর চোখ মুখ যেন মনে হ'ল আনন্দে জ্বলে উঠল। যেন কৃতার্থই হয়ে গেলেন তিনি। একটু ইতস্ততও করলেন, একবার বসতেও গেলেন আবার কিন্তু তারপরই মন শক্ত ক'রে নিলেন যেন। উঠে দাঁড়িয়ে

লেখাপড়া এতক্ষণ জোর ক'রে হচ্ছিল বার বার চেষ্টার ফলে, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। রতনদির ম্লান মুখ, তাঁর করুণ কণ্ঠস্বর আর শেষের এই কথাগুলো—সব জড়িয়ে কেবলই মনে হ'তে লাগল—এত সব থাকতেও রতনদির কিছু নেই, রতনদি বড় দুঃখী। বড় দুঃখেই ছুটে ছুটে আসে তার কাছে। এই একটুখানি যা তার সান্ত্বনা—তা থেকেও বঞ্চিত করল কান্তি। না বললেই হ'ত টাস্কের কথাটা, কেন যে বলতে গেল! ভারী অনুতাপ হ'তে লাগল ওর।

(ক্রমশঃ)

নৈঃশব্দের উৎসারণ

কল্লোল মজুমদার

স্ট্রিন্ডবার্গ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'মিস জুলি'র ভূমিকাচ্ছলে বলেছিলেন—"It has seemed to me, that the theatre, like religion, may be on the verge of being abandoned as a form which is dying out, and for the enjoyment of which we lack the necessary conditions...... We have not got the new form for the new content, and the new wine has burst the old bottles." —এই নূতন প্রক্রিয়ার মদই Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ। প্রতীচ্যের নাট্যকলায় এর আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে। প্রাথমিক পর্যায়ে নাট্যরসিকদের কাছে এর বাস্তবিক মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না। সে যুগের নাট্য-সমালোচকদের মতে—অভিব্যক্তি নাটকের একটি বস্তু এবং সমস্ত বস্তুময় দিবসের অর্থ, একটি মিথ্যার মত শুকিয়ে যাওয়া। নাট্য-রসিকেরা তাই একে বাঁকা হাসিতে তাচ্ছিল্যের কাপড় জড়িয়ে পেছনে সরিয়ে রেখেছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী যেন চক্রান্ত চলছিলো। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে যখন বিশ্ববিশ্রুত বার্ণার্ড শ-এর বিখ্যাত নাটক 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি 'জি, বি, এস' নামে পরিচিত। যে কোন মানবই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা অতি-মানবে পরিণত হতে পারে। কিন্তু যত-ক্ষণ সেই মার্গে আরোহণে সে অসমর্থ, ততক্ষণ তার সঙ্গে অতিমানবিক চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সংঘাত—সম্ভবতঃ তাকে কেন্দ্র করেই 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান'এর নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই কাল্পানুযায়ী এ নাটকে অভিব্যক্তির স্থান ছিল গৌণ; জড়বাদী বিশ্বাসই তখন প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছিল। ঐ বছরেই এমিল জোলা "এবং আঁরি বেক-এর সাহিত্যের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বজায় রেখে ব্রিয়ো'র 'ড্যামেজ্‌ড্ গুডস্" প্রকাশিত হল। বিশ্ববন্দিত নাট্যকার ইব্‌সেনের নাটকগুলো তখন প্রতীচ্যের নাট্যরসিক মহলে প্রশংসার ঊর্মিল আলোড়ন এনেছে। স্থিতিধর্মের আগল খুলে উঠে এল স্ব-ভাবের সমুদ্র, তার মন্থনে মঞ্চে সংপৃক্ত হ'ল বিষয় ও বক্তব্যের অনিবার্য সমীকরণ। স্বভাববাদীরাও ভাব ও কল্পনার নেপথ্য প্রাচীর ভেঙে মনোবৃত্তিগত অনুকারবাদের অবস্থিতি চাইল। এই অন্ধ আবেগের জোয়ারে নীলান্ত রেখার বাঁধ বাঁধলেন স্ট্রিন্ড-বার্গ। নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আনুকারিক দৃষ্টির অনুসরণ করবে না; সে হবে ভাবগত বুদ্ধির প্রতি-ফলন, নেপথ্যের হিরন্ময় অলিন্দের দ্যুতিতে হবে উদ্ভাসিত।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে—অভিব্যক্তি-বাদ আসলে তবে কি? সমসাময়িক সমালোচকেরা অভিব্যক্তিবাদকে জড়বাদ-বিরোধী বলে প্রচার করেছিলেন, গভীরতার পাশ কাটিয়ে নিরঙ্কুশ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসত্যকে স্থিত করা গেল না। জড়বাদ জীবনধর্মে বিশ্বাসী। ভাব-গহ্বরে জীবন-দর্শন জড়বাদকেই সমর্থন করে। এই অভি-ব্যক্তিবাদ। জড়বাদী লেখকের সমস্যাকে নিঃশব্দ অভিব্যক্তির সাহায্যে এত গভীর সংবেদনশীল করে তোলা যায়—যা শব্দ-কল্লোলে সম্ভব হয় না। সেখানে সমস্যা প্রকাশিত, 'কিন্তু গভীর অনুভূতিশীল নয়। আর যেখানে গভীরতাই অনুপস্থিত সেখানে শিল্পধর্মীতার পদস্খলন ঘটে। দুরূহ সমস্যা এবং কঠিন প্রশ্নকে প্রকাশ করতে স্বভাববাদীকে যেখানে কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়, অভি-ব্যক্তিবাদী সেখানে দুর্বোধ্যতার বেড়া ডিঙিয়ে অনায়াসে সহজ সংবেদনশীল হতে পারেন। কোন বিখ্যাত সমা-লোচকের মতে—"এক্সপ্রেসনিজম্ ইজ্ দাস ড্রামাটাইজেসন অফ সাইলেন্স্। ইট অ্যাটেম্পটস্ অ্যাট্ প্রোজেক্‌টিং দ্য ইনার ওয়ার্কিংস্ অফ দ্য মাইন্‌ড।" মানবাত্মার অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিল সংঘাত অভিব্যক্তি নৈঃশব্দ্য আধারে প্রয়োজনীয় রূপ ধারণ করে—অবলম্বনেই যেমন জলের বাস্তবিক রূপ। অভিব্যক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্ভবতঃ কিউবিষ্ট অন্ত-র্বৃত্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কোন অভিব্যক্তিবাদী চিত্রশিল্পী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি বই অথবা টেবিল চিত্রায়িত করবেন, তিনি বিভিন্ন ভঙ্গী বা বর্ণের সমাবেশে বই বা টেবিলের উদ্দেশ্যমূলক অভিব্যক্তি রেখায়িত করবেন।

এইখানেই প্রয়োজন সম্পূর্ণ-তার সন্ধান। Cape de Nutt Cafe de I' Alcazar-এর মুখবন্ধে ভ্যান্ গগ্ অভিব্যক্তিবাদী মনোবৃত্তির সমর্থনে বলেছিলেন— "I have tried to express the terrible passions of humanity by means of red and green....I have tried to express the idea that the cafe is a place where one can ruin oneself, run mad or commit a crime. So I

have tried to express as it were the powers of darkness in a low drink shop......" মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান অন্ধকামনা রূপ নিয়েছিল বিচিত্র রঙের সংঘাতময় আঙ্গিকে। উদ্দেশ্যমূলক বর্ণ ও রেখায় ভ্যান্ গগ্ অভিব্যক্তির সফল প্রয়োগে নিচুতলার আঁধারকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। একই পথে অভিব্যক্তিবাদী লেখক তাঁর বহুমুখী চিন্তা পাঠক এবং দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন।

'রোড টু ডামাস্কাস' এমন একটি নাটক, যার সাফল্য মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন কলানৈপুণ্যের ওপর সম্ভবতঃ নির্ভরশীল। প্রসঙ্গতঃ একটি বিশেষ চরিত্রের কথা এসে পড়ে। নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে—জগতের কোন বস্তুই সর্বনাশের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। মানসিক সংঘাতকে পরিস্ফুট করতে তখন প্রয়োজন বিচিত্র অভিব্যক্তির—যেটা সম্পূর্ণ সময়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিভিন্ন আঙ্গিক ও মঞ্চকলার স্বার্থে সময়ের সুযোগ থেকে অভিনেতা বঞ্চিত হ'লেন। ফলে বিষয়বস্তু হ'ল সংক্ষিপ্ত এবং 'রোড টু ডামাস্কাস' একটি আঙ্গিকধর্মী নাটক হয়ে উঠল। বক্তব্যের এই বিন্দুতে একটি উভয়মুখী স্রোতের সংমিশ্রণ দেখা যায়, যেন একটি মূর্তির পার্শ্বভাগ এবং সম্মুখভাগ একত্রে চোখের সামনে ধরা দিল। কিন্তু শুধু আঙ্গিকের সাহায্যে দু'টি উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্যকে সহজ সরল করে তোলা যায় না। অনুভূতির জটিলতম গ্রন্থিগুলো মানসিক চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে।

বক্তব্যকে সুস্থিত করতে মাতিস-পিকাসো-মেনেৎ প্রমুখ কলাদক্ষরা তাই কিউবিজম ও সুর-রিয়ালিজমকে বন্যার ঢেউয়ের মত সমস্ত পশ্চিমী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিলেন। সেই লবণাক্ত ঢেউয়ের কম্পন ভারতবর্ষেও কিছুটা ছিটকে এসে প'ড়েছিল। 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তিতে সেই প্রপঞ্চ চিত্রবিধৃত। কিউবিষ্ট কলাদক্ষ জ্যামিতিক রেখার কৌণিক ব্যবহারে যে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে চান, ইম্প্রেসনিষ্ট কলাদক্ষ বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে তাকেই প্রকাশিত করতে পারেন। অভিব্যক্তিবাদী লেখক বা নাট্য-পরিচালকও চরিত্রের জটিলতম মানসিক সংঘাতে ভাব এবং বুদ্ধির সফল প্রয়োগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। উভয়মুখী দ্বন্দ্ব অথবা বক্তব্যের পূর্ণ সফলতা তাই অভিব্যক্তির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত।

সমস্যার মরুঝড় যখন হ্যামলেট্‌কে শুষ্ক বালির মত শান্তির মরুদ্যান থেকে উড়িয়ে নিয়েছিলো, তখন থেকে আমৃত্যু নিজের মানসিক সত্তাকে কঠিনতম উভয়মুখী প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন—"To be or not to be that is the question." পিতা আততায়ী হস্তে নিহত, মাতা ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এবং পর-অনুরক্তা। জগৎ তাঁর কাছে প্রতিহিংসার মত মিথ্যা এবং অর্থহীন। হ্যামলেট চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ অমিত্রাক্ষর ও মুক্তছন্দের মধ্যাবস্থায় একক সংলাপের দ্বারা পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন সেক্সপীয়ার। বস্তুতঃ হ্যামলেট্ এমন একটি নাটক—যা অভিব্যক্তিবাদী উপস্থাপনার ওপর স্থিতিস্থাপক। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক কবি টি এস এলিয়ট কোন একজন কলা-সমালোচককে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—নাটকের কিছুটা অন্ততঃ এমন অংশ আছে, যেটা—যা আলোকসম্পাত বা আঙ্গিকের দ্বারা পরিস্ফুট হয় না, সেখানে প্রয়োজন শিল্পধর্মাশ্রয়ী ভাব এবং ব্যঞ্জনা। এই শিল্পাশ্রয়ী ভাব ও ব্যঞ্জনার অপ্রাচুর্য সে কালের নাট্যমঞ্চে হ্যামলেট্ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকুই ফুটিয়ে তুলেছিলো মাত্র; জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী হ্যামলেট্ অব্যক্তই রয়ে গিয়েছিলো। এরপর এলিজাবিথান মঞ্চ নিজস্ব সাহসিকতা ও সরলতার পবিত্র ফলে শেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টিকে যথার্থ সম্মান দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু এলিজাবিথান প্রযোজকের ব্যবসাগত পুঁজির মূলধন বৃদ্ধির স্বার্থে পূর্ণ সিদ্ধি এল না। আমরা জানি না—শেক্সপীয়ার তাঁর চরিত্রাভিনেতাদের কাছে কি ধরনের প্রয়োগরীতি চেয়েছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, জন্ ব্যারিমোর, এবং লরেন্স অলিভিয়র-এর মত প্রতিভাও নাটকের গন্ধরাজ-গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি। সংলাপ উচ্চারণে ছন্দের প্রতি অন্ধ-আবেগ মহাকবির 'হ্যামলেট্'কে পূর্ণতা এনে দেয়নি। অলিভিয়র-এর হ্যামলেট ছিল দুর্বল এবং ব্যারিমোর ছিলেন অধিক বৈশিষ্ট্য-দোষে দুষ্ট।

অভিব্যক্তিবাদী প্রয়োগরীতিই নাটকের পূর্ণ সফলতা এনে দিতে পারে—একথা আজ সু-প্রমাণিত। Lamb এই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেও অবশেষে বাধ্য হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন। জি, বি, এস, ব্রিয়ো, ইবসেন প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর কর্ণধার মনীষীদের সুতীব্র আক্রমণ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এলো চিরাচরিত ভুল পথে। অভিব্যক্তিবাদী প্রয়োগরীতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—'টু হিউজ ফর্ দ্য স্টেজ।' যান্ত্রিক প্রয়োগরীতিকেই তিনি নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিলেন। যদিও অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্নিহিত সুর তিনি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেন নি, তবুও Lamb-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি—আংশিক হলেও যিনি এর প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন।

'হ্যামলেটে'র মত 'কিং লিয়ার'-ও এমন একটি নাটক যা ভাব এবং বুদ্ধিগত কল্পনার ভিত্তিতে' সুপ্রতিষ্ঠিত। ঘটনার সংঘাতের প্রতীক হিসেবে মঞ্চে ঝড়ের দৃশ্যের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন ছিল; কারণ ঘটনা স্ব-ভাবেই প্রতীকধর্মী। আলোকোজ্জ্বল জগতের বাইরে রাত্রির রাজত্ব। সেই রাত্রির রাজত্বে এসে রাজা কত অসহায় এবং করুণার পাত্র—চলমান ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শেক্সপীয়ার সম্ভবতঃ সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন।

নাট্যমঞ্চে প্রতীকের ব্যবহার বহুদিন পূর্বেই প্রচলিত হয়েছিল। শেকভে'র প্রায় প্রতিটি নাটকে প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইবসেনের শেষজীবনের নাটকগুলোতেও প্রতীকবাদকে আংশিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। পূর্বে নাটকে ঘটনার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে প্রাণোজ্জ্বল করে তোলার জন্য প্রতীকের ব্যবহার হ'ত, আবেদনশীল বক্তব্যও শিহরিত হ'ত নাটকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অণুতে-পরমাণুতে। মানব চরিত্রের চেতনার গভীরে যে অবচেতন চিন্তা ও ভাব লুকিয়ে থাকে—প্রতীকী অভিব্যক্তির সাহায্যে তাকে নাট্যজগতে প্রথম সুস্পষ্টভাবে সুস্থিত করলেন অভিব্যক্তিবাদীরা।

প্রথিতযশা আমেরিকান নাট্যকার এলমার রাইস্-এর 'দ্য অ্যাডিং মেসিন' একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তিধর্মী নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে থিয়েটার গিল্ড্-এর প্রযোজনায় এর উদ্বোধন হয়। নাটকটি আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণকারী। যন্ত্রযুগের জনসংখ্যা দিনে দিনে উৎপাদিত দ্রব্যের মতই বর্ধমান। নাটকের

নায়ক Mr. Zero-র জীবন ও মৃত্যুর পটভূমিকে বিদ্রূপের তীক্ষ্ম চাবুক মেরে এলমার রাইস্ এই সত্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম দৃশ্যের যবনিকা উঠলে দর্শক দেখতে পান—Mr. Zero শয্যায় শায়িত। সমস্ত দৃশ্যটিতে তিনি নির্বাক, অপর পক্ষে তাঁর স্ত্রী অনর্গল কথা বলে গেলেন। Zero-র পঁচিশ বছরের কর্ম-জীবনে তাঁর পত্নী কখনো বাক্যবর্ষণে এবং Zero নিঃশব্দ শ্রবণে ক্লান্ত হননি। আসল দৃশ্যের অবতারণা Zero-র অফিস কামরায়। মধ্যবয়স্কা একজন সহকর্মিনীর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর পদোন্নতি সম্বন্ধীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। এরপর মালিকের কঠোর ও রূঢ় ব্যবহারে উৎপীড়িত হয়ে তিনি মালিককে হত্যা করলেন। সমগ্র নাটকটি সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দৃশ্যে নাটকের দৃশ্যমান গতিবেগ অনুপস্থিত। মঞ্চ সরঞ্জামের পরিবর্তন এবং দু' তিনটি সংলাপ ছাড়া দর্শকেরা আর কিছুই দেখেন না, কিন্তু অনুভব করেন। অভাবনীয় খুনের চিন্তা যেখানে Zero-র অন্তর্লোকে সংঘাতময় ঘূর্ণীর সৃষ্টি করছে——নিঃসন্দেহে সেইটিই নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। এ দৃশ্যের মঞ্চ পরিচালনা অপূর্ব। পঁচিশ বছরের কর্মজীবনের অভাবনীয় শাস্তি-প্রাপ্তিতে ক্ষিপ্ত ও অপ্রকৃতিস্থ Zero মঞ্চের যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন—সেটি প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগলো। সেই মুহূর্তে মালিকের রূক্ষ তিরস্কারের শেষ অংশটুকু শোনা গেল। এরপর মঞ্চের নেপথ্য থেকে আঙ্গিকের প্রয়োগ শুরু। বাতাস, উত্তাল তরঙ্গমালা, ছুটন্ত অশ্বের হ্রেষা এবং পদধ্বনি ও অবশেষে উদ্দাম ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অগ্নিমোজ্জ্বল আলোকের ঝলক Zero-র জিঘাংসা-প্রবৃত্তি দর্শকের চিত্তপটে স্পষ্ট প্রতি-ফলিত করে দিল। প্রতীকী অভিব্যক্তির ভিত্তিতে 'দ্য অ্যাডিং মেসিন' তাই সেদিন অভিব্যক্তিবাদীদের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করে তুলেছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লেডী গ্রেগরী কোন একটি সভায় আলোচনাচ্ছলে বলেছিলেন—"আমরা আয়র্ল্যাণ্ড-এর নাট্যপ্রবাহকে বস্তুবাদী বনিয়াদ ও সৌন্দর্যবাদের রূপদী সংজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টি করব।"—সৌন্দর্যের এই সৃষ্টি-সত্তা ও' কেসী'র পূর্ণবয়সের রচনা-গুলিতে জন্মলাভ করেছিল, যদিও প্রকৃতিবাদের ওপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। 'দ্য ষ্টার্ টারন্স্ রেড্' এবং 'পার্পল ডাস্ট' (দু'টি নাটকই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং তিন অঙ্কে বিভক্ত) অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে ও' কেসী'র দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলা যেতে পারে। তাঁর সবকটি বিখ্যাত নাটকই প্রতীকী অভিব্যক্তির দ্বারা সুচিহ্নিত।

নাট্যশিল্পে আমূল পরিবর্তনের আন্দোলনে নাট্যকারগণও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বর্তমানের নাট্যমঞ্চে সর্বাপেক্ষা প্রধান দর্শনীয় ব্যক্তি হলেন প্রযোজক। নিঃসন্দেহে নাট্যশিল্পে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। প্রযোজক একাধারে অভিনেতা, শিল্পী, স্থপতি, আলোকশিল্পী হ'বেন—ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও চরিত্রাভিনেতার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট জ্ঞান থাকবে এবং সর্বোপরি তিনি মনুষ্যচরিত্রে গভীর অনুভূতিশীল হ'বেন।
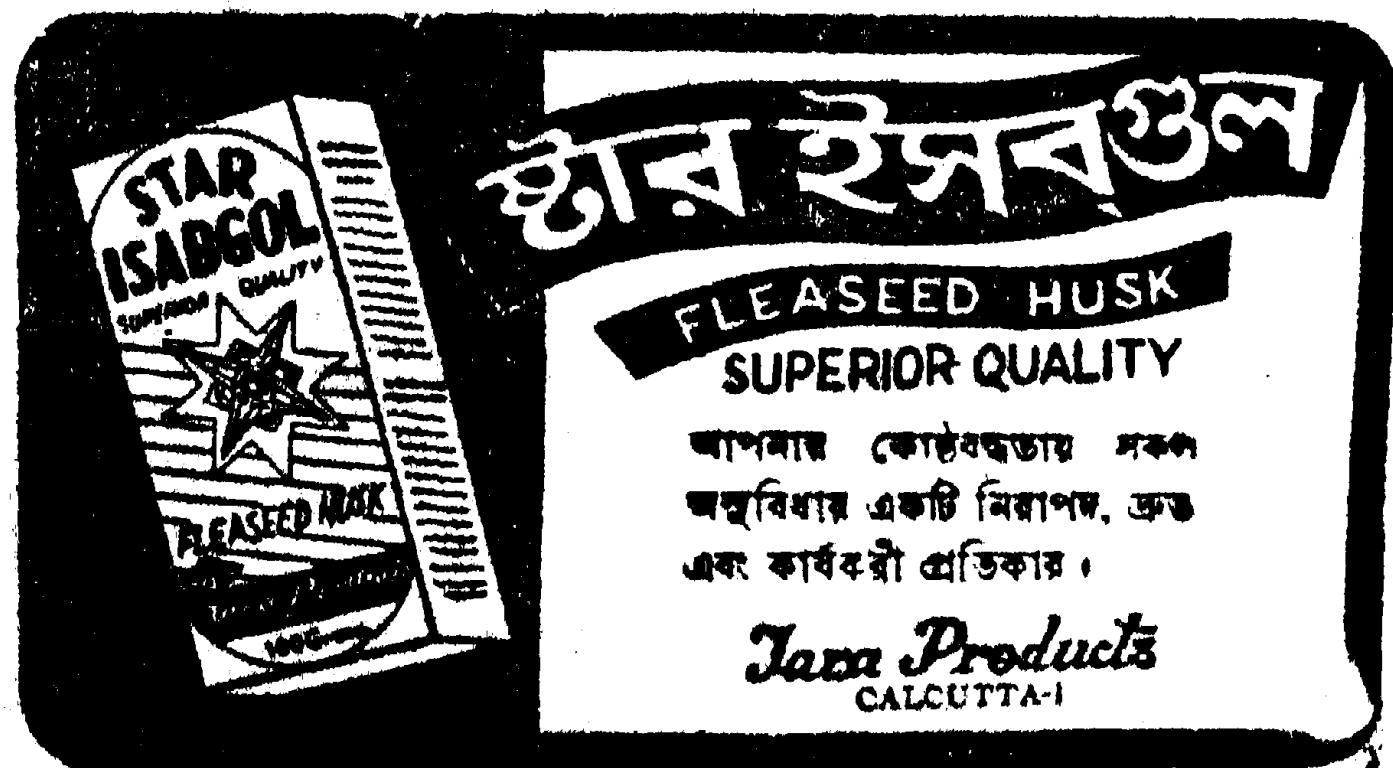
বস্তুবাদী নাট্যমঞ্চের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ এনেছিলেন প্রথিতযশা অভিনেত্রী এলেন টেরীর সুযোগ্য পুত্র গর্ডন ক্রেগ্। মঞ্চসজ্জায় বিভিন্ন সাঙ্কেতিক রীতি ও ত্রি-মাত্রিক সেটের ব্যবহার প্রচলন করেন তিনি। তাঁর দৃশ্য-সজ্জায় ছিল প্রশস্ত অভিনয়ক্ষেত্র এবং একটি সরল ও দীর্ঘ গাম্ভীর্য। ক্রেগ্ এবং তাঁর সহযোগী এ্যাপিয়ারের প্রয়োগরীতি থেকেই পরবর্তী সময়ে কিউবিক্ মতবাদ, ভবিষ্যবাদ প্রভৃতি মঞ্চরীতিতে প্রবিষ্ট হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ টেরেন্স গ্রে প্রবর্তিত নির্মাণবাদের কথাও এসে পড়ে। নির্মাণবাদের রঙ্গমঞ্চ বিভিন্ন যান্ত্রিক রীতির সাহায্য গ্রহণ করে। এইসব বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আংশিক পার্থক্য থাকলেও আসল উদ্দেশ্য সকলের এক—বস্তুবাদী মঞ্চ-রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। সে উদ্দেশ্যে পুরোপুরি না হলেও অর্ধপথের বেশি তাঁরা অতিক্রম করে এসেছেন। সেই পশ্চিমী আগুনের আঁচ আজ ভারতবর্ষেও এসে পড়েছে, যদিও তা এদেশের কঠিন শীতলতাকে দূর করার মত যথেষ্ট পরিমাণ নয়। অথচ ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে—পশ্চিম জগত আজ যে মতবাদের স্রষ্টা বলে স্বীকৃত হয়েছে—ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সবই প্রচলিত ছিল।

এ সম্বন্ধে অজিত ঘোষের 'নাটকের কথা' পুস্তকে পাওয়া যায়—ভরতের নাট্যশাস্ত্রে * আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক—এই চার রকমের অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। আঙ্গিক অভিনয়—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গগুলির দ্বারা প্রকাশিত। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, পার্শ্ব-দ্বয়, কটি ও পদদ্বয় এই ছ'টি অঙ্গ; উদর, স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, উরুদ্বয়, জঙ্ঘা-দ্বয় ও পৃষ্ঠ এই ছ'টি প্রত্যঙ্গ ও নেত্র, ভ্রু, অক্ষিপুট, তারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, হনু, অধর, দন্তপঙক্তি, জিহ্বা ও মুখ এই ক'টি উপাঙ্গ। কাব্যনাটকাদিতে বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয় বাচিক। হার, কেয়ূর, বেশ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্করণ আহার্য অভিনয়ের অঙ্গীভূত। স্তম্ভ, স্বেদজল, স্বরভঙ্গ, রোমাঞ্চ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা এই সাত্ত্বিক ভাবগুলো প্রতিফলিত হ'ত। নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়-দর্পণ' এবং

* "আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব হ্যাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা" নাট্যশাস্ত্র। অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' প্রভৃতি পুস্তকে নাটকের বিভিন্ন বিভাগের রূপ ও ভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা গভীর শিল্পবোধের পরিচয় আজও বহন করে আসছে। নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ লেখকদের এইসব গ্রন্থ অনুশীলনে বোঝা যায়—প্রাচীন ভারতীয় সমাজ নাট্যকলার গভীর সাধনায় কতখানি নিমগ্ন ছিল।

নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়-দর্পণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে নন্দিকেশ্বরের নাট্যসম্প্রদায় এবং ভরতের নাট্যসম্প্রদায়—এই দুটি প্রধান দল ছিল। নন্দিকেশ্বর ছিলেন ভরতের নাট্যগুরু। তিনি নাটক অভিনয়ে বহিরঙ্গ আঙ্গিকের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। অপরপক্ষে ভরত অন্তরঙ্গ ভাব ও রসস্ফূর্তির সমর্থক ছিলেন এবং অতিমাত্রিক অঙ্গাভিনয়ের নিন্দাই করে গেছেন। পরবর্তী যুগে পরস্পরবিরোধী এই দুই মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন কোহল ও মতঙ্গ। এঁরাও রসসৃষ্টিকেই মুখ্য করে তুলেছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু আঙ্গিককেও একেবারে বিদায় করেননি। আঙ্গিককে ভাব ও রসের বাহন করে নাট্যজগতকে সার্থক প্রতীকধর্মী করে তুলেছিলেন।

আজ কোথায় আমাদের সেই শিক্ষা-সংস্কৃতি, কোথায়ই বা আমাদের শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুভূতিশীল সাধনা। নইলে সব থাকতেও কেন আমরা সবহারাদের দলে! এদেশেই তো জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে বাংলার নাট্যসাহিত্যে যুগান্তকারী আন্দোলন বললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—আজ দেশে-বিদেশে রবীন্দ্র-নাটকের মঞ্চাভিনয় সফল করে তোলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে। চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি নাটকে বহিরঙ্গ আঙ্গিকের প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করা যায়। কবির অধিকাংশ নাটকই অন্তরঙ্গ বক্তব্য ও রসসৃষ্টির পরিচায়ক। প্রসঙ্গতঃ দুটি মাত্র নাটকের কথা বলি। ১৩১৮ সালে 'অচলায়তন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জগতে যেখানেই ধর্মকে উপেক্ষা করে আচার বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই মনুষ্য-অন্তর নিজের কপটতার দ্বারা রুদ্ধ হয়। সেই রুদ্ধ চেতনার ব্যথা ও বেদনাই 'অচলায়তনের' বিষয়বস্তু।

ধর্মের প্রকাশ্য গতিসৃষ্টির জন্যই আচারের জন্ম। কিন্তু ধর্ম যখন সেই আচার এবং নিয়ম-সংযমকে অতিক্রম করে আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে—তখন সে উত্তপ্ত মরুভূমি, অথবা স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই নীরস পথকে সনাতন রূপে সম্মান করার অর্থ মানবাত্মাকে ক্রমাগত অধীর ও তৃষ্ণার্ত করে তোলা। ১৩১৮ সালে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের একটি অংশে কবি বলেন—"সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে—তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনামাত্র। এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ না কেহ শুনাইয়াছে যে—আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন। ....অচলায়তনের গুরু কি কেবল ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি বলেন নাই—"ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সবচেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না। যেখানে ভাঙা হইল সেইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে।"

অচলায়তনের মত 'মুক্তধারা'-ও রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নাটক—অন্তরঙ্গ রসসৃষ্টির ওপর যার বক্তব্য সুস্থিত। যন্ত্র এই নাটকের একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে। যন্ত্র যখন প্রাণকে আঘাত করে তখন প্রাণ দিয়েই সে যন্ত্রকে ভাঙতে হয়, যন্ত্র দিয়ে নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে লেখেন—"যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে; কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে।.........যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডী তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, মার লাগিয়ে জয়ী হ'ব। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, হে মন—মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"
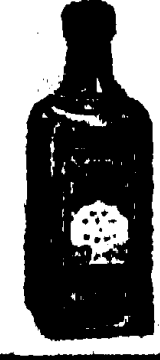
প্রতীকধর্মী সংলাপ ও উপস্থাপনার নাট্য-সংঘাত কত রসঘন গভীর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে,—এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী আজ আন্দোলন চলেছে, চলেছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রুদ্ধ চিত্তের আশা ও বেদনাই শিল্পাশ্রয়ী সৃষ্টির বিষয় এবং আনুষঙ্গিকে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই ব্যক্ত হয়ে পড়ে—এটা বিশ্বজনীন সত্য বলে স্বীকৃত। এত বড় সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে না, আমারও নেই।

ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথ

সরোজরঞ্জন রায়চৌধুরী

বোলপুরের রেল ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তরে দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দুইটি ছাতিমবৃক্ষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একদিন শুভমুহূর্তে তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—সেদিন তিনি সেই বৃক্ষপাদমূলে উপবেশন করিয়া পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের অপূর্বশোভা দর্শন করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিশিযাপন করেন। তিনি হৃদয়ে বিশ্বরূপের সেই পরম সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন ঃ—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের এই অমৃতময় বাণী জীবনের মূলমন্ত্র ও সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে এই অক্ষয়বাণী সার্থকরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কথা দিয়া কথা গাঁথিয়া ছন্দের মাধ্যমে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে. উহা তাঁহার সাধনালব্ধ উপলব্ধির কথা যাহা মানবমনে অত্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা ঋষি কবির জীবনে সেই সমস্ত বাণী যে কতদূর সত্য ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি সুদীর্ঘকাল তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ও তাঁহাকে যেভাবে যতখানি দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহার কতকটা আভাষ আমি আমার নিজের দেখা কয়েকটি বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়াই দিবার চেষ্টা করিব। শোকে দুঃখে বা রোগশয্যায় সেই আত্মস্থ ঋষি কবির সহজ সুন্দর সরলস্বরূপ বিশ্লেষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। এই মহামানবের চরণে ভক্তিনম্রচিত্তে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

শোকে

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার মাত্র কয়েক বৎসর পর অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি ও আমার অগ্রজ মনোরঞ্জন চৌধুরী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। তখন এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৭৬ জন দাঁড়াইয়াছিল। এই সময়ে গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথও ছাত্ররূপে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। শমীন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নম্রস্বভাব ও মধুর ব্যবহার দ্বারা সকল সহপাঠীরই মন জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

শমীন্দ্রনাথের রূপের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন—শুধুমাত্র এই কথা বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে শমীন্দ্রনাথ—"বালক রবীন্দ্রনাথ"। যেমন তাঁর দুধেআলতার মত গায়ের রং তেমনি মুখের আকৃতি ও শরীরের গড়ন পিতৃদেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতই ছিল। এই মাতৃহারা শিশুপুত্রকে গুরুদেব পিতা ও মাতার যুগ্ম দায়িত্বরূপে গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন দ্বারা সর্বদা কাছে রাখিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র আহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত অন্য সমস্ত সময়ই তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হইত। এই সময়ে শমীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাত্র ৪।৫ মাস একত্র আশ্রমে থাকিবার পরই পূজার ছুটিতে তিনি মুঙ্গের বেড়াইতে গিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র সরোজচন্দ্রের সঙ্গে। শ্রীশবাবুর প্রথম পুত্র সন্তোষচন্দ্র ছিলেন গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় পুত্র সরোজচন্দ্র গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু।—এইভাবেই দুইপুরুষের বন্ধুত্বসূত্র পরস্পর পরস্পরের সহজ মিলনের পথে সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল।

পূজাবকাশ শেষ হইবার কয়েকদিন পূর্বেই গুরুদেব টেলিগ্রামে খবর পাইলেন যে শমীন্দ্রনাথ কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন কিন্তু কলিকাতা হইতে গুরুদেব চিকিৎসক লইয়া গিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার আর অবকাশ পাইলেন না, তাহার পূর্বেই আদরের দুলাল শমীন্দ্রনাথ ১৯শে কার্তিক, ১৩১৪ সনে মরধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রাণপ্রিয় পুত্রের এই অকালমৃত্যু গুরুদেবের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত দিল বটে কিন্তু বিধাতার এই অমোঘ বিধান তিনি শান্তচিত্তেই সহজভাবে বরণ করিয়া লইলেন। অসীম ধৈর্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার জীবনদেবতার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া দৈনন্দিন কার্যে নিয়মিত মনোনিবেশ করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্মাহত হইলাম এবং ছুটীর পর শান্তিনিকেতনে আসার পরের দিনই সকালে দেখি ধীরপাদক্ষেপে "প্রাক্-কুটীরের" উত্তরদিকে বড় কুয়ার পাশে গাব গাছের নীচে গুরুদেবের সদা হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি উপস্থিত। আমরা কয়েকজন ধীরে ধীরে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদের সকলকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্রমের দৈনন্দিন কার্যে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। এতবড় আঘাতের উল্লেখ তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ পর্যন্ত তাঁহার কথায় বা আচরণে দেখা গেল না। দৈনন্দিন সমস্ত কাজের মধ্যে এই সময়ে রামানন্দবাবুর "প্রবাসী" পত্রিকায় এলাহাবাদে "গোরা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও নিয়মিত পাঠানোর ব্যাপারে কোন অন্তরায় দেখা দেয় নাই।

গুরুদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলাদেবী (মাধুরীলতা) রূপে গুণে পিতারই অনুরূপা এবং গুরুদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। ইনি অত্যন্ত দরদী ও স্নেহশীলা নারী ছিলেন. বেলাদেবীর মাতৃহৃদয়ের মধুর রূপটি প্রকাশ পাইত তখন, যখন তিনি তৎকালীন শিশুবিভাগের ১৪।১৫টি ছেলের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। ১৯০৮ সালে গুরুদেব সর্বপ্রথম শিশুবিভাগ প্রবর্তন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন আমায় ও শ্রীহিতেন্দ্রনাথ নন্দীর উপর। তখন বেলাদেবীকে যে ২।১বার আমার আশ্রমে দেখিয়াছি তাহাতে দেখিতাম তিনি "দেহলী" ভবনের পার্শ্বে যে ত্রিভুজাকৃতি বাড়িটি আছে তাহার মধ্যস্থলের বাঁধানো সুপ্রশস্ত চাতালে বসিয়া সন্ধ্যার সময় শিশুবিভাগের এই ১৪।১৫টি ছেলেদের গল্প শুনাইতেছেন। পূর্ণিমার দিন তাহাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করিয়া নিজহাতে পরিবেশন করিতেন। কী স্নেহ ও ভালবাসার সহিত মায়ের মত যত্ন করিয়া প্রতিটি শিশুকে খাওয়াইয়া তিনি

কী যে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন তাহা সেই দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। এমন মধুর স্বভাবের দুর্লভ মহিলার সেবা যত্ন পাইয়া শিশুমন প্রচুর আনন্দে ভরিয়া উঠিত। এই বেলদেবী দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণায় ভুগিয়া ১৬ই মে, ১৯১৮ সনে কলিকাতায় নিজগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গুরুদেব তখন কলিকাতায়ই ছিলেন। কন্যাকে এই শঙ্কটাপন্ন রোগের হাত হইতে আর রক্ষা করা সম্ভবপর নয় এই কথা গুরুদেবের অজ্ঞানা ছিল না এবং শেষদিন তাঁহার অন্তিম অবস্থার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়িতে করিয়া কন্যার বাসগৃহে গিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার আত্মা সেইমাত্র দেহমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি আর গাড়ি হইতে না নামিয়াই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সন্ধ্যার সময় বিচিত্রা-ভবনে যথারীতি পূর্বদিনের অসমাপ্ত আলাপ-আলোচনা শেষ করিবার জন্য যথাস্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সদস্যবৃন্দ জোড়াসাঁকো আসিয়া যখন এই নিদারুণ সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন সকলেই সেইদিন ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময় শুনিলেন যে কবি বিচিত্রা-ভবনে সকলের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সকলে উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি স্বাভাবিক-ভাবেই পূর্বদিনের অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপন করিলেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ তাঁর বাচনভঙ্গিতে বুঝিতেই পারিলেন না যে সেইদিন দুপুরেই কবির জীবনে এত বড় একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন—সান্ত্বনার কোন ভাষাই আর তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হইল না।

কঠোর সাধনায় কতখানি সিদ্ধিলাভ করিলে এইরূপ আত্মসমাহিত চিত্তে দুঃখকে বিধাতার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়া সহজ ও সুন্দরভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহা এই ঘটনা হইতেই অনুমান করা চলে। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমৃতময় বাণীতেও তাঁহার এই সাধনালব্ধ উপ-লব্ধির কথাই নানাভাবে বিচিত্র ছন্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ আরো ঘটনার কথা উল্লেখ করা চলে তবে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াই এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করিব।

১৯৩২ সনের আগষ্ট মাসে বর্ষা-মঙ্গল উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য আশ্রমে তোড়জোড় চলিতে লাগিল। ৮ই আগষ্ট উক্ত অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা ছিল। গুরুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র নীতু (নীতিন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়) এই সময় বিদেশে গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী। এই সংবাদ শুনিয়া মীরাদেবী বিদেশে রোগশয্যায় শায়িত পুত্রকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু ৭ই আগষ্ট টেলিগ্রামে গুরুদেব জানিতে পারিলেন যে একমাত্র প্রিয় দৌহিত্র নীতু আর ইহধামে নাই। এই মর্মান্তিক সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে আশ্রমে ছড়াইয়া পড়িল ও তদানীন্তন সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয় আশ্রমের যাবতীয় কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পরদিন বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিলেন। গুরুদেব এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জগদানন্দবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—"জগদানন্দ, নীতুর মৃত্যু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি তারজন্য আশ্রমের শান্তি নষ্ট করে বর্ষা-মঙ্গলের অনুষ্ঠান বন্ধ করা হোক এটা আমার মনঃপূত নয়। উৎসব অনুষ্ঠান যথারীতি হয় এটাই আমার ইচ্ছা।" জগদানন্দবাবু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন, কোন কথা আর বলিতে পারিলেন না। সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় কবির ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া উৎসবের কাজ যথারিতী অনুষ্ঠিত হইবে এইকথা সকলকে জানাইয়া দিলেন। পরদিন পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার নিমিত্ত গুরুদেব যথাসময়ে গরদের জামা, কাপড় পরিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং উদাত্তকণ্ঠে বেদবাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করিলেন। সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, কোনরূপেই শোকের কোন বাহ্য-প্রকাশ কিঞ্চিৎও দেখা গেল না। বিস্ময়ে আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম।—

রোগে

সামান্য অসুস্থতায় গুরুদেবকে কখনও শয্যা গ্রহণ করিতে দেখি নাই। বরং নিরলসচিত্তে সেইসব উপেক্ষা করিয়াই নিত্যকর্মে মনোনিবেশ করিতেই দেখিয়াছি। সুদূরে বিস্তৃত প্রান্তরে যখন শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পশ্চিমপ্রান্তে মহর্ষির প্রিয় ছাতিম-বৃক্ষ ও পূর্বপ্রান্তে বিরাট এক অশ্বত্থ বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন গাছের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মহর্ষির সাধনাস্থল এই প্রান্তরে স্থায়ীরূপে গ্রহণ করিবার সময় আস্তে আস্তে কিছু শাল ও ফল ফলাদির গাছ রোপিত হইয়াছিল। বৃক্ষলতাবিরল প্রান্তরে গ্রীষ্মকালে তখন ১০৯।১১০ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপ দেখা যাইত। গুরুদেবকে দেখিয়াছি এই দারুণ গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে নিবিষ্টচিত্তে আসনে বসিয়া নিত্যকর্ম করিয়া যাইতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মে এক-খানা ছোট হাতপাখা কাছে থাকিত বটে কিন্তু তাহা ব্যবহার করিবার অবকাশ কখনও হইত না। প্রকৃতির বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ঋতুকেই মনপ্রাণ দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সমস্ত ঋতুর মধুর আবির্ভাব অন্তরে উপলব্ধি করিতেন বলিয়াই তিনি সঙ্গীতে, সাহিত্যে, ও কাব্যে তাহা অনায়াস ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

এই গ্রীষ্মকালের একটি মধুর স্মৃতি কতকটা অবান্তর হইলেও প্রকাশ করিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মের অসহ্য তাপও অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় যদি কোন কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা হয়। এই শিক্ষা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে গুরুদেব এক অভিনব পরি-কল্পনার সৃষ্টি করিলেন। নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।—

১০৯।১১০ ডিগ্রী উত্তাপে তখন খোলা মাঠে যেন আগুনের হল্কা বহিয়া যাইত এবং আশ্রমবাসী কোন কোন ছাত্র ও অধ্যাপকের নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে দেখা যাইত। এই সময় অধ্যাপনার কাজ সব ১০টার মধ্যেই শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া পড়িতাম। খাইতে যাইবার পূর্বে সমস্ত দুয়ার জানালা একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিয়া খাইতাম। আহারান্তে অন্ধকার ও অপেক্ষাকৃত শীতল ঘরের ছায়ায় নিদ্রা যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বিকালে প্রায় ৫টার সময় দুয়ার জানালা খোলা হইত। গুরুদেব এই বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই দীর্ঘ সময় সকলে যদি বিছানায় শুইয়া গড়াগড়ি ও ঘুমাইয়াই কাটায় তাহা হইলে কোন কাজই তো সুষ্ঠুভাবে চলিবে না বরং অলসভাবেই দিন কাটিয়া যাইবে। তাই তিনি স্থির করিলেন দুপুরে ছেলেদের থাকার বড় হলঘরে নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকল ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে নূতন রকম হাল্কা অথচ আনন্দময় শিক্ষামূলক কাজে সকলকে মনোনিবেশ করাইতে হইবে।

তিনি নূতন এক খেলার আবিষ্কার করিলেন যাহাতে সকলে প্রচুর আনন্দের মধ্য দিয়া গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তার খোরাক পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছুটিয়া যাইবে। একদিন তিনি সকলের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া সমস্ত অধ্যাপকদের পাশে রাখিয়া চতুর্দিকে সকল ছাত্র গোল হইয়া একের পর এক উপবেশন করিবার নির্দেশ দিলেন। গুরুদেব একটি গল্প আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অধ্যাপক মহাশয়কে তাহার সঙ্গে খানিকটা গল্পের অংশ যোগ করিয়া দিতে বলিলেন। প্রত্যেকে ২।৩ মিনিটের বেশি সময় পাইতেন না। এইভাবে একের পর একজন গল্পটিকে চালু রাখিয়া নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুসারে গল্পের পরবর্তী অংশ মুখে মুখে বলিয়া গেলেন। এইভাবে প্রত্যেক অধ্যাপক ও

ছাত্রদের বেশ চিন্তা করিয়া তাহার নিজের অংশটি যে কি হইবে তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে হইত। গল্পের গতির দিকে বিশেষ মনোযোগ না রাখিলে তাহার নিজ অংশটুকু খাপছাড়া হইয়া যাইবে বলিয়া সকলকেই গভীর মনোনিবেশ সহকারেই চিন্তা করিতে হইত। এইভাবে ঘুম তো ছুটিয়াই যাইত বরং গল্পে সকলে মশগুল হইয়া গল্পাংশ তৈয়ারী করার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। প্রত্যেকেই তাহার নিজের আসনে তাহার গল্পাংশ স্থির করিয়া রাখিতেন সময় আসিলেই যেন একটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া সচ্ছন্দে বলিয়া যাইতে পারেন। এইভাবে একটি গল্প আরম্ভ হইয়া ডালপালা বিস্তার করিতে করিতে শেষ হইতে প্রায় দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা সময় অতিবাহিত হইত অথচ তাহাতে কাহারো বিন্দুমাত্র কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক গল্পটির গতির ও পরিণতির কথা ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইতেন কারণ বিভিন্ন লোকের চিন্তা-ধারা বিভিন্ন রকমের—কাজেই আরম্ভে যদিও বা একটা সঙ্গতি থাকিত কিন্তু পরিশেষে গল্পটি অদ্ভুত বিচিত্ররূপ ধারণ করিত। এইভাবে গল্প ঘুরিয়া শেষে গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি গল্পটি কিভাবে আরম্ভ হইয়াছিল ও কিভাবে ঘুরিয়া বর্তমানে কী অবস্থায় দাঁড়াইল তাহা বুঝাইয়া দিয়া তার শেষ পরিণতি কী হইবে তাহা বলিয়া দিয়া গল্পাংশ শেষ করিতেন। এইভাবে গরমের জন্য আর কাহাকেও কষ্টবোধ করিতে হইত না। এই অভিনব খেলা অবসর সময়ে বনভোজনে বা দূরে যাত্রা-পথে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।—

যতদূর মনে পড়ে বোধহয় ১৯০৯ সালে গুরুদেব অর্শরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক এই সময় একদিন গুরুদেব ছাত্রদের হাতে স্বায়ত্তশাসনের গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রমের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের তাঁর 'দেহলী' ভবনের দ্বিতলায় স্বল্প-পরিসর স্থানে সকাল ৯টার সময় আহ্বান করিলেন এবং দারুণ অর্শের যন্ত্রণার মধ্যে প্রায় ১½ ঘন্টা এক আসনে স্থির হইয়া বসিয়া অবিচল চিত্তে সমস্ত বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন, মুহূর্তের জন্যও কোনরূপ অস্বস্তির ভাব বা যন্ত্রণার লেশমাত্র মুখে বা বাহ্যব্যবহারে প্রকাশ করিতে দেখি নাই, যদিও আমরা তাঁর যন্ত্রণার কথা তখন ভাল করিয়াই জানিতাম। অসীম ধৈর্যের প্রতীক ঋষি কবির পক্ষেই ইহা সম্ভব এবং এইরূপ উদাহরণ বিরল। এই অর্শের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন পরবর্তী সময়ে বিলাতে এক নার্সিং হোম-এ থাকিয়া চিকিৎসা করার পর।

১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিম্পংএ গুরুদেব অসুস্থ হইবার পূর্বে ১৯৩৭ সনেও ঠিক এই সময়েই শান্তিনিকেতনে হঠাৎ মূত্রগ্রন্থিরোগে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। শান্তিনিকেতনের বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেব ইউরেমিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ যথাবিধি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা এই সংবাদ শুনিবামাত্র ছুটিয়া উত্তরায়ণে গেলাম। তখন গুরুদেব উত্তরায়ণের নিচের তলায় দক্ষিণদিকের এক প্রশস্ত কক্ষে বাস করিতেন। গুরুদেবের এই অবস্থা আমরা পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তার শচীনবাবু কলিকাতা হইতে কোন বিচক্ষণ ডাক্তার আনাইয়া অনতিবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য রথীবাবুকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কারণ এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে শচীনবাবু সাহস পাইলেন না। রথীদা ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত কলিকাতায় প্রশান্তবাবুকে টেলিফোন করিয়া সমস্ত বিষয় জানাইলেন ও কোন বিচক্ষণ ডাক্তারসহ অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রশান্তবাবু তৎক্ষণাৎ ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ডাক্তার জ্যোতি সরকার সহ আরো বিশিষ্ট কয়েকজন ডাক্তারকে যন্ত্রপাতি ও ঔষধাদি সহ শান্তিনিকেতনে পরবর্তী ট্রেনেই রওয়ানা করাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া অল্পের জন্য ট্রেনটি ধরিতে পারিলেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা মোটরে করিয়াই রওয়ানা হইয়া বর্ধমানে সেই ট্রেন ধরিয়া সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলেন। শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াই ডাক্তার সরকার কবির নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পর্যন্ত তাঁহাকে কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিলে রথীদা ডাক্তার শচীনবাবুর প্রেসক্রিপশান দেখাইয়া শচীনবাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। শচীনবাবু ডাক্তার নীলরতন সরকারের মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ডাক্তারের সহিত পরিচিত হইয়া নিজেকে একদিকে ধন্য ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বিষম বিব্রত বোধ করিতেছিলেন এবং চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল কিনা সেই ভয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি-বোধ করিতেছিলেন। ডাক্তার সরকার তাঁহার প্রেসক্রিপশান দেখিয়া শচীনবাবুর চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কথা জানিবার জন্য নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন। শচীনবাবু তাহাতে আরো বিব্রত হইয়া পড়িলেন কিন্তু ডাক্তার সরকার তথায় উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত ডাক্তারদের ডাকিয়া বলিলেন, মফঃস্বলে এরূপ বিচক্ষণ ডাক্তার যে থাকিতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। গুরুদেবের এইরূপ অবস্থায় মাথা ঠিক রাখিয়া যে চিকিৎসা ইনি করিয়াছেন আমি থাকিলেও ঠিক তাহাই করিতাম এবং তাঁহার এই চিকিৎসার গুণেই গুরুদেবের অবস্থা বর্তমানে অনেকটা ভাল দেখিতেছি—এতক্ষণে শচীনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল বদনে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মনে শান্তি আনিয়া দিল।

ডাক্তার সরকার দুই দিন থাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া গুরুদেবকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শচীনবাবু ডাক্তার সরকারের নিকট হইতে চিকিৎসাবিধি সম্বন্ধে যাহা জানিবার সমস্ত জানিয়া লইলেন। ডাক্তার সরকার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন শুনিয়া বোলপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ ও পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ একদিন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন ও চিকিৎসা-বিধি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার আগে ডাক্তার সরকার আর একবার গুরুদেবকে দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য কবির শয্যাপার্শ্বে গিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে দেখিয়াই হাস্যমুখে নমস্কার জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী রকম দেখছেন?" ডাক্তার সরকার বলিলেন, "এখন তো বেশ ভালই দেখছি—আর কোন ভয় নেই।" তাঁহারা যে এত কষ্ট

করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিয়া গেলেন সেইজন্য গুরুদেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন কিন্তু ডাক্তার সরকার কিছু না বলিয়া জোড়হস্তে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গুরুদেব বলিলেন, "কী দেখছেন?" উত্তরে ডাক্তার সরকার বলিলেন, "আপনার কাব্যে দুঃখ শোক-জনিত নানা আঘাত সম্বন্ধে কত উপদেশ পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, আর আজ এত কষ্টের মধ্যেও যে আপনি পরম আনন্দে নির্বিকার থাকিয়া হাস্যালাপ করিতে পারেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতেছি। তাই আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইতেছি।" গুরুদেব ছলছল নেত্রে তাঁহাকে জোড়হস্তে নমস্কার জানাইলে ডাক্তার সরকার সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গুরুদেবকে ডাক্তার সরকারের নির্দেশ-মত প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস শশার সরবৎ অবলীলাক্রমে খাইতে দেখা প্রসঙ্গে আজ একটি অবান্তর কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই কথাটি বন্ধুবর সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নিকট যেমন শুনিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি। গুরুদেব শশার সরবতের মত মাঝে মাঝে আরো অনেক রকম বিচিত্র খাওয়া অনায়াসে অভ্যাস করিয়া লইয়াছিলেন। শারীরিক উপকার হইবে বলিয়া আটার রুটিতে ক্যাস্টর অয়েলের ময়াম ও প্রতিদিন প্রাতে এক গ্লাস করিয়া নিমপাতার রসও মাঝে মাঝে খাইতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সকালে চা খাওয়ার সময় তাঁহার পুরাতন ভৃত্য "নীলমণি" (নীলমণি) এক গ্লাস নিমপাতার রস টেবিলে ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমাদের বন্ধু সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সকালে চা খাওয়ার সময় গুরুদেবের সঙ্গলাভের জন্য রোজই আসিতেন। এই রকম সবুজরঙের এক গ্লাস রস গুরুদেবকে রোজই খাইতে দেখিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, চা খাওয়ার আগে ওটা কিসের সরবৎ আপনি খান?" গুরুদেব গম্ভীরমুখে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন "বড় উপাদেয় সরবত, একটু খেয়ে দেখ। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা খুবই উপকারী"। এই বলিয়া তিনি অন্য একটি গ্লাসে অর্ধেক সরবত ঢালিয়া সুধাকান্তকে দিলেন বাকীটুকু তিনি মুখ একটুও বিকৃতি না করিয়া ঠিক সরবত খাওয়ার মত একটু ২ করিয়া খাইতে লাগিলেন—সুধাকান্ত অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়া গ্লাসটি লইয়া মুখে একটু ঠেকা দিয়াই মুখ-চোখ কুঁচকাইয়া জিভ বাহির করিয়া অ্যাঃ থুঃ থুঃ এযে হাড়তেতো বলিয়া ফেলিয়া দিলেন। গুরুদেব আড়-চোখে তার দিকে তাকাইয়া এই দৃশ্য দেখিবেন বলিয়াই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এটা আর কী তেতো রে? এটা রোজ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। দেখিস্ তো আমি রোজই খাই।"

যে কোনরকম বিস্বাদ জিনিসও তিনি মুখ বিকৃত না করিয়াই অবলীলাক্রমে খাইতে পারিতেন, কাজেই শশার সরবত আর তাঁর কাছে বেশি কি?

কালিম্পং যাত্রা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া বৌঠান প্রতিমা দেবীর লিখিত বিবরণ হইতেই প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারা যায়। ১৯৪০ সনে গুরুদেবের স্বাস্থ্য আবার উদ্বেগজনক হইয়া পড়িল। গুরুদেব স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য পাহাড়ে যাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ অন্যান্য সকল ডাক্তারই কবির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেখানে প্রয়োজন হইলে সহজে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাইবে না এরূপ কোন স্থানে যাওয়ার পক্ষে মত দিতে পারিলেন না। গুরুদেব মংপু যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডক্তারদের অভিমত জানিয়া কালিম্পংএ বৌঠান প্রতিমা দেবীর কাছেই যাওয়া স্থির করিলেন। তখন বৌঠানের শরীরও বিশেষ ভাল ছিল না। কাজেই গুরুদেব সেইখানে যাইতেছেন জানিয়া বৌঠান অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রথীদা তখন জমিদারীতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন—বৌঠানও শারীরিক অসুস্থতার জন্য কালিম্পং চলিয়া গিয়াছেন কাজেই এই সময় গুরুদেব নিজের শরীরের অবস্থা অনুভব করিয়া একা শান্তি-নিকেতনে থাকিয়া শান্তি পাইতেছিলেন না। আসন্ন কোন বিপদের আশঙ্কা যে তাঁর মনে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা বুঝিয়াই আপনজনের কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি কালিম্পংএ বৌঠানের নিকট আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া স্বস্তি বোধ করিলেন। কয়েকদিন মনের আনন্দে একটু সুস্থ-বোধও করিয়াছিলেন কিন্তু কালব্যাধি তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ থাকিতে দিতে-ছিল না—অবশেষে ব্যাধির আক্রমণে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। এই সময়ে গুরুদেব কালিম্পং আসিয়াছেন জানিয়া মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবীও আসিয়া পড়িলেন। বৌঠান মৈত্রেয়ী দেবীকে এই সময় পাইয়া অনেকটা সাহস পাইলেন। কলিকাতায় এই খবর পৌঁছিবামাত্র প্রশান্তবাবু, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র, অমিয়নাথ বসু ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকার মহাশয়দের লইয়া কালিম্পং যাত্রা করিলেন এবং তাঁহারা গুরুদেবের সংজ্ঞা-হীন অবস্থাতেই কলিকাতায় ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। গুরুদেবের এই আকস্মিক অচৈতন্য অবস্থার কথা খবরের কাগজে ও রেডিয়োতে জানিয়া আমরা গুরুদেবকে দেখিবার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছুটিয়া গেলাম।

ডাক্তার নীলরতন সরকার, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যসখা মৈত্র, অমিয় সেন, অমিয়নাথ বসু, রামচন্দ্র অধিকারী, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ গুরুদেবকে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া কিরূপ চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সেই সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য পাশের ঘরে গিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে লাগি-লেন। ললিতবাবুর মত হইল যে কবির শারীরিক অবস্থা বর্তমানে যেরূপ তাহাতে অনায়াসে অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহাকে কষ্টের হাত হইতে সহজেই মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার সরকার বলিলেন, "আচ্ছা, আপনারা অস্ত্রোপচার করলে কবি যে কয়দিন বাঁচিবেন সে কয়দিন তিনি কি একেবারে পঙ্গু হয়ে থাকবেন না?" ডাক্তার ব্যানার্জি বলিলেন, "হ্যাঁ, সহজভাবে নড়া-চড়া করে বেড়ানো সম্ভব হবে না বটে, তবে কষ্টের অনেক লাঘব হবে।" ডাক্তার সরকার বলিলেন, "এমন একটা মহামূল্য জীবনকে এইভাবে পঙ্গু করে রেখে লাভ কি? তার চাইতে আমরা যদি ওষুধ দিয়ে তাঁকে সহজভাবেই কিছুদিন বাঁচাবার চেষ্টা করি তবে তাতে আপত্তি কি?" ডাক্তার ব্যানার্জি বলিলেন, "হ্যাঁ, সে তো ভাল কথা কিন্তু তাকি বেশিদিন স্থায়ী হবে? কিন্তু এখন যে অবস্থায় অপা-রেশন করতে আমি সাহস পাই তখন হয়তো এমন অবস্থা হয়ে পড়বে যে আমার দ্বারা আর অপারেশন করা সম্ভব হবে না এবং আমি তখন এই রকম মহামূল্য জীবনের জন্য দুর্নামের ভাগী হতে পারব না। আমার একান্ত অনুরোধ তখন আর আপনারা অপারেশনের জন্য আমাকে ডাকিয়ে পাঠাবেন না।" এইরূপ আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে ঔষধ দিয়াই সম্প্রতি কবিকে অস্ত্রোপচারের হাত হইতে রক্ষা করাই নীলরতন বাবুদের একান্ত ইচ্ছা। তদনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় ধীরে ধীরে অবস্থার খানিক উন্নতি হইল বটে কিন্তু তখনও একেবারে বিপদমুক্ত হইল না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছেড়ে দিলাম
পাথরটা

কৃষ্ণ মেনন

বদলে গেল
মতটা

এমন অবস্থায়
পড়তে পারে
সবারি মত
বদলায়!

মেনন
ক্যান্টিন

খাসনবিশের খাসদপ্তরে

কমল দেব

ওয়ান-ডায়মেন্‌শান্‌ অর্থাৎ কিনা একমাত্রা-বিশিষ্ট লোককে কি যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়? বলা বাহুল্য, মাত্রাটা দৈর্ঘ্যের দিকে। রাখাল ভটচাজ কিন্তু যুদ্ধে গিয়েছিল। আর ও ছিল ওয়ান-ডায়মেন্‌শানাল।

রাখাল ভটচাজ নাকি লম্বায় ছিল ছ' ফীট। অবশ্য মনে হত সাড়ে ছ' ফীট বলে। হবে নাই বা কেন! একে একমাত্রা-বিশিষ্ট জীব, প্রস্থে ও পরিধিতে শুধু অস্তিত্বই আছে, আয়তন নেই। তার ওপর ও যখন খাকি হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-শার্ট, ভারী বুট এবং হাফ-মোজা পরে, খোয়া-বাঁধানো পথে খড়মড় আওয়াজ তুলতে তুলতে ওয়ার্কশপের দিকে বীর কদমে এগোত, তখন মনে হত, ও বুঝি পোড়া বাঁশের একজোড়া রণ-পায় চেপে দৌড়চ্ছে।

পোড়া বাঁশের একজোড়া রণপায়ে চেপে দৌড়চ্ছে

রাখাল ভটচাজ যদি ক্যাপ্টেনগোছের কিছু হত, তাহলে না হয় বোঝা যেত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও হেলমেট পরে, চোখে ফিল্ড-গ্লাস লাগিয়ে শত্রুপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য করছে। গাছের ওপর বা উঁচু ঢিলায় চড়তে হয়নি। শত্রুপক্ষও নিশ্চয় ওকে কোন বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ীর পোড়া খুঁটি ভেবে, কিংবা কৃষিক্ষেত্রের কাক-তাড়ুয়া ভেবে অমূল্য বুলেট খরচ করছে না। কিন্তু তা'তো নয়। ও যুদ্ধে গিয়েছিল ইলেক্‌ট্রিসিয়ান হিসেবে। মধ্য-প্রাচ্যের বহু যুদ্ধক্ষেত্রে ওকে বালির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এক ট্রেঞ্চের সঙ্গে আর এক ট্রেঞ্চের বৈদ্যুতিক সংযোগ বজায় রাখতে হয়েছিল। হলদে বালির ওপর রাখাল ভটচাজের কৃষ্ণ-মধুর বর-বপুর শোভার সাক্ষী রয়ে গেল শুধু মিত্রপক্ষের জীবিত সৈনিকরা।

যুদ্ধের পর রাখাল ভটচাজ অধ্যাপক খাসনবিশের ল্যাবরেটরীতে এয়ার কণ্ডিশনিং মেকানিকের পদে যোগ দিল। প্রথম দিন এসেই ওকে ম্যানেজার গিলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হল। সাহেব ওকে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, "আমাদের কণ্ডিশানিং প্ল্যাণ্টটা ঘরের ছাদের কাছে বসানো। সুপারভাইস করার জন্য তোমার বোধ হয় মই লাগবে না, কি বল?"

রাখাল ভটচাজ মোটামুটি ইংরিজি কথাবার্তা বুঝতো। কিন্তু সামনে বসে স্কচ্‌ সাহেবের গাঁক-গাঁক করে সংলাপ শোনার অভ্যাস ছিল না। সাহেবের মাথা নাড়া আর 'নট'-এর ওপর ঝোঁক দেখে ও ধরে নিল, না বললেই সাহেব খুশী হয়। তাই পরম যোদ্ধার মত ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে ও বলল, "নো স্যার।"

সাহেব এবারও গম্ভীরভাবে বললেন, "তুমি কি আরও লম্বা হতে চাও?"

রাখাল 'টল্‌' কথাটা থেকে ধরে নিল ওর দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন। ও চটপট উত্তর দিল, "ইয়েস স্যার। সিক্স্‌ ফীট্‌।"

সাহেব মৃদু হেসে বললেন, ও-কে। তারপর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভূদেববাবুকে বললেন ওকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে।

কথাটা বেশ মুখরোচক হয়ে ল্যাবরেটরীতে পল্লবিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে রাখাল ভটচাজ আর এক কাণ্ড করে দিয়েছে।

ভূদেববাবু যখন ওকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন, "আপনি অফিসের নিয়ম-কানুন সব জানেন তো?"

"মিলিটারীর নিয়ম-কানুন জানি।"

"তাহলেই হবে। সব সাহেবের একই পুজো। অফিসারদের একটু-আধটু নমস্কার করবেন।"

"সে আর বলতে হবে না, স্যার।"

পরদিনই কাণ্ডটা ঘটল। ডক্‌টর গড়গড়ি আর মিস্টার মণ্ডল অফিসে ঢুকতেই দারোয়ান ও'দের নমস্কার করল। ও'রা উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করছিলেন দারোয়ান ও'দের নমস্কার করে কিনা দেখবার জন্য। দারোয়ানকে নমস্কার করতে দেখে হৃষ্টচিত্তে, যেন ওসব খেয়ালই করেননি, এমনিভাবে আল-গোছে হাতটা একবার কপালের কাছে তুললেন। ল্যাবরেটরীতে সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকছে কিনা, তা বোঝবার মাপকাঠি হল এইগুলো। অধ্যাপক খাসনবিশ যাকে অপছন্দ করবেন, ল্যাবরেটরীসুদ্ধ লোক তাকে আর পাত্তা দেবে না। দারোয়ান-বেয়ারা অবধি নমস্কার করতে ভুলে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাবে।

ও'রা দু'জন দারোয়ানকে অতিক্রম করে সবেমাত্র এগিয়েছেন এমন সময় পাশেই খোয়া-বাঁধানো পথটার ওপর হঠাৎ খড়মড় আওয়াজ হতে দু'জনে চম্‌কে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, খাকি হাফ-প্যাণ্ট-পরা পোড়া কাঠসদৃশ সুদীর্ঘ এক দেহ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। মাটি থেকে ছ' ইঞ্চি ওপরে ভারী মিলিটারী বুট-পরা একজোড়া পা পরস্পরের ওপর সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

ডক্‌টর গড়গড়ি আঁৎকে উঠে

জিগেস করলেন, "কি হল, পিঁপড়ে কামড়ালো নাকি -"

মিস্টার মণ্ডল কিন্তু এ-সুযোগ হারালেন না। ঘাড়টা টান-টান করে দেহটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, পোর্টফোলিও ব্যাগ-ধরা হাতটা অল্প কয়েক ইঞ্চি তুলে রাখাল ভটচাজের স্যালুট গ্রহণ করলেন। তারপর গড়গড়ির কানের কাছে ফিস-ফিস করে বললেন, "মিলিটারী স্যালুট যে।"

ডক্টর গড়গড়ির আপশোষের সীমা রইল না। এরকম স্যালুট জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়। অথচ যদিও বা পেলেন, বুঝতেই পারলেন না। আর যখন বুঝতে পারলেন, তখন তো রাখাল ভটচাজকে ডেকে স্যালুট রিসিভ্ করা যায় না। মিস্টার মণ্ডল কিরকম ডাঁটের মাথায় সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে নড্ করল!

পরের দিন অফিসে ঢোকবার সময়ে ডক্টর গড়গড়ি খুব সতর্ক রইলেন। কিন্তু গেটের কাছে সেদিন রাখাল ভটচাজ ছিল না। পর পর কয়েকদিনই ওঁকে বেশ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হল। একদিন দূরে থেকে দেখলেন, তাঁর ঘরের সামনে করিডোরে রাখাল ভটচাজ দাঁড়িয়ে। গড়গড়ি শংকিত হৃদয়ে নিজের চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি যেতে যেতে যদি রাখাল ভটচাজ চলে যায়! আর হলও তাই। একটুখানির জন্য তিনি পৌঁছতে পারলেন না।

এদিকে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে তো অন্তর্বিপ্লব লেগে গেল বললেই চলে। সিনিয়ার কেমিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কে বি পাল মিস্টার দাসের সঙ্গে গল্প করতে করতে ল্যাবরেটরীতে ঢুকছিল। দুজনেরই পরণে সার্জের পাঞ্জাবি আর ধুতি। ওদের আগে আগে যাচ্ছিল জুনিয়ার কেমিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট সুনীল মজুমদার, পরণে টাই ও স্যুট। গেটের সামনেই রাখাল ভটচাজের সঙ্গে মোলাকাৎ। ফলে সেই মিলিটারী স্যালুট। সুনীল মজুমদার হৃষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই পেছন থেকে কে বি পাল এসে হাজির। "শালা, তুমি অফিসার হয়েছ! ভটচাজ তোমাকে সেলাম করলে, আর আমাদের করলে না!"

সেদিন টেস্টিং ডিপার্টমেন্টের একটা টেস্টিং মেশিন হঠাৎ বিগড়ে গেল। ডিরেক্টার খাসনবিশের একটা জরুরী স্যাম্পেলের টেস্ট হচ্ছিল সে মেশিনটায়। হেড-টেস্টার মিস্টার দাস শ্লিপ দিলেন ডিরেক্টারের কাছে। ডিরেক্টার সেই শ্লিপটার ওপর লাল পেন্সিল দিয়ে 'ইউ' লিখলেন, অর্থাৎ জরুরী। তারপর 'ইউ'টাকে ঘিরে নীল পেন্সিল দিয়ে একটা গোল দাগ দিলেন, অর্থাৎ অতি জরুরী। তারপর সেটাকে ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানেজার গিলিশ সাহেব নীল গোল দাগটার চারপাশে লাল পেন্সিল দিয়ে আর একটা গোল দাগ দিয়ে হেড মেকানিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অর্থাৎ বিষয়টার গুরুত্ব আরও এক ধাপ বেশী। হেড মেকানিক আবার সেই লাল গোল দাগটার ওপর নীল গোল দাগ দিয়ে ইলেকট্রিসিয়ানের কাছে পাঠালেন। ইলেকট্রিসিয়ানের হয়তো ইচ্ছে ছিল নীল-লালের খেলাটা আর একটু চালায়। কিন্তু ওর তলায় যে সমস্ত ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রয়েছে, তারা আবার ইংরিজি জানে না। তাই তিনি মেগার-টেস্টার নিয়ে দলবল-সমেত টেস্টিং ডিপার্টমেণ্টে ঢুকলেন। মিস্ত্রীরা মেশিনটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ইলেকট্রিসিয়ান ঘোষবাবু মিস্টার দাসকে বললেন, "কি মশাই, ডিরেক্টার সাহেবের রিসার্চের বারোটা বাজিয়ে দিলেন।"

"পারলুম আর কই। আপনারাই তো মশাই সব ভণ্ডুল করে দেন। খেলাটা একটু জমতে না জমতেই এসে পড়ে সব মাটি করে দিলেন।"

একটা এ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে অধ্যাপক খাসনবিশ এসে হাজির হলেন।

"কি অবস্থা?"

মিস্টার দাস এবং ঘোষবাবু শশব্যস্তে "এই যে, প্রায় হয়ে এলো"।—বলে দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মেশিনটার ওপর। পেছনে অধ্যাপক দাঁড়িয়ে কাজ দেখতে লাগলেন।

খবর পৌঁছে গেল। স্যার এসেছেন শুনে হেড মেকানিক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল। একটু পরে ম্যানেজার গিলিশ সাহেবও। হেড মেকানিকের একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা অভ্যেস। তিনি বললেন,

"আমার মনে হচ্ছে স্যার, পেনিয়ানের দাঁতগুলো আলগা হয়ে গিয়ে রেভোল্যুশানারী মোশানের স্পীডটা বোধ হয় কমে যাচ্ছে।"

স্যার গম্ভীরভাবে বললেন, "অ!"

গিলিশ সাহেব একটাও কথা বলেন নি। তিনি এবার দুহাতে ভিড় ঠেলে মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখমুখ কুঁচকে এই অবাধ্য যন্ত্রশিশুটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর সদ্য-ভাঙ্গা, ক্রীজ-তোলা শার্ট-প্যান্ট-টাইসমেত চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন মেশিনটার সামনে একজন সুদক্ষ মোটর মেকানিকের মত। ধাঁ করে একটা আঙ্গুল চালিয়ে দিলেন মেশিনের এক ফাঁকে। কালো রঙের খানিকটা গ্রীজ উঠে এল। সুইচটা ধরে ঘটাং ঘটাং করে নাড়ানাড়ি করলেন। স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে দুবার ঠক্ঠক্ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন তোয়ালে এগিয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে চিন্তিতভাবে বললেন, "হুম্!" তারপর ঘোষবাবুর দিকে তাকিয়ে, যেন সবই বুঝতে পেরেছেন এমনি ভাব করে বললেন, "হ্যাল্লো গোস্-বাবু।"

ঘোষবাবুও যেন সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝে গেলেন এমনিভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ইয়েস স্যার।"—বলেই ব্যস্তভাবে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

হঠাৎ পেছনে একটা কুঁই-কুঁই আওয়াজ পেয়ে সবাই চমকে তাকালো। একটা শ্লিং-হাইগ্রোমিটার হাতে নিয়ে রাখাল ভটচাজ মুখ ব্যাদান করে নীরবে হাসবার চেষ্টা করছে। ওকে দেখে হেড মেকানিক রীতিমত গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, "এটা স্যার কারেণ্ট এবং রেসিস্টেন্স্ সংক্রান্ত গোলযোগ। সুতরাং—"

খাসনবিশ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে তো খুব সহজ ব্যাপার। 'ওম্স্ ল' এ্যাপ্লাই করুন। 'ওম্স্ ল'-এ কি যেন বলছে—"

"ওরকমভাবে হবে না স্যার।"

হেড মেকানিক রাগতভাবে রাখাল ভটচাজের দিকে তাকালো। খাসনবিশ বিরক্তভাবে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "কেন, ওম্স্ ল-টা খাটালে—" "ওসব কেতাবী ওম্স্ ল-ট এখানে খাটবে না", বাধা
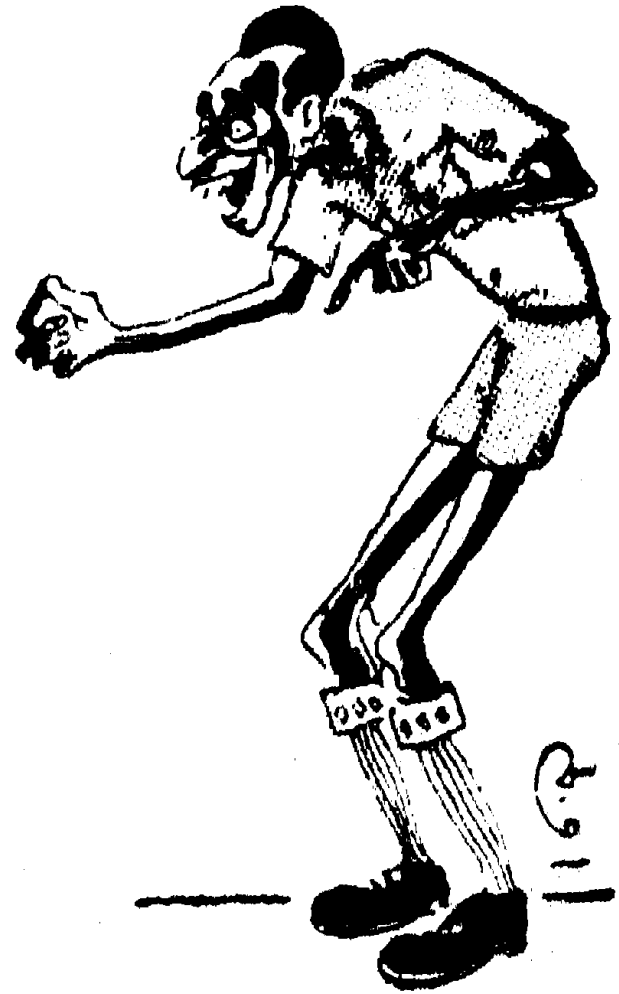
পেছনে কষে টাইট দিতে হবে

দিয়ে বলে উঠল রাখাল, "ওই ইস্-কুরুপটার পেছনে কষে টাইট দিতে হবে।"

রাখাল 'পেছনে' শব্দটার বদলে প্রাকৃততর শব্দ ব্যবহার করল। শুনে খাসনবিশ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মিস্ত্রীরা মুচকি হাসল। ঘোষবাবু যেন শুনতেই পার্নিন, এমনিভাবে মাথা নীচু করে নিজের হাতে সেই স্ক্রুটায় টাইট দিতে লাগল। একটু পরেই মেসিনটা গোঁ করে চলতে শুরু করল।

খাসনবিশ এবং হেড মেকানিক গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন। গিল্লিশ সাহেব শার্ট-প্যান্টের ক্রীজে টোকা মারতে মারতে "ওয়েল ডান বাট্‌চাজ্" বলে চলে গেলেন। মিস্ত্রীদের মধ্যে একটা ছোকরা সবার শেষে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীচুস্বরে বলল, "দাদা, বেশ তো এয়ার কন্ডিশনিং করে ঘর ঠান্ডা রাখছিলেন। হঠাৎ হাওয়া গরম করতে গেলেন কেন?"

রাখাল ভটরাজ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে গবেষণাগার আর কিছু না পারুক, কর্মীদের সময়ে হাজিরা দেওয়ার কৃতিত্বে রেকর্ড স্থাপন করতে পারে, সেইখানে কিনা রাখাল ভটচাজ রোজ লেট করে অফিসে আসতে লাগল। আর দু-চার মিনিট লেট নয়; আধ ঘন্টা থেকে প'য়তাল্লিশ মিনিট। লাল পেনসিল দিয়ে হাজিরা-খাতায় দাগ দিয়ে দিয়ে ক্যাজুয়েল লিভ্ কেটে নিতে নিতে দেখা গেল সারা বছরের ক্যাজুয়েল লিভ্ শেষ। অথচ ও যে রেটে লেট করছে তাতে তো আগামী দু-চার বছরের ক্যাজুয়েল লিভ কেটে নিতে হয়। খাস-দপ্তরে খাঁসনবিশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি করে স্টেপ নেওয়া যায়? ডিসিপ্লিনই যদি ভেঙে গেল, তাহলে তাঁর এই সাধের ল্যাবরেটরীর আর কি দেবার রইল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে।

একটু একটু করে বিরক্ত হয়ে উঠছিল খাশনবিশের মেজাজ। এমন সময়ে চীফ্ ফিজিসিস্ট ডক্টর গড়গড়ির কাছ থেকে একটা শ্লীপ এলো—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ থেকে, পিসার টাওয়ারের মত দেখতে (হেলানো নয়) যে সেমি-সাইক্লো-ব্যালেন্স যন্ত্রটি কেনা হয়েছে, যাতে অল্প কয়েকটি ধূলিকণা অবধি ওজন করা যাবে, তার ওপর প্রভূত পরিমাণে ধুলো-বালি, পাটের সূক্ষ্ম ফেঁসো ইত্যাদি জমা হয়ে সেটাকে প্রায় কয়লার দোকানের দাঁড়ি পাল্লার সক্ষ্মতায় পরিণত করেছে। অনতি-বিলম্বে এটাকে ঢেকে রাখবার বন্দোবস্ত না করলে, এটাতে ভবিষ্যতে কয়লা ওজন করা চলবে। তাতে কয়লার ডিপার্টমেন্টের সুবিধে, কেননা ওদের প্রচুর পরিমাণে কয়লা ওজন করতে হয়। কিন্তু ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে পাটের সূক্ষ্মতা নিয়ে যে গবেষণা চলছে, তা অতল তলে তলিয়ে যাবে।

খাসনবিশ তো ফায়ার! সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোকে ডেকে আধঘন্টা ধরে পাঁচ লাইন নোট ডিক্টেট করলেন—পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যালেন্সের ঢাকনার জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। সুতরাং সেখান থেকে কোন বন্দোবস্ত হবে না। আমাদের ল্যাবরেটরীতে এবং তার ওয়ার্কশপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু গবেষক-পন্ডিত ও বহু সুদক্ষ কর্মীর অন্টবজ্র সম্মেলন হয়েছে বলে প্রতিনিয়ত অনুভব করি। সুতরাং একের পান্ডিত্য ও অপরের কর্ম-দক্ষতার যোগফলে একটা ঢাকনা তৈরী হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া নিজের ডিপার্টমেন্টের সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখাই ভালো। অন্য ডিপার্ট-মেন্টের কিসে সুবিধে হবে এ'সব ভাবলে নিজের গবেষণার ক্ষতি বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

নোট পেয়েই তো গড়গড়ি লাফিয়ে উঠলেন। স্যার উপদেশ দিয়েছেন একটা ঢাকনা বানাতে। অতএব আর দেরী নয়। তিনি কর্মপদ্ধতি স্থির করবার জন্য ভাবতে বসে গেলেন।

গড়গড়ি ঠিক করলেন, প্রথমেই তিনি বাঁ ও ডান হাত স্বরূপ সহকর্মী এন কে বসু এবং বি কে শীলের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষ হলে তার ভিত্তিতে একটা ড্রইং করবেন। সেই ড্রইং নিয়ে হেড-মেকানিকের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তারপর সেটা ওয়ার্ক-শপে দেবেন এবং কাজ চলাকালীন মাঝে মাঝে পরিদর্শন করবেন।

পরদিন সকালে এসেই সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিলেন গড়গড়ি। ঠিক হল, সরু ব্রাস্-রড দিয়ে পিসার টাওয়ারের ডিজাইনে একটা খাঁচার মত কাঠামো বানানো হবে। বলা বাহুল্য খাঁচাটা পিসার টাওয়ারের মত হেলানো হবে না। তারপর তার ওপর এ্যালকাথিন পেপার জড়ানো হবে। সেটা ব্যালেন্সের ওপর দিয়ে পরিয়ে ঢাকা দেওয়া চলবে।

এরপর শুরু হল ড্রইং। একবার ড্রইং-এর পর তিনবার আলোচনা। তারপর একবার ড্রইং। আবার ড্রইং। তারপর আবার আলোচনা, আবার ড্রইং, ইত্যাদি চলতে চলতে শেষ অবধি ড্রইং সমাপ্ত হল। তারপর সেই ড্রইং হেড-মেকানিককে বোঝানো হল। হেড-মেকানিক আবার সেটা মেকানিককে বোঝালো। সে ঠিকমত বুঝতে না পেরে গড়গড়ির কাছে এসে বুঝে গেল। ইতিমধ্যে সাড়ে চারদিন কেটে গেছে। এরপর কাজ আরম্ভ হল। গড়গড়ি এবং তাঁর দুই সহকর্মী প্রায়ই গিয়ে সুপার-ভাইস করে আসতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সেই মেকানিকটি আধখানা খাঁচা হাতে ঝুলিয়ে গড়গড়ির কাছে এসে পরামর্শ নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেই খাঁচা তৈরী হল। তারপর অফিসে নোট গেল এ্যালকাথিন পেপার, ছুঁচ, সুতোর জন্য। হেড-ক্লার্ক ডিরেক্টারের কাছে জানতে চাইল, এগুলোর জন্যে কোন টেন্ডার আহ্বান করা হবে কিনা। ডিরেক্টার নির্দেশ দিলেন, এগুলো ক্যাশ্ পারচেস্ করতে। আউটডোর ক্লার্ক দৌড়ল ছুঁচ-সুতো ইত্যাদি কিনতে। বি কে শীল সেই কাঠামোর ওপর এ্যালকাথিন পেপার সেলাই করে খাঁচা বানালো। সত্যি, দেখতে হল অপূর্ব। তার ঢাকনাটা বেশ একটু লম্বা বলে, আর ব্যালেন্সটা টেবিলের ওপর বসানো বলে একটা টুলের ওপর উঠে ঢাকনাটা খুলতে বা লাগাতে হয়।

স্ট্যাটিস্টিকাল এ্যাসিস্ট্যান্ট্ সনাতন-বাবু চিরাচরিত প্রথায় ঢাকনার দাম কষে বার করলেন। ডক্টর গড়গড়ির তিনদিনের মাইনে, শীল আর বোসের পাঁচদিনের, এমনিভাবে সবাইকার লেবার প্লাস ছুঁচ-সুতো-এ্যালকাথিন আড়াই টাকা—মোট-মাট দাঁড়ালো এগারোশো বাহান্ন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। সাড়ে তিন হাজার টাকার ব্যালেন্সের উপযুক্ত ঢাকনা। কম্টিং-করা কাগজটার অনেকগুলো কপি ল্যাবরেটরীময় হাতে হাতে ফিরতে লাগল।
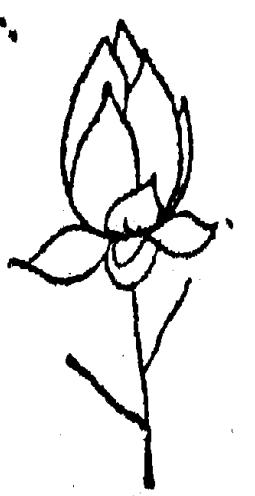
ব্যালেন্সের ঢাকনাটা ঘিরে অধ্যাপক খাসনবিশ, ডক্টর গড়গড়ি এবং অন্যান্য কর্মীরা দাঁড়িয়েছিলেন। অধ্যাপক খাস-নবিশ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, "এমনিভাবেই আমাদের নতুন ভারত গড়ে তুলতে হবে—আমাদের এ্যাডিশনাল সেক্রেটারীর একান্ত ইচ্ছে তাই। আমার অনেক সহ-কর্মী বন্ধু পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির উন্নতির কথা উল্লেখ করে আমাদের কাজের প্রতি কটাক্ষ করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে বাইরের সাহায্য ছাড়াই

পূর্ব-ইউরোপ নিজেদের গড়ে তুলেছেন যেমন করে আমরা এই ঢাকনাটা তৈরী করলাম।"

হঠাৎ মূর্তিমান বেরসিকের মত রাখাল ভটচাজের অকুস্থলে প্রবেশ। হাতে স্লিং-হাইগ্রোমিটার, উদ্দেশ্য হিউমিডিটি দেখা। সবাইর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বোকার মত হেসে ও এগিয়ে এসে ঢাকনাটার গায়ে আলতোভাবে হাত বোলাতে লাগল। তারপর একগাল হেসে বলল, "হুজুর এটার জন্যে তো অনেক খরচা পড়ল। শুনেছি নাকি হাজার দেড় হাজার টাকা।"

গড়গড়ি তো অবাক! "কে বলেছে তোমায়?"

"এই যে হুজুর, এই কাগজটায় সব দাম কষা রয়েছে।"

খাসনবিশ এবং গড়গড়ি ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখতে লাগলেন। বাকি সবাই চোখ-মুখের ঈষৎ কুঞ্চনে একটা যেন পুলকের তরঙ্গ সৃষ্টি করল।

"হুজুর, এটা অনেক সস্তায় হয়ে যেত।"

গড়গড়ি চোখ-মুখ লাল করে এবং খাসনবিশ গম্ভীর-উদাসীনভাবে রাখালের দিকে তাকালেন।

"হুজুর, এই ঢাকনাটা খোলা আর লাগানো বড় ঝামেলার ব্যাপার। টুলের ওপর চড়। সোজাভাবে পরাও। তার চেয়ে ঐ যে কাঁচের ঢাকনাটা রয়েছে—" ঘরের কোণটা দেখাল ভটচাজ। তিনটে ধার এবং মাথার ওপর কাঠের ফ্রেমে কাঁচ লাগানো, যন্ত্র ঢাকনারই একটা কাঁচঘর। অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

"হুজুর ওর সামনের দিকটা খোলা। ওখানে এই প্ল্যাস্টিকের কাগজ দিয়ে পরদার মত টাঙিয়ে দিন। কাজের সময় পরদাটা তুলে দেবেন, কাজ হয়ে গেলে পরদা নাবিয়ে দেবেন। এতে হুজুর এক পয়সাও খরচ পড়বে না।"

খাসনবিশ ঘাড় নাড়তে নাড়তে গম্ভীরভাবে বললেন, "হুম!" তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভটচাজের ডাক পড়ল খাস দপ্তরে।

"কি ব্যাপার বলুন তো আপনার? আগে তো আপনি এরকম ছিলেন না।"

"কি হয়েছে হুজুর?"

"আপনি অফিসের নিয়ম-কানুন ভেঙে দিনের পর দিন লেট করে অফিসে আসছেন। জানেন, সেটা কত বড় অপরাধ?"

"হুজুর, আমায় শাস্তি দিন। তা নইলে আমার পাপের বোঝার লাঘব হবে না হুজুর।"

"শাস্তি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু কি শাস্তি আপনাকে দেব, হঠাৎ যেন অসহায়ের মত বলে ফেললেন খাসনবিশ, "আপনার তো সব ক্যাজুয়াল লীভ্ কাটা যাবে।"

বিগলিত হেসে ভটচাজ বলল, "তাহলে হুজুর শাস্তি দিয়েও হালে পানি পাচ্ছেন না।"

ধাঁ করে রক্ত মাথায় চড়ে গেল খাসনবিশের। কঠিন কণ্ঠে বললেন, "শুনুন। শাস্তি এখনও আমার হাতে কিছু আছে। কিন্তু তাতে ভাতে মারা হয়। তাই সেগুলো ব্যবহার করা হয় না। ইনক্রিমেন্ট্ বন্ধ করে দিলে কি আপনি খুশী হন?"

"হুজুর, আমার যা অপরাধ, তাতে চাকরী থেকে না তাড়ালে আমি খুশী হব না।"

"বটে! তাহলে জেনে রাখুন, আমি কা'কেও ডিসচার্জ করি না। যার যাবার ইচ্ছে সে নিজে থেকেই যায়। এ বাজারে কারোর চাকরী যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।"

পরের দিন রাস্তায় ট্রাফিক সিগনাল-গুলো পর পর না পাওয়ায় দশটা বাজতে দশ মিনিটে ডিরেক্টারের গাড়ী ল্যাবরে-টরীর গেটে ঢুকল। খাশনবিশ বিরক্ত হচ্ছিলেন ঠিক সময়ে না আসতে পারার জন্যে। এমন সময়ে দেখলেন, রাখাল ভটচাজ দারোয়ানের পাশে বসে গল্প করছে। হৃষ্টচিত্তে খাসনবিশ ভাবলেন, এখনও ধমকে কাজ হয়। দিন কয়েক ধরে লক্ষ্য করলেন হাজিরা খাতায় রাখালের দশটায় সই।

সেদিন বেলা এগারটা নাগাদ টেল্টিং থেকে নোট এলো—ঘরের হিউমিডিটি যেখানে দু পারসেন্ট কম-বেশী হয় সেখানে তিরিশ পারসেন্ট্ হচ্ছে। ডিরেক্টারের যে স্পেশাল রিসার্চ স্যাম্পেল-গুলো এক পারসেন্ট হিউমিডিটি কম-বেশীর মধ্যে রাখবার কথা, সেগুলো এখানে থাকবে কিনা জানানো হোক।

খাসনবিশ লাফিয়ে উঠলেন। টেল্টিংটা বড্ড জ্বালায়। দৌড়ে এলেন ব্যাপারটা দেখবার জন্যে। খোঁজ পড়ল রাখালের। ওকে পাওয়া গেল না। খাস-নবিশ প্রথমেই হাজিরা খাতা দেখলেন। না, ঠিক দশটায় সই রয়েছে ওর। গেল কোথায় লোকটা! খাসনবিশ লনে নেমে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দারোয়ানকে দেখতে পেয়ে ওকে জিগেস করলেন। দারোয়ান ও'কে যেদিকটা দেখিয়ে দিল, সেদিকটা স্টাফ্-কোয়ার্টার। ওখানে কি করছে লোকটা! শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে নাকি? দ্বিধাদ্বিত চিত্তে খাসনবিশ এগোলেন।

একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা কলতলা। সেখানে এক-মাত্রিক দীর্ঘদেহী রাখাল ভটচাজ এক বিঘৎ একটা গামছা পরে বালতি করে মাথায় জল ঢালছে, আর বিড় বিড় করে অশুদ্ধ সংস্কৃতয় কি যেন একটা শ্লোক আবৃত্তি করছে। ডিরেক্টারকে দেখেই সেই অবস্থায় রাখালের বিরাট একটা সামরিক অভি-বাদন। খাসনবিশ আঁৎকে উঠে সরে
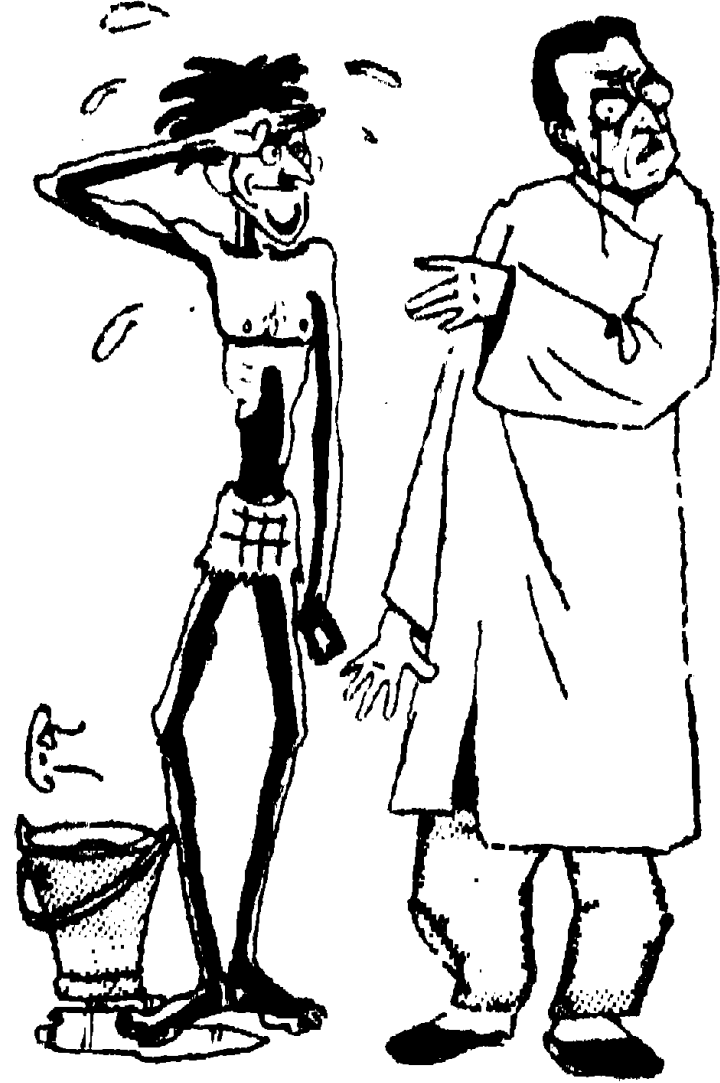
গামছার টেনশানটা ঠিক জানা না থাকায়।

এলেন, কোমরের ওপর গামছার টেনশানটা ঠিক জানা না থাকায়।

আধ-ঘণ্টাটাক পর ডাকতে পাঠিয়ে শুনলেন, রাখাল ভাত খাচ্ছে। ইস, এদিকে স্যাম্পলগুলোর যে কি অবস্থা হচ্ছে! ঘণ্টাখানেক পর আবার ডাকতে পাঠালেন। এবারে শুনলেন, ও পান খেতে গেছে। পান চিবোতে চি'বাতে ও যখন ফিরল, তখন 'একটা'। টিফিন পিরিয়াড। এ্যাসিস্টান্টদের কাউকে পাওয়া গেল না। টিফিন শেষ হল দেড়টায়। তারপর কাজ শুরু হল। অবশ্য দশ মিনিটের মধ্যেই এয়ার কণ্ডিশনিং মেশিন চালু হয়ে গেল।

পরের দিন আবার মেশিনের এক অবস্থা। উদ্বিগ্নচিত্তে ডিরেক্টারের প্রতীক্ষা, কখন রাখালের চান করা থেকে পান খাওয়া অবধি শেষ হবে। নাঃ, এরকমভাবে আর গবেষণা চলে না।

সেদিন একটু বিরক্তি প্রকাশ করে জানতে চাইলেন ডিরেক্টার, মেসিনে কেন এরকম গণ্ডগোল হচ্ছে।

"হুজুর, বুড়ো রুগীকে কি আর ওষুধ দিয়ে বাঁচানো যায়। দুচারদিন একটু সুস্থ রাখা যায়।"

"বুড়ো রুগী মানে?"

"আজ্ঞে, মেসিনটার কথা বলছি হুজুর। নতুন দামে কিনলে কি হবে, ওটা যে সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ মাল, সে তো হুজুর আমার চেয়ে ভালো জানেন।"

"বটে!" খাসনবিশ ঠোঁট কামড়ালেন।

দিনকয়েক পর বেলা দুটো নাগাদ আবার মেসিনে গণ্ডগোল। সেদিন কিন্তু সারা ল্যাবরেটরী খুঁজেও রাখালকে পাওয়া গেল না। অথচ এ্যাটেডেন্স্-রেজিস্টারে সই আছে। সাড়ে চারটে অবধি ডিরেক্টার খবর রাখলেন, ও ফিরেছে কিনা। তখনও রাখাল ভটচাজ ফেরেনি।

পরদিন সকাল দশটায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই গবেষণাগারে ডিরেক্টারের প্রধান কাজ হল, রাখাল ভটচাজকে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করা।

"আপনি এখানকার ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছেন।"

"আমি হুজুরের কথামত চলি। তাতে ঐ ডিসিপ্লিন না কি যেন বলছেন—যদি ভেঙে যায়, তাহলে আমি কি করব হুজুর!"

"আমার কথামত চলেন কি রকম?"

"আজ্ঞে আপনি বলেছেন ঠিক দশটায় আসতে আর পাঁচটায় যেতে।"

"কিন্তু কাল কি আপনি পাঁচটায় গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

খাসনবিশ তো অবাক। লোকটার সাহস তো কম নয়। জলজ্যান্ত মিথ্যেকথা বলছে।

"কাল দুটো থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আপনাকে ল্যাবরেটরীতে খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"আমি যে তখন পান খেতে গিয়েছিলাম হুজুর। খেয়ে উঠে পান না

খেলে আমার আত্মার পোষায় না। তাই হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম কালীঘাট।"

"কালীঘাট! সে তো এখান থেকে পাঁচ মাইল!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর," একগাল হেসে রাখাল বলল, "ওখানকার জর্দা" দেওয়া পান না খেলে হুজুর কাজ করতে গা লাগে না। তাইতো ফিরতে এত দেরী হল হুজুর। জানি তো আপনার মেসিন বিগড়োবে। তাই এসে মেসিন চালু করে ঠিক পাঁচটায় বেরিয়েছি। আবার আজ সকাল দুটায় এসে হাজির হয়েছি। ঐ যে ডিসিপ্লিন না কি যেন—ওসব ভাংগা আমাদের কাছে পাবেন না হুজুর।"

"আচ্ছা আপনি এখন যান।"

ডিরেক্টারের ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী এসে গ্রেপ্তার করল।

"কি হল। ভয় দেখালে চাকরী যাবার ?"

"কই না, তেমন কিছু বললে না তো।"

"কোন রকম শাস্তি দেবার ভয় ?"

"আজ্ঞে কিছুই না।"

"কিন্তু আপনিই বা এরকম করছেন কেন," হতাশ হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "চাকরী বজায় রাখতে গেলে তো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।"

"কি হবে নিময়-কানুন মেনে কাজ করে। এখানে আমি করব কাজ। ইনাম আর ইজ্জত পাবে আমার হেড, যে কাজের কিছুই বোঝে না।"

রাখাল ভটচাজের গলায় এমন একটা তিক্ততার সুর ছিল, যাতে ওর এতদিনের পরিচয়টা ঢাকা পড়ে গেল।

এরপর থেকে রাখাল প্রায়ই কামাই করতে শুরু করল। একদিন আসে তো তিনদিন আসে না। এই সময়ে এক কমিটি মীটিং-এ পুরোনো কণ্ডিশনিং প্ল্যান্ট্টা বাতিল করে দিয়ে নতুন একটা প্ল্যান্ট কেনার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। যে কোম্পানী মেসিন বিক্রি করবে, তারাই রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাবে, এটাও স্থির হল। পুরোনো প্ল্যান্টে যে লোকগুলি কাজ করত তারা উদ্বৃত্ত হয়ে গেলেও তাদের যাতে চাকরী না যায়, তার জন্য ডিরেক্টার খুব লড়লেন কমিটিতে।

পরদিন সমস্ত উদ্বৃত্ত কর্মীদের কাছে নোটিশ গেল, তোমরা বিকল্প কাজ করতে প্রস্তুত আছ কিনা জানাও। সবাই সম্মতি জানিয়ে দিল। প্রথম বিকল্প চাকরী দেওয়া হল রাখাল ভটচাজকে—তুমি অনতিবিলম্বে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে বেয়ারার কাজে যোগ দাও। ওখানে একজন বেয়ারা ছুটিতে আছে।

ইউনিয়ান-সেক্রেটারী হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

"আপনি মামলা করুন। কিছুতেই ছাড়বেন না।"

"ওসব করবে কে? আমার আর কতটুকু ক্ষমতা।"

"ইউনিয়ান তো আপনার পেছনে আছে। আপনি ইউনিয়ানের মেম্বার তো ?"

"না।"

"এখনও মেম্বার অবধি হন নি।" হতাশ হয়ে বললেন ভদ্রলোক।

"আজ্ঞে, এখনও তো কিছুই হতে পারিনি। শুধু ইলেকট্রিসিয়ান হতে চেয়েছিলাম। তাও পারলাম না।"

সেদিন কাজ না করে ও বাড়ী চলে গেল। আর সেইদিনই প্রথম ওকে নিয়ে ল্যাবরেটরীতে গবেষণা শুরু হল—ওর চাকরী যাবে, না ও চাকরী ছাড়বে। চাকরী না থাকলে ওর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অসুবিধে হবে কিনা। ওর স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি আছে কিনা। ও ব্যাচিলার কিনা। যদি ব্যাচিলার হয় তবে কেন ও ব্যাচিলার। ওকি লস্ট্ লাভার? ওকে কি কোনদিন কোন মেয়ে ভালোবেসেছিল। যদি ভালোবেসে থাকে তবে কি দেখে ভালোবাসবে। অনেকদিন পর একটা ভালো বিষয়বস্তু পাওয়া গেল গবেষণার।

পরপর দিনকয়েক ও অফিসে এলো না। শোনা গেল, ওর নামে এবার চার্জ-শীট দেওয়া হবে। ব্যস্ত হয়ে ইউনিয়ান-সেক্রেটারী অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে ছুটল ওর বাড়ী। সেখানে ওকে পাওয়া গেল না। এক বন্ধু আর তার স্ত্রীর সংগে ও নাকি দুর্গাপুর গেছে। ওর বাড়ীর লোকজন কেউ আছে কিনা খোঁজ নিতে বাড়ীওলা বলল, "না মশাই, কেউ কোথাও নেই। একখানা ঘর নিয়ে একলা থাকত।

এইরকম অবস্থায় কেউ বেড়াতে যায়। কি করা যায় তাহলে? ভাবতে ভাবতে বাড়ীটার একতলায় ছোট্ট চায়ের দোকানে বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়লেন ভদ্রলোক।

"বাবু, চা দেব একটা?"

"দাও।"

ছোট্ট কাঁচের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে দোকানী বলল, "বাবু কি রাখালকে খুঁজতে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ। চেন নাকি ওকে?"

"খুব চিনি। আপনি কি ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী?"

"হ্যাঁ, কেন বল তো।"

"আপনার কথা ও বলেছে। লোকটার মাথা খারাপ বাবু। তা নইলে চাকরীর এ'রকম অবস্থায় একটা মেয়ের জন্যে কেউ অফিস কামাই করে।

"মেয়ের জন্যে?"

"তাছাড়া আর কি বলব বলুন। ঐসব আপনাদের প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার। আমাকে বলত সব। তবে বলি শুনুন। যদি আপনি কিছু সুরাহা করতে পারেন।

ইউনিয়ান সেক্রেটারী পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার নিয়ে তো ইউনিয়ানে বিশেষ চর্চা নেই। তবে যদি এক এস আর দাসকে বললে কিছু করতে

পারে। ও নাকি ঐসব নিয়ে খুব কালচার-টালচার করে।

মেয়েটি থাকত রাখালের পাশের ঘরটায়। পরিবারটি খুব দুঃস্থ। ওদেরই স্বজাতি। মেয়েটির বয়স হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে হয়নি। মেয়েটা খুব বই পড়তে ভালোবাসত। এর ওর কাছ থেকে বই খবরের কাগজ চেয়ে-চিন্তে আনত। এই মেয়েটিকে রাখালের ইচ্ছে হল, বিয়ে করে। কিন্তু ওর সহজ নিঃসংকোচ ব্যবহারের জন্য রাখাল কিছু বলবার সুযোগ পায়নি। চায়ের দোকানী

হরেরামের কাছে গুজগুজ করত

হরেরামের কাছে গুজগুজ করত। দু'একবার হরেরাম বলেছিল, কথাটা পাড়বে কিনা ওদের কাছে। রাখাল আঁৎকে উঠে নিষেধ করেছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা পাড়ার একটি ছোকরা মাষ্টারের সাহায্যে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল। পাশও করল। তারপর ট্রেনিং পাশ করে দুর্গাপুরে এক প্রাইমারী স্কুলে চাকরী পেয়েছে। সেই মাষ্টারটিও সেখানে একটা চাকরী যোগাড় করেছে। তারপর দুজনে বিয়েটা সেরে সেখানে চলে গেছে। একদিন রাখাল ওদের বিয়ের জন্য খাটা-খাটুনি করেছে অফিস কামাই করে। এবারে ওদের সঙ্গে দুর্গাপুরে গেছে, ওদের ঘর-দোর গুছিয়ে দেবার জন্য। অথচ লোকটা শুধু শুধু চাকরীটা খোয়াতে বসেছে মেয়েটার জন্যে। মেয়েটা সকালে পড়তে যেত মাষ্টারের বাড়ী। পাড়ার ছেলেরা বিরক্ত করত। রাখাল সকালে চলল পৌঁছে দিতে, আবার বেলায় নিয়ে আসতে। অফিস লেট হচ্ছে হোক। পরীক্ষার আগে রাখালই দুপুরে নিজের ঘরে ওদের পড়বার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। ছেলেটাও তখন কি একটা পরীক্ষা দিচ্ছিল বলে ছুটি নিয়েছিল। তা বেশ, এবারে অফিসে যা মন দিয়ে কাজ কর। তা না দুপুর বেলা অফিস থেকে চলে এসে দোকানে বসে থাকত। নিজের ঘরে ঢুকতে পারত না। তবুও দোকানে এসে বসে থাকা চাই।

"কতবার বলেছিলাম, রাখাল তোমারই তো স্বজাতি। বলো কথাটা পাড়ি।" হাত চেপে ধরে রাখাল বলেছে, "না ভাই। ওসব জাত নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না। আসলে আমি মিস্ত্রী আর ও একটু লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকই পছন্দ করবে।"

রেগে গিয়ে আমি বলেছি, "তুমি কি ছোটলোক? আমরা সবাই ছোটলোক?" কাঁচুমাচু হয়ে থেকেছে রাখাল; কোন উত্তর দিতে পারেনি।

দিনকয়েক পর টেস্টিং ল্যাবরেটরীর বন্ধ হয়ে যাওয়া কন্ডিশনিং মেসিনটা হঠাৎ চলতে শুরু করল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাখাল সেদিন কাজে যোগ-দান করেছে। আরও শোনা গেল সেদিনই নাকি ওকে চার্জ-শীট দেওয়া হবে, বিনা নোটিশে কামাই, ইত্যাদি আরও নানা অপরাধে।

ইউনিয়ান-সেক্রেটারী খবর পেয়েই ওকে খুঁজে বার করল। রাখাল তখন নিষ্কর্মার মত বসে বসে বিড়ি টানছিল। ও সাধারণতঃ বসে থাকে না। সেক্রেটারীকে দেখে বিড়িটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

"আসুন স্যার। সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে এলাম।"

"কি রকম?"

"রেজিগনেশান লেটার দিয়ে দিয়েছি।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। ঝামেলা আর রাখলাম না।"

"কিন্তু এককথায় চাকরী ছাড়লেন কেন? মামলা করা যেত। সমস্ত স্টাফ ছিল আপনার পেছনে। আপনার তো গ্রাউন্ড ভালো ছিল। কেউ কিছু করতে পারত না।"

"কি আর দরকার। কাজ একটা ঠিক জুটেই যাবে। যাই বলুন স্যার, ডিরেক্টার কথা রেখেছে। বলেছিল বটে, আমি চাকরী থেকে কা'কেও ছাড়াই না। কেউ ইচ্ছে করলে ছেড়ে যেতে পারে।"

"অন্য কোথাও কাজকর্মের চেষ্টা করছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। ভাবছি দুর্গাপুরে যাব।"

"সেখানে কেন?"

"ওখানে কাজকর্ম পাওয়ার সুবিধে আছে। তাছাড়া জায়গাটা স্যার বেশ ভালো লাগল।

জানাতে পারেন

সম্পাদক, 'অমৃত',

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় অহিভূষণ মিত্র দুটি প্রশ্ন করেছেন 'জানাতে পারেন' বিভাগে।

প্রথম প্রশ্নটি বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রংয়ের ব্যবহার হয় কেন? কত দিন হইতে ইহার শুরু হইয়াছে?'

বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রংয়ের ব্যবহার হয় বহুবিধ কারণে। বিভিন্ন রঙের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই ধারণাটি স্পষ্ট হবে। যেমন সাদার মধ্যে আছে একটি শুচি শুভ্র ভাব, কিছুটা বা রিক্ততাও। সবুজের মধ্যে আছে স্নিগ্ধতা ও নবীনত্ব। নীলের মধ্যে আছে রোমান্টিক স্বপ্নিলতা, গৈরিকের মধ্যে বৈরাগ্য। কিন্তু লালের মধ্যে আছে ভয়ংকরের সূচনা।

দ্বিতীয়ত, সমাজের বিধান যখন সুশৃঙ্খলিত হয়নি, স্বেচ্ছাচার যখন কলংকিত করেছে সমাজের প্রতিটি নারীকে—তখনও স্বীয়াকে চিহ্নিত করবার জন্য পুরুষ ব্যবহার করেছে এই লাল রঙই। তারই বর্তমান বিবর্তিত রূপ সিঁদুর। বহু অলিখিত নির্দেশ ও অনুশাসনের ইঙ্গিতবহ এই সিঁদুর। সিঁদুরের রঙও লাল। বিবাহিতা নারীর সিন্দুর বিন্দুর অর্থ আশা করি কারুর কাছেই অস্পষ্ট নয়।

এ ছাড়া অন্যান্য রঙের চেয়ে লাল রঙ স্পষ্টতর। বহু দূর থেকেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটি বর্ণান্ধ ছেলেকে জানি যে কোনও রঙই প্রায় বুঝতে পারে না। কিন্তু লাল রঙ পারে। এমন কি রাত্রেও ক্যারামের রেডটি' চিনে নিতে তার অসুবিধা হয় না।

শেষতঃ রক্তের রঙ লাল। আর রক্তের সঙ্গে লাল রঙের কোথায় যেন সাযুজ্য আছে। তাই রক্তের রঙের মত লাল রঙও আমাদের মনে কিছুটা বিভীষিকা, কিছুটা ত্রাসের সঞ্চার করে।

এই সমস্ত কারণেই বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে লাল রঙ অদ্বিতীয় এবং এর ব্যবহার শুরু হয় বহু দিন থেকেই।

ছেলেবেলায় পাঠশালায় শেখানো হইত : ১এ চন্দ্র, ২এ পক্ষ ইত্যাদি। ইহার 'তিন নেত্র' ও 'পঞ্চ বাণ' কি কি?

—মহাদেবের ত্রিনয়নকে তিন নেত্র' বলে। এবং পঞ্চবাণ—মদনদেবের পাঁচটি ফুলশরই, পুষ্পধনুধারী প্রণয়ের দেবতা স্বয়ং মদনকেই পঞ্চশররূপে অভিহিত করা হয়। পঞ্চশর দগ্ধ করে করেছ
এ কী সন্ন্যাসী......
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

—(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীকুমকুম দে, কোলকাতা—৯।

সম্পাদক অমৃত,

বিগত ৫ই অকটোবর তারিখের জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীশুভময় রায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

রাজার ভার্যা বা স্ত্রী হইলেই যদি রাণী হয়, তবে এই আক্ষরিক অর্থে রাজা দশরথের অনেক রাণী ছিলেন বলিয়া রামায়ণে দেখা যায়। তবে তাঁহার মহিষী ছিলেন মাত্র ৩ জন। এই তিন মহিষী ছাড়া রাণীর সংখ্যা ছিল সার্ধসপ্তশত বা ৭৫০ (অযোধ্যা কাণ্ড—বঙ্গবাসী সংস্করণ—৩৪ সর্গ)। প্রথমা মহিষী রাম-মাতা কৌশল্যা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া সম্পর্কেই রামায়ণে সামান্য একটু গোলমাল দেখা যায়। অযোধ্যা কাণ্ডের ৯২ সর্গে ভরত ভরদ্বাজ ঋষিকে বলিতেছেন যে, সুমিত্রা রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী, আবার অরণ্য-কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায়, স্বয়ং রামই বলিতেছেন যে, কৈকেয়ী তাঁহার মধ্যমা জননী। এই সামান্য অসঙ্গতিটুকু ছাড়া রামায়ণের আর সর্বত্রই লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন-মাতা সুমিত্রা দেবীকে মহিষীর ক্রম বা পর্যায়ে দ্বিতীয়বার স্থান দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায় (যেমন অযোধ্যা কাণ্ড ৮৯ ও ৯২ সর্গ, লংকা কাণ্ড—১২৯ ও ১৩০ সর্গ ইত্যাদি)। অযোধ্যা কাণ্ড ১০ম সর্গে ভরত-মাতা কৈকেয়ীকে রাজা দশরথের তরুণী এবং প্রিয়তমা ভার্যা বলা হইয়াছে। সুতরাং কৈকেয়ী যে মহিষীগণের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর দুই মহিষীর মত সুমিত্রা রাজ-কন্যা ছিলেন না। রাজা দশরথেরই কোন এক ব্রাহ্মণ সচিবের কন্যা ছিলেন এবং দেখিতে কৃষ্ণাঙ্গী ছিলেন বলিয়া অন্যত্র দেখা যায়।

ঐ তারিখেই 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীকৃপাপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর :—

পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, গুরুতর কোন সামাজিক বা অন্য অপরাধে অপরাধীকে চূড়ান্তভাবে অপমান বা এলাকা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য পূর্বে তাহার মাথা সম্পূর্ণ বা আংশিক মুড়াইয়া রাস্তা বা নগর প্রদক্ষিণ করান হইত। শাস্তি হিসাবে মুখে চুনকালী লেপিয়া রাস্তা বা নগর প্রদক্ষিণ করাইবার আর একটি প্রক্রিয়াও এই সঙ্গে প্রচলিত ছিল দেখা যায়। হাতের কাছে গাধা পাওয়া গেলে দোষীকে মুণ্ডিত বা চুনকালী প্রলিপ্ত অবস্থায় গাধার পিঠে উল্টা দিকে মুখ করিয়াও চড়ান হইত। সামাজিক সাজা হিসাবে এই দুইটি পন্থাই এখন পর্যন্ত কিছুটা বজায় আছে দেখিতে পাই।

যতদূর মনে হয়, শাস্তির মাত্রা চূড়ান্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই দুইটি প্রক্রিয়াকে কালে একীভূত করা হয় এবং মস্তকমুণ্ডন ও চুন মাখান এক সঙ্গে চালান হয়। চুন গুলিয়া অপরাধীর নেড়া করা মাথায় ঢালিয়া দিলে শাস্তি ও অপমানের মাত্রা আরও চূড়ান্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অপরাধীর চক্ষু নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে বলিয়াই হয়ত গোলা চুনের বিকল্প হিসাবে একই রং বিশিষ্ট ঘোলের ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। ইহাতে শাদা রং বিশিষ্ট গোলা চুনের কাজও হইল, অথচ অপরাধীর চক্ষুও নষ্ট হইল না। ঘোল প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক কারণ হয়ত ইহাই।

—শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
কলিকাতা—৯।

(প্রশ্ন)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগের মাধ্যমে দু-একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই, সমাধান পাবার আশায়।

(ক) জাদুকরেরা যে সব খেলা দেখান, সেই সব অদ্ভুত এবং অপূর্ব 'জাদু বিদ্যায়' জাদু অর্থাৎ মন্ত্র বর্তমান না সেগুলি শুধু বিভিন্ন জটিল কৌশলেরই অভূতপূর্ব প্রয়োগ?

(খ) ছোটবেলায় যা মন্ত্রশক্তি বলে মনে করতাম বড় হয়ে দেখছি তা মন্ত্রশক্তি নয়, শুধু মাত্র 'ট্রিক্স', তবে কি মন্ত্রশক্তি বলে কিছু নেই, যা আজ মন্ত্রশক্তি বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল সেটাই হাতের কিংবা যন্ত্রের কৌশল বলে প্রমাণিত হবে।

(গ) শুনেছি, সাগর মহাসাগরের ভিতর দিয়ে টেলিগ্রাফ লাইন গিয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়েছে?

ইতি—
সমীরকুমার বিশ্বাস,
রাঁচী।

অথ প্যারিস-কথা

দিলীপ মালাকার

প্যারিস, অক্টোবর—গ্রীষ্মের ছুটী অনেক কাল পূর্বেই শেষ হয়েছে। গ্রীষ্মও বিদায় নিয়েছেন ছুটীর শেষে। প্যারিসিয়ানরা আবার জড়ো হয়েছে প্যারিসে। সবাই কাজে ব্যস্ত। ইস্কুলের ছাত্ররা নতুন বই সংগ্রহ করে সুবোধ বালকের মত গুরুমহাশয়ের পাঠ মনে করছে বিদ্যালয়ে। সরকারিভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয় খুলেছে ১৫ই অক্টোবর। কিন্তু এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের পাঠ নেওয়া শুরু করবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কিন্তু যারা বিগত জুন মাসের পরীক্ষায় ফেল করেছে তারা পুনরায় পরীক্ষা দিচ্ছে অক্টোবর মাস ধরে। এদের পরীক্ষা শুধু লিখে নয়। লিখে পাশ করলে আবার মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হয়। সে এক হাঙ্গামা। ছাত্ররা বলে পরীক্ষায় হাঙ্গামা না থাকলেই ভাল। মৌখিক পরীক্ষা নয় যেন আদালতে বিচার।

কর্মব্যস্ত প্যারিসিয়ানরা। প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেছে। তার সাথে সাহিত্য পুরস্কারের বায়না। শিল্প-সংস্কৃতি ছেড়ে দিলে আসে রাজনীতি। অক্টোবরের শেষে হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের গণ-ভোট। তারপর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণ নির্বাচন। একটির পর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা লেগেই আছে। কারুর বিরাম নেই। প্যারিস নগরী এখন কর্মচঞ্চল। তার নেই ফুরসৎ।

সরকারি-বেসরকারি কাজে যে যেমন কর্মব্যস্ত। ঠিক তেমনি প্রকৃতি দেবী। তিনিও নিয়ম-মাফিক কাজ করে চলেছেন। তাঁর তুলির আঁচড়ে প্যারিসের বুলভা-এভিনুর ধারে বীথিকায় পাতায় পাতায় সবুজের ওপর সোনালি রঙের ছোপ। কোথাও দেখি সোনালি বা লাল রঙের পাতাগুলো পথের ধারে স্তূপীকৃত। গাছের ঝরা পাতা জানান দিচ্ছে এটা হেমন্ত কাল। ঠান্ডা পড়া শুরু হয়েছে। শীত আসতে এখনও দেরী। সবে ঠান্ডা। মানে ওভার-কোট চাপাতে হচ্ছে। অবশ্য হাল্কা। গলায় পশমী চাদর আর হাতে দস্তানা আঁটতে হচ্ছে না এখনও। অল্প অল্প ঝির-ঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে না যদিও। তবে বেশ ঠান্ডা। এই হল প্যারিসের হেমন্ত কালের রূপ।

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে না ছিল চাঞ্চল্য, না ছিল জীবন। হেমন্তের ছোঁয়ায় প্যারিস নগরী আবার জেগে উঠেছে। চারধারে তাই কোলাহল। প্রদর্শনী বা মেলার সেরা হল মোটর গাড়ীর বাৎসরিক মেলা। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন মোটরগাড়ি আর বিলাসিতার দ্রব্য নয়। আমাদের দেশে মোটরগাড়ি যাঁর আছে তিনি একজন কেষ্ট-বিষ্টু। মোটরগাড়ি কেনা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু এখানে আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, গ্রামের কৃষকও বাজারে যায় তার নিজস্ব মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে। এ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস হবার উপায় নেই। এ হেন যান্ত্রিক বাহন সম্পর্কে ঔৎসুক্য যেমন আছে তেমনি কৌতূহল। আমাদের দেশে মোটর না থাকার জন্যে অনেকে ক্ষেদ করে। মোটরের অভাবে ট্রামে-বাসে চড়ে। কিন্তু প্যারিসে রাস্তায় শুধু গাড়ি। গাড়ির ভিড়ে মোটর চালান সাধ্য-সাধনার ব্যাপার। তাই মোটরগাড়ির মালিকরা আজকাল মোটর-গাড়ির বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবার জন্যে ট্রামে-বাসে চড়ছে। আমাদের দেশে গাড়ি না থাকাটা গ্লানির কিন্তু এদের গাড়ি এত আছে যে তারা তার হাত থেকে নিস্তার পেতে চায়। মোটরগাড়ি এদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী তাই প্রতি বছরে বসে এই অক্টোবর মাসে মোটরগাড়ির প্রদর্শনী। এবার মোটরগাড়ীর মেলা বসেছিল প্যারিসের চিরস্থায়ী প্রদর্শন ক্ষেত্র পোর্ত দ্য ভার্সাই-এর আঙ্গিনায়। মেলার ক্ষেত্র ছিল দেড় মাইলের মতন। দশ দিনে প্রায় সাত লক্ষ দর্শক ভিড় করেছিল। শুধুই কি মোটরগাড়ি। সাইকেল থেকে আরম্ভ করে স্কুটার, লরী-ট্রাক তো ছিলই। তার ওপর যে কটি দেশ মোটরগাড়ি নির্মাণ করে তাদের অতি-আধুনিক মোটরগাড়ির প্রদর্শনী চলে দশ দিন ধরে। মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত হয় যত রকমের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সবই দেখান হয়েছে ঐ মেলায়। প্যারিসে মোটরগাড়ির মেলা সত্যি দেখবার মতন।

সব দেশেই আজকাল মোটরগাড়ির ব্যবসায় মন্দা চলছে। ১৯৬০ সালে বিশ্বে মোটরগাড়ি নির্মিত হয়েছে এক কোটি ষাট লক্ষ আর ১৯৬১ সালে নির্মাণের সংখ্যা হয় এক কোটি ঊনপঞ্চাশ লাখ। বিশ্বে যে-সব দেশ মোটরগাড়ি নির্মাণ করে তাদের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১ সালে ছেষট্টি লাখ আর সমগ্র ইউরোপ নির্মাণ করে আটান্ন লাখ। ১৯৬১ সালে পশ্চিম জার্মানী নির্মাণ করে একুশ লাখ মোটরগাড়ি বৃটেন চোদ্দ লাখ, ফ্রান্স বার লাখ, জাপান আট লাখ এবং ইতালি সাত লাখ। ১৯৬১ সালের শেষে জগতে মোট গাড়ির সংখ্যা ছিল তের কোটি বাহাত্তর লক্ষ বিশ হাজার। তার মধ্যে একমাত্র মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের ছিল সাত কোটি আটান্ন লাখ। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মোটরগাড়ির সংখ্যার অর্ধেক। পশ্চিম ইউরোপে মাত্র তিন কোটি বিশ লাখ। ফ্রান্সে মোটরগাড়ির মোট সংখ্যা বর্তমানে সত্তর লাখ।

বসন্তের আমেজ আর পরিষ্কার সকালে সূর্যি মামার ঝলকানি দেখলেই প্যারিসের আর্টিস্টরা ছোটেন গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতি দেবীর শোভা দর্শনে। যখন ঠান্ডা পড়া শুরু হয় তখন তারা প্যারিসে এসে জড়ো হন। তারা এলেই শুরু হয়
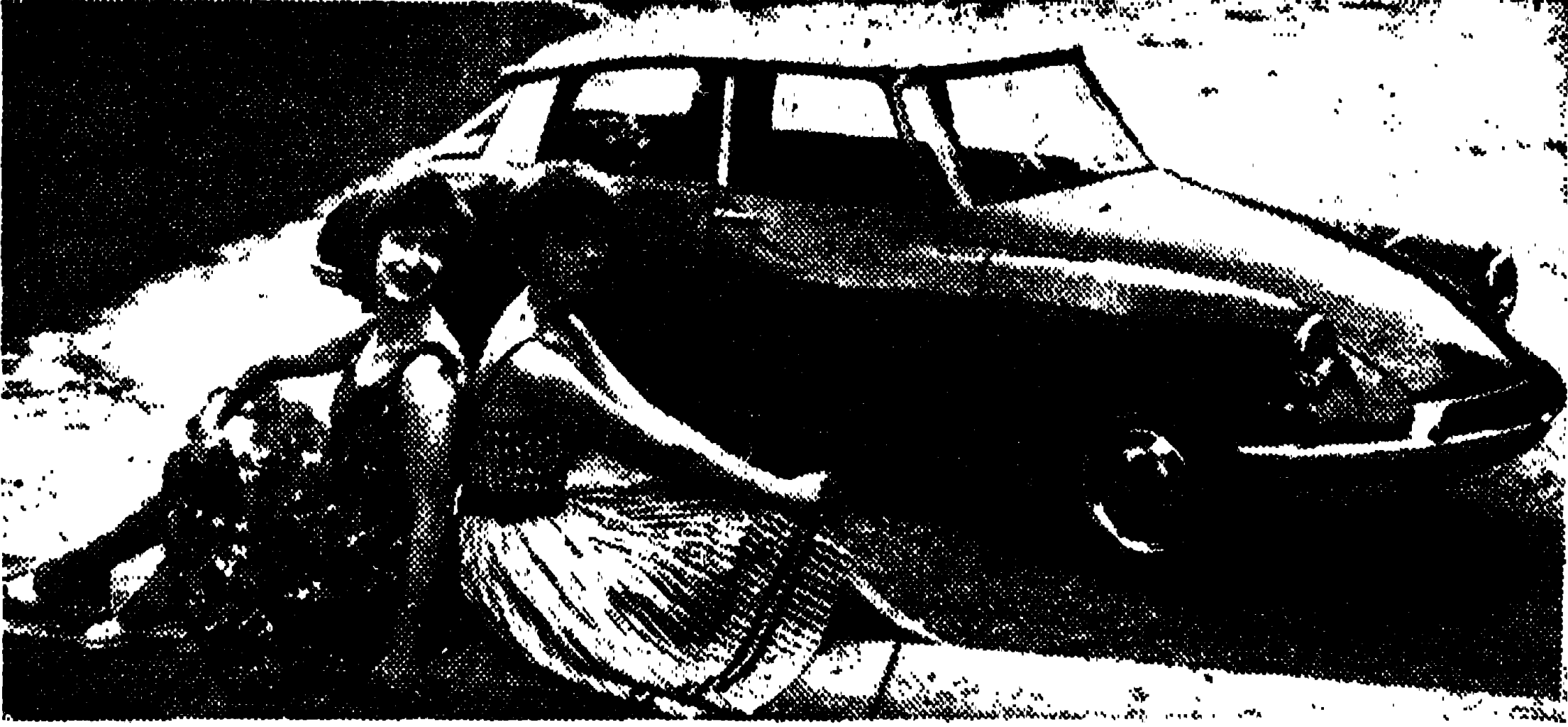
তিন মুখো গাড়ী দেখতে খারাপ হলেও এতে চড়ে আরাম

প্যারিসে আর্টিস্ট পাড়ায় আর্ট গ্যালারিতে সোরগোল। অক্টোবরে চাই শুরু চিত্র-প্রদর্শনীর। হেমন্ত কালে প্যারিসে সেরা চিত্র-প্রদর্শনী হল বিশালাকায় 'গ্রাঁ পালে'র একটি অংশে 'সালোঁ দোতন' (হেমন্তের প্রদর্শনী)। এ-বছরে পালিত হচ্ছে ষাট বছরের সালোঁ দোতন। সালোঁ দোতনের বৈশিষ্ট্য হল এর বিরাট আকার ও অসংখ্য চিত্রপট। সাধারণতঃ প্যারিসের অন্যান্য চিত্র-প্রদর্শনীতে কয়েকটি বাছাইকরা চিত্র দেখান হয়। বেশী নয়। কিন্তু সালোঁ দোতনে তার ব্যতিক্রম। তার কারণ হল এই যে, সালোঁ দোতনে অনেক অজ্ঞাতনামা এমন কি ছাত্রদের আঁকা ছবিও প্রদর্শিত হয়। আজ যাঁরা চিত্রকর হিসেবে বিখ্যাত তাদের অনেকের আঁকা ছবি এককালে এই সালোঁ দোতনে প্রদর্শিত হয়েছে। সেকালে হয়ত তারা ছিলেন না বিখ্যাত। তবে সালোঁ দোতনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অজ্ঞাত-নামা চিত্রকরের আঁকা ছবির পাশে অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবিও দেখান হয়ে থাকে। সালোঁ দোতনের প্রদর্শনী এক ঘন্টায় দেখে শেষ করার মতন নয়। কয়েক ঘন্টা লাগে। এটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। দেশ-বিদেশের চিত্রকরদের আঁকা চিত্রপটে সমৃদ্ধ। তেমনি এতে দেওয়া হয় অসংখ্য পুরস্কার।

অক্টোবর মাসে আরেকটি বিখ্যাত চিত্র-প্রদর্শনী চলেছে বিখ্যাত আর্ট গ্যালারি শারবানতিয়ের এক দোকানে। গ্যালারি শারবানতিয়েরে চলেছে 'একোল দ্য পারী'র চিত্র-প্রদর্শনী। এখানে দেখান হয় একমাত্র পাত্র চিত্রপট। এটির নাম 'একোল দ্য পারী' কিন্তু শুধু প্যারিস বা ফরাসী শিল্পীদের একচেটিয়া নয়। দেশ-বিদেশের অগণিত শিল্পীর আঁকা চিত্রপট স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এমন কি বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকর রাজার একটি চিত্রপট। শিল্পী রাজা বম্বের লোক। তিনি প্রায় বছর পনের ধরে প্যারিসের অধিবাসী। ইনি সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী।

কলকাতার তরুণ শিল্পী শ্রীসুনীল দাসের প্রদর্শনী চলেছে দুই সপ্তাহ ধরে মোপারনাসে 'ফোইয়ের দেজ আর্তিস্ত' গ্যালারিতে। সুনীল দাস তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি বদলেছেন। ইনি এখন এ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকছেন। সুনীল দাস ভবিষ্যতের আশা রাখেন।

মনে করবেন না যে এই কটি বুঝি চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে প্যারিসে। প্যারিসে আর্ট গ্যালারির সংখ্যা কয়েক শত। তাছাড়া আর্ট মিউজিয়মের সংখ্যা হল আশিটি। এসব মিলে প্রদর্শনীর সংখ্যা কত হতে পারে তা অনায়াসে অনুমেয়। উপরে যেকটির কথা বললাম সে কটি শুধু বিখ্যাত নয়, তারা বিশ্ববিখ্যাত। তাদের জগৎজোড়া নাম।

বইয়ের দোকানে শোকেস সাজান হচ্ছে নতুন নতুন বই দিয়ে। সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে দেখা যাচ্ছে নতুন বই-এর বিজ্ঞাপন। সাহিত্য-পুস্তকের প্রকাশক ও বিক্রেতারা এখন ব্যস্ত। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ফরাসী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোঁকুর', 'রোনাদো' ও 'ফেমিনা ' পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে এখন। বিচারকেরা যেমন উপন্যাস পাঠ করে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন তখনি সংবাদপত্রের সমালোচকরা দিচ্ছেন তাঁদের রায়। উপরন্তু প্রতিটি প্রকাশক বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার করছে তাঁদের কোন উপন্যাস কি পুরস্কার পাবার যোগ্য ইত্যাদি। নভেম্বর মাসে ফ্রান্সে সাহিত্যের পুরস্কার নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে পড়ে যায় সোরগোল। সে দেখবার মতন।

কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকায় ইতিমধ্যে সমালোচকেরা তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। তাদের মতে এ-বছরের 'গোঁকুর, পুরস্কার লাভ করবে মঁ অঁরি-ফ্রাসোঁয়া রে-এর উপন্যাস 'লে পিয়ানো মেকানিক', মঃ জেরার বুতেও-র উপন্যাস 'ল্য প্লাঁ অ'সম্বল', মঃ জ' মল্তোরিয়ের উপন্যাস 'কম্ আ এ্যাডার্স ল্য যেছ', এই তিনটি উপন্যাসের একটি। নইলে অন্য দুটো পুরস্কার তো পাবেই।

ইতিমধ্যে কিছু সাহিত্য পুরস্কারের ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে ফরাসী সাহিত্য আকা-ডেমির বাৎসরিক উদ্বোধন। সেখানেও চলবে নতুন আকাডেমিসিয়ানদের আনা-গোনা নিয়ে উৎসব। প্যারিস নগরী এখন সংস্কৃতির কলরবে মুখর।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। বত্রিশ ।।

ডাক্তার সৌমেন ঘটক ঘরে ঢুকে শব্দ করে ব্যাগটা রাখলেন টেবিলের ওপর। ডাকলেন, রাণীদি!

রাণী কতকগুলো ওষুধ কোম্পানীর ক্যাশ মেমো নিয়ে হিসেব তৈরি করছিল। চোখ না তুলেই জানতে চাইল, কী হল?

—তুমি মাসে মাসে যে সম্মান-দক্ষিণা আমাকে দিয়ে থাকো, তা থেকে গোটা পঞ্চাশেক আজ আগাম দিতে হবে।

রাণী কলমটা নামিয়ে রেখে আশ্চর্য হয়ে তাকালো ডাক্তারের দিকে।

—এটা তো নতুন ঠেকছে। এর আগে তো আপনাকে কোনোদিন টাকা চাইতে শুনিনি।

ডাক্তার মাথা নাড়লেন : ঠিক কথা। তুমি শ্রদ্ধা করে প্রণামী দিতে, আমি কৃপা করে গ্রহণ করতুম। কিন্তু দিদি, আজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মানে, আজ আমিই কৃপার পাত্র।

—কেন?

—রবীন্দ্রনাথের লাইন একটু ঘুরিয়ে বলি। 'দিবসে যে ধন পেয়েছিনু, তারে হারানু নিশীথ রাতে।'

—মানে?—রাণী আরো আশ্চর্য হয়ে বলল : কিছু তো বুঝতে পারলুম না।

ডাক্তার বললেন, শুনেছি আবেগ এলে কবিতা বেরিয়ে আসে। আপাতত আমি দস্তুরমতো ইমোশন্যাল।

—ইমোশনের হেতু?

—ওই কবিতার লাইনটার মধ্যেই আছে। ধাঁধার মতো ঠেকছে তো? ভেবে-চিন্তে তুমি উত্তরটা বের করো আর তার মধ্যে আমি একবার তোমার হাসপাতাল চক্কর দিয়ে আসি। আর ধাঁধার জবাব যদি খুঁজে পাও, তা হলে টাকাটা যে কেন চাই তা-ও বুঝতে পারবে।

হেসে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন, এগোলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। মিনিটখানেক অন্যমনস্ক ভাবে বসে থেকে রাণী আবার হিসেবের ভেতরে তলিয়ে গেল।

দোতলার অন্য পেশেন্টদের খোঁজ-খবর নিতে ডাক্তারের মিনিট চল্লিশেক কাটল। তারপর এসে দাঁড়ালেন দীপ্তির ঘরের সামনে।

বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় দীপ্তি একটা সিনেমা-পত্রিকার পাতা উলটে চলেছিল। এ আর এক জীবন। সামনের পাতা-জোড়া ছবিতে যে বিখ্যাত ফিল্ম-স্টারটি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে, দীপ্তি জানে সে মেয়েটি তার চাইতে সুন্দরী নয়। অথচ কত নাম—কত টাকা! দীপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছিল।

চৌরঙ্গীর সেই হোটেলে কিছুদিন এক মুগ্ধ ভক্ত জুটেছিল তার। বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে, অল্প একটু নেশা হলেই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলত। আর রুমাল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে মুছতে বলত, তুম্ ফিল্‌ম্ লাইনমে চলো, বৈজয়ন্থীমালা, সরোজা, সাধনা—সব ঘায়েল হো জায়েগা।

দীপ্তি বলেছিল, বেশ তো, আমাকে ঢুকিয়ে দাও না ফিল্‌মে।

অল্প বয়েসী ছেলেটি তার দেবীকে নিয়ে তিন-চারদিন ঘোরাঘুরি করেছিল নানা প্রডিউসার-ডিরেক্টারের দরজায়। সবাই ফেরৎ দিয়েছিল। জবাব দিয়েছিল, দীপ্তির চেহারা ভালো হলেও ক্যামেরায় ঠিক আসবে না, ফিল্ম-ফেস্ নেই, অসহ্য বাঙালে উচ্চারণ, তার ওপর দীপ্তির অভিনয়ে কোনো ন্যাক্ নেই। চলবে না।

রাতের পর রাত যাকে অভিনয় করে যেতে হয়, সে অভিনয় করতে পারে না! আশ্চর্য!

ছেলেটি চটে বলেছিল, ই লোগ্ কেয়া সমজেগা? চলো রায় কো পাস্!

কিন্তু রায়কে পাওয়া গেল না, তিনি তখন ইয়োরোপে। ছেলেটি বললে, বহুৎ আচ্ছা, ম্যায় তুম্‌কো বম্বই লে জাউঙ্গা।

বোম্বাই আর যাওয়া হল না। ছেলে-টির বাপ বড়োবাজারের একটি এঁদো ঘরে বসে চারটি টেলিফোন পাশে নিয়ে সারা ভারতবর্ষের শেয়ার বাজারের হিসেব নিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু ছেলের দিকেও তাঁর নজর ছিল। বয়েস কম, কিছুদিন টাকা ওড়াচ্ছে ওড়াক, কিন্তু রাশ টানতে হয় এক সময়, বলতে হয়, বাস্ করো। কাজেই বোম্বাই যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হতেই ছেলেকে তিনি হায়দ্রাবাদে চালান করে দিলেন। দীপ্তি আর ফিল্ম-স্টার হতে পারল না।

সত্যিই কি সে পারত না? একটু-খানি হাসি, দু ফোঁটা চোখের জল,

সাজিয়ে দুটো কথা বলা। এ তো তার প্রতিদিনের কাজ, ফাঁকা হাসি, মিথ্যে কান্না আর সাজানো কথা দিয়েই তো তার প্রত্যেকটা সন্ধ্যাকে ভরে তুলতে হয়। তবু দীপ্তিকে কেউ সুযোগ দিল না। তাকে শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যেতে হল, নবদ্বীপের এই নার্সিং হোমে এসে হারিয়ে যেতে হল চিরকালের মতো। আজকে গালের ওপর দুটো বীভৎস ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে রূপের বেসাতিতেও সে অর্ধেক বাতিল—ফিল্মের মরীচিকা অনেক দূরে মিলিয়ে গেছে এখন।

পত্রিকাটা বন্ধ করল দীপ্তি। চোখের সামনে সব আবছা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো দু মাস, হয়তো তিন মাস। তারপর আবার তাকে সেই পুরোনো জীবনের ভেতরে ফিরে যেতে হবে। আবার তেমনি করে আশ্চর্য নেশা আর অসহ্য গ্লানির মধ্যে বেঁচে থাকা। একটা মাতাল জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে থাকবে, 'তোমাকে বিয়ে করব, পাটরাণী করে রাখব।' পায়ের তলায় কেউ উপুড় হয়ে পড়বে—রেল-লাইনের ধারে কাটা-পড়া কুকুরকে যেমন শকুনে ছিঁড়ে খায়, তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ। কখনো পুলিশ এসে রেইড্ করবে আর পেছনের স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে একটা বোবা গলির মধ্যে পালাতে পালাতে গুণ্ডাও তাকে দয়া করে ছেড়ে দেবে, বলবে, 'আরে যানে দো, উ তো কসবী হ্যায়!'

চোর-ডাকাত-গুণ্ডারাও তাকে নিজের লোক বলে চিনে নিয়েছে। কাকের মাংস কাক খায় না!

হাসপাতালের সেই মেয়েটি—কী নাম যেন! কল্পনা।

কল্পনা বলেছিল, বিয়ে করে ফেলুন ভাই, এত রূপ নিয়ে—

বিয়ে! আশ্রয়, সংসার, স্বামী। উদ্বাস্তু কলোনীর সেই মেয়েটি। দাওয়া নিকোচ্ছিল, সারা গায়ে তার অদ্ভুত একটা মাটির গন্ধ। কলার পাতায় বাতাস শব্দ করছিল, উড়ে যাচ্ছিল সজনের ফুলে। মেয়েটির হাতে শাঁখা ছিল আর দুগাছা কাচের চুড়ি। কপালের সিঁদুর যেন তার মুখের হাসির আলোয় আরো বেশি জ্বলজ্বল করছিল।

এক বাটি মুড়ি এনে দিয়েছিল, এক টুকরো গুড়।

সিনেমার মায়াপুরী সরে রইল অনেক দূরে, যেখানে নিকোনো-দাওয়া থেকে ভিজে মাটির গন্ধ আসে আর বাতাসে সজনে ফুল উড়ে যায়, সেও রইল আর এক রূপকথা হয়ে। এখন সারা শরীরে নিজের লজ্জার ভার। সে ভার নেমে গেলে আবার—

কোথাও পালানো যায় না? বাইরে বাতাস গরম হয়ে উঠেছে—গা জ্বালা করছে। দীপ্তি একটা অন্ধকারকে ভাবতে চেষ্টা করল। যে অন্ধকারে আকাশ দেখা যায় না, তারা দেখা যায় না, নিজেকে দেখা যায় না। সেই অন্ধকারে, জমাট পাঁকের মতো খানিক নরম আর ঠান্ডা আশ্রয়ের ভেতরে ডুবে থাকতে পারলে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস সেখানে তলিয়ে থাকতে পারলে—সব জ্বালা তার জুড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে অন্ধকার—সেই নরম ঠান্ডা একটা আশ্রয় কলকাতায় কোথাও নেই—এই নবদ্বীপেও নয়।

যদি কোথাও থাকে—

থাকলেই কি পালাতে পারে দীপ্তি? সেই সজনে গাছের তলায়, শুধু শাঁখা আর দুগাছা করে কাচের চুড়ি পরেই কি সে খুশি হয়ে উঠতে পারে? অনেকগুলো নিয়নের আলোজ্বলা ঘরে, পিয়ানো-অ্যাকর্ডিয়নের বাজনার তালে তালে রক্ত যে ডাক শোনে, কোনো অন্ধকার—কোনো শীতল বিশ্রাম কি নেবাতে পারে তাকে? নিজের কাছ থেকে কি সত্যিই পালাতে পারে সে?

—আসতে পারি?—গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করলেন ডাক্তার। দোরগোড়ায় মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর তাঁর মনে হয়েছে, তিনি পাঁচ ঘণ্টা এভাবে অপেক্ষা করলেও দীপ্তি তাঁকে দেখতে পাবে না।

দীপ্তি সোজা হয়ে উঠে বসল বিছানায়। গায়ের কাপড় এলোমেলো হয়ে ছিল, গুছিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ। বললে, আসুন—আসুন।

ডাক্তার ঢুকলেন। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। ডাক্তারের দিক তাকিয়ে দীপ্তির বুকের মধ্যে দুলে উঠল একবার—এই মানুষটা একেবারে নতুন ধরনের। রাণীকে ঠিকই বলেছিল সে—ডাক্তারের মতো কাউকে এর আগে কোনো-দিন তার চোখে পড়েনি।

ডাক্তার বললেন, খবর কী?

—নতুন কোনো খবর নেই।

—শরীর?

—চলছে এক রকম।

—ডাক্তারের কিছু করবার নেই?

দীপ্তি হাসতে চেষ্টা করল: আপাতত কিছু দেখছি না।

ডাক্তার একটু চুপ করে রইলেন। পকেট হাতড়ে আবার বের করলেন সেই পোড়া চুরুট। ধীরে-সুস্থে দেশলাই জ্বেলে ধরালেন সেটাকে। কড়া তামাকের ধোঁয়ায় খানিক বিস্বাদ গন্ধে ভরে উঠল ঘরটা।

ডাক্তার বললেন, রাত-দিন এমনি করে বসে থাকেন নাকি?

দীপ্তি জবাব দিল না।

ডাক্তারের মুখে পেশাদারী গাম্ভীর্য ঘনিয়ে এল: একটু চলাফেরা করবেন—যে-ভাবে বলেছি, তেমনিভাবে এক্সারসাইজ্ করবেন মধ্যে মধ্যে। নইলে—

—কী হবে?

সৌম্যেন ঘটকের কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল, ঠোঁটের উদ্দেশ্যে চুরুটটা তুলেছিলেন, মাঝপথে থেমে দাঁড়ালো সেটা। বললেন, আপনার এর পরের কথাগুলোও আমি জানি। আপনি বলবেন, আমার ও-সবে দরকার নেই, এখন মরলেই আমি বাঁচি। ও-সব ট্র্যাডিশনাল

নন্‌সেন্স্‌ ছাড়ুন। মা হতে চলেছেন, ট্রাই টু কীপ ইয়োরসেল্‌ফ্‌ ফিট্‌।

—মেয়ে হলে আর আমার অবস্থায় পড়লে—দীপ্তির স্বর হঠাৎ ধারালো হয়ে উঠল : বুঝতে পারতেন। তখন আর এত সহজে এসব উপদেশ আপনার মুখে আসত না।

বলেই খারাপ লাগল। বিশ্রী রকমের রূঢ় শোনালো নিজের কাছেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার। ছোট ঘরটুকুর ভেতরেই পায়চারি করলেন কয়েক বার। চুরুটটা নিবে গেল, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে পকেটে পুরলেন। তারপর চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—ঠিক।—নিজের সঙ্গেই যেন কথা কইলেন ডাক্তার : ঠিক। মেয়েদের ট্র্যাজেডী সম্পূর্ণ বুঝতে পারা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু মানুষের সম্পর্কে কয়েকটা সহজ কথা বলা যায় তো। দেখুন, ডাক্তারী পড়তে গিয়ে এই শিক্ষাটাই গোড়াতে পেতে হয়েছে যে, জীবনটা অত্যন্ত দামি। রোগটা যত ভয়ংকর হোক, যতই সাংঘাতিক হোক ক্ষতটা আমরা আশা করি সারিয়ে তুলব। শুধু তাই নয়, প্রাণপণ চেষ্টাও করতে হয় সেজন্যে।

—আমি আপনাদের আশা-চেষ্টার বাইরে।

—ট্র্যাশ—রোমাণ্টিক্‌ ট্র্যাশ—জ্বলজ্বল করে উঠল ডাক্তারের চোখ : এই কথাগুলো শুনলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, যেন থিয়েটারের মতো মনে হ'তে থাকে। কী এমনটা হয়েছে আপনার যে বৈরাগ্য-শতক আওড়াচ্ছেন বসে বসে? কুমারী অবস্থায় মা হতে চলেছেন? সোস্যালি ব্যাপারটার একটা নোংরা চেহারা আছে—আড্‌মিটেড্‌। যদি বলেন সাংঘাতিক একটা ভুল করেছি, তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যে যুগ, যে ইকনমি, যে গ্যাংগ্রীনের মধ্যে আমরা বাস করছি, তাতে আপনার কিসের লজ্জা? কোনো অন্যায় যদি আপনার হয়েই থাকে, তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে সমাজ—আপনি নন।

এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটে উঠল দীপ্তির ঠোঁটে। ডাক্তার বক্তৃতা দিচ্ছেন। অন্য সময় হলে শুনতেও মন্দ লাগত না। কিন্তু পৃথিবীটা মাতৃসদনের এই ঘরটুকুই নয়, সমস্ত মানুষ ডাক্তার সৌমেন ঘটকের বক্তৃতা শুনে হাততালি দেবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে নেই।

ডাক্তার বললেন, জবাব দিচ্ছেন না?

—শুনছি।

—যা বলেছি তাই করবেন। চলাফেরা, যেমন ডিরেকশন দিয়েছি তেমনি লাইট্‌ এক্‌সারসাইজ—আর মনটাকে খুব ভালো রাখা—ডাক্তার ঘুরে এসে চেয়ারে বসলেন। বললেন, বেড়াতে যাবেন?

দীপ্তি চমকে উঠল : কোথায়?

—এই নবদ্বীপেই। জায়গাটাকে যা ভাবছেন তা নয়। ইতিহাস জানেন তো এর? এখানেই লক্ষ্মণ সেনের শেষ, চৈতন্যের আবির্ভাব এদেশে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধন-পীঠ। কাশী ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এত মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। একদিন যান, রাণীদির সঙ্গে দেখে আসুন সব। তবে উঁচু সিঁড়িগুলো দয়া করে ভাঙবেন না।

—না।

— না কেন?

—আমি বেশ আছি।

—লজ্জা? —ডাক্তারের চোখ আবার চকচক করে উঠল : বলেছি তো কোনো লজ্জা আপনার নেই। মাথা সোজা করে চলুন।

দীপ্তির ঠোঁটের কোণা আর একবার বাঁক নিলে, কিন্তু হাসিটা এবারে আর স্পষ্ট হয়ে ফুটল না। ভালোমানুষ ডাক্তার নিজের যুক্তি আর বিশ্বাস নিয়েই থাকুন, মিথ্যে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। দীপ্তি আস্তে আস্তে বললে, ভেবে দেখব।

—ভেবে দেখবেন কেন? আমিই রাণীদিকে বলে দেব না হয়। এখন আপনার ঘড়িটা দেখুন তো, কটা বাজল। —বাঁ হাতের মণিবন্ধের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, বারো বছরের সঙ্গী ছিল ঘড়িটা—বড্ড মায়া হচ্ছে।

দীপ্তি নিজের ছোট্ট ঘড়িটা তুলে নিলে টিপয় থেকে। বললে, দশটা বাজতে সাত মিনিট। কিন্তু কী হল আপনার ঘড়ির? ভেঙে গেছে নাকি?

—ভাঙলে এমন করে বুক ভাঙত নাকি? ভঙ্গুর জিনিস—একদিন ওকে যেতেই হবে—এইটে ভেবেই সান্ত্বনা পাওয়া যেত। ব্যাপারটা তা নয়—চুরি হয়ে গেছে কালকে।

—বলেন কি—দীপ্তি চমকে উঠল : কী করে চুরি হল?

—কাল রাত্রে যখন ঘুমুচ্ছিলুম, তখন চাকর নিয়ে উধাও হয়েছে। শুধু ঘড়ি নয়, গোটা দুই দামী ফাউন্টেন পেন, মা-র দেওয়া একটি আংটি ছিল—যদিও কখনো পরতুম না—সেটা, আর সুটকেস থেকে শ-দেড়েক টাকা।

—কী সর্বনাশ! বাড়ীর আর সবাই—

—আর সবাই তো কেউ নেই। মা-বাবা কালনায় দেশের বাড়ীতে থাকেন, ছোট ভাই কলকাতায় চাকরি করে। আমি একাই একটা বাড়ীর দুটো ঘর নিয়ে মুক্তির আনন্দে কাটাচ্ছিলুম। ভালোই করেছে চাকরটা—মুক্ত পুরুষের মায়ার বাঁধন আরো অধিক আলগা করে দিয়ে গেছে। সেইজন্যেই তো প্রথমে এসেই আজ রাণীদির কাছে হাত পাততে হল।

—থানায় খবর দিয়েছেন?

—কী হবে?—ডাক্তার হাসলেন : কয়েকটি ভদ্রসন্তান এমনিতেই নানা ঝামেলায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে রয়েছে, মিথ্যে আর তাদের বিব্রত করা কেন? তা ছাড়া থানা জায়গাটাকে আমার একেবারে ভালো লাগে না, গেলেই কেমন বুকের ভেতর গুর-গুর করে ওঠে, জীবনে যা কিছু করে বসেছি, সব কনফেস করতে ইচ্ছে হয়।

দীপ্তি অধৈর্য হয়ে বললে, ঠাট্টা নয়। থানায় খবর দিন, ধরে ফেলবে।

—ধরে ফেলবে?—ডাক্তার আবার হাসলেন : একটু বেশি কমপ্লিমেণ্ট দিচ্ছেন হয়তো। যদি ধরেই ফেলে—তাতেই বা কী হবে?

—সব ফিরে পাবেন।

—দেখুন, ফিরে পেলেই ফিরে নেওয়া উচিত কিনা তাও ভাবা দরকার। আমি মাসে শ-চারেক টাকার মতো রোজগার করি, ওকে বাইশ টাকা মাইনে দিতুম। তার বদলে রান্না করত, ঘর সাফ করত, বাসন মাজত, বাজার করত, সময়-অসময়ে চা করবার হুকুম মেনে চলত। পরিশ্রমের কথাটা ভাবলে বোধ হয় ডিসট্রিবিউশন অফ মানিটা একটু বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিল। ও তারই খানিকটা ক্ষতি-পূরণ করে নিয়েছে—কেন রাগ করব বলুন।

—না—এ অন্যায়, ভারী অন্যায়। ছি-ছি, এতগুলো টাকার জিনিস—দীপ্তি একবার থামল : সত্যিই আপনি বিয়ে করুন ডাক্তারবাবু। এভাবে থাকার কোনো মানে হয় না।

সত্যিই আপনি বিয়ে করুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বললেন, রাইট। বিয়ে করলে অন্তত গিন্নীর একটা কড়া নজর থাকত। চাকরটা হয়তো নির্বিঘ্নে বাজারের পয়সায় হাত পাকাতে পাকাতে শেষ পর্যন্ত এতখানি ডেভেলপ করতে পারত না। বিয়ের প্রস্তাব তো রাণীদির কাছে করেই ছিলুম, কিন্তু জানেনই তো, আমার এই দাড়ির জন্যেই বোধ হয় ভদ্রমহিলা আমাকে দাদা ছাড়া কিছু আর ভাবতে পারলেন না।

—রাণীদি ছাড়া কি আপনার জন্যে আর পাত্রী জুটত না?

—জুটত খুব সম্ভব। আমার এই দাড়ি দেখেও আতঙ্কে পিছিয়ে যাবে না এমন বীরাঙ্গনা বাংলা দেশে যে নেই সে-কথা আমার মনে হয় না। কিন্তু খুঁজবে কে বলুন। তাই শেষ পর্যন্ত মনের দুঃখে দেশান্তরীই হতে হল।

—দেশান্তরী মানে?—দীপ্তি চকিত হয়ে উঠল, ডাক্তারের কথাটা এবারে আর ঠাট্টার মতো মনে হল না।

—মানেটা খুব জটিল নয়।—ডাক্তার হাসলেন : মাস তিনেক আগে খেয়াল-খুশিতে চাকরির একটা দরখাস্ত করে-ছিলুম ওড়িষ্যায়। হঠাৎ তার একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এসে গেছে। চাকরিটা নেব কি নেব না এই নিয়েই চিন্তা কর-ছিলুম, কিন্তু চাকরটা চলে গিয়ে মনটাকেও উদাস করে দিয়েছে। ভাবছি আমিও চলে যাই। আর পাঁচ দিন পরেই জয়েন করতে হবে, অতএব 'বাঁধ গাঁটরিয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল দীপ্তি। কালো হয়ে গেল চোখ-মুখ। হঠাৎ মনে হল, এই দুঃসময়েও পায়ের তলায় একটা শক্ত ডাঙার মতো ছিল কোথাও। এইবার কে যেন সেটাকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে।

ডাক্তার নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন দীপ্তির দিকে। বাইরের আমগাছে বুলবুলিতে শিস দিচ্ছিল, খানিকক্ষণ যেন তাই শুনলেন কান পেতে। কী যে ভাবলেন তিনিই জানেন। তারপর ঃ

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

দীপ্তি দুটো আবছা চোখ মেলে ধরে বললে, বলুন।

—মনে রাখবেন, আপনার আমার মধ্যে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে—তাই সোজা জিজ্ঞেস করব, সোজা উত্তর দেবেন।—ডাক্তার তরল হতে চেষ্টা করেও পারলেন না ঃ কাউকে ভালোবাসেন আপনি?

বুকের মধ্যে ঘা পড়ল একটা। কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল দীপ্তি, তারপর বললে, না। কিন্তু একথা কেন?

—বলছি পরে।—ডাক্তার এবার পোড়া চুরুটটা বের করেই আবার উত্তেজিতভাবে পকেটে পুরলেন ঃ তার আগে জবাব দিন। আপনি যদি নিজের সম্বন্ধে কোনো ডিসিশন নিতে চান—কেউ বাধা দেবে?

—সব বাধা পেরিয়ে এসেছি আমি।

—তা হলে নির্ভয়ে বলতে পারি।—ডাক্তারের গলাটা কেঁপে উঠল ঃ উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট্ মাই প্রোপোজাল?

—প্রোপোজাল? কিসের?

ডাক্তার তাঁর থাবার মতো প্রকাণ্ড মুঠোটা বাড়িয়ে দিয়ে দীপ্তির একখানা হাত চেপে ধরলেন ঃ যদি বলি আমাকেই না হয় বিয়ে করে ফেলুন—আপনি আপত্তি করবেন?

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল দীপ্তির—চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা যেন গোল হয়ে ঘুরতে লাগল আর সেই সঙ্গে ডাক্তারের জ্বলন্ত দৃষ্টি একটা আগুনের বৃত্তের মতো যেন প্রদক্ষিণ করে চলল তাকে।

—কী হল? কী হল আপনার?

অনেক দূর থেকে যেন ডাক্তারের গলা ভেসে এল, যেন স্বপ্নের ভেতরে শুনল দীপ্তি। ধীরে ধীরে ঘুরন্ত ঘরটা স্থির হল, আর মনে হল ডাক্তারের চোখ থেকে একটা দৃষ্টি এসে তার মুখের ওপর চিরকালের মতো আটক পড়ে গেছে, ডাক্তার চলে গেলেও এই দৃষ্টিটা কোনো-দিন আর ওখান থেকে সরে যাবে না।

আর কোথা থেকে যেন একটা চাবুকের ঘা এসে পড়ল খানিকটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে জাগিয়ে দিলে দীপ্তিকে।

আরো মনে পড়ল, ডাক্তারই এই কথাটা প্রথম বলেননি—চৌরঙ্গীর হোটেলে আরো অনেকবার অনেকের মুখে থেকে শুনতে হয়েছে তাকে। কোনো আশা করেনি দীপ্তি, নেশা কেটে যাওয়ার পরে কথাটা যে কারো মনে থাকবে না এ-ও তার অজানা থাকেনি।

ডাক্তারেরও সেই নেশা। মদের নয়—মুহূর্তের একটা মানসিক মাতলামি। কিন্তু যে-কোনো মাতালই হোক, আপাতত দীপ্তি তাদের আর সহ্য করতে পারছে না। ডাক্তারের ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা ঘৃণায় বিস্বাদ হয়ে গেল তার।

আশ্চর্য নিষ্ঠুর আর বিষাক্ত স্বরে দীপ্তি বললে, আমাকে বিয়ে করতে চান? এই অবস্থাতেই?

ডাক্তার বললেন, আপত্তি নেই।

—জানেন, আমি যার মা হতে চলেছি তার কোনো পরিচয় নেই?—দীপ্তির মুখ প্রেতিনীর মতো বিকৃত হয়ে গেল ঃ জানেন, কলকাতার হোটেলে আমি পয়সার জন্যে শরীর বিক্রী করি, তাই আমার পেশা?

দীপ্তির মুঠো থেকে হাত খুলে গেল ডাক্তারের। প্রত্যেকটা কথা একটা করে ছুরির ঘায়ের মতো এসে লাগল, যুদ্ধ-ফেরৎ সৌম্যেন ঘটকও এতখানির জন্যে তৈরী ছিল না। মুখের কথা যা-ই হোক, চিরকালের সংস্কার তৎক্ষণাৎ কুঁকড়ে আনল স্নায়ুগুলোকে।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়। আর দীপ্তি নিষ্ঠুরভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে—যেন পরম পরিতৃপ্তিতে গুলি করা শিকারের মৃত্যু-যন্ত্রণা উপভোগ করছে সে।

ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন ডাক্তার। বললেন, পারব।

দীপ্তি থমকে গেল। ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে বসল তার।

—বিশ্বাস করতে পারবেন আমাকে?

—তা-ও পারব।

আরো নির্মম, আরো কঠিন হতে চাইল দীপ্তি। একটা চরম আঘাত দিতে চাইল ডাক্তারকে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের একটা শক্ত চাপ দিয়ে বললে, কিন্তু আমি তো নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না। যে বুনো বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে একবার, তাকে ঘাস-পাতা খাইয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন আপনি!

কথাটা ঘুরিয়ে বলা, কিন্তু অর্থটা অস্পষ্ট রইল না ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার অধৈর্যভাবে হাতের আঙুল-গুলো মটকালেন একবার, যেন শরীর-

মনের সমস্ত জড়তা মিটিয়ে নিতে চাইছেন। উজ্জ্বল চোখ কিছুক্ষণের জন্যে সংশয়ে ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, এবার কুয়াশা সরে গিয়ে সে দুটো তারার মতো ঝকঝক করে উঠল।

—বাজে কথা। আপনি এমন কিছু মনের বাঘ নন—সেই স্বাভাবিক আর বলিষ্ঠ স্বর জেগে উঠল ডাক্তারের : ইট্ ইজ ইকনমি—ইট্ ইজ্ এ সোস্যাল ট্র্যাজেডী। এই বীভৎস প্রোফেসান মেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয় এই ক্রিমিনাল্ সমাজ। তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে যাদের হত্যা করা হয়—দু-একটা অ্যাব্‌নর্মাল সাইকোলজী বাদ দিলে—তারা যে সেই মৃত্যুর প্রেমে পড়ে এ-কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে রাজী নই। আমি জানি, আপনি একটা সুস্থ সংসার চান, আপনি জীবনে মর্যাদা চান, বাঁচতে চান—কাজ করতে চান।—দীপ্তির চোখের সামনে ডাক্তারের মূর্তিটা যেন ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, যেন সমস্ত ঘরটাকে জুড়ে বসল তার শরীর, যেন দীপ্তির এতদিনের চেনা-জানা সমস্ত পৃথিবীটাকে তা আড়াল করে দিলে। ডাক্তার বলে চললেন : জানি এখনো আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না, করা উচিত নয়, তবু আপনাকে দেখে মনে হয় আমাদের আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং আসবে। আমি কোনোদিন আপনাকে দেবতা বলে ভুল করব না, আমার ভেতরে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি দেখতে পাবেন আপনি। তবু মানুষ হিসেবে এ ওকে চিনে নিয়ে হয়তো আমরা জীবনটাকে এগিয়ে নিতে পারব। আই অ্যাম্ টায়ার্ড—আই ওয়ান্ট টু সেট্‌ল। ইউ আর এ ভিক্‌টিম অব্ দি সোশ্যাল হাউণ্ডস্। আসুন, আবার গুছিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করা যাক। আপনাকে আমার ডিপেণ্ডেণ্ট্ করে রাখতে চাই না—যদি কোনোদিন আমাকে অসহ্য বোধ হয়, সম্মান নিয়ে বাঁচবার জন্যে আপনাকে আমি ফারদার এডুকেশনের সুযোগ দেব। যদি চলে যেতে চান একবারও বলব না আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আই এম টু স্ট্রং ফর দ্যাট্। —ডাক্তার থামলেন : আমার সব কথা খুলে বলেছি আপনাকে। রাজী?

দীপ্তি বসে রইল পাথর হয়ে। সমস্ত হিংস্রতা, সব বিদ্বেষ যেন একটা পাথরের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ঠিকরে পড়েছে। ডাক্তারকে শ্রদ্ধা করবে, বিশ্বাস করবে না ভয় করবে, তাই সে বুঝতে পারল না।

একটু চুপ করে রইলেন ডাক্তার। এতক্ষণ পরে পোড়া চুরুটটা বের করে ধরাতে পারলেন। সেই উগ্র কটু গন্ধ ঘর-ময় ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, জানি, মেনে নিতে সময় লাগবে। আমাকে যারা চেনে জানে, তারা আমাকে দেখে আকর্ষণের চাইতে বিকর্ষণটাই বোধ করে বেশি। সুতরাং আপনার মুখের তেতো স্বাদটা আর একদিন সইয়ে নিতে চেষ্টা করুন। কাল আপনার মতামত জানতে চাইব। ইয়েস অর নো।

দীপ্তি যেন হঠাৎ ভেসে উঠল সমুদ্রের তলা থেকে। একটা অস্পষ্ট স্বর বেরুল : আর আমার সন্তান।

—ইয়েস। তা-ও ভেবে দেখেছি। ওটা না হলেই ভালো হত। বাট্ হোয়েন ইট্ ইজ দেয়ার—জায়গা একটা দিতেই হবে তাকে। ডাস্টবিনে ফেলে দেবার জন্যে মানুষের জন্ম হয় না, আর তা ছাড়া আমি যখন কিছু আর করতে পারি, তখন অনাথ আশ্রমের ভার মিথো বাড়িয়ে কী লাভ। লেট্ ইট্ বী মাই চাইল্ড্। মাস্টার অর মিস্ ঘটক।

এইবার দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল দীপ্তি। যা কিছু বাঁধ ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সামনে। দুর্বল শরীর আর সইছে না, ক্লান্ত মন সব কিছু ভাববার শক্তি হারিয়েছে তার।

দীপ্তির মাথার ওপর প্রকাণ্ড হাতখানা নেমে এল ডাক্তারের।

—থামুন,—থামুন। ডোণ্ট্ বী সেণ্টিমেণ্টাল।

ঘরে ঢুকল রাণী। দাঁড়িয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্যে।

—ডাক্তারবাবু।

দীপ্তি নিথর হয়ে বসে রইল, আর শান্ত হাসিতে ভরে উঠল ডাক্তারের মুখ।

—এসো, এসো রাণীদি।

রাণী তীক্ষ্ণ চোখে একবার ডাক্তারের দিকে চাইল, একবার দীপ্তির দিকে। কপালে ছায়া ঘনিয়ে এল তার। ঘরের আবহাওয়াটা ভালো লাগল না—একটা সন্দেহ মাথা তুলল মনে।

—নীচে পেশেণ্ট্ বসে আছে। আপনি ভারী আড্ডাবাজ হয়ে যাচ্ছেন আজকাল।

—আড্ডা নয় রাণীদি, অত্যন্ত সীরিয়াস্ ব্যাপার। তুমি তো পাত্তাই দিলে না, তাই এই ভদ্রমহিলাকেই বললুম, আমাকে বিয়ে করে ফেলুন। যদিও এখনো কথা দেননি, তবু মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যাবেন।

—কী বললেন!—রাণীর গলা চিরে চিৎকারের মতো বেরিয়ে এল কথা।

—সরল বাংলাতেই বলেছি দিদি। তোমার না বোঝবার কথা নয়।

একটা অর্থহীন যন্ত্রণায় আর অসহ্য ক্রোধে রাণীর মুখ বেগুনে হয়ে গেল। শক্ত করে দরজাটা চেপে ধরে, কঠোর স্বরে বললে, ডাক্তারবাবু, এটা হাসপাতাল। এর কতগুলো নিয়ম আছে, লোকের চোখে এর একটা সম্মান আছে। এটা ইয়ার্কির জায়গা যে নয় সেটা ডাক্তার হিসেবে আপনার অন্তত জানা উচিত।

—সেই কথা ভেবেই তো রিজাইন দেব রাণীদি।

—রিজাইন!—রাণী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

—তা ছাড়া তো উপায় নেই। তোমাকে বলা হয়নি, উড়িষ্যায় একটা চাকরি পেয়েছি। এই মহিলাকে নিয়ে পাড়ি জমাব সেখানে। ঘর বাঁধব। তোমাকে আর ঘটকালির পরিশ্রম করতে হল না, নিজেই সেটা ম্যানেজ করে নিলুম।

—এই মেয়েটাকে নিয়ে চলে যেতে চান!—দীপ্তির সম্পর্কে যে-টুকু মমতা রাণীর মনে দেখা দিয়েছিল অসহ্য বিদ্বেষ আর ঘৃণায় এক মুহূর্তে সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল : নিয়ে যেতে চান—কোনো আপত্তি নেই। প্রভাতদা এনেছিলেন বলেই জায়গা দিয়েছিলুম, নইলে এ ধরনের কদর্য মেয়ের জন্যে আমার নার্সিং হোম নয়।—বিন্দু বিন্দু করে বিষ ঢালতে লাগল রাণী : একের

রাখলে হাসপাতালের বদনাম—সম্মানের ক্ষতি। আপনি একে যে-চুলোয় খুশি নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু প্রভাত-দাকে আমি কী কৈফিয়ৎ দেব?

চোখের জল মুছে ফেলেছিল দীপ্তি। কয়েক মিনিট আগেও যা অনিশ্চিত ছিল, রাণীর এই ঘৃণার আঘাত তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত করে দিলে। দীপ্তি মাথা তুলল।

—প্রভাত-দাকে যা জানাবার আমিই জানিয়ে দেব, আপনি ভাববেন না।

—বেশ ভাবব না।—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাণী। বলে গেল, ডাক্তারবাবু, আপনার পাওনাটা আজ বিকেলেই মিটিয়ে নিয়ে যাবেন। আর—একবার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, বিয়ের নিমন্ত্রণটা আর দয়া করে করবেন না, অতটা সইতে পারব না।

শুধু ঘর থেকেই বেরিয়ে গেল না রাণী, দোতলা থেকে নেমে সোজা বেরিয়ে গেল হাসপাতাল থেকে। সামনে যে নার্সটি পড়ল, তাকে বলে গেল, এ বেলা আমি আর আসব না—কেউ খোঁজ করলে বলে দিয়ো।

রিক্সা করে বাড়ীর দিকে ফিরতে ফিরতে যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যেতে লাগল রাণীর, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বার বার করে ভাবতে চাইল সেই স্বামীকে—ভালো করে যাকে দেখবার আগেই একটা ভয়ঙ্কর রাতের মোটর-দুর্ঘটনায় যে চিরকালের মতো মুছে গেছে।

কিন্তু—!

* * *

বার থেকে সন্ধ্যায় তেমনি টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন কাঞ্জিলাল সাহেব।

ড্রাইভার প্রভাত সরকারকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আজ নতুন ড্রাইভার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। একজন পাঞ্জাবী—তাঁর বন্ধু ঘোষসাহেব আজ সকালে এটিকে এনে দিয়েছে।

বারের বাইরে এসে একবার দাঁড়ালেন কাঞ্জিলাল সাহেব।

হঠাৎ মনে হল, কিসের জন্যে, কার জন্যে তাঁর এই এভারগ্রীন লাইফ? কালকে রিনি অদ্ভুত পাগলামির মধ্যে কাটিয়েছে সারাদিন—নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়েছে টুকরো টুকরো করে—হিংস্র চিৎকার করেছে। সময় মতো রিভলবারটা কেড়ে নিয়েছিলেন, নইলে হয়তো খুনই করে বসত কাউকে।

ফ্রাস্ট্রেশন!

নিজেরই বাধাহীন প্রশ্রয়ে আজ তাঁর মেয়ে একটা শূন্যতার জগতে এসে জায়গা নিয়েছে। ব্যর্থ-বিকৃত। এক ডাক্তার বন্ধু বললেন, বিয়ে দিন—নইলে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে দেবেন? সেই ছেলেটা—দ্যাট স্কাউন্ড্রেল তাকে বিট্রে করবার পর—

কাঞ্জিলালের মনে হল, শুধু রিনি নয়, তিনিও পাগল হয়ে যাবেন। এতদিন পরে তাঁর সব কিছু যেন বালির বনিয়াদের মতো ধসে পড়েছে পায়ের নীচ থেকে।

শুধু একটা বাকী ছিল তাঁর। বিশ্বপ্রেম।

কিন্তু কোথায় বিশ্বপ্রেম? সেদিনও বলেছিলেন, বিশ্বপ্রেমের বাণী পাঠাবেন হিমালয়ে—প্রেমাশ্রুতে মিলন ঘটাবেন—যত বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু—

আজকের কাগজে বড়ো বড়ো হেডলাইন। আগুনের মতো খবর।

বিশ্বপ্রেমে কেউ কর্ণপাত করে না। তাই চীনের আক্রমণ। বিশ্বাসঘাতকতা। পঞ্চশীলের সমাধি। পীত নদীর জলে 'গৌটামা বুড্ঢার' বিসর্জন।

অস্ত্র! ওয়ার! প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান।

শুধু পাহাড়ের টিলা নয়—নদী নয়—দেশের মাটি। তার প্রতি ইঞ্চি জমিকে রক্ত দিয়ে বাঁচাব আমরা। সারা ভারতবর্ষ ক্ষুধিত সিংহের মতো গর্জন করছে। থর থর করে কাঁপছে হিমালয়।

ক্লাবের আড্ডাবাজ বন্ধুদের মুখ থমথম। কয়েকজন মদ পর্যন্ত স্পর্শ করলেন না আজকে। দুচার কথার পরেই উঠে গেলেন। ডেজ অব্ হার্ড ট্রায়াল অ্যাহেড্। আজ রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের। কোটিপতি থেকে পথের ভিক্ষুক। সকলের দায়িত্ব সমান—সকলের সঙ্কল্প এক।

মদের গ্লাশ আর বিশ্বপ্রেমের বাণী! সারা জীবন কী পাগলামি নিয়ে কাটালেন! কী পেলেন একমাত্র মেয়ের কাছ থেকে—কী পেলেন পৃথিবীর কাছ থেকে? হিমালয়ের তুষার আজ যুদ্ধের রক্ত দিয়ে রাঙানো। কোথায় দাঁড়াবেন কাঞ্জিলাল সাহেব?

সামনে দিয়ে গর্জিত প্রসেশন চলেছে একটা। কতগুলো মুষ্টিবদ্ধ হাত। দেশ আমাদের। প্রতি কণা ধুলোর জন্য বুকের সব রক্ত ঢেলে দেব।

চুরমার হয়ে গেছে শৌখিন বিশ্ব-প্রেম। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাঁর স্বপ্নের প্রাসাদ। হিমালয়ের ওপার থেকে যেন গুপ্তঘাতকের ছোরা এসে বিঁধেছে তাঁরই হৃৎপিণ্ডে। চোখের সামনে চার-দিকের আলোগুলো জোনাকির মতো ঘুরপাক খেতে খেতে মিলিয়ে গেল। ঘনিয়ে এল একরাশ অন্ধকার। হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন কাঞ্জিলাল সাহেব। জ্ঞান হারাবার আগে যেন কানে এল রিনির অদ্ভুত সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার: ও ড্যাডী, ইয়ু আর এ ফুল—ইয়ু আর অ্যান ইডিয়ট্! ইয়োর লাইফ ইজ—

পাঞ্জাবী ড্রাইভারই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল তাঁর দিকে।

—(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাহিত্য সমাচার

মহাভারতের দ্বিতীয় পর্বের রুশ অনুবাদ

সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত কালিয়ানোফকৃত মহাভারতের সভাপর্বের রুশ অনুবাদ ২৭-এ অক্টোবর লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। টীকাব্যাখ্যাসহ এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে 'স্মরণীয় সাহিত্য' গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত মহাভারতের আদিপর্বের রুশ অনুবাদও করেছিলেন এই বিশিষ্ট সোবিয়েত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সম্পাদনা করেছিলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান আলেক্সি বারান্নিকফ।

মহাভারতের এই রুশ অনুবাদের সঙ্গে কালিয়ানোফ তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞানসম্মত টীকাব্যাখ্যা যোগ করেছেন দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত মূল সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য উদ্ধৃতির সাহায্যে। দেশের জনগণকে ভারতের ও অন্যান্য আপ্রোশীয় দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত করা, এইসব দেশের জাতিসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক লেনদেনকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার ওপরে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে, মহাভারতের এই রুশ অনুবাদ প্রকাশ তারই প্রমাণ বলে অ্যাকাডেমিশিয়ান কালিয়ানোফ মনে করেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও জনগণের জীবন অনুশীলন করার পক্ষে মহাভারত যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ, সে কথা উল্লেখ করে কালিয়ানোফ বলেন যে, ভারত সম্পর্কে একটি কোষগ্রন্থ হিসাবে মহাভারত সোবিয়েত পাঠকদের নিকট খুব আকর্ষণীয় একটি মহাকাব্য।

সভাপর্বের এই রুশ অনুবাদের প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের দায়িত্ব বহন করেন লিথুয়ানিয়ার রাজ্যবিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ও সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবিদ বোরিস লারিন। এই লিথুয়ানীয় বিজ্ঞানপরিষদের প্রাচীন জাতিসমূহের ইনস্টিটিউটে রক্ষিত ১৫টি জলরঙে অঙ্কিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্র এই রুশ সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সোবিয়েত বিজ্ঞানপরিষদের এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিটিউটের ভারতীয় বিভাগের প্রধান ভ্লাদিমির কালিয়ানোফ। গত ২৭-এ অক্টোবর একজন 'তাস' প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন : 'ভারতের মহাকাব্য মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ ও টীকাটিপ্পনিসহ রুশ অনুবাদের কাজে সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।' বর্তমানে কালিয়ানোফ মহাভারতের চতুর্থ পর্ব (বিরাটপর্ব) অনুবাদে নিযুক্ত আছেন। তৃতীয় পর্ব (বনপর্ব) অনুবাদ করছেন তাঁর ছাত্রী সভেৎলিনা লেভিনা।

।।এ হংকং হাউস ।।

এডমণ্ড ব্লানডেনের নতুন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির নাম 'এ হংকং হাউস'। হংকং ইউনিভার্সিটিতে তিনি ইংরিজি সাহিত্য অধ্যাপনা করেছিলেন কিছুকাল। সুদূর প্রাচ্যের এই অঞ্চলটির অভিজ্ঞতাই তাঁর এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতারই ভিত্তিভূমি। পূর্বপ্রকাশিত 'পোয়েমস অব মেনি ইয়ারস' গ্রন্থখানি এককালে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। লিডস্ ইউনিভার্সিটি তাঁকে সাহিত্যে অনারারি ডিগ্রী দিয়েছে।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন পুরস্কার ১৯৬২

এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য সৃষ্টির জন্য। গত জুলাই মাসে জুরিখে পুরস্কারটির আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী মিলিত হন। বর্তমান বৎসরের জন্য এই সম্মানজনক পুরস্কারটি লাভ করেছেন মেরী নরটন, তাঁর 'দি বরোয়ার্স আফ্লোট' গ্রন্থের জন্য। শিশু অ্যাডভেনচারের এই মুগ্ধকর কাহিনীটি বিচারকমণ্ডলীকে অভিভূত করে। মেরী নরটন ইতোপূর্বে 'দি বরোয়ার্স' নামক শিশুদের গ্রন্থ রচনার জন্য 'কারনেজি' মেডাল লাভ করেন।

।। সোভিয়েতে 'ডক্টর জিভাগো' ।।

রুশ সাহিত্যিক য়েভজেনি পেপোভকিন সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশ করেছেন। সংবাদটি হচ্ছে বর্তমান বৎসরের মধ্যেই বরিস পাস্তেরনাক রচিত বহুবিতর্কিত উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

।।পর্তুগালে নিষিদ্ধ গ্রন্থ ।।

সম্প্রতি পর্তুগীজ সরকার ডঃ ম্যানুয়েল জোস্ হোমেন ডি মেলো রচিত 'পর্তুগাল, হার ওভারসিজ্ প্রভিন্সেস অ্যান্ড দি ফিউচার' নামক গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করেছেন। ডি মেলো ১৯৫৮ সালে জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রাক্তন পর্তুগীজ প্রেসিডেন্ট মার্শাল ক্র্যাভিরো লোপেস। গ্রন্থে সালাজার সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংস্কার থেকে শুরু করে জাতীয় সমস্যার মুক্ত আলোচনার জন্য এবং আফ্রিকায় পর্তুগীজ শাসননীতির পরিবর্তন সাধনের স্বপক্ষে স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবী জানিয়েছেন ডি মেলো এবং লোপেস।

।। ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ।।

আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. পরিচালিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল জানা গেছে। কেবলমাত্র সংস্থার সদস্যগণের পক্ষেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সম্ভব। ২৫০ জনের ওপর প্রতিযোগী যোগদান করে। প্রথম পুরস্কার ৫০০ ডলার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ ডলার এবং তৃতীয় পুরস্কারের পরিমাণ ২০০ ডলার।

প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন স্টর্ম্ জেমসন (গ্রেট বৃটেন), আঁদ্রে মরিস্ (ফ্রান্স) এবং হুইট বারনেট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

প্রথম পুরস্কার : অ্যান অর্ডার (ড্যানিশ থেকে অনূদিত), লেখক : সি. ই সোয়েক। ইনি একজন নাট্যকার এবং ডেনমার্ক কেন্দ্রের সদস্য।

দ্বিতীয় পুরস্কার : অ্যাগু (গ্রীক থেকে অনূদিত), লেখিকা : ইর্সি সেফেরিয়েডস হাজ্জীটিমিহেলি। ইনি গ্রীক কেন্দ্রের সদস্য।

তৃতীয় পুরস্কার : দুভাগে ভাগ করে দুজন সদস্য লাভ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রের সদস্য ভ্লাদিমির কসটেটস্কির 'অ্যাডাম, আই অ্যান্ড ক্যাপিটাসকি' রুশ থেকে অনূদিত গল্পটি পুরস্কৃত হয়েছে। মিসেস কনসট্যান্স ইয়ং রচিত 'অ্যান্ড ইজোলিনি স্মাইলড্' গল্পটি, পুরস্কার লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কেন্দ্রের কেপ টাউন' শাখার সদস্য।

।।লেট মাই পিপল গো ।।

অ্যালবার্ট লুথুলি রচিত বর্তমান গ্রন্থখানি দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। বিচারমন্ত্রী ভোস্টার গ্রন্থ বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আমদানিকৃত সমস্ত 'লেট মাই পিপল গো' ইতোমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু আর অধিক কপি বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

আদিবাসী বিবাহের নানারূপ

প্রভাতকুমার দত্ত

ভারতবর্ষে আদিবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে ২২৪.৮৮ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬ ভাগ। এদের জীবনধারা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আদিবাসী জীবনের একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দিক নিয়ে আলোচনা করবো। সেটি হচ্ছে বিবাহপ্রথা। ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজে মোটামুটি নিম্নোক্ত ধরণের বিবাহপ্রথা লক্ষ্য করা যায়।

॥ মেয়ে চুরি করে বিবাহ ॥

দক্ষিণ ভারতের মুথুভান শ্রেণীর মধ্যে এই ধরণের বিবাহ প্রচলিত আছে। এদের সমাজে বিবাহ ঠিক হয়ে গেলে বর কনেকে তার মায়ের বাড়ী থেকে যে কোন ফন্দীতে চুরি করে নিয়ে যায় এবং তারা বনের একেবারে নির্জন অংশে কিছুদিন একত্র বাস করে। পরে তারা ঘরে ফিরে আসে যদি-না ইতিমধ্যে তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের খুঁজে বার করে থাকে। নাগা, হো ও মুন্ডা সমাজেও এ রীতি আছে। খাড়িয়া ও বীরহোর পুরুষেরা পিছন থেকে লুকিয়ে এসে প্রার্থীত নারীর সিঁথিতে সিন্দুর লাগিয়ে দেয়। এই সিন্দুর দেওয়া বিবাহেরই নামান্তর। মধ্যভারতে উৎসব দিনে যখন বিভিন্ন গ্রামের লোক একত্র মেলে তখন উৎসব-মত্ততার সুযোগে বিবাহের জন্য এই ধরণের যুবতী হরণ-কার্য সম্পাদিত হয়। যে পুরুষ হরণ বা চুরি করে সে যদি ক্ষতিপূরণ দেয় বা সবাইকে খাওয়ায় তবে এই চুরিকে বিবাহের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

॥ কাজের বিনিময় ॥

দক্ষিণ ভারতের মান্নান ও পালিয়ান সমাজে বিবাহের এ রীতি লক্ষ্য করা যায়। বর তার ভাবী শ্বশুরের বাড়ী ছয় মাস থেকে এক বছর কাল বাস করে এবং গৃহের নানা কাজকর্ম করে দেয়। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে পর বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। যে সমস্ত পুরুষেরা কন্যাপণ সংগ্রহ করতে পারে না তারাই এভাবে বিবাহ করে। স্ত্রী সংগ্রহের জন্য কাজ করার কারণই হচ্ছে যে মেয়ের বাপ শুধু হাতে অর্থাৎ কিছু না নিয়ে মেয়েকে হাত ছাড়া করতে ইচ্ছুক নয়। কোন গোণ্ড বা বৈগা পুরুষ কন্যা-মূল্য না দিতে পারলে ভাবী শ্বশুরের বাড়ীতে চাকররূপে যায় এবং কয়েক বছর পরে মেয়েকে বিবাহ করে। বীরহোর সমাজে কন্যা-মূল্যের জন্য শ্বশুর টাকা ধার দিয়ে থাকে। এই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত জামাইকে শ্বশুরের বাড়ী থাকতে বাধ্য করা হয়। বর ভালভাবে কাজকর্ম করলে কনের বাপ সহজেই মেয়ে দিয়ে দেন।

।। কন্যা-ক্রয় ।।

মেয়ে কিনে বিবাহের রীতি শুধু আদিবাসী সমাজ কেন সভ্য সমাজেও লক্ষ্য করা যায়। নাগারা টাকা বা জিনিষ দিয়ে মেয়ে কেনে। দাম দেওয়াটা হচ্ছে নারীর 'প্রয়োজনীয়তার' জন্যই। হো সমাজে কন্যা-মূল্য দেওয়ার অর্থনৈতিক দিকটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এখানে মূল্যের হার এত উঁচু যে বেশীর ভাগ যুবক-যুবতী অবিবাহিত থাকে। অংগামী নাগাদের মধ্যে কন্যা-মূল্য দেওয়ার রীতি না থাকায় নারীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং অনেকেই তারা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। অপরদিকে রেংগমা নাগাদের মধ্যে এই রীতি থাকার জন্য তাদের সমাজে নারীর এ অবমাননা ঘটে নি। কেরালার বিভিন্ন

মুরিয়া বিয়ের কনে

আদিবাসীদের মধ্যে কন্যা-মূল্যের প্রচলন আছে। এখানে যে অর্থ আদায় হয় তা মা-মামা প্রভৃতিরা ভাগ করে নেন। কন্যা-মূল্য জিনিষটাকে স্ত্রী রাখার ক্ষমতার পরিচায়করূপে গণ্য করা যেতে পারে।

।। ভগ্নী বিনিময় ।।

ভগ্নী বিনিময় করে বিবাহ উরাঙী, উল্লাটান, বিষভান প্রভৃতি আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত। যার নিজের ভগ্নী নেই তার পক্ষে স্ত্রী পাওয়া সম্ভব নয় কারণ শর্ত হচ্ছে স্ত্রী নিলে বিনিময়ে ভগ্নী দিতে হবে। এই রীতিতে টাকা বা সম্পত্তি দিয়ে স্ত্রী কেনা চলে না। ভগ্নী নেই অতএব ভাগ্যে বিবাহ নেই এটাই নিয়ম। ভগ্নী বিনিময় প্রথার উদ্ভব কন্যা-মূল্য জিনিষটাকে এড়াবার জন্যই।

॥ ভাগিনেয় বিবাহ ॥

দক্ষিণ ভারতেই এই প্রথার চলন বেশী। কেরালার আদিবাসীরা বিশেষ-ভাবে এই প্রথা অনুসরণ করে থাকে। সেখানে মুথুভান, মাম্লান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পুরুষেরা মামার মেয়েকে বিবাহ করাটাই বেশী পছন্দ করে। অবশ্য পিসিমার মেয়ের সংগে বিবাহ নিষিদ্ধ। ভাগিনেয়-বিবাহ রীতি পরিবারের বাঁধুনী শক্ত রাখে ও সম্পত্তি এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। যে সমাজে উত্তরাধিকারী শুধু মেয়েরাই সেখানে পিতা তাঁর ভগ্নীর মেয়ের সংগেই পুত্রের বিবাহ দেন। মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যেই ভাগিনেয় বিবাহ বেশী প্রচলিত। এক আদিবাসী সমাজের দূরবর্তী আদিবাসী সমাজগুলি সম্পর্কে অপরিচয়ও এই প্রথা উদ্ভবের কারণ হতে পারে। সাধারণত মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বেশী দূরে কেউ পাঠাতে চায় না। এটা একটা অতি স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

।। একবিবাহ ।।

এই প্রথা ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজে প্রধানত কাদার, মালাপান্-তারাম, সাঁওতাল, খাসিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি বিবাহ মাতা-পিতা ও পুত্র-কন্যার মধ্যে সবচেয়ে সহজতম রূপ। গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা দুই-ই এ প্রথার বৈশিষ্ট্য। পুরুষেরা নারীর সতীত্বকেই বেশী শ্রদ্ধা করে এবং এর পরিচয় হচ্ছে একবিবাহ। মধ্যপ্রদেশে অত্যধিক কন্যা-মূল্যের জন্য একবিবাহ ছাড়া গত্যন্তর নেই। দক্ষিণ ভারতে মথুভান, মাম্লান, পালিয়ান সমাজে এই বিবাহ রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় পাছে কোন দুষ্ট দৃষ্টি বর-কনের ওপর পড়ে।

।। বহুবিবাহ ।।

বহুবিবাহ আদিবাসীদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। বহুবিবাহ মানে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যের অবসান। যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে সেখানেই এ প্রথার উপস্থিতি। বর্তমানে নাগা, গোন্ড, বৈগা, লুসাই, টোডাদের মধ্যে বহু-বিবাহের অনেকটা রেওয়াজ আছে। কেরালাতে মুথুভান, পালিয়ান, কানিক্কর প্রভৃতিদের মধ্যেও বহুবিবাহ দেখা যায়। উরাঙী আদিবাসী পুরুষেরা যতগুলি ভগ্নী ঠিক ততগুলি বিবাহ করে থাকে। ফলে উরাঙীদের মধ্যে যাদের বয়স কম, তারা বিবাহের জন্য মেয়ে পায় না কারণ বয়স্ক বা বৃদ্ধদের পত্নীর সংখ্যাই বেশী হয়ে যায়। বহু-বিবাহের সামাজিক কয়েকটি কারণ আছে। যে সমাজে বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা বেশী সেখানে বহু-বিবাহ চলে। বহু পত্নী থাকলে ঘরে কাজ করার লোকও বেশী পাওয়া যায়। তা'ছাড়া পত্নীর সংখ্যা পুরুষের সামাজিক মর্যাদার পরাকাষ্ঠা বিশেষ। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোন সমাজে নারীর সংখ্যাধিক্য ঘটলে বহু-বিবাহ দেখা দেয়। এখানে লক্ষ্যণীয়, যে যে আদিবাসী সম্প্রদায় মৎস্য আহরণ ও শিকারের স্তরে রয়েছে তাদের মধ্যে বহু বিবাহ থাকতে পারে না। কারণ খাদ্যাভাবের জন্য একটির বেশী দুটি পত্নীর ভরণপোষণ সম্ভব নয়। কিন্তু পশুপালন ও কৃষিনির্ভর আদিবাসী গোষ্ঠীতে বহু-পত্নীর ভরণ-পোষণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাই বহু-বিবাহ প্রচলিত।

॥ বহু ভ্রাতার এক পত্নী ॥

লাদাকি, দেরাদুন অঞ্চলের কোলটা টোডা, কোটা, কুরুম্বা, খাদাগাদের মধ্যে বহু ভ্রাতার এক পত্নী নেওয়ার রীতি আছে। নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যাধিক্য এই রীতি উদ্ভবের বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। কাশ্মীরের লাদাকি গোষ্ঠীতে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। টোডা সম্প্রদায়ে যখনই কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করে, সংগে সংগে সেই নারী বরের অন্যান্য ভ্রাতাদেরও পত্নীরূপে গণ্য হয়। সম্পত্তির প্রশ্ন ও যৌন-অসাম্য এই প্রথা উদ্ভবের কারণ। একথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, খাদ্য প্রচুর হলে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী হবে আর এর উল্টো দেখা যাবে যদি খাদ্য দুর্লভ হয়। খাদ্য ঘাটতির জন্য মালাপুলা, উরাঙী, পালিয়ানদের সমাজে পুরুষের আধিক্য। তাই সেখানে বহু পুরুষের এক পত্নী-রীতির প্রচলন। দারিদ্র ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, যেমন তিব্বতে—বহু-পুরুষকে এক পত্নী নিতে বাধ্য করতে পারে। কারুর কারুর মতে গোষ্ঠী-বিবাহেরই একটি পরবর্তী রূপ হচ্ছে আলোচ্য প্রথা। আরেকটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, একই আদিবাসী সম্প্রদায়ে এক-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বহু পুরুষের এক পত্নী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রথা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। যেমন টোডাদের মধ্যে দেখা যায়।

॥ গোষ্ঠী বিবাহ ॥

এক গোষ্ঠীর প্রতিটি পুরুষ অপর এক গোষ্ঠীর প্রতিটি নারীর স্বামীরূপে গণ্য হলে তাকেই গোষ্ঠী-বিবাহ বলা হয়। এই প্রকার বিবাহের ফলে যে পুত্র-কন্যা জন্মলাভ করে তারা ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীর পুত্র-কন্যা।

।। লেভিরেট ।।

মৃত ভ্রাতার পত্নীকে বিবাহ করাকেই 'লেভিরেট' বলে। এই প্রথার বহুল প্রচলন আছে এবং অনেকের মতে 'বহু পুরুষের এক পত্নী' প্রথারই পরিবর্তিত রূপ 'লেভিরেট' রীতি। যেখানে নারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য সেখানে তা অন্যান্য সম্পত্তির মত হাত-বদল হয়। মৃতের ভ্রাতা না থাকলে নিকটতম আত্মীয় বিধবাকে 'লাভ' করে। দক্ষিণ ভারতের কানিক্কর, পুল্যা, গরৈয়া, মালায়ারায়ান প্রভৃতি আদিবাসীরা এই প্রথায় বিবাহ করে।

॥ সোরোরেট ॥

এই প্রথায় অনেকগুলি ভগ্নী থাকলে সকলের বড়টিকে বিবাহ করলে সকল ভগ্নীকে বিবাহ করা হয়। লেভিরেট ও সোরোরেট প্রথা একত্র করলে দাঁড়ায় ভ্রাতা হিসাবে একদল স্বামীর সংগে ভগ্নী হিসাবে একদল পত্নীর বিবাহ। আন্তঃ-পরিবার দায়-দায়িত্ব পালন এবং দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন লেভিরেট ও সোরোরেট বিবাহ-রীতি এই দুটি বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। ফ্রেজার মনে করেন গোষ্ঠীবিবাহপ্রথার মধ্যেই এই সমস্ত রীতির উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতের উরালি, উল্লাটান এবং মাম্লান আদিবাসী শ্রেণীর মধ্যে এই দুটি প্রথারই উপস্থিতি বর্তমান।

॥ বিধবা বিবাহ ॥

আদিবাসী সমাজে বিধবা বিবাহের সম্মতি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মৃত স্বামীর ভ্রাতাই বিধবাকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করে। কানিক্কর-মুথুভান সমাজে এটাই নিয়ম। মৃত স্বামীর অগ্রজের সংগে বিধবার বিবাহের রীতি মালাপু-ল্যাদের মধ্যে দেখা যায়। সেমা নাগারা মা ছাড়া পিতার অন্য বিধবাকে বিবাহ করতে বাধ্য। পরিবারে একবার যাকে নেওয়া হয়েছে তাকে রাখার জন্যই মধ্য-ভারতে মৃত অগ্রজের বিধবাকে বিবাহ করার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। বিহারের ঘাড়িয়া সমাজেও বিধবা বিবাহের রীতি আছে। একজন বিধবা আরেকজন বিপত্নীক যুবক বা অবিবাহিত যুবককে বিবাহ করতে পারে এবং এর জন্য কোন কন্যা-মূল্য লাগে না।

মোটামুটি এই বারটিই হোল ভারতের আদিবাসী সমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ-রীতি।

প্রদর্শনী

॥ চিত্ররসিক ॥

হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটির উদ্যোগ

গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী-গৃহে হায়দ্রাবাদ আর্ট সোসাইটির চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শিত ছবি এবং ভাস্কর্যের সংখ্যা সত্তরটিরও অধিক। আজকের দিনের শিল্পে আধুনিকতার হাওয়া সর্বত্রই বইতে দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশও তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত হতে দেয়নি। বিশেষ করে সেখানকার ললিত-কলা অ্যাকাডেমির সংগ্রহের যে অংশ এখানে প্রদর্শিত হয়েছে তা প্রায় একই ধরণের। কেবল হায়দ্রাবাদ মিউজিয়ামের "ফুল ওয়ালোঁ কা মেলা" নামে ছবিটি এর ব্যতিক্রম। প্রাচীন মুঘল প্রথায় (অথবা দাক্ষিণী প্রথায়) আঁকা কয়েক শ লোকের নিখুঁত প্রতিকৃতি সাজিয়ে আঁকা এই বৃহদাকার ছবিটি এতগুলি একই ধরণে আঁকা ছবির মধ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের প্রচেষ্টা

এরপর কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে, এই সহস্র সমস্যাসংকুল শহরের সমস্যার ধরণ এবং তাদের সম্ভাব্য উন্নয়নের পরিকল্পনার বিবরণ যে ম্যাপ আর চার্টের সহযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে, তার উল্লেখ করতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতা শহরের আকার ও আয়তন কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই থেকে শুরু করে কলকাতার খাদ্য সমস্যা কিভাবে সমাধান হয়, এখানকার লোক-বসতি, তাদের অর্থোপার্জন সমস্যা, বস্তী সমস্যা, যানবাহন ইত্যাদি নাগরিক জীবনের বহু বিভিন্ন সমস্যাগুলি ম্যাপ এবং চার্টের সাহায্যে সুন্দরভাবে বোঝান হয়েছে। নতুন পরিকল্পনায় গৃহ এবং যানবাহনাদি সমস্যার সমাধান কিভাবে করা হবে বলে স্থির হয়েছে তার কতকগুলি ছবি দেওয়া হয়েছে। এই প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে শহরবাসীর মনে কৌতূহল জাগাবে।

শিল্পী রাখালচন্দ্র দাসের একক প্রদর্শনী

এ সপ্তাহে (৯ই নভেম্বর) অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী-গৃহে নতুন শিল্পী রাখালচন্দ্র দাসের একক প্রদর্শনীর শুরু হল। শিল্পী ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের পাশকরা ছাত্র। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগে কাজ করেন। এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। ২২ খানি ছবি নিয়ে তাঁর আগমন। আধুনিকতার হাওয়ায় শিল্পী গা ভাসিয়ে দেননি। চোখে যা দেখা যায় তাকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। প্রায় সব ছবিই জলরং এবং প্যাস্টেলে আঁকা। কিন্তু আঙ্গিকের ব্যবহারে কিছুটা একঘেঁয়েমি আছে। প্রতিকৃতির মধ্যে 'অভিনেতা' (১০) ছবিটি তৃপ্তিকর। নিসর্গ চিত্রের মধ্যে ৫, ৭, ১৭ এবং ২০ সংখ্যক ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে বর্ণপ্রয়োগে বৈচিত্র্যের কিছু অভাব দেখা যায়, এইসব এবং আরো কতকগুলি কারণে ছবিগুলির মধ্যে কিছুটা ক্যালেণ্ডার-মার্কা ভাব এসে গিয়েছে।

শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর একক প্রদর্শনী

১১ই নভেম্বর থেকে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর একক শিল্প প্রদর্শনী শুরু হল। তেলরং, জলরং আর চারখানি ড্রইং নিয়ে মোট পঁয়তাল্লিশটি ছবি শিল্পী উপস্থিত করেছেন। এই তরুণ শিল্পী এখনো নিজেকে খুঁজে পাননি। তাই কোন পথে তিনি যাবেন সে সম্বন্ধে তাঁর অনিশ্চয়তাই সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে ফুটে রয়েছে। তেলরংয়ের ছবিগুলির মধ্যেই এই অনিশ্চয়তার ছাপ প্রকট। বস্তুনিষ্ঠ এবং ডেকরেটিভ এই উভয় রীতির মধ্যেই তিনি যাওয়া আসা করছেন। মনে হল এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ইউরোপে যে এক্সপ্রেসনিস্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তার প্রতিই যেন তাঁর ঝোঁকটা কিছু বেশী। উদাহরণস্বরূপ ১, ১১ এবং ১৫ সংখ্যক ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে, (৭, ৮, ১১, ১২, ১৬) কিন্তু সে দৃষ্টি তেমন সচেতন নয়। বর্ণবিন্যাস অনুজ্জ্বল, রেখাঙ্কন দ্বিধাগ্রস্ত। কখনো কখনো "তুলি-কর্ম" (ব্রাশ ওয়ার্ক) দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, ফলে সেটি বক্তব্য বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার বদলে দৃষ্টির বিভ্রান্তি রচনা করতেই সমর্থ হয়েছে। এ-সব দৌর্বল্যের কারণ, নিজের চোখে দেখা নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টার পরিবর্তে পরের চোখে দেখা পরের অভিজ্ঞতার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ। জলরং-এর ছবিগুলি একটু মামুলী ধরণের। বর্ণপ্রয়োগের দ্বিধা-সঙ্কোচ এখানেও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু তাঁর তেলরংয়ের ছবিতে বিভিন্ন আঙ্গিকের দিকে শিল্পীর মনোযোগের ফলে দর্শকের যেমন খানিকটা বিভ্রান্তি-বোধ ঘটে, জলরংয়ের ছবিতে এত আঙ্গিক-বৈচিত্র্য এড়িয়ে বিষয়বস্তুকে ফোটাবার চেষ্টার দরুণ এদের মধ্যে একটা একতার ভাব আছে। তাই এগুলির মধ্যে ৩১ এবং ৩৭ সংখ্যক ছবি দুটি অসাধারণ না হলেও তৃপ্তিকর।

রেখাচিত্র: মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

সাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ কলমের এক খোঁচায় ॥

এক কলমের খোঁচায় যখন আপনার আমার চাকুরীর জীবনে ওঠা-নামা, এমন কি মর্মান্তিক ধ্বংস পর্যন্ত নামতে পারে, তখন সেই সর্বশক্তিমান কলমকে ভয় না করে আমাদের উপায় কি? দোলনা চেয়ারে দুলতে দুলতে যে ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে আপনার আমার সার্ভিস রেকর্ডে স্তূপীকৃত প্রশংসাকে এক কলমের আঁচড়ে বাতিল করে দিয়ে, নীচুতে নামিয়ে দিতে না পারলেও, বেশী বাড় আর বাড়ার রাস্তায় কন্টকের ব্যবস্থা করে দেন, তাঁর সেই দেড়শ টাকা দামের কলমটিকে সত্যিই যে কোন তরবারির চাইতে শক্তিশালী ভাবা মোটেই আমাদের পক্ষে আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আর ইদানীং ব্যবসা মন্দা রূপে অর্থ-নৈতিক সংকটের নয়া পরিত্রাণ হিসেবে চালু র‍্যাশালাইজেসান কথাটির কল্যাণে এই কলমের খোঁচায় সত্যিই ত তরবারির কোপ আমাদের ঘাড়ে বেশ ঘনঘনই পড়ছে। তবু কেরানী হিসাবে কলম নামক বস্তুটিকে এই কারণে ভয় করলেও, আমার কলম ধরার উদ্দেশ্য অন্য।

হ্যাঁ, আমি কেরানীদের পক্ষ থেকেই একটা নিবেদন রাখতে চাই, সেই সব সাহিত্যিক-কলমধারীদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা কেরানীদের সাহিত্য-পাঠক হিসেবে ভাবতে লজ্জিত হন, যাঁরা নিজেদের সৃষ্টি (অনাসৃষ্টি কিনা সে বিচার করবার যোগ্যতা আমাদের নেই, তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলার সাহসও নেই আমাদের) সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে লেখেন, 'যাঁরা রাত ৯॥ নাগাদ শয়নগৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসেবে জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ যাঁদের ঘুমে কাটে, ভোরের অক্ষম পিচুটি কচলিয়ে জেগে ওঠে তাঁরা যা আশা করতে পারেন তা হল হরিণঘাটার, দুধ, ওই জন্য তাই-ই তাঁরা পেয়ে থাকেন, আধুনিক সাহিত্য তাঁদের জন্য নয়। গোটা রাত্রি জুড়ে কী হল এ'দের জানাতে যাওয়া বৃথা, এ'রা জানবেন না কোন দিনই।'

এই শেষের উত্তর দেওয়া বা রাত জাগার উপলব্ধিতে এ'দের কলমের খোঁচায় কি রত্ন আহরিত হচ্ছে তাও পরিবেশন আমরা করতে চাই না। তবে সাহিত্যস্রষ্টা না হলেও সাহিত্য-পাঠক হিসাবে আমাদের বক্তব্য কিছু আছে। খুবই প্রাঞ্জল সে বক্তব্য এবং সাহিত্যের সোনার কলম যাঁদের হাতে তাঁদের এ বক্তব্যে (আজ না হলেও) কর্ণপাত করতেই হবে। কারণ পৃথিবীর সব কিছু পদার্থের পরিবর্তন ঘটে থাকলেও কলম মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতির একমাত্র অপরিবর্তনীয় হাতিয়ার। যে কলমের আঁচড় কেটে একদিন মানুষের জ্ঞান, মানুষের সৌন্দর্যের, এই পৃথিবীর যা কিছু ভাল তার প্রতি মানুষের অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল, যে কলম ধরে বিশ্বের জ্ঞানী চিন্তানায়ক, সাহিত্যিক, দার্শনিক মানুষের অন্তরলোককে উদ্ভাসিত করে গেছেন, যে কলমে লিখে গেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, সেই কলমের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বলেই আমরা দুঃখ পাই যখন রাত-জাগা (!) অসুস্থ মনোবিকলনকে আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে আমরা মেনে নিতে না পারলে আমরা সাহিত্যিক পদবাচ্য এই সব কলমধারীদের কাছে ব্যঙ্গই পাই শুধু।

বুদ্ধি আমাদের কম হলেও এটাও আমরা বুঝি, যুগে যুগে সাহিত্যের ফর্ম বদল হয়, স্টাইল পালটায় কিন্তু তাই বলে অস্থির সমাজ-ব্যবস্থাজনিত হতাশার অজুহাত দেখিয়ে সাহিত্যকে ঘৃণাউদ্রেককারী বস্তুতে পরিণত করতে হবে, এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রক্ষণশীলের মত নোংরা ঘাঁটা মাত্রই আমরা যদিও নিন্দার বলব না, কিন্তু সেই নোংরার মধ্য থেকে কিছু একটা উজ্জ্বল সত্যও আবিষ্কার করা চাই, যে সত্যের মুখোমুখি হয়ে আমরা জীবনের প্রতি আস্থায় আরও দৃঢ় হতে পারব, জীবনের প্রতি অনুরাগে ভাবতে পারব আমাদের এই বাঁচাটা, নানা হীনতা, তুচ্ছতার মাঝেও, কম শ্লাঘার বস্তু নয়।

আমাদের তাই একটাই বক্তব্য, সাহিত্যিকের কবির সোনার কলম যাঁদের হাতে, তাঁদের উদ্দেশ্যে, আর যাই করুন আপনাদের এক কলমের খোঁচায় মানুষকে ছোট করবেন না। মানুষের অনেক দোষ, অনেক সংকীর্ণতা, অনেক জটিল মান-সিকতার তারা শিকার, তবু মানুষ মানুষই। সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে তার মানবিকতা, তার মহত্ত্ব। মানুষকে মনো-বিশ্লেষণের সস্তা থিয়োরী দিয়ে যাচাই না করে, নিজের আবেগ-বুদ্ধি অনুভূতি দিয়ে বিচার করুন, তারপর সাদা কাগজের পাতায় আপনার কলমটা রাখুন। আপনার পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য আপনার নাগালে যখন রয়েছে, তখন এটা নিশ্চয় আপনাদের বলে দিতে হবে না, মানুষকে মহত্ত্বে মহিয়ান করে সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই এই সব পূর্ব-সূরীদের কলমের আঁচড় কালের প্রহারেও আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

আপনাদের একথা বলব না, দলের নির্দেশ লিখলেই বা কোন 'বাদ'কে অবলম্বন করে লিখলেই, আপনারা আপনাদের কলমের মর্যাদা রাখবেন, এও বলব না শ্রমিক-কৃষক সমস্যা, সংগ্রাম, প্রগতি, শ্রেণী-সংঘর্ষ আপনাদের রচনায় না থাকলে তা সাহিত্যই নয়। কিন্তু এটা বলব আপনাদের রচনায় যেন জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়, যেন আপনাদের কলমে মানুষ তার সহস্রবিধ তুচ্ছতার মাঝেও নিজের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করার সম্ভাবনা রেখে যায়।

আপনার সৃষ্টি ফর্মে স্টাইলে, কাঠামোয় আধুনিক হোক, কিন্তু জীবনের প্রতি আস্থায় যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। হয়ত তাতে কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার আপনাদের হতেও পারে। কিন্তু কলমের মর্যাদা রাখতে পেরে নিজেদের গর্বিত ভাবতে পারবেন এবং আমরাও সাহিত্যের আবদ্ধ জলাশয়, শহরের বুকে পানশালায় ভিড় জমে ওঠার মত, নোংরা জঞ্জাল জমে উঠতে দেখে আপনাদের কলমকে যে রীতিমত ভয় করতে শুরু করে দিয়েছি, সে ভয় থেকে মুক্ত হতে পারব। আমরা চাই, আপনাদের নিদ্রাহীন রাত্রের সৃষ্টি, রাতের শেষে নিছক সৌখীন কারিকুরির প্রলোভনে যে জীবনে আমরা জেগে উঠি, তা যেন না কুৎসিত করে তোলে।

কলম তরবারির চেয়ে শক্তিশালী, বিকৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে আপনারাও এ কথাটি ভুলে গেলে, আমরা সাধারণ মানুষ যারা মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি, তারা কি সে ভরসা পাব বলতে পারেন?

জানি এ যুগে অনেক যন্ত্রণা, তারও ছাপ আসবে আপনাদের কলমের মুখে, কিন্তু সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হলে নোংরা আবর্জনার মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থেকে আক্ষেপই করে যাওয়াই কি আমরা আমাদের জীবনের একমাত্র পরিণতি বলে ভেবব। জীবনের প্রতি অনুরাগে দীপ্ত অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাহিত্যের কত শত বৎসরের ইতিহাস কিন্তু একথা বলে না।

তরবারি দিয়ে ঘাস কাটাটা যেমন হাস্যকর, তেমনি কলম দিয়ে জীবন-বিমুখ কোন অসত্যকে সত্য বলে চালানোও এই অতীত ঐতিহ্যেরই অসম্মান।

তাই কামনা করি বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের কলমই বিরাট কিছু সৃষ্টি করতে না পারুক, অন্ততঃ জীবনের প্রতি অনুরাগটুকু পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে যেন পারে। সে-টুকুতেই তাঁদের কলম ধরার সার্থকতা।

॥ ডাঃ কার্ভের জীবনাবসান ॥

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী ভারতরত্ন ডাঃ ধন্দো কেশব কার্ভে গত ৯ই নভেম্বর পরলোকগমন করেছেন ১০৪ বৎসর বয়সে। স্বর্গত মনীষী ডাঃ বিশ্বেশ্বরায়ার ন্যায় এই মনীষী পন্ডিত ছিলেন ভারতীয় জনগণের এক অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ রাণাডে, তিলক, গোখলে ভান্ডারকর প্রভৃতির সংগে জাতীয় ইতিহাসে এক উচ্চস্থানের অধিকারী।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে তিনি পুণা ফার্গুসান কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯২-১৯২৪ পর্যন্ত এই কাজে আবদ্ধ থাকলেও সমাজ-সংস্কারকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন বহুপূর্ব থেকেই। ১৯০৭ সালে তাঁর বিখ্যাত মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৬ সালে যে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন তার কাজেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। দেশে-বিদেশের নানা পন্ডিত এসেছেন এখানে। পন্ডিত মালবীয়ের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর পর একক প্রচেষ্টায় এমন অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ বর্তমান ভারতে আর চোখে পড়ে না। তাঁর এই মহৎ কাজে অপর দুজন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য স্যার বিটলদাস থ্যাকার্স এবং শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর থ্যাকার্স। সামগ্রিকভাবে নারী-সমাজের সেবার কাজে উৎসর্গীকৃত এমন সেবায়তন অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগরের অনুরাগী এই অমরসাধক সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ সকল ক্ষেত্রেই এক অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

॥ পরলোকে মিসেস রুজভেল্ট ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মিসেস রুজভেল্ট ৭৮ বৎসর বয়সে ৭ই নভেম্বর নিজ গৃহে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর যোগাযোগ এবং তিনি ডেমোক্রাট দলের সমর্থক ছিলেন। গত বৎসর যে জনমত গ্রহণ করা হয় তাতে তিনি 'বিশ্বের অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন মহিলার আসন' লাভ করেন। গত বৎসরই বানারোডো বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেনর রুজভেল্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন ইতিহাসের এই মহীয়সী মহিলা আপন প্রতিভাগুণে এক অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

দেশে বিদেশে

॥ কঠিন সমস্যা ॥

দেশ আজ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অনতিবিলম্বেই যুদ্ধ শেষ হবে এমন ভুল ধারণা যেন কারও মনে না থাকে এবং আরও রক্ত ও অশ্রুপাতের জন্য সারা দেশ যেন প্রস্তুত থাকে।

যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের ফলাফল ভারতের বিরুদ্ধে গেছে। কারণ ১৯৫৬ সালের পর ১৯৬০ সালের মানচিত্রে চীন নতুন করে ভারতের যে কয়েক হাজার বর্গমাইল জমির উপর দখল দাবী করেছিল তা ২০শে অক্টোবরের পর প্রথম ১৭ দিনের যুদ্ধেই চীন ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আপাতত ভারতের কোন ভূমিখণ্ডের উপর চীনের আর দাবী নেই। ওদিকে সীমান্তে কঠিন শীত নামায় মূল ঘাটির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখাও চীনের পক্ষে এখন কঠিন হবে। এঅবস্থায় চীন এখনই হয়ত আর অগ্রসর হবে না এবং যা সে ইতিমধ্যে দখল করেছে তার ওপর কায়েম বজায় রাখার দিকেই সে দৃষ্টি দেবে।

সুতরাং আত্মরক্ষার সংগ্রামের অধ্যায় ভারতের পক্ষে শেষ হয়েছে, হৃতভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতকে এখন আক্রমণাত্মক সংগ্রাম সুরু করতে হবে। একাজ যে সহজসাধ্য নয় তা সহজেই অনুমেয়। প্রবল প্রত্যাঘাতের ঝুঁকি নিয়ে আক্রমণকারী চীন এখন ভারতের উত্তর ভূখণ্ড প্রস্তুত হয়ে আছে, প্রবলতর শক্তির সহায়তা ছাড়া তাকে পিছু হটানোর চিন্তা বাতুলতা মাত্র। আবার ভারত যখন হৃতভূমি পুনর্দখলের সংগ্রাম সুরু করবে তখন যুদ্ধবাদী চীন যে কি আচরণ করবে তা এখন থেকেই অনুমান করা সম্ভব নয়। চীন হয়ত তখন এমন এক আক্রমণাত্মক নীতি নেবে যার ফলে যুদ্ধ আর উত্তর সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এইজন্যেই প্রধানমন্ত্রী বারবার করে বলেছেন, চীনা অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ায় কেউ যেন না মনে করেন যে ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে।

ভারতের সকল মানুষের সম্মুখে আজ একটিই মাত্র কর্তব্য আছে। তা'হল সকল বাদবিসম্বাদ ও অভাব অভিযোগের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে রাষ্ট্রের নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করা। যখন যে আহ্বান জানাবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তা বিনা প্রশ্নে পালনের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে সারা দেশ। আজ একথাই যেন ভাবি সবাই যে, মাতৃভূমির পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোন স্বার্থত্যাগই চরম ত্যাগ নয়।

॥ ব্যর্থ দৌত্য ॥

যুদ্ধবাদী চীনকে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি

নাসের। এসিয়া ও আফ্রিকার মহান ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখার আন্তরিক আগ্রহে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি লাল চীনের মদমত্ত নেতাদের কাছে। কিন্তু সে আবেদন তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। যে চারটি সর্তে তিনি ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাতে চেয়েছিলেন তা ভারত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করলেও চীন তাতে সম্মত হয়নি। ফলে নিরুপায় হয়েই নাসেরকে হাতগুটাতে হয়েছে।

কিন্তু তবুও আমরা বলব, তাঁর প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আরব নেতার এই উদ্যোগের ফলে এটুকু অন্তত প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত যুদ্ধ চায়নি। নয়া সাম্রাজ্যবাদী চীনের অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধকল্পেই অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়েছে সে। আর এই সত্যটুকু প্রমাণিত হওয়াতেই আজ দেশদেশান্তর হতে আসছে ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

॥ সমর্থন ॥

আক্রান্ত হওয়ার পরেই ভারত পৃথিবীর সকল দেশের কাছে সমর্থন ও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। সে আবেদনে পৃথিবীর সকল দিক হতে যে বিপুল পরিমাণ সাড়া পাওয়া গেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। এপর্যন্ত চল্লিশটি দেশ প্রকাশ্যে চীনের আক্রমণের নিন্দা করে ভারতের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। কমিউনিষ্ট দেশগুলি ভারতকে সমর্থন না করলেও একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া আর কেউ প্রকাশ্যে এখনও পর্যন্ত চীনের পক্ষে সমর্থন জানায়নি। বর্তমানে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির এই নীরবতা ও নিরপেক্ষতার মূল্য কিছু কম নয়। চীন কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তারা যে চীনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেনি তার দ্বারা এইটাই প্রমাণিত হয় যে, চীনের দাবীকে তারা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেনি।

॥ নতুন প্রস্তাব ॥

বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজে একঘরে হয়ে চীনের কিছুটা সম্বিত্ত ফিরেছে বলে মনে হয়। বোধহয় চীন এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে, তার অনর্গল মিথ্যা প্রচারে কোন কাজ হয়নি। ভারত আক্রমণকারী এমন আজগুবি কথা দুনিয়ার কাউকে বারে বারে শুনিয়েও বিশ্বাস করাতে পারেনি সে। ভারতের পক্ষে অর্থ অস্ত্র ও সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে এতগুলি দেশ, কিন্তু তার পাশে এসে কেউ দাঁড়ায়নি। সুতরাং তার সাম্রাজ্যবাদী লালসা যদি চরিতার্থ করতে হয় তবে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিয়েই করতে হবে।

কিন্তু বিশ্বপরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও চীনের বর্তমান মনোভাবের প্রকৃত কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্তত তার ৭ই নভেম্বরের প্রস্তাব পাঠে তা বোঝা যায় না। পূর্বভাগে ম্যাকমেহন লাইনকেই ভারতের সীমা বলে মেনে নিতে চীন রাজী এবং ম্যাকমেহন লাইনের ১২ মাইল উত্তরে তার সৈন্যবাহিনী পিছিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সে প্রস্তাব যে অর্থহীন তা বোঝা যায়, ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে চৌ এন লাই-এর নূতন ব্যাখ্যায়। তিনি যে সীমান্ত বরাবর ম্যাকমেহন লাইন টানতে চান তা মানতে হলে শুধু পূর্ব সীমান্তেই ভারতকে প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গমাইল স্থান হারাতে হবে। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য বিভাগের সীমান্ত রেখা সম্বন্ধে চীনা প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুতরাং আপোস ও যুদ্ধবিরতির জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে যে আবেগটুকু প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আন্তরিকতার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কথার মারপ্যাঁচে বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করাই এই প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

॥ পাক-দৌরাত্ম্য ॥

ভারতের বিরুদ্ধে চীনের নগ্ন ও নির্লজ্জ আক্রমণে সারা বিশ্বের জনমত বিক্ষুব্ধ হলেও এই সুযোগে কাজ গুছানোর মতলবে সবচেয়ে ব্যস্ত হয়েছে পাকিস্তান। আজন্ম ভারতের বৈরী এই দেশটির ধারণা, ভারতের এখন খুবই বেকায়দা অবস্থা, সুতরাং তার কাছ থেকে কিছু যদি আদায় করে নিতে হয় তবে এই তার উপযুক্ত সময়। তাই যাদের কাছে পাকিস্তানের আজ টিকি পর্যন্ত বাঁধা, সেই বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ সত্ত্বেও পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে তার যা দাবীদাওয়া তা আদায়ের চেষ্টা এখন তারা বন্ধ করবে না।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে ন'বছর আগে গৃহভৃত্যের মত বিতাড়িত হয়েছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তারপর গত ন'বছর লজ্জায়, অপমানে ও আরও বেকারদায় পড়ার ভয়ে একবারের জন্যেও মুখ খোলেননি তিনি। আজ পূর্ব-পাকিস্থানে জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে জনাব সুরাবর্দীর নেতৃত্বে যে প্রবল গণ-আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে খাজা সাহেবকে কোন কাজে লাগানো যায় কিনা পরখ করে দেখার উদ্দেশ্যে আয়ুব খাঁ প্রায় ঠাণ্ডা ঘর থেকে টেনে বার করেছেন তাঁকে। আয়ুব খাঁর হুকুম তামিলের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন মুশ্লিম লীগের সভাপতি হয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দিন, আর হওয়ামাত্রই হুমকি ছেড়ে বলেছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি চাই ভারতের বিরুদ্ধে, সৈন্য মোতায়েন করো ভারতের সীমানা বরাবর। কাশ্মীরে গণভোট এখনই চাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর গত ১৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ একবারের জন্যেও তাদের শাসক নির্বাচনের সুযোগ পায়নি। তারপর আয়ুবশাহী কায়েম হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রায় দশ কোটি নাগরিককে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা ভোটদানের অযোগ্য। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় মতামত দেওয়ার মতো বুদ্ধি বা বিবেচনা শক্তি তাদের নেই। অতএব তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারও স্বীকার করা হবে না। এইভাবে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে পাকিস্তানের যে শাসকবর্গ তারাই আজ কাশ্মীরের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণের দাবীতে মুখর! জনমতের প্রতি পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকদের যে কতখানি শ্রদ্ধা তা বিশ্ববাসীর অজানা নেই। সুতরাং সুযোগ বুঝে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আবার জিইয়ে তোলার এই অপপ্রয়াসেও পাকিস্তান বিশ্বের কোন দেশের সমর্থন পাবে না। উপরন্তু ভারতের বর্তমান অসুবিধার সুযোগ নেওয়ার জন্য তাদের নিন্দনীয় প্রয়াস সর্বত্রই নিন্দিত হবে। বস্তুত আজ চীনকে তার হঠকারী নীতির জন্য যেভাবে একঘরে হতে হয়েছে, পাকিস্তানকেও তার বর্তমান নীতির জন্য একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবীতে এমন বুদ্ধিহীন দেশ একটিও নেই যে ভারতের বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের সঙ্গে মিতালী করবে। সংখ্যাতীত সমস্যায় সমগ্র পাকিস্তান আজ বিপর্যস্ত এবং ভারতের সৌহার্দ ও সহযোগিতা ছাড়া তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। এই সত্য যতদিন না পাকিস্তান উপলব্ধি করতে পারবে ততদিন তার দৌরাত্ম্যও বন্ধ হবে না এবং সমস্যার বোঝাও দিনের পর দিন বেড়ে চলবে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১লা নভেম্বর—১৫ই কার্তিক : 'জাতির মর্যাদার প্রশ্নে আপোষের কোন স্থান নাই—চীন বর্তমানে আর প্রতিপক্ষ নয়, শত্রু'—দিল্লীতে সাইপ্রাস প্রেসিডেন্টের (ম্যাকারিওস) সম্বর্ধনা-সভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কর্তৃক সমস্ত স্বর্ণালংকার দান।

কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ কর্তৃক চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা--গৃহীত প্রস্তাবে ভারত সরকারের সকল ব্যবস্থা সমর্থন।

কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্তৃক রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গের স্থলে 'বাংলা' করার সিদ্ধান্ত।

২রা নভেম্বর—১৬ই কার্তিক : নেফা ও লডাক রণাঙ্গনে অস্বস্তিকর স্তব্ধতা—একমাত্র ওয়ালং-এ উভয় (চীন-ভারত) পক্ষের মধ্যে সামান্য গুলী বিনিময়।

ব্যাংক অব চায়নার লাইসেন্স বাতিল—জনস্বার্থে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার কার্যব্যবস্থা— সরকারী লিকুইডেটর কর্তৃক ব্যাংকের সম্পত্তি গ্রহণ।

৩রা নভেম্বর—১৭ই কার্তিক : রাষ্ট্রবিরোধী যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার অথবা আটক করার ব্যবস্থা--নূতন অর্ডিন্যান্সবলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জরুরী ক্ষমতা গ্রহণ।

৪ঠা নভেম্বর—১৮ই কার্তিক : নেফার ওয়ালং-এর নিকটে ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা আঘাত।

ভারতের সংকটে ফরাসী সরকার ও জনগণের সহানুভূতি জ্ঞাপন—শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পত্র।

৫ই নভেম্বর—১৯শে কার্তিক : সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর) সমর্থ ব্যক্তিদের রাইফেল চালনা শিক্ষাদান—দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিকল্পনামত ভারতীয় ফৌজের দৌলতবেগ ওল্ডি ঘাঁটি (লডাক অঞ্চল) ত্যাগ—ওয়ালং-এর নিকট উভয়পক্ষে (ভারত-চীন) গুলী বিনিময়।

সমগ্র ভারতে শেয়ার ও সোনার বাজারে তীব্র মন্দা—বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

৬ই নভেম্বর—২০শে কার্তিক : ত্রিশজন সদস্য লইয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত—চেয়ারম্যান : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

লডাকে চুশুলের নিকট নূতন চীনা সৈন্য আমদানী—ভারতীয় জওয়ানদের গুলীবর্ষণে ওয়ালং-এর নিকট চীনাদের পশ্চাদপসরণ।

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সীমান্ত জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) কর্মক্ষম ব্যক্তিদের রাইফেল ব্যবহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

৭ই নভেম্বর—২১শে কার্তিক : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিদায়—প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত।

বিভিন্ন রাজ্যে 'চীনাপন্থী' ৪১জন নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্ট গ্রেপ্তার—দিল্লীতে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীবি টি রণদিভে ধৃত —নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার জন্য নাগরিক প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত।

॥ বাইরে ॥

১লা নভেম্বর—১৫ই কার্তিক : ভারত ও চীনের মধ্যে অবিলম্বে সংঘর্ষের (সীমান্ত) বিরতি ও চীনা সৈন্যদের অপসারণ (৮ই সেপ্টেম্বরের সীমারেখায়) দাবী—কায়রো বেতারে প্রেসিডেন্ট নাসেরের (যুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র) চার দফা প্রস্তাব প্রচার—শান্তিপূর্ণ পন্থায় সীমান্ত বিরোধ মিটাইতে সংশ্লিষ্ট দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়কে আহ্বান।

রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে কাস্ত্রোর (কিউবার প্রধানমন্ত্রী) আপত্তি—উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল) কিউবা শান্তি মিশন কার্যত ব্যর্থ।

২রা নভেম্বর—১৬ই কার্তিক : চীন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট নাসেরের মীমাংসা প্রস্তাব অগ্রাহ্য—ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে চীনের আপত্তি—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর নিকট রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের দ্বিতীয় পত্র।

সোভিয়েট মহাকাশযানের ('লালগ্রহ') মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে যাত্রা—মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান উৎক্ষেপণের প্রথম উদ্যম।

৩রা নভেম্বর—১৭ই কার্তিক : রাওয়ালপিণ্ডিতে শীর্ষস্থানীয় পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাদের সহিত পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বৈঠক—চীন-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তানের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।

৪ঠা নভেম্বর—১৮ই কার্তিক : ভারতের প্রতি খাজা নাজিমুদ্দীনের (পাকিস্তান মুসলীম লীগের নব-নির্বাচিত সভাপতি) রণহুংকার—৪-দফা সর্ত (গণভোট গ্রহণের দাবীসমেত) না মানিলে কাশ্মীর সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করার হুমকী।

৫ই নভেম্বর—১৯শে কার্তিক : 'ইঙ্গ-মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের (ভারতকে প্রদত্ত) ফলে চীন-ভারত সংঘর্ষ ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের জল্পনা-কল্পনা—পাকিস্তানের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর সদম্ভ উক্তি : কাশ্মীর না ছাড়িলে পাকিস্তান ভারতকে সমর্থন করিবে না।

'ভারতের উপর চীনা আক্রমণ শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের বিপদ'—শ্রীনেহরুর নিকট ডাঃ আদেনুয়েরের (পশ্চিম জার্মান চান্সেলার) লিপি—অপর পত্রে জাপ প্রধানমন্ত্রী ইকেদারও উদ্বেগ প্রকাশ।

'সর্বপ্রথম যুদ্ধ-বিরতি ও পরে সর্ত-বিহীন গোলটেবিল বৈঠক—ভারত ও চীনের নিকট 'প্রাভ্দা'র (সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র) প্রস্তাব।

৬ই নভেম্বর—২০শে কার্তিক : ভারতের নিকট চীনা প্রস্তাবসমূহের 'সঠিক উত্তর' দাবী—মীমাংসায় না আসিলে আত্মরক্ষার জন্য চীনকে প্রত্যাঘাত শুরু করিতে হইবে বলিয়া পিকিং সরকারের নূতন হুমকী।

'ব্যাংক অব্ চায়না' বন্ধ করার জের—ভারতের নিকট চীনের প্রতিবাদ।

১লা জানুয়ারী (১৯৬৩) মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য রাষ্ট্রসংঘের আহ্বান।

৭ই নভেম্বর—২১শে কার্তিক : চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের অবসানকল্পে নূতন ভাষায় চীনা প্রধানমন্ত্রীর (চৌ এন-লাই) পুরাতন প্রস্তাব—শ্রীনেহরুর নিকট চৌ-এর আর একদফা লিপি—৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন।

মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জয়—প্রেসিডেন্ট কেনেডির পূর্ণ কর্তৃত্ব বহাল।

সমকালীন সাহিত্য

ইংরাজ লেখকের দৃষ্টিতে ভারত

অভয়ঙ্কর

আজ এবং যে কালে ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, সেই অন্ধকার দিনেও, কোনো সময়েই ভারত-আত্মার অন্তরে এতটুকু বিদ্বেষ বা তিক্ততা ছিল না। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রীতির মনোভাবই অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারত ইংরাজের সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করেছে, তার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে—এমন কি ইংরাজী ভাষা অতিশয় স্বচ্ছন্দ এবং সহজ ভঙ্গীতে ভারতবাসী ব্যবহার করেছেন তাঁদের আবেদন নিবেদনে, বাদ-প্রতিবাদে, সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যে। এই বৈদেশিক ভাষায় ভারতবাসী এক আশ্চর্য সাবলীলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও জবাহরলাল নেহরু। এঁরা সকলেই ইংরাজী ভাষায় শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর বাদসার আমলে চার শতাব্দী আগে প্রথম জেমসের আমলে যে-ইংরাজ এদেশে এসেছিলেন এবং কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির অনুমতি লাভ করে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, সমগ্র জাতির রাষ্ট্র-নৈতিক অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাঁরাই আবার একদিন 'হে বন্ধু বিদায়' বলে ভারত ত্যাগ করে গেছেন। উভয়-পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল প্রীতি-মধুর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শাসক-গোষ্ঠী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর মানুষ ভারতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়েছেন এবং ভারত-আত্মার মর্মবাণী উপলব্ধীর জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদল দেশ গঠনেও সহায়তা করেছেন একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন্য। উইলিয়ম জোন্স, হেনরী কোলব্রুক এবং ডানকান প্রভৃতির মত প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদরা ছিলেন আবার হিউম, বার্ক এবং ক্রীপসের মত সহানুভূতিশীল রাজনীতিক ও সংস্কারক, ঐতিহাসিক, ধর্মপ্রচারক, চিত্রশিল্পী এবং লেখকবৃন্দ, বিশেষতঃ কবি ও ঔপন্যাসিকের দল ভারতের আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেছেন, তাঁদের অনেকের কাছে হয়ত ভারত-বর্ষ রহস্যময়পুরী এবং নানাবিধ আভ্যন্তরীণ চক্রান্তে পূর্ণ মন হয়েছে, তবু তাঁদের আগ্রহ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ঘনিষ্ট এবং উৎকৃষ্ট অনুশীলনের ধারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট এবং গভীরতর বোধ লাভ করেছেন, তার ফলে এই সব সাহিত্যিকের উপন্যাস প্রভৃতি ক্রমশঃ মানবিক আবেদনসম্পন্ন এবং বিদ্বেষবিহীন হয়ে উঠেছে।

ই, এম, ফরষ্টার রচিত "এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া" এই জাতীয় প্রগতিমূলক উপন্যাসাদির গোড়ার যুগের গ্রন্থ, তারপর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে আরো কয়েকটি রচিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উৎস ক্ষীণ হয়নি। জন মাসটারস জাতীয় (ইনি কিন্তু আংলো-ইন্ডিয়ান) লেখকবৃন্দ ভারতীয় পটভূমিকায় অনেক কাহিনী লিখে চলেছেন, তাঁদের অনেকগুলি গ্রন্থ সাফল্যলাভ করেছে। এই ধারা, এক হিসাবে একে বাঞ্ছনীয় এবং সুস্থ ধারা বলা যায়, কারণ এই সংযোগহেতু উভয়-দেশকে পরিণামে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতেও পারে। যদিও এই কালে অচ্ছেদ্য বন্ধনের আকস্মিক অবসানও হামেশাই ঘটে থাকে, তবু ভালো ফলটাই সাধারণ মানুষ আশা করে।

এ কথা বলা উচিত যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বা ভারতকে পটভূমি করে লিখিত কাহিনী মাত্রেই উৎকৃষ্ট তা নয়, কয়েক খানির মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা না থাকাই উচিত ছিল, লেখকের অজ্ঞতার পরিচায়ক ইত্যাদি। কিন্তু এর মূলে আছে অতীতের ধারণা, যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। এইসব উপন্যাসে তাই অতীতের ভারতের পট-ভূমিকা, এমনকি কোনো ক্ষেত্রে কয়েক শতাব্দী আগেকার, কিছু আবার অতি-আধুনিককালের। ভারতের রাজনৈতিক জীবন, রাজা মহারাজার বিলাসবহুল জীবন। ওপরতলার সমাজের রঙীন চিত্র, ক্যাডিল্যাককন্টকিত হোটেলে আর হৈ-হৈ-ময় জীবনের চাপে ভারতের হাট-বাজারের চিত্র চাপা পড়ে যায়। তবু মাঝে মাঝে যা পাওয়া যায় তা প্রীতিপদ এবং মনোরম।

এই জাতীয় লেখকদের মধ্যে যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের নাম এডওয়ার্ড টমসন, ডঃ ভেরিয়ার এলুইন, সমরসেট মম, ই, এম, ফরষ্টার, মিস রুমার গডেন এবং জন মাসটারস। ফরষ্টারের মত টমসনের উপন্যাসও রচিত হয়, কয়েক যুগ
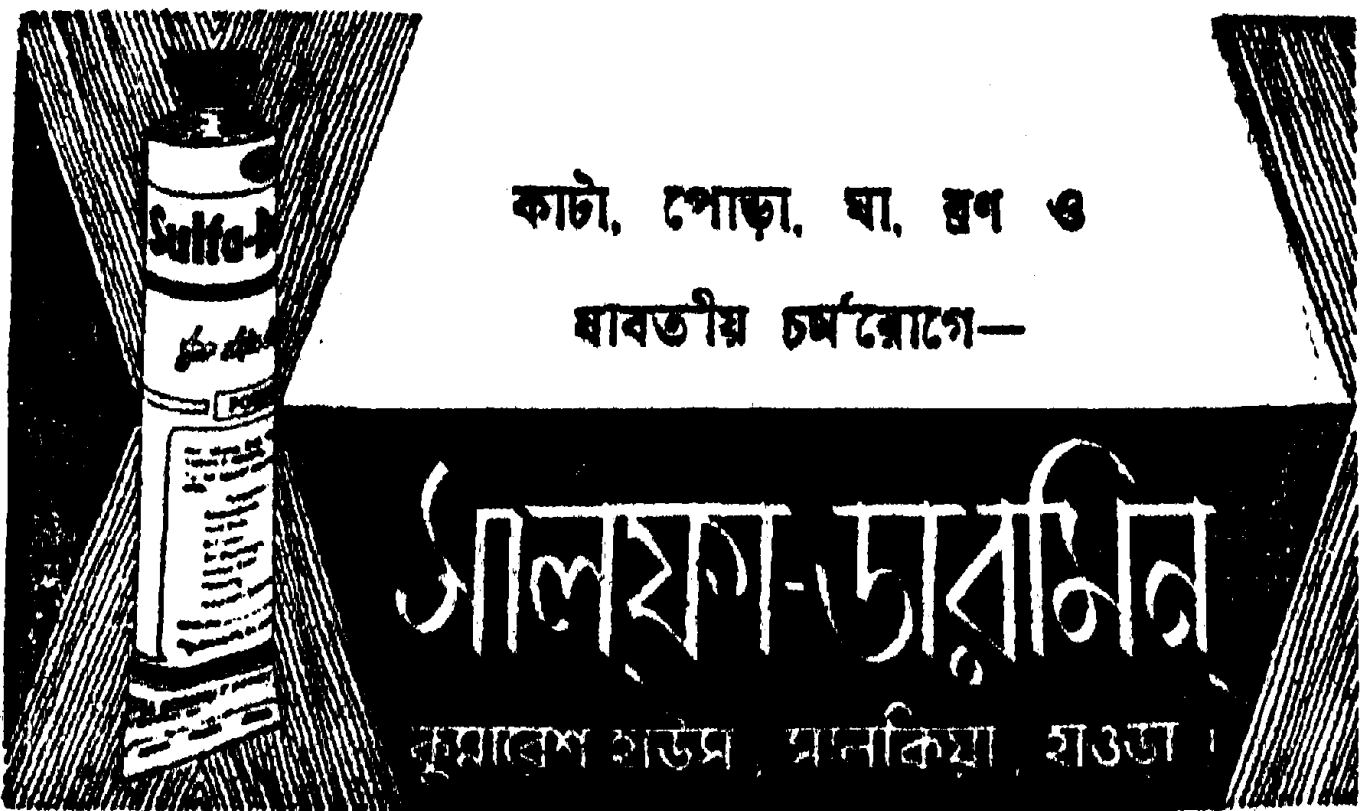
আগে। কিন্তু তাঁর রচিত "ইণ্ডিয়ান ডে", "এন্ড্ অফ্ আওয়ার্স" কিংবা "ফেয়ার ওয়েল টু ইণ্ডিয়া" যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে কি গভীর অনুভূতি নিয়ে তিনি এই গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন।

"এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" ভারতীয় মানসিকতার আর এক পরিচয়। এ ছাড়া বৃটিশরা এদেশে কি জীবনযাপন করেছে, এদেশের আইনগত ও ন্যায়-সংগত রাজনৈতিক অভীপ্সা সম্পর্কে বৃটিশ রাজপুরুষ এবং নাগরিকদের ধারণা। ডঃ আজিজের জ্বালা ও যন্ত্রণা, তাঁকে একটা মিথ্যা অভিযোগে জড়ানো হয়েছিলো, অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে লিখিত। বৃটিশ প্রভুত্ব এবং অহমিকার ফলে নিরপরাধকে কি ভাবে কষ্ট পেতে হয় তার দৃষ্টান্ত এখনো পর্যন্ত এই দিকটি কোনও লেখক এমন নিষ্ঠার ও সততার সঙ্গে তুলে ধরেনি। ফলে এই উপন্যাস চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কিপলিঙের ভারত এবং ফরষ্টারের ভারত দুটি বিভিন্ন দেশ—উভয়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান।

সমর সেট মমের 'রেজর্স এজে' আর এক দিক উদ্ঘাটিত। ভারত-আত্মার অধ্যাত্ম জীবনের মহৎ ঐশ্বর্যের পরিচায়ক কাহিনী 'রেজর্স এজ'। যম মুমুক্ষুদের প্রতি উপদেশ দিয়েছিলেন—উত্থিত হও। বিবিধ বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হও। মোহনিদ্রা ত্যাগ করে জাগরিত হও, আর শ্রেষ্ঠ আচার্যের নিকট উপস্থিত হয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করো। বিবেকবান ব্যক্তিগণ ব্রহ্মলাভের পথকে ক্ষুরধারার ন্যায় শাণিত, দুর্গম এবং দুরত্যয় বলেছেন, কঠোপনিষদের এই সূক্তকেই বিধৃত করেছেন সমর সেট মম কাহিনী মাধ্যমে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মম লিখেছিলেন :

"বহুদিন আগে 'মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স' নামক উপন্যাস রচনা করি, ফরাসী চিত্রকর পল গগার জীবন-কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য। তবে এই উপন্যাসে কল্পনার আশ্রয় নিইনি, (এই উপন্যাসটি 'রেজর্স এজ') যাঁরা এখনও জীবিত অস্বস্তি ও অশান্তির হাত থেকে তাঁদের ত্রাণকল্পে আমি চরিত্রাবলীর কাল্পনিক নাম দিয়ে, সহজে যাতে তাঁদের ধরা না যায়, সেই চেষ্টা করেছি।"

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ কাহিনী-কার সমর সেট মম যে উপন্যাস লিখেছেন তা সর্বকালের যে ভারত—সেই ভারতের মর্মবাণী। অনাদি কাল থেকে যে ধারা অব্যাহতগতিতে প্রবাহিত, সেই ধারার পরিচয় দানের প্রচেষ্টা। এই দিক থেকে টি, এস, এলিয়ট, আলডাস হাক্সলী ও ক্রিসটোফার ইসারউডকে স্মরণ রাখা কর্তব্য। এলিয়ট ও ইসারউড অবশ্য ইংরাজ নন।

ডঃ ভেরিয়ার এলউইন ভারতকেই তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মধ্যভারত, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতির আদিবাসী অঞ্চলে তিনি সুদীর্ঘকাল কাজ করেছেন। তাঁর "এ ক্লাউড দ্যাটস ড্রাগনিস" বা "ফুলমত অব দি হিলস"—ভারতের আর এক প্রান্তে নিয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের 'বস্তার' রাজ্যের আদিবাসী সম্পর্কে সাধারণ ভারতবাসীর জ্ঞান কতটুকু, এদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনধারা, আকর্ষণময় চরিত্র, সমাজশৃঙ্খলা এবং রোমান্টিক জীবনধারা এই সমাজ-বিজ্ঞানী লেখককে মুগ্ধ করেছে, ভালো না বাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না। এই পরম সত্যে এলউইন সাহেব বিশ্বাসী।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের জন মাষ্টারস: তিনি জাতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সেনাবাহিনীতেও কাজ করেছেন, যতদূর মনে হয় উইলিয়ম ম্যাকপীস্ থ্যাকারের মত এই কলকাতা সহরেই জন্মেছিলেন। তাঁর 'ভবানী জংসন' ভারত বিভাগের পটভূমিকায় রচিত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের কাহিনী, কিছু অবাস্তবতা যে নেই তা নয়, তবু অনেকাংশে উপন্যাসটিকে সার্থক বলা যায়। তাঁর 'করোমণ্ডল' অবশ্য আধুনিক কালের কথা নয়, যখন জ্যাসন স্যাভেজ মাউণ্ট মেরুতে রত্ন খনির সন্ধানে এসেছিলেন সেই অতীতের কথা। "লোটাস এ্যাণ্ড দি উইণ্ড" আছে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে এক সম্ভাব্য আক্রমণাশঙ্কার কাহিনী, সেই আক্রমণ অবশ্য সফল হয়নি। আর "নাইট রানার্স অব বেঙ্গল" উপন্যাসে আছে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের কথা।

রুমার গডেনও ভারতে বাস করেছেন, তাঁর 'দি রিভার' নামক উপন্যাসটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অনেকেরই হয়ত পরিচিত। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পও ভারতীয় পটভূমিতে রচিত।

ডঃ সিমেয়নস্ কুষ্ঠ রোগীদের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন, তাদের জন্য শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, মানবিক সহানুভূতিরও যে প্রয়োজন তা তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর "মাস্ক এ্যাণ্ড দি লায়ন" উপন্যাসে এই মহাদেশের এক দর্জি পরিবার কি ভাবে এই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তারই কাহিনী বিধৃত।

ভি, জি স্টোল তাঁর "দি ডোভ ফাউণ্ড নো রেস্ট" নামক উপন্যাসে ভারতবাসীর ব্যথা ও বেদনার অংশ-ভাগী হয়েছেন। রয় ফষ্টার তাঁর "দি ফ্লুট অব অশোকে" জাপানী ও জার্মাণীর সহযোগে কয়েকজন ভারতীয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী লিখেছেন, আর 'ইণ্ডিগো' নামক উপন্যাসের লেখিকা ক্রিষ্টিন ওয়েষ্টন লিখেছেন কাল্পনিক শহর কথকপুরের সুগভীর চক্রান্তকাহিনী "দি ওয়াল্ড ইস্ত্রীজ" নামক উপন্যাসে। এই লেখিকাও ভারতে শিশুকাল থেকে বাস করে গেছেন।

ইংরাজ লেখক-লেখিকাদের ভারতীয় পটভূমিতে রচিত এই কাহিনীগুলি সাহিত্য রসিকদের পড়া উচিত, যাঁরা বিদেশী উপন্যাস অনুবাদে আগ্রহান্বিত তাঁরা এই সব উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে একথা নিসংশয়ে বলা যায়।

নতুন বই

জাতক নিদান— শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু কর্তৃক মূল পালি থেকে অনূদিত। প্রকাশক : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার— ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২.৫০ নয়াপয়সা।

পালি ভাষায় শাক্য-গৌতমের যে জীবনকথা পাওয়া যায় তাকে মূল হিসাবে ব্যবহার করে শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু বাংলায় সেইগুলি অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমান অনুবাদক সংস্কৃত বুদ্ধচরিত এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায় মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর নামক প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে 'জাতক-নিদান' অনুবাদ করে ধর্মপাল ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধদেবের মহাজীবনকথা বাঙালী পাঠকের কাছে সহজলভ্য করেছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থ বৌদ্ধ-সমাজ ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্য পাঠকের কাছেও মূল্যবান।

রবীন্দ্র-সংগীত সাধনা— সুবিনয় রায়। গীতবীথি ।। ১৯৫বি মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭।। মূল্য চার টাকা।।

রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে ইদানীং কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্র-সংগীতের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক দিকের আলোচনাকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত চর্চাপদ্ধতি ও আদর্শকে শিল্পী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য লেখক পরিবেশন করেছেন। তানপুরা ব্যবহার, রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী, যন্ত্র-সংগীত সহযোগিতা এবং রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি এই চারটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। শেষ পরিচ্ছেদে আকার-মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির নিয়মাবলী ও সাংকেতিক চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাছে বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী অধ্যায়টিও সুলিখিত। রবীন্দ্র-সংগীতের অনুশীলনে গ্রন্থটি সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন প্যালেস্টাইন—(ইতিহাস)— শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম ছয় টাকা।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙলাদেশের উজ্জ্বল ঐতিহাসিক। তিনি যে কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস রচনায় সমগ্র জাতীয় চেতনাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তা প্রাচীন বা বর্তমান যে কালেরই হোক না কেন। ইতোপূর্বে তাঁর রচিত 'প্রাচীন ইরাক', 'প্রাচীন মিশর', 'মহাচীনের ইতিকথা' প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ সত্যকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করেন তিনি।

'প্রাচীন প্যালেস্টাইন' তাঁর রচিত পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির অসাধারণত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, উপাখ্যান, ধর্ম, দর্শন কেমনভাবে একটি সমগ্র জাতির পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলে বর্তমান গ্রন্থপাঠে তা উপলব্ধি করা যায়। আব্রাহামের আগমন —মোজেসের জীবনকথা থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইনের রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির বর্ণনায় গ্রন্থকারের অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। জটিল জীবনকথাকে যে মনোগ্রাহীরূপে বর্ণনা করা যায় তা এই অধ্যায়গুলির আলোচনায় ও উপাখ্যান পর্যায়ে নানাবিধ কাহিনীর মধ্যে সুস্পষ্ট। ইহুদিদের বিচিত্র জীবন-কথা— মাতৃভূমিবিচ্যুত জাতির দেশ-বিদেশে অসহায় অবস্থায় দিন কাটান— নানাবিধ বিরুদ্ধশক্তির প্রতিকূলতা— বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম— পরিশেষে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা গ্রন্থকারের সুনিপুণ বর্ণনা-ভঙ্গিমায় জীবন্ত। এ সমস্ত বর্ণনায় আবেগের প্রাধান্য না দিয়ে যুক্তিতর্কের পথ দিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। ইহুদি-সভ্যতার সামগ্রিক বিবর্তনধারার এমন প্রাণবন্ত ও তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থরচনা বাঙলা ভাষায় হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্যে শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন তা বাঙলা সাহিত্য ও ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করবে তেমনি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনায় নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে। সমগ্র বিশ্ব ইতিহাস তাঁর কঠোর পরিশ্রমে এমন উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠুক এই কামনা করি।

সদ্ধর্ম রত্নমালা— শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু ত্রিপিটক বিশারদ সংকলিত। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ত্রিপিটক এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত 'সদ্ধর্ম রত্নমালা' বৌদ্ধ নিত্যকর্ম পদ্ধতি জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বন্দনা, পূজা, দান, চীবর দান, ত্রিশরণ কথা, শীল পরিচিতি, প্রব্রজ্যা কাহিনী, ভাবনা-কথা, গৃহীদের কর্তব্য, আবাহ বিবাহপদ্ধতি এবং পরিত্রাণ কথা। গ্রন্থটির প্রারম্ভে "দুল্লভঞ্চ মনুস্সত্তং" এই প্রসঙ্গ দিয়ে গ্রন্থটির সূত্রপাত, মানবজনম দুর্লভ তাই বুদ্ধদেব প্রবর্তিত মার্গ অনুসরণ করলে বৃহত্তম সুখলাভ সম্ভব এই বক্তব্য। গ্রন্থটি বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রকাশন।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্র নিয়ে যে আমোদ-প্রমোদের জগৎ, তাই নিয়েই আমাদের "প্রেক্ষাগৃহ"। এবং এতদিন পর্যন্ত আমরা সাধ্যমত সেই জগতেরই খবরাখবর দিয়ে ও সেই জগতের বিভিন্ন সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা ক'রে আমাদের কর্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সহসা জাতির জীবনে এমন এক দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে, যখন রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের আলোককে এবং চিত্রগৃহের সম্মুখভাগের চিত্র-বিচিত্র আলোকোজ্জ্বল শোভাকে আমাদের চক্ষুপীড়াদায়ক ব'লেই মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে, প্রমোদ জগতের বহুতর কাহিনীকে মসী দ্বারা রূপায়িত করবার চেষ্টাকে কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রেখে অসিকে শত্রুরক্তে রঞ্জিত করবার জন্যে সেই সীমান্ত প্রদেশে ছুটে যাই, যেখানে আমাদের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবার জন্যে চৈনিক বর্বরতা উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে। এডমণ্ড বার্ক বলেছেন public calamity is a mighty leveller (সাধারণ বিপদ একটি প্রকাণ্ড সমতাসাধক)। আজ ভারতের উত্তর সীমানা বলপ্রয়োগে অতিক্রম ক'রে ক্ষমতালোলুপ চীন আমাদের দেশকে যে জাতীয় সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মধ্যে কে রাজনৈতিক, কে ব্যবসায়ী, কেই বা চিকিৎসক, আর কেই বা সাহিত্যিক, কে বিচারক এবং কেই বা শিল্পী—এ-কথা মনে রাখতে পারছি না; মনে জাগছে, আমরা প্রত্যেকেই ভারতবাসী এবং আমাদের সম্মানকে আজ ধুলোয় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে একদা-বন্ধুর-মুখোসধারী প্রতিবেশী লাল চীন।

আজ সারা ভারত বিক্ষুব্ধ, উদ্বেলিত। জাতি আজ শত্রুপ্রচেষ্টাকে প্রতিহত করবার জন্যে একাগ্র। কাতারে কাতারে ভারতীয় যুবক এগিয়ে আসছে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে; আহত সৈন্য-দের চিকিৎসাকে সহজতর করবার জন্যে সুস্থ মানুষ আজ রক্তদান করতে হাসপাতালে জমায়েত হচ্ছে; যুদ্ধের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে অস্ত্রাদি আনাবার বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থানের জন্যে দেশের মায়েরা অকাতরে স্বর্ণদান ক'রে নিরাভরণা হচ্ছেন, প্রাসাদবাসী ধনপতি থেকে রাজপথে ভূমিশয্যাগ্রহণকারী ভিক্ষাজীবী পর্যন্ত অর্থদান করছেন সাধ্যাতীতভাবে। স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার জন্যে কারুর কাছেই কোনো কিছুই অদেয় থাকতে পারে না; বিশেষ ক'রে দু'শতাব্দীকাল পরাধীন থাকবার পরে যে-স্বাধীনতার স্বাদ ভারতবাসী মাত্র কয়েক বছর উপভোগ করছে, তাকে সে কোনোক্রমেই লাঞ্ছিত দেখতে প্রস্তুত নয়।

সদ্যমুক্ত রেনেসাঁস ফিল্মস্-এর "ঢেউ-এর পরে ঢেউ" চিত্রের একটি মধুর মুহূর্তে শম্পা (নায়িকা) ও শংকর (নায়ক)।

এর আগেও ভারত নিজেকে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়েছে; এই কলকাতার বুকেই শত্রু-বিমান বোমা নিক্ষেপ করেছে কয়েক দিন। নিশীথ নগরীর নিষ্প্রদীপ রাজপথে সতর্কীকরণের সাইরেণ জনচিত্তে যে-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলত, তার স্মৃতি সহজে মুছে ফেলবার নয়। এবং সে-যুদ্ধেও ভারতীয় সৈন্য বিভিন্ন রণাঙ্গনে তার শৌর্যবীর্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু সে-যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের প্রকৃতিগত প্রভেদ কি বিরাট! তখন পরাধীন ভারত তার বিদেশী শাসকের স্বার্থরক্ষায় নিজেকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু আজ! আজ স্বাধীন ভারত তার উত্তর সীমান্তে হানাদার শত্রুর সঙ্গে মোকা-বিলা করতে ব্যস্ত; শত্রুকবলিত সীমান্ত প্রদেশ যতদিন পর্যন্ত না পুনরুদ্ধার করা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই।

তাই আমাদের প্রমোদসূচীতেও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আজ জাতির প্রয়োজনে নাটকাভিনয়ে এবং চলচ্চিত্রে এমন বিষয়বস্তুরও অবতারণা করতে হবে, যা দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে রণোন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে,

আপামর জনসাধারণকে নতুন ক'রে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। মনে রাখতে হবে, আজ সমগ্র জাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে—স্বাধীন ভারত আজ চীনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নরনারীনির্বিশেষে সকলকেই আজ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাড়া দিতে হবে। এমন নাটক আজ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোক, এমন চলচ্চিত্র আজ আমাদের চিত্রগৃহগুলিতে প্রদর্শিত হোক, যা প্রতিটি দর্শককে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেবে, স্বাধীন ভারতের মর্যাদা-রক্ষা-প্রচেষ্টায় সেও একজন অংশীদার, সামগ্রিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তারও রয়েছে কর্তব্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচনের জন্যে একদিন বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়-গুলি যে-ভাবে জাতীয় ভাবোদ্দীপক দেশাত্মবোধক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ক'রে জাতির ধন্যবাদভাজন হয়েছিল, আজ আবার তাদের ডাক এসেছে জাতিকে আত্মসচেতন করবার প্রচেষ্টায় নবভাবে নাট্যার্ঘ সাজাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্যে। পরাধীন ভারতে আমাদের চলচ্চিত্র দেশে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগাবার জন্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেনি বহু রকম প্রতিবন্ধকের দরুণ; কিন্তু আজকের স্বাধীন ভারতে জনসাধারণকে কর্তব্যসচেতন ও স্বাধীনতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে কোনো বাধাই যখন নেই, তখন চলচ্চিত্রজগতকে আজ সেই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। এমন কাহিনী আজ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন, যা দেখে দর্শক বুঝবে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে-কোনো দুঃখকষ্ট বরণ করা যায়, যে-কোনো ত্যাগস্বীকার করা যায়, সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণকে বলি দেওয়া যায়।

চিত্র সমালোচনা
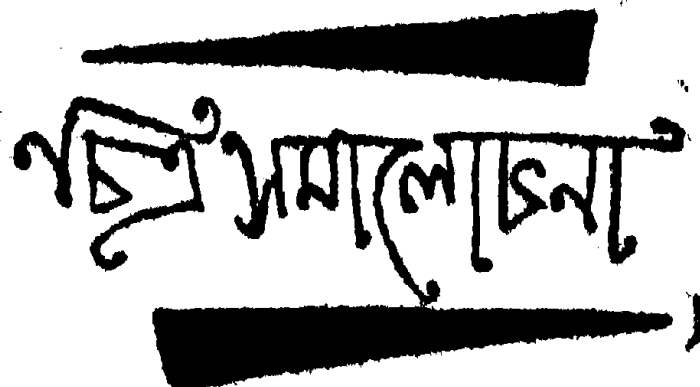
দাদাঠাকুর (বাঙলা): জালান প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১৩,৯৮৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা: শ্যামলাল জালান; কাহিনী: নলিনীকান্ত সরকার; চিত্রনাট্য এবং পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কাহিনী: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা: সুধীর মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা: হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম, শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত (দা'ঠাকুর) ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ: বিভূতি চক্রবর্তী; শব্দ-ধারণ: সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতগ্রহণ: শ্যামসুন্দর ঘোষ; আবহ-সঙ্গীত ও পুনঃ শব্দ-যোজনা: সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা: বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা: সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ণ: ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, সুলতা চৌধুরী, ছায়া দেবী, সীতা দেবী, আশা প্রভৃতি। জালান ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৯ই নভেম্বর থেকে মিনার, ছবিঘর, বিজলী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বিদেশের চলচ্চিত্রে জীবিত মানুষের জীবনী নিয়ে একাধিক ছবি তৈরী হয়েছে; এই সেদিনও "জর্জ র‍্যাফট্ স্টোরী" আমরা প্রত্যক্ষ করলুম। কিন্তু সে-সব ছবি যাঁদের নিয়ে, তাঁরা প্রত্যেকেই দেশবিখ্যাত, এমন কি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ, ধৈর্য প্রভৃতির পরিচয় দিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কোনও জীবিত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র রচিত হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। মনে হয়, "দাদাঠাকুর"-ই বাঙলা, তথা ভারতের প্রথম ছবি, যা একজন জীবিত ব্যক্তির জীবনকথা অবলম্বন ক'রে নির্মিত হয়েছে। এবং তাও এমন একজন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ব্যক্তির জীবনালেখ্য, যাঁর নাম পর্যন্ত আজকের দিনের সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বহু সম্ভ্রান্ত সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বরেণ্য জন-নেতাদের কাছেও একান্ত অজানা।

কিন্তু "বিদূষক"-সম্পাদক, এডিটার, লেখক, কম্পোজিটর, প্রুফ-রীডার, প্রিন্টার এবং হকার, সেই নাতিদীর্ঘ শুভ্রকান্তি, নগ্নগাত্রে শুভ্র যজ্ঞোপবীত-ধারী, সগুম্ফবদন সহাস্যময়, নির্ভীক, তেজস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দা'ঠাকুরকে আমরা দিনের পর দিন দেখেছি, তাঁর প্রতি মুহূর্তে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সরস প্রত্যুত্তর—ইংরেজীতে যাকে বলে রেপার্টি শুনে হেসেছি এবং দেখে বিস্মিত হয়েছি দারিদ্র্যকে কি আশ্চর্য সহজে তিনি তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তাকে একটি মর্যাদার কৌলীন্য দান করেছেন। আজ দা'ঠাকুরের বয়স নিশ্চয়ই আশীর ওপরে, কিন্তু তিনি আজও সেই দা'ঠাকুর, সেই রকমই 'সতেজ সরল সরস রসিকার জীবন্ত প্রতিমূর্তি'। কাজী নজরুল ইসলাম বোধ করি এ'কে দেখেই লিখেছিলেন, "হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান"।

এত কথার পরেও প্রশ্ন উঠতে পারে, চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার মত এমন কি উপাদান আছে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনে।

আছে—যথেষ্টই আছে। একমাত্র রাণী ভবানী প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা ছাড়া যে-নির্লোভ ব্যক্তি জীবনে কোনোকিছুর জন্যেই কারুর স্বারস্থ হননি, ইংরাজ গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে থেকে শুরু ক'রে লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি পদস্থ দেশবরেণ্য ব্যক্তির সানুগ্রহ সখ্য, সুপারিশ এবং আর্থিক দানকে অকাতরে

প্রত্যাখ্যান ক'রে স্বাবলম্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, জীবনে সুখ-দুঃখ কোনো কিছুকেই গায়ে না মেখে নিজের দৈনন্দিন কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, ধনীর ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজের জিদকে বজায় রেখেছেন এবং দেশের মুক্তি-আন্দোলনকারীদের বহু রকমে সাহায্য ক'রে গৌরববোধ করেছেন, বৈষয়িক দিক থেকে সেই অতি-সাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ জীবন-কথা আজকের খোলসসর্বস্ব সভ্য বাঙালী সমাজের সামনে চলচ্চিত্রের মারফৎ তুলে ধরা যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা 'দাদাঠাকুর'-ছবিটিকে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না ক'রলে বুঝতে পারা যাবে না। বিশেষ ক'রে দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমরা যেন এমনই একখানি ছবির প্রতীক্ষায় ছিলুম।

দা'ঠাকুরের সহকর্মী এবং অনুগত ভক্ত নলিনীকান্ত সরকার রচিত জীবন-কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে হয়ত কোথাও কোথাও বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু ছবিখানির মধ্যে দা'ঠাকুর থেকে শুরু ক'রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যে অগণিত বাস্তব চরিত্রের সমাবেশ সাধন করা হয়েছে, তাদের কারুরই চরিত্র অণুমাত্রও ক্ষুন্ন হয়েছে ব'লে মনে করতে পারছি না। এমন কি, গুরুসদয় দত্ত, লালগোলার মহারাজ, নির্মলচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ আমাদের চোখে-দেখা চরিত্রগুলিকে যখন পর্দার ওপর উপস্থাপিত হ'তে দেখেছি, তখন তাদের সান্নিধ্য অনুভব ক'রে সেই যুগে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও ফিরে যেতে আমাদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি। চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়কে এইজন্যে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় এমনই নিষ্ঠা ও দরদের সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন যে, 'দাদাঠাকুর' অনায়াসেই তাঁর পরিচালক-জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি ব'লে পরিগণিত হবে। পরলোকগত ছবি বিশ্বাসের মৃণ্ময় মূর্তির সঙ্গে নেপথ্য থেকে তাঁর প্রশস্তিজ্ঞাপন ক'রে তাঁরই নামে ছবিখানিকে উৎসর্গ করা থেকে শুরু ক'রে দা'ঠাকুর-রূপী ছবিবাবুর পর্বতজোড়া মুখ দিয়ে শহীদ দর্পনারায়ণের প্রশস্তিজ্ঞাপনে ছবির শেষ

বিনু বর্ধন পরিচালিত আর ডি বনশালের 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে কালী ব্যানার্জি ও তন্দ্রা বর্মন।

পর্যন্ত কাহিনীটিকে উত্তরোত্তর দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী ক'রে যে-ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে পরিচালকের উচ্চ-প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

ছবিটির চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ এবং শিল্প-নির্দেশনায় সর্বত্র একটি উচ্চ মান বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্পাদনার চাতুর্য ছবিখানিকে একটি বিশিষ্ট সুরে বেঁধে তাকে সুন্দরভাবে গতিশীল রেখেছে। ছবিটির পরিচয়-লিপিগুলি অত্যন্ত মার্জিত রুচিপূর্ণ নূতনত্বের পরিচায়ক।

ছবিতে আটখানি গান আছে। তার মধ্যে তিনখানি নতুন, বাকীগুলি আগেকার রচনা। ভোটের দু'খানি গান, কল্‌কাতার ভুল এবং বোতলপুরাণ দাঠাকুরের নিজের রচনা। নলিনীকান্ত সরকারের গাওয়া 'কলকাতার ভুল' গানের রেকর্ড একদিন কল্‌কাতার ঘরে ঘরে বাজত। নজরুল রচিত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কাজীর নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে সেকালের রাজনৈতিক সভা-সমিতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করত। ছবির সকল গানই সুরসমৃদ্ধ, সুগীত ও সুপ্রযোজিত; তবে 'দুর্গম গিরি' গানটিতে যেন তীব্র মাদকতার কিছু অভাব দেখলুম। আবহ-সংগীত ছবির বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে।

জানি না, ছবি বিশ্বাস অভিনীত আর কোনো ছবি এখনও মুক্তি পেতে বাকী আছে কিনা; কিন্তু 'দাদাঠাকুর'-এর চরিত্র-চিত্রণে তাঁর অভিনেতৃ-জীবনের স্মরণীয় অভিনয়গুলির মধ্যে বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য। মাত্র আকৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি চরিত্রটির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে এমন আশ্চর্যরূপে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর অভিনয়কে একটি অনবদ্য সৃষ্টি না ব'লে পারি না। এর পরেই যে-চরিত্রটি আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, সেটি হচ্ছে বিশ্বজিৎ অভিনীত দর্পনারায়ণ। একটি লম্পট জমিদারপুত্র থেকে অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরূপে শহীদত্ব বরণ করার মধ্যে যে সুনিশ্চিত মানসিক ও মানবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, তার প্রতিটি পর্যায় তাঁর অভিনয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। বিশ্বজিতের জীবনে এখনও পর্যন্ত এইটিই শ্রেষ্ঠতম অভিনয়। নলিনীরূপে তরুণকুমার এবং কার্তিক ফুলুরিওয়ালারূপে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয়ে অনায়াসেই দর্শক-হৃদয় জয় করেছেন। চমৎকার উপস্থাপনার গুণে ছায়া দেবী অভিনীত দা'ঠাকুর-গৃহিণীর চরিত্রটি মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রথমে নিগৃহীতা এবং পরে দেশসেবিকা লতার ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী অভিনয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেননি; কিন্তু তাঁর মুখ-চোখে আর একটু ভাবের প্রকাশ দেখতে পাবার আশা করেছিলুম। এ ছাড়া আরও যে অসংখ্য চরিত্র ছবিখানিতে ভীড় ক'রে আছে, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সুঅভিনীত।

'দাদাঠাকুর' বাঙলা চিত্রজগতে একটি গৌরবান্বিত সংযোজন।

ঢেউ এর পরে ঢেউ (বাঙলা) ঃ রেনেসাঁস ফিল্মস্-এর নিবেদন; ৩২৯৮ মিটার দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ মাণিক দত্তগুপ্ত; কাহিনী ঃ লর্ড টেনিসন-এর 'এনক-আর্ডেন'-কাব্যগীতিকার ছায়া; চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল, স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতা; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ রবিশঙ্কর; চিত্রগ্রহণ ঃ ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল; শব্দানুলেখন ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা ঃ গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ ঃ শঙ্কর, বাদল, শৈলেন দে, অনিল দত্ত, গাঙ্গুলী মশাই, সুকুমার গুহ, শম্পা মিত্র প্রভৃতি। এম্ জি, ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৯ই নভেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ, লোটাস, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কলেজ-জীবনে টেনিসনের 'এনক-আর্ডেন' কাব্য-গীতিকা মনকে দিয়েছিল এক অভিনব দোলা। একটি মেয়েকে মাঝে রেখে এনক আর্ডেন এবং ফিলিপ রে-র প্রেমের দুই বিপরীতধর্মী অভিব্যক্তির কাহিনী প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। দুরন্ত সাহসী এনক আর্ডেন তার স্ত্রী ও সন্তানদের সুখীজীবন কামনার যে-দিন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দশ বছরের মধ্যে আর ফিরল না, অ্যানি লীর দুর্দশার চরম অবস্থা উপস্থিত হ'ল, তখন ধনীর সন্তান, স্বভাবতঃ মুখচোরা ফিলিপ রে এল ওদের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে। একদিন সে অ্যানি লীকে মনে মনে ভালোবেসেছিল; কিন্তু যেদিন এনক-আর্ডেন তার সোচ্চার প্রেম নিবেদন ক'রে অ্যানিকে নিজের জীবনসঙ্গিনী ক'রে

নিলে, সেদিন সে তার মনের নিভৃত কোণের গোপন বাসনাকে প্রকাশ না ক'রে তার যে-ভদ্র পরিচয় দিয়েছিল, সেই ভদ্রমনই তাকে তার বন্ধু-পত্নীর বিপদে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু যেদিন তার মনে হ'ল, তার বন্ধু নিশ্চয়ই আর ইহজগতে নেই, অথচ তারই জন্যে মিথ্যা আশায় অ্যানি নিজের জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে, সেদিন সে নিজের মনকে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারেনি। অ্যানি প্রথমটা হয়েছিল চকিত, পরে যথেষ্ট সময় নিয়ে যখন সে এনক-আর্ডেনের সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিল, তখন ফিলিপ রে-র হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রতে তার বাধেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এনক-আর্ডেন ফিরে এসেছিল এবং অ্যানি-ফিলিপের মিলিত জীবনযাত্রা দেখে ব্যথিত হয়েও সে ওদের ওপর রাগ করতে পারেনি; বরং অ্যানির সুখের জন্যে ফিলিপ এবং ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে নিজেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের কাছে অজ্ঞাতই রেখেছিল এবং মৃত্যুকালে তার আশ্রয়দাত্রীকে তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে অনুরোধ করেছিল, আর যেই জানুক না কেন, অ্যানি যেন তার পরিচয় না জানতে পারে; তা নইলে সে তার মৃতদেহ দেখে ব্যথা পাবে।

এই কাব্য-গীতিকাকে প্রায় হুবহু বাঙলা চিত্ররূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন রেনেসাঁস ফিল্মস। দীঘার সমুদ্রতট ও তার বেলাভূমির পটভূমিকায় এই কাব্যকে চিত্রায়িত করবার যে-সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন চিত্রশিল্পীরূপে ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল। বিস্তীর্ণ জলরাশি, সফেন সমুদ্রতরঙ্গ, বালুময় বেলাভূমি, আলোছায়ায় ঘেরা বনপথ, দীর্ঘ আন্দোলিত তরুরাজির বিচিত্র সচল দোলায়মান ছায়া—এ-সবই অতি সুন্দরভাবে গৃহীত হয়েছে এবং চিত্রটিকে একটি সাদা-কালোয় আঁকা শিল্পসুষমা দান করেছে। এ দিক দিয়ে 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' ছবিখানি একটি অনাস্বাদিতপূর্ব নূতনত্বের দাবি করতে পারে অনায়াসেই।

কিন্তু মূল গল্পের বাঙলা রূপান্তরে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। টেনিসনের বর্ণনাচাতুর্যে যে-সব দৃশ্য বা ঘটনা ওদেশের পক্ষে অবলীলাক্রমে সহজগ্রাহ্য ছিল, গল্পের দৃশ্য-সংস্থাপনায় এবং বিশেষ ক'রে সংলাপ রচনায় যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে এবং বাঙালীর জীবনযাত্রার বিপরীত-ধর্মিতা প্রকাশ পাওয়ায় সেই সব ঘটনাই অসম্ভাব্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে। কাজেই নবাগত শিল্পীদের অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ

বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "স্বর্ণচোরা" চিত্রের একটি দৃশ্যে হরিধন মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসু।

অভিনয়ও লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোতে পারেনি। বিশেষ ক'রে বাদল অভিনীত লোটন চরিত্রটিকে—যে-চরিত্রটি মূলে একটি অসামান্য নায়কের পদাভিষিক্ত হয়েছে, সেই মহৎ চরিত্রটিকে আমরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। এমন কি শংকরের সাহসিকতা এবং বলিষ্ঠ পৌরুষ উপস্থাপনার দুর্বলতায় পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারেনি।

কুশলী ও শিল্পিবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টা হিসেবে 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' আমাদের সহানুভূতি লাভের যোগ্য।

রাখী (হিন্দী) : প্রভুরাম পিকচার্স-এর নিবেদন; ১৩,৮২১ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ: প্রযোজনা : শিবাজী গণেশান; কাহিনী : কে, পি, কোট্টারাক্কারা; সংলাপ ও গীত-রচনা : রাজেন্দ্র কৃষণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : এ, ভীম সিং; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি; চিত্রগ্রহণ : জি, ভিট্টল রাও; শব্দধারণ : এ, ভেঙ্কটচলম ও এ, বিশ্বনাথন্; সম্পাদনা-তত্ত্বাবধান : এ, ভীম সিং; সম্পাদনা : পল্ ডোরাইসিংহম্ ও কে, থিরুমালাই; শিল্প-নির্দেশনা : গঙ্গা; রূপায়ণ : অশোককুমার, প্রদীপকুমার, মেহমুদ, রাজ মেহেরা, রণধীর, শিবরাজ, মোহন চটি, ওয়াহীদা রেহমান, অমিতা, মালকা, ললিতা পাওয়ার প্রভৃতি। মিউজিক্যাল ফিল্মস্ (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ৯ই নভেম্বর থেকে সোসাইটি, কৃষ্ণা, দর্পণা, প্রিয়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

রাজু এবং রাধা—দুই ভাইবোন, দুজনের জন্যেই দুজন যথাসর্বস্ব পণ করতে পারে। তাই রাধা যেদিন আনন্দকে ভালোবাসল, সেদিন রাজু নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধাকে তারই হাতে সমর্পণ করতে দ্বিধা করল না। কিন্তু গোল বাধাল আনন্দর বড় বোন; তার মুখর কোপন স্বভাব রাজুকে অন্যত্র যেতে বাধ্য করল। রাজুর স্ত্রী মালতী যখন সন্তান-প্রসবের সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে রাজুকে শোকার্ত ক'রে তুলল, ঠিক সেই সময়েই রাধার কাছ থেকে সম্পত্তি

জাওলা প্রোডাকশনের 'দুই বোন' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নির্মলকুমার

বিভাগের দাবী এসে উপস্থিত। রাজু ক্ষোভে দুঃখে দেশত্যাগী হ'ল। কিন্তু কোথাও তার স্বস্তি নেই। প্রাণসমা ভগ্নী রাধার জন্যে তার প্রাণ নিয়তই কাঁদে। তাই দৈবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে সে যেদিন বাড়ীর কাছাকাছি এসে একটি শিশুকে মোটর দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের চোখ হারাল, সেদিন রাধাও জানল, তারই ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে তার দাদা তারই কাছে ফিরে এসেছে এবং দিনটাও রাখীপূর্ণিমা—যেদিনে বোন ভাইয়ের হাতে রাখী বে'ধে স্নেহের সম্বন্ধকে দৃঢ় করে।

এই ঘটনাবহুল কাহিনীকে দর্শক-মনোরম ক'রে তোলবার জন্যে মাদ্রাজের সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা শিবাজী গণেশান্ প্রযোজক হিসেবে শিল্পী-সমন্বয় থেকে শুরু ক'রে জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট, নৃত্য-গীত, রোমহর্ষক ঘটনা-সমাবেশ এবং কৌতুকদৃশ্যের অবতারণা পর্যন্ত কোনোরকম অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেননি। শিল্পীদের মধ্যে রাজুর ভূমিকায় অশোককুমার তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। রাধারূপে ওয়াহীদা রেহমানও নৃত্য-গীত-অভিনয়ে নিজ ভূমিকাটির প্রতি সুবিচার করেছেন। আনন্দের ভূমিকায় প্রদীপকুমারও প্রশংসার দাবী করতে পারেন। কিন্তু দর্শকরা সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন আনন্দের ভাগ্নের ভূমিকায় মেহমুদের অনবদ্য কৌতুকাভিনয়ে। অপরাপর ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার, অমিতা, মোহন চোট্টি, রণধীর, রাজমেহরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের কাজ সব দিক দিয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভের যোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

এম কে জি-র "রক্তপলাশ" :

আজ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর এম-কে-জি প্রোডাকসন্স-এর রহস্যঘন চিত্র "রক্তপলাশ" রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কালিকা ফিল্মস্ পরিবেশিত এই অভিনব রোমাঞ্চ চিত্রটির পরিচালনা ও সুরসৃষ্টি করেছেন যথাক্রমে পিনাকী মুখোপাধ্যায় এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এবং বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে

এম কে জির 'রক্তপলাশ' চিত্রে উৎপল, দীপক, অনাদি এবং জনৈক অভিনেতা

পাওয়া যাবে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জহর রায়, ছায়াদেবী, রেণুকা রায় প্রভৃতি শিল্পীকে। নবাগত বালক-অভিনেতা মাস্টার বাসুদেব এবং ল্যাসি নামে একটি কুকুর নাকি এই ছবিখানির বিশেষ আকর্ষণ। ছবিখানি "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ :

পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক রাসবিহারী সরকার জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং অর্থমন্ত্রী মাননীয় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

"সেতু"র বিশেষ অভিনয় :

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-দানের উদ্দেশ্যে আজ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে "সেতু" নাটকের একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ঐ তহবিলে দেওয়া হবে।

।। "রূপান্তরী"র নতুন নাটক ।।

আগামী ১৮ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটার হলে রূপান্তরী গোষ্ঠী তাদেরই সদস্য জগদীশ চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত নতুন নাটক "প্রতিনিধি" মঞ্চস্থ করবেন।

এলিটে "অ্যাডভেঞ্চার অব এ ইয়াং ম্যান" :

আজ শুক্রবার, ১৬ই নভেম্বর থেকে এলিট সিনেমায় হেমিংওয়ের 'অ্যাডভেঞ্চার অব এ ইয়াং ম্যান' দেখানো হবে। প্রধান ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছেন রিচার্ড বেমার, ডায়ানা বেকার এবং পল নিউম্যান।

।। জার্মানীর ভ্রাম্যমান নাট্য সংস্থা ।।

একটি জার্মান নাট্য সংস্থা সম্প্রতি এশিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গত ৩রা এবং ৪ঠা নভেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবনে উক্ত দলটি একটি পূর্ণাঙ্গ এবং দুটি একাংকিকা মঞ্চস্থ করেন। দলটির নাম 'সেতু'। জার্মানীর সঙ্গে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের জন্যেই এই দলটি প্রায়শঃই ভ্রাম্যমাণ। 'সেতু' নাট্য সম্প্রদায় ইতিপূর্বেই দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং সমগ্র ইয়োরোপ সফর শেষ করেছেন। ম্যাক্সমুলার ভবনে প্রথমদিন এ'রা দু'ঘন্টার একটি নাটক 'ডু ইউ নো দি মিল্কি ওয়ে' অভিনয় করেন। নাটকটি দু'ঘন্টার হলেও মাত্র দুজন অভিনেতা এই নাটকে অভিনয় করেছেন। দ্বিতীয়দিন এই দলটি দুটি কৌতুক নাটক মঞ্চস্থ করেন তার মধ্যে একটি হল গোটের 'দি গিল্টি' এবং অপরটি 'দি প্রোপোজাল'। তিনটি নাটকেরই সংলাপ জার্মান ভাষায়। 'সেতু' নাটকের দলটি বাসে করেই এশিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছেন, নিজেরাই এ'রা নিজেদের ব্যয়ভার বহন করছেন। দলের সঙ্গে জার্মান রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী

"দাদাঠাকুর" চিত্রে নামভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও জীবন-কাহিনীর রচয়িতা নলিনী-কান্ত সরকারের ভূমিকায় তরুণকুমার।

ম্যাক্সমুলার ভবনে অভিনীত গোটের 'দি গিল্টি' নাটকের একটি দৃশ্য

ভিটার ব্রামের, জুসট্ জি ডফ। ইংগে ম্যাসার্টাস ব্রামের, হুবার্ট কিসটেরের।

স্টার থিয়েটারের বিশেষ অভিনয় ঃ

২৬এ নভেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ৬৷৷টায় স্টার থিয়েটার মন্মথ রায় রচিত দে শা ত্ম বো ধ ক পৌরাণিক নাটক "কারাগার"-কে মঞ্চস্থ করবেন জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানের সাধু সঙ্কল্প নিয়ে। এই নাট্যাভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে নাট্য-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করবেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, চন্দ্রশেখর, অপর্ণা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, বাসবী নন্দী, সাধনা রায়চৌধুরী, শীলা পাল প্রভৃতি স্টারের কুশলী শিল্পীবৃন্দ। বলা বাহুল্য, টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদায় অর্থই প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

শৌভনিক নাট্য সংস্থা ঃ

শৌভনিক নাট্যসংস্থা স্থির করেছেন, গেল ৮ই নভেম্বর থেকে শুরু ক'রে তাঁদের "যা-নয়-তাই" নাটকের নিয়মিত অভিনয়ে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রতি অভিনয় বাবদ অন্ততঃ ১০৲ (দশ) টাকা তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে থাকবেন।

'অপরূপ কথা'র মহরৎ ঃ

নবগঠিত ফোটোপ্লে সিণ্ডিকেট-এর প্রথম কিশোরচিত্র, পরিবর্তনের কাহিনীকার মনোরঞ্জন ঘোষ লিখিত "অপরূপ কথা"র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী মাননীয় জগন্নাথ কোলের পৌরোহিত্যে গেল রবিবার, ১১ই নভেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

।। সাজঘরের নতুন প্রচেষ্টা ।।

বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা সাজঘর আগামী সোমবার ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬৷৷টায় তাদের নতুন নাটক "সুখের পায়রা" মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সলিল সেনের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করবেন।

নাটকটি পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটক। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমতী আলো দাশগুপ্ত।

।। "বিরহ" ।।

"বিরহ" নামে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসন একসময় রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছিল। এই প্রহসনের একটি পরম উপভোগ্য রূপারূপ আগামী ১২ই ডিসেম্বর, '৬২ বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় 'মুক্ত-অঙ্গনে' বিচিত্রা সংস্থা মঞ্চস্থ করবেন। এই নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীতরুণ মিত্র। নাটকটির একটি মুখ্য চরিত্রে শ্রীমিত্র ও কৃতি অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় অংশ গ্রহণ করবেন।

।। 'উদীচী'র সমাবর্তন উৎসব ।।

গত ৪ঠা নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভারতী-ভবনে 'উদীচী'র সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য ও কৃতিত্বপত্র বিতরণ করেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার। গ্রহীতা, সঙ্গীতে সুশীল মল্লিক, রমেন্দ্র দাশশর্মা, নৃত্যে—দেবযানী মুখোপাধ্যায়, গীটারে—সূর্যকান্ত বসুরায় ও রবীন্দ্রমোহন রায়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শৈলেন ভড় তাঁর ভাষণে বলেন 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এবং সুষ্ঠু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন সুরুচিপূর্ণ শিল্পীমনের পরিচয়। শ্রোতাদের উদ্দেশে শ্রীভড় বলেন, 'অধিবেশন আরম্ভের পরে ও শেষ হবার পূর্বে আসনগ্রহণ ও ত্যাগ শুধু অশোভন নয়, অবাঞ্ছনীয়ও। এতে শুধু শিল্পীর প্রতি নয় কবির প্রতিও অসম্মান ও অশ্রদ্ধা দেখানো হয়।'

সভাপতি শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের একটি লিখিত বিবৃতি সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন। পরে ভবতারণ সাঁতরার পরিচালনায় সমবেত গীটারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়। তারপর শচীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ও কল্পনা করের নৃত্য পরিচালনায় শরৎশ্রী পরিবেশিত হয়। সবশেষে শিক্ষায়তন সদস্য কর্তৃক ''বৈকুণ্ঠের খাতা' মঞ্চস্থ হয়। বিপিনের ভূমিকায় চন্দ্রকান্ত শীল উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা ঃ

'এক টুকরো আগুন'-এর কাজ শেষ করে পরিচালক বিনু বর্ধন তাঁর পরবর্তী ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন গত সপ্তাহে দু নম্বর নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওয়। সমরেশ বসুর 'অচিনপুরের কথকতা' কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির নামকরণ হয়েছে 'বিভাস'। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন কমল মিত্র, বিকাশ রায়, তরুণকুমার প্রভৃতি। এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, বৈদনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কার্তিক বসু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা সংস্থা হল জেনিথ পিকচার্স।

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে পরিচালক মধু বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবিটি পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। নামভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন 'ভাগিনী নিবেদিতা' খ্যাত শিল্পী অমরেশ দাস। এ ছাড়া অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে

অভিনয় করবেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী। সংগীত পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী। নির্বাক ছবি 'ইংগিত'এর পর প্রযোজক-পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায় এবারে যে ছবি করবেন তার নাম 'সৎ-ভাই'। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অসিতবরণ, কমল মিত্র, অনুপকুমার, অসীমকুমার, জহর রায়, সুখেন দাস, সরযূবালা, সন্ধ্যারাণী, দীপিকা দাস ও লিলি চক্রবর্তী।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সম্প্রতি একটি হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ছবির নাম 'সুখে স্বপ্নে বাসী গীত'। এর মধ্যে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সঙ্গীত-পরিচালক পবিত্র দে এ ছবির একটি গান রেকর্ডিং করছেন। যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মুখ্যে বলরাজ সাহনি, বিপিন গুপ্ত, জীবনকলা, মির্জা মুশারফ, আরতি দাস ও বীরেন চ্যাটার্জি অন্যতম। কিরণ ফিল্মস প্রযোজিত এই হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করছেন অরুণ চৌধুরী।

বোম্বাই:

প্রযোজক জে ওমপ্রকাশের পরবর্তী রঙিন ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'আরজু'। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শচীন ভৌমিক। ছবিটি পরিচালনা করছেন মোহন কুমার। সংগীত-পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ। প্রধান চরিত্র-অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, সায়রা বানু, ধর্মেন্দর, নাজির হোসেন, সুলোচনা ও শোভা খোটে।

আলিবাবা মার্জিনা পুরোন গল্পের কাহিনী অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্ত যে রঙিন ছবিটি করছেন তার নাম রাখা হয়েছে 'কনিজ'। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন গুরু দত্ত ও সিমি। সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণ। পরিচালক গুরু দত্ত।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের 'প্রেমপত্র' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। বর্তমানে তিনি 'বন্দিনী' ছবির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। নাম-ভূমিকায় রয়েছেন অশোককুমার ও ধর্মেন্দর। নায়িকার চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন নূতন। সঙ্গীত-পরিচালক শচীনদেব বর্মণ। এছাড়া আর একটি হিন্দী ছবি 'বেনজির'র কাজ আরম্ভ করছেন পরিচালক শ্রীরায়।

এ ছবির প্রধান ভূমিকা-লিপি হল অশোককুমার, মীনাকুমারী, শশীকাপুর ও রাজশ্রী শান্তারাম। সুরকার শচীনদেব বর্মণ।

সম্প্রতি কারদার স্টুডিওয় রঙিন ছবি 'দিল দিয়া দরদ লিয়া'র কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক এ আর কারদার। কাহিনী-চিত্রনাট্য রচনা ও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার। বিপরীতে রয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান। পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন জনি ওয়াকার, প্রাণ, শ্যামা, রেহমান, এস নাজির ও রানী। আলোকচিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন দোয়ারকা দিবাচী এবং নৌসাদ।

গীতিকার শৈলেন্দ্রের প্রথম-প্রযোজনা হিন্দী ছবির নাম 'তিসরি কসম'। রাজকাপুর ও ওয়াহিদা রেহমান এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শঙ্কর-জয়কিষণ। পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন বাসু ভট্টাচার্য ও সুব্রত মিত্র।

মাদ্রাজ:

জনপ্রিয় উপন্যাস 'পেনমানাম' অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক এল ভি প্রসাদ সম্প্রতি রাহনি স্টুডিওয় কাজ শুরু করেছেন। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শিবাজী গণেশন, বি সরোজাদেবী, এস ভি রাঙ্গারাও, এম আর রাধা, টি আর রামচন্দ্র এবং করুণানিধি। আলোকচিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কে এস প্রসাদ ও কে ভি মহাদেবন।

অঞ্জলি পিকচার্সের পরবর্তী ছবি হল 'আঁধেরে চিরাগ'। অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা ও মনোজ এই ছবির তিনটি মুখ্য আকর্ষণ। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ ছবির কাজ আরম্ভ হবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন ইন্দর রাজ আনন্দ। সঙ্গীত-পরিচালক আদি নারায়ণ রাও।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
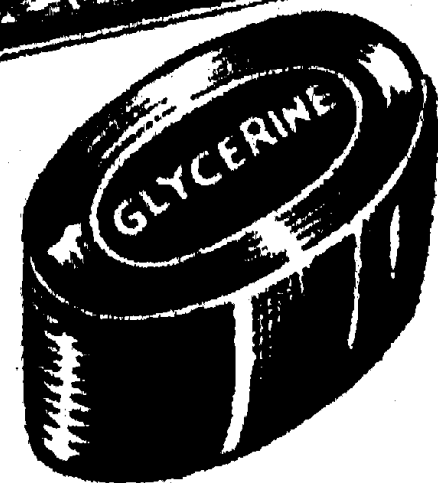
(ঘরের মধ্যে ছোট কিংকর মাটিতে শুয়ে আছে। চিরঞ্জীবকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসলো।)

ছোট চিরঞ্জীব—যাক্। তাহলে মারধোর খেয়ে চৈতন্য হয়েছে। হোটেলেই ফিরে এসেছো দেখছি।

কিংকর—আজ্ঞে?

চিরঞ্জীব—বলছি, মারধোর খেয়ে জ্ঞান ফিরেছে তাহলে? সেই পঁচিশ হাজার টাকা কোথায়?

কিংকর—সে তো আপনি চলে যাবার পরই আমি হোটেলের ম্যানেজারবাবুর লোহার সিন্দুকে জমা করে দিয়েছি। এই যে তার রসিদ।

চিরঞ্জীব—তাহলে রাস্তায় অমন ধানাই-পানাই বকলি কেন?

কিংকর—রাস্তায় বক্‌তে যাবো কোন্ দুঃখে? আমি তো হোটেল থেকে রাস্তায় পা-ই দিইনি।

চিরঞ্জীব—কিংকর! আবার মার খাবি তুই। পথে তুই তো আমাকে বললি যে মা আর মাসিমা সকাল থেকে না-খেয়ে বসে আছেন। বাড়ী চলুন?

কিংকর—এই মরেছে! এ-সব আবার কি কথা গো। আপনি চলে যাবার পর—আমি তো খাওয়া-দাওয়া করে—এই ঘরে শুয়ে—

চিরঞ্জীব—ফের বাজে কথা বলছিস? শীগগির বল—রাস্তায় আমাকে ও-কথা বললি কেন তুই!

কিংকর—আরে! কি আপদ! আমি তো—
(এই সময় দরজায় ঘা পড়ল।)

চিরঞ্জীব—কে?

ম্যানেজার—আমি স্যার!

চিরঞ্জীব—আসুন!

উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ভ্রান্তিবিলাস' ছবির দৃশ্যগ্রহণের আগে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক মানু সেন।

কিংকর—ম্যানেজারবাবু! বাবু হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি কি বাইরে বেরিয়েছি?

ম্যানেজার—না! তুমি তো আমার কাছে টাকা জমা দিয়ে খেয়ে-দেয়ে এসে শুলে।

চিরঞ্জীব—কী বলছেন মশায়! ও বাইরে যায়নি?

ম্যানেজার—না স্যার!

চিরঞ্জীব—আপনি কি বলতে এসেছেন, বলুন!

ম্যানেজার—আমি বলতে এসেছি স্যার—যে দুঘণ্টার জন্যে আমি একটু বাইরে বেরুচ্ছি। এরমধ্যে আপনার টাকার দরকার হবে কি?

চিরঞ্জীব—ওই জমা টাকার? না।

(ম্যানেজার চলে গেল। চিরঞ্জীব চেয়ে দেখে এখনও কিংকর মুখভার করে আছে। চিরঞ্জীব শান্ত হয়।)

চিরঞ্জীব—নে, কাপড়-জামা পরে নে। এখানে খুব বড় মেলা হচ্ছে। চল্—দেখে আসি।

(কিংকর এগিয়ে জামা টেনে নিয়ে গায়ে দিল।)

এই অভিনীত চিত্র-নাট্যের চিত্রগ্রহণ চলেছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। ছোট চিরঞ্জীব ও কিংকরের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করলেন উত্তমকুমার এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যানেজারের চরিত্রে রূপ দিলেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন্ ছবির কথা বলছি?—উত্তমকুমার প্রোডাকসন্সের 'ভ্রান্তিবিলাস'। ছবিটি পরিচালনা করছেন মানু সেন। আলোকচিত্র পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও রূপকার যথাক্রমে হরিপদ মহালনবিশ, সুনীল সরকার ও শান্তি সেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'ভ্রান্ত-বিলাস' অবলম্বনে বর্তমানের এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। এ কাহিনীর ঘটনা ও পরিবেশ আজ থেকে বহু বছর আগেকার জয়স্থল-অধিরাজ বিজয়বল্লভের রাজত্বে। কিন্তু এই চলচ্চিত্রায়ণে শুধু মূল ঘটনার কাঠামোটুকু আছে। বাকী পরিবেশ, সাজ-সজ্জা ও কিছু কিছু ঘটনা যুগোপযোগী করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই আধুনিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক যথার্থ বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ সেই এক যুগ আগের প্রাচীন পরিবেশ নিয়ে বর্তমানে ছবি করা দুঃসাধ্য ছিল এবং বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হোত।

ভ্রান্তি-বিলাসের ওপরেই এ কাহিনীর মূল ঘটনা। সোম দত্ত নামে এক বণিকের দুই সুকুমার যমজকুমার ছিল যাদের নাম ছোট এবং বড় চিরঞ্জীব। চেহারার মিল একই রকম। এই সময়ে এক দুঃখিনীর কাছ থেকে একাকৃতি সমজ সন্তানযুগল কিংকরদ্বয় ভৃত্যস্বরূপ নিজের কাজে লাগালেন সোম দত্ত। এর মধ্যে একবার অর্ণবপোতে যাত্রা করার সময় এক প্রবল সমুদ্র-ঝড়ে এই সংসারের সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শুধু সোম দত্ত, কিংকর ও ছোট চিরঞ্জীবকে এক-

সঙ্গে দেখা গেল। অনেক বছর উত্তীর্ণ হলেও যখন কোন খবর জানতে পারলেন না তখন চিরঞ্জীব নিরুদ্দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু পরে তিনি পুত্রেরও কোন সংবাদ পেলেন না। শেষে সোম দত্ত স্বয়ং পর্যটন আরম্ভ করলেন এবং জয়স্থলে উপস্থিত হয়ে মহারাজ বিজয়বল্লভের কাছে তিনি ধৃত হন। এই সময় এখানে ছোট চিরঞ্জীব ও ছোট কিংকর উপস্থিত হয়। এক বিদেশী বন্ধুর সাহায্যে কিছু অর্থের মালিক হয়ে উভয়ে এক হোটেলে এসে হাজির হয়। এই নগরের অধিপতির দুই কন্যা—চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী। প্রথমার সঙ্গে ঘটনাচক্রে বড় চিরঞ্জীবের বিবাহ হয়। বড় কিংকর এর সঙ্গেই ছিল।

ঘরের বাইরেই প্রথম বিবাদের পর্ব শুরু হল। ছোট-বড় চিরঞ্জীব ও কিংকরকে দেখে সকলে ভুল করতে শুরু করলো। বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে নাটকের মূল ঘটনা এগিয়ে চলে। শেষ-পর্যন্ত দেবালয়ের প্রাঙ্গণে সোম দত্ত তাঁর সংসারের স্ত্রী-পুত্র ও ভৃত্যদ্বয়ের সন্ধান পেলেন। বিলাসিনীর সঙ্গে ছোট চিরঞ্জীবের বিবাহের কথা পাকা হল।

এই সংক্ষিপ্ত মূল কাহিনীর শুধু গল্পের প্রধান বক্তব্যটুকু ছবির চিত্রনাট্যে স্থান পেয়েছে। ঘটনা এবং পরিবেশ নতুন আঙ্গিক পরিচালক ব্যক্ত করেছেন। ছবি দেখতে বসে এ কাহিনী আপনাদের নতুন বলে মনে হবে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন—দ্বৈত চিরঞ্জীব ও কিংকরের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রপ্রভা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিলাসিনী—সন্ধ্যা রায়, বসুপ্রিয়—বিধায়ক ভট্টাচার্য, সোম দত্ত—বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণ্যময়ী—ছায়া দেবী, রূপবতী—লীলাবতী করালি, অপরাজিতা—সবিতা বসু, ধর্ম দত্ত—তরুণকুমার ও অন্যান্য চরিত্রে জয়নারায়ণ, মণি শ্রীমানী, তমাল লাহিড়ী, গৌর সী, প্রশান্ত চ্যাটার্জি ও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

—চিত্রদূত

ভিনদেশী ছবি

।। টনি কার্টিস : ক্রিস্টিন কাউফম্যান ।।

৩৭ বছরের টনি কার্টিস সম্ভবতঃ আগামী ১১ই অথবা ১২ই জানুয়ারী জার্মান চিত্রাভিনেত্রী সপ্তদশী ক্রিস্টিন কাউফম্যানকে বিয়ে করবেন। দশ বছর অভিনেত্রী জেনেট লের সঙ্গে সংসারযাত্রা করার পর তাঁর সঙ্গে টনির বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। হলিউডের গুজব তাঁর জন্যে নাকি ক্রিস্টিনই দায়ী। অবশ্য টনির ভূতপূর্ব স্ত্রী জেনেট প্রতিহিংসা নিয়েছেন অদ্ভুতভাবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই জেনেট ফাটকা বাজারের দালাল বব ব্র্যাসটকে নিয়ে বিবাহ-রেজিস্ট্রারের অফিসে হাজির হন। এবং পূর্ব স্ত্রীর দ্রুত পুনর্বিবাহের লজ্জা এড়াবার জন্যেই মনে হয় টনিও যথাসত্বর ক্রিস্টিনের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসেছেন। মার প্রভাবে ক্রিস্টিন এক কথায় রাজী হন নি। মার প্রভাব তাঁর ওপরে কম নয়। কারণ 'রোজেন রেজলি', 'দি সাইলেণ্ট এঞ্জেল', 'গার্লস ইন ইউনিফর্ম' প্রভৃতি ছবির সাফল্যের মূলে ছিলেন মা এবং তিনিই তাঁকে জার্মান চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান হাইমাণ্ট থেকে ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নাম করার জন্যে অন্যান্য জার্মান, ইটালীয়ান চিত্র-প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। ঐসব প্রতিষ্ঠানে থাকার কিছুদিন পরে ক্রিস্টিন মিউনিক ও ভিয়েনায় কার্ক ডগলাসের সঙ্গে বিশ্বনন্দিত 'সিটি উইদাউট পিটি'তে খ্যাতিলাভ করেন। হলিউডে এসে ক্রিস্টিন টনি কার্টিস ও ইউল ব্রাইনারের সঙ্গে 'টারসা বালবা' অভিনয় করেন। হলিউডে যাওয়া সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর মার অমতই ছিল। হলিউডে অভিনয় করার পর ক্রিস্টিন দেশে ফিরে এলে টনিও তাঁর সঙ্গে আসেন জার্মানীতে। জার্মানীর প্রায় সব জায়গাতেই টনি এবং ক্রিস্টিনকে একসঙ্গে দেখা যেতে থাকে। তাঁর মা মেয়ের এই প্রেমকে মোটেই সুনজরে দেখেননি এবং এই নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ-ও করেছিলেন অবশ্য কুৎসার ভয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে যেতে হয়। টনিকে বিবাহের প্রস্তাবে তিনি মেয়েকে জানিয়েছেন জানুয়ারী মাসে সাবালিকা হলে সে যা খুশী করতে পারে। ক্রিস্টিনের সেই 'যা খুশী করা'র দিন ধার্য হয়েছে ১১ই অথবা ১২ই জানুয়ারী।

ক্রিস্টিন কাউফম্যানের নবতম ছবি 'নাইণ্টি মিনিটস্ আফটার মিডনাইট' ছবির কাজ এখনো চলছে। —চিত্রকূট

টনি কার্টিস ও ক্রিস্টিন কাউফম্যান

খেলাধুলা

দর্শক

॥ অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি ॥

এডিলেডে অনুষ্ঠিত এম সি সি বনাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের চারদিনের ক্রিকেট খেলা ড্র গেছে। বৃষ্টির দরুণ এম সি সি দল জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

এম সি সি এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩৮। খেলার ফলাফল : এম সি সি'র জয় ১৯, ড্র ১৪ এবং পরাজয় ৫।

প্রথমদিনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দল ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৩২৪ রান করে। জন লিল ৭১ মিনিটের খেলায় ৮৭ রান ক'রে নিজ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করার কৃতিত্ব লাভ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স ৪২ রান করেন। পীচ বোলার-দের সহায়ক ছিল না। ১৫৪ রানের মাথায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের তিনটি উইকেট (৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম) পড়ে যায়। খেলার প্রথম এক ঘন্টা এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের ১৫৪ রানের মাথায় এম সি সি দলের বোলাররা যা কিছুটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। শেষের-দিকেও এম সি সির বোলাররা সুবিধা করতে পারেনি—অষ্টম উইকেটের জুটিতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ৬০ রান উঠে যায়।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৩৩৫ রানে শেষ হয়—অর্থাৎ প্রথমদিনের ৩২৪ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১১রান যোগ হয় ৩৩ মিনিটে, এদিকে উইকেট পড়ে বাকি ৩টে। এইদিনের বাকি সময়ে এম সি সি ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩৩৩ রান করে।

তৃতীয়দিনের খেলার সমস্ত গৌরব এম সি সি দলের। এম সি সি ৫০৮ রানে (৯ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের সহ-অধিনায়ক কলিন কাউড্রে এবারও গোল্লা করেন—দুটো খেলায় উপর্যুপরি তিনটে গোল্লা। মিডলসেক্স কাউন্টি দলের চৌকস খেলোয়াড় ফ্রেড টিটমাস ১৩৭ রান ক'রে নটআউট থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে তাঁর চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং এই ১৩৭ সর্বোচ্চ রান। গ্রেভনীর পাথরচাপা কপাল—মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরী করায় গৌরব হাত-ছাড়া করেন। ব্যারিংটনের ১০৪ রান উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বোলার হক ১৩০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৭৪ রান দাঁড়ায়।

চতুর্থদিনে ২৮৩ রানের মাথায় (৭ উইকেট পড়ে) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সমাপ্তি ঘোষণা করে। সোবার্স ৯৯ রান ক'রে রানআউট হন—নিজ দলের পক্ষে তাঁর রানই সর্বোচ্চ ছিল। খেলার এই অবস্থায় এম সি সি দলের জয়লাভ করতে ১১১ রানের প্রয়োজন হয়, তখন খেলা ভাঙ্গতে ৬৭ মিনিট সময় ছিল। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৯ মিনিট আগেই বৃষ্টির দরুণ খেলা বন্ধ হয়ে যায়: এই সময়ে এম সি সি'র জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান থেকে মাত্র ১৬ রান কম ছিল। এই ষোল রান করতে পারলেই এম সি সির ষোলকলা পূর্ণ হ'ত। বৃষ্টির দরুণ ১৩০ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।

এডিলেডে ওভাল মাঠে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বনাম এম সি সি'র খেলায় হ্যূকসের বলে এম সি সি'র কলিন কাউড্রের শূন্য ক'রে আউট হওয়ার দৃশ্য—কলিন কাউড্রের উপর্যুপরি তৃতীয় বার শূন্যে রান।

দ্বিতীয় ইনিংসে কাউড্রে ৩২ রান ক'রে নটআউট থাকেন। তাঁর প্রথম উইকেটের জুটি জিওফ পুলার ৫৬ রানে আউট হ'ন। প্রথম উইকেটের জুটিতে তাঁরা এক ঘণ্টারও কম সময়ে ৯১ রান তুলে দেন।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৫ রান (জেন লিল ৮৭ এবং ম্যাকালাচান ৫৩। স্টেথাম ৫৮ রানে ৪ উইকেট) ও ২৮৩ **রান** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গারফিল্ড সোবার্স ৯১। স্টেথাম ৮৩ রানে ৩ উইকেট)।

এম সি সি : ৫০৮ রান—৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। (ফ্রেড টিটমাস ১৩৭, কেন ব্যারিংটন ১০৪, টম গ্রেভনী ৯৯। হক ১৩০ রানে ৬ উইকেট) ও ৯৫ রান (১ উইকেটে। পুলার ৫৬)।

ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানী

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ-পশ্চিম জার্মানীর পঞ্চম এ্যাথলেটিক টেস্টের ১৮টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ১২টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রিলে অনুষ্ঠানে এসিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ হয়। পশ্চিম জার্মানীর জাঞ্জ ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫১·৩ সেকেণ্ডে দূরত্ব পথ অতিক্রম ক'রে প্রথম হ'ন এবং নতুন এশিয়ান রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ৪×৪০০ মিটার রিলে অনুষ্ঠানে জার্মানী ১ মিঃ ৫২·২ সেকেণ্ডে প্রথমস্থান পেয়ে এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করে।

হায়দরাবাদের ষষ্ঠ এ্যাথলেটিক টেস্টেও পশ্চিম জার্মানী তাদের জয়লাভের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। মোট ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ১১টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে। ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী তিনজন এ্যাথলীটই (স্কম্যান, নাগভূষণম এবং রাজশেখরম) এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেন। লং জাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানের তিনটি স্থানই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা অধিকার করেন।

বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানীর সপ্তম তথা সর্বশেষ এ্যাথলেটিক্স টেস্টে পশ্চিম জার্মানী মোট ১৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১২টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। জার্মাণ দল হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানে যোগদান করেনি। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ৬টি ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়। ভারতবর্ষ পোলভল্ট, ১১০ মিটার হার্ডলস, হাইজাম্প, লংজাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে প্রথম স্থান পায়। ভারতীয় জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে ৪০০ মিটার দৌড়, পোল ভল্ট, সটপুট, ডিসকাস, ৪০০ মিটার হার্ডলস, হাতুড়ি নিক্ষেপ ও ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে। একমাত্র পশ্চিম জার্মানীর উরবাক দুটি অনুষ্ঠানে—সট্পুট এবং ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

॥ টেড ডেক্সটার ॥

অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি দল তথা ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। টেড ডেক্সটার একজন খ্যাতনামা অপেশাদার টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়। জীবনবীমা কোম্পানীর চাকুরী-জীবন ছাড়াও বেতার ভাষ্যকার, প্রবন্ধকার এবং বিজ্ঞাপনের লেখক হিসাবে তিনি বেশ সম্মানজনক পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তাছাড়া অতি সম্প্রতি তিনি এবং তাঁর স্ত্রী একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ডেক্সটার নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন, ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের উপর নির্ভর করে তাঁর আর্থিক অবস্থা বর্তমানে বেশ স্বচ্ছলই। কিন্তু তিনি তাঁর বয়স এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য এই দুটির উপর বেশী গুরুত্ব রেখে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা স্থির করে নিতে আজ খুবই ব্যগ্র। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমানে চাকুরী সূত্রে আবদ্ধ রয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মহল ডেক্সটারের ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবন সম্পর্কে মোটেই উৎসাহিত নন্। তাঁদের মনোভাব, ডেক্সটার তাঁর ২৮ বছরের ব্যক্তিগত জীবনে ক্রিকেট খেলায় যা দিয়েছেন তা যথেষ্টই। সুতরাং ডেক্সটার বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বর্তমান চাকুরী বজায় রাখতে হলে তাঁকে ক্রিকেট খেলা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

আগামী মার্চ মাসেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবন সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

॥ সন্তোষ ট্রফি ॥

আগামী ২২শে ডিসেম্বর থেকে বাঙ্গালোরে ১৯৬২ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার কথা। সংবাদে প্রকাশ, মহীশূর স্টেট ফুটবল এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে এল জার ডি ক্লাব আদালতে যে মামলা দায়ের করেছে তার ফলে মহীশূর স্টেট ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করার নাকি অসুবিধা ছিল। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির বিবৃতি থেকে জানা গেছে সে রকম অসুবিধা নেই।

খেলার তালিকা

প্রথম রাউণ্ড : (১) গুজরাট : উড়িষ্যা (২৩শে ডিসেম্বর)

দ্বিতীয় রাউণ্ড—(২) রেলওয়ে : বিহার (২২শে); (৩) মধ্যপ্রদেশ : অন্ধ্র (২২শে)। (৪) কেরালা : রাজস্থান (২৪শে); (৫) বিজয়ী (১) : মহীশূর (২৫শে); (৬) বাংলা : উত্তরপ্রদেশ (২রা জানুয়ারী); (৭) আসাম : মাদ্রাজ (৩০শে ডিসেম্বর); (৮) সেনাদল : পাঞ্জাব (২৯শে); (৯) দিল্লী : মহারাষ্ট্র (৩০শে)।

কোয়ার্টার ফাইনাল—বিজয়ী (২) : বিজয়ী (৩) ২৬শে; বিজয়ী (৪) : বিজয়ী (৫)—২৮শে; বিজয়ী (৬) : বিজয়ী (৭)—৩রা জানুয়ারী; বিজয়ী বিজয়ী (৮) : বিজয়ী (৯)—১লা জানুয়ারী।

সেমিফাইনাল খেলা দুটি **৫ই** ও ৬ই জানুয়ারী, তৃতীয় স্থানের জন্য সেমি-ফাইনালে বিজিত দু'দলের খেলা ৭ই জানুয়ারী এবং ফাইনাল খেলা **৬ই** জানুয়ারী হওয়ার কথা আছে।

ভারত-সিংহল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের চতুর্থ বার্ষিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় (স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের) ভারতবর্ষ ১০—৫ লড়াইয়ে সিংহলের বিপক্ষে প্রথম জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে এই দ্বৈত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ১৯৫৯ সালে কলম্বোতে প্রথম আরম্ভ হয়। সিংহল উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে—১৯৫৯ সালে ৯—৬, ১৯৬০ সালে ৮—৭ এবং ১৯৬১ সালে ৮—৬ লড়াইয়ে। বর্তমানে সিরিজের ফলাফল দাঁড়াল—সিংহলের জয় ৩ এবং ভারতবর্ষের ১ (১৯৬২)।

আলোচ্য চতুর্থ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সিংহলের নোয়েল বুলনার জুনিয়র বিভাগে এবং ভারতবর্ষের সমর মিত্র সিনিয়র বিভাগে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন। সমর মিত্র (নাসিরুদ্দিন স্কুল, ক'লকাতা) হেভী ওয়েট বিভাগে সিংহলের এল ডি ডগলাসকে পয়েন্টে পরাজিত করেছিলেন।

ভারতবর্ষ দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে এন ডি গুণশেখর কাপ পায় এবং ভারতবর্ষের অধিনায়ক সমর মিত্র শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে ওবেসেকার কাপ পান।

জাতীয় জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতা

গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় জিমনাষ্টিক প্রতিযোগিতায় দিল্লীর প্রতিনিধিরা পুরুষ এবং বালকদের দলগত বিভাগে এবং বালকদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ ক'রে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। পশ্চিম বাংলা বালক এবং বালিকাদের দলগত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং বালিকাদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। পশ্চিম বাংলার

পত্রের বালকাদের ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন যথাক্রমে ক্ষেত্রেশ দাশগুপ্ত এবং বাসনা রায়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল

চীনের ভারতভূমি আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ আজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। চীনা হানাদারদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। চীনাদের এই অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দেশের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে অর্থ, স্বর্ণ, অলংকার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামগ্রী দান করতে এগিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলি এবং ক্রীড়াবিদরাও জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য বোম্বাইয়ে ভারতীয় দল বনাম রোভার্স একাদশ দলের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় দল ৩—১ গোলে জয়লাভ করে। ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়দের নিয়ে এই প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনী খেলায় ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

প্রথম এশিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের পূর্বাঞ্চলের সদস্য শ্রীদিলীপ বসু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভারতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য কমিটির তহবিলে ব্যক্তিগতভাবে ১৪০০ টাকা দান করেছেন।

১৯৫২ সালের হেলসিংকি অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক শ্রীশৈলেন মান্না পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভারতীয় প্রতিরক্ষা সাহায্য কমিটির তহবিলে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান ক্লাবের আই এফ এ শীল্ড জয়লাভ উপলক্ষ্যে তিনি এই আংটিখানি উপহার পেয়েছিলেন।

রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ১৩ই অক্টোবর থেকে বোম্বাইয়ে প্রখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ৪৪টি দল যোগদান করেছে—স্থানীয় দল ১৫টি এবং বহিরাগত দল ২৯টি। গত বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী ই এম ই সি (সেকেন্দ্রাবাদ), রানার্স-আপ মোহনবাগান, সেমি-ফাইনালে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং হায়দরাবাদের অন্ধ্র পুলিশ দলের প্রথম খেলা পড়ে তৃতীয় রাউন্ড থেকে।

তৃতীয় রাউন্ডে মোহনবাগান দলের খেলা পড়ে আই এল ই দলের (বাঙ্গালোর) সঙ্গে। এই খেলাটি প্রথমদিন ২—২ গোলে ড্র যায়। মোহনবাগান ২—০ গোলে অগ্রগামী থেকেও শেষ-পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয়দিনের খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়লাভ করে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। খেলার শেষ দশ মিনিটে মোহনবাগান দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড শেখ আলি দুটি গোল দেন।

তৃতীয় রাউন্ডের অপর এক খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সহজভাবেই ৪—০ গোলে বাঙ্গালোরের প্রখ্যাত হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট দলকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল দল এই খেলার প্রতি অর্ধে দুটো ক'রে গোল দেয়। কোয়ার্টার-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা পড়েছে হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল পুলিশ দলের সঙ্গে। গত বছরের প্রতিযোগিতায় হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল পুলিশ দল অপ্রত্যাশিতভাবে ৬—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল।

ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় রাউন্ডে ১—৫ গোলে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে গত ৩০শে অকটোবর থেকে বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি দেশের মোট সাতজন প্রতিনিধি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই সাতজনের মধ্যে চারজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান—ইংল্যান্ডের হার্বার্ট বিথাম (১৯৬০), ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স (১৯৫৮), অস্ট্রেলিয়ার রবার্ট মার্শেল (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫১) এবং অস্ট্রেলিয়ার টম ক্লারি (১৯৫৪)। এ ছাড়া আছেন সোমনাথ ব্যানার্জি (ভারতবর্ষ), বিল হারকোর্ট (নিউজিল্যান্ড) এবং রসিদ করিম (পাকিস্তান)। অস্ট্রেলিয়ান বিলিয়ার্ডস কাউন্সিলের ঔদার্যে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রতিনিধি সোমনাথ ব্যানার্জির পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগদান করা সম্ভব হয়েছে।

এ পর্যন্ত (১২।১১।৬২) একমাত্র উইলসন জোন্সই প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। উইলসন জোন্স ১,৯৯১—১৯২৩ পয়েন্টে সোমনাথ ব্যানার্জিকে, ২,৩৪৫—৭১৬ পয়েন্টে রসিদ করিমকে, ১৮১০—৮৭৯ পয়েন্টে বিল হারকোর্টকে, ১,৬৩৬—১৪৮৮ পয়েন্টে বব্ মার্শেলকে এবং ১৫৮২—১১০৩ পয়েন্টে ১৯৬০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হার্বার্ট বিথামকে পরাজিত করেছেন।

উইলসন জোন্স ভারতবর্ষের এক নম্বর বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড়। তিনি বহুবার ভারতবর্ষের জাতীয় অপেশাদার বিলিয়ার্ডস এবং স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় খেতাব লাভ করেছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় অবস্থায় প্রথম স্থান এবং ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান (জয় ৫ এবং হার ২) লাভ করেন। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেলেও তিনি কয়েকটি বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করেন—সর্বাধিক ব্রেক (৫৮৯), সর্বাধিক সমষ্টি (১২,৩৮৯) এবং সর্বাধিক পয়েন্ট (২,৪৬৮)। সর্বাধিক 'ব্রেক' রেকর্ড করার দরুণ তিনি 'এ রস হিউইট কাপ' পুরস্কার লাভ করেন।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই খেলা শুরু হবে মাদ্রাজে ১লা ডিসেম্বর। প্রথমে খেলাটি দিল্লীতে হওয়ার কথা ছিল। মেক্সিকো ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ৩—২ খেলায় শক্তিশালী সুইডেনকে পরাজিত ক'রে ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার বিজয়ী দেশই শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলা হবে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবনে—২৬শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বর। ইতিমধ্যেই মেক্সিকোর খেলোয়াড়রা ব্রিসবেন যাওয়ার জন্য বিমানের টিকিট কেটে রেখেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ডীন অফ্ দি ফ্যাকালটি অব ড্রামা—রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়;
মেম্বার, বোর্ড অফ্ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়;
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০৲

সেকালের অভিনেতা অভিনেত্রী ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্র ও তথ্যে
সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ

নাট্যমঞ্চ ও নাট্যজীবন এক অবধারিত অনিবার্য পরিণতিতে এসে পৌঁছেছিল নাট্যকোবিদ নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সংসার পথ পরিক্রমায়। তিলে তিলে দিনে দিনে ঊনবিংশ শতকের ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে কলিকাতার অলিন্দ থেকে, জেগে উঠছে নব-চেতনার বিংশ-শতক। এবং এই সন্ধিক্ষণই প্রবল সিন্ধু তরঙ্গের মতো তাঁকে এনে দিয়েছিল নাট্য-লক্ষ্মীর সাধন-মন্দিরে। এই বিবর্তন যেমন তীব্র নাটকীয়, তেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি আগ্রহ-উদ্দীপক। এক আন্তরিক ও অকপট আত্ম-কথনের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, এই সুবৃহৎ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে এক অপরূপ রসলোকে, নাট্যতীর্থ থেকে সাহিত্যতীর্থে উত্তরণের এ এক নাটকীয় স্বাক্ষর বলা যেতে পারে।

উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সপ্তপদী ২·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিল ৩·২৫

অনুরূপা দেবীর
ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলন সেতু ২·৫০

নবেন্দু ঘোষের
পাপুই দ্বীপের কাহিনী ৩·০০

জ্যোতির্ময় ঘোষের
কাঞ্চন ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ব্যোমকেশের ছটি ৪·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বাজীমাৎ ১·৭৫

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

দিলীপকুমার রায়ের
অঘটন আজো ঘটে ৫·০০

লীলা মজুমদারের
ঝাঁপতাল ২·৭৫

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ৬·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কৃষ্ণকলি নাম তার ৫·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
বারো ঘর এক উঠোন ৮·০০

শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবকন্যা ৪·৫০

অজিতকৃষ্ণ বসুর
সানাই ২·৫০

দেবেশ দাশের
রক্তরাগ ৪·৫০

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

'বনফুল'-এর নাটক
দশ ভাণ ও আরও কয়েকটি ৫·০০
[পনরটি একাঙ্ক নাটিকার সংকলন]

'বনফুল'এর গল্প-সংগ্রহ ৮·৫০
(প্রথম শতক)
[একশতটি গল্পের সংকলন]

'বনফুল'-এর উপন্যাস
জলতরঙ্গ ৪·০০
হাটে বাজারে ৩·৫০
[রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস]

বিমল মিত্রের উপন্যাস
নফর সংকীর্তন ২·৫০
কন্যাপক্ষ ৩·২৫

চিত্রিতা দেবীর উপন্যাস
দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস
নীলে সোনায় বর্সাতি ৩·৫০

কাব্যগ্রন্থ :

দিলীপকুমার রায় সংকলিত
দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮·০০

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের
কবি-চিত্ত ৫·০০
['মালঞ্চ', 'সাগরসঙ্গীত', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর-কিশোরী' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থের ও অপ্রকাশিত কবিতাবলীর সংকলন]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম 'কালচার'

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd November 1962
40 Naya Paise.

চীন আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমবারে তাহারা অতর্কিত আক্রমণ ও আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলার পূর্ণ সুযোগ লওয়া সত্ত্বেও আমাদের রক্ষীবাহিনীকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই কেবলমাত্র আমাদের সেনাগণের প্রবল যুদ্ধদানে প্রবল প্রতিরোধ চেষ্টার কারণে। ঐ প্রথম দিকের আক্রমণের অভিজ্ঞতার বশে নূতন প্রস্তুতিতে এবং নেফা অঞ্চলের পথহীন পর্বতমালায় উহাদের অভিযান চালনার পথ-ঘাট করিবার জন্য বিস্ফোরকে পাহাড় উড়াইয়া ও কাটিয়া ফেলিতে, এতদিন হয়তো যুদ্ধে অপেক্ষাকৃত বিরতি দিয়াছিল চীনাগণ। এখন সেই প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হওয়ায় যুদ্ধের দ্বিতীয় ও প্রবলতর অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। আরম্ভের প্রথম দিকেই নেফায় উহাদের লক্ষ্যস্থলের একটি উহারা অধিকার করিয়াছে এবং দ্বিতীয়টির জন্য অর্থাৎ সেলা গিরিসংকটের জন্য প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। এই দুইটি অধিকার করিলে পরে উহারা উহাদের প্রকৃত অভিযান-পথের সম্মুখের ঘাঁটিতে পৌঁছাইবে, অর্থাৎ চীনা যুদ্ধ-অভিযান তাহার প্রকৃত রূপ গ্রহণ করিবে এবং তাহার লক্ষ্য বুঝা যাইবে। লাডাকে এখন চুসুলই চীনাদের লক্ষ্য।

নেফায় জং এলাকা ও ওয়ালং শহর চীনাদের হস্তগত হওয়ায় আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই। তবে সেই ক্ষতির পরিমাণ ও তাহার ফলাফল বুঝা যাইবে চীনাদের অগ্রগতির পরিমাণ ও বিস্তৃতির পূর্ণ বিবরণ পাইলে পর। এখন যাহা বুঝা যায় তাহাতে মনে হয় চীনারা তাহাদের শীতকালীন যুদ্ধ-অভিযানকে পূর্ণরূপে চালিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছে, যাহাতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দোষ-ত্রুটি শোধরাইবার অবকাশ আমরা না পাই।

অভিযান আরম্ভের পর চার সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এখনও আমাদের ভরসা শুধু আমাদের বীর সেনাদলের শৌর্যবীর্য ও অদম্য যুদ্ধদানে স্পৃহা ও উৎসাহের উপর। আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কঠোর ব্রত পালনের জন্য। এখন প্রয়োজন দৃঢ়সংকল্পের ও সহিষ্ণুতার।

আমাদের অভাব প্রধানতঃ যুদ্ধ-সম্ভারের এবং সেই অভাব পূরণ করিতে প্রয়োজন প্রধানতঃ সময় এবং যথাযথ ব্যবস্থার। এই দুইয়ের জন্যই আমাদের অতি কঠোর মূল্যদান করিতে হইবে, সহ্য করিতে হইবে অনেক কিছুই যাহা দুঃসহ ঠেকিবে প্রথম দিকে। আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসিগণ যুদ্ধবিগ্রহে অনভ্যস্ত। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ আমরা দেখি নাই এক শতাব্দীর উপর এবং পরোক্ষভাবেও যাহা দেখিয়াছি তাহা ব্যাপক কোনও দিন হয় নাই, কি সময়ের হিসাবে, কি ভূমির পরিমাণে। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলাফলে অতি অল্পেই আমাদের মনে হয় মাথায় বুঝি আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, আর বুঝি রক্ষা নাই। আবার সামান্য যুদ্ধ-বিরতিতে আমরা উল্লসিত হইয়া উঠি, মনে করি ঝড় বুঝি কাটিয়া গেল।

আমাদের বুঝিতে হইবে যে যুদ্ধের শেষ নিষ্পত্তি শুধুমাত্র এই সকল বিচ্ছিন্ন জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে দীর্ঘকালের বুদ্ধি, ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্তে শক্তি-পরীক্ষার পরিণতির উপর। যে দেশ বিঘ্ন-বিপদ, দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ দিতে থাকে সে দেশ অজেয়, এ তো এই শতাব্দীতেই একাধিক বার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে যোদ্ধার অভাব নাই। সময় পাইলে শতাধিক ডিভিশন রণাঙ্গনে পাঠাইতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এবং অস্ত্র-সাহায্যও আমরা পাইতেছি ও পাইব।

তবে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি-পর্বে এখন আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এবং দেশের ভিতরে শত্রুর পঞ্চম-বাহিনীর উপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এখন নিতান্তই প্রয়োজন। শত্রুর অগ্রগতিতে তাহারা আশান্বিত হইয়া দেশবিধ্বংসী কার্যকলাপের সূচনা করিতে পারে। আসামে ট্রেন লাইন বিচ্যুত করার চেষ্টা, বর্ধমানে "চীন-প্রতিরোধ"-মিছিলের উপর পটকা ও ইষ্টক নিক্ষেপ, এগুলি শুভলক্ষণ নয়।

ভারতের আর এক শত্রু এখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে আমাদের জন্য অস্ত্রপ্রেরণে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টিত হইয়া বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ হয় নাই তাহার। এখন চলিতেছে অবিশ্রাম গালিবর্ষণ, নিন্দাবাদ এবং এই সুযোগে ভারতকে ঘায়েল করার উস্কানি সেখানের সংবাদপত্রে। তবে সেখানকার কর্তৃপক্ষ এখন বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়াছেন, ইহা একটি সুসংবাদ বটে।

কবিতা

গান

॥ ১ ॥

(অংশ)

মাগো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্' বলে।
আমার যায় যেন জীবন চলে॥

যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে!
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ তলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হবো কোন্ কালে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমার বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

(পুনর্মুদ্রণ)
কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ

গান

॥ ২ ॥

(অংশ)

দুর্গম গিরি-কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার।

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

গিরি সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁসিয়ার

(পুনর্মুদ্রণ)
নজরুল ইসলাম

চীনের প্রতি

আশিস সান্যাল

বিশ্বাসের বিনিময়ে করেছো আহত। তুমি ঘৃণ্য দাবানলে
বিধ্বস্ত করেছো মৈত্রী, অভিজ্ঞতা, স্বাভাবিক নিয়ম-চেতনা
অসুস্থ রক্তের লোভে। তাই আজ অবিরত তীব্র অনুতাপে
ভীষণ ধিক্কার ধ্বনি। চতুর্দিকে অপ্রেমের প্রবল প্রতাপে
তোমার আকাশ যেন স্মরণীয় সূর্যোদয়ে যেতে যেতে ক্রমে
আঁধারে বিনষ্ট আজ। কিন্তু তবু সময়ের ইতিহাস জানে
পেছনে ফেরে না সূর্য, আলো কিংবা মানুষের নির্ভয়
মহিমা—
আততায়ী স্তব্ধ সব—কবরের অন্ধকারে যেহেতু নিহত।

রক্তের দুর্লভ স্রোতে প্রতিহত করবো তোমাকে। ভ্রান্ত চীন,
তোমার ঔদ্ধত্য আর দস্যুতা-লোলুপ এই স্বার্থের লালসা,
সাম্রাজ্যের লোভে ভ্রষ্ট, উত্তেজিত কোলাহলে প্রতিভাত মুখ
দেখবো না কোনোদিন। বন্ধুত্বের প্রতিদানে চতুর আঘাতে
বিধ্বস্ত করেছো মৈত্রী। তাই আজ সমবেত আমরা সকলে
রক্তাক্ত প্রাণের মূল্যে রুখবোই অভিশপ্ত তোমার সংগ্রাম।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

পাঠক! আজ আমি হাল্কা কথায় আপনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করব না। সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। মাঝে মাঝে এমন উপলক্ষ্য আসে যখন সোজা-সুজি কথা বলার দরকার হয়। ভারতের উপর লাল চীনের আক্রমণে আজ জৈমিনির মতো বিদূষকেরও কিছু স্পষ্ট-ভাষণের প্রয়োজন ঘটেছে।

চীনের এই অতর্কিত আক্রমণে সারা ভারতবর্ষ আজ যেভাবে এক হ'য়ে রুখে দাঁড়িয়েছে তা অভূতপূর্ব। দেশের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা অর্থ দিয়ে, সোনা দিয়ে এবং যা সোনার থেকে দামী সেই রক্ত দিয়ে আমাদের জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের অগ্নিশিখাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলছেন। এই আত্ম-নিবেদনের ডাকে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদেরও যে বিশেষভাবে সাড়া দেওয়ার দায়িত্ব এসে গেছে সেই কথাই আমি বিশেষ করে বলতে চাই।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকগণের ঐতিহ্য খুবই গৌরব-পূর্ণ। স্বাজাত্যবোধ বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম প্রেরণা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অগণিত কবি ও সাহিত্যিক স্বদেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করে মহত্ত্ব অর্জন ক'রে গেছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যিকগণও এ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। শরৎচন্দ্র ও নজরুলের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকগণের অনেকে এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন বলে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না, কিন্তু প্রায় সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুয়ায়ী দেশজননীর সেবা করে ধন্য হ'য়েছেন।

কিন্তু গত দশ বারো বছরে বাংলা সাহিত্যের গরিষ্ঠ অংশ যেন এই জাতীয়-কর্তব্য পালনের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। এই লেখকদের প্রতিই আজ আমি আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে চাই।

আমি জানি, সৌন্দর্য সৃষ্টি একটা বড় কথা। সুন্দরভাবে প্রকাশিত না হ'লে কোনো বক্তব্যই পাঠক-সাধারণের মনে

স্থায়ী আবেদন জাগাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সুন্দরের লাবণ্যমণ্ডিত প্রকাশের নিচে থাকে মঙ্গলের শোণিত-প্রবাহ। যে সাহিত্যকর্ম পাঠকবর্গের মনকে মানুষের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে না তোলে, সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয়ে সচেতন করে না তোলে, তাতে সৌন্দর্য যতোই থাক তা নিষ্ফলা। কিংবা তাও নয়। সত্যি বলতে গেলে বলা যায়, এধরণের সৌন্দর্য আসলে কোনো সৌন্দর্যই নয়, তা প্রাণহীন অনুকরণ-মাত্র। আর অনুকরণ যে শেষপর্যন্ত বিকারে পর্যবসিত হয় সে তো বলাই বাহুল্য।

বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের যে অংশের কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, বিকারই তার প্রধান উপজীব্য। স্বকপোল-কল্পিত মন-দেওয়া-নেওয়ার হেঁয়ালি, কিংবা রীতির ঝুটো জৌলুস দিয়ে তার অসারতা আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। সিম্বলের নামে কবিতায় যেমন দেখা যাচ্ছে পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপ, গল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি নকল কাব্যিয়ানা এবং চেতনা-প্রবাহের অচেতন উন্মাদনা বোবার আর্তনাদের মতো করুণ হ'য়ে উঠেছে।

এই পটভূমিতে চীনা-আক্রমণ আজ তরুণতর লেখকদের সামনে প্রবল একটি চ্যালেঞ্জের মতো উদ্যত।

চল্লিশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি এ'দের বিরাগ এ'রা নানাভাবেই প্রকাশ করেছেন। সে সময়ের অনেক লেখাই আজ অপাঠ্য তা সবিনয়েই মেনে নেব, (কোন সময়েরই বা সব রচনা পরবর্তী-কালে সুপাঠ্য হয়!) কিন্তু একটা কথা তবু স্বীকার করতে হবে যে, লক্ষ্যের বিষয়ে তাঁদের মনে কোনো গোঁজামিল ছিল না। সাহিত্য যে সমাজবাসী মানুষের দ্বারা সামাজিক মানুষের জন্যেই রচিত হয়, এ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন স্থিরনিশ্চয়—আর এও তাঁরা জানতেন যে, জাতির প্রধান দায়িত্বের সঙ্গে যে-সাহিত্য হাত মিলিয়ে চলতে পারে না, ইতিহাস তাকে নির্বিচারে নিক্ষেপ করে আবর্জনাস্তূপে।

সাহিত্যিক এবং শিল্পীগণ এই দেশেরই মানুষ। জ্ঞানগরিমায় তাঁরা বিশ্বনাগরিকতার অংশীদার হলেও দেশের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সাধারণ মানুষেরই পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। গত মহাযুদ্ধের সময় আমরা এই কলকাতা শহরেই সামরিক পোষাক পরিহিত বহু বিদেশী কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে দেখতে পেয়েছি। হয়তো আমাদের দেশে ঠিক এই মুহূর্তেই সেরকম সর্বাত্মক সামরিক-বৃত্তির আহ্বান

> **॥ মনে পড়ল ॥**
>
> **এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশিত হবে। মোটামুটি ৮৪০টি শব্দ-সম্বলিত এই রচনা—হাসির ঘটনা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, শিকার-কাহিনী, স্বীকার - কাহিনী, অলৌকিক অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন বা বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে হতে পারে। প্রথমে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা দিয়ে শুরু করে এই বিভাগে অদূর-ভবিষ্যতে পাঠক-পাঠিকাদের লেখা প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই 'অমৃতে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে এই ধরণের মনোজ্ঞ এবং সুলিখিত রচনা পেলে আমরা সানন্দে প্রকাশ করব।**
>
> **সম্পাদক, 'অমৃত'।**

এসে উপস্থিত হয়নি, কিন্তু তার বাইরেও করণীয় আছে অনেক কিছুই।

একথা সকলেই জানেন যে, শিল্প-সাহিত্যের প্রেরণা-সঞ্চারী ক্ষমতা অসাধারণ। একটা বন্দুক কেবল একজন সৈনিকের বুকে সাহস জোগায়, কিন্তু একটি গান পুরো ব্যাটালিয়নকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। এই ভাবমণ্ডল গঠনের জন্যে শিল্পী-সাহিত্যিকগণকে আজ বিশেষভাবে সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে।

বাংলাদেশে আজ যে ধরণের ছবি আঁকা হয়, যাকে চলতি কথায় বলে মডার্ণ আর্ট, তার মধ্যে ভালো কিছু একেবারে নেই তা বলা হয়তো অন্যায় হবে, কিন্তু নতুন কিছু করার ঝোঁকটা সেখানে এতই প্রবল যে ছবি-আঁকা প্রায় খেয়ালখুশির নামান্তর হ'য়ে উঠেছে। এই নৈরাশ্যের কারণ কী, তার হয়তো অনেকরকমই ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। তবে শিল্পীদের দায়িত্ব তাতে কমে না, বরং বেড়ে যায়। কারণ দর্শকের হৃদয়ানুভূতি যদি কোনো রকমেই চিত্রের ভিতরে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে তাদের ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। এবং সে বাধার প্রাচীর ভাঙতে হবে শিল্পীদেরই।

আজ দেশের পরিবর্তিত পটভূমিতে সাহিত্যিকগণের সঙ্গে শিল্পীদের সামনেও তাই নতুন কর্তব্য দেখা দিয়েছে। তাঁরা শুধু ফর্মের কারিকুরি ছেড়ে বলিষ্ঠ ভাববস্তুর সার্থক রূপায়ণের দিকে এগিয়ে আসবেন এবং চিত্রানুরাগী জনসাধারণের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবেন, এইটেই এখন আমাদের বিশেষ প্রত্যাশা।

এবং এইকথাই বলব আমরা দেশের তরুণ সঙ্গীত রচয়িতা এবং সুরকারদের। বাঙালী তার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের জন্যে গৌরব অনুভব করে। বন্দেমাতরম এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বাঙালীরই অমর স্বদেশপ্রেমের বাণীমূর্তি। তাছাড়াও আরো শত শত গান একদিন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে দেশপ্রেমের প্লাবন এনে দিয়েছে। এই গৌরবময় উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ সত্ত্বেও কেন যে নবীন বাংলার গীতিকার এবং সুরস্রষ্টা-গণ তাঁদের জাতীয় কর্তব্যে পিছিয়ে থাকবেন, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া কঠিন।

তাই আজ আমাদের তরুণতর সাহিত্যিক-শিল্পী ও সুরকারদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা বাস্তব কর্তব্যের বিষয়ে অবহিত হন। চীনের এই নগ্ন আক্রমণকে আমাদের জওয়ানেরা যেমন প্রতিহত করছে দুর্জয় সাহসে, আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদেরও গড়ে তুলতে তেমনি স্বাজাত্যবোধের দুর্জয়তর প্রেরণা। আজ শিল্পীরা তাঁদের রঙে ও রেখায়, সাহিত্যিকগণ তাঁদের উদ্দীপ্ত কল্পনার বাঙ্ময় প্রকাশে এবং সুরস্রষ্টাগণ তাঁদের সঙ্গীতের মৃত্যুঞ্জয় আহ্বানে সমস্ত দেশের হৃদয়কে মুক্তিমন্ত্রে জাগ্রত ক'রে তুলুন।

ইতিহাস তাঁদের আশীর্বাদ জানাবে।

বর্তমান সীমান্ত-সঙ্কট ও আমাদের কর্তব্য

তুষারকান্তি ঘোষ

কখনো যা ভাবিনি, তাই হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আক্রমণ করেছে। যে চীনকে আমরা আপনার বলে জেনেছিলাম, বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, যাকে আমরা আত্মার আত্মীয়রূপে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম, আঘাত এসেছে সেই চীনের কাছ থেকেই। চীন সমস্ত মানবিক নীতি ভুলে বর্বর শক্তির দম্ভে আমাদের বন্ধুত্বের প্রসারিত হাতে তার লালসার নখর বসিয়েছে। আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার প্রতিদানে সে আমাদের প্রিয়তম বাসভূমি গরীয়সী মাতৃভূমির সীমান্ত কামড়ে ধরেছে। বেশ কিছুটা গ্রাসও করেছে। আমরা চমকে উঠেছি। আমরা বিস্মিত হয়েছি। একটা অতর্কিত ভূকম্পনে আমাদের বিশ্বাসের ভিৎটাই যেন নড়ে উঠেছে। নড়ে উঠেছে এই জন্যে যে, চীন ছিল আমাদের বন্ধু, ভারতের সঙ্গে তার দীর্ঘকালের সম্পর্ক। সেই বন্ধুই আজ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নেমেছে। ইতিহাসে এ বিশ্বাসঘাতকতার নজির দুর্লভ।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত আর ইতিপূর্বে এতো বড়ো বিপদের সম্মুখীন হয়নি। বহু ত্যাগে, বহু আত্মদানে যে স্বাধীনতার সূর্য ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছে, হঠাৎ যেন একটা কালো মেঘ ক্ষুধার্ত রাহুর মতো তার উপর কালো ছায়া ফেলেছে। আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সে গ্রাস করতে চায়। পশুশক্তির অসীম স্পর্ধা শুভশক্তিকে ধূলায় বিলীন করে দিতে চায়।

এই অতর্কিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাতে আমাদের বেগ পেতে হয়েছে। বেগ পেতে হচ্ছে তার কারণ ঐরকম আক্রমণের জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ভারত শান্তিবাদী। তার এই শান্তিবাদ মৌখিক নয়, আন্তরিক। এই শান্তিবাদের প্রকাশ তার আচারে, অনুশীলনে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণে যে ভারত রিক্ত, হৃতসর্বস্ব, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সেই ভারতই নতুন ক'রে নিজেকে সাজানোর তপস্যায় মগ্ন। কাজেই সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সে তার তূণকে অস্ত্র-শস্ত্রে ভরে তোলেনি।

কিন্তু আঘাত যেদিন এলো, পররাজ্যলোভী কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণ যেদিন শুরু হলো, ভারতের সেদিন ধ্যানভঙ্গ হয়েছে, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় ভারতের নও-জোয়ানরা সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন। যে বলের বিকারে চীন ভারতে আক্রমণ শুরু করেছে, সেই বল প্রয়োগ করেই হয়েছে তার প্রতিরোধ করার আয়োজন। পশুশক্তির বিরুদ্ধে কল্যাণশক্তির এ হলো দুর্জয় প্রতিরোধ। ভারতের পক্ষে এ হলো ন্যায়ের যুদ্ধ—সত্যরক্ষার, স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রাম।

চীনের এ 'চ্যালেঞ্জ'র মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সমগ্র জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বান ঠিক যেন যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। সর্বপ্রকার বাদ-বিসম্বাদ ভুলে ভারত আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে, হয়েছে আমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন।

কিন্তু এই শক্তিকে আজ কি-ভাবে কাজে লাগাতে হবে, সেইটেই হলো আজকে আমাদের চিন্তার বিষয়। আজকের রণকৌশলের একটি প্রধান কথা হলো, আজকের দিনে যুদ্ধ জয়, শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই করা যায় না, সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে যারা থাকে, অর্থাৎ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের কর্মনিষ্ঠা ও উদ্যোগ-আয়োজনের উপর যুদ্ধজয় অনেকখানি নির্ভর করে। কাজেই যে যুদ্ধ আজ আমাদের সীমান্তে চলেছে, ভারতের বীর জোয়ানরা শত্রুকে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করার যে মরণ পণ সংগ্রাম শুরু করেছেন, সে সংগ্রামে জয়লাভের জন্যে আমাদেরও পশ্চাৎ-ফ্রন্ট খুলতে হবে। যুদ্ধজয়ের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে আমাদের ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায়, সর্বক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে যেতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যে কাজ করি, দেশের আপদকালীন জরুরী অবস্থায় আজ তার চেয়েও ঢের বেশী কাজ চাই। কাজ-কাজ—কাজই আজ আমাদের হৃদস্পন্দন হোক। আমাদের যে জোয়ানরা আজ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামরত, আমাদের কাজই তাঁদের হাতে শক্তি জোগাবে, মনে আশা জাগাবে, তাঁরা বুঝবেন তাঁদের পেছনে রয়েছে সমগ্র জাতির সহযোগিতা। এই বিশ্বাস তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করবে।

একটা কথা আজ মনে রাখতে হবে, শত্রুকে আমাদের দেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে হলে আজ সর্বাত্মক আয়োজন প্রয়োজন। দেশের ডাকে আমাদের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ আজ যে সাড়া দিয়েছেন, সে সাড়া অভূতপূর্ব।

প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নরনারীর মনে আজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দুর্জয় সংকল্প। দেশের দিকে দিকে আজ যেন দেশপ্রেমের প্রবল বন্যা প্রবহমান। কিন্তু শুধু আবেগ দিয়ে তো আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আবেগ হলো সৃষ্টিকর্মের উৎস। আজ তাই এই আবেগকে আমাদের কর্মের খাতে বইয়ে দিতে হবে।

এক মুহূর্তের জন্যেও যেন আজ আমরা না ভুলি, শত্রু আমাদের মাতৃভূমির পবিত্রতা নষ্ট করেছে, সে এখনও আমাদের জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এ অপমান যদি আমরা না ঘোচাতে পারি তা'হলে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার আমাদের কোন অধিকারই নেই। সমগ্র বিশ্বের কাছে আমরা করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়াবো, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামী ঐতিহ্য চিরদিনের মতো নষ্ট হবে। তাই শুধু সোনা-দানা, অর্থ-বস্ত্র দিলেই চলবে না, দেশের প্রয়োজনে যে-কোন কর্তব্য পালনের জন্য সকলকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ দেশের প্রয়োজন সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন, স্বাধীনতার আদর্শ সবচেয়ে বড়ো আদর্শ। এই আদর্শ রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে শেষ ভাই, শেষ পাইটিও উৎসর্গ করতে হবে। আজ ঘরে ঘরে সেই প্রস্তুতিই শুরু হোক।

আমাদের দেশবাসীর অসীম দেশপ্রেম। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও হয়তো কিছুসংখ্যক কালোবাজারী ও মুনাফাশিকারী রয়েছে, যারা এই সুযোগে নিজেদের কার্য গুছিয়ে নিতে চায়। তাদের আমরা এই বলে সতর্ক করে দিই যে ইতিহাসের ঘরবদল হয়েছে, ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে, এই পরিবর্তিত পরিবেশে যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটায় তা হলে জাতি কোনদিনই তাদের ক্ষমা করবে না। জাতির দুর্দিনে নিজের সৌভাগ্যের ভিৎ রচনা করার অপচেষ্টার অর্থ হলো জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এই নীতিভ্রষ্ট ব্যবসায়ীগণ যদি এখনই এ বিষয়ে সতর্ক না হয় তাহলে সমস্ত জাতির ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলে উঠবে। আর তার পরিণাম ভয়াবহ।

আর একটি কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এখনও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যে এ যুদ্ধ যে ভারতের পক্ষে ন্যায় ও ধর্মযুদ্ধ, আত্মরক্ষার যুদ্ধ, সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী কিম্বা একমত নহেন। আমাদের দেশের এই বিপদে অবিশ্বাসী বা অর্ধবিশ্বাসীর স্থান নেই। যাঁরা আজও সন্দেহের অবকাশ রাখেন দেশবাসী তাঁদের ক্ষমা করবেন না।

আগেই বলেছি, এ যুদ্ধে ন্যায় ও ধর্ম আমাদের পক্ষে। আমরা সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তির উদগ্র লালসাকে প্রতিরোধ করছি। এ যুদ্ধে জয় আমাদের অনিবার্য। আমাদের ত্যাগ, আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, অন্যায়কে প্রতিরোধ করার আমাদের দুর্জয় সাহস শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সমগ্র পৃথিবী পশুশক্তির সর্বগ্রাসী লোভ থেকে রক্ষা পাবে। আর সেটাই হবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর কাছে শান্তিবাদী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। জয়হিন্দ।

(আকাশবাণী, কলিকাতা-র সৌজন্যে)

মৃত্যু

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শুধুই তোমার চুলে ছিল বুঝি ফাল্গুনের হাওয়া,
শুধুই তোমার চোখে একদীঘি জল।

আমার যা-কিছু নেওয়া-পাওয়া
তুমি শুধু আর সবি বঞ্চনা কেবল।

একটু সময় নেই সময়ের মতো,
তুমি আজ নিরন্তর সতত
তোমাতে সময় বেজে যায়।

কেউ নেই আপনার মহামহিমায়,
আমার উজ্জ্বল আত্মা সেও তোমাতেই
আর্ত হয়ে উপস্থিত নেই
আমার বলতে কিছু আর।

দাও তবে মৃত্যু, দাও শেষ অন্ধকার ॥

অক্ষর

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন অত মধ্যাহ্নের আঁচে
দাঁড়িয়ে রয়েছ, এস বারান্দার ভিতরে দাঁড়াও।
এখানে ক্ষুধার অন্ন না থাক অন্তত
নেই অগ্নিদাহ।

বারান্দা পেরিয়ে তুমি অনায়াসে ঘরের নিভৃতে
ঢুকে এস, শুধু কটি জীর্ণ পাতা ছড়ানো রয়েছে;
আমার ভার্যার বেশে সন্ধ্যালোক তোমার আতিথ্যে
নিয়োজিত হবে, তুমি এসে

আসন গ্রহণ করো, কেন অত মধ্যাহ্নের আঁচে
দাঁড়িয়ে রয়েছ, এই বারান্দা এ ঘর
বিমূঢ় সন্ধ্যার মত বিঁধে আছে নিঃশব্দ মারাচে।
তুমি আজ আমার হও, আরাধ্য অতিথি, হে অক্ষর!

মনে পড়ল

একটি ব্ল্যাকমেলের কাহিনী

পরিমল গোস্বামী
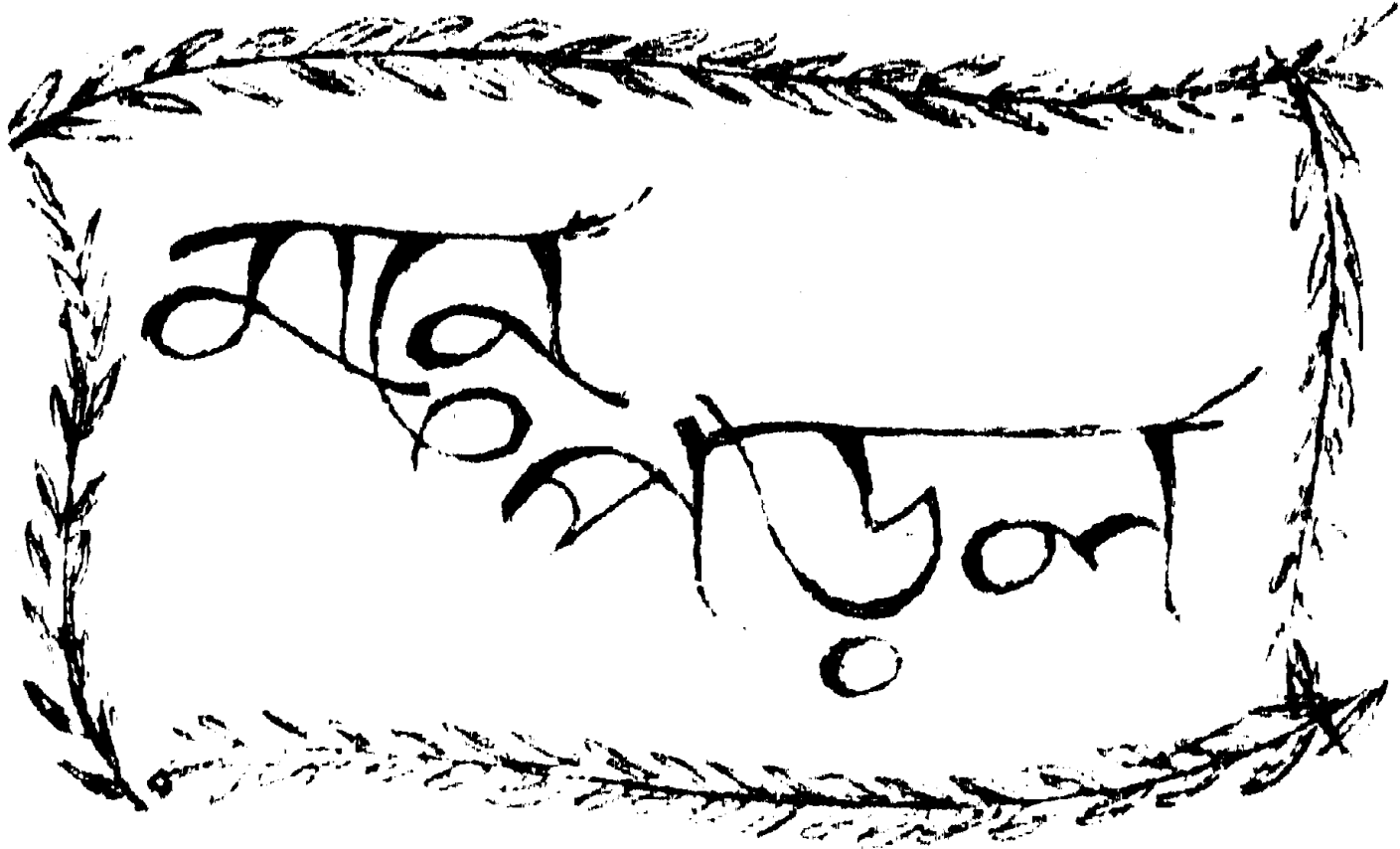
মনে পড়ল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা। ওঁকে আমি গত বছর ব্ল্যাকমেল করেছিলাম।

ব্ল্যাকমেল কথাটির একটি অর্থ হচ্ছে—কোনো অসুবিধাজনক বিষয় প্রকাশ ক'রে জব্দ করব, এই ভয় দেখিয়ে কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করা।

প্রেমেনকে ব্ল্যাকমেল করেছিলাম অনেকটা এই অর্থেই।

কিন্তু কাহিনীটি বলবার আগে তার কিছু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা দরকার।

যাঁদের সঙ্গে প্রেমেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, সে যে-কোনো বিষয় বেশ মনোহর ক'রে বলতে পারে। এই বলা সে এমন একটি আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তার মোহ থেকে তার নিজেরও এখন নিষ্কৃতি নেই। এ জন্য স্বভাবতই তার বন্ধুর সংখ্যা বেশি আর তার লেখার সংখ্যা কম। সময় পাবে কি ক'রে?

আলাপের বিষয় যাই হোক না কেন, প্রেমেনের কাছে সব বিষয়েরই সমান মর্যাদা। রোম্যান্টিক কবি-মানস। তার মনে, যাকে বলে—exuberant intellectual curiosity—তা সব বিষয়ে সব সময়। সে যদি তার কোনো সামান্য অসুখের বিষয় আলাপ শুরু করে, তবে সেই বিষয়টিকে একটি বৈজ্ঞানিক বিস্তারে টেনে নিয়ে যাবে, এবং তাকে নতুন ক'রে সাজিয়ে দর্শনীয় ক'রে তুলবে। তখন তা আর তার ব্যক্তিগত অসুখ থাকবে না, সে-অসুখ তখন একটি অতি চিত্তাকর্ষক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয়ে উঠবে। এবং তার এই অসুখের জন্য তার প্রতি কারো সহানুভূতি দেখাবার দরকার হবে না। দেখাবার সুযোগও পাবে না কেউ। কারণ তার উদ্দেশ্য অন্য। সে শুধু অসুখটাকে মন থেকে টেনে বাইরে মেলে ধরে।

কথা না রাখা এবং কোনো বিষয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে না থাকার ব্যাপারটাতেও সে এমন একটি রম্য-মাধুর্য আরোপ করতে পারে যে, তার কাছে অল্পক্ষণ বাস করলেও রুটীন-অনুসারীদের মনে তার প্রতি ঈর্ষা জাগবে। তার সমস্ত অভ্যাসের উপরেই সে একটা রোম্যান্টিক আবরণ পরিয়ে তাকে সবার বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসালাভের উপযুক্ত ক'রে তোলে। ম্যাজিশিয়ানরা যেমন প্রতারণাকে আর্ট বানায়, প্রেমেনও ঠিক তাই করে। লেখা চেয়ে চেয়ে কাগজের লোকেরা যত তার কাছে ঘোরে, তত সে তাদের ফিরিয়ে দেয়, এবং তত তারা লেখা ফেলে লেখককে বেশি পছন্দ করতে থাকে। তার প্রতারণাই তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

প্রেমেনকে কোনো লেখা লিখতে বললেই সে ভারী সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দেয় যে, তার সময় বড়ই কম, এত কাজ তার। এ বিষয়ে ঘন্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাকে সে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবে।

কাজের চাপে সে অস্থির।

এটি অবশ্য তার ধারণা মাত্র। সম্ভবত বিশ্বাসও।

জেরা ক'রে দেখিয়ে দিয়েছি, সে বস্তুতঃ ব্যস্ত নয়, কাজের চাপ তার বিশেষ কিছুই নেই।

বুঝতে পারে। এবং হাসে। কিন্তু ধারণা নষ্ট হয় না। পুনরায় বক্তৃতা দিতে উদ্যত হয়।

এমন লোকের কাছ থেকে লেখা আদায় করা বড়ই কঠিন। ঘাড়ে চেপে না বসলে পাওয়া যায় না। একবার তার লেখা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম, তার এক কোণে লিখে দিয়েছিলাম, লেখা না দিলে গুন্ডা লাগাব।

কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। গত বছর তাকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল শারদীয় যুগান্তরের জন্য। যথারীতি 'নো রিপ্লাই'। জানতাম লেখা এ ভাবে আসবে না। সময় প্রায় উত্তীর্ণ, এমন সময় প্রেমেন সশরীরে হাজির যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে।

উৎসাহপূর্ণ আবির্ভাব। এমন কি তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যটাই ভুলিয়ে দিয়েছিল এসে। বললাম লেখা দাও।

ভুল ধারণা। লেখা নেই। অন্য কাজে এসেছে।

তখন মনে পড়ল এই হল খাঁটি প্রেমেন। একে ভুললাম কি ক'রে?

কিছু বললাম না। কিছু সময় গেল ভাবতে। পথ পেলাম একটা। বললাম, ভাই একজন তোমার অটোগ্রাফ চেয়েছে, যাহোক দু লাইন কবিতা লিখে দাও।

কাগজ এগিয়ে দিলাম হাতে।

প্রতিবাদ জানাল—এখন কি লিখব? কিছু ভাববার সময় নেই।

বললাম, সেই তো ভাল। যা-তা এলোমেলো কিছু লিখে দাও। এলোমেলো কথাটার উপর জোর দিলাম। ভাবলাম স্পষ্ট কোনো অর্থ হবে না, বেশ হবে।

প্রেমেন তখন নিরুপায়। দু'চার সেকেন্ড চিন্তা ক'রে লিখে দিল অটোগ্রাফ। চার লাইন মোট, শিরোনামা ঐ "এলোমেলো"।

"গুছিয়ে কি লিখবে
দুনিয়াই এলোমেলো
যাই লেখো তাই সই
কি বা কি সে এলোগেলো।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৬।৯।৬১

লেখাটি হাতে পাওয়া মাত্র পাশে যে ছিল তাকেই বললাম, অবিলম্বে প্রেসে পাঠাও পূজাসংখ্যার জন্য।

প্রেমেন চেঁচিয়ে উঠল—না না, ওটা দিও না, দিও না। কি চাও বল।

গল্প চাই।

তাই দেব।

বেশ, তা হলে এটি প্রেসে পাঠাব না। কিন্তু যদি না দাও তা হ'লে পাঠাব।

এর তিন দিনের মধ্যে তার গল্প পেয়ে গেলাম। ১৯৬১ (বাংলা ১৩৬৮) সালের শারদীয় যুগান্তরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'গল্পে নেই' নামক যে গল্পটি ছাপা হয় তা এইভাবে তাকে ব্ল্যাকমেল ক'রে আদায় করা হয়েছিল। কথাটি প্রকাশ করলাম এতদিনে। কিন্তু আশা করি কেউ এ পন্থার অনুকরণ করবেন না। ভালো মানুষের উপর অত্যাচার করা শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

ম্যাকমেহন লাইনের ইতিহাস

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতের উত্তর সীমান্ত স্থিরীকরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয় ১৮০১ সালে। ঐ সময়েই সর্বপ্রথম সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে ভারতের অধিকারের সীমা সুনির্দিষ্ট করা হয়।

এরপর ১৮৪৭-৪৮ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের পরিচালনায় কাশ্মীর ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভারতীয় এলাকা লদাকের জরিপকার্য শেষ হয়। ভারত সরকারের ঐ জরিপ সেদিন তিব্বতের দলাইলামা ও লাসাস্থ চীনা রাষ্ট্রদূতের অনুমোদন লাভ করে। এই-ভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগেই কাশ্মীর থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর সীমান্তের শেষ প্রান্ত মোটামুটি-ভাবে স্থির হয়ে যায়।

।। লদাক ।।

নেপাল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একমাত্র লদাক ছাড়া অন্য কোন এলাকা নিয়ে আপাতত চীনের সঙ্গে বিরোধ নেই। সুতরাং লদাকের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও ইতিহাস এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে জানা দরকার লদাকের ব্যাপারে চীনের এত আগ্রহ কেন। তার একমাত্র উত্তর হল লদাকের ভৌগোলিক অবস্থিতির গুরুত্ব। লদাকের তিনদিকে রয়েছে তিব্বত, সিনকিয়াঙ ও পাকি-স্থান। আফগানিস্থান ও সোভিয়েট ইউনিয়নও লদাক থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ঐ একটিমাত্র এলাকার উপর চীন ভালভাবে অধিকার কায়েম করতে পারলে ঐখান থেকে সে চার পাঁচটি রাষ্ট্রের উপর তার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

কিন্তু লদাক প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই চীনের অধিকারে ছিল না। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে লদাক যথাক্রমে তিব্বত ও কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করলেও বিগত শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত লদাক ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারপর জম্মুর রানা গুলাব সিং লদাক অধিকার করেন। অবশ্য ১৬৯০ সালে সম্রাট আরঙজেবের শাসনকালে তিব্বত একবার লদাক দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু কাশ্মীরের মুঘল সুবাদারের সহায়তায় লদাক সেই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং তারপর থেকে মুঘল সুবাদারের সহায়তার প্রতিদানস্বরূপ লদাক নিয়মিতভাবে কশ্মীর সুবাদারকে ভেট পাঠাতে থাকে। কিন্তু সে ভেট ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক এবং তার দ্বারা লদাকের রাজনৈতিক বশ্যতা প্রমাণিত হত না। লদাক বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীরের অংশীভূত হয় ১৮৪৬ সালে। বৃটিশ সরকার ঐ সময় কাশ্মীর উপত্যকার শাসনভার জম্মুর রাজার উপর অর্পণ করেন। তার দু' বছর পরেই স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের পরি-চালনায় লদাকের সীমান্তরেখা স্থিরীকৃত হয়।

।। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ।।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও ভারত ও তিব্বত চিরাচরিত প্রাকৃতিক সীমারেখা মেনে চলত বলে তিব্বত যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন ভারত ও তিব্বতের মধ্যে কোন সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিব্বত ও চীনের বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করাতে ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত স্থিরীকরণেরও তাগিদ অনুভব করেন।

১৯১২ সালে চীন তিব্বত পুন-র্দখলের চেষ্টা করে কিন্তু তিব্বতীদের প্রবল বাধায় চীনের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, তিব্বতীদের প্রতি-আক্রমণে চীন পিছু হটতে হটতে একেবারে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের উপক্রম করে। একারণে ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটামাত্র ভারত সরকার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে

তিব্বত ও চীনকে এক ত্রিপক্ষ সম্মেলনে আহ্বান জানালেন।

সম্মেলন আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী স্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে লেঃ চার্লস বেলের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী দলকে তিব্বত সীমান্তে পাঠালেন। ইয়ং হাসব্যান্ডের তিব্বত অভিযানকালে চার্লস বেল ছিলেন তাঁর প্রধান সহকর্মী, আর তিব্বতী ভাষাও তিনি খুব ভাল জানতেন। তাই ভারত সরকার বেলকেই ঐ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করলেন।

চার্লস বেল তাঁর সেই তথ্যসমৃদ্ধ দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনী No passport to Tibet গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ঐ গ্রন্থেরই এক জায়গায় লোপা খণ্ডজাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে চার্লস বেল লিখছেন—'সীমান্ত-পল্লী মিগিটাম অতিক্রম করে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি লোপা খণ্ডজাতির ছিল না।' এই উক্তিটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে লোপা খণ্ডজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল তিব্বত রাজ্যের বাইরে। এর একটু পরেই বেল আবার লিখছেন—"We found ourselves on the edge of the **No man's Land** between the Tibetans and the Lopas." এই উক্তিটুকুর বিশেষ উল্লেখ এখানে এই কারণে করা হল যে, ঐ লোপা খণ্ডজাতির বাসস্থানই হল লংজু, যা আজ তিব্বত দখলের দাবীতে চীন তার এলাকা ব'লে দাবী করেছে। এ দাবী শুধু যে অর্থহীনই নয়, অনৈতিহাসিকও তা চার্লস বেলের কথাগুলি থেকে প্রমাণিত হবে।

।। নেফার অধিবাসীগণ ।।

তিব্বতী ভাষায় লোপা কথাটির অর্থ হল বিদেশী, এবং বর্তমান নেফা অঞ্চলের মিশমি, আবর, মিরি, আকা, দাপলা, মন প্রভৃতি সবকটি উপজাতিকেই সম্মিলিতভাবে তিব্বতীরা বলে লোপা। এদের সঙ্গে তিব্বতীদের ভাষার বা সংস্কৃতির বা ধর্মীয় আচার-আচরণের কোন সম্পর্ক নেই এবং কোনদিনই এরা তিব্বতীদের অধিকারে ছিল না। তাদের সম্পর্ক ছিল আসামের অহোম রাজাদের সঙ্গে। তারপর উনিশ শতকে বিভিন্ন উপজাতি একে একে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন আকা উপজাতির সঙ্গে ভারত সরকারের সন্ধি হয় ১৮৪৪ ও ১৮৮৮ সালে। আবর এলাকা ভারত সরকারের শাসনাধীন হয় ১৮৬২-৬৩ সালে। মিরি অঞ্চল ভারত সরকারের শাসন মেনে নেয় ১৮৫৩ সালে। ঐসব এলাকার জরিপ শেষ হয় ১৯১১-১৩ সালে। লোহিত এলাকার জরিপ হয় ১৯১১-১২ সালে। ১৯১৩ সালে যখন সিমলায় ত্রিপক্ষ সম্মেলন আরম্ভ হয় তখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ঐ খণ্ডজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি শাসনকার্যের সুবিধার্থে 'সাদিয়া ফ্রন্টিয়ার' ও 'বালিপাড়া ফ্রন্টিয়ার ট্রাক্ট' নামে দুটি প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট শাসন-এলাকায় বিভক্ত ছিল।

।। সিমলা সম্মেলন ।।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সিমলায় ত্রিপক্ষ সম্মেলন আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালে। এবং বহু নোট বিনিময় ও আলাপ আলোচনার পর সম্মেলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৪ সালের ২৭শে এপ্রিল। কারণ ঐদিন চুক্তিপত্রে ভারত সরকারের পক্ষ হতে স্বাক্ষর দেন স্যার হেনরি ম্যাকমেহন, তিব্বতের পক্ষ হতে স্বাক্ষর করেন তিব্বতের প্রধানমন্ত্রী মা-ত্র ও চীনের হয়ে স্বাক্ষর করেন ইভান চেন।

ভারত সরকারের প্রতিনিধি স্যার হেনরি ম্যাকমেহন ছিলেন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী। কূটনৈতিক রীতি অনুসারে তিনিই হন ঐ সম্মেলনের সভাপতি এবং এই কারণেই ঐ সম্মেলনে স্থিরীকৃত ভারত-তিব্বত সীমান্তরেখা ম্যাকমেহন লাইন নামে পরিচিতি লাভ করে।

কিন্তু স্যার ম্যাকমেহন ভারত সরকারের প্রধান প্রতিনিধি হলেও তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন লেঃ চার্লস বেল। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে তাঁরই আলোচ্য সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল সবচেয়ে বেশী। এ কারণে সহজেই তিনি সম্মেলনের আলোচনার উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রস্তাবমত ২৭°-৪৮' অক্ষাংশ বরাবর ভূটান হ'তে ভারত-চীন-বর্মা সীমান্ত-সঙ্গমের নিকটবর্তী তালু পাস পর্যন্ত প্রায় ৭৫০ মাইল দীর্ঘ তিব্বত-ভারত সীমান্ত স্থিরীকৃত হল। প্রকৃতপক্ষে যে সীমান্তকে ভারত ও তিব্বত দীর্ঘকাল হতে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সীমারেখা বলে মনে করে আসছিল সিমলা সম্মেলনে উভয় সরকারের ইচ্ছাক্রমে তাই আইনতঃ সীমারেখা বলে স্বীকৃতিলাভ করল। এই সীমারেখার সমর্থনে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, তার দৈর্ঘ্য বরাবর রয়েছে একশ মাইল প্রশস্ত দুর্গম পর্বতশ্রেণীর দুস্তর ব্যবধান।

ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর জলচ্ছেদ বরাবর এই সীমান্তরেখার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটানো হয় মিগিটাম অঞ্চলে তিব্বত সরকারের অনুরোধে ও লোহিত, দিহং, সুবর্ণশ্রী ও নামজং নদীর প্রবেশ-মুখে। মিগিটাম অঞ্চলে জলচ্ছেদ নীতির ব্যতিক্রম ঘটানো হয় তিব্বতের দুটি পবিত্র হ্রদ সো কার্পো (শ্বেত হ্রদ) ও সারি সারপু সম্পূর্ণরূপে তিব্বতের অভ্যন্তরে দেবার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া তিব্বতের তীর্থপথ সারি নিইংপা ও সীমান্ত পল্লী মিগিটামও তিব্বতের অভ্যন্তরে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, তিন সরকারের প্রতিনিধি নূতন সীমান্ত ব্যবস্থায় সম্মত হয়ে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পাকা দলিলে স্বাক্ষর দানের জন্যে কাগজপত্র যখন চীনে পাঠানো হ'ল তখন চীন সরকার এক নতুন আপত্তি তুললেন। তাঁরা বললেন, ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী প্রস্তাবিত ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে তাঁদের কোন বক্তব্য নেই, কারণ ও ব্যাপারে তাদের কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল না। কিন্তু তিব্বত ও চীনের মধ্যে যে সীমান্ত-রেখা প্রস্তাবিত হয়েছে তা তাঁরা মানতে রাজী নন। সিমলা সম্মেলনে গৃহীত চারটি সিদ্ধান্তের মধ্যে ঐটিই ছিল প্রথম। সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

চীনের এই অনমনীয় জেদের জন্যে ভারত সরকারকে বাধ্য হয়েই সিমলা সম্মেলনের প্রথম সিদ্ধান্তটি বাদ দিতে হ'ল। এবং বাকি সর্তগুলির ভিত্তিতে তিব্বত ও ভারতের অনুমোদনক্রমে ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমারেখা স্থির হ'ল।

তিব্বত সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ভারত সরকার কি মনোভাব প্রকাশ করেছে বা চীন কি দাবী করেছে এইটাই বড় কথা নয়। তিব্বত যে চীনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন স্বাধীন ইচ্ছায় ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত স্থির করেছিল তাতে প্রমাণ হয় যে, তিব্বত তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। অন্যথায় এজাতীয় ঘটনা কিছুতেই ঘটা সম্ভব ছিল না। আজ তিব্বত আর তা পারে না এবং পরাধীন বলেই সেটা সম্ভব নয় তার পক্ষে। দিল্লী সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসাম বা কেরলের রাজ্য সরকার যদি কোনদিন অন্য কোন দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে তবে সেদিন নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, আসাম বা কেরল আর দিল্লী সরকারের অধীন নয়। ১৯১১ সালের পর থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিব্বত যে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল তা কোন যুক্তি দেখিয়েই অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং একদিন দুই সরকারের স্বাধীন ইচ্ছায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, পিকিঙ সরকারকে তার এক পক্ষের উত্তরাধিকারীরূপে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক আইনের এটি অবশ্যপালনীয় বিধান।

এমন তো কথা ছিলোনা!

কুট্টি
২৬-১১-৬২

আমি তো আগেই বলেছি, ওদের অটোম্যাটিক অস্ত্র নেই! সবই ওদের সেই পুরানো ধরনের বেয়নেট ওলা বন্দুক!
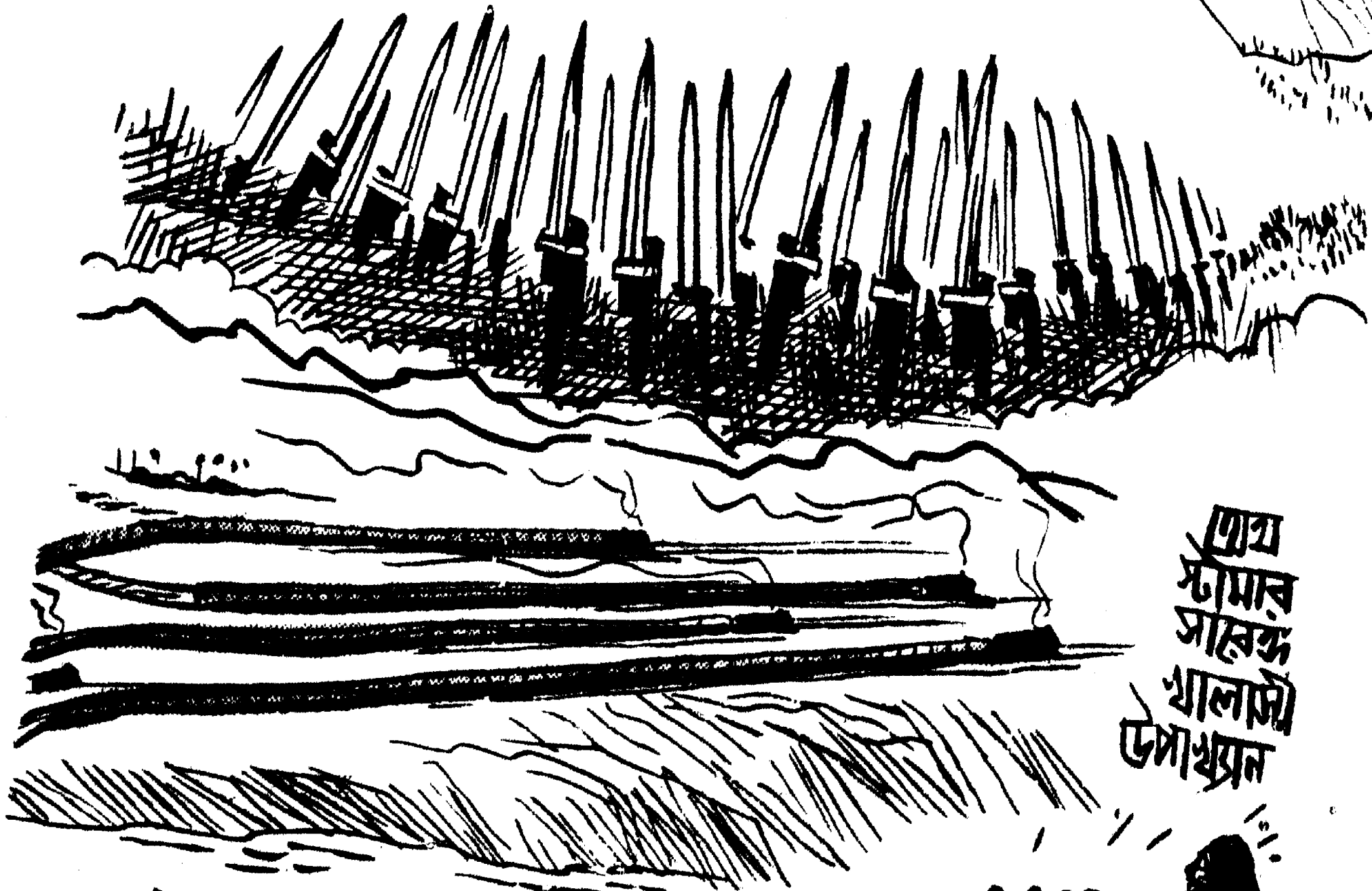
তাতো বুঝলাম, কিন্তু একেবারে এভাবে ...!

অথ স্টীমার সারেঙ্গ খালাসী উপাখ্যান

ও মিঞা, আমরা তো হরতাল করলাম! আর এখন যে ভারত ওপার রেলেই মাল পাঠায় আসামে?

প্রতিভা বসু

[উপন্যাস]

সমস্ত ঠিক-ঠাক ক'রে দিয়ে নীলিমা এ ঘরে এসে দাঁড়ালো; 'তা হ'লে আপনি এবার শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু।'

দিগ্বিজয়ী টি-বি-বিশারদ ডাক্তার মৈত্র মোটা চুরুট দাঁতে কামড়ে বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে ভ্রূকুটি করলেন। 'শোবো! এখুনি! এখুনি ঘুম পেয়ে গেল তোমার?'

নীলিমা হাসলো, 'বা রে, আমার কেন ঘুম পাবে। এমনিতেই আমার দেরিতে শোবার অভ্যেস, তার উপরে এ দেশে তো দেখছি যতো কাজ যতো ফূর্তি সব তাদের রাত্রে। আমাদের বারোটা একটার আগে কোনোদিন ঘুম হয় না।'

'তবে?'

'তবে কী? আপনি ক্লান্ত না?'

'ক্লান্ত! ক্লান্ত কেন হবো।'

'সেই শিকাগো থেকে বাসে চড়ে এক রাত একদিন কাটিয়ে এসে পৌঁচেছেন। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে তবে তো বিশ্রাম হবে?'

'দেখো নীলা, আমি এইচ, বোসের কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন নই যে নিজের মাথায় টাক নিয়ে অন্যের মাথার চুল গজাবার তেল বিক্রী করবো। আমি প্রশান্ত মৈত্র, আমি নীরোগ থাকার মন্ত্র জানি বলেই রোগীদেরও সেই মন্ত্র দিতে পারি। মহম্মদ মহসীনের গল্পটা জানো তো?'

নীলিমা বসলো, বললো, 'কী?'

'এক বিধবা মহিলা এসে তাঁর কাছে নালিশ জানালেন, তাঁর ছেলেটি রোজ সন্দেশ খেতে চায়। রোজ তাকে সন্দেশ খাওয়াবেন এমন সাধ্য তাঁর নেই, অথচ ছেলেকে সে কথা কোনোরকমেই বোঝানো যায় না, সে খাবেই। আর না পেলেই চ্যাঁচাবে। সুতরাং মহিলাটির আর্জি মহসীন সাহেব যদি তাঁর ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে উপদেশ দেন, ছেলেটি হয়তো তার এই অন্যায় আবদার থেকে মুক্ত হ'তে পারে। আর্জি শুনে মহসীন মুখ নিচু করলেন, কপাল কুঁচকে ভাবনার সাগরে ডুব দিলেন। একটু পরে বললেন, "আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে তুমি ছেলেকে নিয়ে এসো। আমি তখন বলতে পারবো এই রোগ তার সারাতে পারবো কিনা।" কথামতো তাই করলেন মহিলাটি এবং তাঁর ছেলের আবদার সেরে গেলে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, এক সপ্তাহের সময় তিনি নিয়েছিলেন কেন? মহসীন একটু লজ্জিতভাবে বললেন, "জানো মা, আমার নিজেরো যে ঐ একটা বদরোগ ছিলো। একটি সন্দেশ আমার রোজই চাই। যদি নিজেই লোভ ছাড়তে না পারবো, অন্যের লোভ ছাড়াবো কী করে?" ডাক্তার মৈত্র হাসলেন, 'বুঝলে? আমি যদি এইটুকুতে ক্লান্ত হই তাহ'লে মা লক্ষ্মী তোমাদের ক্লান্তি কোন্ অসুধে দূর করবো ব'লো?'

নীলিমাও হাসলো। উপমাটা উপভোগ ক'রে বললো, 'তা হ'লে আর এক কাপ কফি ক'রে আনি? কফি সহযোগে—'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কফি তুমি যতো কাপ খুশি ক'রে আনো না কেন, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বয়স বেড়েছে বলে বুড়ো ভেবো না, দশটা না বাজতে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে বোলো না।'

হাসিমুখে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নাঘরে কফি করতে গেল নীলিমা। এক কাপ নয়, এক পট ভর্তি করে আনলো। ঢালতে ঢালতে বললো, 'ঠিক আছে, দেখি, কতো রাত জাগতে পারেন। বলুন, দেশের কে কোথায় কেমন আছে, সব খবর বলুন।'

ডাক্তার মৈত্র পা নাচালেন, গরম কফিতে চুমুক দিলেন, হাতের বই মুড়ে রেখে বললেন, 'দেশের গল্প যথা পূর্বং তথা পরং, বিদেশের গল্পই জমবে ভালো। তুমি বলো, এখানে লাগছে কেমন।'

'খুব ভালো।'

'একেবারে খুব ভালো?'

'সত্যি খুব ভালো।'

'কী ভালো? দেশটা? দেশের খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য? পুষ্টি? পরিচ্ছন্নতা? না কি মানুষ-জন দোকান-পসার—'

'সব মিলিয়েই অত্যন্ত পছন্দসই। আমি ভেবেছিলাম, এখানে আমার মন টিঁকবে না, খুব খারাপ লেগেছিলো আসবার সময়ে, কিন্তু কোথা দিয়ে যে বছর দু'টো কেটে গেল।'

'সর্বনাশ। একেবারে মেমসাহেব বনে গেলে? দেখো বাপু, ফিরবে তো শেষ পর্যন্ত।'

'মেয়াদ ফুরোলেই ফিরবো কিন্তু তাড়া নেই মনের মধ্যে। কেন, আপনার ভালো লাগছে না?'

'আমার! আমার ভালো-মন্দের উপর কিছু নির্ভর করছে না।'

'কেন?'

'কেন কী গো। আমি তো মাত্র কয়েক দিনের অতিথি। ঋতুপর্ণ। সময় ফুরোলেই ঝরবো।'

ডাক্তার মৈত্র শিকাগোতে একটা মেডিকেল কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন মাসখানেক আগে, কাজ সেরে ফিরে যাবার পথে কয়েক দিনের জন্য নিউইয়র্কে বন্ধু-কন্যা শ্রীমতী নীলিমা সান্যালের আতিথ্য কাটিয়ে যেতে এসেছেন। নীলিমার স্বামী প্রোফেসর সান্যাল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অধ্যাপক। কোনো কাজে ওয়াশিংটন গিয়েছেন, তাই অপেক্ষা করছেন জামায়ের জন্য। নীলিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আহা আপনি যেন এই একবারই এলেন।'

ডাক্তার মৈত্র হাসলেন. 'তা অবশ্যি বলতে পারো, তবে তোমার মতো কখনো মজে গিয়েছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তা কি আর?' নীলিমা ঠাট্টা করলো, 'কতো বার প্রেমে পড়েছেন বলুন দেখি?'

'প্রেম! কই, মনে তো পড়ছে না।'

'কী ক'রে পড়বে। ভারতীয় ছেলেরা ভুলতে ওস্তাদ। দিব্যি প্রেম টেম ক'রে— শেষে পালিয়ে যায়!'

'আর এ-দেশের ছেলেরা বুঝি একেবারে অচল হ'য়ে লেগে থাকে?'

'থাকেই তো।'

'না বাপু, তোমার একথা আমি মেনে নিতে পারলুম না।'

'কেন? কেন?' প্রতিবাদের সুরে আপনা থেকেই তীব্রভাবে বেরিয়ে এলো নীলিমার গলায়।

ডাক্তার মৈত্র হাসলেন, 'এ জাতের সব ভালো কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে এরা বড্ড হাল্কা।'

'কক্ষনো না।'

'প্রমাণ করতে পার?'

'নিশ্চয়ই।'

'করো দেখি। বলো দেখি এই দু' বছরে তুমি এমন কোনো প্রেমিককে দেখেছ কিনা, যে ছোকরা সতেরো থেকে সাতাশের মধ্যে সতেরো দুগুণে—অন্তত চৌত্রিশ বার প্রেম করেনি, আর প্রেমিকা ছাড়েনি?

'আমি তো এখানে এমন কোনো ছেলে-মেয়েই দেখিনি যাদের মনের কথাটা শুধু এই যে বিয়ে করবো না অথচ প্রেম করবো। সে ওরা চৌত্রিশবারই করুক আর চৌত্রিশ দুগুণে আটষট্টি বারই করুক।'

'ওরে বাবা, এ দেখছি এ দেশের উকিল নিযুক্ত হ'য়েছে!'

'এখানে ওদের নিজেদের দেখেশুনে বিয়ে করতে হয় বলেই রোজ রোজ এর ওর সঙ্গে ডেট্ করে, মিলে-মিশে পছন্দ হ'লে তবে তো? ঐ ডেট করাই বলুন, আর প্রেম করাই বলুন, ওটাই ওদের মেয়ে দেখা বা ছেলে দেখা বা সম্বন্ধ করা। যাকে পছন্দ হয় প্রেমটা লেগে যায়, যাকে হয় না ভেঙে যায়। নিতান্তই সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপার। যেমন আমাদের বেলায় চব্বিশবার সাজিয়ে-গুজিয়ে মেয়ে দেখানো হয়। আপনি কি বলবেন সেটা এর চেয়ে কিছু কম বিশ্রী? বরং যুক্তি-তর্ক যদি তোলেন আমি প্রমাণ ক'রে দেবো সেটার মতো অপমানকর ব্যাপার মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই। এর মধ্যে আর যাই থাক, অপমান নেই। আর সত্যিকারের প্রেম যখন হয়, তখন এরা যে কতো সিরিয়াস আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি, এখানে আসবার মাসখানেকের মধ্যেই একটি সানফ্রান্সিস্কোর ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়—কিন্তু না, সে গল্প থাক।'

ডাক্তার মৈত্র উৎসুক হ'য়ে বললেন, 'বলো, বলো।'

'অনেক রাত হ'য়ে যাবে।'

'আবার তুমি আমাকে সন্ধ্যারাতেই বাচ্চাদের মত ঘুমিয়ে পড়তে প্ররোচিত করছো?'

নীলিমা হাসলো, 'ক'টা বেজেছে জানেন?'

'ঘড়ি দেখে শুইনি কোনোদিন।'

'গল্পটা শুনলে ধারণা আপনার নিশ্চয়ই পালটাবে, কিন্তু বড্ড বড়ো, শুনতে সময় লাগবে অনেক, শেষ পর্যন্ত আপনার ধৈর্য থাকবে না।'

'আহা, কথা না বাড়িয়ে আসল খবরটা বলো দেখি তুমি।' ডাক্তার মৈত্র নড়ে-চড়ে সিগারটা নতুন ক'রে ধরিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে বসলেন।

নীলিমা উঠে গিয়ে জানালার ভারি পর্দাটা ভালো ক'রে টেনে দিতে দিতে বললো, 'মিসেস ব্রাউন বলে এখানে এক ভদ্রমহিলা আছেন, পার্ক এ্যাভিনিউর বাসিন্দা তাঁর বাড়িরই মস্ত এক গণ্যমান্য ককটেল পার্টিতে গিয়ে এই ছেলেটিকে আমি প্রথম দেখি। নিউইয়র্ক শহরে এই মহিলার বাড়িটি বিখ্যাত। তাঁর সুসজ্জিত ড্রইং-রুমটি আধুনিকতার একেবারে চরম উৎকর্ষ বলে ধ'রে নিতে পারেন। ঘরের মধ্যেই তাঁর উদ্যান, লন, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল, কৃত্রিম পাহাড়, ফোয়ারা, বাকী নেই কিছু। কিন্তু একটুও দেখানোপনা লাগে না, সাজানো বানানো লাগে না, একেবারে 'যথার্থ'। দেয়ালগুলো কী একরকম অদ্ভুত কাচ ধরনের জিনিসে তৈরী যে সমস্ত ঘরটা আয়নার মতো তার মধ্যে ছায়া ফেলে। জানালা দিয়ে তাকালে সোজা ঈস্ট নদী দেখা যায়, এতো মজা লাগে। তীরে তীরে সব একতলা দোতলা রাস্তা। ভদ্রমহিলা থাকেন উনিশ আর কুড়ি তলার উপরে। ঐ দু'টো এ্যাপার্টমেন্ট কিনে নিয়েছেন উনি।'

'অত্যন্ত ধনী মহিলা বলতে হবে।'

'দারুণ। ড্রইং-রুম থেকে পাঁচ ধাপ উঁচুতে কী ভালো একটা লাইব্রেরী করেছেন, আবার তার তিন ধাপ নিচে যতো সব মূল্যবান ছবির সংগ্রহ, সব অরিজিনেল। এদিকে পাহাড় ফোয়ারা ঘিরে কিছু গ্রীক ভাস্কর্যের নমুনাও দেখা গেল। একটা বর্দা আছে।'

'তা হ'লে বাড়িটি দেখবার মতো।'

'সত্যিই দেখবার মতো।'

'আর বাড়ির মালিকানিটিও নিশ্চয়ই—'

'তিনিও দেখবার মতোই সুন্দরী। বয়েস বেশ হ'য়েছে, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। মনে হয় পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তরুণী। ভাব-ভঙ্গী রানীর মতো। বয়সের তুলনায় মাথার চুল কী ঘন। আর সেই চুল তিনি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ঢেউ খেলিয়ে এমন সুন্দর ক'রে রাখেন! তখন আবার নতুন রং করিয়েছিলেন, চকচক করছিলো। একেবারে পাকা ধানের মতো গাঢ় সোনালি রং।'

'ঐ সব ঝোঁক দিয়েই তোমার মন ভুলিয়েছে বুঝেছি।'

'মোটেও না। মেকি আমরা কে না করি। প্রকৃতি আমাদের যেভাবে ভব-সংসারে পাঠিয়েছেন, কেউ কি সেভাবে থাকি? শরীর তো মেকিতেই ভ'রে রাখি, বলতে পারেন সেই মেকিতেও ওরা সমান দক্ষ। আমাদের মতো এবড়োখেবড়ো, নয়।'

'নাঃ, তুমি দেখছি বড্ড বেশি ভক্ত হ'য়ে পড়েছ।'

'একদিন মিসেস ক্রাউনের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক'রে নিয়ে যাবো আপনাকে, এই বুড়ো বয়সে যদি কেলেংকারী করেন আমি জানি না।'

'না, সে ভয় নেই। ভদ্রমহিলা ডিভোর্স'ড।'

'যাক একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। তারপর বলো—'

'সেদিন তিনি আমাদের অনারেই পার্টি'টা দিয়েছিলেন। আর যেহেতু আমরা ভারতীয় সেইজন্য পোষাকটা তাঁর গাঢ় মেজেন্টা রংয়ের ভারতীয় র সিল্কে তৈরী ছিলো। সেই অদ্ভুত ছাঁটের ঢোলা পোষাকের মেজেন্টা রং আর তাঁর গায়ের রং মিশে রূপের জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিলো। তার উপরে গলায় ডুমুরের মতো বড়ো বড়ো মুক্তোর তিন-লহরী

নোংরা জামা-কাপড় পরে.....

ডাক্তার মৈত্র জোরে হেসে উঠলেন, 'কী বোকা মেয়ে, এতো লেখাপড়া শিখে একটুকুও শিখলে না যে কেলেংকারী মানুষে না জানিয়েই করে। কিন্তু মাগো, মিসেস্ ক্রাউনের সাহেব স্বামী কি তা হ'লে আমাকে আস্তো রাখবেন?'

মালা ঝুলিয়েছিলেন, হাতে মুক্তোর আংটি, কানে মুক্তোর ফুল। খাড়ার মতো তীক্ষ্ম নাক, পাৎলা রঙিন ঠোঁট, নীল রংয়ের টানা টানা চোখ,—ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যেন প্রজাপতি। দেখে দেখে আমার আর চোখ ফিরছিলো না। বুঝতে পারছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে যে এই মহিলার এতো প্রতিষ্ঠা, তার কারণ শুধুমাত্র তাঁর ডলার নয়, এই রূপেও অনেকখানি। তার উপর মহিলাটি বিদুষী। কবিতা লেখেন, হার্প বাজিয়ে মিষ্টি গান করেন, হৃদয়টি স্নেহশীতল, ব্যবহার ত্রুটিহীন। এই ধরনের আতিথেয়তা বা সমাজ-সেবায় একেবারে ঢেলে রেখেছেন নিজেকে।'

'গল্পের নায়িকা তা হ'লে ইনিই?'

'না। এই গল্পের সঙ্গে এ'র সম্বন্ধ বলতে গেলে নিতান্তই কম।

'সে কী। তা হ'লে গল্প দাঁড়াবে কী ক'রে।'

'শুধু নায়কটিকে নিয়েই আমার গল্প।'

'শুধুই নায়ক?'

'শুধুই নায়ক। সেই সানফ্রান্সিস্কোর ছেলেটিই এই গল্পের একমাত্র খুঁটি।'

'তা হ'লে মিসেস ক্রাউনের পার্টি'টা?'

'ওটা উপলক্ষ্য।'

'বুঝতে পারলাম, তুমি কোনোদিন লেখিকা হ'তে পারবে না।'

'তা নিশ্চয়ই পারবো না। কিন্তু কেন পারবো না তার কী এমন বিশেষ কারণ আপনি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সেটা বলুন তো?'

'উৎকৃষ্ট গল্প-লিখিয়েরা তাদের গল্পের মধ্যে কোনো অকারণ চরিত্র ঢোকায় না।'

'কিন্তু এটা তো আমার গল্প নয়।'

'কী তবে?'

'নিজের দেখা সত্য ঘটনা।'

'ও, আচ্ছা বলো।'

'মিসেস ক্রাউনই সেই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার। বললেন, 'এই আমাদের রাসেল, ওয়াশিংটন স্কোয়ারের বিখ্যাত বীটনিক। কবিতা লেখে, রাত জাগে, কম খায়, বেশী খাটে আর সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।' ব'লে মিষ্টি ঝিরঝিরে গলায় হাসলেন।

এই ছেলেটির কথা আমি আগেও নানা লোকের কাছে শুনেছিলাম। মিসেস ক্রাউনও বলেছিলেন। ভালো ক'রে দেখলাম। রাসেল সবেগে মাথা ঝেঁকে বললো,

'ম্যাডাম, আপনার সব কথা সত্যি নয় অন্তত বীটনিক শব্দটার জন্য আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

মিসেস ক্রাউনের মুখে কৌতুক বিচ্ছুরিত হ'লো। ভ্রুকুটি ক'রে বললেন, 'যদি ভুল বলে থাকি, দুঃখিত। কিন্তু আমার মনে হয় একটা পার্টিতে আসতে গেলে অন্তত তার কাস্তাগুলো নিয়ম-কানুন মেনে নেয়া উচিত। যেমন গায়ের শার্টটা, পায়ের জুতোটা, মাথার চুলটা—'

রাসেল বাধা দিল, 'আপনি তো জানেন আমি ও সব মানি না।'

'তার মানেই তুমি বীট।'

'কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হ'তে আমি রাজী নই, আমার মতামত একা আমার। আর অত টিপটপ কাপড়চোপড় আমি কোথায় পাবো বলুন তো। যা দেখলে আর আপনি আমাকে বীট বলবেন না? আমার সামর্থ্য আছে নাকি?'

মিসেস ক্রাউনের মুখের হাসি অমলিন। ওর পিঠে তিনি আস্তে হাত ছোঁওয়ালেন। বোঝা গেল ছেলেটির উপর তাঁর স্নেহ আছে। নরম গলায় বললেন, 'লোকে তো বলে একটা কবিতার বই বিক্রী ক'রেই তুমি অনেক ডলার লাভ করেছ।' বাঁ দিকের ভুরুটা তুলে একটু ঠাট্টা ক'রলেন, 'অবিশ্যি সেটাকে ঠিক কবিতার বই বলা যায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে।'

রাসেল ঠাট্টাটা বরদাস্ত করলো না, চটে গিয়ে বললো, 'মতভেদ আর যা নিয়েই থাকুক, কবিতা নিয়ে যদি হয় তা হ'লে বলবো, সে সব লোক কবিতা বোঝে না। আর তাছাড়া শুনুন, ও-সব ফর-ম্যালিটি যে আমি মানি না তাতো আপনার অজানা নয়। ও-সব মেকি সভ্যতা আমার খুব অপছন্দ।'

'কিন্তু, দেশাচার তো বাছা মানতেই হবে?'

'দেশ! দেশ কোথায়? কার দেশ? আমি যতোটা আমেরিকান, তার চেয়ে বেশী ভারতীয়। না, শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী।' বলতে বলতে রাসেল উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, হাতের কোমর-সরু গ্লাশ থেকে খানিকটা ড্রাই মার্টিনি উপচে পড়লো তার গলা-খোলা শার্টের বুকে।'

মিসেস ক্রাউনের চোখে আদর উপ-চালো, 'তা ভারতীয়ই হও আর বাঙালীই হও, তাই বলে নোংরা জামা-কাপড় পরে আসবে সেটা মোটেই শোভন নয়। যদি পারো তা'হলে বলবো, ভারতীয়রাই নোংরা।'

জেনে-শুনেই মিসেস ক্রাউন রাসেলের আসল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। রাসেল দেয়ালে ঠেসান দিল, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিল, চ্যালেঞ্জের সুরে বললো, 'তর্ক যদি করতেই চান, তা হ'লে আসুন, আপনি প্রমাণ করুন আপনারা পরিষ্কার, আমি প্রমাণ করি, সত্যিকারের পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে। আর তার যা'রা দৃষ্টান্তস্থল সেটা কোন্ দেশ।'

'রক্ষে করো' মিসেস ক্রাউন ঈষৎ শব্দ ক'রে হাসলেন এবার, হাতজোড় ক'রে বললেন, 'এখন বসে তোমার সঙ্গে যদি ঝগড়া করি, তা'হলে আর অন্য অতিথি-দের আসতে বললাম কেন? সে একদিন একা একা নিভৃতে হবে। তুমি বরং এই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ ক'রে মাথা ঠাণ্ডা করো, আমার মনে হয় আজকের সভা তোমার এ'র জন্যই সুখের বলে মনে হবে। আর তাছাড়া বলা কি যায়, মিসেস সান্যাল হয়তো তাকে চেনেন।'

'কাকে?' আমি এতোক্ষণে একটা কথা বলার সুযোগ পেলাম।

মিসেস ক্রাউন বললেন, 'সেটা আপনি রাসেলের কাছেই জানতে পারবেন। কী বলো?' বলতে বলতে তিনি চোখ টিপে একজোড়া আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আপনি তো জানেন কাকাবাবু, এই ককটেল পার্টিগুলোর মস্ত অসু-বিধেই হচ্ছে এই যে, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যে কাজে আমি একেবারেই অপটু। যদিও তখনো তেমন জমে ওঠেনি পার্টি, তবু প্রায় আধঘণ্টার উপরে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পা ধ'রে এসেছিলো। একটু বসবার জন্য প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এ কোণে, ও কোণে নরম ফোমের রাশি রাশি কুশানশোভিত সব আরামের আসন ছড়ানো ছিটানো, রাসেলের দিকে তাকিয়ে কাতর হ'য়ে বললাম, 'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আর যদি খুব অভদ্রতা না হয়, তা হ'লে আমি একটু বসি।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই।' রাসেলই অগ্রণী হ'য়ে বসলো গিয়ে, আমাকে ডাকলো, 'আসুন।' অবাক গলায় বললো, 'আপনি কোনো পানীয় নিলেন না?'

'আমার ও সব অভ্যেস নেই।'

'বুঝেছি। কিন্তু এখানে অনেক ভালো ফরাসী মদ আছে। একটু যদি ভাঁদর কিম্বা দুবনে নিয়ে দেখেন আমার মনে হয় খুব ভালো লাগবে।'

'ও আমার হবে না।'

'না, না, খুব হবে। একটু নিন। নিয়ে দেখুন না কেমন লাগে।' রাসেল দৌড়ে বয়কে ডেকে নিয়ে এলো, অতি-যত্নে পাৎলা ছোটো গ্লাশটি তুলে দিল হাতে। মৃদু হেসে বললো, 'খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে। আপনি তো বাঙালী?'

'একেবারেই খাঁটি বাঙালী।'

'আমি আপনার লাল সিঁথি দেখে বুঝেছি।'

'লাল সিঁথি? মানে সিঁদুর। বাঙালী মহিলাদের সিঁদুর রহস্যও তা হ'লে তোমার জানা আছে দেখছি।'

'সব জানি।'

'এখানে এসে থেকে তো এই সিঁদুরের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত। সকলেরই দেখছি এ বিষয়ে মহা কৌতূহল।'

'আমার খুব ভালো লাগে। কপালের এই লাল ফোঁটা আর সেই ভাগ করা কালো চুলের মাঝখানে লাল সিঁথি —খুব, খুব সুন্দর। আর লম্বা চুলের খোঁপাও আমি খুব ভালোবাসি।'

'তাই নাকি?' যদি বিয়ে না ক'রে থাকো তা হ'লে একটি বাঙালী বৌ জুটিয়ে দেবো, সে খুব সিঁদুর পরবে সিঁথিতে।'

'সে ভাগ্য কি আমার হবে? আমার তো তাই স্বপ্ন। বাংলাদেশ আর বাঙালী মেয়ে, এর কি কোনো তুলনা আছে জগৎ সংসারে?'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কাকে দেখে মন মজেছে বলো তো? তুমি কবে গিয়ে-ছিলে আমাদের দেশে? ক'দিন ছিলে?'

'না, ঈশ্বর এখনো আমার সে সাধ পূর্ণ করেন নি।'

'যাওনি! তবে এতো জানলে কী ক'রে?'

'না গেলেও জানা যায়।'

'কিন্তু একবার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। না দেখেই যদি এই—'

'উচিত বলছেন কী, বলুন, না গিয়ে বেঁচে আছো কী ক'রে!'

'এতো!'

'এতো। কিন্তু এ ইচ্ছে আমার হয়তো কখনোই পূরণ হবে না।'

'কেন হবে না?'

'আমাকে যদি কেউ কখনো কোনো শুভ ইচ্ছে জানায় আমি তাকে এই আশীর্বাদই করতে বলি, যেন মৃত্যুর আগে অন্তত একবার সেখানে যেতে পারি।'

একথার পরে আমি চুপ ক'রে রাসেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এ দেশে এসে ভারতবন্ধুর অভাব দেখছি না, ভারতবর্ষ বিষয়ে আগ্রহের অন্ত দেখছি না; ভারতীয় বলে খাতির যত্ন বন্ধুতা, উষ্ণতা পুরোপুরির ভোগ করছি, দোকানে পসারে যেখানেই যাই, 'মাই ইয়াং লেডি', 'মাই হানি' শুনতে শুনতে প্রায় নিজের উপর সম্ভ্রম হ'তে শুরু করেছে, তবুও রাসেলের মতো এ রকম অদ্ভূত আবেগ আর প্রত্যক্ষ করেছি বলে মনে করতে পারলাম না। একটু দূরে মস্ত কাচের চৌবাচ্চায় মিসেস ব্রাউনের লাল কালো মাছেরা খেলা করছিলো, সামুদ্রিক লতাপাতা নুড়ি গহ্বর মধ্যে ঢেউ তুলছিলো, ঘাই মেরে মেরে ক্ষিপ্ত করছিলো টলটলে জল, আমি সেইদিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠলাম।

রাসেল বললো, 'আপনি বাঙলা দেশের কোন শহরে থাকেন!'

মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম, 'কলকাতা।'

'কলকাতা!' যেন স্বর্গ, ঠিক এরকম মুখের ভাব করলো রাসেল, যে তার তাকিয়ে থাকার ধরনে মনে হলো আমি যেন সেই স্বর্গ থেকে অকস্মাৎ কক্ষচ্যুত তারার মতো ছিটকে এসে এই মর্ত্য-ভূমিতে পড়ে গিয়েছি।

'আমি সেই কলকাতাতেই যেতে চাই।' আবেগে প্রায় গলা বন্ধ হ'য়ে এলো রাসেলের, 'সেই কলকাতাই আমার ধ্যান, জ্ঞান, আমার আশা, আলো, আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।'

কথাগুলো রাসেল কবিতার মতো গুণগুণিয়ে আবৃত্তি করলো। তার মাতৃভাষায়, অর্থাৎ ইংরিজিতে অনেক গভীর শুনিয়েছিলো সুরটা, আমার বাংলা তর্জমায় আমি ততোটা ফোটাতে পারলুম না।

হেসে বলেছিলুম, 'তা আর এমন কি কঠিন ব্যাপার, একবার নিশ্চয়ই এসো। যদি ততোদিনে আমরা ফিরে যাই। আমাদের অতিথি হবার নিমন্ত্রণ এখন থেকেই জানিয়ে রাখি।'

রাসেল ভরা গলায় বললো, 'এই নিমন্ত্রণ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবো। তার জন্য আমার অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমি জানি আমি কোনোদিনই যেতে পারবো না।'

'কেন?'

'আমি নিতান্ত দরিদ্র, সামান্য একজন স্কুলমাস্টার মাত্র, আমার টাকা কই?'

একটি বিষণ্ণ হাসিতে রাসেল স্মীথের সুকোমল মুখখানা করুণ হ'য়ে উঠলো।

আমি হেসে বললাম, 'এটা কেনো কথাই নয়। তেমন যদি আগ্রহ থাকে তা হ'লে তোমাদের দেশে টাকার জন্য কিছু আটকায় এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'বিশ্বাস করুন, শুধু সেই কারণেই আটকে আছি।'

'কুবেরের দেশে টাকার সমস্যা!

'ঠিক তাই।' রাসেল মস্ত এক চুমুকে পানীয়ের গ্লাসটি শেষ করলো। সিগরেট এগিয়ে দিল আমার দিকে, আমি বললাম, বাঙালী মেয়েদের এ সব ঠিক আসে না।

'জানি। আর সে জন্যই বাঙালী মেয়েদের এতো ভালো লাগে। মেয়েরা সত্যি সত্যি মেয়ে এমন আর পৃথিবীর কোন দেশে আছে?'

'যদিও আমাকে খুশি করার জন্যই তুমি একথাটা বলছ বলে আমি ধ'রে নিচ্ছি, তবুও শুনতে খুব ভালো লাগছে।'

'না, না', রাসেল মাথা নেড়ে ভুরু কুঁচকে সবেগে প্রতিবাদ জানালো, 'আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, একটুও স্তুতিবাদ করছি না, এ আমার একান্ত মনের কথা। আপনার ইচ্ছে না হয় বিশ্বাস করবেন না।'

'তা হ'লে তো তোমার নিশ্চয়ই আমাদের দেশে একবার যাওয়া দরকার।

'আমি তো পাগল হ'য়ে পা বাড়িয়েই আছি।'

'তুমি এ দেশের একজন বিশিষ্ট কবি, তুমি চাইলে নিশ্চয়ই কোনো প্রতিষ্ঠান তোমাকে সাহায্য করবে।'

'আমাকে সাহায্য করবে! পাগল! আমি অত্যন্ত অপাংক্তেয় এদেশে।'

'কেন?'
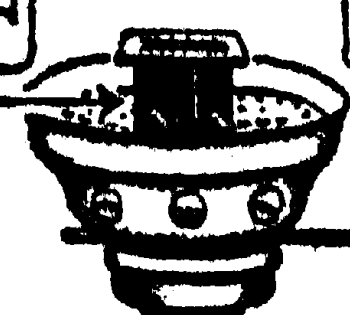
'সেই 'কেন'র জবাব দু' এক কথায় দেয়া যায় না। তবে একথা আপনাকে বলতে ভালো লাগছে, আমার মন প্রাণ আত্মা সব আপনাদের দেশে চলে গেছে। আমি শুধু দেহটা নিয়ে পড়ে আছি এখানে। যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয়, তবু আমি একদিন না একদিন সেখানে যাবোই।'

'শুনে সত্যি আনন্দ হচ্ছে। নিজের দেশকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু অন্যের দেশ সম্পর্কে তোমার মতো এমন আশ্চর্য আগ্রহ আমি আর কোথাও দেখিনি। জিজ্ঞেস করতে কৌতূহল হচ্ছে এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

(ক্রমশঃ)

পুনর্জীবন স্বপ্ন নয়

বার্তাবাহক

(এবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী লিও দাভিদোভিচ লান্দাউ। সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য অ্যাকাডেমিশিয়ান লান্দাউ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসাবে সর্বদেশে স্বীকৃত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স" বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সর্বদেশের উচ্চতর পদার্থ-বিদ্যার ছাত্রদের পক্ষে এই বইটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যপুস্তক।

গত জানুয়ারী মাসে (১৯৬২) লিও লান্দাউ এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হন। কিন্তু সোভিয়েত চিকিৎসক ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীদের যে সমবেত প্রয়াসে লান্দাউয়ের ক্ষেত্রে মৃত্যুকে হার মানতে হয়, তা এক মহৎ আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু। এখানে সোভিয়েত সাংবাদিক দানিল দানিন সেই কাহিনী সংক্ষেপে বলেছেন।)

এই বছরের গোড়ার দিকের ঘটনা। জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ, রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা নগরী সুবিখ্যাত দুব্‌না'র পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তার জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। আবহাওয়া ছিল জঘন্য। সারাটা পথ বরফে জমাট। একটি মেয়ে পথ পার হয়ে বাস স্টপের দিকে ছুটছিল। গাড়ীর ব্রেক চাপা হল সজোরে, আর গাড়ীটা পথ পিছলে দ্রুত-গামী এক ট্রাকের ওপর গিয়ে পড়ল। সংঘর্ষ নিবারণের কোন উপায় ছিল না। গাড়ীর একটা দিক ভেঙে মুচড়ে ভেতরে ঢুকে গেল, আর সমস্ত ধাক্কাটা গিয়ে লাগল যে ব্যক্তি পেছনের সীটে ডান ঘেঁষে বসেছিলেন তাঁর ওপর।

এই ব্যক্তি হলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান লিও লান্দাউ, কিংবা শুধু "দাউ"—যে নামে তিনি গত ত্রিশ বছরের বেশী কাল ধরে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিচিত।

একখানা অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে—মস্কোর তিমিরিয়াজেভ জেলার ৫০নং হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হল। স্ট্রেচার লিফটে করে তোলা হল সাত তলায়—সেন্ট্রাল মেডিক্যাল আপগ্রেডিং ইনস্টি-টিউটের ট্রমাটোলজি ক্লিনিকে। ডিউটির ডাক্তার লিদিয়া পানচেংকো ঝুঁকে পড়-লেন রোগীর ওপর—যাঁকে প্রাণহীন বলে মনে হচ্ছিল। এই হল সূচনা, লান্দাউয়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের চিকিৎ-সকদের অসাধারণ, সত্যিকারের বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রামের সূচনা।

রবিবারটা কারু পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দিন বলা চলে না। এইদিন ইনস্টিটিউট সব বন্ধ থাকে, ল্যাবরেটরী কর্মীরা ছুটিতে, যাঁদের ওপর পুনরুজ্জীবন নির্ভর করে তাঁরা সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ করছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ট্রমাটোলজি ক্লিনিকের অধ্যক্ষ প্রোফেসর ভালেনতিন পালিয়াকফ সেদিন একজন রোগীকে দেখতে এসে-ছিলেন; আগের দিন তিনি তার দেহে অস্ত্রোপচার করেছেন। ডিউটির ডাক্তার তাঁকে তৎক্ষণাৎ লান্দাউয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে একটা নিদারুণ অসমান যুদ্ধে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হল। শক্-বিরোধী চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে নানা-বিধ প্রফিল্যাক্‌টিক সিরাম ইনজেকশন দেওয়া হল।

ততক্ষণে হাসপাতাল থেকে টেলি-ফোন পেয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকা-দেমির পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সমস্যাবলীর ইনস্টিটিউটে লান্দাউয়ের সহকর্মী এবং বন্ধুরা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। নিকোলিন পাহাড় থেকে মস্কোয় ছুটে এলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান পিওৎর কাপিৎসা। সবাই খুঁজতে লাগলেন অধ্যাপক এভগেনি লিফশিৎকে—যিনি লান্দাউয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃহৎ "তত্ত্বগত পদার্থ-বিদ্যা" পাঠক্রমের সহ-রচয়িতা। এইভাবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে খোলা হল "দ্বিতীয় রণাঙ্গন"—সেকেন্ড ফ্রন্ট।

চিকিৎসাবিজ্ঞান আকাদমির সদস্য এবং বিশিষ্ট নিউরোপ্যাথিস্ট নিকোলাই গ্রাশেচনফকে নিযুক্ত করা হল লান্দাউয়ের জীবন রক্ষাকারীদের প্রধান রূপে। তিন-জন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর প্রথম পরামর্শ-সভা সর্বপ্রথম বসল বিকাল ৪টায়; এর পর থেকে তাঁরা অবিরত রোগী পর্যবেক্ষণে রত হলেন। এই তিনজন হলেন গ্রাশেচনফ, পালিয়াকফ, এবং বিখ্যাত নিউরো সার্জন অধ্যাপক গ্রিগরী কার্শিয়ানস্কি।

পরামর্শ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কঠিন এক রোগলক্ষণ নির্ণয় করলেন। এর বারোটি পয়েন্ট। প্রত্যেকটি পয়েন্টে ১১টি ফ্র্যাকচার দেখা যায়, এর মধ্যে আছে মাথার বেসের ফ্র্যাকচার এবং বুকের বহু পাঁজরের ফ্র্যাকচার। এর পর রোগীর অবস্থা রোজই খাবার খেলে আরো খারাপ হতে থাকে: শ্বাস

প্রশ্বাসের কষ্ট, হৃদপিণ্ডের গোলমাল, কিডনির অসুস্থতা, ট্রমাটিক নিউ-মোনিয়া, আর তাই থেকে দেখা দিয়েছে ডবল ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়া এবং আন্ত্রিক প্যারোসিস। ১লা ফেব্রুয়ারী নিকোলাই গ্রাশেচনকফ বললেন : "বিশ বছরের ডাক্তার-জীবনে আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম এমন একটা জটিল ট্রম্যাটিক কেস দেখলাম। দাউ যে তিন সপ্তাহ বেঁচে আছেন এটাই একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়!"

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এই বিস্ময় থেকে কোন আশার কারণ পাওয়া যায় কিনা। গ্রাশেচনকফ, কার্শি-য়ানস্কি, পালিয়াকফ এবং থেরাপিউটিস্ট অধ্যাপক এ এম দার্সির এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দিলেন না। কিন্তু এ তাঁদের নৈরাশ্য নয়, এ শুধু সতর্ক-

তার অভিব্যক্তি। বোধ হয় বিজ্ঞানীদের খানিকটা সংস্কারগত সতর্কতা, যাঁরা জানেন যে শত্রু পুরোপুরী পর্যুদস্ত হয়নি।
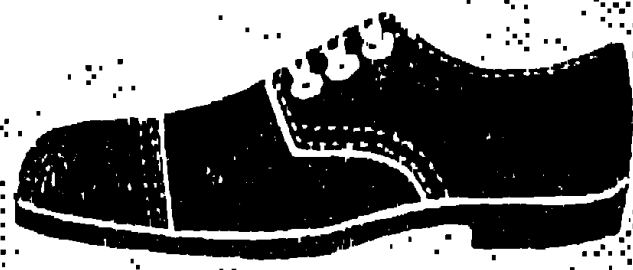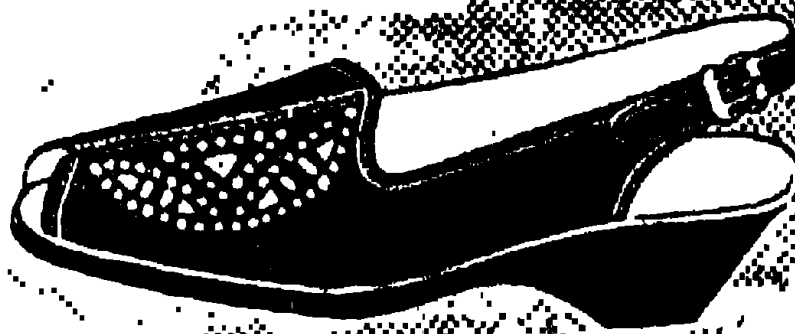
মার্চ মাসেই এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, লান্দাউয়ের আঘাত থেকে জীবনের শক্তি বেশী। আরো জানা গেল যে, লান্দাউ তাঁর মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় আঘাতে আহত হননি। ছয়মাস ধরে প্রতিদিন, প্রতি রাত্রিতে, প্রতি মিনিটে তা ঘটে চলল। ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের অপরিসীম নিঃস্বার্থ সেবার এ এক ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ের ঘটনা। সোভিয়েত দেশের অন্তত পঞ্চাশ-জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ঘুম আর বিশ্রাম ভুলে দিনরাত লান্দাউয়ের জীবন রক্ষার জন্যে সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কিন্তু ডাক্তাররাও তাঁদের পক্ষ থেকে পদার্থবিদগণের সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁরাও তাঁদের নাম, পদবি এবং উপাধির কথা উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা, ঔষধপত্রের সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনেও আকাদমির বিকল্প সদস্যগণ, ডি এস-সি ও এম এস-সি-গণ, ৫৪ বৎসর বয়স্ক লান্দাউয়ের সমবয়স্ক বিজ্ঞানীরা ও তাঁর ছাত্ররা এবং তাঁর ছাত্রদের অতি তরুণ ছাত্ররা—স্বেচ্ছায় সব কাজ চেয়ে নিয়েছেন। কেউ বার্তা বহন করেছেন, কেউ চালিয়েছেন গাড়ী, কেউ আলাপ আলোচনার কাজ করেছেন, কেউ সরবরাহের বা সেক্রেটারির কাজ, কেউ অন্য ডিউটি দিয়েছেন, কেউ ফুট-ফরমাস খেটেছেন, কেউ স্ট্রেচার বহন করেছেন। তাঁদের সদর কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়ে প্রধান চিকিৎসকের অফিসে ঘাঁটি গেড়েছিল এবং চিকিৎসকদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও জরুরী নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে ঘড়ির কাঁটা ধরে পালন করার এজেন্সী হয়ে উঠেছিল এই কেন্দ্রটি।

এই স্বেচ্ছামূলক "জীবনরক্ষা সমিতিতে" যোগ দিয়েছিলেন সাতাশীজন তত্ত্ববিদ এবং গবেষণাকারী। যে সকল লোক এবং ইনস্টিটিউট যে কোন মুহূর্তে কাজে আসতে পারে তাদের টেলিফোন ও ঠিকানা বর্ণানুক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই লিস্টিতে আছে ২২৩টি টেলিফোন নম্বর। এর মধ্যে আছে হাসপাতাল, মোটরডিপো, বিমান বন্দর, শুল্ক বিভাগ, ফার্মাসী, মন্ত্রী দপ্তর এবং এমন অনেক জায়গা যেখানে পরামর্শদাতা ডাক্তার পাওয়া যেতে পারে।

সব থেকে গুরুতর সংকটজনক দিনগুলিতে সাততলা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত আট থেকে দশখানা গাড়ী; দাউ-এর মরণাপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছিল চারদিন।

১২ই জানুয়ারী যখন কৃত্রিম শ্বাস-যন্ত্রের ওপরই সব কিছু নির্ভর করছিল, তখন তত্ত্ববিদদের একজন ফিজিক্যাল প্রব্লেমস ইন্সটিটিউটের ওয়ার্কসপে তক্ষুনি তা তৈরী করে দেবার প্রস্তাব করেন। তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, এ প্রস্তাব ছেলেমানুষিও বটে, কিন্তু এর পেছনে যে নিষ্ঠা সে কী আশ্চর্য! পদার্থ-বিদগণ পলিওমাইলাইটিস রিসার্চ ইনস্টি-টিউট থেকে মেসিনটি দিলেন, নিজেরা তা বহন করে নিয়ে এলেন ওয়ার্ডে যেখানে লান্দাউ শ্বাসকষ্টে মুমূর্ষ হয়ে পড়ে-ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সহকর্মী, শিক্ষক ও বন্ধুর জীবন রক্ষা করেছেন।

সমগ্র ঘটনা পদার্থবিদগণের এক আশ্চর্য ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন। পরামর্শ-সভায় যেদিন খানিকটা আশার কথা শোনা গেল সেদিন গ্রাশ্চেনকফ তাঁদের বলে-ছিলেন: "দাউ বেঁচে উঠলে তার অর্ধেক কৃতিত্ব আপনাদের।"

সাধারণ ব্যবস্থা সবই গ্রহণ করবার পর এক বিশেষ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখার কথা মনে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং বৃটেনে।

কাপিৎসা তৎক্ষণাৎ তিনটি টেলিগ্রাম পাঠান তাঁর তিনজন পুরাতন সহকর্মীর কাছে: লণ্ডনে সুবিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্র্যাকেটের কাছে; প্যারিসে মহাবিজ্ঞানী লাজভাঁর সহকারী ফরাসী বিজ্ঞানী রিকার্টের কাছে এবং কোপেনহ্যাগেনে নিলস্ বোরের পরিবারের কাছে। কাপিৎসা বোরের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান নি এই বৃদ্ধ শিক্ষককে তিনি বিচলিত করতে চাননি। কিন্তু পরদিন তাঁরই কাছ থেকে এল এক ছোট টেলিগ্রাম; তাতে বলা হল—ঔষধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ ঠিক নামটি জানতেন না, আর বোর পাঠিয়েছিলেন এমন একটা ঔষধ যা ঠিক উপযুক্ত ছিল না। রিকার্ট প্রাগে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কর্মী ইউনিয়নে তাঁর পরিচিত নেসেজকে টেলিগ্রাম করেন। নেসেজ অধ্যাপক শোয়ের্ম-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং শোয়ের্ম প্রয়োজনীয় জিনিসটি মস্কোয় পাঠিয়ে দেন।

বৃটেন থেকে সাহায্য এসেছে আরো আগে। কাপিৎসার টেলিগ্রাম লণ্ডনে ব্র্যাকেটের কাছে পৌঁছোয়নি, সেটি তৎক্ষণাৎ ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণুবিজ্ঞানী জন ককরফটের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়; ককরফট জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইতিমধ্যে এভ-গেনি লিফশিৎস অক্সফোর্ডের বিজ্ঞান সম্পাদক, তাঁর পুরানো বন্ধু ম্যাকস্-ওয়েলকে টেলিফোন করেন; এই ম্যাকস্-ওয়েলই লান্দাউ ও লিফশিৎসের লেখা বিরাট গ্রন্থ "তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা" ব্রিটেনে প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন। ককরফট ও ম্যাকস্ওয়েল তাঁদের সমস্ত সঙ্গতি জড়ো করলেন; পর দিন লণ্ডন বিমান বন্দরে টিউ-১০৪ বিমানখানাকে খানিকটা দেরী করতে হয়, সেই বিমানে করেই মস্কোতে আসে একটি ছোট পার্সেল—তার উপরে লেখা "মিঃ লান্দাউয়ের জন্য।"

ম্যাকস্ওয়েল তখন নিজেই বিপন্ন ছিলেন; মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তাঁর পুত্র কয়েকদিন যাবৎ হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর আপন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে, পরে অ্যান্টিবায়োটিকস্ দরকার হবে।

শেরেমেতিভো বিমান বন্দরে ঔষধের পার্শেল আসতে লাগল বেল-জিয়াম থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, জার্মানী থেকে। এই বিমান বন্দর থেকে ৫০নং হাসপাতালে ঔষধের পার্শেল বহন করে আনার কাজ নিয়েছিলেন অধ্যাপক ইয়াকফ্ স্মরোদিনস্কি।

কিন্তু লান্দাউয়ের জীবন রক্ষা হয় একটি ঔষধের অ্যাম্পুলের সাহায্যে—সেটির সন্ধান পেয়েছিলেন আচার্য ভ্লাদিমির এঙ্গেলহার্দৎ। তিনি এবং নিকোলাই সোমিয়নফ দুর্ঘটনার দিনই ঔষধটি তৈরী করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আরো একটি সহজ উপায় পাওয়া যায়। এঙ্গেলহার্দৎ-এর ছাত্ররা লেনিনগ্রাদে একটি তৈরী অ্যাম্পুল পান। ম্যাকস্ওয়েলের পার্শেল এসে পৌঁছনোর আগেই ডাক্তাররা সেটি পেয়ে যান।

ওপরে যে বিবরণ দেওয়া হ'ল তা এই আশ্চর্য ঘটনার প্রারম্ভিক এবং কঠিনতম অবস্থার বর্ণনা। তারপর প্রবীণ নিউরো সার্জন পেত্রোফলফের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক চিকিৎসা পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। আর একটি চিকিৎসা নিকেতন—বুরদেনকো ইনস্টিটিউট অব নিউরো সার্জারির—ডাক্তার এবং নার্সরাও লান্দাউয়ের শয্যা পার্শ্বে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। এই পুনরুজ্জীবিত রোগীর আরোগ্যত্তর সেবা ও চিকিৎসা এখনো চলেছে।

ডাক্তার এবং পদার্থবিদগণের আলো-চনায় পরামর্শে সেই মহৎ শব্দটি—আশার কথাটি ঠিক কোন মুহূর্তে প্রথম এসেছিল আজ তা নিরূপণ করা কঠিন।

কিন্তু সে আশা সত্য হয়েছে—এইটেই সব থেকে বড়ো কথা।

যুদ্ধের স্বাদ ও সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

।। এক ।।

অনিচ্ছায় আমরা একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি, যে যুদ্ধ হয়ত সহজে মিট্‌বে না। বিস্তৃত সমরাঙ্গনে বীর সৈনিকরা যুদ্ধ করছেন। তাঁদের শৌর্যের, তাঁদের ক্লেশ ও নির্যাতনের কাহিনীও শোনা যাচ্ছে। শান্তির নীড় ছোট ছোট কত পাহাড়-পর্বত, কত গ্রাম আজ হয়ত রণাঙ্গনে পরিণত। তারপর আসবে আধুনিক যুদ্ধের অভিশাপ, গ্রাম, নগর, সব হয়ত একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাবে। যুদ্ধের সময় দূর নিকট হয়, পর আপন হয় এবং মিত্র শত্রু হয়। নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাই নতুনতর বিধি। যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে উঠেছে, গভীরও হয়েছে, যাঁরা সবাই এই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, শুধু তাঁরা নয়, পিছনের সারির সবাই সেই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। যারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িত তাদের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটবে তার স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবে, সে আর এক কাহিনী।

যুদ্ধের সঙ্গে আছে সর্বাঙ্গীন আক্রমণ, অনটন, নিয়ন্ত্রণ, কৃচ্ছ্রসাধন। সর্বসাধারণ সে ক্লেশ হাসি মুখে সইবে। এখন আমরা বৃহত্তর কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক মহান দায়িত্বে জড়িয়ে পড়েছি। এই যুদ্ধে সেনাবাহিনী ভিন্ন বেসামরিক নাগরিকের ভূমিকাও কম নয়। যুদ্ধেরও আর্ট আছে, তাই প্রতিটি সৎ নাগরিকের দায়িত্ব আছে সেই আর্ট সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করার। আর যে স্বাধীন মানুষ বোঝে যুদ্ধের কি অভিপ্রায়, তার পক্ষে একজন পেশাদার সৈনিকের চাইতেও অনেক বেশী শৌর্য প্রকাশ করা সম্ভব। এই কারণে ইতিহাসে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বাহিনী দেশপ্রেমের পবিত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক সময় সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রীস পার্সিয়ার যুদ্ধ, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ তীরন্দাজরা ক্রেসীতে যুদ্ধকালে যে-বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈনিকদের ট্যাঙ্ক-বিজয় আর মাদ্রিদের কথা স্মরণীয়।

যুদ্ধকে পটভূমি করে যুগে যুগে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কাব্য, গাথা ও কাহিনীর মাধ্যমে কবি, চারণ ও কাহিনীকার যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ চিত্র লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যুদ্ধের অভিশাপ তাঁদের রচনামাধ্যমে সাধারণ পাঠক বুঝেছে। এমনই কোনো কোনো যুদ্ধকাহিনী রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্যে বিধৃত। 'সাহিত্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ট্রাজেডি'—একথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক প্রবন্ধে। যুদ্ধের মধ্যে যে ট্রাজেডি জড়িয়ে আছে এমন আর কোনো বস্তুতে নেই। তাই যুদ্ধের স্বাদ যে সব কবি ও সাহিত্যিক লাভ করেছেন, তাঁরা তা প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাব্যে ও কাহিনীতে। তবে, লেখকের পরিচয় তাঁর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে নির্ভরশীল নয়, অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীটাই আসল। নিছক অভিজ্ঞতা মূল্যহীন। টলস্টয় ভিন্ন অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকের হাতে পড়লে 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' হয়ত শিশুপাঠ্য রোমাঞ্চকর কাহিনী হয়ে উঠ্‌ত।

।। দুই ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডে কবিতার ফসল বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই জ্যাকুলীন ট্রটার নামক একজন সংকলক "ভ্যালর এ্যান্ড ভীস্‌ন" নামে যুদ্ধ-কবিতার এক সঞ্চয়ন প্রকাশ করেন। শ্রীমতী ট্রটার তাঁর ভূমিকায় নিবেদন করেছিলেন যে এই সংগ্রহকর্মে তাঁকে অন্ততঃ পাঁচশো-খানি কবিতাপুস্তক অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এইসব কবিতাবলীর সঙ্গে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়ানো অসংখ্য কবিতার কথা যোগ করা উচিত। দেশ-প্রেমের আবেগে গোড়ার দিকে অনেক কবিতা রচিত হয়।

এই কালের কবিতার আনুপাতিক কাব্য-মূল্য সরাসরি বিচার করা চলে না। কারণ, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সব কবিতাবলীর একটা বৃহৎ অংশ রীতিগত এবং ভাবাবেগপ্রধান। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ফলে যে জরুরী অভিব্যক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তার ফলে রীতি এবং প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙে পড়ে একটা নতুন সাহিত্যিক আকৃতি গড়ে উঠল। প্রগতিবাদী "নিউ নাম্বারস"-গোষ্ঠী প্রভৃতির উদ্ভাবিত সাধারণ পথ-চলতি কথাবার্তা, শিল্পাঞ্চলীয় পরিবেশ, এবং বাক্‌-প্রতিমার ব্যবহার করাটাই রীতি হয়ে দাঁড়ালো। বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধসমাজ যে অসংখ্য মানুষের ব্যথা ও বেদনায় সমান অংশভাগী তা অনুভূত হল। তার ফলেই ছকবাঁধা প্রচলিত কাব্যিক রীতি বিসর্জন দেওয়া সহজ হল। সুতরাং, কাব্যমূল্যে যাই হোক, এইসব কবিতা সামরিক সংঘর্ষজনিত বহুজন অনুভূত মানসিক প্রতিক্রিয়ার সার্থক রূপায়ণে সমর্থ হল, জনপ্রিয়তা লাভ করল।

আরো আশ্চর্য কাণ্ড, যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গেই কবিতার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। হরিজন হয়ে একপাশে যে পড়েছিল রাতারাতি তাকে সম্মানের আসনে বসানো হল। তখন আর কবিতা পাদপূরণের প্রয়োজনে ব্যবহার হয় না, তার ভূমিকা তখন দায়িত্বপূর্ণ। লণ্ডন টাইমসের মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধ-লেখক তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে কবিতা ব্যবহার করতে লাগলেন। আর হোরেশিয়ো বটমলী জাতীয় দেশভক্তগণও জনপ্রিয় সংবাদপত্রে উদাত্ত আহ্বান জাগালেন। প্রখ্যাত লেখকরা পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন, তবে কিপলিঙ-এর "For All we Have and Are" এবং হার্ডির "Song of the Soldiers" আজো প্রেরণা জাগায়। এই সব সমরকালীন কবিতা সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে আহরিত হয়ে "Songs and Sonnets for England in War Time" নামে প্রকাশিত হয়। মোট পঞ্চাশটি কবিতা ১৯১৪-র আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রচিত।

এই সব কবিতার মূল বক্তব্য কাইজারের ঘৃণিত শঠতা, নীচতা এবং বর্বর, নগ্ন আক্রমণ। তাছাড়া কাইজার দাবী করতেন যে তাঁর সবকর্মে আছে দৈব অনুমোদন, আর অপর পক্ষ মনে করতেন যে দৈব কেবলমাত্র বৃটেনের অনুকূলে। এই বিষয়বস্তু বা বক্তব্য অধিকাংশ কবিতায় প্রকাশিত। স্যার উইলিয়াম ওয়াটসন আবেগভরে লিখে ফেলেছিলেন—

> "Shall all the false and
> creeping things
> Find a last refuge among
> Kings?"

তারপর হয়ত কবির খেয়াল হয় যে ইংলণ্ডে রাজা আছেন। আর মিত্রপক্ষে আছেন রোমানফ বংশের জার। তাই

পরবতী অংশে এ'দের প্রশংসা করতে হয়েছে। জার্মানরা তখনও 'হূন' নামে অভিহিত হয়নি বা কুৎসাভরা 'ঘৃণার পাঁচালী' তখনও বেশ জমিয়ে লেখা সুরু হয়নি। এই কালেই উইলিয়ম আর্চার, উদার-নীতিক সংবাদপত্র 'ডেইলী নিউজ'-এ 'The workers thinkers and singers' -দের ত্রাণ করার জন্য ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করে কবিতা লিখলেন। মানবকল্যাণে আবার যাতে জার্মানদের উদ্বুদ্ধ করা যায় তার আহ্বান জানালেন। যুদ্ধ-জ্বর-জনিত এই অবস্থার মধ্যে শান্তিকামী বিদগ্ধদেরও সংখ্যা কম ছিল না, তাঁরা 'নেশন', 'নিউ ষ্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন। এই কালেই জন মেসফিল্ড (আগস্ট ১৯১৪) একটি কবিতা রচনা করেন, যা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সংবাদ শুনে জনৈক কিষাণের আত্ম-চিন্তনে কবি নিজের মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় একজন সাধারণ মানুষের জন্মভূমির প্রতি নিবিড় আবেগ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, সে আর কিছু জানে না। জানে শুধু 'স্বপ্ন দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' তর সাধের মাতৃভূমি। এই মনোভাবটিই রুপার্ট ব্রুক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

"All these people at the front who are fighting muddledly enough for some idea called England — it's some faint shadowing of goodness and loveliness they have in their hearts to die for."

যুদ্ধের হেতু সম্পর্কে যদিচ ইংলণ্ডের কবিদের মনে ধোঁয়াটে ভাব ছিল তবু তাঁরা সেদিন এক হয়ে যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা করেছেন। জন ফ্রীম্যান তাই বলেছিলেন, "এক অজ্ঞাত এবং নির্ভয় ভবিষ্যের পানে আমরা এই এক বৃহৎ জাতি যে এগিয়ে চলেছি এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে?"

।। তিন ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের স্মরণীয় কবি রুপার্ট ব্রুক এনটোয়ার্পের রয়্যাল নেভাল ডিভিসনের প্রতিরক্ষা-কর্মে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূর্তি দেখেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই ইজিয়ান সমুদ্রের বিখ্যাত দ্বীপে কবির দেহ সমাধিস্থ হয়। এই স্বল্পকালের মধ্যে রুপার্ট ব্রুক (অর্থাৎ ১৯১৪-র ডিসেম্বরের মধ্যে) তাঁর বিখ্যাত সনেটগুলি রচনা করেন। আত্মত্যাগী তারুণ্যের প্রতীক হয়ে রুপার্ট ব্রুক আজো তাই একটি কাল-পর্বের প্রতীক হয়ে আছেন। তাঁর চরিত্র ছিল সম্ভাবনাময়, তাঁর শেষ পরিণতি বিয়োগান্ত। তারুণ্যের প্রতিমূর্তি এই কবির আত্মত্যাগ দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে এক মহান দৃষ্টান্ত। জীবনের উজ্জ্বল দিকের স্বপ্ন দেখার সুযোগ হয়েছিল রুপার্ট ব্রুকের। তাঁর পরিচিত মহলের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তিনি অনেক দেশ পর্যটন করেছেন, সাউথ-সী-আইল্যাণ্ডের স্বর্গীয় পরিবেশে কিছুকাল কাটিয়েছেন। এই প্রাচুর্য ও সৌভাগ্য তিনি ভোগ করলেও নিজের বিচারবুদ্ধিকে বলিদান করেননি। তাই সাউথ-সীর উপকূলে বসেও তিনি আশা করেছেন 'Some kind of upheaval'-এর, যা দেশকে কুৎসিত সংক্রমণের হাত থেকে ত্রাণ করবে। ফেবিয়ানিজম তাঁর কাছে দুর্বল মন্ত্রশক্তি মনে হয়েছে। রুপার্ট ব্রুকের সনেটের মধ্যে একটা জাতিকে জাগ্রত করার প্রেরণা আছে। রুপার্ট ব্রুকের মৃত্যুর পর লণ্ডন টাইমসের শোক-প্রশস্তি লিখেছিলেন উইনস্টন চার্চিল, জীবনের শেষ কয়েক মাস সৈনিক কবি কিভাবে দেশকে প্রেরণা দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে :

"The Poet Soldier told with all the simple force of genius the sorrows of youth about to die, and the sure consolations of a sincere and valiant spirit."

চার্চিল অবশ্যই জানতেন যে যুদ্ধ ক্রীসমাসের মধ্যে শেষ হবে না, তারপর ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্টের সামরিক কার্যকলাপ যখন প্রায় ধামাচাপা অবস্থায় তখনই প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহত্ব ক্রমশঃ সর্বসাধারণ উপলব্ধি করতে পারলেন।

এই মুহূর্তে 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হল, আত্মদানের আদর্শে লিখিত আগেকার সব আবেগময় কবিতাকে নস্যাৎ করে এলিজাবেথ ব্রীজেস এই কবিতায় লিখলেন :

"Sons and brothers
Take for armoury,
All love's Jewels
Crushed, thy warpath be."

পোয়েট লরিয়েট রবার্ট ব্রীজেস কিন্তু তখনও নীরব, শিল্পীর মনে যে অনভ্যস্ত আসে হয়ত তৎকালে তিনি তাতে আচ্ছন্ন ছিলেন। এই কারণে, তাঁকে কুৎসিত আক্রমণও সইতে হয়েছে। এরপর প্রকাশিত হল তাঁর সংকলন-গ্রন্থ "দি স্পিরিট অফ্ ম্যান", এই গ্রন্থে তিনি তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"Man is a spiritual being, the proper work of his mind is to interpret the world according to his higher nature, and to conquer the material aspects of the world so as to bring them into subjection to the spirit."

এই সংকলন-গ্রন্থ হাজার হাজার সৈনিকের পকেটে পকেটে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরতে লাগল। সৈনিকদের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করলো। ব্রীজেস অশেষ লিপিকুশলতায় ত্রিপক্ষীয় অতীতের সঙ্গে দু'হাজার বছরের মানবিক অভীপ্সাকে সংযুক্ত করে এক বিচিত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

যুদ্ধের কাল প্রলম্বিত হতে থাকে, ততই মানুষের মনে জাগে হতাশা এবং নৈরাশ্য, তাই এতকাল যা দেশপ্রেমের ভাবাবেগ মাত্র ছিল, যা ছিল কল্পনা তা বাস্তবে রূপায়িত হতে লাগল। কবিদের রচনায় প্রাচীন রীতি পরিবর্তিত হয়েছিল, কবিতার আলংকারিক বাহুল্য খসে গিয়ে কঠোর বাস্তবতা ফুটে উঠল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সীগফ্রীড্ সাসুন "সুইসাইড ইন ট্রেনচেস" নামক যে কবিতা প্রকাশ করলেন তার মধ্যে অসহনীয় অবস্থার ছবি পরিস্ফুট। একদা আনন্দময় এক সৈনিকের বেদনা নিয়ে তিনি লিখলেন—

"In winter trenches,
cowed and glum
With crumps and lice
and lack of rum,
He put a bullet through
his brain,
No one spoke of him
again........"

"ক্রামপ্স" মানে বৃহৎ জার্মান শেল। এই কবিতা অনেকের মনোমত না হতে পারে কিন্তু, একথা অস্বীকার করা যায় না যে যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেই কবি রীতিগত পথ পরিত্যাগ করে পরিষ্কার ছবি সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। যা তখনও ছায়াচ্ছন্ন তাকে স্পষ্ট করেছেন।

সাসুন যা বলেছিলেন তা আর দুবছর আগে বলা যেত না। এই ১৯১৫-র অকটোবর মাসে সি, এচ,

সরলীর মৃত্যু হয়। তাঁর কবিতায় কল্পলোক বিধ্বস্ত। সচেতন সৈনিক সর্বদাই জানে যে সে তলহীন গর্তের অতলে ব্যক্তি হিসাবে বিলীন হবে। তাই সরলী লিখেছিলেন : "লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের বিকৃত অবয়ব যখন দেখো, তোমার স্বপ্নের মধ্যে যখন ম্লান সেনা-বাহিনী বিলীন হয়, তখন অপর মানুষের মতো মধুর কথা বোলো না, তোমার তাতে প্রয়োজন নেই। প্রশংসা দিও না, তারা বধির শুনতে পাবে না। অশ্রুজলের প্রয়োজন নেই, তাদের চোখ দৃষ্টিহীন, তোমার চোখের জল কি করে দেখবে! সম্মানও চাই না। বরং মৃত্যুই ভালো..."

।। চার ।।

মৃত্যুর অপরিহরণীয়তা, অভিশপ্ত যৌবনের সান্ত্বনাহীন ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকার রচনা করেছে। বে-সামরিক জগতে যে-প্রিয়জনরা পড়ে আছে তাদের অঙ্গীকারের মূল্য কি! এই ভাবাবেগকে অনুকম্পাও বলা যায় না, তিক্ততাও বলা চলে না। উইলফ্রেড ওয়েনের কবিতায় এই অভিব্যক্তির পূর্ণতর প্রকাশ লক্ষিত হয়।

ফরাসী লেখক আঁরি বারবুস কিছুকাল হাসপাতালে কাটিয়ে এবং গভীর মনঃসংযোগের ফলে তাঁর বিখ্যাত বিয়োগান্ত উপন্যাস "Le Feu" রচনা করেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে যে সব মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা শান্তি বিঘোষিত হওয়ার পর, সেই কারণে, আঁরি বারবুসের উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। কেননা যুদ্ধের কালে শুধু সংক্ষিপ্ত কবিতা লেখাই সম্ভব ছিল, বৃহত্তর রচনা নয়। বার-বুসের উপন্যাসে আছে যাঁরা হালকা কর্মে নিযুক্ত তাঁদের নিয়েই কিভাবে সেনাগোষ্ঠীকে ব্যস্ত থাকতে হয়, এই সামরিক পোষাক পরিহিত কাজ-এড়ানো একদল মানুষ একদিকে আর অপরদিকে সুদূরপ্রান্তের বে-সামরিক জীবন। তারা দেখে যে অল্পসংখ্যক মানুষ যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট তারাই আসল বোঝা বইছে। এমনকি পদাতিক বাহিনীর সংগে গোলন্দাজ বাহিনীরও কোনো তুলনা চলে না। তাই ট্রেঞ্চ থেকে যে সৈনিক ছুটিতে ঘরে আসে সে এমন এক জগতের সামনে এসে পড়ে যেখানে ট্রেঞ্চের জীবন কল্পনাতীত। তার কাছে বে-সামরিক জগৎ খাপছাড়া ঠেকে, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন কি ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও এই নিঃসঙ্গতার দুঃখ এসে প্রবেশ করে, প্রেমিকাকে বাহুপাশে পেয়েও মনে হয় যেন যুদ্ধের প্রেত উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এডমন্ড ব্লাণ্ডেনের "রিইউনিয়ন ইন ওয়ার" কবিতার মধ্যে এই ভঙ্গীটি স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হল। ব্লাণ্ডেন লিখলেন প্রেমিকের মিলন-মুহূর্তে যুদ্ধের প্রেত-মূর্তি এসে চীৎকার করে ওঠে:—

"Love's but a madness,
a burnt flare;
The shell's a madman's bride."

বে-সামরিক সংসারের চেতনহীন অবস্থা এর জন্য কম দায়ী নয়। সেই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন রাজনীতিবিদ্ ও প্রচার-বাগীশরা।

এইভাবে কবিরা ক্রমশঃই বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এডমন্ড ব্লাণ্ডেন, উইলফ্রেড ওয়েন এবং সীগফ্রীগ সাসুন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে করুণা ও প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছিলেন। তাঁরা এ যুগের ক্রুদ্ধ তরুণদলের পুরোগামী। এঁরা সকলেই সৈনিক, যুদ্ধের স্বাদ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে যুদ্ধের এবং ফ্রন্টলাইনের
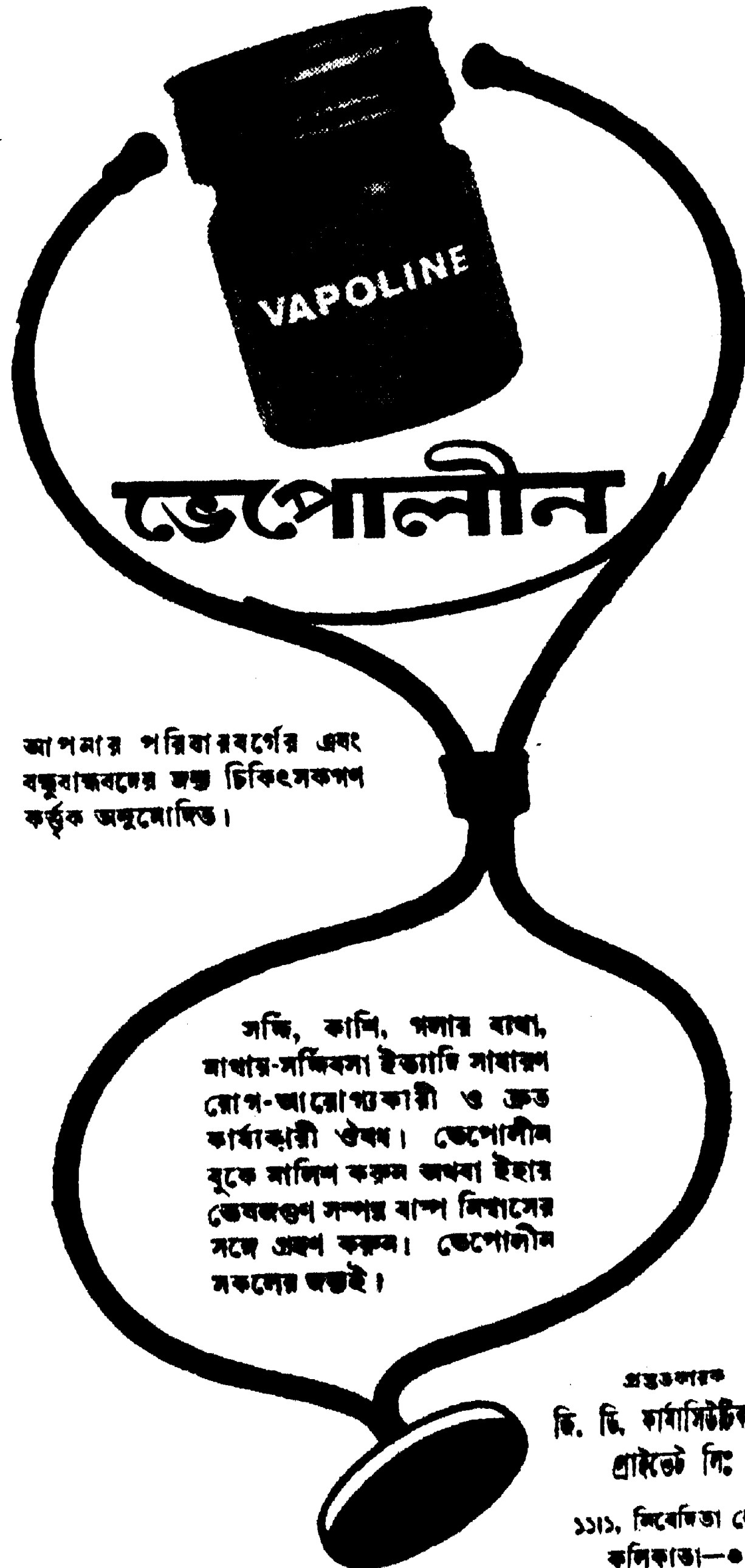
কঠোর বাস্তব রূপকে প্রকাশ করেছেন, দুর্বল স্নায়ুবিকার-গ্রস্ত মানুষের বিভীষিকময় ক্রন্দন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে অনেক সৈনিক কবি সমরাঙ্গনে গিছলেন। তাঁরা যুদ্ধের যন্ত্রণা ভোগ করে যুদ্ধের কবিতা লিখেছিলেন। তাই তার মধ্যে শুধু দেশপ্রেমের ভাবাবেগ নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাস্তবচিত্রও পাওয়া যায়। সাসুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন, তবু শান্তি নেই—

"In bitter relief
    I awake, unfriended;
And while the dawn begins
    with slashing rain
I think of the battalion
    in the mud
'When are you going
    out to them again?
Are they not still your
    brothers through our blood?"

এইখানে দেশপ্রেমকে ছাপিয়ে 'কম'রেড-সীপ' জাগ্রত হয়েছে। এই ভঙ্গী নিয়েই উইলফ্রেড ওয়েন লিখেছেন যে "আমি ঘুম ভেঙে আমার বন্ধুদের দীর্ঘশ্বাস শুনি, তাদের দুর্দশার কথা বলার জন্য তাদের বাসনা নেই, পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এসেছে, এবার যাই।"

উইলফ্রেড ওয়েন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিরতির দিনই শেলাঘাতে নিহত হন। ওয়ার অফিস থেকে তাঁর ব্যক্তিগত খাত-পত্র তাঁর মার কাছে পাঠানো হয়। সেই নোটবুকের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণ ১৩১৭ (ইং ১৯১০-এ) লিখিত 'যাবার দিন' কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ লেখা ছিল:—

"যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি,
তুলনা তার নাই।"

ওয়েনের মা রবীন্দ্রনাথকে একথা লিখে জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার আর একটি কারণ আছে। কবিতাটির তলায় ওয়েন স্বহস্তে লিখেছিলেন—এই কবিতাটি রণক্ষেত্রের কঠোর পরিবেশে আমার মনে গভীর শান্তি এনেছে।

কবি-সৈনিকের ব্যক্তিগত দুঃখভোগে সমষ্টির দুঃখেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। তাই গৃহসুখ এদের ভালো লাগে না, সবাই আবার ফিরে যেতে চায় সমরাঙ্গনে, সেই কারণে ওয়েন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলেন, তাদের সহায়তা করবার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে একজন অফিসারের পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, আর অপ্রত্যক্ষভাবে তাদের দুর্ভোগ দেখে তাদের জন্য দক্ষ উকীলের মত আবেদন-নিবেদন করার প্রয়োজনে। যাঁরা ঘরে বসে আছেন তাঁদের অনড়ত্ব ঘুচিয়ে মানসিক দুর্নীতি থেকে মুক্ত করার জন্য ওয়েন বে-সামরিক মহলে আন্দোলন করে আবার সমরাঙ্গনে ফিরে গেলেন। সামরিক ও বে-সামরিক-দের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ওয়েনের রচনায়। তিনি অতিশয় তিক্ততার সঙ্গে বলেছিলেন—ইংলণ্ডের যা কিছু মহৎ তা সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে চলে গেছে।

।। পাঁচ ।।

যুদ্ধের বিরতির প্রাক্কালে লেখকদের মনে যে চিন্তা জেগেছিল তা যুদ্ধকে ভয় করে নয়, যুদ্ধান্তে এক উজ্জ্বল সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাতের জন্য। বিদ্বেষের বিষবাষ্প যেন পৃথিবী থেকে মুছে যায়—এই ছিল তাঁদের কামনা। আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীতে শান্তি আসুক; রাত্রির তপস্যা যেন একটি প্রসন্ন দিনকে আনতে পারে।

তা কিন্তু হল না। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী, সেই পৃথিবীর লোভ-জটিল-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি কই। তাই কিছুকাল যেতে না যেতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে ওঠে। আবার সেই রণভেরীর আহ্বানে সমরাঙ্গনে ছুটতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই ইংলণ্ডের এক রক্ষণশীল সংবাদপত্রের সাহিত্য সাময়িকী কয়েকজন কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন যুদ্ধসংক্রান্ত কবিতা পাঠানোর জন্য। এই আমন্ত্রণের উত্তরে অতি সামান্য কয়েকটি কবিতা পাওয়া গিয়েছিল, ফলে সম্পাদক গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসীবাদের লড়াই-এ কবিগণের এই জাতীয় নিস্পৃহ ভঙ্গী দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে কড়া সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের রুপার্ট ব্রুকের মত এই যুদ্ধে কোনো কবির অভ্যুদয় হচ্ছে না কেন এই অভিযোগ। এর কারণ ইংরাজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষায় ইতিমধ্যেই গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসীবাদের সম্পর্কে কবিতা লিখিত হয়েছে। ফেদারিকো লোরকা স্মরণীয়।

পরিবর্তিত মূল্যবোধ এবং কাব্যে বিমূর্তনবাদের আবির্ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরকালে কবিতার রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি। ষ্টীফেন স্পেনডার একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন এর কারণ—

"Poetic minds of our times are materialist, for better or worse, because outstanding problems are national ones."

সভ্যতার সংকটকাল সম্পর্কে এযুগের কবিরা সচেতন। তাই রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৮-এ যে কথা বলেছেন আজো সেকথা সত্য—"প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে—"

ইংলণ্ডে দুই যুদ্ধের মাঝখানে যে দুজন কবি উল্লেখযোগ্য তাঁদের নাম এলিয়ট এবং অডেন। আমাদের দেশে এ দুজনই সুপরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরকালে যে কবি-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় তাঁদের নাম, লুই ম্যাকনীস্, ষ্টিফেন স্পেনডার, সিসিল ডেলুইস, ডিলান টমাস এবং জর্জ বার্কার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইংরাজী কবিতায় গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জীবনের যা অংশ, যা জীবনে জড়িয়ে আছে তাকে এড়িয়ে চলা যায় না, মানুষের অনুভূতি গভীরতর হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এ যুগের মানুষ আত্মচিন্তনে অধিকতর আগ্রহী। কবিরাই মানব-মনের গভীরে কি আছে তার অন্তরঙ্গ বিচার করতে পারেন, যুদ্ধের অমানুষিকত্ব ও নগ্ন অত্যাচারের পিছনে কি মানবিক সংগ্রাম আছে তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এবং উদ্ঘাটন করেছেন। বিশেষতঃ তিনজন ইংরাজ কবি মহাযুদ্ধের ভয়ংকরত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁদের রচনায় তা বিধৃত করেছেন, এঁদের নাম এলুন লুইস, রয় ফুলার এবং সিড্‌নে কীস। লুইস আর সিড্‌নে কীস্ দুইজনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত হন, কিন্তু তার আগেই কয়েকটি আশ্চর্য কবিতা রচনা করে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে লুইসের ভঙ্গী ছিল সরল এবং সহজ, তাঁর প্রেমের কবিতা এবং সমর-জীবনের কবিতা যুদ্ধের অনর্থকত্ব এবং মানবমনে তার প্রতিক্রিয়ার উত্তম রূপায়ণ বলা যায়। সিড্‌নে কীসের ভঙ্গী ছিল সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ, বয়সে তরুণ হলেও লিপিকুশলতা ও আঙ্গিকে পরিণত মানসের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফুলার অনেক আগে থেকেই লিখেছিলেন, তাঁর রচনারীতি উন্নত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর কয়েকটি উত্তেজনাময় কবিতা তিনি লিখেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

সোজাসুজি বই-খাতা গুটিয়েই বসে রইল সে। মোক্ষদা এল না—আজ স্বয়ং ঠাকুর এসে ওর চা-জলখাবার দিয়ে গেল। আজ আর বাঁধা বরাদ্দ ঘরে তৈরী পরোটা নয়—কান্তি যা ভালবাসে বেছে বেছে তা-ই আনিয়েছে রতন। বড় বড় হিংয়ের কচুরি, আলুর দম—তার সঙ্গে খাস্তা গজা। দুঃখই করুক অভিমানই করুক—রতনদির তার প্রতি স্নেহ কিছুমাত্র কমেনি—এই খাবার আনানোতে আর এক দফা তাঁর অপরিসীম স্নেহেরই পরিচয় পেলে কান্তি।

এর পর বসে বসে প্রায় ছটফট করতে লাগল সে। রতনদি যে নিজেই উঠে আসবেন একটু পরে কিম্বা ডেকে পাঠাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। থাকতে পারবেন না কিছুতেই। সেই-টেরই অপেক্ষা করছে সে, তার আগে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু অপরাহ্ণ ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে এল, আবছা হয়ে এল বাড়ির ভেতরের দিকটা, তবু রতনদির তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। এই সময় প্রসাধন শেষ ক'রে চা খেয়ে রোজই ওপরে ওঠেন প্রায়। তবে আজ এমন চুপচাপ কেন? সত্যি বটে একবার বলে-ছিলেন ওকেই নিচে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলাতে, সেইটেই ধরে বসে আছেন নাকি? বেশ মজার লোক তো। আবার যে বলে গেলেন, 'আমি বরং সন্ধ্যের সময় আসব'—সেটা ভুলে গেলেন! কিন্তু এ ভুল তো স্বাভাবিক নয়। কান্তি বেশ জানে ওদের এই সান্ধ্য আসরে মন পড়ে থাকে তাঁর। তবে কি সত্যি সত্যিই খুব অভিমান হয়েছে। চাপা মেয়ে অভিমান চেপে অন্য রকম ব'লে চলে গেল?

সে আর থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। অন্য দিনের চেয়ে একটু সন্তর্পণেই নামল। কেন যে এই সতর্কতা তা সে জানে না। এটা যে সঙ্কোচ—এবং এ ধরনের সঙ্কোচের যে কোন কারণ নেই, সে সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়, আপনা থেকেই পা টিপে টিপে নামল সে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে—মোক্ষদা নিচে রান্নাঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছে দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। এর পর নিশ্চিন্ত হয়েই ঢুকল রতনদির ঘরে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল সে। ঘরে আলো জ্বালা হয়নি, এখনও বেশ-ভূষা সারা হয়নি রতনদির, চুলটা পর্যন্ত বেঁধে দিয়ে যায়নি মোক্ষদা—যেমন সেই বিকেলে ওর কাছে গিয়েছিল তেমনি অবস্থাতেই আছে এখনও। সেই ঘুম থেকে ওঠা সাধারণ কাপড় পরা আলু-থালু অবস্থা। ঝাপসা অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন—নিচের ঢালা বিছানাটাতে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে—সামনে হাতের কাছে একটা গেলাসে লাল-পানা কী সরবতের মতো।

কী যে সেটা, তা আজ আর বলে দিতে হ'ল না। গন্ধতেই টের পেয়েছে। এতদিনে গন্ধটার সঙ্গে ভাল রকম পরিচয় হয়ে গেছে ওর। সে একটা চাপা আর্তনাদের মতো 'রতনদি' বলে ডেকে কাছে গিয়ে বসে বলে উঠল, 'এ কী করছ রতনদি, এমন ক'রে বসে এখন থেকেই মদ খাচ্ছ!' তারপর কেমন একটু অসংলগ্নভাবেই বললে, 'আমার ওপর রাগ ক'রেছ রতনদি? কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে এ কাণ্ড কেন করতে গেলে! ছি ছি!'

ওর ওপর রাগ ক'রেই এই কাণ্ড করছেন রতনদি, এটা মনে করবার তার কোন অধিকার নেই—এটাও এক রকমের ধৃষ্টতা, অনধিকারচর্চা তো বটেই—কিন্তু সে সব কথা সে মুহূর্তে মনে এল না ওর। আবারও যে সে 'তুমি' বলছে তাও লক্ষ্য করল না।

বরং আরও আবেগের সঙ্গে, ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই রতনের একটা হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললে, 'ওঠো—উঠে বসো রতনদি—লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি গা-হাত ধুয়ে নাও। এ সব ছাই-ভস্ম আর এখন থেকে খেতে শুরু করো না। মাথায় বরং জল দাও একটু—নইলে সন্ধ্যে থেকেই মাথা ধরবে হয়ত।'

এতক্ষণ পাথরের মতোই বসেছিল রতন কিন্তু ওর এই স্পর্শে যেন পাষাণী প্রাণ পেল। হাতটা কান্তির হাতের মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে-ই দু হাতে চেপে ধরল কান্তির দুটো হাত। তারপর প্রবল আকর্ষণে ওকে আরও খানিকটা কাছে টেনে এনে বলল, 'সাধ ক'রে কি খাই। না খেয়ে উপায় কি বল্? দুঃখ ভুলতে পারি আর যে আমার কিছু নেই, কেউ নেই। ওরে আমি যে বড় দুঃখী, কত যে দুঃখী তা তুই বুঝবি না।'

'কে বললে বুঝব না রতনদি। আমি বুঝেছি তোমার দুঃখ। বুঝেছি বলেই

তো ছুটে এসেছি। কেউ নেই তোমার কেন এ কথা বলছ—আমি তো আছি! আমি তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি।...তুমি এখানে এমনি ক'রে বসে না থেকে আমার কাছে গেলে না কেন, অন্যদিনের মতো জোর ক'রে ডেকে নিলে না কেন? কেন এমন অন্ধকারে একা বসে বসে ঐ সব বিষ খাচ্ছ?'

'একটা বিষ নামাতে এই বিষ খাচ্ছি—বুঝলি। নইলে সে বিষে সব ছারখার হয়ে যাবে। তুই যা ভাই, আমার কাছে আর থাকিসনি। নয়ত এ বিষে তুইও জ্বলেপুড়ে মরবি। তুই কালই বাড়ি চলে যা!'

আর যা-ই হোক ঠিক এ কথাটা আশা করেনি কান্তি। সে একেবারে আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল। রতনদির রাগ হয়েছে অভিমান হয়েছে—এটা সে আগেই আশংকা করেছিল কিন্তু ঠিক এতটা যে হয়েছে, তা বুঝতে পারেনি। সে কিছুক্ষণ চুপ করে ক'রে থেকে প্রায়

ঘাট হয়েছিল টাস্কের কথা তোলা। সত্যি বলছি, আর কখনও বলব না। এই বারটি মাপ করো আমাকে!'

সে হাত দুটো রতনের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যিই দু হাত জোড় করলে।

অকস্মাৎ যেন পাগল হয়ে গেল রতন। একটা প্রবল ধাক্কায় ওকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললে, 'যা বলছি আমার সামনে থেকে, দূরে হয়ে যা! নাকে কান্না কে'দে আমার মন ভোলাতে এসেছে! যত সব মায়াকান্না! ওসব আমি ঢের দেখেছি। দূর হ হতভাগা। কাল সকালে উঠে যেন তোর মুখ আর আমাকে না দেখতে হয়। আমি ওঠবার আগে বই-খাতা জামা-কাপড় সব নিয়ে চলে যাবি—কোন চিহ্ন না থাকে তোর!'

চাপা হিংস্র গলায় কথাগুলো বলে যেন হাঁপাতে থাকে রতন।

ওর এ চেহারা বহুকাল দেখেনি কান্তি। অনেক দিন আগে, একেবারে

ওরে আমি যে বড় দুঃখী......

গোড়ার দিকে একদিন সকাল বেলা স্নান করার আগে মদের খোঁয়াড়ি না ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে বকুনি খেয়েছিল—সেই সময় কতকটা এই রকম চেহারা দেখেছিল ওর। কিন্তু তাও এতটা নয়।

ভেঙ্গে-আসা কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ রতনদি, আমি—আমি তো বলিনি কিছু। আমি তো বললুম রাত জেগে সেরে নেব পড়া—তুমিই তো চলে এলে। আমার

বাঘিনী কেমন তা জানে না সে, কখনও দেখেনি—কিন্তু বই পড়ে যা ধারণা হয়েছে তার—হঠাৎ মনে হ'ল রতনদি আর মানুষ নেই, সেই বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এল সে সেখান থেকে। অপমানে দুঃখে দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল আসছিল ভরে, গলা অবধি ঠেলে উঠছিল কান্না—কিন্তু এখানে এর পর চোখের জল ফেলতেও সাহস হ'ল না ওর। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু চেপে পা পা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে ওপরে চলে এল।

নিজের ঘরে এসে কান্না আর কোন শাসন মানল না। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো শব্দ ক'রেই 'কাঁদতে লাগল সে ছেলেমানুষের মতো। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। অপমান তো বটেই—দুঃখও তার কম হচ্ছিল না। বিনা দোষে সে এমনি লাঞ্ছিত হ'ল সেইটেই আরও দুঃখ। কেন এমন হয়ে গেল রতনদি, এতদিনের স্নেহ ভালবাসা একদিনে ভুলে গেল! নাকি বড়লোকের ধরনই এই? এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য—এত হাসি-তামাসা গল্প-গুজব একসঙ্গে খাওয়া-বসাতেও কান্তি কিছুমাত্র আপন হ'তে পারেনি রতনদির, কিছুমাত্র কাছে পৌঁছতে পারেনি। দুজনের অবস্থার মধ্যে—ভিক্ষাদাতা ও গ্রহীতার যে দুস্তর ব্যবধান তা ঠিক রয়ে গেছে। তাই না আজ রতনদি এমন ক'রে অনায়াসে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেন তাকে!...ওদের গরীবের ঘরে ছেঁড়া জুতোও বুঝি এমন ক'রে ফেলে না।...এখন ও বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে, কি কৈফিয়ৎ দেবে? তাঁরা কি বিশ্বাস করবেন যে কান্তির সত্যিই কোন দোষ ছিল না? তাই কি কেউ বিশ্বাস করে? যেখানে এত আদর-যত্ন সেখান থেকে বিনা দোষে বিতাড়িত হয়েছে—এ তো বিশ্বাস করার কথাও নয়।

ছি ছি, এর চেয়ে মরে যাওয়ায় ঢের ভাল ছিল। আজকের রাতটা শেষ হবার আগে কোন রকমে তার মৃত্যু হয় না?

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে এমনি, এলোমেলো আবোল-তাবোল কত কী কথা ভাবতে লাগল সে। মুখেও দু-একটা কথা বেরিয়ে এল। ভাগ্যে এ সময়টা ওপরে কেউ থাকে না। নইলে পাগল ভাবত তাকে। সে চেষ্টা ক'রেও যে সামলাতে পারছে না নিজেকে!

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর অনেকটা

শান্ত হয়ে উঠে বসল। বিছানাটা ভিজে গেছে ওর চোখের জলে, মোক্ষদাদি এসে দেখলে কী মনে করবে! যদি প্রশ্নই করে—কিসে ভিজল? অবশ্য রাত্রে বড় একটা ওপরে ওঠবার সময় পায় না। তবু—আসতেও তো পারে। ছিঃ—যদি জানতে পারে, সে বড় লজ্জার কথা হবে।

দুঃখের প্রথম আবেগটা কেটে গিয়ে এইবার মনে হ'ল—তাহলে কী সত্যিই বই-খাতা গুছিয়ে নিতে হবে তাকে? জামা-কাপড় সে নেবে না, যেমন একবস্ত্রে এসেছিল তেমনি একবস্ত্রে চলে যাবে। ওসব ভাল ভাল জামা-কাপড় যাকে খুশি দিন রতনদি, নয়ত পুড়িয়ে দিন—ওতে কান্তির কোন দরকার নেই। আবার মনে হ'ল সত্যিই কি রতনদির ওটা মনের কথা? না মদের ঝোঁকে বলেছে? নেশা কেটে গেলে আবার ওকে খুঁজবে—আনতে লোক পাঠাবে? নিশ্চয়ই তাই! কী একটা ভেবে দুঃখ হয়েছিল, তাই মদ খেতে শুরু করে—আর মদ খেলেই তো রতনদির অমনি মেজাজ হয়। মাতালের কথা কি ধরা উচিত?

ভাবতে ভাবতে বেশ একটু জোর পেলে মনে। সোজা হয়ে উঠে বসল। হাসি পেতে লাগল নিজের ছেলেমানুষিতে। মিছিমিছি এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল করে তুলে নিজেই কষ্ট পেল সে। রতনদির এত স্নেহ—এমন একদিনে মুছে যেতে পারে না। এই তো ক'বছরই দেখছে তাকে, এক-আধদিন তো নয়, তা সত্ত্বেও এমন ভুল বুঝতে পারল কী ক'রে তাঁকে! আশ্চর্য!

আবার একসময় মনে হ'ল—কিন্তু যদি সত্যিই বলে থাকেন। ওটা যদি তাঁর অন্তরের কথাই হয়? হয়ত কী শুনেছেন কার কাছে, হয়ত মোক্ষদাদিই মিছে ক'রে কী লাগিয়েছে ওর নামে—সত্যি-সত্যিই রেগে গেছেন। যদি তাই হয়, কাল সকালে ওকে দেখে যদি এমনি রেগে ওঠেন, সকলকার সামনে যাচ্ছেতাই করেন? সে যে আরও অপমান!... ..

অনেকক্ষণ বসে ভাবল কান্তি। অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেল না। কী করবে, কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারল না। খাবার সময় হ'তে ঠাকুর যখন ডাকতে এল, একবার ভাবল সহজভাবেই গিয়ে খেয়ে আসবে—কেউ না কিছু সন্দেহ করে, লোক জানাজানি না হয়! আবার ভাবল, খেতে গেলেই সে সম্ভাবনাটা বেশী থাকবে, কারণ এখন তার যা অবস্থা একগালও বোধ হয় খেতে পারবে না। সমস্ত দেহটা ভেতরে ভেতরে থর-থর ক'রে কাঁপছে—গা বমি-বমি করছে সর্বক্ষণ। সে আস্তে আস্তে বললে, 'আমার শরীরটা ভাল নেই ঠাকুরমশাই, আজ আর কিছু খাব না। তখন ঐ সব খেয়ে বোধহয় অম্বলমতো হ'য়েছে—গা গুলোচ্ছে বড্ড!'

ঠাকুর অবশ্য তাই বুঝেই নেমে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই দেখা দিল মোক্ষদা-ঝি।

'বলি ব্যাপারটা কি বল তো ঠাকুর—খোলসা করে বল দিকি আমায়? আমার সেই দোপর বেলাকার কথাতেই মন ভারী হ'ল নাকি? নাকি দুজনে সোহাগের আগাআগি হয়েছে? আমার কথাগুলো লাগানো হয়েছে বুঝি?'

'না—মাইরি বলছি মোক্ষদাদি, এই বিদ্যে ছুঁয়ে বলছি, তোমার কথা কাউকে একটাও বলিনি! বিশ্বাস করো!'

'তা যদি বলনি বাপু তো দুজনেরই মেজাজ গরম কেন? আগাআগিটা হ'ল কি নিয়ে? উনি তো মান ক'রে পড়েছিলেন এতক্ষণ—নিহাৎ নটা বাজে দেখে তখন উঠে যেমন তেমন ক'রে কাপড় বদলে চুল বেঁধে নিলেন, তুমি তো আহার-নিদ্রাই ছেড়ে দিলে! আবার দিদিবাবুর হুকুম হয়েছে, দাদাবাবুর সরকারমশাইকে জোর তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়েছেন কালকের মধ্যেই কোথায় কি বোর্টিংওলা ইস্কুল আছে খোঁজ ক'রে দেখে তোমাকে ভর্তি করে দিয়ে আসতে হবে। তোমাকে উনি এ বাড়িতে আর রাখবেন না! ...... এসব তো অমনি অমনি হয় না বাপু —কারণ একটা আছে। এ সমিস্যেটা কি হ'ল আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দিকি!'

এ আবার এক নতুন খবর। মন্দের ভাল অবশ্য। তাড়িয়ে দেবেন না, বাড়িতেও যেতে হবে না—বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন। একদিক দিয়ে হয়ত খুবই ভাল হ'ল। পড়াশুনোটা হবে। তবে বাড়িতে কী বলবে, সে কথাটা থেকেই যাচ্ছে যে!

আর, আর যেটা—সেটা হ'ল রতনদি আর তাকে এ বাড়িতে রাখতে চান না। তাকে দেখতে চান না তাঁর সামনে। সে কি তারই মঙ্গলের জন্যে—না সত্যিসত্যি তার ওপর রেগে গেছেন?

'কী গো মুখে রা নেই কেন? শরীর সত্যি খারাপ না আগ হয়েছে? —বল তো খাবার উপরে পৌঁছে দিয়ে যাই। খাওনি শুনলে কাল সকালে আমাদের কারুর ধড়ে মাথা থাকবে না!'

'না মোক্ষদাদি, রতনদি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, আমার আর মুখ দেখতে চান না। আমি খাইনি শুনলে কিছুই বলবেন না আর, খোঁজও করবেন না!'

'হুঁঃ!' অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে ওঠে মোক্ষদা, টক্ ক'রে জিভেরও একটা আওয়াজ করে, তারপর যেন একপাক নেচে নিয়ে বলে, 'ইল্লো! মরে যাই গো। ......তা আর না। বেরক্ত হয়েছে! বেরক্ত হওয়া কাকে বলে তা কি আর আমি জানি না! ওসব সোয়াগের কোঁদল—আত পোয়াতে যা দেরি, আর পোয়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে ঐ বোর্টিং মোর্টিংএ যেতে দেবে ভাবছ? তবেই হয়েছে। তবেই চিনেছ মেয়েজাতকে। মিছিমিছি সরকারমশায়ের অদেষ্টে হয়রানি আছে, ঘুরে মরবে। ওগো ঠাকুর, এই মুকী ঝির অনেক বয়স হয়েছে—অনেক দেখেছে এ।

......নাও, নাও, সোজা হয়ে ব'সো দিকি। চোখে জল দাও। কেঁদে কেঁদে তো চোখ ফুলিয়েছ দেখছি। একেই বলে ছেলে-মানুষ। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করা ঠিক নয়, কাঁচা বয়স এখন তোমাদের—বলে, আত-উপোসী হাতি পড়ে। খাবার আমি রোপরে দিয়ে যাচ্ছি, লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে শুয়ে পড়ো সকাল সকাল। ওসব আগাআগি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে।'

তারপর যেতে গিয়েও ফিরে এসে—গলাটা আরও নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, 'বরং যদি সেয়ানা হও তো এই তালে কিছু বাদায় ক'রে নাও মোটামুটি। দু' দণ্ড মান ক'রে বসে থাকলেই যথাসর্বস্ব দিয়ে মেটাবে। নতুন নেশা তো—তার জন্যে সব করতে পারে। হি-হি!'

চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়তে পড়তে চলে গেল মোক্ষদা।

(ক্রমশঃ)

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

(১) শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভরতপুর থানায় ভরতপুর গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর আছে। একটি পুঁথির কয়েকটি পাতার উপর তোলা পাঠে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত সংশোধন আছে। এই পুঁথির কাগজ খুব পাতলা প্রায় বর্তমান যুগের ইণ্ডিয়া পেপারের ন্যায়; পুঁথির পাতা বলিলে আমরা তুলট কাগজের কথা ভাবি—ইহা সেই রকম নয়। ইং ১৯৫৩ সালে (পদ্মশ্রী) তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, পাইকপাড়া ও কান্দি রাজবংশের কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহের সহিত এই হস্তাক্ষর দেখি। জগদীশবাবু হস্তাক্ষরের ফটো তুলিবার জন্য পকেট ক্যামেরা লইয়া যান, পথে জীপগাড়ির ধাক্কায় ক্যামেরার কল খারাপ হইয়া যাওয়ায় ফটো তোলা হয় নাই।

রাঁচি শহর হইতে ১৩।১৪ মাইল জগন্নাথপুর গ্রামে এক মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর আছে বলিয়া শুনি। ইং ১৯৫৫ সালে ৺বিমলচন্দ্র সিংহের সহিত যাইবার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায় যাইতে পারি নাই।

অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য স্থানেও শ্রীচৈতনাদেবের হস্তাক্ষর পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহারা জানেন তাঁহারা আপনার পত্রিকা মারফত সে স্থানের খবর জানাইলে ভাল হয়।

বাংলা লিপি।

(২) বাংলা লিপির যুগে যুগে পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে বাংলা লিপি কি রকম দেখিতে ছিল? এ বিষয়ে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আশুতোষ মিউজিয়ামে বাংলার রাজা তৃতীয় গোপালদেব কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি দিই। ইহার পাদমূলে যে অক্ষরে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা পণ্ডিতেরা প্রোটো বেঙ্গলী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা হইলে নবম-দশম শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর ও সমসাময়িক পুঁথি হইতে ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা লিপি কি রকম ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অনেক পুরাতন বাংলা দলিলে 'ন'য়ে ফুটকি দিয়ে 'ল' লিখিত আছে দেখিয়াছি। ইহা ১০০।১৫০ বছর আগেকার কথা।

(৩) বাংলায় সহি।

আমি বাংলাও জানি, ইংরাজীও জানি। সাধারণতঃ ইংরাজীতে সহি করি—ইহা হয়ত আমার ব্যবসাগত অভ্যাস। সরকারী কর্মচারীরা ইংরাজ আমলে ত বটেই, এখনও নিজেদের পারিবারিক দলিলাদিতে ইংরাজীতে সহি করেন।

১৫৮২ সালে রাজা টোডরমল্ল বাংলা ও বিহারের আসল জমা তুমার করেন। সরকার মুঙ্গেরের জমাবন্দীর কাগজ ফারসীতে লিখিত; কিন্তু যে রাজকর্মচারীর অধীনে ও তত্ত্বাবধানে এই জমাবন্দী হইয়াছিল তাঁহার সহি বাংলায়; "শ্রীকন্ঠ দত্ত" বলিয়া লিখিত। ইনি উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ; ইনি বহু উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থকে ভাগলপুরে বসবাস করান। এই কাগজ ভাগলপুর কালেক্টরীতে ডবল তালার ভিতরে রক্ষিত আছে।

সরকার যদি ইহার ফটো-ষ্ট্যাট প্রকাশ করেন ত অনেক ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রকাশিত হইতে পারে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দত্তর কয়েকটি ছাড়-পত্র দেখিয়াছি। তাঁহার সীলে ফারসী অক্ষর, সহি বাংলায়।

এ বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

(৪) এই রামগতি বন্দোপাধ্যায় কে?

আঙ্গুলের টীপ-ছাপ লওয়ার কথা সকলেই জানেন। আমার আঙ্গুলের টীপ-ছাপ অপর কাহারও টীপ্-ছাপের সঙ্গে মিলিবে না; আর সারা জীবন আমার টীপ্-ছাপ একই রকমেরই থাকিবে। আমাদের বাংলা দেশেই এই টীপ্-ছাপ লওয়ার প্রথা উদ্ভব হয়। স্যর উইলিয়ম হার্সেল ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন তিনি লোকে যাহাতে জাল করিতে না পারে, এইজন্য ভয় দেখাইয়া টীপ্-ছাপ লইতেন। তখন কেহই জানিত না যে একজনের টীপ্-ছাপের সহিত অপর জনের টীপ্-ছাপের মিল নাই—আর সারা জীবন একই রকমের টীপ্-ছাপ থাকে।

হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন তিনি কতকগুলি দলিলে সহি ছাড়াও টীপ-ছাপ লয়েন। পরে বহু বৎসর পরে হুগলীর সাব-রেজিষ্ট্রার রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলেন। যাঁহারা দলিলে পূর্বে টীপ-ছাপ দিয়াছিলেন (সাহেবের ভয়ে) তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ি রামগতি বাবু যায়েন। অনেকে ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন; কেহ বা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে; বাকী লোকদের বুঝাইয়া রাজি করাইয়া রামগতি বাবু পুনরায় টীপ-ছাপ লয়েন। এবং আগের লওয়া টিপ্-ছাপের সহিত খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া মিল আছে কিনা দেখেন। তাঁহার তদন্তের ফলাফল—এইটী সরকারি তদন্ত নহে, সখের তদন্ত, স্যার উইলিয়াম হার্সেল স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনকে পাঠান। স্যার ফ্রান্সিস তাঁহার Finger Prints বা Decipherment of old Prints পুস্তকে—কোন্‌টায় আমার ঠিক মনে নাই, রামগতি বাবুর প্রশংসা করেন এবং তাঁহার সংগৃহীত তথ্য হইতে টীপ্-ছাপ যে সারাজীবনে বদলায় না এই সিদ্ধান্তে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় আইসেন। ইহা ইং ১৮৯০ সালের পূর্বের কথা।

এই রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় কে? কোথায় বাড়ি? কতদিন সব-রেজিষ্টারী আফিসে ছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে কেহ কি সন্ধান দিতে পারেন? আমরা সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, সন্ধান পাই নাই। যদি কেহ জানেন "অমৃত" মারফত প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

৪৫নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিঃ—২

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শে অক্টোবর ('৬২) প্রকাশিত আপনার পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীঅঞ্জনা মিত্র যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

কোন ছেলে বা মেয়ে যথেষ্ট বয়স হওয়ার আগেই 'পাকা' (অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) হয়ে উঠলে তাকে আমরা আখ্যা দিই 'এঁচোড়ে পাকা'।

এ প্রশ্ন যিনি করেছেন তাঁর বক্তব্য—অকালপক্কতার সঙ্গে 'এঁচোড়' নামক বিশেষ ফলটিই কেবল আমরা যুক্ত (associate) করি কেন। উত্তরটি, আমার ধারণায় খুব শক্ত নয়।

'এঁচোড়' হল কাঁঠালের কাঁচা অবস্থার নাম। 'এঁচোড়' পাকলে 'কাঁঠাল',—পাকার আগে তা এঁচোড়ই। কাজেই 'এঁচোড়ে পাকা'র অর্থ অকালে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই) পাকা। একমাত্র 'এঁচোড়'ই যে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তার কারণ অন্য কোন ফলের দুটো নাম (অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায় একটি এবং পাকলে আর একটি) নেই। 'আম' কাঁচা থাকলেও 'আম'—পাকলেও 'আম'। কাজেই "ছেলেটি আমপাকা" বললে সুপক্কতার ধারণাই আমাদের মনে আসে—অকালপক্কতার ধারণা আসে না। অন্য যে কোন ফল সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।

"এঁচোড়ে পাকা" এই প্রবাদটি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসাই যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নয় কি?

তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়,

কর্ণেল গোলা, মেদিনীপুর।

মুক্তিস্নান

মন্মথ রায়

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

স্ত্রী ॥ আমার শিয়রে কে বসে?

স্বামী ॥ আমি।

স্ত্রী ॥ সে কি গো! সারাটি রাত জেগে বসে আছ?

স্বামী ॥ আমার ভালই লাগছে তরলা। কী সুন্দর তুমি ঘুমোচ্ছিলে। মনে হচ্ছিল, তোমার আর কোনো যন্ত্রণা নেই। খুব শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলে তুমি। জাগলে কেন?

স্ত্রী ॥ জানো, যম এসেছিল।

স্বামী ॥ না, না তরলা। ও সব তোমার স্বপ্ন। স্বপ্নে বাঘ-ভালুক কত আমরা দেখি। ও সব নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি। নাও, আর একটু ঘুমোও। রাত আর বেশী নেই।

স্ত্রী ॥ আর ঘুম হবে না আমার। ডাক আমার এসে গেছে। এবার আমাকে যেতে হবে।

স্বামী ॥ তুমি ঘুমোও, ঘুমোও তরলা।

স্ত্রী ॥ না, না আর ঘুমুতে আমি আমি পারবো না। চোখ বুজলেই সে আবার আসবে, আবার তাকে দেখবো। এবার তবে আর তাকে রুখতে পারবো না আমি। রুখতে চাইও না আমি।

স্বামী ॥ মিছে ভয় পেয়ো না, তরলা।

স্ত্রী ॥ তুমি ভেবেছ, যমকে আমি ভয় পাচ্ছি। না গো, না। ছোট-বেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছি যমরাজার বিকট চেহারা। শিংওয়ালা কালো মোষ তার বাহন। কিন্তু এ যা দেখলাম, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। কী সুন্দর যে তার মূর্তি! ব'লে উঠতে পারবো না আমি। শান্তি। পরিপূর্ণ শান্তি।

স্বামী ॥ বেশ তো! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকে দেখো। কথা ব'লে ব'লে আর ক্লান্ত হয়ো না।

স্ত্রী ॥ কিন্তু কথা শেষ না ক'রে আমি যে তার সাম্নে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না গো! কাজেই কথা আমার বলতেই হবে। শেষ ক'রে যেতে হবে আমার সব কথা। তিনি আমাকে বলেছেন তবেই আমি পাবো তাঁর কাছে যাবার ছাড়পত্র।

স্বামী ॥ এমন ক'রে বললে, আমি এখান থেকে চ'লে যাবো গো, চলে যাবো।

স্ত্রী ॥ তাতে আমার যন্ত্রণা বাড়বে। কী অসহ্য এই মৃত্যুর যন্ত্রণা! জীবনের শেষ কয়েকটি কথা আমি তোমাকে বলবো, তুমি তা শুনবে না? পালিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে?

স্বামী ॥ বলো।

স্ত্রী ॥ যা বলবো তা শুনলে রাগ করতে পারবে না কিন্তু তুমি।

স্বামী ॥ রাগ করবো কেন তরলা? যা ব'লতে চাও অল্প কথায় চটপট ব'লে ফেলো। এই ধর বলতে লাগবে মিনিট খানেক। তারপরই আমার তরুরাণী চুপ করবে। আর কথা ব'লে ক্লান্ত হবে না। এক কাপ হরলিকস খাবে।

স্ত্রী ॥ সে কী গো? মাত্র এক মিনিট? কত কথা রয়েছে বলবার সে কি এক মিনিটে আমার শেষ হবে?

স্বামী ॥ শেষ করতেই হবে। কী রকম জানো? শুনবে? এই ধরো, আমি যেন ট্রেণে চেপে কোনখানে যাচ্ছি। গার্ড হুইশিল দিয়েছে, ট্রেণ ছাড়ছে। এমন সময় প্লাটফর্মে এক বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমি। পরমবন্ধু। কত কথাই না তাকে বলার ছিল। কিন্তু ট্রেণ তখন ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধু আমার ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। তখন যে কটি কথা আমি তাকে ব'লে যেতে পারি—সেই কটি কথা—সব কথার সামারী।

স্ত্রী ॥ মন্দ বর্ণনা। হ্যাঁ, বেশ বলেছো। আমার গার্ড'ও হুইশিল দিয়েছে। আমার ট্রেণও ছেড়ে দিয়েছে। দু' কথাতেই আমি বলছি আমার সারা জীবনের শেষ কথা।

স্বামী ॥ লক্ষ্মীটি! দেখি এক মিনিটে কেমন সামারী ক'রতে পারো তুমি? তার পরেই কিন্তু এক কাপ হরলিকস।

স্ত্রী ॥ এক মিনিটই হোক, আর আধ মিনিটই হোক আর এক ঘন্টাই হোক, সে কথাটা আমাকে বলতেই হবে—ব'লে যেতেই হবে তোমাকে। না বললে আমার শান্তি নেই। ক্ষমা নেই, মুক্তি নেই।

স্বামী ॥ কিন্তু এসব কথা বলতে গিয়ে, তুমি তো এক মিনিট প্রায় শেষ ক'রেই ফেললে তরলা।

স্ত্রী ॥ বেশ! তবে দশ সেকেন্ডও লাগবে না আমার সে কথা বলতে। আমি সতী নই, আমি অসতী।

স্বামী ॥ সে কী? এ তুমি কী বলছো তরলা?

স্ত্রী ॥ মরতে ব'সে আমি মিথ্যে বলিনি। সত্যটা শেষে ব'লে যেতে পারলাম বলে আমার যেন কেমন শান্তি বোধ হচ্ছে।

স্বামী ॥ না, না এ সব তুমি প্রলাপ বকছো। তোমার এ সব কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। আজ দশ বছর তোমাকে নিয়ে ঘর ক'রলাম। কী ভালোই না বেসেছ তুমি আমাকে এই দশটি বছর! সুখে-দুঃখে, শোকে, তাপে কী সান্ত্বনাই না ছিলে তুমি আমার! মূর্তিমতী পবিত্রতা ছিলে তুমি আমার সংসারে। তুমি হবে অসতী! ছি-ছি-ছি।

স্ত্রী ॥ আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি। ফাঁকি দিয়েছি এই দশটি বছর। কিন্তু আর আমার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেমন একটা প্রশান্তি নেমে আসছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্বামী ॥ ফাঁকি দিয়েছ বিশ্বাস করি না। শোনো, তুমি ঘুমিও না। হরলিকস খেতে হবে তোমাকে।

> **॥ একাঙ্ক নাটক ॥**
>
> **বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে সময় সংক্ষেপের জন্য দীর্ঘ রচনাপাঠে মনোনিবেশ একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে। তাই বৃহৎ উপন্যাসের পাশে ছোট-গল্পের উদ্ভব এবং তা সর্বজন-স্বীকৃত। এ কারণেই দীর্ঘ চার অঙ্ক - পাঁচ অঙ্ক নাটকের পাশেই অতি সম্প্রতি একাঙ্কিকার উৎপত্তি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এবং জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। এ কালের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের অবদানে বাঙলা একাঙ্কিকা আজ সমৃদ্ধ। 'অমৃত' পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের এই নতুন শাখাকে সুযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আরও সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই বর্তমান সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হবে 'অমৃতে'।**
>
> **অমৃত, সম্পাদক।**

স্ত্রী ॥ না। হরলিকস খাবো না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। তোমাকে তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্বামী ॥ ডাক্তার! ডাক্তার! আমি ডাক্তারকে ডাকছি।

স্ত্রী ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) ডাক্তার! না আর ডাক্তার ডেকো না। সারা জীবন ঐ ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছি আমি। কোনো ফল হয়নি তাতে। ব্যারাম আমার দিন দিন বেড়েই গেছে। আর ডাক্তার ডেকে এনো না তুমি।

স্বামী ॥ ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে কেন তরলা? তোমার বাড়া-বাড়ি দেখে আমি যে তাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছি। রাতের পর রাত জেগেছে সে। আজ আমি তাই ওকে জোর করে শুইয়ে দিয়েছি। ওকে ডাকছি।

স্ত্রী ॥ (আতকাইয়া উঠিয়া) না, না ওকে ডেকো না।

স্বামী ॥ তোমার অস্থিরতা বাড়লে ও'কে ডাকতে বলেছেন।

স্ত্রী ॥ তোমার ঐ ডাক্তার বন্ধুটিকে তুমি জানো না। তোমার ঐ বন্ধুই আমার যম। বিয়ের পর থেকেই ও আমাকে ওষুধ দিয়ে দিয়ে মৃত্যুর পথে নিয়ে চলেছে।

স্বামী ॥ সে কী?

স্ত্রী ॥ তুমি জানো না, তুমি জানো না। আজ তোমাকে তা জানাতে পারলাম ব'লে আমি পরম শান্তি পাচ্ছি, আমার ঘুম পাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি, তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না আমি। বিদায় বন্ধু বিদায়। বিদায়।

(চোখ বুজিল। মৃত্যুর প্রশান্তি তাহার সমস্ত দেহে নামিয়া আসিল)।

স্বামী ॥ তরলা! তরলা! ডাক্তার! ডাক্তার!

ডাক্তার ॥ (পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে) ব্যাপার কী শ্যামল? আসবো?

স্বামী ॥ না। দরকার নেই। আর তুমি তাকে পাবে না। না-না পাবে না নয়। তাকে তুমি চিরতরে পেয়ে গেছ।

(নিস্তব্ধতার মধ্যে যবনিকা পড়িল)।
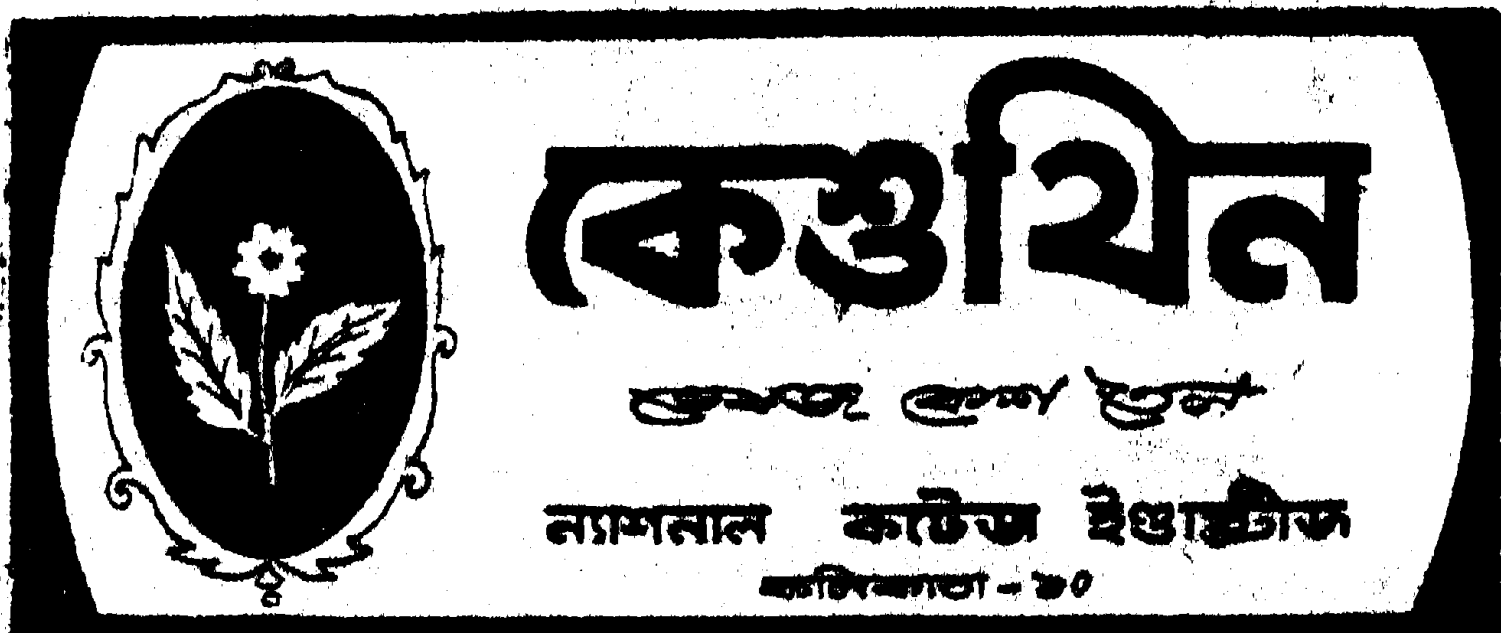
ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথ

সরোজরঞ্জন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তখন বহুলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু মুস্কিল হইল তিনি সকলের সেবা সহজভাবে গ্রহণ্ করিতে একেবারেই রাজী নন। অর্থের বিনিময়ে সেবা গ্রহণ করা তিনি কখনই পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে দরদী মনের স্পর্শ থাকে না।—দায়, মিটানোর কাজের মত প্রতি মুহূর্তে সেবার মাধুর্য নষ্ট করিয়া দিয়া দুঃখের ভার বাড়াইয়া তোলে, অশান্তির সৃষ্টি করে। তাই খুব অন্তরঙ্গ, প্রিয় ও স্নেহের পাত্র যাহারা এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা আনন্দের সঙ্গে প্রফুল্ল বদনে সহজ ও কোমল হস্তে নিপুণভাবে সেবা করিতে পারিবেন এবং রহস্যালাপে যথা-যথভাবে যোগদান করিয়া তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিতে সক্ষম ছিলেন এমন সেবকদের সেবাই তাঁহার রোগে কতকটা আরাম দিতে পারিত—তিনিও তাহাতে আনন্দ লাভ করিতেন।—কাজেই এই সকল পরীক্ষায় যাঁহারা কতকটা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কেবলমাত্র তাঁহাদের নামের তালিকাই নিম্নে দিলাম ঃ—

নন্দিতা কৃপালানি (বুড়ি), রাণী মহলানবীশ, মৈত্রেয়ী সেন, অমিতা ঠাকুর, রাণী চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিলকুমার চন্দ, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বিশ্বরূপ বসু, সচ্চিদানন্দ রায় (আলু)।

উপরোক্ত প্রিয় ও স্নেহের পাত্র সকলেই গুরুদেবের সেবা করিবার অধিকার লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছেন।" তাঁর আশীর্বাদই তাঁহাদের জীবনের মহামূল্যে লাভ।

চিকিৎসকগণ প্রতিদিন তাঁর প্রস্রাবের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া রোগ-প্রশমনের প্রতি খুবই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন ও প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে জলপানের ব্যবস্থা দিলেন। রাত্রি ১২টার পর আমার ও সচ্চিদানন্দের (আলু) উপর সেদিন সেবার ভার পড়িয়াছিল। রথীদা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "ডাক্তারেরা আজ রাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ জল খাইয়ে যাতে বাবা মহাশয়ের প্রচুর প্রস্রাব করাতে পারা যায় সেই চেষ্টা করতে উপদেশ দিয়েছেন। কাজেই তোমরা আজ রাত্রে সেইরকম ব্যবস্থা করো, নয়তো বাবা মহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁরা এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। যথেষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজের জল বোতলে করে ফ্রিজিডিয়ারে রাখা আছে, তোমরা প্রয়োজনমত সেটার ব্যবহার করো।" রথীদার উপদেশ শুনিয়া আলুকে ডাকিয়া রথীদা যাহা বলিয়া গেলেন তাহা শুনাইলাম। আলু বলিলেন "সরোজদা, তুমি জান না গুরুদেবকে যথেষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজের জল খাওয়ানো বড় শক্ত কাজ। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন।" আমি বলিলাম, "উপায় নেই। কারণ তাঁকে যেরকম করেই হোক খাওয়াতেই হবে—এখানে রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করলে চল্‌বে না। তুমি কেবল আমাকে সাহায্য করো আমি তার একটা ব্যবস্থা করব।" এই পরামর্শ করিয়া প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এক গ্লাস করিয়া জল দিতে আরম্ভ করিলাম এবং ২।৩ বার খাওয়ার পরই গুরুদেব প্রবল আপত্তি জানাইলেন, বলিলেন—"তোরা করছিস্ কি—এইতো খানিকক্ষণ আগেই জল খেয়েছি—আবার কেন? এত জল খাবার জায়গা কোথা? আর আমি খাব না?" আমি বলিলাম, "ডাক্তার বলেছেন এটা খেতে হবে।" তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ডাক্তার বলেছেন—ওঃ—তাহলে দাও।" ডাক্তারের অভিমত তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন দেখিয়া আর আমার কোন অসুবিধা রহিল না। যখনই গ্লাসভরা জল লইয়া গিয়াছি তখনই অবলীলাক্রমে তাহা খাইয়া ফেলিয়াছেন। শেষ রাত্রের দিকে ডাক্তারের নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়াইয়া প্রচুর প্রস্রাব হওয়ায় আলু ও আমি দুইজনই ছুটিয়া গিয়া পাশের ঘরে রথীদাকে ডাকিয়া বলিলাম, "রথিদা এই দেখুন কত প্রস্রাব হয়েছে।" রথীদা পরম আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "আঃ—নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আজ চা-র টেবিলে প্রচুর মিষ্টির ব্যবস্থা থাক্‌বে, সকলে মিলে আনন্দোৎসব করা যাবে।" পরদিন এই সংবাদ চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং চিকিৎসকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আমাদের অন্তরের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এমন সময় বড়মা (হেমলতা দেবী) সেই আনন্দসংবাদ শুনিয়া আমাদের চায়ের টেবিলে আসিয়া বলিলেন, "আজ কী আনন্দ হচ্ছে তাই জানাবার জন্য তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।" আমরা এইজন্য প্রচুর মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়া আনন্দ করিতেছি দেখিয়া বড়মা সকলকে বলিলেন—"আজ রাত্রে এই উপলক্ষে আমি তোমাদের সকলকে রাত্রের খাওয়ার নেমন্তন্ন জানাচ্ছি। বাড়ির সকলে ও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে তোমরা এসো। কেবল তোমাদের সংখ্যাটা আমাকে আগে থেকে জানিয়ে দিয়ো।" গুরুদেব যে ঘরে শুইয়াছিলেন তাহারই পূব দিকের প্রশস্ত বারান্ডায় ৫০।৬০ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির দুই সারি বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আহারে উপবেশন করার আহ্বান আসামাত্র সকলে যথাস্থানে উপস্থিত হইতেছেন এমন সময় বড়মা আমার হাতে একটি বড় গাঁদা ফুলের মালা দিয়া বলিলেন, "সরোজ আজ তোমাদের একজনকে প্রধান অতিথি করে তাঁর গলায় এই মালাটি পরিয়ে দিয়ো। তাড়াতাড়িতে অন্য ভাল ফুলের কোন মালা আর সংগ্রহ করতে পারিনি।" ঠিক্ আছে বলিয়া আমি বড়মার হাত হইতে মালাটি লইয়া আস্তে আস্তে যাইতেছি আর ভাবিতেছি কাহাকে প্রধান অতিথি করা যায়। এমন সময় দেখি উত্তর দিক হইতে একজন ভদ্রলোক ধোপ-দুরস্ত পরিস্কার খদ্দরের কাপড় পরিয়া ধীর পদক্ষেপে ভোজনপংক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। রংটা অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণই বলা চলে কিন্তু তাহা হইলেও সুপুরুষ বলিয়া তাঁহারই গলায় গাঁদা ফুলের মালাটি দেওয়া স্থির করিলাম। তিনি নিকটে আসামাত্র বলিলাম—"ভাই, একটু দাঁড়াও, তোমাকে আজ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করতে হবে।" এই বলিয়া জোড়হস্তে ঊর্ধদিকে মালাটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম—"মা মহামায়া, অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার উপযুক্ত বলি আর না পেয়ে এঁকেই তোমার চরণে উপস্থিত করছি, তুমি দয়া করে গ্রহণ্ করে আমাদের কৃতার্থ কর।" এই বলিয়া মালাটি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলাম। এই কথা বলামাত্র ভদ্রলোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "সরোজদা, করছ কী, করছ কী, আমাকে শেষকালে এমন

করে জব্দ করলে?" উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলেই এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। গুরুদেব এত হাসির রোল শুনিয়া বুড়িকে (নন্দিতা কৃপালনি) জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতো এদের আজ এত উল্লাস কেন?" বুড়ি তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া সমস্ত বিষয়টা জানিয়া লইয়া গুরুদেবকে শুনাইলেন। গুরুদেব শুনিয়া খুব খুশী। তিনি বুড়িকে বলিলেন, "সরোজকে বল্ খাওয়ার পর যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যায়।" বুড়ি আমাকে বলিলেন, "সরোজদা, দাদা-মহাশয় তোমাকে খাওয়ার পর দেখা করতে বল্‌লেন।" আমিতো শুনে অবাক, বুড়িকে বলিলাম "কেন হে কী জন্য ডেকেছেন জান কিছু?" বুড়ি বলিলেন—"সে আমি জানি না—আমাকে যা' বল্‌তে বলেছেন তাই বললাম।" আমার আনন্দ তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেবলই ভাবিতেছি খাওয়ার পর গুরুদেব আমাকে দেখা করিতে বলিলেন কেন? যাই হোক্ ভুরিভোজনের শেষে "বড়মা কি ফতে" বলিয়া সকলে আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। আহারান্তে আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া দেখি গুরুদেব নাত্‌নির (বুড়ি) সঙ্গে বেশ রহস্যালাপে মশগুল আছেন। আমি ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই দেখি মুহূর্তের মধ্যে গুরু-দেবের মুখের ভাব বদল হইয়া গিয়া গম্ভীর আকার ধারণ করিয়াছে। (গুরু-দেব যে কত বড় অভিনেতা ছিলেন তাহা যাহারা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আর নূতন করিয়া পরি-চয় দিতে হইবে না)। আমি জোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুদেব, আমাকে ডেকেছেন?" তিনি কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়াই বলিলেন—"তোমার এত বড় সাহস যে আমার একান্ত-সচিবকে সকলের সামনে এমন করে অপদস্থ করলে? জান—তাঁকে অপমানিত করা মানে আমাকে অপমানিত করা?" আমি তো এই কথা শুনিয়া একে-বারে অবাক! কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম—"গুরুদেব, আমি না বুঝে এমন একটা কাজ করে ফেলেছি—আর কখনো এমনটি হবে না।" গুরুদেব মুহূর্তের মধ্যে মুখের চেহারা পরিবর্তন করিয়া হাস্যমুখে আমার পিঠে দুইটি চাপড় মারিয়া বলিলেন, "আরে ঠিক করেছিস। আমি খুব খুসি হয়েছি। ও ব্যক্তি যখন তখন সবাইকে জব্দ করে বেড়ায়, কিন্তু ওকে কেউ জব্দ করতে পারে না। আজ তুই তাকে এমন করে জব্দ করেছিস শুনে খুব খুসি হয়েছি।"

সদা হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া এই রঙ্গ রহস্যালাপ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করিতেন। রোগযন্ত্রণা মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

এই ঘটনার পর হয়তো গুরুদেবের মনে হইয়াছিল আচ্ছা দেখি তো সরোজকে একটু অপ্রস্তুত করা যায় কিনা। তাই একদিন সকালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথারীতি কাজে মন দিব এমন সময় তিনি আমাকে দেখিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। আমি মনে করিলাম হয়তো শরীরটা আজ তত সুস্থবোধ করিতেছেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুদেব, আজ শরীরটা কেমন মনে হচ্ছে?" তিনি আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "কাল রাত্রে একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি—সারারাত ঘুম হয়নি—তাই ভাল লাগছে না।" আমি উত্তরে বলিলাম—"অসুস্থ দুর্বল শরীরে এই রকম দুঃস্বপ্ন সকলেই দেখে থাকে—তাতে এত মন খারাপ করার কি আছে? কী স্বপ্ন দেখেছেন?" তিনি তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি কোথায় কোন্ এক বড় সহরে যেন আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলুম না—গেলুম সেই সহরে কিছু বলার জন্য। মস্ত বড় হলঘর লোকে লোকারণ্য। সকলে আমাকে নিয়ে গেলেন সেই হল-ঘরে। আমি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমার ভাষণ দিচ্ছি, একটু পরেই মঞ্চের নিচেই কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁরা হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন—'না না, আমরা আপনার কথা শুনব না—আপনি বসে পড়ুন। আপনার মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হচ্ছে না—আপনি বসুন।' আমি বললুম, 'আচ্ছা আমাকে আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন, পরে আপনাদের যদি কিছু বলবার থাকে তো বলবেন। আমি শুনে যদি বুঝি জবাব দেবার কিছু থাকে তা'লে দেবো।' এই কথা বলেই আবার আমি বক্তব্য বল্‌তে আরম্ভ করি। তাঁরা এবারও বলে উঠ্‌লেন—'না, না, আমরা শুনব না, আপনি বসে পড়ুন।' আমি বললুম, 'আপনারা আমাকে ডেকে এনেছেন একটু ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য কথাটা শুনুন, পরে আপনারা প্রতিবাদ করবেন—আমি শুনব।' এই বলে আবার আমি আমার বক্তব্য বল্‌তে সুরু করেছি এমন সময় তাঁরা আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে মঞ্চের উপর উঠে এসে বল্‌তে লাগ্‌লেন—'আপনি বসবেন কিনা বলুন, নইলে আমরা জোর করে আপনাকে বসিয়ে দেবো'—এই বলে তাঁরা আমাকে আর সময় না দিয়েই খপ করে আমার দাড়ি ধরে টেনে বসাতে গেলেন। আমি বললুম—'আহা হা করছেন কি? আমার দাড়িটা ছাড়ুন, দাড়ি ছিঁড়ে গেল। প্রতিবাদ করার এটা তো ভদ্ররীতি নয়—আপনারা ছাড়ুন ছাড়ুন।' তাঁরা কোন কথা না শুনে আমার দাড়ি ধরে টেনে হিঁচড়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমার জীবনে কখনও এত বড় অপমান হইনি। আমি দুঃখে অধোবদন হয়ে বসে রইলুম। আচ্ছা বল তো এটা কোথায় হতে পারে? আমার মনে হচ্ছে এটা যেন ময়মনসিংহে সূর্যকান্ত হলে ঘটেছিল। তুই কি বলিস?" এতক্ষণ পরে আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম যে আমার বাড়ি ময়মনসিংহে বলিয়া আমাকে জব্দ করার জনাই এই গল্পের অবতারণা। যাহোক, আমি শোনামাত্র বলিলাম—"না না গুরুদেব, আপনি ভুল করছেন—এটা তো ময়মনসিংহে হয়নি।" তিনি বলিলেন—"অ্যা, তবে কোথায় হয়েছিল?" আমি বলিলাম—"এটা তো হয়েছিল যশোরে।" শুনিয়াই গুরুদেব অসুস্থ শরীরেও অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছিস। এটা ময়মনসিংহে নয় এটা আমার শ্বশুরের দেশে! নগেনকে (গুরুদেবের শ্যালক) এই কথাটা বলে দিস যে শ্বশুরের দেশে ভগ্নীপতির কী দশা হয়েছিল।"

গুরুদেবের এই সমস্ত রহস্যালাপের মধ্যে যে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ উত্তর দিতে পারিতেন তার উপর তিনি খুব খুসী হইতেন এবং তাঁহার প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। তাই আমার জবাবটা বলামাত্র শুনিয়া বড়ো খুসী হইয়াছিলেন এবং নাত্‌নি বুড়িকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ দিদিমণি, সরোজের যে এমন সুন্দর রসবোধ আছে তা তো আগে বুঝতে পারিনি।"

এই রকম হাসি ঠাট্টার মধ্যেই রোগ-শয্যা সহজ সুন্দর ও মধুর করিয়া তোলাই তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। রোগের গ্লানিকে তিনি কখনই প্রাধান্য দিতেন না। এই রোগশয্যায় থাকিয়াই কখনো

তিনি মুখে মুখে কবিতা বলিয়া যাইতেন উপস্থিত সেবক বা সেবিকার মধ্যে যে কেহ তখন তখনই তাহা লিখিয়া লইতেন এবং পরে তিনি উহা সংশোধন করিয়া দিলে ছাপা হইতে যাইত। কখনও বা শুধু হাসি ঠাট্টার মধ্যেই সময় কাটাইতেন। সেবক সেবিকাদেরও তাই তাঁহার সঙ্গ অত্যন্ত মধুর ও সহজ বলিয়া মনে হইত। সেবার মধ্যে কখনও শ্রান্তি বা ক্লেশ অনুভব করিতেন না।

শান্তিনিকেতনে

নভেম্বর, ১৯৪০ সনের তৃতীয় সপ্তাহে চিকিৎসকদের পরামর্শমত গুরুদেবকে শান্তিনিকেতনে লইয়া আসা হইল। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস ও শীতের নবরূপ ও সতেজ আবহাওয়া তাঁহার দেহমনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইবে এই আশা চিকিৎসকদের মনে ছিল—গুরুদেবও কলিকাতার বদ্ধ ঘরের দূষিত আবহাওয়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এইখানে আসিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। প্রতিদিন নির্মল আবহাওয়া তাঁহার দেহমনে অফুরন্ত আনন্দ ও শান্তি আনিয়া দিল। তিনি সুস্থমনে প্রতিদিন নানা ছড়া ও কবিতা মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, ও রাণী চন্দ নিষ্ঠার সহিত তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। গুরুদেব উত্তরায়ণের নিচের তলায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণের বারান্দায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উপবেশন করিতেন। নীরবে প্রকৃতির অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতেন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে যেন সেই অমৃতময় সত্তার আবির্ভাব অনুভব করিতেন। তাই তিনি এই সময়ে লিখিয়াছেন ঃ—

"জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
—আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করে—সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত
সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।"

উদয়ন
১৮শে নভেম্বর, ১৯৪০
প্রাতে।

গুরুদেব তাঁর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের সেবায় পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কি করিয়া যে এই সেবার ঋণ শোধ করিবেন সেটি তাঁহার মনে সর্বদা জাগ্রত থাকিত। একদিন সকালে আমি তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "এই যে সরোজদাদা এসেছ—তোমার জন্য এইটা রেখেছি।" বলেই তিনি একটি তসরের লম্বা জোব্বা (যা' তিনি নিত্য ব্যবহার করিতেন) আমার হাতে তুলিয়া দিলেন—বলিলেন "এইটি পর দেখি।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, এই জিনিষ আমাকে মানাবে কেন? তা' ছাড়া এত বড় জোব্বা আমার গায় যে ঢল্‌ঢল্ করবে।" তিনি বলিলেন, "পরই না—তোর গায় ঠিক লাগবে।" বারবার পীড়াপীড়িতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সেটি গায় দিয়ে দেখি একটা ভাঁড়ের মত চেহারা হয়েছে। গুরুদেব বলিলেন—"হ্যাঁ একটু বড় হয়েছে বটে, তা এটাকে এক কাজ করিস, কোন ভাল দর্জিকে দিয়ে একটু কাটিয়ে নিয়ে তোর গায়ের মাপের মত করিয়ে নিস্—পরতে পারবি—জিনিষটা ভালো। দেখ্ এইটার বুকের কাছে একটু কালির দাগ লেগেছে—আমি যখন ছবি আঁকছিলুম তখন একটু কালি লেগে গেছে—ভাল শালকরকে দিয়ে ধুইয়ে নিস দাগটা উঠে যাবে।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, এই জিনিষ আমি দর্জি দিয়ে নিজের গায়ের মাপসই করিয়ে নষ্ট করব না—এটা আপনার আশীর্বাদ, যত্ন করে ধুইয়ে মাথায় তুলে রাখব। তিনি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—তোর যা ইচ্ছা হয় তাই করিস।"

আমি সেবা দ্বারা যে এই মহামানবকে অল্প একটুও সুখী করিতে পারিয়াছিলাম এইটাই আমার পরম লাভ। তাহারই নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার এই আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তিনি জানিতেন অর্থ দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে আমাদের সেবার প্রতিদান হইবে না, তাই তাঁহার পরমপ্রিয় সেবকদের প্রায় অধিকাংশকেই তিনি অমর ছন্দে তাঁহার কাব্যে চিরদিনের জন্য স্বরূপে বিশ্লেষণ করিয়া স্থান দিয়া গিয়াছেন। সার্থক হইয়াছে এই মহামানবের সেবা।

আমার জীবনের মহত্তম একটি ঘটনা এইখানে উল্লেখ না করিলে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি ঘটাইব মনে করিয়া আজ সর্বসাধারণের সম্মুখে অকপটচিত্তে উদ্ঘাটিত করিতেছি। পাঠক আমাকে ভুল বুঝিয়া নিজের প্রশস্তি গাহিতেছি মনে করিয়া যেন উপহাস না করেন।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১৯৪১ সনের ৮ই জানুয়ারী রাত্রি দুই ঘটিকায়। এইদিন রাত্রি দুই ঘটিকা হইতে আমার উপর সেবার ভার ছিল। আমি যথারীতি ঠিক দুইটার সময় রোগীর ঘরে ঢুকিয়া দেখি ঘরে জোর আলো জ্বলিতেছে—মাথার উপর বন বন পাখা ঘুরিতেছে, গুরুদেব একেবারে নগ্নদেহে খাটের একটু দূরে একটা কৌচের উপর বসিয়া পরিধেয় লুঙ্গির মধ্যে দড়ি ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি তো দেখিয়া অবাক্। বেতনভোগী শুশ্রূষাকারী তাঁহার পার্শ্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়াই পাখাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, "গুরুদেব একি ব্যাপার?" তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কে, সরোজ দাদা এসেছ? এই লুঙ্গিটাতে দড়ি পরাতে পারছি না—তুই এটা পরিয়ে দে তো?" আমি তাঁহার হাত হইতে লুঙ্গি লইয়া বলিলাম "এটা থাক্, আমি আর একটা লইয়া আসিতেছি।" তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া একটা পাঞ্জাবী ও দড়ি পরানো লুঙ্গি লইয়া তাঁহাকে প্রথমে পাঞ্জাবীটা পরে লুঙ্গি পরাইয়া দিলাম এবং আস্তে আস্তে কৌচের উপর বসাইয়া কম্বল দিয়া গা ঢাকিয়া লম্বা করিয়া শোয়াইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, "জামা লুঙ্গি সব ভিজে গিয়েছিল।" আমি বিছানার কাছে গিয়া মশারি তুলিয়া দেখি বিছানা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সমস্ত বিছানা তুলিয়া সরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি ৪।৫টা ভাল কম্বল পাতিয়া দিলাম। তাহার উপর বিছানার চাদর দিয়া একটা অয়েল-ক্লথ ও তাহার উপর বড় একটা তোয়ালে বিছাইয়া আবার একটা বিছানার চাদর দিয়া চারিদিকে হাত দিয়া দেখিলাম বিছানাটা বেশ নরম হইয়াছে কিনা, কারণ বিছানা নরম তুলতুলে না হইলে তাঁহার মনঃপূত হইবে না। সমস্ত ঠিক করিয়া মাথার কাছে ৫।৬টি বালিশ দিয়া পায়ের কাছে গায়ের কম্বলটি রাখিলাম। কৌচের কাছে গিয়া বলিলাম, "গুরুদেব চলুন এইবার খাটে শোয়াইয়া দিই।" তিনি আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, বিছানা সব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এইখানেই বেশ আছি—রাত্তির তো আর বেশি নেই। বাকী রাতটা এইখানেই বেশ কেটে যাবে।" আমি বলিলাম—"আমি সব ঠিক করে দিয়েছি। আপনি গিয়ে দেখুন, যদি ঠিক না থাকে তো এইখানেই আবার

করে শুইয়ে দেব।" "আবার আমাকে টেনে নিবি—এইখানেই তো বেশ ছিলুম।" আমি দুই হাতে তাঁহার সেই দীর্ঘদেহ ধরিয়া তাঁহার হাত আমার কাঁধে তুলিয়া দিয়া অতি কষ্টে কৌচ হইতে উঠাইয়া ধীরে ধীরে খাটের কাছে লইয়া গেলাম। খাটের একধারে বসিয়া চারিদিকে হাত বুলাইয়া দেখিলেন সব ঠিক আছে। পা দুইটা তখন খাটের উপর তুলিয়া বালিশ-গুলি পিঠে ও মাথায় ঠিক করিয়া বসাইয়া দেওয়ার পর শুইয়া পড়িলেন। আমি কম্বলটি টানিয়া মশারি গুঁজিয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত আরামের সঙ্গে একটা আঃ—শব্দ করিয়াই চক্ষু বন্ধ করিলেন। উজ্জ্বল আলোটি নিভাইয়া অদূরে একটি ক্ষীণপ্রভ বাতি জ্বালাইয়া রাখিলাম। মাথার উপর পাখাটিও ছাড়িয়া দিলাম। দেখিতে না দেখিতে গুরুদেব বেশ আরামে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ ব্যাপারটা ভাল করিয়া জানিতে না পারিয়া অদূরে বেতনভোগী শুশ্রূষাকারীর নিকট গিয়া কি হইয়াছিল জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "গুরুদেব যথারীতি প্রস্রাব করিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলে আমি আলো জ্বালিয়া মূত্রাধারটি যথাস্থানে রাখার চেষ্টা করছি দেখেই তিনি জোরে ধমক দিয়ে আমার হাত থেকে সেটি টেনে নিলেন। বললেন —'তোমার কিছু করতে হবে না। আমি নিজেই করছি।' —আমি দেখছি মূত্রাধারটি যথাস্থানে নাই, তখন তাড়াতাড়ি সেটিকে ধরে ঠিক করে বসিয়ে দিতে গেলে তিনি আবার আমাকে জোর ধমক দিয়ে বললেন—'সরে যাও বলছি, তুমি ধরবে না, আমি দিচ্ছি।'—কিন্তু তখনও ঠিকমতো বসানো হয়নি বলে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ধরে দিবার জন্য আবার হাত বাড়াতেই তিনি আরো জোরে বলে উঠলেন—'বারবার বারণ করছি তবু শোন না, সরে দাঁড়াও—খবরদার হাত দেবে না।' আমি ভয়ে সরে দাঁড়াতেই দেখি প্রস্রাব মূত্রাধারে না পড়ে বিছানায় পড়ছে ও জামা লুঙ্গি সব ভিজে যাচ্ছে। তিনি মূত্রাধারটি আমার হাতে দিয়েই বললেন—'এ্যাঃ সব ভিজে গেল।' এই বলেই আমাকে হটিয়ে দিয়ে তিনি নিজে নিজেই উঠে বসলেন ও খাট ধরে ধরে জামা-লুঙ্গি খুলে ফেলে কৌচের উপর বসলেন ও আমাকে একটা সাফ লুঙ্গি এনে দেবার জন্য আদেশ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা' পেয়েছি তাই এনে দিয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে দড়ি পরানো ছিল না। এই সময় আপনি এসে পড়ায় রক্ষা হয়েছে।" এই বলেই সেই ভদ্রলোক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "রথীদা এই খবর জানতে পারলে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হবেন।" আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যাহা বলিতে হয় তাহা আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব।

পূর্বেই বলিয়াছি যে গুরুদেব অর্থের বিনিময়ে কাহারো সেবা কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু রথীদা ও সুরেনবাবু গুরুদেবকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, প্রথম রাত্রে ও দুপুরের পরে কাছে থাকার জন্য একজন লোক রাখা বিশেষ দরকার নতুবা অন্য সকলের পক্ষে দীর্ঘদিন নিয়মিত সেবার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালানো শক্ত হইয়া পড়িবে। গুরুদেব তাহার জবাবে অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, "আমি তো এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি আর কোন সেবা-শুশ্রূষার দরকার নাই। কাউকেই আর আসতে হবে না।" যাহা হউক তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত মৌন সম্মতি জানাইলেও বেতনভোগীর নিকট হইতে কোন সেবাই গ্রহণ করিতেন না। বরং দেখিলেই ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হইতেন। তাহারই পরিণতি উপরের ঘটনা।—

ভোর ৫টায় যখন বুড়ি (নন্দিতা) গুরুদেবের প্রাতঃকৃত্যাদি করাইবার জন্য আসিলেন তখন গুরুদেব বলিলেন— "জানো দিদিমণি—কাল রাত্রে এক কাণ্ডই করেছি। ভাগ্যিস সরোজদাদা এসে পড়েছিলেন তাই মুস্কিল আসান হলো।" ব্যাপারটা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেই বুড়িকে জানাইলাম পরে বলিব। গুরুদেব বলিলেন, "কাল তোমার 'প্লাকসো বেবি' বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছেন।"

'নির্বাণ' পুস্তকে শ্রদ্ধেয়া বৌঠাকুরাণী প্রতিমা দেবী গুরুদেবের সেবা করার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"যাঁদের সেবায় দেহের অত্যন্ত ক্লিষ্টতার দিনে তাঁকে শান্তি ও স্বস্তি দিত, সেই অনুরক্তদের অন্তরাত্মাকে গভীর যাতনার মধ্যেও তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই সত্যমূর্তি তাঁর কাছে ধরা পড়ত। তাঁরা নব-জন্মলাভ করতেন তাঁর চেতনালোকে, সেই সব মানব-মানবীর আধ্যাত্মিক ছবি রূপায়িত হোলো "রোগশয্যায়"-এর আবেগময় ছন্দে।"

শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাই উপরোক্ত ঘটনার পরই গুরুদেব ছন্দোময় বাণীতে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন— আমাকে অমর করিয়া দিয়াছেন তাঁর "আরোগ্য" নামক কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়া। অমর কবির ঋণ শোধ হইল বটে কিন্তু আমাদের ঋণ আরো বহুগুণ বাড়িয়া গেল। ধন্য হইল ঋষি-কবির সেবা।—

গুরুদেব ৯ই জানুয়ারী সকালেই এই আশীর্বাণী লিখিয়া শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন— "এইটি এখনই ভাল কাগজে লিখে আমার কাছে নিয়ে এসো"। কর মহাশয় তাড়াতাড়ি তাহা লিখিয়া গুরুদেবকে দিলে তাহার উপর তিনি 'সরোজদাদা' এই কথাটি লিখিয়া নিচে নিজের নাম দস্তখত সহ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪১ লিখিয়া দিলেন। কর মহাশয় সত্বর তাহা পিয়নবই দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রবাহক মহাদেবকে ডাকিয়া গুরুদেব বলিলেন, "এইটা সরোজদাদার হাতে দিয়ে তার মুখখানা খুসি হলো কিনা দেখবি এবং এখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে চলে আসবি।" আমি পত্রবাহকের নিকট হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িয়া দেখিয়া অবাক্ এবং সই করিয়া দিতেই সে বলিল "বাবা মহাশয় আপনাকে এখনই একবার ডেকেছেন।" আমি যাচ্ছি বলিয়া ভিতরে গিয়াই স্ত্রীর হাতে তাহা তুলিয়া দিলাম। উত্তরায়ণে যাইব বলিয়া বাহির হইতেছি এমন সময় আমার বন্ধুবর সুধাকান্ত রায়চৌধুরী 'সরোজ বাড়ি আছ' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলেন। "সরোজ বাইরে এসো তোমাকে দেখি।" আমি বলিলাম, "সে কী? তুমি কি আমাকে কোনদিন দেখ নাই?" সুধাকান্ত বলিলেন, "তোমার মুখখানা প্রসন্ন না বিষণ্ণ সেটাই শুধু দেখে গিয়ে গুরুদেবকে এখনই বলতে হবে এই আদেশ। আর তোমাকে এখনই উত্তরায়ণে আসতে বললেন। ব্যাপারটা কি বল দেখি? আমাকে দূর থেকে আসতে দেখেই গুরুদেব বললেন, 'সুধাকান্ত তোমার চা তৈরী হচ্ছে তুমি আগে সরোজের বাড়ি যাও তারপর এসে চা খাবে।' আমার কোন কথা বলার আগেই তিনি উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন।" আমি হাসিয়া তাহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া সেই কাগজখানা হাতে তুলিয়া দিলাম। পড়িয়া বলিলেন, "তাই বলো। এটা পেয়ে তোমার মুখ প্রসন্ন না বিষণ্ণ তা' জানতে চেয়েছেন। যাই হোক্, তুমি শিগগির উত্তরায়ণে এসো— তিনি তোমার জন্য বারান্দায় বসে আছেন।"

আমি উত্তরায়ণে গিয়া দেখি তিনি বারান্দায় কৌচে বসিয়া আমার দিকে দূর হইতেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—"কী সরোজ দাদা— খুসি হয়েছ?" আমি বললাম—"গুরুদেব, খুসি হই নাই? আমি এতো পাবো তা' কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। আমি আপনার আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিয়েছি—খুব খুসি হয়েছি। কিন্তু"—বলিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখ আবার 'কিন্তু'— জানি বাঙাল কিছুতেই পুরো খুসি হয়নি—অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা যে এটা

যখন দিলেনই, তখন আপনি নিজের হাতে লিখে দিন—কারণ সুধীরের হাতের লেখা পছন্দ নয়। আচ্ছা—ঠিক আছে—এটাও রেখে দে। আমার হাত তো কাঁপে, এটা পরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে ধরে লিখে দেব।" আমি বলিলাম, "গুরুদেব, এখন আপনি লিখবেন না। একটু সুস্থ হলে পরে লিখে দিলেও চলবে।" কিন্তু তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—খুসির পর্বটা চুকাইয়া দিবার জন্য সেইদিনই ধরিয়া ধরিয়া লিখিয়া বিকালের দিকে লেখাটা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এই অমূল্য সম্পদ আমি যত্ন করিয়া ঘরে রাখিয়া দিয়াছি।

শেষ যাত্রা

বেশ কিছুদিন সুস্থ থাকার পরে গুরুদেবের শরীরের অবস্থা আবার ক্রমশঃ উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কলিকাতা হইতে ঘন ঘন চিকিৎসকগণ শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন ঔষধেই আর আশানুরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছিল না। চিকিৎসকগণ এখন অতি সত্বর অস্ত্রোপচার করা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই বলিয়া স্থির করিলেন ও রথীদা সেই সংবাদ গুরুদেবকে জানাইয়া তাঁহার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব অস্ত্রোপচারের ঘোরতর বিরোধী। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "অস্ত্রোপচার করা ছাড়া যখন কোন গতি নাই তখন আর আমাকে কেন এইভাবে কষ্ট দেবে, আমাকে শান্তিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দাও। আমি এই ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারি না।" গুরুদেব খুবই চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু মুখে আর কিছু প্রকাশ করিলেন না—তবে ভিতরে ভিতরে ঘোর অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁর শরীর ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। গুরুদেবের এই অবস্থা দেখিয়াও ডাক্তারদের এই দৃঢ় অভিমত জানিয়া একদিন গুরুদেবকে বলিলাম—"গুরুদেব, ডাক্তারদের মত যখন অপারেশন করলে আপনি অনেকটা সুস্থবোধ করবেন তখন এই বিষয়ে আপনি দয়া করে মত দিন।" গুরুদেব বলিলেন—"দেখ আমার এই দেহটাতে কোনদিন একটা আঁচড়ও কাটতে হয়নি—আজ যদি সে কাজ করা হয় তাহলে আমার এই দেহ সেটা কিছুতেই সহ্য করবে না। আমি জানি সেদিন তাহলে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে যেতে হবে।" সুন্দরের পূজারী দেহকে কোনরূপ অসুন্দর করিতে পারেন না তাই অস্ত্রোপচারই তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করিল। শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে তিনি অস্ত্রোপচার করাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৮ যেদিন তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবেন তার পূর্বদিন সারা রাত্র তাঁহার ঘুম হইল না। সকালে তাঁহার চেহারা একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বিষণ্ন নেত্রে যেন সুদূরের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, দুঃখে আমাদের অশ্রু সংবরণ করা অসম্ভব হইল। উদয়নের দোতালা হইতে ইনভেলিড চেয়ারে গুরুদেবকে বসাইয়া আমি, সচ্চিদানন্দ রায়, মাসোজি ও বিশ্বরূপ ধীরে ধীরে নিচের তলায় বাসে উঠাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া চলিলাম। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে আশ্রমের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ সারিবদ্ধ হইয়া জোড়হস্তে নীরবে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। গুরুদেব নির্বাক নিশ্চল প্রতিমূর্তি হইয়া অপলকদৃষ্টিতে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। সমস্ত আশ্রম তাঁহাকে সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলে বাস ধীরে ধীরে উত্তরায়ণের বাহিরে আসিয়া ছাতিমতলার পাশ দিয়া বিশ্বভারতীর অফিসের সম্মুখে গিয়া চৌমাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুদেব পশ্চিম আকাশের দিকে উদাস নয়নে যেন সুদূরের জীবন-দেবতার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন। বাস আবার ধীরে ধীরে বেণুকুঞ্জের পাশ দিয়া নেপাল রোড বাহিয়া বোলপুর যাইবার রাস্তায় আসিয়া পড়িল। একবার বড় দাদার (দ্বিজেন্দ্রনথ ঠাকুর) চরণে যেন প্রণাম নিবেদন করার জন্য নিচু বাংলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে কী করুণ দৃশ্য! সেদিন যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুধু তাঁহারাই জানেন সে কী! বোলপুর ষ্টেশনে সেদিন শহরের লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সাইডিং-এ রেলের চিফ্ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁহার সেলুনটি গুরুদেবের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় শ্রদ্ধাভরে গুরুদেবকে তুলিয়া লইলেন।—গুরুদেবের পথে সেবা-শুশ্রূষার জন্য নন্দিতা কৃপালনি, রাণী মহালানবিশ প্রমুখ কয়েকজন মহিলা মাত্র সেই কামরায় উঠিলেন—আমরা অন্যান্য সকলে পৃথক কামরায় রহিলাম। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রমোদচন্দ্র রায় মহাশয় নিউ থিয়েটার্সের বড় ভ্যান-খানা গুরুদেবকে জোড়াসাঁকো পৌঁছাইয়া দিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রমোদদা অতি যত্নে ও ধীরে ধীরে ভ্যানটি চালাইয়া গুরুদেবকে জোড়াসাঁকো পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর যে ডাক্তার ললিতবাবু একদিন এই অস্ত্রোপচার করার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহা হইল না বলিয়া তিনি ভবিষ্যতে এই মহামানবের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয় সেইভাবে বিনীত নিবেদন জানাইয়াছিলেন, আজ বাধ্য হইয়াই তাঁহাকেই আবার ডাকিতে হইল। অভিমান ত্যাগ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই অস্ত্রোপচারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে থাকিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ শল্যচিকিৎসক অমিয় সেন তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচারের পূর্বে ললিতবাবু আসিয়া গুরুদেব খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া গেলেন ও গুরুদেবকে বলিলেন, "আপনি কিছু ভাববেন না—আপনি টেরও পাবেন না যে অপারেশন করা হবে। শুধু একটু পিঁপড়ে-কামড়ের মত মনে হবে। আপনার সজ্ঞান অবস্থায়ই আমাদের কাজ শেষ করব।"

জোড়াসাঁকো বাড়ির পূর্ব দিকের প্রশস্ত বারান্দাটি ঘেরাও করিয়া সেইখানে অস্ত্রোপচারের জন্য গুরুদেবকে লইয়া যাওয়া হইল। ললিতবাবু অস্ত্রোপচারের স্থানটুকু ঔষধ দিয়া একেবারে অবশ করিয়াই সুনিপুণ হস্তে তাঁহার কাজ প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিয়া গুরুদেবকে আবার তাঁহার ঘরে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। তিনি খানিকক্ষণ পরে আসিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কী কিছু টের পেলেন কী?" গুরুদেব মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"না, এই পিঁপড়ের কামড় মাত্র।" অথচ অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ত্রোপচারের সময় মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই। এইভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার পরই গুরুদেব ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। ডাক্তার অমিয় সেন মাঝে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। গুরুদেব আর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন না। সকলেই ব্যস্ত হইয়া ইহা কি হইল ভাবিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই চলিয়াছে। পরদিন ভোরবেলা হইতেই নাভিশ্বাস উঠিয়াছে দেখিয়া সুধীরা দেবী (নন্দলাল বসুর স্ত্রী) মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতে লাগিলেন এবং বেলা ১০টার সময় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেবের অন্তিমশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁর পূত আত্মার জন্য উপাসনা করিলেন। দুঃখে আমরা গুরুদেবের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। ঘড়িতে যখন বারোটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট তখন গুরুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মরধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

(সমাপ্ত)

ডেম সিবিল থর্নডাইকের বৈঠকে

রাখী ঘোষ

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা শ্রীমতী ঠাকুর ইউরোপের সাংস্কৃতিক জগতের কয়েকজন বিখ্যাত নর-নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ইংল্যান্ডে অনুরূপ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে আমার উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল জগদ্বিখ্যাত অভিনেত্রী ডেম (নাইট) সিবিল থর্ণডাইকের সঙ্গে। এ'র স্বামী বিখ্যাত নট স্যার লুই ক্যাসন।

ডেম সিবিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ— প্রায় ষাট বছর আগে সিবিলের মঞ্চ-জীবন শুরু হয়। শৈশব থেকেই সিবিল ও তাঁর ভাই রাসেলের মধ্যে অভিনয় প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়েছিল। শিবিল কিন্তু হতে চেয়েছিলেন পিয়ানিস্ট। কিন্তু দেখা গেল একটানা বেশীক্ষণ পিয়ানো বাজালে তাঁর হাতের শিরায় টান ধরে। সুতরাং সিবিল অভিনয়-জীবনই বেছে নিলেন এবং অভিনয় শিক্ষা করবার জন্য বেনগ্রীট একাডেমীতে যোগ দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সিবিল অভিনয় জগতে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। এরপর তিনি আমেরিকা যান এবং সেক্সপীয়রের নাটকের ছোট বড় প্রায় সব চরিত্রে রূপদান করেন। ওলড্ ভিক থিয়েটার এদেশে যে নাট্য আন্দোলনের শুরু করে তারও আগে ম্যাঞ্চেস্টারে নব নাট্য আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিবিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে মিস বেলিস শুরু করলেন ওল্ড ভিক থিয়েটার।

কিন্তু চারদিকে যুদ্ধের এত বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁরা যেন আরও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। জীবনে অত উৎসাহ আর কোন দিনও পাননি। বোধ হয় তাঁর মনে হয়েছিল যুদ্ধের ধ্বংস আর অশান্তির মধ্যে জাতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের প্রেরণা দেবার মত মহৎ কাজ আর নেই। সিবিল তখন সাধারণ অভিনেত্রী। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে "কিং লীয়রের" অভিনয় চলছে। তাঁর ভাই রাসেল করছেন কিং লীয়রের ভূমিকা আর তিনি করছেন "ফুল" বা বোকার পার্ট। তখন তাঁকে বেশীর ভাগই ছেলেদের ভূমিকায় নামতে হত। কারণ ছেলেদের ভূমিকায় অভিনেতা পাওয়া কঠিন ছিল। ছেলেরা প্রায় সবাই তখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। যাক্। সেই অভিনয় চলার সময় সামনেই ওয়াটারলু ষ্টেশন বোমার আঘাতে উড়ে গেল। কিন্তু অভিনয় থামেনি। সিবিলের ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোট ছোট। তাদের রেখে তিনি আসতেন থিয়েটারে। এক মিনিট দেরী হবার উপায় ছিল না। টিউব ষ্টেশনে বোমা পড়ার সঙ্কেত শুনে যাত্রীদের বাইরে যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু সিবিল বেপরোয়া। টিকিট কালেক্টর তাঁকে বলত "এত যখন তাড়া তখন নিশ্চয়ই মিস বেলিশের লোক তুমি। যাও বাপু।" কিন্তু তবু কি নিস্তার আছে? মিস বেলিশ বলতেন "এ্যাঁ এত দেরী করে ফেললে! এভাবে কি ক'রে চলবে?"

অভিনয়-কলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, কমেডি অভিনয় করাটা সব অভিনয় শিক্ষার মূল। ভাল কমেডি না করতে পারলে ভাল ট্র্যাজিডী অভিনয় করা যায় না। যাঁরা শুধু একটাই করেন তাঁদের অভিনয় একঘেয়ে হয়ে পড়ে, কিং লীয়র আর মিডিয়া দুয়েই আমার অসামান্য সাফল্য। দুইই কমেডি। এখানে বলা দরকার যে, সিবিলকে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক অভিনেত্রী বলা হয়।

কি ধরণের পার্ট তাঁর ভাল লাগে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যে, কোন চরিত্র যাতে আমি আর আমাতে থাকি না যার বিরাটত্ব আমার নিজের সত্ত্বাকেও বিরাট করে তোলে, সেই ধরণের চরিত্রই আমার পছন্দ। যেমন জোয়ান অফ আর্ক। জোয়ানের ভূমিকা বোধহয় আমি হাজারবার করেছি। প্রত্যেক বারই আমি নতুন উদ্দীপনা পেয়েছি, নতুন কিছু আবিষ্কার করেছি। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যে আজও আমি তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আজও সে অভিনয় আমার অক্ষয় স্মৃতি। আমি যা বলতে চাই জোয়ান করবার আগে আমি কঠিন পরিশ্রম ঠিক তাই বলেছে। ঐ চরিত্রে রূপদান

লরেন্স অলিভিয়ার—ইডিপাস, সিবিল থর্ণডাইক—ইয়োকাস্টা

অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে হরতনের বিবির ভূমিকায় সিবিল থর্নডাইক

করেছি। জোয়ান অফ আর্ক সম্বন্ধে, তার বিচার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু পড়েছি। জোয়ানের দুটো ভাষণ আছে। একটা ঠিক তার মৃত্যুর আগে, আরেকটা ভগবানের নিঃসঙ্গতা নিয়ে। দুটোই অপূর্ব। কি জান, অভিনেতাকে হতে হবে নমনীয়। ঠিক কাদার তালের মত। যখন যে চরিত্রে অভিনয় করবে ঠিক তার মত হতে হবে।

ইংল্যাণ্ডের স্টেজে রাইনহার্টের প্রভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীমতী ঠাকুর। নিশ্চয়ই তাঁর প্রভাব আছে। তিনি ওয়েলসের লোকদের দিয়ে ওয়েলস ভাষায় কয়েকটি বই করিয়েছিলেন। প্রত্যেকটিই সুন্দর হয়েছিল। Every Man তো খুবই ভাল হয়েছিল।

আমরা যে ধারার লোক সে ধারাকে বিচ্ছিরি নাম দিয়েছে "কিচেন সিঙ্ক স্কুল"। তা যাই হোক না বাপু, ঐ কথাটা তো ঠিক আমাদের প্রত্যেককেই সেখানে আসতে হয়। অন্তত সেটা চিনি তো ভাল করে। এই ধারার লোকদের মধ্যে জন ওসবোর্ণ, উইসকার হ্যারল্ড পিন্টা এবং আরও অনেকে নাম করেছেন। তবে সবচেয়ে ভাল লেখেন পিন্টা। ও'র লেখা একটা বই তিনবার দেখতে গিয়েছিলাম। তিনজন লোককে নিয়ে গল্প। মানুষের আত্মার বা মনের যে চিরন্তন নিঃসঙ্গতা তাই তার উপজীব্য। ও'রই লেখা আরেকটি বই "দি কিচেন"। মাটির তলায় বিরাট রান্নাঘর। ওপরে রেস্টুরেণ্ট। ওপরটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ওয়েটারদের দৌড়াদৌড়ি দেখে। নীচের তলায় লোকেরা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের নিয়েই গল্প। এক বিরাট ট্রাজিডী সেখানে রূপ নিচ্ছে। ঐ নাটক শেষ হবার পরও প্রশ্ন থেকে যায় কি হবে? দর্শককে নীতি উপদেশ নয় তার মনে চিন্তা জাগাতে হবে।

আবার বললেন সিবিল। এখানে প্রথম দিকে ট্রাজিডী অভিনয় করা যে কি কঠিন ছিল! জানই তো আমরা ইংরেজরা অতি দুঃখেও হাসি। অন্য কোন জাত তো দূরের কথা জার্মাণ ফ্রেঞ্চরাও আমাদের এদিকটা বুঝতে পারে না। ট্রাজিক জিনিষ দেখে হাসা আমাদের স্বভাব। আমাদের কমেডিগুলো তোমাদের মত হাল্‌কা নয়। বড় বেশী গুরু-গম্ভীর।

কলকাতার থিয়েটার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সিবিল। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় সম্বন্ধে বললেন ও'র সাথে ফরাসী অভিনেতাদের তুলনা করা চলে। নাটকীয় অথচ স্বাভাবিক। আমি ভাষা বুঝতে পারিনি কিন্তু তাঁর কণ্ঠ আমাকে আশ্চর্য্য করেছিল। তিন অক্টেভেই তাঁর গলা চলত।

কলকাতার ছেলে মেয়েদের অভিনয় প্রতিভা আছে। আমি ইউনিভারসিটির ছেলে মেয়েদের করা বাংলা ম্যাকবেথ দেখেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। তোমাদের মধ্যে তো বহু অপেশাদার দল আছে—প্রচুর নাট্যরসিক লোক আছেন যাঁরা সারাটা জীবন নাট্যবেদীর মূলে উৎসর্গ করেছেন। তোমাদের তো প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু দয়া করে তাদের বোল' তারা যেন মাইক ব্যবহার না করে। দেখ না এদেশে আজকাল কণ্ঠস্বরের চর্চা কমে গেছে। কিন্তু গলার স্বরের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন, বিভিন্ন ভাবের প্রকাশে তার যে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি তা কি কখনো মাইকে প্রস্ফুটিত হয়। আমার স্বামীর গলাই ধর না কেন। অপূর্ব তাঁর কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমি যখন সে গলাই মাইকে শুনি তখন মনে হয় এ যেন আর কারুর গলা শুনছি।

শুধু গলায় অভিনয় করা কিছু কঠিন নয়। চর্চা করলেই সেরকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া যায়। খুব বড় জায়গায় যদি শুনতে অসুবিধা হয় তাহলে সেরকম জায়গায় থিয়েটার করাই উচিত নয়।

পল্‌রবসন—ওথেলো, সিবিল থর্নডাইক—এমিলিয়া

দর্শকের সংখ্যা ১৯০০র বেশী হবে না এবং ১১০০ দর্শকের কানে কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া কিছু কঠিন নয়।

তোমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকই মুক্ত স্টেজে বা ওপেন এয়ার স্টেজে করা চলে। আমি এরকম স্টেজই সবচেয়ে পছন্দ করি। তবে গ্রীণ থিয়েটারের মত না হলে ওপেন এয়ারে সংলাপ বলা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

আজকালকার থিয়েটারগুলোর চেয়ে এলিজাবেথীয়ান যুগের থিয়েটারগুলো অনেক বেশী প্রাণবন্ত ছিল। থিয়েটারের যে অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য তা যেন আজকাল ব্যাহত হচ্ছে। সিনেমা এবং টেলিভিশনের প্রভাবটাও হয়েছে। সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো গলার স্বর বা বাচনভঙ্গী স্পষ্ট করা নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু থিয়েটারে এমনকি প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ পর্যন্ত পৃথক ও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

রবীন্দ্র স্মৃতি ঃ—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সিবিলের শ্রদ্ধা অসীম। রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন তিনি ১৯১৯ কি কুড়ি সালে। তাঁর চেহারা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর বাচনভঙ্গী সবই যেন মোহময়। রবীন্দ্রনাথ এলে তাঁকে নিয়ে কবিতা রচিত হল। আবৃত্তি করলেন সিবিল থর্ণডাইক। তাঁকে বললেন "এসো একদিন আমার ওখানে।" সিবিল কবি যে হোটেলে উঠেছিলেন সেখানে এলেন পরদিন সকাল আটটায়। কবির চারিদিকে আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু কবি সবাইকে বিদায় করে প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন। কি অভিনয় করছ, কেমন লাগছে ইত্যাদি। এ সাক্ষাৎকার সিবিলের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। একদা তিনি যে এই মহাপুরুষের ব্যক্তিগত স্নেহ ও মনোযোগ পেয়েছিলেন এ কথা আজও গৌরবের সাথে বলেন সিবিল।

এরপর কবিকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন তখন তিনি যে নাটকে অভিনয় করছিলেন সেটি দেখবার জন্য। কবি এলেন। অভিনয় দেখলেন। অভিনয়ের পর আলাপ করলেন সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে। সিবিলের মনে পড়ে কবি চলে যাওয়ার পরেও সকলের সেই অভিভূত অবস্থার কথা।

ভারতবর্ষ আমার ভাল লাগে—প্রথমেই লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের কথা উঠলো। সিবিল বললেন, ওখানেই বহু ভারতীয়ের সাথে আমার প্রথম আলাপ। এমন কি কৃষ্ণ মেননের সাথেও। মেনন সম্পর্কে ছেলেমানুষের মত বার বার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন। যেন দুষ্ট ছেলে সম্পর্কে সস্নেহে কোন গুরুজন অভিমত প্রকাশ করছেন "ওয়াইল্ড বয়।"

প্রথম থেকেই সিবিল ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সাথে যুক্ত আছেন। ভারতবর্ষ কেমন লেগেছিল এ প্রসঙ্গে সিবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হলেন। বললেন, ভারতীয় নৃত্য অপূর্ব। মাদ্রাজে থাকবার সময় কাছেই একটি গ্রামে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তাতে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম। মণিপুরী নাচও দেখেছি। কি সুন্দর তোমাদের কমনীয়তা। আমাদের যা সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয়, তোমাদের তা জন্মলব্ধ।

সিবিল থর্ণডাইক—সেন্ট জোয়ানের ভূমিকায়

আমি তখন দিল্লীতে গ্রীক নাটক সম্পর্কে কিছু কাজ করছি। সে সময় দূর পার্বত্য অঞ্চল থেকে একদল মেয়ে এসেছিল আমার কাছে। পা অবধি তাদের ঘাগরা পরা, গায়ে ওড়না। কি তাদের চলার ভঙ্গী! অমনটি আর দেখিনি।

ভারতীয় শাড়ী ঃ—একবার ওল্ড ভিক থিয়েটারে একটি ভারতীয় নাটকে পরবার জন্য আমার স্বামী আমার জন্য একটা নীল শাড়ী কিনে এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার সেটি পরা হয়নি। যে মেয়েটি রাজকন্যা হয়েছিল তাকেই পরানো হয়েছিল। কিন্তু সে নীল আমি আর কোথাও দেখিনি। ভূমধ্য সাগরের নীলিমাকে আরও অতল আরও গভীর করলে তবে সে নীলিমা পাওয়া যায়। শাড়ীর কি তুলনা হয়? আর তাছাড়া তোমাদের এ রকম বছরে বছরে হাস্যকর উদ্ভট ফ্যাশন চালু হয় না। সেও মস্ত সুবিধা। আমরা এবার সমস্বরে হেসে উঠলাম। তোমাদের গান বাজনাও আমার খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয় তোমাদের কতকগুলো বাদ্যযন্ত্রের সাথে চৈনিক যন্ত্রের মিল আছে। তবে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী স্বর ব্যবহার কর। দুটো স্বরের মধ্যে অত সূক্ষ্ম ব্যবধান আমাদের সঙ্গীতে নেই।

"আপনি তো ভারতীয় চরিত্রেও রূপদান করেছেন,—না?"

হ্যাঁ। আমি সাবিত্রী ও শকুন্তলার পার্ট করেছি। গত বছর রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে আমি, আমার নাতনী এবং ওল্ড ভিক থিয়েটারের আরও অনেকে "বিসর্জন" নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। তোমরা বুঝি তখন ছিলে না?

সে সৌভাগ্য হয়নি জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে দেখে কিন্তু মনেই হয় না যে, আপনার বয়স প্রায় আশী হতে চললো। তার কারণ বয়স আমার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই আশীর কাছাকাছি এসেও আমি নিজেকে বৃদ্ধ মনে করি না।

সময় হয়ে এসেছিল। এবার আমরা উঠবো। এ কথোপকথনে প্রশ্ন বেশী ছিল না। সিবিল নিজেই আত্মমগ্নভাবে বলে চলেছিলেন সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে।

লিফট পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বয়সেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও সজীব মন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সিবিল থর্ণডাইক থামেননি। এখনও তিনি নতুন পথের সন্ধান করছেন। ঘরোয়া জীবনে তিনি বিলাসী নন। অহংকারী নন। আবার এই অসাধারণ দম্পতীর ঘরের বাইরেও কাজের অবসর নেই। সৃষ্টি যদি যৌবন হয় তাহলে আজও এঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন। এই অক্লান্ত শিল্পীকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম।

ভবঘুরের খাতা
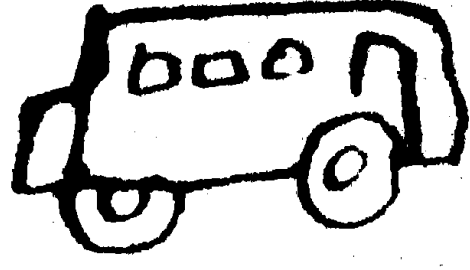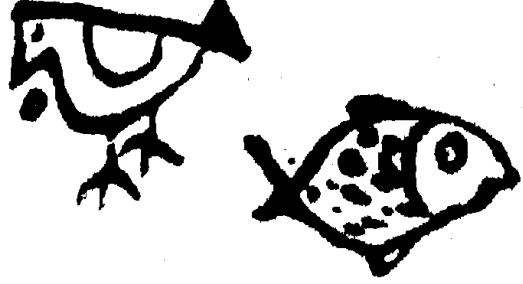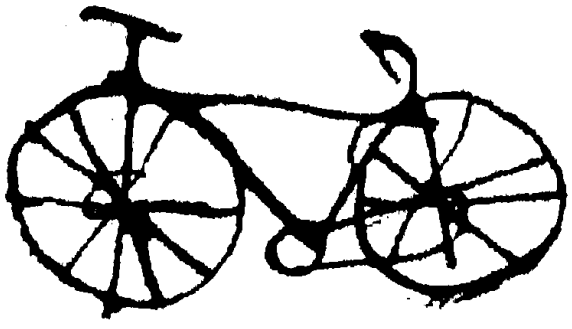
অয়স্কান্ত

কলকাতা : অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ

কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দুঃসহ জীবনযাত্রার কোনো ছবিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ ছবিটি যে কী ভয়াবহ সে-বিষয়ে সকলের অবহিত হওয়া দরকার। সম্প্রতি কলকাতার ইনফর্মেশন সেণ্টারে কলকাতা মেট্রো-পালিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন (সংক্ষেপে সি-এম-পি-ও) কর্তৃক একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। প্রদর্শনীটি খুবই শিক্ষাপ্রদ ও সময়োচিত। তবে শহরের জরুরি অবস্থার দরুন এই প্রদর্শনীটি কতজন দেখে উঠতে পেরেছেন আমি জানি না। আমি এ-সপ্তাহে এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন চার্ট ও ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত কয়েকটি তথ্য পর-পর সাজিয়ে কলকাতার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে চাই।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণকের আমলে ছোট ছোট তিনটি গ্রাম নিয়ে যে স্বল্পায়তন শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছিল তারই নাম কলকাতা। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কলকাতা ছোট্ট এতটুকু একটা রঙের ছোপ মাত্র। আয়তন মাত্র ০·৯৪ বর্গমাইল। তারপরে বছরে বছরে কলকাতা কি-ভাবে আয়তনে বেড়েছে তা নিচের হিসেবের দিকে তাকালে বোঝা যাবে।

কলকাতার আয়তন

সাল		আয়তন	
১৭৫০	সালে	০·৯৪	বর্গমাইল
১৮০০	"	১·৯৫	"
১৮৫০	"	৭·৬৯	"
১৯০০	"	১৯·৫০	"
১৯৩১	"	৩৫·০২	"
১৯৬১	"	৩৮·২৩	"

এই হিসেব খাস কলকাতার, অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকার। এই খাস কলকাতার জনসংখ্যা বর্তমানে ২৯ লক্ষ। আর সন্নিহিত এলাকা নিয়ে যাকে বলা হয় বৃহত্তর কলকাতা তার আয়তন বর্তমানে ১৭০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ৬৫ লক্ষ। গত দশ বছরে কলকাতার জনসংখ্যা শতকরা ৮·৪৮ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, ১৯৮৬ সালে কলকাতার জনসংখ্যা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। এই বিপুল জনসংখ্যার চাপে কলকাতা একটা বেলুনের মতো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে কিনা, তা নিতান্তই অনুমানের ব্যাপার। তবে কলকাতার বর্তমান জনসংখ্যার চাপেই এক ঐতিহাসিক শহরের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে সে-সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্যে একটা উদ্ধৃতির সাহায্য নিচ্ছি।

"গত কুড়ি বছর ধরে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত এই শহরের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে শহরের এই বিরাট আয়তনও আজ অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমতঃ যুদ্ধকালীন শিল্পগুলি কলকাতার বুকে ও আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সর্বভারতীয় শ্রমিক ও কর্মীদলে শহর ছেয়ে গেল। এরপরে এল '৪২ সালে মন্বন্তরে গ্রামাঞ্চল থেকে পালিয়ে-আসা স্বল্পকালীন বাসিন্দার দল আর সবচাইতে শেষ এল পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার বলি হতভাগ্য সর্বহারা ঘরছাড়াদের দল। কলকাতা ও আশেপাশে বর্তমানে পনেরো লক্ষ উদ্বাস্তুর বাস।"

শুনলে অবাক হতে হবে যে কলকাতায় প্রতি বর্গমাইলে মানুষ বাস করে ৭৩,১৮২ জন। বস্তি অঞ্চলে অবশ্যই আরো বেশি—প্রতি একরে ২৫৮·৫ জন। খাস কলকাতার ২৯ লক্ষ মানুষের মধ্যে বস্তিতে বাস করে ৭ লক্ষ, পরিবারের হিসেবে ১,৮৯,০০০টি। অর্থাৎ কলকাতার প্রতি চারজনের মধ্যে একজন বস্তিবাসী। শহরাঞ্চলের ছ-ভাগের একভাগই বস্তির কবলে।

কলকাতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যদি কোনো ধারণা করতে হয় তাহলে এই বস্তিগুলোর দিকেই আরো ভালো করে তাকাতে হবে।

প্রথমে দেখা যাক, বস্তিবাসীদের পরিবার-পিছু আয় কত। গড় মাসিক আয় পরিবার-পিছু ১০৭ টাকা, বা মাথা-পিছু ৩০ টাকা। শতকরা ৫০টি পরিবারের মাসিক আয় ৫১ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। শতকরা ১৭টি পরিবারের মাসিক আয় ৫০ টাকারও কম। ঘরভাড়া পরিবার-পিছু মাসে ১১ টাকা।

আশা করি, এই সংখ্যাগুলো বলার পরে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না যে কলকাতার প্রতি চারজন মানুষের একজন বাস করে স্থায়ী অনাহারের অবস্থায়।

আর এই অনাহারী মানুষগুলো কোন্ পরিবেশে বাস করে? এবারেও সোজাসুজি অঙ্কের হিসেবে আসা যাক।

বস্তিবাসী প্রায় দু-লক্ষ পরিবারের মধ্যে নিজস্ব জলের কল আছে শতকরা মাত্র একটি পরিবারের। শতকরা ৬১টি পরিবার জলের কল অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। বাকি শতকরা ৩৮টি পরিবারের ভরসা রাস্তার কল। নিজস্ব পায়খানা আছে শতকরা মাত্র দুটি পরি-

বারের। শতকরা ৮১টি পরিবার অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। শতকরা ১৭টি পরিবারের কোনো পায়খানাই নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে শতকরা ২২টি পরিবারে।

এই হচ্ছে খাস কলকাতা শহরের বস্তি-জীবন।

আর কলকাতার বস্তি-জীবনের সমস্যাই কম-বেশি পরিমাণে কলকাতার নাগরিক জীবনের সমস্যাও। নিজেদের জীবনযাত্রার দিকে তাকালেই বিষয়টিকে উপলব্ধি করা যাবে।

গোটা শহরটি যে প্রায় একটা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ কলকাতার পরিবহন-ব্যবস্থা। আমরা কলকাতার ট্রাম-বাস নিয়ে যতই গর্ব করি না কেন, কলকাতার পরিবহন-ব্যবস্থা যে-কোনো সভ্যদেশের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। দুর্ঘটনার খতিয়ানই এর সবচাইতে বড়ো প্রমাণ। গত বছরে শহরে দুর্ঘটনার সংখ্যা ২৭৫। তার মধ্যে ১৮৯টি ক্ষেত্রে বলি হয়েছে পথচারী। তার ওপরে আছে ট্রাফিক-জ্যাম, প্রয়োজন অনুপাতে কম সংখ্যক ট্রাম-বাস, উপযুক্ত রাস্তার অভাব, ইত্যাদি। অবস্থাটা যে কী অসহনীয় হয়ে উঠেছে তা বোঝাবার জন্যে কয়েকটি হিসেব দিচ্ছি। অপিসের সময়ের কলকাতায় যানবাহন যে গতিতে অগ্রসর হয় তা প্রায় শামুকের মতো। ধর্মতলা স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, লোয়ার চিৎপুর রোড ইত্যাদি ধরনের কয়েকটি রাস্তায় যানবাহনের গতি ঘণ্টায় সাড়ে-সাত মাইলেরও কম। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও আরো কয়েকটি রাস্তায় ঘণ্টায় সাড়ে-সাত থেকে দশ মাইলের মধ্যে। ওয়েলেসলি স্ট্রীট ও আরো কয়েকটি রাস্তার ঘণ্টায় দশ থেকে সাড়ে-বারো মাইলের মধ্যে। পার্ক স্ট্রীট ও আরো কয়েকটি রাস্তায় ঘণ্টায় সাড়ে-বারো থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে। আর পনেরো মাইলেরও বেশি স্পীড হতে পারে এমন রাস্তা কলকাতায় খুবই কম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রেড রোড। তবে রেড রোডের মতো রাস্তা কলকাতায় এতই কম যে সেগুলোকে হিসেবের বাইরে রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, যদিও আমরা বাস করছি এক শিল্পোন্নত শহরে, যদিও আমরা আমদানি করেছি আধুনিকতম যানবাহন, কিন্তু গতির বিচারে এখনো আমরা পড়ে আছি সাইকেলের যুগে। তবে আমাদের সান্ত্বনার কথা এই যে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বলেছেন যে ভারতের মানুষ আমরা নাকি সবে সাইকেলের যুগে প্রবেশ করেছি।

সব মিলিয়ে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে সুস্থ নাগরিক জীবনযাপনের কোনো ব্যবস্থাই আজকের দিনের কলকাতায় নেই। অভাব শুধু যে বাসগৃহের ও যানবাহনের তাই নয়, অভাব গ্যাসের ও বিদ্যুতের, পরিশ্রুত পানীয় জলের, রাস্তাঘাটের আবর্জনা পরিষ্কারের যথোচিত ব্যবস্থার। কলকাতায় স্বাস্থ্য নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই।

কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সমস্যাও প্রায় একই ধরনের। আর সকল সমস্যার মূলে সেই একই কথা—জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি। একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছি।

"অন্যান্য দেশে শিল্পের প্রসার দেশের সমৃদ্ধির সূচনা করেছে, দেশবাসীর জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধতর ও সুন্দরতর করেছে—আর আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার হুগলী নদীর দুই তীরে অগণিত মেহনতী মানুষকে অসহনীয়, অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে দিনযাপনে বাধ্য করেছে। এই বিরাট জনসমুদ্র যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে—সামান্য আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মিউনিসিপ্যাল সংস্থাগুলির পক্ষে তার সমাধান সাধ্যাতীত।"

সন্নিহিত অঞ্চলের জনসংখ্যা কি-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটা হিসেব দেওয়া যাক।

	জনসংখ্যা ১৯৩১	জনসংখ্যা ১৯৬১
ব্যারাকপুর	৩৪৩২	৫০৫৯
টিটাগড়	৫৯১৪	১০৮৭৫
খড়দহ	১৫০১	৩৮৬১
বরানগর	৮৭৫১	২০০৫৯

এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্যে উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। ফলে অনিবার্যভাবেই বস্তির উৎপত্তি হয়েছে। আর এক-একটি বস্তি প্রায় এক-একটি নরক। পানীয় জল নেই, আবর্জনা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত নেই, বিদ্যুৎ নেই। আর এই নরকের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে ও বড়ো হচ্ছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা।

কলকাতার জীবনযাত্রাকে যদি উন্নত করে তুলতে হয় তাহলে সবচেয়ে প্রথমে হাত দিতে হবে এই বস্তির ওপরে। ধাপে ধাপে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে যাতে বস্তি অপসারিত হয় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সমন্বিত বাসস্থান গড়ে উঠতে পারে। কলকাতা যদি বাঁচে তাহলেই আশেপাশের আরো বত্রিশটি মিউনিসিপ্যালিটি বাঁচতে পারে। সি-এম-পি-ও গঠিত হয়েছে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

"বৃহত্তর কলকাতার ব্যাপক পুনর্গঠন ও এখানকার অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিকল্পনা রচনার ভার সি-এম-পি-ও'র ওপর ন্যস্ত। এই সংস্থার কর্মীদল ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একদল বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কলকাতা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্রমবর্ধমান শহরাঞ্চলের চারিশত বর্গমাইল পরিমিত ভূমিতে আগামী ১৯৮৬ সালের বসবাসকারী আনুমানিক জনসংখ্যার সুস্থ নাগরিক জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির একটি 'সর্বাত্মক পরিকল্পনা' রচনায় লিপ্ত আছেন। এই সর্বাত্মক পরিকল্পনাটি বৃহত্তর কলকাতার নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।"

এই উদ্ধৃতিটি সি-এম-পি-ও'র একটি পুস্তিকা থেকে। লক্ষ্য খুবই মহৎ কিন্তু কতখানি বাস্তবে রূপায়িত হবে তা অপেক্ষা করে দেখবার বিষয়। যে প্রদর্শনীটির কথা উল্লেখ করেছি সেখানে অনেকগুলি চার্ট ও মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে ভবিষ্যতের কলকাতার রূপ কী হবে। হুগলী নদীর ওপর দিয়ে আরেকটি পুল তৈরি হবে, প্রত্যেকটি পার্ক হয়ে উঠবে অতি মনোরম উদ্যান, মাথা-পিছু ত্রিশ গ্যালন জল সরবরাহ হবে, বস্তি অপসারিত হয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলবে আলো-হাওয়ায় উদ্ভাসিত অতি সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাটবাড়ি। এতখানি হওয়া সম্ভব কিনা তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুটাও যদি হয় তাহলেও তা হবে একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

॥ তেত্রিশ ॥

তৃপ্তি ফিরে এসেছে। বাবা ভালো-মন্দ একটা কথা বলেননি, অসুস্থ মা একবার মেয়ের মাথায় হাত রেখেছেন, মেয়ে কেঁদে ভেঙে পড়েছে মায়ের পায়ের ওপর। অভয়ই হয়তো আগের থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে, তৃপ্তিকে ক্ষমা করেছে সবাই।

পাড়ায় একটুখানি চঞ্চলতা জেগে-ছিল। কিন্তু অমলের চেহারাই আলাদা এখন। বোঝা-পড়ার ব্যাপারটা মাঝ পথেই চাপা পড়েছে—কাউকে সোজাসুজি ধরতে না পেরে আর দিন কতক অমলকে হয়রাণ করে পুলিশ প্রায় হাত গুটিয়েছে মনে হয়। আর অমলের হঠাৎ মনে হয়েছে, পাড়ার চাঁই হিসেবে এই বিপন্ন পরি-বারটির ভালো-মন্দ দেখা তার একটা নৈতিক কর্তব্য।

বন্ধুদের বলেছে, মাইরি ভাই, ভারী একটা ফ্যাকামো হয়ে গেছে। বাইরের লোক—ভাড়া নিয়ে আছে, ভারী দুঃখে-কষ্টে দিন কাটায়। কোনো ডিসটার্ব করবিনি—বুঝলি? সাধ্য মতো বরং হেল্প করতে হবে, এই হল আমাদের ডিউটি।

এখন সেই ডিউটিই করে চলেছে। তৃপ্তি সম্পর্কে একটা কথা উঠতে দেয়নি পাড়ায়। সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে—কোনো আলোচনা কেউ যেন না করে।

তা ছাড়া—

তা ছাড়া এখন ফাজলামির সময় নয়। যুদ্ধ এসে গেছে। দেশের দায়িত্ব। অনেক কাজ আমাদের।

ডিসেন্সের টাকা তুলতে হবে। সভা-সমিতি। রক্ত দিতে হবে। ডাক পড়লে যুদ্ধে যাব। কেন—ইলেক্‌শনে আমরা লড়িনি? আরো বড়ো ডাক এসেছে—এখন আর ইয়ার্কি চলবে না।

তৃপ্তির প্রসঙ্গ চাপা পড়েছে। রকে, পথে ঘাটে এখন অন্য আলোচনা। অন্য উত্তেজনা।

বাইরের কালো ঝড় এসে ঘরের সমস্যাকে যেন মুছে নিয়ে গেছে। তৃপ্তিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন কারো নেই। এমন কি, সর্ব ঘটে যিনি কাঁঠালী কলা হয়ে বিরাজ করেন, সেই বাঁড়ুজ্জে-মশায়েরও নয়। ডাক্তারের চেম্বারে এত দিনে নতুন কম্পাউন্ডার এসেছে আবার। বুড়ো মানুষ, সতর্ক সংসারী লোক—কাজ-কর্মে চটপটে, প্রচুর কথা বলতে পারে। গোবেচারা করুণাময়ের সঙ্গে তার কোথাও কোনো মিল নেই। বাঁড়ুজ্জে নিয়মিত সেখানে যান—খবরের কাগজ নিয়ে যুদ্ধের আলোচনা তোলেন, দুজনে মিলে অসংখ্য সমস্যার চমৎকার সমাধান করে দেন। যে বেঞ্চিতে বসে বাঁড়ুজ্জে তর্ক করেন, দেড় মাস আগে সেটা যে করুণাময় কম্পাউন্ডারের রক্তে মাথামাখি হয়ে গিয়ে-ছিল, সে কথা তাঁর মনেও পড়ে না।

আর গৌরাঙ্গবাবু তাঁর চৌকিটিতে চুপ করে বসে থাকেন। সামনের বাড়ীটার মাথার ওপর দিয়ে সেই অপরিচ্ছন্ন আকাশ—যেখানে রেলওয়ে সাইডিঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হাওয়ায় গলির স্তূপাকার ময়লার গন্ধ ভাসে।

আবার যুদ্ধ।

সেই দিনগুলোকে মনে পড়ে। সেই অন্ধকার আর বিভীষিকা ভরা কতগুলো দিন। তারপর পার্টিশন। আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছেন যেন। কিন্তু এখন আর কিছু ভাবতে পারেন না। একটার পর একটা আঘাত—এই অসুখের ছেদহীন যন্ত্রণার শৃঙ্খল—আজ আর কোনো কথা নিয়ে থাকতে পারেন না বেশিক্ষণ। একটু পরেই মনে হয় মাথার শিরাগুলো তাঁর টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

যা হওয়ার হোক। যা ঘটার ঘটুক। গৌরাঙ্গবাবু ফুরিয়ে গেছেন। কিছু করবার নেই তাঁর—কোনো কথা ভাববার নেই।

অভয় খুব ব্যস্ত। কারখানার কর্মীদের মধ্যে যুদ্ধের জন্য চাঁদা তুলছে—সভা-সমিতি করছে। কারখানায় আরো বেশি কাজ তার—প্রোডাক্‌শন বাড়াতে হবে। দেশের এখন মহা-সঙ্কট।

মা-র অসুখ দেখে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল চন্দন সিংয়ের কাছে। সবই স্বীকার করেছে চন্দন সিং। তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—তৃপ্তিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। চাচাই সব গোল-মাল করে দিয়েছে। চন্দননগরের ওধারে কোথায় মাঠের মধ্যে সে নামিয়ে দিয়েছে অমিয় আর তৃপ্তিকে। তার পরের খবর চাচা জানে না—চন্দন সিংয়ের তো কোনো কথাই নেই।

তারপর পুলিশের কাছ থেকে খবর এল। হাওড়া স্টেশন থেকে তৃপ্তিকে নিয়ে এল সে। অমিয়র চিঠি এসে গেছে। মা অনেকটা ভালো—উঠে বসেন, দু-পা চলা-ফেরা করেন। এখন সংসারের ভার আবার তৃপ্তির উপর। আগেকার মতো সে মুখ বুজে নেপথ্যে মিলিয়ে গেছে। কোনোদিন বেশি কথা বলত না—এখন একেবারে চুপ হয়ে গেছে।

যুদ্ধ। বাইরের জগৎ মাতিয়ে দিয়েছে অভয়কে। ঘরের কথা সে আর ভাববার সময় পায় না। অমিয় কাশীতে চাকরি করে। দিদি নবদ্বীপ থেকে লিখেছে—ভালো আছি, ভেবো না।

এতদিন ধরে যা কিছু বেসুরো ঘটে গিয়েছিল, গৌরাঙ্গবাবুর সংসারে যে

ঝড়ের পালা এসেছিল—সমস্ত থিতিয়ে গেছে যেন। আগের সব-কিছু দুঃখ-সুখের একটা বাঁধা ছকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। দীপ্তি চলে যাওয়ার পর অভাব বেড়ে গেছে—অভয়ের ওভার-টাইমেও সপ্তাহে দু'দিনের বেশি বাজার হয় না—চালের মুঠিতে টান পড়ে মাসের মাঝামাঝি থেকে। মা-র অসুখের জন্যে কিছু ধারও হয়ে গেছে অভয়ের। কিন্তু অভাবের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের আর এসব গায়ে লাগে না।

শুধু প্রভাত সরকার গুম হয়ে বসে থাকে। কাঞ্জিলালসাহেবের চাবুকের ঘা শরীরে কোথাও নেই—কিন্তু মনের মধ্যে তার জ্বালাটা জ্বলতে থাকে সারাক্ষণ। রিনি কাঞ্জিলালের হাতে বাঁদর-নাচ নাচবার সময় তারও ঘোর লেগেছিল—তারও নেশা ধরেছিল বইকি। কিন্তু যে চাবুকটা দিয়ে কাঞ্জিলাল কুকুর মারেন—তারই কয়েকটা আঘাত এসে তাব মাথা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। দীপ্তিকে দয়া করতে গিয়েছিল—সে দান দীপ্তি ছুঁড়ে দিয়েছে তার মাথার ওপর।

রাণী ভার নামিয়ে দিয়েছে মন থেকে। প্রভাতের ছুটি। কাঞ্জিলাল-সাহেবই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছেন তাকে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। তার কাছে এখন সব সমান।

বাঁকুড়ায় মুরারিবাবুকে চিঠি দিয়েছিল, আজকে জবাব এসেছে তার।

"তুমি চলে এসো। চাকরি ঠিক হয়ে আছে—ভাবতে হবে না।"

না—ভাববার আর কিছু নেই।

বারান্দায় বসে গৌরাঙ্গবাবু ঝিমুচ্ছেন। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। এমন সময় পিয়ন ডাকল:

মণি অর্ডার।

মণি অর্ডার? চমকে জেগে উঠলেন।

—আমার

—হাঁ বাবু, আপনার নামেই। কুড়ি টাকার।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর নামে কোনোদিন মণি-অর্ডার আসতে পারে এ-কথা ভুলে গেছেন তিনি। কে তাঁকে পাঠাতে পারে—কার কাছে টাকা পাবেন তিনি?

কাঁপা হাতে ফর্মটা নিলেন। টাকা পাঠিয়েছে অমিয়।

"বাবা, আমাকে মাপ করবেন। আমি—"

আর পড়তে পারলেন না—চোখ দিয়ে জল এল। অমিয়ের একটা চিঠি এসেছিল বটে অভয়ের নামে, তৃপ্তিও বলছিল যেন ছোড়দা চাকরি করছে। কিন্তু গৌরাঙ্গবাবু বিশ্বাস করেননি। সেই দায়িত্বহীন অমিয়, ফুটবল খেলে আর ইয়ার্কি দিয়ে যার দিন কাটে—সে করবে চাকরি! ওরা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছে তাঁকে।

কিন্তু সত্যিই তো টাকা পাঠিয়েছে অমিয়—ক্ষমা চেয়েছে তাঁর কাছে। অভিভূত হয়ে ফর্মটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা লাইন পড়তে পারছেন না—কোনো কিছুর অর্থ বুঝতে পারছেন না তিনি।

পিয়ন একটা কলম এগিয়ে দিলে। বললে, সই করে দিন বাবু—আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে আবার।

বাতের জন্যে যে আঙুলগুলো টন-টন করছিল, আজ কি সেখানে যন্ত্রণার কোনো অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন না? কাঁপা হাতে দুটো সই করলেন।

পিয়ন টাকা দিয়ে চলে গেল, বুকের ভেতর কুপন আর নোট-দুটো নিয়ে গৌরাঙ্গবাবু বসে রইলেন।

হৃৎপিণ্ড এতদিন পাথরের মতো জমাট বেঁধে ছিল, আবার যেন চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে আবার বাঁচবেন, আবার মাথা তুলবেন। তাঁর দুই ছেলে দু হাতে শক্তি এনে দিয়েছে নতুন করে। দীপ্তি গেছে যাক—তৃপ্তি ফিরে এসেছে। কিছুই ফুরিয়ে যায় না—মেঘ কাটে, আলো দেখা দেয়—সব নতুনভাবে শুরু করা চলে।

কুড়ি টাকা পাঠিয়েছে অমিয়। কিন্তু এই কুড়ি টাকা কুড়ি লক্ষের চাইতেও বেশি।

সামনে দিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলেছিলেন বাঁড়ুজ্জেমশাই। গৌরাঙ্গবাবু তাঁকে ডাকলেন। নিজে থেকে ডাকলেন এই প্রথম।

—কোথায় চলেছেন, ও মশাই, কোথায় চললেন?

অবাক হয়ে বাঁড়ুজ্জে থেমে দাঁড়ালেন। গৌরাঙ্গবাবুর এমন গলা কোনোদিন শোনেননি তিনি।

—কেমন আছেন আজ?

—খুব ভালো—খুব ভালো!—একটা অদ্ভুত আলোয় গৌরাঙ্গবাবুর চোখ

হাঁ বাবু, আপনার নামেই কুড়ি টাকার

জ্বলতে লাগল ঃ এবার আমি ভালো হয়ে যাব—বুঝলেন।

অসীম কৌতূহলে এগিয়ে এলেন বাঁড়ুজ্জে।

—কী ব্যাপার বলুন তো? কোন দৈব ওষুধ পেয়েছেন নাকি?

—দৈব ওষুধ না। তার চাইতেও ঢের বেশি। অমিয় আজ টাকা পাঠিয়েছে আমাকে।

—তাই নাকি?

বাঁড়ুজ্জে এসে রোয়াকের পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। গৌরাঙ্গবাবুর উৎসাহ তাঁরও মধ্যে এসে সংক্রমিত হয়েছে এতক্ষণে।

—কোথা থেকে টাকা পাঠিয়েছে? কেমন আছে সে?

—আসুন, আসুন—বলছি।

ঠিক সেই সময় প্রভাত এসে

কাকিমার ঘরের সামনে দাঁড়ালো। ডাকল ঃ কাকিমা!

কাকিমা বিছানায় বসে ছিলেন। সাড়া দিলেন ঃ এসো বাবা।

প্রভাত ঢুকল। রাস্তার দিকের জানলা বন্ধ—দিনে-দুপুরেও আবছা অন্ধকার। বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলে প্রথমে যেন কিছু চোখে পড়তে চায় না। চৌকাঠ পেরিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল প্রভাত—তারপর দৃষ্টিটা সহজ হয়ে এল তার।

তৃপ্তি বসে ছিল মা-র পাশেই, প্রভাতকে দেখে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। কাশী থেকে ফেরবার পর এই সাত-আট দিনের মধ্যে একটা কথাও বলেনি প্রভাতকে, একবারও চোখ তুলে তাকায়নি তার দিকে।

কাকিমা বললেন, যাচ্ছিস কোথায় তিপু? বোস।

তৃপ্তি বসে পড়ল। ঠোঁট দুটো কী একটা বলতে গিয়ে একবার কেঁপে উঠেই থেমে গেল। এই বাড়ীতে শুধু প্রভাতদা সামনে এলেই সমস্ত লজ্জা যেন পাহাড়ের মতো নেমে আসে তার ওপর—মাটিতে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় তৃপ্তির।

কাকিমা বললেন ঃ কী বাবা?

প্রভাত দ্বিধা করল একবার। তারপর বললে, আমি চলে যাচ্ছি কাকিমা।

কাকিমা চমকে উঠলেন। তৃপ্তি চোখ তুলেই নামিয়ে ফেলল।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বাঁকুড়ায়।—প্রভাত শুকনোভাবে হাসতে চেষ্টা করল ঃ জানেন তো, এখানকার চাকরি আমার চলে গেছে। এ-ভাবে বেকার বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে কাকিমা বললেন, চাকরি পেয়েছ ওখানে?

—একটা জুটে যাবে মনে হয়। ড্রাইভারের কাজের অভাব হয় না।

—কবে যাবে?

—কাল।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কাকিমা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, একটা কথা রাখবে আমার?

—বলুন।

—আমার এই ছোট মেয়েটাকে—এই বোকা তিপুকে—কাকিমার গলা ধরে এল একবার ঃ তুমি ভুল বোঝোনি তো বাবা? ছেলেমানুষ, ভয় পেয়ে একটা পাগলামো করে ফেলেছে বলে তুমি কি ওর ওপর রাগ করে থাকবে?

কথার ধরনে একটু আশ্চর্য হল প্রভাত। একটু নতুন রকমের ঠেকল কানে।

—আমি রাগ করব কেন কাকিমা? আর তাতে কী আসে যায়?

—আসে যায় বাবা।—কাকিমা একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রভাতের ডান হাতখানা চেপে ধরলেন ঃ তুমি যদি যাওয়ার আগে কথা দাও আমার মেয়েটাকে তুমি নেবে—তা হলে আমার সব ভাবনা মিটে যায়।

—আমি!

বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রভাত কাকিমার শুকনো ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঘরের আবছায়ায় কী বিষণ্ণ, কী করুণ! মাথায় আঁচলটা তোলা রয়েছে—তার ধারে ধারে কালো সুতোর সেলাই পর্যন্ত দেখা যায়। প্রভাতের মনে হল, এই বাড়ীটার যত ব্যথা—যা কিছু দুঃখ, কাকিমার মাথার সেলাই করা আঁচল থেকে তাঁর রোগা আঙুলগুলো পর্যন্ত একসঙ্গে তাদের সমস্তটাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

তৃপ্তির মাথাটা আরও নীচে ঝুঁকে পড়ল, যেন এই ঘরের মেজেটা তাকে একটু একটু করে টেনে নিচ্ছে। আর পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রভাত, কী ভাববে—কী যে বলবে খুঁজে পেলো না।

—মেয়েটাকে নেবে না বাবা?—কাকিমার গলায় যেন কান্নার ঢেউ দুলে উঠল।

—আমি গরিব, কাকিমা। আমার চাল-চুলো নেই।

—গরিব আমরাও—সে তো তুমি সবচেয়ে ভালো করে জানো। আর চাল-চুলো? সংসার করলেই তা আসবে।

—কিন্তু অভয়, কাকাবাবু—

—অভয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তার আপত্তি নেই। শুধু বলেছিল, 'আগে বললেই পারতে—এত জলঘোলা করবার দরকার ছিল না।' তোমার কাকাবাবু তোমাকে ভালোবাসেন—তিনি খুশি হবেন।

কিন্তু প্রভাত খুশি হতে পারল না সম্পূর্ণ—কোথায় একটা ভয় আর সংশয় তার মনটাকে চেপে ধরতে লাগল বার বার। শুকনো মুখে চুপ করে রইল সে।

—কথা দেবে না বাবা?

দীপ্তির কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেবার প্রহসনটা মনে পড়ল একবার। মনে পড়ল কাঞ্জিলালের চাবুক। আবার কি নতুন করে বাঁদর-নাচের মহড়া চলেছে তার? এর থেকে জীবনে কি সে নিস্তার পাবে না কোনোদিন?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কাকিমা।

—না বোঝবার তো কিছু নেই প্রভাত। তবে তোমার মনে যদি খটকা থাকে—কাকিমার গলায় আবার কান্না দুলে উঠল ঃ তুমিও যদি ভাবো যে—

—আমি কিছুই ভাবিনি কাকিমা। কিন্তু—কিন্তু—তিপু কি সুখী হবে?

—সুখী হবে বইকি।—কাকিমার বাঁ হাতখানা এবার তৃপ্তির মাথায় এসে পড়ল ঃ ও আমার খুব ভালো মেয়ে। নিজে সুখী হবে—তোমায় সুখী করবে এ আমি বলে দিচ্ছি। বলো, কথা দিলে?

সংশয় গেল না। মেঘলা মুখে প্রভাত বললে, দিলুম কাকিমা।

শুধু তৃপ্তি প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। একটা কী যেন তার বুকের ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে—কোনোমতেই সেটাকে সে সামলে রাখতে পারছে না।

রাত অনেক। সমস্ত বাড়ী ঘুমিয়ে পড়েছে। তৃপ্তি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছোট উঠোনটিতে জ্যোৎস্না। চতুর্দশীর আলো দিনের মতো জ্বলছে চারদিকে। এত আলো—অথচ একটি মানুষের সাড়া নেই কোথাও। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না আজকে।

বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়ালো তৃপ্তি। একবার মনে হল, আজ সেদিনের মতো আবার পালিয়ে যেতে পারে সে। কেউ জেগে নেই, কেউ তাকে বাধা দেবে না। পথ একবার যে চিনতে শিখেছে—পথকে আর তার ভয় নেই।

কত বড়ো এই জীবন। ট্রেনে যেতে যেতে কত বিশাল একটা আকাশ আর কী অসীম পৃথিবীকে দেখেছিল সে! তবু সব ফুরিয়ে গেল। সে নিজে বড়ো হয়ে—একটা বিরাট জীবনের ভেতরে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউ তাকে দাঁড়াতে দিল না। আবার সেই অন্ধকূপেই টেনে আনল। করুণাময় গেল তো প্রভাতদা এসে পথ আটকে দাঁড়ালো।

নন্দলাল তাকে নিয়ে চলেছিল। কোথায় নিয়ে চলেছিল? মৃত্যু না মুক্তিতে? পুলিশ বলে, নন্দলাল শয়তান। হয়তো তাই। কিন্তু—

কিন্তু সংশয় যায় না। কানের কাছে এখনো বেজে উঠছে ঃ বাঙ্গালোর-বোম্বাই-দিল্লী-এলাহাবাদ। পাহাড়-সমুদ্র-চন্দন বনের ডাক। হয়তো নন্দলালই তাকে সত্যিকারের মুক্তির খবর দিয়েছিল।

এই সময়। এখনো পালানো যায়। দিনের মতো জ্যোৎস্না—অথচ একটি মানুষ কোথাও জেগে নেই। কেউ বাধা দেবে না তৃপ্তিকে—সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে।

একবার যেন ঘুমের ঘোরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো, তারপরেই বসে পড়ল। দাওয়ার ওপর। উপায় নেই—পালানোর পথ নেই। মা-র শুকনো মুখ। বাবা। বড়দা—

খাঁচার দরজা খোলা পেলেই কি পাখি পালাতে পারে? পায়ের শিকল না-ই থাক, যেটা মনের—তার কাছ থেকে কি নিষ্কৃতি আছে কোনোদিন?

এক ঝলক বাতাস এসে গায়ে পড়ল তার—বাইরের প্রকাণ্ড পৃথিবীটার একটা কাতর মিনতির মতো, একটা আর্ত দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো। আর নিজের বুকে—প্রতিটি শিরা-স্নায়ুতে সেই অসহ্য শৃঙ্খলের যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে—তৃপ্তি দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে চলল একটানা॥

—শেষ—

আটপাঁচ

।। চোরাকারবারীদের দুর্দিন ।।

পশ্চিম জার্মানীতে চোরাকারবারীরা মহা ফাঁপড়ে পড়েছে। তাদের আগেকার ফান্দিফিকির আর চলছে না। জুতোর গোড়ালির মধ্যে হীরে, টুপির মধ্যে সিগারেট কিম্বা দুমরা স্যুটকেশ, টাইপরাইটার অথবা দুধের টিনে মাল-পত্তর পাচার করা আজকাল অচল হয়ে গেছে। তবে তারাও বসে নেই, নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করছে। এখন মালপত্তর পাচার না কোরে ব্যবসার জাল দলিল, শুল্ক সম্পর্কীয় কাগজপত্র আমদানির নথী, জিনিষপত্রের ঝুটো ওজন ও হিসেব নিয়ে তারা কারবার করছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে বে-আইনী ব্যবসা চালাচ্ছে, য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারের দেশগুলির আইন-কানুন এড়াচ্ছে, বিনিময় বাণিজ্যে লুকোচুরি খেলছে। এ-দেশের শুল্ক বিভাগও কম যায় না; তারাও যাকে বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

কোলোনের শুল্কবিভাগের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান এইসব চোরাকারকারীদের সর্বাপেক্ষা চতুর জালিয়াতি ও ধূর্ত কৌশল ধরার জন্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতি ও যান্ত্রিক সাজসরঞ্জামকে কাজে লাগিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক, ইঞ্জিনীয়ার ও সাংকেতিক লিখন পারদর্শী গোয়েন্দারা একত্রে কাজ করে। চোরা-কারবারী ও জালিয়াতদের অফুরন্ত ছল-চাতুরী ধরার জন্য এরা এখানে অক্লান্ত-ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যায়।

রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে এরা কাগজের অদৃশ্য ও অস্পষ্ট লেখা ফুটিয়ে তোলে। মূল্যবান ডাচদেশের মধু বলে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে সস্তাদরের আর্জেন্টিনার মধু চালাচ্ছে, কিন্তু এদের অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় দেখা গেল যে ফুল থেকে মৌমাছিরা ঐ মধু সংগ্রহ করেছে, সেই ফুল একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মায়; অতএব ধর ব্যাটাদের। চোরাকারবারীদের ধাবমান গাড়ীতে ট্রেসার অ্যামুনিশন গুলী চালিয়ে কোন খাঁজে কোথায় কি লুকানো আছে, তা পরিষ্কার ধরা যায়।

প্রত্যেকটি সীমান্ত পারাপার বিন্দুর সঙ্গে রেডিও, টেলিফোন ও টেলি-প্রিন্টারের মাধ্যমে কোলোন কেন্দ্রীয় দপ্তরের যোগাযোগ আছে। চোরাকার-বারীদের সর্বাধুনিক ফন্দি, সন্দেহজনক গতিবিধি সম্বন্ধে, সীমান্তের শুল্ক-বিভাগের কর্মচারীদের সবসময়ে খবর পাঠান হয়। য়ুরোপীয় কমন মার্কেটের দেশগুলির সঙ্গে সবসময় সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা আছে। যন্ত্রতন্ত্র খানাতল্লাসী চালাবার জন্যে এই বিভাগের গাড়ীতে এক্সরে সমেত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার সবরকম ব্যবস্থা আছে। আদালতে একবার যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সেইসব চোরাকারবারীদের সম্পূর্ণ পরিচয়পত্র এই দপ্তরে আছে। এইসব ব্যবস্থার ফলে চোরাকারবারীদের ফলাও ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠার বন্দোবস্ত হয়েছে।

।। যোগ্যতার বয়স ।।

মানুষ কোন বয়সে সর্বাধিক যোগ্যতা অর্জন করে দেখবার উদ্দেশ্যে মনো-বিজ্ঞানীরা "আমাদের জীবনের সেরা অংশ" সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলাফল শুনলে আশ্চর্য হবেন যেহেতু চিরাচরিত মতবাদকে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত করে।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে দশ-পনের বছরের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা পঁচিশ থেকে পয়তাল্লিশ বছরের লোকরা সবকিছু তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, চট্‌ করে বুঝতে পারে। তবে এর মধ্যে একটি কথা আছে এবং সেটি হচ্ছে কুড়ি পঁচিশ বয়সের লোক ঐ বয়সে যাকিছু শিখুক, তার জ্ঞানের ওপর সে নির্ভর করতে পারে যেমন লিখতে, পড়তে জানে, অংক বুঝতে পারে, যন্ত্র-পাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, যে বিষয়ে শিখতে চায় সে সম্বন্ধে আগ্রহ আছে। কোন একটা বৃত্তি ও জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে নিজের খুশিমত জিনিষ শেখে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় কিন্তু একথা খাটে না; দিব্যি খেলাধুলোর মধ্যে থেকে হঠাৎ জোরজবরদস্তি করে স্কুলে পাঠালে তাদের সবকিছু বিস্বাদ লাগে, ভড়কে গিয়ে কিছু বুঝতে পারে না এবং বুঝতেও চায় না। অথচ মনোবিজ্ঞানীদের কাছে এটাও একটি আশ্চর্যের বিষয় যে অজ্ঞান শিশুদের যেক্ষেত্রে বছর খানেকের মধ্যেই লেখাপড়া দখলে এসে যায়, অক্ষর-জ্ঞানহীন বয়স্ক লোকদের লেখাপড়া আয়ত্ত করতে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে।

"সর্বোচ্চ সৃজনীশক্তির বয়স" সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফলাফল পেয়েছেন যেমন ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে কবিদের কাব্যশক্তি ফুটে ওঠে, লেখকদের সৃজনীশক্তি শিখরে ওঠে চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে। আবিষ্কারক, চিত্রকর, গীতিকাররা তাঁদের জীবনের তুঙ্গে ওঠেন তিরিশ বছর বয়সে কিন্তু বিজ্ঞানী ও গণিতবেত্তাদের জীবনে চরম সাফল্য আসে তেত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এবং ডাক্তার ও মনো-বিজ্ঞানীরা ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেন।

পঞ্চাশ থেকে ছাপান্ন বছর বয়সে মানুষ সবচেয়ে বেশী অর্থ রোজগারে মনোযোগ দেয়। বয়স যত বাড়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানুষের মন তত ঝোঁকে অবশ্য এটি তাঁদেরই হয় যাঁরা তাঁদের মনকে ঐভাবে তৈরী করেন।

এই অনুসন্ধানের ফলাফল সাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য, অসাধারণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে খাটে না, যেমন মোৎসার্ট ছিলেন একজন "শিশু প্রতিভা" অথচ গেটে, বার্নার্ডশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁদের সৃজনীশক্তি অব্যাহত রেখেছিলেন। পরি-সংখ্যানের হিসাবে "চরম পরিণতি বিন্দু" স্থির করা সম্ভব হলেও সর্বক্ষেত্রে যে একথা খাটে না তার প্রমাণ আজকের রাজনীতিক্ষেত্রে চল্লিশ বছরের কেনেডি, নাসের, উইলি ব্র্যান্ড এবং অন্য দিকে পয়ষট্টি পঁচাশি বছর বয়সের ক্রুশ্চেভ, দ্যগল ও আদেনাুর বিশ্ব-রাজনীতিতে তাঁদের অস্তিত্ব পুরোদস্তুর বজায় রেখেছেন।

।। ব্যক্তিগত রুচিমাফিক 'তৈরী' বাড়ী ।।

পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমুনট শহরে সম্প্রতি বিস্ময়কর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানী সমেত ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রায় ২৭০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের তৈরী "প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ী" হাতেকলমে এখানে দেখিয়েছিল।

সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটি পরিবারের উপযুক্ত প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ী, এই শ্রেণীর বাড়ীর মোট ১৮টি নমুনা এখানে ছিল। আর এক ধরণের বাড়ী ছিল যেগুলি দরকার মত তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে।

প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ীর বিরুদ্ধে লোকের মনে কুসংস্কারের কারণের মধ্যে রয়েছে বাড়ীগুলির আয়ু সম্বন্ধে সন্দেহ, ঠাণ্ডা, আর্দ্রতা ও শব্দরোধক হবে কিনা সে সম্বন্ধে ভয় এবং বাড়ীগুলির ছাঁচে-ঢালা গড়ন যা নিজস্ব রুচি অনুযায়ী অনেকেরই মনঃপূত নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে মধ্য-য়ুরোপীয় আবহাওয়ায় প্রিফ্যাব্রিকেটেড বাড়ী পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর টিকবে। বাড়ীগুলির একঘেয়েমি দোষ কাটাবার জন্য নির্মাতারা আজকাল কুড়ি থেকে চল্লিশ রকমের বিভিন্ন ছাঁচের বাড়ী তৈরী করছেন। তাছাড়া এসব বাড়ীতে 'ব্লক' পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় বলে মালিকরা খুশীমত বাড়ীর চেহারা পালটে দিতে পারবেন। এ যেন সেই ছোট বাচ্চাদের নানা ঢঙে খেলনার বাড়ী তৈরী করার মত, আর তেমনি সহজ।

মাথাধরা

কনাদ চৌধুরী

'ম্যান ইজ এ র‍্যাশনাল অ্যানিমেল' এই আপ্ত বাক্যটির অর্থ আমার এক ছাত্র এইভাবে করেছিলঃ 'মানুষ রেশনের চালডাল খাওয়া জন্তু'। হেসেছিলাম মনে আছে, কিন্তু বকতে পারিনি। কারণ র‍্যাশনালিটি যে অন্যান্য জন্তুর মধ্যে একেবারেই নেই হলপ করে বলা শক্ত। বরং খাঁটি 'র‍্যাশনাল' মানুষের সংখ্যা ভূমধ্যে যথার্থই মুষ্টিমেয়। অতএব মানুষকেই একমাত্র 'র‍্যাশনাল অ্যানিমেল' বলার মধ্যে আর যাই হোক র‍্যাশনালিটির কোনো লক্ষণ নেই। মানুষকে যদি একান্তই কোনো বিশেষণ-বাচক বাক্যে বন্দী করতে হয় তাহলে বলা উচিত 'ম্যান ইজ এ্যান অ্যানিমেল উইথ হেডেক'। আশা করি এই তথ্যের কেউ প্রতিবাদ করবেন না যে আলংকারিক এবং ব্যবহারিক অর্থে মাথা একমাত্র মানুষেরই ধরে এবং মানুষের যে মাথা আছে তার প্রমাণও ওই একটিই। স্বাভাবিক নিয়মেই বলা যেতে পারে বুদ্ধির প্রলয় যাদের বেশি মাথাও তাদের বেশি ধরে। এবং স্ত্রীবুদ্ধি যে প্রলয়ংকরী তার একমাত্র কারণই হল ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি মাথাব্যথা। কিছু কিছু স্ত্রীবিদ্বেষী লোকেরা অবশ্য বলেন যে মেয়েদের যতটা মাথাধরে তার চেয়ে বেশি তারা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি পুরুষদের নিজেদেরো মাথাধরার বিষয় কিছু কম না। রেস গাইডের প্রতিটি পাতাই ত পুরুষদের পক্ষে মাথধরার পাতা। তেমনি, শীল্ড ফাইনাল খেলায় রহমানের আত্মঘাতী গোল, নতুন রীতির গল্প, হিন্দি সিনেমা, দাবার চাল, অফিস-কালীন স্টেটবাসে ওঠা ইত্যাদি সব কিছুই পুরুষদের মাথাধরার উৎস। এমনকি কোন কারণ না থাকলেও যে মাথা ধরবে না তার কোনো নিয়ম নেই। মাথা ধরলে মাথা রাখবার যদি একটা কোল এবং একটি সুখস্পর্শ হাত পাওয়া যায় বুদ্ধিমান পুরুষ মাত্রেই সেক্ষেত্রে মাথাকে ধৃত হতে দ্যান। কপালে ওষ্ঠ-তিলক প্রাপ্তির পরমলগ্নকে কোনো প্রেমিকের পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব না। শুধু প্রেমিকই বা কেন বুদ্ধদেব বসুর নায়িকা বিশাখা হবু স্বামীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার জন্যে নিজেই মাথা ধরিয়েছিল।

'মাথাধরা' রোগটি ঠিক কবে মানুষের শিয়রে এসেছে বলা শক্ত, তবে মাথাধরাকে সভ্যতার সমান বয়সী বলা চলতে পারে স্বচ্ছন্দে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন এবং মাথাধরা প্রায় যমজ। আজকে কৃত্রিম উপগ্রহের কল্যাণে মানুষের মাথাধরা পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে নভোমণ্ডলে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানকেও আজকাল মাথাধরা নিয়ে বিলক্ষণ মাথা ঘামাতে হচ্ছে। বলতে গেলে এই রোগটি আধুনিক যুগের একটি ব্যাপক ব্যাধি এবং মানুষের নিত্যসঙ্গী। মাথাধরা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন এত্তেলা দিয়ে আসে না। তাই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থার ঢালে তাকে আটকাবার উপায় নেই। রোগটা প্রায় গরিলা সৈন্যের মতন, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে মাথা দখল করে সমস্ত রণাঙ্গণ জুড়ে বিজয়োল্লাস করতে থাকে। তবে মাথা যে কারো কারো ক্ষেত্রে দিনক্ষণ বুঝেই ধরে এ তথ্য জেনেছিলাম আমার এক ফিচার লেখক বন্ধুকে দেখে। একটি দৈনিক কাগজে প্রতি রবিবার তাকে একটা করে রম্য-রচনা জাতীয় নিবন্ধ লিখতে হয়। বন্ধুটি তার নিবন্ধের বিষয় নির্বাচন করে সারা সপ্তাহ ধরে। প্রবন্ধটা লেখে বুধবার। এই বুধবারটিই তার অপরিসীম মাথাধরার দিন। প্রতি বুধবারেই ওর মুখ শুকনো দেখি।

—বুধবার বুধবার তোর কি হয় বলত? এরকম মনমরা শুকনো দেখায় কেন তোকে?

—বুধবার আমার পক্ষে সত্যিই একটা শুকনো দিন!

বন্ধুর অধঃপতনে দুঃখ পাই। বুধবারটা যাদের কাছে 'ড্রাই ডে' তাদের মধ্যে ওকে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। আমারো প্রায় শুকিয়ে আসা মুখের দিকে তাকিয়ে ও নিজেই ব্যাখ্যা করে বাস্ত হয়।

—না, না তুই যা ভাবছিস তা নয়। বুধবারে বুধবারে আমাকে লেখা সাবমিট করতে হয় কাগজে। সপ্তাহে ছটা দিন ধরে কি নিয়ে লিখবো ভাবি, বুধবার সকাল হলেই দেখি বিষয়গুলো কেমন গুলিয়ে গেছে! যেটা মনে পড়ল সেটা নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখি নানান ফৈজৎ।

ফৈজৎ-এর ব্যাপারটা অবশ্য খানিকটা আমি জানতাম। খাঁড় ধরার ওপর লিখলে করপোরেশন চটবে, ছাত্রদের নিয়ে লিখলে বাড়িতে বেনামী চিঠি আসে, মেয়েদের নিয়ে কিছু লিখলে সম্পাদকীয় কলমে গাদা গাদা গালাগালি দেওয়া চিঠি বেরোয়। বাড়িভাড়ার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে প্রায় ছমাস বাড়িয়ালাকে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। প্রবন্ধটি বেরানোর পর বাড়িওলার সরকারমশাই এসে জানালেন যে তাঁর মনিব ঐ প্রবন্ধটি পড়েছেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে তিনি দু-একদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। বন্ধুটির দৃঢ় ধারণা 'আলোচনা'টা আর কিছুই না বাড়ি ছাড়ার নোটিশ।

—দ্যাখ যা লিখবি একদিনেই ভেবে ঠিক করে লেখ। সপ্তাহের ছদিন ধরে মাথা ঘামালেই নির্ঘাত সপ্তমদিনে মাথা ধরবে। কারণ মাথাঘামানোর সঙ্গে মাথা-ধরার অতি নিকট সম্বন্ধ।

—যা যা, বাজে বকিস না! হিন্দি ছবি দেখতে গিয়ে ত আমি মাথা ঘামাই না, তবে মাথা ধরে কেন? আর তোর

কথা সত্যি হলে ত সবসময়েই রিক্সায়ালা, শিয়ালদা স্টেশনের মুটে এদের সবসময় মাথা ধরে থাকত।

—এদের মাথা ধরবে কেন? অবাক হয়ে তাকাই বন্ধুর দিকে।

—ধরবে না? ওরা সকলেই ত খুব বেশী মাথা ঘামায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওরাই ত রোজগার করে। মাথা-ঘামানোর সংগে মাথাধরার—

বন্ধুর যুক্তির বহর দেখে মাথায় হাত দিয়ে, কিংবা বলতে পারেন মাথাটা ধরেই, বসে পড়ি মাটিতে। ফিচার লেখক বন্ধুটিকে আর কিছুই বলতে পারিনি, কারণ, মাথাধরার রুগীকে কখনও বেশী ঘাঁটাতে নেই। মাথা যাঁদের ধরে তাঁরা মাথায় প্রায়শঃই বিচারবোধকে ধরে রাখতে পারেন না। বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হবার মতন হয় তাঁদের। পাড়ার তারিণীবাবুরেও হয়েছিল একদা। তারিণীবাবু আর পরমেশ ঘোষাল দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। প্রায় পনেরো বছর ধরে আমরা দুই বন্ধুকে মোড়ের রতনের দোকানে চা খেতে, খবরের কাগজ ভাগ করে পড়তে দেখে আসছি। অথচ এই গভীর বন্ধুত্বও তারিণীবাবুর মাথাধরাকালীন একটি সংলাপে শেষ হয়ে গেছে। এখন দুজন দুজনকে এড়িয়ে চলেন। তারিণীবাবুর চা খাওয়া হয়ে গেলেই রতনের দোকানে ঢোকেন আজকাল পরমেশ ঘোষাল। অথচ ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই না। দুই বন্ধু রোজ বিকেলে পার্কে এসে গল্পগুজব করেন। সেদিনও দুজনে বসে গল্প করছিলেন পার্কের বেঞ্চে। কথা বলতে বলতে পরমেশ ঘোষাল লক্ষ্য করেন তারিণীবাবু যেন গল্পে তেমন মন দিতে পারছেন না।

—কি হল তারিণী? কপাল কুঁচকে ওরকম চুপচাপ বসে আছ কেন? জ্বরটর হয়েছে নাকি?

—আর বোলো না, সেই যে দুপুর থেকে আধকপালি মাথাধরে আছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।

—মাথাধরার বড়ি খাও না!

—খাইনি আবার, চারটে ট্যাবলেট খেয়েছি, কিসসু হয়নি! সখেদে জানান তারিণীবাবু। আর ঠিক তখুনি না জেনে সাপের গর্তটার দিকে পা বাড়ালেন পরমেশ ঘোষাল। পরমেশ ঘোষাল লোকটা এমনিতে খারাপ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক অবিবাহিত বন্ধুর কাছে স্ত্রীকেন্দ্রিক কথা বলতে ভালবাসেন। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর রান্না, সেবা, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদির গল্প প্রায় রোজই শুনতে হয় অবিবাহিত তারিণীবাবুকে। হয়ত বন্ধুকে বিবাহে প্রলুব্ধ করার জন্যেই স্ত্রীর গল্প করেন পরমেশ ঘোষাল এবং বিবাহিত জীবনের খুটিনাটি শুনতে খারাপ লাগে না বলেই শোনেন অকৃতদার তারিণীবাবু।

সেদিনও ত যথারীতি শুনে যাচ্ছিলেন মাথাধরা নিয়েও, কিন্তু বন্ধুর একটা কথায় হঠাৎ বুঝি তাঁর মনে হয়েছিল শুধু তাঁর মাথাই না সমস্ত জীবনটারই মাথা ধরে আছে। ওষুধেও মাথাধরা যায়নি শুনে পরমেশ ঘোষাল একটু চিন্তিত হয়েই বলেছিলেন—ওষুধ খেয়েও যায়নি? তাইত! তবে কি জানো তারিণী, ডাক্তারী ওষুধটষুধ সব বাজে। এ আমি নিজের ব্যাপার থেকেই জানি। আমারো একবার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। গরম চায়ের সংগে অ্যাসপিরিন খেলাম, নস্যি নিলাম, রগের ওপর দড়ি বাঁধলাম, এতটুকু কমল না। তারপর শেষে—। কথাটা শেষ না করে পরমেশ ঘোষাল সিগেরেটের প্যাকেটটা বার করলেন। বন্ধুর কথা শেষ না করার এই বিশেষ ভঙ্গিটি চেনেন তারিণীবাবু। এরপরেই নিশ্চয়ই স্ত্রীর দেওয়া কোনো টোটকার কথায় আসবেন পরমেশ ঘোষাল। কিন্তু মাথাধরার গরজ বড় বালাই। বন্ধুর থেমে যাওয়াতে বিরক্ত হয়ে তাড়া লাগান তারিণীবাবু।

—সিগেরেটটা না হয় পরেই ধরালে। বল না কি ওষুধ দিলেন তোমার গিন্নী?

—না, ওষুধ তেমন কিছু নয়। আলোটা নিভিয়ে খাটের ওপর আধশোয়া করে বসিয়ে যত্ন করে মিনিট কুড়ি টিপে দিতেই বিলকুল অলরাইট হয়ে গেল। সত্যি নীরজা এমন সুন্দর মাথা টিপতে পারে......।

তখুনি মাথাধরায় বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অকৃতদার তারিণীবাবু বন্ধু বিচ্ছেদকারী সেই অমোঘ বাক্যটি ঘোষণা করলেন।

—বৌ-এর টেপায় ভেড়ুয়াদের মাথা-ধরা সারে, ভদ্রলোকের সারে না, বুঝলে?

ব্যস সেই থেকে দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ!
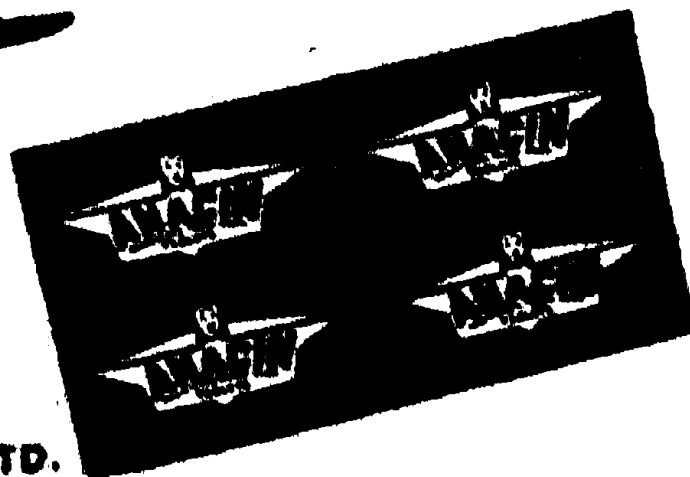
শিরঃপীড়ার মতন খুব কম রোগই সারা বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ হতে পেরেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, মাথাধরার উৎস মাথার মধ্যে নয়, অন্যত্র।

নারীরা বেশ মাথা টিপতে পারে

নিউইয়র্কের শিরঃপীড়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বলেছেন * "আমরা আমাদের রোগীদের মাথাধরার চিকিৎসা করতে গিয়ে কাঁধের ওপরের অংশের চিকিৎসা করি না, করি তার নিম্নাংশের।" ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, মাথাধরা শারীরিক বা মানসিক বিপর্যয়েরই একটা লক্ষণ ব্যতীত আর কিছু নয়। রোগ নির্ণয়ের জন্যে মাথাধরার রোগীকে ওই ধরা মাথাটাকে নিয়েই অনেকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যথা, যন্ত্রণাটা ঠিক কোন জায়গায় হচ্ছে—কপালে, মাথার ওপরে, না ঘাড়ের পেছন দিকটায়? কোন সময়ে সাধারণত মাথাধরা শুরু হয়? আধ-কপালে না পুরো কপালে? মাথাধরা কি আকস্মিকভাবে সেরে যায়। না ধীরে ধীরে কমে? অস্বাভাবিক কাজের চাপ, মস্তিষ্ক চালানোর ফলে অথবা খাওয়ার পরে কি মাথাধরা বেড়ে যায়? এর সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ থাকে কি—যেমন বমির ভাব, কানে ভোঁ ভোঁ করা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া ইত্যাদি? যাঁরা পুরোনো মাথাধরার রোগে ভুগছেন তাঁদের আবার এতসব প্রশ্নের উত্তর দিতে মনোসমীক্ষকের কামরায় ঢুকতে হয়।

* মাথাধরা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি একটি মার্কিণী সন্দর্ভ থেকে গৃহীত। ক, চৌ।

ডাঃ ফ্রায়েডম্যান মনে করেন এই রোগের চিকিৎসায় রোগীর ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করা একান্তই আবশ্যক। প্রচণ্ড মাথাধরার রোগীদের অবশ্য চোখের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, অথবা মানসিক ও স্নায়বিক চিকিৎসার ব্যবস্থাই করতে হয়। 'অ্যাসপিরিন' জাতীয় ওষুধ এই রোগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও অ্যাসপিরিন সেবনের কুফল সম্বন্ধে প্রায় সব চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাই একমত। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক উইলিয়াম সারওয়ান তাঁর 'অ্যাসপিরিন' গল্পে লিখেছেন :

আমি রোজ অ্যাসপিরিন খাই মাথাধরা সারানোর জন্যে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন অ্যাসপিরিনেও সারবে না। সেদিন কি করবো? বাস্তবিক কিছুই করার নেই তখন। সব মাথা ধরাই অ্যাসপিরিনের প্রভাবে মুক্তি পায় না। শারীরিক কারণে মাথা ধরলে তার হাত থেকে যত সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, মানসিক কারণে ধরা মাথার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তত কঠিন।

আমেরিকার চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যে ধরনের মাথাব্যথা খুব সাধারণভাবে দেখা যায় তার মূল কারণ হল মাথা ও ঘাড়ের মাংসপেশীর ক্রমাগত সংকোচন, দীর্ঘসময় কোনো কাজে মনঃসংযোগ (ষোলো হাজার ফিটের হিন্দী ছবি দেখবেন না) অথবা ভাবাবেগপ্রধান এমন কোনো সমস্যার অনুশীলন যাতে মস্তিষ্ক চালানোর প্রয়োজন হয়। আরেক ধরনের মাথাধরা আছে যার উৎসমূল স্নায়ু। একে 'মাইগ্রেন' বলা হয়। এই ধরনের মাথাধরার কারণ জানা যায়নি। তবে মাইগ্রেন রোগাক্রান্ত রোগীদের দেখা গেছে তারা একদম পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না। মেয়েদেরই এই ধরনের মাথাধরা রোগ সবচেয়ে বেশি হয়। আর্গোটামাইন টারট্রেট শুঁকিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কিন্তু যাবতীয় গবেষণা সত্ত্বেও ডক্তারেরা স্বীকার করেছেন যে শিরঃপীড়া বিষয়ক গবেষণার কাজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। অন্যান্য রোগের গবেষণা জীবজন্তুর ওপর চালানো যায় কিন্তু মাথাধরার গবেষণা একমাত্র মানুষের ওপরেই চালানো সম্ভব, কারণ 'ম্যান ইজ দি ওনলি অ্যানিমেল উইথ হেডেক'।

সাহিত্য সমাচার

।। মার্কিণী শিশু-সাহিত্যে ভারত ।।

বর্তমান নিবন্ধে মার্কিণ শিশু-সাহিত্যে কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করব। যাদের পটভূমিকায় যে কোন-ভাবেই ভারতবর্ষ উপস্থিত। ভারত সম্পর্কে আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জ্ঞানলাভের সুযোগ এতকাল ছিল অভিধানের গন্ডীতেই আবদ্ধ। সম্প্রতি তাদের সে অভাব দূর হয়েছে। ভারতীয়দের কাজকর্ম, ধ্যানধারণা ও জীবনের নানাদিক সম্পর্কে আলোকপাত করে নতুন নতুন বই রচিত হচ্ছে আমেরিকায়। এই বইগুলি মার্কিণ শিশুদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ছেলেমেয়েদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর প্রায় ১,৬০০ বই প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং অন্য দেশ সম্পর্কে যখন একখানা কি দুখানা বই প্রকাশিত হয় ভারত সম্পর্কে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সেখানে ছ'খানা।

শার্লি লীজ অরোরা রচিত 'হোয়াট দেন, রামন' এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-সমূহের অন্যতম। শ্রীমতী অরোরা জন্মসূত্রে আমেরিকান হলেও বিবাহ করেছেন একজন ভারতীয়কে। ভারতীয় স্বামীর সঙ্গে চার বৎসরকাল দক্ষিণ ভারতে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। 'হোয়াট দেন, রামন' বইটিতে একটি ছোট ভারতীয় বালকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রামের মধ্যে এই ছেলেটিই সর্বপ্রথম লিখতে পড়তে শেখে।

বইটির রচনা প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন, 'ভারত সম্পর্কে আমার পুঁথিগত জ্ঞান আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। যে ভারতকে আমি প্রাত্যহিক সংস্পর্শে উপলব্ধি করেছি আমার রচনার মধ্যে তাকেই মূর্ত করবার প্রয়াস পেয়েছি। ভারতের সনাতন প্রথা ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আধুনিক যুগ-জীবনের সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে—সে সম্পর্কেও কিছু আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি এতে।'

'হোয়াট দেন, রামন' তিনটি পুরস্কার লাভ করেছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু-রক্ষা তহবিল কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের জন্য পুরস্কার।

'হোয়াট দেন, রামন' বাঙ্গালোরের শিশুসাহিত্য সমালোচক বৃন্দা নিরোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মিস্ নিরোদী বলেন, বইটি সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় মেজাজে রচিত। আমাদের দেশের লোকেদের ধ্যানধারণা, তাদের মনের ঘাত-প্রতিঘাত ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরত্বকে লেখিকা ভালভাবেই জানেন।

'জেনেক, দি স্টোরি অব এ পিজিয়ন'-এর বাংলানুবাদের প্রচ্ছদচিত্র

সম্প্রতি মিস নিরোদী শিশুসাহিত্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকা প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত। শ্রীমতী অরোরার বইটিও এই তালিকাভুক্ত হয়েছে। মিস নিরোদী বলেন, 'আমার মনে হয়, ভারতীয়রা এই বইটির যোগ্য সমাদর করবে, কেননা, সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য এই বই কালের কষ্ঠিপাথরের বিচারে অম্লান গৌরবে টিকে থাকবে।'

আমেরিকান লেখকদের আরও দুখানি বইও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি বার্ণী শর্টারের লেখা 'ইন্ডিয়ান চিলড্রেন'। লেখিকা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই বইখানি অভিষিক্ত। কোন বালক বা বালিকার জীবনের কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারটি ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জীবনযাত্রার রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। অপর বইটি ওয়ালটার ফেয়ার সার্ভিসের লেখা 'ইন্ডিয়া'। সিন্ধু উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সময় সেই কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে লেখক যে জ্ঞান লাভ করে-ছিলেন তার ভিত্তিতে এই বইটি রচিত। ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে এশিয়ার যাযাবর উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

যে সব আমেরিকান লেখক কখনও ভারত ভ্রমণ করেননি তাঁদের মধ্যে বীয়াট্রিস ম্যাকলিয়ডের 'অন স্মল উইংস' বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই বইয়ের উপাদান আহরণ করা হয়েছে দীর্ঘকাল ভারতে কাটিয়েছেন এমন এক মিশনারী দলের চিঠিপত্র থেকে। বইটি পড়লে মনে হবে লেখক যেন বহুকাল ভারতে কাটিয়েছেন এবং ভারত ও ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাইরের মহল ছাড়িয়ে অন্দরের অন্তরঙ্গতায় এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

জীন কেথওয়েল শিক্ষিকারূপে দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করেন। তাঁর লিখিত 'স্টোরী অব ইন্ডিয়া' নামক বইটিতে ভারতের ইতিহাস, ভারতীয়দের জীবনযাত্রা এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের সমন্বয়ের এক সুন্দর ছবি চিত্রিত হয়েছে। 'দি লিটল বোট বয়' বইটি কাশ্মীরের ছোট্ট হাফিজকে নিয়ে লেখা। পরিবারবর্গ বন্ধুবান্ধব, কাশ্মীরের কম্বল ব্যবসায়ী ও মহাজনের সঙ্গে হাফিজের সম্পর্ক লেখিকার দরদী লেখনীর বাস্তব স্পর্শে জীবন্ত। 'দি প্রমিস্ অব্ দি রোজ' নামক বইটি পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েরা তন্ময় হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর ভারত সম্রাট আকবরের আমলে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। তাঁর রচিত অপর একটি বইয়ে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমির জীবনযাত্রা মনোজ্ঞ ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'দি লিটল ফ্লুট প্লেয়ার' নামক এই বইটিতে দেখানো হয়েছে দশ বৎসরের টিকারাম কিভাবে অজন্মার বৎসরে তার পরিবার-বর্গকে আহার জুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখে-ছিল।

আমেরিকার লেখকদের ভারত সম্পর্কে লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে কর্নেলিয়া স্পেনসারের 'মেড ইন

'হোয়াট দেন রামনে'র- অপূর্ব প্রচ্ছদচিত্র

ইণ্ডিয়া', ভারতে প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজের কন্যা সিন্থিয়া বোলজ-এর 'অ্যাট হোম ইন ইণ্ডিয়া' এবং 'ইয়াং ট্র্যাভেলার ইন ইণ্ডিয়া' নামক বইগুলি উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্য ভারতীয় লেখকদের লেখা বইগুলির মধ্যে পার্বতী মেনন থাম্পির 'গীতা অ্যান্ড দি ভিলেজ স্কুল' বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। এই বইটিতে ছোট্ট একটি ভারতীয় মেয়ের এক নতুন বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্পর্কে ভীতির কাহিনী অপূর্ব দক্ষতাসহকারে বর্ণিত। তাছাড়া রূথ সোলবার্ট নামক আমেরিকান শিল্পীর আঁকা মনোরম ছবিতে বইটি সমৃদ্ধ।

'হোয়াট দেন্, রামন' বইটির চিত্রশিল্পী হানস গুগেন হাইমের আঁকা ছবিগুলি চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গল্পের পরিবেশসৃষ্টিতে এবং চরিত্রগুলির মেজাজ বর্ণনায় ছবিগুলি বিশেষ সহায়ক।

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরিয়ান ম্যারিয়া কিমিনোর মতে, আমেরিকান শিল্পীরা ভারতীয় শিশুসাহিত্যের উপযোগী চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর বিরাট চিত্র-সংগ্রহের উল্লেখ করে তিনি বলেন—'এই সংগ্রহগুলি বইয়ের জন্য যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের গবেষণার কাজে লাগবে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত সম্পর্কে লিখিত বইগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি ও আলোকচিত্রে পূর্ণ।' ম্যারিয়া কিমিনো বিশ্বসাহিত্য থেকে শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ চয়নের জন্য গত পঁচিশ বৎসর ধরে অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর ভারতীয় পুস্তক-সংগ্রহ বিভাগটি সারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

উল্লিখিত বইগুলি ছাড়াও পাবলিক লাইব্রেরীর শেল্‌ফের বইয়ের ভীড়ে আরও অনেক ভারতীয় বইয়ের দর্শন মিলবে। এই সঞ্চয়ন ভারতের বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার সম্পর্কে আমেরিকার ছেলেমেয়েদের মনে অন্ততঃ কিছুটা আলোকপাত যে করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অব্ রাম'। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই বইটি রচনা করেছেন জোসেফ গেয়ার। তাছাড়া জোসেফ জ্যাকবস্-এর লেখা 'ইণ্ডিয়ান ফেয়ারী টেলস্' এবং এর্লেন সি, ব্যাবিট কর্তৃক নতুন করে বলা ভারতের শাশ্বত অমর কাহিনী 'দি জাতক, টেলস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ভারতীয় সঞ্চয়ন ভাণ্ডারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্যে ভারতীয় লেখকেরাও বেশ কিছু মন-ভোলানো গল্পের বই লিখেছেন। ভারতীয় লেখকদের রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'গেনেক, দি স্টোরি অব্ এ পিজিয়ন' বইটি শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যমূলক রচনা হিসাবে নিউবেরী পদক লাভ করে। আর, লাল সিং-এর 'গিফট অব দি ফরেস্ট' নামক বইটি ভারতীয় জঙ্গলের এক বিচিত্র উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের আলেখ্য।

বেশির ভাগ সময়েই ছেলেমেয়েদের গল্প বলার জন্য রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'জঙ্গল বয়', 'কিম', ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'দি হিন্দু ফেবলস্ ফর লিটল্ চিলড্রেন', 'টেলস ফ্রম দি পঞ্চতন্ত্র' এবং জোসেফ গেয়ারের 'দি অ্যাডভেঞ্চারস্ অব রাম' প্রভৃতি ক্লাসিক পর্যায়ের শিশু-সাহিত্যেরই স্মরণ নিতে হয়।

ভারত সম্পর্কে লিখিত কোন বইটি শিশুচিত্ত আকর্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম, সেকথা সঠিক বলা শক্ত। অ্যাসট্রিড বার্জম্যান সাক্‌সডর্ফ-এর লেখা 'চেন্দু দি বয় অ্যান্ড দি টাইগার' শিশুদের আদরের বই। এই বইটি অসংখ্য পাঠক বহুবার পড়েছে। বইটি রঙীন ছবি ও আলোকচিত্রে ভরা। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এই জন্যেই একে এত পছন্দ করে। আর, বড় ছেলেমেয়েরাও এ বই সাগ্রহে পড়ে। কারণ, এর মধ্যে তারা ভিন্-দেশের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎ পায়।

আমেরিকার বইয়ের জগতে ভারতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ভরা বইয়ের আজ আর অভাব নেই।

পঞ্চনদীর
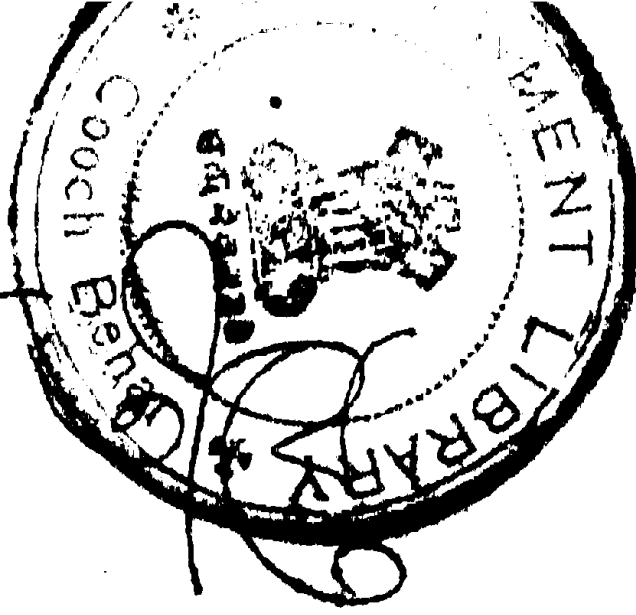
অ. না. দ.

'বন্দীবীর' কবিতার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই ছেলেবেলা থেকে পরিচিত। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের একটি কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন : শিখবীর বান্দার ধর্মবিশ্বাস, বীরত্ব ও অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের কাহিনী।

ইতিহাসে শিখবীর বান্দাকে নিতান্ত বর্বর, নিষ্ঠুর হত্যাকারী কিংবা নাটকীয় দানবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এক বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত যে বান্দার প্রতাপে মহাশক্তিশালী মুঘল সম্রাটের সিংহাসন টলে উঠেছিল। কেবল তা-ই নয়, ভারতে শিখরাজ্যের পত্তনও করে গেছেন তিনি।

বান্দার জন্ম রাজপুত বংশে, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে। ছেলেবেলায় নাম ছিল লছমন দাস। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশ তাঁর মন উদাসী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ঘরে তাঁর মন টিকল না, যোগ দিলেন এক বৈরাগী দলে। সেখানে নাম হল মাধো দাস। অনেককাল ঘুরে বেড়িয়ে শেষকালে মধ্যভারতে এসে ঠাঁই নেন এক হিন্দু আশ্রমে এবং পরে এক সময়ে নিজেই একটা আখড়া খুলে বসেন গোদাবরী তীরে। পনের বছরকাল কাটল এই আখড়ায়।

এই সময়ে একদিন শিখধর্মনেতা গুরু গোবিন্দ সিং এসে দেখা করলেন বান্দার সঙ্গে। সেটা ১৭০৮ সন। তখন মুঘলে ও শিখে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। শিখ-সম্প্রদায় রুখে দাঁড়িয়েছে মুঘল সম্রাটের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ঐ ব্যাপারে বান্দাকে শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বললেন গুরু গোবিন্দ। তিনি সম্মত হলেন।

এবারে শুরু হল বান্দা বৈরাগীর কর্মজীবন। একদল শিখ সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন দিল্লী অভিমুখে। হাতে গুরু গোবিন্দের পতাকা। দিল্লীর কাছাকাছি এসে ছাউনি করলেন এক গ্রামে। তারপর চারদিকে হুকুমনামা জারি করে শিখদের আহ্বান করলেন তাঁর দলে যোগ দিতে। আবার ঘোষণা করে অভয় দিলেন চোর ডাকাত দস্যুর হাত থেকে, ধর্মান্ত রাজপুরুষদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবেন সকলকে; কোনো রকম অন্যায় অবিচার যাতে না হয় তারও ব্যবস্থা করবেন।

একেই ত লোকের মনে ক্ষোভ আর অসন্তোষের অন্ত ছিল না, উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে। বান্দার ঘোষণায় আগুন জ্বলে উঠল চারধারে। অচিরে দলে দলে শিখরা এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। 'হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।' পাঞ্জাবের কৃষককুল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জমিদার ও রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে—শুরু হল আন্দোলন এবং আনুষঙ্গিক লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড। সে ভীষণ ব্যাপার। বান্দার বারণ কেউ শুনল না। আন্দোলন থামাবার চেষ্টাও তিনি করলেন না। তিনি জানতেন, একবার বাঘের পিঠে চড়লে আর নামা যায় না।

অবশেষে দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চল ছেড়ে তিনি দলবলসহ গ্রান্ড ট্রাংক রোড ধরে এগিয়ে চললেন উত্তরাপথে। যেতে যেতে সেনাপত, সখানা, শিরহিন্দ প্রভৃতি পথিপার্শ্বস্থ কয়েকটি জনপদ দখল করলেন। এভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বান্দার অধিকার বিস্তৃত হল। এই অঞ্চলের বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বান্দার দারুণ প্রতিপত্তি! শিরহিন্দ জয়ের তারিখ থেকে শুরু করে একটা নতুন সালই তিনি প্রবর্তন করে ফেললেন; তা ছাড়া তাঁর শাসনকার্যের স্মারকচিহ্নস্বরূপ গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর নামাঙ্কিত মুদ্রাও চালু করলেন।

এর কিছুকাল পরেই বান্দা সাহারাণপুর অধিকার করলেন। সমগ্র যমুনা-গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীরা দলে দলে তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিল। শতদ্রু পার হয়ে বান্দা চললেন এগিয়ে। গ্রামের পর গ্রাম তাঁর অধিকারে এসে গেল। অধিবাসীদের মুক্ত করে দিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ থেকে। আর দুটো মাত্র ঘাঁটি রইল মুঘলদের—রাজধানী লাহোর ও আফগান শহর কসুর। বান্দা যদি আর একটু তৎপর হয়ে দিল্লী ও লাহোর দখল করতেন তাহলে ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেত। কিন্তু তিনি দুর্দান্ত সাহসী হয়েও রাজ্য গড়ে তোলার মতো একটা কিছু স্থির সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হননি বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর জয়যাত্রা সফল হয়নি।

এদিকে ব্যাপার দেখে শুনে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা'র টনক নড়ে উঠল। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। রাজপুত-পাঠান-আফগান সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন পাঞ্জাব অভিমুখে।

বান্দা তখন ছিলেন মুখ্‌লিসগড় দুর্গে। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী দুর্গ অবরোধ করল। এক গভীর রাত্রে জনকয়েক বাছা বাছা তলোয়ারধারী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে বান্দা বেরিয়ে পড়লেন দুর্গ থেকে, পালিয়ে গেলেন মুঘল সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে। পরদিন মুঘল সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করল। দখল করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু প্রবেশ করে দেখে দুর্গ প্রায় শূন্য। সৈন্যসামন্ত অল্পই ছিল।

বান্দারই মতো চেহারার একটি লোককে পাওয়া গেল, তার পরনেও ছিল বান্দার পোষাক। মুঘল সৈন্যদের উল্লাস দেখে কে? মনে করল বুঝি বান্দা ধরা পড়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল, ওর নাম গুলাব সিং। বুঝতে পারল পাখি পালিয়েছে। ওরা বাজপাখি ধরতে গিয়ে ধরল একটা পেচক!

বাহাদুর শা ক্ষেপে গেলেন। নিরপরাধ লোকদের উপরেই শুরু করলেন অত্যাচার। অবশ্য লাভ কিছু হল না; বান্দাকে ত আর ধরা গেল না? অবশেষে মন ভেঙে গেল সম্রাটের। বেশিদিন আর বাঁচলেন না। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হল।

সম্রাটের মৃত্যুর পরে সিংহাসনের দাবী নিয়ে তাঁর ছেলেদের মধ্যে লাগল ঝগড়া বিবাদ। বান্দা এতদিন পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এবার সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এসে মুঘল অধিকৃত স্থানগুলো পুনরায় দখল করলেন। কিন্তু বেশিদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। প্রথমে সম্রাট জাহান্দর শা এবং পরে সম্রাট ফারুক সিয়ার, উভয়েই পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বান্দা পাঞ্জাবে টিকতে পারলেন না; তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ তিনি পালিয়ে গেলেন জম্মু থেকে মাইল কয়েক দূরে এক গ্রামে। পরে তাঁরই নামে ঐ গ্রামের নাম হয়েছিল ডেরা বাবা বান্দা।

১৭১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বান্দা শেষবারের মতো মুঘলদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার উদ্দেশ্যে ঐ পার্বত্য বাসস্থান ছেড়ে চলে এলেন পাঞ্জাবে। দলবল নিয়ে মুখোমুখি হলেন মুঘলদের। কিন্তু পেরে উঠলেন না। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ করে আবার তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মুঘল সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করত, আর বান্দা এ ঘাঁটি থেকে সে ঘাঁটিতে পলায়ন করতেন, ঠিক যেমন বন্য পশু এক ঝোপ ছেড়ে আর এক ঝোপে আশ্রয় নেয়। এতে করে তাঁর লোকক্ষয় হল প্রচুর, অবশ্য পশ্চাদ্ধাবনকারী দলেরও যে ক্ষতি হল না তা নয়।

অবশেষে গুরুদাসপুর নাঙ্গল নামে একটা জায়গায় মুঘল সৈন্য বান্দাকে ঘেরাও করে ফেলল। উপায়ান্তর না দেখে ওখানে আস্তানা করে নিয়ে শেষ সংগ্রামের জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। জনৈক মুঘল ঐতিহাসিক এই অবরোধের এক চাক্ষুষ বর্ণনায় বলছেনঃ অবরোধকালেও শিখদের কাজকারবার ছিল দারুণ বেপরোয়া। দিনে দুতিনবার ওরা এক এক দল বেঁধে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসত ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটতে, আর অমনি মুঘল সৈন্যরা আক্রমণ করত তাদের। কিন্তু শিখরা তীর ধনুক আর তরোয়াল দিয়ে ওদের দফা নিকেশ করে পালিয়ে যেত। শিখদের বীরত্বে আর তাদের নেতা বান্দার চাতুরিতে মুঘল সেনাপতিরা এমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল যে তারা মনেপ্রাণে প্রার্থনা করত ঈশ্বর এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে বান্দা তাদের রেহাই দিয়ে দুর্গ থেকে নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পারে।

যাক, বান্দা মরিয়া হয়ে আট মাসকাল দুর্গ আঁকড়ে রইলেন। দেখা গেল ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যসামন্ত সব কাবু হয়ে পড়েছে, বর্শা বা তরোয়াল চালনার ক্ষমতা একজনেরও নেই। বাধ্য হয়ে বান্দা মুঘলদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, এবং হত্যা করা হবে না এই আশ্বাস পেয়ে দলবলসহ ধরা দিলেন। সেটা ১৭১৫ সনের ১৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা।

বন্দী হলেন বান্দা। হাতে হাতকড়া, পায়ে লোহার বেড়ি, গলায় একটা লোহার হাঁসুলি। দুপাশে দুজন রক্ষীসৈন্য বান্দার সঙ্গে একত্রে হাতকড়ায় আবদ্ধ। এই অবস্থায় একটা লোহার খাঁচায় বন্ধ করা হল তাঁকে।

অন্যান্য বন্দীদেরও গলায়, হাতে-পায়ে পড়ল লোহার বেড়ি। এদের সংখ্যা ছিল সাত শতেরও বেশি। মুঘলদের তরবারের চোটে যে শত শত শিখের মাথা কাটা পড়েছিল সেই ছিন্নমুণ্ডগুলো এবং সাতশত বন্দীকে গরুর গাড়িতে বোঝাই করে মুঘল সৈন্যরা বিজয়োল্লাসে পাঞ্জাব থেকে মার্চ করে চলে এল দিল্লীতে,—১৭১৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। প্যারেড করান হল দিল্লীর রাজপথে।

ঐ সময়ে দিল্লীর রাজ দরবারে উপস্থিত দুইজন ইংরেজ এই ঘটনার নিম্নরূপ এক সরকারী বিবরণ বিলাতে পাঠিয়েছিলেন ঃ—

'শেষ পর্যন্ত লাহোর অঞ্চলের সেই বিখ্যাত বিদ্রোহী গুরুকে তার পরিবার এবং সহচরবর্গসহ (সংখ্যায় ৭৮০) বন্দী করা হয়েছে। দিন কয়েক হল তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় উটের পিঠে চড়িয়ে আনা হয়েছে রাজধানীতে। উটগুলো এই উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকেই পাঠান হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধে হত প্রায় দুহাজার শিখের ছিন্নমুণ্ড কাষ্ঠফলকে বিদ্ধ করে নিয়ে আসা হয়েছে। বিদ্রোহী গুরুকে প্রথমে হাজির করা হয় সম্রাটের সামনে, তারপরে পাঠান হল কারাগারে। এতদিন রাজত্ব করে গুরু যে-টাকাকড়ি ধনরত্ন সংগ্রহ করেছে সেসব কোথায়, কোন্ গুপ্তস্থানে লুকানো আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে তার একটা হদিস বের করা যায় কিনা দেখবার জন্যে তাকে আপাতত দিনকতক সময় দেওয়া হয়েছে, পরে তাকে হত্যা করা হবে। এদিকে প্রত্যহ বন্দী শিখদের একশ জনকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। কী ধৈর্যের সঙ্গে তারা মৃত্যুবরণ করছে দেখলে অবাক হতে হয়। শেষ পর্যন্ত স্বধর্ম ত্যাগ করেনি।'

সঞ্চিত ধনসম্পদের খোঁজ পাবার আশায় ক্রমান্বয়ে তিনমাসকাল বান্দাকে নৃশংস নির্যাতন করা হল, কিন্তু বৃথা। অবশেষে একদিন তাঁর চার বছরের ছেলে অজয় সিং, পাঁচজন সেনাপতি ও অন্য একদল শিখ বন্দীসহ বান্দাকে আবার দিল্লীর রাজপথে প্যারেড করান হল। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হল দিল্লী থেকে এগারো মাইল দূরে মেহেরৌলি নামক স্থানে, বাহাদুর শা'র সমাধিস্থলে।

হত্যা করার পূর্বে বান্দাকে বলা হল, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মুক্তি দেওয়া হবে। বান্দা কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন পুত্র অজয় সিংকে তাঁর চোখের সামনে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল।

এইভাবেই জীবন সাঙ্গ হল বান্দা বাহাদুরের। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন শান্ত সমাহিত জীবনযাপন করবেন বলে। কিন্তু একদা অতর্কিতে জীবনের মোড় গেল ঘুরে। শান্তির আবাস ছেড়ে চলে এলেন লোকালয়ে, যত অত্যাচারিত জনসাধারণের হাতে তুলে দিলেন অস্ত্র এবং মহাক্ষমতাশালী এক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার ভিত এমনভাবে নেড়ে দিলেন যে, আর কখনো তা মাথা তুলতে পারেনি।

স্লিপিং পিল

মিহির পাল

এখন নিজেকে সৌমেনের গুহাশ্রিত জীব বলে মনে হচ্ছে, বিরাটকায় জন্তুর তাড়া খেয়ে এক অন্ধ কোটরে সে আশ্রয় নিয়েছে। তার চারদিকে এক আদিম আঁধার ঘন হয়ে ছড়িয়ে। আর তার বুকে মুখ লুকিয়েছে চেয়ার, টেবিল, বাক্স, জামা-কাপড় রাখবার ব্র্যাকেটটা, কোণে ঝোলান দড়ি, দেয়ালের ক্যালেণ্ডার দুটি। সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ কলকাতার এই দু'কুল ভাঙ্গা-চোরা গলির পাশে দশ বাই দশ ফুট অন্ধকার ঘরটাতে ধোঁয়ার অন্তরের মাঝে শুয়ে শুয়ে নিজেকে গুহাবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে সৌমেন কিন্তু অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল।

জানলার বাইরে সৌমেন দৃষ্টিক্ষেপ করল। তার ঘরের উল্টোদিকের পাঁচ বাই দুয়ের সি বাড়ীর পনের বছরের শিপ্রা আলো জ্বালিয়ে পড়তে বসে গেছে। দুলে দুলে পড়া মুখস্ত করছে। আর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে গলির লোক দেখছে। চিৎপুরের ট্রাফিক জ্যম হয়ে থাকার মত সৌমেনের মাথাটা ধরে রয়েছে। একপাশের কপালের 'পরে শিরাটা দপ-দপ করছে। চোখদুটো জ্বালা করছে অনবরত।

এতক্ষণ সৌমেন অফিসের জামা-প্যাণ্ট না ছেড়ে জুতো পড়েই শুয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা বালিশের 'পরে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর চোখ বুজে ভাবছিল। সত্যেনদের কথা। সত্যেনদের মেসের ঘরখানা তার বুজে-থাকা চোখের আঁধারের মাঝেও ব্ল্যাক-আউটের রাতের ঘোমটা-পড়া আলোর মত জ্বলজ্বল করছিল।

সৌমেন ভাবছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সত্যেনের ঘরে দরজা বন্ধ করে ওরা গোল হয়ে বসেছে। ওরা চারজন। সত্যেন, রবি, অশোক আর সত্যেনের রুমমেট অরবিন্দ। সত্যেনের খাটের 'পরে বসে থাকা তিন-জনের সামনে কিছু খুচরো পয়সা জড়ো করা। হয়ত পয়সা চাপা দেওয়া এক-আধটা টাকাও। আর অরবিন্দ সিগারেটের খরচ তুলবার জন্যে খালি কৌটো হাতে বোর্ড-মানির আশায় বসে।

টুং-টাং পয়সা পড়বে, রাত বাড়বে, চল্লিশ পাওয়ারের ডুমটা ঘিরে কয়েকটা পোকা ক্লান্তিহীন ঘুরতে থাকবে। আর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে খেলা এগোবে। সত্যেন নিশ্চয়ই পুকুরের শান্ত জলে মাছের বুড়বুড়ি কাটার মত মাঝে মাঝে বলবে— সৌমেনটা আজও এল না। অনেকক্ষণ পর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে হাই তুলে রবি বলবে, এবার উঠব। কিন্তু উঠবার কোন লক্ষণ সে দেখাবে না।

সৌমেন আজ ওদের আসরে গেল না। গতকালও যায়নি। চিড়িয়াখানায় থাকা-কালীন (তার এক ছোট বোন বিজু তাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটার এই নামকরণ করেছিল) সেই যে তার ইনসমনিয়া ভোগা শুরু হয়েছিল সেটা এতদিনে ক্রনিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইদানীং আবার এমনি একিউট স্টেজে পৌঁছেছে যে গত কিছু-দিন ধরে তার প্রায় ঘুমই হচ্ছে না। মাথাটা সব সময় ধরে রয়েছে। চোখদুটো জ্বালা করছে আর কপালটা টিপটিপ।

গতকাল সত্যেনদের ওখানে না গিয়ে সে অনেক রাত অবধি গড়ের মাঠে শুয়ে কাটিয়েছে। খানিক দূরে মনুমেন্টের মাথা ঘিরে অনেক তারার আকাশ আর দূরে নিয়ন আলোর রকমারী সাজ দেখতে দেখতে কখন তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। আর সেই চেতনার আবছা আলোয় সৌমেন তাদের বিরাট চুনবালি-খসা বিবর্ণ বাড়ীটা পিতৃ পিতৃ প্রদীপের মত দেখছিল। সেই বিকট বাড়ীটার একটি খুপরিতে তার আরও সাতটি সহোদর-সহোদরা আর জনক-জননী (আহা জনক-জননী!) বেঁচে থাকার আত্মপ্রসাদ লাভ করছে এবং অভিসম্পাত দিচ্ছে। সৌমেন ও-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগেই দীপু পালিয়েছিল। পরে শুনেছে চোপ-সান যৌবন নিয়ে বছর দুই বাদে সে ফিরে এসেছিল। প্রদোষের প্লুরিসি হবার খবরও তার কাছে এক চিঠির মাধ্যমে পৌঁছেছিল। ও বাড়ীতে থাকাকালীনই অতনু কোন এক চোরাকারবারীদের দলে ভর্তি হয়েছিল। কখনও কখনও উল্কার মত সে বাড়ীতে হাজির হত। দু-চার ঘণ্টা বা এক-আধদিন থাকার পর মায়ের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে সে পালাত। বুঝতে পারার পর প্রথম প্রথম কদিন মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সৌমেন বিলাপ করতে দেখেছিল। আফিমের নেশায় স্থাণুর মত বসে থাকা লোকটিকে কথার আঁকশি দিয়ে মা মাটির বুকে জলকাদায় পেড়ে ফেলতে চাইত। দেয়ালের বুকে ছোঁড়া বলকে ফিরিয়ে দেবার মত নির্বিকার ঔদাসীন্যে সৌমেন বাবাকে সব কথা অগ্রাহ্য করতে দেখত। কদিন বাদে অতনুর কল্যাণ কামনায় কালীর কাছে মাকে সৌমেন পুজো দিতে দেখেছিল। দাদা অজয়ও এখন ও-বাড়ীতে নেই। কাকে বিয়ে করে বাড়ী থেকে সরে গিয়েছে। বিজু কোন এক কারখানায় কি একটা কাজ নিয়েছে। শুধু বোধহয় তার বাবাই স্থির আছে। আফিমের প্রভাবে জীবন-প্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গের কূলে বসে নির্ভাবনায় রোদ্দুরে পিঠ তাতাচ্ছে।

বাবাকে সৌমেনের এক বিরাটকায় কীট বলে মনে হত। অথবা মৃত এক শামুকে।

ভাবতে ভাবতে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে সৌমেন চমকে উঠেছিল।—মালিশ হবে বাবু।

চোখ মেলে তাকাতেই দেখে বেঢপ পাজামা আর পাঞ্জাবী পরনে একটা লোক আবছা অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সৌমেন বিরক্ত বোধ করছিল। হাত নাড়িয়ে বিদায় দিতে চাইল। লোকটা তবু দাঁড়িয়েই রইল। সৌমেন উঠে বসল। তারপর তাড়া লাগাল—কি, কি চাই তোমার।

পাঞ্জাবী পাজামা এবার একটু সচল হল। লোকটা মুখ খুলল, একটু থেমে বলল—লেড়কী আছে বাবু, খুপসুরৎ, কলেজ গার্ল। যাবেন?

পলকের তরে সৌমেনের চোখে ভাসল, এক উষ্ণ নারীদেহ, বাসন্তীর। অনেকদিন বাসন্তীর কাছে সে যায়নি। এতদিনে অনেক খদ্দেরের ক্ষুধা মেটাতে মেটাতে বাসন্তী নিশ্চয়ই তাকে ভুলে গেছে।

কিন্তু নগ্ন নারীদেহ যা এক্ষুণি তার চোখে ভাসছিল তা তাকে মোটেই বিচলিত করল না। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, নেহি, যাও।

সৌমেন অফিসের জামাজুতো পরে তার বিছানায় এখনও নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। এক গভীর আঁধারের মাঝে সে এখন নিমজ্জিত। আর এ আঁধারের রাজ্য ছাড়িয়ে আলোর সীমানায় পৌঁছুবার কোন তাগিদ সে বোধ করছে না। নস্যির টিপ তুলবার মত ডান হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে কপালের পাতলা চামড়াকে টেনে তুলবার সে চেষ্টা করছে। তাতে মাথা ধরার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে যেন খানিকটা আরাম অনুভব করছে। হঠাৎ তার স্লিপিং পিলের শিশিটার কথা মনে পড়ল। অনেককাল সে পিল খায়নি কিন্তু আজ তাকে খেতেই হবে। আর খেয়ে স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে বিশ্রাম দিতে হবে। দিনের পর দিন তার নিদ্রাহীনতা, বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে পরিশ্রমকাতর ও উত্তেজিত করে তুলছে। বাক্সটার মধ্যে শিশিটা রয়েছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে। এবং এখনই, নইলে হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার পর তার আর মেজাজ থাকবে না।

সৌমেন আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে অলস দৃষ্টি ছড়াল। শিপ্রা বই খোলা রেখে বাড়ীর মধ্যে গেছে। বইয়ের পাতা ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে।

সৌমেন চোখ বন্ধ করে আলোটা জ্বালল। চোখ বোজা থাকা সত্বেও সে টের পেল এক ঝাঁক বিদ্যুৎ কোথা থেকে হুট করে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারপর ঠিক কখন চোখ খুলবে ভাবতে ভাবতে এক সময় সত্যি সত্যিই সে তাকাল। আর ঘরের সমস্ত জিনিস তার চোখে প্রত্যক্ষ হল। প্রাত্যহিকের স্পর্শ-লাগান পুরোন জিনিসকটি যা দেখতে দেখতে তার চোখ ক্ষয়ে গেছে সেগুলো আলাদা আলাদা ভাবে আর দৃষ্টি দিয়ে না ছুঁয়ে সে জামাকাপড় ছাড়ল। তারপর হাতমুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে ঢুকল। ঢোকার মুখে বাড়ীটার ভেতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ভেতরটা অন্ধকার। মোহিত নেই। খুব সম্ভবতঃ রেবাকে নিয়ে সিনেমায় গেছে। এতও সিনেমা দেখে মোহিত!

সিনেমাটাকে নেশা করে নিয়েছে মোহিত। সৌমেন ভাবছে, তার যেমন তিনপাত্তি খেলাটা। নেশা ছাড়া এ যুগে মানুষ বাঁচতে পারে না। ঈশ্বর-লাভের আকাঙ্খা আর পাপের ভয় মানুষকে আজকাল নাড়া দিতে অক্ষম। মরচে পড়া, ধার ক্ষয়ে যাওয়া বঁটির মত মনুষ্যের ফালতু জিনিসের জঞ্জালে তা অবহেলায় পড়ে থাকে। কাজেই পরলোকের আকর্ষণ ও ধর্মের নেশা টুটে-যাওয়া মানুষ স্বভাবতই কোন পার্থিব তরল নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে চায়।

এখন তার মনে পড়ছে তার মা একদিন দীপুকে চুল ধরে টেনে হিচড়ে মা-কালীর ফটোর সামনে এনে ফেলেছিলেন। দেবীর পা ছুঁইয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটো তখন মূর্তিমান ক্রোধে পরিণত। চুল খুলে অগোছাল। সমস্ত মুখে চটচটে ঘাম আর শরীরের সমস্ত পেশী কঠিন, শক্ত। সে মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু মা-কালীর পা স্পর্শ করে বলে দেওয়া কথা-গুলো আওড়ে যেতে আপত্তি করেনি। কিন্তু পনেরদিন পার না হতেই ক্লাশ এইট অবধি পড়ে ক্ষান্ত দেওয়া উনিশ বছরের দীপু চিড়িয়াখানা সদৃশ বিরাট বাড়ীর আর একটি চিড়িয়ার সাথে পালিয়ে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তার দেখে সৌমেনের হাসি পেয়েছিল, ভীষণ হাসি। চুনবালি খসে পড়া তাদের ঘর-খানার মাঝে অট্টহাস্যে তার খানখান হয়ে ভেঙ্গে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। তার মন এক প্রচণ্ড খুশীতে নেচেছিল মেঘডাকা ময়ূরের মত। সে কি মায়ের পরাজয়ে না একটা খাবার মুখ কমে যাওয়াতে সৌমেন আজও জানে না।

কিন্তু মোহিত সিনেমার নেশায় মগ্ন হতে চাইলেও রেবা সিনেমাতে খুব আকর্ষণ বোধ করে না। সে বরং মাঝে মাঝে সৌমেনকে ধরে টানতে ভালবাসে। বছর কয়েক আগে সেই বিসদৃশ বাড়ীটা হতে বেরিয়ে আসার সময় আগ্রহ করে রেবাই তাকে এখানে এনেছিল। মাঝে মাঝে রেবা তাকে আফিসে যেতে দেয় না। মোহিত অফিসে বেরিয়ে যাবার পর খেয়ে দেয়ে দুপুরে তাকে নিয়ে রেবা রাস্তায় নামে। আর বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক—কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত খালি বাসে রেবা সৌমেনকে পাশে নিয়ে বসে। আর বামবাহু অথবা দক্ষিণবাহুতে তীব্র দহন অনুভব করতে করতে সৌমেনের মনে হয় তাদের দুজনের দুটো মন যেন দুটো সাপের মত জড়িয়ে পাক খাচ্ছে।

বাক্সটা খুলে ফেলেছে সৌমেন। ডাইনে বামে একোণে ওকোণে আঙ্গুল ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করল। স্লিপিং পিলের শিশিটা হাতে ঠেকছে না। কাপড়গুলো ওপর থেকে তুলে মেঝেতে ডাই করতে লাগল। আর বাক্স খালি হতেই এক কোণে তার চোখে পড়ল লম্বাটে শিশিটা। কিন্তু তৎক্ষণে সৌমেনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে বাণ্ডিল দু'তিন চিঠির 'পরে। একটা প্যাকেট হাতে তুলল সে। পুরোন সোঁদা সোঁদা গন্ধ তার নাকে লাগল। সব তার লেখা চিঠির কপি। লেখা হয়েছিল অনুপমকে।

অথচ অনুপমের লেখা চিঠি একখানাও নেই। এমনকি ছায়ারও নেই। সৌমেনের মনে পড়ছে এককালে নিজেকে সে ভালবাসতে পেরেছিল। আমি সৌমেন-প্রেমে মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সৌমেনের চিন্তা-ভাবনা লেখা—সৌমেন সম্পর্কিত সব কিছু আমার কাছে এত প্রিয় ও অনুরাগের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আমার আর অন্য কিছুতে মন ছিল না। অথবা অন্য সব কিছু থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে এনে আমি আত্মস্থ হতে চেয়েছিলাম। সবাইকে অবাঞ্ছিতের মত সরিয়ে দিয়ে আমি নিজের মাঝে মগ্ন হয়েছিলাম।

তাই আজ অনুপমের চিঠি, ছায়ার চিঠি, তপেনের চিঠি—কিছু নেই, কেউ নেই! কিন্তু সেই সৌমেন-ভালবাসাও আমি ধরে রাখতে পারিনি। আমি আস্তে আস্তে সৌমেন সম্বন্ধেও নিস্পৃহ হয়ে গেলাম। আমার মনটা এক বন্ধ্যা সমভূমি হয়ে গেল। বৃষ্টিহীন, বায়ুহীন, তাপহীন এক পাথুরে ডাঙ্গা আমি। আমার কাছে প্রতিটি দিন অন্য-দিনের সমান্তরাল, প্রতিটি রাত অন্য রাতের প্রতিভূ। সন্ধ্যা আমার কাটতে চাইত না। এখানে ওখানে ঘুরতাম উদ্দেশ্যহীন, নির্দেশশূন্য, বাসনা জাগলে আর বাসনাকে ঘিরে দেহমন অনবরত পাক খেতে থাকলে পকেটে হাত দিতাম। টাকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে আমি মাঝে মাঝে

বাসন্তীর ওখানে যেতাম ক্ষুধা মেটাতে আর ক্ষুধা জাগাতে। এখন আর যাইনে। সময় কাটাবার পথ খুঁজিনে। এখন সোজাসুজি সত্যেনের ওখানে চলে যাই। সত্যেন আর ওর রুমমেট অরবিন্দ অপেক্ষা করে আমাদের জন্যে। আমি যাই, অশোক আসে। রবি আসে সবার শেষে। আর সত্যেন খিস্তি করে, বউয়ের গন্ধ ছেড়ে আসতে পারলে বাপধন। রবি কান্নার মত মুখ করে। কি বলতে যায় কিন্তু কথাটা যেন গলায় আটকে যায়। একটু বাদে সামলে নিয়ে বলে, স্বরটা কেমন ক্লান্ত শোনায়—তবু তো আসি। না এসে পারিনে। তারপর তারা তাশ বাটবে। প্রায় নিঃশব্দে খেলা চলবে। শুধু পয়সার টুংটাং মিষ্টি শব্দ উঠবে। তার রুপোলী পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের চোখ কখনও সখনও চিকচিক করে জ্বলবে। চশমা চোখে অশোক বিরক্ত হয়ে শুধু মাঝে মাঝে বলবে, সত্যেন তোদের এ ডুমটা পাল্টা, তাশ প্রায় চিনতে পারছিনে। ম্যানেজারকে অন্ততঃ ষাট পাওয়ার লাগিয়ে দিতে বলিস। নইলে তুইই বদলে নিস।

শুকিয়ে যাওয়া গাছের মত স্থাণু নিষ্ক্রিয় সৌমেন মেঝের 'পরে ডাই করে রাখা কাপড় জামার পাশে বসে হাট করা প্রায় শূন্য বাকসটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে ভাবছিল। হাতে তার একতাড়া চিঠি। তার মাঝে পুরোন সৌমেনের গন্ধ।

সৌমেন ততক্ষণে তার এক চিঠির মাঝে ডুব দিয়েছিল।

'অনুপম তুমি আমার দিনগুলোর খবর জানতে চেয়েছ। তা দিনগুলো কাটছে মন্দ নয়—বিরক্তি, ব্যস্ততা, ভাল-বাসায় মাখামাখি দিনগুলো। সকালে উঠেই স্পষ্ট বিরক্তি, শ্রীমান মনখারাপ অফিসে যাবার কথা মনে পড়াতে। মনটা চায় কুঁড়েমি করতে, ভাবতে, পড়তে, কখনও বা লিখতে। সেই একই সময়ের জন্যে অফিসে যাবার জন্যে ডানা ঝাপটান—কষ্ট হয় (এটা মার্চ মাস—এরই মধ্যে আমার দশদিন ক্যাজুয়াল লীভ চলে গেছে)। তবু নানা পন্থা। বিরক্তি চেপে, কষ্টটুকু বুকে করে সেই ছককাটা পথে পদক্ষেপ।

ছ'চোগেলার মত অফিসের সময়-টুকুকে গিলি। কখনও কাজের চাপে দিশাহারা, কখনও দৈনন্দিন (দৈনিকও বটে) খবরগুলোকে নিয়ে গুলতানি, কথার হাউইয়ের ছড়াছড়ি, ঠাট্টা তামাসা তর্ক (বহু পুরোন ও বহুকথিত ঠাট্টা-গুলোকে আমরা ঘুরে ফিরে বলি, হাসি, হাসাই); আবার কখনও বা কাজ আর কথাকে ঠেলে দিয়ে সময়ের বুকে সাঁতরাই ভাবনা জুড়ে জুড়ে। আমি তখন নিথর মৌন। শুধু সিগারেটের গন্ধ ভাসে আমার চারধারে।

বিকেলে অফিস শেষে, আর সাথে সাথে এক প্রবল ক্লান্তি, আমার মনের 'পরে এক জগদ্দল পাথর, আমার চিন্তায় কি এক বিষণ্ণতা Waste, a colossal waste. সমস্ত দিনটাই আমার শুয়োরের মাংস হয়ে গেল পুরোন রসিকতার জের টেনে টেনে, স্থূল আদি রসাত্মক কথাবার্তা শুনে হাসতে হাসতে। ওহ্, হাসতে হাসতে আমি যদি কাঁদতে পারতাম!

কিন্তু সূর্যালোক নিভে আসা বিকেলের গরম আলোর মাঝে এসপ্লানেডে এসে দাঁড়াতেই মনটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর খুশীতে উচ্ছল। ততক্ষণে অফিসের গন্ধ মুছে ফেলে আমি পৃথিবীর গন্ধ গায়ে মেখে নিয়েছি। বিকেলের হাওয়াকে বলতে ইচ্ছে হয়—এই যে তুমি, বন্ধু, এসেছ—মুক্তি নিয়ে, ভালবাসা নিয়ে। মনে মনে ভাবি—এই যে আমার জীবন, আমার মুক্তি—এই যে আমি। আমি মরে গিয়ে-ছিলাম, সমস্ত দিনভর আমি মৃত আমি হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মাংস, আত্মা (অথবা আমার ইচ্ছা বাসনা সাধ) আমি বিক্রী করে দিয়েছিলাম, এখন আমি আবার আমাকে ফিরে পেয়েছি, এই যে আমি—আমি, সন্ধেটুকুকে নিয়ে আমি মাতাল হতে চাই, পাগল হবার সাধ জাগে। রাতটুকু থেকে কি এক ঐশ্বর্য আমি নিংড়ে বের করতে চাই—কি এক সম্পদে সেও আমায় বলীয়ান করতে চায়—কিন্তু কোনক্রমেই সাফল্য আমার করায়ত্ত হচ্ছে না। সাধ্য না থাকার দরুণ আমার প্রবল সাধ রাতের আঁধারের বুকে এক আর্তনাদের জন্ম দেয়। আমি রোজ অসীম তৃষ্ণা বুকে নিয়ে ঘরের আলো নেবাই।

কিন্তু তার পরও কি রেহাই আছে। আমার চোখের স্পষ্ট নিদ্রাবিহীনতার বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হই। অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হবার পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তারপর নিদ্রাদেবী দয়াপরবশ হয়ে আমায় আশ্রয় দেয়। তাও পরিপূর্ণ অভয়ের সাথে নয়।'

অনেকদিন বাদে সৌমেন পুরোন চিঠির কপি পড়তে কৌতুক বোধ করছে, বিদ্রূপে তার ঠোঁট বেঁকে গেল। ছেলে-মানুষের মত উচ্চরোলে তার হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে হাসল না। পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসা সৌমেন চিঠি থেকে শুধু মাথা তুলল তার চোখ কুঁচকে একটা যন্ত্রণাকে বিদায় করতে চাইল।

আর তখনই সৌমেনের ছায়ার কথা মনে পড়ল। কিন্তু ছায়ার চেহারাটা সে কিছুতেই মনে আনতে পারছে না, তার মনে পড়ছে না। চোখ, নাক, কপাল, ঠোঁট, চিবুক, গলা—সব মিলিয়ে ছায়ার যে আলাদা বাহ্যিক অস্তিত্ব সেটা সৌমেন কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না। চেষ্টা করে করে সৌমেন অবশেষে ক্ষান্ত দিল।

হঠাৎ খস্‌খস্ একটা আওয়াজ উঠতেই সৌমেন মুখ তুলল। তার ডান-দিকের দেয়ালের কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্র্যাকেটটার পাশে একটা অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি ঝুলছিল। সেই ছবিটার ওপর দিয়ে দ্রুত একটা টিকটিকি ছুটে

গেল একটা আরশুলার পিছু পিছু। কিন্তু আরশুলা শিকারে ব্যর্থ হয়ে টিকটিকিটা খানিকদূরে এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর টিকটিকির দ্রুত পদসঞ্চারে ক্যালেন্ডারটা মদির কটাক্ষসহ সেই স্বল্পবসনা মেয়েটিকে নিয়ে ডাইনে বামে দেয়ালের 'পরে দুলতে লাগল।

ক্যালেন্ডারটির দিকে তাকালেই তার বাসন্তীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বাসন্তীর ওখানকার আর আর মেয়েগুলোর কথা।

মোহিত তাকে এই ক্যালেন্ডারটা দিয়েছিল। দেবার সময় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলেছিল, তোমার ঘরে রেখে গেলাম। রেবার জ্বালায় ঘরে রাখার উপায় নেই। বলে—এখানে ছেনালীপনা চলবে না। মাঝে মাঝে তোমার ঘরে এসে বরং দেখা যাবে।

সৌমেন হাসছে। মোহিত তুমি রেবাকে লুকিয়ে নগ্ন ছবি দেখতে চাও। অশ্লীলতা তোমায় সমানে টানছে। আর পা ছুঁইয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে রেবা তোমাকে ফাঁকি দিয়ে রেস্তোরার চোরকুঠরীতে আমায় নিয়ে বসে। পায়ে কেমন এক আদুরে ভঙ্গিতে বলে, সৌমেন এবার একটা বিয়ে কর—কেমন! আমার বোনকে তোমার পছন্দ হয়?

আর আমি? আমি ওর গলার স্বরে টের পাই ওর মনে এক ভূমিকম্পের ধ্বস নেমেছে, এক অবুঝ আকাঙ্ক্ষায় ও কাঁপছে। উত্তর না দিয়ে (কেননা, উত্তর ও সত্যি সত্যিই চায় না) খেলার ছলে ওর হাতখানা নিয়ে আমি পিষি।

মোহিত ফাঁকি দিচ্ছে, ফাঁকি দিচ্ছে রেবা। রবি বৌকে ফাঁকি দিয়ে জুয়া খেলে দিনের পর দিন। জেনেশুনেই ফাঁকি দিচ্ছে। আর আমি? আমি সময়ের হাত থেকে পালিয়ে রোজ সতোনদের আসরে গিয়ে জুটি।

আমরা প্রত্যেকেই কাউকে না কাউকে ফাঁকি দিই। ফাঁকি দিচ্ছি—কেননা উপায় নেই। কিন্তু এতেও আমরা কিছু লাভবান হচ্ছিনে। আমরা অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তি, ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিনে।

হঠাৎ সৌমেনের মনে হল—সে গরমে ঘামছে, আর বুক আর পিঠের ওপর দিয়ে ঘামের বিন্দুগুলো পিলপিল করে নামছে। ঘাড় আর কপালটা ভেজা ভেজা লেপটান। মাথাটা তার প্রায় যন্ত্রণায় টনটন করছে। আর বাঁ দিকের কপালটা দপদপ করছে। গায়ে জামাটা গলিয়ে সে চট করে বেরিয়ে গেল।

সৌমেন হোটেল থেকে একেবারে খেয়েদেয়ে ফিরল। সামনের পাঁচ বাই দুয়ের সি বাড়ীর শিপ্রা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে। তারও শোয়ার আয়োজন করতে হবে। মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা কাপড়-চোপড় কাগজপত্রের থেকে স্লিপিং পিলের শিশিটা সে খুঁজে বার করল। ট্রেন ফেল করার ব্যস্ততা নিয়ে সৌমেন অন্য জিনিসগুলো বাক্সের মধ্যে কোন-রকমে ঢুকিয়ে রাখল। চকচকে শিশিটা প্রায় ভর্তি। হাতের মুঠোতে নিয়ে বার দুইতিন সে নাড়ল। শিশির ভেতর পিলগুলো যেন খুশীতে হাসল। আর নড়তে চড়তে ঝনঝন শব্দ করল। কটা খাবে সৌমেন ভাবছে। দুটো তিনটে চারটে না আরও বেশী। সৌমেন মনে করতে পারছে না। তার ডাক্তারবন্ধু দেবাশীষ এককালে তাকে কি সব বুঝিয়ে বলেছিল। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব বুঝিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল, তার ভারগ্রস্ত মাথা সে সব অঙ্কের সাবধানী হিসেব একদম গুলিয়ে ফেলেছে। কটা খেলে প্রগাঢ় তন্দ্রায় সে ঢলে পড়বে অথচ চৈতন্যের এপারে থেকে যাবে আর কটা তাকে চৈতন্যের পরপারে পৌঁছে দেবে সেসব সৌমেনের স্মরণ নেই। তবে নিশ্চয়ই দু একটায় কোন কাজ দেবে না।

আর ডোজ বেশী হলেই বা ক্ষতি কি! শুধু মোহিত কাল সকালে খবরের কাগজটা নিতে এসে তাকে তুলতে পারবে না। প্রথমে সে বিরক্ত হবে, পরে ভয় পাবে। আর সে নিজে সময়কে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। এবার আর অতৃপ্তির কোন প্রশ্ন থাকবে না, অসন্তুষ্টির কারণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হঠাৎ সৌমেনের হাসি পেল। আমি ভাবনায় খুব রোমান্টিক হয়ে পড়ছি। মৃত্যুবিলাসে মগ্ন হচ্ছি।

সিরিয়াস সৌমেন ভাবছে। আমরা সচেতন ভাবে মৃত্যুর কথা বাদ দিয়েও বেঁচে থাকাটা প্রমাণ করতে পারছিনে। আমরা আমাদের জীবনে কিছুই প্রমাণ করতে পারিনে। শুধু আমরা একটা ক্লান্ত স্থবির বৃত্ত পরিক্রমা করে যাচ্ছি। একই জায়গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা ঘুরছি, ঘুরছি আর ঘুরছি। আমাদের জীবনে পুরোন ভাঙ্গা একটা রেকর্ড বেজেই চলছে।

অনেকক্ষণ ধরে সৌমেন বাথরুমে যাবার প্রয়োজন অনুভব করছিল। ফেরার পথে সৌমেন মোহিতদের ঘরের দিকে তাকাল। এদিকের খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের মেঝে একরাশ তীব্র আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আর সেই উজ্জ্বল আলোর নিচে একটুকরো মুগ্ধতা ছবির

"......সৌমেন এবার একটা বিয়ে কর—কেমন!"

মত স্থির। সৌমেনের দৃষ্টি আটকে গেল, সৌমেন দাঁড়িয়ে গেল।

সৌমেন রেবার কথা ভাবছে, মাঝে মাঝে একটা অস্থিরতা রেবাকে পেয়ে বসে। রেবা তখন তাকে আশ্রয় করে। সেটাকে রেবার চিন্তাবিলাস বলে সৌমেন কোনদিন ভাবতে পারেনি। রেবার অস্বাভাবিক দৃষ্টি, গলায় ক্লিষ্ট স্বর—সব মিলিয়ে তার চেতনাকে সৌমেনের কোনদিন কৃত্রিম বলে মনে হয়নি। রেবার মাঝে একরকম অসন্তুষ্টির চেহারা আবিষ্কারে সৌমেন পরোক্ষে খুশী হয়েছিল। আজ এক্ষণে জানলা দিয়ে একটুকরো নীরব নিভৃত সংলাপ দেখতে-থাকা সৌমেনের ভাবনায় বিতর্ক এসে হাজির হল। রেবার দুটো ভিন্নধর্মী রূপ ও দুরকম চেতনার পরস্পর বিরোধিতা সম্পর্কে সে এই প্রথম চিন্তায় গভীর হল। * *

হঠাৎ তার চমক ভাঙল। জানলা দিয়ে রেবা আর মোহিতকে দেখা যাচ্ছে না। ভাবিত সৌমেন ঘরে ঢুকল। তার মনে হচ্ছে রেবা এই যুগ-যন্ত্রণার স্মারক, রেবার মধ্যেই যেন যুগের চেহারা আঁকা রয়েছে। সৌমেনের যেন মনে হচ্ছে জীবন-যন্ত্রণার শান্ত অনুভবের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেই এ যুগের মানুষের মনুষ্যত্বের পারদ ব্যারোমিটারের বুক বেয়ে উঠে কাঁপছে। সৌমেন আর বিচলিত হবে না। এ যুগের গরল আর অমৃত দুই-ই সে ধারণ করবে স্থির শান্ততায়।

স্লিপিং পিলের শিশিটার 'পরে সৌমেনের নজর পড়ল। তার বিছানার 'পরে শিশিটা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তার গায়ে লেখা পয়জন শব্দটা সৌমেনের চোখকে ভীষণ পীড়িত করছে।

শিশিটার দিকে তাকাতে তাকাতে সৌমেন ভাবছে। এক যন্ত্রণার হাত থেকে পালাবার বাসনায় সে একদিন চিড়িয়াখানা সদৃশ বাড়ীটার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু জীবনে সে যন্ত্রণাকে এড়াতে পারল কই! আজকাল সে সময়ের হাত থেকে পালাবার জন্যে রোজ সত্যেনদের আসরে গিয়ে জোটে। এক তরল নেশায় সে ডুবে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্লান্তি সে এড়াতে পারছে কোথায়!

উন্সমনিয়াটা তার একিউট স্টেজে এসে পৌঁছেছে। গত ক' রাত তার প্রায় ঘুমই হচ্ছে না, কপালটা দপদপ করছিল আর চোখ দুটো জ্বলছিল। মাথাটার মধ্যে যন্ত্রণার পাথর ভাঙছিল নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে। স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমোবার বাসনা সে পোষণ করছিল। এখন ভাবছে কোন যন্ত্রণাই এ পৃথিবীতে এড়ানো যায় না। শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা আর যন্ত্রণার স্বরূপ প্রকৃতি মনন দিয়ে বিশ্লেষণ করা ছাড়া মানুষের করণীয় আর কিছু নেই।

আগামীকালই সে তাদের সেই চিড়িয়াখানা সদৃশ বাড়ীতে ফিরবে। স্লিপিং পিলের শিশিটা জানলা দিয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গলির বুকে একটা ছোট্ট শব্দ জেগে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সংগীত বীক্ষা
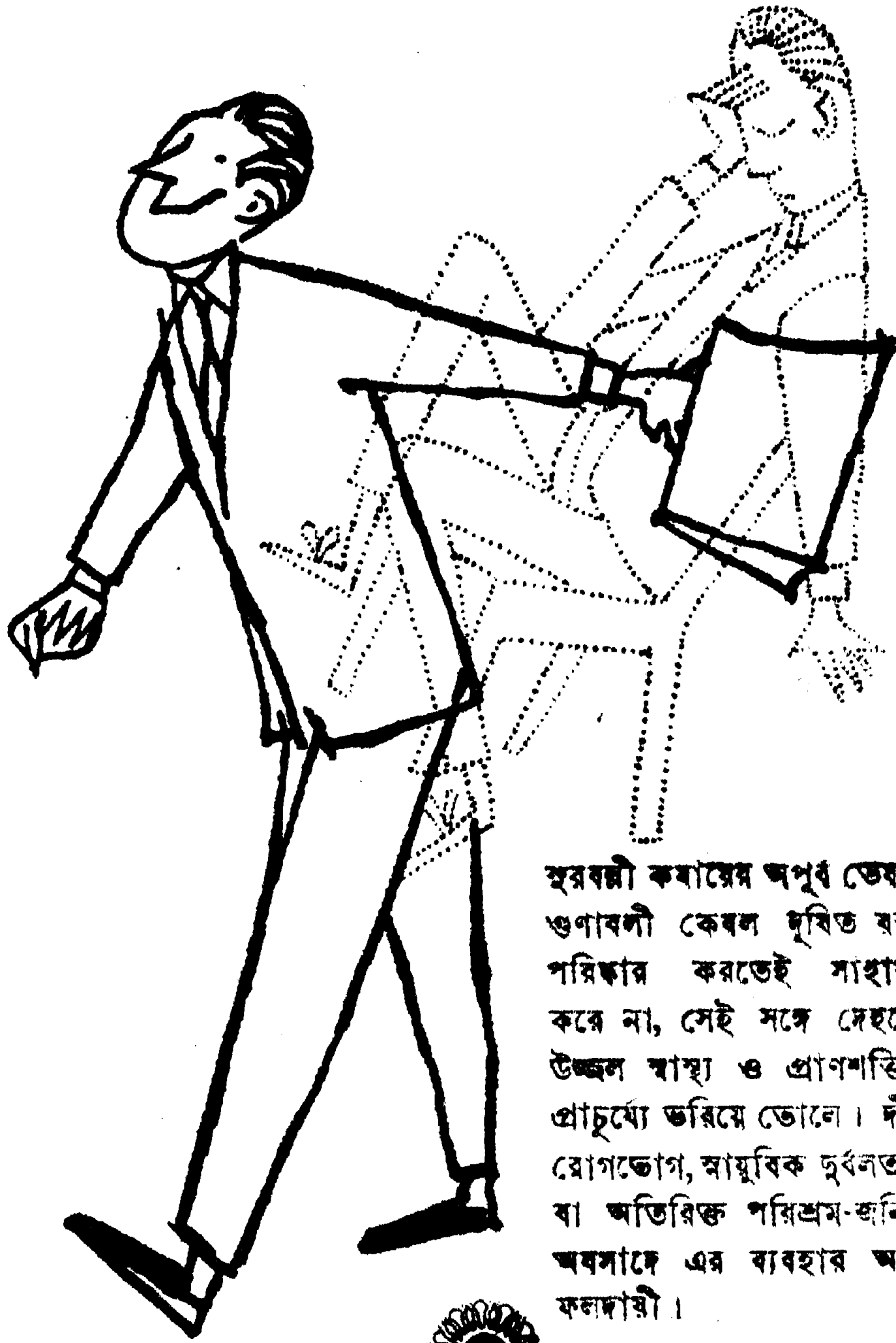
আনন্দ ভৈরব
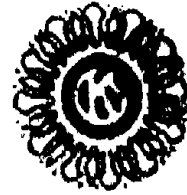
সংগীত সম্মেলন

প্রতি বছর প্রধানত শীতকালকে কেন্দ্র করে কলকাতায় নানা সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের আবহাওয়া অন্যান্য বারের মতো না হলেও এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পালা আরম্ভ হয়েছে। এই-সব সংগীত সম্মেলনে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী-গণ তাঁদের সংগীত-পরিবেশন দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দান করেন। মানুষের জীবনে এরূপ আনন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আনন্দ লাভ করার পন্থা সকলের একরূপ নয়। শিক্ষার্থী শিক্ষক সমঝদার সমালোচক ও সাধারণ-শ্রোতা-ভেদে আনন্দলাভের পন্থা ও পরিমাণের তারতম্য লক্ষিত হয়।

আর একটি দিক আছে। সেটি হল শিক্ষার দিক। আমাদের দেশে সংগীত-শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমশ অধিকতর বিস্তৃত হচ্ছে। এখনও মতান্তর ও অসামঞ্জস্যের বহু বিষয় আছে যেগুলি সংগীত সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য-যুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে সংগীত-কীর্তিবান 'চতুর পণ্ডিত' বিষ্ণু-নারায়ণ ভাতখণ্ডের কথা মনে পড়ে। তাঁর উদ্যোগে ও গাইকোয়াড় মহারাজের সহায়তায় ১৯১৬ খৃস্টাব্দে বরোদায় প্রথম যে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছিলেন :

"মেরা উদ্দেশ্য ইস প্রতিনিধি সভা কে সামনে অপনী পদ্ধতি কো রাখনে কা কেবল য়হী হৈ কি মৈঁ চাহতা হুঁ কি মেরে ইস অসম্পূর্ণ কার্য কী ওর সমর্থ প্রতিনিধিয়োঁ কা ধ্যান আকর্ষিত হো জাবে, তাকি উনকী সহায়তা সে মৈঁ ইসে পূর্ণতা প্রদান কর সকুঁ ঔর জব বিশ্ববিদ্যালয় উসকী মাঙ্গ করে তো এক সর্বাঙ্গপূর্ণ পদ্ধতি উসে হম দে সকেঁ।"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রধানত উত্তর-ভারতীয় সংগীত সম্পর্কেই এই উক্তি করেছিলেন। এ-বিষয়ে সকলের পক্ষে গ্রাহ্য একটি 'সর্বাঙ্গপূর্ণ পদ্ধতি' স্থিরীকৃত করা সহজ কাজ নয়। অথচ ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োজন। আজও বহু রাগের ক্ষেত্রে নিয়মের একীকরণ আবশ্যক। তা ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যা ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। সংগীত সম্মেলনে বিশিষ্ট গুণীগণের উপস্থিতিতে সে-সম্বন্ধে কার্যকর আলোচনা হতে পারে। এরূপ আলোচনার শ্রোতা কেবলমাত্র টিকেট-শ্রোতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সংগীততত্ত্বানু-সন্ধানী ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা যায় কিনা বিবেচ্য। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এরূপ আলোচনায় টিকেট-ক্রেতা শ্রোতা খুব কমই উপস্থিত থাকেন অথচ এরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ সংগীতের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি সমঝদারের সংখ্যাও বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন। সমঝদারের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধির পক্ষে সহজে প্রবেশাধিকারলভ্য আলোচনা আংশিক-ভাবে সাহায্য করে বই-কি।

প্রতি বৎসর এই-যে সংগীত সম্মেলনে বহু শিল্পী ও বিখ্যাত শিল্পীগণ গীত বাদ্য ও নৃত্য পরিবেশন করেন তাতে নূতনত্ব ও অভিনবত্বের সন্ধান মেলে কিনা তাও ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে। প্রধানত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কলকাতায় সিনেট হলে প্রথম অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের যে অধিবেশন হয় তাতে উদ্বোধন-ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন :

"সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিষ এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে, একথা বলা বাহুল্য।......প্রাণের যে ধর্ম সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। তা যদি হয় তাহলে আমাদের একথা চিন্তা করতে হবেই যে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না।......বড়ো বড়ো লোকেরা শিক্ষা দিয়েছেন তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ কর— সেই অনুপ্রেরণাকে তোমাদের শক্তিতে প্রকাশ কর। তানসেন অনুকরণের কথা বলেননি, এবং কোনো গুণীই তা বলেননি, বলতে পারেন না।"

এই মূল্যবান উক্তিতে যথেষ্ট অনু-ধাবনের বিষয় আছে। কিন্তু তার বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। অন্য যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সেটি হল এই যে শিল্পীভেদে গুণপনার তারতম্য তো স্বাভাবিকই, কিন্তু একই শিল্পী যে স্থলে বছরের পর বছর সংগীত পরি-বেশন করেন সে স্থলে তিনি তাঁর কলাশৈলীতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রস-সৃষ্টিতেও অধিকতর পারঙ্গম হয়েছেন কিনা, সে-বিষয়ও অবশ্য বিচার্য। ক্ল্যাসিকাল গান ও বাজনায় আলাপের মাধ্যমে রাগ-রূপায়ণের স্থান অতি উচ্চে। এক-একটি রাগের যে ধ্যানরূপ বা ভাবরূপ আছে তার সঙ্গে সেই রাগের রসাভিব্যক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। রাগের ভাবরূপের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক-ঠিক রস অভিব্যক্ত করার অধিকার অর্জন করতে না পারলে সার্থক শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয় সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে শ্রোতার পক্ষেও সম্যকরূপে রসগ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এই তো সেদিন শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারে দরবারী কানাড়া রাগের রূপায়ণ করলেন। তাঁর বাজনায় উক্ত রাগের ভাবরূপ ও রসের

সুষ্ঠু অভিব্যক্তি শুনে চমৎকৃত ও পরিতৃপ্ত হয়েছি।

সংগীতশাস্ত্রে 'গানাৎ পরতরং ন হি' বলা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও দেখা যায় সংগীত সম্মেলনে গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা অপেক্ষা নৃত্যানুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা অধিক। সকলেই যে নৃত্যশৈলী দর্শনের অভিলাষে আসেন তা নয়। তা হলে শ্রোতার সংখ্যা-গরিষ্ঠতার কারণ কি? এ বিষয়ে সামান্য বিশ্লেষণ করা ভালো। সাধারণভাবে বেশভূষার পারিপাট্য এবং আংশিকভাবে নর্তক-নর্তকীর চেহারা ও কলাকুশলতা, তাল-ছন্দ-লয়ের উত্তেজনা ও বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক নৃত্যের সমাবেশ দর্শককে আকৃষ্ট করে। নৃত্যের রসগ্রহণের পক্ষে এই বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু আংশিকভাবে নয় সামগ্রিকভাবে। অর্থাৎ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি হলে তবেই নৃত্য দেখা সার্থক হয়।

আর একটি বিষয়ে উল্লেখ করে এই ক্ষুদ্র আলোচনা শেষ করব। ভারতবর্ষের সংগীতে উত্তেজনার স্থান উচ্চে নয়, নিম্নে। গীত বাদ্য বা নৃত্যে দ্রুতলয়ের উত্তেজনাকেই যদি সংগীতের চরম উৎকর্ষ বলে ধরে নেওয়া যায় তা হলে শিল্পীর প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, শ্রোতার বা দর্শকের সমঝদারিত্বের অধিকারী হওয়ার আশাও সুদূরপরাহত হয়। এবারকার সংগীত সম্মেলনের প্রাক্কালে বিষয়টি স্মরণ রাখা ভালো।

॥ সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন ॥

গত ৯ই নভেম্বর থেকে নবম বার্ষিক নিখিল ভারত সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন কলকাতায় মহাজাতি সদনে আরম্ভ হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তানসেন নামটি যেমন, অন্যদিকে নিয়ামৎ খাঁর নামটিও বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মতো। মুখ্যত ধ্রুপদ ও বীণাযন্ত্রের কলাকার নিয়ামৎ খাঁ তাঁর সংগীতপ্রতিভার জন্য বাদশাহ মহম্মদ শা কর্তৃক 'শাহ সদারঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত হন। পারস্যের আমীর খসরু প্রবর্তিত খেয়াল গানের নবরূপায়ণ ও বহু খেয়াল গানের রচনা দ্বারা খেয়ালকে জনপ্রিয় করে তোলা সদারঙ্গের অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁর নামে নামাঙ্কিত উক্ত সম্মেলন ৯—১৭ নভেম্বর এই নয় দিনের নয়টি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়েছে।

৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার কর্তৃক গীত 'বন্দেমাতরম্' সংগীত দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত এই গানটি বিশেষ সময়ের পটভূমিতে সৃষ্ট হলেও গানটি যে সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে চিরভাস্বর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাজাত্যবোধে ও জাতীয়তাবাদের জাগরণে এই গান মন্ত্রের মতো কাজ করেছে, আজও করছে। প্রথম সংগীত অধিবেশনের সূচনায় ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করেন ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁ। প্রতি বৎসর কোনো-না-কোনো সংগীত সম্মেলনে তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় এই গুণীর ধ্রুপদ শোনার সুযোগ হয়। দবীর খাঁ সাহেব বহুদিন কলকাতায় আছেন। ভবিষ্যতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বা শিষ্যদের কণ্ঠে ধ্রুপদ শোনার আশা করব। এই অধিবেশনে শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক কর্তৃক পরিবেশিত বেহাগ রাগের রূপায়ণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিষ্ণু দিগম্বর ঘরানার অন্যতম ধারক পণ্ডিত বিনায়ক নারায়ণ পটবর্ধনের সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীমতী পটনায়ক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাগ-রূপায়ণ করলেন। তা ছাড়া, সঙ্গীত-পরিবেশনকালে তাঁর তন্ময়তা প্রশংসার দাবি রাখে।

তৃতীয় অধিবেশনে পূরিয়া-মার্গ-বেহাগ-কেদার রাগ পরিবেশন করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী। স্পষ্টতই এটি সংকীর্ণ রাগ, মিশ্রণটিও অভিনব। ছায়ালগ ও সংকীর্ণ রাগের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণ শুনতে অভ্যস্ত এবং মনে হয় তাতে blending হয় ভালো। এরূপ মিশ্রণের প্রধান তাৎপর্য হল এই যে এক-একটি রাগের স্বাধীন সত্তা অন্য সমপ্রকৃতি রাগের সহিত যথাসম্ভব ওতোপ্রোতভাবে মিশে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূরিয়া, মার্গবেহাগ ও কেদার রাগের মিশ্রণের তাৎপর্য আমাদের কাছে ঠিক-ঠিক ধরা পড়েনি। গায়নের পূর্বে শিল্পী একটু ব্যাখ্যা করে দিলে সুবিধে হত। সেতারে জোগ রাগের সুষ্ঠু রূপায়ণ করলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এই রাগে তিলং রাগের আবেদন মুখ্য, তার সঙ্গে মালকোষের আবির্ভাব surprise দেয়।

চতুর্থ অধিবেশনে হারমোনিয়মে বসন্ত রাগ পরিবেশন করেন শ্রীমন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সহকারিতা করেন তাঁর পুত্র শ্রীমহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলা সংগত করেন শ্রীকানাই দত্ত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন ভালো, আরো তাঁর সুন্দর মেজাজের গুণে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে। নবাগত শিল্পী গোলাম হাসান সাগ্গান কর্তৃক মালকোষ রাগের রূপায়ণ অভিনন্দন-যোগ্য। সূচনায় গীত রাগলক্ষণ অনুযায়ী মালকোষ রাগকে ভৈরবী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়ে মতান্তর থাকা সম্ভব।

পঞ্চম অধিবেশনে শঙ্করা রাগ পরিবেশন করেন শ্রীমতী গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল। তাঁর সঙ্গে সহকারিতা করেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণ হাঙ্গল, তবলায় সংগত করেন শ্রীশেষগিরি হাঙ্গল। এই অনুষ্ঠানে রাগ-রূপায়ণ চমৎকার হয়েছে। শ্রীমতী কৃষ্ণ হাঙ্গলের কণ্ঠস্বর বেশ ভালো। তবে অন্যবারের তুলনায় এবারে তিনি কণ্ঠসহযোগিতা অপেক্ষাকৃত কম করেছেন বলে মনে হল। কথক নৃত্যে শ্রীমতী রোশনকুমারী তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-সংগত এই অনুষ্ঠানকে উদ্দীপিত করেছে। এবারে শ্রীমতী রোশনকুমারীর নৃত্যে লয়কারি যতটা হয়েছে, সেই তুলনায় ঘুঙুরের সূক্ষ্ম ঝংকারের মাধ্যমে লয়কারির অংশ প্রদর্শিত হয়েছে কম। এই প্রসঙ্গে আনন্দভৈরব একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চায়। কথক নৃত্যে এক-একটি বোলের শৈলী প্রদর্শন করার জন্য সেই বোলের গঠন অনুযায়ী লয় কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে হয়। তাতে বিলম্বিত থেকে ক্রমশ মধ্য ও দ্রুত লয়ের দিকে গতির জন্য যে উপভোগ্যতা হবার কথা তা যেন ক্ষুন্ন হয়। নৃত্যখণ্ড-গুলিকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি ক্রমিক লয়ের সূত্রে গ্রথিত করা যায় কিনা নৃত্য-বিশারদগণ বিবেচনা করলে ভালো হয়।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পরে আলোচ্য।

দেশে বিদেশে

॥ সীমান্তের সংবাদ ॥

নেফা ও লদাক উভয় রণাঙ্গনেই প্রায় পক্ষকাল অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে গুলীবিনিময় ও ছোটখাটো অনুল্লেখ্য সংঘর্ষ ছাড়া আর কোন সংবাদ কোনদিক থেকে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং তাতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, সমগ্র ভারতভূমি শত্রু-কবলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না। সংসদের সকল দলও প্রধান-মন্ত্রীর এই ঘোষণাকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা একমনে সর্ব সামর্থ দিয়ে সরকারের যুদ্ধ প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে যাবেন।

স্বভাবতই এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শত্রুর অগ্রগতি না হয় রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাকে বিতাড়নের উদ্যোগ কোথায়? রণভূমিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি শত্রু বিতাড়িত হবে? ইতি-মধ্যে শত্রুপক্ষ যদি আরও বেশী প্রস্তুত হয়ে অগ্রগমনের চেষ্টা করে তখন আমরা কি করব? সুতরাং শীত থাকতে থাকতেই আঘাত হানা উচিত নয় কি?

দেশকে আমরা শত্রুমুক্ত দেখতে চাই, তাই আমাদের মনে এসব প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের স্থির মস্তিষ্কে এ কথাটা বোঝা দরকার যে যুদ্ধ মানে শুধুই আক্রমণ নয়। হঠাৎ আক্রমণে হয়ত সাময়িক কিছু লাভ হতে পারে কিন্তু সে লাভ স্থায়ী হয় না। চীনের প্রাথমিক সাফল্যের বর্তমান পরি-ণতিই তার পরিচয়।

ইতিপূর্বে চীন যেমন তার জাতীয় জীবনে 'Twenty years in a day', 'Great leap forward' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে ও তারপর কতকগুলি হঠকারিতামূলক কাজ করে চরম অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, আজ রাতারাতি ভারত দখলের দুর্বুদ্ধি নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে নেমেও তারা একই-জাতীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ভারত দখলের অদ্ভুত চিন্তায় চীন তিব্বতে লক্ষাধিক সৈন্যের সমাবেশ করেছে। কিন্তু তিব্বতে বৌদ্ধ মঠগুলি ছাড়া এমন কোন আচ্ছাদিত স্থান নেই যেখানে এই প্রচণ্ড শীতে সৈন্যদের রাখা যেতে পারে। তিব্বতে এখন তুষারপাত শুরু হয়েছে এবং ঐ অঞ্চলের রুক্ষ আবহাওয়ার সঙ্গে সমতল অঞ্চলের চীনাদের কোনই পরিচয় নেই। তার পরেও আছে সৈন্যদের নিয়মিত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের সমস্যা। তিব্বতের নিকটবর্তী এলাকায় অতি সামান্যই খাদ্য পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে ঐ বিরাট সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের প্রয়োজন কোন-মতেই মেটা সম্ভব হবে না। অথচ শীত এখন বাড়তেই থাকবে এবং যুদ্ধেরও সহজে মীমাংসা হবে না। সমগ্র পরি-স্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, চীনকে ইতিমধ্যেই যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার সঙ্গে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া আক্রমণের পর জার্মাণ সৈন্যবাহিনীরই তুলনা হতে পারে। রাশিয়ার প্রবল শীতে মূল ঘাঁটি হতে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত জার্মান সৈন্যবাহিনীকেও ঠিক এই রকম সমূহ বিপর্যয়ে পড়তে হয়েছিল।

এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের অবস্থা এখন অনেক ভাল। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের আনুকূল্যে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদের অভাব ভারতীয় সৈন্যদের কখনও হবে না এবং তা রণক্ষেত্রে সরবরাহ করাও ভারতের পক্ষে খুব কঠিন নয়। সুতরাং ভারতের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালানোর যে সুযোগ আছে চীনের পক্ষে তা নেই। পৃথিবীর কোন উল্লেখযোগ্য দেশের সমর্থন পায়নি চীন, তাই অস্ত্র-শস্ত্রের ভাণ্ডারও তার সীমিত।

আজকের দিনে যুদ্ধের সাফল্য ধৈর্য, মনোবল ও রসদ সামর্থ্যের উপর
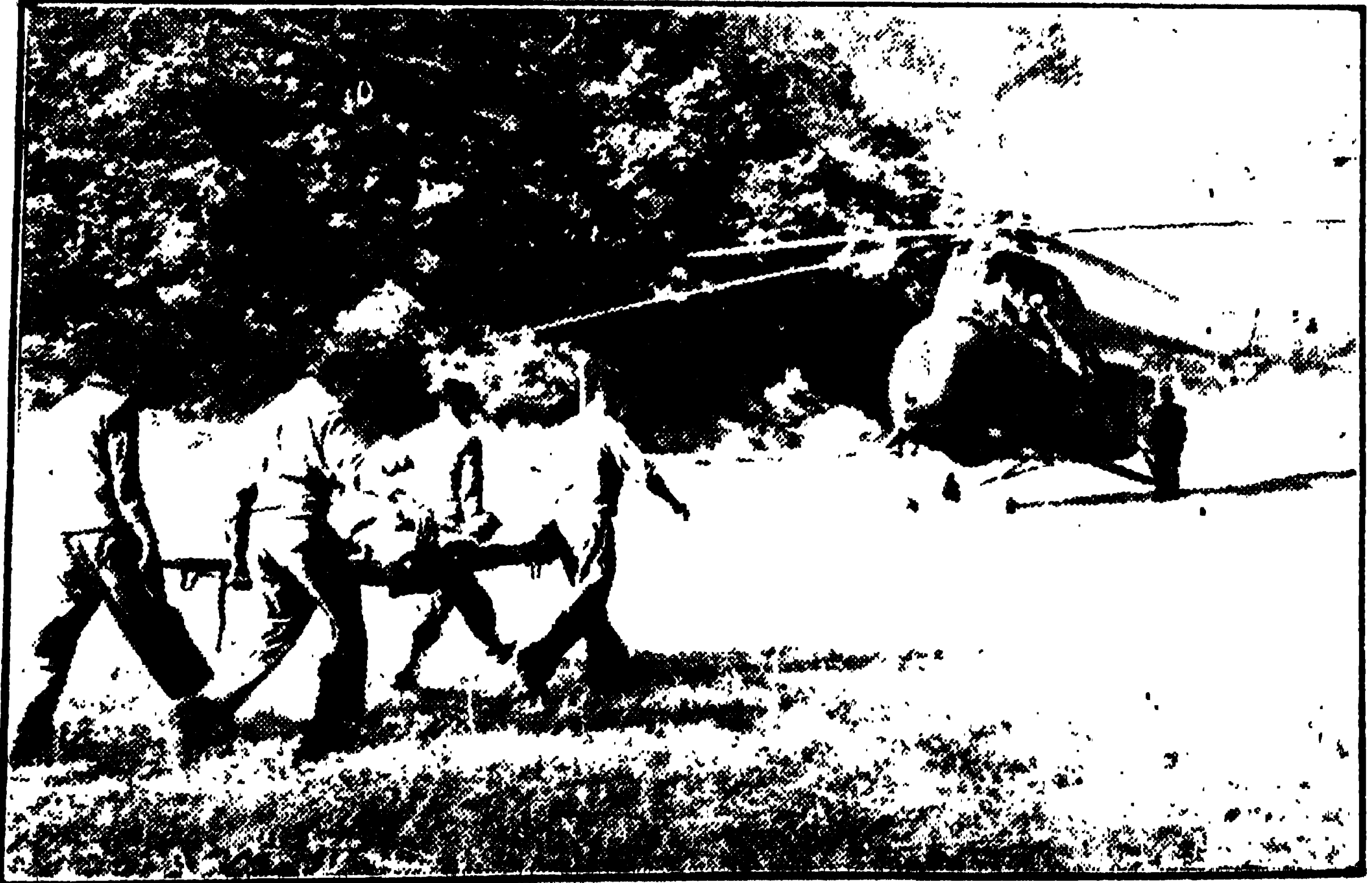
নেফা অঞ্চলে আহত সৈন্যদের প্রাথমিক শুশ্রূষার পর হেলিকপ্টারযোগে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নির্ভরশীল। হঠাৎ আক্রমণ ও প্রাথমিক সাফল্যের মূল্য সেখানে নিতান্তই সামান্য। আধুনিক যুদ্ধে শেষ জয়ই একমাত্র জয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাফল্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুতরাং যুদ্ধের বর্তমান থমথমে ভাবে ধৈর্যহীন বা নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রত্যেকের আজ এটা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার যে, রসদ সরবরাহের সামর্থ্যের উপরেই আমাদের সাফল্য নির্ভরশীল। যুদ্ধের প্রথম সাফল্য কারখানায়, তারপর যুদ্ধাঙ্গনে। তাই কারখানা ও খেত খামারগুলিকে কর্মমুখর রাখাই দেশবাসীর আজ একমাত্র কাজ। রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সৈনিকদের চেয়ে সে কাজ কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম গৌরবের নয়।

॥ দেশবাসীর সাড়া ॥

প্রতিরক্ষা তহবিলে যাথাসাধ্য সাহায্যদানের জন্য সমগ্র ভারতে আজ যেভাবে সাড়া জেগেছে, এদেশের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। কাশ্মীর হতে কেরল, গোয়া হতে নেফা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভারতের কোটি কোটি মানুষের কন্ঠে আজ শুধু আত্মত্যাগের শপথ। ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত শুধু কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা তহবিলেই জমা পড়েছে ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ও ১০ হাজার ৭০০ তোলা সোনা।

এছাড়া প্রতিদিনই সকল রাজ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ও শত শত তোলা সোনা সংগৃহীত হচ্ছে। রক্তদানের জন্যেও এগিয়ে আসছে অসংখ্য নরনারী।

কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তিপণস্বরূপ আজ যে পরিমাণ অর্থ, স্বর্ণ ও রক্তের প্রয়োজন তার অতি সামান্যতম অংশই এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। আরও বহু ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সহায়তার প্রতীকস্বরূপ অন্তত ৪৫ কোটি টাকা জাতীয় শপথ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক পরিবারের কর্তা যদি তাঁর পরিবারভুক্ত সকলজনের হয়ে মাথাপিছু একটাকা দান করেন তবে অতি সহজেই ৪৫ কোটি টাকার ভান্ডার পূর্ণ হতে পারে।

॥ সিকিমে বিপদাশঙ্কা ॥

১৩ই নভেম্বর সিকিমের মহারাজা সমগ্র রাজ্যে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

মহারাজার ঘোষণায় বলা হয়েছে, ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সিকিমের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য সমগ্র সিকিমে নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে।

নেহরুজীর জন্মদিনে

১৪ই নভেম্বর জন্মদিবসে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শ্রীনেহরুকে আলিঙ্গন করছেন।

ইতিপূর্বে আর এক ঘোষণায় সিকিমের মহারাণা ভারতভূমির উপর চীনের আক্রমণের নিন্দা করে জানিয়েছেন, সিকিম তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়াবে।

॥ রুশ-চীন সম্পর্ক ॥

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে মনে হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্ক বর্তমানে আরও খারাপ হয়েছে। কিউবা সংকটের সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন চীন-ভারত সংঘর্ষে চীনের প্রতি যে সামান্য সহানুভূতিটুকু দেখিয়েছিল বর্তমানে সেটুকুও প্রত্যাহৃত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে সর্বশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে বন্ধু ভারত ও ভ্রাতা চীনের মধ্যে বিরোধের আশু মীমাংসাই তার কাম্য, এবং এমন কোন কাজই তার পক্ষে করা উচিত হবে না যা এই দুই দেশের সঙ্গে তার পূর্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

এরপরেই ভারত হতে ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার প্রতিশ্রুতি মত বিমানবহর ভারতকে সরবরাহ করবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত ও ভারতকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বিমানবহর সরবরাহের ঘোষণা চীনের পক্ষে খুবই ক্ষোভের কারণ হয়েছে। চীন প্রকাশ্যেই 'পীপলস ডেলী' পত্রিকায় এই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, এক সমাজতান্ত্রিক দেশ (অর্থাৎ চীন) যখন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা (অর্থাৎ কিনা ভারত) আক্রান্ত (!) তখন সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির এই মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইতিমধ্যে বুলগারিয়ার স্তালীনবাদী নেতৃত্বের অপসারণও
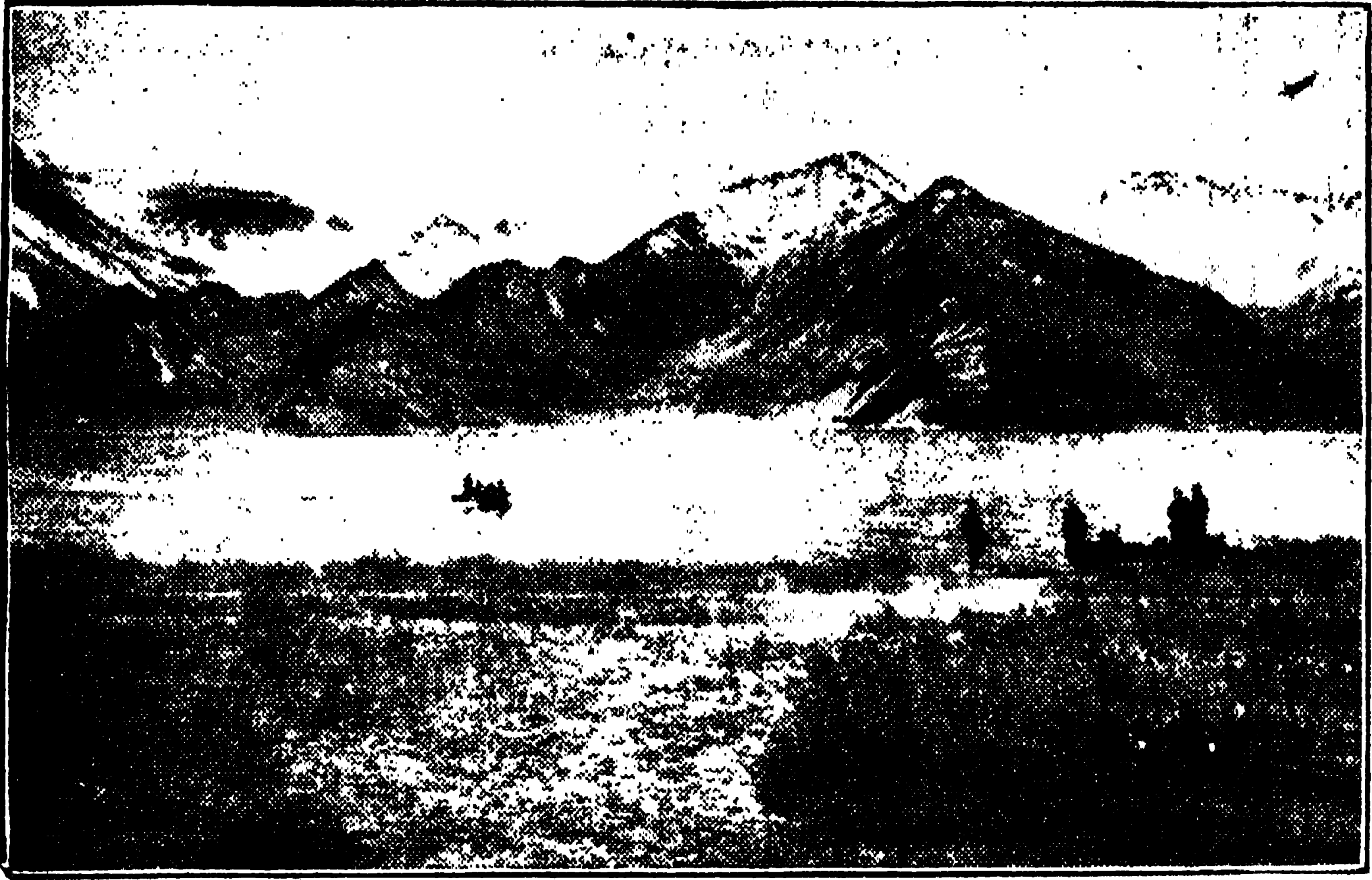
লদাকের পাংগং হ্রদের দৃশ্য—এই ঘাঁটির ভারতীয় জোয়ানগণ প্রভূত শক্তিশালী চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফটোতে ভারতীয় সৈন্যদের পারাপার করতে একখানি নৌকাকে আসতে দেখা যাচ্ছে।

স্তালীনবাদী লাল চীনের পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আলবানিয়ার মত বুলগারিয়াও অনতিবিলম্বে তার পক্ষে যোগ দেবে এই ছিল চীনের আশা। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের ঐ দেশটিতে স্তালীনবাদী নেতৃত্বের পতন হওয়াতে লালচীনের সে আশা নির্মূল হল।

এ সকল কারণে চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে বিরোধ গত কয়েক বছর ধরে সঞ্চিত হচ্ছিল তা হয়ত অনতিবিলম্বেই বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই চীন নাকি পূর্ব ইউরোপের সবকটি কমিউনিষ্ট দেশ হতে তার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের স্বদেশে ফিরে আসার জন্যে নির্দেশ পাঠিয়েছে।

চীনের বিভিন্ন স্থানে রাশিয়ার যেসব বাণিজ্য দূতাবাস ছিল তাদের কাজকারবার বহুদিন আগেই গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। পিকিং ছাড়া চীনের আর কোথাও এখন সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাস নেই। রাশিয়ার বর্তমান আচরণ হতে মনে হয় যে, লাল চীনের জংগীবাদকে আর প্রশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছা তার নেই।

॥ বন্ধুর দান ॥

বৃটেনে কমন্স সভায় চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কিত আলোচনাকালে কমনওয়েলথ সচিব স্যান্ডস জানান যে, ভারতের অনুরোধে ভারতকে যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিনাসর্তে বন্ধুর দানস্বরূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ভারত যা অস্ত্র চেয়েছিল তা সবই তাকে দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিস্তি সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয় বিমানে, বাকি পাঠানো হয়েছে জাহাজে। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে ভারতের অনুরোধমত আরও অস্ত্র বৃটেন ভারতকে দেবে।

॥ মার্কিণ সাহায্য ॥

মার্কিন সাহায্যেরও প্রথম কিস্তি ভারতে এসে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার হতে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, আপাতত আর অস্ত্র ভারতে পাঠানো হবে না। তবে দরকার হলেই ভারতের অনুরোধ রক্ষা করা হবে।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ এক বিবৃতিতে বলেছেন, অস্ত্র সরবরাহকালে ভারতের উপর এমন কোন সর্ত আরোপ করা হয়নি যে, ভারতকে জোট নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে পশ্চিমী শক্তিজোটে যোগ দিতে হবে।

॥ ভারতের প্রতিরক্ষা ॥

ইতিমধ্যে দিল্লীতে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এক ঘোষণায় বলেছেন, ভারতের সমরোপকরণ উৎপাদন গত তিন সপ্তাহে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীগুলিতে এখন দিবারাত্রি কাজ চলছে। ভারতের কারখানায় নির্মিত স্বয়ংচালিত অস্ত্রশস্ত্র হয়ত আর একমাসের মধ্যেই ভারতীয় জওয়ানদের হাতে পৌছে যাবে।

॥ দুর্ঘটনা ॥

গত ১১ই নভেম্বর ভোর তিনটার উত্তর বিহারের সারণ জেলায় মানঝি ও বাকুলাহ ষ্টেশনের মধ্যবর্তী একস্থানে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ছাদের উপর উপবিষ্ট ২৫ জন যাত্রী নিহত ও ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ট্রেনটি একটি ব্রীজের নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। সংবাদে প্রকাশ, নিকটবর্তী একটি মেলার জন্য ঐদিন গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড় ছিল এবং তার জন্যই যাত্রীরা গাড়ীর ছাদে উঠতে বাধ্য হয়।

বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও যাত্রীদের অসাবধানতার জন্যই এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষের অবহেলার প্রতিকার হওয়া সহজ নয়। সুতরাং আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য যাত্রীদেরই সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

॥ ঘরে ॥

৮ই নভেম্বর—২২শে কার্তিক : লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা : যা আসে আসুক, যা ঘটে ঘটুক, চীনের নগ্ন আক্রমণের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করিলাম।

'দৃঢ়তার সহিত চীনের বিশ্বাস-ঘাতকতার জবাব দিতে হইবে'—রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

নেফার ওয়ালং ও জং অঞ্চলে কয়েকটি সংঘর্ষ—চীনাদের উপর ভারতীয় জওয়ানদের প্রত্যাঘাত।

৯ই নভেম্বর—২৩শে কার্তিক : পুণায় বিশিষ্ট সমাজসেবী 'ভারত-রত্ন' ডঃ ডি কে কার্ভের (১০৪) জীবনাবসান।

লডাক রণাঙ্গনে 'চুশুলের নিকট চীনাদের ট্যাঙ্ক আমদানী—নেফায় জং অঞ্চলে শত্রুঘাঁটির উপর ভারতীয় ফৌজের গোলাবর্ষণ।

১০ই নভেম্বর—২৪শে কার্তিক : বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা—দেশব্যাপী সমবায় বিপণি ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত—লোকসভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুল্জারীলাল নন্দের ঘোষণা।

নেফা অঞ্চলের সংঘর্ষে উভয়পক্ষে (ভারত-চীন) কামান ব্যবহার।

'রাশিয়ার নিকট হইতে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি মধ্যে 'মিগ' জঙ্গী বিমান পাওয়া যাইবে' —শ্রীনেহরু কর্তৃক সোভিয়েট প্রেরিত বার্তার বিবরণ প্রকাশ।

১১ই নভেম্বর—২৫শে কার্তিক : উত্তর বিহারে মানঝি ও বাকুলাহা ষ্টেশনের মধ্যে ট্রেণ দুর্ঘটনায় (প্রত্যুষের ঘটনা) ২৫জন যাত্রী নিহত ও তিনজন আহত—ট্রেনের ছাদে বসিয়া ভ্রমণের প্রাণঘাতী পরিণতি।

অননুমোদিত ব্যক্তিদের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ নিষিদ্ধ—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী—অপর অর্ডিন্যান্সে রাজ্যে হোমগার্ড বাহিনী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণ অনুযায়ী ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রিপদ গ্রহণে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবনের সম্মতি।

সীমান্তে চীন-ভারত সংঘর্ষের অবস্থা অপরিবর্তিত—ওয়ালং-এর নিকট উভয়পক্ষে গুলী বিনিময়।

ঘটনা প্রবাহ

১২ই নভেম্বর—২৬শে কার্তিক : 'আজ প্রতিটি ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও আত্ম বলিদানের দিন'—ময়দানের (কলিকাতা) জনসভায় জেনারেল কারিয়াপ্পার (প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি) স্পষ্ট ঘোষণা—চীনের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নেতাজীর সংগ্রামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান।

নেফা এলাকায় তিনটি চীনা আক্রমণ প্রতিহত।

বেরুবাড়ীর জরিপ কার্য (ভারত-পাকিস্তান যৌথ ব্যবস্থা) বন্ধ রাখার দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের (পশ্চিমবঙ্গ) নিকট বেরুবাড়ী প্রতিরক্ষা কমিটির স্মারকলিপি।

১৩ই নভেম্বর—২৭শে কার্তিক : রাজ্যসভায় ভারতভূমি হইতে চীনা হানাদার বিতাড়নের সংকল্প অনুমোদন—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা : চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নাই।

দেশের সর্বত্র সোনায় আগাম লেন-দেন নিষিদ্ধ—ফাটকাবাজী রোধে ভারত সরকারের ঘোষণা।

নেফা ও লডাক উভয় রণাঙ্গনে অস্বস্থিকর নিস্তব্ধতা—ভারতীয় জওয়ানদের অবাধ টহলদারী।

পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব কর্তৃক শ্রীনেহরুর লিপির (চীনা আক্রমণ প্রসঙ্গে) জবাব প্রেরণ—ভারতের সহিত মৈত্রী রক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ।

১৪ই নভেম্বর—২৮শে কার্তিক : শ্রীচাবন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত—রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার : প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রীপদে শ্রীকে রঘুরামাইয়া।

জন্মদিবসে (৭৪তম) শ্রীনেহরুর প্রতি দেশের সহস্র সহস্র নর-নারীর অভিনন্দন—অমৃতসরের নাগরিকগণ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর ওজনের দ্বিগুণ সোনা দান—সর্বত্র 'শিশু দিবস' পালন ও চীনা দস্যুদের বিতাড়নের শপথ গ্রহণ।

ওয়ালং-এর নিকট চীনা হানাদারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

মহারাষ্ট্রের নূতন রাজ্যপাল পদে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিযুক্ত।

'চীনা হানাদারদের হটাইতে ভারত বদ্ধপরিকর'— লোকসভায় গৃহীত প্রস্তাব।

॥ বাইরে ॥

৮ই নভেম্বর—২২শে কার্তিক : 'পাকিস্তানের এলাকার মধ্য দিয়া ভারতের জন্য অস্ত্র সরবরাহ যাইতে দেওয়া হইবে না'—করাচীতে পাক্ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ আলির বিবৃতি।

৯ই নভেম্বর—২৩শে কার্তিক : চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ প্রসঙ্গে মার্শাল টিটো (যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট) কর্তৃক শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) পত্রের উত্তর প্রেরণ—চীন ভারতকে আক্রমণ করায় দুঃখ।

১০ই নভেম্বর—২৪শে কার্তিক : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইয়েমেনের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

'ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইলে (চীনা আক্রমণের দরুণ) সকল গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই বিপর্যয়'—মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমানের সতর্কবাণী।

১১ই নভেম্বর—২৫শে কার্তিক : কাতাঙ্গার স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি দাবীতে রাষ্ট্রসংঘের চরমপত্র—আনুগত্যের শপথে স্বাক্ষর না দিলে ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকী।

সৌদী আরবের আকাশে মিশরীয় জঙ্গী বিমান—সৌদী আরবীয় বিমান-বিধ্বংসী কামান হইতে গোলাবর্ষণ।

১২ই নভেম্বর—২৬শে কার্তিক : লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের সহিত জাপানী প্রধানমন্ত্রী ইকেদার সাক্ষাৎকার—চীন-ভারত সংঘর্ষ বিষয়ে বিশদ আলোচনা।

১৩ই নভেম্বর—২৭শে কার্তিক : ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ-জনিত অবস্থা ঘোষিত।

কিউবা সম্পর্কে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সোভিয়েট ও কিউবান সরকার কর্তৃক উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল) নিকট যুক্ত ফর্মুলা পেশ।

১৪ই নভেম্বর—২৮শে কার্তিক : 'ন্যাটো' রাজনৈতিক কমিটি কর্তৃক ভারত সীমান্তে চীনা আক্রমণের নিন্দা এবং ভারতকে সাহায্যদানে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন'

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ জাতীয় সংকট ও বুদ্ধিজীবী ॥

কম্যুনিষ্ট চীন একই দশকে দ্বিতীয়বার পররাজ্যগ্রাসে উদ্যোগী হয়েছে। এই যুদ্ধ যে আপাততঃ কিছু অঞ্চল গ্রাস করার মতলবেই করা হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লাদকে চীনারা ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশ গ্রাস করে সেখানে সিংকিয়াং-তিব্বত রাজপথ বানিয়েছে। নেফায় ম্যাকমেহন লাইন পর্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমান ছিল, তার সীমানা অতিক্রমণের কোনো বাসনা ভারতের ছিল না। থাগলো গিরিশ্রেণীতে চীনাবাহিনী এগিয়ে এসে ভারতীয় ভূখন্ড গ্রহণ করার পর, ভারত সরকার ভারতীয় এলাকা থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা গোড়ার দিকে সীমানা-সংঘর্ষ বলে মনে হয়েছিল, তা যে নিছক সীমানা-অঞ্চলেই সীমিত থাকবে না, তার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং ম্যাকমেহন লাইনের দক্ষিণে ৫০,০০০ বর্গমাইল পরিমাণ জমি চীনারা দাবী করে তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ। শুধুমাত্র একটা টেকনিক্যাল ঘোমটা পরা আছে, তার নাম অঘোষিত যুদ্ধ। সেই ঘোমটা যেদিন খসবে, সেদিন অবস্থা আরো কঠিন হবে।

এখন আর কারো মনে সংশয় নেই, চীনের অভিপ্রায় সম্পর্কে। তারা যে আক্রমণ করেছে সেকথাও স্বীকার করতে নিছক মোহমুগ্ধ দুচারজন ছাড়া আর কারো স্বীকার করতে বাধা নেই। সুতরাং আমরা যে একটা বৃহৎ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি একথা সকলেই বুঝেছেন, হয়ত কিছু কিছু ব্যক্তির মনে এখনও কিঞ্চিৎ আত্মতুষ্টির ভাব আছে, সেই ভাবও কাটবে।

এই সংকটকালে বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের কি কর্তব্য? শান্তিকামী এবং সহবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী ভারতবর্ষ আজ বিদেশী সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত। এখন মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার জন্য সকলেরই সর্বস্ব পণ করা উচিত। এই সংকটে বুদ্ধিজীবিরা কি করবেন? কিছু বিশেষ দায়িত্ব আছে কি তাঁদের?

এ কথা বলা বাহুল্য যে বুদ্ধিজীবি নামক শ্রেণীবিশেষরাও মানুষ। অন্ন, বস্ত্র, নিরাপত্তার প্রয়োজন তাঁদের আর কারো চেয়ে কম নয়। যদি ঘরে আগুন লাগে তাহলে একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক যে কাজ করবেন, বুদ্ধিজীবীও তাই করবেন। অর্থাৎ আগুন কিভাবে এল, কোন্ অঞ্চল থেকে এল, এবং আসাটা উচিত হয়েছে কি অনুচিত হয়েছে এই বিচার বিবেচনা না করে, অকারণ কালহরণ না করেই সর্বাগ্রে জলের সন্ধান করে আগুনটা নির্বাপিত করাই প্রাথমিক কর্তব্য, একথা সবাই জানে।

বুদ্ধিজীবিদের বিপদ এই যে তাঁরা পাত্রাধার তৈল, কি তৈলাধার পাত্র এই নিয়ে অনেক সময় কালহরণ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রেও তাই যে হয়নি তার পরিচয় পাওয়া গেল বুদ্ধিজীবিদের আলোচনা শুনে। সেখানে ম্যাকমেহন লাইনের ঐতিহাসিকত্ব এবং চীনারা মহৎ কি অসৎ এ নিয়েও বিতর্ক হল, এমন কি সোস্যালিষ্ট রাজ্য কোনো মতে নিছক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যে অগ্রসর হতে পারেন না এমন কথাও শোনা গেল। আবার অতিশয় উগ্র দেশপ্রেমমূলক বক্তব্যও শুনেছি। কেউ বলেছেন যে বর্তমান সংকটে বিনা দ্বিধায় স্বাধীনতা-রক্ষার সংকল্প নিয়ে আত্মবিসর্জনের শপথ গ্রহণ করা প্রথম কর্তব্য। আরেকজন বললেন যে, অতীতের ভুলত্রুটি ভুলে গিয়ে দেশের হস্তচ্যুত অংশগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশপ্রেমের প্রচারে বুদ্ধিজীবিদের উদ্যোগী হতে হবে। আগে দেশ পরে আর সব।

একটি সভায় উপস্থিত থাকায় বুদ্ধিজীবীদের এই আলোচনার ধারা থেকে আজ আমাদের সমাজে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা হৃদয়ংগম করেছি। বুদ্ধিজীবিদের একটা কর্তব্য এবং মহৎ ভূমিকা আছে এই সংকটকালে, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। আজও বহু বিভ্রান্ত দেশবাসী এই সংকটের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, বুদ্ধিজীবিদের কর্তব্য আলোচনার দ্বারা তাঁদের মনের সংশয় ঘুচিয়ে তাঁদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

জাতীয় মনোবল গঠনে বুদ্ধিজীবিরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। শুধুমাত্র অসংখ্য নামাবলীসংযুক্ত বিবৃতিদান করেই ভারতভূমি থেকে চীনকে হঠানো সম্ভব নয়। দেশের মানুষকেই সর্বাগ্রে উপযুক্ত জ্ঞান দান করা কর্তব্য। সাধারণ মানুষকে গড়ে তুলতে হবে।

দেশপ্রেম এমন জিনিস যে তা কাউকে অনুনয় বিনয় করে বোঝাতে হয় না, এ দেশের শিশুরাও জানে যে জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী। শুধু প্রয়োজন সেই সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করা।

লেখকের অস্ত্র তার বাণী। এমন সময় হয়ত আসতে পারে যে নিজের রচনা লেখক স্বহস্তে আর লিখতে পারবেন না, তবু এই বাক্যই তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। এই বাক্যকে শাণিত, তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। উপযুক্ত

ক্ষেত্রে উপযুক্ত বাক্য-প্রয়োগ কার্যকরী হয়।

অনেক কথার কদর্থ করা হবে, অনেক অর্থকে অনর্থক প্রমাণিত করার চেষ্টা হবে। ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলে, আর যে কথার দ্বারা আমরা সেই সংবাদ জানতে পারি সেও এগিয়ে চলে। কথা কানে হাঁটে, একথা আমাদের পল্লী-বাসীরাও জানে। আমাদের তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের বোঝা উচিত যে যুদ্ধকালে 'বাক্যের'ও একটা ভূমিকা আছে, তার পরিমিত ব্যবহার প্রয়োজন। অনেক শোভন কথা যেমন বর্জন করা উচিত, তেমনই দরকার হবে অনেক কঠোরতর বাক্য প্রয়োগের। উল, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি যুদ্ধের প্রয়োজনে শান্তিকালীন অবস্থানুপাতে সুলভ হবে না, বাক্যও তাই। তার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এমন অনেক কথা আছে যার অর্থ অনেক রকম, আবার অনেক কথা অস্পষ্ট, এর ফলেই অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, একথা সর্বদা স্মরণ প্রয়োজন। বিরুদ্ধ প্রচারণা সহ্য করার শক্তি আমাদের থাকা উচিত। অনেক কথা বিপদকালে হজমও করতে হবে। এইসব কথা স্মরণে রেখে আমাদের কর্মে এবং ব্যবহারে যেন খাঁটি কথাই আঁকড়ে থাকি। এই দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীর। তাঁদের মনই তাঁদের কর্মের বাহন।

দীর্ঘকাল আমরা শান্তিতে বসবাস করেছি। ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী, সহবস্থান নীতির পোষক। তাই এই শান্তির আবহাওয়া আমাদের অন্তরকে কিঞ্চিৎ কোমল এবং দ্রব করে রেখেছে, ফলে আজ ভারতবাসী একটা অবক্ষয়ের মুখে এসে পেঁছোচ্ছিল। প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা, ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতার আধিক্য ঘটেছিল। আত্মিক দিক থেকে একটা অসাড়ত্ব এসেছিল। এই যুদ্ধের হোমকুণ্ডে স্নান করে ভারত অনেকখানি পরিশুদ্ধ এবং পরিশীলিত হয়ে উঠবে। স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, —কঠোপনিষদের বাণী— "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—", আজ আবার মোহনিদ্রা ত্যাগ করে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডের অবস্থাও অনুরূপ হয়েছিল। সেই অবক্ষয়কে এলফ্রেড নোয়েস বলেছিলেন – "the sloth, the intellectual pride; the trivial jest, the lawless dreams the cynic art—" এর থেকে মুক্ত হতে হবে। পরিশেষে স্বদেশের ধূলিকে স্বর্ণ-রেণু বলে কবি এলফ্রেড নোয়েস সেদিন বলেছিলেন :

"The fire, the fire that made her great
Once more upon her altar burns.

Once more redeemed and healed and whole,
She moves to the Eternal Goal."

সেদিনের ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীর মনে এই ভাব জাগ্রত হয়েছিল, তাই তাঁরা দেশবাসীকে বলতে পেরেছিলেন যে, যে আগুন আমার দেশকে মহৎ করেছিল আবার সেই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত। আবার আমরা চিরন্তন লক্ষ্যে পৌঁছাব।

জবাহরলাল নেহরু বলেছেন এতদিন আমরা শান্তির জন্য চেষ্টা করেছি, এবার আমাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। স্বদেশের মানুষকে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে, ভাবাবেগে চালিত হয়ে, কিংবা বিজ্ঞাপিত হওয়ার লোভ মোহ ত্যাগ করে বুদ্ধিজীবীকে আজ জাগ্রত হতে হবে।

প্রথম মহাসমরের কালে ইংলণ্ডের তরুণ কবি রুপার্ট ব্রুক একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"There are a few people who have been so anti-war before, or so suspicious of diplomacy, that they feel rather out of national feeling. But it is astonishing how the 'intellectuals' have taken on new jobs. No, not astonishing; but impressive."

আজ এদেশের বুদ্ধিজীবিদের স্বদেশের মহামন্ত্রে নতুন করে দীক্ষা নিতে হবে, বুদ্ধিজীবীকে নতুন পোষাক পরতে হবে, তবেই এই সংকটে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব পালিত হবে।

বুদ্ধিজীবীকে intellectual pride থেকে মুক্ত হয়ে বজ্রকঠিন সংকল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় শান্ত ও সংযতচিত্তে মুক্তিযজ্ঞের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করতে হবে এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর পাশে দাঁড়াতে হবে, নিছক ভক্তিযোগ নয় কর্মযোগের প্রয়োজন আজ অধিক। বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে তবেই ভারতভূমি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হবে।

নতুন বই

ইতশ্চেতঃ— **এককলমী ।। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী ।। কলিকাতা—১২ ।। দাম—ছয় টাকা।**

'যুগান্তর' সাময়িকীর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা যে রঙ্গরসাত্মক স্তম্ভের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন রবিবারের প্রভাতে তার নাম "ইতশ্চেতঃ"। চলতি সংবাদের ওপর লঘু আলোচনা, মাঝে মাঝে গুরু আলোচনা ইত্যাদি এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। 'যুগান্তর' যখন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে সরস আলোচনা করতেন 'পথচারী', যিনি পরে "যাযাবর" নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'নন্দীভৃঙ্গী' ছদ্মনামে লিখতেন, প্রাচীনকালে ইন্দ্রনাথ লিখতেন 'পঞ্চানন্দ' নামে এবং হিতবাদীর 'শ্রীবুদ্ধ' যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "বুদ্ধের বচন" যাঁদের পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা তা আজো ভুলতে পারেন নি। কিন্তু ইদানীং যে দুজন সর্বজনপ্রশংসিত 'কলমী' রঙ্গরস পরিবেশন করেন তাঁদের রচনারীতি বিভিন্ন, পূর্বসূরীদের সঙ্গে কোথাও মিল নেই, এমন কি পরিমল গোস্বামী এবং শিবরাম চক্রবর্তী দুজনেই সমকালীন হলেও দুজনের রচনারীতিতে পার্থক্য আছে। একলমীর স্তম্ভের নিয়মিত পাঠক হিসাবে বর্তমান সমালোচক তাই "ইতশ্চেতঃ" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ আনন্দিত। 'একলমী'র বৈশিষ্ট্য যে তাঁর আশ্চর্য ব্যঙ্গপ্রবণতা তা নয়, তাঁর 'নেগেটিভ্ এ্যাপ্রোচ' (বাংলা করা গেল না)—বিশেষভাবে প্রশংসাযোগ্য। লেখকের মন বিজ্ঞানীর মন, তাই বিজ্ঞানের অনেক গুরু বিষয়ের সরস আলোচনা "ইতশ্চেত"র স্তম্ভে ছড়ানো আছে, সেই সঙ্গে আছে সমসাময়িক সাহিত্য, সমাজ, ও রাজনীতির ওপর এমন "অল্পকথায় তীক্ষ্ন উপহাস" (রাজশেখর বসুর উক্তি) করার শক্তি আর কারো নেই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। চলতি ঘটনার সরস দিক সংবাদপত্রের পাতায় লুপ্ত হয়ে যায়, তাই "এককলমী"র উক্তি গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হওয়ায় প্রকাশককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। "ইতশ্চেতঃ" সংকলনটি পাঠ করতে গিয়ে অনেক পুরাতন কথা স্মরণে আসবে, তাই এই জাতীয় গ্রন্থ হাতের কাছে থাকলে বারবার পড়া যায়, অবসর বিনোদন ব্যতীত স্মৃতির রোমন্থনে তা সহায়ক হবে। বাংলা সাহিত্যে সরস রচনার সংখ্যা অল্প তাই এই গ্রন্থ যে সর্বত্র সমাদৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

রূপমতী নগরী— (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)— **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৪.৫০।**

আলোচ্য গ্রন্থটি ভিন্ন স্বাদের ভ্রমণ-কাহিনী। এই গ্রন্থের লেখক শিল্পমনের অধিকারী, তাই সমস্ত রচনায় রসশুদ্ধ আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত। সর্বোপরি গ্রন্থকার একজন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী। যে কথা রচনায় বলা সম্ভব হয়নি ক্যামেরার চোখ দিয়ে তিনি তা দেখিয়েছেন। চিত্রশিল্প নিজস্ব বিভূতি প্রকাশ করেছে। কাজেই এই ভ্রমণপর্বের আর্ট পেপারে সুমুদ্রিত প্রতিচিত্রগুলি এই গ্রন্থের লোভনীয় আকর্ষণ। মাণ্ডু শহর থেকে শুরু করে বেলুড়, তিরুপতি, মহাবলীপুরম, খাজুরাহো, পুষ্করতীর্থ, তাজমহল, অম্বর, দিলওয়ারা, অমৃতসরের সরস কাহিনী চিত্রে ও রচনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। প্রতিটি স্থানের ঐতিহাসিক পরিচয় এমনকি আঞ্চলিক কিংবদন্তীগুলি লেখক অত্যন্ত পরিশ্রমে সরবরাহ করেছেন। লেখকের ভাষা সাহিত্যগুণান্বিত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং হৃদয়ের উদারতা রচনাকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য দান করেছে। অকারণ পাণ্ডিত্যের অহম্মন্যতা নেই বলে সাধারণ পাঠক-দরবারে এই গ্রন্থ সমাদর পাবে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের নাট্যশালা ও চিত্র-প্রযোজকের কর্তব্য :

গেল হপ্তার প্রেক্ষাগৃহে লিখেছিলুম, 'আজ জাতির প্রয়োজনে নাটকাভিনয়ে এবং চলচ্চিত্রে এমন বিষয়বস্তুর অবতারণা করতে হবে, যা দেশের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রণোন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে, আপামর জনসাধারণকে নতুন ক'রে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে।...... এমন কাহিনী আজ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন, যা দেখে দর্শক বুঝবে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে-কোনো দুঃখকষ্ট বরণ করা যায়, যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করা যায়, সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে হাসতে হাসতে প্রাণকে বলি দেওয়া যায়।' সম্প্রতি একটি বৈঠকে এই একই প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। উপস্থিতদের মধ্যে একজন হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'গেল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ইংলন্ডের নাট্যশালাগুলি কি সময়োপযোগী, জাতীয়তাধর্মী, উদ্দীপক নাটক মঞ্চস্থ করেছিল?' সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠ থেকে উত্তর এল নিশ্চয়ই! ওদেশে বহু নাটক লেখা এবং লেখানো হয়েছিল যুদ্ধকালীন প্রচার-কার্য চালাবার জন্যে, গণমানসে আশা, উদ্দীপনা, সহনশীলতা ও সাহস জাগিয়ে রাখবার জন্যে। যুদ্ধকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 'হোম অব দি ব্রেভ', 'টুমরো দি ওয়ার্ল্ড', 'মিসেস্ মিনিভার', 'দিস ল্যান্ড ইজ মাইন' প্রভৃতি বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এর মধ্যে শেষের দু'টিকে চলচ্চিত্রের মারফৎ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের মত বহু লোকেরই হয়েছে। বোমাবিধ্বস্ত লন্ডন শহরের মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখভোগ ক'রেও কেমন করে শত্রুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছিল, তার বাস্তবচিত্র আমরা দেখেছিলুম 'লন্ডন ক্যান টেক ইট' ছবিতে। যুদ্ধকালে ইংরেজী ভাষায় যে অগুন্তি নাটক রচিত হয়েছিল, তার ভিতর কিছু সংখ্যক নাটক নিয়ে 'ওয়ার ড্রামাজ' (যুদ্ধকালীন নাটকাবলী) নাম দিয়ে কয়েকটি সংকলনও দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাধীন জাতির নাগরিকরূপে আমাদের নাট্যকারদেরও আশু কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্যে আমাদের দেশের লোককে মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে, তাদের মনোবল অটুট রাখবার জন্যে বর্তমান সময়োপযোগী নাটক লেখবার জন্যে কলম ধরা। বিদেশী শাসনকালে আমাদের দেশাত্মবোধ যে রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, বলা বাহুল্য, এখনকার দেশাত্মবোধ নিশ্চয়ই তার থেকে ভিন্ন রূপ। তখন গান ছিল, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়", এখন আমাদের গান হবে, "বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই, কর কর সবে সাজ।" তখন আমাদের নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়েছে, 'মেবার পতন', 'প্রতাপাদিত্য', 'ছত্রপতি শিবাজী,' 'সিরাজদ্দৌলা', 'কারাগার', কিন্তু এখন মঞ্চস্থ হোক এমন নাটক, যা আমাদের যুব-সম্প্রদায়কে সৈন্যদলভুক্ত হবার জন্যে
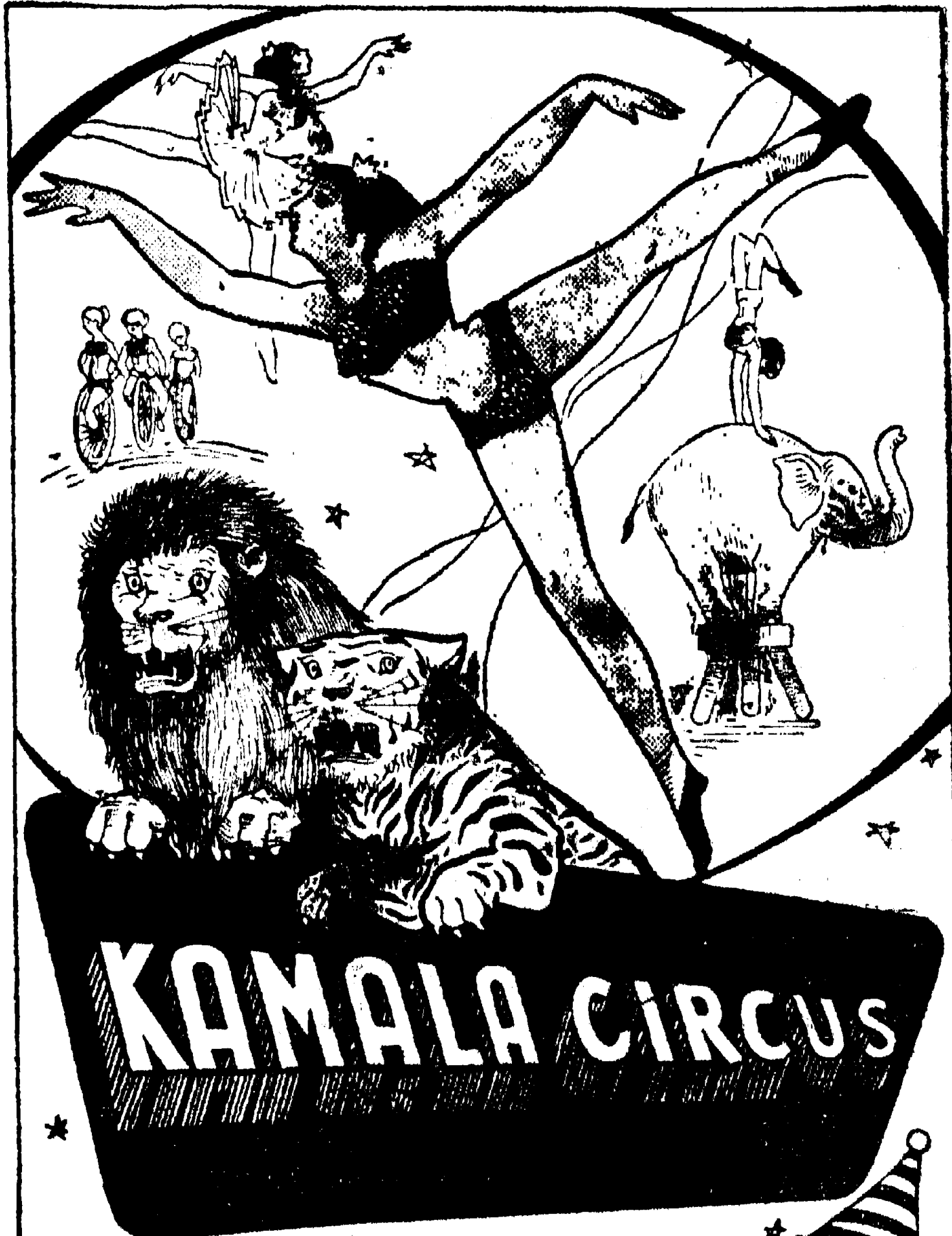
"রক্তপলাশ" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও নিরঞ্জন রায়

উদ্দীপিত করবে, নিজের গ্রাম বা শহরকে রক্ষা করবার জন্যে গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু ক'রে সকল প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শিক্ষা এবং গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। যে বৈঠকের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন, রাণাপ্রতাপ দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করবার জন্যে সদলবলে প্রথমে গিরিকন্দরে আশ্রয় নিয়ে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই নীতিকে বিশ্লেষণ ক'রে বর্তমান কালোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করা সম্ভব। শ্রীচৌধুরীর প্রস্তাবটি আমরা বাঙলাদেশের নাট্যকারদের সামনে রাখলুম। কিন্তু চীনের ব্যাপক আক্রমণে বর্তমান সংকটকাল আসবার বহু পূর্বেই ১৯৫৯ সালের ২৮এ নভেম্বর থেকে ৩০এ নভেম্বর—এই তিন দিনের মধ্যেই বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় 'মহাপ্রেম' নাম দিয়ে যে অনতিদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ নাটকখানি রচনা করেছিলেন এবং ১৯৬০ সালের ২৬এ জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাকেই বর্তমান কালোপযোগী প্রথম নাটক ব'লে অভিনন্দিত করতে চাই। 'একটি অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ' নিয়ে রচিত এই 'মহাপ্রেম' নাটকখানি পাঠ ক'রে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয় এই ভেবে যে, ১৯৬২ সালের ২০এ অক্টোবর তারিখে চীনাদের দ্বারা ভারত সীমান্ত যে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবে, এ সম্পর্কে শ্রীরায়ের কি স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল? কিংবা কোনো ভবিষ্যদ্রষ্টা জ্যোতিষী প্রায় তিন বছর আগে তাঁকে এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন? নইলে তাঁর এই 'মহাপ্রেম'-এর প্রতিটি ছত্র প'ড়ে কেন মনে হয়, চীন কর্তৃক আক্রান্ত অঞ্চলের কোনো গ্রামের দুটি দিনের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি? নাটকের প্রথম সংলাপ—"না, না পঞ্চায়েত, আর দেরী নয়। একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে শত্রু-পল্টন,—বিনা বাধায় এগিয়ে আসছে" থেকে শুরু ক'রে শেষ সংলাপ "হ্যাঁ, এসে গেছি। দুশমনদের তাড়িয়েছি" পর্যন্ত চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকখানির বক্তব্য হচ্ছে, মিলিটারীর সাহায্য পাওয়ার আগে পর্যন্ত শত্রু-আক্রমণ-সম্ভাবনাপূর্ণ গ্রামের লোকেদের কি করা উচিত, গ্রামের পথঘাট কিভাবে শত্রুর পক্ষে অব্যবহার্য করা সম্ভব, পঞ্চমবাহিনীর লোক সম্বন্ধে কতখানি সজাগ থাকা প্রয়োজন, সমস্ত গ্রামের মনোবল অটুট রেখে গেরিলা যুদ্ধের জন্যে দেশের যুব-সম্প্রদায় কিভাবে প্রস্তুত হতে পারে এবং প্রয়োজন হ'লে কিভাবে "পোড়ামাটি" নীতি অবলম্বন ক'রে পশ্চাদপসরণও করতে হয়। অথচ এমন সুকৌশলে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচনা করা হয়েছে যে, শুষ্ক প্রচারের নামগন্ধও কোথাও নেই। আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে এই 'মহাপ্রেম' নাটকখানি।

শুনে আনন্দিত হলুম, প্রায় আড়াই-তিন ঘন্টা ধরে যাতে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হতে পারে, তার জন্যে শ্রীরায় সম্প্রতি আরও চারটি দৃশ্য যোজনা করে নাটকটির কলেবরকে দ্বিগুণ করেছেন। আমরা আশা করি, কোনো সাধারণ রঙ্গালয় যদি উৎসাহী হয়ে নাটকখানিকে কালবিলম্ব না ক'রে মঞ্চস্থ করেন, তাহলে তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ অর্জন করবেন। কিন্তু এই এক 'মহাপ্রেম'ই নয়, আরও বহু নাটক লিখিত হয়ে পেশাদারী এবং অপেশাদারী—সকল নাট্য সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হওয়ার আশু প্রয়োজন ঘটেছে আজ।

চিত্র-প্রযোজকদেরও এই পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে দৃঢ়তর হয়, স্বাধীন ভারতের প্রতিটি যুবক যাতে অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যে-কোনো মুহূর্তে নিজেকে সংগ্রামী সৈনিকে পরিণত করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে উৎসাহিত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে তাঁরা পর্দায় প্রতিফলিত করুন। নেহরু বলেছেন সংঘর্ষ দীর্ঘ দিন ধরে চলবে। কাজেই জনসাধারণ তাদের মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে দীর্ঘকাল দেশমাতৃকার জন্যে দুঃখবরণে প্রস্তুত থাকে, চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে সেই আদর্শ প্রচার করবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করবার জন্যে সকল চলচ্চিত্র-প্রযোজককে অনুরোধ জানাই।

চিত্র সমালোচনা

রক্তপলাশ (বাঙলা) : এমকেজি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন ; ৩,৬৫২ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ, প্রযোজনা : সুনীল বসুমল্লিক, পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : প্রণব রায়, সঙ্গীত-পরিচালনা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত, চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : অনিল গুপ্ত, চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা, শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু, সম্পাদনা : রবীন দাস, রূপায়ণ : অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, দীপক মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, জীবেন বসু, উৎপল দত্ত, বীরেশ্বর সেন, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি), অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, মাঃ বাসুদেব প্রভৃতি। কালিকা ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ১৬ই নভেম্বর থেকে

রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

একটি বিদেশী ছায়াচিত্র থেকে সংগৃহীত কাহিনী অবলম্বন করে 'রক্তপলাশ' চিত্রনাট্যটি গড়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক, জাহাজী অফিসার শংকর চৌধুরী নিতান্ত আত্মরক্ষার চেষ্টায় নায়িকা নীলার দুর্বৃত্ত ভাই শশাংককে যখন দৈবক্রমে গুলীর আঘাতে হত্যা করে বসল, তখন ডাকু নামে এক দুঃসাহসী ছেলে হয়ে রইল তার একমাত্র সাক্ষী। পুলিশ এবং শংকর, দু'পক্ষই যখন জানল ডাকুই হচ্ছে ঐ হত্যাকান্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, তখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শংকর ডাকুকে নিজের দলে টেনে গা-ঢাকা দিল। সেই থেকে শুরু হ'ল পুলিসের খোঁজাখুঁজি। অবশ্য ডাকু ধরা পড়ল বনভোজনকারী একটি দলের কৌতুক-সৃষ্টিকারী দলপতির সাহায্যে। এইবার শংকর হয়ে পড়ল ভীত—ডাকু পুলিশের চাপে সত্যপ্রকাশে বাধ্য হলে অবধারিত তার ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে একটি বিদেশগামী জাহাজে চাকরী নিয়ে দেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে পা বাড়াল। কিন্তু পুলিশ তাকে সহজে ছেড়ে দিল না। রোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে যখন সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, তখন খুনের দায়ে সে হল আদালতে অভিযুক্ত। এরপর ডাকুর সাক্ষ্যের ফলে কেমন করে প্রমাণিত হল যে হত্যাকান্ডটা নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং শংকর নির্দোষ, তাই নিয়েই ছবির পরিসমাপ্তি।

এই ধরনের রোমাঞ্চকর চিত্রকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে আলোকচিত্রকরের দায়িত্ব অনেকখানি। চিত্রগ্রহণ-পরিচালক অনিল গুপ্ত এবং চিত্রগ্রহীতা জ্যোতি লাহা সেই দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন করেছেন। বিশেষ করে ছবির আরম্ভভাগে রাত্রির বহির্দৃশ্যগুলি অসাধারণভাবে দর্শক-মনকে অধিকার করে। ঠিক অনুরূপ কথাই বলতে হয় আবহ-সঙ্গীত সম্পর্কে, তবে ঘটনানুযায়ী ভাবসৃষ্টির জন্যে আবহ-সঙ্গীতকে কোথাও অযথা গুরুভার করে তোলা হয়নি। শব্দানু-লেখনে বাণী দত্তর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সম্পাদনায় রবীন দাস ছবিটিকে যে সুষম ছন্দে বদ্ধ করে ধীরে ধীরে এর গতিবেগকে বর্ধিত করেছেন, তাও ভূয়সী প্রশংসালাভের যোগ্য; এখানে বিশেষ করে বলা দরকার, একদিকে খুনের কাহিনী এবং অপর দিকে একটি মধুর প্রেমের উপাখ্যানকে একসঙ্গে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া রীতিমত মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। পাতলা কাগজের সাহায্যে ঘষা কাচ সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টাকে বাদ দিলে কার্তিক বসুর শিল্পনির্দেশনা উচ্চাঙ্গের এবং বাস্তবসম্মত।

'জয় ভবানী' চিত্রে মনহর দেশাই ও জয়শ্রী গডকর

'রক্তপলাশ'-এর একটি উজ্জ্বল অংশ হচ্ছে এর সমষ্টিগত অভিনয়। অসংখ্য চরিত্র-বিশিষ্ট এই ছবিখানিতে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। কিন্তু সকলের কৃতিত্বকে অতিক্রম করে যার অভিনয় দর্শকমনে অত্যন্ত সুগভীর রেখাপাতে সমর্থ হয়, সে হচ্ছে বালক-অভিনেতা মাস্টার বাসুদেব। এই 'ক্ষুদে' অভিনেতাটি তার চলনে, বলনে, চোখের চাহনি এবং অঙ্গভঙ্গীতে ছবির সব জায়গাতেই তার নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও যেখানে সে তার চোখে-দেখা হত্যা দৃশ্যটিকে পুনরভিনয় করে দেখায়, সেখানে তার আশ্চর্য অভিনয় অবিস্মরণীয়। অনিল চট্টোপাধ্যায় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী, নায়ক শংকরের ভূমিকায় তাঁর আন্তরিক অভিনয় তাঁর সুনামকে বর্ধিত করবে। নায়িকা নীলা বেশে সন্ধ্যা রায় তাঁর সংবেদনশীল অভিনয়গুণে চরিত্রটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ভূমিকাটিতে তাঁকে মানিয়েছেও যেমন চমৎকার, তেমনই এই ভূমিকায় তাঁর বহুমুখী অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। ডাকুর মামীর ভূমিকায় রেণুকা রায়ের স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ অভিনয় আমাদের অতিমাত্রায় তৃপ্ত করেছে।

এছাড়া পুলিস-অফিসারের ভূমিকায় কমল মিত্র, নায়কের ডাক্তার পিতার বেশে বিপিন গুপ্ত, শিবু গুন্ডারূপে দীপক মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মামার ভূমিকায় জীবেন বসু, বনভোজনকারীদের দলপতিরূপে জহর রায়, নায়কের মায়ের ভূমিকায় ছায়া দেবী প্রভৃতি সকল শিল্পীই যে তাঁদের গৃহীত চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করেছেন, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। মাত্র নায়িকার দুর্বৃত্ত ভাই শশাঙ্কের ভূমিকাটিতে নিরঞ্জন রায়ের অভিনয় আরও উন্নততর হবার অবকাশ ছিল বলেই মনে হয়।

বহু রোমহর্ষক দৃশ্যে ভরা এই 'রক্তপলাশ' চিত্রটি অপরাপর নানা গুণের মধ্যে বিশেষ করে মাস্টার বাসুদেবের অবিস্মরণীয় অভিনয়গুণে চিত্ররসিকদের পক্ষে একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য চিত্ররূপে চিহ্নিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদ-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস ঃ

গেল শনিবার, ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নাটক-রচনা, আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্যে পরিষদ 'বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা' নামে একটি মহাবিদ্যালয় চালু করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে পনেরোজন সদস্য নিয়ে একটি শক্তিশালী পরিচালন-পরিষদ গঠিত হয়েছে। যাতে এই সান্ধ্য মহা-বিদ্যালয়টি আসচে বছরের জানুয়ারী থেকেই কাজ শুরু করতে পারে এবং যত শীঘ্র সম্ভব নবগঠিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়, তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে ব'লে প্রকাশ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ ঃ

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি নাতিদীর্ঘ ছবি করবার জন্যে মনস্থ করেছেন। উল্লেখযোগ্য এর পরিচালক তপন সিংহ থেকে শুরু ক'রে এর শিল্পিবৃন্দ, কলাকুশলীরা এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দ এতে কাজ করবার জন্যে একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নেবেন না। ফিল্ম প্রভৃতিও যাতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়, তারও চেষ্টা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, ডিসেম্বরের প্রথম হপ্তার মধ্যেই ছবিটি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হতে পারবে।

জার্মান নাট্য-বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা ঃ

গেল শনিবার, বেলা ২৷৷টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে পশ্চিম জার্মানীর নাট্য-বিশেষজ্ঞ ডঃ স্টেম্যান 'জার্মানীর নাট্য আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা দেন। ৫৩৯ খৃীষ্টপূর্ব থেকে গ্রীস দেশের নাট্য-প্রচেষ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, যে দিন মানুষ বেদীর ওপর ভগবানের নামে উৎসর্গ দিতে শুরু করে, সেদিন থেকেই নাটকের হয়েছে জন্ম। প্রতি মাসে একটি ক'রে চার মাসে প্রদত্ত চারটি বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য শেষ হবে।

পরলোকে মনোরঞ্জন ঘোষ ঃ

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী চিত্রগৃহের পরিচালন-সংস্থা 'দি স্ক্রীণ কর্পোরেশন'-এর নির্বাহী অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডাইরেক্টার) মনোরঞ্জন ঘোষ গেল শনিবার, ১৭ই নভেম্বর সকালে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় আটষট্টি। বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা বহু আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুদের রেখে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তাঁর আদি নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুরে হ'লেও তাঁর জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার সদনপুর গ্রামে ১৮৯৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে। ছাত্রজীবন কিন্তু তাঁর প্রধানতঃ কলকাতাতেই। এম-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত "রূপবাণী" নাম নিয়ে উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহটি ১৯৩২ সালে যে-দিন তার দ্বারোদ্ঘাটন করে, সেই দিন থেকেই শ্রীঘোষেরও চলচ্চিত্র-জগতে পথযাত্রার শুরু। পরে 'প্রাইমা ফিল্মস্' নামে পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এবং অরুণা ও ভারতী নামে আরও দুটি চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেন। এই বছরই তিনি ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আমরা শ্রীঘোষের পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

'নবাগত'-এর 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' ঃ

আজ শুক্রবার ২৩এ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় 'নবাগত' নাট্যসংস্থা নীতীশ সেন রচিত 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা'

নামে নাটিকা দুখানি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবেন।

'শিল্পশ্রী'র ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন :

গেল সোমবার, ১৯এ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় সুবিদিত সংস্কৃতি সংস্থা 'শিল্পশ্রী'র ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি-রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কলকাতার শেরিফ সন্তোষের রাজা বি. এন. রায়চৌধুরী. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতে নিযুক্ত সাংস্কৃতিক অধিকর্তা হার্বার্ট বার্টহোল্ড এবং ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু।

এই উপলক্ষ্যে সংস্থার সভাবৃন্দ ডি. পি. কর রচিত 'সুরবঈ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

একখানি জাপানী ছবির বিশেষ প্রদর্শনী :

ছবিখানির জাপানী নাম "হাদ্কা নো শীমা"; ইংরেজীতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় "দি ভ্যালিয়ান্ট আইল্যান্ড" (সাহসী দ্বীপ)। ২,৬৩৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৮ রীলে সম্পূর্ণ এই ছবিখানি ১৯৬১ সালের মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "গ্র্যান্ড প্রিক্স" লাভ করেছে। সাদা-কালোর সমন্বয়ে নির্মিত এই ছবিখানিতে সংলাপ নেই একটিও; আছে মাত্র কিছু গান, কিছু হাসি, কিছু কান্না এবং আনুষঙ্গিক শব্দ ও আবহ সংগীত। একটি নির্জন দ্বীপে একটি চাষী দম্পতির অজস্র পরিশ্রম ক'রে দিন-যাপনের কঠিন বাস্তব কাহিনী এই ছবিখানিতে চিত্রিত হয়েছে। "চিলড্রেন অব হিরোশিমা", "গিস্কো-এ গিজা গার্ল", "উলভস্" প্রভৃতি চিত্রের সুখ্যাত পরিচালক কানেতো শিন্ডো এই ছবিখানি পরিচালনা করা সম্পর্কে বলেছেন, "পৃথিবী এবং প্রকৃতির সঙ্গে কৃষক-দম্পতির নীরব সংগ্রামটিকে যথা-যথভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই আমি ছবিটিকেও "নীরব" (সংলাপহীন) করেছি। প্রতিটি চিত্রই এখানে ভাষ্যকারের কাজ করেছে।" এই পরীক্ষায় কানেতো শিন্ডো যে সসম্মানে জয়যুক্ত হয়েছেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। মেহবুব প্রোডাকসন্স এবং জ্যোতি সিনেমার সহযোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এই অপূর্ব ছবিখানির বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

একটি অনুষ্ঠান

গত ২০শে অক্টোবর, শনিবার কোলড়া বীণাপাণি ক্লাবের ৭৬তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলা সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের সর্বাধিনায়ক ডাঃ বি. এন. সিনহা মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক শ্রীপঞ্চানন দত্ত মহাশয়। সঙ্ঘের সভাবৃন্দ কর্তৃক শচীন সেন-গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' সঙ্ঘের নবনির্মিত নিজস্ব মঞ্চে অভিনীত হয়। গোলাম হোসেনের ভূমিকায় শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সকলের মনে রেখাপাত করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী পঞ্চানন নন্দী, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বলাই চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন শেঠ, গৌর সরকার, শীতল সরকার, আনন্দ সরকার, দীননাথ ঘোষাল, রবীন্দ্র সরকার, চিন্তা ঘোষাল, বিভূতি চট্টোপাধ্যায়, রাধারমণ সরকার, চিন্তা সরকার, বেচু চট্টোপাধ্যায়, মধু মান্না, হারু শেঠ, কৃষ্ণধন ঘোষাল, সমর মুখার্জি, শ্রীমতী মেনকা ভট্টাচার্য, দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়।

।। 'দুঃখীর ইমান' নাট্যাভিনয় ।।

'তুলসীদাস লাহিড়ীর বিখ্যাত নাটক 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ করলেন গত ১২ই নভেম্বর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্মচারী সমিতির হেড অফিস শাখার সভাবৃন্দ। অফিস ক্লাবের পক্ষে এ ধরনের দুরূহ ও জটিল নাটক অভিনয় দুঃসাহ-সিকতার পরিচয় এবং তাঁরা এই দুঃসাহসিক কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। একেবারে ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, তা নয় কিন্তু বিশেষ করে নায়কের চরিত্রে অপূর্ব বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন রণজিত রায়। একদিকে উত্তরবঙ্গীয় ভাষার আমেজ অন্যদিকে রাগ ও দুঃখ এবং চারিত্রিক দার্ঢ্য প্রকাশে পেশাদারী অভিনেতার প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠেছেন। তারপরই উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেছেন জামালের ভূমিকায় দীপেন সেন এবং টাইপ চরিত্র হিসাবে রামঅবতারের ভূমিকায় দেবেশ চৌধুরী। এ ছাড়াও বিলাতীর ভূমিকায় আভা মণ্ডল, ম্যানোর চরিত্রে সান্ত্বনা ঘোষ, বসিরের ভূমিকায় মাঃ মানস এবং জমিদারের চরিত্রে ধ্রুব গুপ্ত সুঅভিনয় করেছেন। নাটকটির সুষ্ঠু পরিচালনা করেন শ্রীভীম মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে

কমনওয়েলথ চলচ্চিত্র পুরস্কার

বৃটেনের রয়েল সোসাইটি অব আর্টস কমনওয়েলথ দেশগুলিতে সাধারণের কল্যাণ-কল্পে নির্মিত শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের জন্য একটি পুরস্কার দিয়ে আসছেন দু-বছর ধরে। এ বৎসরে পুরস্কার লাভ করছেন জামাইকার উন্নয়ন দপ্তর এবং হংকং সরকার। চিত্রে জামাইকার অস্থায়ী হাই-কমিশনারকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করলেন বিখ্যাত সুঅভিনেতা শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়।
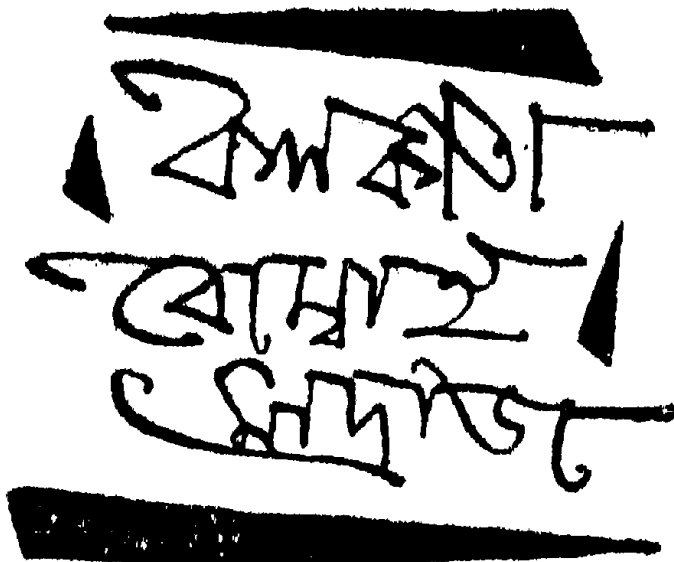
কলকাতা

সম্প্রতি দীঘায় বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন জওলা প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি 'দুইনারী'-র পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী। দুইনারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে ভালবাসার অন্তরবেদনায় একটি পুরুষ সাড়া দিয়েছিল সেই কাহিনী রচনা করেছেন কথাশিল্পী সমরেশ বসু। বহির্দৃশ্যের একটি রোমাঞ্চমধুর দৃশ্যে শিল্পী ছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নির্মলকুমার। কাহিনীর আর এক নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কাজল গুপ্ত। এ ছবির কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। আলোকচিত্র ও সংগীত পরিচালনা করেছেন দীনেন গুপ্ত ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।
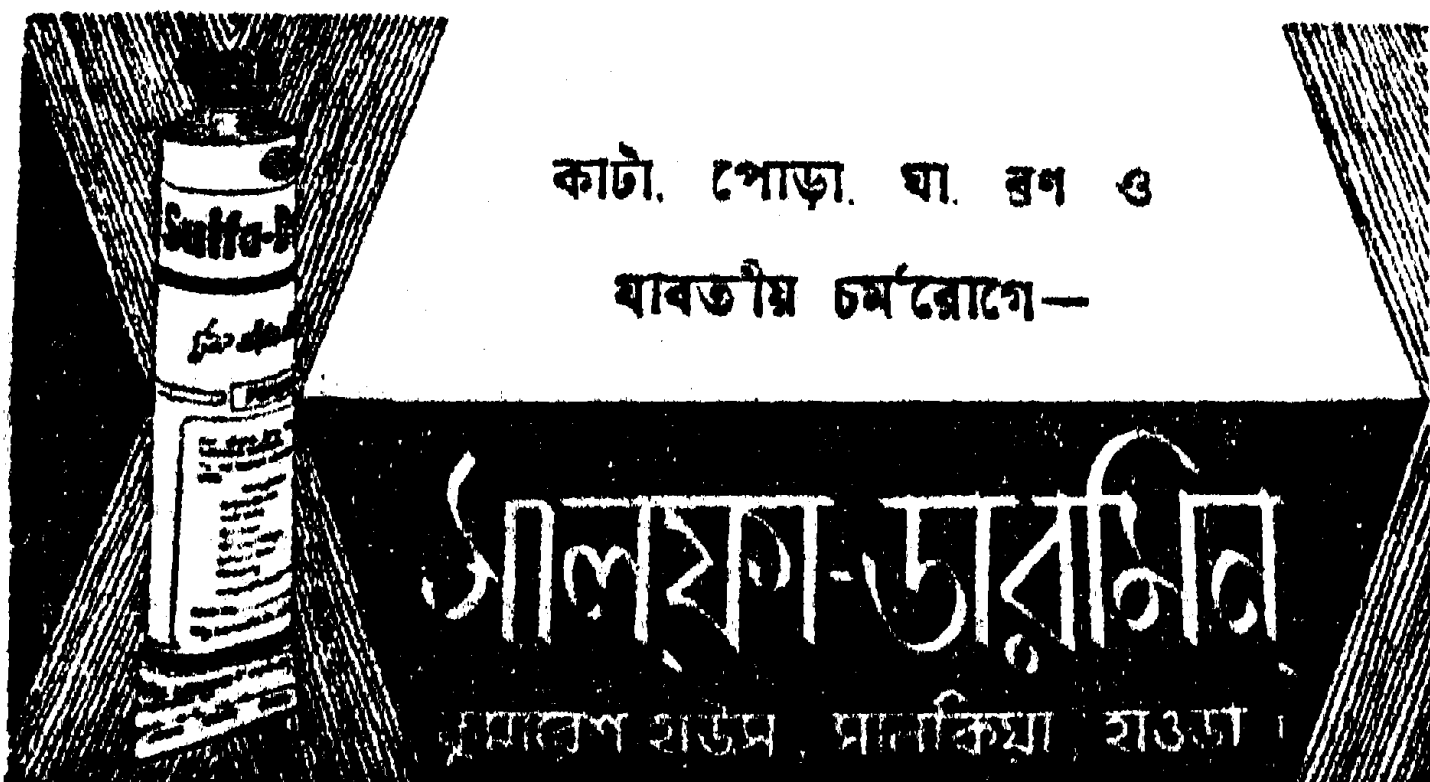
কিশোর চিত্র 'অপরূপ কথা'-র শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হল। পরিবর্তন-খ্যাত মনোরঞ্জন ঘোষ এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন পঞ্চক-গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনা করবেন সন্তোষ সেনগুপ্ত।

রাধা ফিল্মস স্টুডিওর পরি-চালক ভূপেন রায় একটি রহস্য-রোমাঞ্চকর ছবি 'নিশাচর'-এর কাজ আরম্ভ করছেন। শম্ভু মিত্রের বিপরীতে অভিনয় করছেন মঞ্জু দে। নায়িকা সম্ভবতঃ শম্পা। একটি বিশেষ চরিত্রে বিকাশ রায়কে দেখা যাবে।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'নবদিগন্ত'। বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরি-চালনা করেছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। আলোকচিত্র, সংগীত ও শব্দগ্রহণ পরি-চালনা করেছেন বিভূতি লাহা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও যতীন দত্ত। কাহিনীর দুই নারীর প্রণয়-জীবনের কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে এ ছবির চিত্র-নাট্য গড়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী ও অপর্ণা দেবী। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স এ ছবির পরিবেশক।

বোম্বাই

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণে সীমান্ত রক্ষার তহবিলে সবচেয়ে আশাজনক সাড়া দিয়েছেন বোম্বাই ও মাদ্রাজের চলচ্চিত্র শিল্পীরা। সম্প্রতি প্রতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহকল্পে শিবাজী পার্ক থেকে বল্লভ-ভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম পর্যন্ত এক শিল্পী-মিছিল দেখা যায়। প্রিয়শিল্পীদের হাতে জনসাধারণ তাঁদের অর্থ ও স্বর্ণ দান করেন। শিল্পীদের নিজস্ব কয়েক-জনের উল্লেখযোগ্য দান হল, এ ভি এম—পঞ্চাশ হাজার, এম জি রামচন্দ্র—এক লক্ষ, শিবাজী গণেশন— পঞ্চাশ হাজার, দিলীপকুমার, মীনাকুমারী, রাজকাপুর ও শংকর জয়কিষণ পঞ্চাশ হাজার করে। বৈজয়ন্তীমালা, শাম্মি কাপুর ও রাজেন্দ্র-কুমার প্রত্যেকে পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়া প্রতিদিন অর্থের অঙ্ক বেড়ে চলেছে। এই আসন্ন অর্থ সংগ্রহার্থে সিনে আর্টিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশন তৎপর হয়েছেন।

প্রযোজক মোহন সায়গল তাঁর পর-

বর্তী ছবি 'শ্রেয়সী'র হিন্দী এই মাসেই শুরু করছেন। এ ছবির হিন্দী নামকরণ হয়েছে 'ওয়াপস'। নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল পার্ক ও এ্যারে মিল্ক কলোনীর বহির্দৃশ্যে সঙ্গীত গ্রহণ-দৃশ্য শেষ হল বি এস রাওয়াল প্রযোজিত 'দিল হি তু হাই' ছবির। এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজকাপুর, নূতন, প্রাণ, আগা, নাজির হোসেন, লীলা চিটনিস, সবিতা চ্যাটার্জি ও শিশুশিল্পী রাজা। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রোশন। যুগ্ম-পরিচালক পি এল সন্তোশী ও রাওয়াল।

রূপতারা স্টুডিওর মুকুল পিকচার্সের 'রাজা' ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। আলোকচিত্র প্রযোজনা করছেন রামদয়াল। • রাধাকান্ত-র পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিজয়া চৌধুরী, জগদীপ, জীবন, সুন্দর, জীবনকলা ও শাম্মি। সঙ্গীতে সুর-সৃষ্টি করেছেন এস এন ত্রিপাঠী।

ঈগল ফিল্মসের 'প্রফেসর' এই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। এফ সি মেহেরা প্রযোজিত ও লেখ টেনডন পরিচালিত এছবির প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর ও কল্পনা। সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ।

মাদ্রাজ

ভসু ফিল্মসের 'ভরোসা'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে বাস্থান স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন আশা পারেখ, গুরু দত্ত, মাহমুদ, শুভা খোটে ও নীনা। প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন বাসুদেব মেনন ও কে শঙ্কর। সংগীত পরিচালক হলেন রবি।

মাদ্রাজের বিভিন্ন চিত্রগৃহে সম্প্রতি পাঁচটি নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে। প্রথমটি 'মুথুমান্দাপাম'। অভিনয় করেছেন এস এস রাজেন্দ্রন, বিজয়াকুমারী, চন্দ্রকান্ত ও মনোরমা। পরিচালনা করেছেন এ স্বামী।

দ্বিতীয়টি 'সাবরিমালাই শ্রীআয়াপ্পান'। পদ্মিনী, রাগিণী ও অম্বিকা অভিনীত। এ ছবির পরিচালক হলেন এস নাইডু।

তৃতীয়টি প্রযোজক-পরিচালক এস রাঘবন-এর ছবি 'আজাগুনীলা'। সংগীত পরিচালক কে মহাদেবন।

চতুর্থ ছবি 'বিক্রমাদিত্য'। রামচন্দ্রন ও পদ্মিনী অভিনীত ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন এস রাজেশ্বরাও।

শেষ ছবিটি শান্তি ফিল্মসের 'বৃন্দাবনশাম'। পরিচালনা করেছেন ভীম সিংহ। শিবাজী গণেশন, জেমিনী গণেশন ও জি সাবিত্রী প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি
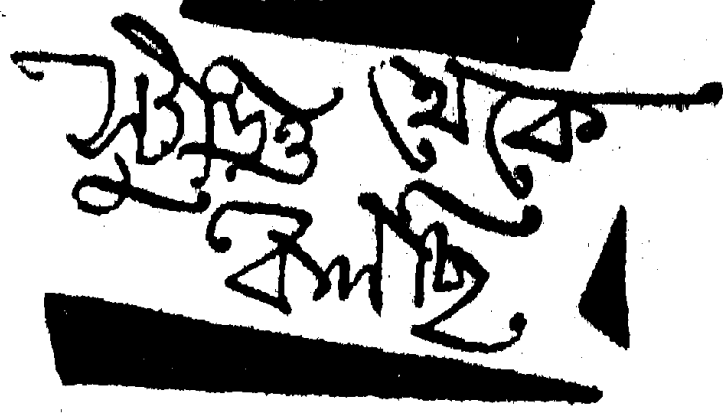
মুক্তি প্রতীক্ষিত আগামী চিত্রের একটি কাহিনী সম্পর্কে এবারে আপনাদের বলবো। ছবির নাম 'ধূপছায়া'। এ ছবির সংগঠনে রয়েছেন, প্রযোজনা—অনন্ত সিংহ। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত। সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে অমল মুখোপাধ্যায়, সুহৃদ ঘোষ ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীজগন্নাথ পিকচার্সের পরিবেশনায় এ ছবির প্রচার পরিকল্পনায় আছেন রমেন চৌধুরী।

চরিত্র-রূপায়ণে প্রধান চরিত্রে নাম কৃষ্ণকান্ত—ছবি বিশ্বাস, প্রদীপ—বিশ্বজিৎ, হিমাদ্রি—এন, বিশ্বনাথন, যতিশঙ্কর—বিপিন গুপ্ত, অমিয়নাথ—পাহাড়ী সান্যাল, সিদ্ধার্থ—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট—তরুণকুমার, উমা—দীপ্তি রায়, অমিতা—অনুভা গুপ্তা, গৌরী—সন্ধ্যা রায়, করুণাময়ী—অপর্ণা দেবী, অমর মল্লিক, চণ্ডীদাস, ভানু ঘোষ ও শান্তা দেবী ছবির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

কাহিনীর আরম্ভে নায়ক হিমাদ্রি শিমুলতলায় তার দাদু অমিয়নাথের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে আসে। কলকাতায় ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। হিমাদ্রি তাই খালি হাত-পায়েই চলে এসেছিল এখানে। কিন্তু হঠাৎ এই বাড়ীর আশ্রিতা উমাকে দেখে তার কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল লেগে যায়। তিনদিনের ছুটিতে তিন মাস উত্তীর্ণ হল। হিমাদ্রি-উমা দুটি যৌবন এক হল। ঘনিষ্ঠভাবে তারা মেতে ওঠে। যদিও বিলেত থেকে ফিরে এসে সামাজিক প্রথায় উমাকে হিমাদ্রি বিবাহ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তারা এই প্রণয়মধুর দিনগুলো সবার অলক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছিল। হিমাদ্রির কথায় উমা বিশ্বাসী হয়।

কলকাতায় ফিরতে হয় হিমাদ্রির। হঠাৎ বিলেত যাবার আগে হিমাদ্রির বাবা যতিশঙ্কর তার বন্ধু-কন্যা অমিতার সঙ্গে হিমাদ্রির বিয়ের কথা পাকা করলেন। কারণ তিনি এ ব্যাপারে বন্ধুর সঙ্গে আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ। এদিকে কোন উপায় না দেখে হঠাৎ বিয়ের আগে আবার হিমাদ্রি শিমুলতলায় উমার কাছে ছুটে চলে আসে। কিন্তু উমার তখন কোনও উপায় ছিল না। এই কয়েক-মাসের মধ্যেই উমাকে সন্তান-সম্ভবা দেখে সামাজিক লজ্জা থেকে বাঁচতে অমিয়নাথ উমাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন। দাদু অমিয়নাথের পদ-মর্যাদার কথা ভেবে উমা কলকাতায় চলে আসে ঘর ছেড়ে। হিমাদ্রির সঙ্গে উমার দেখা হোল না। শিমুলতলায় এসে জানতে পারে যে উমা মৃত। এই মিথ্যে খবর শুনে কলকাতায় হিমাদ্রি ফিরে গেল। যতিশঙ্করের অনুরোধে হিমাদ্রি অমিতাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। এই দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা শুধু উমা জানতে পারলো। প্রতিশ্রুত এতদিনের বিশ্বাসটা ভেঙে যায় উমার। কলকাতার জনসমুদ্রে নিজেকে তার বড় দুর্বল বলে মনে হয়। এই দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ এক মোটর দুর্ঘটনায় উমা এক নার্সিং হোমে তার সদ্যজাত শিশুর কান্নায় যেন নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা পেল। তাই একদিন সুস্থ হলে রাতের আঁধারে হিমাদ্রির বাড়ীতে এই নবজাত শিশুকে রেখে আসে। এইসঙ্গে বিস্তারিত হিমাদ্রিকে লেখা একটা চিঠি রেখে উমা নিঃস্ব হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো। তখন হিমাদ্রি সাগরপারে। শুধু অমিতা হিমাদ্রিকে লেখা উমার চিঠিতে সব জানতে পারে। অমিতা নীরবে নিজের ব্যথা ভুলে এই শিশুকেই বুকে তুলে নেয়।

এরমধ্যে দীর্ঘ বছর উত্তীর্ণ হয়। পৃথিবীর কাছ থেকে ছুটি চাইলেও উমা কিন্তু ছুটি পায়নি। এক অনাথ মেয়েকে

চিত্ত বসু পরিচালিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূপছায়া'র একটি দৃশ্যে বিশ্বনাথন ও অনুভা গুপ্তা।

বড় করে তোলার দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। অন্যদিকে অমিতা সেই নবজাত শিশু প্রদীপকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে সাবালক করে তোলে। দীর্ঘ বাইশ বছর পার করে হিমাদ্রি বিলেত থেকে এসে কোন কথাই জানতে পারেনি। শুধু এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তার কেটে গেছে দীর্ঘ বছর। প্রদীপকে তাই সে সহজে গ্রহণ করতে পারলো না।

উমার কাছে অনাথা গৌরী বড় হয়। ঘটনাচক্রে একদিন প্রদীপের গৌরীর প্রতি ভালবাসা জন্মায়। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার মধ্যে প্রদীপ জানতে পারলো না যে গৌরীর বড় মা-ই তার নিজের মা বলে। কিন্তু উমা সব জেনেও নিজেকে ধরা দেয়নি কোনদিন।

ডাক্তারী পাশ করে প্রদীপ। অমিতা প্রদীপকে বিলেতে পাঠাবার কথা ভাবেন। তবে এরমধ্যে স্বাভাবিকভাবে একদিন গৌরী ও প্রদীপের বিয়ের কথা ওঠে। কিন্তু হিমাদ্রি তীব্র প্রতিবাদ করে। এক অজ্ঞাত জীবনের সঙ্গে আর একজনের জীবনকে এমনিভাবে গোপনে জড়িয়ে ফেলার কোন অর্থই তার কাছে সুস্পষ্ট নয়।

অমিতা কিন্তু তবু নীরব। প্রদীপের সত্যিকারের পরিচয় সে হিমাদ্রিকে জানাতে পারলো না বোধহয় মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবার কষ্টে। আর উমা? সে কি এখনও হিমাদ্রির প্রতিশ্রুত কথার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে? না হিমাদ্রি সব জেনে জীবনটাকে ভুলতে চেয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর আপনারাই ছবি দেখে বিচার করবেন। আগে থেকে সমাপ্তি বা পূর্ণচ্ছেদ না টানাই ভাল। —চিত্রদূত

বিদেশী ছবি

।। ইরমা-লা-দুস ।।

আমেরিকার চিত্রনির্মাণ জগতের সাম্প্রতিক বিস্ময় হল স্যামুয়েল গোল্ডুইন স্টুডিওতে আড়াই লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত একটি সেট। প্যারিসের দুটো রাস্তাকেই যেন তার সমস্ত দোকান-পাট রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত তুলে এনে বসানো হয়েছে। সেইটি নির্মিত হয়েছে 'ইরমা লা-দুস' চিত্রের জন্যে। আই, এ, এল ডায়মন্ড এই চিত্রের কাহিনীকার এবং পরিচালক হলেন বিখ্যাত বিলি ওয়াইল্ডার। মিরিশ এবং ইউনাইটেড আর্টিস্ট চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হচ্ছে।

ইদানীং হলিউডে হাসির ছবি তৈরী করার তিনটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলেন প্রযোজক পক্ষ। এক হচ্ছে ছবিতে থাকবে কতগুলো কিম্ভূত চরিত্র যারা অবিশ্বাস্য জীবন-যাপন করে, অদ্ভুত কাজ করে, কথা বলে। এই ধরনের উপাদান নিয়ে তোলা 'পিলো টক', অপারেশন পেটিকোট', 'কাম সেপ্টেম্বর', 'লাভার কামব্যাক' এবং 'ড্যাড টাচ অফ মিংক' প্রভৃতি ছবিগুলির সাফল্য প্রযোজকদের এই ধরনের ছবি নির্মাণে ক্রমশঃই উৎসাহিত করেছে। ওয়াইল্ডার কিন্তু এই ধরনের নির্জলা রঙ্গ-রসের ছবি নির্মাণে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে সমাজ-বীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই উঁচুদরের হাসির ছবি নির্মিত হতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, সমাজসমস্যাবদ্ধ কৌতুক রচনা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে কীর্তিত হয়ে আসছে, অ্যারিস্টোফেনিস, সেক্সপীয়ার, সেরিডাস অস্কার ওয়াইল্ড-এর নাটকগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খোদ হলিউডেও কিছুকাল আগে 'ফিলাডেলফিয়া ষ্টোরী', 'দি সেনেটর ওয়াজ ইনডিসক্রীট' প্রভৃতি ধরনের সমাজসমস্যার পটভূমিতে বক্র-অফিসধন্য হাসির ছবি তোলা হয়েছে। এমন কি ওয়াইল্ডার নিজেও 'দি এ্যাপার্টমেণ্ট'-এর মত অস্কার পুরস্কার-জয়ী ছবি নির্মাণ করেছেন যার কাহিনীকারও হলেন ডায়মণ্ড।

হলিউডের হাসির ছবি নির্মাণের দ্বিতীয় প্রথাটির বিরুদ্ধেও ওয়াইল্ডার বিদ্রোহী। ব্রডওয়ে মঞ্চে কোনো সঙ্গীত-মূলক নাটক জনপ্রিয় হলেই প্রযোজকরা তার পেছনে ছোটেন। 'ইরমা লা দুস' যদিও একটি ব্রডওয়ে সফল সঙ্গীতবহুল নাটক, ওয়াইল্ডার তাঁর ছবিতে সঙ্গীতের এতটুকু স্থান রাখেন নি। শুধু কাহিনীর কাঠামোটুকু নিয়েছেন তাঁর ছবির জন্যে।

কিন্তু হলিউডের অন্যান্য চিত্র-নির্মাতাদের থেকে সবচেয়ে বড় পার্থক্য অর্জন করেছেন ওয়াইল্ডার বহির্দৃশ্য গ্রহণে অনীহাপ্রকাশ করে। তাঁর এই ছবিটির বহিদৃশ্য যদি প্যারিসেই তোলা হত পুরোপুরি, অনেক কম খরচে কাজ হত, কিন্তু ওয়াইল্ডারের মতে প্যারিসের দৃশ্য গ্রহণ প্যারিসের চেয়ে স্টুডিও সেটের নকল 'প্যারিসে'ই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু হবে।

ইরমা লা দুসের কাহিনীটি সম্পূর্ণ আধুনিক কালের। 'জনৈকা গণিকার অন্নভোজী একটি চরিত্রকে ঘিরে এই চিত্রের কাহিনী। তার জন্যে অর্থোপার্জন করে আনন্দ দেবে অনা লোকেদের এই চিন্তা নায়কের অসহ্য। একটি সংলাপের মধ্যেই গোটা ছবির মূল চরিত্র ধরা পড়ে। বিবাহহীন ভালবাসা সমাজে বে-আইনী এই উক্তির উত্তরে নায়ক বলছে—কি সমাজেই আমরা থাকি! ভালবাসা বে-আইনী অথচ ঘৃণা কদাপি বে-আইনী নয়। যে যে-কোনো অবস্থাতেই থাকে তাকে ঘৃণা করতে পারে, তকে বে-আইনী বলা যাবে না।!

• • •

বৃটেনে টেডি বয়দের নিয়ে সম্প্রতি একটি ছবি মুক্তি লাভ করেছে। ছবিটির নাম 'দি বয়েজ'। কাহিনীকার হলেন জন বার্কে।

—চিত্রদূত

খেলাধুলা

দর্শক

এম সি সি বনাম অস্ট্রেলিয়ান একাদশ

এম সি সি : ৬৩৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কেন ব্যারিংটন ২১৯ নট আউট, বেরী নাইট ১০৮, টেড ডেক্সটার ১০২ এবং কলিন কাউড্রে ৮৮ রান। মিশন ১০৩ রানে • ৩ এবং সিম্পসন ১৫৩ রানে ৩ উইকেট) ও ৬৮ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন ১১।)

অস্ট্রেলিয়ান একাদশ : ৪৫১ রান (ববি সিম্পসন ১৩০, বেরী শেফার্ড ১১৪, ম্যাকলাকলান ৫৫ এবং হার্ভে ৫১) ও ২০১ রান (৪ উইকেটে। শেফার্ড ৯১ নট আউট এবং ম্যাকলাকলান ৬৮।)

প্রথম দিনের খেলায় এম সি সি দল ৫ উইকেট খুইয়ে ৪৫৮ রান করে। টেড ডেক্সটার ১০২ রান করেন। কেন ব্যারিংটন এবং বেরী নাইট যথাক্রমে ১২২ এবং ৫৭ রান করে নট আউট থাকেন। কলিন কাউড্রে এবার হতাশ করেননি, ৮৮ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দল ৬৩৩ রানে (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করে নি। ১৯৩২-৩৩ সালের পর অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলের এই রানই (৭ উইকেটে ৬৩৩ রান) এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান। ১৯৩২-৩৩ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল ৯ উইকেটে ৬৩৪ রান করেছিল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

কেন ব্যারিংটনের নট আউট ২১৯ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট ব্যাট করে ১৭টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী মারেন। ব্যারিংটনের ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে এই রানই বর্তমানে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। তাঁর পূর্বে রান ১৮৬, ১৯৫৯ সালে ওয়ারউইকসায়ার দলের বিপক্ষে। ১৯৫০-৫১ সালে নিউসাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে রেগ সিম্পসন যে ডবল সেঞ্চুরী (২৫৯ রান) করেন তার পর অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দলের পক্ষে এই প্রথম ডবল সেঞ্চুরী। আলোচ্য খেলায় ব্যারিংটন এবং বেরী নাইটের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি ১৬০ মিনিটের খেলায় ২০৯ রান যোগ করেন। বেরী নাইট আলোচ্য খেলায় যে ১০৮ রান করেন তা তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী। এম সি সি দল আলোচ্য অস্ট্রেলিয়া সফরে এ পর্যন্ত পাঁচটা খেলায় যোগদান করে সেঞ্চুরী করেছে ৬টা।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া দল কোন উইকেট না খুইয়ে ১৮ রান করে।

খেলার তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া একাদশ দলের ৪টে উইকেট পড়ে ৩৫৫ রান ওঠে। ওপনিং ব্যাটসম্যান সিম্পসন সেঞ্চুরী (১৩০ রান) করেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৪৫১ রানে শেষ হলে এম সি সি দল ১৮২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; কিন্তু তারা ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৮ রান করে। এই ৬৮ রানের মাথায় এম সি সি দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে অস্ট্রেলিয়ান দল জয়লাভের প্রয়োজনে ১৬০ মিনিটের খেলায় ২৫১ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের ২০১ রান উঠেছে ৪টে উইকেট পড়ে। ফলে খেলাটি ড্র গেল।

কেন ব্যারিংটন

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস্ চ্যাম্পিয়ানসীপ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান-সীপ প্রতিযোগিতায় রবার্ট মার্শাল (অস্ট্রেলিয়া) ৩৬২৩—২৮৯১ পয়েন্টে ভারতবর্ষের উইলসন জোন্সকে পরাজিত ক'রে চতুর্থবার বিশ্বখেতাব পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। মার্শাল ইতিপূর্বে এই অনুষ্ঠানে জয়লাভ করেছেন ১৯৩৬, ১৯৩৮ এবং ১৯৫১ সালে। ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স বিশ্বখেতাব পান ১৯৫৮ সালে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক (চারবার) জয়লাভ করেছেন মার্শাল।

এ বছরের মূল প্রতিযোগিতায় মার্শাল এবং উইলসন জোন্স মোট ৬টা খেলায় সমান পয়েন্ট অর্জন ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেন। ফলে প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য তাঁদের মধ্যে পুনরায় খেলা হয়। মূল প্রতিযোগিতায় উইলসন জোন্স ১৬৫৬—১৪৮৮ পয়েন্টে বব মার্শালকে পরাজিত ক'রেও নিষ্পত্তি-মূলক খেলায় তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই নিষ্পত্তিমূলক খেলার দ্বিতীয় সেসনের শেষে দেখা যায়, উইলসন জোন্স ১৫৭৩—১৪২৮ পয়েন্টে অগ্রগামী হয়েছেন—উইলসনের সর্বাধিক ব্রেক ৪৮৯ এবং মার্শালের ২৩৪। কিন্তু তৃতীয় সেসনে মার্শাল অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী হ'ন। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ সেসনে উইলসন খুব ভাল খেলেও পয়েন্টের ব্যবধান অতিক্রম করতে পারেন নি।

আলোচ্য বছরের মূল প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিযার টম ক্লিয়ারি ভারতবর্ষের উইলসন জোন্সের বিপক্ষে প্রতিযোগিতার সর্বাধিক ব্রেক (৩১৫) করার রেকর্ড ক'রে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন। নিষ্পত্তিমূলক খেলায় উইলসন জোন্সের সর্বাধিক ব্রেকের রেকর্ড (৪৮৯) এক্ষেত্রে গণ্য হয়নি এই কারণে যে, জোন্সের উক্ত রেকর্ড মূল প্রতিযোগিতার বাইরের ঘটনা।

উইলসন জোন্স মূল প্রতিযোগিতার মোট ৬টি খেলার মধ্যে ৫টি খেলায় জয়লাভ ক'রে একটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করেন। উইলসন জোন্সের খেলার ফলাফল : জয় (৫)—সোমনাথ ব্যানার্জিকে ১৯৯১—১৯২৩ পয়েন্টে, রসিদ করিমকে ২৩৪৫—৭১৬ পয়েন্টে, বিল হারকোর্টকে ১৮১০ — ৮৭৯ পয়েন্টে এবং বব মার্শালকে ১৬৫৬—১৪৮৮ পয়েন্টে পরাজিত করেন। পরাজয় (১)—টম ক্লিয়ারির (অস্ট্রেলিয়া) কাছে ১৪২১—১৮০৮ পয়েন্টে পরাজিত হন।

আলোচ্য বছরের চ্যাম্পিয়ান বব মার্শাল মূল প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেলার মধ্যে কেবল একটি খেলায়—উইলসন জোন্সের কাছে পরাজিত হন।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতার মোট সাতজন যোগদান করেছিলেন। এ'দের মধ্যে এই চারজন ছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান

—অস্ট্রেলিয়ার বব মার্শাল (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫১), ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স (১৯৫৮), অস্ট্রেলিয়ার টম ক্লিয়ারি (১৯৫৪) এবং ইংল্যান্ডের হার্বার্ট বিথাম (১৯৬০)। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় হার্বার্ট বিথাম অপরাজেয় অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতা এক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬২ সালের চূড়ান্ত ফলাফল

১ম বব মার্শাল (অস্ট্রেলিয়া), ২য় উইলসন জোন্স (ভারতবর্ষ), ৩য় টম ক্লিয়ারি (অস্ট্রেলিয়া), ৪র্থ হার্বার্ট বিথাম (ইংল্যান্ড), ৫ম সোমনাথ ব্যানার্জি (ভারতবর্ষ), ৬ষ্ঠ রসিদ করিম (পাকিস্তান) এবং ৭ম বিল হারকোর্ট (নিউজিল্যান্ড)।

॥ রোভার্স কাপ ॥

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪—১ গোলে হায়দরাবাদ পুলিস লাইনস দলকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। গত বছর এই পুলিস দলই রোভার্স কাপের খেলায় শোচনীয়ভাবে ৬—১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল দলের এই জয়লাভ গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ বলা চলে। আলোচ্য কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় হায়দরাবাদ পুলিস লাইনস দল প্রথমে গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল দল গোল শোধ দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল দল পুলিস দলকে কোণঠাসা করে রাখে। আট মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল দল দুটো গোল দিয়ে ৩—১ গোলে অগ্রগামী হয়। খেলা ভাঙ্গার শেষ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল দল চতুর্থ গোল দেয়।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২—১ গোলে ১৯৬২ সালের ক'লকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। প্রথমার্ধের প্রথম আঠার মিনিটের খেলায় টাটা স্পোর্টস ক্লাব দুটো গোল দিয়ে বিশ্রাম সময়ে ২—১ গোলে অগ্রগামী থাকে।

তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ক'লকাতার বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাব ২—০ গোলে বোম্বাইয়ের শক্তিশালী ক্যালটেক্স দলকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে রেল দলের খেলা পড়েছে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে।

চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল (হায়দরাবাদ) ৫—০ গোলে বোম্বাইয়ের মফৎলাল মিলস দলকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। পুলিশ দলের ইনসাইড রাইট খেলোয়াড় ইউসুফ খান হ্যাট-ট্রিক করেন। পুলিশ দল সেমি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে।

॥ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ॥

ত্রিবেন্দ্রামে অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ বার্ষিক জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল পুরুষ বিভাগে সর্বাধিক ৫৭ পয়েন্ট অর্জন ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে। জাতীয় সন্তরণ প্রতি-

নিমাই দাস

যোগিতায় রেলওয়ে দলের এই দলগত সাফল্য এই প্রথম। পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দলই উপর্যুপরি গত কয়েক বছর প্রথম স্থান লাভ করেছিল। এবছর দেশের বর্তমান আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভিসেস দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় রেলওয়ে দলের পক্ষে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করার পথ সুগম হয়। বাংলা দল জুনিয়ার বিভাগে ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে এবং মহিলা বিভাগে ৩২ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করে। বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা সাঁতারু এবছর রেল বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করায় বাংলা দল দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া কয়েকজন নামকরা মহিলা সাঁতারু ব্যক্তিগত কারণে এবছর প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে সক্ষম হননি।

পুরুষ বিভাগে বাংলার নিমাই দাস তিনটি অনুষ্ঠানে (২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) প্রথম স্থান লাভ ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার ফলে দেশে যে জরুরী অবস্থার উদ্রেক হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়া-নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি জাতীয় কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। প্রধানতঃ বিশেষ প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমেই এই অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যুদ্ধের মত জাতীয় আপৎকালেও খেলাধূলার ভূমিকা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় খেলাধূলার ভূমিকা দ্বিবিধ—প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ এবং দেশের জনসাধারণকে হতাশা, ভয় এবং উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা করা।

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভায় স্থির হয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই একটি শক্তিশালী হকি দল গঠন করা হবে এবং এই দলটি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বড় বড় শহরে প্রদর্শনী হকি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে বোম্বাই, দিল্লী, ক'লকাতা প্রভৃতি শহরে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর ক'লকাতায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর একাদশ বনাম পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল একাদশ দলের এক চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের অতীত এবং বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে অবস্থানকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রখ্যাত চারজন ফাস্ট বোলারদেরও আমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির আবেদনে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন সর্বসম্মতিক্রমে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০০ টাকা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, ক'লকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, ক'লকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খন্ড, ৩০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 30th November, 1962
40 Naya Paise

সব মুখেই এক প্রশ্ন, "চীনাদের এই চালের অর্থ কি, এবং এই চালের পরেই বা কোন মুখে গতি?"

এ প্রশ্নের উত্তর জানে শুধু চীনের ভাগ্যবিধায়ক কয়েকজন মাত্র। এবং পূর্ণ উত্তর তাহারাও জানে না, কেননা এই চালের আমরা কি অর্থ করিব এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় আমরা কোন পথে চলিব তাহার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। তবে একথা সহজেই বলা যায় যে, এই প্রশ্নের কোনও সরল ও সদুত্তর নাই, কেননা প্রশ্নটাই কুটিল ও জটিল। এবং তাহার এই জটিলভাব যে ইচ্ছাকৃত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, কেননা যে "যুদ্ধবিরতি" প্রস্তাবের বশে এই সকল প্রশ্নের উদয় হইয়াছে সেই প্রস্তাবের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী অনেক বাক্য রহিয়াছে। ভারত সরকারের বিবৃতিতে সেই সকল অসঙ্গতির উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে করা হইয়াছে। এবং দুই তিনটি দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাও চীনা সরকারের নিকট চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে। তাহার কি উত্তর আসে এবং সেই উত্তরে এই প্রস্তাব জটিলতর হয় কি সহজ হয় সে বিষয়েরও কোনও স্থিরতা নাই।

আমাদের বীর জওয়ানরা আপনাদের বাঁচানোর জন্য রক্ত দান করছেন। আপনি তাঁদের বাঁচাবার জন্য রক্ত দিন ॥

সুতরাং সারা জগত যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না সে প্রশ্নের কোনও আনুমানিক সমাধান এখানে আমরা উপস্থিত করিব না। শুধুমাত্র একথা বলিয়া এখনকার মত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ স্থগিত রাখিব যে বিগত ২০শে অক্টোবরের আক্রমণের ফলে চীনের যে মুখোস খুলিয়া গিয়া তাহার ক্রূর ও হিংস্র মুখ দেখা দিয়াছে, এই যুদ্ধবিরতির মুখোস তাহারই পরিবর্তে পরা হইয়াছে, জগতকে ভুলাইবার জন্য এবং ভারতকে ছলিবার জন্য। এবং সবশেষে বলিব "ফলেন পরিচীয়তে"।

বর্তমানের দিকেই এখন খরদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন কেননা আমাদের প্রতিরোধ প্রস্তুতির অভাবে আমাদের যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে তাহার পুনরাভিনয়ের সম্ভাবনাকে দূর করা নিতান্তই প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের আরও কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তেই যাহাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ়তর ও যথোচিত হয় সেদিকে প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে। চীনাদের বৃহত্তর আক্রমণের আয়োজন যে অনুক্ষণ চলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। শুধু তাহার দিনক্ষণ ও আক্রমণের গতিমুখ এখন অনিশ্চিতের মধ্যে আসিয়াছে এই সাময়িক যুদ্ধ বিরতির ফলে। হিমালয়ের অন্তরালে ঐ বিশ্বাসহন্তারা কিসের আয়োজন করিয়া চলিতেছে আমরা আগেও বুঝিতে পারি নাই, এবং এখনোও বুঝি না। তবে উদ্দেশ্য যে সৎ নয় সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাসাধিককালের অবিশ্রাম যুদ্ধে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের সেনাদলের যুদ্ধদানের ক্ষমতা, তাহাদের শৌর্যবীর্য এবং ধৈর্য পূর্বেকার মতই অটুট ও অতুলনীয় আছে। এখন প্রশ্ন যুদ্ধাস্ত্রের এবং যুদ্ধদানের অন্য উপকরণের। এখানেই আমাদের প্রস্তুতির মধ্যে অশেষ ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গিয়াছে যাহা শোধরাইতে এখন প্রবল আয়াসপ্রয়াস ও আয়োজন চাই।

এই অবস্থার মধ্যে আমাদের আশ্বাসের প্রধান উপাদান দেখা গিয়াছে আমাদের বিদেশী বন্ধুদের সহায়তার আকাঙ্ক্ষা ও সক্রীয় উদ্যোগের মধ্যে। সেই সহায়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলে আমাদের প্রতিরক্ষা এবং তাহার পর পুনরুদ্ধার-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইবেই। তাই বর্তমানে প্রয়োজন সেইদিকে সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দ্রুতবেগে আয়োজন সম্পূর্ণ করার।

এদেশের পবিত্র ভূমির সূচ্যগ্র অংশ যতদিন শত্রু-কবলিত থাকিবে ততদিন অন্য সকল কথা বা অন্য সকল চিন্তা অবান্তর।

যাঁহারা দেশের ও জাতির পথপ্রদর্শক আশা করি তাঁহারা চতুর চীনের এই নূতন ফন্দীতে প্রতারিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে কোনও বিরাম-বিশ্রাম বা বিভ্রমের সৃষ্টি করিবেন না। যুদ্ধপরিচালনার জন্য দুইটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে কোনও ভুলভ্রান্তিতে প্রকৃত কাজে ব্যাঘাত বা ব্যবস্থাবিভ্রাট ঘটিবে না। ঝড় কাটিয়া যায় নাই, ইহা সাময়িক ক্ষান্তি মাত্র।

কিন্তু মাভৈঃ!

কবিতা

গান

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি—মা আমার, মা আমার !
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে, অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাটো সুখদুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার!
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলংক ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

(পুনর্মুদ্রণ)
কামিনী রায়

গান

(অংশ)

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।

নন্দন কাননে কিবা শোভাহার
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান্।

পিতামহদের অস্থি মজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হ'তে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্যৎ সন্তান।

প্রকৃত সন্তান জেন সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।

(পুনর্মুদ্রণ)
হরিদাস হালদার

চীন : ১৯৬২

অতীন্দ্র মজুমদার

এতকাল আমি বন্ধু বলেছি তাকে—
মানুষের হাতে রক্ত লুব্ধ তীক্ষ্ণ ড্রাগন-নখ
গোপনে যে ঢেকে রাখে,
—হায়, এতকাল বন্ধু বলেছি তাকে!
আমার প্রেমের প্রসারিত দুই হাতে
হাত রেখে, পরে ছলনার কালো রাতে
যে করেছে পিঠে প্রবল ছুরিকাঘাত—
সুহৃদের প্রেম সখ্যের বুকে যে করেছে পদাঘাত,
এতকাল আমি বন্ধু বলেছি তাকে,—
পঞ্চশীলের শাক দিয়ে যারা
লোভের মাছকে ঢাকে—
সহোদর বলে এতকাল আমি পিঠ চাপ্‌ড়েছি তাকে!

মূর্খ! আজও কি বন্ধু বলবি তাকে?
—যে আমার সব সৃষ্টি স্বপ্ন
হিংসার মেঘে ঢাকে?
আমার ঘরের শিশুর মুখের হাসি
আমার মাঠের সোনার শস্যরাশি
আমার প্রাণের মুক্ত গানের বাঁশি
মরণ-আগুনে যে-পোড়াবে বলে
রাইফেলে হাত রাখে—
ভায়ের শোণিতে যে আজ নিজের
পতাকার রঙ আঁকে,
—মূর্খ! আজও কি বন্ধু বলবি তাকে?

পূর্বপক্ষ

আমাদের জাতীয় জীবনে আজ এক নিদারুণ পরীক্ষাকাল উপস্থিত হয়েছে। এবং অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গেই সে পরীক্ষার সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ আমরা কায়-মনোবাক্যে গ্রহণ করেছি।

এরই পাশাপাশি আরো একটি ঘরোয়া পরীক্ষা বাংলাদেশের প্রায় প্রতি পরিবারেই এখন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। সেদিকেও আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না।

প্রসঙ্গটা মনে পড়ল, দিল্লির এক শিশু সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভাষণ পাঠ করে। সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিবরণে দেখা যায়, তিনি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এমনও হতে পারে যে, তোমাদের কেউ কেউ বড় হয়েও দেখবে যুদ্ধ তখনো শেষ হয় নি। তখন তোমরা সেই যুদ্ধে যোগদানের মতো উপযুক্ত হবে এবং যোগও দেবে।' তারপর তিনি বলেন, 'দেশ আজ সংকটের সম্মুখীন। এই সময় জনসাধারণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার হয় এমন সব মৌলিক বিষয়ের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যস্ততার মুহূর্তে শিক্ষণ ও শৃঙ্খলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-গুলির ব্যাপারে আমাদের অবহিত থাকতে হবে। তা না হলে দেশ শক্তিহীন হয়ে পড়বে।'

বাংলাদেশে এখন ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষা চলছে। এই পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলি আমাদের পুরনো দায়িত্বকে নতুন করে ভেবে দেখার সুযোগ দিল। দেশের শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ এ বিষয়ে অবহিত হবেন বলে আশা করি।

ভারতের প্রতি চীনের এই নগ্ন আক্রমণে অতি সংগত কারণেই আমরা ক্রুদ্ধ এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। আজ সর্বত্র সকলের মুখেই এই এক কথা—আততায়ী শত্রুকে দেশ থেকে হটিয়ে দিয়ে দেশজননীর গৌরব পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ সংকল্পের কথা কেবল সভাসমিতিতেই নয়, ঘরে ঘরে উচ্চারিত। বলা বাহুল্য, গৃহসীমার মধ্যে আমরা যখন এ আলোচনায় আমাদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞার কথা বারম্বার ব্যক্ত করি, আমাদের ছেলেমেয়েরাও তখন আশেপাশেই থাকে, এবং তাদের ছোটো ছোটো বুকেও জেগে ওঠে স্বাজাত্য-বোধের পবিত্র আবেগ। এরই প্রেরণায় তারা তাদের সামান্য হাতখরচ থেকে

পয়সা বাঁচিয়ে, কিংবা কানের দুল খুলে দান করে আসে জাতীয় প্রতিরক্ষা ভান্ডারে। তাদের এইসব ছোটো ছোটো দান আমাদের কাছে সাত রাজার ধন মাণিকের চেয়েও মূল্যবান। যে কয়টি পয়সা বা যে কয় রতি সোনা তারা দান করে তার চেয়েও বেশি যা তারা দেয়, তা হল তাদের হৃদয়। সেই দেব দুর্লভ নিষ্পাপ হৃদয়ের আকুতি আমাদের এই কথাই যেন আরো গভীরভাবে ভাবতে শেখায় যে, আমরা কেবল আমাদের বর্তমানকেই শত্রুমুক্ত করার ব্রতে নিয়োজিত নই, এইসব শিশুরা বেড়ে উঠবে যে নতুন ভবিষ্যতে তাকে নিষ্কন্টকভাবে বিকশিত করে তোলারও কর্তব্যে নিযুক্ত।

শিশুরা যে দান এনে দিচ্ছে, তার প্রতিদানে আমাদের দিতে হবে এই শত্রুমুক্ত নতুন ভবিষ্যৎ।

এ কাজে আমাদের প্রথম কর্তব্যঃ দেশরক্ষার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা। আমাদের বীর জওয়ানেরা যেমন প্রতি বিন্দু রক্তের বিনিময়ে দেশের মাটিকে নিঃশত্রু করার ব্রতে আত্মনিবেদিত, আমরাও তেমনি অর্থ দিয়ে, সোনা দিয়ে, রক্ত দিয়ে পালন করব আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এরই সঙ্গে আরো এক গুরুতর কর্তব্য রয়েছে আজ আমাদের সম্মুখে। আমাদের ঘরে ঘরে যেসব শিশু আছে, তাদের শিক্ষার বিষয়ে অবহিত হতে হবে। শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধের প্রথম লাইন যদি হয় সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বিতীয় লাইন তা হলে নিশ্চয়ই হবে ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী তাই শিশুদের আহ্বান করে বলেছেন, 'আজ তোমরা শিশু। কিন্তু আগামীকাল তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের দায়িত্ব এবং বিশ্বের সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তোমাদের শিক্ষা, এমন কি, খেলাধুলোও তোমরা ত্যাগ করতে পার না।'

সত্যিই পারে না। খেলাধুলোর ভেতর দিয়ে শিশুদের দেহ পুষ্ট হয়, পড়াশোনার ভেতর দিয়ে তারা পৃথিবীকে ভালো করে জানে। প্রত্যক্ষ কাজের চাপে যদি আমরা শিশুদের বিষয়ে অবহেলা করি তা হলে সেটা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসও আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা, ইংলন্ড, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ এক প্রলয়ংকর তান্ডবের মধ্যে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও শিশুশিক্ষার বিষয়ে অবহেলা করে নি। আর তা করে নি বলেই আজ ঐসব দেশ কেবল শত্রুজয়ের গৌরবই লাভ করে নি, বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির অভূতপূর্ব উন্নতিতে মানবজাতির সম্মুখে এক নতুন মহিমার দ্বারও উদ্ঘাটিত করতে পেরেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার সংখ্যাতীত গবেষণাগারে যেসব বৈজ্ঞানিক কর্মী এবং প্রয়োগকুশলী আজ নব-নব আবিষ্কারের অবগুন্ঠন-মোচনে নিয়োজিত, পনের-বিশ বছর আগে তাঁদের অনেকেই ছিলেন ছাত্র। তাঁদের স্বদেশের জনগণ যখন শত্রুর সঙ্গে সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তখন এইসব শিশু ও কিশোর আত্মনিবেদন করেছিলেন জ্ঞান-আহরণের দুর্জয় সাধনায়। এই দৃষ্টান্ত আজ গ্রহণ করতে হবে আমাদেরও ছাত্র-ছাত্রী ও শিশুদের। কারণ প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, চীনের সঙ্গে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং আজ যারা শিশু বড় হয়ে তাদেরই হয়তো নিতে হবে সে যুদ্ধের দায়িত্ব। তখন সম্মুখ রণাঙ্গনেও যেমন মোকাবিলা নিতে হবে শত্রুর, তেমনি নব-নব গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার উৎকর্ষ ঘটিয়ে শত্রুর উৎপাদন ব্যবস্থাকেও পরাজিত করতে হবে। ভবিষ্যতের সেই কঠিন দায়িত্বের কথা মনে রেখে আমাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ আজ দেশের সমস্ত শিশু ও কিশোরদের এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে জ্ঞান-যজ্ঞে নিয়োজিত করুন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যে বলেছেন, 'এই পরীক্ষায় আমরা সগৌরবে উত্তীর্ণ হব।' সে অভয়বাণী রূপায়িত হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিদিনের কর্মে ও চিন্তায়। জয় আমাদের অনিবার্য।

মতামত

দেশপ্রেম ও সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মী সম্পর্কে

মহাশয়,

গত সংখ্যায় পূর্বপক্ষে শ্রীজৈমিনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষণায় সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীদের প্রতি যে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন তার জন্যে তিনি ধন্যাবাদার্হ। সৎ-সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ভাবাকাশ সর্বদাই জাতিকতার দ্বারা উজ্জীবিত। বিশেষ করে সাহিত্যিকরা 'জাতির বিবেক' বলে পরিচিত। তাই এই আপৎকালীন অবস্থায় তাঁদের উপর জাতিগত সমূহ দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের পিছনে মহান ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতা-পূর্ব সাহিত্যে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের কল্লোলে মুখরিত। স্বাধীনতার পবিত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত সাহিত্য প্রতিভাত করেছে। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা-পর সাহিত্যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন তেমন করে প্রতিফলিত হয়নি। সাহিত্যের বৈচিত্র্য এসেছে, ভূগোল বেড়েছে, কিন্তু জাতীয় শর্তগুলি প্রতিপালিত হয়নি। আজকে গুরুতর চীনা আক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্য-কর্মীদের দেশ-প্রেমিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দরকার হলে প্রপাগাণ্ডিষ্ট হতে হবে, চারণ কবি হতে হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে রাজপথে নেমে এসেছেন। নন্দনতত্ত্ব আপাতত মুলতুবী থাক। দরকার মুকুন্দ দাশকে, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। যাঁরা কবি উদাত্ত উৎসাহের আওয়াজ তুলুন, গদ্য-লেখকেরা নাটকের মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে তাঁদের দায়িত্ব পালন করুন। চিত্রকররা এগিয়ে আসুন তাঁদের বলিষ্ঠ তুলি নিয়ে, সংগীত-শিল্পীরা স্বর্ণকণ্ঠে আবেগকে সমুন্নত করে তুলুন। মনে রাখবেন শুধু বাহুবলে যুদ্ধ জয় করা যায় না, হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মী ছাড়া আর কারা তা করতে পারে?

একজন সাহিত্যকর্মী হিসেবে আমি বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীদের কাছে এই আবেদন করছি।

মিহির আচার্য,
কলকাতা

তিন শত্রু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রতিরোধ প্রতি পদে প্রতি পলে-পলে
প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকায়, প্রতিটি বিঘতে।
রে দুরাত্মা, আরো তোর তিন শত্রু আছে এ ভারতে—
জেনে রাখ তার পরিচয়।

এক শত্রু, গ্রামান্তের জীর্ণ দেবালয়
ইটের কোটর কিংবা সামান্য কুটির,
আরতির ঘণ্টা শোন নিবিড় মদির।
বটমূলে বাঁধা বেদী, বুড়ো শিব বসানো পাদপ
হাটে ঘাটে আটচালা, চণ্ডীর মণ্ডপ।

দুই শত্রু, ছোট পুঁথি, ক'টি মাত্র শ্লোক,
মৃত্যুরে অগ্রাহ্য করা অমৃত আলোক।
ক্লৈব্য জাড্য মূঢ়তার চির-বিরোধিতা
নাম তার শুনে রাখ—গীতা।

তৃতীয়, অপরাজেয় প্রতি প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাস
শাশ্বত বিশ্বাস,
ধর্ম খাদ্য ধর্ম জল ধর্ম প্রতি বক্ষের নিশ্বাস।
রে দুর্বৃত্ত, বণ্ডক বর্বর,
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর ॥
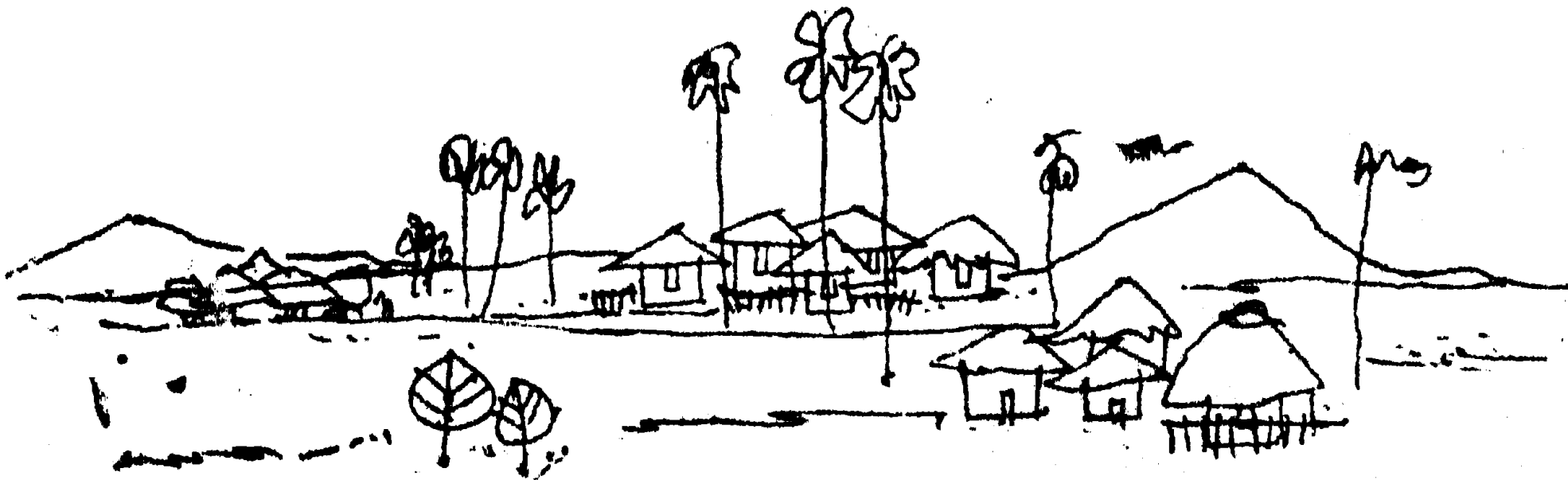
শয়তান হতে সাবধান

২২·১১·৬২

কেননা,
দুর্জনের ছলের
অভাব হয়না !

চিকি: হঠাৎ
যুদ্ধ বিরতি
প্রস্তাব

জেনে রাখবেন,
সাবধানের
মার নেই !

এখন নাকে
সর্ষের তেল দেওয়া
বন্ধ করুন !

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত ....

মনে পড়লো

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

॥ বুঝতে পারিনি ॥

সামান্য একটুখানি ঘটনা, কিন্তু ভোলানাথের কাছে তাও আজ যেন অসামান্য হয়ে উঠেছে।

থাকে বাগবাজারে। হাতের কাছে গঙ্গা। কাজেই গঙ্গার জলে অবগাহন স্নান তার নিত্যদিনের ঘটনা।

সেদিন সকালে সে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছে, এমন সময় তার স্ত্রী বললে, আজ আর তুমি যেয়ো না গঙ্গায়।

—কেন?

—ভারি খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে। তুমি যেন ডুবে যাচ্ছ গঙ্গার জলে।

ভোলানাথ বিশ্বাস করেনি তার স্ত্রীর কথা। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটাকে। বলেছিল, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না।

ভোলানাথ সেদিনও গিয়েছিল স্নান করতে।

কিন্তু তার স্ত্রীর স্বস্তি ছিল না। —স্বামী যতক্ষণ না ফিরে আসে গঙ্গা থেকে ততক্ষণ সে ক্রমাগত ঘর-বার করেছে।

ভোলানাথ ফিরে এসেছিল শেষ পর্যন্ত। ডোবেনি গঙ্গার জলে।

নিশ্চিন্ত হয়েছিল তার স্ত্রী।

কিন্তু ভোলানাথ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

আমার কাছে চুপিচুপি এসে বলেছিল, এই সব স্বপ্নে তুমি বিশ্বাস কর?

বলেছিলাম, না।

উদ্‌ভ্রান্ত ভোলানাথ কিন্তু আমার মুখের দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে বলেছিল, কিছু বুঝতে পারছি না ভাই এর রহস্য। শোনো তাহ'লে কি হয়েছিল। আজ আমি সত্যিই ডুবেছিলাম। খড়ের নৌকোর একজন মাঝি ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিল, নইলে আজ আর আমাকে দেখতে পেতে না।

কোনও সান্ত্বনাই সেদিন দিতে পারলাম না ভোলানাথকে। দিতে পারলাম না জীবন-রহস্যের কোনও সন্ধান।

মনে পড়লো আমারও জীবনের এমনি একটি দিনের কথা। ভোলানাথের মত আমিও সেদিন হাঁ করে তাকিয়েছিলাম জীবনের এই অজ্ঞাত রহস্যলোকের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে।

ইংরেজিতে লেখা দুখানি বই পেয়েছিলাম। একখানির নাম 'In Search Of God' আর একখানি 'In The Vision Of God'; বইএর সামনের পাতায় লেখকের নাম ছিল। 'রামদাস'। ছবি ছিল দুখানি। প্রথম বইখানিতে ছিল শীর্ণ কঙ্কালসার এক যুবকের ছবি। দ্বিতীয়টিতে ছিল এক বৃদ্ধের ছবি। মুণ্ডিত-মস্তক দন্তহীন এক বৃদ্ধের হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন প্রফুল্ল আনন্দময় একখানি মুখ। ঠিক সেরকম হাসি, সেরকম মুখ আমি বোধহয় জীবনে সেই প্রথম দেখলাম। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

'ঈশ্বরের সন্ধানে' নাম দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওই চিররহস্যময় ব্যক্তিটির সন্ধান তো অনেকেই করেছেন, সে সন্ধানের ইতিহাস আমি অনেক পড়েছি, সবাই সেই এক কথাই বলেছেন। ইনি আর বেশি কি বলবেন? কাজেই একটুখানি দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে ম্যাঙ্গালোরের কাছাকাছি সমুদ্র-উপকূলের অখ্যাত অবজ্ঞাত কোন্ এক পল্লীর এক যুবক চাকরি করতেন কোথায় যেন কোন্ এক কাপড়ের কলে।

মানুষের জীবনে ছোটখাটো দুঃখ আছে, আনন্দও আছে, কিন্তু কোনকিছুতেই যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই। সবই যেন ক্ষণস্থায়ী। ধরে রাখা যায় না কাউকেই। না দুঃখকে, না আনন্দকে। দুঃখ পেলে খারাপ লাগে, আনন্দ পেলে ভাল লাগে। তাই মানুষ শুধু আনন্দই চায়। তাই-না দেখে এই মানুষটির মনে হলো বুঝি জীবনের দেবতা আনন্দময়। ভাবলেন বুঝি সেই আনন্দময়কে ধরতে পারলেই সব লেঠা চুকে যায়!

বাস্, শুরু হয়ে গেল তাঁর আনন্দময়ের অনুসন্ধান। নিজের পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে নাম নিলেন রামদাস। পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি সব রাম। তিনি নিজে সকলের দাস। চোরও রাম। সাধুও রাম। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—সব রাম। এই রামময় পৃথিবীকে দেখবার উদগ্রীব বাসনা নিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন তিনি সারা ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে। দেবতার মন্দিরে-মন্দিরে। প্রথম বইখানি তাঁর সেই অনুসন্ধানের ইতিকথা। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র অনুভূতির দিনপঞ্জী। ধীরে-ধীরে চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকার একটা পর্দা যেন সরে যেতে লাগলো। কখন যে প্রথম বইখানি শেষ করে দ্বিতীয় বইখানি ধরেছি বুঝতে পারিনি। তন্ময় হয়ে গেছি পড়তে পড়তে। অতি সুখপাঠ্য উপন্যাসের চেয়েও মনোরম সে ভ্রমণকাহিনী। মনে হলো যেন আমি নিজেও রামদাসের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলাম দু'-দুবার। তাঁর সে বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ লাগলো যেন আমারও মনে। আমারও চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকার যবনিকা অপসারিত হতে লাগলো ধীরে-ধীরে। সুদীর্ঘ পনেরোটি দিন কোন্-দিক দিয়ে পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। পনেরো দিন পরে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলো এই মানুষটিকে একবার চোখে দেখবার। কিন্তু বহুদূরে সে দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্তী আনন্দাশ্রম। সংসারের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে বুঝলাম যাওয়া সেখানে অসম্ভব। দূর থেকেই প্রণাম নিবেদন করলাম এই মহাপুরুষকে।

মন আমার তখন আনন্দে ভরে আছে। মনে হচ্ছে আমারও যেন মুক্তিস্নান হয়ে গেছে। কোনও দুঃখই আমাকে যেন স্পর্শ করতে পারছে না।

এমন দিনে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ আমার জীবনে এলো এক নিদারুণ বিপর্যয়। সে যে কী, তার বিবরণ দিতে হলে অনেককিছু বলতে হয়। সুতরাং এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, অতি জঘন্য প্রকৃতির একজন মানুষ অতর্কিতে আমার এমন এক সর্বনাশ করলে যার ফলে আমার মনের শান্তি ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল। কোথায় গেল আমার সেই দর্শন, কোথায় গেল আনন্দ! এই মানুষটিও যে রাম, সে-কথা ভাবতেই পারলাম না। বুঝলাম, আমার মনের পরিবর্তন যাকিছু হয়েছিল সবই সাময়িক। এ শুধু ভাবের আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

খুব কষ্ট হতে লাগলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে ঘুম এলো না। মনের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মনে-মনে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা জানালাম স্বামী রামদাসের কাছে। —'আমাকে তুমি সাহায্য কর! মনের যে-শান্তি আমি হারিয়েছি সেইটুকু আমাকে ফিরিয়ে দাও!'

রাত্রে ভাল ঘুম হ'লো না। সকালে হাত মুখ ধুয়ে ওপরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি, একজন অচেনা ভদ্রলোক সোজা আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন।

—কে আপনি? খবর না দিয়ে ওপরে উঠে এলেন কেন?

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, আপনাকে ডাকছেন।

—কে?

—স্বামী রামদাস।

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। উঠে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

বলেই জামাটা গায়ে দিয়ে নিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

পাশেই কালী বোসের প্রকাণ্ড বাড়ী। সেখানে যেতেই সিঁড়ির ওপর দেখলাম, কালীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটি গোলাপ ফুলের মালা। হাসতে হাসতে বললেন, স্বামী রামদাসকে এনেছি আমার বাড়ীতে। আপনি বোধ-হয় চেনেন না তাঁকে। মাদ্রাজী সাধু একজন। তাঁর গলায় ফুলের মালা দিতে হবে। তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলুম আপনাকে। মালাটা আপনিই পরিয়ে দিন।

আমার মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরুচ্ছে না। দোতলায় বারান্দায় দেখলাম বসে আছেন স্বামী রামদাস। সেই প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি, আমার সেই বইএর ছবিতে-দেখা মানুষটি!

ফুলের মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে মাথা নত করে প্রণাম করলাম তাঁকে। দু'হাত বাড়িয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে সেই হাসি! যেন কতকালের চেনা!

কারও মুখে কোনও কথা নেই। আমার বাংলা তিনি বুঝবেন না। মনে-মনেই বললাম ঃ আশীর্বাদ করুন!

তিনি আমার মনের কথা শুনতে পেলেন নাকি?

আমার মাথায় হাত রাখলেন তিনি। হাত রেখে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পরেই আবার সেই হাসি!

আমার মনের সমস্ত গ্লানি মনে হলো যেন সেই হাসির স্রোতে ভেসে গেল—ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু কেমন করে ঘটলো এই অঘটন?

কে এই রহস্যের সমাধান করে দেবে?

আমি আজও বুঝতে পারিনি।

জানাতে পারেন

(উত্তর)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

গত উনিশে অক্টোবরের অমৃততে শ্রীসত্যজিত চক্রবর্তী যে প্রশ্ন করে-ছিলেন তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে Statistics না নিলেও খ্যাতির ওপর ভিত্তি করে অনুমানে বলা যায় যে Daily Mirror-ই পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র।

২(ক) সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে যদি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকেও ধরতে হয় তবে বলব ১৯০৮ এবং ১৯৩৩ সাল—এই দুই বছরেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই দুই বছরেই মোট ৯ খানি করে পুস্তক তাঁর প্রকাশ হয়।

১৯০৮ সালে—কথা ও কাহিনী, গান, প্রজাপতির নির্বন্ধ, শারদোৎসব, মুকুট, রাজা-প্রজাসমূহ, স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা।

১৯৩৩ সালে—বিচিত্রিতা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী, দুইবোন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, মানুষের ধর্ম, ভারত-পথিক রামমোহন রায়।

অবশ্য প্রবন্ধকে বাদ দেবার কথা যদি সত্যজিতবাবু চিন্তা করে থাকেন তবে বলতে হয় কাব্য ও গানের ক্ষেত্রে ১৯১৪ সালে (স্মরণ, উৎসর্গ, গীতি-মাল্য, গান, গীতালি, ধর্মসঙ্গীত) এবং নাটকের ক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে (চিরকুমার সভা, শোধবোধ, নটীর পূজা, ঋতু উৎসব ও রক্তকরবী) রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা বেশি সাহিত্য সৃষ্টি করে ছিলেন।

২(খ) 'পুরস্কার' কবিতাটিই রবীন্দ্র-নাথের দীর্ঘতম কবিতা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

বিগত ১৯শে অক্টোবর তারিখের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর ঃ—

(১) কুমার অর্থে সাধারণতঃ পুত্র, বালক (৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত), অবিবাহিত পুরুষ এবং রাজ-পুত্রকে, আর কুমারী বলিতে পুত্রী, বালিকা, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, এবং রাজকন্যা প্রভৃতিকে বুঝায়। বাংলায় অবিবাহিতা বালিকা বা মহিলাদের নামের পূর্বে কুমারী লেখার রেওয়াজ হাল আমলে খুব বেশি চালু হইলেও অবিবাহিত যুবক বা পুরুষের নামের পূর্বে কুমার শব্দটি ব্যবহার আজও প্রায় অপ্রচলিত। কারণ বাংলায় নামের পূর্বে কুমার শব্দটির প্রয়োগে রাজা উপাধি-ধারীগণের পুত্রদিগকেই বুঝাইয়া থাকে চাই তাঁহারা বিবাহিতই হউন আর অবিবাহিতই হউন। প্রয়োগের ব্যতিক্রম এজন্যই মনে হয়। কংগ্রেসী সরকারের আমলে রাজা উপাধি দান বিলুপ্ত হইলেও ইংরেজ আমলে প্রাপ্ত রাজা উপাধিধারীগণের পুত্রেরা কেহ কেহ এখনও নামের পূর্বে 'কুমার' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(২) বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে নামের মধ্যে কুমারী লেখা মোটেই রীতি-বিরুদ্ধ বা প্রয়োগ-বহির্ভূত নয়। বহু বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলার নামের মধ্যেই কুমারী শব্দটির প্রয়োগ দেখা যাইবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই দুই ভগ্নীর নাম ছিল স্বর্ণকুমারী দেবী ও বর্ণকুমারী দেবী। এ ছাড়াও চন্দ্রকুমারী জ্যোৎস্নাকুমারী, মীনাকুমারী, বীণা-কুমারী প্রভৃতি কুমারীযুক্ত নামের সাক্ষাৎ বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে বহুস্থানে মিলিতে পারে। আমার নিজেরই এক জ্যেষ্ঠা পিতামহীর নাম ছিল কুমারী দেবী, আর বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র-গুপ্তের মাতার নাম ছিল কুমার দেবী। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্রের নাম ছিল কুমার গুপ্ত। আর কুমার নামধারী বহু বিবাহিত ও অবিবাহিত লোকেরই সাক্ষাৎ ভারতের সর্বত্র মিলিবে। সুতরাং কুমার-কুমারীর এই বৈচিত্র্য ব্যাপক, সন্দেহ নাই।

বাংলায় বিবাহিত ও অবিবাহিত পুরুষ, উভয়েই নামের মধ্যে কুমার শব্দটির ব্যবহার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য শব্দটি এখানে কোন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া নামের পূরক বা পরিপূরক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রথমে রাশনাম বা বাড়ির লোকের দেওয়া নাম, শেষে কৌলিক উপাধি, এবং মধ্যে কুমার, চন্দ্র, নাথ, মোহন প্রভৃতি পরি-পূরক শব্দ।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা—৯।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার "অমৃত" পত্রিকায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

১। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দেওয়ালপঞ্জির প্রবর্তন কে করেন। কোন দেশে, এবং কতদিন পূর্বে?

২। বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে দুটি 'ব' কেন? ব্যবহারগত প্রকারভেদ কোথায়?

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র মান্না,
পোঃ বৃন্দাবনপুর,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

যুদ্ধের স্বাদ ও সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছয় ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের ঘোর না কাটতেই য়ুরোপে আবার অশান্তি জেগে উঠ্‌ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হতাশা, বিভ্রান্তি ও বিতৃষ্ণায় এ যুগের তরুণের মন ভরে উঠ্‌ল। তাদের সকলেই ওপরতলার সমাজে সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে মানুষ, সম্পন্ন বাপ-মার সন্তান, পাবলিক স্কুল আর য়ুনিভার্সিটির ব্যয়বহুল শিক্ষালাভ ক'রেছেন। মিঃ অডেন একটি চিঠিতে মিঃ ঈশার উডকে লিখেছিলেন—Behind us we have stuco suburbs and expensive educations — এরা যখন জীবনের দিকে তাকায় তখন দেখে কি নিদারুণ অবস্থা। চারিদিকে পরিবর্তন, চারিদিকে বিপ্লব! এই পরিবর্তনের প্রভাবে সাহিত্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হয়ে উঠেছে প্রচারমুখী। যুদ্ধের আশংকায় লেখকরা লিখ্‌ছেন নতুন ভঙ্গীতে। আগেকার গজদন্ত মিনার এখন চূর্ণিত হওয়ার উপক্রম, সুদৃঢ় সেই মিনার এতদিনে হেলে পড়েছে। এই অবস্থার কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বছরে প্রকাশিত "দি লীনিং টাউয়ার" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফ।

ডেলুইস, অডেন, স্পেন্ডার, ঈশার উড, লুই ম্যাকনীস্ প্রভৃতি লেখক বৃন্দ এই যুগের প্রতিনিধি। তাঁদের অন্তরে জেগেছে মানবিক প্রেরণা, এই হেলান মিনার সাহিত্যের প্রবণতা হল, সম্পূর্ণ হতে হবে, সামগ্রিক জীবনের অংশভাগী হতে হবে, মানবিক হতে হবে "All that I would like is to be human' — that cry rings through their books — the longing to be closer to their kind. to write the common speech of their kind. no longer to be isolated and exalted in solitary state upon their tower, but to be down on the ground with the mass of human kind."

(The Leaning Tower).

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ঠিকই বলেছেঃ আত্ম-বিশ্লেষণ ও জীবনজিজ্ঞাসায় এ যুগের লেখকরা মগ্ন। নৈরাশ্য ও বৈকল্য চিন্তায় তাঁরা ভারাক্রান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক এবং বৈদগ্ধ্যের ভিত্তিমূলে অনেক আগেই আঘাত শুরু করেছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ, এতদিনে তা সম্পূর্ণ হল।

এই পটভূমিকার ওপর শুরু হল স্পেনের গৃহযুদ্ধ। কেবলমাত্র বিপ্লবের দ্বারা একটা আসন্ন আন্তর্জাতিক যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে এই চিন্তা প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ল এবং সব শ্রেণীর বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবির দল (যার মধ্যে ছিল পৃথিবীর সব অঞ্চলের প্রখ্যাত লেখক সম্প্রদায়) একত্র সম্মিলিত হয়ে ফ্যাসিস্ত অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে হাত মেলালেন। ফ্যাসী-বিরোধী একটা দল স্পেনে রিপাবলিক্যানদের হয়ে লড়তে গেলেন। ব্রিটেনের কয়েকজন তরুণ লেখকও গিছলেন, এঁদের মধ্যে জন কর্নফোর্ড এবং র‍্যাল্‌ফ ফকস্ ছিলেন বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন। এঁরা দুজনেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত হ'ন। ফেদরিকো গারথিয়া লোরকা গৃহযুদ্ধের গোড়ার দিকেই ফ্যাসিস্তের গুলীতে প্রাণ দেন। স্পেনের নবযুগের তিনি ছিলেন প্রতিনিধি স্থানীয়। মৃত্যুকালে বয়স ছিল সাঁইত্রিশ। তাঁর অনেক কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

স্পেনের এই গৃহ-বিবাদের যুদ্ধে নতুন আন্দোলনের চরম পরিণতি ঘট্‌ল। রিপাবলিক্যানরা যখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তখনই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। এই বিভ্রান্তি সাধারণ ধরনের নয়। যা ওপর থেকে সহজ মনে হয়েছিল যখন দেখা গেল তা গভীরভাবে জটিল তখন মনে বিভ্রান্তির উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। লেখকের নিজস্ব মতবাদ বা আইডিয়ালিজমকে রাজনৈতিক খেলার পুরানো চালবাজিতে জড়ানো হল। সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। লেখকরা বুঝতে শুরু করলেন যে, এইভাবে যুদ্ধে অংশভাগী হয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু মহৎ কার্য করেন নি, কারণ সংকীর্ণ একটা রাজনৈতিক আবর্তে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা হয়ত শিল্পী হিসাবে তাঁদের প্রকৃত এবং প্রাথমিক কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। শিল্পীর কর্ম শিল্পসম্মত সাহিত্য-সৃষ্টি, যা হবে কালজয়ী। সাময়িক উত্তেজনার মুখে পুস্তিকা রচনা নয়।

ফলে ১৯৩৯-এ যখন জার্মান যুদ্ধ ঘোষিত হল তখন লেখকমহলের প্রচণ্ড ভাটার কাল সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। ব্রিটেনে তাই ১৯৩৯-উত্তর কালে দেশপ্রেমমূলক আবেগ প্রায় নীরবতায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর আশ্চর্য কর্মক্ষমতা, সাহস, তেজোদীপ্ত বাণীর দ্বারা একটা জাতিকে যুদ্ধজয়ের পথে নিয়ে গেছেন, যিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে (ইতিহাস, জীবনী ও বাগ্মিতার স্বীকৃতি হিসাবে), সেই উইনষ্টন চার্চিল-ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক। ১৯৪০-এর ১০ই মে তারিখে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। আর পরবর্তী সোমবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠে "Blood, Sweat and tears" নিয়ে আবেগময়ী বক্তৃতা দিলেন। এই এক বক্তৃতা সেদিন ইংলণ্ডের মানুষকে জাগিয়ে এবং মাতিয়ে দিল। চার্চিলের জীবনীকার বলেছেন 'an immortal masterpiece among England's great orations.'

।। সাত ।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে উইনষ্টন চার্চিল একটি প্রায়-বিধ্বস্ত জাতিকে সর্বোত্তম সম্মানে অভিষিক্ত করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকখানি গ্রন্থ 'ওয়ার ক্লাসিক' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বাগ্রে নাম করতে হয় এরিক মারিয়া রেমার্কের "ইন ওয়েষ্টার্ণ নীটস নিউজ" নামক জার্মান উপন্যাস, যা 'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট' নামে পৃথিবীখ্যাত। ১৯২৯-এর জানুয়ারীতে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পল বমার ছাত্রাবস্থা শেষ হওয়ার আগেই যায় সমরাঙ্গনে লড়তে। কাজিনস্কি, মুলার, জ্যাডেন প্রভৃতি সহ-সৈনিকদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব জমে ওঠে এবং যুদ্ধের বিচিত্র ক্লেশ ও নির্যাতন সকলে একত্রে ভোগ করে। পল বমারের বন্ধুরা একে একে রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। কারো স্নায়ুবিকার ঘট্‌লো, কেউ বিকলাঙ্গ হয়ে ঘরে ফেরে যুদ্ধের পর— সামরিক জীবনের অভিশাপ কিভাবে সাধারণ সৈনিকের দেহ-মনকে বিকল করে তার কাহিনী। এই জনপ্রিয় গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ ১৯৩১-এ ৩৭৫ হাজার খণ্ড বিক্রীত হয়। ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয় রেমার্কের দ্বিতীয় গ্রন্থ ডের ওয়েজ জারাক বা 'রোড ব্যাক'। এই উপন্যাসের উপজীব্যও প্রথমটির মত। যুদ্ধের পরবর্তীকালের দুর্দশার বিবরণ।

রাশিয়ান লেখক মিখাইল সোলোকোভ লেখেন "দি কোয়ায়েট ডন"। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত এই গীতকাব্যধর্মী উপন্যাসে প্রথম মহাযুদ্ধকালীন রাশিয়া ও রাশিয়ানদের জীবনালেখ্য বর্ণিত। স্পেনের লেখক ভিসন্ত ব্লাস্‌কো ইবানেজ লেখেন "দি ফোর হর্সমেন অফ্ দি এপোকালিপস্" (১৯১৬)— নরহত্যা, বিজয়, দুর্ভিক্ষ, প্রথম মহাযুদ্ধের কালে কিভাবে সমরাঙ্গনে বিভীষিকা সৃষ্টি ক'র তার কাহিনী। সি এস, ফরেষ্টার নামক ইংরাজ লেখক ১৯৩৫-এ লেখেন "দি আফ্রিক্যান কুইন"—এক ষ্টীমলঞ্চে জনৈক ভীরু ককনি এবং মিশনারীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বিধৃত। এই

উপন্যাসটি চার্চিলের অতিশয় প্রিয়। ১৯২৯-এ ইংরাজ লেখক রবার্ট গ্রেভস এক আত্মজীবনীমূলক কাহিনী রচনা করেন "গুড বাই টু অল দ্যাট"—এই গ্রন্থে যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন সহকর্মীদের কথা লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সি. ই. মনটেগুর "ডিসএনচানমেণ্ট", এডমন্ড ব্লাণ্ডেন কৃত 'অনডারটোনস অব ওয়ার' এবং টমলিনসনের 'অল আওয়ার ইয়েষ্টারডেস'' প্রভৃতির মতো এই গ্রন্থটিতে যুদ্ধের বেদনাভরা দিনের কাহিনী বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত। গ্রেভসের এই আত্মজীবনীতে এমন এক সরলতা আছে যা সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। সাধারণতঃ আত্মজীবনীতে এই ধরনের সম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না। এই একই কারণে উপরিল্লিখিত গ্রন্থাবলী ওয়ার ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে।

আরেকটি জার্মান উপন্যাস কার্ল অ্যান্ড আনা বা 'কার্ল ও আনা' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই উপন্যাসের লেখক লিওনিদ ফ্রাঙ্ক। দুই বন্ধু ছিল একই বন্দী শিবিরে, সেখানে প্রতিদিন একজন অপরজনকে তার ঘরের খবর শোনাত, স্ত্রীর বর্ণনা এমনই বলে যেত যে অন্য বন্ধুর কোনো কিছু অজানা রইল না। একদিন কোনোমতে বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে অপরজন হাজির হল বন্ধুর স্ত্রীর কাছে। নানাবিধ অন্তরঙ্গ কথা এমন ভঙ্গীতে বলে যে মহিলাটি তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করে, অথচ বোঝে যে সে তার স্বামী নয়। অবশেষে একদিন আসল স্বামী ঘরে ফেরে, এতদিনে নকলের সঙ্গেও মহিলাটির প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এইখানেই শুরু হল এক নিদারুণ ট্রাজেডি।

যুদ্ধের বিভীষিকা, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গঠনই ছিল এই সব উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। সদ্য যুদ্ধযন্ত্রণাক্লান্ত য়ুরোপ অতি স্বাভাবিক কারণেই এইসব উপন্যাস এবং আত্মজীবনীকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল।

।। আট ।।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ যেমন কবি ও সাহিত্যিকদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছে, তেমনই বিশ্ব-সাহিত্যে একজন স্মরণীয় লেখককে দান করেছে তাঁর নাম আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে। হেমিংওয়ে স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং তাঁর উপলব্ধিকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। "আনডার দি রীজ" নামে স্পেন-যুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর একটি গল্প আছে আত্মনেপদী কাহিনী। ফ্রণ্টে হেমিংওয়েরের 'স্প্যানিস আর্থ' ছবি তোলা হচ্ছে, ফিল্ম ইউনিট কয়েক-জন রিপাবলিক্যান সৈনিকের সঙ্গে কথা-বার্তায় মেতে আছে, তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠল—আমি সব বিদেশীকেই ঘৃণা করি। অপর সৈনিকরা তার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে সংগ্রাম এবং কথাবার্তা চলছে এমন সময় দেখা গেল জনৈক মধ্যবয়সী ফরাসী ভদ্রলোক ফ্রণ্ট লাইন ঘেঁষে যাচ্ছেন। তিনি নীচে রীজের তলায় মিলিয়ে গেলেন, সেইখানে সৈন্যরা এবং ফিল্ম ইউনিট দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে একদল রাশিয়ান আর্মি পুলিস এসে হাজির, প্রশ্ন করে কেউ কি ফরাসী-টাকে দেখেছ? সবাই বলে—কই না ত। রাশিয়ানরা চলে যায়, পরে সেই ফরাসী-টিকে খুঁজে গুলি করে মেরে আবার ফিরে আসে। তখন পূর্বোক্ত সেই সৈনিকটি পুলিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলে—এর নাম—। লেখক কথাটি সম্পূর্ণ করেন—যুদ্ধ। যুদ্ধে ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন আছে।

সৈনিক বলে—সেই ডিসিপ্লিন পালন করতে গিয়ে আমরা মারা যাব কি?

লেখক বলেন—ডিসিপ্লিন না থাকলে আমাদের সবাইকেই ত' মরতে হবে।......

এ পর্যন্ত কাহিনী হেমিংওয়ের বিশিষ্ট ভঙ্গীর পরিচায়ক। যুদ্ধ উত্তম এবং সত্য। হিংসার প্রয়োজন আছে, মানুষের ভালো কিংবা মন্দ বিচার করতে হবে, সে বেশ কড়া না দুর্বল এই মাপকাঠিতে। এর পর কাহিনীর মেজাজ পালটে যায়, সেই সৈনিক লেখককে বলেন যে তাঁর প্রদেশের একটি ছেলে নিজের হাতেই গুলি করে, বোমা ফেলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবে বলে। তাকে হাসপাতালে যেতে হল, সেরে উঠে আবার তাকে কাজে পাঠানো হল। রাশিয়ান পুলিসরা ওকে ফ্রণ্টে নিয়ে এল। তার সঙ্গীরা তাকে অভিনন্দন জানায়, ছেলেটি বলে—আমি অবশ্য কাজটা নির্বোধের মত ক'রছিলাম, তার জন্য লজ্জিত। এখন এক হাতেই কাজ করব, যে মহৎ দায়িত্ব নিয়েছি, তা পালন করব।

রাশিয়ানরা কিন্তু ঠিক যেখানে ছেলেটি নিজের হাতে গুলি করে আহত হয়েছিল সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে গুলি করে মারল, দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই উদ্দেশ্য। এর পর সৈনিকটা বলে—আমার ঘৃণার কারণ বুঝলেন?

লেখক বললেন—বুঝেছি।

এর পরই ফিল্ম ইউনিট তাদের যন্ত্রপাতি গুটিয়ে চলে গেল। এখানেই গল্প শেষ। গল্পটি এমন জায়গায় শেষ হওয়ায় এর মূল্য বেড়েছে, এর আগে থামলে অন্য রকম হত। একটা নির্দিষ্ট সীমার মাঝে মানুষ যে নিষ্ঠুর ও উন্মাদ হতে পারে তার আগ্রহ এক রকম, কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতা এবং উন্মত্ততা সম্পর্কে অপরের অনুভূতির এই অভি-ব্যক্তির মূল্য অনেক বেশী।

হেমিংওয়ে ১৯২৯-এ লিখেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় "এ ফেয়ার-ওয়েল টু আর্মস"—প্রেমের কাহিনী, অত্যন্ত সাহসিক কাহিনী, আর "ফর হুম দি বেল টলস" স্পেনীয় গৃহ-যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত, এর মধ্যেও আছে প্রেম আর বিপজ্জনক মুহূর্ত। সমালোচকদের মতে এই উপন্যাস হয়ত হেমিংওয়ে শিল্পী হিসাবে সচেতন হয়ে রচনা করেন নি, তাই এত উৎকৃষ্ট হয়েছে। এণ্ড্রেস তার সঙ্গীর জীবনরক্ষার জন্য হেডকোয়ার্টার্সে একটা সংবাদ পাঠাবার জন্য সচেষ্ট। যত বিলম্ব হচ্ছে হতাশায় মন ভরে উঠছে। এই বিলম্ব আর হতাশা উপন্যাসটির মধ্যে প্রতীকের কাজ করেছে। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ত্রাণ নয় বিপ্লবের মুক্তিই, এই প্রতীকের অর্থ। ভয়ের বিশ্লেষণও চমৎকার। হেমিংওয়ে এর অনেক আগে লিখেছিলেন "দি সান অলসো রাইজেস"—সেই উপন্যাসে আছে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর, যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল তার কাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ এবং মার্কিন উপন্যাসিকরাই কয়েকখানি মহৎ উপন্যাস রচনা করেছেন। কনষ্টানটাইন সিমোনভ রাশিয়ার একজন নেতৃস্থানীয় সমর-সাংবাদিক। ১৯৪১-এর ২৪শে জুন তিনি বেরিয়েছিলেন সমরাঙ্গনের পথে, তারপর বেরেনটস থেকে ব্ল্যাক সী এবং ষ্টালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। ষ্টালিনগ্রাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি রচনা করেছেন—"ডেস এণ্ড নাইটস"। ১৯৪৬-এ এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ, সেখানকার নর-নারী, তাদের যন্ত্রণা আর বিজয়উল্লাসের কাহিনী। এই উপ-ন্যাসের জন্য তিনি 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' এবং অনেক পদক লাভ ক'রেন। এর পূর্বে ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'রাশিয়ান পিপল' নামক নাটকটি ষ্ট্যালিন প্রাইজ লাভ করে। এই নাটকের চমকপ্রদ চরিত্র লাল ফৌজের স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধ পক্ক-কেশ ভূতপূর্ব জার আমলের অফিসার, নির্ভীকত্বে তিনি তরুণদের চেয়েও পারদর্শী।

ভডসেংকো লিখেছেন—"নাইট বিফোর ওয়ার" নামক শক্তিশালী সমরোপন্যাস। ইউক্রেনের নদীর প্রাচীন মাঝিদের বীরত্বের পটভূমিতে রচিত। ভডসেংকো লিখেছেন—"নদী নয় যেন একটি নাটক, আর এই প্রাচীন মাঝিরা যেন নদীর মূল-আত্মা। তারা দুঃসাহসী ও দুর্জয়, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না।"

ইগনেৎসিও সিলোনে নামক ইতালীয় লেখক লিখেছিলেন 'ব্রেড এণ্ড ওয়াইন'। ফ্যাসিস্তদের তাঁবে ইতালীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, এবং আণ্ডার গ্রাউণ্ড প্রতিরোধবাহিনীর বিরামবিহীন সংগ্রামের কাহিনী।

পোল্যাণ্ডের ভান্দা ওয়াসিলিয়েভস্কা যুদ্ধ-সাংবাদিক। জার্মান অধিকৃত

ইউক্রেণের একটি গ্রামকে পটভূমি করে তিনি লিখেছিলেন 'রেন বো'। ষ্ট্যালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত এই উপন্যাসে তিনি ইউক্রেণের মাটি ও মানুষের দুঃসাহসিক চরিত্রের কাহিনী লিখেছেন। শীতের কয়েকটি দিনের মধ্যে উপন্যাসটি সমাপ্ত। লাল ফৌজ কর্তৃক মুক্ত হওয়ার পূর্বেকার কয়েকটি দিনের ইতিহাস। গ্রামের সবাই হাতিয়ারহীন তবু তারা যুদ্ধ করে যায়। প্রধান চরিত্র ওলেনা একজন গেরিলা যুদ্ধের নায়িকা। শান্ত ভঙ্গীতে সে দেশের মুক্তির জন্য নিজের ও সদ্যোজাত সন্তানের জীবন দান করল। ওলেনা কস্টিয়ুক এক বিচিত্র নারীচরিত্র।

জার্মান লেখক ডঃ লিঅন ফয়েট-ভাংগার ১৯৩৩-এ জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে পালিয়ে আসেন। পরে ফ্রান্স জার্মান অধিকারে আসায় কিছুকাল অন্তরীণ থাকার পর আমেরিকায় আশ্রয় নেন। যুদ্ধ এবং অবরোধকালীন দক্ষিণ ফ্রান্সের পটভূমিকায় তিনি লেখেন 'সীম'। সীম' নামে একটি সাধারণ ফরাসী মেয়ে পাঁচশো বছর আগেকার বিপ্লবী নায়িকা জোন অব আর্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিভাবে ফরাসী প্রতিরোধবাহিনী গড়ে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তার আশ্চর্য কাহিনী। একটি কিশোরী মেয়ের দেশপ্রেম, এবং দেশপ্রেমের আগুনে সে আত্মবিসর্জন দিয়েছে, আপনাকে সে ভেবেছে বীরবালা জোন অব আর্কের অংশ, এবং সেই প্রেরণায় সে দুর্ধর্ষ জার্মান সেনার সঙ্গে লড়েছে। উপন্যাসটির আঙ্গিক বিচিত্র।

একজন বাঙালী লেখক গিরিজা মুখোপাধ্যায় যুদ্ধের সময় ছিলেন ফ্রান্সে। জার্মান আক্রমণের কালে তিনিও আরো অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে আসছিলেন, কিন্তু পারলেন না, প্যারিতে ফিরে এলেন। জার্মান পুলিস ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাঁকে ফরাসী জেলখানায় রাখল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এ. সি. নাম্বিয়ারের পরামর্শে তিনি জার্মানী গেলেন। সেখানে তিনি 'আজাদ হিন্দ' বেতারের ঘোষক হলেন, সুভাষচন্দ্র এবং গ্রান্ড মুফ্‌তির সঙ্গে যোগাযোগ হল। জার্মানী থেকে হল্যান্ডে, সেখান থেকে আবার বার্লিন, সেখান থেকে দক্ষিণ জার্মানী, ইতিমধ্যে রাশিয়ানরা বার্লিনে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে তিনি পালালেন সুইজারল্যান্ডে। সেখান থেকে আবার জার্মানী। তারপর ফরাসীদের হাতে পড়ে কোনোরকমে নিষ্কৃতি। শ্রীযুক্ত গিরিজা মুখোপাধ্যায়কে

যুদ্ধের হেরফেরে তাঁতের মাকুর মত ঘুরতে হয়েছে। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি লিখেছেন তাঁর "দিস্ ইয়োরোপ" নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থটিও একটি উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-সাহিত্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

।। নয় ।।

এর পর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য মার্কিন উপন্যাসের বিবরণ দান করে নিবন্ধটি শেষ করব। পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিণ সাহিত্যিকরা প্রচুর মহৎ উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে নর্মান মেলরকৃত 'দি নেকেড এ্যাণ্ড দি ডেড্' উপন্যাসটির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এই উপন্যাসটি ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয়, পরে সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনীটি রিপোর্টাজের এক দৃষ্টান্ত। সাউথ-প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডে আমেরিকান সৈনিকদের (জি-ওয়ান) চিন্তা এবং জীবনযাত্রার নিখুঁত বর্ণনা। তারা কিভাবে থেকেছে, কথা বলেছে এবং মরেছে তার রিপোর্ট। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড কামিংসএর থিয়োরী ছিল অদ্ভুত। তিনি তাঁর সহকারীকে বলতেন—আমাকে যে-কোনো একটা লোক দাও তাকে আমি ভয়ার্ত করে তুলব। আমেরিকান সৈনিককে দৃঢ় হতে হবে তবেই সে শত্রুকে কায়দা করতে পারবে। আমার কৌশল হল যে শত্রুর চেয়ে আমাকেই বেশী ভয় করবে। এইভাবে ভয় জয় হবে।

লেফ্‌টেনান্ট হার্ন বল্‌তো—আর সেই সৈনিক যখন আপনার দিকে মেশিনগান ঘুরিয়ে দেবে, তখন?" —কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে আছে মানবজীবনের অতিশয় অন্তরঙ্গ কাহিনী। সাধারণতঃ এমন খোলাখুলিভাবে খুব কম উপন্যাসই রচিত হয়েছে।

জেমস জোনস লিখেছেন—'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি'। এই উপন্যাসটিও সেনা ব্যারাকের কাহিনী। পদস্থ সৈনিকরা কিভাবে তাঁদের নিম্নপদস্থ সৈনিকদের প্রতি অত্যাচার করেন তারই বিয়োগান্ত কাহিনী। বিউগিল কোরের বার্টলী প্রিউইটের পার্ল হারবারের কাছে স্কোফিলড ব্যারাকে বদলীর আদেশ হল। অত্যাচারিত আহত প্রিউইট ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১—শুনতে পেল জাপানীরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলেছে। সে এতদিন দলছাড়া হয়ে পালিয়েছিল, সৈন্যদলে যোগদান করতে যাওয়ার পথে রাতের অন্ধকারে সেনাদল তাকে গুলি করল, সে বলে আমি সৈনিক। তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, স্টেনগানের আঘাতে তার দেহ নিশ্চল হয়ে গেল।

প্রিউইটের সম্মানে বিউগিল বাজালেন ওয়ার্ডেন নিজে। তাঁর সুরজ্ঞান নেই, তবু তিনি জানেন একজন সৎ সৈনিকের উদ্দেশ্যে তিনি বিউগিল বাজাচ্ছেন। সেই সঙ্গে পড়ে চোখের জল।

'দি টি হাউস অব দি আগস্ট মুন' ভার্ণ জে স্নাইডার-কৃত উপন্যাস। এই উপন্যাস পরে নাটক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্যাপ্তেন ফিস্‌বি ভাবতেন আমি সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত নই, তবু যা হোক যুদ্ধে জয় হল। ফিস্‌বি সাহসী, সৎ এবং নিষ্ঠাবান। কর্নেল পারডির কাছেও সেই কথাই বলে—আমি স্যার সোলজার হওয়ার জন্যে জন্মাইনি। কর্নেল হতাশ হন, কি আর করবেন। ওপর থেকে পাঠিয়েছে। তিনি বল্লেন—ক্যাপ্তেন, আমরা কেউই সৈনিক হয়ে জন্মাই নি, তবু আমাদের এই কর্মে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, কাজ চাই, কাজ করতে হবে। কর্ণেল বল্লেন—এই নিন, প্লান 'বি', ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো হয়েছে, এখানকার পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা। এই প্লান আপনার বাইবেল। ভালোকথা আপনি লুচু আনে কেমন?

—সে কি স্যার? সেটা আবার কি বস্তু?

—এখানকার স্থানীয় ভাষা। আচ্ছা আপনাকে একজন দোভাষী দেওয়া হবে। সাকিনি ছেলেটি ভালো, এই সা-কি-নি।

সাকিনি জাপানী তরুণ। খালি হাসে। ঘুম ঘুম চোখ, গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন হাতে বোনা কাপড়ের জামা জড়ানো, পায়ে মার্কিণ সৈনিকের বিরাট মোজা, আর বুট। সে এসে হেসে বলে—সার্কিনি প্রেসেন্ট, সকস্ আপ, নট স্লিপিং—'

এই কাহিনীর শুরু। তারপর সাকিনি এবং ক্যাপ্তেন ফিস্‌বি দুজনে মিলে বিধ্বস্ত জাপানের একটি পল্লীগ্রামের সমরোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনানুসারে কিভাবে একটা চায়ের আসর গড়ে তুললেন তার কাহিনী। চমৎকার স্যাটায়ার।

যুদ্ধের এক বিচিত্র ব্যঙ্গ-কাহিনী।

আরও অনেক কাহিনী—পার্ল-হারবার, বিমানবহর, ফ্রান্সের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের শুধু পরিচয় দেওয়া হল।

।। দশ ।।

আরনল্ড বেনেট বলেছিলেন টলস্টয়ের "ওয়ার এণ্ড পীস" সম্পর্কে "St. Peter at Rome is a trifle compared with Tolstoy's 'War and Peace.." টলস্টয় স্বয়ং এই উপন্যাসকে ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ৩৫০টি চরিত্র, জীবনের এক বিচিত্র মিছিল। নেপোলিয়ানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত বিশাল উপন্যাস। প্রিন্স আঁদ্রে প্রিয়তমা নাটাশার কক্ষে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত্যুর শীতল স্পর্শলাভ করেন, ফরাসীর হাতে বন্দী পীয়ের। মৃত সৈনিকের পাহাড় অতিক্রম করে পীয়েরের পদযাত্রা, সঙ্গে কারাটেভ সান্ত্বনা দেয়।

যে টলস্টয় একদা তাঁর উপন্যাসকে ইলিয়াডের সমগোত্র বলেছেন, তিনিই আবার পরে বলেছেন—এসব তুচ্ছ। অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি টলস্টয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

টলস্টয়কে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বিচার করতেন একজন pomeshthchik বলে, অর্থাৎ জমিদার মত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে সম্মানিত হয়। তিনি রাশিয়ার বরেণ্য মনীষীদের অন্যতম হিসাবে মর্যাদালাভ করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' পড়ে শোনানো হত।

পাঁচ বছরের বিরামবিহীন পরিশ্রমে টলস্টয় যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা আজো বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত।

শেলীর বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ—

"Poets are the trumpets which sing to battle, poets are the unacknowledged legislators of the world."

কত কাব্য, কত কাহিনী বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, কিন্তু যে সাহিত্য দেশপ্রেমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই সাহিত্য অবিস্মরণীয়। যুগে যুগে তাই প্রয়োজন হয়েছে অতীতের পুনরাবিষ্কার, অতীত বিমুখ হয়ে বসে থেকে নিখিল মারণযজ্ঞের শীকার হওয়ার মত মূর্খামি আর নেই। যুদ্ধের স্বাদ তাই আমাদের যুদ্ধ সম্পর্কে বিরূপ করলেও, দেশ যখন আক্রান্ত তখন সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটবেই। ঠুনকো মূল্যবোধ বিপদকালে ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত তলিয়ে যায়, তখন তাই প্রয়োজন সেই ঐশ্বর্যের যা চিরন্তন। মানুষের মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লিষ্টতার গভীর তমিস্রার মাঝে বিদ্যুচ্চমকের মত সাহিত্যিকের সাহসিক বাণী যুগে যুগে পথ নির্দেশ করেছে।

—শেষ—

অনিশ্চয়

প্রতিভা বসু

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসেল কিছু জবাব দেবার আগেই মিসেস ক্রাউন একজোড়া নতুন দম্পতি নিয়ে এলেন আলাপ করাতে। রাসেলের সঙ্গে কথোপকথনে ছেদ পড়লো।

এই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মনস্তত্ত্ববিদ। দুজনেই নিজেদের বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করেন। প্রচুর রোগী জোটে, এবং সেই রোগীদের দয়ায় প্রচুর পয়সাও করেছেন। নিউইয়র্ক শহরে, ম্যানহাটানের উপর বাগান ঘেরা একটি আড়াইতলা বাড়ি কিনেছেন দুজনে, দুটি আলাদা চেম্বার করেছেন। এমন কি চারটি বেডসম্বলিত একটি হল ঘরও আছে অতিথিদের থাকবার জন্য। তেমন তেমন বাঘা রোগীরা সেখানে থেকে চিকিৎসা করিয়ে রোগমুক্ত হ'য়ে চলে যান। আর সেই বেডের যা মূল্য তার অঙ্ক শুনে আমাদের মাথা ঘোরে।

ভদ্রলোকটি দেখতে খুব সুন্দর, মাথা ভর্তি চুল, নীল চোখ, টিকোলো নাক, বাঁকা ঠোঁট—সব মিলিয়ে চেয়ে থাকার মতো। তিনি নিজে জাতিতে ওলন্দাজ, স্ত্রী আমেরিকান। ভারতবর্ষের তন্ত্র বিষয়ে তাঁদের অশেষ কৌতূহল, সাধু সন্ন্যাসীতে অগাধ বিশ্বাস। আমার সঙ্গে আলাপ হ'তেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি মেহেরবাবাকে চিনি কিনা। সবিনয়ে স্বীকার করতে হ'লো সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির নাম আমি কোনোদিন শুনিনি। ভদ্রলোকটির স্থূলাঙ্গী এবং তাঁর তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধা স্ত্রীটি চোখ বড়ো ক'রে দারুণ বিস্ময়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। ঘোর কাটলে বললেন, 'রিয়েলি?'

আমি বললাম, 'রিয়েলি।'

তখন আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, চোখ ছোট করলেন, ভর্ৎসনার সুরে বললেন 'এ রীতিমতো অজ্ঞতা।'

আমি মুখ নিচু ক'রে হাতে হাত ঘষলাম।

ভদ্রলোকটি বললেন, 'সেই ভগবান-তুল্য সাধকটি দক্ষিণ ভারতের এক দুর্গম অরণ্যে বাস করেন। সেই অরণ্যে বাঘেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে কিন্তু মেহেরবাবাকে তারা কিচ্ছু বলে না। মেহেরবাবা সব বাঘেদের বাবা। তিনি যদি একবার চোখ তুলে তাকান, বাস, হ'য়ে গেল। এক নিমেষে সব ঠাণ্ডা। অমনি সব নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের নড়বার ক্ষমতা থাকবে না, কোনো ইচ্ছাশক্তি কাজ করবে না।'

শুনে চমৎকৃত হ'লুম। এর পরে মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারটি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভারতের কোন প্রদেশ থেকে?'

বললুম 'বাংলা দেশ।'

শুনে খুশি হ'লেন তিনি, ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড়ো আনন্দ হ'লো। টেগোর তো শুনেছি বাঙালী।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'আমি তাঁর কিং অব ডার্ক চেম্বার পড়েছি।'

'কেমন লাগলো?'

'চমৎকার। আপনি কি জানেন এই নিউইয়র্ক শহরে মাস দেড়েক হ'লো সেই নাটকটা হচ্ছে'?

'দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তা হ'লে তো জানেন। আমরাও যাবো। শুনছি খুব ভিড় হচ্ছে। আমি আপনার স্বামীর বক্তৃতা শুনে থেকেই এ বিষয়ে প্রথম কৌতূহলী হই। তারপর থেকেই আমার টেগোর বিষয়ে খুব জানতে ইচ্ছে করে। যদি আপনাদের খুব অসুবিধে না হয়, একদিন আমার বাড়িতে খেতে বলতে পারি কি?'

'খুব আনন্দের কথা।'

'আমাদের একজন ফরাসী বান্ধবী আছেন, এখন তিনি বৃদ্ধা, তিনি টেগোরকে দেখেছেন, তাঁর কাছে টেগোরের সাতখানা চিঠি আছে।'

'তাই নাকি?'

'সেদিন তাঁকেও বলবো।'

'খুব ভালো।'

'এখন বড্ড শীত। ধরুন আর দুমাস। তারপরেই বসন্ত। আমার বাগান তখন টিউলিপে ভরে যাবে। আমার কালো টিউলিপের বেড আছে। একটি মস্ত মেপল গাছও আছে

বাগানে, তাতে যখন সবুজ পাতা গজাবে, আমি তখন গার্ডেন পার্টি করবো আর আপনারাই হবেন আমার প্রধান অতিথি।'

বুঝতে পারলুম মিসেস ব্রাউন একবার যাদের প্রধান অতিথি করে এতোবড়ো এক পার্টি'র আয়োজন করেছেন, সমাজে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবার চলতে থাকবে একের পর এক। ব্রাউন সম্মান পাওয়া মানেই নিকষ পাথরে ঘষে যাচাই হয়ে যাওয়া সোনা। মন্দ কী। হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালুম।

ভদ্রলোকের স্ত্রী একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, 'ভারতবর্ষ' বিষয়ে আমাদের অনেক কথা জানবার আছে, শোনবার আছে। ভারতবর্ষ এক রহস্যময় দেশ। দেখুন আমরা যে মানুষের মনের ব্যাধি সারাই, সবই বই পড়া বিদ্যা। ভারতবর্ষের সাধুরা শুনেছি যোগঅভ্যাস দিয়ে সে বিদ্যা অর্জন করেন। সন্ন্যাসীরা সব অলোকিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে হতবাক করে দেন তেমন তেমন পণ্ডিত লোককে। বলুন সত্যি কিনা।'

'হয়তো। আপনারা যে রকম শোনেন আমরাও সে রকমই শুনি।'

'দেখা পাননি কারো?'

'না তেমন ভাগ্য এখনো হয়নি। আপনাদের মতো আমাদেরও বই পড়া বিদ্যা ভাঙিয়েই দিন কাটে। যদি ভেবে থাকেন ভারতবর্ষ মানেই সাপ বাঘ আর সন্ন্যাসীদের বিচরণক্ষেত্র তা হ'লে বোধহয় সুবিচার হবে না। এই আমাদের মতো লোকেরই ভিড় বেশী। সুতরাং কোনো অলৌকিক বিষয়ে যদি আলাপ করতে চান তা হ'লে আমি বা আমার স্বামী আপনাদের হৃদয়ে যে খুব বেশী আলোকপাত করতে পারবো তা তো মনে হয় না।'

'কী। কী বিষয়ে কথা হচ্ছে?'

কটকটে ইংরিজি বলতে বলতে অন্য একজন ভারতীয় প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এলেন। চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম না তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ। শুধু এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হলুম তিনি বাঙালী নন। দেখলাম আমেরিকান অঙ্গভঙ্গি তাঁর করায়ত্ত। প্রাগ করে বললেন, 'এই যে মিসেস ওয়েভায়েন, তা শুনুন, ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীর বিষয়ে যদি জানতে চান, আমি আপনাদের এমন সব ঘটনা বলতে পারি যা শুনলে আপনাদের লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠবে। এবং আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।'

'তাই নাকি। তাই নাকি।'

ঢেউয়ে কচুরিপানার মত দুলতে দুলতে ভাসতে ভাসতে তৎক্ষণাৎ ছোটো একটি মানুষের দল এসে ঘিরে ফেললো তাকে। সে সদম্ভে সবিস্তারে গল্প ফাঁদলো, 'শুনুন তা হ'লে। বছর পাঁচেক আগে আমি একবার মারা যাই—'

'কী!'

'কী!'

'কী!'

সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখের তারা ছিটকে বেরিয়ে এলো প্রায়।
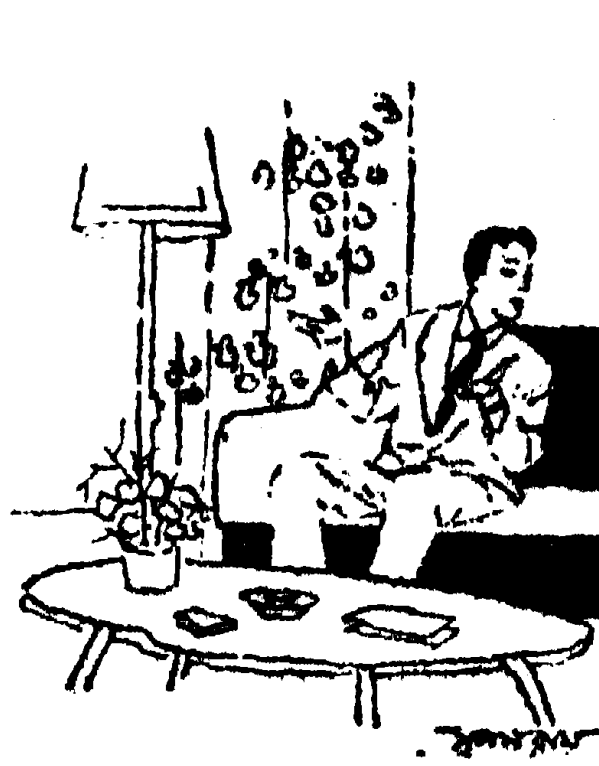
সে সদম্ভে সবিস্তারে গল্প ফাঁদলো.....

'মারা যান?'

'মানে?'

'মানে আমার মৃত্যু ঘটে।'

'মৃত্যু ঘটে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'তারপর?'

'তারপর যথারীতি আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী আমার আত্মীয়-স্বজনরা আমাকে শ্মশানে নিয়ে যান। পোড়াবার ব্যবস্থা করতে কাঠ জড়ো করেন। আপনারা বোধহয় জানেন না, কীভাবে মৃতদেহ পোড়ানো হয়। আমাদের শ্মশানে কতোগুলো মানুষ শোওয়াবার মতো কাটা জায়গা থাকে মাটির উপরে। তাতে প্রথমে কয়েক পাঁজা কাঠ সাজিয়ে মৃতদেহটিকে শুইয়ে দেয়া হয়, তারপর তার উপর আরো কয়েক পাঁজা কাঠ দিয়ে তলা থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।'

'চুক। চুক। চুক। তারপর?'

'আমাকেও সেই ভাবে শোয়ানো হ'লো।'

'ইশ। তারপর?'

'তারপর মন্ত্র পড়ে সাতপাক ঘুরে আমার আট বছরের ছেলে যখন আমাকে আগুন ধরিয়ে দিতে এলো—'

'ছেলে?'

'হ্যাঁ, প্রথম আগুনটা ছেলেকেই ধরিয়ে দিতে হয় কিনা?'

'তাই বুঝি?'

'ওটার নাম মুখাগ্নি। যাই হোক, আট বছরের ছেলে তো আগুন এনে ছুঁইয়ে দিয়েই বাবা বাবা বলে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, আগুনও ধরে উঠলো দাউ দাউ করে। এর মধ্যে হঠাৎ লালপাড় শাড়ি পরনে, লাল টকটকে সিঁদুর কপালে, এক অতি অপূর্ব চেহারার মহিলা কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হলেন কে জানে। এই লম্বা লম্বা চুল, হাতে কমণ্ডলু, তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন, 'তিষ্ঠ'।
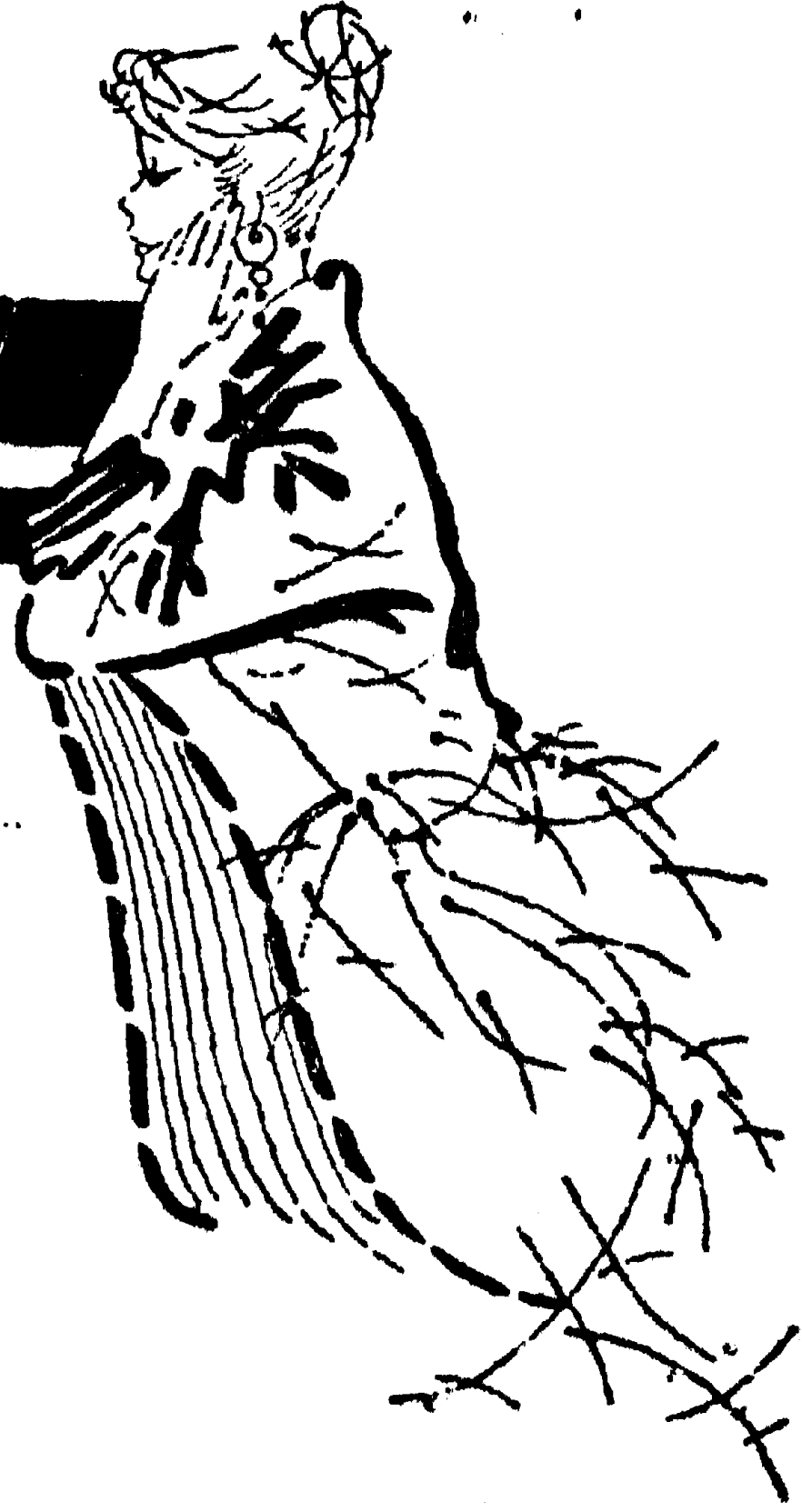
'তিষ্ঠ'!'

'হ্যাঁ। মানে থামো। বলেই কমণ্ডলু থেকে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে

দিলেন, অমনি আগুন নিবে গেল। তখন সেই দেবী কাঠ সরিয়ে আমার দেহটা তুলে এনে আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আমার চারপাশের আত্মীয়-স্বজনকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'শীগ্গির একে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মুখে জল দাও, গা মুছিয়ে পরিষ্কার করে দাও, তারপর বাড়ি নিয়ে যাও'।

আত্মীয়-স্বজনরা স্তম্ভিত। মরা মানুষকে শ্মশান থেকে কোথায় বাড়িতে নিয়ে যাবে? সকলে তো মা মা বলে লুটিয়ে পড়লেন সেখানে। মা তখন আমার কানে জীয়ন মন্ত্র ঢাললেন, তারপর মস্ত এক চপেটাঘাত করে যেন জাগিয়ে দিলেন ঘুম থেকে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম।'

'এ্যাঁ!'

'এ্যাঁ!'

'এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আর এই ঘটনা কাগজে কাগজে বেরিয়ে তখন দেশে ভয়ানক আন্দোলন তুলেছিলো। দলে দলে লোক দেখতে আসতে লাগলো আমাকে, আর তারপর—'

'হ্যালো ডেশাই—'

আর একজন মহিলা এসে ভিড় বাড়ালেন। ভারতীয় ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে।

মহিলাটি হাত ধরে থেকে বললেন, 'তারপর? দেশ থেকে কবে ফিরলে? নতুন কী জিনিস আনলে?'

কোথা থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দেশাইয়ের স্ত্রী এসে হাজির হ'লো 'এই যে ডক্টর ওয়েভারেন, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

'হ্যালো পেনি, আছ কেমন?'

ভালো না, ডক্টর ওয়েভারেন।'

কেন? আবার কী হ'লো?'

পেনি ওরফে মিসেস দেশাই তার রোগা দেহ নিয়েও হাঁসফাস করলেন। গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ছোট্ট রুমালে মুখ মুছে হতাশার সুরে বললেন, 'আপনার চিকিৎসায় সত্যি আমার উপকার হয়েছিলো, বিরক্ত বিরক্ত ভাবটা খুব কমে গিয়েছিলো, চট করে রেগে ওঠা বা মনখারাপ করে বসে থাকা ভাবটাও একদম ছিলো না কিন্তু এখন আবার আর এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে।'

কী উপসর্গ?'

'ভারি দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'দুঃস্বপ্ন! এ তো ভালো নয়।'

'আর তা ছাড়া আপনি তো জানেন একটু একটু কবিতা লেখার অভ্যাস ছিলো, আজকাল আর কিছুই মাথায় আসছে না।'

'তাই নাকি?'

ডক্টর ওয়েভারেন তো বটেই, মিসেস ওয়েভারেনও ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ভুরু কুঁচকে বিড় বিড় করলেন একে দুঃস্বপ্ন তায় কবিতা লেখার ভাব না আসা—উঁহু, এ ভালো লক্ষণ নয়। ডক্টর ওয়েভারেন নিজের মাথায় চারটি টোকা মারলেন। চুপ করে থেকে বললেন 'দ্যাখো পেনি, যা মনে হচ্ছে বেশ সিরিয়াস ব্যাপার। নেগলেক্ট করা একটুও উচিত হবে না। দুঃস্বপ্নের সঙ্গে কবিতা লিখতে না পারার সম্বন্ধটা খুব খারাপ। তার মানে একটাই আর একটা টেনে এনেছে'।

'তা হ'লে?' পেনির আর্তস্বর।

'তাই তো ভাবছি, কী করা যায়। শোনো, এক কাজ করো। আর একদিনও দেরি নয়। তুমি কালই আমার ক্লিনিকে এসো। আমি তোমাকে একটা দু' সপ্তাহের ট্রীটমেণ্ট দিয়ে দেখি আগে, সেটাতে ফল পেলে মাত্র পাঁচ মাসের চিকিৎসাতেই তুমি সেরে যাবে।'

'তাই যাবো ডক্টর ওয়েভারেন। এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'না হবারই কথা।'

'দেখুন, যদি আমার স্বামীর দেশে একবার যেতে পারতাম নিশ্চয়ই কোনো সাধুবাবা আমাকে এক ফুঁয়ে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু আমার স্বামী এমন নিষ্ঠুর, নিজে এর মধ্যে মাল আনতে দু'বার ঘুরে এলেন, আমাকে একবারো নিলেন না।'

বলতে বলতে মিসেস দেশাই চোখে রুমাল চাপা দিলেন।

আসলে এই দেশাই ভদ্রলোক এখানে ব্যবসা করেন। রকফেলার প্লাজার বেইজমেণ্টে তাঁর ভারতীয় সামগ্রীর মস্ত দোকান। সেখানে তিনি চটের মতো ভারি ভারি কাপড়ের দিশী স্যুট বানিয়ে রেখে তাক লাগিয়ে দেন সাহেব-সুবোর। দিশী নেকটাই ঝুলিয়ে প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের নয়ন মন হরণ করেন। তা ছাড়া মেয়েদের পুঁতির-মালা, কাচের চুড়ি, বেনারসী স্কার্ফ—ইত্যাদির সমাবেশও কম নয়। কিছু বাসনও আছে সঙ্গে। কটকি কাজ করা এ্যাশ ট্রে, আখরোট কাঠের কাশ্মীরি বাসন, জয়পুরী মিনে করা ফুলদানি, নেপালী সেটিংয়ের পিতলের থালা—বেশ আকর্ষণযোগ্য দোকান। আর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ সেই দোকানে একটি শাড়ি-পরা সেলস গার্ল—সব সময়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। এই পেনি নামের পুয়েটোরিকান মেয়েটিও ঐ দোকানে কাজ করতো। শেষ পর্যন্ত দেশাই তাকে বিয়ে করে দোকানের মালিকানী করে নিয়েছেন। না নিয়ে অবিশ্যি উপায় ছিলো না। বিয়ের তিন মাস পরেই তাদের একটি বাচ্চা হয়ে মারা যায়।

দেশাইয়ের দোকান সেখানে বিখ্যাত। শুধু দোকানই নয়, ইংরিজিতে একখানা

বইও লিখেছেন দেশাইসাহেব। বইয়ের নাম 'ভারতের ভূত, ভারতের সাধু, ভারতের আত্মা' অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত অলৌকিকতা বিষয়ে দেড়শো পাতার মধ্যে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। বর্তমানে 'ভারতের সর্প ও ব্যাঘ্র' এই বিষয়ে লিখতে মনোনিবেশ করেছেন। শোনা গেল দোকানের বিক্রীর সংগে পাল্লা দিয়ে সেই বই বিক্রী হয়। দেশাই অনেক ডলারের মালিক।

মিসেস ক্রাউন এর আগে তাঁকে চিনতেন না। নাম শুনেছিলেন। আজ আমাদের অনারেই এই ভারতীয় ভাজবটিকে ডেকে এনেছেন। ভেবেছেন, দেশওয়ালী ভাই দেখে আমরা সুখী হবো। তা হলুম।

আরো একজন ভারতীয়কেও এই রকমই কানে শুনে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি। তাঁর দোকান নেই, তিনি শুধুই লেখেন। এবং লিখেই তিনি সেখানে প্রচুর আরামের জীবনের অধিকারী হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বিষয়ে জোরালো প্রবন্ধ ছেপে খুব বাহবা পেয়েছেন। ভারতীয় মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে গংগাস্নান, পতিসেবা, আগুনে পুড়ে সতী হওয়া, মাতৃত্বের মহিমা, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে বেশ্যাবাড়ি পেণছে দিয়ে আসা—এ সব বিষয়ে নাকি এর অনন্ত জ্ঞান। বর্তমানে একের পর এক সেই সব ছাড়ছেন। শীগ্গিরই একটা কালেকশন বেরুবে। আশা করছেন তা থেকে তিনি বাকী জীবনের সংস্থান করে নিতে পারবেন। বাচ্চা বয়েস থেকে ব্যবসায়ী পিতার সংগে প্রবাসেই জীবন কেটেছে তাঁর। মাতৃভূমির মতো মাতৃভাষার সংগেও তাঁর কোনো নাড়ির যোগ নেই। কিন্তু তবু তিনি ভারতীয়, গায়ের রং এখনো মেটে, সুতরাং ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বর্ণনায় তাঁর জন্মগত অধিকার।

এই নমুনা দুটির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। তারপর এ পাশ থেকে ও পাশে গিয়ে বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

ও রকম নিঃসংগ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেতে যেতে মাঝপথে থেমে গেলেন মিসেস ক্রাউন।

'এ কী, এখানে একা? এসো এসো, এদের সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দি', নিউইয়র্ক শহরের তথা আমেরিকার তিনজন হোমরা-চোমরাকে উপস্থিত করলেন তিনি। তিনজনের নামই বহুশ্রুত। একজন মস্ত রাজনীতিজ্ঞ, একজন সেই বছরের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি, অন্যজন সেই বেহালাবাদক, যাঁর বাজনা শুনতে একদা কলকাতার রাস্তায় টিকিটের জন্য আধ মাইল জোড়া লম্বা লাইন হয়েছিলো।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে রাসেল বেরিয়ে এলো। 'আমি এবার পালাই, মিসেস ক্রাউন।'

'কেন? এতো তাড়া কিসের?'

'অনেক দূর যেতে হবে। খুব ভালো লাগলো।' আমার দিকে তাকালো 'আপনি আর কতোক্ষণ?'

বললাম, 'যতোক্ষণ না স্বামীকে উদ্ধার করতে পারি।'

'ওঁকে তো দেখলাম আমাদের এক সত্যিকারের বিট কবির পাল্লায় পড়ে আছেন। সেই কবি আপনার স্বামীর কাছে আপনাদের দেশের ভাং, গাঁজা, সিদ্ধি এবং সোমরসের ভেদাভেদ বিষয়ে জ্ঞান চাইছেন। আমার যদ্দুর মনে হ'লো সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুব প্রবল নয়।'

আমি হেসে বললাম, 'কেন, দেশাই বা ভট্ট থাকতে ফানী লোকের অভাব কী? যা চায় তাই পাবে।'

রাসেল খোলা গলায় হেসে উঠলো। মিসেস ক্রাউন আমার হাত ধরে বললেন, 'এখুনি যাবার কথা তুলো না। তোমাদের জন্যই এই পার্টি। এখনো সবাই আসেন নি। আর রাসেল, তুমিও আর একটু থাকো না।'
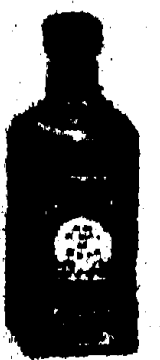
রাসেল মিসেস ক্রাউনের হাতে হাত বুলোলো, 'মাদাম, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে, নইলে আমার নিজেরো একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন।' পকেট থেকে দস্তানা বার করলো সে।

সেদিনকার ঐ কৌতুকপ্রদ ককটেল-পার্টি আরো অনেকক্ষণ চলেছিলো। আরো অনেক লোক এসেছিলেন, অনেককেই অত্যন্ত ভালো লেগেছিলো, মস্ত ড্রইংরুমের তরঙ্গায়িত মানুষের ঢেউ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠেছিলো, জলের স্রোতের মতো কেটে গিয়েছিলো সময়। মিসেস ক্রাউনের দরাজ হাতের মূল্যবান মদ্য পরিবেশনে, আর চুটকি খাবারের বৈচিত্র্যে সকলেই তৃপ্ত হয়েছিলো সেদিন। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। লবিতে এসে সুন্দরী শাদা চামড়ার দাসীর হাতে কোট পরতে পরতে এই পার্টির জন্য মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিলুম মিসেস ক্রাউনকে। মিসেস ক্রাউন তাঁর গাড়িতে পেণছে দেবার বন্দোবস্ত করে আমাদের আরো কৃতজ্ঞ করলেন।

বাড়ি এসে অনেকক্ষণ সে বিষয়েই কথা বলাবলি করলুম। অনেক ছবিই ছায়া ফেললো মনের পর্দায়, কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট যে ছবিটা দেখলুম সেটা রাসেলের। বারে বারেই আমার কেবল রাসেলকে মনে পড়তে লাগলো। এমন কি বিছানায় শুয়েও ওর ভাবনা আমার মন থেকে গেলো না। ছিপছিপে চেহারা, বড়ো বড়ো এলোমেলো চুল, বড়ো বড়ো চোখ, সেই চোখের বিষাদভরা দৃষ্টি, পাগলাটে ধরন, কথা বলার জেদি ভঙ্গি, সব ভেসে ভেসে উঠছিলো চোখে। বাংলাদেশের উপরে ওর উগ্র আকর্ষণের উৎসটা কী, সেটা খুঁজতে চেষ্টা করছিলাম। যদিও পরের দিন সকালে উঠেই ভুলে গিয়েছিলাম সব তবু তার ছাপটা মুছেও মুছে যাচ্ছিলো না। ওর বহু বিখ্যাত পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বইখানা কিনে পড়ে ফেললুম একদিন। চেহারা দেখে যতো না পাগল মনে হয়েছিলো, বই পড়ে বুঝলাম তার চেয়ে সে বেশী পাগল।

(ক্রমশঃ)

নেফার মানুষঃ মিশমী

নলিনীকুমার ভদ্র

একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নিধনকারী পরশুরাম দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছলেন পার-লোহিত্য প্রদেশে পাহাড়ঘেরা এক রমণীয় স্থানে। সেখানে এক সুরম্য কুন্ডে অবগাহন করবার সঙ্গে সঙ্গে স্খলিত হল তাঁর হস্তসংলগ্ন কুঠার। এই কুন্ডের পুণ্যোদকে অবগাহন করে মাতৃহত্যাজনিত পাপ এবং অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন পরশুরাম। তার পর থেকে এই কুন্ড সমগ্র ভারতে প্রখ্যাত হল পরশুরাম কুন্ড নামে।

কাহিনীটি শুনেছিলাম প্রথম যৌবনে অজানার আকর্ষণে যেদিন সদিয়ার লোহিত নদী পার হয়ে পরিদর্শন করতে যাই পরশুরাম কুন্ড। তখনই প্রথম এসেছিলাম সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী মিশমিদের সংস্পর্শে, যারা ক্ষত্রিয়-হন্তারক পরশুরামের বংশধর বলে আত্মপরিচয় দিতে রীতিমত গৌরববোধ করে।

আহোম রাজা পুরন্দর সিংহের নিকট থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শাসন-সৌকর্যার্থে সদিয়াতে একজন এ্যাসিস্টান্ট পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৯ সালে তিব্বত-সীমান্ত-সংলগ্ন বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত সমগ্র ভূভাগকে বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল এবং সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলই বর্তমানে নেফা নামে সুপরিচিত এবং কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত, তিরাপ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। লোহিত বিভাগটি আগেকার সদিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এলাকার মধ্যে। এই বিভাগে দুরধিগম্য মিশমি পাহাড়ে মিশমী জাতির বাস। এ ছাড়া লোহিত বিভাগে পদম নামে একটি উপজাতীয় এবং খামতি এবং সিংফো নামে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী দুটি উপজাতীয় লোক বাস করে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের দুটি বিভাগ (পশ্চিম প্রান্তের কামেং এবং পূর্ব প্রান্তের লোহিত) চীনা অনুপ্রবেশের ফলে আজ রণাঙ্গনে পরিণত। এ ছাড়া আর একটি সমরাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে কামেং-এর পূর্বদিকস্থ ডফলা, মিরি, আফা প্রভৃতি উপজাতি অধ্যুষিত সুবনসিরি বিভাগের উত্তর ভাগে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে (বর্তমান নেফা) যে পঞ্চান্নটি উপ-ভাষাভাষী উপজাতির বাস তাদের মধ্যে একদা মিশমীরাই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিল আর্য-সংস্কৃতি দ্বারা। পরশুরাম কুন্ডের কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া মিশমীদের দেশ লোহিত বিভাগে আছে শ্রীকৃষ্ণাপহৃতা রুক্মিণীর পিতা রাজা ভীষ্মকের রাজধানীর আর তাম্রেশ্বরী দেবীর তাম্রনির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আগেকার দিনে দূরদূরান্তর থেকে পুণ্যলোভীরা এসে সমবেত হত এই তীর্থমন্দিরে।

নেফার আদিবাসীদের মধ্যে মিশমীরাই হচ্ছে সকলের চেয়ে সুন্দর। মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই দেহের বর্ণ পীতাভ গৌর, উচ্চতা মাঝারি, মেয়েরা অনেকেই রূপলাবণ্যবতী। মিশমীদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিচিত্র নকশা এবং বর্ণ-সৌসামঞ্জস্যে তাদের সহজাত সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুদের উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন মুখ এবং মেয়েপুরুষ উভয়েরই মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত দেখে মন খুশী হয়ে ওঠে। তারাওন এবং কামান মিশমী মেয়েদের সযত্নবিন্যস্ত কেশশোভা দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ
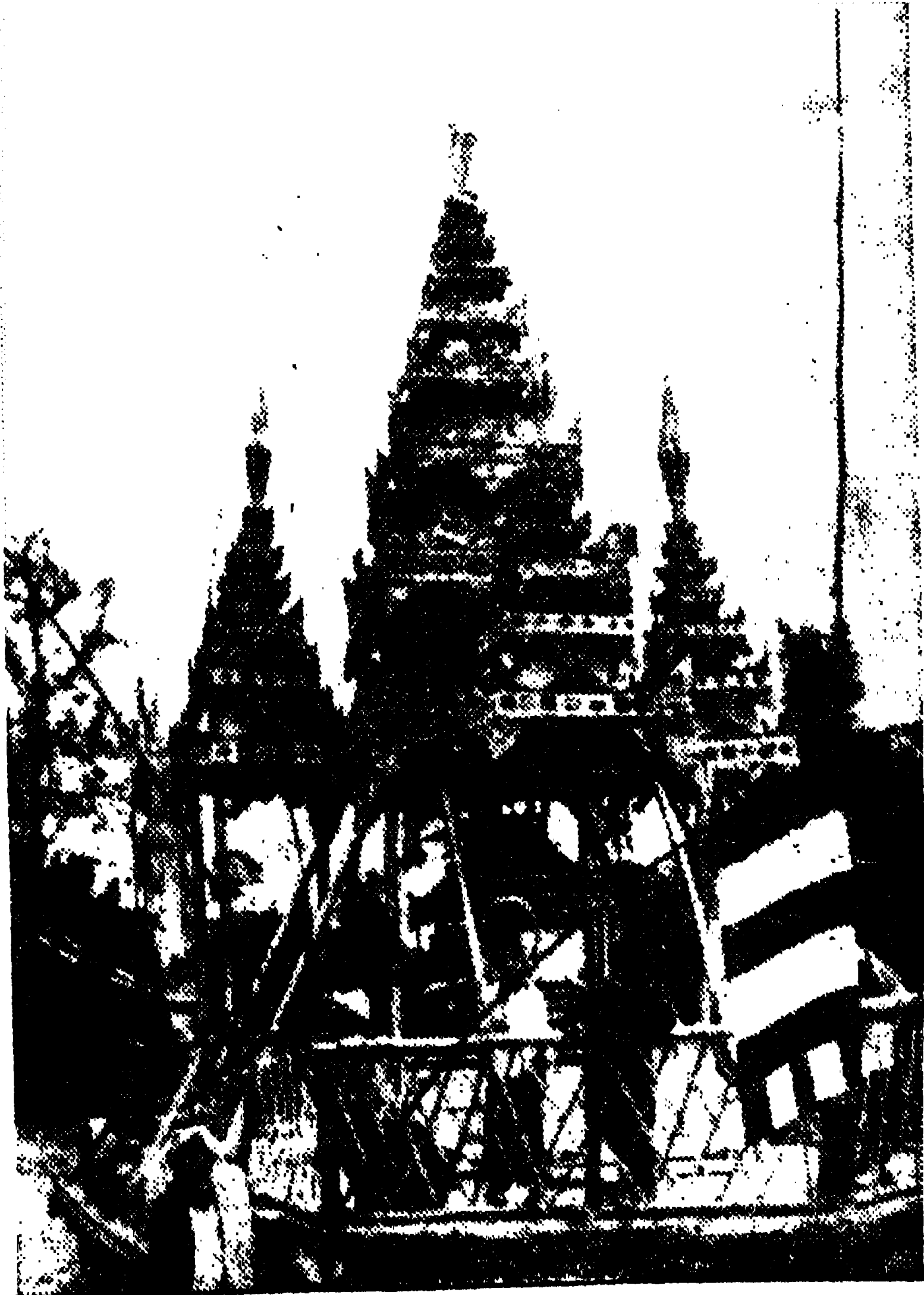
খামতি উপজাতিদের বৌদ্ধ উৎসব

করে, কোনো কোনো গোষ্ঠীর মিশমী মেয়েরা তাদের অনাবৃত বক্ষোদেশকে সুশোভিত করে বিচিত্রবর্ণের কাচ ইত্যাদির সচ্ছিদ্র গুটিকায় তৈরী মালা এবং রেশমী সূত্রগুচ্ছ দ্বারা। যৌবন এদের দেহে স্থায়ী হয় দীর্ঘকাল, মলিন হয় না কখনো মুখের মৃদু হাসি। আরণ্য পরিবেশে নিঃসঙ্গ বনচারিণী, স্থিরযৌবনা বিদ্যুদ্বর্ণা মিশমী রূপসীকে দেখলে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে :

যা তত্র স্যাদ্‌ যুবতি বিষয়ে
সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।।

অর্থাৎ, এ যেন বিধাতার সৃষ্ট প্রথম যুবতী।

মিশমীদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী আছে তিনটি : দিগারু (তারাওন), মিজু (কামান), চুলিকাটা (ইদু)। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় একই ধরনের, পার্থক্য যেটুকু সে শুধু কেশবিন্যাসের কেরামতিতে। চুলিকাটাদের মাথার চারপাশের চুল ক্ষুর দিয়ে চেঁছে বৃত্তাকারে কামানো। তারাওন এবং কামান গোষ্ঠীর মেয়ে-পুরুষ উভয়েই কিন্তু মাথায় রাখে লম্বা চুল। বেশভূষাও একই ধরণের, পুরুষদের মুখে আবার গোঁফদাড়ির বালাই নেই বললেই চলে। কাজেই বিদেশীদের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে কে পুরুষ কে নারী বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। লুসাইদের (মিজো) বেলায়ও ঠিক এমনি ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি হয়।

নেফার সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে, দফলাদের ন্যায় মিশমীদেরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের গ্রামজীবনে সংহতির অভাব। গোটা গ্রামে আসলে ঘর বলতে আছে মোটে একখানি —জঙ্গলের ভিতরে অথবা খাড়া পাহাড়ের গায়ে সে ঘর। এই বাসগৃহগুলি আকারে বেশ বড় হয়। দৈর্ঘ্যে একশো ফুট, প্রস্থে পনেরো ফুট পর্যন্ত। দশ থেকে ষাটজন লোক বাস করতে পারে এতে। এদের যেটুকু সামাজিক ঐক্য তা গড়ে ওঠে এই যৌথ বাসভবনকে কেন্দ্র করেই. গ্রামের অন্যান্য ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলি পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে ছড়ানো। একটি থেকে আর একটির দূরত্ব কম-সেকম আধ মাইল। মিশমী গ্রাম-প্রধানকে বলা হয় গাম। সামাজিক অপরাধ ইত্যাদির বিচারে তার সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হয় গ্রামবাসীদের।

মিশমী বালিকা

থামলাং উপত্যকায় কামান মিশমী

কামান এবং তারাওন মিশমীদের বেশভূষা বর্ণাঢ্য এবং নয়নসুভগ। বেশীর ভাগই এরা নিজেরা তৈরি করে, তিব্বত থেকে আমদানি করা হয় বহুবর্ণরঞ্জিত এবং ক্রুশচিহ্নশোভিত এক রকম অতি চমৎকার গরম কোর্তা। পুরুষরা সাধারণত গায়ে দেয় কালো অথবা ম্যাবণে রঙের নকসা-তোলা বর্ডার-দেওয়া কোর্তা, মাথায় পরে সযত্নে বোনা বেতের টুপি।

তারাওন এবং কামান মেয়েদের পরনে কোমরে গেরো-দেওয়া, রঙিন' ডোরাকাটা কালো রঙে ছোপানো আপাদলম্বিত দীর্ঘ বস্ত্রখন্ড, গায়ে চমৎকার সূচের কাজ-করা হাতাহীন আঁট-সাঁট জামা। গয়নাগাটির মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কপালে আটকানো পাতলা রূপোর পাতগুলি এবং ভেরীর মতো আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণভূষণ। মেয়েরা গলায় মালার মত ঝুলিয়ে রাখে প্রকান্ড প্রকান্ড তারের ফাঁস। আজকাল অবশ্য টাকা এবং কাঁচ, পুঁতি ইত্যাদির তৈরি মালার প্রচলন হওয়াতে তারের মালা পরার রেওয়াজ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তিব্বতী কবচ মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই অতি প্রিয় জিনিস।

মিশমী মেয়ে-পুরুষ সকলেই ধূমপানে অত্যাসক্ত। আপনি যদি মিশমীদের দেশে বেড়াতে যান তা হলে দেখে অবাক হবেন যে, রুপো অথবা পিতলের তৈরি তামাকের পাইপ সকল সময় এদের ঠোঁটে লেগেই আছে। যদি জুমের ক্ষেতের ধারে গিয়ে হাজির হন তা হলে দেখবেন, মাথার চুল চূড়াকারে বাঁধা, উজ্জ্বলবর্ণ পরিপুষ্টাঙ্গী মিশমী সুন্দরীরা কুড়ুল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে, কিংবা অন্য কোনো কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কাজ করছে। দুই ঠোঁটের মাঝখানে তাদের শোভা পাচ্ছে আঁট করে চেপে ধরা তামাকের লম্বা পাইপ, মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরের দিকে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

মিশমীরা প্রকৃতির সন্তান, কিন্তু প্রকৃতির তান্ডবলীলাজনিত মহতী বিনষ্টির হাত থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে এদের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা। ১৯৫০ সালে আসামে যে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প হয় তার দরুণ আবর এবং মিশমী পাহাড়ের উপজাতি অধ্যুষিত প্রায় চৌদ্দ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অনেকগুলি গ্রামের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতির এই অভাবিতপূর্ব রুদ্রতাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ আদিবাসী।

আসাম গবর্ণমেন্টের মনোযোগ এবং প্রযত্ন সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতার প্রভাব থেকে আজও মিশমীরা রয়ে গেছে বহুদূরে।

মিশমী পাহাড়ের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম। তীব্র গতিশীল পার্বত্য নদী পারাপার করতে হয় বেতের তৈরি একটি দড়ির সাহায্যে। সেই দড়ির এক প্রান্ত এপারের একটি গাছে এবং অপর প্রান্ত ওপারের একটি গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। এই দড়িতে সংলগ্ন থাকে কতকগুলি প্রকান্ড প্রকান্ড বেতের আংটা। নদীতিতীর্ষুকে বেঁধে দেওয়া হয় এই আংটায়, তার পর যে ভাবে সে খরস্রোতা নদী অতিক্রমণ করে তার চাইতে ভবনদীর ওপারে যাওয়া ঢের সোজা। 'দি আও নাগাজ', 'দি লোটা নাগাজ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা জে পি মিল্‌সকে লোহিত উপত্যকা পরিদর্শনকালে এমনিভাবে নদী পার হতে হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন যে, জীবনে এত ভয় আর কখনো পাননি তিনি।
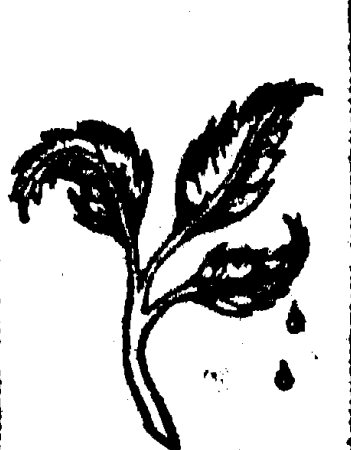
যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যবিধ বহু কারণে বলতে গেলে গোটা মিশমী জাতটাই আজ অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি, গড়ে ওঠেনি কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান; আধুনিক সভ্যতার উপকরণসমূহ মিশমীদের একঘেয়ে জীবনে আরাম উপভোগের ব্যবস্থা করেনি। কর্মক্লান্ত জীবনে সান্ত্বনা লাভ করে তারা নভোলীন তুষারাবৃত পর্বতমালার পানে তাকিয়ে, বেগবতী পার্বত্য নদীর কলগানে এবং ছায়াঘেরা অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে কানে তাদের বর্ষিত হয় শান্তির অমৃতবাণী। কিন্তু আজ লোহিত প্রদেশ নেফার অন্যতম যুদ্ধভূমিতে পরিণত হওয়াতে ব্যাহত হয়েছে মিশমীদের শান্তিপূর্ণ জীবনধারা। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ যারা, পরশুরামের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি লোহিতের অধিবাসী সেই মিশমীদের মনে চীনাদের এই অনধিকার অনুপ্রবেশ এক নতুন জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছে।

ডফলা বালিকা

একদিন রাত্রে

হেরম্যান হেস্‌এ

নভেম্বরের নিকষ কালো আকাশ সেদিন টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় শহরটার ওপরে বজ্রবিদ্যুতের তাড়নায় প্রবল বেগে দুলছিল। ঝড়-বৃষ্টির একটানা আক্রমণে অলিগলি, পথঘাট সব কেমন বিপর্যস্ত। ভেজা ফুটপাথগুলোতে রাস্তার ম্লান আলো প্রতিফলিত হয়ে যেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসছে। দূরে পাহাড়-শ্রেণীর একটা টিলার ওপরে একটা প্রাচীন অট্টালিকার চূড়া অনবরত মেঘ এবং কুয়াশা নিয়ে খেলে যাচ্ছে। চূড়াটা মাঝে মাঝে দেখা যায়, মাঝে মাঝে কুয়াশায় সাদা হয়ে আসে। দুটো জানালায় শুধু লালচে আলোর আভা ছাড়া সেই নিরেট পাথরের প্রাসাদে আর কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারের রহস্যময় প্রহরী হয়ে বিশাল এক রক্তচক্ষু দৈত্য নীচে শহরের বাড়িগুলোর ছাদের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। শহরের নির্জন পথের দু' পাশে পত্র-পুষ্পহীন চেস্টনাট লিন্ডেন এবং প্লেন গাছের সারি একদল শীর্ণ বৃদ্ধের মত রাত্রির হাসপাতালে মৃত্যু-ভয়ে ধুঁকছে। রয়েটলিংগেন স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটাও ছেড়ে গেল। ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকার ভারী হাওয়ায় যেন অনেকক্ষণ লেগে থাকে।

মাঝে মাঝে ঝড়টা জিরিয়ে নেয়। তখন নেকার নদীর জলস্রোতের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। কারা যেন নিঃশব্দ বিষাদের চাদর নদীর দুই তীর ধরে বিছিয়ে রেখে চলে গেছে। এখন ভাবাই যায় না এই নদীর তীর একদা ছাত্রদের গানে, বনভোজনে প্রীত ছিল। টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়টিও যেন আজকে পুরোনো স্মৃতির শিবির মাত্র। অতীতের সেই আলোকিত মুখগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির আনাচ-কানাচে কোথাও খুঁজলে পাওয়া যাবে না। হয়ত ফেলডেরলিন-এর সেই কিংবদন্তীর যন্ত্রসঙ্গীতকে পাথরের পুরোনো দেয়ালগুলো গিলেই ফেলেছে একদিন। এখন পাথরের গায়ে কান পাতলে তার শেষ রেশটুকু শোনা গেলেও যেতে পারে। সেই সব কাল আর নেই। টুবিঙ্গেনের ঘড়িতে এখন নতুন সময় বাজছে। প্লেটো, অ্যারিস্টোটল প্রভৃতির রচনাবলীর ওপর নতুন চোখের উঁকি-ঝুঁকি এখন।

দুজন ছাত্র নেকার নদীর সেতুর দিক থেকে হেঁটে আসছিল। এই তুমুল ঝড়-বৃষ্টিকে এতটুকু সমীহ না করে শুধু গরম কোটেই আচ্ছাদিত হয়ে হাঁটছিল দুই বন্ধু।

—বোতলে আর কিছু আছে নাকি? অটো এবের বন্ধুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। ওর বন্ধু হেরমেন লাউশের জাতে কবি অতএব স্বভাবতই একটু বিষাদগ্রস্ত এবং উচ্চমনা। বেনেডিকটাইনের প্রায় শূন্য বোতলটাকে পকেট থেকে বার করে বন্ধুর হাতে দিল। নদীর অপর পারের বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে চীৎকার করে এবের।

—অয়ি জ্ঞানদাত্রী জননী আজিকে তোমারই স্বাস্থ্য পান করি! বোতলে যেটুকু ছিল এক চুমুকে শেষ করে ফেলল এবের। খালি বোতলটা দেখিয়ে লাউশের প্রশ্ন করে,

—এই অপদার্থ পদার্থটিকে নিয়ে এখন কি করবো আমরা?

—কি আর করবো, এটাকে টুবিঙ্গেনের ফাঁড়িতে জমা রাখব। এই ত আমাদের ফাঁড়ি—। এবের বোতলটাকে নদীর ওপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল তাক করে ছুঁড়ে মারল। পাথরে লেগে বোতলটা চুরমার হয়ে যায়। কাঁচের টুকরোগুলো ছিটকে পড়ে চারদিকে।

—অতঃ কিম?

—অতঃ 'লুয়েন'। ওখানে সাবরে শারপনের আর রেচকে পাওয়া যাবে। গত বৃহস্পতিবারের দাঙ্গার শোক ভুলছে দুটোতে ওখানে। এবের লং কোটটাকে ভাল করে এঁটে তাড়াতাড়ি পা চালাতে আরম্ভ করে।

—অত দৌড়চ্ছো কেন? আমাদের পক্ষে কিন্তু আজকের আবহাওয়াটা একে-

বারে আদর্শ। বোতলটা শেষ না হলে বন্ধ চারটে দেয়ালের মধ্যে কখনই ঢুকতাম না আমি। 'লুয়েনে' গিয়ে শারপেনের আর রেচের সংগে বসার ত কোনো মানেই হয় না। একটা বিরক্তকর গবেট, আরেকটা ত অল্পেই চেঁচাতে শুরু করে। কিন্তু ওরা যদি 'উলবাখের' গেলে তাহলে কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। আজে-বাজে মদ আমার ভালো লাগে না। লাউশেরের কথায় হেসে ফেলল এবের। হাসতে হাসতেই বলল।

—মদ-গর্বিত? ওখানে অন্য কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। লাউশের! আমরা কিন্তু এক কাজ করলে পারি। আমরা কয়জনে মিলে একটা ক্লাব করলে কি রকম হয় বল ত? আমরা ত আছিই, আরো জনাকয়কে ভিড়িয়ে ফেল-করা ছাত্রদের একটা সমিতি করা যায় স্বচ্ছন্দে।

—ক্লাব? অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে লাউশের, তারপর বলে।

—তার চেয়ে আমি সন্ন্যেসী হয়ে পাহাড়ে চলে যাব!

—কেন? যারা কেতাদুরস্ত ক্লাবে যেতে চায় না এবং হতাশ ছাত্র, যাদের পাশ করার কোনো আশা নেই শুধু তাদের নিয়েই আমরা ক্লাব খুলবো। রেচ আমাদের ক্লাবের সভ্যদের সমস্ত পাপ আর গ্লানির বোঝাকে কান্নার স্রোতে ভাসিয়ে দেবে। শারপেনেরকে আমাদের হয়ে লড়বার জন্যে উপযুক্ত বর্ম দেয়া হবে। আমি হবো বীয়ার কমিশনার এবং তুমি ক্লাবের সেক্রেটারী এবং বোতল রক্ষক!

আমরা নিয়ম করে দেবো যে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের অন্যত্র পান-গমন নিষিদ্ধ। ধরো যদি কাউকে 'অস্যোন'-এ মদ খেতে দেখা যায় তাকে এক মার্ক জরিমানা করা হবে।

দু বন্ধু কথা বলতে বলতে পুরোনো সেতুটার ওপরে উঠল। পানশালা থেকে ছাত্রদের হাসি-হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসে। সেতুর থামে নেকার নদীর উন্মত্ত জলস্রোত ক্রমাগত আছড়ে আছড়ে পড়ছে। রাস্তার আলোগুলোকে কোলে নিয়ে ক্রমাগত নাচাচ্ছে নদীটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জার ঘন্টার সময় শুনল তারা দুজন। নদীর ঠিক উঁচু পাড় থেকে আরম্ভ হয়ে সামনের মাঠটা পর্যন্ত একসার কিম্ব-

বিদ্যালয়ের পুরোনো বাড়ির সারি চলে গেছে। তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি একেবারে নিঝুম ঘুমে আচ্ছন্ন, আবার কোনো কোনো বাড়ি তখনও আলোকিত জানালায় জেগে আছে। সেতুটার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা আর একটাও কথা বলল না। হয়ত নিশিথ নগরীর রূপ, নেকার নদীর জল—শব্দ এবং দূরে থেকে ভেসে-আসা ছাত্রদের সমবেত গানের রেশ ওদের অতীতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে থাকবে। যে ছাত্রজীবন আর ফিরবে না তারই জন্যে শোকজ্ঞাপক নীরবতা পালন করছে যেন দুই বন্ধু। সেতুটা পেরিয়ে ওরা হোলংস মার্কট-এর দিকের খাড়া সরু রাস্তা ধরল। গির্জা, কির্শ ষ্ট্রীট, বন্ধ বাজার, 'সোনে' পানশালা, ছাড়িয়ে 'লুয়েন'-এর পেছনের দরজায় এসে দাঁড়ালো। খিড়কির দরজাটার সামনে কাদা জলে একেবারে থৈ-থৈ। ভেতরে ঢুকবার আগে ওরা নীচের জানালা দিয়ে রেচ আর শার্পেনারকে দেখতে পায়। দুজনে এক কোণে বসে মদ খাচ্ছে।

—ওরা 'উইংকলের' খাচ্ছে। কেমন বলিনি তোমাকে? আনন্দে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে এবের। প্রথমে লাউশের ঢুকল দরজা দিয়ে। ভেতরে ঢুকে লেমনেডের বিজ্ঞাপনের পোষ্টারটা হঠাৎ একটা অহেতুক আক্রোশে টেনে ধরে এবের। মালিকের মেয়ে মাথিল্ডা আসতেই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে কোটটা দেয় ওর হাতে।

ওদের দুজনকে ঢুকতে দেখে উইংকলের-পায়ীরা একবার মুখ তুলে তাকায়। ওদের মধ্যে প্রথম কথা বলল শার্পেনার।

—ভীষণ দেরী হয়ে গেছে! কিছু পান করবে নাকি তোমরা। পান না করে চানও করতে পারো, অথবা সমস্ত দুঃখগুলোকে একসঙ্গে মদের মধ্যে চুবিয়েও দিতে পারো। উঃ! জীবনে আর কখনো বাজী ফেলবো না। পনেরো বোতল মাল টেনে যাওয়া কি অসম্ভব একঘেঁয়ে।

যত ইচ্ছে উইংকলের আছে খাও।

—ঠিক হায়। কোনো ভয় নেই। মাথিল্ডা! দুটো গ্লাস!

একটা বোতল তুলে নিয়ে খানিকটা নেড়ে-চেড়ে দেখে দুটো গেলাস ভরে নিল লাউশের।

—এবের এই হচ্ছে আমার মদের মতন জল তরল আনন্দ!

—খেয়ে যাও। ঠোঁটে তলাসুদ্ধ উপড়ে করে দাও।

—জিনিসটা কিন্তু 'ভাল! এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা খালি করে আবার ভরে, চেয়ারের পিছনে হাতটাকে যেন ছুঁড়ে ফেলল লাউশের।

—তোমার হয়েছেটা কি? এ রকম উল্লুকের মতন লাগছে কেন তোমাকে?

শার্পেনের প্রশ্ন করে লাউশেরের দিকে তাকিয়ে। উত্তরটা দেবার চেষ্টা করে এবের।

—ও ত আবার লিকার খেতে পারে না। বেনেডিকটাইনটা শেষ—এবেরের কথা শেষ না হতেই হঠাৎ দাঁত চেপে শিস দিয়ে উঠল লাউশের।

—এবের বেশী বোকো না। আর দ্যাখো শার্পেনার এই ধরণের আজে-বাজে প্রশ্ন করা উচিত না। আরেকটা গেলাস ভরে চুমুক দিতে দিতে খুব গম্ভীর এবং আস্তে আস্তে বলতে থাকে লাউশের।

—তোমরা কয়জন একেবারে খাঁটি শুয়োরের বাচ্চা। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি সময় সময়, তোমাদের সঙ্গেই কিনা আমাকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয়। রেচ ওর বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠে, মদের গেলাস উঁচিয়ে, কবি হায়মেন লাউশেরের স্বাস্থ্য পান করে। ঘরের আবহাওয়াটাকে শান্ত করবার জন্যেই যেন বলল এবের,

—যাগগে বড় বড় কথা ছেড়ে এখন একটু শিল্প দর্শন কিংবা একটু রসিকতা কর দেখি বাবা, যা তোমার ছিঁচকাঁদুনে কবিতায় কখনও পাওয়া যায় না!

—নিশ্চয়ই আমার কবিতায় পাওয়া যাবে না। তোমাদের সঙ্গে এইভাবে বসে আছি, তোমাদের পয়সায় মদ খাচ্ছি, তোমাদের মাথার ওই ফাঁকা খুলিগুলো আমাকে দেখতে হচ্ছে সব সময়—নিজের মনে সোনা-রুপো, রূপকথার ঐশ্বর্য থাকা সত্বেও তোমাদের মেনে নিয়েছি—এর চেয়ে বড় রসিকতা আর কি হতে পারে? নিজেদের কথা ভাবো না তোমরা? এখানে বসে কি করছ? মদের মধ্যে কোন দুঃখ কোন সুখকে ঢাকবে? হয়ত একটা সামান্য পরীক্ষা, কয়েকটা টাকা কিংবা একটা ইতর চাকরী, বাস এই শুধু। কারণ তোমরা হঠাৎ বুঝে ফেলেছো যে শুধু এই সমস্ত জিনিসের জন্যে বাঁচা যায় না! আর আমি? আমার কবিতার সূর্য-করোজ্জ্বল নীল আকাশকে আমি আমার মদে ডুবিয়ে দিচ্ছি। আমার কল্পনার জন্মভূমি আমার তুলির রঙ, আমার সেতারের তার, শিল্পের একটা অংশ, যশের অংশ, অসীমের অংশ সব ডুবিয়ে দিচ্ছি আমি। কারণ সত্যি কোনো কিছুর জন্যেই বেঁচে থাকা যায় না। উদ্দেশ্যহীন জীবনও যেমন নিষ্প্রভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আয়ুও তেমনি গ্লানিকর।

রেচ যথারীতি ওর কবি বন্ধুর কথায় হাসতেই থাকল। এবের গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে বলল।

—খাও, খাও শুধু খেয়ে যাও। জীবনটাকে অত কালো করে নাই বা দেখালে।

হঠাৎ রেচের দিকে চোখ পড়ে এবেরের।

—রেচ, এখন তুমি কি করবে? বুড়োকে তোমার ব্যাপারটা সব জানিয়েছ?

—বুড়োকে কি জানাবে? লাউশের প্রশ্ন করে।

—তুমি জানো না? এই নিয়ে তৃতীয়বার রেচ পরীক্ষা দিতে বসেনি। ওর নামও কাটা গ্যাছে! কিন্তু এখন কি করবে তুমি রেচ?

—কি করবো?—আমি নাম লিখিয়েছি!

—নাম লিখিয়েছ?

—সৈন্যবাহিনীতে আজকাল বন্ধ মাতালদেরো নিচ্ছে নাকি?

—কয়েকটা হয়ত তাই। আসলে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে একটা স্বর্গের টিকিট পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট চোখের জল ফেলেছি। আর নয় বাপস্‌।

—কিন্তু তোমার নামটা নিলো কে? এতক্ষণ পরে লাউশের প্রশ্ন করল।

—এক ভদ্রলোক। তোমরা নিশ্চয়ই আলাপ করতে চাইবে। অদ্ভুত ভালো ভদ্রলোক—।

—ভদ্রলোক না তোমার মাথা! ভদ্রলোক সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো হে ছোকরা? আমার চেয়েও কি লোকটা ভদ্র?

—অনেক, অনেক। আমি বলছি লাউশের ওরকম ভদ্রলোক হয় না। যাকগে তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলে লাভ নেই। ভদ্রলোকটি আজ সন্ধ্যেয় এখানে আসবেন। আমাকে তিনি কথা দিয়েছেন।

—সত্যি আসবেন?

—আলবাৎ!

লাউশের পকেট থেকে কয়েকটা কালো

লম্বা চুরুট বার করে বন্ধুদের বিলিয়ে দেয়। নিজে একটা ধরিয়ে একমনে টেনে যেতে থাকে। সমস্ত ঘরটায় চুরুটের ধোঁয়া ভেসে বেড়ায়। ঘরের সকলেই চুপচাপ মদ খেয়ে যায়, ঘরটাকে আরো ধূমায়িত করে। পানশালার অন্যান্য লোকদের হাসি-গল্পের টুকরো টুকরো কথাবার্তা ভেসে আসে এদিকে। ওরা আর কেউ একটাও কথা বলে না। চুপচাপ কথা না বলে মদ খেয়ে ওরা চারজন অনেকদিন রাত কাবার করেছে। মনে হচ্ছিল আজকের রাতটাও বোধ হয় তেমনি গড়িয়ে যাবে তাদের নির্বাক চিন্তার চাকায়। অনেক কয়েকটা গেলাস শেষ হবার পর প্রথম কথা বলল এবের,

—সত্যি তোমার ওই ভদ্রলোককে দেখবার জন্যে আমি উৎসুক।

কেউ কোনো উত্তর দেয় না। ম্যাথিল্ডা এসে আরো দুটো বোতল খুলে দিয়ে যায়। আবার কথা বলল এবের,

—কিন্তু আমাদের কে নেবে? আমার ত' আর দুটো চান্স আছে পাশ করার, তারপর ত' সব খতম!

—আমার আবার টাকা ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। বাবাকে আর রাজী করানো যাবে না। শার্পেনার বলল।

—আমারও ত' সেই একই ব্যাপার। বুড়ো একেবারে হাত মুঠো করে ফেলেছে। লাউশের মুখে ভ্যাংগায়।

—একেই বলে বেঁচে থাকার চিন্তা। আচ্ছা এবের, তুমি কি হলপ করে বলতে পারো আগামী দুটো টার্ম পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকবেই? আগামী এক বছরে কত কিছু হয়ে যেতে পারে তা জানো?

—যথা?

—যথা তুমি চুরুটের আগুনে এই মুহূর্তেই পুড়ে মরতে পার।

—জাহান্নমে যাও। এবের চেঁচিয়ে ওঠে।

—তুমি—। লাউশের কথাটা শেষ করতে পারে না। হঠাৎ ওর মুখটা কেমন ভয়ে শাদা হয়ে যায় জানালার দিকে তাকিয়ে।

—কি হল? শার্পেনার চেঁচায়।

লাউশের নীরবে জানালাটা দেখায় আঙ্গুল দিয়ে। সকলেই ফিরে তাকায় জানালার দিকে। একটা রোগা লম্বা লোককে দেখল তারা জানালার কাছে। লোকটার রং অসম্ভব ফ্যাকাসে, ভঙ্গীটা কেমন যেন উদ্ধত, লম্বা চিবুকে ছুঁচালো দাড়ি আর সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ইস্পাতের ফলার মত তীক্ষ্ণ এক-জোড়া চোখ। লোকটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে ছিল।

ঘরের মধ্যে শার্পেনের শুধু ভয় পায় নি। হেসে উঠে বলল,

—সংটাকে সরে যেতে বলবো?

আগন্তুক জানালা থেকে সরে যায় কিন্তু একটু পরেই তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখল ওরা। শার্পেনের রেগে দাঁড়িয়ে উঠে লোকটাকে বেরিয়ে যেতে বলবার উপক্রম করতেই রেচ লোকটার সংগে করমর্দন করবার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

—ক্ষমা করবেন, আপনাকে দূর থেকে চিনতে পারিনি। আমার বন্ধুদের সংগে আলাপ করবেন না?

রেচ অল্প মাতাল হয়েছিল। আলাপ করাতে গিয়ে আগন্তুকের নামটাই বলতে একদম ভুলে গেল।

—কিন্তু আলাপের পর আরেকটা কথাও কেউ বলল না। ঘরের লোকগুলো যেমন চুরুট টেনে যাচ্ছিল, মদ খেয়ে যাচ্ছিল অবিকল তেমনিই চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে লাউশের চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

—আমি যাচ্ছি! কেউ বিলিয়ার্ড খেলবে?

কেউ উত্তর দিল না।

আগন্তুক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনি যদি চান, আমি খেলবো। আমরা 'ভাল্যফিশে' যেতে পারি। আমি ওদিক দিয়েই এলাম, বিলিয়ার্ড টেবিলটা দেখলাম ফাঁকাই আছে।

ওরা চারজনই আগন্তুকের প্রস্তাবে রাজী হল। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন হাড়ের ভেতরটাও কাঁপছে ওদের। কর্ণহাউস স্ট্রীটটা একেবারে কাদার সমুদ্র। কোনো রকমে পা টেনে টেনে ওরা পাঁচজন 'ভাল্যফিশ'এ পৌঁছল। রেচ সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে যেতে থাকে। একটা গ্যাস-লাইটের নীচে এসে এবের ভদ্রলোককে থামায়।

—যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব।

—বলুন।

—রেচ আপনার সম্বন্ধে আগেই বলেছে আমাদের। আপনি নিশ্চয়ই কোনো সমিতির এজেন্ট।

—হুঁ। কেমন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে আসে দীর্ঘকান্তি আগন্তুকের কণ্ঠ থেকে।
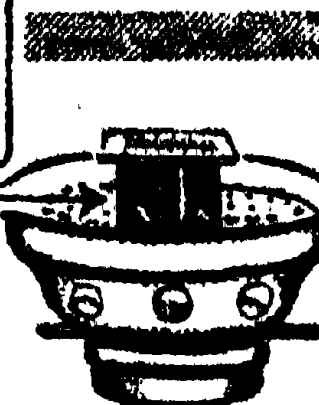
—দেখুন। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে পরিচয়টা আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত।

—নিশ্চয়ই। শুনে সুখী হলাম। আমি মাত্র আজকের দিনটাই এখানে থাকবো। আপনার বন্ধু আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কালকে অনেক খবর জানাতে পারবেন। আমি প্রতিটি ষান্মাসিক টার্মিনালেই টুবিঙ্গেনে আসি।

আর একটাও কথা বলল না কেউ। ধোঁয়ায় ভরা কাফের মধ্যে ঢুকল তারা।

রেচ আগেই ঢুকে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে একটা সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। লাউশের বিলিয়ার্ড স্টিকে চখ ঘষছে। দুজনে খেলতে আরম্ভ করল। ভদ্রলোক অসাধারণ ভালো খেলেন।

—আপনি সত্যি ভাল খেলেন। একটু চর্চা করলে অসাধারণ খেলতে পারবেন আপনি। ভদ্রলোক বল্লেন লাউশেরকে। লাউশের কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল। আগন্তুক অবিশ্বাস্য রকমে কিউ বলটাকে টেবিলের মধ্যে ঘোরাচ্ছিলেন। খেলা শেষ হবার পর অন্য বন্ধুদের টেবিলে এল ওরা দুজন। এবের আর লাউশের কফি খেতে আরম্ভ করল, অন্যরা শেরী এবং শ্যাম্পেন-এর অর্ডার দিয়েছিল। একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল ওদের। মেয়েটির নাম মলি। ছোট্টখাট্টো দেখতে, শরীরের তীক্ষ্ম রেখায় মেয়েটি বেশ আকর্ষণীয়। ওদের সঙ্গে শেরী খেতে খেতে মলি বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল রেচের সঙ্গে। রেচ তখনো সোফায়। ওর দিকে আঙ্গুলে দেখিয়ে লাউশেরকে প্রশ্ন করলেন আগন্তুক :

—ওকে আপনার কি মনে হয় বলুন ত?

—রেচ? ও একটা শুকরছানা, কিন্তু মনটা ভালো ওর।

—আর আপনার ওই বন্ধুটি? এবার শার্পেনেরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন আগন্তুক।

—একেবারে বোকা নয়। ব্যক্তিত্বহীনও নয়। ও আমাদের বীর অসিযোদ্ধা। কিন্তু ও বোঝে না বন্ধুপ্রীতির আধিক্যই ওর পক্ষে কাল হবে। লাউশের মৃদু কণ্ঠে বলল।

—আর ওই তৃতীয় জন?

—কে এবের? তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এবেরের ব্যক্তিত্বের কিছুটা অভাব আছে। ভেতরের নৈরাশ্যকে ও ভীষণ ভয় পায়।

—আপনি কিন্তু আপনার বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে সুন্দর মতামত দিতে পারেন।

—কেন পারবো না। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অবক্ষয়ের মধ্যে বাস করি। আমাদের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্যও অসমান।

—আমি কিন্তু আপনাকে পছন্দ করি।

—সত্যি?

লাউশের দাঁড়িয়ে উঠে এবেরকে ডাকে।

—চল আমরা চাই।

আগন্তুক ওদের একটা অদ্ভুত বিচ্ছিরি হাসি দিয়ে বিদায় জানালেন। সাবরে শারপেনের ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। রেচ আর মলি নরম সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে শুধু নিজেদের মধ্যেই মত্ত। এবের এবং লাউশের সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে জনশূন্য অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। 'লুয়েন' বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোনো পানশালার ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না ওদের। ঘড়িতে তিনটের ঘন্টা বাজল।

—চলো বাড়ি যাওয়া যাক্। হাঁটতে হাঁটতে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এবের। লাউশের মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে তাকিয়ে নেয় একবার।

—আমি যাবো না। সবাই যেন মরে হেজে গ্যাছে। লোকগুলো সাত-তাড়াতাড়ি ঘুমোচ্ছে কি করে?

—এসো এসো আমরাও তাই করি।

—ঘুম? না! কবি লাউশের বন্ধুর বড় বড় মাতাল চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

—এবের এখন নিশ্চয়ই তোমারও 'পৃথিবী রসাতলে যাক' বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে?

—তাতে কিছু এসে যায় না। চলো আমরা বরং 'সোয়াৎসর্ভাডের'এ যাই।

—একই কথা আমার পক্ষে। বেশ চল।

ওরা দুজন পানশালায় ঢুকে 'গিলকা'র অর্ডার দিল। এবের ক্রমশঃই যেন ওর বন্ধুর প্রভাবে মনমরা হয়ে যাচ্ছে। নিরাশ, অতৃপ্ত এবং অর্ধমৃত দৃষ্টি দিয়ে তারা দুজনে নিজেদের চুরুট আর ধোঁয়াভর্তি ঘরটাকে নিরর্থক দেখছিল। রাত-প্যাঁচার মতন তিনজন কিম্ভূত লোক কফি-টেবিলের ওপর ঘুঁটি খেলছে। কাফের পরিচারিকা একপাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। একটা মাছি গ্যাস-পাইপ বেয়ে ক্রমাগত হামাগুড়ি দিচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তেই গ্যাসের আগুনের মধ্যে পড়ে যেতে পারে মাছিটা। কাঁচের শার্সিতে তখনও প্রবল বৃষ্টির বাজনা।

—আমাদের কিন্তু এতটা ভাবপ্রবণ হওয়া উচিত না। এক ঘন্টা নীরবতার পর বলল এবের। গিলকার গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করল কথাটা বলে। খাওয়া শেষ করে আবার ওরা বেরোল। এবার জর্ডেন এ্যালির উৎরাই ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। 'ভাল্‌ফিশ' কাফের ধার দিয়ে যাবার সময় দেখল দোকানের লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করছে। পুরোনো এ্যামার ব্রীজ-এর কাছে এসে দাঁড়ায় দুজনে।

—বাঁদিকে যাওয়া যাক। এবের প্রস্তাব করে।

—ব্রীজের ওপর দিয়ে গেলেই সবচেয়ে কম দূরে পড়বে। লাউশেরের কর্কশ গলায় এবের মিইয়ে আসে কেমন যেন।

সেতুর এপারে আসতেই ঘাটের কাছে কাকে যেন পড়ে থাকতে দেখা গেল। নদীর ঘাটের সিঁড়িতে মাথা রেখে লোকটা শুয়ে আছে। লোকটার বেপরোয়া শোয়ার ভঙ্গী দেখে এবের হেসে ওঠে।

—বাঃ বেড়ে ঘুমোচ্ছে ত!

—বোধ হয় নামী ক্লাব থেকে দামী মাল টেনে ফিরছিল। কালকে ঘুম ভাঙ্গলে এই হট্টমন্দিরের শয়ন ওকে অবাক করে দেবে খুব।

হঠাৎ লোকটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এবের,

—হে ভগবান, এ ত রেচ। সারা ইয়োরোপে একমাত্র রেচ ছাড়া কেউ এই ধরনের ড্রেস-কোট পরে না!

সিঁড়ি দিয়ে দুজনে ত্বরা শায়িত মূর্তিটার কাছে নেমে গেল। সিঁড়ির ওপর মুখ দিয়ে পড়ে ছিল রেচ। ওকে ধরে তুলল দুজনে মিলে। রেচের সমস্ত মুখময় শুকনো কালো রক্ত।

—ইস্ খুব বিশ্রীভাবে পড়ে গেছে বেচারী। এবের কথাটা শেষ হতেই সিঁড়িতে একটা কিছুর পড়ার শব্দ শোনা গেল। রেচের শক্ত মুঠি থেকে ঠাণ্ডা পিস্তলটাই পড়েছে শানবাঁধানো ঘাটে। এবং ঠিক তখনই রেচের ডান কপালে গুলীর কালো দাগটাকে দুজনেই দেখতে পেল একসঙ্গে।

লাউশের দেশলাই জ্বালায়।

—তুমি এখানে থাকো লাউশের, আমি পুলিশ ডেকে আনি। কোনো রকমে কথা বলে এবের।

—না, আমাকেই সব কিছু করতে দাও। হঠাৎ কোত্থেকে একটা তীক্ষ্ম-স্বর ভেসে আসে। ওরা চমকে তাকিয়ে দেখল সেই দীর্ঘকান্তি শীর্ণ আগন্তুক, যিনি প্রতি ষান্মাসিক পরীক্ষার পর টুবিঙ্গেনে আসেন, সিঁড়ি দিয়ে যেন নদী থেকেই উঠে আসছেন। কাছে এসে তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে যেন দুই বন্ধুকে কুর্নিশ করলেন। একটা অদ্ভুত হিংস্র হাসলেন। বরফের মতন শীতল দুই চোখে তাকিয়ে রইলেন টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হতভম্ব দুজন ছাত্রের দিকে। ওদের সমস্ত মেরুদণ্ড যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেল। দুজনেই সেই দুর্ধর্ষ রাত্রির মধ্যে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ করে।

পরদিন লাউশেরের গৃহকর্ত্রী লাউশেরকে ঘুম থেকে তুলে ওর টেবিলে গরম কফির কাপটা রাখতে রাখতে বললেন

—কালকে একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটেছে মিঃ লাউশের। শোচনীয় ব্যাপার। একজন ছাত্র এ্যামার নদীর ঘাটে আত্ম-হত্যা করেছে।

অনুবাদ : **বিমল রায় চৌধুরী**

এই যুদ্ধের সংবাদ

শ্রীসঞ্জয়

চীনা সৈনাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম পর্যায়ে ব্যর্থতা দেশবাসীকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে। শত্রুর আক্রমণের মুখে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রথমে স্বহস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদায়ী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ৭ই নভেম্বর মন্ত্রিসভা হ'তে সম্পূর্ণ বিদায় নেন।

কিন্তু আপৎকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রতিরক্ষা দপ্তরের গুরু-দায়িত্ব বহন কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই রাষ্ট্রপতির আহ্বানে শ্রীযশোবন্ত রাও চ্যবন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে ১৪ই নভেম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন শ্রী কে রঘুরামাইয়া। শ্রীকৃষ্ণমাচারী হলেন আর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। মন্ত্রিসভার এই রদবদল সংসদ ও দেশবাসীর অনুমোদন ও পূর্ণ সমর্থন লাভ করল।

ইতিমধ্যে ৭ই নভেম্বর চীনের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরুকে আরও একটি শর্ত-সম্বলিত পত্র লেখেন। তাতে লদাক সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না এবং পূর্ব সীমান্তে ম্যাকমেহন লাইন বরাবর যুদ্ধবিরতি সীমারেখার যে প্রস্তাব করা হয় তাও ছিল শঠতাপূর্ণ। পত্রে ম্যাকমেহন লাইনের যে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি তা মেনে নিলে ভারতকে চীনের পূর্ব দাবীমত প্রায় সাড়ে চার হাজার বর্গমাইল স্থান ছেড়ে দিতে হ'ত। তাই প্রধানমন্ত্রী সেই তথাকথিত শান্তি প্রস্তাব পূর্বের মতই প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ভারত চীনের সঙ্গে কোন আলোচনায় বসবে না।

৮ই নভেম্বর সংসদের জরুরী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, চীনা সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের ফলে [illegible] তা গ্রহণ করতে ভারত পশ্চাৎপদ হবে না। ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম চীনকে সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করলেন এবং চীনা হানাদারদের বিতাড়নের কঠোর সংকল্প প্রকাশ করে বললেন, পরিণাম যাই হোক, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারত কখনই হানাদারদের কাছে নতি স্বীকার করবে না।—সংসদের সকল দলের সদস্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, সারা দেশ আজ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশাধীন। যতদিন না মাতৃভূমি শত্রুকবলমুক্ত হবে ততদিন সমগ্র জাতি একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করবে শত্রুর বিরুদ্ধে।

চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসাকল্পে আরব নেতা প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রথম প্রয়াসের ব্যর্থতা ২রা নভেম্বর সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। সে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল চীনের অনমনীয়তা। নাসের প্রস্তাবিত চার দফা মীমাংসাসূত্র চীন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। কিন্তু ৯ই নভেম্বর মীমাংসা প্রয়াসে নাসেরের নূতন উদ্যমের কথা শোনা গেল। ভারত-চীন বিরোধের ফলে যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারে না—এই চিন্তাই ছিল নাসেরের নূতন উদ্যমের অনুপ্রেরণা। কিন্তু তিনি যে তাঁর পূর্ব মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন করেননি তা ঐ দিনের 'অল অহরাম' পত্রিকার সম্পাদকীয় হতেই সুস্পষ্ট হল। 'অল অহরাম' পত্রিকা রাষ্ট্রপতি নাসেরের মুখপত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

'অল অহরামের' সম্পাদকীয়তে বলা হল, যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় উভয় পক্ষ না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হ'তে পারে না। এই মন্তব্যের পরেই সম্পাদকীয়তে বলা হল, এই প্রস্তাব ভারতের দাবীর প্রতিধ্বনি বলে মনে হলেও এই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত।

ঐ দিন রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ভারতের প্রথম পর্যায়ের ব্যর্থতার জন্য তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অপ্রস্তুতি কতখানি দায়ী ছিল তা পরে অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

অপরাহ্নে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানালেন, ভারতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং মাসখানেকের মধ্যেই ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র রণাঙ্গনে পাঠানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বললেন চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যে সকল রাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করছে, ভারত তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১০ই নভেম্বর লোকসভায় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের অজুহাতে কেউ যাতে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বাড়াতে না পারে তার জন্য সরকার দেশব্যাপী সমবায় বিপণি ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। খাদ্যশস্য, সুতীবস্ত্র ও ঔষধের দাম যাতে বৃদ্ধি না পায় সরকার সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

ঐ দিন নেফা রণাঙ্গন হতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ওয়ালঙের কাছে চীনাদের কয়েক দফা প্রচণ্ড আক্রমণ আমাদের বীর জওয়ানরা ব্যর্থ করেছেন। লদাক সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মালয়ের প্রধানমন্ত্রী তুঙ্কু আবদুল রহমান ১০ই নভেম্বর কুয়ালালামপুর হ'তে এক বেতার ঘোষণায় ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে এশিয়ার সব গণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। ভারতকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে মালয়ের প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' তহবিল গঠনের কথাও ঐ বেতার ভাষণে প্রচারিত হল।

১১ই নভেম্বর দিল্লীর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, গত তিন সপ্তাহে ভারতে সমরোপকরণ উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন মিটাতে অস্ত্রনির্মাণ-কারখানাগুলিতে দিন-রাত্রি কাজ চলছে। উভয় রণাঙ্গনই ঐ দিন প্রায় সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকে।

১২ই নভেম্বর নেফা এলাকায় চীনাদের তিনটি আক্রমণ প্রতিহত হয়। লদাকের অবস্থা আগের মতই অস্বস্তিকরভাবে শান্ত থাকে।

১৩ই নভেম্বর সিকিমে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উভয় রণাঙ্গনই শান্ত থাকে। "নেফা ও লদাকে আমাদের সৈন্যরা সক্রিয়ভাবে টহল দিতেছে, কিন্তু গতকাল ঐ দুই এলাকায় কোন সংঘর্ষ ঘটে নাই"—প্রতিরক্ষা দপ্তর হতে ঐ দিন শুধু এই কটি কথাই জানানো হয়।

১৪ই নভেম্বরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না, উভয় রণাঙ্গনই অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করে। ঐ দিন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দানস্বরূপ নগদ একশ লক্ষাধিক টাকা ৫,৩২৭ গ্রাম সোনা উপহার পান। সহস্রাধিক পাউণ্ডের কয়েকটি চেকও তাঁকে সেদিন উপহার দেওয়া হয়। পাঞ্জাবের জনসাধারণ ঐ দিন প্রধানমন্ত্রীকে ১,৩০,০০০ গ্রাম স্বর্ণ উপহার দেন।

১৫ই নভেম্বর নেফায় ভারতীয় সৈনাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। [illegible] কিবাথো ওয়ালং হতে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে চীনা-

সৈন্য বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত জেনারেল জে. এন. চৌধুরী সামরিক বাহিনীর সদর কার্যালয় থেকে বাইরে আসছেন।

কবলিত একটি এলাকায় আমাদের সৈন্যরা অভিযান চালায়।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল ঐ কংগ্রেস সংসদীয় দলের এক সাব-কমিটির বৈঠকে জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জরুরী প্রয়োজন প্রতি মাসে ৫০ হাজার টন গম ও ২০ হাজার টন চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রায় সপ্তাহকাল যুদ্ধের যে অবস্থা ছিল তাতে মনে হয়েছিল, ভারত অতর্কিত আক্রমণের প্রাথমিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলিয়ে নিতে পেরেছে। চীনাদের আর অগ্রগমন সম্ভব হবে না এবং ভারতীয় সৈনাদের পাল্টা আক্রমণে তাদের অবিলম্ব পশ্চাদপসরণ শুরু হবে।

কিন্তু ১৬ই নভেম্বর আবার চীনা-দের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হল। প্রত্যুষে নেফা সীমান্তের ওয়ালঙ অঞ্চলের একাধিক ঘাঁটির উপর অর্ধবৃত্তাকারে চীনা সৈন্যদল প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করল। ২০শে অক্টোবরের পর ঐ দিনই ছিল চীনা সৈন্যদের বৃহত্তম আক্রমণ। নেফার চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু রণাঙ্গনে তখন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে এসেছিল। এ অবস্থায় চীনের এই দুর্বার আক্রমণ শুরু হওয়ায় বোঝা গেল, প্রচণ্ড শীতেও যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের সম্ভাবনা কম। লদাকের অবস্থা ঐ দিনও শান্ত ছিল।

১৮ই নভেম্বর নেফা সীমান্তে যুদ্ধ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের ব্যাপক আক্রমণে ওয়ালঙ ভারতীয় সৈন্যদের হাতছাড়া হওয়ার আশংকা দেখা দিল।

ঐ দিনই চীনা রেডক্রসের মাধ্যমে ভারতীয় রেডক্রস মারফৎ জানা গেল যে, ২০শে অক্টোবরের পর হতে ১৭ই

নেফার একটি পুরোবর্তী এলাকায় মাটির বাঁধের আড়ালে ভারতীয় জওয়ান।

নেফায় একটি পুরোবর্তী এলাকায় টহলরত ভারতীয় জওয়ানদল।

নভেম্বর পর্যন্ত চীন-ভারত যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার ডালভিসহ মোট ৯২৭ জন ভারতীয় সৈন্য চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে।

সরকারের পক্ষ হতেও ১৮ই নভেম্বর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হল, ২০শে অক্টোবর হতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যের নিহত ও নিখোঁজ সংখ্যা ১৬২৩, তার মধ্যে ২৬৪ জনের মৃত্যুসংবাদ সুনিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে। নিখোঁজদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং বহু নিখোঁজ সৈন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন পরিত্যক্ত রণাঙ্গন হতে ফিরে আসছে। সাঁতাশ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য আহত হয়েছে মাত্র ১৫৫ জন। নিখোঁজদের মধ্যেও হয়ত কিছু আহত থাকতে পারে।

প্রায় এক মাস ধরে প্রতি দিনই 'প্রচন্ড' যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। বন্যার স্রোতের মত দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে আসা বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যের ভারী সমরাস্ত্রের প্রবল আক্রমণে একান্ত নিরুপায় হয়ে একটির পর একটি ঘাটি ছেড়ে পিছু হঠে এসেছে ভারতীয় বীর সৈনিকরা—এই সংবাদই প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করেছে দেশের লোক। অক্টোবরের শেষেই ভারত সরকার জানিয়েছিলেন, প্রথম দশ দিনের যুদ্ধে দুই থেকে আড়াই হাজার ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত হয়েছেন। তা থেকে দেশবাসীর ধারণা হয়েছিল, পরবর্তী এক পক্ষকালের প্রচন্ড সংগ্রামে আরও কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য হয়ত রণক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছেন। সে অবস্থায় ব্রহ্ম সীমান্তের নিকটবর্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়ালঙ শহর ও তৎনিকটবর্তী বিমানক্ষেত্র পরিত্যাগের পূর্বে ভারত সরকার জানালেন, যুদ্ধের প্রথম থেকে ওয়ালঙ ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সীমান্তের উভয় রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে মাত্র ২৬৪ জন ও আহত ১৫৫ জন। পূর্বে যে দুই হতে আড়াই হাজার ভারতীয় সৈন্য হতাহত হওয়ার কথা প্রচারিত হয়েছিল তাও ঠিক নয় বলে সরকারীভাবে জানানো হল।

১৯শে নভেম্বরের সংবাদপত্রে দেশবাসী জানল, ওয়ালঙ পরিত্যক্ত হয়েছে। নেফার পশ্চিম সীমান্তে জঙ্গ অঞ্চলে সেলা গিরিপথেও চীনা সৈন্যদের প্রচন্ড আক্রমণে আমাদের সৈন্যবাহিনী কাহিল হয়ে পড়েছে।

নেফা সীমান্তে চীনাদের প্রায় তিন সপ্তাহ চুপ থাকার অর্থ বোঝা গেল। আসলে সে স্তব্ধতা ছিল পরবর্তী আক্রমণের ব্যাপক প্রস্তুতি। জানা গেল ইতিমধ্যে তিব্বতে তারা প্রায় ১৫।১৬ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে। সড়কনির্মাণকারী শ্রমিক বাহিনীসহ ভারত সীমান্তে চীনা হানাদারদের মোট সংখ্যা তখন তিন লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বিশ হাজার!

লদাকেও চুশুল এলাকায় আমাদের ঘাঁটিগুলির উপর চীনা সৈন্যদের প্রবল আক্রমণ শুরু হয়।

১৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু আবার জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বললেন, সীমান্ত রণাঙ্গনে জওয়ানদের সাময়িক বিপর্যয়ে দেশের কোন মানুষ যেন বিচলিত না হন। শত্রুর প্রত্যেকটি আঘাত যেন আমাদের শক্তিলাভের সহায় হয়। আক্রমণকারীদের কবল হতে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি বিপর্যয় যেন আমাদের সংকল্প বৃদ্ধি করে।

পরদিন বমডিলা পতনের সংবাদ প্রচারিত হল। ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, বমডিলা চীনাদের কুক্ষিগত হয়েছে। বমডিলা কামেং সীমান্ত ডিভিশনের সদর কার্যালয়। সেখানকার দু' হাজার অসামরিক অধিবাসীকে পূর্বেই স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ঐ দিন আরও জানা গেল যে, বমডিলা পতনের আগে সেলা গিরিবর্ত্মও চীনা হানাদারদের কুক্ষিগত হয়েছে। মাত্র ক' দিনের মধ্যে চীনারা বুমলা থেকে তাওয়াঙ পর্যন্ত একটি রাস্তাও তৈরী করে ফেলেছে বলে জানা গেল।

লদাকের চুশুল রণাঙ্গন হতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, চুশুল বিমানক্ষেত্রের উপর শত্রুর অবিরল আক্রমণ তখনও বন্ধ হয়নি। তবে তার ফলে বিমানক্ষেত্রটি একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি বা চুশুল এখনও শত্রুকবলিত হয়নি।

২০শে নভেম্বর লদাক ও নেফা উভয় অঞ্চলেই চীনা হানাদারদের প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যাহত ছিল। নেফায় সেদিন যুদ্ধ চলছিল বমডিলার কয়েক মাইল দক্ষিণে ও বর্মা সীমান্তে ওয়ালঙের ১২।১৪ মাইল দক্ষিণে। অর্থাৎ পর্বতের ব্যবধান অতিক্রম করে আসামের সমতল অঞ্চলের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে চীনাবাহিনী। ঐ দিনই আসামের সমতল অঞ্চলের প্রধান শহর তেজপুরের অসামরিক অধিবাসীদের শহরত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

যুদ্ধে একটানা বিপর্যয়ের কারণ যে শুধু চীনাদের উন্নততর রণনৈপুণ্য বা বিপুল সংখ্যাধিক্যই নয় তা বোধ হয় আমাদের কর্ণধাররা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই সৈন্যদের মনোবল ও সেই সঙ্গে জাতির মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০শে নভেম্বর জেনারেল থাপারের স্থানে লেঃ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতের স্থল-সৈন্য-বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর এই নূতন নিয়োগের ঘোষণা বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা সম্বর্ধিত হল। বহু সংগ্রামের বীর নায়ক লেঃ জেঃ চৌধুরী জাতির এই চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে যোগ্যতম নায়ক, সকলেই এক বাক্যে একথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু ২০শে নভেম্বর রাত্রে (ইংরেজি মতে ২১শে নভেম্বর) কমিউনিস্ট চীন সরকার এক অতর্কিত ঘোষণায় সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিলেন। বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তাঁরা জানালেন, ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হতে তাঁরা সমগ্র ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ করবেন। ১৯৬২ সালের ১লা ডিসেম্বর হতে তাঁদের সৈন্যবাহিনী পিছু হটে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর চীন ও ভারতের প্রকৃত দখলে যে সীমারেখা ছিল তারও ২০ কিলোমিটার (১২½ মাইল) পিছনে চলে যাবে। ঐ বিবৃতিতে চীন সরকার আরও বলেন যে, সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসাকল্পে গত ২৪শে অক্টোবর তাঁরা যে তিন দফা প্রস্তাব ভারতকে দিয়েছিলেন, এবং যা ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকেই কার্যকরী করার জন্য চীন সরকার একাই যুদ্ধ-বিরতি ও পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চীনা সরকারের এই অভাবিত প্রস্তাব বিশ্বের সকল কূটনৈতিক মহলকেই বিস্মিত করে। কারণ যে সরকার সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকের মত শান্তিকামী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর অতর্কিত আঘাত হেনেছে এবং যার কার্যক্রমের ফলে সমগ্র বিশ্ব আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তার পক্ষ হতেই হঠাৎ এই চৈতন্যোদয় ও শান্তির আগ্রহ প্রকাশ কারও পক্ষেই নেওয়া সহজ হয় না। ঐ দিনই বিশ্বের বিভিন্ন কূটনৈতিক মহল হতে বলা হয় যে, চীনের এই শান্তির আগ্রহ নিছক ধাপ্পা। ওটা চীনাদের স্বভাবজাত চতুরীরই আর এক রূপ। ২১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংসদে ঘোষণা করেন যে, চীনাদের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভালভাবে না জানা পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাব যে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় তা চীনকে বহু পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে মীমাংসার দাবী অর্থহীন। চীন যতক্ষণ না ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে ততক্ষণ তার সঙ্গে কোন আলোচনা হবে না।

তবে ২২শে নভেম্বরের সংবাদে জানা যায় যে, চীন সত্যই সীমান্তে সংগ্রাম বন্ধ করেছে। চীনা সৈন্যরা তখন নেফায় ফুটহিলসের কাছে ও লদাকে চুশুলের উপকণ্ঠে। কিন্তু ২২শে নভেম্বরের মধ্যরাত্রি হতে কোথাও আর তারা গুলী চালায়নি।

চীন সরকারের সাম্প্রতিক আচরণ এমনই নিন্দনীয় যে, হঠাৎ তার কোন কথাই সত্য বা আন্তরিক বলে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। একথা ভারত বা তার মিত্রদের পক্ষে মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, চীন প্রথম পর্যায়ে আক্রমণের পর যেমন কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ শেষ হওয়ার পর আবার সে ঠিক তেমনি কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে। কারণ রণাঙ্গন এখন খুবই বিস্তৃত ও সীমান্তের প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে এখন যুদ্ধচালনাও খুবই কষ্টকর। সরবরাহ ক্ষেত্রও তাদের এখন অনেক দূর হয়ে গেছে, সুতরাং এই অবকাশে তারা হয়ত সদ্য অধিকৃত ওয়ালঙ বা জঙ অঞ্চলে তাদের নতুন সরবরাহ ঘাঁটি গড়ে তুলতে চায়। আর সেই সঙ্গে যদি তারা হঠাৎ যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত প্রচার করে তবে তা ভারতের দ্রুত সামরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াসকেও বেশ কিছুটা শিথিল করবে। যুদ্ধ-বিরতির আনন্দে ভারত যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সেই সময় আবার শুরু হবে বিশ্বাসঘাতক চীনের কঠিন আক্রমণ। সুতরাং শুধুমাত্র চীনের হঠাৎ একতরফা ঘোষণাতেই ভারত যে তার যুদ্ধপ্রয়াস শিথিল করেনি বা চীনকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানায়নি, সেটা ভারতের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ভারত আজ কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন, এ অবস্থায় মুহূর্তের বিভ্রান্তি বা শৈথিল্য হয়ত সমগ্র জাতির সমূহ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। এককারণে ভারত সরকার বা ভারতের জনগণ কারও একথা মনে করে হাত গুটানোর উপায় নেই যে, বিপদ কেটে গেছে। বর্তমান নিস্তব্ধতাকে শত্রুর আরও ব্যাপক আক্রমণের প্রাক্-প্রস্তুতি মনে করেই আমাদের প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

মোট কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দিক থেকে কিছুই করণীয় নেই। সদিচ্ছার পরিচয় যদি কাউকে নতুন করে দিতে হয় তবে তা আক্রমণকারী চীনকেই দিতে হবে, আক্রান্ত ভারতকে নয়। চীনের যদি সত্যই শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে তবে তাকে পরে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মত ও মতির পরিবর্তন হয়েছে ধরে নিয়ে আমরা যেন আমাদের কঠিন কর্তব্য পালনে বিরত না হই।

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ পরমাণুর জনক নীল বোর ॥

দেশের জরুরী পরিস্থিতির দরুণ নীল বোর-এর মৃত্যু-সংবাদ হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক সময় হলে আমরা নিশ্চয়ই এই উপলক্ষে নীল বোরের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তুলতাম। তার ফল ভালোই হত, কারণ নীল বোরকে জানা মানেই আজকের এই যুগটিকে জানা।

নীল বোরকে বলা হয় 'ফাদার অব দি অ্যাটম'—পরমাণুর জনক। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থ পরমাণু, তারই একটি মডেল খাড়া করেছিলেন তিনি। এই মডেলটি পরবর্তীকালে বিশ্বকে এক নতুন যুগে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল, যে যুগটিকে বলা হয় পারমাণবিক। এই বিচারে তিনি অবশ্যই যুগস্রষ্টা।

তাঁর জীবনও কম ঘটনাবহুল নয়। সংগ্রামে ও সাধনায় উজ্জ্বল এই জীবনটি অনায়াসেই একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হতে পারে। নিজের দেশের এবং সারা বিশ্বের মানুষদের মনে তিনি যে বিরল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত তা এমন কি এই বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সহজলভ্য নয়।

আর ডেনমার্কের মানুষ তাঁদের দেশের এই মহান বিজ্ঞানীকে নিয়ে যতোখানি গর্ববোধ করে, তার বোধহয় কোনো তুলনা নেই। ছোট একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। একজন মার্কিন ভদ্রমহিলা কোপেনহাগেনের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে স্থানীয় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, তাঁর স্বামী কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার সংস্থায় অধ্যয়ন করেন। কথাটা শুনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক সংগে সংগে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালেন। বলা বাহুল্য, এই অভিবাদন মার্কিন ভদ্রমহিলার স্বামীর উদ্দেশ্যে নয়, কোপেনহাগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা সংস্থার অধ্যক্ষ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী নীল বোরের উদ্দেশ্যে।

১৯৬০ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে নীল বোর ভারতে এসেছিলেন। সে সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতাতেও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ও ছাত্রমহলে সে সময়ে যে উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এই হুজুগের শহর কলকাতার পক্ষেও একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা।

১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে কোপেনহাগেন শহরে নীল বোরের জন্ম। তাঁর বাবাও ছিলেন কোপেনহাগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর পড়াশুনা। তবে তিনি যে শুধু কৃতী ছাত্র ছিলেন তাই
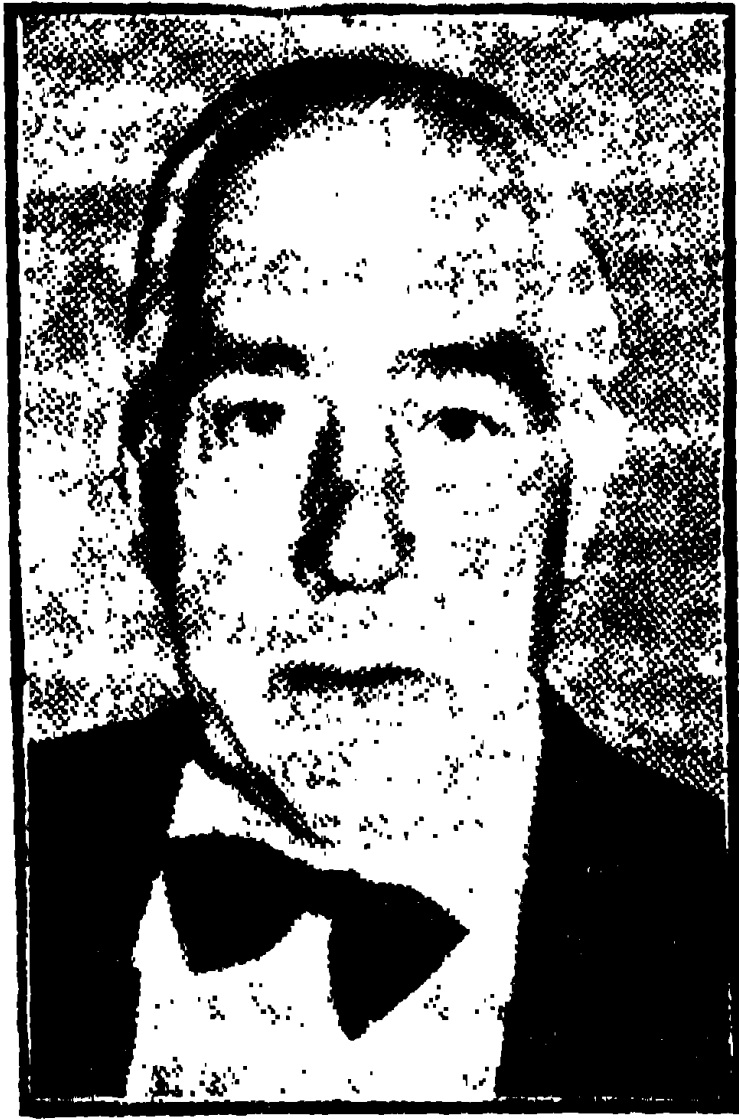
প্রফেসর নীলস বোর

নয়, কৃতী খেলোয়াড়ও। বিশেষ করে ফুটবলে তাঁর নামডাক সারা ডেনমার্কে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডেনমার্কের জাতীয় টিম তাঁকে বাদ দিয়ে গঠিত হতে পারত না। পরবর্তী জীবনে প্রায় ষাট বছর বয়সেও তিনি স্কি-প্রতিযোগিতায় জয়-লাভ করেছিলেন। সাইকেল ও নৌকো—দুটি যানের চালনাতেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি সারফেস টেনশন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্যে ডেনমার্ক বিজ্ঞান সমিতির স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি। তারপরে তিনি গিয়েছিলেন ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে। সেখানে তিনি গবেষণা করেছিলেন তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ইলেকট্রনের জনক জে জে টমসনের পরিচালনায়। তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। পরবর্তী কালে এই দুজন বিজ্ঞানীর বন্ধুত্ব সারা জীবনব্যাপী অটুট ছিল।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল পারমাণবিক গঠন সম্পর্কিত নীল বোরের মৌল তত্ত্বটি। এই তত্ত্বটি পরবর্তী কালে অনেক পরিমাণে পরিবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু নীল বোরের মূল কাঠামোটিতে বিশেষ রদ-বদল হয়নি। এই কাঠামো থেকে অগ্রসর হয়েই শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক তেজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

সকলেই জানেন, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপকে বলা হয় পরমাণু। ১৮০৮ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডাল্টন সর্বপ্রথম পরমাণুর ধারণাকে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। তখন থেকে প্রায় একশো বছর ধরে ধারণা ছিল যে পরমাণু অবিভাজ্য, পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তারপরে ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন যে, পরমাণুই পদার্থের শেষ কথা নয়। পমাণুরও উপাদান আছে, আছে বিশেষ একটি কাঠামো। আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে এই উপাদান ও কাঠামো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক।

পেঙ্গুইন প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অভিধানে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা এই: 'পরমাণুর মধ্যে আছে একটি পজিটিভ চার্জযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যষ্টি (কোর) যার নাম নিউক্লিয়স বা কেন্দ্রীন এবং এই কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষে ঘূর্ণ্যমান নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেকট্রন।' কাঠামোটিকে তুলনা করা চলে একটি ক্ষুদে সংস্করণের সৌরমণ্ডলের সঙ্গে। সূর্য হচ্ছে এক্ষেত্রে নিউক্লিয়স আর গ্রহ হচ্ছে ইলেকট্রন। বিভিন্ন গ্রহের সূর্য-প্রদক্ষিণের মতো এক্ষেত্রেও বিভিন্ন ইলেকট্রনের নিউক্লিয়সে-প্রদক্ষিণ।

ডালটনের অবিভাজ্য পরমাণুকে যে শেষ পর্যন্ত নিউক্লিয়াসে ও ইলেকট্রনে ভাঙতে হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল ইউরেনিয়ম-খনিজের ও রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ও তজ্জনিত আলফা বিটা ও গামা রশ্মিকে ব্যাখ্যা করার

প্রয়োজনীয়তা। পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরে নিলে এই তেজস্ক্রিয়তাকে বা রশ্মিকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা চলে না।

এই ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল রাদারফোর্ডের পরমাণুর সাহায্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এই ব্যাখ্যাটিও পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটি অসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

সকলেই জানেন, কোনো গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি হলে সেই গ্যাসটি জ্বলতে শুরু করে। যেমন, নিওন গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে পাওয়া যায় কমলা-লাল রঙের অতি সুন্দর আলো। তেমনি প্রত্যেকটি গ্যাসেরই নিজস্ব একটি আলো আছে। বিজ্ঞানীরা এই বিদ্যুৎপ্রবাহজনিত আলোকে বিশ্লেষণ করেই গ্যাসটিকে সনাক্ত করতে পারেন।

কেন এক-একটি বিশেষ গ্যাস থেকে এক-একটি বিশেষ ধরণের আলো নিঃসরিত হয় তার ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেল রাদারফোর্ডের পরমাণু এই ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই ব্যাখ্যাটি পাওয়া গিয়েছিল রাদারফোর্ডের তত্ত্বের দু-বছর পরে প্রকাশিত নীল বোরের তত্ত্ব থেকে। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, উপাদান ও কাঠামোর দিক থেকে রাদারফোর্ডের পরমাণু নির্ভুল; কিন্তু ইলেকট্রন-কক্ষের অঙ্ক-গণনায় প্রাচীন গণিত বাতিল করে আশ্রয় নিতে হবে প্ল্যাঙ্ক-উদ্ভাবিত নব্য-গণিতের—কোয়ান্টামের।

'কোয়ান্টাম' শব্দটি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু এই শব্দটির ব্যাখ্যা দরকার। এই ব্যাখ্যা দেবার জন্যে আমি শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্য নিচ্ছি।

"কোয়ান্টাম বিধির তাৎপর্য হল তাপ-বিকীরণ শক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন না মনে করে তাকে গণ্য করা উচিত কণাসমষ্টি-রূপে। এই সিদ্ধান্তে প্ল্যাঙ্ক উপনীত হন ১৯০০ অব্দে তাপ বিকীরণের একটা বিসদৃশতার সূত্র-সন্ধানে। প্রত্যক্ষের সঙ্গে হিসাবের বিসদৃশতার মীমাংসার জন্য ইতিপূর্বে লর্ড রেলে, উইন, বোলজমান প্রভৃতি এক-একটি মীমাংসা দাখিল করেন। তন্মধ্যে বোলজমানের সূত্রই হয়েছিল সমীচীন। এই সূত্রের সমর্থন-সন্ধানে প্ল্যাঙ্ক এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিকীরণের শক্তি আসলে শক্তি-কণার সমষ্টি। একটা সহজ সূত্রও তিনি আবিষ্কার করেন, সে হল বিকীরণের স্পন্দন বা তরঙ্গ-সংখ্যাকে একটা অভিন্ন অঙ্ক—যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্লাঙ্কাঙ্ক'—দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে তার শক্তি-মাত্রা। শক্তিকে কণারূপে গণ্য করা সে সময়ের পক্ষে এমনই অর্বাচীন ছিল যে স্বয়ং প্ল্যাঙ্ক তাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। অবশেষে একে সংশয়মুক্ত করে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করলেন পাঁচ বছর পরে, ১৯০৫ অব্দে, আইনস্টাইন। তিনি আলোকপাতে ধাতুগাত্র থেকে ইলেকট্রন মোচন হওয়ার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যায় প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম-তত্ত্ব প্রয়োগ করেন ও সেই থেকে এই অভিনব তত্ত্ব বিজ্ঞানজগতের স্বীকৃতি লাভ করে। আইনস্টাইন বলেন, আলোকরশ্মিও কণিকাসমষ্টি; —তারও তরঙ্গ-সংখ্যাকে প্লাঙ্কাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় সে রশ্মির শক্তি-মাত্রা। এতদিন ঈথর তরঙ্গ বা বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ বলেই আলোক বিদিত ছিল, এখন সন্ধান পাওয়া গেল আলোক-অণুর; তার নাম হল 'ফোটন'।"

এই ব্যাখ্যা যদি কারও কাছে অস্পষ্ট মনে হয়ে থাকে তাহলে আমি তাঁকে অনুরোধ করব লিঙ্কন বার্ণেট-এর লেখা 'দি ইউনিভার্স অ্যান্ড ডঃ আইনস্টাইন' বইটি পড়তে। বইটি পকেটবুক সংস্করণেও পাওয়া যায়।

১৯২২ সালে নীল বোর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ; নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু নিজের দেশে তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অনেক আগে থেকেই উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার সংস্থার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়ার মহিলা বিজ্ঞানী লিজে মাইটনার ও তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিশ কোপেনহাগেন নীল বোরের গবেষণাগারে গবেষণা করছিলেন। সে সময়ে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান্-এর লেখা ইউরেনিয়ম পরমাণুর ভাঙন সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের সূত্র ধরে গবেষণা করতে করতে ফ্রিশ-মাইটনার সিদ্ধান্ত করলেন যে নিউট্রন অভিঘাতে ইউরেনিয়ম পরমাণু সমান দুটি ভাগে ভাঙতে পারে। সে সময়ে ইতালীর পরমাণু-বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাঙ্গেরিয়ান পদার্থ-বিজ্ঞানী লিও জিলার্ডও আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। নীল বোরও আমেরিকায় এলেন এবং আইনস্টাইন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। অন্যদিকে ফ্রান্সে জোলিও কুরী ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণাতেও ফ্রিশ-মাইটনারের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হল। তারপরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের তৎপরতা যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে লাগল তারই ফল পারমাণবিক বোমা। ইতিহাসের এই পর্বটি যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁদের আমি রবার্ট য়ুঙ্কের লেখা 'ব্রাইটার দ্যান থাউজেন্ড সানস' বইটি পড়তে অনুরোধ করি। এই বইটিও পকেটবুক সংস্করণে পাওয়া যায়।

ইহুদী মায়ের সন্তান নীল বোরকে এক সময় নাৎসী-কবলিত ডেনমার্ক ছেড়ে পালাতে হয়েছিল একটা জেলে-ডিঙ্গিতে চেপে। দেশে ফিরে এসেছিলেন যুদ্ধ শেষ হবার পরে।

১৯৫৫ সালে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত 'অ্যাটম্স্ ফর পীস' সম্মেলনের তিনি ছিলেন সভাপতি। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের জন্যে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(২)

পুণ্যসলিলা সুরধুনী তীরে প্রায়োপবেশনে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন ভারত-সম্রাট পরীক্ষিত শ্রোতা, আর আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ববন্ধন বিনির্মুক্ত ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা মহর্ষি শ্রীশুকদেব বক্তা। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম নরলীলার পরম প্রকাশ শ্রীশ্রীরাসলীলার পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া —সম্রাট প্রশ্ন তুলিলেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে বিভিন্ন রুচির অসংখ্য জনই তো রহিয়াছেন। সাধারণের সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যেই মহারাজের এই জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাস্য—গোপীগণ তো পরকীয়া ভাবেই শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা করিয়াছিলেন। শাশ্বত ধর্মগোপ্তা ভগবান আভীর-তনয়াগণের এই জারবুদ্ধি অনুমোদন করিলেন কেন? শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের যে কয়েকটি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটির যুক্তি এইরূপ—

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্য ওদৈবাচরণঃ ক্কচিৎ"—ঈশ্বরের বচনই সত্য, তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে সর্বত্র সে কথা বলা চলে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম। একমাত্র তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই বোধহয় একথা বলিতে পারি যে তাঁহার বাণীও যেমন সত্য আচরণও তেমনই সত্য। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়" ইহাই ত তাঁহার জীবন-বাণী। শ্রীমহাপ্রভুর সমগ্র জীবন এই বাণীরই ঘনীভূত বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যকথা আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার এই জীবনাদর্শের বিষয় সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। শ্রীভগবানের বাণী এবং আচরণের মধ্যে অনেক সময় স্ব-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি না, তাই কখনো সেই উক্তিকে বলি প্রক্ষিপ্ত, এবং আচরণের করি কদর্থ। ভগবদ্‌বাক্যের মধ্যে যে পূর্বাপর কোন অসংগতি নাই, থাকিতে পারে না, তাঁহার আচরণ যে সর্বত্রই সামঞ্জস্যপূর্ণ, অনুকূল অনুশীলন, ও সুগভীর অনুধ্যান ভিন্ন তাহা ধরা পড়ে না। যাহা অনুভূতিবেদ্য, তাহা বিতর্ক-সংকুল মনে প্রতিফলিত হয় না। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ভিন্ন তাহা বোধগম্য হয় না।

শ্রীচৈতন্যলীলা সত্যই দুরবগাহ। তাঁহার কৃপা ভিন্ন সে লীলাসমুদ্রে অবগাহন কল্পনাতীত ঘটনা। তবে ভরসার কথা এই লীলায় সর্বজনের সহজবোধ্য অংশেরও অসদ্ভাব নাই। প্রথম প্রথম সাধারণ পাঠক আপাত-দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর জীবনে এবং আচরণে সেই সহজবোধ্য অংশেও হয়তো কিছু কিছু স্ব-বিরোধ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় সামান্য অনুধাবনেই ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে সে সুযোগও ঘটিয়া উঠে না। আমাদের প্রথম অসুবিধা—আজ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিবৃতিপূর্ণ যতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবত লইয়া সেরূপ কোন আলোচনা হয় নাই। কেহ তেমন ব্যাখ্যা বিবৃতিও প্রকাশ করেন নাই।

দ্বিতীয় অসুবিধা, সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণের কদর্থ করিয়াছেন, তাঁহার বহু বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আপনাদের মতবাদের সম্পূর্ণ সমর্থনের অনুকূলে। ইহাদের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, দুই চারিখানি ছাপানো পুস্তকও পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বহু আখড়ায়—এই সম্প্রদায়ভুক্ত তথাকথিত বৈষ্ণবের সংখ্যা প্রচুর। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আউল, বাউল প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহারা ভিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সুবিধা পাইলেই আপনাদের ব্যাখ্যা সহ চৈতন্যকথা প্রচার করেন। পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থগণের মধ্যেও এই মতবাদের প্রসার লক্ষ্য করিয়াছি। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেও এই মতবাদ অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি। ইদানীং কথক সম্প্রদায়ের বিলোপ ঘটিয়াছে, শ্রীচৈতন্যকথা শুনাইবার লোকের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত আচার্য-সন্তানগণকে পল্লীগ্রামে প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। ইঁহাদের মুখ নগরাভিমুখি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্মৃদ্ধ-সম্পন্ন কোন সুসম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠানও নাই। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার সুসংগতি আছে। বাঙালী সাধকগণ এই সঙ্গতি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজলীলার গতি মাধুর্য হইতে ঐশ্বর্যের পথে, আর নবদ্বীপলীলার গতি ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যের আনন্দ-নিকেতনে। কবি জয়দেবের জীবনে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু কবির সাধনার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত সাধনার পার্থক্য আছে। কবির সাধনা ছিল সৌন্দর্যের সাধনা, রসের উপাসনা, নিত্যসিদ্ধ সাধকের ভাবাস্বাদন। শ্রীচৈতন্যদেব কিন্তু নবদ্বীপলীলায় সাধারণ মানুষের সাধনপদ্ধতিরই পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস এই পথের ইতিহাসবেত্তা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তিনি এই পথের এবং পথিকের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মহাকাব্যে এই পথ ও পথযাত্রীর একটি অতি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত আছে। বৃন্দাবন দাস একজন মহাকবি, একজন সিদ্ধবিদ্য পটুয়া। অন্যথায় লক্ষ লক্ষ কবির অনুভূতি-বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সার্থক ও সুসম্পন্ন, রসভাবের মিলিত তনু নিখিল জগতের নাটুয়া শ্রীচৈতন্যদেবের এমন প্রাণবন্ত মনোহারী মূর্তি তিনি চিত্রিত করিতে পারিতেন না।

আমাদের উদ্দিষ্ট লীলার সূচনা হইয়াছে গয়াধামে। গয়াধামে পিতৃকৃত্য সম্পাদনের পর নবদ্বীপে প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনের কয়েকটি ঘটনা আমাদের অবলম্বন। ইহারই মধ্য হইতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, নিমাই পণ্ডিত একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকা অভিনয়ে কেমন করিয়া বিশ্বের নর-নারীকে একটি ক্রম-পারম্পর্যে সুশৃংখল সুন্দর সাধনপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার চরণাঙ্কিত এই সাধনসরণি আজিও পথযাত্রীর অপেক্ষা করিতেছে।

আমি বলিয়াছি শ্রীচৈতন্যলীলা নিতান্তই নিগূঢ় লীলা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত কথিত সমস্ত লীলার সামঞ্জস্য-পূর্ণ ব্যাখ্যাদান, আমার মত সাধনহীন সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত। তথাপি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্মরণপূর্বক এই সুদুর্গম পথে আমি অগ্রসর হইয়াছি। এবং তজ্জন্য সর্ববৈষ্ণববৃন্দের পদপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার দিব্যজীবনের অপরাংশ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। এই-খানেই শ্রীবৃন্দাবন দাস আপন কর্তব্য

শেষ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি শ্রীনিত্যানন্দ লীলায় আবিষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসোত্তর জীবনের কিছু কিছু কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে তত্ত্বের ফল্গুপ্রবাহ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই অংশের মধ্যে তথ্যের অংশই অধিক। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যেন এক পৃথক মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদরের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীদাস রঘুনাথের কৃপাধন্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার পরিচায়ক।

আমাদের আলোচনার পশ্চাৎপট-রূপে আমরা নবদ্বীপলীলার দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত যখন প্রতিষ্ঠার শিখর-দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, এমন সময় একদিন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। অধ্যাপনা অন্তে ছাত্র-সঙ্গে পণ্ডিত গৃহে প্রত্যা-গমন করিতেছেন, নিয়তিনিয়মে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আসিয়া পথিমধ্যে দর্শন দিলেন। প্রেমকল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর বিশ্বজনবন্দ্যনীয় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রশিষ্য বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই শ্রীল ঈশ্বরপুরীই গয়াধামে নিমাইকে দীক্ষাদান করেছিলেন। পথের মধ্যে স্পর্শমণি, মণিকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। নিমাই-এর ভূবন ভুলানো রূপ, তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি পুরীর পথরোধ করিল। শ্রীগৌরচন্দ্রের চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি পুরীর অন্তরে তরঙ্গ তুলিল। আশ্চর্য এই অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকৃতি। পুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি তোমার নাম বিপ্রবর, কোন্ গ্রন্থের অধ্যাপনা কর, তোমার বাড়ী কোন্খানে? ছাত্রগণ সগৌরবে উত্তর করিল, ইনিই নিমাই পণ্ডিত। 'ও তুমি সেই' বলিয়া পুরী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের এই প্রথম দৃষ্টিবিনিময়। লৌকিক জগতের ভবিষ্যত গুরু-শিষ্যের এই প্রথম পরিচয়। নিমাই তাঁহাকে আপন গৃহে ভিক্ষার আমন্ত্রণ জানাইলেন। পুরীও পরমানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। এইযাত্রায় পুরী কয়েক মাসই শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য আপন গৃহে পুরীকে স্থান দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নবদ্বীপেই শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে পুরীর পরিচয় হয়। তিনি অতি যত্নে স্ব-প্রণীত গ্রন্থ "কৃষ্ণ-লীলামৃত" গদাধরকে অধ্যয়ন করাইয়া-ছিলেন।

গয়াধামে দীক্ষা গ্রহণের পর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পথে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরী-পাদের জন্মস্থান কুমারহট্ট দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবন ধন প্রাণ॥

সাধুসঙ্গের ফল কত সুদূরপ্রসারী হয়—আপন জীবনে মহাপ্রভু তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে যাঁহার শুভারম্ভ, গয়াধামে তাঁহার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাইব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার পরই মহা-প্রভুর সঙ্গে এক সর্বজ্ঞের সাক্ষাৎকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভু যেন দেখাইতেছেন— সাধুসঙ্গের ফলেই তাঁহার মনোদর্পনে অতীত দিব্যজন্ম কর্মের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছে। নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নিমাই পণ্ডিত সর্বজ্ঞের গৃহে গিয়া অন্যজন্মে আমি কি ছিলাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্বজ্ঞ—শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি দেখিয়াছেন মথুরার কংস কারা-গারে। পরে বালগোপাল মূর্তি দেখিয়া গোপীগণ পরিবেষ্টিত ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদনকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শ্রীরাধার উল্লেখ করেন নাই। পরে রামচন্দ্র, বরাহ, নরসিংহ, বামণ, মৎস্য, হলধর, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শনলাভ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নাই, পূর্বাপর বিচারও নাই। আমি প্রসঙ্গক্রমে সর্বজ্ঞদৃষ্ট এই ছায়া-চিত্রের কথাটা উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। ইহার মধ্যে সর্বজ্ঞ কর্তৃক জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে দর্শনের মধ্যে যেন অদূর ভবিষ্যতে সচলব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য-দেবের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সাগর তীরে দারুব্রহ্ম সমীপে অবস্থানের ইঙ্গিত আছে। অন্যথায় অবতার পর্যায়ে—জগ-ন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার উল্লেখের কোন সার্থকতা থাকে না। অনেকে জগন্নাথ-দেবকে বুদ্ধাবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কিন্তু স্পষ্টরূপে বুদ্ধের উল্লেখ আছে।

লেঃ জেনারেল চৌধুরী

হিরণ্ময় সেন

লেফটন্যান্ট জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী স্বাধীন ভারতের স্মরণীয় ও বরেণ্য সেনানায়ক। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এই সমরকুশলী অধিনায়ক আজ সমস্ত জাতির শ্রদ্ধার পাত্র। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জয়ন্তনাথের জীবনকথা নানা কীর্তিগাথায় সমুজ্জ্বল।

পাবনার বিখ্যাত অভিজাত চৌধুরী পরিবারে জয়ন্তনাথের জন্ম ১৯০৮ সালের ১০ই জুন। এই সুপ্রসিদ্ধ পরিবারেই জন্ম নিয়েছিলেন এক সময় আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী— বাঙলাদেশের অমর সন্তানেরা। সেই পরিবারের ঐতিহ্য যেমন অক্ষুন্ন রেখেছেন জয়ন্তনাথ তেমনি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন আরও উজ্জ্বলভাবে।

কলকাতা থেকে লন্ডনের হাইগেট স্কুলে গিয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপর যোগদান করেন স্যান্ডহার্স্টের রয়েল মিলিটারী কলেজে। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ১৯২৮ সালে কমিশন লাভ করে সপ্তম লাইট কাভালারিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই শিক্ষাযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই জয়ন্তনাথের উপযুক্ত ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। জয়ন্তনাথ কোয়াটার স্টাফ কলেজেও যোগদান করেন এবং শিক্ষালাভান্তে বিখ্যাত পঞ্চম ভারতীয় ডিভিসনের সহযাত্রী হয়ে বিদেশে যান। সুদান, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়ায় প্রত্যক্ষ সামরিক ও যুদ্ধাভিজ্ঞতা লাভ করেন ঐ ডিভিসনের সংগে সংযুক্ত থাকাকালে। এই ডিভিসনে জয়ন্তনাথ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে পালন করেন। তাঁর ডিভিসনের সহকারী অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ও কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের দায়িত্ব পালন করাই ছিল পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর কর্মভার। এই কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর উপযুক্ততার সত্যতা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হল এবং কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের জন্য 'অর্ডার অব দি বৃটিশ এম্পায়ার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জয়ন্তনাথ ভারতে ফিরে এলেন। এবার নিযুক্ত হলেন কোয়েটার স্টাফ কলেজের সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর। জয়ন্তনাথের কর্তব্যভারের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ১৯৪৪ সালে ষষ্ঠ দশ ক্যাভালারির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই সর্ব প্রথম তাঁকে সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হল। জয়ন্তনাথের নেতৃত্বে ক্যাভালারির গৌরবময় কাহিনী আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাঁর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে কোয়েটা থেকে নৈইকতলা যাওয়ার পর মধ্যব্রহ্মের রণক্ষেত্রে অমর শৌর্য-বীর্যের অক্ষয় কীর্তি রচনা করে। জয়ন্তনাথের সুনিপুণ সমর-কুশলতা এবং সামরিক অভিজ্ঞতায় সুচিন্তিত ও দ্রুতসিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাহীনতার মধ্যে ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ সমর-নায়কের পরিচয় ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তারপর তিনি ইন্দোচীন ও জাভায় যুদ্ধে যোগদান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী

জয়ন্তনাথ মালয় কম্যান্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্রিগেডিয়ার ইনচার্জ নিযুক্ত হন ১৯৪৬ সালে। ইতোপূর্বে ব্রিগেডিয়ার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন মাত্র দুজন ভারতীয়। ১৯৪৬ সালে একটি ভারতীয় বিজয়ী বাহিনী লন্ডনে যায়। জয়ন্তনাথ ছিলেন সেই দলের অধিনায়ক। ১৯৪৭ সালেই তিনি লন্ডনে যান ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজের এক বিশেষ শিক্ষাক্রমে যোগদানের জন্য। উক্ত শিক্ষাক্রমে যোগদানকারী দুজন ভারতীয়ের মধ্যে জয়ন্তনাথই ছিলেন অন্যতম। ভারতে ফিরে আসার পর ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি ব্রিগেডিয়ার (প্ল্যান্স) এবং কিছুকাল বাদেই স্থল বাহিনীর সদর দপ্তরে ডিরেক্টর অব আর্টিলারি অপারেশনস অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্সের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিযুক্ত হন মেজর জেনারেল এবং চীফ অব জেনারেল স্টাফেরও কাজ চালান সাময়িকভাবে।

১৯৪৮ সালে সাঁজোয়া ডিভিসনের অধিনায়কতার দায়িত্ব নিয়ে জয়ন্তনাথ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। হায়দরাবাদ অভিযানে এই বাহিনীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। হায়দরাবাদ জয় করার পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জয়ন্তনাথকে ঐ রাজ্যের সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত এবং ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি নানা কাজে জড়িয়ে পড়েন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ হল স্থলবাহিনীর সদর কার্যালয়ে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল (১৯৫২), চীফ অফ জেনারেল স্টাফ (১৯৫৩), সাদার্ণ কমান্ডের অধিনায়ক (১৯৫৯)। শেষোক্ত পদে কার্যকালীন তাঁর ঐতিহাসিক গোয়া অভিযান। বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই কাজ করে আসছিলেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তীকালের ভারতীয় ইতিহাসে জয়ন্তনাথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। এই দুর্ধর্ষ সেনানায়ক ভারতীয় বাহিনী ও জনগণের সামনে চিরজয়ের বাস্তব সত্যকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। হায়দরাবাদের গৌরবদীপ্ত অভিযান ও গোয়ার ঐতিহাসিক অভিযানে তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতাগুণেই ভারতীয় বাহিনীর বিজয় অভিযান হয় সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত। আজ আবার তাঁর আহ্বান এসেছে। চীনা দস্যুদের ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের জন্য তিনি স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। এ আহ্বানে যে দায়িত্ব তিনি মাথায় তুলে নিয়েছেন তা পূর্বের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর। কিন্তু অভিজ্ঞ, দুঃসাহসী, নেতৃত্বের দুর্লভ ক্ষমতাগুণে উজ্জ্বল এই সেনানায়ক আমাদের সামনে বিজয়ের বরমাল্য গলায় দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কোন অমংগল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর দুর্ধর্ষ সামরিক অভিজ্ঞতা জাগ্রত হোক। আমাদের সকলের বল একত্রিত হোক। আমাদের মঙ্গলকামনায় তাঁর অভিযাত্রা হোক সার্থক ও জয়দীপ্ত।

মূক চলচ্চিত্র

কণাদ চৌধুরী

ভাষা হল ভাববিনিময়ের সেতু। ভাষাকে সভ্যতার প্রথম রাজদূতও বলা যেতে পারে। রাজ্য ভিন্ন হলে রাজদূতের বেশবাসও যেমন ভিন্ন, আবাস অনুযায়ী ভাষাও তেমনি একেবারে বদলে যায়। এমন কি এক দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার পার্থক্য সম্ভবতঃ উদাহরণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং ভাষা যেমন ভাব-বিনিময়ের সেতুও হতে পারে পার্থক্যের দেয়াল গাঁথতেও ভাষার তুল্য রাজ-মিস্ত্রি নেই। ভিনদেশী ভাষা বুঝতে হলে অনুশীলনের শ্রম স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি পৃথিবীকে যেমন ছোট করেছে, তেমনি সময়কেও। আজকের খণ্ডিত জীবন সময়ের পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে নাজেহাল। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বসুন্ধরার অনেক অধ্যবসায়কে আমরা চলমান জীবনের জানালা থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলছি। অতএব মাতৃভাষা এবং বড় জোর বিদ্যালয়লব্ধ দ্বিতীয় একটি ভাষা ছাড়া ভাব-বিনিময়ের আর কোনো সেতু আমাদের নেই।

ইউনেস্কো সম্প্রতি একটি সার্ব-জনীন সেতুনির্মাণে নিরন্তর চেষ্টা করে আসছেন। তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সঙ্গীত দিয়ে। মনুষ্যমনে সুর অবার সুতরাং রেডিও, টেলিভিশন মারফৎ বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত প্রচার করে সারা বিশ্বের রসিকদের মনে সহজেই সাড়া তুলতে পেরেছেন তাঁরা। সঙ্গীতের পর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ঘটনাবলী অবলম্বনে মূকাভিনয় দ্বারা বিশ্বের নানা প্রান্তকে একাত্ম করবার চেষ্টা করে-ছিলেন ইউনেস্কো। প্রথমে স্থির হয়েছিল একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করানো হবে। কিন্তু নানা কারণে ইউনেস্কোর পরি-কল্পনাটি সুফলপ্রসূ হয়নি।

ইউনেস্কো সম্প্রতি আটটি দেশের শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী-নির্ভর মূক চলচ্চিত্র তুলেছেন টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্যে। এই মূক চলচ্চিত্রে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মে ছবির বক্তব্যকে উপস্থিত করা হয়নি। তবে

বিশেষ ভঙ্গীমায় মূকঅভিনেতা এরভিং ডিনসার।

আমেরিকার শ্রীমতী লক্ষা মিত্র এবং হল্যাণ্ডের ডার্ক স্যাণ্ডসন অভিনীত মূকচলচ্চিত্রের একটি নৃত্যদৃশ্য।

প্রতীচ্যের প্রাচীন মূকাভিনয়ের কাহিনী এবং চরিত্রগুলি যত সহজে ইয়োরোপীয় দর্শকদের পক্ষে বোধগম্য, প্রাচ্যের ধর্ম-নির্ভর নৃত্য-কাহিনী থেকে মর্ম গ্রহণ প্রতীচ্যের দর্শকদের পক্ষে তত সহজে সম্ভব না। ইটালীর ষোড়শ শতকে যে 'কমেডিয়া দেলা আর্তে'এর মূক নাট্যচরিত্র-গুলিকে উপস্থিত করার জন্যে কোনো বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। হারলে-কুইন, হারলেকুইন প্রেমিকা কলাম্বাইন, ডক্টর, প্যান্টালোন, ট্রেকেলডিনো প্রভৃতি চরিত্রগুলি লোকপরম্পরায় ইয়োরোপে আজো সজীব। এমনকি তুরস্কের নাসিরুদ্দিন ওঝার তুর্কী চরিত্রটিকেও ইয়োরোপের রসিকজন চিনতে ভুল করেন

নাসিরুদ্দিন ওঝার ভূমিকায় এরডিং ডিনসার।

না। কিন্তু প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারত-বর্ষের নৃত্য-নাট্য থেকে রস গ্রহণ করতে হলে ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা একান্তই আবশ্যক। ভারতীয় নৃত্যের একেকটি মুদ্রা বিশেষ বিশেষ অর্থ বহন করে। শিবের তাণ্ডব নৃত্যে অন্তরালশায়ী সৃষ্টি এবং ধ্বংসের তত্ত্বকে না জানলে দর্শকমনে ভাববিনি-ময়ের সেতুটি সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু প্রাচ্যের এই বৈশিষ্ট্যই বারবার প্রতীচ্য মনকে আকৃষ্ট করেছে। ইউনেস্কোর এই মূক চলচ্চিত্রে তাই কোনো দেশেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ব্যাহত করা হয়নি। এই চলচ্চিত্রে ইউনেস্কো বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের চিরন্তর সূত্রকে বিধৃত করেছেন বিভিন্ন দেশের লোকগাথা ধর্মকাহিনীকে অবলম্বন করে।

লরা এবং স্যান্ডারস-এর একটি আবেগমধুর দৃশ্য মূকচলচ্চিত্রে।

শিবের প্রতীক্ষায়　　শিল্পী—[illegible]

সাহিত্য সমাচার

।। বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যিক ।।

অক্টোবর মাসের শেষদিকে তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক ভারত-সোবিয়েত সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুসারে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। এই তিনজন ভারতীয় লেখক হলেন রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য আকাদমির সেক্রেটারি শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী ও হিন্দী লেখক শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। এঁরা তিনজন সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যান প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের সোবিয়েত দেশ সফর-সংক্রান্ত নথিপত্র অনুশীলন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য।

এই তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখকই রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্রীকৃপালনী দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে প্রথমে ছাত্র হিসেবে ও পরে অধ্যাপনার কাজে এবং ইংরিজি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত থেকেছেন; তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনী রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ছিলেন বিশ্বভারতীর হিন্দী-ভবনের পরিচালক (বর্তমানে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত)।

এঁরা তিনজনে সোবিয়েত দেশ সফরকালে লেনিনগ্রাদে যান এবং সেখানে এঁদের নগর-দর্শনে ও তথ্যসংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন প্রখ্যাত ভারতবিদ পরলোকগত আলেক্সি বারান্নিকফের পুত্র পিওৎর্ বারান্নিকফ্। পিওৎর্ বেশ কিছুকাল ভারতে ছিলেন এবং তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট হিন্দী ভাষাবিদ। এই তিনজন ভারতীয় লেখকের লেনিনগ্রাদ সফর সম্পর্কে পিওৎর্ বারান্নিকফ নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির অনুরোধে যে রিপোর্ট লিখে দেন, তা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া গেল :

শ্রীমুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃপালনী ও ডঃ দ্বিবেদী লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিট্যুটের প্রতিনিধিবৃন্দ ও লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য অনুশীলন বিভাগের অধ্যাপকগণ তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানান। এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক কালিয়ানোফ ও অধ্যাপিকা ভেরা নোভিকোভা।

ভারতীয় সাহিত্যিকত্রয় আনুষ্ঠানিকভাবে এশীয় জাতিসমূহের অতিথি হলেও, প্রথম দিনটা বারান্নিকফের অতিথি হিসেবে কাটান। বারান্নিকফের ব্যক্তিগত আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ তাঁরা রক্ষা করেছিলেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ৪৫তম বার্ষিকীর মাত্র কিছুদিন আগে। প্রথমেই তাঁরা ইতিহাস-খ্যাত নগরীর ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও দ্রষ্টব্যগুলি দেখেন। ৪৫ বছর আগে ৭ই নভেম্বর তারিখে যে ক্রুজার যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা' থেকে কামানধ্বনি করে সমাজতান্ত্রিক নবযুগের জন্ম ঘোষণা করা হয়, লেনিনগ্রাদে রক্ষিত সেই জাহাজটি এঁরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করেন। তারপরে এঁরা যান রাজলিভে—যেখানে লেনিন আত্মগোপন করে থেকে আমাদের শ্রমিক-শ্রেণীকে পরিচালনা করেন। অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে এখানে থাকার সময়েই লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থটি রচনা করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর স্বদেশে নিয়ে যাবেন বলে এখানকার কিছু ফুল সযত্নে তুলে নেন।

লেনিনের কর্মজীবনের সঙ্গে জড়িত আর একটি জায়গা হল স্মোলনি। বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় এখানেই। এই বাড়িটিকে এখন একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে এবং লেনিনের ঘরটি তিনি থাকার সময় যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরে ঢুকে শ্রীমুখোপাধ্যায় বার বার অভিভূত স্বরে বলে ওঠেন, 'পবিত্র স্থান! অতি পুণ্য স্থান।' ডঃ দ্বিবেদী বলেন, 'লেনিনের মতো একজন মহাপুরুষের ও বিরাট জননায়কের জীবনযাত্রা যে কতদূর সহজ ও সরল ছিল, তা দেখে আমরা বিস্মিত। এই পবিত্র স্থান দর্শন করে আমরা আনন্দিত।'

এর পরে তাঁরা মিউজিয়ামের অন্যান্য অংশ এবং বিশেষ করে বিগত যুদ্ধে লেনিনগ্রাদের বীরদের অবিস্মরণীয় বীরত্বের ইতিহাস সংক্রান্ত দ্রষ্টব্যগুলি মনোযোগের সঙ্গে দেখেন। ডঃ দ্বিবেদী বলেন, 'সোবিয়েত দেশ সফরে এসে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে সোবিয়েত জনগণ সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধকে ঘৃণা করেন। লেনিনগ্রাদ অবরোধের এই ইতিহাস জানার পর আমরা উপলব্ধি করছি যে কেন আপনারা শান্তির জন্যে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এমনভাবে সংগ্রাম করছেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে বিশ্ব-শান্তির জন্য আপনাদের এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই।' সঙ্গে সঙ্গে কৃপালনী যোগ করেন, 'শান্তির জন্যে আপনাদের এই সংগ্রামে আমাদের দেশের মানুষও আপনাদের সহযোদ্ধা।'

তারপর তাঁরা বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁদের গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁরা এখানকার ভারতবিদদের সঙ্গে ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ও আলাপ আলোচনায় কাটান।

এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিট্যুট ও লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-অনুশীলন বিভাগের যুক্ত উদ্যোগে এঁদের তিনজনকে এক সম্বর্ধনা সভায় সম্মান জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এশীয় ইনস্টিট্যুটের ভারতীয় শাখার পরিচালক অধ্যাপক ভি, কালিয়ানোফ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পরিচালিকা অধ্যাপিকা নোভিকোভা ভারতীয় অতিথিদের পরিচয়দান প্রসঙ্গে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁই তিনজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরে জোর দেন। সোবিয়েত দেশে রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে নানা তথ্য তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক কালিয়ানোফ জানান, মহাভারতের টীকাসহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কাজে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী দীর্ঘকাল ধরে নিযুক্ত আছেন এবং মহাভারতের সভাপর্বের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। (এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ২৮ সংখ্যা অমৃতে)।

ভারতীয় অতিথিরা লেনিনগ্রাদে ছিলেন চারদিন। বলাবাহুল্য তাঁরা সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছিলেন তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন তারজন্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সফর সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও নথিপত্র অনুশীলন—সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

লেনিনগ্রাদ পরিত্যাগের কালে এই ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের পক্ষে দলনেতা শ্রীমুখোপাধ্যায় লেনিনগ্রাদ-বাসীদের উদ্দেশে সুগভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করেন ও তাঁদের আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানান। লেনিনগ্রাদ সফর করে সব থেকে কোন বিষয়টি তাঁদের মনে রেখাপাত করেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃপালনী বলেন, "যুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সইতে হয়েছে, এই ঐতিহাসিক শহরের অনেক কিছুই সে সময় ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ মাত্র এই ক'বছরের মধ্যেই সেই ধ্বংসচিহ্নগুলিকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়ে এক অপূর্ব সুন্দর নতুন লেনিনগ্রাদ গড়ে তোলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, সোবিয়েত জনসাধারণের উদ্যম কি অনন্যসাধারণ! এই ব্যাপারটাই আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করেছে।"

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

রাত্রে ঘরের দোর দিয়ে শোবার অভ্যাস ছিল না কান্তির। কৌটোর মতো বন্ধ বাড়ি, সদর দরজা বন্ধ হ'লে আর একটা মাছিরও ঢোকবার উপায় নেই কোনদিক দিয়ে—এমনি সব বন্দোবস্ত করা। তাছাড়া কীই বা আছে তার ঘরে যে চোর ঢুকবে? বইখাতা কতকগুলো—দু'-একটা জামা কাপড়, এই তো। বেশী জামাকাপড় নিচেই থাকে আজকাল রতনদির দেরাজে। যেদিন মনে পড়ত সেদিন দরজাটা ভেজিয়ে দিত শুধু আর যেদিন পড়তে পড়তে খুব ঘুম পেয়ে যেত সেদিন কোনমতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত, দরজার কথা মনে থাকত না। রাত্রে মোক্ষদা বা ঠাকুর শুতে আসবার সময় কপাটটা হয়ত টেনে ভেজিয়ে দিত।

সেদিনও খোলাই ছিল দরজা। ভেজানো কপাট প্রায় নিঃশব্দেই খুলেছে—তবু খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেছে কান্তির। কারণ বহু রাত অবধি ঘুমোতে পারেনি সে—এলোমেলো চিন্তায় আর পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, ঘুম আসেনি তাই—একেবারে শেষের দিকে, হয়ত এই ঘণ্টা-খানেক আগে একটু তন্দ্রা এসেছে। তাও খুবই পাতলা ঘুম—সামান্য শব্দেই জেগে উঠেছে আবার।

কে একজন তার ঘরে ঢুকছে!

তখনও ঘুমের ঘোর রয়েছে চোখে—এবং মনেও। অনিদ্রার গ্লানি আর অতৃপ্ত নিদ্রার জড়তা তখনও জড়িয়ে আছে তাকে। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, কিন্তু আওয়াজটা ভাল ক'রে বেরোল না গলা দিয়ে। আরও যে চেঁচিয়ে উঠতে পারল না, তার কারণ উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কে' বলে প্রশ্ন করার সময়েই তার মনে হ'ল—এ রতনদি। রতনদি ছাড়া কেউ নয়।

কিন্তু এ সময় এমনভাবে রতনদির আসাটা এতই বিস্ময়কর, এতই অবিশ্বাস্য যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চাইল না।

'রতনদি?' বলে প্রশ্ন করতে গেল সে, কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার—ভাল ক'রে স্পষ্ট উচ্চারণও করতে পারল না। অস্ফুট একটা স্বরই বেরোল শুধু কোনরকমে।

মূর্তিটা আরও কাছে এল। আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ সবে উঠেছে—পূর্বমুখী দরজা দিয়ে ভেতরে এসেও পড়েছে তার এক ফালি আলো। তাতেই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মুখচোখ খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই—তার অত দরকারও নেই কান্তির। এ সবই পরিচিত ওর। ঐ বেশভূষা, ঐ চলবার ভঙ্গি, দেহের ঐ গঠন! সেই চওড়া কালাপাড় দেশী শাড়িটা—হাতে সেই ফারফোরের বালা ঝিকঝিক করছে। কানে হীরের টব দুটো এই সামান্য আলোর আভাসেই ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'রতনদি!' এবারে অস্ফুট কণ্ঠে হলেও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারল। এতক্ষণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কান্তি। জামাইবাবুর কোন অসুখ-বিসুখ করল না তো—কিম্বা ও'রই?

রতন ঘরে ঢুকেছিল আস্তে আস্তে—বোধহয় অন্ধকারে আগে কিছু ঠাওর পাচ্ছিল না—তাই। এখন চোখটা সয়ে আসতে একরকম ছুটে এসেই বিছানায় বসে কান্তিকে জড়িয়ে ধরল একেবারে। যা কখনও করেনি আজ পর্যন্ত—পাগলের মতো একেবারে ওর গালে নিজের গালটা চেপে ধরে চুপিচুপি বলল, 'তুমি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কান্তি? চলে যেতে পারবে? একটু মায়া হবে না তোমার? মন-কেমন করবে না? তবে যে তুমি বললে তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি! কেন বললে তাহ'লে?'

কান্তির প্রথম মনে হ'ল মাথাটা-খারাপ হয়ে গেছে একেবারে রতনদির। কিম্বা মদের ঝোঁকেই উঠে এসেছেন।

কিন্তু কৈ না, তেমন উগ্র গন্ধ তো ছাড়ছে না রতনের নিঃশ্বাসে। খুবই কম—একটু আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত সেই সন্ধ্যায় যেটুকু খেয়েছিল—তারপর রাত্রে আর খায়নি। কোনমতে এড়িয়ে গেছে ওর বরের জবরদস্তি। কিন্তু তবে? তবে এসব কী বলছে?

সেও তেমনি চুপিচুপিই উত্তর দিল—পাশেই মোক্ষদারা আছে হয়ত, ভয়ে ওর বুক কাঁপছে ঢিপ্ ঢিপ্ করে, যা মুখ, কী সব যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করবে হয়ত এই নিয়ে যদি টের পায়—'কিন্তু আমি তো—মানে তুমিই তো বললে আর মুখ দেখব না। তুমিই তো শুনছি বোর্ডিংএ পাঠাবার ব্যবস্থা করছ! আমার কী দোষ, বারে! আমি তো কিছু বলিনি। আমি—আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে তো চাইনি!'

'ছাড়বে না? আমাকে ছাড়বে না তো? যাই কেন হোক না, কোনদিন কিছুতে ছেড়ে যাবে না? বল বল—উত্তর দাও। এই আমাকে ছুঁয়ে বল।'

'না না—রতনদি, তুমি 'যাও' না বললে যাব না।'

'না, সে আমি বলতে পারব না প্রাণে ধরে। বলাই উচিত, তবু পারব না। অনেক ভেবে দেখলুম। তোমাকে কোথাও পাঠাতে পারব না।...... আমার কথা যখন কেউ ভাবে না—আমিই বা কেন অপরের কথা ভাবব? আমি বড় দুঃখী কান্তি, আমাকে তুমি দয়া কর। আমি বড় দুর্বল আর লোভী। যদি অন্যায় ক'রে ফেলি—তবু আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।'

'ছিছি। ওসব কথা কেন বলছ রতনদি। তুমি আমার কাছে এমন কোন অন্যায় করতেই পার না। তোমার কাছে যা পেয়েছি তা কি আমি জীবনে ভুলব? জীবন দিয়েও তোমার ঋণ শোধ হয় না?'

'ঠিক বলছ? অন্তরের কথা তোমার? জীবন দিতে পারবে আমার জন্যে? আমি যে তাই চাইতেই এসেছি। পালিয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। ওরা ঘুমোচ্ছে, সবাই ঘুমোচ্ছে কিন্তু আমি ঘুমোতে পারিনি। সারারাত ভেবেছি। ভেবে দেখেছি ভাল করে—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তাতে যা হয় হবে। জীবনে কিছুই পাইনি—এটুকু আমি আদায় করব। কিন্তু জীবন দেবে তো আমার জন্যে? দিতে পারবে? কথার কথা নয় তো—মন বুঝে বলছ তো?'

'ঠিকই বলেছি রতনদি। তুমি যা করতে বলবে আমি তাই করব।'

'আঃ বাঁচলুম, বাঁচলুম। তুমি আমাকে বাঁচালে।'

এই বলে অকস্মাৎ আরও জোরে আরও নিবিড়ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল রতন—তারপর পাগলের মতো ওকে চুমো খেতে লাগল বার বার। এত জোরে জড়িয়ে চেপে ধরেছিল যে কান্তির মনে হ'ল পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। চোখেও কিছু দেখতে পারছে না। অনুভব করছে শুধু আগুনের মত ঐ চুম্বনগুলো।

কী যেন ভয়ংকর মোহ গ্রাস করছে ওকে। যেন কোন মায়াবিনীর মায়া তার সব শক্তি হরণ করছে।

কী যে—তা ও সেদিন বোঝেনি। আজও বোঝে না।

ভাববারও অবসর ছিল না কিছু। কারণ একটু একটু ক'রে ওর সমস্ত চৈতন্য অসাড় হয়ে এল সেই মায়ায়।

তার পর আর কিছু মনে নেই ওর। আর কিছু মনে পড়ে না।

তারপর আর কিছু মনেও পড়েনি। সেই দিনগুলোয় আর কিছু মনে ছিল না। সব একাকার অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে। তার লেখাপড়া, বর্তমান-ভবিষ্যৎ—তার মা দাদা বৌদি, যারা তার মুখ চেয়ে আছে অনেকখানি আশা নিয়ে—কিছু না। এক সীমাহীন নির্লজ্জতায়, এক সর্বনাশা উন্মত্ততায় সব কিছু ঘুলিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। যেন একটা প্রচন্ড ঘূর্ণিতে আত্মসমর্পণ করেছিল; সেটা যে ঘূর্ণি—ও যে শূন্যেই ঘুরছে ওর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চারিদিকে ধূলির আবরণ সৃষ্টি করে, এ ঘূর্ণি যেমন অকস্মাৎ একদিন শূন্যে তুলেছে তেমনি অকস্মাৎই একদিন কোথাও আছাড় মেরে ফেলবে—তাও বুঝতে পারেনি। এক আধ দিন নয়—অনেক কদিনই—কোথা দিয়ে কেটে গেল তাও টের পায়নি। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না, কোন লজ্জার আবরণ ছিল না। সাংঘাতিক এক নেশায় সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিল।

ইস্কুলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল বলতে গেলে—কারণ ইস্কুলে গেলে পড়তে হয়, পড়া দিতে হয়—টাস্ক করে নিয়ে যেতে হয়। রতন শুধু মাসে মাসে মাইনে পাঠিয়ে দিত, আর খবর পাঠাত যে শরীর খারাপ, শরীর ভাল হ'লেই যাবে আবার। সে প্রতিদিনই আশা করত যে এবার সে সংযত হবে, কান্তিকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে—কোন বোর্ডিংএ কোথাও—যাতে নতুন ক'রে পড়াশুনো আরম্ভ করতে পারে। তার ভরসা ছিল কান্তি ভাল ছেলে—একটা বছর নষ্ট হ'লেও আবার ঠিক ধরে নেবে।

এরই মধ্যে টেস্ট পরীক্ষার দিন কবে পেরিয়ে গেল—কান্তির মনেও পড়ল না। কিছুই মনে ছিল না তার, হুঁশ ছিল না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাটত এক উন্মত্ত নেশার মধ্য দিয়ে—রাত নটা থেকে পরদিন প্রভাত পর্যন্ত কাটত সারা দিনের স্মৃতি-রোমন্থনে ও আসন্ন দিনের সুখ-কল্পনায়। এর মধ্যে তুচ্ছ জীবন বা ভবিষ্যতের কথা ভাববার মতো ফাঁক কৈ?

অবশেষে আবারও একদিন এল বিপদের সংকেত। নিয়ে এল সেই মোক্ষদাই।

নটার সময় বাবু এসে গেলে একদিন ওপরে উঠে এল সে। কান্তি তখন বিছানায় চুপ করে শুয়ে ভাবছে রতনের কথাই। রতন যেন চির-বিস্ময় তার কাছে, চির-বাঞ্ছিত। তার চিন্তায় ওর ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। কিন্তু মোক্ষদার রূঢ় পদক্ষেপে সেই চিন্তায় ছেদ পড়ল—স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

'ও মোক্ষদাদি? তাই ভাল। আমি বলি কি—'

'কী বল? ভাবছিলে তোমার রতনদি? হ্যাঁ—ঐটে কতটু বাকী আছে! পয়সা দেনেয়ালা বাবুকে ছেড়ে অসের নাগরের কাছে অস করতে আসা! বলি ঠাকুর—সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম তা আমার কথা তো শুনলে না। উলটে বেশী ক'রে মুখ জুবড়ে পড়লে দ'কের মধ্যে। তা আমার কি! আমিও চুপ করেই ছিলুম। নিহাৎ শেষ পর্যন্ত একটা খুনাখুনি বেম্মঅক্তপাত হবে বলেই আবার হুঁশ করাতে আসা। শোন না শোন—তোমার ইচ্ছে!'

—'কী বলছ মোক্ষদাদি—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!' কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কান্তি। লজ্জা, সামনাসামনি প্রকাশ্যভাবে এই সব কথা আলোচনার লজ্জা আর তার সঙ্গে সত্যিকারের একটা ভয় যেন তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিয়েছে। হঠাৎ ওর মনে হ'ল মোক্ষদার কথাগুলির মধ্যে সত্যিই একটা আসন্ন বিপদের আভাস আছে।

'বেশ বুঝেছ।' চোখ-মুখ ঘুরিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে মোক্ষদা, 'বলি বুঝতে তো তোমার বাকী নি কিছু! বুঝবে না কেন? সেই য্যাখন কচি খোকাটি ছিলে—ত্যাখন বুঝতে পারনু নি বললে সাজত। এখন আর সাজে না। এখন আর জানতে বুঝতে কোন্ জিনিসটা বাকী আছে তোমার? বলে সপ্ত কান্ড আমায়ণ, সীতে কার পিতা!...... শোন ঠাকুর, বাজে কথা বক-বার সময় নি আমার, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবুনি। এক আশ কাজ পড়ে আছে নিচেয়। ওসব ন্যাকাপানায় আর কাজও নি—যা বলছি ঠিক ঠাক মন দিয়ে শোন। বাবু মানে জামাইবাবু একটা কিছু সন্দ করেছে। ঠাকুরকে দারোয়ানকে ডেকে নানা রকম জেরা করেছে—আমাকে করেনি তার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে জানে দিদিবাবুর হাতের নোক বলে। তাও করতে পারে। এমনি কেউ বলে দেবে না—দিদিবাবু মুঠো মুঠো টাকা দে মুখ বন্ধ করে এখেছে সব—কিন্তু জেরার মুখে কোন কথায় কাকে কী

বেইরে যাবে তাকি কিছু ঠিক আছে! ত্যাখন কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে নি বাবু, ত্যামন বাবু নয় কো। আগলে, মদ পেটে পড়লে পিচেশ হয়ে ওঠে তা তো জানই। যদি কটে-পটে কোনদিন ধরে ফেলতে পারে তো তেক্ষুনি কেটে দু-টুক্‌রো করে ফেলবে!'

হয়ত ওর কথাগুলো বলবার এই উদ্ধত অপমান-কর ভঙ্গিতে, কিম্বা তাকে উপলক্ষ্য করেই ওরা নিয়মিত অর্থ দোহন করছে রতনদির কাছ থেকে—এই কথাটা শুনে, হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল কান্তির। সে-ও বেশ চড়াসুরেই উত্তর দিল, 'তা আমাকে এসব কথা শোনাতে এসেছ কেন? নিজের মুনিবকে গিয়ে বল না। তিনি ছাড়লেই আমি যাব। বিপদ তো শুধু আমার একার নয়, তারও —আর তেমন কিছু হ'লে, তোমাদেরও। এত সুখের চাকরি কোথায় পাবে?'

মোক্ষদা কিন্তু রাগ করলে না। কথাটা মেনে নিয়েই বললে, 'সে কথা একশবার। হক কথা এটা। এমন পরিপুষ্ট গাই সহজে মেলে না। দুয়ে উঠতে পারলেই হ'ল। বলি সেই জন্যেই তো এত মাথাব্যথা গো! কিন্তু ওকে তো বলবার যো নি। ও তো পাগল এখন, কোন কি হুস্যি-দীষ্যি জ্ঞান আছে? তুমি একটু বুঝ্ করে দ্যাখো। মার খেয়ে সে-ই যেকালে বেরোতে হবে, সেকালে এই বেলা মানে মানে সরে পড়া ভাল নয় কি? আর বলি তোমারও রেহকাল পরকাল দু-কালই তো গেল ঝরঝরে হয়ে, এর পরে খাবে কি করে তাও ভাব। আজকাল নেকাপড়া না হ'লে সায়েবের চাকরি হয় না। তোমার তো অইল ধর গে হয় উনুনে ফুঁ, নয়তো শাঁকে ফুঁ। তা যে লবাবী মেজাজ করে দিয়েছে তোমার ত্যাতে কি আর ঐ ওজ-গারে মন উঠবে? তার চেয়ে সময় থাকতে এই বেলা দু-চার হাজার বাগিয়ে নে সরে পড়ো। তোমারও স্বাথেরের কাজ হোক—ও ছুঁড়িও বাঁচুক। নেশা কেটে গেলে এমন কত টাকা দুয়ে বার করে নিতে পারবে বাবুর ঠেঙে। তুমিও চাই কি ঐ টাকায় একটা দোকান-দানী দিয়ে ক'রে খেতে পারবে। আর কেনই বা পড়ে আছ, তোমারও তো সাধ মিটে গেছে—এবার রব্যাহতি দাও না!'

আবারও সেই টাকার ইঙ্গিত।

এবার বেশ রূঢ়ভাবেই বললে কান্তি, 'আমি তোমাদের মতো অত ইতর নই মোক্ষদাদি যে এতদিন এত খেয়ে এত হাত পেতে নিয়ে আবার টাকা বাগিয়ে সরে পড়ব! যেতে হয়তো এমনিই চলে যাব। পুরুষমানুষ—আর কিছু না হয় মোট বয়ে খাব। তাতে কি?'

মুচকি একটু হেসে আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মেজাজেই জবাব দিল মোক্ষদা, 'তা বাপু মানছি আমরা রিতর ছোট-লোক। পয়সা খুব চিনি। পয়সার জন্যেই তো খানকিবাড়ি গতর খাটাতে এসেছি। পয়সা চিনব না! তুমি চেনো না চেনো—নিজের ভাল বোঝ না বোঝ সে তোমার রুভিরুচি। তবে তাও বলি টাকা তোমার পাওনা—বেহক্কের কিছু নয়। নিলে এমন কিছু ছোটনোকপানা হ'ত না। তোমার কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খসে অইল—তার দাম দেওয়া তো রুচিতই।'

এই বলে আর কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে মোক্ষদা চলে গেল।

কিছুই বলতে পারল না কান্তি। খুব দুকথা শুনিয়ে দিতে পারলে একটু শান্তি হ'ত ওর—কিন্তু বলা হ'ল না। অবসর মিলল না বলে নয়—ডেকে থামানো যেত, জোর ক'রে ধরে দুকথা বলা যেত—কী বলবে তাই ভেবে পেল না যে। শুধু একটা দুঃসহ রাগে সমস্ত দেহটা চিনচিন করতে লাগল—অব্যক্ত কী রকম কষ্ট হ'তে লাগল। রাগ আর অপমানবোধ। ওদের দুজনকে জড়িয়ে বার বার যে ইঙ্গিত দিয়ে গেল মোক্ষদা সেইটেই যথেষ্ট অপমানকর। অথচ কী-ই বা বলবার আছে। কথাটা এত নির্ঘাৎ সত্য যে অস্বীকার করবার, কি মোক্ষদাকে ধমক দেবার কোনও উপায় নেই কোথাও। আজ তারা এমনভাবেই নিজেদের নামিয়ে এনেছে যে, এইসব সামান্য দাসী-চাকরের বিদ্রূপ-ইঙ্গিত-অপমান নিরবে সয়ে যেতে হচ্ছে। জবাব দেবার মতো কিছু নেই ওদের তরফ থেকে।

কিন্তু তবু বার বার মনে হ'তে লাগল—এত স্পর্ধা ওদের, এত দুঃসাহস! যে মুখ নেড়ে এই অপমান ক'রে গেল সেই মুখখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ঠিক জবাব হ'ত এ আস্পর্ধার।

একবার মনে হ'ল কালই রতনদিকে বলে ওকে জবাব দেওয়ায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবের মূঢ়তা নিজের কাছেও ধরা পড়ল। কোন ফল হবে না। রতনদি সাহস করবেন না ওকে জবাব দিতে! এই জন্যেই করবেন না। বড় বেশী জানে ওরা। বিশেষত মোক্ষদা। যে মুহূর্তে জবাব দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে মোক্ষদা গিয়ে জামাইবাবুকে খবর দেবে—জানিয়ে দেবে সম্পূর্ণ ইতিহাস। ওরা এখন এদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। একদিক দিয়ে অপমানিতও হ'তে হবে আর একদিক দিয়ে টাকাও গুণতে হবে। মাথায় পা দিয়ে চললেও কিছু বলবার যো থাকবে না।

মনে পড়ল একদিন ইংরিজী কি খবরের কাগজে 'ব্ল্যাকমেল' কথাটা পেয়ে-ছিল। মানেটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ইংরিজীর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন, ওর মানে কোন গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেবার ভয় দেখিয়ে, অপদস্থ করবার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধে আদায় করা। এই ধরণের ব্যাপার। তারপরই বলেছিলেন, বড় খারাপ কাজ ওটা। বড় ঘৃণ্য। ওর মানে না বোঝাই ভাল। কোনদিন যেন বুঝতেও না হয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। একেই বুঝি ব্ল্যাকমেল বলে। এরা ব্ল্যাকমেল ক'রে রতনদির কাছ থেকে টাকা আদায় করছে।...

কী করবে, এ অবস্থায় কি করা উচিত ভেবে পেল না কান্তি। যেন কী একটা দৈহিক অস্বস্তিতে ছটফট ক'রে বেড়াল খানিকটা।

বলবে রতনদিকে মোক্ষদার কথাটা?

লাভ কি?

বড় ম্লান হয়ে যাবেন। কষ্ট পাবেন খুব। সেই মলিন মুখ এবং নত দৃষ্টি কল্পনা ক'রেই মায়া হ'তে লাগল কান্তির। অথচ শুনবেনও না কথাটা—তাও সে ভাল ক'রেই জানে। প্রাণধরে বিদায় দিতে পারবেন না।

কান্তিই কি পারবে এই নিরানন্দ পুরীতে ওকে ছেড়ে যেতে?

তারচেয়ে ওদের ঘনিষ্ঠতাটাই কমিয়ে দেওয়া ভাল। তাছাড়া এইবার চেপে পড়তে বসতেও হবে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সামনের বার পরীক্ষা না দিলেই নয়। ভাগ্যিস দাদারা অত হিসেব রাখেন না—নইলে কী কৈফিয়ৎ দিত তার ঠিক নেই। মুখ দেখাতে পারত না তাঁদের কাছে।

সাতপাঁচ ভেবে কিছুই বলা হ'ল না রতনদিকে। মোক্ষদারা এই ব্যাপার নিয়ে

টাকা আদায় করছে তাঁর কাছে এটা কান্তি টের পেয়েছে জানলে লজ্জায় মরে যাবেন রতনদি। এতটুকু হয়ে যাবেন অপমানে। নানা—ছিঃ, সে মুখ-ফুটে বলতে পারবে না এ কথাটা।

যেটা বলতে পারে সেটাই বলল একদিন—ঐ ঘটনার দিন চারপাঁচ পরে। বলল, 'এবার একটু চেপে পড়তে হয় রতনদি। একটা বছর গেল, আর গেলে চলবে না!'

'একটা বছর গেল মানে? নষ্ট হয়ে গেল?'

'গেল বৈকি। টেস্ট দেবার কথা ছিল দিলুম না। এইতো সামনেই এক-জামিন। টেস্টে পাস না করলে তো তাতে বসতে দেবে না!'

'তা কৈ—।' কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় রতন। 'তা কৈ বলনি তো'—এই কথাই বলতে যাচ্ছিল। দোষটা যে তার ঘাড়েই এসে পড়বে, সেইটে মনে পড়ে যাওয়ায় আর বলল না। আস্তে আস্তে মাথা নামাল। মুখটা লাল হয়ে উঠল—কানের ডগা পর্যন্ত।

তেমনি মাথা নামিয়েই একটু পরে বলল, 'তাহ'লে তুমি কাল থেকেই আবার ইস্কুলে যেতে শুরু কর। আর কামাই ক'রে কাজ নেই।'

এবার মাথা নামাবার পালা কান্তির। সে নত মুখে রতনের বালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ইস্কুলে আর আমার যেতে ইচ্ছা করে না। সকলে ঠাট্টা করবে, যা-তা বলবে। মাষ্টারমশাইরা বকবেন, নতুন সব ছেলেদের সামনে। এখন যারা ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে তারা আমার নিচে পড়ত, কত খাতির করত। তাদের সামনে অপমান হওয়া—'

'তবে কি করবে? নতুন কোন ইস্কুলে ভর্তি হবে? কিন্তু আমি তো সে সব সন্ধান জানি না। সরকার-মশাইকে বললে নানান্ কৈফিয়ৎ—জানাজানি!'

আবারও মাথা নামায় রতন।

কান্তির মাষ্টারমশাইও এসে রোজ ফিরে যেতে হয় বলে গত মাসখানেক আসছেন না। সেটাও মনে প'ড়ে গেল দুজনকারই।

'মাষ্টারমশাইকেই বরং খবরটা দিই। এবার থেকে নিয়মিত আসুন।'

'না-না। ও'কে না। তুমি বরং সরকারমশাইকে বল অন্য একজন মাষ্টারমশাই ঠিক করতে। এ'কে দিয়ে চলছে না, ভাল একজন মাষ্টারমশাই চাই—এ বলতে তো কোন দোষ নেই। তাতে কি কিছু—মানে মনে করবেন ওরা?'

'না না। তা মনে করবেন কেন? তাই বলি বরং সরকারমশাইকে। একটু যদি চেপে পড়ান, বেশী ক'রে সময় দিয়ে। মানে ঘন্টা-দুই আড়াই—না হয় বেশী মাইনেও নেবেন কিছু।'

'সে রকম হ'লে বোধ হয় কুড়ি-প'চিশ টাকা হে'কে বসবেন!' ভয়ে ভয়ে বলে কান্তি।

'তা হোক। টাকার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কান্তি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। এবার আস্তে আস্তে সে দূরে চলে যেতে পারবে।

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না। ঠিক পরের দিনই—সরকারমশাইকে ডেকে নতুন মাষ্টার খোঁজার কথা বলবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তখন তিনটে চারটে হবে, রতনদির খাটে পাতলা বাঘের ছবি আঁকা বিলিতি কম্বলটার মধ্যে ওরা দুজনে ঘুমোচ্ছিল। দরজা ছিল ভেজানো। হঠাৎ সজোরে দোরটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন রতনদির বর—বা বাবু—দত্তসাহেব। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন একেবারে।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত যে ঘুম ভেঙে গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় লাগল ওদের। তারপরই ধড়মড় ক'রে দুজনে দুদিক দিয়ে নেমে এল খাট থেকে। কিন্তু দত্তসাহেবের মুখ দেখেই বুঝল ওরা যে আজ আর রক্ষা নেই কারুর। ও'র দুদিকের রগে শিরাগুলো ফুলে উঠে দব্‌দব্ করছে তা এখান থেকেই দেখা যায়। দুই চোখ টকটকে লাল—হয়ত মদও খেয়েছেন একটু—কিন্তু এ লাল অন্যরকম—মাথায় রক্ত ওঠার দরুণ এত লাল হয়েছে নিশ্চয়।

ওদের তরফ থেকে কিছু বলবার—কৈফিয়ৎ দেবার কি ক্ষমা চাইবার কোন অবসর মিলল না। জিজ্ঞাসাও করলেন না দত্তসাহেব। কেউ কোথাও চুকলি খেয়েছে নিশ্চয়। পাকা খবর পেয়েই এসেছেন। কৈফিয়ৎ অনেক দেওয়া চলতে পারত অবশ্য—ভাইবোনে, বিশেষ ছোট ভায়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া কিছু অন্যায় নয়, অশোভনও নয়। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ শুনবে কে? ওদেরও দেবার মতো অবস্থা নয়। দাঁড়িয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না ওরা। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। আর সেইটেই তো ওদের তরফ থেকে অপরাধের স্পষ্ট স্বীকৃতি।

প্রস্তুত হয়েই এসেছেন দত্তসাহেব।

যে হাতখানা এতক্ষণ পিছনে ছিল সেইটে এবার সামনে এল।।

শঙ্কর মাছের চাবুক একটা। এ বস্তুটা চেনে কান্তি। এ ঘরেও একটা টাঙানো আছে।

হিস হিস ক'রে উঠলেন দত্ত-সাহেব, 'রাস্তার কুকুর—তুমি মুখ দিতে এসেছ ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে! এত আস্পর্দ্দা তোমার! এত সাহস! এত সাহস কোথা থেকে এল তাই ভাবছি। ভিখিরী বামুনের ছেলে—পেট পুরে ভাত জুটছিল না—আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছিলুম—তার এই শোধ! চমৎকার। এই তো নিয়ম, আমারই খেয়ে আমারই পয়সায় বিষ সঞ্চয় ক'রে আমাকে ছাড়া আর কাকে কামড়াবে?

সাপের দন্তুরই যে এই। তবে সাপের ওষুধও আমার জানা আছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। হারামজাদ, কুত্তাকি বাচ্চা কাঁহাকা।

সব কথা শুনতেও পেল না কান্তি। কারণ তার আগেই সপাসপ চাবুক পড়তে লাগল—পিঠে হাতে বুকে মুখে—সর্বত্র। কেটে কেটে বসতে লাগল শঙ্কর মাছের চাবুক। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। রতন ব্যাকুলভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, চাপা রোষে ধমক দিয়ে উঠলেন দত্তসাহেব—

চুপ! তুমি কি ভাবছ তুমি বাদ যাবে? ও কসবীর জাতকে শাসন করতে হয় কী করে তা আমি জানি। ওর হয়ে সুপারিশ করতে আসছ!... নিজের ভাবনা ভাব গে, তবে এ আগে। কসবী কসবীর ধর্ম পালন করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্যায়ের কোন মাপ নেই। বেইমানী হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ—

চাবুক কিন্তু বন্ধ নেই এক মিনিটের জন্যেও। কান্তি এতক্ষণ ছট-ফট করছিল, এই বৃষ্টির মতো আঘাতের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষার এতটুকু ফাঁক খুঁজছিল আকুল হয়ে—দুই হাত বাড়িয়ে, অন্ধের মতো। এবার অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল সে।

এক মুহূর্তও থামলেন না দত্ত-সাহেব, একবার ফিরে তাকালেন না তার দিকে, একবার হাতটা পর্যন্ত বদল করলেন না। বাঘের মতো গিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন রতনের ওপর। এবারের আঘাতটা যেন আরও নিষ্ঠুর, আরও সাংঘাতিক, আরও অব্যর্থ। কাপড়জামা ভেদ করে সে চাবুক মাংসতে চেপে বসে সেগুলোকে রক্তে ভিজিয়ে তুলল।

এরা কেউই কাঁদেনি, চেঁচামেচি করেনি। কিন্তু নিচে থেকে সবাই ছুটে এসে জড়ো হয়েছে বাইরে। অমন ভাবে অসময়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বাবুকে ছুটে ওপরে আসতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝেছে তারা। তাছাড়া চাবুকের শব্দ বন্ধ দোরের মধ্য দিয়েও বাইরে আসছিল।

একটা বছর গেল, আর গেলে চলবে না।

মোক্ষদা হাউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা কী হবে গো। একটা খুনো-খুনি করবে নাকি শেষমেষ। ওমা—কোথায় যাব গো। থানা-পুলিশ করতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। ওগো ও জামাইবাবু খোল খোল দরজা খোল। দরজা বন্ধ ক'রে আবার কী শাসন। শেষে কি সবাইকার হাতে দড়ি দেওয়াবে নাকি। অ ঠাকুর, যাও যাও কত্তাবাবুকে ডেকে নে এস। আর, দারোয়ান তুমিই বা কী রকম নোক গা। এত ডালরুটি খাও বস্তা বস্তা ......একটু গায়ে জোর নেই, দরজাটা ভাঙতে পারছ না! মনিব খুন হচ্ছে ওধারে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেছ সঙের মতো। ভাঙ ভাঙ কপাট ভেঙে ভেতরে সেঁধোও—

দারোয়ান সাহস পেয়ে দুম-দুম লাথি মারতে লাগল দরজায়। একটু পরে কর্তাবাবু অর্থাৎ রতনের বাবাও ছুটে এলেন। ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'এ সব কী হচ্ছে কী? দত্ত, এই দত্ত—দরজা খোল শিগগির!'

ততক্ষণে রতনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। রক্তাক্ত চাবুকটা শেষবার ওর অনড় দেহটাতেই আছড়ে ফেলে দোর খুলে বেরিয়ে এলেন দত্তসাহেব। ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে একটু চড়া গলাতেই কি বলতে যাচ্ছিলেন কর্তাবাবু, এক ধমকে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'তুমি চুপ ক'রে থাকো! বুড়ো শুয়োর কোথাকার! মেয়ে বেচে খাচ্ছ বসে বসে—মেয়েকে পাহারা দিতে পার না? পথের কুকুর এসে ঘরে ঢুকছে দেখতে পাও না? ছোটলোকের জাত!'

তারপর সকলকার সামনে দিয়েই গট গট ক'রে বেরিয়ে চলে গেলেন তিনি।

কর্তাবাবু পর্যন্ত একটি কথাও বলতে পারলেন না!

এরপর কদিন আর কান্তির কোন জ্ঞান ছিল না। কদিন তাও জানে না সে। গায়ের ব্যথায় আর প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। গায়ে নাকি ঘাও হয়ে গিয়েছিল চার-পাঁচ জায়গায়।

যেদিন জ্ঞান হ'ল সেদিন দেখলে পাশে একটা টুলে ডাক্তারী ওষুধ সব রয়েছে। কাটা ঘাগুলোতেও মলম লাগানো। অর্থাৎ ডাক্তার ডাকা হয়েছে, শুশ্রূষাও হয়েছে কিছু কিছু। আরও ভাল ক'রে চেয়ে দেখল যে, সে তার

ওপরের ঘরে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে।

জ্ঞান হবার পর প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হ'ল ওর—তা হচ্ছে অপরিসীম লজ্জার। ছি ছি, এ বাড়িতে আর মুখ দেখাবে কি ক'রে—এই সব ঝি-চাকরদের সামনে! এখনই পালিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু কোথায়ই বা পালাবে। বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে! সেখানে গিয়েই বা কোন মুখে দাঁড়াবে!

একটু পরেই হাসিহাসি মুখে মোক্ষদা এসে দাঁড়াল।

'এই যে হুঁশ ফিরে এসেছে? যাক বাবা, বাঁচা গেল। যা ভাবনা হয়েছিল! এধারে ইনি প'ড়ে রজ্জান-রচৈতন্যি—ওধারে উনি পড়ে। আমরা যাই কোথায় বল দিকি! তবু ভাগ্যে জামাইবাবুই ডাক্তার পাঠিয়ে দেছ'ল তাই অক্ষে!'

তারপর একটু থেমে আঁচলের নাড়া দিয়ে কান্তির মুখের ওপর থেকে মাছি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এবার চটপট সেরে উঠে সময় থাকতে থাকতে সরে পড় দিকি। ব্যবস্থা একটা হয়েছে যেকালে সেকালে আর দেরি ক'রে নাভ নি। মানুষের মন না মতি। এখন মত হয়েছে আবার সে মত ঘুরে যেতে ক্যাতক্ষণ? এই বেলা কাজ গুছিয়ে নাও!'

কান্তির এ সব বোঝার কথা নয়। তার তখনও একটু জ্বর রয়েছে, দুর্বল মাথায় এ সব কথা ঢুকলও না। সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই রইল মোক্ষদার মুখের দিকে।

মোক্ষদাই বুঝিয়ে দিলে এবার, 'তা বাপু মারুক ধরুক যা-ই করুক—এধারে মানুষটার বিবেচনা আছে, তা কিন্তুক মানতেই হবে। আমরা তো ভাবনু তাড়িয়েই দেবে সোজাসুজি, দেশে গিয়ে যেখানকার ছেলে সেখানে উঠতে হবে। মুখ দেখাবে কী ক'রে সেই ভাবছিলুম। তা সেদিক দিয়ে বাবু যায়নি, হুকুম দিয়েছে কোথায় কোন ওর জমিদারীতে কি ইস্কুল আছে সেখানে যদি গিয়ে থাকতে চাও তো ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে—কাছারীবাড়িতে থাকবে, রামলাদের সঙ্গে খাবে—ইস্কুলে পড়বে। খরচা সব তেনার। তবে নবাবি চলবেনি। গরীব গেরস্তর চালে থাকতে হবে। পোষায় ভাল, তিনি নোক দেবে, সঙ্গে গিয়ে ভর্তি ক'রে দে আসবে, আর না পোষায় তো পত্তরপাঠ তোমাকে পথ দেখতে হবে।...তা আমি বাপু তোমার হয়ে বলেই দিয়েছি ও সেখানে যেতেই আজী।......জানি তো দেশে-ঘাটে যাবার মুখ নি তোমার—কোথায় যাবেই বা!'

এই প্রথম মোক্ষদা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করল কান্তি। আঃ বাঁচা গেল! বাঁচা গেল! বেঁচে গেল সে। বাঁচল এই লজ্জা থেকে শুধু নয়—সর্বনাশ থেকেও। আর কোন পথ কোথাও ছিল না। বাড়ি গেলে পড়াশুনো আর হ'ত না এটা নিশ্চিত। এ তবু নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করার একটা সুযোগ মিলল। এখন যদি চেপে খাটে তাহ'লে আবারও হয়ত ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

হায় রে! তখন যদি জানত দত্ত-সাহেবের এই আপাত-দয়ার পিছনে কি সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা আছে! সামান্য দৈহিক শাস্তিতে কিছুই মন ওঠেনি তার, দুঃসহ ক্রোধের কিছুমাত্র শান্তি হয় নি। বড় রকমের শাস্তির জন্য তাঁর এই সদয় প্রস্তাব। পৈশাচিক শাস্তি—যা দীর্ঘকাল মনে থাকে, সারা জীবনে যা বাঘের দাঁতের মতো স্থায়ী দাগ রেখে যায়—তারই জন্যে এই বদান্যতার ব্যবস্থা, এই আয়োজন।

মোক্ষদা বলল, 'তাই বলছিনু তোমায়—মেজাজ ভাল থাকতে থাকতে সেখানে গে চেপে ব'সো গে যাও। তার-পর আর কী মনে থাকবে ওর! বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না! একবার হুকুম হয়ে গেলে রামলা-গোমস্তরা ঠিক খরচা জুগিয়ে যাবে পরের পর। মোদ্দা আর দেরি ক'রোনি! কখন আবার মেজাজ পালটে যাবে, অক্ক চড়ে যাবে মাথায় আবার দুম ক'রে কী বলে বসবে।...দেখলে তো—যা বলেছিনু সেদিন, তাই ফলে গেল রক্ষরে রক্ষরে। খুন হওনি সে তোমার গুরুর ভাগ্যি, আর আমাদের বাপ-মা'র পুণ্যি—বামুনের অক্ক দেখতে হ'লনি। গরীবের কথা বাসি হ'লেই খাটে। এবার আর দেরি করো নি। আমি যে মানুষ চিনি—এই সব বাবু ভাইদের চিনতে কি আর বাকী আছে। ঘরের মাগকে পাহারা দেয় কে তার ঠিক নি—বাইরের আঁড়কে পাহারা দেবার জন্যে চোখে ঘুম নি! হাস্তোর বড়মানুষ রে!'

বোধ করি একটু দম নেবার জন্যই থামল একবার মোক্ষদা। সেই ফাঁকে কান্তি আস্তে আস্তে বলল, 'আমি আজই যেতে চাই মোক্ষদাদি, যত শিগ্গির পার একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও—সরকার-মশাইকে বলে। আমি আর একদিনও থাকতে চাই না।'

'ওমা, তাই বলে কি আজই এক্ষুনি যাওয়া হয়। এখনও গায়ে তাত অয়েছে বেস্তর' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালটা দেখে নিল মোক্ষদা, 'ওঠো, একটু ভাল হও। পথ্যি কর দুটো—তারপর তো যাওয়ার বন্দোবস্ত। ভয় নি—একদিনে কিছু মহাভারত রশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সরকারমশাইকে তো আমি তোমার জবানীতে বলেই দিয়েছি, তিনিও নাকি চিঠিপত্তর নিকে দিয়েছে!'

এর তিন-চার দিন পরেই প্রথম যেদিন ভাত পেল সে—সেই দিনই রওনা হয়ে গিয়েছিল কান্তি, কিছুতেই আর থাকতে রাজী হয়নি।

যাবার আগে রতনের সঙ্গে দেখাও হয়নি আর। সে কথা কেউ বলেওনি। রতনও চেষ্টা করেনি দেখা করার। কান্তিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। হয়ত দত্তসাহেব শুনতে পেলে আবার রাগ করবেন, হয়ত রতনদিকেই তার জন্য কথা শুনতে হবে। কিম্বা আবার মার খেতে হবে—। নিজের আঘাত দিয়েই রতনদির কী পরিমাণ লেগেছিল তা বুঝতে পারে কান্তি। অমন ননীর মতো নরম দেহে ঐ চাবুক যখন কেটে কেটে বসেছে তখন না জানি কী যন্ত্রণাই পেয়েছে রতনদি। আজও সে কথা মনে হ'লে দু' চোখে জল ভরে আসে তার। সত্যিই বড় দুঃখী রতনদি, বড় অসহায়। সে তো তবু পালিয়ে যেতে পারছে, ওকে পড়ে মার খেতে হবে। থাক, আর দেখা করার চেষ্টা কর'বে না সে। তাছাড়া, রতনদিও লজ্জা পাবে মিছিমিছি। এমনিই বোধ হয় লজ্জাতে মরে যাচ্ছে সে। আর লজ্জা বাড়িয়ে দরকার নেই।

সেও ভাল হয়ে উঠেছে, ভাত খেয়েছে এটুকু মোক্ষদাই একদিন উপযাচক হয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল তাকে। সেই জেনেই নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে-ছিল কান্তি।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

সন্তোষকুমারী রোহার্তাগির একক প্রদর্শনী

সন্তোষকুমারী রোহার্তাগি কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাস করে কিছুকাল দিলীপ দাশগুপ্তের স্টুডিওতে কাজ করেন। পরে স্কলারশিপ নিয়ে ফ্রান্সে চলে যান। বিভিন্ন জায়গায় তিনি ইতি-পূর্বে প্রদর্শনী করেছেন। এটি তাঁর পঞ্চম একক প্রদর্শনী। আর্টিস্ট্রি হাউসে বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর হাল-আমলের ইউরোপ-ভ্রমণের সময় আঁকা পঁয়তাল্লিশখানি ছবি এবং স্কেচ প্রদর্শন করছেন। সবগুলিই তেল রংয়ে আঁকা।

গণ্ডোলাজ

শিল্পী: রোহার্তাগি

শ্রীমতী রোহার্তাগির ছবিগুলির মধ্যে একটা উজ্জ্বল, কোমল এবং সতেজ ভাব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ভ্রমণকালে যা কিছু তাঁর চোখে লেগেছে তাই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাতে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাড়ী ঘর, নিসর্গ দৃশ্য, পথ ঘাট, বুল ফাইট, বাজার, প্রমোদশালা, পার্ক কিছুই উপেক্ষা করেন নি। ইম্প্রেশনিষ্ট ধারার অনুসরণে আলোছায়া, এবং আবহাওয়া ফোটানোর প্রচেষ্টাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশী তবে সুরুচিসম্মত রংয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমতল প্যাটার্ণ সৃষ্টির দিকেও তিনি সমান নজর রেখেছেন। 'আর্লি কাস্টমার' (১১), মর্নিং লাইট (৩৩), ক্যানাল, ভেনিস (৩৪), 'গণ্ডোলাজ' (৩৫), ব্ল্যাক স্টকিংস (৩২) প্রভৃতি ছবি-গুলির মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে 'মাদমোয়াজেল ফে'র স্কেচটিতে (২২) খুব আলোর মধ্যে একটি চরিত্রের আভাস আনা হয়েছে। প্রদর্শনীর ছবিগুলির কোনটিই বিশেষ বড় মাপের নয়। কিন্তু এর মধ্যেও নিসর্গ চিত্রগুলিতে বেশ বিস্তৃত ক্ষেত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে। একই কারণে আজকের গৃহসমস্যার দিনে ছোট ঘরেও ছবিগুলি টাঙ্গানোর সুবিধা রয়েছে। প্রদর্শনীর সাজসজ্জা সন্তোষজনক।

ওয়ার্কারস্

শিল্পী: রোহার্তাগি

অথ লন্ডন-কথা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কোন দেশেই বা তাঁরা অপরিচিতা? —রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে তাঁরা পরিহাসের পাত্রী। বয়োকনিষ্ঠরা তাঁদের জন্যে সমবেদনা বোধ করে। বয়োজ্যেষ্ঠরা করেন বিদ্রূপ। নীতিবাগীশেরা সন্দেহ। সরকার মনে করে প্রতিকারসাধ্য সামাজিক সমস্যা। আদমসুমারীতে তাঁদের বলা হয় একক-নারী। সমাজতত্ত্ববিদদের সভায় 'যৌন-উদ্বৃত্তা।'

—এরা সেই অপরাধিনীরা—যৌবনে যাঁরা মোহজাল, কিম্বা যৌতুক-কৌতুক-হাস্য-লাস্য, যে কোন উপায়েই হোক না কেন, কোন পুরুষকে আকৃষ্ট করে শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধনে বাঁধতে পারেননি।

প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ইংল্যন্ড ও ও য়ে ল শে নারী-পুরুষের সংখ্যার সামঞ্জস্য নেই, প্রথমোক্তরা সংখ্যায় প্রায় ৫০ লক্ষ বেশি। অবশ্য এই সংখ্যা-গরিষ্ঠাদের মধ্যে বৃহত্তম অংশ হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্কা ও বৃদ্ধা। কিন্তু ২০ থেকে ৪৫ বছরের উদ্বৃত্ত নারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ। সেই পনোরো লক্ষের মধ্যে একটি অংশ আবার বিধবা কিম্বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না। বাকি প্রায় ১৩৪৫০০০ জন বিবাহ-সম্ভাবনারহিত বা চিরআইবুড়ো। ফ্রান্সে অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৮ (পুরুষ ৯·৫)। নরওয়েতে জনসংখ্যার (অর্থাৎ নারী ও পুরুষ) ১৮ শতাংশ এবং সুইডেনে ১৭ শতাংশ অবিবাহিত। মার্কিন দেশে অবিবাহিতা মেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে কম মাত্র ৩·৮ শতাংশ কিন্ত অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৮ শতাংশ।

এঁদের দাম্পত্য-সঙ্গী হবার মত শুধু যে যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষ নেই তাই নয়—পুরুষদের একটি লক্ষণীয় অংশ * বিচিত্র সামাজিক ব্যাধি সমলিপ্সায় বিকৃত-রুচি। নারীদের মধ্যেও সমলিপ্সু নেই তা নয়, কিন্ত তা সংখ্যায় নগণ্য। পায় সব যৌন-উদ্বৃত্তা, অনূঢ়াদের জীবন নিঃসঙ্গ, উপেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিষণ্ন।

একজন অবিবাহিত পুরুষ যে কোন বয়সে যতজন খুশি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে। তাতে দোষ সামান্য বাহবা প্রচুর। মেয়ের বয়সী কোন তরুণীকে নিয়ে সে নির্বিকারে কোন মজলিশ হাজির কিম্বা সপ্তাহ শেষে অবকাশ যাপন করতে যেতে পারে। লোকে তার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বলবে, 'স্ফূর্তিবাজ অকৃতদার।' দোষ যদি দিতে হয় দেবে সেই সঙ্গিনী মেয়েটিকে।

বস্তুতপক্ষে, অবিবাহিত পুরুষের যা-হোক-একটা যৌন জীবন থাকবেই—এটা যেন প্রকাশ্যে কিম্বা অপ্রকাশ্যে ধরেই নেওয়া যায়। বরং সে যদি সম্পূর্ণ-ভাবে নারী-সংসর্গ এড়িয়ে চলে তা হলেই লোকে তাকে পূর্বোক্ত ধরণের কোন যৌন-স্খলন, মনোবিকার কিম্বা মাথায় ছিটের সন্দেহ করবে।

আর মেয়েদের বেলা?—এই তো সে দিন পর্যন্ত বলে আসা হয়েছে যে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কোন যৌন প্রবৃত্তি নেই। যদিবা থাকে, তাহলে তাকে দমন করা উচিত। আর সেই দমনের নামে আমাদের দেশে ও সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের অজ্ঞাত-অন্ধ ও অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার জবর-দস্তি চালু রাখা হয়েছিল ও হয়েছে। আমাদের বালবিধবাদের দেহ-মনের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন করা হয়েছে। আর পাশ্চাত্য বর্বরতার চরম প্রকাশ পেয়েছে 'চেসটিটি বেল্টে'।

আজ অবশ্য, মনোবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের বিপুল বিপ্লবের পর মেয়েদের যৌন নিষ্ক্রিয়তাবাদ অন্তত যুক্তির দিক থেকে কেউ স্বীকার করবেন না। বরং অনেকেই বলবেন তাদের কামনা-বাসনা পুরুষের চেয়েও গভীর, গহন ও ব্যাপক। কারণ তার দেহ-মন সব কিছুই আরেকটি মহান ও আদিম সৃষ্টি পরি-কল্পনার অধীন। মানব অস্তিত্বের আদি-উৎস সেই পরিকল্পনা হচ্ছে মাতৃত্ব।

তবু আজ যদি কোন ক্ষয়িষ্ণু-যৌবনা অপরিণীতা মনের বাসনা ব্যক্ত করে তা হলে?—চারদিক থেকে নির্মম তিরস্কার বর্ষিত হবে, সম্ভব হলে তাকে নির্যাতিত করা হবে।

মনোবাসনা গোপন রাখলেও তার একলা চলা সহজ নয়। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিলাম। বৃটেনেও একজন অবিবাহিতা প্রাপ্তবয়স্কার ঘর ভাড়া পাওয়া সহজ নয়। তিনি যত শিক্ষিতা ও সম্মানিত পেশারই অধিকারিণী হোন না কেন, একজন অশিক্ষিতা বাড়ী-ওয়ালীর শালীনতাহীন সন্দেহ ও বক্র-বচন তাঁকে নিষ্প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে। ঘরে তিনি তাঁর কোন পুরুষ-বন্ধুকে আনলে হয়তো পরের দিন ঘর ছেড়ে দেবার পরোয়ানা আসবে। আর কোন সমবয়সী বান্ধবীর সঙ্গে হৃদ্যতা হলে মুচকি হাসির চোরা আঘাতে মন ও মেজাজ ক্ষত-বিক্ষত হবে। চতুর্দিকে ফিসফিসানী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে 'ওরা সমলিপ্সু। লেসবিয়ান'।

আর যদি কোন কারণে কোন বয়োকনিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে মেলামেশাটা একটু বাড়ে? তা হলে তার নতুন নামকরণ হবে, 'বালক শিকারী'। —এ শুধু বৃটেনেই নয়। যুদ্ধের পর রাশিয়াতে নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হারে যে দারুণ তারতম্য ঘটে তা পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি। মধ্য-তিরিশ নারী-পুরুষের মধ্যে সেই তারতম্য গিয়ে দাঁড়ায় ১ জনে ৭ জন। তৎসত্ত্বেও সে সময় কিম্বা এখন, কোন বয়স্কা নারী যদি সেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি কম বয়স্ক কোন পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে তাহলে সে নিন্দা ও বিদ্রূপের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

অতএব সমাজের এই সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ, উৎপীড়ন, বিদ্রূপ ও অনুকম্পায় এবং সর্বোপরি নিজ অন্তরের দমিত বাসনার প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ সে তিরীক্ষে মেজাজ ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে লাবণ্য শুকিয়ে যায়। বিপ্রলব্ধ

Richard Hanser নামক সমাজ-তত্ত্ববিদের The Homosexual Society অনুযায়ী শতকরা ৪ জন লোক পুরোদস্তুর সমলিপ্সু। অন্য 'সমলিপ্সু' নামে পরিচিতরা প্রকৃতপক্ষে উভয়লিপ্সু। Jess Stearn নামক অন্য এক লেখকের The Sixth Man অনুযায়ী এ দেশে প্রতি ছজন পুরুষের একজন সমলিপ্সু। তবে তারা পুরোদস্তুর না আধাআধি তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।

---

* ১৯৫৪ সালে পার্লামেন্ট নিযুক্ত বিখ্যাত উলফেনডেন কমিটি কর্তৃক ১৯৫৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩১ থেকে '৫৪ সালের মধ্যে ঐ অপরাধ ১৩০৩ থেকে ১১৯১৬তে বৃদ্ধি পায়। বলা বাহুল্য আইনের জালে ধরা নজিরের সাহায্যে ঐ জাতীয় অপরাধের সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায়।

জীবনের ক্ষোভ আত্মম্ভরিতায় প্রকাশ পেতে চায়। বলে বিয়ে করার ঝঞ্ঝাট ও গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে সে খুশি। আর পুরুষের সাহচর্য? 'ছোঃ, কে চায়? তারা তো শুধু একটি জিনিষই বোঝে।'

হায়! অন্তরের অতলে তার মত কে আর পরিষ্কার করে জানে যে ঐ 'একটি জিনিষই' যদি কোন পুরুষকে সে দিতে পারতো তবে যা কিছু দেবার তা সে কেমন অকৃপণভাবে লুটিয়ে দিত।

অবশ্য এর পরও নীতিবাগীশরা বলতে পারেন যে, অবস্থা যখন এমনি প্রতিকার-অসাধ্য তখন অনূঢ়ারা কেন ব্যষ্টি বা সমষ্টি সেবায় অথবা সন্ন্যাস-ব্রতে বাকি জীবনটা অতিবাহিত করেন না?—এর উত্তরে ফরাসী লেখক রোমাঁ গ্রের ভাষা পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে, "আমি এমন একটি লোককেও চিনি না যার চরিত্র অশ্লীলতম যৌন সাহিত্যের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু এমন বহু লোককে আমি দেখেছি যাদের চরিত্র খুব সম্ভ্রান্ত নীতিবাগীশের নির্দেশে সম্পূর্ণভাবে বিপথগামী হয়েছে।"—কারণ মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শুধু তো ধর্মানুষ্ঠানের পদ্ধতির দ্বারা নির্দেশ মাফিক নির্জীব করে ফেলা যায় না, বা করলেও তার ফল ভাল হয় না।

আর সন্ন্যাস যদি কেউ গ্রহণ করে তবে অন্তরের টানেই তা করা বিধেয় অবস্থাচক্রে পড়ে নয়। কারণ তা হচ্ছে মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙানো। তার দারুণ প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক বর্ণনা স্থান-সাপেক্ষ।

এ'দের বিপরীত পন্থীরা বলবেন যে, এই অবহেলিতা যৌবনাদের জীবনে অন্তত আংশিক পূর্ণতা আনার জন্যে সমাজের সনাতনী নরনারী সম্পর্ককে একটু শিথিল করা হোক। কিন্তু তার অনিবার্য পরিণাম হবে জারজ জন্মের বহুল বৃদ্ধি, অগণিত বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অশান্তি ও যৌন-ঈর্ষা।

এতদুভয়ের মধ্যব্যবস্থা হতে পারে অনূঢ়ারা সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বিনী হয়ে শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, কারুশিল্প প্রভৃতি কোন সুকুমার বৃত্তির চর্চায় মনের উৎকর্ষ সাধনে নিমগ্ন থাকবে। অনুরূপ অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়েই তাই করেন।

কিন্তু এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, যে-মন যত সংস্কৃত তা ততই সংবেদনশীল। ততই সে উপলব্ধি করে এ বৃহৎ বসুন্ধরা কী অর্থে যে ভরা। তাই পঞ্চশরের বেদনামাধুরী তার পক্ষে আরো মর্মান্তিক।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে একাকী

তাই সঘন দাদুরী ডাকা বর্ষামুখর রাতে কিম্বা বনের আঙিনায় গন্ধবিভোল দক্ষিণ বায়ু জলস্থলের মর্মদোলায় দোল দিলে, ঝরা বকুলের কান্নায় আকাশ ব্যথিত হলে তার মন বিষাদ-ঘন হয়ে উঠবে। মাধবীলতার মজ্জায়-মজ্জায় ফুল ফোটার যে বেদনা সেই বেদনা তাকে আকুল করবে। প্রতিটি ঋতুচক্রের আবর্তনে উপেক্ষিত বন-গোলাপের রক্ত-পাপড়ির মত তার অন্তরের জীবন-সম্ভাবনা ঝরে পড়বে। তবু ভ্রমর আসবে না।

সংগীত বীক্ষা

আনন্দভৈরব

॥ সংগীত সম্মেলন ॥

গত সপ্তাহের অমৃত পত্রিকায় নবম বার্ষিক সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন পর্যন্ত কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ অধিবেশনে বেহাগড়া রাগে খেয়াল ও ঠুংরি পরিবেশন করেন শ্রীমতী মালবিকা কানন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে বেহাগড়া রাগের রূপায়ণ রসগ্রাহী হয়েছে। অতঃপর পূরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন ওস্তাদ আমীর খাঁ। ওস্তাদ আমীর খাঁ কিরানা ঘরানার প্রখ্যাতনামা শিল্পী। রাগ-রূপায়ণে তাঁর স্বর-প্রয়োগের পদ্ধতি ও মেজাজ প্রশংসার দাবী রাখে। রাগবিশেষে মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে বিস্তারিত আলাপের পরিবেশনে রাগের আবহাওয়া সৃষ্টি করা এই শিল্পীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূরিয়া-কল্যাণের পর ওস্তাদ আমীর খাঁ বাগেশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। বাগেশ্রী রাগে তাঁর ঋষভ, কোমল গান্ধার ও মধ্যম স্বরত্রয়ের পর-পর বার-বার প্রয়োগ একটু অভিনব মনে হয়েছে। একটি রাগের পর আর একটি রাগ আরম্ভকালে পরবর্তী রাগের আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার আশা স্বভাবতই মনে জাগে। পূরিয়া-কল্যাণের পর দুটি রাগের গান শিল্পী এমন হঠাৎ ধরলেন যে রাগের আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার আশা মনেই রয়ে গেল। ষষ্ঠ অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠান ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ কর্তৃক সেতার-বাদন। তিনি সেতারে রাগেশ্রী রাগের আলাপ জোড় ঝালা বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের গৎ এবং প'র ঠুংরি পরিবেশন করেন। ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ রাগেশ্রী রাগের চমৎকার রূপায়ণ করলেন। এই রাগে পরিবেশিত আলাপের পরবর্তী অংশগুলিতেও পূর্বাপর একটি বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল। পূর্বাপর এই সামঞ্জস্য রাখার ক্ষমতা খুব কম শিল্পীরই থাকে এবং একই শিল্পীও তাঁর সব অনুষ্ঠানে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হন না। রাগেশ্রী রাগে স্পষ্টতই বাগেশ্রী রাগের ছায়া আসে। কিন্তু শুদ্ধ গান্ধারের সুষ্ঠু প্রয়োগে সেই ছায়া তিরোহিত হয়। ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর সেতার-বাদনের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-বাদনে শৈলীকুশলতা ছাড়াও একটা সজীবতার ভাব আছে। এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর তবলা-সহযোগিতায় বিশেষ সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

সপ্তম অধিবেশনে প্রথমে দরবারী কানাড়া রাগে খেয়াল ও পরে ভজন পরিবেশন করেন বিষ্ণুদিগম্বর ঘরানার অন্যতম ধারক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর। পাণ্ডিত্য, সংগীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়ার অধিকার, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বাচন-শক্তি, শুদ্ধাচার ইত্যাদির বিবেচনায় পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ সর্বকালেই দুর্লভ। এই শ্রদ্ধেয় শিল্পী প্রায় বার্ধক্যে উপনীত, কিন্তু কণ্ঠস্বর আজও তাঁর উদাত্ত। বিশেষ করে তাঁর কণ্ঠস্বরের গভীরতা (depth of voice) বিস্ময়জনক। অনেক শিল্পী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েও গভীর কণ্ঠস্বরের deep voice অধিকারী হন না। এটি কতকাংশে সাধনা দ্বারা লব্ধ হয়, তার উপভোগ্যতায় স্বতন্ত্র মজা আছে। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের দরবারী কানাড়া রাগের রূপায়ণ হৃদয়-গ্রাহী হয়েছে। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে অধিকতর স্থিতির জন্য, সাধারণ কোমল গান্ধার অপেক্ষা এক শ্রুতি নিম্নগামী অতি-কোমল গান্ধারের প্রয়োগ ও আন্দোলনের জন্য রাগটির গাম্ভীর্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। রাগবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে শিল্পীর পক্ষেও স্থৈর্যের আবশ্যক হয়। পণ্ডিতজীর পরিবেশনে এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আমরা আনন্দ পেয়েছি। বিলম্বিত লয়ের খেয়ালের পর তাঁর মধ্য লয়ের খেয়াল-গায়নও উপভোগ্য হয়েছে। মধ্য লয়ের খেয়াল আজকাল কমই শোনা যায়, যদিও তার বিশেষ মজা আছে বলে শোনার ইচ্ছে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মধ্য পন্থার আর সন্ধান মেলে না, বিলম্বিতের পরেই একেবারে দ্রুত লয়ের আবির্ভাব ঘটে।

অষ্টম অধিবেশনে আড়ানা রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শিষ্যা শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার। আড়ানা রাগে কেউ দুই নিষাদ ব্যবহার করেন, কেউ কেবলমাত্র কোমল নিষাদ ব্যবহার করেন। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে শেষোক্ত রূপে আড়ানা পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার সুষ্ঠুভাবে রাগটি পরিবেশন করে রাগোচিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। একটি ভজন গান গে'য়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। এই অধিবেশনে ভারতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শন করেন শ্রীমতী পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনী ও সম্প্রদায়। কথক নৃত্যে লয়কারির অংশ প্রধান। ভারতনাট্যম নৃত্যে লয়কারির প্রাধান্য তার তুলনায় ততটা না থাকলেও নৃত্যে ভজনের সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে ভাবাভিব্যক্তি মিলে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ভারতনাট্যম দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য। সেজন্য এই নৃত্যের সঙ্গে নেপথ্য থেকে যে সংগীত পরিবেশিত হয় তা প্রায়শঃ দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটিক সংগীত-ভিত্তিক। শ্রীমতী পদ্মিনী প্রিয়দর্শিনীর নৃত্য মোটামুটি উপভোগ্য হয়েছে, তবে তাঁর নৃত্যে লাস্যের ভাব কিছু বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

নবম বার্ষিক সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের নবম ও শেষ অধিবেশনটি ছিল সারা রাত্রিব্যাপী। এই অধিবেশনের আরম্ভে ছায়ানট রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের খেয়াল পরিবেশন করেন কুমারী শুচিস্মিতা মিত্র। এবারে সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত ইনিই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা। সম্মেলনে প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে নবীন শিল্পী-দেরও সুযোগ দেওয়া ভাল। কুমারী শুচিস্মিতা বেশ ধীর-স্থিরভাবে ছায়ানট রাগের রূপায়ণ করলেন। আমরা এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করি। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা-লহরা উপভোগ্য হয়েছে। তারপর এই অধিবেশনে যথাক্রমে শ্রীশিবকুমার শুক্লা হংকধ্বনি ও আড়ানা রাগে খেয়াল, শ্রীমতী জারিন দারুওয়ালা স্বরোদে কৌশিকী-কানাড়া ও পাহাড়ী-ঝিঁঝিট রাগ, শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক গোরখ-কল্যাণ রাগে খেয়াল ও পরে ভজন, ওস্তাদ গোলাম হোসেন সাগ্গান দরবারী-কানাড়া, সুহা ও অহীর ভৈরব রাগে খেয়াল, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সেতারে বসন্তকলি রাগ ও পরে ভাটিয়ালী সুর এবং সবশেষে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ভৈরব-বাহার রাগে খেয়াল ও পরে ভজন পরিবেশন করেন। উল্লিখিত শিল্পীগণ এই সম্মেলনে পূর্বের কোন-না-কোন অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রেই পূর্বদিনের অনুষ্ঠানই অধিকতর রসোত্তীর্ণ হয়েছে। পণ্ডিত ভি জে জোগের শিষ্যা স্বরোদ-শিল্পী শ্রীমতী জারিন দারুওয়ালা নবাগতা। সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁর স্বরোদ-বাদন পূর্বদিনের চেয়ে ভাল হয়েছে। ওস্তাদ গোলাম হাসান সাগ্গানও নবাগত শিল্পী। পূর্ব অধিবেশন অপেক্ষা সমাপ্তি অধিবেশনে তাঁর খেয়াল পরিবেশন নিকৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর স্থৈর্য ও গায়ন-সংযমের অভাবে দরবারী কানাড়া রাগের গাম্ভীর্য ও রস নষ্ট হয়েছে।

যে সকল শিল্পী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আলোচনা করা হল তাঁরা ছাড়াও এই সম্মেলনে আরো অনেক শিল্পী অংশ-গ্রহণ করেছেন ও যথাসম্ভব নিজ-নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে সব অনুষ্ঠানের আলোচনা করা তথা বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। অল্প হোক, বেশি হোক, গত কদিনে তাঁরা যে আনন্দ দান করলেন তার মূল্যও কম নয়।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের উদাত্ত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গীত হওয়ার পর নবম বার্ষিক সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

একটি সন্ধ্যা

আভা পাকড়াশী

প্রথমে তো ভদ্রলোক শুরু করলেন বহুকাল আগের সেই পেগান ছবিটার একটি সুর গেয়ে। সেই সুরের জন্ম হল একটি সন্ধ্যায়। একটি ক্যানোর মত সরু নৌকোয় চলেছে প্রেমিক আর প্রেমিকা। চঞ্চল সমুদ্র। নীল জলে ভাসছে সন্ধ্যার রুপোলী নীলে মেশা ছায়া। তার মধ্যে দিয়ে ক্যানো চলেছে ধীরে ধীরে। দাঁড় টানার সঙ্গে সঙ্গে নায়কের হাতের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। আর নায়িকা যেন লতার মত সহকারের গায় জড়িয়ে আছে। গাইছে নায়ক। এবার ভদ্রলোকের গলার আওয়াজে আর সুরে সত্যিই এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হল, যেন মনে হল সেই পেগানের নায়ক আর নায়িকা আমাদের সামনে দিয়েই ক্যানোয় চড়ে চলেছে। ভুলে গেলাম সেই কিউরিও দিয়ে সাজান সুন্দর ড্রয়িং রুম। ভুলে গেলাম সেই পরিবেশ। কানে বাজতে লাগল সুর আর চোখে ভাসতে লাগল সেই যুগল প্রেমিক।

হঠাৎ ভদ্রলোক গান থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কিন্তু কাল সকালে আর নৌকোয় চড়বেন না। চড়লেও একা চড়বেন। ওর সঙ্গে, বলেই থেমে গেলেন। ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন কেমন! একথা ঘরে ঢুকেই আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম। এবার বুকটা যেন কেমন ছাঁত করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে

তাকালাম আমার স্বামীর দিকে আর ওর দিকে। আমার স্বামী কিন্তু সংগে সংগে উত্তর দিলেন, এ আপনি কি বলছেন মিঃ রবার্টস, আমার স্ত্রী তো জলক ভীষণ ভয় পায়। ও তো, ও তো জীবনে কোনদিন নৌকোয় চড়েনি। এইতো লেকে এত লোক বোটিং করছে, কিন্তু ও কোনদিন যায় না। আপনি হয়ত ভুল করছেন। একটু হাসলেন মিঃ রবার্টস। তারপর আবার স্বামীকেই বললেন, আপনিও রোজ সকালে ডাক-বাংলোয় যাবেন না। বাড়ীতে থাকবেন। মনে হল যেন স্বামী একটু চমকে উঠলেন।

এদিকের পিয়ানোর টুল থেকে দাঁড়িয়ে উঠলেন মিস্ ক্রিস্টিনা। তিনি বললেন, হাউ ফানি, মিঃ রবার্টস, আপনি কি গানের সংগে সংগে জ্যোতিষচর্চাও করেন নাকি? নাহলে এতসব কি করে বলছেন!

মিঃ রবার্টস কেমন একরকম করে হেসে বল্লেন, কিছু-কিছু চর্চা সব কিছুরই করি। তবে একটা কথা বলব আপনাদের—এই ইণ্ডিয়া একটি মিসটিরিয়াস প্লেস। এর মধ্যে কিছু যাদু আছে। তারমধ্যে এই নৈনীতাল পাহাড়। আমি যেখানেই থাকি না কেন বছরের এই সময়টা এখানে না এসে পারি না।

আমি আর একটিও কথা বলিনি, চুপ করে চেয়ে বসেছিলাম; আর মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভয়ে আমার বুকটা টিপ টিপ করছিল। বুঝতে পারছিলাম যে ভদ্রলোক আর কিছু জানুন আর নাই জানুন থট রিডিংটা খুব ভাল রকমই জানেন। ওঠার জন্য উসখুসও করছিলাম। সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমার স্বামীর আবার হাত দেখানো বাতিক। মেতে গেছে সায়েবের সংগে। আবার মিঃ রবার্টস আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। আর আমিও সংগে সংগে দাঁড়িয়ে উঠে আমার স্বামীকে বললাম, এবার চলো। মিঃ রবার্টসও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, একি? মিসেস বোস, আপনি তো একটুকরো কেকও নিলেন না। পারব না, মাফ করবেন, বল্লে অন্যদের নমস্কার করে বেরিয়ে আসি।

পাহাড়ের পরিবেশটা প্লেনের থেকে অনেক ভিন্ন। বেশ অন্যরকম। এখানকার এই পরিবেশ, মহিলা, পুরুষ আর শিশু সকলেরই রংচংএ বেশভূষা, আনন্দোচ্ছল ভাব বেশ মানিয়ে যায় কিন্তু, কে কি ভাবছে, কে কি মনে করছে এসব না ভেবেই বেপরোয়া ভাবে উদ্ভট কিছু করে বসা, আশ্চর্য, অসামঞ্জস্য লাগে না কিন্তু। শুধু এই পাহাড়ী পরিবেশ বলেই লাগে না। এইতো বেঞ্চিতে বসে দেখছি বিরাট বপু এক পঞ্জাবনী ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। দুপাশের শরীরের মাংসগুলো থলাস থলাস করছে। কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল সত্যেনের দেখা নেই কেন? কাল রাত থেকেই ওর মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখছি।

অদ্ভুত ভদ্রলোক কিন্তু ঐ মিঃ রবার্টস! কি করে এত সব জানতে পারেন কে জানে। কিন্তু ঐ সত্যেন, সত্যি আমি ওকে এড়াতে পারি না। আমার স্বামীর রূপ-গুণের কাছে ও কিছুই না, তবু আমার ভাল লাগে ওকে। কেমন যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ওর। আমার ওকে ভালবাসার একটা কারণ অবশ্য আমি নিজেই খুঁজে বের করেছি। আমার স্বামীর বিরাট ব্যক্তিত্ব আর তার উৎকর্ষ প্রকাশের দরুণ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। আমার নিজস্ব সত্তা যেন কোথায় ডুবে যায়। তাই যার কাছে আমি নিজেকে খুঁজে পাই, আর আমার মধ্যে যে কিছু দ্রষ্টব্য খুঁজে পায় সেখানে কি মিল হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক? আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এটা অন্যায়। কিন্তু মানুষের মনের ওপর বিশেষ শাসন চলে না। অবশ্য সত্যেন যদি ওভাবে দিনের পর দিন আমার কাছে না আসত তবে কি হত বলা যায় না। এটাও কিন্তু ঠিক আমি নৌকোয় চড়তে ভীষণ ভয় পেতাম। কোনদিন কোন কারণেই আমি নৌকোয় চড়িনি। কিন্তু সত্যেনের সংগে নৌকোয় চড়তে ভীষণ ভাল লাগে। ঠিক যেন ভয়মিশ্রিত একটা আনন্দ উপভোগ করি।

সত্যেন আসছে। ওর চোখ মুখ যেন একদিনেই কিরকম শুকিয়ে উঠেছে। হাতে আবার কাগজের একটা রোল, কি ওটা? আমার হাতে বোনা লেমন কলারের হাইকলার সোয়েটারে সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু ওকে। বিকেলের সোনালী আলো পড়েছে ওর ফর্সা মুখে। অনেকটা গ্রেগরী পেকের মত লাগছে। কিছুই না বলে কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। আমি আস্তে আস্তে রোলটা খুলতে লাগলাম। ভেতর থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে লাগল একটি ছোট্ট মেয়ের কোঁকড়া চুলে ঢাকা গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মুখ। বড় বড় টানা টানা চোখ। একটা ছোট্ট নাক আর ঠোঁট ভরা মিষ্টি হাসি। কেমন যেন চমকে উঠলাম, ভয়ানক চেনা মনে হল মেয়েটিকে। কোথায় দেখেছি একে? কবে দেখেছি? কিছুতেই মনে করতে পারছি না। হঠাৎ সত্যেনের দিকে চোখ পড়তে দেখি সে কেমন যেন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করছে। এই চাউনি আমি ওর চোখে খুব কমই দেখেছি। কেমন যেন অস্বাভাবিক আর অপ্রকৃতিস্থ মনে হয় এখনকার এই সত্যেনকে। চেনা শক্ত হয়ে ওঠে ওকে। হঠাৎ কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে, চেনো একে? নিশ্চয়ই বলবে চেনো না। কিন্তু তুমি অস্বীকার করলে কি হবে? আমি জানি, তুমি সুজাতা, তুমিই সেই সুজাতা। ওর এই অর্থহীন প্রলাপের আমি কোন মানে বুঝি না। ওর হাতটা ধরে এবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, এই সত্যেন! কি বলছ কি পাগলের মত! এবার সুর নরম হয় ওর। বলে, চল নৌকোয় চল। আমি বলি, রবিবার আজ, নৌকো পাবে না, তাছাড়া ভীষণ জোর বৃষ্টি আসছে। এই সময় নৌকোয় চড়া কি উচিত তুমিই বল? বলে, সে ভাবনা তোমার নয় আমার। নৌকো আমি ঠিক যোগাড় করব। তবে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন কই এতদিন তোমার মনে ওঠেনি তো? ওঃ, ঐ রবার্টস। ও লোকটা আমার জীবনের শনি। আমার চম্পাকে—বলেই দুহাতে মুখ ঢাকে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কাল রবার্টস সাহেবের ঘরে একটা জয়পুরী রুপোর গুলাবদানে অনেকগুলি চাঁপা-ফুল রাখা ছিল। গুলাবদানটি ছিল একটা টিপয়ের ওপর একটা ছবির সামনে। ছবিতে ছিল দুটি মেয়ে। এই মেয়েটির থেকে একটু বড় একটি মেয়ের আর একটির অবিকল এই মুখচ্ছবি। আর ঠিক তক্ষুনি আমার মনে পড়ল কাল রাত্রের কোচে বসা সত্যেনের মুখের চেহারা। ওঃ কি করুণ আর কি বীভৎস। যেন কোমলতা আর কঠিনতার যুগপৎ বিকাশ। ছবিটির দিকে তাকাচ্ছে করুণ চোখে আর রবার্টসে দেখছে কুটিল দৃষ্টিতে।

মনে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? নানান প্রশ্নের ঝড় ওঠে আমার

সত্যি বলছি আমি এই সত্যেনকে আগে দেখিনি। আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে ছিল অন্য সত্যেন। সে যে আমাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেত না। যেন কি এক অপরাধ করেছে ও আমার কাছে, সেটা কাটাবার জন্য আমাকে উজাড় করে সব কিছু দিতে রাজী। যেন কত বড় একটা ভুল করেছে ও আমার কাছে সেই ভুল শোধরাবার জন্য ও যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। ভাল লেগেছে ওর আন্তরিক ব্যবহার—বিনয়নম্র কথা। কিন্তু এ কোন্ সত্যেন? নৈনীতাল আসার পর থেকেই ওর মধ্যে একটা উন্মনা ভাব লক্ষ্য করেছিলাম, তবে এতটা পরিবর্তন ভারী আশ্চর্যজনক। ওর আগ্রহেই কিন্তু নৈনীতালে আসা। হঠাৎ দেখি পাশে সত্যেন নেই।

আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন চন করে ওঠে।

গুড ইভনিং মিসেস বোস। দেখি প্রশান্ত হাস্যে সমুজ্জ্বল মিঃ রবার্টস। বোধহয় সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

ফিরে এলো সত্যেন। বলল নৌকো পেয়েছি সুজাতা, চল। হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় মিঃ রবার্টস বললেন, না যাবে না ও। কক্ষনো যাবে না। ইউ ব্রুট্. যেন সাপের উদ্যত ফণায় কেউ মন্ত্র পড়ে দিল। মাথা নীচু করে চলে গেল সত্যেন।

হোটেলে ফিরে দেখি সত্যেন নেই। তার জিনিসপত্রও নেই। আমার স্বামী ছিলেন বাইরের লাউঞ্জে। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম চলে গেছে। আর কিছুই বললেন না তিনি। শুধু একটা মোটা নীলরঙা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ঐ খাম আমার চেনা। ও চিঠি সত্যেনের।

ঘরে এলাম চিঠিখানা নিয়ে। বড় ফাঁকা লাগছে। মনের ভেতর থেকে যেন কিরকম একটা গুমরোনো ভাব সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। রাগ, অভিমান, ভয়, কৌতূহল সবই আছে, তবে উপস্থিত কৌতূহলটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শুধু একটা প্রশ্নই তখন ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে জাগছে কি দরকার ছিল তবে এত ভালবাসার যদি এইটুকুতেই ছেড়ে চলে যাবে? কেন এমন করে খেলা করল আমার সঙ্গে? কৌতূহল আরও তীব্র হওয়ায় এবার চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম।

সুজাতা, আমার সুজাতা,

তোমাকে যা কখনো বলিনি—যা তুমি স্বপ্নেও ভাবোনি আজ তাই বলতে চলেছি। শোন। সুজাতা আমি একটা খুনী। আমি সুজাতাকে খুন করেছিলাম। আর তাতে সে একটুও বাধা দেয়নি। কিন্তু তার মুখে তখন যে একটা হাসি দেখেছিলাম, উঃ সেটা যদি একটু আগে দেখতাম, একটু আগে যদি বিদ্যুৎটা চমকাত তবে আমি তাকে কক্ষনো খুন করতে পারতাম না। ঠিক সেই হাসি দেখেছি তোমার মুখে। তুমি যখন আমার বুকে মাথা পেতে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে আর বলতে আঃ কি শান্তি সত্যেন। কতবড় একটা আশ্রয় তোমার এই বুকটা। আমার তখন কোন কথাই কানে যেত না। আর মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠত। ভাবতাম ছি ছি রাগের মাথায় কি অন্যায়ই না করেছি। হিংসেয় অন্ধ হয়েছিলাম। ওঃ তোমাকে তো আসল কথাই বলা হয়নি। সুজাতা ছিল আমার স্ত্রী। আমার চম্পার মা। ঠিক তোমার মত মিষ্টি মেয়ে ছিল সে। দেখতেও ছিল অনেকটা তোমার মত এমনি ছোটখাট, গোলগাল টুকটুকে।

অনেক বড় একটা আঘাত দিলাম তাই না সুজাতা! আরও আঘাত দিচ্ছি সত্যি কথা বলে, তোমাকে আমি ঠকিয়েছি সুজাতা। আমি তোমাকে ভালবাসিনি। আমি তোমার নাম আর তোমার চেহারা আর স্বভাবকে ভালবেসেছিলাম। শুধু তোমার মধ্যে আমি আমার সুজাতার ছায়া দেখতে পেতাম বলে তোমাকে ভাল লেগেছিল। ঐ জন্য যখনই তোমার সঙ্গে তার কোথাও অমিল দেখতাম, ক্ষেপে উঠতাম আর তাই তুমি আমার সেই অহেতুক অসন্তোষের কোন কারণ খুঁজে পেতে না।

প্রথম দিন যখন তোমাকে তোমাদের সেই জলন্ধরের বাংলোয় দেখলাম তখনই আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল এ কে? কাকে দেখছি? তবে কি আমি তাকে মারিনি? বেঁচে ছিল সে? সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে বাগানে বসেছিলাম আমরা। তুমি একবার উঠে গিয়ে আমার আর অমরের জন্য কফি নিয়ে এলে। আশ্চর্য তোমার হাঁটাচলা এমন কি কথা বলার ধরণ হাসি সব কি তার মত? সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলাম অমরের মুখে তোমার নাম শুনে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ও সুজাতা বলে তোমাকে ডাকতেই আমার হাত থেকে কফির পেয়ালা পড়ে গিয়েছিল।

তারপর। পরদিন আবার গেলাম শুধু একটিবার দিনের আলোয় তোমাকে দেখতে। পেলাম না দেখতে। অমর বলল, সে কলকাতা যাচ্ছে কাজে, প্রায় মাস-খানেক দেরি হবে তার ফিরতে। আমি যখন ওখানেই বদলি হয়েছি যেন তার স্ত্রীকে দেখাশুনো করি। সুযোগ পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে নিত্য রোজ তোমার কাছে গিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে তোমার মনে নিজের স্থান করে নিলাম। তোমাকে ভালবেসে সুজাতার ঋণ শোধ করতে লাগলাম।

তারপর থেকে নিত্য রোজ......

অমরের অনেক পুরনো কথা আমি জানতাম। ও একটি পঞ্জাবী মেয়েকে আগে ভালবাসত। সে মেয়েটিকে ও বিয়ে করতে পারল না শুধু ওর বাবা অমত করায়। কিন্তু মেয়েটির পেটে ওর বাচ্চা ছিল। মেয়েটি তা লুকিয়ে বাধ্য হয়ে আর একজনকে বিয়ে করে। সেইসব কথা সেদিন বলছিল অমর। তুমি বলছিলে চুপিচুপি কি এত আলোচনা হচ্ছে আপনাদের দুই বন্ধুতে? আমি এলেই চুপ হয়ে যাচ্ছেন? অমর বলছিল, জানিস সত্যেন, বোধহয় সেই অভিশাপেই আর আমার ছেলে হল না। নাহলে এই তিন বছরে অন্ততঃ একটাও কি হত না?

এই পর্যন্ত পড়েই আমার বুকের ভেতরটা যেন কি রকম মোচড় দিয়ে উঠল। ছুটে গেলাম অমরের কাছে। বললাম দোহাই তোমার দুটি পায় পড়ি সত্যেনের খোঁজ কর। এই দেখ যা লিখছে তুমি নিজে পড়। তাচ্ছিল্যের সংগে আমার পায়ের ওপর চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গোল্লায় যাক সত্যেন। সে একলা গেল কেন? তার সংগে তোমাকেও নিয়ে যেতো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতো আমার জানাই ছিল। এর থেকে আর বেশি কি আশা করেছিলাম ওর কাছ থেকে। আজ সত্যি ও বলতে পারে, কারণ আছে ওর বলার। কিন্তু যখন কোন কারণ ছিল না তখনই বা কোন ভাল ব্যবহার করেছে ও আমার সংগে?

পায় চটিটা গলিয়ে, ম্যাকিণ্টসটা জড়িয়ে সোজা চলতে শুরু করলাম চায়না পিকের রাস্তায়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যের সেই হৈ চৈ আর রং-এর মেলা এখন আর নেই। দুএকটা পাহাড়ী লোকের দেখা মিলছে। আর কেউবা ওভারকোট মুড়ে জড়ানো গলায় ইংরেজী গান গাইতে গাইতে, এলোমেলো পা ফেলে নিজের ডেরায় ফিরছে। ওদের কাছাকাছি হলেই বুকটা কেমন করছে। এক একবার মনে হচ্ছে কেন যাচ্ছি! কার জন্য এই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি? যে অমন করে আমাকে ঠকিয়েছে? কিন্তু আশ্চর্য কোন বিরুদ্ধ ভাব জাগছে না মনে। লোকটাকে খুনী জেনেও তার ওপর ঘেন্না আসছে না। বিশ্বাসই হচ্ছে না কথাটা। উপরন্তু ঐ অসহায় অসহিষ্ণু লোকটাকে একটা আসন্ন সঙ্কট থেকে বাঁচাবার জন্য অদ্ভুত একটা প্রেরণা জাগছে মনে। কেন এমন হয়?

ভদ্রলোক তাহলে এখনো ঘুমোননি? ঐতো বেহালা বাজছে। যতই চড়াই বেয়ে উঠছি ততই বেহালার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই পেগানের সুর। যা গেয়ে শুনিয়েছিলেন, সেই সুর তুলেছেন বেহালার বুকে। এই সুরের সংগে যেন ও'র প্রাণের যোগ রয়েছে একটা। আর এই সুর শুনলেই চোখের সামনে সেই সমুদ্রের অতল জলের আভাস, ঢেউএর শব্দ, চাঁদনী রাত, আর নৌকো বেয়ে চলা যুগল প্রেমিকের ছবিটা পরিষ্কার ভাবে ভেসে ওঠে। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, এমনই একটা মাদকতা আছে এই সুরে।

ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ী বর্ষা। লেগেই আছে বৃষ্টি। দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিতে বেহালার সুর থামল। দরজা খুলে ড্রেসিং গাউনপরা মিঃ রবার্টস আমাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিয়ে বললেন, আপনাকে ভয়ানক ফেকাসে দেখাচ্ছে। এক কাপ কফি আনি। আমি আর তার উত্তর না দিয়ে শুধু বলি, সত্যেনকে আপনি বাঁচান মিঃ রবার্টস। তারপর আনুপূর্বিক সব শুনে তিনি বললেন, আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন মিসেস বোস। ঐ রকম আত্মহত্যা করব বলে ভয় দেখিয়ে আমাকেও আগে অনেক চিঠি দিয়েছে ও। ও তা পারবে না। সে মনের জোর ওর নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। একবার যে খুন করেছে ও সেটা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে করেছে। দ্বিতীয়বার ও খুন করতে চেয়েছিল আপনাকে। অবশ্য প্রকৃতিস্থ ছিল না ও। ওর অপ্রকৃতিস্থ মনে আজ থেকে দশ বছর আগের নৈনীতালের পরিস্থিতি ছায়া ফেলছিল। আপনাকে তাই ও চম্পার মা বলে কল্পনা করেছিল। আপনাকে খুন করার সঙ্কল্পটা ওর মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছিল সেই রাত্রে আমার ড্রয়িংরুমে এই ঘরে বসে। তাই আপনাকে নৌকোয় তোলবার জন্য ও অত ব্যগ্র হয়েছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস বোস, ও এখন করুণার পাত্র। ওকে এখন অ্যাসাইলামে রাখা উচিত। পারি তো আমি সেই ব্যবস্থাই করব। বেশি দূরে যে ও যায়নি ঐ চিঠিই তো তার প্রমাণ। কোথায় আছে তাও আমার খানিকটা জানা।

ওর স্ত্রী সুজাতার সংগে কি সত্যিই আমার খুব সাদৃশ্য আছে? এবার রবার্টস-এর নীল চোখের একাগ্র দৃষ্টি আমার মুখের ওপর পড়তে একটু অস্বস্তি লাগে।

আছে। সত্যিই অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। শুধু ব্যতিক্রম মধ্যে আর গালে একটা কালো তিল ছিল। চমকে উঠি আমি। ওঃ তাই কি সত্যেন আমাকে খালি বলত গালে একটা তিল আঁক না সুজাতা। বেশ কালো করে একটা বড় তিল। এঁকেও দিয়েছিল একদিন আমার বাঁ গালে কাজল দিয়ে একটা তিল।

মিঃ রবার্টস বলতে শুরু করেন। যদিও ওর মন হিংসেয় পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য তার কোনই প্রকাশ বোঝেনি ওর স্ত্রী। না হলে অন্ততঃ আমাকে সে ঠিকই বলত। আমি ওদের মেয়ে চাম্পিকে ভীষণ ভালবাসতাম। কারণ—বলে একটা ঢোক গেলেন রবার্টস, তারপর একদমেই বলতে থাকেন, কারণ আমার নিজের মেয়ে রোজি ঐ বয়েসে এই চায়না পিক থেকে নামতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মা ছিল না। আমার ঠিক নীচের টিলার ঐ বাড়ীটায় থাকত সুজাতা সত্যেন আর চাম্পি। সুজাতা রোজিকে ঠিক নিজের মেয়ের মত যত্ন করত। রোজি ছিল চাম্পির চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু ওরা ছিল ঠিক যেন দুটি বোনের মত। খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনে। একসংগে স্কুলেও যেত ওরা। রোজির সারাদিন প্রায় কাটত ওদের বাড়ীতে। ওকে কাছে পেতে গেলে আমাকেও ওদের বাড়ী যেতে হত। গেলে সুজাতা আমাকেও যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করত। সত্যেন তখন হয়তো বাড়ীতে নেই এমনও হয়েছে। তারপরই ঐ দুর্ঘটনা রোজি আমাকে হঠাৎ ছেড়ে চলে গেল। ওর এই আকস্মিক মৃত্যু আমার বুকে শেলের মত বাজল। কোথাও বেরুতাম না, চুপ করে স্থানুর মত এই ঘরের ওই কোচটায় চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতাম। তখন ঐ সুজাতা লজ্জা, ভয়, সব ছেড়ে ছুটে এসেছে আমার কাছে। তার মমতায় ভরা অন্তরের মাধুর্য দিয়ে মুছিয়ে দিতে চেয়েছে আমার মনের ব্যথা। বুঝতে দিয়েছে যে সেও সমব্যথী। রোজির বিচ্ছেদ বেদনা তার মনের গভীরেও বেজেছে। সত্যেন ভুল বুঝল সুজাতাকে। অথচ সে কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না সুজাতাকে। বরং প্রশ্রয় দিত।

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে ছিল ঐ সুজাতা। সে নিজের সংসারের সব কাজ কর্তব্য সেরেও আমার পুরো দেখা-শোনার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। সকালের চা থেকে রাত্রের সাপার পর্যন্ত সব কিছু হত তার নির্দেশে। জুতোটা পর্যন্ত পালিশ করিয়ে রাখত সে। সবই ছিল তার নেপথ্যে, প্রকাশ্যে ছিল খুব কম। কিন্তু সত্যি বলছি, তার সঙ্গে আমার কোন রকম অবৈধ সম্পর্ক ছিল না। তবে হ্যাঁ তার সেবার মধ্যে দিয়ে, চার্মাপির মধ্যে দিয়ে তাকে আমি কাছে পেতাম। চার্মাপিকে সেই আমার কাছে এগিয়ে দিত, রোজির অভাবের তীব্রতা বোধটা কিছু অংশে কমাবার জন্য। আমি চার্মাপিকে খুবই স্নেহ করতাম। সকাল-বেলা উঠেই সে তার রবোটের কাছে চলে আসত। সুজাতা ওকে আঙ্কল বলতে শেখাত কিন্তু বলবে না সে। হয় রোজির মত ড্যাডি বলবে আর নয়তো বলবে রবোট। ভারি মিষ্টি মেয়ে ছিল চার্মাপি।

সুজাতার চমৎকার একটা পরিমাপ বোধ ছিল। তার কাছে ততটা পর্যন্তই এগুনো যেত যতটা সে চাইত। তার বেশি নয়। আমার প্রতি তার যে সহানুভূতি ছিল সেটা তার মনে যে ভালবাসায় পরিণত হয়েছে সেটা আমি কোনদিনই বুঝিনি। এমনই ছিল তার সীমা বোধ। কিন্তু সত্যেন সুজাতার মত স্ত্রীর মূল্য বুঝল না। ওর মত সেন্টিমেন্টাল লোকের মনে আবার যা ছাপ কাটে সে আবার সেই ছাপে সব ছেপে নেয়। তাই সবই সে নিল অন্য রংএ। হয়তো এতটা কিছুই হত না, যদি না চার্মাপি একরাত্রের মধ্যে ডিপথিরিয়ায় মারা যেত। সত্যেনও মেয়েকে ভীষণ ভালবাসত। শত চেষ্টাতেও যখন চার্মাপি বাঁচল না তখন সত্যেন তো হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। আর আমি আবার পাথর হয়ে গেলাম। সুজাতাকে বললাম আমার স্নেহে বোধহয় অভিশাপ আছে। ও কিন্তু সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। নিজের প্রচণ্ড শোক চেপে রেখে আমাকে আর সত্যেনকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। সত্যেন এখানেও ভুল বুঝল। ওর ধারণা হল সুজাতা মোটেই দুঃখিত নয় মেয়ের মৃত্যুতে। যেন তার বাঁধন কমলো, রাস্তা পরিষ্কার হল।

এবার ধীরে ধীরে সে তার কাজ শুরু করল। সুজাতাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে শুরু করল। যা কখনো করত না এমনি ভাল ব্যবহার করতে লাগল। নিজের ক্লাব আর খেলা বাদ দিয়ে বেশিক্ষণ সময় সুজাতার সঙ্গে কাটাতে লাগল। সুজাতা খুবই কৃতজ্ঞ তাতে। ভাবত মেয়ের অভাবে তার মনে যে বিরাট শূন্যতা এসেছে সেটা কিঞ্চিৎ ভরিয়ে তোলাই বোধহয় সত্যেনের উদ্দেশ্য। সে আরও নির্ভর করত ওর ওপর। কিন্তু দেখতে পেতাম তার মনে কি নিদারুণ শূন্যতা, তার হাসিতে কত কান্না। তবু সান্ত্বনা দিতে পারিনি তাকে কাছে গিয়ে। তার যে স্বভাব ছিল সব কিছু চাপা দেওয়া। তার মনোভাবটাই সে সব সময় একটা সুন্দর হাসির আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে চমৎকার ভাবে নিজের কর্তব্য করে যেত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে শেষের দিকে সে সত্যেনের উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তার প্রমাণ তার চিঠিতে। ওর মৃত্যুর পর আমি পাই চিঠিটা।

যেদিন এখানে পেগান ছবিটা ওপন্ করল সেদিন ওরা দুজনে গেল দেখতে। ফিরে এসে সুজাতা বলল, রবার্ট প্লিস্ তুমি ছবিটা দেখে এসো। ওর মধ্যে যে একটা গান আছে সেটা তোমার বেহালায় চমৎকার উঠবে। গেলাম। সেই সুরে আমাকে দিয়ে সুজাতা চলে গেল। হয়তো তার মৃত্যুর ইসারা দিয়ে গেল ঐ নৌকো বেয়ে চলার মধ্যে দিয়ে। আমি ছবি দেখতে না গেলে ওরা একা একা নৌকোয় যেত না। রোজ আমি ওদের সঙ্গী হতাম। সেদিনই সুযোগ পেল সত্যেন। আগে থাকতেই ও নিজের মন তৈরি করে নিয়েছিল। তাই সব কিছুই সুন্দরভাবে ঠাণ্ডা মাথায় করতে পেরেছে।

এতক্ষণ আমি নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসেছিলাম। এবার প্রশ্ন করি, সেই চিঠি কোথায়? কি ছিল সেই চিঠিতে?

হ্যাঁ বলি, শোন। সরি, শুনুন। (আবার সেই নীল চোখের গভীর দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির হল।)

But I think you are Sujata, the same Sujata. I can't believe that you are not. চমকে উঠি আমি, বলি, না না রবার্ট, আমি সে নই। আমি অরফ্যানেজে মানুষ। অকিঞ্চিৎকর জীবন আমার। বৈচিত্র্যহীন সে কাহিনী। জানি না। কে আমার মা, কে আমার বাবা, কোথায় আমার জন্ম? সবই রহস্য আমার কাছে। আমার পরিচয় শুধু আমি। জলন্ধরে অরফ্যানেজে মানুষ। লেখাপড়া ভাল-বাসতাম, স্কুল থেকে কলেজে পড়তে যাই। সেই কলেজে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউ-সনের সময় মেজর গুপ্ত মানে অমর আমাকে দেখে পছন্দ করে। মিলিটারি ম্যান, ডিসিসন নিতেও দেরি হয় না। বিয়েও করে ফেলে আমাকে। কিন্তু নেশার চোখে দেখা। তাতে কোন মনের বালাই ছিল না। ও বস্তুটাই তার মধ্যে নেই। বুঝলাম ছিলাম আগুনে, এখন উঠেছি তপ্ত কড়াইয়ে, এই যা তফাত। এইতো আমার জীবন।

রবার্টস অবাক হয়ে বলে, কিন্তু কি করে তোমার সঙ্গে তার এত মিল। এমনকি তোমার ঐ হাত নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিতে বসার ধরণে আমি সুজাতাকে খুঁজে পাচ্ছি। তবে সে ছিল দিল্লীর এক প্রফেসরের মেয়ে। তারা ছিল দুই বোন। এক বোন আমার ঠিক মনে নেই মারা গিয়েছিল বা হারিয়ে গিয়েছিল এমনি কিছু হবে। আমি বলি, যমজ বোন ছিল কি?

প্লেনে করে চলেছি লণ্ডনের পথে। সঙ্গে আছে রবার্টস। এই বোধহয় আমার বিধিলিপি। যাকে কোনদিন দেখিনি, জানিনি, সেই আমার যমজ অনুজা, তারই দুই প্রিয়তমের মাঝে ঠাঁই করে নিলাম আমি। ঢেউএর মত সত্যেন এসেছিল আমার জীবনে। তাকে আমি আর রবার্টস মিলে চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করে বাঁচি রেখে এলাম। একটা বড়ই দুঃখ রইল এত করেও আমার মা বাবাকে দেখতে পেলাম না। দুজনেই নেই। বড় সাধ ছিল দেখার। হল না। আমি তো জানতাম আমার কেউ নেই। সবাই ছিল। পাইনি কপাল দোষে। হারিয়ে গিয়েছিলাম বার্মা ইভাকুয়েসনের সময়। মা বাবা বার্মায় থাকতেন। কি করে জলন্ধরে গেলাম জানি না। তখন আমার বয়েস মাত্র চার বছর। স্নেহ-ভালবাসাহীন, নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, রুক্ষ জীবন কেটেছে। যাকে ভালবাসতে গেছি আঘাত পেয়েছি। তাই যে পরম আদরে বুকে তুলে নিল তাকে ফেরাই কি সাহসে? সঞ্চয়ের পরিমাণ আমার এতই অকিঞ্চিৎকর, এতই তুচ্ছ যে মনের গভীরে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেও এমন কিছুই পাই না যাকে আঁকড়ে ধরে তাচ্ছিল্য করতে পারি এই আহ্বানকে। তবে এও জানি আমার বোনের ছায়াকে এরা ভালবাসছে, আমাকে নয়। হয়ত সেই বিদেহী আত্মা আমার মধ্যে দিয়েই তার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করছে। কিন্তু আমারও সত্যেনকে ভাল লেগেছিল। রবার্টসকেও ভাল-বেসেছি একথা অস্বীকার করি কি করে? এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে রবার্টস যে কি বলি। আর ভালবাসায় আদরে যত্নে যেন ভরিয়ে তুলেছে আমাকে। এরা যেন দুজনেই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে আমার। সে বীজ বুনে গেছে ফল ভোগ করছি আমি।

॥ বাগান করা ॥

কলকাতা শহরে যেখানে মাথা গোঁজাটাই একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার, সেখানে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ আজও কারোর বাগান করার নেশা আছে ভাবতে বসাটাই বিস্ময়কর। বড় জোর সৌখীন টবের বুকে বাগান তৈরী করার করুণ প্রয়াসে মানুষের বাগান করার আদিম নেশাটুকু সীমাবদ্ধ। তাই এ নিবন্ধ সেই সব মানুষদের আমি পড়তে বলব না, যাদের বাড়ীতে ঢুকলে এক চিলতে আকাশই দেখা যায় না, এক টুকরো গাছ বসাবার জমির সন্ধান পাওয়া ত' কাঙালের স্বর্গ পাওয়ার মত। আমার নিবেদন সেই সব অনেকের মধ্যে অল্প সংখ্যক ভাগ্যবানদের উদ্দেশে যাঁরা চেষ্টা করলে এই নেশার কবলে আত্ম-সমর্পণ করে নিজের এবং আমাদেরও উপকার করতে পারেন।

বাগান ব্যাপারটার ওপর আমার বিশেষ পক্ষপাত আছে বলে মনে করবার কোন কারণ নেই, কারণ বাগান করা ব্যাপারটাই আদম নামধেয় এক মানুষের প্রধান কাজ ছিল একদিন। স্বর্গের বাগানে ঈশ্বরের হয়ে সেই মানুষই দেখাশোনা করত। স্বর্গোদ্যানে ছিল সৌন্দর্য আর ক্ষুধা দুইই মেটাবার জন্যে ফল আর ফুল। বলতে কি, ইভকে পাবার আগে, আদম পেয়েছিল ইডেনকে।

সেই আদমের যুগ থেকেই বাগান করায় মানুষ সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পেয়ে এসেছে। সরু সরু সবুজ মটর-লতার ডালে ডালে যখন মটরশুঁটিরা থরে থরে দেখা দিয়েছে তখন সেই টাটকা সবজী মটরশুঁটি যেমন তার পেট ভরিয়েছে, তেমনি নিষ্প্রয়োজন হলেও ফুলগাছের ফুটন্ত ফুলের সৌন্দর্য তার মন ভরিয়েছে। শুধু তার পরিশ্রমের ফলই সে পায়নি, পেয়েছে সৃষ্টির আনন্দ। ফুল অথচ নিজে ফুটেও তার স্রষ্টার চেয়ে বেশী আনন্দ পায় নি।

এ আনন্দ কত সাধনার বস্তু। শুধু বীজ পোঁতা আর জল দেওয়া ত' নয়, প্রতি মুহূর্তের চিন্তা সেই গাছটিকে ঘিরে যে গাছটির ফুলটি উজ্জ্বল করে তুলবে তার একটুকরো উদ্যানকে। সেই গাছেদের বুনো ঝোপঝাড় আর কীটের আক্রমণ থেকে, পতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে কত না পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তা।

ঋতু বদলায়, বাগানের রং বদলায়। গ্রীষ্মের বেলকুঁড়ির সুবাস মিলোতে না মিলোতে, বর্ষার রজনীগন্ধা গন্ধ ঢালে, আসে হেমন্তের চাঁপার চাপা গন্ধ, আসে শীত তার সঙ্গে বর্ণালী ফুলের সমারোহ। সূর্যমুখী যখন সূর্যের মুখ চেয়ে ডালে আর পাতার মাঝে দোল খায়, তখন তার স্রষ্টার শরীর আর মন দুইই ভরে ওঠে।

সাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

এক টুকরো বাগান তাই জীবনে শান্তি আর সৌন্দর্যের দ্যোতনা আনে। তাই জীবনটাকে শান্ত আর সুসমঞ্জস-ভাবে গড়ে তুলতে গেলে বাগান তৈরী করার নেশা একটা মস্ত বড় অবলম্বন—এ বিষয়ে সব দেশেরই মানুষ একমত। শোনা যায় ইংরেজ জাতটা বাগান-পাগল, কোন একটা বাড়ীর সঙ্গে ছোটখাটো কোন বাগান নেই—এ নাকি কোন ইংরেজের ভাবনার অতীত। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও আমার দৃঢ় ধারণা বস্তুবাদী সোভিয়েট দেশেও ফুলের আদর তাদের শিশুদের জন্যে আদরেরই পরে।

স্বর্গোদ্যানের কথা জানি না, এ-পৃথিবীতে বাগান তৈরী করার ব্যাপারটা কাদের প্রথম মাথায় আসে জানা যায় না। তবে বাগান-পাগল ইংরেজদের এ ব্যাপারে গুরু যে রোমানরা একথা ওরাও স্বীকার করে।

অবশ্য বাগান বলতে ফুলের বাগান বলেই আমরা সাধারণতঃ বুঝলেও, আজকের কেরানী বাঙালী একটুকরো জমি পেলে যেমন কুমড়ো ফুল ফুটিয়ে খুবই আনন্দ পায় বা কোন বাঙালী সাহিত্যিকের চরিত্র সেই ফুলভক্ত ভদ্র-লোকটি (বলা বাহুল্য ফুলটি ভেজে খাওয়ার সম্ভাবনায় মুগ্ধ!) যিনি ঔদরিক স্বার্থেই ফুল ভালবাসেন, তেমনি বাগান বলতে আগে এই ফল সবজির ব্যাপারই বোঝাত।

তারপর ধীরে ধীরে ফুল ফোটাবার তাগিদ এসেছে মানুষের মনে এবং তখনই বাগান বলতে যে শুধুই এলো-পাথারি শাকসবজি ফল-ফুলুরি ফলানো বা লাল-নীল ফুল ফোটানো নয়—এটা মাথায় উদয় হয়েছে।

তাই কাঁচি এসেছে বাগান-কারিয়ের হাতে। নানা শট তুলে চিত্র-পরিচালক যেমন ছবিটি এডিট করবার জন্যে গন্ধবাহকের জিম্মায় যদি না তুলে দিতেন, তাহলে যেমন সেটা ছবি হত না, তেমনি বাগানেরও একটা পরিকল্পনা আছে।

সুন্দর হলেই যেমন তা আমাদের চোখ টানে না, তাকে তেমনভাবে দেখাতে না পারলে তার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না, তেমনি বাগান করার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য। গ্লোব নার্সারীতে ছোটাছুটি করে ক্যাটালগ হাতড়ে নানা দুষ্প্রাপ্য ফুল ফুটিয়ে বাহাদুরী আছে, কিন্তু বাগানটিতে রুচিসম্মতভাবে সজ্জিত করার পেছনে যদি না ভাব না থাকে, তবে তা আমরা যারা সেই বাগানের পাশ দিয়ে যাব তাদের ভাল লাগবে কেন?

ফুলদানিতে ফুল সাজানোর আর্টের মত ফুলফলের বাগান সাজানোও একটি আর্ট।

তবে হাঁ, বাগানে ফুলগাছ সমধিক আদর পাবে এ ত জানা কথা, কিন্তু যারা ফলের বা শাকসবজির চাষ করেন, নিদেনপক্ষে কুমড়ো ফুলের আগায় ফলের আভাস দেখে খুশী হন, তাঁদের অপরাধী বলতে আমরা মোটেই রাজী নই। মনটার আমাদের বেশী দাবী কিন্তু পেটটিও ত' ফেলনা নয়। ইংরেজরা শুনেছি ফল ফলানোর চাইতে ফুল ফোটাতেই বেশী পছন্দ করে, কারণ জন্মে নাকি মানুষ আগে চারপাশ চেয়ে দেখে তারপর দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেলে তবেই সে খিদের জন্যে কাঁদে। তাই চোখের সৌন্দর্যেরই তারা ভক্ত বেশী।

যদিও ফুল যেমন আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গী, তেমনি লাউ-কুমড়ো ত' নয়। কারণ শেষ যখন আমরা চোখ বুঁজি, তখন ফুল বুকে নিয়েই বিদায় নিই। অতএব ফুলের দাবী আগে বৈকি!

আজ যখন শহরের চারধারে নকল ফুলের সজ্জায় আমরা মনকে ভোলাতে চাইছি, তখন কেউ যদি আমাদের সেই ফেলে-আসা গ্রামের বাংচিতার বেড়া দেওয়া ছোটখাট ফুলে-ছাওয়া বাগানটির কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সত্যি আমরা এই শহরে যেখানে মাথা খুঁজে থাকি, তাকে আর যাই হোক বাড়ী বলে না।

যে বাড়ীতে ফাঁকা কোন জায়গায় ফুল ফোটে না, সেটা আর যাই হোক শান্ত সুখী গৃহকোণ নয়। এ বিষয়ে আমি কেন সব দেশের গৃহপাগল মানুষ মাত্রেই একমত। একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু দ্বিমত। বাগান করাটা একটা উত্তম ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু সৌন্দর্যবোধ ছাপিয়ে নেশার যান্ত্রিক দাসত্বের কবলে পড়ে সময় আর অর্থ ব্যয় দুটোই আমাদের কোন উপকারে আসে না।

বাগান করাটা অপরকে দেখানো ততটা নয়, তার চেয়ে বেশী নিজে দেখা, খুরপি হাতে গাছের গোড়া ঠিক করে দিতে দিতে নিজের মনটা শান্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারাটাই কাম্য বেশী। আধুনিক কবির মত ফুল ফুটুক না ফুটুক তাতেই আনন্দ।

ফুল ফোটানোতে আনন্দ আছে ঠিকই কিন্তু যদি ফলের সৌন্দর্যের চাইতে গজ ইঞ্চির মাপকাঠিতে ফুলের আয়তনের কৃতিত্বই বড় হয়ে ওঠে, তবে তা পেশাদারী বাগান করা হয়ে ওঠে।

তাই আমার এই কথাগুলো পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা বাগান করার কাজে হাত লাগাবেন, তাঁদের পূর্বাহ্নেই আমার এই আশংকা জানিয়ে রাখছি।

ভরার মেয়ে

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

শিপ্রা দেবী

'ভরার মেয়ে' কথাটি বাঙালি সমাজের এক দীর্ঘ কলঙ্কিত অধ্যায়ের 'ফসিল' বা জমাটবাঁধা অবশেষ। নৌকা অর্থে ভরা শব্দ পূর্ববঙ্গে বহুপ্রচলিত। নৌকা ভরে আনা মেয়েদের চিহ্নিত করা হতো ভরার মেয়ে আখ্যায়। এক সময়ে জাহাজভর্তি আফ্রিকার নরনারী চালান যেতো আটলান্টিকের পরপারে, মার্কিন মুলুকে। এই ক্রীতদাসরা পূরণ করতো সে দেশের শ্রমিকদের অভাব। প্রায় সে সময়েই বিক্রমপুরে বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কনের অভাব মেটাতো ভরায় আনা তরুণীর দল। 'ভরার মেয়ে' কৌলিন্যপ্রথার এক বাই-প্রডাক্ট বা উপজাত। কনের অভাব কি করে ঘটল তা বুঝবার জন্য কৌলিন্যপ্রথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা দরকার।

কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তি

বাঙলাদেশ ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত এক প্রান্তবর্তী অঞ্চল। দূরত্বের জন্য আর্য রীতি-নীতি ও ধর্মানুষ্ঠান এখানে স্বভাবতই শিথিল ছিল। তার ওপর বাঙলা ছিল দীর্ঘকাল বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড-বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবাধীন। ব্রাহ্মণগণ বেদের চর্চা ছেড়ে রাজার অনুগ্রহপুষ্ট বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিংবদন্তীর হিন্দু রাজা আদিশূর এখানে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠাবার জন্য কনৌজের রাজাকে অনুরোধ জানান। তিনি বাঙলা দেশে পাঁচজন সুপন্ডিত ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে আদিশূরের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন, শান্ডিল্য ভট্টনারায়ণ, ছিলেন 'ক্ষিতীশ-নন্দন', কনৌজের রাজকুমার। বাকি চারজনের নাম, ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ, কাশ্যপদক্ষ, বাৎস বেদগর্ভ ও স্বাবর্ণ চন্দ্র। আসবার সময় তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন হোমাগ্নি, যজ্ঞের সরঞ্জাম এবং তাঁদের সহধর্মিণী। থাকবার জন্য আদিশূর প্রত্যেক পন্ডিতকে একটি করে গ্রাম দান করলেন। এভাবে বৌদ্ধ ভাবাপন্ন বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

কনৌজী ব্রাহ্মণগণ এখানে এসে বাঙালি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের পলিতে গড়া উঁচু ভূমি রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী ভূখন্ডের নাম ছিল বরেন্দ্রভূম। বাসস্থানের নাম অনুসারে রাঢ়ের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রভূমের ব্রাহ্মণগণ বারেন্দ্র নামে পরিচিত। রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা বলেন, তাঁরা ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পন্ডিতদের হিন্দুস্থানী পত্নীর, এবং বারেন্দ্রগণ তাঁদের বাঙালি পত্নীর সন্তান। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বলেন এর উল্টো। তাঁদের ধমনীতে যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ আর্য শোণিত প্রবাহিত, রাঢ়ীদের এই দাবী নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কেন্দ্র করেই কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি।

ঠিক আটশ বছর আগে বাঙলার রাজা ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বল্লাল সেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সংখ্যা তখন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আদিশূরের সময়ের পাঁচখানা গ্রামের পরিবর্তে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততিদের অধিকারে ছিল ৫৬টি গ্রাম। এসব গ্রামের নাম অনুসারে রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ ৫৬ গাঁই বা শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গ্রামে অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ ছিল।

রাজা বল্লাল কনৌজী ব্রাহ্মণদের বংশধরদের ব্রাহ্মণত্ব ও বংশের শুচিতা রক্ষার উদ্দেশে গুণের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণী-বিভাগ করেন এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের বিবাহ নিয়ন্ত্রিত করেন। বল্লাল সেনের এই সংস্কার বল্লালী বা কৌলিন্য প্রথা নামে ৮০০ বছর বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজে বহু বিষময় ফল প্রসব করে এখন শেষ দশায় উপস্থিত, কিন্তু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেনি।

বল্লালীর গঠন

সভাপন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার পর রাজা বল্লাল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে ন'টি লক্ষণ নির্ধারিত করেছিলেন তা হলো—**আচার**—ব্রাহ্মণের জন্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন; **বিনয়**—সংযম; **বিদ্যা**—বেদ ও শাস্ত্রাদি চর্চা; **প্রতিষ্ঠা**—সদাচারের খ্যাতি; **তীর্থদর্শন**—পুণ্যস্থান ভ্রমণের আগ্রহ; **নিষ্ঠা**—ধর্মানুষ্ঠানে অনুরক্তি; **আবৃত্তি**—সমান ঘরে বিবাহের রীতি রক্ষা; **তপ**—আত্মোপলব্ধির জন্য কঠিন সাধনা ও **দান**—বদান্যতা। এই ন'টি গুণের কষ্টিপাথরে প্রত্যেক পরিবার যাচাই করে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। সকল গুণের অধিকারীকে কুলীন এবং আবৃত্তি ছাড়া অন্য আটটি গুণ যাদের ছিল তাদের শ্রোত্রিয় আখ্যা দেওয়া হলো। কালক্রমে এদের মধ্যে ভঙ্গ কুলীন ও বংশজ নামে দুটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেজন্য রাঢ়ীদের মধ্যে এখন চার শ্রেণী,—নিকষ (কষ্ঠিপাথরে কষে খাঁটি প্রমাণিত) কুলীন, ভঙ্গ কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজ। সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বেঁধে দেওয়াতে আপত্তির বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু কৌলিন্য প্রথার সব অনর্থের মূলে রয়েছে বল্লাল রচিত বিবাহ-বিধি।

মনু-স্মৃতি অনুসরণ করে রাজা বল্লাল নিয়ম করলেন যে প্রত্যেক শ্রেণীর পুরুষ তার স্বশ্রেণী অথবা নিচের যে কোন শ্রেণী থেকে পত্নী গ্রহণ করতে

পারবে। নারীর বেলা নিয়ম হলো এর বিপরীত। নারী তার স্বশ্রেণী অথবা যেকোন উঁচু শ্রেণী থেকে পতি গ্রহণের অধিকারিণী হলো। এর ফলে সর্বোচ্চ সোপানের কুলীন কন্যা এবং সর্বনিম্ন সোপানের কষ্ট শ্রোত্রিয় পুরুষের স্বশ্রেণী থেকে পতি ও পত্নী গ্রহণ ছাড়া আর কোন পথ থাকল না।

বল্লালের পরে

যোগ্যতার ভিত্তিতে গঠিত শ্রেণীর, ভোটার-তালিকার মত সাময়িক সংশোধন প্রয়োজন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন তাই-ই করেছিলেন। বল্লাল সেন বাইশটি গাই কৌলিন্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। অসদাচরণের জন্য তাদের চৌদ্দটি লক্ষ্মণ সেন শ্রেণীচ্যুত করেন। এই নামকাটা কুলীনদের আখ্যা দেওয়া হলো গৌণ কুলীন। গৌণ কুলীনদের ভিন্ন সত্তা এখন আর নেই। অবশিষ্ট আটটি গাই থেকে উনিশটি পরিবারকে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

এই কৃত্রিম আভিজাত্য ও শ্রেণী-বিভাগ রক্ষার জন্য সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন ক্ষমতাশালী তত্ত্বাবধায়ক থাকা প্রয়োজন। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-

রক্ষক রাজক্ষমতার অবসান ঘটল। বল্লালের সমাজব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আকর্ষণে অশুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল।

'কন্যাগত কুল', এটা কৌলিন্যপ্রথার এক মূল সূত্র। কন্যা কুলীন পাত্রে দান করলে কন্যার বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই মোহ ক্রমে উন্মাদনায় পরিণত হলো। অকুলীনদের অনেকেই কন্যার জন্য কুলীন বর সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে। বরের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে বর-পণ বেড়ে গেল। অশ্রোত্রিয় ধনী ব্রাহ্মণরা সে যুগে ২০০০ু পর্যন্ত পণ দিতে দ্বিধা বোধ করতো না। ত্রিশ বছর আগে বিক্রমপুরের এক স্বভাব কুলীন পিতা তার পুত্রকে ভঙ্গ করাবার খেসারত নিয়েছিলেন ৪০,০০০ টাকা। অর্থলোভে অ-শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করে বহু কুলীন হয়েছিল ভঙ্গ। যে ভঙ্গ হতো তাকে বলা হতো স্বকৃত ভঙ্গ। তার অধস্তন তিন পুরুষ ভঙ্গ কুলীনের সম্মান লাভ করতো। পঞ্চম পুরুষ থেকে তাদের কৌলিন্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেত। চতুর্থ পুরুষের পর ভঙ্গ কুলীনের বংশধরেরা 'বংসজ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

দেবীবর ঘটকের সংস্কার

প্রায় দু'শ বছর এভাবে চলবার পর দেবীবর ঘটক নামে যশোহরের এক কুলতত্ত্ব-বিশারদ কৌলিন্য প্রথার সংস্কার সাধন করেন। কুলীনদের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করা ছিল তাঁর সংস্কারের উদ্দেশ্য। দেবীবরের সংস্কার কুলীনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কুলীনদের তিন শ্রেণী,—স্বভাব, ভঙ্গ ও বংশজ—স্বীকৃত হলো। পূর্বপুরুষের নাম, গোষ্ঠীর নাম অথবা গ্রামের নাম অনুসারে কুলীনদের বিভক্ত করা হলো ছত্রিশ ভাগে। এসকল ভাগের নাম দেওয়া হলো মেল। এদের নাম—ফুলিয়া, খড়দহ, সর্বানন্দী, বল্লভী ইত্যাদি। স্বীয় মেলের মধ্যেই কুলীনদের বিবাহ করতে হবে, দেবীবরের সংস্কারের এটাই ছিল প্রধান কথা। দেবীবরের অনুশাসন কুলীনরা মেনে নিয়েছিল। স্বভাব কুলীনদের কোন্ পরিবারের সঙ্গে কোন্ পরিবারের বিবাহ হতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার নাম 'পাল্টি-প্রকৃতি'।

পরিণাম

কৌলিন্য প্রথার ইতিহাস নারীর প্রতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ও নির্মম অত্যাচারের করুণ কাহিনী। দেবীবরের মেল-বন্ধনের পর এই কৃত্রিম আভিজাত্য ও বিবাহ-নিয়ন্ত্রণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজকে অপ্রতিহত প্রতাপে পরিচালিত করেছে পাঁচশ বছর। দীর্ঘস্থায়ী যুক্তিহীন সংস্কার মানুষকে হিতাহিত বোধশূন্য করে অন্ধের মতো পরিচালনার পরিণাম কি হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের এক আবেদনপত্রে। বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বে একুশ হাজার হিন্দুর স্বাক্ষর-সংবলিত এই পত্রখানি কুলীনের বহু-বিবাহ নিবারক আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানিয়ে বাঙলার লাট সাহেবের নিকট পেশ করা হয়েছিল। আবেদনপত্রে বলা হয়েছে যে কুলীনের পত্নীসংখ্যা সাধারণত ১৫ থেকে ৮০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। বহু-পত্নীক কুলীনের পক্ষে সকল স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ি চিনে রাখা সম্ভব হতো না। এক কৌতুকপ্রিয় বহুপত্নীক কবি কুলীনের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন—

'বিয়া করাছি কুড়ি চারি,
চিনিনা সব শ্বশুরে বাড়ী,
কোন্ পথে যাব গো মা,
বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী।'

চিনতে না পেরে কুলীন স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করছেন 'মা'।

রাজা দশরথের রাণীর সংখ্যা নাকি ছিল সাতশ। চন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের রাণীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। মুসলমান আমীর ওমরাহ, সুলতান বাদশার হারেমে থাকত বহু রমণী। যাদের রমণী তারাই নিত তাদের ভরণপোষণের ভার। বল্লালের সৃষ্ট কুলীন ওমরাহদের সে দায় ছিল না। বিবাহের সময় তারা পেত পণ ও যৌতুক—বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি পদার্পণ করলে মিলত তার ভিজিট বা দর্শনী। বিবাহের সূত্রে আবদ্ধ নারীর প্রতি কুলীন স্বামী কোনো কর্তব্যই পালন করতো না। বিক্রমপুরের এক ছড়ায় কুলীন বলেছে—

ঘটি না দেই, বাটি না দেই,
শয্যায় না দেই ঠাঁই,
বিয়া কইর‍্যা ফালাইয়া রাখি
পোষে বাপ-ভাই।

এমন সুবিধের বিবাহ ছাড়া তো সহজ নয়। বিবাহ হল কুলীনের কুল-ধর্ম ও পেশা। অনেকেরই ঘর-বাড়ি থাকতো না। গোকুলের ষাঁড়ের মতো তারা চরে
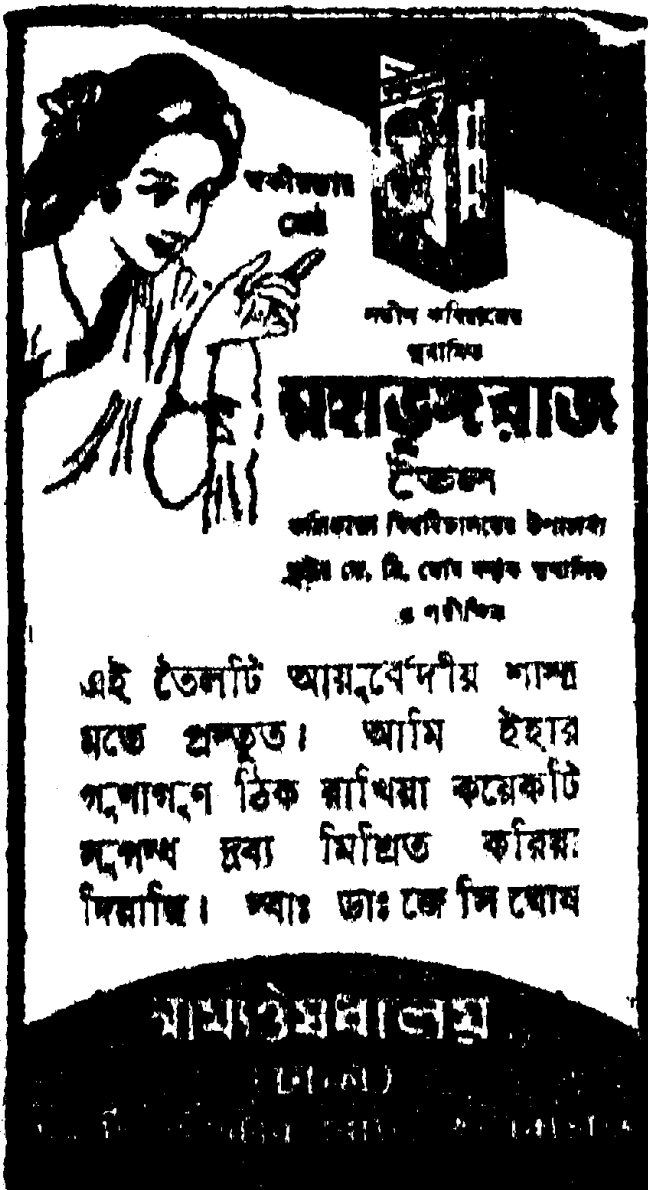
বেড়াতো শ্বশুরবাড়ির গোঠে গোঠে। কেউ বা ভর্তি হতো ধনী শ্বশুরের 'জামাই-ব্যারিকে'। কোনো কোনো জমিদার ও তালুকদার নিজ বাড়ি 'জামাই-ব্যারিকে' পরিণত না করে কুলীন জামাইকে বাড়ি করে দিতেন অদূরেই। ভরণ-পোষণের জন্য জামাইদের দান করা হতো জমি। আম্বারিয়া, জয়দেবপুর, কলস-কাঠি, পদ্মার কুক্ষিগত কাউলিপাড়া, সাকাজনগর, বটেশ্বর ও তারপাশা প্রভৃতি গ্রামে এভাবে গড়ে উঠেছিল কুলীন-কলোনী।

কনের দুর্ভিক্ষ

নারী ও পুরুষের সংখ্যার স্বাভাবিক হার প্রায় সমান হবে। একজন পুরুষ একটির বেশী বিবাহ করলে সমাজে কোনো কোনো পুরুষের ভাগ্যে পত্নী জুটবে না। একজন কুলীন এক পত্নী লাভের অধিকারী। কৌলিন্য প্রথার কৃত্রিম ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সে যদি চার কুড়ি নারী দখল করে বসে তাহলে উনআশী জন পুরুষের বিবাহের কনের অভাব ঘটবে। কুলীনে কন্যা দান করতো না এমন শ্রোত্রিয় ও বংশজের সংখ্যা ছিল খুবই কম। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কন্যা-বিক্রেতা পিতা কনের দর চড়িয়ে দিলে। কনের যত বয়স তার দর হতো তত শ' টাকা। হাজার টাকা পণে দশ বছরের মেয়ে বিবাহ করা ছিল অনেকের সাধ্যের অতীত। শ্রোত্রিয় বংশজের মধ্যে অকৃতদার পুরুষের সংখ্যা বেড়ে গেল। ছেলেবেলায় ছোটো দুটি গ্রামে প্রায় দশজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ চিরকুমার ব্রাহ্মণ দেখেছি। সে যুগে টাকা ছিল দুর্লভ। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। তার ওপর পুষতে হতো 'সদারপত্তি' কুলীন জামাই। কুলীনদের বোঝা বইতে বইতে অকুলীনরা হয়ে পড়তো নিঃস্ব। নিজেদের বিবাহের পণ জুটতো না তাদের। এভাবে বহু অকুলীন পরিবার নির্বংশ হয়ে গেছে। বিবাহ যাদের হতো তাদের মধ্যে বর-কনের বয়সের বৈষম্য থাকত বিস্তর। পণের টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় বরের বয়স যেত বেড়ে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষের সঙ্গে নয়-দশ বছরের মেয়ের বিবাহ অসাধারণ ছিল না। এ অবস্থা রূপায়িত হয়েছে মুখের কথায়—

যাবৎ বিবি বড় হবে,
তাবৎ সাহেব গোর পাবে।

চিরকুমারী কুলীন-কন্যাও ছিল ঘরে ঘরে। বল্লাল ও দেবীবরের শাসনে অনূঢ়া কুলীন-কন্যা ও অকৃতদার অকুলীনের মিলনের পথ ছিল রুদ্ধ। সমাজের বন্ধন মানুষকে চিরকাল কাম-জয়ী করে রাখতে পারে না। ভেতরের তাগিদে পত্নীলাভের নতুন উপায় বের করা হলো।

কনের ব্যবসা

কনের অভাবের মধ্যে ধূর্ত লোকেরা পেল অর্থোপার্জনের এক ভিন্ন পথের সন্ধান। তাদের পানসি চলতে শুরু করলো শীতললক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও সুরমার উজান বেয়ে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের অনুন্নত অঞ্চল থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মেয়ে সংগ্রহ করে তারা ফিরে আসত বিক্রমপুর। ঘটক ঘুরে ঘুরে সস্তা দরের এই তরুণীদের জন্য অকুলীন বর জুটিয়ে আনতো। তারপর হতো বিবাহের অভিনয়। অজ্ঞাত পরিচয়াদের বংশ-তালিকা রচিত হতো। কেউ কেউ মেয়ের ভাই বা মামার ভূমিকা অভিনয় করতো। মুস্কিল দেখা দিত বিবাহের পর। মেয়ের ভাষা ও আচরণে ফাঁস হয়ে যেত তার বংশের পরিচয়। সাঁঝ-বাতি দেবার সময় বৌর মুখ থেকে 'ঠাউকরাণ, চিরাগডা কই?' প্রশ্ন শুনে শাশুড়ীর বুঝতে বাকি থাকতো না যে বৌমা মুসলমানের মেয়ে। এক নতুন বৌ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের বাড়ি টানা হানা দেখি না ক্যান্?' মুসলমান ও তাঁতীর মেয়ের আত্মপরিচয় প্রকাশের পরও তাদের ত্যাগ করা হতো না। সমাজের প্রধানদের মুখ চাপা দেবার ব্যবস্থা চলতো মাত্র। ভরার মেয়েদের সমাজে থাকতে হতো মাথা নিচু করে। তারা কোনো সময় বাপের বাড়ী যেত না। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না। দেশের মেয়ে স্বামীর বাড়ি লাঞ্ছিত হলে ভয় দেখিয়ে বলতো, 'আমি কি (বান্ধব-হীন) ভরার মেয়ে এসেছি?'

পণের ব্যবসা শুরু হয়েছিল কখন তা জানা যায় না। যে দুজন ভরার মেয়ে দেখেছি তাদের বিবাহের সময় ছিল গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে। এ থেকে বোঝা যায় তখনও বাইরে থেকে বিক্রমপুরে মেয়ে আনা হত্তো। শিক্ষার প্রসার এবং মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বহু বিবাহের ব্যবসায় ভাটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কনের অভাব হ্রাস পেয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভরায় করে মেয়ে আনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বল্লাল সেন ও দেবীবর ঘটক। তাঁদের বাঁধন ভেঙে ভরার মেয়ে ঢুকে পড়লো ব্রাহ্মণের ঘরে। এভাবে প্রকৃতি নিয়েছিল তার দীর্ঘ বিলম্বিত প্রতিশোধ।

[কৌলিন্য প্রথার ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য আমরা স্যর হার্বার্ট রিসলি ও সাম্প্রতিক জনগণনার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয়ের নিকট ঋণী।]

দেশে বিদেশে

॥ স্তব্ধ সীমান্ত ॥

হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেছে। ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হতে চীনা আক্রমণকারীদের বন্দুক হতে আর কোন গুলী-বর্ষণ হয়নি। তার আগে পর পর ক' দিনের যুদ্ধে কেবলই পরাস্ত হচ্ছিল ভারত। নেফা সীমান্তে ওয়ালঙ ও বমডিলার পতন ও লদাক সীমান্তে চুশুলের পতনের আশঙ্কা রীতিমত আঘাত হেনেছিল ভারতের মনোবলের উপর। শত বিপর্যয়েও দিশাহারা হলে চলবে না, তাতে বিপদ আরও বাড়বে—এ কথা জানত ভারতবাসী, আর সে কারণে আরও অধিক সম্ভাব্য বিপদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সারা দেশ। সেই সময়েই এল এক অভাবিত সংবাদ, চীনের ব্যাপক আক্রমণের মতই যা ছিল এদেশ তথা বিশ্ববাসীর কল্পনাতীত। চীন জানাল, তার ২৪শে অক্টোবরের তিন দফা শান্তি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সে ভারতের সংগে মীমাংসাপ্রার্থী, এবং এ ব্যাপারে তার আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যেই সে স্বেচ্ছায় ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে।

ইতিপূর্বে যখন ঐ প্রস্তাবটি ভারতের কাছে চীন পাঠিয়েছিল তখন ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, চীন যদি সত্যিই ভারতের সংগে আপোষ করতে চায় তবে তাকে আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য সব আগে সৈন্যবাহিনীকে এই বছরের ৮ই অক্টোবরের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চীন তাতে কর্ণপাত করেনি এবং ভারত-ভূমির উপর সে নির্লজ্জভাবে তার আক্রমণ চালিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ চীনের এই পূর্ব প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি ও একতরফা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত সারা পৃথিবীর কূটনৈতিক মহলকেই হতবাক করে দেয়।

চীনের অতীত কার্যকলাপ যাদের জানা আছে তাদের কারও পক্ষেই এ প্রস্তাব সহজ মনে বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবুও চীনের এই নতুন সিদ্ধান্তকে একেবারে ধাপ্পাবাজী বলে উড়িয়ে দেওয়ারও কোন যুক্তি নেই। কারণ এমনিতেই চীনের আন্তর্জাতিক সুনাম আজ ভূলুণ্ঠিত। এ অবস্থায় তার নতুন করে একবার নিজেকে ধাপ্পাবাজ প্রমাণ করানোর কোনই যুক্তি থাকতে পারে না, বিশেষ করে যখন একথা তার খুব ভালভাবেই জানা আছে যে, তার এই হঠাৎ ঘোষণায় ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতিও শিথিল হবে না বা ভারতকে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তারাও এই সামান্য ঘোষণাটুকুতেই হাত গুটিয়ে নেবে না। বরঞ্চ ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত যদি বিনা বাধায় যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় পায় তবে তার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে সে বিরাট প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলতে পারবে। সুতরাং আমরা আমাদের প্রস্তুতির কাজ সামান্যতমও শিথিল না করে, বরঞ্চ এই সুযোগে তা দ্বিগুণিত করেও ধরে নিতে পারি যে, যে কোন কারণেই হোক, চীনের পক্ষে বর্তমানে আর অগ্রগমন সম্ভব হবে না।

কারণগুলি কি হতে পারে, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে প্রথমেই একথা বলা যেতে পারে যে, চীন একক শক্তিতে নির্ভর করে আর অগ্রসর হয়ে বিরাট এক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারে না। একথা চীনের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, পার্বত্য এলাকা থেকে যুদ্ধ যখন সমতলে নামবে এবং তার ফলে সারা ভারত জুড়ে যখন ব্যাপক ধ্বংসলীলা শুরু হবে তখন যুদ্ধ আর নিশ্চয়ই ভারত ও চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভারতকে আজ যে সব শক্তিশালী দেশ বিপুল সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তারা নিশ্চয়ই প্রবলতর শক্তির বিরুদ্ধে ভারতকে একা ক্ষতবিক্ষত

তেজপুরে হোমগার্ডবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর নারীদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত তথ্য-সন্ধানী মিশনের সদস্যগণ গত ২০শে নভেম্বর নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সফরকারী মিশনের নেতৃত্ব করছেন সেনেটর মাইকেল জে ম্যানসফিল্ড।

ও বিপর্যস্ত হতে দেখেও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে না। আর ভারতের পক্ষে যখন তারা যুদ্ধে নামবে তখন যে শুধু হিমালয়ের এই দুর্গম এলাকা দিয়েই তারা চীনকে প্রতি-আক্রমণ হানবে এমনও কোন কথা নেই। যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হলে ফর্মোসা, জাপান প্রভৃতির দিক থেকেও চীন আক্রান্ত হতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মত কোন প্রথম শ্রেণীর শক্তির সহায়তা ছাড়া এত বড় যুদ্ধের ঝুঁকি চীন এখনও পর্যন্ত নিতে পারে না। অথচ আজ পর্যন্ত উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে চীন যেভাবে তড়িৎগতিতে ভারতের কয়েকটি স্থান অধিকার করে নিয়েছে তাতে আর কাউকে না হলেও ভারত ও তৎপার্শ্ববর্তী এশিয়ার অন্যান্য ছোট দেশগুলিকে সে বোঝাতে পেরেছে যে, চীনের দাবীকে উপেক্ষা করা আজ তাদের কারও পক্ষেই নিরাপদ নয়। লাল-চীন হয়ত আপাততঃ এই লাভটুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে করছে, এবং বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকিও সে রাশিয়ার সক্রিয় সমর্থন ছাড়া নিতে চাইছে না। সুতরাং জয়ের মাথাতে অস্ত্রসংবরণ করাটাই বর্তমানে সে সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবতে পারে। এখনই অস্ত্রসংবরণ করে সে যদি স্বেচ্ছায় ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরে যায় তবে সে কোন দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, পরন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশকে সে বোঝাতে পারবে যে, অস্ত্রের জোরে নিজ দাবী পূরণের সামর্থ থাকলেও চীন প্রকৃতই শান্তিকামী। এসব দিক থেকে বিচার করলে চীনের এই সিদ্ধান্তকে মোটেই বিস্ময়কর বা নিছক ধাপ্পাবাজী বলে মনে হবে না। আজ জেতার মাথায় তার যে মহৎ ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ আছে পরাজয়ের দিনে তা কোনমতেই থাকবে না।

॥ নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ ॥

২০শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু সংসদে ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল থাপার স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ছুটি প্রার্থনা করায় তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তাঁর স্থানে লেঃ জেনারেল চৌধুরীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রাথমিক বিপর্যয়ের কারণ যে শুধু চীনা বাহিনীর উন্নততর রণনৈপুণ্যই নয়, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতাও তার জন্যে যথেষ্ট দায়ী এ চিন্তা এদেশবাসীকে প্রথম থেকেই পীড়িত করছিল। এ কারণেই চীনা আক্রমণ শুরু হওয়ার পর প ক্ষ কা লে র মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেননকে পদত্যাগ করতে হয়। আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ে প্রধান সেনাপতির দুর্বলতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে সকলের মনে প্রশ্ন জাগছিল, তাই জেনারেল থাপারের বিদায়কেও দেশবাসী সময়োপযোগী ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছেন।

সমরকুশলী সেনাপতিরূপে লেঃ জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর খ্যাতি দীর্ঘ দিনের। ইংরেজ শাসনের আমলেই বর্মায় জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি যথেষ্ট সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হায়দ্রাবাদ ও গোয়ায় ভারতের পুলিশী অভিযানের নেতৃত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়। জয়ন্তনাথের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাই আজ দেশবাসী ও সৈন্যবাহিনীর অপরিসীম আস্থা। আর এ কারণেই প্রধনমন্ত্রী যখন লোকসভায় লেঃ জেনারেল চৌধুরীকে নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন তখন লোকসভার সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে সে ঘোষণাকে সমর্থন জানান।

॥ ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান ॥

এক মাসের যুদ্ধে ভারত ও চীনের কত ক্ষতি হল তার পূর্ণ হিসাব কোন দিনই হয়ত পাওয়া যাবে না। কারণ চীন হয়ত তার পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক

হিসাব কখনও প্রকাশ করবে না। তবে ভারতের পক্ষে লোকক্ষয়ের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া গেছে। চীন সরকারের কাছে তথ্য পেয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ব্রিগেডিয়ার ডালভিসহ মোট ৯২৭ জন ভারতীয় সৈন্য চীনা আক্রমণকারীদের হাতে বন্দী হয়েছেন। অপরপক্ষে ভারত সরকারের পক্ষ হতে প্রকাশিত এক হিসাবে বলা হয়েছে, ২০শে অক্টোবর হতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধে ভারতের পক্ষে নিহত ও নিখোঁজ হয়েছে মোট ১৬২৩ জন সৈন্য। তার মধ্যে নিহতের সংখ্যা ২৬৪। তা ছাড়াও ঐ ক'দিনের যুদ্ধে আহত হয়েছে মাত্র ১৫৫ জন জওয়ান। জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদের সর্বাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এই হতাহতের সংখ্যা নিঃসন্দেহে সামান্য। নিখোঁজদের মধ্যেও অনেকে ফিরে আসবেন বলে ভারত সরকার আশা প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রথম দশ দিনের যুদ্ধে ভারতের পক্ষে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার মত সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল তা ঠিক নয় বলে ভারত সরকারের পক্ষ হতে জানানো হয়েছে। শুধু হতাহতের সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে একথা অনেকেরই মনে হবে যে, চীনা হানাদারদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল জমি ছেড়ে আসার আগে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কর্তারা খুব বেশী ঝুঁকি নেননি।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

অতর্কিত আক্রমণের জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল না। তার ওপর দীর্ঘকাল ধরে ভারত পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে আসছিল তাতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে ভারতের মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ ঘটার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। তাই ভারতের বিভিন্ন আপৎকালের মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে সক্রিয় সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকল সে সময় ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সেই দারুণ প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন প্রতিশ্রুতির প্রতীক্ষায় না থেকেই বিপন্ন ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে। একথা আমরা অকপটেই স্বীকার করব যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এভাবে সাহায্যের জন্য সাগ্রহে এগিয়ে না এলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত, এবং ভারতবাসীর মনোবল ভেঙে গিয়ে এক বিরাট জাতীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত। অবশ্য রাশিয়া নিরপেক্ষ থেকেও যে ভারতের অসীম কল্যাণের কারণ হয়েছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও রাশিয়ার নিরপেক্ষতা সমভাবেই আজ আক্রমণকারী চীনকে জয়ের মুখেও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে।

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিও ভারতকে সর্বভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এ ছাড়াও ভারতকে পূর্ণ সমর্থন জানায় ও চীনের নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ণ সাফল্য কামনা করে পৃথিবীর সকল মহাদেশের আরও অন্তত পঞ্চাশটি দেশ। তাদের কাছেও ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

ভারতের চরম বিপদের দিনে ভারতকে সবচেয়ে নিরাশ করেছে জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি, যাদের এতদিন ভারত তার নিকটতম বন্ধু বলে জেনে এসেছে। সরকারীভাবে একমাত্র মিশরই ভারতের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং ভারতের পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে যাতে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় তার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। এ কারণে রাষ্ট্রপতি নাসেরের কাছেও ভারত কৃতজ্ঞ। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে কিছুটা সমর্থন পেয়েছে ভারত, কিন্তু ঘানা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির তথাকথিত নিরপেক্ষ আচরণ ভারতকে রীতিমত বিব্রতই করেছে। আক্রান্ত ভারতের পাশে বৃটেন যে বন্ধুর মত এসে দাঁড়িয়েছে এটাও ঘানার প্রেসিডেন্টের মনঃপুত হয়নি। মুখ্যত এই তথাকথিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির আচরণের জন্যেই ভারতকে ভবিষ্যতে হয়ত তার পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে হবে।

দেশবাসী যে এই বিপদের দিনে কল্পনাতীতভাবে সাড়া দিয়েছেন তার জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর স্পর্ধা আমাদের নেই। আমরা যদি আমাদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করে থাকি তবেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করব।

॥ কাস্ত্রোর মত পরিবর্তন ॥

অবশেষে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ফিদেল কাস্ত্রোর মত পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্তকে তিনি জানিয়েছেন, কিউবা থেকে ২৮টি সোভিয়েট ইলিউশিন বোমারু বিমান তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দাবীমত সোভিয়েট ইউনিয়নকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। ডঃ কাস্ত্রো বলেছেন, বিমানগুলি খুবই পুরানো ধাঁচের এবং বেশী উঁচুতে ওঠার শক্তি তাদের নেই। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধে ঐ ধরণের বিমান একেবারেই অচল।

ভারতের নূতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৫ই নভেম্বর—২৯শে কার্তিক ঃ নেফার ওয়ালঙ এলাকায় শত্রু (কম্যুনিষ্ট চীন) কবলিত একটি ঘাঁটি পুনর্দখল—ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা অভিযানের জের ১৪ হাজার ফুট উচ্চ সে-লা গিরিপথ 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে মুখরিত।

জরুরী অবস্থাধীনে সমগ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের এন-সি-সি ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা—দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠনে ভারত সরকারের নূতন প্রস্তাব।

১৬ই নভেম্বর—৩০শে কার্তিক ঃ ওয়ালঙ অঞ্চলে চীনাদের ব্যাপক পুনরাক্রমণ—২০শে অক্টোবরের পর বৃহত্তম অভিযান—ভারতীয় জওয়ানদের দুর্জয় প্রতিরোধে চীনা অগ্রগতি ব্যাহত।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জরুরী অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে চীনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা—শেষ রক্তবিন্দু দিয়া হানাদারদের হটাইবার দৃঢ় সংকল্প—চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপনকারী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কংগ্রেস) কর্তৃক চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী।

১৭ই নভেম্বর—১লা অগ্রহায়ণ ঃ প্রচণ্ড লড়াই-এর পর ভারতীয় জওয়ানদের ওয়ালঙ ত্যাগ—জং এলাকায় চারবার শত্রু (চীন) আক্রমণ প্রতিহত।

রাজ্য বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্টদের প্রতি আরও ধিক্কার।

'বজ্রকঠিন সংকল্প লইয়া কম্যুনিষ্ট চীনকে প্রতিরোধ করিতে হইবে'—ময়দানের (কলিকাতা) বিশাল জনসভায় আচার্য কৃপালনীর আহ্বান ঃ সূচাগ্র ভূমি চীনা দখলে থাকা পর্যন্ত আপোষের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

১৮ই নভেম্বর—২রা অগ্রহায়ণ ঃ নেফা অঞ্চলের সে-লা গিরিবর্ত্ম চীনা হানাদারদের কবলিত—সুবর্ণশ্রী এলাকায় চীনাদের নূতন আক্রমণ-প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য ভারতীয় সৈনেন্‌র মরণপণ সংগ্রাম।

সাময়িক বিপর্যয়ে বিচলিত না হইবার জন্য জাতির প্রতি শ্রীনেহরুর আবেদন—আক্রমণকারীদের তাড়াইবার জন্য প্রতিটি বিপর্যয়কে নূতন সংকল্পে পরিণত করার উপদেশ—দিল্লীর আঞ্চলিক বাহিনী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর তেজোদ্দীপক বক্তৃতা।

বর্ধমানে চীনা-আক্রমণ-বিরোধী মিছিল আক্রান্ত—উত্তেজিত জনতা কর্তৃক স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি অফিসে হানা—সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত ঃ দুইজন শোভাযাত্রী ছুরিকাহত ঃ কম্যুনিষ্ট এম-এল-এ (শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়) সহ ৫১ জন গ্রেপ্তার।

১৯শে নভেম্বর—৩রা অগ্রহায়ণ ঃ প্রবল সংগ্রামের পর বমডিলা'র (কামেং সীমান্ত বিভাগের সদর) পতন—চুশূল এলাকাতেও (লাডাক) একটি ঘাঁটি হাতছাড়া—বিপর্যয় সত্ত্বেও আক্রমণকারী চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের সর্বত্র বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কর্তৃক চীনা হানাদার বিতাড়নে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ—শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের আহ্বান—কম্যুনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে আরও ধিক্কারধ্বনি বর্ষণ।

'বিপর্যয় সত্ত্বেও জয় সুনিশ্চিত ঃ শত্রু বিতাড়ন না করিয়া নিরস্ত হইব না'—বেতারে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২০শে নভেম্বর—৪ঠা অগ্রহায়ণ ঃ লেঃ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ (অস্থায়ী) নিযুক্ত।

চুশূলে রক্ষায় ভারতীয় বাহিনীর দৃঢ়তা—বমডিলা ও ওয়ালঙের দক্ষিণে আক্রমণকারী চীনা ফৌজের সহিত সংগ্রাম—ফুটহিলের দিকে চীনাদের অগ্রগতি।

২১শে নভেম্বর—৫ই অগ্রহায়ণ ঃ 'চীনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে'—পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—প্রস্তাবের সাধুতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে ঘোর সন্দেহ।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ প্রায় ৬০ জন চীন-দরদী কম্যুনিষ্ট আটক—ভারতরক্ষা ও নিরাপত্তা আইনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাড়ে তিন শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

॥ বাইরে ॥

১৫ই নভেম্বর—২৯শে কার্তিক ঃ কিউবা হইতে জেট বোমারু বিমান অপসারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মতি।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে শ্রীচ্যবনের শপথ গ্রহণ।

মধ্যরাত্রি হইতে সমগ্র সীমান্তে গুলীবর্ষণের বিরতি।

নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত—দীর্ঘ পরামর্শের পর রুশ-মার্কিন মতৈক্য।

১৬ই নভেম্বর—৩০শে কার্তিক ঃ পশ্চিমী মিত্রবর্গ ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করায় পাকিস্তানের গাত্রদাহ—করাচীতে বিভিন্ন মহলে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ—স্থানে স্থানে প্রতিবাদ দিবস পালন।

চীন-ভারত যুদ্ধের অবসানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা—রাষ্ট্রসংঘে ৩৫টি নিরপেক্ষ দেশের বৈঠক।

১৭ই নভেম্বর—১লা অগ্রহায়ণ ঃ লিওপোল্ডভিলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা—কঙ্গোলী প্রেসিডেন্ট জোসেফ কাসাভবু কর্তৃক আদেশ জারী—লিওপোল্ডভিল প্রদেশে ক্রমাগত হত্যা ও সশস্ত্র ডাকাতি সহ অরাজকতার জের।

'ভারতকে প্রদত্ত অস্ত্রের অপব্যবহার হইবে না'—পাক সরকারকে আমেরিকার আশ্বাস দান।

১৮ই নভেম্বর—২রা অগ্রহায়ণ ঃ প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে (ইন্দোনেশিয়া) হত্যা করার ষড়যন্ত্রের জের—সামরিক আদালত কর্তৃক ৭ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।

কিউবার উপর দিয়া বেসামরিক বিমান চলাচলও নিষিদ্ধ—কাস্ত্রো সরকারের (কিউবা) কার্য-ব্যবস্থা।

১৯শে নভেম্বর—৩রা অগ্রহায়ণ ঃ মিঃ চৌ এন লাই-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) সহিত পিকিং-এ ভারতীয় দূত শ্রী পি কে ব্যানার্জির বৈঠক ঃ চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন ই'রও আলোচনায় যোগদান।

মস্কোয় সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক দলীয় কর্মনীতি বিশ্লেষণ।

আমেরিকার নিকট ভারতের আরও অস্ত্রসাহায্য প্রার্থনা—ওয়াশিংটনে মিঃ কেনেডি'র (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বি কে নেহরুর আলোচনা।

২০শে নভেম্বর—৪ঠা অগ্রহায়ণ ঃ চীন সরকার কর্তৃক অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা—২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হইতে ব্যবস্থা বলবৎ—১লা ডিসেম্বর হইতে সৈন্যাপসারণ শুরু।

ভারতের জন্য বৃটেনের উদ্বেগ—আরও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা।

আমেরিকা কর্তৃক কিউবায় নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার।

২১শে নভেম্বর—৫ই অগ্রহায়ণ ঃ ভারতের অভিমুখে মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক মিশনের যাত্রা—চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের যুদ্ধাস্ত্রের চাহিদা নিরূপণই লক্ষ্য।

সমকালীন সাহিত্য

।। বন্দে মাতরম্ ।।

অভয়ংকর

চীনের ভারত আক্রমণ উপলক্ষ্যে একটা কথা উঠেছে যে প্রগতিশীল ক্ষুদ্র দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। দেশপ্রেমটা নাকি নিছক অপ্রগতিমূলক মনোভাব। আমাদের দেশের অনেক লোক আছেন যাঁরা কাকে কান নিয়ে গেল শুনে কাকের পিছনে দৌড়েছেন, কানে হাত দিয়ে যাচাই করার অপেক্ষা রাখেননি কানটা আছে কি নেই।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ তারিখে স্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে একটি বক্তৃতা দেন, তার অংশ বিশেষ উধৃত করছি, মরিস হিনডাসকৃত Russia Fights on গ্রন্থে সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি পাওয়া যাবে। সেদিন কমরেডদের উদ্দেশে স্টালিন বলেছিলেন,—'আপনারা কি চান আমাদের সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ তার স্বাধীনতা হারাবে? আমরা পরাজয় চাই না!'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় স্বদেশপ্রেমের জোয়ার এল। গভীরতর অভীপ্সা, মহত্তর আত্ম-বলিদানের বিস্ময়কর প্রেরণায় সমগ্র জাতি মেতে উঠল। চারিদিকে কমসোমল কমিটির দেয়ালে দেয়ালে লেখা হোল—

'দেশপ্রেমহীন মানুষের সমাজে কোনও স্থান নেই'

মরিস হিনডাসকে কেন্দ্রীয় কমসোমল কমিটির সেক্রেটারী সুন্দরী তরুণী ওলগা মিশাকোভা বল্লেন:

> "প্রধানতঃ আমরা চাই আমাদের যুব সম্প্রদায় দেশপ্রেমিক হোক। অন্তরে তাদের দেশপ্রাণতা থাক, অতীতে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে এবং সোভিয়েট-তন্ত্রাধীনে যা করা হবে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাক। দেশপ্রেম জীবনের আকর বস্তুর অন্যতম—দেশপ্রেম পবিত্র সম্পদ।"

প্রখ্যাত রুশ লেখক বোরিস গর্বাটোভ 'Letters to a Comrade' নামক পত্রে লিখেছিলেন:—

> "মাতৃভূমি কি শক্তিশালী বাক্য। ২১ মিলিয়ন কিলোমিটার ও দুশো মিলিয়ন সহ-দেশবাসীকে ঘিরে রেখেছে এই মাতৃভূমি। তবু সকলের কাছে যে স্থানে ও যে বাড়িতে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেই তার মাতৃভূমি। তোমার আমার কাছে ডনবাসিনের খনি এই মাতৃভূমির উৎস। একই ধূসর আগাছার ভেতর তোমার ও আমার কুটির। এখানে কেটেছে যৌবনের সোনালী দিন। পাহাড়ের নিম্নভূমি যেন অন্তহীন সমুদ্র, দিগন্তপ্রসারী। আর সৌম্য গম্ভীর আকাশ।...... সোভিয়েট জনগণ আমাদের স্বপ্ন, আমাদের গর্ব।"

আলেকসী টলস্টয়, মিখাইল সলোকোভ, টিয়ানোভ, কনস্টানটাইন সিমানোভ, এলাইয়া এরেনবুর্গ প্রভৃতি সোভিয়েট রাশিয়ার লেখকবৃন্দ দেশপ্রেমের প্রশস্তি গানে রাশিয়ার জনগণের মনে বিশেষতঃ সৈন্যগণের মনে প্রেরণা জাগিয়েছেন। তার মধ্যে কোনো কোনো আবেদনে আছে গীতিকবিতা বা প্রার্থনা-সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী আবেদন। সৈনিকের উদ্দেশ্যে এরেনবুর্গ বলেছিলেন:—

> "তোমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছে কৃশাঙ্গী তরুণী ট্যানিয়া (জয়া কসমোডেমিনস্কয়া), সেবাস্তপোলের দৃঢ়চিত্ত নৌ-সেনাদল। তোমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছেন স্মরণীয় পূর্বসূরীগণ, যাঁরা এই বিশাল দেশকে একসূত্রে বেঁধেছেন! প্রিন্স ইগোর নাইটবৃন্দ বা ডিমিট্রিদল। তোমাদের সঙ্গে মার্চ করে চলেছেন, সেই বীর সেনানীদল যাঁরা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে অপরাজেয় নেপোলিয়ানকে বিতাড়ন করেছেন। তোমাদের সঙ্গে চলেছেন বুদেনীর সৈন্যদল, চাপাইয়েভের স্বেচ্ছাবাহিনী, নগ্নপদ, বুভুক্ষিত সর্বজনবিজয়ী সৈন্যদল। তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমাদের সন্তান, জায়া ও জননী। তাদের আশীর্বাণী তোমাদের শিরে। এদের জন্য তুমি আনবে শান্তিময় অবসরের দিন, স্ত্রীর জন্য প্রত্যাবর্তনের মধুরক্ষণ, আর সন্তানের জন্য অপার আনন্দ।

> "সৈন্যদল, তোমার সঙ্গে অভিযানে চলেছে সারা রাশিয়া। রাশিয়া তোমার পাশে পাশে চলেছে। শোনো তার পদধ্বনি, যুদ্ধের ভয়ংকর মুহূর্তে তোমাকে মধুর বাক্যে সেই রাশিয়া পরিতৃপ্ত করবে। সেই রাশিয়া দেবে বাহুতে শক্তি ও অন্তরে সাহস। যদি বিজয়ী হও আলিঙ্গন করবে।

> "দেশপ্রেমহীন মানুষের সমাজে কোনও স্থান নেই।"

৭ই নভেম্বর, ১৯৪১-এর বক্তৃতায় স্টালিন Predki—বা পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেছেন প্রেরণা লাভের জন্য। স্বদেশের সংকটে Stariki—বা বৃদ্ধদের স্মরণ করা হয়েছে। স্বদেশ ও স্বাধীনতা, Semya (পরিবার) ও Rodina (পিতৃভূমি)-র প্রতি শ্রদ্ধা রাখো। সূর্যবিহনে যেমন অন্ধকার ও নিশ্চিন্ত মৃত্যু তেমনি পরিবার ও স্বদেশ ভিন্ন সবই শূন্য ও অসার্থক। স্বদেশ পরিবারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আর এই পরিবারই সেই স্বদেশকে অনধিগম্য, অনতিক্রম্য করে রেখেছে।"

স্টালিনের অতিবড় শত্রুও তাঁকে রিভিশনিস্ট কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বলতে পারবেন না। স্বদেশের মূল্য যে বোঝে না দেশপ্রেম যার অন্তরে নেই, সে মানুষের স্বদেশে স্থান নেই, শত্রুর আগমনের পথ যে দেশদ্রোহী খুলে দেয়, ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।

জননী জন্মভূমির দুর্দিনে তাই অতীতের পুনরাবিষ্কার প্রয়োজন। রাশিয়াও করেছিল। যে টলস্টয়কে তারা দূরে সরিয়ে রেখেছিল বিপদের দিনে তাঁকে স্মরণ করেছে।

আমরা যুদ্ধ করিনি, তবু আমাদের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছেন, দেশপ্রেমের মহিমা কীর্তন করেছেন। স্বদেশপ্রেমাত্মক প্রথম কবিতা লিখেছিলেন ১৮২৭-এ ডিরোজিও ইংরাজীতে। সে কবিতায় পরাধীনতার বেদনা পরিস্ফুট—

> "Where is that glory, where
> that reverence now?
> Thy Eagle pinion is chained
> down at last — "

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন:—

> 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
> কে পরিবে পায়।।"

কিন্তু স্বদেশকে মা বলে প্রথম স্মরণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৪৮-এ লিখিত এক কবিতায়। হিন্দু মেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন নব-জীবনের গান। সেই গানটি অত্যন্ত ভালো লেগেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। এ গান সারা ভারতে ধ্বনিত হোক এই ছিল তাঁর বাসনা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আবার জোয়ার এলো। স্বদেশ মাতৃসমা, তাঁর পূজায়, তাঁর সেবায় জীবন পণ করতে হবে, এই ছিল সেদিনের কবিদের বক্তব্য। দ্বিজেন্দ্র-লাল লিখেছিলেন—

"সাজ সাজ সকলে রণ সাজে
শুন ঘন ঘন ভেরী বাজে
চল সমরে, দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।।

রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি মা এই দেশে'। 'ও আমার দেশের মাটি', 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী', 'স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি,' প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্র-লালের—'ভারত আমার, জননী আমার', 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা', রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', অতুলপ্রসাদের 'বল বল বল সবে' ও কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের—'যায় যেন জীবন চলে, বন্দে মাতরম বলে—'।

এই সব গান আমাদের অতীতে প্রেরণা দিয়েছে, এই সংকটে আবার নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

অনেকের হয়ত স্মরণ নেই, কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯২৮—২৯-এ একটা সম্বর্ধনা দান করা হয়। 'বাংলার কথা' দৈনিকের গোপাললাল সান্যাল ও কবি সুবোধ রায় সেই সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি সেদিন বলে-ছিলেন,—'নজরুলের গান গেয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্চ করে যাব।' সে কথা সত্য হয়েছে।

* *

কাজী নজরুলের দেশপ্রেমের গান ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙালীকে মাতিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এই কালে অপর কোনো কবির দেশপ্রেমের গান এমনভাবে প্রেরণা দান করতে পারেনি।

আজ দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে প্রয়োজন এই গৌরবময় অতীতকে পুনরাবিষ্কার করা। দেশের মধ্যে দীর্ঘ-দিনের জড়তার ঘোর কাটিয়ে তুলতে, দেশপ্রেমের বন্যায় দেশকে মাতিয়ে তুলতে চাই—পুরাতন গান, পুরাতন সাহিত্য। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে রাশিয়া এইভাবেই বিজয়ী হয়েছিল সে কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

নতুন বই

সাহিত্য ও শিল্পলোক— (প্রবন্ধ) **দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। এ মুখার্জি এন্ড কোং, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২, পাঁচ টাকা।**

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের এই প্রবন্ধ-সংগ্রহটিতে সাহিত্য ও শিল্পের প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। নিপুণ বিশ্লেষণের আলোয় লেখক বুঝিয়েছেন, সাহিত্য ও শিল্পের উদ্ভব যদিও জীবন থেকে এবং যদিও তা ব্যাখ্যা করে জগৎকে, তবু সার্থক সৃষ্টি জগৎ ও জীবনের বাস্তব রূপ অতিক্রম করে দুর্নিরীক্ষ্য রসের স্তরে উন্নীত হয়। সেই রসের প্রকৃতি ও প্রাণই ব্যাখ্যা করে-ছেন গ্রন্থকার, আলোচ্য বইয়ের প্রথম স্তবকে গৃহীত ছ'টি প্রবন্ধে। দ্বিতীয় স্তবকে গ্রথিত হয়েছে তাঁর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কীয় এক গুচ্ছ প্রবন্ধ। এগুলি তত্ত্বমূলক নয়, তথ্য বিচারাশ্রিত রচনা এবং বলাই বাহুল্য, নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। লোক-সাহিত্য ও লোকসংগীত, গণসচেতন সাহিত্য, রম্যরচনা, যুগান্তকারী উপ-ন্যাস প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির কথা বলছি। বইটি জিজ্ঞাসু ও বিচারশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন, দৃঢ় এবং বাহুল্যশূন্য, বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদও সুন্দর।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী— (প্রবন্ধ) **বিশ্বভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।**

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চার খণ্ডে রবীন্দ্র-জীবনী রচনা করেছেন। দীর্ঘ-কাল তিনি বিশ্বভারতীর সংগে জড়িত। বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আজও তিনি আমাদের সামনে আছেন। শান্তি-নিকেতন-বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ ইতিহাস এবং অন্তর্লীন সত্যকে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে বর্তমান গ্রন্থ-রচনা।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাস-প্রসঙ্গে এসেছে বীরভূমের রায়পুর, সুপুর, সুরুল, বোলপুরের ইতিহাস। ১৮৬৩ সালের ১লা মার্চ দেবেন্দ্রনাথ ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট প্রতাপনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে ভুবনডাঙ্গার ২০ বিঘা জমির বন্দোবস্ত নেন। এখানে গড়ে ওঠে দেবেন্দ্রনাথের সাধনপীঠ। বহু পরিশ্রমের পর স্থানটি মনোরম করে তোলা হয়। তারপর ১৮৭৩ সালে ১১ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এখানে আসেন। মহর্ষি ১৮৮৩ সালে সর্বশেষ শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৮ সালের ১৯শে অক্টোবর। তারপর নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়, লরেন্স, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির শিক্ষকতায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। ১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র রায় নামে যে তরুণ শিক্ষক আসেন তাঁর নাম শান্তিনিকেতনের সংগে গভীরভাবে যুক্ত। ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তারপর ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের উন্নতি ঘটতে থাকে খুবই দ্রুত। শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন, ব্যবস্থাপনায় উন্নততর ব্যবস্থা, শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের আগমন ঘটে। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস বহু জটিলতায় পূর্ণ। বর্তমানে গ্রন্থকারের গবেষণাধর্মী মননধর্মীতায় তা সুন্দররূপে প্রতিভাত। বিদেশের ছাত্র-শিক্ষকেরা এসে শান্তিনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন কেমনভাবে তারও পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থ থেকে। কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অনেকের চোখেই বিস্ময়কর বলে মনে হবে। বিশ্বভারতীর সংগে রবীন্দ্রনাথের নাম মিশে আছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক আনয়ন, অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থাপনা, ত্রিশ বৎসর ধরে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। বহু মানুষের সাধনার পীঠস্থান 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' আজ ভারতীয় মাত্রেরই গৌরবের স্থান। তার অতীত ইতিহাসের এই সুনিপুণ ও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা একটি অভাব দূর করল সত্য। বিশেষ করে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। আশা করি গ্রন্থের সম্পূর্ণ খণ্ড তিনি রচনা করেও যেতে পারবেন।

কত রঙ—(উপন্যাস)— প্রভাত দেবসরকার ।। গ্রন্থপীঠ ।। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ।। কলিকাতা-৬ ।। চার টাকা ।।

প্রভাত দেবসরকার ছোটগল্পের সার্থক রূপায়ণে খ্যাতি অর্জন করেছেন। চরিত্র-চিত্রণে এবং ঘটনা-সংস্থাপনে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় ইতিপূর্বে তাঁর গল্প-উপন্যাসে পাওয়া গেছে। 'কত রঙ' তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি একালের এক সরকারি অফিস, যেখানে বাঙালী মেয়ে-পুরুষ সামাজিক বিবর্তনে একাত্ম হয়ে জীবিকা অর্জনে এসেছেন। চাকুরীজীবির জীবনের যে ভালো এবং মন্দ দিক আছে যে বিচিত্র জগতে তাঁরা বিচরণ করেন আলোচ্য উপন্যাসে তারই কাহিনী বিধৃত। কেরানী-মনস্তত্ত্ব এক অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র, বিশেষতঃ আধুনিককালের কেরানী-জীবন। লেখক সেই বাস্তব-জগতের সম্মুখীন হয়েছেন। সেই রাজ্যে বাঙালী প্রগতিশীলা স্বাধিকার প্রমত্তারা কেমন ভীড়ে গেছে, বড় সাহেব, ছোট সাহেব, তাদের প্রীতি এবং প্রতিকূলতা কোথায় নিয়ে যায় তার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন লেখক। তরফদার সাহেব, লাবণ্য, মন্দিরা, সীতা, সেনচৌধুরী, মীনাক্ষী ইত্যাদি চরিত্র সরকারি অফিসের অতি-পরিচিত চরিত্র। সেই জনতার মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সুধীরবাবু। তাই তিনি যখন শোনেন—রায়সাহেব চলে গেছেন, তরফদার বড় সাহেব হয়েছেন, মীনাক্ষী বিয়ে করে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, লাবণ্যও রিজাইন করেছে, বীণাদি তেমনি আছে। তখন ভাবে দু'বছরে দুনিয়া কত বদলেছে। অতিশয় দক্ষতা ও সংযমের সংগে লিখিত উপন্যাসটি এ যুগের এক ডকুমেণ্টারি। ছাপা প্রশংসনীয়।

প্রাণতরঙ্গ ।। (উপন্যাস) —প্রফুল্ল রায়চৌধুরী ।। মুকুন্দ পাবলিশার্স ।। ৮৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা। দাম সাড়ে ছ'টাকা।

প্রফুল্ল রায়চৌধুরীর অন্য কোনও উপন্যাস দেখেছি স্মরণ হয় না। 'প্রাণতরঙ্গ' কিন্তু পাকা হাতের পরিচয়। শিক্ষক-আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সংবাদপত্র অফিসের ব্যস্ততার মধ্যে, টেলিপ্রিন্টারে খবর আসে, আর নাইট এডিটর গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেই সংবাদ সাজিয়ে চলেছেন। এমন সময় শিক্ষক-আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট টিচারেরা রাজভবনের সামনে বসে আছেন, তাঁদের পুলিশে ধরে নিয়ে যেতে পারে। সোমেন সাব-এডিটর সে সংবাদ দিচ্ছে। সোমেন ও বিকাশ এ যুগের মানুষ। তারা ব্যথা ও বেদনা বোঝে, সংবাদপত্রে কাজ করে, নিউজ কি করে 'কিল' করতে হয় জানে না। শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিযান সোমেনের মনকে আন্দোলিত করে। মলিনা আর সাদা শাড়িপরা ক্রীশ্চান মেয়েটি, যে বাজনা শিখিয়ে খাওয়া-পরার সংস্থান করে তার কথা ভাবে। সোমেনের মনে বিষাদে মেশানো যে আনন্দ—তার নাম অনুপমা। শেষ পর্যন্ত সোমেন অনুপমার কাছেই ধরা দিয়েছে। কিন্তু সুবৃহৎ উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাসে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেছে, যে লিপিকুশলতা এবং শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান কালের পটভূমিকায় এমন একখানি সার্থক উপন্যাস কদাচিৎ চোখে পড়ে। বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনের পরিচয় লেখক দিয়েছেন। তজ্জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।
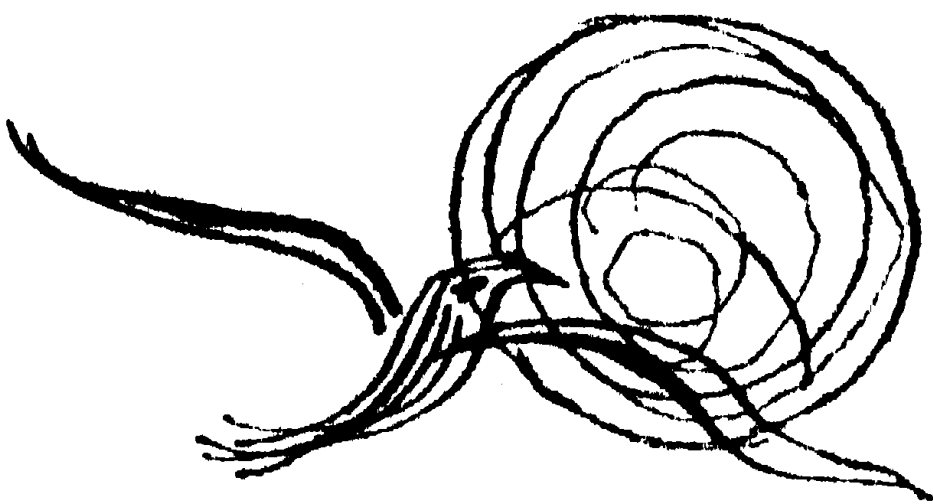
প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

শয়তানের মুখে শান্তিবাণী :

২১এ নভেম্বর, পিকিং সময় মধ্যরাত্রি (ভারতীয় সময় রাত্রি ৯॥টা) থেকে নেফা এবং লাদক রণাঙ্গনে বহু শত বর্গমাইল ভারতভূমি অধিকার করবার পর পররাজ্যগ্রাসী চীনাবাহিনী অস্ত্রসংবরণ করেছে সীমান্ত-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার যে শেষ প্রস্তাব পিকিং থেকে এসেছে, তারই প্রথম শর্ত হিসেবে। সদা শান্তিকামী ভারতও অস্ত্রসংবরণকারী চীনাবাহিনীর উপর গুলী-গোলা ছোঁড়া বন্ধ করেছে পরবর্তী শর্তগুলি চীন কিভাবে পালন করে, তা' সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করবার অধীর প্রতীক্ষায়।

মদমত্ত চীনাবাহিনী যখন বিভিন্ন রণাঙ্গনে পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে প'ড়ে ভারতীয় জোয়ানদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাদের অগ্রগতির পথকে দীর্ঘায়ত করছিল, ঠিক সেই সময়ে চীনের কাছ থেকে এই শান্তি-প্রস্তাব জগতের বহু ঝানু রাজনীতিজ্ঞকেই বিভ্রান্ত করেছে; কিন্তু প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে, চীনের এই শান্তি-প্রস্তাব একটি চালবাজী ছাড়া কিছুই নয়। বর্বর শয়তানের মুখ থেকে শান্তির বাণী ঘোষিত হবার কারণ বড় গূঢ়।

পণ্ডিত নেহেরু বারংবার বলেছেন, ভারতের এক ছটাক জমিও যতক্ষণ শত্রু-কবলিত থাকবে, ততক্ষণ আমরা শান্ত হব না। সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের ভার আমাদেরই উপর। রণদক্ষ সৈনিক, আধুনিকতম অস্ত্র, পর্যাপ্ত রসদ এবং সর্বোপরি অটুট মনোবল জোগাবার ভার আমাদেরই ওপর। রঙ্গজগৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শিল্পী, কলাকুশলী, কর্মী ও সাংবাদিককে এই কথা স্মরণ রাখতে অনুরোধ জানাই। পবিত্র ভারতভূমি থেকে শেষ শত্রুটি বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই।

দর্শকরুচি :

বীজ আগে, না বৃক্ষ আগে?—এই প্রশ্ন নানা আকারে আবহমান কাল ধ'রে চলে এলেও বাইবেলের "ঈশ্বর কহিলেন, আলোক হউক এবং আলোক হইল" বা ডারউইনের "থিয়োরি অব ইভলিউশান"-কে যদি মানতে হয়—বিজ্ঞান অবশ্য আমাদের ডারউইনের থিয়োরি মানতেই বলে—, তাহ'লে গোড়ায় বীজের অস্তিত্বকেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সকল শিল্পকলার মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্প হচ্ছে অত্যন্ত জটিল এবং কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। একজন চিত্রকরের ছবি আঁকবার জন্যে দরকার একটুকরো কাগজ বা কাপড় এবং কিছু রঙ-তুলি। একটি হার্মোনিয়ম বা তানপুরা থাকলেই গায়ক তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেন; সুরসৃষ্টির জন্যেও এর বেশী যা লাগে, সে হচ্ছে কিছু কাগজ ও কলম। আর সাহিত্য বা কবিতা রচনার জন্যে মাত্র কাগজ-কলমই যথেষ্ট। অবশ্য ভাস্কর্যের জন্যে কিছু ভারী জিনিসের দরকার হয়—শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর এবং খোদাই কাজের জন্যে বিভিন্ন আকারের ছেনি ও হাতুড়ী। কিন্তু একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে?—ক্যামেরা, সাউণ্ড-রেকর্ডিং মেসিন প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি থেকে শুরু ক'রে কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সংগীত-পরিচালক, আলোকচিত্র-শিল্পী, শব্দযন্ত্রী, শিল্পনির্দেশক, সম্পাদক প্রভৃতি সমেত এক বিরাটকায় কর্মিসংঘের সঙ্গে অল্প বা বেশী সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ। এবং এই সমাবেশ ঘটাতে গেলে যে বেশ কয়েক সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ছবিটিকে জনপ্রিয় তারকাখচিত করতে গেলে অর্থের পরিমাণটা কয়েক লক্ষে গিয়ে পৌঁছোয়।

'মা-বেটা' চিত্রে নিরূপা রায়

সৃষ্টিতত্ত্বের এই দার্শনিক প্রশ্নের মতই নন্দনতত্ত্বের বিচারে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, দর্শকরুচির দৈন্যের জন্যেই খারাপ চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হয়, না খারাপ চলচ্চিত্রই দর্শকরুচিকে উন্নত হতে দিচ্ছে না? দর্শকের গতানুগতিক, অমার্জিত, অপরিশীলিত রুচির জন্যেই প্রযোজকরা জাঁকজমকবহুল, নৃত্যগীতপূর্ণ যৌন-আবেদনে ভরা নিম্নস্তরের ছবি তৈরী করতে বাধ্য হন, না আর্থিক সাফল্যকে একমাত্র লক্ষ্য রেখে তৈরী এই সব ছবিই দর্শকরুচিকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিকৃত করছে?

এই ব্যয়বাহুল্যই চলচ্চিত্র শিল্পকে মাত্র শিল্পকলা বা আর্টের গণ্ডীতে থাকতে না দিয়ে একটি বৃহত্তর ব্যবসায়ের

রূপে পরিগ্রহ করতে বাধ্য করেছে এবং এরই জন্যে একে একটি বৃহৎ দর্শক-গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। প্রথম জীবনে পাঠকসমাজের স্বীকৃতির অভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্ব-কবি হওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু কোনো চলচ্চিত্র-প্রযোজকের দু'তিনখানি ছবি যদি জনপ্রিয়তার অভাবে আর্থিক দিক দিয়ে অসাফল্য বরণ করে, তা'হলে তাঁকে চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্র থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিতে বাধ্য হ'তে হয়। চল-চ্চিত্র-পরিচালকদের সম্বন্ধেও প্রায় সমান কথাই বলা চলে। কাজেই যথার্থ সৃষ্টি-ধর্মী চলচ্চিত্র-প্রযোজককেও এর ব্যব-সায়িক দিকের কথা মনে রেখে চলতে গিয়ে বহু রকম আপোষ-মীমাংসায় আসতে হয়। এবং এর ফলে তাঁর শিল্প-স্বাধীনতা হয় ক্ষুণ্ণ।

অবশ্য গণমানসে প্রচুর প্রভাব বিস্তার-কারী আর্ট হিসেবে চলচ্চিত্রের এই দর্শক-নির্ভরতা এক হিসেবে শুভকর। চলচ্চিত্র রচনায় বেপরোয়া অসংযম, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কল্যাণবোধের অভাব অত্যন্ত মারাত্মক। দর্শকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত করতে হয় ব'লে রুচি বা নীতিগত শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা প্রযোজককে করতেই হয়। ছবির বিষয়-

জাওলা প্রোডাকশনের 'দুই বোন' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার ও কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়

বস্তু থেকে শুরু ক'রে তার গঠন-পারিপাট্য পর্যন্ত সব বিষয়েই যাতে বৃহত্তর দর্শকসমাজের অনুমোদন পাওয়া যায়, সে দিকে তাঁকে সতর্ক লক্ষ্য রাখতেই হয়। মনে করা যেতে পারে, কোনও চলচ্চিত্রের সৃষ্টির ব্যাপারে বৃহত্তর দর্শকসমাজও একটি বড় অংশী-দার এবং সেই কারণে এ-ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্বও আছে অনেকখানি।

সমাজ এবং সাহিত্য যেমন পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে দর্শক-সমাজ এবং চলচ্চিত্রও তেমনই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দর্শক-সাধারণের রুচি যেমন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু বা তার গঠন-সৌকর্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, ঠিক তেমনই চলচ্চিত্রও তার বলিষ্ঠ বক্তব্যের দ্বারা দর্শক-সাধারণের মধ্যে রুচির সৃষ্টি বা পরিবর্তন সম্ভব করতে পারে। প্রমোদ-পরিবেশনের নামে অবাস্তব ঘটনা বা দৃশ্যাবলীর অবতারণা যে করতেই হবে, এমন কোনো শর্ত দর্শকরা কোনো দিনই প্রযোজকের সামনে উপস্থাপিত করেননি। ক্রন্দনরত শিশুকে ভুলোবার সহজ উপায় হচ্ছে তাকে সামান্য পরিমাণ অহি-ফেন খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। ঠিক তেমনই জাঁকজমক, নাচগান, যৌন-আবেদন প্রভৃতি বাস্তব সম্পর্কবর্জিত বস্তুর সমন্বয়ে দর্শকচিত্তকে অনবরত মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখলে দর্শকচিত্তও ক্রমে 'অহিফেন'-ধর্মী হয়ে পড়ে: তখন দেখা দেয়, রুচিবিকার। ছবি দেখতে গিয়ে দর্শক তখন তার সুস্থ স্বাভাবিক মনকে হারিয়ে ফেলে; তার পলায়নপর মনোবৃত্তি তখন বলে—ছবি দেখতে গিয়ে যদি ঘণ্টা দুয়েক সমস্ত ভুলে খানিকটা আনন্দেই না ভাসতে পার, তা'হলে ঐ বন্ধ ঘরের মধ্যে যাব কেন? এ যেন কয়েকজন বন্ধু নিয়ে মদ্যপান ক'রে কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করা। এও এক রকম মনের ব্যভিচার। সাধারণ চিত্র-প্রযোজক বলবেন, আমার অন্যায়টা কোথায়? দর্শক যা চায় আমি তাই দি। তাহ'লে ক্রন্দনরত শিশুকে অহিফেন দেওয়াতেই বা দোষ কি?

জানি, সারা দেশে জনশিক্ষার রীতি-মত ব্যবস্থা না ক'রলে, লোকের সামনে একটা সুস্থ জীবনাদর্শ খাড়া করতে না
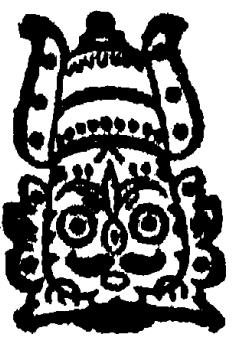
পারলে গণমানসের রুচিবোধ সামগ্রিক-ভাবে উন্নত হ'তে পারে না। এবং যে-কাজ আধুনিক যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের, সেই কাজের ভার মুষ্টিমেয় কয়েকজন চলচ্চিত্র-প্রযোজকের ওপর অর্পণ করা অসংগত। তবু বলব, জনমানসে চলচ্চিত্রের অসামান্য প্রভাবের কথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক চলচ্চিত্র-প্রযোজকেরই কর্তব্য, ছবির মাধ্যমে এমন বিষয়বস্তুর অবতারণা করা, এমন ঘটনা ও দৃশ্যের সমাবেশ ঘটানো, শিল্পীদের এমন সাজ-সজ্জায় উপস্থিত করা এবং এমনভাবে অভিনয় করানো, যা বাস্তবের পরিপন্থী নয়, যা দর্শককে জীবনাদর্শের সন্ধান দেবে এবং তাকে কল্যাণের পথে চালিত করবে। এবং কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাঁদের যে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের দেশের সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপুর সংসার' প্রভৃতি চিত্র, এবং বিদেশের 'বাইসিকল থিভস্' (ইতালীয়), 'যুকিও-য়ারিসু' (জাপানী) 'হ্যাপিনেস ফর আস অ্যালোন' (জাপানী), 'ব্যালাডস্ অব এ সোলজার' (রুশীয়), 'দি লেটার দ্যাট ওয়াজ্ নেভার সেণ্ট' (রুশীয়) প্রভৃতি ছবির আর্থিক সাফল্যের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

গান শোনবার জন্যে যেমন কান তৈরী করতে হয়, সাহিত্য বা কবিতার সমঝদার হবার জন্যে যেমন সাহিত্যবোধ সৃষ্টির আবশ্যকতা হয়, তেমনই চলচ্চিত্রের প্রকৃত গুণাবধারণের জন্যেও উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্র-ভারতীতে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমী'তে নাট্য-গুণাবধারণ (ড্রামা অ্যাপ্রিসিয়েশান) নামে একটি বিশেষ পাঠ পড়ানো হয়। মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যানিটিজ বিভাগে 'আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশান'—যার মধ্যে নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয় থাকবে—সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় যদি আজও অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তা হ'লে অচিরেই তা' করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে।

বিবিধ সংবাদ

।। মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র 'নবদিগন্ত' ।।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসনের 'নবদিগন্ত' চিত্রটি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুক্তিলাভ করেছে উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে। খ্যাতনামা অগ্রদূত গোষ্ঠী চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। ডঃ বিশ্বনাথ রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চ্যাটার্জি এবং সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটির পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

পরলোকে নবদ্বীপ হালদার :

চলচ্চিত্র এবং গ্রামোফোনের বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদার গেল রবিবার, ২৫এ নভেম্বর চৌষট্টি বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি হাঁপানী রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। রবিবার তাঁর শ্বাসকষ্ট খুব বেড়ে যাওয়ায় রাত্রি ১০॥টা নাগাদ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এইখানেই মাত্র একঘণ্টার মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলে এবং তিনটি মেয়েকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। তাঁর পরলোকগত আত্মা যেন শান্তি পায়, এই কামনাই করি।

এ-ভি-এম-এর "মনমৌজী"

গেলকাল, বৃহস্পতিবার, ২৯এ নভেম্বর থেকে দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় এ-ভি-এম-এর নবতম চিত্র-নিবেদন "মনমৌজী" শুভমুক্তিলাভ করেছে ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী, বীণা, খান্না প্রভৃতি চিত্রগৃহে। ছবিখানির পরিচালনা, সংলাপ ও গীতরচনা এবং সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে কৃষ্ণান পঞ্জু, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ও মদনমোহন।

আর-ডি-বনশালের নূতন প্রয়াস "ছায়াসূর্য" :

প্রযোজক আর-ডি-বনশালের নবতম চিত্র "ছায়াসূর্য"-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ কাজ শুরু হবে এই মাসেরই শেষ সপ্তাহে। আশাপূর্ণা দেবী লিখিত কাহিনী অবলম্বনে তরুণ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবিটির প্রধান চরিত্রে আছেন শর্মিলা ঠাকুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্ত, ছায়া দেবী প্রভৃতি শিল্পীকে।

চিত্রালয়-এর "দুই বাড়ী" :

শৈলেশ দে লিখিত কাহিনী অবলম্বনে অসীম পালের পরিচালনায় চিত্রালয়-এর "দুই বাড়ী" ছবিখানি মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। আলোকচিত্রম প্রাইভেট

'মনমোজী' চিত্রে সাধনা ও কিশোরকুমার

লিমিটেড পরিবেশিত এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, রেণুকা রায়, নীলিমা চক্রবর্তী, তন্দ্রা বর্মণ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দকে। ছবির চিত্রনাট্য, গীত-রচনা, সঙ্গীত-পরিচালনা এবং সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছেন পরিচালক অসীম পাল, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, কালীপদ সেন এবং অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

শৌভনিক-এর অনুষ্ঠান :

গেল মঙ্গলবার, ২৭এ নভেম্বর ছিল হেরোসিম লেবেডফ দিবস এবং শৌভনিক-সম্প্রদায়ের জন্মদিন। এই দিনটিতে তাঁদের অগ্রগতির পথকে সুদৃঢ় করবার জন্যে তাঁদের প্রস্তাবিত নাট্য-নিকেতনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'ল পার্কসার্কাসের রকেরা পার্কে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমির ডীন অব ড্রামা, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী দ্বারা। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, শৌভনিকের যাত্রাপথ যেন কুসুমাস্তীর্ণ হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ও'দের নূতন নাটক "যা-নয়-তাই"-এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ল "মুক্ত-অঙ্গন" রঙ্গমঞ্চে।

নবাগত-এর 'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' :

গেল শুক্রবার, ২৩-এ নভেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নবাগত-নাট্যসম্প্রদায় নীতিশ সেন রচিত দু'খানি একাঙ্কিকা—'একটি চায়ের কাপ' ও 'রসভরা' অভিনয় করেন। প্রথম নাটিকাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে মামুলিত্ব থাকলেও নাটকীয়তার উপাদান ছিল এবং অনায়াসেই 'অনীতা'র মানসিক সামঞ্জস্য বিধান ঘটানোকে যুক্তিগ্রাহ্য করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু কাঁচা হাতের লেখা ব'লে 'করুণা'-বৌদি বা 'অনীতা'-ননদের চারিত্রিক বিবর্তন সহজ পথ ধরে অগ্রসর হতে পায়নি। অবশ্য বিভিন্ন শিল্পীর—বিশেষ ক'রে প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (অমল), সুলেখা চক্রবর্তী (অনীতা) এবং তরুণ চক্রবর্তীর (দীপক)—অভিনয়গুণে প্রথম নাটিকাটি দর্শকদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে। দ্বিতীয় নাটিকা—'রসভরা'তেও শিল্পীরা যথেষ্টই সুন্দর অভিনয় করেছেন। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (সুভাষ), পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায় (কমল), দীপক অধিকারী (মণি), নীলিমা চক্রবর্তী (লিলি) এবং মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় (সুরমা) যথার্থই সু-অভিনয় করেছেন। কিন্তু পিতার গোঁড়ামি এবং পুত্র-কন্যার আধুনিকতা নিয়ে কিছু সংবাদ আদান-প্রদান সংক্রান্ত কথোপকথনকে নাটক নাম দিলে নাটকের সংজ্ঞা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

ই. রেলওয়ে কমার্সিয়াল ষ্টাফ কালচারাল কাউন্সিলের (হাওড়া অঞ্চল) ৩য় বার্ষিক উৎসব গত ১৭ই নভেম্বর '৬২ হাওড়ার রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সভ্যগণ কর্তৃক ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কাণাগলি' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। প্রত্যেকটি শিল্পীই প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সর্বশ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম গাঙ্গুলী, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মুখোপাধ্যায়, লতিকা মুখার্জি।

কমলা সার্কাস :

একদিন ছিল, যখন খ্রীস্টমাস ডে অর্থাৎ বড়দিন উপলক্ষ্যে কলকাতা শহরে—বিশেষ ক'রে চৌরঙ্গীপাড়ায়—আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল' (যেখানে এখন ইউ-এস-আই-এস, কে-এল-এম এবং মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক), আর্মি নেভী স্টোর্স (বর্তমান

'দুই বাড়ী' চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলী ও ভানু ব্যানার্জি

লয়েডস্ এবং ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক), হল অ্যান্ডার্সন প্রভৃতি বড় বড় দোকান এবং হগ সাহেবের বাজারের যে-অপরূপ শোভা এই বড়দিনের সময় হ'ত, তা' আজ আর কোনো কিছু উপলক্ষ্যেই হওয়া সম্ভব নয়। এই আনন্দের হাটে শহরবাসীকে আনন্দ দেবার জন্যে উপস্থিত হ'ত বড় বড় সার্কাসের দল; এরা গড়ের মাঠে—ময়দানে—তাঁবু ফেলে তাদের খেলা দেখাত। আজও মনে আছে, হিপোড্রোম এবং হার্মিনস্টোন সার্কাসের কথা। এর মাঝে আমাদের দেশী সার্কাসও ছিল—বোসের সার্কাস; এই সার্কাসেই বিখ্যাত জাদুকর গণপতি—যিনি পি, সি, সরকারের গুরু—তাঁর আশ্চর্য খেলা দেখাতেন।

পরে কিন্তু, কি কারণে জানি না, ইংরেজ আমল থাকতেই কলকাতা শহরের বুকে তাঁবু ফেলে সার্কাস দেখানো নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার লোককে সার্কাস দেখতে ছুটতে হ'ত হাওড়া ময়দানে। সম্প্রতি আবার শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে সার্কাসের তাঁবু ফেলবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তাই শীত পড়তে না পড়তেই চলছে "কমলা সার্কাস" এবং টালা পার্কে শিগ্‌গিরই আস্‌চে প্রফেসর সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশিত "ইন্টার-ন্যাশনাল সার্কাস"।

"কমলা সার্কাস"-এর শিল্পিগোষ্ঠীর অসামান্য ক্রীড়াচাতুর্য যে-কোনও দর্শককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার ক্ষমতা রাখে। অসামান্য স্বাস্থ্যের অধিকারিণী দক্ষিণী মেয়েরা ট্রাপিজ, রোম্যান রিং, রোপ-ওয়াকিং, রোপ-সাইক্লিং প্রভৃতি খেলায় যে-দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেন, তাকে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হবেনা। এ'দের সঙ্গে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা শিল্পীর সাইক্লিং এবং ব্যালান্সিং খেলাও যথেষ্ট উপভোগ্য। দু'টি ওরাং-ওটাংয়ের সাইকেল চালনা এবং টয়ট্রেনের চালকও গার্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াও কম উপভোগ্য নয়। হাতীর খেলা এবং বাঘের খেলা সাধারণ দর্শক-দের যেমন স্তম্ভিত করে, ভাঁড়গুলির—বিশেষ ক'রে বামন ভাঁড়টির—কীর্তি-কলাপ তাদের মধ্যে তেমনই হাসির বন্যা বইয়ে দেয়। "কমলা সার্কাস" এ-বছর শীতের একটি বিশেষ আনন্দ-আকর্ষণ।
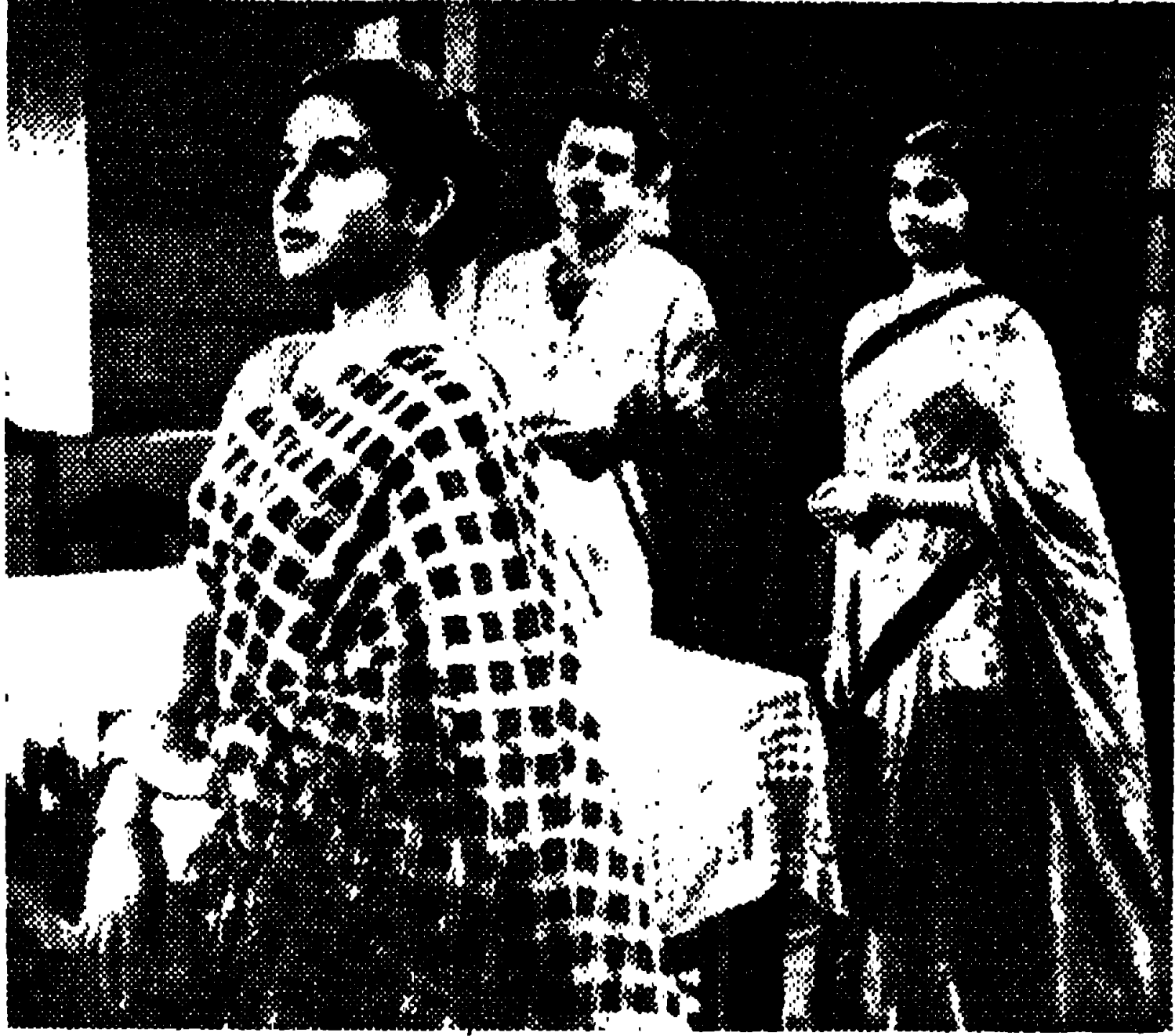
খগেন রায় পরিচালিত 'বিংশতি জননী' চিত্রে মাধবী মুখার্জি, অনুপকুমার এবং লিলি চক্রবর্তী

।। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির ।।

১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যায় পার্কসার্কাস ময়দানে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে উৎসব-মণ্ডপে শ্রীজওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ও শিশু-উৎসব উপ-লক্ষে নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্য-কলা মন্দিরের শিল্পিবৃন্দের 'ভারত-ভূমি' নৃত্য-নাট্য মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এম-এল-সি মহাশয়। নৃত্য-নাট্য রচয়িতা ও সূত্রধরের রূপদান করেন পরিতোষ মুখার্জি, নৃত্য ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন অনুজ শংকর, অরুণ কুমার, স্বপ্না সেনগুপ্তা, শোভা মিত্র, অরবিন্দ মিত্র, জয়শ্রী মিত্র, অনিল ঘোষ, গোপাল মিত্র, শংকর পাল প্রভৃতি। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের ও দর্শক-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

।। উদ্দীপক ও স্বদেশ সঙ্গীত ।।

উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'উদীচী'র সম্পাদক শ্রীশৈলেশ ভড় তাঁর একটি ঘোষণায় দেশের পরি-স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'জাতীয় পতাকার মত জাতীয় সঙ্গীতকে কিভাবে শ্রদ্ধা জানানো উচিত তা আমরা

কমলা সার্কাসে'র পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০১ টাকা দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখার্জীর হাতে এবং ডানদিকে সার্কাসের একটি দৃশ্য

'বাত এক্ রাত কী' চিত্রে ওয়াহেদা রহমান ও দেব আনন্দ

অনেকেই জানি না। জাতীয় সংগীত আমাদের নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদের সম্মান রক্ষা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।' তিনি আরো বলেন, 'আজ দেশের এই দুর্দিনে আমরাও নিজেদের উৎসর্গ করবো দেশরক্ষার কাজে।' এ বিষয়ে 'উদীচী' কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এবং এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করার জন্য 'উদীচী'র প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এবং যোগ্য শিল্পীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে ৯টা 'উদীচী' শিক্ষায়তনে শ্রীশৈলেশ ভড়ের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপক ও স্বদেশ সংগীত বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করবেন শ্রীশচীন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্রকান্ত শীল। যোগদানেচ্ছু শিক্ষার্থীরা কর্মসচিব শ্রীমনোরঞ্জন সিংহের সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।

বার্মিংহামে ভারতীয়দের জন্য চিত্রগৃহ

বার্মিংহামের অন্তর্গত স্মেথউইকের একটি চিত্রগৃহ, চার বৎসর পূর্বে নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তা পুনরায় বিশেষভাবে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী শ্রোতৃবর্গের জন্য সম্প্রতি খোলা হয়েছে।

চিত্রগৃহটি নির্মাণ করতে প্রায় ১৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়েছিল, পরিচালনব্যয় বহন করছেন ভারতীয় ও পাকিস্তানী সম্প্রদায়ের সদস্যগণ। চিত্রগৃহে সপ্তাহ শেষের ছুটিতে এবং অন্যান্য ছুটির দিনে নানা ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্যোক্তাগণ আশা করেন যে এই চিত্র-গৃহটি সপ্তাহের অন্যান্যদিনে শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারবে।

লয়ালপুরবাসী শ্রীমহম্মদ সর্দার, যিনি চিত্রগৃহের পরিচালক গোষ্ঠীর একজন সদস্য, তিনি বলেন কমনওয়েলথের যে কোন নাগরিক এই চিত্রগৃহে চলচ্চিত্র দেখতে আসতে পারবেন। এর আসন সংখ্যা ৯০০।

তিনি আরও বলেন লভ্যাংশের সামান্য অংশ বৃটেনে যে-সমস্ত ভারতীয় ও পাকিস্তানী রয়েছেন তাঁদের কল্যাণে, বিশেষভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত ও অন্যান্য কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে, ব্যবহৃত হতে পারবে।

চিত্র-গৃহের ম্যানেজার হবেন শ্রীকে কে মার্নিন, ইনি একসময় জব্বলপুরের অধিবাসী ছিলেন, এবং বর্তমানে ইনি বার্মিংহামে একটি মুদির দোকানের পরিচালক। ইনি এবিষয়ে একদল ভারতীয় ও পাকিস্তানী কর্মচারীর সাহায্য লাভ করবেন। —বি আই এস

।। ভারতে ব্রিটিশ থিয়েটার কোম্পানী ।।

আগামী বৎসর ব্রিস্টল ওল্ড ভিক কোম্পানী কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য প্রায় ৩০ জন শিল্পী ও কর্মী নিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল পরিদর্শনে আসছে।

তাঁরা অভিনয় করবেন শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট', জর্জ বার্নাড শ'র 'আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান' এবং রবার্ট বোল্টের নতুন নাটক 'এ ম্যান ফর অল সিজনস'।

দলটি ঢাকা হ'তে ৩১শে জানুয়ারী কলকাতায় পেঁছিবে এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী, ১লা মার্চ বোম্বাই ও ১৪ই মার্চ হায়দরাবাদ যাবে। ১৭ই হ'তে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত মাদ্রাজে অভিনয়ের পর দলটির ভারত সফর শেষ হবে। ইহার পর দলটি সিংহলে যাবে।

৮ই এপ্রিল দলটি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করবে।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর সদ্যমুক্ত 'নবদিগন্ত' চিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও বসন্ত চৌধুরী

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীর সম্পাদনা-টেবিলে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বর্ণচোরা'র কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। বনফুল রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, রেণুকা রায় ও রাজলক্ষ্মী। এ ছবির প্রযোজনা ও সংগীত-পরিচালনা করেছেন গৌর দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'সূর্যশিখা'র শেষ সুটিং শেষ করলেন প্রযোজক-পরিচালক ও কাহিনীকার সলিল দত্ত। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন বিজয় ঘোষ ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রে যাঁরা অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উত্তম-কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তরুণকুমার ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। সংগীতে সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিবেশনা করবেন চন্ডীমাতা পিকচার্স।

কল্পনা মুভিজের 'শেষ অংক' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। সম্প্রতি আবহসংগীত গ্রহণ করলেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা শেষ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন হরিদাস ভট্টাচার্য। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, শিশির বটব্যাল, রেণুকা রায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এ ছবির প্রযোজক।

রামধনু পিকচার্সের একটি পরীক্ষা-মূলক ছবি 'তের নদীর পারে' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। ভ্রাম্যমাণ একটি সার্কাস দলের বাস্তব জীবন নিয়ে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যের এ ছবিটির আলোকচিত্র ও পরিচালনা করেছেন বারীন সাহা। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়ম হাজারিকা। সংগীত পরিচালনা করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

অর্ধসমাপ্ত একটি ছবি—সুশীল ঘোষ পরিচালিত 'পলাশের রঙ'। সুর-সৃষ্টি করেছেন ভি বালসারা। প্রধান চরিত্র-শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অসীম-কুমার, মঞ্জুলা সরকার, মঞ্জু দে, চিত্রিতা মন্ডল ও বঙ্কিম ঘোষ।

জে বি প্রোডাকসন্সের 'এ প্রভু মহাপ্রভু' ছবিটির কাজ শীঘ্রই শুরু

হবে। নোরা ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন হরিধন, শীতল, রাজলক্ষ্মী ও ধীরেন চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করবেন রতন চট্টোপাধ্যায়।

বোম্বাই

সম্প্রতি মডার্ণ স্টুডিওয় রতনদীপ পিকচার্সের 'ঘর বাসাকে দেখো'র চিত্রগ্রহণ শেষ হল। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেন মনোজকুমার ও রাজশ্রী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন চিত্রগুপ্ত। ছবিটি পরিচালনা করছেন কিশোর সাহু।

অমর ছায়ার 'ম্যবসে তুমহে' দেখা হাই' ছবির একটি বিশেষ কাওয়ালি দৃশ্যে শাম্মিকাপুর ও রাজেন্দ্রকুমারকে দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কেদার কাপুর। সম্প্রতি গীতাবলি ও অন্য নৃত্য-শিল্পীদের নিয়ে একটি 'টুইস্ট' দৃশ্যায়িত হল। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার, বিজয়লক্ষ্মী, দুলারী, মোহন চোটী, সুন্দর ও আনা। সংগীত পরিচালক হলেন দত্তরাম।

প্রযোজক-পরিচালক এন এ আনসারী 'মুলজিম' ছবির আরও কয়েকটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ করলেন। মুখ্যচরিত্রের শিল্পীরা হলেন প্রদীপকুমার, শাকিলা, জনি ওয়াকার ও আনসারী। এ ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন রবি।

শাম্মিকাপুর ও রাজশ্রী অভিনীত রঙীন ছবিটির নাম 'জানওয়ার'। হরদীপ প্রযোজিত ছবিটি পরিচালনা করছেন ভাপ্পি সোনি। সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ। কাহিনী ও আলোকচিত্র রচনায় শচীন ভৌমিক ও তারু দত্ত। রূপতারা স্টুডিওয় এ ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথিরাজ কাপুর, রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ, অচলা সহদেব ও মাধবী।

প্রায় এক মাসব্যাপী পরিচালক আর কে নায়ার তাঁর ছবি 'ইয়ে রাস্তা হায় পেয়ার কী'র কাজ শেষ করলেন। অশোককুমার, সুনীল দত্ত, মতিলাল, লীলা নাইডু, শশিকলা, রেহমান, হরি সদাশিব, রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এ ছবির প্রধান চরিত্র-শিল্পী। সংগীত-পরিচালনা করেছেন রবি।

গত সপ্তাহে প্রায় এক মাসের জন্য গোয়ালিয়র-বহির্দৃশ্যে পরিচালক মণি ভট্টাচার্য তাঁর দলবলসহ রওনা হয়ে গেছেন 'মুঝে জিনে দো' ছবির জন্য। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় এ ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন সুনীল দত্ত, ওয়াহিদা রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ, নিরূপা রায়, দুর্গা খোটে ও তরুণ বসু। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক জয়দেব।

মাদ্রাজ

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান হিসেবে স্মরণীয়। অভিনেতা এম জি রামচন্দ্রন তার মাসিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন বলে তিনি এক সভায় প্রতিশ্রুতি দেন এবং এই অনুষ্ঠানে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন প্রথমে।

এম জি রামচন্দ্রন সম্প্রতি চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এই চিত্রটি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তোলা হবে।

শিবাজী গণেশন এই উপলক্ষে একটি অল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র 'নাম নাদু' সম্প্রতি শেষ করেছেন। সীমান্ত রক্ষীর উৎসাহ-দানকল্পে যে ছোট্ট কাহিনী গড়ে উঠেছে তার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিবাজী গণেশন, জি সাবিত্রী, জেমিনী গণেশন ও কে সারংগপানি। সংগীত পরিচালনা করেন বিশ্বনাথন এবং রামমূর্তি। ছবির পরিচালক বি আর পান্থালু। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতই অবস্থা হয়েছে আজকাল স্টুডিওগুলোর। নতুন ছবি তেমন আরম্ভ হচ্ছে না। বাংলা ছবির বাজার কিভাবে চলেছে সে তো আপনারা প্রেক্ষাগৃহেই প্রমাণ পাচ্ছেন। সরকার অবশ্য পরিকল্পনার কথা ভাবছেন। জানি না এ অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে। চালু যে কয়েকটি স্টুডিও আছে তার মধ্যে নিউ থিয়েটার্স এবং টেক্‌নিসিয়ানে বর্তমানে কিছু নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হবে বলে খবর পেলাম। অন্য আর সব স্টুডিওগুলোর কাজ প্রায় বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্য যা পুরনো ছবির কাজ হয়। তাই এক একদিন নিরাশ মনে স্টুডিওপাড়া থেকে অবসাদের হাই তুলতে তুলতে বাড়ী ফিরি।

সম্প্রতি টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয় একটি নতুন ফ্লোর কয়েক মাসের মধ্যে তৈরী হল। এই স্টুডিও-ফ্লোরে একটি নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। খবর পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলাম। ছবির নাম—'নবারুণ রাগে'। ছবিটি পরিচালনা করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা অতনুকুমার। আপনারা এঁর বহু ছবি এর আগে দেখেছেন। যেমন—উপহার,

টনসিল, কাবুলিওয়ালা, লোহকপাট, ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত এবং আকাশ পাতাল ছবিতে। তিনি এই প্রথম পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। পরমহংস বাণীচিত্রের 'নবারুণ রাগে' অতনুকুমার নায়ক এবং পরিচালক। পর পর কয়েক দিনের দৃশ্য-গ্রহণ দেখে মনে হয়েছে তিনি অভিনয়ের মত পরিচালনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন। এ ছবির সংগীত এর আগেই গৃহীত হয়েছে। সংগীত পরিচালক ভি, বালসারা। এ ছবির তিনটি গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা মিশ্র।

বাসন্তী দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা করছেন হিরন্ময় দত্ত। চিত্রগ্রহণ করছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। সম্পাদনা শিব ভট্টাচার্য। শিল্প-নির্দেশনা গৌর পোদ্দার। রূপসজ্জার অনাথ মুখোপাধ্যায় ও গৌর দাস। শব্দগ্রহণে সমেন চট্টোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্রায়ণে সেদিন নায়ক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দৃশ্যটি গৃহীত হচ্ছিল। নায়ক সকালে শয্যাত্যাগ করে বিছানায় বসে চা খাচ্ছিল। এমনি সময়ে সুজাতা এ ঘরে এসেছে। কাহিনী পরে বলছি তার আগে অভিনীত দৃশ্যটির কয়েকটি সংলাপ বলে রাখি।

গৌতম—একি আপনি কেন! বুন্ধু গেল কোথায়?

সুজাতা—তা কি করে হবে। নব-বিবাহিতা স্ত্রী পড়ে পড়ে আটটা পর্যন্ত ঘুমবে আর স্বামীর জন্য Bed-tea নিয়ে আসবে সেই পুরাতন ভৃত্য! তাতে ছন্দ পতন হবে যে।

গৌতম—তাহলেও আপনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা উচিত নয়।

সুজাতা—জানেন তো অভিনয় করতে হলে নিখুঁত হওয়া চাই। তা না হলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

এই পর্যন্ত। দৃশ্যটিকে বুঝিয়ে দিয়ে পরিচালক-নায়ক গৌতম এবং সুজাতার ভূমিকার অভিনয় করলেন অতনুকুমার ও নায়িকা সবিতা বসু। কাহিনী সংক্ষেপে আজকের সমাজের একটা দিকের কথা বলা হয়েছে। জমিদার কুমার বাহাদুর জমিদার-প্রথায় বিশ্বাসী হলেও চাষাবাদের জন্য নতুন পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন। চাষীদের সব রকমের সুবিধার কথা তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার বাদ সাধলেন অন্যদিকে। অবশ্য চাষের জন্য সাহায্য করতে চাইলেন আধুনিক ট্রাকটার আর সব যন্ত্রপাতি দিয়ে। জমির ইঞ্জিনিয়ার গৌতম মুখোপাধ্যায়কে তাঁরা পাঠালেন জমিদারের কাছে। কুমার বাহাদুর এই পরিকল্পনার বিশ্বাসী না হওয়ায় তার একমাত্র প্রণয়ী সুজাতাকে পাঠালেন গৌতমের কাছে। সুজাতা রাজী হয় এক সর্তে। কুমার বাহাদুরের কথায় গৌতমের সংগে সুজাতা কলকাতায় চলে আসে। সুজাতা সব কথা জান'য়।

সুজাতা যখন পালিয়ে কলকাতায় এসেছে তখন কুমার বাহাদুর গ্রাম্য চাষীর মেয়ে ললিতার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন। সুজাতার বাবা নলিনীবাবু মেয়ের কোন খবর না পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের সাহায্য নিলেন। সুজাতার মা ভেঙে পড়েন। গোয়েন্দাদ্বয় কানু ও বংশী কাজ শুরু করে।

গৌতম এবং সুজাতা গ্রামে ফিরে আসে। সরকারের পরিচালনায় গৌতম বিরাট কারখানা ও চাষাবাদের পরি-কল্পনা গ্রহণ করে। জমিদার কুমার বাহাদুর তাঁর কথা রাখেন নি। জমিদার

পরিচালক ও নায়ক অতনুকুমার 'নবারুণ রাগে'-র একটি দৃশ্যে নায়িকা সবিতা বসুকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বংশের সেই রক্ত তাকে লালসার পথে নিয়ে গেছে। সুজাতার কথা না রেখে তিনি ললিতাকে বিবাহ করেন।

শুধু অভিনয় নয়। ইঞ্জিনিয়ার গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই সুজাতার বিয়ের সব পাকাপাকি হল কাহিনীর শেষ অঙ্কে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন কুমার বাহাদুর—অসিতবরণ, সুজাতা— সবিতা বসু, গৌতম— অতনুকুমার, ললিতা—আরতি দাস, রাজা বাহাদুর—কমল মিত্র, নলিনীবাবু—বিপিন গুপ্ত, সুজাতার মা—অপর্ণা দেবী, কানু—তরুণকুমার, বংশী—জহর রায় ও বৃন্দ—পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

—চিত্রদূত

ভিনদেশী ছবি

।। দি লংগেস্ট ডে ।।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে আজ পর্যন্ত যত ছবি উঠেছে তাদের মধ্যে 'দি লংগেস্ট ডে' হল দীর্ঘতম। ছবিটিকে প্রায় একটি আন্তর্জাতিক চিত্রও বলা যেতে পারে। কারণ এই চিত্রের জন্যে তিন দেশের তিনজন প্রথিতযশা পরিচালক এবং চার দেশের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়োজিত করেছেন ড্যারিল জ্যানুক। নরম্যাণ্ডি উপকূলে মিত্রপক্ষের সৈন্যাবতরণের সেই ঐতিহাসিক ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন এই চিত্রের পটভূমি। যে যে দেশ সেই স্মরণীয় দিনে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেকেরই সাহায্য লাভ করেছেন জ্যানুক এই ছবি তুলতে গিয়ে। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানীর অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই চিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিচালনা করেছেন বৃটেনের কেন আনাকিন, আমেরিকার এ্যানড্রু মারটন এবং জার্মানীর বার্নার্ড ভিকি। যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে যে যে দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল চিত্রের সেই সেই অংশের পরিচালনার ভার সেই দেশেরই পরিচালকের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু 'দি লংগেস্ট ডে' শুধুমাত্র তারকাখচিত চলচ্চিত্র নয়। ৬ই জুনের সেই স্মরণীয় দিনটি যেভাবে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী এবং জার্মান চোখে প্রতিভাত হয়েছিল তারই তথ্যনির্ভর নিখুঁত ছবি এই চিত্রটি। নিটোল কোনো কাহিনীর সূত্র এই চিত্রে অনুসরণ করা হয়নি। এবং কোনো মুখ্য চরিত্রকেও প্রাধান্য দেয়া হয়নি বর্তমান চিত্রে। কিন্তু তাতে চিত্রের আকর্ষণ এতটুকু কমেনি দর্শকদের কাছে। চিত্রের ঘটনাংশ নেয়া হয়েছে কর্ণেলিয়াস রায়ানের একটি গ্রন্থ থেকে। রায়ান আমেরিকান বলে মার্কিনী সৈন্যের ক্রিয়াকলাপ চিত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে বটে তবে অন্যান্য দেশের সৈন্য বাহিনীর ভূমিকাও মর্যাদার সঙ্গে রাখা হয়েছে। যেমন ইংরেজ সৈন্যদের ওরনে নদীর সেতু আক্রমণের দৃশ্যটি (এই অংশে সৈন্য পরিচালনা করেছেন রিচার্ড টড) এবং সোর্ড বীচে লর্ড লোভাট-এর (পিটার লফোর্ড) নেতৃত্বে সৈন্যাবতরণের দৃশ্য ইংরেজ গরিমারই বীরত্বব্যঞ্জক প্রমাণ। ফরাসী প্রতিরোধ কাহিনীর তীব্র আক্রমণও চিত্রে যথাযথ রাখা হয়েছে। এমন কি জার্মান সৈন্য বাহিনীর প্রতিও কোনো বিরূপ ভাব জাগ্রত করার প্রচেষ্টা নেই চিত্রে। বরং জার্মান সেনাপতিদ্বয় রুনস্টেড এবং রোমেল-এর প্রতি দর্শকরা সহানুভূতিই বোধ করবেন।

চিত্রটি সাদাকালোয় সিনেমাস্কোপে তোলা হয়েছে। যুদ্ধের ব্যাপক আক্রমণ প্রতিআক্রমণের মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্বই হারিয়ে যায়নি এইটেই হচ্ছে এই বিরাট চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই বৃদ্ধ ফরাসীটি যে তার বাড়িটাকে কামানের গোলায় চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখেও আনন্দে উদ্ভাসিত—তাকে দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে। কুকুর সঙ্গী কেনেথমোর, আহত বিমানচালক রিচার্ড বার্টন, আহত জনওয়েন এই চিত্রে কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন।

।। জাঁ আনুইর নাটক চিত্রায়িত ।।

আনুইর ঐতিহাসিক নাটক 'বেকেট' পিটার গ্লেনভিল-এর পরিচালনায় তোলা হচ্ছে বৃটেনে। চিত্রটি পরিবেশনা করবেন প্যারামাউন্ট পিকচার্স। টমাস বেকেট একটি ভুল বোঝাবুঝির ফলে চার্চের মধ্যে রাজার সৈন্যদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। টমাস বেকেটের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রিচার্ড বার্টন এবং দ্বিতীয় হেনরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পিটার ওটুল।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

এম সি সি বনাম নিউ-সাউথ ওয়েলস

এম সি সি : ৩৪৮ রান (জিওফ পুলার ১৩২, কাউড্রে ৫০ এবং ডেক্সটার ৪২। জে মার্টিন ১২২ রানে ৪ এবং রিচি বেনো ৬১ রানে ৩ উইকেট) ও ১০৪ রান (পারফিট ২২। রিচি বেনো ১৮ রানে ৭ উইকেট এবং মার্টিন ৩৮ রানে ২ উইকেট)

নিউ সাউথ ওয়েলস : ৫৩২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ও'নীল ১৪৩, সিম্পসন ১১০, হার্ভে ৬৩, ডেভিডসন ৫৫, ফ্রকটোন নট আউট ৬২ এবং রিচি বেনো নট আউট ৪০। ডেক্সটার ১১৬ রানে ২ এবং ইলিংওয়ার্থ ১৪৪ রানে ২ উইকেট)

নিউ সাউথ ওয়েলস এক ইনিংস এবং ৮০ রানে এম সি সি দলকে পরাজিত করে।

নিউ সাউথ ওয়েলস দলের এগার জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আটজন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলোয়াড় এবং এই আটজনের মধ্যে ছ'জন খেলোয়াড়—রিচি বেনো, হার্ভে, ও'নীল, ডেভিডসন, সিম্পসন এবং বুথ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন প্রথম টেস্ট খেলায় দলে স্থান পেয়েছেন। সুতরাং নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে এম সি সি-র এই চারদিনের খেলাটিকে ছোট আকারের টেস্ট খেলা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত ১৯৫৮-৫৯ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিপক্ষে দুটো খেলাই ড্র রেখেছিল। এ পর্যন্ত নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম এম সি সি দলের ৫২টি খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল : এম সি সি'র জয় ২০, হার ১৮ এবং খেলা ড্র ১৪।

আলোচ্য খেলার প্রথম দিনেই এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস ৩৪৮ রানে শেষ হয়। ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার সেঞ্চুরী (১৩২ রান) করেন। কোন রান করার আগেই এবং নিজস্ব ১৭ রানের মাথায় আউট হওয়ার হাত থেকে তিনি বেঁচে যান। তবে তিনি বিপক্ষের বোলিংকে তোয়াক্কা করেননি। ডেভিডসন প্রথম ইনিংসে কোন উইকেটই পান নি। বেনোর থলি চা-পানের আগে পর্যন্ত শূন্য ছিল। চা-পানের পরের খেলায় বেনো তাড়াতাড়ি ৩টে উইকেট পান। মনে হয় কলিন কাউড্রে এতদিনে দুষ্টগ্রহের কুপদৃষ্টি থেকে ছাড়ান পেলেন। এবার ৫০ রান করেন। এই দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, কিন্তু কোন রান হওয়ার বা উইকেট পড়ার আগেই খেলা বন্ধ হয়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস মারমুখী হয়ে খেলতে থাকে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়, নিউ সাউথ ওয়েলস দলের ৫ উইকেট পড়ে ৪০৮ রান উঠেছে। ববি সিম্পসন (১১০ রান) এবং নর্ম্যান ও'নীল (১৪৩ রান) সেঞ্চুরী করেন। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের বিপক্ষে ববি সিম্পসন এই নিয়ে তিনটে সেঞ্চুরী করলেন—এডিলেডে সম্মিলিত একাদশ দলের পক্ষে ১০৯, মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের পক্ষে ১৩০ এবং সিডনিতে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের পক্ষে ১১০ রান।

নিউ সাউথ ওয়েলস দলের খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দলের মাত্র ১৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট (টমাস) পড়ে যায়। সিম্পসনের সঙ্গে ও'নীল দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে নামেন এবং এই দু'জনেই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে সিম্পসন এবং ও'নীল দলের ২৩৪ রান যোগ করেন। সিম্পসন তিন ঘন্টার বেশী খেলে দশটা বাউন্ডারী মারেন। ও'নীল ১৩০ মিনিটের খেলায় তাঁর শতরান পূর্ণ করেন। ২৪৯ মিনিটের খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলস দলের ৩০০ রান পূর্ণ হয়।

খেলার তৃতীয় দিনে নিউ সাউথ ওয়েলস দল ৫৩২ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে এম সি সি দল ১৮৪ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এম সি সি দলের খেলোয়াড়রা বিপক্ষের মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে আত্মরক্ষা করতে পারেননি। এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা মাত্র ১৭৩ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে তারা ১০৪ রান করে। এম সি সি দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব রিচি বেনোর। বেনো মাত্র ১৮ রানে ৭টা উইকেট পান। বেনোর বোলিংয়ের হিসাব : ওভার ১৮-১, মেডেন ১০, রান ১৮ এবং উইকেট ৭। এইদিন পীচের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। নিউ সাউথ ওয়েলস দল এই দিনের খেলায় একটা উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ৪০৮ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১২৪ রান যোগ করে মধ্যাহ্নভোজের সময় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

ডেভিডসন এই খেলায় মাত্র একটা উইকেট (২য় ইনিংসে ১১ রানে ১) পেলেও ইংল্যান্ডের পক্ষে তিনি নিঃসন্দেহে ভয়ের কারণ। ব্রিসবেনে ৩০শে নভেম্বর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের হাতে এম সি সি দলের এই শোচনীয় পরাজয় দলের পক্ষে মোটেই শুভ নয়।

॥ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ॥

৩০শে নভেম্বর ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবে। ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজের এই প্রথম টেস্ট খেলাটি ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ১৮৪তম টেস্ট খেলা। ব্রিসবেনে এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সাতটি টেস্ট খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং ইংল্যান্ডের ৩। ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার বিগত সাতটি টেস্ট খেলায় যে সব উল্লেখযোগ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিবরণ ইতিপূর্বে (অমৃতের ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) প্রকাশ করা হয়েছে।

আসন্ন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলে এই বারজন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন : রিচি বেনো (অধিনায়ক), নীল হার্ভে, ব্রায়ান বুথ, পিটার বার্জ, এ্যালান ডেভিডসন, ওয়ালি গ্রাউট, বিল লরী, কেন ম্যাকায়, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, নর্ম্যান ও'নীল, ববি সিম্পসন এবং বেরী শেফার্ড। এই বারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বেরী শেফার্ড বাদে বাকি এগারজন খেলোয়াড়ই ১৯৬১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলে খেলে ইংল্যান্ডকে ৫৪ রানে পরাজিত ক'রেছিলেন। ন্যাটা খেলোয়াড় বেরী শেফার্ড টেস্ট দলে এই প্রথম স্থান পেলেন। এ বছর তিনি খুব ভাল খেলেছেন। সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের হয়ে শেফার্ড এম সি সি দলের বিপক্ষে ১১৪ এবং নট আউট ৯১ রান করেন। শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় তিনি এই মাসেই ডবল সেঞ্চুরী করেন। মনে হয়, নির্ভরশীল টেস্ট খেলোয়াড় ব্রায়ান বুথ চুড়ান্তভাবে দল নির্বাচনের সময় শেফার্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন। খেলার দিন সকালে দলের দ্বাদশ খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হবে।

ব্রিসবেন ক্রিকেট মাঠ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, এখানে যে দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায় সেই দলই বেশীর ভাগ সময় খেলায় জয়মাল্য লাভ করে। তাছাড়া এখানের ক্রিকেট খেলার সঙ্গে বরুণদেবের যেন একটা অতি নিকট সম্পর্ক আছে। খেলার সময় বৃষ্টিপাত এখানের আবহাওয়ার এক বিশেষত্ব। খেলার উপর বৃষ্টির খুবই প্রভাব। ফলে যে দল প্রথম ইনিংস খেলবে তারাই জয়লাভ করবে। অবিশ্যি প্রতিটি খেলায় এ-সব প্রবাদ খাটে না।

অস্ট্রেলিয়া বিগত দুটি টেস্ট সিরিজের (১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৬১) অধিক সংখ্যক টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে জয়লাভের পুরস্কার কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' নিজেদের অধিকারে রেখেছে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া আজ স্বদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলছে। এই দুটি ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার মনোবল অটুট রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

॥ ডেভিস কাপ ॥

মাদ্রাজে আগামী ১লা, ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলা হবে। এই পর্যায়ে খেলবে ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকো। ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকো ইতিপূর্বে কখনও ডেভিস কাপের ইণ্টার-জোন ফাইনালে পেঁছিতে পারেনি। গত বছর ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ২—৩ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার ক্রম-পর্যায় তালিকায় মেক্সিকোর কোন বিশেষ স্থান ছিল না। কিন্তু ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপের খেলায় মেক্সিকো যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে খেলেছে। আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া এবং সুইডেন এই তিনটি শক্তিশালী দেশকে পরাজিত ক'রে মেক্সিকো ইণ্টার-জোন ফাইনালে উঠেছে। মেক্সিকোর এই সাফল্য অপ্রত্যাশিত কিন্তু দৈবক্রমে মেক্সিকো জয়লাভ করেছে বললে অবিচার করা হবে।

মেক্সিকোর ডেভিস কাপ দল ভারতবর্ষে পেঁছে গেছে। এই দলের সঙ্গে এসেছেন এই চারজন—পি কণ্ট্রিরাস (অধিনায়ক), রাফেল ওসুনা, এ্যাণ্টোনিয়ো প্যালাফক্স এবং মারিয়ো লামাস।

আসন্ন ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার ফলাফল সম্পর্কে মেক্সিকোর অধিনায়ক কণ্ট্রিরাস তাঁর নিজ দলের সাফল্যের উপর বেশী জোর দিয়ে বলেছেন, মোটের উপর তাঁর দল ভারতীয় দল অপেক্ষা শক্তিশালী। তিনি ভারতীয় দলের রমানাথন কৃষ্ণানের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে মন্তব্য করেছেন, কৃষ্ণান যদি দুটি সিঙ্গলস খেলায় জয়লাভও করেন তাহলে বাকি দুটি সিঙ্গলস এবং গুরুত্বপূর্ণ ডাবলসের খেলায় মেক্সিকোর জয়লাভ সম্পর্কে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী। মেক্সিকো দলের অধিনায়ক ডাবলসের খেলার ফলাফলের উপরই বেশী জোর দিয়ে বলেছেন, এই খেলার ফলাফলই তাঁর দেশকে জয়যুক্ত করবে।

॥ রোভার্স কাপ ॥

১৯৬২ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু দু'দিনের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। প্রথম দিন ১—১ গোলে খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিনের নির্ধারিত সময়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। দুই দলই একটি ক'রে গোল দেয়। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত উভয় দলকেই যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অন্ধ্র পুলিশ দল টসে জয়লাভ করায় প্রথম ছ'মাস রোভার্স কাপ নিজেদের অধিকারে রাখবে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে উভয় দলের যুগ্মভাবে রোভার্স কাপ জয় এই প্রথম।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দল ইতিপূর্বে হায়দরাবাদ পুলিশ দল নামে উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯৫০—৫৪) রোভার্স কাপ জয় ক'রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়ের রেকর্ড করে। এই দলটি পুনরায় ১৯৫৭ এবং অন্ধ্র পুলিশ দল নামে ১৯৬০ সালে রোভার্স কাপ পায়। অন্ধ্র পুলিশ দল এ পর্যন্ত ৮বার (১৯৫০—৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে যুগ্মভাবে) রোভার্স কাপ পেল—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এত অধিকবার কোন দলই রোভার্স কাপ জয় করতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চারবার (১৯৪৯, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬২) রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে দু'বার (১৯৪৯; ১৯৬২ সালে যুগ্মভাবে) রোভার্স কাপ পেল। ১৯৬০ সালের ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশ দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৩—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল। প্রথমদিনের ফাইনাল খেলাটি ২—২ গোলে ড্র ছিল।

১৯৬২ সালের প্রথমদিনের ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ২১ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দলের ইনসাইড-লেফট জুলফিকার প্রথম গোল দেন। বিরতির সময় পুলিশ দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। খেলা ভাঙ্গার চার মিনিট আগে কর্ণার সট থেকে অরুণ ঘোষ মাথা দিয়ে গোল শোধ করেন।

দ্বিতীয়দিনের খেলায় প্রথম গোল দিয়ে অগ্রগামী হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দল। প্রথমার্ধের খেলার ৩০ মিনিটে বলরামের ফ্রিকিক থেকে এইদিনের খেলার প্রথম গোল হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২৬ মিনিটে পুলিশ দল একটা কর্ণার পায়। এই কর্ণার কিক থেকে পুলিশ দলের লেফট-ব্যাক নঈম গোলটি শোধ দেন। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আর কোন গোল হয়নি।

।। স্মরণীয় ।।

১৮৯১ সালে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়।

১৯২৩ সালে বিশেষ নিমন্ত্রণে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের যোগদান এবং ফাইনালে ১—৪ গোলে ডারহামস দলের কাছে মোহনবাগান দলের পরাজয়। ফাইনালে মোহনবাগান ৪৫ মিনিট সময় পর্যন্ত এক গোলে অগ্রগামী ছিল।

১৯৩৭ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে বাঙ্গালোর মুসলিম দলের রোভার্স কাপ জয়। এই বছরের ফাইনালে বাঙ্গালোর মুসলিম দল ১—০ গোলে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ডীন অফ্ দি ফ্যাকালটি অব ড্রামা—রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়;
মেম্বার, বোর্ড অফ্ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়;
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

সেকালের অভিনেতা অভিনেত্রী ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্র ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ

নাট্যমঞ্চ ও নাট্যজীবন এক অবধারিত অনিবার্য পরিণতিতে এসে পৌঁছেছিল নাট্যকোবিদ নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সংসার পথ পরিক্রমায়। তিলে তিলে দিনে দিনে ঊনবিংশ শতকের ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে কলিকাতার অলিন্দ থেকে, জেগে উঠছে নব-চেতনার বিংশ-শতক। এবং এই সন্ধিক্ষণই প্রবল সিন্ধু তরঙ্গের মতো তাঁকে এনে দিয়েছিল নাট্য-লক্ষ্মীর সাধন-মন্দিরে। এই বিবর্তন যেমন তীব্র নাটকীয়, তেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি আগ্রহ-উদ্দীপক। এক আন্তরিক ও অকপট আত্ম-কথনের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, এই সুবৃহৎ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছে এক অপরূপ রসলোকে, নাট্যতীর্থ থেকে সাহিত্যতীর্থে উত্তরণের এ এক নাটকীয় স্বাক্ষর বলা যেতে পারে।

দাম কুড়ি টাকা

স্মরণীয়

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

গল্প ও উপন্যাস

'বনফুল'-এর **গল্প সংগ্রহ**	৮·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মৌসুমী**	৩·০০
বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের **কাঞ্চন মূল্য**	৫·৫০
সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব**	৩·৫০
নবেন্দু ঘোষের **প্রথম বসন্ত**	২·৫০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **বারঘর এক উঠোন**	৮·০০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের **সোহো স্কোয়ার**	২·৫০
বিমল মিত্রের **সুয়োরাণী**	৩·২৫
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি**	৫·৫০

কাব্য-গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের **সাগর থেকে ফেরা**	৩·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **স্বনির্বাচিত কবিতা**	৪·০০
দেবেশ দাশের **সুদূর বাঁশরী**	২·৫০

'বনফুল'-এর উপন্যাস **কন্যাসু ২·৫০**

"বনফুলের রচনার বিশেষত্ব বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশের মধ্যে সমাজদর্শন। এ উপন্যাসটির বিষয় আমাদের দেশের একটি মেয়ের বিয়ে হওয়া। বস্তুত এমন সভ্যদেশ বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই যেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি ছেলে মেয়ের মধ্যে প্রথম আলাপ হয় বাসর-ঘরে। এমন কি বিয়ের ব্যাপারটাও নিজেদের করতে হয় না বলেই আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজই নিজেরা করতে পারে না। এক ভদ্রলোকের যদি একটি ছেলে ও একটি মেয়ে থাকে তবে মেয়ের বাবা এবং ছেলের বাবা হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন চরিত্র।

বনফুল অবশ্য কোনো সংস্কারের মনোভাব নিয়ে উপন্যাসটি লেখেন নি। তবে এ বিষয়ে একশোটা প্রবন্ধের চেয়ে এ রচনাটি মূল্যবান। * * একটি মেয়ের বিয়ের জন্য নানান খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত সৎ পাত্রে ন্যস্ত করায় আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে আছে আর একটি মেয়ের কথা, যার বিয়ে হয়নি এবং কখনো হবে না। বই-এর শেষে কাজ শেষ করার পর নিশ্চিন্ত কন্যার পিতার আকস্মিক নতুন সংকল্প প্রকাশ করায় চোখে জল আসে।"

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ **এমন দিনে ৩·৭৫**

"শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন প্রধানত খ্যাতি রহস্য কাহিনীর জন্য। তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসগুলিও বিশেষ মূল্যবান। এ ছাড়া তিনি হাল্কা রসের গল্প রচনার জন্যও বহু পাঠকের প্রিয়। এ বইটিতে তাঁর তিন জাতের রচনাই সংকলিত হয়েছে। যেমন রহস্য-কাহিনী : সাক্ষী। এমন নিপুণভাবে লিখতে বাংলাদেশে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আর কেউ নেই।

ইতিহাসের আচরণে গল্প : আদিম। ঐতিহাসিক সত্যাসত্য যাচাই করার প্রশ্নই ওঠে না কারণ গল্পগুলি পড়লেই পাঠকের মন অজ্ঞাতপূর্ব বিস্ময়কর ইতিহাসের প্রাচীনকালে বিচরণ করে এবং মনে হয় যেন ঘটনাগুলি চোখের সামনে হয়ে চলেছে।

** হাল্কা-রসের কবিত্বময় কাহিনীর টুকরো রচনায় এখন তিনি অদ্বিতীয়—যেমন 'এমন দিনে', 'সেই আমি', 'সুত মিত রমণী'। নানা রসের স্বাদে বইটি খুবই উপভোগ্য।"

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪-২৬৪১ গ্রাম 'কালচার'

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত

২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 7th December, 1962.
40 Naya Paise.

সমরাঙ্গনে এখন শান্তি না হোক ক্লান্তি। কিন্তু কূটনীতির বুদ্ধি-পরীক্ষায় এখন যে প্রবল তর্ক ও যুক্তির ধূলিজাল উড়িয়াছে তাহার পিছনে শত্রুপক্ষের কিসের প্রস্তুতি চলিতেছে তাহাই এখন আমাদের চিন্তার কারণ। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে যদি চীন কূটতর্ক ও যুক্তির চালে ভারতকে পরাস্ত না করিতে পারে তবে যুদ্ধের অনল আবার প্রজ্বলিত হইবে। অন্য দিকে ইহাও এখন প্রায় নিশ্চিত যে চীনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধুমাত্র হিমালয়ের কয়েক সহস্র বর্গমাইল-ব্যাপী প্রস্তর ও তুষারময় অধিত্যকা বা জঙ্গলে ছাওয়া পার্বত্য অঞ্চল গ্রাস করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না। সুতরাং এই কূটিল তর্কের শেষে পুনর্বার শক্তি-পরীক্ষা অনিবার্য। কেননা চীনের যদি প্রকৃতই এই সীমান্ত লইয়া বিরোধের শান্তিময় মীমাংসা করার ইচ্ছা থাকিত তবে তাহার শর্তগুলির মধ্যে এরূপ কথার 'মারপ্যাঁচ' থাকিত না। যুদ্ধবিরতি রেখা কোথায় স্থির থাকিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই এবং সে বিষয়ে কোনও সরল ও সহজ উত্তর এখনও আসে নাই।

চীন সারা জগতকে বুঝাইতে চাহিতেছে যে সে ভারতের দাবী অপেক্ষা অনেক বেশী দিতে প্রস্তুত আছে। ভারতের পিছনে নাকি সাম্রাজ্যবাদীদিগের চক্রান্ত চলিতেছে এবং তাহারই বশে ভারত যুদ্ধবিরতি করিয়া শান্তিময় মীমাংসার জন্য কথাবার্তা চালাইতে চাহে না। চীনের মুখপাত্র চু এন-লাই সারা জগতকে জানাইয়াছেন যে ভারত যুদ্ধবিরতির শর্তে বলিয়াছে যে চীনা সৈন্যবাহিনী এই বৎসরের ৮ই সেপ্টেম্বর যেখানে ছিল সেই সীমারেখায় ফিরিয়া যাইলে শান্তি বিষয়ক আলোচনা চলিবে। চীনা কর্তৃপক্ষ নাকি ভারতকে আরও অধিক সুবিধা দিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা তাঁহাদের সৈনাবাহিনীকে আরও প্রায় তিন বৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের সীমারেখার পেছনে ফিরাইতে প্রস্তুত এমনই শান্তিকামী তাঁহারা। এবং জগতের অনেক দেশে এই চীনা-ধাঁধার প্রকৃত রহস্য না জানা থাকায়, এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে যে এই সীমান্ত বিরোধ এবং তাহার পরের চীনা আক্রমণ ব্যাপারে আমাদের দোষ যথেষ্ট আছে। এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টির মূলে এখন দেখা যাইতেছে যে আমাদের কথা বলিবার অর্থাৎ এই অপরূপ শান্তি প্রস্তাবের ভিতরে যে ফাঁকি রহিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার লোকের অভাব। যে সকল লোককে আমাদের বহির্রাষ্ট্রবিভাগ বিদেশ-স্থিত আমাদের দূতাবাসগুলিতে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য লোক অল্প। অযোগ্য লোক যে কত আছে তাহার একটি উদাহরণ তো সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। জাকার্তায় অর্থাৎ ইন্দোনেশীয়ায়, ভারতীয় দূতাবাসের বিহারীলাল নামক জনৈক কর্মচারী "অসন্তোষজনক" কার্যকলাপের জন্য ভারতে ফেরৎ আসিতেছিল। সেই বিমানে বহির্রাষ্ট্র-দপ্তরের ইতিহাস বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ এস গোপালও ছিলেন—যিনি উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের সহিত বর্মা, মালয়, কাম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশীয়ায় এই চীনা প্রস্তাবের ভিতরের ফাঁকি ধরাইতে গিয়াছিলেন। বিমানে ঐ বিহারীলাল "তোমরা চীনের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছ" বলিয়া ডাঃ গোপালকে ছুরিকাহত করে। আমাদেরই দূতাবাসে এরূপ ব্যক্তি থাকিলে সে দেশে যে আমাদের বিরুদ্ধে বিপরীত মতের সৃষ্টি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? এই বিহারী-লাল মহাশয় কে এবং তিনি ঐ বিভাগে নিযুক্ত হইলেন কি ভাবে তাহা জানা প্রয়োজন।

চীনা প্রস্তাবের ভিতরের উদ্দেশ্য ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। ঐ প্রস্তাবিত পশ্চাদপসরণের কোনও প্রকৃত সীমারেখা নাই, অর্থাৎ চীনাবাহিনী তাহাদের এই অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে যাহা গ্রাস করিয়াছে চীন চাহে যে সে সকলই তাহার অধিকারে থাকে এবং আমাদের সেনাবাহিনী আরও ১২ মাইল পিছু হটিয়া আসে। লাডাখে এই ব্যাপার ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। নেফার কথা বুঝা যায় নাই—এই লেখার সময় পর্যন্ত।

ওদিকে আমাদের আর এক প্রতিবেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এই সময় ভারতের সহিত বুঝাপড়া করিতে। যাই হোক, সম্প্রতি ব্রিটিশ ও মার্কিন মিশনের দুই কর্তাব্যক্তি, সাণ্ডস এবং হারিমান রাওয়ালপিণ্ডি ও নয়াদিল্লীর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ আলোচনার গোড়া-পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন মনে হয়।

কবিতা

গান

গৃহে গৃহে আজি দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়ায়ে হাঁক দিয়ে বল,
মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই,
জয় গাহ আজি দেশ মাতার
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার
জ্বালাও মুক্তি কামনার আলো
হৃদয়ে জ্বালাও সুর দিয়ে বল,
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
জোর করে বল আপোষ নাই, আপোষ নাই
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই
মৃত্যুপণ জীবনপণ হয় বিজয় নয় মরণ
দিগ্‌দিগন্তে ঝড় তুফানে অন্ধ আঁধার ঘনায় ঐ
বল মাভৈঃ বল মাভৈঃ, হে সৈনিক নিশান কৈ।

(পুনর্মুদ্রণ)
—অজ্ঞাত

গান

(অংশ)

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলসরে, সাজো সাজো রণ-সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল!
কে রবি প'ড়ে লাজে॥

বহে স্রোত জীবন নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয় দূর সাগর ডেকে যায়॥
হ'বি মৃত্যু-পাথার পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥

(পুনর্মুদ্রণ)
—কাজী নজরুল ইসলাম

অটল চূড়া

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

প্রণাম অটল চূড়া,
অয়ি শুভ্রকিরিটিনী দেশ,
ভুবনমোহিনী প্রাণ-প্রতিমার মুগ্ধ স্বপ্নাবেশ
কুজ্ঝটিকা ছিন্ন করে বিচ্ছুরিত নব রৌদ্ররাগে
এ কোন নতুন রূপ আমায় দেখালে,—
সমুদ্যত দশদিকে ঝলসায় দশ প্রহরণ
উর্ধ্বে দ্বি-ত্রিংশকোটি ভুজৈর্ধৃত খর-করবালে।

নতুন স্বরূপে আজ আরবার তোমাকে চিনলাম,
দুর্জয় তুষারমৌলি, হে কারাকোরাম।
অভ্রংলিহ গৌরীশৃঙ্গ গম্ভীর মহিমা নিয়ে জাগে
আরক্ত ছটায় দীপ্ত নবোদিত সূর্যের সংরাগে।
কে আছো ঘুমিয়ে? শোনো, প্রভাতের এই বৈতালিক—
অজেয় প্রতিটি শৃঙ্গ—সীমান্তের নির্ভীক সৈনিক।
অটুট প্রতিজ্ঞা নিয়ে দৃঢ়বদ্ধ প্রতি ওষ্ঠাধরে
বিনিদ্রিত অক্লান্ত প্রহরে
প্রতিরোধে প্রতিরোধে শেষতম রক্তবিন্দু ঢালে;
আমার বুকের রক্তে ফোঁটা দিই তাদের কপালে।

পাথুরে দেয়াল তুলি; কে এগোও, কলঙ্কিত পায়ে?
কে এগোও? সাবধান! কে এগোও, অন্ধ আবছায়ে?
জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো ঘরে ঘরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি
প্রাণযজ্ঞে দিতে পূর্ণাহুতি,
এখানে প্রস্তুত চতুর্দিক;
ছিন্ন করে স্বপ্নাবেশ
জাগে সুপ্ত সিংহ-দেশ ঃ
প্রণাম অটল চূড়া—সীমান্তের নির্ভীক সৈনিক।

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

গত সপ্তাহে শিশু ও কিশোরদের লেখাপড়ার বিষয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করেছি। এবার বলছি প্রধানত কিশোর এবং তরুণদের বিষয়ে।

বলা বাহুল্য, দেশের এই সংকট-কালেও কিশোর ও তরুণ, অর্থাৎ আমাদের ছাত্র সমাজের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বড়, তাদেরও লেখাপড়ার কাজে অবহেলা করলে চলবে না। কিন্তু তার সঙ্গেই আরো কতকগুলি নতুন কর্তব্য আছে তাদের, যা পড়াশোনার সঙ্গেই সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন ক'রে যেতে হবে।

আমি সামরিক শিক্ষার কথা বলছি। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে, অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু করে কলেজের ছাত্র পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে শরীর গঠন ও সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করা হ'য়েছে। এ প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাবেন না, এমন অভিভাবক বোধহয় একজনও নেই। বরং ইতিমধ্যে যখন খবরের কাগজে একদিন দেখলাম, আমাদেরই এই শহরের একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় দু'হাজার ছাত্র স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থায় অগ্নিনিয়োগ করেছেন, তখন গৌরবে আমার বুক ভরে উঠল। আমি জানি, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ-গুলিতেও অনুরূপ প্রেরণার জোয়ার এসে যাবে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যগণ ইতিমধ্যেই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ এবং দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। এগুলি নিশ্চয়ই মনে রাখবার মতো ঘটনা।

বাস্তবিক ছাত্র সমাজের এই জাগরণ এত উৎসাহজনক যে, আজ রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলা চলে যে, দেশের সেবায় কে আগে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে, সেই নিয়েই প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন ছাত্রগণ প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে অত্যাচারীর মুখোমুখী রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেইরকমই কিংবা তারো চেয়ে বেশি আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা

নিয়ে অগ্নিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে আজ আমাদের ছাত্র সমাজ। দেশজননীর আশীর্বাদে তারা হবে অজেয়।

কিন্তু এই সামরিক শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করেই আমাদের কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হননি। এইসঙ্গে তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রেরণা যাতে দৃঢ়মূল হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রকে জাতীয়সংগীতের ভাবগাম্ভীর্যে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলার কার্যক্রম তার অন্যতম। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থেকে এই মহৎ পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন। এবং সে প্রয়োজনের বিষয়ে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষও যে একমত হবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।

এইগুলি এবং এই ধরণের আ'রো কতকগুলি ব্যবস্থা আছে যাকে বলা যায় 'অবিলম্বে করণীয়'. কিন্তু এছাড়া অন্য কয়েকটি বিষয় আছে সেগুলি 'দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্রম' হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে।

চীনা-আক্রমণের পটভূমিতে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক চিন্তা এবং সমাজ সংগঠন ইত্যাদিকে যেমন ঢেলে সাজতে হচ্ছে, সেইরকম শিক্ষাবিধিরও দ্রুতপরিবর্তন প্রয়োজন।

একদা বিদেশী-আমলে আমাদের শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেরানী তৈরি করা। স্বাধীনতালাভের পর নবজাগ্রত জাতির আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার দিকে বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়। এবং সেইসঙ্গেই ছিল বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই ব্যবস্থাগুলিতে ছিল দেশের শান্তিকালীন অবস্থার প্রতিফলন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে এক মদমত্ত শত্রুর অস্ত্রাঘাত। তাকে প্রতিঘাত হানার ক্ষমতা অর্জনের জন্যে যে ধরণের শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের উচ্চতর ছাত্রদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থাও আমাদের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বেই করবেন। এ প্রসঙ্গে আমার কেবল নিবেদন এইটুকু যে, শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উচ্চতর ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাকে নিবদ্ধ না রে'খ শিশু-শিক্ষার স্তর থে'কই তার গোড়াপত্তন ঘটানো দরকার।

সকলেই বোধকরি স্বীকার করবেন, মানুষ যে শিশু অবস্থা থেকে নানাভাবে শিক্ষালাভ করতে করতে ক্র'ম 'মানুষ' হ'য়ে ওঠে, তার পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র। পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের প্রভাব তাতে যথেষ্টই থাকে বটে, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের প্রভাবও প্রায় অপরিসীম।

সেইজন্যে আমার প্রস্তাব এই যে, মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যে একেবারে প্রাথমিক স্তরের যেসব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় তারও বাক্যগঠন ও সন্দর্ভগুলি দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার দিকে লক্ষ্য রেখে লিখিত হওয়া উচিত। এবং এই প্রক্রিয়া স্তরে স্তরে ব্যাপ্ত হ'য়ে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

এছাড়া ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠক্রমেরও কিছু পরিবর্তন প্র'য়োজনীয়। দৈনন্দিন জীবনে যেসব ঘটনা আমাদের তরুণতর ছাত্রগণ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে আলোচিত হতে শোনে তার প্রকৃত তাৎপর্য তারা অনেক সময়েই বুঝতে পারে না। এইগুলি যাতে তারা মোটামুটি বুঝতে পারে তার জন্যে তাদের বিদ্যালয়িক শিক্ষার কিছু হেরফের ঘটানো দরকার। প্রতি সপ্তাহে এখন একটি ক্লাসের ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায়, যেখানে সেই সপ্তাহে আলোচিত ঘটনা ইত্যাদির বিষয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যামূলক ভাষণ দেবেন, এবং ছাত্ররাও প্রশ্ন করে বিস্তৃততর তথ্যাদি জেনে নেবে।

এইসঙ্গে আরো একটি প্রস্তাব আছে যা বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। ভারত সরকার ও আমাদের রাজ্য সরকারের প্রযোজিত তথ্যচিত্রগুলি নিজের দেশকে ভালো করে জানার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট উপায় বলে মনে করি। কর্তৃপক্ষ যদি ব্যবস্থা করেন যে, যেখানে সুবিধে আছে সেখানে এই ছবিগুলি নিজেদের বিদ্যালয়ে এবং অন্যদের জন্যে এগুলি বিনামূল্যে সরকারী প্রেক্ষাগৃহে দেখাতে হবে প্র'ত্যেকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের, তাহলে একটা মহৎ কর্তব্য সাধিত হ'তে পারে।

আমাদের ছাত্রসমাজ আজ দেশাত্মবোধে যতো গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে, আমাদের ভবিষ্যৎও হবে ততোই ভাস্বরতর মহিমায় দীপ্ত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের সহযোগিতায় আমরা এমন এক লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞার যুগে উত্তীর্ণ হ'য়েছি আজ যে সকলেই প্রতিনিশ্বাসে অনুভব করছি—আমরা নতুন মানুষ।

শত্রুর পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী।

*

'পূর্বপক্ষে'র ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনায় শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের দেশাত্মবোধক রচনার জন্যে আহ্বান জানানো হ'য়েছিল। তারপর দে'শ সাহিত্যিকগণও যেমন সভাসমিতি ক'রে, কবিতা ইত্যাদি রচনা ক'রে তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছেন, শিল্পীরাও তেমনি পিছিয়ে নেই। তাঁদেরও ছবির প্রদর্শনী উন্মুক্ত হ'য়েছে জনসাধারণের জন্যে। এবং সেই প্রেরণায় অপেক্ষাকৃত অখ্যাত শিল্পীও তুলি ধরেছেন দেশসেবার ব্রতে।

নিদর্শন হিসাবে 'অমৃতে'র জনৈক পাঠক শ্রীহরিনারায়ণ কর্তৃক অঙ্কিত দুটি প্রতিরোধের স্কেচ মুদ্রিত করা হ'ল এখানে।

*

॥ দুই স্মৃতি ॥

শরৎ-বন্দনা। তখনকার দিনের গণ্য-মান্যেরা উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। টাউন হলে খুব ঘটা করে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। কর্তাদের পিছনে পিছনে আমরা আছি। শরৎচন্দ্র চেনেন আমাকেও—সামান্য-সাধারণ অনেককেই তিনি চিনতেন। পরিষদের পরিমণ্ডল গড়ে মানুষ থেকে আলাদা হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না।

লোকারণ্য টাউন হলে। সেদিন আবার হিজলি-দিবস। হিজলি বন্দীশালায় ঐ তারিখে বীর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে গুলী মেরেছিল ইংরেজের চেলা-চামুণ্ডারা। নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্মৃতিময় জাতীয় দিবস।

শরৎচন্দ্র টাউন হলে ঢুকতে যাচ্ছেন, ছেলেরা পথ আটকাল : এমন শোকের দিনে আপনি উৎসব করতে যাচ্ছেন কেন?

শরৎচন্দ্র দাঁড়ালেন। আমি অনতি-দূরে—স্বচক্ষে সমস্ত দেখছি। শরৎচন্দ্র বললেন, জন্মদিন বলেই এই তারিখ ঠিক হয়েছে। জন্মানোয় আমার তো হাত ছিল না। হিজলির দুর্ঘটনাও হয়নি তখন।

আবার তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। যজ্ঞ পণ্ড।

কোথায় চলে গেলেন, বড়রা খোঁজ পেয়েছিলেন হয়তো। বেহালায় মণীন্দ্র রায়ের বাড়ি শরৎচন্দ্রের আস্তানা। সেই-খানে গিয়েছি আমি। আরও কেউ কেউ গেলেন, নাম মনে পড়ছে না। শরৎচন্দ্র ফেরেন না। রায়-বাড়ির লোকেরাও উদ্বিগ্ন।

অনেক রাত্রে অবশেষে ফিরলেন।

কোনখানে নিরুদ্দেশ হলেন, সকলে ভেবে সারা।

শরৎচন্দ্র বললেন, বাড়ি এসে বসতে ইচ্ছে হল না। কী করা যায়? ভাবলাম, জোড়াসাঁকোয় রবিবাবুর কাছে যাই। সেখানে গল্পসল্প হচ্ছিল এতক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, দেখ শরৎ, তোমার জীবন সম্বন্ধে লোকের বড় কৌতূহল। আমার 'জীবন স্মৃতি' সকলে আনন্দ করে পড়ে। তুমিও লেখো তেমনি।

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন, আমার জীবন তো ভাল নয় আপনার মতন। সে জিনিস লেখা যায় না।

একটু থেমে আবার বললেন, আগে তো জানিনে এত বড় হব। তা হলে সেই রকম মাপজোখ করে চলতাম।

মনে পড়ল

এ গল্প আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখে শুনেছি। শরৎ-বন্দনার প্রথম অধিবেশন পণ্ড হল—সেই রাত্রে। মণীন্দ্র রায় মশায়ের বৈঠকখানায়।

*　　*　　*

দীনেশ সেন মশায়কে নিয়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

তিনি তখন 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে বাঙ্গালী জাতির সুরম্য সুবৃহৎ ইতিহাস লিখছেন। বাংলার লোক-সাহিত্য লোক-শিল্প ও লোক-সংস্কৃতি নিয়ে সেই বয়সটায় আমার বড় উৎসাহ। 'পল্লী-সম্পদ রক্ষা সমিতি' স্থাপিত হয়েছে—গুরুসদয় দত্ত মশায় সভাপতি, জসীম-

মনোজ বসু

উদ্দিন ও আমি যুগ্ম-সম্পাদক। বাংলার আসল চেহারাটা দেখবার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই অনেক সময়।

সেন মশায়কে আমি খবর দিলাম, কালীঘাটের নোংরা দুর্গম বস্তির মধ্যে এক দরিদ্র পটুয়ার কাছে পুরানো দিনের দুষ্প্রাপ্য কয়েকখানা পট আছে। দীনেশ-চন্দ্র বললেন, তুমি নিয়ে চলো আমায় সেই জায়গায়। জিনিসগুলো একবার দেখে আসব।

যথা নির্দেশ এক দুপুরে বেহালায় সেন মশায়ের বাড়ি গিয়েছি। আমায় সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব ঘোড়ার গাড়িতে বেরুলেন। ইউনিভার্সিটিতে বোর্ডের মিটিং, সেখানটা একবার ঘুরে যেতে হবে—এই মিনিট পনেরোর ব্যাপার। দু-জনে তারপর কালীঘাট চলে আসব।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর দোতলার বারান্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে 'আসছি' বলে দীনেশচন্দ্র মীটিঙের ঘরে ঢুকে গেলেন। পনের মিনিটের ঘন্টা পুরে গেল, দেখা নেই। আরও কয়েকটা জরুরি কাজ রয়েছে আমার—দেরির জন্য ছটফট করছি। কিন্তু বাংলা দেশের প্রতি একান্ত প্রীতিপ্রবণ তিনি—মানুষটিকে বড় শ্রদ্ধা করি, তাঁকে ফেলে চলে যেতে পারছি না।

অবশেষে বেরুলেন। প্রায় দু-ঘন্টা কেটেছে। বললাম, পনের মিনিটের কথা বলে দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন—

দীনেশচন্দ্র বোমার মত ফেটে পড়লেন : যাও, শ্যামাপ্রসাদকে বলোগে—

সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। শ্যামা-প্রসাদের শিক্ষক তিনি, বড় আনন্দের সম্পর্ক দুয়ের মধ্যে। এ ব্যাপার নিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে কি বলতে হবে, বুঝতে পারিনে।

বলছেন, কাজকর্ম আর কিছু হবে না। হবার উপায় নেই। আগে নিয়ম ছিল, মেম্বাররা যা-কিছু বলবেন ইংরেজিতে। পারতপক্ষে কেউ মুখ খুলত না গ্রামার ভুল হবার ভয়ে। শ্যামাপ্রসাদের আমলে নিয়ম হল, বাংলাতেও বলা যাবে। এবারে জো পেয়ে গেছে। আজেবাজে তর্ক—নানান কায়দায় বিদ্যে জাহির করা। যা মিনিট পনেরোয় হয়ে যায়, তার জন্য দু-ঘন্টা লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি কাজ চাই তো আবার সেই পুরানো নিয়ম বহাল হোক। কথাবার্তা লেখাজোখা সমস্ত ইংরেজিতে।

শ্যামাপ্রসাদের কাছে একদিন এই কাহিনী বলেছিলাম। হাসাহাসি চলল।

ঢাকী ঢুলী সাবধান!

— কাফী খাঁ
২৯-১১-৫২ ইং

নেপাল

পাকিস্থান

ম্যাকমেহন লাইন

জয় হিন্দ

অনুকূল

অকস্মাৎ বজ্রপাতে হয়তো হয়েছি সচকিত,
হয়তো ভাবিনি কভু বন্ধু হবে বিশ্বাস-ঘাতক,
তবু মোরা আছি স্থির, নহি ভীত, নহি বিচলিত,
স্বহস্তে স্ববীর্যবলে ধৌত করি শত্রুর পাতক,
উত্তীর্ণ হইব মোরা নব-তীর্থে নবীন জাতক।

সে নবীন স্ফীত বক্ষে দৃপ্ত কণ্ঠে করিবে ঘোষণা,
ভারত-সন্তান মোরা সহিব না মিথ্যা অপমান,
দস্যুদের রক্তচক্ষু নেহারিয়া কাঁপিবে না প্রাণ
সূচ্যগ্র সমান ভূমি ভীত হ'য়ে কখনও দিব না
নিত্যকাল উচ্চশির গেয়ে যাব ভারতের গান।

স্বাধীন ভারতবাসী এ মোদের সত্য পরিচয়
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, উচ্চকণ্ঠে বলহ নির্ভয়।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে কলম ধরুন

ভারতীয় লেখকদের প্রতি সাহিত্য আকাডেমীর আবেদন

সাহিত্য আকাডেমীর পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীকে আর কৃপালনী বলেছেন, দেশের এই জরুরী অবস্থায় সমগ্র জাতীয় সম্পদ একত্রিত করতে হবে। ভারতীয় লেখকদের কর্তব্য হবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লেখনী চালনা করা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সাহিত্য আকাডেমীর সভাপতি।

শ্রীকৃপালনী দেশের লেখকদের প্রতি তাঁর আবেদনে বলেন, লেখকদের নিকট স্বাধীনতা হতে অধিক মূল্যবান আর কিছু নেই। এই স্বাধীনতা আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মধ্যেই উপভোগ করেছি। এক্ষণে জাতি তার জীবনমরণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এই নিদারুণ দুঃসময়ই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের শক্তি এবং যা কিছু আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান করে তোলে সেগুলি রক্ষার্থে আমাদের ক্ষমতা পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। যদি এরজন্য আমরা প্রাণপাত করতে প্রস্তুত না থাকি তবে আমরা স্বাধীনতা ভোগের অনুপযোগী বলে পরিগণিত হব।

শুধু ভৌগোলিক সীমান্তেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অঙ্গনেই অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও যুদ্ধ চলেছে। আমাদের প্রত্যেককে, যে যাই করি না কেন, আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতার ঋণ পরিশোধের জন্য জাতীয় সম্পদ একত্র করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

আসুন আমরা ঐ কর্তব্য সাধনে বদ্ধপরিকর হই। নাগরিক হিসাবে আমাদের বৈষয়িক সম্পদ দেশের জন্য দান করতে হবে এবং লেখক হিসাবে আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের লেখনী ধারণ করতে হবে।

আজ সমগ্র দেশে যে স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ দেখা দিয়েছে, বিরাট উদ্যম ও সাহসিকতাপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তার প্রকাশ আবশ্যক। অন্যথায় তা ব্যাপক বিদ্বেষ ও উত্তেজনার প্রহসনেই রূপান্তরিত হবে। সকল সৃজনীশক্তির পক্ষেই তা চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি এবং শান্তিতেই বসবাস করেছি। কিন্তু পরাধীন হয়ে শান্তিতে বাস করা যায় না। তা মানবিকতার পক্ষে অপমানও বটে। অহিংসার উপাসক মহাত্মা গান্ধী বলতেন, "সমগ্র জাতির স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে আমি শত সহস্রবারও হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা করব না।" তিনি আরও বলতেন, "জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি ভারতবাসীদের অস্ত্রধারণ করতে বলব। ভীরুর মত থেকে জাতীয় অসম্মান লক্ষ্য করার চেয়ে তা অবশ্যই শ্রেয়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন একজন শান্তির কবি। তিনিও এক সময়ে গেয়েছিলেন,

> "তোমার কাছে আরাম চেয়ে
> পেলেম শুধু লজ্জা।
> এবার তবে আপন হাতে
> পরাও রণসজ্জা॥"

সীমান্তের ডাক

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

চরিত্র

শিবনাথ	সর্বেশ্বর
প্রভা	বাউল
রাধারাণী	সমীর

[একটি টালীর ঘরের সম্মুখস্থ উঠোন। বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন। দূরে থেকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হবে।]

শিবনাথ ।। ইতিহাসের সেই একই প্রশ্ন—বার বার একই প্রশ্ন আসছে ঘুরে ঘুরে.........

প্রভা ।। এই মরেছে! কোথায় তর্ক শুরু ক'রে দিয়েছিল—ক্ষেপে উঠেছে। এমন লোক নিয়ে মানুষ পারে! বেলা দুপুর হতে চললো—সেদিকেও যদি হুঁশ থাকে! বাজারটা পর্যন্ত হলো না আজ......

[শিবনাথের প্রবেশ]

শিবনাথ ।। ওরা ভেবেছিল আমরা দুর্বল!

প্রভা ।। কারা ভাবলো?

শিবনাথ ।। যারা আমাদের বুকে থাব্‌লা মেরে খানিকটা মাংস তুলে নিতে চায়।

প্রভা ।। এস আবার কী!

শিবনাথ ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তাই। কিন্তু ওরা তো জানে না এটা দধীচির দেশ। বুকের অস্থিতে এখানে বজ্রের সৃষ্টি।

প্রভা ।। কিন্তু এদিকে যে বজ্রপাত! বাজার তো হলো না—সামনে বেড়ে দেব কী?

শিবনাথ ।। ছেলেটা যখন আমাকে জিগ্যেস করলে—যুদ্ধ হয় কেন?

প্রভা ।। আর অমনি তোমার মাথা গরম হয়ে উঠলো!

শিবনাথ ।। মাথা নয়, মাথা নয়—রক্ত গরম হয়ে গেল।

প্রভা ।। তা তো হবেই! সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিতে না পারলেই যত গণ্ডগোল।

শিবনাথ ।। প্রশ্নটা সহজ, প্রভা!

প্রভা ।। সহজ বই কি। অন্যেরটা জোর করে কেড়ে নিতে গেলেই যুদ্ধ করতে হয়।

শিবনাথ ।। আমরা তো কারো কিছু কেড়ে নিতে যাইনি!

প্রভা ।। চায়ের দোকানে বসে বুঝি এতক্ষণ এই তর্কই করছিলে?

শিবনাথ ।। তর্ক নয়, তর্ক নয়—গোটা ইতিহাস এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়। নগ্ন বর্বর রূপটাকে দেখে আমি আঁতকে উঠি। সেকেন্দর, সিজার, চেঙ্গিজ, হিটলার আমার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ায়। কী বীভৎস রূপ তাদের! কিন্তু পারেনি, কেউ পারেনি কালের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে।

প্রভা ।। চাকা যেদিকে ঘুরবার ঘুরবেই। নিজেদের অদৃষ্ট দেখেই তো বুঝতে পারছি।

শিবনাথ ।। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা ভাববার এ সময় নয়, প্রভা।

প্রভা ।। কেন ভাববো না! দেশ দেশ করে সারাটা জীবন দিলে—দেশ কী দিয়েছে তোমাকে?

শিবনাথ ।। ভুল করো না। দেশ জীবনের চাইতেও বড়ো।

প্রভা ।। জানি, জানি। জীবনভর তোমার মুখ থেকে ওই একটা কথাই শুনলাম। এসব লোকের ঘর-সংসার পাতা অন্যায়।

শিবনাথ ।। দেশের মাটি আছে বলেই সংসার পাততে পেরেছি।

প্রভা ।। সংসার! না শ্মশান?

শিবনাথ ।। প্রভা!

প্রভা ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্মশান, শ্মশান। তুমি শ্মশানের শিব। ঘরে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শান্তি নেই—আর তুমি দেশ নিয়ে মেতে আছ!

শিবনাথ ।। যে দেশের বায়ুতে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে, যে দেশের রসে আমার দেহ পুষ্ট হচ্ছে, যে দেশের নীল আকাশ আমার দু'চোখকে স্নিগ্ধ করছে, যে দেশের সবুজ মাঠ আমার হৃদয়কে দোলা দিচ্ছে, যে দেশের বারিধারা আমার তৃষ্ণা নিবারণ করছে, যে দেশের মাটি আমাকে কোল দিয়েছে—সে দেশ আমার জননী। সে দেশকে যে ভুলে যায় সে বেইমান।

প্রভা ।। যে মা তার সন্তানকে খেতে দেয় না, তিলে তিলে শুকিয়ে মারে, সেও বেইমান।

শিবনাথ ।। প্রভা, প্রভা! মা হয়ে তুমি এমন কথা বলতে পারলে! সন্তানের মুখে অন্ন যোগাতে না পারলে মায়ের বেদনা হয়, কিন্তু মা বেইমান হয় না।

প্রভা ।। হয় হয়, মা'ও বেইমান হয়। না হলে যে মায়ের আঁচল ধরে ছিলাম সেই জন্মভূমি বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে আসতে হলো কেন?

শিবনাথ ।। মা ছাড়েননি—আমরা ছেড়ে এসেছি। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। যদি প্রাণ দিতে পারতাম ...

প্রভা ।। প্রাণ নয় গো, প্রাণ নয়—যদি মান দিতে পারতাম...

শিবনাথ ।। কিন্তু মান তো আমাদের বেঁচেছে।

প্রভা ।। হ্যাঁ, মান বেঁচেছে, তবে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কী পেয়েছি এখানে এসে আমরা? দেশ ভাগ হলো, বাড়ি গেল, ঘর গেল, তোমার চাকরি গেল। এখানে এসে কোনোরকমে যোগাড় করলে একটা স্কুল-মাষ্টারি। বুড়ো হয়েছ বলে তাও গেল। এখন দুবেলা ছেলে পড়িয়ে যে ক'টা টাকা পাও তা দিয়ে দশদিনও চলে না। বস্তিরও অধম এই জবরদখল কলোনীতে কাঠ-পাতার চালাঘরে বাস! ছেলেটাকে কলেজে পড়ানো গেল না টাকার অভাবে। দেশের কাছ থেকে তো এই পেয়েছ! আর তোমার খালি দেশ ...দেশ...দেশ!

শিবনাথ ।। মহাজনী বুদ্ধি তোমার আছে স্বীকার করি।

প্রভা ।। হ্যাঁ, আছেই তো। কেন থাকবে না! আমি যদি দেশের জন্যে ভাবি, দেশ কেন আমার জন্যে ভাববে না!'

শিবনাথ ।। দ্যাখো, দেশসেবা তো লগ্নী কারবার নয় যে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে আদায় ক'রে নেব!

প্রভা ।। নেবই তো। কেন নেব না? হোমরা-চোমরাদের কেউ কি কম নিচ্ছে? পাঁচ বছর আন্দামানে কাটালে, চার বছর অন্তরীণ থাকলে, সাত বছর জেল খাটলে, কিন্তু তোমার জন্যে সরকারী মাসোয়ারা বরাদ্দ হলো মাত্র চল্লিশ টাকা। আর দ্যাখো গিয়ে, যারা ছ'মাসও দেশের জন্য জেল খাটেনি, এমন কি কোনোদিন জেলের ফটকও চোখে দেখেনি, তাদের একেকজন একশ' দেড়শ' ক'রে সরকারী মাসোয়ারা পাচ্ছে। এই তো বিচার!

শিবনাথ ।। মাসোয়ারা না পেলেও আমি কিছু বলতাম না।

প্রভা ।। কেন বলবে না! তোমার দাবি নেই?

শিবনাথ ।। না, নেই। দেশের কাছে আমার একমাত্র দাবি আছে তাকে সেবা করার। সেই অধিকার থেকে কেউ আমাকে কোনোদিন বঞ্চিত করতে পারেনি এবং পারবেও না।

প্রভা ।। আশ্চর্য মানুষ তুমি!

শিবনাথ ।। আমার মাও এ কথাই বলতেন। সর্বস্ব পণ করে দেশের কাজে নেমেছিলাম। আর কোনো প্রত্যাশাই ছিল না—একমাত্র কামনা ছিল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। আজ আবার সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামের দিন এসেছে। এসময় পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন আসে না, প্রভা। শুধু দেয়া— দেয়া—কে কত দিতে পারে......

প্রভা ।। যাদের আছে তারা দেবে। যাদের কিছুই নেই তারা আবার দেবে কী!

শিবনাথ ।। আছে আছে, প্রভা, দেবার অনেক আছে। আছে আমাদের মন-প্রাণ অন্তর, আছে দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগ।

প্রভা ।। বুঝেছি, ঢাকে কাঠি পড়েছে আর অমনি গাজনের সন্ন্যাসী মেতে উঠেছেন!

শিবনাথ ।। হ্যাঁ, মেতে উঠেছে, সত্যি মেতে উঠেছে। ভেতরটা নেচে উঠেছে আমার। মনে হয় শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে। যে হাত একদিন ইংরেজ মারতে উদ্যত হয়েছিল সে হাত আবার অস্ত্র ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বার্ধক্য আমাকে বাধা দিচ্ছে। যদি শক্তি থাকতো তবে আজই আমি সৈন্য-দলে নাম লেখাতাম।

প্রভা ।। লেখাও না। বাধা দিচ্ছে কে! একটা পিঁজরাপোল-বাহিনী হবে! নাঃ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনলে তো পেট ভরবে না। যা হয় সেদ্ধ-পোড়া তো কিছু চাপাতে হবে। না হলে তো হরিবাসর। এমন পাগল নিয়ে যেন কাউকে কোনোদিন ঘর না করতে হয়।

[প্রভার প্রস্থান]

শিবনাথ ।। ইতিহাসের সেই একই প্রশ্ন—ঘুরে আসে বার বার!

[চেঁচামেচি করতে করতে সর্বেশ্বর ও রাধারাণীর প্রবেশ।]

রাধারাণী ।। আমার সোনায় হাত দিবি তো তোর মুখে নুড়ো জেলে দেব।

সর্বেশ্বর ।। অঃ! বড়ো সোনার মালিক হয়েছেন! সোনা তুই পেলি কোথায়! কার টাকায় সোনা হয়েছে?

রাধারাণী ।। তোর টাকায় হয়েছে, মুখ-পোড়া, তোর টাকায় হয়েছে?

সর্বেশ্বর ।। আমার টাকায় হয়নি তো কার টাকায় হয়েছে? তুই রোজগার করিস, না তোর কোনো নাগর আছে?

রাধারাণী ।। ভালো হবে না, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। মুখ খারাপ করবি তো মুখে ঝাঁটা মারবো।

সর্বেশ্বর ।। মার্ না ঝাঁটা, দেখি কেমন ক্ষেমতা আছে! বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো তোর চুল ছিঁড়ে বেহালার ছড় বানাবো।

রাধারাণী ।। আমাকে বেশি চটাসনি, বলছি, বেশি চটাসনি! তোর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাবো।

সর্বেশ্বর ।। শুনছেন শিবনাথবাবু, শুনছেন মাগীর কথা। [দাঁত কড়মড় করে] কথা শুনে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে না!

শিবনাথ ।। আহা হা, থামুন না একজন।

সর্বেশ্বর ।। থামবো কি মশায়, মাগীর কথা শুনে পিত্তি জ্বলে যায়। বাচ্চা ছেলেমেয়ে-গুলোর কথা ভেবে আমি

পারিনে। না হলে নাথি মেরে কবে ওকে বাড়ি থেকে খেদাতাম!

রাধারাণী।। মার না নাথি, দেখি তোর কেমন মুরদ! তোর পায়ে কুষ্ঠ হবে।

সর্বেশ্বর।। তা হতে পারে। নচ্ছার মাগী! তোর অঙ্গ স্পর্শ করাও পাপ।

শিবনাথ।। আঃ সর্বেশ্বরবাবু! একজন চুপ করবেন তো!

সর্বেশ্বর।। ওকে আগে চুপ করতে বলুন। কুন্তী দিনরাত খালি আমার সঙ্গে খ্যাঁক খ্যাঁক করে।

রাধারাণী।। শুনলেন, শুনলেন তো চাটুজ্যে মশায় ড্যাকরার কথা! জন্মের পরে ওর
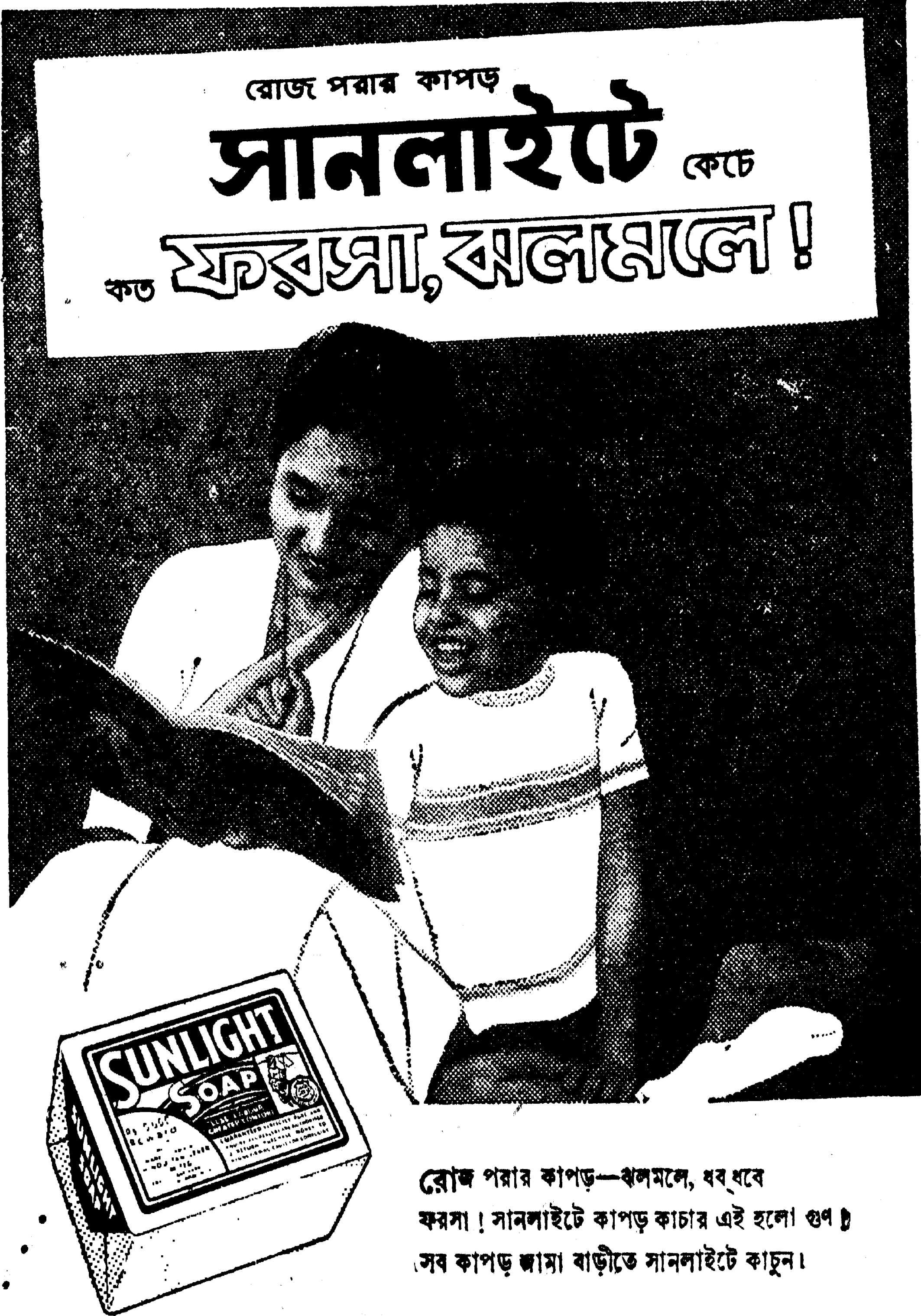
মা ওর মুখে মধু দেয়নি, বিষকচুর ডাঁটা পুরে দিয়েছিল।

সর্বেশ্বর ।। আর তোর মুখে দিয়েছিল কেউটের ল্যাজ।

শিবনাথ ।। আপনারা একজন চুপ করবেন, না কি?

সর্বেশ্বর ।। আপনিই বিচার করুন, শিবনাথবাবু আমি কি অন্যায় কথাটা বলেছি?

রাধারাণী ।। হ্যাঁ, আপনার ওপরই আমি বিচারের ভার দিলাম, চাটুজ্জেমশায়, ড্যাকরার যদি অলেহ্য কথা বলে থাকি, আমার মুখে আপনি পাঁচ ঘা জুতো মারেন।

শিবনাথ ।। ছিঃ ছিঃ! এসব কি কথা!

রাধারাণী ।। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি। আপনাকে এই কলোনীর আমরা সবাই মান্যি করি। আপনিই বিচার করুন, সোনা ও কেড়ে নেবে কেন?

সর্বেশ্বর ।। আমি কেড়ে নেব বলেছি!

রাধারাণী ।। বলিসনি, বলিসনি তুই যে আমি যদি আমার গয়না না দিই তবে জোর করে তুই তা কেড়ে নিবি?

সর্বেশ্বর ।। কী হবে গয়না দিয়ে? বলি কী হবে? গয়না পরার বয়স তোর আছে?

রাধারাণী ।। তা থাকবে কেন! তোর মন পড়ে থাকে কোথায় আমি জানিনে? আমি তো এখন তোর দু'চোখের বিষ হয়েছি।

শিবনাথ ।। রাধারাণী, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বাড়িতে গিয়ে করাই ভালো নয়কি?

রাধারাণী ।। আমি ঝগড়া করতে আসিনি, চাটুজ্জেমশায়। আপনি তো জানেন, আমি কি ঝগড়া করার মানুষ! ও আমাকে দিয়ে ঝগড়া করায়।

সর্বেশ্বর ।। অঃ! কী শান্ত সুশীলা রে!

রাধারাণী ।। ওই দ্যাখেন, দ্যাখেন আপনি! আপনাকেও যদি মান্যি করে! আবার ঝগড়ার তালে আছে।

শিবনাথ ।। কী হয়েছে সর্বেশ্বরবাবু? আপনারা তো শুধু ঝগড়াই করছেন—অথচ কী নিয়ে ঝগড়া, খুলে বলছেন না কেউ!

সর্বেশ্বর ।। কী আর বলবো! ও আমাকে একতিলও বিশ্বাস করে না।

রাধারাণী ।। বিশ্বাস না করলে পঁচিশ বছর একসংগে ঘর করছি কেমন করে রে, ড্যাকরা!

সর্বেশ্বর ।। তবে গয়না দিতে তোর এত আপত্তি কেন?

রাধারাণী ।। আহা-হা-হা, আমার শখের পায়রা রে! ব্যবসার নাম করে আমার গয়নাগুলো খোয়াবি তো?

সর্বেশ্বর ।। খোয়াবো কেন! আরো দশখানা করে দেব।

রাধারাণী ।। কত ক'রে দিবি তুই! সে মানুষ থাকে আলাদা। দ্যাখ্ গে চৈতন সা সোনা দিয়ে তার বউর গা মুড়ে দিয়েছে। তুই দিয়েছিস, আমাকে একখানা গয়না? এক রত্তি সোনা কিনতে বললেই খেঁকিয়ে উঠিস। এক পয়সা দু'পয়সা করে জমিয়ে কত কষ্টে আমি সোনাদানা করেছি। এখন শকুনের মতো তার দিকে নজর!

সর্বেশ্বর ।। কী হবে সোনা ঘরে জমিয়ে রেখে? দেখছিসনে দিন দিন সোনার দাম কমে যাচ্ছে?

রাধারাণী ।। কমে যাচ্ছে তো কিছু কিনে রাখ্ না। যুদ্ধ তো আর চিরদিন থাকবে না। সোনার দর আবার বাড়বেই। দেখিসনি গত যুদ্ধের পরে সোনার দাম কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছিল। তা নয় —ঘরের লক্ষ্মী বার করার তাল!

শিবনাথ ।। এখন সোনা কেনার সময় নয়, রাধারাণী, দেবার সময়।

সর্বেশ্বর ।। তা কি ও বোঝে!

রাধারাণী ।। বুঝি বুঝি, আমি সব বুঝি। তোর শয়তানী বুঝতে আমার আর বাকী নেই।

শিবনাথ ।। কত সোনা আছে তোমার?

রাধারাণী ।। কী আর তেমন আছে, চাটুজ্জেমশায়। সবশুদ্ধু ধরলে পনর-বিশ ভরি।

সর্বেশ্বর ।। মিছে কথা বলিসনে। চাটুজ্জেমশায় গুরুজন। গুরুজনের কাছে মিছে কথা বলা পাপ।

রাধারাণী ।। তার বেশি সোনা আছে আমার?

সর্বেশ্বর ।। নেই! চাটুজ্জেমশায় জিগ্যেস করুণ তো ওর ক'ছড়া হার আছে?

রাধারাণী ।। তুই তো বেশি দেখবিই। মাত্র তিন ছড়া হার আছে আমার—তাতেই তোর চোখ টাটায়! হারু তালুকদারের বউর আছে সাত ছড়া হার।

সর্বেশ্বর ।। তোর হাতের চুড়ির ওজন বিশ ভরি।

রাধারাণী ।। তুই দেখেছিস, কানা!

সর্বেশ্বর ।। বারো ভরির আর্মলেট নেই তোর?

রাধারাণী ।। হুঁ! কোদাল ভাঙিয়ে গড়েছি তো!

সর্বেশ্বর ।। দশ ভরি দিয়ে চুড় গড়াসনি তুই?

রাধারাণী ।। আ মলো! তাকে চুড় বলে? পইছা পইছা। সেই পইছা দিয়ে গুঁতিয়ে যে তোর দাঁত ভেঙে রক্ত বার করেছিলাম, এরই মধ্যে তা ভুলে গেলি বেহায়া!

সর্বেশ্বর ।। ও মিথ্যুক। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না চাটুজ্জেমশায়। সোনার খাই ওর এত বেশি যে, একটা স্যাকরার দোকান উজাড় করে দিলেও ওর আশ মিটবে না।

রাধারাণী ।। আপনি তো ওকে চেনেন, চাটুজ্জেমশায়। ওর লোভের অন্ত নেই। তিন টাকার জিনিস পাঁচ টাকায় বেচতে ওর চক্ষুলজ্জায় আটকায় না।

শিবনাথ ।। চেপে যান চেপে যান, দিনকাল ভালো নয়। কার মুখ থেকে কার কানে কথাটি যাবে—শেষে মুশকিলে পড়বেন।

সর্বেশ্বর ।। সেই ভয়েই তো এই কলোনীতে এসে টিনের ঘরে বাস করছি, শিবনাথ-

বাবু। গেল যুদ্ধের সময় ছোটখাটো ঠিকেদারী করে দু'পয়সা হাতে এলো। অমনি পাড়ার লোকের চোখ টাটানি। এদিকে দেশটাও ভাগ হলো। ভাবলাম গরিবদের সঙ্গে থাকাই ভালো। আ প দে বি প দে তারাও আমাকে দেখবে— সময়ে অসময়ে আমিও তাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া এই কলোনীর অবস্থাও তো এরকম থাকবে না। দেখছেন তো, পাশেই জমির দাম কাঠা আড়াই হাজার টাকায় উঠেছে।

রাধারাণী ।। জানেন, এই জমিটা ও বেচে দেবার তালে আছে?

সর্বেশ্বর ।। বলুন তো, বেচে দিয়ে উঠবো গিয়ে কোথায়? আজকাল কি জায়গা মেলে কোথাও! আর ঘর ভাড়া করে থাকা? সে তো আমাদের নাগালের বাইরে। ছোট হোক বড়ো হোক এই জায়গাটুকু আঁকড়েই আমাকে থাকতে হবে। ভাবছি পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই কোনোরকমে দু'খানা কোঠাঘর তুলে নেব। তাও তো টাকার দরকার। মালমসলার কেমন দাম তো দেখতেই পাচ্ছেন। তাই ভাবছি ব্যবসাটা একটু বাড়িয়ে নেব। সোনার দাম যখন দিনদিন কমে যাচ্ছে, তখন ওগুলো ঘরে ফেলে রেখে কী হবে? তার চেয়ে ওগুলো বেচে দিয়ে যা পাওয়া যাবে তা ব্যবসায় খাটানো ভালো নয় কি? তাতে দু'পয়সা আসবে বই যাবে না তো।

রাধারাণী ।। হুঃ। আমার সোনা বেচে তা দিয়ে চাল-ডাল, তেল-নুন, কাপড়চোপড় মজুত করা হবে!

সর্বেশ্বর ।। তাতে ক্ষেতিটা কী! কখন কোন্ দিক দিয়ে বিপদ আসে বলা যায় না তো। আমার গুদোমে যদি মাল থাকে; তবে বিপদের দিনে আপনাদের আমি সাহায্য করতে পারবো।

শিবনাথ ।। কিন্তু মজুতদারী করা যে এখন বে-আইনী কাজ সর্বেশ্বরবাবু।

সর্বেশ্বর ।। আহা হা হা, বেআইনী কাজ করতে যাবো কেন আমি! পারমিটের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে নেব। তাছাড়া দরকার মতো সরকারকেও সাহায্য করবো আমি। জরুরী অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনের জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

শিবনাথ ।। দেখুন সর্বেশ্বরবাবু, আপনি যে বুদ্ধি বাতলেছেন সেটা ছিল পরাধীন ভারতের বুদ্ধি। আজ দেশ স্বাধীন। স্বাধীন দেশের মানুষ বা সরকার কেউই আপনাদের এ বুদ্ধি বরদাস্ত করবে না।

সর্বেশ্বর ।। আহা হা হা! আপনি ওভাবে নিচ্ছেন কেন!

রাধারাণী ।। ঠিকভাবেই নিয়েছেন উনি। যুদ্ধ দেখে দাও মারার তালে আছ তুমি! সেটি হবে না। মুনাফার লোভে কালোবাজারী করতে গিয়ে তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে, আর আমি একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসবো? আমার চোখে ধুলো দেওয়া! এক রত্তি সোনাও আমার হাতছাড়া করবো না।

সর্বেশ্বর ।। আমি তবে পুলিশে খবর দেব আর খানাতল্লাসী করিয়ে ছাড়বো। দেখবো তখন সোনা থাকে কোথায়!

রাধারাণী ।। আমিই ছেড়ে দেব ভেবেছিস? ব্যবসার নামে তোর জালজুচ্চুরির কথা আমার অজানা আছে কিছু? স-অ-ব বলে দেব আমি। ল্যাজের আগুনে শেষটায় মুখপোড়া হনুমান হবি বলে দিচ্ছি।

[গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রবেশ।]

ওরে ও মন পাগল!
যা তোর দেবার আছে
এবার দিয়ে চল।

আর কেন রে খোঁজাখুঁজি,
বিলিয়ে দে সকল পুঁজি,
দেশের ধুলো অঙ্গে মাখি
পথের কাঁটা পায়ে দল।

শিঙা ফুঁকে পাগলবাবা
দিয়েছে ঐ ডাক:
এক নিমেষে সকল বাঁধন
ছিন্ন হয়ে যাক।

কে তোর আপন কে বা পর,
হাত বাড়িয়ে হাতকে ধর—
প্রলয় নাচন নাচরে এবার,
মুখে মাভৈঃ মন্ত্র বল্।

বাউল ।। ইচ্ছাময়, তোমারই ইচ্ছা

পূর্ণ হোক! চাট্টি ভিক্ষে পাবো, বাবা?

শিবনাথ ।। বাউল, এ গান তোমার নিজের রচনা?

বাউল ।। না বাবা, নিজের বলি কী করে! ইচ্ছাময় ভেতর থেকে যা বলান তাই বলি।

শিবনাথ ।। আশ্চর্য গান! গানটা আমাকে লিখে দেবে?

বাউল ।। কী হবে, বাবা, লিখে! পথে চলতে চলতে মনের মানুষ যা বলে তাই গেয়ে যাই। আবার পথেই ভুলে যাই তা। তারপর লীলা-ময়ের দেখি নতুন লীলা। ভেতরের মানুষটা তখন ডেকে বলে—ওরে গেয়ে চল্ গেয়ে চল্, চলার পথে নতুন গান গেয়ে চল্। আমি কি তখন না গেয়ে থাকতে পারি! ভেতরের মানুষটা ঠেলা মারে। সে বড়ো কঠিন মানুষ—এক দন্ড আমাকে তিষ্ঠুতে দেয় না। কেবল বলে—এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্......

শিবনাথ ।। ঠিক বলেছ বাউল। তার ডাক যে শুনতে পায় সে ঘরে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। খালি পথে বেরিয়ে পড়তে চায় তার মন। আজ সেই ডাক এসেছে—তাই কেউ স্থির থাকতে পারছে না।

বাউল ।। কী করে পারবে! মহা-জীবন যখন ডাক দেয় তখন প্রতি প্রাণকণাই যে তার দিকে ছোটে। তিনিই দেন, আবার তিনিই নেন। আমার আমার ক'রে আমরা মিছেই ভেবে মরি। ডাক যে কখন কোন্ দিক থেকে আসবে, কেউ কি তা বলতে পারে!

[আবার গান]

ও তুই ভাবিসনে মনে—
ডাক দেবে সেই মহাক্ষ্যাপা
শুভদিন গুণে।

সে যে ছন্নছাড়া আত্মহারা
আপন খেয়ালে
কী লিখে যায় হিজিবিজি
মনের দেয়ালে।

কী বলে তা কী বা জানি—
আমায় নিয়ে টানাটানি;
আমার আমি হারিয়ে ফেলে
ছুটি তার সনে।

বাউল ।। ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

শিবনাথ ।। বাউল আমি যদি এখানে ছেলেদের একটা দল খুলে দিই, তুমি তাদের গান শেখাতে পারবে?

বাউল ।। না, তা পারবোনি। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার জো নেই আমার। কপালের লিখন তো খণ্ডাতে পারবো না! বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছে ঘোরা—তাই শুধু ঘুরে মরি। তার আদেশ কি আমি অমান্য করতে পারি?

সর্বেশ্বর ।। বাউলের ঘর কোথায়?

বাউল ।। ঘর? দিনের শেষে যখন যেখানে গিয়ে হাজির হই সেখানেই আমার ঘর—কখনো গেরস্তর দাওয়ায়, কখনো গাছতলায়।

সর্বেশ্বর ।। গান গেয়ে তো বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়?

বাউল ।। তা হয় বই কি, বাবা। বিধাতার ভাণ্ডারে তো অভাব নেই। আমার জন্যে সব ভাণ্ডারই খোলা।

সর্বেশ্বর ।। হুঁ, গতর খাটিয়ে দু'পয়সা রোজগার করতে হিমশিম খেতে হয়—আর ভিক্ষের চালে বাড়িও ওঠে।

রাধারাণী ।। শুনেছেন চাটুজ্জেমশায়, কথায় ছিরি! না, বাউল-ঠাকুর, ওর কথা নেবেন না। শাপমন্যিরও যদি ভয় থাকে একটু!

বাউল ।। না মা, কারো কথাই আমি কিছু মনে করিনে। ভিক্ষের মতো ভিক্ষে মিললে হয় বই কি। আজ ব্রতভিক্ষে দেবার দিন এসেছে। পাগল-বাবার সন্নেসীরা গাজনে নেমেছে। ভিক্ষে দিয়ে তাদের আঁচল ভরিয়ে দিতে হবে, মা। দেবে মা কিছু ভিক্ষে?

রাধারাণী ।। কী দেব? আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই!

বাউল ।। নেই! তবে থাক। [শিবনাথকে] এক মুষ্টি ভিক্ষে মিলবে, বাবা!

[শিবনাথ পকেট থেকে এক টাকা বার করে দেন]

জয় হোক, বাবা জয় হোক। মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করুক।

[সর্বেশ্বর ট্যাঁক থেকে খুলে পাঁচটা নয়া পয়সা দেয়।]

রাধারাণী।। কেমন লোক গা! মাত্র পাঁচটা নয়া পয়সা দিলে! চাটুজ্জেমশায় দিলেন এক টাকা—আর সেখানে, পাঁচ নয়া পয়সা!

বাউল ।। তাতে কী হয়েছে, মা? আজ কোনো দানই ছোট নয়। রামচন্দ্র যে সাগরে সেতু বেঁধেছিলেন তাতে কাঠবেরালিরও ডাক পড়ে-ছিল। বিন্দু বিন্দু বারি দিয়েই তো সিন্ধু হয়, মা। সারাদিন ভিক্ষে করে যা পাবো তা থেকে নিজের জন্যে এক মুষ্টি রেখে বাকীটা কাল সকালে ব্রত-ভিক্ষে দিয়ে আসবো।

রাধারাণী।। ব্রতভিক্ষে কী, বাবা?

বাউল ।। বুঝলে না মা! যারা জননী-জন্মভূমির মান রাখায় ব্রত নিয়েছে, তাদের ব্রতভিক্ষে দিতে হবে। যাই এখন। এক জায়গায় তো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে, ভেতরের মানুষটা ঠেলা মারে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সর্বেশ্বর ।। এ দেখছি রাজনৈতিক বাউল!

বাউল ।। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কী বললেন বাবা? রাজনৈতিক? রাজনীতি আমি বুঝিনে, বাবা। রাজনীতি বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি কই আমার! আমি পথের বাউল —সহজ বুদ্ধি আমার। রাজনীতির জটিল ব্যাপার কি আমার মাথায় ঢোকে!

পথে চলতে চলতে আকাশে বাতাসে যে-কথা শুনতে পাই তাই গেয়ে বেড়াই আমি। মানুষের মধ্যে যখন ভগবান জেগে ওঠে তখন শতকোটি প্রণাম জানাই তাকে। স্বদেশী যুগে আমি ছিলাম ছেলেমানুষ। বাবা গান গাইতেন আর আমাকে বলতেন—দ্যা খ্, যা রা হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, ফাঁসীর হুকুম শুনেও কারাগারে যাদের দেহের ওজন বেড়ে যায়, তাদের মধ্যে ভগবান জাগ্রত। তাদের গান গাওয়া ভগবানেরই নাম করা। গান্ধী মহারাজের যুগে মানুষের মধ্যে আবার সেই ভগবানকে জাগতে দেখেছিলাম। প্রাণ ভরে সেদিন গেয়েছিলাম তাদের গান। আজ আবার মানুষের মধ্যে ভগবান জেগে উঠছে—তাই তার গান গাইছি আর জানাচ্ছি শত কোটি প্রণাম।

[...জোড় করে নমস্কার করে।]

...। বাউলঠাকুর!

... ।। বলো মা, বলো।

... ।। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

... । রাখার মতো হলে নিশ্চয়ই রাখবো, মা।

... । আমার হাতের এই বালা দুগাছা ব্রতভিক্ষের জন্যে নেবেন?

... ।। [হাতজোড় করে] ক্ষমা করো মা। অত বড়ো দান গ্রহণ করার সামর্থ আমার নেই। আমি দীন বাউল। স্বর্ণদান গ্রহণ করার অধিকার কি আমার আছে? দান যদি করতেই চাও স্বর্ণদান গ্রহণের যাঁরা অধিকারী তাঁদেরই হাতে অর্পণ করো।

না, তা হবে না। এ না নিলে আমি মনে কষ্ট পাবো। ভাববো, আপনি আমাকে ঘৃণা করেন—তাই আপনি নিলেন না।

বাউল ।। বড়ো মুশকিলে ফেললে মা! এই সোনা নিয়ে আমি কোথায় রাখবো? যেখানে সেখানে রাত কাটাই—সোনাদানা রাখা কি সম্ভব।

সর্বেশ্বর ।। ও মেকী সোনার গয়না—আপনি স্বচ্ছন্দে নিতে পারেন।

রাধারাণী ।। [রুদ্ধ কণ্ঠে] মেকী! ও জানে মেকী! আমি নিজে স্যাকরার দোকানে গিয়ে কিনে এনেছি—আর ও বলে মেকী' ড্যাকরার জন্য সোনা তো রাখা যাবেই না। লাগুক সৎকাজেই লাগুক। আপনি নিয়ে যান বাউলঠাকুর। ওর কথা শুনবেন না।

[হাত থেকে বালাজোড়া খুলে বাউলের হাতে দেয়।]

বাউল ।। নাম বলতে হবে যে, মা।

রাধারাণী ।। গুরুজনের সামনে নিজের নাম কি বলতে আছে!

শিবনাথ ।। রাধারাণী সাউ।

বাউল ।। নাম ঠিকানা দয়া করে লিখে দেবেন বাবা?

[সর্বেশ্বর তেড়ে গিয়ে বাউলের হাত চেপে ধরে]

সর্বেশ্বর ।। বাটপাড় কোথাকার! বাউলের বেশে চোর! মেয়েছেলের মন ভিজিয়ে সোনা চুরি করা! চল্, এখ্খুনি তোকে নিয়ে যাবো থানায়।

শিবনাথ ।। কী হচ্ছে সর্বেশ্বরবাবু!

সর্বেশ্বর ।। আপনি বুঝতে পারছেন না! বেটা চোর। ওর আলখাল্লার ভাঁজে ভাঁজে শয়তানী। ওকে আমি পুলিশে দেব।

রাধারাণী ।। চোর তুই। তুই যে চোরাই সোনার কারবার করিস আমি জানিনে? বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো আমি পুলিশকে সব কথা বলে দেব। আমি বলে তোর সব দোষ ঢেকে রেখেছি—অন্য মেয়েমানুষ হলে এতদিনে সব কথা ফাঁস করে দিত' হাত ছাড় বাউলের......

সর্বেশ্বর ।। বটে!

রাধারাণী ।। ছাড় বলছি—ভালো চাস তো হাত ছেড়ে দে। আমার সোনা আমি গঙ্গায় ফেলে দেব—তবু তোকে এক রত্তি দেব না।

সর্বেশ্বর ।। অ!

[বাউলের হাত থেকে বালাজোড়া কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়]

রাধারাণী ।। [গর্জে উঠে] কী! বাউলের হাত থেকে তুই বালা কেড়ে নিলি! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নির্বংশের ব্যাটা—কামড়ে আঁচড়ে তোকে আজ আমি শেষ করে দেব না......

[সর্বেশ্বরের পিছু ধাওয়া করে।]

বাউল ।। মানুষের মধ্যেই ভগবান—আবার মানুষের মধ্যেই শয়তান। ইচ্ছাময়, কী বিচিত্র লীলা তোমার!

[গান]

ও ভোলা মন ভুলের সীমা নাই।
ভগবান আছেন কাছেই—
হাত বাড়ালেই পাই।
আকাশে তাকাস মিছে—
ভগবান আছেন নীচে;
অরূপ আজ রূপ ধরেছে,
সেরূপে নয়ন জুড়াই।

[গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রস্থান]

শিবনাথ ।। কালের চাকা ঘোরে— কিন্তু ইতিহাসের প্রশ্নটা মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায় বার বার!

[প্রভার প্রবেশ]

প্রভা ।। আপাততঃ প্রশ্নটা চাপা দিয়ে দিনের চাকা ঘোরাও দেখি। ঘাটে গিয়েছিলাম স্নান করতে—এদিকে সোরগোল শুনে মনে হচ্ছিল রোশনচৌকি বসেছে আমার বাড়িতে। ক'টা বাজলো? নাওয়া-খাওয়া আছে তো!

শিবনাথ ।। জানো, এক আশ্চর্য বাউল এসেছিল একটু আগেই এখানে!

প্রভা ।। তা তো গান শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। সর্বেশ্বর সাউ আর তার ঝগড়াটে বউটা বুঝি বাউলের একতারার সঙ্গে নাচলো? যত আপদ এসে জোটে এখানে!

শিবনাথ ।। আপদ! সত্যি প্রভা আজ আপদই এসে জুটেছে ভারতের ভাগ্যে। বহু সংগ্রাম ক'রে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সেই স্বাধীনতা আজ বিপন্ন।

প্রভা ।। দেশ স্বাধীন হয়েই বা কী হয়েছে। আমাদের পাথর-চাপা কপাল! এ ভাগ্যের তো আর কোন দিনই পরিবর্তন হবে না!

শিবনাথ ।। হবে হবে, অনেক পরিবর্তন হবে। আবার যদি আমরা পরাধীন হই তবে আমাদের ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। লাঞ্ছনার আর শেষ থাকবে না।

প্রভা ।। লাঞ্ছনার বাকী আছে কিছু!

শিবনাথ ।। আশ্চর্য, প্রভা! তোমার জন্যে করুণা হয়। বাইরের দৈন্য যাদের মনকেও দীন ক'রে দেয়, সত্যি তারা কৃপার পাত্র।

প্রভা ।। রেখে দাও তোমার আপ্ত-বাক্য। [আবেগভরে] তোমার হাতে পড়ে সারাটা জীবন কী পেয়েছি আমি? খোকা তখন আমার পেটে। দেশের কাজে তুমি দিলে গা-ঢাকা। সবদিন দুবেলা পেট ভ'রে ভাতও জুটতো না। পাড়ার ছেলেরা মুষ্টি-ভিক্ষে তুলে সাহায্য করতো। তা দিয়ে অতি-কষ্টে দিন চলতো আমার। খোকার জন্মের পরে ক'দিন ওকে দুধ খাওয়াতে পেরেছি আমি? সেদিনও ছিল যে দৈন্যদশা—আজো তাই।

[খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটে।]

শিবনাথ ।। দুঃখের অবসান হয়নি বলে আরো দুঃখকে যদি আমরা ডেকে আনি, তা হবে আত্ম-হত্যারই সামিল। অন্ন বাঁচায় জীবনকে—আর মহৎ কাজ বাঁচায় মানুষের আত্মাকে। আত্মাকে বাঁচাবার জন্যে যদি অন্ন যায়, যাবে—তাতে কাতর হলে চলবে না। মানুষ মহৎ বলেই অমর।

প্রভা ।। তোমার মহত্ত্ব নিয়েই তুমি থাকো। তোমার কাছে মানুষের জীবনের যে কোনো মূল্য নেই, তা আমি জানি।

[দ্রুত গতিতে প্রস্থান]

শিবনাথ ।। পল গুনে গুনে বেঁচে থাকাই কি মানুষের জীবন? না জীবনের অন্য কোনো মহৎ লক্ষ্য আছে?

[বলতে বলতে সমীরের প্রবেশ।]

সমীর ।। বাব্বা! যা বিরাট লাইন—শেষ হতে আর চায় না।

শিবনাথ ।। কিসের লাইন, সমীর?

সমীর ।। সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে সব লাইন দিয়েছে।

শিবনাথ ।। তুই সেখানে কী করতে গিয়েছিলি?

সমীর ।। আমিও নাম লিখিয়ে এসেছি, বাবা।

শিবনাথ ।। [চমকে উঠে] আঁ!

সমীর ।। ভালো করিনি, বাবা? জোয়ানরা যখন দেশের জন্যে লড়াই করছে তখন আমরাই বা ঘরে চুপ করে বসে থাকবো কেন? আমরাও প্রাণ দিতে পারি কি না দেখিয়ে দেব। ওরা ভেবেছে ভারতের বুকে প্রাণ নেই—আছে কতগুলি মরা মানুষ!

[শিবনাথ নির্বাক]

চুপ করে রইলে কেন বাবা! আমি ভালো কাজ করিনি?

শিবনাথ ।। [স্বপ্নোত্থিতের মতো] আঁ! [নিজেকে সামলে নিয়ে] হ্যাঁ হ্যাঁ!

সমীর ।। তুমি অমন কচ্ছ কেন, বাবা!

শিবনাথ ।। [আত্মসান্ত্বনার সুরে] না না, কিছু করছিনে, বাবা। ভাবছিলাম, এ কি বিধাতার নির্দেশ?

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা
ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়
কৃতনিশ্চয়ঃ।।

[দুজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রবেশ করে প্রভা।]

প্রভা ।। খোকা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পুবের সূর্যি যে প শ্চি মে হে ল লো—সেদিকেও খেয়াল নেই? ছেলে পড়াতে গিয়ে বাপ ফিরলেন দেশোদ্ধার করে। তুই এলি আবার কী উদ্ধার করে?

[শিবনাথ ও সমীর দুজনেই প্রভার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

কী? দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন! বল্ কী অপরাধ করেছি আমি?

সমীর ।। মা, অমনভাবে কেন বলছ! তুমি কেন অপরাধ করবে! বরং আমিই অপরাধ করেছি।

শিবনাথ ।। সমীর, তোর মুখ থেকে এমন কথা বেরুবে এ আমি ভাবিনি। অপরাধ! কিসের অপরাধ করেছিস তুই!

প্রভা ।। তোমাদের দুজনের মধ্যে কী যেন একটা গোপন পরামর্শ হচ্ছিল—আমি হঠাৎ মাঝ-খানে এসে পড়েছি।

শিবনাথ ।। না, গোপন পরামর্শ কিছুই নয়। সমীর আজ যা করেছে তাতে তার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। বরং তার জন্যে আমাদের গর্ব অনুভব করা উচিত।

প্রভা ।। কী করেছিস খোকা? বল্, আমাকে খুলে বল্।

শিবনাথ ।। সমীর সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে।

প্রভা ।। আঁ! সর্বনাশা তুই আমাকে এভাবে খুন করলি! এ কথা শোনার আগে আমার মাথায় বজ্রপাত হলো না কেন! খোকা, তোর মনে যদি এই ছিল তবে আগেই আমাকে বিষ খাইয়ে মারলিনে কেন? আমার কপালে এও ছিল!

[কেঁদে কেঁদে কপালে করাঘাত করতে থাকে।]

সমীর ।। [ব্যাকুল কণ্ঠে] মা, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, মা, ...ঠিক বুঝতে পারিনি। ক'দিন থেকেই কে যেন আমাকে শুধু ডাকছিল—ওরে আয়, ওরে আয়। সে-ডাক শুনে আমি তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, মা। তুমি কেঁদো না। কালই গিয়ে আমি নাম কাটিয়ে আসবো।

শিবনাথ ।। তা হয় না, সমীর। দেবতার নামে কিছু উৎসর্গ করে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

প্রভা ।। তুমি বলতে পারলে একথা! বাপ হয়ে তোমার মুখে একটু আটকালো না! তুমি কি পাষাণ দিয়ে গড়া!

শিবনাথ ।। [সামান্য বিচলিত হয়ে] না না, প্রভা, আমি পাষাণ নই, পাষাণ নই। আমিও বাপ। অন্য কারো চেয়ে আমার প্রাণে অপত্যস্নেহ একটুও কম নয়। কিন্তু আমার ছেলের শিরায় শিরায় বইছে আমারই রক্ত। মা আজ রক্ত চাইছেন—সে রক্ত আমাকে দিতে হবে—মায়ের ঋণ শোধ করতে হবে। জানো, এদেশেরই এক বীর সন্তান একদিন ডাক দিয়ে বলেছিলেন— আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি

তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব। আজ আবার সেই ডাক শুনতে পাচ্ছি— সীমান্তের ডাক......

প্রভা ।। আমি ওকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছিলাম এজন্যে? নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তিলে তিলে ওকে বাড়িয়ে তুলেছিলাম এজন্যে? না না, তুমি বুঝবে না। তুমি মা নও... তুমি বুঝবে না।

সমীর ।। [আবেগে মাকে জড়িয়ে ধরে] মা!

প্রভা ।। না না, তোকে আমি যেতে দেব না, যেতে দেব না...... কামানের মুখে তোকে আমি যেতে দেব না।

সমীর ।। ভেবো না মা তুমি। যেদিন রণে যাবো সেদিন বারুদের গন্ধ হবে তোমার আরতির ধূপের ধোঁয়া— কামানের লাল গোলা হবে তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ— পরিখা হবে তোমার কোমল দুটি বাহু, অক্ষয় কবচ তোমার স্নেহ-চুম্বন—আর বীজমন্ত্র হবে বন্দেমাতরম্।

শিবনাথ ।। ধন্য, আমি ধন্য!

[বালা নিয়ে ছুটতে ছুটতে রাধারাণীর প্রবেশ।]

রাধারাণী।। এনেছি, আমি বালা এনেছি। ওকে নিতে দেব আমার সোনা! কখ্খনো না, কখ্খনো না। বাউল-ঠাকুর কই, চাটুজ্জেমশায়।

শিবনাথ ।। সে তো তখনই চলে গেছে, রাধারাণী।

রাধারাণী।। চলে গেলো! আমার বালা না নিয়েই সে চলে গেলো? আমি যে তাকে দেবোই। তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন চাটুজ্জেমশায়।

শিবনাথ ।। কোন্ দিকে সে গেছে কী করে জানবো!

রাধারাণী।। তবে উপায়! তাকে কোথায় পাবো আমি? এই বালা-জোড়া তার হাতে তুলে না দিয়ে যে আমি শান্তি পাবো না। আমি চিনেছি তাকে, চিনেছি—সে সামান্য বাউল নয়......

শিবনাথ ।। রাধারাণী, সময়ই মানুষকে সামান্য করে—আবার সময়ই তাকে অসামান্য করে তোলে। তুমিও এখন আর সামান্যা নারী নও। তুমি কি আর সেই রাধারাণী আছ? এখন মহারাণী হয়ে উঠেছ। বাউলের মুখ দিয়ে মা ডাক দিয়েছেন— সে ডাক তোমার কানে পৌঁচেছে। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাবো— ব্রতভিক্ষে দিয়ে আসবে।

রাধারাণী।। তাই যাবো। এই সোনা আমি দান করবোই। শকুনের পেটে যাওয়ার চাইতে দেবতার পুজোয় লাগা ভালো।

শিবনাথ ।। দাও দাও......যে যা পারো আজ দিয়ে যাও। যে পারো সোনা দাও, যে পারো পুত্র দাও, যে পারো রক্ত দাও— আজ মাতৃযজ্ঞে আহুতি দাও সবাই।

সমীর ।। মা, বলো তুমিও আমাকে হাসিমুখে বিদায় দেবে?

প্রভা ।। আমি জানতাম, আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে। তোদের বংশে এক সর্বনাশা রক্ত আছে। সেই রক্তের কণাগুলো যখন নেচে ওঠে তখন তোরা পাগল হয়ে যাস। তোদের আমি চিনি, ভালো করেই চিনি। তখন তোদের মা থাকে না, বাপ থাকে না, ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন কেউ থাকে না—দেশ দেশ করে শুধু উন্মাদের মতো ছুটিস। তোর বাপ আমাকে আজীবন জ্বালিয়ে খেয়েছে —তুইও যে জ্বালাবি, আমি জানতাম......আমি জানতাম ....

[কেঁদে কেঁদে বিহ্বল হয়ে পড়ে।]

শিবনাথ ।। স্থির হও, প্রভা, স্থির হও। মেয়েদের অতো ভেঙে পড়লে আজ চলবে না। নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করো। বীরজননী হওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। অন্তরের বেদনাকে চেপে রেখে হাসিমুখে সন্তানকে বিদায় দিতে হবে; না হলে মায়ের চোখের জল তাকে দুর্বল করে ফেলবে, তার অকল্যাণ হবে। তুমি জানো না— রণাঙ্গনে মায়ের হাসিমুখ মনে পড়লে যোদ্ধার বাহুতে বল আসে। চোখের জল ফেলার দিন আজো আসেনি— ভগবান করুন তেমন দিন যেন না আসে। আর সত্যি যদি তেমন দুর্দিন আসে সেদিন তোমাদের চোখের জল যেন আগুন হয়ে দেখা দেয়।

প্রভা ।। [সমীরকে বুকের কাছে নিয়ে] নাঃ! জানি আমি তোকে ধরে রাখতে পারবো না। চোখের জলও যে তোদের ধরে রাখতে পারে না তা আমি জানি। [আঁচলে চোখ মুছে] আমি তো কাঁদতে চাইনে— তবু কেন বার বার আমাকে কাঁদতে হয়। কারা কাঁদায়? আমি বুঝতে পারিনে...... কিছু বুঝতে পারিনে। মায়েদের এই কান্নার শেষ কি হবে না......হবে না কোনোদিনই?......?

[সমীরকে আরো জোরে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। শিবনাথ ও রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।]
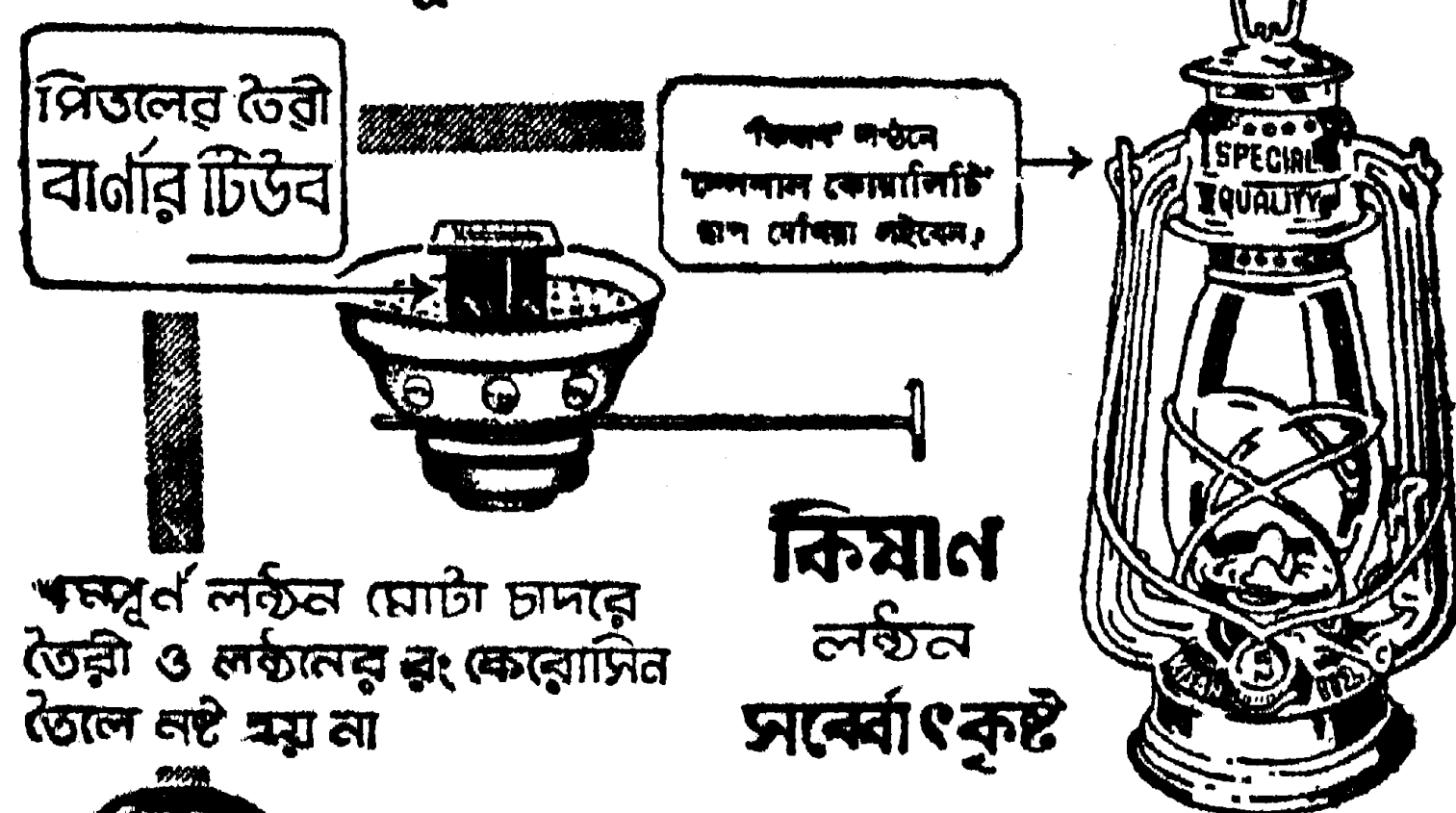
যবনিকা

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

৭ই নভেম্বর-১৯৫৯

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

চীন-ভারত সীমান্তে স্থিতাবস্থা রক্ষার দুটি প্রস্তাবিত তারিখ--৭ই নভেম্বর, ১৯৫৯ ও ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। প্রথমটি চীনের প্রস্তাব, দ্বিতীয়টি ভারতের।

২০শে অক্টোবর ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা সৈন্যদের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়। তার চারদিন পরে ২৪শে অক্টোবর চীন ভারতের কাছে একটি তিন দফা সর্ত-সম্বলিত আলোচনা-প্রস্তাব পাঠায়। তাতে চীন বলে যে, আলোচনার মাধ্যমেই চীন সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করতে চায় এবং তারজন্যে সে তার সৈন্যবাহিনীকে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

কিন্তু আক্রমণকারী চীনের যে প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হতে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, আক্রান্ত অবস্থায় ভারত চীনের কোন প্রস্তাবই বিবেচনা করতে রাজী নয়। কোনরকম আলোচনা শুরু করার আগে চীনকে অবশ্যই অস্ত্রসংবরণ করতে হবে এবং আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তাকে অবশ্যই আরও পেছিয়ে এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় চলে যেতে হবে। তা যতদিন না চীন যাবে ততদিন ভারত নিজভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে সংগ্রাম করে যাবে। তার জন্যে যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক না কেন ভারত তা স্বীকারে প্রস্তুত। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সে যুদ্ধে ভারতকে যদি প্রভূত ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়, ভারত তা করবে, কিন্তু শত্রুর হুমকি বা আঘাতের ভয়ে সে নতি স্বীকার করবে না।

ভারতের এই স্পষ্ট ও দৃঢ় উত্তরে আক্রমণকারী চীনকে খুবই বিব্রত হতে হয়। ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার যে মতলব চীন করেছিল, ভারতের দৃঢ়তায় তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। ওদিকে চীন আরও যেসব আশা নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল সে সবও তার সম্পূর্ণ অপূর্ণ থেকে গেল। সোভিয়েট ইউ-নিয়ন এ বিরোধে কোন অংশ নিল না। ক্রুশ্চেভ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন যে, বন্ধু ভারত ও ভ্রাতা চীনের বিরোধ তার কাম্য নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নীতি অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশ-গুলিও অনুসরণ করল। শুধুমাত্র দুটি নগণ্য শক্তি আলবানিয়া ও উত্তর কোরিয়া ছাড়া আর কারও সমর্থনই চীন পেল না। অপর পক্ষে ভারতের সমর্থনে এগিয়ে এল যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশ, তাদের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে। তারা জানাল, চীনের আক্রমণ হটাতে ভারত তাদের কাছে যা সাহায্য চাইবে তারা তাই দেবে। এমন কি ইঙ্গিতে একথাও তারা বুঝিয়ে দিল যে, প্রয়োজন হলে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েও তারা ভারতকে সাহায্য করবে।

চীনের সামরিক বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক, ভারতকে যারা সাহায্য

লদাক রণাঙ্গন—

This sketch follows the map drawn and printed by Indian Army Hqs. Survey Coy.

Line demarcating the extent to which Chinese forces had set up posts by 7th Nov. 59.

Line roughly separating Chinese and Indian forces on 7th Sept. 62.

Area of demilitarisation 20 Km on either side of the line of actual control as defined by the Chinese.

করতে এগিয়ে এসেছে তাদের তুলনায় তার শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ। শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের ভরসাতেই চীন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস করতে পারত। কিন্তু কিউবা হতে প্রত্যাহার করে সোভিয়েট ইউনিয়ন বুঝিয়ে দিল যে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ করে কোন সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সে একেবারেই রাজী নয়। কিউবা হতে ক্রুশেচভের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে চীন তীব্রভাবে সমালোচনা করে এবং পিকিঙ রেডিও খোলাখুলিভাবেই ক্রুশেচভকে 'ভীরু', 'শোধনবাদী' ইত্যাদি বলে' গালি দেয়। চীনের শেষ পর্যন্ত একটা আশা ছিল যে, হয়ত ক্রুশেচভের সিদ্ধান্ত সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি অনুমোদন করবে না। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনের পর চীনকে সেদিক থেকেও নিরাশ হতে হ'ল।

এরপরেও একার ভরসায় এগোনের সাহস চীনের ছিল না। তাই যেমন অতর্কিতে সে ২০শে অক্টোবর ভারত আক্রমণ করেছিল, তেমনি অতর্কিতেই ঠিক এক মাস পরে ২০শে নভেম্বর সে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে আরও জানালো যে, ১লা ডিসেম্বর হতে তার সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে আরম্ভ করবে এবং ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর সে যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় তার সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর ভারত যদি তার পূর্ব প্রস্তাবিত ২৪শে অক্টোবরের সর্তাবলীর ভিত্তিতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তার জন্যও সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সুতরাং, চীনের যুদ্ধবিরতির

চীনা আক্রমণে গৃহহারা এক উপজাতীয় মা ও সন্তানদ্বয়।

নেফা রণাঙ্গন—
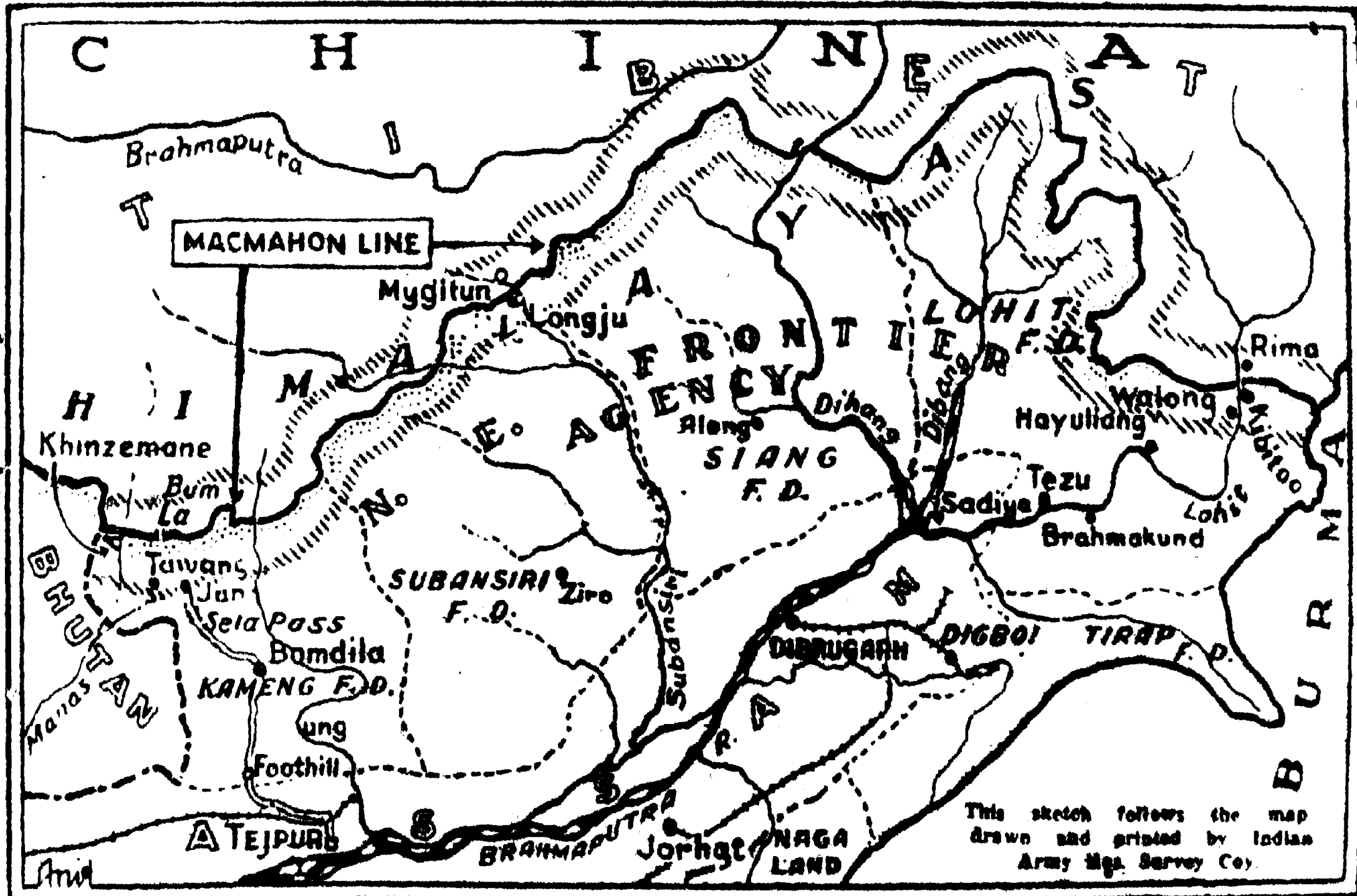
Line of actual control separating Chinese and Indian forces on 7th Sept. 62.

Area of demilitarisation 20 Km on either side of the line of actual control as defined by the Chinese

Area of dispute regarding interpretation of McMahon Line — Khinzemane & Longju

এই একতরফা সিদ্ধান্ত আপাতঃদৃষ্টিতে যতই চমকপ্রদ বলে মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা শঠতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বর্তমানে তার পক্ষে আর একপাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধে জয় অব্যাহত থাকতেই চীন যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিল। বলতে দ্বিধা নেই, এই ব্যাপারে চীন যথেষ্ট চাতুর্য ও সময়জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীন মীমাংসা করতে চায় তা যে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য ভারত চীনকে ২৭শে অক্টোবরের পরেই তা জানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধ-বিরতিকালে তারই পুনরাবৃত্তি করা অন্তত চীনের পক্ষে যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এইটুকু চীনের বোঝা উচিত ছিল।

এরমধ্যে অবশ্য চালাকি দেখানোর একটা সুযোগ আছে। চীন জগতকে এই সুযোগে দেখাতে পারে যে, ভারত তাকে যে অবস্থায় ফিরে যেতে বলেছিল, তার চেয়েও তিন বছরের আগের অবস্থায় সে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও ভারত তার সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজী নয়। তাতে, চীনের অন্তত ধারণা বোধহয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভারতকে ভুল বুঝবে। কিন্তু ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারে যে কোন কাজ হয় না, এটা চীনের এতদিনের অভিজ্ঞতায় কিছুটা অন্তত উপলব্ধি করা উচিত ছিল। এতদিন ধরে এক-নাগাড়ে ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছে চীন, কিন্তু তবুও আজ সে দেখতে পাচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীই ভারতের সমর্থক। প্রকাশ্যে যে সমর্থন করতে পারেনি সেও নীরব থেকে বুঝিয়েছে যে, চীনের পক্ষে বলার কিছুই নেই।

তিন বছর আগের অবস্থাটা এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বরের চেয়ে যদি চীনের পক্ষে খারাপই হ'ত তবে ত চীন সানন্দেই ভারতের ৮ই সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত। ভারত তাকে আরও বেশী ভারতের অভ্যন্তরে থাকতে বলছে, আর চীন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্বেচ্ছায় আরও বেশী পেছিয়ে যাচ্ছে—দস্যু চীনের এই ধরণের বৈষ্ণবী যুক্তিতে নিশ্চয়ই কেউ আস্থা স্থাপন করবে না। প্রস্তাবের গভীরে না গিয়ে শুধু এই কথাটুকু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, অস্ত্রের জোরে যা সম্ভব হয়নি কথার মারপ্যাঁচে চীন তা হাসিল করার চেষ্টা করছে।

১৯৫৭ সালের মধ্যে চীন লদাক অঞ্চলে ভারতের প্রায় বারো হাজার বর্গ মাইল জমির উপর জবরদখল কায়েম করে। ১৯৫৯ সালের ২০শে অক্টোবর অর্থাৎ বর্তমান পর্যায়ের ব্যাপক আক্রমণের ঠিক তিন বছর আগে চীনা সৈন্যরা হঠাৎ লাদাকের দক্ষিণ দিকে চল্লিশ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও চাঙ চেনমো উপত্যকায় প্রহরারত ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণ করে' নয়জনকে হত্যা করে ও দশজনকে ধরে নিয়ে যায়। চীনের সেদিনের আচরণে সারা ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও অবিলম্বে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-বলম্বনের দাবী জানায়। কিন্তু ভারত সরকার সেদিন শান্তভাবেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন ও ১৬ই নভেম্বর চীনের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করেন যে, ভারত চীনের দাবী মত সীমারেখাতে ভারতের সৈন্য ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু চীনও ভারতীয় মানচিত্রে প্রদর্শিত চিরাচরিত সীমা-রেখায় তার সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাক' কিন্তু চীন ১৭ই ডিসেম্বর ভারতের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও আকস্মাই চীনের আরও দক্ষিণ ও পশ্চিমে চীনা সৈন্য এগিয়ে যায় ও ঐ অঞ্চলে পথ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। এইভাবে চীনের অগ্রগতি ও জবর-দখলের মধ্যে শেষ হয় ১৯৫৯ সাল।

পাঁচ বছর বাদে, বহু বন্ধ্যা তর্ক-বিতর্কের পর ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারতের পক্ষ হতে উভয় পক্ষের সীমান্ত সম্পর্কিত দাবী-দাওয়া ও দীর্ঘ আলোচনা সম্পর্কে যে সরকারী দলিলপত্র প্রকাশ করা হয় তাতে বলা হয়, চীন ভারতের অভ্যন্তরে পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইল জমির উপর দখল দাবী করেছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল স্থান দখল করে নিয়েছে। ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের এই দলিল হতেই বোঝা যাবে যে, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর চীন ভারতের কতখানি জায়গার ওপর জবর-দখল কায়েম করে রেখেছিল।

তারপরেও অবশ্য চীনের এখানে-ওখানে হামলা বন্ধ হয়নি। কিন্তু ভারত সরকারও ক্রমে অবস্থা সম্বন্ধে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং ভারতীয় সৈন্যরা লদাক ও নেফা উভয় অঞ্চলেই চীনাদের দখল হতে কিছু কিছু জায়গা পুনরুদ্ধার করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে এই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের ভারতীয় ভূমি পুনরুদ্ধারের কাজ চলতে থাকে। অর্থাৎ, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর (যখন ভারতে চীনাদের জবরদখল সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁচেছিল) ও ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা চীনাদের হাত হতে বহু এলাকা ফিরিয়ে নিতে সমর্থ হয়। পূর্বে ম্যাকমোহন লাইন পর্যন্ত ভারতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ৮ই সেপ্টেম্বর হ'তে আবার চীনাদের ভারতীয় ভূমিতে হামলা শুরু হয়। ঐদিনই তারা ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে' নেফায় আগলা শৈল-শিরা পুনর্দখল করে।

১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, এই বছরে মে মাসের পর থেকে চীনা সৈন্যরা লদাকে চিপচাপ, গলোয়ান, কারাকাশ ও প্যাঙ্গঙ হ্রদ অঞ্চলে ৩৪টি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

১০ই অক্টোবর নেফার শোঙ্গা অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের প্রায় বারো ঘণ্টা গুলী-বিনিময় হয় ও তাতে ১৭ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। এর দশদিন পরেই চীনা সৈন্যরা ব্যাপকভাবে ভারতের উভয় সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। চীনাদের আক্রমণ পদ্ধতিতেও বিশাল সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আক্রমণের জন্যে চীন অনেকদিন আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল। যাইহোক তার ঠিক এক মাস পরে তারা আবার নিজে থেকেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে এবং বলে যে, সীমান্ত বিরোধের মীমাংসাকল্পে তারা ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে।

কেন যে তারা হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিল তার আলোচনা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই করা হয়েছে, এবং ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের অবস্থা যে তাদের পক্ষে কতখানি সুবিধাজনক তা ১৯৬১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত ভারত সরকারের দলিল

থেকেই বুঝতে পারা যাবে। ঐ অবস্থায় চীন যদি তার দখল কায়েম রাখতে পারে তবে ভারতের প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল জমি তার দখলে থেকে যাবে। আর ভারত যদি তাকে ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় সম্মত করাতে পারে তবে এই দুই সময়ের ব্যবধানে ভারত চীনের কাছ থেকে যে এলাকাগুলি পুনর্দখল করতে পেরেছিল তা চীনকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু চীন তাতে সম্মত নয়, পরন্তু প্রস্তাবের সংগে আরও যে কটি সর্ত চীন সংযুক্ত করেছে তাতে ভারতকে সম্মত হতে হলে তার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা আরও বেশী খারাপ হয়ে যাবে।

চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে' ভারত সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছে, ঐ প্রস্তাবে সম্মত হলে ভারতকে নেফায় ঢোলা, খিনজেমান, কিবিটো ও ওয়ালঙ ত্যাগ করতে হবে এবং লদাকে ত্যাগ করতে হবে ৪০টি ঘাঁটি। উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে বরাহিতো-সহ একটি বিস্তীর্ণ এলাকা এমনিতেই চীনকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হবে।

চীনের নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, চীন ম্যাকমোহন লাইনের ওপারে চলে গেলেও ভারতীয় সৈন্য ম্যাকমোহন লাইনের এপারে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ অঞ্চলকে অসামরিক অঞ্চল করে' ফেলে রাখতে হবে। অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য বমডিলা হতে আগলা শৈলশিরা পর্যন্ত ও কিবিটো হতে ওয়ালঙ পর্যন্ত চীনের হুকুমে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি ভারত প্রবেশ করে তবে চীন তার স্ব-আরোপিত সর্ত অনুসারে ভারতকে প্রত্যাঘাত হানবে।

অর্থাৎ চীনের বর্তমান সর্তের সারমর্ম এই যে চীন ২০শে অক্টোবরের আগে যে প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল জমি দখল করেছে তাও সে ছাড়বে না, পরন্তু ২০শে অক্টোবরের পর গত এক মাসে সে যে সব ভারতীয় এলাকা দখল করেছে সেগুলি ছেড়ে গেলেও ভারতকে তা পুনরুদ্ধার করতে দেবে না। আপাততঃ চীনের ইচ্ছামত ঐ সব এলাকা অসামরিক ও বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকবে।—এ প্রস্তাবকে শান্তি প্রস্তাব বলে প্রচার করাতে চীনের নির্লজ্জ মিথ্যাচারী নেতাদের কোন সঙ্কোচবোধ না হতে পারে কিন্তু ভারতের কাছে
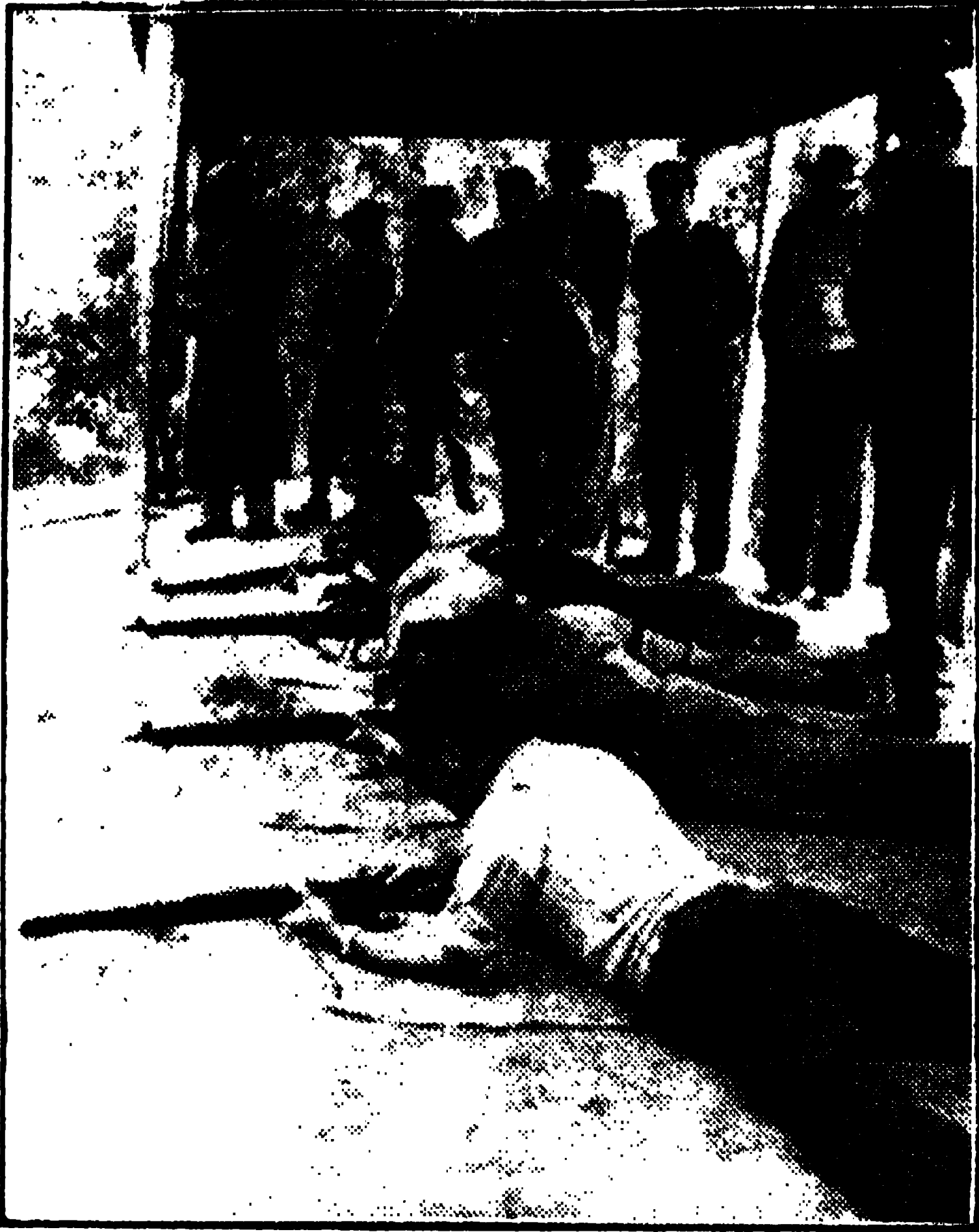
দার্জিলিং রাইফেল ক্লাবের সদস্যগণ রাইফেল ট্রেনিং নিচ্ছেন।

এ প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে বশ্যতারই সর্ত-স্বরূপ।

এই প্রস্তাবে ভারতের সম্মত হওয়ার অর্থ, শত মাইল বিস্তৃত পর্বতের স্বাভাবিক ব্যবধান অতিক্রম করিয়ে পররাজ্যলোভী দস্যু চীনকে একেবারে ভারতের সমতলভূমির উপান্তে আহ্বান করে আনা।

চীন তার প্রস্তাবের ফাঁকি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই প্রস্তাব করা মাত্রই স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারতকে আক্রমণ করার সময় চীন বিশ্বের জনমতকে হেলায় উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু ভারতে তার দাবী করা ভূমির সবখানি দখল করার পর তারই প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধের নিষ্পত্তি করানোর জন্যে এখন তার আগ্রহ সীমাহীন। শুধু যে এশিয়া ও আফ্রিকার নিরপেক্ষ দেশগুলির কাছেই চীন তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে মধ্যস্থতা করার আবেদন জানিয়েছে তাই নয়, থাইলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও চীন তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানিয়েছে। অথচ থাইল্যাণ্ডের সংগে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছেও একই মর্মে আবেদন জানাতে চীনের চতুর নেতারা ভুল করেননি। ক'দিন আগেও বিশ্বের সকল প্রতিবাদ ও নিন্দা তুচ্ছ করে যে চীন অস্ত্রবলে তার দাবী পূরণে উদ্যত হয়েছিল তার আজ বিরোধ মীমাংসায় কি অপরিসীম আগ্রহ! অথচ মীমাংসার সর্ত তারই এবং এমন সব সর্ত যা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে ভারত প্রায় এক মাস আগে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। এই প্রচার তৎপরতাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত মীমাংসার কোন আগ্রহ চীনের নেই। যা সে গত কয়েক বছর ধরে ও বিশেষ করে গত কয়েকদিনে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, ছদ্ম শান্তি প্রস্তাবের আড়ালে তার ওপরেই সে তার জবরদখল পাকাপাকি করে নিতে চায়।

গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়,

গত ১১ই আশ্বিন ১৩৬৯, ২৮শে সেপ্টেম্বর '৬২ ২১শ সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসুচিত দাস, আমতা, হাওড়া থেকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর ঃ—

ব দুই প্রকার—(১) প বর্গ ও (২) অন্তস্থ ব বর্ণ।

প বর্গের ব ব্যবহার ঃ—বলাকা, বসুন্ধরা, বেনু, বীণা প্রভৃতি।

অন্তস্থ ব বর্গের ব হইতেছে ঃ— অবলা, অবনী প্রভৃতি।

প্রশ্নের দাস মহাশয় দুই ব এর প্রভেদ কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ—

. দুই ব দেখিতে এক প্রকার, ব্যবহার ভিন্ন হয়।

বন্দনা সেন,
অর্ঘ, পূর্বপল্লী,
শান্তিনিকেতন।

গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত জনাব মহম্মদ ইউনুস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর ঃ—

বাংলার তারিখ, সাকিন বা সাকিম প্রভৃতি শব্দ মুসলমান আমলে আরবী ভাষা হইতে আমদানী হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের প্রয়োগ ইংরেজ আমলের পূর্ব হইতেই ছিল। আর ইহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ তাং, সাং প্রভৃতিও ইংরেজী ভাষার অনুকরণে হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক ভাষারই সংক্ষেপী-করণের একটা নিজস্ব রীতি থাকে। হিসাব শব্দটিও আরবী ভাষা হইতেই বাংলায় চালু হইয়াছে. এবং পূর্বাপর সংক্ষেপিত রূপ "হিঃ" দ্বারাই সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কোন কৈফিয়ৎ আছে বলিয়া মনে করি না। ইংরেজীতেও এরূপ অসমতা বা অসামঞ্জস্য বহু আছে। প্রশ্নকর্তার উল্লেখিত উদাহরণগুলি হইতেই নমুনা দেখান যাইতে পারে, যেমন Number-এর সংক্ষিপ্ত রূপ Nu, না হইয়া No., Limited এর সংক্ষিপ্ত রূপ দুই অক্ষরযুক্ত Li বা তিন অক্ষরযুক্ত Lim. না হইয়া হইয়াছে তিন অক্ষরযুক্ত Ltd., আর Maximum এর বেলায় হইয়াছে তিন অক্ষরযুক্ত Max.। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রেই পূর্বাপর প্রচলিত রূপেই অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধারা বা রীতির অনুসন্ধান করা পন্ডশ্রম হইবে।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬ নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন

আপনার পত্রিকার জনপ্রিয় 'জানাতে পারেন' বিভাগটির মারফৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর আশা করি।

(১) বিখ্যাত লোকের নামে দেশের রাস্তাঘাটের নামকরণের প্রচলন পৃথিবীর কোন দেশে প্রথম ও কবে হয়? আমাদের দেশে এই প্রথা কতদিন প্রচলিত রয়েছে?

(২) ইংরেজী ক্যালেন্ডারের মাস ও বারের নামগুলি বিভিন্ন রোমান দেবতার নামানুসারে প্রচলিত। বাংলাদেশের মাস ও বারগুলির নামকরণের উৎস কি? অগ্রহায়ণ মাসকে 'মার্গশীর্ষ' বলা হয় কেন? রবিবার ছাড়া অন্য কোন বার হতে সপ্তাহের গণনা কোনদিন শুরু হয়েছিল কি?

(৩) শোনা যায় কাকের একটিমাত্র চক্ষু, সেই কারণে চারিদিক দেখবার জন্য এরা ক্রমাগত ঘাড় ফেরায়। এ কি বৈজ্ঞানিক সত্য? পরিষ্কার নির্মল জলকে কাকচক্ষুর সহিতই তুলনা করা হয় কেন?

ভবদীয়,
অহিভূষণ মিশ্র।
পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' মারফত কয়েকটি বিষয় জানতে ইচ্ছুক, আশা করি অনুগৃহীত করবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের মধ্যে "বৈদ্যের" স্থান কোথায়? অনেকের মতে প্রাচীনকালে যাঁরা আয়ুর্বেদের চর্চা করতেন তাঁরাই বৈদ্য নামে এখন পরিচিত, এবং ব্রাহ্মণরাই ছিল বেদ চর্চার অধিকারী। এর সত্য কতদূর, পূর্বে নাকি বৈদ্যরা শর্মা লিখতেন, যেমন সেনশর্মা, দাশশর্মা ইত্যাদি, এখন তাঁরাই লিখছেন সেন-গুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত। অনেকে উপবীত কারণ করেন, অনেকে করেন না, কেন?

শ্রীমঙ্গলকুমার দত্তগুপ্ত,
ই।১৮।৪, নিউ এয়ার-পোর্ট কলোনী
বম্বে—২৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের চিত্তাকর্ষক "জানাতে পারেন" বিভাগে কয়েকটি কৌতুহলো-দ্দীপক বিষয় জানাচ্ছি। সহৃদয় পাঠক ও পন্ডিতবর্গ থেকে এর যথোচিত উত্তর আশা করছি।

(১) আজকাল শিশুদের তোতাপাখির মত কেবল মুখস্থ ক্রিয়ার উপর থেকে শিক্ষাপ্রণালীপ্রস্তুতকর্তাদের নজর সরে এসেছে কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর ,অর্থাৎ কাজের থেকে শিক্ষা—যেমন, আঁকা, খেলা, কাজ, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি থেকে শিক্ষণীয় জ্ঞান অর্জন করা। ৪০।৫০ বছর আগে দেখা গেছে পাঠশালার মরমী দরদী পন্ডিত মশাইগণ শিশুদের ছবি আঁকা শেখাতেন বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা ইত্যাদির মিশ্রণে। এবং সে সম্বন্ধে সুন্দর ছড়াও একটি পাই। ছড়াটি হল ঃ (এই ছড়াটি একটু আধটু পরিবর্তিত আকারে অনেক বয়স্ক ব্যক্তির জানা থাকতেও পারে)

দ-কে হল জ্বর
২২ জন ডাক্তার এল
বসতে দিল লাঠি
খেতে দিল বটি।
উপর দিয়ে ছিটুনী দিলে
হল একটি পাখি।

এই ধরণের ছড়া শিশুদের বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজনীয়। পুরনো ছড়া যদি কারো জানা থাকে, প্রকাশ করলে উপকৃত ও বাধিত হব।

(২) কোন জিনিসের , পৌনঃপুনিক ব্যবহার বা অতিরিক্ততা বস্তুটির প্রতি তিক্ততা জাগায়, সেই সূত্রে প্রবাদ প্রচলিত "নেবু বেশি দললে তেতো হয়ে যায়"। কেন তেতো হয়? নেবুর মধ্যে Cytric Acid আছে। সেই Acid-এর গঠনগত কোন পরিবর্তনের ফল কি? আরও দেখা গেছে দুধ থেকে দই যখন সবে বসতে শুরু করেছে—তখনো টক হয়নি, তার স্বাদে কিছু তিক্ততা অনুভব করা যায়। এও কি Acidity হবার প্রাক্কালীন Acid Molecule গুলির ছন্নছাড়া অবস্থা?

মধু চক্রবর্তী,
১১৫নং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রোড, কলিকাতা—২৬।

অগ্নি[illegible]

প্রতিভা বসু
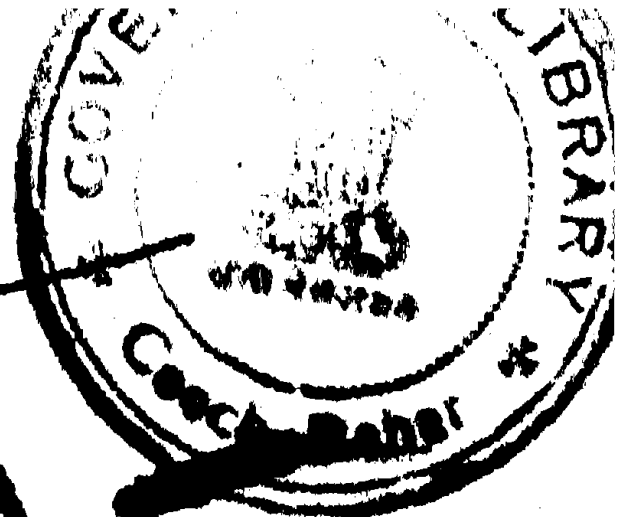
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। অসহ্য শীত চলেছে ক'দিন থেকে। তার উপর ঝিরি-ঝিরি বরফ পড়ছে, বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘরের বাইরে পা দেবার কথা ভাবতেই শরীর হিম হ'য়ে আসে। আপনি শীতের সময় কখনো থেকেছেন কিনা জানি না, কিন্তু কাকাবাবু, এখানকার শীতকালের শীত যে কী ভয়ংকর জিনিস তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। বাইরে বেরুলে মনে হয় কে যেন দৌড়ে এসে তাল তাল বরফের মধ্যে জোর ক'রে ঠেসে ধরলো। ঘরের শীতকে এরা পরাস্ত করেছে বটে, দিব্যি আরামে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় পাতলা জামা-কাপড় পরে চটি পায়ে ঘুরে বেড়ানো চলে। দোকানে পসারে, গাড়ির ভিতরে--সর্বত্রই এই আরামের উত্তাপ। কিন্তু আকাশের তলায় পা দিলাম কি গেলাম। একেবারে মৃত্যু। গুঁড়ি মেরে থাকা লক্ষ লক্ষ শীতের সৈনিক শরীরের উপর লাফিয়ে পড়ে টেনে ছিঁড়ে হাড়, মাংস চিবিয়ে খাবে।

সে জন্যেই পথ-ঘাট সাধারণত জনবিরল থাকে। লোকজনেরা কেউ উপরে ওঠে না, সবাই যতোটা সম্ভব মাটির তলার পথেই আনাগোনা করে। মাটির তলার ট্রেনগুলো তখন কলকাতার ট্রামের চেয়েও বেশী ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে মানুষের চাপে। তবুও এমন অনেক কাজ আছে যা মাটির তলায় সম্ভব নয়। বাজার করা, অষুধ কেনা, এমনি ধরনের কাজগুলোর জন্য উপরের রাস্তায় না বেরুলে উপায়ই থাকে না। সাত প্রস্থ গরম কাপড়ের তলায় অসহায় শরীরটাকে লুকিয়ে গুটিয়ে নামতেই হয় খোলা রাস্তায়। কিন্তু যতো গরম কাপড়ের পুঁটুলিই হই না কেন, যেমন ক'রেই বেরুই না, শীতের সেই দুর্দান্ত দস্যুকে কোনো রকমেই পরাস্ত করা যায় না, বাঘের চেয়েও ভীষণ ঐ শীতের থাবা, আর সেই আঘাত সইতেই হতো, দিনের মধ্যে অন্তত একবার।

এই শীতের উপরেও প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে বরফ পড়লো দু'দিন। আকাশ থেকে যেন কোটি কোটি বস্তা লাক্স সাবানের গুঁড়ো ঝরে পড়তে লাগলো এবং পড়ে গিয়ে সেগুলো গলে গেলো না, শক্ত হ'য়ে জমতে লাগলো। ঘরে বসে ডবল কাঁচের মোটা জানালার উপরে এক আঙুল পুরু সিল্ক সাটিনের আপাদ-মস্তক মুড়ে রাখা মস্ত মোটা পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বরফ ঝরার এই দৃশ্যটা দেখতে মন্দ রমণীয় মনে হ'লো না। চোখের সামনে সহরটা আস্তে আস্তে একটা ধোঁয়াটে সাদা বরফের সাগরে পরিণত হ'য়ে গেল। বাড়ি-ঘরের চেহারা রইলো না, রাস্তা-ঘাট, পার্ক ময়দান, মস্ত মস্ত মোপলে গাছের শুকনো ডাল সব একাকার হ'য়ে গেল সাদা শক্ত পাথরের মতো বরফের চাপে। সেই সাদা ছাড়া কোনোদিকে আর কোথাও অন্য রং রইলো না অমন জাঁকের নিউইয়র্ক সহরে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি গাড়িগুলো এক একটা এক এক রকম প্রাগ-ঐতিহাসিক অদ্ভুত জানোয়ারের আকৃতি নিয়ে বরফ-ঢাকা হ'য়ে পড়ে রইলো। চল্লিশতলা, পঞ্চাশতলা বাড়িগুলোকে সারা গায়ে বরফ মেখে উঁচু-নিচু তুষারাবৃত পাহাড়ের এক একটি চূড়ো বলে ভ্রম হ'তে লাগলো। প্রায় অচল হ'য়ে উঠলো সহর।

বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো পাঁচতলার সমান উঁচু এক একটা বরফ কাটা যন্ত্র তার হাঙরের মতো পাঁচশো দাঁত নিয়ে আর্তনাদ ক'রে ফিরতে লাগলো এ্যাভিনিউগুলোতে। স্ট্রীটগুলো না হয় পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ্যাভিনিউগুলো পরিস্কার না করলে চলবে কেমন করে? পথ কই? লোক চলবে, বাস চলবে, ট্যাক্সি চলবে।

প্রাইভেট গাড়ি বেরুনো অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হ'য়ে গেছে। প্রাইভেট গাড়ির গতি অনবরত নয়। তাকে থামতে হয় নানা জায়গায়। কর্তাকে আপিশে পৌঁছে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কোনো বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, দোকানে নিয়ে গেলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আর সেই দাঁড়িয়ে থাকার সময়টুকুর মধ্যেই সে আকণ্ঠ ডুবে যায় বরফে। যে গাড়ির যে রকম চেহারা, বরফ তাকে সেই চেহারায় মুড়ে রাখে, কোদাল দিয়ে কুপিয়েও সেই বরফের স্তূপ ভেঙে তাকে বার ক'রে চালানো যায় না। হাঁ ক'রে থাকতে হয় প্রকৃতির দিকে, কোনদিন কড়া রোদ

উঠবে। বরফ গলবে, তারপর আবার বৃষ্টি হ'য়ে ধুয়ে দেবে।

সহর সত্যি প্রায় অচল হবার দশা। সবাই হায় হায় করতে লাগলো, বলতে লাগলো তবে কি এবার বরফের তলাতেই সমাধি হবে নাকি? নিউইয়র্ক টাইমস বড়ো বড়ো হেড লাইনে খবর দিল আশি বছরের মধ্যেও এমন একটা ঘটনা ঘটে নি। এতো স্লীট নয়, এর নাম ব্লিজার্ড। তুষার-ঝড়। এই তুষার তুলোর আঁশের মতো ঝুরে ঝুরে ক'রে মাটিতে পড়েই গলে যায় না, শক্ত হ'য়ে ওঠে।

সেই শক্ত হ'য়ে ওঠা পাথরের মতো সতেরো ইঞ্চি পুরু বরফের চাপে যন্ত্রের দাঁত বসতে চাইলো না। সে এক মহা ব্যাপার। স্ট্রীটের বাসিন্দারা তাদের রাস্তার ধারে পরিখার মতো গর্ত খুঁড়িয়ে সমানে আগুন জ্বলাতে লাগলো, যদি তাতে গলে। সবাই বললো, এই বরফ পরিস্কার ক'রে হাডসন নদীতে ফেললে নদী বুজে যাবে। অবস্থাটা বুঝুন।

এদিকে নতুন এসে সংসার পেতেছি, এটা থাকে তো ওটা থাকে না, তখন বাধ্য হ'য়েই বেরুতে হয়। তলাকার গোটা পাঁচেক পশমী জামার উপরে লম্বা হাতের সোয়েটার পরে, সিল্কের শাড়ি জড়িয়ে তার উপরে এক দশ মন ওজনের কোট চাপিয়ে, ওভার শু'তে পা ঢেকে, মাথায় ফ্লানেলের টুকরো বেঁধে কাঁপতে কাঁপতে কিনতে-কাটতে যাই। দু' পা হাঁটি আর কোনো-না-কোনো ড্রাগস্টোর চোখে পড়লেই ঢুকে পড়ি। আপনি জানেন, এখানকার ড্রাগস্টোরগুলো কেমন অন্য রকম। অষুধ মনোহারি আর রেস্তোঁরা এক সঙ্গে। এক পাশে ঘোরানো টেবিল ঘিরে উঁচু চেয়ারে বসে লোকেরা মোটা মোটা শুয়োরের মাংসের স্যান্ডুইচ আর কফি খেতে খেতে গল্প করে। কেউ কেউ শুধু কফি খায়, কেউ কোকা-কোলা, অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি চা। আসলে সবাই একটু শরীর গরম করতে ঢোকে। একটা কিছু নিয়ে বসে থাকে খানিকক্ষণ। আবার বেরোয়। এমনিই এক উঁচু চেয়ারে এক কাপ গরম পানীয় নিয়ে বসে থাকতে থাকতে আবার দেখা হ'য়ে গেল রাসেলের সঙ্গে। সে-ও ঐ একই উদ্দেশ্যে ঢুকেছিলো। আমাকে দেখে এক লাফে কাছে এসে হাত ঝাঁকিয়ে উদ্ভাসিত মুখে সম্ভাষণ করলো। আমিও খুশী হ'য়ে উঠলাম। বললাম, 'কেমন আছ?'

'আপনি কেমন আছেন?'

নিয়ম মাফিক শীত বিষয়ে একটু রসিকতা করলুম। রাসেলও যথারীতি জবাব দিল। আলাপ জমতে দেরি হ'লো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাছেই থাকো নাকি?'

'কাছে!' চোখ বড়ো করলো সে, 'মোটেই না, সেই কুইন্সে। কিন্তু এ রাস্তাই আসলে আমার রাস্তা, এই ওয়াশিংটন স্কোয়ারই আমার আসল পাড়া।' সে কী অর্থে বলেছিল, তখন আমি বুঝিনি, পরে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলুম। তখন ভেবেছিলুম কবি সাহিত্যিকের তীর্থস্থান তো এই ওয়াশিংটন স্কোয়ার পাড়াই, রাসেল হয়তো সে কথাই বলছে তাই জবাবে বললুম, 'সে তো বটেই,—তোমাদের জন্যই গ্রীনউইচ ভিলেজের এতো খ্যাতি। এখন অবিশ্যি বিটনিক।'

রাগ করলো রাসেল, ভারি গলায় আধো আধো বাংলায় বললো, 'বা রে কোটাবার বোলবে যে হামি একটুকু বিটনিক নই।'

'আরে, বাংলা বলতে পারো! কী আশ্চর্য!'

আমি একেবারে অবাক। মুহূর্তে তাকে আমার আপন মানুষ বলে মনে হ'তে লাগলো। আমি তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, 'বিটনিক বললে তুমি রাগ করো কেন বলো তো? আমার তো খুব ভালো লাগে তাদের কথা ভাবতে।'

'কিন্তু আমি যা নই' রাসেল জোর দিল গলায়, 'তা কেন আমাকে বলা হবে?'

'ঠিক আছে, আর বলবো না। বরং এসো কলকাতার কথা বলি।'

'আপনিও কি ঠাট্টা করছেন?'

'কক্ষনো না। সেদিন আলাপ হ'য়ে থেকে আমি কতোবার তোমার কথা মনে

করেছি, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো।'

'আমার মতো নয় নিশ্চয়ই' ভালো লাগার প্রতিযোগী হ'য়ে রাসেল স্মীথ হাসলো, 'আপনি আর আমাকে কতোটুকু ভেবেছেন. আমি সেই থেকে ভাবছি আবার কেমন ক'রে আর কোথায় দেখা হ'তে পারে আপনার সঙ্গে।'

'খুব কিছু কঠিন ছিল না নিশ্চয়ই। অনায়াসে ফোন করতে পারতে, একদিন আসতে পারতে।'

'আমি কি ফোন নম্বর জানি? ঠিকানা জানি?'

'মিসেস ব্রাউন তো জানেন।'

'তিনি জানলেই কি আমার জানা হয়?'

'তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারতে!'

'আমি জানি জিজ্ঞেস করলেই উনি হাসবেন, ঠাট্টা করবেন।'

'কেন?'

'ও সব ঠাট্টা আমার সয় না।'

'কিন্তু ঠাট্টা করবেন কেন সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'সে আপনি বুঝবেন না। আপনাকে আমি একদিন সব বলবো।'

'সেই ভালো। কবে তুমি আবার দেখা করবে বলো।'

'কোথায় দেখা করবো?'

'কেন, আমার কি ঘর-বাড়ি নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নেই সেখানে। চলো না আজই নিয়ে যাই, তারপর বেশ অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে।'

'আজ? এখন!'

'ক্ষতি কী?'

'তা কখনো হয়? আগে থেকে একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না করে—'

'এই বুঝি তুমি বাঙালী?'

'কেন?'

'বাঙালীরা কখনো এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে কারো বাড়ি যায় না। আমাদের দেশে অত সব ফর্মালিটি নেই। মনে হলে যাবো, বেশ কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসবো।'

'সেটা বেশ ভালো।'

'অত তোড়-জোড় ক'রে গেলে তো আদ্ধেক সুখই মাটি। কী বলো।'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তা হ'লে আর সারপ্রাইজ থাকে কোথায়?'

'এই তো বেশ বুঝেছ কথাটা।'

'কেন বুঝবো না! আমি তো জানি সে কথা। মালিকাদের কাছে তো আমি সেই ভাবেই যেতাম।'

'মালিকা কে?'

'মালিকা মালিক।'

'মালিকা মালিক! মানে মল্লিকা মল্লিক?'

'ঠিক, ঠিক।'

'কে সে?'

'বাংলায় বলবো?'

'খুব সুখের কথা।'

'সে হামার আলো, সে হামার প্রাণ।'

'কী।'

'সে হামার স্বোপ্নো, সে হামার গান।'

'এ্যাঁ।'

'সে হামার দিন, সে হামার রাত্রি। আপনি কি এ গানটা জানে না, টেগোরের লেখা,

দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে
খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে ব্যাকুল হ'য়ে
জাগে আঁখি।
শ্রাবণে শুনি দূরে মেঘে লাগায়
গুরু গুরু গরো।
ফাগুনে শুনি বায়ু বেগে জাগায়
মৃদু মরো মরো,
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তার
থাকি থাকি।'

এ গানটা রাসেল তার উচ্চারণে ওখানে বসেই সুর ক'রে গাইলো। আমি চুপ ক'রে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখে জল ভ'রে উঠেছে।

সেদিন রাসেল আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসেনি। সেই অকথ্য শীতের রাত্রে কোথায় সে কোন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে গেল। সেখানেই নাকি তাদের প্রথম দেখা হয়েছিলো। তার আর সেই মল্লিকা মল্লিকের। আমি শুনে বললাম, 'তুমি কি পাগল হ'য়েছ? এই দুরন্ত শীতের মধ্যে কেউ আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে, না থাকতে পারে, না কি পারলেও থাকা উচিত? ঘরে যাবে যে।'

রাসেল হাসলো। আমি তবু বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'যার কথা ভেবে তুমি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এগারো হাজার মাইল দূরে থেকে তা কি সে দেখতে পাবে?'
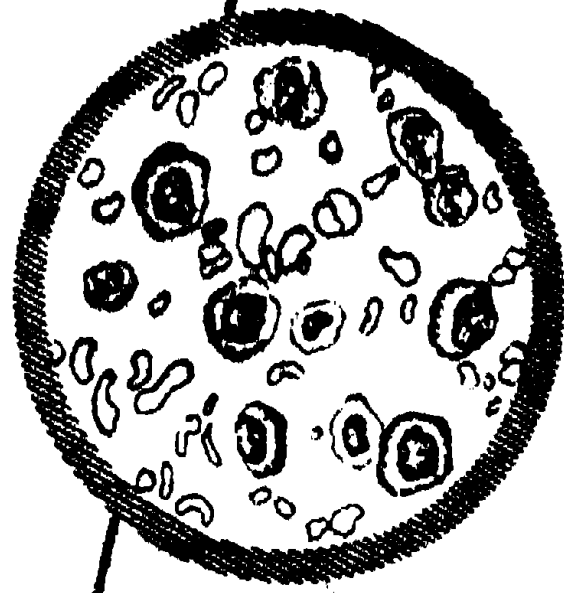
'অনুভব করবে।'

'বলছো কী তুমি?'

'ঠিক বলছি। আপনাকে আমি সত্যি বলছি—সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কতোদিন আমি তাকে পেয়েছি, একেবারে বুকের কাছে পেয়েছি, আমি যেন স্পষ্ট দেখেছি সে এসেছে, ছুঁয়েছে, আমার সমস্ত বিচ্ছেদ-বেদনা ধুয়ে গেছে এক মুহূর্তে। অবিশ্যি রোজ তা হয় না। না হোক, তার জন্যে অপেক্ষার দাম দিতে হবে আমাকে?'

এর উত্তরে আমি আর কথা ভেবে পাইনি সেদিন। সে নিজেই আবার বলেছে, 'আপনি বুঝবেন, আমি জানি আপনি বুঝতে পারবেন সে কথা। আপনি যে তারই মতো একজন বাঙালী মেয়ে, সব বুঝতে পারবেন আপনি।'

এর পরে আমি শুধু বললাম 'তা হ'লে আজ আসি।'

রাসেল বললো, 'কবে ফ্রী আছেন'

আমি বললাম, 'যেদিন তুমি বলবে।'

'যেদিন আমি বলবো? কী সুন্দর ক'রে বললেন আপনি। এমন সুন্দর ক'রে কথা বলতে বাঙালী মেয়েরা ছাড়া আর কে পারে?'

'তোমার মালিকা বাঙালী হ'য়ে আমারো সুবিধে হ'য়ে গেল, মিছি-মিছিই তোমার প্রশংসা পেয়ে যাচ্ছি, অথচ—'

আমার এই ঠাট্টায় রাসেল মিষ্টি ক'রে হেসে বাধা দিয়ে আবার বাংলায় বললো, 'ওঠোচো হামার ডিডিটির কোনো গুণই নেই।'

'আবার দিদিও শিখেছ?' আমি তৎ-ক্ষণাৎ সেই বিদেশীটির জন্য একটা বিগলিত স্নেহ অনুভব করলাম হৃদয়ের মধ্যে।

রাসেল বললো, 'হামি ডিডি জানি, মামী জানি, মামাবাবু জানি। মালিকার মামী তো হামারো মামী, মামাবাবুও হামার মামা, আর মালিকার য়েকটা ছোটো ভাই ছিলো, সেটা মালিকাকে ডিডি বলটো, টাইটো হামি ডিডি জেনেছি।'

'খুব ভালো করেছ। এখন তা হলে বলো কবে দিদির বাড়ি খেতে আসছো।'

'খেতে?'

'আমি রান্না করবো, সব বাঙালী রান্না। তারপর একসঙ্গে বসে খাবো।'

'আঃ। ভাবতেও কতো ভালো লাগছে।' চোখ বুজে নিঃশ্বাস নিল রাসেল। 'আমি বাঙালী রান্না খুব ভালোবাসি। খুব। খুব। আমি মঙ্গলবার যাবো কেমন?'

'খুব ভালো।'

'আর আপনাকে সব বলবো।' হাত নেড়ে দরজা ঠেলে সে বেরিয়ে গেল ধা ধা করে। কোথায় মিলিয়ে গেল সতেরো ইঞ্চি পুরু বরফের রাস্তা বেয়ে। আমিও নামলাম দোকান থেকে ফুটপাতে, হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরলাম।

মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ে রাসেল এলো। দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম অনেক উপহার নিয়ে এসেছে হাতে করে। এক বাকস চকোলেটের সঙ্গে স্প্যানীশ মশলা, কাগজি লেবু, মস্ত একটা বেগুন, বাঙালী দিদির জন্য তার যা যোগ্য মনে হয়েছে এমনি সব টুকটাক জিনিস। এই নিউইয়র্ক সহরে বেগুন আর লেবু! আমি তো অবাক।

'জানে, জানে, হামি সোব জানে।'

'বাংলাও জানেন দেখছি।'

'যোতোটা জানা উচিত তোতোটা কেন জানে না সেই তো দুঃখ।'

'এ দুঃখ বেশীদিন থাকবে না, আপনার দিদি কয়েকদিনের মধ্যেই সে দুঃখ মিটিয়ে দেবেন।'

আমি খাবার জায়গা দিয়ে দিলুম। আমেরিকার নিয়ম মতো বিকেল ছ'টাতেই খেতে বসা গেল। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সপ্তাহে তিনদিন আমার স্বামীকে কাজ করতে হয়। খাওয়ার পরে আর গল্পে বসা হলো না তাঁর। তিনি চলে গেলে একটু চুপ করে থেকে রাসেল বললো, 'কলকাতা সহর কতো বড়ো?'
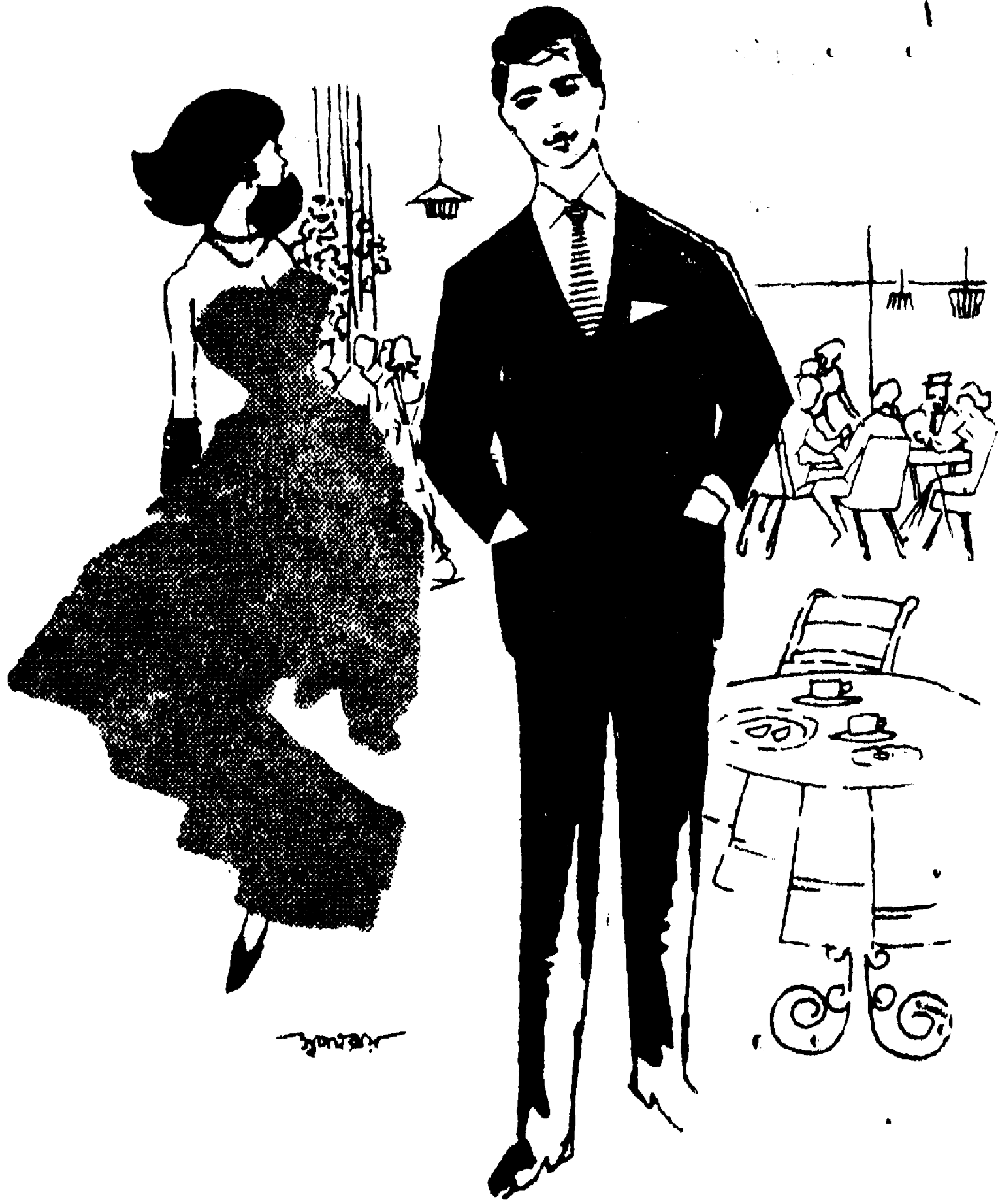
'আঃ। ভাবতেও কতো ভালো লাগছে।'

'এ সব তুমি কোথায় পেলে? কেমন করে জানলে এ সবই আমরা ভালো-বাসি।'

রাসেল বিজ্ঞের মতো হাসতে লাগলো। আমার স্বামী বললেন 'শুনলাম দিদি পাতিয়েছেন, তা বেগুন দিয়ে সেটা খুব বেশী করে জমবে। আপনার দিদিটি ভীষণ বেগুন ভালোবাসে।'

আমি বললাম, 'মস্ত।'

রাসেল বললো, 'সেখানে কি সবাই সকলকে চেনে?'

আমি বললাম, 'নিউইয়র্কে কি সবাই সকলকে চেনে?'

তখন রাসেল হাসলো। নিজের প্রশ্নে নিজেই কৌতুক বোধ করে বললো, 'বুঝি সবই, তবু একজন এমন মানুষের দেখা পেতে ইচ্ছে করে, যে মালিকাকে চেনে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।'

'তুমি বলো না তার গল্প, হয়তো বা চিনতেও পারি। আর না-ই-বা চিনলাম, তাতেই বা কী, তবু আমাদের দেশের মেয়েই তো। যখন কলকাতা যাবো, ঠিক বার করে নিয়ে আলাপ করবো, তোমার কথা বলবো।'

'বলবেন!'

'কেন বলবো না। ঠিকানা দিলেই আমি ঠিক—'

'আমি যে ঠিকানা জানি না।'

'জানো না।'

'না।'

'কেন?'

'কী করে জানবো?'

'সে চিঠি লেখে না তোমাকে?'

'না।'

'সে কী কথা? তুমি লেখো না?'

'আগে লিখতাম।'

'এখন লেখো না?'

'জবাব দেয় না যে।'

'কোনোদিন দেয়নি?'

'তা কেন দেবে না। প্রথম দিকে একটুও নিয়মের গোলমাল হতো না।'

'তারপর?'

'তারপর যে কী হলো আমি জানি না। এটুকু বুঝতে পারি যে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।'

'ওরা কবে এদেশে ছিলো?'

'দু' বছর আগে।'

'তার মানে এই দু' বছরই তোমাদের দেখাশুনো নেই?'

'না।'

'আর চিঠি?'

'তা-ও প্রায় দশ মাস হলো পাই না।'

'কোনো খোঁজই পাও না?'

'না।'

'ওর সঙ্গে তোমার কেমন করে আলাপ হয়েছিলো বল না?'

'সে ভারি অদ্ভুত।'

'বলো না শুনি।'

'একদিন একটা বিশেষ কাজে আমি এ পাড়ায় এসেছিলুম। ঠিক এই রকমই শীতের রাত ছিলো, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো, স্লীট পড়ছিলো। আমি একটা ট্যাক্সী করে এসেছিলুম। ট্যাক্সী থেকে নেমে যখন ভাড়া মিটিয়ে

দিচ্ছিলুম, মনে হলো কেউ এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে। অনুমানে বুঝলুম, ট্যাক্সীটার আশায়। আসলে আমি ছাড়লেই সে নেবে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই রকম টিপটিপ বৃষ্টি আর বরফ পড়া শীতের রাত্রে একটা ট্যাক্সী পাওয়া কী দুরূহ ব্যাপার। তাই সবাই একটা গাড়ি দেখলেই ওরকম ওৎ পেতে থাকে। আমি ভাড়া দিতে দিতেই আমার পিছনের মানুষটি আমার পাশা-পাশি হয়ে ড্রাইভারকে হাত তুললো। কিন্তু ড্রাইভারটি আমার হাত থেকে ভাড়াটা নিয়েই তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে স্টার্ট দিল গাড়িতে। আমি পাশে তাকালাম। দেখলাম শাড়িপরা ছোট-খাটো একটি মেয়ে। আমাদের দেশের তুলনায় আপনাদের বাঙগালী মেয়েরা এতো ছোট যে দেখলে মায়া হয়। শাড়ি-পরা মেয়ে দেখে আমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। তার হাতভরা জিনিস ছিলো; কোটের উপর, মাথার চুলে সব জায়গায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ, চোখের দৃষ্টি অসহায়।

গাড়িটা স্টার্ট দিতেই সে অস্থির হয়ে উঠলো, অনুরোধ করলো দাঁড়াতে। লোকটা হাত নেড়ে জানিয়ে দিল যাবে না। মাত্র স্টার্ট দেয়া গাড়ি, আমি তক্ষুনি ছুটবার সুযোগে, গালাগালি করে বললুম যখন এই পেশা, সোয়ারী না নেয়ার রাইট নেই তোমার। সে জবাব দিল 'আমি নেবো না।'

'নেবে। নিতেই হবে। নিশ্চয়ই নেবে।' আমি দৌড়তে দৌড়তে গাড়িটার পিছনে একটা ঘুষি মারলুম, ড্রাইভার স্পীড দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

বরফ পড়ে পড়ে তখন সারা সহর নোংরা হয়ে আছে। সেই পিছল পথে ছোটা যায় না। পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। আর এ রকম সময়ে খুব জরুরী কাজ না থাকলে বেরোয়ই না কেউ। পথটা খুব নির্জন ছিলো। হতাশ হয়ে আমি ফিরে তাকালাম; বললাম, 'এই ড্রাইভার লোকটি অত্যন্ত দুষ্টু, যদি রাস্তা ভালো থাকতো আমি ঠিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলতাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। এ রকম রাতে এই ক্যাবওয়ালাগুলো সকলের সঙ্গেই এই রকম দুর্ব্যবহার করে। আসলে সারা-দিন খেটে খেটে ক্লান্ত শরীরে এই শীতের রাত্রে ওদের বোধহয় আর সোয়ারী বইতে ইচ্ছে করে না।'

ক্যাবওয়ালার অপরাধে আমার এই ক্ষমাপ্রার্থীর চেহারা দেখে মেয়েটি বোধ হয় একটু অবাক হয়েই চোখ তুলে তাকালো, আর সেই চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে আমি যেন একটা ধাক্কা খেলাম।

আমাদের এই আমেরিকার একটা বদনাম আছে কালো রং দেখলেই লোকেরা খারাপ ব্যবহার করে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দক্ষিণের লোকেরা অবিশ্যি এ বিষয়ে অত্যন্ত বিশ্রী কিন্তু কেনেডির চেষ্টায় এই নিউইয়র্ক সহরে সেই দোষ খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। বুঝতেই পারেন, অশিক্ষিত লোক মাত্রই সংস্কারের অধীন। সে তো আপনাদের দেশেও আছে বলে জানি। আপনাদের জাতিভেদ প্রথাটা কি ভালো? বলুন?

'নিশ্চয়ই না।'

'তবু তো আছে?'

'তা আছেই তো।'

'আর ইংলণ্ডের কথাও ভেবে দেখুন, কী ভয়ানক শ্রেণীভেদ। জার্মান রুশের ইহুদি বিতাড়ণের কথা আর না-ই বললাম। কিন্তু তবু এই সাদা কালো নিয়ে ভেদাভেদের দুর্নাম আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশী। কাজেই মনে হলো মেয়েটি হয় তো ভাবছে যে সে সাদা চামড়ার নয় বলেই ড্রাইভারটির এই বেয়াদপি করতে সাহস পেলো। দেশের এই বদনামের ভয়েই আমি ও রকম ছুটে গিয়ে গাড়িটা ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। আর সেই জন্যই নানা রকম কৈফিয়ৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'আমি যদি জানতাম চলে যাবে, তা হলে আগে আপনাকে ভিতরে বসিয়ে তবে ভাড়া মিটোতাম।

মেয়েটি এবার তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। ঠোঁটের কোন বাঁকিয়ে খুব সুন্দর করে একটু হাসলো, নরম গানের মতো করে বললো 'আপনার ব্যবহার অনুকরণ-যোগ্য। এই উপকারের কথা আমার মনে থাকবে। আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

আমি বললাম, 'এখুনি আর একটা ট্যাক্সি এসে যাবে, আপনি ভাববেন না।'

'না, না, ভাববো কেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

তবু আমি ব্যস্ত হলাম। নিজের কাজ ভুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম তার সঙ্গে। মনে মনে বললাম এই সুন্দর শাড়িপরা বিদেশী মেয়েটিকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আমি কখনোই তাকে একা ফেলে যাবো না, গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে অন্য কথা।

অস্থির হয়ে মেয়েটি বললো, 'আপনি আর কেন এই দুরন্ত শীতে অকারণে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন, না, না, আমি ঠিক একটা পেয়ে যাবো।' আর এক পলক চোখ তুললো সে।

তার সেই দৃষ্টি, দ্বিধান্বিত গলার স্বর, কুণ্ঠিত হবার ভঙ্গি, ঈশ্বরের পোষাকের মতো শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ছোটো শরীরের নিখুঁত গড়ন, সবটা মিলিয়ে আমি অত্যন্ত অভিভূত বোধ করলাম। এর আগে আর কোনো শাড়ি-পরা মেয়ে আমি দেখিনি, এমন সুন্দর নরম গলা শুনিনি, বইয়ে লেখা লজ্জা শব্দের এমন চেহারাও কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। শুনেছিলাম, ভারতীয় মেয়েরা নাকি এই রকমই হয়। আমার এক ভারত ফেরৎ বন্ধু আমাকে রাতদিন তাদের বিষয়ে গল্প করতো। এমন কি, সে এতোটাই মুগ্ধ হয়ে এসেছিলো যে চেষ্টা-চরিত্র করে আবার চলে গেছে সেখানে। সে গেছে বাংলা দেশে। সে বলতো বাংলাদেশই তার ভালো লেগেছে বেশী। কলকাতার বন্ধুদের নাকি তুলনা নেই, তাদের সঙ্গেই সে বেশী মনের মিল খুঁজে পেয়েছে।

অনেক স্বপ্ন ছিলো আমার, সেই স্বপ্নই মূর্তি হয়ে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখের আশ্চর্য কোমলতার দিকে তাকিয়ে আমার চোখের দৃষ্টি আটকে রইলো। আমি এক পা নড়তে পারলুম না সেখান থেকে। এমন কি কেন দাঁড়িয়ে আছি সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আমি সুখী হলাম, শিহরিত হলাম, তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমি আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে গেলাম। তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ কবিতার মিল খুঁজে পেলাম আমি।

সেদিনের সেই কুয়াশা-ঢাকা বরফ-ঝরা টিপটিপ বৃষ্টির রাত আমি জীবনে ভুলবো না। সেই রাত্রি আমাকে স্বর্গের স্বাদ দিয়েছিলো। উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপার ছাড়িয়ে আমি অগণিত তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুললাম।

(ক্রমশঃ)

নেফার মানুষ – মন্‌পা

প্রভাতকুমার দত্ত

অক্টোবর মাসের কুড়ি তারিখে বিশ্বাসঘাতক চীনের অতর্কিত আক্রমণে নেফার যে স্থানটি আমাদের হাতছাড়া হয় তা হচ্ছে মন্‌পা জাতিদের আবাসস্থল তাওয়াং। মন্‌পারা নেফার বহুজাতির মধ্যে একটি এবং সংখ্যায় খুব বেশী নয়। এরা সকলেই বৌদ্ধমতে দীক্ষিত। তাওয়াং শহর মন্‌পাদের কাছে অতি পবিত্র। কারণ এখানে রয়েছে তাদের প্রধান মঠ। তাওয়াং-এর পতনের পর মঠের প্রধান লামা তাঁর সহকারীদের নিয়ে ভারতীয় এলাকা তেজপুরের দিকে চলে আসেন। বহু সাধারণ মন্‌পাও এঁদের সঙ্গে আসতে বাধ্য হয়। তবে খবরের কাগজে আমরা পড়েছি যে যারা পেছনে রয়ে গেছে তারা চীনা-প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রতিরোধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। চীনারা তাওয়াং মঠকে অস্ত্রাগারে পরিণত করে যেভাবে অপবিত্র করেছে, তাদের শান্তিময় জীবনে যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে তাঁর প্রতিশোধ নিতে মন্‌পরা সচেষ্ট।

অদ্ভুত শান্তিপ্রিয় আর ধর্মনিষ্ঠ জাত এই মন্‌পরা। সুন্দর রুচিবোধ এদের চরিত্রের অপর একটি ভূষণ। ধর্ম এদের জীবনের প্রায় সবটুকু স্থান জুড়ে রয়েছে। মঠে [illegible] মূর্তির সামনে প্রদীপের ডালি সাজিয়ে দেওয়া এদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। এদের হাতে সব সময়েই থাকে প্রার্থনাচক্র। তিব্বতীয় ধরনের ধর্মীয় পতাকায় মন্‌পাদের ঘর-বাড়ী সর্বক্ষণ সজ্জিত থাকে। মন্‌পরা নেফার উত্তরতম প্রান্তের কামেঙ বিভাগের বাসিন্দা। তাওয়াং-এর অল্প-দূরে ম্যাকমোহন সীমানা পেরোলেই থাগ্‌লা গিরিশ্রেণী। এরপর তিব্বত। তিব্বতের সঙ্গে মন্‌পাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মন্‌পারা যে ভাষায় কথা বলে তা তিব্বতীয় ভাষারই রূপান্তর। যদিও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে তবু মন্‌পরা তিব্বতের মারফৎ বৌদ্ধধর্ম লাভ করেছে। প্রতি বছর মন্‌পরা দুর্গম গিরিপথ দিয়ে তিব্বতে যায় গরম কাপড়, ব্রোকেড, রঙচঙে টুপি, জুতা, রিবন ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য। পশ্চিম বাঙলার উত্তরে কালিম্পঙ শহরেও তারা দলবদ্ধভাবে ফি বছর আসে। সওদা করার সময় ধর্মীয় ব্যবহারের জন্য মন্‌পারা কেনে মূর্তি, প্রার্থনা-পতাকার কাপড়, ছোট ছোট প্রার্থনাচক্র, পুঁতির মালা। এছাড়াও তারা নেয় সুন্দর রঙকরা পাত্র যার কোনটা রূপোর বা কোনটা কাঠের। ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন বলেছেন : "অতীতে মন্‌পারা তাদের ধর্ম ও শিল্পকলার জন্য তিব্বতের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নেফার শাসন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে মন্‌পারা বৌদ্ধধর্মের আদিকেন্দ্র ভারতের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে।"

মন্‌পাদের উপজীবিকার প্রধান উপায় চাষবাস আর মেষপালন। চাষবাসে মন্‌পারা মোটামুটি উন্নত প্রথা অনুসরণ করে। সাধারণতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মত নেফার আদিবাসীরাও জুম চাষে অভ্যস্ত। সকলেই জানেন এই প্রথা ক্ষতিকারক।

বিরাটাকার চায়ের পাত্র হস্তে মন্‌পা লামা

আশ্চর্য ব্যাপার হোল একমাত্র মন্‌পা জাতি জুম চাষ বন্ধ করে অপেক্ষাকৃত উন্নত টেরাসিং বা সিঁড়ি পদ্ধতিতে চাষ শুরু করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে যে পাহাড়গুলি ঢালু হয়ে গেছে তার গা কেটে কেটে চাষবাস অগ্রসর হয়েছে। এতে ধানের ফলন বেড়ে গেছে। জুম চাষে যেটা সম্ভব নয় সেই জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর ধারণ.টা ক্রমে ক্রমে তাদের মাথায় ঢুকছে।

মন্‌পা বালিকা

মন্‌পারা [illegible] কুটিরশিল্পেও খুব নিপুণ। অতি সুন্দর [illegible] কাজ করা কার্পেট, মাদুর, চামড়ার ব্যাগ ইত্যাদি তৈরীতে এরা খুব পটু। পরনের পোষাক যা কিছু তা মেয়েরাই তাঁতে তৈরী করে নেয়। রঙটা এদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে পাত্র, প্রার্থনা-পতাকা—এ সবকিছুই নানা বর্ণে উজ্জ্বল। ধাতুর কাজেও মন্‌পারা অভিজ্ঞ। অবশ্য আদিবাসী অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কাজটি নিষিদ্ধ। তাই মন্‌পারা কেবল নিজেদের অঞ্চলের নয় নেফার অন্যান্য আদিবাসী এলাকা ঘুরে ঘুরে কামারের কাজ করে বেড়ায়। সমগ্র নেফা অঞ্চলের একমাত্র কামেঙ বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ শুধু মন্‌পা জাতির মধ্যেই চিত্রাঙ্কনের প্রচলন আছে। এরা এ বিদ্যায় বিশেষ অগ্রণী। চিত্র-শিল্পীরা অবশ্য চিরাচরিত বৌদ্ধশিল্পের রীতিতেই ছবি আঁকে। তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দেয়াল ও ছাদ চিত্র-মণ্ডিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের পাত্র, মুখোস ইত্যাদি অলংকৃত করে। মন্‌পারা কিছু কিছু কাগজও তৈরী করে যা শিক্ষিত লামারা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলির জন্য ব্যবহার করে।

মন্‌পাদের ঘরবাড়ী পার্বত্যভূমিতে গৃহ-স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। আমাদের অনেকেরই ধারণা আদি-বাসীরা যে-কোনভাবে তৈরী [illegible]

তাওয়াঙ-এ লামার বাসস্থানের একাংশ

তাড়া দেওয়া খুপরির মত ঘরে বাস করে। মনপাদের ঘরদোরগুলি দেখলে আমাদের সে ভুল ধারণা ভেঙে যায়। এদের ঘরে উপযুক্ত জানলার ব্যবস্থা আছে। ভেরিয়ার এলউইন বলেছেন যে তিনি মনপাদের যে সমস্ত ঘরে থেকেছেন তার প্রত্যেকটিই আলো-বাতাসযুক্ত। শস্য মাড়াই করা কিম্বা প্রার্থনাচক্র ঘোরাবার জন্য এখনকার লোকেরা জলস্রোতের দ্বারা পরিচালিত চাকার ব্যবহার করে। এটি একটি স্থানীয় অভিনবত্ব। ভারতে আদিবাসী সমাজে অনেক ক্ষেত্রে 'গার্লস ডরমিটরি' বা মেয়েদের আলাদা যৌথ ঘুমোবার স্থানের রেওয়াজ আছে। মনপাদের মধ্যে কিন্তু এ জিনিস নেই।

সংস্কৃতির প্রশ্নে এলে দেখা যায় যে তা বৌদ্ধ বৎসরের নানা উৎসবকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত। আনুষ্ঠানিক প্যান্টোমাইম্ বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা অভিনয় মনপা-সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য। এজন্য বিভিন্ন ধরনের উজ্জ্বল পোশাক ও রঙচঙে মুখোস ব্যবহার করা হয়। অভিনেতাদের সঙ্গে একদল লোক ঢাক ও শিঙা বাজায়। মঠের লামারাও বৃহদাকার করতালের শব্দে চারিদিক মুখরিত করেন। এ ধরনের প্যান্টোমাইম্ সব সময়েই মঠ বা গোম্ফার সামনে অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয়ের গল্পাংশ বা উপদেশাত্মক বক্তব্য থাকে। এরই মধ্যে আবার ভাঁড় চরিত্রগুলি হাসির খোরাক জোগায়। তবে এ ধরনের অভিনয় খরচা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ বলে ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হয় না। তাই প্রাত্যহিক আনন্দের জন্য মনপা নারী ও পুরুষেরা কয়েকটি সহজ নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

মনপা-জীবনের আর একটি অতি-সুন্দর দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানবো। সেটি হচ্ছে মনপা রমণীদের ফুলের প্রতি ভালবাসা। মনপারা গরীব তাই মেয়েরা ফুল দিয়েই নিজেদের সাজায়। প্রত্যহ মঠের মূর্তির সামনে রাশি রাশি ফুলের অর্ঘ্য দিতে ভোলে না। আরো বিচিত্র হোল কোন অতিথি এলে মনপা রমণীরা তার আসার পথে ফুল ছড়িয়ে দেয়। সৌন্দর্যপ্রীতি কত গভীর হলে এ জিনিস সম্ভব! এই ধরনের রুচিবোধসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ শান্তি-প্রিয় মনপা সম্প্রদায়ের উপর দস্যু চীনারা অকারণে বিপদ আর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাই প্রত্যেক ভারতবাসীর সহানুভূতি মনপাদের পক্ষে।

[অমৃতে প্রকাশিত গত ৩০শ সংখ্যায় ৪৩১নং পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা "তিন শত্রু" শীর্ষক কবিতায় কিছু ভুল থেকে গিয়েছে। কবিতাটি নিম্নলিখিতরূপে পড়তে হবে।]

তিন শত্রু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রতিরোধ প্রতি পদে প্রতি পথে-পথে
প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকায়, প্রতিটি বিঘতে।
রে দুরাত্মা, আরো তোর তিন শত্রু আছে এ ভারতে—
জেনে রাখ তার পরিচয়।
এক শত্রু, গ্রামান্তের জীর্ণ দেবালয়
ইটের কোটর কিংবা সামান্য কুটির,
আরতির ঘণ্টা শোন নিবিড় মদির।
বটমূলে বাঁধা বেদী, বুড়ো শিব বসানো পাদপ
হাটে ঘাটে আটচালা, চণ্ডীর মণ্ডপ।
দুই শত্রু, ছোট পুঁথি, ক'টি মাত্র শ্লোক,
মৃত্যুরে অগ্রাহ্য করা অমৃত আলোক।
ক্লৈব্য জাড্য মূঢ়তার চিরবিরোধিতা
নাম তার শুনে রাখ,—গীতা।
তৃতীয়, অপরাজেয় প্রতি প্রাণে ঈশ্বরবিশ্বাস
শাশ্বতে বিশ্বাস,
ধর্ম খাদ্য ধর্ম জল ধর্ম প্রতি বক্ষের নিশ্বাস।
রে দুর্বৃত্ত, বঞ্চক বর্বর,
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর।।

মহাকাশ অভিযানে পরমাণুর ভূমিকা

গ্লেন থিওডোর সীবর্গ

[পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরটি চালু হয়েছিল ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে। এই সাফল্যের মূলে যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির অবদান ছিল তার নাম চেইন রিঅ্যাকশন বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া। ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নেতৃত্বে বেয়াল্লিশ জন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রচিত হয়েছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও নতুন অধ্যায়, উন্মোচিত হয়েছিল আশ্চর্য এক দিগন্ত। পরমাণু শক্তি মানুষের আয়ত্তে আসার কুড়ি বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। ডঃ গ্লেন থিওডোর সীবর্গ আজকের মার্কিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নবিজ্ঞানী। ১৯৫১ সালে তিনি তাঁরই সহকর্মী বিজ্ঞানী ডঃ এডুইন এম. ম্যাকমিলানের সঙ্গে একযোগে রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডঃ সীবর্গ একাধিক নতুন মৌল পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। —সম্পাদক।]

চাঁদের দেশে মানুষের অভিযান শুরু হবে, বা গ্রহলোকে বা নক্ষত্রলোকে—এ স্বপ্ন মানুষের বহু শতাব্দীর। তবে রকেটের ব্যবহার কিন্তু প্রধানত শুরু হয়েছিল সামরিক উদ্দেশ্যে এবং খুব প্রাচীন কাল থেকেই। তারপর থেকে পদার্থবিজ্ঞানীরাও আবহাওয়া বা মহাজাগতিক রশ্মি বা এমনি ধরনের কোনো বিষয় সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে বেশ কিছুকাল ধরে ঊর্ধ্বাকাশে রকেট পাঠিয়ে এসেছেন।

এতদিন পর্যন্ত রকেটের বেগ সঞ্চারের জন্যে রাসায়নিক জ্বালানীর ওপরে নির্ভর করে আসতে হয়েছে। আজকের এই মহাকাশ অভিযানের যুগে রকেটের যে-সব রকমফের দেখা যাচ্ছে—যেমন, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ বা ব্যোম-অনুসন্ধানী বীক্ষণাগার—এসব ক্ষেত্রেও জ্বালানী হয় রাসায়নিক। তথ্যসংগ্রহের জন্যে এই সমস্ত উপগ্রহে বা বীক্ষণাগারে নতুন নতুন যন্ত্র বসাতে হয় আর যন্ত্রগুলোকে চালু রাখবার জন্যে প্রয়োজন হয় নানা ধরনের ব্যাটারি। দেখা গিয়েছে, এক্ষেত্রে সৌর ব্যাটারির ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধের। তবে সৌর ব্যাটারির সুনির্দিষ্ট অসুবিধেও আছে।

মহাকাশ-অভিযানে নিউক্লিয়র তেজ ব্যবহার করার কথা শোনা যাচ্ছে। কথাটা নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের, কেননা এনরিকো ফার্মির সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার পরে কুড়ি বছরও পার হয়নি। এনরিকো ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরাই হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, পরমাণুর নিউক্লিয়সের বিভাজন-জনিত প্রক্রিয়ার ফলে নিঃসৃত তেজকে সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

এনরিকো ফার্মি (১৯০১-১৯৫৪)

তবে এ-প্রসঙ্গে মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃতের নামও স্মরণ করতে হয় যিনি সেই ১৯১৯ সালেই আক্ষেপ জানিয়েছিলেন যে, নিউক্লিয়র শক্তি তাঁর আয়ত্তে নেই। এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন রবার্ট এইচ, গডার্ড। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কারণ আমাদের আয়ত্তে অধি-পারমাণবিক শক্তি নেই......" (অধি-পারমাণবিক শক্তি বলতে ডঃ গডার্ড যা বুঝিয়েছেন তারই নাম আমরা দিয়েছি নিউক্লিয়র শক্তি।)

রকেটের বেগসঞ্চারের জন্যে নিউক্লিয়র শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হলে এমন একটি শক্তির ভান্ডার মানুষের আয়ত্তে এসে যাবে যার ফলে মানুষ অবাধে মহাকাশের যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারবে। অর্থাৎ, বিজ্ঞাননির্ভর গল্পে যে-সব কথা বলা হয়ে থাকে তাই হয়ে উঠবে বৈজ্ঞানিক বাস্তব।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্তমানে যতোখানি অগ্রসর হয়েছে তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, মহাকাশে দীর্ঘকালের জন্যে পাড়ি দিতে হলে বেগসঞ্চারের জন্যে নিউক্লিয়র তেজকে ব্যবহার করাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পন্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই উদ্দেশ্যে দুটি বিভিন্ন দিকে আপন প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছেন।

একটি হচ্ছে রকেট-চালনার উপযোগী নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর উদ্ভাবন করা। এই উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম "রোভার"। এই কর্মসূচীটি রূপায়ণের দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করে থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন ও জাতীয় বিমানবিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। ১৯৫৭ সাল থেকে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ হচ্ছে।

দ্বিতীয় কর্মসূচীটির নাম "স্ন্যাপ্"। অর্থাৎ, এমন একটি ব্যবস্থা যার ফলে আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে কমিশনের উদ্দেশ্য হবে এমন কিছু ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যার ফলে মহাকাশগামী যানের তথ্য-সংগ্রাহক ও তথ্য-প্রেরক যন্ত্রপাতির জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি

পাওয়া যেতে পারে,—নিউক্লিয়র তেজের সাহায্যে। পরবর্তী কালে যখন মানুষ-যাত্রী সমেত ব্যোমযানের যাত্রা শুরু হবে তখনো সেই যানের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির শক্তিও পাওয়া যাবে এই নিউক্লিয়র তেজের সাহায্যেই। ১৯৫৫ থেকে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ হচ্ছে।

বর্তমানে 'রোভার' কর্মসূচী অনুসারে যে-সব কাজ হচ্ছে তার লক্ষ্য, এমন একটি নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর তৈরি করা যার জ্বালানী হবে কঠিন পদার্থ। এই ধরনের রিঅ্যাক্টরের সাহায্যে ব্যোমযান দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারবে।

নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর সমন্বিত ব্যোমযানের একটি সুবিধে এই যে, এক্ষেত্রে জ্বালানীর জন্যে যে-পরিমাণ ওজন বহন করবার প্রয়োজন হয় তা খুবই কমে যায়। ব্যোমযানের পাড়ি যতো দীর্ঘ হবে ততোই আনুপাতিক হারে জ্বালানীর ওজন কমবে। যেহেতু জ্বালানী বহনের ওজন অনেক কমিয়ে ফেলা যাবে, অতএব মাল ও যাত্রী আরো অনেক বেশি ওজনের বহন করা চলবে। কিংবা দুয়ে মিলিয়ে ব্যোমযানের ওজন অনেক কমে যাবে। আমরা এই মত পোষণ করি যে, রাসায়নিক জ্বালানীর সাহায্যে চালিত রকেট মহাকাশ-অভিযানের যে-সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা সেখানে নিউক্লিয়র রকেট সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারবে।

এখনো পর্যন্ত রোভার কর্মসূচী অনুসারে যতোদূর কাজ হয়েছে তা থেকে
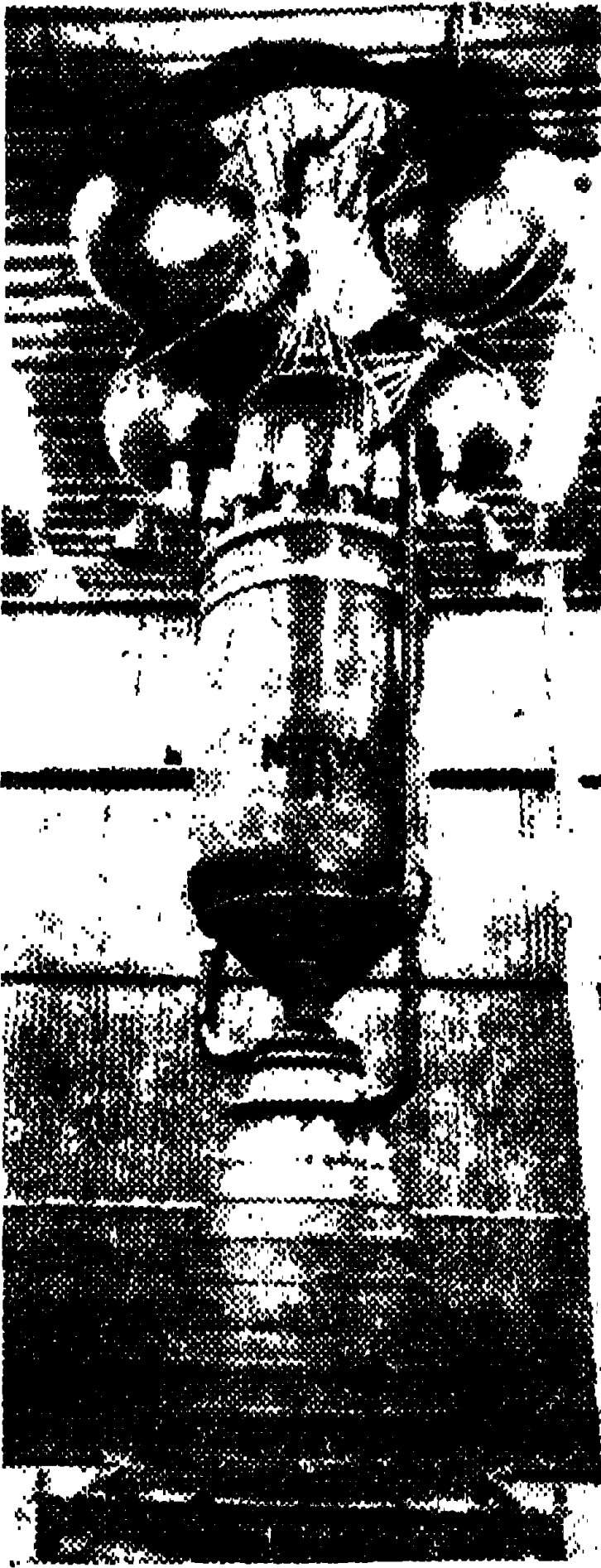
রকেটে ব্যবহারের জন্য পরমাণু চালিত এঞ্জিন

আমরা যুক্তিসংগতভাবেই আশা করতে পারি যে, ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে নিউক্লিয়র ইঞ্জিন সমন্বিত রকেটের মহাকাশ-অভিযান শুরু হবে। যাঁরা এই গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁদের ধারণা, যদি নতুন কোনো টেকনিকাল অসুবিধে দেখা না দেয় তাহলে হয়তো ১৯৬৫ সালের মধ্যেই পরীক্ষামূলক মহাকাশ-অভিযান শুরু হয়ে যেতে পারে।

আর 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচী অনুসারে উদ্ভাবিত হবে ব্যোমযানে ব্যবহারযোগ্য বৈদ্যুতিক নিউক্লিয়র আধার। এই আধারটি হবে দৃঢ়সংবদ্ধ, হাল্কা, দীর্ঘস্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য। নিউক্লিয়র তেজের ব্যবহার থেকে যে কী অনন্যসাধারণ ফল পাওয়া যেতে পারে, এটি তার একটি নিদর্শন। বিশেষ করে ব্যোমযানের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ফলে এতখানি সুবিধে পাওয়া যায় তার একটি কারণ, এই ব্যবস্থায় ব্যোমযানের ওজন অনেকখানি কমিয়ে ফেলা চলে।

কৃত্রিম উপগ্রহ, ব্যোমযান ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে নিউক্লিয়র তেজের দ্বারা চালিত যে ইলেকট্রিক জেনারেটার তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে তা হবে দু-ধরনের। একটিতে ব্যবহৃত হবে উচ্চ তাপমাত্রার কম্প্যাক্ট রিঅ্যাক্টর যার সাহায্যে চালিত হবে টার্বো-জেনারেটর। এই টার্বো-জেনারেটর থেকে যে উত্তাপ পাওয়া যাবে তা উদ্দীপ্ত করবে থার্মোইলেকট্রিক ও থার্মো-আয়োনিক কনভার্টারকে আর এইভাবে পাওয়া যাবে বৈদ্যুতিক শক্তি। দ্বিতীয়টিতে ব্যবহৃত হবে বিশেষ বিশেষ রেডিওআইসোটোপের ক্ষয়হেতু উত্তাপ, যার দ্বারা থার্মোইলেকট্রিক ও থার্মো-আয়োনিক কনভার্টার উদ্দীপ্ত হবে। বর্তমানে 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচী অনুসারে কম-পক্ষে ত্রিশটি বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে।

মহাকাশ-অভিযানে এমন ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে যাদের সারাই বা মেরামতের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচীতে এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ হচ্ছে। নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টরের উত্তাপকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে আমরা ছোটো আকারের টারবাইন ও অলটারনেটর তৈরি করার চেষ্টা করছি। তাছাড়া আমরা চেষ্টা করছি এমন ধরনের জেনারেটর তৈরি করতে যাতে কোনো সচল অংশ থাকবে না এবং তার ফলে জেনারেটরটি খুবই নির্ভরযোগ্য হবে।

এমন কি এই মুহূর্তেই 'স্ন্যাপ্' কর্মসূচী অনুসারে উদ্ভাবিত এমন থার্মো-ইলিক্ট্রিক জেনারেটর আমাদের হাতে আছে যার জ্বালানী হবে উপযুক্ত কোনো আইসোটোপ এবং যা কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা চলবে। এই জেনারেটরটির ওজন মাত্র চার পাউন্ড (১.৮ কিলোগ্রাম) এবং এই জেনারেটরে পাঁচ বছর ধরে হাজার হাজার পাউন্ড (কিলোগ্রাম) ব্যাটারির সমপর্যায়ের বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এসব কথা বলার নয় কাউকে। মা-দাদা-বৌদির কাছে তো নয়ই—এতখানি অপরাধের কথা, লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, অস্বাভাবিক অমানুষতার কথা কারও কাছেই বুঝি বলা যায় না। সুতরাং চুপ ক'রেই থাকে সে। চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ে যায় উত্তরের বদলে। এক এক সময় মা ক্ষেপে যান—সব কথা সে শুনতে পায় না বটে, কানের মধ্যে সর্বদা যেন একটা ঝম ঝম ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, দিন-রাতই—আভাসে আন্দাজে তাঁর তিরস্কারের কঠিন ভাষা সে কিছু কিছু বুঝতে পারে—কিন্তু, তবু জবাব দিতে পারে কৈ? মা এক একদিন তেড়ে মারতেও আসেন, অথচ, কী ক'রে বোঝাবে সে তাঁকে যে বলার মতো তার কিছুই নেই। বলবার কোন উপায় নেই। সে তিরস্কারে মাথাটাই শুধু আরও খানিকটা হেট হয়, চোখের ধারাটাই শুধু আরও প্রবল হয়।

বৌদি আড়ালে আবডালে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, হেঁকে বললে মা শুনতে পাবেন বলে সাতার ফেলে যাওয়া স্লেটটা খুঁজে বার ক'রে লিখে জানায় যে, 'তুমি আমার কাছে বল. কেউ টের পাবে না। তেমন যদি কিছু কথা হয় তো আমি বলবও না কাউ'কে। আর যদি এমন হয় যে মার কাছে বলতে লজ্জা করছে তোমার তো তাও আমাকে বলা সুবিধে, আমি ওঁদের বলতে পারব। চক্ষুলজ্জা হয় তো আমি চলে যাচ্ছি সেলেটে লিখে রাখো। দূরে নিয়ে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু তাও পারে না কান্তি। হাত জোড় করে শুধু।

এদিকে কানের রোগটা ওর বেড়েই যায় দিন দিন। আগে একটু চেঁচিয়ে বললেই শুনতে পেত—এখন কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করলে তবে কিছুটা শুনতে পায়। তাও অর্ধেক কথা বুঝতে পারে না। কেমন এক রকম করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে ঘাড় নাড়ে. কানটা এক হাত দিয়ে খানিকটা চোঙের মতো ক'রে বক্তার মুখের আরও কাছে নিয়ে আসে।

এবার হেমও চিন্তিত হয়ে পড়ে। এখানের হাসপাতাল থেকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। তারা আর পারবে না কিছু করতে।

কনক ক্রমাগত খোঁচায়, 'ওগো কি করছ? এর পর যে চিকিচ্ছের বাইরে চলে যাবে। দুটো একটা দিন অফিস কামাই কর। কলকাতার কলেজে নিয়ে যাও।'

অগত্যা তাই করতে হয়। অফিস কামাই ক'রে মেডিকেল কলেজের আউট-ডোরে নিয়ে যায়। ই-এন-টি'তে ধর্ণা দিয়ে যখন ডাক আসে তখন কিন্তু আশার সঞ্চার হয় একটু, হেমের মনে। কারণ ডাক্তার যিনি দেখছিলেন তিনি ওর কেস দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের ডেকে দেখালেন, স্ট্রেঞ্জ! ড্রামে কিছুই হয়নি, কানা হওয়ার অন্য কোনও কারণ নেই—অথচ শুনতে পাচ্ছে না। এ একটা ইন্টারেস্টিং কেস কিন্তু।'

দু-দিন বড়মাসীর কাছেই রইল ওরা দু-জনে। ছোটমাসীর একখানা ঘর, তাতে ওদের ছোট ভাই খোকাকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। সেখানে থাকা সম্ভব নয়। বাড়ি থে'কে রোজ রোজ আসার খরচাও আছে, বঞ্চাটও আছে।

তিন দিন পর পর গেল কান্তি। শেষের দিন বলে-করে শরৎ মেসোমশাইকে সঙ্গে দিয়ে হেম অফিস গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। এ'রাও বললেন 'দুর্বলতার জন্যেই এ রকম হয়েছে। ভাল পুষ্টিকর কিছু খেতে দিন। টনিক খাওয়ান একটা।' টনিক লিখেও দিলেন। বিলিতী নার্ভ-টনিক। সাত-আট টাকা দাম।

হেমের মুখ শুকিয়ে উঠতে দেখে শরৎ মেসোমশাই আটটা টাকা বার ক'রে দিলেন। বললেন, 'তুমি লজ্জা করো না বাবা, এ লৌকিকতা-লজ্জার সময় নয়। আছে বলেই দিচ্ছি. নইলে কি আর দিতে পারতুম। তুমি ওষুধটা কিনে নিয়েই যাও। আর ওখানে গিয়ে একটা দুধের জোগানি ব্যবস্থা করো, অন্তত এক পো ক'রে। সেটাও আমি দেব। শুধু টনিকে কিছু হবে না, তার সঙ্গে ভাল খাওয়াও চাই। মাছ মাংস খাওয়াতে তো পারবে না তেমন, তবু এক পো ক'রে দুধ খেলেও কিছুটা হবে।'

নেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিতে হ'ল। কারণ সত্যিই তারও এমন সংগতি নেই যে দুম ক'রে আট টাকায়

ওষুধ কিনে খাওয়ায় এখুনি। কিছু সে হাতে রাখে ঠিকই মাইনের টাকা থেকে—কিন্তু সেও হাতি ঘোড়া কিছু নয়। তা থেকেও তো ডাক্তারে ওষুধে কত টাকা বেরিয়ে গেল গত দু-মাসে। আরও কি বিপদ-আপদ হয় ঠিক আছে!

শরৎ মেসোমশাইয়ের দিল আছে ও'রও কাই বা আয়। একটা ছোট ছাপাখানা ছিল—নিজে দেখতে পারেন না, লীজ দিয়েছেন, তারই কটা টাকা ভরসা। তারও অর্ধেক নাকি আদায় হয় না। গিয়ে তাগাদা দিয়ে দু টাকা এক টাকা ক'রে আদায় করতে হয়। দুর্দান্ত হাঁপানি মেসোমশাইয়ের, রোজ যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মাসিমা এখনও টিউশ্যানি ক'রে সংসার চালাচ্ছেন তাই রক্ষে, নইলে খেতেই পেতেন না।

বিচিত্র ভাগ্য ছোটমাসির। ওষুধটা কিনতে কিনতে কথাটা মনে হ'ল হেমের। জীবনে একদিনও স্বামীর সাহচর্য পেলেন না—ফুলশয্যার রাত্রেও না। স্বামী তাঁর কোন্ ডোমের মেয়ে রক্ষিতা নিয়েই রইলেন সারাজীবন, অসচ্চরিত্র স্বামী স্পর্শ করলে স্ত্রীর অপমান হবে এই ভয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না কোনদিন। মার কাজের সুসার হবে বলে শুধু নাকি বিয়ে করেছিলেন। তারপর শ্বাশুড়ির জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলেন মাসিমা। দিদিমা একা, সহায়সম্বলহীন। কোথাও দাঁড়াবার কোন আশ্রয় না পেয়ে সেদিন ছোটমাসী উপার্জনের এক অভিনব পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, সামান্য লেখাপড়া সম্বল ক'রে এক টাকা দু টাকার টিউশ্যানী ধরে ছিলেন গোটাকতক। তারপর থেকে সে-ই চলছে আজও। একেবারে বুড়ো বয়সে বলতে গেলে, শরতের সেই রক্ষিতাটি গত হ'লে শরৎ যখন অসহায় হয়ে পড়লেন—অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেসবাড়ির নিচের তলার ঘরে পড়ে পড়ে কাশছেন আর হাঁপাচ্ছেন দেখে হেমই এসে খবর দিয়েছিল ছোটমাসীকে। ছোটমাসী গিয়ে মেস থেকে উদ্ধার ক'রে এনে কাছে রেখে সেবা করছেন এখন। কিন্তু নিজের কোট ছাড়েননি তাই ব'লে. মেসোমশাইয়ের শত অনুরোধেও টিউশ্যানী ছাড়তে রাজী হননি। বলেছেন, 'জীবনের এতগুলো বছর যদি স্বামীর ভাত না খেয়ে চলে যেতে পেরে থাকে তো এখনও পারবে। মানুষের জীবন, বলা যায় না কিছু—তবে পারি তো শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ভাতই খেয়ে যাব। দুদিন ভাত দিয়ে যে তুমি বিয়ের সময়কার করা প্রতিজ্ঞা সেরে নেবে—তা হবে না!'...

শরতের দেওয়া সে টনিক ফুরোবার আগেই খবর পেয়ে অভয়পদ আর এক শিশি কিনে পাঠিয়ে দিলে। একদিন এক রাশ'ফলও পাঠিয়েছিল। দুধের যোগানি টাকা হেম অবশ্য কারুর কাছ থেকে নেয়নি—নিজেই দিয়ে যাচ্ছে যেমন ক'রে হোক। তবে মাছ মাংস খাওয়াবার কোন সুবিধে হয়নি। শনি-রবিবার হাত-ছিপে যা দু-একটা ধরা পড়ত, তারই বেশির ভাগটা কান্তিকে দিত কনক, এই পর্যন্ত।

এর জন্য কান্তির লজ্জার অবধি ছিল না। আরও মাথা নুয়ে পড়ত তার। অত দামী ওষুধ খাবার সময় প্রত্যেকবারই লজ্জায় তার কান মুখ রাঙা হয়ে উঠত। উপায় নেই বলেই খেতে হ'ত তবু। এতগুলো লোককে ব্যস্ত করছে, এত টাকা খরচ করাচ্ছে—এখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠে এদের অব্যাহতি দিতে পারলেই ভাল। বৃথা চক্ষুলজ্জা ক'রে রোগ বাড়িয়ে আরও বিব্রত করা উচিত নয়।

কিন্তু দু শিশি টনিক খেয়েও কানের কোন উপকার হ'ল না। বরং মনে হ'তে লাগল আরও কালা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কিছুই প্রায় শুনতে পায় না এখন, কানের কাছে গিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করলে দুটো-একটা কথা ধরতে পারে শুধু। এবার তার নিজেরও চিন্তা হয়েছে খুব। কান না ভাল হ'লে ইস্কুলে যেতে পারবে না—মাস্টারমশাইয়ের পড়ানো তো কিছুই শুনতে পাবে না।

সেখানকার সেই খাতাগুলো সেই কাছারী বাড়িতেই পড়ে আছে। কেই বা আনতে যাবে। তারা যে গরজ ক'রে পাঠাবে সে সম্ভাবনাও নেই। চিঠি লিখলেও কোন সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শুধু চুপ করে ব'সে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। কখনও কখনও সাধ্য মতো টুকটাক বাগানের কাজ করে এক-আধটু, নইলে বেশির ভাগ সময়ই চুপ ক'রে বসে থাকে আর ভাবে এই অসুখের কথা, নিজের জীবনের কথা, এই সর্বনাশা রোগের কথা। ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পায় না কিছু—অসুস্থ শরীরে খানিকটা ভাববার পর মাথা ঝিমঝিম করে। লজ্জায় অনুতাপে চোখে জল এসে যায় বার বার।

তুমি আমার কাছে বস, কেউ টের পাবে না...

দু' শিশি টনিকেও কোন কাজ হয় নি—উন্নতি তো হয়ই নি উল্টে বরং কিছু অবনতিই ঘটেছে শুনে গোবিন্দ ওকে আবার কলকাতাতে পাঠাতে বললে। কে একজন ই-এন-টি'র বড় ডাক্তার আছেন, ওর বন্ধু এবং মনিব ধরের আত্মীয় হন তিনি। ওর বন্ধুকে বলেই ব্যবস্থা করেছে গোবিন্দ, তিনি বিনা পয়সায় দেখতে রাজী হয়েছেন। যদি ছোট-খাট কোন অপারেশন করলে কাজ হয় তো তিনিই করবেন—তারও কোন খরচ লাগবে না। তিনিই হাসপাতালে ভর্তি ক'রে নেবেন।

কিন্তু এবারও কোন লাভ হ'ল না। দু'তিন তিন দিন ধরে দেখলেন ডাঃ মল্লিক। কোন আশাও দিতে পারলেন না তিনি। বললেন, 'আসলে ওর কানের নার্ভগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ওর কোন চিকিৎসা বিলেতে হয় কিনা জানি না, এদেশে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। বৃথা চেষ্টা। এর পর একেবারেই কিছু শুনতে পাবে না। কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝতে পারবে না। একেবারেই বরবাদ হয়ে গেল ছেলেটা!... ঐ যে দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া হয়েছিল বললেন, তাতেই এই কাণ্ডটি হ'ল। সাধারণত ঐ টাইপের ম্যালেরিয়া শরীর একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়ে যায়। মনে হয় ওর বংশে ভিডিও ছিল। তাতেই আরও অনিষ্ট হয়েছে। সরি, কী আর বলব। I feel pity for the boy.

অর্থাৎ এদিক দিয়ে আশা-ভরসা আর কিছু রইল না। একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'ল ওরা।

এই খবরের পর শ্যামা আর একবার আছাড় খেয়ে পড়লেন। আর এক দফা—রতনকে উদ্দেশ্য ক'রে—গালিগালাজ শাপ-শাপান্তর ঝড় উঠল। কান্তি কিছুই শুনতে পেল না তার, তবে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল সে অনেক কিছুই। তাকে কেউ বলে দেয়নি যে আর কোন আশা নেই কোথাও তার কান সারাবার—কিন্তু দাদা বৌদির অন্ধকার হতাশ মুখ, বড়মাসিমার চোখের জল আর মার এই রণরঙ্গিণী মূর্তি ও আছড়ে পড়া দেখে কিছু আর বুঝতে বাকী রইল না। এবার পাথর হয়ে গেল সে। চোখে আর জল নেই তার। সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এত বড় সর্বনাশের কথা যখন ভাবতেও পারে নি—তখন লজ্জায়, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে চোখ দিয়ে জল পড়ত এখন আর কিছুই নেই, এ সবের অতীত হয়ে গিয়েছে সে। এখন শুধু সামনে দিক-দিশাহীন অন্ধকার, নিঃসীম শূন্যতা। ভয়েই পাথর হয়ে গেল সে।

অনেক চেঁচামেচি, অনেক কান্না-কাটির পর শ্যামাও এক সময় বোধ হয় শ্রান্ত হয়েই চুপ করলেন। কিন্তু মনের আক্রোশ মেটেনি তাঁর—এই কথাটা নিয়েই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলেন। একবার ভাবলেন সত্যি-সত্যিই যাবেন সেখানে, সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে-তাই ক'রে আসবেন, কৈফিয়ৎ তলব করবেন তাদের এই আচরণের। কোন্ অধিকারে ওঁদের না জানিয়ে ছেলেকে সেই মৃত্যু-পুরীতে পাঠিয়েছিল তারা? কেন? কেন এ কাজ করতে গেল তারা, কিসের জন্যে?

আবার পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছিঃ! জামাইবাড়িতেই কোন দিন গেলেন না তিনি—তা আবার তাদের আত্মীয়-বাড়ি। বিশেষ ক'রে ঐ বাড়িতে—ঐ পাড়ায়। না, সে সম্ভব নয়; তা তিনি পারবেন না।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা কাজ করলেন। মহাশ্বেতার বড় ছেলেটা এসেছিল একদিন, তার শরণাপন্ন হলেন; 'বুড়ো ভাই, একটা কাজ করবি? চুপি চুপি কোন রকমে তোর মেজকাকীর কাছ থেকে তোর রতনপিসীর ঠিকানাটা জোগাড় ক'রে দিবি? এরা শুনলে হৈ-চৈ ক'রে উঠবে কিন্তু সেখানে কান্তির একরাশ কাপড়-জামা পড়ে রয়েছে—মিছিমিছি নষ্ট হবে বৈ তো নয়। ঠিকানাটা পেলে আমি মন-মন কাছে একটা চিঠি লিখে দেব, কাউকে দিয়ে তারা পাঠিয়ে দেবে।'

বুড়ো কথাটা বুঝল। নিতান্তই স্বাভাবিক এটা তার দিদিমার পক্ষে। তবে সে পারবে না, অন্য ব্যবস্থা করবে। সেই কথাই বলল, 'না দিদিমা, আমার কম্ম নয় ওসব। তবে কথাটা বার ক'রে নেব। বাঁচি আছে মেজকাকীর পেয়ারের মন্ত্রী, তাকেই বলব। বরং তোমার নাম ক'রেই বলব।'

'তাই বলিস। আর ঠিকানাটা পেলে আমাকে দিয়ে যাস। লক্ষ্মী দাদা আমার। তবে দেখিস, এরা না কেউ টের পায়।'

'ঠিক আছে, সে তুমি কিছু ভেবো নি।' আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বুড়ো অর্থাৎ বিষ্ণুপদ।

অবশ্য বুড়োর বুদ্ধিতে কাজও হয়। দু দিন পরেই হাসতে হাসতে ঠিকানাটা এনে দিয়ে যায়। 'মেজকাকীও জানত না ঠিক—মেজকাকার কাছ থেকে

ঝেনে দিয়েছে। দূর বাবা, ও কি আমাদের কাজ। বাঁচি বল্লেই পেরেছে!'

বুড়োকে দিয়েই একখানা দু-পয়সার খাম আনিয়ে নিলেন শ্যামা। তারপর অনেকদিন পরে সীতার খাতা থেকে একখানা কাগজ যোগাড় করে চিঠি লিখতে বসলেন। সবাইকে বাঁচিয়ে আড়ালেই লিখতে হ'ল—সেজন্যে দুদিন সময় লাগল তাঁর চিঠি শেষ করতে। বহুদিনের অনভ্যাস, কলমও সরতে চায় না। দেরি হওয়ার সে-ও একটা কারণ।

শ্যামা লিখলেন,

"কল্যাণীয়াসু,

তোমার কল্যাণ কোন-ক্রমেই আমার কাম্য নয়, তবে অন্য পাঠ খুঁজিয়া না পাইয়াই এই পাঠ দিলাম। কল্যাণ-কামনা তো দূরের কথা, তোমাকে নিত্য অভিসম্পাৎ না দিয়া আমি জল খাই না। তোমার অনিষ্টই এখন আমার একমাত্র কাম্য। কারণ বিশ্বাস করিয়া তোমার কাছে আমার গর্ভের সেরা সন্তানটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া একটু যদি মানুষ করিয়া দাও এই আশায়—তুমি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার সর্বনাশ করিয়াছ। এমন স্থানেই তাহাকে পাঠাইয়াছিলে যে কমাসেই বাছার আমার জীবনসংশয় ঘটিয়া গেল। দুর্দান্ত ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পড়িয়া ছিল, একজন অপরিচিত লোক দয়াপরবশ হইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন বলিয়া তবু প্রাণটা বাঁচিল। তাও অনেক কষ্টে অনেক অর্থব্যয় করিয়া। বহু রাত জাগিয়া শুশ্রূষা করিতে হইয়াছিল, দশ-বারোদিন পর্যন্ত জীবনের কোন আশা ছিল না। প্রাণ যদি বা বাঁচিল চিরদিনের মতো পঙ্গু অক্ষম হইয়া গেল। শুনিয়া বোধ হয় সুখী হইবে—চিরদিনের মতো তাহার দুটি কান কালা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ কালা নয়, বদ্ধ কালা। এখন কানের কাছে ঢাক বাজিলেও শুনিতে পায় না। আমরা ভিখারী তবু ভিক্ষা দুঃখ করিয়াই বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়াছি, চিকিৎসারও কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন ও কান আর ভাল হইবে না। কোনদিনই না। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার বিষেই উহার কানটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে কী করিয়া খাইবে বলিতে পারো? পথের ধারে বসিয়া ভিক্ষা করা ছাড়া তো আর কোন উপায় রহিল না। মা, একটা কথা তোমাকে দুই হাত জোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমরা তোমার কী অনিষ্ট করিয়াছিলাম যে, তুমি বা তোমরা আমার এতবড় অনিষ্টটা করিলে? সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম—না পারিলে সোজা-সুজি বলিয়া দিলে না কেন? সে নাকি বিগড়াইয়া গিয়াছিল, তোমরা বলিয়াছ, (সেও তো তোমার দায়িত্ব!) সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছেই পাঠাইয়া দিলে না কেন? আমাদের ছেলে আমরা বুঝিতাম। তাহাকে সাক্ষাৎ যমদুয়ারীতে পাঠাইবার তোমার কী অধিকার ছিল? এই রহস্যটা যদি খোলসা করিয়া জানাও, এক্ষণে তবু মনকে একটা সান্ত্বনা দিতে পারি। আশা করি এ জবাব চাহিবার আমার সম্যক্ অধিকার আছে। পরিশেষে আবারও জানাই, সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিত্য অভিশাপ দিব, তুমিও যেন এমনি করিয়া সকল ভালর মাথা খাইয়া বসিয়া থাক। ইতি—

কান্তির মা।"

বহুকাল পরে লিখতে বসা। হাতের লেখা এককালে মুক্তোর মতো ছিল—এখন এঁকেবেঁকে বিশ্রী হয়ে গেল। বিস্তর বানানভুলও হ'ল নিশ্চয়ই। তবু পড়ার কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হ'ল না। শ্যামা চিঠিখানা খামে এঁটে ঠিকানা লিখে দুপুরের দিকে নিজে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী-তলার কাছে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন!

জবাব পাবেন আশা করেন নি। প্রধানত গায়ের ঝাল মেটাতেই চিঠিটা লেখা। তবু দুদিন পর থেকেই একটু উৎসুক হয়ে দুপুরের দিকটায় বাইরের বাগানে ঘুরতে লাগলেন। ঐ সময় পিওন যায় প্রত্যহ এই পথ দিয়ে! যদিই চিঠি আসে, তাঁর হাতেই পড়া বাঞ্ছনীয়। বৌমা কি কান্তির হাতে পড়লে অনেক ঝামেলা। কৈফিয়ৎ দিতে হবে বিস্তর। এখনকার ছেলেমেয়েদের আবার বড় বেশী ভদ্রতাজ্ঞান। যে আমার মন্দ করেছে তাকে দু-কথা শোনাব—এতেও ওঁদের ভদ্রতায় বাধে।......

জবাব ডাকে এল না অবশ্য। তবে জবাব পেলেন শ্যামা।

অপ্রত্যাশিতভাবে। অচিন্তিত পথ দিয়ে এসে পৌঁছল।

চিরদিনের ভগ্নদূত মহাশ্বেতাই নিয়ে এল সে জবাব, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে সে খবরটা দিলে।

'আর শুনেছ ব্যাওরাটা। রতন গো রতন, আমার মামাতো ননদ, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে পরশুদিন। কাল ইনি শুনে এয়েছেন। পুলিশ-হাঙ্গামার কাণ্ড তো—সবাইকেই জানিয়েছে তাই, যে যেখানে আছে আপ্ত-স্বজন।'

'গলায় দড়ি দিয়েছে! সে কি? আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

'হ্যাঁ গো। ঠিক দুপুর বেলা। নিজেরই শাড়ি কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে এই কাণ্ড ক'রে বসে আছে মেয়ে। কেউ জানে নি, কেউ টের পায়নি এমন চুপিসাড়ে কাজ সেরেছে। সন্ধ্যে হয়ে যায় তবু দোর খোলে না, ঘর থেকে বেরোয় না, এতেই সন্দ হতে দোর ভেঙে ঘর ঢুকে দেখে ঐ কাণ্ড। চিঠি লিখে গেছে নাকি—কারুর হাত নেই এতে, নিজের পাপের প্রাচিত্তির করতে আমি মরছি!... এমন ঘর-বাড়ি, এত পয়সা, সুখের জীবন, দ্যাখো দিকি বাপু! কী যে হ'ল। তোমারই শাপমন্যি ফলল আর কি। যা গালটা দিলে কদিন ধরে ছড়া কাটিয়ে, এত কি সহ্য হয়! তোমার বাপু কথা বড্ড ফলেও যায়, কালমুখের বাণী।...... বলে কে যেন একখানা চিঠি দিয়েছিল দুদিন আগে, সেই চিঠি পেয়ে এস্তক মন ভারি ক'রে ছিল, খায়নি দায়নি কিছু করেনি দুদিন। সে চিঠিও পাওয়া যায়নি—তাহলে তবু একটা কিনারা হ'ত যে কেন এ কাজ করলে। কে যে বাপু এমন শত্তুরতা ক'রে চিঠি দিলে! কী লিখেছিল কে জানে, এমন কে চিঠি দিল ওকে যে আত্মঘাতী হ'তে হ'ল!'

বকেই যায় মহাশ্বেতা আপনমনে, ওর অভ্যাসমতো।

কিন্তু শ্যামা যেন আর শুনতে পারেন না। তাঁর দু কান যেন পুড়িয়ে দেয় কে। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।

অভিশাপ দিয়েছিলেন সত্য কথা—কিন্তু এ রকম তো তিনি চাননি। ঈশ্বর জানেন এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা তিনি কখনও চিন্তা করেননি।

—এমন হবে জানলে ও চিঠি কখনই দিতেন না তিনি। যদি মেজবৌয়ের মনে পড়ে, যদি সন্দেহ করে যে তাঁর চিঠিতেই এই কাজ করেছে রতন তো তিনি ওদের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে?

আর তা ছাড়া—আজ যত বড় অনিষ্টই ক'রে থাক সে—অনেক উপকারও করেছে, কান্তিকে যে যথার্থই ভালবাসত, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই! তার এমন ভয়াবহ পরিণতি—কোন অন্ধ ক্রোধের বশেও কখনও কল্পনা ক'রেন নি। ছি ছি, কী করল হতভাগী। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে গেল তাঁকেই!

শ্যামা নির্জনে বার বার নিজের ইষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। পরলোকে গিয়ে যেন হতভাগিনী শান্তি পায় একটু—সেখানে না আবার এই আত্মহত্যার শাস্তি বইতে হয় তাকে।

'ঠাকুর তাকে মাপ করো, তাকে তোমার কাছে টেনে নাও।'

(ক্রমশঃ)

সংবাদ বিচিত্রা

।। পেশা যাদের মেঘের ওপর ভাসা ।।

শুধু রূপ থাকলেই হয় না। কারণ কেবল সৌন্দর্য ও চটক থাকলেই কঠিন কাজ করা যায় না। এয়ার হোস্টেস-দের প্রথম গুণ হচ্ছে অতিথিদের সকলের প্রতি সম্মান সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। চলতি সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী এদের শিখতে হয়। শুধু রায়ো-ডি-জেনিরো কোথায় বা বিমান লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে উড়ছে কিনা এই বললেই হবে না। কেননা হয়তো কোন যাত্রী বিমানের ইঞ্জিনের শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারে অথবা কোন ভীতু যাত্রী হয়তো জানতে চাইবে কত ওপরে উঠলে সে ঠাণ্ডায় জমে যাবে কিম্বা বিপদের সময় বাইরে লাফিয়ে পড়ার দরজাটা ঠিকমত কাজ করে কি না; তৃতীয় কোন যাত্রী হয়তো জানতে চাইবে সামনের শহরের দর্শনীয় বস্তু কি কি?— এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তো দিতে হবেই তাছাড়া প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তার জানা চাই। আর জানা চাই কোন যাত্রীর হৃদরোগ দেখা দিলে তাকে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে।

এই সব ছাড়াও তাকে শেখানো হয় বিমান চলার সময় কিভাবে খাদ্য ও পানীয় তৈরী কোরে পরিবেশন করতে হয়, কিভাবে যাত্রীদের তদারক করতে হয়। অর্থাৎ দূরত্ব বাঁচিয়ে তাঁদের সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই এয়ার হোস্টেসের কাজ।

।। গ্রহান্তর-ভাষা সমস্যা ।।

অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা, বিজ্ঞান তা আজও জানে না। বিজ্ঞানাশ্রয়ী গল্পরচয়িতাদের মাঝে মাঝে এই সমস্যাটির মুখোমুখী হতে হয়েছে যে পৃথিবীর অধিবাসীরা গ্রহান্তরবাসীদের কাছে নিজেদের বক্তব্য বোঝাবে কি ভাবে? ইদানিং বিজ্ঞানীরাও এদিকে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আমাদের অস্তিত্বের কথা আমরা অন্যান্য গ্রহে জানাবো কি ভাবে? একটা প্রস্তাব বিজ্ঞানী মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে—কারণ প্রস্তাবটি খুব সরল। এই প্রস্তাবটি হল : পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী কিছু একটা গড়ে তোলা। সকলেই জানেন : একটি সমকোণ-বিশিষ্ট ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গফল অন্য দুটি ভুজের বর্গফলের যোগফলের সমান—এই উপপাদ্যটিই পিথাগোরাসের নামে প্রচলিত—যদিও, পিথাগোরাসের বহু আগে থেকেই এই সূত্রটি মানুষের জানা ছিল। সে যাই হোক, গণিতবিদরা দাবি করেন যে, প্রত্যেকটি সমাজকেই তার বিবর্তনের ধারায় এক সময়ে এই সূত্রটি আবিষ্কার করতেই হবে, জ্ঞান ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিকাশের এ একটি অবশ্যম্ভাবী দিক্‌চিহ্ন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি খুব সহজ মনে হলেও, প্রশ্ন উঠছে : গ্রহান্তরে যদি এমন কোন সমাজ থাকে যে-সমাজের প্রাণীরা সমাজ বিকাশের আদিম অবস্থাতেই রয়েছে, তাহলে তো তারা পিথাগোরীয় সূত্রের মর্ম বুঝবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে ভিন্ন গ্রহে অধিবাসী থাকলে, তারা মানুষের সমান অথবা বেশি বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন।

তাই, আর একটা পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে : মার্কিন বিজ্ঞানীরা মাস ছয়েক আগে ২১ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ পাঠিয়েছিলেন 'এরিডেনাস' নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। এই নক্ষত্রলোকের গ্রহগুলির পরিবেশ ঠিক আমাদের সূর্যলোকের গ্রহগুলির পরিবেশের অনুরূপ। তাই সেখানে মানুষের অনুরূপ প্রাণী থাকিলেও থাকতে পারে। এরিডেনাসের কোনো গ্রহে যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে, তাহলে এই সংকেত পেয়ে তারা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তারাও সংকেত পাঠিয়ে তাদের অস্তিত্ব আমাদের জানাবে।
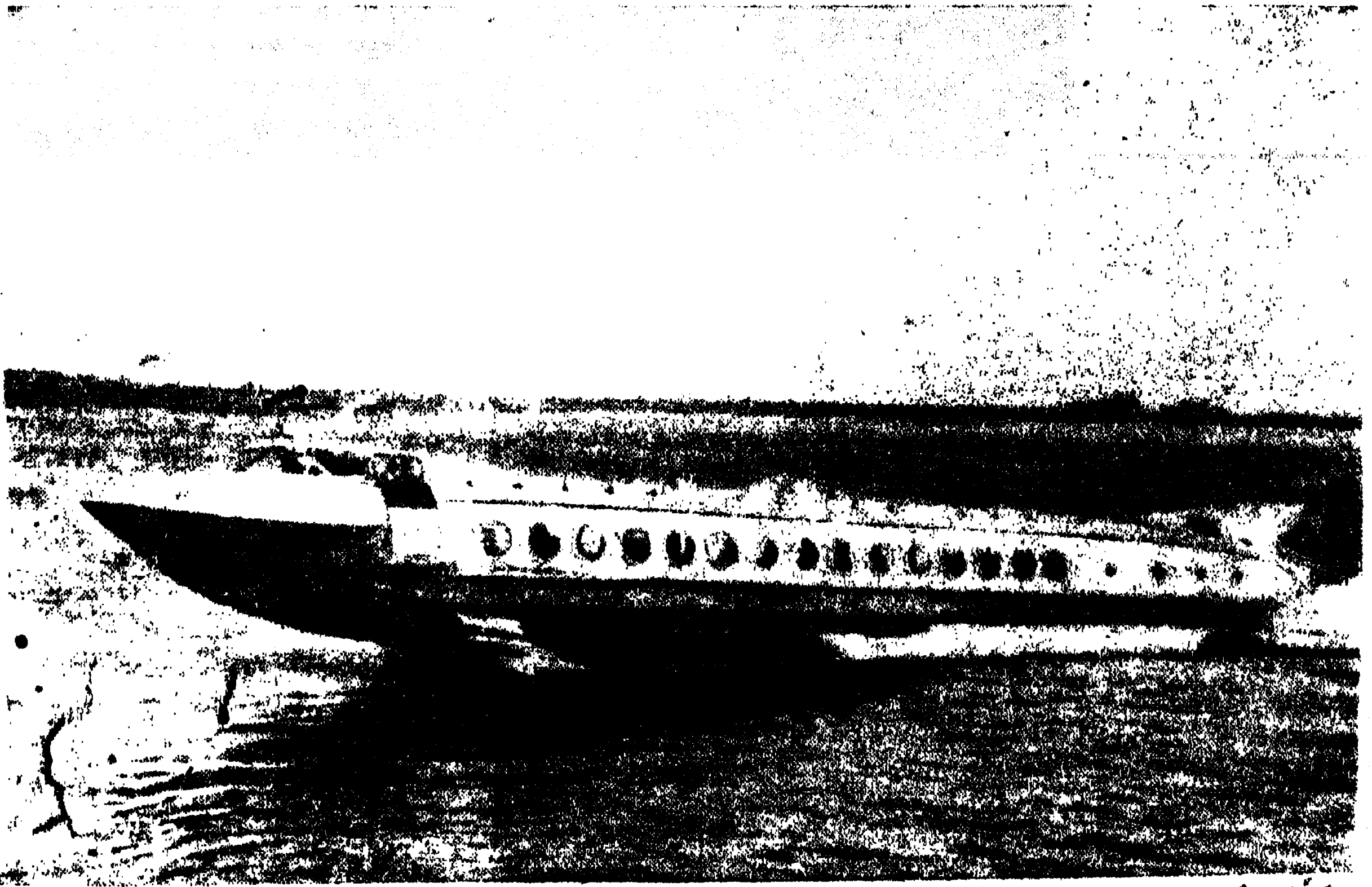
সিগারেটের মত দেখতে এই সুদৃশ্য যাত্রীবাহী মোটর বোটটির নাম 'চাইকা' চাইকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বোট। এর ওয়াটার জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে গতিমাত্রা বাড়ান যায় ঘণ্টায় ৯৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। ৩০ জন যাত্রীবহনে সক্ষম এই বোটটি পরিচালনা করেন মাত্র দু'জন লোক—ক্যাপ্টেন এবং একজন নাবিক। এইটি প্রথম হাইড্রোফয়েল মোটর-বোট নয়। এর আগে 'রকেটা', 'স্পুটনিক' 'মিটিওর' প্রভৃতি সমধর্মী যানগুলি যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আত্মপরিচয়ে ইংরাজ

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

ভদ্র ইংরেজ কেমন হবে? পোষাক-আসাকে টিপটপ। আরও একটু চাই। তাকে ছত্রপতি হতে হবে। আমাদের দেশে এককালে যেমন চুড়িদার পাঞ্জাবির সংগে একটা ছড়ি লাগত। বাবু ইংরেজের হাতে একটা ছাতা চাই। ফিতে দিয়ে নিপাট করে বাঁধা। এদেশে বৃষ্টি লেগেই আছে। ছাতা আত্মরক্ষার অস্ত্র। না থাকলেই বিপদ। ব্যবসায়ী জাত প্রয়োজন বুঝে ফ্যাশনের রেওয়াজ তুলেছে। উঁহু হল না। হাতে বন্দুক আছে কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্যেও গুলী ছোড়ার হুকুম নেই। ছাতা খোলা মানেই সমাজচ্যুতি। কেষ্ট-বিষ্টু থেকে কেষ্টাবেটার দলে নাম লেখান। বৃষ্টি পড়লেই বনেদী ভদ্রলোককে ট্যাক্সির সন্ধান করতে হবে। হাতের ছাতা যেমন নিপাট করে বাঁধা ছিল তেমন থাকবে।

ইংরেজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বসে বলেছেন শ্রীমতী পার্ল বাইন্ডার [Pearl Binder]। বইটার নাম "The English Inside Out." *

টি পার্টি বসেছে। সবাই নামজাদা লোক। এমন সময় ইংরেজ কূটনৈতিক প্রতিনিধির স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি ব্যাপার? নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হল? ভদ্রমহিলা শুধরে দেন, চা করতে গেলে আগে দুধ দিতে হয়। এর সার্থকতা কি? খেতে ভালো হয়, বেশীক্ষণ গরম থাকে? এর পেছনে যুক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, তবু মানতে হবে। ওইটে ভব্যতা—প্রচলিত রীতি। না মানলে ইংরেজের সামাজিক পৃথিবী রসাতলে যাবে। কিন্তু যে বিনা দুধে চা খায় তার বেলা কি বিধান?

এমন আরও কত ঘটনা লিখেছেন। ইংরেজ চরিত্রের এমন সরস সংস্কার-মুক্ত বর্ণনা আমি অন্তত পড়িনি। বর্ণনা নয় বলা যায় আত্মবিশ্লেষণ। দোষগুণ সব তুলে ধরেছেন। সময় সময় দুর্বলতার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। নিজের জাত সম্বন্ধে তা সবাই করে। তাই বলে এড়িয়ে যাননি। সাধারণ ইংরেজের মত হামবড়াই ভাব কোথাও নেই। লেখাটা রম্যরচনা। প্রথম প্রথম মনে হয়েছে পাঠককে আনন্দ দেওয়াই বইটার উদ্দেশ্য। শেষ করলে বোঝা যায়, বই-টায় শুধু ঘটনার অসংখ্য সংগ্রহ নেই, ভাববার বিষয়বস্তু আছে।

আবহাওয়া নিয়ে শুরু। ইংরেজ রক্ষণশীল জাত। ভদ্রতার নানান কোড মেনে চলতে হয়। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে প্রতিবেশীর সংগে কথা বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। হয়ত দশ বছর ধরে একই রাস্তায় হাঁটছে, দুবেলা পথে দেখা হচ্ছে তবু কথার লেনদেন নেই। কিন্তু বিশেষ বিধি আছে। আলোচনার বিষয় বস্তু আবহাওয়া হলে সাতখুন মাপ। বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিতার সংগেও এ নিয়ে খোস গল্প করা যায়। বলাবাহুল্য আবহাওয়াকে আক্রমণ করে আলাপের শুরু। এই অব্যবস্থচিত্ত আবহাওয়াই নাকি জাতটাকে gambler এবং grumbler করে তুলেছে—বাইরে ঘুরতে না পারলেও জুয়া খেলা যায়, অসন্তোষভরা কথার তুবড়ি ছোটান যায়। এই আবহাওয়া নাকি বিশ্ববিজয়ী রোমান-সম্রাট সিজারকে কাবু করেছিল। সম্রাটের সৈন্যদল অপরাজেয়—দুর্দান্ত প্রতাপ। তারা উন্নতশির বীর ঘুরে বেড়ায় আর হুংকার ছাড়ে। কিন্তু বিলেতে এসে চড়া সুর হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চোয় রূপান্তরিত হল। শেষে পটাপট বিছানা নিল—সর্দি কাসি জ্বর। বুকে বর্ম এঁটে টহল দিতে আরম্ভ করল। দেখতে হল

শ্রীমতী পার্ল বাইন্ডার

কিম্ভূতকিমাকার। বিজয়ী সৈন্যের একি অপমান!

বইটায় ভালো করে চোখ বোলালেই বোঝা যায়, রাজপরিবারকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচা লেখিকার মনঃপূত নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোষ বার করেছেন। কিন্তু দোষ করেছেন সন্ধিপত্র দাখিল করে। রাণীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দাঁড়ি-পাল্লার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।

রাজপরিবার সম্বন্ধে রবিবারের কাগজ "রেনল্ডস নিউসে"র রিপোর্টে :

কোন বিজ্ঞানের ছাত্র বলেছে—'রাজ-বংশের প্রতীক আজ আউট ডেটেড। রাজারাণী নিয়ে হৈ-চৈ যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই মঙ্গল'। অন্য একজন বলেছে—'রাণী দেখতে সুন্দর। ডিউককে দেখতে জামাই-এর মত। দুজনকেই আমি খুব পছন্দ করি। কিন্তু ওইখানেই শেষ। তার বেশী টেনে নিয়ে যাওয়া ছেলেমানষী।' অপর জনের মত —'অনেকে বলে তারা রাণী বা ডিউক হতে চায় না। আমি কিন্তু চাই। কেমন মজা করে ঘুরে বেড়াও, পোলো খেলো। চেষ্টা করে খুঁজে বার কর কি করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা যায়।'

লেখিকা জুড়ে দিয়েছেন, রাণীর পরম ভক্তরাও তাঁর খরচের দিকে কটাক্ষ করে। রাণীর জাঁক-জমক মন্দ লাগে না। তবে ব্যক্তিগত খরচের মোটা অংক বিসদৃশ লাগে। রাজপরিবারের বাৎসরিক ব্যয়ের তালিকা দেখা যাক।

	পাউণ্ড
মহারাণীর হাতখরচ	৬০,০০০
সাংসারিক খরচ	১৮৫,০০০
দান-ধ্যান	১২১,০০০
অতিরিক্ত খরচ	১৩,০০০
মহারাণীর মা	৭০,০০০
ডিউক অফ এডিনবরা	৪০,০০০
ডিউক অফ গ্লস্টার	৩৫,০০০
রাজকুমারী মার্গারেট	৬,০০০
রাজকুমারী রয়াল	৬,০০০
প্রিন্স অফ ওয়েলস	১০,০০০

খরচের তালিকা যোগ করলে দেখতে বড়ই হয়, আসলে কিন্তু সস্তা। দেশ-বাসীর মাথাপিছু মাত্র তিন পেনি। প্রেসিডেন্টের চেয়ে রাণী অনেক ঘরোয়া। তাকে নিয়ে বেশী আনন্দ করা যায়। সমস্ত রাজপরিবার দেশের সামাজিক উৎসব বাঁচিয়ে রেখেছে। কমনওয়েলথ রাণীকে নিজের দেশে দেখতে পেলে উল্লসিত হয়। রাণীকেও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ১৯৬১ সালে ৫০,০০০ করমর্দন করতে হয়েছে। ৫০টা রাজসুয় যজ্ঞে যেতে হয়েছে। পাঁচ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পনের ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হয়েছে। সবার বড় কথা স্থায়িত্ব বা stability প্রেসিডেন্টের নেই একমাত্র রাজপরিবার দেশকে তা দিতে পারে।

সাপ-লুডো খেলার তুলনা দিয়েছেন প্রচুর। সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে মই বেয়ে সমাজের ওপরতলায় ওঠার। কিন্তু সেত সহজ নয়। সাপের দল হাঁ করে বসে আছে মুখে পড়লেই পপাত ধরণী-তলে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এমন কোন জাতিভেদ নেই বটে তবু কঠোর ব্যব-ধান। শ্রমিক - মধ্যবিত্ত - উচ্চমধ্যবিত্ত। দেশের অধিকাংশ লোক শ্রমিক। তাদের ধনুকভাঙা পণ মধ্যবিত্তের পর্যায়ে ওঠার। শ্রমিকরা এদেশে মন্দ উপায় করে না, ভদ্র কেরাণীকুলের চেয়ে বেশী। কিন্তু টাকা ত সব নয়, সেরা জিনিস হল সামাজিক মর্যাদা। তাই শ্রমিকের চেষ্টা কি করলে তার ছেলেরা ককনি ছেড়ে বিশুদ্ধ ইংরাজী শিখবে—কুইন্স ইংলিশে কথা বলবে। কেতাদুরস্ত আদব-কায়দা শিখবে। ভালো কাউন্সিল স্কুল আছে বাড়ীর কাছে, তার আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি এবং মাইনে লাগে না। তবু মন উঠল না, ভর্তি করলে এক নিকৃষ্ট পাব্‌লিক স্কুলে। মাইনে লাগে লাগুক, ভালো সমাজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে ত মিশতে পারবে। দুদিন বাদে জাতে উঠবে। কৌলিন্য না থাকলেও মর্যাদা ত মিলবে।

কৌলিন্য আর বংশগৌরব কোনটাই হেলা-ফেলার নয়। তার তকমা এঁকে বিজয়কেতন ওড়ান যায়। কিন্তু হায়! বর্ণশ্রেষ্ঠর রঙটাও ধার করা—নীলবর্ণ শৃগালের মত। বিজয়ী উইলিয়ামের মাত্র দুজন সঙ্গী ছিল যাদের ধমনীতে বইত আসল নর্মান রক্ত। অন্য সকলে দাস। প্রভুকে ভক্তি দেখাবার জন্যে আগের কালে কৃতদাসরা প্রভুর নামে নিজের পরিচয় দিত। আজকের লর্ডদের পরিচয় নিলে দেখা যাবে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন সার্ফ।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে তিনটে গুণ লাগে,—শিক্ষা, ব্যবহার ও বৃত্তি। শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে চাই মার্জিত উচ্চারণে কথা বলা। ভালো মন্দ উচ্চারণের ওপর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। আরও আছে মধ্যবিত্ত সমাজের কড়া পাহারা। সব সময় সজাগ অযোগ্য কেউ ঢুকে পড়ে কিনা। অবশ্য কোন

রকমে বেড়া টপকাতে পারলেই নিষ্কৃতি নেই। এক পরিবার রাতারাতি বড়-লোক হল, যাকে বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ। পুলে টাকা পেল লাখ দশেক। জাতে উঠতে হবে, প্রথমেই বাতিল করল পরিচিত পরিবেশটা, বাড়ী কিনল অভিজাত পল্লীতে। কিন্তু এ যে শ্মশানভূমি। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকায় না। আগের পাড়ায় প্রতিবেশীরা কত গল্প-গুজব করত। এ ওর নিন্দে রটাত। বাগানের বেড়ায় হুমড়ি খেয়ে বলত, ও দিদি শুনেছ। দরকার পড়লে এ ওর জিনিস ধার করত। এখানে কা কস্য পরিবেদনা। কাউকে বাগানের পাশে উঁকি মারতে দেখা যায় না। কেউ প্রতি-বেশীর নিন্দে করে না। আগের পাড়ায় দরজা ছিল সবার জন্যে অবারিত। এখানে প্রতি দরজায় আভিজাত্যের হুড়কো লাগান।

তবু সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে। বছর পঞ্চাশেক আগে কেউ রাতারাতি ভদ্রলোক হবার স্বপ্ন দেখত না। স্ত্রী চার্চ চ্যারিটি আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। আঙুলে দিয়ে গোনা যেত মধ্যবিত্ত সমাজকে। বর্তমানে গণ-তন্ত্রের ঢেউ আলোড়ন তুলেছে, ভদ্র-লোকের সমাজটা ফেঁপে ফুলে উঠছে। হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা। সঙ্গে সঙ্গে চাইছে তাদের অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে। লেবারের সঙ্গে যেন তাদের কোনকালে সম্পর্ক ছিল না, তারা সবাই অভিজাত টোরি পার্টির সমর্থক।

বার্নাড শ পঞ্চাশ বছর আগে বলেছিলেন, চাকরী এবং অর্থের সাচ্ছল্য দেশকে টোরি করে দেবে। আজ সে ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হয়েছে। worker বা labourer কথাটাই যেন কানে লাগে মানমর্যাদাশূন্য সমাজের এক অপাংক্তেয় গোষ্ঠী। এমন কি লেবার পার্টিও সে কথা ভাবছে। আজকের দিনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে লেবার কথাটা বাতিল করতে হবে।

ইংরেজের অসাধারণ কুকুর-বেড়াল-প্রীতির কথা বলেছেন। ছেলে-মেয়েদের পথে-ঘাটে প্রেমালাপের একটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আরও লিখেছেন, কয়েক বছর আগে পথে ঘাটে দেহ-ব্যবসায়ীরা লোকশিকারে বেরোত। বর্তমানে আইন করে তা বন্ধ করা হয়েছে। পথে ঘাটে তাদের পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। নিউস এজেন্ট এদেশের পত্র-পত্রিকা বিক্রির দোকান। সামনে কাচ দিয়ে ঢাকা বড় শো-কেস। ভেতরে ছোট ছোট কার্ডে লেখা বিজ্ঞাপন—মডেল — সোনারবরণ চুল। ৩৮-২৩-৩৭। কফিখানার নীচে স্টুডিয়ো। অন্য কার্ডে লেখা—জেনি পুরোনো ও নতুন বন্ধুদের আহ্বান জানাচ্ছে। ফোন বেলা বারোটা থেকে রাত আটটা। আর একটা, ক্যারোলিন। মডেল। ছোট পুতুলের মত দেখতে। স্টুডিয়ো। সেই বোর্ডের আর একটা বিজ্ঞাপন। বিনামূল্যে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাপের মূল্য মৃত্যু।

মধ্যবিত্ত পরিবারের রোমান্স সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলেছেন : দুই সুখী পরি-বার। ধরা যাক তাদের নাম শ্রী ও শ্রীমতী 'ক' এবং শ্রী ও শ্রীমতী 'খ'। দুজনেরই ছেলে-মেয়ে আছে। দুই ভদ্র-লোক ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। একই পাড়ায় বাড়ী। নিয়মিত যাতায়াত আছে। সন্ধ্যে হলে দুজোড়া দম্পতি একসঙ্গে ব্রিজ খেলতে বসেন। তাদের পরম বন্ধুত্ব। ক্রমে দেখা গেল 'ক'-এর বাথ-রুমের জানলায় ভিজে তোয়ালে টাঙান। দুদিন বাদে 'খ'-এর বাথরুমে তোয়ালে ঝুলতে দেখা গেল। সন্দেহ থেকে সুস্থ প্রমাণ। প্রথম মন কষাকষি তারপর কোর্টঘর। পরস্ত্রী প্রীতির অভিযোগে দুপক্ষেরই বিবাহবিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হল। শ্রী 'ক' বিয়ে করলেন শ্রীমতী 'খ'-কে এবং উঠে এলেন 'খ'-এর বাড়ী। শ্রী 'খ' আশ্রয় নিলেন শ্রীমতী 'ক'-এর গৃহে। ছেলেমেয়েরা যেমন ছিল তেমনি থাকল। আবার তাদের মধ্যে গড়ে উঠল সদ্ভাব। সন্ধ্যে না হতে ব্রিজ খেলা শুরু হল। তবে কিছুদিন বাদে আবার নাকি বাথরুমে তোয়ালে ঝুলতে দেখা গেছে।

হাস্যরসিক ইংরেজের পরিচয় প্রসঙ্গে মজার ঘটনা বলেছেন। অবশ্য এদেশে প্রতি বছর কলেজের ছেলেরা দল পাকিয়ে একটা কিছু কিম্ভূতকিমাকার কাজ করে। তাকে বলে rag—লোককে বোকা বানায় —একটু নির্দোষ আনন্দ—এপ্রিল-ফুলের দিন যা অনেকে করে। লেখিকা আক্ষেপ করেছেন তেমন মজার ফন্দি আঁটার সময় কোথায় লোকের। পয়সাই বা কার আছে। সে ছিল একজন—হোরেস-ডি-ভেরে-কোল। অনেকটা আমাদের দেশের বিগত দিনের জমিদারের মত। কোল তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পুঁথি পড়ার চেয়ে লোক ঠকানোর ফন্দি আঁটতে বেশী বুদ্ধি খরচ করতেন। কেবল চিন্তা কি করে রথী-মহারথীদের বোকা বানান যায়। সেটা ১৯০৫ সাল। তিনি সাজলেন জানজিবারের সুলতান, এক ছাত্রী সাজলেন বেগম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠান তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা জানান। কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি। যতদিন না ঘটনাটা ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়।

দ্বিতীয় দফায় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনা। দীর্ঘদিন ধরে চলল অভিযানের খসড়া। এবার টার্গেট নৌ-বাহিনী। এ্যাডমিরাল স্যার উইলিয়ামে মের কাছে টেলিগ্রাম এলো। এমনভাবে লেখা যেন বৈদেশিক দপ্তরের স্থায়ী আন্ডার সেক্রেটারী স্যার চার্লস লিখছেন। বিষয়-বস্তু আবিসিনিয়ার মহারাজ সদলবলে আসছেন। জানি হাতে বেশী সময় নেই, তবু তাঁদের যেন উপযুক্ত সামরিক অভ্যর্থনা জানান হয়।

মহারাজ নামলেন। সঙ্গে দুজন দেহরক্ষী, একজন রাজকুমার, একজন জার্মান দোভাষী এবং স্বয়ং কোল সেজেছেন আবিসিনিয়ার বৈদেশিক বিভাগের কর্মচারী। বিশেষ ট্রেন তাঁদের নিয়ে এসেছে ওয়েমাথ-এ। নৌ-বাহিনী রাজোচিত সম্বর্ধনা জানায়। কোল নিজের পরিচয় দেন। কফির নিমন্ত্র

প্রসঙ্গে বলেন—রাজপুরীর পাচকবর্গকে আনা সম্ভব হয়নি, অবশ্য আবিশিনিয়া ও বিলেতের কফি তৈরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে ধর্মের অনুশাসন। বাইরে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ নিষেধ। তাই নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁদের অক্ষমতা জানাচ্ছেন। তাঁদের ভয় ছিল খাবার আসরে নামলে কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ না খসে পড়ে। তিনি আরও বললেন, সূর্যাস্তের সময় মক্কার দিকে মুখ ফিরে আজান করতে হবে তাই বিদায় নিচ্ছেন। সোনার হ্যাটধারী দোভাষী তখন সামাল দিচ্ছেন। অভিধান থেকে তাঁরা কয়েকটা কথা মুখস্থ করেছেন। অ্যাডমিরালটির ফ্লাগশিপ এক একটা অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে রাজা সপারিষদ উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। মুখে মুখে বিস্ময়ের আভাস। আর বলে উঠছেন 'বুংগ', 'বুংগা', অর্থাৎ চমৎকার। কয়েক দিন বাদে দৈনিক পত্রিকায় বড় বড় হরফে ছাপা হল 'বুংগা বুংগা'। এডমিরাল মে'র জীবন নিশ্চয় কিছু-দিনের জন্যে দুর্বিসহ হয়েছিল। কোল বলছিলেন হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হয়েছে বটে তবে রাজকীয় সম্বর্ধনার তুলনায় তা কিছুই নয়।

বইটার শেষ অধ্যায় "ঈশ্বর ইংরাজ ও হাইড্রোজেন বোমা" এই শিরোনামে। ভল্টেয়ার বলেছিলেন, ইংরেজের শখানেক ধর্ম এবং এক মনোভাব। তিনি খুব ভুল করেন নি। ইংরেজের ভগবানের সঙ্গে সরাসরি ইংরাজী ভাষায় কথা বলা যায়। পার্থক্য কোথায়। মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে Low Church বা Chapel একমাত্র আশ্রয়। যারা অবস্থাপন্ন ইংরাজিয়ানায় তাদের পরম বিশ্বাস। যে দলকে কম পয়সা দেওয়া হয়েছে তাদের ধর্মে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। সৎ হোক ধার্মিক হোক বিনয়ী হোক। তাদের মধ্যে দু-একজন দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তুমুল আক্রোশে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছে। কিন্তু তার পরিধি কতটা—বড়জোর খবরের কাগজের চিঠি-পত্রের কলম।

লেবার পার্টি শুরু করে Sunday School সেখানে ছেলে-মেয়েদের ধর্মকথা শোনান হয় এবং শিক্ষা দেওয়া হয় কি করে প্রতিবেশীকে সাহায্য করা যায়। আজ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে তার রূপ পরিবর্তন হচ্ছে। যারা দরিদ্র শ্রমিক ছিল তাদের ছেলে-মেয়েরা কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে কেউ বা ভাল মাইনের চাকুরী করছে। সংসারে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য। ভুলে যাচ্ছে সেবা সংগঠন। কিন্তু এই টাকাই কি জীবনের সব? হয়ত দুদিন বাদে লোকে উপলব্ধি করবে অর্থই পরমার্থ নয়।

ম্যাকমিলান গত সাধারণ নির্বাচনের আগে বলেছিলেন We have not had it so good—জাতির জীবনে এত ভালো দিন আর আসেনি। লেখিকা বলেছেন একথা শুনে লজ্জায় তাঁর মাথা নত হয়ে গেছে। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক আজও পেট-ভরে খাবার খেতে পায় না। ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক, যারা পেন্সনের ওপর নির্ভর করে আছে তাদের তেল আনতে নুন ফুরোয়। শীতে জমে যায় তবু আগুন জ্বালার পয়সা নেই। আজও ইংলণ্ডে প্রতি চারটে বাড়ীর মধ্যে একটা বাড়ীতে স্নানঘর নেই। অথচ প্রতি বছর হাজার হাজার মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করা হচ্ছে সামরিক আয়োজনে—মানুষ-মারা ছুরিতে শান দেবার জন্যে। মাথার ওপর নেটোর প্লেন আণবিক বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ম্যাকমিলান হয়ত কথাটা বিশ্বাস করে আনন্দ পেতে চান। তবে দেশবাসী এ কথায় সায় দেবে না।

হাইড্রোজেন বোমা নিয়েই ত কত লোকের মাথা-ব্যথা। যুদ্ধ হলে পৃথিবী ধ্বংস হবে একথা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডিও বলেছেন। যুদ্ধ না বাধলেও পুরোপুরি অব্যাহতি নেই। আণবিক পরীক্ষাও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়ায়, তাতে লোকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগবে। ভাবীকালের সন্তানদের কেউ হবে অন্ধ কেউবা বিকলাঙ্গ। তারপর বলেছেন—ব্যান-দি-বম দলের কথা। ধর্ম জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে যোগ দিয়েছে এই দলে। গত মহাযুদ্ধের পর কোন রাজনৈতিক দল যুব শক্তিকে এত আকৃষ্ট করতে পারে নি। তার কারণ এর নীতি ছোটখাট দলাদলির অনেক ঊর্ধ্বে। মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব নিয়ে এদের দুর্ভাবনা। এই দলে আছে ডাফল-কোট-পরা গরীর ও মধ্যবিত্তের দল। আছে গীটার বাজিয়ে, যৌবনের উচ্ছ্বাসভরা লোক। মাথায় অল্প ছিট এমন লোকও এ দলে আছে, কেউ দাড়ী রাখে, কেউ উদ্ভট পোষাক পরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

ওই বোমার প্রতিবাদে অল্ডার-মাস্টন মার্চ। ছেলে বুড়ো, যুবক যুবতী কদম কদম এগিয়ে চলেছে। মা বাচ্চাকে প্র্যামে শুইয়ে এগিয়ে চলে, ভাল করে হাঁটতে শেখেনি এমন ছেলেকে নিয়ে বাবা ধীরগতিতে এগোয়। প্রিয় কুকুর বেড়ালকে ঘরে ফেলে রেখে যেতে কারও মন সরেনি। তাই তাদের নিয়ে চলেছে প্রসেশনে। প্রথম বছর শোভাযাত্রা যায় ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে অল্ডারমাস্টন। ট্রাফলগার স্কোয়ারে সভার দিন চমৎকার আবহাওয়া। চার দিন ধরে যাত্রা। পর দিন বেশ ঠাণ্ডা পড়ল, এলো ঝড়-বৃষ্টি শেষে তুষারপাত। অনেকের তেমন গরম পোষাক নেই তবু দমে যায়নি। গীটার থেকে গড়িয়ে পড়েছে জল আর বরফের কুচি তাই বলে বাজনা থামেনি। দলে দলে গেয়ে চলেছে পথ চলার সঙ্গীত। আশ্চর্য এদের সংযম এবং শৃঙ্খলা। কোন প্রতিষ্ঠানের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি। পথে এক অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার হামলা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু যাত্রীদল নির্বিরোধ। স্কুলে বা চার্চ হলে রাত কাটিয়ে যখন পরের দিন যাত্রা করেছে একটা কাগজের টুকরো পর্যন্ত পথে পড়ে থাকেনি। সব পরিষ্কার করে তবে পথে নেমেছে। মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। তারা গেয়েছে জীবনের সংগীত। বলেছে মনুষ্যত্ব দীর্ঘজীবী হোক।

---

* Published by
Weidenfeld & Nicolson.
20, New Bond St.
London W.I.

'প্যাকেজ' পরিকল্পনা

বার্তাবাহক

['প্যাকেজ' পরিকল্পনা ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। অধিক ফসল উৎপাদনে এবং দেশের একটি বৃহৎ সমস্যা সমাধানে এই পরিকল্পনাটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দেশের কৃষক সম্প্রদায় সানন্দে গ্রহণ করছে এই পরিকল্পনার উজ্জ্বলময় ভবিষ্যতকে।]

বিহারের শাহাবাদ জেলার কিষাণপুরা গ্রামে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নীরব পরিবর্তন চলছে, সেই পরিবর্তনের ছাপ গ্রামের কৃষকদের মধ্যেও পড়েছে। এই গ্রামেরই কৃষক জয়রাম তেওয়ারীর মধ্যেও সেই আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে যা সহজে নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। চল্লিশের প্রান্তে উপস্থিত হয়ে এই প্রৌঢ় কৃষকের আজ একটা কথা বলার আছে। সেকথা শুধু জয়রামের একার নয়, গ্রামের মোড়ল কীর্তানন্দ তেওয়ারী থেকে আরম্ভ করে সামান্য কৃষক পর্যন্ত প্রত্যেকেরই, সেকথা গ্রামের কৃষকদেরই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাহিনী।

দেশকে গড়ে তোলার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। আর চলেছে সেই পরিকল্পনার সার্থক রূপদানের প্রচেষ্টা। কিষাণপুর তার থেকে বাদ পড়েনি। মাত্র গত এক বছরে এই গ্রামকে 'সামগ্রিক কৃষি জেলা পরিকল্পনা', যা আজকাল 'প্যাকেজ পরিকল্পনা' নামেই বিশেষ পরিচিত, তার অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যে সাতটি জেলাকে এই পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা হয়—শাহাবাদ তারই একটি। এই পরিকল্পনায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকদের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কোন ধারণা ছিল না। ধারণা ছিল না কেমন করে ফসল বাড়ান যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী জয়রাম এবং তারই মত ঐ গ্রামের আরও জন-কুড়ি-বাইশ কৃষককে গত এক বছরে উন্নতপ্রথায় চাষ-আবাদ পদ্ধতির শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে মোটালাভের পথও।

॥ ফসল বোনার নতুন রীতি ॥

প্যাকেজ পরিকল্পনার জন্য যে প্রসার (কৃষি) কর্মীর দল গ্রাম পরিদর্শনে যান তারা গ্রামের চাষীদের কাছে নতুন রীতিতে ফসল বোনার ওপর খুব ঝোঁক দেন। এবং নতুন রীতিতে ফসল-বোনা সম্পর্কে কৃষকদের সম্মুখে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে হাতে-কলমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তারা বিশেষকরে এই কথাই বলেন যে, রবিখন্দে প্রচলিত ধারায় গম এবং ডালের অর্থাৎ ছোলা প্রভৃতি রবিশস্যের মিশ্র চাষ না করে ভালো সেচের ব্যবস্থায় গম এবং ডালের চাষ করা উচিত। আর খরিফখন্দে প্রথমে জলদি আলুর চাষ করে পরে পেঁয়াজ এবং ভুট্টার চাষ করা উচিত। সেই অনুসারে চাষ করে কৃষকরা হাতে হাতে ফল পায়। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট পরিমাণে এবং আরও দ্বিগুণ হয়। কৃষকরা সানন্দে এই ফসল বোনার নতুন রীতিকে স্বীকার করে নেয়। কারণ এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পায়।

এর আগে কৃষকরা খরিফখন্দে সেচ করা ধানের ক্ষেতে সামান্য পরিমাণ 'এমোনিয়ম সালফেট' ব্যবহার করত। কিন্তু এখন তারা ভাল ফসলের জন্য সম-পরিমাণে সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। সরকারও এবিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন করেছেন। সার সরবরাহ করে কৃষকদের নিয়মিত সাহায্য করা হয়। এবং সে সার কিভাবে

শাহাবাদ জেলায় একজন প্রসার-কর্মী ভুট্টার জন্য প্যাকেজ পরিকল্পনা অনুসারে চাষ শিক্ষা দিচ্ছেন।

ক্রমশঃই বেশী সংখ্যক কৃষক উন্নত প্রথায় চাষ করার রীতি গ্রহণ করছে। ছবিতে এইরূপ একজন কৃষককে মাঠে চাষ করতে দেখা যাচ্ছে।

ব্যবহার করলে উপযুক্ত ফল লাভ হবে তাও দেখিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এই জেলায় গত এক বছরে সারের ব্যবহার বেড়ে গিয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফসফেট্‌ ঘটিত সারের চল খুব বেড়ে যায়, আগের বছরের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পায়। মিশ্রসার এবং পটাশের চল এ অঞ্চলে একেবারে ছিল না বললেই চলে কিন্তু এখন থেকে চাষীরা জমিতে এই সার প্রয়োগের শুভপ্রথা এই প্রথম গ্রহণ করল বলা চলে। গ্রামের বহুমুখী সমবায় সমিতি বর্তমানে এই সব কৃষকদের নতুন সভ্য করে নিয়েছে এবং বীজ ও সার কেনার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ঋণও দিচ্ছে।

।। উৎপাদন বৃদ্ধি ।।

আরও অনেকের মতই জয়রাম তেওয়ারী আগের বছরে যে জায়গায় ১০ মণ ধান উৎপাদন করতে পারত সেই জায়গায় ২৬ মণ ধান উৎপাদনে সক্ষম এবং ১০০ মণ দেশী আলুর বদলে ৩০০ মণ 'আপ-টু-ডেট' আলু উৎপাদন করে। শাহাবাদ জেলার প্রায় দু হাজার গ্রাম 'প্যাকেজ' পরিকল্পনার আওতায় আসার ফলে বিষাণপুরার মতন পরিবর্তন সর্বত্রই দেখা দিয়েছে। আজ ৩৫০০ কৃষক পরিবার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে এই পরিকল্পনায়।

উৎপাদন বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হয় কৃষকদের মনে একটি প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা। তাই সামগ্রিক কৃষি জেলা পরিকল্পনা বিশেষ জোর দেয় কৃষি-প্রদর্শন ব্যবস্থার ওপর। এই উপায়েই কৃষকদের মনে দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি করা যায় যে চিরাচরিত প্রথায় চাষ করার চেয়ে উন্নত প্রথায় চাষ করা কত ভাল। গত বছরে এই জেলায় ধান-চাষের উপর মোট ১৪৫৫টি এবং গম ও আলু ইত্যাদি অন্যান্য শস্যের উপর যথাক্রমে ১৪৯৯ এবং ১৪১৭টি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

।। উন্নত প্রথায় চাষ ।।

উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন এবং জমির ফলন বৃদ্ধির প্রথম ধাপ উন্নত বীজ ব্যবহার। এই উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার এই জেলায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। শুধুমাত্র গমের জন্য উন্নত বীজের ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ১৫১৭ মণ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৬১-৬২ সালে ৪৫৬০ মণের কাছাকাছি হয়। আর উন্নত জাতের বীজ আলুর ব্যবহার ৪৮৫ মণ থেকে বেড়ে গিয়ে ৩৫৮০ মণে দাঁড়ায়।

মাটিরও দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। ক্ষেতের মাটি পরীক্ষার নানারকম সুবিধাজনক দিকটাও শাহাবাদের কৃষকদের আকৃষ্ট করে। বহু কৃষক তাঁদের জমির নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজেদের জমির গুণাগুণ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পেরেছে। এ পর্যন্ত মোট প্রায় ১৮৬০টি নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল জমির মাটি পরীক্ষার জন্য। এর মধ্যে ৬১৪টি বিধিসম্মত উপায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার ফলাফল কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোটামুটি গ্রামের সকলের ফসলই কীট ও রোগের আক্রমণ থেকে ভালভাবে রক্ষা পায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে, কীটনাশক ঔষুধের ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের ১৩,০০০ পাঃ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৬২ সালে ৫২,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে।

।। প্রয়োজনীয় ঋণদান ।।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণদান বিশেষ প্রয়োজন। এই ঋণের পরিমাণও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬১-৬২ সালে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ হিসাবে ২৭ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। আগের বছরে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ টাকা। আবার পূর্বের দুই বছরের দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকার জায়গায় ৬ লক্ষ টাকা নাতিদীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। কৃষি-পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সতেরটি কৃষি-বাজার সমিতিও স্থাপিত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ ও সংরক্ষণের জন্য গুদামঘরের বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ ২৩টি গুদাম ইতি-মধ্যে নির্মিত হয়েছে। ৩৫টি নতুন গুদামঘরের নির্মাণকার্য চলেছে এবং ৩১টি ভাড়া লওয়া হয়েছে।

প্যাকেজ পরিকল্পনা বিষাণপুরার মতন সমস্ত গ্রামে গ্রামে কৃষকদের কাছে নতুন পথ দেখাচ্ছে—কি উপায়ে কৃষির উন্নতি করা যায়, কিভাবে আয় বাড়িয়ে তোলা যায়। জয়রাম তেওয়ারীও বলে—"আমি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি। আমি জানি যে, কৃষির উন্নতি করতে পারলে আমি আমার এই সাড়ে চার একর জমি থেকে অনেক বেশী আয় করতে পারব।"

ঘাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

।। লাইন ।।

কথাটা বললে বিশৃংখলা চাইছি বলে ডিসিপ্লিনভক্ত সভ্য নাগরিকেরা আমার ওপর বিরক্ত হতে পারেন এবং আমাকে কলকাতায় বাসের অনুপযুক্ত বলে গ্রাম দেশে ডেরা বাঁধবার বিনামূল্যে উপদেশও দিতে পারেন, তবু নিঃসংকোচে বলব, লাইন দেওয়া ব্যাপারটা আমি আমার মানসিক আভিজাত্য বোধের জন্যেই একটুও পছন্দ করি না। অবশ্য সামান্য চাল ডাল কেরোসিনের জন্যে বাংলাদেশের অভাবী মানুষকে একদিন যে কারণে রাতজেগে লাইন দেওয়াটা মেনে নিতে হয়েছিল, হাঁ মাত্র সেই কারণেই এই কলকাতায় আমিও লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছি। এবং এও সগর্বে বলি যেখানে লাইনে দাঁড়ানো ব্যাপারটা থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে হলে, নিজের চাহিদা বা শখকে খুব বেশী বিসর্জন দিতে হয় না সেখানে আমি সর্ববিধ লাইন এড়িয়েই চলি।

প্রশ্ন উঠতে পারে আমারই বা লাইন দেওয়ার ব্যাপারে এবংবিধ বীতরাগের হেতুটাই বা কি থাকতে পারে? সমাজটা যখন সুশৃংখলভাবে নানা আইনের বেড়াজালে চলে যাচ্ছে স্বয়ং মনুর আমল থেকেই, তখন আইনমাফিক যদি সব কিছু হয় তাতে ক্ষতি কি! এই ধরুন, বোম্বের মত এখানকার ট্রামে বাসেতে যদি এই লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে অনর্থক গুঁতোগুতির হাত থেকে শরীর আর পোষাক কি খাসাই না বাঁচানো যায়। বলতে গেলে, লাইন মানেই সাম্যবাদ। গায়ের জোর আর পয়সার জোর দুটোই কেমন লাইনের শাসনে দুর্বল। অবশ্য এঁদের এই যুক্তির মধ্যে সত্যতা অস্বীকার করবার নয়, কিন্তু তবু ইতিমধ্যেই যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত লাইনসম্যান হয়ে উঠেছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন লাইন দিয়ে জেতাটা গায়ের জোর বা পয়সার জোর যাদের নেই, তাদের পক্ষে রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। তবু লাইন দেওয়ার সমর্থকদের আমি সে যুক্তিও দেব না।

আসলে আপনি আমি সকলেই জানি এই লাইন দেওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি করেছে মানুষের সবচেয়ে শত্রু যুদ্ধ। তাই এই একটা কারণেও বটে লাইন দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় সেই সর্বনেশে প্রভাবের দিনগুলো। আর তখনই ডিসিপ্লিনভক্ত বন্ধুদের লাইন দেওয়ার যুক্তির বিপক্ষে আমায় মানসিক আবেগেই বলতে হয়, বন্ধু লাইন মানে শৃঙ্খলা নয়, লাইন মানে অভাব, হাহাকার। ম্যালথাস বলে এক ভদ্রলোকের শিষ্যরা যখন তাই বলেন মানুষ কমাও, তা না হলে ভোগ্যপণ্যের জন্যে কামড়াকামড়ি করতে হবে, তখন আমি ভাবি, অধিকাংশ পণ্য বণিকের ঘরে তুলে দিয়ে, উচ্ছিষ্টের জন্যে আমাদের লাইন দেওয়ালে তাতে মনে হতে পারে আমরা কি সভ্য, আমাদের কি সুন্দর শৃংখলাবোধ, কিন্তু তাতে আমাদের প্রাণও বাঁচে না, মানও বাঁচে না। লাইন দেখলেই তাই ভাবি কেন এত যানবাহন কম, কেন এত কম চিত্রগৃহ, কেন ট্রেন ছাড়বার একঘন্টারও আগে আমাকে মাত্র শ্রীরামপুর যাবার জন্য সুবার্বান টিকিট ঘরের জানলায় দাঁড়াতে হবে; কেন যেখানেই চোখ চেয়ে দেখি সেখানেই দেখব অজগরের মত দীর্ঘ এক লাইন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে ভাগ্যিস আমাকে সিনেমা হাউসের টিকিট ঘর থেকে লাইন করে পথে নামতে হয় না! তা হলে হয়ত সত্যজিতের ছবি দেখার আশাই আমাকে ছাড়তে হত। এতদিন ধরে যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে আসছেন এবং যে হারে অর্থনীতির কাঁটাটা এগোচ্ছে তাতে করে মরবার আগে পর্যন্তও লাইনে দাঁড়াবেন (বা মরেও হয়ত পোড়াবার জন্যে নিমতলায় অপেক্ষা করবেন) তাঁদের প্রত্যেকের বুকে কান পেতে শুনলে এটাই শোনা যাবে, এ কাঙালপনা চাইনে, চাইনে। সাতাশী নয়া পয়সা পর্যন্ত বরাদ্দ করে চিত্ররসিক যে বন্ধু সাতাশী নয়া পয়সা ফুরোতে সংনিশ্বাসে লাইন ছাড়লেন, তার জন্যে অবশ্য আমি লাইনকে দায়ী করছিনে, তবু মনে হল এই অস্বস্তির হাত থেকে পরিত্রাণের রাস্তা লাইনে নেই।

আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে তাই অভ্যস্ত হচ্ছি, যেমন অভ্যস্ত হচ্ছি আমাদের দিনের পর দিন আর্থিক অবনতিতে অদৃষ্টবাদীর মত। এ কেন, এ প্রশ্ন তোলার দায় চুকিয়ে দিয়েছি আমরা। এই বুঝি নিয়ম। লাইনে ছাড়াও ভাগ্যে থাকলে মিলবে প্রার্থিত বস্তু, নচেৎ নয়।

এই প্রসঙ্গে, এই কিউ ব্যবস্থার জনক বৃটেন দেশের মানুষদের এই ব্যবস্থার দাপটে কি হাল হয়েছিল, তারই একটা কৌতুককর ঘটনা নিবেদন করছি। ঘটনাটা ওদের দেশের কাগজেই বেরিয়েছিল ১৯৪৫-এ।

মিসেস অ্যালবার্ট ট্রট বলে এক ভদ্রমহিলা শাকসব্জী কিনে বাড়ী ফিরে দেখলেন দরজাটা বন্ধ। তিনি কিছু না ভেবেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মিসেস উইলকস এটা লক্ষ্য করেছিলেন। তখন পোনে বারটা হবে। সাড়ে বারটায় সময়ে মিসেস ট্রটের মেয়ে এলফি কোন একটা দোকানে মোজা কেনবার জন্যে লাইন সেরে শুধু পায়ে ফিরল। মাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েও মায়ের পেছন পেছন দাঁড়িয়ে পড়ল।

হ্যাঁ যা ভাবছেন ঠিক তাই সন্ধ্যে সাড়েছটা পর্যন্ত বাড়ীর কর্তাটি ফিরলেন, তখন এলফির পেছনে লাইন করে দাঁড়িয়ে অনেক নারী পুরুষ এবং সেই লাইনে প্রতিবেশিনী মিসেস উইলকসও, মিঃ ট্রটের অন্য একটা কিউয়ের পাল্লায় বাড়ী ফিরতে বেশ কিছুটা দেরী হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু নিজের বাড়ীতে ঢোকবার জন্যে বউ তার লাইন দিয়েছে দেখে মিঃ ট্রটের চোখ ত ছানাবড়া। নিজের বাড়ীতেও লাইন করে ঢুকতে হবে; এটা আবার 'নতুন নিয়ম হল নাকি, তাহলেই ত' গেছেন মিঃ ট্রট!

যাক শেষ পর্যন্ত, মিঃ ট্রট সস্ত্রীক, সকন্যা ত বাড়ীতে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। সেই ও'রাই কিন্তু কয়েকঘন্টা পরে শোবার ঘরের জানলা থেকে দেখলেন ওদের বাড়ীর সামনের লাইনটা শুধুমাত্র সরে গেছে পাশেই একটা ল্যাম্পপোস্টের সামনে।

না, এই মজার গল্পটা আমার লাইন দেওয়ার অভ্যাসকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে কোন উদ্ধৃতি নয়, কলকাতায় রাশিয়ান সার্কাস দেখবার জন্যে এক লাইন ভেঙে অন্য লাইনে টিকিট পাবার জন্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে ঘোড়ার লাথি খাবার ভয়ে পা মচকে দু'মাস বিছানায় পড়ে থাকার যন্ত্রনার কথাও তুলব না।

শুধু বলব, পূর্ব রেলের মস্তবড় ইংরাজী অক্ষরে লিখে কিউ দেবার অভ্যাসের আপাততঃ পরামর্শ আপনি কানে নেবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমাদের কর্তব্য [illegible] আমরা করেছি, তোমাদের কর্তব্য তোমরা কর। আমাদের সুখ সুবিধার প্রতি একটু যত্ন দিলে, তাতে আখেরে ট্রেন বলে জিনিষটার প্রতি যে অশ্রদ্ধা আমাদের জন্মেছে, তা অনেক কমে যাবে।

আপনাদের কাছে, আপনারা যাঁরা আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের নিয়ন্তা, আমার মত অনেকের হয়েই একটাই মাত্র নিবেদন রাখছি, আপাততঃ আমরা লাইনে দাঁড়াচ্ছি, না দাঁড়িয়ে উপায় নেই বলেই কিন্তু দোহাই আপনাদের, এমনই অবস্থার সৃষ্টি করুন এদেশে যেন লাইনে দাঁড়ানোর হাত থেকে আমরা অব্যাহতি পাই চিরদিনের জন্যেই, বুঝতে পারি, বেঁচে থাকবার জন্যে আমার দেশে কাঙালপনার দিন কবেই ফুরিয়েছে!

আরমানি দূত পিদ্রু

শোভনলাল বাগচী
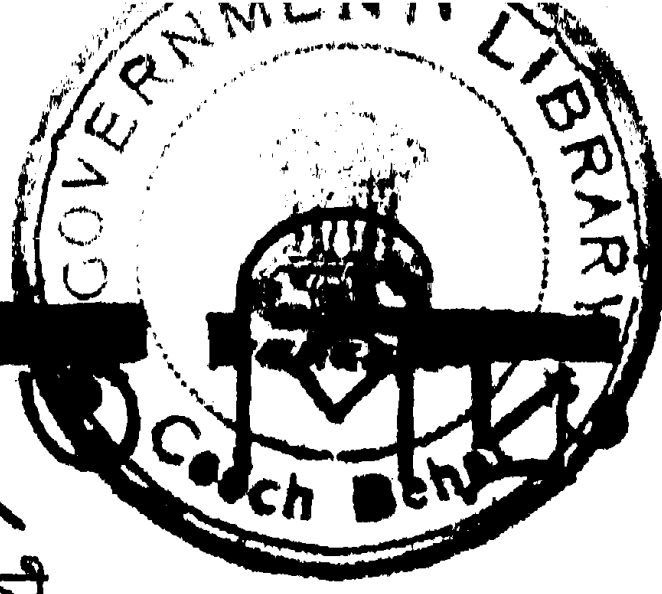
কোম্পানীর রাজনীতিতে আকস্মিকভাবে এসেছিল আরমানি বণিক পিদ্রু। মিলিয়েও গেল আকস্মিকভাবে। কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখলে না। অথচ সে-ই সমস্ত চক্রান্তের নির্বাক সাধক।

আরমানিরা বহু বছর আগে এসেছিল কলকাতায়, ইংরেজদেরও আগে। ব্যবসা-পাতি করত। শান্তভাবে থাকতো। এই আরমানিদের সর্দার ছিল পিদ্রু। সবাই তাকে সম্মান করত। সুবা বাংলার রাজধানী তখন মুর্শিদাবাদ। তাই ব্যবসায়ী পিদ্রুর সম্পর্ক কলকাতার সংগে যেমন ঠিক তেমন মুর্শিদাবাদের সংগেও। মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে তখন আরমানিদের বড় আড্ডা। ১৭৫৮ সালে সৈদাবাদের আরমানি গির্জাটা তৈরী করেছিল পিদ্রু।

যাই হোক, সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিল ফলতায়। নৌকোয় থাকে গোরা সাহেবরা। নবাবের ভয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে না গ্রামের লোক। রোগে আর অনাহারে প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে গোরাদের। এই দুঃসময়ে ইংরেজদের পাশে অযাচিতভাবে এসে দাঁড়াল আরমানি বণিক পিদ্রু আর নবকেষ্ট—পরে যিনি হলেন শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ।

তারপর চুপচাপ। রাজনীতিতে পিদ্রুর আর দেখা নেই। আবার ইংরেজদের সংগে সিরাজের বিবাদ পাকিয়ে উঠল।

১৭৫৭ সালের ২৫শে জানুয়ারী পিগট চিঠি লিখলে ক্লাইভকে : "ফরাসীদের মধ্যস্থতা না মেনে নবাব আমাদের সংগে মিটমাট করে ফেলতে চায়। তাই নবাবের প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে আরমানি বণিক পিদ্রুকে পাঠিয়ে ছিল"...... ইত্যাদি। দূতের কাজে পিদ্রুর এই প্রথম আবির্ভাব।

দূতের কাজে আরমানিরা পাকা। নবাব-বাদশার আঁতি-পাতি খবর তাদের নখ-দর্পণে। বাজারের হাল-চাল জানা খুব ভাল ভাবেই। দূতের কাজে আরমানিদের বিশ্বাস করা যায়। স্যারম্যান যখন দিল্লীর দরবারে গেল, তখন সংগে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল এই আরমানিকেই। আশা করার যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে পেয়েছিল অবিশ্বাস্য রকমের সুফল। দূতের কাজ তাই আরমানিদের বিশ্বাস করে গোরা ইংরেজ।

১৭৫৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ আবার পাঠায় পিদ্রুকে ইংরেজদের কাছে।

পরের দিন ফোর্ট উইলিয়মে যে চিঠি লেখে ক্লাইভ তার শুরুতেই ছিল : "পিদ্রু নবাবের কাছ থেকে চিঠি ও উপহার নিয়ে এসেছে। আমি তার কাছে আমাদের প্রস্তাব পাঠাতে চাই। সুতরাং আপনারা তাড়াতাড়ি প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দেবেন।"

কিন্তু এর পরই নাটকের আরম্ভ। ১৭৫৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হুগলী থেকে দশ ক্রোশ দূরে বসে ওয়াটস এই চিঠি পাঠাল কর্নেল ক্লাইভকে : "পিদ্রু আর দু'জন ভদ্রলোককে আমিও চুঁচুড়ায় পাঠাই। আমি খবর পেয়েছি যে ফরাসীরা নৌকোয় মাল বোঝাই করছে। নৌকোতে যদিও ঝুড়ি, তুলো, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্র আছে, কিন্তু তা লোক ঠকাবার জন্য ওপর ওপর সাজান। নৌকো কামানের বারুদে ভর্তি।"

১৭৫৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিলেতে সিক্রেট কমিটিকে দীর্ঘ চিঠি লিখে ক্লাইভ জানাল যে, "আরমানি বণিক পিদ্রু নবাবের চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। পিদ্রু আমাকে বলেছে যে, নবাব কলকাতায় আসবে না।........ তবু পরের দিন, ৬ তারিখে, নবাব আসে দমদমে। আমাদের কাছে নবাব আবার পিদ্রু আর রঞ্জিত রায়কে পাঠায়।" তারপর সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কথাবার্তা হয়। কিন্তু তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে রঞ্জিত রায়ের। কারণ রঞ্জিত রায় হল শেঠবাড়ির প্রতিনিধি। আর এই সন্ধির সর্তে শেঠবাড়ির স্বার্থ ছিল গভীরভাবে জড়িত।

১৭৫৭ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে মুর্শিদাবাদ থেকে ওয়াটস লিখল ক্লাইভকে, "দু'দিন আগে মীরজাফর খুব গোপনে খোজা পিদ্রুকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। মীরজাফর বলে পাঠিয়েছে যে দরবারের সবাই নবাবকে অপছন্দ করে। নবাব প্রত্যেককেই অপমান করে। মীরজাফরের ত দরবারে যেতেই ভয় করে। কারণ মনে হয় দরবার থেকে তিনি বোধ হয় আর ফিরবেন না। তাকে খুন করা হবে। তাই তিনি সব সময় সৈন্য-বাহিনীকে তৈরি হয়ে থাকার হুকুম দিয়েছেন। তাঁর ছেলেও থাকে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে। তাঁর ধারণা এই যে নবাব সন্ধির সর্তগুলি পালন করবে না। মোহনলাল এখন অসুস্থ। সে ভাল হয়ে উঠলেই এবং পাটনা থেকে আর কিছু সৈন্য এসে পড়লেই নবাব আমাদের আক্রমণ করবে। মীরজাফর তাই পিদ্রুর কাছে বলে পাঠিয়েছে যে, যদি আমরা রাজী থাকি তবে সে, রহিম খাঁ, রায়দুর্লভ আর বাহাদুর আলি খাঁ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের সংগে যোগ দিতে পারে এবং নবাবকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে অন্য আর একজনকে করতে পারে নবাব।"

১৪ই মে তারিখে ওয়াটস একটা চিঠিতে ক্লাইভকে জানায় যে, পিদ্রুকে সংগে নিয়ে সে মীরজাফরের বিশ্বস্ত বন্ধু ওমর বেগের সংগে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছে।

উমিচাঁদ ইতিমধ্যে নাটকে এসেছে। উমিচাঁদ একটা চিঠি লেখে পিদ্রুকে : "উমিচাঁদ পিদ্রুকে অভিবাদন জানাচ্ছে। আমি ওয়াটসকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, যতক্ষণ আমি আসতে না বলছি ততক্ষণ ইংরেজরা যেন না আসে। এখন আপনার স্বার্থ আর আমার স্বার্থ অভিন্ন। সুতরাং আমাদের স্বার্থ সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং সেই মত কাজও করবেন। ইতিমধ্যে আমাদের বন্ধু (অর্থাৎ ওয়াটস) যদি যাত্রা না করে থাকেন তবে তাঁকে আরও কিছু দিন আটকে রাখবেন। কারণ এখানে সব ব্যাপারের এখনও মীমাংসা হয়নি। পরে আমি আপনাকে সব জানাচ্ছি। আপনি সমস্ত ব্যাপার বোঝেন খুব ভাল করে। সুতরাং বেশি লেখা বাহুল্য মাত্র। আমাদের সার্থকতা নির্ভর করছে আমাদের দু'জনের ওপর। আমার কিন্তু সব ভরসা আপনিই।"

উমিচাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে নিজের অবস্থা পাকা করা। পিদ্রু উমি-

চাঁদকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ছিল ইংরেজদের একান্ত অনুগত। পিদ্রু এই চিঠিটা ওয়াটসের হাতে তুলে দেয়। ইংরেজদের কাছে উমিচাঁদের অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে আর তার ফল উমিচাঁদকে পেতে হ'ল জাল সন্ধিপত্রে।

১৫ই জুন তারিখে ক্লাইভ লেখে, "কাল রাত্রে আমি কাটোয়ায় এসেছি। আমার সিপাইরা হে'টে আসছে। তারা খুবই ক্লান্ত। আমি আজকেই মুলোজোড় যাবো। সেখানেই কামানগুলো খালাস করব। দিন-দুয়েকের মধ্যে আমি অগ্রদ্বীপ পৌঁছাব। মিঃ ওয়াটস তার লোকজন নিয়ে কাল বিকেলে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার সঙ্গে আছে পিদ্রু। ওরা ১৩ তারিখ রাজধানী ছেড়েছে। ওরা আমাকে বলেছে যে, মীরজাফরের দল দিন দিন বাড়ছে।"

২৩শে জুন। মীরজাফরের চিঠি এল ক্লাইভের কাছে। মীরজাফর লিখল : "আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার শর্ত আমি পড়েছি। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক। ওমর বেগ, ওয়াটস অথবা পিদ্রুকে আমার কাছে পাঠান।......"

পলাশীর চক্রান্তে পিদ্রুর ভূমিকা এখানেই শেষ। কিন্তু এই চক্রান্ত থেকে কিছু লাভ করতে পারেনি পিদ্রু। সে উমিচাঁদের মত পাগল ও বেয়াকুব হয়নি। ১৭৫৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে দীর্ঘ ও করুণ চিঠি পাঠায় সে।

সে দীর্ঘ চিঠিতে পিদ্রু ব্যাকুলভাবে তার ইংরেজ সেবার ইতিহাস আবার জানাল বিলেতের সাহেবদের কাছে। পিদ্রুর আশা ছিল সে বিলেত থেকে সুবিচার আদায় করে আনবে।

পিদ্রু এই বলে চিঠি শেষ করল : "আমার আর আব্রাহাম জেকবের অসাধারণ পরিশ্রমের সুফল আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজকে কলকাতা শান্ত। কিন্তু সেই সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজ পরিবারের দুঃখ লাঘব করতে আমি যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছি, যে বিপদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, যেমন ভাবে সুন্দর বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছি, তার বিনিময়ে আমি পেয়েছি নীরব উপেক্ষা। আজ আমার বন্ধু আব্রাহাম জেকবের অবস্থা আমার মত। সে আজ অসুস্থ। কিন্তু কোম্পানীর কাজের জন্য আমরা নিজেদের তরফ থেকে যে ব্যয় করেছি তা অবধি আমরা পেলাম না।" পিদ্রুর মিনতি এখনও শেষ হল না। অথচ পলাশীর যুদ্ধ শেষ হবার পর নৌকোর পর নৌকায় ধনরত্ন সাজিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে গোরারা এসেছে কলকাতায়। ভাগ করে নিয়েছে। চোখের সামনে দেখেছে পিদ্রু। কোন সারিকানা নেই তার সেই লুণ্ঠনে। অথচ পলাশীকে সার্থক করে তুলতে সে ত কম বিপদের ঝুঁকি নেয় নি। বিশ্বাসভঙ্গ করে ঠকল উমিচাঁদ আর বিশ্বস্ত থেকে ঠকল পিদ্রু। পিদ্রু তাই করুণ সুরে আবেদন জানাল বিলেতে,

"....Hope you will consider me worthy of the gratuity to have some post in your Honour's Service conferred on me."

এ চিঠির, কোন উত্তর পায়নি পিদ্রু। তবু ইংরেজদের সেবা করেছিল পিদ্রু।

আর একবার যখন মুকুট মোচন যজ্ঞ হয়, মীরজাফরের মাথা থেকে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে যখন বসান হল মীরকাশিমের মাথায় তখনও এগিয়ে এসেছিল এই আরমানি বণিক।

কিন্তু শেষ পুরস্কার পেতে বেশি দেরি হয়নি তার।

১৭৬৩ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে কলকাতা কাউন্সিলের মিটিংএ ব্যাটসন অভিযোগ করল :

"আমাদের প্রতি নবাব মীরকাশিমের জঘন্য মনোভাব দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক জানে যে, আরমানি বণিক পিদ্রু হল নবাবের গুপ্তচর। তাই মিঃ ব্যাটসন প্রস্তাব করছেন যে, তাকে এবং তার পরিবারের সবাইকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।"

এই প্রস্তাবকে ভোটে দেওয়া হয়। কাউন্সিলের সমস্ত সভ্যই এই প্রস্তাবের ওপর নিজেদের মতামত জানায়। ওয়াটসও কথা বলে। পিদ্রুর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয় ওয়াটসের। কিন্তু এই ওয়াটসও বলে, "পিদ্রু লোকটা বড়ই কুচক্রে। এই কাজেই সে হাত পাকিয়েছে। আমাদের আর সিরাজের মাঝখানে থেকে সে গুপ্তচরের কাজ করেছে। সে একবার এই গুজব ছড়ায় যে, ক্লাইভ ছোট নবাবকে (মীরণকে) খুন করার কথা ভাবছে। এই গুজব ছড়াবার জন্য ক্লাইভ তাকে আগে একবার কলকাতা ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। তাই আমার মনে হয় তাকে কলকাতা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া দরকার।"

কিন্তু সেবার কলকাতা ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া গেল না। প্রেসিডেণ্ট জানাল যে, এই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পিদ্রু হল একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী। এই করেই তার দিন চলে। কোম্পানী যদি স্বাধীন ব্যবসায়ীদের ওপর প্রভুত্ব করতে যায় তবে বাজারে তাদের বদনাম হয়ে যাবে। অন্য ব্যবসায়ীরা তাদের বিশ্বাস করবে না। তাই পিদ্রুকে শুধুমাত্র এই হুকুম দেওয়া হল যে, সে আর নবাব মীরকাশিমের উকীলের কাজ করতে পারবে না।

সে যাত্রা বিপদটা কেটে গেল অবশ্য। কিন্তু বেশি দিন আর সুস্থির হয়ে থাকতে পারেনি পিদ্রু। ১৭৬৩ সালে মীরকাশিমের সঙ্গে বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল। মেজর এডামস আবার অভিযোগ আনল যে, পিদ্রু নবাব মীরকাশিমের গুপ্তচর। এই অভিযোগের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে, পিদ্রুর ছোট ভাই গার্গিন খাঁ হল মীরকাশিমের বড় সেনাপতি। গার্গিন খাঁ বা নবাবের অন্যান্য আরমানি সেনাপতিরা ইংরেজ বন্দীদের ওপর অত্যাচার করতে পারে। যুদ্ধ যখন হচ্ছে তখন সে সম্ভাবনা আছে। তাই এডামস প্রস্তাব করল যে, পিদ্রুকে বন্দী করে রাখা হোক। পিদ্রু যদি বন্দী হয়ে থাকে তবে গার্গিন খাঁ তার বড় ভাই-এর প্রাণরক্ষার জন্য অন্তত ইংরেজদের খুন করবে না। এডামসের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। পিদ্রু হল যুদ্ধ-বন্দী।

১৭৬৩ সালের ৩রা অক্টোবর মেজর আবার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখল : "কাল আমি খবর পেয়েছি যে কয়েকজন মোগল সৈন্য মাইনে পায়নি বলে বিদ্রোহ করে এবং এই বিদ্রোহে গার্গিন খাঁ আহত হয়। শত্রুপক্ষ থেকে এক হরকরা এসে এই মাত্র আমাকে জানাল যে কালকের আঘাতের ফলে গার্গিন খাঁ আজকে মারা গেছে এবং এই সঙ্গে প্রায় চল্লিশজন মোগল সৈন্যও মারা যায়। এই খবর যদি সত্যি হয়, তবে পিদ্রুকে যুদ্ধবন্দী করে আমাদের কাছে রেখে আর কোন লাভ হবে না। তাই আমার মনে হয় যে তাকে এবার কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। যাই হোক এই বিষয়ে বোর্ডের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছু করব না।"

পিদ্রু ছাড়া পায় এবং কলকাতায় ফিরে আসে। তার আর কোন আশংকা ছিল না। পিদ্রু শান্ত হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে ১৭৬৩ সালেই সে কলকাতায় আরমানি গির্জাটা সংস্কার করায় এবং গির্জার ভিতরে আরো দুটি বেদী তৈরি করে। একটা করেছিল তারই ছোট ভাই নিহত গার্গিন খাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আর একটা তার নিজের জন্য।

হেষ্টিংসের সঙ্গে পিদ্রুর ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। ভারতের কোম্পানীর সর্বোচ্চ পরিচালক বিলাতে যখন তিরস্কৃত তখন তার অর্থাভাব হয়। সেই বিপদের সময় তার নিজের ভারতীয় দেওয়ান এক পয়সাও দেয়নি হেষ্টিংসকে। কিন্তু দিয়েছিল পিদ্রু। পিদ্রু এই সময় পাঠায় বারো হাজার টাকা।

১৭৭৮ সালে মারা যায় পিদ্রু। কলকাতার আরমানি গির্জায় তাকে সমাধি দেওয়া হয়। স্মৃতি-ফলকে লেখা আছে :

"....He departed in the hope of salvation at the age of fifty three and was placed in this tomb with pomp in the year of our Lord 1778, the 29th of August, and in the year 163 of the era of Azaria, the 12th day of the month of Nadar."

আকস্মিকভাবে এল পিদ্রু। পলাশীর চক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার পর আকস্মিকভাবেই মিলিয়ে গেল। শুধু নিয়ে গেল কিছু বঞ্চনা আর কিছু অপমান।

হলুদ আলোর রেখা

সমরজিৎ কর

ভোরের রোদটাকে আজ অদ্ভুত হলুদ বলে মনে হোল মৃগাঙ্কের। আকাশ বড় বেশী নীল। খুবই স্বচ্ছ। আস্তে আস্তে রোদের আভা যতই পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল, তার মনে হোল জীবনের তলানিটা বুঝি এবারই নিঃশেষ হবে। বিস্তৃত আকাশের দিকে আর একবার চাইল মৃগাঙ্ক। ক্ষণিক চেয়ে চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ঘরের মধ্যে। জানলার পর্দাটা একটু সরে গিয়েছিল। তারই ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ একটা হলুদমাখানো সুতোর মত ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। পড়েছে অসীমার মুখের ওপর। অসীমা তখনও ঘুমচ্ছে। তারই ফাঁকে মৃগাঙ্কের মনে হোল অসীমা যেন বড়ই শীর্ণা। রোদটা যদি হলুদ না হোত? মন্দ কি? যদি লাল হোত? অসীমা এখনও ঘুমবে। অন্ততঃ আরও কিছুক্ষণ। ছ'টার আগে ওর ঘুম ভাঙে না।

মৃগাঙ্ক একটা সিগারেট ধরালো। আরও একটা। আরও। কটা পুড়ল সে হিসেব সে রাখে না। শুধু ধোঁয়োর মধ্যে দিয়ে সম্মুখে ঝোলানো আয়নাটায় নিজের মুখখানা একবার দেখল। কিন্তু নিজের কাছেই অচেনা মনে হোল তা। আর সেই আয়না থেকে যে আলোর রেখা তির্যক হয়ে ঠিকরে পড়েছিল মায়ার ছবির ওপর তার কাছে চকিতে মনে হোল সেই হলুদ আলোয় মায়া যেন সত্যিই খুশী হয়ে উঠেছে তার দিকে চেয়ে।

হঠাৎ কেশে উঠল মৃগাঙ্ক। কাশির শব্দে অসীমার ঘুম ভাঙল।

—এ কি? কখন উঠলে? অমন

করে এই ভোরে বসে কেন? বিছানার উপর থেকেই, কতকগুলি প্রশ্ন বর্ষিত হোল মৃগাঙ্কের প্রতি।

মৃগাঙ্ক সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল, এখনও ছ'টা বাজে নি। দশ মিনিট বাকি। আর একটু ঘুমোও।

—বয়ে গেছে আমার ঘুমতে। আগে বল তুমি এত ভোরে কেন এমন করে বসে আছ? অনুযোগের সুরে কথা বলল অসীমা।

—অমন মানে? কেমন দেখলে আবার?

—তুমি নিজেই দেখ না। আয়না তো রয়েছে সামনে।

—কই? তেমন তো কিছু চোখে পড়ছে না? একবার আয়নায় মুখ দেখল মৃগাঙ্ক।

—ইস্! একি? এরই মধ্যে পাঁচটা সিগারেট শেষ? না না। ভাল হবে না। ঐ জঞ্জাল তোমাকে ছাড়তেই হবে। তাছাড়া তোমার স্বাস্থ্য এখন মোটেই ভাল যাচ্ছে না। মা'ও কাল বলছিলেন, আমি যেন তোমাকে ও ছাই-ভস্ম খেতে না দিই।

মৃগাঙ্ক কৌটো থেকে আর একটা সিগারেট বের করার জন্যে হাত বাড়ালো। অসীমা মুহূর্তে কৌটোটা সরিয়ে ফেলল। না। আর না। মুখটা একটু গম্ভীর করল। একটু অভিমানের রেশ। মৃগাঙ্কের মাথার চুলের মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল ডুবিয়ে দিয়ে তার কাঁধের ওপর মাথা রাখল সে।

—কি হোল আবার? মৃগাঙ্ক কথা বলল।

—জিজ্ঞেস করো না। একটু যেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল অসীমা। না না। সব মিথ্যে কথা। এখনও আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে রেখেছ। মোটেই না। মোটেই আমাকে তুমি ভালবাস না।

এবার একটু শব্দ করেই হাসার চেষ্টা করল মৃগাঙ্ক। আয়নায় সে মুখ দেখল না। দেখলে নিজেই বুঝতে পারত হাসিটা কিন্তু কৃত্রিমই দেখাচ্ছিল। স্বরটা মধুর করার চেষ্টা করল ও। বলল, তাই নাকি? এই তথ্যই বুঝি বিয়ের এক বৎসর পর আজ ভোরে আবিষ্কার করলে তুমি?

অসীমাকে আরও কাছে টেনে নিল মৃগাঙ্ক।

—তাহলে এত ভোরে তুমি মুখ অমন করে বসে আছ কেন?

বাইরে ঠিকে-ঝিটা এতক্ষণে বোধহয় এল। উঠনে কয়লা ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মৃগাঙ্ককে ছেড়ে অসীমা দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মৃগাঙ্কের শক্ত বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সে পারল না।

—কি করছ এখন? আর সকলে এর মধ্যে উঠে পড়বে যে। ভাববে কি সকলে বল ত?

—ভাবুক! মৃগাঙ্ক আদর করল অসীমাকে। বলল, কেন আবোল-তাবোল আমার সম্বন্ধে ভাব তুমি, বল ত?

—তুমি কেন এই ভোরে অমন করে বসে থাকবে? অসীমা আবার মৃগাঙ্কের চুলে হাত বোলালো।

অসীমা বাইরে গেল। সম্ভবতঃ বাথ-রুমে। এই ফাঁকে মৃগাঙ্ক আর একবার মায়ার ছবিটার দিকে চেয়ে রইল। ভোরের সূর্যের হলুদ আলোটা তার মুখ থেকে কখন অদৃশ্য হয়েছে। মায়ার মুখে এই কিছুক্ষণ আগেও যে মৃদু-হাসির আমেজ লক্ষ্য করেছিল, সেটা নেই। একবার উঠে এল ছবিটার সামনে। স্বচ্ছ কাচের ওপর হাতটা রাখল। সমস্ত শরীরে কেমন যেন এক রোমাঞ্চ! মায়া আর তার মধ্যে ঐ কাচেরই মত একটি স্বচ্ছ ব্যবধান রচিত হয়েছে। সব দেখছে সে। বুঝছেও সব। কিন্তু, স্পর্শের মধ্যে সে কই? মনে হোল অসীমা আর সে যেন দুইটি পূর্ণ বাক্য, একটি মাত্র অর্থ প্রকাশ করতে। দুই-এর মধ্যে আছে শব্দসম্ভার, আছে ব্যঞ্জনা, যতি। আর এই যতির মধ্যে একটু ব্যবধান।

—আবার ভাবা হচ্ছে? পেছনে দাঁড়িয়ে অসীমা। হাতে চা'য়ের কাপ।

চমকে চেয়ে সরে এলো মৃগাঙ্ক মায়ার ছবির কাছ থেকে। অসীমা মৃগাঙ্ককে টেনে এনে চেয়ারে বসালো। এক কাপ চা' তুলে দিল তার হাতে।

মৃগাঙ্ক চা'য়ের কাপে চুমুক দিয়ে এক হাতে কাছে টেনে নিল অসীমাকে।

বলল, অদ্ভুত কিন্তু লাগছে তোমাকে অসীমা।

—ছাড়ো, সকালেই অত নভেলিয়ানা করতে হবে না। চটপট চাটা খেয়ে আমাকে রেহাই দাও। বাবার অফিসের ভাত রাঁধতে হবে। হ্যাঁ। আর একটা কথা। কালকের সেই ভদ্রলোকের কথাটা মনে আছে তো। এবার কিন্তু দায়িত্বটা আমিই নিয়েছি। ছি ছি। লেখাটা তুমি আজ সেরে ফেল, লক্ষ্মীটি। টাকা এ্যাডভান্স নিয়েছি। কাগজ প্রকাশেরও দেরি নেই। অত করে তোমাকে অনুরোধ করে গেল। আমাকেও।

মৃগাঙ্ক টেবিলের ওপর ছড়ানো কলম আর কতকগুলো টুকরো কাগজের দিকে চাইল।

অসীমা চলে গেল। মৃগাঙ্ক পরিষ্কার শুনল অসীমা রান্নাঘরে প্রবেশ করেছে। কি যেন কড়ায় চাড়িয়েছে। হাতা নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

কাগজ-কলম নিয়ে বসল মৃগাঙ্ক। গণপতিবাবুকে পুজোর গল্পটি আজ

দিতেই হবে। ভদ্রলোককে অনেক ঘুরিয়েছে সে। তাছাড়া টাকার তারও তো দরকার। পুজো আসছে। অফিসে সে যে কাজ করে, তার আয়ে সংসার চলে না। তার ওপর পুজোর খরচ। এ-সময়টায় লিখে তাকে উপরি কিছু রোজগার করতে হয়। ব্যাচারা অসীমা! জীবনের প্রথম অধ্যায় যে প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে, তার পক্ষে এই সামান্য অবস্থায় কি করে চালানো সম্ভব, সেইটেই ভেবে পায় না মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্কের মনে হয় ওকে যদি আরও প্রাচুর্য দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারত?

না। সময় নষ্ট করলে চলবে না। লেখাটা আজ শেষ করতেই হবে। ঘণ্টা তিনে কই শেষ হবে মনে হয়। কলম তুলে নিল মৃগাঙ্ক। দু'চোখ বুজে তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে কলমটি রেখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চেপে ধরল কপালের ঠিক মাঝখানে। যেটুকু লিখেছে সেটুকু মনে মনে চিন্তা করে নিল। লেখাটা গড়িয়েছে মন্দ না। মনে হয় ইন্টারেস্টিং হবে। নায়িকা তৃপ্তিকে সে মেরে ফেলতেই চায়। জীবনে যে শুধু স্বামীর কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে উপেক্ষাই পেল, বেঁচে থেকে তার কোন লাভ আছে কি? তৃপ্তির জীবনে ত্যাগ আছে অনেক। বহু বিঘ্নিত এবং লাঞ্ছিত-জীবন নিয়ে একদিন নায়ক রমেনের কাছে যখন সে এসেছিল, ভেবেছিল, রাত্রির বুঝি সমাপ্তি ঘটল। নতুন প্রভাতে নতুন সূর্য তাকে আনন্দ পথের সন্ধান দেবে। কিন্তু ভুল তার ভেঙেছে। সে বুঝতে পেরেছে রমেনকে ভালবাসা যায়, কিন্তু কাছে পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে লেখাটা জমছে। কলম দ্রুত আঁক কেটে চলেছে।

একটা খুট করে শব্দ হোল। অসীমা এসেছে। হাতে চা এবং জলখাবার। আস্তে করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে হাতের চামচটা বিকট শব্দ করে পড়ে গেল। চিৎকার করে উঠল মৃগাঙ্ক। কি করছ তুমি? কে এখানে গোলমাল করতে আসিতে বলল। যত সব উৎপাত! ব'লে টেবিলে মাথা রাখল।

হাসল অসীমা। বলল, এই যে। উৎপাত সামনেই দাঁড়িয়ে। ফাঁসি দিতে হবে নাকি?

—এখন যাও রসিকতা করতে হবে না।

—মা। এগুলি না খেলে যাব না। দেখছ মা তোমার শরীরটা কত খারাপ হয়ে গেছে?

উঃ! এবারে যেন ক্ষেপে উঠল মৃগাঙ্ক। মুহূর্তে কলমটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তেপায়াটাকে সজোরে উল্টে দিল।

মৃগাঙ্কের এ ব্যবহার বুঝি অসীমাও আশা করতে পারেনি। দীর্ঘ এক বৎসরের বিবাহিত জীবনে মৃগাঙ্ককে এত বেশী রাগতে কখনও সে দেখেনি। এটুকু সে বুঝেছিল, মৃগাঙ্ক কিছুটা খামখেয়ালী। কিন্তু রাগী বলা চলে না। তবে আজ এমন কি হোল?

মৃগাঙ্কের রাগ তখনও পড়েনি। অসীমাকে বলল, শত্রু। একেবারে শত্রু তুমি। ঠিক যখন কাজ করতে বসেছি তখনই এসে সেটাকে নষ্ট না করে দিলে হোত না? জানি। জানি। আজ যদি মায়া থাকত, সে পারত না। সে বুঝত আমার দুঃখ কোথায়।

"এই যে! উৎপাত সামনেই দাঁড়িয়ে।"

এবারে ফেটে পড়ল অসীমা। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে—কি বলতে চাও তুমি? বলল সে। লজ্জা করে না তোমার? বিয়ে করেছিলে কেন তুমি আমাকে? মায়া! মায়া! মায়া! মায়াকে নিয়ে থাকলেই তো পারতে?

—হ্যাঁ তাই থাকব! মৃগাঙ্কও বুঝি মরিয়া হয়ে উঠল। পাশে ঝোলানো জামাটা পরল। পায়ে স্যাণ্ডেল গলালো। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। অসীমা শুধু দাঁড়িয়ে দেখল। কোন বাধা দিল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফুটপাথের ওপর একবার দাঁড়ালো মৃগাঙ্ক। কোন দিকে যাবে? পকেটে হাত পুরে দেখল মাত্র কয়েক আনা পয়সা সম্বল। ধর্মতলা-গামী একখানি ট্রাম আসছিল। তার সেকেন্ড ক্লাশে উঠে পড়ল সে। গড়িয়ে যেতে লাগল গাড়ী। দু'পাশের বাড়ীঘর-গুলি ঝাপসা ছবির মত একে একে পেছনে চলে যেতে লাগল। কোন এক চার্চের পাশ দিয়ে গেল ট্রামটা। চার্চের টাওয়ার-ক্লকটার দিকে তাকালো সে। বেলা বেশী হয়নি। মাত্র আটটা। সোয়া আটটা নাগাদ এসপ্ল্যানেডে পৌঁছল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে প্রিন্সেসঘাটে এসে একটি অশ্বত্থতলায় বেঞ্চে বসে পড়ল।

গঙ্গার উপর জাহাজের সারি। ছোট-খাটো ডিঙিগুলি এদিক-ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। বেলা যত বাড়তে লাগল, জলের বুকে কর্মচঞ্চলতাও গেল বেড়ে। মধ্যাহ্নে অশ্বত্থের ছায়া ছোট হয়ে এল। পাশে এক ছাতুওয়ালা কখন পশার বিছিয়ে বসেছে। এরই মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে। কুলিরা ও ঠেলাওয়ালারা গঙ্গায় স্নান সেরে তার কাছ থেকে ছাতু কিনে খাচ্ছে। ঘড়ি দেখল মৃগাঙ্ক। উঃ বারোটা। খিদের পেট চোঁ চোঁ করছে।

চানা চাই বাবু? বড়িয়া দালবাঁউ? শশা? পাঁপড়? একজন ফেরী-ওয়ালা কানের কাছে কথা বলল।

কখন বাঁ-পকেটে হাত পুরেছে মৃগাঙ্ক।

—কি দেব বাবুজী? ফেরিওয়ালা নাছোড়বান্দা হোল।

—পেঁপে চার আনার! অস্ফুট কণ্ঠে বলল মৃগাঙ্ক।

ফেরিওয়ালা পেঁপের ঠোঁঙাটা বাড়িয়ে দিল। মৃগাঙ্ক তার হাতে অবশিষ্ট সিকিটা তুলে ধরল।

একবার সদ্য জলে ভেজানো লাল পেঁপের দিকে তাকালো সে। জিভের জল বুঝি ঝরে পড়বে। উঃ বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে তার! দুটো আঙ্গুল বাড়ালো একটুকরো পেঁপে মুখের সামনে ধরে। হঠাৎ পাশের বেঞ্চে দেখল একজন পুরুষ, একজন রমণী। বোধহয় দম্পতি। সম্ভবতঃ কলকাতা বেড়াতে এসেছে। অবাঙ্গালীই মনে হোল। টিফিন-বাক্স থেকে খাবার নিয়ে পরস্পর ওরা খাচ্ছে। চমকে উঠল মৃগাঙ্ক। পেঁপের ওপর থেকে আঙ্গুল দুটি সরিয়ে নিল। মনে পড়ল অস্পষ্ট স্মৃতিতে একখানি মুখ। মনে পড়ল এমনি করে আরও একদিন সে মায়ার ওপর রাগ করে এখানে এসে বসেছিল। নদী তার ভাল লাগে। আর ভাল লাগে জাহাজের ঐ বিচিত্র মুখগুলি। ওদের দেখতে দেখতে কোন স্বপ্ন-রাজ্যে সে চলে যায়। অথচ সেই মায়া—! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অসীমা কি করছে এখন? মেয়েদের অত রাগ ভাল না। করলামই বা একটু রাগ। তাই বলে ও-ও মুখ ঘুরিয়ে কথা শোনাবে? শোনাবেই তো? ও তো মায়া নয়?

—বাবু! একটি বাচ্চা। বছর আটেকের। হাত পেতে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। একটু খাব। ক্ষিধে পেয়েছে। বলল ছেলেটি।

বুকের মধ্যে কোথায় যেন খচ করে বিঁধে উঠল। অসীমা কি করছে। আহা! নিশ্চয় ওর ক্ষিধে পেয়েছে খুব। ব্যাচারা! ওরই বা দোষ কি? সবই তো করে। অতবড় সংসারের কাজ! নিজেকে কি ভাবেই না সঁপে দিয়েছে! কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয় মৃগাঙ্ক। না না। এ স্বার্থপরতা। ভীষণ স্বার্থপর অসীমা। আমি না হয় একটু রাগ করলামই। তাই বলে তার পাল্টা দিতে হবে?

—বাবু? ছেলেটির কণ্ঠে আবার সেই যাচ্ঞা!

মৃগাঙ্ক হাতের ঠোঁঙাটা আস্তে আস্তে ছেলেটির হাতে দিয়ে দিল। ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! ঠোঁঙা থেকে এক এক টুকরো পেঁপে কত আনন্দচিত্তেই না খেল সে!

মৃগাঙ্কের মনে হোল একটা মস্ত পাথর যেন এতক্ষণ কোথায় তার দেহে আবদ্ধ ছিল। শরীরটাকে এতক্ষণ মস্ত এক বোঝার মত মনে হচ্ছিল। এবারে সব হাল্কা হয়ে গেল।

পাশের সেই দম্পতির এতক্ষণ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওরা এখন গল্প করছে দুজনে। অপরাহ্নের ছায়া তখন আউটরামঘাট ছেড়ে গড়ের মাঠের দিকে এগোতে লাগল। মধ্যাহ্নের সেই ক্ষিধের ভাব একেবারে নেই। মৃগাঙ্ক দেখল জাহাজের মানুষগুলি কতই না কর্মচঞ্চল! কাজই যেন ওদের জীবন। এবারে মৃগাঙ্কের রাগ গিয়ে পড়ল গণপতিবাবুর ওপর। যত নষ্টের গোড়া তো সেই! লেখার জন্যে অত তাগাদা না দিলে কি ঐ ভোরে সে লিখতে বসত? লেখা! লেখা! লেখা! কি হয় লিখে? অসীমা কেন তাকে অত তাগাদা দিল? পরে লিখতে বসলেও তো হোত? না মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। ভাবতে পারে না মৃগাঙ্ক। আবার রাগ হয় অসীমার ওপর। রাগ করে সে না হয় বাইরেই পা বাড়ালো। তাই বলে সে কি মৃগাঙ্ককে চেপে ধরতে পারত না? সেকি বাধা দিতে পারত না? তাহলে কি এভাবে সারাটা দিন কাটাতে হোত?

ক্রমে সন্ধ্যে নেমে এলো গঙ্গার বুকে। রঙবেরঙী আলো জ্বলল এদিক-সেদিক। স্বামী-স্ত্রী, পরিবার, প্রেমিক-প্রেমিকা সব হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। কি উচ্ছলতা ওদের প্রাণাবেগে, মানুষের জীবনে এত প্রাণ! এত উচ্ছ্বাস! পীচ-ঢালা রাস্তার ওপর রঙবাহারীর ভিড়। আইসক্রীম, ডালবুট, বিচিত্র খাবার। দেখতে দেখতে কখন অন্ধকার ঘন হয়ে এল, মৃগাঙ্কের মনে হোল শরীরটা যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঘড়িতে রাত আটটা। ওঃ! বারো ঘণ্টা এর মধ্যেই কেটে গেল! না। এবার উঠতে হয়। পকেটে হাত দিল মৃগাঙ্ক। হাতে কিছুই বাঁধল না। সর্বনাশ। এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে।

টলতে টলতে চলতে শুরু করল। রাত প্রায় ন'টায় পৌঁছলো বাসায়। কড়া নাড়ল। দোর খুলল অসীমা। মৃগাঙ্ক একবার তার মুখের দিকে চাইল। মৃদু হাসল অসীমা, বলল, চল।

মৃগাঙ্ক নিজের ঘরে বসল। সমস্ত কিছু দেখল একবার। সমস্ত কেমন গোছগাছ করা। ধূপদান থেকে ধূপের ধোঁয়া তখনও ঘরখানায় একটা মৃদু সৌরভ বিস্তার করে রেখেছিল। মৃগাঙ্ক দেখল, অসীমা গামছা, সাবান এগিয়ে দিয়েছে। সে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুলো।

ঘরে এসে দেখল, গরম ভাত আর মাংস এক বাটি। মৃগাঙ্ক মাংস ভালবাসে। সারাদিন অনাহারের পর পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলি শেষ করতে সময় লাগল না। খাওয়া সেরে হাত ধুলো, পান এগিয়ে দিল অসীমা। পান খেল। সিগারেট এগিয়ে দিল। তাও ধরালো।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃগাঙ্ক খাটের ওপর বসল। অসীমা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করল।

মৃগাঙ্ক বলল, তুমি খাবে না?

অসীমা বলল, ক্ষিধে নেই।

সুরটা নরম করল মৃগাঙ্ক। রাগ এখনও পড়েনি। চলো। খাবে চলো। লক্ষ্মীটি!

না। থাক।

কিন্তু শুনল না মৃগাঙ্ক। নিজেই রান্নাঘরে গেল। হাঁড়িতে হাত দিল। আর চমকে উঠল। ভাত কই? সমস্ত বুক মুচড়ে উঠল তার।

—কাকার ছেলে মন্টু এলো একটু রাত করে। অসীমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—মন্টু? ছোটকাকার ছেলে?

—হ্যাঁ। অত রাতে আর বাজারে কে যায়? থাকগে। একটাই তো রাত!

এবারে নিজেকে আর সামলাতে পারল না মৃগাঙ্ক। দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে অসীমাকে! কেন? কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দাও বলতে পার? আর ঐ। ঐ গণপতিবাবু! না! লেখা ছাড়তে হবে। মায়াকে হারিয়েছি। অসীমা! তুমিও কি আমাকে ছেড়ে—? মৃগাঙ্ক অসীমার বুকে মুখ লুকিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এল।

মুখে হাত রাখল অসীমা মৃগাঙ্কের। ছিঃ অমন কথা বলো না। দিদি স্বর্গে গেছেন। আমি তো আছি। আর তোমার কোন দুঃখ হবে না।

মৃগাঙ্ক দেখল, টেবিল-ল্যাম্পের একফালি আলো আবার নেমে পড়েছে মায়ার মুখের ওপর। মৃগাঙ্ক পরিষ্কার দেখল, মায়া এবারে সত্যিই হাসছে।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

।। নয় ।।

বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের সাম্রাজ্যাভিষেকের পর বঙ্গভঙ্গ যখন নিবৃত্ত হলো, তখন ভারতের একটি শুভযুগের সম্ভাবনা সমাসন্ন। যুক্তবঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মহানগরী দিল্লী ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে মণ্ডিত হয়ে ভারতের রাজধানীরূপে অধিষ্ঠিত হলো। যদিও কলকাতা থেকে ভারতের শাসনকেন্দ্র পরিবর্তিত হলো, তথাপি উভয়-বঙ্গের পুনর্মিলনের ফলে কলিকাতার মানসিক আবহাওয়ায় বিষাদের কোনও চিহ্ন ছিল না। পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারের পর যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন এখানেও জনচিত্ত বহুবিধ উৎসবের মধ্যদিয়ে প্রচুর আমোদ-উল্লাসের পরিচয় দিয়েছে। খেলাধুলো, থিয়েটার, ঘোড়দৌড় প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের আসরও কম জমকাল হয়ে ওঠেনি। কলিকাতার স্থানীয় কলাকারদের মধ্যে কৃতী স্বরোদী কৌকভ খাঁ ও দুর্ধর্ষ-গায়ক বিশ্বনাথ রাও তখন যন্ত্র ও কন্ঠ সংগীতের আসরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এঁদের সংগীতানুষ্ঠানের পর আর কারও গান-বাজনা জমতো না। তবে এসময়ে ইমদাদ খাঁ সেতারী ও গয়ার বিখ্যাত খেয়ালী হনুমান প্রসাদজী কলিকাতায় নানা সংগীত-সভায় বিশেষ সমাদর অর্জন করতে পেরেছিলেন। হনুমানজী খেয়ালী হলেও এস্রাজের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সোনীপ্রসাদ এস্রাজ ও হারমোনিয়াম বাদনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঐ সময় গয়াতে এস্রাজযন্ত্রের বিশেষ চর্চা ছিল। ইতিপূর্বে কানাই ঢেড়ী গয়ায় এস্রাজযন্ত্রের বহুমুখী বাদ্য-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি এস্রাজে কন্ঠের অনুকরণে যেমন খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি বাজাতেন, তেমনই স্বরোদ ও সেতারের অনুকরণে আলাপ ও গৎ-কারীতেও যথেস্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ছড়ির যন্ত্রে মিজরাপ বা জবার পদ্ধতি প্রবর্তনের অনেকেই বিরোধী। বিশেষতঃ বর্তমানে এস্রাজে বা বেহালায় গান ছাড়া অন্য কিছু বাজালে অনেক সংগীত সমালোচকই অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু কানাই ঢেড়ীর পরও হনুমান প্রসাদ ও তাঁর শিষ্যগণ এস্রাজে তন্ত্রকারী পদ্ধতির নানা উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন। এঁদের মধ্যে গয়াবাসী বাঙালী ডাঃ ভেলুবাবু, বুলাকীরাম ও চন্দ্রিকাপ্রসাদজীর নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। চন্দ্রিকাপ্রসাদ আজও জীবিত আছেন। এঁরা ছড়িতে স্বরোদ ও সেতারের ন্যায়ই দ্রুত বোল প্রকাশ করতে পারতেন। কলিকাতার বিখ্যাত এস্রাজী কালী পাল স্বরোদী কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষালাভের পর এস্রাজে স্বরোদের বোল ও বাদ্যপদ্ধতি অবিকল প্রদর্শন করে গেছেন। ভারতগৌরব আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বেহালাযন্ত্রে গায়কী তান ছাড়াও স্বরোদের দুনী বোল ও ঠোক ঝালা যথেষ্ট বাজিয়েছেন।

বৃটিশ সম্রাটের কলিকাতা আগমনের সময় মদীয় পিতৃদেব ও শীতলবাবুর সহিত গয়াবাসী এস্রাজীদের সাক্ষাৎকার ও যোগাযোগ ঘটে এবং শীতলবাবুর অনুরোধে বাবা সর্বপ্রথম হনুমানপ্রসাদের নিকট নাড়া বেঁধে সংগীতে দীক্ষালাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শীতলবাবুও হনুমানজীর নিকট এস্রাজে দীক্ষিত হন। তবে হনুমানজী এখানে স্থায়ীভাবে থাকতেন না; তাঁর পুত্র সোনীবাবু মাঝে-মাঝে কলিকাতায় আসা-যাওয়া করতেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর ঠুমরীর আসরে স্বনামধন্য গিরিজাবাবুর সহিত সংগীতিক অনুষ্ঠানে সোনীবাবু প্রায়ই অংশ গ্রহণ করতেন। এই সময় থেকেই এস্রাজযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীতলবাবুকে একজন উৎকৃষ্ট এস্রাজীরূপে বিখ্যাত করার জন্য তাঁর ইচ্ছা বলবতী হয়ে ওঠে।

১৯১২ সালের পর শীতলবাবুকে ঢাকা থেকে এনে বাবা নিজ সহচররূপে কর্মে নিযুক্ত করেন। মাঝে-মাঝে তাঁকে গয়ায় এস্রাজ শিক্ষার জন্য পাঠাতেন এবং শীতলবাবুও তাঁর শিক্ষালব্ধ আলাপ ও গতের স্বরলিপি বাবার জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। বস্তুতঃ বর্তমানে আমাদের কাছে গান ও বাজনার যে বিপুল স্বরলিপি সংগ্রহ স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, তার সূত্রপাত হয় শীতলবাবু প্রদত্ত গয়ার তালিমযুক্ত খাতা থেকে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ সুরেলা সেতারীদের মধ্যে ইমদাদ খাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর নিজ দক্ষতাই শুধু এর কারণ নয়, তাঁর সুবিখ্যাত পুত্র এনায়েৎ খাঁ এক সময় ভারতের এক প্রধান সেতারীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। এনায়েৎ খাঁর দেহান্তের পর তাঁর পুত্র বিলায়েৎ খাঁ বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেশে-বিদেশে সেতারী হিসাবে প্রচুর সম্মান ও সমাদর লাভ করেছেন। বলা যেতে পারে যে, পুত্র ও পৌত্রের মধ্যদিয়েই ইমদাদ খাঁ সংগীত-জগতে সেতারের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে অমরত্ব লাভ করেছেন। ইমদাদ খাঁ ও তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির সহিত গৌরীপুর ঘরের এক সুনিবিড় সম্বন্ধ আজও অটুট রয়েছে। এই আত্মীয়তার সৃষ্টি হয় ১৯১৩ সাল থেকে। গয়ার হনুমানপ্রসাদজীর নিকট এস্রাজে দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পর আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে ইমদাদ খাঁর সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে। হনুমানজী গয়ায় স্থায়ীভাবে থাকতেন, তাই স্থায়ীভাবে এস্রাজ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাবা সাপ্তাহিক দুঘন্টা করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইমদাদ খাঁকে নিযুক্ত করেন। ইমদাদ খাঁ বাবাকেই শিক্ষা দিতেন শীতলবাবুকে নয়। কেননা

শীতলবাবু গয়ায় নিয়মিত যাতায়াতের দ্বারা সেখানকার শিক্ষা সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সংগীত সংঘের একটি আসরেই ইমদাদ খাঁ'র সহিত বাবার প্রথম পরিচয় ঘটে। যদিও ইমদাদ্ খাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে সভাবাদকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বাসের পর ইন্দোর রাজদরবারে চাকরী পেয়ে ইন্দোর চলে যান। তারপর বৃটিশ সম্রাটের কলিকাতা আগমনের সময় নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং দু-এক বৎসর কলিকাতায় থেকে যান। কিন্তু তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয় ইন্দোর দরবারে। ইন্দোরের সভাবাদক হিসাবে ১৯২০ সাল পর্যন্ত নানা সংগীত সম্মেলনে যোগদান ক'রে তিনি যন্ত্রসংগীতে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে গেছেন। ১৯১৩ সালে কয়েকমাসের জন্য আমাদের গৃহশিক্ষকপদে আমরা তাঁকে লাভ করেছি। তবে একথা স্মরণীয় যে ইমদাদ্ খাঁ'র চূড়ান্ত সম্মানলাভ ও কৃতিত্বঅর্জন কলিকাতা নগরীতে কোনদিনই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে সেতার ও সুরবাহারের উচ্চতম আসন সাজাদ মহম্মদের জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেনী বাজের আলাপ ও রেজাখানি গতের অতুল কীর্তি লাভ ক'রে গেছেন। তাঁর পরে দ্বিতীয় সেতারীর স্থানে ইমদাদ্ খাঁ ছিলেন। সাজাদ মহম্মদের মৃত্যুর পর গোবরডাঙার অধিপতি জ্ঞানদাপ্রসন্নবাবুর ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ সুরবাহার ও সেতারে সুর ও লয়ের চূড়ান্ত উৎকর্ষ প্রদর্শন ক'রে গেছেন। তাঁর সুরবাহারের মীড়ে খাঁচার পাখীও উল্লাসে নৃত্য করতো। ইমদাদ্ খাঁর প্রথম কলিকাতাবাসকালে মহম্মদ খাঁ ছিলেন সেতারের খলিফা। কেননা তিনি ছিলেন সাজাদ মহম্মদেরই শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। ইমদাদ্ খাঁ তাঁর সহিত প্রতিযোগিতার চেষ্টা না ক'রে ইন্দোরে চলে যান। সেখানে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ বীণকাররূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মোরাদ খাঁ, বাবু খাঁ, মজিদ খাঁ প্রভৃতির নাম সংগীত-ইতিহাসে আজও বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

পশ্চিম ভারতে সুরবাহারযন্ত্রের কোনও বিশিষ্ট শিল্পী তখন না থাকার দরুন ইমদাদ্ খাঁ ঐ অঞ্চলে সুরবাহারের জন্য একচ্ছত্র সম্মানলাভ করেন এবং সেজন্যই তাঁর কলিকাতায় দ্বিতীয়বার আগমনের পরও পশ্চিম ভারতের আকর্ষণে তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করতে হয়। ইমদাদ্ খাঁ সুরবাহারযন্ত্রে খানিকটা বীণাপদ্ধতি ও খানিকটা গোয়ালিয়র ঘরের খেয়ালের তানপদ্ধতি সম্মিলিত ক'রে এক অভিনব বাদন-পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। সেতারেও তিনি জয়পুরের সেনী ঘরানার শিক্ষার সহিত খেয়ালের তান-কর্তবের সমন্বয় সাধন ক'রেছেন। তাছাড়া নানা প্রকার তেহাইযুক্ত তানের পথও তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তিনি ছিলেন অতি কুশলী ও সুরেলা শিল্পী এবং তাঁর যন্ত্রসংগীত ছিল বিচিত্রপ্রকার পদ্ধতির সৌন্দর্যে সুশোভিত। তিনি অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং নিজেকে কোনদিনই সংগীতবিদ্যার নায়করূপে প্রচারের চেষ্টা করেননি। তিনি শ্রেষ্ঠ গুণীগণের সংগীত পরিবেশনের সময় অতি মনোযোগের সহিত সেই সমস্ত সংগীত শুনতেন এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রভাবে পূর্বশ্রুত উৎকৃষ্ট সংগীত সেতারে আদায় করবার চেষ্টা করতেন। আমার নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বাবার সংগৃহীত গয়াঘরের গৎ বা আমীর খাঁ স্বরোদীর গৎ তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে নিজের জন্য সংগ্রহ ক'রতে চাইতেন, এবং সে সকল গতের পদ কিছু কিছু পরিবর্তিত ক'রে জলসায় নিজ সেতারে অপূর্ব ঝংকারের সহিত বাজাতেন। সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে তিনি একটি ছোট এস্রাজ নিয়ে শেখাতে আসতেন। তাঁর যন্ত্রের ছড়ি ছিল কৃষ্ণবর্ণ রোমযুক্ত। আমার নয় বৎসর বয়সে তাঁকে দেখেছি। তাঁর প্রথম শিক্ষা ইমনের একটি প্রসিদ্ধ মসিদখানি গৎ, যা এখনও অনেকেরই সুবিদিত। আমার একান্ত অনুরোধে একবার তিনি সুরবাহারযন্ত্র নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। সেই সময়ে শীতলবাবু আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। ইমন ছিল তাঁর অতি প্রিয় রাগ। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ইমদাদ্ খাঁ সাহেব তাঁর বিখ্যাত ইমনকল্যাণের আলাপ সুরবাহারে বাজিয়ে শোনালেন। আসলে তাঁর ইমনকল্যাণ ইমন ভিন্ন আর কিছু নয়। কেননা খাঁটি ইমনকল্যাণে ইমন-শুদ্ধ কল্যাণ ও বিলাবল এই তিন রাগের সমন্বয় দেখা যায়। যাইহোক তাঁর ইমন আলাপ এখনও আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রয়েছে। তখন আমার বয়স মাত্র দশ। বাজনার তত্ত্ব বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। তবে এটা মনে আছে যে বিলম্বিত আলাপের সময় তিনি এরূপ সুমধুর ও নিখুঁত সুরেলা মীড়ের সন্নিবেশ করেছিলেন, যার তুলনা আমি আজও পাইনি। সান্ধ্যকালীন সেই অনুষ্ঠানে তিনি একজন তার-ওয়ালাকে সংগে এনেছিলেন। সে তাঁর সুরবাহার শুনতে শুনতে প্রথমে ঝিমনো শুরু করলো, পরে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে শুয়ে পড়লো। আমরা কিন্তু সজাগ ছিলাম; বিলম্বিতের পর তিনি খেয়ালের পাল্টা অনুযায়ী গমক-জোড় শুরু করলেন। তাঁর গমকের মধ্যে সুরের মাধুর্য সম্পূর্ণ বজায় ছিল—যা সচরাচর দেখা যায় না। জোড়ের পর তিনি ঝালা বাজালেন; তারপর আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "খোকা মহারাজ, এবার শুনবেন ঝড়াকি তান।" এই ব'লে তিনি ঝড়ের অনুকরণে লুড়ির বোলযুক্ত নানা তান শোনালেন। তাঁর ঝড়কি তান বাজাবার সময় ঘুমন্ত তারওয়ালার নাসিকা গর্জনও প্রবলবেগ ধারণ করেছিল। তাঁর তারের ঝড় থামলে তার-ওয়ালা কিছুক্ষণ পর জেগে উঠলেন ও বললেন,—খাঁ সাহেবের সুরবাহার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে বাজনা শেষ হ'লে আমি ও শীতলবাবু খাঁ সাহেবকে সম্বোধন ক'রে যা বলেছিলাম, আজও অকুণ্ঠিতচিত্তে তা প্রকাশ ক'রতে চাই।

"খাঁ সাহেব, আপনার এত সুরেলা মীড়ের যন্ত্রবাদন কখনও শুনিনি আর বোধ করি কখনও শুনতেও পাবো না।" সত্যি বলতে কি ইমদাদ্ খাঁ'র মত নিখুঁত সুরে মীড়গমকের বাজনা শোনার সৌভাগ্য আজও আমার ভাগ্যে ঘটেনি।

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

শিল্পী: শ্যামল দত্ত রায়

২৩শে নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসএ দেশের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের ১৩০টি ছবি এবং ভাস্কর্যের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। আমাদের দেশের শিল্পীদের অর্থ-সামর্থ্য অতি সামান্য। কিন্তু দেশের এই দুর্দিনে তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য তাঁদের শিল্প-সম্ভার উপস্থিত করেছেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

প্রদর্শনীতে গত ২৫।৩০ বছরে দেশের শিল্প কোথা থেকে কোন ধারায় বইছে তার এক নমুনা পাওয়া যায়। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীঅতুল বসু প্রমুখ প্রবীণ শিল্পী থেকে নবীন স্টুডিও গ্রুপ, সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস, ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটির শিল্পীবৃন্দ প্রভৃতি সকলেই আছেন। যদিও সব শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবির নিদর্শনগুলি এখানে রাখা যায়নি তবু মোটামুটি তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পবস্তু উপস্থিত করেছেন। পুরোনো একাডেমিক ধরণের ছবি থেকে আধুনিক রীতি পর্যন্ত সব রকমের ছবিরই কিছু কিছু নমুনা এখানে পাওয়া যাবে। এদিক থেকে প্রদর্শনীর একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।

শিল্পী: অরুণ বসু

গত ২৪শে নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসএ ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটির অন্যতম শিল্পী শ্রীঅনিমেষ নন্দীর একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল তৈলচিত্র এবং ড্রয়িং সর্বসমেত ২২ খানি ছবি নিয়ে। শ্রীনন্দী আধুনিক রীতির চর্চা করেন তবে সম্পূর্ণ বিমূর্ত শিল্প নয়। গঠনের সঙ্গে এখনো সম্পর্ক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রধানত ছবিগুলি অলংকার ধর্মী। ১, ২, ৩ এবং ১০ সংখ্যক ছবিতে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ কাজেই এখনো দ্বিধাসংকোচের ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আশা করি ভবিষ্যতে এঁর আরো উন্নত ধরণের ছবি দেখতে পাবো।

শিল্পী: অনিমেষ নন্দী

১৭ই নভেম্বর রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটিতে কালীঘাটের পটের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ৭৪টি রঙ্গীণ এবং এক রঙা ড্রইং নিয়ে এই প্রদর্শনী। এই ছবিগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণের ছবি। ইংরেজ রাজত্ব তখন কায়েম হয়েছে এবং

শিল্পী: অজিত চক্রবর্তী

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিদেশী সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠ হতে সুরু করেছে। লোকশিল্পের এই মাধ্যমেও তার ছাপ দেখা যায়। যেমন স্বচ্ছ জলরংএর ওয়াশ দেওয়ার পদ্ধতি। এটি মনে হয় বিলিতি ছবি থেকেই আমাদের দেশে এসেছে। আমাদের সাবেক আমলের ছবি, মোগল, কাংড়া, রাজপুত থেকে পুরোনো পটচিত্র প্রায় সবই সাদা মিশিয়ে টেম্পারা পদ্ধতির ধরনে আঁকা। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ ছাড়া রং দেবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিমাত্রিক গঠন ফোটাবার চেষ্টা লক্ষ্য করবার মত। এই প্রচেষ্টা কেবল-মাত্র রেখাঙ্কনগুলির মধ্যেও স্পষ্ট। প্রদর্শনীর ছবিগুলি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক ধর্ম সম্বন্ধীয়। যেমন শিব, দুর্গা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই প্রভৃতি। দুই জীবজন্তুর ছবি,

শিল্পী: মিলন মুখোপাধ্যায়

যেমন, বাঘ আর বাঘের মাসী, টিয়া, কাক, মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি এবং তৃতীয় হল সামাজিক সমালোচনাধর্মী ছবি যেমন, তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং এলোকেশী সংক্রান্ত ছবি, বারস্ত্রী এবং মদ্যাসক্ত বাবুদের ছবি ইত্যাদি। রঙীণ ছবির মধ্যে গলদাচিংড়ি (৬৮) পাকা হাতের কাজ। জাপানী টাচের কাজের কিছু কিছু গুণ যেন এতে বর্তমান মনে হয়।

ড্রইংএর মধ্যে 'যশোদার দুগ্ধ-দোহন (৩) প্রসাধন (১৬) সুরা ও নারী (৩১) মাছকোটা (৩৬) প্রভৃতি ছবিগুলির সাবলীল ও দ্বিধাহীন রেখাপাত দেখবার মত। আর ছবিগুলির প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে কোথায় যেন বাংলার লোকসঙ্গীত আর গ্রামীণ ছড়ার মেজাজের সঙ্গে একটা একাত্মতা আছে। আর সেই সঙ্গে বিশেষ ধরনের এক কৌতুক বোধ। এই শিল্পীরা হাসতে জানতেন। আজকালকার ছবি বড় বেশী সিরিয়াস্।

২৮শে নভেম্বর আর্টিষ্ট্রি হাউসে সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস্-এর চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী খোলা হল। এটি এই সংস্থার ৩য় বার্ষিক প্রদর্শনী। বহু বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে এই সংস্থা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গত এক বছরের মধ্যে এঁরা ১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীটে নিজেদের একটি স্টুডিও এবং গ্যালারী খুলেছেন এবং দশটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। সেদিক দিয়ে এঁদের কাজ প্রশংসনীয়।

বর্তমান প্রদর্শনীতে জলরং, তেলরং, গ্রাফিকস এবং ভাস্কর্য নিয়ে আঠারজন শিল্পীর ৪৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এবারে প্রদর্শনীতে ছবি আরো কঠোরভাবে বাছাই করা হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে ছবির মান আগের বছরের চাইতে উন্নত দেখা গেল। আর সমস্ত প্রদর্শনীই আগের চাইতে উজ্জ্বল মনে হল। অরুণ বসুর দুখানি ছবি 'দি এলিফ্যান্ট' (১), 'দি ক্যাচ' (২) তার বর্ণ সম্ভার এবং কম্পোজিশনের মৌলিকত্ব নিয়ে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্যামল দত্তরায়ের 'হ্যাঙিঙ্ ব্রিজ' (২৫) এবং 'বয়েজ এন্ড কাইটস্' (২৩)এর প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্যণীয়। বর্ণ প্রয়োগ সংযত, গম্ভীর এবং প্রকাশধর্মী, সনৎ করের 'ইন টিউন' (৩৯)এর কাব্য-ধর্মী অলঙ্করণ এবং অরুণোভ দত্তের 'ডিয়ার' (৭) চক্ষুতৃপ্তিকর। অনিলবরণ সাহা 'হোলি চার্চ' (৩) ছবিতে বিশেষ একটি মুড সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া অরুন্ধতী রায়চৌধুরী, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার দত্ত প্রভৃতি সকলেই একটা নিম্নতম মান রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। ভাস্কর্যের মধ্যে অজিত চক্রবর্তীর 'মাদারস প্রাইড' (৪২) সব-চেয়ে প্রশংসনীয়। গ্রাফিকসের মধ্যে সোমনাথ হোড়ের 'দি পীকক' একটি অনবদ্য সৃষ্টি এবং সুহাস রায়ের 'ব্রিজ' (২১) দর্শনীয়। আগামী বৎসর থেকে এঁরা একটি ছবি ধার দেবার লাইব্রেরী করছেন। এর ফলে সাধারণ লোকের কাছে শিল্পবস্তু সহজলভ্য হবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি। প্রদর্শনীটি ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছু অংশ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দেওয়া হবে।

২৮শে নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গৃহে ১৭খানি ছবি নিয়ে মোহেঞ্জোদারো গোষ্ঠির শিল্পী মিলন মুখোপাধ্যায়ের একক প্রদর্শনী সুরু হল। সমাজের নীচেরতলার অবহেলিত মানুষদের পরাভবের কাহিনী ছবিগুলির বিষয়বস্তু। তবে অঙ্কনরীতি দেখে ক্যাটালগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেল। লিখে না দিলে এছবি বোঝবার উপায় নেই। শিল্প যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করে বসে তবে দর্শকের ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটে। প্রদর্শনীটি ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ প্রতিরক্ষা তহবিলে দেওয়া হবে।
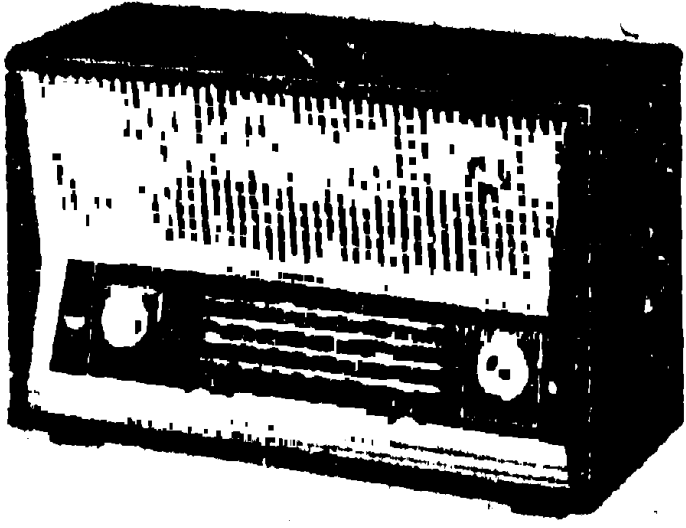
দেশে বিদেশে

॥ স্বাগতম ॥

পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি ডঃ হাইনরিখ লুবকে আজ ভারতের সম্মানিত অতিথি। সুপণ্ডিত ও ভারতবন্ধু এই রাষ্ট্র-নায়ককে আমরা স্বাগত জানাই। পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় ভারতের অনেক শিল্প-উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা আশা করব, এই মহান রাষ্ট্রনায়কের শুভাগমনে উভয় দেশের সম্পর্ক আরও নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে।

॥ চীনের প্রস্তাব ॥

২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রে চীনের পক্ষ হতে একতরফা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হয়, তারপর থেকে সীমান্ত সম্পূর্ণ স্তব্ধ। চীন তার ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে অস্ত্রসংবরণ করেছে, এবং ভারত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও চীনের বর্তমান কার্যক্রমে কোন বাধা দেয়নি। ১লা ডিসেম্বর থেকে চীনা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ করে "৭ই নভেম্বর, ১৯৫৯-এর কার্যত নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখার" সাড়ে বারো মাইল উত্তরে চলে যাওয়ার কথা। ২৮শে নভেম্বর তারিখেও কমিউনিস্ট চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ পিকিঙে এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছেন, চীন অবশ্যই ফিরে যাবে, এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে বিরোধের মীমাংসা হয়ে যায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইও ঐ সম্বর্ধনা সভায় পিকিঙস্থ ভারতীয় চার্জ দ্য এফেয়ার্সকে বলেন যে, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

চীনের সাম্প্রতিক আচরণ এমনই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যে, তার কথা সহজে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। শুধু ভারত নয়, ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী বহু দেশের শাসনকর্তারাই ভারতের সঙ্গে সমভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, শুধু মুখের কথায় চীনকে বিশ্বাস করা কোনমতেই উচিত হবে না। জার্মানীর চান্সেলর ডঃ আদেনাউর বলেছেন, শীতে চীন আর যুদ্ধ করতে চায় না বলে এই চাল চেলেছে, বসন্তে আবার তার আক্রমণ শুরু হবে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ ভারতের সাহায্যকারী পশ্চিমী মিত্ররা বলেছে, চীনের শুভেচ্ছার উপর ভরসা করে ভারতের গুটিয়ে বসে থাকা উচিত হবে না। তার প্রস্তুতিকার্যে এতটুকুও ঢিলে দেওয়া চলবে না। চীন আরও অধিক শক্তি অর্জনের জন্য এখন প্রস্তুত হচ্ছে। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের ইতিমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সমরাস্ত্র বৃটেন ভারতকে বিনামূল্যে সরবরাহ করবে। আমেরিকাও জানিয়েছে যে কোন সর্ত আরোপ না করেই সে ভারতকে অস্ত্র-সাহায্য করবে। মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান পুনরায় ভারতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, চীন-ভারত সংঘর্ষকে মালয় শুধু সীমান্ত সংঘর্ষ বলে মনে করে না। মালয় মনে করে যে, ভারত যদি নতি স্বীকার করে তবে চীনের পররাজ্যলোলুপ পররাষ্ট্র-নীতির দাপটে সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই কারণেই মালয় ভারতকে তার বিপদের দিনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ভারতকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে গঠিত মালয়ের 'গণতন্ত্র বাঁচাও' তহবিলে আড়াই লক্ষ টাকা চাঁদা উঠেছে।

বলা বাহুল্য, চীনকে বিশ্বাস করার মত কোন কাজই এখনও পর্যন্ত চীন করেনি। তবুও চীন যে এখন কিছুটা পিছু হটবে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে চীন ভারত আক্রমণ করেছিল, সে উদ্দেশ্য তার ইতিমধ্যেই পূরণ হয়ে গেছে এবং তার সিদ্ধান্তমত পশ্চাদপসরণের দ্বারা সে এতটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ভারতের কাছ থেকে সে যে জমি দাবী করেছিল তা সে ২০শে অক্টোবরের ব্যাপক আক্রমণের পর সতের দিনের মধ্যেই দখল করে নিয়েছিল। তারপর আরও তেরদিনে সে যা দখল করেছিল তা আজ ছেড়ে দিলে লাভ বই ক্ষতি কিছু হবে না। এর দ্বারা সে জগতকে দেখাতে পারবে যে, শক্তি তার যথেষ্টই আছে কিন্তু শক্তি দিয়ে সে কোন কিছুর মীমাংসা করতে চায় না, শান্তিই তার কাম্য। দ্বিতীয়ত, তড়িৎগতিতে কদিনের মধ্যে দুর্গম পর্বতের

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইনরিখ লুবকে ভারত সফরে এসেছেন

নয়াদিল্লীর বিমানঘাঁটিতে বৃটিশ সামরিক প্রতিনিধি দলের নেতা জেনারেল হালের সহিত জেনারেল চৌধুরীর আলোচনা।

বাধা অতিক্রম করে ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় সৈনিকদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত করে সে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের শক্তিবর্গকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে, চীন আজ দুর্মদ, দুর্নিবার। তার সামরিক শক্তির একটা পরিচয় বহির্জগতকে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল, এই সুযোগে সে তা দেখিয়ে নিতে পারল। ভবিষ্যতে এর জোরেই সে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে বশে রাখতে পারবে। একারণে এখন সংযত হওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ তার পক্ষে।

এসব দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় চীন আর এখন যুদ্ধ করবে না, এবার শান্তির কথা প্রচার করে সে ভারতকে অন্যদিক থেকে অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করবে।

॥ কূটনৈতিক তৎপরতা ॥

ভারতকে আক্রমণ করার সময় চীন বিশ্বের জনমতকে সামান্যই মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু কাজ হাসিল করার পর স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে ভারতের আগেই তৎপর হয়ে উঠেছে। ভারত তার কাছে দাবী জানিয়েছিল যে, যতদিন না চীন স্বেচ্ছায় ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরে যাবে ততদিন ভারত তার সংগে কোন আলোচনা করবে না। কিন্তু চীন আজ একতরফা যুদ্ধ-বিরতি করে জগতকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ত অনেক পরের কথা, তারা স্বেচ্ছায় ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর, অর্থাৎ, তিন বছর আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু তবু ভারত চীনের সংগে আপোষ করতে চাইছে না। সে আজ বিভিন্ন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে হাত মিলিয়ে এশিয়ার এই প্রান্তকে আর একটা বিশ্ব-যুদ্ধের সমরাংগনে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, এ প্রচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের মনোভাব ভারতবাসীর কাছেই এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়নি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ ত অনেক পরের কথা। গত ২০শে অক্টোবরের পর হতে আজ পর্যন্ত ভারত সরকার কোন মুখচিত্র প্রকাশ করে বা কোন বিবৃতি দিয়ে এদেশের লোককে বোঝাননি যে, দুইটি প্রস্তাবিত স্থিতাবস্থার তারিখের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি! যদি চীনের প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করে তবে ভারতকে আপাতত কতখানি ভূমির উপর অধিকার হারাতে হবে। আমরা না হয় ধরে নিতে পারি যে, আমাদের ক্ষতি হবে বলেই ভারত সরকার চীনের প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ, বা ওটা চীনের আর এক চালবাজী। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশও ভারতের প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হয়ে সমগ্র পরিস্থিতির বিচার করবে এতটা আমরা কিভাবে আশা করি?

এরপর আছে পশ্চিমী সাহায্যের প্রশ্ন। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র আজ যেভাবে ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তা কিছুদিন পূর্বেও এদেশবাসীর কল্পনাতীত ছিল। যদি তারা ওভাবে এগিয়ে না আসত তাহলে আজ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভারতের যে কি দুর্গতি হত তা আমাদের ভাবতেও ভয় হয়। দীর্ঘদিন যাদের মৈত্রীর উপর আস্থা রেখে ভারত নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তারা সকলেই কৌরবসভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদীর আর্তনাদের সম্মুখে অবিচল ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠিরের মত নীরব হয়ে রইল। সামান্য মুখের কথাটুকু প্রকাশ করেও ভারতকে সহানুভূতি জানাল না। ভারতের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে সাহায্যের পূর্বে অনেক কিছু সর্তও আরোপ করতে পারত পশ্চিমী শক্তিবর্গ। কিন্তু সে-সব কোন কিছু না করে ভারতকে সর্বশক্তি নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে তারা আজ গণতন্ত্রী জগতের কাছে সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণ করে দিল যে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণের বিরুদ্ধে তারাই প্রকৃত বন্ধু।

বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে, এবং এখন থেকেই আমাদের প্রকৃত মিত্রদের সহায়তায় এমন এক শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করতে

হবে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের এমন বিপর্যয়ে পড়তে হবে না।

॥ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ॥

নয়াদিল্লী হতে ২৮শে নভেম্বর প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, দেশবাসীর স্বেচ্ছাদানে ঐ দিন পর্যন্ত ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তা-ছাড়াও অলংকারসহ স্বর্ণ পাওয়া গেছে মোট ২১,৬১২ তোলা।

পশ্চিমবঙ্গ হ'তে ঐ সময়ের মধ্যে মোট সংগৃহীত হয়েছে ১,১০,২০,২১৬. টাকা ও ৫,৩০৪ তোলা সোনা। দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত দানে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ ইতিপূর্বে এদেশে কখনও সংগৃহীত হয়নি। এর দ্বারা এইটাই প্রমাণ হয় যে, শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও দেশের মানুষ দেশকে কত ভালবাসে। কিন্তু তবুও আমাদের জানা প্রয়োজন যে, জাতির প্রয়োজনের তুলনায় এ দান নগণ্য। আরও বহু দানের জন্য অমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনেও জাতীয় সরকারকে সাহায্য করার কাজে অগ্রণী হতে হবে।

॥ পাকিস্তানের মতিভ্রম ॥

ভারতের জাতীয় জীবনের বিরোধিতা করেই পাকিস্তানের জন্ম। সুতরাং ভারত যা করবে, বা যা করলে ভারতের ভাল হবে এমন সব কাজের বিরোধিতা করাই পাকিস্তানের আজন্ম অনুসৃত নীতি। ধর্মের ধুয়া তুলে পাকিস্তান স্বতন্ত্র হয়েছে, আজও সরকারীভাবে পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র। ইসলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং ইসলাম-বিরোধী সব কিছুই তার মতে রাষ্ট্র-বিরোধী। এই অপরাধে পাকিস্তানের হিন্দুরাও আজ নিজ বাসভূমিতে পরবাসী। এতদিন পাকিস্তানের আর এক রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল কমিউনিজম বিরোধিতা। সকল কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের সংগে পাকিস্তানের ছিল বৈরিতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল তার আশ্রয়।

কিন্তু যেদিন থেকে চীনের সংগে ভারতের সম্পর্কের প্রকাশ্য অবনতি ঘটতে আরম্ভ করল সেইদিন থেকেই দেখা গেল, নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে নিরীশ্বরবাদী কমিউনিষ্ট চীন ও ঐশলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মধ্যে। তারপর চীন যখন প্রকাশ্যে ভারত আক্রমণ করল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এল ভারতকে সাহায্য করতে, তখন রাতারাতি পাকিস্তানের সমগ্র পররাষ্ট্র-নীতিরই সমূহ পরিবর্তন ঘটে গেল। পাকিস্তান আবিষ্কার করে ফেলল, চীনের সংগে তার বন্ধুত্ব নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য! 'সেণ্টো', 'সিয়াটো' প্রভৃতি পশ্চিমী সামরিক আঁতাত থেকে নাম কাটিয়ে নেওয়ার কথাও নাকি পাকিস্তান চিন্তা করছে। ভারতকে যারা সাহায্য করে তারা আবার পাকিস্তানের বন্ধু কি? তার চেয়ে চীন তার অনেক ভাল বন্ধু।

এ ব্যাপারে আপাতত শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। কিন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা যখন কোনভাবেই হল না, তখন অচিরে তাকে চরম শিক্ষাই পেতে হবে।

তেজপুরে উপনীত যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ মিশনের সামরিক বিশেষজ্ঞদ্বয়। ছবির বাম হতে দক্ষিণে বৃটেনের ইম্পিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফের প্রধান, জেনারেল স্যার রিচার্ড হল এবং যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর জেনারেল পল এ্যাডামসকে দেখা যাচ্ছে

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২২শে নভেম্বর—৬ই অগ্রহায়ণ : পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা : ২১শে নভেম্বর মধ্য রাত্রি হইতেই উভয় রণাঙ্গনে (নেফা ও লডাক অঞ্চল) গুলী-বর্ষণের বিরতি—চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে বলিয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্রের উক্তি।

ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে সারা দেশে কমিউনিস্টদের (চীনপন্থী) ধর-পাকড়—দিল্লীতে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ (ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক) গ্রেপ্তার।

চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের সামরিক প্রয়োজন নির্ধারণে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক মিশনের দিল্লী উপস্থিতি—বৃটিশ দলের নেতা : স্যার রিচার্ড হাল (বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ) ও মার্কিন মিশনের অধিনায়ক : মিঃ এভারেল হ্যারিম্যান (মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব)।

২৩শে নভেম্বর—৭ই অগ্রহায়ণ : 'গুলী বন্ধ হইলেও আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই : যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা'—দিল্লীতে যুব কংগ্রেস আয়োজিত সমাবেশে শ্রীনেহরুর বাণী।

চীনা হানাদার উৎসাদনে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগের আহ্বান—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ।

জলপাইগুড়ি শহরে রাত্রিবেলা সতর্কতামূলক নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) সহিত বৃটিশ ও মার্কিন মিশনের বৈঠক।

চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া কংগ্রেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মন্তব্য—চীনা প্রস্তাবের অর্থ : নেফা ও পশ্চিম অঞ্চলে ভারতের সব কয়টি চৌকীই (৪৭টি) ছাড়িয়া দেওয়া।

ভারত কর্তৃক পিকিং-এর নিকট চীনা প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবী।

২৪শে নভেম্বর—৮ই অগ্রহায়ণ : সফরকারী বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধি দলের নিকট ভারতের অস্ত্র ও সমরোপকরণ চাহিদা (বেশ মোটা রকমের) পেশ—যুদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রী মিঃ ডানকান স্যাণ্ডসেরও দিল্লী আগমন।

শিলিগুড়ি শহরে ও ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে নিষ্প্রদীপ ঘোষণা।

২৫শে নভেম্বর—৯ই অগ্রহায়ণ : রণাঙ্গন পরিদর্শনের জন্য মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক মিশনের নেফা যাত্রা—প্রতিরক্ষা চাহিদা সম্পর্কে সরেজমিনে পর্যালোচনার আগ্রহ।

দিল্লীতে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রথম বৈঠকের অনুষ্ঠান—সামরিক বিষয়

ডিসেম্বর মাসে (১৯৬২) সোভিয়েট-'মিগ' বিমান পাওয়ার (পূর্ব প্রতিশ্রুত) সম্ভাবনা নাই—রাশিয়ার উপর চীন সরকারের প্রবল চাপ দিবার সংবাদ।

সে লা ও বমডি লার (নেফা অঞ্চল) মধ্যে আটক তিন সহস্রাধিক ভারতীয় সৈন্যের প্রত্যাবর্তন।

২৬শে নভেম্বর—১০ই অগ্রহায়ণ : 'চীনের ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গ বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপনের ইচ্ছা নাই'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

দেশরক্ষায় সামগ্রিক প্রস্তুতি হিসাবে সীমান্ত এলাকার সমর্থ লোকদের রাইফেল চালনা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

দিল্লীতে বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ স্যাণ্ডস-এর সহিত শ্রীনেহরুর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

ভারত সফরে আগত পশ্চিম জার্মান প্রেসিডেণ্ট ডঃ লুবকে কর্তৃক চীনের অবিমৃষ্যকারিতাপূর্ণ ভারত আক্রমণের নিন্দা জ্ঞাপন। চীনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে পিকিং সরকারের ব্যাখ্যা (ভারতের দাবীকৃত) দিল্লীতে প্রেরিত—ভারত সরকার কর্তৃক বিষয়টি বিবেচনা।

২৭শে নভেম্বর—১১ই অগ্রহায়ণ : চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতকে বৃটেনের বিনামূল্যে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা—দিল্লীতে বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

'চীনাপন্থী' কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তারের পর পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পুনর্গঠন—দলীয় সম্পাদক শ্রীভবানী সেন ও দলীয় মুখপাত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক পদে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী।

চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে ভারতীয় বক্তব্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ।

২৮শে নভেম্বর—১২ই অগ্রহায়ণ : লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারত প্রতিরক্ষা বিল গৃহীত।

বাংলার যশস্বী শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র (অন্ধগায়ক—বয়স ৭০) জীবনাবসান।

আটকাবস্থা হইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের মুক্তিলাভ।

॥ বাইরে ॥

২২শে নভেম্বর—৬ই অগ্রহায়ণ : 'চীনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব এশিয়া ও আফ্রিকাকে বিভ্রান্ত করার অভিসন্ধি : আসামের সমভূমি আক্রমণের প্রস্তুতিকল্পে সময় লইবার ফিকির মাত্র'—মার্কিন কূটনৈতিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য।

ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে লর্ড রাসেলের (বৃটিশ দার্শনিক) আহ্বান।

২৩শে নভেম্বর—৭ই অগ্রহায়ণ : এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়কদের নিকট চৌ এন লাই-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) বার্তা—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় সাহায্য করার আবেদন— আবেদনের আন্তরিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ।

২৪শে নভেম্বর—৮ই অগ্রহায়ণ : ভারতের বিরুদ্ধে চীনের নয়া ষড়যন্ত্র—প্রেসিডেণ্ট আয়ুবকে (পাক প্রেসিডেন্ট) চীনের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের আহ্বান—পাক সরকারের নিকট পিকিং-এর পত্র।

২৫শে নভেম্বর—৯ই অগ্রহায়ণ : শ্রীমতী বন্দরনায়ক (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক কলম্বো-এ আফ্রো-এশীয় ছয়টি রাষ্ট্রের (সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া, ঘানা ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা।

লর্ড রাসেলের নিকট চৌ এন লাই-র তারবার্তা—চীনা প্রস্তাব গ্রহণে শ্রীনেহরুকে রাজী করাইবার জন্য অনুরোধ।

২৬শে নভেম্বর—১০ই অগ্রহায়ণ : জেনেভায় পুনরায় ১৭ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসায় সাহায্যার্থে ইন্দোনেশিয়ার নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রীর (মিঃ চৌ) ধর্ণা।

২৭শে নভেম্বর—১১ই অগ্রহায়ণ : সিংহলে প্রস্তাবিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলন (শ্রীমতী বন্দরনায়কের প্রস্তাব অনুযায়ী) অনুষ্ঠানের জন্য চীনের চাপ—নাসের (আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট) সমেত বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের নিকট চৌ-এর লিপি।

চীনের প্রেমে পাক শিল্পমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর গদগদ ভাব—পিকিং প্রস্তাবিত অনাক্রমণ চুক্তি গ্রহণের পক্ষে নানা যুক্তি হাজির।

২৮শে নভেম্বর—১২ই অগ্রহায়ণ : কায়রো-এ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত ভারতের আইন মন্ত্রী শ্রী এ কে সেনের বৈঠক—শ্রীসেন কর্তৃক চীন-ভারত প্রসঙ্গে ভারতীয় বক্তব্য জ্ঞাপন।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ সক্রিয় প্রতিরোধ ॥

মহাকবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গ সুরু করেছেন যে দুটি লাইন দিয়ে ভারতের সীমারেখা বর্ণনার এত সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর উক্তি আর দেখা যায় না—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো
নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ
পৃথিব্যা ইব মানদন্ডঃ॥"

অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক, পৃথিবীর মানদন্ডের ন্যায় বিদ্যমান, দেবতাদিগের অধিষ্ঠানভূমি এক বিরাট পর্বত ভূমন্ডলের উত্তর দিক জুড়ে আছে, তার নাম হিমালয়, এতবড় পর্বত আর নেই, সেই ভূধর পর্বতকুলের রাজা কুমারসম্ভব দেবতাদের প্রধান সেনাপতি কার্তিকের জন্মকাহিনী। পুণ্যভূমি হিমালয়, কৈলাসের শিবের আবাস, তাঁর সহধর্মিণী পার্বতী হিমবানের কন্যা, তাই তিনি গিরিজাসুতা হৈমবতী। বদ্রিনাথে আছেন নারায়ণ, আর কেদারে মহেশ্বর। এরমধ্যে আছে গঙ্গোত্রী ভারতে পুণ্য-সলিলা নদীগুলির উৎস, যে যমুনা তীরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাপ্রকাশ করেছেন সেই যমুনারও উৎস এই হিমালয়। আমাদের দেশের সাধকবৃন্দ যুগে যুগে এই হিমালয়ে তপশ্চর্যা করেছেন। কালিদাস বলেছেন হিমালয় পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক (অর্থাৎ উভয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত) এই পর্বত এবং শেষ লাইনই বিশেষ অর্থপূর্ণ—ভারতীয় মহাদেশের সীমারেখা নির্দেশের যেন মানদন্ড এই পর্বত।

আমাদের জাতীয় জীবনে, সাহিত্যে, পুরাণে উপকথায় এই পর্বত জড়িয়ে আছে, সেই দেবতাত্মা হিমালয়ের সুমহান ঐতিহ্য আজ শত্রু আক্রমণে বিঘ্নিত। এই পবিত্রভূমিতে বর্বর আক্রমণকারী রাত্রির অন্ধকারে হানা দিয়েছে, হিমালয় ভারতের ভূগোলের একটি অংশ মাত্র নয়, আমাদের অমর সংস্কৃতির একটা অংশ, আমাদের ধর্মের চিরন্তন উৎস, আমাদের আত্মার আশ্রয়, আর হিন্দুর দেব-দেবীর পবিত্র বিচরণভূমি।

এই অঞ্চলে আক্রমণের অর্থ, আমাদের যা কিছু পবিত্র, যা কিছু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাকে ধ্বংস করা, যদি ভারতীয় সংস্কৃতির বিনাশ ঘটে, তাহলে ভারতের মৃত্যু।

জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ সত্যম, শিবম, সুন্দরম এই মন্ত্রের আমরা উপাসক, আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মের স্থান সবার উপরে—সেই ধর্মের নাম চিরন্তন ন্যায়। আমরা 'অস্তেয়', চুরি না করা, 'অপরিগ্রহ' অর্থাৎ অপরের জিনিষ অধিকার না করার নীতিতে বিশ্বাসী ভারতবাসী, আমাদের সম্প্রসারণে রুচি নেই, অপরের দ্রব্য গ্রহণের বাসনা নেই। এই আমাদের জাতীয় শিক্ষা। তাই আমাদের কাছে জননী আর জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমাদের যা কিছু শক্তি, যা কিছু সঞ্চয় সবই সেই স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যয় করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন..."বন্দেমাতরম্।

—মাতা-কে ? এ তো দেশ, এ তো মা নয়।

—আমরা অন্য মা জানি না, আমরা বলি জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি।"

সারা ভারত আজ ধর্মক্ষেত্র, আর পবিত্র দেবভূমি হিমালয় আজ কুরুক্ষেত্র, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত!"—অতএব ওঠো, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। জেনারেল কারিয়াপ্পা বাঁকুড়ায় এক সভায় বলেছেন যে "মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার্থে চীনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে ধর্ম-যুদ্ধ বলা উচিত। আমাদের জন্মভূমি অশোক ও চন্দ্রগুপ্ত এবং শিবাজী ও রাণা প্রতাপকে জন্ম দিয়েছে, এইসব বিরাট পুরুষদের আমরা উত্তরাধিকারী, কম্যুনিষ্ট চীনের ভ্রূকুটিতে আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়া চলে না।" তাই যুদ্ধ সম্পর্কে আবার অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা উধৃত করছি—"তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ।" "অর্জুন, উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হও।" এই আদেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবাসীর মর্মমূলে অনুরণিত। তাই যখন যুদ্ধের আহ্বান এল তখন যুধিষ্ঠিরের মত ভদ্র এবং মহাশয় ব্যক্তি-ও যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছেন। ভীষ্ম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কিন্তু রণে তাঁর চরিত্রের ভয়ঙ্কররূপ প্রকাশিত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীষ্ম প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীবৃন্দ যুদ্ধের মধ্যে যে ন্যায় আছে তা স্বীকার করেছেন, ন্যায়ের পথ ও প্রভাব বিস্তারে যুদ্ধ যেখানে অপরিহার্য সেখানে যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় বৌদ্ধ যুগে অজাতশত্রু ও বিম্বিসার যুদ্ধ করেছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও যুদ্ধ করেছেন। কলিঙ্গ জয়ের কাল পর্যন্ত—

অশোক দিগ্বিজয় করে বেড়িয়েছেন, কলিঙ্গের পর আর কিছু করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁর উত্তরাধিকারী পুষ্যমিত্র মৌর্য সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। হূন, আফগান, তুর্কী ও মোগলরা যখন ভারত আক্রমণ করেছে তখন ভারতবাসীরা বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছে। রাণা সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, চৌহান, রাণা প্রতাপ, শিবাজী মহারাজ, গুরু গোবিন্দ সিংহ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পবিত্র নাম, স্মরণীয় নাম। যখন ঔরংজেব তাঁর পূর্বগামীদের শান্তির পথ পরিত্যাগ করে সংঘর্ষে মেতেছেন তখন পাঞ্জাব, রাজস্থান, ও মহারাষ্ট্র এমন তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের পতন সম্ভব হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতবাসী ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মেতেছে, সাফল্য লাভ না করলেও ভারতের মানুষের মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনা।

আজ চীনা শত্রুর প্রতিরোধে বাংলার সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ অগ্রণী হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—

"তোমার কাছেই ঋণী হলাম
বিষকীটচক্র কপটতার!
তোমার বৃশ্চিক পুচ্ছই
আমার শান্ত শোণিত স্রোতে
এনেছে তপ্ত দুর্বার বন্যা-বেগ,
আমার অসন্দিগ্ধ শৈথিল্য
দিয়েছে ঘুচিয়ে।।"

ভারতের অসন্দিগ্ধ শৈথিল্য আজ চীন এক আঘাতে ঘুচিয়ে দিয়েছে। ভারতের জাড়িমার ঘোর কেটে গেছে।

অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—

"—রে দুর্বৃত্ত, বণ্ডক বর্বর
জেনে রাখ এ মাটিতে তোদের কবর।।"

ভারতের মাটিতে সম্প্রসারণশীল বণ্ডক বর্বর চীনের সমাধি রচিত হোক।

এঁরা দুজন ছাড়া জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আরো অনেকেই হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই লিখবেন। যেমন 'অমৃতে'র বর্তমান সংখ্যাতেই প্রকাশিত হচ্ছে 'বনফুলের' একটি অনবদ্য কবিতা।

অপেক্ষাকৃত তরুণতর, কিন্তু খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার ও আশিস সান্যালের কবিতা। অন্যত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার ও সুনীল মুখোপাধ্যায়।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অকটোবর নভেম্বরের মধ্যে বাংলার কবিরা যেসব কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে আছে প্রতিরোধের সুর। সে সুরে সারা দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে হবে, স্বদেশের জন্য শেষ রক্তবিন্দু ব্যয় করতে হবে একথা আজ স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন।

নতুন বই।

লেদ সেপিং ও মিলিং শিক্ষা—
সোমনাথ দাঁ। বসু চৌধুরী, ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯।

আধুনিক শিল্প যদিও নানা জটিল যন্ত্রের উদ্ভাবনায় ও প্রবর্তনে ক্রমেই স্বয়ংক্রিয়তার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, কিন্তু মেশিনটুল এখনো পর্যন্ত অপ্রচলিত নয়। বরং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটুলেরও অতি দ্রুত উন্নতি হয়ে চলেছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে ভারী শিল্পের পাশাপাশি যদি মাঝারি ও ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হয় তাহলে মেশিনটুলের চাহিদা খুবই বেশি হবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য মেশিনটুলের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মেশিনিস্ট ও মেশিনচালকও প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশের নানা স্থানে পলিটেকনিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেমন হাতে-কলমে কাজ করতে শেখেন, তেমনি বই পড়েও শেখেন। যে-দেশের কারিগরদের যতো বেশি বই পড়ার সুযোগ আছে সে-দেশের কারিগররা ততো বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। আমাদের দেশের একজন কারিগরের চেয়ে একজন ইংরেজ বা জার্মান বা রুশ কারিগরের দক্ষতা যে অনেক বেশি, তার কারণ ওইসব দেশের কারিগরদের জন্যে মাতৃভাষায় অজস্র বই লিখিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত টেকনিকাল বিষয়ে মাতৃভাষায় বই রচনা করার রেওয়াজ তেমনভাবে শুরু হয়নি। অথচ আমরা যদি চাই যে আমাদের দেশে কলকারখানার প্রসার শুরু হোক তাহলে এ-দায়িত্ব যতো শীঘ্র পালিত হবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। শ্রীযুক্ত সোমনাথ দাঁ বাংলা ভাষায় লেদ সেপিং ও মিলিং শিক্ষা সম্পর্কিত

বইটি রচনা করে সত্যিকারের দেশ-হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন।

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিত একটি ভূমিকা বইয়ের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। এই ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "কি ইন্‌জিনিয়র কি কারিগর সকলকেই প্রয়োগশালায় শিক্ষানবিশী করতে হয়। নিজের হাতে যন্ত্র চালাতে হয়, যাতে সে শিখতে পারে নানা যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। তবে আমাদের কারিগররা সব সময় ইন্‌জিনিয়রের মত উচ্চশিক্ষিত হয় না। ইংরাজী লেখা বই বুঝতে অনেক সময় তাকে বিব্রত হতে হয়। এদিকে নিপুণ কর্মী হতে গেলে গতানুগতিক-ভাবে যন্ত্রাগারে মাস্টারের কাছে সাগরেদী করে শিখলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বিদ্যা আয়ত্ত হবে না—চাই নিজে পরিশ্রম করে ঘরে বসে নানা বই পড়ে নিজের জ্ঞান বাড়ান—"

শ্রীযুক্ত সোমনাথ দাঁ-র লেদ শেপিং ও মিলিং শিক্ষা এমনি ঘরে বসে পড়বার মতো একটি বই। বইটির ভাষা প্রাঞ্জল, উপস্থাপনার ভঙ্গি জটিলতাবর্জিত। প্রচলিত ইংরেজী টেক্‌নিকাল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করার চেষ্টা হয়নি—এতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাই হবে। আশা করি বইটির বহুল প্রচার হবে এবং এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যরাও বাংলায় টেক্‌নিকাল বিষয়ের বই লিখতে উৎসাহিত হবেন।

ঢেউ কথা কয়— (গল্প সংগ্রহ) **সুভাষ সমাজদার। ভারতী বুক স্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দু-টাকা।**

শ্রীসুভাষ সমাজদারের 'ঢেউ কথা কয়' একখানি অভিনব বই। একাধারে এতে প্রত্নতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, উপকথা, ইতিহাস ও ছোটগল্পের সমাবেশ হয়েছে, আবার সব কিছুকে অতিক্রম করে মূর্ত হয়েছে লেখকের একটি জাগ্রত কবি-কল্পনার সুরও, যা চিরায়ত সাহিত্যের বস্তু। দীঘির 'দেশ' দিনাজপুরে দীঘি দেখা যায় যেমন অসংখ্য, তেমনি লোক-মুখে শুনতে পাওয়া যায় এই দীঘি-গুলোকে কেন্দ্র করে সুপ্রাচীনকাল থেকে গড়ে-ওঠা বিচিত্র কিম্বদন্তী, উপকথা ও ইতিবৃত্ত। সেগুলোকেই লেখক গ্রথিত করেছেন এই বইয়ে, মনোরম গল্পের ভাষায় পরিবেশন করেছেন। প্রত্যেকটা লেখার মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে ফুটেছে যেমন তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা, তেমনি কথা-সাহিত্যিকের কুশলী কলমও স্বাক্ষর রেখেছে তাঁর ছত্রে ছত্রে। বাংলাভাষায় এইভাবে হাট, মেলা, মঠ ও মন্দিরকে বেষ্টন করে যে সমস্ত লোকবৃত্ত ও কল্পকথা জনারণ্যে ছড়িয়ে আছে, তা সংগ্রহ করার প্রয়াস এর আগেও কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু রসোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে প্রকাশমান হয়েছে তার কমই। সুভাষ সমাজদারকে স্বাগত জানাচ্ছি, প্রথম এই পথের সফল পথিক-রূপে। বাণরাজার কাহিনী, যশোমতীর কাহিনী, দীবোর (দিব্যক?) কাহিনী... কত বিচিত্র কাহিনীরই পসরা মেলে ধরেছেন তিনি এবং তা সাজিয়েছেন কি নিপুণ গল্পের পোষাকে! পুরাতনের কঙ্কাল যেন নবজীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে লেখাগুলির মধ্যে এবং সেকালকে দিয়েছে একালের সঙ্গে সংযুক্ত করে! বইটির যোগ্য সমাদর কামনা করি।

ঊর্মিমালা—(উপন্যাস) **অসিত গুপ্ত। করুণা প্রকাশনী। ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—বারো। দাম তিন টাকা।**

অসিত গুপ্ত ইতিপূর্বে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর 'এই সব আলো প্রেম' গ্রন্থখানির প্রশংসা করেছিলাম আমরা। সে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ছিল—লেখক যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। এবং গ্রন্থখানি বাঙলা উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ পাঠে আমাদের সে ধারণা সার্থক হোল না। চরিত্রচিত্রণ খুবই দুর্বল। লেখক গ্রন্থখানি কোথাও কোথাও ইচ্ছাকৃতভাবে শ্লীলতার বাইরে নিয়েছেন বলে মনে হল।

গ্রন্থখানির বাঁধাই, প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ চমৎকার।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

নর্বাদগন্ত (বাঙলা) : শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, ৩৬৫৪ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ : প্রযোজনা : শিশিরকুমার মল্লিক; কাহিনী : ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ('নতুন দিনের আলো' নামে উপন্যাস); পরিচালনা : অগ্রদূত; চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা; শব্দানুলেখন : যতীন দত্ত; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশ : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ণ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, শীলা পাল, সাধনা রায়চৌধুরী, আরতি দাস, রাখী মজুমদার, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, এস ম্যালকম্, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৯এ নভেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"নর্বাদগন্ত" কাহিনীতে এমন একটি সামাজিক প্রশ্নকে তুলে ধরা হয়েছে, যার কোনো সদুত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। সামাজিক বা আইনগত স্বীকৃতিধন্য নয়, এমন যৌনমিলনের ফলে যদি কোনো সন্তানের জন্ম হয়, আমাদের সমাজ-জীবনে তার স্থান কোথায়? যে-ছেলে বা মেয়ে নিজের জন্মদাতা পিতার নাম জানেনা, কোন্ অপরাধে সে সতীর্থদের কাছে বা লোকসমাজে উপহসিত হয়? নিজে কোনো রকম অপরাধে অপরাধী না হয়ে সে অগৌরবের ভাগী হবে কেন? আজকের দিনে যখন অপরিণামদর্শিতার ফলে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব আমাদের সমাজ-দেহকে কন্টকিত করছে প্রতি নিয়তই, তখন এ-ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে কাহিনীকার এবং চিত্র-প্রযোজক একটি নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যেভাবে এবং যে-বয়সে ডাঃ সমীর ভট্টাচার্য এবং রুচিরা ধীরে ধীরে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে, সেখানে রেজেষ্ট্রী ক'রে তাদের বিবাহকার্যটি সময় থাকতেই সমাধা না হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক লেগেছে এবং সেই কারণেই রুচিরার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বকে সমর্থন জানানো সহজ নয়। রুচিরার বাবার মৃত্যুর পর থেকে ডাঃ সমীর ভট্টাচার্যের চেষ্টায় ও সাহায্যে রুচিরা যখন প্রথমে নার্স, পরে সিনিয়র নার্স এবং সবশেষে ডাক্তারী পর্যন্ত প'ড়ে পরীক্ষা দেয়, তখন অতখানি সময়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওরা কেন নিজেদের মধ্যে বিবাহ-অনুষ্ঠানটিকে সম্পন্ন করেনি, তার কোনো সদুত্তর নেই। মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম এলেই যে বিবাহ রেজেস্ট্রি না ক'রেই চলে যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এমন কথা তাঁরাই বলতে পারেন, বাস্তব জীবনে যাঁদের অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই। এবং মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশে গিয়ে যে-পরিস্থিতিতে সমীর ডাক্তার আর কলকাতায় ফিরতে পারল না বা রুচিরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারল না, তাকেও খুব স্বাভাবিক ব'লে গ্রহণ করতে না পারাই স্বাভাবিক। এ-ছাড়া এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট ও পি-আর-এস উপাধিধারী কলেজ প্রোফেসার গৌতমকে রুচিরার অবৈধ সন্তান, আইএ ক্লাশের ছাত্রী লিপিকার সঙ্গে যে-ভাবে প্রেম করতে দেখানো হ'য়েছে, তা যে-কোনও তরুণ কলেজ-প্রোফেসারের কাছে বিসদৃশ এবং আপত্তিকর ব'লে বোধ হবে। তাই প্রথম থেকেই অধ্যাপক গৌতমকে তাঁর আই-এ ক্লাশের ছাত্রী লিপিকার প্রেমে ডগমগ হওয়াকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি।

কাহিনীর এই অস্বাভাবিকতাকে উপেক্ষা করতে পারলে "নর্বাদগন্ত" ছবিটি অপরাপর দিক দিয়ে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। চিত্রনাট্যের মধ্যে যে-ভাবে দু'টি ফ্ল্যাশব্যাকের অবতারণা করা হয়েছে, তা শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক। বিভূতি লাহার চলচ্চিত্রায়ণ ছবিটিকে একটি উজ্জ্বল সুষমাসম্পন্ন করে তুলেছে এবং তাঁকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করেছেন শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী। শব্দানুলেখনে যতীন দত্ত সর্বত্র একটি উচ্চমান বজায় রেখেছেন। গানগুলি অত্যন্ত দীর্ঘায়ত এবং সুরের মধ্যে নূতনত্ব না থাকলেও প্রত্যেকটি গানই সুগীত।

"নর্বাদগন্ত"-এর প্রতিটি শিল্পী নিজের নিজের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বহুদিন পরে বসন্ত চৌধুরী একটি উপযোগী ভূমিকায় তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও দরদী অভিনয় দেখাবার সুযোগ পেয়ে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন; বিশেষ করে প্রৌঢ় ডাঃ সমীরের বেশে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং স্মরণীয়। রুচিরার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন; তাঁর চরিত্রের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সহানুভূতিশীল চিকিৎসকরূপে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছবির প্রেমিক-প্রেমিকা অধ্যাপক গৌতম ও ছাত্রী লিপিকার ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায় তাঁদের সাবলীল অভিনয়ের দ্বারা চরিত্র দু'টির দাবি পূর্ণ করেছেন; আবেগপূর্ণ দৃশ্যগুলিতে তাঁদের আন্তরিকতা দর্শক-চিত্তকে উদ্বেলিত করে। অপরাপর ভূমিকায় সকলেই যথাযোগ্য অভিনয়ে ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

এই কলাকৌশলসমৃদ্ধ ছবিটির মাধ্যমে বর্তমান সমাজ জীবনের একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন সার্থকভাবে তুলে ধরবার জন্যে আমরা ছবির প্রযোজক এবং পরিচালকবৃন্দকে সাধুবাদ জানাই।

মনমৌজি (হিন্দী) : এ. ভি. এম-এর নিবেদন; ৪,১১১ মিটার দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ. ভি. মায়াপ্পান; কাহিনী : কে. ভি. রেড্ডী, ডি. ভি. নরশরাজু এবং ডি. মধুসূদন রাও; পরিচালনা : কৃষ্ণন পঞ্জু; সঙ্গীত পরিচালনা : মদনমোহন; গীতিরচনা ও সংলাপরচনা : রাজেন্দ্র-কৃষ্ণন; আলোকচিত্র পরিচালনা : এস. মারুতিরাও; আলোকচিত্র গ্রহণ : ডি. পুণ্যকোটি; শব্দানুলেখন : এস. পি. কার্তার; শিল্পনির্দেশনা : এইচ.

শান্তারাম; সম্পাদনা ঃ এস, পাঞ্জাবী ও আর, বিঠল; রূপায়ণ ঃ সাধনা, নাজ, লীলা চিটনীজ, দুর্গা খোটে, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, অচলা সচদেব, ভারতী রায়, কিশোরকুমার, প্রাণ, আনওয়ার হোসেন, অসীমকুমার, সুন্দর, মোহন চটি, ওম প্রকাশ, মাস্টার সরোশ প্রভৃতি। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৯এ নভেম্বর থেকে ওরিয়েন্ট, বীণা, বসুশ্রী, কৃষ্ণা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সেক্সপীয়র বলেছেন, পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিসই ঘটে, যা কবির কল্পনাকে হার মানিয়ে দেয়। তাই ছোট্ট ছেলে রাজা তার মরণাপন্ন গরীব মায়ের ওষুধের দাম সাত টাকার বদলে তার সম্বল পাঁচটি টাকা দিতে চেয়েও না পেয়ে ওষুধের শিশিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং এই অপরাধে সাজা পেয়ে শিশু-অপরাধীর সংশোধনাগারে প্রেরিত হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে সে শোনে, তার মা ইত্যবসরে মারা গেছেন এবং তার একমাত্র ছোট-বোন লক্ষ্মীকে একটি অনাথ আশ্রমে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনাথ আশ্রমের দ্বাররক্ষক মিথ্যা কথা ব'লে তাকে যখন তাড়িয়ে দেয়, তখন সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে এক কৃপণ বড়লোকের বাড়ীতে। সেখানে থাকতে থাকতেই এক দুর্বৃত্তের হাত থেকে সে সাঁঝওয়ালী রাণীকে রক্ষা করে। রাজা ও রাণীর বন্ধুত্ব যখন ভালোবাসায় পরিণত হচ্ছে, তখন রাজা তার বোন লক্ষ্মীর সন্ধান পায় সেই অনাথ-আশ্রমে। সেখানে তাকে মিথ্যে ক'রে বলতে হয়, সে ব্যবসায়ী এবং ধনী। লক্ষ্মী কলেজে পড়ায় সাহায্যের জন্যে সে তার মনিববাড়ী থেকে তিনশো টাকা এবং মনিবকন্যার বিবাহের জন্যে কেনা দামী শাড়ী ও কিছু গহনা এনে লক্ষ্মীকে দেয়। কিন্তু যখন সে ঐ জন্যে ধরা পড়ে আবার জেলে যায় তখন দুঃখে অনুশোচনায় লক্ষ্মী আশ্রম ত্যাগ করে। জেল থেকে আবার ছাড়া পেয়ে সে এক জায়গায় মোটর-ড্রাইভারের কাজ নেয়; কিন্তু যখন দেখে, তারই আদরের বোন সেই বাড়ীর ছোট ছেলের বৌ হ'তে চলেছে, তখন সে ড্রাইভারের কাজ ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে ওখানেও সে পায় চোর অপবাদ। তার ওপর তার আগেকার কৃপণ মনিব যখন টের পায়, তার বোনের সঙ্গে সেই ডাক্তার ছেলেটির বিয়ে হচ্ছে, যে তার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়নি, তখন কৃপণ ঐ বিয়ে ভেঙে দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। কিন্তু এখানেও দৈবের গুণে কৃপণ হ'ল নিহত এবং সন্দেহের বশে রাজু পড়ল ধরা। এরপর আসল দুর্বৃত্ত ধরা প'ড়ে নিরপরাধ রাজু কেমন ক'রে ছাড়া পেয়ে তার প্রেমিকা রাণীর সঙ্গে মিলিত হ'ল, তাই নিয়েই গল্পের শেষ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে। "মনমৌজি" কথাটার অর্থ হয়ত মন যার প্রতি মজে; সেই ব্যক্তি অর্থাৎ মনের মানুষ। এ-ক্ষেত্রে রাজা ও রাণী হচ্ছে পরস্পরের মনমৌজি।

প্রযোজক মায়াম্পান চিত্রপ্রিয় দর্শকদের বেশ ভাল রকমই চেনেন। তাই তিনি তাদের সব রকমে ভালো লাগবার মতো করেই তাঁর জনপ্রিয় ছবিগুলি প্রস্তুত করেন; দর্শকচিত্তজয়ী সব কটি বাণকেই তিনি তাঁর ছবিতে কায়দা-মাফিক নিক্ষেপ করেন এবং তার কোনোটাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। দর্শক সহানুভূতি লাভের উপযোগী চরিত্রে ভরা কাহিনীর মধ্যে আনন্দ ব্যথা যেমন থাকে, তেমনি থাকে নাচ-গান ও কৌতুকরসের প্রস্রবণ; তার ওপর থাকে সুন্দর বহির্দৃশ্যের সঙ্গে জমকালো

সদ্যমুক্ত শিশির মল্লিক প্রোডাকসন্স-এর 'নবদিগন্ত' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

দৃশ্যপটপূর্ণ স্টুডিও-সেট। তাই দেখি, ছবির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ দর্শক তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় এবং প্রতিক্ষণে ছবির ঘটনাবৈচিত্র্যে কখনও আনন্দে অধীর হয়, আবার কখনও কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে। "মনমৌজি"তেও তার ব্যতিক্রম দেখিনি।

অভিনয়ে রাজা, রাণী, রায় বাহাদুর ভোলানাথ, জগু এবং লক্ষ্মীর ভূমিকায় যথাক্রমে কিশোরকুমার, সাধনা, ওম প্রকাশ, প্রাণ এবং নাজ তাঁদের গৃহীত চরিত্রে সাবলীল অভিনয় ক'রে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছেন। কিশোর এবং সাধনার নাচ-গান উপভোগ করেননি, এমন দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পেলুম না। অন্যান্য চরিত্রে লীলা চিটনীজ, দুর্গা খোটে, আনওয়ার হোসেন, অসীমকুমার প্রভৃতি যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে 'এ-ভি-এম'-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

মঞ্চাভিনয়

স্টারে "কারাগার" : ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির তহবিলে অর্থদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ অভিনয় রজনীতে স্টার থিয়েটার মন্মথ রায় রচিত "কারাগার" নাটকটি অভিনয় করেছিলেন গেল সোমবার, ২৬এ নভেম্বর।

মাত্র একদিন অভিনয় করবার জন্যে "কারাগার"-এর মত একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটককে মহলা দিয়ে উপযোগী সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপট সমন্বয়ে সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ করা নাট্যজগতে নিশ্চয়ই একটি অভাবনীয় ব্যাপার। আমরা দেখে চমৎকৃত হয়েছি, স্টার কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুযোগ্য শিল্পিবৃন্দ, নেপথ্য-শিল্পী ও কলাকুশলী এবং পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ফলে এই গুরুদায়িত্ব এমন সার্থকভাবে পালন করেছেন যে, মনে হয়েছে, ওঁরা এই নাটকখানিকে বেশ কিছুকাল ধরে নিয়মিতভাবে অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত করেছেন।

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে, ১৯৩০ সালের ২৪এ ডিসেম্বর অধুনালুপ্ত মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে মন্মথ রায় রচিত "কারাগার" নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন আমাদের দেশ ছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত। তখন নারায়ণের চরণে অস্ত্র সমর্পণ করে মথুরারাজ কংসের বিরুদ্ধে যাদবকুলের নিরস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সৌসাদৃশ্য ছিল ব'লে নাটকখানি ঐ সময় যে যুগবার্তা বহন ক'রে নিয়ে এসেছিল, আজকের দিনে তার প্রয়োজন নিশ্চিতভাবে ফুরিয়ে গেছে। তবুও দেশাত্মবোধক নাটক হিসেবে "কারাগার"-এর যে স্বকীয় মূল্য আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ ক'রে কাজী নজরুল ইসলাম এবং হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত গানগুলি নাটকখানির বিশেষ সম্পদ। এই হিসেবে অল্প চরিত্র নিয়ে রচিত দেশাত্মবোধক নাটক "কারাগার"কে মঞ্চস্থ ক'রে স্টার কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৩০ সালে "কারাগার" নাটকের উদ্বোধন রজনীতে যে আকর্ষণীয় ভূমিকালিপি ছিল, তা এখানে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বসুদেব—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (দানীবাবু), কংস—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কঙ্কন—ভূমেন রায়, নরক—মণি ঘোষ, দেবকী—সুশীলাসুন্দরী, চন্দনা—নীহারবালা, মদিরা—শেফালিকা।

স্টারের আলোচ্য অভিনয়ের ভূমিকালিপি আগেকার থেকে নিশ্চয়ই দুর্বল। বর্তমানের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক, এমনকি নৃত্য-গীত সংবলিত অপেরা অভিনয় করবার মত শিল্পী সঙ্ঘের বিশেষ অভাব। এমন কোন সাধারণ রঙ্গালয় আজ নেই, যেখানে নরীসুন্দরী, আশ্চর্যময়ী, সুবাসিনী, আঙুরবালা, ইন্দুবালার সমপর্যায়ভুক্ত গায়িকা আছে। অভিনয়ে, নৃত্যে, গীতে নীহারবালার সমকক্ষ নায়িকা আজকের রঙ্গজগতে একান্ত দুর্লভ। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী, চারুশীলা প্রভৃতির মত নৃত্যকলাদক্ষ শিল্পী আজ কোথায়? এবং স্টারের বর্তমান স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র যাঁর উত্তরাধিকারী, সেই উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারের সুবিখ্যাত সখিসঙ্ঘ আজ নিঃশেষে অন্তর্হিত।

তাই স্ত্রী-ভূমিকাগুলিতে নৃত্য-গীতের দিক দিয়ে "কারাগার"-এর অভিনয়কে সেদিন অত্যন্ত দুর্বল ব'লেই মনে হ'ল। বাসবী নন্দী আপ্রাণ চেষ্টা করে "ধরিত্রী"র উন্মাদনাকারী গানগুলিকে জীবন্ত, প্রাণস্পন্দী ক'রে তুলতে পারেননি। মাত্র "মদিরা"-রূপিণী শীলা পাল তাঁর ভরত-নাট্যম নৃত্যে কিছুটা মুখরক্ষা করেছেন; যদিও

"মদিরা"র মাদকতাময়ী লাস্যানুভোর যৌবনোচ্ছ্বাস তাতে ছিল না।

অভিনয়াংশে অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন কংসের ভূমিকায় কমল মিত্র। তাঁর রূপসজ্জা, দৈহিক সৌষ্ঠব এবং বাচনভঙ্গী ভূমিকাটির মর্যাদা রক্ষা করেছে। বসুদেবের ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় দর্শক মনকে স্পর্শ করেছে; অতি শুদ্ধ বাণীর প্রতি এ'র সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি অতিমাত্রায় প্রশংসনীয়। বিদুরথ বেশে পঞ্চানন ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন; বিশেষ ক'রে পুত্রহারা বিদুরথের উন্মাদ-দশাটি স্মরণীয়। স্ত্রী-চরিত্র দেবকী ও চন্দনার ভূমিকায় যথাক্রমে অপর্ণা দেবী ও গীতা দে অভিনয়গুণে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কঙ্কন ও কঙ্কার রোমান্টিক চরিত্রে শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী ভূমিকা দুটির প্রতি সুবিচার করেছেন। অপরাপর ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত।

মঞ্চস্থাপনায় ও আলোকনিয়ন্ত্রণে অনিল বসুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

শৌভনিক-এর "যা নয় তাই": প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শৌভনিক সম্প্রদায় গেল ২৭এ নভেম্বর মুক্তাঙ্গনে নিবেদিতা দাস রচিত "যা নয় তাই"—নামে তাঁদের চলতি নাটকটিকে মঞ্চস্থ করলেন।

মোলেয়ার রচিত যে কৌতুক নাটিকাখানি থেকে "যা নয় তাই"-এর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তাই নিয়ে গঠিত "দিল্লী থেকে কলকাতা" নামে একখানি চলচ্চিত্র আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। তবে পার্থক্য এই যে, বর্তমান মঞ্চ-নাটিকাটি অভিনয় এবং প্রয়োগগুণে যে পরিমাণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, ছবিখানি চলচ্চিত্রায়ণের দোষে ততটা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

সামান্য কেরাণীর স্ত্রী তার বান্ধবীর কাছে নিজেদের মিথ্যা পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কি কাণ্ড না ক'রে বসল এবং শেষ পর্যন্ত দুই বান্ধবীরই মিথ্যা দম্ভ কেমন ফাটা বেলুনের মত চুপসে এতটুকু হয়ে গিয়ে সত্যকে প্রকাশ ক'রে উভয়পক্ষের সম্পর্ককে সহজ ক'রে তুলল, তাই নিয়েই এই চমৎকার কৌতুক-নাটিকাটির বিস্তৃতি।

অভিনয়ে মাত করেছেন কুমুদিনীর ভূমিকায় নিবেদিতা দাস এবং তাঁকে সব রকমে সাহায্য করেছেন কিশোরের ভূমিকায় গোপেন মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্র-নারায়ণরূপে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটিকার শেষাংশে সূর্যনারায়ণ বেশে রথীন ঘোষ নতুন ক'রে হাসির খোরাকের আমদানী করেন।

পরিমিত মঞ্চের ওপর একটি মাত্র সুপরিকল্পিত দৃশ্যের সাহায্যে শৌভনিক-সম্প্রদায়ের "যা নয় তাই" অভিনয় দর্শকদের অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে উপভোগ্যতার সাগরে ডুবিয়ে রাখে।

বর্তমান সীমান্ত পরিস্থিতির ওপর রচিত ছোট একাঙ্কিকা "তৈরী হও" অত্যন্ত সময়োচিত নাট্যাবদান এবং এর অভিনয়ও প্রাণস্পর্শী।

বিবিধ সংবাদ

স্টার থিয়েটারের সাহায্য অভিনয়:

গেল সোমবার, ২৬শে নভেম্বর ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে স্টার থিয়েটার মন্মথ রায় রচিত "কারাগার"-এর যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, তার বিক্রয়-লব্ধ ২৮১০৲ টাকা ঐ রাত্রিতেই দর্শক-সমক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঐ সঙ্গে আরও যে-সব দান ঐ অনুষ্ঠানে সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্টারের স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্রের ২০০১৲ টাকা; তাঁর সহধর্মিণীর ১২½ ভরি সোনা, কমল মিত্রের ৫০১৲ টাকা, কাহিনীকার শক্তিপদ রাজগুরুর ১০১৲ টাকা, নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের সোনার ঝর্ণা-কলম, শিল্প-নির্দেশক অনিল বসুর সোনার বোতাম, অপর্ণা দেবী ও লিলি চক্রবর্তীর একটি ক'রে নেকলেস, গীতা দে, প্রভাবতী জানা, শীলা পাল প্রভৃতির আংটি এবং চন্দ্রশেখর প্রমুখ কয়েকজন শিল্পীর সোনার পদক।

রঙমহলের "মহাপ্রেম"-নাটকের অভিনয়-স্বত্ব লাভ

গেল হপ্তায় প্রেক্ষাগৃহে আমরা লিখেছিলুম, "কোনো সাধারণ রঙ্গালয় যদি উৎসাহী হয়ে নাটকখানিকে কাল-বিলম্ব না ক'রে মঞ্চস্থ করেন, তাহলে তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ অর্জন করবেন।" শুনে অতিমাত্রায় আনন্দিত হলুম, রঙমহল সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই নাটকখানির অভিনয়স্বত্ব ক্রয় করেছেন এবং যাতে তাঁরা ডিসেম্বরের মধ্যেই "মহাপ্রেম"কে মঞ্চস্থ করতে পারেন, তারও জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা, নাটকখানির উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

স্টারে মন্মথ রায়ের "স্বর্ণকীট":

ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে স্টার থিয়েটার যে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, সেই আসরে নাট্য-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত সাধারণ্যে নিবেদন করেন, অতি শীঘ্রই স্টার কর্তৃপক্ষ মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা "স্বর্ণকীট" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন।

মহিলা শিল্পী মহল-এর "নিশরকুমারী" অভিনয়

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে এবং দুঃস্থ শিল্পীদের আশ্রয় প্রতিষ্ঠা-কল্পে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট মহিলা শিল্পীবৃন্দ গেল বুধবার, ৫ই এবং আজ শুক্রবার ৭ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে "নিশরকুমারী" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছেন এবং করবেন। সরযূ দেবী এবং মলিনা দেবীর যুগ্ম-পরিচালনাধীনে এই নাটকের ভূমিকালিপি হচ্ছে: আরন—

'মনমৌজী' চিত্রে সাধনা

মলিনা, সামন্দেশ—সুনন্দা, জিনো—কানন, রামেশিশ—বনানী, কাকাতুয়া—মঞ্জু, খারেব—অনুভা, সায়া—সুলতা, বুলা—বাসবী এবং নাহরিণ—মাধবী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা করছে বাঁশরী লাহিড়ী ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং আলোক-সম্পাতে আছেন তাপস সেন।

এই অভিনয় দেখবার জন্যে নাট্যামোদী সুধিবৃন্দের মধ্যে যে-উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেল, তাতে আশা করা অন্যায় নয়, মহিলা শিল্পী মহলের সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

অভিনেতৃ সঙ্ঘের উদ্যোগে "ডাক" ও "সাজাহান"

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্যে আসছে মঙ্গলবার, ১১ই ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতৃ সঙ্ঘের উদ্যোগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রথিতযশাঃ পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের দ্বারা প্রণব রায় রচিত দেশাত্মবোধক নাটিকা "ডাক" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটক অভিনীত হবে।

রঙমহল-এর বিশেষ অভিনয়

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্যে কাল শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর রঙমহলের শিল্পীরা তাঁদের চলতি নাটক "আদর্শ হিন্দু হোটেল" অভিনয় থেকে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ দান করবেন বলে স্থির করেছেন।

"মুখোস" সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা

ভবানীপুরের থিয়েটার সেন্টারে নিয়মিত অভিনয়কারী "মুখোশ"-সম্প্রদায়ের পরিচালক তরুণ রায় নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন, তাঁরা আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানতঃ কি রসের নাটক দেখবার ইচ্ছা করেন। নাট্যামোদী দর্শকরা যদি সরাসরি এ ব্যাপারে ৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ—এই ঠিকানায় থিয়েটার সেন্টারের পরিচালক তরুণ রায়কে তাঁদের মত মত জানিয়ে দেন, তাহলে "মুখোশ"-সম্প্রদায় দর্শকদের মনোমত কোনো নাটককে ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে মঞ্চস্থ করতে পারেন।

তরুণ রায় আর একটি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাঙলা দেশের নাট্যশিল্পবৃন্দকে। ১৯৬৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি "সাজাহান" নাটক মঞ্চস্থ করবার সংকল্প প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি বাঙলা দেশের সকল পেশাদার এবং
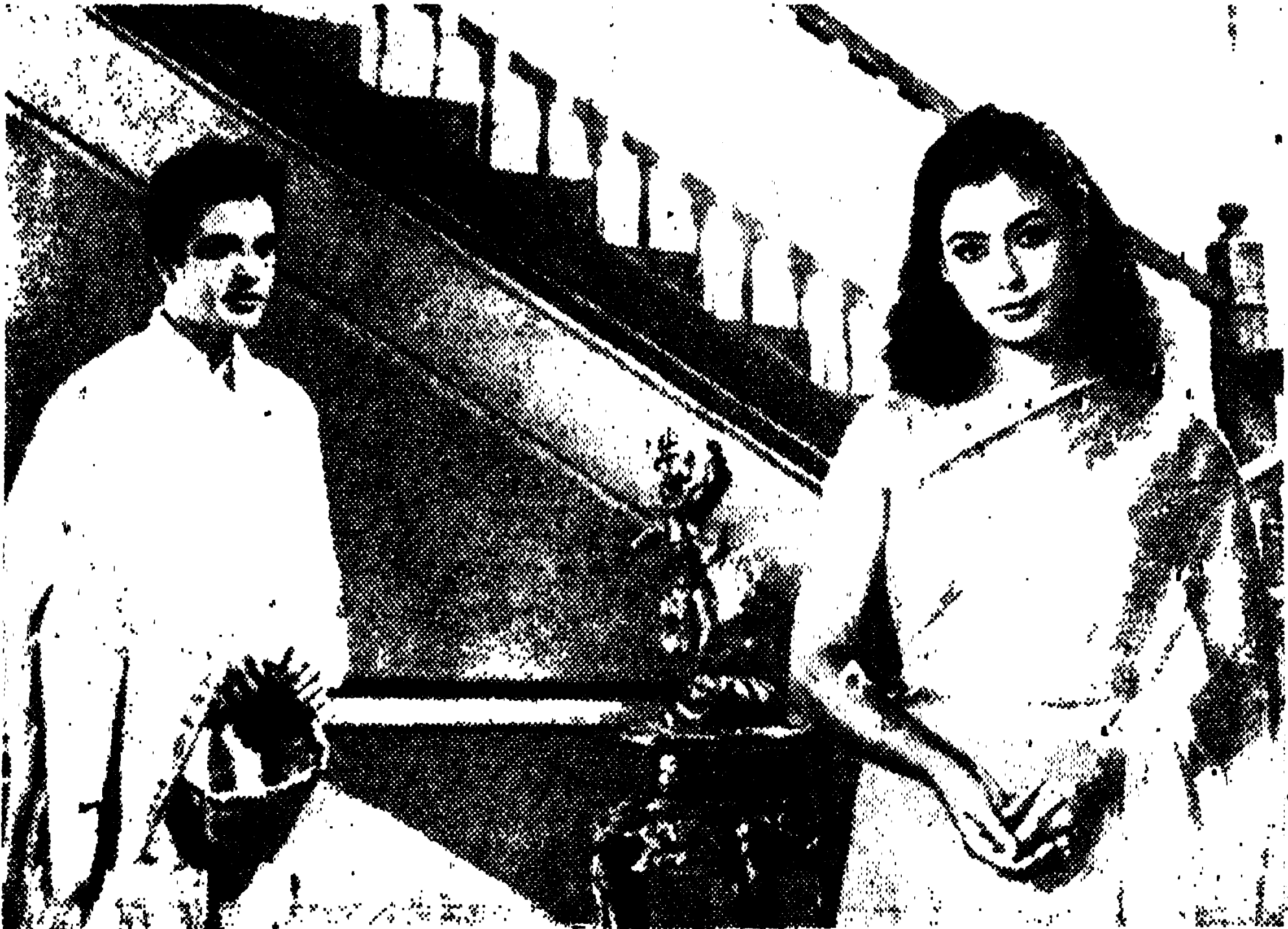
অগ্রদূত পরিচালিত 'উত্তরায়ণ' চিত্রে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। (কাহিনী ঃ তারাশঙ্কর)

অপেশাদার মঞ্চশিল্পীর সহযোগিতা কামনা করেন।

বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে "বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা" শিগ্‌গিরই চালু হবে, এ-খবর "অমৃত"-র পাঠকদের অজানা নেই। এই কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে (গভর্ণিং বডি) অন্যূন ৩০ জনের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্ল-চন্দ্র সেন, অর্থমন্ত্রী মাননীয় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অচ্যুত দত্ত, অধ্যক্ষ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যক্ষ ডঃ রমা চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সাধন ভট্টা-চার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, মন্মথ রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টা-চার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি জনবরেণ্য মনীষী।

পদ্মিনী পিকচার্স (মাদ্রাজ)-এর "দিল তেরা দিওয়ানা"

আজ শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর থেকে হিন্দ, জনতা, কৃষ্ণা, রূপালী, ভবানী, প্যারামাউন্ট প্রভৃতি চিত্রগৃহে মাদ্রাজের পদ্মিনী পিকচার্স-এর "দিল তেরা দিওয়ানা" ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে। বি আর পান্থালু পরিচালিত এবং শঙ্কর জয়কিশনের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে মালা সিংহ, শুভা খোটে, শাম্মী কাপুর, মেহমুদ, প্রাণ, ওমপ্রকাশ, মোহনপেটি, মনমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি শিল্পীকে। রাজশ্রী পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

ভ্রম সংশোধন

গেল ৩০শে নভেম্বর "অমৃত"-এ কমলা সার্কাস-এর একখানি ছবির (৪৯৩ পৃঃ) নীচে পরিচয়লিপিতে ছিলঃ "কমলা সার্কাসের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০১্ টাকা দেওয়া হচ্ছে।" আসলে টাকাটা দেওয়া হয়, কমলা সার্কাসের স্থানীয় প্রযোজক মেসার্স ডি সি কাপুরের পক্ষ থেকে।

জীবন গাঙ্গুলী পরিচালিত 'দুই নারী' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নির্মলকুমার

"দিল তেরা দিওয়ানা" চিত্রে শাম্মি কাপুর ও মালা সিন্‌হা

একখানি চিঠি

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

সাম্রাজ্যবাদী চীনের নৃশংস ভারত আক্রমণে যন্ত্রণায়, ক্ষোভে রোষে সুকঠোর জীবনপণ সংগ্রামের শপথ নিয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। নতুন চেতনায়, নতুন পথে কোটী কোটী মানুষের নিঃশংক অভিযান চলেছে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে। মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য প্রায় সর্বত্রই শিল্পীরা পথে নেমেছেন স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি বন্দনায়।

কলকাতায় এসে কিন্তু কৌতূহলী চোখ দুটো হতাশায়, লজ্জায় আপনি বুজে যাবে। এই সেই কলকাতা, চার চারটে পেশাদারী নাট্যমঞ্চ। এদের কোনটির গায়ে নতুন চেতনার অরুণ আলো লাগেনি। শত রজনী অতিক্রান্ত নাটকগুলির ক্লান্তিকর পরিক্রমা চলেছে সমানভাবে। অথচ পরাধীন ভারতে অসহযোগ, স্বরাজ্য, বঙ্গভঙ্গ এমনি কত আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ সুগভীর দেশ-প্রেমের হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছিল নট-গুরু গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন', ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর', 'রঘুবীর', বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'রাজ-সিংহ' প্রমুখ খ্যাত, স্বল্পখ্যাত নাট্যকার-বৃন্দের গম্ভীর 'প্রস্থার্ঘ্য' নিয়ে।

এই তো সেদিন! বিপ্লবীদের 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে সংগ্রামে, বন্দী

আজাদ হিন্দ. ফৌজের মুক্তির দাবীতে, রামেশ্বর ব্যানার্জি', আব্দুস সালামের রক্তে ভেসে যাওয়া রাজপথে ছাত্র সমাজের শোণিত শপথে পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশ ঘোষণায় কলকাতার মঞ্চও পৌঁছিয়ে থাকেনি। স্টারে চলেছে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের রচনা পরিচালনায় 'মহারাজ নন্দকুমার', 'টিপুসুলতান', 'রাণী ভবানী', 'রণজিৎ সিংহ', 'স্বর্গ হতে বড়', মিনার্ভায় 'কেদার রায়', 'ঝান্সীর রাণী' রঙমহলে 'বাংলার প্রতাপ', 'পথের দাবী' শ্রীরঙ্গমে নাট্যাচার্যের 'দুঃখীর ইমান', 'বিপ্রদাস', 'সিরাজদ্দৌলা', নাট্যভারতীতে 'দুই পুরুষ' অপূর্ব গরিমামন্ডিত সেদিনের নাট্যমঞ্চগুলির ভূমিকা।

জানি, সেদিন যাঁরা নাট্যমঞ্চগুলির হাল ধরেছিলেন, তাঁরা কম বেশী আদর্শ-বাদী ছিলেন। তাই নাট্যমঞ্চগুলি যথার্থই 'A nation is known by its theatre' কথাটি সার্থক করতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে চারটির তিনটিতে তো প্রবীণ নাট্যকারবৃন্দ রয়েছেন। কেন তাঁদের এই লজ্জাকর নীরবতা!

দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও জনসাধারণ বার বার আবেদন জানিয়েছেন দেশাত্মবোধক নাটকগুলির পুনরভিনয়ের জন্য। ব্যর্থ হয়েছে সে ডাক। তবে প্রতিরক্ষা তহবিলে কিছু অর্থদান করাতেই যদি কর্তব্য শেষ হয় তবে নাট্যমঞ্চগুলি একটি করে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষ মহল কিছু কিছু স্বর্ণালংকার দান করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

ভবিষ্যতে হয়তো এ ভ্রান্ত ভূমিকা নাট্যশালাগুলি থেকে বিদায় নেবে চিরতরে, কিন্তু আজকের একটি ব্যর্থতা ভবিষ্যতে বহুদিনের লজ্জা বেদনায় সঞ্চয় করে রাখবে স্মৃতির ভান্ডারে। ইতি—শ্রীদীনেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া।

উত্তর

বর্তমান সংখ্যার 'বিবিধ সংবাদে' এ বিষয়ে কিছু সংবাদ আছে।

সম্পাদক, অমৃত

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
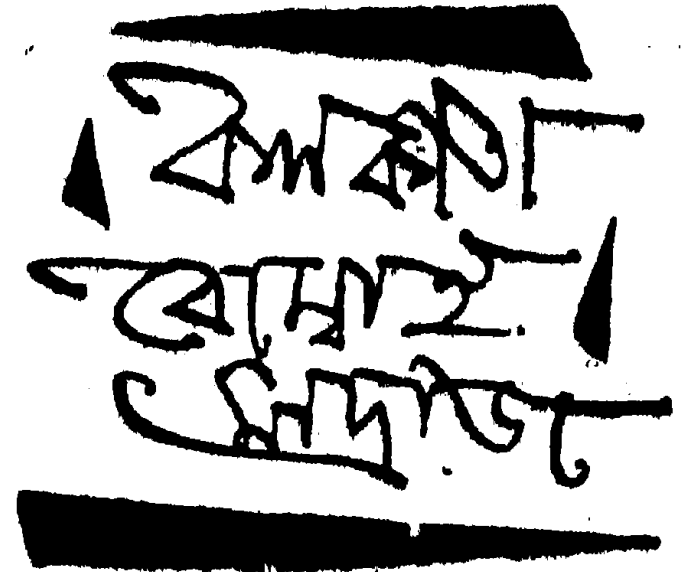
।। কলকাতা ।।

সত্যজিৎ রায়ের তিন সহকারী মিলে একটি ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই নবতম 'প্রান্তিক' গোষ্ঠীর অন্যতম পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ ও নৃপেন গাঙ্গুলী। সুবোধ ঘোষের 'শেষ প্রহর' অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই মাসের মাঝামাঝি টেকনিসিয়ান স্টুডিওর চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে বলে জানা গেল। প্রধান তিনটি মুখ্য চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কুশলী বিভাগে আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় কাজ করবেন সৌমেন্দু রায়, দুলাল দত্ত এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত। রূপন ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন অনন্ত দাস ও মুকুল চৌধুরী। সম্ভবত এ ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক অসিত সেনের সহকারী পার্থপ্রতিম চৌধুরী এই প্রথম স্বাধীন-ভাবে তাঁর ছবি আশাপূর্ণা দেবীর 'ছায়াসূর্য'র কাজ আরম্ভ করেছেন গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। আর ডি বনশাল প্রযোজিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর, নির্মলকুমার, অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, গীতা দে ও দিলীপ রায়। রবি ঘোষ। আলোকচিত্র ও সংগীত পরিচালনা করছেন বিশু চক্রবর্তী ও ভি বালসারা।

এই মাসে চিত্ত বসু পরিচালিত 'ধূপছায়া' মুক্তিলাভ করছে। নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত এ কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাশ-গুপ্ত। সংগীত পরিচালক অমল মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। পার্শ্ব চরিত্রে অজিতম
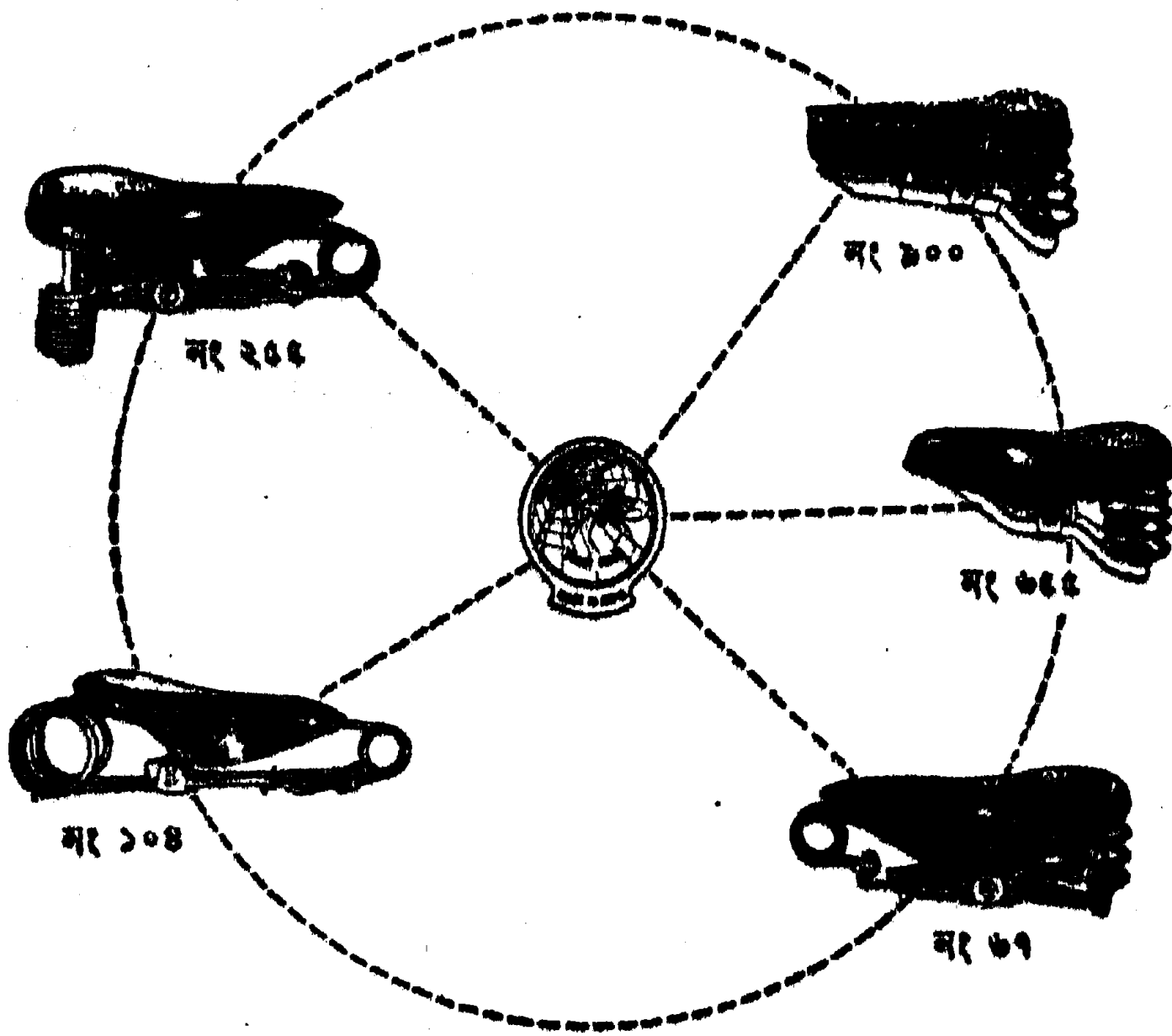
করেছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথন, অনুভা গুপ্তা, দীপ্তি রায়, তরুণকুমার ও অপর্ণা দেবী।

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয় পরিচালক সুরেশ রায় 'মরুতৃষা' ছবির কাজ পুনরায় শুরু করেছেন। এ ছবির সংগীত পরিচালক কালোবরণ। আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন মুরারী ঘোষ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, রবীন মজুমদার, তপতী ঘোষ, বিপিন গুপ্ত, পদ্মা দেবী, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও মণি শ্রীমানি।

।। বোম্বাই ।।

মডার্ণ স্টুডিওয় গত সপ্তাহে শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'কাশ্মীর কী কলিয়া' ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। এ ছবির নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর এই প্রথম হিন্দী ছবিতে অভিনয় করতে বোম্বে এসেছেন। বিপরীত নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় শিল্পী শাম্মি কাপুর। সংগীত পরিচালনা করবেন ও পি নায়ার। এই রঙিন ছবির কাহিনী রচনা করেছেন রঞ্জন বসু।

'হাম দোনো' চিত্রের কাহিনীকার নির্মল সরকার সম্প্রতি প্রযোজক হয়েছেন। তিনি একটি হিন্দী ছবির মহরৎ করেছেন, যার নাম 'জুয়ারী'। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন শশি কাপুর ও নন্দা। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুরজ প্রকাশ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন রাজকুমার, তনুজা, মাধবী, অচলা সচদেব, মদনপুরী ও নবাগত কাবেরী। সংগীত পরিচালনা করবেন—কল্যাণজী এবং আনন্দজী।

হামরাহী ফিল্মস্-এর 'দামাদ' চিত্রগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এস এম আব্বাস পরিচালিত এ ছবির নায়ক-নায়িকা হলেন বিশ্বজিৎ ও অনিতা গুহ। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। কল্যাণজী-আনন্দজী এ ছবির সংগীত পরিচালক।

সম্প্রতি দুটি ছবির সংগীত গ্রহণ শেষ হল। সংগীত পরিচালক শচীনদেব বর্মন বৃন্দাবন পিকচার্সের 'কৈয়সে কহু' ছবির সংগীত গ্রহণ করলেন লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও নন্দা। ছবিটি পরিচালনা করছেন আত্মারাম।

স্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের হাতে অর্থ ও অলঙ্কারাদি তুলে দিচ্ছেন। মধ্যে রয়েছেন নাট্যকার মন্মথ রায়।

'মুঝে জিনে দো' ছবির সংগীত গ্রহণ করলেন সংগীত পরিচালক জয়দেব। কণ্ঠদান করেন আশা ভোঁসলে। গোয়ালিয়র বহির্দৃশ্যে একটি গানের দৃশ্য গৃহীত হবে। সুনীল দত্ত প্রযোজিত ও অভিনীত এ ছবির বিপরীত নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন ওয়াহিদা রেহমান। ছবিটি পরিচালনা করছেন মণি ভট্টাচার্য।

।। মাদ্রাজ ।।

মাদ্রাজের বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত ছয় লক্ষ টাকারও বেশী অর্থ সংগৃহীত হয়েছে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে। সারা ভারতের চিত্রজগতের মধ্যে মাদ্রাজের দানই উল্লেখযোগ্য।

চিত্রালয়ের একটি জনপ্রিয় তামিল ছবির কাহিনী অবলম্বনে হিন্দী 'দিল এক মন্দির'এর কাজ আরম্ভ হয়েছে বাহেনী স্টুডিওয়। এ ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হলেন সি ভি শ্রীধর। তিন সপ্তাহে এ ছবির কাজ শেষ করবেন বলে পরিচালক জানিয়েছেন। মীনাকুমারী, রাজেন্দ্রকুমার, রাজকুমার, মামুদ, শুভা খোটে, কৃষ্ণাকুমারী ও অচলা সচদেব এ ছবির প্রধান চরিত্রলিপি। সংগীত পরিচালনা করছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

স্টুডিও থেকে বলছি
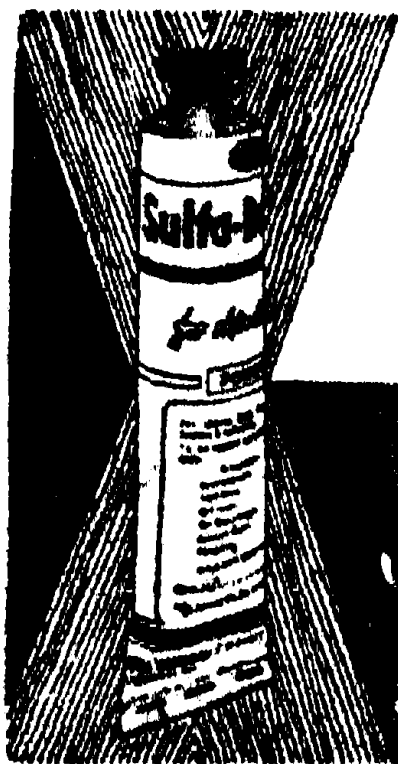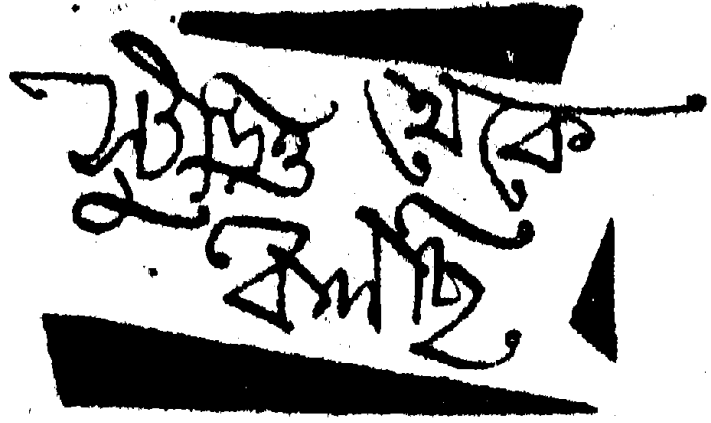
এ সপ্তাহ থেকে কয়েকটি বাংলা ছবির কাজ আবার আরম্ভ হয়েছে। শীতের দুপুরে স্টুডিও পাড়ার খবর এখন অনেক। সারি সারি স্টুডিও-ফ্লোরে নতুন নতুন ছবি। টেক্‌নিসিয়ানে যাত্রিকগোষ্ঠীর 'পলাতক।' ক্যালকাটা মুভিটনে কনক মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ প্রদীপ।' ইন্দ্রপুরীতে শম্ভু মিত্র ও অমিত্র মৈত্রের নতুন ছবির চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এখানেই পরিচালক সুশীল ঘোষ তাঁর ছবি 'পলাশের রঙ' আরম্ভ করেছেন। চিত্র গ্রহণের দিনে শ্রীঘোষ পরিচয় করিয়ে দেন এ ছবির শিল্পীদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, অঞ্জনা নাগ এবং বঙ্কিম ঘোষ। আপনারা বঙ্কিম ঘোষের অভিনয় নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে চলচ্চিত্রে নয় রঙ্গমঞ্চে। রূপকার সংস্থার 'ব্যাপিকা বিদায়' দেখে থাকবেন। সেই ঘনশ্যাম-এর চরিত্রে যিনি একাই একশো। এ ছবিতেও এঁর অভিনয় আপনাদের খুসী করবে। কারণ চিত্রগ্রহণ দেখে আমার তাই ধারণা হয়েছে। শ্রীঘোষের খুব ইচ্ছে চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করার। কিন্তু তেমন সুযোগ তিনি এখনও পাননি বলে অভিযোগ করেন। একদিন কিন্তু এঁর অভিযোগ ভাঙবে তা আজকের অভিনয় দেখে বোঝা যায়।

এ ছবির কাহিনী আগে আপনাদের বলি তারপর অন্যান্য খবর জানাবো। চিত্রগ্রহণের অবসরে পরিচালক শ্রীঘোষ কথায় কথায় এ ছবির গল্প বললেন।

হারাণ কবিয়ালের স্বপ্ন—মহিমকে সে কবি-গান গাইতে দেবে না—তাকে ওস্তাদী গান শেখাবে, বড় করবে। সারা দেশের মানুষগুলো মহিমের গান শুনে পাগল হয়ে যাবে। কাগজে কাগজে মহিমের ছবি ছাপা হবে। সকলের মুখে মুখে শুধু একটাই নাম হবে—মহিম রায়।

সেবার রায় বাবুদের বাড়ীতে গান গাইতে এল—চম্পাবাঈ। সেদিন আসরে মহিমকেও গাইতে হল। ওর গান শুনে এদিকে চম্পাবাঈ মুগ্ধ হয়ে মহিমকে ভিক্ষে চেয়ে বসে। হারান তো শুনে অবাক। সে তো এই স্বপ্নই দেখছে সারাটা জীবন ধরে। জমিদার রায় বাবুও হারানকে বুঝিয়ে বলেন—'এই ছাই-গাদাতে আর পদ্মফুলটাকে ফেলে রেখো না ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। হারান চম্পাবাঈকে কথা দেয়। কিন্তু

'পলাশের রঙ' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে বঙ্কিম ঘোষ, পরিচালক সুশীল ঘোষ, অসীমকুমার ও মঞ্জুলা সরকার

মহিম বেঁকে বসে—সে একা যাবে না কোথাও। হারানকাকা, মা এবং গৌরীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। গাঁয়ের মাটিই তার ভাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চম্পাবাঈ-এর চাপে মহিমকে কলকাতায় চলে যেতে হল।

নিঃস্বার্থভাবে মহিমকে বড় করে তোলে চম্পাবাঈ। বড় বড় ওস্তাদের কাছে শেখে। একের পর এক সংগীত সম্মেলনে মহিম রায়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সকলেরই মুখে মুখে তার নাম। এমনিভাবে একদিন খবরের কাগজ থেকে হারানও দেখতে পায় মহিমের ছবি। গৌরী আর গৌরীর মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মহিমের ছবিটির দিকে। ওদিকে চম্পাবাঈও ছবি দেখে। স্বপ্ন তার সার্থক হয়েছে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য! মহিম তার কে? এইরকম নানান প্রশ্ন তোলে চম্পাবাঈয়ের বিগত প্রেমিক কুমার সাহেব। চম্পাবাঈ জবাব দেয়—কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসেব কষে দেখিনি কুমার। আজ আমি সার্থক। স্বপ্ন দেখা আমার সফল হয়েছে।

জয়মাল্য পরে ফিরে আসে মহিম। হাসতে হাসতে চম্পাবাঈকে একটা আড়াই হাজার টাকার চেক্ দেখায়। এই অর্থ-প্রাপ্তি তার কোন একটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার জন্য। চম্পাবাঈ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—এ তুমি কি করেছো মহিম? টাকার জন্যে তুমি নিজের প্রতিভাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এলে! ওরা তোমার গুণের মর্যাদা দেবে না। মহিম প্রতিবাদ জানায়। বলে—এটা তোমার গোঁড়ামি। যারা গানই বুঝলো না তারা গানের অপমৃত্যু ঘটাবে কি করে? এ তোমার অহেতুক ভয়। আমি যোগদান করবো কারণ টাকা চাই আমার—অনেক টাকা।

স্তম্ভিত হয় চম্পাবাঈ। একি সেই মহিম। যাকে অনেক বড় করে মানুষ করতে চেয়েছিল সে একদিন? স্বপ্ন দেখেছিল অনেক! এখন হারান কবিকে সে কি জবাব দেবে? কিছুই ভেবে পায়না চম্পাবাঈ।

কিন্তু মহিম তার প্রতিজ্ঞায় অটল।

বি এন বাহেতী প্রযোজিত স্বস্তিকা ফিল্মস্-এর 'পলাশের রঙ' ছবির কাহিনী রচনা করেছেন বাণী বিশী। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য করছেন সুশীল ঘোষ। আলোকচিত্র, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় গণেশ বসু, গোর পোদ্দার এবং শিবসাধন ভট্টাচার্য। সংগীত পরিচালক হলেন ভি বালসারা।

এ ছবির বিভিন্ন রূপায়নে রয়েছেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অঞ্জনা নাগ, বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, চিত্রিতা মন্ডল, আভা মন্ডল, নিমাই ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, রমেন ঘোষ ও নবাগত সুতপা মজুমদার। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন কিনে কর্ণার প্রাইভেট লিমিটেড।

—চিত্রদূত

ভিনদেশী ছবি

।। ভিনদেশী ছবি ।।

আবার অনেকদিন পরে চিত্ররসিকরা বিগতদিনের দুই শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীকে দুটি অসাধারণ ভূমিকায় দেখতে পাবেন। ছবিটির নাম "ওয়াট এভার হ্যাপেনড টু বেবি জেন"। হেনরি ফ্যারেলের অদ্ভুত রসের উপন্যাস 'বেবী জেন' অবলম্বনে ছবিটি তোলা হয়েছে। দুই বন্ধ্যা ভগ্নীর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাহিনীর মূল আখ্যান। দুবোনই যৌবনে চিত্রাভিনেত্রী ছিল। ছোট বোনের খ্যাতি বড় বোনের খ্যাতিকে ম্লান করে দেওয়ার পর থেকেই দুবোন পরস্পরকে অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। বড় বোন বেবী জেন শৈশব থেকেই মঞ্চে অভিনয় করে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। খ্যাতির হঠাৎ আলোয় সমস্ত প্রীতির সম্পর্ককে সে বিষ করে ফেলেছিল দম্ভ এবং একগুঁয়েমির তাড়নায়। বাবা মাকে সে তৃণ জ্ঞান করতো ছোটবেলা থেকেই এবং তার সহোদরা তার কাছে কেঁচোর চেয়েও তুচ্ছ। কিন্তু খ্যাতির আলোগুলো যতই নিভতে লাগল তার জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে ততই সেই তুচ্ছ কেঁচোটি যেন সাপের ফণা মেলাতে থাকে। দিদির দুর্ব্যবহারের, অবজ্ঞার, প্রতিশোধ নেবার জন্যে ছোট বোন যেন দিনের পর দিন নীরবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বড় বোন মদের মধ্যে ডুবে গিয়ে অতীতের গৌরব এবং বর্তমানের রৌরব থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে। ছোট বোন জোয়ান তখন হলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী। একদিন রাত্রে জোয়ান রাগে দিশাহারা হয়ে দিদিকে চাপা দেবার চেষ্টা করে

বেটি ডেভিস ও জোয়ান ক্রফোর্ড

বিফলকাম হল। গাড়িটা একটা গেটে ধাক্কা খায় এবং জোয়ানকে হারাতে হয় তার পা-দুটো। ভাগ্যের পরিহাসে সেই দিদির ওপরেই তাকে নির্ভর করে থাকতে হয়। দিদি কিন্তু তাকে চাপা দেয়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কারণ ঘটনার সময় অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তার চেতনার খুব কমই অবশিষ্ট ছিল। তার কেমন ধারণা হল গাড়িটা সে নিজেই চালাচ্ছিল এবং দুর্ঘটনার জন্যে সেই দায়ী। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সে স্থির করে বাকী জীবনটা পঙ্গু বোনের সেবা করেই কাটিয়ে দেবে। জোয়ানও নিজের স্বার্থে দিদির ভুলটা ভাঙে না।

কিন্তু দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ছোট বোনের অক্লান্ত সেবা করবার পর আসল ঘটনাটাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলল দিদি। তীব্র মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে বড় বোন প্রতিশোধের অবিশ্বাস্য উপায় খুঁজতে থাকে। তার প্রতিশোধ সুরু হয় খাবার দিয়ে। একদিন একটা ইঁদুর পুড়িয়ে ভালো করে সাজিয়ে ছোট বোনের মুখের কাছে ধরে। ব্যস খাওয়া একদম ঘুচে গেল জোয়ানের। সব সময় মনে হয় তার যেন যাবতীয় অখাদ্য জিনিষ রান্না করে খেতে দিচ্ছে তাকে দিদি। না খেয়ে খেয়ে পঙ্গু জোয়ান দিন দিন দুর্বল হয়ে আসে। পিশাচ দিদির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ফোন করতে যায়, দেখে ফোনের লাইন কাটা। সিঁড়ি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পালাতে যায় দিদি এসে তাকে বেঁধে রাখে ঘরে, মুখও বন্ধ করে দেয় বেঁধে।

পরিচালক রবার্ট এলড্রিচ রোমহর্ষক ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে চিত্রটিকে একেবারে ভয়াল ছবি করে তুলেছেন।

বড় বোনের ভূমিকায় বেটি ডেভিস রোমাঞ্চকর অভিনয় করেছেন। ছোট বোনের ভূমিকায় জোয়ান ক্রফোর্ড-এর অভিনয়ও মনে রাখার মত।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ কমনওয়েলথ গেমস ॥

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থের পেরী লেক স্টেডিয়ামে সম্প্রতি সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস শেষ হ'ল। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৩৫টি দেশের ১,০০০ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই সপ্তম কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে নি। ভারতবর্ষের যোগদানের কথা ছিল; কিন্তু চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের পক্ষে যোগদান সম্ভব হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার কারণ অন্য, তারা আর কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত নয়। এই কমনওয়েলথ গেমসে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় (পঞ্চম অনুষ্ঠান) চতুর্থ স্থান এবং ১৯৫৮ সালের প্রতিযোগিতায় (ষষ্ঠ অনুষ্ঠান, কার্ডিফ) তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। গত ষষ্ঠ কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পেয়েছিল দু'টি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্যপদক।

পঞ্চাশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপ সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই উদ্বোধন উৎসব সাড়ে চার ঘন্টা স্থায়ী ছিল। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের পুরোভাগে ছিল ওয়েলস। ১৯৫৮ সালের ওয়েলসের কার্ডিফে ষষ্ঠ কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণে তারাই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের শীর্ষ ভাগে স্থান পায়। অস্ট্রেলিয়ার আইভান লান্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের পক্ষ থেকে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেন। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের তালিকায় ছিল—এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, মুষ্টি যুদ্ধ, সাইকেল চালনা, কুস্তি, ভারোত্তোলন, রোয়িং, ফেনসিং এবং লন বাউলস। অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন সর্বাধিক প্রতিনিধি—২৪০ জনেরও বেশী। মাত্র একজন প্রতিনিধি নিয়ে যোগদান করেছিল—বার্বাদোজ, মালটা, বহামা এবং ডোমিনিকা। বহামা এবং বার্বাদোজের যোগদান সার্থক হয়েছিল। বহমার প্রতিনিধি একটি রৌপ্যপদক এবং বার্বাদোজের প্রতিনিধি একটি ব্রোঞ্জ-পদক পান।

আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় গত ১লা ডিসেম্বর।

ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ৩৫টি দেশের মধ্যে ১১টি দেশ স্বর্ণ পদক লাভ করে। স্বর্ণ পদকের মোট সংখ্যা ছিল ১০৪। স্বর্ণ পদক প্রাপ্তির তালিকায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম (৩৮ পদক), ইংল্যান্ড দ্বিতীয় (২৯), নিউজিল্যান্ড তৃতীয় (১০) এবং পাকিস্থান চতুর্থ স্থান (৮) পায়। মোট পদক লাভের তালিকায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম (১০৫ পদক), ইংল্যান্ড দ্বিতীয় (৭৮ পদক)। নিউজিল্যান্ড তৃতীয় (৩২ পদক) এবং কানাডা চতুর্থ (৩১ পদক) স্থান পায়। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা থেকে ইংল্যান্ড উপর্যুপরি ৬টি অনুষ্ঠানে পদক লাভের তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছিল। ইংল্যান্ডের এই একটানা প্রাধান্য সপ্তম ক্রীড়ানুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া খর্ব করেছে। কার্ডিফে ১৯৫৮ সালের ৬ষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠানেই অস্ট্রেলিয়া তার এই সাফল্যলাভের পূর্বাভাষ দিয়েছিল—ইংল্যান্ডের স্বর্ণ পদক সংখ্যা ছিল ২৯ এবং অস্ট্রেলিয়ার ২৭।

আলোচ্য সপ্তম ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সন্তরণ অনুষ্ঠান। সন্তরণে ৯টি বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ হয় এবং ৩টি বিষয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করে। এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা এ্যাথলিটদের যোগদান সত্ত্বেও কোন নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়নি।

পার্থের এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত দুই সাঁতারু—মহিলা বিভাগে মিস ডন ফ্রেজার এবং পুরুষ বিভাগে মারে রোজের ব্যক্তিগত সাফল্য অপর সকলকে নিষ্প্রভ করেছে। এ'রা দুজনেই চারটি (রিলে সমেত) ক'রে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইংল্যান্ডের মহিলা সাঁতারু অনিতা লন্স ব্রাউ তিনটি বিষয়ে (১১০ গজ ও ২২০ গজ বুক সাঁতার এবং ৪৪০ গজ ব্যক্তিগত মিডলি রিলে) স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। সাঁতারের দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন—অস্ট্রেলিয়ার কেভিন বেরী (১১০ গজ ও ২২০ গজ বাটার ফ্লাই), ইংল্যান্ডের ব্রায়ান ফেলপস (স্প্রিং বোর্ড এবং হাই বোর্ড ডাইভিং), অস্ট্রেলিয়ার মিস সু নাইট (স্প্রিং বোর্ড এবং হাই বোর্ড ডাইভিং) এবং ইংল্যান্ডের পনর বছরের স্কুল-ছাত্রী মিস লিন্ডা লুডগ্রোভ (১১০ গজ ও ২২০ গজ ব্যাক স্ট্রোক)।

সন্তরণ অনুষ্ঠানে (ডাইভিং সমেত) অস্ট্রেলিয়া ১৭টি, ইংল্যান্ড ৮টি এবং কানাডা ২টি স্বর্ণ পদক লাভ করে।

এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানের পুরুষ বিভাগে সেরাফিনো আন্তাও (কেনিয়া) ১১০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে এবং মহিলা বিভাগে মিস ডোরথি হিম্যান (ইংল্যান্ড) ১১০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে স্বর্ণ পদক পেয়ে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। ম্যারাথান রেসে (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) ব্রিয়ান কিলবি (ইংল্যান্ড) ২ ঘন্টা ২১ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম ক'রে প্রথম স্থান' পান। দ্বিতীয় স্থান পান ৬ষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠানের (১৯৫৮ সাল) বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার

সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৪৪০ গজ ফ্রি স্টাইল রিলে সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গকারি অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারু দল। (বাম দিক থেকে) ডন ফ্রেজার, রবিন থর্ন, রুথ এভারুস এবং লীন বেল। ৪ মিনিট ১১.০ সেকেন্ড সময়ে এ'রা বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

ডোভ্ড পাওয়ার—সময় ২ ঘণ্টা ২২ মিনিট ১৫·৪ সেকেণ্ড।

দৌড় প্রতিযোগিতায় দর্শক সাধারণের নয়ন-মন জয় করেছিলেন ৬ মাইল দৌড়ে বিজয়ী কানাডার ব্রুস কিড। তিনি ২৮মিঃ ২৬·৭ সেকেণ্ড সময়ে (নতুন রেকর্ড) লক্ষ্য স্থলে পেণছান। এই দীর্ঘ দূরত্ব অতি সহজ-ভাবেই তিনি অতিক্রম করেন; তাঁর দৌড়-ভঙ্গিমার মধ্যে ভবিষ্যতের আন্ত-র্জাতিক খ্যাতি লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা পরিস্ফুট।

পদক লাভের তালিকা

(প্রথম ...৭টি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
অস্ট্রেলিয়া	৩৮	৩৬	৩১	১০৫
ইংল্যাণ্ড	২৯	২২	২৭	৭৮
নিউজিল্যাণ্ড	১০	১২	১০	৩২
কানাডা	৪	১২	১৫	৩১
স্কটল্যাণ্ড	৪	৭	৩	১৪
পাকিস্থান	৮	১	০	৯
ঘানা	৩	৫	১	৯

সন্তরণে বিশ্ব-রেকর্ড

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনু-ষ্ঠিত সপ্তম বৃটিশ এম্পায়ার এ্যাণ্ড কমনওয়েলথ গেমসে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

৪৪০ গজ ফ্রিস্টাইল রিলে (মহিলা): সময় : ৪ মিঃ ১১·০ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া পূর্ব রেকর্ড : ৪ মিঃ ১৩·৮ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া, ২২শে অক্টোবর, ১৯৬২।

৮৮০ গজ ফ্রিস্টাইল রিলে (পুরুষ)

সময় : ৮ মিঃ ১৩·৪ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া। পূর্ব রেকর্ড : ৮ মিঃ ১৬·৬ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬০।

১১০ গজ ফ্রিস্টাইল (মহিলা)

সময় : ৫৯·৫ সেঃ—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)।

২২০ গজ বুক সাঁতার (মহিলা)

সময় : ২ মিঃ ৫১·৭ সেঃ—আনিটা লন্সব্রাউ (ইংল্যাণ্ড)।

৪৪০ গজ মিডলি রিলে (মহিলা)—সময় : ৪ মিঃ ৪৫·৯ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া।

১১০ গজ ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)—সময় : ১ মিঃ ১০·৮ সেঃ—মিস পাম সার্জিয়েন্ট (অস্ট্রেলিয়া)।

২২০ গজ ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)—সময় : ২ মিঃ ৩৫·২ সেঃ (হিট)—লিণ্ডা লুড গ্রোভ (ইংল্যাণ্ড)।

৪৪০ গজ ফ্রি স্টাইল রিলে (পুরুষ)—সময় : ৩ মিঃ ৪৩·৯ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

কুইন্সল্যাণ্ড : ৪৩৩ রাণ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কে ডি ম্যাকে নট আউট ১০৫, ট্রিম্বল ৯৫, বিজেস ৫৯ এবং গ্রাউট ৫৬। কোণ্ডওয়েল ১০৬ রাণে ২, লার্টার ৬৩ রাণে ২ এবং নাইট ৫৮ রাণে ২ উইকেট) ও ৯৪ রাণ (৭ উইকেট। ডেক্সটার ৮ রাণে ৪ এবং গ্রেভণী ২ রাণে ২ উইকেট)।

এম সি সি : ৫৮১ রাণ (৬ উই-কেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন নট আউট ১৮৩, শেফার্ড ৯৪, নাইট ৮১, ডেক্স-টার ৮০ এবং গ্রেভনী ৫২। ওয়েস্টওয়ে ১৫৬ রাণে ৩ উইকেট)।

ব্রিসবেনে কুইন্সল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে এম সি সি দলের সফরের অষ্টম খেলাটি ড্র গেছে। বর্তমানে আলোচ্য সফরের ফলাফল : খেলা ৮, এম সি সি'র জয় ২, হার ২ এবং ড্র ৪।

কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে এম সি সি দলের খেলার ফলাফল বর্তমানে দাঁড়াল—মোট খেলা ১৬, এম সি সি'র জয় ৮, হার ১ এবং ড্র ৭।

বৃষ্টির দরুণ নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম দিনে মাত্র ১২০ মিনিট খেলা হয়েছিল। কুইন্সল্যাণ্ড প্রথম ব্যাট করে ২ উই-কেটের বিনিময়ে ১২৩ রাণ করে। ইংল্যাণ্ডের কোণ্ডওয়েল ৪০ রাণে দুটো উইকেটই পান। ডেভিড লার্টার সুবিধা করতে পারেননি—৭ ওভার বলে ২৯ রাণ দিয়ে কোন উইকেট পাননি। চা-পানের পরের খেলায় লার্টারের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওভারে টেস্ট আম্পায়ার টাউনসেন্ড পাঁচবার 'নো-বল' ডাকেন। ফলে দলের অধি-নায়ক ডেক্সটার তাঁর বল দেওয়া বন্ধ করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় কুইন্স-ল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা এম সি সি দলের বোলিং তুলোধুনা করে ছেড়ে দেয়। কুইন্সল্যাণ্ড ৭ উইকেটে ৪৩৩ রাণ করে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ম্যাকে সেঞ্চুরী (১০৫ রাণ) করেন। পাঁচ রাণের জন্যে ট্রিম্বল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। উইকেট-কিপার গ্রাউটের ৫৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। ম্যাকে এবং গ্রাউট দু'জনেই প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে স্থান পেয়েছেন। এইদিনে এম সি সি দল আধ-ঘণ্টার খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ২৯ রাণ করে।

তৃতীয় দিনের খেলায় এম সি সি দলের ৫ উইকেট পড়ে ৩৭৩ রাণ দাঁড়ায়। প্রথম উইকেটের জুটিতে শেফার্ড এবং পারফিট ১৩২ মিনিট খেলে দলের ১০১ রাণ যোগ করেন—এবারের সফরে এই রাণই প্রথম উই-কেটের জুটিতে এ পর্যন্ত সর্বাধিক রাণ হিসাবে গণ্য। শেফার্ড ৯৪ রাণ করে আউট হ'ন। ২৪৪ মিনিটের খেলায় তিনি ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। শেফার্ড এবং ডেক্সটারের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ১১০ রাণ যোগ হয়। অধিনায়ক ডেক্সটার ৮০ রাণ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রখ্যাত টেস্ট বোলার ওয়েসলী হল কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেন। তাঁর একটা ম্যার-মুখী বলে দলের উইকেট-কিপার গ্রাউটের চোয়াল ভেঙ্গে যায়। গ্রাউটকে বরাবরের মত খেলা থেকে অবসর নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হয়। প্রথম টেস্ট খেলার মুখে এরকমের বড় দুর্ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অশুভের সূচনা না হলেই মঙ্গল। এইদিনের খেলায় হল বোলিংয়ে কোন রকম সাফল্যলাভ করতে পারেননি—ওভার ২০, মেডেন ১, রাণ ৮২, উইকেট ০।

চতুর্থ দিনের খেলায় এম সি সি দল ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এম সি সি দল ৫৮১ রাণে (৬ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তৃতীয় দিনের ৩৭৩ রাণের (৫ উই-কেটে) সঙ্গে এইদিনের খেলায় মাত্র একটা উইকেট খুইয়ে ২০৮ রাণ যোগ করে। পূর্বদিনের নট আউট খেলোয়াড় ব্যারিংটন এবং নাইট খেলা আরম্ভ করেন। চৌকস খেলোয়াড় নাইট ৮১ রাণ করে আউট হন। দুটো ওভার বাউণ্ডরী এবং ১১টা বাউণ্ডারী মারেন। তিনি সফরে প্রত্যেকটি খেলায় ৫০ রাণ করেছেন। নাইট এবং ব্যারিংটনের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ১৮০ রাণ যোগ হয়। ব্যারিংটন ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের খেলায় ১৮৩ রাণ করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। তিনি ২২টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী করেন। এই নিয়ে ব্যারিংটন উপর্যুপরি তিনটে খেলায় সেঞ্চুরী করলেন—এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০৪, মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়ান একাদশ দলের বিপক্ষে নট আউট ২১৯ এবং ব্রিসবেনে কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে নট আউট ১৮৩ রাণ।

কুইন্সল্যাণ্ড দল ১৪৮ রাণের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলা মোটেই সুবিধার হয়নি। ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ৯৪ রাণ ওঠে। এম সি সি দলের অধিনায়ক ডেক্সটার মাত্র ৮ রাণ দিয়ে একাই ৪'টি উইকেট পান। প্রকৃতপক্ষে ১৩টা বলে মাত্র এক রাণ দিয়ে তিনি এই চারটি উইকেট পেয়েছিলেন। কুইন্সল্যাণ্ড দলের শেষের দুটো উইকেট পান টম গ্রেভনী। গ্রেভনী কদাচিৎ বল করেন।

কুইন্সল্যাণ্ড কান্ট্রি একাদশ দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় (সফরের নবম খেলা) এম সি সি দল ৭ উইকেটে জয়লাভ করে। এম সি সি দলের পারফিট নট আউট ১২৮ রাণ করেন। এ পর্যন্ত সফরের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ৯, এম সি সি'র জয় ৩, হার ২ এবং খেলা ড্র ৪। এম সি সি'র এই জয়ের মধ্যে মাত্র একটা প্রথম শ্রেণীর খেলা।

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ : ৩৩৭ রাণ—(৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। দিলীপ সারদেশাই ৮৬, আমরোলীওয়ালা ৮৫। কিং ৬৭ রাণে ২, ওয়াটসন ৩২ রাণে ৬, উমরীগড় ৫৮ রাণে ১, দুরাণী ১৮ রাণে ১ এবং বোরদে ৭৮ রাণে ১ উইকেট) ও ২০২ রাণ (ওয়াদেকার ৭১, আমরোলীওয়ালা ৫১। ভোঁসলে ১৭ রাণে ৪, কিং ২৫ রাণে ৩ এবং উমরিগড় ২১ রাণে ২ উইকেট)।

রাজ্যপালের একাদশ : ৩৪৯ রাণ (অধিকারী ৮৩, উমরীগড় ৬২, কিং ৬১। সুভাষ গুপ্তে ৬০ রাণে ৪, গিলক্রিস্ট ৮২ রাণে ৩, দেশাই ৩১ রাণে ১, নাদকাণী ২১ রাণে ১, রামচাঁদ ৪৪ রাণে ১ উইকেট) ও ১৭৫ রাণ (৮ উইকেটে। সুভাষ গুপ্তে ৫৪ রাণে ৩ এবং নাদকাণী ২২ রাণে ২উইকেট)।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালের একাদশ দল বনাম মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের তিনদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার সময় মাঠে ঘোষণা করা হয়, এই খেলা উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট বিক্রয় এবং খেলায় প্রবেশমূল্য বাবদ দুই কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই তিন দিনের প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদিন ত্রিশ হাজার ক'রে দর্শক সমাগম হয়েছিল এবং প্রতিদিনই দর্শক সাধারণ টেস্ট খেলা দেখার মেজাজ নিয়ে খেলায় প্রভূত আনন্দ ও উত্তেজনা উপভোগ করে-ছিলেন।

উভয় দলেই কয়েকজন করে ভারত-বর্ষের টেস্ট খেলোয়াড় যোগদান করে-ছিলেন। তাছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রখ্যাত চারজন ফাস্ট বোলার--- ওয়াট-সন এবং কিং রাজ্যপাল একাদশ দলে এবং গিলক্রিস্ট এবং স্টেয়ার্স মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট ক্যাপটেন লালা অমরনাথ রাজ্যপাল দল পরি-চালনা করেন; অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দল পরিচালনা করেন ভূতপূর্ব টেস্ট খেলোয়াড় মুস্তাক আলী। লালা অমরনাথ টসে জয়লাভ করেও মুখ্য-মন্ত্রীর একাদশ দলকে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ ছেড়ে দেন। প্রথম দিনে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের ৬ উইকেট পড়ে ৩৩৭ রাণ উঠে।

দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দল পূর্বদিনের ৩৩৭ রাণের (৬ উই-কেটে) উপর প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। রাজ্যপাল একাদশ দলের প্রথম ইনিংস চা-পানের পরবর্তী খেলার ৩৫ মিনিটে ৩৪৯ রাণে শেষ হলে তারা ১২ রাণে অগ্রগামী হয়। এইদিনের খেলায় মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২টো উইকেট খুইয়ে ৪৩ রাণ করে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের অব্যবহিত পরে মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২০২ রাণে শেষ হয়। তখন খেলা শেষ হতে ১৯১ মিনিট বাকি ছিল। রাজ্যপাল দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণের সংখ্যাও ছিল ১৯১। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যপালের একাদশ দল ৮ উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রাণের বেশী তুলতে পারেনি। মাত্র ১৬ রাণের জন্যে তারা জয়লাভের গৌরব হাত-ছাড়া করে—ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ঘড়ির কাছে হার স্বীকার করে।

প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর একাদশ দল বনাম পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল একাদশ দলের চার দিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি আগামী ২২শে, ২৩শে, ২৪শে এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ক'লকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় যোগদানের জন্য যাঁদের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ তাঁদের সম্মতি দিয়েছেন: লালা অমরনাথ, সৈয়দ মুস্তাক আলী, ভিনু মানকড়, পলি উম্রিগড়, চাঁদু বোরদে, বাপু নাদকার্নি, রমাকান্ত দেশাই, সেলিম দুরাণী, বুদ্ধি কুন্দরাম, দিলীপ সরদেশাই, বিজয় মেহেরা, আব্বাস আলী বেগ, লেস্টার কিং, চার্লস স্টেয়ার্স, রয় গিলক্রিস্ট, ওয়াটসন, রুসি সুর্তি, অজিত ওয়াদেকার, শের মহম্মদ এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার।

।। ভ্যালেরি ব্রুমেল ।।

বিশ্ববিখ্যাত রুশ এ্যাথলিট ভ্যালেরি ব্রুমেল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সাংবাদিক সংগঠন কর্তৃক ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে ২৬টি দেশের ক্রীড়া-সাংবাদিকদের ভোট গ্রহণ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, হাইজাম্পে বিশ্ব রেকর্ড (৭ ফিট ৫ ইঞ্চি) স্রষ্টা ব্রুমেল উপর্যুপরি দু' বছর এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করলেন।

ভ্যালেরি ব্রুমেল

॥ জাতীয় জুনিয়র ভারোত্তোলন ॥

প্রথম জাতীয় জুনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক পয়েন্ট (৪২ পয়েন্ট) পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

দলগত পয়েন্টের হিসাব

প্রথম পশ্চিম বাংলা ৪২, দ্বিতীয় রেলওয়ে—৩৪, তৃতীয় মাদ্রাজ—৩১, চতুর্থ উত্তর-প্রদেশ—১৮, পঞ্চম হায়দরা-বাদ (অন্ধ্র)—১৪, ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র—১১, সপ্তম দিল্লী—৭, অষ্টম উড়িষ্যা—২।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

হার্ণিয়া কোষবৃদ্ধি ফাইলেরিয়া

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, পোষ্ট বক্স নং ২৫, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৭৫৫।

নগদ ও কিস্তিতে
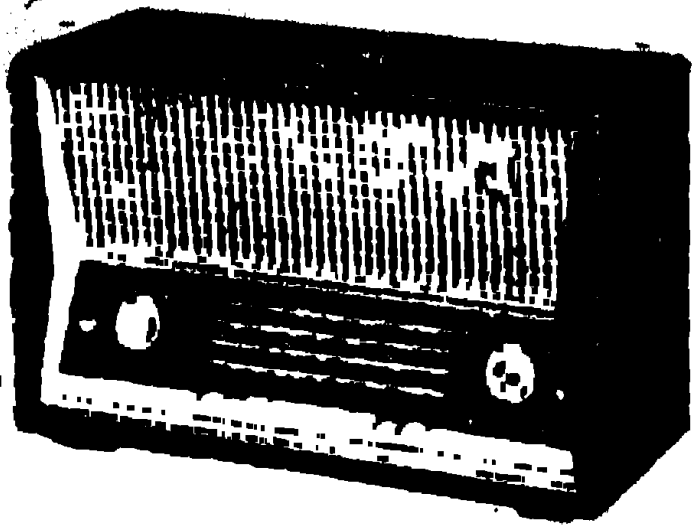
রেডিও সেট রেডিওগ্রাম ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যাণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোন: ২৪-৪৭৯৩, কলিঃ-১৩

শক্তিশালী কথাশিল্পী
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
সর্বশেষ উপন্যাস

লাইলাক একটি ফুল

মার্কিণ ও ফরাসী সংস্কৃতির দ্বন্দ্বমূলক এক পটভূমিকায় মার্কিণ সমাজজীবন নিয়ে রচিত ভারতীয় ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ এই অসাধারণ উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের নিশানাস্বরূপ।
আমেরিকায় এক ফরাসী কন্যার এ এক অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান।
দাম ৪ টাকা।

ভারতী লাইব্রেরী
৬নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের
ভারতে জাতীয় আন্দোলন ॥ ১০·৭৫ ॥

পরিমল গোস্বামীর
স্মৃতিচিত্রণ ॥ ৭·০০ ॥ **রোল নং—২০৫** (কিশোর পাঠ্য) ॥ ২·৫০ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
অখণ্ড-অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ ॥ ৮·৫০ ॥

উৎপল দত্তের অগ্নিগর্ভ নাটক
ফেরারী ফৌজ ॥ ২·৫০ ॥

বাণী রায়ের উপন্যাস
মিস্ বোসের কাহিনী ॥ ৩·০০ ॥

শিবরাম চক্রবর্তীর (কিশোর উপন্যাস)
দাদু-নাতির দৌড় ॥ ২·২৫ ॥
ভালোবাসার ইতিকথা (ছোট গল্প) ॥ ২·৫০ ॥
বুদ্ধদেব বসুর
সাড়া (উপন্যাস) ॥ ৩·০০ ॥
[illegible] ॥ ১·৫০ ॥

গ্রন্থম্ : ২২/১, কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। | পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের অন্তরঙ্গ হার্দ্য বাস্তব প্রতিচ্ছবি

পাঠক-সাধারণের সবিশেষ অনুরোধে ও সুবিধার্থে এই বৃহৎ গ্রন্থটি দুটি পৃথক খণ্ডে বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম খণ্ড: ১৪·০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড: ১২·০০ ॥ একত্রে দুটি খণ্ড: ২৫·০০ ॥

বনফুলের
জঙ্গম ১ম (৭ম মুঃ) ৫·০০ ॥ ২য় (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·৫০ ॥ ৩য় (৫ম মুঃ) ৭·৫০ ॥

ব্যঙ্গ কবিতা সাড়ে ছ' টাকা ॥ **মানদণ্ড** ৪র্থ মুঃ ৪·৫০ ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
উপনগর সাত টাকা ॥

বিজন ভট্টাচার্যের
রাণী পালঙ্ক ২·৫০ ॥

সীতা দেবীর
মহামায়া ছ' টাকা ॥

শান্তা দেবীর
অলখ-ঝোরা ৫·০০ ॥

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিকষিত হেম ৩·০০ ॥

স্বরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
গোধূলির রঙ ৩·৫০ ॥

নীলকণ্ঠের
হরেকরকমবা ২য় মুঃ ২·৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪·৫০ ॥

রমাপদ চৌধুরীর
মুক্তবন্ধ তিন টাকা ॥

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বৈদেশিকী সচিত্র সংস্করণ ৫·৫০ ॥

সাগরময় ঘোষ—সম্পাদিত
বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন **শতবর্ষের শতগল্প** ১ম খণ্ড: ১৫·০০ ॥ ২য় খণ্ড: ১২·৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা: ১২
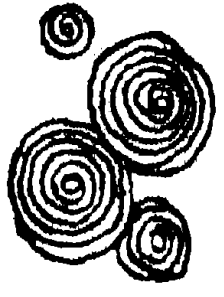
অমৃত
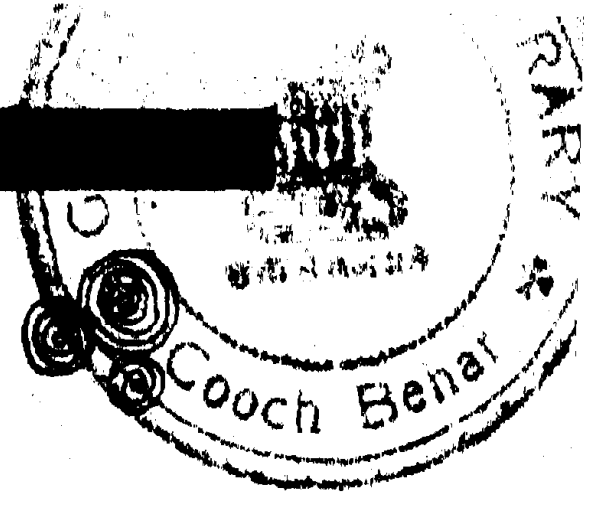
২য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Firday, 14th December, 1962.
40 Naya Paise

সীমান্তে এখনও যুদ্ধবিগ্রহ নাই। এই যুদ্ধ-বিরতির পিছনে কি আছে সেটা এখনও অনিশ্চিতই আছে সুতরাং ভবিষ্যতের কথা বিচার করা বৃথা। তবে একথা নিশ্চয় যে বৃহত্তর শক্তি-পরীক্ষার প্রশ্ন এখন আরও প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে কেননা চীনের কথা-বার্তায় যাহাই থাকুক কাজে দেখা যাইতেছে তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা এখনও প্রবল আছে, নহিলে লাডাখে পশ্চাদপসরণের কোনও ইচ্ছা তাহার কথায় বা কাজে প্রকাশ পাইতেছে না কেন? নেফায় যদিও পিছনের দিকে সৈন্যাপসরণের চিহ্ন দেখা গিয়াছে, অগ্রবর্তী অঞ্চলে সে প্রকার কোনও কাজের খবর এখনও নাই। সকলের চাইতে অনিশ্চিত ব্যাপার রহিয়াছে আমাদের দিকে।

চীন-সেনা পিছাইবার সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের সেনাদল অগ্রসর হইবে? যে এলাকায় চীনারা দখল ছাড়িবে সেখানে কি আমাদের সেনাদল যাইবে, না শুধু পুলিশ-প্রহরী ও অসামরিক কর্মচারীগণ সেখানের তত্ত্বাবধান করিবে? প্রধানমন্ত্রী এ প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক সমাধানে এখনও উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কথাবার্তায় মনে হয় ইহা এখনও অনিশ্চিতের মধ্যেই আছে। যদি তাই হয় তবে এ যুদ্ধ-বিরতির একমাত্র মূল্য সময়প্রাপ্তি এবং তাহাও কতদিনের জন্য সেকথাও অনিশ্চিত। এই সময়ের অর্থ যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতির অবকাশ।

এরূপ পরিস্থিতিতে শান্তির বিষয় চিন্তা করাও বাতুলতা, কেননা ঐরূপ চিন্তা করার ফল আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে শুধু ঢিলা দেওয়া নয়, তাহা পূর্ণ ও ব্যাপক হওয়ার বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করা। সাময়িক উত্তেজনার পরেই অবসাদ আসে একথা আমরা জানি এবং আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির ব্যাপারে এই অবসাদ যে কিরূপ মারাত্মক ভুল হইতে পারে সেকথা আমরা চিন্তা করি না বলিয়াই এখন যুদ্ধ-বিরতি ও এই সীমান্ত-বিরোধের শান্তিময় সমাধান সম্পর্কে নানা গুজব ও গাল-গল্পে আমরা মুখর হইয়া উঠিতেছি।

এই সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির একটা কারণ ইহাও হওয়া সম্ভব যে, শত্রুপক্ষ চাহে যে এই যুদ্ধ-বিরতির ফলে আমাদের মধ্যে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়। চীনের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও অতর্কিত আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই উত্তেজনা ও সাহসের স্ফুরণ দেখিয়া আমাদের বিদেশী বন্ধুরা যেভাবে আমাদের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহার জন্য বোধহয় চীন অধিকারিবর্গ প্রস্তুত ছিলেন না এবং সেই কারণে ঐ প্রতিক্রিয়ার মুখে অভিযান চালন বোধহয় তাঁহারা সমীচীন মনে করেন নাই। এই যুদ্ধ-বিরতিতে সেই উত্তেজনা নির্বাপিত হইতে পারে এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বভাবগত যে দীর্ঘসূত্রতা ও অন্য মানসিক দৌর্বল্য আছে তাহা আবার আমাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজ সকলভাবে আচ্ছন্ন ও ব্যাহত করিতে পারে। এবং সেই সঙ্গে যদি বিদেশী অস্ত্র-সাহায্য সম্বন্ধে আমাদের কর্তৃপক্ষের মনে কূট প্রশ্নের ও মানসিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় তবে তো শত্রুপক্ষের সোনায় সোহাগা।

আমাদের সকলের,—অর্থাৎ উচ্চতম অধিকারি হইতে সাধারণ জন পর্যন্ত প্রত্যেকের—এখন বুঝা প্রয়োজন যে যাহা শত্রুর পক্ষে সুবর্ণসুযোগ তাহাই আমাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদের কারণ। এই বর্তমানের উত্তেজনা যদি অবসাদে পরিণত হইয়া সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা নির্বাপণ করে তবে সেই অবসাদ জাতির ও দেশের মরণকালের অন্তিম অবসাদে পরিণত হইবে।

আমরা যুদ্ধবিগ্রহে অনভ্যস্ত সেইজন্য এই তথা-কথিত যুদ্ধবিরতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি। আমাদের জানা প্রয়োজন যে, এই বর্তমানের যুদ্ধকালীন অবস্থা সাময়িক আগ্নেয়াস্ত্র-সম্বরণ মাত্র (cease-fire), ইহা প্রকৃত যুদ্ধ-বিরতি (armistice) নয়। যাহারা যুদ্ধের ব্যাপারে অভ্যস্ত তাহারা জানে, এই সময়ে যে ক্ষিপ্রতর প্রস্তুতি করিতে পারে তাহারই জয় সম্ভব এবং যে মূঢ়মতি ঐ অবসরে বিরাম-বিশ্রামের চিন্তা করে তাহার সমূহ বিপদ আসন্ন।

আমাদের বাংলাদেশ তো সবে জাগ্রত হইতেছিল। এখনও যুবশক্তি বিভ্রান্ত ও অন্যমনস্ক, আমাদের এখন "জাগো জাগো" "সাজো সাজো" বলিয়া সকল উদ্যম যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতিতে নিয়োগ করা প্রয়োজন। শান্তি এখনও সুদূর পরাহত।

কবিতা

গান

চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে, সাধ্‌রে সাধ সবে, দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগ সবে, বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আনতে, নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে, নব উৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান।

লোক রঞ্জন, লোক গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।

(পুনর্মুদ্রণ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে,
আয়রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনমতে।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ
সে সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্ত কায়া,
টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া
চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্য পর্বতে।

ঐ যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুলছে নাকি প্রাণ
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যা বেগের মতো
ছুটছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে!

(পুনর্মুদ্রণ)

—অজ্ঞাত

ভারত ছাড়ো

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চীনা বুনো ফৌজ ভারত ছাড়ো।
তিব্বত গিলে খাই বেড়ে আজ
ভারত-দেহেরও মাংস কাড়ো?
গলায় আঙুল দিয়েই বলব ঃ
ভারত ছাড়ো॥

আমার ভারত, আমার নিশান—
আমার জীবন, মান, সম্মান;
আমার ধর্ম, আমার মন্ত্র ঃ
বন্দে মাতরম্‌।

গৈরিক রং গঙ্গার ধারে
সরস্বতীর তুষারের আড়ে
শ্যাম যমুনার প্রলেপে নিশান
ত্রিবেণীর সঙ্গম।

এই তেরঙ্গা নিশানের দেশে
চেঙ্গিস খাঁর সাকরেদ এসে
নতুন মুখোসে ভোল পাল্টিয়ে
রক্ত নিশান গাড়তে পারে?
ভারত ছাড়ো॥

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

চীনা আক্রমণ আমাদের নানাদিকেই সচেতন করে তুলেছে। শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আগে কিছু নিবেদন করেছি। এবার টেলিস্কোপ ঘোরাচ্ছি অন্য একটা বিষয়ের দিকে।

ডিসেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি, অথচ এখনও শীত পড়ল না ভালোকরে। ইংরেজি কবিতায় ছাত্রজীবনে পড়েছি, ইফ উইন্টার কামস্‌, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইণ্ড? জীবনের অনেক দুঃখের সময় এ কথা চিন্তা করে শান্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু বাংলাদেশে যে ঐ উক্তির কিছুটা পরিবর্তন করে অনুবাদ করলে লাগসই হয় তাও লক্ষ্য করেছি সবিস্ময়ে।

অর্থাৎ, 'শীত এলে বসন্ত আসতে দেরি হয় না', মানেটা ঠিক এরকম না হয়ে হবে এই রকম—শীত না এলে বসন্ত আসতে দেরি হয় না।

বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে 'বসন্ত' কথাটার মানে একটু অন্য রকম। তার মধ্যে মলয়ানিলের স্নিগ্ধ স্পর্শ নেই, কোকিলের কুহুরব নেই। আছে কেবল যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ দাহ এবং শয্যাশায়ীর উহুরব। ব্যাপারটা নিছক একটি ব্যাধি, যাকে চলতি কথায় বলে স্মল পক্স। ঋতুগত বসন্তের মতো, এই দেহগত বসন্তেরও শীতের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্ক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অবশ্য এইখানেই বলে নেওয়া ভাল, 'বসন্ত' শব্দটির এই বিপরীত ব্যবহার আমার মৌলিক সৃষ্টি নয়। এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির একস্থানে আছে—'কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি।' তাই থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি শব্দটির ব্যঞ্জনা কতো গভীর।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। শীত না পড়লে বসন্ত দেখা দিতে শুরু করে। আর বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে সেই একই ঘটনা—কলকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সমাসন্ন।

শোনা যাচ্ছে, চার বছর পর-পর বসন্ত রোগের যে বড় ধাক্কাটা আসে, এবার নাকি সেই পাইকিরি রোগের

বছর। কাজেই, চারদিকেই একটা অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বসন্ত-কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক রোগ এখন অপ্রতিষেধ্য বলে মনে করা হয় না। সত্যি বলতে কি, ইউরোপ-আমেরিকায় তো বটেই, আমাদের এই ভারতবর্ষেরও অনেক শহরে ঐ সব ব্যাধির প্রকোপকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। কলকাতা এবং সমগ্রভাবে বাংলাদেশেও যে তা করা যাবে না কেন তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

অবশ্য একটা কারণ যে আছে, তা আমরা সকলেই জানি। সে হল আমাদের জনসাধারণের উদাসীনতা। কিন্তু তাকে সঙ্গত কারণ বলা যায় না। স্বাধীনতা পাওয়ার এত বছর পরেও যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার মতো একটা প্রাথমিক ব্যাপারে এতখানি উদাসীন হয়ে আছেন, তাকে নিয়তির বিধান বলে মেনে নিতে পারি না।

কিন্তু অতীতে আমরা কী করেছি আর কী করতে পারিনি, তার চুলচেরা বিচারে বসে এখন লাভ নেই। চীনাদের দস্যুসুলভ আক্রমণে দেশরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যাপারেই আমরা এখন নতুন করে প্রস্তুত হতে সচেষ্ট। আমার বক্তব্য, জনস্বাস্থ্যের দিকেও যেন আমরা নজর দিতে কুণ্ঠিত না হই।

একদা এমন সময় ছিল, যখন সাধারণ মানুষ টীকা নিতে ভয় পেতেন। আমি এক ভদ্রলোকের কথা জানি, তিনি ছিলেন প্রাথমিক ইস্কুলের পরিদর্শক। জায়গাটা ছিল কলকাতার কাছেই একটা মফঃস্বল শহর। কোনো একটা বিশেষ ইস্কুলে পরিদর্শন করতে গেছেন তিনি। তাঁর হাতে ছিল একটা ব্যাগ, যার মধ্যে তিনি জরুরী কাগজপত্র রেখেছিলেন। খোলা চালার মধ্যে বসেছিল ইস্কুল। শহরতলীর দরিদ্র ছেলেরা দূর থেকে এই ইন্সপেক্টারবাবুকে দেখে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে বইপত্র ফেলে এমন উৎক্ষিপ্তের মতো চারিদিকে ছুটে পালাল যে, তিনি তো অবাক! যাই হোক, ইস্কুলের চত্বরে এসে হেডমাস্টার মশায়ের অভ্যর্থনা লাভ করে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তিনি। আগে তো ভেবেছিলেন এটুকুও বরাতে জুটবে না, বরং সেখানেও পাবেন বিরূপ সম্বর্ধনা।

মাস্টার মশায় ছাত্রদের অসঙ্গত আচরণের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, এবং বললেন কিছুক্ষণ বসলে ওদের কাউকে কাউকে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে ধরে আনতে পারবেন তিনি।

কিন্তু কেনই যে ওরা এমন করে ছুটে পালাল, আর কেনই বা ওদের 'ধরে' আনতে হবে, সেকথা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না ইন্সপেকটারবাবু। সে কি তিনি ওদের পড়া ধরবেন এই ভয়ে? প্রশ্ন করলেন তিনি হেডমাস্টার মশায়কে। উত্তর হল, আজ্ঞে তা নয়। পালিয়েছে ওরা আপনার ঐ ব্যাগ দেখে। ওরা ভেবেছিল, আপনি টীকাদার।.........

এমনি ভয় ছিল এক সময় টীকা নেওয়ার বিষয়ে। এখন হয়তো এতটা নেই। কিন্তু একেবারে যে নেই, একথা বলা চলে না। পাছে টীকা ওঠে, পাছে কয়েকটা দিন একটু অসুবিধে হয় এই ভয়ে অনেক মোটামুটি শিক্ষিত মানুষকেও আমি টীকা নিতে গড়িমসি করতে দেখেছি। এই ধরণের ভয় যে কী রকম সাংঘাতিক কুফল আনতে পারে এ বিষয়ে অনেকেই দেখেছি অচেতন।

এইখানেই আসে আমাদের দেশবাসীর সচেতন অংশের দায়িত্ব। সব কিছুই সরকারী প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার অর্থ হল নিজের কর্তব্যে অবহেলা। সরকার বা কর্তৃপক্ষের যা করণীয় তা তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকে সর্বত্রগামী এবং সর্বাঙ্গসার্থক করার জন্যে দরকার হল আমাদের সচেতন দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা। আশা করি এ ব্যাপারে কেউ উদাসীনতার প্রশ্রয় দেবেন না।

দেশ আজ নতুন করে জেগে উঠেছে। তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি যেমন অপ্রতিরোধ্য, তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতিজ্ঞাও তেমনি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সকলের প্রথমে হটাতে হবে আজ হামলাদার বিদেশী দস্যুদের। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখতে হবে, মহামারী এসে যাতে আমাদের জয়ের আনন্দ উপভোগে বাধা না দিতে পারে। আমাদের এই নবজাগরণের বন্যায় মুছে যাক আজ পুরনো দুর্বলতার গ্লানি,—পুরনো ব্যাধির কলুষস্পর্শ।

প্রতিরক্ষা সংখ্যা

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর প্রকাশিতব্য 'অমৃতে'র ৩৪ সংখ্যাটি বিশেষ প্রতিরক্ষা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। ঐ সংখ্যায় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নানা তথ্যপূর্ণ সচিত্র রচনা এবং বর্তমান জাতীয় সংকটে সাহিত্য, নাট্যশালা ও চলচ্চিত্রের বিশেষ কর্তব্যের বিষয়ে বহুবিধ হৃদয়গ্রাহী নিবন্ধ স্থান পাবে। তাছাড়া থাকবে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত একটি দেশাত্মবোধক ছোট গল্প, প্রতিরোধাত্মক বিদেশী গল্পের অনুবাদ, ধারাবাহিক উপন্যাস ও অন্যান্য বিভাগ।

এই বিশেষ সংখ্যাটিরও
দাম থাকবে
যথারীতি ৪০ নয়া পয়সা।
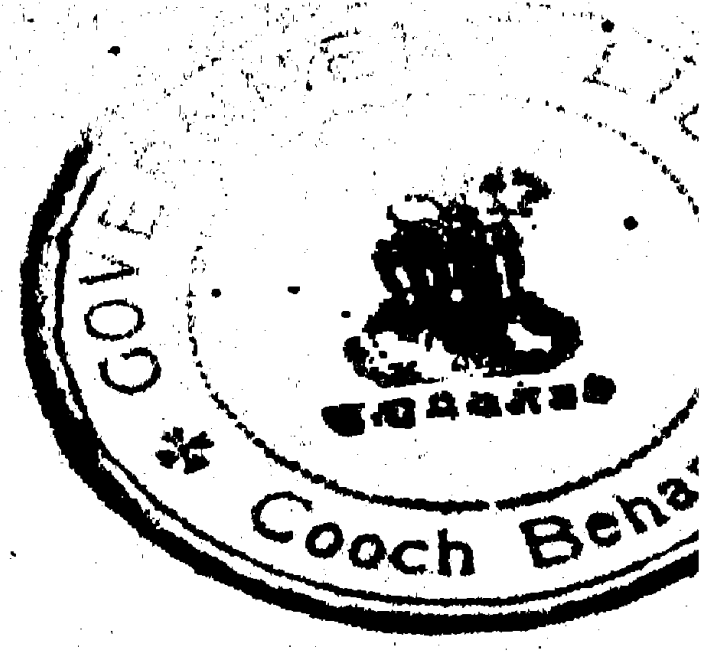
প্রদাহ

সব কিছু তাই আছে
বাড়ি আর বেড়া
আশা, তৃপ্তি, অসন্তোষ,
উল্লাসে ও অবসাদে
জীবনের বৃন্ত খুঁজে ফেরা,
হেমন্তের কুয়াশায় ধোঁয়ার ভেজাল,
নির্মল প্রাণের ধারা
রুদ্ধ করা মিথ্যার জঞ্জাল।

তবু এক দুঃসহ প্রদাহে
অন্য সব জ্বালা মুছে গেছে,
আর সব চেতনা অসাড়।
আকাশ পৃথিবী সব ভিন্ন চোখে চায়,
সূর্যোদয় রক্তিম ধিক্কার
রাত্রি গাঢ় গ্লানির কালিমা।

আত্মায় ধর্ষিত আমি।
আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সত্তায়
অশুচি স্পর্শের ক্ষত
পাপের ব্যাধির মত দহে।
শিরায় শোণিত নয়,
বিষাক্ত আর কোনো স্রোতে
হৃদয় স্পন্দিত।

সুখ, প্রেম, শান্তি আর সত্যের পিপাসা
থাক তবে আজ মুলতবি,
বাঁচার চেয়েও বড়
জীবনের অত্যাজ্য সুরভি,
মাটির মমতা আর মানবতা মেশানো আধারে
স্বাধীনতা যার এক নাম।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুলে প্রচারিত "অমৃত" পত্রিকার জনপ্রিয় 'জানাতে পারেন' বিভাগের আমরা নিয়মিত পাঠক। উক্ত বিভাগ মারফৎ কয়েকটি প্রশ্ন পাঠক-বর্গের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য পাঠালাম। আশা করি প্রশ্ন কয়টি অমৃতের পাতায় যথাসময়ে দেখতে পাব। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ :—

১। ভারতবর্ষে মোট কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কি কি?

২। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কোন প্রদেশে কত?

৩। ভারতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশাগত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়ন করেন?

৪। বহির্ভারতীয় কি কি ভাষায় কোন কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়?

৫। ভারতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা কয়টি এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত?

শ্রীবিপুলেন্দ্রশঙ্কর রায়।
শ্রীহেমচন্দ্র দে।
পি. ডব্লু. আই, (কন্স্ট্রাকসন)
অফিস অন্ডাল, বর্ধমান।

(উত্তর)

গত ১৯শে অক্টোবরের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর :—

১। সমাজ-সংস্কারক ও মেলবিধি নামক সংস্কৃত কুলজী গ্রন্থ রচয়িতা দেবীবরের উপাধি মিশ্র ছিল না, ছিল ঘটক। রাজা আদিশূর কর্তৃক কনোজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষ, এবং বাংগালপাশী গ্রাম নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী সংকেত বংশ-সম্ভূত সর্বানন্দ ঘটকের পুত্র ছিলেন এই দেবীবর ঘটক বিশারদ। উপাধি দ্বারাই বুঝা যায়, সম্ভবতঃ বিবাহের ঘটকালি করাই তাহাদের পেশা ছিল। আনুমানিক ১৪০২ শকে বা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি এক এক প্রকার দোষযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণকে এক এক দলভুক্ত করিয়া এক এক মেলের নামকরণ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত মেল বা দলের সংখ্যা ছিল ৩৬।

২। "সন্ধ্যা" দেশের উল্লেখ প্রশ্ন-কর্তা কোথায় এবং কোন্ প্রসঙ্গে পাইয়াছেন, তাহা জানাইলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতিথিকে কিভাবে সম্ভাষণ জানান হয়. তাহার উত্তর 'জানাতে পারেন' বিভাগের স্বল্পপরিসর স্থানে দেওয়া সম্ভবপর নহে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, হিন্দুগণ হাতজোড় করিয়া নমস্কার বা প্রণাম, খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ভাষায় সুপ্রভাত বা সুসন্ধ্যা ইত্যাদি বলিয়া করমর্দন, মুসলমানগণ "আস্ সালামো আলায় কুম্" বলিয়া একটু অন্যভাবে করমর্দন দ্বারা, এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণ হিন্দুদের মতই জোড়হাত উত্তোলন করিয়া অতিথিগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অতিথি বিশেষ সম্ভ্রান্ত বা পদস্থ হইলে সকলেই সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্ভাষণ জানাইবার সময় মাথা বা ঘাড় কমবেশী নোয়াইয়া থাকেন।

৪। পার্শীয়ান বলিতে বর্তমানে পারস্য বা ইরান দেশের লোককে বুঝায়। তাঁহারা প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্মা-বলম্বী, মৃত লোককে কবর দিয়া থাকেন। তবে পারস্য হইতে ধর্ম ও প্রাণভয়ে পলাতক বোম্বাই-প্রবাসী অগ্নি-উপাসক পার্শী সম্প্রদায় মৃত লোককে Tower of Silence-এ শকুন ও বাজপাখির খাদ্য হিসাবে এখনও রাখিয়া আসেন, অন্য কোনরূপ সংস্কারের ব্যবস্থা করেন না। অবশ্য ইহার মধ্যেও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। মৃত ব্যক্তির পচনশীল দেহ দ্বারা অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি পক্ষীর তুষ্টিসাধন।

৫। ৫০ মেগাটন বোমা যেখানে বিস্ফোরণ করা হইয়াছিল, সে স্থান হইতে বায়ুতাড়িত হইয়া আণবিক ভস্মকণাসমূহ যে যে স্থানে খুব বেশি পরিমাণে পড়িয়াছে, সে সে স্থানেই ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা।

৬। মোটামুটিভাবে উপকথা ও রূপকথার মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না। উভয়ই অলীক বা উপাখ্যান মাত্র, এবং উভয়ের মধ্যেই গল্পের মাধ্যমে উপদেশমূলক কোন কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে। তবে উপকথার উপজীব্য সাধারণতঃ মানুষ, পশুপক্ষী ইত্যাদি, আর রূপকথার কাহিনীতে রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব, পরী ইত্যাদির প্রাধান্যই দেখা যায়।

৭। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম কোনটি, তাহা যাঁহাকে লইয়া ধর্মের উদ্ভব (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা), একমাত্র তিনিই সঠিকভাবে বলিতে পারেন। ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ (যেমন সমগ্র ইয়োরোপ এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি স্থানে), এবং হত্যাকান্ডের ফলে (যেমন সমগ্র আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া'য়) পৃথিবীর বহু প্রাচীন ধর্মই আজ অবলুপ্ত। তবে যে সমস্ত সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এবং তাহাদের অনুগামীগণও বাঁচিয়া আছেন, তন্মধ্যে বৈদিক ভাষায় রচিত ঋগ্বেদ পৃথিবীর সমগ্র আর্য জাতির প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, আর প্রাচীন হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলের Old Testament সেমেটিক জাতিসমূহের (পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কিয়দংশের অধিবাসিগণ) প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক বলিয়া স্বীকৃত। Old Testament বর্ণিত ধর্ম Judaism (জুডাইসম্) বা প্রাচীন ইহুদী ধর্ম। এই দুই ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদকেই প্রাচীনতর বলিয়া ধরা হইলে বৈদিক আর্যধর্ম এবং তাহার ধারক হিসাবে ভারতের হিন্দুধর্মকেই বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইরানের প্রাচীন আর্য অধিবাসিগণের, এবং বর্তমানে ভারতের পার্শী সম্প্রদায়ের "জেন্দ্ আবেস্তা" ঋগ্বেদ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। আর প্রাচীন মংগোলীয় জাতির প্রধান বাসস্থান হিসাবে চীনদেশে প্রচলিত "তাও" ধর্ম বা "কন্ফুসিয়ান্" ধর্ম বা তৎপরে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা বয়সে অনেক নবীন। এই ভারতেই আজ হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে একপ্রকার সমকালেই প্রচারিত ভগবান মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্ম এবং ভগবান বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম বৈদিক আর্যধর্মেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র সন্দেহ নাই। প্রভু যীশুখৃষ্ট প্রবর্তিত খৃষ্ট-ধর্মের বয়স কমবেশি ১৯৩০ কি ১৯৩২ বৎসর, আর প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ইস্‌লাম ধর্মের বয়স কমবেশি ১৩৫২ বৎসর মাত্র। এই দুই ধর্মকেই প্রাচীন Judaism এর দুই নবরূপ বলা যায়।

৮। ইংরেজী ১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে, দেহরক্ষার কয়েকমাস পূর্বে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিকাল বেলায় কাশীপুর উদ্যানবাটির প্রাঙ্গণে ভাবস্থ অবস্থায় "কল্পতরু" হইয়া শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত প্রায় সকলকেই তাহাদের অন্তরের অভিলাষ অনুযায়ী বরদান করিয়াছিলেন। বলা-বাহুল্য, ভক্তগণ সকলেই সেই পবিত্র ভাবময় মূর্তির সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া মনে মনে পারমার্থিক কল্যাণই হয়ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঐহিক সুখভোগ প্রার্থনা করেন নাই। সেই পবিত্র দিনটিকে স্মরণ করিয়াই তাঁহার অগণিত ভক্ত ও অনুরাগীগণ প্রতি বৎসর "কল্পতরু" উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা-৯

মনে পড়ল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ সারপ্রাইজ ভিজিট ॥

খবরের কাগজে দেখলাম বর্মাডিলার পতনের পর চীনদরদী ক'টা বাঙালি বিভীষণ ঠোঙায় করে খাবার কিনে এনে খেয়েছে।

মনে পড়ল।

তখনও দেশ ভাগ হয়নি, এক মফঃস্বলী সদরে মুন্সেফিতে আছি। বদলির অর্ডার এসে গিয়েছে, সেরেস্তাদারকে চার্জ দিয়ে জয়েনিং টাইম 'এভেইল' করছি। জিনিসপত্র প্যাক হচ্ছে।

হঠাৎ সন্ধের দিকে ছোকরা এক আমলা এসে হাজির।

এখন তো উদীয়মানের কাছেই যাওয়া উচিত, অস্তমানের কাছে কে আসে।

'স্যার, ওরা ফিস্টি করছে।'

'কারা?'

'কোর্টের আমলারা।'

'উপলক্ষ্য?'

'আপনি বদলি হয়ে গিয়েছেন, তাই।'

তার মানেই শত্রুপক্ষের পতন হয়েছে বলে উল্লাস। আমিও উল্লসিত হলাম-যেহেতু বিভীষণরাও নিরাপদ নয়। বিভীষণের মধ্যেও বিভীষণ।

বললাম, 'তা ওদের ঘুষ-ফুস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল—আমি চলে গেলে ফুর্তি তো হবেই—'

'স্যার, একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন?'

চার্জ দিয়ে দিয়েছি, সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার আর এক্তিয়ার কই? তবে বাঙালি মতে এমনি গিয়ে পড়লে কে আটকায়।

বললাম, 'চলুন।'

হাকিমি পোশাক নয়, সাদাসিধে ঘরোয়া ধুতি-পাঞ্জাবিতেই চললাম। শুধু র‍্যাপার দিয়ে মুড়িসুড়ি দিলাম—যা কনকনে শীত।

'এই যে এস। এত দেরি করলে কেন?' সেরেস্তাদার স্বয়ং অভ্যর্থনা করল। 'শালা ভেগেছে এত দিনে। চার্জ দিয়ে দিয়েছে।'

বুঝলাম দেখামাত্রই চিনতে পারেনি আমাকে। কোনো অনুপস্থিত আমলা বলে ভুল করেছে।

বললাম, 'কই আমার ঠোঙা কই?'

যেই কণ্ঠস্বর, পলকে চিনে ফেলল।

'স্যার, স্যার—' সকলের প্রায় নাড়ী-ছাড়ার অবস্থা।

'বা, ফিস্টি তো ভালো কথা। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে কেন? যার জন্যে ফিস্টি তারই নেমন্তন্ন নেই? আমার একটাও ফেয়ারওয়েল মিটিং হয়নি, এইটেকেই বরং তাই করা যাক। খাবার ঠোঙায় কেন, প্লেট নিয়ে আসুন। আর ওপেনিং সং গাইবার জন্যে একটা হারমোনিয়ম—'

কেউ বা প্লেট আনবার কেউ বা হারমোনিয়ম আনবার নাম করে কেটে পড়ল।

সেই রাত্রেই ট্রেনে করে কলকাতা গেলাম। সকালে হাইকোর্টে দেখা করতে গেলাম রেজিস্ট্রারের সঙ্গে। ভাগ্যক্রমে রেজিস্ট্রার ইংরেজ।

স্থানীয় জেলাজজকে বাই-পাশ করে গেলাম। প্রথম কারণ, চার্জ দিয়ে দেবার পর সে আর আমার জজ নয়; দ্বিতীয় কারণ, বাঙালি "ইউরোপীয়ান" জজের রসবোধ নেই বললেই চলে।

কার্ড পাঠালেও সহজে ডাকছেন না রেজিস্ট্রার। সে নির্ঘাৎ বুঝেছে বদলি ক্যানসেল করতে এসেছি। আর ওজুহাত সেই মামুলি—স্ত্রীর ডেলিভারি আসন্ন।

'কী, স্ত্রী অসুস্থ?' ঘরে ঢুকতেই হুমকে উঠল রেজিস্ট্রার।

হাসলাম। বললাম, 'না, স্যার। বদলি রদ করবার তদবিরে আসিনি। শুধু একটা গল্প বলতে এসেছি।'

'গল্প?'

'হ্যাঁ, এখন না বলে গেলে বলবার আর চান্স পাব না কোনোদিন।'

বলে সব ব্যক্ত করলাম।

রেজিস্ট্রার গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমার প্রতি ওরা এত বিরূপ কেন?'

'ঐ সারপ্রাইজ ভিজিট।' হাসলাম। 'একেবারে না বলে-কয়ে কোনো পূর্বাভাস না দিয়েই সারপ্রাইজ ভিজিট। কখনো-কখনো সরাসরি এজলাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে। কখনো বা অফিস-টাইমের বাইরে, রাত্রে।'

'কিছু আবিষ্কার করেছ?'

'তার আর লেখাজোখা হয় না। উকিল নথি থেকে সারেপটিস্যাস কপি নিচ্ছে, আউটসাইডাররা ভাড়ায় কাজ করছে, আমলারা সাইকেলে বেঁধে নথি নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, আর সেরেস্তাদার দিব্যি খালি গা হয়ে খেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন—'

'কিছু সুফল হয়েছে?'

'সুফলের মধ্যে প্রসিডিং করে-করে নিজের কাজ বাড়িয়েছি আর পেছন থেকে চুপি চুপি এসে সেরেস্তাদারের হুঁকো থেকে জ্বলন্ত কলকে তুলে নিতে গিয়ে হাত পুড়েছে। আর, শেষ পর্যন্ত, ঐ ফিস্টি—'

'তুমি কি আজই ফিরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, তা, আজই।'

'তবে নেক্সট ট্রেনেই ফিরে যাও। আর অর্ডারের য়্যাডভান্স কপি নিয়ে যাও সঙ্গে করে।'

পরদিন যথাসাজে কোর্টে গিয়ে কলিং বেল-এ বাড়ি মারতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেরেস্তাদার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এ কী!

বললাম, 'চার্জ টেক ওভার করব। বদলি রদ হয়ে গেছে।' অর্ডারের য়্যাডভান্স কপিটা দেখালাম। 'আর শুনুন, অফিসে এখন আমি একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেব। সব টিপটপ করে রাখুন। ভিড়ভাড় সরিয়ে দিন। হুঁকো-কলকে সরা-মালসা—সমস্ত। আর যদি কালকের ঠোঙা-ফোঙা থাকে, তাও। আর শুনুন,—' সেরেস্তাদার আবার ফিরল। 'সিগারেট খান না? সিগারেটটা মন্দ কী! চট করে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ছুঁড়ে। এই নিন একটা—দেখুন—'
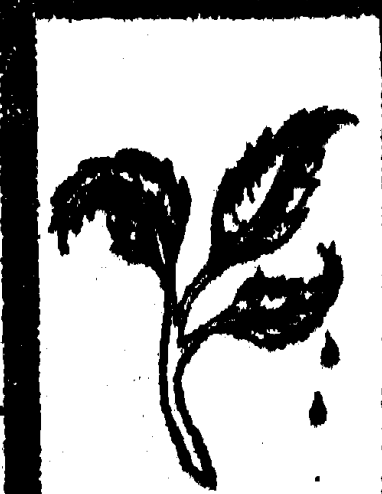
'না স্যার, না স্যার—' পায়ে যেন হাড় মাংস নেই এমনি টলতে-টলতে চলে গেল সেরেস্তাদার।

এজলাসে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

মনে পড়ল।

তার মানেই বর্মাডিলা আবার অধিকৃত হল।

বিভীষণরা বোধ হয় আরো একবার খাবে। ভাব দেখাবে আমার ফিরে-আসা যেন ওদেরই ফিরে-পাওয়া।

দুই নৌকায় পা

একেই বলে 'বিজনেস ইজ বিজনেস' খেলা

৬-১২-৬২ ইং

চীনের জন্য টার্বোপ্রপ

ভারতের জন্য অস্ত্র

চীন

ভারত

জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানী

কলকাতা

ঢাকা

এই যুদ্ধের সংবাদ

শ্রীসঞ্জয়
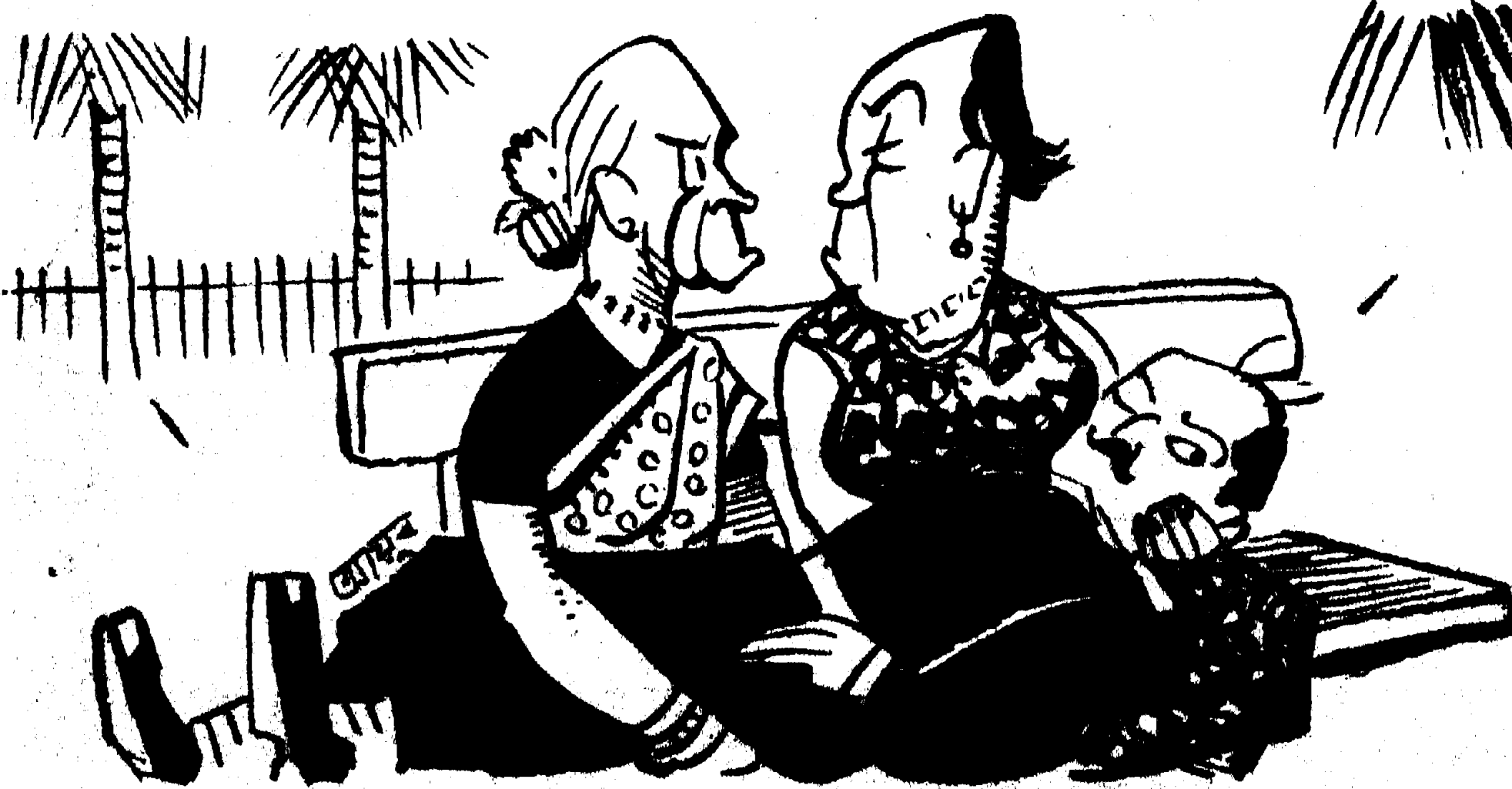
চীন তার এক তরফা ঘোষণা অনুসারে ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রির পর অস্ত্রসংবরণ করে।

কিন্তু অস্ত্র সংবরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা যে পশ্চাদপসরণের কথা বলেছিল সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়নি। ১লা ডিসেম্বর থেকে চীনা সৈন্যদের অধিকৃত ভারতীয় এলাকা ত্যাগ করে পূর্বে ম্যাকমেহন লাইনের ২০ কিলোমিটার উত্তরে ও পশ্চিমে "চিরাচরিত সীমান্তরেখার" ২০ কিলোমিটার উত্তরে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চীনাদের এই প্রতিশ্রুতি পালনের কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই থেকেই বোঝা যায় যে, কারও মধ্যস্থতায় বা সরাসরি আলোচনায় ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দখল করা জমি হাতছাড়া করার ইচ্ছা তাদের নেই।

ভারত চীনের ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বাবস্থায় চীনা সৈন্য না ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কোন রকম আলাপ আলোচনা চীনের সঙ্গে শুরু করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। ভারতের এই সিদ্ধান্ত হতে চীন স্বভাবতই ধরে নিতে পারত যে সে কোন দখল করা জমি ত্যাগ করে গেলে ভারতীয় সৈন্য অগ্রসর হয়ে তা দখল করে নেবে। কিন্তু, যেকোন কারণেই হোক, ভারত সরকারের পক্ষ হতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে চীনা সৈন্যরা ভারতের যেসব অঞ্চল ত্যাগ করে যাবে ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে তা পুনর্দখল করা হবে না। অসামরিক ব্যক্তিরা সেসব স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ভারতের এই নির্দেশ বোধহয় চীনকে এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেছে যে, চীন আবার আক্রমণ আরম্ভ না করলে ভারত আর সংঘর্ষের ঝুঁকি নেবে না। একারণে ২১শে নভেম্বর যেসব কথা চিন্তা করে চীন অস্ত্র সংবরণের ও পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বর্তমানে তার সে মনোভাবের অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাহায্য চীনকে যে কতখানি উত্তেজিত করে তা অস্ত্রসংবরণের পরেরদিন ভারতের উদ্দেশ্যে লিখিত পিকিং পিপলস ডেইলীর আবেদনটুকু পড়লেই বুঝতে পারা যায়। তাতে বলা হয় Particularly serious is the prospect that if U.S. imperialism is allowed to become involved, the present conflicts will grow into a war. অর্থাৎ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যদি এই বিরোধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে বর্তমান সংঘর্ষ যুদ্ধে পরিণত হবে।

কিন্তু ভারতের বর্তমান মনোভাব ও কার্যক্রম চীনকে একথা বোঝার সুযোগ দিয়েছে যে, মার্কিন সাহায্য পেলেও ভারত এখন আর নিজ উদ্যোগে যুদ্ধ শুরু করবে না। সুতরাং ব্যাপক যুদ্ধের আশঙ্কায় চীন যে আপাতত কিছুটা ভারতীয় জমি ছেড়ে দিয়ে যে সদিচ্ছা প্রমাণের কথা ভেবেছিল সেভাবে সে হয়তো এখন আর চিন্তা করছে না।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের উদ্যোগে ১০ই ডিসেম্বর কলম্বোয় এসিয়া ও আফ্রিকার ছয়টি নিরপেক্ষ দেশ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ঘানা, সিংহল, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার যে সম্মেলন আহূত হয় ভারত তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীআর কে নেহরু যান আফ্রিকায় ও আরব রাজ্যগুলিতে এবং ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন যান কলম্বো সম্মেলনে আহূত এসিয়ার দেশগুলিতে। ভারতের বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের প্রতিলিপির সাহায্যে তাঁরা ঐসকল দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বোঝান ভারতের দাবী কোন ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সফর অন্তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা সকলেই তাঁদের দৌত্যের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রীঅশোক সেন ৬ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর চীনারা যেখানে ছিল সেখানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ভারতের পক্ষে কোন সমাধানই গ্রহণযোগ্য হবে না একথা তিনি প্রেসিডেন্ট নাসের ও প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে জানিয়ে এসেছেন। তিনি আরও বলেন যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের শান্তি প্রস্তাব ভারতের প্রস্তাবেরই অনুরূপ কিন্তু চীন তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

শ্রীসেন আরও বলেন যে, কায়রো ও আক্রায় তাঁদের আলোচনার ফলে চীনাদের 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার' অস্পষ্টতা ও অসত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃত

তেজপুরে তিনজন সেনাধ্যক্ষ : (বাম হতে দক্ষিণে) ইণ্টার্ণ কমাণ্ডের অধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল এল পি সেন নেফা কমাণ্ডের নূতন অধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল মানেক শা এবং সর্বদক্ষিণে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল জে এন চৌধুরী।

নিয়ন্ত্রণরেখা কোনটি? চীনাদের মতে, যেটি চিরাচরিত রেখা। আবার চিরাচরিত রেখা কি না, ১৯৬০ সালের চীনা মানচিত্রে যা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, চীনা ভাষামতে, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন রেখা" হল ১৯৬০ সালের মানচিত্রে দেখানো সীমান্ত রেখা। এবং সে সীমান্ত রেখাও আবার চীনা সৈন্যরা দখল করেছে আরও দু বছর পরে, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ব্যাপকভাবে ভারতের উপর হানাদারি শুরু করার পর।

শ্রীসেন তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে অতি সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে, চীন যা গায়ের জোরে দখল করেছে তার কিছুই সে ছেড়ে যাবে না। পরন্তু চীনের প্রস্তাব মানতে হলে ভারতকেই ঐ সকল এলাকা থেকে আরও সাড়ে বারো মাইল পিছু হটে আসতে হবে।

কলম্বো সম্মেলনে যে ছয় রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তারমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর উপরেই চীনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ ডঃ সুকর্ণ যে মীমাংসা-প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ করতে চান চীন তা পূর্বেই নাকচ করে দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাব করে যে চীন ভারতের দাবী মেনে তার সৈন্যবাহিনী ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাক, আর ভারতও চীনের দাবীমত ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের "প্রকৃত নিয়ন্ত্রাণাধীন এলাকা" হতে ২০ কিলোমিটার পেছিয়ে আসুক। তাহলে উভয় দেশের মধ্যবর্তী নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলের পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু কলম্বো সম্মেলনের উপর ভারত যত গুরুত্বই আরোপ করুক না কেন, সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে খুব বেশী আশাহীন বলে মনে হয় না। কারণ সব রাষ্ট্র হতেই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা, প্রধান শাসকরা নন। কারণ, তাঁরা বোধ-

সেলায় বিচ্ছিন্ন ভারতীয় বাহিনীর এই সৈন্যরা দুর্গম গিরিপথ লঙ্ঘন করে দলে যোগদানের পর তেজপুরে সাংবাদিকদের নিকট তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন। বাম হতে দক্ষিণে—মেজর যশোবাল, ক্যাপ্টেন বেইনস, জমাদার সিরিচাঁদ ও অন্যান্যরা।

ভারতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জে কে গলব্রেথ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর বিঃ জেনারেল জন কৌলকে সংগে করে একটি হেলিকপ্টারযোগে নেফা এলাকায় সম্মুখ অঞ্চল সফরে যাচ্ছেন।

হয় এটা ধরে নিয়েছেন যে, চীনের মনমত প্রস্তাব যদি তাঁরা না গ্রহণ করতে পারেন তবে চীন তা কখনও মেনে নেবে না। সুতরাং নতুন কোন প্রস্তাব মাথা খাটিয়ে বার করতে যাওয়াটাই তাঁদের পণ্ডশ্রম হবে।

আর চীনের মনোভাব এ ব্যাপারে দুকান কাটার মত। তারা আজ সমালোচনা বা নিন্দাতে আর সংকুচিত হয় না। সারা বিশ্বের জনমত তার বিরুদ্ধে গেছে এমন কি কমিউনিষ্ট দুনিয়ার মনোভাবও তার প্রতিকূল। তার ওপর যদি কলম্বো সম্মেলনের সিদ্ধান্তও তার বিরুদ্ধে যায় তাতে তার এমনকি ক্ষতি হবে? তার যুদ্ধ ভারতের সংগে, সুতরাং ভারত যতক্ষণ না তাকে বলপূর্বক উৎখাত করছে ততক্ষণ তার থাকতে বাধা কোথায়?

সম্প্রতি বুলগারিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির যে বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল তাতে প্রায় সর্বত্রই চীনের বর্তমান কার্যকলাপ ও মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু চীন তাতে এতটুকুও দমেনি। বরঞ্চ চীনা প্রতিনিধিরা সেসব সম্মেলনে বলেছেন, চীন তাদের সমালোচনার ভয় করে না। কারণ চীন এগিয়ে চলেছে বিপ্লবের পথে আর তার সমালোচনা করছে যেসব কমিউনিষ্ট দেশ বা দল তারা সকলেই শোধনবাদী, বিপ্লব-বিমুখ এমন কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল।—এই হচ্ছে আজ চীনের মনোভাব। কেউ যদি তার সঙ্গে না থাকে তবে সে একাই চলবে। যুদ্ধ যদি করতে হয় ত সে একার হিম্মতেই করবে। সত্তর কোটি লোক তার সমর্থক, সুতরাং তার ভয় কাকে? এই যে দেশের মনোভাব, দীর্ঘদিনের মিত্র ও সংগ্রাম-সাথীদের সম্বন্ধেও যাদের এত অশ্রদ্ধা-পূর্ণ উক্তি ও আচরণ, সোভিয়েট ইউনিয়নও যে দেশের মতে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত, তার কাছে কলম্বো সম্মেলনের বিরূপ সমালোচনার কি মূল্য থাকতে পারে? সুতরাং কলম্বো সম্মেলন বা ঐ জাতীয় মধ্যস্থতার উপর আমরা যতই নির্ভর করি না কেন চীনের কাছে তার মূল্য নিতান্ত সামান্য। আর ঐসব সম্মেলন ও বন্ধ্যা আলোচনায় ভারত যত কালক্ষেপ করবে ততই চীনের পক্ষে পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় মিলবে।

শ্রীনেহরু অবশ্য তেজপুরের সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, চীনারা যদি ভারতীয় অঞ্চল হতে সরে না যায় তাহলে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের বলপূর্বক বার করে দিতে বাধ্য হবে। আর কখন তা করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব ভারতের।

কিন্তু চীন যদি কোন স্থান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে যায় তবে ভারতের অসামরিক ব্যক্তিরা সে সব স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, ভারতের এই পূর্ব-ঘোষিত নীতি চীনকে হয়ত শ্রীনেহরুর এই

সর্বশেষ ঘোষণাকে খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে না নেওয়ার জন্যই প্ররোচিত করবে। তারপর তেজপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীনেহরু যে বলেছেন, বিদেশী সৈন্যের সাহায্য ভারত কখনও নেবে না।

লদাক সম্বন্ধে আমরা একবার শুনেছিলাম, সেই জনপরিত্যক্ত পার্বত্য এলাকায় ঘাস পর্যন্ত গজায় না। কিন্তু চীনের মনোভাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত। ৩রা নভেম্বর 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী' লদাকের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রচার করেন তাতেই বোঝা যায় যে, ঐ এলাকাটির প্রতি তাদের লোভের প্রকৃত কারণ কি। ঐ বর্ণনায় বলা হয়, 'যদিও মনুষ্য বাস সেখানে সামান্য, প্রাকৃতিক সম্পদ সেখানে প্রচুর। এ পর্যন্ত সেখানে খনিজ সম্পদের মধ্যে মাইকা, জেড, কৃস্টাল প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। উঁচু পাহাড়ের বহু স্থানে বহু দুষ্প্রাপ্য জন্তু-জানোয়ার ও ভেষজ গুল্মের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'ঐ এলাকার বরফও একটা বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রতি বছর বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী মাসগুলিতে ঐ বরফের গলিত স্রোত সিনকিয়াং-এর বহু কৃষি ভূমিকে সিঞ্চিত করে।

'কোংকা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণে আছে ঝর্ণার জলসিঞ্চিত বহু তৃণাচ্ছন্ন পশু-চারণ ক্ষেত্র যেখানে যুগ যুগ ধরে তিব্বতী পশুচারকরা তাদের পশুপালন করছে।

'প্যাংগং হ্রদে প্রতি বছর এপ্রিল ও মে মাসে নৌকা চলে। হ্রদের অপর সম্পদ হল মাছ ও দেশবিদেশ থেকে উড়ে আসা বুনো হাঁস। আর ঐ হ্রদের তীরে আছে মানুষ-সমান উঁচু ঝাউ গাছের ঝোপ।'

এমন এলাকা চীন স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাবে এ আশা হয়ত অনতিবিলম্বের ইতিহাসেই অকারণ ও অর্থহীন দুরাশা বলে প্রমাণিত হবে।

এ কারণেই আজ সকল ভারত-বাসীকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে হবে যে, পররাজ্যলোভী চীন আজ যে যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা শেষ হয়নি। আর কঠিন আঘাত দিয়ে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত তারা এদেশের অধিকৃত ভূমি ত্যাগ করে যাবে না। এ ব্যাপারে আমাদের সবচেয়ে ভরসা এই যে, আমাদের চরম সংকটের দিনে যারা উদারহস্তে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে-ছিল তাদের সাহায্যের ভাণ্ডার আজও আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। বৃটেনের সঙ্গে আমাদের অস্ত্র-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সেদেশ থেকে এপর্যন্ত যে নানাবিধ অস্ত্র আমরা পেয়েছি তা সবই পেয়েছি বিনামূল্যে ও বন্ধুর দানরূপে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হতেও অনুরূপভাবে জাহাজ ও বিমানে ভরে অস্ত্র এসেছে এবং প্রয়োজন হলে আরও আসবে। অস্ট্রেলিয়া হতে আসছে ১৮ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র। এমন কি যে নিরপেক্ষ সুইডেন কখনও কোন যুদ্ধ বা বিরোধে অংশ গ্রহণ করে না সেও আক্রান্ত ভারতকে বিমান-ধ্বংসী কামান দিয়ে সাহায্য করছে। এ ছাড়াও ফ্রান্স, জার্মাণী, কানাডা প্রভৃতি শক্তিশালী ও সম্পদশালী দেশগুলিও আমাদের সকল উপায়ে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।

আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের মিগ বিমান সরবরাহ নিয়ে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল সে সন্দেহেরও নিরসন হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক সাম্প্রতিক ঘোষণায়। তাঁরা জানিয়েছেন যে, মিগ বিমান নির্মাণ কারখানা স্থাপনের যে কথা তাঁরা দিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোন কারণই ঘটেনি, শুধু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর জন্য প্রতিশ্রুতি পালনে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে মাত্র।

নৈতিক সমর্থনের অবশ্যই মূল্য আছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশের সকল দেশের সমর্থন লাভের জন্য ভারত সব সময়ই সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চাই অস্ত্র ও রসদের অফুরন্ত সাহায্য সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের অবস্থা চীনের চেয়ে অনেক ভাল। কিন্তু লোহা লাল থাকতেই কি করে তার উপর আঘাত হানা যায় সেই কথাটাই আজ তৎপরতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে।

সেলা পাস থেকে একজন আহত জওয়ানকে তেজপুরে আনা হচ্ছে হেলিকপ্টারযোগে।

জওয়ান

মন্মথ রায়

॥ একাঙ্ক নাটক ॥

ব্যারাকপুর শহরে একটি মধ্যবিত্ত পল্লীতে বড় রাস্তার ধারে মহানন্দ মিত্রের বাড়ি। মহানন্দ মিত্র সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। পুত্রবধূ ভারতী দেবী, পৌত্র আনন্দ, পৌত্রী নন্দা এবং ভৃত্য ঈশ্বরকে লইয়া তাঁহার সংসার। কাল সন্ধ্যা। ভৃত্য ঈশ্বর কক্ষে ধূপধুনো দিল।

নেপথ্য কণ্ঠ ।। কে আছেন স্যার? আসবো?

[পল্টন এবং লণ্ঠন নামক দুইটি গুণ্ডাপ্রকৃতির ভবঘুরে যুবক একটু ভয়ে-ভয়েই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াইল। ঈশ্বর একটু কানে খাটো।]

পল্টন ।। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছি। সাড়া দিচ্ছিলে না যে? বাবু আছেন?

ঈশ্বর ।। সাবু? বাজারে পাবেন। এখানে কেন? দোকানে যান।

পল্টন ।। আহা! সাবু নয়। বাবু, বাবু।

ঈশ্বর ।। শুনিছি, শুনিছি। সাবু তো? বল্লাম তো বাজারে পাবেন।

লণ্ঠন ।। এ শালা মাইরি একেবারেই কালা।

পল্টন ।। মালিক? মালিক আছেন?

ঈশ্বর ।। শালিক? পাখী? উড়ে গেছে বুঝি?

লণ্ঠন ।। এ শালা একেবারে কানে সীসে ঢেলে রেখেছে মাইরি।

পল্টন ।। [কানের কাছে মুখ লইয়া] বাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করবো।

ঈশ্বর ।। ও। বসুন বসুন। তা কেউ তো বাড়ি নেই। সব মীটিংয়ে গেছেন। লড়াইয়ের মীটিং।

পল্টন ।। বাড়ীতে কেউ নেই?

ঈশ্বর ।। না।

লণ্ঠন ।। গিন্নীমা?

ঈশ্বর ।। গিন্নী-মা গেছেন স্বর্গে।

লণ্ঠন ।। বেশ-বেশ। ছেলে টেলে?

ঈশ্বর ।। ছিল একই ছেলে। তা তিনিও স্বর্গে।

লণ্ঠন ।। বাঃ, সব স্বর্গে।

ঈশ্বর ।। না—না—ছেলের বৌ আছেন। বৌমা।

পল্টন ।। বাড়িতে আছেন?

ঈশ্বর ।। কানে শোন না নাকি? বল্লাম না, কর্তার সঙ্গে গেছেন লড়াইয়ের মিটিংয়ে। আনন্দ দাদু, নন্দা দিদি, তারাও গেছে।

লণ্ঠন ।। তা এতবড় বাড়িতে কেউ নেই?

ঈশ্বর ।। চোখেও দেখ না নাকি? আমি নেই?

পল্টন ।। বটেই তো—বটেই তো। তাহলে আমরা একটু বসি। কর্তার সঙ্গে দেখা করব কিনা।

ঈশ্বর ।। তা বেশ তো, বসো।

পল্টন ।। একটু জল খাওয়াতে পারো?

ঈশ্বর ।। ও, জল?

পল্টন ।। হ্যাঁ জল। একটু গরম জল হবে? একটু চা? অনেক দূর থেকে এসেছি কিনা।

ঈশ্বর ।। হবে, হবে। তোমরা বোসো—আমি দিচ্ছি। বাবুরা না থাকলে কী হয়, আরে আমি তো আছি।

পল্টন ।। তুমি কে?

লণ্ঠন ।। নাম কি?

ঈশ্বর ।। নাম? আমার নাম ঈশ্বর।

[ঈশ্বর ভিতরে চলিয়া যায়]

লণ্ঠন ।। ওরে বাবা। চাকরের নামই যদি ঈশ্বর হয়, বাবু না জানি কোন পরমেশ্বর?

পল্টন ।। আরে শালা, ও লোকটার কান থেকেও কান নেই আর তোর শালা চোখ থেকেও চোখ নেই। গেটের সামনে দেখিসনি একটা প্লেটে লেখা আছে, মহানন্দ মিত্র।

লণ্ঠন ।। মহানন্দ মিত্র? তাহলে ওস্তাদ আনন্দ করতে করতেই ফেরা যাবে কী বল? লড়াইয়ের চাঁদা আদায় করে?

পল্টন ।। দেখ লণ্ঠন! তোর যদি এতটুকু আক্কেল থাকে?

লণ্ঠন ।। কী বেয়াক্কেলের কাজ তুই আমার দেখলি?

পল্টন ।। সরকার ঢাক-ঢোল মেরে রটিয়ে দেয়নি যার তার হাতে লড়াইয়ের চাঁদা দেওয়া চলবে না? চাঁদা চাইলেই দেখতে চাইবে সরকারী রসিদ। আর তা না দেখাতে পেলেই—

লণ্ঠন ।। ওরে বাবা!

পল্টন ।। ধোলাই—একেবারে ধোলাই। সব শালা আজ চালাক হয়ে গেছে।

লণ্ঠন ।। কিন্তু আজ কিছু কামাই না করলেও তো চলবে না ওস্তাদ। দেখছি মাল টাল কী আছে এখানে। নাম যখন মহানন্দ, নিরানন্দ করো না বাবা।

[চোরের মতন এদিকে ওদিকে তাকাইতে তাকাইতে একটু ভিতরে গেল। পল্টন পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল ও একটি খবরের কাগজ লইয়া মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল।]

পল্টন ।। এই যাঃ, বিল্টু শালা পকেট মারতে গিয়ে কাল ধরা পড়েছে! এই লণ্ঠন, শুনছিস?

[উল্লসিত লণ্ঠন পাশের ঘর হইতে বাহিরে আসিল]

লণ্ঠন । মার দিয়া কেল্লা!

পল্টন ।। কি?

লণ্ঠন ।। এই দেখ।

[মুঠো খুলিয়া দেখাইল]

পল্টন ।। [তাহা দেখিয়া] মারহাব্বা! টিসো ঘড়ি, একেবারে আনকোরা নূতন, তার মানে তিন শো! পার্কার পেন—এটা দশ আনারে শালা।

লণ্ঠন ।। আরে, না না। বাজিয়ে দেখেছি। একেবারে খনির মাল রে—কম করে আশী নব্বুই। তাহলে ওস্তাদ এ দুটো চাঁদা হিসেবে ধরেনি?

পল্টন ।। না। ঈশ্বর এলো বলে। জিনিস দুটো এখুনি, যেখানে ছিল, সেখানে রেখে আয়।

লণ্ঠন ।। হাসালে ওস্তাদ, হাসালে। ওই ঈশ্বরকে ভয় পাচ্ছ?

পল্টন ।। [রাগতস্বরে] লণ্ঠন! যা বলছি শোন। এখানে একটা নতুন টিকস্ খাটাতে হবে আজ।

লণ্ঠন ।। কী?

পল্টন ।। তুই আগে রেখে আয়, আমি বলছি।

[অনিচ্ছা সত্ত্বেও লণ্ঠন জিনিস দুইটি ভিতরে রাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

লণ্ঠন ।। বলো। কী তোমার টিকস্ ওস্তাদ বলো।

পল্টন ।। বলছি। শুনলি তো, এ বাড়ির সবাই গেছে লড়াইয়ের মীটিংয়ে।

লণ্ঠন ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে বুঝলে পল্টনদা, ঐ পার্কে যে খুব বড় একটা মীটিং হচ্ছে, সব চেঁচাচ্ছে 'সেনাদলে যোগ দাও', 'চীনকে হটাও', ঐ মীটিংটাতেই গেছে।

পল্টন ।। ধর তুই আর আমি অনেক দূরে থেকে, বারাসত-বসিরহাট সাইডের কোন গাঁ থেকে যেন আমরা এসেছি। যাবো কলকাতায়, সৈন্য হ'তে। ধর তোর আর আমার প্রাণ দেশের জন্য খুব কাঁদছে। আমরা গেঁয়ো লোক। কোথায় সৈন্য হওয়ার জন্য নাম লেখানো যায়, এ সব আমরা কিছু জানি না। পকেটে নেই পয়সা, কিন্তু মনে খুব দেশপ্রেম। ধর ষোল মাইল পথ আমরা হেঁটে চলে এসেছি। দেশের জন্যে প্রাণ দেবই আমরা। তা' এখানে আসতেই রাত হ'য়ে গেল। পথ না পেয়ে সামনে এই ভালো বাড়িটা দেখে এই মহানন্দবাবুর কাছেই সাহায্য চাইছি—আমাদের মশাই পাঠিয়ে দিন, দেশের জন্য প্রাণ দিই।

লণ্ঠন ।। ওস্তাদ। এ সব কি বলছিস তুই। সত্যি সত্যি জান্ টান্ দিবি নাকি? না ওস্তাদ, ওসবের মধ্যে আমি নেই। জান্ টান্ দিতে পারবো না।

পল্টন ।। আরে বুদ্ধু, এটা একটা টিকস্। মানে, আমরা সৈন্য হবো—লড়াইয়ে যাবো এ-সব আমরা বলবো, বললেই তো আর যাচ্ছি না। সেরেফ্ 'ভড়কি'। কিন্তু এ-সব বললেই আজকাল কি খাতির যত্নটা হয় দেখবি এখন। হ্যাঁ কাগজে সব পড়ছি যে।

লণ্ঠন ।। কিন্তু তাতে হচ্ছেটা কী? 'পাত্তি'? পাত্তি আসবে তাতে? জানিস আমি বাড়ি ফিরলে তবে ছোট ভাইটার মুখে একটু ওষুধ-পথ্যি পড়বে—এই আশায় বসে আছে মা।

পল্টন ।। সে যদি বলিস্, আরে আমারোতো তাই। বস্তিতে খোলার বাড়ি। তারই ভাড়া বাকী পড়ে গেছে চার মাস। বাড়িওয়ালা শালা ডিগ্রী করে রেখেছে। এই শনিবারের মধ্যে ভাড়া মিটিয়ে না দিলে বুড়ো বাপ আর ভাই-বোন দুটোকে নিয়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। 'পাত্তি'? 'পাত্তি'? আমারই কি কিছু কম দরকার? কিন্তু আসছে কোথ্থেকে? পাচ্ছি কোথায়? তাই না 'চারশো-বিশ' হচ্ছি। লড়াইয়ে যাবো বললে, দেখি মহানন্দ মহাশয় কলকাতা যাবার খরচ-পত্রটা দেয় কিনা। রাতের খোরাকিটা বেঁচে যায় কিনা। রাতটা এই ঘরে কাটাতে দিলে শেষ রাতে ঐ 'টিসো' ঘড়ি আর ঐ পার্কার পেন—

লণ্ঠন ।। ওস্তাদ! ওস্তাদ! সাধে কি আর তোকে ওস্তাদ বলি। দে মাইরি, হাতখানা দে। [হাত ধরিয়া হ্যাণ্ড-সেক্]

পল্টন ।। চুপ! ঈশ্বর, ঐ ঈশ্বর এসে গেছে।

[দুই প্লেট খাবার ও দুই কাপ চা লইয়া ঈশ্বরের প্রবেশ]

পল্টন ।। ওরে বাবা! এ যে একেবারে রাজভোগ।

লণ্ঠন ।। এ রাজভোগ দেখে আবার ঐ টিসো ঘড়ি আর পার্কার পেন যেন ভুলো না।

পল্টন ।। আরে শুনবে যে।

লণ্ঠন ।। আরে এ ঈশ্বর শোনেন না। কিহে কিছু কানে গেছে তোমার?

ঈশ্বর ।। বানে? হ্যাঁ বান হয়েছিলো খুব। বানে ভেসে গেছে এবার আমার দেশের বাড়িঘর। তোমরা জানলে কি ক'রে?

লণ্ঠন ।। আরে তা আর জানবো না। তোমার দেশেই যে আমাদেরও বাড়ি।

ঈশ্বর ।। হ্যাঁ! হ্যাঁ! হাঁড়ি। ভাতের হাঁড়ি। আমাদেরও ভেসে গিয়েছিল।

পল্টন ।। যাবেই তো। তুমি যে ভেসে যাওনি এই আমাদের ভাগ্যি।

[মহানন্দবাবু সপরিবারে বাড়ি ফিরলেন।]

মহানন্দ ।। এই তো তোমরা—আপনারা। না-না, বসুন-বসুন, আলাপ-পরিচয় পরে হবে। প্লেটে যে কিছু নেই দেখছি। [ভারতীকে] বৌমা—

পল্টন ।। না-না, স্যার। খুব খেয়েছি। আপনার ঈশ্বর খুব খাইয়েছে আমাদের [ভারতীকে] না—মা। আর আমাদের কিছু লাগবে না। আমরা আমরা একটা বিপদে পড়েই এখানে এসে উঠেছি।

মহানন্দ ।। বিপদ! কী বিপদ ভাই?

পল্টন ।। শুনেছি, চীন আমাদের দেশ কেড়ে নিতে আমাদের মাটিতে ঢুকে পড়েছে।

মহানন্দ ।। হ্যাঁ ভাই। স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের এত বড় বিপদ আর আসেনি।

[ঈশ্বর চায়ের কাপ, প্লেট সব লইয়া চলিয়া গেল।]

আনন্দ ।। দেশের এই বিপদে—ভারতের জওয়ানরা হাতগুটিয়ে বসে থাকবে না—

ভারতী ।। দেশের এই বিপদ তো রয়েছেই, কিন্তু এদের বিপদটা কি সেটা তোমরা শোনো।

মহানন্দ ।। বটেই তো! বটেই তো! হ্যাঁ তোমাদের কী বিপদ বলছিলে?

পল্টন ।। আমরা দুই বন্ধু বসিরহাটের এক গাঁয়ে থাকলেও দেশের এই বিপদের কথা শুনেছি। শুনেই ছুটে আসছি সৈনাদলে নাম লেখাতে। কিন্তু এই ব্যারাকপুরে আসতেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

লণ্ঠন ।। পকেটও ফাঁকা।

পল্টন ।। এখানে বসে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা দেখিয়ে দিলেন আপনার বাড়ি। বললেন, সটান চলে যাও মহানন্দবাবুর কাছে।

লণ্ঠন ।। আপনিই নাকি সব ম্যানেজ করে দেবেন স্যার।

মহানন্দ ।। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আনন্দ ।। কি আনন্দ! বন্দেমাতরম্।

নন্দা ।। বন্দেমাতরম্। লড়াইয়ে যাবেন। বলুন তবে জয়হিন্দ।

সকলে ।। জয়হিন্দ।

ভারতী ।। সত্যি আনন্দ হচ্ছে। আমি তোমাদের খাবার জোগাড় করছি বাবা। নন্দা আয় আমার সংগে। [শ্বশুরকে] বাবা, আপনিও কাপড় জামাটা ছেড়ে আসুন। [মহানন্দের অন্দরে গমন।] এ বেলা মাছ নেই, মাংস আছে। আর আছে ঘরে-তৈরী রাবড়ি। মাংস খাও তো বাবা?

লণ্ঠন ।। মারহাব্বা— [বলিয়াই লজ্জা পাইল]

পল্টন ।। ওরে বাবা, খাই আবার না!

আনন্দ ।। শুধু মাংস আর রাবড়ি! না-না, মা! লড়াই করতে গেলে ভালো মন্দ খাবার তো আর জুটবে না। বলুন না, আপনারা কী খেতে ভালবাসেন? আমি কিনে আনছি।

লণ্ঠন ।। কী খাবি বল্ না?

পল্টন ।। তুই থাম।

নন্দা ।। না-না। আপনারা লজ্জা করবেন না।

ভারতী ।। হ্যাঁ বাবা। লজ্জা করো না। আমাকে তোমরা মা বলেই জেনো। আমার ছেলেমেয়েরাও যাবে এই লড়াইয়ে।

আনন্দ ।। কলেজ থেকেই আমাদের পাঠাবে। এন-সি-সি ট্রেনিং আমার শেষ। আমি দিন গুণছি।

নন্দা ।। আমাকেই বা আটকাচ্ছে কে? গার্লগাইড ট্রেনিং আমারও শেষ হবে এই মাসে। আমি হব নার্স।

ভারতী ।। [লণ্ঠন ও পল্টনকে] কিন্তু তোমরা দুজন যাচ্ছো, কাল ভোরেই। আবার কবে তোমাদের পাবো আমি জানি না। আজ তোমাদের একটু ভালো করে খাওয়াতে ইচ্ছে। কি খেতে ইচ্ছে, বলো না?

পল্টন ।। আমরা ডাল ভাত পেলেই খুশি মা।

লণ্ঠন ।। সেই সংগে যদি পারেন দেবেন একটু আচারটাচার। যদি ইচ্ছে হয়।

নন্দা ।। মা, এ ছেলেরা তোমাকে আপনার ভাবতে পারছে না। প্রাণ খুলে তাই বলতে পারছে না কিছু। সত্যিকার মা নও কিনা তাই।

আনন্দ ।। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি!

ভারতী ।। তা যদি বলিস সত্যিকার মাকেও ছেলেদের বলতে হয় না। মা তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারে কি খেলে খুশি হবে তারা। [আনন্দ ও নন্দাকে] তোরা আয় দেখি আমার সংগে। যা দরকার আমি করছি। তোমারা বাবা জামা কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করো। যাচ্ছো লড়াই করতে, আর বিশ্রাম জুটবে কিনা কে জানে। ঘরে যা আছে তাই দিয়েই খাইয়ে দিচ্ছি তোমাদের যাতে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো।

[আনন্দ ও নন্দাকে টানিয়া লইয়া ভারতীর অন্দরে প্রস্থান]

লণ্ঠন ।। ওরে চুপ মেরে গেলি যে! গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিস্ ওস্তাদ?

পল্টন ।। চল, পালিয়ে যাই।

লণ্ঠন ।। সে কি ওস্তাদ! পালাবি কি?

পল্টন ।। হ্যাঁরে, কেমন দম আটকে আসছে।

লণ্ঠন ।। বারে! পালাবো তো সেই শেষ রাতে। এখনই পালাবো কি। মওকা তো এই শুরু হলো ওস্তাদ।

পল্টন ।। যা বলেছিস্।

লণ্ঠন ।। তবে পালাবার কথা বলছিস কেন?

পল্টন ।। তোর মনটা বাজিয়ে দেখছিলাম।

লণ্ঠন ।। তাই বল। তা আমি ঠিকই আছি। এখন ভরপেট খাওয়া তারপর ঘুমুবো বলে শুয়ে পড়া। তারপর সবাই ঘুমুলে—

পল্টন ।। ঐ টিসু আর পাকুটা হাতিয়ে হাওয়া, কেমন ?

লণ্ঠন ।। এই তো! এই তো! জানি ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। মার দিয়া কেল্লা। মারহাব্বা।

[ঘরোয়া জামাকাপড়ে মহানন্দবাবুর প্রবেশ]

মহানন্দ ।। এই যে, দাদুরা তোমরা এখনও একটু গা হাত পা ছড়িয়ে বসোনি? একটু আরাম করবে না?
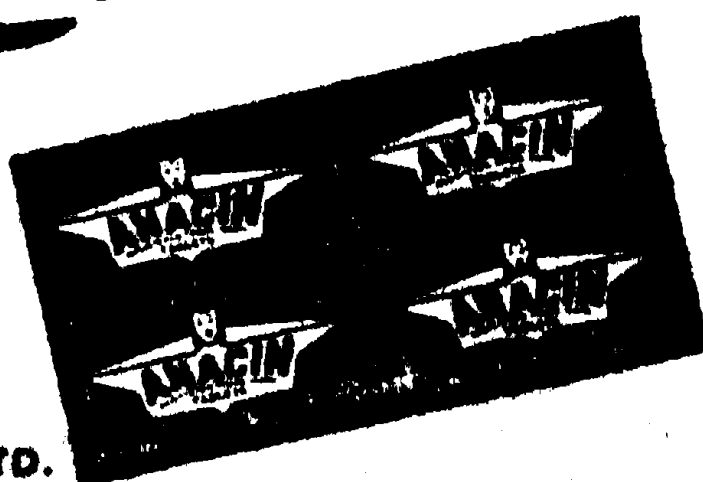
পল্টন ।। না-না, এই বেশ আছি।

মহানন্দ ।। শুনে বড়ো খুশি হলাম দাদু। নেহরুজী বলেন—'আরাম হারাম হ্যায়'। আর লড়াই করতে যখন যাচ্ছো, আরাম যে কি তা তো ভুলেই যেতে হবে ভাই।

পল্টন ।। লড়াই করতে না গিয়েও আরাম কি তা ভুলে গেছি। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে যদি দুমুঠো ভাত জোটে।

মহানন্দ ।। কি করো তোমরা? পাশ-টাস কিছু করেছো?

পল্টন ।। ওসব আর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না দাদু।

মহানন্দ ।। সে কি হে? তবে চলছে কি করে?

লন্ঠন ।। চারশো বিশ।

পল্টন ।। এই!

মহানন্দ ।। 'সোবিশ'? 'সোবিশ'টা কি বাপু?

পল্টন ।। ও আপনি বুঝবেন না।

মহানন্দ ।। কেন বুঝবো না দাদু? 'সোবিশ' মানে শুয়ে বসে থাকো। কিন্তু আর তো শুয়ে বসে থাকলে চলবে না দাদু। চীনের আক্রমণে দেশের আজ চরম বিপদ। জাতির আজ চরম দুর্দিন।

পল্টন ।। তাই তো ছুটে এসেছি স্যার।

মহানন্দ ।। আসবে বৈকি। গান্ধীজী আর নেতাজীর নেতৃত্বে বিদেশী শাসনের অবসানে আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। ভারতের যে কোন পরি-বারে আজও খুঁজে দেখো কাউকে নিশ্চয়ই পাবে যে এই স্বাধীনতার জন্যে কত না আত্মত্যাগ করেছে। হয় জেল খেটেছে কিম্বা মরেছে কিম্বা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

লন্ঠন ।। আমার বাবাই তো কতবার জেল খেটেছে।

পল্টন ।। আমার বাবাও। বেয়াল্লিশ সালের বিপ্লবে দস্তুর মতো লড়াই করে জখম হয়েছে; একটা পা আর নেই তাঁর।

মহানন্দ ।। ঐ বেয়াল্লিশের বিপ্লবেই গুলী খেয়ে আমারো একমাত্র ছেলে মহিম শেষ হয়ে গেছে। তাই না মুছে গেছে আমার ঐ বৌমার সীমন্তের সিঁদুর।

[লন্ঠন ও পল্টন নীরবে চিন্তামগ্ন]

মহানন্দ ।। তোমার আমার এক ছটাক জমি যদি কেউ বেদখল করতে আসে আমরা কখনও তা সইতে পারি?

পল্টন ও লন্ঠন ।। [একসঙ্গে হাঁকিল] না!

মহানন্দ ।। তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী গেল বাইশে অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কিছুটা তোমরা শোনো—

[পকেট হইতে একটি সংবাদপত্রের কর্তিতাংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।]

"......চীন ও ভারতের সীমান্ত বিরোধে আমরা শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম। যুদ্ধ চাই নাই, সংঘর্ষ চলিতে থাকাকালেও আমরা শান্তিপূর্ণ আলোচনা চালাইতেছিলাম, কিন্তু আলোচনা চলিতে থাকাকালে চীন অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করিয়া আমাদের স্কন্ধে এই যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। শান্তির জন্য আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।......দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষা করা এবং যাহারা আমাদের পবিত্র ভূমি গ্রাস করিতে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করাই আজ আমাদের একমাত্র কর্তব্য। [যুগান্তর]

[মহানন্দ উত্তেজিত কন্ঠে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ, নন্দা এবং ভারতীদেবী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মহানন্দবাবুর পাঠ শেষ হওয়ামাত্রই আনন্দ ও নন্দা যুগ্মকণ্ঠে গাইয়া উঠিল "জয়হিন্দ"এর গান। সেই গানে লন্ঠন ও পল্টন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তাহারাও ক্রমে কণ্ঠ মিলাইয়া দিল।]

ভারতী ।। এসো বাবা—এবার তোমরা আমাদের সঙ্গে খাবে এসো। খেয়ে এসে এই ঘরেই তোমরা শোবে।

[ভারতী সকলকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন]

[সময়াঙ্কপক অন্ধকার অন্তে দেখা গেল উদ্গার তুলিতে তুলিতে লন্ঠন ও পল্টন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, তক্তপোশের ওপর তাহাদের দুইজনের শুইবার উপযোগী একটি পরিপাটি বিছানা হইয়া গিয়াছে]

পল্টন ।। ওরে বাবা! রাজভোগ, তারও-পর এই রাজশয্যা। এ কোথায় এলাম রে বাবা!

[ঈশ্বর দুইটি পাশবালিশ লইয়া আসিল।]

লন্ঠন ।। তার ওপর আবার এই পাশ-বালিশ। মাইরি বিপদ হ'ল দেখছি ওস্তাদ!

পল্টন ।। কেন বল তো?

লন্ঠন ।। এমন আরামে ঘুমিয়ে পড়তে হবে যে। পালাবো কি করে? [ঈশ্বরকে] আর বালিশ পেলে না!

ঈশ্বর ।। মালিশ! হ্যাঁ, মালিশও জানি। কর্তাবাবুকে করি যে।

[সঙ্গে সঙ্গে লন্ঠনের মাথায় 'ম্যাসাজ' করিতে লাগিল]

পল্টন ।। এই যাঃ! আবে ঘুমিয়ে পড়বি যে শালা!

লন্ঠন ।। [ঈশ্বরকে] আর চাই না।

ঈশ্বর ।। চা?

লন্ঠন ।। তোমার মাথা।

ঈশ্বর ।। ছাতা? দেখছি।

[ঈশ্বর চলিয়া গেল]

পল্টন ।। ভ্যালা বিপদ।

[পানের ডিবা লইয়া নন্দার প্রবেশ]

নন্দা ।। এই যে আপনাদের পান।

[এক প্যাকেট সিগারেট লইয়া আনন্দের প্রবেশ]

আনন্দ ।। দাদু বললেন—সিগ্রেট দিতে—অবশ্য যদি আপনারা খান্।

পল্টন ।। তা'—আচ্ছা। [সিগ্রেটের প্যাকেটটি লইল]

লন্ঠন ।। আপনাদের দাদু—মাইরী খুব মাইডিয়ার লোক। [পল্টনকে] কি সিগ্রেট রে?

পল্টন ।। গোল্ড ফ্লেক্। তোর চার-মিনার' না।

লন্ঠন ।। তবে তুই খা। আমার চার-মিনার না হলে শানায় না। [নিজের পকেট হইতে একটি চারমিনার বাহির করিয়া ধরাইল]

পল্টন ।। আমারও তাই। তবে এনেছেন, খাচ্ছি। [একটি গোল্ড ফ্লেক্ ধরাইয়া আনন্দকে] আপনি?

আনন্দ ।। না—থাক। দাদু আসবেন যে।

[নন্দা ইহাদের বিছানাটি ভাল করিয়া সাজাইয়া দিয়া এইবার দুইটি গ্লাস এবং একটি জলের কুঁজো আনিয়া দিল।।

নন্দা ।। এই যে আপনাদের খাবার জল রইলো।

আনন্দ ।। আপনারা তো লড়াইয়ে যাচ্ছেন! আমিও একদিন যাচ্ছি। সেখানে দেখাও হয়ে যেতে পারে আবার একদিন। কি ভালই না লাগবে সেদিন!

নন্দা ।। আমার সঙ্গেও কিন্তু দেখা হতে পারে। আমি নার্স-এর ট্রেনিং নিয়েছি যে!

লন্ঠন ।। উঃ দেখা হলে সে যা হবে মাইরি!

নন্দা ।। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যেন কোনদিন আমার দেখা না হয়। লড়াইয়ে গিয়ে কোন আঘাতই যেন আপনারা না পান। আচ্ছা আর আপনাদের কি লাগবে বলুন না!

পল্টন ।। না-না আর কি লাগবে! এই যা করেছেন—বড্ড বাড়াবাড়ি করে-ছেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি যেন সইতে পারছি না।

আনন্দ ।। সোলজারদের এটা প্রাপ্য। কেন পাবে না তারা? দেশের জন্য প্রাণ দিতে যাচ্ছে না তারা?

নন্দা ।। তা' নয় তো কি! বরং সে তুলনায় সৈনিকদের কতটুকু সেবা আমরা করতে পারি? এই তো ভাইফোঁটার দিনে আমাদের জওয়ান-দের জন্য দেশের সব বোনেরা কত কি উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু কোন বোনেরই মন তাতে ভরেনি। হাতে করে তো কেউ কিছু দিতে পারেনি। আজ কিন্তু আমরা দুই ভাইবোন আপনাদের কিছু দেবো। নিতেই হবে আপনাদের।

[নন্দা ও আনন্দ পাশের কক্ষে গিয়া তখুনি দুইটি উপহার লইয়া আসিল]

নন্দা ।। [পল্টনকে] আমার এই পার্কার পেনটি আপনাকে আমি দিলাম।

আনন্দ ।। [লন্ঠনকে] আর আমার এই "টিসট্" ঘড়িটি আপনাকে আমি দিচ্ছি।

পল্টন ।। এ্যাঁ! না—না।

লন্ঠন ।। ওরে বাবা! এ কি!

নন্দা ।। না-না, হাতে করে দিতে পারছি এই আনন্দটুকু আমাদের দিন। এই কলমটা দিয়ে যদি দু'একটা পোষ্ট-কার্ড লিখে আমাদের জানান কেমন আছেন আপনারা! জানাবেন তো?

আনন্দ ।। [লন্ঠনকে] তুমি ভাই এই ঘড়িটা সব সময়ে রেখো হাতে। সময় দেখতে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো মনে পড়বে আজকের এই রাতটির কথা। আচ্ছা চলি।

[আনন্দ যাইতেছিল। পল্টন তার হাত চাপিয়া ধরিল]

পল্টন ।। না-ভাই, আর একটা গান শুনিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ ।। গান! এখন!

পল্টন ।। হ্যাঁ—আমাদের মনটাকে তৈরী করে দাও ভাই—মনটাকে তৈরী করে দাও।

আনন্দ ।। নন্দা ধর—

[আনন্দ ও নন্দা আর একটি দেশপ্রেমমূলক গান ধরিল! এই গানের মধ্যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহানন্দবাবু এবং ভারতীদেবী]

মহানন্দ ।। ওরে, এসব গান শুনে আমি আমার বয়স ভুলে যাই। ভুলে যাই আমার সব ব্যারাম-ট্যারাম। ইচ্ছে হয় ছুটে চলে যাই যেখানে হচ্ছে লড়াই। কেন জানো? আমার যেন কেবলই মনে হয় এদের বাপ—আমার সেই বীর ছেলে—ও'র সেই বীর স্বামী—আমাদের সেই মহিম—তার আত্মা হয়তো স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে দেখতে, যে স্বাধীনতা তারা জীবন দিয়ে এনে দিয়ে গেছে আমাদের হাতে,—সেই স্বাধীনতা অটুট রাখতে আমি কি করছি? কতটুকু আমি করছি?

ভারতী ।। আমি বিশ্বাস করি বাবা।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'।

মহানন্দ ।। [আবেগপূর্ণকণ্ঠে বারবার আবৃত্তি] 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'!

নন্দা ।। দাদু-দাদু।

ভারতী ।। বাবা! আপনি শান্ত হোন বাবা। চলুন এখন আপনি শোবেন চলুন।

মহানন্দ ।। চল, চল—যাচ্ছি।

আনন্দ ।। আচ্ছা—আজকের মত শুভরাত্রি। কাল সকালে তো আবার দেখা হচ্ছে।

নন্দা ।। আচ্ছা—এখন তাহলে আসি। মশাটশা কামড়ালে আপনারা ডাকবেন। আবার ফ্লিট দিয়ে যাবো।

[ভারতী ব্যতীত আর সবাই চলিয়া গেল]

ভারতী ।। [পল্টনকে] তোমার মা আছেন বাবা?

পল্টন ।। না, নেই।

ভারতী ।। বাবা আছেন?

পল্টন ।। আছেন।

ভারতী ।। তুমি যে লড়াইয়ে যাচ্ছো তাতে তিনি খুশী হয়েছেন।

পল্টন ।। [বিব্রত হইয়া] আমি জানি না—জানি না আমি।

ভারতী ।। [লন্ঠনকে] তোমার?

লন্ঠন ।। মা আছেন। বাবা নেই।

পল্টন ।। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আজ আমরা সব কিছু ফিরে পেয়েছি। যার বাপ নেই সে পেয়েছে বাপ। যার মা নেই সে পেয়েছে মা।

ভারতী ।। তেমনি যাদের ছেলে নেই তাদেরও অভাব পূরণ করেছো তোমরা—ছেলেরা। দেশের যখন একটা চরম বিপদ আসে তখন এই ই হয়ে থাকে বাবা। পুত্রহীনেরা পায় পুত্র। পিতৃহীনেরা পায় পিতা—মাতৃহীনেরা পায় মা। যেমন আজ হয়েছে। ঝগড়াঝাটি, হিংসাদ্বেষ আজ সবই ভুলে যাচ্ছে। আজ দেশের সব লোক যেন ভাইবোন। একই মায়ের সন্তান যেন সবাই। সে মাতা আমাদের দেশমাতা। রাত হয়েছে। এবার তোমরা শুয়ে পড়ো বাবা।

[ভারতীদেবী অন্দরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর]

লন্ঠন ।। কি রে, গড়িয়ে নিবি নাকি একটু?

পল্টন ।। গড়িয়ে নিতে হয় তুই নে।

লন্ঠন ।। তা ওস্তাদ, যা নরম বিছানা তা একটু শোয়াই যাক। মেয়েটা এত যত্ন করে বিছানাটা পেতে দিয়ে গেছে, না শুলে দোষ হবে। কিন্তু ওস্তাদ তাই বলে যেন ঘুমিয়ে পড়ো না—বাড়িটা নিঝুম হলে শটকাতে হবে মনে রেখো। কি ওস্তাদ, মুখে চাবি মেরে বসে আছো যে! এতো কি ভাবছো?—মাল তো আপসে হাতে এসে গেছে। আমি কি ভাবছি জানো ওস্তাদ? এমন সুন্দর ঘড়িটা পরতে পারবো না দুদিনও। বেচে হোক কি বাঁধা রেখেই হোক 'পাত্তি' যোগাড় করতে হবে।

পল্টন ।। খবরদার! এ ঘড়ি তুই নিয়ে যেতে পারবি না লন্ঠন।

লন্ঠন ।। পারবো না মানে? এ ঘড়ি আমায় দেয়নি?

পল্টন ।। দিয়েছে। তুই দেশের হয়ে লড়াই করতে যাচ্ছিস তাই দিয়েছে—তুই কি লড়াই করতে যাচ্ছিস?

লন্ঠন ।। পারলে যেতাম। কিন্তু পারছি না, তাই যাচ্ছি না।

পল্টন ।। কাজেই এ ঘড়িও তুই পাচ্ছিস না।

লন্ঠন ।। [ব্যঙ্গে] পাচ্ছি না! তুই কি তুই পার্কার কলম এখানে ছেড়ে যাচ্ছিস!

পল্টন ।। যদি লড়াইয়ে না যাই তবে এ কলম আমি নিচ্ছি না।

লণ্ঠন ।। 'এবে', খুব যে সাধু হয়ে গেলি। তোর মতলবটা কি বলদিকি? একটু ঝেড়ে কাস না শালা।

পল্টন ।। ভদ্রলোকের বাড়ি। শালা শালা বলে ওমন চিল্লাবি না। মুখ খারাপ করবার জায়গা এটা নয়, তোকে আমি বলে রাখছি লণ্ঠন।

লণ্ঠন ।। কি বাবা—মেয়েটার 'লসে' পড়ে গেলি নাকি—তাই এমন বাছা বাছা বুলি আওড়াচ্ছিস—ধম্মপুত্তুর যুধিষ্টির সাজছিস।

[পল্টন কোনও জবাব দিল না।

চিন্ত্যমগ্ন।

এইয়ে শালাকে পরীতে পেয়েছে দেখছি। [কথার কোনও উত্তর না পাইয়া হঠাৎ তাহার পিঠে এক ধাক্কা দিয়া] চল

শালা, বাড়িটা নিঝুমে, এই ফাঁকে কেটে পড়ি।

পল্টন ।। [পল্টন রুখিয়া গিয়া লন্ঠনকে এক চড় মারিল।]

লন্ঠন ।। [লন্ঠন গালে হাত বুলাইতে লাগিল] তুই আমাকে মারলি?

পল্টন ।। কোনও দিন কোনও খানে এতো ভালবাসা, এতো সম্মান পেয়েছিস তুই, না আমিই পেয়েছি? যখন যেখানে আমরা যাই, কেউ ভাল মুখে একটা কথা বলে? মন থেকে এমন আদরযত্ন করে? কুকুর বেড়ালের মত তাড়া না করে, এমন করে বুকে টেনে নেয় কেউ? কত ছোট ভাববে এরা আমাদের, যদি আমরা এই কলম আর ওই ঘড়ি নিয়ে পালিয়ে যাই? আমরা খুব ছোট—আমরা খুব নীচ—কিন্তু তারও কি একটা সীমা নেই? শেষ নেই লন্ঠন?

লন্ঠন ।। হুঃ, তুই কি করতে চাস ওস্তাদ?

পল্টন ।। তোর যদি যেতেই হয় যা—তবে ঘড়িটা তুই রেখে যা লন্ঠন।

লন্ঠন ।। আর তুই?

পল্টন ।। আমি লড়াইয়ে যাবো।

লন্ঠন ।। সে কি রে?

পল্টন ।। হ্যাঁ। এ জীবনে কোন একটা ভাল কাজ করার সুযোগ আমরা পাইনি, কেবলই ছোট কাজ করে করে কত ছোট হয়ে গেছি আমরা, তা আজ এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

লন্ঠন ।। এরা সব বড়লোক। এদের কথা আলাদা।

পল্টন ।। হ্যাঁ আলাদা, কিন্তু দেশের জন্য লড়াইটা আলাদা নয়। সবাই সৈনিক—সেখানে বড়লোক, ছোট-লোক নেই। শত্রুর গুলী বড়লোক ছোটলোক চেনে না। সেখানে সব একাকার। লন্ঠন, এ মওকা আমি ছেড়ে দেব না। আমি লড়াইয়ে যাবো।

লন্ঠন ।। তোর বুড়ো বাপ আর নাবালক ভাই-বোন? পথে দাঁড়াবে তারা? আমাকে লড়াইয়ে যেতে বলছিস, আমিই বা কী করে যাই। আমার ছোট ভাইটা না পাবে ওষুধ, না পাবে পথ্যি। মারা যাবে না?

পল্টন ।। কিন্তু গোটা দেশটা মারা যেতে বসেছে যে আজ। শোন ভাই লন্ঠন, তুই ওই ঘড়িটা রাখ—আমার এই কলমটা নে—চলে যা বাড়ি। তোর ভাইয়ের মুখে ওষুধ পথ্যি দিয়ে ফিরে চলে আয় কালই সকালে—নিদেন দুপুরে। কালই আমরা চলে যাই কলকাতায়—যেখানে সৈন্য হবার জন্য নাম লেখানো যায়।

[কাহারও মুখে আর কথা সরিল না। পল্টন লন্ঠনের হাতে তাহার পার্কার কলমটি দিল। লন্ঠন পল্টনের হাতে তাহার 'টিসট' ঘড়িটি রাখিল। নেপথ্যে মহানন্দের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

মহানন্দ ।। দরজাটা খুলবে ভাই?

[পল্টন দরজাটা খুলিয়া দিল। দেখা গেল মহানন্দবাবু একা নন; সঙ্গে ভারতীদেবীও আছেন। তাঁহার হাতে একখানা পাখা। সকলে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল।]

মহানন্দ ।। কি ভাই যুদ্ধে যাওয়ার আনন্দে ঘুম আসছে না বুঝি? খুব গল্প করছো—আ ও য়া জ পাচ্ছিলাম। আমার বৌমার আবার মায়ের মন কিনা—আমাকে বলছেন মশার কামড়ে ওদের ঘুম হচ্ছে না। ওই দেখ, পাখা নিয়ে এসেছেন হাওয়া করতে।

ভারতী ।। হ্যাঁ বাবা—আমি হাওয়া করছি। তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো।

পল্টন ।। না-না, মশা টশা নয়।

ভারতী ।। তবে ঘুমচ্ছো না কেন বাবা? কাল থেকে শুরু হবে তোমাদের কষ্টের জীবন। একটা রাত আমাদের এখানে কাটিয়ে যেতে এসেছো—তাও যদি ঘুমুতে না পারো—আমি যে ঘুমুতে পারবো না বাবা অনেক রাত!

মহানন্দ ।। ঘুম অবশ্য আমারও হচ্ছে না—কিন্তু সে মশার জন্যে নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার যেটুকু আলাপ হয়েছে, তাতে আমি এই কথা বুঝেছি ভাই, সংসারে তোমাদের অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। টাকা-কড়িরও অভাব রয়েছে। আজ লড়াইয়ে যেতে সেই ব্যথাটা তোমাদের মনে কাঁটা হয়ে ফুটছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাদের মুখে আমি সে, আনন্দ দেখিনি, যে আনন্দ ফুটে ওঠে, লড়াইয়ে যাবার স্বপ্নে, আমার আনন্দ-দাদুর মুখে—আমার নন্দা-দিদির চোখে। তাই আমি ঘুমুতে পারছিলাম না। ঘুমুতে পারি ভাই—ঘুমুতে পারবো আমি—যদি এই শ'দুই টাকা তোমরা নিয়ে কাল সকালে মনিঅর্ডার করে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

[পল্টন এবং লন্ঠন উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল]

মহানন্দ ।। হ্যাঁ ভাই। এটাকা তোমাদের নিতেই হবে। আজ দেশরক্ষার লড়াই বেঁধেছে—আজ তোমার পরিবার, ওর পরিবার, আমার পরিবার আলাদা নয়। আজ গোটা দেশে মাত্র একটি পরিবার। সৈনিকের পরিবার। ঐ একটি পরিবারের লোকই আজ আমরা সবাই।

[মহানন্দ ইহাদের হাতে নোটগুলি গুঁজিয়া দিলেন]

পল্টন ।। [ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া] আপনারা জানেন না—আমরা কে? আমরা কি?

মহানন্দ ।। [দুজনকে বুকে টানিয়া লইয়া] জানি ভাই খুব জানি। তোমরা ভারতমাতার বীর সন্তান। স্বাধীন ভারতের নওজোয়ান। স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিক ছিল তোমাদেরই পূর্বপুরুষ। স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে আজ যারা সৈনিক, তাঁদের বংশধর তোমরা। দেশের আশা তোমরা—দেশের ভরসা তোমরা।

ভারতী ।। তা নয়তো কি? মায়ের সম্মান রাখতে যে সন্তান জীবন পণ করে, প্রাণ দেয়, মায়ের সন্তান শুধুই সে। সেই সন্তান তোমরা। মায়ের মুখোজ্জ্বল করবে তোমরাই।

লন্ঠন ।। [ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া] জবাব নেই—এর কোনও জবাব নেই, ওস্তাদ। দে আমার ঘড়ি দে—আর এই নে তোর কলম। চল, ঝাঁপিয়ে পড়ি দেশের ডাকে। লড়াই-এ।

[পল্টন আবেগে লন্ঠনকে বুকে জড়াইয়া ধরিল]

পল্টন ।। আয়, পায়ের ধুলো নিই মায়ের—পায়ের ধুলো নিই দাদুর। [উভয়ে তথাকরণ] বন্দেমাতরম্।

[সকলেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলিলেন। আনন্দ ও নন্দা ঘুম হইতে জাগিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহারা গাহিয়া উঠিল—রণসঙ্গীত। সকলেই তাহাতে যথাসাধ্য যোগ দিল। আনন্দময় পরিবেশে যবনিকা নামিল।]

—য ব নি কা—

অগ্নিপুষ্প

প্রতিভা বসু

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার হৃদয় মন উধাও হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। আকাশ আমার মন কেড়ে নিয়েছিলো। আমি যে সেদিন সারা বিশ্বে কী মাধুরী দেখেছিলাম আমি জানি না। গির্জের অর্গানের মতো একটা গভীর গম্ভীর শব্দ ধীর লয়ে বেজে চলেছিলো আমার বুকের মধ্যে।

যখন চোখ নামালাম, স্বভাবত মেয়েটির মুখের দিকেই তাকাতে গিয়েছিলাম, দেখলাম আলো জ্বালিয়ে আর একটা খালি ট্যাক্সি ছুটে আসছে সামনে থেকে। তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। অন্য একজন মহিলাও সেই গাড়িটির আশায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছিলেন। আমি জানতাম প্রতিযোগিতায় ঐ ফ্রকপরা মেয়েটির সঙ্গে এই শাড়িপরা মেয়েটি কখনোই জয়ী হতে পারবে না, সুতরাং দিক-বিদিক হারিয়ে আমি তার আগেই দৌড়ে গিয়ে গাড়িটা ধরতে চেষ্টা করলাম। আর দৌড়োবার সঙ্গে সঙ্গেই বরফের মধ্যে পা পিছনে পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে।

হাতে আর মাথায় দারুণ চোট লাগলো। মেয়েটি এসে ধরলো আমাকে, গাড়িটাও থেমে গেল। বিশ্রী ব্যাপার হলো। ওঠবার শক্তি ছিলো না, ড্রাইভারটি নেমে এসে মেয়েটিকে সাহায্য করলো আমাকে ধরে তুলতে। কোথায় আমি মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দেব, তা নয়, সে-ই আমাকে তুলে দিল। ড্রাইভারের ধারণা হয়েছিলো আমরা যুগলযাত্রী, বস্তুত হলোও তাই। আমাকে তুলে দিয়ে একটু ভাবছিলো মেয়েটি, ড্রাইভার যখন তাকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বার জন্য তাড়া দিল, সে আর দ্বিধা করলো না। আমার অবস্থাটা বুঝেছিলো, আমি যে আর একা যাবার যোগ্য নেই সেটা ভেবে আমাকে সে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলো।

আমাকে কোনো ঠিকানা জিজ্ঞেস করলো না সে, নিজের ঠিকানায় নির্দেশ দিল। আমার তখন প্রতিবাদ করবার মতো শক্তি ছিলো না, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো মাথায়। আচ্ছন্নের মতো হেলান দিয়ে ছিলুম গাড়ির আসনে। গাড়ি দ্রুততর হয়ে চলতে লাগলো নির্দিষ্ট ঠিকানার দিকে।

আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ বটে, কিন্তু কোনো নিয়ম মাফিক ধর্মও যেমন মানি না, ভাগ্য নামক বস্তুটির প্রতিও তেমনি কোন আস্থা ছিলো না। কিন্তু সেদিনের সেই অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহে আমি ঈষৎ হতচকিত হলাম। মনে হলো জীবনের সবটাই পুরুষকার নয়। ভাগ্যের হাতও আছে। আর সেই ভাগ্যই আমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছিল যা মুহূর্তকাল আগেও আমি ভাবতে পারিনি। আমার যুক্তি বুদ্ধি বা ইচ্ছে নামক সব জোরালো পুরুষকারেরা সেখানে মাথা গলাতে পারেনি। ঘটনাটা ঘটে গেছে, ঘটবে বলেই ঘটেছে। এগারো হাজার মাইল দূরের একটি মানুষকে আমার সঙ্গে একাত্ম করবার জন্যই ঘটেছে। আমার মাথা নিচু করে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না।

আস্তে মেয়েটি বললো, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?' আমি শুধু মাথা ঝাঁকালাম। আমার হাতের উপর মুহূর্তের জন্য তার হাতটা এসে পড়লো, বেদনা-বিদ্ধ স্বরে বললো, 'আমিই এ জন্য দায়ী।'

'না, না।' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণাটাকে সহ্য করবার চেষ্টায় ছটফট করতে করতে চোখ মেলে তাকালাম। কাচ ঢাকা প্রায় অন্ধকার গাড়ির মধ্যে অস্পষ্ট দেখতে পেলাম তাকে, তার উদ্বিগ্ন মনের ছায়া অনুভব করলাম তার সমস্ত ভঙ্গিতে। সে আমার হাত থেকে বরফে ভিজে যাওয়া দস্তানা দুটো খুলে দিল। নিজের ছোট্ট রুমালে আমার কোটের উপরকার বরফের কুচিগুলো ঝেড়ে দিল। আর তার এই সেবার ইচ্ছের চেহারার মনোহারিত্বে আমি সব কষ্ট সুখের বলে মনে করতে লাগলাম।

বাড়ি খুব দূরে ছিলো না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল গাড়ি। গাড়ির দরজা খুলে নেমে বললো, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি ডোরম্যানকে ডেকে আনছি, সে এসে আপনাকে নামতে সাহায্য করবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায় নামতে সাহায্য করবে।'

'এখানে। আমি এখানেই থাকি। আমার মামা ডাক্তার, আপনি যদি কষ্ট করে লবিতে এসে বসেন একটু—'

'না না কিছু দরকার নেই।' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম 'অনেক

ধন্যবাদ। আপনি নেমে গেলে এই ট্যাক্সিটা নিয়েই আমি চলে যাবো।'

'কোথায় যাবেন?'

'প্রায় চোদ্দো মাইল। আমি কুইন্সে থাকি।'

অতদূরে। এ অবস্থায়! একা!'

উৎকণ্ঠা দেখে হাসলাম, বললাম, 'তাতে কী?'

'যেতে যেতে যে বেড়ে যাবে।'

'তা একটু যাবে বোধহয়।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'একা একা অতদূরে? না না' তা হয় না।'

'হয়। বরং তা ছাড়াই আর কিছু হতে পারে না।'

'কিন্তু আমার জন্যই আপনার এই দুর্ভোগ হলো।'

'কিছু না, কিছু না, বরং আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশী সুখী হলাম। আচ্ছা,—'

মেয়েটি দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছিলো, বিদায়ের জবাবে বিদায় নিল না। ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ডোরম্যানকে ডেকে আনলো। মুহূর্তে বলিষ্ঠ নিগ্রো ডোরম্যানটি গাড়ির কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। মেয়েটি আমার অনুমতি নেয়া না নেয়ার ধার দিয়েই আর গেলো না দেখলাম। যেন সেই আমার গতিনিয়ন্ত্রণের কর্ণধার এমনি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হুকুম দিতে লাগলো। যাতে ব্যথা না লাগে এমনভাবে যেন নামানো হয়, তার নির্দেশ দিতে লাগলো ডোরম্যানকে। ডোরম্যানটিই শুধু তার হুকুম পালন করলো না, আমিও বিনা প্রতিবাদে নেমে এসে লবিতে বসলাম। এই আমাদের আলাপ হবার ইতিহাস মিসেস সান্যাল, এই আমাদের প্রথম দেখা।' আনমনা হয়ে চুপ করলো রাসেল স্মিথ, একটা সিগারেট ধরিয়ে এলোমেলো টান দিল।

আমি একমনে শুনছিলাম। গল্পের মতো লাগছিলো। বললাম 'তারপর?'

রাসেল হাসলো। 'তারপর তো অবস্থাটা দেখছেন।'

'তা তো দেখছি, কিন্তু অবস্থাটা তো সেদিনই এ রকম হয়নি।'

'কে জানে। তা নৈলে আমি তার কথামতো নামলাম কেন বলুন? কারো উপরে নির্ভরশীল হওয়াটাকে আমরা অপমান বলে মনে করি। আমার মা ছিলেন ফরাসী মেয়ে, বাবা আমেরিকান, এই দুই রক্তের সংমিশ্রণে আমার জন্ম। সেই রক্তে তো কোনো নির্ভরতার প্রশ্ন থাকা উচিত ছিলো না। একটি অপরিচিত বিদেশী মেয়ের সেবা বা সাহায্য আমি নিতে যাবো কেন? আশৈশব আমরা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠি। আমার বাবা একটু ঢিলেঢোলা মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু আমার ফরাসী মা যেমনি অহংকারী তেমনি রাগী, আর তেমনি অসহিষ্ণু। এতোটুকু নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছাড়া আমাদের দেশের মা বাবা আমাদের জন্য কোনো প্রয়োজনে সাহায্য করতে চান না, তাতে শিশুদের শক্তপোক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে বাধা হয়। আমরা গলায় ন্যাপকিন বেঁধে, ছোট অপটু হাতে কাঁটা চামচে ধরে দেড় বছর বয়েস থেকেই একলা বসে খেয়ে ক্ষিদে নিবৃত্ত করতে অভ্যস্ত হই। আর একটু বড়ো হয়ে জামা জুতোও নিজেরা পরি। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি, নির্দিষ্ট সময়ে জেগে উঠি। নির্দিষ্ট সময়ে খেলি, নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসি। সময় আমাদের কলের নিয়মে বাঁধা। আমি যখন খুব ছোট ছিলুম, হয়তো অন্য শিশুদের চেয়ে বেয়াড়া ছিলুম একটু। দুপুরে বা রাত্রে কখনোই আমার ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করতো না। জেগে থেকে মা বাবার কাছে কাছে ঘুরতে চাইতুম। কোনো অতিথি এলে তো আর কথাই নেই, হাঁ করে তাদের কথা গিলতে ইচ্ছে করতো। মার ইসারা ইঙ্গিত আদেশ সব উপেক্ষা করে ছুটোছুটি করতুম, কিছুতেই ধরা দিতুম না। কতোদিন শক্ত করে মা-র হাঁটু জড়িয়ে ধরেছি, একটু বেশী সময় তাঁর কাছে, তাঁর কোলে থাকবার জন্য বায়না ধরেছি, মা একটুও প্রশ্রয় দেননি। আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জোর করে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর হাতে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন। তারপর বাইরে থেকে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি লাফিয়ে উঠে এসে ঘসা কাচের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে কেঁদেছি। আমার মাথা যতোটুকু উঁচুতে উঠতো, ঠিক সেই জায়গায় মুখটা ঠেকিয়ে থাকতুম বলে ঐ খানটায় আমার চোখের জলে দাগ ধরে যেতো। তারপর এক সময় হতাশ হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম।

তা বলে আদরের কমতি ছিলো বলে ভাববেন না। আমি একমাত্র সন্তান ছিলুম। আমার স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষার জন্য, যোগ্য হয়ে উঠবার জন্য আমার মা বাবার চিন্তার অন্ত ছিলো না। কিন্তু, যত বাজে বকছি না? আমি বরং যাই।'

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, 'মাত্র সাড়ে আটটা, এক্ষুনি যাবে কি। বোসো না, কী চাও? কী পানীয় দেব বলো? গরম না ঠাণ্ডা?'

'ঠাণ্ডাও আছে?'

'তুমিই তো নিয়ে এলে।'

'সে তো আপনাদের জন্য।'

'আমরা অতো কৃপণ নই, শেয়ার করতে রাজী আছি।'

রাসেল স্মীথ হাসলো। বললো, 'সেদিন প্রোফেসর সান্যাল ওখানে কিয়ান্টিটা বেশ পছন্দ করছিলেন, তাই ভাবলাম নিয়ে যাই—'

'খুব ভালো করেছ। দিদির জন্য বেগুন আর লেবু, আর ভগ্নিপতির জন্য কিয়ান্টি।'

'দিদি যে ও রসে বঞ্চিত। শুনুন, আপনি যদি আমাকে কোনো পানীয় দিতেই চান, তাহলে আর এক কাপ কফি দিন।'

'নিশ্চয়ই।'

আমি উঠে গিয়ে কফি নিয়ে এলাম। কফি খেতে খেতে বললো, 'জানেন, আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিলো আমার সাত বছর বয়সে। বাবাই আমাকে মার হাত এড়িয়ে একটু প্রশ্রয় দিতেন। বাবার জন্য আমার যে কী কষ্ট হয়েছিলো বলতে পারি না। বাবার মৃত্যুর পরে মা সেই শোক ভুলতে আমার প্রতি উগ্রভাবে আসক্ত হয়ে উঠলেন, যেন বদলে গেলেন মানুষটা। কিন্তু আমাদের মা আর ছেলের যৌথ জীবনের সুখ বেশীদিন টিকলো না। আমার এগারো বছর পুরতে চার মাস আগেই মারা গেলেন তিনি। একেবারে একা হয়ে গেলাম। একেবারে নিঃস্ব।

এদিকে ভাইবোনও কেউ ছিলো না যাদের সঙ্গসুখে একদিনের জন্যও সুখী হতে পারি। এই নিবিড় নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতে পারি। দিনগুলো ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম সবই সয়ে গেল একদিন।

কিছু সঞ্চিত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন মা বাবা, এক আত্মীয় আমাকে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি লেখাপড়া করতে ভালোবাসতুম। আমি বেঁচে গেলুম। সত্যি বলতে লেখাপড়া করা ছাড়া আর কিছুর দিকেই আমি তখন মনোযোগ দিইনি। আর কিছুর উপর তেমন মনোযোগ এখনো আমার কিছু নেই। ইস্কুলের গণ্ডি পার হতে বেগ পেতে হ'লো না। ততোদিনে আমি সাবালক হয়েছি, নিজেরটা নিজেই গুছিয়ে নিতে শিখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলুম। সেখানকার তরীও ঘাটে ভিড়লো, আর তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে বয়স যখন পঁচিশে এসে পৌঁছুলো, তখুনি তাকে দেখলুম। ততোদিনে আমি দু'বছর ইশকুল মাস্টারি করে পাকা হয়ে গেছি নিজের নির্জন জীবন নিয়ে বেশ তো সুখেই ছিলাম সেই সময়টায়। বই ছিলো সঙ্গী, কবিতা ছিলো আনন্দ, পড়ানোর কাজটাতেও কোন অভিযোগ ছিলো না। কখনো কখনো যে একা লাগেনি তা নয়, বন্ধুবান্ধবীদের ডেকে সেই একাকী ঘুচিয়ে নিতুম। কিন্তু সবই ছিলো ভাসাভাসা। মনের গভীরে তারা নাড়া দিতো না, তাই শেকড়ও গাড়তে পারতো না।

সকালে ব্রেকফাস্ট তৈরী ক'রে খেয়ে চলে গেছি কাজে, ফিরে এসে বেহালা বাজিয়ে, কুকুরটাকে আদর ক'রে,—যা হোক কিছু রান্না ক'রে খেয়ে কবিতা লিখে আর কবিতা পড়েই সময়কে একঘেয়ে হতে দিইনি।

ঐ দেখুন আবার আমি আমার নিজের কথায় ফিরে এসেছি। জানেন, এই আমার দোষ। একবার আরম্ভ করলে আর আমি থামতে পারি না। কখন যে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

কফিটফি ফেলে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাসেল, 'চলি।'

'সে কী। এমন হঠাৎ।'

'না, হঠাৎ নয়, আমি বুঝতেই পারিনি যে এর মধ্যেই এতোগুলো সময় কেটে গেছে। আজ বিদায় দিন।'

'আবার কবে আসবে?'

'আমি আপনাকে ফোন করবো।'

চলে গেল সে। আর চলে যাবার পরে আমার মনে হ'লো, ওর ঠিকানাটা রাখা উচিত ছিলো। তারপর ভাবলাম যাক গে, ও ঠিক আবার আসবে না হ'লে ফোন করবে।

কিন্তু বেশ দিনকয়েক কেটে গেল, আর দেখা নেই। বাঙ্গালী মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী। আমার এদিকে তারই মধ্যে একটু টান পড়ে গেছে ওর উপর। একবার 'দিদি' ডেকেই আমার মন কেড়ে নিয়েছে। এই স্বজনবিরহিত প্রবাসে সেই ডাকটুকুর মূল্য কম নয়। আমি অস্থির হ'য়ে উঠলুম।

শেষে উনি বুদ্ধি দিলেন 'মিসেস ব্রাউনকে ফোন ক'রে দেখতে পারো।' ঠিক। যেন অকূলে কূল পেলাম। দেরি না ক'রে তখুনি সেই মত কাজ করলুম। কিন্তু হতাশ হ'তে হ'লো। শুনলাম ভদ্রমহিলা তাঁর গ্রামের বাড়িতে থাকতে গেছেন কয়েকদিনের জন্য। তখন আর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইলো না। আর অপেক্ষা কর'তে করতে যখন প্রায় ভুলে এসেছি, তখুনি ফোন বেজে উঠলো তার গলা নিয়ে।

'আমি রাসেল, রাসেল স্মিথ।'

'ওমা, রাসেল স্মিথ? কী কাণ্ড! কোথায় ডুব দিয়েছিলে এতোদিন?'

'স্কুলে পরীক্ষা চলছিলো, সময় করতে পারছিলাম না। ভালো আছেন?'

'তুমি ভালো আছ?'

'অনুমতি করেন তো আবার একদিন গিয়ে বিরক্ত করি।'

'শোনো তোমার জন্য আমি অস্থির হ'য়েই আছি। দয়া ক'রে এলে এই বাঙালীদিদিটি ভয়ানক সুখী হবে।'

'আপনি সেদিন রাগ করেননি তো?'

'রাগ? কেন?'

'বিরক্ত ক'রে এসেছি।'

'বিরক্ত হ'য়েছিলাম বলে মনে হয়েছিলো?'

'জানি না।'

'তা হ'লে জেনে নাও, তোমার কথা শোনার জন্য আমি অধীর হ'য়ে অপেক্ষা

করছি। আধখানা বলে আমাকে ভারি অস্বস্তিতে রেখে গেছ।'

'তবে কি আবার যাবো?'

'নিশ্চয়ই।'

'অসুবিধে হবে না তো?'

'বিদেশে একা আছি, তোমার মতো একাধারে ভাই আর বন্ধুকে কে না চায়? এসো, নিশ্চয়ই এসো।'

'কবে স্ত্রী আছেন?'

'কবে আসতে চাও?'

'সোমবার।'

'বেশ তো।'

'তা হ'লে তাই ঠিক রইলো। আমি ঠিক পাঁচটা পঞ্চাশে গিয়ে পেঁছুবো, তারপর আপনাকে আর প্রোফেসর স্যান্যালকে নিয়ে বাইরে খেতে যাবো।'

'বাইরে খেতে যাবে? তার দরকার কী? বরং তুমিই সেদিন আমাদের সঙ্গে খাওনা।'

'না, না, সে হয় না।'

'কেন হয় না?'

'তা হ'লে কিন্তু আমি রাগ করবো।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যা তোমার খুশি তাই কোরো।'

তাই হ'লো। সোমবার বিকেলে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা পঞ্চাশেই এলো সে। আমরা ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কোনো ইতালীয় রেস্তোরায় খেতে গেলাম। খাওয়ার শেষে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উনি চাকরী করতে গেলেন, আমি রাসেলকে নিয়ে বাড়ি এলাম। বললাম, 'বসো, তোমাকে কফি করে দি।'

'না, না, আর কফি কেন, এই তো খেয়ে এলাম।'

'তাতে কী? অধিকন্তু নঃ দোষায়। আর কফি ছাড়া গল্প জমবে কেন?'

'তা ঠিক, তা ঠিক। আপনি এতো ভালো। এতো বোঝেন। জানেন, মল্লিকাও ঠিক এরকমই ছিলো।'

'কী রকম?'

'আপনার মতো।'

'তা হ'লে তো তোমার মল্লিকাকে বেশী প্রশংসা করতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমার মতো হওয়াটাকে আমার ভালো মনে হয় না।'

চোখ টিপলো রাসেল। 'তাই বুঝি? কিন্তু আমি তো ভালো মন্দ কিছু বলিনি।'

'কী বলেছ?'

'বলেছি আপনার মতো। তা সে মন্দও হ'তে পারে।'

'মন্দ! আমাকে তুমি মন্দ বলছো?'

আয়াস করে সিগারেট খেতে খেতে মাথা নেড়ে বাংলায় বললো, 'হ'টে পারে।'

'তার মানে মল্লিকাকেও মন্দ বলছো?'

'হটে পারে।'

'ঠিক আছে। দাঁড়াও, দেশে গিয়েই তাকে বলে দেব সব।'

চোখ জ্বলে উঠলো রাসেলের, 'ডেখা টোবে হোবে?'

'কেন হবে না!'

'টবে, টাকে বোলবেন, সে হামাকে বুঝি ভুলটে পারে হামিটো পারে না।' ছেলেমানুষের মতো সে সজল হ'য়ে উঠলো। আর আমারও কী যে কষ্ট হ'লো আপনাকে বলতে পারবো না কাকাবাবু।

'বারোটা দশ। এরপরের সময়টা ঘুমের দাবী করতে পারে।'

'ওটাকে দুটো পর্যন্ত লাইসেন্স দেয়া যায়।

'না, না, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন।

'আমি বলছি তুমি তোমার গল্পটা শেষ করো।

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'আপনাকে আমি আর রাত জাগতে দিতে পারি না।'

'জামাই থাকলে আমি সারারাত তার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাতুম। আমার এ স্বভাব কি তোমার জানা নেই?'

'তা আর নেই।'

'সেবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে মনে আছে?'

"আর কফি ছাড়া গল্প জমবে কেন?"

চুপ করলো নীলিমা। ডক্টর মৈত্রও চুপ ক'রে কী যেন ভাবতে লাগলেন। অনেক পরে বললেন, 'তারপর?' এবার ঘড়ি দেখলো নীলিমা, চোখ খাড়া ক'রে বললো, 'ক'টা বেজেছে জানেন?'

'দরকার কী জেনে?'

'রাতটা তো মানুষের জেগে থাকবার জন্য নয়?'

'ঘুমিয়ে থাকবার জন্যও নয়।'

'খুব মনে আছে।' নীলিমা হাসলো 'সত্যি, কী ক'রে অত রাত জেগে কেবল কথা বলেন বলুন তো?'

'সুতরাং এখুনি শোবার প্রস্তাব না ক'রে তোমার বিদেশী ভ্রাতাটিকে আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করো।

'কতোগুলো অচেনা মানুষের কথা শুনিয়ে রাত দু'টো বাজিয়ে আমি

আপনার শরীর খারাপ করতে পারবো না।'

'অচেনা কে বললো তোমাকে?'

'রাসেলকে আপনি চেনেন?'

'বলা কি যায়?'

'মল্লিকাকেও চেনেন বোধহয়।' খুব হাসলো নীলিমা। ডাক্তার মৈত্রের মুখেও হাসি ফুটলো। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাইপ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'খুব অসম্ভব মনে হচ্ছে নাকি?'

'না, অসম্ভব কী। জগৎ সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'তা হ'লে রাত বাড়িয়ো না।'

'আমি জানি, আজ আপনি ক্লান্ত।'

'তুমি বড্ড ঘুম কাতুরে।'

'মোটেও না।'

'ঐ জন্যই তো প্রোফেসর সাহেব না থাকলে আমার জমে না।'

'সেটা আপনার পক্ষপাতিত্ব।'

'সে আমাকে কক্ষনো বারোটা বাজতেই শুয়ে পড়তে বলতো না।'

'তা কী ক'রে বলবে, প্যাঁচা যে। রাত জাগাতেই তো তার ফূর্তি।'

'সব ভদ্রলোকেরাই তা হ'লে প্যাঁচা।'

'লোকেদের প্রেমের গল্প শোনায় এত আগ্রহ কেন? না, এসব ভালো না।'

'দ্যাখো, নীলা, আমি হলাম ডাক্তার। পরোপকার করাই আমার ধর্ম। তার উপরে এ দেশ থেকে তুমি আরো এক বছর বাদে ফিরছো, আমি ফিরছি কাল-পর্শু, প্রয়োজনে লেগে যেতে পারি। আমি হয়তো খুঁজে-পেতে মল্লিকাকে বার ক'রে তোমার স্মিথ সাহেবের 'অধীর আদর্শন তৃষা' মিটিয়ে দিতে পারি। তারপর কী হ'লো বলো।'

'ঠিক আছে, আমার কী। কিন্তু যতো রাতই হোক, গল্প শেষ পর্যন্ত না শুনিয়ে ছাড়বো না। এই কন্ডিশন।'

'না শুনিয়ে যে ছাড়বে না, তা আমি জানি গো, জানি। কেবল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা বলে একটু দেখে নিচ্ছ আমি সত্যি মন দিয়ে শুনছি কি না। নাও, বলো।' আর তার আগে একটা কাজ করো—'

'বলুন।'

'ঘরের হীটটা একটু কমিয়ে দাও দেখি বড্ড গরম লাগছে।'

হীট কমিয়ে, দিয়ে এসে গুছিয়ে বসলো নীলিমা। ডাক্তার মৈত্র তাকে খেই ধরিয়ে দিলেন, 'রাসেল বাংলায় বললো, 'আমি তাকে ভুলতে পারিনি। তারপর?'

'তারপর আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলাম। এক সময়ে রাসেল নিজেই বলতে আরম্ভ করলো। বললো, 'জানেন সেই যে মেয়েটি আমাকে তার নিজের একটা স্বাভাবিক সেবার দায়িত্বে আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই নামিয়ে নিল, যত্ন ক'রে লবিতে এনে বসিয়ে পিঠের তলায় কুশান গুঁজে দিল তখুনি আমার কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল সব। সে বললো, 'আমাদের এ্যাপার্টমেন্ট চারতলাতে, আমি এক্ষুনি আমার ডাক্তারমামাকে ডেকে নিয়ে আসছি।' এই বলে প্রায় ছুটে গিয়ে সে লিফটে উঠলো। আর আমি আমার ব্যথাবেদনা সব ভুলে অদ্ভুত এক বিমূঢ় অবস্থায় সামনের দিকে দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়ে বসে রইলাম চুপচাপ।

আসলে সেদিন আমার মাথায়ই যদিও বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিলো, কিন্তু মাথার চেয়ে জখম হয়েছিলো বেশী হাতটা। হাতটা ভেঙেই গিয়েছিলো। বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছের হাড়টা সরে গিয়েছিলো। কেটেও গিয়েছিলো অনেকটা। মেয়েটির ডাক্তারমামা তখুনি নেমে এলেন। ছোটখাট শক্তপোক্ত মধ্যবয়স্ক এক সুশ্রী ভদ্রলোক। চমৎকার ব্যবহার, অত্যন্ত সহৃদয়, তার চেয়ে বেশী স্নেহশীল। দেখে আর উনি দেরি করলেন না। তৎক্ষণাৎ গাড়ি ডাকিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আমার এতো যন্ত্রণা হচ্ছিলো যে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। ভালোও লাগছিলো সেই মনোযোগটুকু।

কেউ আমার জন্য কিছু করুক এ আর কে না চায় বলুন? তা ব্যতীত আমি বোধহয় একটু স্নেহ-কাঙালও আছি। মা বাবার কাছে ঠিক পুরোপুরি পাওনাটা আদায় হয়নি আমার। অনেক-অনেক বাকী ছিলো, অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিলো। নিঃসঙ্গ এক স্নেহপিপাসিত হৃদয় নিয়েই একা একা বড়ো হ'য়েছি। আমার শারীরিক কষ্ট ছাপিয়ে সেই পাবার সুখটুকু যেন উপচে পড়ছিলো।
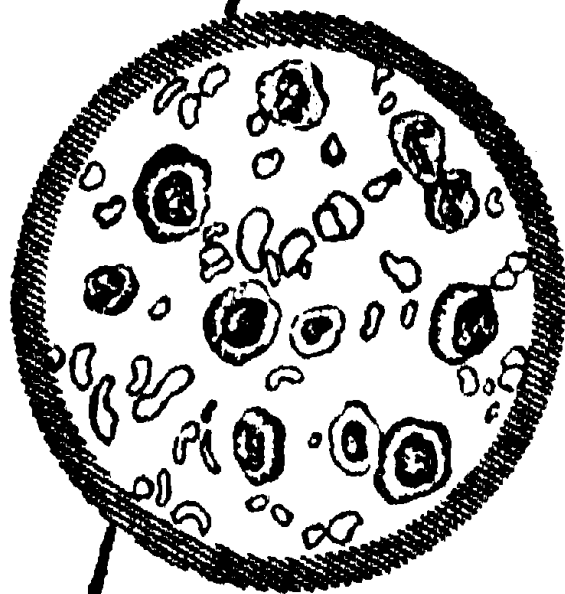
(ক্রমশ)

নেফার মানুষ-টাঙ্সা

নলিনীকুমার ভদ্র

আজ থেকে কয়েক শো বছর আগেকার কথা। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের পাতকোই পর্বতের আরণ্য অঞ্চল থেকে একদল বুভুক্ষু যাযাবর মানুষ বেরিয়ে পড়ল বাস এবং চাষ করবার উপযোগী উর্বরা ভূমির সন্ধানে। দুর্গম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছল তারা লোহিত নদীর দক্ষিণে তিরাপ এবং নার্মাচিক নদীবারি-বিধৌত রমণীয় পার্বত্য-ভূমিতে। ধীরে ধীরে এই নদী দুটির দুই তীরে গড়ে উঠল টাঙ্সাদের উপনিবেশ। দূর অতীতে বহিরাগত এই টাঙ্সাদের বাসভূমি আজ নেফার অন্যতম অঙ্গ এবং তিরাপ নামে পরিচিত।

বিচিত্র দেশ এই তিরাপ। তীব্র গতিশীলা কলনাদিনী অগণিত পার্বত্য স্রোতস্বিনী এই দেশকে করে রেখেছে সুজলা, সুফলা এবং শস্য-শ্যামলা। বনানী-মণ্ডিত গিরিগাত্রের উপর দিয়ে প্রবহমান এই সকল নদীর জলধারা ঋজু কুটিল নানা পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এসে গা ঢেলে দিয়েছে আসামের লোহিত নদীর প্রসারিত বক্ষে। নদীর স্বচ্ছ জলে স্বচ্ছন্দ সন্তরণশীল মৎস্যকুলের পাখনা পর্যন্ত দেখা যায়।

এখানকার বনভূমিতে বিচরণ কালে গাছ-পালার প্রাচুর্য দেখে মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যেন সবুজের বান ডেকেছে। অরণ্যের শ্যাম শোভার মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে কাকু, জাতি প্রভৃতি হরেক রকমের বাঁশগাছ। গোটা দেশটা জুড়েই এই বাঁশ গাছের অজস্রতা। তিরাপের বনভূমি শুধু ঘুঘু, সবুজ পায়রা, টিয়া, কাঠঠোকরা, কোকিল ইত্যাদি পাখীর কাকলিতেই মুখরিত নয়—বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি বন্য-জন্তুর গর্জনেও প্রকম্পিত এবং বুনো হাতীর বপ্রক্রীড়ায় বিধ্বস্ত।

নেফার অন্তর্ভুক্ত এই ভীষণ-রমণীয় তিরাপ ভূমিতে লুঙ্গি-পরা যে সকল মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করে মনে-প্রাণে ভারতীয় হয়ে গেছে, তাদের কথা কিছুই আমরা জানি না। অথচ এদের মধ্যে অনেকেই অসমীয়া ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারে, অনেক অসমীয়া শব্দ পুষ্ট করেছে এদের শব্দকোষকে। যেমন ঃ সুদূর অতীতে বর্মার ছেড়ে-আসা গ্রামের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের এরা বলে 'অজান্তি', অর্থাৎ অজানা দেশের মানুষ।

একই দেশের অধিবাসী হলেও আদিবাসী টাঙসারাও আমাদের কাছে 'অজান্তি'। বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে কোনো বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন-এর নির্দেশে, তিরাপ সীমান্ত বিভাগের এ্যাসিস্টান্ট রিসার্চ অফিসার পারুল দত্ত 'দি টাঙসাস' নামক একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। 'তিরাপের' টাঙ্সাদের সম্বন্ধে এখানিই একমাত্র আকর-গ্রন্থ।

টাঙ্সা কথাটার মানে হচ্ছে পাহাড়ী মানুষ। লোহিত বিভাগের ঠিক দক্ষিণে এদের অধ্যুষিত তিরাপ বিভাগ। তিরাপের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমে আসামের লক্ষীমপুর ও জোড়হাট জেলা। আসামের তৈল-সমৃদ্ধ অঞ্চল মার্গারিটা, ডিগবয় তিরাপের পশ্চিম প্রান্তসীমা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। খেলা হচ্ছে তিরাপের হেড কোয়ার্টার।

আক্রমণকারী চীনারা অবশ্য এবার টাঙ্সাদের দেশ তিরাপে অনুপ্রবেশ করেনি, লোহিত বিভাগের কিবোতুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে খেলাতে খেল শুরু করেও দেয়নি। তাই বলে একথা

মেঙুয়া বালুক্যা

মনে করলে ভুল হবে যে, চীনা সৈন্যরা টাঙ্সাদের অচেনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মা থেকে পাতকোই পর্বতমালা পার হয়ে বহু চীনা সৈন্য তিরাপের গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে অস্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়েছিল। বিভিন্ন গ্রামের টাঙ্সারা তখন চীনাদের সংস্পর্শে আসে। চীনাদের অনুকরণে তখন এদের মধ্যে হাতে উল্কি পরার রেওয়াজ হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। উল্কি-পরা টাঙ্সারা চীনা ভেল্কি এবং ভাঁওতায় ভুলবার পাত্র নয়। পাতকোই পর্বতের ওপারের জাত-ভাইদের সঙ্গে সামাজিক লেন-দেনের সম্পর্ক এদের ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজ তা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। পক্ষান্তরে ভারতের সন্নিহিত এবং দূরবর্তী অঞ্চলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এদের একাত্মতাবোধ ক্রমবর্ধমান। শুধু অসমীয়া নয়, হিন্দী ভাষাতেও তারা চমৎকার বাত-চিৎ করতে পারে। বিশেষতঃ যে-সকল মেয়ে লিডো এবং মার্গারিটার হাটে সওদা করতে আসে তাদের মুখে অসমীয়া ভাষায় যেন খৈ ফুটতে থাকে।

আজ টাঙ্সারা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী মানুষ, কিন্তু একদা এরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও নাগাদের মত নরমুণ্ড-শিকারী। কোন্ গাঁয়ের ওপর চড়াও করতে হবে তা স্থিরীকৃত হত মাতব্বরদের বৈঠকে। গোটা গাঁয়ের মানুষদেরই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করতে হত, বাদ যেত কেবল মেয়েরা, শিশুরা আর বুড়ো এবং অশক্ত লোকেরা।

যুদ্ধ পরিচালনা যে করত তাকে বলা হত সেরাই! সেরাই ভোরবেলাতেই তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোনো গাঁয়ের উপর, তার পর নির্বিচারে স্ত্রী-পুরুষের মাথা কাটতে শুরু করত, রেহাই পেত কেবল শিশুরা, ফিরবার সময় তাদের তারা বন্দী করে নিয়ে যেত।

অতর্কিত আক্রমণ ছাড়া এক গ্রাম আর এক গ্রামকে সম্মুখ সমরেও আহ্বান করত। এক্ষেত্রে একটি তীরের ফলায় একটি মোরগের মাথা রেখে ছুঁড়ে ফেলা হত, অথবা কয়েকজন যুযুধান তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠত : "কালো কালো রাতি, স্নিয়া মিবা রাতাই কালো"; অর্থাৎ আমরা আসছি তোমাদের সঙ্গে লড়বার জন্যে, গাঁয়ে যদি পুরুষ-বাচ্চা কেউ থাকো তো বেরিয়ে এস।"

এমনিভাবে কোনো গাঁয়ের উপর চড়াও হওয়ার আগে একটি শুকর মারা হত, তার পর রাজসিক ভোজন এবং প্রচুর পরিমাণে ধান্যেশ্বরীর সদ্ব্যবহারের পালা। পান-ভোজনের পালা শেষ হলে সেরাই একটা মোরগ মেরে যুদ্ধের শুভাশুভ নির্ণয় করত। লড়াইয়ে জিতলে পর অনুষ্ঠিত হত 'মই' অথবা 'মাই-ল্পাম-

মাঠের পথে টাঙ্সা বালিকা

মাছধরা জাল ঠিক করছে টাঙ্সা পুরুষ

সিপ' নামক বিজয়োৎসব। শত্রুদের কাটা মাথা এবং হাত পুঁতে ফেলা হত গ্রামের সীমানার বাইরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের নীচে। সাতদিনের দিন মাটি খুঁড়ে মুণ্ড ইত্যাদি নিয়ে এসে বিতরণ করা হত গ্রামবাসীদের মধ্যে, মাথাগুলি পড়ত অবশ্য সেরাইয়ের ভাগে।

টাঙ্সাদের আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি আজ বিলুপ্তপ্রায়, এদের সমাজে নরমুণ্ড শিকারের রেওয়াজ এখন আদৌ নেই। আজকের দিনে সহজ সরল সদাহাস্যময় টাঙ্সাদের সংস্পর্শে এলে মুগ্ধ হতে হয় তাদের অমায়িক আচরণে। এদের সুপসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁতে-বোনা জ্যামিতিক নকশাওয়ালা কাপড়ে, মেয়েদের নীবিবন্ধে এবং বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি ইত্যাদিতে।

বর্মী পুরুষদের মত টাঙ্সা পুরুষদেরও প্রধান পরিধেয় ডোরা-কাটা লুঙ্গি —এগুলি সবুজ এবং কালো রঙের। গায়ে হাতাহীন জামা, মাথায় ছোট একটি কাপড়ের টুকরো জড়ানো। মেয়েদের পরনে কোমরে গেরো-দেওয়া হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত বস্ত্রখণ্ড (খোসা)। এই নয়নাভিরাম খোসা টাংসা মেয়েরা নিজেরাই বোনে লাল কালো সাদা এবং নীল রঙের সুতো দিয়ে। খোসার বিচিত্র প্যাটার্নের নকশাগুলো দেখলে তারিফ করতে হয়। দেহের উত্তরার্ধ আচ্ছাদিত করে এরা নীল সুতোয় তৈরী দুটি বহির্বাস দিয়ে।

এই হ'ল টাঙ্সা মেয়েদের নিজস্ব জাতীয় পরিচ্ছদ। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াওতায় আসার দরুণ আজকাল কিন্তু এদের বেশভূষার, কেশবিন্যাস-প্রণালী ইত্যাদির অনেক অদল-বদল হয়েছে। এদের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বয়নশিল্পকে হটিয়ে দিয়ে সস্তা দরের মিলের কাপড় ব্লাউজ ইত্যাদি ধীরে ধীরে বাজার ছেয়ে ফেলছে।

অন্যান্য পাহাড়ী মেয়েদের মতো টাঙ্সা মেয়েদেরও উদয়াস্ত খাটুনির আর অন্ত নেই। অতি প্রত্যুষে পল্লীপথে বেড়াতে বেরুলে কানে আসে ধান ভানার ছন্দোময় ধ্বনি, বুঝতে পারা যায়—শুরু হল পার্বত্য জনপদ-বধূদের কর্মব্যস্ত জীবনের প্রাত্যাহিক পর্ব, ধান ভানা সারা হলে পর তারা চলে যায় ঝরণা-তলায় জল আনতে, ফিরে এসে হাঁড়ি চাপায় উনুনে। রান্না-বান্নার পরেও কি আর একটু জিরিয়ে নেবার জো আছে। তাড়াতাড়ি ঝুড়ি নিয়ে চলে যেতে হয় ক্ষেতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরে ফিরে আসে তারা ঝুড়ি-ভর্তি তরিতরকারী, ধান আর জ্বালানি কাঠ নিয়ে। এসেই শুয়রগুলোকে খাওয়াতে হয়, তারপর আবার রাতের রান্নার জন্যে উনুন ধরানো। খাওয়া-দাওয়ার পর চুল্লীর গনগনে আগুনের কাছে বসে গল্পগুজবে কাটিয়ে দেয় তারা কয়েক ঘণ্টা, শুতে যায় রাত আন্দাজ এগারোটা নাগাদ। কুমারী তরুণীরা খেয়ে-দেয়ে গিয়ে জমায়েৎ হয় যৌথ শয়নাগারে এবং সেখানে নিশি যাপন করে বান্ধবীদের সঙ্গে।

অতীতে তরুণদের মোরাঙ্ বা যৌথ শয়নাগার টাঙ্সাদের সামাজিক জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। এই সকল সুসংগঠিত শয়নাগারকে বলা হ'ত লুপ্পঙ্। এগুলি ছিল একাধারে গ্রামের প্রতিরক্ষা-গৃহ এবং কুমারদের প্রমোদ-নিকেতন। সেকালের দিনে বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল বলে প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশ-পথেই নির্মিত হত একটি করে লুপ্পঙ্। গাঁয়ের সকল অবিবাহিত যুবক একত্রে শয়ন করত সেই বিরাট ভবনে। সকল রকম হাতিয়ার ছাড়া একটি প্রকাণ্ড কাঠের মাদল মজুত থাকত সেখানে। আপৎ-সূচনা দেখা দিলেই কাঠি পড়ত মাদলে আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যেত সাজ-সাজ রব। সাম্প্রতিক কালে কিন্তু আর এই সকল লুপ্পঙ্-এর অস্তিত্ব নেই।

মেয়েদের যৌথ শয়নাগার (লুপ বা লিকপিয়া) কিন্তু এখনো কোনো কোনো গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হচ্ছে অনূঢ়া তরুণীদের প্রমোদ-নিকেতন এবং যৌথ শয়নাগার। অবিবাহিত যুবকেরা সন্ধ্যাকালটা কাটিয়ে দেয় লিকপিয়াতে মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গাছা করে।

টাঙ্সা স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয় আনুষ্ঠানিক বিবাহের মাধ্যমে। 'বন্ধনহীন গোপন মিলন' লাভ করে না সামাজিক মর্যাদা।
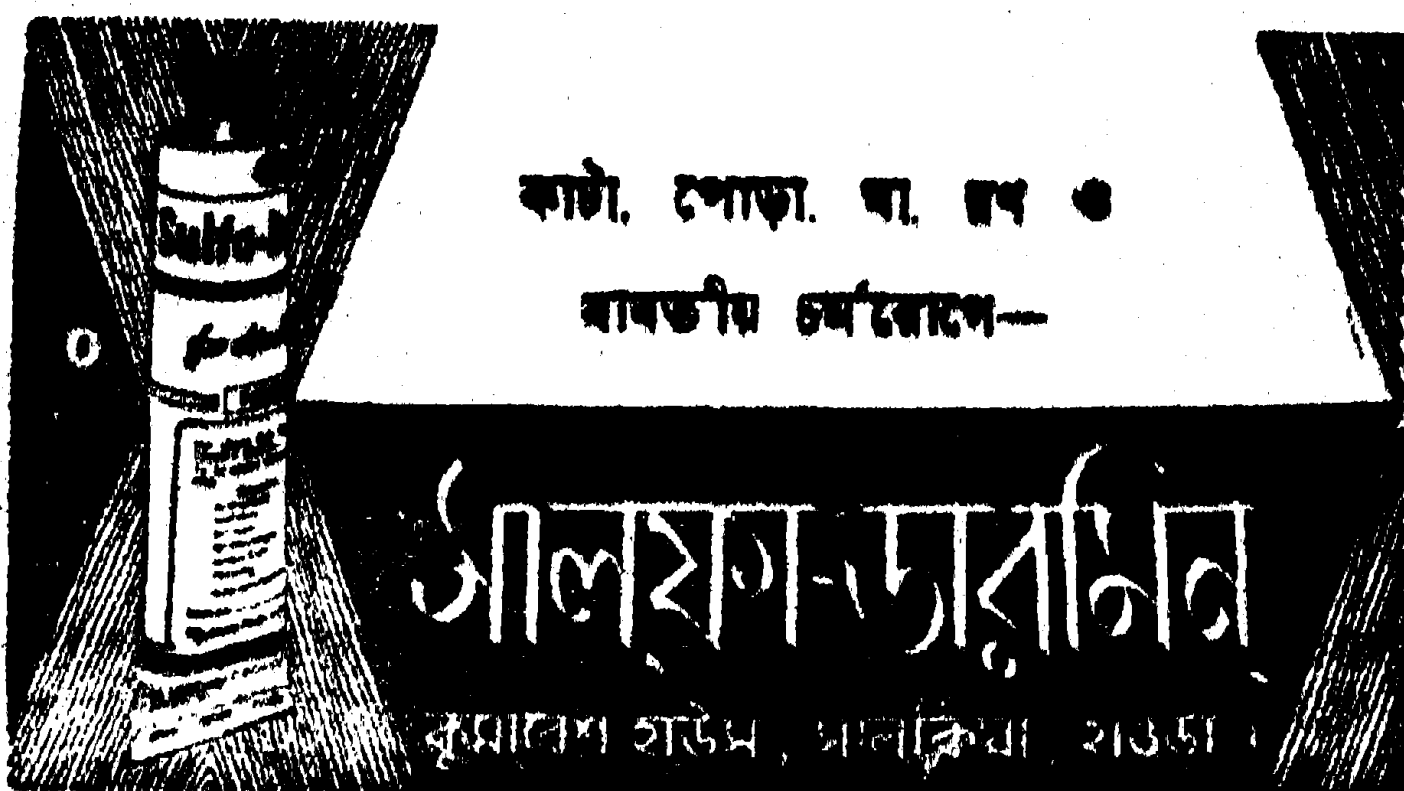
ভিন্ন গোত্রে বিবাহ (exogamy) হচ্ছে এদের সাধারণ নিয়ম। আসামের মিকিরদের ন্যায় টাঙ্সাদের মধ্যেও মামাতো বোন এবং পিসতুত ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। এইটেই হচ্ছে আদর্শ বিবাহ। কোনো বিবাহেচ্ছু যুবকের যদি মামাতো বোন না থাকে অথবা কনের পিসে যদি অপুত্রক হয় তাহলেই শুধু এরা অন্য পরিবার থেকে জীবনসঙ্গী অথবা জীবনসঙ্গিনী বেছে নিতে পারে। অগ্রজের বিধবাকে বিয়ে করবার অগ্রাধিকার হচ্ছে অনুজের। ভাদ্রবধূ কিন্তু ভাশুরের অপরিশেয়া বলে পরিগণিতা।

কন্যা-পণের প্রথা প্রচলিত টাঙ্সাদের সমাজে। কনের পিতা বরপক্ষের নিকট দাবি করে কন্যার 'গা-ধন' বা দেহের মূল্য। কথাটা অসমীয়া ভাষা থেকে ধার করা। এই গা-ধন খুব বেশী হলে কন্যাগর্বী পিতা নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করে। গা-ধন সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে ফয়সালা হলে পর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। তিন দিন ধরে চলে বিয়ের অনুষ্ঠান।

প্রথম দিনে বর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবসহ কনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। সঙ্গে করে নিয়ে যায় দু একটি শূকর এবং গুটিকতক চোঙা ভর্তি লাহু বা ধেনো মদ। ঐ দিনই কনেকে নিয়ে বর ফিরে আসে নিজের বাড়িতে।

কনের সহগামিনী হয় তার পরিবারের দুটি মেয়ে। বরের বাড়িতে কনে এই দুটি মেয়ের সঙ্গে শোয় আলাদা একটা ঘরে।

দ্বিতীয় দিনে কনের পিতামাতাকে গা-ধন দিয়ে পুত্রদায় হতে মুক্ত হতে হয় বরের বাপকে।

ঐ দিন সকালবেলা কনে সহ বর-পক্ষের লোকেরা কনের বাপের বাড়িতে যায়। বরপক্ষের লোকেরা পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হলে পর নব-পরিণীত দম্পতির প্রত্যেকের বাঁ হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় মঙ্গলসূত্র। এদের মিলন যাতে শাশ্বত হয় সেজন্যেই এই রাখিবন্ধন। অনুরূপ আরো একটি অনুষ্ঠানের পর বরপক্ষ নব-দম্পতিসহ ফিরে আসে বরের বাড়িতে।

তৃতীয় দিনে বরবধূ একসঙ্গে আসে কনের বাড়িতে। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় তারা ফিরে আসে বরের বাড়িতে। কনে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসে একটি দা, একটি বর্শা, একটুকরো কাপড় এবং একটি ঝুড়ি।

অন্যান্য উপজাতির ন্যায় টাঙসারাও অপ-দেবতাদের অস্তিত্বে আস্থাবান।

টাঙসারা সাধারণত মৃতদেহকে মৃত্তিকায় সমাহিত করে। স্বাভাবিক ভাবে কারো মৃত্যু হলে পর শবদেহকে বাসগৃহের সম্মুখভাগেই মাচার নীচে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। অপমৃত্যু ইত্যাদির বেলায় কিন্তু মৃতদেহকে গ্রামের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে গোর দেওয়া হয়।

কবর খোঁড়া হলে পর সেখানে রাখা হয় কাঠের তৈরী একটি শবাধার। মৃত-ব্যক্তিকে ঐ আধারে রাখবার আগে, ঘরের ভিতরেই জল দিয়ে তার মুখ, বুক এবং হাত ধুয়ে ফেলা হয়। তারপর তাকে যথাস্থানে রেখে শবাধারের উপরিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয় কতকগুলি কাঠের তক্তা দিয়ে। তারপর সেটিকে ভালো করে ঢেকে দেওয়া হয় কাঁটাগুল্ম, পাথর, মাটি এবং কাঠের গুঁড়ি দিয়ে।

কারো মৃত্যু হলে পর টাঙসারা সাধারণত তিন দিন অশৌচ (মাঙপিয়ের) প্রতিপালন করে। এই তিন দিন গ্রাম-বাসীদের মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়া বারণ। চতুর্থ দিনে মৃতের আত্মীয়-স্বজন এক ভোজের আয়োজন করে, গ্রামবাসীরা তাতে আমন্ত্রিত হয়।

টাঙসাদের বিশ্বাস যে মানুষের দেহে আছে একটি অপার্থিব বস্তু—আত্মা —যার প্রসাদে সে থাকে জীবিত। এটি যখন দেহ ছেড়ে চলে যায় তখনই হয় মানুষের মৃত্যু। টাঙসারা মনে করে

সুতো কাটছে টাঙসা বালিকা

মস্তকই হচ্ছে আত্মার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। মুখের নির্গম পথ দিয়ে এই আত্মা দেহ ছেড়ে প্রয়াণ করে।

ব্রিটিশ আমলে যাতায়াত-ব্যবস্থার অসুবিধা ছিল এদের জাতীয় ঐক্যের প্রধান পরিপন্থী, কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের প্রশাসনের উদ্যোগে গত বার বৎসরের মধ্যে তৈরী হয়েছে বহু রাস্তাঘাট। এতে যে সুফল লাভ হয়েছে সে সম্বন্ধে পারুল দত্ত বলেছেন, "....the Tangsas are now coming out of their seclution and feeling their unity with the body of the Indian nation, অর্থাৎ টাঙসারা এখন বেরিয়ে আসছে তাদের নিভৃতি থেকে এবং ভারতীয় মহাজাতির সঙ্গে তাদের ঐক্য সম্বন্ধে হয়ে উঠছে সচেতন।"

রাস্তাঘাট নির্মাণ ছাড়া প্রশাসনের প্রযত্নে টাঙসাদের কৃষিকাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, কাজ-কারবারের সুবিধার জন্যে স্থাপিত হয়েছে অনেক-গুলি সমবায় সমিতি, চিকিৎসার জন্যে চাঙলাঙ-এ খোলা হয়েছে একটি হাস-পাতাল, শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কতকগুলি বিদ্যালয়। সর্বতো-মুখী উন্নয়ন এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে পুর্ণোদ্যমে—কিন্তু এদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে রাখা হয়েছে সতর্ক দৃষ্টি। কাজেই নিজেদের জাতীয় আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এরা প্রগতির পথে। অর্ধ শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—"........বেরুক নূতন ভারত পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে।"—স্বামীজীর সেই স্বপ্নই আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে নব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত টাঙসাদের মধ্যে।

সাহিত্য সমাচার

।। শিশু-সাহিত্য-পুরস্কার ।।

রাজা বাদশার কাল শেষ হয়েছে অনেক কাল। আমরা স্বাধীন। সে আমলে জ্ঞানীগুণীরা সভা অলংকৃত করে থাকতেন। জায়গীর জেতেন। অন্যথায় মাসোহারা পেতেন শিল্পসাধনার জন্য। সেকাল অতীত। ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র। আমরা দেশের শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতেই তুলে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতির সম্মান জানানোর দায়িত্ব আমাদের। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের জাতীয় সরকার নানাবিধ পুরস্কার বিতরণ করে আমাদের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সত্যিকার প্রতিভা নিয়ে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের দাম আজ আর উপেক্ষিত নয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর শিশু সাহিত্যের একটি প্রতিযোগিতা আহবান করেছিলেন। বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মোট ঊনত্রিশখানি গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়েছে। পুরস্কার বিতরণের এই অষ্টম বর্ষ।

ঊনত্রিশটি পুরস্কারের তিনটি পুরস্কার পেয়েছে বাঙলা ভাষায় রচিত তিনখানি গ্রন্থের লেখক। অন্যান্য ভাষায় পুরস্কৃত গ্রন্থের পরিমাণ নিম্নরূপ—অসমীয়া—২, গুজরাটি—২, হিন্দী—৫, কানাড়ী—২, মালয়ালম—১, মারাঠী—৩, ওড়িয়া—২, পাঞ্জাবী—২, তামিল—২, তেলেগু—২, সিন্ধী—২ এবং উর্দু—২। এই গ্রন্থগুলির লেখকেরা প্রত্যেকে পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য মোট আর্থিক ১,০০০ টাকা পাবেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙলা গ্রন্থগুলির নাম :—(১) সুন্দরবন—শ্রীশিবশংকর মিত্র, (২) খেলাঘরের রাজো—শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম ও (৩) বয়নকারের জীবনকথা—শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'সুন্দরবন' গ্রন্থের আলোচনা প্রসংগে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা অমৃতে বলা হয়েছিল—"শ্রীশিবশংকর মিত্র ইতিপূর্বে 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' লিখে চমক লাগিয়েছিলেন। সুন্দরবনের এক নিঃস্ব ও ক্ষীণকায় চাষী আর্জানের সাহস এবং দুর্জয় অভিযানের কাহিনীও যে কত রোমাঞ্চকর হতে পারে তা আমরা কখনো অনুমান করিনি। শিবশংকরবাবু সেদিক থেকে পথিকৃতের গৌরব দাবী করতে পারেন।

বর্তমান বইটিও সেই সুন্দরবনের পটভূমিতেই রচিত। অবশ্য এখানে আর্জানের মতো কোনো এককনায়ক নেই, ছোট ছোট কতকগুলি কাহিনী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কিন্তু ভাষার উপর যে পরিমাণ সহজ কর্তৃত্বের ফলে আর্জানের জীবনকাহিনী মনোগ্রাহী হতে পেরেছিল, সেই ভাষার জোরেই বর্তমান সংকলনের গল্পগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অবশ্য বইখানি পড়তে শুরু করলে ভাষার যাদু ছাড়াও আরো একটি জিনিস নজরে পড়ে। সেটা হল লেখকের অভিজ্ঞতা। সুন্দরবনকে তিনি অত্যন্ত ভালো করে চেনেন, তার গাছপালা-নদী-খাল, পশু-পাখী সবই তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। আর তেমনি তিনি জানেন সুন্দরবনের কাছাকাছি বাস করে যেসব মানুষ তাদেরও। এরা কেউ বা চাষী, কেউ কাঠুরে, কারো পেশা মাছ ধরা, কারো বা মধু সংগ্রহ করা। বাঘ-সাপ-কুমিরের হিংস্র আক্রমণকে উপেক্ষা করে এইসব মানুষ প্রায় নিরস্ত্রভাবে জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু এদের পদে পদে, তবু এরা হার মানে না। এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-সংগ্রামের রূপটিই অপার সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর কাহিনীগুলিতে।"
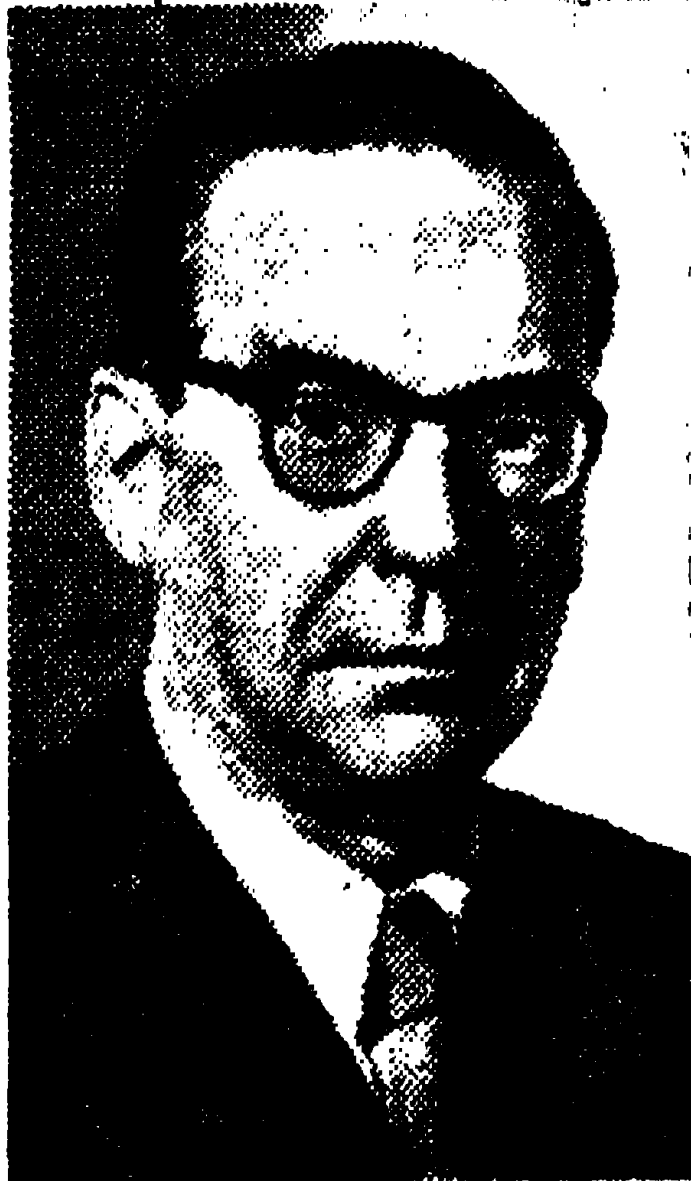
ইভো আন্দ্রিক

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর সুন্দরবন পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ 'বনবিবি' রচনার কাজ শেষ করেছেন। গ্রন্থটি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

।। নিঃশব্দের প্রতিধ্বনি ।।

এ বছর সাহিত্যে পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিণী সাহিত্যিক জন স্টাইনবেক। গত বছর পেয়েছিলেন যুগোশ্লাভের ৭০ বৎসর বয়স্ক কথাশিল্পী ইভো-আন্দ্রিক। আন্দ্রিক আমাদের পাঠক-সমাজে অতি অল্প কালের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এর মূলে অবশ্য আন্দ্রিকের সেই বিখ্যাত উপন্যাস 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'। কোন বিশেষ একখানি রচনার জন্য আন্দ্রিককে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়নি। সামগ্রিকভাবে সমস্ত রচনাবলীর জন্য এই পুরস্কার লাভ করছেন। এবং সুইডিশ আকাদমি আন্দ্রিককে পুরস্কৃত করবার পক্ষে নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত কালে 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র উল্লেখ করেন।

সম্প্রতি আন্দ্রিকের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'ডেভিলস্ ইয়ার্ড' এবং তিনটি ছোট উপন্যাসের সংকলন 'দি ভিজিয়ার্স এলিফ্যান্ট'। এ গ্রন্থ দুটি কম মাত্রায় এপিক লক্ষণাক্রান্ত হলেও পূর্ববর্তী দুটি গ্রন্থ 'বোসনিয়ান স্টোরি' এবং 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'র থেকে শিল্পগুণে কোন অংশেই কম নয়। সাম্প্রতিক উপন্যাস দুটিতে আন্দ্রিকের জীবনদর্শন আরও সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ-রূপে প্রকাশিত।

আন্দ্রিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনও কোনও সময় বেদনা-হতাশার একটি প্রবল ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন সমালোচকেরা। আন্দ্রিক যে জটিল জীবন-যন্ত্রণা আর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিলেন সেখানেই সুপ্ত রয়েছে চরম বেদনার জ্বালা। কিন্তু আন্দ্রিক হতাশ হননি। হতাশ হলে 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় যে মানবতাবোধ যে গভীর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে—তা হয়ত পাওয়া যেত না। আন্দ্রিক ইতিহাসকে ভালবাসেন। ইতিহাসের প্রবল গতি-ধারায় যে নীরব শান্ত প্রবাহের মধ্যেও উন্মাদনা ফুটে ওঠে আন্দ্রিক তার দর্শক। আন্দ্রিকের মনে মানুষের প্রতি যে বিশ্বাস-বোধের যে গভীর সত্যকে উপলব্ধি করা যায় সাম্প্রতিক উপন্যাস দুটিতে তা আরও সুস্পষ্ট—এবং বলিষ্ঠরূপে প্রকাশিত। যুদ্ধ ইতিহাস, সমকালীন জীবন সকল চিন্তার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক উপন্যাস দুটিতে।

আন্দ্রিক উচ্ছ্বাসপ্রবন শিল্পী নন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এক একটি রচনায়। নীরব সাধনায় কেটে গেছে জীবনের সত্তরটি বছর। শান্ত উজ্জ্বল-কান্তি, লৌহকঠিন মনোবলের অধিকারী বিশশতকের এই প্রদীপ্ত নক্ষত্র বার বার এক একটি মহৎ শিল্প অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। বহু বিতর্কের ঝড় উঠছে। কিন্তু তিনি নীরব। নিরত সাধনায়।

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস (সিন্ধী)

নায়িকার নাম রেখা

সুন্দরী আসেসানদাস উত্তমচান্দানী

দীপকের শেষ চিঠিঃ বাবা, দোকানের সমস্ত জিনিস নিলামে উঠতে বাকি, বাজারে চারদিকে ধারদেনা করে বসে আছি। তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে পাওনাদাররা অস্থির করে তুলছে। এই অবস্থায় ব্যবসা গুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

গোপালদাস বিদেশে অনেক বছর দোকান চালিয়ে ছেলের হাতে দোকানের ভার দিয়ে দেশে ফিরে এসেছে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। দীপকের যোগ্যতার উপর তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দীপকের দোকানে বসার পাঁচ বছরের মধ্যেই গণেশ উল্টোল।

ব্যবসা গুটিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকেই গোপালদাসের বয়স হু-হু করে যেন বেড়ে গেল। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে পনের-কুড়ি হাজার টাকা খরচা করে বড় মেয়ে শীলবন্তীর বিয়ে দিল ঘটা করে।

গোপালদাস এখন ভাড়াটে বাড়িতেই আছে। সঙ্গে আছে বউ রুক্মিণী, মেয়ে রেখা এবং একটি নাতি। যে সব আত্মীয়-স্বজন অতীতে দিনের পর দিন ওদের বাড়িতে কাটিয়ে দিতো তারা এখন আর চিনতে পারে না।

রেখাও বড় হয়েছে। আজ বাদে কাল তারও বিয়ে দেওয়া দরকার। দীপক যে কোথায় পালিয়ে গেল কোন পাত্তা নেই। এ সব বিষয়ে রেখার মা গভীরভাবে চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত।

রেখা চমৎকার বীণা বাজায়। মা-বাবা তার পাশে বসে অনেকক্ষণ ঐ বাজনা শুনত। নিজেদের মনের করুণ সুরের সঙ্গে বীণার সুরের মিল খুঁজে পেত তারা।

গোপালদাসের পারিবারিক অবস্থা যখন এই তখন শুরু হল দেশভাগের পালা। নানা রকম খবর শুনে মা-বাবা রেখার কোমল সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রুক্মিণী রেখার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছে। তার নাক, মুখ, চোখ নাকি নিখুঁত। আর এখন তো একগলা যৌবন রেখার। তার রূপলাবণ্য আরও খুলেছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই মেয়ে বড় হলে বাবা-মার দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। তার উপর দেশের এই চরম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মুহূর্তে দুর্ভাবনা আরও বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

গোপালদাসের দিদি এসে একদিন বলল, ভাই গোপাল, ব্যবসা দীপকের জন্য নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তোমার হাতে যা টাকা আছে তাতে যে কোন সময় অন্য কোথাও গিয়ে কিছু করে খেতে পারবে। আমার অবস্থা তো আর বলার মতো নয়—একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও যেতে চাইলেও তো শুধু গাড়ী ভাড়াই লেগে যাবে শ' দুয়েক টাকা।

গোপালদাস বলল, দিদি তুমি তো অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত—তোমার মেয়েগুলো সব ছোট ছোট। এদিকে আমার রেখার জন্য তো ওর মায়ের চোখে ঘুম নেই। তুমি যা ভাবছ অত টাকা আমার কাছে নেই; তবে হ্যাঁ, রেখার বিয়ের জন্য হাজার কয়েক টাকা তুলে রেখেছি। সে—যাই হোক, দরকার হলে শ' দুয়েক টাকা তোমায় দেবো।

—বাঁচালে, কি দুশ্চিন্তাতেই না ছিলাম।......ও ভাল কথা, যদি কিছু মনে না কর একটা কথা বলি তোমায়।

—অত সঙ্কোচের কি আছে দিদি আমার মেয়ের চেয়েও তোমাকে বেশি আপন মনে করি। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো।

—এক কাজ কর না, আমার দেবরাণীর ভাইপোর সঙ্গে রেখার বিয়ে দাও। ছেলেটা দেখতে-শুনতে ভাল, নম্র ব্যবহার, কলেজে তিন-তিনটে পাশ করেছে—রোজগারও ভাল করে। পণ-টনের কোন ঝামেলা নেই। ওদের বাড়ি থেকে এখন আদা-জল খেয়ে লেগেছে ভাল মেয়ের খোঁজে। ও বাড়ির বড় বউ নাকি অনেকদিন ধরে বাপের বাড়িতে রয়েছে। তাই সংসারের কাজ-কর্মের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে।

এতক্ষণ দরজার আড়ালে রুক্মিণী দাঁড়িয়েছিল। ওর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোর গলায় নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, অমন কাঙালদের বাড়িতে রেখার বিয়ে দিতে দেবো না।

একদিন পাশের বাড়িতে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে ফিরে এসে রুক্মিণী

স্বামীকে বলল, ...যাই বলো আর কিন্তু এখানে আমার আর মন টিকছে না—সবাই জমি জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে কি করে থাকব ভেবে পাচ্ছি না। অথচ এখন এখানে থাকাও নিরাপদ নয়।......পাত্রের খোঁজ করেছো? শুনলাম শীতলদাসের বাড়িতে একটি সুপাত্র আছে।

—গোপালদাস বলল, তাতো আছে। কিন্তু ও যে দাবি করবে কুড়ি হাজার টাকা। টাকে তো আমার কুড়িগো টাকাও নেই।

—টাকা যখন ছিল তখন তো আর তোয়াক্কা করলে না। এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝছ।

রুক্মিণীর সর্বক্ষণ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা। ঘরের এক কোণে বসে প্রায়ই তারা চোখের জল ফেলে। সেদিন রাত্রে স্বামীকে বলল, আচ্ছা, তোমার দিদি যার কথা বলেছে তার সঙ্গেই যদি বিয়ে ঠিক হয়। রেখা গররাজি হবে না তো?

—সে কথা নিজেই রেখাকে জিজ্ঞেস করলে পার। গোপালদাসের হাতে রুক্মিণীর চোখের জল পড়ল। চমকে উঠে সে বলল, আরে, একি মাথা খারাপ হল নাকি! কাঁদছ কেন! দেখ, এ সব ব্যাপারে যার যা ভাগ্য। রেখার ভাগ্য যদি ভাল থাকে—

—ওকে আর কি জিজ্ঞেস করবো। ফুলের মত যত্নে এত বড় করে শেষে আজ ওকে কাটার বনে ছুঁড়ে ফেলবো।

—মা, আমি গররাজি হব না।

বাবা-মা বিস্মিত হল। এ যে রেখার কণ্ঠস্বর। গোপালদাস বলল, কে মা রেখা? আয় ভেতরে আয়।

কথা একটা ছুঁড়ে দিলেও এখন কিন্তু রেখা দরজায় হেলান দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। বিয়ের সব ব্যবস্থা সমাপ্ত। সেদিন বিয়ের দিন। সকালে ঘুম ভাঙতেই রেখার মনে হল সারা পূর্বাকাশ যেন আগুনের মত জ্বলছে। রাত্রে যে অনেক কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। কি যে চিন্তা করেছে তাও মনে পড়ছে না।

সকাল হতে না হতেই ইন্দিরা, শীলা, গোপী রেখার তিন মাসতুতো বোন পৌঁছে গেল। বিয়ের দিনে রেখার সঙ্গে ওরা ঠাট্টা-তামাসা করতে এসেছে। কয়েক ঘণ্টা পরে রেখা লক্ষ্য করে বাড়ির সকলের চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। রেখা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা, তোমরা সব এত চুপচাপ কেন বল তো? কি হয়েছে মা?

রুক্মিণী মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তেমন কিছু হয়নি মা, এমনি।

—আমার দিব্যি, বল—কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

—কাল রাত্রে একটা খারাপ খবর পেলাম। তাই নিয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে রেখা জিজ্ঞেস করল, কি খারাপ খবর মা—বলনা।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রুক্মিণী বলল, রাত্রে তোর বাবার কাছে হরিরাম এসেছিল লক্ষ্য করেছিলি? ভদ্রলোক তোর জেঠাইমার আত্মীয়। ... বলল, চন্দন নাকি মাসে খুব জোর আশি টাকা রোজগার করে। বাড়ির অবস্থা এত খারাপ যে মাঝে মাঝে বড় বউ দুবেলা ঠিক মত খেতে পায় না বলে বাপের বাড়ি চলে যায়।

রেখা কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ চঞ্চল বালিকার মত বলে উঠল, এটা এমন কি খবর যে বাড়ির সবাই মুখ ভার করে বসে রয়েছো!

মেয়ের সহজ সরল কথা শুনে রুক্মিণী বলল, আমি যে তোকে ফুলের মত যত্ন করে এতবড় করেছি—এসব জেনে-শুনে কি করে আমি তোকে ওদের হাতে তুলে দেবো? এ বিয়েতে আমি যে গোড়াতেই গররাজি হয়েছিলাম।

রেখা চমকে উঠল। বাবা তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোপালদাসের ঘরে ঢোকার সময়েই কানে গেল বউয়ের শেষ কথা। বউকে বলল, হ্যাঁরে পাগলি, ও-খবর পেয়েছি বলে কি আজ বিয়ের দিনে সব ভঙ্গ করব। পাকা কথা যেদিন দিয়েছি ধরে নিতে হবে সেইদিনই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাগ্যে যা আছে হবেই। তোমার বোঝা উচিত যে আমাদেরও বর্তমান অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। আর তাছাড়া বিনাপণে ওর চেয়েও ভাল পরিবারের পাত্র পাবে কোথায়?

রুক্মিণী কোন কথা বলেনি। মাথা হেঁট করে বসে মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটছিল।

।। দুই ।।

[illegible] দু-চার কথা পরেই [illegible], চল।

—না, আমি অন্য বিছানায় শোব। হাত ছাড়িয়ে নিল রেখা। চন্দন হেসে উঠে বলল, তুমি যে কত বড় অভাগিণী তাতো আর তুমি জান না। এ ঘরে অন্য বিছানা করার জায়গা কোথায়।

রেখা স্বামীর এই সহজ-সরল অথচ বাস্তব কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হল। শুধু কি তাই বান্ধবীদের কাছে ফুল-শয্যার রাত্রি সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে, তাই সে ভেবেছিল, স্বামী নিজেই তার হাত ধরে বিছানায় শোয়াবে। চুমোয়-চুমোয় তার গাল ভরে দেবে।

কিন্তু রেখার সে কল্পনা কল্পনাই রয়ে গেল। ওদের মধ্যে কত কথাই হল সেই রাত্রে। কথায় কথায় রেখা বলল, আমার মতে দাম্পত্য জীবনে গভীর প্রেম গড়ে তোলাই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

—আমার মতে কিন্তু দেশবাসীর সেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। অনেক রাত পর্যন্ত কথা—অর্দ্ধভাগুন ইত্যাদির পর কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়ল টের পায়নি।

সকালে ঘুম ভাঙতে রেখার মনে হল সে যেন সারা রাত দুঃস্বপ্ন দেখ-ছিল। গোটা শরীরে কেমন যেন একটা ব্যথা। জানলা খুলতেই সূর্যরশ্মি এসে পড়ল তাদের বিছানায়। ফুলশয্যায় তত ফুল নেই। রেখার চোখ পড়ল নোনাধরা দেয়ালের উপর। দরজা খুলতেই নজরে পড়ল কুড়ি বছরের একটি যুবতী রাশ করছে। ঘর থেকে রেখাকে বেরোতে দেখে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দোতলায় বসল। দুজনের হাসিতেই যেন দুষ্টুমির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কমলা ভাবছে, আমার জীবনে কি এদিন আসবে না? আর রেখা ভাবছে, জগতের লোক গতরাত্রিকে একবারে ভুলে যাক। আমি যে বিবাহিত সেই স্মৃতি সকলের মন থেকে মুছে যাক। আমি ফিরে যাই আমার বাপের বাড়িতে। কিন্তু দুজনেই অসমর্থ। কমলার বাবা গরীব, আর রেখার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

দিন তিনেকের মধ্যেই রেখা এবং কমলার মধ্যে ভালবাসা গভীরতর হল। উভয়েরই অসহায় ভাবকে ভুলে থাকার যেন এ-একটি মাধ্যম, চতুর্থ দিন কমলা রেখার কাছে এসে বলল, পিসি, আজ হয়ত আমাকে দাদা নিতে যেতে আসবে। সত্যি সত্যি সেদিন কমলা চলে গেল। ও-বাড়ির বড় বউ দুপুরে ঝগড়াঝাটি করে বাপের বাড়ি চলে গেল। ঘটনা তেমন কিছু নয় তবু একটি অজুহাতে ঝগড়া বেধে গেল। রেখার শাশুড়ী গম রোদে দিয়ে নিজে রোদে বসেছিল, বৃদ্ধা রোদ পোহাচ্ছিল।

সর্দি হয়নি অথচ গোলাপের বউ ছেলেকে গরম জলে স্নান করাচ্ছিল। হঠাৎ কিছু জল ছিটকে পড়ল ঐ গমের উপর। গোলাপের মা বলল, দেবী, একটু সরে গিয়ে বাচ্চাকে স্নান করাও। বাচ্চার তো আর সর্দি-কাশি হয়নি যে গরম জলে স্নান করাতে হবে!

—তাতো বুঝি মা। সর্দি তো আপনারও হয়নি, তবু তো রোদে বসে আছেন দেখছি। বাচ্চাদের তো একটু সর্দি ভাব থাকেই।

ঠিক সেই সময় রেখা ঝকঝকে নতুন শাড়ি পরে সেজেগুজে আঙিনায় এসে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াল। দেবী এমনিতেই, তেলে-বেগুনে চটে গেছে। রেখা যে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তা সে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ সব জল একরকম ছুঁড়ে ফেলার মত বাচ্চার গায়ে ঢেলে দিল। বেশ কিছু জলের ছিটা রেখার শাড়ীর উপর পড়ল। যে বাড়িতে মাত্র তিন দিন হল সে এসেছে সেখানে আর কিইবা বলবে! তবে মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। বড় বউয়ের কাণ্ড দেখে শাশুড়ী চটে গেলেও রাগ প্রকাশ করল না। রেখার প্রণাম করার পর বলল, এসো মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ওখানে কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না—যাবে আর আসবে কিন্তু।

রেখা মাথা নেড়ে চলে গেল। বৃদ্ধা তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বলল, বেচারি কত বিনয়ী, অমন ঝকঝকে নতুন শাড়িতে জল পড়ে একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তবু বেচারী মুখ ফুটে একটু কথা বলল না।

বড় বউয়ের রাগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। গত তিন-চারদিন ধরে সমানে শাশুড়ীর মুখে ছোট বউয়ের রূপের প্রশংসা শুনে আসছে। কথায় কথায় তার সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্যের তুলনা করছে। আর থাকতে না পেরে বলল, অত কে বলছে মা, ও সব ছোটখাটো ব্যাপারে কি আর কেউ ঝগড়া করে!

বৃদ্ধা ওর মনোভাব বুঝে বলল, আমি তো তোমাকে বলিনি বউমা—আর যদি বলেই থাকি তাহলে দোষ কিসের! বেচারীর বেরানোর মুখে শাড়ি খারাপ হয়ে গেল আর কিছু বলবে না! দুঃখ তো তার হবেই।

দেবী প্রত্যেকটি শব্দে জোর দিয়ে দিয়ে বলল, তাতো বটেই মা। তবে আমার কথা হোল, যে বউ বাপের বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে আসে তারই দুঃখ করা সাজে, যে কিছুই আনে না, সে আবার কি নিয়ে দুঃখ করবে!
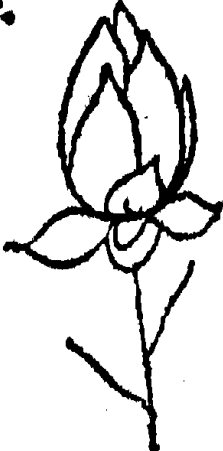
—লেনদেনের ব্যাপারে তোমার অত মাথা ঘামানোর কি দরকার! ভগবান আমার চন্দনের ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছে তাই হবে।

দেবী ঈর্ষায় যেন জ্বলে উঠে বলল, তাতো বটেই। আমার মুখ দেখার সঙ্গে

"দেশবাসীর সেবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত"

সংসারই তো অনেকেরই ভাগ্য বিগড়ে যায়। আমি তো এমনিতেই বাপের বাড়ি থেকে আসতে চাইছিলাম না। আমি তো আপনাকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছি। তবু তো আমার বাপের বাড়ি গিয়ে খোসামোদ করেছেন অন্ততঃ এই বিয়েতে খাটা-খাটুনির জন্য যাতে আসি। এখন যখন বিয়ে হয়েই গেছে তখন কি আমাকে এবাড়িতে থাকতে দেবেন! মা আমাকে ঠিকই বলেছিল।......চল সুন্দর, জামা-কাপড় পরে নে—তোর দিদিমার বাড়িতে যাব।

সন্ধ্যার সময় রেখা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে দেবী নেই। চলে গেছে বাপের বাড়ি। চন্দন উনুনে হাত গরম করতে করতে বলল, মা বৌদি এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন?

মা সব ঘটনা জানাল। শেষে ক্ষোভের সংগে বলল, না জানি কোত্থেকে এই রাক্ষুসী গোলাপের ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে।

—দাদার তো এই বউদির প্রয়োজন ছিল না, দরকার ছিল পাঁচ হাজার টাকার।

—দেখ খোকা, ওভাবে টাকা জোগাড় না করলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে পারত না। আর তা না করলে আজকে যত টাকা সে রোজগার করছে তা আর হয়ে উঠত না। অনেক ভেবে-চিন্তেই এই পোড়াকাটকে বিয়ে করেছে। যাই হোক আজও তো তোর বউদির বাপের বাড়ি থেকে কিছু না কিছু জিনিস আসে।

রেখা ওদের পরিবেশন করতে করতে এই সব কথা শুনে মনে মনে ভাবল: গোলাপ অর্থাৎ তার ভাসুর নিশ্চয়ই খুব একটা ভালোমানুষ নয়। যে টাকার জন্যই বিয়ে করে সে আর যাই হোক ভাল লোক নয়। কিন্তু তার ছবির দিকে তাকালে তো মনে হয় না যে লোকটা খারাপ। সুন্দর হাসিভরা মুখ। রেখার কাছে গোলাপের ছবি ভালই লাগল।

চন্দন বলে উঠল, মা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখছি তুমি ঘরের সব কথা বলে দিলে—এ সব শুনে কি হবে আমার!

—সাংসারিক ব্যাপারে এখনো যদি মন না দিস চলবে কি করে! যাতে সংসারী হোস, বাড়িতে যাতে তোর মন বসে সেই জন্যেই তো বিয়ে দিয়েছি।

চন্দন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাতো আমি জানতাম না মা, আমার জীবনধারা বদলানোর জন্যে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছো জানতে পারলে আমি বিয়েই করতাম না। যাক তবু বলছি, সংসারের কাজে আমাকে জড়াতে পারবে না। অবশ্য আগন্তুককে জড়াতে পার।

রেখা তার কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে এগোচ্ছে। তার ছায়া তার সামনে থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

খেতে বসে রেখা ভাবছে, মাত্র এই তিনদিনে তার জীবনে কত বড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে—এ-বাড়ি আর ও-বাড়ির মধ্যে কতবড় একটা পার্থক্য। ও-বাড়ির উচ্চ শিখর থেকে নীচে দ্রুত-গতিতে পড়ে যাচ্ছে, আর এ-বাড়ির লোক স্বপ্ন দেখছে উপরে ওঠার। স্বপ্ন তো আমার বাড়ির লোকও [illegible] দেখেছে। কিন্তু এদের আর ওদের স্বপ্ন দেখার মধ্যেই যেন বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে। শাশুড়ী ভাবছে, তার প্রত্যেকটি ছেলে বড় বড় চাকরি করবে, মোটা মাইনে আনবে, বাড়িতে চাকর-চাকরাণী থাকবে। থালা-বাসন হবে রূপোর। সুন্দর কাজ-করা চীনামাটির পাত্র থাকবে চায়ের সেট।

—চন্দন, আর আমাদের বাবা এখানে থাকা চলবে না—চারদিকের যা অবস্থা দেখছি তাতে প্রতি মুহূর্তে ভয় করছে আমার।

চন্দনকে অন্যমনস্ক দেখে মা আবার বলল, তোর জন্য এমন ফুলের মত সুন্দর বউ এনেছি, তবু তোর মন কোথায় যে পড়ে থাকে, কি যে ভাবিস, বুঝি না বাবা।

চন্দন রেখার মুখের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই রেখা কেমন যেন সলজ্জ হয়ে উঠল। চন্দন বলল, মা সুগন্ধহীন সুন্দর ফুল পেয়ে কি লাভ! কতটুকু আনন্দ পাব সে ফুল পেয়ে।...... যাক সে কথা। শোন মা, এদেশ ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। এখানে আর যাই হোক আশি টাকা মাইনের একটি চাকরি রয়েছে, আর আমাদের নিজস্ব একটি বাড়ি রয়েছে। এসব ছেড়ে-ছুড়ে চলে গেলে আর পাব কোথায়।

মা কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আর্থিক স্বাচ্ছলতার কথা মনে পড়তেই থেমে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে যে যার ঘরে চলে গেল। রেখা শাশুড়ীর পা টিপতে বসল। ঘুম পেলে উঠে গেল। সকালে চন্দন চাকরিতে বেরিয়ে যায়। সারাদিন ঘরে থাকে রেখা, তার শাশুড়ী এবং দুই ছোট দেবরের সংগে। ওদের নাম গোপ এবং শ্যাম। সারাদিন ওরা বউদির সংগে খেলাধুলো করতে ভালবাসে। আর রেখাও তাদের সংগে খাপ খাইয়ে নেয়।

আজকাল বাড়ির সব কাজ রেখা নিজেই করে। গোড়ার দিকে তার রূপ-লাবণ্যের যে প্রশংসা হত, কদিন যেতে না যেতেই কমে গেল। সে আদরও নেই আর। ঘরের কোথায় কি আছে সমস্ত তার নখ-দর্পণে। প্রায় সারাদিন কাজ-কর্মের মধ্যেই তাকে লিপ্ত থাকতে হয়।

একদিন রাত্রে পা টেপাতে-টেপাতে শাশুড়ী বলল, বুঝলে ছোট বউ, ঐ গান্ধুদের বাড়িতে থালা-বাসনও ছিল না, কিন্তু ও-বাড়ির বউগুলো বাপের বাড়ি থেকে থালা-বাসন থেকে শুরু করে বাক্স-প্যাঁটরা আর খাট-পালঙ্ক এত এনেছে যে ঘর ভরে গেছে।

রেখা পা টিপতে টিপতে ও সব কথা শোনে আর হাসে। ইচ্ছে জাগে শাশুড়ীকে বলার, গান্ধুর মা তো আর আমার মত সুন্দরী বউ পায়নি। পুনরুক্ত ভাবে এঁর কাছে ও সব কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রেখা মাথা নীচু করে কোন কথা না বলে পা টিপছে।

—বউমা, হঠাৎ তুমি মুখ ভার করে বসে আছ কেন, আমি তো তোমাকে কটাক্ষ করে বলিনি। রেখা বাইরে একটু হাসল, কিন্তু ভেতরটা তার কেঁদে উঠছে।

—তাহলে আর এ কথা পাড়লেন কেন মা! মোক্ষম একটা জবাব দিতে পেরে রেখা মনে মনে হাসল।

—তুমি দেখছি বেশ সেয়ানা মেয়ে! বেশ তো তাই যদি বলে থাকি, তাহলে কি ভুল বলেছি। ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে এত বড় যে করলাম তা তো আর ওমনি-ওমনি নয়! ছেলে তো আর আমার পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া নয়।

শাশুড়ীর ব্যঙ্গাত্মক কথা শুনে রেখা থ' বনে গেল।

পরের দিন রেখার বাপের বাড়ি থেকে অনেক খাওয়ার জিনিস এল। রেখার শাশুড়ী যা বাদ পড়েছে তাই

নিয়ে গজর-গজর করল। কিন্তু চন্দন ও সব সম্পর্কে মন্তব্য করা অশালীন মনে করল।

॥ তিন ॥

গোধূলি বেলা। আবির ছড়ানো। মাঙ্গুরেমান্টগা বস্তির অদূরে সারি সারি নারকেল গাছ। তার গা ঘেঁষে বড় রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রতীরে এক বড় পাথরের উপর বসে রেখা ভাবছে, কতদিন পরে এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসার অবকাশ পেয়েছে। আজ তার খুব ইচ্ছে করছে অস্তমান সূর্যের লীলাখেলা দেখার।

দেশ ছেড়ে আসার পর থেকে সে এতখানি সুযোগ পায়নি। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর মাটুংগাতে যে ছোট্ট ছোট্ট ঘরদুটি পাওয়া গেল তার নেই কোন রান্নাঘর, নেই [illegible]। যে রেখা হায়দ্রাবাদের বিরাট বাড়িতে এত বড় হয়েছে সে এত ছোট ঘরের কল্পনাই করতে পারে না। অনেকক্ষণ সে পাথরের উপর বসে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। হন্তদন্ত হয়ে চন্দন এসে গেল, এ কি, তুমি শেষে এখানে এসেছো? তোমাকে বেড়াতে কেউ বারণ করেনি। কিন্তু না বলে এলে কেন? আমরা কখন থেকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।

রেখা কোন জবাব না দিয়ে নীরবে [illegible] অনুসরণ করল। ঘরে পা দিতেই শাশুড়ী গর্জে উঠল, বলি ঘর কি তোমায় কামড়াচ্ছে। যত বাইরে বেরোনোর সখ হল।

আঁচল ঠিক করে নিয়ে রেখা বলল, মা আজ মন বসছিল না ঘরে, তাই একটু বেরিয়েছিলাম।

—মেয়ের কথা শোন। ঘরে নাকি মন বসে না। মন কি তাহলে পাথরের উপর বসে বৌমা! আমরা এখানে সেই কখন থেকে গরু-খোঁজা খুঁজছি। শেষে শ্যাম আর গোপ বলল ওদের ঘুড়ি উড়াতে বলে তুমি নাকি পাথরের উপর বসেছিলে।

রেখা আর ওখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পারল না। বিয়ের পর নিজেকে এতখানি পরাধীন তার কোন দিন মনে হয়নি। চন্দন কোন এক বন্ধুর সঙ্গে কাজ আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল। রেখাকে ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে দেখে শাশুড়ী বলল, হায় হায়, একি! আমি এমন কি বলেছি যে, অত কান্নাকাটি করছ! আজকালকার বউদের দেখছি একটা কথা বলার জো নেই।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রেখা জেগেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত তার মায়ের কথাগুলো কানে [illegible] [illegible] [illegible] ভার। কি

একটা কথা বলেছি তাই নিয়ে একেবারে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। আর স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কান্না কোথায় চলে গেল।

এব্যাপারে চন্দন যত ভাবে ততই তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। চন্দন ভাবে, আসলে বউ আমার কি চায়। বোম্বাইয়ের জীবন যে কত কঠিন তা কি সে টের পাচ্ছে না। মাথা গোঁজার জায়গা এখানে পাওয়া ভার। এই খুপরি দুটোর জন্যেই দেড় হাজার টাকা সেলামী দিতে হয়েছে। কত কাণ্ড করেও তো নসর-বাগিও মিলে একটা সাধারণ কেরানীর চাকরি পেয়েছি। জীবনের এসব বাস্তব দিকগুলো কি রেখার নজরে পড়ে না।

পারিবারিক ব্যাপারে বেশিক্ষণ চিন্তা করার অবকাশ চন্দনের নেই। বোম্বাইয়ের সংঘর্ষময় জীবন এবং জীবিকার বিষয়ে তার রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক চিন্তাধারার আলোকে বিচার করার চেষ্টা করছে।

মাস-কয়েকের মধ্যে মিলের অনেকের সঙ্গে তার পরিচিতি ঘটে। অল্পদিনের মধ্যেই সে জনপ্রিয় হয় এবং কর্মচারী সমিতির সহ-সম্পাদক পদ পায়। তারই উদ্যোগে একটি পাঠচক্র গঠিত হয়েছে। ইদানীং সেখানে আলোচনা চলেছে নানা-ধরণের। সবারই খুব উৎসাহ।

গভীর রাত্রে রেখার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকে জেগে উঠতে দেখে বলল,
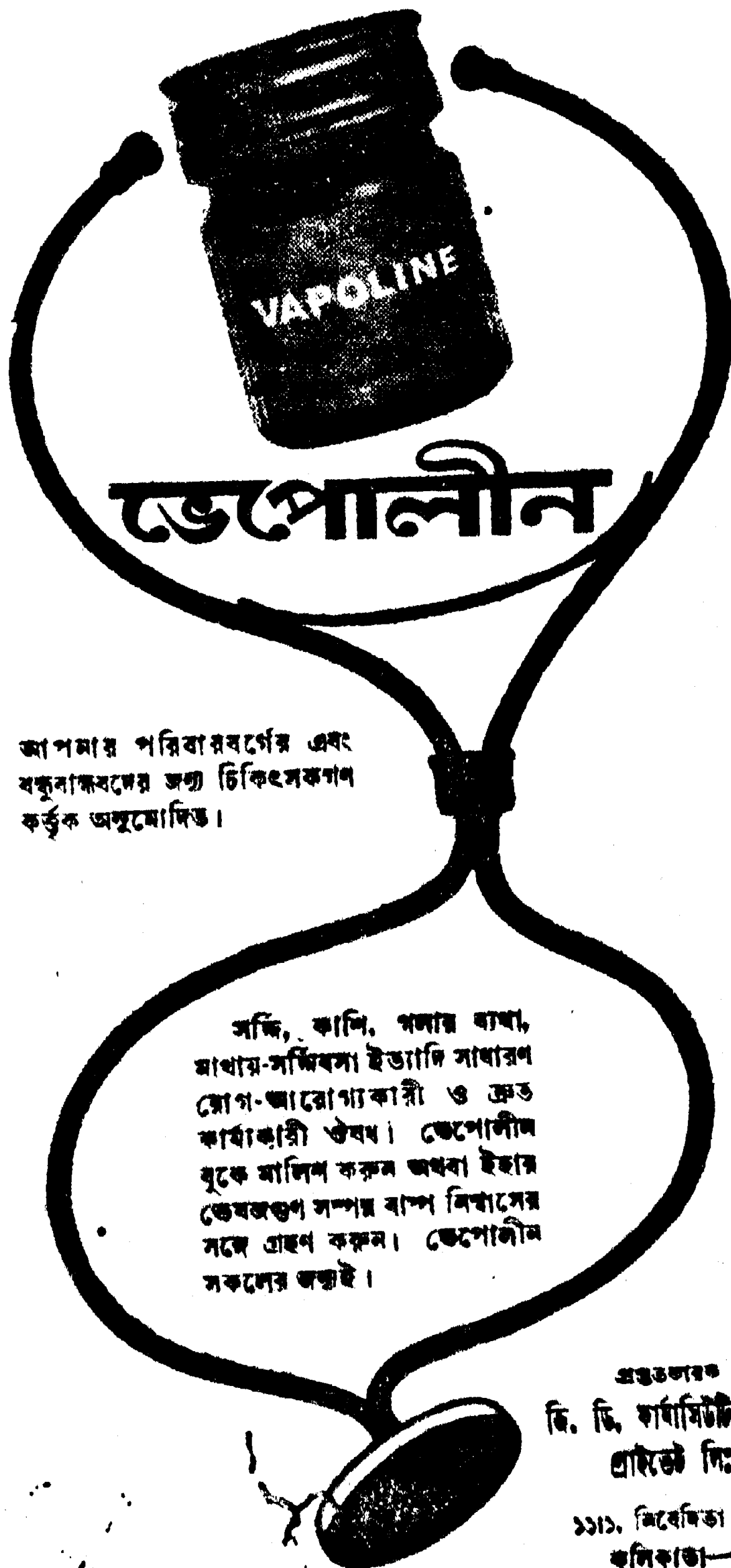
আমি বন্ধুর বাড়ি চলে যাওয়ার পর তুমি অত কাঁদছিলে কেন?

রেখা কোন জবাব দেয়নি।

তোমার হয়ত এখানে বিশ্রী লাগছে। বিশ্রাম পাচ্ছ না। সুন্দর সুন্দর শাড়িও তোমাকে দিতে পারছি না।

রেখা তীব্রদৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল।

যে চন্দন স্কুল-কলেজে বিতর্কসভায় প্রথম হ'ত, যার ভাষণ হাজার মানুষ মুগ্ধ হয়ে শোনে তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল স্ত্রীর সেই চাউনি।

রেখা পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে কাঁদছে আর ভাবছে, কে চেয়েছে অত সুন্দর সুন্দর শাড়ি—আমি তো তা চাইনি। স্বামী তো সময় পায় না ঘরে বেশিক্ষণ থাকার। রাজ্যের মরাঠী এবং গুজরাতীদের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। ওদের সঙ্গেই যেন তার যত কথা। রেখার মনে পড়ল প্রতিবেশিনী রাধার কথা। সে বলেছিল, তোমার স্বামীটি কেমন যেন। প্রায়ই দেখি মরাঠীদের মত প্যান্ট জামার সঙ্গে একটা চটি জুতো পরেন, আর কাঁধে একটি ব্যাগ আর সেই ব্যাগে রাজ্যের বইপত্তর।

রেখা কোন জবাব দেয়নি। রাধা লক্ষ্য করেছে রেখার সেই উদাস বিষণ্ণ ভাব। আমার কথা কি খারাপ লাগছে ভাই? যাই বলো লোকটা কিন্তু খুব সাদা-সিদে। আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক ভাল। আর যাই হোক, তোমার স্বামীর কাছ থেকে তো আর একথা শুনতে হয় না, শ্বশুরবাড়ি থেকে এটা দিল না ওটা দিল না...যাই বলো ভাই, আজকালকার নজর সব শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ওপর। ঘরে কানাকড়ি থাকুক আর না থাকুক ছেলের নাম কিন্তু হবে ধনপতি! রাধার কথায় একটু সান্ত্বনা পেয়েছিল রেখা। সমুদ্রের তীরভূমিতে বসে মাঝে মাঝে সে এই ধরণের সান্ত্বনাই পায়। রেখা ভাবে, এইভাবেই কি তাকে গোটা জীবন কাটাতে হবে? তার জীবনে কি নতুনত্বের আর কোন আভাস থাকবে না? অনেকক্ষণ ধরে তার মনের আকাশে হাজার প্রশ্নের পাখিগুলো উড়ছিল।

শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লো রেখা। সকালে ঘুম ভাঙল অনেক দেরীতে। কাছের মন্দিরের ঘন্টা বাজছে...মনে পড়ে গেল বাপের বাড়ির কথা। বাড়িতে এই সময় প্রত্যেক দিন গীতাপাঠ হত। পাশের ঘরে দেখে চন্দন আর একজন যুবক খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। মুখ ধুয়ে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, নিজেকে বড্ড ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চন্দন বলল, মা হীরের জন্যও এক কাপ চা হবে।

রেখা চা আনতে গেলে শাশুড়ী বলল, মহারাণীর এতক্ষণে ঘুম ভাঙল। বলি চোখ খুলে একটু দেখেছ, কত বেলা হয়েছে।

রেখা সংকোচে মাথা নিচু করে চায়ের কাপ তুলে চলে গেল। হীরের সামনে চায়ের কাপটা রাখার সময় তার মনে হল হীরের দুই সকৃতজ্ঞ চোখ যেন তার দিকে নিবদ্ধ। যুবকটির যাওয়ার সময় রেখা লক্ষ্য করল তার হাঁটা মন্দ দেখাচ্ছে না। কিন্তু পায়ে পরানো চটি জুতো। রেখা মনে মনে হেসে ফেলল। যতই হোক কার বন্ধু দেখতে হবে তো।

।। চার ।।

গোলাপের মায়ের মুখ আজকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরটাও নতুন দেখাচ্ছে। ভাল ভাল খাওয়ার ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে ঘরে, রান্নার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে। উপলক্ষ্য গোলাপের আগমন। রেখা ভাবছে, ভাশুরের স্বভাব কেমন হবে। তার কাছে কি ওর হাতের রান্না ভাল লাগবে। আর রান্না ভাল হলে তারিফ করবে।

তিনটে নতুন ট্রাঙ্ক, একটি রেডিও-সেট, ছ-সাতটা ছোট ছোট বাক্স ট্যাক্সি থেকে নামল। গোলাপের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। রেখা জানালা দিয়ে দেখে নিল একবার ভাশুরকে। গোলাপের দৃষ্টিও তার দিকে পড়াতে সে তাড়া-তাড়ি সরে গেল সেখান থেকে। শ্যাম এবং গোপ হাততালি দিয়ে চীৎকার করে বলছে, মা, দাদা এসে গেছে দাদা এসে গেছে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলের মাথায় হাত বুলোল। পরক্ষণে কাঁপা গলায় বলল, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকত...রেখাকে ইসারায় কাছে ডেকে বলল, গোলাপ এই হোল আমাদের ছোট বউ।

রেখা মাথা নোয়াল।

—গোলাপ, চন্দনের ভাগ্যে সুন্দর বউ জোটেনি? গোলাপের মা এমন ভাবে বলল যেন তারই হাতে তৈরি সুন্দর পুতুল রেখা। আড়চোখে রেখা লক্ষ্য করল ভাশুর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। রেখা এখন নিঃসংকোচে গোলাপের সামনে যাতায়াত করছে। গোলাপের কাপড় জামা আলনায় গুছিয়ে রাখছে, তার জুতো ব্রাশ করে দিচ্ছে, তার রুমাল কেচে দিচ্ছে। রেখা ভাবে, রুমাল কত সুগন্ধ... আমার স্বামী যদি এরকম আতর ব্যবহার করত বেশ হত...

—রেখা, এখানে কি করছ...এক কাজ কর তো, কালকের মত বেশ গরম রুটি কতগুলো বানাও তো।

গোলাপ বিলেত থেকে রেডিও এনেছে। তার আসার পর প্রত্যেকটি জানলায় রেশমি-পর্দা ঝুলানো হয়েছে।

—বুঝলি গোলাপ, রেডিও এনে খুব ভাল কাজ করেছিস...আমিও ভাবছিলাম কবে আমাদের ঘরে বসে রেডিওর গান শুনতে পাব। আমাদের ছোট বউমা তো বাথরুমে বসে খুব গান গাইত। আমিই একদিন বারণ করে দিয়েছিলাম।

—তাই নাকি, রেখা গান গাইতে পারে? রেখা শোন, আজ কিন্তু তোমাকে গান শোনাতেই হবে।

রেখার মন নেচে উঠল। মাথা নিচু করে ফিক্ করে হেসে ফেলল সে।

—শুধু হাসলে চলবে না, এক্ষুনি গান শোনাতে হবে।

—না বাবা, ওসব আমি পছন্দ করি না। তোমার কাকিমা আমার চেয়ে কত ছোট। তবু তার বউমারা তাকে অনেক ভয় করে চলে।

রাত্রে শ্যাম-গোপ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। রেখা শাশুড়ী এবং ভাশুরকে খেতে দিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটি ফিল্মী পত্রিকা দেখছিল।

—বুঝলে মা, যার ভাগ্যে সুন্দরী বউ জোটে সেই সত্যিকারের ভাগ্যবান।

—তোর ভাগ্যেও যে সুন্দরী বউ জুটেছিল না তা তো নয়। তুই তো নিজেই কনেপক্ষের লোকদের বলেছিলি, মেয়ে যাই হোক টাকা কিন্তু বেশি চাই।

—মা। ওরকম সময় দু'নৌকোয় পা রাখা কি আমার উচিত হত, [illegible] অবস্থা তখন কি ছিল ভেবে দেখ। আর আজ কতগুণ বেশি টাকা নিয়ে এসেছি। আর একবার বিলেত ঘুরে আসতে পারলে তুমি সোনার থালায় খেতে পারবে।

রেখা ঠিক সেই সময় জলের গ্লাস রাখতে রাখতে ভাশুরের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। তার মনে হল শুধুমাত্র টাকার জন্য একজন প্রেমিক তার প্রেম বিক্রী করছে। বেচারীর ভাগ্যে যদি একটি সুন্দরী গুণবতী বউ জুটতো, জীবনে কোন আক্ষেপ থাকত না।

পরমুহূর্তেই শাশুড়ী বউমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরগলায় বলল, তা কি করে বলো বাবা। সম্পত্তি না-আনা সুন্দরী বউকে ঘরে এনেও তো দেখছি কি সুখ পাচ্ছে। স্বামীকে তো সারা-দিন খেটে মরতে হচ্ছে কারখানায়। শুধু সুন্দরী পেলেই তো আর হয় না।

শাশুড়ীর কথাগুলো রেখার মনে বিঁধছিল। কিন্তু ওদের কথার মধ্যে নাক গলানো উচিত মনে করল না সে। আর সেখানে থাকতে না পেরে মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অথ প্যারিস-কথা

দিলীপ মালাকার

প্যারিস। প্যারিস নগরীকে কখনো কখনো সংস্কৃতির তীর্থস্থান বলে বর্ণনা করা হয়। কথাটা যে সত্য তা বোঝা যাবে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এলে। প্যারিস শুধু ফ্রান্সের রাজধানী নয়, সংস্কৃতিবান ও চিন্তাশীলদের রাজধানী। এর এক এক রাস্তায় এক এক রকমের বৈশিষ্ট তেমনি সাংস্কৃতিক জীবন। প্যারিসের 'রিভ্ গোশ্' বা সেইন নদীর বাম তীরে ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পুস্তক-প্রকাশক বিক্রেতা, লেখকদের আড্ডাখানা চিত্রশিল্পীদের আস্তানা সবই এই অঞ্চলে। এমনি একটি অঞ্চল সাঁ জারমা দে প্রে' হল চিন্তাশীল চিত্রকরদের পাড়া। এখানকার চায়ের দোকানে বসে লেখক শিল্পীদের আড্ডা। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই লেখক বা শিল্পী নন। ছাত্র এবং অনেক গুণমুগ্ধরা আসে দলে দলে। এই অঞ্চলে ছেলে ও মেয়েদের পোষাক দেখবার মতন। কেউ চুল ছেঁটেছে ছোট করে, কেউ রেখেছে বিরাট বাবরি চুল। মেয়েরা এখানে রংচং মাখেনা বটে তবে পোষাকে দেখা যাবে অদ্ভুত ভাব। এই রহস্যময় অঞ্চলে সুরু হয়েছে চঞ্চলতা। মাসখানেক ধরে সুরু হয়েছে সাহিত্যের ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ। কত হাজার রকমের যে পুরস্কার থাকতে পারে তার হিসেব নিতে করতে গেলে সন্ধে হয়ে যাবে। আর পুরস্কার যারা দেয় সেইসব প্রতিষ্ঠানের কথা না বলাই ভাল। সব প্রতিষ্ঠান কিন্তু বিজ্ঞ মহলের নয়। 'সাঁ জারমা দে প্রে'র দুই কাফে যথাক্রমে 'কাফে দো মাগো' ও 'কাফে ফ্লোর'ও প্রতি বছরে তাদের নির্বাচিত দুই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকে দিয়ে থাকে দুই হাজার টাকার পুরস্কার। চায়ের দোকানও সাহিত্যের পুরস্কার বিতরণ যখন করে তখন ফরাসী সরকার, জেলার শাসনকর্তা, বিভিন্ন শহরের পৌর-প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, পুস্তক প্রকাশকের দল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কথা হিসেবের মধ্যে না আনাই ভাল। অধিকাংশ পুরস্কারের টাকার অংক হাজার টাকা থেকে দশ-পনর হাজার টাকা পর্যন্ত। কিন্তু যেটি ফ্রান্সে সব চেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্য-পুরস্কার তার টাকার অংক কিন্তু পাঁচ শ টাকার নিচে। সেই পুরস্কারের নাম হল "গঁকুর" পুরস্কার। গঁকুর পুরস্কার ফ্রান্সের পয়লা নম্বরের ঔপন্যাসিকরাই পেয়ে থাকেন।

এ বছরের 'গঁকুর' পুরস্কার এনেছে যেমন উত্তেজনা তেমনি আশ্চর্য। কারণ এ বছরের গঁকুর পুরস্কার পেয়েছেন একজন মহিলা সাহিত্যিক এবং দ্বিতীয় পুরস্কার যার নাম হল 'রনোদা', এটিও পেয়েছেন আরেকটি মহিলা। গঁকুর পুরস্কার-এর ইতিহাসে এ হল অভিনব। এর আগে অর্থাৎ গত ষাট বছরে মাত্র চারজন মহিলা সাহিত্যিক গঁকুর পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৬২ সালের গঁকুর পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীমতী আন্না লাংফুস্ আর রনোদা পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী সিমন্ জাক্‌মার।

'সাঁ জারমা দে প্রে'-অঞ্চলের দৃশ্য

গ'কুর পুরস্কারের টাকার অংক মাত্র পাঁচশ টাকা। কিন্তু এই পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থকার তাঁর বই বিক্রি বাবদ রোজগার করবেন এক থেকে দেড় লাখ টাকা। গ'কুর পুরস্কার প্রাপ্ত বই কম করে বিক্রি হবে কয়েক মাসের মধ্যে লাখ পাঁচেক। তারপর সেই বই হবে সিনেমায় রূপান্তরিত, হবে অনুদিত বিভিন্ন ভাষায়। এই সব থেকে লেখকের আয় বাড়তেই থাকবে।

গ'কুর পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখিকা শ্রীমতী আন্না লাংফুস্ হলেন জাতে পোলিশ। জন্ম হয় পোল্যাণ্ডে ১৯২০ সালে। যুদ্ধের পরেই তিনি ফ্রান্সে চলে আসেন উদ্বাস্তু হয়ে। যখন তিনি প্যারিসে এলেন তখন তিনি ভালভাবে ফরাসী বলতে পারতেন না। এক ইস্কুলে অংকের মাস্টারি করতেন। তিনি তখন ফরাসী ভাষা শিখছেন। তাঁর ক্লাশের ছাত্ররা তাঁর ফরাসী শুধরে দিত। এইভাবে চলে ফরাসী সাহিত্যের আরাধনা। কয়েক বছর পরে তাঁর দুটো উপন্যাস বাজারে বেরোয়। যে উপন্যাসটি এবারকার গ'কুর পুরস্কার পেয়েছে সেটির নাম হল, 'লে বাগাজ্ দ্য সাব্‌ল' (বালির বস্তা)। এই উপন্যাসের আখ্যান বস্তু হল এইরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক মাস পর মারিয়া নামে এক যুবতী পোল্যাণ্ড ছেড়ে এসে প্যারিসে বসবাস করতে থাকে। মারিয়া প্যারিস ছেড়ে চলে যায় দক্ষিণ ফ্রান্সে। সেখানে এক বুড়োর প্রেমে পড়ে। বুড়োর সঙ্গে তার দিনগুলো কাটছিল সুখেই। একদিন সেই বুড়োর স্ত্রী এসে হাজির। বুড়ো তাকে বলে যে, স্নেহ ও ভালবাসাই সব নয়। এদিকে মারিয়া হারিয়েছে পোল্যাণ্ডে তার আত্মীয়স্বজন। সে তার কিশোরী দিনের কথা নিয়মিত ভাবতে লাগল। কিছু দিন পরে এলো তার জীবনে অবসাদ। এর পর সে ঠেকে শিখল যে, এই দুনিয়া অতি সহজ সরল নয়। বক্র তার পথ। সে ভেসে চলল নিষ্ঠুর দুনিয়ার জনস্রোতের মুখে। সেখানে সে হারিয়ে গেল।

শ্রীমতী আন্না লাংফুস

ফরাসী যার মাতৃভাষা নয়, অনেক সাধ্যসাধনা করে ভাষা শিখে, সেই ভাষায় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করা সোজা কথা নয়। তাই আন্না লাংফুস্ পেয়েছে অফুরন্ত প্রশংসা। দ্বিতীয় পুরস্কারটি রনোদা পুরস্কার বলে খ্যাত। এটি পেয়েছেন শ্রীমতী সিমন্ জাক্‌মার। সিমন্ জাক্‌মার বয়স এখন আটত্রিশ। গত দশ বছরে ইনি পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছেন। রনোদা পুরস্কার-প্রাপ্ত সিমন্ জাক্‌মারের উপন্যাস "ল্য ভেইয়র দ্য ন্যুই" (রাত্রির প্রহরী)র আখ্যানবস্তু হল এই, এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুরি করে এনে তাকে নিজের বাগানে কুয়া খনন করে সেখানে তাকে লুকিয়ে রাখে। অনেককাল পরে সে খবর জানা যায় বিচার চলা কালে।

নভেম্বর মাস ধরে চলেছে পুরস্কারের পালা। সে পালা চলবে ডিসেম্বর-জানুয়ারী ধরে। তবে বিখ্যাত ও সরকারী পুরস্কারগুলো বিতরিত হয়েছে নভেম্বর মাসে। তবে তিনটে জনপ্রিয় পুরস্কার যেমন, ফেমিনা, এ্যাঁতেরাইতে মেদিসি ইত্যাদি বিতরিত হবে শীঘ্রই।

সরকারী পুরস্কারগুলোর মধ্যে দুটি হল অন্যতম। প্রথমটি হল ফরাসী আকাদেমির উপন্যাসের ওপর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবার দেওয়া হয়েছে মঃ মিশেল মরকে। ঔপন্যাসিক মিশেল মর্ তাঁর উপন্যাস 'লা রুজ' মারিটিম' এর জন্য পেয়েছেন দশ হাজার টাকা পুরস্কার। দ্বিতীয়টি হল জাতীয় পুরস্কার। এ বছরের সাহিত্যের গুরু ন্যাশনাল পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যিক মঃ পিয়ের জ' জুভ্। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও কবি। তাঁর সর্বশেষ বই 'ল্য তম্ব দ্য বদলেয়র' (বদলেয়রের কবর) উল্লেখযোগ্য।

প্যারিস হল সেইন জেলার শহর। সেই সেইন জেলার আধাসরকারী সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন মঃ আরম' লানু। প্যারিস ও তার আশে পাশের অঞ্চল নিয়ে লেখার ওপর এই পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতি বছরে। পুরস্কারের টাকার অংক চার হাজার টাকা। প্যারিস পৌর-প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য-পুরস্কার এখনো বিতরিত হয়নি। হবে পরে। সেইন জেলার প্রতিবেশী সেইন এ ওয়াজ জেলা প্যারিসকে ঘিরেই। সেইন এ ওয়াজ জেলার সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন এ বছরে মঃ জর্জ মঁগ্রাদিয়ান্। মঃ মঁগ্রাদিয়ান সেইন এ ওয়াজ জেলার ইতিহাস লিখে প্রসিদ্ধ। এই পুরস্কারটিও চার হাজার টাকার।

সমালোচনা-সাহিত্যের ওপর অনেকগুলো পুরস্কার বিতরিত হয় প্রতি

মোমার্ত অঞ্চলের পথের ধারে একমনে শিল্পী এ'কে চলেছেন

বছর। এ বছরের সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী সুজান্ ব্ল'-বেরার তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থ 'ল্যা জনেস্ দা রোম' দ্য বালজাক্'। বালজাক-সাহিত্যের সমালোচনা লিখে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন।

আকাদেমি এ্যাঁতরনাশিওনাল দে এসপারেসিস্ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরস্কার অর্পণ করেছে। তার সংখ্যা গোটা পাঁচেক। এক সাহিত্যের ওপরই পেয়েছেন পাঁচজন ফরাসী সাহিত্যিক।

দশ হাজার টাকার 'প্রি দেকুভ্যার' এক মাসের মধ্যে দেওয়া হবে বিজ্ঞানের ওপর লেখা শ্রেষ্ঠ বইএর লেখককে। এই পুরস্কার দিচ্ছে প্যারিসের সাংবাদিক সংঘ।

ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি থেকে এ বছরে অনেকগুলো পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পঁয়ষট্টি হাজার টাকার ফোঁদাশিয় শার্ল লেওপোল্ড মায়ার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মঃ মোনো ও মঃ জ্যাকবকে। এরা দুজনে প্রাণী-বিজ্ঞানী।

বিশ হাজার টাকা করে তিনটি কোনাক্-জে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পরমাণু বিজ্ঞানী মঃ ব্লুশার, মঃ গ্রেগোরি, মঃ পিরুকে। চারটি পনোর হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে চার বিজ্ঞানীকে, মঃ আরমনতেরো, মঃ আস্তিয়ের, মঃ লাগারিক্ এবং মঃ মুলারকে।

প্রাণী বিজ্ঞানের বিখ্যাত পেলমান পুরস্কার লাভ করেন মিউজিয়ম অব ন্যাচরাল হিস্‌ট্রির গবেষক মঃ পিয়ের দুজে। এই পুরস্কার বিশেষ সম্মানীয়। রাউল-দুত্রি পুরস্কার দেওয়া হয় পরমাণু বিজ্ঞানী মঃ রবার পোর্তকে। তিন হাজার টাকার চিকিৎসক-লেখক পুরস্কার দেওয়া হয় ডাক্তার শাভিরেকে তাঁর উপন্যাস 'লে পাশ' (পথযাত্রী)র জন্য। যে সব চিকিৎসক সাহিত্যচর্চা করেন তাঁদের ভিতর থেকে বেছে এই পুরস্কার প্রতি বছরে দেওয়া হয়ে থাকে।

শিশুসাহিত্যের জন্যে দেওয়া হবে, এক হাজার টাকার দুটো পুরস্কার। পেয়েছেন লাইনেল টেরি পর্বতারোহনের বই লিখে, আরেকজন মাদাম ইভন্ মেইনিয়ের পেয়েছেন বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখে। ব্যংগ-সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন মরিস দ্রুলং তার 'সেলেব্রেশান দ্য লার মিলিটেয়ার' এবং গাব্রিয়েল শেক তাঁর উপন্যাস 'ল্যা সুর-মুয়ে'র জন্য।

* * *

পশ্চিম জার্মাণীতে এখন যে বইটি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে সেটি কোনো উপন্যাস বা রহস্য রোমাঞ্চের বই নয়। জার্মাণীর পুরাকালের ইতিহাস নিয়ে বইটি লিখেছেন এক জার্মাণ সাংবাদিক মিঃ রুডলফ্ বার্টনার। বার্টনারের বইটির বিষয়বস্তু হল জার্মাণীতে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে জার্মাণীর জাতীয় ইতিহাস বর্ণনা। তাতে আছে সে যুগের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা। অর্থাৎ যীশুখৃষ্ট জন্মাবার বহু আগের ইতিহাস এতে স্থান পেয়েছে। পেয়েছে জার্মাণীর প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস।

রঙ-বেরঙ

।। সুর জগতের কথা ।।

হাঙ্গেরিয়ান সংগীতের সৃজনী কল্পনা ও অপূর্ব সুরমাধুর্যের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন ফ্রাঞ্জ লিজ্‌ট তাঁর রচনার মাধ্যমে। কিন্তু সেই হাল্কা, মধুর, আনন্দঘন অথচ করুণ সংগীতগুলি ফ্রাঞ্জ লেহার ও এমেরিথ কেলমানের সুরের যাদুতে হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

এমেরিথ কেলমানের আসল নাম ছিল ইমরে। ছোট একটি গ্রাম সিওফোকে তাঁর জন্ম হয় ১৮৮২ সালে। বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হ'ত আশি বছর। প্যারিসে ১৯৫৩ সালে তিনি মারা যান। অল্পবয়সেই তিনি সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পিয়ানোবাদক হবার বাসনা মনে জাগে। কিন্তু ডান হাত দুর্বল হওয়ায় সে বাসনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয় এবং কেলমান অন্য পেশার কথা চিন্তা করতে থাকেন। খানিকটা আইন অধ্যয়ন করে কোন ব্যবহারজীবীর অফিসে কেরানীর কাজ শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার সংগীতের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে এবং হাঙ্গেরীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংগীতের সমালোচনা লিখে জীবিকা অর্জন আরম্ভ করেন। তারপর ১৯০৮ সাল থেকে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি নিয়োজিত হয় হাল্কা সংগীত-রচনার মধ্যে। সেই সময়ে তাঁর রচিত গীতিনাট্য "অটাম ম্যানোভার" বা "হেমন্তের অভিযান" অভাবিত সাফল্য অর্জন করে। ভিয়েনায় অভিনীত হবার পর ইউরোপের সমস্ত অপেরা-হাউসে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় গীতিনাট্যটি। এরপর কেলমান বহু গীতিনাট্য রচনা করে ভিয়েনার সঙ্গে এতো বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন যে আসলে হাঙ্গেরিয়ান হলেও লোকে তাঁকে অস্ট্রিয়ার লোক বলেই ভাবতে শুরু করে।

তাঁর গীতিনাট্যের জনপ্রিয়তার মূলে সুরে লোকসঙ্গীতের প্রাধান্য। ১৯১৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত মঞ্চ তিনি জয় করেছিলেন ও লক্ষ লক্ষ মানুষের চিত্তে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর পাগলকরা সুরে তিনি চারদিকে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। তাঁর আকুলকরা সুরগুলিকে ঠিক সংগীত বলা চলে না কিন্তু তা' ছিল আধুনিক ছন্দে বাঁধা লোকসংগীত যা সেদিনের মানুষকে মোহিত করেছিল।

ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ তাঁর নিজস্ব ধারায় সংগীতের ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন অপেরা নেই যেখানে তাঁর স্বর প্রতিধ্বনি তোলেনি।

যুদ্ধ তাঁর সৃজনীশক্তিতে ছেদ আনে। প্রিয় ভিয়েনা ত্যাগ করে তিনি চলে যান প্যারিসে এবং সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিউইয়র্কে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। তার দুবছর বাদে ১৯৫৩ সালের ৩০শে অক্টোবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর শেষ গীতিনাট্য "আরিজোনা লেডী" আগের মত সাফল্য অর্জন করতে অসমর্থ হয়। সেজন্যে একজন সমালোচক বলেছিলেন, "কেলমান ভিয়েনাকে চায় আর ভিয়েনা চায় কেলমানকে।" জীবনে যে সুরের ঝড় তিনি বইয়েছিলেন, আজও তাই তাঁর স্মৃতিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে জাগরূক রেখেছে।

* * *

এই বছরে বেরষেখ ও সালৎজবুর্গের সংগীতানুষ্ঠানে বহু বিদেশী শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর কোন গায়ক বিদেশে বিশেষতঃ ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও নেদারল্যান্ডে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই মত-ভোটে যেসব মহিলা গায়িকাদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন মেলিণ্ডা মুজেৎ লি, এরনা বেরগের, ক্রিস্তা লুডভিক, ইরমগার্ড সিফ্রিড ও আনেলিজে রোথেনবেরগের এবং পুরুষ গায়কদের ক্রমিক নাম হচ্ছে, ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ, উলগাঙ্ক হিন্ডগাসেন, রুডলফ্ শোক, যোশেফ গ্রাইন্ডল, হাইঞ্জ হপ্পে ও বেন্নো কুশে।

এঁদের মধ্যে প্রথমজন ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ যেন গায়ক হবার জন্যেই জন্মেছিলেন। তাঁর জীবনে কখনও কোন বাধা আসেনি। অন্যেরা যখন সংগীত-শিক্ষার কঠোর সাধনায় রত, ডিয়েট্রিখ তখন পুরোদস্তুর সংগীত-পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি, তখনই বার্লিনের একজন নামজাদা পরিচালক তাঁকে পৌর-অপেরায় শিল্পী হিসেবে নিয়োগ করে প্রভূত সাফল্যলাভ করেন। এরপর তিনি যখনই মঞ্চে যে-কোন অভিনয় করেন তাতেই যশের অধিকারী হন। শিল্পের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে অভিনয় করায় তাঁর অভিনয় ও গানে একটি সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও মহত্ব ঘিরে থাকে। স্বর ও অভিব্যক্তিতে সংগীত ও নাটকের মধ্যে যেন প্রাণসঞ্চার করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এমন কোন অপেরা নেই, যেখানে তাঁর স্বরের প্রতিধ্বনি জাগেনি, এমন কোন আন্তর্জাতিক শ্রোতা নেই যিনি তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন নি। বড় বড় গীতিনাট্যে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও, ডিয়েট্রিখ জার্মানীর সংগীতধারার প্রতি আজও অনুরক্ত। তাঁর মতে এ যুগেও সেই সংগীতধারা অচল নয়। সেকালের সেইসব সংগীতকে আজকের দিনে কেউ যদি সুর দিতে পারে এবং তার উপযুক্ত শিল্পী ও আধুনিক ভাষ্যকার যদি কেউ থাকে, তবে ডিস্কাউ-এর নাম করতে হয় প্রথমে। এই কথাটাই প্রমাণ করেছেন শিল্পী ও গায়ক ডিয়েট্রিখ ফিশের ডিস্কাউ।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

মহাশ্বেতার ইচ্ছা ছিল কান্তিকেও খবরটা দিয়ে যায়। বোধ করি পেট ফুলছিল তার তখনও। তাই শামা যখন সেখান থেকে উঠে একরকম ছুটেই পিছন দিকের বাগানে চলে গেলেন নিজেকে সামলাতে—মহাশ্বেতা খুঁজে খুঁজে কান্তিকে বারও করেছিল।

'ঐ শুনেছিস! তোর সেই তিনি রে—তোর রতনদি যে ঘোড়া উলটেছেন। অক্কা পেয়েছে।...... আ-মর্ চেয়ে আছে দ্যাখো কেমন করে—রতনদি তোর, রতন, আমার সেই ননদ মরে গেছে, বুঝলি? এই—গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলেছে। মা মানুষটি তো আমার সহজ নয়—মার গাল সহ্য করতে পারবে কেন? হাতে হাতে ফলে গেল ওর শাপ! বাব্বা, মনে হ'লেও ভয় করে।'

যৎপরোনাস্তি চেঁচিয়েই বলেছিল মহাশ্বেতা, কিন্তু কান্তির কানে তাও পৌঁছবার কথা নয়। সে তেমনি করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে বললে, 'কিছু বুঝতে পারছি না কি বলছ। কার কথা বলছ? কার কী হয়েছে? একটু লিখে দেবে?

'দূর হ কালার ডিম। এক জ্বালা হয়েছে কালাকে নিয়ে। আমি তোদের মতো লিখতে পড়তে পারি কি না, যে লিখে দেব। বলে কবে সেই দাগা বুলিয়েছিলুম দিনকতক, এখনও তা নাকি মনে আছে। আব্দেক বানান জানি না।........ শোন্, যা বলছি আমার মুখের দিকে তাকা। তবু চেয়ে থাকে দ্যাখো বোকার মতো—'

আরও ভাল ক'রে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবার হয়ত চেষ্টা করত কিন্তু ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে আকৃষ্ট হয়ে কনক এসে পড়ল। সে ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারেনি বটে, তবে এটা সে তার সহজ সহানুভূতি দিয়ে বেশ বুঝেছে যে, কান্তির এই দুর্গতির জন্য রতন যতই দায়ী হোক, কান্তির তার প্রতি এখনও যথেষ্ট টান আছে। কারণ এতদিনের এত কথার মধ্যেও ওর মুখ দিয়ে একটি দিনের জন্যেও রতনের বিরুদ্ধে কোন নালিশ উচ্চারিত হয়নি। হয়ত এককালে প্রচুর স্নেহ পেয়েছে তার কাছ থেকে বলেই—কৃতজ্ঞতাটা ভুলতে পারেনি, অথবা ওর এই অনিষ্টের মূলে রতনের সত্যিই তেমন কোন হাত ছিল না,—কারণ যা-ই হোক, কান্তি মনে মনে আজও রতনকে স্নেহ বা শ্রদ্ধা করে। সুতরাং হঠাৎ এত বড় খবরটা পেলে দুর্বল শরীর আরও ভেঙে পড়বে।

সে ব্যস্ত হয়ে এসে মহাশ্বেতার হাত ধরে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে গেল।

'ও কি করছিলেন ঠাকুরঝি, ওকে কি এখন এই খবর দেয়! এখনও ভাল ক'রে সেরে উঠতে পারেনি, রোগা শরীর, এখন এত বড় আঘাত সইতে পারবে কেন?'

'নে বাপু, তোদের আদিখ্যেতা দেখলে আর প্রাণ বাঁচে না। এখনও কি তার ওপর এত টান ছেদ্দা-ভক্তি আছে ওর যে একেবারে বুক ফেটে যাবে! সে মাগী তো ওকে মেরে ফেলতেই বসেছিল। মা কি মনিষ্যটা দিত অমনি অমনি!'

'তাই বলে কি এতদিনের ছেদ্দা-ভক্তি একদিনেই উবে যায়। এত বছর ধ'রে এত যত্ন করেছে, এত উপকার করেছে, সে-সব একদিনেই ভুলে যাবে? অন্তরের টান থাকবে না একটা!'

'জানি নে বাপু! তোদের কথার ধাঁচ-ধরন বুঝতে পারি না। বলে—যে দিয়েছে মনে ব্যথা তার সঙ্গে আমার কিসের কথা, তবু যদি কই কথা ঘুচবে না মোর মনের ব্যথা!'

গজগজ করতে করতে মহাশ্বেতা চলে যায়।

কিন্তু ঐ ভাবে তাকে টেনে আনাতে কান্তির মনে একটা খটকা লাগে। সে কনকের কাছে এসে বলে, 'কী হয়েছে বৌদি, কী বলছিল বড়দি? কেউ মরেছে? কার কথা বলছিল? গলা দেখাচ্ছিল!'

ঠোঁটের ভঙ্গি করে কনক বুঝিয়ে দেয়, 'ও কিছু না। ওর কে এক পাড়ার লোক মরেছে!'

কান্তি চুপ ক'রে যায়—কিন্তু মনের খট্‌কাটা যে দূর হয় না সেটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে কনক।

পরের দিন দুপুরে আবার এসে কনককে ধরে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি-চুপি বলে, 'একটা কথা বলব বৌদি, কাউকে বলবে না?—লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, না বলে আমি থাকতে পারছি না!'

কনকের মুখ শুকিয়ে ওঠে। তবুও বলতে হয়, 'বল না কী বলবে! কী এমন কথা?'

বলবার আগেই কান্তির মুখ লাল হয়ে ওঠে। মাথা নিচু ক'রে খুব চুপিচুপি বলে, 'এর মধ্যে—এর মধ্যে তোমরা রতনদির কোন খবর পাও নি?' আটকে আটকে যাচ্ছিল কথাগুলো। বিশেষ ক'রে রতনদির নামটা। কোনমতে যেন মরীয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করলে।

যা আশঙ্কা করেছিল তাই। হয় তাহা মিথ্যে বলতে হয়, নয় তো সত্যটা স্বীকার করতে হয়। তবু পাশ কাটাবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করল কনক, 'কেন বল তো?'

আবারও মুখ নিচু করল কান্তি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে. নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'কাল রাত্রে বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। যেন ছেঁড়া-ময়লা একটা কাপড় পরা, গলায় একটা কাটা দাগ—এসে আমার কাছে হাত জোড় করে কী চাইছে। কী যে চাইছে তা বুঝতে পারলুম না। সেই যে ঘুম ভেঙেগ গেল, আর ঘুম এল না। রতনদির কিছু হয়েছে—হ্যাঁ বৌদি, লক্ষ্মীটি আমার কাছে গোপন ক'রো না, সে-সে বেঁচে আছে তো!'

একেবারে নির্জলা মিথ্যাটা মুখে আটকায় বৈ কি!

কনক মাথা নিচু করল এবার।

কান্তির গলাটা যেন একেবারে ভেঙেগ এল। সে স্খলিত কণ্ঠে একেবারে ফিসফিস ক'রে বলল, 'তাই বুঝি কাল বড়দি বলতে এসেছিল? কেউ-কেউ খুন করেছে তাকে? গলা কেটে দিয়েছে?'

কনক ঘাড় নাড়ল। ইঙ্গিতে দেখাল যে গলায় দড়ি দিয়েছে রতন।

চুপ ক'রে গেল কান্তি। শুধু আবার দুই চোখ দিয়ে তার এতদিন পরে অশ্রুর বন্যা নামল।

এর পর দুটো দিন তার যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল তা কনক ছাড়া পুরোটা কেউ বুঝতে পারল না। ঠিক এইটেই আশঙ্কা করছিল সে। যদি বেচারা প্রাণ খুলে একটু কাঁদতেও পারত তো হয়ত আঘাতের তীব্রতা অতটা লাগত না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে দাদা বা মার সামনে সে চোখের জলও ফেলতে পারত না। কে জানে অপরাধিনীর জন্য চোখের জল ফেললে যদি এরা রাগ করেন? ঠিক সেই কারণেই তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো স্বাভাবিক ভাবেই করে যেতে হ'ত—অন্তত চেষ্টা করতে হ'ত। ভাতের সামনে গিয়েও বসতে হ'ত, যদিও খেতে পারত না প্রায় একগালও। প্রথম দিন রাতে ইচ্ছা ক'রেই হেমের সঙ্গে তাকে খেতে দেয়নি কনক, হেমের প্রশ্নের উত্তরে 'আমার সঙ্গে খাবে' বলে কাটিয়ে দিয়েছিল। মারও সেদিন একাদশী, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তা নইলে বিস্তর বকুনি খেতে হ'ত ওকে। ভাত কমই দিয়েছিল কিন্তু তাও খেতে পারল না সে—দু এক গ্রাস নাড়াচাড়া ক'রে কনকের চোখে চোখ পড়তেই কেঁদে ফেলল। ইঙ্গিতে আশ্বস্ত ক'রে কনক তাকে চুপ ক'রে বসে থাকতে বলল, তারপর নিজের খাওয়া হ'তে নিঃশব্দে ভাতসুদ্দ ওর থালাটা নিয়ে পুকুরে চলে গেল।

পরের দিন কিন্তু আর চেপে রাখা গেল না। কিন্তু বিচিত্র কারণে শ্যামা খুব একটা বকাবকি করলেন না। শুধু কনককে প্রশ্ন করলেন একবার, 'খবরটা ও শুনেছে বুঝি কোমা? মহাই বুঝি এই উপকারটি ক'রে গেলেন আমার?'

কিন্তু শ্যামা বকাবকি না করলেও দুদিনেই আবার কান্তির যা চেহারা হয়ে গেল, তা দেখে ভয় পাবারই কথা। কনক তো বটেই—শ্যামাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। শ্যামা যে এতটা সহানুভূতির চোখে ব্যাপারটা দেখবেন তা আশা করেনি কনক, সে ভরসা পেয়ে বলল, 'কী হবে মা—আবার একটা কিছু ভারী অসুখ বিসুখ হবে না তো গুমরে গুমরে!'

'কী জানি মা, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটা কিছু কাজের মধ্যে থাকলেও বা যা হয় হ'ত—শুধু শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা—এই যে হয়েছে আরও কাল!'

'ওকে—ওকে কোথাও দু একদিনের জন্যে পাঠালে হ'ত না?'

'কোথায় পাঠাব বল। উমার কাছে একটা রাত্তিরও কাটাবার জায়গা নেই, পাঠাতে গেলে এক বড়দির কাছে। তা কালা-মানুষ কিছুই শোনে না। কলকাতায় গাড়ি-ঘোড়ার পথ, ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আরও, কলকাতায় গেলে—ঐসব কথা বেশি ক'রে মনে পড়বে হয়ত!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে বাঁচিয়ে দেয় উমাই।

তৃতীয় দিনে ডাকে একটা চিঠি আসে কান্তিরই নামে। উমা ওকে বিস্তর সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে লিখেছে

—'তুমি কোন কারণেই হতাশ হইও না—বা হাল ছাড়িয়া দিও না। মেয়েদের পড়ার বইতে অনেক অনেক জীবনী নিত্যই পড়িতেছি, তোমার অপেক্ষা গুরুতর রকমের অঙ্গহীন লোকও পৃথিবীতে বহু বড় বড় কাজ করিয়া কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে হাত-পা বা ঐ ধরণের কোন অঙ্গ যায় নাই। আমি বলি কি, তুমি আবার পড়াশুনাতেই মন দাও। ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়িয়াছিলে, মোটামুটি অনেকটা জানাই আছে। এখন বই হইতে নিজেই পড়িতে পারিবে। এখন তো লিখিত পরীক্ষা—কানে শুনিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তুমি বরং ওখানকার ইস্কুল হইতে, বা যেসব বই তুমি পড়িতে, মনে করিয়া পুস্তকের তালিকা করিয়া আমাকে দাদার মারফৎ বা ডাকে পাঠাইয়া দাও, আমি আমার ছাত্রীদের বাড়ি হইতে যতটা পারি যোগাড় করিয়া দিব, বাকীগুলি তোমার মেসোমহাশয় কিনিয়া দিবেন। তুমি আর একদিনও সময় নষ্ট না করিয়া কাজে লাগিয়া যাও।'

উমার এই চিঠিখানাই যেন দশ বোতল টনিকের কাজ করল। কান্তির মুখ-চোখের চেহারা ফিরে গেল দুদিনে। রতনের শোকটাও এই প্রবল উৎসাহের বন্যায় অনেকটা দূরে চলে গেল। এক আধবার—বিশেষত সন্ধ্যার সময়টা—একটু উন্মনা হয়ে উঠত, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও হয়ত ফেলত কিংবা দূর শূন্যে চেয়ে চোখ দুটো উঠত ছলছল ক'রে—কিন্তু সেই গুম্ হয়ে বসে থাকা বা শুকিয়ে ওঠাটা একেবারে চলে গেল। সে সেইদিনই বসে বসে একটা বইয়ের ফর্দ করে দাদার হাতে দিয়ে দিলে ছোট-মাসীকে দেবার জন্যে। তারপর খুঁজে খুঁজে, সীতার [illegible] বালির কাগজের খাতাটা বার ক'রে তারই দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসল। যে ইংরেজী প্রবন্ধ গুলো তার তৈরি করা ছিল সেইগুলোই নতুন ক'রে লিখে মিলিয়ে নিতে লাগল। অর্থাৎ নতুন উৎসাহ এসেছে জীবনে—হতাশ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। এরাও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবার।

দিন পাঁচ সাত পরেই ছোটমাসী একদফায় কতকগুলো বই পাঠিয়ে দিলেন। হেম ইতিমধ্যে ওর অফিস থেকে রেলের কখানা বাঁধানো খাতা এনে দিয়ে-ছিল—অঙ্ক কষা ও অন্য সব লেখার জন্য: এতো আর ইস্কুলে দেখাতে হবে না—মিছিমিছি সাদা খাতা কিনে পয়সা নষ্ট করার প্রয়োজন কি! তাতে অবশ্য কান্তিরও আপত্তি নেই। সে এবার দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনো শুরু করল। অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে সে। শুধু ওর এই একেবারে কালা হয়ে যাওয়াটা এদের এখনও অভ্যাস হয়নি বলে এদেরই একটু অসুবিধা হচ্ছে। পেছন ফিরলে আর কোন মতেই ডাকার উপায় নেই। সামনে ফিরে থাকলে হাত পায়ের ভঙ্গি ক'রে ঠোঁট নেড়ে তবু কাজ চলে। অন্যদিকে ফিরে থাকলে গায়ে হাত দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নয়ত ঘুরে গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়—কি ঘাড় হেঁট ক'রে থাকলে, একটা হাত ওর চোখের সামনে ঘুরিয়ে মাথা তোলবার ইঙ্গিত জানাতে হয়।

এইসব দেখে হেম মধ্যে মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ে। মাকে বলে, 'পড়ছে তো, প্রাইভেটে একজামিন দিয়ে পাশও হয়ত করতে পারবে কিন্তু কোন কাজ হবে কি তাতে? ও যে কোথাও চাকরি পাবে বলে তো মনে হয় না। কে দেবে ওকে কাজ? যে মাইনে দেবে সে এত দিকদারি সহ্য করবে কেন?... যা দেখছি ষাঁড়ের নাদ হয়েই ওকে জীবন কাটাতে হবে।

......ও যে কোথাও চাকরি পাবে বলে তো মনে হয় না......

শ্যামা চুপ ক'রে থাকেন। তিনি হেমের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না। মধ্যে মধ্যে তিনিও যে একটা হিম হতাশা বোধ করেন না তা নয় কিন্তু ঠিক এতখানি অন্ধকার ভবিষ্যৎ মেনে নিতে তাঁর মন চায় না। এ ছেলের ওপর যে অনেকখানি ভরসা ছিল তাঁর। সে আশার প্রাসাদ একেবারে ধুলিসাৎ হলে তিনি দাঁড়ান কোথায়? তাই কতকটা নিজের গরজেই একটা ক্ষীণ আশা আঁকড়ে ধরে থাকেন। একটা কি কিছু উপায় হবে না, ভগবান কি এতটা অবিচার করবেন? তবে যে লোকে বলে 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি'—সে কি মিছে কথা? শুধুই কথার কথা? তাঁর জীবনে তিনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন সে কথা ভেবেও বল পান অনেকটা। আবার এমনও একটা ক্ষীণ আশা মনে মনে উঁকি দেয়—ভালও তো হয়ে যেতে পারে, যেমন হঠাৎ কালা হয়ে গেছে তেমনি হঠাৎই আবার হয়ত শুনতে আরম্ভ করবে। অনেক সময় দৈব ওষুধেও কাজ হয়। একবার তাই না হয় যাবেন মঙ্গলার কাছেই। তাঁর অনেক জানাশুনো আছে—যদি তেমন কোন ওষুধ বিষুধের সন্ধান দিতে পারেন তিনি।

ছেলের মুখে চোখে নতুন উৎসাহের দীপ্তি জেগেছে, তার আলোও খানিকটা তাঁর মনে এসে পড়ে। হবেই একটা উপায়, যা হোক ক'রে। ভগবান কোন মতে একটা পথ দেখিয়ে দেবেনই।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

অয়স্কান্ত

॥ জনকল্যাণে পরমাণু-শক্তি ॥

গত সপ্তাহের 'অমৃত' পত্রিকায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট মার্কিন রসায়ন-বিজ্ঞানী গ্লেন থিওডোর সিবর্গ-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির নাম 'মহাকাশ অভিযানে পরমাণুর ভূমিকা'। প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মহাকাশ অভিযানের অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে পারমাণবিক শক্তি মানুষের আয়ত্তে আনার কুড়ি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে। সুতরাং গত সপ্তাহের প্রবন্ধের পরিপূরক হিসেবে জনকল্যাণে পরমাণুর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা তোলা যেতে পারে।

গোড়ায় একটু পুরনো ইতিহাস স্মরণ করা যাক। ১৯০৭ সালে মাদাম কুরী প্যারিস ইনস্টিটিউটকে এক গ্রাম রেডিয়াম উপহার দিয়েছিলেন। সে-সময়ে এই এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম ছিল কয়েক লক্ষ রুবল। এই রেডিয়াম পাওয়া গিয়েছিল খনিজ আকর থেকে। এই পদ্ধতিতে সারা বছরে কয়েক গ্রামের বেশি রেডিয়াম পাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু-শক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। এখন নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর থেকে কৃত্রিম উপায়ে অজস্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যাচ্ছে। এই নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টরকে বলা চলে আমাদের যুগের 'অ্যালকেমিস্টিক' চুল্লী। মধ্যযুগে অ্যালকেমিস্টরা পদার্থের মৌলিক রূপান্তরের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন পারদ থেকে সোনা তৈরি করতে। অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন এখন বাস্তবে রূপায়িত। পারদ থেকে সোনা তৈরি করা এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়, যদিও তাতে খরচ এত অসম্ভব রকমের বেশি যে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু অন্যদিক থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। নিউক্লিয়র রিঅ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী থেকে যেমন পারমাণবিক তেজ পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে অজস্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। বর্তমানে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত আইসোটোপের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। এত বিভিন্ন প্রকারের এত অজস্র আইসোটোপ যে মানুষের আয়ত্তে আসতে পারে তা কুড়ি বছর আগে বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে পারেননি। আর আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে আইসোটোপ যে কী অশেষ জনকল্যাণকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তাও এখনকার বিজ্ঞানীরা কল্পনা করতে পারছেন না।

আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে আইসোটোপ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। 'অমৃত' পত্রিকার পুরনো একটি সংখ্যায় (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬১) এ-বিষয়ে আমরা আলোচনা তুলেছিলাম। সেই আলোচনার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

॥ আইসোটোপ ॥

"পরমাণুর ভর নির্ণীত হয় নিউক্লিয়সের দ্বারা। নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে প্রোটোন ও নিউট্রন। প্রোটোন কত সংখ্যক থাকবে তা নির্ভর করে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপরে, অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার ওপরে। কাজেই, পারমাণবিক সংখ্যাটি যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রোটোনের সংখ্যা কম-বেশি হবার উপায় নেই। কিন্তু নিউট্রন যদি কম-বেশি হয় তাহলে পরমাণুর ভর কম-বেশি হবে বটে, কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ৯২। কিন্তু পারমাণবিক ভর সর্বক্ষেত্রে সমান নয়—কখনো ২৩৪, কখনো ২৩৫, কখনো ২৩৮। ইউরেনিয়াম-২৩৪-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪২টি নিউট্রন। ইউরেনিয়াম—২৩৫-

রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিনের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থি পরীক্ষা

এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪৩টি নিউট্রন। ইউরেনিয়াম—২৩৮-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪৬টি নিউট্রন। অর্থাৎ, প্রোটোনের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই সমান, সেই কারণে পারমাণবিক সংখ্যাও সর্বক্ষেত্রে ৯২। কিন্তু পারমাণবিক ভর কখনো ২৩৪, কখনো ২৩৫, কখনো ২৩৯। অতএব, একই পদার্থ ইউরেনিয়ামকে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন পারমাণবিক চেহারায়। একই পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট একই পদার্থের এই যে বিভিন্ন পারমাণবিক চেহারা—এরই নাম আইসোটোপ।"

পেঙ্গুইন প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অভিধানে 'আইসোটোপ'-এর সংজ্ঞা এই: "একই মৌলিক পদার্থের কতকগুলো পরমাণু যদি এমন হয় যে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে সমান কিন্তু পারমাণবিক ভর পৃথক, তাহলে পরমাণুগুলোকে বলা হয় এই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ।"

চিকিৎসাকার্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

ক্যানসারের চিকিৎসায় এতকাল রেডিয়াম ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি ক্যানসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেডিয়ামের জায়গা নিয়েছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আগেই বলেছি, রেডিয়ামের দাম খুবই বেশি, সে-তুলনায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের দাম সামান্যই। যেমন, এক টুকরো তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের দাম মাত্র ১০০ ডলার—অথচ এই কোবাল্টে যতোটা কাজ হবে, ততোটা কাজ করবার মতো রেডিয়াম সংগ্রহ করতে গেলে দাম পড়বে ২৩,০০০ ডলার। ১৯৪৬ সালের পর থেকে ক্যানসারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি রোগনির্ণয় ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার শুরু হয়েছে। রোগীর দেহে এমন কী ঘটেছে যার দরুণ অসুস্থতা—তা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নির্ভুলভাবে খুঁজে বার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে রোগনির্ণয়ের জন্যে আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। দেহে রক্তের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্যানসারের সঠিক অবস্থান নির্ণয় এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গোলযোগ সঠিকভাবে জানবার কাজেও আইসোটোপের ব্যবহার চলেছে।

তেজস্ক্রিয় আয়োডিন, অর্থাৎ আয়োডিন-১৩১, চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। থায়রোয়েড গ্ল্যান্ডের সক্রিয়তার জন্যে আয়োডিন প্রয়োজন। শরীরের বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে এই গ্ল্যান্ডের ওপরে। মানুষের শরীরে যদি আয়োডিন প্রবিষ্ট হয় তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জমা হয় থায়রোয়েড গ্ল্যান্ডে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্রয়োগ করে জানা যেতে পারে এই গ্ল্যান্ড ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। রোগীকে তখন সোডিয়াম আয়োডাইডের সঙ্গে অল্প তেজস্ক্রিয় আয়োডিন সেবন করানো হয়। এর পর গাইগার কাউন্টারের মাধ্যমে জানা যায় আয়োডিন কত সময়ের মধ্যে গ্ল্যান্ডে জমা হচ্ছে—তার সক্রিয়তার পরিমাপ করার এই হচ্ছে পদ্ধতি।

ফসফরাস-৩২ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সঙ্গে ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের গোপন টিউমার ধরা পড়ে। বাইরে থেকে এই ধরনের টিউমার বড়ো একটা ধরা যায় না, বা ধরা পড়লেও ঠিক টিউমার কিনা বোঝা শক্ত।

রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার দোষত্রুটি ধরা পড়ে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম-২৪ ব্যবহারে। শরীরের কোনো স্থানে সংকোচনের ফলে রক্ত-সঞ্চালন ব্যাহত হলে এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তা জানিয়ে দেয়।

সুস্থ মানুষকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সেবন করিয়ে বা ইনজেকশন দিয়ে মানুষের দেহভ্যন্তরস্থ জটিল কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আজ জানা যাচ্ছে। রক্তসঞ্চালন, খাদ্য ও অক্সিজেনের গতিপথ এবং দেহাভ্যন্তরের ধাতব দ্রব্যাদির ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদভাবে জানবার পক্ষে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আজ চিকিৎসক ও

বিজ্ঞানীদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।

কৃষিক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগের ফলে কৃষি-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধনের নতুন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ফসল বাড়াবার জন্যে কখন কোথায় কিভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে, উদ্ভিদ-জীবন ও উদ্ভিদের রোগ, শস্যনাশী কীট, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইউ-এস-আই-এস প্রকাশিত একটি বুলেটিনে তামাক-চাষের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে গবেষণার একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে :

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের তামাক-চাষীরা তামাক উৎপাদনের জন্য ফসফেট জাতীয় সার প্রয়োগ করতো। বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে আবিষ্কার করলেন যে, তামাকের চারা ফসফেট জাতীয় সার গ্রহণ করতে পারে না। এটা জানবার পর চাষীরা তামাকের ক্ষেতে ফসফেট সার দেওয়া বন্ধ করে দিল। সুতরাং এই সার প্রয়োগের ফলে প্রতি বৎসর অর্থের যে অপচয় ঘটতো তা নিবারিত হলো। সারের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কোন ধাতব দ্রব্য প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের বিশেষ বৃদ্ধি হয়ে থাকে, এটা আগেও জানা ছিল। কিন্তু এই পরিমাণ যে পূর্ব ধারণার চাইতে অনেক কম হওয়া দরকার সেটা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যেই গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে। সামান্য পরিমাণে মোলিবডেনাম ধাতুর সঙ্গে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে এবং উদ্ভিদের প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে মোলিবডেনাম থাকলে সেই উদ্ভিদকে যারা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবে তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ক্ষতিকারক হবে। জমিতে কি পরিমাণে মোলিবডেনাম প্রয়োগ করলে সেই জমিতে উৎপন্ন ফসল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না—তা এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে নিরূপিত হয়ে থাকে।"

উদ্ভিদের দেহে জল ও বাতাসের সংযোজনের ফলে কিভাবে জীবন্ত টিস্যু বা কলা গড়ে ওঠে—যে প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফটোসিনথিসিস—সে-সম্পর্কেও অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শ্রমশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতের অন্য কোনো সংখ্যার জন্যে এ-আলোচনা তোলা রইল। আপাতত অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই।

॥ ভস্মনিক্ষেপের সমস্যা ॥

পারমাণবিক চুল্লীর ছাই কোথায় ফেলা হবে, সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো একটা সমস্যা। আমাদের রান্নার উনুনের ছাই যেখানে সেখানে ফেলা যেতে পারে, কিংবা এমন কি পেঁপে বা অন্য কোনো গাছের সার হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারখানার চুল্লীর ছাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানার পাশেই কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় স্তূপ হয়ে জমতে থাকে। এতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। অনেকের পক্ষে—যারা ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে পোড়া কয়লা বার করে—সুবিধের ব্যাপারও বটে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় পারমাণবিক চুল্লীর বেলায়। যেহেতু চুল্লীটি পারমাণবিক, এই চুল্লীর ভস্মও তেজস্ক্রিয়। এই তেজস্ক্রিয়তার জন্যেই এই ভস্মকে যেখানে সেখানে ডাঁই করা চলে না। যে-কারণে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি, সেই একই কারণে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পারমাণবিক চুল্লীর ভস্ম সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ও মস্ত মস্ত বইও লিখেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সহজ ও সুলভ কোনো পদ্ধতির হদিশ পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে অভিযোগ করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিক্ষেপ করে করে গভীর সমুদ্রের জলকে কলুষিত করে তুলছে। খবরে বলা হয়েছে, পঞ্চান্ন গ্যালনের ইস্পাতের ড্রাম বা কংক্রীটের আধারে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ভরে নিয়মিত
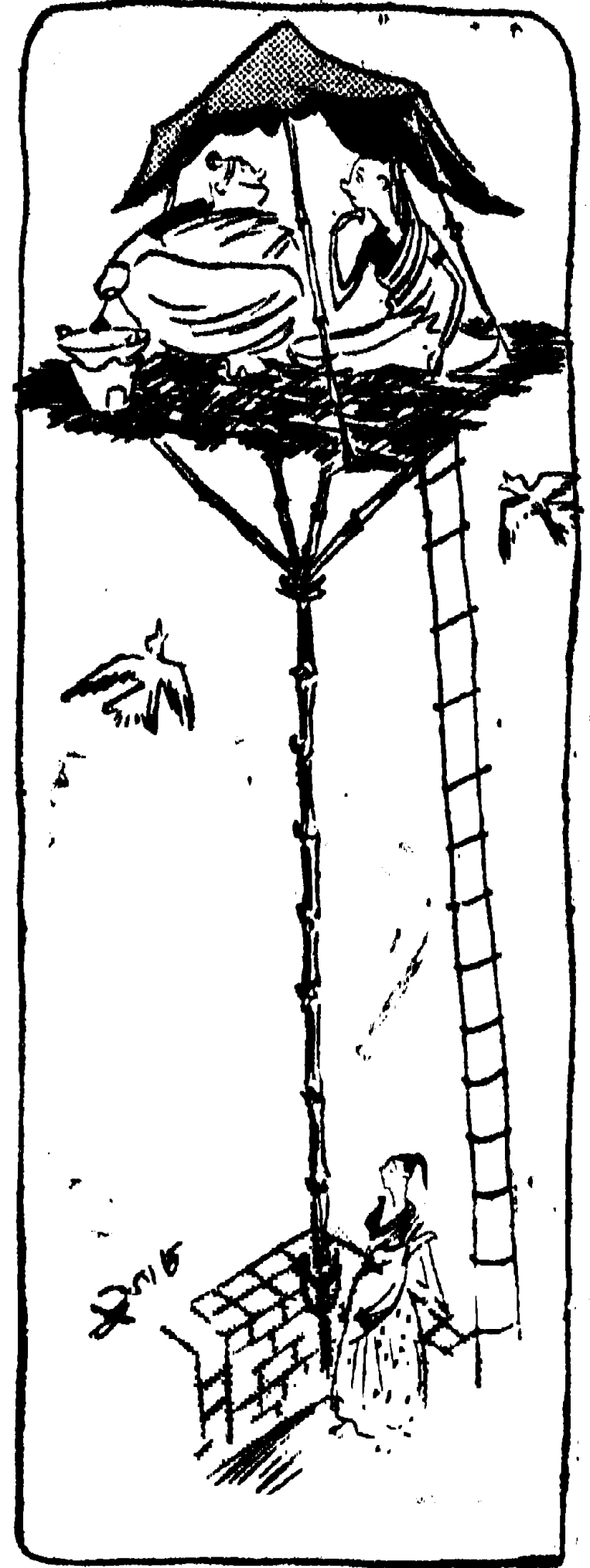
বাড়ীতে দুটো ঘর দুই ছেলে বউ নিয়ে থাকে। তাই ছেলেরা আমার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে।

ভাবে সমুদ্রের জলে ফেলা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৬ সাল থেকে এমনি হাজার হাজার ড্রাম বা আধার ফেলেছে প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে। ব্রিটেনের উইন্ডস্কেল-এ যে পারমাণবিক চুল্লী আছে তার ভস্ম ফেলা হয় আইরিশ সাগরে। অথচ বহিঃসমুদ্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (১৯৫৮ সালে সম্পাদিত) বলা হয়েছে যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিক্ষেপ করে সমুদ্রের জলকে কিছুতেই কলুষিত করা চলবে না। খবরে আরো বলা হয়েছে, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিক্ষেপ করা হয় মাটির নিচের গভীর গর্তের মধ্যে।

আমাদের দেশেও অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হতে চলেছে। যে চুল্লীর ছাই ফেলাটাও এত-বড়ো একটা সমস্যা তা নিশ্চয়ই খুব একটা সরল ব্যাপার নয়। অতঃপর আমাদের দেশেও অন্য অনেক সমস্যার সঙ্গে এই ছাই-ফেলার সমস্যাটাও যুক্ত হবে।

মরালী-মন

সুভাষ সমাজদার

শোন উর্মিলা, বেশ ভাল করে ভেবে দেখ, এদেশে যাকে সাধারণত ভাল মেয়ে বলা হয়, তা তুমি নও। কোন যুক্তি দেখিয়ে তুমি মানুষের কাছে সহানুভূতি চাইবে? জীবনকে নিয়ে তুমি যেমন ইচ্ছা খেলেছো। জীবনের অর্থ তোমার কাছে স্পষ্ট নয় বলেই তুমি এতটা যেতে পেরেছো। তা না হলে তোমার শুরুটা তো বাঙলাদেশের আর পাঁচটা মেয়ের মতই ছকবাঁধা রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

•

বাগবাজারের গঙ্গার ধারের সেই ভাড়া-করা বিয়ে-বাড়ীর কথা মনে পড়ে? তোমার বিয়ের আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। ছোট উঠানে আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীর পদাঙ্কলেখা জ্বলজ্বল করছিল। আম্রপল্লব, মঙ্গলঘট কোন কিছুরই অভাব ছিল না। পুরোহিত বেদের মন্ত্র পড়েছিল, যজ্ঞাগ্নির শিখায় ছাতনাতলা আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

হ্যাঁ তুমি—এই তুমিই উর্মিলা বসু, দর্শনে অনার্স-পড়া মেয়ে এক গা গয়না আর বেনারসী শাড়িতে আপাদমস্তক মুড়ে জবুথবু হয়ে সেদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলে। তোমার সামনে সিল্কের পাঞ্জাবি পরা আর টোপর মাথায় দেওয়া যে মানুষটি বসেছিল, তারও স্বাস্থ্যের অভাব ছিল না। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। বিদ্যাও এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত ডিঙিয়ে বিদেশ থেকেও সমৃদ্ধ হয়ে এসেছিল। যা থাকলে তোমার মত মেয়ে সুখী হয়, তার কোন কিছুর কমতি ছিল না। তবুও—

তুমি আজ বর্ধমান রোডের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হোস্টেলের একটি ঘরের একক বাসিন্দা। তোমাকে ঘিরে কুমারী জীবনের রিক্ততার অভিশাপ!.....

চিঠি লেখার প্যাডের ওপর শক্ত করে কলম ধরল উর্মিলা। লিখল, দেখ মায়া, তোকে লিখতে ইচ্ছে করছে অনেক কথা। কিন্তু এত চিন্তার তোড় আসছে যে, কলম চলতে চাচ্ছে না। তুই আমার সবই জানিস! তোকে যেমন অনেক গল্প বলেছি, তেমনি আরেকটি গল্প বলবো বলে আপাতত কলম ধরেছি। মনে হচ্ছে, এই গল্পটি আমার জীবনে সত্য হয়েও যেতে পারে। আর যখুনি ভাবছি, সত্য হলেও হতে পারে, তখুনি আমার নিজের জীবনের বিচিত্র অতীতটা আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলছে।

আচ্ছা তুই বল মায়া, সত্যিই কি জীবন নিয়ে খেলেছি আমি? তোদের কাছে মেয়েদের জীবন কতগুলো কর্তব্যের বোঝা মাত্র। প্রাক-বিবাহকালীন যুগে মায়ের টুকটাক ফাইফরমায়েশ খাটা আর পড়াশুনা (বাবার সঙ্গতি থাকলে) করা। তারপর বিবাহোত্তর যুগে তো জীবনের ওপরে অসংখ্য রকমের রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ পড়ে। বিভিন্ন ছাপ ছাপে জীবনটা একেবারে হিজিবিজি হয়ে ওঠে। কোন ষ্ট্যাম্পে লেখা থাকে, বৌদি, কোনটায় থাকে কাকীমা—মাসীমা, জা, ছোট বৌমা, বড় বৌমা হাজারো রকমের ষ্ট্যাম্প। প্রতিটি সম্বন্ধ অনুযায়ী প্রত্যেকের মন জুগিয়ে কর্তব্য করতে করতে নিজের বলতে আর কিছু থাকে না! সেই যে বেদান্ত বলে না, ব্রহ্মের সঙ্গে একেবারে আত্মালোপ করে যাওয়া—বিয়ের পর মেয়েরা মিশে যায় সংসার-রূপ ব্রহ্মের সঙ্গে। অবশ্য যদি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার না হয় কিম্বা দূরে কোন কর্মস্থলে স্বামীর সঙ্গে পৃথিবীর দূর কোণে রহিব আপন মনে থাকার ভাগ্য যদি থাকে—তাহলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু—

আমার তো তাও ছিল মায়া! শুধু স্বামীকে নিয়েই ঘর বেঁধেছিলাম সমুদ্রতীরের এক শান্ত জনপদে। সারা দিন হু-হু-করা হাওয়ার গর্জনে কানে তালা ধরে যেত। জানালার কাঁচের শার্শির ওপারে দেখা যেত উচ্ছল সমুদ্রের বিশাল নীল জলরাশি। গাঢ় নীলের পরেই সাদা ঝকমকে ধু-ধু

বালুচর। বিপুলবিস্তৃত আকাশের দূর-দিগন্তে শ্বেতপদ্মের মালা গেঁথে গেঁথে উড়ে যেত সাগর-পাখীরা। প্রকৃতির সম্ভার ছিল যেমন অফুরন্ত, তেমনি ছিল আমার সংসারের (আমার স্বামীর) ঐশ্বর্য!

কিন্তু ছিল না মন। যে মন থাকলে ভালবাসতে পারে, ভালবাসতে পারে প্রকৃতিকে, তা ভদ্রলোকের একেবারেই ছিল না। ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ার। লোহালক্কড় আর কুলি-কামিন নিয়ে কারবার। চেহারার মত মনটাও স্থূল। তাকে দেখলে মনে হতো লোকটার পৃথিবীতে স্থূল বস্তু ছাড়া আর কিছু নেই বুঝি......

উর্মিলা! এ-সংসারে মনের মত মানুষ কয়টি মেয়ে পায়? বেদের মন্ত্র পড়ে যার হাতে সঁপে দেওয়া হয়, তাকেই একটু একটু করে আপনার মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে নেয় মেয়েরা। স্বাস্থ্যবান আর যথেষ্ট উপার্জন করে এমন স্বামী পেলে মেয়েরা সুখীই হয়। তুমি হওনি। তাকে রচনা করে নিতে পারো নি।

তুমি জানো না উর্মিলা, মেয়েরা 'স্বামীস্বর্গের ইন্দ্রাণী'। চারটে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরই তাদের স্বপ্ন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীলোক হয়ে জন্মালেই হয় না, স্ত্রীভাবের পরিস্ফুটন হওয়া চাই। স্ত্রী-ভাব বলতে সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, উদারতা—এই সব বৃত্তিকেই বুঝায়। স্ত্রীভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে আত্মবিলোপ!

এই আত্মবিলোপের কথা আছে শাস্ত্রে। তোমার হয়তো মনে আছে তোমার বাবা 'ভাগবত ধর্ম' থেকে তোমাকে পড়ে শোনাতেন : আত্মবিলোপ হয়েছিল কৃষ্ণের জন্য গোপিকাবৃন্দের! তারা পুরুষোত্তম সেই মথুরাপতি ভিন্ন আর কিছু জানতো না। তাঁর ভেতরেই বিলীন করে দিয়েছিল তারা আপন গুণ, আপন প্রীতি, আপন লজ্জাও—মনের সে এক অতি উন্নত অবস্থা!

উর্মিলা! তোমার উদার প্রকৃতির বাবার সঙ্গে ছোটকাল থেকে বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে তুমি নারীপ্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছো। তোমার বাবা যদি ফরেস্ট অফিসার না হতেন, আর তোমার মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে—তাহলে হয়তো তুমি স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে উর্মিলা......

আবার কলম তুলল প্রাচ্যবিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যাপিকা মিসেস উর্মিলা রায় (পদবীটা এখনও বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মত বিগত দিনের স্মৃতি বহন করছে)। জানিস মায়া, বাবা আমার এই স্বভাবের কথা জানতেন বলেই অনেক খুঁজে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলে ইরিগেশান ডিপার্ট-মেন্টের ইঞ্জিনীয়ার। কর্মস্থলে উন্মুক্ত প্রকৃতির ভেতরে থাকবে মেয়ে। কোলকাতায় কি আর কোন শহরে একটা বড় বাড়ীর কোন ঘরে মেজ কি সেজবৌ হয়ে থাকার বিড়ম্বনা নেই। এমন কি আর সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই।

দীঘার সমুদ্রতীরে ছোট একটা বাংলো-বাড়ী। উচ্চপদস্থ অফিসার স্বামী। খানসামা, বেয়ারা বাবুর্চি। বিলাসের উপকরণ ছিল নিখুঁত। তাই তোরাও অবাক হয়েছিলি, কেন-কেন এত পেয়েও আমি সব ছাড়লাম। শুনেছি, তোরাও বলেছিলি, ওর স্বভাবটাই ও রকম—

ওই স্বভাবটুকু, ওই বৈশিষ্ট্যটুকুই আজও আমার গর্ব ভাই। আজ হোস্টেলের এই ঘরে একেবারে নিঃস্ব একক জীবনযাপন করি। তোরা মনে করিস, আমার জীবন বুঝি রিক্ততার ব্যথা আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু আমার এই রিক্ত, অভিশপ্ত আর করুণ জীবনের ভেতরেও অদ্ভুত একটা আত্ম-তৃপ্তি আছে ভাই। সেটা কি জানিস, আমি একটু আলাদা রকমের মানুষ, আমার স্বভাবে কতগুলো মৌলিক গুণ আছে।

ছোটকাল কেটেছে তরাইয়ের অরণ্যে। কৈশোর কেটেছে বানগড়ের রিজার্ভ ফরেস্টে। আর যৌবনেরও কয়েকটি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার স্মৃতি পরম মমতার মত জড়ানো আছে বংশীহারির বনের শাল-শিশু-সেগুনের পাতায় পাতায়। বরাবরই খাওয়া-পরা পশুর মত বেঁচে থাকার এই জীবন আর জগৎকে ছাড়িয়ে বহু-বহু উর্ধ্বে একটা বিচিত্র ভাবের রাজ্যে আমার মন মরালের মত ভেসে ভেসে বেড়াতো। এই জন্যেই—এই জন্যেই হয়তো রূঢ় বাস্তব সংসার আজ আমার কাছে থেকে মূল্য আদায় করে নিচ্ছে।

ভাগবত ধর্ম পড়তেন বাবা। যদিও ফরেস্ট অফিসার, কিন্তু শুধু বন্দুক আর লাঠি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। উপনিষদ পড়তেন, রবীন্দ্রনাথও পড়তেন। শোনাতেন, আমার সঙ্গে আলোচনাও করতেন। কোন শাস্ত্রে কি চিন্তাশীল লেখকের লেখা গ্রন্থে এমন কথা কখনো পাইনি—যে মেয়ে-পুরুষের আত্মার ভেতরে কোন মৌল পার্থক্য রয়েছে। মেয়েমানুষের আত্মা শুধু কতগুলো বিধি-নিষেধের খাঁচার ভেতরে না-রোদ-না-জল, না-হাওয়ায় খাবি খেতে খেতে বেঁচে থাকবে। তা আমি ভাবতেই পারতাম না।

আরো আছে। কত বড় এই নীল আকাশ, কত বিপুল আর বিস্ময়কর এই সমুদ্র। কেন মানুষ হয়ে জন্মেও প্রকৃতির এই অবারিত সৌন্দর্যের প্রতি নির্মমভাবে বিমুখ থাকবো আমরা। শুধু টাকার নোটের বাণ্ডিলের ভেতরে ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের পাতায় পাতায় ঘুরে ঘুরে মরবে মন?

আমরা এ যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা, এক কথায় বিদগ্ধ ইনটেলেকচুয়ালসদের (ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, লেখক, পণ্ডিত, শিক্ষক, অধ্যাপক) আমার কি মনে হয় জানিস মায়া, অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক। যে যা করছে তার বাইরে যেন দুনিয়া নেই আর। কেউ কারো কথা একটু ধৈর্য ধরে শোনে না। সময় নেই। সহিষ্ণুতা নেই। সবাই—সবাই যেন নিজের নিজের পথ ধরে উন্মাদের মত ছুটছে। কে ছুটছে না। ছুটতে পারছে না। কোথায় কোন অন্ধকারে কে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল—সে সব দেখার তাদের উপায় নেই।

যে যা ভাবে তাই হয়ে যায় মায়া। অসুখের কথা ভাবতে ভাবতে অসুখই বাঁধিয়ে ফেলে মানুষ। আমার মনে হয়, বুঝলি, একটা এ্যাম্বিশন বা কোন স্থির-লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ছুটতে ছুটতে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইটকাঠ পাথরের মত একটা জড়বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। অনেক টাকা, অনেক বড় বাড়ী, গাড়ী আর অনেক নাম ইত্যাদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সাধনা আসলে সেই ম্যাটারের উপাসনা মায়া!

রাশিয়া আকাশে রকেট ছুঁড়ছে। তার দেখাদেখি আমেরিকাও ছুঁড়ছে। তোরা যে যাই বল না কেন মায়া, আমার কিন্তু অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়। ওই রকেট যেন গোটা দুনিয়ার মানুষের আত্মা চুরি করে নিয়ে অজানা আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এখানে শুধু পড়ে আছে হাড়-চামড়ার জড়ানো খোলগুলো।

তোর কি মনে হচ্ছে মায়া, আমি ফ্রাস্টেটেড! হতাশ? তাই মানুষ সম্বন্ধে এত উন্নাসিক হয়ে উঠেছি! কাব্যের ভাষায় তোরা হয়তো বলবি, ব্যর্থ জীবনের সুর ফুটেছে তোর কথায়। তাই তোকে এসব কথা বেশি লিখতে ইচ্ছা করছে না। এবার তোকে, সেই গল্পটা বলি—যে গল্পটা আমার জীবনে একটা চমকপ্রদ ঘটনা হয়ে যাবে বলে হচ্ছে......

অনেক লিখেছি উর্মিলা। বাইরে তাকাও। দেখবে আলিপুর পার্ক রোড আর বর্ধমান রোডের মোড় ছাড়িয়ে গাঢ় সবুজ রঙের শিরিষ গাছের সারি বহু-কালের পুরানো। তারাজ্বলা আকাশের নীচে ধ্যানমগ্ন এক একটি অতি বৃদ্ধ মুনির মত দাঁড়িয়ে আছে। দূরে মাঝের-হাট স্টেশনের কাছে রেললাইনের ওপর সিগন্যালের লাল আলো জ্বলছে। চারি-দিকের ঘন অন্ধকারে জবাফুলের মত ফুটে থাকা লাল আলোটাকে তোমার মনে হবে যেন কোন অভিশপ্ত প্রেতাত্মার রক্তচক্ষু তোমাকে ভ্রূকুটি করছে। এই মধ্যরাত্রির নির্জনতায় বেশ করে জেগে

দেখ ঊর্মিলা, মানুষ যেমনই হোক, যার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যেমন হোক, তার সঙ্গে মানিয়ে চলা যায় না? একেবারেই কি অসম্ভব। সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের একটি লোককে আপন করে নেওয়ার ভেতরে প্রতিভা আছে ঊর্মিলা।

তোমার অসুবিধা কি জানো, তোমাকে যে কখনও কাউকে আপন করে নিতে হয়নি। কোন কৃপণতার ভেতরে কি কোন কৃত্রিমতার ভেতরেই তুমি বেড়ে ওঠোনি। তুমি বড় হয়েছো অরণ্যের শাল-শিশুর মত। বর্ষার জল, রোদ ছায়ার স্নেহ তুমি পেয়েছে অকৃপণভাবে। সেই তুমি ফরেস্ট অফিসার অজয় বসুর একমাত্র কন্যা ঊর্মিলা বসু কি করে পঁচিশ বছরের পরিণত মন নিয়ে অন্য একটা লোকের প্রভুত্ব মেনে নেবে।

আর মানুষের প্রকৃতি দেখ কী

অদ্ভুত। যার যার স্বভাব নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকে না। সে যে রকম অন্যকেও সেই রকম করতে পারলে তবে তার শান্তি। যতক্ষণ তুমি তার মত না হচ্ছো, ততক্ষণ তোমার নিস্তার নেই। মানুষের এই স্বভাবের জন্যে পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত হয়ে গেছে।

তোমার মনে পড়ে উর্মিলা, ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারের রাগ রাগ সেই ভারী মুখখানা। সেদিন তুমি সমুদ্রের ধার থেকে ফিরতে রাত করেছিলে—

—এত রাত করলে যে?

—সমুদ্রের বুকের ভেতর থেকে চাঁদ উঠেছিল বুঝলে! বালুচরের চারিদিকে কেয়ার ঝোপে ঝোপে কী সুন্দর কেয়া ফুটেছে আর দূরে হ্যামিল্টন সাহেবের বাগান-বাড়ীর সামনে ঝাউবনে বাতাসের সে কী মাতামাতি—

—বুঝলাম। এত রাত করে বাড়ী ফেরা আমি পছন্দ করি না।

—বাঃ রে। তুমি বেড়াতে ভালবাসো না, আমি বাসি—

—আমি যা পছন্দ করি না, তা করবে না—খুব গম্ভীর হয়ে জলের পাইপের ফুট হিসাব করতে শুরু করল সে। সামনে ছাইদানিতে ফেলে-দেওয়া সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছিল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। আর সমুদ্রের হু-হু বাতাসে তার টি-এ বিলের কাগজগুলো কেমন বিশ্রী একটা খড়মড় আওয়াজ করে উড়ছিল। তুমি উর্মিলা, আর একটিও কথা না বলে চলে গিয়েছিলে। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে কি ভেবেছিলে মনে আছে, উর্মিলা?

আপন আপন স্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে পরস্পরকে ভালবাসা যায় না। পঁচিশ বছর ধরে একটু একটু করে যে চরিত্র গড়ে উঠেছে, সেটাকে কয়েকটা মন্ত্রের জোরে স্বামী হয়ে ভেঙ্গে দিতে চায়। এ কেমন জুলুম? তার চেয়ে এই তো বেশ, যে তুমি থাকবে তোমার পাইপ, ডায়নামো ফিট-করা জল-তোলা মেশিন আর কুলি-কামিন নিয়ে। আমি থাকবো আমার ইচ্ছা আমার পছন্দ নিয়ে। তোমার কাজ শেষ করে যদি সময় পাও আর ইচ্ছে হয় কাছে আসবে। বসবে। যদি আমাকে ভাল লাগে, ভালবাসবে। আদর করে ডাকবে। তা-না! সব সময় তোমার লোহা-পেটানো ইঞ্জিনীয়ারি জোর খাটাবে। কেন রে বাপু, আমার স্বভাবটা কি একটা লোহার রড, যে আগুনে তাতিয়ে আচ্ছা করে পেটালেই তোমার মনের মত আকৃতি নেবে!......

শোন মায়া, তুই আমাকে ভুল বুঝিস না ভাই। আমার সেই গল্পটা বলি-বলি করেও বলা হচ্ছে না। অনেক বাজে কথা ভিড় করে আসছে। সেই গল্প শুরু করার আগে তোকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি ভাই। উপনিষদ বলে, প্রাণো বিরাট। জীবন—তোরা যাকে মরজীবন বলিস, তা একটা কিন্তু প্রাণের প্রবাহ অনন্তকাল থেকে বয়ে চলেছে ভাই। প্রাণকে কেউ নিপিষ্ট করতে পারে না।

তুই শুনলে অবাক হবি, আজও এই চল্লিশের কোঠায় এসে যৌবন যখন বার্ধক্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে চলেছে তখনও আমি একটি সজীব প্রাণের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। মায়া, তোর শুনতে অবাক লাগছে না, চল্লিশ বছরের একটি বাঙালী মেয়ের চোখে এখনও—এখনও স্বপ্ন নেমে আসে।

আমি ভেবে দেখলাম, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের সেই সনাতন বন্ধন মেনে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে থাকলে, দুজনেই তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবো। তাই তাকে মুক্তি দিয়ে চলে এলাম।

কলকাতায় এসে জীবনটাকে নতুন করে গড়তে চেষ্টা করলাম। স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকা যায় কিনা ভাবতে লাগলাম।

একদা দর্শনে অনার্স পড়েছিলাম। সবাই বলল, এম-এ-টা দিয়ে দাও! কলেজে অধ্যাপনা করো। নতুন নতুন ছাত্রী আর বইয়ের সংস্পর্শে তোমার মনটা সজীব হয়ে উঠবে। বই আর পড়াশুনা যারা ভালবাসে, তাদের কাছে সবচেয়ে ভাল লাইন—এই প্রফেসারী।

পাশ করলাম এম-এ। হলাম অধ্যাপিকা। কিন্তু—কিন্তু সব নতুনই এক দিন পুরানো হয়ে যায়। কলেজে পড়াই আর দেখি কলেজের শিক্ষকরাও অত্যন্ত—অত্যন্ত সাধারণ এক চাকুরী-জীবী ছাড়া আর কিছুই না। কারো কোন 'আউটলুক' নেই। কিসে দুটো পয়সা আসে; কোথায় ভাল টিউশানি পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিদ্যার নয়, বস্তুর সাধনা করে চলেছে। এদের ভেতরে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে গেলাম। মনের ভেতরে জেগে উঠল সেই নিরাকার নিরুদ্ধ অস্থিরতা।

হয়ত তোর কাছে এ সব কথা একটু ধোঁয়াটে লাগছে। ভাবছিস কি ও চায়? আমার চাওয়াটা খুবই সামান্য ভাই। ইঞ্জিনীয়ার হও, ডাক্তার হও আর অধ্যাপকই হও না কেন, জীবিকা যার যাই হোক—সেই জীবিকার পায়েই প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয় সঁপে দেবে কেন মানুষ? কেন তার স্বপ্ন দেউলে হয়ে যাবে? টাকা রোজগার, বাড়ী করা, ওপরের পোস্টে যাওয়ার চেষ্টা—এই সব ছোট ছোট স্বার্থের প্রহরীরা জীবনকে পাহারা দেবে কেন?

দূরে-আকাশে চাঁদ ওঠে। চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধা তার বুকের সৌরভ উজাড় করে রাতের বাতাস ভারী করে তোলে। শুধু প্রকৃতিতে নয়—এ যুগের বস্তুবাদী মানুষের জীবনেও প্রাণের লীলা কখনও সখনও দেখা যায়। পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এখনও কেউ কেউ। হিমালয়ের কোন দুর্গম গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কারের স্বপ্ন চোখে নিয়ে তুহিনশীতল বরফের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রাণ দেয়। আমি—

আমি এই প্রাণময় জীবন বড় ভালবাসি মায়া। কয়েক মাস আগে। একদিন মেডিকেল কলেজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য সর্টকাট করে, সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে পড়বো। হঠাৎ দেখি, ব্লাড ব্যাঙ্ক লেখা সাইনবোর্ডটার সামনে একটি বিদেশী যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে একটা ভিখারী। খক খক করে কাশছে। কাশের সঙ্গে দলা দলা রক্ত উঠে আসছে—

—টি-বি-র ওয়ার্ডটা কোথায় বলতে পারেন ম্যাডাম?

—আপনি একে কোথায় পেলেন?

রাস্তায় বসে কাশছিল।

—রাস্তায়! অবাক হয়ে ভাবলাম, রাস্তার যুবকটির জন্য সাগরপারের যুবকটির মনে এত মমতা!

—আপনাদের দেশের লোক অদ্ভুত ম্যাডাম—স্ট্রেঞ্জ! লোকটা কেশে কেশে মরে যাচ্ছে। রাস্তার লোক দিব্যি একবার তার দিকে তাকিয়েই চলে যাচ্ছে। তার মুখে ঘৃণার ছায়া ফুটে উঠল।

প্রশস্ত কপাল তারুণ্যের তেজে জ্বলজ্বল করছে। আর কিসের যেন প্রেরণায় ছটফট করছে তার স্বপ্নাচ্ছন্ন ঘন নীল চোখদুটো।

আমার মন. বলে উঠল, এই সেই দুর্লভ মানুষ, যে আত্মকেন্দ্রিক নয়, যার চোখে স্বপ্ন আছে আর আছে নিশ্চয় ওর বুকের ভেতরে উত্তাল সমুদ্রের মত একটা উদ্দাম প্রাণ!

আলাপ হলো।

ডেনমার্কে বাড়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসীদের হাতে বন্দী হয়ে বার্লিনে থাকে দেড়বছর। জেল থেকে পালায়। কোনরকমে সমুদ্রের ধারে এসে একটা ডেনিশ জাহাজ ধরে আসে অস্ট্রিয়ায়। ভিয়েনার এক পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করে কয়েক বছর কিন্তু কোন একটা কাজ বাঁধাবাঁধিভাবে দীর্ঘদিন তার করতে ভাল লাগে না। যুদ্ধ শেষ হতেই আবার দেশে ফিরে যেয়ে ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেই সে এসেছে ভারতবর্ষে। এদেশের

সমাজব্যবস্থা ও ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনধারা দেখতে এসেছে।

—আপনি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করবেন ম্যাডাম?

—নিশ্চয়ই।

সেই শুরু হল। তাকে নিয়ে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দিনের পর দিন ঝড়ের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কলকাতার অভিজাত পল্লী বালিগঞ্জ, পাইকপাড়া, চৌরঙ্গীতে নিয়ে যেতে চাইলেই হ্যানস বলতো—উহুঁ—উহুঁ ওখানে আপনাদের জীবন আর্টি-ফিসিয়েল—বস্তীতে চলুন—

গ্রে স্ট্রীট ধরে সোজা পূবে যেয়ে গেয়াবাগান বস্তি। সেখানে চারিদিকে বীভৎস নোংরা দেখে আঁতকে উঠেছে। আবার স্যাঁতসেঁতে নোনাধরা ঘরের মেঝেতে বসে কোন মা-কে দেখেছে—বাচ্চাকে আদর করছে: কোথাও বা ঘন হয়ে বর্ষা নেমেছে, জলে থৈথৈ করছে ঘর। বস্তি ভাসছে। ঘরের জল গামলা দিয়ে ছেঁচে ফেলে দিতে দিতে কোন তরুণী গুনগুন করে গান ধরেছে।

—স্পেলণ্ডিড! সুপার্ব।

—কেন?

—এত দুঃখেও এদের প্রাণ মরেনি! একটু গম্ভীর হল হ্যানস। বলল, আমাদের দেশের লোক ভাবতেই পারে না—এই অবস্থায় মানুষ গান করতে পারে!

কলকাতার বাইরে নিয়ে গিয়েছি। দমদম, বারাকপুর, নৈহাটী—ওদিকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মাঠে মাঠে কাজ করছে চাষীরা, কাঠ কাটছে দেহাতী মানুষ। জ্বালানি করবে। কোথাও খেজুর গাছ ঝুড়ছে। কেন কি করছে—কেন করছে—সব বুঝিয়ে দিলাম।

—আচ্ছা, যে যা করছে, ওটাই ওদের একমাত্র জীবিকা?

—হ্যাঁ।

—কত মজুরী।

"তুমি বেড়াতে ভালবাসো না, আমি বাসি।"

—কত আর—দিনে দেড়টাকা দুটাকা হবে।

—ওনলি ওয়ান এ্যাণ্ড হাফ রুপি! ওয়াণ্ডারফুল! কত অল্পে সন্তুষ্ট তোমাদের দেশের লোক। এই দেড়টাকা পেয়েও মাঠে ধান কাটে গান গেয়ে!

হ্যানস আনন্দিত হতো। উচ্ছ্বসিত হতো। আমি চুপ করে থাকতাম আর ভাবতাম, আমাদের দেশের 'ইণ্টেলি-জেন্সিয়া' অর্থাৎ শিক্ষিত জনসমাজ তোমাদের দেশের মতই বস্তুবাদী। 'নাল্পে সুখমস্তি' তাদেরও জীবনের মূলমন্ত্র! সে যাই হোক—

আমি যে ধরনের মানুষ পছন্দ করি, হ্যানস ঠিক সেই রকম লোক। হাসে হো হো করে। অট্টহাসির শব্দ চারিদিকে বয়ে যায় লহরে লহরে। কথা বলে চড়া গলায়। ওকে দেখে মনে হতো, একটা উদ্দাম প্রাণের আবর্ত যেন ওর ভেতরে ভেঙেগ ভেঙেগ পড়ছে নিশব্দে।

আর সবচেয়ে তার বড় গুণ কি জানিস মায়া। যদিও হ্যানস সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষক, তবুও ওর কাব্যময় মন ছিল। ছিল কবিদৃষ্টি।

হালকা সবুজ শাড়ি পরে একদিন তাকে নিয়ে গিয়েছি টিটাগড়ে। সেখানে কুলিদের মহল্লা দেখে আমরা বারাকপুর গান্ধীঘাটে গিয়েছিলাম। গঙ্গায় জোয়ার এসেছিল। ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছিল ছোট ছোট ঢেউ। আর ওপারে শ্রীরামপুর-কোন্নগরের আকাশে কালো মেঘে বর্ষার সমারোহ ঘন হয়ে উঠেছিল। হুহু বাতাসে আমার চুল উড়ছিল, উড়ছিল আমার শাড়ির আঁচল।

—বাঃ স্প্লেনডিড্! আপনাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ম্যাডাম—

—কি রকম?

—বিক্ষুব্ধ এক ঝড়ো জীবনের ভেতর দিয়ে চলেছেন আপনি। ঘনঘোর দুর্যোগের ভেতর দিয়ে যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। তবুও আপনি দৃঢ় পায়ে চলেছেন! আপনার পুরুষালি লম্বা চেহারাটায় আর চোখেমুখে কঠোর প্রতিজ্ঞার ছাপ।

কোপেনহেগেন আর কলকাতা। পুরুষমানুষের স্বভাব সর্বত্র একরকম। মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে ছেলেরা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। বিদেশে গবেষণা করতে এসে ইডেন গার্ডেন, ভিকটোরিয়া মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ আর আউটরামের ঘাটের সন্ধ্যা হ্যানসের জীবনে মিষ্টি রোমাঞ্চকর স্মৃতির সম্পদ হয়ে রইল। বেলুড়মঠের সবুজ মাঠের আর দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর বায়ুসেবীরা কত শান্ত সন্ধ্যায় দেখত এক বিদেশীর যুবকের হাত ধরে চলেছে বাঙালী মেয়ে। কিন্তু তারা জানতো না, কত অসংখ্যবার বাঙলা-দেশের তরুণ প্রেমিকের মত সাগরপারের এই তরুণটিও ধরা গলায় বলতো, তোমার প্রেরণায় আমার কাজ কত এগিয়ে গিয়েছে......

না। মায়া, হ্যানসকে নিয়ে কোন অসম্ভব দেখার মত বোকা মেয়ে ভাবিস না আমাকে। তবুও—

তবুও সৃষ্টির সেই আদিকালের খেলাই তো। মেয়েদের বুঝতে একটুও দেরি হয় না এ খেলা। কিন্তু কোপেন-হেগেন ইউনিভারসিটি থেকে যেদিন তাড়া এল, সেদিন হ্যানস আবার নতুন করে প্রমাণ করে দিল, কচ ও দেবযানীর

উপাখ্যান মিথ্যা নয়। বৃহস্পতিতপুত্র কচের ভেতর দিয়ে যেন দুনিয়ার সমস্ত পুরুষের স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক আর কাজ-পাগল মনের প্রতিফলন হয়েছে। কাঁধি-দীঘার সেই ইরিগেশান ডিপার্ট-মেন্টের ইঞ্জিনীয়ারই শুধু নয়, কাজ অর্থাৎ ডিউটি ছাড়া পুরুষরা আর কিছু বোঝে না। এমন কেজো ভূত, এমন প্র্যাকটিক্যাল জীব আর দুটি নেই পৃথিবীতে।.........

একটু থামো। তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছো উর্মিলা। উঠে এসে একটু খোলা জানালার সামনে দাঁড়াও। দেখবে আলিপুর পার্ক রোডের দুধারে সবুজ সবুজ আবছায়া অন্ধকার জড়ানো ঝাউ-বনের ওপরে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোন অদৃশ্য হাত একটু একটু করে আলো ছড়াচ্ছে। সুসুপ্ত প্রকৃতি আশা করছে, চাঁদ উঠবে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ!

উর্মিলা, আকাশের এই জ্যোৎস্নার আভা, দেবদারুবীথি, ঝাউবন, আর ভুতুড়ে অন্ধকারে ঢাকা ঐ শিরিষগাছ-গুলো মিলিয়ে নিশীথ রাত্রির রহস্যময় পৃথিবীটা তোমার বড় আপন মনে হচ্ছে না?

হচ্ছে। হবে জানি। কিন্তু কাছে এস. হোস্টেলের ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এস। দেখবে পায়ে পায়ে ভয় আর কত রকমের বিপদ তোমাকে জড়িয়ে ধরবে। প্রতিদিনের ব্যবহারে আর সান্নিধ্যে মলিন হয় না বলেই আকাশের মেঘ অত সুন্দর! দূরে থেকে হয়তো ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারকেও তোমার ভাল লাগতো।

তুমি দর্শনে অনার্স পড়েছ উর্মিলা, কিন্তু দর্শনকে তুমি তোমার জীবন-বোধের ভেতরে ব্যাপ্ত করে দিতে পারোনি। তোমার অনার্সের ডিগ্রি নিছক প্রাণহীন একটা আসবাবের মত। তুমি কি জানো না, তোমার চাওয়াটা—তোমার সেই স্বপ্নের মানুষটি, তোমারই মনের ইচ্ছার সৃষ্টি। 'দি ওয়ার্ল্ড এ্যাজ মাই উইল (will)' তোমার এই ইচ্ছার সঙ্গে অন্য লোকের ইচ্ছা নাও মিলতে পারে! তাই বলে ছেড়ে আসতে হবে.........

শোন মায়া, এবার তোকে বলবই সেই গল্পটা। আমার জীবনের প্রায় সব গল্পই তুই শুনেছিস। এবারেরটা অদ্ভুত!

খরস্রোতা নদীর বুকের ভেতরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে রাখে জেলেরা মাছ ধরার জন্য—দেখেছিস তো? আমার মনে হয়, আমি সেই বাঁশের খুঁটি। আমার চারিদিক দিয়ে হ্যানসের মত আরও অনেকের উদ্দাম ভালবাসার স্রোত বয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু খুঁটির মত দাঁড়িয়েই আছি। আজও আমাকে কেউ ভালবাসছে দেখলে আশা হয়, আনন্দ হয়, আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমার খুব ভয়—খুব আতঙ্ক—ঘরবাঁধার সেই দুর্মর বাসনায়। সংসার করলে আবার যদি ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ারের মত তার পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমার ওপর চাপিয়ে দেয় —শুধু স্বামী বলে! আমি মেয়ে। কিন্তু মানুষ। আমারও একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—আত্মা আছে—যদি এসব কিছু—কিছুই মানতে না চায়। আরও—আরও—

ভয় আছে। দৈনন্দিনতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, সংসারের কাদামাটি লেগে যদি সেই স্বপ্নের মানুষটি যে দিনের পর দিন কত রঙীন স্বপ্নের কথা বলছে, কত অসংখ্য মুহূর্তকে ছন্দোসুরভিত করে তুলেছে—সে যদি রুক্ষ, নীরস আর সহানুভূতিহীন হয়ে যায়। যে গানের সুর মধুর, সেই গানটাই শেষের গান হওয়া ভাল নয় কি মায়া! মধুর রেশটুকু থাক। স্বপ্নটুকু থাক। কিন্তু—

এবার যে এসেছে সে যেন বর্ষার ভরা নদীতে নৌকো ছেড়েছে। পালে লেগেছে হাওয়া। আর উন্মত্ত একটা গতির আনন্দে ভেসে চলেছে। সে যেন কখনো থেমে থাকতে জানে না। বিশ্রাম জানে না। বহুকালের স্থবির কোন নিভু নিভু নক্ষত্রের কাছে প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড!

অদ্ভুত ভাল ছবি আঁকে। হয় ঝড়ের ছবি, না হয় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ছবি। যাতে প্রচণ্ড কোন গতি নেই এমন ছবি সে আঁকে না!

বেড়াতে বেরোলে ওর সঙ্গে ছুটে ছুটে হাঁফ ধরে যায়। বেড়ানোর জায়গা-গুলোও অদ্ভুত! চলো হাওড়া স্টেশন। কাটো টিকিট। ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে ব্যাণ্ডেল। ব্যাণ্ডেলে-চুঁচুড়ায় বেড়িয়ে আবার ট্রেনে কলকাতা? উঁহু, তাহলে আর বৈশিষ্ট্য কি! স্টীমলঞ্চে পার হও গঙ্গা। চলো নৈহাটী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ী দেখে শ্যামনগরে কালীবাড়ীর সামনে গঙ্গার পাড়ে কিছুক্ষণ বসে দূরে ওপারে চন্দননগরের আলোর মালার ঝিলিমিলি দেখে সেই রাত্রে বাড়ী ফেরা!

আমার কি মনে হয় জানিস মায়া, সেই স্বপ্ন দেখার সবুজ বয়সে,—সেই উথাল-পাতাল উনিশ-কুড়িতে যে পুরুষের ছবি মনে মনে এঁকেছি—সে এই দীর্ঘ বিশ বছর পরে কোথায় থেকে এল? বারে বারে মনে হয়, সে আসাই এলে, তবে বড্ড—বড্ড দেরি করে এলো। হ্যানসকে ভালো লেগেছিল। আরো অনেককে ভালবেসেছিলাম কিন্তু এই-রকম কখনও হয়নি মায়া, সবসময় কেমন জ্বরজ্বর ভাব। মাথায় কানের দুপাশে কেমন একটা জ্বালাধরা অনুভূতি। পড়তে গেলে তার কথা মনে আসে। ঘুমোতে গেলে তার মুখ চোখ ভাসে। তাহলে চল্লিশ বছর বয়সে কি প্রথম ভালবাসার স্বাদ পেলাম। এই কি তবে প্রথম পুরুষ.........

ভুল-ভুল উর্মিলা, যা তুমি পাওনি, সেই না-পাওয়ার বেদনাটা তোমার চোখের সামনে পাওয়ার একটা রঙীন ছবি তুলে ধরে। মেয়ে হয়ে জন্মেছো। অথচ নারী-জীবনের কোন সাধ তোমার পূরণ হয়নি। তাই তোমার রক্তের ভেতরে জীবাণুর মত কিলবিল করে হাজারো আকাঙ্ক্ষা! সেইজনাই যে পুরুষই তোমার জীবনে আসে—তাকেই তুমি মোহের চোখে দেখ।

উর্মিলা, এই কল্পনাপ্রবণ আর্টিস্ট ছেলেটির কথা এমন করে ভেব না। তুমি দুঃখ পাবে। তাকে দুঃখ দেবে। তার চেয়ে তুমি এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দাও। তুমি প্রাচ্য বিদ্যাপীঠ কলেজের অধ্যাপিকা। কতলোক তোমাকে সম্মান করে। তোমার এ ছেলেমানুষী মানায় না।

চিঠি রেখে উঠে এস। দেখ, আকাশের যেখানে একটু আগে কোন অদৃশ্য হাত আলো ছড়াচ্ছিল, সেখানে বৈষ্ণবের কপালের তিলকের মত বাঁকা চাঁদ উঠছে। চাঁদ উঠছে উর্মিলা—চাঁদ উঠছে। ঝাউবন, দেবদারুবীথি আর বর্ধমান রোডের দুধারে নিবিড় শিরিষ গাছের সারি কেমন আবছায়া স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বিষণ্ণ চাঁদের আলোয় এই নিশি রাত তোমার মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত করুণ অনুভূতি জাগিয়ে দেবে। শোঁ শোঁ বাতাস তোমার কানের কাছে বলবে—কত বড় এই পৃথিবী! কত কোটি কোটি অসংখ্য অগনন জীবন! তোমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আশা স্বপ্ন এখানে কত তুচ্ছ—কত অকিঞ্চিৎকর। একান্ত করে তোমারই সুখদুঃখের স্বার্থ আশা-নিরাশার স্বপ্নের দুর্গ থেকে তোমার মনকে বৃহতের ভেতরে, মহতের ভেতরে অদ্ভুত একটা উদার অনুভবের ভেতরে নিয়ে যাবে এই ম্লান চাঁদের আলোয় ভরা মধ্যরাত্রি...

ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে কেমন হয়েছে জানিস মায়া? যখন সকালের রোদ হোস্টেলের বাগানে লুটিয়ে পড়ে, কামিনীর ঝাড়, চন্দ্রমল্লিকা আর বেলী রোদ গায়ে মেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসে, তখন কেন যেন ভেতরে ভেতরে খুব জোর পাই। মনে হয়,

কিছুই অসম্ভব নয়। আমি পারবো—পারবো অশান্ত সেই ঝড়কে বুক পেতে গ্রহণ করতে। আর অমনি মনের পটে ছবির পর ছবি ফুটে উঠতে শুরু করে। বেনারসী শাড়ি... আলো... লোকজন... হৈ হৈ ভিড় আর চীৎকার! যুঁইফুলের পাপড়ির মত চন্দনের ফোঁটা দেওয়া মুখাবয়ব। ঠোঁটের প্রান্তে লাজুক হাসির ঝিকিমিকি! আরও কত—কত স্বপ্ন দেখি আর বুকের ভেতরটা অজানা একটা ব্যথায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে চায়—সেই সঙ্গে আশ্চর্য একটা মিষ্টি অনুভূতি।

আবার যেই গাছপালায় ঘেরা বর্ধমান রোডের সেই সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হোস্টেলের চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া নামে। ঝাপসা অন্ধকার একটু একটু করে দূরে নিউ আলিপুরের বড় বড় বাড়ীগুলোকে অবয়বহীন করে তোলে, তখন কেন যেন মনে হয় আমার মনের ভেতরের আশার রঙীন শিশুদের ওই অন্ধকার গ্রাস করতে আসছে। আমার মনের সব স্বপ্নকে মুছে দেয় এই আসন্ন রাত্রির অন্ধকার। মনে হয়, না—না ভুল—সব ভুল। কখনো কেউ আমাকে ভালবাসেনি। বাসবে না। হোস্টেলের এই অন্ধকার ঘরেই সে যেন অনন্তকাল ধরে বন্দী হয়ে আছে। থাকবে। এখান থেকে কেউ তাকে আলোর রাজ্যে, জীবনের ভেতর নিয়ে যাবে না। তারপর—তারপরে একদিন শ্বাসরোধী অন্ধকার ঘেরা এই ঘরেই মৃত্যু এসে দাঁড়াবে। আর তার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবে।

আলো-নেভানো অন্ধকার ঘরে নিজের অজানিতেই কখন হাত উঠে আসে মুখে, গালে, কপালে-গালের হাড়-দুটো উঁচু উঁচু মনে হয়। আর বেশ বুঝতে পারি চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। গালের হাড়দুটোর ওপরে জলের ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে জমে থাকে। তারপর কখন আমার ঘুম আসে আর বাতাসের ভেতরে অক্সিজেনের কল্যাণে জল শুকিয়ে যায় (ভাগ্যিস বাতাসে অক্সিজেন ছিল), শুধু দাগটা থাকে। ঘুম ভেঙ্গে গেলেই চোখের নীচে হাত বুলাই। চোখের নীচে কি কালির দাগ পড়েছে। চোখের জলের দাগটা কি পুরানো ঘায়ের মত মনে হচ্ছে? কখন—কখন ভোর হবে। সকাল হবে। প্রাতঃকালীন প্রসাধনের সময় পাউডার পমেডের প্রলেপে রাত্রির দুশ্চিন্তার সব স্বাক্ষর তুলে ফেলে দেবো। ভোরের আলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি মায়া!

ভোর হয়। বহুকালের পুরানো এই পৃথিবীটা নতুন সাজে সেজে ফিক-ফিক করে হাসে। আমিও অভিসারিকার বেশে সেজে তার বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। দ্রৌপদীর শাড়ির মত রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কেন অফুরান হয় না। কিন্তু তা হয় না। আবার রাত্রি আসে।

তোরা যে যাই বল মায়া, চল্লিশ বছরে আবার বিয়ের সাজে সাজলাম। কলকাতার শ্রেষ্ঠ ইংরাজী বাজনা আনালাম। অনেক - অনেক আলো দিয়ে ভাড়া-করা বিয়েবাড়ীকেই ইন্দ্র-পুরী করে তুললাম। এল সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মী যে যেখানে আছে। লোকে লোকারণ্য বাড়ী। চারিদিকে মেয়েদের রঙীন ভিড়। এখানে-ওখানে জল-তরঙ্গের মত হাসির শব্দ। টুকরো-টুকরো কথা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সকলের মুখেই এক কথা! এই বয়সেও কী সুন্দর মানিয়েছে উর্মিলাকে। বাড়ীর চারিদিকে মঙ্গলশঙ্খের শব্দ—

ভোরে মেটাল বক্স কোম্পানীর সিটি দেওয়ার শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গল। সকালের আলোয় আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় লজ্জা পেলাম মায়া। দুঃখও হল। ছিঃ ছিঃ এই বয়সেও বিয়ের স্বপ্ন দেখছি। এখনও - এখনও তাহলে স্বপ্ন আছে। মনে হল, কোন উপায়ে এই স্বপ্নটুকুকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না? যদি এই খানেই ছেদ টেনে দেওয়া যায়—তাহলে এই মধুর অনু-ভূতিটাই সত্য হয়ে থাকবে। বেশি চাইতে গেলে যদি সব হারায়—যদি সে-ও ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনীয়ারের মত হয়ে যায়, রক্তের ভেতরে আবার সেই ভয়ের বীজাণু আবার কিলবিল করে উঠল। সেইদিনই—

সেইদিনই বুঝলি মায়া,—তোকে বলতে বড় কষ্ট হচ্ছে—কি করলাম জানিস? তাকে ডেকে নিয়ে গেলাম ভিক্টোরিয়া মনুমেণ্টের মাঠে। কাছে-দূরে যতদূরে চোখ যায় সমস্ত মাঠজুড়ে কেমন সবুজ অন্ধকার! শোঁ শোঁ বাতাসে প্রেতিনীর কান্নার শব্দ। আমার ভালবাসার মানুষটির হাতে হাত রাখলাম।

—তুমি কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।

—বলো, চুপচাপ আছো কেন?

আমার বুকের ভেতরে যেন রাতের অন্ধকারে ঢাকা গড়ের মাঠের বাতাস মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরছে! শরীরের সব শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়ছে। মাথার ভেতরে উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে।

—বলো। ও কি তুমি কাঁদছো!

আমি আর সামলাতে পারলাম না। বললাম সেই কথা যা আমি বহুজনকে বলেছি। কিন্তু এত কষ্ট কখনও হয়নি। ঢোক গিলে থেমে থেমে বললাম পারবো না—হবে না—আমি—

—পারবো না? সে যেন আঁতকে উঠল। আর আমি সেই আবছায়া অন্ধ-কারে একটা কান্নাকে বহন করে ঝড়ের মত ছুটে পালিয়ে এলাম। বুঝলি মায়া, একেবারে পালিয়েই এলাম........

উর্মিলা! বাইরে তাকিয়ে দেখ, রাত্রির অন্ধকারের দুস্বপ্নে আচ্ছন্ন পৃথিবীর দূরদিগন্তে একটু একটু করে ভোরের আভা জাগছে। চিঠি রেখে উঠে এস উর্মিলা। এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভোরের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বৃহতের ভেতরে মনটাকে ছড়িয়ে দাও। ভেবে দেখ, বহুকালের পুরানো, জীর্ণ এই পৃথিবীও সকালের সোনার রোদে ঝলমল করে উঠবে। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসেও তোমার ও মরালী-মন কল্পনার পাখায় ভর করে কোন নিরুদ্দেশ শূন্যে আজও—আজও উধাও হয়ে যায়। এখন—এখনও তুমি স্বপ্ন দেখ। তোমার মনে তারুণ্যের স্পর্শ রয়েছে। তোমার বেদনাশীর্ণ দীর্ঘ জীবনের ঘন অন্ধকারের ভেতরে আশা আর স্বপ্ন-গুলোকে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রেখে পরমায়ুর বাদবাকী দিনগুলো হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে পারো না?

সূর্য উঠছে—সূর্য উঠছে উর্মিলা! দেখ চারিদিকে ঈশ্বরের অপার মহিমার কী লীলা! গাছের পাতায় পাতায় প্রাণের স্পন্দন। পৃথিবীর দিকে দিকে জীবনের অন্তহীন প্রবাহ বয়ে চলেছে! তোমার বন্ধুর কাছে লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেল উর্মিলা! তুমি যে দুর্বল—ভয়ংকর দুর্বল আর খুব দুঃখী, —এই নির্মম সত্যটার বেদনা-করুণ একটা রাগিণীই কি তোমার চিঠির ছত্রে ছত্রে বাজছে না? জেনে রেখ জীবন-বিমুখতা মৃত্যুর নামান্তর আর দুঃখ, শোক হতাশার চেয়েও জীবন অনেক—অনেক বড়। এই সত্যটাকে স্বীকার করে নিয়ে ছিঁড়ে ফেল—ছিঁড়ে ফেল উর্মিলা তোমার এই চিঠি!

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

গত ২৩শে নভেম্বর 'পেইন্টার্স এন্ড স্কাল্পটরস এসোসিয়েশন' আর্টিস্ট্রি হাউসে তাঁদের সংস্থার প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তৈলচিত্র, জলরং, প্যাস্টেল, ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে উন-চল্লিশটি শিল্পবস্তু দেখান হয়েছে। এ'রা এক গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও কোন এক বিশেষ শৈলীর অনুগামী নন। সমূর্ত এবং বিমূর্ত দু-রকম ছবিরই চর্চা করেন দেখা গেল। ছোট দু-খানি ঘরের মধ্যে ছবি সাজান ভালই হয়েছে। লালুপ্রসাদ সাহা 'ফ্লাওয়ার ভাস' (১) ছবিতে বেশ একটি প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছেন। ইশা মহম্মদ-এর 'অফিস মেশিন' (৪) ছবিটির বর্ণপ্রয়োগ সুন্দর। দেবদাস ব্যানার্জীর দু-খানি প্যাস্টেলে কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় (২৬, ২৭)। ভাস্কর্যের মধ্যে চিন্তামণি করের 'মনোলিথ' (২৮) আকারে বৃহৎ। সুরজিৎ দাসের 'মিল্ক মেইড্' (৩২) এবং নির্মলেশ দেও ধবল দেও-এর 'সুইমার্স' (৩৫) ও 'গেইশা গার্ল' (৩৬)-এ সুন্দর একটি ছন্দবোধ আছে। সমস্ত প্রদর্শনীতে একটা নিম্ন-তম মান রাখার চেষ্টা আছে।

১লা ডিসেম্বর 'ইন্ডো কন্টিনেন্টাল আর্টিস্ট্' সংস্থার শিল্পী শ্রীমতী সম্প্রীতি দেবীর একটি একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গৃহে। সম্প্রীতি দেবী কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিল্প শিক্ষা-লাভ করেননি। অপরের সাহায্য বিনা যেটুকু শিল্পবিদ্যা আয়ত্ব করা সম্ভব তাই করেছেন। শিল্পী-জীবনের গোড়া থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত আঁকা ত্রিশটি জল রং ও তেল রংয়ের ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী করা হয়েছে। মনে হয় ছবি বাছাইয়ে বেশী সময় দেওয়া হয়নি। ফলে ছবির মান ঠিক উঁচু রাখা যায়নি। আশা করি এর পরের প্রদর্শনীতে আরো ভাল ছবি দেখতে পাবো।

ভাস্কর্য-শিল্পী নির্মলেশ দেও ধবল দেও কর্তৃক সৃষ্ট 'গেইশা গার্ল' (কাঠের)।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্য গত ৬ই ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস চার থেকে পনেরো বছরের ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পশ্চিম-বঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী এর উদ্বোধন করেন। দেশের সংকটের সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পেছিয়ে থাকেনি। তাদের সাধ্যমত শিল্পকার্য নিয়ে দেশের সাহায্যে তারাও এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা দুশো পঁয়তাল্লিশটি ছবির এই প্রদর্শনীটি সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে মূক বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলি চমৎকার। প্রদর্শনীটি ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে। আশা করি প্রদর্শনীর মহৎ উদ্দেশ্য সফল হবে।

এযুগের কমনওয়েলথ শিল্প

গত ৬ই নভেম্বর রাণী এলিজাবেথ লণ্ডনে যে নূতন কমনওয়েলথ ইনষ্টি-টুটের উদ্বোধন করেন, তারই আর্ট গ্যালারিতে "কমনওয়েলথ আর্ট টুডে" বা "এযুগের কমনওয়েলথ শিল্প" নামক এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে; এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেছে ভারত সহ ২৪টি কমনওয়েলথ দেশ।

প্রদর্শনীটি ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। প্রদর্শনীর লক্ষ্যই হল কমন-ওয়েলথ এযুগে কি ধরণের উৎকৃষ্ট শিল্পোৎপাদন করতে পারছে তারই পরিচয় দান করা।

প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের ১৮৫টি নিদর্শন। ১৭০ জন শিল্পী (সকলেই জীবিত) এতে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এই শিল্পকর্মগুলি প্রথম পর্যায়ে ২৪টি দেশের প্রত্যেকটির শিল্প কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়; প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য সর্বশেষ নির্বাচন হয় ব্রিটেনে। নির্বাচিত শিল্প-কর্মগুলির একটা বড় অংশ আসে ভারত, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া থেকে।

প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ এই উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রস্তুত করেছেন, এই ক্যাটালগের ভূমিকায় প্রত্যেকটি দেশের শিল্প চর্চার একটা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণী প্রদান করা হয়েছে; এই বিবরণী যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই শিল্প বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় নিদর্শনগুলির জন্য এই বিবরণী লিখেছেন শ্রী বি. সি. স্যান্যাল। তিনি ভারতীয় শিল্পে "বেঙ্গল স্কুল মুভমেন্ট" কিভাবে নব-জীবন সঞ্চারিত করেছে তার বর্ণনা করে বলেন, "ভারতীয় শিল্পের যত রকমের ব্যাখ্যাই হোক না কেন একথা ঠিক যে, এই শিল্প সর্বাবস্থায় ভারতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে।"

শিল্পী : সম্প্রীতি দেবী

সবশুদ্ধ ২২টি ভারতীয় শিল্পকর্ম এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। এর অধিকাংশই জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত এবং বিশেষভাবে অবিনাশ চন্দ্রের "কল্প ফল"-এর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। চিত্রটিতে কমলা রঙ ও হলদে রঙ এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা পশ্চিমী বিচারকদের মতে ঐতিহ্যগত-ভাবে ভারতীয়।

অরুণ বসুর "ম্যান উইথ গোট" চিত্রটিতে পিকাসোর প্রভাব সুস্পষ্ট; কে, শ্রীনিবাসালুর "আর্থ অ্যান্ড লাইফ" চিত্রটিতে শিল্পীর প্রাতিস্বিকতা এতদূর স্পষ্ট যে, অন্যান্য চিত্রের মধ্য থেকে এটিকে সহজেই আলাদা করা যায়। আর একটি আকর্ষণীয় শিল্পকর্ম হল রাঘব কানেরিয়ার ব্রোঞ্জ নির্মিত গোবৎস, ভারত সরকার এই বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য শিল্পকর্মটি ধার দেন।

ব্রিটিশ বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ড ও ভিকটর প্যাসমোর-এর কয়েকটি সম্প্রতি অঙ্কিত চিত্র; হেনরি মুরের তৈরি এক বিরাট উল্লম্বী মূর্তির দুদিকে এই চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়েছে; এই মূর্তিটিও এবার এখানে প্রথম প্রদর্শিত হল।

দেশে বিদেশে

॥ ছয়-রাষ্ট্র সম্মেলন ॥

চীন ও ভারতের বিরোধ মীমাংসাকল্পে, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক বিশেষ উদ্যোগী হন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি সিংহল সমেত এসিয়া ও আফ্রিকার ছয়টি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটি সম্মেলন কলম্বোয় আহবানের প্রস্তাব করেন। অপর যে পাঁচটি রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের নাম কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানা। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই শ্রীমতী বন্দরনায়েকের আহবানে সাড়া দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ১০ই ডিসেম্বর হতে কলম্বোয় এই ছয়-রাষ্ট্র সম্মেলন শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমান অবাঞ্ছিত বিরোধের মীমাংসাকল্পে সিংহল ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির এই উদ্যোগকে ভারত পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং তাদের কাছে ভারতের পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাবলম্বন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে যাত্রা করেন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ও আফ্রিকা ও আরব রাজ্যগুলিতে যান আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন ও ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীআর কে নেহরু। ভারতের সকল প্রতিনিধিই সফরান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, তাঁদের দৌত্য সফল হয়েছে। সকল দেশই তাঁদের বক্তব্য ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছে এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের অনেক ভুল ধারণা নিরসন হয়েছে।

অপর পক্ষে, ৫ই ডিসেম্বর পিকিঙ থেকে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ, কলম্বো সম্মেলন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই চীনের কূটনৈতিক মহলে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছে। এই সম্মেলন আহূত হওয়ার ব্যাপারে চীন প্রথমে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল, কিন্তু এখন চীন এব্যাপারে মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে, সম্মেলনে কোন রাষ্ট্রই চীনের সর্বশেষ প্রস্তাব বা ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের সীমান্তে স্থিতাবস্থা সৃষ্টির দাবীতে সমর্থন

গুপ্তচর হতে সাবধান!

জানাবে না। এমন কি চীনের সবচেয়ে বড় সমর্থক বলে প্রচারিত ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকেও যে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা হয়েছে তাতে নাকি চীনকে ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই চীন নাকি ইন্দোনেশিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে যে ঐ প্রস্তাব তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না।

॥ মিগ বিমান ॥

মিগ বিমান সম্পর্কিত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে।

কিছুদিন আগে এক সংবাদে বলা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ভারতে যে মিগ বিমান আসার কথা ছিল তা যথাসময়েই আসবে এবং মিগ বিমান পরিচালনার ট্রেনিং নিতে ইতিমধ্যেই আটজন বৈমানিক মস্কোয় চলে গেছেন। আর উড়িষ্যায় যে মিগ বিমানের কারখানা স্থাপনের কথা আছে তাও যথাসময়ে স্থাপিত হবে। কিন্তু এই সংবাদের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই আবার প্রচারিত হয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে মিগ বিমান সরবরাহ না করার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং ডিসেম্বর মাসে মিগ বিমানের যে প্রথম চালান আসার কথা ছিল তা আসবে না। ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভারতের বর্তমান নীতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাতে পরবর্তী সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবি কে নেহরু ও বৃটেনের কমনওয়েলথ সচিব মিঃ ডানকান স্যান্ডসও এ সম্বন্ধে বলেন যে, কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভারতের সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে মিগ বিমান পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়ে যাবতীয় অনুমান ও গবেষণার প্রতিবাদ করে বলেছেন— সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে স্পষ্ট করে একথা জানিয়েছে যে, ভারতকে মিগ বিমান সরবরাহ ও ভারতে মিগ বিমান নির্মাণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার মত কোন কারণই ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচবনও জানান যে, সোভিয়েট সরকার মস্কোস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই মাসের মধ্যেই অথবা তার "অল্প কিছু পরেই" প্রতিশ্রুত মিগ বিমান ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শুধু কিউবার গণ্ডগোলের জন্যই সব কাজ ঠিকমত সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। নইলে মিগ বিমানের প্রথম চালান ইতিমধ্যেই ভারতে এসে যেত। এরপরেও ১৯৬৩ ও '৬৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতিমত বিমান সরবরাহ করে যাবে এবং ভারতে বিমান নির্মাণের কারখানার কাজও শুরু হয়ে যাবে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৯শে নভেম্বর—১৩ই অগ্রহায়ণ ঃ কাশ্মীর সম্পর্কে পাক্-ভারত আলোচনার সিদ্ধান্ত—প্রারম্ভে মন্ত্রি-পর্যায়ে ও পরে নেহরু-আয়ুবে বৈঠকের ব্যবস্থা—বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত উদ্যোগের ফল।

'চীনের সর্বশেষ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা আরও বিভ্রান্তিকর'—কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের মন্তব্য।

শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর নূতন পত্র—সর্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে যুদ্ধবিরতি-ব্যবস্থা ভঙ্গের হুমকী।

৩০শে নভেম্বর—১৪ই অগ্রহায়ণ ঃ 'কাশ্মীর বিভাগের ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার কথা ভিত্তিহীন'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

লেঃ জেনারেল বি এম কাউলের স্থলে লেঃ জেনারেল ম্যানেকশ ইস্টার্ণ কমাণ্ডের কোর কম্যাণ্ডার নিযুক্ত।

চীনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী—পিকিং-এর নিকট ভারতের নূতন লিপি প্রেরণ।

১লা ডিসেম্বর—১৫ই অগ্রহায়ণ ঃ 'চীন এক তরফা সীমা স্থির করিতে পারে না'—চৌ-এর সর্বশেষ লিপির উত্তরে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সীমান্ত হইতে চীনা সৈন্য প্রত্যাহারের সঠিক সংবাদ ভারত সরকার অনবহিত—আক্রমণকারীরা সরিয়া গেলে পরিত্যক্ত এলাকায় অসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত—কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতি।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ ঃ 'নেফা ও লডাক অঞ্চল হইতে চীনা সৈন্যদের অপসারণ করা হয় নাই'—কর্তৃপক্ষীয় সামরিক মহলের সংবাদ।

জাকার্তা হইতে ফিরিবার পথে বিমানে রাষ্ট্রপতির পুত্র ডঃ এস গোপাল (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধিকর্তা) ছুরিকাহত—সহযাত্রী আততায়ী গ্রেপ্তার।

'ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না ঃ চীনা আক্রমণ প্রতিরোধই সমর প্রস্তুতির উদ্দেশ্য'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে শ্রীনেহরুর আশ্বাস।

৩রা ডিসেম্বর—১৭ই অগ্রহায়ণ ঃ 'আক্রমণকারী চীন—ভারত ছাড়'—চীনা বাণিজ্য দূতাবাসের (কলিকাতা) সম্মুখে দুর্জয় ছাত্রসমাজের সরোষ ধিক্কার—মহানগরীতে ছাত্রদের অভূতপূর্ব বিক্ষোভ মিছিল—সারা বাংলা চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ দিবস পালন।

'শুধু পিছন হইতে চীনাদের সৈন্যাপসরণের আভাস— পুরোবর্তী ঘাঁটিগুলিতে এখনও চীনাদের অবস্থান'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

ভারতের উপর দিয়া চীনের সর্বপ্রকার অসামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ।

৪ঠা ডিসেম্বর—১৮ই অগ্রহায়ণ ঃ 'প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসেই রাশিয়া ভারতে 'মিগ' বিমান পাঠাইবে'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

পাক্-ভারত সীমান্ত হইতে প্রচুর সৈন্য (ভারতীয়) অপসারিত,—প্রত্যাহৃত সৈন্যদের চীনের বিরুদ্ধে নিয়োগের ব্যবস্থা—ভারত সরকারের বিবৃতি।

'যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও ভারতীয় সৈন্যদের উপর চীনাদের গুলীবর্ষণ'—লোকসভায় শ্রীনেহরু।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে ভারতের পক্ষে সমর্থন আদায়ে কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গের ইউরোপ (মস্কো সহ বিভিন্ন স্থান) সফরে যাত্রা।

৫ই ডিসেম্বর—১৯শে অগ্রহায়ণ ঃ 'হানাদার চীনা বাহিনীকে ভারতভূমি হইতে হটিতেই হইবে'—গোহাটির জনসভায় শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা—গোহাটি হইতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন সহ প্রধানমন্ত্রীর তেজপুরে উপস্থিতি।

কলিকাতার অসামরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে 'মাস্টার প্ল্যান' সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

॥ বাইরে ॥

২৯শে নভেম্বর—১৩ই অগ্রহায়ণ ঃ চীনে রাশিয়ার সমস্ত বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধের সংবাদ।

১লা ডিসেম্বর কলম্বো সম্মেলন (চীন-ভারত সংঘর্ষ প্রশ্নে সিংহলী প্রধানমন্ত্রী আহূত) অনুষ্ঠানের জন্য পিকিং-এর পীড়াপীড়ি—সত্ত্বেও আরব প্রজাতন্ত্র সহ আফ্রো-এশীয় দেশগুলির উপর প্রবল চাপ।

ঢাকা হাইকোর্টে পাকিস্তানে দণ্ডিত লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্যের (ভারতীয়) হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন।

৩০শে নভেম্বর—১৪ই অগ্রহায়ণ ঃ পাঁচ বৎসরের জন্য উ থান্ত সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল নির্বাচিত।

ভারত সীমান্ত হইতে চীনা সৈন্যাপসরণ সুরু হইয়াছে বলিয়া পিকিং সরকারের দাবী।

১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় জাতি আফ্রো-এশীয় সম্মেলন (কলম্বো-এ আহূত) স্থগিত।

১লা ডিসেম্বর—১৫ই অগ্রহায়ণ ঃ ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আক্রায় ঘানা প্রেসিডেন্ট নক্রুমার সহিত ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের আলোচনা।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ ঃ সমগ্র সিকিম রাজ্যে গণ-নিরাপত্তা বিধি জারী—মহারাজার আদেশনামা।

৩রা ডিসেম্বর—১৭ই অগ্রহায়ণ ঃ 'চীন-আলবানিয়া জোট আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের ক্ষতি করিয়াছে'—চীনের যুদ্ধবাদী নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে ইতালির কম্যুনিস্ট নেতা মিঃ তোগলিয়াত্তির অভিযোগ।

পাকিস্তানী মাঝি-মাল্লাদের (জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানী সংশ্লিষ্ট) ধর্মঘট মিটাইবার জন্য ঢাকায় চতুর্দলীয় বৈঠক।

'ভারত চীনের নিকট নিজের কোন অঞ্চলই ছাড়িয়া দিবে না'—দিল্লী সফরান্তে কমন্স সভায় বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব মিঃ স্যাণ্ডস-এর উক্তি—কাশ্মীর সম্পর্কিত বিরোধ (পাক্-ভারত) মীমাংসার আশা পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

৪ঠা ডিসেম্বর—১৮ই অগ্রহায়ণ ঃ জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীর দুই হাজার পাকিস্তানী কর্মীর (নাবিক) ৫০ দিনব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

৫ই ডিসেম্বর—১৯শে অগ্রহায়ণ ঃ 'পাকিস্তান চীনের সহিত আক্রমণ চুক্তির জন্য উদ্গ্রীব'—পাক্ প্রেস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ।

কঙ্গোলী বাহিনী কর্তৃক কঙ্গোলো শহর দখল—অবিরাম যুদ্ধের পরিণতি।

সমকালীন সাহিত্য

॥ লেবাননের কবি ॥

অভয়ঙ্কর

"ধর্ম নয়, বিজ্ঞান নয়, রূপের কাছে আর কিছু নেই—রূপসৃষ্টি করে যাও, আর সব কিছু চুলোয় যাক।"

এই উক্তি করেছেন লেবাননের জাতীয় লেখক কাহলিল জীব্রাণ। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও চিত্রশিল্পী। কোটি কোটি আরবী-ভাষাভাষী মানুষ তাঁর রচনা পাঠ করে আনন্দ পান। তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব প্রাচ্যদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে দূরদূরান্তরে প্রসার লাভ করেছে। বহু বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তাঁর অনেক রচনা অনুবাদ করেছেন নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

কাহলিল জীব্রাণের জন্ম হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লেবাননের এক অখ্যাত গ্রামে, নাম তার বিস্আরে। এই গ্রামের সন্নিহিত দেবদারুকুঞ্জ অতি পবিত্র বলে বিবেচিত। এখানকার কাঠ দিয়ে নাকি সম্রাট সলোমান তাঁর জেরুজালেমের উপাসনামন্দির গড়েছিলেন।

এই গ্রামে পাঠ সাঙ্গ করে, ভাই-বোনদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে চলে যান জীব্রাণ বারো বছর বয়সে। সেখানে তিন বছর কাটানোর পর তাঁর জননী বেরুটের বিখ্যাত বিদ্যামন্দির মাদ্রাসা আল-হিকমাতে তাঁকে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। স্নাতক হয়েই জীব্রাণ সিরিয়া ও লেবাননের ঐতিহাসিক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন-গুলি পরিদর্শন শেষ করে ১৯০২-এ লেবানন ত্যাগ করলেন, তারপর আর সেখানে ফেরেননি।

প্যারীতে আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে ভর্তি হয়ে তিনি বিখ্যাত ভাস্কর র‍্যদার কাছে চিত্রবিদ্যা শিখলেন। জীব্রাণের ছবি সারা পৃথিবীতে প্রদর্শিত হয়েছে। মরমীর ভঙ্গীতে ছবি এঁকেছেন জীব্রাণ। তার মধ্যে আছে মানব-হৃদয়ের গভীর মর্মবাণী।

জীবনের শেষ কুড়ি বছর যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে ১৯৩১-এ লোকান্তরিত হয়েছেন জীব্রাণ। এই শেষের দিনগুলিতে তিনি ইংরাজীতেই লিখেছেন বেশী। বিখ্যাত কবি জর্জ রাসেল বলেছিলেন—**"I do not think the East has spoken with as beautiful a voice as in THE PROPHET OF Kahlil Gibran, since the GITANJALI of Rabindranath Tagore."** জীব্রাণের "প্রোফেট" এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী সাহিত্যপাঠকের কাছে বিশেষ সমাদৃত।

কাহলিল জীব্রাণের জীবনীকার বারবারা ইয়ং-এর মতে এই কবির জীবন ছিল তাঁর বাণীরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর জগৎ ছিল 'দেবোপম' মানুষের জনাকীর্ণ সমাবেশ। মানুষকে তিনি এঁকেছেন অপরূপ সৌন্দর্যসুষমায় মণ্ডিত করে। দেহের মধ্যে পার্থিব প্রকৃতি নেই, আত্মা অতি সূক্ষ্ম আবরণে মণ্ডিত। শুধু যে সব চরিত্র এঁকেছেন তার মধ্যেই যে এই বৈচিত্র্য তা নয়, সেই বৈচিত্র্য ছিল তাঁর জীবনে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর দোষ-ত্রুটিহীন জীবন কদাচিৎ মেলে। তাঁর মন ছিল কল্পলোকবিহারী।

এই মনোভঙ্গী নিয়েই তিনি ছবি এঁকেছেন ও লিখেছেন। যে কালে ছবি আঁকায় সকল অন্তর ঢেলে দিয়েছেন সেই কালেই জীব্রাণ লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি প্রোফেটের" প্রথম সংস্করণ, পরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। এই পরিবর্তিত সংস্করণ সারা বিশ্বে এক আশ্চর্য আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিরিশের শতকে এবং চল্লিশেও জীব্রাণের প্রভাব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

এই কালে তিনি যে সব গদ্য-কবিতা রচনা করেছেন তা **"Tears and Laughter", "Secrets of the Heart"** এবং অতি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে 'A Treasury of Kahlil Gibran' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডটিও অনুবাদ করেছেন এন্টনি আর ফেরিস মূল আরবী থেকে।

এন্টনি রিজকাল্লা ফেরিসের জন্মও লেবাননে, ১৯৩১-এ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীতে কাজ করেছেন। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বর্তমানে অধ্যাপনা করেন। কাহলিল জীব্রাণের অসংখ্য রচনার সার্থক অনু-বাদক হিসাবে তিনি খ্যাত।

রিজকাল্লা ফেরিসকৃত অনুবাদ "সেকেন্ড ট্রেজারী" গ্রন্থটি যাঁদের পাঠ করার সুযোগ হবে তাঁরাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন যে, এই মহাকবির কাব্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার কি আশ্চর্য মিল।

যৌবনে কবি জীব্রাণ "দি প্রোফেটে" এমন এক বিশ্বের কল্পনা করেছেন যা সর্বাঙ্গসুন্দর ও অশুভস্পর্শমুক্ত এক অকলঙ্ক জগৎ। সে পৃথিবীতে 'আকাশ-ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা গান', সেই আনন্দলোকে নেই অজ্ঞানতার অন্ধকার, আছে এক সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন জগৎ, যেখানে আছে দুর্নীতিহীন প্রগতিশীল পরিবেশ। ন্যায় এবং প্রজ্ঞা পাশাপাশি সেখানে বিচরণশীল। একতার একসূত্রে সহস্র জীবন সেখানে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু কবি জীব্রাণ তাঁর কল্পলোকের এই জগৎ থেকে রূঢ়, রুক্ষ, বাস্তব জগতের ভীষণ আকৃতি দেখে আতঙ্কিত হয়েছেন, নৈরাশ্যে তাঁর মন ভরে উঠেছে।

জীব্রাণ রাষ্ট্রপ্রধানদের মনে করতেন প্রকৃত ধর্মাবতার। তাঁরা ন্যায় ও প্রজ্ঞার আদর্শ স্থাপন করবেন এই ছিল তাঁর আশা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের শোষণ নীতি এবং বিলাসবাহুল্য তাঁকে আহত করেছে, জীব্রাণ রাষ্ট্রপ্রধানদের 'অত্যাচার'-কেই বলেছেন এর অপর নাম 'রাজনীতি', তারপর লেবাননের এই মনীষী আরবী সংবাদপত্র, গ্রন্থ এবং সাময়িকপত্রে বহু জ্বালাময়ী নিবন্ধ রচনা করেছেন। এন্টনি রাজকাল্লা ফেরিস সম্পাদিত **'A Treasury of Kahlil Gibran'** নামক গ্রন্থটিতে এই জাতীয় অনেক রচনা সংকলিত হয়েছে।

জীব্রাণের ধ্যানের জগৎ ছিল এক সংবেদনশীল, ন্যায় ও চিন্তার জগৎ। এ জগতের মানুষ শঠ এবং বঞ্চকের প্রতারণায় প্রতারিত হয় না, সংস্কারকে আঁকড়ে বসে থাকে না। তাদের কাছে একমাত্র শিখা প্রজ্বলিত, তার নাম জ্ঞানের শিখা, অজ্ঞতার অন্ধকার পথকে সেই অনির্বাণ জ্যোতি উজ্জ্বল করে রাখে। জীব্রাণের নিজের জীবনটিকে এইভাবেই গড়ে নিয়েছিলেন, সংস্কার ও গোঁড়ামির অন্ধকারকে তিমিরবিদারী জ্ঞানের সূর্যা-লোক বিতাড়িত করেছে। তাঁর রচনার পরিচয় হিসাবে Thoughts and Mediations নামক অংশের 'স্বপ্ন' নামক একটি অনুচ্ছেদ এখানে অংশতঃ উদ্ধৃত করছি :

"আমি দেখলাম শৈলচূড়ায় তিনটি ছায়ামূর্তি বসে আছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে পড়লাম, যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে।

যেন ইন্দ্রজালের বশে সেই ছায়া-শরীরের কিছু দূরে আমার গতি স্তব্ধ হল। সেই সময় ছায়াশরীরীদের একজন উঠে দাঁড়ালেন, যেন সমুদ্রবক্ষ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল :

"প্রেমহীন জীবন যেন ফল-ফুলহীন বৃক্ষ। রূপহীন প্রেম যেন গন্ধহীন পুষ্প, বীজহীন ফল...জীবন, প্রেম ও রূপ একের ভিতর তিন, এদের পরিবর্তন করা যায় না, পৃথক করাও চলে না।"

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির বাণী জল-প্রপাতের ছন্দে ঝঙ্কৃত হল—'বিদ্রোহহীন জীবন যেন বসন্তহীন ঋতুরঙ্গ। আর ন্যায়নীতিহীন বিদ্রোহ যেন শুষ্ক মরুতে বসন্তকাল—জীবন, বিদ্রোহ এবং ন্যায়নীতি একের ভিতর তিন, এদের পৃথক করা চলে না।"

তখন বজ্রনির্ঘোষের মত ধ্বনিত হল তৃতীয় ছায়ামূর্তির কণ্ঠে :—স্বাধীনতা-

হীন জীবন যেন আত্মাহীন দেহ। চিন্তাহীন স্বাধীনতা বিভ্রান্ত মননের মত.. জীবন, স্বাধীনতা এবং চিন্তা—একের ভিতর তিন। এরা চিরন্তন, এদের ক্ষয় নেই।

তারপর সেই তিনটি ছায়াশরীর উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণকণ্ঠে সমস্বরে বলল :—

"That which Love begets,
That which Rebellion creates,
That which Freedom rears,
Are three manifestations of God,
And God is the expression
Of the intelligent Universe."

সেই মহাক্ষণে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে, কেবল যেন কোন স্বর্গীয় শরীরের পক্ষবিধূনন শোনা যায়।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। যা শুনেছি তার প্রতিধ্বনি আমার মনে অনুরণিত। চোখ খুলে দেখলাম কিছু নেই, কুয়াশায় ঢাকা সমুদ্র কল্লোলিত। আমি সেই শৈল-শিখরের দিকে এগিয়ে গেলাম একটু আগেই ছায়াশরীরগুলি যেখানে ছিল, এখন আর কিছুই নেই, শুধু সুগন্ধি ধূম-জ্যোতি উর্ধ্বগগনে স্বর্গলোকের পানে ধূমায়িত।"

মরমী কবি জীব্রাণ মানবপ্রেমে রবীন্দ্রনাথের সহধর্মী। অশিক্ষা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ইত্যাদির নাগপাশে সরল মানুষকে যন্ত্রণাভোগ করতে দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর কবিতায় এক বিভ্রান্ত মানুষের বিলাপ শোনা যায়, তার রচনার বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য এবং দার্শনিক অনুভূতির সঙ্গে ভারতীয় ভাবসাধনার বিস্ময়কর মিল। নরদেবতার সেবায় তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ, মানব-কল্যাণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ প্রেমে, নৈতিক জীবনের বিকাশে। জীব্রাণ অদ্বৈতবাদী, তাঁর দর্শনে কেবল একটি শক্তি বিরাজিত। *

*** A SECOND TREASURY OF KAHLIL GIBRAN : Translated from the Arabic by ANTHONY R. FERRIS. The Citadel Press: New York.**

নতুন বই

দ্বারকানাথ ঠাকুর—(কি শো রী চাঁদ মিত্রকৃত ইংরাজী জীবনীগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক— দ্বিজেন্দ্র লাল নাথ। প্রকাশক— সম্বোধি পাবলিকেশনস (প্রা) লিমিটেড— কলিকাতা—এক।। দাম আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সৎ গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করেছেন, আলোচ্য গ্রন্থ সেই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। এই সিরিজের সম্পাদক ও পরিকল্পক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের "Memoir of Dwarkanath Tagore" গ্রন্থটি নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান। দ্বারকানাথ ঠাকুর বঙ্গদেশের এক সন্ধিক্ষণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নবাবঙ্গের জনক। সতীদাহ প্রথা বিলোপে রামমোহনকে তিনি সহায়তা করেন। হিন্দু কলেজের পুনর্গঠনে উইলসন এবং হেয়ারকে সহায়তা দান, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং শব-ব্যবচ্ছেদের কালে উপস্থিতি তাঁর সংস্কারমুক্ত উদার প্রকৃতির পরিচায়ক। এই মহাজীবনের কথা লিখেছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্রের অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন, এর পূর্বে তিনি রামমোহন-জীবনী রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। সম্পাদক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত গ্রন্থটির একটি ভূমিকা রচনা ব্যতীত প্রসঙ্গ-কথা অধ্যায়টি রচনা করেছেন এবং সম্পাদনাকর্মে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশকালে যে জাতীয় টীকা, ও সমসাময়িক বৃত্তান্ত দান করা প্রয়োজন তা সম্পাদকের জানা থাকায়, গ্রন্থটির মূল্য এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থশেষে ঠাকুরবাড়ির একটি বংশলতিকা এবং দ্বারকানাথের জীবনের ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি চিত্রও সংযোজিত হয়েছে, তবে মুদ্রণ ব্যবস্থা এই জাতীয় মহাগ্রন্থের উপযুক্ত নয়।

রবীন্দ্রদর্শন— (প্রবন্ধ) শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড—কলিকাতা—৯। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'রবীন্দ্রদর্শন' — রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের মধ্যে যে দার্শনিক ভাবধারা নিহিত তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ। লেখক স্বয়ং কবি ও দার্শনিক, তাঁর বিচারভঙ্গীর মধ্যে তাই অতি সূক্ষ্ম নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডিত্যের দুরূহতায় আলোচনাটিকে ভারাক্রান্ত না করে অতিশয় প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে লেখক তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। অনাবশ্যক বাহুল্য যেমন এই গ্রন্থে নেই, তেমনই নেই জটিলতা, অথচ এক জটিল তত্ত্বের আলোচনা 'রবীন্দ্র-দর্শন'। এই আলোচনা-পদ্ধতি 'বস্তু পরিচয়', 'দর্শনের মার্গ', 'বিশ্বের রূপ', সত্যোপলব্ধি', 'মানুষের ধর্ম ও সমালোচনা এই ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি কিন্তু দার্শনিক অনুসন্ধান তাঁর রচনার একটা বৃহৎ অংশে পরিব্যাপ্ত, রবীন্দ্রনাথের গদ্যে আলোচিত প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। লেখক 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক কবির বিরাট লেকচারটিকে একটি অমূল্য দার্শনিক রচনা মনে করেন, এবং তাঁর মতে কবির সমগ্র দার্শনিক ভাবনা এক জায়গায় বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন কবি। লেখক বলেছেন—'যদিও বিশ্বের সর্বত্রই কবি এক পরম সত্তার প্রকাশ আবিষ্কার করেছেন তবুও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এই পরম সত্তা মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে ও প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান।' লেখক বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনে অনুভূতিমার্গের প্রতি পক্ষপাত, মনন-মার্গকে তিনি পরিহার করেছেন। মননশক্তিতে যা পাওয়া যায় তা শুষ্ক, নীরস আর অনুভূতিমার্গে পাই প্রেম। পরম সত্তা বহু বিচিত্র অথচ তিনি এক—বিশ্বের সেই একত্ব—ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না—বহু ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মননশক্তির সাহায্যে একত্ব উপলব্ধি করতে হয়, রূপহীন পরম সত্তা বিশ্বের সর্বত্র মাধুরী ছড়িয়ে রেখেছেন, সেই বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি আত্মগোপন করে আছেন। এই ভাবে লেখক দুর্জ্ঞেয় গুরুতর তত্ত্বকে সহজ ও সরল করে প্রকাশ করেছেন। কবির সমগ্র জীবনের সাধনালব্ধ বাণীর পরিপূর্ণ রূপটি যেমন হৃদয়ঙ্গম করেছেন সেই ভাবে পরিবেশন করায় তাঁর এই গ্রন্থটি 'রবীন্দ্র-দর্শন' বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি বিশিষ্টতম গ্রন্থ একথা বলা চলে। গ্রন্থটির পর পর তিনটি সংস্করণ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। সাহিত্য-সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

রমেশচন্দ্র— (জীবনী) মণি বাগচি। প্রকাশক :জিজ্ঞাসা। কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

মণি বাগচি ইতিমধ্যে গৌতমবুদ্ধ, বিজয়কৃষ্ণ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সুবর্ণযুগের বঙ্গসন্তানদের জীবনী রচনা করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জীবনীকার। তাই তাঁর জীবনী-রচনার মধ্যে আছে অসামান্য স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা। তথ্যনির্ভর জীবনকাহিনীকে যে-আঙ্গিকে পরিবেশন করলে তা হৃদয়গ্রাহী হয় তা লেখকের জানা থাকায় তাঁর রচিত জীবনী-গ্রন্থাবলী এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যে ব্যক্তিটিকে তাঁর বন্ধু লালমোহন ঘোষ একদা বলেছিলেন, "রমেশ, তুমি দেখছি বেদ থেকে আরম্ভ

করে ধারাপাত, "সবকিছু লিখে গেলে।" সেই ব্যক্তির জীবনী বাঙালীমাত্রেরই প্রাণের সামগ্রী। রমেশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সংগে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার দিনে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে।" রমেশচন্দ্র সাহিত্যিক, স্বদেশপ্রেমিক, ভারতের অতীত গৌরবে বিশ্বাসী, নিরলস সাহিত্য-গবেষক এবং নিষ্ঠাবান শাসক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুতে তাই 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় লিখেছিলেন:
"Ramesh Chandra Dutt stands out as one of the most prominent man of the generation."—রাজনৈতিক মতবাদে রমেশচন্দ্র ছিলেন মডারেট, তথাপি তাঁর চরিত্রগুণে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আজ থেকে তিপান্ন বছর আগে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে রমেশচন্দ্রের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে সুদূর বরোদায়। ধর্মানুসন্ধানে, স্বদেশপ্রেমে, সাহিত্যসেবায় ও মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত রমেশচন্দ্র বিগত যুগের এক আদর্শ মানব, আজ প্রয়োজন অতীতের পুনরাবিষ্কার, তাই সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তিতে যে মহাপ্রাণ বাঙালী লেখক তিনখন্ডে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছেন, সমগ্র বাঙালী জাতি তাঁর কাছে ঋণী। মণি বাগচি এই সুন্দর গ্রন্থটি রচনা করে এ-যুগের বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন সন্দেহ নেই।

চীনের নাম বিষ— (সংকলন) **বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৫ নঃ পঃ।**

রক্তে ভাসা মুখ— (সংকলন) **বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদার। পরিবেশক ইণ্ডিয়ানা, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩০ নঃ পঃ।**

চীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তলোলুপ বর্বরতার বিরুদ্ধে বাংলার সাহিত্যিক-সমাজ আজ অগ্রণী হয়েছেন। চীনের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কবিগণ যে প্রতিরোধের গান রচনা করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদার দুটি বিভিন্ন সংকলন-পুস্তিকায় তা বিধৃত করেছেন। তাঁদের কন্ঠে ধ্বনিত এই ধিক্কার-ধ্বনি আজ প্রতি ঘ'র ঘরে প্রতিধ্বনিত হোক। 'চীনের নাম বিষ' সংকলিকায় সম্পাদক যেসব কবিতা সংকলন করেছেন তার মধ্যে মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, তরুণ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির কবিতা উল্লেখযোগ্য।

'রক্তে ভাসা মুখ' সংকলিকায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অতীন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি প্রতিরোধের কবিতা সঞ্চয়িত হয়েছে। কবিতাগুলি সাময়িক পটভূমিকায় রচিত দীপ্ত কন্ঠের উদাত্ত আহ্বান।

এই জাতীয় কাব্য-পুস্তিকার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী।

সরকারস্ ডায়রী (১৯৬৩)
এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২।

'সরকারের ডায়রী'র ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই ডায়রীর সংগে বিশেষভাবে পরিচিত। বর্তমান বৎসরেও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিভিন্ন ধরণের ডায়রী প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নলিখিত ডায়রীগুলি আমরা পেয়েছি: 'ল ডায়রী' (দাম দুটাকা), 'এভরি ম্যানস্ ডায়রী' (দাম দুটাকা), 'লিটল ডায়রী' (দাম দুটাকা ও দুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা), 'পকেট ডায়রী' (একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা), 'বাংলা ডায়রী' (দুটাকা) 'ক্রাউন ডায়রী' (তিন টাকা), 'ডিমাই ডায়রী' (দাম চার টাকা) ও 'রয়েল ডায়রী' (দাম পাঁচ টাকা)।

যাদু-কাহিনী— (রহস্য-কাহিনী) **অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা।**

যাদুর সংগে ভারতের যোগ সুপ্রাচীন। এই রহস্যময় জগৎ সম্পর্কে আজও ভারতীয় মাত্রেই সমানভাবে উৎসুক। দেশী বিদেশী বিচিত্র যাদু-কাহিনী নিয়ে বর্তমান গ্রন্থখানি।

যাদুজগতের শ্রেষ্ঠতম নায়ক হ্যারি হুডিনি সম্পর্কে আলোচনাটি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। যাদুকর গণপতি, চুং লিং সু, ফরাসী যাদুকর উদ্যাঁ, ডেভিড ডেভাণ্ট—প্রসংগে লেখকের কাহিনী অত্যন্ত জীবন্ত। এই গ্রন্থে আরও চমৎকার সুখপাঠ্য হৃদয়গ্রাহী কাহিনী আছে। এই সমস্ত কাহিনী একদিকে যেমন অনেকের বিস্ময়ের বিষয় তেমনি মজাদারও বটে। জীবনে যাঁদের খ্যাতবান যাদুকরদের যাদু-প্রদর্শনে যোগদান সম্ভব হয়নি তাঁরা বর্তমান গ্রন্থ পা'ঠে সে অভাব অনেকটা দূর করতে পারবেন বলে মনে হয়। একজন যাদুকরের কথা, শয়তান ও ম্যাসকেলিন, একটি অভিশপ্ত খেলা, আদালতে যাদুকর উত্তর দেশের যাদুকর, যাদু জগতের আষাঢ়ে গল্প, আসল ও মেকি, কাউণ্ট ক্যালিওস্ট্রো, দুটি অলৌকিক কাহিনী, খেয়ালী যাদুকর, বেকায়দায় যাদুকর, কয়েকটি যাদু খেলার কথা—এ সমস্ত বর্ণনায় গ্রন্থকার স্বাভাবিকভাবে মূল কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ফলে গ্রন্থখানি মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এ সমস্ত রহস্যজনক কাহিনীর পেছনে খ্যাত ও অখ্যাত যাদুকরদের জীবনব্যাপী সাধনার কথা পরিব্যাপ্ত। আর লেখকের সুনিপুণ বর্ণনাভঙ্গিমায় তা জীবন্ত।

গ্রন্থকারের ভূমিকাটি যথেষ্ট মূল্যবান। গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে আশা করি।

ছবি ও গল্পে যীশুর জীবন—
(কিশোর গ্রন্থ) সুবোধবিকাশ দত্ত। সুসমাচার সাহিত্য ভাণ্ডার, ১১।১, মিশন রো, কলিকাতা—১।

বর্তমান গ্রন্থটিতে যীশুর পুণ্য জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে যীশুর জীবনকাহিনী হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অগণিত জনমানসকে প্রভাবিত করে আসছে। যীশুর পবিত্র জীবনকাহিনী সাহিত্যের, শিল্পের এবং সংগীতের এমন কোনো শাখা নেই যাকে প্রভাবিত করেনি। বাংলার ইতিপূর্বে যীশুর জীবন নিয়ে অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে কিন্তু কুণ্ঠার সংগে স্বীকার করি সুখপাঠ্য বাইবেলের গল্প বাংলাভাষায় অংগুলিমেয়ই। তবে সুখের বিষয় সুবোধবাবু নিষ্ঠার সংগে যীশুর জীবনকাহিনীকে সংকলিত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা ঝরঝরে এবং কিশোরদের পক্ষে উপযোগী। এই গ্রন্থের আরেকটি আকর্ষণ ছোট ছোট রঙীন ছবির পাতাটি। কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে যথাস্থানে ছবি কেটে কেটে বসানোর ব্যবস্থা থাকাতে গল্পগুলি পড়লে সহজেই মনে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

ম্যাণ্ডেলীন মেলোডিস্ট— **প্রকাশক: জয়দেব দাস। প্রাপ্তিস্থান: ২৭।১, হরিঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম: দেড় টাকা।**

পুস্তকটি উচ্চাংগ ও লঘু ম্যাণ্ডোলিন শিক্ষার জন্য রচিত। ম্যাণ্ডোলিন বিদেশী যন্ত্র ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রটি আমাদের দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত। ম্যাণ্ডোলিন তারযন্ত্র এবং এর দ্বারা রবীন্দ্র ও রাগসংগীতও বাজান যায়।

বাংলাভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচিত হওয়ায় গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাই। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রন্থটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

আজকের কথা

একটি সংগত প্রশ্ন :

পণ্ডিত নেহরু বারংবার বলেছেন, সীমানা বিরোধ নিয়ে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হবে। এবং কূট-নীতিজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে চীনের এই যে একতরফা যুদ্ধবিরতি এবং তার মর্জি অনুযায়ী গঠিত একটি অদ্ভুত আজগুবি সীমারেখাকে মেনে নিয়ে উভয় তরফের সৈন্যদের সেই সীমারেখা থেকে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২॥ মাইল) পশ্চাদপসরণের প্রস্তাব, এ কেবল ধোঁকাবাজী। কাজেই বর্তমান আপদা-বস্থার সমাপ্তি কবে, এ 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।' এ হেন পরিস্থিতিতে বাঙলার সাধারণ নাট্যশালা এবং মঞ্চহীন পেশাদারী, অর্ধপেশাদারী ও অপেশা-দারী বা সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়গুলির কি ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করা কর্তব্য, তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য এরও আগে আর একটি জরুরী প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। বহু লোকের আশঙ্কা যদি নির্মমভাবে সত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই যদি চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ আবার শুরু হয়ে অতি শীঘ্রই ব্যাপক ও উত্তাল হয়ে ওঠে, তাহ'লে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলি তাদের পাদপ্রদীপের আলোককে কি বেশী দিন জ্বালিয়ে রাখ্‌তে পারবে? কিংবা যদি দৈবক্রমে ঠিক বিপরীত অবস্থাই অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যায় অর্থাৎ সামগ্রিক রাজনীতির পরোক্ষ চাপে প'ড়ে চীন যদি সত্যিই হঠাৎ অন্ততঃ বর্তমানে কিছুদিনের জন্যে অতিমাত্রায় শান্তিকামী হয়ে ওঠে, তাহ'লে? তাহ'লে আমাদের রঙ্গমঞ্চ-গুলি কি রাজনৈতিক প্রয়োজন বা দেশ-প্রেমকে আপাততের মত সিন্ধুকজাত ক'রে যে যার চালে চলতে শুরু করবে?

না, অত সহজে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। অবস্থার গতিকে সাধারণ নাট্যশালাগুলিকে যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে দরজা বন্ধ করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু থিয়েটার যদি চালু থাকে, তাহ'লে প্রতিটি থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে এমন নাটক অভিনয় করা, যা দেখে আমরা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক, সে সম্বন্ধে সচেতন হই। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যাতে আমাদের দেশের, রাষ্ট্রের এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হই, এমন নাটক এখন কিছুকাল ধ'রে আমাদের দেশে রচিত হোক। সস্তা, হাল্কা প্রেমের গল্প, আদর্শের বিরোধ নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে, বাপে ছেলেতে, স্বামী স্ত্রীতে বা বন্ধুতে বন্ধুতে সংঘর্ষকে উপজীব্য ক'রে গল্প, হাসির গল্প, কোনো সামাজিক সমস্যার গল্প বা স্রেফ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্মমূলক কিংবা নাচ গানের গল্প নিয়ে রচিত নাটককে এখন বেশ কিছু দিনের জন্যে বিদায় দেওয়া হোক। তার পরি-বর্তে আমরা দেখতে চাই এমন নাটক, যা আমাদের চিরাচরিত 'অহিফেনসেবী'র শান্তিপ্রিয়তাকে চিরতরে নির্বাসিত ক'রে আমাদের মধ্যে জাগাবে বীর্য, শৌর্য এবং দেশের স্বাধীনতাকে অটুট রাখবার জন্যে শক্তি অর্জনের স্পৃহা। বহু শতাব্দী-ব্যাপী পরাধীনতার ফলে আমাদের জাতি আজও হয়ে রয়েছে অর্ধ-জাগ্রত। জাতিকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ ক'রে বীর্য-বান ক'রে তোলবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটির সার্থক রূপায়ণের ভার গ্রহণ করতে হবে আমাদের নাট্যকার এবং নাট্যশালাকে। সীমান্ত সংঘর্ষ চলুক, বা নাই চলুক, দেশকে বীর্যবান ক'রে তোলাই এখন আমাদের নাট্যশালার একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান আপৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'দেশের জনসাধারণ অর্থ, স্বর্ণ, রক্ত ও শ্রম দান ক'রে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বজ্রকঠিন ক'রে তুলতে সচেষ্ট, তখন আমাদের পেশাদারী নাট্যমঞ্চ চারটির মধ্যে (দক্ষিণ কলকাতার 'থিয়েটার সেণ্টার' ও 'মুক্ত-অঙ্গন'কে হিসেবের মধ্যে না ধ'রে) 'কোনটির গায়ে নতুন চেতনার অরুণ আলো লাগেনি', এমন অনুযোগ করেছেন জনৈক পত্রপ্রেরক গেল হপ্তায় প্রকাশিত একখানি চিঠির মারফৎ আমাদের "অমৃত"-সম্পাদকের কাছে। তাঁরা নাকি 'প্রতিরক্ষা তহবিলে কিছু অর্থ দান' ক'রেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন। সত্যের খাতিরে আমরা বলতে বাধ্য, পত্র-প্রেরকের এ অনুযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন। একটু কষ্ট ক'রে যে-কোনো বাঙলা দৈনিকের রঙ্গজগতের বিজ্ঞাপন-গুলির দিকে চোখ চেয়ে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া প'ড়ে গেছে। বিশ্বরূপা বেশ কিছু দিন ধ'রে তাঁদের বিজ্ঞাপনে বাঙলা-সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে "আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম, বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে অতি তীব্র প্রেম আলিঙ্গন স্নান ভাল নাহি লাগে অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝনঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে ক্ষুদ্র জয়লাভ।" (রবীন্দ্রনাথ), "করিব সংগ্রাম—যতদিন মাংস নাহি খ'সে পড়ে অস্থি হ'তে খণ্ড খণ্ড হয়ে, যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা" (গিরিশচন্দ্র), "ওঠো সৈনিকগণ, দৃঢ়-পণ ক'রে ওঠো, ভারতবর্ষ জানুক, বিদেশী জানুক, তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয়নি" (দ্বিজেন্দ্রলাল), "দেখাব ভারতবীর্য দেখাব কেমন! বলে যদি হিমাচল, করে তারা রসাতল, পারিবে টলাইতে একটি চরণ?" (নবীনচন্দ্র) প্রভৃতি বহু উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী 'স্বদেশপ্রেমের পীঠস্থান বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আহ্বান' রূপে প্রকাশিত ক'রে চলেছেন। এ-ছাড়া 'প্রতিদিন অভিনয়ের আগে তাঁরা টেপ-রেকর্ড মারফত প্রতিরক্ষা বিষয়ে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে একটি উদাত্ত বাণী বিঘোষিত করেন। আরও প্রকাশ যে, তাঁদের জনপ্রিয় "সেতু" নাটকের আগে অভিনয়োপযোগী, বর্ত-মান পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি ছোট দেশাত্মবোধক নাটক নির্বাচনে তাঁরা ব্যস্ত। স্টার থিয়েটার তো ইতিমধ্যেই তাঁদের "শেষাগ্নি" নাট্যাভিনয়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে গেল বৃহস্পতিবার, ১৩ই ডিসেম্বর থেকে মন্মথ রায় রচিত "স্বর্ণকীট" ও "কারাগার" মঞ্চস্থ করতে শুরু করেছেন। রঙমহল মহলায় ফেলে-ছেন মন্মথ রায়েরই আর একখানি নাটক "মহাপ্রেম" এবং আশা করছেন, অতি

শীঘ্রই তাঁরা পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করতে পারবেন। মিনার্ভা থিয়েটার তাঁদের "অঙ্গার"-এর অভিনয় বন্ধ করেছেন সাধারণের দাবীতে এবং নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করছেন বাঙলার বৈপ্লবিক যুগের পটভূমিকায় রচিত অসামান্য নাট্যালেখ্য "ফেরারী ফৌজ"। এ অবস্থায় কেন যে কোনো ভদ্রলোকের "কলকাতায় এসে কিন্তু কৌতূহলী চোখ দুটো হতাশায়, লজ্জায় আপনি বুজে যাবে", তা' আমরা বুঝতে সর্বৈব অক্ষম।

এখানে পত্রপ্রেরক এবং পাঠক-সাধারণকে একটি বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হ'তে অনুরোধ করব। সীমান্তে চীনা ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছিল ২০-এ অক্টোবর এবং একতরফাভাবে তারা এই আক্রমণ বন্ধ করেছে গেল ২১-এ নভেম্বর। আমরা স্বাধীন হবার পর ভারতকে নানা দিক দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে গড়বার দিকে মনোনিবেশ করেছিলুম, অপরের অন্যায় আক্রমণ থেকে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার যে প্রয়োজন হবে, এ-কথা আগে থাকতে চিন্তা ক'রে গোলাগুলি, যুদ্ধাস্ত্র এবং অপরাপর সামরিক উপকরণ নির্মাণ ও দেশের সক্ষম ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ক'রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও অজেয় করবার দিকে মনঃসংযোগ করিনি। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জন কেনেডী ১৯৬১ সালের ২০-এ জানুয়ারী তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমাদের সামরিক শক্তি যখন নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত ব'লে বিবেচিত হবে, মাত্র তখনই সেই শক্তি যে কখনও ব্যবহৃত হবে না, সেই সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হ'তে পারব।" স্বাধীনতা লাভের পনেরো বছর বাদে গেল ৮ই ডিসেম্বর আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, "আমাদিগকে এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারত যখন প্রকৃতই শক্তিমান হইবে, মাত্র তখনই প্রকৃত শান্তি সম্ভব।"

এই পরিস্থিতিতে সকল মানুষকে সর্বাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে একখানি যুগোপযোগী দেশাত্মবোধক নাটক লেখা কি সহজ কথা? কোথায় নাটকীয় উপকরণ, মাত্র এক মাসের সংঘর্ষে অপ্রস্তুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ যে-সব ঘটনার কথা শোনা গেছে বা যাচ্ছে, তার থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্যে একাধিক নাট্যকার ব্যস্তভাবে অনুসন্ধানরত, এ সংবাদ আমরা রাখি। ভারতের ইতিহাস মন্থন ক'রে বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করবার মত উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টাও যে না চলছে, তা নয়। কিন্তু সবই সময়সাপেক্ষ। এবং একখানি নাটক চূড়ান্তভাবে লেখা হবার পরেও তাকে কোনো বিশেষ নাট্যশালা দ্বারা অভিনীত হবার উপযোগী করবার জন্যে যে আবার ক'রে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, তাও কারুর অজানা থাকবার কথা নয়। এর পরে মহড়া, আঙ্গিক প্রভৃতির প্রস্তুতি এবং প্রয়োগকর্ম প্রভৃতির জন্যে অন্ততঃ দু' মাস সময় দেবার পর একখানি নাটকের উদ্বোধন সম্ভব হয়। কাজেই কলকাতার চারটে পেশাদারী মঞ্চ বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বিকার, এ অনুযোগ করবার সময় এখনও আসেনি। আমরা নিজেদের অপর থেকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে

'ধূপছায়া'র একটি স্মরণীয় মুহূর্তে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

আত্মপ্রসাদ লাভ করি। তাই পত্রলেখক মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশের শিল্পীদের পথে পথে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু আমাদের রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীরা যে শহরের বিভিন্ন পার্কে প্রণব রায় রচিত "ডাক" নামে পথ-নাটিকাটি অভিনয় করছেন, কিংবা মিহির ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, জহর রায়, অপর্ণা দেবী, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাস প্রমুখ খ্যাতনামা মঞ্চ ও চিত্রশিল্পীরা যে দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত "এগিয়ে চলার ছন্দ" নামে পথনাটিকাটি শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করছেন, অথবা আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীরা যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথপরিক্রমা করছেন, সে-সম্পর্কে তিনি কি কোনো সংবাদই রাখেন না? অথবা ইচ্ছা ক'রেই নীরবতা অবলম্বন করেছেন?

চিত্র সমালোচনা

(১) **আমার দেশ** (বাঙলা): ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নিবেদন; ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ ও ২ রীলে সম্পূর্ণ; রচনা ও পরিচালনা: তপন সিংহ; সঙ্গীতপরিচালনা: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; নেপথ্য-ভাষণ: রাধামোহন ভট্টাচার্য; চিত্রগ্রহণ: বিশু চক্রবর্তী, বিমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি; শব্দানুলেখন: শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা: দুলাল দত্ত; রূপায়ণ: উত্তমকুমার, সৌমিত্র, অনিল, রাধামোহন, বিকাশ, পাহাড়ী, কালী, দিলীপ, বসন্ত, সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা, অরুন্ধতী, রুমা, ছায়া প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ প্রচার বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত হয়ে গেল শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর থেকে রাধা, শ্রী, উত্তরা, রূপবাণী, দর্পণা, মিনার, প্রাচী, বসুশ্রী, পূর্ণ, ভারতী, ইন্দিরা এবং বিজলী চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সীমান্ত বিরোধকে উপলক্ষ্য ক'রে চীন ভারতের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছিল, তাতে সমস্ত ভারত আজ রুখে দাঁড়িয়েছে—হানাদারকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত করতে নেহরু সরকারের সঙ্গে আজ হাত মিলিয়েছে সমস্ত ভারত-সন্তান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টাকে তীব্রতর ক'রে তোলবার ব্রত নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন (পূর্বতন বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন) 'আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে ৯২ খানি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র উপহার দিতে মনস্থ করেছেন, তারই প্রথম চিত্র হচ্ছে তপন সিংহ রচিত ও পরিচালিত "আমার দেশ"।

দেশপ্রেম দ্বারা চরম উদ্বুদ্ধ হয়েই তপন সিংহ "আমার দেশ" রচনা করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কি, স্বাধীনতা লাভ করবার পর শান্তি-প্রিয় ভারত কেন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ব্রতী না হয়ে দেশকে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে, তা দেখাবার পর যখন বন্ধুভাবাপন্ন ভারত অতর্কিতে চীন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তখন সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হয়ে নিজ বীর্য পরীক্ষা দেবার জন্যে কিভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাই বর্ণিত হয়েছে "আমার দেশ" ছবিতে। প্রথমে রাধামোহন ভট্টাচার্যের শুদ্ধবাণী সমন্বিত কণ্ঠে ধারাবিবরণীর পর রবীন্দ্রনাথের দু'খানি উদ্দীপক সংগীত "হে ভৈরব, শক্তি দাও" এবং "আগুন জ্বালো" উত্তমকুমার, সৌমিত্র, অনিল, বিকাশ, পাহাড়ী, বিশ্বজিৎ, বসন্ত, রাধামোহন, দিলীপ, কালী, সুচিত্রা, সুনন্দা, অরুন্ধতী, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা, রুমা, ছায়াদেবী প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীর দ্বারা গানে রূপায়িত হয়ে ছবিখানির সমাপ্তি টানা হয়েছে। দেশাত্ম-বোধক এই নাতিদীর্ঘ চিত্রটি শিল্পকৃতিতে বাঙলার চিত্রজগতের একটি স্মরণীয় অবদান বলে চিহ্নিত হয়ে রইল।

(২) **হম এক হয়** (হিন্দী): মেহবুব প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; দু' রীলে সম্পূর্ণ; রূপায়ণে দিলীপকুমার, সুনীল দত্ত, রাজেন্দ্রকুমার, রাজকুমার প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানকে বিশিষ্ট শিল্পীর সাহায্যে রূপায়িত করেছেন পরিচালক-প্রযোজক মেহবুব এই স্বল্প-দৈর্ঘ্য চিত্রটিতে। সুন্দর ও বাস্তব পটভূমিকায় অতি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত এই গীত-চিত্রটি দর্শকের মনকে দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করতে অতিমাত্রায় সক্ষম। বর্তমানের জাতীয় পরিস্থিতিতে এ-রকম চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(৩) **দিল জোরা দিওয়ানা** (হিন্দী): পদ্মিনী পিকচার্স (মাদ্রাজ)-এর নিবেদন; ৪০৪৬ মিটার দীর্ঘ, এবং ১৫ রীলে

সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ দাদা মিরাসী; চিত্র-নাট্য ও সংলাপ ঃ ইন্দ্ররাজ আনন্দ; প্রযোজনা ও পরিচালনা ঃ বি আর চোপরা; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ শঙ্কর জয়কিষণ; গীত-রচনা ঃ শৈলেন্দ্র ও হসরৎ জয়পুরী; চিত্রগ্রহণ ঃ ভি রামমূর্তি; সঙ্গীত-গ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা ঃ মিনু কাত্রার; শিল্পনির্দেশ ঃ এ কে শেখর; সম্পাদনা ঃ আর দেবরাজন; রূপায়ণ ঃ শাম্মী কাপুর, মেহমুদ, ওম প্রকাশ, প্রাণ, উল্লাস, মনোমোহন কৃষ্ণ, মালা সিংহ, শুভা খোটে, মমতাজ বেগম প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৭ই ডিসেম্বর থেকে ছিন্দ, জনতা, কৃষ্ণা, রূপালী, ভবানী, প্যারামাউন্ট, পূর্ণশ্রী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কোনো নিও-রিয়ালিস্টিক, নিউ-ওয়েভ বা বাস্তবাশ্রয়ী নয়, "দিল তেরা দিওয়ানা" একেবারে সাধারণ হিন্দী চিত্রামোদীদের জন্যে নির্মিত হাসিখুশী, গান নাচ, কৌতুক ও প্রেমের চিত্র। তাই গল্পের নায়ক মোহনকে দেখি তার নারী-বেশধারিণী বন্ধু আনোখেলালের সঙ্গে 'রেবেল ক্লাব'-এ নাচগানে মশগুল থাকতে, এবং কঠিন নিয়মতান্ত্রিক পিতা দ্বারা প্রাক্তন জেলার দয়ারাম জঙ্গবাহাদুরের কাছে নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষার জন্যে প্রেরিত হয়ে নিজের বন্ধু আনোখেকে সেখানে 'মোহন' নামে পরিচিত হয়ে থাকতে সম্মত করিয়ে নিজেকে দরিদ্রের বেশে অন্ধ পিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যা মীণার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। কেমন ক'রে শেষ পর্যন্ত মোহন আবার স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মীণাকে বিবাহ করল এবং আনোখে নিজের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের জন্যে জেলারের মেয়ে মালতীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হ'ল, তাই নিয়েই কাহিনীর চমকপ্রদ, কৌতূহলোদ্দীপক, সাধারণের উপভোগ্য দৃশ্যগুলি।

অভিনয়ে মেহমুদ আনোখেলাল এবং ছবির শেষাংশে রিক্সাওয়ালা ও আনোখেলাল—এই যুগ্মচরিত্রে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। মীণার বেশে মালা সিংহ নাচে গানে, প্রেমের অভিনয়ে দর্শকচিত্ত হরণে কিছুমাত্র ত্রুটি করেননি। মোহনবেশে শাম্মী কাপুর তাঁর "জংলী"র ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করেছেন; দর্শকরা তাঁর মুখ এবং অঙ্গভঙ্গী পছন্দ করে। প্রাক্তন জেলারের বেশে ওমপ্রকাশ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় শুভা খোটে, প্রাণ, উল্লাস মনোমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি ভূমিকানুযায়ী অভিনয় করেছেন।

কলাকুশলের কাজ সর্বত্র একটি উচ্চমান বজায় রেখেছে। "দিল তেরা দিওয়ানা" একটি দর্শকমাতানো আনন্দ-মুখর সঙ্গীত চিত্র।

বিবিধ সংবাদ

এস, এস, চিত্রমন্দির-এর "ধূপছায়া" ঃ

আজ শুক্রবার, ১৪ই ডিসেম্বর রাধা, পূর্ণ, প্রাচী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে এস এস চিত্রমন্দির-এর "ধূপছায়া" মুক্তি পাচ্ছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে প্রদীপ দাসগুপ্ত কর্তৃক লিখিত চিত্রনাট্যটিকে রূপায়িত করেছেন পরিচালক চিত্ত বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন অমর শিল্পী ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, এন বিশ্বনাথন, তরুণকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অপর্ণা দেবী, সন্ধ্যা রায়, দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্ত প্রভৃতি। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন অমল মুখোপাধ্যায়। শ্রীজগন্নাথ পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

*

মহিলা শিল্পীমহল-এর "মিশরকুমারী" ঃ

একটি সদুদ্দেশ্য মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে, তার একটি জাজ্বল্যমান নিদর্শন দেখলুম মহিলা শিল্পীমহল আয়োজিত "মিশরকুমারী"র অভিনয় আসরে ৫ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়। দুঃস্থা মহিলা-শিল্পীদের জন্যে একটি আশ্রয়-ভবন নির্মাণকল্পে যেভাবে মহিলা-শিল্পীরা একত্র হয়ে সেদিন মহাজাতি সদনে অভিনয় থেকে শুরু ক'রে স্মারক-পুস্তিকা বিক্রয় পর্যন্ত সমস্ত কাজে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন, তা আমাদের চোখে অভূতপূর্বই ঠেকেছে। শ্রীমতী কানন, চন্দ্রা, মলিনা, সুনন্দা, সরযূ, ভারতী, অনুভা, বনানী, মঞ্জু, সুলতা, বাসবী, নমিতা, শ্যামলী, স্বাগতা, গীতা, দীপিকা, সাধনা, মেনকা, ইরা, মমতা, আশা, ঊষা, কবিতা, ছন্দা প্রভৃতি মঞ্চ ও চিত্রের খ্যাত এবং অখ্যাত শিল্পীর এমন একত্র সমাবেশ কচিৎ দেখতে পাওয়া গেছে। মন্ত্রী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে শোনা গেল, ওই অভিনয় রজনীতে কমবেশ বিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে ও'দের উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্যে। মনে হয়, ৭ই ডিসেম্বরের অভিনয় মারফৎ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যের জন্যেও তাঁরা অনুরূপ পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করতে পেরেছেন।

*

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে রঙ-মহলের অভিনয় ঃ

গেল শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে, এই মর্মে রঙ-মহল কর্তৃপক্ষ পত্রপত্রাদিতে পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। ঐ রজনীতে বিক্রয়লব্ধ ১৭২০ টাকা, কর্মিবৃন্দের সমবেত দান ২৭০ টাকা ও জহর রায়ের ব্যক্তিগত ১০১ টাকা—একুনে ২০৯১ টাকা নগদ এবং জহর রায়ের স্ত্রী কমলা রায় প্রদত্ত ৭ ভরি সোনা, তাঁর তিনটি মেয়ের দেওয়া ৩টি আংটি, সরযূ দেবীর ১ গাছি চুড়ি ও ১টি পেণ্ডেণ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১ জোড়া কানের দুল এবং সলিল সেনের ১টি আংটি—এ সমস্তই সেই রাত্রে দর্শক সমক্ষে

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'বর্ণচোরা' চিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে

পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলের হাতে দেওয়া হয়।

*

ডাঃ দাশগুপ্তের ইন্দ্রজাল:

যক্ষ্মোত্তর কলোনীর সাহায্যকল্পে ২রা ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত যে অলৌকিক ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন, তা যে-কোনো পেশাদার ইন্দ্রজালিকের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করবে। একজন প্রথিতযশা ডাক্তার তাঁর সকল কর্তব্য সম্পাদন করার মধ্যেও কি ক'রে এমন অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা আয়ত্ব করেছেন, তা' অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। শুনে সুখী হলুম, ডাঃ দাশগুপ্ত আমাদের পরলোকগত রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর আরোগ্যোত্তর কলোনীর জন্যে যে-দশ হাজার টাকা তুলে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঐ দিনের প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ যোগ ক'রে তাঁর দান ঐ অর্থের অঙ্ক পার হয়ে গেছে।

*

শিশু রংমহলের বার্ষিক উৎসব:

এবার শিশু রংমহলের (চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার) বার্ষিক উৎসব হচ্ছে দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে ২১এ ডিসেম্বর থেকে। উদ্বোধন উৎসবে সভাপতি হবেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অতুল্য ঘোষ এম, পি এবং উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যকল্পে ২২এ ডিসেম্বর "অবন পটুয়া" মঞ্চস্থ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাতে ঐ দিনের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ দেওয়া হবে।

শিশু রংমহলের বার্ষিক উৎসবে যে টাকা পাওয়া যায়, তার থেকেই "সি-এল-টি"র সারা বছরের কাজ চলে এবং যে টাকা বাড়তি থাকে, তা' গৃহ-নির্মাণ তহবিলে জমা রাখা হয়। ঐ তহবিল থেকেই ১,৭২,০৫০, টাকা দিয়ে সি-এল-টি'র নিজস্ব বাড়ীর জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর কাছ থেকে সম্প্রতি জমি কেনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করেছেন, দু' বছরের মধ্যেই ঐ জমির ওপর সি-এল-টি নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করবে।

বর্তমানে জাতীয় সঙ্কটের দিকে লক্ষ্য রেখে বার্ষিক কার্যক্রমকে অল্প-দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং অনাবশ্যক খরচ সংক্ষেপের জন্যে দেশ-প্রিয় পার্ককেই উৎসবের স্থানস্বরূপ নির্বাচিত করা হয়েছে। শিশু রংমহলের 'অবন পটুয়া', 'মিঠুয়া', 'জিজো' প্রভৃতি জনপ্রিয় পালাগুলি ছাড়া নতুন সৃষ্টির মধ্যে আছে 'লালচে বুড়ো' ও 'কাঠ-ঠোকরা'। এর ওপর আছে সর্বভারতীয় শিশুচিত্র প্রদর্শনী এবং সুরেশ দত্তর পুতুল নাচের আসর।

*

"দীপশিখার" নবপ্রচেষ্টা :

আধুনিক কালের উদীয়মান ও তরুণ শিল্পীদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত নাট্যসম্প্রদায় "দীপশিখা" আসছে ১৮ই ডিসেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের চিরনূতন প্রহসন "অলীকবাবু" নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। এই দলে যাঁদের দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁদের মধ্যে আছেন রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর, নীরেন, দেবব্রত, তরুণ মিত্র, রুবী মিত্র ও কৃষ্ণা রায়।

*

জাতীয় প্রতিরক্ষায় "দশরূপক" নাট্যসংস্থা :

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে সুপরিচিত নাট্যসংস্থা "দশরূপক" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রথম দফায় ৯০১, টাকা পাঠিয়েছেন। আসছে জানুয়ারী মাসের প্রথম হপ্তা নাগাদ এঁরা কোনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চে মন্মথ রায়ের 'মহাপ্রেম' নাটকটি অভিনয় ক'রে

আরও ৫০১্ টাকা ঐ তহবিলে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এছাড়া দেশে যতদিন আপৎকালীন অবস্থা থাকবে, ততদিন এ'রা যতগুলি অভিনয়-আসর বসাবেন, তার প্রতিটি থেকে অন্ততঃ ১০্ টাকা হিসেবে প্রতিরক্ষা তহবিলে দেবেন। "দশরূপক"-এর প্রশংসনীয় উদ্যম সার্থক হোক।

*

নিখিল বঙ্গ যাদুকর সম্মিলনী

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু সংস্থাই এগিয়ে আসছে নৃত্য-গীত অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ করে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা।

খবরটা শুনলে সকলেই খুশি হবেন যে, এই ব্যাপারে যাদুকর গোষ্ঠীরাও পিছিয়ে নেই। যাদুচক্রের উদ্যোগে, আগামী ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আশুতোষ কলেজ হলে এক যাদুকর সম্মিলনীর মাধ্যমে মনোরম যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট যাদু শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন। এদের মধ্যে দি গ্রেট ডি-সি-দত্ত, ম্যাজিসিয়ান বিনয়, ম্যাজিসিয়ান রঞ্জন; শ্রীসুনীল দত্ত এম-কম (এ্যাঃ), শ্রীঅনাদি দত্ত বি এস-সি (ইঞ্জিঃ) গ্লাসগো, আরও অনেকে। **টিকিট বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।**

মৃণাল সেন পরিচালিত অভ্যুদয় ফিল্মসের 'অবশেষে' চিত্রের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত ও ছায়া দেবী। (কাহিনী : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্সিওরেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত তিরিশে নভেম্বর শুক্রবার রঙমহল মঞ্চে কো-অপারেটিভ্ লাইফ ইনসিওরেন্স রিক্রিয়েশন ক্লাব ভানু চট্টোপাধ্যায়ের "কানাগলি" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এ'দের দলগত সুন্দর অভিনয় নাটকটির একটি প্রধান সম্পদ। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীকালিপদ চক্রবর্তী। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে দক্ষতার সহিত অভিনয় করেছেন সর্বশ্রী বরেণ মুখার্জি, পান্না ব্যানার্জি, সারদা চক্রবর্তী, সুবীর সেনগুপ্ত, সুবোধ ব্যানার্জী এবং নাট্যপরিচালক অভিনেতা কালিপদ চক্রবর্তী। স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন রমা ব্যানার্জী এবং ঊষা বোস এবং রিক্তা সরকার। বিশেষ কয়েকটি চরিত্রে সুনামের সহিত অভিনয় করেন সর্বশ্রী
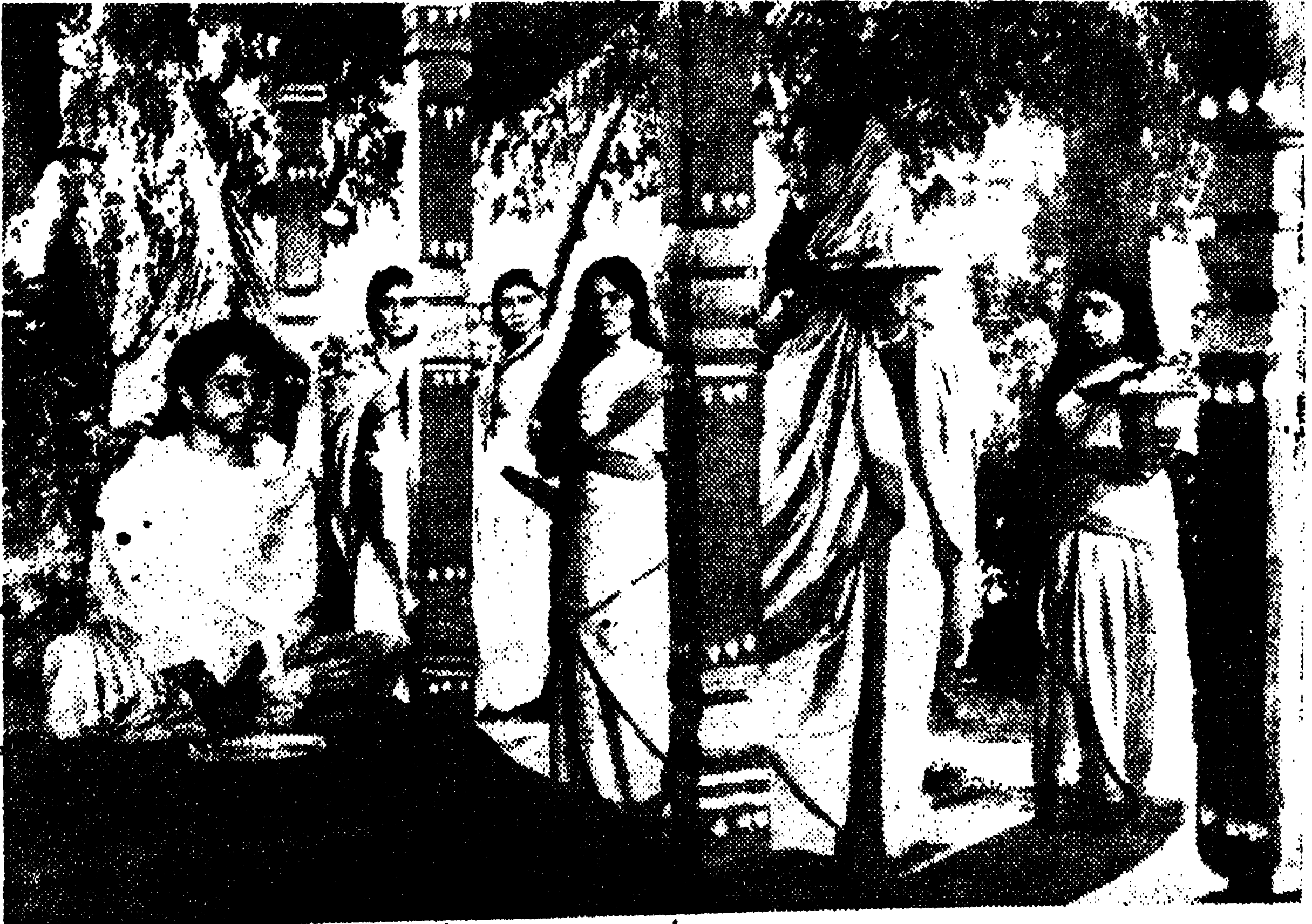
ভূপেন রায় পরিচালিত 'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রে উত্তম ব্যানার্জি, শিপ্রা দেবী ও অন্যান্যরা।

অজয় বসু, গোপী চক্রবর্তী, উমাকান্ত গাঙ্গুলী, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী এবং ভবতোষ ব্যানার্জী।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
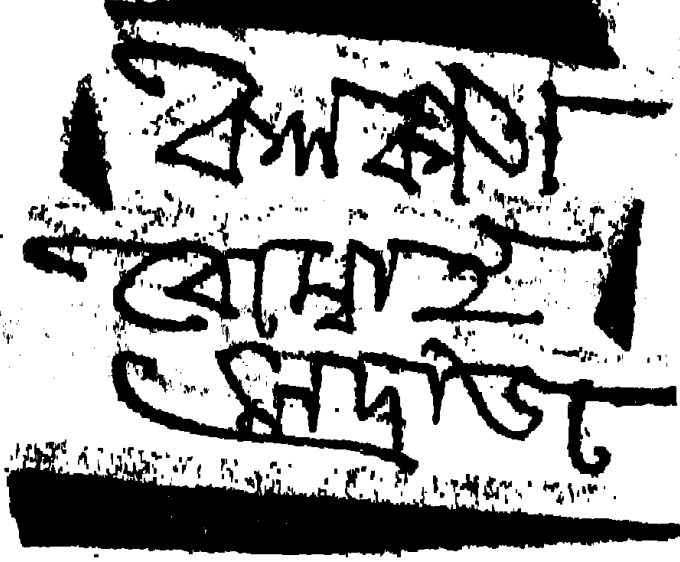
কলকাতা

রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওয় সম্প্রতি মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের 'ন্যায়দণ্ড' চিত্রের কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। জরাসন্ধ রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তন্দ্রা বর্মন, আশীষকুমার, অসিতবরণ, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সবিতা বসু, মঞ্জুলা সরকার, রবি ঘোষ, তপতী ঘোষ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। কুশলী বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন, আলোকচিত্রে—কানাই দে, শিল্পনির্দেশনায়—সুনীল সরকার, সম্পাদনায়—বি, নায়ক, রূপনে—শৈলেন গাঙ্গুলী ও সঙ্গীত পরিচালনায় আলী আকবর খাঁ।

যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত 'পলাতক' ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলেছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। জমিদার আংটী চ্যাটার্জীর নাটমহলে ঝুমুর দলের একটি বিরাট নৃত্য ও গানের দৃশ্য গ্রহণ করলেন আলোকচিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায়।

জমিদার বাড়ীর এই দৃশ্যে শিল্পী-সহ প্রায় আড়াইশো জন 'একস্ট্রা' উপস্থিত হয়েছিল। শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্পনির্দেশনায় নিখুঁত পরিবেশটি যে দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হচ্ছে। ভি, শান্তারাম প্রযোজিত এই চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, ভারতী দেবী ও রবি ঘোষ। সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় যুক্ত আছেন দুলাল দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সম্প্রতি 'কাইহীন' ছবির নায়ক চরিত্রে অনিল চ্যাটার্জীর কণ্ঠে একটি গান ছবির একটি দৃশ্যে গৃহীত হল। দিলীপ মিত্রের পরিচালনায় ছবির কাজ সমাপ্তপ্রায়। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন অনিল চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা রায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, রেণুকা রায়, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, অজিত চ্যাটার্জী ও তুলসী চক্রবর্তী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

উত্তমকুমার ফিল্মস্-এর প্রথম ছবি 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর সঙ্গীত-গ্রহণের পর প্রথম পর্যায়ে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকটি প্রধান দৃশ্যে অভিনয় করেন দ্বৈতভূমিকায় উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। নারী-চরিত্রে প্রধান শিল্পীরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও সবিতা বসু। এ মাসের শেষে দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবেন পরিচালক মানু সেন। কুশলী কর্ম-নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন আলোকচিত্রে—অনিল গুপ্ত, সম্পাদনায়—হরিদাস মহালনবিশ, শিল্পনির্দেশনায়—সুনীল সরকার, রূপকার—শক্তি সেন ও সংগীত পরিচালনায় শ্যামলকুমার মিত্র। বিদ্যাসাগর রচিত ভ্রান্তিবিলাস অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন তরুণকুমার, ছায়া দেবী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানি, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতী করালি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তমাল লাহিড়ী। ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ছায়াবাণী।

বোম্বাই

সম্প্রতি 'সেহ্‌রা' ছবির প্রযোজক ও পরিচালক ভি, শান্তারাম রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক অঞ্চলে প্রায় দু'মাসকাল চিত্রগ্রহণ শেষ করে ফিরেছেন। বিকানীর বহির্দৃশ্যে একমাস অবস্থানকালে যোধপুর ও আলোয়ারে-এ ছবির মধ্য দৃশ্যগুলি গৃহীত হয়েছে।

'আপনা ঘর আপনি কহানি'-এর জন্য নায়ক-নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বীণা রাই ও শেখর। রচনা ফিল্মস-এর ছবিটি পরিচালনা করবেন পরিচালক রুপী মজুমদার। রাজনাথ কোছের প্রযোজিত এ ছবির সংগীত পরিচালক এন দত্ত।

ন্যাশনাল ফিল্মস-এর 'পুনরমিলন' ছবিতে মাতা ও পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছেন লীলা চিটনীস ও বলরাজ

জাহানী। নরেন্দ্র দেব পরিচালিত শশিকলা, জয়দীপ ও অমিতা, অভিনীত এ ছবির আর একটি আকর্ষণ। সঙ্গীত ও প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন সি অর্জুন ও রবীন্দ্র দেব।

প্রযোজক ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'শর্মিলা' ছবির এ মাসেই বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে। উত্তমকুমার ও ওয়াহিদা রেহমান ছাড়াও এ ছবির অতিথি-শিল্পী হিসেবে বিশ্বজিৎকে একটি বিশেষ দৃশ্যে দেখা যাবে। সম্ভবত মঞ্জু দে ছবির আর এক আকর্ষণ। ছবিটি পরিচালনা করছেন বীরেন নাগ।

নীতিন বসু পরিচালিত ও ভারতভূষণ প্রযোজিত 'দুজ কা চাঁদ' চিত্রের একটি বহির্দৃশ্য কোলহাপুর অঞ্চলে গৃহীত হল। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ভারতভূষণ, বি সরোজা দেবী, চন্দ্রশেখর, আগা, মুরাদ, জীবন জলিল, রাজকুমার ও ভি, গোপাল। ছবির সঙ্গীত পরিচালক রোশন।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের পরবর্তী 'বন্দিনী' ছবিতে বহুদিন পর আপনারা সঙ্গীত পরিচালক শচীনদেব বর্মনের স্বকণ্ঠে গান শুনতে পাবেন। সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় শ্রীবর্মনের কণ্ঠে এ গান গৃহীত হয়।

অসীম পাল পরিচালিত 'দুই বাড়ী' চিত্রের একটি দৃশ্যে পাহাড়ী সান্যাল ও তন্দ্রা বর্মণ।

মাদ্রাজ

এ, ভি, এম-এর আগামী একটি চিত্রের জন্য সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে মদনমোহন স্বাক্ষর করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন ভীম সিং। নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মালা সিনহা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা সংকল্পে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী কে কামারাজ একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তামিল ছবিতে অভিনয় করছেন। প্রযোজক এম, জি রামচন্দ্রন-এর এই ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। এই প্রতিরক্ষা সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে শিবাজী গণেশন যে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন সেটি বর্তমানে মুক্তি পেয়েছে।

তেলেগু ছবি 'পেন্ডুলি পিলুপু'-র কানাড়া ভাষায় গৃহীত হচ্ছে বহুনি স্টুডিওয়। জানকী, লীলাবতী, রাজকুমার, রাজাশঙ্কর, রামা দেবী ও বালকৃষ্ণ প্রভৃতি শিল্পী এ ছবির মুখ্য চরিত্র। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন জি কে ভেংকটেস।

—চিত্রদূত